তাফসীরে মাযহারী

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)

প্রথম খন্ড

www.eelm.weebly.com

তাফসীরে মাযহারী

প্রথম খন্ড

প্রথম ও দ্বিতীয় পারা

কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভূঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

www.eelm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

মহাকালের পথ ধরে মহাজীবনের পথে এগিয়ে চলেছে মানুষ। যাত্রা শুরু হয়েছে রূহের জগত থেকে। তারপর পৃথিবীর পথ। তারপর মৃত্যুর অনিবার্য তোরণ। তারপর অনন্ত জীবন। সে জীবনে রয়েছে চির-স্বস্তি অথবা চির-শাস্তি। ওই স্বস্তি ও শাস্তির বিষয়টি নির্ধারিত হবে পৃথিবীর কর্মকান্ডের উপরেই। তাই ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনকে সংযত, শুদ্ধ ও পরিশীলিত না করে আমাদের উপায়ই নেই। ঔদাসীন্য ও স্বেচ্ছাচরণ তাই আমাদের জন্য নিষিদ্ধ ও অসিদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

মাটির মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহের সীমা পরিসীমা নেই। অনন্ত জীবনের প্রস্তুতিপর্ব এই পৃথিবীতে তিনিই প্রেরণ করেছেন আমাদের প্রকৃত সুহৃদ নবী ও রসুলগণকে। এ হচ্ছে তাঁর অপার অনুকম্পা। তাঁদের মাধ্যমেই এসেছে জ্ঞান, প্রেম ও পথনির্দেশনা।

জ্ঞানের পথই প্রকৃত পথ। আর প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে প্রত্যাদেশসঞ্জাত জ্ঞান। মহাগ্রন্থ আল কোরআনই সর্বশেষ প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ। প্রত্যাদেশ (ওহী) আর আসবে না। সুতরাং শেষতম, শ্রেষ্ঠতম ও পূর্ণতম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ মহাজ্ঞানের আকর এই কোরআনুল করিমের দ্যুতিকেন্দ্রে এসে দাঁড়াতেই হয় সকলকে। বিশ্বাসীকেও। অবিশ্বাসীকেও। কিন্তু বিশ্বাসীরা পথ পায়। অবিশ্বাসীরা পায় না। বিকৃত বিশ্বাসীরাও পথে থেকে যায়। গন্তব্যের সন্ধান জানে না। আমরা যারা চাই জ্ঞানের উদ্বোধন, চাই পথ ও পথশেষের নির্ভুল সফলতা — তাদেরকে কোরআনকেন্দ্রিক মানস গঠন করতেই হবে। এর বিকল্প কিছু নেই।

অনস্তিত্বের অন্ধকারে আমরা আলো হয়ে ফুটেছি। কার দয়ায়? কার দানে? কার অভিপ্রায়ে? কার মহিমায়, কার পরাক্রমে নিশ্চিত হচ্ছে আমাদের জীবন, আমাদের মৃত্যু, আমাদের জীবনোপকরণ। আমাদের রোদনে ও রহস্যে বার বার এ সকল প্রশ্ন নাড়া দিয়ে যায়।

অনুসন্ধিৎসার বিরল বাতাসে বার বার আন্দোলিত হতে হতে আমরা এখন এসে পড়েছি একবিংশ শতাব্দীর উপকূলে। সাথে করে এনেছি উত্তরাধিকার, অঙ্গীকার — মহাযাত্রার, মহাজীবনের। অভিজ্ঞানের অনন্ত অভিযাত্রা অকূল পাথারের হাতছানি হয়ে আমাদেরই জন্য অপেক্ষমান। যারা যাত্রী তারা কোথায়?

এসো মানবতা। এসো বেহেশত থেকে আগত প্রথম মানুষের রক্তপ্রবাহ। এসো শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের অক্ষয় প্রজ্ঞার উত্তরাধিকার — এসো গ্রহণ করি আমাদের সত্তার, আত্মার, পিপাসার পরিচয়। প্রত্যাদেশিত পাদপ্রদীপেই তো রয়েছে আমাদের প্রত্যয়িত প্রশ্রয়। সন্তাপবিহীন, স্খলনহীন আশ্রয়।

মূর্খতার তিমির ভেদ করে আমাদেরকেই হয়ে উঠতে হবে সূর্যোদয়সম জ্ঞানোদয়ের শাদা ভোর। তাজা প্রত্যূষ। শানিত সকাল। তাই এই অনন্য আধ্যাত্মিক উৎসব। মহাগ্রন্থ আল কোরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণসমৃদ্ধ অমর উদ্যোগ তাফসীরে মাযহারীর বঙ্গ-পদবিক্ষেপ।

বাংলাদেশের মর্মমূলে রয়েছে আল্লাহ্ প্রেম, নবী প্রেম ও অনন্তজীবনের প্রেম। কিন্তু হৃদয়ের এই অনাবিল আর্তিকে আমরা মান্য করেছি বড় বিলম্বে। নইলে প্রায় তিনশ' বছর আগের এই কালজয়ী সৃষ্টিকে এতদিন পরে বঙ্গ-দর্পণে ও দর্শনে প্রতিবিম্বিত হতে দেখবো কেনো?

তাফসীরে মাযহারী প্রণেতা শ্রদ্ধার্হ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী র. ছিলেন প্রথিতযশা আলেম ও আরেফ। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান জিন্নুরাইনের অধস্তন বংশধর ছিলেন তিনি। ছিলেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের

www.eelm.weebly.com

হানাফী মাযহাবের একনিষ্ঠ অনুসারী ও বোদ্ধা। আর ছিলেন আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে নেসবতে সিদ্দীকির (হজরত আবুবকর সিদ্দীক রা. এর আত্মিক সংশ্লিষ্টতার) রঙে পূর্ণ রঞ্জিত। মোজাদ্দেদিয়া তরিকার তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ আরেফ হজরত মাযহারে শহীদ জানে জানা র. এর প্রিয় মুরিদ ও খলিফা ছিলেন তিনি। এভাবেই তিনি তাঁর প্রজ্ঞাকে করেছিলেন অধীত বিদ্যা (এলমে হুসুলী) এবং সত্তাসঞ্জাত বিদ্যার (এলমে হুজুরীর) অবাক সমাহার। তাই তাঁর বিবরণে রয়েছে একই সঙ্গে রহস্যের সুবাস, বুদ্ধির ঝলক এবং সুসিদ্ধান্তের সংশ্লেষ। তাফসীর শাস্ত্রের জগতে তিনি এনেছেন বর্ণনা পরম্পরার (রেওয়ায়েতের) সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির (দেরায়েতের) সম্মিলিত নির্ভরতা। তার সঙ্গে মিলিয়েছেন অন্তর্দৃষ্টির (ফেরাসাতের) নিখুঁত পর্যবেক্ষণকে। তাই তিনি কালজ হয়েও কালোত্তর। অন্তরাল হয়েও স্মরণমুখর।

যারা স্থূলদর্শী এবং তাফসীর শাস্ত্রকে স্বকপোলকল্পিত মতবাদের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করতে অভ্যস্ত তারা তো পেচকসদৃশ। সমুজ্জ্বল সূর্যালোক তাদের কাম্য নয়। তারা এ আলো এড়িয়ে চলতে চায়। তাফসীরে মাযহারীর বিলম্বিত বঙ্গায়নকেও তারা হয়তো শুভদৃষ্টিতে দেখতে নারাজ।

অন্তরের আলো ছাড়া কোনো বিষয়ের মূল প্রকৃতি অনুভবগ্রাহ্য হয় না। আলোকিত অন্তর্লোক ছাড়া সরল পথরেখা দৃষ্টিগ্রাহ্যও হয় না। আর শ্রুতির আওতায়ও আসে না আল্লাহ্পাকের অমোঘ ঘোষণাটি — আলা লিল্লাহিদ্ দীনুল খলিছ (সাবধান হও -আল্লাহ্র জন্যই বিশুদ্ধ ধর্ম)। এই অন্তর্লোকের প্রবহমানতাকে যথামান্যতা দিয়েছেন আমাদের সম্মানিত তাফসীরকারক। তাফসীর গ্রন্থটির নামকরণে মুদ্রিত রেখেছেন তাঁর পীর কেবলা ও কাবা'র নাম। কারণ, প্রকৃত অর্থেই জ্ঞানী ছিলেন তিনি। পীর ও মোর্শেদের তাওয়াজ্জোহ্ ব্যতিরেকে যে মানুষের জ্ঞানকেন্দ্রের সম্ভাবনার পূর্ণউন্মোচন ঘটেনা — তা তিনি জানতেন। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মোজাদ্দেদ হজরত শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সংস্কার প্রবাহের এক বিরল বিকাশকে তাঁর মাধ্যমে বিকশিত হতে দেখেছি আমরা। সেই মহান মোজাদ্দেদের খলিফা ছিলেন হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম সেরহিন্দী — তাঁর খলিফা খাজা সাইফুদ্দিন সেরহিন্দী — তাঁর খলিফা খাজা নূর মোহাম্মদ বদাউনি এবং তাঁর খলিফা ছিলেন মাযহারে শহীদ জানে জানাঁ রহমতুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন।

আমরা আমাদের অযোগ্যতাকে স্বীকার করেই মহাগ্রন্থ আল কোরআনের এই জ্ঞানগর্ভ তাফসীর গ্রন্থটি বাংলায় রূপান্তরিত করবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া কেন্দ্রিক কতিপয় ফকির দরবেশের যুথবদ্ধ উদ্যোগটিকে আল্লাহ্পাকই তাঁর আপন করুণায় বাস্তব রূপ দিয়ে চলেছেন। দ্বিধাজড়িত পদবিক্ষেপকে দান করেছেন শক্তি, সহায়তা ও বাস্তবতা। আর আমরাও এগিয়ে চলেছি কেবল সংকল্পের বিশদ্ধতাকে অবলম্বন করে। আমাদের সঙ্গী হিসেবে সদাজাগ্রত রয়েছে ভয় ও সাহস। পাপী আমরা। সকল অপরাধের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রাপ্তির নিবেদন জানিয়ে চলেছি আমাদেরই পরম প্রেমময়

www.eelm.weebly.com

প্রভুপ্রতিপালক আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর দরবারে। হে আমাদের প্রিয় প্রতিপালক। আমাদেরকে মার্জনা করো। চিরতরে আমাদেরকে নিমজ্জিত করো তোমার দয়া ও ভালোবাসার সীমাহীন সমুদ্রে। সকল পবিত্রতা, স্তবস্তুতি তোমার। সকল গৌরব, কৃতিত্ব ও মহিমাও তোমার। তুমি রহমান। তুমি গফুর। আমরা তোমারই মিলন প্রত্যাশী। আমাদের বিরহকাতরতাকে প্রশমিত করো। যে মহাগ্রন্থ তুমি অবতীর্ণ করেছো তোমার অক্ষরের অমুখাপেক্ষি (উম্মি) রসুলের বক্ষাধারে তার আক্ষরিক অধ্যয়নের মাধ্যমে তোমার অতুলনীয় বানীবৈভবের দ্যুতিচ্ছটার সন্ধান যেনো আমরাও পাই।

হে আমাদের জীবন মৃত্যুর অধিকারী মহারাজাধিরাজ আল্লাহ্। তোমার অপার পরাক্রমে আমরা সন্ত্রস্ত। আমাদেরকে পরিত্রাণ দাও। দাও ভালোবাসা — তোমার, তোমার প্রিয়তম রসুলের। রসুলশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে দয়া করে পৌঁছে দাও আমাদের অন্তরোৎসারিত অফুরন্ত দরুদ ও সালাম — তাঁর সকল নবী রসুল ভ্রাতৃবৃন্দ, সম্মানিত সহচরবৃন্দ, পবিত্র পরিবার পরিজন, বংশধর ও আউলিয়া সম্প্রদায়কেও। তাঁরা তোমারই দল। তোমার দলই বিজয়ী। তাঁদের মাধ্যমে বিশেষ করে পীর ও মোর্শেদের মাধ্যমে আমাদেরকেও দান করো বিজয়। প্রবৃত্তির উপর। পার্থিবতার উপর। অজ্ঞতার উপর। আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ (বিশ্বাস) প্রদাতা হে আমাদের আল্লাহ্ — এই অধম ফকিরের প্রিয় ফরজন্দ ও অনুবাদক মাওলানা তালেব আলীর অনুবাদ প্রচেষ্টাকে কবুল করো। কবুল করো এই প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আর্থিক ও শারীরিক সকল প্রকার সহযোগীকে। আমাদেরকে দাও পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। আর আমাদেরকে নিরাপদ রাখো আগুনের আযাব থেকে। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

উল্লেখ্য — বাংলা তরজমাটি আমরা গ্রহণ করেছি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কুরআনুল করীম থেকে। কারণ, এই তরজমাটিই আমাদের বিবেচনায় অধিকতর সুন্দর। এর জন্য আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতি জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আরো উল্লেখ্য — মূল তাফসীরে মাযহারী আরবী ভাষায় রচিত। আর আমাদের অনুবাদটি করা হয়েছে দিল্লীর নাদ্ওয়াতুল মুসান্নিফের পরিচালক মাওলানা আবদুদ্ দাঈমের উর্দু তরজমা থেকে।

বিদগ্ধ পাঠক সমাজের নিকট আবেদন — মুদ্রণজনিত কিংবা অন্য কোনো বিচ্যুতি দৃষ্টিতে এলে জানাবেন। সকলের জন্য কল্যাণ কামনা ও সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভূঁইগড়, পাগলাবাজার, নারায়ণগঞ্জ।

www.eelm.weebly.com

সূচীপত্র

প্রথম পারা — সুরা ফাতিহা ঃ আয়াত ১ — ৭

নামকরণ /১৫
বিস্‌মিল্লাহ্ কি সুরা ফাতিহার অংশ /১৮
ফযীলত /২৮

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১ — ১৪১

বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা (হরূফে মুকাত্তায়াত) /৩২
মুত্তাকীরাই হেদায়েত প্রাপ্ত /৩৯
ইমানের অর্থ /৪১
মুত্তাকীগণ বিশুদ্ধচিত্ত /৪৪
এলমে হুসুলী ও এলমে হুজুরী /৪৬
ইহুদীরা মুনাফিক /৫০
সাহাবাগণ সত্যের মাপকাঠি /৫৫
মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত /৫৯
আকাশ ও পৃথিবী প্রসঙ্গ /৭০
সর্বশ্রেষ্ঠ পদবী — আল্লাহ্‌র বান্দা /৭২
অবিশ্বাসীদের জন্য দোজখ /৭৪
বিশ্বাসীদের জন্য জান্নাত /৭৫
কাফেরদের উপমা /৮২
অনস্তিত্ব,জীবন, মৃত্যু, পুনরুজ্জীবন /৮৪
আকাশের সংখ্যা /৮৯
পৃথিবীর প্রতিনিধি সৃষ্টি /৯৪
ফেরেশতাদের অনুযোগ /৯৬
মৃত্তিকাসম্ভূত মানুষই আল্লাহ্‌র দীদার লাভের যোগ্য /৯৭
হজরত আদমের শ্রেষ্ঠত্ব /৯৯
ইবলিসের অবাধ্যতা /১০৫
হজরত আদম ও হজরত হাওয়া /১১০
শয়তানের প্রতারণা /১১১
প্রথম মানুষের পৃথিবীতে অবতরণ /১১৪
বনী ইসরাইলদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ /১১৮
আল কোরআনকে মান্য করার নির্দেশ /১২২
বেআমল উপদেশ দাতার অবস্থা /১২৬
ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা /১২৮
কিয়ামতের অবস্থা /১৩২
ফেরাউনের অত্যাচার /১৩৩
ফেরাউন বাহিনীর সলিল সমাধি /১৩৪

www.eelm.weebly.com

গো-বৎস মূর্তির উপাসনা /১৩৮
তওবা ও আত্মহনন /১৪০
হজরত মুসার তুর পর্বত গমন /১৪২
মান্না ও সালওয়া /১৪৪
প্রান্তরের বন্দী জীবন /১৪৮
বনী ইসরাইলদের অবাধ্যতা /১৫১
ইহুদী, খৃষ্টান ও সাবেঈন /১৫২
পাহাড় উত্তোলন /১৫৪
অবাধ্যরা হলো ঘৃণিত বানর /১৫৬
বিশেষ গরু জবাইয়ের নির্দেশ /১৫৭
বিশেষ গরু সম্পর্কে কুটতর্ক /১৬১
ইহুদীদের হৃদয় পাথর অপেক্ষাও কঠিন /১৬৬
মুনাফিকদের কপটতা /১৬৯
শেষ নবী সম্পর্কিত তথ্য বিকৃতি /১৭৫
ইহুদীদের অপবিশ্বাস ও তার পরিণাম /১৭৬
বনী ইসরাইলদের অঙ্গীকার /১৭৮
প্রেরিত পুরুষদের প্রতি অস্বীকৃতি /১৮২
ইহুদীদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশম্পাত /১৮৬
মৃত্যু কামনা সিদ্ধ না অসিদ্ধ /১৯৫
হজরত জিবরাইলের প্রতি অপবাদ /২০১
ফেরেশতা ও রসুলের শত্রুরাই আল্লাহর শত্রু /২০৫
ইহুদীদের অঙ্গীকার ভঙ্গ /২০৬
হজরত সুলায়মানের কথা /২০৮
যাদু, তন্ত্রমন্ত্র ও হারুত মারুতের কাহিনী /২১০
কলব, রুহ্ ও নফস /২১৬
রায়েনা ও উনজুরনা /২১৯
বিধান রহিতকরণ প্রসঙ্গ /২২১
নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ /২২৬
ইহুদী ও খৃষ্টানদের বির্তক /২২৮
সবদিকই আল্লাহ্র দিক /২৩১
আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করা থেকে পবিত্র /২৩৩
'হও' বললেই সবকিছু হয়ে যায় /২৩৫
আল্লাহ্র নিদর্শন দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্য /২৩৭
শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারী /২৩৮
হজরত ইব্রাহিমের প্রার্থনা /২৫১
কাবাগৃহ নির্মাণের নির্দেশ /২৫২
হাজারে আসওয়াদ /২৫৩
মক্কাবাসীদের জন্য প্রার্থনা /২৫৫

www.eelm.weebly.com

হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ /২৫৭
হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইয়াকুবের অসিয়ত /২৬০
সমর্পণকারীরা সকল রসুলকে মান্য করে /২৬৪
রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর /২৬৫
আল্লাহ্ পাকই তোমাদের ও আমাদের প্রতিপালক /২৬৭

দ্বিতীয় পারা — সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৪২ — ২৫২

কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ /২৬৭
মধ্যপন্থী উম্মত /২৭০
ইহুদীরা রসুলপাক স. কে আপন সন্তানবৎ চিনে /২৮৩
তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট রসুল /২৮৮
অর্জিত জ্ঞান, সত্তাসঞ্জাত জ্ঞান, এলমে লাদুন্নী /২৮৯
আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো /২৯২
ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা /২৯৫
শহীদগণ জীবিত /২৯৬
ধৈর্যশীলদের পরীক্ষা /২৯৯
সাফা ও মারওয়া /৩০২
সত্য প্রত্যাখানকারীদের প্রতি অভিশম্পাত /৩০৮
আকাশ পৃথিবী, দিবস, রাত্রি, বৃষ্টি, বাতাস, মেঘমালা /৩১০
আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসীদের ভালোবাসা /৩১২
হাশর প্রান্তরে অবিশ্বাসীদের অবস্থা /৩১৬
বৈধ ও পবিত্র খাদ্যগ্রহণের নির্দেশ /৩১৭
সত্য প্রত্যাখানকারীরা বধির, মুক ও অন্ধ /৩১৯
মৃতদেহ, রক্ত ও শুকরের গোশত হারাম /৩২১
আল্লাহ্র কিতাব গোপন করা হারাম /৩২৮
পুণ্য কর্মের বিবরণ /৩৩১
হত্যাকান্ডের দন্ড /৩৩৯
হত্যার বিনিময় হত্যা /৩৪১
কয়েকজন মিলে একজনকে হত্যা /৩৪৬
একজন কর্তৃক কয়েকজনকে হত্যা /৩৪৭
অসিয়ত সম্পর্কিত বিধান /৩৫২
রোজার বিধান /৩৫৬
মুসাফির ও পীড়িত ব্যক্তির রোজা /৩৫৯
রমজান মাস /৩৬৬
আমিতো নিকটেই থাকি /৩৭৬
রমজানের রাতে স্ত্রী সম্ভোগ /৩৮০
সেহেরীর শেষ সময় /৩৮২
এতেকাফ /৩৮৮

www.eelm.weebly.com

অন্যের অর্থসম্পদ গ্রাস করা হারাম /৩৯১
নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন /৩৯২
সীমা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ /৩৯৫
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় /৪০১
হজ, ওমরা, কোরবানী, মস্তকমুন্ডন, কংকর নিক্ষেপ /৪০৩
হজের মাস /৪২১
আরাফা ও মুজদালিফা /৪২৭
আইয়ামে তাশরিক /৪৩৮
পূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ করো /৪৫১
আল্লাহ্‌পাকের তাজাল্লী /৪৫৪
মানুষ এক মতাদর্শী ছিলো /৪৫৯
জান্নাতের পথ পরীক্ষা সংকুল /৪৬৩
জেহাদের বিধান /৪৬৫
পবিত্র মাসে যুদ্ধ /৪৭০
মদ ও জুয়া /৪৭৭
অংশীবাদী নারী ও পুরুষের সঙ্গে বিবাহ্ হারাম /৪৯৩
রজঃস্রাব সম্পর্কিত বিধান /৪৯৫
তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র /৪৯৬
শপথ, শপথ ভঙ্গের কাফফারা /৫০৪
তালাক, পুনগ্রহণ, নারীর উপর পুরুষের মর্যাদা /৫১৭
এক সঙ্গে তিন তালাকের মাসআলা /৫২৪
খোলা তালাকের মাসআলা /৫৩৪
ইদ্দত /৫৪৫
বংশগত সাম্য ও রমণীদের স্বেচ্ছাবিবাহ /৫৪৯
শিশুর স্তন্যপানের সময়সীমা /৫৫৭
পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ধাত্রী নিয়োগ /৫৬৪
বৈধব্য, ইদ্দত /৫৬৫
ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব /৫৬৮
তালাক বৈধ, কিন্তু নিকৃষ্ট /৫৭১
মধ্যবর্তী নামাজ /৫৭৪
ভয়সংকুল পরিবেশের নামাজ /৫৮০
তালাকপ্রাপ্তা নারীর ভরনপোষণ /৫৮১
হজরত হিযকিল কর্তৃক পুনরুজ্জীবন দানের ঘটনা দর্শন /৫৮৭
জেহাদ, উত্তম ঋণ /৫৯০
হজরত শামুয়েল নবীর ঘটনা /৫৯৪
তাবুত : একটি বিস্ময়কর সিন্দুক /৫৯৬
তালুত ও জালুতের ঘটনা /৬০০
হজরত দাউদ কর্তৃক জালুত বধ /৬০২

www.eelm.weebly.com

সূচীপত্র

তৃতীয় পারা — সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫৩ — ২৮৬

নবী ও রসুলগণের পারস্পরিক মর্যাদা এবং রসুলুল্লাহ স. এর শ্রেষ্ঠত্ব /১৬
আয়াতুল কুরসি /২২
জাকাত প্রদানের নির্দেশ /২২
কুরসী সম্পর্কিত আলোচনা /২৪
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, সৃষ্টি মুখাপেক্ষী /২৬
মহামর্যাদামণ্ডিত আয়াত /২৭
শয়তানের শিক্ষা /২৮
ইসলাম গ্রহণে বাধ্যবাধকতা নেই /২৯
আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের বন্ধু /৩২
হজরত ইব্রাহিম আ. ও নমরুদ /৩৪
হজরত উযায়ের নবীর বিস্ময়কর ঘটনা/ ৩৮
হজরত ইব্রাহিমের মৃতকে জীবন দানের ঘটনা দর্শন /৪০
আধ্যাত্মিক পর্বের উরুজ নুজুলের বিবরণ /৪১
দান সম্পর্কিত আলোচনা /৪৪
জাকাতের বিধান /৫১
কৃপণতা ও বদান্যতা /৫৮
হিকমত প্রসঙ্গ /৫৯
গোপন দান /৬১
যাঞ্চাকারীর নিন্দা /৬৫
সুদখোরদের পরিণতি /৬৭
সুদ, ক্রয় বিক্রয়, ঋণ /৬৯
সুদ ও দান /৮৬
সুদের শাস্তি /৮৯
ঋণগ্রহিতাকে অবকাশ দানের ফযীলত /৯০
ঋণ আদান প্রদানের নিয়ম, লেখক ও সাক্ষ্যদাতা /৯৪
রমণীদের সাক্ষ্য /১১০
মুনাফিকদের নিদর্শন /১১১
বিচারক ও সাক্ষ্যদাতা /১১২
বন্ধক, আমানত /১১৭
অবয়বধারী ও নিরাবয়ব সৃষ্টি /১২৪
অন্তর ও বাহিরের পাপ /১২৪
তাসাওফপন্থীরাই বিনা হিসাবে বেহেশতী /১২৮
সাহাবীগণের ফযীলত, নাজাতপ্রাপ্ত দল /১৩১
সাধ্যাতীত দায়িত্ব দেয়া হয় নাই /১৩২

www.eelm.weebly.com

সুফীগণের তরিকায় চলা ফরজ /১৩৫
সুরা বাকারার শেষ আয়াতের ফযীলত /১৩৮

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১ — ৯১

হজরত ইসা আ. সম্পর্কে বিতর্কের জবাব /১৪১
মানব জন্মের বিবরণ /১৪৫
সুস্পষ্ট ও রহস্যাচ্ছন্ন আয়াত /১৪৬
ওলামায়ে রসেখীন, এলমে লাদুন্নী /১৫২
সত্যলংঘনপ্রবণতা থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা /১৫৪
কিয়ামত, সত্যপ্রত্যাখানকারীদের পরিণতি /১৫৫
বদরযুদ্ধ এক অলৌকিক নিদর্শন /১৫৮
পৃথিবীপ্রীতি ও আল্লাহপ্রীতি /১৬০
বেহেশতের বিবরণ /১৬২
ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, দানশীল, উষাকালে ক্ষমাপ্রার্থী /১৬৬
এককত্বের সাক্ষ্য /১৬৯
ইসলামই একমাত্র ধর্ম /১৭০
ধর্মপ্রচারই মূল কর্তব্য /১৭২
নবীহন্তারক ইহুদী সম্প্রদায় /১৭৩
কোরআনই মীমাংসাকারী /১৭৬
পারস্য ও রোম বিজয়ের সুসংবাদ /১৭৭
ইচ্ছার সর্বাধিগম্যতা /১৭৮
দিবস-রাত্রি, জীবন-মৃত্যু /১৭৯
অবিশ্বাসীর সঙ্গে বিশ্বাসীদের বন্ধুত্ব /১৮১
জ্ঞানের সর্বপরিব্যপ্ততা /১৮৩
আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের আনুগত্য /১৮৫
হজরত আদম, নূহ, ইব্রাহিম ও ইমরান /১৮৮
হজরত মরিয়মের জন্ম /১৯১
হজরত যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে /১৯২
হজরত যাকারিয়া প্রার্থনা /১৯৫
হজরত মরিয়মের মর্যাদা /১৯৬
হজরত খাদিজা, আয়েশা, ফাতেমা এবং আসিয়ার মর্যাদা /১৯৭
হজরত ঈসার জন্ম /১৯৯
হজরত ঈসার মোজেজা /২০০
হজরত ঈসার আহ্বান /২০৫
হজরত ঈসার আকাশারোহণ /২০৮
হজরত আদম এবং হজরত ঈসার দৃষ্টান্ত /২১১
মুবাহিলার আহ্বান /২১৩
তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের মূল কথা /২১৬

www.eelm.weebly.com

হজরত ইব্রাহিম ছিলেন একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী /২২০
নাজ্জাশীর দরবারে /২২২
ইহুদীদের মুখোশ উন্মোচন /২২৫
ইহুদীদের আমানত আত্মসাৎ ও আমানতদারী /২২৭
সম্পদ আত্মসাতের শাস্তি /২২৯
ইহুদী, খৃষ্টানদের কুটতর্ক/২৩৪
আল্লাহ ও নবীগণের অঙ্গীকার /২৩৬
তাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত /২৪০
তওবার অর্থ /২৪১

চতুর্থ পারা — সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৯২ — ২০০

প্রিয় বস্তু দান প্রসঙ্গ /২৪৫
খাদ্যবস্তু হালাল হারাম প্রসঙ্গ /২৪৯
সর্বপ্রথম গৃহ /২৫১
কাবা শরীফের মর্যাদা /২৫৩
হজের মাসায়েল /২৫৭
ইহুদীদের অপচেষ্টা /২৬৩
আহলে বাইতের মর্যাদা /২৬৭
কামালতে বেলায়েত অর্জন ওয়াজিব /২৬৯
দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র রশি ধারণের নির্দেশ /২৭১
বাহাত্তরটি দোজখী ও একটি বেহেশতী দল /২৭৩
আকাবা প্রান্তরে মদীনাবাসীদের ইসলাম গ্রহণ /২৭৮
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ /২৮০
সাহাবীগণ নক্ষত্র তুল্য /২৮৪
বিশ্বাসীদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, অবিশ্বাসীদের হবে কৃষ্ণকায় /২৮৫
উজ্জ্বল মুখাবয়ববিশিষ্ট হবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত /২৮৬
শেষ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব /২৮৮
ধর্মপ্রচারক মোর্শেদের মর্যাদা /২৯০
বিশ্বাসীদের প্রতি সান্ত্বনা /২৯২
আহলে কিতাব মুসলমানদের মর্যাদা /২৯৪
সত্যপ্রত্যাখানকারীদের দোজখবাস চিরস্থায়ী /২৯৬
অবিশ্বাসীদের মনোভাব /২৯৮
উহুদের রণপ্রস্তুতি /৩০২
বদর যুদ্ধের স্মৃতিচারণ /৩০৬
সাহায্য কেবল আল্লাহর দিক থেকেই হয় /৩০৯
রসুল স. এর বদদোয়া /৩১১
সকল প্রকার সুদ হারাম /৩১৩
জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান /৩১৪

www.eelm.weebly.com

দানশীলতার ফযীলত /৩১৫
আহলে এহ্সান অর্থ সুফীয়ায়ে কেরাম /৩১৭
সগীরা ও কবীরা গোনাহ, তওবা, ক্ষমা /৩১৭
হেদায়েতের প্রতি আহ্বানকারীর ফযীলত /৩২০
উহুদ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ের ঘটনা /৩২৪
জেহাদের ফযীলত /৩২৬
রসুল স. এর শহীদ হওয়ার সংবাদে হতবিহ্বলতা /৩২৭
রসুল মোহাম্মদ স. এর প্রশংসা /৩২৯
উহুদ যুদ্ধের কাহিনী /৩৩০
মৃত্যুর জন্য রয়েছে নির্ধারিত সময় /৩৩৪
নবী ও রব্বানীগণের ক্ষমাপ্রার্থনা /৩৩৬
সত্যপ্রত্যাখানকারীদের আনুগত্য নিষিদ্ধ/৩৩৭
আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্তির শর্ত — ধৈর্য ও সাবধানতা /৩৩৯
মুসলমান বাহিনীকে তন্দ্রাচ্ছন্নতার মাধ্যমে নিরাপত্তা দান /৩৪৩
হজরত ওসমান রা. এর মর্যাদা /৩৪৬
তকদীর অস্বীকার কুফরী /৩৪৭
পরামর্শ বিনিময়ের গুরুত্ব /৩৪৮
তাওয়াক্কুলের অর্থ /৩৪৯
গনিমত সম্পর্কিত বিবরণ /৩৫২
খেলাফতের অধিকার কোরাইশদের /৩৫৬
উহুদের বিপর্যস্ততার উদ্দেশ্য /৩৬০
মৃত্যুর সময় ও স্থান সুনির্দিষ্ট /৩৬১
শহীদগণের মর্যাদা /৩৬২

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১ — ২৩

এতিম নারীদের বিবাহ /৪২৮
বিবাহের মাসায়েল /৪৩০
স্ত্রীদের সম অধিকার /৪৩৪
মোহরানা /৪৩৫
এতিমের সম্পদ প্রত্যর্পণ /৪৩৯
সম্পদের উত্তরাধিকার /৪৫৫
আকদারিয়ার মাসআলা /৪৬৪
মাসআলায়ে হেমারিয়া /৪৭৪
মাসআলায়ে আওল /৪৭৮
ব্যভিচারের শাস্তি /৪৯০
তওবা ও ক্ষমা /৪৯৪
নারীনির্যাতনের নিষিদ্ধতা /৪৯৭
মোহরানার পরিমাণ /৪৯৯
যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ /৫০৭
দুধ পানের মাসায়েল /৫১১

www.eelm.weebly.com

সূচীপত্র

পঞ্চম পারা — সুরা নিসা ঃ আয়াত ২৪ — ১৪৭

হিজরতকারিণী রমণী প্রসংগ/১৫
যুদ্ধবন্দিনী প্রসংগ/১৬
মোহরানা ছাড়া বিবাহ বৈধ নয়/১৯
মোহরানা নির্ধারণের নিয়ম/২১
মোহরানার ন্যূনতম সীমা/২৬
মুত্‌আ প্রসংগ/২৯
মুত্‌আ হারাম/৩০
বিবাহ প্রসংগ/৩৭
মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল/৪৮
ব্যবসা, ক্রয়-বিক্রয়, উপার্জন/৪৯
আত্মহত্যা নিষিদ্ধ/৫২
সম্পদ আত্মসাৎ ও অন্যায়ভাবে হত্যা/৫৪
কবীরা গোনাহ্ ও সগীরা গোনাহ্/৫৫
ফাসেক ব্যক্তির প্রশংসা করা হারাম/৫৮
হুজুরী কল্‌ব ছাড়া পাপমুক্ত হওয়া যায় না/৬২
পুণ্যকর্মের বিনিময়/৬৪
উত্তরাধিকার প্রসংগ/৬৫
পুরুষ রমণীর অভিভাবক/৬৭
পুণ্যবতী রমণীর বৈশিষ্ট্য/৬৮
ওই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তম তার স্ত্রীর নিকট/৭১
ইবাদতের সংজ্ঞা/৭৪
পিতা-মাতার অধিকার/৭৬
আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও প্রতিবেশীর অধিকার/৭৬
সঙ্গী-সাথী, পথচারী ও দাস দাসীদের অধিকার/৭৭
কৃপণতার নিন্দা/৭৯
লোক দেখানো দান দূষণীয়/৮০
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়/৮১
আল্লাহ্ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না/৮২
মুমিনদের সাক্ষ্য/৮৪
কিয়ামতের অবস্থা/৮৬
অপবিত্রতার গোসল/৯০
ওজু ও তায়াম্মুম/৯৩
ওজুবিহীন অবস্থার মাসায়েল/৯৪
ওজু ভঙ্গের কারণ/৯৭
তায়াম্মুমের নিয়ম/১০৯
জখমের উপর মসেহ্/১১৭
পানি ও মাটি কোনোটাই যদি না পাওয়া যায়/১১৮
ইহুদীদের ইচ্ছা — মুসলমানেরাও পথভ্রষ্ট হোক/১২০
শনিবার অমান্যকারীদের প্রতি অভিসম্পাত/১২৫
আল্লাহ্‌র শরীক করার পাপ ক্ষমার্হ নয়/১২৭
আল্লাহ্‌পাক শাশ্বত, চিরবিদ্যমান, অবিনাশী/১২৭
হজরত ওয়াহ্‌শী ও তাঁর সঙ্গীদের ঘটনা/১২৮
শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা আল্লাহ্‌পাকের দান/১৩০

www.eelm.weebly.com

নবী রসুল ব্যতীত অন্য কেউ নিস্পাপ নয়/১৩১
জিবত্ ও তাগুত কাকে বলে/১৩৩
সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তি/১৩৮
বিশ্বাসীদের পুরস্কার/১৪১
আমানত প্রত্যর্পণের নির্দেশ/১৪২
কাবা শরীফের চাবি রক্ষক/ ১৪২
ফানা ও বাকা প্রসঙ্গ/১৪৫
ইনসাফ— আমানতের একটি শাখা/১৪৭
ন্যায়বিচারকের মর্যাদা/১৪৭
আল্লাহ্, রসুল এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের আনুগত্য/১৪৮
শাসকের আনুগত্য/১৫২
হজরত ওমর কর্তৃক মুনাফিক হত্যা/১৫৪
তাগুতের শরণ প্রার্থনা নিষিদ্ধ/১৫৪
ক্বওলাম বালিগা বা মর্মস্পর্শি বচন/১৫৮
নবীকে মান্য করতে হবে/১৬০
নবীর সিদ্ধান্ত বিরোধীরা ইমানদার নয়/১৬২
সাহাবীগণ ছিলেন সতত অনুগত/১৬২
নবী, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ/১৬৫
অস্ত্রসজ্জিত হওয়ার নির্দেশ/১৭০
আল্লাহ্র পথে নিহত ও বিজয়ীর পুরস্কার/১৭০
জেহাদের নির্দেশ/১৭১
মৃত্যুর সময় ও স্থান সুনির্ধারিত/১৭৬
কল্যাণ আল্লাহ্র নিকট থেকে, অকল্যাণ নিজের দিক থেকে/১৭৭
রসুলের আনুগত্যই আল্লাহ্র আনুগত্য/১৭৯
কোরআন অনুধাবনের নির্দেশ/১৮০
উলিল আমর সাহাবীগণের মর্যাদা/১৮২
আল্লাহ্র পথে সংগ্রামের নির্দেশ/১৮৩
ভালো ও মন্দ কাজের সুপারিশ/১৮৪
অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদন/১৮৬
কে কাকে কখন অভিবাদন করবে/১৮৮
কিয়ামতের দিন একত্রিকরণ সুনিশ্চিত/১৯১
হিজরত তিন ধরনের/১৯৫
বিশ্বাসীকে হত্যা করা সংগত নয়/১৯৯
ভুলবশতঃ হত্যা/২০০
ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ হত্যা/২০২
রক্তপণ প্রসঙ্গ/২০২
হত্যার কাফ্ফারা/২০৩
ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করলে/২০৬
কলেমা পাঠকারীকে অযথা সন্দেহ করা যাবে না/২২৫
যারা জেহাদ করে এবং যারা করে না/২২৯
সুযোগ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যারা হিজরত করে না/২৩৫
হিজরতের ফযীলত/২৩৮
সফরের নামাজ/২৪৩
ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজ/২৫৬
দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ/২৬৩
নামাজের সময়/২৬৪

www.eelm.weebly.com

কিতাব অনুসারে বিচার মীমাংসার নির্দেশ/২৭০
আল্লাহ্ বিশ্বাসভঙ্গকারী পাপীকে ভালোবাসেন না/২৭৪
দান-খয়রাত, সৎকার্য, শান্তি স্থাপন/২৭৮
রসুলের বিরুদ্ধাচরণ আযাবকে অবধারিত করে/২৮১
শয়তান যার অভিভাবক সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত/২৮৬
হজরত ইব্রাহিমের মর্যাদা/২৯৭
রসুল মোস্তফা স. এর মর্যাদা/৩০২
হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির মর্যাদা/৩০২
তিনিই এই বিশাল বিশ্বের একক অধীশ্বর/৩০৩
পিতৃহীন নারী ও অসহায় শিশু/৩০৪
দাম্পত্য জটিলতার ক্ষেত্রে আপোষ নিষ্পত্তির নির্দেশনা/৩০৭
স্ত্রীদের পালা সম্পর্কিত বিধান/৩১৪
হজরত সালমান ফারসীর মর্যাদা/৩১৮
ইমাম আবু হানিফার মর্যাদা/৩১৮
ইমাম বাহাউদ্দিন নকশবন্দের মর্যাদা/৩১৯
ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ বোখারীর মর্যাদা/৩১৯
ন্যায়বিচারের নির্দেশনা/৩২০
সত্য-প্রত্যাখ্যানপ্রবন ইহুদীরা ক্ষমার্হ নয়/৩২৫

ষষ্ঠ পারা — সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৪৮ — ১৭৬

সকল নবীকে মান্য করতে হবে/৩৩৮
পৃথিবীতে আল্লাহ্কে দেখতে চাওয়ার শাস্তি/৩৩৯
হজরত ঈসা ক্রুশবিদ্ধ হননি/৩৪২
যখন ইহুদীরা ঈমান আনবে/৩৪৫
ইহুদীদের সীমালংঘনের শাস্তি/৩৪৭
ইহুদীরা সকলেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী নয়/৩৪৮
নবী রসুলগণের প্রকৃত সংখ্যা/৩৫১
ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী/৩৫৬
আল্লাহ্র দাসত্ব সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় বিষয়/৩৫৯
প্রমাণ ও স্পষ্ট জ্যোতিঃ/৩৬২
সহোদর ভাই বোনদের উত্তরাধিকার/৩৬৫

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১ — ৮২

ইহ্রাম অবস্থায় শিকার বৈধ নয়/৩৬৮
পশুর উদরস্থ শাবক জবেহ ছাড়া হালাল কিনা/৩৭০
আল্লাহ্র নিদর্শন— ইহ্রাম, তওয়াফ, মস্তক মুণ্ডন, কোরবানী ইত্যাদি/৩৭৪
মড়া, রক্ত, শুকর মাংশ ইত্যাদি হারাম বস্তুর বিবরণ/৩৭৮
পশু জবেহ্ করার নিয়ম/৩৮১
আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম/৩৮৫
সমস্ত ভালো জিনিষ বৈধ/৩৮৮
শিকারের নিয়ম/৩৯১
জবাই ও জখমের নিয়ম/৩৯৬
সিংহ, চিতা বাঘ, কুকুর, শিয়াল, বিড়াল, উদ হারাম/৪০০
মাটিতে বিচরণরত পোকা মাকড় হারাম/৪০১
গুইসাপ, ইঁদুর, টিড্ডি, গাধা ও খচ্চর সম্পর্কিত বিধান/৪০২
ঘোড়ার গোশত সম্পর্কিত বিধান/৪০৪
শকুন, দাঁড়কাক, পাতিকাক সম্পর্কিত বিধান/৪০৪

www.eelm.weebly.com

সামুদ্রিক প্রাণী সম্পর্কিত বিধান/৪০৫
ইহুদী ও খৃষ্টানদের জবেহ করা পশু হালাল কিনা/৪০৮
কিতাবী মুশরিক ও সাবায়ী রমণীকে বিয়ে করা যাবে কিনা/৪১১
ওজুর নিয়ম/৪১৪
ওজুর সুন্নত সমূহ/৪৩২
ওজুর শেষের দোয়া/৪৩৪
মেসওয়াকের বিধান/৪৩৫
অপবিত্র অবস্থার গোসল/৪৩৬
গোসলের সুন্নত নিয়ম/৪৩৮
ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকার নির্দেশ/৪৪২
বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার/৪৪৩
অধিকাংশ বনী ইসরাইল বিশ্বাসঘাতক/৪৪৯
হজরত ঈসাকে যারা আল্লাহ্ বলে তারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী/৪৫৪
রসুল প্রেরণ আল্লাহ্পাকের রহমত/৪৫৯
রসুলগণের ধর্মাদর্শ এক— বিধিবিধান ভিন্ন/৪৫৯
ইহুদীদের প্রতি পবিত্র ভূমিতে গমনের নির্দেশ/৪৬০
চল্লিশ বৎসরের নিষেধাজ্ঞা/৪৬১
হজরত ইউশার নবুয়ত লাভ/৪৬৮
হজরত হারুণের মহা প্রয়াণ/৪৭০
হজরত মুসার মহা অর্ন্তধান/৪৭১
হাবিল ও কাবিলের বৃত্তান্ত/৪৭২
হজরত আদমের পুত্র শোক/৪৮০
হজরত শীশের জন্ম ও কাবিলের পরিণতি/৪৮০
আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারীর শাস্তি/৪৮৪
আল্লাহ্পাকের নৈকট্য লাভের উপায়/৪৯৫
চুরির শাস্তি/৪৯৮
চুরি ও ব্যভিচার/৫১৮
সকল অবৈধ উপার্জন নিষিদ্ধ/৫৩০
কিসাসের বিধান/৫৩৮
সৎকর্মে প্রতিযোগীতা করো/৫৪৫
প্রকৃত বিশ্বাসীরাই পরিণাম সম্পর্কে সচেতন/৫৪৯
ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ/৫৫০
আল্লাহ্ যাদেরকে ভালোবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালোবাসবে/৫৫৩
মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ/৫৫৪
আল্লাহ্র দল বিজয়ী/৫৬২
গাদিরে খুমের ঘটনা/৫৬৩
ইহুদী ধর্মনেতা ও আলেমগণের প্রকৃতি/৫৭২
রসুলের প্রতি ধর্ম প্রচারের নির্দেশ/৫৭৯
রসুলের প্রতি মানুষ থেকে রক্ষা করার অংগীকার/৫৭৯
আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করলে জান্নাত নিষিদ্ধ, অগ্নিবাস অবধারিত/৫৮৭
হজরত মরিয়মের মর্যাদা/৫৯০
ইহুদী ও মুশরিকেরাই বিশ্বাসীদের প্রধান শত্রু/৫৯৫
আবিসিনিয়ার হিজরত/৫৯৭

www.eelm.weebly.com

সূচীপত্র

সপ্তম পারা — সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৮৩ — ১২০

নাজ্জাশীর প্রতিনিধি দলের বিবরণ/১৫
উৎকৃষ্ট ও বৈধ বস্তুসমূহকে অবৈধ করা যাবে না/২০
শপথ ও শপথভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত/২৫
মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর নিষিদ্ধ/৪৬
ইহরাম অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ/৫৩
নিষিদ্ধ শিকারের ক্ষতিপূরণ/৫৫
কাবাতে প্রেরিতব্য কোরবানী/৬৯
ক্ষতিপূরণের অন্নদান/৭১
ইহরাম অবস্থায় সমুদ্রের শিকার ও তার গোশত বৈধ/৭৫
কাবা শরীফের মর্যাদা/৮২
প্রচার করাই কেবল রসুলের কর্তব্য/৮৪
মন্দ ও ভালো কখনো এক নয়/৮৫
অনাবশ্যক প্রশ্ন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা/৮৭
বাহিরা, সায়েবা, ওসিলা ও হাম/৯২
পথভ্রষ্টরা বিশ্বাসীদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না/৯৫
অসিয়ত/৯৯
অসিয়তের সাক্ষী/১০০
মিথ্যা শপথের বিরুদ্ধে সত্য শপথ/১০৪
কিয়ামতের দিন হজরত ঈসাকে প্রশ্ন/১০৮
অলৌকিক খাঞ্চা/১১১
কিয়ামতের দিন হজরত ঈসার জবাব/১২০
সত্যবাদীগণের পুরস্কার/১২৬

সপ্তম পারা — সুরা আনআ'ম ঃ আয়াত ১ — ১১০

আসমান, জমিন, অন্ধকার ও আলোর সৃষ্টি/১২৮
তিনিই তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন/১৩২
ছয় প্রকার মানুষের প্রতি অভিশাপ/১৩৫
নবী-রসুল ও ফেরেশতার মধ্যে পার্থক্য/১৪২
পৃথিবীতে পরিভ্রমন করো/১৪৪
আল্লাহ্‌র গজব অপেক্ষা রহমত অধিকতর প্রবল/১৪৬
পুনরুত্থান দিবসের সফলতা/১৫১
আল্লাহ্‌ই নিশ্চিত করেন কল্যাণ ও অকল্যাণ/১৫২
নবী ও রসুলগণের আবশ্যিক কর্তব্য/১৫৫
আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনাকারীরা জালেম/১৫৮
কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা/১৬১
সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বোধহীন, বধির ও অন্ধ/১৬৩
আবু তালেবের প্রস্তাব/১৬৬
মোতাজিলাদের ভ্রান্তি/১৭২
মৃত্যু মুমূর্ষ ব্যক্তির কিয়ামত/১৭২
কবরের অবস্থা/১৭৩

www.eelm.weebly.com

জাকাত না দেয়ার শাস্তি/১৭৪
আবু জেহেলের স্বীকৃতি/১৭৫
সকল প্রাণী ও পাখিরাও উম্মত/১৮১
দুঃখ ও সুখের পরীক্ষা/১৮৫
সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করা একটি প্রশংসার্হ কাজ/১৮৭
রসুলগণ হচ্ছেন সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী/১৮৯
অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান/১৯১
শাফায়াতের বিবরণ/১৯৩
যারা প্রাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌কে ডাকে/১৯৪
হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর কথা/১৯৭
বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের বিতণ্ডার মীমাংসা/২০৫
এলমে গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান/২০৬
মৃত্যুর ফেরেশতা/২০৯
উর্ধ্বদেশ ও তলদেশের শাস্তি/২১৭
রসুল স. এর তিনটি প্রার্থনা/২১৮
মুশরিকদের মজলিশে উপবেশন নিষিদ্ধ/২২০
যারা ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করে/২২২
যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে/২২৭
হজরত ইবরাহিমের জ্ঞানানুশীলনের বিবরণ/২৩২
হজরত ইবরাহিমের জন্মবৃত্তান্ত/২৩৬
অংশীবাদীদের সঙ্গে বিতর্ক/২৪৩
হজরত ইবরাহিমের বংশধর/২৪৮
কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়ত/২৫২
ইহুদীদের মিথ্যাচার/২৫৫
আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনাকারীদের শাস্তি/২৫৯
কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদের দুরবস্থা/২৬৩
আল্লাহ্‌পাকই জীবন ও মৃত্যুদাতা/২৬৪
উষা, রাত্রি এবং চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টির রহস্য/২৬৫
নক্ষত্র সৃষ্টির রহস্য/২৬৬
হজরত আদম থেকে সকল মানুষের সৃষ্টি/২৬৭
বৃক্ষ সৃষ্টির রহস্য/২৬৮
আল্লাহ্‌তায়ালা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন থেকে পবিত্র/২৭০
তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত/২৭২
আবু তালেবের ঘটনা/২৭৯
মোজেজা সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায় নির্ভর/২৮২

অষ্টম পারা — সুরা আনআ'ম ঃ আয়াত ১১১ — ১৬৫

আল্লাহ্‌তায়ালার অবাধ্য মানুষ ও জ্বিনেরা শয়তান/২৮৭
সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র বাণী সম্পূর্ণ/২৮৯
অবিশ্বাসীদের কথামতো চলা নিষেধ/২৯২
জবাই করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নিতে ভুলে গেলে/২৯৫
অবিশ্বাসীদের অন্তর মৃত/২৯৮
অপরাধী জনতার চেয়ে অপরাধী নেতারা বড় অপরাধী/৩০০

www.eelm.weebly.com

নবী-রসুল এবং ফেরেশতা সম্পর্কে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির ব্যাখ্যা/৩০২
বক্ষ সম্প্রসারনের ব্যাখ্যা/৩০৪
আল্লাহ্ই কেবল সরল পথের নির্দেশনা দিতে সক্ষম/৩০৬
শান্তির আলয়/৩০৭
অবিশ্বাসী জ্বিন ও মানুষ আল্লাহ্র সাহায্য থেকে বঞ্চিত/৩১০
জ্বিনদের মধ্যে নবী-রসুল প্রেরিত হয়েছিলো কি না/৩১২
মর্যাদা ও অবস্থান নির্ধারিত হয় আমলের ভিত্তিতে/৩১৫
তাদের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাও শোভন/৩১৯
হারাম ও হালাল নির্ধারনের অধিকার কেবল আল্লাহ্র/৩২২
ফসলের দেয়/৩২৫
হালাল ও হারামের বিবরণ/৩৩২
আল্লাহ্পাক যা নিষিদ্ধ করেছেন/৩৪২
যেনো তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো/৩৪৬
এই পথই আমার সরল পথ/৩৫১
এই কিতাব কল্যাণময়/৩৫৫
কিয়ামতের আলামত/৩৫৮
যারা দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে/৩৬৬
ছয় ধরনের মানুষের উপর আল্লাহ্ ও নবীগণের অভিসম্পাত/৩৭০
সৎকার্যের বিনিময় দশগুণ/৩৭৩
আল্লাহ্র জিকিরের সওয়াব সদকার চেয়ে বেশী/৩৭৬
সালাত, ইবাদত, জীবন, মৃত্যু/৩৭৭

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১ — ৮৭

বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজির রহস্য/৩৮১
নবী-রসুলগণের জবাবদিহিতা/৩৮৬
পাপ-পুণ্যের ওজন/৩৮৯
সৃজনশীলতা কেবল আল্লাহ্র/৩৯৮
গবেষণাজনিত ভুল ক্ষমার্হ/৪০২
বেহেশত অহংকারীদের স্থান নয়/৪০৪
শয়তান ও তার অনুসারীরা জাহান্নামী/৪০৬
শয়তান কীভাবে আক্রমণ করে/৪০৭
সাবধানতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট/৪১৫
আল্লাহ্ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না/৪১৮
ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ/৪২০
পুনরুত্থান ঘটবে বস্ত্রবিবর্জিত অবস্থায়/৪২১
নামাজের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধানের নির্দেশ/৪২৪
আবরণযোগ্য অঙ্গের মাসআলা/৪২৭
উত্তম পরিচ্ছদ ও খাদ্য নিষিদ্ধ নয়/৪৩৫
যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে/৪৪০
আ'রাফবাসীদের অবস্থা/৪৫০
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে ছয় দিনে/৪৬১
আরশে সমাসীন হওয়ার অর্থ/৪৬২
প্রভু পালককে ডাকো বিনীতভাবে ও গোপনে/৪৬৪

www.eelm.weebly.com

জিকির তিন প্রকার/৪৬৭
সুসংবাদবাহী বায়ু, ঘন মেঘ, বৃষ্টি/৪৭১
হজরত নুহের বংশপরিচয়, জীবন, মহাতিরোধান/৪৭৬
হজরত হুদ ও আ'দ সম্প্রদায়/৪৮২
আ'দ সম্প্রদায়ের কাহিনী/৪৮৯
হজরত সালেহ্ ও ছামুদ সম্প্রদায়/৫০০
হজরত লুত ও তাঁর সম্প্রদায়/৫০৮
হজরত শোয়াইব ও তাঁর সম্প্রদায়/৫১২

নবম পারা — সুরা আ'রাফ : আয়াত ৮৮ — ২০৬

হজরত মুসার মোজেজা/৫৩০
যাদুকরদের সমর্পণ/৫৩৯
হজরত মুসার প্রতি বনী ইসরাইলদের অনুযোগ/৫৪৪
প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্তের আযাব/৫৪৯
বনী ইসরাইলদের প্রতি শুভবাণী/৫৫৭
হজরত মুসার তুর পর্বতে যাত্রা/৫৬২
আল্লাহ্-দর্শনের অভিলাষ ও তার প্রতিক্রিয়া/৫৬৩
শেষ নবীর উম্মতের ফযীলত/৫৭২
তওরাত শরীফের বিবরণ/৫৭৫
গো-বৎস মূর্তির পূজা/৫৭৯
হজরত মুসা ও হজরত হারুন/৫৮২
উম্মী শব্দের অর্থ/৫৯৩
তওরাতে বর্ণিত রসুল স. এর গুণাবলী/৫৯৬
পাথর থেকে উৎসারিত বারোটি প্রস্রবণ/৬০৩
শনিবারের সীমালংঘনকারীদের শাস্তি/৬০৬
কিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হবে ইহুদীদেরকে/৬১১
সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট হয় না/৬১৫
আত্মার জগতের অঙ্গীকারানুষ্ঠান/৬১৭
বালআম বাউরের ঘটনা/৬২৩
কামনা বাসনার অনুসারীরা কুকুরের মতো/৬৩০
জাহান্নামী জ্বিন ও মানুষ/৬৩৪
উত্তম নামসমূহ আল্লাহ্র/৬৩৮
সাহাবীগণ ন্যায়ের পথপ্রদর্শক এবং ন্যায় বিচারক/৬৪৩
নিদর্শন প্রত্যাখ্যানকারীরা ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে যায়/৬৪৪
কিয়ামতের বিবরণ/৬৪৭
প্রথম জনক ও প্রথম জননীর ঘটনা/৬৫২
ক্ষমাপরায়ণতা ও সৎকর্মের নির্দেশ/৬৬৩
অজ্ঞদেরকে উপেক্ষার নির্দেশ/৬৬৫
শয়তানের প্রোচনা থেকে আত্মরক্ষার জ্ঞান/৬৬৭
মনোযোগের সঙ্গে কোরআন শ্রবনের নির্দেশ/৬৬৯
সবিনয়ে ও সশঙ্কচিত্তে জিকিরের নির্দেশ/৬৭৭

www.eelm.weebly.com

সূচীপত্র

নবম পারা — সূরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ১ — ৪০

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন ও উত্তর/১৬
বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য/২০
বদর যুদ্ধ/২৫
আতেকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের স্বপ্ন/২৬
মুশরিক বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা/২৯
রসুল স. এর যুদ্ধযাত্রা/৩২
বদর যুদ্ধের পুনরালোচনা/৩৮
যুদ্ধ শুরু/৪৮
যোদ্ধা ফেরেশ্‌তাদের বিবরণ/৫০
বিজয়ের শুভ সংবাদ/৫৫
অলৌকিক তন্দ্রাচ্ছন্নতা/৫৮
আল্লাহ্‌ শাস্তি দানে কঠোর/৬৪
যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন নিষিদ্ধ/৬৬
বিজয়ের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব/৭০
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ফযীলত/৭৩
আবু জেহেল বধ/৭৭
রসুলের আনুগত্যই আল্লাহের আনুগত্য/৮০
রসুলের ডাকে সাড়া দিতে হবে/৮২
আল্লাহ্‌র অতুলনীয় অবস্থান/৮৩
ফেত্‌না থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ/৮৫
হজরত আবু লুবাবার ঘটনা/৯০
বিশ্বাসভঙ্গ না করার নির্দেশ/৯৩
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হচ্ছে পরীক্ষা/৯৫
আল্লাহ্‌কে ভয় করার বিনিময়/৯৬
মক্কার মুশরিকদের ষড়যন্ত্র/৯৯
আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচবার দু'টি অবলম্বন/১০৯
পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি/১১৪
শত্রুপক্ষের অনেকের ইসলাম গ্রহণ/১১৬
ফেত্‌না দূর না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের নির্দেশ/১১৭

দশম পারা — সূরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৪১ — ৭৫

গনিমতের এক পঞ্চমাংশ সম্পর্কে নির্দেশনা/১২১
রসুল স. এর স্বজন কারা/১২৩
পিতৃহীন, দরিদ্র ও পথচারী কারা/১২৫
খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল/১৩২
গনিমতের অবশিষ্ট চার অংশের বণ্টন/১৩৬

www.eelm.weebly.com

অনুপ্রেরণামূলক পুরস্কার/১৪৩
ইমাম আবু হানিফার অভিমতের পর্যালোচনা/১৪৫
একাধিক অশ্বের অংশ/১৫১
বিজিত ইরাকের জমিজমা বণ্টন/১৫৬
বদর যুদ্ধের মোজেজা সমূহ/১৬১
বদরে মুসলিম ও মুশরিক বাহিনীর অবস্থান/১৬৪
শত্রুর সম্মুখে অবিচল থাকার নির্দেশ/১৬৮
গর্ব ও প্রদর্শনপ্রবনতা নিষিদ্ধ/১৭০
যুদ্ধক্ষেত্রে ইবলিস/১৭২
যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে/১৭৬
ফেরেশতাদের প্রহার/১৭৭
মক্কার মুশরিকেরা পূর্ববর্তী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতো/১৭৯
সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা নিকৃষ্ট জীব/১৮২
ইহুদীদের চুক্তি ভঙ্গ/১৮৩
বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গের নির্দেশ/১৮৫
সমরসম্ভার বৃদ্ধির নির্দেশ/১৮৭
হজরত ওসমানের ফযীলত/১৯১
আল্লাহ্ই সম্প্রীতি স্থাপন করেন/১৯৩
গনিমত ও মুক্তিপণ বৈধ/২০৭
হজরত আব্বাসের ইসলাম গ্রহণ/২১০
মোহাজির ও আনসারগণের প্রশংসা/২১২
অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের বন্ধু/২১৫

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১ — ৯৩

সুরা তওবার নাম সমূহ/২১৮
প্রারম্ভে বিস্মিল্লাহ্ নেই কেনো/২১৯
অংশীবাদীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা/২২০
মহান হজের দিবস/২২২
নেপথ্যের কাহিনী/২২৭
হেরেম শরীফের সীমানায় হত্যা নিষিদ্ধ/২৩২
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নয়/২৩৯
জেহাদ বা ধর্ম যুদ্ধের উদ্দেশ্য/২৪০
চুক্তিভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ/২৪১
অংশীবাদীদের সকল কর্ম ব্যর্থ/২৪৫
মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের পাঁচটি যোগ্যতা/২৪৭
জিকিরকারী মুজাহিদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ/২৫২
জমজমের পানি পান করানোর ঘটনা/২৫৩
পূর্ণ ইমানদারের বৈশিষ্ট্য/২৫৬
হুনায়েন যুদ্ধ/২৫৯

www.eelm.weebly.com

বিশ্বাসীর প্রতি বিশেষ দয়া বর্ষণ/২৭০
যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন/২৮১
অংশীবাদীরা অপবিত্র/২৮৭
রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ/২৯১
জিযিয়া/২৯৩
জিযিয়ার পরিমাণ/৩০১
হজরত উযায়ের আ. এর ঘটনা/৩১৪
যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে/৩২১
জাকাত না দেয়ার শাস্তি/৩২৬
হিজরত/৩৪০
সুরাকার কাহিনী/৩৫১
তাবুক অভিযান/৩৬২
মুনাফিকদের সহযোগীতা গ্রহণ না করার তিনটি কারণ/৩৭১
জাকাত বণ্টনের নিয়ম/৩৭৭
ফকির ও মিসকিনদের মধ্যে পার্থক্য/৩৭৮
জাকাত সংগ্রাহকেরা কী পাবে/৩৮১
জাকাত গ্রহীতা হিসেবে প্রতিবেশীরাও অগ্রগণ্য/৩৯৬
যাঞ্ঝাকারীদের অধিকার/৪০৩
রসুল স. এর বংশধরদের জন্য জাকাত ও খয়রাত হালাল কিনা/৪০৭
রসুল পাক স.কে হত্যার ষড়যন্ত্র/৪১৭
মুনাফিক নর ও নারী একে অপরের অনুরূপ/৪২৫
বিশ্বাসী নর ও নারী একে অপরের বন্ধু/৪২৯
সকল অঙ্গিকার ভঙ্গকারীরাই মিথ্যাবাদি/৪৩৯
আল্লাহ্‌র বিদ্রূপ এক ধরনের শাস্তি/৪৪২
পৃথিবীতে হাসতে হবে কম/৪৪৭
মুনাফিকদের জানাযা পড়া যাবে না/৪৪৯
আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুল কারো মুখাপেক্ষী নন/৪৫৩
অক্ষমদের জন্য জেহাদ না করা অপরাধ নয়/৪৫৫
মরুচারী বেদুঈনদের স্বভাব/৪৬৩

একাদশ পারা — সুরা তওবা : আয়াত ৯৪ — ১২৯

মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে সাবেক্বীন কারা/৪৬৭
মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেয়া হবে দু'বার/৪৭২
আল্লাহ্‌ তাঁর দাসদের তওবা কবুল করেন/৪৮১
মসজিদে জেরা (ষড়যন্ত্রের মসজিদ)/৪৮৪
আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করেছেন/৪৯৫
অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নিষিদ্ধ/৫০১
হজরত ইব্রাহিম ছিলেন কোমল হৃদয় ও সহনশীল/৫০৫

www.eelm.weebly.com

সংকটকালে নবীর অনুসারীদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা/৫০৯
হজরত আবু লুবাবা ও তাঁর সঙ্গিগণের ঘটনা/৫১৪
আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও সত্যবাদিদের অন্তর্ভুক্ত হও/৫২৩
একদল জেহাদ করবে, আরেক দল করবে জ্ঞানানুশীলন/৫২৮
ইমান হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত সর্বোত্তম অনুগ্রহ/৫৩৫
রসুল তোমাদের মঙ্গলকামী, তোমাদের প্রতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু/৫৩৬
তাবুক যুদ্ধের সময় প্রকাশিত মোজেজা সমূহ/৫৩৮

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ১ — ১০৯

কোরআনের মূল বক্তব্য চিরন্তন/৫৫৬
মানুষের নবী মানুষ/৫৫৭
ছয়দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি ও আরশে সমাসীন হওয়ার অর্থ/৫৬০
তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন/৫৬৬
জান্নাতবাসীদের অবস্থা/৫৬৯
রসুল স. এর পৃথিবীর জীবনের পরিসর/৫৭৬
তিনি তোমাদেরকে জলে স্থলে ভ্রমণ করান/৫৮২
পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত/৫৮৪
ভালো কাজ ও মন্দ কাজের প্রতিফল/৫৮৭
আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে কে/৫৯৩
আল্লাহ্‌ই সত্যের পথনির্দেশ করেন/৫৯৫
কোরআন আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো রচনা নয়/৫৯৭
মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলম করে/৬০১
ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনো কিছুই আল্লাহ্‌র অগোচর নয়/৬১৩
আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোনো ভয় নেই/৬১৫
বেলায়েত অর্জনের মাধ্যম/৬১৭
আল্লাহ্‌পাকের মহব্বত/৬১৮
অলিআল্লাহ্‌গণের বৈশিষ্ট্য/৬১৯
আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজনদের প্রতি সুসংবাদ/৬২০
স্বপ্ন তিন প্রকার/৬২৩
হজরত নুহের বৃত্তান্ত/৬২৮
হজরত মুসার বৃত্তান্ত/৬৩৩
তাওয়াক্কুল ছাড়া পূর্ণ ইমানদার হওয়া যায় না/৬৩৫
ফেরাউন ও তার দলের সলিল সমাধি/৬৪১
সন্দেহবাদীদের প্রতি/৬৪৭
হজরত ইউনুসের বৃত্তান্ত/৬৫০
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও পছন্দ/৬৫৬

www.eelm.weebly.com

সূচীপত্র

একাদশ পারা — সুরা হুদ ঃ আয়াত ১ — ৫

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত নিষিদ্ধ/১৫
ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং প্রত্যাবর্তন করো/১৭
গোপন, প্রকাশ্য— সকল কিছুই আল্লাহ্র জ্ঞানায়ত্ত/১৯

দ্বাদশ পারা — সুরা হুদ ঃ আয়াত ৬ — ১২৩

প্রত্যেক জীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্র/২১
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে ছয় দিনে/২৩
ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার/২৬
অবিশ্বাসীদের পুণ্যকর্ম নিরর্থক/৩২
হজরত আলীর ফযীলত/৩৬
অঙ্গ- প্রতঙ্গের সাক্ষ্য প্রদান /৩৯
বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের উপমা /৪৩
হজরত নুহের নৌকা নির্মাণ /৫০
মহাপ্লাবনের বিবরণ/৫৩
মহাপ্লাবনের শেষে/৫৯
হজরত হুদ ও তাঁর সম্প্রদায়ের কাহিনী/৬৫
হজরত সালেহ্ ও তাঁর সম্প্রদায়ের কাহিনী/৭২
হজরত ইব্রাহিম ও অতিথি ফেরেশতাবৃন্দ/৭৭
হজরত ইব্রাহিমের তিনটি বৈশিষ্ট্য/৮৪
হজরত লুত ও তাঁর সম্প্রদায়ের কাহিনী/৮৫
হজরত শোয়াইব ও তাঁর সম্প্রদায়ের কাহিনী/৯৪
হজরত মুসা ও ফেরাউন/১০৬
দোজখীদের চিৎকার/১১২
জান্নাত ও জাহান্নাম চিরস্থায়ী/১১৩
নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার/১১৮
হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির কথা/১১৯
ইস্তেকামাত বা দৃঢ়তা/১২২
সৎকর্ম অসৎকর্মকে মিটিয়ে দেয়/১২৬
মানুষের মতৈক্য কখনোই প্রতিষ্ঠিত হবে না/১৩৪
অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্র/১৩৫

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১ — ৫২

হজরত ইউসুফের স্বপ্ন/১৪১
স্বপ্ন কী/১৪৩
স্বপ্ন নবুয়তের অংশ— কথাটির ব্যাখ্যা/১৪৬
হজরত ইউসুফের ভ্রাতাদের ষড়যন্ত্র/১৫২
অন্ধকূপে নিক্ষেপ/১৫৬
মিসরাভিমুখী অভিযাত্রী দল/১৬১
ক্রীতদাসরূপে আজিজের গৃহে/১৬৪
জুলায়খার আহ্বান ও ছলনা/১৬৬
রটনাকারিণীদের ঘটনা/১৭৭

www.eelm.weebly.com

কারাগারে/১৮৩
কারাসঙ্গীদ্বয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা/১৯০
মিসররাজের স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা/১৯৩
উরুজ ও নুযুল/১৯৯
অপবাদের অপনোদন/২০০

ত্রয়োদশ পারা — সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৫৩ —১১১

মানব-প্রবৃত্তি স্বভাবতই মন্দকর্মপ্রবণ/২০১
মিসররাজের বিশেষ উপদেষ্টারূপে/২০৩
মিসররাজের অবসর গ্রহণ ও নতুন সম্রাটরূপে হজরত ইউসুফের অভিষেক/২০৭
জুলায়খার সঙ্গে বিবাহ/২০৮
দুর্ভিক্ষ থেকে আত্মরক্ষার আয়োজন/২০৯
হজরত ইয়াকুব-তনয়দের খাদ্যশস্য সংগ্রহার্থে মিসরে আগমন/২১১
পরবর্তী যাত্রায় বিনইয়ামিনের অংশগ্রহণ/২২০
বিনইয়ামিনকে রেখে দেয়ার পরিকল্পনা/২২২
আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছি/২২৫
নবী ইউসুফ তাঁর পিতার সঙ্গে দেখা করতে যাননি কেনো/২৩৪
মাবদায়ে তা'য়ুন বা সৃষ্টির সূচনাস্থল সম্পর্কে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির ব্যাখ্যা/২৩৮
তবে কি তুমিই ইউসুফ/২৫২
আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি/২৫৬
মহান পিতা ও মহিমান্বিত পুত্রের মহামিলন/২৬০
তুমি আমাকে আত্মসমর্পণকারীর মৃত্যু দাও/২৬৬

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ১ — ৪৩

কোরআন, হাদিস, এজমা, কিয়াস/২৮০
সৃষ্টি অবয়ববিশিষ্ট, আর স্রষ্টা অবয়বের অতীত, আনুরূপ্যবিহীন/২৮২
ভূমির বিভিন্ন অংশ পরস্পর সংলগ্ন/২৮৪
মঙ্গলের পরিবর্তে তারা শাস্তি তরান্বিত করতে বলে/২৮৭
গর্ভকালীন সময়সীমা/২৯১
যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান, তিনি তা অবগত/২৯৪
প্রহরী ফেরেশতার বিবরণ/২৯৫
তিনি সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ/৩০১
কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালক/৩১০
তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন/৩১৩
আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার নির্দেশ/৩১৮
বিশ্বাসীগণ রসুল স. এর আত্মিক সন্তান/৩২৫
আল্লাহ্র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়/৩২৯
বেহেশতের একটি সুদীর্ঘ বৃক্ষ/৩৩১
সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্র এখতিয়ারভুক্ত/৩৩৭
নবী-রসুলগণ সংসারবিরাগী নন/৩৪৫
সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য, জীবন, মৃত্যু/৩৪৬

সুরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ১ — ৫২

অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে/৩৫৬
ধৈর্য ইমানের অর্ধাংশ/৩৬২

www.eelm.weebly.com

তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও/৩৬৪
তিনি আহ্বান করেন পাপ মার্জনার জন্য/৩৬৭
প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থমনোরথ হয়/৩৭২
জাহান্নামীদের শাস্তি/৩৭৩
সকলে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবেই/৩৭৭
বিচার সমাপনের পর/৩৮০
সৎ বাক্যের উপমা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ/৩৮৪
অসার বাক্যের তুলনা অসার বৃক্ষ/৩৮৬
কবরের প্রশ্নোত্তর পর্ব/৩৮৮
বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা সুপারিশ করতে পারবেন/৩৯৫
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অগণনীয়/৩৯৬
হজরত ইব্রাহিমের প্রার্থনা/৩৯৮
বিচার দিবসের অবস্থা/৪০৮
যে দিন অন্য পৃথিবী হবে/৪১৩
আল্লাহ্ প্রত্যেককে কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন/৪২০
সুরা হিজর ঃ আয়াত ১
এগুলো হচ্ছে মহাগ্রন্থের আয়াত/৪২২
চতুর্দশ পারা — সুরা হিজর ঃ আয়াত ২ — ৯৯
আমিই কোরআনের সংরক্ষক/৪২৭
আকাশে আমি রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি/৪৩০
পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি/৪৩২
আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি/৪৩৪
আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে জানি/৪৩৭
আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি বিশুষ্ক মৃত্তিকা থেকে/৪৩৯
জ্বিন সৃষ্টি করেছি অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ থেকে/৪৪০
হে ইবলিস, সেজদা করলে না কেনো/৪৪৪
ইবলিসের যুক্তি/৪৪৫
সাবধানীরা থাকবে প্রস্রবণ-বহুল জান্নাতে/৪৫০
সেখানে অবসাদ স্পর্শ করবে না/৪৫২
হজরত ইব্রাহিমের অতিথিদের কথা/৪৫৫
হজরত লুতের সম্প্রদায়ের পরিণতি/৪৫৭
হজরত শোয়াইবের সম্প্রদায়ের পরিণতি/৪৬৪
হজরত সালেহের সম্প্রদায়ের পরিণতি/৪৬৫
কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী/৪৬৬
সুরা ফাতিহার সাত আয়াত/৪৬৮
মহাবিচার দিবসের চারটি প্রশ্ন/৪৭৫
রসুল স. এর প্রতি বিদ্রূপকারীদের পরিণতি/৪৭৮
সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১— ১২৮
আল্লাহ্‌র আদেশ আসবেই/৪৮৪
তিনি শুক্র থেকে মানুষ সৃষ্টি করেন/৪৮৭
তিনিই সৃষ্টি করেন পশুপালকে/৪৮৮

www.eelm.weebly.com

তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন/৪৯১
রজনী,দিবস, সূর্য ও চন্দ্র/৪৯৩
তিনিই সমুদ্রকে করেছেন তোমাদের অধীন/৪৯৪
পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত/৪৯৬
সৃষ্টি করেছেন পথ-নির্ণায়ক চিহ্নসমূহ/৪৯৮
আল্লাহ্র অনুগ্রহের সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না/৫০০
আল্লাহ্ অহংকারীকে পছন্দ করেন না/৫০২
আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসুল পাঠিয়েছি/৫১৩
মহাপুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী/৫১৬
আমি বলি 'হও' ফলে, তা হয়ে যায়/৫১৮
হিজরতকারীদের মর্যাদা/৫১৯
সমর্পণ ঃ বাধ্যগতভাবে অথবা স্বেচ্ছায়/৫২৫
আল্লাহ্র আনুগত্য করা শাশ্বত কর্তব্য/৫২৮
তারা শিশুকন্যাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলতো/৫৩৩
দুগ্ধবতী পশু/৫৪০
খর্জুর বৃক্ষ ও আংগুর/৫৪২
মধুমক্ষিকা, মধুচক্র ও মধু/৫৪৪
তিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মৃত্যু ঘটাবেন/৫৪৮
আল্লাহ্র কোনো সদৃশ স্থির কোরো না/৫৫২
আল্লাহ্ উপমা দিচ্ছেন এক ক্রীতদাসের/৫৫৪
আরো উপমা দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির/৫৫৫
মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান চোখের পলকের মতো/৫৫৭
তারা কি লক্ষ্য করে না বিহঙ্গের প্রতি/৫৫৮
গৃহচ্ছায়া, গৃহসামগ্রী ও পরিধেয়/৫৬০
সেদিন আমি নবী-রসুলগণকে সাক্ষী করবো/৫৬৪
ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ/৫৬৮
আল্লাহ্র নামে কৃত অংগীকার পূরণের নির্দেশ/৫৭১
বিশ্বাসীদেরকে দান করবো আনন্দময় জীবন/৫৭৬
অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্র শরণ গ্রহণের নির্দেশ/৫৭৯
কিন্তু কোরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা/৫৮৬
যারা আল্লাহ্র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, তারা মিথ্যাবাদী/৫৮৮
যাকে সত্যপ্রত্যাখ্যানে বাধ্য করা হয়/৫৯০
আল্লাহ্ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর করে দিয়েছেন/৫৯৯
যেদিন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেয়া হবে/৬০২
আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের/৬০৪
অনন্যোপায় ব্যক্তির বিধান/৬০৭
হজরত ইব্রাহিম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক/৬১১
শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার/৬১৪
আহবান করো হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা/৬১৬
প্রতিশোধ গ্রহণ ও ধৈর্য ধারণ/৬১৮

www.eelm.weebly.com

সূচীপত্র

পঞ্চদশ পারা — সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ১ — ১১১

মহারহস্যময় মেরাজের প্রারম্ভিক অবস্থা/১৫
নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে/২৫
নবী শা'ইয়ার প্রতি প্রত্যাদেশ/৩০
বখ্তে নসরের অভিযান/৩৮
নবী ইয়াহ্ইয়ার শাহাদাত/৪৬
বখ্তে নসর কর্তৃক গণহত্যার নির্দেশ প্রদান/৪৭
মানুষ যা মনে আসে, তারই আশু রূপায়ণ চায়/৫১
মানুষের কৃতকর্মকে করেছি তার গ্রীবালগ্ন/৫৪
আমি রসুল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না/৫৭
কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে/৭১
পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ/৭৩
আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও পর্যটকের প্রাপ্য/৭৮
অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই/৮০
নিন্দিত ও নিঃস্ব হওয়াই কার্পণ্য ও অমিতাচারের পরিণাম/৮১
দারিদ্র-ভয়ে সন্তান-বধ কোরো না/৮৪
পিতৃহীনের সম্পদ-সংরক্ষণ ও প্রতিশ্রুতি পালন/৮৮
মাপ ও ওজন সঠিক করার নির্দেশ/৮৯
ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ কোরো না/৯২
এই কোরআনে বহু নীতিবাক্য বার বার বিবৃত করেছি/৯৫
জড়-অজড় সকল সৃষ্টি আল্লাহ্র তসবীহ্ পাঠ করে/৯৭
অংশীবাদীরা বলে, আমাদের অন্তর পর্দাচ্ছাদিত/৯৯
আরো বলে, কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে/১০৩
শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু/১০৫
আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রদর্শন করি/১১৩
অভিশপ্ত বৃক্ষ/১১৬
হজরত আদম ও ইবলিসের ঘটনা/১১৮
আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদাদান করেছি/১২৬
যে এ জগতে অন্ধ, সে পর-জগতেও অন্ধ/১২৯
তুমি আমার নিয়মের কোনো পরিবর্তন পাবে না/১৩৬
নামাজের সময় নির্ধারণ/১৩৯
রসুল স. এর তাহাজ্জুদ/১৪৫
মাকামে মাহমুদ বা প্রশংসিত স্থান/১৪৮
শাফায়াতে কোবরা বা মহান সুপারিশ/১৫৪
সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে/১৬৪

www.eelm.weebly.com

কোরআন বিশ্বাসীদের জন্য উপশান্তি ও দয়া/১৬৭
বলো, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত/১৭১
তোমার প্রতি আছে তাঁর মহান অনুগ্রহ/১৭৬
কোরআনের অনুরূপ রচনা অসম্ভব/১৭৮
সেদিন আমি তাদেরকে সমবেত করবো অন্ধ, মুক ও বধির করে/১৮৬
মানুষ তো অতিশয় কৃপণ/১৯০
রসুল মুসার নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন/১৯১
কোরআন অবতীর্ণ করেছি খণ্ড খণ্ড ভাবে/১৯৬
আল্লাহ্‌র সকল নাম সুন্দর/১৯৯
রসুল স. এর কোরআন পাঠ/২০২
সূরা কাহ্‌ফ ঃ আয়াত ১ — ৭৪

অবিশ্বাসীদের তিনটি প্রশ্ন/২০৫
আসহাবে কাহফ/২১০
আউলিয়া কেরামের মাজার সংলগ্ন মসজিদ/২৪০
আসহাবে কাহফের সংখ্যা/২৪১
যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি/২৪৪
দোজখবাসী ও বেহেশতবাসীদের অবস্থা/২৫৪
ধনী ও দরিদ্র দুই ব্যক্তির উপমা/২৫৮
ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা/২৬৭
যেদিন আমি পর্বতসমূহকে করবো উন্মূলিত/২৬৯
ইবলিসের সন্তান-সন্ততি/২৭৮
মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়/২৮২
রসুল মুসা ও খিজির/২৮৮
কামেল পীরগণের অবস্থা/২৯৭
ষষ্ঠদশ পারা — সূরা কাহ্‌ফ ঃ আয়াত ৭৫— ১১০

খিজিরের বিসদৃশ কর্মকাণ্ডের রহস্যভেদ/৩০৬
হজরত খিজির জীবিত না মৃত/৩১৬
সম্রাট জুলকারনাইনের কাহিনী/৩১৯
ইয়াজুজ-মাজুজ/৩২৬
অনতিক্রম্য প্রাচীর নির্মাণ/৩৩০
সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম/৩৩৭
বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যান/৩৪১
আমার প্রভুপালনকর্তার প্রজ্ঞা ও বাণী অনন্ত/৩৪৪

www.eelm.weebly.com

সূরা মারয়াম ঃ আয়াত ১ — ৯৮

নবী জাকারিয়ার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ/৩৫১
নবী ইয়াহ্ইয়ার বৈশিষ্ট্যাবলী/৩৫৯
হজরত ঈসার আবির্ভাব/৩৬৩
শিশু নবীর ভাষণ/৩৭৫
আল্লাহ্ ভার্যা ও সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র/৩৭৮
পিতার সঙ্গে নবী ইব্রাহিমের বিতর্ক/৩৮২
মুসা ছিলেন বিশুদ্ধচিত্ত রসুল, নবী/৩৯০
ইদ্রিস ছিলেন সত্যবাদী, নবী, উচ্চমর্যাদাধারী/৩৯৩
তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যশীল হও/৪০৩
অবাধ্যদেরকে আমি টেনে বের করবোই/৪০৬
পুলসিরাত অতিক্রমের বিবরণ/৪১৩
সৎকর্মের ফল স্থায়ী/৪২০
সাবধানী ও অপরাধীদের অবস্থা/৪২৪
তুমি কি তাদের কাউকেও দেখতে পাও/৪৩২

সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ১—১৩৫

ক্লেশ দিবার জন্য কোরআন অবতীর্ণ করিনি/৪৩৫
রসুল মুসার বৃত্তান্ত/৪৪১
আল্লাহ্র সঙ্গে কথোপকথন/৪৪৩
নামাজ প্রতিষ্ঠা করো আমার স্মরণার্থে/৪৪৬
কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী/৪৪৮
আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও/৪৫৬
জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও/৪৫৭
মুসা জননীর প্রতি প্রত্যাদেশ/৪৫৯
আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি/৪৬৬
ফেরাউনের নিকটে গমনের নির্দেশ/৪৭১
মৃত্তিকা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি/৪৭৮
যাদুর প্রতিযোগিতা/৪৮৩
যাদুকরদের ইমান গ্রহণ/৪৮৯
ফেরাউন ও তার অনুসারীদের সলিল সমাধি/৪৯৬
সত্তরজনকে নিয়ে তুর পর্বতে গমন/৫০০
সামেরীর কুটচক্রান্ত/৫০২
নবী হারূনের সাবধানবাণী/৫০৬

www.eelm.weebly.com

সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হবে ভীত-সন্ত্রস্ত/৫১৪
পর্বতসমূহের পরিণতি/৫১৫
আমার জ্ঞানের বৃদ্ধিসাধন করো/৫২০
নবী আদম ও নবী মুসার মৃদু বিতর্ক/৫২৭
শত্রুরূপে একই সঙ্গে জান্নাত থেকে নেমে যাও/৫২৯
আল্লাহ্‌প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী/৫৩৮

সপ্তদশ পারা — সূরা আম্বিয়া : আয়াত ১—১১২

মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন/৫৪৩
মানুষের নবী মানুষ/৫৪৯
হুজুরার বাসিন্দাদের বৃত্তান্ত/৫৫২
আকাশ-পৃথিবী ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি/৫৫৪
তাঁর কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার কারো নেই/৫৫৮
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিলো ওতপ্রোতভাবে/৫৬৪
পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত/৫৬৬
জীব মাত্রই মরণশীল/৫৬৮
মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ/৫৬৯
আমি তো কেবল প্রত্যাদেশ দ্বারা তোমাদেরকে সতর্ক করি/৫৭৪
কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করবো ন্যায়বিচারের মানদণ্ড/৫৭৭
ইব্রাহিমকে দিয়েছিলেন ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান/৫৮১
অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো মূর্তিগুলোকে/৫৮৫
প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ/৫৯১
দেশত্যাগ/৫৯৬
নবী নূহের কথা/৫৯৯
নবী দাউদ ও নবী সুলায়মানের বিচার-মীমাংসা/৬০১
নবী আইয়ুবের বৃত্তান্ত/৬১৩
দীর্ঘ রোগ-ভোগ থেকে পরিত্রাণ/৬২২
দুঃখ-কষ্টের কাল ও প্রার্থনার সময়/৬২৩
নবী ইসমাঈল, নবী ইদ্রিস ও জুলকিফলের কাহিনী/৬৩১
নবী ইউনুসের কাহিনী/৬৩৪
পূতপবিত্রা ঈসা-জননী/৬৪১
অমোঘ প্রতিশ্রুতকাল আসন্ন হলে/৬৪৩
যাদের জন্য পূর্ব থেকে কল্যাণ নির্ধারিত/৬৪৮
আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি আশিসরূপে প্রেরণ করেছি/৬৫৪

www.eelm.weebly.com

সূচীপত্র

সপ্তদশ পারা — সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ১ — ৭৮

কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার/১৫
পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি সন্দিগ্ধ হও/২০
কপটাচারীদের পরিচয়/২৭
আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন/৩১
আল্লাহ্‌কে সেজদা করে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলকিছু/৩৩
সম্মুখসমরে হজরত হামযা ও হজরত আলী/৩৬
তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক/৩৮
যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তারা জান্নাতী/৪১
মহাসম্মানিত মসজিদ/৪৪
মক্কার জমিন ক্রয়-বিক্রয় প্রসঙ্গ/৪৭
মক্কার বাসগৃহ সমূহের মালিকানা/৪৮
হেরেম শরীফে পাপকার্য ও তার পরিণাম/৫১
ইব্রাহিমের জন্য স্থির করে দিয়েছিলাম কাবা গৃহের স্থান/৫৩
মানুষের জন্য হজ্জের ঘোষণা করে দাও/৫৫
নফল কোরবানীর গোশত ভক্ষণ প্রসঙ্গ/৫৯
সাধারণ কোরবানীর গোশত ভক্ষণ প্রসঙ্গ/৬০
দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা বিদূরণ, মানত পূরণ ও তাওয়াফ/৬২
মস্তকমুণ্ডন প্রসঙ্গ/৬৫
মানতের প্রকার ভেদ/৬৯
মানত সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার অভিমত/৭৩
ইবাদতনির্ভর মানত ও কসমের কাফফারা/৭৪
পাপযুক্ত মানত, তার হুকুম ও প্রকার/৭৬
ইবাদতনির্ভর মানতের বিবরণ/৮০
অনুগত মানতকে শর্তান্বিত করার বিধান/৮২
দাঁড়িয়ে বা বসে নামাজ পাঠ করার মানত/৮৩
চিৎ বা কাত হয়ে নামাজ পাঠ করার মানত/৮৪
কাবা, মসজিদে নববী ও বসতবাটি সংলগ্ন মসজিদে নামাজ পাঠের পুণ্য/৮৫
সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানত/৮৬
পদব্রজে হজ/৮৮
পদব্রজে মানতকারী যদি যানবাহন যোগে হজ করে/৯১
হজ ও ওমরার উল্লেখহীন পদব্রজে কাবাগৃহে গমন সম্পর্কিত মানত/৯৩
কাবাশরীফে নামাজ পাঠ করার মানত/৮৪
ইবাদতের মানতে আনুষঙ্গিক শর্তসহ পালন করা ওয়াজিব/৯৪
ইতেকাফের মানত/৯৫
রমজান মাসের ইতেকাফ/৯৯
কাফের অবস্থার মানত/১০১
দশ অথবা একশত হজ্জ করার মানত/১০২
রোগমুক্তির জন্য হজ্জের মানত/১০২
সমস্ত সম্পদ দানের মানত/১০৪
পশু কোরবানীর মানত/১০৬
বস্ত্রদানের মানত/১০৬

www.eelm.weebly.com

আত্মহনন, সন্তানহনন অথবা ক্রীতদাসহননের মানত/১০৭
রোজা রাখার মানত/১০৮
ফরজ, ওয়াজিব ও নফল তাওয়াফ/১১০
আগমনী তাওয়াফ/১১১
বিদায়ী তাওয়াফ/১১৫
তাওয়াফের শর্ত/১১৬
তাওয়াফে জিয়ারতের সময়/১২০
হাতিম কাবাগৃহের অংশ/১২২
তাওয়াফের মোস্তাহাব সমূহ/১২৬
নিঃসন্দেহে পৌত্তলিকতা নাপাক/১২৯
মিথ্যা সাক্ষ্য শিরিকতুল্য/১৩০
কোরবানীর পশুর দ্বারা উপকার আহরণ/১৩২
কোরবানীর স্থান/১৩৪
জবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র জিকির অত্যাবশ্যক/১৩৬
উষ্ট্রকে করেছি তোমাদের জন্য নিদর্শন/১৩৭
আল্লাহ্‌র নিকট পৌছে কেবল ধর্মনিষ্ঠা/১৪১
জেহাদের অনুমোদন/১৪৩
মুসলিম সেনাপতির অধিকার/১৪৭
আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে/১৪৯
আমি ধ্বংস করেছি কতো জনপদ/১৫১
অন্ধ হচ্ছে তাদের বক্ষস্থিত হৃদয়/১৫৩
আল্লাহ্ তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না/১৫৪
আমি তো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী/১৫৭
শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ্ তা বিদূরিত করেন/১৬০
সীমালংঘনকারীরা অশেষ মতভেদে রয়েছে/১৬৬
সেদিন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র/১৬৮
যারা গৃহত্যাগ করেছে আল্লাহ্‌র পথে/১৭০
আল্লাহ্ নিশ্চয় পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল/১৭১
আল্লাহ্ বারি বর্ষণ করেন আকাশ থেকে/১৭৩
তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন/১৭৪
হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, শোনো/১৮১
বার্তাবাহকগণের মনোনয়ন/১৮৪
সংগ্রাম করো আল্লাহ্‌র পথে/১৮৮
নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ/১৯০
এই ধর্ম তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের ধর্মের অনুরূপ/১৯২

অষ্টাদশ পারা : সূরা মু'মিনূন : আয়াত ১ — ১১৮

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে বিশ্বাসীরা/১৯৬
যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে/২০০
যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে/২০৩
তারাই হবে উত্তরাধিকারী জান্নাতের/২০৪
আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে/২০৬
তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে/২১২
আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি/২১৪

www.eelm.weebly.com

নবী নূহ ও তাঁর সম্প্রদায়/২১৮
রসূল মূসা ও হারুন/২৩০
মহাপুণ্যবতী মরিয়ম ও তাঁর আত্মজ/২৩২
আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না/২৪০
তবে কি তারা এই বাণী-বিষয়ে অনুধাবন করে না/২৪৪
আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ/২৪৬
তুমি তো তাদেরকে সরল পথে আহ্বান করছো/২৪৭
তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো/২৫২
কে সপ্তাকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি/২৫৪
তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা/২৫৫
সে দিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না/২৬১
যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম/২৬৩
যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা নিজেদের ক্ষতি করেছে/২৬৭

সূরা নূর : আয়াত ১ — ৬৪

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর শাস্তি/২৭৭
সঙ্গেসার/২৮৬
ব্যভিচারের সংজ্ঞা/২৯৭
ব্যভিচারের সাক্ষ্যদান/৩০২
গর্ভবতী ব্যভিচারিণীর শাস্তি/৩০৮
যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে/৩১৬
যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে/৩২৮
লেয়ানের বিধান/৩৪০
জননী আয়েশার প্রতি অপবাদের ঘটনা/৩৫৩
এটাতো নির্জলা অপবাদ/৩৬০
এটাতো এক গুরুতর অপবাদ/৩৬৪
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না/৩৬৮
ব্যভিচারের অপবাদপ্রদাতারা অভিশপ্ত/৩৭০
জননী আয়েশার বৈশিষ্ট্যসমূহ/৩৭৬
অন্যের গৃহে প্রবেশের বিধান/৩৭৮
পর্দার বিধান/৩৮৭
বিবাহের বিধান/৩৯৯
নারী, সৌগন্ধ ও নামাজ/৪০৫
যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই/৪১১
মুকাতাব ক্রীতদাসের বিধান/৪১২
আল্লাহ্ আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি/৪২৬
জ্যোতির উপরে জ্যোতি/৪৩১
হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির বিশুদ্ধ কাশফ ও ইলহামজাত ব্যাখ্যা/৪৪১
যাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত রাখে না/৪৫১
সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কার্য মরুভূমির মরীচিকা সম/৪৫৪
উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে/৪৫৮
আল্লাহ্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালা/৪৫৯
আল্লাহ্ সকল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে/৪৬০
মুনাফিকদের স্বভাব/৪৬২
আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম/৪৬৫

www.eelm.weebly.com

তিনি বিশ্বাসীদেরকে দান করবেন পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব/৪৬৮
গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়/৪৭৫
বৃদ্ধা নারীদের পর্দার বিধান/৪৭৮
অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্নের সঙ্গে একত্রাহারের বিধান/৪৮১
কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন/৪৮৭
স্থানত্যাগের জন্য রসুল স. এর অনুমতি গ্রহণের বিধান/৪৯১

সূরা ফুরক্বান : আয়াত : ১—২০

সার্বভৌমিকত্বে তাঁর কোন অংশী নেই/৫০০
তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি/৫০৯
যেদিন তিনি একত্রিত করবেন অংশীবাদীদেরকে/৫১৩
তোমাদের জন্য এককে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি/৫১৬

ঊনবিংশ পারা : সূরা ফুরক্বান : আয়াত ২১—৭৭

তারা বলবে, রক্ষা করো রক্ষা করো/৫২০
জান্নাতবাসীদের বাসস্থান ও বিশ্রামস্থান/৫২১
যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে/৫২২
যদি রসুলের সঙ্গে সৎপথ অবলম্বন করতাম/৫২৫
সমগ্র কোরআন একবারে অবতীর্ণ হলো না কেনো/৫৩০
হজরত মুসা, হজরত হারুন, হজরত নুহ প্রসঙ্গ/৫৩৩
যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করে/৫৩৯
কীভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়া বিস্তার করেন/৫৪২
তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন/৫৪৪
আমি নিজে পবিত্র ও অন্যকে পবিত্রকারী/৫৪৫
তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে/৫৬৩
নির্ভর করো তাঁর উপর, যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই/৫৬৭
যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র/৫৬৯
আল্লাহ্ তাদের পাপক্ষয় করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা/৫৭৭
মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার শাস্তি/৫৮৪

সূরা শুআরা : আয়াত : ১—২২৭

আমি পৃথিবীতে কতো উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদগত করেছি/৫৯৮
রসুল মুসা ও ফেরাউন প্রসঙ্গ/৫৯৯
নবী ইব্রাহিমের কাহিনি/৬১৯
সাবধানী ও পথভ্রষ্টদের পরিনাম/৬২৯
নবী নুহের ইতিবৃত্ত/৬৩২
নবী হুদের বিবরণ/৬৩৭
নবী সালেহ্ ও ছামুদ সম্প্রদায়/৬৪৩
নবী লুত ও তাঁর সম্প্রদায়/৬৪৭
নবী শোয়াইব ও অরণ্যবাসী/৬৫০
আল কোরআন তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক থেকে অবতীর্ণ/৬৫৩
স্বজনবর্গকে সতর্ক করে দাও/৬৬১
নির্ভর করো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্র উপর/৬৬৪
শয়তান অবতীর্ণ হয় ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট/৬৬৮
কবিদেরকে অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত/৬৭১
তবে তাদের কথা স্বতন্ত্র যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে/৬৭৩

www.eelm.weebly.com

সূচীপত্র

ঊনবিংশ পারা ¾ সূরা নমল ঃ আয়াত ১ ¾ ৫৯

কোরআন, পথনির্দেশ ও শুভ সমাচার/১৬
হজরত মুসা বললেন, আমি আগুন দেখেছি/১৭
তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো/২২
তোমার হাত বগলে রাখো/২৪
আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞানদান করেছিলাম/২৬
সুলায়মান ছিলেন দাউদের উত্তরাধিকারী/২৮
যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছুলো/৩৩
হুদহুদকে দেখছি না কেনো/৩৮
সাবার রানী বিলকিস/৪৪
বিলকিসের আত্মসমর্পণ/৬৬
হজরত সালেহ্ ও ছামুদ সম্প্রদায়/৬৮
হজরত লুত ও তাঁর অবাধ্য সম্প্রদায়/৭৪

বিংশতিতম পারা ¾ সূরা নমল ঃ আয়াত ৬০ ¾ ৯৩

যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী/৭৮
আল্লাহ্ ব্যতীত কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না/৮৩
নিশ্চয় এটা বিশ্বাসীদের জন্য নির্দেশ ও দয়া/৯০
এক জীব, যা মানুষের সঙ্গে কথা বলবে/৯২
আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্য/৯৮
যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে/৯৯
যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম/১০৭

সূরা ক্বসাস ঃ আয়াত ১ ¾ ৮৮

হজরত মুসা ও ফেরাউনের বৃত্তান্ত/১১১
তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কোরো/১১৫
তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম/১২৮
হজরত মুসার মাদিয়ান যাত্রা/১৩৬
হে মুসা! আমিই আল্লাহ্, বিশ্বজগতের প্রভুপালক/১৪৮
আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন/১৭৪
যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে/১৮১
কারূন ছিলো মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত/১৯০
শুভপরিণাম সাবধানীদের জন্য/২০৫

www.eelm.weebly.com

সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ১ ¾ ৪৪

তাদেরকে কি পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে/২১০
মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ/২১৬
হজরত নুহ ও তাঁর সম্প্রদায়/২২১
হজরত ইব্রাহিম ও তাঁর সম্প্রদায়/২২৪
হজরত ইব্রাহিমের অগ্নি-পরীক্ষা ও হিজরত/২৩০
আমি আদ ও ছামুদকে ধ্বংস করেছিলাম/২৪০

একবিংশতিতম পারা ঃ সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ৪৫ ¾ ৬৯

আল্লাহ্‌র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ/২৪৬
আপনাকে করেছি উম্মি (অক্ষরের অমুখাপেক্ষী)/২৫৪
সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট/২৫৮
পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত জীবন/২৬৬

সূরা রূম ঃ আয়াত ১ ¾ ৬০

রোম ও পারশ্যের জয়-পরাজয়/২৭২
তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না/২৭৯
সেদিন অপরাধিগণ হতাশ হয়ে পড়বে/২৮৩
তিনিই মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান/২৮৭
তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন/২৯১
আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুসরণ করো/২৯৭
মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে/৩০৯
তুমি মৃতকে শোনাতে পারবে না/৩১৬
তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন/৩২১

সূরা লোকমান ঃ আয়াত ১ ¾ ৩৪

এগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত/৩২৫
যারা অসার বাক্য ক্রয় করে/৩২৭
তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভব্যতীত/৩৩৬
আমি লোকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম/৩৩৮
হে বৎস ! আল্লাহ্‌র কোনো শরীক কোরো না/৩৪৩
পৃথিবীর সকল বৃক্ষ যদি কলম হয়/৩৫৫
ভয় করো সেই দিনের/৩৬০
কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকটে রয়েছে/৩৬২

সূরা সাজদা ঃ আয়াত ১ ¾ ৩০

সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে/৩৬৬
মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে/৩৭১

www.eelm.weebly.com

জ্বিন ও মানুষ উভয়ের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো/৩৭৫
আর তারা অহংকার করে না/৩৭৯
অগ্রাহ্য করো এবং উপেক্ষা করো/৩৯১

সূরা আহ্যাব ঃ আয়াত ১ ¾ ৩০

আল্লাহ্কে ভয় করো/৩৯৩
তোমরা তাদেরকে ডাকো তাদের পিতৃপরিচয়ে/৩৯৯
তাঁর পত্নিগণ তাদের মাতা/৪০১
খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ/৪০৭
কয়েক ওয়াক্তের নামাজ কাযা হলে/৪২৬
তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিলো/৪৩৪
তারা অল্পই যুদ্ধ করে/৪৩৮
তোমাদের জন্য রসুলুল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ/৪৪২
বনী কুরায়জার পরিণতি/৪৪৮
ভারী কোনো বস্তুর আঘাতে কাউকে হত্যা করলে/৪৬৪
যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন/৪৬৭
হজরত সাদ ইবনে মুয়াজের পরলোকগমন/৪৭৪
ইলার ঘটনা/৪৮৪

দ্বাবিংশতিতম পারা ঃ সূরা আহ্যাব ঃ আয়াত ৩১ ¾ ৭৩

হে নবী পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও/৪৮৬
আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী/৪৯৭
কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলকে অমান্য করলে/৫০০
তুমি অন্তরে যা গোপন করছো/৫০২
তোমরা আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করো/৫১১
আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে/৫১৬
স্পর্শ করবার পূর্বে তালাক দিলে/৫২০
হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি/৫২৮
এতে তাদের তুষ্টি সহজতর হবে/৫৩৫
এর পর তোমার জন্য কোনো নারী বৈধ নয়/৫৩৯
আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না/৫৪৩
তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও/৫৫২
দরূদশরীফ পাঠের ফযীলত/৫৫৬
যারা আল্লাহ্ ও রসুলকে পীড়া দেয়/৫৬০
যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে পীড়া দেয়/৫৬৪
তুমি কখনো আল্লাহ্র রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না/৫৬৭
যে দিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে ওলটপালট করা হবে/৫৬৯
সে তো অতিশয় জালেম, অতিশয় অজ্ঞ/৫৭৪

www.eelm.weebly.com

সূরা সাবা ঃ আয়াত ১ ¾ ৫৪

যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে/৫৮৬
তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কোরো/৫৯৩
আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে/৫৯৬
সাবাবাসীদের ঘটনা/৬০৬
শাফায়াত প্রসঙ্গ/৬১৭
তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী/৬২১
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে/৬২৩
সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নেতা-জনতার বিতর্ক/৬২৬
পৃথিবী হচ্ছে পরীক্ষাগার/৬৩০
যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করবে/৬৩২
আমার প্রতিপালক সত্যের দ্বারা অসত্যকে আঘাত করেন/৬৩৯
তারা নিকটস্থ স্থান থেকে ধৃত হবে/৬৪১

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ১ ¾ ৪৫

তিনি সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন/৬৪৫
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য/৬৪৯
কাউকে যদি তার মন্দকর্ম শোভন করে দেখানো হয়/৬৫০
তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ সমুত্থিত হয়/৬৫৩
দরিয়া দু'টি একরূপ নয়/৬৫৭
সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়মাধীন/৬৬০
হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী/৬৬২
সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান/৬৬৫
এমন ব্যবসায়, যার ক্ষয় নেই/৬৬৭
কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ অগ্রগামী/৬৭১
সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের/৬৭৬
তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন/৬৭৯
আল্লাহ্‌ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন/৬৮৪
তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি/৬৮৫

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ১ ¾ ২১

তুমি অবশ্যই রসুলদের অন্তর্ভুক্ত/৬৮৯
তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি/৬৯২
আমিই মৃতকে করি জীবিত/৬৯৫
বর্ণনা করো এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত/৬৯৭
যখন তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম দু'জন রসুল/৭০০

www.eelm.weebly.com

সূচীপত্র

ত্রয়োবিংশতিতম পারা— সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ২২—৮৩

হজরত ঈসার প্রতিনিধিদ্বয়ের ঘটনা/১৫
তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী/২৩
সূর্য-চন্দ্রের পরিক্রমণ, দিবা-রাত্রির বিবর্তন/২৫
আর একটি নিদর্শন জলযানসমূহ/৩০
তারা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের/৩২
যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে/৩৫
তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও/৪০
আমি রসুলকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি/৪৫
আমি সৃষ্টি করেছি আন্‌আম/৪৮
আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু থেকে/৫১
তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদ করেন/৫৬

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ১—১৮২

শপথ তাদের, যারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান/৫৯
আকাশকে নক্ষত্ররাজি সুষমাদ্বারা সুশোভিত করেছি/৬১
তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি আঠালো মৃত্তিকা থেকে/৬৫
তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে/৭০
তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে/৭৫
তবে তারা নয় যারা আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা/৭৬
এই বৃক্ষ উৎগত জাহান্নামের তলদেশ থেকে/৮৩
নূহ আমাকে আহ্বান করেছিলো/৮৬
আর ইব্রাহিম তো তাঁর গুণগামীদের অন্তর্ভুক্ত/৮৮
আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম/৯৯
আমি স্বপ্নে দেখি, আমি তোমাকে জবেহ করছি/১০২
আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মুসা ও হারুনের প্রতি/১১২
নবী ইলিয়াসের ইতিবৃত্ত/১১৩
নবী লূতের কাহিনী/১২৬
নবী ইউনুসের ঘটনা/১২৭
তারা আল্লাহ্ ও জ্বিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে/১৩৭
ফেরেশতা প্রসঙ্গ/১৩৯
তারা কি তবে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়/১৪৪

সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ১—৮৮

কাফেরেরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধীতায় ডুবে আছে/১৪৮
তাদের নিকটে কি আছে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের ভাণ্ডার?/১৫৪
স্মরণ করো, আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা/১৫৯
আমি দাউদকে দান করলাম সুলায়মান/১৮৫
স্মরণ করো, আমার বান্দা আইয়ুবকে/১৯৯
ইব্রাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব, ইসমাইল, আল-ইয়াসা ও জুলকিফল নবীর কথা/২০১
জাহান্নাম, কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল/২০৫
বলো, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র/২০৯
মানুষ সৃষ্টির ইতিবৃত্ত/২১৩
এটাতো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র/২১৭

সূরা যুমার ঃ আয়াত ১—৭৫

এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ নিকট থেকে/২১৯
তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন/২২২

www.eelm.weebly.com

তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না/২২৬
বলো, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?/২২৯
হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের প্রভুপালককে ভয় করো/২৩১
তুমি কি দেখোনা, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন?/২৩৭
আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন/২৪২
আরবী ভাষায় এই কোরআন বক্রতামুক্ত/২৫০
তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল/২৫২

চতুর্বিংশতিতম পারা— সূরা যুমার ঃ আয়াত ৩২—৭৫

জিজ্ঞেস করো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন/২৬০
আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের/২৬৪
মানুষকে বিপদ-আপদ স্পর্শ করলে সে আমাকে আহ্বান করে/২৬৯
আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না/২৭৩
তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও/২৮২
অতএব তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করো ও কৃতজ্ঞ হও/২৮৮
তারা আল্লাহ্র যথোচিত সম্মান করে না/২৯১
কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে/২৯৬
যারা আল্লাহ্কে ভয় করতো, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে/২৯৮

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ১—৮৫

যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন/৩০২
কেবল কাফেরেরাই আল্লাহ্র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে/৩০৬
যারা আরশ ধারণ করে আছে/৩০৯

আল্লাহ্ অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে/৩১৪
সুতরাং আল্লাহ্কে ডাকো তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে/৩১৮
তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না?/৩২৪
ফেরাউন বংশের এক ব্যক্তি, যে মু'মিন ছিলো/৩২৮
সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আমার অনুসরণ করো/৩৩৯
তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে সকাল ও সন্ধ্যায়/৩৪২
আমি অবশ্যই মুসাকে দান করেছিলাম পথ-নির্দেশ/৩৪৬
দাজ্জাল প্রসঙ্গ/৩৪৯
প্রার্থনা করুন এর অঙ্গীকার/৩৫৬
দোয়া কবুল হওয়ার শর্তসমূহ/৩৫৭
প্রার্থনার শিষ্টাচার/৩৫৮
তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, সবকিছুর স্রষ্টা/৩৬০
যারা আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে/৩৬৪

সূরা হা-মীম-আস্সাজ্দা ঃ আয়াত ১—৪৬

আরবী ভাষায় কোরআন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য/৩৭৩
তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠে/৩৮০
আকাশ সৃষ্টির বিবরণ/৩৮১
আদ সম্প্রদায়ের কথা/৩৮৭
সেদিন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে/৩৮৯
যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, তারপর অবিচলিত থাকে/৩৯৫
যে আল্লাহ্র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে/৩৯৯
যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহ্র স্মরণ নিবে/৪০৩
যিনি ভূমিকে জীবিত করেন, তিনিই তো মৃতের জীবনদানকারী/৪০৭
কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না/৪০৯

www.eelm.weebly.com

আমি যদি আজমী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করতাম/৪১০
তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না/৪১২

পঞ্চবিংশতিতম পারা— সূরা হা-মীম-আস্‌সাজদা ঃ আয়াত ৪৭—৫৪

কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌তেই ন্যস্ত/৪১৩
আমি তাদের জন্য নিদর্শন ব্যক্ত করবো বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে/৪১৭

সূরা শূরা ঃ আয়াত ১—৫৩

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা তাঁর-ই/৪২১
তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন/৪২৭
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁর নিকট/৪২৯
আল্লাহ্‌কে স্বীকার করবার পর যারা তাঁর সম্পর্কে বিতর্ক করে/৪৩৩
আমি তার জন্য ফসল বর্ধিত করে দেই/৪৩৬
আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাই না/৪৩৮
আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজবাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন/৪৪৩
তিনি মোমিন ও সৎকর্মপরায়ণগণের আহ্বানে সাড়া দেন/৪৪৭
তোমরা আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে পারবে না/৪৫১
যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে/৪৫৫
তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও/৪৬০
এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি/৪৬৩

সূরা যুখ্‌রুফ ঃ আয়াত ১—৮৯

পূর্ববর্তীদের নিকট আমি বহু নবীপ্রেরণ করেছিলাম/৪৬৮
তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যা/৪৭১
তিনি কি তাঁর সৃষ্টি থেকে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন/৪৭৫
স্মরণ করো, ইব্রাহিম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলোছিলো/৪৮১
নবী ইব্রাহিমের আকাশী পুস্তিকায় লিখা আছে/৪৮৬
হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানীর বক্তব্য/৪৮৮
আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান/৪৯০
তুমি কি শুনাতে পারবে বধিরকে/৪৯২
মুসাকে তো আমি আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছিলাম/৪৯৬
যখন মরিয়ম তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়/৫০২
যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো ও আত্মসম্পর্ণ করেছিলো/৫০৯
নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকবে স্থায়ীভাবে/৫১২
আমি কি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না/৫১৫

সূরা দুখান ঃ আয়াত ১—৫৯

আমি তো এটা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে/৫১৯
তিনি জীবনদান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান/৫২২
ফেরাউন ও নবী মুসার বৃত্তান্ত/৫২৫
আমি তো উদ্ধার করেছিলাম বনী ইসরাইলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে/৫৩০
শ্রেষ্ঠকি তারা, না তুব্বা সম্প্রদায়/৫৩২
নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য/৫৩৪

সূচীপত্র

ষষ্ঠবিংশতিতম পারা— সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১—১৮

আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের সমক্ষে কোনো বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না/১৬
নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু কোরো না/১৯
কপটাচারীর বার্তা পরীক্ষা করে দেখবে/২৭
বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাই ভাই/৩৩
মুসলমানদের কোনো সম্প্রদায় যদি শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়/৩৫
তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কোরো না/৩৯
অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ/৪৪
আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে/৪৮
ইমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি/৫২

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ১—৪৫

আকাশ-পৃথিবী এবং অন্যান্য সৃষ্টির বিবরণ/৬০
অবাধ্য সম্প্রদায়সমূহের বিবরণ/৬২
আমি মানুষের গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর/৭০
কর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্বয়ের বিবরণ/৭৩
মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যই আসবে/৭৫
সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো/৮০
আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে মুত্তাকীদের/৮২
আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং সকল কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে/৮৭
যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনতে পাবে মহানাদ/৯০

সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ১—৩০

তোমরা তো পরস্পরবিরোধী কথায় লিপ্ত/৯৪
নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে/১০০
সম্মানিত অতিথিদের বৃত্তান্ত/১০৫

সপ্তবিংশতিতম পারা— সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ৩১—৬০

আমি নিদর্শন রেখেছি নবী মুসার বৃত্তান্তে/১১১
আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী/১১৫
জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি এজন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে/১১৮

সূরা তূর ঃ আয়াত ১—৪৯

যে দিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে/১২৫
মুত্তাকীরা তো থাকবে জান্নাতে আরাম আয়েশে/১২৮
অতএব তুমি উপদেশ দান করতে থাকো/১৩৩
যেদিন তারা বজ্রাঘাতে হতচেতন হবে/১৩৮

সূরা নাজ্‌ম ঃ আয়াত ১—৬২

শপথ নক্ষত্রের, যখন তা হয় অস্তমিত/১৪৩
যা সে দেখেছে, তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি/১৫০
আত্মিক বিশ্বাস ও আত্মিক দর্শন/১৫৩
মেরাজের বিবরণ/১৫৯
ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্‌রই/১৬৪
তুমি কি দেখেছো সেই ব্যক্তিকে, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়/১৭৯
মৃত ব্যক্তির শোকে তার স্বজনেরা বিলাপ করলে কী হয়/১৮৩
সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রভুপালকের নিকট/১৯১
তিনি শি'রা নক্ষত্রের মালিক/১৯৫

সূরা ক্বমার ঃ আয়াত ১—৫৫

কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে, আর চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে/২০০
নবী নূহের বৃত্তান্ত/২০৩
আদ সম্প্রদায়ের বিনাশপ্রাপ্তির বিবরণ/২০৬
ছামুদ সম্প্রদায়ের বিনাশপ্রাপ্তির বিবরণ/২০৮

নবী লূতের সম্প্রদায়ের বিনাশপ্রাপ্তির বিবরণ/২১১
ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের বিনাশপ্রাপ্তির বিবরণ/২১৪
আমি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে/২১৭

সূরা আররহমান ঃ আয়াত ১—৭৮

দয়াময় আল্লাহ্, ইনিই শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন/২২১
তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য/২২৫
ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সমস্তই নশ্বর/২৩১
জাহান্নামের বিবরণ/২৪০
জান্নাতের বিবরণ/২৪৪

সূরা ওয়াক্বিয়াহ্ ঃ আয়াত ১—৯৬

তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে/২৫৮
জান্নাতের সুখপোকরণসমূহ/২৬২
কতো ভাগ্যবান ডানদিকের দল/২৬৭
কতো হতভাগ্য বামদিকের দল‘২৭৭
তোমরা যে বীজ বপন করো/২৮২
তোমরা যে পানি পান করো/২৮৩
তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করো/২৮৪
আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের/২৮৬
কোরআন স্পর্শ করা সম্পর্কিত বিধান/২৮৯
হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির ব্যাখ্যা/২৯১
প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়/২৯৪
যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়/২৯৬

সূরা আল হাদীদ ঃ আয়াত ১—২৯

তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত/২৯৯
তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্তে ইমান আনো না/৩০৩
কে আছে, যে আল্লাহ্কে দিবে উত্তম ঋণ/৩১১
তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবার সময় কি আসেনি/৩১৯
পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক/৩২৫
সন্ন্যাসবাদের বিবরণ/৩৩২

অষ্টাবিংশতিতম পারা— সূরা মুজাদালাহ্ ঃ আয়াত ১—২২

জেহারের বিধান/৩৪৫
গোপন পরামর্শ সম্পর্কিত বিধান/৩৬৭
কথা বলতে গেলে হাদিয়া প্রদানের বিধান/৩৭৫

সূরা হাশর ঃ আয়াত ১—২৪

ইহুদী বিতাড়নের বিবরণ/৩৮৫
প্রথম হাশর কী/৩৯২
আল্লাহ্ পাপাচারীদের লাঞ্ছিত করবেন/৩৯৬
ফায় এর বিবরণ/৩৯৯
যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে/৪১০
আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মুনাফিকেরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী/৪২৪
তারা শয়তানের মতো/৪২৯
তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহ্কে ভুলে গিয়েছে/৪৩৫

সূরা মুমতাহিনা ঃ আয়াত ১—১৩

হজরত হাতেবের বৃত্তান্ত/৪৪০
তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না/৪৪৩
সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন/৪৪৯
তোমাদের নিকট বিশ্বাসবতীরা হিজরত করে এলে/৪৫৩
কাফের নারীদের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না/৪৫৬
বিশ্বাসবতীগণ যখন আপনার নিকট এসে বায়াত গ্রহণ করে/৪৬০
তারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে/৪৬৪

সূরা আস্সফ্ফ ঃ আয়াত ১—১৪

www.eelm.weebly.com

তোমরা যা করো না, তা তোমরা কেনো বলো/৪৬৬
নবী মুসা ও নবী ঈসার বৃত্তান্ত/৪৬৮
আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিবো/৪৭১
জান্নাতের বিবরণ/৪৭৩

সূরা জুমআ' ঃ আয়াত ১—১১

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রসুল পাঠিয়েছেন/৪৭৭
নকশবন্দিয়া সিলসিলার আউলিয়াগণের মর্যাদা/৪৭৯
হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি ও তাঁর খলিফাগণের মর্যাদা/৪৭৯
অক্ষরের অমুখাপেক্ষী নবীর মহামর্যাদা/৪৮০
সেই মৃত্যু তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে/৪৮১
জুমআ'র দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়/৪৮২
প্রথম জুমআ'র নামাজ/৪৮৪
জুমআ'র আজানের বিধান/৪৮৮
খলিফা হজরত ওসমানের খুতবা/৪৯৪
খুতবার মাসায়েল/৪৯৪
জুমআ'র নামাজ কোথায় কীভাবে পড়তে হবে/৪৯৮
জুমআর দিনের সফর/৫০৬
জুমআর সুন্নতসমূহ/৫০৮
জুমআর দিবসের শ্রেষ্ঠত্ব/৫১১
জুমআর নামাজের মুসল্লির সংখ্যা/৫১৮

সূরা মুনাফিকুন ঃ আয়াত ১—১১

কপট আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের বৃত্তান্ত/৫২১
জননী জুওয়াইরিয়ার বৃত্তান্ত/৫২৯
কপটাচারীদের বৈশিষ্ট্যাবলী/৫৩১
যারা আল্লাহ্র স্মরণে উদাসীন, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত/৫৩৬

সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত ১—১৮

আধিপত্য তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান/৫৩৮
আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো বিপদই আপতিত হয় না/৫৪৬
তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা বিশেষ/৫৪৯

সূরা ত্বলাক ঃ আয়াত ১—১২

তালাকের বিধান/৫৫৪
'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' সম্পর্কে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি/৫৬০
বৃদ্ধা, অপ্রাপ্তবয়স্কা ও বিধবাদের ইদ্দতের বিধান/৫৬২
ইদ্দতপালনকারিণীদের বাসগৃহের বিধান/৫৬৮
বিচ্ছেদকৃতাদের খোরাকীর পরিমাণ/৫৭৭
আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং তাদের অনুরূপ পৃথিবীও/৫৮১

সূরা তাহরীম ঃ আয়াত ১—১২

আল্লাহ্ কসম থেকে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেছেন/৫৮৪
সহধর্মিণীগণ থেকে রসুল স. এর পৃথকবাসের বৃত্তান্ত/৫৯৫
তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা করো— বিশুদ্ধ তওবা/৬০৩
তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পাশে ধাবিত হবে/৬০৪
নবীগণ নিষ্পাপ/৬০৫
মহাপুণ্যবতী আসিয়ার বৃত্তান্ত/৬০৬
মহাপুণ্যবতী মরিয়মের বৃত্তান্ত/৬০৭
উম্মতজননী হজরত খাদিজা ও হজরত ফাতেমার মর্যাদা/৬০৮

www.eelm.weebly.com

সূচীপত্র

ঊনত্রিংশতিতম পারা ¾ সূরা মুলক ঃ আয়াত ১ ¾ ৩০

সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ত/১৬
যিনি সৃষ্টি করেছেন জীবন ও মৃত্যু/১৭
যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ/২৪
তিনি তো অন্তর্যামী/৩০
তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের উর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকুলের প্রতি/৩৩
তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন স্মরণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তকরণ/৩৬
শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে/৩৯

সূরা কলাম ঃ আয়াত ১ ¾ ৫২

তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার/৪১
তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত/৪৩
যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান-অধিপতিগণকে/৫১
মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই রয়েছে ভোগবিলাসপূর্ণ জান্নাত/৫৭
যে দিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে/৫৯
নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ/৬৪
নবী ইউনুসের বৃত্তান্ত/৬৭
কোরআন তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ/৭১
যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়/৭৩
ছামুদ ও আদ জাতির বিনাশের বৃত্তান্ত/৭৫
ফেরাউন ও অন্যান্য অবাধ্যদের শাস্তি/৭৭
যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে/৭৯
বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের পরিণতি/৮৬
নিশ্চয় এই কোরআন এক সম্মানিত রসুলের বাহিত বার্তা/৯০

সূরা মাআ'রিজ ঃ আয়াত ১ ¾ ৪৪

ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহ্‌র দিকে উর্ধ্বগামী হয়/৯৫
জজবা ও পীর-মোর্শেদের তাওয়াজ্জোহ্/৯৯
সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মতো/১০০
লেলিহান অগ্নি, যা গা থেকে চামড়া খসিয়ে দিবে/১০২
মানবজাতি যেনো বিভিন্ন খনি/১০৫
যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে/১০৯
কাফেরদের কী হলো যে, তারা তোমার দিকে ছুটে আসছে/১১১

সূরা নূহ ঃ আয়াত ১ ¾ ২৮

নবী নূহ ও তাঁর সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত/১১৫
তকদীর দুই রকমের/১১৭
অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে/১২৩
কবরাভ্যন্তরের বিবরণ/১২৯

সূরা জ্বিন ঃ আয়াত ১ ¾ ২৮

আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি/১৩২
রসুলেপাক স. এর তায়েফ যাত্রা/১৩৩
কিছুসংখ্যক জ্বিনের ইসলাম গ্রহণ/১৩৫
উরুজ-নুযুলের বিবরণ/১৪০
জ্বিনদের একটি ঘটনা/১৪২
জ্বিনদের বক্তব্য/১৪৬
যেব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়/১৫২
বলো, আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি/১৫৬
তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা/১৬০
ওলীগণের কারামত/১৬২
ওলীগণের এলমে হুজুরী/১৬৪
জ্যোতিষী ও চিকিৎসকদের জ্ঞান/১৬৬
সন্যাসী-সন্তদের ভবিষ্যদ্বাণী/১৬৯

সূরা মুয্‌যাম্‌মিল ঃ আয়াত ১ ¾ ২০

কোরআন আবৃত্তি করো ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে/১৭১
আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুভার বাণী/১৭৭
হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির একটি সিদ্ধান্ত/১৮০
সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো/১৮৪

www.eelm.weebly.com

লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ করো/১৯০
যদি তোমরা কুফরী করো, তবে কী করে আত্মরক্ষা করবে/১৯৪
নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু/১৯৭
তাহাজ্জুদ নামাজের প্রবিধান/২০০
ক্বেরাতের প্রবিধান/২০৬

সূরা মুদ্দাছ্ছির ঃ আয়াত ১ ¾ ৫৬
তাকবীরে তাহরিমার বিধান/২১৩
তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো/২১৪
সেদিন হবে এক সংকটের দিন/২১৭
আমি অচিরেই তাকে চড়াবো শাস্তির পাহাড়ে/২২১
প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ/২২৮
ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো কাজে আসবে না/২৩১
আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ উপদেশ গ্রহণ করবে না/২৩৭

সূরা ক্বিয়ামাহ্ ঃ আয়াত ১ ¾ ৪০
তবুও মানুষ পাপাচার করতে চায়/২৪০
সেদিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায়/২৪১
কোরআন সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমার/২৪৪
সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে/২৪৬
মানুষের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির ব্যাখ্যা/২৫০
কোনো কোনো মুখমণ্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ/২৫৩
মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে/২৫৭

সূরা দাহর ঃ আয়াত ১ ¾ ৩১
যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলো না/২৫৯
মানতের বিবরণ/২৬৫
যারা অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে/২৭২
জান্নাতের পানীয়, পানপাত্র ও সেবকদের বিবরণ/২৭৮
আমি তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি ক্রমে ক্রমে/২৮৫
তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন/২৮৮

সূরা মুরসালাত ঃ আয়াত ১ ¾ ৫০
নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্যম্ভাবী/২৯০
আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থকে সৃষ্টি করিনি/২৯৩
চলো তিন ছায়াবিশিষ্ট ছায়ার দিকে/২৯৭
মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় এবং প্রস্রবণবহুল স্থানে/৩০০

ত্রিংশতিতম পারা ¾ সূরা নাবা ঃ আয়াত ১ ¾ ৪০
তারা একে অপরের নিকট কী বিষয়ে জিজ্ঞেস করছে/৩০৪
আমি কি করিনি ভূমিকে শয্যা ও পর্বতসমূহকে কীলক/৩০৬
নিশ্চয়ই নির্ধারিত আছে বিচার দিবস/৩০৮
নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওৎ পেতে আছে/৩১১
বেদাতীরা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে/৩১৬
মুত্তাকীদের জন্য তো আছে সাফল্য/৩১৮
কবরাভ্যন্তরে যা ঘটবে/৩২৫

সূরা নাযিআ'ত ঃ আয়াত ১ ¾ ৪৬
শপথ তাদের যারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে/৩২৬
সেদিন প্রথম শিঙ্গাধ্বনি প্রকম্পিত করবে/৩৩১
তোমার নিকট মুসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কী/৩৩৪
তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি/৩৩৮
শায়েখ বাহাউদ্দিন নকশবন্দের কথা/৩৪৪
শায়েখ ইয়াকুব চরখীর কথা/৩৪৫
কিয়ামতের পরম জ্ঞান আছে কেবল আল্লাহ্র/৩৪৬

সূরা আ'বাসা ঃ আয়াত ১ ¾ ৪২
সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতুমের ঘটনা/৩৫০
মানুষ ধ্বংস হোক! সে কতো অকৃতজ্ঞ/৩৫৪
যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে/৩৫৯

সূরা তাকভীর ঃ আয়াত ১ ¾ ২৯
সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হবে/৩৬২
আয়লের বিধান/৩৬৭
সে তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে/৩৭২

সূরা ইনফিত্বর ঃ আয়াত ১ ¾ ১৯
যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে/৩৭৬
হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করলো/ ৩৭৫
পুণ্যবানগণতো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে/ ৩৮১
সূরা মুত্বাফফিফীন ঃ আয়াত ১ ¾ ৩৬
দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়/ ৩৮৪
পাপাচারীদের আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে/ ৩৮৮
অবশ্যই পূণ্যবানদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যীনে/ ৩৯৪

সূরা ইনশিক্বাক্ব ঃ আয়াত ১ ¾ ২৫
মহাপ্রলয় ও প্রতিফল দিবসের বিবরণ/ ৪০২
নিশ্চয়ই তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করবে/ ৪০৬
তেলাওয়াতের সেজদা সম্পর্কিত বিধান/ ৪১০

সূরা বুরূজ আয়াত ঃ ১ ¾ ২২
ধ্বংস হয়েছিলো কুণ্ডের অধিপতিরা/ ৪১৩
যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে জান্নাত/ ৪২১
লওহে মাহ্‌ফুজের বিবরণ/ ৪২৪
সূরা ত্বারিক্ব ঃ আয়াত ১ ¾ ১৭
প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে/ ৪২৬
নিশ্চয় আল- কোরআন মীমাংসাকারী বাণী/ ৪২৯

সূরা আ'লা ঃ আয়াত ১ ¾ ১৯
সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো/ ৪৩১
নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাবো, ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না/ ৪৩৪
নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে, যে পবিত্রতা অর্জন করে/ ৪৩৭

সূরা গশিয়াহ্ ঃ আয়াত ১ ¾ ২৬
সেদিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হবে/ ৪৪৩
অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে আনন্দোজ্জ্বল/ ৪৪৫
অতঃএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশদাতা/ ৪৪৯

সূরা ফাজর ঃ আয়াত ১ ¾ ৩০
নিশ্চয় এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য/ ৪৫২
আদ ও ছামুদ জাতির দুর্গতির বৃত্তান্ত/ ৪৫৩
মহাপূন্যবতী আসিয়ার বৃত্তান্ত/ ৪৫৭
সুখ ও দুঃখের পরীক্ষা/ ৪৫৯
আল্লাহ্ আদেশ করবেন, জাহান্নামকে উপস্থিত করো/ ৪৬৩
আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো/ ৪৬৫

সূরা বালাদ ঃ আয়াত ১ ¾ ২০
আর তুমি এই নগরের অধিবাসী/ ৪৬৯
সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করেনি/ ৪৭৪
সূরা শামস ঃ আয়াত ১ ¾ ১৫
সে-ই সফল কাম হবে যে, নিজেকে পবিত্র করবে/ ৪৮১
অলৌকিক উষ্ট্রীবধের পরিণাম/ ৪৮৪

সূরা লাইল ঃ আয়াত ১ ¾ ২১
অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির/ ৪৮৬
আমার কাজ তো কেবল পথনির্দেশ করা /৪৯০
সাহাবীগণ কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবেন না / ৪৯২

সূরা দুহা ঃ আয়াত ১ ¾ ১১
তোমার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়/ ৪৯৯
তিনি কি তোমাকে এতিম অবস্থায় পাননি/ ৫০১
অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন/ ৫০৪
তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দাও/ ৫০৭
হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির মাহাত্ম্য/৫০৯

সূরা ইনশিরাহ্ ঃ আয়াত ১ ¾ ৮
আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেইনি/ ৫১০
কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে /৫১৪

সূরা তীন ঃ আয়াত ১ ¾ ৮
আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে/ ৫২০
আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন/ ৫২৪

সূরা আ'লাক ঃ আয়াত ১ ¾ ১৯
পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন/ ৫২৯

www.eelm.weebly.com

যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন/ ৫৩৩
শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না/ ৫৩৩
বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে/ ৫৩৬
সেজদা করো এবং আমার নিকটবর্তী হও/ ৫৪১

সূরা ক্বদর ঃ আয়াত ১ ¾ ৫
নিশ্চয় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে/ ৫৪৪
কদর রজনীর সঠিক তারিখ/ ৫৪৬
শান্তিই শান্তি, সেই রজনীর ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত/ ৫৫০

সূরা বায়্যিনাহ্ ঃ আয়াত ১ ¾ ৮
যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিলো/ ৫৫৪
যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ/ ৫৫৬
পরিতুষ্টি হতে পারে দুই রকমের/ ৫৫৭

সূরা যিলযাল ঃ আয়াত ১ ¾ ৮
পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে কম্পিত হবে/ ৫৫৯
কেউ অনু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখবে/ ৫৬৩
কেউ অনুপরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখবে/ ৫৬৫

সূরা আ'দিয়াত ঃ আয়াত ১ ¾ ১১
শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির/ ৫৬৭
অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে/ ৫৭১

সূরা ক্বারিয়াহ্ ঃ আয়াত ১¾১১
সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো / ৫৭২
তার স্থান হবে হাবিয়া / ৫৭৩

সূরা তাকাছুর ঃ আয়াত ১ ¾ ৮
প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে/ ৫৭৮
তোমরা তো জাহান্নামকে দেখবেই/ ৫৮১
অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে/ ৫৮২

সূরা আসর ঃ আয়াত ১ ¾ ৩
মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত/ ৫৮৫

সূরা হুমাযাহ্ ঃ আয়াত ১ ¾ ৯
দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে/ ৫৮৭
তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহ/ ৫৯০
সূরা ফীল ঃ আয়াত ১ ¾ ৫
হস্তিঅধিপতিদের পরিণতি/ ৫৯১
আবরাহার বৃত্তান্ত/ ৫৯৩
সূরা কুরাইশ ঃ আয়াত ১ ¾ ৪
কুরায়েশ বলা হয় নজর ইবনে কানানার বংশধরদেরকে/ ৫৯৮
সূরা মাউ'ন ঃ আয়াত ১ ¾ ৭
তুমি কি দেখেছো তাকে, যে দ্বীনকে অস্বীকার করে/ ৬০২
সূরা কাউছার ঃ আয়াত ১ ¾ ৩
আমি অবশ্যই তোমাকে কাউছার দান করেছি/ ৬০৮
সূরা কাফিরূন ঃ আয়াত ১ ¾ ৬
আমি তার ইবাদত করি না, যার ইবাদত তোমরা করো/ ৬১২
সূরা নাসর ঃ আয়াত ১ ¾ ৩
যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়/ ৬১৫
তিনি তো তওবা কবুলকারী/ ৬২৯
সূরা লাহাব ঃ আয়াত ১ ¾ ৫
ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও/ ৬৩৩
সূরা ইখলাস ঃ আয়াত ১ ¾ ৪
তিনিই আল্লাহ্, এক অদ্বিতীয়/ ৬৩৭
আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী/ ৬৩৯
তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি/ ৬৪১
তাঁর সমতুল্য কেউই নেই/ ৬৪১
সূরা ফালাক্ব ঃ আয়াত ১ ¾ ৫
আমি শরণ গ্রহণ করছি ঊষার স্রষ্টার/ ৬৪৫
সূরা নাস ঃ আয়াত ১ ¾ ৬
আমি শরণ গ্রহণ করছি মানুষের প্রতিপালকের/ ৬৪৯
কোরআনের মাহাত্ম্য/ ৬৫৩

www.eelm.weebly.com

প্রথম পারা

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

সুরা ফাতিহা ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ

الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

- ❒ প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহেরই প্রাপ্য,
- ❒ যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু,
- ❒ কর্মফল– দিবসের মালিক।
- ❒ আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি,
- ❒ আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর,
- ❒ তাহাদের পথ, যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ,
- ❒ যাহারা ক্রোধ-নিপতিত নহে, পথভ্রষ্টও নহে।

<u>নামকরণ</u>

সুরা ফাতিহার একটি নাম আলহামদু শরীফ। আরেকটি নাম ফাতিহাতুল কিতাব। অর্থ–গ্রন্থের উদ্বোধনী। কোরআনের অবতরণিকা এই সুরা দিয়েই শুরু হয়েছে। তাই এই নামকরণ। আরেকটি নাম হচ্ছে উম্মুল কোরআন। অর্থ– কোরআনের জননী। এই সুরা দিয়েই কোরআন শুরু হয়েছে বলে সুরাটি কোরআনের মা স্বরূপ। এই সুরার আরেকটি নাম সাব্‌উ মাসানী। অর্থাৎ অনুপম বাণীসপ্তক। সর্ববাদীসম্মত মত এই যে, সাতটি আয়াত রয়েছে এই সুরায়। সুরাটি

www.eelm.weebly.com

নামাজে বারংবার আবৃত্তি করা হয়। মাসানী বলা হয় এই কারণে যে, সুরাটি একবার মক্কা শরীফে, আরেকবার মদীনা মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে অধিকতর বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, মক্কা শরীফই এই সুরার অবতরণ স্থল। আল্লামা ইবনে জারীর হজরত আবু হোরায়রা রা. এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, হজরত রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন—সুরা ফাতিহা অর্থাৎ আলহামদু শরীফ হচ্ছে উম্মুল কোরআন, ফাতিহাতুল কিতাব, সাব্উ মাসানী। আলহামদু সুরার আরেকটি নাম সুরা কান্জ (ভান্ডার)। হজরত আলী রা. থেকে ইসহাক ইবনে রওয়াহা বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেন—এই সুরাটি আরশের নিম্নস্থিত ভান্ডার থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। সুরা ফাতিহার আরেকটি নাম সুরা শিফা। ফযীলত অধ্যায়ে একটু পরেই আমি এই মর্মে আলোচনা পেশ করবো যে, সুরা ফাতিহা সকল ব্যাধির প্রতিষেধক।

'বিসমিল্লাহ্' অর্থ আমি আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করি। 'বিস্মি' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'বা' এবং 'ইসিম' শব্দ দু'টি দিয়ে। অতি ব্যবহারের ফলে ইসিমের 'আলিফ' অক্ষরটি লুপ্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে হজরত ওমর বিন আবদুল আজীজ এর উক্তি আল্লামা বাগবী উল্লেখ করেছেন এভাবে—হে মানুষেরা! তোমরা 'বা' অক্ষরটিকে প্রলম্বিত আকারে লিপিবদ্ধ করো, সুন্দরভাবে প্রতিভাসিত করো 'সিন'। আর 'মিম' বর্ণটিকে করো গোলাকৃতি। এতে করে আল্লাহর কালামের সম্মান করা হবে।

'ইসিম' শব্দটির ব্যুৎপত্তি ঘটেছে 'সামু' থেকে, 'ওয়াসমুন' থেকে নয়। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় 'সামিউন' এবং 'সামিয়াতুন'। 'বা' অক্ষরটি সঙ্গী ও সাহায্য কামনা অথবা বরকত অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্পাকের জিকির দ্বারা সাহায্য কামনা করা হয়ে থাকে। 'বা' অব্যয়টি 'আররহীম' শব্দের পরে লুপ্ত একটি ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ 'আক্রাউ' (আমি পড়ি)। যেমন বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা বাক্যটিতে দেখা যায়। সমধিক পরিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে—প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ্ উল্লেখ থাকাই বাঞ্ছনীয়। আবদুল কাদির তাঁর হাবী আরবাইন গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে লিখেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন— যে কাজ বিসমিল্লাহ্র সঙ্গে শুরু না হয় সে কাজ অসমাপ্ত থাকে। অর্থাৎ সহজ কথায় এরকম বলা কর্তব্য যে, আল্লাহ্পাকের নামে আমি পাঠ আরম্ভ করলাম।

আল্লাহ্ ঃ কারো কারো অভিমত হচ্ছে 'আল্লাহ্' শব্দটি একটি মৌল শব্দ। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে 'আল্লাহ্' শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে 'ইলাহ্' (উপাস্য) শব্দটি থেকে। ইলাহ্ শব্দের 'হামজা'র স্থলে 'আলিফ' ও 'লাম' যুক্ত করা হয়েছে। আর এমতো সংযোজন করা হয়েছে জরুরী ভিত্তিতে, যদ্দরুন 'আল্লাহ্' শব্দটি সিদ্ধ। কেনোনা, ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন শব্দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মিলিত এবং পৃথক অবস্থায় শব্দ দু'টি যেনো একার্থবোধক হয়। পরিশেষে বলা যায় শব্দটি ওই চিরস্থায়ী সত্তার মহিমান্বিত নাম যা সকল প্রকার অপরিচ্ছন্নতা ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র। এজন্যই

www.eelm.weebly.com

নামটি স্বমহিমায় ভাস্বর। নতুন কোনো শব্দের মাধ্যমে এর বিশেষণ সংযোজন নিষ্প্রয়োজন। তাই এককত্ব প্রকাশের পবিত্র বাক্যটি হচ্ছে— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। কখনো আবার শব্দটির ব্যবহার তার মূল অর্থের উপরও প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। যেমন বলা হয়েছে—"হুয়াল্লাহু ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌দ" (তিনিই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের একমাত্র উপাস্য)।

আর রহমানির রহীমঃ 'রহমান' এবং 'রহীম' শব্দ দু'টির অর্থ- দাতা ও দয়ালু। দু'টি শব্দই উৎপন্ন হয়েছে রহমত শব্দটি থেকে। রহমত অর্থ আন্তরিক নম্রতা। যার পরিণতি হচ্ছে কল্যাণ ও অনুগ্রহ। স্মর্তব্য, আল্লাহ্পাকের গুণবাচক নামের উপক্রমণিকা 'বা' শব্দ এখানে ধর্তব্য নয় বরং মুখ্য বিষয় হচ্ছে অর্থ ও উপসংহার। যেমন বলা হয়, রহমত বা অনুকম্পার পরিণতি হচ্ছে ইহ্‌সান বা অনুগ্রহ। উপক্রমণিকা বা সূচনা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র।

কোনো কোনো ভাষ্যকার মন্তব্য করেছেন– 'রহমান' ও 'রহীম' শব্দ দু'টি সম অর্থজ্ঞাপক। বিশেষণের আধিক্য বুঝাতে শব্দ দু'টি একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃত কথা হচ্ছে— 'রহীম' শব্দটির তুলনায় 'রহমান' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। আর 'রহমান' শব্দটি যেমন আল্লাহ্পাকের জন্য সুনির্দিষ্ট, 'রহীম' শব্দটি তেমন সুনির্ধারিত নয় (বিশ্বাসীদের সঙ্গে রসুল স. এর সম্পর্ক নির্ণায়ক রূপে কোরআনের একস্থানে তাঁর স. জন্য 'রউফুর রহীম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'রহমান' শব্দটির এরকম ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়না)।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ওই নাম দু'টির যুথবদ্ধ রূপ পূর্ণ অনুগ্রহকে প্রকাশ করে। তারা একে অপরের আধিক্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে সমুন্নত করে। অনুকম্পার এই আধিক্য অপরিমেয়। ব্যাপকতর অর্থবোধক বলে পৃথিবীতে 'রহমান' এবং এতাদৃশ ব্যাপক নয় বলে আখেরাতে 'রহীম'। আখেরাতে কেবল আল্লাহ্ভীরুগণই অনুকম্পা লাভে ধন্য হবেন। অনুকম্পা বন্টনের এবম্বিধ প্রকার হচ্ছে পরিমাণমূলক। আর অনুকম্পা বন্টন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও হওয়া সম্ভব। এই দৃষ্টিকোণটি বিচার্য হলে পৃথিবী ও আখেরাত উভয় স্থানেই তিনি রহমান এবং কেবল আখেরাতেই তিনি রহীম। তাই পরজগতে কেবল মু'মিনরাই উপকৃত হবেন। আর ইহজগতে মু'মিন কাফের উভয়েই উপকৃত হবে। আখেরাতের নেয়ামত অমূল্য। আর পৃথিবীর নেয়ামত স্বল্পমূল্য অথবা দুর্মূল্য। আর 'রহমান' শব্দটি আল্লাহ নামের সঙ্গে নামবাচক বিশেষ্যের মতোই সুনির্দিষ্ট। তাই রহমানের উল্লেখ এসেছে রহীমের আগে। আর ইহকালতো পরকালের আগেই। তাই রহীমের পূর্বে রহমানের উল্লেখ নিতান্তই সঙ্গত।

বিস্‌মিল্লাহ্ কোনো সুরা বা কোরআনের অংশ কিনা

মদীনা মুনাওয়ারা ও বসরার ক্বারীগণ এবং ইমাম আবু হানিফা ও কুফার অন্যান্য ফকিহ্গণের অভিমত হচ্ছে— বিস্‌মিল্লাহ্ সুরা ফাতিহার অংশ নয়। অন্য কোনো সুরারও অংশ নয়। বরকতের জন্য এবং দুই সুরার পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য

—২

www.eelm.weebly.com

প্রতিটি সুরার প্রারম্ভে বিস্‌মিল্লাহ্‌র অধিষ্ঠান। কারো কারো মতে বিস্‌মিল্লাহ্‌ কোরআনের অংশ নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে, বিস্‌মিল্লাহ্‌ অবশ্যই কোরআনের অন্তর্ভুক্ত। আর বিস্‌মিল্লাহ্‌ অবতীর্ণ হয়েছে দুই সুরার পার্থক্য নির্ণায়ক রূপে।

ইমাম হাকেম, ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের নীতিমালার অনুসরণে বিশুদ্ধ হাদিস রূপে হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. প্রথম প্রথম দু'টি সুরার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হতেন, তখন বিস্‌মিল্লাহ্‌ অবতীর্ণ হয়। ইমাম আবু দাউদ এই হাদিসটিকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, এই বর্ণনাটি মুরসাল হওয়ার অভিমতটি বিশুদ্ধতর। ইমাম মোহাম্মদ ইবনে হাসানকে বিস্‌মিল্লাহ্‌ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, দুই মলাটের মাঝখানে যা কিছু রয়েছে সবই কোরআন।

আমার বক্তব্য হচ্ছে, বিস্‌মিল্লাহ্‌ কোরআনের অন্তর্ভূত না হলে পৃথকীকরণের আরো অনেক উপায় থাকা সত্ত্বেও কোরআন লেখকগণ প্রতি সুরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ্‌ লিপিবদ্ধ করতেন না। যেমন তারা 'আমীন' শব্দটি পুনঃ পুনঃ লিখেননি।

বিসমিল্লাহ্‌ কি সুরা ফাতিহার অংশ

বিসমিল্লাহ্‌ যে সুরা ফাতিহার অংশ নয় তার প্রমাণ হিসেবে হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদিসটি পেশ করা যায়। হজরত আনাস বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্‌ স., হজরত আবুবকর এবং হজরত ওমরের পিছনে অনেক নামাজ পড়েছি। তাঁরা কেউই উচ্চ স্বরে বিসমিল্লাহ্‌ পড়েননি।

দ্বিতীয় প্রমাণ হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত ওই হাদিসটি, যেখানে বলা হয়েছে, আমি নামাজকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত করে দিয়েছি। এই হাদিসটি আমি অনতিবিলম্বে ফাযায়েল অধ্যায়ে বর্ণনা করবো।

তৃতীয় প্রমাণ হিসেবে আসছে, হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মা'কাল থেকে ইমাম আহমদ বর্ণিত হাদিসটি যেখানে উল্লেখ রয়েছে, আমার পিতা আমাকে নামাজের মধ্যে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম সহ আলহামদু সুরা উচ্চ স্বরে পড়তে শুনলেন। নামাজ শেষে তিনি আমাকে বললেন, বৎস! ইসলামে নতুনত্ব (বেদাত) সংযোজন থেকে বিরত থেকো। আমি হজরত রসুল স., হজরত আবুবকর, হজরত ওমর ও হজরত ওসমানের পিছনে নামাজ পড়েছি। কিন্তু তাঁদেরকে কখনোই বিসমিল্লাহ্‌ থেকে ক্বেরাত শুরু করতে শুনিনি। তাঁরা ছিলেন বেদাতের ঘোর শত্রু। ইমাম তিরমিজি বর্ণিত হাদিসেও এরকম উল্লেখ রয়েছে যে, আমি মহানবী স., আবুবকর, ওমর ও ওসমানের পিছনে নামাজ পড়েছি। কিন্তু তাঁদেরকে কখনো বিসমিল্লাহ্‌ (সশব্দে) পড়তে শুনিনি। মক্কা এবং কুফার ক্বারীগণ ও হেজাজের অধিকাংশ ফকিহ্‌ বলেছেন, বিসমিল্লাহ্‌ সুরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোনো সুরার অংশ নয়। অন্যত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে কেবল দুই সুরার মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর

www.eelm.weebly.com

জন্য। বিশুদ্ধ সূত্র সহযোগে হাকেম 'ওয়ালাক্বাদ আতাইনাকা সাবয়াম মিনাল মাসানি ওয়াল ক্বোরআনিল আজীম'– এ আয়াতটির তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে হজরত সাঈদ ইবনে জোবায়েরের ওই বর্ণনাটির উল্লেখ করেছেন; যেখানে বলা হয়েছে, সাবউ মাসানী ও উম্মুল কোরআন হচ্ছে সুরা ফাতিহা। আর বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম সুরা ফাতিহার সপ্ত আয়াতের একটি। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস যেভাবে পাঠ করতেন, আমিও সেভাবে পাঠ করি। তিনি আরও বলেছেন, বিসমিল্লাহ্ সুরা ফাতিহার সপ্তম আয়াত। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি উল্লেখ করেছেন– রসুলে পাক স. তাঁর নামাজ শুরু করতেন বিসমিল্লাহ্ দ্বারা। আমি (গ্রন্থকার) মনে করি, বিসমিল্লাহ্ সুরা ফাতিহার সপ্তম আয়াত– হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের এই উক্তিটি তাঁর নিজস্ব অভিমত। হাদিসটি মারফু নয়। আর ইমাম তিরমিজি বর্ণিত হাদিসটি সূত্রবিচারের দিক দিয়ে যথেষ্ট শক্তিশালীও নয়।

অপর একদল আলেম এরকম অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বিসমিল্লাহ্ সুরা তওবা ব্যতীত (সুরা ফাতিহাসহ) কোরআনের অন্য সকল সুরার অংশ। ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইবনে মুবারক এবং ইমাম শাফেয়ীও এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। আর কোরআনের সকল অনুলিপিতেই সুরা তওবা ব্যতীত সমস্ত সুরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আমি বলি, এর দ্বারা এতোটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, বিসমিল্লাহ্ কোরআনের অন্তর্ভূত। কিন্তু এতে করে একথা প্রমাণ করা যায় না যে, বিসমিল্লাহ্ প্রত্যেক সুরার অংশ। কী করে তা সম্ভব? এ সম্পর্কে সহীহ্ হাদিসসমূহ বিদ্যমান। সুরা মুল্‌ক সম্পর্কে রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন– এটি তিরিশ আয়াত সম্বলিত কোরআনের একটি সুরা। ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে আমি বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনায় আনবো। এখন শুধু এতোটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আয়াত গণনাকারীগণ এবিষয়ে একমত হয়েছেন যে, বিসমিল্লাহ্ ছাড়াই সুরা মুল্‌কের আয়াত সংখ্যা তিরিশ।

আলহামদু (সকল প্রশংসা) ঃ পার্থিব সৌন্দর্যের মৌখিক প্রকাশের নাম হামদ্। সে সৌন্দর্যের সঙ্গে নেয়ামত বা অনুগ্রহরাজি সম্পৃক্ত থাকুক বা না থাকুক। প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার (হামদ্ ও শুকরিয়ার) মধ্যে একটি সাধারণ সম্পর্ক বিদ্যমান। কৃতজ্ঞতা অনুগ্রহ লাভের সঙ্গে সম্পর্কিত। অভিব্যক্তির দিক থেকে বিভিন্নভাবে কৃতজ্ঞতাকে নির্দিষ্ট করা যায়। কখনো আন্তরিক অনুভবের মাধ্যমে, কখনো অন্যান্য ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির দ্বারা, আবার কখনো ভাষার মাধ্যমে। কিন্তু প্রশংসা কেবল ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ করা সম্ভব। তাই রসুল স. এরশাদ করেছেন - প্রশংসা হলো কৃতজ্ঞতার ভিত্তি। যে আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা করলো না, সে ন্যূনতম কৃতজ্ঞতাও পালন করলো না। –এ বর্ণনাটি এসেছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, কাতাদা এবং আবদুর রাজ্জাকের মাধ্যমে। 'হামদ' শব্দটি 'মাদাহ্'

www.eelm.weebly.com

শব্দটির সঙ্গে সাধারণভাবে তুলনামূলক সম্পর্কধারী। পার্থিব কিংবা অপার্থিব সৌন্দর্য প্রশংসিত হলে, ওই প্রশংসাকে 'মাদাহ্' বলে। 'হামদ' এর সঙ্গে 'আল' যুক্ত হয়ে সুনির্দিষ্ট শব্দটি গঠিত হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে– এই সুনির্দিষ্ট অবস্থাটি আবার কী রকম? একটি তো জাতিবাচক বিশেষণ যা সর্বজনবিদিত। আর অপরটি হচ্ছে সামষ্টিক প্রকাশ। সমষ্টিগতভাবে সকল প্রশংসাইতো আল্লাহ্পাকের জন্যে। তিনি তাঁর বান্দাগণের কার্য সমূহের স্রষ্টা। তিনি বলেন, হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা যা কিছু নেয়ামত পেয়েছো, সে সমস্ত আল্লাহ্র দিক থেকেই এসেছে। এতে এরকম ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্পাক জীবিত, ক্ষমতাশালী, অভিপ্রায়াধিকারী ও শক্তির মালিক। একারণে তিনি সকল প্রশংসার অধিকারী।

এর পরের শব্দটি হচ্ছে 'লিল্লাহ্'। 'লিল্লাহ্' এর অর্থ কেবল আল্লাহ্র। 'লি' আল্লাহ্ শব্দটিকে সুনির্দিষ্ট করেছে। আরবী ভাষারীতি অনুযায়ী আলহামদুলিল্লাহ্ একটি পূর্ণ বাক্য– যার অর্থ হচ্ছে, সমস্ত প্রশংসা কেবলই আল্লাহ্র। এই বাক্যটির মাধ্যমে বান্দাদেরকে প্রশস্তি প্রকাশের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বাক্যের উহ্য অংশটিসহ পূর্ণ উদ্ধৃতি হবে .এরকম- 'কুল আলহামদুলিল্লাহ্ (হে মানব সকল! বলো, সকল প্রশংসা কেবলই আল্লাহ্র)। এরকম বলা হলে পরবর্তীতে আগত 'ইয়্যাকা না'বুদু'বাক্যটির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। যেহেতু না'বুদু কথাটির বক্তা বান্দা নিজেই।

রব্বিল আ'লামীন ঃ অর্থ বিশ্বসমূহের প্রভুপালয়িতা। 'রব' শব্দের আরেকটি অর্থ সত্ত্বাধিকারী। যেমন বলা হয়, 'রব্বিদ্ দার'– গৃহের সত্ত্বাধিকারী। রব শব্দটি তরবিয়ত অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। কোনোকিছুকে ক্রমপরিণতির দিকে পৌঁছানোর নাম তরবিয়ত। তরবিয়ত বা প্রতিপালনের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়, "খলিদুন সওমুন ওয়া যায়িদুন আদলুন।" 'রব' শব্দটি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো বেলায় প্রযোজ্য হতেই পারে না। আর বিশ্বজগত সমূহের উন্মেষ, স্থিতি এবং স্থায়িত্ব রবের (প্রভুপালয়িতার) মুখাপেক্ষী।

আ'লামীন (বিশ্বসমূহ) ঃ 'আলম' (বিশ্ব) শব্দের বহুবচন (কোরআন এবং হাদিসে 'আলম' শব্দের একবচনসুলভ ব্যবহার নাই)। ব্যবহারিক দিক থেকে আলামীনের একবচন হিসেবে 'আলম' শব্দটি পরিদৃষ্ট হয় না। 'আলম' বলতে ওই বস্তুকে বুঝানো হয়– আলমের স্রষ্টা যার সম্পর্কে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। যেমন সীল বলা হয় ওই বস্তুকে যার দ্বারা সীলমোহর করা হয়। সম্ভাব্য সকল কিছুকেই আলম নামে অভিহিত করা যায়। সকল সৃষ্টিই সম্ভাব্য অস্তিত্ব (মুমকিনুল ওজুদ)। তাই সকল সৃষ্টিকে আলম বলা যেতে পারে। ফেরাউন বলেছিলো, জগতের প্রভুপালক কে? হজরত মুসা আ. বলেছিলেন, তিনিই সারা জাহানের রব, যিনি নভোমন্ডল, পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের সকল কিছুর সত্ত্বাধিকারী।

জগতের রয়েছে বহুতর বিন্যাস। তাই এখানে বহুবচনের ব্যবহারই সঙ্গত। ওয়াহাব বলেছেন, আল্লাহ্পাক আঠারো হাজার আলম সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে এ

www.eelm.weebly.com

পৃথিবী একটি আলম। বিশ্বসমূহের তুলনায় পৃথিবী যেনো সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে রক্ষিত একটি তস্তরী (পিরিচ)। হজরত কাব আহবার বলেছেন, আলম সমূহের সংখ্যা এবং আল্লাহ্পাকের সৈন্যসংখ্যা আল্লাহ্পাক ছাড়া অন্য কারো জানা নেই। কেউ কেউ বলেছেন, জ্ঞানসম্পন্ন সৃষ্টিকুলের নাম আলম। যেমন, মানুষ, ফেরেশ্তা ও জ্বিন। অন্যান্য সৃষ্টি এদের অধীন।

আর রহমানীর রহীম (পরম দাতা ও দয়ালু) ঃ কোরআন পাঠকগণ এখানে বিরামস্থলে মৃদু উচ্চারণকে সিদ্ধ রেখেছেন। এ আয়াতটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম সুরা ফাতিহার অংশ নয়। যদি হতো তবে 'আর রহমানীর রহীম' বাক্যটি পুনরাবৃত্ত হতো না। আর অকারণ পুনরাবৃত্তি একটি অসুন্দর ব্যাপার। এরকম দুর্বল বর্ণনাভঙ্গি ভাষাবিদগণের নিকট অনভিপ্রেত। কেউ কেউ বলেছেন, 'রব্বিল আলামীনের' কারণ স্বরূপ 'আর রহমানীর রহীম' উল্লেখিত হয়েছে (কেনো তিনি বিশ্বসমূহের প্রভু? উত্তর হচ্ছে- এ কারনে যে, তিনি রহমান ও রহীম)।

মালিকি ইয়াউমিদ্দিন(প্রতিফল দিবসের মালিক) ঃ ক্বারী আসিম, কাসাই এবং ইয়াকুবের পঠনে ব্যবহৃত হয়েছে 'মা-লিক'। অন্যান্য ক্বারীগণ পড়েছেন 'মালিক'। ক্বারী আবু ওমর পড়তেন 'আর রহী ম্মালিকি ইয়াউমিদ্দিন'। অর্থাৎ 'আর রহীমের' মীমকে তিনি মালিকির মীমের সঙ্গে সন্ধি করতেন। এভাবেই দুই হরকত বিশিষ্ট শব্দের সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। শর্ত হচ্ছে, শব্দ দু'টি হতে হবে সমুচ্চারিত অথবা সমুচ্চারণের নিকটবর্তী। বিস্তৃত বিবরণ এরকম - একজাতীয় দু'টি অক্ষর দু'টি শব্দের অন্তিমে ও প্রারম্ভে উল্লেখিত হলে সন্ধিবদ্ধ উচ্চারণ করা যায়। এরকম অক্ষরের সংখ্যা সতেরটি (অবশ্য কতিপয় ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও রয়েছে)। এই সতেরটি অক্ষর হচ্ছে – বা, তা, ছা, হা, র, সিন, আঈন এবং আঈন থেকে ইয়া। এই সন্ধিবদ্ধতাকে ইদগম বলে। নিম্নে ক'টি উদাহরণ দেয়া হলো –

১. যাহাব্ বি সাময়িহিম– এখানে যাহাব এর 'বা' এবং বিসাময়িহিম এর 'বা' পাশাপাশি বিদ্যমান থাকার কারণে সন্ধিসিদ্ধ উচ্চারণ হয়েছে।
২. গইরাযাতিশ্ শাউকাতিত্ তাকুনু লাকুম– এখানে 'শাউকাত' এবং 'তাকুনু' শব্দ দু'টিতে 'তা' অক্ষরটি পাশাপাশি থাকার কারণে ইদগম হয়েছে।
৩. লা আব্‌রহ্হাত্তা– এখানে 'আব্‌রহ্' শব্দটির শেষে এবং 'হাত্তা' শব্দটির প্রথমে 'হা' থাকায় ইদগম হয়েছে।
৪. ফাস্তাগ্ফার রব্বাহু– এক্ষেত্রে 'র' বর্ণটি পাশাপাশি থাকার কারণে যুক্তভাবে উচ্চারিত হয়েছে।
৫. ওয়া তারান্নাসু সুকারা– এটি 'সিন' অক্ষরের ইদগমের উদাহরণ।
৬. ওয়াত্ত্বিয় য়ালা কুলুবিহিম– এটি আঈনের ইদগমের একটি দৃষ্টান্ত।
৭. তায়রিফ ফি উজুহিহিম - এখানে ইদগম হয়েছে 'ফা' অক্ষরের।

www.eelm.weebly.com

৮. গঈনের ইদগমের উদাহরণ হচ্ছে– ওয়া মাইয়াব্‌তাগি গইরল ইসলাম।

৯. ক্বফ এর ইদগমের দৃষ্টান্ত এরকম– আদরাকাহুল গারাকুক্বলা।

১০. কাফ এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে– ইন্নাকা কুনতাবিনা।

১১.লাম এর দৃষ্টান্ত– জায়াল্‌লাকুম।

১২. ওয়াও এর নিয়ম– ইল্লাহুউউয়াল মালাইকাহ্।

১৩. গোল হা এর দৃষ্টান্ত– ইন্নাহ্ হুয়া।

১৪.ইয়া এর ইদগম এরকম– নুদিইয়্ইয়ামুসা।

বর্ণিত বর্ণগুলোর মধ্যে সন্ধি করা শুদ্ধ হলেও এর সঙ্গে রয়েছে আরো কিছু নিয়ম। যেমন 'তা' অক্ষরটি পাশাপাশি লিপিবদ্ধ হলেও একটি যদি উত্তম পুরুষ এবং অন্যটি যদি মধ্যম পুরুষ জ্ঞাপক হয় তবে সন্ধি হবে না। যেমন কুনতুতুরবা - এখানে 'তা' বর্ণ দু'টি ইদগম না হয়ে ইজহার হবে (পৃথক পৃথক ভাবে স্পষ্ট উচ্চারিত হবে)। আবার পাশাপাশি উল্লেখিত দু'টি বর্ণের প্রথমটি তানবীন অথবা তাশদীদ যুক্ত হলেও ইদগম হবে না। যেমন, ওয়াসিউল আলীম, ছুম্মা মিক্বদ। দৃষ্টান্ত হিসেবে আরো বলা যায়, লা ইয়াহ্‌জুনকা কুফ্‌রুন– এখানে 'কাফের' পূর্ব অক্ষর 'নুন' ইখফার অক্ষর। তাই আবু আমের এক্ষেত্রে সন্ধি করেননি। সন্ধিবিরোধী আরো একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে– প্রথম শব্দের শেষ অক্ষর হজফ বিশিষ্ট (মাহ্‌জুফ) হলেও ইদগম হবে না। এ সকল ক্ষেত্রে হজফের কারণেই এক জাতীয় দু'টি অক্ষর পাশাপাশি অবস্থান নিতে পেরেছে। যেমন, ইয়াবতাগি গইরাল ইসলাম– এখানে মূল শব্দটি ছিলো 'ইয়াব্‌তাগি' ইয়াকু কাজিবা– মূলে ছিলো 'ইয়াকুন।' আরেকটি দৃষ্টান্ত এরকম- 'ইয়াখলু লাকুম', যা মূলে ছিলো 'ইয়াখ্‌লু'। –এই শব্দগুলোর ক্ষেত্রে ক্বারী আবু আমের ইদগম ও ইজহার উভয় ব্যবস্থাকেই সিদ্ধ রেখেছেন। আরেকটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হচ্ছে– 'আলি লুত।' অধিকতর শুদ্ধ বিধান হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে ইদগম সিদ্ধ। ক্বারী আবু আমেরের অভিমত হচ্ছে – 'হুয়া' শব্দের হা বর্ণটি যদি পেশ যুক্ত হয় এবং তারপর যদি ওয়াও বর্ণটি আসে তবে ইদগম হবে। যেমন– হুয়া ওয়া মাইইয়া'মুরু বিল আদ্‌লি। –এসকল অবস্থায় ইদগম করা না করা সম্পর্কে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। তবে ইদগমের বর্ণনাবলী সমধিক শক্তিশালী।

কেউ কেউ বলেছেন, 'মালিক' এবং 'মা-লিক' এর অর্থ এক-ই। যেমন ফারিহীন এবং 'ফা-রিহিন', 'হাজিরিন' এবং 'হা-জিরিন'। প্রকৃত কথা হচ্ছে, সত্ত্বাধিকারী হিসেবে ব্যবহৃত 'মা-লিক' শব্দটি 'মালিক' শব্দ থেকে গঠিত হয়েছে। আরবী ভাষায় প্রবাদ রয়েছে 'মা-লিকুদ্দার' অর্থ 'রব্বুদ্দার' (গৃহের সত্ত্বাধিকারী)। মালিক শব্দের অর্থ রাজা বা সম্রাট– যা গঠিত হয়েছে মূল্‌ক শব্দটি থেকে। 'মালিক' এবং 'মা-লিক'– এই দু'রকম উচ্চারণই আল্লাহ্‌পাকের বিশেষণ রূপে সুবিদিত। কাজেই কেবল মালিক উচ্চারণটি সর্বজনমান্য বলা যায় না। কেউ কেউ

www.eelm.weebly.com

বলেছেন মালিক অথবা মা-লিক তিনিই, যিনি অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম। তাই এই শব্দ দু'টিকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা বৈধ নয়।

'ইয়াউমিদ্দিন' অর্থ প্রতিফল দিবস। ওই দিবসকে প্রতিফল দিবস বলে, যেদিন পুরস্কার ও তিরস্কার কার্যকর হবে। 'কামা তাদিনু তুদান' শব্দটি গঠিত হয়েছে দ্বীন শব্দ হতে। এর অর্থ হচ্ছে, যেমন কর্ম তেমন ফল। এটি একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ এবং মারফু হাদিস (যে হাদিসের সূত্র রসুলুল্লাহ্ স. পর্যন্ত সংযুক্ত)। কামিল গ্রন্থে হজরত আদী শিথিল সনদের সঙ্গে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন মুরসাল রূপে। মালিক বিন দিনারের মাধ্যমে আহমদ বর্ণনা করেছেন - এই আয়াতটি তওরাত শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ফুজালা বিন উবাইদ থেকে মারফু হিসেবে ইমাম দায়লামী বর্ণনা করেছেন, এটা ইঞ্জিল শরীফের বাক্য। ইমাম মুজাহিদ বলেছেন, ইয়াউমিদ্দিন অর্থ হিসাব নিকাশের দিন। কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে– 'যালিকাদ দিনুল কাইয়িমু' (আর এটা সোজা হিসাব)। কেউ কেউ বলেছেন, 'দ্বিন' অর্থ পরাক্রম। আরবীভাষীগণ বলেন, 'দাইয়ান তুহু ফাদানা' (আমি তাকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করলাম, সে অনুগত হয়ে গেলো)। 'দ্বিন' শব্দের অর্থ ইসলাম ও আনুগত্যও হতে পারে। কেনোনা ওই সময় ইসলাম ও আনুগত্য ব্যতীত অন্য কিছুই ফলদায়ক হবে না। ওই দিনটিকে বিশেষ দিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এজন্য যে, ওই দিন ব্যতীত অন্য সকল দিনে সৃষ্টির জন্য রূপক অর্থে মালিক শব্দটির ব্যবহার হওয়া সম্ভব। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে ভীতিপ্রদর্শন এবং 'ইয়্যাকা না'বুদু' (আমরা তোমারই ইবাদত করি) – এই ঘোষণার প্রতি আহবান জানানো। এখানে বিশেষণকে ক্রিয়ার আধারের সঙ্গে একারণেই সম্বন্ধিত করা হয়েছে যে, এখানে ক্রিয়ার আধার কর্মপদের স্থলাভিষিক্ত। এরকম সম্বন্ধিত অবস্থা রয়েছে 'সারিকুল লাইলাহ্' বাক্যটিতে। 'মা-লিক' শব্দটি কর্তৃপদ– যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপক। কিন্তু এখানে অতীতকাল হিসেবেই অর্থবহ। যেমন, ওয়ানাদা আছ্হাবুল জান্নাহ্। যে ঘটনা আত্মপ্রত্যয়শীল এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক, বুঝতে হবে তা সংঘঠিত হয়েছে। ব্যাপারটি এরকমই। তাই আল্লাহ্র বিশেষণ হিসেবে 'মা-লিকি ইয়াউমিদ্দিন' বিশেষণের ব্যবহার সুসঙ্গত। রব্বিল আলামীন, আর রহমানীর রহীম, মা-লিকি ইয়াউমিদ্দিন এসমস্ত বর্ণনার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্পাক সকল স্তব-স্তুতির অধিকারী। তাই তিনি ব্যতীত উপাসনা লাভের যোগ্য কে? ইয়্যাকা না'বুদু (আমরা তোমারই ইবাদত করি) – এ বাক্যটির ভূমিকা স্বরূপ আল্লাহ্তায়ালার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে প্রথমেই। প্রমাণ করা হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার এককত্ব, পরাক্রম এবং দয়া দাক্ষিণ্যকে। এভাবেই প্রমাণিত হয়েছে সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার পার্থক্য। এভাবেই তাঁর অদৃশ্য ও অব্যক্ত গুণাবলী যেনো দৃশ্যগোচর হয়। আর এ অবস্থায় যেনো সৃষ্টির সমর্পনেচ্ছাকে সহজাত বিকাশ লাভের সুযোগ করে

www.eelm.weebly.com

দেয়া হয়েছে। বান্দা এবার উচ্চারণ করুক 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্‌তাঈন' (হে করুণানিধান দয়াময়, আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি)। ক্বারীগণ 'নাস্‌তাঈন' শব্দের 'নুন' বরং প্রতিটি পেশ যুক্ত বর্ণ বিরাম স্থলে 'রওম' এবং 'ইশমাম' আনুনাসিক রূপে উচ্চারণ করেন। এমতাবস্থায় আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা হবে এরকম– বর্ণিত বিশেষণে বিশেষিত হে আমাদের আল্লাহ্! আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট আনুগত্যের সামর্থ্য কামনা করি। শুধু ইবাদতের সামর্থ্য কামনাই নয়, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল বিষয়ে আমরা তোমারই সহায়তা যাচনা করি।

জ্ঞাতব্যঃ দার্শনিক এ্যারিস্টটল ও তার অনুসারীদের মতবাদ হচ্ছে– আল্লাহ্‌পাক সমস্ত সৃষ্টির কার্যকারণ নীতি। অর্থাৎ সৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা ও অনুভূতি ব্যতিরেকেই। যেমন, সূর্যের আলোকচ্ছটা সূর্যের বিনা ইচ্ছাতেই বিকিরিত হয়। জগতের নিত্যনতুন ঘটনা প্রবাহই শুধু নয় বরং জগতের সূচনাও তাঁর পরম সত্তার সাথে একীভূত। এ জগত নিত্য পরিবর্তনশীল হলেও সম্ভাবনার আদিজগত অপরিবর্তনীয়। আর ভিন্ন দৃষ্টিতে সৃষ্টিও অনাদি। রহ্‌মানীর রহীম উচ্চারণ দ্বারা এই বাতিল মতবাদটির প্রতি প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। রহমত অর্থ বাধ্যবাধকতাহীন দয়া, করুণা। করুণাকারী করুণা করতে বাধ্য নন বরং তিনি তাঁর আপন ইচ্ছায় করুণা বিতরণ করেন। কর্তব্য বা দায়িত্ব পালনের নাম রহমত হতে পারেনা। আল্লাহ্‌তায়ালা এজন্যই রহমান এবং রহীম যে, সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান তাঁর কর্তব্যভূত নয় এবং সৃষ্টির অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে কোনো দায়বদ্ধতাও তাঁর নেই। বরং তিনি দয়া করে এজগতকে সৃষ্টি করেছেন - সৃষ্টির অস্তিত্ব নিশ্চিত করেছেন এবং সৃষ্টিকে নিয়ে চলেছেন পূর্ণতা ও ক্রমপরিণতির দিকে।

আরবী ভাষায় বাকভঙ্গির বিভিন্ন রূপান্তর রীতিসিদ্ধ। প্রথম থেকে মধ্যম পুরুষ এরকম বাকভঙ্গি আরবী ভাষায় সুপ্রচল। এরকম রূপান্তরশীল বাকভঙ্গির উদ্দেশ্য হচ্ছে, শ্রোতার অন্তরে উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চার করা। ইবাদত বা উপাসনা হচ্ছে চরম অসহায়ত্ব ও চূড়ান্ত পর্যায়ে বিনয়নম্রতার নাম। আরবী প্রবাদ বচনে রয়েছে– তারিকুন মুয়াব্বাদুন।

'না' বুদু' ও 'নাস্‌তাঈন' শব্দ দু'টিতে উত্তম পুরুষের বহুবচন 'আমরা' ব্যবহৃত হয়েছে। এতে করে পাঠকের সঙ্গে তার সঙ্গী-সাথীগণ সম অংশীদার হন। এই বর্ণনাভঙ্গিটি হচ্ছে দলবদ্ধ উপাসনার প্রতি ইঙ্গিত। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী 'ইয়্যাকা' শব্দটি ক্রিয়া ও কর্তৃপদের পরে আসার কথা। কিন্তু এখানে ক্রিয়া ও কর্তৃপদের পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌পাকের মহিমা, উপাস্য হওয়া এবং সাহায্যদাতা হওয়ার বিষয়টিকে সুনির্দিষ্ট করা। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলতেন, না'বুদুকা ওয়ালা না'বুদু গইরুক্ (হে আল্লাহ্! আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, আর তোমার ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক

www.eelm.weebly.com

করিনা। হজরত জুহাকের সূত্রপরম্পরায় এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈন' বাক্যের ওয়াও (এবং) সংযুক্ত হওয়ার কারণে অর্থ দাঁড়াবে এরকম - হে আল্লাহ্! (আমরা) তোমার নিকট সাহায্য কামনা করেই শুধু তোমারই ইবাদত করি।

'ইহ্‌দিনা' অর্থ আমাদেরকে দেখাও। এই প্রার্থনাভঙ্গিটিও ইয়্যাকা নাস্‌তাঈন (আমরা তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি) এর অনুরূপ। এখানেও বলা হচ্ছে ইহ্‌দিনাস্ সিরত্বল মুস্তাকীম অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। এই সরল পথই মানুষের চরম আর্তি এবং প্রাপ্তি। তাই পৃথক বাক্যের মাধ্যমে এই প্রার্থনাটি পেশ করা হয়েছে। হেদায়েতের প্রকৃত অর্থ হলো বিনম্র পথপ্রদর্শন। কেবল কল্যাণ ও পুণ্য লাভ বুঝাতেই হেদায়েত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো- এই প্রার্থনাটি মহানবী মোহাম্মদ স. এর মাধ্যমে উচ্চারিত তাঁর সকল উম্মতের প্রার্থনা। তাঁর হেদায়েত প্রাপ্তি তো পূর্বাহ্নেই সুনিশ্চিত ছিলো। এই প্রার্থনাটি উচ্চারণের মাধ্যমে তিনি তাঁর উম্মতকে হেদায়েত প্রাপ্তির নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। অবশ্য হেদায়েত প্রাপ্তদের জন্যও এই প্রার্থনাটি জরুরী। প্রকৃত বিশ্বাসীদের অন্তরে অধিকতর হেদায়েতপ্রাপ্তির কামনা চিরবহ্নিমান। আর আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাতের এটাই মতাদর্শ যে, আল্লাহ্‌পাকের করুণা ও হেদায়েত অন্তহীন। আল্লামা ইবনে কাসীর 'কানাবেলের' বর্ণনা অনুযায়ী বলেছেন 'সিরত্বল' শব্দটি কোরআন মজীদের কোনো কোনো স্থানে 'আল' সহযোগে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আবার কোথাও উল্লেখিত হয়েছে 'আল' ব্যতিরেকেই। তিনি 'সিরত্ব' শব্দের প্রথম বর্ণটি 'ছুদ' এর পরিবর্তে 'সিন' পড়েছেন। সিন যুক্ত সিরত্ব শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গলাধকরণ করা। আরবীভাষীগণ বলে থাকেন সারতিত্ তোয়ামু আয় ইয়াব্‌তালিয়াহ্ অর্থাৎ খাদ্য গলাধঃকরণ করেছেন অথবা গিলে ফেলেছেন। যখন কেউ খাদ্যের গ্রাস গলাধঃকরণ করেন তখনই বলা হয় সারতুত্ তোয়াম। অনুরূপ যে পথে অধিক সংখ্যক পথচারী চলেন, সে পথকে বলা হয় আত্তারিকু ইয়াস্‌রুতুস্ সাবিলা। অন্যান্য ক্বারীগণ সিরত্ব শব্দটি পাঠ করেছেন 'ছুদ' সহযোগে। আর এটাই কুরায়েশদের আঞ্চলিক উচ্চারণ। ক্বারী খাল্‌ফ্ কোরআন মজীদের সবখানেই সিরত্ব শব্দটি উচ্চারণ করেছেন 'ছুদ' এবং 'ঝা' এর মাঝামাঝি উচ্চারণে। খাল্লাদ কেবল এখানেই পাঠ করেছেন 'মুস্তাক্বীম' অর্থ সমতল, সরল। প্রকৃত অর্থ হলো সত্যপথ। কেউ কেউ অর্থ করেছেন ইসলাম। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইব্‌নে জারীর এরকমই বর্ণনা করেছেন। হজরত আবুল আলিয়া এবং হজরত ইমাম হাসান বলেছেন, সিরত্বল মুস্তাক্বীম হচ্ছে হজরত রসুল স.এবং তাঁর প্রধান সহচর হজরত আবুবকর ও হজরত ওমরের পথ। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার পরে আমার আদর্শ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শকে দৃঢ়ভাবে

www.eelm.weebly.com

আঁকড়ে ধোরো। তিনি আরো নির্দেশ করেছেন– আমার পরে আবুবকর ও ওমরের অনুসারী হয়ো।

সিরত্বল্লাজিনা আন্‌আম্‌তা আলাইহিম– এই বাক্যটি 'সিরত্বল মুস্তাকীম' বাক্যটির পূর্ণ দ্যোতনাকে প্রকাশ করেছে। সুদৃঢ় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করাই এরূপ বাকভঙ্গির উদ্দেশ্য। এতে করে একথাটিও প্রমাণিত হয়েছে যে,ওই সমস্ত লোকের পথ যাঁদের মুস্তাক্বীম হওয়ার বিষয়টি সুস্বীকৃত। এর অর্থ দাঁড়াবে এরকম– আয় আল্লাহ্! আমাদেরকে ওই সমস্ত লোকের পথানুগামী করো, যাঁদেরকে তুমি করুণাসিক্ত করেছো। ওই করুণাসিক্ত লোকেরাই ইমান ও আনুগত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁরা হচ্ছেন
নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ্।

ইলাইহিম, আলাইহিম এবং লাদাইহিম কোরআন মজীদের যে বাক্যাবলীতে রয়েছে, সে সমস্ত বাক্যের বিরামস্থলে অথবা মিলিতাবস্থায় 'হা'কে পেশ যুক্তাবস্থায় পাঠ করেছেন ক্বারী হামজা। অন্যান্য ক্বারীগণ পাঠ করেছেন যের সহযোগে। ইবনে কাসীর বহুবচনের 'মীম'কে মিলিতাবস্থায় (পরে সাকিন না থাকলে) পেশ সহযোগে এবং ইশ্‌বা সহ পড়েছেন। কিন্তু নিয়ম হলো পরবর্তী বর্ণ সাকিন হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় ইশ্‌বা' করে বা না করে দুই নিয়মেই পাঠ করা সিদ্ধ। ওয়ারশ বলেছেন, আলিফ শূন্য মিলিতাবস্থায় ইশ্‌বা করে পাঠ করা সিদ্ধ। কিন্তু বহুবচনের 'মীম' এর পর আলিফ মিলিত হলে, 'হা' এর পূর্বাক্ষর যের বিশিষ্ট এবং 'ইয়া' সাকিন হলে (যেমন– বিহিমুল আসবাব এবং আলাইহিমুল ক্বিতাল)। হামজা এবং কাসায়ী 'হা' এবং 'মীম'কে পেশ সহযোগে পাঠ করেছেন। এ সকল ক্বারী ব্যতীত অন্যান্য ক্বারী 'মীম' কে পাঠ করেছেন পেশ বিশিষ্ট অবস্থায়। প্রকৃত নিয়ম এটাই। ক্বারীগণ 'হা' কে যের যুক্ত অবস্থায় পাঠ করে থাকেন, যেহেতু তার পূর্বের 'ইয়া' সাকিন অথবা যের বিশিষ্ট। এ ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে কেবল বাক্যের মিলিতাবস্থায়। তবে বিরাম অবস্থায় পূর্বাক্ষর যের বিশিষ্ট থাকায় সকলেই যের যুক্ত পাঠকে মান্য করেছেন। এর পরেও অবশ্য ক্বারী হামজার মতানৈক্য থেকেই যায়।

গইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়াদ্দ্বল্লিন- এই বাক্যটি আন্‌আম্‌তা আলাইহিম বাক্যের ব্যাখ্যা বোধক। অর্থাৎ যাঁদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর করুণা দানে ধন্য করেছেন, তাঁরাই পথভ্রষ্টতা এবং আল্লাহ্‌তায়ালার গজব থেকে সুরক্ষিত। অথবা বাক্যটি একটি প্রকাশ্য বা বিমুক্ত বিশেষণ। এমতাবস্থায় সর্বনামকে অনির্দিষ্ট মেনে নিতে হয়– ফলে কোনো নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত দলকে নির্দেশ করা যায়না। যেমন, আরবী কবিতায় বলা হয়েছে–ওয়ালাক্বদ আমুররু আলাল লাইয়িমি ইয়াসুব্বুনি (যখন আমি কোনো কদর্য স্বভাব বিশিষ্ট লোককে অতিক্রম করি যে আমাকে গালি দেয়)। অথবা একথাও বলা যায় 'গইর' শব্দটি এমন বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধিত যে, তার বিপরীত শব্দ মাদ্ একটি হেদায়েত, এজন্য সর্বাবস্থায় তা সুনির্দিষ্ট। সম্বন্ধিত হওয়ার কারণেই এখানে সুনির্দিষ্ট অবস্থাটি এসেছে। যেমন বলা হয়–আলাইকুম

www.eelm.weebly.com

বিল হারকাতে গাইরাস্‌সুকুন। 'আলাইহিম' শব্দটি কর্তৃকারকে অবস্থান গ্রহণ করার দরুণ কর্তৃবাচ্য হয়েছে (অর্থাৎ বাক্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'গইর' শব্দটি 'মাগদুবি' শব্দটির কর্মপদ, যার কর্তৃপদ রয়েছে উহ্য)। আর লাম শব্দটি 'গইর' শব্দের না সূচক— কে অধিকতর শক্তিশালী করেছে যেনো প্রকৃত বাক্য ছিলো এরকম - লা মাগদুবি আলাইহিম (না তাদের পথে, যাদের উপর আল্লাহ্‌র গজব অবতীর্ণ হয়েছে)। প্রতিশোধ স্পৃহার উল্লাস ও উদ্দীপনার নাম গজব। কিন্তু এর সম্পর্ক যখন আল্লাহ্‌র সঙ্গে করা হয়, তখন তার মর্ম হবে গজবের পরিণাম বা পরিসমাপ্তি। আযাব এবং দালালাহ্‌ শব্দ দু'টি হেদায়েত শব্দের বিপরীত অর্থবোধক শব্দ (যে পথ আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌঁছায়, ওই পথের প্রতি বৈমুখ্যই দালালাহ্‌)। সে পথের রয়েছে অনেক স্তর। স্তরান্তর। হজরত আদি বিন হাতেম থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন— যাদের প্রতি গজব অবতীর্ণ হয়েছে তারা ইহুদী। আর যারা পথভ্রষ্ট, তারা খৃষ্টান। এই হাদিসটি ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে এবং ইবনে হাব্বান তাঁর সহীহ্‌ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিরমিজি স্বীকার করেছেন, হাদিসটি হাসান। অন্যান্যরাও আদি বিন হাতিম থেকে এ বর্ণনাটি পেশ করেছেন। হজরত আবু জর থেকে ইবনে মারদুবিয়াও এই হাদিসটির অনুরূপ বর্ণনা এনেছেন। ইবনে জারীর এবং ইবনে আবি হাতেম, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত ইবনে মাসউদ, রবী বিন আনাস এবং সাঈদ বিন আসলামের সঙ্গে এই ব্যাখ্যাটি সম্পর্কযুক্ত করেছেন। ইবনে আবি হাতেম বলেন, এই ব্যাখ্যাটিতে মতবিরোধ রয়েছে বলে আমার জানা নেই।

আমি বলি, 'গইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্‌দ্বল্লিন' অর্থাৎ গজবগ্রস্ত ও পথভ্রষ্ট— এই শব্দ দু'টিতে সাধারণভাবে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, অবাধ্য এবং বেদাতী সম্প্রদায় শামিল রয়েছে। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে নিষিদ্ধ হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেছেন— গজবুল্লাহি আলায়হি (তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র গজব)। কাফের এবং বেদাতীদের সম্পর্কে বলেছেন ফামাজা বা'দাল হাক্কী-ইল্লাদ্‌ দালাল এবং আল্লাজিনা দল্লা সা'ইউহুম ফিল হায়াতিদ্দুনিয়া।

সুরা ফাতিহা পাঠ শেষে ক্ষণিক বিরামসহ আমীন বলা সুন্নত। হ্রস্ব এবং দীর্ঘ দু'অবস্থাতেই তাশদীদবিহীন অবস্থায় এই শব্দটি পাঠ করা যায়। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম বাগবী বলেছেন, আমীন শব্দের অর্থ শুনুন এবং কবুল করুন। অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন এবং গ্রহণ করুন। হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে ইমাম ছা'লাবী উল্লেখ করেছেন, আমি নবী করিম স. এর নিকটে আমীন শব্দটির অর্থ জানতে চাইলাম। তিনি বললেন— ইফয়াল। ইবনে আবী শায়বা তাঁর স্বরচিত গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী দালায়েল পুস্তকে হজরত আবু মায়সারা থেকে বর্ণনা করেছেন— হজরত জিব্‌রাইল আ. রসুল স. কে সুরা ফাতিহা পাঠ করিয়েছেন এবং ওয়ালাদ্‌দ্বল্লিন শেষে বলেছেন, এবার বলুন আমীন। ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনান গ্রন্থে লিখেছেন— উচ্চ মর্যাদাশালী

www.eelm.weebly.com

সাহাবী হজরত আবু জোহাইর বলেছেন, আমীন হচ্ছে পত্রের উপর সীলমোহর করার মতো। তিনি আরো বলেছেন, আমি এক রাতে রসুল স. এর সঙ্গে বাইরে বের হলাম। চলতে চলতে আমরা এমন এক লোকের নিকট পৌঁছলাম, যিনি পূর্ণ বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোয়া প্রার্থনা করছিলেন। রসুলেপাক স.এরশাদ করলেন, যদি সে তার দোয়াতে সীলমোহর করে দেয়, তবে আল্লাহ্পাক তার দোয়া কবুল করবেন। সঙ্গীদের একজন নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! দোয়াকে সীলমোহর করতে হয় কীভাবে? তিনি স. বললেন, 'আমীন' দিয়ে। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে– রসুল স. নির্দেশ করেছেন (হে মানুষেরা) ইমাম যখন ওয়ালাদ্দ্বল্লিন বলবেন তখন তোমরা বলবে আমীন। ওই সময় ফেরেশতারাও আমীন বলেন। যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের অনুরূপ হয়, তার অতীত পাপের উপর ক্ষমার কলম আন্দোলিত হয়। আবু দাউদ, তিরমিজি ও দারা কুতনীতে রয়েছে- রসুল স. যখনই ওয়ালাদ্দ্বল্লিন পাঠ করতেন তখনই বলতেন, আমীন। এই হাদিসের বিশুদ্ধতা প্রসঙ্গে ইবনে হাব্বান শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেছেন।

ফযীলত

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন– আমার জীবনাধিপতি ওই পবিত্র সত্তার শপথ, সুরা ফাতিহার মতো কোনো সুরা তওরাত, যবুর, ইঞ্জিল অথবা কোরআন– কোনো আসমানী কিতাবেই নেই। এটা সেই অনুপম ও অনন্য বাণীসপ্তক যা আল্লাহ্পাক আমাকে দান করেছেন। তিরমিজি এই হাদিসটি লিখেছেন এবং হাদিসটিকে বিশুদ্ধ এবং হাসান বলে মন্তব্য করেছেন। হাকেম বলেছেন, মুসলিমের মাপকাঠি অনুযায়ী হাদিসটি বিশুদ্ধ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমরা ক'জন রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। হজরত জিব্রাইলও এক পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ উপরের দিকে দরোজা খোলার মতো আওয়াজ পাওয়া গেলো। হজরত জিব্রাইল আকাশের দিকে তাকালেন এবং বললেন, এই দরোজাটি আগে কখনো নিরর্গল করা হয়নি। বর্ণনাকারী (হজরত ইবনে আব্বাস) বর্ণনা করেছেন, ইত্যবসরে আকাশ থেকে এক ফেরেশতা নেমে এলেন এবং রসুল স. এর সম্মুখবর্তী হয়ে নিবেদন করলেন, এই মুহূর্তে আপনাকে দু'টি নূরের অধিকার দেয়া হলো। যে অধিকার অন্য কোনো নবী পাননি। একটি হলো ফাতিহাতুল কিতাব এবং অপরটি হলো সুরা বাকারার শেষাংশ। এই দু'টি নূরের একটি থেকে আপনি যদি একটি বর্ণও পাঠ করেন, তবে পরিপূর্ণ নূরের অধিকারী হবেন। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন– আল্লাহ্পাক বলেছেন, আমি আমার বান্দাগণের নামাজকে দুইভাগে ভাগ করেছি। অর্ধেক আমার আর অর্ধেক আমার বান্দাদের। বান্দারা যা চাইবে তাই পাবে। রসুল স. আরো এরশাদ করেন- যখন বান্দা বলে আলহামদুলিল্লাহ্ (সকল প্রশংসা

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌র) তখন আল্লাহ্‌ বলেন, হামাদানি আবদি (আমার বান্দা আমার অনেক প্রশংসা করেছে)। বান্দা যখন বলে, আর রহমানির রহীম। তখন আল্লাহ্‌ বলেন, আমার বান্দা আমার খুব গুণগান করছে। বান্দা মালিকি ইয়াউমিদ্দিন বললে আল্লাহ্‌ বলেন, আমার বান্দা আমার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করছে। যখন বান্দা বলে, ইয়া কানা'বুদু ওয়াইয়্যাকা নাস্‌তাঈন। তখন আল্লাহ্‌ বলেন, এটা হলো আমার ও আমার বান্দার মধ্যবর্তী সেতু স্বরূপ। আমার নিকট আমার বান্দার জন্য সে বস্তুই প্রস্তুত রেখেছি যা আমার বান্দা চায়। বান্দা যখন বলে, ইহ্‌দি নাস্‌সিরত্বল মুস্তাক্বীম; সিরত্বল্লাজিনা আন্‌-আম্‌তা আলাইহিম, গইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দ্বল্লিন। তখন আল্লাহ্‌ বলেন, আমি আমার বান্দার সকল প্রার্থনা কবুল করলাম। আরো প্রার্থনা করলেও কবুল করবো। মুসলিম।

ইবনে উমাইর থেকে আবদুল মালিক মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন - সুরা ফাতিহা সকল রোগের মহৌষধ। বিশুদ্ধ সূত্রসহযোগে এ হাদিসটি দারেমী তাঁর মসনদে এবং বায়হাকী তাঁর শোয়াবুল ইমানে লিপিবদ্ধ করেছেন। হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন - হে জাবের! আমি কি বলবো কোরআনের সর্বোত্তম সুরা কোনটি? হজরত জাবের বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এরশাদ করুন। রসুল স. বললেন, সুরা ফাতিহা। হজরত জাবের বলেন, আমার মনে হলো, রসুল স. যেনো বললেন, ফাতিহা হলো সকল ব্যাধির মহৌষধ। হজরত জাবের কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, সুরা ফাতিহা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের প্রতিষেধক। হাদিসটি খালই তাঁর ফাওয়ায়েদ কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সাঈদ বিন মায়াল্লী থেকে বর্ণিত হয়েছে, কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরা হচ্ছে - আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। স্ব-সূত্রে ইমাম বোখারী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বলেছেন, সুরা ফাতিহা কোরআনের দুই তৃতীয়াংশ।

আবু সুলায়মান বলেছেন, এক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কতিপয় সাহাবী যাত্রাপথে এক মৃগী রোগীর সাক্ষাত পেলেন। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলো। সাহাবাদের একজন সুরা ফাতিহা পাঠ করে তার কানে ফু দিলেন সে দিব্বি সুস্থ হয়ে উঠলো। রসুল স. এঘটনা জানতে পেয়ে এরশাদ করলেন, এরকমতো হবেই। কারণ, কোরআন জননী ফাতিহা হচ্ছে সকল ব্যাধির প্রতিষেধক। ইমাম ছা'লাবী এই বর্ণনাটি আবু সুলায়মানের উদ্বৃতিসহ মুয়াবিয়া ইবনে সালেহ্‌ এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন– সুরা ফাতিহা বিষেরও ঔষধ। সাঈদ ইবনে মানসুর তাঁর সুনানে এবং বায়হাকী তাঁর শোয়াবুল ইমানে এ হাদিসটি লিখেছেন।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমরা প্রবাসে ছিলাম। পথ চলতে চলতে এক স্থানে থামলাম। সেখানে এক দাসী এসে বললো, এই জনপদের সর্দারকে সাপে কেটেছে। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ওঝা আছে? সাহাবাদের একজন দাঁড়ালেন এবং দাসীর সাথে গিয়ে সুরা ফাতিহা পড়ে সর্দারের সর্পদষ্ট স্থানে ফুঁ

www.eelm.weebly.com

দিলেন। লোকটি সাথে সাথে সুস্থ হয়ে গেলো। প্রবাস বাস শেষে গৃহে ফিরে আমরা হুজুর স. এর নিকট এ ঘটনাটি জানালাম। তিনি স. ওই সাহাবীকে বললেন, তুমি কেমন করে জানলে যে এটা একটা মন্ত্র? বোখারী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু শায়েখ এবং ইবনে হাব্বানও এরকম হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন। হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ বলেছেন, রসুল স. সুরা ফাতিহা পাঠ করে আমার উপর ফুঁ দিয়েছেন এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, তাঁর মুখের পবিত্র লালা আমার মুখে দিয়েছেন। আউসাত গ্রন্থে এ হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন তিবরানী। হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, শয্যায় শুয়ে সুরা ফাতিহা এবং সুরা কুলহুওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করলে মৃত্যু ব্যতীত অন্য সকল বিপদ থেকে নিরাপদ ও নির্ভয় থাকা যায়।

সুরা বাকারা

সুরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। জননী আয়েশা রা. থেকে ইমাম বোখারী বর্ণনা করেছেন, (হজরত আয়েশা বলেন) সুরা বাকারা এবং সুরা নিসা অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমি রসুল পাক স. এর সঙ্গে ছিলাম।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ○

الٓمٓ ○

❐ আলিফ্- লাম-মীম।

আলিফ্ লাম মীম - এরকম বিচ্ছিন্ন বর্ণ কোরআন মজীদের কোনো কোনো সুরার প্রারম্ভে বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণের বিভিন্নমুখী মন্তব্য রয়েছে। যেমন— ১. কেউ কেউ বলেছেন, সুরার প্রারম্ভে লিপিবদ্ধ এই অক্ষরগুলো ওই সুরারই নাম। ২. কেউ কেউ বলেছেন, এগুলো একটি বাক্যের শেষ এবং অন্য বাক্যের সূচনা সম্পর্কে সতর্কবার্তা (বক্তার আসল উদ্দেশ্য হলো এক বাক্যের পরিসমাপ্তি এবং অন্য বাক্যের সূচনাচিহ্নকে এগুলো দ্বারা সনাক্ত করা)। ৩. কারো কারো অভিমত হচ্ছে- এগুলো বিভিন্ন শব্দের আদ্যাক্ষর। যেমন, আরবের একজন প্রসিদ্ধ কবির বর্ণনায় রয়েছে— 'ফাকুলতু লাহা কিফি ফারতাল লি কৃফ।'

আবুল আলীয়া থেকে ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আলিফ লাম মীম এর আলিফ দ্বারা ইলাউল্লাহ্, লাম দ্বারা লুতফে খোদা এবং মীম দ্বারা মালিক বেজাওয়াল বুঝানো হয়েছে। আবুল আলীয়া থেকে আরদ ইবনে হামীদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম এরকমও বর্ণনা

www.eelm.weebly.com

করেছেন যে, আলিফ লাম র, হা মীম এবং নুন এর সমষ্টি হচ্ছে 'আর রহমান'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলিফ লাম মীম এর অর্থ আনাল্লাহু আলীম (আনা শব্দের আলিফ, 'আল্লাহ্' শব্দের লাম এবং 'আলীম' শব্দের মীম)। আল্লামা বাগবী সাঈদ ইবনে জোবায়েরের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের বাণী হিসেবে উল্লেখ করেছেন, আলিফ লাম মীম ছুদ অর্থ আনাল্লাহু আয়লামু ওয়াফছাল (আমি আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ এবং সকল কিছুর সুষ্ঠু সমাধান দাতা)। অনুরূপ আলিফ লাম র অর্থ 'আনাল্লহ আরা' (আমি আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা)। আলিফ লাম মীম র অর্থ আনাল্লাহু আয়লামু ওয়া আরা (আমি আল্লাহ্ সমধিক পরিজ্ঞাত ও দ্রষ্টা) ১। কোনো কোনো প্রাজ্ঞজনের ধারণা আবজাদের হিসাবানুযায়ী এর মর্ম হচ্ছে- জাতির জীবনেতিহাসের সময়কাল নিরূপণ এবং ওই জাতির মহৎ বিবর্তনকে চিহ্নিতকরণ২। যেমন– বোখারী তাঁর ইতিহাসে এবং ইবনে জারীর অশক্ত সূত্র সহযোগে বর্ণনা করেছেন, রসুল স.এর খেদমতে কতিপয় ইহুদী আগমন করলো। তিনি স. সুরা বাকারা পাঠ করলেন। ইহুদীরা হিসাব করে এবং মনে কিছু ভেবে নিয়ে বললো, আমরা এমন ধর্মে কেমন করে আসবো যাঁর স্থায়িত্ব মোটে একাত্তর বৎসর (আবজাদের হিসাবে আলিফ লাম মীমের গাণিতিক সংখ্যা দাঁড়ায় একাত্তরে)। রসুল স. তাদের কথা শুনে মৃদু হেসে নীরব হয়ে গেলেন। ইহুদীরা বললো, আরো কিছু কি আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আরো অবতীর্ণ হয়েছে 'আলিফ লাম মীম ছুদ', 'আলিফ লাম র' এবং 'আলিফ লাম মীম র'। ইহুদীরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বললো, আবুল কাশেম! তুমিতো আমাদেরকে সন্দেহের মধ্যে ঠেলে দিলে। আলিফ লাম মীম ছুদের সংখ্যা একশ একষট্টি, আলিফ লাম র এর সংখ্যা দু'শ একত্রিশ এবং আলিফ লাম মীম র এর সংখ্যা দুইশ একাত্তর। ভাবালে কিন্তু আমরা তো এখন ভীষণ সংশয়াচ্ছন্ন। বুঝতে পারছি না কোনটা গ্রহণ করবো আর কোনটা পরিত্যাগ করবো।

---

১. হজরত আলীয়া এবং ইবনে আব্বাসের মন্তব্য সমুহের মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হরূফে মুকাত্তায়াত বা বিচ্ছিন্ন প্রতিটি বর্ণ কোনো না কোনো শব্দের বাহন।

২. পারস্যের অধিবাসীরা তাদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস অথবা কোনো রাজার অভিষেক কিংবা কোনো ঘটনা সংঘঠিত হওয়ার তারিখের স্মৃতিচারণের জন্য আরবী বর্ণমালার আবজাদ করে বিভিন্ন সংখ্যা নির্ধারণ করে রেখেছিলো। আবজাদ সংখ্যার আবিষ্কারক আরবী নয়। আর আরবে এর প্রচলনও ছিলো না। তাই একে আরবী নিয়ম বলে সনাক্ত করা সঙ্গত নয়। ইহুদী পন্ডিতেরা বিষয়টি জানতো। তাই তারা হরূফে মুকাত্তায়াতের আবজাদ হিসাব কষতে প্রবৃত্ত হয়েছিলো।

আমি বলি, হরূফে মুকাত্তায়াত সম্পর্কে যে আলোচনাগুলো এসেছে, তার সবগুলোই সত্যপন্থী আলেমগণের নিকট পরিত্যাজ্য। ১. প্রথম মতটি পরিত্যাজ্য একারণে যে, এগুলো সুরার নাম হলে একই সুরার এরকম মিশ্রিত নাম

www.eelm.weebly.com

অশোভনীয়। আলংকারিকগণ এরকম জগাখিচুড়ী নাম কিছুতেই পছন্দ করবেন না। একই বিষয়ের তিন অথবা দুই তিন অথবা ততোধিক বৈসাদৃশ্যপূর্ণ নাম রুচিসম্মত নয়। আর কিছু সুরার নামকরণ হবে, আবার কিছু সুরা হবে নামবিহীন—এরকম ব্যবস্থা নামকরণকারীর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে। ২. দ্বিতীয় মতটি একারণেই গ্রহণীয় নয় যে, এগুলোকে এক বাক্যের শেষ ও অন্য বাক্যের শুরু বলে কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। এরকম হলে প্রত্যেক সুরার প্রারম্ভে এই ব্যবস্থাটি বলবৎ থাকতো। ৩. তৃতীয় অভিমতটিও ভুল। শব্দসমূহের কোনো কোনো বর্ণকে নির্বাচন করে একত্রিত করার রীতি আরবী ভাষায় নেই। এসম্পর্কে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে কিফি শব্দটি দ্বারা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কবির সম্বোধনকৃত উক্তি কাফ যা ওয়াকাফতু শব্দ থেকে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। এই রীতিটি হরূফে মুকাত্তায়াতের অক্ষর বিন্যাসের সম্পূর্ন বিপরীত। কবিতার দৃষ্টান্তটির সঙ্গে হরূফে মুকাত্তায়াতের কোনোই সৌসাদৃশ্য নেই (আলিফ লাম মীম এর আলিফ দ্বারা আল্লাহ্‌র নেয়ামত, লাম দ্বারা স্নেহাশীষ এবং মীম দ্বারা সীমাহীন রাজত্ব – এরকম মর্ম গ্রহণ করা কিছুতেই সঠিক হতে পারে না)। এবার আসা যাক কতিপয় সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তি সম্পর্কে। বর্ণিত উক্তিগুলো অপ্রচলিত এবং বিরোধাভাস সম্পন্ন। তাছাড়া উক্তিগুলো ভাষা ও অলংকারশাস্ত্রবিরুদ্ধ। একেক শব্দের একেক অক্ষরকে নির্দিষ্ট করে একত্রিত করা। ইচ্ছে মতো কোনো অক্ষর গ্রহণ ও বর্জন করা অভাবনীয়। শেষ প্রসঙ্গটি হচ্ছে ইহুদীদের কথোপকথন। তাদের মন্তব্য শুনে রসুল স. মৃদু হেসেছিলেন। তাঁর এই মৃদু হাসি অনুমোদন মূলক ছিলো না। ছিলো অবজ্ঞামূলক। তাদের নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতা দেখে তিনি এরকম উপেক্ষাসূচক হাসি হেসেছিলেন।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, বিচ্ছিন্ন এই অক্ষরগুলো শপথের অক্ষর। অক্ষরগুলো শপথের মহিমাকে প্রকাশ করেছে। অক্ষরগুলো আল্লাহ্‌পাকের নাম সমূহের মূল আর ভাষারও আদি। তাই আল্লাহ্‌ ওগুলোর দ্বারা শপথ উচ্চারণ করেছেন। এই অভিমতটি গ্রহণ করলে এমন একটি বিষয়কে স্বীকার করে নিতে হবে, যার কোনো প্রমাণপঞ্জি কিংবা কোনো অকাট্য দলিল নেই। তাই এ অভিমতটিও ধর্তব্য নয়। মোট কথা, এ সম্পর্কে কোনো অভিমতই গ্রহণযোগ্যতাকে স্পর্শ করতে পারে না। স্বনামধন্য মুফাস্‌সির কাজী বায়যাবী আরেকটি অভিনব ও বিতর্কিত অভিমতকে আশ্রয় করেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে— অক্ষরগুলো বাক্যের আদি অংশ ও ভাষার মূল; তাই কতিপয় অক্ষর দ্বারা কিছু কিছু সুরা শুরু করা হয়েছে- উদ্দেশ্য ওই সমস্ত লোকদেরকে সতর্ক করা, যারা কোরআন মজীদ যে আল্লাহ্‌পাকের নিকট থেকে অবতীর্ণ- একথা স্বীকার করে না। তারা আরো বলে, তোমরা যা পড়ে শোনাচ্ছো— তা তো তোমাদের কথা মতোই অক্ষরাশ্রয়ী। তাদেরকে হুঁশিয়ার করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, কোরআন যদি আল্লাহ্‌পাকের বাণী না হয়— তবে তোমরা এতোদৃশ বাণী নির্মাণ করতে পারো না

www.eelm.weebly.com

কেনো? সুরার শুরুতে হরূফে মুকাত্তায়াতের প্রতিষ্ঠার আরো একটি উদ্দেশ্য, মানুষের স্মৃতিতে এমন একটি গুঞ্জরণকে আন্দোলিত করে তোলা– যা তাদের অজ্ঞতা ও অক্ষমতাকে সুপ্রকট করে। বর্ণ ব্যতিরেকে লিখা ও পড়া অসম্ভব! তাই অনক্ষর কোনো ব্যক্তির উপরে অবতারিত বিচ্ছিন্ন শব্দরাজির এরকম রহস্যাচ্ছন্নতা একটি নিশ্চিত অলৌকিকত্ব (মোজেজা) নয় কি? এই রহস্যপূর্ণ বর্ণগুলোর মাধ্যমে যে সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা হয়েছে, তার সম্মুখে আরবী ভাষা বিশারদগণ বিস্ময়ে হতবাক হতে বাধ্য। মোট কথা, লক্ষ্য করতে হবে আরবী বর্ণমালার চৌদ্দটি বর্ণ উনত্রিশটি সুরার শুরুতে সন্নিবেশিত হয়েছে– যেগুলো গণনায় বর্ণসমষ্টির সমান অথচ ব্যবহারে অর্ধেক। আর পরিমাণ নির্ধারণও এরকম যে, কোনো অক্ষরই এর আওতা বহির্ভূত থাকেনি। হরূফে মুকাত্তায়াত হিসেবে যে চৌদ্দটি বর্ণ নির্ধারণ করে অধিকাংশ বাক্যগঠিত হয়, সেগুলো দিয়েই অন্য অক্ষরগুলোর ব্যবহার নিতান্তই কম। যেমন, আলিফ লাম মীম, আলিফ লাম র ইত্যাদির উদ্দেশ্য এই যে, একই বর্ণমালা দ্বারা আল্লাহ্ ও মানুষের বাক্যাবলী গঠিত হলেও, হে কোরআন অস্বীকারকারীগণ (হরূফে মুকাত্তায়াত সহ) কোরআন সদৃশ বাণী নির্মাণ করতে তোমরা অক্ষম হয়েছো কেনো? এ প্রসঙ্গের শেষ কথাটি হচ্ছে এই যে, হরূফে মুকাত্তায়াত আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসুলের একধরনের রহস্যময় আলাপন, যা দুর্জ্ঞেয়। এটাই আমার সার কথা এবং সঠিক সমাধান। বিষয়টি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের একান্ত বিষয়। সাধারণ মানুষ এখানে যোগ্যতারহিত। আর এ বিষয়ে সাধারণকে জ্ঞান দান করা আল্লাহ্র ইচ্ছা নয়। আল্লাহ্র রসুলও তাঁর পরম প্রিয় প্রভুপালকের ইচ্ছানুসারী। রসুল স. এর পূর্ণ অনুসরণকারীগণ অবশ্য এর ব্যতিক্রম। ইমাম বাগবী বলেন, হজরত আবুবকর সিদ্দিক রা. বলেছেন– প্রত্যেক গ্রন্থেরই একটি গোপন রহস্য থাকে। আর কোরআনের গোপন রহস্য হচ্ছে, কোনো কোনো সুরার প্রথমে ব্যবহৃত বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি। হজরত আলী বলেছেন, প্রতিটি পুস্তকের একটি সার সংকলন থাকে। আর কোরআন মজীদের সার সংকলন হলো এই বিচ্ছিন্ন হরফগুলো। হজরত আবুবকর, হজরত আলী ও অন্যান্যদের নিকট থেকে ইমাম ছা'লাবীও এরকম বর্ণনা পেশ করেছেন। হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে এরকম বর্ণনা এনেছেন সমরখন্দী। সুফিয়ান সওরী থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম কুরতুবী, রবীয়া ইবনে খাসয়াম, আবুবকর ইবনে আম্বরি, ইবনে আবী হাতেম। মুহাদ্দিসগণের একটি বড় দলও বিভিন্ন সূত্রসহযোগে এই বর্ণনাটি পেশ করেছেন। হজরত সাজওয়াদী বলেছেন, এ সম্পর্কে সুপ্রবীণ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, ইন্নাহা সিররুন বাইনাল্লাহি ওয়া বাইনা নাবীইয়্যিহি সল্লাল্লাহু ওয়া আলইহি ওয়া সাল্লাম (এগুলো একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর মধ্যকার গোপন রহস্য)। এরকম বাকভঙ্গি গোপন আলাপনের ইঙ্গিতবহ।

www.eelm.weebly.com

এরকমও বলা হয়েছে যে, বিচ্ছিন্ন হরফগুলোর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ই রাখেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্র রসুলও কিছু জানেননা, রসুলের অনুসারীগণ তো নয়ই। এই অভিমতটি যুক্তিসম্মত নয়। অভিমতটি মেনে নিলে একথাটিও মেনে নেয়া জরুরী হয়ে পড়ে যে, কোরআন অর্থবহ নয় (শব্দ ও অর্থ সহযোগেই কোরআন প্রকাশিত হয়েছে। কোরআন যেমন কেবল শব্দমালার সংকলন নয়, তেমনি সম্পূর্ণত অর্থনির্ভরও নয়। কোরআন হচ্ছে শব্দ ও অর্থের সমন্বয়। – উর্দু অনুবাদক)। শ্রোতাকে কিছু জানানোই বক্তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে— তাই হরূফে মুকাত্তায়াতের অর্থ অবশ্যই রয়েছে। নতুবা ব্যাপারটি দাঁড়াবে এরকম, যেমন কোনো ভারতীয় ভাষাভাষীকে আরবী ভাষায় বক্তৃতা শোনানো হচ্ছে। এরকম ভাবলে কোরআন সামগ্রিক ভাবে বোধগম্যতার আড়ালে থেকে যাবে। তখন একে হেদায়েতও বলা যাবেনা। আর আল্লাহ্পাকও এই মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন যে, ছুম্মা ইন্না আলাইনা— বায়ানুহু (অতঃপর বর্ণনার দায়িত্ব আমার উপরেই)। আল্লাহ্তায়ালার এই প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং আল্লাহ্ জানেন আর কেউ জানেন না— হরূফে মুকাত্তায়াত সম্পর্কে এই অভিমতটি গ্রহণীয় নয়। কারণ, আল্লাহ্পাকের পক্ষে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী হওয়া অসম্ভব। সুস্পষ্ট (মোহকামাত) আয়াত যেমন সত্য, তেমনি অস্পষ্ট (মোতাশাবিহাত) আয়াতও সত্য। তাই আল্লাহ্তায়ালার জন্য এটা নিতান্তই জরুরী যে, তাঁর কৃত অঙ্গীকারাণুসারে অবতীর্ণ কোরআনের বিশদ ব্যাখ্যা তিনি অবশ্যই তাঁর প্রিয় রসুলকে জানাবেন।

হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফে সানী কাদ্দাসা সিররুহ্ হরূফে মুকাত্তয়াতের রহস্য জানতেন। সারকথা হচ্ছে, অস্পষ্ট আয়াত সমূহের জ্ঞান রসুল স. এর তো ছিলোই, সেই সঙ্গে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসারীগণও এই জ্ঞান রাখেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি 'রসিখিনা ফিল ইলম' (জ্ঞানে সুগভীর) দের মধ্যে একজন। আর যাঁরা অস্পষ্ট আয়াত ও বিচ্ছিন্ন বর্ণ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, আমি তাঁদেরও একজন। শব্দগত কিছু তারতম্যসহ মুজাহিদও এরকম বর্ণনা করেছেন। হাদিস শরীফে এরকম উল্লেখিত রয়েছে যে, বুঝা যায় না আমার উম্মতের পূর্ববর্তীগণ উত্তম না পরবর্তীগণ। সম্ভবতঃ পূর্ববর্তীরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁদের জ্ঞান ছিলো সুবিস্তৃত ও সুগভীর। সুমহান ছিলেন তাঁরা। হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফে সানী র. দাবী করেছেন, আল্লাহ্পাক কোরআন পাকের হরূফে মুকাত্তায়াতের রহস্য আমার নিকট উন্মোচন করেছেন। কিন্তু সাধারণ্যে এ সম্পর্কে বিবরণ প্রদান অসম্ভব।

কেউ কেউ বলেন, বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলো আল্লাহ্পাকের নাম। যেমন— আল্লাহ্র নাম ও সিফাত কিতাবে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে এই মর্মে বর্ণনা পেশ করেছেন ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া। বলা হয়েছে, এ বর্ণনাগুলোর সনদও সহীহ্। ইবনে মাজা বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে হজরত আলী তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, ইয়া কাফ, হা, ইয়া,

www.eelm.weebly.com

আঈন, ছুদ ইগফিরলী। রবী ইবনে আনাস বলেছেন, কাফ,হা, ইয়া, আঈন, ছুদ – এর অর্থ তিনি যাকে ইচ্ছে সাহায্য করেন, তিনি ছাড়া অন্য কেউ সাহায্য দেয় না।

কতিপয় আলেম বলেছেন, বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলো কোরআনের নাম। হজরত কাতাদা থেকে আবদুর রাজ্জাক এরকম বিবরণ এনেছেন। হজরত কাতাদার উক্তি অনুসারে বুঝা যায়, বিচ্ছিন্ন অক্ষর দ্বারা কোরআন এবং কিতাবের নাম সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

আমি বলি, বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার দ্বারা আল্লাহ্পাকের নাম উদ্দেশ্য হলে, একথা মেনে নিতে হবে যে– নামগুলো হবে অবশ্যই গুণবাচক। আর গুণবাচক নাম আল্লাহ্তায়ালার সম্পূর্ণ সত্ত্বাকে নির্দেশ করে না। আর কোরআনের নাম বলে মেনে নিলে গুণবাচক নামকেই ধরে নিতে হবে। যেমন কোরআন, ফোরক্বান, নূর, হায়াত, রূহ্, জিকির, কিতাব ইত্যাদি। কিন্তু একথাটিও মেনে নেয়া যায় না। কারণ, আল্লাহ্র নাম এবং কোরআনের নামের অর্থ মানুষ জানে। কিন্তু হরূফে মুকাত্তায়াতের অর্থ মানুষেরা জানে না। এই জ্ঞান বক্তার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন– তাকেই এই জ্ঞান দান করেন। সুতরাং শেষ পর্যন্ত এমতটি সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে, হরূফে মুকাত্তায়াত আল্লাহ্পাক এবং তাঁর প্রিয় রসুলের মধ্যবর্তী একটি গোপন রহস্য। এরহস্য ভেদ করে- এমন কেউ নেই। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্পাক যদি ইচ্ছা করেন তবে রসুলের একনিষ্ঠ অনুসারীদের কাউকে কাউকে এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যটির অংশ দান করেন। হরূফে মুকাত্তায়াত যেমন সাধারণের জ্ঞানবহির্ভূত। তেমনি আয়াতে মুতাশাবিহাতের অর্থও সাধারণের নাগালের বাইরে। 'আর রহমানু আলাল আরশিশ্তাওয়া, ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম'– এ সকল আয়াতের শব্দগত বা প্রকাশ্য অর্থ করা যায় না। মোতাজিলারা এরকম করেছে– তাই তারা ভ্রষ্ট। মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স. এসমস্ত আয়াতের প্রকৃত অর্থ জানতেন। তাঁর কতিপয় একনিষ্ঠ অনুসারীগণও জানতেন।

দুর্বোধ্য এ বিষয়টি সম্পর্কে এতোটুকু বলা যায় যে, আল্লাহ্পাকের গুণাবলী অসীম ও অশেষ। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন, 'হে প্রিয় নবী! আপনি বলুন– আমার আল্লাহ্পাকের বাণী লিখতে গিয়ে সাগরের সমূদয় পানিও যদি কালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে আমার প্রভুর বাণী শেষ হওয়ার পূর্বেই সাগর শুকিয়ে যাবে।' আরো বলেছেন, 'পৃথিবীর সমস্ত গাছকে যদি লেখনী করা হয়, সাত সাগরের পানি যদি হয় কালি– তবে কলম ও কালি এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে– তবু আল্লাহ্পাকের কথা শেষ হবেনা।'

এটা চিরন্তন সত্য যে, শব্দকে আশ্রয় করা হয় কোনো না কোনো অর্থ প্রকাশের জন্য। শব্দ সসীম। কিন্তু আল্লাহ্পাকের সত্তা ও বৈশিষ্ট্যাবলী অসীম। আর মানবিক জ্ঞান আল্লাহ্পাকের অস্তিত্ব ও গুণাবলীর মহিমা আয়ত্ত করতে অক্ষম। তবে হ্যাঁ, আত্মিকভাবে এই উদাহারণরহিত জ্ঞান সম্পর্কে বিস্ময়বিমূঢ় পরিচিতি যৎকিঞ্চিত লাভ করা যেতেও পারে। আর বিষয়টি কেবল সাধারণ ব্যক্তি

www.eelm.weebly.com

নয়– বিশেষ ব্যক্তিরও ধারণা অপেক্ষা উচ্চে। যেমন–হজরত আবুবকর সিদ্দিক রা. বলেন, অনুসন্ধানের পরে না পাওয়াটাও একটি জ্ঞান। আর আল্লাহ্‌পাকের সত্তাসম্ভূত রহস্যকে জ্ঞানাবদ্ধ করার চেষ্টা শির্‌ক। কিন্তু তাঁর গুণাবলী বস্তুজগতের গুণাবলীর সঙ্গে এক ধরনের সাদৃশ্য রচনা করেছে। তাই সে সমস্ত গুণাবলীর মাধ্যমে তিনি তাঁর অতুলনীয় গুণাবলীকে প্রকাশ করেছেন। যেমন, এলেম (জ্ঞান), হায়াত (জীবন), সামা (শ্রবণ), বাসার (দর্শন), ইরাদা (অভিপ্রায়), রহমত (দয়া), কহর (বিপদ) ইত্যাদি। আল্লাহ্‌তায়ালার এসব গুণাবলী সম্পর্কে যখন বিবরণ দান করা হয়,তখন মানুষ মনে করে, আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলীকে জ্ঞানায়াত্ত করে ফেলেছি। মনে করে, গুণাবলীর প্রকৃত তত্ত্ব আমাদের জানা হয়ে গিয়েছে। এই ধারণা সত্যানুসরণ থেকে বহু দূরে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত গুণাবলী নয় বরং গুণাবলীর সুদূরবর্তী কিছু প্রচ্ছায়া ছাড়া অন্য কিছু লাভ করা তাঁদের ক্ষমতাতীত। আল্লাহ্‌তায়ালার এমন অনেক গুণাবলী রয়েছে সৃষ্টিজগত যার কোনো প্রকার সাদৃশ্যই কল্পনা করতে পরে না। হজরত নবী করীম স. তাঁর প্রার্থনায় উল্লেখ করতেন, আয় আল্লাহ্! আমি তোমাকে তোমার ওই সমস্ত নামের মাধ্যমে ডাকি যা কেবল তোমারই জন্যে নির্ধারিত। যা তুমি তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছো অথবা তোমার কোনো সৃষ্টিকে জানিয়ে দিয়েছো কিংবা যা রেখেছো অন্তরালবর্তী সংরক্ষণে– যা কাউকে জানাওনি। এই হাদিসটি ইবনে হাব্বান তাঁর সহীহ্ কিতাবে এবং হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে লিখেছেন। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের একটি দীর্ঘ হাদিস থেকে এই বর্ণনাটি এনেছেন ইমাম আহমদ ও আবু ইয়া'লী। যে বর্ণনাটির প্রথমেই উল্লেখ ছিলো লিমান আসাবাহু আল্লাহুম্মা। হজরত আবু মুসা থেকে তিবরানীও এরকম বলেছেন।

শেষ কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালার ওই নামগুলো গোপনীয় এবং মানুষের ভাষা ও অভিধানের উর্ধ্বে। আবার কতিপয় নাম তিনি তাঁর হাবীব স. এবং তাঁর যথার্থ অনুসারীদেরকে ইল্‌হামের (আত্মিক প্রক্ষেপণের) মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁদেরকে দিয়েছেন দিব্যজ্ঞান–যার মাধ্যমে তাঁদের সামনে সকল রহস্য উন্মোচিত হয়। যেমন– আল্লাহ্‌পাক হজরত আদম আ.কে সকল কিছুর নাম শিখিয়েছেন। সেই সঙ্গে দিয়েছেন এমন দিব্যজ্ঞান– যার আলোকচ্ছটায় প্রতিটি বস্তুর তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়। তাই তিনি সহজে বুঝতে পারতেন, কোন্ শব্দটি কোন বস্তুর জন্য সমীচীন। ফলে মনে হতো তিনি যেনো আগে থেকেই এসব জানতেন। এ ব্যাপারটিও সম্ভব যে, হরূফে মুকাত্তায়াত তেলাওয়াতের সময় আল্লাহ্‌র ওই সমস্ত নাম বা নামের বৈশিষ্ট্যাবলীর মর্ম নবী করীম স. এর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হতো। আমার শায়েখ উস্তাদ কতো সুন্দররূপেই না বলেছেন, কেউ যদি কাশ্‌ফ (আত্মিক দৃষ্টি) সহযোগে কোরআনকে পর্যবেক্ষণ করে, তবে তার সম্মুখে এই রহস্যের অর্গল উন্মোচিত হবে। কোরআন মজীদ আল্লাহ্‌পাকের বরকতের সুগভীর সমুদ্র। এই সুগভীর সুবিশাল সীমাহীন সাগরে বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলো এমতো বিকশিত

www.eelm.weebly.com

হয়– যেনো উত্তাল এক উর্মিমুখরতা আরো গভীরতর কোনো সুবিশাল সাগরের দিকে সতত প্রবহমান। যদি সেই দিব্যদৃষ্টি দিয়ে হরুফে মুকাত্তায়াতকে কোরআনেরই নাম নির্ধারণ করা যায়, তবে সত্বরই সুস্পষ্ট হয় যে, সমস্ত কোরআন মজীদই এই সংক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বর্ণ সমূহের অনন্যসাধারণ ব্যাখ্যা।

আমি বলি, এ বিষয়ে আল্লামা বায়যাবীর মত বর্ণিত অভিমতের বিরুদ্ধে নয়। কোরআন মজীদের প্রতিটি আয়াতের একটি প্রকাশ্য ও আরেকটি অপ্রকাশ্য মর্ম রয়েছে। প্রতিটি উচ্চারণের সীমারেখায় রয়েছে একটি দিকনির্দেশনা। প্রতিটি বর্ণেরও রয়েছে একটি সীমাচিহ্ন। সেগুলোরও দিকনির্দেশ রয়েছে। আল্লামা বায়যাবী হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে এরকম বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই প্রতিটি মূল অক্ষর যেমন প্রকাশ্যতঃ কোরআনের মূল প্রকৃতি হয়েছে, তেমনি অধিকাংশ বাক্য গঠিত হয়েছে এই অক্ষরগুলো দিয়েই। কোরআনে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম অনুষঙ্গ, অভাবনীয় রহস্যের দ্যুতিচ্ছটা। এই বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলো যেনো সেই নিগুঢ় নির্যাস, যেনো আল্লাহ্পাকের অনিঃশেষ অনুকম্পার জলধিতরঙ্গ - উদ্বেলিত নির্ঝর। এই গোপনতম রহস্যাচ্ছন্নতার বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই অবহিত। আর তিনি নিছক প্রেম ও পবিত্র অভিপ্রায় বশতঃ এই জ্ঞানের অবহিতি দিয়েছেন তাঁর প্রিয় রসুলকে এবং সেই সূত্রে রসুলের পথের দিকে আহবানকারী অনুসরণনিষ্ঠদেরকে। কোন উপায়ে তিনি এই রহস্যের যবনিকা উন্মোচন করেছেন, তা তিনিই ভালো জানেন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

☐ ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, সাবধানীদের জন্য ইহা পথ নির্দেশক।

এই গ্রন্থটি হচ্ছে ওই পবিত্র গ্রন্থ– যা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. পাঠ করেন এবং যা অস্বীকার করে মুশরিকেরা। 'জালিকা' শব্দটি দ্বারা কোরআনের ওই অংশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা ইতোপূর্বে (এই সুরা বাকারার পূর্বে) অবতীর্ণ হয়েছিলো। এরকমও হতে পারে যে, এখানে সম্পূর্ণ কোরআনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে– যার কিছু অংশ অবতীর্ণ করা হয়েছে পূর্বাহ্নেই। সকল অবস্থায় 'জালিকা' শব্দটি উদ্দেশ্য এবং কিতাব শব্দটি বিধেয়। অর্থাৎ এই কিতাব হচ্ছে ওই কিতাব– যা প্রদানের অঙ্গীকার দেয়া হয়েছে রসুলে পাক স. কে। এরকমও বলা যায় যে, এ হচ্ছে সেই পরিপূর্ণ গ্রন্থ যা কিতাব নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

www.eelm.weebly.com

'কিতাব' শব্দটি বিশেষণ এবং এর পরের শব্দগুলো বিধেয়– এরকমও বলা যেতে পারে। কতিপয় মুফাস্‌সির উল্লেখ করেছেন, এখানে 'হাজা' শব্দটি উহ্য রয়েছে। আর এই উহ্য বাক্যটি সহ অর্থ হবে এরকম– হে মোহাম্মদ স.। আপনার উপর যা প্রত্যাদেশ করা হয়, তা হচ্ছে এই কিতাব–যা অবতীর্ণ করার অঙ্গীকার আমি করেছি তওরাত ও ইঞ্জিলে। অথবা 'ইন্না সানুলক্বি আলাইকা ক্বওলান ছাক্বিলা'– একথার দ্বারা যে অঙ্গীকার আমি করেছিলাম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'জালিকা' শব্দটি উহ্য উদ্দেশ্যটির বিধেয়। আর 'কিতাব' হচ্ছে এর বিশেষণ। 'কিতাব' শব্দটি যদিও মাছদার বা ধাতু– কিন্তু তার অর্থ হবে মকতুব বা লিখিত। আরবী ভাষায় ধাতুর সঙ্গে কর্ম পদের অর্থ গ্রহণ করার রীতি বহুল প্রচলিত। এর অর্থ হচ্ছে মিলিত করা, একত্রিত করা। এ কারণেই সেনাবাহিনীকে বলা হয় কুতাইবাতুন। কারণ, অনেক লোক সেখানে একত্রিত থাকে। গ্রন্থের নাম কিতাব রাখা হয়েছে একারণে যে, এতে বর্ণ সমূহের পারস্পরিক মিলন অথবা সন্ধি নিশ্চিত হয়। নামকরণের এটাও একটি কারণ যে, এটা লিপিবদ্ধ। 'জালিকা' শব্দটি দ্বারা দূরবর্তী ইঙ্গিত করা হয়, যে ইঙ্গিতের মাধ্যমে কিতাবের উচ্চ মর্যাদার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

লা রইবা ফিহী– এর অর্থ এই কিতাবের প্রমাণাদি এমতো প্রকাশ্য, যৌক্তিক এবং দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন ও ন্যায়ানুগতাপ্রিয় ব্যক্তি একে ওহী বলে আখ্যায়িত করতে এতোটুকুও সন্দিহান হতে পারেন না। বিধেয় এখানে নেতিবাচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যে কারণে এর অর্থ দাঁড়াবে এরকম– হে মানব সকল, এই কিতাব যে আল্লাহ্‌পাকের নিকট থেকে আগত তাতে সন্দেহমাত্র নেই। 'লা'– সত্তাগতভাবে নেতিবাচক। 'রইবা' বিশেষ্য এবং 'ফীহ্' হচ্ছে খবর। এরকমও বলা যায় যে, 'ফী' বিশেষণ, 'লিল মুত্তাক্বীন' খবর এবং 'হুদা' অবস্থা হওয়ার কারণে জবর বিশিষ্ট। অথবা 'লা'- কে খবর হিসেবে উহ্য মেনে নিতে হবে। যেমন, 'লা খইরা' শব্দটিতে খবর উহ্য রয়েছে। আর 'ফীহ্' শব্দটিকে 'হুদা' শব্দটির খবর বলা যেতে পারে। 'হুদা' শব্দটি নাকেরা হওয়ার দরুণ এর পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে 'ফীহ্'। এভাবে প্রতিপাদ্য বাক্যটি হবে 'লা রইবা ফীহী হুদান।' উত্তম বিধান হচ্ছে – এ সমস্ত সম্মিলিত অথবা পৃথক বাক্য সুসাব্যস্ত করা। এভাবে প্রতিটি পরের বাক্য পূর্বের বাক্যের তাগিদ হয়। যেহেতু দু'টি বাক্যের মধ্যবর্তীতে কোনো সংযোজক বর্ণ ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই 'জালিকাল কিতাব' এমনই একটি বাক্য হিসেবে দণ্ডায়মান হয়, যাতে করে একথা বুঝা যায় যে–এই কিতাব এমনই উচ্চস্তরে সমাসীন, যা চূড়ান্ত বিশেষণে বিশেষিত। এদিক থেকে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশই নেই। 'হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন' বাক্যটিকেও এরকম নিঃসন্দিগ্ধ মনে করতে হবে। আল্লামা ইবনে কাসীর 'ফীহ্' শব্দের 'হা' কে মিলিত অবস্থায় 'ইশবা' করে পাঠ করেছেন। আর শুধু এ ক্ষেত্রেই নয় যে জমিরে

www.eelm.weebly.com

গায়েবের প্রথম অক্ষর সাকিন হবে সেটাকে মিলিত অবস্থায় 'ইশবা' করেই পড়তে হবে। অর্থাৎ যেরকে 'ইয়া' এর উচ্চারণ সহযোগেই পড়তে হবে, যদি তার পূর্বাক্ষরে হরকত থাকে। আর উক্ত হরকতযুক্ত অক্ষর যদি যের বিশিষ্ট হয় তবে 'ইয়া' দ্বারা 'ইশবা' হবে। অন্যথায় 'ইশবা' হবে 'ওয়াও' দ্বারা। যেমন, ইয়াহ্যিবুহু লাহু। কিন্তু এখানে যে শর্তটিকে মান্য করতে হবে তা হচ্ছে, শেষ অক্ষরটি সাকিনযুক্ত হতে পারবে না। সাকিনযুক্ত অক্ষর মিলিত থাকলে 'ইশবা' বাতিল হবে। এটা হচ্ছে ক্বারীগণের সর্ববাদীসম্মত অভিমত। যেমন, ইয়ারদাহু, ইয়া'তিহি, নুয়াল্লিহি, নুসলিহি, ফায়ালক্বিহি, ইয়াত্তাক্বিহি। 'হা' এর পূর্বাক্ষর হরকত যুক্ত হলে, তার উচ্চারণের নিয়ম সম্পর্কে ক্বারীগণের মতানৈক্য রয়েছে। ইনশাল্লাহ্ উপযুক্ত স্থানে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। এখানে সংক্ষেপে শুধু এতোটুকুই বলা যায় যে, ক্বারীগণ পূর্বাক্ষরে হরকত দেখেই 'ইশবা' করে থাকেন। কেউ কেউ ধারণা করেন, হরকত যুক্ত পূর্বাক্ষর উহ্য অক্ষরের সমকক্ষ। তাই তারা পাঠ করেন সাকিন সহযোগে। আবার কেউ কেউ একে পাঠ করেন ইখতেলাছ এর আকারে। কারণ, এই পদ্ধতিতে পূর্বাক্ষরের হরকতকে বহিরাগত বলে মনে করা হয়, যা উহ্য অক্ষরের উপর জোর দেয়। এই কিতাব পথপ্রদর্শন করে তাঁদেরকে যাঁরা মুত্তাকী। এই সম্মানিত গ্রন্থের বাক্যাবলী এক অভিনব পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রমাণের পরে প্রামাণ্য বিষয়, কারণের পরে কার্য - এভাবে এই পবিত্র গ্রন্থটি হয়েছে পূর্ণতার চরমতম শিখরস্পর্শী। তাই এই বাণীবৈভব যে আল্লাহ্রই সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। যাঁরা সাবধানী, সদাসতর্ক এবং আল্লাহ্কে সমীহ্ করে চলেন, তাঁরা এর আবেদনের নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য। এই নিয়মেই তাঁরা লাভ করেন হেদায়েত।

হেদায়েত শব্দটি ব্যবহৃত হয় দু'টি অর্থে। একটি হচ্ছে— গন্তব্যের প্রতি পথনির্দেশ। দ্বিতীয়টি – গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো। হাদি শব্দটি যদিও ক্রিয়ামূলক, তবুও শব্দটি কর্তৃপদের অর্থবাহী। হাদি অর্থ হেদায়েতকারী উত্তম পথপ্রদর্শক। প্রথম অর্থের ভিত্তিতে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এরকম— কোরআনের নির্দেশনা দ্বারা কেবল ওই সমস্ত মানুষ উপকৃত হতে পারেন, যাঁরা আল্লাহ্ভীরু (মুত্তাকী)। তবে সাধারণভাবে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের জন্যই পথপ্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে এই কোরআনে। যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছে- 'হুদাল্লিন্নাস' (সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়েত)। তবে বিশ্বাসীরাই কেবল এ থেকে উপকৃত হতে পারে। দ্বিতীয় অর্থের ভিত্তিতে হেদায়েতকে আল্লাহ্ভীরুদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার কারণটিও সুস্পষ্ট। গন্তব্যস্থলে উপনীত হতে পারেন কেবল তাঁরাই, যাঁদের বিবেকের আয়না অমলিন, তমসাবিমুক্ত। যেমন, উত্তম আহার্য নিরোগ মানুষকে পরিপুষ্ট করে আর রোগগ্রস্তদেরকে করে অধিকতর পীড়িত। আল্লাহ্পাক অন্য আরেক স্থানে এরশাদ করেছেন, 'ওয়া নুনায্যিলু মিনাল কুরআনি মাহুয়া শিফা উঁ ওয়া রহমাতুল্লিল মু'মিনীনা ওয়ালা ইয়াজিদুজ্জ্বলিমিনা ইল্লা খসারা।'

www.eelm.weebly.com

মুত্তাকী ওই ব্যক্তি, যে পৃথিবীপরবর্তী জীবনের অনিষ্ট ও শাস্তি থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রেখেছে। সেই অনিষ্টকারী বিষয়টি হচ্ছে শিরিক (আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, গুণাবলী ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে অংশীস্থাপন)। শিরিক মুক্ত থাকা হচ্ছে মুত্তাকীর সর্বনিম্ন যোগ্যতা। পাপ ও অবাধ্যতা থেকে মুক্ত থাকা মধ্যবর্তী স্তর। আর সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে অনাবশ্যক ও অতিরিক্ত কার্যাবলী থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া। এই সর্বোচ্চ স্তরের মুত্তাকীদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে, 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানুত্তাকুল্লাহ্ হাক্কা তুক্বতিহি ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা আংতুম মুসলিমুন।'

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রা. বলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে নিজেকে কোনো কিছুর চেয়ে উত্তম অথবা অধম মনে না করাই হচ্ছে তাকওয়া (সাবধানতা)। শাহার ইবনে হাওশাব বলেছেন, তিনিই মুত্তাকী– যিনি নিষিদ্ধ ও অসিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে বেঁচে থাকেন। এমনকি অতিসংশ্লিষ্টতার ভয়ে অনেক বৈধ বিষয়াবলীও পরিত্যাগ করেন। বোখারী ও মুসলিমে হজরত নোমান বিন বশীরের উদ্ধৃতিতে ইবনে আদীর বর্ণনায় এসেছে– রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, হালাল সুস্পষ্ট। হারামও সুস্পষ্ট। এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে অনেক সন্দিগ্ধ বিষয়াবলী যা সহজবোধ্য নয়। যাঁরা এসমস্ত সন্দিগ্ধ বিষয়াবলী থেকে মুক্ত, তাঁরা তাঁদের সম্মান ও ধর্মপরায়নতাকে আবিলতামুক্ত করেছে। আর যারা সন্দিগ্ধতায় লিপ্ত তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে নিষিদ্ধতায়। দৃষ্টান্তটি এরকম–এক রাখাল তার পশুপাল চরাচ্ছে কোনো নিষিদ্ধ চারণভূমির পাশে। যে কোনো মুহূর্তে সে সেই চারণভূমিতে প্রবেশ করতে পারে। শোনো। অভিনিবেশী হও। প্রতিটি রাজ্যাধিপতির একটি নিষিদ্ধ সীমানা আছে। আর আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ সীমানা যবনিকাবৃত। মনে রেখো, শরীরে রয়েছে একটি গোশত্‌পিন্ড। সেই গোশত্‌পিন্ড শুদ্ধ ও সঠিক থাকলে শরীরও সুস্থ ও সঠিক থাকে। আর যখন সেটি অশুদ্ধ হয়ে যায়, তখন শরীরও অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। শুনে নাও, ওই গোশত্‌পিন্ডটি হচ্ছে হৃদয়।

আল্লামা তিবরানী তাঁর সগীর গ্রন্থে লিখেছেন, হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। আর যে বিষয় তোমাকে সন্দেহে নিক্ষেপ করে, তাকে পরিত্যাগ করো। আশ্রয় করো সন্দেহ বিমুক্ততাকে।

আমি বলি, হাদিস শরীফে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের যে উল্লেখ এসেছে তাকেই সুফী দর্শনের ভাষায় বলা হয় ফানায়ে কলব (অন্তর্নিমজ্জন) – যার চূড়ান্ত স্তর হচ্ছে, ফানাফিল্লাহ্ (আল্লাহ্‌তে নিমজ্জন)। এই স্তরটি বেলায়েতের প্রাথমিক স্তর। সন্দিগ্ধতা থেকে মুক্তি বেলায়েতের মাধ্যমে অর্জিত হয়। বেলায়েত অর্জনই তাকওয়াকে নিশ্চিত করে (বেলায়েতের চূড়ান্ত স্তরে উপনীত ব্যক্তিবর্গই পূর্ণ মুত্তাকী)। তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, 'কেবল মুত্তাকীরাই তাঁর বন্ধু (অলি)।' এই আয়াতে অবশ্য তাকওয়ার দরোজায় দন্ডায়মান ব্যক্তিদেরকেও মুত্তাকী বলে অভিহিত করা হয়েছে (তারা যদিও এখনো তাকওয়ার পূর্ণ

www.eelm.weebly.com

পরিচ্ছদাবৃত নন তবুও তার প্রবেশপথের সম্মুখে দন্ডায়মান– আশা করা যায় এই তোরণ অতিক্রম করে শেষাবধি তারা গন্তব্যে উপনীত হতে পারবেন)। এমতাবস্থায় 'হুদাল্লিল মুত্তাক্বীনের' অর্থ হবে ওই হাদিস শরীফের অনুকূল যেখানে বলা হয়েছে, 'মান কাতালা কাতিলান্ ফা লাহু সালবুহু'। এই হাদিসে নিহত বলা হয়েছে তাকে যে বর্তমানে নিহত না হলেও ভবিষ্যতে হবে। আলোচ্য আয়াতেও তেমনি ভবিষ্যতে যারা তাকওয়ার চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হবেন, তাদেরকে মুত্তাকী বলা হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩

ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝

❑ যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে ও তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।

অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন মুত্তাকীগণের বৈশিষ্ট্য। শিরিকমুক্ততাকে যদি তাকওয়ার অর্থে নির্দেশ করা হয় তবে অদৃশ্যে বিশ্বাসকে সিফাতে এহতেরাজিয়া বলতে হবে। অথবা বলতে হবে সিফাতে কাশেফা। ইমান, নামাজ, জাকাত এর অন্তর্ভূত। এগুলো মৌলিক আমল। ইমান হচ্ছে আমলের মস্তক। নামাজ ও জাকাত দ্বীনের স্তম্ভ। এখানে সিফাত শাহেদা হওয়ারও অবকাশ রয়েছে। এমতাবস্থায় 'আল্লাজিনা' থেকে শেষপর্যন্ত মুবতাদা এবং বিজ্ঞপ্তি হচ্ছে 'উলায়িকা আলা হুদা'। ক্বারী ওয়ারশ 'ইউ'মিনুনা' শব্দটিকে 'ওয়াও' সহযোগে পাঠ করতেন– যা ব্যবহৃত হয়েছে হামজার পরিবর্তে। ক্বারী আবু জাফর সকল সাকিন যুক্ত হামজাকে নিরুচ্চারিত রাখেন। 'পেশ' এর পরে উল্লেখিত হলে 'ওয়াও' দ্বারা এবং যেরের পরে হলে 'ইয়া' দ্বারা পরিবর্তন করেন। এই নিয়মের বাইরে রয়েছে নাব্বিহুম আমবিহিম নাব্বিনা। ক্বারী আবু আমর সকল অবস্থায় সাকিনযুক্ত হামজাকে অনুচ্চার্য রাখেন। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে জজম অবস্থায় সাকিন হয় অথবা শব্দান্তরিত হয়, সেক্ষেত্রে তিনি অনুচ্চার্য রাখেন না। যেমন র– ইয়া. মুছাদাহ। ক্বারী ওয়ারশও ক্রিয়াপদের প্রথম অক্ষরে ব্যবহৃত সাকিনযুক্ত হামজাকে উহ্য রাখেন। তিনি নুদিয়া এবং নুতিহি শব্দ দু'টিকে এই নিয়মবহির্ভূত বলেছেন। ক্রিয়াপদের মধ্যবর্তী অক্ষরে হামজা উল্লেখিত হলে র-ইয়া এবং মধ্যবর্তী যের বিশিষ্ট ক্রিয়াপদে অবলুপ্তির রীতি নেই।

ইমানের অর্থ ঃ ইমানের আভিধানিক অর্থ স্বীকৃতি প্রদান। আল্লাহ্পাক বলেন, 'ওয়ামা আন্তা বিমুমিনিন্ লানা (আর তুমি আমার স্বীকৃতি প্রদানকারী নও)। এখানে মুমিন অর্থ স্বীকৃতিদানকারী, স্বীকৃতি প্রদানকারী। স্বীকৃতির সম্পর্ক মন ও

www.eelm.weebly.com

মুখের সঙ্গে। শরিয়তগত অর্থ হচ্ছে, রসুল স. আল্লাহ্পাকের নিকট থেকে যা এনেছেন তার প্রতি মনে ও মুখে স্বীকৃতি প্রদান করার নামই ইমান। এই জ্ঞান হচ্ছে সুদৃঢ় জ্ঞান। মৌখিক স্বীকৃতি ব্যতীত কেবল আন্তরিক স্বীকৃতি পূর্ণাঙ্গ নয়। বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্য কেবল আন্তরিক স্বীকৃতি গ্রহণীয়। আল্লাহ্পাক বলেছেন,'এতদসত্ত্বেও ফেরাউনের মন মুসার মোজেজার প্রতি দৃঢ় আস্থাবান হয়েছিলো কিন্তু আত্মম্ভরিতার কারণে সে তা মানেনি।' এখানে মনের স্বীকৃতির সঙ্গে মুখের স্বীকৃতি ছিলো না বলে তা গ্রহণ করা হয়নি। আল্লাহ্পাক আরো বলেছেন, 'ইহুদীরা যেরূপ আপন সন্তানদেরকে চিনে, তেমনি নবী মোহাম্মদকেও চিনে।' এখানেও মনের স্বীকৃতিকে ধরা হয়নি। তবে হ্যাঁ, বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে মনের স্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য। এ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে, 'যাকে কুফরীর উপর বলপ্রয়োগ করা হয় অথচ তার মনে রয়েছে ইমানের প্রশান্তি এতে কোনো অপরাধ নেই।'

মোট কথা, শুধুই আন্তরিক স্বীকৃতি কেবল বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে ধর্তব্য। অন্যথায় স্বীকৃতি বলতে বুঝতে হবে মৌখিক ও আন্তরিক স্বীকৃতি। আল্লাহ্পাক বলেন, 'আর আল্লাহ্পাক সাক্ষ্য দেন যে, মুনাফিকেরা নিশ্চিত মিথ্যাবাদী।' মুনাফিকদের আমল ইমানের সাথে সংযুক্ত নয়। তাই সালাত কায়েমের সম্পর্ক ইমানের সঙ্গে সম্পর্কিত। তেমনি অন্যান্য সৎকর্ম সমূহও সম্পৃক্ত ইমানের সঙ্গে।

মুসলিম শরীফে হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমরা একদিন রসুল পাক স. এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। সহসা উপস্থিত হলেন শুভ্র পরিচ্ছদাবৃত এক আগন্তুক। তাঁর কেশরাজি ছিলো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। পথশ্রান্তির কোনো চিহ্ন তাঁর অবয়বে পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো না। আমরা কেউ তাঁকে চিনতে পারলাম না। তিনি অগ্রবর্তী হলেন এবং হাঁটু মুড়ে রসুল স. এর অতিসন্নিকটবর্তী হয়ে বসলেন। হাত রাখলেন রসুল স. এর পবিত্র উরুর উপর। তারপর নিবেদন করলেন, (ভ্রাতা) মোহাম্মদ! বলুন ইসলাম কী ? তিনি স. এরশাদ করলেন, ইসলাম হচ্ছে এ মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতযোগ্য কেউ নেই এবং মোহাম্মদ স. তাঁর রসুল - নামাজ পাঠ করা, জাকাত দেয়া, রমজানের রোজা রাখা এবং বাহন ও পাথেয় থাকলে আল্লাহ্র গৃহের হজ করা। আগন্তুক বললেন, যথার্থ বলেছেন। হজরত ওমর রা. বলেছেন, আমি বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম (এ কেমন লোক!) প্রশ্ন করছে। আবার নিজেই জবাবের অনুমোদন দিচ্ছে। আগন্তুক পুনরায় বললেন, ইমান কী ? হজরত স. বললেন ইমান হচ্ছে আল্লাহ্পাককে, ফেরেশতাকুলকে, আল্লাহ্র কিতাব সমূহকে, তাঁর নবীগণকে, কিয়ামত দিবসকে এবং অদৃষ্টের ভালোমন্দকে আন্তরিক প্রত্যয়ে গ্রহণ করা। আগন্তুক বললেন, ঠিকই বলেছেন। পুনরায় প্রশ্ন করলেন আগন্তুক, এহসান কী ? এরশাদ হলো, এহসান হচ্ছে এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করো যেনো তুমি তাঁকে দেখছো। এরকম না হলে, তিনি তোমাকে দেখছেন এরকম প্রতীতি রাখো।

www.eelm.weebly.com

আগন্তুক বললেন, কিয়ামতের কথা বলুন। কবে তা সংঘটিত হবে? তিনি স. বললেন, এ বিষয়ে প্রশ্নকর্তার চেয়ে উত্তরদাতা অধিক অবগত নন। আগন্তক বললেন, কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে বলুন ? তিনি স. বললেন, দাসী তার প্রভুকে প্রসব করবে (দাসী অধিক সন্তানবতী হবে)। অন্যান্য আলামত হচ্ছে নগ্নপদ, বিবস্ত্র ছাগ চারণকারী সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে দর্পিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। হজরত ওমর বলেছেন– আগন্তক চলে গেলেন, আমি বসে রইলাম। রসুল পাক স. বললেন, ওমর! আগন্তকটি কে তুমি জানো? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই সমধিক অবগত। তিনি স. বললেন, তিনি ছিলেন জিব্‌রাইল। তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। বোখারী ও মুসলিম কিঞ্চিত শব্দগত তারতম্য সহকারে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

রসুল স. আরো এরশাদ করলেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে বিবস্ত্র, নগ্নপদ, বোবা ও বধির জনপ্রশাসক হবে। 'গইব' বা অদৃশ্যের জ্ঞান বস্তুতঃ পাঁচটি এমন বিষয়ের জ্ঞান, যা আল্লাহ্পাক ব্যতীত আর কেউ জানে না। অতঃপর রসুল স. সুরা লুকমানের শেষাংশ থেকে পাঠ করলেন। ১. কিয়ামতের বিষয়ে কেবল আল্লাহ্ই জানেন আর কিয়ামতের জন্য রয়েছে নির্ধারিত সময় যা আল্লাহ্ ব্যতিত কেউ অবগত নয় ২. মেঘমালার বর্ষণ ৩. মায়ের উদরের সন্তান পুত্র না কন্যা তা কেবল তিনিই জানেন ৪. ভবিষ্যতের জ্ঞান ৫. মৃত্যুবরণের স্থান – নিঃসন্দেহে আল্লাহ্পাক এসকল বিষয়ে অবহিত।

বর্ণিত হাদিস দৃষ্টে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম হচ্ছে প্রকাশ্য আমলের নাম। আল্লাহ্পাক বলেন, আরবের বেদুইনেরা বলে আমরা ইমান এনেছি। হে নবী। আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা ইমান আনো নাই। তোমরা বরং বলতে পরো– আমরা মুসলমান হয়েছি।

কোরআন ও হাদিসের বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইমান ও ইসলাম কখনো ভিন্নার্থক আবার কখনো সমার্থক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। ইমান ও ইসলাম অবশ্যই দু'টি পৃথক বিষয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ইমানকে ব্যবহারিক অর্থে ইসলাম হিসেবেও গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে, 'ইজক্বালা লাহু রব্বুহু আসলিম ক্বালা আসলামতু লি রব্বিল আ'লামীন।' এই আয়াতে ইসলাম শব্দটি উল্লেখিত হলেও এর মর্মার্থ হচ্ছে ইমান। সার কথা হচ্ছে ইসলাম বলতে প্রকাশ্য আমল এবং অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস উভয়কেই বুঝায়।

বিল গয়িব—এখানে 'গয়িব' শব্দটি মাসদার। শব্দটি মুবালিগা হিসেবে 'ইউ' মিনুন' শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আল্লাহ্পাক বলেন, 'আলিমুল গইবি ওয়াশ্ শাহাদাহ্'। ওই সকল বস্তুকে গয়িব বলে যা মানবচক্ষুর অন্তরালবর্তী। যেমন আল্লাহ্পাকের জাত, সিফাত, ফেরেশতা, মৃত্যুত্তোর জীবন, বেহেশত, দোজখ, পুল সিরাত, মিজান, কবরের শাস্তি ইত্যাদি।

www.eelm.weebly.com

মুত্তাকীগণ বিশুদ্ধচিত্ত। তাঁদের বিশ্বাস ও স্বীকৃতি প্রত্যক্ষ। তাঁরা ওই সমস্ত কুটিল মনের অধিকারী প্রতারকদের মতো নন, যারা মুসলমানদের সামনে ইমান প্রকাশ করে, আর তাদের অসাক্ষাতে অস্বীকার করে। এমনও বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতের স্পষ্ট মর্ম হবে এরকম– যেমন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, যে ব্যক্তি রসুল পাক স.- কে স্বচক্ষে দেখেছে, তাঁর স. পবিত্র সংসর্গে অবস্থান করেছে- তার উপর তাঁর স. নূর সূর্যকিরণের চেয়ে সমুজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট ছিলো। ওই ব্যক্তির জন্য রসুল স. এর প্রতি ইমান আনা এবং তাঁর আহবানে সাড়া দেয়া তেমন বিস্ময়কর ও প্রশংসার্হ নয়। বরং ওই ব্যক্তির ইমানই প্রশংসাধন্য যে তাঁকে স. না দেখেই ইমান এনেছে। যিনি ব্যতীত প্রতিপালনকারী কেউ নেই, সেই আল্লাহ্পাকের কসম! ইমানের ক্ষেত্রে কেউ তার চেয়ে অধিক মহান নয়, যে রসুল স. কে না দেখেই ইমান এনেছে এবং তাঁর আহবানকে মান্য করেছে। একথার সাক্ষ্য হিসেবে হজরত ইবনে মাসউদ 'আলিফ লাম মীম' থেকে 'মুফলিহুন' পর্যন্ত পাঠ করলেন।

ওয়া ইউক্বিমুনাস্‌সলাহ– এবং নামাজ কায়েম করে। 'ইউক্বিমুন' অর্থ ইউহাফিজুন– অর্থাৎ মুত্তাকীরা ওই সকল লোক যারা নামাজের যথাযোগ্য হক সংরক্ষণ করে, শর্তসমূহ ও সীমারেখাকে যথানিয়মে মান্য করে। নামাজের রোকন সমূহ এবং প্রকাশ্য কর্মকান্ড, যেমন ওয়াজিব ও সুন্নত সমূহ পালন করে। অভ্যন্তরীণ অবস্থা অর্থাৎ একাগ্রচিত্ততাকেও সুসংরক্ষিত রাখে। 'ইউক্বিমুন' এর অর্থ কোনো কিছুকে সুন্দর ও সরল করা। সালাত শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রার্থনা। নামাজ প্রকৃতপক্ষে দোয়া বা প্রার্থনাই। তাই নামাজকে সালাত বলা হয়েছে। ক্বারী ওয়ারশ সালাত শব্দটির 'লাম' হরফকে মোটা করে পড়েছেন। কিন্তু তিনি ব্যতীত অন্য ক্বারীগণ পড়েছেন পাতলা করে। অবশ্য 'আল্লাহ্' শব্দের লামকে মোটা করে পড়ার ব্যাপারে সকল ক্বারীই একমত। তবে এক্ষেত্রে একটি শর্ত রয়েছে যে, লাম অক্ষরের আগের অক্ষর জবর অথবা পেশযুক্ত হতে হবে।

ওয়া মিম্মা রজাক্বনাহুম ইউনফিকুন– তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে। 'রিজিক' শব্দের আভিধানিক অর্থ হিস্‌সা বা অংশ। 'ইনফাক্ব' অর্থ কোনো বস্তুকে আপন অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। ব্যবহারিক অর্থ সৎপথে সম্পদ ব্যয়। এই বাক্যটি ওই সকল আরববাসীদের শানে অবতীর্ণ হয়েছে যারা বিনা বাক্যব্যয়ে নবীপাক স. এর প্রতি ইমান এনেছিলেন।

www.eelm.weebly.com

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○

❒ এবং তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে যাহারা বিশ্বাস করে ও পরলোকে যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী,

এরশাদ হচ্ছে, হে নবী! মুত্তাকী বা সাবধানী তারাই যারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে ইতোপূর্বে (তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ও অন্যান্য আকাশী পুস্তিকায়) – সকল কিছুর প্রতি ইমান এনেছে। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীরের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে– এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে ওই সকল আহলে কিতাবগণকে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁরা জ্ঞানে ধারণীয় এবং ইন্দ্রিয়ে অনুভবনীয় বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছেন। সাথে সাথে শরিয়তের আমলও কার্যকর করেছেন। তাঁরা ওই সমস্ত বিষয়েও বিশ্বাসী যা কেবলই শ্রুতিনির্ভর। শ্রুতি ছাড়া যা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের আওতাবহির্ভূত। এই আয়াতে সাধারণ ও বিশেষ অবস্থা সম্মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন 'তানায্যালুল মালাইকাতু ওয়াররূহ্' বাক্যটিতে রূহ্ ও মালায়িকা শব্দ দু'টির সম্মিলন ঘটেছে। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু মুসা আশআরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তিন ধরনের ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। তন্মধ্যে একটি ধরণ হচ্ছে এরকম– যারা আহলে কিতাব (পূর্ববর্তী নবীর উম্মত) আবার হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা স. এর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনকারী।

ইনজাল অর্থ অবতরণ। এখানে লাওহে মাহফুজ থেকে হজরত জিব্‌রাইলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কালাম অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। মহামর্যাদামন্ডিত আল্লাহ্‌তায়ালার অসীম জ্ঞানভান্ডার থেকে সসীম মানবের জ্ঞানে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টিকে ইনজাল শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। দুই শব্দের মাঝখানে যখন টেনে পড়ার (মাদ) এর ব্যাপারটা আসে, তখনও আবু জাফর, ইবনে কাসীর এবং সুসী না টেনেই পড়েছেন। আর কালুণ এবং দাওরী কখনো টেনে কখনো না টেনে পড়েছেন। এরা ছাড়া অন্য ক্বারীগণ টেনে পড়েছেন। এ ধরনের টেনে পড়াকে মাদ্দে জায়েয এবং মাদ্দে মুনফাসিল বলে। আরো এক ধরনের মাদ রয়েছে, যাকে বলে মাদ্দে মুত্তাসিল, যে মাদ থাকে একই শব্দের মধ্যে। যেমন আল মা-উ, ওয়াস্‌সামা-উ- এই সকল মাদ প্রলম্বিত উচ্চারণে পড়তে হয়। এ ব্যাপারে মতভেদ নেই। এই মাদকে বলে মাদ্দে ওয়াজিব। মাদ্দে মুত্তাসিল ও মাদ্দে মুনফাসিলের ব্যাপারে অবশ্য ক্বারীগণের মতানৈক্য রয়েছে। ইবনে কাসীর, আবু আমর এবং কালুণ মাদ্দে মুত্তাসিলকে তিন হরকত পরিমাণ টেনে পড়েছেন।

www.eelm.weebly.com

ইবনে আমের, কুসাই পড়েছেন চার হরকত পরিমাণ এবং আসেম পাঁচ হরকত পরিমাণ। ওয়ারশ এবং হামজা পড়েছেন ছয় হরকত পরিমাণ। এই মতানৈক্য কেবল ওই মাদের বেলায় যেখানে মাদের হরূফের পরে হামজা থাকে। মাদের পর সাকিন থাকলে সকল ক্বারীই ছয় হরকত পরিমাণ টেনে পড়তেন। যেমন, ওয়ালাদ্দ্বল্লিণ, আলিফ লাম মীম। এধরণের মাদকে বলে মাদ্দে লাজেম। কিন্তু সাকিনযুক্ত হরূফে যদি যতি টানতে হয়, তবে ক্বারীগণের সর্বসম্মত মত হচ্ছে— দুই হরকত, চার হরকত অথবা ছয় হরকত টেনে পাঠ করা যাবে। আর হরূফে সাকিন যদি পেশ যুক্ত হয়, তবে তা সাত হরকত পরিমাণ টেনে পড়ার ব্যাপারে সকল ক্বারী একমত। যেমন, নাস্তাঈন।

'পরলোকে যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী' পরলোক অর্থাৎ আখেরাতের বিপরীত শব্দ হচ্ছে দুনিয়া। দুনিয়া শব্দটি গঠিত হয়েছে দুনু শব্দ থেকে— যার অর্থ নিকটবর্তী। যেহেতু বর্তমানে এটাই নিকটতম তাই এর নাম দুনিয়া বা পৃথিবী। আখেরাত বা পরকাল হচ্ছে পরবর্তী পৃথিবী। আখেরাতে একিন বা বিশ্বাস হচ্ছে সুদৃঢ় জ্ঞাননির্ভর। সন্দেহাতীত বিশ্বাসের নামই একিন। এই একিন অর্জিত, স্বয়ম্ভু নয়। তাই আল্লাহ্পাককে মুকিন (একিনলব্ধ জ্ঞানের অধিকারী বলা যায় না)।

জ্ঞাতব্য ঃ দার্শনিকগণের মতে মানুষ তিন ধরনের জ্ঞানে জ্ঞানবান। ১. হুসুলী। হুসুলী অর্থ অর্জিত জ্ঞান। চিন্তাশক্তির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তাকে বলে এলমে হুসুলী বা অর্জিত জ্ঞান। ২. হুজুরী। হুজুরী হচ্ছে সত্তাগত জ্ঞান। চিন্তাশক্তির প্রবেশাধিকার এখানে নেই। সত্তার অনুভূতি যেমন চিন্তা ব্যতিরেকেই অনুভবনীয়। ৩. কাসবী। অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সংশ্লেষণের মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ হয়- তাকে বলে এল্মে কাসবী। ধারণা, দৃঢ় প্রত্যয়, অনুমান ইত্যাদি এই জ্ঞানেরই শাখা প্রশাখা। কাজেই একিন বা দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী - এরকম বাক্য ব্যবহার আল্লাহ্পাকের মর্যাদার অনুকূল নয়। তাঁর জ্ঞান স্বয়ম্ভু,স্বতিষ্ঠ, স্বপ্রতিষ্ঠিত।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৫

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

❒ তাহারাই তাহাদের প্রতিপালক-নির্দেশিত পথে রহিয়াছে এবং তাহারাই সফলকাম।

আপন প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে যাঁরা রয়েছে তাঁরাই সফলকাম। ইতোপূর্বে তাঁদের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন- তাঁরা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে। সালাত কায়েম করে। প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে দান করে। পূর্ববর্তী ও

www.eelm.weebly.com

বর্তমানে অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাস করে। আখেরাত সম্পর্কেও তাঁরা নিশ্চিত বিশ্বাসী। এসমস্ত গুণাবলী সফলকাম হওয়ার সহায়ক বরং এসকল গুণবিশিষ্টদের জন্য সফলতা অনিবার্য। সফলতার এই সিদ্ধান্ত আল্লাহ্পাকের দিক থেকেই। তাই 'মিররব্বিহিম' বলে মুত্তাকীদের মর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে। 'মুফ্লিহুন' অর্থ সফল। শব্দটি এসেছে 'ফালাহ্' শব্দ থেকে। তাঁদের এই সাফল্য লাভ হবে পৃথিবী ও আখেরাত উভয় স্থানেই। এখানে তাঁদের আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে থাকা এবং সফলকাম হওয়ার সংবাদ দু'টি 'এবং' বা 'ওয়াও' এর মাধ্যমে সংযুক্ত করে পেশ করা হয়েছে। কারণ সংবাদ দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির। এক ধরণের হলে 'ওয়াও' এর উল্লেখ ব্যতিরেকেই বর্ণনা করা হতো। যেমন অন্যত্র উল্লেখিত হয়েছে, 'উলা-ইকা কাল আ'নাম বাল হুম আদাল্লু উলায়িকা হুমুল গফিলুন'—তারা চতুষ্পদ জন্তুতুল্য বরং তদপেক্ষা নিকৃষ্ট, তারাই উদাসীন (গাফেল)। এখানে একই ধরনের দু'টি সংবাদ বিবৃত হয়েছে বলে 'এবং' সংযোজক ব্যবহৃত হয়নি। হুমুল মুফ্লিহুন—এর হুম সর্বনামটি পার্থক্যপ্রকাশক (বিধেয় এবং তার বিশেষণের পার্থক্যকারী)। এরকমও বলা যায় যে, 'হুম' সর্বনামটি পার্থক্যপ্রকাশক নয় বরং উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিধেয় হয়েছে 'মুফ্লিহুন'—বরঞ্চ উভয়ে মিলিত হয়ে পূর্বের 'উলা-ইকা' এর বিধেয় হয়েছে।

মোতাজিলা সম্প্রদায় সর্বনামটিকে সীমাবদ্ধ সর্বনাম বলে প্রমাণ করে যে, কবীরা গোনাহ্কারীরা চিরদিনের জন্য নরকবাসী। তাদের অভিমত দুর্বলতাদুষ্ট। তাই পরিত্যাজ্য। কারণ, আল মুফ্লিহুন বলে ওই সমস্ত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে—যাঁরা পূর্ণ সফলকাম। অন্যেরা পূর্ণ সফলকাম না হলেও সাধারণ সফলতার অধিকারীও যে হবে না- এ রকম ইঙ্গিত এখানে নেই।

পরবর্তী আয়াতে আসছে মুত্তাকীদের বিপরীত মেরুর লোকদের আলোচনা, যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। প্রসঙ্গটি ভিন্নতর। তাই সংযোজক অব্যয় ব্যতিরেকেই পরবর্তী বাক্যটি শুরু হয়েছে। এরশাদ হয়েছে—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৬

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

❑ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর, তাহাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তাহারা বিশ্বাস করিবে না।

---

www.eelm.weebly.com

'কুফর' শব্দের আভিধানিক অর্থ নেয়ামতকে গোপন করা। ব্যবহারিক অর্থ— ইমানের বিপরীত বস্তু—অবিশ্বাস বা সত্য প্রত্যাখ্যান। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সতর্ক করা বা না করা একই কথা। সতর্ক করা এবং না করা দু'টি পৃথক কাজ, তাই দু'টি পৃথক বাক্যেই এ দু'টি কাজকে বিবৃত করা যেতো। কিন্তু দু'টি নির্দেশের প্রতিফল যেহেতু একই— তাই দু'টি বাক্যকে একাকার করা হয়েছে। 'আম' শব্দটির প্রথম অক্ষর 'হামজা' প্রশ্নবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তাগিদ প্রদানার্থে। 'ইনজার' অর্থ আল্লাহ্তায়ালার শাস্তি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা বা সতর্ক করা। এখানে এর বিপরীত শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। কারণ, কল্যাণ লাভ অপেক্ষা অকল্যাণ থেকে অব্যাহতির প্রসঙ্গটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 'তাহারা বিশ্বাস করিবে না'—এটাই উপসংহার। সতর্ক করা বা না করা তাদের কাছে এক বরাবর। তাদের সম্পর্কে এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে, তারা কস্মিনকালেও বিশ্বাসকে গ্রহণ করবে না। কারণ—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৭

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۗ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۫ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۟

❑ আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয় ও কর্ণ মোহর করিয়া দিয়াছেন, তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহা শাস্তি।

কৃলব বা অন্তর হচ্ছে একটি গোশ্তের টুকরা। এর আকৃতি মসুর ডালের দানার মতো। বাম পাঁজরে—এর অবস্থান। বুদ্ধিকেন্দ্র অথবা জ্ঞানকেন্দ্র বুঝাতেও কখনো কখনো কৃলব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছে-'ইন্না ফি জালিকা লা জিকরা লিমান কানা লাহু কৃলবুন'। আল্লাহ্পাক সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। মূল বা আনুষাঙ্গিক সকল সৃষ্টি তাঁরই সৃজনশীলতার অধীন। কার্যকারণ নীতি তাঁরই সুনির্দিষ্ট বিধান। এই বিধানের নেপথ্যেই রয়েছে তাঁর সৃজনের উন্মেষ। মানুষ যখন তার ইন্দ্রিয়সমূহকে পরিচালিত করতে চায়, তখন আল্লাহ্ই তার অনুভব ও ইচ্ছাকে কার্যে রূপ দেন। নয়তো মানুষের ইচ্ছা ইচ্ছাই থাকতো। কার্যে পরিণত হতে পারতো না। অভিপ্রায়কে বাস্তবায়ন করা না করা সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাধীন। তিনি ইন্দ্রিয়কে স্থবির ও বুদ্ধিকে অকার্যকর করার ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতাবান। কখনো কখনো তিনি অনুভূতিকে তার নিজস্ব সীমায়

www.eelm.weebly.com

স্থির রাখেন। ফলে অনুভূতির প্রভাব ক্বলব বা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয় না। রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, মানুষের মন আল্লাহ্‌পাকের অতুলনীয় ও অলৌকিক দুই অঙ্গুলীর মধ্যে। তিনি অন্তরসমূহকে যেমন ইচ্ছা তেমনি করে দেন। তিনি স. প্রার্থনা করতেন, হে অন্তরের আবর্তনবিবর্তনকারী আল্লাহ্! তুমি আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার আনুগত্যমুখী করে দাও।

কাফের বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তরকে পবিত্র করা আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় নয়। তাই তাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী দর্শন এবং সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার দরোজা চিররুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তারা নিদর্শনাবলীও মোজেজাগুলো অবলোকন করে বটে, কিন্তু অন্তরে এসবের প্রভাব ধারণ করার যোগ্যতা তাদের নেই। এই অবস্থাকেই মোহর করে দেয়া বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে 'ত্বা' (সীলমোহর)। কোথাও উল্লেখিত হয়েছে আগফাল (উদাসীনতা)। কখনো বলা হয়েছে আকিস্‌সা। আবার কোথাও বলা হয়েছে গিশাওয়া (যবনিকা)। এখানে মোহর করার অর্থ পাথর বা সীসা দ্বারা মোহরাঙ্কিত করা নয়। বরং অর্থ হবে অযোগ্যতার মোহরাঙ্কন। এরকমও বলা যায় যে, আল্লাহ্‌পাক তাদের মন, চক্ষু ও কর্ণকে আচ্ছাদনের অধীন করে দিয়েছেন। অথবা এরকমও অর্থ হতে পারে যে, খতম বা মোহর হচ্ছে ওই কৃষ্ণকলংক, যা পাপের নির্যাসরূপে অন্তরের উপরে পতিত হয়। হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে ইমাম বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, মুমিন বান্দা গোনাহের কাজ করলে তার অন্তরে সৃষ্টি হয় একটি ক্ষুদ্রাকৃতির কালো দাগ। এর পর যদি সে তওবা করে, পাপ থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে অন্তরের কালো দাগ অপসারিত হয়। অন্তর তখন পরিচ্ছন্ন হয়ে নির্মল রূপ ধারণ করে। আর যদি সে পাপের পথেই অনড় থাকে তবে ওই কালো দাগ প্রশস্ততর হতে থাকে। শেষে সমস্ত অন্তঃকরণই তমসাচ্ছাদিত হয়ে যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'কাল্লাবাল র'না আলা কুলুবিহিম মা কানু ইয়াকসিবুন।'

আমি বলি, এই আয়াতের মর্মই উপরোল্লিখিত হাদিসে বিবৃত হয়েছে। এই অবস্থাটি অন্য হাদিসে এইভাবে বলা হয়েছে—ইজা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লুহু (যদি অন্তর অশুদ্ধ হয়, তবে সমস্ত শরীরই অশুদ্ধ হয়ে যায়)। অশুদ্ধ অন্তর বিশুদ্ধ অন্তরের সম্পূর্ণ বিপরীত। গোনাহ্ করলে মুমিনদের এই অবস্থা হয় (অন্তরে কালো দাগ পড়ে)। কাফেরদের অবস্থা অবশ্য অন্যরূপ। তাদের ক্ষেত্রে ফাসাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। ব্যবহৃত হয়েছে ত্বা, আগফাল অথবা আকিস্‌সা। এই আয়াতে কাফেরদের ক্বলবের অবস্থা খতম শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। কোনো বস্তুতে সীলমোহর করার অর্থ, ওই বস্তুর চূড়ান্ত অবস্থা নিশ্চিত করে ফেলা এবং ওই বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে আবরিত করা। কাফেরদের ক্বলবকে খতম বা সীলমোহর করে চিরদিনের জন্য হেদায়েতের আলো থেকে আড়াল করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

এরকমও বলা যায় যে, তাদের কুলব সম্পূর্ণরূপে অকর্মন্য ও অকেজো। মোহরাঙ্কনের মাধ্যমে এই অকর্মণ্যতারই চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

শুধু কুলবই নয়—তাদের শ্রুতিও মোহরাঙ্কিত। তাই বলা হয়েছে, ওয়া আলা সাময়িহিম—এবং কর্ণ। সামা শব্দটি একবচন। শব্দটি ক্রিয়ামূল। আর ক্রিয়ামূল বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হয় না, তাই এখানে একবচনই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ হবে বহুবচনসুলভ। মন ও কানের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। অন্য আয়াতে মন ও চোখের মোহরাঙ্কনের ব্যাপারে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে, 'খতমাল্লাহু আলা ক্বালবিহি ওয়া জায়ালা আলা বাস্ব রিহি গিশাওয়া।' এখানে খতম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে মনের জন্য এবং গিশাওয়া শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে চোখের জন্য। এই আয়াতে হৃদয় এবং শ্রুতির জন্য খতম এবং দৃষ্টির জন্য গিশাওয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, 'ওয়া আলা আব্স্বারিহিম।' আবস্বার হচ্ছে বাস্বার শব্দের বহুবচন। এখানে অর্থ হবে, তাদের চক্ষু বা চক্ষুসমূহের উপরে রয়েছে আবরণ। আয়াতের শেষপাদে বলা হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি (ওয়া লাহুম আযাবুন আজীম) আযাব শব্দটি এসেছে আযাবুশ্ শাই থেকে। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীকে আরববাসীগণ আযাবুশ্ শাই শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করেন। আযাব বা শাস্তি অপরাধীকে পুনর্বার অপরাধী হতে বাধা দেয়। তাই শাস্তিকে বলে আযাব। শব্দটি আরো ব্যাপক পরিসরে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। তাই সকল দুঃখ-ব্যথাকে আযাব বলে অভিহিত করা হয়। যদিও তা সকল ক্ষেত্রে শাস্তি নয়। এরকমও বলা যেতে পারে যে, আযাব শব্দটির ব্যুৎপত্তি হয়েছে তা'যীব থেকে। এর অর্থ আনন্দ বা আস্বাদ নিবারণ করা।

আজীম শব্দটি হাকির (নগন্য) শব্দের বিপরীত। আজীম অর্থ মহা বা মহান। আরেকটি অর্থ বৃহৎ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৮

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۘ

❒ মানুষের মধ্যে এমন লোক রহিয়াছে যাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী,' কিন্তু তাহারা বিশ্বাসী নহে;

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, ইবনে সলুল, মানাব ইবনে কুশাইর, জায়েদ বিন কায়েস এবং তাদের সতীর্থদেরকে লক্ষ্য করে। তারা ছিলো ইহুদী এবং মুনাফিক। আয়াতে মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে বলে এদেরকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। 'নাস' (মানুষ) শব্দটি মূলে ছিলো 'আন্ নাস'। 'মিন' এর সঙ্গে যোগ করতে যেয়ে মধ্যের হামজাটি লোপ পেয়েছে। নাস শব্দটি

www.eelm.weebly.com

ইনসান শব্দের বহুবচন। ইন্‌স থেকেও নাস শব্দটি গঠিত হতে পারে। মানুষ পরস্পরের প্রতি সৌহার্দশীল হয়, তাই এমনটি হতে পারে। আনাসুন বা ইন্‌স থেকেও শব্দটির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। এর অর্থ– প্রকাশিত। যেমন কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে, 'আনাসা মিন জানি বিত্তুরি নারা'—তুর পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আগুন প্রকাশিত হলো।' মানুষেরা পরস্পরের প্রত্যক্ষগোচর তাই তাদেরকে নাস বলা হয়। জ্বিন সম্প্রদায় অপ্রত্যক্ষ বলেই তাদেরকে জ্বিন বলা হয়। আন্‌নাস শব্দটির 'আল' নির্দিষ্টবাচক অব্যয়, যা জাতিবাচক আর 'মিন' হচ্ছে গুণবাচক। কেউ কেউ বলেন, উল্লেখিত পদ হচ্ছে 'মান'। আর উল্লেখ্য বা সম্পৃক্ত পদ হচ্ছে আল্লাজিনা কাফারু। আর একথাও বলা যেতে পারে যে, 'মান' সম্বন্ধবাচক সর্বনাম। এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গদেরকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কারণ, তারাই মোহরাঙ্কিত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। বরং তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অগ্রদূত। শঠতা ও প্রবঞ্চনাসহ তারা সকল দোষে দুষ্ট। আয়াতে কেবল আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বিধৃত হয়েছে। কেনোনা, বিশ্বাস্য বিষয়সমূহের মধ্যে এ দু'টিই মুখ্য এবং চরম মর্যাদামন্ডিত।

ওই সকল ইহুদী ও মুনাফিকদের সম্পর্কে আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'তাহারা বিশ্বাসী নহে।' এ হচ্ছে তাদের মিথ্যা দাবীর প্রতিবাদ। এখানে 'ওয়ামাহুম বি মু'মিনিন' না বলে 'ওয়ামা আমানু' বলা যেতো। এরকম বললে প্রতিবাদটি হতো তাদের বক্তব্যের সমান্তরাল। কিন্তু প্রতিবাদটি অধিকতর শক্তিশালী করার মানসে তাদের সম্পর্কে এই মর্মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে, তারা বিশ্বাসী (ই) নয়। এতে করে তারা হয়েছে ইমানদারদের দল থেকে পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত। নেতিবাচকতাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এখানে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৯

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

❒ আল্লাহ্ এবং বিশ্বাসীগণকে তাহারা প্রতারিত করিতে চাহে। অথচ তাহারা যে নিজদিগকে ভিন্ন কাহাকেও প্রতারিত করে না ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না।

ওই ইহুদী ও মুনাফিকেরা প্রবঞ্চক। তাই বলা হয়েছে, 'ইউখদিউন্নাল্লাহ্ (তারা আল্লাহ্‌র সাথে প্রতারণা করতে চায়)।' খদিয়ু শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো কিছুকে গোপন করা। শব্দটি আরবী প্রবাদ খদায়া দিব্বু থেকে এসেছে। এর মাধ্যমে আপন গহ্বরে লুকিয়ে গুইসাপ যেমন শিকারীকে প্রবঞ্চনা দেয়—সেই প্রবঞ্চনার প্রসঙ্গ বিধৃত হয়েছে। গুইসাপের এরকম প্রতারণাকে আরববাসীরা খদায়া দিব্বু বলে থাকে। এই আয়াতে আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করতে চাওয়ার অর্থ হবে আল্লাহ্‌র রসুলকে প্রতারিত করতে চাওয়া। রসুলের প্রসঙ্গ এখানে উহ্য রয়েছে। সুতরাং, প্রকৃত অর্থ হবে তারা আল্লাহ্‌র রসুলকে প্রতারণা করতে চায়।

www.eelm.weebly.com

এরকমও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌র রসুলের সঙ্গে প্রতারণাকে আল্লাহ্‌ তাঁর নিজের সঙ্গে প্রতারণা বলে গণ্য করেছেন। কারণ, রসুল আল্লাহ্‌ নন বটে, কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। সুতরাং তার প্রতিনিধির সঙ্গে যে আচরণ করা হয়, সে আচরণ প্রবর্তিত হয় আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিই। বিষয়টি পরিষ্কাররূপে কালাম মজীদের অন্যত্র উল্লেখিত হয়েছে। যেমন, মাই ইউতিইর্ রসুলা ফাক্বদ আতাআল্লাহ্—যে রসুলের অনুসরণ করলো, নিশ্চয়ই সে আল্লাহ্‌র অনুসরণ করলো। আরো উল্লেখিত হয়েছে—ইন্নাল্লাজিনা ইউবাইয়ুনাকা ইন্নামা ইউবাইয়ুনাল্লাহ্, ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম—যারা আপনার হাতে হাত রেখে বায়াত গ্রহণ করছে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ্‌র হাতেই বায়াত গ্রহণ করছে, তাদের হাতের উপরে রয়েছে আল্লাহ্‌র হাত।

দু'জন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে যে কর্ম সম্পাদিত হয়, সে কর্মটি হয় শক্তিশালী। মুনাফিকেরা প্রকাশ্যতঃ ইমানের দাবীদার। আল্লাহ্‌তায়ালাও প্রকাশ্যতঃ তাদের সঙ্গে সে রকমই আচরণ বজায় রাখেন। রসুলুল্লাহ্ স. এবং অন্যান্য মুসলমানেরাও আল্লাহ্‌তায়ালার এই বিধান মেনে চলেন। কিন্তু মুনাফিকদের গোপন অবস্থা অত্যন্ত ভয়ংকর। তারা সরাসরি অবিশ্বাস প্রকাশকারীদের তুলনায় অধিকতর নিকৃষ্ট। তাদের গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা অবশ্যই জানেন। তাঁর প্রিয়তম রসুলকেও তিনি এ বিষয়ে যথাঅবহিতি দান করেন। আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট গোপন কোনো কিছুই নেই। তথাপি মুনাফিকেরা গোপনে আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দিতে চায়। তাদের ধোঁকায় তারা নিজেরাই বন্দী। তাদের ধোঁকার প্রতিক্রিয়া প্রকৃত অর্থে তাদের প্রতিই প্রত্যাবর্তিত হয়। চরমতম মূর্খ বলেই তারা একথা ভাববার প্রয়াস পায় যে, রসুলপাক স. এবং বিশ্বাসীদেরকে আমরা প্রতারণাবদ্ধ করে ফেলেছি। তারা জানেনা—সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর রসুলকে মুনাফিকদের প্রতারণা ও দুরভিসন্ধি সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে ক্রমাগত সংবাদ দিয়ে চলেছেন। উদাসীনতা ও অচেতনতাই তাদেরকে প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে অপারগ করে দিয়েছে। তারাই প্রতারিত। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ওয়ামা ইয়াশ্উরুন (ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না)।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১০

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝

❏ তাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করিয়াছেন ও তাহাদের জন্য রহিয়াছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তাহারা মিথ্যাচারী।

www.eelm.weebly.com

'মারাদুন' অর্থ ব্যাধি বা অসুস্থতা। শারীরিক অর্থ গ্রহণ করলে এর উদ্দেশ্য হবে অস্বাভাবিক অসুস্থতা যা শরীরকে দুর্বলতর করে এবং অবশেষে শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দেয়। আত্মিক দিক থেকে অর্থ করলে উদ্দেশ্য হবে, মূর্খতা, হিংসা অথবা অবিশ্বাস। অশুভ ধারণাকেও মারাদুন বা অসুস্থতা আখ্যা দেয়া যায়। অনিরাময়যোগ্য শারীরিক অসুস্থতা যেমন শারীরিক মৃত্যু ঘটায়, তেমনি অনপনেয় অভ্যন্তরীণ ব্যাধি আত্মিক মৃত্যুকে নিশ্চিত করে। এরকম অবস্থা চিরস্থায়ী ধ্বংসের কারণ। মুনাফিকেরা বিবেকের ব্যাধিতে আক্রান্ত। তারা মুসলমানদেরকে দেখতো হিংসার দৃষ্টিতে। মুসলমানদের ক্রমোন্নতি ও প্রভাব তাদেরকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিলো। প্রথম থেকেই তাদের অন্তরে ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানের মনোভাব। তাই এই আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে, 'তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি।' সত্য প্রত্যাখ্যানের এই ব্যাধি প্রথম থেকেই তাদের অন্তরে ছিলো। আল্লাহ্তায়ালা সেই ব্যাধিকেই বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে তাদের এই পীড়া উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। মোহরাংকনের মাধ্যমে আল্লাহ্ কেবল এই পীড়াকে স্থায়ী ও শক্তিশালী করে দিয়েছেন। কোরআনের আয়াত যত নাজিল হয় তাদের শত্রুতাও ততই বৃদ্ধি পায়। এমনও বলা যায় যে, আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে সহায়তা দানের মাধ্যমে তাদের উন্নাসিকতা ও শত্রুতার রহস্যকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থাকেই আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন—বলা হয়েছে।

ওই মুনাফিকদের জন্য রয়েছে চরম যন্ত্রণাদগ্ধ শাস্তি। কারণ, তারা মিথ্যাচারী। বিমা কানু ইয়াক্জিবুন (তারা মিথ্যাচারী) এই অংশটির মা অব্যয়টি মুস্দারিয়া। 'ইয়াকজিবুন' শব্দটি কুফাবাসিরা তাশদীদবিহীন অবস্থায় পড়তেন। যেমন এই আয়াতে লিখা হয়েছে। অন্য ক্বারীগণ পড়তেন তাশদীদসহ (ইউকাজ্জিবুন)। প্রথম উচ্চারণ অনুযায়ী অর্থ হয় মুনাফিকদের দাবী মিথ্যা (যেমন পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে)। দ্বিতীয় উচ্চারণের অর্থ—মুনাফিকেরা রসুলে করীম স. কে তাঁর আগোচরে অসত্যারোপ করতো যে অসত্যারোপন ছিলো মিথ্যা। দুই উচ্চারণের প্রকৃত মর্ম একই। অর্থাৎ মুনাফিকেরা মিথ্যাচারী। আর মিথ্যাচারীতার জন্যই তাদের অদৃষ্টে রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১১,১২

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ۝ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۝

☐ তাহাদিগকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিও না' তাহারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী।'

www.eelm.weebly.com

❑ সাবধান! ইহারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু ইহারা ইহা বুঝিতে পারে না।

'ফাসাদ' শব্দের অর্থ অশান্তি বা অনাসৃষ্টি। এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে সোলেহ বা শান্তি। সকল অকল্যাণজনক কাজকেই ফাসাদ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। পক্ষান্তরে, সকল শুভ কাজকেই বলা হয় সোলেহ। আলোচ্য আয়াতে মদীনার মুনাফিকেরা যে অশান্তি বা ফাসাদ সৃষ্টিকারী সে কথা বলা হয়েছে। মুনাফিকেরা একথা স্বীকার করে না। তারা কোরআনের প্রতি এবং রসুল স. এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। নিজেরা তো বিশ্বাস করেই না। অন্যদেরও বিশ্বাস করতে বাধা দেয়। মক্কার মুশরিকদের নিকট মুসলমানদের গোপন তথ্য সরবরাহ করে। তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী করে তোলে। সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংগঠিত করার প্রয়াস অবশ্যই ফাসাদ। রক্তক্ষয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেয়ে অধিক অশান্তি আর কী হতে পারে?

মুসলমানেরা তাদেরকে সদুপদেশ দিতেন। বলতেন, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কোরো না। তারা বলতো, আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী (ইন্নামা নাহনু মুছলিহুন)। বিস্ময়ের ব্যাপার—তারা অসত্যকেই সত্য রূপে দেখতে পেতো। তাই নিশ্চিন্ততার সঙ্গেই এরকম জবাব দিতো। তাদের দৃষ্টিতে অশুভই শুভ হিসাবে প্রতিভাত হতো। তাই অনুশোচনার পথে না গিয়ে মুখের উপরে বলে দিতো, আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী। এরকমও হতে পারে যে, তারা মুসলমানদের (সাহাবাগণের) সামনে এমন বলার সাহস পেতো না। নিজেদের মধ্যে এরকম বলাবলি করতো। তাদের উক্তির শুরুতেই থাকতো 'ইন্নামা' শব্দটি যার অর্থ 'নিশ্চয়'। তাদের বলার মাধ্যমে প্রকাশিত হতো তাদের শান্তিকামিতার নিশ্চিত ধারণা।

পরের আয়াতে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় নবীকে সতর্ক করে দিয়ে জানাচ্ছেন, সাবধান! তাদের কথা বিশ্বাসনীয় নয়। 'আমরা দেশে কোনো গোলোযোগ সৃষ্টি করিনা' 'আমরা সম্প্রীতিবাদী' 'আমরাইতো শান্তিকামী'—এরকম যতো মধুর কথাই তারা বলুক না কেনো—তাদের কোনো কথাই বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ তারা কপট, প্রতারক, মিথ্যাবাদী। এই আয়াতটি মুনাফিকদের অসৎ উক্তির প্রতি চরমতম প্রতিবাদ। আরবী বাকভঙ্গির চূড়ান্ত প্রতিবাদী রূপটি ব্যবহৃত হয়েছে এই বাক্যটিতে। প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে 'আলা' (সাবধান)। সুনিশ্চিত কোনো কিছুকে প্রকাশ করতে গেলে প্রথমেই এই শব্দটি উল্লেখ করাই আরবী ভাষাভঙ্গির নিয়ম। এরপর ব্যবহৃত হয়েছে ইন্না শব্দটি। যার অর্থ নিশ্চয় বা অতি অবশ্যই। এরপর এসেছে হুম সর্বনামটি—যার অর্থ তারা (মুনাফিকেরা)। তারপর মুফসিদুন (অশান্তি সৃষ্টিকারী) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ও বিধেয় এর পার্থক্য সৃষ্টিকারী সর্বনাম হুম এবং বিধেয়কে সুনির্ধারণকারী আল (হুমুল) সহযোগে।

www.eelm.weebly.com

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ○

❒ যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'অপরাপর লোকদের মত তোমরাও বিশ্বাস কর', তাহারা বলে, 'নির্বোধগণ যেরূপ বিশ্বাস করিয়াছে আমরাও কি সেইরূপ বিশ্বাস করিব?' সাবধান! ইহারাই নির্বোধ, কিন্তু ইহারা বুঝিতে পারে না।

যখন মুনাফিকদেরকে বলা হয় অপরাপর লোকেরা যেমন ইসলামে আস্থা এনেছে, তোমরাও সেরকম আস্থাবান হও-এখানে অপরাপর লোক অর্থ মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ। তাঁরাই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ইসলামে আস্থা স্থাপনকারী। অপরাপর লোকের মধ্যে ইহুদী সম্প্রদায় থেকে আগত সাহাবী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং তাঁর সাথীরাও রয়েছেন। আল্লাহ্তায়ালা আহবান জানাচ্ছেন, তাঁরা যেমন ইমান এনেছেন তোমরাও তেমনি ইমান আনো (যেহেতু তাঁরাই সত্যের মাপকাঠি)। এই আহবানটি আল্লাহ্পাকের অভূতপূর্ব দয়া প্রদর্শনের নিদর্শন। মুনাফিকদের নিশ্চিত অবিশ্বাস ঘোষণার পরেও আল্লহ্পাক তাদেরকে ডাক দিয়ে যাচ্ছেন। কারণ আল্লাহ্ পাক চান, অশান্তি অবলুপ্ত হোক। প্রতিষ্ঠিত হোক প্রশান্তি।

কতোই না মূর্খ মুনাফিকেরা। এই আহবানের জবাবে তারা বলে— নির্বোধেরা যেমন বিশ্বাস করে, আমরাও কি সে রকম বিশ্বাসী হবো? তারা সাহাবাগণকে অনভিজ্ঞ ভাবতো। নিজেদেরকে মনে করতো উচ্চ মর্যাদাধারী। তাই এহেন গর্হিত উচ্চারণ অনায়াসেই তাদের রসনায় উচ্চারিত হয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে জানাচ্ছেন, হে আমার রসুল। নিশ্চিতরূপে জেনে নিন, ওই সকল লোকেরাই নির্বোধ। তারা অহরহ রসুলের মোজেজাসমূহ অবলোকন করছে। তওরাত পাঠের মাধ্যমে শেষ নবী যে আপনি, সে সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করেছে। তবুও ইমান আনছে না। সুতরাং তাদের নির্বুদ্ধিতা স্বতঃসিদ্ধ। পূর্বের আয়াতের মতো এই আয়াতের শেষেও তাদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'লা ইয়া'লামুন'-তারা বুঝতে পারে না। ফাসাদ বা অশান্তি অনুভব করতে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। পূর্বের আয়াতটি ছিলো অশান্তি সৃষ্টি করার কুফল সম্পর্কে। তাই সেখানে বলা হয়েছিলো, লা ইয়াশ্উরুন। এই আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে ইমান প্রসঙ্গ। তাই বলা হয়েছে, 'লা ইয়া'লামুন।' কারণ, বিশ্বাস প্রসঙ্গটি সূক্ষ্মতর। বিশ্বাস ও ধর্মানুভূতি গভীরতর অভিনিবেশের দাবী রাখে।

www.eelm.weebly.com

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ۝

❐ যখন তাহারা বিশ্বাসীগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করিয়াছি,' আর যখন তাহারা নিভৃতে তাহাদের দলপতিগণের সহিত মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই রহিয়াছি; আমরা শুধু তাহাদের সহিত ঠাট্টা-তামাশা করিয়া থাকি।'

মুনাফিকদের আচরণ এক রকম নয়। একেক সময় একেক প্রেক্ষিতে তারা একেক কথা বলে। বিশ্বাসীদের সাক্ষাতে বলে আমরাও বিশ্বাসী । আর তারা যখন তাদের নেতাদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন তাদেরকে বলে, আমরাতো তোমাদেরই দলের। তাদের নেতাদেরকে এই আয়াতে শায়াতিন বলা হয়েছে। 'শায়াতিন' শব্দটি 'শয়তান' শব্দের বহুবচন। শাতনুন ধাতু থেকে এই শব্দটির উদ্‌গতি। এর অর্থ, দূর হয়ে যাও। ইবলিস সত্য থেকে দূর হয়ে গিয়েছিলো বলেই তার নাম শয়তান। শাতন শব্দ থেকে এই শব্দটি উদ্‌গত হয়ে থাকতে পারে। 'শাতা' অর্থ বাতিল (পরিত্যক্ত)। বাতিল শয়তানের আরেকটি নাম। এই অভিমত অনুসারে 'শাতা' এর সঙ্গে 'নুন' অক্ষরটি যুক্ত হয়ে শাতান বা শয়তান গঠিত হয়েছে। শয়তান অর্থ গণৎকারও হতে পারে। গণৎকারেরাও শয়তানের অধীন। শয়তান তাদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। মুনাফিকদের নেতা বা দলপতিরাও শয়তানের অধীন। তাই এই আয়াতে তাদেরকে শায়াতিন বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুনাফিকদের দলপতি ছিলো পাঁচজন—বনি আসলামের কা'ব বিন আশরাফ,জুহাইনা গোত্রের আবু বুরদাহ্, বনি আসাদ সম্প্রদায়ের আব্দুদ্‌দার, আউফ বিন আমের এবং শাম দেশের আবদুল্লাহ্ বিন সাওদা।

শয়তান শব্দের আভিধানিক অর্থ বিদ্রোহী বা সীমালংঘনকারী। শয়তান-জ্বিন ও মানুষ উভয় সম্প্রদায়ভূত হতে পারে। অন্যত্র আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, 'শায়াতিনাল ইনসি ওয়াল জ্বিন (এভাবেই আমি মানুষ এবং জ্বিনের মধ্য থেকে নবীগণের শত্রু হিসেবে শয়তানদেরকে সৃষ্টি করেছি)। অন্য এক স্থানে এরশাদ করেন, 'মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস' (আমি মানুষ এবং জ্বিন শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করছি)।

মুনাফিকরা তাদের শয়তান দলপতিদের কাছে বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি। তাদের (বিশ্বাসীদের) সঙ্গে আমরা কেবল ঠাট্টা-মশকরা করে থাকি। 'ইস্‌তাহ্‌জিউ' অর্থ তামাশা। আর 'মুস্‌তাহ্‌জিউ' অর্থ তামাশা বা

www.eelm.weebly.com

ঠাট্টাকারী। মুনাফিকদের নিভৃত আলাপনের অবস্থাটি আসলে এরকম– তারা তাদের দলপতিকে বলে, আমরা তো তোমাদেরই দলে। দলপতিরা বলে, তবে তোমরা দ্বীন ও ইমানের দাবী করো কেনো? তারা বলে, (ওঃ এই কথা!)। আমরা তো তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-মশকরা করে থাকি মাত্র।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৫

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

❒ আল্লাহ্ তাহাদের সহিত তামাশা করেন, আর তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইবার অবকাশ দেন।

আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে তামাশা করেন, অর্থ মুনাফিকদের তামাশা মুনাফিকদের দিকেই ফিরিয়ে দেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্ পাকের তামাশা এরকম–যখন অবিশ্বাসীরা জান্নাতের খোলা দরোজার দিকে এগিয়ে যাবে, তৎক্ষণাৎ দরোজা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তাদেরকে আগুনের দিকে হাঁকিয়ে দেয়া হবে। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, বিশ্বাসীদের জন্য একটি নূর প্রজ্বলিত করা হবে। সে নূরের আলোয় তাঁরা সহজে পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারবেন। আর মুনাফিকদের পুলসিরাত অতিক্রমকালে সেই নূরকে আড়াল করা হবে। আল্লাহ্পাক এক আয়াতে এরশাদ করেছেন, 'ফা দুরিবু বাইনাহুম বি সুয়ারিল্লাহু বাব'– অতঃপর তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর তৈরী হয়ে যাবে, যার দরোজা থাকবে কেবল একটি। হজরত হাসান বলেন, ঠাট্টা তামাশা করার আরেকটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্পাক তাদের প্রতারণা পরিকল্পনাকে মু'মিনদের নিকট প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিতাবুস্ সিহ্হত গ্রন্থে হাসান থেকে ইবনে আবিদুদ্দুনিয়া বর্ণনা করেছেন–যারা মানুষের সঙ্গে ঠাট্টা-পরিহাস করে, তাদের একজনের জন্য বেহেশতের দরোজা খোলা হবে। তাকে বলা হবে এখানে এসো। যখন সে দরোজায় পৌঁছে যাবে, তখনই দরোজা বন্ধ করে দেয়া হবে। হাদিসটি মুরসাল এবং হাসান।

'আল্লাহু ইয়াস্তাহ্জিউ বিহিম' বাক্যটি পূর্বোক্ত বাক্যের সাথে সংযোজক অব্যয় ব্যতীতই বর্ণনা করা হয়েছে। এতে করে বুঝা যায়, আল্লাহ্পাকই তাদের প্রতিফল দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এমতো ক্ষেত্রে মু'মিনদের জন্য কোনো প্রতিবাদ করার প্রয়োজন নেই।

'আল্লাহু ইয়াস্তাহজিউ বিহিম'এর স্থলে 'আল্লাহু মুসতাহ্জিউবিহিম' বলা হয়নি। রহস্য এই যে, তাদের উপহাসের প্রতিফল তাদের প্রতিই পুনঃপুনঃ প্রত্যাবর্তিত হবে। বার বার সর্বনাম (তাহারা, তাহাদের, তাহাদিগকে) ব্যবহারের দ্বারা এই ক্রিয়ার (তামাশা করা) পুনসংঘটনের প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্য এক স্থানে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আওয়ালা ইয়ারাওনা আন্নাহুম ইউফতানুনা ফি কুল্লি আ'মিন মাররতান আওমাররতাইনি'–ওরা কি দেখে না, বৎসরে একবার বা দু'বার তারা বিপদাপদে আপতিত হয়। 'ওয়া ইয়াম্দ্দুহুম' অর্থ আল্লাহ্ পাক তাদেরকে অবসর দান

www.eelm.weebly.com

করেন। ইয়ামুদ্দু শব্দটি গঠিত হয়েছে 'মাদ্দাল জাইশা' থেকে। মাদ্দাল জাইশা অর্থ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা। অথবা শক্তিশালী করা। মাদ্দা এর প্রকৃত অর্থ আধিক্য। মাদ এবং আমওয়াদ একার্থবোধক। তফাত শুধু এতোটুকুই যে, সৎকর্মের ক্ষেত্রে আমওয়াদ, অসৎ কর্মের ক্ষেত্রে মাদ ব্যবহৃত হয়। আমওয়াদ শব্দটি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হিসেবে এই আয়াতটি উল্লেখ করা যায়—'ওয়ামদাদনাকুম বি আমওয়ালিউ ওয়াবানিন'— (আর আমি সন্তান ও সম্পদ দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করেছি)।

'ফি তুগ্ইয়ানিহিম'—অর্থ পাপ ও অবিশ্বাসে সীমা অতিক্রমণ। ক্বারী কাসায়ী 'তুগ্ইয়ান' শব্দটি সবসময় ইমালা সহকারে পাঠ করেছেন।

'ইয়া'মাহুন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বোধশক্তি বিনষ্ট হওয়া। দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হওয়াকে বলে আ'মা। এ সকল অর্থকে আয়াতে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে তামাশা করেন এবং তাদেরকে তাদেরই অবাধ্যতায় বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করে কালক্ষেপণের অবকাশ দেন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৬,১৭,১৮

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ۝ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝

❐ ইহারাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ ক্রয় করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের ব্যবসা লাভজনক হয় নাই, তাহারা সৎ পথেও পরিচালিত নহে।

❐ তাহাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করিল; উহা যখন তাহার চতুর্দিক আলোকিত করিল আল্লাহ্ তখন তাহাদের জ্যোতিঃ অপসারিত করিলেন এবং তাহাদিগকে ঘোর অন্ধকারে ফেলিয়া দিলেন, তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না—

❐ তাহারা বধির, মূক, অন্ধ; সুতরাং তাহারা ফিরিবে না।

'ইশতারাউ' শব্দের অর্থ বিনিময় কামনা। 'দালালা' অর্থ কুফরী এবং 'হুদা' অর্থ ইমান। আর পুঁজি বাড়ানোর বাসনার নাম 'তিজারা'। উদ্ধৃত তিনটি আয়াতের প্রথমটিতে এই শব্দ ক'টির মাধ্যমে মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা ইমান ও সৎপথের বিনিময়ে কুফরী ও ভ্রান্তপথ ক্রয় করেছে, তাই তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি। পরিণতিতে সৎপথেও পরিচালিত হতে পারেনি। তারা মুহ্তাদিন বা হেদায়েতপ্রাপ্ত নয়।

www.eelm.weebly.com

দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের দুর্দশার বিষয়টিকে অধিকতর পরিস্ফুট করে দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তটি চমকপ্রদ। তাই বলা হয়েছে 'মাসালুহুম'। বিরল দৃষ্টান্ত উল্লেখের ক্ষেত্রে এরকম শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। কামাসালাল্লাজি এর আল্লাজি অর্থ আল্লাজিনা। অন্য আয়াতেও এমতো ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যেমন,ওয়াখুদ্ তুম কাল্লাজি খাদু– এখানেও 'আল্লাজি' 'আল্লাজিনার' অর্থবোধক। অন্যান্য ক্ষেত্রে এরকম শব্দ ব্যবহার বিধিসম্মত নয়। যেমন, আল কাইয়্যিমিন (দন্ডায়মান ব্যক্তিগণ) এর স্থলে আল কাইয়্যিম (দন্ডায়মান ব্যক্তি) বলা যায় না। এরকম পার্থক্যের কারণ হিসেবে বলা যায়, আল্লাজি বলার উদ্দেশ্য পূর্বোক্ত বাক্যের উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আল্লাজি কোনো পূর্ণ নামপদ নয় বরং এটা যেনো পূর্ণ নামপদের একটি অংশ। আর আংশিক নামপদের বহুবচন হয় না। আল্লাজিনা শব্দটি আল্লাজি এর বহুবচনও নয়। এটি একটি পৃথক নামপদ। তবে এটা কিছুটা ব্যাপক অর্থবাহী।

মুনাফিকদের দৃষ্টান্তটি এরকম—যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেলো। আল্লাহ্ তখন সে আলো নিভিয়ে দিলেন। মানুষ পথ চলে আলোতে, আগুনে নয়। তাই আলো অপসারণের কথা বলা হয়েছে। আলো হচ্ছে আগুনের ক্রিয়া। আল্লাহ্তায়ালাই সকল ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক। আলো অপসারণের বিষয়টির সঙ্গে অন্য কোনো রহস্য জড়িত থাকাও সম্ভব। অথবা আলোর অবলুপ্তির বিষয়টিকেই গুরুত্ববহ করে তোলার জন্যই এরকম বাকভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে। আর এই ক্রিয়াটি বিশেষভাবে সংযুক্ত হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে।

আল্লাহ্ আলো অপসারণ করলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন। আলো অপসারণের কথা বললেই তাদের দূরবস্থার কথা স্পষ্ট হয়ে উঠতো। কিন্তু এর পরেও অন্ধকারে ফেলে দিলেন বলা হয়েছে। তারপরে বলা হয়েছে, তারা কিছুই দেখেনা। লক্ষ্যণীয় যে, দৃষ্টান্তের শুরুতে এক ব্যক্তির অগ্নি প্রজ্বলনের কথা বলা হয়েছে। শেষে উল্লেখ করা হচ্ছে বহুবচন (তাহাদের)। জুলমত বা অন্ধকার শব্দের বিশেষণ রূপে বলা হয়েছে, 'লা-ইউবস্বিরুন' (দেখতে পায় না)। এরকম বিবরণভঙ্গির উদ্দেশ্য পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ভয়াবহতাকে প্রকাশ করা। তারাকা (ফেলে দেয়া) ক্রিয়ার কর্মপদ হচ্ছে লা-ইউবস্বিরুন (দেখতে পায় না)। এটি একটি পূর্ণ অকর্মক ক্রিয়া। এই বিবরণভঙ্গির মাধ্যমে দর্শনক্ষমতাকে অকার্যকর করে দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে এটাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক এক ধরনের হেদায়েত দান করেছিলেন কিন্তু সে তার হেদায়েতের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সে তার যোগ্যতাকে চিরস্থায়ী কল্যাণের কাজে ব্যবহার করতে পারেনি। যখন তার হেদায়েত লাভের যোগ্যতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হলো, তখন সে হয়ে গেলো দৃষ্টিহীনদের মতো আক্ষেপকারী। পূর্বে আলোচিত আয়াতের ব্যাখ্যা ও প্রমাণ হিসেবে এই আয়াতটিকে দাঁড় করানো হয়েছে। 'আমরা বিশ্বাস করেছি' এই সত্য বাক্যটি তারা মুখে উচ্চারণ করেছে। সাথে সাথে আন্তরিক অবিশ্বাসের মাধ্যমে তাকে বিনষ্টও করেছে। অথবা ব্যাপারটি এরকম– আল্লাহ্পাক মুনাফিকদের বিশ্বাসকে আগুনের সঙ্গে তুলনীয় করেছেন।

www.eelm.weebly.com

সে আগুন জ্বলেছে এবং তার মাধ্যমে তারা তাদের জীবন ও সম্পদ সংরক্ষণ করতে পেরেছে। এমনকি মুসলমানদের সঙ্গে গনিমতেরও অংশীদার হয়েছে। কিন্তু সে আগুন স্থায়ী নয়, তাই পার্থিব জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর কৃষ্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। তাদের অপবিশ্বাসের কারণেই পরকালে ধ্বংস ডেকে এনেছে তারা। আর পৃথিবীতে মুনাফিকদের আসল রূপ প্রকাশ করে দেয়াও আগুনের আলো নিভিয়ে দেয়ার মতো।

উপরোদ্ধৃত শেষ আয়াতে বলা হয়েছে—তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা আর ফিরবে না। তারা বধির একারণে যে, সত্য আহবানের প্রতি তারা কর্ণপাত করেনি। তাদের অন্তরও সত্যকে ধারণের অনুপযুক্ত। তাই তারা আন্তরিক স্বীকৃতিসহ সত্যের মৌখিক ঘোষণা দিতে পারেনি। অতএব তারা প্রকৃত অর্থেই মূক, বোবা। আর চোখ থাকলেও তারা দৃষ্টিহীন একারণে যে, তাদের দৃষ্টিতে সত্যের স্বরূপ প্রতিভাসিত হয়নি। প্রকৃত অর্থেই তারা দৃষ্টিহীন। তাই তারা অবশ্যই অন্ধ। শেষ বাক্যটি যেনো উপরোক্ত বর্ণনাবলীর উপসংহার। আপন ইচ্ছায় তারা হেদায়েতের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছে। প্রত্যাবর্তনের পথকে করেছে চিররুদ্ধ। তাই এই চূড়ান্ত ঘোষণা- তারা আর ফিরবে না।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯,২০

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَٰعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌۢ بِالْكَٰفِرِينَ ۝ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝

❒ কিংবা যেমন আকাশের মুষলধারে বৃষ্টি, যাহাতে রহিয়াছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ-চমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে তাহারা তাহাদের কর্ণে অঙ্গুলি প্রবেশ করায়। আল্লাহ্ সত্য-প্রত্যাখ্যানকারিগণকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

❒ বিদ্যুৎ-চমক তাহাদের দৃষ্টি-শক্তি প্রায় কাড়িয়া লয়। যখনই বিদ্যুতালোক তাহাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় তাহারা তখনই পথ চলিতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তাহারা থমকিয়া দাঁড়ায়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করিতেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

www.eelm.weebly.com

উদ্ধৃত আয়াত দু'টিতে মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে আরো দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। 'সাইয়্যাবুন' অর্থ অবতরণ। এখানে এর অর্থ মেঘ। আসল অর্থ বৃষ্টিপাত। মুষলধারার বর্ষণ। আয়াত শুরু হয়েছে 'আও' (কিংবা) সহযোগে। এই শব্দটির মাধ্যমে দৃষ্টান্তের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে এভাবে–পূর্ববর্তী উদাহরণ অথবা এই উদাহরণ। মর্ম হবে এরকম, হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায় তোমরা আগের এবং এখনকার যে কোনো একটি উপমার মাধ্যমে মুনাফিকদের অবস্থা বুঝে নিতে পারো। কোরআনের অন্য স্থানেও এরকম বর্ণনাভঙ্গির প্রয়োগ রয়েছে। যেমন, ওয়ালা তুতি' মিনহুম ইসমান ওয়া কুফরাহ। এর ব্যাখ্যা হতে পারে এরকম–হে মানুষ ও জ্বিন। অবিশ্বাসীদের সঙ্গে করণীয় আচরণ সম্পর্কে তোমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া গেলো। এখানে বুঝা যায়, অনুসরণের নিষিদ্ধতার ক্ষেত্রে মানুষ, জ্বিন উভয়ই সমতুল।

'সামা-আ' অর্থ আকাশ। এই আয়াতে নির্দিষ্টসূচক অব্যয় 'আল' সহযোগে হয়েছে আস্‌সামায়ি। এভাবেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে সম্পূর্ণ আকাশকে। কেউ কেউ বলেছেন, সামাআ অর্থ মেঘ। যা কিছু উচ্চ, তাকে বলে সামাআ। এর সঙ্গে 'আল' যুক্ত হয়েছে প্রকারগত অবস্থা নির্ধারণকল্পে। কিন্তু অন্যান্য আয়াতসমূহে এই শব্দটির ব্যবহার থেকে বুঝা যায়, আকাশ থেকেই বৃষ্টি বর্ষিত হয়। যেমন আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, 'ওয়া আনযালনা মিনাস্ সামায়ি মাআন তাহুরা'–আর আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করেছি। ইবনে হাব্বান বলেছেন, হজরত হাসানের নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, বৃষ্টি মেঘ থেকে বর্ষিত হয়, না আকাশ থেকে? তিনি বলেছিলেন, আকাশ থেকে। মেঘ তো অবলম্বন মাত্র। ইবনে আবী হাতেম এবং আবু শাইখ বর্ণনা করেন–খালেদ বিন মাদান বলেছেন, বৃষ্টি আরশের নিম্নদেশ থেকে নির্গত হয়ে এক আকাশ থেকে আরেক আকাশে নামতে থাকে। এভাবে নামতে নামতে পৃথিবীর আকাশে আছরাম নামক স্থানে জমায়েত হয়। সেখানে সৃষ্টি হয় কালো মেঘ। বৃষ্টি ওই কৃষ্ণ মেঘে প্রবেশ করে এবং পরে বর্ষিত হয় পৃথিবীতে। আল্লাহ্‌পাক ওই বৃষ্টিময় মেঘকে যেদিকে ইচ্ছা পরিচালিত করেন। ইবনে আবী হাতেম এবং আবু শাইখ হজরত ইকরামা থেকে আরো বর্ণনা করেন, বৃষ্টি সপ্তম আকাশ থেকে বর্ষিত হয়।

মুষলধারার বর্ষণের মধ্যে থাকে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ-চমক। 'যাহাতে' সর্বনামটি সাইয়্যাবুন অথবা সামায়ি শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সামায়ি বা আকাশ শব্দটি পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন অন্যত্র এরশাদ করা হয়েছে, 'আস্‌সামা-উ মুনফাতিরুন বিহ্।' আরেক স্থানে বলা হয়েছে 'ইনফাতারাত জুলমাত।' মর্ম হচ্ছে ঘন পুঞ্জিভূত অন্ধকার– মেঘের, বৃষ্টির, রাতের। বজ্রধ্বনি নির্গত হয় মেঘ থেকে। বিদ্যুৎও বিকিরিত হয় মেঘের মাধ্যমে। বজ্র ও বিদ্যুৎ (র'দ এবং বারক) হচ্ছে শব্দমূল। তাই এগুলোর বহুবচন হয় না। হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস এবং অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন, মেঘ

www.eelm.weebly.com

পরিচালনাকারী ফেরেশতার নাম র'দ। আর বিদ্যুৎ বা বারক হচ্ছে সেই ফেরেশতার অগ্নিযষ্টির ঝলক। ফেরেশতাগণ ওই অগ্নিযষ্টি দ্বারাই মেঘ পরিচালনা করেন। কেউ কেউ বলেছেন, মেঘ বাধাগ্রস্ত হলে বজ্রধ্বনির সৃষ্টি হয়। আবার কেউ বলেছেন, বজ্রধ্বনি হচ্ছে ফেরেশতাদের তস্‌বী পাঠের আওয়াজ। মুজাহিদ বলেছেন, র'দ এক ফেরেশতার নাম। তাঁর আওয়াজকেও র'দ বলা হয়। এখানে বলা হয়েছে, বজ্র ও বিদ্যুৎ মেঘবৃষ্টিতে থাকে। এর কারণ হচ্ছে, বৃষ্টিপাতের সঙ্গেই জড়িত রয়েছে বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎপাত। আর ব্যাকরণবিধি অনুযায়ী এখানে বজ্রের আওয়াজ ও আলোককে কর্তৃকারকরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বৃষ্টি, বজ্রনির্ঘোষ ও বিদ্যুৎ বিকিরণে আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রাণভয়ে কানে আঙ্গুল দেয়। তাদের আশংকা থাকে– এই বিকট আওয়াজ তাদের শ্রুতিকে পর্যুদস্ত করবে। ফলে তারা মৃত্যুবরণ করবে অথবা অজ্ঞান হয়ে যাবে। মৃত্যু বা অজ্ঞানাশংকা বুঝাতে এখানে 'সওয়ায়িক্ব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এরকম ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় অন্য আয়াতেও। যেমন, 'ফা সাওয়ায়িক্ব মানফিস্ সামাওয়াত'–আকাশের অধিবাসীগণ মৃত্যুবরণ করবে। প্রত্যেক বিধ্বংসী শক্তিকে সায়ীকাহ বলা হয়। উদ্ধৃত শব্দ বিশ্লেষণগুলোকে একত্র করলে মর্ম দাঁড়ায় এই– ভয়াবহ বজ্রনির্ঘোষ এবং প্রলয়ংকরী বিদ্যুতাগ্নিসহ ফেরেশতাকুল যেদিকে গমন করেন সেদিককে ধ্বংস না করে ছাড়েন না।

এরপর বলা হয়েছে, 'ওয়াল্লাহু মুহিতুম বিল কাফিরিন'–আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। এর অর্থ– অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌পাকের নিকট থেকে পরিত্রাণ পাবে না। তারা রয়েছে অপরিত্রাণের অনড় বেষ্টনীতে। বিদুৎ-চমক তাদেরকে প্রায় দৃষ্টিহীন করে ফেলে। এই আয়াতটি আগের আয়াতটির সঙ্গে সংযুক্ত নয়। এটি একটি পৃথক বাক্য। এটি একটি প্রশ্নের জবাব, যে প্রশ্নটি উহ্য রয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে, বজ্রবিদ্যুৎ যখন তাদেরকে ঘিরে রেখেছে তখন তাদের অবস্থা কী? উত্তর হচ্ছে, তাদের তখন প্রায় দৃষ্টিরহিত অবস্থা। যখন চমকে ওঠে, তখন তারা পথ চলতে উদ্যত হয়। পরক্ষণেই বিদ্যুৎ নিভে গেলে থেমে যায়। এভাবেই বারংবার তারা আশাহত হতে থাকে। আল্লাহ্‌পাক ইচ্ছা করলে তাদেরকে শ্রুতিহীন এবং দৃষ্টিহীন করে দিতে পারতেন। অর্থাৎ প্রচন্ড বজ্রনির্ঘোষের মাধ্যমে তাদেরকে সম্পূর্ণ বধির এবং সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুচ্চমকের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অন্ধ করে দিতে পারতেন। বিষয়টি সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। এতে করে বুঝা যায়, প্রতিটি মৌল ও যৌগ ক্রিয়াকলাপ এবং মানুষের যাবতীয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ্। আয়াতের শেষে বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।'

শাইয়্যুন শব্দমূল থেকে গঠিত হয়েছে শাইয়িন (সমস্ত কিছু) শব্দটি। কখনো কখনো শব্দটি ব্যবহৃত হয় কর্তৃকারক রূপে। যেমন, আল্লাহ্‌পাক এরশাদ

www.eelm.weebly.com

করেছেন, 'কুল আইয়্যু শাইয়িন আকবারু শাহাদাতান কুলিল্লাহ।' কর্মপদ রূপেও শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। এরকম ব্যবহার অনুসারে শব্দটি সম্ভাব্য জগতের (দায়রায়ে এমকানের) সকল কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহু খলিকু কুল্লি শাইয়িন'— আল্লাহ্পাক সকল সম্ভাব্য বস্তুর স্রষ্টা। আলোচ্য আয়াতে শব্দটির অর্থ নেয়া হয়েছে সাধারণ ব্যবহারবিধি অনুসারে। আল্লাহ্পাক ক্বদীর। বস্তুকে অস্তিত্বশীল করার পূর্ণ ক্ষমতা (কুদরত) তাঁর রয়েছে। কুদরত অর্থ, ইচ্ছে করলে করা,ইচ্ছে না করলে না করা। আল্লাহ্পাক ব্যতীত অন্য কারো প্রসঙ্গে এই শব্দটির ব্যবহার শোভনীয় নয় বলা যায়।

ঘনঘোর বৃষ্টিকে উপমিত করা হয়েছে ইসলাম ও কোরআনের সঙ্গে। বজ্রনিনাদ ও বিদুৎ-চমক হচ্ছে ধর্মের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার উদাহরণ। এ সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করতে গেলে প্রয়োজন সমর্পণসিদ্ধতা, নিখাদ উপাসনাপ্রবৃত্তি, রিপুরিক্ততা, সাধনা, সংযম ইত্যাদি। হজরত আনাস থেকে মুসলিম, আহমদ এবং তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, বেহেশত আকর্ষণহীন আর দোজখ আকর্ষণীয়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি, আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, বেহেশত সৃষ্টির পর আল্লাহ্পাক হজরত জিব্রাইলকে নির্দেশ দিলেন, প্রত্যক্ষ করো। হজরত জিব্রাইল বেহেশত এবং বেহেশতের সামগ্রীসমূহ দেখে বললেন, হে আমার আল্লাহ্! তোমার মর্যাদা ও মহিমার শপথ! যে ব্যক্তি বেহেশতের বৈভবের কথা শুনবে, সে বেহেশতে প্রবেশ না করে ছাড়বে না। এরপর বেহেশতকে ঢেকে দেয়া হলো সংযম এবং দুঃখময় সাধনার আবরণে। আল্লাহ্পাক বললেন, পুনঃপ্রত্যক্ষ করো। হজরত জিব্রাইল পুনঃঅবলোকন করে বললেন, তোমার সম্মান ও পরাক্রমের কসম! আমার মনে হচ্ছে কেউ আর বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। দোজখ সৃষ্টির পরও আল্লাহ্তায়ালা নির্দেশ দিলেন, হে জিব্রাইল প্রত্যক্ষ করো। হজরত জিব্রাইল দোজখ দেখে বললেন, আয় আল্লাহ্। তোমার শান শওকতের কসম! দোজখের কথা শুনলে কেউই দোজখে প্রবেশ করতে চাইবে না। আল্লাহ্ তখন দোজখকে ঢেকে দিলেন মনোমুগ্ধকর আচ্ছাদনে। তারপর বললেন, পুনঃপ্রত্যক্ষ করো। হজরত জিব্রাইল পুনরায় দেখে বললেন, তোমার মহানুভবতার শপথ! এখন সেখানে প্রবেশ না করে কেউ ছাড়বে না। বিষয়টি কোরআনুল করীমে উল্লেখিত হয়েছে এইভাবে—'ওয়া ইন্নাহা লা কাবীরাতুন ইল্লা আলাল খশিয়িন'—বিনম্রজন ব্যতীত অন্যদের নিকট নামাজ একটি বিরাট বোঝা।

বজ্রনিনাদ হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার ওই সমস্ত নিদর্শন, যা শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে। আর বিদুৎ-চমক হচ্ছে বিজয় এবং প্রচুর গনিমতের মাল। মুনাফিকেরা এ সব পেয়েছিলো। তাই তারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের অনুসরণ করে যাচ্ছিলো। এই বাহ্যিক অনুসরণের কারণেই তারা পার্থিব শাস্তি (মৃত্যুদন্ড অথবা বন্দীজীবন)

www.eelm.weebly.com

থেকে অব্যাহতি লাভ করছিলো। গনিমতের সম্পদ না পেলে ফুটে উঠতো তাদের আসল চেহারা। তখন বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শনেও তারা গড়িমসি করতো। ওই সমস্ত সুস্পষ্ট প্রমাণকেও বিদুৎ-চমক বলে ধরে নেয়া যায়, যা সরল পথপ্রদর্শনের সহায়ক। যা ইবাদতের কঠোর পরিশ্রমকে সহজতর করে দেয়। কর্ণকুহরে আঙ্গুল দেয়ার কারণ হচ্ছে এই—তারা সত্যের আহ্বান শুনতে চায় না, সত্যের নিদর্শনও দেখতে চায় না। তারা পরস্পরে বলাবলি করতো, এই কোরআন তোমরা শুনোনা। মৃত্যুর ভয়ে কানে আঙ্গুল দেয়ার অর্থ হচ্ছে এমতো আশংকা যে, আমরা যদি ইমান গ্রহণ করি তবে ইবাদতের কঠোর পরিশ্রমের বোঝা কাঁধে নিতে হবে। জেহাদের সমন এলে যুদ্ধে যেতে হবে। শ্রমসাধ্য ইবাদত ও যুদ্ধভীতি তাদের কাছে মৃত্যুতুল্য। তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'হে নবী। আপনি তো তাদের ভীতিগ্রস্ত অবস্থা দেখেছেন। তখন তারা আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এভাবে, আতংকাবস্থায় তারা যেনো মৃত্যুকে দেখছে।' কানে আঙ্গুল প্রবেশ করানোর আরেকটি উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, তারা মনে করতো—শাস্তি সম্পর্কিত আয়াতগুলো না শুনলে হয়তো তারা শাস্তিমুক্ত থাকতে পারবে। কিন্তু মূর্খেরা একথা বুঝতে পারে না যে, কান বন্ধ করে বজ্রের গর্জন থেকে মুক্তি পেতে চাইলেও তাদের শেষ রক্ষা হবে না। যেমন কোনো খরগোশ সামনে শিকারীকে দেখে আত্মগোপনের সুযোগ না পেয়ে চক্ষু বন্ধ করে রইলো—এতে করে কি তার শেষ নিষ্কৃতি হবে?

আল্লাহ্পাক কাফেরদেরকে পরিবেষ্টনকারী—একথার অর্থ পৃথিবীতে তাদের জন্য বিভিন্ন যাতনা ও লাঞ্ছনা তো রয়েছেই, তদুপরি রয়েছে আখেরাতে সুনির্ধারিত শাস্তি। আগেই বলা হয়েছে, বিদুৎ-চমক অর্থ বিজয়াভিযান, গণিমত অথবা শৌর্যবীর্য। সত্য প্রত্যাখ্যানকারিরা যেহেতু লোভী, তাই বিজয়, গনিমত ইত্যাদি তাদের দর্শনশক্তিকে অনতিবিলম্বে অকার্যকর করে দেবে। বিদ্যুচ্চমকের আরো একটি অর্থ হতে পারে সুস্পষ্ট এবং সুউজ্জ্বল প্রমাণ। এই সুস্পষ্ট এবং সুউজ্জ্বল প্রমাণাদি তাদের ক্ষয়িষ্ণু দৃষ্টি ও বিবেককে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেবে। বিদুৎ-চমক দেখলে তারা পদবিক্ষেপে আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে । আলো নিভে গেলে থেমে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা দোদুল্যমান অন্তরে আল্লাহ্র ইবাদত করে। পার্থিব লাভ দেখলে নিশ্চিন্ত হয়, আর বিপদ দেখলে পিছিয়ে যায়।'

আল্লাহ্তায়ালা ইচ্ছা করলে তাদের শ্রুতি ও দৃষ্টি অবলুপ্ত করে দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে সত্যদর্শনের দৃষ্টি এবং সত্যকথা শোনার ক্ষমতাও দিয়ে দিতে পারেন। এই অনুষঙ্গটি অন্যস্থানে ঘোষিত হয়েছে এভাবে- আমি যদি ইচ্ছা করতাম,তবে সকলকে হেদায়েত দান করতাম। কিন্তু আমার এই কথা সুনির্ধারিত যে, আমি জাহান্নাম পরিপূর্ণ করবো।

www.eelm.weebly.com

আস্ সুদ্দীর পদ্ধতিতে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের একটি উদ্ধৃতি আবু মালেকের মাধ্যমে আল্লামা ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন। তিনি আরেকটি বিবরণ দিয়েছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং অন্যান্য সাহাবাগণের মাধ্যমে মুর্‌রা থেকে। বিবরণটি এই—মদীনার দু'জন মুনাফিক মুশরিকদের দলে ভিড়বার পরিকল্পনা নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলো। পথে শুরু হলো ঘনঘোর বৃষ্টি, বজ্রধ্বনি ও বিদুৎ-চমক। যখন বিকট আওয়াজে বজ্রপাত শুরু হলো তখন তারা প্রাণভয়ে তাদের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করালো। যখন বিদ্যুৎ চমকাতো তখন তারা পথ চলতে চেষ্টা করতো। আর বিদ্যুৎ নিভে গেলেই থেমে যেতো। তারা আর গন্তব্যের দিকে যেতে সাহস করলো না। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নিজ আবাসে ফিরে এলো। তারা ঠিক করলো, আর নয়। সকাল হলেই নবীপাক স. এর দরবারে যেয়ে তওবা করতে হবে। সকাল বেলা তারা যথারীতি রসুল স. এর দরবারে যেয়ে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ইসলাম গ্রহণ করলো। এই ঘটনাটি দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হয়ে থাকবে। আর কানে আঙ্গুল দেয়া মুনাফিকদের একটি সাধারণ স্বভাব। রসুল স.এর দরবারে তারা নতুন আয়াত অবতীর্ণ হলে কানে আঙ্গুল দিয়ে বসে থাকতো। তাদের ভয় হতো, হয়তো বা এই আয়াত তাদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হচ্ছে। হয়তো তাদেরকেই হত্যা করার নির্দেশ এসেছে এই আয়াতে। তাদের এই আচরণ বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎতের সময়কার হতবিহ্বলতার মতো (কানে আঙ্গুল দেয়ার মতো)। নির্বিঘ্ন বিজয় এবং সম্পদপ্রাপ্তির সময় তারা বলতো, মোহাম্মদের আনীত ধর্মতো এখন সত্যিই মনে হচ্ছে। তাদের এই অবস্থা বিদ্যুৎ-ঝলক দেখে পথ চলতে চেষ্টা করার মতো। বিপদাপদের সময় পরিদৃষ্ট হতো তাদের আসল রূপ। তখন তারা বলতো, মোহাম্মদের ধর্মের অনুসরণ করার কারণেই এসব হচ্ছে। এভাবে তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করতো। তাদের এ অবস্থা বিদ্যুৎ নিভে যাওয়ার সময়ের থেমে পড়ার মতো। ইবনে জারীর।

আমি (গ্রন্থকার) বলি, জুলমত (অন্ধকার) শব্দের মর্ম রহস্যাচ্ছন্ন (মোতাশাবেহাত) আয়াতগুলোর মতো। এই অনুভূতিটি চিন্তা বিবেকের অতীত। আর বার্‌ক (বিদ্যুৎ) শব্দটির মর্ম সুস্পষ্ট (মোহকাম) আয়াতগুলোর মতো চিন্তা বিবেকের আওতায় ধরা যায়। তাই বিশুদ্ধ মু'মিনের দল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হচ্ছে, বোধ্য এবং অবোধ্য সকল কিছুর উপরই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। যেহেতু এসমস্ত কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে। আর যাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা ও শঠতা, তারাই ফেতনা ফাসাদের উদ্যোক্তা। তারা তাদের প্রবৃত্তিপ্রসূত দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতগুলোর ভ্রান্ত বিশ্লেষণে রত হয়। এই অপপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বলতে গেলে তারা কানে আঙ্গুল দেয় (মুনাফিকদের মতো)। তাদের অভিমত পবিত্র আয়াতগুলোর প্রকৃত মর্মের সঙ্গে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। প্রকৃত অর্থের প্রতি তাদের ভয় মৃত্যুভয়ের মতো। কোরআন মজীদকে তারা করতে চায় তাদের কল্পনার অনুকূল। অবাস্তবতার অভিযাত্রী

www.eelm.weebly.com

তারা। কোরআনের কোনো বিধানকে তারা তাদের অর্বাচীনতার অনুকূলে দেখতে পেলে তার গুণগ্রাহী হয়। ইমানের ঘোষণা দেয়। আর সামান্য প্রতিকূলতাতেই সত্য প্রত্যাখ্যান করে বসে। তখন তাদের বিকৃত বিশ্বাসই হয়ে ওঠে তাদের একমাত্র অবলম্বন। এই বিকৃত ব্যাখ্যাকারীরাই বিভিন্ন বিভ্রান্ত দল উপদলে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। তারা বলে, প্রতিটি বস্তুই আকৃতি বিশিষ্ট; আর সব কিছুরই দৃষ্টান্ত রয়েছে। নিরাবয়ব ও দৃষ্টান্তবিহীন সত্তার প্রতি তাদের কোনোই স্বীকৃতি নেই। তাই আনুরূপ্যহীন আল্লাহ্‌কে তারা স্বীকার করে না। যদি স্বীকার করে তবে তাকে দেহবিশিষ্ট বলে জানে। কেউ কেউ আবার তার দর্শনে অস্বীকৃত হয়। কেউ অস্বীকার করে কবরের শাস্তি, পাপ পুণ্যের ওজন, পুলসিরাত ইত্যাদি। কেউ বলে কোরআন সৃষ্ট (অথচ কোরআন আল্লাহপাকের বাণী) যা সৃষ্টির বৃত্তভূত নয়। এ সমস্ত অবিশ্বাসী ও বিকৃত বিশ্বাসীরা রাফেজী, খারেজী, মোতাজিলা ইত্যাদি বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। তারা যেনো বলতে চায়, আমরা কোরআনের কিছু অংশে বিশ্বাস করি এবং কিছু অংশে বিশ্বাস করি না। এ রকম মনোভাব সুস্পষ্ট অবিশ্বাসের নাম। তাদের এহেন অপবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে— আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতেন।

ওয়া মিনান্নাস (৮ নং আয়াত) থেকে এই আয়াত পর্যন্ত ধর্মের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং প্রবৃত্তিপ্রমত্ত মুনাফিকদের স্বভাববৈশিষ্ট্যের সম্যক বিবরণ দেয়া হয়েছে। একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, তারা ইমানের দাবী পেশ করলেও তাদের ইমান কস্মিনকালেও গ্রহণীয় নয়। তারা প্রতারক। কিন্তু তারা একথা জানে না যে, এই প্রতারণা তাদের প্রতিই প্রত্যাবর্তিত হয়। তারা মিথ্যাবাদী, বক্কিমবিশ্বাসী। তাদের অন্তরের কুটিলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। কঠোরতম শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে তাদের জন্য। তারা বলে, আমরা শান্তিপ্রয়াসী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারাই অশান্তির জনক। নিতান্তই অজ্ঞ তারা। তাই বুঝে না— প্রকৃত করণীয় কী। অজ্ঞতামুক্ত হওয়ার জন্যই তাদেরকে আহবান করা হয়েছে, অপরাপর লোকের (সাহাবায়ে কেরামের, আহলে বাইতের) ইমানের মতো ইমান গ্রহণ করো। এই ইমানের নিশানবাহী আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। এই জামাত বিভ্রান্ত দল উপদলগুলো অপেক্ষা সংখ্যায় এবং মর্যাদায় গরিষ্ঠ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে তিরমিজি বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, শ্রেষ্ঠ জামাতের প্রতি আল্লাহ্‌পাকের হাত (হেফাজত) রয়েছে।

আল্লাহ্‌পাকের সদয় আহবানের জবাবে তারা বলেছে, 'আমরা কি নির্বোধদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবো।' নিজেদের অপবিশ্বাসের অনুকূলে পেতো না বলেই তারা সাহাবাগণকে নির্বোধ মনে করতো। রাফেজী ও খারেজীরাও তাঁদেরকে এরকম মনে করে থাকে। সাহাবাগণের মধ্য থেকে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌তায়ালা খলিফা নির্ধারণ করেছেন। তাঁরাই আল্লাহ্'র সন্তোষভাজন। এটাই সাহাবাদের প্রতি তাদের বীতশ্রদ্ধ হওয়ার কারণ।

www.eelm.weebly.com

তাদের উপমা সেই অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী ব্যক্তির মতো, যার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সীমিত পরিসর। সুতরাং পৃথিবীর সীমিত পরিসরই তাদের উপকারে আসে। মৃত্যুর অন্ধকার ঘনায়মান হয়ে উঠলে তাদের অদৃষ্ট হয়ে ওঠে ঘন অন্ধকারাচ্ছাদিত। মৃত্যুত্তোর জীবন হচ্ছে প্রকৃত ইমানের অক্ষয় আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়, যা কেবল প্রকৃত বিশ্বাসীদেরই অধিকারভূত। মহানবী মোহাম্মদ স. এর সময়ের এবং পরবর্তীকালের সকল অপবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এই আয়াতগুলোতে। আমি বলি, রসুল স. এর জামানায় পরবর্তী বাতিল ফেরকাগুলোর অস্তিত্ব না থাকলেও উদ্ধৃত আয়াতগুলোতে বিবৃত মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যাবলী তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এর স্বপক্ষে রয়েছে অনেক হাদিস এবং পূর্বসুরী তাফসীরকারদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আল্লাহ্পাকই সর্বজ্ঞ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ○

❏ হে মানুষ, তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তোমরা আত্মরক্ষা করিতে পার,

---

'ইয়া আইয়্যুহান্নাস' অর্থ হে মানব সম্প্রদায়। যারা এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে পৃথিবীতে এসেছিলেন, যারা আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় বর্তমান ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে যারা আসবেন—সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্। সকল মানুষকেই এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে। সকলের প্রতি এরশাদ হচ্ছে, তোমরা তোমাদর স্রষ্টা ও প্রতিপালকের ইবাদত করো।

'আন্নাস' শব্দটি 'আল' এবং 'নাস' সহযোগে গঠিত। আল হচ্ছে সমষ্টিবাচক বহুবচন এবং নির্দিষ্টবাচক অব্যয়। তাই আন্নাস হচ্ছে সার্বজনীন মানবতা। সাহাবায়ে কেরাম এরকমই বুঝতেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন, কোরআনে 'ইয়া আইয়্যুহান্নাস' বলে মক্কাবাসীদেরকে এবং 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু' বলে মদীনাবাসীদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কায় অবিশ্বাসীরাই ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিশ্বাসীরা ছিলেন সংখ্যালঘু। তাই এরকম সম্বোধন করা হয়েছে যাতে করে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে এই সম্বোধনের লক্ষ্যস্থল হয়। মদীনার অবস্থা ছিলো এর বিপরীত।

www.eelm.weebly.com

সেখানে বিশ্বাসীরাই ছিলেন সংখ্যাগুরু। তাই তাঁদের মর্যাদা রক্ষার্থে মদীনার সকলকেই ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু (হে বিশ্বাসীগণ) বলে ডাকা হয়েছে।

যিনি প্রতিপালক, তিনিই উপাসনা লাভের যোগ্য। প্রতিপালনকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ওয়াজিব (অত্যাবশ্যকীয়)। যদিও আল্লাহ্তায়ালার নিছক সত্তা-ই ইবাদত লাভের উপযুক্ত, তদুপরি তিনি লালনপালনকারী। তাই কৃতজ্ঞতাবদ্ধতার কারণেও কেবল তাঁরই ইবাদত করা উচিৎ। উপাসনার এই অত্যাবশ্যকীয়তা বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলেরই দায়িত্বভূত। মু'মিনরা তো উপাসনা করবেই। কারণ, তারা বিশ্বাসী। কাফেরদেরকেও উপাসনা করতে হবে বিশ্বাস স্থাপনের পর। কারণ, উপসানাকারীকে অবশ্যই বিশ্বাসভাজন হতে হবে। বিশ্বাসবিহীনতায় উপাসনা হয় না।

'আল্লাজিনা খলাক্ব কুম' অর্থ, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এটা রব্বাকুম (প্রতিপালক) এর বিশেষণ, যার মাধ্যমে সৃষ্টির মর্যাদা ও কারণ নির্ণীত হয়েছে। অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করাই সৃষ্টি করা, যে সৃষ্টির নমুনা পূর্বে ছিলো না।

'ওয়াল্লাজিনা মিন ক্ববলিকুম' অর্থ, তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন। এই বিষয়টি সকল মানুষেরই জানা। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি সে কথাই প্রমাণ করে। অন্য আয়াতেও এ বিষয়টির প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'হে নবী। এটা নিঃসন্দেহ যে, আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। পূর্ববর্তীদের উল্লেখ এ কারণে হতে পারে যে, মানুষেরা যেনো সহজ চিন্তাভাবনার মাধ্যমেই আল্লাহপাকের সার্বজনীন সৃজনশীলতার বিষয়টিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এটি এমন একটি ইঙ্গিত যা অস্বীকার করার যো নেই।

'লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন' অর্থ–যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পারো। এ অবস্থাটি হচ্ছে উপাসনাকারীর অবস্থা। অর্থাৎ উপাসনাকারীগণ যেনো অন্তরে এমতো আশা পোষণ করে যে, আল্লাহ্পাক আমাদেরকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিবেন। এই আশার সঙ্গে থাকতে হয় ভয়। কারণ আল্লাহ্পাক সর্বশক্তিমান এবং ইচ্ছাময়। ঈমান চায়, ভয়মিশ্রিত আশা অথবা আশাশোভিত ভীতি। এরকম অর্থও হতে পারে যে, উপাসনা লগ্নে এ রকম আশা পোষণ করা–আমরা ধর্মভীরুগণের পবিত্র দলের অন্তর্ভূত হবো। যারা ধর্মভীরু তারা শরিয়তবিরোধী কর্মকান্ড থেকে বিমুখ। এই বিমুখতার নামই তাকওয়া (আত্মরক্ষা, সাবধানতা)। যথাকর্তব্য সম্পাদনের ভিত্তি এই তাকওয়ার উপরেই। বরং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই প্রকৃত তাকওয়া। 'লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন' বাক্যটি 'খলাক্বকুম' (সৃষ্টি করেছেন) ক্রিয়ার কর্মপদের অবস্থাব্যঞ্জকও হতে পারে। এই ধারণাসূত্রে অর্থ দাঁড়াবে এরকম–আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে এমন অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের নিকট থেকে তাকওয়ার আশা করা যায়। কারণ, তোমাদের সত্তা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাকওয়া সৃষ্টির কারণ ও উপকরণ রয়েছে। তাই স্বভাবতঃই তোমাদের

www.eelm.weebly.com

নিকট থেকে তাকওয়ার আশা করা যেতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, বাক্যটি পূর্বোক্ত উক্তির কারণ। তাই অর্থ হবে এরকম—এ জন্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তোমরা যেনো আত্মরক্ষা করতে পারো। কাযী বায়যাবী বলেছেন, ব্যাখ্যাটি দুর্বল। ভাষাবিদগণের নিকট থেকে এ ধরনের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ দেখা যায় না। ব্যাকরণবিদ সিবওয়াইহ্ বলেছেন, লায়াল্লা এবং আসা শব্দ দু'টি আশাব্যঞ্জক অব্যয়। কোরআন মজীদের যে সকল স্থানে এই অব্যয় দু'টি বিদ্যমান, সে সকল স্থানে বিষয়বস্তুর বাস্তবায়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

আমি বলি, সিবওয়াইহ্ এর অভিমতটি শুদ্ধ নয়। তার কথা মেনে নিলে সকল সৃষ্টিরই মুত্তাকী (তাকওয়া অবলম্বনকারী) হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এরকম হওয়া অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, সিবওয়াইহ্ এর মতবাদের অনুকূলে অন্য একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। যেমন—তোমাদের সৃষ্টিরহস্য এরকম যে, তোমাদের আত্মরক্ষা করার অনুষঙ্গটি ছিলো অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সকলে নয় বরং কিছু সংখ্যক লোক একে বাস্তবায়ন করতে ব্রতী হয়েছে। সৃষ্টি ও প্রতিপালন এই অনুগ্রহ দু'টি ইবাদতকে অপরিহার্য করেছে। একথাও স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, পুণ্যদানও আল্লাহ্পাকের একটি অনুদান। নতুবা উপাসনাই যদি কেবল পুণ্য লাভের কারণ হয়, তবে মানুষকে মনে করতে হবে এমন এক শ্রমিক, যে শ্রমের পূর্বেই তার পারিশ্রমিক নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ইবাদতের প্রকৃত অর্থ হবে আল্লাহ্পকের পরিচয় লাভ। এই পরিচয় লাভের পন্থা হচ্ছে, আল্লাহ্র সৃষ্টিবৈচিত্র সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা। এই পরিচিতি বা মারেফতের মূল মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ্পাকের সিফাতের (গুণাবলীর) পরিচয় লাভ। তাঁর জাতের (সত্তার) পরিচিতি অর্জনায়ত্ব নয়। অর্জিত জ্ঞানে তাঁর সংকুলান হয় না। এই সর্বোচ্চ পরিচিতি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্তায়ালার করুণানির্ভর।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২২

الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○

❒ যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল

www.eelm.weebly.com

উৎপাদন করেন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহের সমকক্ষ দাঁড় করাইও না।

আল্লাহ্‌তায়ালা পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন শয্যারূপে। শয্যা অর্থ এমন বিছানা যা বাসোপযোগী। অতি শক্ত নয়। অতি কোমলও নয়।

'ওয়াস্ সামাআ' অর্থ এক বা একাধিক আকাশ। 'বিনাআ' অর্থ আচ্ছাদন বা ছাদ। এই শব্দটি শব্দমূল এবং অর্থের দিক থেকে কর্মবাচক বিশেষ্য। আল্লাহ্‌পাক আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আকাশ থেকে সৃষ্টি হয় বাষ্প। এ বাষ্পই মেঘের মাধ্যমে বৃষ্টিরূপে আপতিত হয়। এই আপতন বা বর্ষণকে 'আনযালা' শব্দটির মাধ্যমে বিবৃত করা হয়েছে। বৃষ্টিপাতের ফলে অংকুরোদগম ঘটে উদ্ভিদের। সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ফলমূল। সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার কুদরত। বৃষ্টি মিশ্রিত মাটির মাধ্যমে তিনি পৃথিবীতে ফলমূল উৎপাদন নিশ্চিত করেন। মাটি ও পানি বাহ্যিক কারণ। প্রকৃত স্রষ্টা আল্লাহ্‌তায়ালাই। 'মিনাস্ সামারাত' এর 'মিন' অব্যয়টির অর্থ কিয়দংশ অথবা সম্পূর্ণ। 'আররিয্‌ক্ব' (জীবিকা) শব্দটি আখরজা (উৎপাদন) ক্রিয়ার কর্মপদ। 'লাকুম' শব্দটি 'রিয্‌ক্ব' শব্দের বিশেষণ অথবা কর্মপদ। 'রিয্‌ক্ব' হচ্ছে শব্দমূল। 'আখরজা' শব্দটিও নিজস্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বাক্যটির অর্থ হবে—ফলমূল উৎপন্ন করা হয়েছে তোমাদের জীবিকার জন্য।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, ফালা তাজআলু লিল্লাহি আনদাদাঁও ওয়া আংতুম তা'লামুন—সুতরাং জেনে শুনে কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির কোরো না। অর্থাৎ এমন যেনো না হয় যে, আল্লাহ্‌পাকের মতো করে তোমরা অন্য কারো উপাসনায় লিপ্ত হও অথবা অন্য কাউকে আল্লাহ্‌পাকের প্রতিদ্বন্দ্বী সাব্যস্ত করো। আল্লাহ্‌পাক প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন এবং প্রতিপক্ষহীন। 'সমকক্ষ স্থির কোরো না' এই নিষেধাজ্ঞাটি পূর্বের আয়াতের 'ইবাদত করো' আদেশটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একটি আদেশ। অপরটি নিষেধ। অথবা সমকক্ষ দাঁড় করানোর ব্যাপারটা পূর্বের আয়াতের আত্মরক্ষা করার বিষয়টির সাথে জড়িত। যেনো সমকক্ষতার আশংকা থেকেও আত্মরক্ষা করতে বলা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা হবে- যদি তোমরা শংকাগ্রস্ত হও, তবুও কাউকে আল্লাহ্‌পাকের সমতুল কোরো না। অথবা এই আয়াতের প্রারম্ভিকা (আল্লাজি জায়ালালাকুম) এর সঙ্গেও সমকক্ষ না করার আজ্ঞাটি সম্পর্কযুক্ত বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। এরকম অবস্থায় অর্থ হবে- সেই পবিত্র সত্তা, যিনি ভূপৃষ্ঠকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ করেছেন। বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জীবিকাস্বরূপ মাটিতে উৎপন্ন করেছেন ফলমূলের সমাহার। সমকক্ষহীনতাই তাঁর জন্য শোভনীয়। সুতরাং তাঁর সমকক্ষ স্থির করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো।

'ওয়া আংতুম তা'লামুন' অর্থ জেনে শুনে। বলা হচ্ছে, তোমরা জ্ঞানসম্পন্ন। তোমরা তো বিষয়টি জানো এবং বুঝ। একটু চিন্তা করলেই আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির না করার বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারবে। হুঁশিয়ার করার জন্যই এখানে 'ওয়া

www.eelm.weebly.com

আংতুম তা'লামুন' বলা হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য এরকম নয় যে, যাদের বুদ্ধিজ্ঞান কম তারা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করাতে পারবে। প্রকৃত অর্থ হবে এরকম, তোমরা তো জানোই গোটা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌তায়ালা। বিষয়টি তোমরা স্বীকৃতিও দিয়ে থাকো (যেমন অন্য আয়াতে এসেছে- হে নবী। আপনি যদি প্রশ্ন করেন, তাদের সৃষ্টিকর্তা কে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্)।

এই আয়াত এবং পূর্ববর্তী আয়াত আল্লাহ্‌পাকের তাওহীদ (এককত্ব) বিষয়ক। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিনৈপুণ্যের প্রতি চিন্তা নিক্ষেপ করার কথাও আয়াত দু'টোতে বিবৃত হয়েছে। এবার শুরু হবে কোরআন এবং যাঁর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে- সেই মহান রসুলের সত্যতা বিষয়ক আলোচনা, যা ইমান বা বিশ্বাসেরই বলয়ভূত।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৩, ২৪

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ○

❑ আমি আমার দাসের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিলে তোমরা তাহার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর, এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাক্ষীকে আহবান কর।

❑ যদি তোমরা আনয়ন না কর, এবং কখনই করিতে পারিবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর মানুষ এবং পাথর হইবে যাহার ইন্ধন, সত্য প্রত্যাখ্যানকারিগণের জন্য যাহা প্রস্তুত রহিয়াছে।

অবিশ্বাসীরা সন্দেহ করতো, ঘটনাপরম্পরায় যে সমস্ত আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছে তা আল্লাহ্‌র বাণী নয়। কবিরা যেমন একের পর এক পংক্তি রচনা করে যায়—এ অনেকটা সে রকমই। কবিতা আবৃত্তির মতোই এগুলোকে আল্লাহ্‌র বাণী বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদের ধারণা হতো, আল্লাহ্‌র বাণী হলে সম্পূর্ণ কোরআনই অবতীর্ণ হতো এক সঙ্গে। ঘটনা ও পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপারটা এর সঙ্গে জড়িত থাকতো না। তাদের এই সন্দেহের প্রতিবাদে আল্লাহ্‌তায়ালা এখানে এমন এক চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেছেন যা মোকাবেলা করা তাদের সামর্থ্যের বাইরে। ভবিষ্যতেও কেউ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে পারবে না।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্পাক এরশাদ করছেন, আমি আমার দাসের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি— এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, দাস বা বান্দাই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ পদবী। আল্লাহ্তায়ালার আনুগত্যই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। তাই পূর্ণ অনুগত বান্দাই দাস নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। রসুল মোহাম্মদ স.কে এখানে দাস সম্বোধনের মাধ্যমে চরমতম মর্যাদা দেয়া হয়েছে। প্রকৃত দাস বা বান্দা তিনিই। অন্য সকল বিশ্বাসী বান্দারা তাঁরই অনুসরণের সৌভাগ্য লাভের কারণে বান্দা নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য হয়েছেন।

আল্লাহ্পাক জানাচ্ছেন, অবতীর্ণ সুরা সম্পর্কে সন্দিহান হলে তোমরা এর অনুরূপ সুরা পেশ করো। সুরা অর্থ কোরআন পাকের একটি নির্দিষ্ট অংশ। শব্দটির ব্যুৎপত্তি ঘটেছে সুরাতুল মদীনা শব্দ থেকে। যার অর্থ শহরের প্রাচীর। প্রাচীর যেমন শহরকে সীমাবদ্ধ করে—এখানে সুরা বলতে তেমনি কোরআনপাকের কোনো নির্দিষ্ট অংশকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। সুরা শব্দের আরেকটি অর্থ মর্যাদা। কোরআন পাঠকারী এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। সুরা এই মর্যাদার প্রকাশক বলেও ধরে নেয়া যায়। কিন্তু এই আয়াতের সুরা প্রথমোক্ত অর্থেই গৃহীতব্য। এখানে সুরা অর্থ সুরার অংশবিশেষ। সুরার আয়াত সংখ্যা হবে কমপক্ষে তিন।

'মিম্ মিস্লিহি' অর্থ অনুরূপ। শব্দটি সুরা শব্দের বিশেষণ। মিস্লিহি এর 'হি' সর্বনাম। মিস্লিহি এর প্রকৃত অর্থ এর (তাহার) অনুরূপ। এই সর্বনামটি সম্ভবত মা আনযালনা (যা অবতীর্ণ করেছি) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এমতাবস্থায় মিন অব্যয়টি তাবয়ীজিয়া অথবা বয়ানিয়া কিংবা জায়েদা হবে। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এরকম—অলংকরণশোভিত অনুপম ছন্দবিশিষ্ট এই কোরআনের মতো একটি সুরা পেশ করো। উল্লেখিত সর্বনামটি 'আলা আবদিনা' (আমার দাসের প্রতি) এর সঙ্গেও সম্বন্ধিত হওয়া সম্ভব। এ নিয়মে মিন অব্যয়টি সূচনাসূচক বলে গণ্য হবে। এমতো বিশ্লেষণে আয়াতের অর্থ নির্ধারিত হবে এরকম—রসুল মোস্তফা স. এর মতো উম্মী (অক্ষরের অমুখাপেক্ষী) নবী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সুরা নিয়ে এসো। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই উত্তম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, এতে করে কোরআন যে সর্বাংশে আল্লাহ্র রচিত বাণী সে কথা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আর এবাণীর অনুরূপ কোনো বাণী নির্মাণের সাধ্য কারো নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বতঃসিদ্ধ। অন্য আয়াতে একথা বলে দেয়া হয়েছে। যেমন—'হে নবী আপনি সকলকে বলে দিন, মানুষ ও জ্বিন সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালিয়ে কোরআনের অনুরূপ একটি বাক্য প্রস্তুত করুক। (কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, তারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী হলেও এরকম কোনো বাক্য প্রস্তুত করতে পারবে না)।

আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে আরো বলা হয়েছে, তোমরা যদি সত্যবাদি হও তবে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সকল সাক্ষীকে (বাতিল মাবুদদেরকে) এগিয়ে আসতে বলো। সকল সাক্ষী অর্থ অবিশ্বাসীদের মিথ্যা

www.eelm.weebly.com

উপাস্যসমূহ। অথবা অবিশ্বাসীরা যাদের সাহায্য পাবে বলে মনে করে তারা। এর অর্থ আরবী ভাষার কবি এবং সাহিত্যবিশারদকুল। তারাই সুন্দর সুললিত বাণী চয়নে সমর্থ। আল্লাহ্পাক এখানে তাদের প্রতিও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন, তারাও ছিলো অবিশ্বাসী। তারা চেষ্টা করতে পারতো। মিথ্যা সাক্ষীও পেশ করতে পারতো। কিন্তু পারেনি। কারণ বিষয়টি কেবল বাণী নির্মাণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়। এতে রয়েছে সত্য কিংবা মিথ্যার সুস্পষ্ট ঘোষণার ব্যাপার। স্রষ্টার মোকাবেলা কি সৃষ্টি কখনো করতে পারে– না করা সম্ভব? পরের আয়াতে বলা হচ্ছে, 'যদি তোমরা অসমর্থ হও'। আর অসমর্থ তো হবেই। শুধু তোমরা নও তোমাদের পরবর্তীদের জন্যও অসমর্থতা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। তবে এবার মেনে নাও যে, কোরআন হচ্ছে মোজেজা– অক্ষমকারী। এখন একটি পথ খোলা রইলো–বিশ্বাস করা। সুতরাং বিশ্বাস করো। ওই আগুন থেকে আত্মরক্ষা করো যে আগুনের ইন্ধন মানুষ এবং পাথর। 'ওয়াকুদু' অর্থ দাহ্য বস্তু, যদ্দারা আগুন প্রজ্বলিত করা হয়। দোজখের দাহ্য বস্তু বা ইন্ধন মানুষ এবং পাথর। 'ওয়াকুদু' শব্দটি শব্দমূল হওয়াও সম্ভব। আর এটিকে শব্দমূল ধরে নিলে মানুষ এবং পাথর এর পূর্বে একটি সম্পূর্ণ পদ উহ্য আছে মনে করতে হবে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে– দোজখের দহনপ্রখরতা মানুষ এবং পাথরের প্রজ্বলনের কারণে হবে। এ ব্যাপারে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের বক্তব্য উদ্বৃত করেছেন আবদুর রাজ্জাক, সাঈদ ইবনে মানসুর, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, হাকেম, বায়হাকী ও অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ। মুজাহিদ এবং আবু জাফরের এসম্পর্কিত বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে ইবনে আবী হাতেমের মাধ্যমে। প্রথম শ্রেণীর মুফাস্সিরগণও এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ উচ্চারণ করেননি। বক্তব্যটি এই- জাহান্নামে ইন্ধন হবে কৃষ্ণকায় গন্ধক পাথর। কেউ কেউ বলেছেন, সকল প্রকার পাথরই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। এরকমও বলা হয়েছে যে, এই সংবাদটির মাধ্যমে দোজখাগ্নির প্রলয়ংকরী দহন ক্ষমতা এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'ফাইল্লাম তাফ্য়ালু (যদি তোমরা আনয়ন না কর)। এখানে 'ইন' অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। 'ইন' অর্থ যদি। 'যদি' কখনো সুনিশ্চিত নয়। কোরআনের অনুরূপ সুরা প্রস্তুত করতে না পারার বিষয়টি সুনিশ্চিত। তাই এখানে 'ইন' এর পরিবর্তে 'ইজা' অব্যয়টি ব্যবহার করা যেতো। কারণ, ইজা একটি সুনিশ্চিন্ততা সূচক অব্যয়। 'যদি জায়েদ আসে তবে আমিও আসবো'-এরকম বাক্যের মধ্যে আমার আসার ব্যাপারটি নিশ্চয়তাহীন। 'যদি সূর্য উদিত হয় তবে আমি আসবো'-এখানেও যদি ব্যবহারের কারণে আমার আসার নিশ্চয়তা সন্দেহজনকতায় পর্যবসিত হয়েছে। আল্লাহ্পাকের জ্ঞান সন্দেহের অতীত। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সকল কালের সংবাদই তিনি সন্দেহাতীত রূপে জানেন। তবুও এখানে যদি উল্লেখ করার কারণ এই যে, ১. তাদের উপহাস প্রবণতার প্রতিকূলে তাদেরকে উপহাসের সম্মুখীন করাই আল্লাহ্র ইচ্ছা। যেমন, কেউ বললো, আমি শুক্রবারে তোমাদের কাছে আসবো। একথা শুনে কেউ বললো, শুক্রবার যদি না আসে। এরকম উক্তিকে উপহাস ছাড়া আর কী মনে করা যেতে পারে। আল্লাহ্পাক সুনিশ্চিত যে, তাঁর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সাধ্য কাফেরদের নেই। তবুও তিনি 'যদি' ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে

www.eelm.weebly.com

উপহাসের সম্মুখীন করে দিয়েছেন। ২. আল্লাহ্‌পাক কথা বলেছেন তাদের ধারণার সাযুজ্য বজায় রেখে। তাদেরকে ক্ষণিক চিন্তাভাবনার সুযোগ দিয়েছেন যাতে তারা তাদের চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অক্ষমতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে — এই দোজখ প্রস্তুত রাখা হয়েছে সত্য প্রত্যাখ্যানকারিদের (কাফেরদের) জন্য। এই বাক্যটির পশ্চাতে রয়েছে একটি উহ্য প্রশ্ন। সেটি হচ্ছে, দোজখ কার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে? উত্তর-কাফেরদের জন্য।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. এরশাদ করেছেন, পৃথিবীর আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ। বোখারী, মুসলিম। হজরত নোমান বিন বশীর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—হজরত রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, দোজখের সবচেয়ে নিম্নতম শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে একজোড়া আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। এর প্রভাবে আগুনে ফুটন্ত ডেকচির মতো তার মগজ টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকবে। সে মনে করবে, তার চেয়ে অধিক শাস্তিভোগকারী আর কেউ নেই। বোখারী; মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন—রসুল স. এরশাদ করেছেন, জাহান্নামের আগুন এক হাজার বছর জ্বলে জ্বলে লাল রঙ ধারণ করেছে। আরো এক হাজার বছর জ্বলতে জ্বলতে হয়েছে শাদা। এরপর আরো এক হাজার বছর প্রজ্বলিত হতে হতে হয়েছে ঘনকৃষ্ণ আঁধারের মতো।

হজরত নোমান বিন বশীর বর্ণনা করেন—রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আমি তোমাদেরকে দোজখানল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করছি। আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক হতে বলছি। হজরত নোমান বিন বশীর বলেন, রসুল স. কথাগুলো বলছিলেন অতি উচ্চস্বরে। যদি তিনি স. এখন এস্থানে উপস্থিত থাকতেন তবে তাঁর পবিত্র কণ্ঠস্বর বাজারের অধিবাসীরাও শুনতে পেতো। তিনি তখন এমনই উদ্দীপিত ছিলেন যে, তাঁর স. কম্বল লুটিয়ে পড়েছিলো তাঁর পদতলে। দারেমী। হাদিসের বর্ণনা দৃষ্টে বুঝা যায় জাহান্নাম বর্তমান।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

❑ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগকে শুভ সংবাদ দাও যে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাহাদিগকে ফল-

www.eelm.weebly.com

মূল খাইতে দেওয়া হইবে তখনই তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে পূর্বে জীবিকারূপে যাহা দেওয়া হইত ইহা তো তাহাই; 'তাহাদিগকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হইবে এবং সেখানে তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রহিয়াছে, তাহারা স্থায়ী হইবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে দোজখের ভয় দেখানো হয়েছে। আর এখানে দেয়া হচ্ছে বেহেশতের শুভ সংবাদ। ভয় ও আশা পরস্পরবিজড়িত (একই টাকার এপিঠ-ওপিঠের মতো)। এদিক থেকে এই আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা সংযোজিত। আর আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র বর্ণনারীতি এই যে, ভয়ের পরে আশার সঞ্চার, আবার আশার পরে ভীতি প্রদর্শন (যাতে নৈরাশ্য কিংবা উদাসীনতা কোনোটিই অতি প্রশ্রয় না পায়)।

আগের আয়াতের ক্রিয়াকর্মের সাথে এই আয়াতের ক্রিয়াকর্মের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। সেই আগুনকে ভয় করো (ফাত্তাকুন্নারল্লাতি)-পূর্বের আয়াতের এই বাক্যাংশটির সঙ্গে এই আয়াতের শুভসংবাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে–ঈমান আনো, অগ্নি থেকে রক্ষা পাও এবং জান্নাতের শুভসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ্পাক অবশ্য এভাবে সোজাসুজি সুসংবাদ দান করেননি। তাঁর রসুলকে এ সুসংবাদ জানাতে বলেছেন। এরূপ বলার উদ্দেশ্য ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বনকারীদের উন্নত মর্যাদা যে সুস্বীকৃত এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলা। আল্লাহ্পাক সরাসরি সুসংবাদ দিলে বিশ্বাসী ও সৎ কর্মশীলদের সুউন্নত যোগ্যতা স্পষ্টতর হোতো না। তাই বলা হয়েছে, (হে রসুল) তাদেরকে শুভসংবাদ দিন (কারণ তারা শুভসংবাদ লাভের অধিকার অর্জন করেছে)।

'বাশারাত' অর্থ শুভসংবাদ। অন্য আয়াতে যেখানে শাস্তির সুসংবাদ দাও, এ কথা বলা হয়েছে সেখানে শব্দটি এসেছে পরিহাসরূপে। শুভসংবাদ অথবা শাস্তি উভয় ক্ষেত্রেই এই শব্দটি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রেই এই শব্দটির ব্যবহার অধিক।

'ওয়া আমিলুস্ সলিহাত' অর্থ– এবং যারা সৎকর্ম করেছে। সৎকর্ম গুণটি মানুষের নামের মতোই তার গুণবত্তাকে প্রকাশ করে। স্মরণ রাখতে হবে, সৎকর্ম ওগুলোই যেগুলোকে শরিয়ত সৎকর্ম বলে নির্দেশ করেছে। আল্লামা বাগবী বলেন, হজরত মু'আজ রা. বলেছেন, ওই কর্মকে সৎকর্ম বলে যার মধ্যে রয়েছে প্রজ্ঞা (এলেম), নিয়ত (সংকল্প), ধৈর্য (সবর) এবং নিষ্ঠা (এখলাস)। হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রা. ওয়াআমিলুস্ সলিহাত পাঠ করে বলেছেন,দম্ভরহিতাবস্থায় কেবল আল্লাহ্র জন্য অন্তরকে শুদ্ধ রাখার নাম সৎকর্ম। এই আয়াতে বিশ্বাস এবং সৎকর্মকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে করে বুঝা যায়, বিশ্বাস এবং সৎকর্ম দু'টি পৃথক বিষয়। এ কথাও স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, জান্নাতের সুসংবাদ লাভের পূর্ণ অধিকার পেতে হলে বিশ্বাস ও সৎকর্মের (ঈমান ও আমলের) সমন্বয় সাধন করতে হবে।

www.eelm.weebly.com

'জান্নাত' শব্দটি 'জানাহ্' শব্দটির বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ বাগান, যে বাগান বৃক্ষলতা দ্বারা আচ্ছাদিত। 'জান্নাতসমূহের নিম্নদেশে রয়েছে প্রবহমান নদী'– এর অর্থ জান্নাতের অট্টালিকা ও বৃক্ষরাজির পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদী। নদী নয়- নদীর পানি প্রবাহিত হয়। কিন্তু পানি শব্দটি এখানে উহ্য রয়েছে। হাদিস শরিফে এসেছে– পৃথিবীর নদ নদী যে রকম নির্দিষ্ট খাল দিয়ে প্রবাহিত হয়, জান্নাতের নদীর সে রকম নির্দিষ্ট প্রবাহপথ নেই। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ইবনে মোবারক, ইবনে জারীর এবং বায়হাকী।

জান্নাতবাসীদেরকে যখন বেহেশতের ফলমূল খেতে দেয়া হবে, তখন তারা বলবে, এগুলো তো সে রকমই যে রকম আমরা পৃথিবীতে পেতাম। বলা হয়েছে, 'হাজাল্লাজি রুজিক্বনা'-এর অর্থ হচ্ছে জীবিকারূপে, অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রাপ্ত জীবিকার মতো। এখানে মতো (মাসাল) শব্দটি উহ্য রয়েছে। উপমার স্থলে এসেছে উৎপ্রেক্ষা। উপমাকে নেপথ্যে রেখে সরাসরি উপমিতকে প্রকাশ করার নামই উৎপ্রেক্ষা।

বাহ্যিক আকার ও আকৃতির দিক থেকে জান্নাতের নেয়ামত ও ফলমূল দুনিয়ার ফলমূলের মতো। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতবাসীগণ যেনো সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো আকার আকৃতির সম্মুখীন হয়ে বিব্রত বোধ না করেন। জান্নাতের উপকরণসমূহ সম্পূর্ণতই ভিন্ন প্রকৃতির হলে তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা দুরূহ হতো। তুলনা করতে গেলে কোনো না কোনো ধরনের সাযুজ্য অবশ্যই প্রয়োজন। তাই কেউ কেউ বলেছেন, জান্নাতের ফল রঙ ও আকৃতির দিক থেকে পৃথিবীর ফলের মতো। কিন্তু আস্বাদের দিক থেকে পৃথক। অবশ্যই পৃথক। রঙ ও আকৃতিগত আনুরূপ্যের কারণেই জান্নাতিরা এরকম বলবে যে, এরকম জীবিকা আমাদেরকে আগেও দেয়া হতো। কিন্তু স্বাদ গ্রহণের পর তারা বেহেশতি আস্বাদে আপ্লুত হবে।

এরপর আল্লাহ্তায়ালা জানাচ্ছেন, তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেয়া হবে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে মুতাশাবিহা (অনুরূপ) শব্দের মর্ম হচ্ছে, ফলগুলো রঙের দিক থেকে এক রকম- কিন্তু স্বাদের দিক থেকে ভিন্নতর। হজরত হাসান এবং কাতাদা বলেছেন, চিত্তাকর্ষন যোগ্যতা ও পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে ফলগুলো একটি অপরটির অনুরূপ। একটি অপেক্ষা অপরটি নিম্নমানের নয়। (পৃথিবীর ফলে এরকম তারতম্যহীনতা পরিদৃষ্ট হয় না। পৃথিবীর ফল পাকা, কাঁচা, ছোট, বড়, ভালো, মন্দ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। জান্নাতের ফল এরকম বৈসাদৃশ্যপূর্ণ নয়)।

ইমাম বাগবী স্ব-সনদে হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন- রসুল স. এরশাদ করেন, জান্নাতবাসীগণ সেখানে পানাহার করবেন। কিন্তু তাঁরা মল-মূত্র, নাকের শ্লেস্মা, মুখের লালা– এসব থেকে মুক্ত থাকবেন। তাঁদের শ্বাসপ্রশ্বাস হবে তাসবীহ্ (সুবহানাল্লাহ্) এবং তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ্)। তাঁদের হজম ক্রিয়া

www.eelm.weebly.com

সম্পন্ন হবে ঢেকুরের মাধ্যমে। শরীরের ঘামে থাকবে মেশ্‌ক আম্বরের সুবাস। মুসলিম।

এই আয়াতের আরেকটি অর্থ এরকমও হতে পারে যে, (জান্নাতের এই প্রাপ্তি) পৃথিবীর ওই সমস্ত আমল ও ইরফানের ফল। অন্য আয়াতেও এই ধারণার পরিপোষকতা রয়েছে। যেমন, 'স্বাদ গ্রহণ করো যে আমল তোমরা (পৃথিবীতে) করেছিলে।' হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ থেকে তিরমিজি বলেছেন, মহানবী স. এরশাদ করছেন, জান্নাতের মাটি অতীব পবিত্র এবং পানি অতীব মিষ্ট। আর মনে রেখো জান্নাত একটি খোলা প্রান্তর। তার বৃক্ষরাজি হলো তাসবীহ্‌, তাহমীদ এবং তকবীর (আল্লাহু আকবর)। উতুবিহি মুতাশাবিহা (তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেয়া হবে।) —একথার অর্থ শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াচ্ছে যে, সেখানকার কৃতিত্ব, মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের মাপকাঠি হবে আল্লাহ্‌ পরিচিতি এবং সৎকর্ম। মানুষের আমলে যেমন তারতম্য পরিলক্ষিত হয়, তেমনি তাদের বিনিময় প্রাপ্তিও হবে তারতম্য সম্ভূত। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি বলেছেন, জান্নাতের থাকবে একশ'টি তোরণ। এক তোরণ থেকে অন্যটির দূরত্ব হবে একশ' বছরের দূরত্বের সমতুল্য। হজরত উবাদা বিন সামেত থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। তবে সেখানে বলা হয়েছে, এক দরোজা থেকে অন্য দরোজার দূরত্ব হবে আকাশ ও পৃথিবীর দূরত্বের সমান। মাসাবিহ্‌ রচয়িতা মেশ্‌কাত এবং ইমাম তিরমিজি তাঁর সুনান গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। জান্নাতিদের জন্য জান্নাতে রয়েছে তাঁদের পবিত্র সঙ্গীনিরা। হজরত হাসান বলেছেন, 'আয্‌ওয়াজুন' অর্থ জান্নাতিদের ওই সকল বিগত যৌবনা সহধর্মিনীগণ। তাঁদেরকেই যৌবনহীনতা ও পার্থিব অপরিচ্ছন্নতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে জান্নাতে তাঁদের সঙ্গিনী করে দেয়া হবে। সঙ্গিনীগণ হবেন পূতঃপবিত্রা। এর অর্থ মল-মূত্র, ঋতুস্রাব, নাসিক্য শ্লেস্মা এবংবিধ সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। চারিত্রিক কলুষতা থেকেও তাঁরা পবিত্র থাকবেন। শারীরিক পবিত্রতা অর্জনকে তাহারাত বলে। চারিত্রিক পবিত্রতাকেও তাহারাত শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। আর 'মুতাহ্‌হারা অর্থ অতিপবিত্র। আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং তাঁদেরকে পবিত্র করেছেন বলে মুতাহ্‌হারা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আযওয়াজুন বা যাওজ শব্দটির অর্থ জোড়া। যেমন, দু'টি জুতাকে একত্রে জুতা, জুতাজোড়া এবং দু'টি মোজাকে একত্রে মোজা বা মোজাজোড়া বলা হয়। তেমনি পুরুষ ও স্ত্রীকে একত্রে জওজী শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

শেষে বলা হয়েছে, 'তারা সেখানে স্থায়ী হবে'— এর অর্থ সেখানে তাদের মৃত্যু হবে না। সেখান থেকে তারা আর কোনোদিনও বহিষ্কৃত হবে না। স্থায়ীত্বের কথা বলে এই নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, বেহেশতের অনুগ্রহরাশি পৃথিবীর অনুগ্রহরাশির মতো নিঃশেষপ্রবণ ও অস্থায়ী নয়। যেনো এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হচ্ছে—ওই নেয়ামতসমূহ কি চিরকালীন ও অনিঃশেষ? উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

www.eelm.weebly.com

ইমাম বাগবী ইমাম বোখারীর পদ্ধতিতে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন—নবীপাক স. এরশাদ করেছেন, যে দলটি প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাঁরা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুউজ্জ্বল। এর পরে প্রবেশকারী দলটি হবে আকাশের উজ্জ্বলতর নক্ষত্র সদৃশ। জান্নাতিরা মলমূত্র, থুথু, শ্লেস্মা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকবে। তাঁদের চিরুনী হবে স্বর্নের। স্বেদ হবে মেশ্‌ক আম্বরের মতো সৌরভমন্ডিত। আঙটিগুলো হবে সুরভিতে ভরপুর। তাঁদের স্ত্রীগণ হবেন পরমাসুন্দরী (হুরে আইন), আয়তআঁখিনী। প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী হবেন তাঁরা (সেখানে থাকবে শুধু প্রেম ভালোবাসা! মানুষ যেমন আপন সত্তাকে ভালোবাসে, জান্নাতবাসীরা তেমনি পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে)। বেহেশতবাসীরা হবে হজরত আদম আ.এর মতো উচ্চতাধিকারী (বিশ গজ দেহবিশিষ্ট)। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে—যে দল প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাঁদের চেহারা হবে চতুর্দশীর চাঁদের মতো। পরে যাঁরা প্রবেশ করবেন তাঁরা হবেন সুউজ্জ্বল তারকামন্ডলীর মতো। তাদের প্রত্যেকের থাকবে দু'জন স্ত্রী। সত্তর গজ প্রশস্ত বস্ত্রে সুশোভিতা থাকবেন তাঁরা। স্বচ্ছতা ও সূক্ষ্মতার কারণে উরুদেশের অস্থিসকল এবং ধমনীর রক্তপ্রবাহ পরিচ্ছদাবৃতা হওয়া সত্ত্বেও পরিদৃষ্ট হবে। হজরত আনাস রা. বর্ণনা করেছেন রসুল স. এরশাদ করেছেন, জান্নাতের রমণী যদি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে ভূমন্ডল ও নভোমন্ডল হয়ে উঠবে আলোকোজ্জ্বল। আকাশ বাতাস হয়ে উঠবে সুবাসে ভরপুর। জান্নাতের হুরের মাথার উড়নী পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্যাপেক্ষা অধিক দৃষ্টিনন্দন হবে। বোখারী, মুসলিম। হজরত উসামা বিন জায়েদ বর্ণনা করেন— রসুল স. এরশাদ করেছেন, কে আছে এমন, যে জান্নাতের অধিকার লাভের জন্য প্রস্তুত, যে জান্নাত সংশয়াতীত। কাবা শরীফের প্রতিপালকের শপথ! জান্নাত হচ্ছে অত্যুজ্জ্বল নূর, সুবাসিত উদ্যান, সুউন্নত ও সুদৃঢ় প্রাসাদপুঞ্জ, প্রবহমান স্রোতস্বিনী, সুপক্ক ফলমূল, রূপসী রমণী, হাজারো রকম পোশাক পরিচ্ছদ, স্থায়ী আবাসস্থল, অপরিমেয় আহার্য, সবুজ রঙের জরির কাজ করা বিশেষ ধরনের পরিধেয় ইত্যাদি নেয়ামতের সুপ্রতুল সমাহার। সকলে আরজ করলেন, হে আমাদের দয়ার্দ্রচিত্ত নবী। আমরা সকলেই প্রস্তুত। রসুল স. এরশাদ করলেন, ইনশাআল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌ যদি চান) বলো। বাগবী।

হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. এরশাদ করেছেন, জান্নাতীগণ হবেন শ্মশ্রুবিহীন, বিনম্র। অশেষ যৌবনের অধিকারী হবেন তাঁরা। তাঁদের পোশাক কখনো পুরনো হবে না। ইমাম মুসলিমের বর্ণনাতেও একথাগুলো বলা হয়েছে।

হজরত আলী রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—জান্নাতে থাকবে একটি বাজার। সেখানে কোনো ক্রয়বিক্রয় হবে না। সেখানে থাকবে কেবল নারী পুরুষের ছবি। যে ব্যক্তি যে ছবির প্রতি আকৃষ্ট হবে সে তাতেই প্রবিষ্ট হতে পারবে। জান্নাতের

www.eelm.weebly.com

রূপসী হুরেরা একটি সমাবেশে মিলিত হয়ে মধুর কলগুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠবে। বলবে, আমরা অক্ষয়া, অবিনাশীনি, সুখ ও শান্তি বিভূষিতা, অনটনহীনা, ক্ষুধা, অভাব ও রোষ বিমুক্তা। আমরা সদা আনন্দিতা। আমরা তাঁদের জন্যই আনন্দঘন উল্লাস যাঁরা আমাদের। আমরাও তাঁদের। হাদিসটি ইমাম তিরমিজি হজরত আলী রা. থেকে এবং আহমদ ইবনে মুনাব্বাহ্ আবু মুয়াবিয়া থেকে সরাসরি রসুল স. এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হজরত আনাস থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন— রসুল স. বলেছেন, জান্নাতে একটি বিপণনস্থল থাকবে। প্রতি শুক্রবারে জান্নাতীদের সমাগম হবে সেখানে। সেখানকার মৃদুমন্দ সমীরণের প্রভাবে তাঁদের রূপবৈচিত্র উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাঁদের গৌরবমণ্ডিত পরিচ্ছদগুলোও হতে থাকবে নানা সুবাসে মদীরাপ্লুত। তাঁদের সৌন্দর্য হতে থাকবে উত্তরোত্তর চিত্তাকর্ষক। এরকম অবস্থায় যখন তাঁরা আপন ভার্যাগণের সম্মুখীন হবেন, তখন ভার্যাকুল বলবে, আজ তুমি কতো সুন্দর। তাঁরা বলবেন,আল্লাহ্র কসম! তুমিও তো আজ পরম রূপবতী।

আমি বলি, পৃথিবীবাসীদের দৃষ্টি কেবল পার্থিব সম্পদ, আহার্য, পরিধেয় ও যুগলজীবনের প্রতি নিবদ্ধ। এ সকল ব্যতীত উন্নততর নেয়ামত পৃথিবীতে নেই। আল্লাহ্পাক তাই তাঁর প্রিয় নবী মোহাম্মদ স. এর মাধ্যমে এ সকল বস্তু আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। ঊর্ধ্বস্তরের নেয়ামতসমূহ তো আলোচনার অতীত। এ প্রসঙ্গে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ বলেন—আমি আমার দাসদের জন্য এমন অনুগ্রহরাশি সৃষ্টি করে রেখেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো অন্তঃকরণও অনুভব করেনি। প্রমাণস্বরূপ বলা হয়েছে, কেউ জানে না তাদের চক্ষু শীতলকারী বস্তু সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে—শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মোহাম্মদ স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাক জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, আজ আমি তোমাদের প্রতি আমার প্রসন্নতা ঘোষণা করছি। আর কখনো আমি তোমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হবো না। বোখারী, মুসলিম। হজরত জাবের থেকে একটি দীর্ঘ হাদিসের বিবরণে ইমাম মুসলিম উল্লেখ করেছেন—হজরত রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, জান্নাতে আল্লাহ্পাক তাঁর এবং জান্নাতবাসীদের মধ্যস্থিত অন্তরাল অপসারিত করে দেবেন। তখন সকলে আল্লাহ্পাকের দর্শন লাভে ধন্য হবে। তাঁর পবিত্র দীদার অপেক্ষা অধিক সুখকর কোনো কিছুই সেখানে থাকবে না। অতঃপর রসুল স. তেলাওয়াত করলেন, সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাত এবং আল্লাহ্পাকের দীদার।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. এরশাদ করেন, সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের একজন জান্নাতীর সহধর্মিণী, পরিচারক এবং পারিবারিক উপকরণগুলো এক হাজার বছরের পথের পরিসরবিশিষ্ট হবে। সর্বোচ্চ মর্যাদাধারী জান্নাতী সকালে সন্ধ্যায় আল্লাহ্পাকের দীদার লাভে মগ্ন থাকবেন। এরপর রসুল

www.eelm.weebly.com

স. তেলাওয়াত করলেন, ওই দিন অনেকের মুখমন্ডল হবে অধিকতর প্রফুল্লতামন্ডিত। তাঁরা তাঁদের প্রভুপ্রতিপালকের দর্শন লাভে কৃতার্থ হবে। আহমদ, তিরমিজি।

আল্লামা ইবনে জারীর এবং কবীর গ্রন্থে আস্ সুদ্দী নির্ভরযোগ্য সূত্রপরম্পরায় বর্ণনা করেছেন— যখন আল্লাহ্পাক মাসালুহুম কামাসালি ল্লাজিনাস্ তাওক্বদা নারা এবং আও কাসাইয়্যেবিম মিনাস্ সামায়ি (আয়াত ১৭, ১৯) আয়াত দু'টিতে মুনাফিকদের দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করলেন, তখন মুনাফিকেরা জ্বিনগ্রস্ত রোগীর মতো বলতে শুরু করলো, আল্লাহ্ তো অত্যন্ত উচ্চমর্যাদাশালী, তবে তাঁর দৃষ্টান্তগুলো এতো নিম্নমানের কেনো? তাদের এহেন ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করলেন—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ○

❒ আল্লাহ্ মশা কিংবা উহার উচ্চ পর্যায়ের কোন বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না। সুতরাং যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা জানে যে এই সত্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে; কিন্তু যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহারা বলে যে, আল্লাহ্ কি অভিপ্রায়ে এই উপমা পেশ করিয়াছেন? ইহা দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুতঃ তিনি সত্যপথ পরিত্যাগিগণ ব্যতীত আর কাহাকেও বিভ্রান্ত করেন না।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত (শানে নুজুল) আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরকার এর আরেকটি শানে নুজুল বর্ণনা করেছেন। যেমন, আল্লাহ্পাক মক্কার মূর্তিপূজকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ করলেন, মৌমাছিও যদি মূর্তিগুলো থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয় তবুও তারা মৌমাছির কাছ থেকে সেগুলো ফিরিয়ে আনতে পারবে না। অন্যত্র আল্লাহ্পাক তাদের

www.eelm.weebly.com

কৌশলাবলম্বনকে মাকড়সার জালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তখন তারা বলতে শুরু করলো, দেখো আল্লাহ্ চরম উন্নত ও মর্যাদাশীল হওয়া সত্ত্বেও মাছি মাকড়সার আলোচনা করেছেন। তাদের মূর্খতার প্রত্যুত্তর হিসেবে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এই শানে নুজুলটি বর্ণনা করেছেন আবদুল গণীর পদ্ধতিতে ওয়াহেদী। বর্ণনাটি এসেছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে। কিন্তু আবদুল গণী ছিলেন বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। তাছাড়া এখানে আরো একটি সন্দেহ বিদ্যমান, সেটি হচ্ছে— আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। সুতরাং মক্কার মুশরিকেরা কি করে এই আয়াতের লক্ষস্থল হয়। এমতাবস্থায় একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সনদ ও অর্থগত দিক দিয়ে প্রথমোক্ত শানে নুজুলটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও বিশুদ্ধ।

'হায়া' অর্থ দ্বিধাবিজড়িত অবস্থা। অথবা সংকোচ বা লজ্জা। এ অবস্থাটি হচ্ছে— সদম্ভে অসৎকর্ম করা এবং সৎ অসৎ সকল কর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার মধ্যবর্তী অবস্থা। হায়া— আল্লাহ্তায়ালার একটি বিশেষ গুণ হিসেবে হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি এই— রসুলপাক স. এরশাদ করেন, আল্লাহ্পাক বৃদ্ধলোককে শাস্তি প্রদান করতে সংকোচ (হায়া) বোধ করেন। হজরত আনাস থেকে বায়হাকী এবং হজরত সালমান থেকে আবিদুদ্দুনিয়া এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসে আরো বর্ণিত হয়েছে—যখন বান্দা তার প্রভুর নিকট হস্ত উত্তোলন করে, তখন পরমদাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ তার প্রার্থনা নামঞ্জুর করতে লজ্জাবোধ করেন। আবু দাউদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি হাসান। হজরত সালমান থেকে ইমাম হাকেম বর্ণনা করেছেন-বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, এ সকল দৃষ্টান্ত দিয়ে 'হায়া' শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা দুরূহ। কারণ, ভয়, লজ্জা, সংশয় ও সংকোচকেই হায়া বলে। এ সমস্তের প্রতিক্রিয়া থেকে আল্লাহ্তায়ালা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। কাজেই এখানে হায়া অর্থ হবে মুক্ত থাকা বা পরিত্যাগ করা। যেমন কোনো কাজে লজ্জাবোধ করলে মানুষ তা পরিত্যাগ করে। হায়া শব্দের বাহ্যিক অর্থ অসৎকর্ম পরিত্যাগ। কিন্তু এরকম অর্থ আল্লাহ্তায়ালার প্রতি প্রযোজ্য হতেই পারে না। কেনোনা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা কোনোক্রমেই অসৎকর্ম নয়। কাফেরেরা বিভিন্ন বিষয়ে বালখিল্যতা করতো। তুচ্ছ দৃষ্টান্তই তাদের বাচালতার জন্য উপযোগী। আল্লাহ্পাক এখানে তাই করেছেন। হায়া শব্দটি এখানে কাফেরদের অসদাচরণেরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন অন্য স্থানেও এরশাদ হয়েছে- 'মন্দ কাজের পাল্টা জবাব মন্দই'। এখানে অবশ্য বিষয়টি ছিলো দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের উত্তমতা ও অনুত্তমতা সম্পর্কিত। আল্লাহ্পাক বলেছেন, তুচ্ছ বৃহৎ সকল দৃষ্টান্তই আল্লাহ্তায়ালা পেশ করতে পারেন। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণতঃই স্বাধীন। মশা, মৌমাছি, মাকড়সা সকল কিছুকেই উপমা হিসেবে নির্বাচন করা যায়, এতে লজ্জার কিছু নেই। সুতরাং সংকোচের কী আছে? যারা বিশ্বাসী তাঁরা সহজেই মেনে নেয় যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহ আল্লাহ্

www.eelm.weebly.com

প্রভুপ্রতিপালকের নিকট থেকেই এসেছে। এর শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি, উপমা, সবকিছুই যথাযথ। তাঁরা সহজে একথা বুঝে নিতে পারেন যে, তুচ্ছ বস্তুর দৃষ্টান্ত তুচ্ছ বস্তুর মাধ্যমে হওয়াই সমীচীন। মর্যাদাশীলদের জন্যই মহৎ উপমার কথা ভাবা যেতে পারে। সত্য প্রত্যাখ্যানকারিদের অবস্থা এর বিপরীত। তারা নিতান্ত মূর্খ বলেই এরকম প্রশ্ন তোলার ধৃষ্টতা দেখায়। বলে, তুচ্ছ উপমা প্রয়োগের পশ্চাতে তাহলে আল্লাহ্তায়ালার অভিসন্ধি কী?

'বি হাজা মাসালা' অর্থ এই উপমা। তুচ্ছ ও নগণ্য উক্তির উদ্ধৃতি দিতে গেলে হাজা শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়ে থাকে, সে তো এই। শেষে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, এরকম করার অর্থ, এর মাধ্যমে অনেককে বিপথগামী করে দেয়া এবং অনেককে সত্যপথ প্রদর্শন করা। এরকম উপমা প্রয়োগের ফলে কেবল সত্য পথ পরিত্যাগকারিরাই বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। তাদেরকেই আল্লাহ্পাক সত্যচ্যূত করতে চান। একথাটি হচ্ছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত কাফেরদের পরিহাসমূলক উক্তির জবাব। তারা বলতো, আল্লাহ্ কী অভিপ্রায়ে এরকম উপমা পেশ করেছেন? আল্লাহ্র জবাব হচ্ছে, সত্য পরিত্যাগকারিগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য।

'কাসিরা' অর্থ অনেক। এখানে কাফেদেরকেও অনেক বলা হয়েছে (ইউদিল্লুবিহি কাসিরা)। আবার অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ইমানদারদেরকেও (ইয়াহ্দিবিহি কাসিরা) এর অর্থ সংখ্যাগত দিক থেকে কাফেরেরা অধিক এবং গুণগত দিক থেকে মুমিনেরা।

কাফেরদের প্রশ্ন ছিলো, আল্লাহ্ কী অভিপ্রায়ে প্রশ্নটি পেশ করেছেন? আয়াতে এ প্রশ্ন উল্লেখের পরপরই জানানো হচ্ছে, উপমা উপস্থাপনের কারণ হচ্ছে দু'টি— পথপ্রাপ্তি (হেদায়েত) ও পথভ্রষ্টতা (গোমরাহী)। আয়াতের বাকভঙ্গি দৃষ্টে এ কথা বুঝা যায় যে, উপমা উস্থাপনের বিষয়টি পর্যায়ক্রমে চলতেই থাকবে। এর মাধ্যমে বিশ্বাসীরা লাভ করবে উন্নততর হেদায়েত আর অবিশ্বাসীদের অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ হবে ভ্রষ্টতা। কেবলই ভ্রষ্টতা। বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাসের কারণেই এরকম হবে। একই অবতীর্ণ আয়াতের প্রতিক্রিয়া হবে দু'টি। নিঃসন্দিগ্ধতা ও সন্দেহ এভাবে পরস্পরবিরোধী গন্তব্যকে সুনিশ্চিত করবে।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে—'অমা ইউদিল্লুবিহি ইল্লাল ফাসিক্বিন'— এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ সত্য পথ পরিত্যাগকারিগণ (ফাসিক্বিন) ব্যতীত অন্য কাউকে বিভ্রান্ত করেন না। শরিয়তের পরিভাষায় কবীরা গোনাহকারিদেরকে ফাসেক বলে। 'ফিস্ক্ব' এর তিনটি স্তর। ১. বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ অস্বীকার করা। অস্বীকৃতি বা অবিশ্বাসই সর্ববৃহৎ পাপ। কোরআন মজীদে উল্লেখিত ফাসেক শব্দটি এই অর্থেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ২. 'ফিসক্ব' এর দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে পাপাভ্যস্ততা। ৩. তৃতীয় স্তর হচ্ছে পাপলিপ্ততা (সগীরা গোনাহ্ বারবার করা - পাপকে মন্দ জানা সত্ত্বেও)।

www.eelm.weebly.com

اَلَّذِيۡنَ يَنۡقُضُوۡنَ عَهۡدَ اللّٰهِ مِنۡۢ بَعۡدِ مِيۡثَاقِهٖ ۚ وَيَقۡطَعُوۡنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنۡ يُّوۡصَلَ وَيُفۡسِدُوۡنَ فِى الۡاَرۡضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ

❒ যাহারা আল্লাহের সহিত দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইবার পর উহা ভঙ্গ করে, যে-সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন তাহা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

এখানে 'যাহারা' (আল্লাজিনা) অর্থ ফাসেকেরা এবং গোনাহ্গার মুসলমানেরা। বলা হয়েছে যারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে— একথা বলে তওরাতে উল্লেখিত ওই অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ্পাক ও ইহুদীদের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিলো। অঙ্গীকারটি ছিলো এই— তোমরা মোহাম্মদ স. এর প্রতি ইমান আনবে এবং তওরাতে বর্ণিত মোহাম্মদ স. বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা মানুষের মধ্যে প্রচার করবে, গোপন করবে না। অথবা ওই অঙ্গীকারের প্রতি এখানে ইঙ্গিত হয়ে থাকবে, মানুষের রূহ্ সৃষ্টির পর রূহের জগতে যে অঙ্গীকারানুষ্ঠান হয়েছিলো। আল্লাহ্পাক সকল রূহকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আলাস্তুবিরব্বিকুম (আমি কি তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক নই?) সকল রূহ সমস্বরে জবাব দিয়েছিলো, বালা (হ্যাঁ)। 'নক্বদু' শব্দের অর্থ রশি বা দড়ির পাক খুলে দেয়া। প্রতিশ্রুতি ছিন্ন করার ব্যাপারে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রশি দ্বারা যেমন দু'টি বস্তুর মধ্যে সংঘবদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি অঙ্গীকারের মাধ্যমে দুই পক্ষের অটুট সংযোগ স্থাপিত হয়। এই সংযোগছিন্নতাকে 'নক্বদু' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা আরবী ভাষার রীতি।

বলা হয়েছে—'মিম্ বা'দি মীসাক্বিহী' এর অর্থ অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর অর্থাৎ ওয়াসুক্ব বা বন্ধনাবদ্ধ হওয়ার পর। মিসাক্ব অর্থ ওই সমস্ত আয়াত বা কিতাব, যার মাধ্যমে অঙ্গীকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বাক্যাংশটির শুরুতেই 'মিন' অব্যয়টি যোগ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অঙ্গীকার বাস্তবায়নের শুরুতেই ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

এরপর বলা হয়েছে— আল্লাহ্পাক যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে। অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ স.সহ অন্য সকল নবী রসুলদের প্রতি বিশ্বাসের সম্পর্ককে অটুট রাখে না। অথচ নির্দেশ ছিলো এই যে, লা নুফার্ রিকু বাইনা আহাদিম্ মির রুসুলিহ্ (আমরা রসুলগণের মধ্যে ব্যবধান রাখি না)।

www.eelm.weebly.com

ইহুদীরা হজরত মোহাম্মদ স.- কে অস্বীকার করে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ব্যবধান রচনা করেছে। ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করে বলেছে, আমরা কিতাবের কিছু নির্দেশ মান্য করি, আবার কিছু নির্দেশ মান্য করি না। এছাড়া আত্মীয়তার অধিকার বজায় রাখতেও আল্লাহ্‌তায়ালা নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা সে নির্দেশকেও অমান্য করেছে।

এরপর আল্লাহ্ এরশাদ করছেন, 'এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়' (ওয়া ইউফ্সিদুনা ফিল আর্‌দ)। অশান্তি বা ফাসাদ অর্থ আল্লাহ্‌পাকের বিধানকে এবং রসুলপাক স.– কে অবমাননা করা। শস্যহানী, পশুপালের ক্ষতিসাধন– এসকল অপকর্মে লিপ্ত হওয়া।

আয়াত শেষে বলা হয়েছে, উপরোক্ত অপকর্মগুলো যারা করে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ, তারা কল্যাণ ও সুপথ প্রাপ্তির পরিবর্তে ভ্রষ্টতা ও অকল্যাণকে গ্রহণ করেছে। ইতোপূর্বে অবিশ্বাসীদের স্বরূপ উন্মোচন করে দেয়া হয়েছিলো। তাদের অস্বীকৃতি, অসদাচরণ ও উপহাসপ্রবণতার কথা বলা হয়েছিলো। এই আয়াতের শেষে তারা ক্ষতিগ্রস্ত-এই একটি কথায় তাদের সুনিশ্চিত পরিণতি সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সুতরাং একথা এখন স্পষ্ট হলো যে, তারা প্রকৃত দয়াময় আল্লাহ্‌তায়ালার অধিকার সম্পর্কে নিতান্তই অসচেতন। তারা আল্লাহ্‌তায়ালার দয়া ও পরাক্রম নিয়মিত চাক্ষুস করছে। দেখছে জীবনকে, মৃত্যুকে, বিশাল সৃষ্টিরহস্যকে। এতো কিছু দেখেও মহারাজাধিরাজ আল্লাহ্‌তায়ালাকে বিশ্বাস করা নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো। কিন্তু তারা তা করেনি। সুতরাং একথা সুনির্ধারিত যে, ক্ষতিগ্রস্ততাই তাদের ললাট লিখন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৮

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

❐ তোমরা কিরূপে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদিগকে জীবন্ত করিয়াছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পুনরায় জীবন্ত করিবেন, পরিণামে তাঁহার দিকেই তোমরা ফিরিয়া যাইবে।

'আমওয়াতান' অর্থ মৌল অণু, মিশ্ররূপ, শুক্রবিন্দু, রক্ত ও গোশ্‌তের টুকরা এবং নিষ্প্রাণ অস্তিত্ব। জীবনের উন্মেষ এরকম নিষ্প্রাণ অবস্থা থেকেই। জেনে রাখা প্রয়োজন যে, মানুষ গঠিত হয়েছে দশটি উপাদান দিয়ে। বস্তুজগতের পাঁচটি এবং আধ্যাত্মিক জগতের পাঁচটি। বস্তুজগতের পাঁচটি উপাদান হচ্ছে, আগুন, পানি, মাটি বাতাস-এই ভূতচতুষ্টয় এবং এগুলোর সুসংহত অবস্থা নফ্স (প্রাণ)।

www.eelm.weebly.com

আর আধ্যাত্মিক জগতের পাঁচটি উপাদান হচ্ছে, ক্বলব, রূহ্, সির, খফি ও আখ্ফা। বস্তুজগতের পাঁচটি উপাদানের ব্যাপারটা মোটামুটি সকলে জানে। কিন্তু আধ্যাত্মিকজগতের উপাদানসমূহ সর্বজনবিদিত নয়। যাঁরা জ্ঞানে সুগভীর তাঁরাই কেবল এগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন। আলোচ্য আয়াতে ভূতচতুষ্টয়ের মধ্যে কেবল মাটির প্রতি বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে এরশাদ এসেছে, 'খলাক্বকুম মিন তুরাব' (তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করা হয়েছে)। কিয়ামতের দিন শয়তান যখন মৃত্তিকাসম্ভূত মানুষের মর্যাদা ও মহিমা অবলোকন করবে, তখন চিৎকার করে বলবে, ইয়া লাইতানি কুংতুতুরবা' (হায়! আমিও যদি মাটি হতাম)। মৃত্তিকাসম্ভূত হওয়ার কারণেই মানুষ আল্লাহ্পাকের দীদার লাভে ধন্য হতে পারবে। তাই প্রকৃত মানুষ যাঁরা, তাঁরা আল্লাহ্ দর্শনের তুলনায় অন্যান্য আধ্যাত্মিক দর্শনকে পথে পড়ে থাকা বস্তু বলে মনে করে থাকেন।

'ফা আহ্ইয়াকুম' অর্থ তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। অর্থাৎ তোমাদেরকে আধ্যাত্মিক জগতের উপাদান সমূহের সঙ্গে সন্নিবেশিত ও সঞ্জীবিত করেছেন। আল্লাহ্তায়ালা মৃত্যুনিথরতাকে মুহূর্তমধ্যে জীবন দান করেন, তারপর পৃথিবীর জীবন অতিক্রান্ত হওয়ার পর মৃত্যুদান করেন। মৃতকে জীবন দান আল্লাহ্তায়ালার একটি মহান অনুগ্রহ। আয়ুর সীমানায় ইতিরেখা টেনে দেয়াও আরেকটি মহিমান্বিত অনুগ্রহ। কারণ, পৃথিবীর আয়ুকে পিছনে ফেলে গেলেই কেবল চিরস্থায়ী জীবনের সন্ধান পাওযা যায়। আয়াতে বলা হয়েছে, 'পুনরায় জীবন্ত করবেন' (ছুম্মা ইউহ্ইকুম) এর অর্থ কিয়ামতের সময় হজরত ইস্রাফিল ফেরেশতা যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন সেদিন; তোমরা পুনর্জীবন লাভ করবে। মৃত্যু থেকে এই পুনরোত্থান পর্যন্ত জীবন হচ্ছে কবরের জীবন। কবরের জীবনকে প্রকৃত অর্থে হায়াত বলা যায় না। কারণ, সেখানে মানুষের দশটি উপাদান সমন্বিত অবস্থায় থাকে না। প্রশ্ন উঠতে পারে, কবরে হায়াত বা জীবনই যদি না থাকবে তবে সেখানে শাস্তি অথবা স্বস্তি লাভ হবে কীভাবে? জবাবে এরকম বলা যায় যে, শাস্তি এবং স্বস্তি অর্থাৎ আযাব ও সওয়াবের জন্য উল্লেখিত দশটি উপাদানের সমন্বিত অবস্থা থাকা আবশ্যিক নয়। শাস্তি ও শান্তি মানুষের পূর্ণ অবয়বের প্রতি কবরের জগতে প্রযোজ্য না হওয়াই সমীচীন। যাঁরা আল্লাহ্তায়ালার নিদর্শনের প্রতি আস্থাশীল, তাঁদের পক্ষে কবরের আযাব ও সওয়াব সম্পর্কে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। আল্লাহ্পাক এক স্থানে এরশাদ করেছেন, 'এমন কোনো বস্তু নেই যে আল্লাহ্পাকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা না করে। কিন্তু তোমরা বুঝ না।' অন্য এক স্থানে এরশাদ করেছেন, 'তোমরা কি দেখোনা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সকলেই আল্লাহ্পাককে সেজদা করে-চন্দ্র, সূর্য, গ্রহনক্ষত্র, বৃক্ষরাজি, পর্বতমালা এবং অনেক মানুষ।' হাদিস শরীফে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, এক পাহাড় অপর পাহাড়কে ডেকে বলে, তোমার পৃষ্ঠদেশে কোনো পুণ্যবানের আগমন ঘটেছে কি? অপর পাহাড় জবাব দেয়, হ্যাঁ। এ কথা বলে সে আনন্দিত ও আন্দোলিত

www.eelm.weebly.com

হতে থাকে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিবরানী। অন্য আরেক স্থানে আল্লাহ্‌পাক ফরমান, 'আমি আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ পর্বতরাজির নিকট আমানত (শরিয়তের দায়িত্ব) পেশ করলাম। কিন্তু তারা অক্ষমতা প্রকাশ করলো, ভীত হলো।'

উদ্ধৃত আয়াতে প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করার যে কথা বলা হয়েছে তা পার্থিব ভাষা কিংবা পার্থিব পরিবেশভূত নয়। তাই শেষে মন্তব্য করা হয়েছে, 'তোমরা তা বুঝ না।' অর্থাৎ প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনের বিষয়টি তোমাদের নিকট অজ্ঞাত। ইমাম রাজি এবং ইমাম গাজ্জালী অবশ্য বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত সেজদাকে প্রকৃত সেজদা এবং পবিত্রতা বর্ণনাকে প্রকৃতার্থেই পবিত্রতাবর্ণন বুঝতে হবে।

জ্ঞাতব্যঃ বিজ্ঞ তাফসীরবিদগণ বলেছেন, জড়জগত, উদ্ভিদজগত ও প্রাণীজগতের তাসবীহ্ পাঠ (পবিত্রতা বর্ণন) ভাষাগত নয়, মর্মগত। জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর গঠন প্রকৃতিতে আল্লাহ্‌পাকের কুশলী সৃজন নৈপুন্য ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনা বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হয়। আল্লাহ্‌পাকের এককত্বের প্রশংসা ও পবিত্রতা তারা ভাবগতভাবে প্রকাশ করে। গ্রন্থকার হজরত পানিপথী র. মনে করেন, সৃষ্টিকুল কেবল ভাবগত নয়, ভাষাগত তাসবীহ্ পাঠেও মশগুল। বিষয়টি প্রমাণ করতে যেয়ে তিনি দু'টি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তার একটি হচ্ছে, 'এমন কোনো সৃষ্টবস্তু নেই যে তাঁর হাম্‌দ (প্রশংসা) এবং তাসবীহ্ (পবিত্রতা) উচ্চারণ না করে। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ্ বুঝ না।' এই আয়াতে উল্লেখিত তাসবীহ্ পাঠের ব্যাপারটি কেবল মর্মগত এবং বাধ্যগত হতে পারে না। কারণ, আয়াতের শেষাংশে মানবকুলকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'তোমরা তাদের তাসবীহ্ বুঝ না'। অর্থাৎ বিষয়টি তোমাদের নিকট দুর্বোধ্য। মনে রাখেতে হবে, বিষয়টি দুর্বোধ্য বটে, কিন্তু অবোধ্য নয়। অতএব প্রকৃত অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, যেহেতু তোমাদের বুঝবার যোগ্যতা নেই তাই তাদের তাসবীহ্ পাঠ তোমরা বুঝ না। যদি যোগ্যতা থাকতো তবে নিশ্চয়ই বুঝতে। সৃষ্টি হচ্ছে স্রষ্টার নিদর্শন। সৃষ্টিকুল একটি নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ। এই বন্ধন ছিন্ন করার সাধ্য তার নেই। সৃষ্টির মর্মগত তাসবীহ্ পাঠের ব্যাপারটা সর্বজনগ্রাহ্য। সর্বমান্য এ বিষয়টিকে নির্দেশ করাটা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, এ আয়াতে ভাষাগত তাসবীহ্ পাঠের কথাই বলা হয়েছে। যেনো বলা হয়েছে, সৃষ্টিকুলের তাসবীহ্ পাঠ আসলে ভাষাগত তাসবীহ্ পাঠই। কিন্তু তোমরা যোগ্যতারহিত বলে এই ভাষাগত তাসবীহ্ পাঠের ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারো না। অগণিত বৃক্ষকুল ও সেগুলোর অসংখ্য পত্রপল্লব, অপরিমেয় খনিজ পদার্থ, অগণন কীট পতঙ্গ, পশুপাল অনির্ণিতব্য অণু পরমাণু তাদের স্ব স্ব ভাষায় সতত তাসবীহ্ পাঠরত। হে মানুষ। তোমরা তাদের উচ্চারণ শুনতে পাওনা। তাই বিষয়টি তোমাদের নিকট সহজবোধ্য নয়।

www.eelm.weebly.com

দ্বিতীয় আয়াতটিতে বলা হয়েছে, 'তারা কি দেখে না নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সকল কিছু অবশ্যই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়।' এই আয়াতে আকাশ পৃথিবী এবং এতদুভয়ের সকল কিছু যে স্ব-ইচ্ছায়, পূর্ণ সজাগ হয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে অবনমিত হয়; সেই অবনমিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাধ্যগত অথবা স্বভাবগত আনুগত্যের কথা এখানে বলা হয়নি। প্রকৃতিগত মান্যতা তো সকল মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু মানুষ সেজদাবনত হয় স্বেচ্ছায় এবং স্ব-অনুভূতিতে। তাই দেখা যায়, কেউ সেজদা করে। কেউ করে না। কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য সকলেই সেজদা করে। তাই আয়াতের মর্ম হচ্ছে এই যে, অন্যান্য সৃষ্টি মানুষের মতো নয়। অর্থাৎ তাদের মধ্যে কেউ সেজদা করে, কেউ করে না– এরকম নয়। তারা সকলেই সেজদা করে এবং স্ব-ইচ্ছায়, স্ব অনুভূতিতেই করে। কারণ, সৃষ্টির প্রতিটি অণু পরমাণু অনুভূতিশীল ও ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

'ছুম্মা ইলাইহি তুরজাউন' অর্থ পরিণামে তোমরা তাঁর দিকে ফিরে যাবে। অর্থাৎ পুনরুত্থানের পর কৃতকর্মের ফল দানের জন্য তোমাদেরকে হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে। এই আয়াতটি মাদানী। অর্থাৎ মদীনায় অবতীর্ণ। এই বাক্যটি বর্ণনা করা হয়েছে মদীনার মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করে। তারা অবশ্য আগে থেকেই হাশর-নশর ও কিয়ামত সম্পর্কে জানতো এবং বিশ্বাসও করতো। কারণ, তারা যে আসমানী কিতাব পেয়েছিলো, সেখানে এ বিষয়টির বর্ণনা রয়েছে। জানানো প্রয়োজন হয় অজ্ঞ ও অবিশ্বাসীদেরকে। কিন্তু এখানে তা করা হয়নি। কারণ, এই বর্ণনার মাধ্যমে হজরত মোহাম্মদ স.-এর রেসালতকে প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য—যে রেসালতকে তারা অস্বীকার করে। অথবা যারা মৃত্যোত্তর জীবনকে অস্বীকার করে, তাদের নিকট বিষয়টি পরিস্ফুট করাই এই আয়াতটির উদ্দেশ্য হয়ে থাকবে। যিনি অস্তিত্বহীনতাকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম, পার্থিব মৃত্যুর পর তিনি পুনরুত্থান ঘটাতেও সক্ষম– এই কথাটিই এখানে বলে দেয়া হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৯

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

❑ তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

---

www.eelm.weebly.com

মানুষ পৃথিবীর সকল বস্তু থেকে উপকার গ্রহণ করে। আখেরাতের কল্যাণ লাভের আয়োজনও এই পৃথিবীতেই। 'পৃথিবীর সব কিছু'– একথা বলে পৃথিবীর সকল নেয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই নেয়ামতসমূহ উপভোগ করা এবং এসব থেকে উপকার গ্রহণ করা জীবিত মানুষের পক্ষেই সম্ভব। আর এই জীবনদানের কথা পূর্ববর্তী আয়াতে উক্তও হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, 'তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন'।

পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টির পর আল্লাহ্ মনোসংযোগ করেছেন আকাশের দিকে। বলা হয়েছে 'ছুম্মাস্তাওয়া-ইলাস্ সামায়ি' (তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন)। এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় তাফসীরবিদগণের মধ্যে বিভিন্ন অভিমত দেখা যায়। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং অধিকাংশ প্রাচীন তাফসীরবিদগণ বলেছেন, এই বাক্যটির প্রকৃত অর্থ হবে, অতঃপর তিনি আকাশের দিকে আরোহণ করলেন। এই ব্যাখ্যাটি আররহ্মানু আলাল আরশিস্ তাওয়া (রহমান অর্থাৎ আল্লাহ্ আরশে অধিষ্ঠিত হলেন) – আয়াতের অনুরূপ। ইবনে ফিসান, ফারাহ্ ও ব্যাকরণবিদগণের একটি বিরাট দল এই মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, ইস্তাওয়া শব্দের অর্থ, ইচ্ছা করলেন অথবা মনোনিবদ্ধ করলেন। 'ইস্তাওয়া' অর্থ ইচ্ছা। যেমন আরববাসীগণ বলে থাকেন, ইস্তাওয়া ইলাইহিম কাস্ সাহামিল্ মুর্সাল (নিক্ষিপ্ত তীরের মতো তাদের প্রতি মনোসংযোগ করলো)। এখান থেকেই ইস্তাওয়া শব্দের উৎপত্তি। শেষ কথা হচ্ছে, সকল দিকের আকর্ষণমুক্ত হয়ে নিবিষ্টচিত্তে বিশেষ কোনো কিছুর প্রতি লক্ষ্য করার নাম ইস্তাওয়া।

আল্লামা বায়যাবী বলেছেন, এই আয়াতে 'ছুম্মা' (তৎপর) শব্দটি ব্যবহার করার দু'টি কারণ রয়েছে। একটি হচ্ছে এই– পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সকল কিছু সৃজন এবং আকাশ সৃজনের মধ্যে ব্যবধান বিদ্যমান। অপর কারণটি হচ্ছে– আকাশ পৃথিবীর তুলনায় অধিক মর্যাদাশীল। পারস্পরিক মর্যাদা নির্ণয়ের পার্থক্য নির্দেশ করতেই এই 'ছুম্মা' ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। অন্যত্রও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, 'ছুম্মা কানা মিনাল্লাজিনা আমানু'। দ্বিতীয় কারণটি অধিক যুক্তিসঙ্গত। প্রথম কারণটিকে গ্রহণ করলে এই আয়াতটি হয়ে উঠবে অন্য একটি আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বি। সেই আয়াতটি হচ্ছে, 'ওয়াল আরদ্বা বা'দা জালিকা দহাহা',(আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে সুবিন্যস্ত করেছেন)। এখানে দেখা যাচ্ছে, আকাশ সৃষ্টির পর সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী। অবস্থা যদি তাই হয়, তাহলে আকাশ আগে এবং পৃথিবী পরে সৃজিত হয়েছে বলে মানতে হয়। অথচ এই আয়াতে পৃথিবীর পরে আকাশ সৃষ্টির দিকে মনোসংযোগ করার কথা বলা হয়েছে। এরকম হলে এখানে 'তৎপর' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় বিপরীত।

ইমাম বাগবী 'ওয়াল আরদ্বা বা'দা জালিকা দহাহা' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মতে, আল্লাহ্পাক প্রথমে সৃষ্টি

www.eelm.weebly.com

করেছেন ভূমন্ডল এবং এতদস্থিত উৎপাদনশীল বস্তুসমূহ। তারপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন নভোমন্ডলের দিকে এবং আকাশ সৃষ্টির শেষে পৃথিবীকে সুবিন্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, আকাশ সৃষ্টি এবং ভূমন্ডল বিন্যাস একই সাথে করা হয়েছে। এই আয়াতের 'বা'দা' (পরে) শব্দটির প্রকৃত অর্থ হবে 'মা আ' (সঙ্গে)। অন্য একটি আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, 'উতুলিম্ বা'দা জালিকা জানিম' - এখানেও 'বা'দা' শব্দের অর্থ হবে 'মাআ'। সুরা হামিম সেজদার 'খলাক্বাল আর্‌দ্বা ফি ইয়াউমাইনি' আয়াতের ব্যাখ্যায় বাগবী বলেছেন, রবিবার ও সোমবার এই দুইদিনে আল্লাহ্‌পাক পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। 'ওয়া ক্বদ্দার ফিহা আক্বওয়াতাহা' আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, মঙ্গল ও বুধ, এই দুই দিনে নির্ধারিত হয়েছে মর্তবাসীদের আহার্য। এভাবে ভুবনমন্ডল সম্পর্কিত সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার জন্য লেগেছে মোট চারদিন। তাই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, 'দুনিয়ায় বসবাসকারীদের খাদ্য নির্ধারণে চার দিন সময় অতিবাহিত হলো'। অতঃপর এরশাদ হয়েছে, 'তৎপর তিনি বৃহস্পতি ও শুক্র এই দুই দিনে সাত আসমান সৃজন করেছেন'। এ বক্তব্যগুলো উচ্চারণ করেছেন প্রাচীন তাফসীরবিদগণ।

'উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন'– একথার অর্থ, তিনি আকাশের ত্রুটি ও অমসৃণতা অপসারিত করেন। আকাশে কোনো ফাটল নেই। আর আকাশ অসমতলও নয়। 'উহাকে' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এখানে আকাশের সর্বনাম হিসেবে। 'সামায়ি' অর্থ, আকাশসমূহ। এ শব্দটির মাধ্যমে আকাশের অবয়বকে নির্দেশ করা হয়নি।

কেউ হয়তো বলতে পারেন, জ্যোতির্বিদগণ বলেছেন, আকাশ নয়টি। এটা তাদের আবিষ্কার। কোরআন মজীদে বর্ণিত সাতটি আকাশ ছাড়া অন্য দু'টি আকাশ হচ্ছে আওলাস ও সাওয়াবিত্। আবার কেউ বলেছেন, পৃথক পৃথকভাবে ছয়টি এবং সম্মিলিতভাবে তিনটি মিলে একটি – এভাবে আকাশের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাতটি। শেষোক্ত তিনটিকে ধরা হয়েছে একটি আকাশ, যা কেন্দ্র বহির্ভূত। কেউ বলেছেন, কেন্দ্রের বাইরে পাঁচটি এবং কেন্দ্র মধ্যে দু'টি-এই নিয়ে সাতটি। এই সাতটি আকাশের মধ্যে আরো অনেক আকাশ বিদ্যমান। মধ্যবর্তী পরিসরসমূহ আকাশ দিয়েই ভরাট করা হয়েছে। এর মধ্যে শূন্যস্থান বলে কিছু নেই। সেখানে রয়েছে অনির্ণেয় পরিক্রমনশীল নক্ষত্রমন্ডলী। জ্যোতির্বিদগণ এগুলোকে বিচরণশীল আকাশ বলে অভিহিত করেছেন।

আমি বলি, জ্যোতির্বিদগণ তারকারাজির অনল বিকিরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে আকাশের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। তারা যখন লক্ষ্য করলো–চাঁদ, তারা ও গ্রহপুঞ্জ দিনরাত চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে, তখন তারা তাদের অবলোকন সীমাকে একটি আকাশ বলে নির্ধারণ করলো। তারপর তারা দেখলো, সপ্তাকাশের তারকারাজি ছাড়াও আরো অনেক তারকা ভিন্নতর কক্ষপথে আবর্তনশীল। আরো দেখলো,

www.eelm.weebly.com

সাত আকাশের নক্ষত্রগুলোর গতিবিধিও একরকম নয়। কোনোটির গতি অত্যন্ত ক্ষিপ্র। কোনোটির গতি শ্লথ। এবং সেগুলো আকারে ও প্রকারে সাদৃশ্যপূর্ণও নয়। কোনোটি যাচ্ছে উত্তর সৌর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণ সৌর গোলার্ধের দিকে। কোনোটি চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। শেষে তারা এ ব্যাপারটিও লক্ষ্য করলো যে, একমাত্র চাঁদ ব্যতিরেকে অন্য নক্ষত্রগুলো– ধীরগামী, দ্রুতগামী, পূবমুখী, পশ্চিমমুখী, বিরতিসহ, বিরতিবিহীন– বিভিন্ন অবস্থায় ধাবমান। তখন তারা স্থির করলো, এগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী আকাশও অসংখ্য। এভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারা আকাশের সংখ্যা তিরিশটি বলে অভিহিত করেছে। তবুও বিষয়টি তাদের নিকট দুর্জ্ঞেয় হয়েই রয়েছে। সমস্যার সমাধান তারা করতে পারেনি। গবেষণা যদি নিরন্তর চলে, তবে হয়তো সমস্যার সমাধান কখনো হয়ে যেতেও পারে। এই প্রসঙ্গটির শেষ সমাধান হচ্ছে এই–তাদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্য সিদ্ধান্তমূলক নয়। তাই তা গ্রহণীয়ও নয়। তাদের মতামত সমাধানের পরিবর্তে নতুনতর সমস্যা সৃষ্টি করেই যাচ্ছে। তারা বলে, আকাশগুলো পরস্পরমিলিত এবং সেগুলোর ধ্বংস অসম্ভব। তাদের দাবী হচ্ছে, সকল আকাশ কোনো এক মহাকাশের আবর্তন প্রভাবে আবর্তিত হয়। কিন্তু যুক্তি ও ধর্ম বলে, অন্য সকল সৃষ্টির মতো আকাশগুলোও অনিবার্যরূপে বিনাশশীল। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'যখন আকাশ ফেটে চৌচির হবে'। আর আকাশগুলো পরস্পরমিলিতও নয়। এক আকাশের সঙ্গে অন্য আকাশের বিশাল দূরত্ব রয়েছে– ইসলাম একথাই বলে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী মোহাম্মদ স. একদা সাহাবা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখলেন, আকাশে ভেসে এলো এক টুকরো মেঘ। তিনি স. বললেন, তোমরা জানো ওটা কী? সাহাবাগণ আরজ করলেন, আল্লাহ্পাক ও তাঁর রসুল সমধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, ওটা হচ্ছে মেঘ–মাটির জন্য প্রবহমান পানির মতো। আল্লাহ্পাক এখন ওটাকে এমন একটি সম্প্রদায়ের দিকে চালিত করেছেন যে সম্প্রদায় আল্লাহ্পাকের কৃতজ্ঞভাজন নয়, তারা পানি যাচনাও করেনি। তিনি পুনঃ এরশাদ করলেন, তোমরা কি জানো তোমাদের মাথার উপরে কী রয়েছে? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, উপরে রয়েছে আকাশ, যা সুসংরক্ষিত ছাদ ও সুবদ্ধ তরঙ্গসদৃশ। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা কি বলতে পারো তোমাদের এবং আকাশের মধ্যে ব্যবধান কতো? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই উত্তমরূপে অবগত। তিনি বললেন, তোমাদের এবং আকাশের মধ্যে রয়েছে পাঁচশত বৎসরের পথের দূরত্ব। তিনি পুনরায় বললেন, বলতে পারো আকাশের উপরে কী রয়েছে? তাঁরা অজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন, আল্লাহ্পাক ও তাঁর রসুলই একথা বলতে পারবেন। রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, এই আকাশের উপরে রয়েছে আরেকটি আকাশ। আর ওই দু'টি আকাশের মধ্যে রয়েছে পাঁচশ' বছরের পথের সমদূরত্ব।

www.eelm.weebly.com

এভাবে একের পর এক প্রশ্ন এবং উত্তর করে যাচ্ছিলেন রসুলে পাক স.। ক্রমাগত সাতটি আকাশের বিবরণ দিলেন তিনি। তারপর বললেন, সাত আকাশের উর্ধ্বে কী রয়েছে বলো? সাহাবাগণ অপারগতা প্রকাশ করলে তিনি বললেন, সর্বোপরি রয়েছে আরশে আজীম। উর্ধ্বতম আকাশ থেকে যার অবস্থান পাঁচশ' বছর পথের দূরত্বের সমান। রসুল স. পুনরায় বললেন, এবার বলো, তোমাদের নিচে কী? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, মাটি। তোমরা কি জানো মাটির নিচে কী? সাহাবাগণ বললেন, তাঁরা জানেন না। তিনি এরশাদ করলেন, এই মাটির নিচে রয়েছে আরেকটি পৃথিবী। এই দুই পৃথিবীর দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথের সমমাপের। এভাবে তিনি স. নিম্নস্থিত সাতটি পৃথিবীর বর্ণনা দিলেন। অতঃপর বললেন, ওই পরম সত্তার শপথ! আমার জীবনদীপ যাঁর হস্তায়ত্ব। যদি তোমরা এই স্থান থেকে একটি রশি সর্বশেষ পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে দাও, তবে তা পবিত্রতম সত্তার প্রতিই ছুঁড়ে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, 'হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখিরু ওয়াজ্জাহিরু ওয়াল বাতিনু ওয়া হুয়া বিকুল্লি শাইয়িন আলীম' (তিনিই সূচনা, তিনিই সমাপ্তি, তিনিই প্রকাশ, তিনিই অপ্রকাশ, আর তিনিই সবকিছু পরিজ্ঞাত)। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, এই আয়াত পাঠের মাধ্যমে এ বিষয়টি অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয় যে, সব কিছুই আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞানের ও শক্তির অধীন। তাই হাদিসে উল্লেখিত রশি নিক্ষেপকে তাঁর দিকেই নিক্ষিপ্ত হবে বলা হয়েছে। তাঁর জ্ঞান সর্বত্রগামী, আর তিনি আরশারোহী। তাই বলা হয়েছে, তিনি রহমান, আরশের উপর অধিষ্ঠিত।

আমি বলি, রশি নিক্ষেপের ব্যাপারটি মোতাশাবেহাত (দুর্বোধ্য) আয়াতের পর্যায়ভুক্ত। তাঁর আরশাধিষ্ঠানের বিষয়টিও তাই। বিষয়টির অর্থ এরকম হতে পারে যে, সর্বশেষ পৃথিবীতে রশি ছুড়ে দিলে সে রশি শেষ পর্যন্ত আরশ স্পর্শ করবে। হাদিস শরীফ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আরশ এবং তার মধ্যস্থিত সকল আকাশ বৃত্তাকার। আর আকাশ পৃথিবীকে ঘিরে আছে। তাই হাদিসের মর্ম হবে— সর্বশেষ পৃথিবীই হোক আর যেদিকেই হোক, রশি ছুঁড়ে দিলে সে রশি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে আরশে।

সুফী দার্শনিকগণ বলেন, প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ্র সন্নিধানভূত। বিশ্বাসীদের অন্তর (ক্বলব) হচ্ছে, আলমে সগীর (ক্ষুদ্র বা সংক্ষিপ্ত জগত)। বৃহত্তম জগতে রয়েছে আল্লাহ্র আরশ, যা আল্লাহ্পাকের তাজাল্লীর (বিশেষ জ্যোতির) ধারক। আরেকটি বিশেষ জ্যোতি প্রতিফলিত হয় কাবাগৃহে। অন্য আরেকটি রহমানী জ্যোতি আরশের উপরে পরিব্যাপ্ত, যা আলমে কবীর বা বৃহত্তম জগতের কেন্দ্রবিন্দু। রহমান আরশে অধিষ্ঠিত— বলে ওই জ্যোতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ রকম ব্যাখ্যাসূত্রে অনেকের অভিমত এই যে, নিক্ষিপ্ত রশি আরশ পর্যন্ত পৌঁছবে এরকম অতিরিক্ত কথা বলার প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি সর্বত্র

www.eelm.weebly.com

পরিব্যাপ্ত। সুতরাং রশি যেদিকে বা যেখানেই ছুঁড়ে মারা হোক না কেনো, তা আল্লাহ্‌র দিকেই ছুঁড়ে মারা হবে। হাদিসে কুদসীতে এরকম উল্লেখিত হয়েছে যে, মু'মিনের ক্বলব ব্যতীত অন্য কেউ আমাকে ধারণ করতে সক্ষম নয়।

ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন– আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে রয়েছে একাত্তর, বায়াত্তর, অথবা তিয়াত্তর বছর পথের ব্যবধান। আকাশগুলোর পারস্পরিক দূরত্বও এরকম। আকাশের উপরে রয়েছে একটি মহাসমুদ্র, যার নিম্নদেশ এবং উপরিদেশের দূরত্ব দুই আকাশের দূরত্বের সমান। এর উপরে রয়েছে পাহাড়ী ছাগলাকৃতির আটজন ফেরেশতা। তাঁদের বক্ষ ও পশ্চাদ্দেশের প্রশস্ততা সুবিশাল - দুই আকাশের মধ্যবর্তী ব্যবধানের অনুরূপ। ওই ফেরেশতাবৃন্দের পৃষ্ঠোপরি রয়েছে আরশে আজীম। আরশে আজীমের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং গভীরতা দুই আকাশের দূরত্বের মতো। আল্লাহ্‌পাকের অধিষ্ঠান এ সকল কিছুর উপরে।

আমি বলি, হাদিস শরীফে বর্ণিত দূরত্বের গতি নির্ণিত হয়েছে পথপরিক্রমণের গতি অনুসারে– যার পরিমাপ নির্ণিত হয় দ্রুতগামীতা ও ধীরগামীতাকে অবলম্বন করে। তাই কোথাও পাঁচশ' বছর– আবার কোথাও একাত্তর, বায়াত্তর, তিয়াত্তর– এ রকম কথা বলা হয়েছে। অথবা এমনও বলা যায় যে, এখানে সংখ্যা নির্দেশ করা উদ্দেশ্য নয়। বরং দূরত্বের সুপ্রতুলতা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য। যেমন আমরা আধিক্য বুঝাতে যেয়ে বলে থাকি, হাজার হাজার, লাখ লাখ, ইত্যাদি। আর একাত্তর বায়াত্তর তিয়াত্তর বলা হয়েছে একারণে যে, বর্ণনাকারী এখানে নিজেই দূরত্বের বিশালতা নির্ণয় করতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছেন। তাই তিনি সুনির্দিষ্ট সংখ্যার উপরে স্থির থাকেননি। এই দীর্ঘ আলোচনার সারকথা এই যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান কোনো নির্ভরযোগ্য বিষয় নয়। বিষয়টি আসলে পানির উপরে চিত্রাংকনের মতো ব্যাপার। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কথা পরিত্যাজ্য হওয়াই সমীচীন। শরিয়তসমর্থিত অভিমত এই যে, সকল গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে প্রথমাকাশে। আল্লাহ্‌পাক তাই এরশাদ করেছেন, 'আমি পৃথিবীর আকাশকে প্রদীপমালায় সুসজ্জিত করেছি'। দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং শ্লথগতিসম্পন্ন গ্রহনক্ষত্রসমূহ আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়ানুসারে তাঁরই নির্ধারিত কক্ষ পথে পরিক্রমণশীল। এ যেনো পানিতে সন্তরণরত মৎসকুল। আর আকাশ স্থির।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'ওয়া হুয়া বি কুল্লি শাইয়্যিন আলীম'– এর অর্থ, তিনি সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। তিনিই সকল বস্তুর স্রষ্টা। তাই তিনি সকল মৌলবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। কল্যাণ নির্ভরতাই তাঁর সৃষ্টির মূল ভিত্তি।

জ্ঞাতব্য ঃ ১. শাহ্‌ আবদুল আজীজ দেহলভী র. বলেন, নক্ষত্ররাজি যদি থেমে থেমে অগ্রসর হয়, তাহলে এটা জরুরী হবে যে, প্রতিটি নক্ষত্রের জন্য পৃথক পৃথক আকাশ থাকবে এবং সেগুলোর মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকবে না। যদি থাকে,

www.eelm.weebly.com

তবে এক তারকা অন্য তারকার আকাশে ঢুকে পড়বে এবং শুরু হবে ধ্বংসলীলা। বিষয়টি বোধগম্য নয়। আল্লামা বায়যাবী বলেন, নক্ষত্রকুলের আবর্তনের প্রকৃতি দু'রকম। একটি হচ্ছে, আপন কক্ষপথে আবর্তন। যে পথ বিস্তৃত রয়েছে নবম আকাশ পর্যন্ত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আপন কেন্দ্রমূলের উপর আবর্তন। এরকম হলে দিনরাত, মাস, বছর পরিমাপ করা সম্ভব হয়। সম্ভব হয় ঋতু নির্ণয়ের ব্যাপারটিও। গতিপথ ভিন্নতর হলেও অবশ্য কিছু আসে যায় না। কারণ, সেগুলোর কক্ষপথ সুনির্দিষ্ট। ভাষ্যকার ও টিকাকারদের নিকট পুরো ব্যাপারটিই জটিল ও সন্দেহযুক্ত। তাই তাদের অনেকেই এ সম্পর্কিত দীর্ঘ বিবরণকে পরিহার করেছেন। তবে এই বিষয়টি সরলীকরণযোগ্য যে, চন্দ্র নক্ষত্র ও গ্রহমালা পৃথিবীর আকাশে বিদ্যমান। তাদের গতি যেমন পৃথক তেমনি গতিপথও পৃথক। তারা তাদের আপনাপন কক্ষপথে সতত সঞ্চরণশীল, যেমন, মৎসকুল সন্তরণশীল পানিতে। কক্ষপথ সুনির্ধারিত বলেই পারস্পরিক সংঘর্ষের কোনো সম্ভাবনাই নেই।

২. প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ আকাশের সংখ্যা বিন্যাস প্রকৃতি এবং অবস্থান সম্পর্কে নানান কথা বলেছেন। কোরআনের অধিকাংশ ভাষ্যকার সেগুলোকে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কীয় আয়াতের আলোচনায় এনেছেন। আমি মনে করি, আকাশ মার্গের রহস্যের শেষ নেই। তাই কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর মতবাদের উপর সমাধান উপস্থাপন করা সমীচীন নয়। কোরআনে এরকম আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, অনিশ্চয়তার উপর বিশ্বাসের ভিত্তি নির্মাণ করা যায় না। তবে কোরআনের আলোকে জ্যোর্তিবিদদের মতবাদকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এটাই প্রকৃত জ্ঞানীগণের পথ।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণের অনেক অভিমতকেই অস্বীকার করেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে চল্লিশ কোটি সৌরজগত। দশ কোটি আকাশ এবং ত্রিশ কোটি গ্রহ। প্রতিটি আকাশের আশেপাশে তিনটি করে গ্রহ রয়েছে। প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্র আপন কক্ষপথে পরিক্রমণরত। তাদের একটির সঙ্গে অন্যটির কোনো সংযোগ নেই। একটি থেকে অন্যটির দূরত্ব কখনো লক্ষলক্ষ মাইল, আবার কখনো কোটি মাইলের অধিক। মহাকাশের ঊর্ধ ও অধঃ নির্ণয় করা দুরূহ। দিক নির্ণয়ের ব্যাপারটি সেখানে সত্যিই জটিল। আকাশ সৃষ্টির মূল উপাদান সম্পর্কে বিজ্ঞান এখনো কোনো হদিস্ করতে পারেনি। বিদ্যুৎ, উল্কাপিন্ড, ধূমকেতু, মহাজাগতিক রশ্মি এসমস্তের অবস্থান এখনো অনুমাননির্ভর। এগুলোর অবস্থান, আগমন, প্রত্যাগমন, আবর্তন ও পরিক্রমন সম্পর্কে সঠিক তথ্য আহরণ করা সুদূরপরাহত বলেই মনে হয়। নবুয়তের অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে আশ্রয় করা ছাড়া এ রহস্যের উন্মোচন সম্ভব নয়। তথ্য, তথ্যান্তর, বাদ, প্রতিবাদ— এসব নিয়ে এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞান। আল্লাহ্পাকের বাণীতে আকাশ, আরশ ও কুরসী সম্পর্কে যে বিবরণটুকু রয়েছে

www.eelm.weebly.com

তাই যথেষ্ট। এই আলোচনায় কোনো অস্পষ্টতা নেই। সতত পরিবর্তনশীল বিজ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার বাণীকে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারটা মূর্খতার অশ্বারোহীর স্বর্গগমনের মতো।

৩. রশি ছুঁড়ে মারলে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছবে— এ সম্পর্কে ইমাম তিরমিজি বলেন, এখানে আল্লাহ্ অর্থ আল্লাহ্র জ্ঞান ও শক্তি। সম্মানিত গ্রন্থকার (কাযী ছানাউল্লাহ্) এরকম ব্যাখ্যাকে অতিরিক্ত মনে করেন। তাঁর মতে বিষয়টি মোতাশাবেহ্ (দুর্বোধ্য)। প্রতিটি বস্তু আল্লাহ্পাকের সন্নিধানপ্রাপ্ত। তাদের অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা একারণেই সম্ভবপর হচ্ছে। এ ধারণাটি সুফী দার্শনিকদের নিকট স্বীকৃত। টিকাকার মনে করেন, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সুযোগ না থাকলেও হাদিসটি সম্পূর্ণতঃ শুদ্ধ এবং এপ্রসঙ্গে সুফী দার্শনিকগণের মন্তব্যই যথার্থ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩০

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّیْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

❑ স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদের বলিলেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতেছি,' তাহারা বলিল 'আপনি কি সেখানে এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবেন যে অশান্তি ঘটাইবে ও রক্তপাত করিবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বলিলেন, 'আমি জানি যাহা তোমরা জান না।'

তৃতীয় নেয়ামতের বর্ণনা শুরু হয়েছে এখান থেকে। এই আয়াতে ফেরেশতামন্ডলীর উপরে হজরত আদম আ. এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর পরবর্তী বংশধরেরাও এই শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অন্তর্ভূত। এখানে জারি হয়েছে আনুগত্যের বিধান এবং অস্বীকৃতি পরিহারের নির্দেশনা। বাগবী বলেছেন, আল্লাহ্পাক প্রথমে সৃষ্টি করেন গগনমন্ডল, ধরিত্রী এবং ফেরেশতাকুল। তারপর ফেরেশতাদেরকে আকাশে, জ্বিনদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেন। জ্বিনেরা দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীতে বসবাস করতে থাকে। শুরু হয় হিংসা, দ্বেষ ও অশান্তি। অবশেষে রক্তপাত। অনাসৃষ্টি উৎখাতের জন্য আল্লাহ্পাক তখন ধরাবক্ষে প্রেরণ করেন এক বিশাল ফেরেশতা বাহিনী। ওই সকল ফেরেশতাদেরকেও জ্বিন বলা হয়। তারা ছিলেন জান্নাতের রক্ষী বাহিনী। জান্নাত থেকেই জ্বিন নামকরণ করা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে। ওই ফেরেশতা বাহিনীর নেতা ছিলো ইবলিস। ইবলিসের নেতৃত্বে ফেরেশতারা এসে প্রথিবীর জ্বিনদেরকে বিতাড়িত করলেন। জ্বিনেরা পালিয়ে গেলো দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে। তখন জ্বিন নামক ফেরেশতারাই পৃথিবীর অধিবাসী হয়ে গেলেন। তখন ইবলিস হলো মাটি ও আকাশের একচ্ছত্র অধিপতি। জান্নাতের প্রধান প্রহরী হয়ে গেলো সে। তাই কখনো সে ধরাধামে, কখনো উর্ধ্বধামে, আবার কখনো জান্নাতে আল্লাহ্পাকের ইবাদত করতো। এ অনন্য পদমর্যাদা তাকে অহংকারী করে তুললো। সে ভাবতে লাগলো সৃষ্টিকুলের মধ্যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ।

শুরু হলো নতুন অধ্যায়। আল্লাহ্তায়ালা ফেরেশতাকুলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে যাচ্ছি'। ইবলিসও ছিলো এ ঘোষণার লক্ষ্যস্থল। পরবর্তী আয়াত (আয়াত ৩৪) দৃষ্টে একথাই বুঝা যায়। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তিনি (আবু হোরায়রা) বলেন, রসুল পাক স. আমার হাত ধরে এরশাদ করলেন, আল্লাহ্পাক মাটি সৃষ্টি করেছেন শনিবারে। পর্বতরাজি রবিবারে। বৃক্ষলতা সোমবারে। অসৎকর্ম সমূহকে মঙ্গলবারে। নূর বা জ্যোতিকে বুধবারে এবং পশুকুলকে বৃহস্পতিবারে। সবশেষে শুক্রবারে তিনি সৃষ্টি করেছেন হজরত আদমকে। তখন ছিলো আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়। এই হাদিস দৃষ্টে বুঝা যায়, পৃথিবী সৃষ্টির ছয়দিন পরে সৃষ্টি করা হয় হজরত আদমকে। ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, জ্বিন সম্প্রদায় দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস করেছে। তারপর বিতাড়িত হয়েছে। বিতাড়নকারী ফেরেশতারাও দীর্ঘকাল বসবাসের পর আল্লাহ্পাক পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণের ঘোষণা দিচ্ছেন। তাই যদি হবে, তবে পৃথিবী সৃষ্টির ছয়দিন পর আদম আ. সৃষ্ট হয়েছেন– এ কথা বলা হয়েছে কেনো? প্রত্যুত্তরে বলা যায়, পৃথিবী সৃষ্টির ছয়দিন পরের শুক্রবারটিই যে আদম আ. এর সৃষ্টিলগ্ন ছিলো– হাদিস শরীফের বর্ণনায় সেকথা স্পষ্ট বিবৃত হয়নি। সম্ভবতঃ হজরত আদমের সৃষ্টিলগ্নের শুক্রবার ছিলো দীর্ঘকাল পরের কোনো এক শুক্রবার। এই উত্তরই যথার্থ। আর এই ব্যাখ্যাটি কোরআন পাকের বর্ণনার অনুকূল। কোরআনে বলা হয়েছে, আকাশ, জমিন ইত্যাদি সৃজিত হয়েছে ছয়দিনে। আল্লাহ্ পাকই সমধিক জ্ঞাত।

'খলিফা' অর্থ প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধি হচ্ছেন হজরত আদম। খলিফা প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্পাকের বিধানাবলী ও বিধানানুসারী বিষয়ের প্রচলন, পথ-প্রদর্শন, সত্য পথের আহবান, আল্লাহ্র নৈকট্যার্জনের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি। এতে আল্লাহ্পাকের কোনো প্রয়োজন নিহিত নেই। কারণ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু সৃষ্টিকূল তাঁর মুখাপেক্ষী। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষের জন্যই তিনি প্রতিনিধি প্রেরণের এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ, সাধারণ মানুষ আল্লাহ্পাকের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতারহিত। সরাসরি আল্লাহ্পাকের প্রত্যাদিষ্ট বিধান

www.eelm.weebly.com

গ্রহণ করতেও তারা অক্ষম। তাই আল্লাহ্পাক এই প্রতিনিধিত্বের পরম্পরা শুরু করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেছেন হজরত আদমের মাধ্যমে।

আল্লাহ্পাকের ঘোষণা শুনে ফেরেশতারা বিস্মিত হলেন এবং বিনয়াবনত স্বরে বললেন, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আপনি এরকম করলে পৃথিবীতে পুনরায় শুরু হবে অশান্তি ও রক্তপাত। আপনার সপ্রশংস স্তব স্তুতি ও পবিত্রতা বর্ণনের জন্য আমরাই তো রয়েছি। ফেরেশতাদের একথা আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তিরূপে উত্থাপিত হয়নি। তাঁদের এমতো উক্তির পিছনে হজরত আদমের প্রতি কোনো হিংসা দ্বেষও ছিলো না। ইতোপূর্বে পৃথিবীতে সংঘটিত অশান্তি ও রক্তপাতের অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিলো। পুনরায় সেখানে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে ভেবে তাঁরা এরকম মন্তব্য করেছিলেন। তাঁরা জানতেন, তাঁরা নিষ্পাপ এবং প্রতিনিধিত্বের যোগ্য। তাই বলেছেন, 'আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা বর্ণনা করি'।

'নুসাব্বিহু বিহামদিকা' অর্থ সপ্রশংস স্তুতিগান। দু'টি শব্দ রয়েছে এই বাক্যাংশটিতে। একটি হচ্ছে তাসবীহ্ এবং অন্যটি হাম্দ। তাসবীহ্ অর্থ আল্লাহ্পাককে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্ত জানা এবং তা প্রকাশ করা। 'বিহামদিকা' অর্থ আমরা এমন অবস্থায় তোমার তাসবীহ্ পাঠ করি, যার সঙ্গে যুক্ত থাকে প্রশংসা (হামদ)। আর আমাদেরকে তাসবীহ্ ও হাম্দ প্রকাশের (সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণার) সামর্থ তো দিয়েছো তুমিই। নুকাদ্দিসু ও নুসাব্বিহু সমার্থবোধক শব্দ। 'নুকাদ্দিসু লাক' বাক্যাংশের লাম অব্যয়টি অতিরিক্ত অথবা অনতিরিক্ত, দু'টোই ধরা যায়। যদি অতিরিক্ত না ধরা হয় তবে অর্থ দাঁড়াবে— আমরা তোমারই জন্য প্রবৃত্তিকে পাপ থেকে পবিত্র করি। এ অবস্থায় নুকাদ্দিসু শব্দের কর্মপদ উহ্য হবে। আর অতিরিক্ত ধরলে নুকাদ্দিসু লাক এর কাফ সর্বনামটি কর্মপদ বলে গণ্য হবে। ফেরেশতাগণ ফাসাদ বা অশান্তির বিপরীতে সপ্রশংস পবিত্রতা এবং রক্তপাতের বিপরীতে পবিত্রতা বর্ণনার কথা বলেছেন।

এক ব্যক্তি রসুলপাক স. এর নিকট আরজ করেছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্। সর্বোত্তম কথাটি কী? তিনি স. বললেন, ওই কথাটিই সর্বোত্তম কথা যা ফেরেশতাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছিলো। তা হচ্ছে, সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি। হজরত আবু জর গিফারী থেকে মুসলিম বলেছেন, এই কথাটি সৃষ্টির জন্য রহমতের কারণ। এই কথার কারণেই সৃষ্টিকুল তাদের জীবনোপকরণ (রিজিক) পেয়ে থাকে। এই বর্ণনাটি এনেছেন হজরত জাবের থেকে ইবনে আবী শায়বা এবং হজরত হাসান থেকে বাগবী।

ফেরেশতাগণ আগেই জেনেছিলেন যে, হজরত আদমের বংশধরগণের মধ্যে কেউ কেউ হবে বাধ্য এবং কেউ কেউ হবে অবাধ্য। কেউ মু'মিন, কেউ কাফের। তাই তাঁরা মনে করেছিলেন, ফেরেশতাকুল মানবজাতি থেকে উত্তম। কারণ, ফেরেশতাদের মধ্যে কোনোরূপ অবাধ্যতা নেই। নির্দেশাবলীর নিখুঁত প্রতিপালনই

www.eelm.weebly.com

তাঁদের স্বভাব। তাঁরা অবিদ্রোহী, নিষ্পাপ। তাই তাঁরা বুঝে নিয়েছিলেন, তাঁরাই আল্লাহ্পাকের প্রতিনিধি। তাই তাঁরা মানব সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিনয়াবনত অনুযোগ উত্থাপন করেছিলেন। তাঁদের ধারণা সঠিক নয়—এ আয়াতের শেষ বাক্যটিতে সেকথাই পরিস্ফুট হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি বললেন, আমি জানি যা তোমরা জানো না। ফেরেশতারা জানতেন না যে, কোনো কোনো মানুষের অন্তরে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রকৃত প্রেম দান করবেন। যার কারণে তাঁরা আল্লাহ্পাকের রহস্যময় নৈকট্য লাভ করে ধন্য হবেন। বিশুদ্ধ প্রেমিক হওয়ার গৌরব অর্জন করবেন। হাদিস শরীফে এসেছে— যে যাকে ভালোবাসে সে তার সঙ্গে। হজরত আনাস এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে—আল্লাহ্পাক বলেন, আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অন্বেষণে ব্রতী হয়। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি। তখন আমি হয়ে যাই তাঁর কান, যদ্দারা সে শোনে। আমি হয়ে যাই তাঁর চক্ষু, যার দ্বারা সে দেখে।

ফেরেশতারা বুঝতে পারেনি মানুষের প্রকৃত মর্যাদা কী (তাঁরা নিষ্পাপ বটে কিন্তু প্রেমিক নন, সুতরাং প্রেমের মর্যাদা তাঁরা বুঝবেন কীভাবে)? হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন— রসুলপাক স. এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন, ওহে আদম তনয়। আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম কিন্তু তুমি আমার শুশ্রূষা করোনি। সে বলবে, হে প্রভু! আমি তোমার শুশ্রূষা করবো কী করে। তুমি তো সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক। তুমি তো রোগশোকের অতীত। আল্লাহ্ বলবেন, স্মরণ করো— আমার ওমুক বান্দা পীড়াগ্রস্ত হয়েছিলো, অথচ তুমি তার সেবা যত্ন করোনি। তার সেবা যত্ন করলেই আমার সেবা যত্ন করা হতো। পুনঃ এরশাদ হবে, হে বনী আদম! আমি তোমার নিকট আহার্য যাচনা করেছিলাম— তুমি দাওনি। সে পূর্বের মতো বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করবে। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমার ওমুক ক্ষুধার্ত বান্দা তোমার নিকট খাদ্য চেয়েছিলো— তুমি দাওনি। তাকে খাদ্য দিলে আমাকেই দেয়া হতো।

প্রসিদ্ধ সুফীদার্শনিকদের নিকট এ বিষয়টি সতঃসিদ্ধরূপে প্রতীয়মান যে, ভূপৃষ্ঠের সকল কিছু সূর্যের প্রখর কিরণ সহ্য করতে পারে না। মাটি পারে। অন্যান্য সৃষ্টি তেমনি আল্লাহ্পাকের গুণাবলীর বিচ্ছুরণ (তাজাল্লীয়ে সিফাতি) কতকাংশে ধারণ করতে সক্ষম হলেও সত্তাগত বিচ্ছুরণ (তাজাল্লীয়ে জাতী) ধারণ করতে পারে না। প্রকৃত বিচ্ছুরণ নয় বরং উভয় প্রকার বিচ্ছুরণের সুদূরবর্তী ছায়া প্রতিচ্ছায়া গ্রহণ করেই সৃষ্টিকে তৃপ্ত থাকতে হয়। কেবল মানুষ এর ব্যতিক্রম। মানুষের মূল উপাদান মাটি। মাটিসহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দশটি উপাদান নিয়ে মানুষের অস্তিত্ব গঠন করা হয়েছে। মানুষ তাই মহাবিশ্বের সকল কিছুর সমাহার। মহাবিশ্ব

www.eelm.weebly.com

হচ্ছে আলমে কবীর এবং মানুষ আলমে সগীর। মহাবিশ্বের কোনো কিছুই তার মতো সমষ্টিভূতিসম্পন্ন নয়। মানুষ তাই প্রকৃত প্রতিনিধি। প্রকৃত আমানতের দায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা কেবল মানুষেরই রয়েছে। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, 'অবশ্যই আমি পৃথিবী ও পর্বতরাজির নিকট আমানত পেশ করলাম, তারা ভীত হলো। কেবল মানুষ একে গ্রহণ করলো। নিঃসন্দেহে মানুষেরা শ্রেষ্ঠ জালেম এবং জাহেল।'

মানুষকে জালেম বা অত্যাচারী বলা হয়েছে এ কারণে যে, তারা আত্মঅত্যাচার করেছে। যে দায়িত্ব গ্রহণ করার যোগ্যতা তাদের নেই, সে দায়িত্ব তারা স্কন্ধে তুলে নিয়েছে। জাহেল বা মূর্খ বলা হয়েছে এ কারণে যে, আমানতের গুরুভার সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। কিন্তু এই অত্যাচার ও অজ্ঞতাই তাদেরকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করেছে। আলমে কবীর যাকে নেয়নি, তাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে তারা। তাই তারা বাহ্যত ক্ষুদ্র জগত (আলমে সগীর) হলেও কার্যতঃ মহাবিশ্ব (আলমে কবীর) অপেক্ষা উর্ধ্বে। আল্লাহ্পাক তাই এরশাদ করেছেন, জমিন ও আসমান আমাকে ধারণ করতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত মু'মিন বান্দার ক্বলব আমাকে ধারণ করতে পারে।

হজরত আদমকে যে ইতোমধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, ফেরেশতারা তা জানতেন না। আমি জানি যা তোমরা জানো না – এ কথা দ্বারা সে বিষয়টি প্রকাশ পায়। পৃথিবীর সকল প্রকার মাটি এবং সকল ধরনের পানি একীভূত করে আল্লাহ্পাক তাঁকে সৃষ্টি করেছেন এবং রূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তাঁকে দান করেছেন জীবন। সৃষ্টি-গৌরব হজরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, এক দলা মাটি থেকে আল্লাহ্পাক হজরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন। ওই মাটিটুকুর মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর সকল ধরনের মাটি। তাই তাঁর সন্তানেরা বিভিন্ন বর্ণের। কেউ কালো, কেউ শাদা। আবার কেউ বিভিন্ন মিশ্র বর্ণের। তাদের স্বভাব বৈশিষ্ট্যও বিভিন্ন প্রকারের। কেউ উগ্র, কেউ নম্র। কেউ উৎকৃষ্ট, কেউ নিকৃষ্ট। আবার কেউ পূতঃপবিত্র অন্তরের অধিকারী। হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, বায়হাকী, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে মারদুবিয়া এবং হাকেম।

আমি বলি, সারা জগতের মাটি একত্রীকরণের রহস্য এই যে, সকল প্রকারের কর্মদক্ষতা যেনো হজরত আদমের মাঝে সন্নিবেশিত হয়। আল্লামা বাগবী বলেন, আল্লাহ্পাক যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি ভূপৃষ্ঠে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে যাচ্ছি, তখন তাঁদের মধ্যে এ মর্মে আলাপচারিতা শুরু হয়ে গেলো যে, আল্লাহ্পাক যা খুশী তাই করতে পারেন। কিন্তু তিনি আমাদের চেয়ে উত্তম কোনো সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করবেন না। যদি করেনও তবে জ্ঞানের দিক থেকে আমরা তাদের চেয়ে অগ্রগামী থেকেই যাবো। কারণ, তার চেয়ে অনেক আগেই আমাদেরকে সৃজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা অনেক আশ্চর্যজনক বস্তু দর্শন

www.eelm.weebly.com

করেছি, মানুষের সে সৌভাগ্য হয়নি। তাদের এই আলাপচারিতার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্তায়ালা আদমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে দিচ্ছেন এভাবে–

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩১

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ
اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

❒ এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে-সমুদয় ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

সকল কিছুর নাম বলতে কী বুঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে হজরত আদমকে সমস্ত সৃষ্টির নাম বা শিরোনাম শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বাগবী বলেছেন, তাঁকে প্রতিটি বস্তুর নাম শিক্ষা দেয়া হয়েছে—এমন কি পেয়ালা পিরিচের নামও। এ বর্ণনাটি তিনি এনেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদা থেকে। কেউ কেউ বলেছেন, অতীত ও ভবিষ্যতের সমুদয় বস্তুর নাম শেখানো হয়েছে তাঁকে। রবী বিন আনাস বলেছেন, তাঁকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে ফেরেশতাকুলের নাম। কেউ বলেছেন, তাঁর সন্তানদের নাম। কেউ বলেছেন, সকল কারিগরি বস্তুর নাম। ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, তাঁকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে পৃথিবীর সকল ভাষা– যে ভাষায় মানুষেরা কথা বলে। আমি বলি, উল্লেখিত অভিমতসমূহ আমার নিকট পছন্দনীয় নয়। কেনোনা, সওয়াব ও নৈকট্যের ভিত্তিতেই মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয়। উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলোর কোনোটিই মর্যাদা নির্ণায়ক নয়। বর্ণিত বিষয়গুলো সমস্তই পার্থিব। নবী ও রসুলগণের পার্থিব জ্ঞান অন্যাপেক্ষা অধিকতর নাও হতে পারে। যদি উপরের ব্যাখ্যাগুলো গ্রহণ করা হয়, তবে মর্যাদার দিক থেকে হজরত মোহম্মদ স. অপেক্ষা হজরত আদমই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিতে হবে। তিনি স. সকল ভাষায় পন্ডিত ছিলেন না। কারিগরি বা অন্যান্য পার্থিব বিষয়ের জ্ঞানও তাঁর অধিক ছিলো না। তিনি স. বলেছেন, পার্থিব ব্যাপারে তোমরা আমার চেয়ে বেশী জানো। তাই আমার মতে, 'যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন'– এ কথার অর্থ, আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমকে তাঁর নিজের সমুদয় নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। কেউ হয়তো বলতে পারেন, আল্লাহ্তায়ালার নাম তো অশেষ। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন, যদি আল্লাহ্পাকের নামসমূহ লিখতে সাগরের পানিকে

www.eelm.weebly.com

কালিরূপে ব্যবহার করা হয়, তবে তাঁর নাম শেষ হওয়ার পূর্বেই সাগরের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে। অন্যত্র এরশাদ করেছেন, ওয়ালাও আন্নামা ফিল্ আরদ্বে মিন্ শাজারতিন্ আকলামুন ওয়াল্ বাহ্‌রু ইয়ামুদ্দুহু মিম্ বায়্‌দিহি সাবয়াতু আব্‌হুরিন মা নাফিদাত্ কালিমাতুল্লাহ্'। এই আয়াতগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠতে পারে– মানুষের সীমিত জ্ঞানে আল্লাহ্‌পাকের অশেষ নামের সংকুলান হবে কি করে? রসুল মোহাম্মদ স. তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, আয় আল্লাহ্‌পাক! আমি তোমার ওই নামের মাধ্যমে নিবেদন করছি, যে পবিত্র নাম তোমার পরম সত্তা-সংশ্লিষ্ট এবং ওই সকল নামের ওসীলা গ্রহণ করছি, যে সকল নাম তোমার অবতীর্ণ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। আর ওসীলা গ্রহণ করছি ওই সকল নামেরও যা তোমার সৃষ্টিজগতের কাউকে শিখিয়েছো, ওই সমস্ত নামেরও যে সম্পর্কে কারো কোনো জ্ঞান নেই। এই হাদিস হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে হাব্বান, হাকেম, ইবনে আবী শায়বা, তিবরানী ও আহমদ। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌পাকের অনেক নাম তিনি ভিন্ন অন্য কেউ জানে না। হজরত আদমকে যদি আল্লাহ্‌পাকের সমুদয় নাম শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে, তবে আরেকটি জটিলতার সৃষ্টি হয়। যে নামগুলো অন্য কেউই জানে না, সেগুলো তিনি জানবেন কীভাবে? এই জটিলতার নিরসন এভাবে হওয়া সম্ভব যে, নাম সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান নয়, সীমিত জ্ঞান তাঁকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো। তিনি ছিলেন পরম প্রেমময় প্রভুপ্রতিপালক আল্লাহ্‌তায়ালার পরম সত্তার নিগুঢ় সাহচর্যধন্য এবং বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী। অনন্য সাহচর্য এবং নিগুঢ় সৌভাগ্যের কারণেই তিনি এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন যে, যখনই তিনি তাঁর সত্তাগত নাম ও গুণাবলীর প্রতি চিত্তসংযোগ করতেন, তখনই তা দিবালোকের মতো প্রতিভাসিত হয়ে উঠতো। বিষয়টি ওই সুযোগ্য ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির মতো, যিনি কোনো সমস্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে সাথে সাথে মানসপটে ভেসে ওঠে তার সমাধান।

যদি কোনো প্রতিবাদকারী এই মর্মে প্রতিবাদ উত্থাপন করে যে, আমার এই ব্যাখ্যা মনগড়া এবং অনুমাননির্ভর। এরকম অনুমান নির্ভর ব্যাখ্যা হারাম। পূর্ববর্তী তাফসীরবিদগণের ব্যাখ্যার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল। তাছাড়া হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন মজীদের খেয়ালী ব্যাখ্যা করে সে যেনো জাহান্নামে তার ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়। আরো বর্ণিত হয়েছে– অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্‌র কালাম সম্পর্কে কেউ যদি কিছু বলে, সে যেনো তাঁর আবাসস্থল হিসেবে খুঁজে নেয় দোজখকে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিস শরীফে উল্লেখিত এই ভর্ৎসনা কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য, যারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত সম্পর্কে স্বকপোলকল্পিত কাহিনী নির্মাণ করে। ব্যাখ্যা হতে হবে ওহী বা প্রত্যাদেশ নির্ভর। নিছক বুদ্ধিনির্ভর নয়।

www.eelm.weebly.com

তাফসীর (ব্যাখ্যা) শব্দটি তাফসীরাহ্ শব্দটি থেকে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। প্রস্রাব ভর্তি বড় বোতলকে বলা হয় তাফসীরাহ্, যা দেখে চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করতে পারে। তেমনি মুফাসসির (ব্যাখ্যাকার) তাকেই বলা যেতে পারে, যিনি আয়াতের শানে নুজুল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ) এবং সে সম্পর্কিত কাহিনী বর্ণনা করেন। তাফসীরের অর্থই হচ্ছে শানে নুজুল বর্ণনা করা। বিষয়টি এবার পরিষ্কার যে, ওই তাফসীর নিষিদ্ধ যার শানেনুজুল সঠিক নয়। কিন্তু আয়াতের ভাবগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই নিষিদ্ধতা নেই। তাবীর বা ভাবগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে হতে হবে পূর্বাপর সকল আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল এবং কোরআন ও সুন্নাহ্র পূর্ণানুকূল। এরকম ব্যাখ্যা অগ্রহণীয় নয়। জ্ঞানপ্রবীণগণ এরকম ব্যাখ্যার বিরোধী নন। তাবীল শব্দটি গঠিত হয়েছে আওল শব্দ থেকে, যার অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন— রসুল পাক স.এরশাদ করেন, সাত রকম অক্ষরবিন্যাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। প্রতিটি আয়াতের একটা বহিরাবরণ এবং একটি অন্তরায়ন রয়েছে। এতদোভয়ের সীমারেখায় একটি উদয়স্থল রয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন— কোরআন পাক অবতীর্ণ হয়েছে সাতটি আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গিকে মান্য করে। প্রতিটি বর্ণের রয়েছে একটি প্রকাশ্য দিক, আরেকটি আধ্যাত্মিক দিক। উভয় দিকের সীমা রেখায় রয়েছে, একটি করে আবির্ভাব স্থল। বাগবী বলেছেন, উদয়স্থল অর্থ আরোহনস্থল। আল্লাহ্পাক যাঁকে জ্ঞান দান করেন, সে-ই জ্ঞানারোহী হয়। এটা কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে নিষ্ঠাবান গবেষকদের প্রতি আল্লাহ্পাক গুঢ় অর্থের দ্বার উন্মোচন করবেন। কাউকে দানে ধন্য করবেন, কাউকে করবেন বঞ্চিত। আল্লাহ্পাক নিজেই এরশাদ করেছেন, 'জ্ঞানবান অপেক্ষা রয়েছে অধিক জ্ঞানবান'।

আমি বলি, বর্ণনার পরম্পরা লংঘিত হয়েছে বলে যদি আমার অভিমতের প্রতি আপত্তি তোলা হয়, তবে আমি বলবো, আমার অভিমত অন্য তাফসীরকারদের মতের সঙ্গে মিলেনি এ কথা ঠিক। কিন্তু তাঁদের মতামতগুলোও রসুলস. এর সরাসরি কোনো বাণী নয়। তাঁরা গবেষণা করেছেন। কিন্তু গবেষণার ফলাফল একরকম হয়নি। আমার বক্তব্যও সে রকমই গবেষণা নির্ভর। সকল বস্তুর নাম (এমনকি পেয়ালা পিরিচেরও), বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকলের নাম, সন্তান-সন্ততিগণের নাম, সকল কারিগরি কৌশলের নাম—এ সকল ব্যাখ্যা আমার প্রদত্ত ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ প্রতিকূল কিন্তু নয়। যেমন, আল্লাহ্তায়ালার একটি নাম হচ্ছে আল আউয়াল। যার অর্থ, তাঁর পূর্বে কিছুই ছিলো না। আরেকটি নাম 'আল আখির'। অর্থাৎ যাঁর পরেও কিছু নেই। তেমনি তাঁর আরেক নাম 'আজ্জাহির' (প্রকাশ্যতম)। আরেকটি নাম 'আল বাতিন' (গোপনতম)। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস প্রকাশ্য বস্তুসমূহের নামের কথা বলেছেন। বিষয়টিকে সর্বসাধারণবোধ্য করে তোলাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। কারণ, সাধারণের জ্ঞান

www.eelm.weebly.com

অনুযায়ী কথা বলাই ছিলো জ্ঞানপ্রবীণগণের রীতি। আল্লাহ্পাকই প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত।

তাফসীরবিদগণ বলেছেন, 'আরাদ্বাহুম' শব্দটিতে যে, 'হুম' সর্বনামটি রয়েছে তা দ্রব্য-সামগ্রীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। যদিও দ্রব্য-সামগ্রীর কথা আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়নি। এই দ্রব্যসম্ভারের নামই হজরত আদমকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো। 'হুম' সর্বনাম পুংলিঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এতে করে বুঝা যায়, জ্ঞানবানগণও এর অন্তর্ভুক্ত। আমার অভিমত ছিলো, 'আসমা' বা নাম বলতে এখানে আসমায়ে ইলাহিয়া বা আল্লাহ্তায়ালার নাম মনে করতে হবে। এই অভিমতটি গ্রহণ করলে 'আরাদ্বা হুম' শব্দের হুম সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে হজরত আদমের সঙ্গে। সর্বনামটি বহুবচন তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, হজরত আদমের সঙ্গে বহুবচন সর্বনামটি যুক্ত হয় কিভাবে। জবাবে বলতে হয়, হজরত আদমের মর্যাদার আধিক্য বুঝাতেই এ রকম করা হয়েছে। আরেকটি জবাব হচ্ছে, হজরত আদম বলতে এখানে বনী আদম (আদম সন্তানগণ) বুঝানো হয়ে থাকবে। পূর্ব পুরুষের নামের সঙ্গে পরবর্তী বংশধরেরা পরিচিত হয়। এটি একটি বহুল প্রচলিত নিয়ম। যেমন রবীয়া, মুজার—এগুলো বিভিন্ন গোষ্ঠির পূর্ব পুরুষদের নাম। কাযী বায়যাবী বলেছেন, আলা খওফিম্‌মিন ফির আউনা ওয়া মালাইহিম— এই আয়াতের অর্থও এ রকমই। প্রকাশ্যতঃএকথাও জানা গিয়েছে যে, আল্লাহ্পাক হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে নবী রসুলগণকে বের করে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করেছিলেন এবং সকলের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। হজরত মোহাম্মদ স. হজরত নূহ, হজরত ইব্রাহিম, হজরত মুসা এবং হজরত ঈসা আলাইহিমুস্সালাম— সকলেই ছিলেন ওই অঙ্গীকারানুষ্ঠানের অন্তর্ভুত। তদসত্ত্বেও এখানে হুম সর্বনামটি হজরত আদমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়াই অধিক সমীচীন। কেনোনা নবী রসুলগণের নামগুলো এই সর্বনামের পূর্বে উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া এই সর্বনামের পূর্বে স্পষ্ট করে হজরত আদমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং কষ্টকর বিশ্লেষণের প্রতি ধাবিত না হওয়াই উত্তম। হজরত উবাই বিন কাব আরাদ্বাহুম শব্দটিকে পাঠ করতেন 'আরাদ্বাহা' এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ পাঠ করতেন— আরাদ্বাহুন্না। তাঁদের পাঠ অনুযায়ী হুম সর্বনামটি হজরত আদমের নামের সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়।

ফেরেশতাগণ প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব বহন করার উপযোগী নন। একটি প্রশ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা এ কথাটি প্রমাণ করে দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো এই, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো'। তাফসীরবিদগণের একটি বড় দলের অভিমত হচ্ছে, 'এই সমুদয়' বলতে পৃথিবীর দ্রব্যসামগ্রীর কথা বলা হয়েছে। আর আমার অভিমতানুসারে অর্থ হবে, 'এই সমুদয়ের নাম' অর্থ যা হজরত আদম ও তাঁর সন্তানেরা জানেন— ওই নামসমূহ তোমরা বলো।

www.eelm.weebly.com

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে — রসুল স. বলেন, আমি তখনও নবী ছিলাম, যখন হজরত আদম ছিলেন আত্মা এবং শরীরের মধ্যবর্তী স্থলে। রসুল স. এর পবিত্র অবয়ব বর্ণনা করতে যেয়ে এ রকম বলেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, তিবরানী এবং আবু নাঈম। বর্ণনা করেছেন আবুল জাদআর মাধ্যমে ইবনে সা'দ। এই হাদিস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, নবী রসুলগণের জন্য নির্ধারিত জ্ঞান নবুয়তের পূর্ণত্ব এবং তাজাল্লীয়ে জাতী (পরমসত্তার জ্যোতি) হজরত আদমের সৃষ্টির পূর্বেই হজরত মোহাম্মদ স. কে দেয়া হয়েছিলো এবং তখনো তিনি (হজরত মোহাম্মদ) আত্মা ও দেহ বিশিষ্ট ছিলেন। কেননা সত্তাসম্ভূত পূর্ণ জ্যোতি ধারণ করতে পারে কেবল মৃত্তিকা। মৃত্তিকা ব্যতীত দেহ গঠিত হয় না। হজরত আদমও আত্মা ও দেহবিশিষ্ট হওয়ার পর তাঁর অনাগত সন্তানদের রূহ বা আত্মাকে তাঁর পৃষ্ঠদেশে ধারণ করতে পেরেছিলেন এবং পরম সত্তার জ্যোতি অধিক গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করেছিলেন।

'যদি তোমরা সত্যবাদি হও'— এ কথার অর্থ তোমরা তো ধারণা করো, তোমরা আদমের চেয়ে উত্তম। এই দাবীকে যদি তোমরা সত্য বলেই মনে করো, তবে ওই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যা হজরত আদম এবং তাঁর সন্তানেরা বলতে সক্ষম।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩২

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○

❒ তাহারা বলিল, 'আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নাই। বস্তুতঃ আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।'

আল্লাহ্পাকের প্রশ্নের ধরণ দেখে ফেরেশতারা বুঝলেন, তাঁদের চেয়ে হজরত আদমই অধিক জ্ঞানী ও উত্তম। তাঁরা আল্লাহ্তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হলেন এই ভেবে যে, তিনি এই প্রশ্নের মাধ্যমে দয়া করে প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানদান করেছেন। তাঁরা তখন এমনভাবে জবাব দিলেন যাতে পূর্ণ বিনয় এবং হজরত আদমের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বললেন, আপনি পবিত্র, মহান। আপনার বক্তব্য, ক্রিয়াকলাপ, তত্ত্বজ্ঞানহীনতা থেকে পবিত্র। আমরা জানি না। আমাদের জ্ঞান কখনই আপনার অনির্ণেয় জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করতে সক্ষম নয়। আপনিই প্রকৃত জ্ঞানী, বিজ্ঞানবিভূষিত। আমরা কেবল অতটুকুই জানি যতটুকু আপনি আমাদেরকে দয়া করে শিখিয়েছেন।

www.eelm.weebly.com

আয়াত শেষে আল্লাহ্পাকের দু'টি গুণবাচক নাম বিবৃত হয়েছে। একটি হচ্ছে আলিম। অপরটি হাকিম। আলিম অর্থ জ্ঞানী, ন্যায় পরায়ণ বিচারক। হাকিম অর্থ যিনি আপন বিধানকে সুস্পষ্ট, সঠিক ও সুদৃঢ় করেন।

ফেরেশতাগণ যখন তাঁদের পূর্ণ অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন, তখন আল্লাহ্তায়ালা ইচ্ছা করলেন, হজরত আদমকে প্রদত্ত অনুগ্রহ ফেরেশতাদেরকেও দান করবেন। তাই তিনি হজরত আদমকে নাম সমূহের বিবরণ দিতে বললেন। তাই পরের আয়াতে বলা হয়েছে –

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩৩, ৩৪

قَالَ يَآدَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ۝

❐ তিনি বলিলেন, 'হে আদম! উহাদিগকে ইহাদের নাম বলিয়া দাও।' যখন সে তাহাদিগকে উহাদের নাম বলিয়া দিল তিনি বলিলেন, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে স্বর্গ ও মর্তের অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি অবহিত এবং তোমরা যাহা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ নিশ্চিতভাবে আমি তাহা জানি?'

❐ যখন ফেরেশতাদের বলিলাম, 'আদমের প্রতি নত হও,' তখন ইবলীস্ ব্যতীত সকলেই নত হইল; সে অমান্য করিল ও অহংকার করিল। সুতরাং সে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

তাফসীরকারদের বক্তব্য অনুসারে 'বি আসমায়িহিম' শব্দের হুম সর্বনামটি ওই নাম সমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত যা আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমকে শিখিয়েছিলেন। আর আমার ব্যাখ্যানুসারে সর্বনামটি ফেরেশতাদের সঙ্গে সম্বন্ধিত। এই বক্তব্যানুযায়ী বাক্যটির অর্থ হবে এরকম– হে আদম! তুমি ফেরেশতাদেরকে ওই সব নাম জানিয়ে দাও, যে সব নাম জানবার যোগ্যতা আমি তাদেরকে দান করেছি। এখানে আসমায়িহিম এর স্থলে আসমায়িকুম বলা হয়নি। যদি এরকম হতো তবে বুঝা যেতো হজরত আদম যে নামগুলো জানেন তার

www.eelm.weebly.com

সবগুলোই ফেরেশতাদেরকে শিক্ষা দেয়ার হুকুম দিয়েছেন আল্লাহ্পাক। কিন্তু সকল নাম জানবার যোগ্যতা তাদের নেই। যদি থাকতো, তবে তাঁরাও মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের সমান্তরালে এসে দাঁড়াতেন। তাই আসমায়িকুম না বলে আসমায়িহিম বলা হয়েছে। যাতে করে বুঝা যায়, আল্লাহ্তায়ালা ফেরেশতাদের জ্ঞান অনুযায়ী জ্ঞানদান করতে হুকুম দিয়েছেন হজরত আদম আ.কে।

হজরত আদম আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ যথাপ্রতিপালন করলেন। তখন আল্লাহ্তায়ালা বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি, আকাশমন্ডল এবং মৃত্তিকামন্ডলের সকল সংগুপ্ত বিষয়াবলী আমি সম্পূর্ণ অবহিত। 'আমি কি তোমাদের বলিনি'– একথাটি ইতোপূর্বে উল্লেখিত আয়াতের (আয়াত ৩০) ওই বাক্যটির প্রতি ইঙ্গিত, যেখানে বলা হয়েছে, 'ইন্নি আ'লামু মালা তা'লামুন' (আমি জানি যা তোমরা জানো না)। ইমামে হারামাইন এবং আবু আমর ইন্নি শব্দটি যবরযুক্ত ইয়া সহযোগে পাঠ করেছেন। এই নিয়মে সকল সম্বন্ধ পদে ইয়া অক্ষরটি থাকার কথা। তবে এরপর যদি জবরবিহীন আলিফ থাকে তবে যবর সহযোগে পাঠ করা যাবে। কিছু অক্ষর অবশ্য এই বিধানের বাইরে। যথাস্থানে এ সম্পর্কিত আলোচনা আসবে। অন্যান্য ক্বারীগণ কয়েকটি স্থান ব্যতীত এরকম 'ইয়া'তে যবরযুক্ত করেন না। ইনশাআল্লাহ্, যথাস্থানে এ সমস্তের আলোচনা এসে যাবে।

আয়াতের শেষ দিকে বলা হয়েছে, 'তোমরা যা ব্যক্ত করো এবং গোপন করো, আমি সে সকল বিষয় নিশ্চিতভাবে জানি।' এখানে 'ব্যক্ত করো' বলে ফেরেশতাদের ওই উক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেখানে তাঁরা বলেছিলেন, 'আতাজয়ালু ফিহা মাঁই ইয়ুফছিদু ফিহা।' (তারা সেখানে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে)। আর 'গোপন রাখো' বলে ফেরেশতাদের ওই আলাপচারিতার দিকে নির্দেশ করা হয়েছে যা তারা নিজেদের মধ্যে সঙ্গোপনে করেছিলেন। বলেছিলেন, আল্লাহ্পাক আমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন কাউকে সৃষ্টি করবেন না।

হজরত আদমের পবিত্র শরীর যখন মক্কা শরীফ ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে পতিত অবস্থায় ছিলো তখন ইবলিস তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলে ফেললো, একে আবার কেনো সৃষ্টি করা হলো। এরপর ইবলিস হজরত আদমের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করলো। মুখ-গহবর পথে প্রবেশ করে পশ্চাদ্দেশ দিয়ে বের হয়ে গেলো। বললো, এ কেমন সৃষ্টি, যে কোনো কিছু থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। এর অভ্যন্তর ভাগ যে একেবারে শূন্য। এরপর সে তার সঙ্গী ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো, ধরে নাও এই সৃষ্টিটি তোমাদের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ্পাক যদি তোমাদেরকে এর আনুগত্যের নির্দেশ দেন, তবে তোমরা কী করবে? সঙ্গীরা সমস্বরে জবাব দিলেন, আমরা আমাদের মহিমময় ও প্রতাপশালী প্রভুপালকের নির্দেশ মান্য করবো। ইবলিস মনে মনে বললো, আমি

www.eelm.weebly.com

যদি তার উপর প্রাধান্য পাই তবে তাকে ধ্বংস করে ফেলবো। আর সে যদি প্রাধান্য পায় তবে আমি তাকে অমান্য করবো। আমি হবো বিরোধী, বিদ্রোহী। ইবলিসের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ ঘোষিত হলো, 'আদমের প্রতি নত হও।' আয়াতে নির্দেশ পালনকারী হিসেবে ফেরেশতাদের কথা এসেছে এবং ইবলিসের অমান্য করার কথাও এসেছে। বলা হয়েছে, 'ইবলিস ব্যতীত সকলেই নত হলো।' সে (ইবলিস) অমান্য করলো ও অহংকারী হলো। সুতরাং সে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। 'গোপন রাখো' বলে ইবলিস অন্তরে হজরত আদমের প্রতি যে হিংসা গোপন রেখেছিলো, সে সম্পর্কেও ইঙ্গিত করা হয়ে থাকবে। তখন ব্যক্ত করা ও গোপন করার ব্যাপারটি দাঁড়াবে এরকম— ফেরেশতাদের প্রকাশ্য মান্যতা এবং ইবলিসের গোপন অভিসন্ধি, সকল কিছুই আল্লাহ্তায়ালা নিশ্চিতরূপেই জানেন।

আয়াতে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে যে, নবীগণ আল্লাহ্পাকের বিশেষ বান্দা। এই বিশিষ্ট বান্দাগণ বিশিষ্ট ফেরেশতাদের থেকে উত্তম। ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছেন হজরত জিব্রাইল আ.। আল্লাহ্পাক তাঁকে রসুলগণের প্রতি দূত হিসেবে নির্বাচন করেছেন। এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা।

আলেমগণ বলেছেন, সাধারণ মানুষ অর্থাৎ অলি আল্লাহ্গণ (নেককার ও মুত্তাকীগণ) সাধারণ ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম। এই অভিমতটি অবশ্য কোরআনপাক দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। তবে অনেক হাদিসে এর প্রমাণ রয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাকের নিকট কোনো কোনো মু'মিন কোনো কোনো ফেরেশতার চেয়ে উত্তম। ইবনে মাজা। হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে— মহানবী স. বলেন, আল্লাহ্পাক হজরত আদম ও তাঁর সন্তানদেরকে সৃষ্টি করলে ফেরেশতাবৃন্দ বলেছিলেন, হে আমাদের মহান প্রতিপালক! মানুষেরা পানাহার করেন, পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন, পশুর উপরে আরোহন করেন। আমাদেরকে তো এসব কোনো কিছুই করতে হয় না। আপনি বরং তাঁদের জন্য দুনিয়া নির্ধারণ করে দিন। আর আমাদের জন্য নির্ধারণ করুন আখেরাত। আল্লাহ্পাক বললেন, এ কেমন কথা? যাকে আমি আপন হাতে সৃষ্টি করলাম, যার মধ্যে স্বীয় রূহ ফুৎকার করলাম, তাকে আমি কেমন করে ওই সকল সৃষ্টির সমতুল করে দেবো - যারা আমার 'কুন' কথার সাথে সাথে সৃষ্টি হয়েছে। শো'বুল ইমানে ইমাম বায়হাকী এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। আদম সন্তানেরা বেহেশতে আল্লাহ্পাকের দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবেন। ফেরেশতামন্ডলী এই মহিমান্বিত সম্পদ এবং শ্রেষ্ঠ গণিমত থেকে বঞ্চিত থাকবেন! এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, মানুষ ফেরেশতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেবল অলি বেহেশতে আল্লাহ্পাকের দীদার লাভ করবেন তাই নয়, সাধারণ বিশ্বাসীরাও এ নেয়ামত লাভে ধন্য হবেন। অবশ্য মর্যাদার

www.eelm.weebly.com

তারতম্যহেতু দর্শনেরও ন্যূনাধিক্য থাকবে। কেউ প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা, কেউ সপ্তাহান্তের শুক্রবারে দর্শন লাভ করবেন। কেউ লাভ করবেন বছরে একবার। আবার কেউ সুদীর্ঘ দিবস পরে। এভাবে দেখা যাচ্ছে, সকল ধরনের বিশ্বাসীরাই সাধারণ ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বিশ্বাসীরা যদি ফাসেক, ব্যভিচারী অথবা অবাধ্যও হয় তবুও তারা শাস্তি ভোগের পর বেহেশতে প্রবেশ করবেন। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, মাই ইয়া'মাল মিসক্বলা জাররাতিন খইরঁই ইয়ারাহ্ – যে অনু পরিমাণ সৎ আমল করবে সে তাও দেখতে পাবে। মহানবী স. বলেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণকারীর অন্তরে গমের দানা পরিমাণ সৎকর্ম অবশিষ্ট থাকলেও– অথবা বলেন, ইমানের কণা অবশিষ্ট থাকলেও দোজখ থেকে নিষ্কৃতি পাবে। হজরত আনাস থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। হজরত আবু জর গিফারী থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ করে, আর ওই অবস্থায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করবে; যদিও সে চুরি করে ও ব্যভিচারী হয়, যদিও সে চোর হয় ও ব্যভিচার করে, যদিও সে চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয় এবং ব্যভিচারাভ্যস্ত হয়। আবু জর যদি এতে অসন্তুষ্ট হয় তবুও। কিন্তু বুদ্ধি বলে, নিষ্পাপ ফেরেশতা অপেক্ষা পাপাচারী মানুষের উত্তম হওয়া উচিত নয়। শরিয়তও তাই বলে। আর আল্লাহ্পাকও এরশাদ করেছেন, 'আমি কি পাপীদের সমান্তরালে আমার অনুগতদের রাখবো?' এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এটা তো সুস্পষ্টই যে, পাপী মানুষ শাস্তি আস্বাদনের পর ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বেহেশতে প্রবিষ্ট হবে। সে শাস্তি হবে কখনো পার্থিব জীবনে বিভিন্ন বিপদাপদের মাধ্যমে। কখনো শাস্তি হবে কবরে অথবা দোজখে। খাঁটি তওবা করলে বিনা শাস্তিতে জান্নাত লাভ হতে পারে। অপর দিকে আল্লাহ্পাকের করুণাভাজন যাঁরা, তাঁরা তওবা অথবা শাস্তি ব্যতিরেকেই বেহেশতে প্রবেশ করবেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যেভাবেই হোক শাস্তি ভোগের পর ক্ষমাপ্রাপ্ত পাপীরা আর পাপী থাকেন না। তাঁরা তখন অলি, নেককার ও মুত্তাকীদের দলভুক্ত হয়ে যান। যদিও অলিগণের সুউন্নত মর্যাদার স্তরে উন্নীত হন না। সিদ্ধান্ত তো শেষ পরিণতিনির্ভরই হওয়া উচিত। তাহলে সাধারণ মানুষ যে সাধারণ ফেরেশতার চেয়ে উত্তম– এ কথা বলতে বাধা কোথায়? আল্লাহ্পাকই সমধিক পরিজ্ঞাত।

এই আয়াতে আরো একটি বিষয় জানা গেলো যে, ফেরশতাগণের জ্ঞানভান্ডার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পারে। মনুষ্যজাতির মাধ্যমে তাঁরা জ্ঞানলাভ করতে পারেন। কেউ যদি বলেন, কথাটা ঠিক নয়, কারণ আল্লাহ্পাক অন্যত্র বলেছেন, প্রত্যেক ফেরেশতার পদমর্যাদা ও অবস্থানস্থল সুনির্ধারিত। জবাবে একথা বলা যায় যে, এই আয়াতের মূল মর্ম হচ্ছে এরকম– আল্লাহ্তায়ালার নাম ও গুণাবলীর স্তরে ফেরেশতাদের অধিকতর উন্নতি লাভ হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাঁরা পরম সত্তা (মাকামে জাত) পর্যন্ত উন্নতি করতে পারেন না।

www.eelm.weebly.com

ক্বারী আবু জাফর 'লিল মালা-ইকাতি' এর স্থলে পাঠ করেছেন 'লিল মালা-ইকাতু' অন্য একস্থানে উল্লেখিত কুররব্বিকুম কেও তিনি পাঠ করতেন কুর্‌রব্বুকুম। অন্য ক্বারীগণ উভয় স্থানে যের সহযোগে পাঠ করেছেন।

সুজুদ শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিনয়। শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ ইবাদতের উদ্দেশ্যে মাটিতে মস্তক স্থাপন করা। ফেরেশতাদেরকে যে সেজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, সম্ভবত সে সেজদার মর্ম হবে সেজদায়ে শরিয়াহ। সেজদার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বয়ং আল্লাহ্। আর হজরত আদমের মর্যাদার আধিক্য প্রকাশ করার লক্ষ্যে হজরত আদমকে নির্বাচিত করা হয়েছে কেবলা। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ ও মুসলিম বর্ণিত হাদিসটিও এই অর্থটি বহন করছে, যেখানে বলা হয়েছে - রসুল স. এরশাদ করেছেন, যখন মানুষ সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করে এবং সেজদাবনত হয়, তখন শয়তান এক কোনে যেয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাঁদতে তাকে। বলে, হায় আক্ষেপ! মানুষকে সেজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা সেজদা করে জান্নাত লাভ করছে। আমাকেও সেজদা করতে বলা হয়েছিলো, কিন্তু আমি করি নাই। এখন জাহান্নামই আমার পরিণাম।

আমি মনে করি, 'লি আদামা' শব্দের 'লাম' অব্যয়টি ইলা (প্রতি) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে এ রকম– আদমের প্রতি মনোনিবদ্ধ (মোতাওয়াজ্জোহ্) করে আমাকে সেজদা করো। কবি সাহাবী হজরত হাস্‌সান রা. হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর প্রশংসাসূচক একটি কবিতায় ইলা অর্থে লাম ব্যবহার করেছেন। কবিতাটি হচ্ছে–

আলাইসা আউয়ালু মান সাল্লা লি ক্বিবলাতিকুম
ওয়া আরাকান্নাসি বিল কুরআনি ওয়াস্ সুনান

অর্থঃ হজরত আবু বকর কি ওই সকল লোকদের প্রথম নন যাঁরা কেবলামুখি হয়ে নামাজ আদায় করেন। আর তিনি কি কোরআন ও সুন্নাহ্‌র উপরে সর্বাধিক অভিজ্ঞ নন? কবিতায় 'লি ক্বিবলাতিকুম' শব্দটির লাম ব্যবহৃত হয়েছে ইলা (প্রতি) অর্থে।

হজরত আদম সৃষ্টির প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে ফেরেশতাবৃন্দের পক্ষ থেকে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিলো। তাই তওবা হিসেবে তাঁদের দায়িত্বে একটি সেজদা অবধারিত হয়ে যায়। এই সেজদার পরোক্ষ কারণ ছিলেন হজরত আদম। তাই– লি আদামা (আদমের জন্য) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এ রকম– আদমের কারণে আমাকে সেজদা করো। এই নিয়মে 'লি আদামা' শব্দের 'লাম' অব্যয়টিকে কারণ বাচক (সবব) হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, সল্লি লি দুলুকিশ্‌শাম্‌স (সূর্য হেলে পড়ার কারণে নামাজ আদায় করো)। এখানেও কারণ হিসেবে 'লাম' ব্যবহৃত হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

আভিধানিক অর্থেও সেজদা শব্দটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করলে অর্থ দাঁড়াবে এ রকম– অভিবাদন ও সম্মান প্রদর্শনার্থে হজরত আদমের প্রতি সেজদাবনত হও। হজরত ইউসুফ আ. এর ভ্রাতাগণ সেজদার মাধ্যমে তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। বাগবী বলেছেন, এই তাফসীরটি সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি আরো বলেছেন, হজরত আদমকে সেজদার সময় ফেরেশতারা মাটিতে মাথা রাখেন নি। তাঁরা কিঞ্চিত অবনমিত হয়ে তাঁর প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করেছিলেন। শেষ নবী মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্ স. এর সময়ে সেজদার মাধ্যমে অভিবাদনের প্রথা রহিত হয়ে যায়। তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় সালাম আদান প্রদানের নিয়ম।

আমি বলি, হজরত আদম ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র পবিত্র নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাই হজরত আদমের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছিলো অনিবার্য। রসুল পাক স. বলেছেন, যারা মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় তারা আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ নয়। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন হাদিসটি সহীহ্।

'ইবলিস ব্যতীত সকলেই নত হলো' এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, সে ছিলো ফেরেশতাদের দলভুক্ত। এ রকম মনে করলে এ কথাটিও প্রমাণিত হয় যে, সকল ফেরেশতা নিষ্পাপ নয়। অধিকাংশ নিষ্পাপ। মানুষের মধ্যে যেমন অধিকাংশ পাপী। অল্প সংখ্যক নিষ্পাপ। কেউ কেউ বলেছেন, ইবলিস ছিলো জ্বিন সম্প্রদায়ভূক্ত। তবে সে লালিতপালিত হয়েছিলো ফেরেশতাদের সাহচর্যে। দীর্ঘদিন তাদের সঙ্গে বসবাস করার কারণে তার প্রতিও ফেরেশতা শব্দটি প্রযোজ্য হতো। এ রকমও বলা যায় যে, ফেরেশতাদের সঙ্গে জ্বিনদের প্রতিও সেজদার হুকুম জারি করা হয়েছিলো। কিন্তু উল্লেখকালে ফেরেশতাদের উল্লেখকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠদের প্রতি নির্দেশ জারি করলে অধস্তনরাও আপনা আপনি ওই নির্দেশের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। আলাদা করে অধস্তনদের উল্লেখ না করলেও চলে। এ রকম মনে করা যেতে পারে যে, ফেরেশতাদের একাংশ এবং জ্বিনেরা জাতিগতভাবে এক। তাদের মধ্যে রয়েছে কেবল বাহ্যিক পার্থক্য। কেউ অবশ্য এই মতবাদের বিরুদ্ধে ওই হাদিসটি উপস্থাপন করতে পারেন, যেখানে বলা হয়েছে– ফেরেশতাদের সৃষ্টি নূর থেকে, জ্বিনদের সৃষ্টি বিশুদ্ধ আগুন থেকে এবং মানুষের সৃষ্টি মাটি থেকে। হজরত আয়েশা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম। হাদিস দৃষ্টে বুঝা যায়, ফেরেশতা ও জ্বিন সত্তাগতভাবে পৃথক– তবুও একথা বলা সঙ্গত হবে যে, উক্ত হাদিসে জ্বিনদের এক বিশেষ প্রকারের কথা বলা হয়েছে, তাদের সঙ্গে ফেরেশতাদের সত্তাগত পার্থক্য রয়েছে। তারা স্ত্রীও নয়। পুরুষও নয়। তাই তারা বংশবৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যশূন্য। বিষয়টির ব্যাখ্যা এভাবেও করা যায় যে, নূর (আলো) এবং নার (আগুন) অবিকল এক না হলেও সমগোত্রীয়। পার্থক্য তো শুধু এতোটুকু যে, আগুনের চেয়ে নূর উজ্জ্বলতর। অন্য এক আয়াতে

www.eelm.weebly.com

বলা হয়েছে, অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্পাক ও জ্বিনদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক নির্ধারণ করেছে। তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা বলে– একথায় সুস্পষ্ট হয় যে, ফেরেশতা এবং জ্বিন মূলত এক। আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত।

ইবলিস আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ অমান্য করলো এবং অহংকার প্রদর্শন করলো। সে আদমকে সম্মান জানাবে না বলে পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। আল্লাহ্পাকের নির্দেশ সত্ত্বেও সে স্বীয় সিদ্ধান্তে অটলই রয়ে গেলো। এভাবে সে হয়ে গেলো অবিশ্বাসীদের দলভুক্ত। কাফের। আল্লাহ্পাক অন্তর্যামী। শয়তান যে অন্তরে অন্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ছিলো, এই নির্দেশ অমান্য করার পর তার সত্য প্রত্যাখ্যান বা কুফরী সকলের নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়লো। অথবা এ রকম হতে পারে, সত্য প্রত্যাখ্যান তার আসল অবস্থা ছিলো না। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশকে অবজ্ঞা করার কারণে সে কুফরী করলো। হয়ে গেলো সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর সে অহংকারীও। তার অহংকার ছিলো এই– 'আমি তাঁর (আদমের) চেয়ে উত্তম।' অহংকারও কুফরী। কাফেরেরাই অহংকারী হয়ে থাকে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩৫

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

❒ এবং আমি বলিলাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস করো এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না; হইলে, তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

বেহেশতে নিতান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলেন হজরত আদম। তাঁর কোনো সাথীসহচর ছিলো না। একদিন তিনি যখন নিদ্রাভিভূত ছিলেন, তখন আল্লাহ্পাক তাঁর বাম পাঁজর থেকে সৃষ্টি করলেন হজরত হাওয়াকে। নিদ্রাভঙ্গ হলে তিনি দেখলেন, তাঁর শিয়রে উপবিষ্ট রয়েছেন এক রূপবতী নারী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? নবাগতা জবাব দিলেন, আমার নাম হাওয়া। আমি আপনার সহধর্মিনী। আল্লাহ্পাক আমাকে এ জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেনো আমরা পরস্পরের শান্তির কারণ হই।

আল্লাহ্পাক নতুন নির্দেশ জারি করে বললেন, 'তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস করো, যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার করো, কিন্তু ওই বৃক্ষটির নিকটে যেয়ো না, যদি যাও তবে তোমরা অন্যায় করবে।' এখানে আদেশের সঙ্গে রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। আদেশ ও নিষেধ সংবলিত হুকুমই অধিক শক্তিশালী। ওই বৃক্ষটির ফল ভক্ষণ করা না করার কথা এখানে বলা হয়নি। বৃক্ষটির নিকটবর্তী হওয়ার

www.eelm.weebly.com

বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এখানে শিক্ষণীয় এই যে, নিষিদ্ধতাকে গ্রহণ করা হারাম এবং নিষিদ্ধতার নিকটবর্তী হওয়াও অসমীচীন। নিষিদ্ধ কোনো কিছুর নৈকট্য নিষিদ্ধতা গ্রহণে আগ্রহী করে তোলে। আর এই আগ্রহাতিশয্যই মানুষকে শরিয়তের বিধান সম্পর্কে বেখবর করে দেয়। তাই যা গোনাহের নিকটবর্তী করে তা মাকরূহ।

ওই বৃক্ষটি বলতে কোন বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং হজরত মোহাম্মদ বিন কা'ব বলেছেন, ওই গাছটি ছিলো গম গাছ। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, আঙ্গুর গাছ। হজরত ইবনে জুরাইহ বলেছেন, ডুমুর গাছ। হজরত আলী বলেছেন, কর্পূর বৃক্ষ। কেউ কেউ বলেছেন, জ্ঞান বৃক্ষ। এ ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে যে, ওই বৃক্ষটি কি একটিই বৃক্ষ, না ওই প্রজাতির বৃক্ষের মধ্যে একটি।

তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে— এখানে অন্যায়কারী বুঝাতে 'জ্বলেমিন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'জ্বলেমিন' শব্দের অর্থ জীবন সংহারক। আর 'জুলুম' শব্দের অর্থ কোনো কিছুকে অপাত্রে স্থাপন করা।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩৬

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ ○

❑ কিন্তু শয়তান উহা হইতে তাহাদের পদস্খলন ঘটাইল এবং তাহারা যেখানে ছিলো সেখান হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিল। আমি বলিলাম, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নামিয়া যাও, পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল।'

'ফা আজাল্লা হুমাশ্ শাইত্বনু আনহা' (শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটালো) – এই বাক্যের 'আনহা' শব্দের 'হা' সর্বনামটি নিষিদ্ধ বৃক্ষটির দিকে সম্পর্কিত হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে, শয়তান ওই বৃক্ষটিকে মনোহররূপে উপস্থাপন করে হজরত আদমের পদস্খলন ঘটালো। সর্বনামটি যদি জান্নাতের সাথে সম্পর্কিত হয় তবে অর্থ হবে, শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করলো। 'শাতান' শব্দ থেকে শয়তান শব্দটি গঠিত হয়েছে। শাতান অর্থ দূরবর্তী। শয়তানও আল্লাহ্র কল্যাণ ও রহমত থেকে বহু দূরে। শয়তান তো ইতোপূর্বেই বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয়েছিলো। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোন পথে সে বেহেশতে পুনঃ প্রবেশ করলো? এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন রকম মতামত ব্যক্ত করেছেন। বাগবী বলেছেন, যখন ইবলিস শয়তান হজরত আদমকে প্রতারণা

www.eelm.weebly.com

করার নিমিত্তে জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইলো, তখন জান্নাতের প্রহরীরা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। তখন তার সাহায্যে এগিয়ে এলো সাপ। সাপের সঙ্গে তার পূর্ববন্ধুত্ব ছিলো। সাপও ছিলো জান্নাতের প্রহরী। সাপটি দেখতে ছিলো খুব সুন্দর। উটের মতো তার চারটি পা ছিলো। ইবলিস তাকে বললো, তোমার মুখে করে আমাকে জান্নাতে পৌঁছে দাও। সাপ রাজি হলো। সে শয়তানকে মুখে করে বেহেশতে নিয়ে গেলো। অন্য প্রহরীরা সাপের এ কারসাজি ধরতে পারলোনা। এভাবে জান্নাতে পৌঁছে গেলো ইবলিস।

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে জারীর এবং আবুল আলীয়া, ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ্ এবং মোহাম্মদ বিন কায়েসও এরকম বর্ণনা এনেছেন। হাসান বলেছেন, হজরত আদম কোনো কোনো সময় জান্নাতের দরোজায় এসে দাঁড়াতেন। একদিন তিনি যখন জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখনই তিনি শয়তানের প্রবঞ্চনার শিকার হন। বাগবী আরো বলেছেন, হজরত আদম জান্নাত দেখে বলতেন, যে এই জান্নাতে চিরকাল থাকবে সে কতোইনা সৌভাগ্যমন্ডিত। একদিন হজরত আদম ও হজরত হাওয়া যখন জান্নাতে বিচরণ করছিলেন এবং এরকম উক্তি করছিলেন, তখন ইবলিস এসে দাঁড়ালো তাঁদের সামনে। হজরত আদম ও হাওয়া তাকে ইবলিস বলে সনাক্ত করতে পারলেন না। হজরত আদমের কথা শুনে ইবলিস কাঁদতে শুরু করলো। তাকে অঝোর ধারায় রোদন করতে দেখে আদম দম্পতিরও হৃদয় বিগলিত হয়ে গেলো। তাঁরা বললেন, তুমি কাঁদছো কেনো? ইবলিস বললো, আমি তোমাদের জন্যই কাঁদছি। সামনে এগিয়ে আসছে মৃত্যু। তোমরা মারা যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতের নেয়ামত সমূহ হাতছাড়া হয়ে যাবে তোমাদের। শংকিত হলেন আদম দম্পতি। পরিণতির কথা ভেবে মর্মাহত হলেন তাঁরা। ইবলিস ভাবলো, তাঁর পরিকল্পনা কার্যকর হতে চলেছে। সে বললো, যা হবার তাতো হবেই। তবে আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বাতলে দিতে পারি। ওই যে গাছটি দেখছো। ওই গাছের ফল ভক্ষণ করলে চিরঞ্জীব হওয়া যায়। হজরত আদম শিউরে উঠলেন। বললেন, অসম্ভব! ওই গাছ আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। ইবলিস বললো, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের শুভাকাংক্ষী। আমার উপদেশের মধ্যে ক্ষতিকর কিছু নেই। ইবলিসের কসম শুনে তাঁরা দোদুল্যচিত্ত হলেন। ভাবলেন, আল্লাহ্র কসম করে তো কেউ মিথ্যা বলতে পারে না। হজরত হাওয়া অগ্রবর্তীনি হলেন। মৃত্যু থেকে মুক্তিচিন্তা তখন তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেলেন, স্বামীকেও খাওয়ালেন। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বলেন, হজরত হাওয়া তাঁর স্বামীকে শরাব পান করিয়েছিলেন, তখন হজরত আদম ছিলেন নেশাগ্রস্ত। ওই অবস্থায় হজরত হাওয়া তাঁকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং দু'জনে মিলে ওই গাছের ফল খেয়েছিলেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও হজরত কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্পাক হজরত আদমকে বললেন, আমি জান্নাতের যে সমস্ত নেয়ামত তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছিলাম, ওগুলোই কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট ছিলো না? নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তোমরা নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকট গমন করলে কেনো? হজরত আদম আরজ করলেন, বারে এলাহী। আমি জানতাম না যে, কেউ তোমার নামে মিথ্যা শপথ করতে পারে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে হজরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের বর্ণনা করেন, আল্লাহ্পাক হজরত আদমকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আদম! এমন করলে কেনো? তিনি নিবেদন করলেন, হে মহাবিশ্বের মহাঅধীশ্বর! আমি হাওয়ার কথায় প্ররোচিত হয়েছিলাম। আল্লাহ্পাক এরশাদ করলেন, আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করলাম। তাকে গর্ভধারণের কষ্ট পেতে হবে। আর পেতে হবে প্রতি মাসের ঋতুস্রাবের বিড়ম্বনা। নির্দেশ শুনে কাঁদতে শুরু করলেন হজরত হাওয়া। আল্লাহ্পাক বললেন, তোমার ও তোমার কন্যাদের জন্য কান্নাকেই অবলম্বন করে দেয়া হলো।

এরপর এরশাদ হচ্ছে, 'আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে পৃথিবীতে নেমে যাও। সেখানে তোমাদেরকে কিছুকাল জীবনোপকরণসহ বসবাস করতে হবে।' বাগবী হজরত ইকরামা থেকে এবং তিনি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে— রসুল স. সাপ দেখলেই মেরে ফেলার নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন, যারা ভীতিপ্রদ হয়ে সাপ মারা থেকে বিরত থাকবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. বলেছেন, মদীনাবাসী জ্বিনদের একটি গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমরা সাপ দেখলে তিনবার সেটিকে পলায়নের সুযোগ দাও (কারণ, ওই সাপ মুসলমান জ্বিনও হতে পারে)। তোমাদের সুযোগ গ্রহণ না করলে তাকে মেরে ফেলো। কেনোনা সে হচ্ছে শয়তান।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩৭

فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

❑ অতঃপর আদম তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হইল। আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্ষমাপরবশ হইলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু।

আল্লামা ইবনে কাসীর 'ফাতালাক্ব আদামা' বাক্যাংশটির আদামা শব্দটিকে মানসুব এবং 'কালিমাতিন' শব্দটিকে মারফু করে পড়েছেন। এভাবে পড়লে অর্থ দাঁড়াবে— আদমের নিকট তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কতিপয় বাক্য আগমণ করলো। এই বাক্যাবলী ছিলো হজরত আদমের তওবা গৃহিত হওয়ার কারণ।

www.eelm.weebly.com

অন্য ক্বারীগণ আদামাকে মারফু এবং কালিমাতিনকে মানসুব করে পড়েছেন। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে-হজরত আদম আল্লাহ্র নিকট থেকে কিছু বাক্য শিখে নিলেন। বাক্যসমূহ হচ্ছে— রব্বানা জ্বলামনা আংফুসানা ওয়া ইল্লামতাগফিরলানা ওয়াতার হামনা লা নাকুনান্না মিনাল খসিরিন' (হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা আত্মঅত্যাচারী। আর তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করো, দয়া না করো, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূত হবো)।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন, হজরত আদম ও হাওয়া পৃথিবীতে নেমে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পানাহার করেন নি। একশ বছর পর্যন্ত তাঁরা ছিলেন পরস্পর বিচ্ছিন্নাবস্থায়। আর তাঁরা কেঁদেছিলেন দু'শ' বছর ধরে। ইউনুস বিন হাব্বাব এবং আলকামা বিন মারসাদ বলেছেন, পৃথিবীবাসীদের চোখের পানি একত্র করলেও হজরত দাউদ আ. এর চোখের পানির সমান হবে না এবং হজরত দাউদ ও পৃথিবীবাসীদের চোখের পানি একত্র করলেও সেই চোখের পানির চেয়ে হজরত আদমের চোখের পানি হবে অধিক। শহর বিন হাউসাব বলেছেন, আমার নিকট এই সংবাদটি পৌঁছেছে যে, হজরত আদম তার ভ্রান্তির লজ্জায় তিনশ' বছর যাবত মাটি থেকে মস্তক উত্তোলন করেননি।

এরপর বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ক্ষমা পরবশ হলেন'—এর অর্থ তওবা কবুল করলেন। তওবা অর্থ অপরাধের স্বীকারোক্তি, লজ্জা এবং অপরাধের পুনঃসংঘটন না করার দৃঢ়সংকল্প। আয়াতে কেবল হজরত আদমের তওবা গৃহীত হওয়ার বিবরণ দেখা যায়। তবুও স্বাভাবিকভাবে একথা মেনে নেয়াতে কোনো বাধা নেই যে, হজরত হাওয়াও এ সংবাদের অন্তর্ভুক্ত। কোরআন মজীদের অন্য সকল স্থানেও এরকম করা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে কেবল পুরুষদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে নারীরাও রয়েছেন সেই সম্বোধনভূতা।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে, 'ইন্নাহু হুয়াত্তাউয়াবুর রহীম' অর্থ তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ ও দয়ালু। তওবা শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। শব্দটি যদি বান্দার সাথে সম্পর্কিত হয় তবে অর্থ হবে, পাপবিমুখ হওয়া বা পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করা। আর আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে, পাপ ক্ষমা করা এবং পাপের জন্য শাস্তি নির্ধারণ না করা।

সুরা বাকারা : আয়াত ৩৮

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

www.eelm.weebly.com

❑ আমি বলিলাম, 'তোমরা সকলেই এই স্থান হইতে নামিয়া যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসিবে তখন যাহারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করিবে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।'

নির্দেশ হয়েছে- তোমরা সকলেই এখান থেকে নেমে যাও। এরকম নির্দেশ আগেও একবার করা হয়েছে (আয়াত ৩৬)। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ইতোপূর্বের নির্দেশে জান্নাত থেকে আকাশে নেমে আসতে বলা হয়েছিলো। পরের নির্দেশটি ছিলো আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসার। কেউ কেউ বলেছেন, একই নির্দেশ ছিলো আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসার। কেউ কেউ বলেছেন, একই নির্দেশকে গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্য দুইবার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। অথবা এ রকমও হতে পারে যে, প্রথম নির্দেশটি ছিলো শাস্তিমূলক এবং পরের নির্দেশটিতে ছিলো পৃথিবীতে নেমে এসে খেলাফতের (প্রতিনিধিত্বের) দায়িত্ব প্রতিপালন করবার তাগিদ।

সকলেই নেমে যাও– একথার অর্থ এই নয় যে, সকলে সম্মিলিত হয়ে নেমে যাও। 'জামিয়া' শব্দ প্রয়োগের অর্থ হবে, নেমে যাওয়ার নির্দেশটি কেবল সকলের উপরে প্রযোজ্য।

'ফাইম্মা ইয়াতিইয়ান্নাকুম মিন্নি হুদা' (পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের কোনো নির্দেশ আসবে) – এখানে 'ফা' অব্যয়টি সংযোজক হিসেবে এবং 'ইন' অব্যয়টি হরূফে শর্ত হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং 'মা' শব্দটি এসেছে গুরুত্ববাহী হিসেবে। এই নিয়মেই 'ইয়াতি' ক্রিয়ার সঙ্গে নুন সাকিন যোগ করা বিশুদ্ধ হয়েছে। অন্যথায় এতে তলবের অর্থ নাই। ওই সকল ক্রিয়ার সঙ্গে নুন সাকিন যুক্ত হয় যার মধ্যে তলবের অর্থ নিহিত থাকে।

'হুদা' (সৎপথের নির্দেশ) – এর অর্থ, নবী এবং কিতাব। আর 'তোমাদের নিকট' একথা বলে সকল আদম সন্তানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা তখন হজরত আদম আ. এর পৃষ্ঠদেশে ছিলেন।

'ফামান তাবিআ হুদাইয়া' (যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে)। এখানে 'মান' শব্দটি শর্তযুক্ত। এই শব্দ প্রয়োগের কারণে বাক্যটির অর্থ হবে-- আগের কথাটি (সৎপথের কোনো নির্দেশ আসবে) সম্ভাব্য অর্থাৎ সৎপথের নির্দেশ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তখন পূর্বের বাক্যটির অর্থ এভাবেই সুস্পষ্ট হবে যে, রসুল ও কিতাব প্রেরণে তিনি বাধ্য নন। বরং রসুল ও কিতাব প্রেরণ সম্পূর্ণতঃই তাঁর দয়া ও ইচ্ছা নির্ভর।

বায়যাবী বলেছেন, আল্লাহ্পাক 'হুদা' শব্দটি বারবার উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে সর্বনামের ব্যবহার করেননি। কারণ, প্রথম হুদা সাধারণ অর্থে এবং পরের হুদা (রসুল ও কিতাব) বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন। এই বিশেষ হুদা শেষ নবী মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. এর সঙ্গে সম্বন্ধিত।

www.eelm.weebly.com

'তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না'— অর্থাৎ যাঁরা সৎপথানুসারী তাঁদের আশংকা বিলুপ্ত করা হয়েছে। তাই তাঁরা চিন্তাগ্রস্ত হবে না, সন্তপ্তও হবে না। এই অবস্থাটি ভবিষ্যতের কথা, বর্তমানের কথা নয়। তাই অর্থ হবে এ রকম— পারলৌকিক শাস্তির বিষয়ে তাঁরা হবেন শংকাবিমুক্ত। অথবা প্রিয়বস্তু হারানোর ব্যাপারে তাঁরা থাকবেন সন্তাপহীন। এভাবে সৎপথানুসারীদের সওয়াব প্রাপ্তি এবং শাস্তি থেকে অব্যাহতির কথাই এখানে বলা হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৩৯

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

❑ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে ও আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহারাই অগ্নিবাসী - সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

'যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে'— একথার অর্থ, যারা আমার হেদায়েত সম্পর্কে উদাসীন। অথবা হেদায়েতের অস্বীকারকারী। আর 'নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে'— অর্থ যারা আমার অবতীর্ণ আয়াত সমূহের প্রতি অসত্যারোপ করে। অর্থাৎ কোরআন এবং অন্যান্য আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করে— তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। তাদের এই অধিবাস হবে চিরস্থায়ী। সেখানে তাদের মৃত্যুও হবে না এবং সেখান থেকে বের হয়ে আসার ক্ষমতাও তাদের থাকবে না।

এ পর্যন্ত আলোচনায় তিনটি বিষয় পরিষ্কাররূপে জানা গেলো। ১. বেহেশত সৃজন করা হয়েছে। ২. বেহেশতের অবস্থান উর্ধ্বস্তরে। ৩. কাফের বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিদের শাস্তি চিরস্থায়ী। কস্মিনকালেও তাদের কোনো নিষ্কৃতি নেই। এ আলোচনা থেকে হশিভিয়া সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে যে, নবীগণ নিষ্পাপ নয়। তাদের যুক্তি হচ্ছে—হজরত আদম নবী হওয়া সত্ত্বেও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। সুতরাং তিনি নিষ্পাপ থাকেন কি করে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিদ্বানগণ তাদের অসৎ অভিমতের মূল্যোৎপাটন করেছেন এভাবে— ১. নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের ঘটনাটি ঘটেছিলো বেহেশতে। তিনি তখন নবী ছিলেন না। নবী রসুলদের প্রয়োজন তো হয় পৃথিবীতে, বেহেশতে নয়। ২. নিষিদ্ধকর্মটি ছিলো তানযিহি (অনুত্তম), সম্পূর্ণ হারাম বা দৃঢ়নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু বিনয় ও ভালোবাসা বশতঃ এই অনুত্তম কার্যটিকেই তিনি কবীরা গোনাহ্ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই নিজেকে তিনি জালিম (আত্মঅত্যাচারী) এবং খসির (ক্ষতিগ্রস্ত) মনে করেছিলেন। ৩. নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল তিনি ভক্ষণ করেছিলেন ভুলবশতঃ, পূর্বসংকল্পবদ্ধ হয়ে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নয়। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ

www.eelm.weebly.com

করেছেন, 'অতঃপর আদম ভুলে গিয়েছে। আমি তার ইচ্ছাশক্তিকে কার্যকর পাইনি।' তাঁর এই ভুলে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতটি ছিলো এই–আল্লাহ্‌র নামে কসম দেয়াতে তিনি ইবলিসকে অবিশ্বাস করতে পারেননি। যদিও এটা দুর্বলতা, কিন্তু আল্লাহ্‌র কসমের কারণেই এই দুর্বলতাটি প্রশ্রয় পেয়েছিলো। তাই ঘটনা সংঘটনের পরমুহূর্তেই তিনি ক্ষমা প্রার্থী হতে পেরেছিলেন। শরাব পানের ব্যাপারটিও আরেকটি কারণ। শরাবের প্রতিক্রিয়া জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাই তিনি তখন সচেতন ছিলেন না। অবশ্য এখানে আরেকটি জটিলতা দেখা দিতে পারে। সেটি হচ্ছে - ভুলবশতঃ যদি এরকম হয়ে থাকে, তবে তিনি আল্লাহ্ কর্তৃক ভর্ৎসিত হলেন কেনো? জবাবে বলা যায়, ভুলও তাঁর মর্যাদার পক্ষে শোভনীয় ছিলো না। তাই সতর্ক না থাকার কারণে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। ভুলে যাওয়ার বিষয়টি সাধারণ মানুষের জন্য ক্ষমার্হ। কিন্তু নবীগণের পক্ষে তা শোভনীয় নয়, যেহেতু তাঁরা আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্যভাজন। এমনও হতে পারে যে, ভুলের জন্য অভিযুক্ত না হওয়া কেবল হজরত মোহাম্মদ স. এর উম্মতগণের বৈশিষ্ট্য। বিষয়টি এই সুরার শেষে সবিস্তারে আলোচিত হবে ইনশাল্লাহ্‌তায়ালা।

৪. হজরত আদমের ভুলটি ছিলো ইজতিহাদি (বুদ্ধিবৃত্তিক) ভুল, ঈমানি বা বিশ্বাসগত ভুল নয়। তিনি হয়তো তাহরিমীকে তানযিহি ভেবে থাকবেন। 'হাজিহিশ্‌শাজারা' বলতে তিনি একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষকেই বুঝেছিলেন। ওই গাছের ফল তিনি খাননি। ওই প্রকৃতির অন্য একটি গাছের ফল ভক্ষণ করেছিলেন। তিনি একথা বুঝতে পরেননি যে, ওই জাতীয় সকল গাছই এই নিষেধাজ্ঞার অর্ন্তভুক্ত। হজরত আদমকে অপরাধী হিসেবে তিরস্কার করা হয়নি। তিনি নিজেকে অপরাধের কারণ হতে দিয়েছিলেন বলেই তিরস্কার করা হয়েছিলো। যেমন ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলবশতঃ যে কোনো উদ্দেশ্যে বিষ পান করা হোক না কেনো, জীবনহানীই হবে তার সাধারণ পরিণতি।

এই সুরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত আল্লাহ্‌পাক তাওহীদ ও রেসালতের প্রমাণপঞ্জি বর্ণনা করেছেন। মানুষের বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি সম্বোধন করে কিছু বলা হয়নি। সকল মানুষই এ পর্যন্ত ছিলেন তাঁর সম্বোধনস্থল। মানুষকে সাধারণভাবে যে সকল নেয়ামত দেয়া হয়েছে– এ যাবত সে সম্পর্কে আলোচনা চলে এসেছে। এখন সম্বোধন করা হচ্ছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে, যারা আল্লাহ্‌তায়ালার বহু নেয়ামত লাভ করেছে। তাদেরকে সম্বোধন করার একটি কারণ হচ্ছে এই যে, সুরাটি মাদানী (মদীনায় অবতীর্ণ)। ওই সম্প্রদায়ের অনেকেই মদীনাবাসী ছিলো। অনেক বিদ্বানও ছিলো তাদের মধ্যে। মদীনার অন্যান্য সম্প্রদায় তাদের মতো প্রাধান্যের অধিকারী ছিলোনা। তাদের না ছিলো শিক্ষা। না ছিলো বুদ্ধির দীপ্তি। তাই তাদেরকে লক্ষ্য করা হয়েছে একারণে যে, তারা সম্বোধিত হলে অন্য সম্প্রদায়গুলোও স্বভাবতঃই উৎকর্ণ হয়ে পড়বে। সেই

www.eelm.weebly.com

বনী ইসরাইল বা ইহুদীরা যদি সত্য গ্রহণের দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়, তবে অন্যেরাও দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারবে। তাই এরশাদ হচ্ছে –

সুরা বাকারা : আয়াত ৪০

يٰبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْھَبُوْنِ ○

❒ হে বনী ইস্রাইল! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যদ্দারা আমি তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছি; এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করিব; এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

বনী ইসরাইলের বনী শব্দটি মূলে ছিলো ইব্‌নুন্। এর বহুবচন হচ্ছে বানিন। সমার্থক শব্দ হচ্ছে বেনা। ইবন গঠিত হয়েছে বেনা থেকে– যার অর্থ ভিত্তি স্থাপন অথবা নির্মাণ। যেহেতু পিতাই পুত্রের ভিত্তি। সুতরাং বনী ইসরাইল অর্থ ইসরাইলের পুত্র বা পুত্রগণ। হজরত ইয়াকুব আ. এর উপনাম ছিলো ইসরাইল। শব্দটি হিব্রু। এর অর্থ আবদুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র বান্দা। ইসরা অর্থ বান্দা এবং ইল অর্থ আল্লাহ্। কেউ কেউ বলেছেন, ইসরাইল অর্থ আল্লাহ্‌র মনোনীত। ক্বারী আবুজাফর ইসরাইল শব্দটি হামজা ব্যতীতই পাঠ করতেন।

'উয্‌কুরু' অর্থ স্মরণ করো। স্মরণ বা জিকিরের মূল সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে। কিন্তু মুখের উচ্চারণকেও জিকির বলা যেতে পারে একারণে যে, মুখ হচ্ছে মনের মুখপাত্র। মুখের স্মরণ বা উচ্চারণ যদি সত্য হয়, তবে তা মনের স্মরণ বা উচ্চারণকেই প্রতিপন্ন করবে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, উয্‌কুরু অর্থ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন প্রকারান্তরে নেয়ামতেরই স্মরণ। হাসান বলেছেন, নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করাই জিকির।

নি'মাতি (অনুকম্পা) শব্দটি একবচন। কিন্তু শব্দটি বহুবচন হিসেবেও ব্যবহারোপযোগী। এই আয়াতে শব্দটি বহুবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, বনী ইসরাইলকে প্রদত্ত নেয়ামত একটি ছিলো না, ছিলো অজস্র।

সে অনুগ্রহকে স্মরণ করো, যদ্দারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি– একথা বলে তাদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌পাক অন্য সম্প্রদায়কে প্রদত্ত নেয়ামতের কথা এখানে উল্লেখ করেননি, যাতে করে তারা পরশ্রীকাতরতার দিকে ধাবিত হতে পারে। কারণ, অন্যকে প্রদত্ত নেয়ামত হিংসা দ্বেষ এর উদ্রেক করতে পারে। নিজে প্রাপ্ত নেয়ামতের স্মরণই মানুষের কৃতজ্ঞচিত্ত

www.eelm.weebly.com

হওয়ার প্রধানতম কারণ হতে পারে। বনী ইসরাইলকে কি কি নেয়ামত দেয়া হয়েছিলো, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। হজরত কাতাদা বলেছেন, তাদেরকে বিশেষভাবে প্রদত্ত নেয়ামতগুলো হচ্ছে— ফেরাউনের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি ফেরাউনের দলকে সলিল সমাধি দান। সাগরের মধ্য দিয়ে পথযাত্রার সুযোগ করে দেয়া। মরুভূমিতে মেঘের ছায়া প্রদান ইত্যাদি। অন্য তাফসীরকারক বলেছেন, এখানে সকল নেয়ামতের কথা বলা হয়েছে— যা তারা ও অন্য সকল সম্প্রদায় লাভ করেছে।

আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করো— এখানে অঙ্গীকার পূর্ণ করো অর্থ ইমান গ্রহণ করো ও অনুগত হও। 'আর আমিও তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার পূর্ণ করবো' একথার অর্থ ইমান ও আনুগত্যের বিনিময়ে আমিও তোমাদেরকে অধিক অনুগ্রহ দানে ধন্য করবো। অঙ্গীকার শব্দটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অঙ্গীকারগ্রহণকারী এবং অঙ্গীকারগ্রহীতা দু'জনেই। এখানে অঙ্গীকার গ্রহণকারী স্বয়ং আল্লাহ্পাক। তিনি বনী ইসরাইলের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে প্রতিদান প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের উক্তি হিসেবে ইবনে জারীর বিশুদ্ধ সনদে উল্লেখ করেছেন— এই আয়াতের মর্ম হচ্ছে, আমার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করো। অর্থাৎ হজরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স. এর প্রতি ইমান আনো। যদি এ রকম করো, তবে আমিও আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করবো। তোমাদের প্রতি আরোপিত কঠিন বিধানগুলো সহজ করে দেবো।

বনী ইসরাইলদের প্রতি আরোপিত বিধানসমূহ ছিলো অত্যন্ত কঠিন। যেমন— শরীরে বা কাপড়ের যে স্থানে নাজাসাত (অপবিত্রতা) লাগবে, সে স্থান কেটে ফেলে দিতে হবে। বাগবী উল্লেখ করেছেন, কালাবী বলেছেন, আল্লাহ্পাক হজরত মুসা আ. এর মাধ্যমে বনী ইসরাইলের নিকট থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমি ইসমাইলের বংশে একজন উম্মী (অক্ষরের অমুখাপেক্ষী) নবী প্রেরণ করবো। তোমাদের মধ্যে যে তাঁর অনুগামী হবে, তাঁর আনীত জ্যোতিকে স্বীকার করবে, আমি তার সকল গোনাহ্ ক্ষমা করে দেবো। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দ্বিগুণ প্রতিদান দানে ধন্য করবো।

আল্লাহ্পাকের কালামের কোন্ কোন্ স্থানে এই অঙ্গীকারকে উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা কালাবী আরো বলেছেন, অঙ্গীকার সম্পর্কিত একটি আয়াত হচ্ছে এই— 'ওয়া ইজ আখজাল্লাহ্ মিছাক্বল্লাজিনা উতুল কিতাব' (সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন আল্লাহ্পাক আহ্লে কিতাবদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন)।

আমি বলি, ওই আয়াতটি ছিলো অঙ্গীকার সম্পর্কিত, যা হজরত মুসার জবাবের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক বলেছিলেন। সেটি হচ্ছে—'রব্বি লাও শি'তা আহ্লাকতাহুম মিন ক্বব্লু' থেকে 'ইনদাহুম ফিত্তাওরাতি ওয়াল ইনজিল..' পর্যন্ত।

www.eelm.weebly.com

মুজাহিদ বলেছেন, অঙ্গীকারের মর্ম বিবৃত হয়েছে সুরা মায়িদার ওই আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্পাক বনীইসরাইলের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারোজন নেতা মনোনীত করলাম।' আল্লাহ্পাক বললেন, আমি তোমাদের সাথে আছি– যদি তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত প্রদান করো, আমার নবীর উপর ইমান আনো, তাকে সাহায্য করো এবং আল্লাহ্পাককে করজে হাসানা দাও। এ রকম করলে আমি অবশ্যই তোমাদের গোনাহ্ সমূহ মাফ করে দেবো। তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার নিম্নদেশে রয়েছে প্রবহমান নদী। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি সত্যবিমুখ হয়, তবে সে অবশ্যই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে।

হাসান বলেছেন, সুরা বাকারার এই আয়াতটি হচ্ছে অঙ্গীকারের আয়াত–'আর আমি যখন তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম। আর তোমাদের উপর উত্তোলন করলাম পাহাড়, (বললাম) তোমাদেরকে আমি যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, আর তাতে যা কিছু আছে তা স্মরণে রেখো– এ রকম করলে তোমরা নিষ্কৃতি পাবে।

হাসানের অভিমতানুসারে বুঝা যায়, বনী ইসরাইলকে যে নেয়ামত দেয়া হয়েছিলো, তা হচ্ছে হজরত মুসা আ. এর শরিয়ত। আমি বলি, উল্লেখিত মতামত সমূহ প্রকৃত পক্ষে এক। এ প্রসঙ্গে হাসান, কাতাদা, কালাবী এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের উক্তি সমপ্রকৃতির। কাতাদা ও মুজাহিদের বক্তব্যে বলা হয়েছে, আমার নবীগণের উপরে ইমান আনয়ন করো। এ কথার মধ্যে রয়েছে হজরত মোহাম্মদ স. এর প্রতি ইমান আনার প্রসঙ্গটিও। কারণ, তিনিও নবীগণের মধ্যে একজন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের অভিমতও এ রকমই। হাসানের বক্তব্য হচ্ছে, অঙ্গীকারের অর্থ তওরাতের বিধান (হজরত মুসার শরিয়ত)। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, তওরাতের বিধানেও হজরত মোহাম্মদ স. এর প্রতি ইমান আনতে বলা হয়েছে। অতএব মতামতগুলির মধ্যে আর কোনো ভিন্নতাই রইলো না।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো'। এখানে 'ফারহাবুন' শব্দের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, আমার সঙ্গে কৃতপ্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পরিণাম এবং আমার সকল আদেশ নিষেধ সম্পর্কে ভয় করো। যেখানে বিরত থাকা ও রক্ষা পাওয়ার কথা আছে, যেখানে ভয়কে প্রকাশ করা হয়– সেখানেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ভয়কে সুনির্দিষ্টকরণের জন্য এই শব্দটি উপযোগী। তাই অর্থ হয়েছে এ রকম– শুধু আমাকেই ভয় করো (অন্য কাউকে নয়)। 'ইয়্যাকা না'বুদু' (আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি) বাক্যটির চেয়েও এখানে ব্যবহৃত বাক্যটি অধিক সুর্নির্দিষ্ট। এই বাকভঙ্গির মাধ্যমে যেনো মূল বক্তব্যটি ছিলো এ রকম– 'যদি তোমরা ভয়ার্ত হও তবে শুধুমাত্র আমাকেই ভয় করো'– অতএব আমাকেই ভয় করো। এই বাক্যটি সুনির্দিষ্টকরণের কল্যাণবহ (উদ্দেশ্য

www.eelm.weebly.com

সংবলিত)। 'ইয়্যাকা না'বুদু' বাক্যে এতোবেশী কর্মের সমাবেশ ঘটেনি। এখানে অঙ্গীকার, তিরস্কার উভয়টি সম্মিলিত। যেনো বলা হয়েছে, আমি তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবো। পূণ্য ও প্রতিদান দেবো– এটা হচ্ছে অঙ্গীকার। আর আমাকে ভয় করো–এটা হচ্ছে তিরস্কার। আরো রয়েছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অপরিহার্যতা ও অঙ্গীকার পূরণের অনুপ্রেরণা। এ আয়াত দ্বারা একথা পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হয় যে, মুমিনের কর্তব্যকর্ম হচ্ছে, সে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ভয়ে ভীত হবে না।

যে সমস্ত শব্দে 'ইয়া' অক্ষরটি উহ্য থাকে সেগুলোকে ক্বারী ইয়াকুব লেখার সময় স্পষ্ট করে দেখাতেন। কোরআন মজীদে এ ধরনের ইয়া রয়েছে একষট্টিটি। ক্বারী ওয়ারশের বর্ণনায় রয়েছে- নাফে' বলেছেন, সাতচল্লিশটি। কালুনের মতে বিশটি। কালুনের বর্ণনার দু'টি স্থান মতানৈক্যমন্ডিত। সে দু'টি স্থান হচ্ছে আত্তালাক এবং আত্তানাদ। আল্লামা ইবনে কাসীর ওয়াসল (মিলিতাবস্থায়) হোক অথবা ওয়াক্ফ (থেমে যাওয়া অবস্থায়) হোক, উভয় অবস্থায়– এ রকম স্থান নির্ধারণ করেছেন একুশটি। ছয়টি স্থানে অবশ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সে ছয়টি স্থান হচ্ছে– ১. সুরা ইব্রাহিমের তাকাব্বাল দোয়ায়ি ২. সুরা ক্বমারের 'ইয়াদ্দায়ি'– এখানে তিনি ইয়াদউ এর ওয়াওকেও বহাল রাখেন ৩. সুরা ফজরের 'আকরামানী' ৪.আহানানী ৫. সুরা ইউসুফের 'ইন্নাহু মাই ইয়াত্তাক্বি' ৬. সুরা ফজরের ইউস্‌রি। ক্বারী বাজা প্রথম পাঁচটি ক্ষেত্রে মিলিতাবস্থায় এবং থেমে গেলে লেখার সময় 'ইয়া' উল্লেখ করেছেন। ক্বারী কানাবাল 'মাইইয়াত্তাক্বি' শব্দে মিলানো ও থেমে যাওয়া উভয়াবস্থায় 'ইয়া'কে উল্লেখ করেছেন। আর 'ইউস্‌রি' শব্দটিতে উল্লেখ করেছেন মিলিতাবস্থায়। এ সম্পর্কে তার বিপরীত মতও দেখা যায়। চৌত্রিশটি স্থলে ক্বারী আবু আমর মিলিতবস্থায় 'ইয়া' উল্লেখ করেছেন। 'আকরামানি' এবং 'আহানানী' শব্দ দু'টিতে 'ইয়া' উল্লেখ করা না করা উভয় প্রকারের সুযোগ রয়েছে। ক্বারী কাসায়ী সুরা হুদের 'ইয়ামা ইয়া'তি' এবং সুরা কাহাফের 'মা কুন্না নাবগি' এর মধ্যে ইয়া উল্লেখ করেছেন। এদু'টি ভিন্ন অন্য স্থানে তিনি 'ইয়া' উল্লেখ করেননি। ক্বারী হামজা 'তাকাব্বাল দোয়ায়ি'তে কেবল মিলিতাবস্থায় এবং সুরা নমলের 'আতুমিদ্দুনানি'তে সম্মিলিত এবং যতি, দুই অবস্থাতেই 'ইয়া' ব্যবহার করেছেন। ক্বারী আসেম সকল ক্ষেত্রেই 'ইয়া'কে লুপ্ত করেছেন। দু'টি ক্ষেত্রে অবশ্য তার সম্পর্কে ভিন্নতর বর্ণনা পাওয়া যায়। ১. 'ফামা আতানিয়াল্লাহু'তে সংযুক্তাবস্থায় (ক্বারী হাফ্স এই 'ইয়া'কে জবরযুক্ত করেছেন এবং যতিপাতের সময় করেছেন সাকিনযুক্ত)। ২. সুরা জুখরুফের 'ইয়া ইবাদি'তে সম্মিলিত অবস্থায়। ক্বারী আবু বকর এই 'ইয়া'কে জবরযুক্ত অবস্থায় পাঠ করতেন এবং সাকিনযুক্ত অবস্থায় পাঠ করতেন থেমে পড়লে। ক্বারী শোবা প্রথমস্থলে অর্থাৎ 'ফামা আতানিয়াল্লাহু'তে 'ইয়া' উল্লেখ করেন। ক্বারী হাফ্স 'ইয়া-ইবাদি'তে 'ইয়াকে' উল্লেখহীন রাখেন। ইবনে আমের হিসামের বর্ণনানুযায়ী সুরা

www.eelm.weebly.com

আরাফের 'ছুম্মা কিদুনি' শব্দে 'ইয়া' উল্লেখ করেন। ইবনে জাকওয়ানের বর্ণনা মোতাবেক সুরা কাহাফের 'ফালা তাসআল্নি' শব্দে ইয়ার উল্লেখ বলবৎ রাখেন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৪১

وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۖ وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ○

❑ তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহা বিশ্বাস কর। আর তোমরাই উহার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হইও না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করিওনা। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

তোমাদের কাছে যা আছে— এ কথার অর্থ তওরাত ইত্যাদি আসমানী কিতাবসমূহ। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অনুসারী যদি কেউ হয়, তবে সে কোরআন মজীদেরও অনুসারী হবে। তাই আল্লাহ্পাক কোরআনকে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সমর্থক বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, 'তার সমর্থকরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তা বিশ্বাস করো।' পূর্বের আয়াতে বর্ণিত অঙ্গীকার পূর্ণ করার আহবানের সঙ্গে এই আহবানের সংযোগ রয়েছে। পূর্বের আয়াতে সাধারণভাবে ইমানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিলো। আর এই আয়াতে বিশেষভাবে স্পষ্ট করে কেবল কোরআনের প্রতি ইমান আনতে বলা হয়েছে। তওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সত্য। কোরআনে বর্ণিত বিষয়সমূহও সত্য। তওরাত ও ইঞ্জিলে ছিলো বিভিন্ন সত্য কাহিনী। হজরত মোহাম্মদ স. এর আগমনের সংবাদ, তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ, পুনরুত্থান দিবস প্রসঙ্গ, কল্যাণের প্রতি আহবান, অবাধ্যতার শাস্তি সম্পর্কিত সংবাদ, তাওহীদ বিষয়ক আলোচনা, সকল নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ ইত্যাদি। কোরআন মজীদ সাক্ষ্য দিচ্ছে, তওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত বিষয়াবলী আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এখানে নির্দেশ করা হয়েছে, যেহেতু পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ এবং বর্তমানের কোরআন আল্লাহ্ই অবতীর্ণ করেছেন, তাই তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো। আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি কোরো না— তোমরা এর প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না। বরং প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী হও। যেমন হয়েছিলেন মক্কার ইহুদী আলেম ওরাকা বিন নাওফেল। তিনি প্রথম অহী (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, মক্কার কাফেররাই তো প্রথমে কোরআন শরীফকে অস্বীকার

www.eelm.weebly.com

করেছে, তবু মদীনার ইহুদীদেরকে প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী না হওয়ার কথা বলা হচ্ছে কেনো? জবাবে বলা যায়, মক্কার প্রত্যাখ্যানকারীরা ছিলো মুশরিক। তারা গ্রন্থধারী (আহলে কিতাব) ছিলো না। তাই এখানে বলা হয়েছে, তোমরা তো আহলে কিতাব (গ্রন্থধারী)। তোমরা যদি প্রত্যাখ্যান করো, তবে গ্রন্থধারীদের মধ্যে প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হবে।

আমি বলি, 'প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী'– এ কথার মর্ম হচ্ছে, তোমরাই প্রত্যাখ্যানের প্রাথমিক ভিত্তি নির্মাণ কোরো না। তোমরা গ্রন্থধারী, নেতৃস্থানীয়। সাধারণ জনেরা তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সত্য থেকে দূরে সরে পড়বে। সুতরাং তোমরা অন্যদের অথবা পরবর্তীদের সত্য প্রত্যাখ্যানের প্রথম কারণ হয়ো না। জনতা সাধারণত নেতার অনুগামী হয়ে থাকে। সুতরাং সত্যানুসরণে প্রথমে তাদেরই এগিয়ে আসা উচিত। আলেমগণ দ্বীনের নেতা, কাজেই প্রথমে তাদেরকেই হতে হবে সৎকর্মপরায়ণ। এ প্রসঙ্গে রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, সাবধান! আমলহীন আলেম নিকৃষ্টতম। হাদিসটি ইমাম দারেমী আহ্ওয়াস বিন হাকিম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং আহ্ওয়াস বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতার নিকট থেকে। এই হাদিসের প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম– তোমরা তোমাদের অনুসারীদের কুফরীর কারণ হয়ো না। অন্যথায় তাদের পুঞ্জীভূত পাপ তোমাদেরই স্কন্ধে এসে পড়বে।

'আউয়ালা কাফিরিন' (প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী) – এ কথায় বহুবচনবোধক সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করলে অর্থ দাঁড়াবে, প্রথম প্রত্যাখ্যানকারীদের দল। তখন কথাটির উদ্দেশ্য হবে, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ প্রথম কাফের (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী) হয়ো না। যেমন বলা হয়, অমুক ব্যক্তি আমাদেরকে অলংকৃত করেছে। এ কথার ব্যাখ্যা হবে এই যে, আমাদের প্রত্যেককে একেকটি অলংকার বা ভূষণ দ্বারা সজ্জিত করেছে।

'আউয়াল' শব্দটি এমন একটি বিশেষ্য যার ক্রিয়া হয় না। কেউ কেউ বলেন, 'আউয়াল' শব্দটি মূলতঃ আউআলা। 'ওয়াআলা' শব্দটি 'সাআলা' এর ওজনে গঠিত। দ্বিতীয় হামজাটি এখানে রীতিবিরুদ্ধভাবে 'ওয়াও' করা হয়েছে। অথবা মূল শব্দটি ছিলো- আ আউয়ালা। এরপর ওয়াও স্থাপন করে ইদ্গম করা হয়েছে। বাগবী বলেছেন, আয়াতটি কা'ব বিন আশ্রাফ ও অন্যান্য ইহুদী আলেমদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে।

আমার আয়াতের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ কোরো না– এ কথার অর্থ আমার আয়াতের প্রতি ইমানের বিনিময়ে পার্থিব সম্পদ গ্রহণ কোরো না। অথবা অর্থ হবে এরকম– তওরাতের ওই সকল আয়াতের বিনিময়ে পার্থিব বৈভব গ্রহণ কোরো না, যেগুলোতে রসুলপাক স. এর গুণাবলীর বিবরণ রয়েছে।

স্বল্পমূল্য অর্থ পার্থিব সম্পদ। পরিমাণে যতোবেশী হোক না কেনো, আখেরাতের অফুরন্ত বৈভবের তুলনায় পৃথিবীর বৈভবরাশি একেবারেই তুচ্ছ।

www.eelm.weebly.com

আয়াতটির শানে নুজুল হচ্ছে– ইহুদী আলেম ও নেতাদের নিকট অনেক মূর্খ মানুষের সমাগম হতো। আলেম ও নেতাদের বার্ষিক বেতন বা খাজনা হিসেবে তাদেরকে অনেক কিছু দিতে হতো। ফসল, চতুষ্পদ জন্তু, নগদ অর্থ অনেক কিছুই দিতে হতো তাদেরকে। ইসলামের ক্রমবর্ধমান প্রসার দেখে আলেম ও নেতারা এই ভেবে শংকিত হলো যে, আমরা যদি তওরাত থেকে প্রাপ্ত মোহাম্মদ স.এর গুণাবলীর বিবরণ প্রকাশ করি এবং তাঁর অনুগত হই, তবে আমাদের এই সহজ অর্থাগম বন্ধ হয়ে যাবে। এই আশংকায় তারা দুনিয়াকে দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিলো। তওরাতে বর্ণিত রসুল পাক স.এর গুণাবলীর বিবরণ বিকৃত করে ফেললো। মুছে ফেললো তাঁর পবিত্র নাম। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

'তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো'– এ কথার অর্থ জাগতিক মোহ পরিত্যাগ করো। যথামূল্য প্রদান করো পারলৌকিকতাকে। পূববর্তী আয়াতে সাধারণভাবে সকল ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিলো। তাই আল্লাহ্‌কে ভয় করার কথা বলা হয়েছিলো– 'ফারহাবুন' শব্দের মাধ্যমে। যেহেতু 'রহবাত' হচ্ছে তাকওয়ার প্রাথমিক পর্যায়। এই আয়াতে বলা হয়েছে 'ফাত্তাকুন'। বিশেষভাবে আলেমদের প্রতি আহবান করা হয়েছে বলে প্রকৃত ও পরিণত ভয় বা সাবধানতা বুঝাতে এখানে তাকওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৪২, ৪৩

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ
وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِينَ

❒ তোমরা সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিওনা এবং জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিও না।

❒ তোমরা সালাত কায়েম কর ও জাকাত দাও এবং যাহারা অবনত হয় তাহাদের সহিত অবনত হও।

'লিবাস' অর্থ একত্রীকরণ। আয়াতে সত্যের সাথে মিথ্যার একত্রীকরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঘোষিত হয়েছে– এক কথার সঙ্গে অপর কথা এভাবে মিশ্রিত কোরো না, যাতে করে সত্য মিথ্যার পার্থক্যরেখা মুছে যায়। আয়াতের প্রকৃত মর্ম হচ্ছে, হে বনী ইসরাইল! তওরাতে শেষ নবীর বৈশিষ্ট্যাবলীর যে বিবরণ আমি অবতীর্ণ করেছি, তা বাতিলের সাথে মিশিয়ে ফেলো না। নিজ হাতে এর বিকৃতি সাধন থেকে বিরত হও। হজরত মুকাতিল বলেছেন, তওরাতে মহাবিশ্বের গৌরব ও সৌরভ হজরত মোহাম্মদ স. এর সার্বিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয়া ছিলো। তার

www.eelm.weebly.com

মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিপরীত নয়, এরকম কিছু গুণকে তারা স্বীকার করেছে; যাতে করে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হতে না হয়। অন্য বিবরণগুলোকে তারা গোপন করেছে, যাতে করে তাদের পার্থিব স্বার্থ বহাল থাকে। 'ওয়ালা তালবিসুল হক্কা বিল বাতিল' এ কথা বলে তাদের এই অসৎ উদ্যোগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, জেনে শুনে সত্য গোপন কোরো না। ওয়া তাকতুমুল হাক্ব (সত্য গোপন কোরো না) – এ কথায় 'লাম' প্রবিষ্ট হওয়াতে জযমযুক্ত হয়েছে। অথবা 'ওয়াও' এর পরে 'আন' উহ্য থাকার কারণে জবর সংযুক্ত হয়েছে। শেষোক্ত নিয়মে অর্থ দাঁড়াবে এরকম– সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ এবং সত্য গোপন, এ দু'টোকে তোমরা একত্র কোরো না। 'জেনে শুনে'– একথার অর্থ, তোমরা এটা ভালো করেই জানো যে, মোহাম্মদ স. সত্য নবী। তবুও সত্য গোপন করছো। এবং বিষয়টিকে উত্তম মনে করছো। অথচ বিষয়টি অত্যন্ত নিন্দনীয় ও জঘন্য। তোমরা যদি অজ্ঞ হতে, তবে একটা কথা ছিলো। বলতে পারতে, আমাদের নিকট সত্য মিথ্যা নির্দেশক কোনো সংবাদ পৌঁছেনি। কিন্তু এ রকম কোনো ওজরাপত্তি পেশ করার সুযোগও তোমাদের নেই। সুতরাং দুঃসাহসিকতা পরিত্যাগ করো।

'সালাত কায়েম করো ও জাকাত দাও'– একথার অর্থ, মুসলমানেরা যেভাবে নামাজ পড়ে ও জাকাত দেয়, তোমরাও সেই নিয়মে নামাজ আদায় করো ও জাকাত দাও। একথার মাধ্যমে বুঝা যায়, অবিশ্বাসীদেরকে যেমন তাওহীদ, রেসালত ও অন্যান্য বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে; তেমনি বিশ্বাসের শাখাগত নির্দেশসমূহও প্রতিপালন করতে হবে। যেমন, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি। জাকাত অর্থ বর্ধনশীল সম্পদ। আরেকটি অর্থ পবিত্রকরণ। জাকাত দিলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়– এবং সম্পদের পবিত্রতাও অর্জিত হয়। আল্লাহ্পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্তায়ালা সুদকে ক্ষয় করেন এবং জাকাতকে বাড়িয়ে দেন।'

যারা অবনত হয় তাদের সঙ্গে অবনত হও– একথার অর্থ নবী মোস্তফা স.এর সহচরবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে নামাজ আদায় করো। তারা যেভাবে রুকু করেন (অবনত হন), তোমরাও সে রকমভাবে রুকু করো। রুকু নামাজের একটি অংশ (স্তম্ভ)। এখানে নামাজ বুঝাতে রুকুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে একারণে যে, ইহুদীদের নামাজে রুকু নেই। এই নির্দেশটিতে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

মাসআলাঃ ইমাম দাউদ জাহেরী বলেছেন, জামাত নামাজের স্তম্ভ। ইমাম আহমদ বলেছেন, স্তম্ভ নয় বরং ফরজ। অধিকাংশ আলেমগণের মতে জামাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা যা ওয়াজিবের নিকটবর্তী। সুন্নতে মোয়াক্কাদার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ফজরের দুই রাকাত সুন্নত। তবে জামাত নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকলে এই সুন্নত ছেড়ে দিয়ে জামাতে শামিল হতে হবে। প্রকৃত কথা হচ্ছে,

www.eelm.weebly.com

জামাত ওয়াজিবের নিকটতম। হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে— রসুল পাক স. বলেছেন, একা নামাজ পড়ার চেয়ে জামাতের সাথে নামাজ পড়া সাতাশ গুণ উত্তম।

সুরা বাকারা : আয়াত ৪৪

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

❑ কি আশ্চর্য! তোমরা নিজদিগকে বিস্মৃত হইয়া মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না?

এই আয়াতে পূর্বোক্ত আয়াতের নির্দেশাদির উপর সবিশেষ তাগিদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ নিজেরা কেমন উদাসীন। 'আল বির্‌র' শব্দটি 'বির্‌র' শব্দ থেকে এসেছে। সকল পূণ্যকর্মকে বলে বির্‌র'। বাগবী বলেছেন, আয়াতটি ইহুদী আলেমদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। এর শানে নুজুল এই— ইহুদী সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের অমুসলিম প্রবীণ আত্মীয়দেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মতামত কি? এই দ্বীন (ইসলাম) কি সত্য না অন্য কিছু? তারা জবাব দিয়েছিলো, তোমরা যা গ্রহণ করেছো তার উপরই অটল থেকো। মোহাম্মদ স. যা কিছু বলেন, তার সব কিছুই সত্য। তাদের এই কথার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ওয়াহেদী এরকম বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ইহুদী আলেমরা সর্বসাধারণকে তওরাতের নির্দেশসমূহ মান্য করতে বলতো, কিন্তু নিজেরা মান্য করতো না। তাদের এই স্বভাবকে লক্ষ্য করে আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

'অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করো'— এখানে 'কিতাব' অর্থ তওরাত। মর্ম হচ্ছে, কিতাব পাঠের কারণে তোমাদের এ কথাটি সুস্পষ্টরূপে জানা আছে যে, হজরত মোহাম্মদ স.কে? তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী কি? তোমরা সকল কিছুই জানো বুঝ, তবুও এ কেমন ধারা আচরণ তোমাদের? তবে কি তোমরা বুঝ না?

'তবে কি তোমরা বুঝ না' অর্থ, তবে কি তোমরা তোমাদের বিবেক বুদ্ধি সব খুইয়ে বসে আছো। বিবেক বা আকল মানুষকে অনিষ্টকর বিষয় থেকে বাঁচিয়ে রাখে। তোমরা অনিষ্ট থেকে উদ্ধার পাওয়ার ব্যাপারে প্রয়াসশীল নও কেনো? তবে কি তোমরা বিবেকবিরোধী? বাগবী বলেছেন, রসুল পাক স. এরশাদ করেন,

www.eelm.weebly.com

মেরাজ রজনীতে আমি কতিপয় মানুষকে অতিক্রম করছিলাম। তাদের জিহ্বা ও ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিলো। আমি হজরত জিব্রাইলকে বললাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের ওয়ায়েজীন। তারা মানুষকে সৎকাজের উপদেশ দেয়, আর নিজেরা থাকে বে খবর। আর তারা আল্লাহ্র কালামও পাঠ করে।

হজরত উসামা বিন জায়েদ থেকে বর্ণিত হয়েছে— আমি রসুলপাক স.কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক লোককে হাজির করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনের তাপে তার নাড়িভূঁড়ি বের হয়ে আসবে। ওই নাড়ীভূঁড়িকে কেন্দ্র করে সে এমনভাবে ঘুরপাক খেতে থাকবে, যেমন করে কলুর বলদ ঘানির চতুর্দিকে ঘোরে। তার ওই অবস্থা দেখে দোজখবাসীরা একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, তোমার ব্যাপার কী? তুমি তো আমাদেরকে উত্তম কথা শুনিয়েছিলে। কিন্তু নিজে ছিলে বেআমল। সে জবাব দিবে, আমি তোমাদেরকে অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতাম, কিন্তু নিজে লিপ্ত থাকতাম অশ্লীলতায়। বায়যাবী বলেছেন, এই আয়াতে আলেম ও বক্তাদের আত্মশুদ্ধির নির্দেশনা রয়েছে। ওয়াজ নিষিদ্ধ করা হয়নি। কেননা মানুষকে সদুপদেশ দান করাও আল্লাহ্র নির্দেশ। আত্মশুদ্ধি অর্জন ও অবাধ্যতা পরিত্যাগ করাও জরুরী। প্রকৃতাবস্থা এ রকম নয় যে, এক নির্দেশ পালন করতে না পারলে অন্য নির্দেশকে পরিত্যাগ করতে হবে। ব্যাপারটা এ রকম— যেমন কেউ বললো, আমি পরনিন্দা করি, পরের হক নষ্ট করি, তবে নামাজ পড়ে আর কি হবে?

আমি বলি, অন্যত্র আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাকের নিকট জঘন্যতম বিষয় হলো, কেনো ওই কথা বলো, যা করো না। একথায় প্রমাণিত হয় যে, যে অসৎ সে সৎকাজের নির্দেশ দিতে পারে না। কেনোনা আল্লাহ্পাকের নিকট বিষয়টি জঘন্যতম বলে বিবেচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি এ রকম নয়। মূল তাৎপর্য হচ্ছে, আলেমের অপরাধ জাহেলের অপরাধের তুলনায় আল্লাহ্পাকের নিকট অধিক অপছন্দনীয়। তাদের সৎকাজের আদেশ দান কিন্তু অপছন্দনীয় নয়। আল্লাহ্পাকই সমধিক জ্ঞাত।

আল্লাহ্পাকের নির্দেশের কারণে ইহুদীদের পার্থিব ক্ষতি হতে লাগলো। অর্থাগমে মন্দা দেখা দিলো। তাদের অবস্থা উঠলো চরমে। ইসলামকে সত্যধর্ম জেনেও নেতৃত্বাকাঙ্খা ও সম্পদবিনষ্টির ভয় তাদের সত্য গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। ইসলাম হলো তাদের নিকট পর্বত সদৃশ বোঝা।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্পাক করুনা করে এমন এক পদ্ধতিতে পথপ্রদর্শন করেছেন, যাতে করে সত্যগ্রহণ আরো সহজতর হয়। এরশাদ হয়েছে—

www.eelm.weebly.com

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِينَ ۝ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلٰقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رٰجِعُونَ ۝

❑ তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ইহা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন-

❑ তাহারাই বিনীত যাহারা বিশ্বাস করে যে তাহাদের প্রতিপালকের সহিত নিশ্চিতভাবে তাহাদের সাক্ষাৎকার ঘটিবে এবং তাঁহারই দিকে তাহারা ফিরিয়া যাইবে।

আয়াতের শুরুতে ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ, তোমাদের প্রতি আপতিত বিপদাপদ অপসারণ করতে যদি চাও, তবে সাহায্য প্রার্থনার অবলম্বন হিসেবে ধৈর্যধারণ করো ও নামাজ প্রতিপালন করো। সবর বা ধৈর্য শব্দটি ব্যাপক অর্থবহ। যেমন, ১. আল্লাহ্‌পাকের প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে দুঃখমোচন ও মনোবাঞ্ছা পূরণের অপেক্ষায় থাকা। ২. কারো নিকট থেকে কিছু যাঞ্চা করা এবং পেরেশান হয়ে কান্না-কাটি করা থেকে প্রবৃত্তিকে মুক্ত রাখা। অর্থাৎ এই ধারনায় অটল থাকা যে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, কেঁদেকেটে কোনো লাভ নেই। ৩. অবাধ্যতা থেকে আত্মরক্ষা করা এবং আনুগত্যে মগ্ন থাকা। এ রকম করলে বিপদাপদ কেটে যায়। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন, 'তোমাদের প্রতি আপতিত মুসিবত তোমাদেরই কৃতকর্মের পরিণতি।' মুজাহিদ বলেছেন, সবর অর্থ রোজা। তাই রমজান মাসকে সবরের মাস বলা হয়। নামাজ ও রোজা সম্পদপ্রীতির ব্যাধি নিরাময়কারী। নামাজ মানুষকে পরকালমুখী করে এবং রোজা পার্থিব সম্পদের লোভ নিবারণ করে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'ওয়াস্‌সালাত' শব্দের 'ওয়াও' অব্যয়টির অর্থ হবে 'আলা' (উপরে)। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে– নামাজের উপরে ধৈর্যধারণ করে সাহায্য কামনা করো। যেমন অন্যস্থলে আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'হে মোহাম্মদ! তোমার পরিবার পরিজনকে নামাজের আদেশ করো এবং নিজেও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো।' কামনা বাসনা, ব্যতিব্যস্ততা অপসারণ করতে এবং দ্বীন-দুনিয়ার সকল প্রয়োজন পূরণ করতে নামাজই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। হজরত হুজায়ফার ভ্রাতা হজরত আবদুল আজীজ থেকে আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. সমস্যার সম্মুখীন হওয়া মাত্র নামাজের প্রতি মনোযোগী হয়ে যেতেন। এই আয়াতে উল্লেখিত সালাত শব্দটির অর্থ দোয়া বা প্রার্থনাও হতে পারে। এটাই সালাতের আভিধানিক অর্থ। দোয়া বা প্রার্থনার মাধ্যমেও জাগতিক উদ্বেগ দূর হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সংকট মোচন

www.eelm.weebly.com

হয়। রসুল মোহাম্মদ স. এরশাদ করেছেন, যদি কেউ চায়, তার অপরিহার্য কোনো প্রয়োজন পূর্ণ হোক– তবে সে যেনো ভালোভাবে অজু করে, দু'রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। তারপর রসুলুল্লাহ্ স. –এর উপর আন্তরিকতাপূর্ণ দরূদ পাঠ করে এই প্রার্থনা জানায়– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালিমুল কারীম। সুব্হানাল্লাহি রব্বিল আরশিল আজীম। আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন আসআলুকা মুজিবাতি রহমাতিকা ওয়া আযায়িমা মাগফিরাতিকা ওয়াল গনিমাতি মিন কুল্লি বিররিউ ওয়াস্সালামাতি মিন কুল্লি ইসমিন লা-তাদ্উলি জাম্বান ইল্লা–গফার্তাহু ওয়ালা– হাম্মান্ ইল্লা ফার্রজতাহু ওয়ালা হাজাতান হিয়া লাকা রিদান্ ইল্লা ক্বাদ্বায়তাহা ইয়া আরহামার রহিমীন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আউফা থেকে তিরমিজি এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আল্লামা হাকেমও তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে এরকম লিখেছেন।

'ওয়া ইন্নাহা লা কাবিরাতুন' (ইহা নিশ্চিতভাবে কঠিন) – এখানে ইন্নাহা শব্দের 'হা' সর্বনামটি সম্ভবত 'ইস্তায়িনু' (সাহায্য প্রার্থনা করো) এর সঙ্গে সম্বন্ধিত। এ রকম হলে অর্থ দাঁড়াবে– নামাজ রোজা দ্বারা সাহায্য কামনা বড়ই কঠিন। সর্বনামটি সকল আদেশ নিষেধের সঙ্গেও সম্পর্কিত হতে পারে। অথবা সবর (ধৈর্য) ও সালাত (নামাজ) এর সঙ্গেও সর্বনামটির সম্পর্ক থাকা সিদ্ধ হবে। যদিও সর্বনামটি একবচন বোধক। এমতাবস্থায় 'ইন্ন হা' (নিশ্চয়ই ইহা) প্রতিটি আদেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে। কিন্তু এখানে দু'টি আদেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, নামাজ ও রোজা দু'টোই অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর 'ওয়াও'কে যদি 'আলা' অর্থে ব্যবহার করা যায়, তবে 'হা' সর্বনামটি কেবল নামাজের প্রতি প্রযোজ্য হবে। এই রীতি মেনে নিলে অর্থ দাঁড়াবে, ধৈর্যসহ নামাজের দ্বারা সাহায্য কামনা করো (সম্পদাকর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা যদি করো, তবেই কেবল নামাজ সহজতর হবে)। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'হা' সর্বনামটি বিশেষভাবে নামাজের সাথে সম্বন্ধিত। কেনোনা, নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া নামাজের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার সংযম। এর প্রেক্ষিতে কোরআন মজীদের ওই আয়াতটি উল্লেখ করা যায় যেখানে বলা হয়েছে, 'প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল অধিক হকদার, যে তাকে সন্তুষ্ট রাখে।' আল্লাহ্পাককে সন্তুষ্ট রাখাই তাঁর রসুলকে সন্তুষ্ট রাখা। তাই এখানে একবচনবোধক সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের অর্থ হবে, ধৈর্য সহকারে সাহায্য কামনা করো। তবে সেটা নিশ্চিতরূপে কঠিন। আর নামাজের মাধ্যমে সাহায্যপ্রার্থী হও। নিঃসন্দেহে সেটাও খুব কষ্টকর। এই বর্ণনাটিকে সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে আয়াতে এইভাবে বলা হয়েছে। 'ইল্লা আ'লাল খশিয়িন' (বিনীতগণ ব্যতীত) – 'খশিয়িন' অর্থ যাঁরা খুশু অবলম্বন করেছেন। 'খুশু' অর্থ নম্রতা বা বিনয়। 'খুশু' থেকে গঠিত হয়েছে 'খশিয়া'– যার অর্থ বালুময় নরম ভূমি। বিনয় প্রকাশ পায় চোখের দৃষ্টিতে

www.eelm.weebly.com

এবং মুখের কথায়। যেমন কালাম পাকে বলা হয়েছে, 'ওয়া খশায়াতিল আস্ওয়াতু লিররহমান' (রহমানের ভয়ে উচ্চস্বর নিম্নগামী হয়ে যাবে)। আরো বলা হয়েছে, 'ওয়া খশায়াতিল আব্সার' (আর দৃষ্টি অবনমিত হবে)। 'খুজু' শব্দের অর্থ এরকম– নম্র হওয়া, অবনত হওয়া অথবা অনুগত হওয়া। খুশু প্রকাশ পায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে। আর খুজু সম্পূর্ণতই অন্তরসংশ্লিষ্ট। এই আয়াতে 'খশিয়িন' (বিনীতগণ) বলতে ওই সকল বিশ্বাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের অন্তঃকরণ আল্লাহ্পাকের অনুগত, শান্ত বা প্রশান্ত।

'তারাই বিনীত যারা বিশ্বাস করে'– এখানে বিশ্বাস বুঝাতে 'জন্ন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বাগবী বলেছেন, 'জন্ন' একটি দ্ব্যর্থবোধক শব্দ। সন্দেহ কিংবা দৃঢ়বিশ্বাস উভয় ক্ষেত্রেই এই শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এখানে 'জন্ন' বলে দৃঢ়বিশ্বাসকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক নয়। এর প্রকৃত অর্থ দৃঢ় ধারণা। সে ধারণা সৎও হতে পারে। অসৎও হতে পারে। এখানে অবশ্য সদর্থেই শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছে।

আমি বলি, এই আয়াতে এলেম (জ্ঞান) বা একীন (বিশ্বাস) শব্দগুলো ব্যবহার না করে 'জন্ন' শব্দ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে এ বিষয়ে দৃঢ় ধারণা পোষণ করে– সৎ ও অসৎকর্মের প্রতিফলদাতা আল্লাহ্পাকের নিকট উপস্থিত হতেই হবে সে যদি সত্যিকার বিবেকধারী হয়, তবে স্বভাবতঃই পরিত্রাণ লাভার্থে আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা হবে তার প্রতি সহজ। পাত্রের পানি বিষমিশ্রিত—এরকম দৃঢ় ধারণার অধিকারী কখনোই ওই পানি পান করবে না। যদি সে প্রবল তৃষ্ণার্তও হয়– তবুও না। আর পাত্রের পানি স্বাস্থ্যসম্মত জানলে, স্বাদহীন বা তিক্ত পানিও সে গলাধঃকরণ করবে সহজেই। এই যদি মানুষের সাধারণ আচরণ হয়, তবে আল্লাহ্ ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরা আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনার্থে তাঁর নির্দেশাদি পালনের জন্য এগিয়ে আসবে না কেনো? নির্দেশাদি পালন যদিও কষ্টকর, তবুও এই নির্দেশ যেহেতু প্রিয়তম আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই এসেছে, তাই তা কষ্টকর না হয়ে সুখকর হওয়াই সমীচীন। তাই রসুল স. এরশাদ করেছেন, নামাজকে আমার জন্য চক্ষুশীতলকারী করা হয়েছে। হাকেম, নাসাঈ।

'তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাত ঘটবে'—একথার অর্থ তাঁরা পরকালে আল্লাহ্র দীদার লাভে ধন্য হবেন। নামাজ হচ্ছে মু'মিনদের মে'রাজ; আল্লাহ্পাকের দীদারের মাধ্যম। আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'আর রাতের কিয়দংশে তাহাজ্জুদের নামাজে মগ্ন হও। এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত। অচিরেই আল্লাহ্পাক তোমাকে প্রশংসনীয় স্তরে উন্নীত করবেন।' হজরত রবীয়া ইবনে কা'ব বলেছেন, আমি রসুল পাক স. এর পাশে শয়ন করতাম। এক রাতে আমি যখন তাঁর অজুর পানি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উপস্থিত করলাম, তখন তিনি বললেন, তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে চাও। আমি বললাম, হে আমার দয়ার নবী। আমি আপনার সঙ্গে জান্নাতে অবস্থান করতে চাই। তিনি বললেন, আর কিছু? আমি

www.eelm.weebly.com

বললাম, ব্যস। এতোটুকুই। তিনি বললেন, এই যদি তোমার চাওয়া পাওয়া হয়, তবে উদ্যোগ গ্রহণ করো যেনো অধিক পরিমাণে সেজদা করতে পারো। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে– রসুল স. এরশাদ করেছেন, সেজদার অবস্থা হচ্ছে আল্লাহ্পাকের সবচেয়ে নিকটতম অবস্থা। মুসলিম। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'মুলাকু রব্বিহিম' (প্রতিপালকের সঙ্গে তার নিশ্চিত সাক্ষাৎকার ঘটবে) – এ সাক্ষাৎকারের অর্থ, আল্লাহ্পাকের সঙ্গে হাশরের মাঠে সাক্ষাৎকার।

'ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন' (আর আমরা তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী) – বিশ্বাসীরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আল্লাহ্র নিকটে তাদেরকে ফিরে যেতেই হবে। তখন তিনি সৎ ও অসৎকর্মের প্রতিদান দিবেন। তখন জুটবে পুরস্কার অথবা তিরস্কার। এই নিশ্চিত ধারণাই বিশ্বাসীদেরকে ধৈর্যশীল করে তোলে। তাই তারা সংকটাপন্ন অবস্থায় বলে, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন।'

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৪৭, ৪৮

يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ۝ وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَٰعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

❐ হে বনী ইস্রাইল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্দারা আমি তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছি এবং বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।

❐ তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও কোন কাজে আসিবে না এবং কাহারও সুপারিশ স্বীকৃত হইবে না এবং কাহারও নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হইবে না এবং তাহারা কোন প্রকার সাহায্য পাইবে না।

এই আয়াতে আল্লাহ্পাক পুনরায় বনী ইসরাইলদেরকে সম্বোধন করে তাদেরকে প্রদত্ত অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে তাদেরকে যে অধিক মর্যাদাশালী করা হয়েছিলো- সে কথা বলছেন। এই মর্যাদা তাদের পূর্বপুরুষগণকে দেয়া হয়েছিলো। পূর্বপুরুষ বলতে বুঝানো হয়েছে, হজরত মুসা আ. এর সময়ের বিশ্বাসী সাধু পুরুষগণকে। পরবর্তী যুগের সাধুপুরুষগণও এই মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তাঁরা সত্য ধর্মের অনুগামী ছিলেন। তাঁদের জীবনে চক্রান্তপ্রবণতার কোনো প্রশ্রয় ছিলো না। তাঁরা ছিলেন ইমানদার– নবী রসুল ও কিতাবে বিশ্বাসী, ন্যায়নিষ্ঠ, নবীগণের সাহায্যকারী, সৎকর্মপরায়ণ জননেতা ইত্যাদি। পূর্বপুরুষদের মর্যাদার কারণে অধস্তনেরা মর্যাদাশালী হয়ে

www.eelm.weebly.com

থাকে। এ সব কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্পাক আহবান জানাচ্ছেন, তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের মতোই সত্যানুসারী হও। আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্মানের প্রবহমানতাকে অক্ষুণ্ন রাখো। এ রকম করতে হলে বর্তমানের নবী হজরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স.কে মান্য করতে হবে এবং তাঁকে প্রদত্ত কিতাব কোরআন মজীদের অনুসারী হতে হবে। যদি এরূপ করো, তবেই কেবল তোমরা হতে পারবে হজরত মুসা ও তাঁর তওরাতের প্রকৃত অনুসারী। ওহী (প্রত্যাদেশ), নবী-রসুল এবং কিতাবের অনুসরণই তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে মর্যাদামন্ডিত করেছিলো। তোমরাও তাঁদের মতো হও।

বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি— একথার অর্থ, তৎকালীন বিশ্বে সকলের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। হজরত মোহাম্মদ স. এর আবির্ভাবের পর ওই শ্রেষ্ঠত্ব আর বলবৎ নেই। হজরত কাতাদা থেকে ইবনে জারীর, মুজাহিদ ও আবুল আলীয়া এ রকম বর্ণনা করেছেন।

'তোমরা সেইদিনকে ভয় করো যেদিন কেউ কারো কাজে আসবে না'— একথার অর্থ, তোমরা কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও শাস্তির কথা মনে করো, যেদিন অবিশ্বাসীদের উপকার করতে কেউই এগিয়ে আসবে না। বিশ্বাসীদের কথা স্বতন্ত্র। বিভিন্ন আয়াত এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী রসুলগণ ও আল্লাহ্পাকের অন্য প্রিয়বান্দাগণ পাপী বিশ্বাসীদের পক্ষে সুপারিশ (শাফায়াত) করবেন। সত্যানুসারীগণ এ বিষয়টিতে একমত।

সেদিন কেউ কারো অধিকার স্বীকার করবে না, কোনো বিনিময় দিতে স্বীকৃত হবে না। কিয়ামতের ভয়াবহতা ও শাস্তি দূর করার ব্যাপারে কেউ কারো জন্য যথেষ্ট হবে না। অতএব, কেউ কারো কোনো কাজেই আসবে না। কারো নিকট থেকে ক্ষতিপূরণও গৃহীত হবে না।

শেষে বলা হয়েছে, তারা কোনো প্রকার সাহায্য পাবে না। একথার অর্থ তারা আল্লাহ্পাকের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের প্রাপ্য শাস্তি রহিত করার শক্তি কারো হবে না। কেনোনা, কারো উপর আপতিত শাস্তি দূর করতে হলে কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করতে হয়। ১. অপরাধীকে শাস্তিদাতার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে হয়। একে বলে নুসরত বা সাহায্য। ২. বল প্রয়োগ সম্ভব না হলে সুপারিশ (শাফায়াত) করে অভিযুক্তকে ছাড়িয়ে নেয়া যেতে পারে। অথবা ৩. ক্ষতিপূরণ বা জামানতের মাধ্যমে অপরাধীকে দায়মুক্ত করা যেতে পারে। একে বলে প্রতিদান। এই আয়াতে সাহায্য, বিনিময়, প্রতিদান বা ক্ষতিপূরণ— সবগুলো পন্থাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেনো, সকল পন্থাই সেখানে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই-বনীইসরাইলেরা (ইহুদীরা) দাবী করতো, তাদের পিতৃপুরুষগণ তাদের পক্ষে শাফায়াত করবেন। তাদের মিথ্যা দাবীর বিরুদ্ধেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

وَإِذْ نَجَّيْنٰكُم مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِىْ ذٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

❐ স্মরণ কর, যখন আমি ফেরাউনী সম্প্রদায় হইতে তোমাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়াছিলাম, যাহারা তোমাদের পুত্রগণকে জবাই করিয়া ও তোমাদের নারীগণকে জীবিত রাখিয়া তোমাদিগকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত; এবং উহাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এক মহা পরীক্ষা ছিল;

এতোক্ষণ বনীইসরাইলদেরকে প্রদত্ত অনুগ্রহরাজির কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এখন শুরু হলো তার বিস্তারিত বর্ণনা। প্রথমেই বলা হয়েছে অত্যাচারী ফেরাউনী সম্প্রদায় থেকে তাদেরকে (তাদের পিতৃপুরুষদেরকে) নিষ্কৃতি দানের কথা। ফেরাউনী সম্প্রদায় অর্থ, ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ ও তার অন্য অনুচরেরা। 'আলে ফেরাউন' শব্দের 'আল' কথাটি আসলে 'আহাল', যার অর্থ সম্প্রদায়। নবী-রসুল, রাজা-বাদশাহ এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আল কথাটি ব্যবহৃত হয়। আমালিকা সম্প্রদায়ের রাজার উপনাম ছিলো ফেরাউন। হজরত মুসার সময়ে যে ফেরাউন রাজত্ব করতো, তার নাম ছিলো, ওলীদ বিন মাসআব বিন রাইয়ান। রাইয়ান ছিলো হজরত ইউসুফ আ. এর যুগের ফেরাউন। মাসআব ও রাইয়ানের রাজত্বকালের ব্যবধান ছিলো চার'শ বছর।

হজরত মুসার সময়ের ফেরাউন ছিলো নিষ্ঠুর। সে বনী ইসরাইলদেরকে বিভিন্নরূপে যন্ত্রণা দিতো। তাদেরকে শ্রমিক হিসেবে প্রাসাদ তৈরির কাজে নিযুক্ত করতো, মালপত্র বহনের কাজে লাগাতো, তাদেরকে দিয়ে চাষাবাদ করাতো এবং তাদের নিকট থেকে জিজিয়া কর আদায় করতো। মেয়েদেরকে দিতো সুতো কাটার কাজ।

পরবর্তীতে ফেরাউনের অত্যাচার আরো বেড়ে গিয়েছিলো। সে হুকুম দিয়েছিলো, যেনো বনী ইসরাইলদের পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করা হয় এবং কন্যাসন্তানদেরকে জীবিত রাখা হয়। তার নির্মম নির্দেশ দেয়ার কারণ হচ্ছে এই— ফেরাউন একদিন স্বপ্নে দেখলো, বায়তুল মাকদিসের দিক থেকে আগুন এসে সমগ্র মিসর রাজ্য ঘিরে ফেললো। এবং কিবতীদেরকে (তার অনুসারীদেরকে) ভস্মীভূত করে ফেললো। ফেরাউন ভীত হলো। গনৎকারদের ডেকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানতে চাইলো। তারা বললো, বনী ইসরাইলদের মধ্যে একটি শিশু জন্ম লাভ করবে— সে আপনাকে ধ্বংস করে ফেলবে এবং আপনার রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটাবে। এই বিবরণটি দিয়েছেন বাগবী। হজরত সা'দী থেকে ইবনে জারীরও এরকম বলেছেন। বাগবী আরো বলেছেন, এরপর ফেরাউন এই মর্মে

www.eelm.weebly.com

ফরমান জারি করলো যে, বনী ইসরাইলদের পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করামাত্র হত্যা করা হবে। কেবল কন্যা সন্তানদেরকে রেহাই দেয়া হবে। ধাত্রীদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো, বনী ইসরাইলদের সন্তান জন্মলাভের সংবাদ তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ফেরাউনের এই ফরমান জারির পর বনী ইসরাইলদের বারো হাজার নবজাতককে হত্যা করা হয়েছিলো। হজরত ওয়াহাব বলেছেন, ফেরাউন ইসরাইল বংশের নব্বই হাজার সদ্যজাতককে হত্যা করেছিলো। প্রবীণরাও মৃত্যুবরণ করেছিলো স্বাভাবিক নিয়মে। অবস্থা যখন এরকম শোচনীয় তখন কিবতীদের অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা ফেরাউন সমীপে নিবেদন করলো, বনী ইসরাইলের শিশুপুত্ররা নিহত হচ্ছে। বড়রাও ক্রমাগত মৃত্যুবরণ করছে। এভাবে তাদের বংশ উজাড় হয়ে গেলে, আমরা আমাদের কাজ কারবারের জন্য শ্রমিক পাবো কোথা থেকে? ফেরাউন তখন পুনঃ নির্দেশ জারী করলো, এখন থেকে এক বৎসর হত্যাকান্ড চলবে, পরের বছর বন্ধ থাকবে। এই নিয়ম বলবৎ করা হলো। তখন হত্যাকান্ড বন্ধের বছরে জন্মগ্রহণ করলেন হজরত হারুন আ. এবং হত্যাকান্ডের বছরে জন্ম নিলেন হজরত মুসা আ.।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, এটা ছিলো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা— পরীক্ষা কার্যকর হয় সুখ দুঃখ উভয় অবস্থাতেই। দুঃখের অবস্থায় নেয়া হয় ধৈর্যের পরীক্ষা। এবং সুখের অবস্থায় নেয়া হয় কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা। যেমন আল্লাহ্‌পাক অন্যত্র বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে ভালোমন্দ দিয়ে পরীক্ষা করি।' ফেরাউনী সম্প্রদায় থেকে নিষ্কৃতিদানকে যদি পরীক্ষা হিসেবে মেনে নেয়া হয়, তবে তা হবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরীক্ষা। আর ফেরাউনের অত্যাচারকে যদি পরীক্ষা হিসেবে ধরা হয়, তবে তা হবে ধৈর্য ধারণের পরীক্ষা। বস্তুতঃ উভয় প্রকার পরীক্ষাই আপতিত হয়েছিলো বনী ইসরাইলদের প্রতি। অত্যাচারের সময় ধৈর্য ধারণ এবং নিষ্কৃতির সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ উভয়টিই ছিলো তাদের কর্তব্যকর্ম। হজরত মুসার মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাক তাদের নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করেছিলেন।

সুরা বাকারা : আয়াত ৫০

وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

❑ যখন তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম ও ফেরাউনী সম্প্রদায়কে জলমগ্ন করিয়াছিলাম আর তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিতেছিলে,

---

সাগর দ্বিধাবিভক্তির ঘটনাটি এরকম— হজরত মুসার আহবানে ফেরাউন সাড়া দেয়নি। তবুও দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে মুসাকে। হয়তো তার

www.eelm.weebly.com

বোধোদয় হবে, হয়তো ফিরে আসবে বিশ্বাসের বেহেশতী বাগানে। কিন্তু না, অসত্যকে আশ্রয় করে সে সময়াতিপাত করতে লাগলো। দীর্ঘ বিশবছর কেটে গেলো এভাবে। তার ধ্বংসের সময় সন্নিকটবর্তী হলো। আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে হজরত মুসার প্রতি নির্দেশ নেমে এলো– বনী ইসরাইলদেরকে নিয়ে মিসর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও। হজরত মুসা বনী ইসরাইলদের ঘরে ঘরে অতিসঙ্গোপনে এই নির্দেশ পৌঁছে দিলেন। জানিয়ে দিলেন, গোপন প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। ঘোড়ার গদিও গৃহাভ্যন্তরে বেঁধে নিতে হবে। কিবতীরা যেনো কিছুতেই টের না পায়। কিবতীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যে বনী ইসরাইল সন্তানেরা জড়িত ছিলো, আল্লাহ্পাক তাদেরকে স্বসম্প্রদায়ের সঙ্গে একত্রিত করে দিলেন। আর বনী ইসরাইলদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কিবতীদেরকে কিবতীদের সঙ্গেই মিলিয়ে দিলেন। এরপর শুরু হলো মহামারী। অসংখ্য কিবতী মৃত্যুবরণ করলো সেই মহামারীতে। দিনরাত তারা তাদের মৃত আত্মীয়স্বজনদের কাফনদাফনে ব্যতিব্যস্ত রইলো। ইত্যবসরে হজরত মুসা ছয় লক্ষাধিক বনী ইসরাইল সমভিব্যাহারে মিসর ত্যাগ করলেন। চারশ' বছর আগে হজরত ইউসুফের রাজত্বের সময়ে হজরত ইয়াকুব (ইসরাইল) কেনান থেকে মিসরে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন মাত্র বাহাত্তর জন। মিসর পরিত্যাগকারী ছয় লক্ষাধিক বনীইসরাইল তাদেরই অধস্তন বংশধর। বনীইসরাইল বাহিনী এগিয়ে চললো সম্মুখের দিকে। একস্থানে এসে থেমে গেলো পুরো বাহিনী। সামনে সীমাহীন প্রান্তর। পথচিহ্ন নেই। গন্তব্য নির্ণয় দুঃসাধ্য। হজরত মুসা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ঠাহর করতে পারলেন না, কীভাবে পথ চলবেন এখন। প্রবীণদের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করলেন তিনি। প্রবীণগণ বললেন, হজরত ইউসুফ অন্তিমকালে তাঁর ভ্রাতাদের ডেকে এই মর্মে অসিয়ত করেছিলেন যে, যখন তোমরা মিসর থেকে চলে যাবে, তখন আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেও। মনে হয় সেই অসিয়ত প্রতিপালিত হয়নি বলেই এখনো আমরা পথহারা। তাঁর পবিত্র মরদেহ সঙ্গে না নিলে মনে হয় আমরা কিছুতেই আর পথ খুঁজে পাবো না। হজরত মুসা জানতে চাইলেন, তাঁর কবর কোথায়? তারা বললেন, আমরা জানি না। হজরত মুসা উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, হজরত ইউসুফের কবর কোথায়? যে জানো শীঘ্র বলে দাও। আমার এই আহবান কেবল সেই যেনো শুনতে পায়, যে জানে। সেরকমই হলো। এক বৃদ্ধা কেবল শুনতে পেলেন তাঁর ঘোষণা। বৃদ্ধা বললেন, আমি যা চাই তাই যদি আমাকে দেয়া হয়, তবেই আমি হজরত ইউসুফের কবরের সন্ধান দেবো। হজরত মুসা বললেন, যদি আল্লাহ্ আমাকে অনুমতি দেন, তবে আমি তোমার দাবী পূরণের ব্যাপারে অঙ্গীকার করতে পারি। আল্লাহ্পাকের এরশাদ ধ্বনিত হলো, হে মুসা! ওই প্রবীণাকে বলো, সে যা চাইবে তাই তাকে দেয়া হবে। হজরত মুসা বললেন, কী চাও তুমি? বৃদ্ধা বললেন,দু'টি জিনিস আমি চাই। একটি পৃথিবীতে। আরেকটি পরবর্তী পৃথিবীতে। পৃথিবীতে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে চাই।

www.eelm.weebly.com

যেখানেই তোমরা যাওনা কেনো আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আর হে নবী মুসা! বেহেশতের যে প্রাসাদ আপনার আবাসস্থলরূপে নির্ধারিত হবে, আমি তার পাশে অবস্থান করতে চাই। হজরত মুসা বললেন, তথাস্তু। বৃদ্ধা বললেন, হজরত ইউসুফের কবর শরীফ রয়েছে নীল নদের মধ্যস্থলে। হজরত মুসা আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য কামনা করলেন। নীল নদের পানি সরে গিয়ে দৃষ্টিগোচর হলো হজরত ইউসুফের কবর শরীফ। সেখান থেকে কফিন বের করে পুনরায় যাত্রা শুরু করলো বনী ইসরাইল বাহিনী। বাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন হজরত হারুন এবং পশ্চাদ্ভাগে ছিলেন হজরত মুসা। মিসর পরিত্যাগের সংবাদ একসময় পৌঁছে গেলো ফেরাউনের কানে। সে ফরমান জারী করলো, অতিপ্রত্যূষে মোরগ ডাকার পূর্বেই বনী ইসরাইলদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে। আল্লাহ্পাকের কি অপার অনুগ্রহ! সে রাতে কোনো মোরগ ডাকলো না। দিবসের সূর্যকিরণ প্রখর হলে জেগে উঠলো তারা। ফেরাউন ও হামান এক কোটি সাত লক্ষ লশকর নিয়ে বনী ইসরাইলদের সন্ধানে বের হলো। তাদের সঙ্গে ছিলো সত্তর হাজার দ্রুতগামী কালো ঘোড়া। ওদিকে বনী ইসরাইলেরা তখন সমুদ্রতীরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তরঙ্গবিক্ষুব্ধতার সামনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় তারা। পিছনে বহুদূর থেকে ভেসে আসছে শোরগোল। এগিয়ে আসছে ফেরাউনের দুর্ধর্ষ লশকরেরা। উভয় দল পরস্পরের দৃষ্টিসীমানায় এসে পড়লো। শংকিত বনি ইসরাইলেরা বলাবলি করতে শুরু করলো, আমরা যে পাকড়াও হতে চলেছি। হজরত মুসা বললেন, কখনোই নয়। আল্লাহ্পাক আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন। আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে নির্দেশ দিলেন, হে মুসা। তুমি তোমার লাঠি দ্বারা সাগরতীরে আঘাত করো। হজরত মুসা তাই করলেন। সাগর দ্বিধাবিভক্ত হলো। দু'পাশে দাঁড়িয়ে রইলো পাহাড় সদৃশ বিশাল পানির দেয়াল। এরকম পথ বের হলো মোট বারোটি। বনী ইসরাইলেরা ছিলো বারোটি সম্প্রদায়ভূত। প্রত্যেক সম্প্রদায় একেকটি পথ ধরে এগিয়ে চললো। প্রখর সূর্যতাপের মাধ্যমে প্রতিটি পথকে আল্লাহ্পাক এমতো শুষ্ক করে দিলেন যে, পথ চলতে তাদের কোনোই অসুবিধা হচ্ছিলো না। আল্লাহ্তায়ালা প্রতিটি পানির দেয়ালে জানালা করে দিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে তারা একদল অন্যদলকে দেখে নিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে এগিয়ে চলছিলেন। বাক্য বিনিময় হচ্ছিলো পরস্পরের মধ্যে।

আয়াতে বলা হয়েছে,'তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফেরাউন সম্প্রদায়কে জলমগ্ন করেছিলাম এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।' ঘটনার বিবরণ এরকম— সাগরতীরে উপস্থিত হলো ফেরাউন বাহিনী। ফেরাউন দর্পভরে তার লোকদেরকে বললো, দেখো আমার ভয়ে ভীত হয়ে সমুদ্রসলিলও বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অগ্রসর হও। পলায়নপর ক্রীতদাসদেরকে বন্দী করো। একটি কালো অশ্বোপরি আরোহণ করেছিলো ফেরাউন। তার সঙ্গীরাও ছিলো অশ্বারোহী। তাদের সকল ঘোড়াই ছিলো পুরুষ। হজরত জিব্রাইল তখন একটি মাদী ঘোড়ার উপরে সওয়ার হয়ে

www.eelm.weebly.com

সাগর চেরা পথ বেয়ে এগিয়ে চললেন। মাদী ঘোড়া দেখে ফেরাউন বাহিনীর ঘোড়াগুলো দ্রুতবেগে তার পশ্চাদ্ধাবন করলো। তাদের পশ্চাতে আরেকটি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চললেন হজরত মিকাইল। তিনি বলতে শুরু করলেন, চলো, চলো। অগ্রবর্তী সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হও। এভাবে ফেরাউন বাহিনী যখন সাগরভ্যন্তরের পথে এগিয়ে চলছিলো, তখন ভেঙে পড়লো পানির দেয়াল। মিলে মিশে একাকার হয়ে গেলো জলধির উত্তাল তরঙ্গমালা। সলিল সমাধি ঘটলো ফেরাউন সম্প্রদায়ের।

ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় কোন সাগরে ডুবে মরেছিলো, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, সে সাগরটি ছিলো পারস্য সাগরের অন্তর্ভূত। হজরত কাতাদা বলেছেন, মিসর রাজ্যের পাশে আসফ নামে একটি সাগর ছিলো। ওই সাগরেই সলিল সমাধির ঘটনাটি ঘটেছে। বনী ইসরাইল বাহিনী তখন সাগরের অপর পারে গিয়ে উঠেছে। তারা স্বচক্ষে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের জলমগ্ন হওয়ার ঘটনাটি দেখছিলো। আয়াত শেষে তাই বলা হয়েছে, তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করছিলে।

সুরা বাকারা : আয়াত ৫১,৫২,৫৩,

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰۤى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ

اَنْـتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

❒ – যখন মুসার জন্য চল্লিশ রাত্রি নির্ধারিত করিয়াছিলাম– তাহার প্রস্থানের পর তোমরা তখন গো-বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করিয়াছিলে; ইহাতে তোমরা ঘোর অত্যাচার করিয়াছিলে।

❒ ইহার পরও আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছি যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

❒ – যখন আমি মুসাকে কিতাব ও 'ফুরকান' দান করিয়াছিলাম– যাহাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও।

আল্লাহ্‌পাক ওহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণের অঙ্গীকার করেছিলেন এবং হজরত মুসা তুর পর্বতে অবস্থানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। এই অবস্থানের সময়সীমা ছিলো চল্লিশ রাত্রি। জিলকদ মাসের তিরিশ রাত্রি এবং জিলহজ মাসের দশ রাত্রি। পুরো ঘটনাটা এরকম– ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের সলিল সমাধির পর বনী ইসরাইলেরা পুনরায় মিসরে বসতিস্থাপন করলো। আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত মুসাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করলেন যে, তুমি তুর পাহাড়ে চল্লিশরাত্রি ধ্যানমগ্ন থাকবে,

www.eelm.weebly.com

তখন আমি অবতীর্ণ করবো তওরাত। হজরত মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে জানালেন, আমি তুর পাহাড়ে ধ্যানমগ্ন হতে যাচ্ছি। হারুন থাকবে তোমাদের সাথে। সে হবে আমার স্থলাভিষিক্ত, প্রতিনিধি। হজরত জিব্‌রাইল অশ্বারোহী হয়ে হজরত মুসাকে অভ্যর্থনা জানাতে এলেন। তাঁর ঘোড়ার পা যে মাটিতে স্পর্শ করছিলো, সেখানে জন্ম নিচ্ছিলো শ্যামল উদ্ভিদ। সামেরী নামের একজন এই আশ্চর্যজনক ব্যাপারটি লক্ষ্য করে যাচ্ছিলো। সে পেশায় ছিলো স্বর্ণকার। বাজরখ অথবা কিরমানের অধিবাসী ছিলো সামেরী। সে আসলে ছিলো গো-পূজক সম্প্রদায়ের লোক। বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেও, প্রকৃতপক্ষে সে ছিলো মুনাফিক। সে হজরত জিব্‌রাইলের ঘোড়ার পদস্পর্শিত মাটি উঠিয়ে গোপনে নিজের কাছে রেখে দিলো। হজরত মুসার তুর পর্বতে গমনের পর, সেই চরম গর্হিত অপকর্মটি করে ফেললো সে। বনী ইসরাইলদের নিকটে ছিলো কিবতীদের নিকট থেকে ধার নেয়া অনেক স্বর্ণালংকার। সে বনী ইসরাইলদেরকে বললো, তোমাদের কাছে যে স্বর্ণালংকারগুলো রয়েছে, ওগুলো আসলে গনিমতের মাল। ওগুলো ভোগ করার অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা বরং গর্ত খুঁড়ে অলংকারগুলো পুঁতে রাখো। হজরত মুসা ফিরে এলে তিনি যেমন নির্দেশ দেন, সেরকম ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

আল্লামা সুদ্দী বলেছেন, বনী ইসরাইলদেরকে এরকম পরামর্শ দিয়েছিলেন হজরত হারুন। যার পরামর্শেই হোকনা কেনো, বনী ইসরাইলেরা পরামর্শটি গ্রহণ করলো। সমুদয় স্বর্ণালংকার মাটিতে পুঁতে রাখলো তারা। সামেরী তৈরী করলো একটি গো-বৎসমূর্তি। তারপর প্রোথিত অলংকারগুলো তুলে এনে সে গো-বৎসমূর্তিটিকে স্বর্ণ দিয়ে মুড়িয়ে দিলো। মাত্র তিনদিনে কর্মটি সম্পন্ন করলো সে। এরপর হজরত জিব্‌রাইলের ঘোড়ার ক্ষুর স্পর্শিত মাটি মূর্তিটির মুখে প্রবিষ্ট করিয়ে দিলো। এই মাটিতে ছিলো সঞ্জীবনী শক্তি। ওই শক্তির প্রভাবে বাছুরের মূর্তিটি জীবিত বাছুরের মতো হাম্বা হাম্বা রব শুরু করে দিলো। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তরূপে দৌড়াদৌড়িও শুরু করে দিলো বাছুরটি। সামেরী বললো, এটি হচ্ছে তোমাদের ও মুসার মাবুদ (উপাস্য)। মুসা এর কথা বিস্মৃত হয়েছে। তাই তুর পাহাড়ে চলে গিয়েছে। বনী ইসরাইলেরা একদিন ও একরাত্রিকে দুইদিন গণনা করতো। বিশ দিন বিশ রাত্রি অতিবাহিত হলে তারা ধরলো চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়েছে। চল্লিশদিন পর হজরত মুসার ফিরে আসার কথা। কিন্তু তিনি এলেন না। তারা ধারণা করলো, তিনি ইন্তেকাল করেছেন। সামেরী ক্রমাগত বাছুর পূজার জন্য সকলকে উৎসাহিত করে যাচ্ছিলো। শেষে সামেরীর ধোঁকায় পড়ে গেলো সকলে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক এবং হজরত মুসার সঙ্গে তুর পাহাড়ে তিরিশদিন অবস্থানের অঙ্গীকারনামা ছিলো। পরবর্তী এই তিরিশ দিনের সঙ্গে দশদিন বাড়ানো হয়েছিলো। হজরত মুসা যথাসময়ে ফিরে না আসায় বনী ইসরাইলেরা অধিকাংশই সামেরীর ষড়যন্ত্রের শিকার হলো। বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন হজরত হারুন। বারো হাজার লোক তাঁর কথা মান্য করলো। অবশিষ্টরা হয়ে গেলো পথভ্রষ্ট। এই পথভ্রষ্টদেরকে লক্ষ্য করে আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা

www.eelm.weebly.com

তখন গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে; ইহাতে তোমরা ঘোর অত্যাচার করিয়াছিলে।'

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— এরপরও আমি তোমদেরকে ক্ষমা করেছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। এর অর্থ, যখনই তোমরা এই অপকর্মের দায় স্বীকার করে প্রত্যাবর্তন করেছিলে (তওবা করেছিলে) তখনই আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। কৃতজ্ঞতা বলতে এখানে 'শোকর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 'শোকর' অর্থ আনুগত্য। মন, মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে শোকরের পূর্ণরূপ প্রকাশিত হয়। হাসান বলেছেন, প্রাপ্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার অর্থ আল্লাহ্পাকের স্মরণলিপ্ত হওয়া (জিকির করা)। হজরত জুনায়েদ বাগদাদী বলেন, নেয়ামত দাতার প্রসন্নতার অনুকূলে নেয়ামতের সদ্ব্যবহার করাকে শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) বলে। কেউ কেউ বলেছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে অক্ষমতা বোধই কৃতজ্ঞতা। বাগবী বলেছেন, এই মর্মে বর্ণনা এসেছে যে, হজরত মুসা আল্লাহ্পাকের সকাশে নিবেদন করলেন, ইয়া এলাহি! তুমি আমাকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছো। নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও নির্দেশ দান করেছো। ইয়া বারে এলাহি! তোমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগও তো একটি নেয়ামত। এরশাদ ধ্বনিত হলো, হে মুসা! তুমি জ্ঞানী। তোমার সমকালে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেউ নেই। স্মরণে রেখো, আমার বান্দার জন্য এই বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, যা কিছু সে লাভ করেছে, তা আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকেই লাভ করেছে। হজরত দাউদ তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, ওই পরম সত্তার জন্যই যাবতীয় পবিত্রতা— যিনি বান্দার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অক্ষমতাকে দয়া করে কৃতজ্ঞতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমন মারেফাতের (আল্লাহ্ পরিচিতির) পথে অক্ষমতার স্বীকৃতিকেই মারেফাত বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে—যখন আমি মুসাকে 'কিতাব' ও 'ফুরকান' দান করেছিলাম যাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও। তওরাতকেই এখানে কিতাব ও ফুরকান নামে অভিহিত করা হয়েছে। ক্বারী কাসায়ী বলেছেন, 'ফুরকান' শব্দটি কিতাব শব্দটির মর্মমূল। এই দুই শব্দের মাঝখানের 'ওয়াও' অব্যয়টি অতিরিক্ত। 'ফুরকান' শব্দটি এসেছে 'ফারক্ব' থেকে— যার অর্থ বিভক্ত বা দ্বিখন্ডিত করা। সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যসূচক হিসেবে এখানে ফুরকান শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনাবলীকেও ফুরকান বলে। কারণ, মোজেজা সত্যপন্থী ও অসত্যপন্থীদেরকে চিহ্নিত করে দেয়। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত মুসার শরিয়তকে ফুরকান বলে। তাঁর শরিয়তের মাধ্যমে হালাল ও হারাম সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছিলো। সৎপথে পরিচালিত হওয়ার জন্য এরকম পার্থক্য নির্ণায়ক প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যের কথাই আয়াত শেষে এভাবে বলা হয়েছে, 'যাহাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও।'

www.eelm.weebly.com

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

❒ –যখন মুসা আপন সম্প্রদায়ের লোককে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়া তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অনাচার করিয়াছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার পানে ফিরিয়া যাও এবং তোমরা নিজদিগকে সংযত কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট ইহাই শ্রেয়ঃ। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হইবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু।'

'কওম' অর্থ সম্প্রদায়। 'হজরত মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন'— একথার অর্থ, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা গরুপূজায় লিপ্ত হয়েছিলো তাদেরকে বললেন, 'জ্বলামতুম আনফুসাকুম।' অর্থাৎ গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছো। একথা বলে তিনি আত্মঅত্যাচারীদেরকে তওবার আহবান জানিয়ে বলছেন, 'ইলা বারিই'কুম।' অর্থাৎ সেই সত্তার প্রতি প্রত্যাবর্তনমুখী হও, যিনি তোমাদেরকে মধ্যপন্থায় সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের সৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি রাখেননি। পারস্পরিক পরিচিতি চিহ্নিত করার জন্য তোমাদের আকৃতি ও প্রকৃতিকে বৈচিত্র্যমন্ডিত করেছেন। 'বারিই' শব্দটি তিনটি হরফের সমন্বয়ে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে, এক বস্তু থেকে অপর বস্তুকে ছাঁটাই বা পৃথক করে গ্রহণ করা- এভাবে পৃথককৃত বস্তুকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া। আরবীভাষীগণ বিষয়টিকে এভাবে প্রকাশ করে থাকেন। যেমন, বারিআল মারিদু ওয়াল মারিউন (ঋণগ্রস্ত ও রোগী পৃথক হয়েছে)। অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত ঋণ থেকে এবং রোগী রোগ থেকে মুক্ত হয়েছে। এক বস্তু থেকে দ্বিতীয় বস্তুর আবিষ্কার অথবা সৃষ্টিকেও এই শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। যেমন, বারিআল্লাহু আদামা মিন তীন (আল্লাহ্‌পাক মাটি থেকে হজরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন)। অর্থাৎ লবণাক্ত মাটি থেকে তাঁকে পৃথক করে দিয়েছেন। ক্বারী আবু আমর এই আয়াতের দু'টি স্থানে উল্লেখিত বারিই'কুম শব্দটির হরকতকে হালকা করে পাঠ করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, তিনি 'বারিই'কুম' এর হামজাকে পাঠ করেছেন সাকিন করে। তিনি ছাড়া অন্য ক্বারীগণ হামজার হরকতকে পুরোপুরি আদায় করেছেন।

'ফাকতুলু আনফুসাকুম' অর্থ আত্মবিসর্জন দাও (আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে নিজেদেরকে সংযত করো)। হজরত মুসার একথার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে যারা অপরাধমুক্ত, তারা গো-বৎস পূজার অপরাধে অপরাধীদেরকে হত্যা করো। এভাবে তোমরা তোমাদের তওবাকে পূর্ণ ও পরিণত করো। কেবল

www.eelm.weebly.com

মৌখিক বা আন্তরিক তওবা দ্বারা তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। সুতরাং আত্মসংহারের এ বিধানকে তোমরা মেনে নাও।

'তোমাদের স্রষ্টার নিকট ইহাই শ্রেয়ঃ'– একথার অর্থ, আত্মবিসর্জনের বিধান সংবলিত এই তওবাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর এই কল্যাণকর তওবাই আল্লাহ্তায়ালার নিকট গ্রহণীয়। এই হত্যা তোমাদেরকে শিরিকের মলিনতা থেকে মুক্ত করবে। তোমাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরবর্তী পৃথিবীর অনন্ত জীবনকে সফল করে তুলবে।

গো-বৎস পূজারীরা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলো। বললো, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশ কায়মনোবাক্যে মেনে নিলাম। সবাই চাদরাবৃত হয়ে নিজেদের গৃহাঙ্গনে অবনত মস্তকে বসে রইলো। তাদের প্রতি হুকুম জারি করা হলো, কেউ যদি তার অবস্থান পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়, কিংবা মস্তক উত্তোলন করে অথবা হস্তপদ দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে তবে সে অভিশপ্ত। তার তওবা গৃহীত হবে না। তওবাকামীরা নির্দেশ মেনে নিলো। অস্ত্রাঘাতকে স্বাগত জানানোর জন্য স্কন্ধদেশ উন্মুক্ত করে দিলো। তাদের অপরাধমুক্ত আত্মীয় স্বজনরা তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। কিন্তু স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তি এই হত্যাকান্ডের বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তরবারী উত্তোলিত হলো বটে, কিন্তু মায়ামমতার আতিশয্যে তা তাদের হাত থেকে খসে পড়লো। স্বজনহননের এই নির্দেশ তারা কার্যকর করতে পারলো না। শেষে হজরত মুসার নিকট আবেদন জানিয়ে বললো, হে আল্লাহ্র নবী। আমরা তো সম্প্রীতি ও সৌহার্দের প্রভাবে পরাস্ত। এখন উপায় কী? আল্লাহ্পাক তখন কুয়াশা ও কালোমেঘে সকলকে ঢেকে দিলেন। ফলে তারা একে অপরের দৃষ্টি আড়াল হয়ে গেলো। শুরু হয়ে গেলো হত্যাকান্ড। এই হত্যাকান্ড চললো কয়েকদিন ধরে। অধিকাংশ বনী ইসরাইল নিহত হলো। হজরত মুসা ও হজরত হারুন নিবেদন করলেন, আয় আল্লাহ্! বনী ইসরাইলের অধিকাংশ সদস্য নিহত হয়েছে। এবার কৃপাবর্ষণ করুন। আল্লাহ্পাক হত্যাকান্ড বন্ধের নির্দেশ দিলেন। সরে গেলো কৃষ্ণমেঘ ও কুয়াশা। দেখা গেলো, হাজার হাজার বনী ইসরাইলের মরদেহ পড়ে রয়েছে। হজরত আলী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, নিহতদের সংখ্যা ছিলো সত্তর হাজার। হজরত মুসা মর্মাহত হলেন। আল্লাহ্পাক এরশাদ করলেন, হে মুসা! তুমি কি আমার এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নও যে, আমি হন্তারক ও নিহতদেরকে যুগপৎ জান্নাতে দাখিল করবো। নিহতরা হবে শহীদ এবং অবশিষ্টরা হবে ক্ষমাকৃত।

'ফাতাবা আলাইকুম' (তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন)। অর্থাৎ তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। এ বাক্যটি হজরত মুসার হতে পারে, আল্লাহ্তায়ালারও হতে পারে। যদি এই উক্তি হজরত মুসার হয় তবে একথার অর্থ হবে, হত্যাকান্ডের নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্ তোমাদের তওবা গ্রহণ করবেন।

www.eelm.weebly.com

আর উক্তিটি যদি আল্লাহ্‌তায়ালার হয় তবে বুঝতে হবে, এর মাধ্যমে তওবাকারীদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমা লাভের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

'ইন্নাহু হুয়া তাউয়াবুর রহীম' (নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু)। অর্থাৎ তিনি যেমন তওবা কবুলকারী তেমনি তওবার সুযোগ দাতাও।

তওবার এই মর্মবিদারক অধ্যায় শেষ হওয়ার পর আল্লাহ্‌পাক নির্দেশ করলেন, হে মুসা! তুমি বনী ইসরাইলের কতিপয় ব্যক্তিসহ তুর পর্বতে এসো। তোমার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে পাপের প্রায়শ্চিত্তের আবেদন জানাও। নির্দেশ মোতাবেক হজরত মুসা সত্তরজন লোক নির্বাচন করলেন। তাদেরকে বললেন, রোজা রাখো। পবিত্র পোশাকে সজ্জিত হও। তারা হজরত মুসার নির্দেশ প্রতিপালন করলো। তারপর আবেদন জানালো, হে নবী মুসা! আপনি আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন। যেনো আমরা তাঁর বাণী শুনতে পারি। যখন হজরত মুসা তাঁর সত্তরজন সঙ্গীসহ তুর পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলেন, তখন দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে পুঞ্জীভূত মেঘ। সে অলৌকিক মেঘমালায় আবৃত হয়ে আছে সম্পূর্ণ তুর পর্বত। মেঘপুঞ্জের দিকে এগিয়ে গেলেন হজরত মুসা। সঙ্গীদেরকে বললেন, মেঘমালার সন্নিকটবর্তী হওয়ামাত্র তোমরা সেজদাবনত হয়ো। মেঘের মধ্যে প্রবেশ করলেন হজরত মুসা। শুরু হলো আল্লাহ্‌পাকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন। তাঁর অবয়ব আচ্ছাদিত হলো আল্লাহ্‌পাকের জ্যোতিচ্ছটায়। তাঁর জ্যোতির্দীপ্ত চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করার সাধ্য কারো ছিলো না। তবু রয়ে গেলো অন্তরাল। অন্তরালের ওপার থেকে ধ্বনিত হতে লাগলো আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী। সঙ্গীরা শুনতে পাচ্ছিলো, আল্লাহ্‌পাক হজরত মুসাকে তাঁর আদেশ নিষেধাবলী বিবৃত করছেন। তারা শুনতে পেলো আল্লাহ্‌পাক বলছেন, নিঃসন্দেহে আমিই আল্লাহ্‌। আমি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আমি পরম পরাক্রমশীল। আমিই আপন ক্ষমতাবলে তোমাদেরকে মিসর থেকে এখানে এনেছি। তোমরা আমারই ইবাদত করো। আমি ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য নির্বাচন কোরো না। কথোপকথন শেষ হলো। অপসারিত হলো অলৌকিক মেঘের বিস্তার। এরপর শুরু হলো হজরত মুসার সঙ্গীদের আলাপচারিতা—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৫৫, ৫৬

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○ ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

www.eelm.weebly.com

❑ –যখন তোমরা বলিয়াছিলে, 'হে মুসা! আমরা আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করিবনা।' যখন তোমরা বজ্রাহত হইয়াছিলে তখন তোমরা নিজেরাই দেখিতেছিলে।

❑ মৃত্যুর পর তোমাদিগকে পুনর্জীবিত করিলাম যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

সঙ্গীরা বললো, তোমাকে কখনও বিশ্বাস করবোনা– একথার অর্থ আমরা কখনই একথার স্বীকৃতি দিবো না যে, আল্লাহ্ তোমাকে তওরাত উপহার দিয়েছেন, তোমার সাথে তিনি কথা বলেছেন অথবা তুমি আল্লাহ্র নবী।

'হাত্তা নারাল্লাহা জাহারাতান'–একথার অর্থ যতোক্ষণ না আমরা আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষভাবে না দেখি। চাক্ষুষ দর্শন বুঝাতে এখানে 'জাহারন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

যখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে– একথার অর্থ বজ্রের আঘাতে যখন তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলে। কেউ কেউ বলেছেন, 'ছুইক্বা' শব্দের অর্থ আগুন যা আকাশ থেকে অবতরণ করে সব কিছুকে ভস্মীভূত করে দেয়।

তোমরা নিজেরাই দেখছিলে– একথার অর্থ তোমাদের উপর আপতিত ওই বিপদ তোমরা স্বচোখে অবলোকন করছিলো।

মৃত্যুকে স্বচোখে দেখা না গেলেও মৃত্যু নিশ্চিতকারী বিপদকে দেখা সম্ভব। সঙ্গীরা যখন বজ্রাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করলো তখন হজরত মুসা ক্রন্দনরত অবস্থায় আল্লাহ্পাকের দরবারে নিবেদন জানালেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! বনীইসরাইলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা এখন মৃত। আমি আমার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গিয়ে কীভাবে এর জবাবদিহি করবো। হে আমার পরোয়ারদিগার! যদি তুমি ইচ্ছা করতে, তবে আমি সহ আমার সম্প্রদায়ের সকলকেই মৃত্যুদান করতে পারতে। তুমি কি তবে কতিপয় অর্বাচীনের কারণে আমাদের সকলকেই ধ্বংস করে দিবে?' হজরত মুসার রোদন ও প্রার্থনা আল্লাহ্তায়ালার দয়ার সাগরকে তরঙ্গায়িত করে তুললো। একদিন একরাত্রি পর আল্লাহ্পাক হজরত মুসার সঙ্গীদিগকে জীবন দান করলে একে একে তাদের জীবিত ব্যক্তিরা মৃত ব্যক্তিদের জীবিত হওয়া স্বচোখে দেখে যাচ্ছিলো, তাই আয়াতে বলা হয়েছে, তখন তোমরা নিজেরাই দেখছিলে।

'ছুম্মা বায়াছনাকুম মিম্ বা'দি মাউতিকুম' অর্থ মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করলাম। 'বায়াছ' শব্দের আভিধানিক অর্থ– কোনো বস্তু স্বস্থান থেকে উত্তোলন করা। হজরত কাতাদা বলেছেন, তাদের আয়ু এবং রিজিক তখনও ছিলো। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, তাদের মৃত্যু যদি আয়ু শেষের মৃত্যু হতো তবে আল্লাহ্ তাদেরকে আর পুনরুজ্জীবন দান করতেন না। মৃত্যুমুখে পতিত সকল মানুষের মতো পুনরুত্থান ঘটাতেন কিয়ামত দিবসে।

www.eelm.weebly.com

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো– এ কথার অর্থ পুনরুজ্জীবন লাভের নেয়ামতের জন্য আল্লাহ্পাকের শোকর করো অথবা বজ্রাঘাতের শাস্তির মাধ্যমে তোমাদেরকে যে ক্ষমা করা হয়েছে সে কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞ হও।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৫৭

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

☐ আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করিলাম; তোমাদের নিকট মান্না ও সাল্ওয়া প্রেরণ করিলাম। বলিয়াছিলাম, 'তোমাদিগকে যাহা দান করিলাম তাহা হইতে ভাল ভাল বস্তু আহার কর।' তাহারা আমার প্রতি কোন অন্যায় করে নাই, বরং তাহারা তাহাদেরই প্রতি অন্যায় করিয়াছিল।

'গামামা' শব্দটি এসেছে গাম্ শব্দ থেকে। গাম্ অর্থ লুকিয়ে ফেলা বা গোপন করা। এখানে গামামা শব্দের অর্থ মেঘ। সূর্যকে আড়াল করে দেয় বলেই মেঘকে গামামা বলা হয়। এই আয়াতে যে ঘটনার কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে সে ঘটনাটি হচ্ছে এই– আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো বনী ইসরাইলদেরকে, কিন্তু এ নির্দেশ পালন করতে তারা গড়িমসি শুরু করলো। তাদের শৈথিল্য ও হঠকারিতার কারণে আল্লাহ্পাক তাদেরকে একটি বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরে বন্দী করে রাখলেন। চল্লিশ বছর ধরে সেই বৃক্ষছায়াহীন প্রান্তরে বন্দীজীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলো তারা। দিনের শুরুতে কেউ কেউ ওই প্রান্তর থেকে পালাতে চেষ্টা করতো কিন্তু দিনান্তে দেখতো, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করা হয়েছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা। শেষে নিরুপায় হয়ে হজরত মুসা সকাশে তারা তাদের প্রয়োজন সমূহ পূরণের আবেদন জানালো। হজরত মুসার প্রার্থনার বদৌলতে আল্লাহ্পাক তাদের মাথার উপর স্থাপন করলেন শ্বেতশুভ্র মেঘমালা। এভাবে প্রখর সূর্য কিরণ থেকে তাদেরকে রক্ষা করা হলো। রাতে সেখানে স্থাপন করা হতো একটি নূরের স্তম্ভ যাতে করে ঘোর অন্ধকারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

তোমাদের নিকট মান্না ও সাল্ওয়া প্রেরণ করলাম– একথা বলে প্রান্তরের বন্দী জীবনে বনী ইসরাইলদেরকে প্রদত্ত দু'টি বিশেষ খাদ্যবস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটির নাম 'মান্না'। অন্যটির নাম 'সাল্ওয়া'। মান্না অর্থ 'তুবানজবীন'

www.eelm.weebly.com

(এক প্রকার ফল)। কেউ বলেছেন, হালকা চা-পাতি। মুজাহিদ বলেছেন– 'মান্না' গুগ্গু এর মতো আকাশ থেকে পতিত হয়ে পাহাড়ে প্রান্তরে জমাট বেঁধে থাকতো। তার স্বাদ ছিলো মিষ্টতাসম্পন্ন। বর্ণিত হয়েছে, আকাশ থেকে নেমে আসা সুমিষ্ট মান্না খেতে খেতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো বনী ইসরাইলেরা। মিষ্টিতে অরুচি দেখা দিলো তাদের, তারা হজরত মুসার নিকট নিবেদন জানালো, হে মুসা রসুল! আমরা তো একই রকম মিষ্টিদ্রব্য খেতে খেতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। আপনি মেহেরবাণী করে আল্লাহ্তায়ালার নিকট নিবেদন করুন, যেনো তিনি করুণাপরবশ হয়ে আমাদেরকে গোশ্ত আহারের বন্দোবস্ত করে দেন।

তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন খাদ্য দান করলেন আল্লাহ্তায়ালা। তার নাম 'সাল্ওয়া'। অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন, সালওয়া হচ্ছে এক ধরণের পাখি যা দেখতে অনেকটা বটর পাখির মতো। কেউ কেউ বলেছেন, বটর পাখি হচ্ছে 'সাল্ওয়া'। বিশাল মেঘের আকারে অসংখ্য বটর পাখি বনী ইসরাইলদের আওতায় এসে হাজির হতো- তারা একদিন একরাত্রি পরিমান প্রয়োজন পূরণের মতো পাখি ধরে রেখে দিতো। আর শুক্রবারে সংগ্রহ করতো দুই দিন দুই রাত্রির আহার্য। কারণ শনিবারে বটর পাখিরা নেমে আসতো না।

তোমাদেরকে যা দান করলাম তা থেকে ভালো ভালো বস্তু আহার করো– একথার অর্থ তোমাদের জন্য যে পরিমান হালাল কর হয়েছে সেই পরিমাণ আহার্য গ্রহণ করো। হালাল, পবিত্র অথবা ভালো ভালো বুঝাতে এখানে 'তাইয়েবা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ্পাকের নির্দেশ ছিলো এরকম একদিনে তোমাদের যতোটুকু প্রয়োজন ততটুকু আহার্য সংগ্রহ করো। পরবর্তী দিনের জন্য সঞ্চয় কোরো না। বনী ইসরাইলেরা এই নির্দেশের অবমাননা করলো। সঞ্চয় করতে শুরু করলো তারা। আল্লাহ্পাক রুষ্ট হলেন। বন্ধ হয়ে গেলো অনায়াসলভ্য খাদ্য সামগ্রী। তাদের সঞ্চয়েও শুরু হলো পচন। শেষে সম্পূর্ণ সঞ্চয়ই তাদের বিনষ্ট হয়ে গেলো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ, বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন– রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাকের নির্দেশের অবমাননা না করলে বনী ইসরাইলদের আহার্যপ্রবাহ কখনই বন্ধ হতো না। আর বিবি হাওয়া যদি প্ররোচনাপ্রবণা না হতেন তবে কোনো নারী স্বামীর অবাধ্য হতো না।

তারা আমার প্রতি কোনো অন্যায় করে নাই বরং তারা তাদের প্রতিই অন্যায় করেছিলো– একথার অর্থ তারা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি বরং নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। তাদের এ ক্ষতি ছিলো দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের। নির্দেশ অবমাননার কারণে তারা হয়েছে আখেরাতের শাস্তির উপযোগী। দুনিয়াতে হারিয়েছে শ্রমবিহীন রিজিকের নিশ্চয়তা, আখেরাতে যে রিজিকের হিসেব দিতে হতো না।

www.eelm.weebly.com

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّ
ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ
الْمُحْسِنِينَ ○ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○

❑ স্মরণ কর যখন আমি বলিলাম, 'এই জনপদে প্রবেশ কর, যথা ও যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, নতশিরে প্রবেশ কর এবং বল– 'ক্ষমা চাই'। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করিব।'

❑ কিন্তু যাহারা অন্যায় করিয়াছিল তাহারা তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল তাহার পরিবর্তে অন্য কথা বলিল। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিলাম; কারণ তাহারা সত্য ত্যাগ করিয়াছিল।

যে জনপদে প্রবেশ করার কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে সেই জনপদটির নাম আরীহা। ওই জনপদটি অত্যাচারীদের জনপদ বলে অভিহিত হতো। আদ বংশের একাংশ বসবাস করতো সেখানে। তারা পরিচিত ছিলো আমালেকা নামে। এরকম বলেছেন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। আর মুজাহিদ বলেছেন, ওই জনপদটি হচ্ছে বায়তুল মাক্দিস। কেউ কেউ বলেছেন 'ইলইয়া'। কেউ বলেছেন সিরিয়া।

'যথা ও যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর'– একথার অর্থ ওই জনপদে তোমাদের জন্য অঢেল রিজিক মওজুত রয়েছে।

'উদখুলুল বাব' অর্থ ওই জনপদ বা নগরীর যে কোনো দরোজা দিয়ে প্রবেশ করো। বর্ণনায় এসেছে, ওই নগরীর প্রবেশ পথের সংখ্যা ছিলো সাতটি।

'সুজ্জাদন' অর্থ নতশিরে। অর্থাৎ বিনয় প্রকাশার্থে মস্তক অবনমিত করতে করতে প্রবেশ করা। ওয়াহাব বলেছেন এর অর্থ- যখন নগরীতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ্পাকের উদ্দেশ্যে শুকরিয়ার সেজদা করবে। এর পরের নির্দেশ হচ্ছে– প্রবেশকালে বলতে থাকো হিত্তা (ক্ষমা চাই) অর্থাৎ এরকম বলো যে, হে আল্লাহ্পাক! আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দাও। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, একথার মর্ম হচ্ছে– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলো যেহেতু এই বাণী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করলে পাপরাশি বিলুপ্ত হয়। এরপর বলা হয়েছে, এরকম

www.eelm.weebly.com

করলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবো। 'খতাইয়াকুম' অর্থ অপরাধসমূহ। শেষে বলা হয়েছে সৎকর্মপরায়ণদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করবো অর্থাৎ তারা বিনিময় লাভ করবে দ্বিগুন। সৎকর্মপরায়ণদেরকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, তাদের আনুগত্য নিঃসন্দিগ্ধ, অন্যদের মত টলো-টলায়মান নয়।

বনী ইসরাইলদের মধ্যে যারা অসৎ প্রকৃতির তারা হিত্তা না বলে অন্য কথা বলেছিলো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারীর পদ্ধতিতে বাগবী বলেছেন, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন–বনী ইসরাইলদের প্রতি নির্দেশ ছিলো যে, দরোজা অতিক্রমকালে সেজদা করতে করতে এবং হিত্তা বলতে বলতে প্রবেশ করবে। কিন্তু অসৎ প্রকৃতির লোকেরা অধোবদনে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে প্রবেশ করেছিলো এবং 'ক্ষমা চাই' একথা বলার পরিবর্তে 'জবের মধ্যে শস্য' এরকম বলতে বলতে যাচ্ছিলো।

অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করলাম (আল্লাজীনা জ্বলামু) বলে বারংবার বনী ইসরাইলদের প্রতি আরোপিত শাস্তির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এরকম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের জঘন্য স্বভাব চরিত্র যেনো পৃথিবীবাসীদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। তাদের কৃতকর্মের কারণেই যে বার বার শাস্তি আরোপিত হচ্ছে– এ কথাটা বিশেষভাবে প্রচার করে পৃথিবীবাসীদেরকে সতর্ক করে দেয়াও এরকম বাকভঙ্গীর আরেকটি উদ্দেশ্য। আনুগত্যের স্থলে অবাধ্যতা প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে আত্মহননেরই নামান্তর।

আমি বলি, এ রকম বাণীভঙ্গীর কারণ এও হতে পারে যে, যদি 'আলাল্লাজীনা জ্বলামু' এর স্থলে কেবল 'আলাইহিম' বলা হতো, তবে এই সন্দেহটি জেগে উঠতে পারতো যে, ওই শাস্তি ছিলো সমস্ত বনী ইসরাইলের উপরে, আয়াতের বিবরণ ভঙ্গীতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে, কেবল অপরাধীদের উপরে শাস্তি নেমে এসেছিলো।

'রিজ্‌ঝা' অর্থ শাস্তি। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, কোরআন মজীদের যেখানে যেখানে রিজ্‌ঝা শব্দটি রয়েছে তাদের প্রতিটি স্থানেই এর অর্থ হবে শাস্তি। অভিধানে রিজ্‌ঝা শব্দটি ওই বস্তুকে বুঝায় যা স্বভাবতঃ ঘৃণা উদ্রেককারী অথবা যা রুচিকর নয়।

'মিনাস্‌সামায়ি' অর্থ আকাশ থেকে। আকাশ থেকে প্রেরিত এ শাস্তি সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, সেই শাস্তি ছিলো মহামারী প্লেগ। সেই প্লেগের প্রার্দুভাবে এক ঘন্টায় সত্তর হাজার বনী ইসরাইল নিপাত হয়েছিলো। ইবনে জারীর বলেছেন, ইবনে জায়েদের বর্ণনায় এসেছে– মহামারীও একটা শাস্তি যা তোমাদের প্রতি আপতিত হয়েছিলো। এতে করে বুঝা যায় বনী ইসরাইলের উপর প্লেগের প্রার্দুভাব ঘটেছিলো।

www.eelm.weebly.com

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۭ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۭ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۭ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

❑ স্মরণ কর, যখন মুসা তাহার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করিল, আমি বলিলাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর।' ফলে উহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবন প্রবাহিত হইল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনিয়া লইল। বলিলাম, 'আল্লাহ্ -প্রদত্ত জীবিকা হইতে তোমরা পানাহার কর এবং সত্যত্যাগী হইয়া পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না।'

যেদিকে দৃষ্টি যায় সেদিকেই কেবল ধূ ধূ বালুকারাশি, বৃক্ষগুল্মহীন প্রান্তর– পাথুরে পাহাড়; ওই প্রান্তরে বন্দী বনী ইসরাইলীরা হয়ে পড়লো তৃষ্ণার্ত। হজরত মুসা আল্লাহ্তায়ালার সকাশে পানি প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্পাক বললেন, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো। ওই লাঠিটি ছিলো বেহেশতের একটি যষ্টি। দশ হাত লম্বা ছিলো লাঠিটি। চিহ্নিত ছিলো দু'টি ভাগে। অন্ধকারে আলো ঠিকরে পড়তো লাঠি থেকে। হজরত আদম এই লাঠি বেহেশত থেকে এনেছিলেন পরে বংশানুক্রমে লাঠিটি হজরত শোয়াইব আ. এর হাতে এসে পড়ে। তাঁর মাধ্যমে পান হজরত মুসা।

লাঠি দ্বারা যে পাথরে আঘাত করতে বলা হয়েছে, সে পাথরটি ছিলো চতুষ্কোন বিশিষ্ট। আকারে ছিলো মানুষের মাথার সমান। হজরত মুসা ওই পাথরটি একটি চামড়ার থলিতে সংরক্ষণ করতেন। এরকম বলেছেন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। আতা খোরাসানী বলেছেন, ওই পাথরটির ছিলো চারটি কোন। প্রতি কোন থেকে তিনটি করে ঝর্ণা প্রবাহিত হতো। এমনিভাবে বারোটি ধারা প্রবাহিত হতো বারোটি গোত্রের জন্যে। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, এ পাথরটি ছিলো ওই পাথর, যার উপরে পরিধেয় রেখে হজরত মুসা নদীতে গোসল করতে নেমেছিলেন। ঘটনাটি এরকম– হজরত মুসা তাঁর পবিত্র শরীর প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখতেন । এতে করে কিছু লোক মন্তব্য করেছিলো, তাঁর একশিরা নামক ব্যাধি আছে। এটাই তাঁর অতিরিক্ত বস্ত্র ব্যবহারের কারণ। আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ছিলো তিনি তাঁর প্রিয় রসুলকে অপবাদমুক্ত করবেন। তাই সংঘটিত হলো এ ঘটনাটি। একটি নির্জন স্থানে একটি পাথরের উপরে গাত্রাবরণ রেখে পানিতে

www.eelm.weebly.com

নামলেন হজরত মুসা। ঠিক তখনই গাত্রাবরণ নিয়ে পাথরটি দৌড়াতে শুরু করলো। পাথরের পিছনে দৌড় দিলেন হজরত মুসা। এ অবস্থায় ওই লোকদের সম্মুখীন হলেন যারা অপবাদ রটিয়ে যাচ্ছিলো। পাথরটি থেমে পড়লো। অতি দ্রুত পাথরের উপরে রাখা কাপড় নিয়ে তিনি তাঁর পবিত্র শরীর আচ্ছাদিত করলেন। হঠাৎ হজরত জিব্‌রাইল আর্বিভূত হয়ে বললেন, আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশ এই যে, পাথরটি আপনি আপনার কাছে রাখুন। ভবিষ্যতে এক সময় আল্লাহ্‌তায়ালার কুদরত এবং আপনার অলৌকিকত্ব এই পাথরের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। তখন থেকে ওই পাথরটি একটি চামড়ার থলিতে করে সংরক্ষন করে আসছিলেন হজরত মুসা। বোখারী ও মুসলিমে পাথরের পলায়ন কাহিনী বিবৃত হয়েছে, কিন্তু হজরত জিব্‌রাইলের আগমনের উল্লেখ সেখানে নেই। হজরত কাতাদা থেকে আরদ বিন হামিদ বলেছেন, পাথরটি ছিলো তুর পাহাড়ের। বনী ইসরাইলেরা সেটা সাথে সাথে রাখতো। পাথরের প্রকৃতি নির্ণয়ে মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। কেউ কেউ বলেছেন, সেটি ছিলো মর্মর পাথর, কেউ আবার বলেছেন পাথরটি ছিলো ছঙ্গে কুর্দান। পাথরটিতে ছিলো বারোটি গর্ত। লাঠি দিয়ে আঘাত করলে প্রতিটি গর্ত থেকে একটি করে সুমিষ্ট পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হতো। প্রতিটি গোত্র পরিতৃপ্ত হলে হজরত মুসা তাঁর লাঠি দিয়ে পাথরটিতে পুনঃ আঘাত করতেন; তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যেতো পানির প্রস্রবণ। তিনি তখন পাথরটি তাঁর চামড়ার থলিতে রেখে দিতেন। ওই পাথরের প্রস্রবণ প্রতিদিন ছয়লক্ষ তৃষ্ণার্তকে পরিতৃপ্ত করতে পারতো।

ওয়াহাব ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ বলেছেন, পানির প্রস্রবণ জারী হওয়ার ব্যাপারটা কোনো নির্দিষ্ট পাথরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো না। বিষয়টি ছিলো হজরত মুসার মোজেজা। তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে যে পাথরেই আঘাত করতেন সে পাথর থেকেই পানি প্রবাহিত হতো। আতা বলেছেন, হজরত মুসা পাথরের বারোটির স্থলে, বারো বার লাঠি দ্বারা আঘাত করতেন। সেসব স্থানে রমনী স্তনের মতো একটি করে গোশ্‌ত প্রকাশ পেতো। সেখান থেকেই ধীরে ধীরে পানি নির্গত হতো এবং পরে তা নদীর আকার ধারণ করতো।

বারোটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হলো। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনে নিলো। অর্থাৎ প্রতিটি গোত্রের জন্য ছিলো স্বতন্ত্র পান-ঘাট। তারা তাদের নির্ধারিত পান-ঘাট ছেড়ে অন্য ঘাটে কখনোও যেতো না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের এই নির্দেশ দান করলেন যে, আহার করো মান্না ও সালওয়া এবং পান করো এই অলৌকিক ঝর্ণার পানি। আয়াতে 'রিজক্বিল্লাকুম' শব্দের মাধ্যমে এই সুনিশ্চিত ও অনায়াস লব্ধ রিজিকের কথা বলা হয়েছে। এ রিজিক অবশ্যই বিশেষ ধরণের। এই রিজিক অর্জিত নয়, প্রদত্ত। বিশেষ অনুগ্রহমন্ডিত শ্রমবিহীন জীবনোপকরনের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌তায়ালা আয়াতের শেষে এই মর্মে সদুপদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা সত্য ত্যাগ করে

www.eelm.weebly.com

পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে যেয়ো না। কাযী বায়যাবী বলেছেন, 'মুফসিদিন' অর্থ অনর্থ সৃষ্টি কোরো না। অনর্থ মাত্র কোরো না— এরকম অর্থও হতে পারে। কখনোও আবার কোনো প্রতাপশালী অত্যাচারীর বিরোধীতাকেও এই শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। কখনো আবার শব্দটি সোলেহ্ বা সংশোধনের নিমিত্তে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে ব্যবহার করা যায়। যেমন হজরত খিজির আ. কর্তৃক একটি নিস্পাপ শিশুর নিহত হওয়া, নৌকা ফুটো করে দেয়া ইত্যাদি।

আমি বলি, 'আছা' শব্দের অর্থ অতিরিক্ত ব্যয় বা অপব্যয়। হজরত ওমর ফারুক বর্ণিত হাদিসে এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হয়, যেখানে বলা হয়েছে— 'কুলা রসুলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিসরা ওয়া কাইসার ইয়া আইসানি ফিমা ইয়াইসানি ফিহি ওয়া আনতা হাকাজা।' অর্থাৎ হজরত ওমর রসুল পাক স. এর নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কেসরা ও কায়সার (রোম ও পারস্যের বাদশাহ্) বিশাল বৈভব অপব্যয় করে চলেছে আর আপনি! (আল্লাহ্‌র রসুল) একি দীন-হীন অবস্থা আপনার? এ হাদিসের বর্ণনার রীতি অনুযায়ী মুফ্‌সিদিন শব্দটি হালে মুয়াক্কাদ না হয়ে হালে মুকাইয়িদ হবে।

সুরা বাকারা : আয়াত ৬১

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

❑ যখন তোমরা বলিয়াছিলে 'হে মুসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করিব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর— তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য, শাক-সব্জি, কাঁকুড়, গম মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন।' মুসা বলিল, 'তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সহিত বদল করিতে চাও? তবে কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যাহা চাও

www.eelm.weebly.com

তাহা সেখানে আছে।' এবং তাহারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্রগ্রস্ত হইল ও তাহারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হইল। ইহা এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করিত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিত। অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করিবার জন্যই তাহাদের এই পরিণতি হইয়াছিল।

মরু প্রান্তরের বন্দী জীবনে বণী ইসরাইলের প্রতিদিনের পানাহার ছিলো একই রকম। মান্না ও সাল্‌ওয়া এবং সেই অলৌকিক ঝর্ণার পানি। একই রকম পানাহারের পুনরাবৃত্তিতে তারা অপ্রসন্ন হলো। অধৈর্য হয়ে বললো, 'হে নবী মুসা! এরকম একধরণের পানাহার আর আমাদের ভালো লাগে না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা করো। তিনি যেনো আহার্য হিসেবে আমাদেরকে শাক-সব্জি, কাঁকুড়, গম, মসুর, পেঁয়াজ ইত্যাদি ভূমিজাত আহার্য বস্তু দান করেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ফুমিহা' অর্থ রুটি। আতা বলেছেন 'গম।'

বনী ইসরাইলদের ধৈর্যহীনতা ও মূর্খজনোচিত আব্দার শুনে হজরত মুসা বললেন, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুর বদলে নিকৃষ্টতর বস্তুর আকাঙ্খা করো? উৎকৃষ্টতর বস্তু বুঝাতে এখানে খয়ের শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে— এর মর্ম হচ্ছে মান্না ও সাল্‌ওয়া। এগুলো খয়ের এজন্যই যে, শ্রমের কষ্ট ছাড়াই এগুলো পাওয়া যাচ্ছিলো আর এগুলোর জন্য পরকালে কোনো জবাবদিহিও করতে হবে না, আর এগুলো পার্থিব স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য মহা উপকারী।

হজরত মুসা বললেন, উৎকৃষ্টতার পরিবর্তে যদি নিকৃষ্টতাই তোমাদের কাম্য হয়, তবে এমন কোনো নগরীতে গিয়ে উপস্থিত হও; যেখানে তোমরা তোমাদের কাম্য বস্তু লাভ করবে। জুহাক বলেছেন, এখানে নগর বলতে ফেরাউন শাসিত নগর বুঝানো হয়েছে। এভাবেই বনী ইসরাইলেরা আল্লাহ্‌তায়ালার ক্রোধের শীকার হলো। ফলে লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য হলো তাদের নিত্য সঙ্গী। দারিদ্র্য বুঝাতে এখানে 'মাস্‌কানাহ্' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। দারিদ্র্য মানুষকে অকর্মন্য ও হীনমন্য করে দেয়। আশা ও উদ্দীপনাকে করে তিরোহিত। অর্থশালী ইহুদীদেরকেও সম্পদহীনদের মতো জীবন-উত্তাপ বিবর্জিত পরিদৃষ্ট হয়। কারণ, তাদের অন্তর দরিদ্র। বিরামহীন সম্পদ লিপ্সার কারণে তারা হীনমন্যতার শীকার। তাই কেউ কেউ বলেছেন, মাস্‌কানাহ্ শব্দের অর্থ অন্তরের অনুদারতা ও বিত্তলিপ্সা। আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করতো বনী ইসরাইলেরা, তাই তাদের এই করুণ পরিণতি। এখানে আয়াত অস্বীকারের অর্থ তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের ওই সকল আয়াতের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন; যেগুলোতে রয়েছে রসুল মোহাম্মদ স.এর গুণাবলীর বিবরণ। তারা অবাধ্যতা ও সীমা লঙ্ঘনের আরও অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে নবীহত্যা। নবীহত্যা অন্যায় জেনেও তারা এ জঘন্য অন্যায় কর্মে লিপ্ত হতো। বর্ণিত হয়েছে— ইহুদীরা একদিনেই সত্তরজন নবীকে হত্যা করেছিলো।

www.eelm.weebly.com

ইহুদীরা অবাধ্য। সীমালঙ্ঘনকারী। তাদের উপর আল্লাহ্‌র গজব নেমে আসার কারণ অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন।

সুরা বাকারাঃ আয়াত ৬২

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

❑ যাহারা বিশ্বাস করে, যাহারা ইহুদী হইয়াছে এবং খৃষ্টান ও সাবেঈন– যাহারাই আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাহাদের জন্য পুরষ্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাহাদের কোনো ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

যারা বিশ্বাস করে- একথা বলে মুখে ও মনে বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং শুধু মৌখিক বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকেও (মুনাফিকদেরকেও) বুঝানো হয়েছে। আর ইহুদী হয়েছে বলে বুঝানো হয়েছে ইহুদী ধর্মমত অবলম্বনকারীদেরকে। ইয়াহুদ শব্দটি আরবী হাদ শব্দ থেকে গঠিত যার অর্থ তওবা করলো। গো-বৎস্য পূজা থেকে যারা তওবা করেছিলো তাদের নাম ইহুদী। তারা আরো বলেছিলো, 'হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবৃত হয়েছি।' একারণেও তাদেরকে ইহুদী নামে অভিহিত করা হয়ে থাকতে পারে। হজরত ইয়াকুবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিলো ইয়াহুদ। তাঁর নামেই তাঁর পরবর্তী বংশধরদের নাম ইহুদী করা হয়েছে– এভাবেও ইহুদী নামের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। কারণ, পুর্বপুরুদের নামে কোনো গোত্রকে চিহ্নিত করার রীতিটি বহুল প্রচলিত।

'আন্নাসারা' অর্থ খৃষ্টান। শব্দটি নাস্‌রন শব্দের বহুবচন। শব্দটির অর্থ সাহায্যকারী। তাদেরকে নাসারা বা খৃষ্টান এজন্যই বলা হয় যে, তারা হজরত ঈসা আ.কে সাহায্য করেছিলো। অথবা এরকমও অর্থ হতে পারে যে, হজরত ঈসার সহচরবৃন্দ ছিলেন নাসেরা বা নাসরান নামক স্থানের অধিবাসী। তাই তাদেরকে নাসারা বলা হয়।

'ওয়াস্‌সাবেঈন' শব্দটি মদীনাবাসীগণ 'হামযা' ব্যতিরেকে পাঠ করেন। অন্য ক্বারীগণ পাঠ করেন হামযা সহযোগে। সাবিউ শব্দটির মূল অর্থ আল খুরুজ (বের হও)। যখন কেউ ধর্ম থেকে বের হয়ে অন্য ধর্মে দীক্ষিত হয় তখন আরবীভাষীগণ

www.eelm.weebly.com

তাদেরকে বলে সাবিউ ফুলানা (অমুক ধর্মান্তরিত হয়েছে) – এভাবে উটের দাঁত গজালে তারা বলে, উটের দাঁত বের হয়েছে। এক্ষেত্রেও তারা সাবিউ শব্দটি ব্যবহার করে। যারা সকল ধর্ম থেকে বহিঃস্কৃত তাদেরকেই সাবেইন বলা হয়। হজরত ওমর ও হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, সাবেঈন আহলে কিতাবের একটি উপদলের নাম। তবে তাদের মধ্যে বিধানগত পার্থক্য রয়েছে। হজরত ওমর বলেছেন, তাদের জবেহ্ করা পশুর গোশত ভক্ষণ করা আমাদের জন্য হালাল। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, হালাল নয়। মুজাহিদ বলেছেন, সাবেঈন সম্প্রদায় আহলে কিতাবের একটি দল। তাদের ধর্মমত ইহুদী ও অগ্নিপূজকদের মাঝামাঝি। কালাবী বলেছেন, তাদের ধর্মাদর্শ ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের মাঝামাঝি। তারা ইহুদীও নয়। খৃষ্টানও নয়। কাতাদা বলেছেন, সাবেঈন ওই সম্প্রদায় যারা যবুর শরীফ পাঠ করে। ফেরেশতাদের উপাসনা করে। কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে। এভাবে তারা বিভিন্ন ধর্ম থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করে একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেছিলো।

ইহুদী, খৃষ্টান, সাবেঈন– যে সম্প্রদায়ের লোকই হোকনা কেনো, তারা যদি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, শেষ দিবসে আস্থাশীল হয় এবং সৎকাজের ব্রত গ্রহণ করে- একথার অর্থ, আল্লাহ্, রসুল মোহাম্মদ স. এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান আনয়ন করে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, একথার অর্থ, উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে যাঁরা বিশুদ্ধ মুমিন। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম শ্রেণীর মুমিন। কারো কারো মত হচ্ছে, ওই সকল মুমিন যাঁরা রসুল পাক স. এর আবির্ভাবের পূর্বে ইমান ও সত্যধর্মের সন্ধানে ছিলেন। যেমন, হাবীবে নাজ্জার, কায়েস বিন সায়েদা, যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল, ওয়ারাকা বিন নাওফেল, আল বারাউস্ সাত্তা, আবু জর গিফারী, সালমান ফারসী, পাদ্রী বুহাইর এবং নাজ্জাশীর দূত। এদের মধ্যে কয়েকজনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিলো। অর্থাৎ তাদের কয়েকজন রসুল পাক স. এর করুণাস্নাত হয়ে দ্বীনের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবাগণের দলভূত হতে পেরেছিলেন। বাকীরা এরকম সুযোগ পাননি। খতিব বাগদাদী বলেন, এখানে 'ইন্নাল্লাজিনা আমানু'– একথার অর্থ হচ্ছে, ওই সকল লোক যারা হজরত মুসা আ. এর শরিয়ত রহিত হওয়ার পূর্বে ইমানদার ছিলেন। এরকম ব্যাখ্যা গ্রহণের পর 'মান আমানা মিনহুম' এর অর্থ হবে, ওই সকল মানুষ যাঁরা ইমান সহকারে মৃত্যুবরণ করেছেন।

আমি বলি, 'মান আমানা মিনহুম' এর অর্থ, ওই সকল লোক যাঁদের দেহমন শুদ্ধ, পবিত্র, পূর্ণ ও আলোকিত। তাঁরা হচ্ছেন সম্মানিত সূফী সম্প্রদায়। যেহেতু রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, তোমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ইমানদার নও যতোক্ষন না আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল কিছু অপেক্ষা প্রিয় না হই। হজরত আনাস থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম, আহমদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা। অপর একটি হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হবে না, যতোক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালো- অপরের জন্য তাই ভালো মনে না করবে। এই হাদিসটিও হজরত আনাস থেকে বোখারী, মুসলিম,

www.eelm.weebly.com

আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন। অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র বান্দাগণ যতোক্ষণ না নিজের কথার জন্য না হবে- ততোক্ষণ সে ইমানের হকীকতে পৌছতে পারবেনা (অর্থাৎ যতোক্ষণ না নিজের মুখনিঃসৃত কটুকথার জন্য ব্যথিত না হবে)। তিবরানী। বাগবী বলেছেন, সম্ভবতঃ 'মান আমানা মিনহুম' এর পূর্বে 'ওয়াও' (এবং) শব্দটি উহ্য রয়েছে। যদি তাই হয় তবে অর্থ হবে এরকম– হে মোহাম্মদ স.! যাঁরা আপনার উপরে ইমান এনেছে।

ইমান এনে যারা সৎকাজে ব্রতী হবে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পুরস্কার। 'আজর' অর্থ, প্রতিদান বা পুরস্কার। যে পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার আল্লাহ্‌তায়ালা করেছেন– সেগুলো হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য, জান্নাত এবং শান্তি প্রবাহ– যেখান থেকে নৈকট্যভাজনেরা পরিতৃপ্ত হবেন।

শেষে বলা হয়েছে, তখন তাদের আর কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। অর্থাৎ আখেরাতে যখন অবিশ্বাসী সম্প্রদায় শাস্তির ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকবে, সংকীর্ণচিত্ত অবাধ্যরা যখন অপমান ও সন্তাপে জর্জরিত হতে থাকবে, তখন বিশ্বাসীরা হবে শংকাহীন। তখন তাদেরকে আর দুঃখের ভার বহন করতে হবে না।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৬৩, ৬৪.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

❒ স্মরণ কর যখন তোমাদের অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং 'তুর'কে তোমাদের উর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছিলাম; বলিয়াছিলাম, 'আমি যাহা দিলাম দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর এবং তাহাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ রাখ, যাহাতে তোমরা সাবধান হইয়া চলিতে পার।'

❒ ইহার পরেও তোমরা মুখ ফিরাইলে! আল্লাহের অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা তোমাদের প্রতি না থাকিলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হইতে।

আল্লাহ্‌পাক এখানে কৃত অঙ্গীকারের কথা এবং বনী ইসরাইলদের মাথার উপরে পাহাড় স্থাপনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। অঙ্গীকারটি ছিলো, হজরত মুসার আনুগত্য ও তওরাতের অনুসরণ সংক্রান্ত। সুরইয়ানী ভাষায় পাহাড়কে বলে 'তুর'। এখানে তুর শব্দটির মাধ্যমে কোনো একটি পাহাড়ের কথা বলা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে। বাগবী বলেছেন, ঘটনাটি ছিলো এরকম- তওরাত নাজিল হলে হজরত মুসা তওরাতকে মান্য করতে এবং এর বিধানাবলী বাস্তবায়ন করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় উপেক্ষা ও অনীহা প্রকাশ করলো। তওরাতের বিধানাবলী ছিলো অত্যন্ত কঠিন। হজরত মুসার শরিয়ত তাই কঠিনতর। হজরত মুসার নির্দেশ উপেক্ষা করলে আল্লাহ্পাকের নির্দেশে হজরত জিবরাইল একটি বিশাল পাহাড় তুলে এনে বনী ইসরাইলদের মাথার উপরে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখলেন। হজরত আদম আ. এর দৈহিক উচ্চতা যতোখানি ছিলো ততোখানি উপরে ছিলো পাহাড়টি। হজরত জিবরাইল বললেন, তওরাতকে অমান্য করলে তোমাদের উপর এই বিশাল পাহাড়টি ছেড়ে দেয়া হবে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম এরকম বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর নিকট থেকে আতা বর্ণনা করেছেন, তাদের মাথার উপর পাহাড় দাঁড় করানো হলো। আর সামনের দিক থেকে একটি অগ্নিশিখা এবং পিছন দিক থেকে একটি ভয়ংকর গর্জনমুখর আগুনের সাগর তাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলো। নির্দেশ দেয়া হলো, তওরাতকে গ্রহণ করো। নতুবা পাহাড় ও অগ্নিসাগর এক সঙ্গে তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে। আলোচ্য আয়াতেও বলা হয়েছে, আমি যা দিলাম দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করো এবং তাতে যা আছে স্মরণ রেখো যাতে তোমরা সাবধানতা অবলম্বন করে পরিত্রাণ পাও। 'তাকওয়া' অর্থ সাবধানতা। যিনি এই সাবধানতা অবলম্বন করেন, তিনি মুত্তাকী।

মাথার উপর বিশাল পাহাড় দর্শনে উপায়ান্তর না দেখে বনী ইসরাইলেরা তৎক্ষণাৎ নির্দেশ মেনে নিলো এবং সেজদায় পতিত হলো। সেজদাবস্থাতে তারা ঘাড় কাত করে পতনোন্মুখ পাহাড়টি দেখছিলো। এরপর থেকে তাদের মধ্যে কাত হয়ে সেজদার প্রচলন শুরু হয়। তারা বলে, এরকম সেজদাই উত্তম। কারণ, এর মাধ্যমেই আল্লাহ্র আযাব সরে গিয়েছিলো।

কিন্তু বনী ইসরাইলেরা তাদের কথায় শেষ পর্যন্ত অচঞ্চল থাকতে পারেনি। তাই এখানে বলা হয়েছে, এরপরেও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। তদ্সত্ত্বেও আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও অনুকম্পা তোমাদের প্রতি রয়েছে, যদি না থাকতো তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হতে। শাস্তি বিলম্বিত করাকেই এখানে ফজল বা অনুগ্রহ বলা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এরকম হতে পারে যে, হে বনী ইসরাইল! যদি নবী মোহাম্মদ স. এর আগমন না ঘটতো, তবে তোমাদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার নৈসর্গিক আপদ বিপদ ঘটতেই থাকতো। কিন্তু তা ঘটেনি একারণে যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. মহাবিশ্বের রহমত (অনুকম্পা) স্বরূপ। তাঁর কারণেই তোমাদের শাস্তি বিলম্বিত করা হয়েছে। তাই আগের মতো ভূমিধ্বস ও রূপান্তরের শাস্তি স্থগিত রয়েছে।

www.eelm.weebly.com

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ۚ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

❑ তোমাদের মধ্যে যাহারা শনিবারে সীমালঙ্ঘন করিয়াছিল তাহাদিগকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা ঘৃনিত বানর হও।'

❑ আমি ইহা তাহাদের সম-সাময়িক ও পরবর্তিগণের শিক্ষা গ্রহনের জন্য দৃষ্টান্ত ও সাবধানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করিয়াছি।

'সাব্‌তি' শব্দের আসল অর্থ কর্তন করা বা পৃথক করা। কিন্তু এই আয়াতে উল্লেখিত 'সাব্‌তি' শব্দের অর্থ হবে শনিবার। কারণ, শনিবারেই আল্লাহ্‌পাক তাঁর সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন। ইহুদীদের প্রতি নির্দেশ ছিলো, শনিবারে পার্থিব সকল কাজকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতে হবে। এ কারণেও শনিবারকে সাবতি বলা হয়ে থাকতে পারে। শনিবারের সীমালঙ্ঘন সংক্রান্ত ঘটনাটি এরকম— হজরত দাউদ আ. এর যুগে সাগরতীরের একটি শহরে সত্তর হাজার বনী ইসরাইল বসবাস করতো। তারা ছিলো মৎস্যজীবি। আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশ ছিলো শনিবারে তারা মৎস্য শিকার করতে পারবে না। ওই দিন কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিমগ্ন থাকতে হবে। সপ্তাহের অবশিষ্ট ছয় দিনের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। কিন্তু বনী ইসরাইলেরা দেখতে পেতো, শনিবারেই মাছের আনাগোনা বেশী হয়। ওই দিন অসংখ্য মাছের ঝাঁক পানির উপরে ভেসে বেড়াতে থাকে। পানি অপেক্ষা মাছই অধিক দৃষ্টিগোচর হয়। অন্য ছয় দিন এতো মাছ নজরে পড়ে না। ইহুদীরা তখন একটি কৌশল বের করলো। তীরভূমিতে তারা খনন করে রাখলো অনেক খাল বা চৌবাচ্চা। জোয়ারের সময় তীরভূমি প্লাবিত হতো। ভাটার সময় পানি সরে গেলে চৌবাচ্চার বদ্ধ পানিতে অনেক মাছ আটকা পড়ে যেতো। শনিবারে এভাবে মাছ আটকে রাখতো তারা। পরদিন সহজেই সেগুলোকে ধরে ফেলতো। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তারা শনিবার দিন তটভূমিতে পেতে রাখতো মাছ ধরার জাল অথবা অন্য কোনো ফাঁদ। শনিবারের জোয়ারে সেগুলোতে অনেক মাছ আটকা পড়ে যেতো। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা ছিলো বলে সেদিন তারা সেগুলোকে ধরতো না। পরের দিন রবিবারে তারা সেই মাছ তুলে আনতো। অবশ্য সকলেই এরকম করতো না। তিন ধরনের লোক ছিলো তাদের মধ্যে। এক ধরনের লোক নিজেরা এ কৌশল

www.eelm.weebly.com

অবলম্বন করতোই না। উপরোক্ত অন্যদেরকে নিষেধ করতো। দ্বিতীয় ধরনের লোকেরা নিজেরা এহেন অপকর্ম করতো না বটে, কিন্তু অন্যদেরকে নিষেধও করতো না। তৃতীয় প্রকার লোকেরা তাদের পুরো কৌশল কাজে লাগাতো। কারো বাধা-নিষেধের প্রতি কর্ণপাত করতো না তারা। যারা এই অপকর্ম থেকে অন্যদেরকে বিরত থাকতে বলতো তাদের সংখ্যা ছিলো বারো হাজার। নিষেধ অমান্যকারীদেরকে অভিশম্পাত দিয়েছিলেন হজরত দাউদ আ.। তাঁর অভিশম্পাতের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌পাক কুটকৌশল অবলম্বনকারীদেরকে বানরে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে এভাবে– 'তোমরা ঘৃনিত বানর হও।'

এ ঘটনাটি ছিলো তৎকালীন এবং তৎপরবর্তিকালীনদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা। 'নাকালা' শব্দের আভিধানিক অর্থ, নিষেধ করা বা বাধা দেয়া। কিন্তু এখানে এর অর্থ হবে, দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা। কারণ দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষাই মানুষকে পাপ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। জেলখানাকেও নাকালা বলা হয় একারণেই। যেহেতু জেলখানা বন্দীকে পলায়ন থেকে বাধা দেয়।

'সমসাময়িক ও পরবর্তিগণের'– একথা বলে তৎসময়ের এবং তৎপরবর্তি সময়ের মানুষের কথা বুঝানো হয়েছে। তাদের জন্য অবাধ্যতার এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিটিকে একটি নিদর্শন করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, একথার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, শাস্তিটি ছিলো সমসাময়িক– যার প্রতিক্রিয়া কিয়ামত দিবসেও পরিলক্ষিত হবে। অর্থাৎ এ পাপের জন্য কিয়ামতের দিনেও তাদেরকে শাস্তি পেতে হবে। এ ব্যাখ্যাটি অবশ্য অনেকটা কষ্টকল্পনার মতো।

শেষে বলা হয়েছে, 'সাবধানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি।' এখানে সাবধানীগণ বলতে হজরত মোহাম্মদ স. এর উম্মতদেরকে বুঝতে হবে। তাঁরা সাবধানী। আর সাবধানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

সুরা বাকারাঃ আয়াত ৬৭

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ○

❒ যখন মুসা আপন সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি গরু জবাইয়ের আদেশ দিয়াছেন,' তাহারা বলিয়াছিল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছ?' মুসা বলিল, 'আল্লাহ্‌র স্মরণ লইতেছি যাহাতে আমি অজ্ঞদের অর্ন্তভুক্ত না হই।'

---

www.eelm.weebly.com

এ আয়াতে বর্ণিত গরু জবাইয়ের পূর্ণ বিবরণ শুরু হয়েছে পরবর্তী রুকু থেকে (৭২ নং আয়াত থেকে)। ঘটনাটি আগাম উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, নিছক কাহিনী বর্ণনাই কোরআন মজীদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। পৃথক পৃথক ভাবে বনী ইসরাইলদের অপকীর্তিগুলোকে চিহ্নিত করাই উদ্দেশ্য। নেয়ামতের অস্বীকৃতি, অবতীর্ণ বিধানাবলীর প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, বিধিনিষেধের বিকৃতি, অবাধ্যতা ইত্যাদি বিভিন্নভাবে তুলে ধরাই আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্য। গরু জবাই সংক্রান্ত ঘটনাটি ছিলো এরকম– বনী ইসরাইলদের মধ্যে আমীল নামে এক বিত্তশালী লোক ছিলো। তার স্বজন বলতে ছিলো এক চাচাতো ভাই। সে চাচাতো ভাই ভাবলো, সে ছাড়া আর কোনো অংশীদার যখন নেই, তখন আমীলকে হত্যা করলেই তার পূরো সম্পদ তার অধিকারে এসে পড়বে। সে সুযোগ বুঝে একদিন আমীলকে হত্যা করে ফেললো। তারপর তার লাশ গোপনে অন্য এক গ্রাম সংলগ্ন মাঠে রেখে এলো। পরদিন সে চিৎকার করে লোক জড়ো করে জানিয়ে দিলো, আমীলের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। লাশের সন্ধান যখন পাওয়া গেলো, তখন সে ওই মাঠ সংলগ্ন গ্রামের কয়েকজনকে হত্যাকারী বলে অভিযুক্ত করলো। হজরত মুসা এই ঘটনাটি জানতে পেরে অভিযুক্তদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। কিন্তু তারা কোনোক্রমেই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত নয় বলে জানালো। তখন জনতা হজরত মুসাকে বললো, 'হে নবী মুসা! আপনি আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোয়া করুন যেনো এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। প্রকৃত হত্যাকারীর সন্ধান যেনো মিলে। হজরত মুসা দোয়া করলেন। নির্দেশ এলো, আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে একটি গরু জবাইয়ের আদেশ দিয়েছেন। লোকেরা বললো, হে মুসা! তুমি কি আমাদের সঙ্গে উপহাস করছো? জনতা বুঝতে পারেনি যে, আল্লাহ্তায়ালার সকল নির্দেশই হিকমতময়। তারা হত্যাকারী সনাক্ত করার বিষয়ের সঙ্গে গরু জবাইয়ের বিষয়টিকে কিছুতেই মেলাতে পারছিলো না। তাই তাদের মনে হচ্ছিলো যেনো হজরত মুসা তাদেরকে উপহাসের পাত্র মনে করেছেন। তাদের হঠকারিতামূলক মন্তব্য শুনে হজরত মুসা বললেন, আমি আল্লাহ্র শরণপ্রার্থী। আল্লাহ্পাক যেনো আমাকে অজ্ঞদের অন্তর্ভুত না করেন। লোকেরা বুঝতে পারলো, হুকুমটি অবধারিত। আর হুকুমটিও যেহেতু হত্যাকারী সনাক্ত করার ব্যাপারটার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল মনে হচ্ছে না, তখন যে গরু জবাই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে গরু নিশ্চয়ই সাধারণ গরু হবে না। এ মনে করে তারা জবাইযোগ্য গরুর আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্নরকম প্রশ্নের অবতারণা করলো। স্বকপোলকল্পিত ধারণার এই জটিলতা মূর্খতার একটি বড় নিদর্শন বটে। রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, ওই লোকেরা যদি সরল অন্তকরণে আল্লাহ্র নির্দেশকে মান্য করে যে কোনো গরু জবাই করতো, তবে সেটাই যথেষ্ট হতো। তারা কুটতর্কের অবতারণা করলো। সেই সূত্রে আল্লাহ্পাকও তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করলেন। হজরত ইকরামা থেকে এই হাদিসটি মুরসালরূপে

www.eelm.weebly.com

বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন মানসুর। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বিশুদ্ধ সনদে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন মওকুফ রূপে। বনী ইসরাইল জনতার অপ্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে একটি বিশেষ প্রকৃতির গাভী জবাই করা অপরিহার্য হয়ে পড়লো। আল্লাহ্পাকের এক বিস্ময়কর রহস্য প্রচ্ছন্ন ছিলো এই ঘটনাটিতে।

বনী ইসরাইলদের মধ্যে একজন অত্যন্ত সৎকর্মপরায়ণ লোক ছিলো। তার ছিলো এক শিশু সন্তান। আর ছিলো একটি গো-শাবক। মৃত্যুর পূর্বে গো-শাবকটি সে পাশের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্পাকের নিকট প্রার্থনা জানালো, হে দয়াময়! এই বাছুরটি আমি আমার শিশু সন্তান যুবক হওয়া পর্যন্ত গচ্ছিত রাখলাম। তখন থেকে বাছুরটি জঙ্গলে আপনাআপনি চরে বেড়াতে লাগলো। মানুষের পদশব্দ পেলেই সে লোকচক্ষুর অন্তরালে পালিয়ে যেতো। তাই কেউ চেষ্টা করলেও সেটিকে ধরতে পারতো না। ইতোমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হলো সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিটি। ক্রমে ক্রমে তার শিশু সন্তানটি যৌবনে পদার্পন করলো। সেও ছিলো সৎ এবং তার বিধবা মায়ের প্রতি অত্যন্ত সেবাপরায়ণ। রাত্রিকে তিন ভাগে ভাগ করতো সে। এক ভাগ নিদ্রার জন্য। এক ভাগ ইবাদতের জন্য এবং আরেক ভাগ মায়ের সেবা শুশ্রুষার জন্য। প্রত্যুষে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রয় করতো। আর এ উপার্জনকেও সে তিন ভাগে ভাগ করে নিতো। এক ভাগ ব্যয় করতো আল্লাহ্র পথে, একভাগ ব্যয় করতো মায়ের জন্য এবং অপরভাগ নিজের জন্য। একদিন মা বললেন, বৎস! তোমার পিতা তোমার জন্য একটি গাভী রেখে গিয়েছেন। ওমুক জঙ্গলে গাভীটি আল্লাহ্পাকের হেফাজতে রয়েছে। তুমি ওই জঙ্গলে যাও এবং বলো, হে ইব্রাহিম ও ইসমাইলের প্রতিপালক! আমার জন্য নির্ধারিত গাভীটি আমাকে দিয়ে দাও। গাভীটির নিদর্শন এরকম– যখনই তুমি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে দেখবে তার চামড়া থেকে যেনো সূর্যকিরণ ঠিকরে পড়ছে। গাভীটি ছিলো দেখতে ভারী সুন্দর। গাত্রবর্ণ হালকা জাফরানী রঙের। তাই মানুষ সেটিকে সোনালী গাভী বলতো। মাতৃ আদেশে যুবকটি সেই জঙ্গলে গিয়ে বললো, হে ইব্রাহিম ও ইসমাইলের উপাস্য! আমার গাভীটি আমাকে দাও। একথা বলার সাথে সাথে গাভীটি তার নিকট এলো। সে তখন গাভীটির গলা ধরে টানতে শুরু করলো। অনন্যসাধারণ গাভীটি কথা বলতে শুরু করলো। বললো, ওহে মাতৃসেবক! আমার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করো। আরামে গৃহাভিমুখে যেতে পারবে। যুবক বললো, আমার মা এরকম বলেননি। গাভী বললো, ঠিকই বলেছো। যদি তুমি আমার কথা মান্য করতে তবে আমি তোমাকে অমান্য করতাম। মাতৃ আনুগত্য তোমাকে এরকম মর্যাদাশীল করেছে যে, তুমি যদি কোনো পাহাড়কে তোমার সঙ্গে চলতে আদেশ করো, তবে পাহাড়ও স্বস্থান ত্যাগ করে তোমার সহগামী হবে। যুবক গাভীটিকে নিয়ে তার মায়ের কাছে এলো। মা বললেন, কাঠ কাটা এবং ইবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণ তোমার জন্য খুবই কষ্টের

www.eelm.weebly.com

কারণ। তাই আমি বলি, তুমি গাভীটি বেচে দাও। ক্রেতা মূল্য জিজ্ঞেস করলে বোলো, তিন দিনার। তবে বিক্রয়কালে আমাকে জিজ্ঞেস না করে কিন্তু বিক্রয় কোরো না। নতমস্তকে মাতৃ আদেশ পালন করলো যুবক। সে গাভীটি নিয়ে বাজারে গেলো। এদিকে আল্লাহ্পাক তার মাতৃভক্তি যাচাই করার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট ক্রেতারূপে এক ফেরেশ্তাকে পাঠালেন। সেই ক্রেতা বললো, মূল্য কতো? যুবক বললো, মাতৃ অনুমতি সাপেক্ষে তিন দিনার। ফেরেশ্তা বললেন, ছয় দিনার নিয়ে গাভীটি দিয়ে দাও। তোমার মাকে আর জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। যুবক বললো, গাভীর সমান স্বর্ণ প্রদান করলেও আম্মাজানের অনুমতি ছাড়া আমি একে হস্তান্তর করতে পারবো না। এই বলে সে মায়ের কাছে গিয়ে ঘটনাটি খুলে বললো। মা জানালেন, যাও ছয় দিনারেই বিক্রি করে দাও। তবে ক্রেতাকে জানিয়ে দিও, এই বিক্রয়ও মায়ের অনুমতি ব্যতিরেকে হবে না। যুবক পুনরায় বাজারে গেলো। অপেক্ষমান সেই ক্রেতা জিজ্ঞেস করলো, মায়ের অনুমতি পেয়েছো কি? যুবক বললো, শর্ত সাপেক্ষ অনুমতি পেয়েছি। তিনি বলেছেন, এই বিক্রয়ও সংঘঠিত হতে হবে তাঁর সন্তোষ সাপেক্ষে। ক্রেতা বললো, শোনো! মাকে জিজ্ঞেস করে আর কাজ নেই। তুমি বরং বারো হাজার দিনারে বিক্রয়ের কাজটি সম্পন্ন করো। যুবক রাজী হলো না। সে পুনারায় তার মায়ের কাছে গিয়ে সবকথা খুলে বললো। মা বললেন, শোনো পুত্র! ওই ক্রেতা সাধারণ কোনো ক্রেতা নয়। তিনি ফেরেশ্তা। তিনি তোমার মাতৃভক্তির পরীক্ষা নিচ্ছেন। পুনরায় তাঁর সাক্ষাত পেলে বোলো, আমি এখন ওই গাভীটিকে বিক্রয় করতে পারবো কি না? যুবক পুনরায় বাজারে গিয়ে দেখলো ক্রেতা সে স্থানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে বললো মা জিজ্ঞেস করেছেন, গাভীটি এখন বিক্রয় করা যাবে কি না? ক্রেতারূপী ফেরেশ্তা বললেন, না এখনো গাভী বিক্রয়ের সময় হয়নি। হজরত মুসা একটি হত্যাকান্ডের ফয়সালা করার জন্য এই গাভীটি কিনবেন। তখন এর চামড়া ভর্তি দিনারের কমে গাভীটি বিক্রয় কোরো না।

বনী ইসরাইলেরা জবাইয়ের নির্দেশপ্রাপ্ত গাভীর আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো, তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এমন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গাভীর কথা জানালেন যা ওই যুবকের গাভী ছাড়া অন্য কোনো গাভীর মধ্যে নেই। গাভীর বিনিময়ে অপরিমেয় অর্থপ্রাপ্তি ছিলো মাতৃভক্তির পুরষ্কার। বরং মাতৃভক্ত যুবকের প্রতি ওই বিপুল বৈভব ছিলো আল্লাহ্পাকের বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৬৮

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ○

www.eelm.weebly.com

❒ তাহারা বলিল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল উহা কী?' মুসা বলিল, 'আল্লাহ্ বলিতেছেন উহা এমন গরু যাহা বৃদ্ধও নহে, অল্প বয়স্কও নহে– মধ্য বয়সী। সুতরাং যাহা আদিষ্ট হইয়াছ তাহা কর।'

গরু জবাইয়ের নির্দেশ শুনে ইহুদী জনতা আগে বলেছিলো, তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছো? হজরত মুসা বলেছিলেন, আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ্র স্মরণ প্রার্থনা করছি। এর পরও ইহুদীরা সরল পথে না গিয়ে পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপন করলো, তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বলো, উহা কি? তারা সন্দিগ্ধতা থেকে মুক্ত হতে পারছিলোনা বলেই আবার প্রশ্নকন্টকে বিদ্ধ হলো। গরু বলতে কি বোঝায়, তা তারা নিশ্চয়ই জানতো। কিন্তু হত্যাকারী সনাক্ত করতে যে গরু জবাইয়ের প্রয়োজন, সে গরুকে তারা সাধারণ কোনো গরু ভাবতে পারছিলো না। তাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিলো এই যে, গরুটি নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ গরু হবে। এরকমও হতে পারে যে, সেটি হবে কেবল নামেই গরু। প্রকৃতপক্ষে তা অন্য কিছু। তাই প্রশ্ন করে বসলো, উহা কি? হজরত মুসা জানালেন, গরুটি আসলে গরুই। কেউ হয়তো বলতে পারেন, এখানে 'ইন্নাহা' শব্দটির 'হা' (সেই) সর্বনামের মাধ্যমে পূর্বে নির্ধারিত একটি বিশেষ ধরনের গাভীকেই বোঝানো হয়েছে যার বিবরণ পরে দেয়' হচ্ছে। এতে বোঝা যায়, পূর্বের নির্দেশটি নিরপেক্ষ বা সাধারণ ছিলো না। কিন্তু এই সন্দেহ অমূলক। প্রথমে নির্দেশ এবং পরে তার ব্যাখ্যা প্রদান রীতিবিরুদ্ধ নয়। অবশ্য নির্দেশ এবং নির্দেশের ব্যাখ্যার মধ্যে অধিক দূরত্ব না হওয়া চাই। এখানের 'হা' সর্বনামটি যদি পূর্ব নির্দেশিত গাভীর সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়, তবে প্রথমেই যে বিশেষ গাভীর কথা বলা হয়েছে তা কি করে বলা যেতে পারে। সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু সাধারণভাবে গ্রহণ করাই দস্তুর। বরং 'হা' সর্বনামটির মাধ্যমে যে কোনো একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো বলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। হাদিস শরীফে এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন, মহানবী স. এরশাদ করেছেন (প্রথম নির্দেশানুযায়ী) বনী ইসরাইলেরা যে কোনো একটি গাভী জবাই করলে যথেষ্ট হতো। তবে এখানে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথম নির্দেশটি শর্তনিরপেক্ষ থাকলেও অযথার্থ প্রশ্নের কারণে পরে তা শর্তসাপেক্ষ হয়েছে। তাই ধরে নেয়া যেতে পারে, শর্তনিরপেক্ষ নির্দেশটি রহিত হয়ে তদস্থলে শর্তসাপেক্ষ একটি নির্দেশ বলবৎ হয়েছে। মেরাজ রজনীতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছিলো। কিন্তু বাস্তবায়নের পূর্বেই নির্দেশটি রহিত করে তদস্থলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশ বলবৎ হয়েছিলো। এধরনের দৃষ্টান্ত আরো রয়েছে। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'ফা সিয়ামু সালাসাতু আইয়ামা।' (তবে রোজা তিনদিন)। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের ক্বেরাতে এখানে মুতাতাবিয়াত (পরপর) শব্দটি অতিরিক্ত সংযোজন করা হয়েছে। এভাবে 'সালাসাতু আইয়াম' (তিনদিন) সুনির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এর ভিত্তিতেই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, শর্তসাপেক্ষ এবং

www.eelm.weebly.com

শর্তনিরপেক্ষ দু'টি ভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকলে নিরপেক্ষকে সাপেক্ষের উপর চাপানো যাবেনা। যেমন, জেহারের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে একটি দাস মুক্ত করা। এটি একটি নিরপেক্ষ নির্দেশ। এবং হত্যার প্রায়শ্চিত্ত আরেকটি শর্তসাপেক্ষ নির্দেশ। সুতরাং প্রতিটি প্রায়শ্চিত্ত পৃথক পৃথক ভাবে কার্যকর হবে। ফিতরা সম্পর্কীয় হাদিসও আরেকটি দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এক হাদিসে এসেছে, প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তির পক্ষ থেকে (ফিতরা) আদায় করো। অন্য একটি হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, মুসলমান দাস ও স্বাধীন ব্যক্তির পক্ষ থেকে (ফিতরা) আদায় করো। হানাফী মতাবলম্বীগণ উক্ত দু'টি হাদিস অনুযায়ী আমল করে থাকেন। তাই তারা মুসলমান ক্রীতদাস এবং কাফের ক্রীতদাস উভয়ের জন্য ফিতরা দান করে থাকেন। অবশ্য একই ঘটনা ও একই বিধানে নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ নির্দেশ সংমিশ্রিত থাকলে নিরপেক্ষ নির্দেশ সাপেক্ষ নির্দেশের উপরে আরোপ করা যাবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে দু'টি একীভূত করা সম্ভব নয়। অপরদিকে নিরপেক্ষ নির্দেশও সাপেক্ষ হবার সম্ভাবনা রাখে। তাই হানাফীগণ রোজাভঙ্গের শাস্তি স্বরূপ পুনঃরোজা রাখার ক্ষেত্রে পরম্পরা শর্ত আরোপ করেছেন।

গাভীর বিবরণ দেয়া হয়েছে এরকম— বৃদ্ধ নয়, অল্প বয়স্কও নয়-মধ্যবয়সী। বয়স্ক নয় অর্থ এরকম বয়স্ক নয়, যা গর্ভধারণের বয়স অতিক্রম করেছে। এরকম গাভীকেই আরববাসীরা বয়স্কা বা বৃদ্ধা বলে থাকে। অল্প বয়স্ক নয় অর্থ যা এখনো গর্ভধারণের বয়সে পৌঁছেনি। মধ্য বয়সী অর্থ, যা কয়েকবার শাবক প্রসব করেছে এবং এখনো গর্ভধারণের বয়স অতিক্রম করেনি। এরকম বলেছেন, আখফাশ। আরববাসীরা তিরিশোত্তর রমণীকে মধ্যবয়সী বলে থাকে।

শেষে বলা হয়েছে, 'যাহা আদিষ্ট হইয়াছ তাহা কর।' এই নির্দেশের মাধ্যমে প্রশ্নপ্রবণতা থেকে ক্ষান্ত থাকবার তাগিদ দেয়া হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৬৯,৭০,৭১

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ لا فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ○ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ○ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ○

www.eelm.weebly.com

❒ তাহারা বলিল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল উহার রং কি? মুসা বলিল, 'আল্লাহ্ বলিতেছেন, উহা হলুদ বর্ণের গাভী, উহার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যাহা দর্শকদিগকে আনন্দ দেয়।'

❒ তাহারা বলিল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল গরুটি কি? আমাদের নিকট গরুতো একই রকম, এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় আমরা দিশা পাইব।'

❒ মুসা বলিল, 'তিনি বলিতেছেন, উহা এমন এক গরু যাহা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই- সুস্থ নিখুঁত।' তাহারা বলিল, 'এখন তুমি সত্য আনিয়াছ।' যদিও তাহারা জবাই করিতে উদ্যত ছিল না তবুও তাহারা উহাকে জবাই করিল।

আবারো প্রশ্ন করে বসলো বনী ইসরাইল জনতা। জানতে চাইলো, গাভীটির রং কি রকম হবে। হজরত মুসা বললেন, গাভীর রং হবে পীত (হলুদ) বর্ণের। গাভীর রং বোঝাতে আয়াতে 'ফাকিউন' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ফাকিউন' অর্থ গাঢ় পীতবর্ণ। হাসান বলেছেন, কৃষ্ণাভ পীতবর্ণ।

আমি বলি, 'ফাকিউন' এর অর্থ কৃষ্ণাভ পীতবর্ণ নয়। শব্দটির প্রকৃত অর্থ হবে, বিশুদ্ধ পীতবর্ণ। কালো সাপ, উজ্জ্বল লাল, ঘন শ্যামল, খুব শাদা– এরকম বলে যেমন রঙের আধিক্য বা বিশুদ্ধতা বোঝানো হয়, তেমনি 'ফাকিউন' শব্দটির মাধ্যমে পীতবর্ণটি যে বিশুদ্ধ সেকথা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পীতবর্ণটি হবে বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল, গাঢ়। এরকম রং দৃষ্টিনন্দন হয়ে থাকে। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাসুর্‌রুন নাজিরিন' (যা দর্শকদিগকে আনন্দ দেয়)। অন্তরের আনন্দ বা প্রশান্তিকে বলে 'তাসুর্‌রুন। কল্যাণকর কোনোকিছু অর্জন অথবা অর্জনের আশা অন্তরে যে পুলক সৃষ্টি করে, তাকেই বলা হয় 'তাসুর্‌রুন।

এরপরও প্রশ্ন উত্থাপন করলো বনীইসরাইলেরা। বললো, হে মুসা! তোমার প্রতিপালককে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে বলো গরুটি আসলে কিরকম। এ পর্যন্ত যে বর্ণনা আমরা পেলাম তাতে তো মনে হচ্ছে, গাইটি হবে অন্য সাধারণ গাইয়ের মতোই একটি। এরকম সাধারণ গাইয়ের মাধ্যমে হত্যাকারী সনাক্তকরণের অসাধারণ ঘটনাটি কিভাবে ঘটবে তা এখনো আমাদের নিকট বোধগম্য নয়। তাই গরুটির অসাধারণত্ব কি, তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং ব্যাপারটা যদি আমাদেরকে আরো একটু খোলাসা করে বলা হয়, তবে ইনশাআল্লাহ্ (আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে) দিশা খুঁজে পাবো আমরা (অর্থাৎ হত্যাকারীর সন্ধান আমরা পেয়ে যাবো)।

'ওয়া ইন্না ইন্‌শা-আল্লাহ্ লা মুহ্তাদুন' (আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা দিশা পাবো) – এই বাক্যটি থেকে আমাদের আলেমগণ মাসআলা উদ্ধার করেছেন যে, যে কোনো স্থানে যে কোনো ঘটনা ঘটুক না কেনো, তা আল্লাহ্তায়ালার

www.eelm.weebly.com

ইচ্ছাসাপেক্ষেই ঘটে থাকে। মোতাজিলা ও কারামাতিয়া সম্প্রদায় বলে, আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা নশ্বর, পরিবর্তনশীল। এর প্রতিবাদে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইচ্ছাশক্তি আল্লাহ্পাকের একটি অপরিবর্তনীয় ও অনশ্বর গুণ। তাঁর ইচ্ছা শক্তি নয় বরং ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় বা বস্তু পরিবর্তনশীল। কারণ, যা আল্লাহ্ নয় তা-ই নশ্বরতা ও পরিবর্তনশীলতার অধীন। রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, বনী ইসরাইলেরা যদি তখন ইনশাআল্লাহ্ না বলতো, তবে অনন্তকাল পর্যন্ত চেষ্টা করলেও কাঙ্খিত গাভী তারা পেতো না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বাগবী। হাদিসটির সনদকে মো'দাল বলে অভিহিত করেছেন ইবনে জারীর।

তাদের প্রশ্নের উত্তরে হজরত মুসা জানালেন, আল্লাহ্পাক বলেছেন, চাষাবাদ এবং পানিসিঞ্চনের কাজে ব্যবহৃত হয়নি এমন সুস্থ নিখুঁত একটি গরু। বনী ইসরাইলেরা এবার বুঝলো, এমন একটি গরু খুঁজে বের করতে হবে যার মালিক সেটির দ্বারা শ্রমসাধ্য কোনো কাজ করায়নি। কোনো অসুস্থতা যাকে স্পর্শ করেনি এবং যার কোনো অঙ্গে কোনো প্রকার খুঁতই নেই। তাই তারা বললো, এতোক্ষণে তুমি সত্য বিবরণ এনেছো।

এরপর তারা সেই সুস্থ, নিখুঁত এবং চাষাবাদ, পানিসিঞ্চন ইত্যকার সকল শ্রমসাধ্য কর্মে অব্যবহৃত গরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। অনেক অনুসন্ধান শেষে তারা হাজির হলো সেই যুবকের কাছে। যুবক গাভীর চামড়াভর্তি স্বর্ণের বিনিময়ে সেটিকে বিক্রি করতে সম্মত হলো। উপায়ান্তর না দেখে বনী ইসরাইলেরা সেই মূল্যেই কিনে নিলো গাভীটিকে। শেষে তারা নিরুপায় হয়ে উদ্যমহীনভাবে গাভীটিকে জবাই করতে বাধ্য হলো। প্রশ্নদীর্ণ মনোভাব, পারস্পরিক মতানৈক্য, প্রকৃত হত্যাকারী সনাক্ত হওয়ার আশংকা, গাভী অনুসন্ধানের দীর্ঘকষ্ট, অস্বাভাবিক মূল্যমান, এ সমস্তের কারণেই তাদেরকে উদ্যমহীন করে ফেলেছিলো। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে হুকুম প্রতিপালন করলো তারা। তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'যদিও তাহারা জবাই করিতে উদ্যত ছিলনা তবুও তাহারা উহাকে জবাই করিল।'

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৭২,৭৩

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

www.eelm.weebly.com

❐ স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করিতেছিলে- তোমরা যাহা গোপন রাখিতেছিলে আল্লাহ্ তাহা ব্যক্ত করিতেছেন।

❐ আমি বলিলাম, 'ইহার কোন অংশ দ্বারা উহাকে আঘাত কর।' এইভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁহার নিদর্শন তোমাদিগকে দেখাইয়া থাকেন, যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার।

হত্যাকান্ড এবং হত্যাকারী সনাক্তকরণের কাহিনীটির প্রারম্ভিকা এখানে বিবৃত হয়েছে। নিছক কাহিনী বর্ণনা যেহেতু কালাম মজীদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তাই ঘটনাটির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো আগের আয়াতগুলোতে বর্ণনা করার পর এখানে বলা হয়েছে, স্মরণ করো যখন তোমরা একব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যকে দোষী সাব্যস্ত করছিলে। আসলে বিষয়টিকে গোপন করাই ছিলো তোমাদের অভিপ্রায়। আর আল্লাহ্র অভিপ্রায় হচ্ছে প্রকাশ করে দেয়া।

আল্লাহ্পাক নির্দেশ দিলেন, 'ইহার (জবাইকৃত গরুটির) কোনো একটি অংশ দ্বারা উহাকে (নিহত ব্যক্তিকে) আঘাত করো।' এখানে জবাইকৃত গাভীর যে কোনো একটি অংশের কথা বলা হয়েছে। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে অংশ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়েছিলো তা ছিলো গাভীর নিতম্বসংশ্লিষ্ট একটি অস্থি। কেউ কেউ বলেছেন, লেজের হাড় দিয়ে আঘাত করা হয়েছিলো। কেউ বলেছেন, জিহবার দ্বারা। আবার কেউ বলেছেন, দক্ষিণ রানের অংশ দ্বারা। যে অংশের দ্বারাই আঘাত করা হোকনা কেনো, আঘাত করা মাত্র নিহত ব্যক্তি জীবিত হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। তার কণ্ঠনালীর রগগুলো ছিলো তখনো রক্তাক্ত। উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথে পুনর্জীবন প্রাপ্ত ব্যক্তিটি উচ্চারণ করলো, ওমুক ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে। একথা বলার সাথে সাথে সে পুনরায় মৃত্যুবরণ করলো এবং মৃতাবস্থায় পড়ে রইলো। হত্যাকারী চিহ্নিত হলো এবং সে বঞ্চিত হলো উত্তরাধিকারের অংশ থেকে। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ওই হত্যাকারীর পরে আর কোনো হত্যাকারী উত্তরাধিকারে অংশ লাভ করেনি।

মৃত ব্যক্তির পুনর্জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, 'কাজালিকা' যার অর্থ এভাবেই। অর্থাৎ এভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন। আর পুনর্জীবন দানের ঘটনাটি আল্লাহ্পাকের সেই অপার ক্ষমতারই একটি নিদর্শন। এই নিদর্শন প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, হে অজ্ঞ বনী ইসরাইল জনতা! দেখো এবং বিশ্বাস করো। যেভাবে আল্লাহ্ পাক এই মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করলেন, তিনি সকল মৃতকেও জীবন দান করতে সক্ষম (মৃত্যু ও জীবন তাঁর হুকুমের অধীন)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্তায়ালার অপার ক্ষমতার প্রতি আস্থাশীল হও।

লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্পাক এখানে সরাসরি মৃতব্যক্তিকে জিন্দা করেননি। গরু জবাইয়ের ঘটনাটিকে তিনি এখানে মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এরকম

www.eelm.weebly.com

মাধ্যম বলবৎ করার অর্থ কার্যকারণ নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা। আর এই কার্যকারণ নীতিই হচ্ছে আল্লাহ্‌পাকের সাধারণ বিধান। এর মাধ্যমে সৃষ্টিকে দেয়া হয় অনেক সুযোগ। যেমন এখানে গরু কোরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য অর্জনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। হুকুম প্রতিপালনের মাধ্যমে পূণ্য লাভ। আবার অপরদিকে একটি এতীম বালককে দেয়া হয়েছে প্রভূত অর্থার্জনের সুবিধা। এই ঘটনায় এই উপদেশ নিহিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্যার্জনের সুযোগ অনুসন্ধান করা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। আর যারা নৈকট্যান্বেষী তারা যেনো এ থেকে শিক্ষা নেয় যে, আল্লাহ্‌পাকের উদ্দেশ্যে সর্বোত্তম বস্তু কোরবানী করা উচিত। আবু দাউদ বর্ণিত হাদিসে এসেছে, হজরত ওমর একবার একটি অত্যুত্তম উট কোরবানী করেছিলেন যার মূল্য ছিলো তিনশত দিনার।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৭৪

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

☐ ইহার পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হইয়া গেল, উহা পাষাণ কিংবা তদপেক্ষা কঠিনতর। পাথরও কতক এমন যে উহা হইতে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কতক এইরূপ যে বিদীর্ণ হওয়ার পর উহা হইতে পানি নির্গত হয়, আবার কতক এমন যাহা আল্লাহের ভয়ে ধ্বসিয়া পড়ে এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।

এরশাদ হয়েছে, 'এর পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেলো, উহা পাথর অথবা তদপেক্ষাও কঠিনতর।' 'ছুম্মা' শব্দটির অর্থ, এর পরেও। এ শব্দটির মাধ্যমে স্থানের দূরত্ব বোঝানো হয়নি, বিষয়গত দূরত্ব বোঝানো হয়েছে। যেমন বলা হয়, জায়েদকে আমি কতোভাবে বুঝালাম, এর পরেও সে মানতে চায় না।

'তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেলো'– অর্থ তাদের অন্তর হয়ে গেলো দয়ামায়া ও কল্যাণহীন। তার সঙ্গে যুক্ত হলো দীর্ঘ দূরাশা, আল্লাহ্‌র জিকিরবিমুখতা ও কুপ্রবৃত্তির অনড়তা। এসব কিছু মিলিয়ে তাদের অন্তর হয়ে গেলো কঠিন থেকে কঠিনতর। পুনর্জীবন দানের বিস্ময়কর ঘটনা অবলোকন করার পর, সত্যের স্পর্শে অন্তর বিগলিত হওয়াই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে ঘটলো তার

www.eelm.weebly.com

বিপরীত। কালাবী বলেছেন, বিস্ময়কর নিদর্শনটি স্বচক্ষে দেখার পরও হত্যাকারী ব্যক্তিটি বলেছিলো, আমি ওকে হত্যা করিনি।

তাদের অন্তরের উপমা দেয়া হয়েছে পাথরের সঙ্গে। পরক্ষণেই বলা হয়েছে, পাথর অপেক্ষাও কঠিনতর। 'আও' শব্দটির উল্লেখ করে এখানে সম্বোধিত জনকে (হজরত মুসাকে) হয়তোবা পাথর কিংবা পাথরাপেক্ষা কঠিন এ দু'টোর যে কোনো একটি উপমাকে নির্ধারণ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এরকম হতে পারে যে, 'আও' শব্দটি এখানে এক ধরনের প্রতিবাদ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। যেনো বলা হয়েছে, যে তাদের অন্তরের খবর রাখে– সে উপরোল্লেখিত উপমা দু'টোর যে কোনো একটিকে নির্বাচন করে নিতে পারে। যদি এরকম করে তবে ক্ষতিবৃদ্ধির কোনো কারণ নেই।

তামা, কাঁসা ইত্যাদি আরো অনেক কঠিন বস্তু থাকা সত্ত্বেও এখানে পাথরের উপমা আনার কারণ এই যে, তপ্ত হলে অন্য সকল কঠিন পদার্থ গলে যায় কিন্তু পাথর গলে না। সব পাথর যে একরকম নয় পরবর্তী বাক্যেই সেকথা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। এমন অনেক পাথর রয়েছে যেগুলো থেকে নেমে আসে নদী। কোনো কোনো পাথর বিদীর্ণ হলে, তা থেকে বের হয়ে আসে পানির প্রস্রবণ। আবার অনেক পাথর আল্লাহ্র ভয়ে ফেটে যায়, ধ্বসে পড়ে। অথচ কতোই না কঠিন অন্তরের অধিকারী কাফের সম্প্রদায়। যা পাথরের চেয়ে কঠিন– নম্রতা ও আনুগত্য বিবর্জিত, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াহীন। যদি কেউ বলে, পাথর তো নিষ্প্রাণ। সুতরাং নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্র ভয় কিভাবে কল্পনা করা যায়। বায়যাবী বলেছেন, এখানে 'খশিয়া' (ভয়) শব্দের প্রকৃত অর্থ হবে, আল্লাহ্র বিধান। যে বিধানকে মান্য করে সকল সৃষ্টি ধারণ করে আছে তাদের অস্তিত্ব।

আমি বলি, আল্লামা বায়যাবীর জবাবটি যথাযথ নয়। তিনি এখানে যে বিধানের কথা বলেছেন সে বিধান সকল সৃষ্টি মান্য করতে বাধ্য। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'খতামাল্লাহু আলাকুলুবিহিম' আল্লাহ্পাক তাদের (কাফেরদের) অন্তঃকরণের উপর সীলমোহর মেরে দিয়েছেন।' আল্লাহ্তায়ালার এই বিধানই মান্য করে চলেছে কাফেরেরা। অন্য এক স্থানে এরশাদ এসেছে, 'আকাশসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সেজদা করে– সে সেজদা স্বেচ্ছা-আনুগত্যের হোক অথবা বাধ্যতার।' হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে–রসুলপাক স. বলেছেন, আদম সন্তানদের অন্তরসমূহ আল্লাহ্পাকের অলৌকিক দুই আঙ্গুলের মধ্যে অবস্থিত। আল্লাহ্পাক যেমন চান, তেমনই সেগুলোকে বিবর্তিত করেন। একথা উল্লেখ করার পর রসুল পাক স. এই বলে প্রার্থনা করতেন, হে আমার আল্লাহ–হৃদয়ের আবর্তনবিবর্তনকারী! আমাদের হৃদয়গুলোকে তোমার আনুগত্যমুখী করে দাও। মুসলিম। দৃষ্টান্তমূলক আয়াত ও হাদিস সমূহের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব

www.eelm.weebly.com

রক্ষার যে বিধান বলবৎ করা হয়েছে, আল্লাহ্পাকের সেই বিধান মুসলমান কাফের নির্বিশেষে সকলেই মান্য করতে বাধ্য।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, আল্লামা বাগবী বলেছেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত এরকম— জড় অজড় সকল সৃষ্টিকেই এমন একধরনের জ্ঞান ও অনুভূতি দেয়া হয়েছে যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। পদার্থসমূহ ও প্রাণীকুল আল্লাহ্পাকের নিকট প্রার্থনা করে, তাঁর জিকির করে, এবং পবিত্রতা (তসবীহ্) বর্ণনা করে। আল্লাহ্র ভয় রয়েছে তাদের সকলের মধ্যে। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'সকল বস্তুই আল্লাহ্পাকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে।' অন্যত্র এরশাদ করেছেন, দেখো, কতোসুন্দর সারিবদ্ধ পক্ষীকুল, তারা প্রত্যেকেই আপনাপন ইবাদত ও তসবীহ্ সম্পর্কে জ্ঞাত। এছাড়া কবরের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াতটিও পাঠ করা যেতে পারে। ছুম্মা ইউমিতুকুম ছুম্মা ইউহ্ইকুম আয়াতের তাফসীরে এ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। বাগবী আরো বলেছেন, রসুলপাক স. একদা বাশীর পাহাড়ে উঠেছিলেন যখন কাফেরেরা তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। পাহাড় তখন বলেছিলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি মেহেরবানী করে আমার উপর থেকে অবতরণ করুন। আল্লাহ্ না করুন, কাফেররা যদি এখানে এসে আপনাকে বন্দী করে তবে নির্ঘাত আমার প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ হবে। ছওর পাহাড়ও কথা বলেছিলো রসুলপাক স. এর সঙ্গে। বলেছিলো, হে দয়াল নবী! আপনি এখানে অবস্থান করুন, আমার নিকট চলে আসুন।

স্ব-সনদে বাগবী হজরত জাবের বিন সামুরা থেকে বর্ণনা করেছেন— মহানবী স. এরশাদ করেছেন, আমি সেই পাথরটিকে ভালোভাবে চিনি, নবী হওয়ার পূর্বে যে আমাকে সালাম করতো। হাদিসটি শুদ্ধ। মুসলিমও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হজরত আনাস বলেছেন, যখনই উহুদ পাহাড় রসুল পাক স. এর দৃষ্টিগোচর হতো তখন তিনি বলতেন, এই পাহাড় আমার প্রিয় আর আমিও তার প্রিয়।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আমরা রসুল পাক স. এর সঙ্গে নামাজ পড়লাম। নামাজ শেষে তিনি আমাদেরকে বললেন, একটি ঘটনা শোনো। এক ব্যক্তি একটি বলদ হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। পথশ্রান্ত লোকটি যখন বলদের পিঠে আরোহণ করলো, তখন বলদটি বললো, আমাকে কৃষিকাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আরোহনের জন্য নয়। ঘটনা শুনে আমরা আশ্চর্য হয়ে বললাম, সুবহানাল্লাহ্! বলদও তাহলে কথা বলে। হজরত রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, আমি আবুবকর ও ওমর এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। মহানবী স. আরো এরশাদ করেছেন, একব্যক্তি তার ছাগল চরাচ্ছিলো। হঠাৎ এক নেকড়ে এসে ছাগলটিকে আক্রমণ করলো। লোকটি নেকড়ের নিকট থেকে ছাগলটি ছিনিয়ে নিলো। নেকড়েটি বললো, ওহে ছাগলের রাখাল! তুমি আমার শিকার ছিনিয়ে নিলে। যেদিন পশুদের আধিপত্য বিস্তৃত হবে, সেদিনের কথা স্মরণ করো। সেদিন তোমার ছাগলকে কে রক্ষা করবে? তখন আমরাই তো হবো ওর রাখাল। রসুলপাক স. এর পবিত্র মুখে

www.eelm.weebly.com

এ কাহিনী শুনে উপস্থিত লোকজন বললেন, সুবহানাল্লাহ্! নেকড়েও তাহলে কথা বলে! তিনি স. বললেন, আমি আবুবকর ও ওমর ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখেছি। বোখারী ও মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন— রসুল স. একবার এক পর্বতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হজরত আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা ও জোবায়ের রা.। হঠাৎ একটি পাহাড় দুলে উঠলো। রসুলপাক স. বললেন, তিষ্ঠ হে পর্বত! তোমার উপরে নবী, সিদ্দিক এবং শহীদ ছাড়া অন্য কেউ নেই। মুসলিম। হজরত আলী থেকে মুসলিম আরো বর্ণনা করেছেন, আমরা মক্কা মোয়াজ্জমায় রসুলপাক স. এর সঙ্গে পথপরিক্রমণের সময় পাহাড় পর্বত বৃক্ষলতাকে বলতে শুনতাম, আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ্। হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণিত আরেকটি হাদিসে এসেছে, মদীনার মসজিদের মিম্বর তৈরীর পূর্বে একটি কাঠের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসতেন রসুলপাক স.। মিম্বর তৈরীর পর যখন তিনি স. মিম্বরে সমাসীন হলেন, তখন কাঠের খুঁটিটি একটি অসহায় উটনীর মতো চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো। তিনি মিম্বর থেকে উঠে গিয়ে খুঁটিটির সঙ্গে কণ্ঠলগ্ন হলেন। তৎক্ষণাৎ খুঁটিটি নিঃশব্দ হয়ে গেলো। বর্ণিত হাদিস সমূহের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, জড়পদার্থের মধ্যেও প্রাণ ও প্রজ্ঞা বিদ্যমান। বাগবী আরো বলেছেন, মুজাহিদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে যে পাথর, সে আল্লাহ্পাকের ভয়েই গড়িয়ে পড়ে।

সৃষ্টিকুলের সকল ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা সম্যক পরিজ্ঞাত ও সদাসতর্ক। তাই আয়াত শেষে বলা হয়েছে, 'তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।'

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৭৫

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ
كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

❑ তোমরা কি এই আশা কর যে তাহারা তোমাদিগকে বিশ্বাস করিবে? — যখন তাহাদের একদল আল্লাহের বাণী শ্রবণ করিত ও বুঝিবার পর জানিয়া শুনিয়া উহা বিকৃত করিত!

'তোমরা কি এই আশা করো'— এখানে 'তোমরা' (আফা তাতমাউনা) বলতে বুঝানো হয়েছে রসুলে পাক স. এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে।

www.eelm.weebly.com

'তাহারা তোমাদিগকে বিশ্বাস করিবে'– এখানে তাহারা বলতে বুঝানো হয়েছে ইহুদীদেরকে। 'যখন তাহাদের একদল আল্লাহের বাণী শ্রবণ করিত'– এখানে 'আল্লাহের বাণী' (কালামাল্লাহ্) অর্থ তওরাত। তারা তওরাতের বাণী শুনতো এবং সবকিছু বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে সেই পবিত্র বাণীকে বিকৃত করতো। যেমন মহানবী মোহাম্মদ স.এর বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনা এবং রজমের বিধান তারা পরিবর্তন করেছে। তারা যে পরিবর্তনকারী এবং মিথ্যাবাদী তা তারা নিজেরাই ভালোভাবে জানতো। মুজাহিদ, ইকরামা ও সুদ্দী এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। আর হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ব্যাখ্যা করেছেন এরকম– এখানে তাদের ওই সকল পূর্বপুরুষদের আচরণের ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা তুর পর্বতের পাদদেশে আল্লাহ্র বাণী শুনেছিলো এবং পরে তাদের সম্প্রদায়ের লোকের কাছে এসে সে বাণীকে বিকৃতরূপে পরিবেশন করেছিলো। হজরত মুসা আ. বনী ইসরাইলদের যে সত্তরজন নেতাকে নিয়ে তুর পর্বতে গিয়েছিলেন, তাদের অধিকাংশই ছিলো আল্লাহ্র আয়াত বিকৃতকারী। তাদের স্বল্পসংখ্যক সত্যবাদীরা আল্লাহ্র বাণী অবিকৃতভাবে সম্প্রদায়ের লোকদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলো। সংখ্যাগরিষ্ঠ কুটিলেরা বলেছিলো, হ্যাঁ! আল্লাহ্তায়ালা এরকমই বলেছেন বটে। তবে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা যদি তাঁর বিধান মানতে সক্ষম হও তাহলে মানতে পারো, অন্যথায় না-ও মানতে পারো। এভাবেই তারা আল্লাহ্র বাণীকে বিকৃত করেছিলো।

সুরা বাকারাঃ আয়াত ৭৬, ৭৭

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝

❒ তাহারা যখন বিশ্বাসীদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করিয়াছি;' আবার যখন তাহারা নিভৃতে একে অন্যের সহিত মিলিত হয় তখন বলে 'আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তোমরা কি তাহা তাহাদিগকে বলিয়া দাও? ইহা দ্বারা তাহারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করিবে, তোমরা কি অনুধাবন কর না?'

❒ তাহারা কি জানে না যে যাহা তাহারা গোপন রাখে কিংবা ঘোষণা করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তাহা জানেন?

www.eelm.weebly.com

এখানে কাব বিন আশরাফ, ওয়াহাব বিন ইহুদ প্রমুখ মুনাফিক ইহুদীদের অসদাচরণের কথা বলা হয়েছে। তারা অন্যদেরকে হিতোপদেশ দিতো। কিন্তু নিজেরা ছিলো উদাসীন। তারা বিশ্বাসীদের অর্থাৎ মদীনাবাসী মুমিনদের সংস্পর্শে এলে বলতো, আমরা মু'মিন। হজরত মোহাম্মদই সেই নবী তওরাতে যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। তাই তোমাদের উচিৎ তাঁর প্রতি ইমান আনা এবং তাঁর অনুসরণ করা। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে বিশ্বাসী বলতে ইহুদী মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে। একথা গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে এরকম– যখন কপট ইহুদীরা বিশুদ্ধ বিশ্বাসীদের সঙ্গে মিলিত হতো, তখন বলতো, আমরাও তোমাদের মতো বিশুদ্ধ ইমান গ্রহণ করেছি। ওই কপটেরা নিভৃতে যখন পরস্পর সম্মিলিত হতো তখন বলতো অন্য কথা। তাদের একদল অপর দলকে বলতো, মোহাম্মদ সত্য নবী– তাঁকে বিশ্বাস করা তোমাদের কর্তব্য। অপর দল বলতো, তোমরা নিতান্তই মূর্খ। মোহাম্মদ সম্পর্কে যা বলেছো, বলেছো– মুসলমানদের কাছে এরকম বোলো না। যদি বলো তবে তারা এটাকে প্রমাণ হিসেবে ধরে নেবে এবং আল্লাহ্র নিকট এই প্রমাণ পেশ করে বলবে, আয় আল্লাহ্! ওরা রসুল পাক স. সম্পর্কে উত্তম রূপে অবগত ছিলো। তারা আমাদেরকে রসুলানুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করতো অথচ প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে তারাই ছিলো বিরুদ্ধাচারী। বায়যাবী বলেছেন, আয়াতের এরকম ব্যাখ্যার প্রতি আমার মৃদু আপত্তি রয়েছে। আল্লাহ্পাক সকল গোপন বিষয় পরিজ্ঞাত। অন্তর্যামী তিনি। মুনাফিকদের গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোনো কিছু তাঁর অবিদিত ছিলো না। অবস্থা যখন এই, তখন তাদের কপটতার প্রমাণ পেশ করার বিষয়টিতে কি আর যাবে আসবে।

আমি বলি, ইহুদীদের গোপন করার চেষ্টা আল্লাহ্পাকের অসীম জ্ঞানে কোনোই অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না– এ বিষয়টি সন্দেহাতীত। কিন্তু তবু তারা মনে করতো, বিষয়টিকে গোপন করতে চাইলে হয়তো গোপনই থাকবে। তাদের এতাদৃশ অবিমৃশ্যকারিতা ও নির্বুদ্ধিতাকে চিহ্নিত করার জন্যই আয়াতে এরকম বিবরণ এসেছে। তাদের নির্বুদ্ধিতার বিবরণ এসেছে আরো অনেক আয়াতে। যেমন, এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে, '(তারা বলতো) আল্লাহ্পাক কোনো মানবের প্রতি কোনোকিছু অবতীর্ণ করেননি।' অথচ তারা ভালোভাবেই জানতো হজরত মুসার প্রতি তওরাত অবতীর্ণ হয়েছিলো। এই পারার প্রথম দিকেও এরকম বিবরণ রয়েছে। ইহুদীদের কথা ও কাজ ছিলো অসঙ্গতিতে ভরা। তারা হজরত মুসার অনেক মোজেজা দেখেছে। তবুও তারা তাদের স্বভাবদোষ অতিক্রম করতে পারেনি। তাদের আচরণ সুস্থ ছিলো না, ছিলো উন্মাদ সদৃশ। ভর্ৎসনা, তিরস্কার, লাঞ্ছনা- কোনোকিছুই তাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, বজ্রপাতের সময় মৃত্যুভয়ে তারা তাদের কানে অঙ্গুলী প্রবেশ করাতো। তারা

www.eelm.weebly.com

ভালোভাবেই জানতো এভাবে মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না। তবুও অজ্ঞের মতো মনে করতো, কানে আঙ্গুল ঢোকালেই যেনো মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'আফালা তা'ক্বিলুন' (তোমরা কি অনুধাবন করো না) – একথাটি পূর্বোক্ত কথারই অনুগামী। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, অবিশ্বাসীরা কপট বিশ্বাসীদেরকে বলতো, তোমরা সত্যি সত্যি মূর্খ। মোহাম্মদ স. কে মান্য করা উচিত– এরকম কথা তোমরা কেনো বলো? এরকম বললে মুসলমানেরা তোমাদের কথাকেই তোমাদের বিপক্ষে দাঁড় করাবে (আর সেটা করবে এই পৃথিবীতেই)। 'ইনদা রব্বিকুম' (তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে) একথার অর্থ হবে আল্লাহ্র কিতাব। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের নিকটেও তোমাদের এই সাক্ষ্যটি সুসাব্যস্ত হবে। তখন প্রমাণ হিসেবে তারা আল্লাহ্র কিতাবে উল্লেখিত তোমাদের এহেন আচরণ সম্পর্কিত বর্ণনাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে। অথবা এরকম বলা যায়, 'রব্বিকুম' শব্দটির পূর্বে কিতাব অথবা রসুল শব্দটি উহ্য রয়েছে। এমতাবস্থায় 'ইনদা রব্বিকুম' এর প্রকৃত অর্থ হবে, 'ইনদা কিতাবি রব্বিকুম।' কিংবা 'ইনদা রসুলি রব্বিকুম।' বায়যাবী এই ব্যাখ্যাটিকেই অধিকতর পছন্দ করেছেন। বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত উক্তি মুনাফিকদের (কপট বিশ্বাসীদের)। কাফেরদের (প্রকাশ্যে অস্বীকারকারীদের) নয়। অর্থাৎ যারা অন্যদেরকে ইমান গ্রহণ করতে বলতো কিন্তু নিজেরা করতো না, তারা ছিলো মুনাফিক। কাফের নয়।

আমি বলি, প্রথমোক্ত ভাষ্যটি কষ্টকল্পনার নামান্তর। ওই ভাষ্যটির সঙ্গে আয়াতের অর্থ যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ, কপট বিশ্বাসীরা পৃথিবীতে বিশ্বাসীদেরই দলভুক্ত বলে গণ্য হয়। তাই প্রকৃত বিশ্বাসীরা এই পৃথিবীতে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দাঁড় করাতে পারে না। যেহেতু তাদের প্রকাশ্য স্বীকৃতি সত্যের অনুকূল। তাদের সঙ্গে কলহবিবাদের ধারণা কেবল আখেরাতেই হওয়া সম্ভব। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, মুনাফিকদের অসদাচরণের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক যখন তাদেরকে শাস্তি দিতেন, তখন মু'মিনদের নিকট 'কখনো কখনো' তার বিবরণ দিতেন। মুনাফিকেরাও বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতো। বলতো, ওই বিবরণ সমূহ আলোচনাযোগ্য নয়। কারণ, ওই আলোচনাকেই তারা আখেরাতে আল্লাহ্র নিকট প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাবে। এভাবে তারা তোমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদাশীল হতে চেষ্টা করবে। অথবা 'তোমরা কি অনুধাবন করো না' একথা বলা হয়েছে ইহুদীদেরকে। অর্থাৎ এরকম বলা হয়েছে, ওহে মূর্খ ইহুদীকুল! একথাটুকু বুঝবার জ্ঞানও কি তোমাদের নেই যে, তোমাদের পারস্পরিক বাক্য বিনিময়ই কেবল তোমাদের বিরুদ্ধে মুমিনদের একমাত্র দলিল!' তোমরা কি অনুধাবন করো না। একথা মু'মিনদের লক্ষ্য করেও বলা হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয়, তবে একথাটি পূর্ববর্তী আয়াতের 'আফাতাতমাউনা' (তোমরা কি আশা কর) কথাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে। তখন

www.eelm.weebly.com

অর্থ দাঁড়াবে এরকম– হে মু'মিনগণ! যাদের প্রকৃত অবস্থা এরকম তাদের নিকট থেকে ইমান আনয়নের আশা কি দূরাশা নয়? এটাকি তোমরা অনুধাবন করো না। অথবা সম্বোধনটি কাফের ও মুনাফিকদের পারস্পরিক বাক্যালাপের সঙ্গে সম্পর্কিত। এরকম হলে অর্থ দাঁড়াবে– তোমরা কি বুঝতে পারছো না (অনুধাবন করছো না) যে, এটাই তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ।

পরের আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, তারা কি জানে না তাদের গোপন প্রকাশ সকল কথাই আল্লাহ্ নিশ্চিতভাবে অবগত। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক বলেছেন, ওই সমস্ত লোক যারা অন্যদেরকে তিরস্কার করছে, তাদের নিভৃতি, অনিভৃতি- সকল অবস্থার সংবাদ আল্লাহ্ রাখেন। সুতরাং তওরাতে উল্লেখিত মহানবী মোহাম্মদ স. এর প্রশংসাসংবলিত বাণী গোপন করার চেষ্টা করে কী লাভ? এতে করে কি নিশ্চিত প্রমাণকে আড়াল করা সম্ভব? 'তারা' বলতে এখানে মুনাফিকেরা– একথাও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। তখন অর্থ হবে– তাদের কপটতার সংবাদ মহানবী স. কিংবা প্রকৃত মু'মিনদের জানা নাও থাকতে পারে কিন্তু আল্লাহ্পাক তো তাদেরকে অবশ্যই জানেন। 'তারা' সর্বনামটির মাধ্যমে গোটা ইহুদী সমাজকেও নির্দেশ করা হয়ে থাকতে পারে। এরকম হলে আয়াতের অর্থ হবে– তাদের প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য অবিশ্বাস, রসুল পাক স. এর গুণাবলী আড়াল করার প্রচেষ্টা, আল্লাহ্পাকের নিদর্শনাবলীর বিকৃতি সাধন ও সকল অসদাচরণ সম্পর্কে আল্লাহ্পাকের জ্ঞান যে নিশ্চিত, তিনি যে সর্ব পরিজ্ঞাতা– এ কথা কি ইহুদীরা জানে না?

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৭৮

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝

❑ তাহাদের মধ্যে এমন কতক নিরক্ষর লোক আছে যাহাদের মিথ্যা আশা ব্যতীত কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই তাহারা শুধু মনগড়া কথা বলিয়া বেড়ায়।

'লা ইয়ায়্লামুনাল কিতাব' (কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই) – এখানে কিতাব বলতে বুঝানো হয়েছে তওরাতকে। 'আমানি ইয়্যা' অর্থ মনগড়া কথা, অলীক ধারণা। এখানেই ইহুদী আলেমদের অলীক কল্পনাগুলোকে 'আমানি ইয়্যা' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এরকম বলেছেন মুজাহিদ ও কাতাদা। ক্বারীগণ বলেছেন, আমানি ইয়্যা অর্থ মিথ্যাকথা। যেমন হজরত ওসমান গনী রা. বলেছেন আমি ইসলাম গ্রহণের পর কখনও মিথ্যাকথা বলিনি। তাঁর এই বাক্যটিতে মিথ্যা

www.eelm.weebly.com

কথা বুঝাতে 'আমানিইয়্যা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এরকমও বলা যায় যে, যে সকল অবাস্তব চিন্তা-ভাবনা ইহুদীরা অন্তরে অন্তরে পোষণ করতো সেগুলোকে আমানিইয়্যা বলা হয়েছে। তাদের অবাস্তব চিন্তাগুলো ছিলো এরকম– ইহুদী এবং খৃষ্টান ছাড়া অন্য কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, জাহান্নামে গেলেও মাত্র কয়েকদিন সেখানে থাকতে হবে তাদেরকে ইত্যাদি। এরকম বর্ণনা করেছেন হাসান এবং আবুল আলীয়া। আয়াতের মর্ম এরকমও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, ইহুদীরা কেবল তওরাত উচ্চারণ ও আবৃত্তির মধ্যেই বিচরণ করতো। প্রকৃত অর্থ ও মর্ম পর্যন্ত পৌঁছতে পারতো না। যেমন অন্য এক স্থানে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'যখন তারা পাঠ করে, তখন শয়তান তাদের পাঠে অতিরিক্ত কথা নিক্ষেপ করে।' এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। ক্বারী আবুজাফর কোরআন মজীদের সকল স্থানে উল্লেখিত 'আমানিইয়্যা' শব্দটি তাশ্দীদবিহীন অবস্থায় পাঠ করেছেন। অন্য ক্বারীগণ পাঠ করেছেন তাশ্দীদ সহযোগে।

'তারা শুধু মনগড়া কথা বলে বেড়ায়'– একথার অর্থ তারা আসলে কল্পনাবিলাসী। কিতাবের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে তারা নিতান্তই অজ্ঞ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৭৯

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ○

❑ সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং অল্প মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে 'ইহা আল্লাহ্র নিকট হইতে।' তাহাদের হাত যাহা রচনা করিয়াছে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের এবং যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের।

'ওয়াইল' শব্দটির অর্থ আক্ষেপ, দুর্ভোগ অথবা ধ্বংস। জুযাজ বলেছেন, ধ্বংসে আপতিত জনকে ওয়াইল বলা হয়। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওয়াইল অর্থ গুরুদন্ড। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম ওয়াইল। বাগবী বলেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, ওয়াইল হচ্ছে জাহান্নামের একটি অধিত্যকা। কাফেরেরা চল্লিশ বছর ধরে নামতে থাকলেও সেখানে পৌঁছতে

www.eelm.weebly.com

পারবে না (অধিত্যকাটি এতোই গহীন)। জাহান্নামের আরেকটি পাহাড়ের নাম হচ্ছে সউদ। কাফেরেরা সত্তর বছর ধরে ওই পাহাড়ে আরোহন করতে থাকবে। সেখান থেকে নেমে আসতেও তাদের ওই পরিমান সময় লাগবে।

'নিজ হাতে কিতাব রচনা করে'— একথার অর্থ, বাণী বিকৃত তওরাত— যা ইহুদী আলেমরা স্বহস্তে রচনা করেছে। জাগতিক লাভের জন্য তারা এরকম করতো। জাগতিক সম্পদ যতো বিপুল পরিমাণই হোক না কেনো, আখেরাতের সীমাহীন বৈভবের তুলনায় তা নিতান্তই নগণ্য। তাই আয়াতে জাগতিক সম্পদপ্রাপ্তিকে অল্প মূল্য (সামানান কৃলীলা) বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা রয়েছে, ঘটনাটি হচ্ছে— ইহুদী আলেমরা এটা ভালো করে জানতো যে, হজরত মোহাম্মদ স. সত্য নবী। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি এই ভেবে ইমান আনতো না যে, এরকম করলে কিতাববিকৃতির মাধ্যমে তাদের অর্থাগমের পথটি রুদ্ধ হয়ে যাবে। আর তওরাতে উল্লেখিত রসুল পাক স. এর গুণাবলীর বর্ণনা তারা গোপন রাখতো অথবা বিকৃত করতো এই ভেবে যে, এই বর্ণনা প্রকাশ হয়ে গেলে সকলেই মুসলমান হয়ে যাবে। তখন তাদের আয়ের পথটি হয়ে যাবে বন্ধ।

তওরাতে বর্ণিত ছিলো, রসুল পাক স. এর স্বভাব চরিত্র হবে অনিন্দ্য সুন্দর। তিনি হবেন অতুলনীয় কেশরাশির অধিকারী। হবেন মধ্যম অবয়ববিশিষ্ট। ইহুদী পন্ডিতেরা এ সমস্ত বিবরণের স্থলে লিখে দিলো- তিনি হবেন দীর্ঘাকৃতির, নীল নয়ন বিশিষ্ট, উস্কখুস্ক চুলের অধিকারী। জনতা যখন তাদের কাছে শেষ নবীর পরিচয় জানতে চাইতো তখন তারা তাদের বিকৃত বিবরণ পাঠ করে শোনাতো। ওই বিবরণের সঙ্গে মিল খুঁজে না পেয়ে জনতা শেষে রসুলপাক স. কে অস্বীকার করে বসতো।

ওই ইহুদী পন্ডিতদের জন্য আক্ষেপ! তারা নিজ হাতে আল্লাহ্‌র কিতাবকে বিকৃত করেছে- এ ভাবেই তারা আবাহন করেছে শাস্তিকে। তাই শাস্তি তাদের অর্জন বা উপার্জন স্বরূপ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৮০

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

❒ তাহারা বলে, 'দিন কতক ব্যতীত অগ্নি আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করিবে না।' বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অঙ্গীকার নিয়াছ, অতএব আল্লাহ্‌

www.eelm.weebly.com

তাঁহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবেন না; কিংবা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যাহা তোমরা জান না?

ইহুদীরা ধারণা করতো, মাত্র কয়েক দিন তাদেরকে দোজখের আগুনে থাকতে হবে। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর। প্রতি হাজার বছরে একদিন করে মোট সাত দিন তাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাতাদা ও আতা বলেছেন, ইহুদীরা মনে করতো তাদের পূর্বপুরুষ চল্লিশ দিন গরু পূজা করেছিলো, তাই তাদের শাস্তি হবে মাত্র চল্লিশ দিন। হজরত আবুল আলীয়া ও হাসান বলেছেন, ইহুদীরা ধারণা করতো, কোনো বিষয়ের শাস্তি নির্ধারণ করতে গিয়ে আল্লাহ্পাক শপথ করে বলেছিলেন, তোমাদেরকে আমি চল্লিশ দিন শাস্তি দিবো, তাই তাদের শাস্তি হবে মাত্র চল্লিশ দিন।

ইহুদীদের এই অলীক কল্পনার প্রতিবাদে আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছো?' -একথার অর্থ, তোমরা যে বল মাত্র কয়েক দিন শাস্তি হবে, এ সম্পর্কে তোমরা কি আল্লাহ্র তরফ থেকে অভয়বাণী লাভ করেছো? এই প্রশ্নের মাধ্যমে কথিত অঙ্গীকারকে অস্বীকার করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না, কারণ অঙ্গীকার ভঙ্গ একটি চরম অসদাচরণ। এরকম ত্রুটি থেকে আল্লাহ্পাক পবিত্র।

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, এখানে অঙ্গীকারের মর্ম হবে তওহীদ (আল্লাহ্পাকের এককত্বের স্বীকৃতি)। কোরআন মজীদের অন্য একটি আয়াতে 'আহ্দান' বা অঙ্গীকারের প্রকৃত মর্ম স্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে 'ইল্লা মানিত্তাখজা ইন্দার রহমানি আহ্দান।' এখানে 'আহ্দান' শব্দটির অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।' আহ্দান বা অঙ্গীকারের বর্ণিত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করা হলে আয়াতের অর্থ হবে, ওহে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা তো আল্লাহ্পাকের নিকট 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'– এর অঙ্গীকারই করো নাই। তবে আর অন্য অঙ্গীকারের কথা কেনো উঠবে? তোমরা নিতান্তই মূর্খ ও হতভাগা। তাই যা জানো না তাই বলে যাচ্ছো।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৮১,৮২

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

www.eelm.weebly.com

❒ হাঁ, যাহারা পাপকার্য করে এবং যাহাদের পাপরাশি তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করে তাহারাই অগ্নিবাসী– সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

❒ আর যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে তাহারাই জান্নাতবাসী, তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে।

'কাছাবা' শব্দের আভিধানিক অর্থ উপকার বা লাভ অর্জন করা। আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে 'কাছাবা ছাইয়েয়া' (পাপ অর্জন)। পাপ থেকে উপকার লাভ হয় না, তবুও উপহাস ছলে এরকম শব্দ সন্নিবেশ করা হয়েছে। কাফেরদের প্রতি উপহাস ছলে অন্য আয়াতেও এ ধরণের শব্দব্যবহার ঘটেছে। যেমন 'ফাবাশশিরহুম বি আজা-বিন-আলিম' (তাদের কে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও)। কাছাব শব্দটির মতো এখানে বাশারাত (সুসংবাদ) শব্দটিও উপহাসার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। (আয়াতের বঙ্গানুবাদে অবশ্য উপহাসের আবহটিকে উপস্থাপন করা হয়নি)।

তাদের অর্জিত পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে– একথার অর্থ তাদের সকল দিকই পাপ পরিবেষ্টিত। কোথাও কোনো ফাঁক নেই। প্রকৃত কাফের যারা তাদের প্রতি এই আয়াতটি প্রযোজ্য, যাদের অন্তরে অনু পরিমাণ ইমানও রয়েছে তাঁদের প্রতি এরকম বাক্য প্রযোজ্য হতে পারে না। ওই সামান্য ইমানই তাঁদের এমন এক আশ্রয় যা তাঁদেরকে পূর্ণ পাপ পরিবেষ্টন থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, জুহাক, আবুল আলীয়া ও অন্যান্য বিজ্ঞজনেরা মন্তব্য করেছেন 'খতাইয়াত্' (পাপরাশি) অর্থ ওই শিরিক, যে শিরিক সহ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ব্যাখ্যাসূত্রেই মোতাজিলা ও খারেজী সম্প্রদায় বলে থাকে, যারা কবীরা গোনাহ্ করেছে তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। তাদের অভিমতটি ভুল, কারণ এ আয়াতটি কবীরা গোনাহ্কারী ইমানদারদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। প্রকৃত অবিশ্বাসীরাই এই আয়াতের লক্ষ্য। মদীনাবাসীগণ 'খতাইয়াত' শব্দটি বহুবচনে পাঠ করেন। অন্য ক্বারীগণ পাঠ করেন একবচনে। ক্বারী হামজা যতিপাতের সময় হামজাকে ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করে ঈদগম অবস্থায় পাঠ করেছেন।

যারা সম্পূর্ণরূপে পাপ পরিবেষ্টিত (পুরোপুরি কাফের) তারাই দোজখবাসী। দোজখই তাদের চিরকালীন আবাস।

আর যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তাঁরাই বেহেশ্তবাসী। সেখানেই তাঁরা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে।

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৮৩

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ

www.eelm.weebly.com

❒ স্মরণ কর, যখন ইসরাইল-সন্তানদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে এবং মানুষের সহিত সদালাপ করিবে, সালাত কায়েম করিবে ও জাকাত দিবে, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলে–

'মিছাক' অর্থ বজ্রকঠিন (সুদৃঢ়) অঙ্গীকার। আল্লামা ইবনে কাসীর, হামজা, এবং কাসায়ী, 'লা তা'বুদুনা' শব্দটিকে পড়তেন– লা ইয়া'বুদুনা (তা হরফটির স্থলে ইয়া বসাতেন তাঁরা)। অন্য ক্বারীগণ লা তা'বুদুনাই পড়তেন। লা তা'বুদুনা ইল্লাল্লাহু' অর্থ তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো (গায়ের আল্লাহ্র) ইবাদত করবে না। তাই নিষেধাজ্ঞাসূচক নির্দেশটি ছিলো অঙ্গীকারের প্রথম শর্ত। পরের সব কয়টি শর্ত আদেশসূচক।

পরের নির্দেশটি ছিলো পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের অর্থ হচ্ছে তাদের সেবা যত্ন করা, তাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করা এবং আল্লাহ্পাকের হুকুমবিরোধী না হলে তাদের নির্দেশ প্রতিপালন করা। এরপর সদ্ব্যবহার করতে বলা হয়েছে– আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন (এতিম) এবং দরিদ্র (মিসকিন) জনতার সঙ্গে। আয়াতে উল্লেখিত 'মাসাকিন' শব্দটি 'মিসকিন' শব্দের বহুবচন। শব্দটি গঠিত হয়েছে 'সকুন' শব্দ থেকে। সম্বলহীনদেরকে এ কারণেই মিসকিন বলা হয় যে, অভাব-অনটন তাদেরকে এমন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যেখানে স্বভাবগত আনন্দানুভূতিও অনুপস্থিত। আত্মীয় এতিম ও মিসকিন্দের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শনের অর্থ হচ্ছে– তাদের প্রতি যথাকর্তব্য পালন করা।

মানুষের সঙ্গে সদালাপ করবে অর্থ উত্তম কথা বলবে। 'হুসনা' অর্থ উত্তম। ক্বারী হামজা, কাসায়ী এবং ইয়াকুব 'হুসনা' শব্দটিকে পড়েছেন 'হাসানা'। অন্যরা 'হুসনাই' পড়েছেন। বিনয়াতিশয্যে মস্তকাবনত অবস্থায় যে কথা বলা হয়, সে কথাকেই বলে উত্তম বা সুন্দর কথা (ওয়া কুলু লিন্নাসি হুস্না)। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ বলেছেন, আয়াতের মর্ম হচ্ছে– রসুলপাক স. এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কালে তোমরা সত্য কথাটিই বলো। হজরত সুফীয়ান সওরী বলেছেন, এই নির্দেশটির প্রকৃত মর্ম হচ্ছে, মানুষকে সুন্দর কথা বলতে থাকো এবং অসুন্দর কথাকে প্রতিহত করতে থাকো। এরকম মর্ম গ্রহণ করা যেতে পারে যে, পারস্পরিক বাক্যব্যবহারে তোমরা বিনম্র হও। সত্য সাক্ষ্য প্রদান করো– এরকম ব্যাখ্যাও গ্রহণ করা যেতে পারে। এমনও বলা যায় যে- এমন কথা বলো যাতে সওয়াব হয়।

আয়াতের শেষ নির্দেশ দু'টি হচ্ছে– সালাত কায়েম করবে ও জাকাত দিবে। এই নির্দেশ রসুল পাক স. এর সময়ের এবং ইতোপূর্বের সকল ইহুদীদের প্রতি প্রযোজ্য। কিন্তু এই নির্দেশ প্রতিপালন করতে এগিয়ে এসেছেন অল্প কতিপয়

www.eelm.weebly.com

লোক, যেমন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং তাঁর কতিপয় সঙ্গী। ইহুদীদের মধ্য থেকে ইমান গ্রহণকারী এই কতিপয় ব্যক্তি বাদে তোমরা বাকী সবাই অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। তোমরা বিরূদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে—একথার অর্থ তোমরা অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচারী হয়েছিলে। একথা বলে ইহুদীদের বিভ্রান্ত পূর্বপুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারা যেমন ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, তোমরাও তেমনি ক্রমাগত সত্যপ্রত্যাখ্যান করে চলেছো।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৮৪

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۝

❒ – যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করিবে না এবং আপনজনকে তাহাদের গৃহ হইতে বহিষ্কার করিবে না। অতঃপর তোমরা ইহা স্বীকার করিয়াছিলে, আর এই বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী।

এখানে অঙ্গীকারের ওই শর্তটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছিলো তোমরা নিজেদের মধ্যে রক্তপাত ঘটাবে না এবং আপনজনদেরকে দেশান্তর করবে না। বনীইসরাইলদের বংশ, ধর্ম ও ভাষা ছিলো এক। তাই পরস্পরে রক্তপাত করবে না- একথা বলা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এরকম— তোমরা এমন কর্ম কোরো না যাতে করে তোমাদের রক্তপাত ও দেশান্তর অনিবার্য হয়। কেউ কেউ 'অলা তুখরিজুনা' বাক্যাংশটির অর্থ করেছেন এরকম- তোমরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে এমন আচরণ কোরো না যাতে তারা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা নির্দেশটি স্বীকার করেছিলে। সুতরাং কৃত অঙ্গীকারের সাক্ষীও তোমরা। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'ওয়া আনতুম তাশহাদুন' (আর এই বিষয়ে তোমরা সাক্ষী) – এই বাক্যটি পূর্বোক্ত বাক্যের তাগিদ। অথবা এরকমও ব্যাখ্যা হতে পারে যে, ওহে উপস্থিত ইহুদীর দল! তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যে অঙ্গীকার করেছিলো সে অঙ্গীকারের সাক্ষী তোমরাই। রসুল পাক স. এর সময়ের ইহুদীদের প্রতি এই বাক্যটি রূপকভাবে প্রযোজ্য হবে।

www.eelm.weebly.com

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز
تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ
وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ط اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ
بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ز فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ع ○

❒ তোমরাই তাহারা যাহারা অতঃপর একে অন্যকে হত্যা করিতেছ এবং তোমাদের একদলকে আপন গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিতেছ, তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালজ্ঘন দ্বারা তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছ এবং তাহারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও; অথচ তাহাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যাহারা এরূপ করে তাহাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।

❒ তাহারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে। সুতরাং তাহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং তাহারা কোন সাহায্যও পাইবে না।

'ছুম্মা' অর্থ অতঃপর। শব্দটির মাধ্যমে সময়ের দূরত্ব বুঝানো হয়নি। অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকেই এখানে দূরত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে, 'অতঃপর তোমরাই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছো, একে অন্যকে হত্যা করেছো। তোমাদের একদলকে গৃহছাড়া করেছো। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে পরস্পরের পাপ ও সীমালজ্ঘনকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছো। আবার ওই সকল লোকই যদি

www.eelm.weebly.com

বন্দী অবস্থায় তোমাদের নিকট আসে, তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও, অর্থাৎ এক বন্দীর বিনিময়ে অন্য বন্দীকে মুক্ত করো। কেউ কেউ বলেছেন, সম্পদের বিনিময়ে বন্দী মুক্ত কর।

আল্লামা সুদ্দী বলেছেন, আল্লাহ্পাক তওরাতে বর্ণিত বনীইসরাইলদের নিকট থেকে তিনটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। অঙ্গীকার তিনটি হচ্ছে: ১. পরস্পরে রক্তপাত করবে না। ২. একে অপরকে দেশত্যাগে বাধ্য করবে না। ৩. বনীইসরাইলদের কেউ কোথায়ও বন্দী হয়ে গেলে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করবে। তাদের অঙ্গীকার প্রতিপালনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এরকম- মদীনায় মুশরিকদের দু'টি গোত্র ছিলো– আউস ও খাজরাজ। ইহুদীদেরও ছিলো দু'টি গোত্র– বনী নাজির ও বনী কুরাইজা। বনী কুরাইজার মিত্র ছিলো আউস এবং বনী নাজিরের মিত্র ছিলো খাজরাজ। দু'টি ইহুদী দলই তাদের মিত্রশক্তি নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতো। বিজয়ীদল বিজিতদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করতো এবং তাদেরকে এভাবে ঘরছাড়া করতো। কিন্তু মজার ব্যাপার ছিলো এই যে, তাদের কেউ বন্দী হয়ে গেলে উভয় গোত্রই মিলিতভাবে মুক্তিপণ দিয়ে তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে আনতো। আরববাসীরা তখন তাদেরকে বলতো– এ কিরকম আচরণ তোমাদের! একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো আবার কেউ বন্দী হলে একযোগে তাকে মুক্ত করে আনো। ইহুদীরা তখন বলতো, আমরা আল্লাহ্পাকের নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, আমাদের বংশভূত কেউ বন্দী হলে তাকে আমরা মুক্ত করে আনবো। পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ না করার ব্যাপারেও তো তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ—একথা স্মরণ করিয়ে দিলে ইহুদীরা বলতো, মিত্রের সাহায্যে এগিয়ে না আসা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। এরকম করলে মিত্ররা আমাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করবে। অঙ্গীকারের উপরোক্ত তিনটি শর্তের মধ্যে ইহুদীরা কেবল শেষ শর্তটি পালন করতো। আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে (তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও)।

অথচ তাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিলো– একথার অর্থ, তোমরা তাদেরকে ঘর ছাড়া করতে বলেই তারা বিপদগ্রস্ত হতো, কখনো কখনো বন্দী হতো। তোমরা তখন মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তও করতে। কিন্তু একবারও ভাবতে না যে, তোমাদের কারণে তারা এরকম বিপদগ্রস্ত হতো। তোমরা তাদেরকে বহিষ্কার করে দিতে বলেই তাদের কপালে জুটতো বন্দীদশা। অথচ এটা ছিলো তোমাদের জন্য অবৈধ।

'ইখরাজুহুম' অর্থ বহিষ্করণ। বহিষ্করণ ছিলো তোমাদের প্রতি নিষিদ্ধ। তোমাদের মধ্যে কেউ বন্দী হলে তাকে মুক্ত করা ছিলো আল্লাহ্পাকের নির্দেশ। দু'টি নির্দেশের একটি তোমরা মানতে না। অপরটি মানতে। তাই আয়াতে প্রশ্ন করা হয়েছে, তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করো (বন্দীদেরকে মুক্ত করো) আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করো (বহিষ্করণের নির্দেশ মানো না)। এ কী রকম আনুগত্য? এরকম অসম্পূর্ণ আনুগত্য অগ্রহণীয়। এর প্রতিফল অত্যন্ত ভয়াবহ!

www.eelm.weebly.com

পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিনে কঠিনতম শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে তোমাদের এই অসদাচরণের জন্য। রসুল পাক স. এর সময়ে তাদের এই পার্থিব লাঞ্ছনা বাস্তবায়িত হয়েছিলো। অঙ্গীকার ভঙ্গের কারনে বনী কুরাইজাদেরকে বন্দী করা হয়েছিলো এবং মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিলো। আর বনী নাজিরেরা অপমান ও লাঞ্ছনার সঙ্গে বিতাড়িত হয়েছিলো। এরপরেও তাদের শাস্তির অবসান হয়নি। কিয়ামতের দিনে আবারো তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। জাহান্নামের অগ্নিবাসই হবে তাদের চিরকালীন আবাস।

এরপর বলা হয়েছে– তারা যা করে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অনবহিত নন (ওয়ামাল্লাহু বিগফিলিন য়াম্মা তা'মালুন)। ইবনে কাসীর, নাফে, আবু বকর প্রমুখ বিজ্ঞজনেরা 'তা'মালুনের' স্থলে পড়তেন 'ইয়া'মালুন।' এমতাবস্থায় 'তা'মালুন' শব্দের সর্বনাম 'মাইইয়াফয়ালু' এর 'মান' এর সঙ্গে সম্বন্ধিত হবে।

তারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে। এরকম করা স্পষ্টতঃই কুফরী। তাই তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং সেদিন (কিয়ামতের দিন) তারা কোনো সাহায্য পাবে না। আল্লাহ্পাকের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো সুযোগই তাদের থাকবে না।

সুরা বাকারা : আয়াত ৮৭

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۫ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى
ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا
لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۫ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ۝

❐ এবং নিশ্চয় মুসাকে কিতাব দিয়াছি এবং তাহার পরে পর্যায়ক্রমে রসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছি, মরিয়ম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছি এবং 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছি। তবে কি যখনই কোন রসুল এমন কিছু আনিয়াছে যাহা তোমাদের মনঃপূত নহে তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ এবং কতককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ?

আল্লাহ্পাক হজরত মুসাকে কিতাব দান করেছেন। তিনি শেষ নবী ছিলেন না। তাঁর পরেও একে একে আরো রসুল প্রেরণ করেছেন আল্লাহ্পাক। হজরত ইউশা, শামুয়েল, শামাউন, দাউদ, সুলায়মান, আইউব, আরমিয়া, উযায়ের, হিযকীল,

www.eelm.weebly.com

আল ইসায়া, ইউনুস, জাকারিয়া, ইলিয়াস, ইয়াহ্হিয়া এবং আরো অনেক নবী রসুল আলাইহিমুস্সালাম । মরিয়ম তনয় হজরত ঈসাকেও আল্লাহ্পাক রসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে দিয়েছেন অনেক স্পষ্ট নিদর্শন (মোজেজা)। নিদর্শন বুঝাতে আয়াতে 'বাইয়েনাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাইয়েনাত অর্থ নবুয়তের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তিনি জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান করতেন, কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় দান করতেন এবং মৃতকে জীবিত করতেন। এগুলোই ছিলো তাঁর নবুয়তের প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিশালী করেছি– একথার অর্থ, হজরত ঈসাকে হজরত জিবরাইলের মাধ্যমে শক্তিশালী করেছি। অথবা তাঁকে ওই রূহের মাধ্যমে শক্তিশালী ও পবিত্র করেছি, যে রূহ আমি মরিয়মের উদরে ফুৎকার করেছিলাম। 'আল কুদ্স' অর্থ পবিত্র। এখানে পবিত্রকারী স্বয়ং আল্লাহ্পাক। সম্মান প্রদর্শনার্থে বিষয়টিকে আল্লাহ্পাক নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। যেমন বলা হয়েছে বাইতুল্লাহ্ (আল্লাহ্র ঘর) নাক্বাতুল্লাহ্ (আল্লাহ্র উষ্ট্রী)। এরকম আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, ওয়া নাফাখনা ফিহি মিররূহি (আর আমি তাতে স্বীয় আত্মা ফুৎকার করেছি)।

আল্লামা ইবনে কাসীর 'রূহিল কুদুস' শব্দের 'দাল' অক্ষরটিকে পাঠ করতেন সাকিন সহযোগে। অন্য ক্বারীগণ 'দাল'কে পেশ সহযোগে পাঠ করতেন।

'রূহ' এবং 'আল কুদ্স' শব্দ দু'টির সম্বন্ধ খতামুল জুদ (দানশীলতার আংটি) শব্দ দু'টির মতো। একথা মেনে নিলে আল কুদ্স শব্দটি হবে রূহ্ শব্দটির বিশেষণ। হজরত জিবরাইল আ. এবং হজরত ঈসা আ. অবাধ্যতার আবিলতা থেকে মুক্ত ছিলেন বলেই তাঁদেরকে আল কুদ্স বা পবিত্র বলা হয়েছে। হজরত ঈসার জন্মের সময় আল্লাহ্পাক তাঁকে শয়তানের স্পর্শ থেকে নিরাপদ রেখেছিলেন। তাই বিশেষভাবে তাঁকে আল কুদ্স বলা হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে-রসুলপাক স. বলেছেন, সকল সদ্যজাত আদম সন্তানকে শয়তান স্পর্শ করে। কিন্তু হজরত মরিয়ম ও তাঁর সন্তান (হজরত ঈসা) এর ব্যতিক্রম। তাঁরা দু'জন শয়তানের স্পর্শ থেকে মুক্ত ছিলেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত ঈসাকে পবিত্র বলার আরেকটি কারণ হচ্ছে, তিনি ছিলেন পুরুষবীর্য ও ঋতুবতী জরায়ু থেকে মুক্ত। হজরত জিবরাইল কর্তৃক তাঁকে শক্তিশালী করার পদ্ধতিটি ছিলো এরকম– নির্দেশ ছিলো হজরত ঈসা যেখানেই গমন করুন না কেনো জিবরাইল তাঁর সহগামী হবেন। এই নির্দেশের প্রতি হজরত জিবরাইলের ছিলো যথামান্যতা। তাঁর আকাশারোহণের সময় পর্যন্ত এই নির্দেশকে তিনি মান্য করে চলেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, রূহ অর্থ ইসমে আজম, যদ্দারা হজরত ঈসা মৃতকে জীবিত করতেন এবং মানুষের সামনে অলৌকিক বিষয়াবলী প্রদর্শন করতেন। কেউ কেউ বলেছেন, রূহ অর্থ ইঞ্জিল শরীফ। যেমন এক আয়াতে বলা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে, 'আওহাইনা ইলাইকা রূহাম্মিন আমরিনা' (হে মোহাম্মদ স. আমি স্বীয় নির্দেশে আপনার প্রতি রূহ এর প্রত্যাদেশ করেছি)। এখানে রূহ অর্থ হবে কোরআন পাক। আল্লাহ্‌র কিতাবকে রূহ বলার তাৎপর্য হচ্ছে, রূহ যেমন দেহের প্রাণশক্তি তেমনি রূহের প্রাণশক্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব। শেষোক্ত ব্যাখ্যা দু'টির মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাকের সঙ্গে রূহের সম্বন্ধ এবং পবিত্রতার বিশেষণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার রহস্যটি সুস্পষ্ট হয়েছে। কেনোনা রূহ যদি আল্লাহ্‌র কিতাব হয়, তবে পবিত্রতার ব্যাপাটিও তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধিত হওয়া সম্পূর্ণতঃই যুক্তিযুক্ত। বাগবী বলেছেন, ইহুদীরা যখন রসুলপাক স. এর নিকট থেকে হজরত ঈসা বিষয়ক আলোচনা শুনতো, তখন আরজ করতো, আপনি তো হজরত ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণের অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করেন। আমরা সেগুলোকে সত্য বলে মানি। আপনি তো নিজেকেও নবী বলেন। সুতরাং আপনিও তাদের মতো মোজেজা প্রদর্শন করুন। তাদের এই ধৃষ্টতার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্‌তায়ালা এখানে বলেছেন, যখনই কোনো রসুল তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র নির্দেশ নিয়ে আগমন করেছেন, যা তোমাদের মনঃপূত নয়-----। এই আয়াতটি ইহুদীদের প্রতি কঠোর তিরস্কার ও হুমকি স্বরূপ। হজরত মুসা এবং তৎপরবর্তীতে এতো নবী রসুল প্রেরণ করা সত্ত্বেও তারা তাদের অসৎ স্বভাব ত্যাগ করলো না। উপরোক্ত বিভিন্ন অভিযোগ শুরু করে দিলো (যেমন তারা বলতো, আমরাই তোমাকে লালনপালন করলাম। তারপর তুমি এমন হয়ে গেলে যে, আমাদেরকেই অমান্য করো)। এরকমও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে,'আফাকুল্লামা জাআকুম রসুলুন' (যখন কোনো রসুল এমন কিছু এনেছেন) বাক্যটি এখানে নতুন করে শুরু হয়েছে। যেনো একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে এই বাক্যটিকে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাই এ বাক্যের শুরুতে 'ফা আ' (তবে কি) বসানো হয়েছে। পূর্বের বাক্যে নবী রসুল প্রেরণের যে কথা বলা হয়েছে তাতে এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, তারা নবীগণের সঙ্গে কী কী আচরণ করেছে? যার জবাব হচ্ছে, তারা তাদের প্রতি কুফরী করেছে। তাই এই বাক্যে তিরস্কারার্থে উল্লেখিত হয়েছে, যখনই কোনো রসুল আল্লাহ্‌র নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছেন, তখনই তোমরা অস্বীকার করেছো। তারা তোমাদের নিকট মনঃপূত হয়নি বলে তোমরা অহংকার করেছো। কাউকে কাউকে বলেছো মিথ্যাবাদী। যেমন হজরত ঈসা আ. কে এবং হজরত মোহাম্মদ স. কে। কাউকে কাউকে তোমরা আবার হত্যাও করেছো। যেমন, হজরত জাকারিয়া, হজরত ইয়াহ্‌ইয়া প্রমুখকে। নবী হত্যার ব্যাপারটি ছিলো অতীত কালের। তবুও এখানে তা বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের অনুকূল ভাষায় বিবৃত হয়েছে। কারণ, হত্যাকান্ডের ঘটনাগুলো অতিপ্রসিদ্ধ। অতিপ্রসিদ্ধ ঘটনার বর্ণনারীতি এরকমই (যেমন বলা হয়, আমি দিল্লি গমন করলাম, সেখানে দেখছি এক বিরাট জামে মসজিদ। আরো সামনে দেখছি একটি প্রকান্ড কেল্লা)। এরকম বর্ণনারীতি প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদীদের নিকট একথাটি যেনো

www.eelm.weebly.com

দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয় যে, তোমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক নবীকে হত্যা করেছে। ওইরূপ মনোভাব তোমরাও পোষণ করে চলেছো। তোমাদের প্রচেষ্টাও তাদের মতোই। হত্যার অভিপ্রায়েই তোমরা মোহাম্মদ স. কে যাদু করেছো। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হচ্ছো।

হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে— একবার একজন (ইহুদী) রসুল পাক স. এর উপরে যাদু করেছিলো। যাদুর প্রভাবে তাঁর কখনো কখনো স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছিলো। তখন তাঁর মনে হতো, অমুক কাজটি তিনি করেছেন, অথচ সে কাজটি তিনি আদৌ করেননি। এ অবস্থা চললো কিছুদিন ধরে। এরপর তিনি আল্লাহ্‌পাকের সাহায্যপ্রার্থী হলেন। তারপর তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আয়েশা! তুমি তো জানো, একটি বিষয়ে আমি আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলাম। আল্লাহ্‌পাক সে বিষয়টি আমাকে পরিস্কার করে দিয়েছেন। আমি বললাম, হে রহমতের নবী! সেটা কী? তিনি বললেন, আমি দেখলাম, দু'জন লোক এলো। একজন আমার শিয়রে এবং একজন আমার পিছনের দিকে উপবেশন করলো। একজন বললো, বলো দেখি এর কী রোগ হয়েছে! দ্বিতীয়জন বললো, যাদু। প্রথমজন প্রশ্ন করলো, কে যাদু করেছে? অপরজন বললো, লবীদ বিন আসেম ইহুদী। পুনরায় প্রশ্ন হলো, সে কী যাদু করেছে? জবাব— একটি চিরুনী, একগুচ্ছ চুল এবং খেজুরের খোসা। প্রশ্ন- সেগুলো কোথায়? জবাব— জারওয়ান কূপে। এরপর রসুল পাক স. একদল সহচর সমভিব্যাহারে ওই কূপের নিকট গিয়ে বললেন, এই সেই কূপ, যা আমাকে (স্বপ্নে) দেখানো হয়েছে।

আমি বলি, 'তাক্বতুলুন' (হত্যা করেছো) একথাটি ভবিষ্যতকালবোধকও হতে পারে। অর্থাৎ তোমরা হত্যা করবে। আর যাঁকে হত্যা করবে তিনি হচ্ছেন রসুল পাক স.। তাঁকে হত্যার প্রচেষ্টাও ইহুদীরা করেছিলো। খয়বরের এক ইহুদী রমণী রসুলপাক স. কে বিষমিশ্রিত ছাগলের গোশত খাইয়েছিলো। সেই বিষের প্রতিক্রিয়া ছিলো তাঁর অন্তিমকাল পর্যন্ত। এরকম ব্যাখ্যা মেনে নিলে এই হত্যাসম্পর্কিত বর্ণনার মধ্যে পূর্বের নবীগণের হত্যার ব্যাপারটি উহ্য রয়েছে মনে করতে হবে। তখন অর্থ হবে এরকম— নবীগণের একদলকে তোমরা হত্যা করেছো। আরেক দলকে (একজনকে) হত্যা করবে।

হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, খয়বরের এক ইহুদী রমণী ছাগলের গোশতে বিষ মিশ্রিত করে হাদীয়া হিসাবে রসুলপাক স. এর খেদমতে পেশ করলো। রসুলপাক স. কয়েকজন সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে সে গোশত খেতে বসলেন। সামান্য গোশত খাওয়ার পর তিনি এরশাদ করলেন, খাওয়া বন্ধ করো। ইহুদী রমণীকে পাকড়াও করার জন্য লোক প্রেরণ করা হলো। বন্দীনী ইহুদী রমণীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি গোশতে বিষ মিশিয়েছো? রমণী বলল, আপনি কেমন করে জানলেন। তিনি বললেন, আমার হাতের এই ছাগলের রানটি আমাকে সব বলে দিয়েছে। রমণী বললো, হ্যাঁ আমি এরূপ করেছি। করেছি

www.eelm.weebly.com

এজন্য যে, আপনি যদি প্রকৃতই নবী হন, তবে বিষের কোনো প্রতিক্রিয়া আপনার উপর হবে না। আর যদি প্রকৃত নবী না হন, তবে আমরা আপনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবো। রসুলপাক স. ওই রমণীর অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কোনোরূপ শাস্তি ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দিয়েছিলেন তাকে। যে কয়জন সাহাবা ওই গোশত খেয়েছিলেন তাঁরা মৃত্যুবরণ করেছিলেন। রসুলপাক স. তাঁর পবিত্র উরুদেশ থেকে রক্ত বের করে দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিষের প্রতিক্রিয়া মুক্ত হয়েছিলেন। আবু দাউদ, দারেমী। জননী আয়েশা বলেছেন অন্তিম সময়ে রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, আয়েশা! আমি ইহুদী রমণীর দেয়া বিষমিশ্রিত যে গোশত খেয়েছিলাম তার প্রতিক্রিয়া এখনও অনুভব করছি। ওই বিষক্রিয়া আমার প্রাণশক্তির শিকড় কেটে দিচ্ছে। বোখারী।

আমি বলি, আল্লাহ্পাক ইহুদীদেরকে এখানে দু'টি দলে বিভক্ত করেছেন। এক দলকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে 'ফা ফারিকুন কাজ্জাবতুম' (কতককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছো)। আরেকটি দলকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে 'ফারিকুন তাক্বতুলুন (কতককে হত্যা করেছো)। এভাবে তাদের একদল নবীগণের উপরে অসত্যারোপকারী। আরেকদল নবী হন্তারক। যদি কেউ বলে যারা নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং হত্যাও করেছে সেই দলের কথা তাহলে এখানে বলা হয়নি। এ সন্দেহের উত্তরে বলা যায় যে, যদি দু'টি দলের সংযোজক 'ওয়াও' (এবং) এর স্থলে 'আও' অব্যয়টি সন্নিবেশিত হতো, তবে বিবরণটি সন্দেহবিমুক্ত থাকতো। তখন অর্থ হতো– হয়তো তোমরা নবীগণকে অসত্যারোপ করেছো অথবা হত্যা করেছো। কিন্তু এভাবে নবীগণের উপরে যে কোনো একটি (মিথ্যারোপ অথবা হত্যা) কার্যকর হতো। এক সঙ্গে দু'টোকেই বুঝাতো না। কিন্তু 'ওয়াও' (এবং) বসানো হয়েছে বলে সে সন্দেহের অবকাশ আর নেই।

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৮৮

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ○

❑ তাহারা বলিয়াছিল 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত।' হাঁ, সত্য প্রত্যাখানের জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের অল্পসংখ্যকই বিশ্বাস করে।

'গুলফুন' অর্থ ওই অন্তর যা স্বভাবগত পর্দায় আচ্ছাদিত। ওই রূপ অন্তরের অধিকারীরা সত্যবচন শোনে না ও বুঝে না। অন্য একটি আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন 'কাফেররা বলতো, আমাদের অন্তকরণ পর্দায় আচ্ছাদিত।'

www.eelm.weebly.com

এরকম বলেছেন মুজাহিদ ও কাতাদা। অন্য কতিপয় তাফসীরবিদ বলেছেন, 'গুলফুন' শব্দটির আসল উচ্চারণ হবে 'গুলুফুন'। এরকম উচ্চারণ করতেন হজরত আয়রাজ এবং হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। এই পদ্ধতিতে গুলফুন হচ্ছে গুলুফুন শব্দের বহুবচন। এই নিয়মে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এরকম, আমাদের অন্তরগুলো সর্বপ্রকার জ্ঞানের আধার, জ্ঞানে ভরপুর। সুতরাং তোমাদের দেয়া জ্ঞানের আর কোনো প্রয়োজন নেই। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং আতা এরকম বলেছেন। কালাবী বলেছেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আমাদের অন্তকরণ সর্বজ্ঞানের আধার– যা কিছু শোনে তার সংরক্ষণ করে। কিন্তু তোমাদের কথা বুঝেও না সংরক্ষণও করে না। তোমাদের কথায় যদি কোনো পুণ্য বা কল্যাণ থাকতো তবে অবশ্যই আমাদের অন্তকরণ তা উপলব্ধি করতো এবং গ্রহণও করতো। তাদের এতাদৃশ ধারণার প্রতিবাদ হিসেবে এই আয়াত এসেছে। আল্লাহ্পাক এখানে বলেছেন, তাদের অন্তকরণ স্বভাবগতভাবে আচ্ছাদিত নয় বরং তাদের সত্য প্রত্যাখ্যান প্রবৃত্তির কারণেই তারা আল্লাহ্তায়ালার অভিশাপগ্রস্ত হয়েছে। যেমন রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, প্রতিটি শিশুই 'ফিতরাতের' (সত্যগ্রহণ যোগ্যতার) উপরে জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক অথবা মুশরিক বানায়। একজন আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই যদি সে মারা যায় তবে তার কী অবস্থা হবে, তিনি বললেন, আল্লাহ্পাকই তার প্রকৃত অবস্থা অবগত।

আল্লাহ্ তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন–সত্যপ্রত্যাখ্যানের জন্যই তাদের উপর নেমে এসেছে এই অভিশাপ। তাদের অন্তকরণ জ্ঞানের ভান্ডার, জ্ঞানের আধার– ইহুদী অবিশ্বাসীদের এই দাবী অযৌক্তিক। সত্যগ্রহণে তারা অপারগ এই কারণেও যে, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিষবাষ্পে ভরা তাদের অন্তকরণ। আর তারা এ কারণেই অভিশপ্ত। কুফরীর কারণেই তাদেরকে এ অভিশাপ দিয়েছেন আল্লাহ্। অন্য একটি আয়াতেও আল্লাহ্পাক জানিয়েছেন 'আছাম্মাহুম ওয়া আ'মা আবস্বারাহুম' (আল্লাহ্পাক তাদেরকে বধির বানিয়েছেন, আর তাদের চক্ষুসমূহ অন্ধ করে দিয়েছেন)।

সুতরাং অল্পসংখ্যকই বিশ্বাস করে- একথার অর্থ ইহুদীরা অধিকাংশই অবিশ্বাসী। অল্পসংখ্যক ইহুদী ইমানের পথে এগিয়ে এসেছে। মুশরিকরা যেমন অধিক হারে ইসলাম গ্রহণ করেছে–ইহুদীদের ইসলাম গ্রহণ সে তুলনায় অপ্রতুল। এরকম বলেছেন কাতাদা। এরকম অর্থও হতে পারে যে, তাদের পরিমাণগত দিকটি অত্যল্প। অথবা এরকমও বলা যায়-ইমানের মূল বিষয়গুলোর মধ্যে খুবই কম বিষয়ে তারা আস্থাশীল। এভাবে তাদের জন্য ইমানের কতোকাংশ গ্রহণ ও কতোকাংশ বর্জন অবশ্যম্ভাবী হয়। তাই ওয়াকিদী বলেছেন, তারা অল্প বেশি কোনো রকম ইমানেরই অধিকারী নয়। বরং তারা সম্পূর্ণতই ইমানশূন্য। যেমন

www.eelm.weebly.com

বলা হয়, তুমি অমুক কাজটি খুব কমই করো– এরকম কথার প্রকৃত অর্থ হয় অমুক কাজটি তুমি করোই না।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৮৯

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

❒ তাহাদের নিকট যাহা আছে আল্লাহের নিকট হইতে তাহার সমর্থক কিতাব আসিল; যদিও পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে ইহার সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করিত তবুও তাহারা যাহা জ্ঞাত ছিল উহা যখন তাহাদের নিকট আসিল তখন তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহের অভিশম্পাত।

তাহাদের নিকট যাহা আছে- একথার অর্থ তওরাত শরীফ। আর সমর্থক কিতাব অর্থ কোরআন শরীফ। আয়াতে বলা হয়েছে, তওরাতের সমর্থক হিসেবে কোরআন অবতীর্ণ হলো। কোরআন যিনি নিয়ে এলেন, সেই মহানবী মোহাম্মদ স. এর আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদীরা তাঁকে অন্তর থেকে মান্য করতো। তখন অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের জন্য তারা তাঁকে অসিলা করতো। বলতো, যে শেষ নবীর মর্যাদা ও গুণাবলীর বিবরণ আমরা তওরাতে দেখতে পাই– সেই মহাসম্মানিত নবীর বরকতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয় দান করো। এভাবে দোয়া করে তারা আল্লাহ্র সাহায্য লাভ করতো এবং মুশরিকদেরকে এই বলে শাসাতো যে, শেষ নবীর আবির্ভাবকাল সমুপস্থিত। তিনি আমাদেরকে স্বীকৃতি দেবেন। তারপর আমরা তাঁর সহযোগী হয়ে তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবো, ধ্বংস করে ফেলবো যেমন ধ্বংস করা হয়েছে আদ, সামুদ ও এরেম বাসীদেরকে। আয়াতের ব্যাখ্যা এরকম হতে পারে যে, ইহুদীরা মুশরিকদের নিকট রসুল পাক স. এর আকৃতি প্রকৃতি বিষয়ে আলোচনা করতো এবং বলতো,অতিশীঘ্রই তিনি আবির্ভূত হবেন–একথা নিশ্চিত। 'ইয়াস্‌তাফ্‌তিহুনা' শব্দের সিন অক্ষরটি মোবালাগা অর্থে ব্যবহৃত। উপরন্তু সিন অক্ষরটিতে এরকম ইঙ্গিত রয়েছে যে, রসুল পাক স. এর গুণাবলী বর্ণনাকারী যেনো আপনমনকে একথাই জিজ্ঞেস করে, সে নবী কবে আসবেন?

www.eelm.weebly.com

সেই প্রতিশ্রুত শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী এলেন। তওরাত কিতাবে তাঁর পূর্ণ নিদর্শন লিপিবদ্ধ ছিলো। ইহুদীরা তা পাঠ করতো। তাই শেষ রসুলকে তারা সহজেই সনাক্ত করতে সক্ষম হলো। কিন্তু জেনে-শুনে-বুঝেও তারা তাঁকে অস্বীকার করলো। অস্বীকার করলো দু'টি কারণে একটি হচ্ছে – এই নবী কেনো তাদের বংশ থেকে আবির্ভূত হলো না। আরেকটি হচ্ছে–তাঁকে মেনে নিলে নিশ্চিত অর্থাগম ও নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যাবে।

শেষে বলা হয়েছে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশম্পাত–এখানে অবিশ্বাসী ইহুদীদেরকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই আয়াতে 'আলাইহিম' না বলে 'আলাল কাফেরীন' বলা হয়েছে। কারণ ওই সকল ইহুদীই ছিলো আয়াতের লক্ষ্য। তাই অভিশম্পাতের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন ছিলো। অন্যভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে– আল্লাহ্‌পাকের অভিশম্পাত সাধারণভাবে সকল কাফেরদের প্রতি। আর এই ইহুদীরাও যেহেতু অবিশ্বাসীদের অর্ন্তভুক্ত, তাই এরাও অভিশপ্ত।

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৯০

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

❐ উহা কত নিকৃষ্ট যাহার বিনিময়ে তাহারা তাহাদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে-উহা এই যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিত শুধু এই কারণে যে আল্লাহ্ তাঁহার দাসদের মধ্যে হইতে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। সুতরাং তাহারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হইল। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে–একথার অর্থ আখেরাতের লাভের তুলনায় পৃথিবীর লাভকেই তারা বড় করে দেখেছে। দ্বীনের বিনিময়ে ক্রয় করেছে দুনিয়াকে। তাই তারা ঈর্ষাপরবশ হয়ে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা প্রত্যাখ্যান করেছে। 'বাগইয়া' শব্দের অর্থবিদ্রোহাত্মক প্রবৃত্তি বা ঈর্ষা। কুফর বা অবিশ্বাস নয়। 'বাগী', 'ইয়াবগী', 'বাগ ইয়া'– এশব্দগুলো সমার্থক শব্দ। 'বাগী' শব্দের অর্থ কোনো কিছু কামনা করা অথবা বিনষ্ট করা। অত্যাচারীকেও বাগী বলা হয়, কারণ সে অনাচার করে। যে প্রশাসকের বিরুদ্ধে

www.eelm.weebly.com

বিদ্রোহী হয়ে উঠে তাকেও বলে বাগী। কারণ সেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। হিংসুক বা ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিকেও বাগী বলা যায়, কারণ সেও অত্যাচারী। যাকে সে হিংসা করে, সে তার প্রতি অত্যাচারপ্রবণ হয়ে থাকে। তাই সে তার জীবন ও সম্পদ বিনষ্টির কামনায় সদাসচেষ্ট থাকে।

ইহুদীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ আয়াত অস্বীকার করে। অবতীর্ণ কোরআন বুঝাতে এখানে বলা হয়েছে 'আঁইউনাজজিলাল্লা'। ক্বারী আবু আমর এবং ইবনে কাসীর সকল অবস্থায় 'তুনাজজিলু' শব্দটিকে তাশদীদবিহীন অবস্থায় পাঠ করেছেন। ইবনে কাসীর অবশ্য কয়েক স্থানে এর ব্যতিক্রমেও করেছেন। যেমন, 'অমাতুনাজ্‌জিলু' (সুরা হিজর), 'অতুনাজ্‌জিলু মিনাল কোরআন' (সুরা হিজর) এবং 'অনাজ-জিলু আলাইনা' (সুরা ইসরা)। ক্বারী আমরও কয়েকটি স্থানে তাশদীদসহ পাঠ করেছেন। যেমন, 'আই ইয়ান জুলা' (সুরা আনআম) এবং 'ওয়ামা নুনাজ্‌ জিলুহূ' (সুরা হিজর)। সকল ক্বারী অবশ্য 'মা নুনাজ জিলুল মালাইকাতা' আয়াতটি তাশদীদ সহকারে পাঠ করেছেন।

'মিনফাদ্বলিহি' অর্থ তোমার করুণা বা অনুগ্রহ। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাঁকেই এই অনুগ্রহ (ফজল) দান করেন। ইহুদীরা তাঁর এই অনুগ্রহের অবমাননা করেছে। মহানবী মোহাম্মদ স. এবং কোরআন মজীদ– এই মহান অনুগ্রহকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। ইতোপূর্বেও তারা এমন করে বিমুখ হয়েছিলো ইঞ্জিল শরীফের প্রতি। যথাআনুগত্য করেনি তওরাত শরীফেরও। গরু পূজা, শনিবারের মৎস শিকারের নিষেধাজ্ঞা অস্বীকার– এসমস্ত কারণে তারা আগে থেকেই ছিলো আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র। এখন শেষ নবী ও শেষ কিতাবের প্রতি বিমুখ হয়ে পুনরায় তারা ক্রোধের পাত্র হলো। তাই আয়াতে বলা হয়েছে– সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হলো।

আয়াতের শেষ বাক্যটি হচ্ছে- সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রকৃতপক্ষে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বা কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট। পাপী মুমিনদের প্রতি যে শাস্তি আরোপ করা হবে, সে শাস্তি লাঞ্ছনাদায়ক হবে না। লাঞ্ছনা বা অপদস্থতা নয়– পাপমুক্ত এবং পবিত্র করাই হবে সে শাস্তির উদ্দেশ্য।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৯১

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ
تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

www.eelm.weebly.com

❒ এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে বিশ্বাস কর, তাহারা বলে 'আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে আমরা তাহাতে বিশ্বাস করি।' তাহা ব্যতীত সবকিছুই তাহারা প্রত্যাখ্যান করে যদিও উহা সত্য এবং যাহা তাহাদের নিকট আছে তাহার সমর্থক। বল, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হইতে তবে কেন তোমরা অতীতে নবীগণকে হত্যা করিয়াছিলে?'

আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন– একথার অর্থ আল্লাহ্পাক যে সকল আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। একথার মধ্যে তওরাত শরীফ, যবুর শরীফ, ইঞ্জিল শরীফ ও কোরআন শরীফ সহ সকল আসমানী কিতাবই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্তায়ালার এই অখণ্ডনীয় নির্দেশকে ইহুদীরা মান্য করে না। তারা বলে আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা কেবল তাই বিশ্বাস করি। অর্থাৎ তওরাত ছাড়া অন্য কোনো আসমানী কিতাব আমরা মানি না। কিন্তু তওরাতই তাদের এই কথার প্রতিবাদ করে। কারণ, কোরআনকে মান্য করার নির্দেশ তওরাত শরীফেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। তওরাতে একথাও বলা হয়েছে, অতঃপর তোমাদের নিকট আসবেন একজন নবী। তিনি হবেন তওরাতের সত্যায়নকারী। তোমরা অবশ্যই তাঁকে মেনে চলবে এবং অবশ্যই তাঁর সাহায্যকারী হবে। অতএব ইহুদীরা তওরাতকে বিশ্বাস করে না, যদি করতো তবে তওরাতের নির্দেশ অনুযায়ী শেষ রসুল ও শেষ কিতাবকে মেনে নিতো।

শেষ বাক্যটিতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তারা বিশ্বাসী নয়, বরং ঘোর অবিশ্বাসী। তাই তাদেরকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করা হয়েছে– তোমরা যদি বিশ্বাসী, তবে নবীগণকে হত্যা করেছিলে কেনো? লক্ষণীয় যে, মদীনার ইহুদীরা নবী হন্তারক নয়, তবুও তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, তবে নবীগণকে হত্যা করেছো কেনো? ইহুদীদের পূর্ব পুরুষেরা নবীহন্তারক ছিলো– সেদিকে লক্ষ্য করেই এরকম প্রশ্ন করা হয়েছে। কারণ অধস্তন ইহুদীরা তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষদের অপকর্ম সমূহের প্রতি সন্তুষ্ট এবং পূর্ব পুরুষদের একনিষ্ঠ অনুসারীও তারা। তাছাড়া এখনও তারা কোনো নবীকে হত্যা করেনি বটে, কিন্তু শেষ নবী মোহাম্মদ স. কে যাদু, যুদ্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে হত্যা করতে তারা সদা সচেষ্ট রয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ৯২

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

www.eelm.weebly.com

❑ এবং নিশ্চয় মুসা তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছে তাহার পরে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী হইয়া গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে।

'অলাক্বদ্ জাআকুম' অর্থ তোমাদের নিকট এসেছেন। ক্বারী আবু আমর, হামজা, হিশাম ও কাসায়ী সকল ক্ষেত্রে 'ক্বদ জা আকুম' এর 'দালকে' 'জিমের' মধ্যে ইদগম করে পাঠ করেছেন। অনুরূপ 'লাক্বাদ জারনা' বাক্যে 'দাল'কে 'জালের' সঙ্গে,'লাক্বদ জাইআন্না' বাক্যে 'দালকে 'জ' এর মধ্যে, ক্বদ ছামিয়া তে 'দাল'কে 'সিন' এর সাথে, 'ক্বদ শাগ্ফাহা' তে 'দাল' কে 'সিন' এর সাথে, 'ফাক্বদ দ্বলা' তে 'দাল' কে 'ছোয়াদ' এর সাথে এবং 'ফাক্বদ জলামু' তে 'দাল'কে 'জোয়া' এর সাথে ইদগম করে পাঠ করেছেন। কোরআন মজীদে যেসব 'জ' স্থানে 'দাল' এর পরে 'তোয়া' থাকবে সেসকল স্থানেও ইদগম অবশ্যই পড়তে হবে। হিশাম ব্যতীত অন্য ক্বারীগণ 'লাক্বদ ছর্‌রাফনা' বাক্যের 'দালকে' 'ছোয়াদ' এর সাথে ইদগম করেছেন। ইবনে জাকোয়ান চারটি স্থলে হামজা, কাসায়ী ও হিশামের অনুসরণে ইদগম করেছেন। যথা- দাল এর জাল, জোয়া, জোয়াদ, জোয়া। ক্বারী ওয়ারশ ক্বদ এর পরে কেবল দোয়াদ এবং জোয়া এলে ইদগম করেছেন। ইবনে কাসীর এবং আসেম উপরোল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে ইদগম সহ পাঠ করেছেন। ক্বদ এর পরে দাল এলে ইদগম হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। যেমন ক্বদ দাখালু। ক্বদ এর পরে 'তা' এলেও সর্বসম্মতভাবে ইদগম হবে, যেমন ক্বদ্তা বাইয়ানা। কিন্তু নাফে থেকে হাসীন বর্ণনা করেছেন, ক্বদ এর পরে ইদগম হবে না, ইজহার হবে।

এরশাদ হয়েছে— 'নিশ্চয়ই মুসা তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিলেন।' তোমরা তাঁকে এবং তাঁর অলৌকিক নিদর্শন সমূহকে প্রত্যক্ষ করেও সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে গো-বৎস্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে কেনো? সীমালঙ্ঘন বুঝাতে আয়াতে জলিমুন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, ইহুদীরা জালেম (অত্যাচারী)। তারা বলে, আমরা কেবল তওরাতকে বিশ্বাস করি। অথচ বিশ্বাসের কোনো আলামতই তাদের মধ্যে নেই। যদি থাকতো তবে তারা নবীহত্যা, গরু পূজা— এ সমস্ত কখনই করতো না। কারণ, এ সকল বিষয় তওরাত সহ সকল আসমানী কিতাবে নিষিদ্ধ।

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৯৩

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

www.eelm.weebly.com

☐ স্মরণ কর, যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম, এবং তূরকে তোমাদের উর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম 'যাহা দিলাম দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর।' তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা শ্রবণ করিলাম ও অমান্য করিলাম।' সত্যপ্রত্যাখ্যান হেতু তাহাদের হৃদয় গো-বৎস্য-প্রীতি-সিঞ্চিত হইয়াছিল। বল, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তোমাদের বিশ্বাস যাহার নির্দেশ দেয় উহা কত নিকৃষ্ট।'

সেই অঙ্গীকারের কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ্পাক, যখন বনীইসরাইল এর নেতাদের মাথার উপরে তুলে ধরা হয়েছিলো তূর পাহাড়। তখন আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা দিলাম তা দৃঢ়রূপে গ্রহণ করো এবং শোনো। এখানে শোনো শব্দের অর্থ হবে মেনে নাও এবং অনুসরণ করো। কোনো নির্দেশ পালন করতে গেলে তা প্রথমে শুনতে হয়। তাই এখানে পালন করো বা অনুসরণ করো বুঝাতে বলা হয়েছে শোনো। ইহুদীরা তখন জবাব দিয়েছিলো- আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম। ভাষ্যকারগণ বলেছেন, অমান্য করলাম শব্দটি তারা মুখে উচ্চারণ করেনি। কথাটি ছিলো তাদের অন্তরের কথা। সহজেই একথা বুঝা যায় যে, মুখে তারা মান্য করলাম এরকম বাক্যই উচ্চারণ করেছিলো। পরবর্তীতে তাদের অবাধ্যতা এতোই প্রকট হয়ে উঠেছিলো যাতে করে মনে হতো তারা বোধ হয় প্রথমেই শুনলাম ও অমান্য করলাম— এরকম কথা সরাসরি মৌখিকভাবে বলে দিয়েছিলো। আমি বলি, ভাষ্যকারগণ যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছেন। কারণ একথা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, মৌখিকভাবে অমান্য করলে উত্তোলিত পাহাড় তখনি তাদের উপর ফেলে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হতো।

ইহুদীরা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলো বলেই তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিলো গো-বৎস্য প্রীতি। এটি ছিলো তাদের অবিমৃশ্যকারিতার চরম প্রমাণ। সামেরী বিচিত্র রং দিয়ে গো-বৎস মূর্তিকে করেছিলো মনোহর। ওই মনোহারিত্বের রন্ধ্রপথেই গো-বৎস্যপ্রীতির রং এসে পড়েছিলো তাদের মনে। শাদা কাপড়কে রঙ্গিন করলে যে অবস্থা হয়, গো-বৎস্যপ্রীতির রঙ্গে তেমনি রঞ্জিত হয়ে উঠেছিলো তাদের অন্তরাত্মা।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে— তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে— এ কি রকম বিশ্বাস তোমাদের, যে বিশ্বাস নিকৃষ্টতার প্রতি প্ররোচিত করে। তোমরা বলো, তোমরা তওরাতে বিশ্বাসী। যদি তাই হয়, তবে বলো তোমাদের বিশ্বাসভাজন তওরাতে কোথাও কি গো-বৎস্য পূজার নির্দেশ রয়েছে। ইমান কি কখনো কোনো গর্হিত কাজের নির্দেশ দিতে পারে? সুতরাং একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, তোমরা বিশ্বাসীই নও।

ইহুদীরা বলে বেড়াতো— মাত্র কয়েকদিন জাহান্নামের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে, ইহুদী ও খৃষ্টান ব্যতীত কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না, আমরা আল্লাহ্র সন্তান এবং তাঁর বন্ধু ইত্যাদি। তাদের এ সকল অনর্থক উক্তির প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত—

www.eelm.weebly.com

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

❒ বল, 'যদি আল্লাহের নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর–যদি সত্যবাদী হও।'

❒ কিন্তু তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহারা কখনও উহা কামনা করিবে না। এবং আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্বন্ধে অবহিত।

এরশাদ হয়েছে, হে ইহুদীরা তোমরা ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যদি তাই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করো না কেনো? মৃত্যুমুখে পতিত হলেই তোমরা তাহলে তোমাদের প্রিয়জন আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। বন্দীদশা সদৃশ এই পৃথিবীবাস থেকে মুক্ত হয়ে চিরসুখময় আবাসে অনন্তকাল ধরে বসবাস করতে পারবে। অথচ বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, মৃত্যু তোমাদের নিকট চরম অপ্রিয়।

হজরত ইবনে মোবারক জুহুদ অধ্যায়ে এবং বায়হাকী হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন- রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, মৃত্যু হচ্ছে মু'মিনের উপহার। হজরত জাবের থেকে দায়লামীও এরকম বর্ণনা কারেছেন। হজরত হোসাইন বিন আলী থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে, মৃত্যু (প্রকৃত) মানুষের নিকট পুষ্প সদৃশ। হজরত হাব্বান বিন আসওয়াদ বলেছেন, মৃত্যু বন্ধুমিলনের সেতু। কোরআন এবং হাদিসের আলোকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, আখেরাতের প্রথম অধ্যায় হচ্ছে কবর। হজরত ওসমান থেকে তিরমিজি ও ইবনে মাজা মারফু পদ্ধতিতে এরকমই বিবরণ দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াত দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর পর কিয়ামতের পূর্বে মৃতব্যক্তি আল্লাহ্পাকের নিকট থেকে পার্থিব প্রাপ্তির চেয়ে অধিক কল্যাণ লাভ করবে। অন্যথায় মৃত্যু কাম্য হতো না। আর একে বন্ধুমিলনের সেতুও বলা যেতো না। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, আয়াতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, তোমরা যদি তোমাদের দাবীতে সত্য হও, তবে

www.eelm.weebly.com

বিচ্ছেদকন্টকিত এই পৃথিবীবাসের অবসান কামনা করে মৃত্যুকে স্বাগত জানাও। এই ব্যাখ্যাসুত্রে আয়াতটি মুবাহিলার আয়াতের দৃষ্টান্ত হবে।

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, এই ইহুদীরা যদি মৃত্যু কামনা করতো, তবে ধরাপৃষ্ঠে আর কোনো ইহুদী অবশিষ্ট থাকতো না। সকলেই ধ্বংস হয়ে যেতো। বায়হাকী তাঁর দালায়েল পুস্তকে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। বোখারী ও মুসলিম উল্লেখ করেছেন কিছু শব্দ পরিবর্তন সহযোগে। ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে জারীর মওকুফ পদ্ধতিতে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

আয়াত শেষে বলা হয়েছে, 'ইনকুনতুম ছুদিক্বিন'— এর অর্থ যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অর্থাৎ তোমরা যদি মনে করো, তোমরা সত্যবাদী তবে মৃত্যু কামরা করো।

জ্ঞাতব্যঃ মৃত্যু কামনা সিদ্ধ না অসিদ্ধ, এই সমস্যাটির নিরসন হওয়া প্রয়োজন। একথা ঠিক যে, দৈহিক কিংবা আর্থিক বিপদাপদ অথবা সন্তানসন্ততি বা প্রিয়জনের মৃত্যুর কারণে মৃত্যু কামনা করা সিদ্ধ নয়। হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে- রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, বিপদাপদের কারণে তোমরা কখনো মৃত্যু চেয়ো না। অন্তর যদি অতি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তবে শুধু এতোটুকু বলো, হে আল্লাহ্! যতোক্ষণ জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, ততোক্ষণ আমাকে জীবিত রাখো। আর মৃত্যু যখন আমার জন্য কল্যাণকর হবে, তখনই আমাকে মৃত্যু দিও। বোখারী, মুসলিম। বোখারী ও মুসলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে, যে মৃত্যুবরণ করে তার সমুদয় আমল বন্ধ হয়ে যায় (পৃথিবীবাস যদিও অশুভ, তবুও কল্যাণ অর্জনের জন্য আমলের স্থান কিন্তু এই পৃথিবীই)। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে- তোমরা কেউ কখনো মৃত্যু কামনা কোরো না। তোমরা সম্ভবত অধিক পরিমানে পুণ্য অর্জন করতে পারবে। অথবা অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার অবকাশ পাবে। বোখারী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে- রসুলপাক স. বলেছেন, তোমরা কেউ মৃত্যু যাচনা কোরো না। মৃত্যুর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যুপ্রার্থী হয়ো না। কারণ, মৃত্যু মানুষের সকল আমল বন্ধ করে দেয়। মুসলিম। মৃত্যুকামনার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে আহমদ, বায্যার ও বায়হাকী হজরত জাবের থেকে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। মারুজীও এরকম বর্ণনা করেছেন, হজরত মুয়াবিয়ার গোলাম কাসেম এবং হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে। আহমদ, ইয়ালী, হাকেম ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন উম্মুল ফজল থেকে।

একটি জরুরী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন যে, মৃত্যুকামনার মৌখিক উচ্চারণ যে সর্ববাদিসম্মতভাবে নিষিদ্ধ, একথা নিশ্চিত। কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলের মৃত্যুপ্রীতি নিষিদ্ধ নয়। কারণ, অন্তরের গভীরতম আকর্ষণ অনিবারণীয়। যদি কেউ দ্বীনের মধ্যে ফেতনা ফাসাদ দৃষ্টে মৃত্যুপ্রার্থী হয়, তবে তার প্রার্থনা বৈধ হবে।

www.eelm.weebly.com

হজরত সাওবান থেকে ইমাম মালেক এবং বাজ্জাজ বর্ণনা করেছেন—রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, আয় আল্লাহ্! যখন আপনি মানুষের মধ্যে ফেতনার বিস্তার ঘটাবেন, তখন আমাকে ফেতনামুক্ত অবস্থায় আপনার সন্নিধান দানে ধন্য করবেন। ইমাম মালেক বলেছেন, হজরত ওমর তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি এখন শক্তিহীন, বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, আর এদিকে আমার দায়িত্বের সীমানা সুবিস্তৃত। হে আমার পরম প্রভু! আমার দ্বারা কারো অধিকার বিনষ্ট হওয়ার পূর্বে শান্তির সঙ্গে আপন সকাশে টেনে নিও। এই প্রার্থনার একমাস অতীত না হতেই হজরত ওমর ইন্তেকাল করেছিলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন।

হজরত আমর বিন আম্বাসা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুলপাক স. নির্দেশ করেছেন, তোমরা কেউ মৃত্যুপ্রার্থনা কোরো না। তবে যদি আমলে আস্থা না থাকে (অসৎকর্মে লিপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়) তবে মৃত্যুপ্রার্থী হতে দোষ নেই। আর যখন ইসলামের মধ্যে ছয়টি অপকর্মের প্রচলন দেখতে পাবে তখন মৃত্যু কামনা করবে। তখন তোমাদের জীবনের অধিকার তোমরা ছেড়ে দিও (মৃত্যু কামনা করতে দ্বিধান্বিত হয়ো না)। সেই ছয়টি অপকর্ম হচ্ছে— ১. (ব্যাপক) রক্তপাত ২. অপ্রবীণের রাজ্য শাসন ৩. বাধ্যবাধকতার অতিরিক্ততা ৪. মূর্খদের নেতৃত্ব ৫. মামলার রায় ক্রয়বিক্রয় ৬. কোরআন পাঠে সাঙ্গীতিক প্রাধান্য প্রদান। ইবনে আব্দুল বার বলেছেন, হজরত আমর বিন আম্বাসাকে কিছুসংখ্যক লোক জিজ্ঞেস করেছিলো, আপনি মৃত্যু কামনা করেন কেনো? মৃত্যুকামনা তো নিষিদ্ধ। তিনি বলেছিলেন, আমি রসুল পাক স. কে বলতে শুনেছি, ছয়টি বস্তু প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ কোরো (মৃত্যুপ্রার্থী হয়ো) — ১. মূর্খের রাজ্যশাসন ২. শর্ত ও বাধ্যবাধকতার ছড়াছড়ি ৩. বিচারের রায় বেচাকেনা ৪. নিঃশংকচিত্ত রক্তপাত ৫. স্বজনবন্ধন ছিন্ন করা ৬. কোরআন মজীদকে সঙ্গীত তুল্য ধারণা করা (ইচ্ছেমতো রাগরাগিনী সহযোগে কোরআন তেলাওয়াত করা)। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে হাকেম এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে সা'দও এরকম বর্ণনা করেছেন। ফেতনার আশংকায় সলফে সালেহীনদের (পরবর্তী সৎকর্মশীলদের) অনেকেই মৃত্যু কামনা করেছেন। এরকম বর্ণনা করেছেন খালিদ বিন মায়দান থেকে ইবনে সা'দ, ইবনে আসাকের, আবু নাঈম এবং হজরত আবু দারদা থেকে মাকহুল, ইবনে আবিদুদ্দুন্‌ইয়া— হজরত আবু হোজায়ফা থেকে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে আবিদুদ্দুন্‌ইয়া—হজরত আবু বকরা থেকে খতীব, আবিদুদ্দুন্‌ইয়া, ইবনে আসাকের— হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবী শায়বা, বায়হাকী এবং হজরত ইরবাম বিন সাকিলা থেকে তিবরানী ও ইবনে আসাকের। কেউ যদি আল্লাহ্পাকের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্খায় মৃত্যুকে আহবান জানায়, তবে তা উত্তম। জুন্নুনমিসরী থেকে ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন,

www.eelm.weebly.com

তিনি বলেছেন, আশাধারী হওয়া অন্য সকল অবস্থা থেকে শ্রেয়ঃ, সকল মর্যাদার শ্রেষ্ঠ মর্যাদা। প্রভুমিলনের আশা বিলম্বিত মৃত্যুকে অনুমোদন করে না।

আমি বলি, আয়াতে উল্লেখিত সম্বোধনের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌মিলনের আতিশয্য যেনো সুচিহ্নিত হয়। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এরকম— আল্লাহ্ মিলনের আশায় মৃত্যু কামনা করো।

জননী আয়েশা থেকে ইবনে সা'দ, বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন—আমি শুনেছিলাম, সকল নবীকেই মৃত্যুর পূর্বে এই অধিকার দেয়া হতো যে, পৃথিবীতে থাকো অথবা আমার নিকট চলে এসো। অথচ অন্তিম সময়ে যখন রসুলেপাক স. এর রোগযন্ত্রণা বেড়ে যাচ্ছিলো, তখন আমি তাকে বলতে শুনলাম, 'মায়াল্লাজিনা আনআমাল্লাহু আলাইহিম মিনান্নাবীয়্যিনা ওয়া সিদ্দিক্বীনা ওয়াশ্‌শুহাদায়ি ওয়াসসলিহিনা ওয়া হুসনা উলা-য়িকা রফিক্বা' (তাঁদের সঙ্গে যাদের প্রতি আল্লাহ্‌পাক অনুগ্রহরাশি বর্ষণ করেছেন। তারা নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সৎকর্মশীল এবং তারাই উত্তম সঙ্গী)। একথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম তাঁকে আল্লাহ্‌পাক পৃথিবীতে থাকা না থাকা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দিয়ে দিয়েছেন। জননী আয়েশা থেকে নাসায়ীর বর্ণনা এসেছে- অন্তিমকালে রসুল পাক স. আমার কোলে হেলান দিয়েছিলেন। এক সময় তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। আমি তাঁর পবিত্র শরীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম এবং প্রার্থনা করছিলাম, 'হে মানুষের প্রতিপালক! ব্যাধির যন্ত্রণাধিক্য দূর করে দাও। এমন সময় তিনি সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। তার পবিত্র হাত আমার হাত থেকে পৃথক করে নিলেন এবং বললেন, না। আমিতো আল্লাহ্‌পাকের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর কামনা করছি।

আল্লামা তিবরানী থেকে বর্ণিত হয়েছে— হজরত আজরাইল হজরত ইব্রাহিম আ. এর নিকট রূহ কবজের উদ্দেশ্যে এলেন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, এরকম দৃশ্য কি কখনো দেখেছো যে, বন্ধু বন্ধুর প্রাণহরণ করে? হজরত আজরাইল একথা আল্লাহ্‌র সকাশে উপস্থাপন করলেন। আল্লাহ্‌পাক তাঁকে বললেন, তুমি ইব্রাহিমকে বলে দাও, এরকম কি কোথাও কখনো হয়েছে যে, বন্ধু তাঁর বন্ধুর সঙ্গে মিলনে অনীহ? হজরত আজরাইলের নিকট থেকে একথা শুনে হজরত ইব্রাহিম বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্! আমি প্রস্তুত। হজরত ইউসুফ আ. বলেছেন, হে আমার আল্লাহ্! আমাকে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় মৃত্যু দান করো এবং তোমার সৎ বান্দাদের সঙ্গে মিলিয়ে দাও। হজরত আলী বলতেন, আমার কোনো ভয় নেই— যদি মৃত্যু আমার সঙ্গী হয় অথবা আমি মৃত্যুর সঙ্গী হই। ইবনে আসাকের তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এই বিবরণগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। হজরত আম্মার সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের সময় বলেছিলেন, আজ আমি বন্ধুদের সঙ্গে, অর্থাৎ হজরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স. ও তাঁর দলের সঙ্গে মিলিত হবো। এই উক্তিটি তিবরানী তাঁর কবীরে এবং আবু নাঈম তাঁর দালায়েলে উল্লেখ করেছেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন— তিনি (আবু উমামা) বলেছেন, আমি রসুল পাক স. এর পবিত্র সংসর্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি স. বক্তৃতা করছিলেন। তাঁর পবিত্র বক্তৃতা শুনে আমাদের অন্তর বিগলিত হয়ে গেলো। হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস অত্যধিক রোদন করলেন এবং বলে উঠলেন, হায়! এখন যদি আমার মৃত্যু হতো। রসুল পাক স. এরশাদ করলেন, আমি তোমার সামনে উপস্থিত অথচ তুমি মৃত্যু কামনা করছো? একথা তিনি তিন বার বললেন। পুনরায় এরশাদ করলেন, যদি তুমি জান্নাতের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকো তবে তোমার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হবে এবং আমল উত্তম হবে। তোমার জন্য এটাই হবে মঙ্গলজনক। এ হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, সকল অবস্থায় মৃত্যু যাচনা করা বৈধ নয়। দৈহিক বা আত্মিক ক্ষতি হলেও নয়। যেমন এ হাদিসের বিবরণে প্রকাশ পায়, হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস শারিরীক কিংবা বৈষয়িক বিপদাপদের জন্য নয় বরং আল্লাহ্র শাস্তির ভয়ে মৃত্যু কামনা করেছিলেন।

জ্ঞাতব্যঃ রসুল পাক স. এর পবিত্র সংসর্গে অবস্থান করা চরমতম বরকতের কারণ। তাঁর পবিত্র সাহচর্য যতোই প্রলম্বিত হবে ততোই বরকত লাভ হতে থাকবে। মৃত্যু কামনা কেনো, জান্নাত প্রাপ্তিও তাঁর সাহচর্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। কারণ, জান্নাতে অধিকতর মর্যাদা প্রাপ্তি তাঁর পবিত্র সংসর্গের উপরই নির্ভরশীল। একারণেই তিনি স. বলেছিলেন, আমি সামনে উপস্থিত অথচ তুমি মৃত্যু কামনা করছো? উর্দু অনুবাদক।

আমি বলি, হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে মৃত্যু কামনা করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যু আল্লাহ্র আযাবকে রোধ করতে পারে না। তাঁর আযাব থেকে বাঁচতে হলে প্রয়োজন তওবা ইস্তেগফার এবং সৎকর্মের আয়োজন। পাপ বিরতিও অত্যাবশ্যক। একারণেই রসুল পাক স. হজরত সা'দকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছিলেন।

প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে, পাপলিপ্ত হওয়ার ভয় এবং আনুগত্যে শৈথিল্যের আশংকা যদি দেখা দেয়, তবে নিঃসন্দেহে মৃত্যু কামনা করা যেতে পারে। তদুপরি অন্তিমকালে প্রিয়মিলনকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রার্থনা করা সম্পূর্ণতঃই বৈধ। এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। যেমন রসুলুল্লাহ্ স., হজরত ইব্রাহিম, হজরত আম্মার প্রমুখ অন্তিম সময়ে আল্লাহ্পাকের মিলনাকাঙ্খাকে আয়ুষ্কালের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের মিলন পিয়াসী, আল্লাহ্পাকও তাঁর মিলনাভিলাষী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের মিলনকে অপছন্দ করে, আল্লাহ্পাকও তার মিলনকে অপছন্দ করেন। একথা শুনে হজরত আয়েশা অথবা অন্য কোনো নবীপত্নী বললেন, আমরাতো সকলেই মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তিনি স. এরশাদ করলেন, বিষয়টি ওরকম নয় বরং এরকম— বিশ্বাসীরা যখন মৃত্যুর

www.eelm.weebly.com

সন্নিকটবর্তী হয়, তখন তাদেরকে আল্লাহ্পাকের সন্তোষ ও সম্মানসূচক সুসংবাদ দেয়া হয়। ফলে তাদের নিকট আখেরাতই সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু হয়ে থাকে। তখন তাঁরা আল্লাহ্ মিলনের জন্য আকুল হন। আর আল্লাহ্ও ব্যাকুল হন তাঁদের সঙ্গে মিলনের জন্য। আর অবিশ্বাসীরা মৃত্যুর মুখোমুখি হলে তাদেরকে শাস্তি ও তিক্ত পরিণামের দুঃসংবাদ দেয়া হয়। তখন আখেরাত হয় তাদের কাছে সর্বাধিক অপ্রিয় বস্তু। তখন তারা আল্লাহ্ মিলনকে অপছন্দ করে। আল্লাহ্পাকও তাদেরকে অপছন্দ করেন। বোখারী ও মুসলিম।

জ্ঞাতব্যঃ সম্মানিত অলি আল্লাহ্গণ অন্তিম লগ্নে আল্লাহ্পাকের সন্তোষসূচক সংবাদ বোধের আওতায় অথবা কাশ্ফের আওতায় অবগত হন বা তাঁরা সেই বিরল সুসংবাদ ধারণ করেন শ্রুতির আওতায়। অথবা বরকতের অফুরন্ত বর্ষণে স্নাত হয়ে অনুভূতিটি তাঁরা ধারণ করেন আপন সত্ত্বায়। কিংবা হজরত আজরাইল এবং রহমতের ফেরেশতার উল্লসিত উপস্থিতি তাঁদেরকে আল্লাহ্তায়ালার প্রসন্নতা সম্পর্কে নিশ্চিতি দান করে।

সুস্থ জীবন-যাপন অবস্থায় পূর্ববর্তী সাধুজনদের কারো নিকট থেকেই মৃত্যু কামনার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ফেৎনা ফাসাদের আশংকা, আমল বিনষ্টির ভয়– এসব কিন্তু সুস্থাবস্থা নয়। তাই এমতাবস্থায় হজরত ওমর ফারুক ও হজরত আলীর মৃত্যু কামনার ব্যাপারটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক অবস্থার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে আউলিয়া কেরামদের কেউ কেউ মৃত্যু কামনা করেছেন। কিন্তু নবী, রসুল ও সাহাবায়ে কেরাম এরকম করেননি (কারণ, তাঁরা আধ্যাত্মিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে ছিলেন সক্ষম)। তাঁরা আল্লাহ্ বিরহে সারাক্ষণ দগ্ধীভূত হতেন, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও জানতেন যে, এই পৃথিবীতে রয়েছে সৎকর্ম বৃদ্ধির সুযোগ। জনৈক কবি বলেছেন-

প্রবৃত্তির দাস হই মিলনের কালে
বিরহই আমাকে রাখে দাসত্বের হালে

ইহুদীরা মূর্খ, তাই অবাধ্য। তাদের দাবী ছিলো এরকম– আমরা আল্লাহ্র প্রিয়জন। আমাদের কোনো আমলের প্রয়োজন নেই। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে মৃত্যু কামনা করো।' তাদের দাবী যে সর্বৈব মিথ্যা সেকথাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে এভাবে– তারা কস্মিনকালেও মৃত্যু কামনা করবে না। তাদের অসৎ অর্জনই এ কামনার অন্তরায়। তাদের কৃতকর্ম জঘন্য। তারা আল্লাহ্র কালাম অস্বীকার করে, রসুল পাক স.কে অবমাননা করে, তওরাত শরীফকে বিকৃত করে। তাদের সকল অপকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সম্যক অবহিত। একথাই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতের শেষ

www.eelm.weebly.com

বাক্যে জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে— 'আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের (জালেমদের) সম্বন্ধে অবহিত।'

সূরা বাকারা : আয়াত ৯৬

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

❑ তুমি নিশ্চয় তাহাদিগকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ, এমনকি অংশীবাদী অপেক্ষা অধিকতর লোভী দেখিতে পাইবে। তাহাদের প্রত্যেকে সহস্র বৎসর বাঁচিবার আকাঙ্খা করে; কিন্তু দীর্ঘায়ু তাহাদিগকে শাস্তি হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ উহার দ্রষ্টা।

ইহুদীরা পার্থিব জীবনের প্রতি অতি আসক্ত। এমনকি মুশরিক অপেক্ষাও ইহলৌকিক জীবন তাদের নিকট অধিকতর প্রিয়। পরলোকের প্রতি অংশীবাদীদের বিশ্বাস মাত্রই নেই। পক্ষান্তরে ইহুদীরা পাপের শাস্তি, সৎকর্মের বিনিময় লাভ এবং পারলৌকিক জীবনের অন্য সকল কিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তবুও তারা ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর প্রতি মোহগ্রস্ত। এর কারণ এই যে, জাহান্নামের ভয় তাদের নেই। তাদের অলীক বিশ্বাস— জাহান্নামের আগুন তাদেরকে স্পর্শ করবে না। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, 'সমস্ত মানুষ এমনকি অংশীবাদী অপেক্ষাও তারা দুনিয়ার প্রতি অধিকতর লালসাপরায়ণ।'

ইহুদীরা হজরত উযায়ের আ. কে আল্লাহ্‌র পুত্র মনে করে (নাউযুবিল্লাহ্)। নিজেদেরকেও মনে করে অমৃতের সন্তান। 'মিনাল্লাজিনা আশ্‌রাকু' বাক্যের মাধ্যমে ওই সকল ইহুদীদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে। আবুল আলীয়া বলেছেন, এই বাক্যের মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে অগ্নিপূজকদিগকে। কারণ, তারা পারস্পরিক অভিবাদন বিনিময়ের সময় বলে, তুমি হাজার বছর আয়ুষ্মান হও। সুতরাং 'মিনাল্লাজিনা আশ্‌রাকু' (অংশীবাদীদের চেয়ে) — একথার অর্থ, ইহুদীরা সকল মানুষের চেয়ে, বিশেষ করে অগ্নিপূজকদের চেয়েও অধিক আয়ুষ্কালাভিলাষি।

কিন্তু দীর্ঘায়ু তাদেরকে শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না— একথার অর্থ, এমন কেউ নেই, যে তাদের আয়ু বাড়িয়ে দেবে এবং শাস্তি থেকে অব্যাহতি দান করবে। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে, দীর্ঘ আয়ু নিঃসন্দেহে পরজগতের শাস্তি দূর করে (কমপক্ষে বিলম্বিত তো করেই)। তাহলে দীর্ঘায়ু তাদের শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না. আয়াতে একথা বলা হলো কেনো? আমি বলি,

www.eelm.weebly.com

পারলৌকিক জীবন অনন্ত, চিরস্থায়ী। অন্তহীন আখেরাতের তুলনায় পৃথিবীর জীবন যেনো চোখের পলক। সুতরাং পৃথিবীর হাজার বছর অথবা ততোধিক সময়ের কিইবা মূল্য। আল্লাহ্পাকের নিকট তাই পৃথিবীর স্থায়িত্ব গ্রহণযোগ্য কোনো বিষয়ই নয়। শাস্তি দূর হওয়ার আরেকটি অর্থ, সৎকর্মশীলতার জন্য শাস্তি দূর হওয়া। সৎকর্মবিহীন আয়ু প্রকৃতপক্ষে শাস্তিকে দূর করে না, বরং বৃদ্ধি করে। আয়ু যতো বাড়বে পাপও ততো বাড়বে। তওবাবিহীন পাপাচার অধিক শাস্তিকে অবশ্যম্ভাবী করে দেয়।

আয়াতের শেষ কথাটি হচ্ছে, 'ওয়াল্লাহু বাসিরুম বিমা ইয়া'মালুন (তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ উহার দ্রষ্টা)। ক্বারী ইয়াকুব 'ইয়া'মালুন' শব্দটিকে 'তা'মালুন' পড়েছেন। অন্য ক্বারীগণ ইয়া'মালুনই পড়েছেন। এখানে 'তাহারা' বলতে ইহুদীদেরকেই নির্দেশ করা হয়েছে। ইসাহাক ইবনে রহ্ওয়াইহ্ তাঁর মসনদ গ্রন্থে এবং ইবনে আবী শায়বা, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর বিভিন্ন পদ্ধতিতে শা'বীর মাধ্যমে হজরত ওমর ফারুক থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন— হজরত ওমর ইহুদীদের নিকট যেতেন এবং তওরাতের আবৃত্তি শুনতেন। তিনি তখন আনন্দিত এবং বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলতেন, এতো কোরআনপাকেরই সত্যায়ণ। একদিন হজরত ওমর ফারুক এরকম আবৃত্তি শুনছিলেন। তখন রসুল পাক স. সেখানে উপস্থিত হলেন। হজরত ওমর বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, তোমরা তো ভালোভাবেই জানো যে, ইনি আল্লাহ্র রসুল! এক প্রবীণ ইহুদী বললো, হ্যাঁ আমরা জানি ইনি আল্লাহ্র রসুল। হজরত ওমর বললেন, তাহলে তোমরা এঁর অনুসারী হচ্ছোনা কেনো? ইহুদী বললো, একারণেই আমরা তাঁর অনুসরণ করিনা— আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার নিকট ওহী (প্রত্যাদেশ) নিয়ে আসেন কে? তিনি বলেছিলেন, হজরত জিব্রাইল। জিব্রাইল আমাদের শত্রু। কারণ, সে নিয়ে আসে প্রলয় ও ধ্বংস! হজরত ওমর বললেন, তবে কোন ফেরেশতার সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্ব? ইহুদী বললো, হজরত মিকাইলের সঙ্গে। কারণ, তিনি নিয়ে আসেন বৃষ্টি ও রহমত। হজরত ওমর আরো বলেছেন, পরে আমি একদিন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্পাকের নিকট তাঁদের মর্যাদা কী ধরনের ? সে বললো, একজন দক্ষিণে এবং একজন বামে অবস্থানকারী।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন— রসুলপাক স. এরশাদ করেন, আসমানবাসীদের মধ্যে আমার দু'জন উযীর রয়েছেন। একজন হজরত জিব্রাইল, অন্যজন হজরত মিকাইল। আর আমার পৃথিবীবাসী উযীর দু'জন হচ্ছেন, আবুবকর ও ওমর। হজরত উম্মে সালমা থেকে হাসান পদ্ধতিতে তিবরানী বর্ণনা করেন- রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আসমানে দু'জন ফেরেশতা রয়েছেন—তাঁদের একজন কঠোরতার নির্দেশ দেন, অন্যজন নির্দেশ দেন নম্রতার। কঠোরতার নির্দেশ দানকারী ফেরেশতা হচ্ছেন, হজরত

www.eelm.weebly.com

জিব্‌রাইল এবং কোমলতার নির্দেশ দানকারী হচ্ছেন, হজরত মিকাইল। দু'জনই সত্যের নির্দেশক। নবীদের মধ্যেও এরকম দু'জন রয়েছেন যাঁদের একজন কঠোর, অন্যজন কোমল। সেই নবী দু'জন হচ্ছেন, রোষতপ্ত হজরত মুসা এবং বিনম্র হজরত নূহ্। দু'জনই সত্যাধিষ্ঠিত। আমার সাথীদ্বয়েরও একজন কঠোর, একজন কোমল। জালাল ওমর এবং জামাল আবুবকরও সত্যাধিষ্ঠিত।

হজরত ওমর পুনরায় বললেন, তাঁদের মর্যাদা ও নৈকট্য যদি এমন হয়, তবে জিব্‌রাইলের উচিত হবে না মিকাইলের সঙ্গে শত্রুতা করে। আবার মিকাইলেরও উচিত হবে না জিব্‌রাইলের শত্রু হওয়া। আবার জিব্‌রাইলের শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা মিকাইলের জন্য হবে অনুচিত। এবং জিব্‌রাইলেরও উচিত হবেনা মিকাইলের শত্রুর মিত্র হওয়া। জিব্‌রাইলের দুশমন মিকাইলেরও দুশমন। একথা বলে আমি সেখান থেকে চলে এলাম। এই ঘটনাটি রসুল পাক স. কে জানানোর উদ্দেশ্যে আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, আজ যে আয়াত নাজিল হয়েছে তোমাকে কি তা জানাবো? একথা বলেই তিনি পাঠ করলেন—

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৯৭, ৯৮, ৯৯

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَ
مَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ○
وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ○

❑ বল, 'যে কেহ জিব্‌রাইলের শত্রু সে জানিয়া রাখুক সে তো আল্লাহের নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুর্‌আন পৌঁছাইয়া দিয়াছে, যাহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যাহা বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ';

www.eelm.weebly.com

❑ 'যে কেহ আল্লাহের, তাঁহার ফেরেশতাগণের, তাঁহার রসুলগণের এবং জিব্‌রাইল ও মিকাইলের শত্রু সে জানিয়া রাখুক, আল্লাহ্ নিশ্চয় সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের শত্রু।'

❑ এবং নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করিয়াছি। সত্যত্যাগীগণ ব্যতীত অন্য কেহ তাহা প্রত্যাখ্যান করে না।

হজরত ওমর ফারুক বলেছেন— আমি আরজ করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমি ইহুদীদের নিকট থেকে এইমাত্র এলাম। এর মধ্যে দেখছি এ বিষয়ে আয়াত নাজিল হয়েছে। আমি আপনাকে বলার পূর্বেই আল্লাহ্পাক আপনাকে সব বলে দিয়েছেন। শা'বী পর্যন্ত হাদিসটির সনদ সহীহ্। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে শা'বীর সঙ্গে হজরত ওমরের সাক্ষাত ঘটেনি। হজরত ওমর থেকে সুদ্দীর মাধ্যমে ইবনে জারীরও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হজরত ওমর থেকে কাতাদার মাধ্যমেও এরকম বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সনদ দু'টি কর্তিত। আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা থেকে অন্য বর্ণনাকারীর মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, জনৈক ইহুদী হজরত ওমরের সঙ্গে সাক্ষাত করে বললো, তোমাদের নবী যে জিব্‌রাইলের কথা বলেন, সে আমাদের শত্রু। হজরত ওমর তখন পাঠ করলেন, যে কেউ আল্লাহ্র, তাঁর ফেরেশতা মন্ডলীর, তাঁর রসুলগণের এবং জিব্‌রাইল ও মিকাইলের শত্রু সে জেনে রাখুক আল্লাহ্ নিশ্চয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শত্রু। (আয়াত ৯৮)।

আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা বলেছেন, এই বর্ণনার মাধ্যমে বুঝা যায়— আয়াতখানি যেনো হজরত ওমরের ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে জারীর বলেছেন, ঐকমত্য এই যে, এই ঘটনাটি এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। বোখারীর মাধ্যমে হজরত আনাসের উক্তি বর্ণিত হয়েছে এরকম— ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম একদিন তাঁর জমিতে কৃষিকাজ করছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন রসুলুল্লাহ্ স. এদিকে এসেছেন। সংবাদ পেয়েই তিনি তাঁর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আপনাকে এমন তিনটি প্রশ্ন করবো, যার জবাব নবী ছাড়া অন্য কারো জানা নেই। প্রশ্ন তিনটি হচ্ছে— ১.কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন কী? ২. বেহেশতবাসীদের সর্বপ্রথম আহার্য বস্তু কী? ৩. সন্তান কখনো পিতার কখনো মাতার অবয়ব পায়— এর কারণ কী? রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করলেন, এইমাত্র ভ্রাতা জিব্‌রাইল আমাকে প্রশ্ন তিনটির জবাব জানিয়ে দিলেন। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম বললেন, ইহুদীরাতো জিব্‌রাইলকে শত্রু মনে করে। রসুল স. তৎক্ষণাৎ 'যে কেহ জিব্‌রাইলের শত্রু সে জেনে রাখুক'— এই আয়াত পাঠ করলেন। শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, একথাটি সুস্পষ্ট যে, রসুলপাক স. ইহুদীদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদনার্থে এই আয়াত পাঠ করেছিলেন। কিন্তু এই আয়াত এই বিশেষ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর এই

www.eelm.weebly.com

মতটি নির্ভরযোগ্য। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে সাঈদ বিন জোবায়ের এবং তাঁর মাধ্যমে বাশির বিন শিহাব বর্ণনা করেছেন, এক ইহুদী রসুলপাক স. এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে আবুল কাসেম! আমরা আপনাকে পাঁচটি প্রশ্ন করবো। যদি আপনি সেগুলোর জবাব দিতে পারেন তাহলে বুঝবো আপনি সত্য নবী। প্রশ্নগুলো হচ্ছে— ১. হজরত ইয়াকুব কোন বস্তুটি নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন? ২. নবীর আলামত কী? ৩. বজ্র ও বজ্রধ্বনির প্রকৃতি কী? ৪. রমণীরা কখনো পুত্র কখনো কন্যা প্রসব করে— কারণ কী? ৫. আপনার নিকট আসমানী সংবাদ বহন করে আনে কে? আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনার সাথী কে? রসুলপাক স. সবগুলো প্রশ্নের জবাব দিলেন। শেষে যখন বললেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার সাথী হজরত জিব্রাইল, তখন ইহুদী বলে উঠলো, সে তো যুদ্ধবিগ্রহ এবং শাস্তি নিয়ে আমাদের নিকট আবির্ভূত হতো! আপনি যদি রহমত, সজীবতা ও বৃষ্টিবাহী মিকাইলের কথা বলতেন তবে ভালো হতো।

সনদবিহীন অবস্থায় বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আব্দুল্লাহ্ বিন সুরিয়া ইহুদী ছিলো প্রসিদ্ধ পন্ডিত। সে একবার রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলো, আকাশ থেকে কোন ফেরেশতা আপনার নিকট আসে? তিনি স. এরশাদ করলেন, হজরত জিব্রাইল। ইহুদী বললো, জিব্রাইলের বদলে মিকাইল এলে আমরা আপনার উপর ইমান আনতাম। জিব্রাইল বার বার আমাদের সাথে দুশমনি করেছে। সে আমাদের নবীকে বলেছে, বাদশাহ্ বখতে নসরের মাধ্যমে বায়তুল মাকদিস ধ্বংস হবে। ধ্বংসের সময়কাল পর্যন্ত সে বলে দিয়েছিলো। সেই ধ্বংস প্রতিরোধের জন্য আমরা একটি উপায় নির্ধারণ করেছিলাম। বখতে নসর যখন বালক, তখন তাকে হত্যা করার জন্য আমরা একজনকে পাঠিয়েছিলাম। জিব্রাইল তখন বখতে নসরকে সাহায্য করেছিলো বলে আমাদের লোক তাকে হত্যা করতে পারেনি। সে আমাদের লোককে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলো। বখতে নসর বড় হয়ে যথাসময়ে বায়তুল মাকদিস ধ্বংস করে দিয়েছিলো।

মুকাতিল বলেছেন, ইহুদীরা বলতো, আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে জিব্রাইলের প্রতি নির্দেশ ছিলো, সে আমাদের মধ্য থেকে নবী নির্বাচন করবে। কিন্তু সে নির্দেশ ভঙ্গ করে অন্য গোত্রে নবী নির্বাচন করেছে। আমি বলি, শানে নুজুল সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনা দু'টি সম্ভবতঃ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ঘটেছিলো। ইহুদীর সঙ্গে হজরত ওমরের বাক্যালাপ এবং রসুল স. এর সঙ্গে তাদের কথোপকথন, দু'টো ঘটনাই সঠিক। ইবনে কাসীর এই দু'ই আয়াতে (৯৭,৯৮) এবং সুরা তাহ্রীমে উল্লেখিত জিব্রাইল শব্দটিকে জবর যুক্ত 'জীম', জের যুক্ত 'র' এবং 'হামজা' বিহীন অবস্থায় জাবরীল উচ্চারণ করতেন। আবু বকর পাঠ করতেন 'জীম' ও 'র' তে জবর এবং হামজাতে জের দিয়ে জাব্রাইল। হামজা এবং কাসায়ীও অনুরূপ পাঠ করেছেন। কিন্তু তাঁরা হামজার পরে 'ইয়া' উল্লেখ করেছেন— জাবরাঈল। অন্য

www.eelm.weebly.com

ক্বারীগণ পাঠ করেছেন জিব্‌রাইল (জীম এবং র তে জের দিয়ে এবং হামজা বাদে)।

'ফাইন্নাহু নাজ্জালাহু আলা ক্বলবিকা'— এখানে 'ফাইন্নাহু' শব্দের হু সর্বনামটি হজরত জিব্‌রাইলের সঙ্গে এবং 'নাজ্জালাহু' শব্দের হু সর্বনামটি কোরআন মজীদের সঙ্গে সম্বন্ধিত। আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কোরআন পৌঁছে দিয়েছে— একথায় বুঝা যায়, কোরআন অবতরণের প্রকৃত স্থান হচ্ছে রসুলপাক স. এর ক্বলব বা হৃদয়। তাই বলা হয়েছে, 'আলা ক্বলবিকা' (তোমার হৃদয়ে)।

'বিইজনিল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র নির্দেশে) — একথার অর্থ, আল্লাহ্‌র নির্দেশে হজরত জিব্‌রাইল কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। এই কোরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের সমর্থক এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভসংবাদ। এমতো ঘোষণার উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদীদের সম্মুখে প্রকৃত সত্য স্পষ্ট করে দেয়া। একথা বলা যে, যে হজরত জিব্‌রাইলের শত্রু সে ন্যায়নিষ্ঠার হন্তারক। হজরত জিব্‌রাইলকে অস্বীকার করার অর্থ, সকল আসমানী কিতাবের প্রতি অস্বীকৃতি। কেনোনা সকল আসমানী কিতাব হজরত জিব্‌রাইলের মাধ্যমেই অবতারিত হয়েছে। আর শেষ অবতারিত কিতাব আল কোরআন পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সমর্থক।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আয়াতের অন্তর্নিহিত বক্তব্য এই যে, হজরত জিব্‌রাইলকে যখন তারা শত্রু মনে করে, তখন তাদের উচিত, ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে মৃত্যুবরণ করা। এরকমও বক্তব্য হতে পারে যে, যেনো আল্লাহ্ জানিয়ে দিচ্ছেন, যে জিব্‌রাইলের শত্রু, সে আমারও শত্রু। কিংবা আমি তার শত্রু। ৯৮ নং আয়াতের শেষভাগে একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ নিশ্চয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শত্রু।

হজরত জিব্‌রাইল ও হজরত মিকাইল যদিও ফেরেশতা, তবুও তাঁদেরকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ফেরেশতামন্ডলীর মধ্যে তাঁদের বিশেষ সম্মান যেনো সুচিহ্নিত হয়। তাছাড়া ইহুদীদের আলোচনা ছিলো এ দু'জনকে ঘিরেই। একথাটিও এখানে পরিস্কার করে দেয়া হয়েছে যে, যে তাঁদের একজনের শত্রু, সে তাঁদের উভয়েরই শত্রু এবং সে আল্লাহ্‌রও শত্রু। হাফ্‌স্, ইয়াকুব এবং আবু আমর মিকাইল শব্দটিকে পড়েছেন, মিকাল (হামজা এবং ইয়া ব্যাতিরেকে)। নাফে পড়েছেন, হামজা সহ এবং ইয়া বিহীন অবস্থায়। অন্য ক্বারীগণ পড়েছেন, মিকাঈল (হামজা ও ইয়া সহযোগে)।

'ফাইন্নাল্লাহা আদুউল্লিল কাফিরিন' (আল্লাহ্ নিশ্চয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শত্রু) — একথায় বুঝা যায়, আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের শত্রুতার মূল কারণ হচ্ছে কুফরী (সত্যপ্রত্যাখ্যান)। আর একথাটিও বুঝতে বাকি থাকেনা যে, ফেরেশতামন্ডলী এবং রসুলগণের সঙ্গে শত্রুতা রাখাও কুফরী।

www.eelm.weebly.com

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে সাঈদ এবং ইকরামার মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন– ইবনে সুরিয়া ইহুদী রসুল পাক স. কে জিজ্ঞেস করলো, আপনি নবুয়তের নিদর্শন স্বরূপ এমন কিছু করছেন না কেনো, যাতে আমরা আপনার সঠিক পরিচয় পাই? একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো– এবং আমি নিশ্চয় তোমার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি। সত্যত্যাগীগণ (ফাসিক্বিন) ব্যতীত অন্য কেউই তা প্রত্যাখ্যান করেনা–যারা অবাধ্য এবং কুফরীতে অগ্রগামী, তাদেরকে বলা হয় ফাসেক। ইহুদীদেরকেই এই অপবিশেষণে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে।

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন– রসুলুল্লাহ্ স. মালিক বিন হানিফ ইহুদীকে একবার বললেন, দ্বীনে মোহাম্মদী সম্পর্কে তোমাদের নিকট এই অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে যে, যখন ওই দ্বীন প্রকাশ পাবে, তখনই তোমরা তার অনুসরণকে স্বাগত জানাবে। একথা শুনে মালিক ইহুদী শপথ করে বললো, কখনোই এমন অঙ্গীকার নেয়া হয়নি। তার অসত্য ভাষণের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হলো–

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১০০,১০১

أَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

❒ তবে কি যখনই তাহারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছে তখনই তাহাদের কোন একদল তাহা ভঙ্গ করিয়াছে? বরং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

❒ যখন আল্লাহের নিকট হইতে কোনো রসুল আসে যে তাহাদের নিকট যাহা রহিয়াছে তাহার সমর্থক তখন যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের একদল কিতাবটিকে অগ্রাহ্য করে; যেনো তাহারা জানে না।

'আও আকুল্লামা' শব্দের প্রশ্নবোধক হামজাটি অস্বীকৃতিসূচক। আর 'আও' (এবং) একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে সংযোজিত। সেই উহ্য বাক্যটি এরকম- তারা কি নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে? এবং যখনই তারা অঙ্গীকার করে---।

www.eelm.weebly.com

আয়াতে উল্লেখিত 'তারা' অর্থ ইহুদীরা এবং অঙ্গীকার অর্থ সেই অঙ্গীকার যাতে বলা হয়েছিলো, শেষনবী যখন আবির্ভূত হবেন তখন আমরা তাঁর প্রতি ইমান আনবো। 'আও আকুল্লামা আহাদু' এই বাক্যাংশটিকে ক্বারী আবু রেজা আতারেদী পড়েছেন, 'আও আকুল্লামা উহিদু' (যখন অঙ্গীকার নেয়া হলো)। এই অঙ্গীকারের বিষয়টি অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এরকম 'ওয়া ইজ্ আখাজাল্লাহু মিসাকুন্নাবিয়্যিনা লামা আতাইতুকুম মিন কিতাবিন আও হিকমাতিন ছুম্মা জায়াকুম্ রসুলুম মুসাদ্দিকুল্লিমা মায়াকুম লা তু'মিনুন্না বিহি লা তানসুরুন্নাহু।' মূল অঙ্গীকার ছিলো তাদের নবীদের সঙ্গে। সঙ্গত কারণেই নবীর উম্মতেরাও এই অঙ্গীকারের অঙ্গীভূত।

হজরত আতা বলেছেন, এখানে অঙ্গীকার বলতে ওই অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে, যা রসুলেপাক স. এবং মদীনার ইহুদীদের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিলো। ইহুদীরা এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলো যে, যুদ্ধকালে তারা মুশরিকদেরকে সাহায্য করবে না। বনী কুরাইজা এবং বনী নাজির তাদের কৃত এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিলো। অন্য এক আয়াতে এ সম্পর্কিত বিবরণ রয়েছে এরকম– 'তাদের মধ্য থেকে যারা আপনার সাথে অঙ্গীকার করেছে, অতঃপর কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।' আরেক আয়াতে রয়েছে, তাদের একদল (অঙ্গীকার থেকে) পৃথক হয়ে গিয়েছিলো (ফারিকুমমিনহুম)।

তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না– একথার অর্থ, কোনো একটি বিশেষ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা তাদের নিকট মামুলী ব্যাপার। তাদের অধিকাংশই তো আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত কিতাব তওরাতের প্রতি অবিশ্বাসী। সুতরাং যার বিশ্বাসই নেই, সে অঙ্গীকার ভঙ্গের পাপের ভয়াবহতা অনুধাবন করবে কিভাবে?

যখন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোনো রসুল আসেন– এখানে রসুল বলতে বুঝানো হয়েছে হজরত ঈসা আ. এবং হজরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স. কে। এঁদেরকে এবং এঁদের উপর অবতীর্ণ কিতাবকে অগ্রাহ্য করেছে ইহুদীরা। আর এঁদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে অগ্রাহ্য করার অর্থ তওরাতকেও অগ্রাহ্য করা। তওরাতের নির্দেশ যদি তারা মান্য করতো, তবে সকল নবী এবং সকল কিতাবকে মান্য করতো।

'যেনো তারা জানে না'– একথার অর্থ তাদের ভ্রুক্ষেপহীনতায় এ কথাটিই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আল্লাহ্‌র কিতাবকে তারা কিতাব বলেই গণ্য করে না। তাদের সীমালঙ্ঘনকে নির্দেশ করতেই এখানে উল্লেখিত হয়েছে, যেনো তারা জানেই না।

www.eelm.weebly.com

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ
الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ
بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ
فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۗ
وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ
لَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

☐ এবং সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানগণ যাহা আবৃত্তি করিত তাহারা তাহা অনুসরণ করিত। সুলাইমান সত্য প্রত্যাখ্যান করে নাই, কিন্তু শয়তানগণই সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তাহারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত— যাহা বাবেল শহরে হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। 'আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, সুতরাং তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করিওনা'- ইহা না বলিয়া তাহারা কাহাকেও শিক্ষা দিত না। তাহারা তাহাদের নিকট হইতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যাহা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাহা শিক্ষা করিত, অথচ আল্লাহের নির্দেশ ব্যতীত তাহারা কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিত না। তাহারা যাহা শিক্ষা করিত তাহা তাহাদের ক্ষতি সাধন করিত এবং কোন উপকারে আসিত না; আর তাহারা নিশ্চিতভাবে জানিত যে, যে কেহ উহা ক্রয় করে পরকালে তাহার কোন অংশ নাই। উহা কত নিকৃষ্ট যাহার বিনিময়ে তাহারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে, যদি তাহারা জানিত!

'ওয়াত্তাবায়ু' অর্থ, এবং তারা অনুসরণ করলো। অর্থাৎ তারা যাদুবিদ্যার চর্চা শুরু করলো। একে অপরকে যাদু শিক্ষা দিতে লাগলো। 'ওয়াত্তাবায়ু' বাক্যটি পূর্ববর্তী আয়াতের 'নাবাজা' (পশ্চাতে নিক্ষেপ করে বা অগ্রাহ্য করে) কথাটির সঙ্গে সম্বন্ধিত। এভাবে আয়াতের অর্থ হবে— তারা আল্লাহ্র কিতাবকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে (অগ্রাহ্য করে) যাদুর অনুশীলন শুরু করলো। আমি বলি, ব্যাপারটি

www.eelm.weebly.com

এরকম নয়। কেনোনা 'নাবাজা' (অগ্রাহ্য করা) শব্দটি রসুলের আগমনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এভাবে 'ওয়াত্তাবায়ু' এর অর্থ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বরং পূর্ববর্তী আয়াতের 'ওয়া লাম্মা জায়াহুম' (আর যখন তাদের নিকট আসলেন তিনি) এর সঙ্গে 'ওয়াত্তাবায়ু' বাক্যটি সম্বন্ধিত হওয়াই সঙ্গত।

'মা তাত্‌লুশশায়াতিন' (শয়তানেরা যা আবৃত্তি করতো) – এখানে বাকভঙ্গিটি ব্যবহার করা হয়েছে বর্তমান কালের কিন্তু ঘটনাটি অতীত কালের। আরবী ভাষাভাষীদের নিকট এরকম বাকভঙ্গির ব্যবহার সুপ্রচলিত। এখানে আয়াতের বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে এই রীতিতেই। যদি বর্তমান কালের বাকভঙ্গিটি গ্রহণ করা হয় তবে অর্থ দাঁড়াবে এরকম– হজরত সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তান যে বিদ্যার অনুসরণ করতো ইহুদীরা সেই বিদ্যারই অনুসরণ করে (করছে)। 'আলা মুলকি সুলাইমান' (সুলায়মানের রাজত্বকালে) – একথার একটি অর্থ, তারা সেই বিদ্যারই অনুসরণ করতো যার সম্পর্কে শয়তানের ধারণা, হজরত সুলায়মানের রাজত্ব ওই বিদ্যার বলেই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এরকম অর্থ করলে পরবর্তী বাক্য (সুলায়মান সত্য প্রত্যাখ্যান করেনি) এর সঙ্গে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। 'আলা' অব্যয়টির অর্থ 'ফী' (মধ্যে) তে– এরকমও গ্রহণ করা যায়। এরকম অর্থ গ্রহণ করলে 'আলা মুলকি সুলাইমান' বাক্যের অর্থ হবে– হজরত সুলায়মানের রাজত্বে (রাজত্বকালে)। এই পদ্ধতিটি সরল, যা অনুবাদে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাগবী থেকে বর্ণিত হয়েছে– সুদ্দী বলেছেন, অতীতে শয়তানেরা আকাশমার্গে আরোহণ করতো। এবং ফেরেশতামন্ডলীর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কীয় আলোচনা শুনতো। সেসমস্ত আলোচনার সঙ্গে সত্যমিথ্যা মিশ্রিত করে তারা জ্যোতিষদেরকে জানাতো। জ্যোতিষেরা তা সাধারণ্যে প্রচার করতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেগুলোকে লিখে রাখতো। এভাবে বনী ইসরাইলদের মধ্যে এরকম অপবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যে, জ্বিনেরা অদৃশ্যের সংবাদ (গায়েব) জানে। হজরত সুলায়মান বিষয়টি অবগত হলে তাদের নিকট থেকে লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে একত্রিত করে একটি সিন্দুকে আবদ্ধ করেন এবং সেটি পুঁতে রাখেন তাঁর সিংহাসনের নিচে। এরপর হুকুম জারী করেন, জ্বিনেরা অদৃশ্যের সংবাদ জানে– একথা যেনো আর উচ্চারিত না হয়। যদি কেউ এরকম বলে তবে তার শরীর থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে।

হজরত সুলায়মান ইন্তেকাল করলেন। তাঁর সমসময়ের ইহুদী পন্ডিতেরাও মৃত্যুবরণ করলো। তাদের অনুসারীদের নিকট মানুষের আকারে শয়তান উপস্থিত হয়ে বললো, আমি তোমাদেরকে একটি গোপন ভান্ডারের সংবাদ বলে দিতে পারি, যা অধিকার করতে পারলে তোমরা সারা জীবন সুখে থাকবে। হজরত সুলায়মানের সিংহাসনের তলদেশ খনন করলে তোমরা ভান্ডারটি পেয়ে যাবে। লোকেরা সিংহাসনের নিচে খুঁড়তে শুরু করে দিলো। শয়তান দাঁড়িয়ে রইলো দূরে। সে সিংহাসনের নিকটবর্তী হতে পারতো না। নিকটবর্তী হওয়ার উদ্যোগ

www.eelm.weebly.com

নিলেই সিংহাসনের নিম্নদেশ থেকে চোখ ধাঁধাঁনো আলোকচ্ছটা বিকিরিত হতো যা সহ্য করার ক্ষমতা তার ছিলো না। খনন শেষে লোকেরা দেখতে পেলো সেই সিন্দুকটি। শয়তান বললো, ওই সিন্দুকে যা রয়েছে, তার দ্বারাই হজরত সুলায়মান জ্বিন পরী পশুপাখি সবকিছুকে বশীভূত রাখতেন– একথা বলেই অদৃশ্য হয়ে গেলো শয়তান। চতুর্দিকে একথা প্রচারিত হয়ে গেলো, হজরত সুলায়মান ছিলেন যাদুকর। ইহুদীরা যাদুর কাগজপত্রগুলো পেয়ে যাদুচর্চা শুরু করে দিলো। তাই পরবর্তী ইহুদীদের অধিকাংশই যাদুকর। শেষনবী মোহাম্মদ স. যখন আবির্ভূত হলেন, তখন আল্লাহ্পাক কোরআনপাকের মাধ্যমে হজরত সুলায়মানকে যাদুর অপবাদ থেকে নিষ্কলুষ ঘোষণা করলেন। বললেন, ওয়ামা কাফারা সুলাইমানু (সুলায়মান সত্য প্রত্যাখ্যান করেনি)।

আমি বলি, একথাটি স্পষ্ট যে, হজরত সুলায়মান যা পুঁতে রেখেছিলেন তা ছিলো যাদুর বই। শয়তান আকাশে ওঁৎ পেতে ফেরেশতাদের যে কথোপকথন শুনে এসে জ্যোতিষীদেরকে বলতো—সেগুলো যাদু ছিলো না। বহু বৎসর গত হওয়ার পর সেগুলোর কোনো কার্যকারিতাও অবশিষ্ট ছিলো না। কালাবী বলেছেন, শয়তান যাদু, তেলেসমাতির বইগুলো আসফ বিন বরখিয়ার ভাষায় লিপিবদ্ধ করে হজরত সুলায়মানের জায়নামাজের নিচে পুঁতে রেখেছিলো। হজরত সুলায়মান সে সম্পর্কে জানতেনই না। তাঁর ইন্তেকালের পর শয়তান বইগুলো বের করে মানুষকে বললো, দেখো! সুলায়মান এগুলোর মাধ্যমে তোমাদেরকে বশীভূত করে রাখতো। মানুষের মধ্যে যাঁরা ছিলেন বিজ্ঞ ও সৎকর্মশীল, তাঁরা বলে উঠলেন, তওবা-তওবা। হজরত সুলায়মান কিছুতেই এরকম ছিলেন না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শয়তানের প্রতারণায় মুগ্ধ হলো। তারা যাদুর বই গুলোকেই জ্ঞানবিদ্যার ভান্ডার বলে মনে করলো এবং তার ব্যাপক চর্চা শুরু করে দিলো। ছুঁড়ে ফেলে দিলো নবীরসুলগণের আনীত আসমানী কিতাব। তারা বিশ্বাস করতো, হজরত সুলায়মান ছিলেন প্রসিদ্ধ যাদুকর। তাদের অপবিশ্বাসের বিরুদ্ধেই এই আয়াতে বিঘোষিত হয়েছে, সুলায়মান সত্যপ্রত্যাখ্যান (কুফরী) করে নাই। সেহের বা যাদুকে এই আয়াতে কুফরী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে যাদু প্রকৃতপক্ষে কুফরী। আর হজরত সুলায়মান সহ সকল নবীগণই কুফরী থেকে পবিত্র। পরক্ষণেই বলা হয়েছে, কিন্তু শয়তানেরাই সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলো (ওয়ালাকিন্নাশ শায়াতিনা কাফারু)। ক্বারী ইবনে আমর, হামজা এবং কাসায়ী 'লা কিন্না' শব্দটি তাশদীদবিহীন অবস্থায় এবং 'শায়াতিন' শব্দের নুন বর্ণে পেশ সহযোগে পাঠ করেছেন। অন্য ক্বারীগণ লাকিন্না এর নুন তাশদীদযুক্ত অবস্থায় এবং শায়াতিন শব্দের নুন হরফে জবর দিয়ে পাঠ করেছেন।

যাদু (সেহের) এমন একটি চর্চিত বিদ্যা যা মানুষকে শয়তানের নিকটবর্তী করে। শয়তান যাদুকরদের বশীভূত হয় এবং তাদেরকে সাহায্য করে। যাদু মানুষের মনে ও শরীরে এমন প্রভাব বিস্তার করে যার ফলে মানুষ রোগাক্রান্ত হয়,

www.eelm.weebly.com

এমনকি মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। যাদুপ্রভাবিত ব্যক্তি চলে যায় জ্বিনের আওতায়। তার দৃষ্টি ও শ্রুতি হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত, বিকৃত, অসংলগ্ন। যেমন ফেরাউনের যাদুকরেরা ফেরাউন ও উপস্থিত সকল দর্শককে লাঠি ও রশিকেই সর্পরূপে দেখিয়েছিলো। যাদু হচ্ছে মানুষের উপর আল্লাহ্পাকের একটি পরীক্ষা।

বাগবী বলেছেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হচ্ছে, যাদুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। একথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, যাদুচর্চা কুফরী। তাই নিষিদ্ধ। শায়েখ আবুল মনসুর বলেছেন, এরকম বলা ঠিক নয় যে, যাদুই মূলতঃ কুফরী। আগে দেখতে হবে যাদুর ধরণ ধারণ কী। যদি তাতে শরিয়তবিগর্হিত বিষয় থেকে থাকে তবে তা নিঃসন্দেহে কুফরী; অন্যথায় নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যাদু একটি বিস্ময়কর ব্যাপার– যার প্রভাবে বাস্তব কল্পনায় এবং কল্পনা বাস্তবে রূপ নেয়। সুস্থ লোক হয়ে পড়ে অসুস্থ। হত্যাকান্ড পর্যন্ত সংঘটিত হয় যাদুর প্রভাবে এবং তখন কেসাসও (খুনের বদলে খুন) অবধারিত হয়ে পড়ে। ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্যে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, কিছু কিছু যাদু কুফরী এবং কিছু কিছু যাদু কুফরী নয়। মাদারেক গ্রন্থে রয়েছে, যে যাদু কুফরী তা শিক্ষা করাও কুফরী। যারা এরকম শিক্ষা করবে— হানাফী মাজহাবের মতানুসারে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। যাদুর অনুরাগী যারা তাদের উপর হত্যার বিধান বলবৎ করা যাবে না। বরং তার উপর প্রযোজ্য হবে মুরতাদ (ধর্মত্যাগীদের) বিধান। যে যাদু মূলতঃ কুফর নয় কিন্তু মানুষের জন্য ক্ষতিকর, সেই যাদুর চর্চায় নিয়োজিত নারী পুরুষের উপর প্রয়োগ করতে হবে রাহাজানির বিধান। যাদুকর তওবা করলে তার তওবা গৃহীত হবে- সে যাদু কুফরী অথবা অকুফরী যাই হোক না কেনো। যারা বিধান দিয়েছেন, যাদুকরের তওবা গৃহীত হবে না—তারা ভুল বলেছেন। কারণ, কোরআনে উল্লেখ রয়েছে, ফেরাউনের যাদুকরেরা তওবা করে হজরত মুসার একনিষ্ঠ অনুসারী হয়েছিলেন।

আমি বলি, আল্লাহ্পাক যাদুকে সম্পূর্ণতই কুফরী বলেছেন। এই আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। অন্য এক আয়াতে এসেছে, অবশ্যই তারা বুঝে নিয়েছিলো যে, যে ব্যক্তি যাদু ক্রয় করেছে তার জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নেই—সুতরাং একথাটি স্বতঃসিদ্ধ যে, যাদু যে প্রকারেরই হোকনা কেনো তা ইমানের শর্ত বিরোধী। কাজেই যাদু অবিশ্বাস বা কুফর। কুফর ছাড়া শয়তান সন্তুষ্ট হয় না। সন্তুষ্ট না হলে কারো বশীভূতও হয় না। আর শয়তানের প্রভাব ব্যতিরেকে যাদুও কার্যকর হয় না। তাই কিছু যাদু কুফরী, কিছু কুফরী নয় (ইমাম শাফেয়ী এবং আবুল মনসুর যেমন বলেছেন) — এরকম ধারণা সঠিক নয়। তাঁরা হয়তো মনে করেছেন, এরকম যাদু হওয়াও সম্ভব যার শব্দাবলী এবং কর্মকান্ড অবিশ্বাসবিমুক্ত।

জ্ঞাতব্যঃ তন্ত্রমন্ত্র বা ইসমে আজম দ্বারা যদি কেউ কোনো লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, কিংবা দৈহিক অথবা আর্থিক ক্ষতিসাধন করে, সে কাফের না হলেও অবশ্যই ফাসেক। তার উপর রাহাজানির (ছিনতাইকারীর) শাস্তি

www.eelm.weebly.com

কার্যকর করতে হবে। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান নর-নারীকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয় সে অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, যার হাত ও রসনা থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে, সেই প্রকৃত মুসলমান। বালাম ইবনে বাউর হজরত মুসা আ. এর বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছিলো। সে তার হাত ও জিহবাকে ক্ষতিকর কাজে নিয়োজিত করেছিলো। বর্ণিত হাদিসের প্রেক্ষিতে সে মুসলমান বলে গণ্য নয়। সুরা আরাফে তার সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

যাদুর দৃষ্টান্ত হিসেবে এর পর হারুত ও মারুত নামক ফেরেশতা দ্বয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গান্তর হয়তোবা যাদু বিষয়ক এই আলোচনারই ধারাবাহিকতা অথবা অন্য এক ধরনের অধিকতর শক্তিশালী যাদুর দৃষ্টান্ত। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, বাবেল শহরটি কুফায় অবস্থিত। কেউ কেউ বলেছেন, দেমাউন্দ পাহাড়কে বাবেল বলে। এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য আসমানী এলেমের মতো যাদুও আসমানী এলেম। যা আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ, আল্লাহ্পাক যেমন হেদায়েতকারী, তেমন গোমরাহ্কারীও। কেউ হয়তো এরকম প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, আল্লাহ্পাক যাদু নিষিদ্ধ করেছেন, তাহলে তিনি যাদু অবতীর্ণ করবেন কেনো? এর জবাব হচ্ছে, আল্লাহ্র অবতীর্ণ সকল বিষয় শরিয়তের বৈধতার আওতায় নয়। শরিয়তের বিধানই পালনীয়। আসল কথা হচ্ছে, আল্লাহ্পাক দুই ফেরেশতার মাধ্যমে যাদুবিষয়ক পরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন। তাদের একজন ছিলো হতভাগ্য আর অন্যজন ছিলো সৌভাগ্যবান। যে হতভাগ্য সে যাদু শিক্ষা করেছে এবং আল্লাহ্পাকের সঙ্গে কুফরী করেছে। আর যে সৌভাগ্যবান সে যাদু থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছে এবং ইমানের প্রতি অটল থেকেছে। আবার দুজনে একথাও প্রচার করেছে যে, যাদু নিষিদ্ধ এবং যাদু থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায়ও বলে দিয়েছে দু'জনই।

'অমা উনজিলা' বাক্যের মা শব্দটি না সূচক। একথার মাধ্যমে ইহুদীদের বাক্য,যাদুবিদ্যা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে— এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহ্পাক ফেরেশতাদের প্রতি যাদু অবতীর্ণ করেননি। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে 'মা উনজিলা' কথাটি 'মা কাফারা সুলাইমান' (সুলায়মান সত্যপ্রত্যাখ্যান করেনি) এর সঙ্গে সম্বন্ধিত হবে। আর 'বি বাবিলা' (বাবেল শহরে) কথাটি সম্বন্ধিত হবে 'ইউআল্লিমুনান্নাস' (তাহারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিতো) এর সঙ্গে।

বাবেল শহরের লোকেরা হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের কাছ থেকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করতো। ফেরেশতাদ্বয় তাদেরকে নিরুৎসাহিত করতো। বলতো তোমরা যাদু শিখো না, শিখলে কাফের হয়ে যাবে। কারণ যাদু কুফরী অথবা যাদুর পরিণতি কুফরী। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ফেরেশতাদ্বয়

www.eelm.weebly.com

যাদু শিক্ষার্থীদেরকে সদুপদেশ দিতো। আতা এবং সুদ্দী বলেছেন, যে সকল লোক তাঁদের সদুপদেশ মানতো না, ফেরেশতারা তাদেরকে বলতো, ঠিক আছে যাও। অমুক স্থানে বালুর উপরে প্রস্রাব করে দাও। নির্দেশমতো তারা সেখানে প্রস্রাব করতো, সাথে সাথে একটি উজ্জ্বল আভা সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে আকাশের দিকে উঠে অদৃশ্য হয়ে যেতো। এই আলোকচ্ছটাই ইমান ও মারেফাত। এ আলো আকাশে উঠে যাওয়ার পর একটি ধুম্রাচ্ছন্ন কৃষ্ণ বস্তু অবতরণ করতো সেখানে। তারপর ওই বস্তুটি সেই ব্যক্তির কর্নবিবরের মধ্য দিয়ে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতো। ওই কৃষ্ণ বস্তুটি ছিলো আল্লাহ্‌র গজব ও কুফরী। আমরা আল্লাহ্‌পাকের আশ্রয়প্রার্থী। আয়াতের আরেকটি ব্যাখ্যা এরকমও হতে পারে যে, ফেরেশতাদ্বয় ওই সব শিক্ষার্থীদেরকে বলতো আমরা তো পরীক্ষায় অবতীর্ণ। কাজেই তোমরা আমাদের মতো হয়ো না। যারা এ সদুপদেশ শুনতো না তাদেরকেই যাদু শিক্ষা দিতো ফেরেশতাদ্বয়। আমি বলি, পরের ব্যাখ্যাটি যুক্তিসম্মত নয়। কারণ শয়তান কখনও সদুপদেশ দেয় না।

লোকেরা হারুত ও মারুতের মাধ্যমে এমন যাদু শিক্ষা করতো যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হতো। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত কোনো কার্যই সংঘঠিত হয় না। একথাটিই স্বতঃসিদ্ধ। যাদু ক্রিয়ার ব্যাপারটাও তাই। সে কথাটিই এখানে এভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত তারা কারো কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারতো না। আল্লাহ্‌পাকই স্রষ্টা—ভালোমন্দ সকল বস্তুর এবং তাদের প্রতিক্রিয়ার। তাঁর অভিপ্রায় ও শক্তির আনুকূল্য না পেলে কোনো কারণ, নীতি কিংবা প্রচেষ্টা ফলবতী হয় না। কার্যকারণ নীতি হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধান। এই বিধান বাস্তবায়ন হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায় ও নির্দেশের প্রতি নির্ভরশীল।

তারা যা শিক্ষা করতো তা তাদের ক্ষতি সাধন করতো এবং কোনো উপকারে আসতো না- একথার মাধ্যমে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যে সকল বিদ্যা উপকারী নয় সে সকল বিদ্যা শিক্ষা করা মাকরুহ্। একারণেই রসুল পাক স. তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, হে আমার আল্লাহ! আমি উপকারশূণ্য জ্ঞান থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করি।

জ্ঞাতব্যঃ প্রকৃতি বিজ্ঞান, অংক শাস্ত্র অথবা দর্শন যে বিদ্যাই হোক না কেনো উপকারবিহীন হলে তা অর্জনীয় হতে পারে না। যে বিদ্যা ইসলামের ভিত্তিকে ধ্বংস করে ইসলামের বিশ্বাস ও বিধানের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়, সে সকল বিদ্যা হারাম। তবে ইসলামী চিন্তা ও ইসলামের বিধান প্রবিধানের সমর্থক, সহায়তাকারী হিসাবে যে সকল বিদ্যা রয়েছে সেগুলো শিক্ষা করা মোস্তাহাব। বরং কখনো কখনো ওয়াজিব। যে কোনো শিক্ষা হোকনা কেনো তার বৈধাবৈধতা নির্ভর করবে উদ্দেশ্য ও পরিণতির উপর। দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তিও দৃঢ়নিবদ্ধ নয়। দর্শনচর্চাকে যতো গভীরই মনে করা হোকনা কেনো শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা অন্ধকারে ঢিল

www.eelm.weebly.com

ছোঁড়ার মতোই অনুপকারী ও অনিশ্চিত এবং কখনো কখনো ক্ষতিকারক। তবে ইসলাম অস্বীকারকারীদেরকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে কেউ যদি অনৈসলামিক দর্শন শিক্ষা করে তবে তা মাকরূহ হবে না, বরং বিষয়টি তখন হবে প্রশংসনীয়। একারণেই ইসলামী দার্শনিকগণ, গ্রীক দর্শন ও প্রাচ্যদর্শন শিক্ষা করেছিলেন। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, শত্রুকে ধ্বংস করতে হলে তার চিন্তা, আচরণ ও গতিবিধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখা অপরিহার্য।

উপকারশূন্য জ্ঞান দুই প্রকার ১. প্রকৃতিতত্ত্ব বা এ ধরনের কোনো জ্ঞান নিছক কৌতুহল নিবারণ ছাড়া যার অন্য কোনো উপকার নেই। ২. ওই জ্ঞান যা আমল না করলে নিরর্থক বলে গণ্য হয়। আল্লাহ্পাক সর্বাধিক জ্ঞাত। তবে যাদুমন্ত্র, নাস্তিক্য দর্শন এ সকল বিদ্যা যে সম্পূর্ণতই নিষিদ্ধ সে সম্পর্কে কোনো দ্বিধা সন্দেহ নেই।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী এবং হজরত কাতাদা থেকে কালাবী হারুত ও মারুত ফেরেশ্তাদ্বয় সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন এরকম— পৃথিবীবাসীদের রাশি রাশি পাপ আকাশে উত্থিত হচ্ছিলো। ফেরেশ্তারা সেসব দেখে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হতো। বলতো, মানুষ কতো অবাধ্য! কী অবলীলায় তারা তাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অবাধ্যতা প্রদর্শন করে চলেছে। আল্লাহ্পাক তখন বললেন, তোমরা যদি মানুষরূপে পৃথিবীতে অবস্থান করতে তবে তোমরাও গড়ে তুলতে পাপের পাহাড়। ফেরেশ্তারা বললো, ইয়া এলাহী, তুমি মহান, তুমি পবিত্র। তোমার বিরুদ্ধাচরণ প্রদর্শন করতে আমরা অসমর্থ। আল্লাহ্ বললেন, তোমরা যাদেরকে সর্বাপেক্ষা উত্তম মনে করো, তাদেরকে নির্বাচন করো। ফেরেশ্তারা নির্বাচন করলেন হজরত হারুত, মারুত এবং আজরাঈলকে। আল্লাহ্পাক তাদের সত্ত্বাভ্যন্তরে জ্বালিয়ে দিলেন কামতাড়নার অগ্নি। তারপর নির্দেশ দিলেন, পৃথিবীতে বসবাস শুরু করো। মানুষের সমস্যাবলী সমাধানে দায়িত্বনিষ্ঠ হও। মনে রেখো অংশীবাদীতা, অবৈধ শোণিতপাত, ব্যভিচার এবং মদ্যপান তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। নির্দেশিত ফেরেশ্তাত্রয় নেমে এলেন পৃথিবীতে। যথাকর্তব্য সম্পাদনে মনোযোগী হলেন তাঁরা।

হজরত আজরাঈল একদিন অনুভব করলেন তাঁর দেহাভ্যন্তর দগ্ধীভূত হচ্ছে কামাগ্নির উত্তাপে। তিনি তৎক্ষণাৎ তওবা করলেন আল্লাহ্পাকের দরবারে। ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বললেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি দয়া করে আমাকে আকাশে উঠিয়ে নাও। আল্লাহ্পাক তার প্রার্থনা গ্রহণ করলেন। হজরত আজরাঈল কামদহনের প্রায়শ্চিত্য স্বরূপ দীর্ঘ চল্লিশটি বছর সেজদাবনত হয়ে রইলেন। এখন পর্যন্ত তিনি অনুতাপ জর্জরিত এবং নতশির।

হারুত ও মারুত সারাদিন মানুষের প্রশাসনিক কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। রাতে চলে যেতেন আকাশে। এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিলো। এক মাস যেতে না যেতেই বিপদগ্রস্থ হয়ে গেলো তারা। পড়ে গেলো আল্লাহ্ পাকের মহা পরীক্ষায়।

www.eelm.weebly.com

একদিন জোহরা নাম্নী এক রূপসী রমণী তাদের নিকট এসে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলো। পারস্য অধিবাসী জোহরার রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেলো হারুত ও মারুত। তার রূপাগ্নিতে আত্মাহুতি দানের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো তারা। কিন্তু জোহরা তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। বললো, তোমরা প্রতিমা পূজা, মদ্যপান এবং আমার স্বামীকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমাকে পাবে না। ফেরেশ্‌তাদ্বয় তখন উন্মত্ত। তারা মদ্যপান, বিগ্রহবন্দনা, হত্যা, সবই করলো। তারপর লিপ্ত হলো ব্যভিচারে। আল্লাহ্‌পাক ব্যভিচারিনী জোহরাকে উল্কাপিন্ডে রূপান্তরিত করে দিলেন। হারুত ও মারুত দিনান্তে আকাশের দিকে উড়াল দিতে চাইলো। কিন্তু পারলো না। স্বভয়ে দেখলো তারা উড্ডয়ন ক্ষমতারহিত। তখন পৃথিবীতে ছিলেন হজরত ইদ্রিস আ.। হারুত মারুত তাঁর সুপারিশ প্রার্থী হলো। আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশ ঘোষিত হলো—শাস্তি অবধারিত, তবে এতোটুকু তোমাদের নির্বাচন করার অধিকার রয়েছে যে, শাস্তি ভোগ করবে কোথায়? পৃথিবীতে না পরবর্তী পৃথিবীতে। হারুত মারুত পৃথিবীর শাস্তিকেই মেনে নিলো। কারণ, এ শাস্তি একদিন শেষ হবে। কিন্তু আখেরাতের শাস্তি অনিঃশেষ। হারুত মারুতের শাস্তি এখনো চলছে। বাবেল শহরের অগ্নি প্রজ্বলিত একটি কূপে তারা ঝুলন্ত অবস্থায় আগুনের আযাব ভোগ করে চলেছে।

হজরত আলী থেকে ইবনে রওয়াহা ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন— রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌পাক জোহরার প্রতি অভিশম্পাত অবতীর্ণ করেছিলেন। তাই সে ফেরেশ্‌তাদ্বয়কে পরীক্ষায় ফেলেছিলো। আল্লাহ্‌পাকই সমধিক জ্ঞাত।

আমি বলি, এ বিবরণটি খবরে ওয়াহেদ (একক বর্ণনা)। কোরআন পাকে এর সমর্থনসূচক ইঙ্গিত নেই। আর এসম্পর্কে যখন কিছু অসংলগ্ন বিবরণও রয়েছে তখন সুস্থ বিবেক সেগুলোকে সমর্থনযোগ্য বলে মনে করে না। যেমন রবিয়া বিন আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— আল্লাহ্‌পাক জোহরাকে নক্ষত্রে রূপান্তরিত করেছিলেন, সে ইসমে আজম শিক্ষা করতো এবং আকাশে উড়তে পারতো। ওদিকে আবার হারুত মারুত ইসমে আজম জানা সত্ত্বেও জোহরার শিক্ষক হয়েও নেমে এসেছিলো জোহরার সমান্তরালে। আবার এমনও বলা হয়েছে, জোহরা আকাশে উড়তে পারতো অথচ ফেরেশ্‌তাগণ হয়ে পড়লো উড্ডয়নক্ষমতারহিত ইত্যাদি।

মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী, তার 'সাবীলুল রাশাদ্' গ্রন্থে শেখ কামাল উদ্দীনের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেছেন, আলেমগন ঘটনাটিকে বিশুদ্ধ মনে করেন না। ওদিকে আবার তাঁরা হজরত আলী এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বর্ণনাকেও সঠিক মনে করেন। শেখ কামাল উদ্দীন আরও বলেছেন, এ বিষয়ের সকল বর্ণনাগুলোই স্বকপোলকল্পিত বলেই মনে হয়। রসুলপাক স. এর বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ কোনো হাদিসের সঙ্গেই এগুলোর সম্পর্ক নেই। বরং তিনি স. এরশাদ

www.eelm.weebly.com

করেছেন, এগুলো ইহুদীদের কল্পিত কাহিনী মাত্র। এগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে কেবল তাদেরই পুস্তকে। সালেহী বলেছেন, ঘটনাটি যখন ভিত্তিহীন, তখন আয়াতের ব্যাখ্যার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু হেরফের ঘটবে। আর তা ঘটেছেও। তাই আলেমগণ এর বিশদ ব্যাখ্যার সূত্রে বলেছেন, যখন মোজেজা, কারামত ও যাদুর মধ্যে পার্থক্যরেখা নির্ণয় করার ব্যাপারটি দুরূহ হয়ে পড়লো। তখন আল্লাহ্পাক মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করলেন—যেনো তারা মানুষকে প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত করায়; যার ফলে যাদু, কারামত ও মোজেজার পার্থক্য রেখা সকলের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। যারা যাদু, মোজেজা ও কারামতের পার্থক্য নির্ণয়ার্থে যাদুবিদ্যা সম্পর্কে অবহিত হতে চাইতো, তারাই হতো আল্লাহ্ পাকের পছন্দনীয়। আর যাদের উদ্দেশ্য ছিলো এর বিপরীত, তারা পতিত হয়েছিলো কুফরীতে। ফেরেশ্তাদ্বয় অপরিণামদর্শীতার বিষয়ে তাই প্রথমেই এভাবে সচেতন করে দিতেন যে, 'ইন্নামা নাহ্নু ফিত্নাতুন' (আমরা পরীক্ষা স্বরূপ)। সুতরাং তোমরা কুফরী (সত্যপ্রত্যাখ্যান) কোরো না। তারা আরও বলতেন, যাদুকর অমুক কর্ম করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিসম্বাদ সৃষ্টি হয়ে যায়। এরকম ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশ্তারা সর্বাবস্থায় আনুগত্যশীল। ফেরেশ্তাগণ যে নিষ্পাপ সে কথাও এভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। বায়যাবী বলেছেন, জোহরা সম্পর্কে কিংবদন্তীটি ইহুদী সম্প্রদায়ের একটি কল্পকাহিনী। এই ইসরাইলী বিবরণটি হয়তো সলফে সালেহীনের জামানায় অনুপ্রবেশ করে থাকবে।

আমি বলি, 'মালাকাইনি' (ফেরেশ্তাদ্বয়) এর প্রকৃত অর্থ রূহ্ এবং কল্‌ব সহ আধ্যাত্মিক জগতের অন্যান্য লতিফা সমূহ। এখানে সেগুলোর মধ্যে মাত্র দু'টির উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, সংখ্যা বর্ণনা এখানে উদ্দেশ্য নয়। অথবা এমনও বলা যেতে পারে যে, আধ্যাত্মিক পথের পথিকগণের (সালেকগণের) নিকট এ দু'টি লতিফাই অধিক অনুধাবণীয়। এ অধিক অনুধাবনীয় লতিফা দু'টিকেই আত্মিক জগতের প্রতীক হিসেবে এ পথের পথিকরা গ্রহণ করবে। এভাবে জোহরা নাম্নী রমণীকে চিহ্নিত করতে হবে নফস্ হিসেবে, যা ভূতচতুষ্টয়ের সমন্বয়ে সৃজিত। নারী যেভাবে ফেরেশ্তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, ঠিক তেমনি নফসে আম্মারাও অসৎ কর্মের প্রতি প্ররোচিত করে, পদস্খলন ঘটায়। আল্লাহ্পাক অনুপম প্রজ্ঞার দ্বারা আত্মিকজগতের লতিফা সমূহকে নফ্সের সাথে মিলিত করে দিয়েছেন। দিয়েছেন পরস্পরের প্রতি প্রেম ও আসক্তি। তাই নফ্সের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে জ্যোতির্ময় লতিফাগুলো তমসাবৃত হয়েছে। বিস্মৃতি প্রবল হয়েছে। ছিন্ন হয়েছে আল্লাহ্পাকের স্মরণের সূত্র। প্রজ্জ্বলিত হয়েছে কামনা, বাসনার লেলিহান শিখা। এই অগ্নিকুন্ডকেই মনে করতে হবে বাবেলের সেই অগ্নিকূপ। এরপর মৃত্যু। মৃত্যুর পর কিয়ামত। তখন যদি তার মধ্যে সামান্য ইমানের নূরও থাকে, তবে অন্ধকারের বন্দীদশা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। আর তার নফ্স যদি পৃথিবীতেই

www.eelm.weebly.com

পরিচ্ছন্নতা লাভ করে, তবে তা লতিফা সমূহের নূরে রঞ্জিত থাকবে। কৃচ্ছসাধন ও ইসমে আজমের বদৌলতে অন্তিম সময়ে সে এমনভাবে আকাশে উড়াল দেবে যেনো মনে হবে একটি আলোকোজ্জ্বল শুভ্র তারকা অনন্তে উধাও হয়ে গেলো। তখন তাকে লক্ষ্য করে এ সম্বোধনটি বিঘোষিত হবে, 'ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইন্না তুরজিই ইলা রব্বিকি রদ্বিয়াতাম্মারদিয়্যা ফাদ্বখুলি ফী ইবাদি ওয়াদ খুলি জান্নাতি' (হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি, পারস্পরিক প্রসন্নতার প্রেক্ষিতে তোমার প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হও এবং আমার বিশেষ বান্দাদের পর্যায়ভূত হয়ে বেহেশ্তে প্রবেশ করো)। নফসের প্রাথামিক পর্যায়টি ছিলো অপরিচ্ছন্ন। সেই প্রবৃত্তি আধ্যাত্মিকতার রঞ্জনস্পর্শে লাভ করে পবিত্রতার উত্থান। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, মূর্খতা বা কুফরীতে যে শ্রেষ্ঠ, ইসলাম গ্রহণের পরে সেই শ্রেষ্ঠ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

শেষে বলা হয়েছে, 'ইহুদীরা যদি জানতো! কতো নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে।' আগের বাক্যটিতে বলা হয়েছে, 'আর তারা নিশ্চিতভাবে জানতো যে, যে কেউ তা ক্রয় করে, পরকালে তার কোনো অংশ নেই।' পরক্ষণেই বলা হয়েছে, 'যদি তারা জানতো?' প্রশ্ন উঠতে পারে, এখানে এরকম পরস্পরবিরোধী বাক্য ব্যবহৃত হলো কেনো? এর জবাবে কেউ কেউ বলেছেন, তারা আমল করতো নিজ জ্ঞানানুসারে। ওই জ্ঞান ছিলো তাদের স্বভাবজ বুদ্ধি নির্ভর। আর যেটা তারা জানেনা সেটা হচ্ছে, আখেরাতের প্রকৃত বাস্তবতা। আমার জবাবটি এরকম— জ্ঞান দু'রকম— ১. অস্থিরতাতাড়িত জ্ঞান, অন্তরের বহিরাবরনের সঙ্গে যা সম্পর্কিত থাকে। এরকম জ্ঞান বাস্তবে বা বিশ্বাসে পরিণত হয় না। যেমন, ইহুদীরা রসুল পাক স. কে আপন সন্তানাপেক্ষা অধিক জানতো। অথচ ছিলো আনুগত্যবিমুখ। ব্যাপারটা যেনো পৃষ্ঠদেশে জ্ঞানভান্ডারবাহী গর্দভ। ২. যে জ্ঞানের অবস্থান অন্তরের অন্তস্থলে—এই জ্ঞান অন্তরকে তমসাবিমুক্ত করে, অন্তরকে ভরে তোলে আলোকিত প্রশান্তিতে। আল্লাহ্‌র কালামে এসম্পর্কে এরশাদ হয়েছে, 'তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।' আয়াতের শেষ বাক্যে এই জ্ঞানকে নির্দেশ করে বলা হচ্ছে 'যদি তারা জানতো!' মহানবী মোহাম্মদ স. বলেছেন, আলেম সম্প্রদায় নবীকূলের উত্তরাধিকারী। তাঁরা নভোবাসীদের সুহৃদ। জীবনাবসানের পর কিয়ামত পর্যন্ত জলধির মৎস্যকূলও তাঁদের জন্য প্রার্থনারত থাকে। বর্ণিত দুই প্রকার জ্ঞানের অধিকারীদেরকে রসুলপাক স. চিহ্নিত করেছেন এভাবে— সৎ আলেমগণ আল্লাহ্‌পাকের উত্তম বান্দা। আর অসৎ আলেমরা তাঁর নিকৃষ্ট দাস। হজরত হাসান বসরী বলেছেন, এলেম (জ্ঞান) দু'ধরণের। এক ধরণের জ্ঞান থাকে অন্তরে। এজ্ঞানই কল্যাণবাহী। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান হচ্ছে মৌখিক (জবানী) জ্ঞান। এজ্ঞান মানুষের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌পাকের দলিল। হাদিস দু'টি আহওয়াজ বিন হাকিম থেকে বর্ণনা করেছেন দারেমী।

www.eelm.weebly.com

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

❒ যদি তাহারা বিশ্বাস করিত ও সাবধান হইয়া চলিত তবে নিশ্চিতভাবে তাহাদের প্রতিফল আল্লাহের নিকট অধিক কল্যাণকর হইত, যদি তাহারা জানিত!

যদি তারা বিশ্বাস করতো ও সাবধান হয়ে চলতো— একথার অর্থ যদি তারা রসুলপাক স.এর প্রতি ইমান আনতো এবং অবাধ্যতা ও যাদু পরিত্যাগ করতো। এরকম করলে তারা লাভ করতো তাদের উত্তম কর্মের বিনিময় বা সওয়াব। আয়াতে উল্লেখিত 'মাসুবা' শব্দটির অর্থ প্রত্যাবর্তন। সৎকর্মপরায়ণেরা সৎকর্মের বিনিময়ের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। তাই ওই বিনিময়কে সওয়াব বলে আখ্যায়িত করা হয়।

তবে নিশ্চিতভাবে তাদের প্রতিফল আল্লাহ্র নিকট অধিক কল্যাণকর হতো— একথার অর্থ আত্মাকে বিক্রয় করে যে যাদু বা কুফ্রীকে তারা ক্রয় করেছে, তার চেয়ে বিশ্বাস এবং সাবধানতা (ইমান ও তাকওয়া) অধিক কল্যাণকর। আল্লাহ্পাকই কল্যাণদাতা। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'মিন ইনদিল্লাহ্' (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কল্যাণ)। কল্যাণের নিরঙ্কুশতা প্রকাশের জন্যই এখানে কল্যাণবিরোধী বস্তু বা যাদুর কথা উল্লেখ করা হয়নি। যাদুর বিপরীতার্থক রূপে নয়, ইমান ও তাকওয়ার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানোই এখানে উদ্দেশ্য।

শেষে বলা হয়েছে, 'লাও কানু ইয়া'লামুন' (যদি তারা জানতো)। একথার অর্থ, যদি তাদের এই জ্ঞান থাকতো যে, আল্লাহ্পাকের দেয়া পুণ্যফলই সর্বোৎকৃষ্ট, তবে তারা ইমান গ্রহণ করতো। সাবধানতা অবলম্বন করতো।

ইবনে মুনজির বলেছেন, রয়েনা অর্থ, মনোযোগ আকর্ষণ করা। সাহাবায়ে কেরাম এই শব্দটির মাধ্যমে রসুলপাক স. এর মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। 'রয়েনা' বলে তারা বুঝাতে চাইতেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্ আমাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনুন। অথবা আমাদের আবেদন দয়া করে গ্রহণ করুন। কিংবা আপনি আমাদের শিক্ষা ও সংশোধনের নিমিত্তে যা আজ্ঞা করেছেন, তা অধিকতর সহজবোধ্য করে দিন। বা বিষয়টি আমাদেরকে বুঝবার অবকাশ দিন।

আরবী অভিধানানুসারে 'রয়ি' শব্দের অর্থ, অন্যের কল্যাণ রক্ষণাবেক্ষণ করা। অপর পক্ষে ইহুদীদের ভাষায় রয়েনা একটি জঘন্য গালি। তাদের কাছে শব্দটির প্রকৃত অর্থ, 'ইসমা লিমা লা সামিয়তা'। অর্থাৎ শোনো—আল্লাহ্ করুন তুমি শুনতে না পাও (অর্থাৎ তোমার শ্রুতি অকার্যকর হোক)। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটি সম্ভবত 'রওয়ানাত' থেকে এসেছে। যার অর্থ, নির্বোধ। ইহুদীরা যখন শুনলো মুসলমানেরা রসুলপাক স. এর উদ্দেশ্যে শব্দটি ব্যবহার করেন, তখন তারা

www.eelm.weebly.com

একটি সুযোগ পেয়ে গেলো। তারাও তখন কদর্থে রসুলপাক স. এর প্রতি শব্দটি প্রয়োগ করতে শুরু করলো। এই নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতো (তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশম্পাত)। একবার হজরত সা'দ বিন মুআজ তাদের এই অসৎ উদ্দেশ্যের বিষয়টি জানতে পারলেন। তিনি তখন ইহুদীদেরকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দিলেন যে, আর যদি কখনো রসুলপাক স. এর উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে এই শব্দটি প্রয়োগ করতে শুনি, তবে তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দেবো। তারা বললো, তোমরা যে বলো! এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১০৪

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

❑ হে বিশ্বাসীগণ! 'রায়েনা' বলিও না, বরং 'উন্‌জুরনা' বলিও, ও শুনিয়া রাখ, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

আল্লাহ্‌পাক ইমানদারদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা এখন থেকে 'রয়েনা' বোলো না, বোলো 'উন্‌জুরনা'। উন্‌জুরনা অর্থ, আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, দয়া করে আমাদের নিবেদন শ্রবণ করুন অথবা একটু অপেক্ষা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষণিক অবকাশ দিন, যেনো আমরা আপনার বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। 'ওয়াসমায়ু' অর্থ শুনে রাখো। অর্থাৎ রসুলপাক স. এর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যে নির্দেশ জারী করা হয়, তা শ্রবণ করো ও অনুগত হও। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, তাঁর স. পবিত্র সংসর্গে উপবেশন করে এমনভাবে তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করো যেনো দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার প্রয়োজন অবশিষ্ট না থাকে।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়ালিল কাফিরিনা আজাবুন আলীম' (সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি) এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বলে বিশেষভাবে ওই সকল ইহুদীকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যারা রসুলপাক স. কে অপসম্বোধন করতো।

ইহুদীদের একদল ছিলো মুসলমানদের মিত্র। তারা মুসলমানদেরকে বলতো, তোমরা মহানবী স. এর প্রতি আস্থাশীল হও। তোমাদের মঙ্গল হবে। প্রত্যুত্তরে মুসলমানেরা বলতো, তবে তোমরা অনাস্থা স্থাপন করে বসে আছো কেনো?

www.eelm.weebly.com

ইহুদীরা বলতো, তোমাদের ধর্ম যদি আমাদের ধর্মের চেয়ে উৎকৃষ্টতর হতো, তবে অবশ্যই আমরা তা মেনে নিতাম। তাদের ভুল ধারণার অপনোদনার্থে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১০৫

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

❐ কিতাবীদের মধ্যে যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা এবং অংশীবাদিগণ ইহা চাহে না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হউক। অথচ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুকম্পার জন্য বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

নন্দিত অভিলাষ প্রকাশার্থে আরবীতে 'ওয়াদ্‌দু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এই শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে আয়াতে বলা হয়েছে যে, আহলে কিতাবদের মধ্যে অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী তারা এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোনো কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। এখানে খইর (কল্যাণ) শব্দের মর্ম হবে ওহী (প্রত্যাদেশ)। এভাবে আয়াতের প্রকৃত অর্থ হবে, হে বিশ্বাসীরা! কাফের ও মুশরিকেরা তোমাদের প্রতি হিংসা পোষণ করে। আর তারা এটাও চায়না যে তোমাদের প্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হোক।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক যাকে ইচ্ছা আপন অনুকম্পার জন্যে বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল। এখানে রহমত (অনুকম্পা) শব্দটির মর্ম হবে নবুয়ত। এই নবুয়ত আল্লাহ্পাক যাকে ইচ্ছা তাঁকেই দান করে থাকেন। এই বিশেষ দানকে এখানে 'ফজল' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ওই অনুগ্রহ বা দানের নাম 'ফজল' যা বিনা কারণে প্রদান করা হয়।

অংশীবাদীরা বলতো, মোহাম্মদ স. তাঁর সাথীদেরকে একেক বার একেক রকম নির্দেশ দেন। একবার আদেশ দেন, পরমুহূর্তে জারী করেন নিষেধাজ্ঞা। এতে প্রমাণিত হয় প্রত্যাদিষ্ট কোনো কিছু নয় বরং তিনি নিজের মনগড়া কথাই বলে থাকেন। মুশরিকদের এই অপবিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলো—

www.eelm.weebly.com

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ۗ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

❑ আমি কোন আয়াত রহিত করিলে কিংবা বিস্মৃত হইতে দিলে তাহা হইতে উত্তম কিংবা তাহার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান?

❑ তুমি কি জান না, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহেরই? এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নাই এবং সাহায্যকারীও নাই।

'নাস্‌খুন' শব্দের অর্থ দু'রকমের—একটি অর্থ হচ্ছে অনুলিপি করা বা নকল করা। যেমন, 'নাস্‌খুল কিতাব' অর্থ পুস্তকের অনুলিপি। নাস্‌খুন এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে মুছে ফেলা, অপসারণ করা বা রহিত করা। যেমন বলা হয় 'নাসাখাত শাম্‌সুজ্‌জিল্লা' (সূর্যকিরণ ছায়াকে অপসারণ করেছে)। এই আয়াতে নাস্‌খুন শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করতে হবে। আভিধানিক ব্যাখ্যা এরকমই। কিন্তু আল্লাহ্‌পাকের কালামে নাস্‌খুন (রহিতকরণ) সাধিত হয় কয়েকটি পদ্ধতিতে— ১. কোনো আয়াতের তেলাওয়াত রহিত অথচ বিধান বলবৎ আছে, যেমন ব্যভিচারের শাস্তির বিধান জারি আছে অথচ সে আয়াতের পাঠ রহিত হয়েছে। ২. বিধান রহিত হয়েছে অথচ তেলাওয়াত চালু আছে। যেমন আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অসিয়ত করার আয়াত এবং সেই আয়াত যেখানে নারীদের ইদ্দত পালনের সময়সীমা এক বছর বলা হয়েছে। ৩. যে আয়াতের তেলাওয়াত ও বিধান দুটিকেই মুছে ফেলা হয়েছে, যেমন বলা হয়েছে সুরা আহ্‌যাব সুরা বাকারার মতোই দীর্ঘ ছিল। কিন্তু পরে তার অধিকাংশ আয়াতের পাঠ ও বিধান উচ্ছেদ করা হয়েছে।

একথাও জেনে রাখা প্রয়োজন যে, যে সকল আয়াতের বিধান রহিত হয়েছে তা দু'ধরণের। ১.উচ্ছেদকৃত বিধানের স্থলে অন্য বিধান কার্যকর করা—যেমন মিরাসের বিধানের দ্বারা অসিয়তের বিধান অবলোপন করা হয়েছে। অন্য স্থানে স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত পালনের এক বছর সময়সীমা মুছে ফেলে তদস্থলে চার মাসের মেয়াদ কার্যকর করা হয়েছে। ২. পূর্ববর্তী বিধান রহিত হওয়ার পর নতুন কোনো বিধান জারী না হওয়া। যেমন ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে মেয়েদেরকে পরীক্ষা করে মুসলমান করা হতো। পরে এই বিধান রহিত করা হয়। রহিতকরণ

www.eelm.weebly.com

প্রধানত আদেশ বা নিষেধ সূচক বিধানের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। বিজ্ঞপ্তিমূলক কোনোকিছুর ক্ষেত্রে রহিত করনের বিধান প্রযোজ্য নয়।

অধিকাংশ আলেম 'নান্‌সাখ' শব্দের 'নুন' এবং 'সিন' অক্ষরে জবর দিয়ে পাঠ করেছেন। ইহার অর্থ— উচ্ছেদ করা বা রহিত করণ। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— আমি কোনো আয়াত উচ্ছেদ করি। ক্বারী ইবনে আমর শব্দটির 'নুন' অক্ষরে পেশ এবং 'সিন' অক্ষরে জের সহযোগে পাঠ করেছেন। তার পাঠানুযায়ী আয়াতের অর্থ দাড়াবে এরকম—আমি আপনাকে (রসুল মোহাম্মদ স. কে অথবা হজরত জিব্‌রাইলকে) কোনো আয়াত মনসুখ (রহিত) করার নির্দেশ দান করেছি।

'আও নুনসিহা' অর্থ মিশ্রিত হতে দিলে। আল্লামা ইবনে কাসীর এবং আবু আমর শব্দটির প্রথম 'নুন' অক্ষরে ও 'সিন' এ জবর সহযোগে পাঠ করেছেন। তাঁদের পাঠভঙ্গী অনুযায়ী আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে—কোনো আয়াতের বিধান আমি নেপথ্যে স্থিত করি, কিন্তু তার আবৃত্তি অবশিষ্ট রাখি। এভাবে 'নাসেখ' শব্দটির অর্থ হবে উঠিয়ে নেয়া অথবা আমি সেই আয়াত লওহে মাহ্‌ফুজের আড়ালে রেখে দিই (পরিত্যাগ করি) অর্থাৎ আপনার প্রতি অবতীর্ণই করি না। এমতাবস্থায় 'নান্‌সাখ' অর্থ হবে অবতীর্ণ করার পর রহিত করা বা উঠিয়ে নেয়া এবং 'নুনসিহা' শব্দটির অর্থ হবে অবতীর্ণই না করা। অন্য ক্বারীগণ 'নুনসিহা' শব্দটির প্রথম নুন অক্ষরে পেশ এবং সিন অক্ষরে যের সহযোগে পাঠ করেছেন। এই উচ্চারণভঙ্গী অনুযায়ী শব্দটির অর্থ হবে অপসৃতি বা বিস্মৃতি। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে আমি কোনো আয়াতকে আপনার মন থেকে মুছে দিই।

হজরত আবু উমামা বিন সহল বিন হানিফ থেকে বর্ণিত হয়েছে, কতিপয় সাহাবী একরাতে নামাজ পাঠ করছিলেন। তাঁরা একটা সুরা তেলাওয়াত করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলেন না। প্রভাতে তাঁরা রসুল পাক স. এর খেদমতে হাজির হয়ে ঘটনাটি জানালেন। তিনি স. এরশাদ করলেন, ওই আয়াতগুলোর আবৃত্তি এবং বিধান উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

'তাহা হইতে উত্তম কিংবা তাহার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি'— একথার অর্থ আমি যখন কোনো আয়াতের বিধান রহিত বা বিলোপ করি, অথচ তার চেয়ে সহজসাধ্য কল্যাণকর কিংবা অধিক পূর্ণতামন্ডিত আয়াত অবতীর্ণ করি। আবার কখনও রহিত আয়াতের অনুরূপ অন্য আয়াত প্রতিষ্ঠিত করি।

তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান— এই প্রশ্নটির অর্থ— হে নবী! আপনিতো অবশ্যই জানেন যে, আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। সম্বোধিত ব্যক্তির জ্ঞানকে অধিকতর স্পষ্ট করে তোলাই এরকম প্রশ্নরীতির উদ্দেশ্য।

এই আয়াত থেকে কোনো কোনো আলেম কতিপয় সূত্র আবিষ্কার করেছেন। সেগুলো হচ্ছে ১. স্থলাভিষিক্তকরণ ব্যতিরেকে মনসুখ (রহিত) হয় না। ২. রহিত বিধান অপেক্ষা অধিকতর কঠোর বিধান পুনঃ স্থাপিত হয় না। ৩. হাদিস দ্বারা

www.eelm.weebly.com

কোরআন রহিত হওয়া সিদ্ধ নয়। তাদের উদ্ভাবনের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, বিধান বলবৎ না হওয়াই সর্বাপেক্ষা উত্তম। আর কঠোর বিধান অধিক পূণ্য লাভের সুযোগ দান করে এবং হাদিসতো আল্লাহ্‌পাকেরই শিক্ষা, যা তিনি তাঁর প্রিয় নবীকে বলতে অনুমতি দিয়েছেন (সুতরাং হাদিস দ্বারা কোরআনের আয়াত মনসুখ হতে পারবে না কেনো?)

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র। —এই ঘোষণার মাধ্যমে বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এভাবে—আল্লাহ্‌ যেহেতু সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আকাশপৃথিবীর সার্বভৌমত্বের একক অধিকারী—সেহেতু রহিতকরণ, পরিবর্তন অথবা বিস্মৃতি সাধনের উপরে রয়েছে তাঁর নিরঙ্কুশ অধিকার। অবিশ্বাসীরা যেনো একথাও জেনে রাখে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া অভিভাবক ও সাহায্যকারী কেউ নেই। সুতরাং অবিশ্বাসের শাস্তি অবধারিত। 'ওলী' অর্থ অভিভাবক এবং 'নাসির' অর্থ সাহায্যকারী। কাফেররা আল্লাহ্‌র অবাধ্য—তাই তাদের দুর্বল বা সবল কোনো বন্ধুই নেই এবং পরিচিত অথবা অপরিচিত কোনো সাহায্যকারীও নেই।

ইবনে আবী হাতেম, সাঈদ এবং ইকরামার ধারাক্রমানুসারে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাফে বিন হেরিকেলা এবং ওয়াহাব বিন জাহেদ ইহুদী— রসুল করীম স. এর সমীপবর্তী হয়ে বললো, আপনি যদি প্রকৃত রসুল হয়ে থাকেন তবে আসমান থেকে কিতাব আনুন—আমরা তা পাঠ করবো অথবা মাটিতে ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিন। যদি আপনি এমন করেন তবে আমরা আপনার অনুসারী হবো। তাদের কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১০৮

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ○

❑ তোমরা কি তোমাদের রসুলকে সেইরূপ প্রশ্ন করিতে চাও যেইরূপ পূর্বে মুসাকে করা হইয়াছিল? এবং যে কেহ বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাসকে গ্রহণ করে নিশ্চিতভাবে সে সরল পথ হারায়।

এই আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে বাগবী বলেছেন, ইহুদীরা রসুল পাক স. কে বললো, হজরত মুসার প্রতি যেভাবে সম্পূর্ণ তওরাত একবারে অবতীর্ণ হয়েছিলো—আপনিও সেভাবে সম্পূর্ণ কোরআন একসঙ্গে আনুন। তাদের এই

www.eelm.weebly.com

গর্হিত উক্তির প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়েছে। কোনো কোনো ভাষ্যকার এর শানে নুজুল সম্পর্কে বলেছেন, অংশীবাদিরা বললো আমরা তো আপনার প্রতি প্রত্যয়শীল হবোই না, যতোক্ষণ না আপনি আকাশে আরোহন করবেন আর আপনার আকাশারোহনও আমাদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হবে না যদি না আপনি সেখান থেকে একটি কিতাব আমাদের জন্য নিয়ে আসেন। সেই কিতাব আমরা অধ্যয়ন করবো। মুশরিকদের এই উক্তির প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে। মুজাহিদ থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, কোরাইশরা একবার রসুল পাক স. এর নিকট বললো, আপনি সাফা পাহাড়টি স্বর্ণে রূপান্তিত করে যদি দেন, তবে আমরা ইমান আনবো। রসুল পাক স. এরশাদ করলেন, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে একাজ তো অবশ্যই সম্ভব কিন্তু মনে রেখো এর পরেও যদি তোমরা ইমান গ্রহণে অস্বীকৃত হও, তবে তোমাদের অবস্থা হবে বনীইসরাইলদের আসমানী খাদ্য অবমাননা করার মতো। (আকাশ থেকে খাদ্যরূপী 'মান্না' 'সালওয়া' অবতীর্ণ হতো তাদের প্রতি, সে খাদ্যকে অবজ্ঞা করে শুকরে পরিণত হয়েছিলো তারা)। মুশরিকদের এই ঘটনাটি এই আয়াত নাজিলের কারণ। সুদ্দী বলেছেন, অবিশ্বাসীরা রসুল স. কে বলেছিলো, আপনি আল্লাহ্ পাককে ডেকে আনুন আমরা তাকে নিজ চোখে দেখে ইমান গ্রহণ করবো। অবিশ্বাসীদের একথার প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। বাগবী আরও বলেছেন, অবিশ্বাসীরা রসুল পাক স. কে বলেছিলো, আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করান, না হলে আমরা ইমান আনবো না। আবুল আলীয়া থেকে সুদ্দী আরও বর্ণনা করেছেন——এক ব্যক্তি রসুলপাক স. কে উদ্দেশ্য করে বললো, বনী ইস্রাইলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত যেরকম নির্ধারিত রয়েছে, আমাদের পাপের বেলায় সেরকম নির্ধারণ থাকলে ভালো হতো। রসুল পাক স. বললেন, আল্লাহ্পাক তোমাদের জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন সেটাই উত্তম। বনী ইসরাইলদের বিধান ছিলো—— কেউ পাপে লিপ্ত হলে, সে কথা তার ঘরের দরোজায় লিপিবদ্ধ হয়ে যেতো। তখন ওই ব্যক্তিকে তার পাপের কাফ্ফারা দিতে হতো। এভাবে সে আখেরাতের শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যেতো। কিন্তু তার জাগতিক লাঞ্ছনা কখনোই ঘুচতো না। আর কাফ্ফারা না দিলে আখেরাতের শাস্তি হতো আরও বেশী কঠোর। আল্লাহ্পাক তাদের চেয়ে তোমাদেরকে অধিক করুণাভাজন করেছেন। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন, 'কেউ যদি গোনাহ্ করে অথবা তার নফ্সের প্রতি জুলুম করে——অতঃপর আল্লাহ্পাকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তবে তারা আল্লাহ্পাককে পাবে ক্ষমাপরবশ ও দয়ালু রূপে।' পাঁচ ওয়াক্ত

www.eelm.weebly.com

নামাজের ও দুই জুম্মার মধ্যবর্তী সময় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে গণ্য। -এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতের অন্তর্নিহিত উপদেশ হচ্ছে এই— অনর্থক প্রশ্নপ্রবণতা থেকে সংযত হও।

পূর্ববর্তী আয়াতে রসুলপাক স.কে সম্বোধন করা হয়েছিলো এভাবে— 'আলাম তা'আলাম' (তুমি কি জানো না?) এই আয়াতে সম্বোধন করা হচ্ছে সাধারণভাবে সকলকে। বলা যেতে পারে যে, রসুলপাক স. এর প্রতি সম্বোধনটির ব্যাপ্তিও সর্ব সাধারণকে একীভূত করেছে। তাঁর উম্মত—'উম্মতে এজাবত' (বিশ্বাসী উম্মত) এবং 'উম্মতে দাওয়াত' (যাদের প্রতি রয়েছে সত্য গ্রহণের আহবান) —উভয় উম্মতই এই ব্যাপকার্থক সম্বোধনের আওতাভুক্ত। পরবর্তি আয়াতেও এই ইঙ্গিত রয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিলো 'মিঁউ ওয়ালিঐও অলা নাসির'— সেখানেও একবচন ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ সম্বোধিত হয়েছেন রসুলপাক স.। কারণ তিনি সর্বাধিক জ্ঞানী, সকল জ্ঞানের আধার। তাই তাঁকে লক্ষ্য করে সকল মানুষের প্রতি বিবৃত হয়েছে আল্লাহ্‌র অমোঘ ঘোষণা। এভাবে আয়াতের ধারাবাহিকতার সঙ্গত অর্থ হবে এরকম—হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা কি জানো না যে, ভূমন্ডল ও নভোঃমন্ডলের এক চ্ছত্র আধিপত্য আল্লাহ্‌র। তিনি সকলকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। তিনি যেমন অভিপ্রায় করেন, তেমনিই নির্দেশ দান করেন। এসব জেনে শুনেও তোমরা কি অবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকবে? ওই সমস্ত অভিশপ্তদের মতো আচরণ করবে—যারা তাদের নবী হজরত মুসাকে এমনও বলেছিলো, হে মুসা! তোমার আল্লাহ্‌কে আমাদের প্রত্যক্ষগোচর করাও।

শেষ বাক্যে জানানো হচ্ছে— বিশ্বাসের বদলে অবিশ্বাসকে যে স্বাগত জানায়, সে হারিয়ে ফেলে সরল পথ। সুতরাং ভীত হও। এই নসীহতটি গ্রহণ করো এবং এমন প্রশ্ন করতে উদ্যত হয়ো না, যাতে করে সরল পথ থেকে বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

বাগবী বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের অবসান হলো—মুসলমানেরা তখনও বহন করে চলেছেন পরাজয়ের তাজা গ্লানি। তখন কতিপয় ইহুদী হজরত হোজায়ফা এবং হজরত আম্মারকে ডেকে বললো, যদি তোমরা সত্য পথে থাকতে তবে কখনই পরাজয় হতো না। তোমাদের এখন উচিৎ আমাদের ধর্মমত গ্রহণ করা। কারণ আমাদের পথই সঠিক পথ। তাদের এই চরম হঠকারী উক্তির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا
مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى
يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهٖ ؕ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا
الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○ وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا أَوْ نَصٰرٰى ؕ
تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

❒ ঈর্ষামূলক মনোভাববশতঃ, তাহাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও, কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসের পর আবার তোমাদিগকে সত্যপ্রত্যাখানকারীরূপে ফিরিয়া পাওয়ার আকাঙ্খা করে। তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর যতক্ষন না আল্লাহ্ কোন নির্দেশ দেন— আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❒ তোমরা সালাত কায়েম কর ও জাকাত দাও। এই উত্তম কাজের যাহা কিছু পূর্বে প্রেরণ করিবে আল্লাহের নিকট তাহা পাইবে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার দ্রষ্টা।

❒ এবং তাহারা বলে, 'ইহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া অন্য কেহ কখনই জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।' ইহা তাহাদের মিথ্যা আশা। বল, —'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ পেশ কর।'

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হুয়াই এবং আবুল ইয়াসির ইহুদী তাদের গোত্রের বাইরে আরব সম্প্রদায়ের মধ্যে নবী আর্বিভূত হয়েছেন বলে আরববাসীদের প্রতি অত্যধিক ঈর্ষা পোষন করতো। তারা দিন-রাত্রি চেষ্টা করতো, কিভাবে এ নতুন ধর্মের অনুসারীদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। এ আয়াতে তাদের কথাই এভাবে বলা হয়েছে। কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসের পর আবার তোমাদেরকে

www.eelm.weebly.com

সত্যপ্রত্যাখানকারীরূপে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্খা করে। সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও ইহুদীদের এ হঠকারিতা অবাঞ্ছিত ও নিন্দনীয়। তারা তাদের কিতাবে রসুল পাক স. সম্পর্কিত স্পষ্ট বিবরণ পাঠ করেছে, সেই বিবরণের প্রতিভূরূপে তাঁকে নিয়ত প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছে—তবুও তাঁকে স্বীকার করছে না। এর কারণ তাদের অন্তরে রয়েছে অপবিত্রতা এবং ঈর্ষাগ্নির অনিঃশেষ দহন। আয়াতে তাদের সঙ্গে কী আচরণ করতে হবে তা আল্লাহ্তায়ালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বলেছেন, 'ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর যতক্ষন না আল্লাহ্ কোন নির্দেশ দেন।' আল্লাহ্পাকের সেই নির্দেশ ছিলো জেহাদ ও জিজিয়া সম্পর্কিত যা পরবর্তিতে বলবৎ করা হয়েছিলো। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, সেই নির্দেশ ছিলো বনী কুরাইজার নিধন ও বনী নাজিরের দেশত্যাগ সম্পর্কিত বিধান।

আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান—এখানে এ কথার অর্থ তাৎক্ষণিক শাস্তি আপতিত না হওয়ার কারণে কেউ যেনো মনে না করে, তাদের শাস্তি শিথিল করা হয়েছে অথবা তারা আযাব থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাচ্ছে। স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনি তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তভুত অবাধ্যদেরকে যে কোনো সময় আযাব দিতে সক্ষম।

এরপর এরশাদ হয়েছে, 'সালাত কায়েম কর ও জাকাত দাও'—এর অর্থ ইহুদীদের বিরোধিতাকে আমলে না এনে ইবাদত বন্দেগীতে মনোনিবেশ করো। নামাজ, জাকাত ও সৎকর্মই মূল বিষয়। এগুলো ক্রমাগত উপস্থিত করতে থাকো আল্লাহ্ পাকের পবিত্র দরবারে। এটা নিশ্চিত যে, তোমাদের সকল উপাসনা ও শুভকর্মের বিনিময় তাঁর নিকট রয়েছে। আর তোমরা যা করো সেগুলোসহ সকল কিছুরই তিনি দ্রষ্টা।

তারা বলে, ইহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া অন্য কেউ বেহেশ্তে যেতে পারবে না। আল্লাহ্পাক এখানে জানাচ্ছেন, মিথ্যা আশাবাদী তারা। তাদের দাবী সর্বৈব মিথ্যা। ইহুদীরা নিজেদেরকে বেহেশ্তী বলতো। খৃষ্টানরাও বলতো এরকম। নিজ ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকেই তারা সত্য বলে জানতো না। আয়াতে ওই দুই দলের দাবীকেই সম্পূর্ণ অসত্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এটা তাদের মিথ্যা আশা। তারপর বলা হয়েছে তোমরা যদি তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করো।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১১২

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

www.eelm.weebly.com

❐ হাঁ, যে-কেহ সৎকর্ম-পরায়ণ হইয়া আল্লাহের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে তাহার ফল প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না।

কাফেররা কস্মিনকালেও তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে পারবে না, তাই আল্লাহ্ এখানে সমর্পনের আহবান জানাচ্ছেন। বলছেন, ওহে ইহুদীরা! কল্পিত বিশ্বাস থেকে পশ্চাদাপসরণ করো। উত্তমরূপে অবগত হও যে, যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহ্র নিকট সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পণ করবে, সে লাভ করবে উত্তম বিনিময়—যা জমা রয়েছে তাঁর প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোনো ভয় নেই। তারা দুঃখিতও হবে না।

সৎকর্মশীলদেরকে আয়াতে বলা হয়েছে 'মুহসীনুন'—মুহসীন অর্থ ইহ্সানের অধিকারী। 'ইহ্সান' অর্থ এমনভাবে আল্লাহ্ পাকের ইবাদতে লিপ্ত হওয়া, যেনো তুমি তাঁকে দেখছো অন্যথায় তিনি তোমাকে দেখছেন। হাদিসে জিব্রাইলে ইহ্সান সম্পর্কে এরকম ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম, সাঈদ ও ইকরামা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদল যখন রসুল পাক স. এর দরবারে হাজির হলো, তখন ইহুদীরাও সদলবলে এসে পড়লো সেখানে। এরপর তারা তর্কবিতর্ক শুরু করে দিলো। রাফে বিন হারবিলা ইহুদী বললো, তোমরা খৃষ্টানেরা কোনো পথেই নেই। আর ঈসা এবং ইঞ্জিল অসত্য। নাজরানবাসীরা বললো, তোমরাই পথ-বিচ্যুত। মুসা এবং তওরাতও অসত্য। তাদের এই কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১১৩

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

❐ ইহুদীরা বলে 'খৃষ্টানদের কোন ভিত্তি নাই' এবং খৃষ্টানগণ বলে 'ইহুদীদের কোন ভিত্তি নাই; 'অথচ তাহারা কিতাব পাঠ করে। এইভাবে যাহারা কিছুই জানে না তাহারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তাহাদের মতভেদ আছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ উহার মীমাংসা করিবেন।

---

www.eelm.weebly.com

ইহুদীরা খৃষ্টানদেরকে বলে তোমরা ভিত্তিহীন। খৃষ্টানরাও ইহুদীদেরকে বলে তোমাদের কোনো ভিত্তি নেই। অথচ দু'দলই গ্রন্থধারী (আহলে কিতাব)। তারা তাদের আপনাপন গ্রন্থ পাঠ করে, তবু সত্যকে স্বীকার করে না। তওরাত যেমন হজরত ঈসা এবং ইঞ্জিল শরীফের সত্যায়নকারী, ইঞ্জিলও তেমনি হজরত মুসা ও তওরাতের প্রত্যয়নকারী। এতদসত্ত্বেও তারা কুটিল বাকবিতন্ডাকে আশ্রয় করে বসে আছে।

যারা কিছুই জানেনা, তারাও অনুরূপ কথা বলে—একথার দ্বারা আরববাসী মুশরিক, অন্যান্য পৌত্তলিক ও অগ্নি উপাসকদেরকে বুঝানো হয়েছে। অবিশ্বাসীদের অন্যান্য দল উপদলও এই সম্বোধনের লক্ষ্য। তারা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে ছাড়া অন্যকে মিথ্যাবাদী বলে থাকে।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সকল বাক-বিতন্ডার অবসান ঘটাবেন। সেদিন মিথ্যাবাদীদেরকে সুচিহ্নিত করা হবে। তাদেরকে ঠেলে দেয়া হবে নরকাগ্নির দিকে। সত্যপন্থীদেরকেও সেদিন স্বীকৃতি দেয়া হবে। তাদেরকে জানানো হবে স্বর্গীয় সম্ভাষণ।

আব্দুর রহমান ইবনে এজিদ থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হুদাইবিয়া সন্ধির সময় যখন মক্কার মুশরিকেরা রসুলপাক স. কে মক্কা মোয়াজ্জেমায় প্রবেশ করতে দেয়নি, তখন আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করেছেন—

সুরা বাকারা : আয়াত ১১৪

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

❐ যে-কেহ আল্লাহের মস্‌জিদে তাঁহার নাম স্মরণ করিতে বাধা প্রদান করে ও উহার ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয় তাহার অপেক্ষা বড় সীমালংঘনকারী কে হইতে পারে? অথচ ভয়-বিহবল না হইয়া তাহাদের জন্য মস্‌জিদে প্রবেশ করা সঙ্গত ছিল না। পৃথিবীতে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ ও পরকালে তাহাদের জন্য মহা শাস্তি রহিয়াছে।

যে আল্লাহ্‌র মস্‌জিদ সমূহে গমনকারীদের বাধা দেয়, তার চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নয়। মক্কার মুশরিকেরা কাবার মসজিদে গমন করতে বাধা দিয়েছিলো।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে বহুবচন (মস্‌জিদ সমূহ)। এর কারণ হচ্ছে, এর প্রেক্ষিত একটি মসজিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও ঘোষণাটি সাধারণ। আয়াতে বলা হয়েছে, তারা মসজিদে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং মসজিদের ধ্বংস সাধনে উদ্যত হয়। আল্লাহ্‌র ঘরে আল্লাহ্‌র স্মরণমগ্ন হতে না দেয়াও মসজিদ ধ্বংসের নামান্তর। হজরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস এবং হজরত আতা থেকে এরকমই বলা হয়েছে। কাতাদা এবং সুদ্দী থেকে অবশ্য অন্য একটি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। ঘটনাটি হচ্ছে—তীতিউস বিন এসিসিয়ানুস রুমী ও তার সঙ্গী সাথীরা ছিলো চরম ইহুদী বিদ্বেষী। সে বাবেলের বখতে নসরকে সাহায্য করেছিলো। বখতে নসরের দল একযোগে আক্রমণ করে বসলো ইহুদীদেরকে। তাদেরকে এবং তাদের পশুপালকে হত্যা করলো। তাদের সন্তানদেরকে করলো বন্দী। এরপর ধ্বংস করলো বায়তুল মাকদিস মস্‌জিদ ও তওরাত শরীফ। মসজিদের অভ্যন্তরে মৃতদেহ স্তূপীকৃত করলো এবং সেখানে জবাই করলো শুকর। এভাবে গ্রন্থধারীদের হজ ও জিয়ারতের কেন্দ্রকে অপবিত্র করলো সে।

আমি বলি, এই স্থানে পূর্বপুরুষদের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে খৃষ্টানদেরকে ভর্ৎসনা করাই সম্ভবত এই আয়াতের উদ্দেশ্য। ইতোপূর্বে গরু পূজার বিষয় উল্লেখ করে ইহুদীদেরকেও এরকম ভর্ৎসনা করা হয়েছে।

মুশরিকদের মসজিদে প্রবেশাধিকার নেই—এটাই আল্লাহ্‌পাকের সিদ্ধান্ত। তবে তারা যদি ভয়বিহ্বল অবস্থায় মসজিদে প্রবেশপ্রার্থী হয়, তবে অসংগত হবে না। আয়াতের এই বিবরণটির মধ্যে মসজিদে হারাম ও বায়তুল মাকদিস যে মুসলমানদের অধিকারে আসবে তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। অল্প কিছুদিন পরেই আল্লাহ্‌পাকের অঙ্গীকার বাস্তবরূপ লাভ করেছে। মক্কা বিজয়ের পর বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের পরিপূর্ণ অধিকার যখন রসুল স. এর আওতাভূত হলো, তখন তিনি ঘোষণা দিলেন, হুঁশিয়ার! এরপর থেকে কোনো মুশরিক বায়তুল্লাহ্‌র হজ করতে পারবে না। বায়তুল মাকদিস অধিকারের অঙ্গীকারও পরবর্তিতে বাস্তবায়িত হয়েছিলো হজরত ওমর ফারুক রা. এর কালে। তাঁর মাধ্যমে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিলেন আল্লাহ্‌পাক। বিধ্বস্ত বায়তুল মাকদিসকে পুনর্গঠিত করেছিলেন মুসলমানেরা। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, আয়াতের অর্থ হবে এরকম—আল্লাহ্‌পাক অবিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধের মাধ্যমে এমনভাবে পর্যুদস্ত করে দিবেন যে, তারা আর মসজিদের কাছে ঘেঁষতেই পারবে না। যদি তখন তারা মসজিদমুখী হয়, তবে তাদেরকে হতে হবে ভীত, সন্ত্রস্ত। হত্যা অথবা বন্দীত্বের ভয়ে-বিহ্বল। কিংবা এরকমও অর্থ হতে পারে যে, ওরা যেনো মসজিদে প্রবেশ করার সাহসই না পায়। এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকদের জন্য মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ। যদি প্রবেশ করতে চায়, তবে তাদেরকে বিনয় ও ভীতির সঙ্গে প্রবেশ করতে হবে।

www.eelm.weebly.com

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে লাঞ্ছনা এবং পরবর্তি পৃথিবীতে মহা শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত। পৃথিবীর শাস্তি হচ্ছে, হত্যা, বন্দীত্ব অথবা জিজিয়া প্রদান। আর পরকালের মহা শাস্তি হচ্ছে সার্বক্ষণিক নরকানল।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১১৫

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

❑ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহেরই; এবং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সে দিকই আল্লাহের দিক। আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমগ্র ভূভাগের অধিপতি তিনি। সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি। সমগ্র সৃষ্টি তাঁর অস্তিত্বের নিদর্শন ও বিকাশ। সর্বত্রই তাঁর জ্যোতির বিস্তার। আর তিনি ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের নূর (আল্লাহু নূরুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি)। প্রতিটি বস্তুই তাঁর আবেষ্টনাধীন। তাই তিনি কোনো স্থান অথবা কালে সীমাবদ্ধ নন। কেবলার বিধান নির্ধারিত হয়েছে অনেক পরে। নির্দেশ প্রতিপালনের ভার যোগ্যতানুসারেই দেয়া হয়। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, হে মুসলমানগণ! তোমরা যদি শত্রুর প্রতিবন্ধকতার কারণে ফরজ নামাজে কেবলামুখী হতে অসমর্থ হও; অথবা যথাচেষ্টার পরেও কেবলা নির্বাচনে ভুল করে ফেলো, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেনো, সবদিকই তো আল্লাহ্রই দিক। নফল নামাজের জন্য এই নির্দেশনাটি অধিকতর শিথিল। বিশেষ করে সফরের সময়, যদি বাহন থেকে অবতরণ কষ্টকর হয় তবে বাহনে উপবিষ্ট অবস্থায় যেদিকেই তোমরা মুখ করে থাকো না কেনো, তোমাদের নফল নামাজ গ্রহণ করা হবে।

সেদিকই আল্লাহ্র দিক—একথার অর্থ, প্রতিটি দিকই কেবলা। হাসান, কাতাদা ও মুজাহিদ এরকম বলেছেন। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, প্রতিটি দিকের প্রতিই আল্লাহ্তায়ালা প্রসন্ন। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতটি মোতাশাবেহ্। এই হিসেবে আয়াতটি অন্যান্য মোতাশাবেহ্ আয়াতের সমপর্যায়ভূত। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে মুসলিম, তিরমিজি ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন—রসুলপাক স. মক্কা থেকে মদীনা গমণের প্রাক্কালে বাহন যেদিকে চলছিলো সেদিকেই মুখ করে নফল নামাজ আদায় করেছিলেন। একথা বলে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর দলিল হিসেবে এই আয়াতটি পাঠ করেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াতের মর্ম হচ্ছে, সফরের বাহনোপরি উপবিষ্ট অবস্থায় বাহনের গতি যেদিকে, সেদিকেই মুখ করে নফল নামাজ পাঠ করো। হাকেম বলেছেন, মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদিসটি বিশুদ্ধ। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে

www.eelm.weebly.com

আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন—কেবলা পরিবর্তনের আয়াত অবতীর্ণ হলে ইহুদীরা যখন প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিলো, তখন এই প্রতিবাদের জবাবে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এই হাদিসটির সনদও যথেষ্ট শক্তিশালী।

আমি বলি, শানে নুজুল সম্পর্কিত প্রথম বর্ণনাটিই সনদ এবং অর্থের দিক দিয়ে অধিকতর বিশুদ্ধ। এই আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে আরো অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু সেই বর্ণনাসূত্রগুলো দুর্বল। তাছাড়া তিরমিজি, ইবনে মাজা ও দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—হজরত রবীয়া বলেছেন, আমরা একবার রসুলপাক স. এর অন্ধকার রাতের সফরসঙ্গী ছিলাম। নামাজের সময় হলো। আমরা দিক ঠাহর করতে পারলাম না কেবলা কোনদিকে। আমরা সকলে নিজ নিজ অনুমাননির্ভর কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করলাম। সকালে রসুলপাক স. কে আমরা একথা জানালাম। তখন এই আয়াতটি নাজিল হয়। বায়হাকী এবং দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন—হজরত জাবের বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. একটি ক্ষুদ্র সেনাদলকে একবার কোথাও পাঠিয়েছিলেন। আমিও ওই সেনাদলে ছিলাম। যখন রাত হলো, তখন আমরা আর কেবলার পরিচয় উদ্ধার করতে পারলাম না। সবাই আপন ধারনানুসারে কেবলা নির্ধারণ করে নামাজ আদায় করলাম। সকলেই কেবলার দিকে মাটিতে একটি রেখা টেনে রেখেছিলেন। ভোরে দেখা গেলো, প্রতিটি রেখাই কেবলামুখী। মদীনায় ফিরে এসে এই ঘটনাটি আমরা রসুল পাক স. এর সামনে বর্ণনা করলাম। তিনি নিশ্চুপ রইলেন। তখন এই আয়াত নাজিল হলো। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মারদুবিয়াও এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত একথাটি রয়েছে- মেঘাচ্ছন্নতার কারণে কেবলা নির্ণয় করা যাচ্ছিলো না। মুজাহিদ থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন—যখন 'আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি কবুল করবো'—এই আয়াতটি নাজিল হয়, তখন আরববাসীরা প্রশ্ন করেছিলো, আল্লাহ্ কোনদিকে? কোথায় অবস্থান করেন? তাদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ—একথার অর্থ, আল্লাহ্পাকের প্রকারবিহীন নূর প্রাচ্য প্রতীচ্যসহ সৃষ্টির সকল পরিসরেই পরিব্যাপ্ত। যা অনির্ণেয়, অননুধাবনীয়; নিগুঢ় তত্ত্ব। ইমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দি র. নামাজের নিগুঢ় তত্ত্বের বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ সর্বব্যাপী—একথার অর্থ, তাঁর অনির্বচনীয় সত্তার পরিব্যাপ্তি পার্থিব পরিবেশ বিমুক্ত । এ অবস্থা জ্ঞানের অতীত। মানুষের আপত্তি, উদ্দেশ্য, সামঞ্জস্য, অসামঞ্জস্য- সকল কিছু সম্পর্কে রয়েছে তাঁর সম্যক অবহিতি।

www.eelm.weebly.com

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ

❒ এবং তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি মহান, পবিত্র। বরং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহেরই। সব কিছু তাঁহারই একান্ত অনুগত।

মদীনার ইহুদীরা বলতো, হজরত উযায়ের আল্লাহ্র সন্তান। নাজরানের খৃষ্টানেরা বলতো, হজরত ঈসা আল্লাহ্র পুত্র। আর আরবের মূর্তিপূজকেরা বলতো, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। এসকল অপবিশ্বাসের প্রতিবাদে এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

'সুবহানাল্লাহ্ (আল্লাহ্ পবিত্র)' এই বাক্যটি প্রয়োগের অর্থ হচ্ছে, অপবিশ্বাস সমূহের প্রতি বিস্ময় ও অস্বীকৃতি প্রদর্শন করা। জন্মদাতা ও জাতক একই প্রকৃতির হয়। তারা একে অপরের অংশ বটে। কিন্তু সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক তো এরকম নয়। আল্লাহ্তায়ালা প্রজনন প্রক্রিয়া থেকে পবিত্র। জন্মদাতা ও স্রষ্টা কখনো এক নয়। কখনোই নয়। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তানেরা আমার প্রতি অপবাদারোপ করেছে। এটা অমার্জনীয় ধৃষ্টতা। আর তারা আল্লাহ্তায়ালাকে গালি দিয়েছে। এই আচরণটিও যুক্তিহীন। অপবাদারোপ বা অসত্যারোপ করেছে এভাবে- তারা বলেছে, আল্লাহ্পাক মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করতে পারবেন না। আর গালি দিয়েছে এভাবে— তারা বলে, আল্লাহ্র পরিবার পরিজন ও সন্তানসন্ততি রয়েছে। অথচ আমি এ সকলকিছু থেকে পবিত্র। হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এধরনের হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আমার বান্দারা আমার প্রতি একথার মাধ্যমে অসত্যারোপ করে—আল্লাহ্ আমাদেরকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন না, যেমন আমরা এখন আছি। তাদের কথার অর্থ দাঁড়ায়, দ্বিতীয় সৃষ্টি যেনো প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা কঠিন। অথচ তারা জানে না আমি একক সত্তা। আমি অমুখাপেক্ষী। আমি কারো জাত নই। কারো জন্মদাতাও নই। আমার সমতুল্যও কেউ নেই।

আকাশ পৃথিবীর সকলকিছুই আল্লাহ্র। সবকিছুর উপরে রয়েছে তাঁর নিরঙ্কুশ অধিকার। তিনিই সকলকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বময়তায় এনেছেন। সমুদয় সৃষ্টির একক স্রষ্টা তিনিই। সবকিছুই তাঁর আজ্ঞাধীন, অনুগত। সুতরাং পিতা পুত্রের সম্পর্কের আর অবকাশ কোথায়? মুখাপেক্ষির সঙ্গে অমুখাপেক্ষির কীইবা সম্পর্ক? সম্ভাব্য এবং অবশ্যম্ভাবী কি কখনো সমান্তরাল হয়? নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সকলকিছুই তাঁর নিরঙ্কুশ এককত্বের সাক্ষ্যদাতা এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য বলে সাক্ষ্যদানকারী। যেমন অন্য আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, 'আর এমন কোনো বস্তুই

www.eelm.weebly.com

নেই যা তাঁর স্তবস্তুতি (তাসবীহ্) পাঠ না করে। কিন্তু তোমরা বুঝ না।' সাধারণ বিধান হিসেবে এই ঘোষণাটি দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নরা এর ব্যতিক্রম। তাঁরা এই বিশাল সৃষ্টির তাসবীহ্ পাঠের বিষয়টি অনুভব করে থাকেন। জ্ঞানে যারা মধ্যমপ্রকৃতির—তারা লক্ষণ, গুণ ও নিদর্শন দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণ করে থাকেন।

'ক্বানিতুন' অর্থ একান্ত অনুগত। কুনুত শব্দের আভিধানিক অর্থ দন্ডায়মান হওয়া। রসুলপাক স. বলেছেন, দীর্ঘ দন্ডায়মান বিশিষ্ট নামাজই উত্তম নামাজ। মুসলিম, আহমদ, তিরমিজি। ক্বানিতিন শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, একান্ত আজ্ঞাবহ। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে উত্তম সূত্রে আহমদ বর্ণনা করেছেন, কোরআন মজীদে উল্লেখিত প্রতিটি কুনুত শব্দের অর্থ হবে, আনুগত্য। এভাবে 'কুল্লুল্লাহ্ ক্বানিতুন' এর অর্থ হবে, কোনোকিছুই তাঁর অভিপ্রায় ও সৃজনবিন্যাসের বাইরে নয়। সুতরাং কোনোকিছু তাঁর সমকক্ষ নয়। 'সবকিছু তাঁর একান্ত অনুগত' বলতে এখানে চেতনাহীন সকল বস্তু এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন সমস্ত সচেতন সৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। প্রজ্ঞাধারীদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কুনুত বা দাঁড়ানো। তাই তাদেরকে বহুবচনে ক্বানিতুন বলা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এরকম—ওই সমস্ত অংশীবাদিরা যাঁদেরকে (হজরত ঈসা, হজরত উযায়ের ও ফেরেশতামন্ডলীকে) আল্লাহ্র পুত্রপরিজন মনে করে, তাঁরাও আল্লাহ্র একান্ত অনুগত দাস হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং অবিশ্বাসীদের অপবিশ্বাস তাঁদের মর্যাদার প্রতিও একটি জঘন্যতম কটাক্ষ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১১৭

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضٰىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ○

❑ আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করিতে সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন 'হও', আর উহা হইয়া যায়।

আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা—এই আয়াতটির অর্থ দু'টি। ১. তিনি যেমন আকাশ পৃথিবীস্থিত সকল বস্তুর স্রষ্টা। তেমনি আকাশ পৃথিবীরও স্রষ্টা। ২. আকাশ ও পৃথিবী তাঁর দু'টি পৃথক সৃষ্টি। 'ক্বদ্বা' অর্থ—যখন তিনি কিছু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, যখন কোনোকিছুকে পূর্ণত্ব প্রদানের ইচ্ছা করেন। শব্দটির নিবিড় সম্পর্ক পূর্ণত্ব প্রদানের সঙ্গেই। বিষয়টি বর্ণনামূলক হতে পারে। যেমন, অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'আর তোমার প্রতিপালক সন্দেহাতীতরূপে (পরিপূর্ণরূপে) নির্দেশ দিয়েছেন যে, শুধু তাঁরই ইবাদত করো।' আবার বিষয়টি ক্রিয়া সম্পর্কিতও হতে পারে। যেমন বলা হয়েছে, 'ফাক্বদ্বাহুন্না সাবয়া সামাওয়াত'

www.eelm.weebly.com

(অতঃপর তিনি সপ্ত আকাশের পূর্ণত্ব প্রদান করলেন)। কখনো আবার 'কৃদ্বা' শব্দটি কোনো বস্তুর অস্তিত্বে আসা অবশ্যম্ভাবী হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতে শব্দটি শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

'কুন' অর্থ হও। কাকে লক্ষ্য করে এই নির্দেশ, তার উল্লেখ এখানে নেই। বরং বলা হয়েছে, 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।' জমহুর আলেমগণ 'ফাইয়াকুন' শব্দটি একটি পৃথক বাক্য অথবা 'ইয়াকুলু' (বলেন) এর সঙ্গে সংযুক্ত করে সকল ক্ষেত্রেই পেশযুক্ত অবস্থায় পাঠ করেছেন। ক্বারী কাসায়ী ক্বারী ইবনে আমেরের অনুকরণে সুরা নহল ও সুরা ইয়াসীনে উল্লেখিত এই শব্দটিকে জবর সহযোগে পাঠ করেছেন। কিন্তু সুরা আলে ইমরানে এবং সুরা আনআমে পাঠ করেছেন পেশ সহযোগে। জবর সহকারে পাঠ করার কারণ হচ্ছে, নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে 'ফা' এর পরে 'আন' শব্দটি উহ্য থাকে। এমতো ক্ষেত্রে কয়েকটি বিবেচ্য বিষয় এসে সামনে দাঁড়ায়। ১. অনুপস্থিত কোনোকিছুকে সম্বোধন করা যায় না। সুতরাং প্রশ্ন জাগে, অস্তিত্বপূর্ব অবস্থার প্রতি 'হও' নির্দেশটি প্রয়োগ হয় কিভাবে? কোনো কোনো আলেম এরকম সমাধান দিয়েছেন—বস্তুটির অস্তিত্বপ্রাপ্তি সুনির্ধারিত ছিলো। তাই মনে করতে হবে সম্বোধনের সময় যেনো বস্তুটি বিদ্যমান ছিলো। কাজেই এরকম সম্বোধন অসিদ্ধ নয়। ইবনে আমবারী বলেছেন,'ইয়াকুলু' (বলেন) অর্থ, সৃষ্টি করার জন্য তাকে এরূপ বলেন।

বস্তুটিকে সরাসরি নির্দেশ প্রদান করেন, এরকম নয়। সুতরাং নির্দেশটি দৃশ্যতঃ সম্বোধন হলেও মূলত তা সম্বোধন নয়। বায়যাবী বলেছেন, এখানে নির্দেশ প্রদান ও তা মান্য করার ব্যাপার নেই। বরং এখানে আল্লাহ্পাক তাঁর সৃষ্টিকৌশলের একটি উপমা প্রদান করেছেন মাত্র। যেনো এখানে বলা হয়েছে, যেমন কেউ কাউকে নির্দেশ দান করলে, নির্দেশিতজন তা অবনত মস্তকে মেনে নেয়। তেমনি আমি কোনোকিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলে তা বাস্তব রূপ লাভ করে। ২. জবরযুক্ত অবস্থায় শব্দটিকে প্রকৃত নির্দেশ বলে মেনে নিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বিপত্তি এই যে, নির্দেশটি প্রকৃতই কোনো নির্দেশ (আমরে হাকিকি) নয়। বরং বিষয়টি তরিৎ কর্মকুশলতার একটি উপমা। সুতরাং সমস্যাটির সমাধান করতে হবে এভাবে—প্রকাশ্য শব্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে এখানে জবর সংযোগ করা হয়েছে। ৩. 'ফা' এর পূর্বোক্ত বিষয় (আমরান) পরের বিষয়টির (ইয়াকুলু) কারণ। এমতোক্ষেত্রে একটি সৃষ্টির জন্য দু'টি 'কুন' (হও) অনিবার্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এহেন জটিলতার সমাধানে বলা যেতে পারে যে, প্রথম 'কুন' (হও) দ্বারা রূপকভাবে বস্তুর সুনির্দিষ্ট অস্তিত্ব নির্ণীত হয়েছে। কারণ, বস্তুর সুনির্দিষ্টকরণ ব্যতিরেকে তার বিদ্যমানতা অচিন্ত্যনীয়। পরের 'কুন' দ্বারা বস্তুটির বিদ্যমানতা অস্তিত্বশীল হয়েছে।

আমি বলি, বিষয়টি এভাবে সমাধান করা যেতে পারে যে, প্রথম 'কুন' দ্বারা কর্মজগতের উপকরণ এবং দ্বিতীয় 'কুন' দ্বারা প্রতিফলজগতের পরিণাম নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু এই সমাধানের দ্বারা কেবল দায়িত্বশীলগণ চিহ্নিত হয়ে পড়ছেন।

www.eelm.weebly.com

অথচ সাধারণভাবে সমস্ত সৃষ্টি আয়াতের লক্ষ্যস্থল। কাজেই এরকম ধারণা করাই উত্তম যে, প্রথম 'কুন' দ্বারা জ্ঞানজগতের বিদ্যমানতা এবং দ্বিতীয় 'কুন' দ্বারা প্রতিবিম্ব সহ লক্ষ্যগোচর হওয়া বুঝানো হয়ে থাকবে। সুফী দার্শনিকগণ এরকমই বলেছেন। অবশ্য আল্লাহ্পাকের এই সৃজনশীলতা কাললগ্ন নয়। তাঁর সৃজনক্ষমতাকে পরিবর্তনশীল ভাবা অসম্ভব। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে আয়াতটি তাওহীদে শুহুদীর প্রমাণপঙ্ক্তি। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী র. এরকমই অভিমত প্রকাশ করেছেন। শায়েখে আকবর মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী বলেছেন, সম্ভাব্য জগত তার বৃত্তের বাইরে বিদ্যমানতার গন্ধও পায়নি। তাওহীদে অজুদী আশ্রিত তাঁর এই মতামত এই আয়াতের অনুকূল নয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১১৮

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ○

❑ এবং যাহারা কিছু জানে না তাহারা বলে 'আল্লাহ্ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের নিকট আসেনা কেন?' এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীরাও তাহাদের অনুরূপ কথা বলিত। তাহাদের অন্তর একই রকম। আমি দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছি।

ইহুদী সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে এখানে বলা হয়েছে, যারা কিছু জানে না। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন—রাফে বিন হারমিলা ইহুদী রসুলপাক স. কে বলেছিলো, যদি তুমি আল্লাহ্র রসুল হয়ে থাকো, তবে আল্লাহ্কে বলো, তিনি আমাদের সাথে কথা বলুন। আমরা তাঁর কথা স্বকর্ণে শুনি। মুজাহিদ বলেছেন, যারা কিছু জানে না—একথা বলা হয়েছে খৃষ্টানদেরকে লক্ষ্য করে। ইহুদী ও খৃষ্টানেরা যদিও আসমানী কিতাব অধ্যয়ন করতো, তবু তাদেরকে 'যারা কিছু জানে না' একথা বলে মূর্খ প্রতিপন্ন করা হয়েছে এ কারণে যে, তারা কিতাব অনুযায়ী আমল করতো না। কাতাদা বলেছেন, আরবের পৌত্তলিকদের লক্ষ্য করে এরকম বলা হয়েছে।

আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেনো? —একথার অর্থ, আল্লাহ্ তো ফেরেশতাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন, তবে আমাদের সঙ্গে কেনো করবেন না। হজরত মুসার সঙ্গে এরূপ করেছেন। তবে আমাদেরকে কেনো বলে দিবেন না যে, ইনি আমার রসুল। অবিশ্বাসীদের এহেন উক্তি দম্ভপূর্ণ। স্পষ্টতঃই অহংকারাচ্ছন্ন।

www.eelm.weebly.com

কোনো নিদর্শন আমাদের নিকট আসেনা কেনো? তাদের এই উক্তিটিও দর্পপ্রকাশক ও বিধানবিরোধী—যা সত্যের প্রতি অস্বীকৃতিরই নামান্তর।

অতীতের ইহুদী খৃষ্টানেরাও এমন বলতো। যেমন, ইহুদীরা হজরত মুসাকে বলেছিলো, আল্লাহ্ আমাদেরকে প্রকাশ্যে সাক্ষাত দান করুন। খৃষ্টনেরা বলেছিলো, আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ হোক। এরকম দম্ভোক্তি ও অবাধ্যতার ক্ষেত্রে অতীত ও বর্তমানের সকল ইহুদী খৃষ্টানেরাই সমস্বভাববিশিষ্ট। তাই বলা হয়েছে, তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের অনুরূপ কথা বলতো। তাদের অন্তরও ছিলো একই রকম।

আমি দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি—একথায় বুঝা যায়, যাঁরা বিশ্বাসী কেবল তাঁদের জন্যই আল্লাহ্পাক নিদর্শনাবলীকে স্পষ্ট করেছেন—যদিও নিদর্শনাবলী সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তা বিতন্ডাপ্রেমী ও অসাধুদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। কল্যাণবঞ্চিত হওয়ার কারণেই তাদেরকে এখানে অনুল্লেখ্য রাখা হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১১৯,১২০,১২১

إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا ۙ وَّلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحٰبِ الْجَحِيمِ ۝
وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى
اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِى جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ
مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيرٍ ۝ اَلَّذِينَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُونَهٗ حَقَّ
تِلَاوَتِهٖ ۗ أُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهٖ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

❒ আমি তোমাকে সত্য-সহ শুভ-সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। জাহান্নামীদের সম্বন্ধে তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না।

❒ ইহুদী ও খৃষ্টানগণ তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হইবে না, যতক্ষন না তুমি তাহাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বল, 'আল্লাহের পথ-নির্দেশই প্রকৃত পথ-নির্দেশ।' জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর তবে

www.eelm.weebly.com

আল্লাহের বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকিবে না।

❐ যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহাদের যাহারা যথাযথভাবে ইহা আবৃত্তি করে তাহারাই ইহাতে বিশ্বাস করে, আর যাহারা ইহা প্রত্যাখ্যান করে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত।

সত্যসহ শুভসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি—এখানে সত্য (হক) অর্থ হবে কোরআন পাক। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস একথা বলেছেন। শুভসংবাদদাতা অর্থ, অনুগতদের প্রতি সুসংবাদদাতা। আর সতর্ককারী অর্থ, অবিশ্বাসীদের প্রতি ভীতি প্রদর্শনকারী।

'আসহাবিল জাহিম' অর্থ, জাহান্নামী। জাহান্নামীদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে না— একথার অর্থ, হে মোহাম্মদ স. নরকবাসীদের সম্পর্কে আপনাকে কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। কেনোনা তারা বিশ্বাসবিচ্যুত। আপনার দায়িত্ব কেবল সংবাদ পৌঁছানো। আর হিসাব গ্রহণ করবো আমি।

বাগবী বলেছেন, হজরত আতার মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে—একবার রসুলপাক স. বললেন, হায়! আমি যদি জানতে পারতাম, আমার মাতা-পিতা কী অবস্থায় আছেন। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, সওরী মুসা বিন উবাদা থেকে, তিনি মোহাম্মদ বিন কাসাব কুরজী থেকে এবং তিনি হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীর ইবনে জুরাইজের পদ্ধতিতে বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে দাউদ বিন আসেমও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি বলি, এই আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে বাগবী ও অন্যান্যদের বর্ণিত উপরোক্ত বর্ণনাটি আমার কাছে পছন্দসই নয়। শক্তিশালীও নয়। বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হলেও একে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের একটি ধারণা মনে করতে হবে। শানে নুজুল সম্পর্কে উপরোক্ত বর্ণনা সঠিক বলে মেনে নিলেও একথা প্রমাণিত হয় না যে, জাহান্নামী শব্দটি রসুলুল্লাহ্ স. এর মাতাপিতার প্রতি প্রযোজ্য হবে। যদি প্রযোজ্য হয়ও, তবুও একথা বলা যাবে না যে, রসুল পাক স. এর মাতা-পিতা অবিশ্বাসী ছিলেন। কারণ, পাপের কারণে বিশ্বাসীরাও সাময়িকভাবে দোজখবাসী হতে পারে। শাফায়াত বা অনুগ্রহ প্রাপ্তির পর তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত ও শাস্তিমুক্ত হবেন। এ প্রসঙ্গে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণিত ওই হাদিসটির দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে, যেখানে বলা হয়েছে—রসুলে করীম স. এরশাদ করেছেন, আদম সন্তানগণের উপর অতিবাহিত যুগের মধ্যে অতিউত্তম যুগে বরং সর্বোত্তম যুগে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আরো বলেছেন, দল দ্বিধাবিভক্তির পর উত্তম দলে আল্লাহ্পাক আমার জন্ম নিশ্চিত করেছেন। আর আমি খাঁটি মাতাপিতার বিশুদ্ধ সন্তান। মূর্খতার অপবিত্রতা থেকে আমি মুক্ত। হজরত আদম

www.eelm.weebly.com

থেকে আমার মাতাপিতা পর্যন্ত পবিত্র বৈবাহিক সম্বন্ধসূত্রে আমার জন্ম—যে জন্মধারা ব্যভিচারকলুষিত নয়। এ কারণেই আমি স্বীয় সত্তা এবং পিতৃপুরুষের ক্রমপ্রবাহের দিক থেকে তোমাদের চেয়ে উত্তম। হাদিসটি হজরত আনাস থেকে বায়হাকী তাঁর 'দালায়েলে নবুয়ত' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। আবু নাঈম তাঁর গ্রন্থভূত করেছেন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে। আর শায়েখ জালালুদ্দিন সুয়ুতী রসুলুল্লাহ্ স. এর পিতামাতার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কতিপয় পুস্তিকাও রচনা করেছেন। ওই পুস্তিকা সমূহের একটিতে আমি প্রমাণপঞ্জিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নোত্তর সন্নিবেশিত করেছি। সকল প্রশস্তি কেবল আল্লাহ্র জন্যই।

কতিপয় ভাষ্যকার বলেছেন, গ্রন্থধারীরা (খৃষ্টান ও ইহুদীরা) একবার রসুলপাক স. কে বললো, আপনি যদি আমাদেরকে কিছু সুযোগসুবিধা দেন, তাহলে আমরা ইমান গ্রহণ করবো। তখন পরবর্তী আয়াতটি (১২০) নাজিল হয়েছে। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ছা'লাবী বর্ণনা করেছেন—প্রথম দিকে রসুল পাক স. গ্রন্থধারীদের কেবলার দিকে (বায়তুল মাকদিসের দিকে) মুখ করে নামাজ পড়ে যাচ্ছিলেন। এ দেখে মদীনার ইহুদী ও নাজরানের খৃষ্টানেরা ধারণা করতো, অবশেষে তিনি স. তাদের ধর্মে গিয়ে মিলিত হবেন। কিন্তু যখন তিনি স. কাবাশরীফের দিকে মুখ করে নামাজ শুরু করলেন, তখন তারা নিরাশ হয়ে গেলো। ঠিক তখনই অবতীর্ণ হলো—ইহুদী খৃষ্টনেরা তোমার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতোক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো—একথা বলে তাদের নৈরাশ্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্পাকের পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ।' এই পথনির্দেশের নাম ইসলাম। ইসলাম সত্য। আর অবিশ্বাসীদের পথ ভ্রান্ত—এই জ্ঞান প্রাপ্তির পর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কিছুতেই সম্ভব নয়। এখানে 'জ্ঞান' (এলেম) অর্থ, ওহী (প্রত্যাদেশ)। এখানে রসুলপাক স. কে লক্ষ্য করে অন্যদের প্রতি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করলে আল্লাহ্র বিপক্ষে কোনো অভিভাবক, সাহায্যকারী থাকবে না।

যাদেরকে কিতাব দিয়েছি—এখানে যাদেরকে বলে সাহাবা কেরামগণকে চিহ্নিত করা হয়েছে। হজরত কাতাদা ও হজরত ইকরামা একথা বলেছেন। অন্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, যাদেরকে অর্থ, সাধারণ মু'মিনদেরকে। গ্রন্থধারীগণের অন্তর্ভূত মু'মিনগণও এই সম্বোধনের অন্তর্ভূত হতে পারেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আয়াতটির শানে নুজুল এরকম— হজরত জাফর ইবনে আবু তালেবের সহযাত্রী হিসেবে হাবশার হিজরত শেষে চল্লিশজন লোক এসেছিলেন। ওই চল্লিশজনের বত্রিশজন ছিলেন হাবশার এবং আটজন সিরিয়ার। তাদের মধ্যে বহিরা নামক এক পাদ্রীও ছিলেন। তাদের সম্পর্কে এই আয়াতটি নাজিল হয়। জুহাক বলেছেন, ইহুদীদের মধ্যে যাঁরা মুসলমান

www.eelm.weebly.com

হয়েছিলেন তাঁরাই এই আয়াতের লক্ষ্য। তাঁদের সম্মানিত নাম হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম, সাঈদ বিন আমর, উসায়েদ ও আসাদ ভ্রাতৃদ্বয়, আব্দুল্লাহ্ ইবনে সুরিয়া প্রমুখ।

খতীব একটি মাজহুল সূত্রের মাধ্যমে ইমাম মালেক থেকে, তিনি নাফে থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে এবং তিনি রসুলুল্লাহ্ স. থেকে বর্ণনা করেন— 'যথাযথভাবে ইহা আবৃত্তি করে' একথার অর্থ, কিতাবের পুরোপুরি অনুসরণ করে। যথাযথ আবৃত্তি প্রসঙ্গে হজরত ওমর ফারুক বলেছেন, যাঁরা বেহেশতের আলোচনাকালে বেহেশতকামী হয় এবং দোজখের আলোচনাকালে হয় দোজখ থেকে পরিত্রাণাভিলাষি। 'হা' (ইহা) সর্বনামটি কিতাবের সঙ্গে সম্বন্ধিত। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে—যাঁরা কিতাবকে পরিবর্তনমুক্ত অবস্থায় জ্ঞানাহরণ ও আমলের উদ্দেশ্যে আবৃত্তি করে। কালাবী বলেছেন, 'হা' সর্বনামটি আয়াতের দু'টি স্থলে উল্লেখিত হয়েছে। দু'টি সর্বনামই রসুলে পাক স. এর সঙ্গে সম্পর্কিত। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এরকম—গ্রন্থধারীদের অন্তর্ভূত বিশ্বাসীদের নিকট মহানবী স. সম্পর্কে যদি কেউ জানতে চায়, তবে তাঁরা তাঁদের কিতাবে যেমন পাঠ করেছেন হুবহু তেমনই বর্ণনা দিবেন।

শেষে বলা হয়েছে, 'যাহারা ইহা প্রত্যাখ্যান করে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত'—একথার অর্থ, যারা তওরাতকে বিকৃত করে, কোরআনকে অস্বীকার করে অথবা মহানবী স. কে অবিশ্বাস করে—তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

সুরা বাকারা : আয়াত ১২২, ১২৩

يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

❒ হে ইসরাইল—সন্তানগণ! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্দারা আমি তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছি এবং বিশ্বে সকলের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।

❒ এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও কোন উপকারে আসিবেনা এবং কাহারও নিকট হইতে কোন ক্ষতিপূরণ গৃহীত হইবেনা এবং কোন সুপারিশ কাহারও পক্ষে লাভজনক হইবেনা এবং তাহারা কোন সাহায্যও পাইবে না।

---

www.eelm.weebly.com

এই সুরার শুরু থেকে বনী ইসরাইলদেরকে উদ্দেশ্য করে তাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামতের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানেও তেমনি বলা হচ্ছে, হে ইসরাইল সন্তানেরা! তোমাদেরকে প্রদত্ত অনুগ্রহ সমূহের কথা স্মরণ করো। তোমাদেরকে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছিলো। কিয়ামত দিবসের কথাও বিস্মৃত হয়ো না। সেই ভয়াবহ দিবসে বিনিময়, সুপারিশ, সাহায্য—সবকিছুই হবে অচল। এই সতর্কবাণী সমূহের মাধ্যমে পূর্ববর্তী হিতোপদেশগুলোকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তোলাই উদ্দেশ্য। বক্তব্যকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে পৌনঃপুনিকতার রীতিটি এখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১২৪

وَاِذِ ابْتَلٰۤى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ○

❑ এবং যখন ইব্রাহীমকে তাহার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেগুলি সে পূর্ণ করিয়াছিল, আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করিতেছি।' সে বলিল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য হইতেও?' আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি সীমালংঘনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নহে।'

ক্বারী হাশমী 'ইব্রাহিম' শব্দটিকে 'আব্রাহাম' পাঠ করতেন। কোরআন মজীদে হজরত ইব্রাহিমের পবিত্র নাম রয়েছে উ··· ওরটি স্থলে। তার মধ্যে তিনি তেত্রিশ স্থলে আব্রাহাম পাঠ করেছেন। যেমন, সুরা বাকারায় পনেরোটি, সুরা নিসায় তিনটি, সুরা আনআমে একটি, সুরা তওবাতে দু'টি, সুরা ইব্রাহিমে একটি, সুরা নহলে দু'টি, সুরা মরিয়মে তিনটি, সুরা আনকাবুতে একটি, সুরা শুয়ারাতে একটি, সুরা জাছিয়াতে একটি, সুরা নজমে একটি, সুরা হাদীদে একটি এবং সুরা মুমতাহিনাতে একটি। ক্বারী ইবনে জাকওয়ান শুধু সুরা বাকারায় ইব্রাহিম শব্দটিকে 'আব্রাম' এবং 'আব্রাহাম' এই দুই উচ্চারণে পাঠ করেছেন। অন্য সকলে পড়েছেন ইব্রাহিম।

'ইব্‌তালা' শব্দের আসল অর্থ, কঠিন কোনো কর্মের দায়িত্ব অর্পণ করা। 'বালা' থেকে এই শব্দটি গঠিত হয়েছে। এখানে দায়িত্ব অর্পণ করার অর্থ পরীক্ষা করা। ভাষাবিদগণ মনে করেন, ইব্‌তিলা এবং ইখতিবার সমার্থক।

'কালিমাত' অর্থ বাক্যাবলী। এখানে এ শব্দটির অর্থ, বিষয়বস্তু। নির্দেশনা ও নিষেধাজ্ঞাই এখানে বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, কালিমাত শব্দের অর্থ, শরিয়তের শাখাগত ত্রিশটি সুস্বভাব। হজরত

www.eelm.weebly.com

ইব্রাহিমই কেবল ওই সুস্বভাবগুলো আয়ত্ব করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি নরকাগ্নিমুক্ত। তিনি যে আল্লাহ্পাকের সকল পরীক্ষাতীর্ণ— কোরআন মজীদই সে সাক্ষ্য দিয়েছে। সে কথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে—সেগুলো সে পূর্ণ করেছিলো। ওই ত্রিশটি সুস্বভাবের কথা বিভিন্ন সুরায় বর্ণিত হয়েছে। সুরা তওবায় বর্ণিত হয়েছে দশটি। যেমন, ১. তওবাকারী ২. ইবাদতকারী ৩. প্রশংসাকারী ৪. আল্লাহ্র পথে প্রবাসী ৫. রুকুকারী ৬. সেজদাকারী ৭. সৎকাজে আদেশ দানকারী ৮. অসৎকাজে নিষেধকারী ৯. আল্লাহ্র বেঁধে দেয়া সীমা রক্ষাকারী ১০.বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দানকারী। দশটি সুস্বভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে সুরা আহযাবে। যেমন, মুসলমান নরনারী, মু'মিন নরনারী, অনুগত নরনারী, সত্যবাহী রমণী পুরুষ, ধৈর্যধারণকারী ও কারিনী, বিনয়ী ও বিনয়িনী, দানশীল ও দানশীলা, রোজা পালনকারী ও কারিনী, লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারী ও কারিনী, অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র স্মরণকারী ও কারিনী।

অন্য দশটি শুভস্বভাবের কথা উল্লেখিত হয়েছে সুরা মু'মিনুনে। বলা হয়েছে, 'মুমিনগণের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তারা তাদের নামাজে বিনম্র, অনর্থক কর্ম থেকে বিমুখ। যারা জাকাত প্রদান করে, স্ত্রী ও অধিনস্থ ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যদের নিকট থেকে লজ্জাস্থান হেফাজত করে। বৈধ স্ত্রী এবং ক্রীতদাসী ছাড়া যারা অন্যদেরকে কামনা করে—তারা সীমালংঘনকারী। আর যারা স্বীয় আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষণাবেক্ষণকারী, নামাজের হেফাজতকারী, যারা যাঞ্চায় অনভ্যস্ত এবং যারা যাঞ্চাপ্রবণ নয়। তাদের অধিকার স্বীকৃত হয়, যারা প্রতিফল দিবসের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং যারা আপন প্রতিপালকের শাস্তির ভয়ে ভীত।

তাউস বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম দশটি বিষয়ে পরীক্ষিত হয়েছিলেন। বিষয়গুলো শুভ স্বভাবের অনুকূলে। গলদেশ থেকে মস্তক পর্যন্ত পাঁচটি। যেমন— ১. গোঁফকর্তন ২. কুলি করা ৩. নাকে পানি দেয়া ৪. মেসওয়াক করা ৫. মস্তকের কেশকর্তন। অবশিষ্ট শরীরের সঙ্গে আর পাঁচটি বিষয় সংশ্লিষ্ট। যেমন— ১. নখ কাটা ২. বগলের চুল উপড়ে ফেলা ৩. নাভির নিম্নদেশের চুল কামিয়ে ফেলা ৪. খতনা করা ৫. পানি দ্বারা শৌচকার্য সমাধা করা। বর্ণনাকারী তাউস এবং কাতাদা বলেছেন, কালিমাত অর্থ, হজের অনুষ্ঠানসমূহ। হাসান বলেছেন, কালিমাতের উদ্দেশ্য সাতটি বস্তু। যেগুলোর মাধ্যমে তিনি পরীক্ষিত হয়েছিলেন। তন্মধ্যে তিনটি হচ্ছে—চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র—যেগুলোর প্রতি তিনি গভীর অভিনিবেশের পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, আমার প্রতিপালক অক্ষয় ও চিরভাস্বর। ৪. নমরুদের অগ্নিকুন্ডবাসে তিনি ছিলেন চরম ধৈর্যশীল। ৫. হিজরত ৬. পুত্র কোরবানী ৭. খতনা।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, কালিমাত অর্থ—হজরত ইব্রাহিম এবং ইসমাইলের দোয়া (রব্বানা তাক্বাবাল মিন্না.......)। কাবা গৃহ নির্মাণের প্রাক্কালে পিতা পুত্র আল্লাহ্পাকের সমীপে এই প্রার্থনাটি করেছিলেন। ইয়ামান বিন রুবাব

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর সম্প্রদায়ের যে বাদানুবাদ হয়েছিলো, তাকে এখানে কালিমাত বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, পূর্বোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু কালিমাত।

আমি বলি, এখানে এমতোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত যাতে উপরোক্ত সকল বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়। মোটকথা, কালিমাত অর্থ যাবতীয় আদেশ নিষেধ। ত্রিশ, দশ, সাত, সকল বর্ণনাই এর অন্তর্ভূক্ত।

পরীক্ষাসমূহ পূর্ণ করার পর আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করলেন, আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা (ইমাম) মনোনীত করলাম। কালিমাত থেকে ইমামাত (নেতৃত্ব) এবং কাবা শরীফের পবিত্রতার অর্থ গ্রহণ করা যায়। কাবা শরীফের নির্মাণ, ইসলামের সকল আনুষ্ঠানিকতা ইত্যাদিও কালিমাত এর পর্যায়ভূত। এখানে ইমামাত অর্থ নবুয়ত অথবা সাধারণ নেতৃত্ব। তিনিই ইমাম যিনি অনুসরণীয়। যার আনুগত্য অপরিহার্য। অবশ্য রাজত্ব বা নেতৃত্ব কোনো নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহারযোগ্য নয়, যেমন ইমামিয়ারা করেছে। শরিয়ত এবং ইমামতের বিধান তাদের ধারণাকে সমর্থন করে না। আল্লাহ্‌পাক হজরত ইব্রাহিমকে বিশ্ববিশ্রুত সাধারণ ইমামত দান করেছেন। নবীশ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স. কেও আল্লাহ্‌পাক এরকম নির্দেশ করেছেন।

'ইত্তাবিয়্যু মিল্লাতা ইব্রাহীমা হানিফা' (আপনি ইব্রাহিমের দ্বীনের অনুসরণ করুন— —যা হানীফ)। হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ্‌পাকের সমীপে নিবেদন জানিয়েছিলেন, আয় আল্লাহ্! আমার অধঃস্তন বংশধরদের মধ্য থেকেও ইমাম মনোনীত করুন। আল্লাহ্‌পাক শর্ত সাপেক্ষে সেই নিবেদন গ্রহণ করেছেন। বলেছেন, ইমামত হবে কেবল মুত্তাকীদের জন্য। যারা সীমালংঘনকারী তাদের প্রতি আমার কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।

যদি ইমাম অর্থ নবী গ্রহণ করা হয়, তবে জালেম (সীমালংঘনকারী) অর্থ হবে ফাসেক। কেনোনা এটা ঐকমত্য যে, নবীগণ নিষ্পাপ। আর যদি ইমামত অর্থ ধরা হয় সাধারণ নেতৃত্ব —তা'হলে জালেম শব্দটির অর্থ হবে কাফের (অবিশ্বাসী)। কারণ কাফেরকে নেতা বা আমীর নির্ধারণ করা সিদ্ধ নয়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোনো ফাসেক নেতৃত্ব গ্রহণ করে, তবে জুলুম ও পাপের ক্ষেত্রে তার আনুগত্য অসিদ্ধ। কেনোনা রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়। হজরত ইমরান ও হজরত হাকেম বিন ইমরান গিফারী থেকে মালেক ও আহমদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হজরত আলী থেকে বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন— আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে অন্য কারো আনুগত্যই কাম্য নয়। অনুগত হতে হবে কেবল সৎকাজের বেলায়। কোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে– আল্লাহ্‌র অনুসরণ করো, রসুলের অনুসরণ করো আর অনুসরণ করো তার, যিনি তোমাদের আমীর। রসুল পাক স. বলেছেন, হাবসী দাসও যদি তোমাদের আমীর হয়, তবুও

www.eelm.weebly.com

তার অনুগত হও এবং তার কথা মান্য করো। এসকল বিবরণের মর্ম হচ্ছে, শরিয়ত বিরুদ্ধ আনুগত্য সম্পূর্ণ অবৈধ। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরলোকের প্রতি প্রত্যয়শীল হও, তবে তোমাদের পারস্পরিক বিরোধ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি সমর্পণ করো। এসকল ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে ইমাম অথবা আমীরের নিষ্পাপ হওয়া অনিবার্য নয়; যেমন ধারণা রাখে রাফেজীরা। আল্লাহ্‌পাকই অধিক জ্ঞাত।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১২৫

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝

☐ এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন কাবাগৃহকে মানবজাতির তীর্থ ক্ষেত্র ও নিরাপত্তাস্থল করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, 'তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়াইবার স্থানকেই সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।' এবং ইব্রাহীম ও ইস্‌মাইলকে আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, এতেক্বাফকারী, রুকু ও সেজ্‌দাকারীদের জন্য পবিত্র রাখিতে আদেশ দিয়াছিলাম।

'আল বাইত' অর্থ গৃহ কিন্তু এখানে অর্থ হবে কাবা গৃহ—যেমন 'আন্‌নুজুম' অর্থ তারকা হলেও আসল অর্থ সপ্তর্ষিমন্ডল। কাবাগৃহ একটি সম্মেলনস্থল। মুসলমানদের তীর্থক্ষেত্র। সকল স্থানের মানুষ এখানে পুণ্য অর্জনের জন্য একত্রিত হয়। হজ, ওমরাহ্, নামাজ ইত্যাকার নানাবিধ ইবাদত সম্পাদন করে। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, মসজিদে হারামের এক রাকাত নামাজ অন্যত্র সম্পাদিত একলক্ষ রাকাত নামাজের সমান। আয়াতে কাবা গৃহকে তীর্থস্থান বলার পর নিরাপত্তাস্থানও বলা হয়েছে। এখানকার সকল অধিবাসীরাই নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। ইসলাম প্রচারের পূর্বেও মক্কার পৌত্তলিকেরা সেখানকার সকল মানুষকে নিরাপদ বলে ঘোষণা করতো। বলতো, এরা আল্লাহ্‌র পরিবার। কাজেই এদের নিরাপত্তা নির্বিঘ্ন রাখতে হবে। তারা অবশ্য মক্কা শরীফের বাইরের লোকদের প্রতি ছিলো আক্রমণপ্রবণ। অন্য এক আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'তারা কি দেখে নাই আমি হেরেমকে শান্তিধাম করেছি। অথচ তারা চর্তুপার্শ্বস্থ লোকদেরকে আক্রমণ করে।' রসুল স. এরশাদ করেছেন, 'যখন আল্লাহ্‌পাক আকাশ ও পৃথিবী সৃজন করেছেন তখন থেকেই মক্কা নগরী হারাম (মর্যাদাশালী) রূপে বিভূষিত।' কিয়ামত

www.eelm.weebly.com

পর্যন্ত এই মর্যাদা থাকবে অটুট। সেখানে কারো জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ সিদ্ধ নয়। শুধু আমার জন্য দিনের কিছুক্ষণ যুদ্ধ করা সিদ্ধ ছিলো, এরপর কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ নিষিদ্ধ হয়েছে। সেখানকার কাঁটাও অপসারণ করা যাবে না, শিকার তাড়ানো যাবে না। সেখানকার কোনো পরিত্যক্ত বস্তু হস্তগত করা যাবে না, তবে সেই হারানো বস্তু প্রকৃত মালিকের নিকট ফেরৎ দেয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা যাবে। সেখানকার তৃণও কর্তন করা যবে না। হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস বলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! দয়া করে আজখার নামক ঘাস এই নির্দেশের বাইরে রাখুন। কারণ, তা কর্মকারদের প্রয়োজনে আসে এবং বহুবিধ সাংসারিক কর্মে ব্যবহৃত হয়। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এরূপ বিবরণ এসেছে।

নির্দেশ হয়েছে—'তোমরা ইব্রাহিমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাজের স্থানরূপে গ্রহণ করো'। হজরত ইব্রাহিমের দাঁড়াবার স্থানের নাম 'মাকামে ইব্রাহিম'। তাওয়াফ শেষে যে নামাজ পাঠ করতে হয়, সেই নামাজ পড়তে বলা হয়েছে মাকামে ইব্রাহিমে। হজরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, আমরা একবার রসুল স. এর সহগামী হয়ে কাবা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলাম। তিনি স. রোকনে চুম্বন করে তাওয়াফ শুরু করলেন। দ্রুত পদক্ষেপে তিনবার এবং শ্লথ পদক্ষেপে চারবার কাবা প্রদক্ষিণ করে তাওয়াফ শেষ করলেন। তারপর মাকামে ইব্রাহিমের সন্নিকটে দাঁড়িয়ে পাঠ করলেন 'ওয়াত্তাখিজু মিম মাকামি ইব্রাহীমা মুসাল্লা (তোমরা ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর স্থানকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো)। এরপর তিনি সেখানে নামাজ পাঠ করলেন। সে সময়ে মাকামে ইব্রাহিম ছিলো কাবা গৃহ ও তাঁর মাঝখানে। ইমাম নাখ্‌ঈ বলেছেন, সমগ্র হেরেম শরীফই মাকামে ইব্রাহিম। আয়াতে বলা হয়েছে 'মীম মাকাম', মাকামের সঙ্গে মিম সংযুক্ত হওয়ায় এর অর্থ হবে আংশিক মাকাম (স্থান), অথবা মাকামে ইব্রাহিম অর্থ মসজিদে হারাম (মসজিদ চত্বর)। ইবনে ইয়ামানী একথা বলেছেন। হজ প্রতিপালনের স্থানসমূহকেও মাকামে ইব্রাহিম বলা যেতে পারে। যেমন আরাফাহ্, মুজদালিফা ইত্যাদি। যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হজরত ইব্রাহিম কাবা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন ওই পাথরটিকেও মাকামে ইব্রাহিম বলা যায়। হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসে একথা প্রমাণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম—মাকামে ইব্রাহিমের সন্নিকটে নামাজের স্থান নির্ধারণ করো।

কোরআন মজীদের আদেশসূচক বাক্যসমূহের লক্ষ্য উম্মতে মোহাম্মদী। হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমর বলেছেন, তিনটি ক্ষেত্রে আমার ধারণা আল্লাহ্পাকের বিধানের অনুরূপ হয়েছে। একটি হচ্ছে— আমি নবীপাক স. এর নিকট আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি যদি মাকামে ইব্রাহিমকে নামাজের স্থান নির্ধারণ করতে পারতাম তবে কতই না উত্তম হতো। সেই মুহূর্তেই অবতীর্ণ

www.eelm.weebly.com

হলো 'মিম মাকামি ইব্রাহীমা মুসাল্লা'। দ্বিতীয়টি হচ্ছে—আমি একবার আরজ করলাম, হে আমার প্রিয়তম নবী, আপনার নিকট বিভিন্ন প্রকৃতির লোক সমাগম হয়, কতই না সুন্দর হতো যদি আপনি উম্মতের জননীগণকে পর্দার নির্দেশ দিতেন। একথা বলার পরক্ষণে অবতীর্ণ হলো পর্দার নির্দেশসম্বলিত আয়াত। তৃতীয়টি হচ্ছে আমি একবার বুঝলাম, রসুলপাক স. তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের প্রতি রুষ্ট। আমি তখন তাঁর সহধর্মিণীগনের নিকটে যেয়ে বললাম, আপনারা আপনাদের আচরণ সম্পর্কে সংযমী হোন। অন্যথায় আল্লাহ্পাক রসুলুল্লাহ্কে আপনাদের চেয়েও উত্তম সহধর্মিণী দান করবেন। আমার একথার পর অবতীর্ণ হলো—'আর নবী যদি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন তবে অনতিবিলম্বে তাঁর প্রতিপালক তাঁকে তোমাদের চেয়ে উত্তম সঙ্গিনী দান করবেন। বোখারী, মুসলিম।

মাসআলাঃ আলোচ্য আয়াত থেকে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক উদ্ভাবন করেছেন—প্রতি তাওয়াফের পর দু'রাকাত নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। হুকুমটি ফরজ হওয়ারই কথা। যেহেতু কোরআনে এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে বলে এবং খবরে ওয়াহিদ (এককবর্ণিত হাদিস) কর্তৃক এ সম্পর্কে বিবরণ এসেছে বলে এই দু'রাকাত নামাজকে চিহ্নিত করা হয়েছে ওয়াজিব বলে। রসুলপাক স. এর আমল দ্বারা এই দু'রাকাত নামাজ ওয়াজিব বলেই প্রতিপন্ন হয়। তাওয়াফের পর তিনি এই দু'রাকাত নামাজ পড়তেনই। এ নামাজ তাঁকে কখনোই পরিত্যাগ করতে দেখা যায়নি। আর নবীপাক স. এর অপরিহার্য আমল উম্মতের জন্য ওয়াজিব। তাছাড়া তিনি হজের প্রাক্কালে এই মর্মে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আমি কীভাবে হজ করি তা লক্ষ্য করো এবং হজের পদ্ধতি শিখে নাও। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন—রসুলপাক স. হজ এবং ওমরার সময়ে কাবা শরীফ তাওয়াফ করতেন (সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করতেন)। দ্রুতপদে প্রদক্ষিণ করতেন তিনবার এবং ধীরলয়ে চারবার। এরপর দু'রাকাত নামাজ পড়ে সাফা মারওয়ায় সায়ী করতেন। বোখারী, মুসলিম। বোখারী শরীফে সনদবিহীন একটি হাদীসে বলা হয়েছে, ইসমাইল বিন উমাইয়া বলেন, আমি জুহ্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, আতা বলে থাকেন তাওয়াফের দু'রাকাত নামাজের পরিবর্তে ফরজ নামাজই যথেষ্ট, তবে সুন্নতের অনুসারী হওয়া উত্তম। রসুলপাক স. তাওয়াফ শেষে দু'রাকাত নামাজ অবশ্যই আদায় করতেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেছেন, এই আয়াতে উল্লেখিত নামাজ পাঠের নির্দেশটি মোস্তাহাব প্রকৃতির। এক বর্ণনা অনুসারে ইমাম মালেকেরও অভিমত এরকম। ইমাম শাফেয়ী থেকেও দু'টি অভিমতের বর্ণনা পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও নির্দেশটি যে ওয়াজিব প্রকৃতির—একথা বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ, আদেশসূচক বাক্যের মাধ্যমে ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়াই সাধারণ নিয়ম। যদি এক্ষেত্রে কখনো কোনো প্রতিবন্ধকতা দৃষ্ট হয় তবে মোস্তাহাব হিসেবে মেনে নেয়া যেতে পারে। তাওয়াফের পরের এই দু'রাকাত

www.eelm.weebly.com

নামাজ অন্যান্য মসজিদে অথবা মসজিদ ছাড়া যে কোনো স্থানে পাঠ করা যাবে বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ কেউ এর বিরোধিতাও করেছেন। বোখারী ও মুসলিমে হজরত উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত হয়েছে রসুলপাক স. একবার হজরত উম্মে সালমাকে বললেন, যখন ফজরের জামাত সমাপ্ত হয় এবং পরে আগমনকারীরা নামাজরত থাকে, তখন তুমি উষ্ট্রারোহিনী হয়ে তাওয়াফ সেরে নিও। হজরত উম্মে সালমা বলেছেন, আমি সেরূপই করেছি। তাওয়াফ শেষে সেখানে নামাজ পড়িনি—সেখান থেকে বের হয়ে এসেছি। সনদ ব্যতিরেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন—হজরত ওমর তাওয়াফের দু'রাকাত নামাজ হেরেম শরীফের বাইরে জী তুয়াতে আদায় করেছেন।

আমি বলি, আচার অনুষ্ঠান সহজসাধ্য করার জন্য সরলতর পরিবেশ সৃষ্টি করাই বাঞ্ছনীয়। নামাজের জন্য যদি কোনো স্থানকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করা হয়, তবে সংকীর্ণতার কারণে নামাজীরা সেখানে অবশ্যই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবেন। এ রকম প্রতিবন্ধকতা সহজসাধ্যতার নিবারণকারী। আল্লাহ্পাকের বিধানের সঙ্গে সংকীর্ণতার সংশ্রব পরিদৃষ্ট হয় না। যেমন বলা হয়েছে, তোমরা বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহ্র ইবাদত করো। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন—নিয়তই প্রতিটি কর্মের ভিত্তি। বর্ণিত আয়াত ও হাদিসের মাধ্যমে এ ব্যাপারটি সুস্পষ্ট যে—নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতসহ সকল ইবাদতই বিশুদ্ধ নিয়তে সম্পাদিত হতে হবে। নামাজ এবং হজের নিয়ত করতে হবে আমলের প্রারম্ভে। জাকাতের ক্ষেত্রে দেয় জাকাত পৃথক করার পর নিয়ত করতে হবে। রোজার নিয়ত করতে হবে সেহেরীর সময়। ইমাম আবু হানিফার মতে প্রাতঃরাশের সময় পর্যন্ত। লক্ষ্যণীয় যে, কোনো ক্ষেত্রেই সময় বা স্থানের সীমাবদ্ধতাকে অপরিহার্য করা হয়নি। তাওয়াফের নামাজও এমনি সংকীর্ণ অর্থে না ধরে এরকম ধরা উচিৎ যে, ওই নামাজের স্থান মাকামে ইব্রাহিম ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ। কোরআনের দাবীও এ রকম। এই নামাজ মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে পড়া যেতে পারে। কারণ, সমগ্র মসজিদ চত্তরই মাকামে ইব্রাহিম সন্নিহিত। যেমন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'মসজিদে হারামকে আমি অবস্থানকারী (এতেক্বাফকারী) ও দূরবর্তীদের জন্য সমান করে দিয়েছি।' আরো এরশাদ করেছেন, 'এ বিধান তাদের জন্য, যারা মসজিদে হারামের অধিবাসী নয়।' আর হজরত ওমর জী তুয়াতে যে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেছিলেন, সম্ভবত তা ছিলো কোনো জরুরী প্রেক্ষিতে।

'নামাজের স্থানরূপে গ্রহণ করো' (ওয়াত্তাখিজু)—এই বাক্যটির ব্যাখ্যা এরকম করলে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, মাকামে ইব্রাহিমের উল্লেখ স্থান নির্দিষ্টকরণের জন্য নয়- বরং সাধারণ অর্থে অনুকূল পরিবেশ সাপেক্ষে এরকম বলা হয়েছে। অর্থাৎ যখন ভীড় থাকতো না এবং মাকামে ইব্রাহিমে নামাজ পাঠ প্রতিবন্ধকতাহীন ছিলো, তখনকার পরিস্থিতি ছিলো আয়াতের লক্ষ্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, 'এবং তোমাদের পালক সন্তান যা তোমাদের ক্রোড়ে বিদ্যমান'—

www.eelm.weebly.com

এখানে ক্রোড়ে বিদ্যমান অর্থ, সার্বক্ষণিক ক্রোড়ে অবস্থান নয়, বরং সন্তান সাধারণত ক্রোড়ে অবস্থান করে বলেই এরকম বাকভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে।

বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বর্ণনা করেছেন- হজরত ইব্রাহিম তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণী এবং প্রিয় পুত্রকে জনশূন্য মক্কায় রেখে চলে গেলেন। কিছুদিন পর বনী জুরহাম গোত্রের লোকেরা সেখানে এসে বসবাস শুরু করলো। যৌবনপ্রাপ্তির পর হজরত ইসমাইল বনী জুরহাম গোত্রের এক রমণীর পানি গ্রহণ করলেন। তখন হজরত ইব্রাহিম বিবি হাজেরা ও হজরত ইসমাইলের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর প্রথমা স্ত্রী বিবি সারার অনুমতি চাইলেন। বিবি সারা অনুমতি দিলেন। সেই সঙ্গে শর্ত জুড়ে দিলেন যে, তিনি (হজরত ইব্রাহিম) তাঁর বাহন থেকে অবতরণ করতে পারবেন না। হজরত ইব্রাহিম মক্কা শরীফে পৌঁছে শুনলেন, হজরত হাজেরা ইন্তেকাল করেছেন। তিনি তখন হজরত ইসমাইলের গৃহে পদার্পণ করলেন। কিন্তু তাঁকে পেলেন না। পুত্রবধূকে জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাইল কোথায়? বধূ বললেন, শিকারে গিয়েছেন। হজরত ইসমাইল হেরেম শরীফের বাইরে মাঝে মাঝে মৃগয়ায় যেতেন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, পানাহারের কোনো ব্যবস্থা আছে কি? বধূ বললেন, না। ঘরে কিছুই নেই। সংসারে খুব অনটন। অতি কষ্টে দিন যাপন করতে হয় আমাদেরকে। হজরত ইব্রাহিম বললেন, তোমার স্বামী মৃগয়া থেকে ফিরে এলে তাঁকে আমার সালাম জানিও এবং বোলো সে যেনো তাঁর দরোজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে। একথা বলে বিদায় নিলেন হজরত ইব্রাহিম। হজরত ইসমাইল মৃগয়া থেকে ফিরে এসে টের পেলেন সমস্ত গৃহ সুবাসিত। বুঝলেন, তাঁর মহান পিতার শুভাগমন ঘটেছিলো। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িতে কে এসেছিলেন? স্ত্রী তিক্ত স্বরে বলে উঠলো, এক অচেনা বৃদ্ধ। হজরত ইসমাইল বললেন, তিনি কিছু বলেছেন কি? স্ত্রী বললো, হ্যাঁ! ঘরের চৌকাঠ বদলে ফেলতে বলেছেন। হজরত ইসমাইল বললেন, তিনি আমার মহানুভব জনক। তিনি আমাকে তোমার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই আমি তোমাকে তালাক দিলাম। এবার তুমি পিতৃগৃহে গমন করো। এরপর হজরত ইসমাইল ওই গোত্রেরই অন্য এক রমণীকে বিয়ে করলেন। কিছু দিন পর বিবি সারার অনুমতি নিয়ে হজরত ইব্রাহিম পুনরায় হজরত ইসমাইলের গৃহে উপস্থিত হলেন। সে দিনও হজরত ইসমাইল গৃহে ছিলেন না। হজরত ইব্রাহিম নববধূকে বললেন, তোমার স্বামী কোথায়? বধূ বললেন, মৃগয়ায়। মনে হয় তিনি এক্ষুণি এসে পড়বেন। আল্লাহ্ যেনো তাই করেন। আপনি বরং নেমে এসে উপবেশন করুন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, আহারের আয়োজন আছে কি? বধূ বললেন, হ্যাঁ। অনেক কিছু আছে। বলেই তিনি দুধ এবং গোশ্‌ত নিয়ে এলেন। সাংসারিক অবস্থা জিজ্ঞেস করাতে বললেন, আল্লাহ্ পাকের কৃপায় আমরা স্বচ্ছন্দ। হজরত ইব্রাহিম সংসারে অধিকতর বরকত বর্ষণের জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে দোয়া

www.eelm.weebly.com

করলেন। সে সময় যদি তাঁর সামনে গম বা যবের রুটি বা খেজুর উপস্থিত থাকতো, তবে প্রার্থনার বদৌলতে মক্কায় অত্যধিক গম, যব বা খেজুর উৎপাদিত হতো। নববধূ নিবেদন করলেন, বাহন থেকে অবতরণ করুন। আমি আপনার মস্তক ধৌত করে দেই। হজরত ইব্রাহিম অবতরণ করলেন না। তখন বধূ নিয়ে এলেন মাকামে ইব্রাহিম নামে খ্যাত সেই পাথর। ডান পাশে রাখলে হজরত ইব্রাহিম সে পাথরে ডান পা স্থাপন করে মস্তক হেলিয়ে দিলেন। বধূটি তাঁর পবিত্র মস্তকের ডানদিক ধুইয়ে দিলেন। এরপর পাথর নিয়ে এসে রাখলেন বাম পাশে। হজরত ইব্রাহিম তার উপর বাম পা রেখে সেদিকে মাথা ঝুঁকালেন। বধূটি তখন মস্তকের বাম পাশ ধুইয়ে দিলেন। তখন পাথরে অংকিত হলো তাঁর পবিত্র পদচ্ছাপ। বিদায়ের প্রাক্কালে হজরত ইব্রাহিম বললেন, তোমার স্বামী গৃহে এলে আমার সালাম জানিয়ে বোলো দরোজার চৌকাঠটি উপযুক্ত। এটি যেনো সে না বদলায়। হজরত ইসমাইল ফিরে এসে পিতৃ শুভাগনের সুবাসে বিমোহিত হলেন। স্ত্রীকে বললেন, বাড়িতে কোনো মহান অতিথি এসেছিলেন কি? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ। এক সৌম্যদর্শন প্রবীণ অতিথি শুভাগমন করেছিলেন। এরপর সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করে পাথরটির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, দেখুন। প্রস্তরোপরি অংকিত রয়েছে তাঁর পবিত্র পদচিহ্ন। হজরত ইসমাইল বললেন, ওই মহামান্য অতিথি ছিলেন আমার সম্মানিত পিতা হজরত ইব্রাহিম। যে চৌকাঠটি তিনি বদলে ফেলতে নিষেধ করেছেন, সেই চৌকাঠটি হচ্ছো তুমি। তিনি আজ্ঞা করেছেন, আমি যেনো তোমাকে ধরে রাখি।

কিছুদিন পর হজরত ইব্রাহিম মক্কায় পুনরাগমন করলেন। হজরত ইসমাইল তখন যমযম কূপের পাশে বসে তীর প্রস্তুত করছিলেন। পিতাকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। সালাম বিনিময় হলো। হজরত ইব্রাহিম প্রিয় পুত্রের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করলেন। তারপর বললেন, বৎস! আল্লাহ্পাক আমার প্রতি নির্দেশ করেছেন, যেনো তুমি আমার সহায়তাকারী হও। হজরত ইসমাইল বললেন, হে আমার মহান পিতা! আজ্ঞা করুন। পিতা বললেন, আল্লাহ্পাক একটি গৃহ প্রস্তুতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুত্র বললেন, আলহামদু লিল্লাহ্। এরপর পিতা-পুত্র মিলে কাবাগৃহ নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। পাথর এনে দিতে লাগলেন পুত্র। গাঁথুনী নির্মাণ করতে থাকলেন পিতা। যখন দেয়াল উঁচু হলো, তখন পুত্র এনে স্থাপন করলেন ওই পাথরটি, যার নাম 'মাকামে ইব্রাহিম।' পিতাপুত্রের যৌথ উদ্যোগে এভাবে ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠতে লাগলো কাবা শরীফের দেয়াল। তাঁরা দু'জনে প্রার্থনা জানালেন, 'রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলীম।' হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, রোকন এবং মাকামে ইব্রাহিম জান্নাতের একটি ইয়াকুত পাথর। হজরত আনাস থেকে ইমাম মালেক মারফু পদ্ধতিতে এই বিবরণটি দিয়েছেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, রসুলে আকরম স. বলেছেন, রোকন এবং মাকামে ইব্রাহিম জান্নাতের ইয়াকুত পাথর। আল্লাহ্পাক পাথর দু'টির জ্যোতি নিষ্প্রভ করে রেখেছেন। যদি এরূপ না করা হতো তবে পূর্ব পশ্চিম উভয় দিগন্ত আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। বর্ণিত আয়াত থেকে মহান ব্যক্তিবর্গ এমতো ধারণা পোষণ করেন যে, আল্লাহ্র অলিগণ যে স্থানে কিছুকাল অবস্থান করেন, সে স্থানের নিসর্গে বরকত ও সাকিনা (শান্তি) অবতীর্ণ হয়। যদ্দরুণ অন্তঃকরণ আল্লাহ্পাকের প্রতি আকর্ষণবোধ করে। সে স্থানে সৎকর্ম করলে দ্বিগুণ পুণ্য অর্জিত হয় এবং পাপকর্মের ফলে জমা হয় দ্বিগুণ শাস্তি।

'পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম'—এই বাক্যটি পবিত্র-পিতা পুত্রের প্রতি আল্লাহ্পাকের একটি অনুগ্রহরঞ্জিত নির্দেশ। কাবা শরীফকে বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্র ঘর) বলার উদ্দেশ্য, গৃহটিকে অধিকতর মর্যাদামন্ডিত করা। আল্লাহ্পাক স্থানাতীত, কালাতীত। তাই বায়তুল্লাহকে পবিত্র রাখার আদেশ দানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাওহীদ ও পবিত্রতার উপর যেনো নিশ্চিত করা হয় এর নির্মিতি। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের ও আতা বলেছেন, নির্দেশটির অর্থ হচ্ছে, মিথ্যাচার, বিগ্রহবন্দনা ও অশ্লীলতা থেকে গৃহটি মুক্ত রাখো। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, সুগন্ধিদ্রব্য প্রজ্বলিত করো এবং বেশী পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখো।

যাদের জন্য কাবা গৃহকে পবিত্র রাখতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তারা হচ্ছেন— তাওয়াফকারী, রুকু ও সেজদাকারী (নামাজ পাঠকারী) এবং এতেক্বাফকারী (অবস্থানকারী)।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১২৬

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

❒ স্মরণ কর যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! ইহাকে নিরাপদ শহর করিও, আর ইহার অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করিবে তাহাদিগকে ফলাহার করিতে দিও।' তিনি বলিলেন, 'যে কেহ সত্য প্রত্যাখ্যান করিবে তাহাকেও কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিব। অতঃপর তাহাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব এবং উহা কত নিকৃষ্ট পরিণাম।'

---

www.eelm.weebly.com

নিরাপদ শহর অর্থ শান্তির ঘর, শান্তির আলয় বা শান্তিধাম। এই শান্তির শহর মক্কায় যারা বস বাস করবে তারা নিরাপদ। মক্কা ছিলো পাহাড়বেষ্টিত, সন্নিহিত ভূমি ছিল ফসল উৎপাদনের অনুপযোগী মরুভূমি—তাই হজরত ইব্রাহিম আহার্য বস্তুরূপে ফলমূল প্রার্থনা করেছিলেন। একটি অসমর্থিত উক্তিতে বর্ণিত হয়েছে, পূর্বে তায়েফ নগরী ছিল সিরিয়ায়। হজরত জিব্‌রাইল সেখান থেকে নগরীটি নিয়ে এসে মক্কার অনতিদূরে স্থাপন করেন। তায়েফে প্রচুর পরিমাণে ফলমূল উৎপাদিত হয় এবং সেগুলো বাজারজাত হয় মক্কায়। হজরত ইব্রাহিমের প্রার্থনার বদৌলতে মক্কা শান্তির শহর হয়েছে এবং আজও সেখানে আহার্যরূপে প্রচুর ফলমূল পাওয়া যায়। তাঁর দোয়ার অন্তর্ভূত ছিলেন কেবল বিশ্বাসীরা। তাদের শান্তি ও রিজিকের জন্য ছিলো তাঁর প্রার্থনা। উদ্দেশ্য ছিলো মক্কাবাসীরা যেনো কাফের বা অবিশ্বাসী না হয়। প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ্‌তায়ালার বক্তব্য থেকে একথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মক্কাবাসী নিরাপত্তা লাভ করবে ও রিজিকপ্রাপ্ত হবে। এতে বুঝা যায়, পার্থিব সুযোগ সুবিধা মুমিন ও কাফের উভয়েরই জন্য। আল্লাহ্‌পাকের এক নাম 'রহমান'। পৃথিবীবাসী সকলের জন্যই তিনি রহমান (দয়ালু)। রহীম শব্দের অর্থও দয়ালু। কিন্তু এই দয়া বন্টিত হবে আখেরাতে এবং তা পাবে কেবল বিশ্বাসীরা। অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের মতো পার্থিব সকল সুবিধা পেলেও তারা কখনো নবুয়ত ও ইমামত লাভ করবে না। এই অনুগ্রহ কেবলই বিশ্বাসীদের জন্য।

'যে সত্য প্রত্যাখ্যান করবে তাকেও কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিব'—এ কথার মাধ্যমে বুঝা যায় পারলৌকিক অর্জনের তুলনায় পার্থিব অর্জন অত্যন্ত অপ্রতুল। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌পাকের নিকট পার্থিব সাফল্য মূল্যহীন। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন– যদি আল্লাহ্‌পাক এ বিশ্বজগতকে মাছির ডানার মতো মূল্যবানও মনে করতেন তবে তিনি অবিশ্বাসীদিগকে এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেন না। হজরত সহল বিন সাদ থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

অবিশ্বাসীরা তাদের অবিশ্বাসের কারণে পার্থিব জীবনে অধিক নেয়ামত ভোগ করে, কিন্তু পারলৌকিক জীবনে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা। পার্থিব ভোগোন্মত্ততা আল্লাহ্‌পাকের নিকট ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত। সম্ভবত সে কারণেই অবিশ্বাসীরা বিপুল বিত্তবৈভবের অধিকার পায়। আল্লাহ্‌পাক তাই ঘোষণা করেছেন, যদি মানব সম্প্রদায় একই বংশভূত না হতো, তবে যারা নিরেট অবিশ্বাসী তাদের গৃহের ছাদ ও সিঁড়ি হতো রৌপ্যনির্মিত। দরোজাগুলোও হতো সেরকম। তারা তাদের মূল্যবান গৃহে তখতে হেলান দিয়ে থাকতো। এ সমস্ত হচ্ছে পার্থিব ভোগলালসার উপকরণ। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, পৃথিবী অভিশপ্ত। আল্লাহ্‌পাকের জিকির বা জিকির সম্পর্কিত জ্ঞান—এ জ্ঞানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ব্যতিরেকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইব্‌নে

www.eelm.weebly.com

মাজা। তিবরানী তাঁর আওসাত এবং কবীরে বিশুদ্ধ সনদে হজরত আবু দারদা থেকে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। পুস্তকদ্বয়ে এরকম বলা হয়েছে, যে সকল উপকরণ দ্বারা আল্লাহ্পাকের সন্তোষ অর্জন করা যায়, সেগুলো ছাড়া অন্য সকলকিছুই অভিশপ্ত। অবিশ্বাসীদেরকে জোর করে দোজখের দিকে ঠেলে দেয়া হবে। তাই এই আয়াতে বলা হয়েছে, জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করবো। মুজাহিদ বলেছেন, মাকামে ইব্রাহিমের সন্নিকটে এই বিষয়টি লিপিবদ্ধ ছিলো যে, 'আমি আল্লাহ্ মক্কার মালিক। যে দিন চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি করেছি, সেদিন আমি মক্কাকেও সৃষ্টি করেছি। পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির সময় থেকেই আমি মক্কাকে করে রেখেছি মর্যাদামন্ডিত। সাতজন ফেরেশতার মাধ্যমে আমি মক্কার রক্ষণাবেক্ষণ করি। তিনটি পথে এখানে রিজিক উপস্থিত হয়। এখানকার পানি ও গোশ্ত বরকতময়।'

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১২৭, ১২৮

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

❐ যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল কাবা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিতেছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।'

❐ 'হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের উভয়কে একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার অনুগত এক উম্মত করিও। আমাদিগকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখাইয়া দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু।

হজরত ইব্রাহিম ছিলেন কাবা নির্মাতা এবং তার প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইল ছিলেন নির্মাণসহকারী। এ কারণেই আয়াতে তাঁদের নাম পাশাপাশি উল্লেখিত না হয়ে কিঞ্চিত ব্যবধানে উল্লেখিত হয়েছে। নির্মাতাকে প্রাধ্যান্য দেয়াই এ রকম বাক ভঙ্গির উদ্দেশ্য। বিবরণভঙ্গিটি এখানে নিত্যবৃত্ত অতীতের।

বাগবী বলেছেন, জগত সৃষ্টির দু'হাজার বৎসর পূর্বে কাবা গৃহের নির্ধারিত স্থান সৃজিত হয়েছে। স্থানটি শুভ্র ফেনপুঞ্জরূপে পানিতে ভাসমান ছিলো। ওই

www.eelm.weebly.com

ফেনপুঞ্জের তলদেশে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয় মাটি। হজরত আদম পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণ করে বিজন জঙ্গলবেষ্টিত পরিবেশ দেখে ভীতবিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি আল্লাহ্পাকের সাহায্য কামনা করলেন। আল্লাহ্পাক তখন ইয়াকুত মর্মর নির্মিত এবং পূর্ব ও পশ্চিমমুখী জমরূদ নির্মিত দরোজাবিশিষ্ট বায়তুল মামুরকে ধরাপৃষ্ঠে নামিয়ে দেন। এবং তা স্থাপন করেন বায়তুল্লাহ্র স্থানে। নির্দেশ জারী করেন, 'হে আদম। জান্নাতে যেমন তুমি এই ঘরের তাওয়াফ করতে তেমনি এখানেও তাওয়াফ করো, সেখানে যেমন নামাজ আদায় করতে এখানেও তেমনি নামাজ আদায় করো।' বায়তুল মামুরের সাথে সাথে হাজারে আস্ওয়াদকেও পৃথিবীতে নামিয়ে আনা হয়। সে সময়ে পাথরটি ছিলো শুভ্র ও জ্যোতির্ময়। অন্ধকার যুগের অপবিত্রা এক নারীর স্পর্শে পাথরটি হয়ে পড়ে জ্যোতিহীন, কৃষ্ণ।

আল্লাহ্পাকের নির্দেশ পেয়ে হজরত আদম হিন্দুস্থান থেকে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। এক ফেরেশ্তা ছিলেন তাঁর পথ প্রদর্শক। মক্কায় পৌঁছে তিনি প্রথমে হজ সমাধা করলেন। ফেরেশতারা বললেন, আপনার হজ কবুল হয়েছে। আমরা দু'হাজার বৎসর আগেই এ গৃহে হজ সমাধা করেছি।

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন— হজরত আদম ভারত থেকে পদব্রজে চল্লিশবার হজ আদায় করেছেন। হজরত নুহের মহাপ্লাবন পর্যন্ত বায়তুল মামুর কাবা শরীফের স্থলেই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। প্লাবনলগ্নে তাঁকে চতুর্থ আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। এখনো সেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশ্তা আগমন করে এবং জিয়ারত শেষে ফিরে যায়। পুনঃ জিয়ারতের সুযোগ তাদের আর কোনো দিনও আসে না। মহাপ্লাবন শুরু হলে আল্লাহ্পাক হজরত জিব্রাইলকে নির্দেশ দিলেন, হাজরে আসওয়াদকে প্লাবন থেকে রক্ষা করো। আবু কুবাইস পাহাড়ে পাথরটিকে প্লাবনস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখো। বায়তুল মামুরের শূন্যস্থানটি হজরত ইব্রাহিম কর্তৃক কাবা নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত শূন্যই ছিলো। হজরত ইব্রাহিমের গৃহে যখন হজরত ইসমাইল এবং হজরত ইসহাক জন্মগ্রহন করলেন, তখন আল্লাহ্ হজরত ইব্রাহিমকে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। হজরত ইব্রাহিম জানতে চাইলেন— কোথায় হবে সেই মহান কাবার অবস্থান? আল্লাহ্পাক তখন অবতীর্ণ করলেন একটি সাকীনা-দ্বি-মস্তকবিশিষ্ট সর্পাকৃতির একটি তীব্র ঘূর্ণিবাত্যা। আল্লাহ্পাক জানালেন, এই সাকীনা যেখানে গিয়ে স্থির হবে সেই স্থানটিই কাবার স্থান। ঘূর্ণিবাত্যা চলতে চলতে নির্ধারিত স্থানে গিয়ে স্থির হলো। সেখানেই হজরত ইব্রাহিম কাবা নির্মাণ শুরু করলেন। হজরত আলী এবং হাসানের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন— আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করেন একটি চলন্ত মেঘ। মেঘখন্ডটি নির্ধারিত স্থানের দিকে ভেসে চলছিলো। আর হজরত ইব্রাহিমও তাঁর ছায়ায় পথ চলছিলেন। মেঘখন্ডটি একস্থানে এসে স্থির হলো। হজরত ইব্রাহিম সেখানে দাঁড়ালেন। নির্দেশ এলো এখানেই গৃহ নির্মাণ করো।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, আল্লাহ্পাকের নির্দেশে হজরত জিব্রাইল হজরত ইব্রাহিমকে কাবা শরীফের স্থান দেখিয়ে দিয়েছেন। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস বলেছেন— হজরত ইব্রাহিম পাঁচ পাহাড়ের পাথর দিয়ে কাবা নির্মাণ করেছিলেন। পাহাড়গুলো হচ্ছে- ১. হেরা, ২. সিনাই, ৩. সিরিয়ায় অবস্থিত লুবনান, ৪.জুদী এবং ৫.জায়তা। ভিত্তিস্থাপন হয়েছিলো হেরা পর্বতের পাথর দ্বারা। দেয়ালের গাঁথুনি যখন বর্তমানে রক্ষিত হাজরে আসওয়াদের উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছলো তখন হজরত ইব্রাহিম বললেন, ইসমাইল! এখানে সুন্দর একটি পাথর স্থাপন করো, যাতে এদিকে তাওয়াফকারীদের অন্তর আকৃষ্ট হয়। হজরত ইসমাইল অনেক অনুসন্ধান করে একটি পাথর নিয়ে এলেন, কিন্তু হজরত ইব্রাহিমের তা মনঃপুত হলো না। তিনি এর চেয়ে সুন্দর পাথর সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিলেন। পুনরায় অন্বেষণে লিপ্ত হলেন হজরত ইসমাইল। পাহাড়ে পাহাড়ে সুন্দর পাথর খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। এমন সময় আবু কুবাইস পাহাড় থেকে উচ্চারিত হলো- হে ইসমাইল! আপনার একটি গচ্ছিত সম্পদ রয়েছে আমার জিম্মায়। সম্পদটি নিয়ে আমাকে দায়মুক্ত করুন। হজরত ইসমাইল পর্বতাভ্যন্তর হতে পাথরটি নিয়ে কাবা শরীফের দেয়ালে রাখলেন। এভাবেই হাজরে আসওয়াদ পেলো তার যথা অবস্থান।

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্পাক আকাশে একটি ঘর তৈরী করেছিলেন, তার নাম 'বায়তুল মামুর'। ফেরেশতাদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, বায়তুল মামুরের ছায়া অবলম্বনে জমিনে একটি ঘর প্রস্তুত করো। কেউ বলেছেন, হজরত আদমই সর্বপ্রথম কাবাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। মহাপ্লাবনের সময় সে ঘরের চিহ্ন মুছে গেলে হজরত ইব্রাহিম তা পুনঃনির্মাণ করেন।

কাবা নির্মাণকালে পিতা-পুত্র মিলে প্রার্থনা করেছিলেন— হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! তুমি আমাদের এই কাজ গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। অর্থাৎ হে আমাদের আল্লাহ্! তুমি সর্বশ্রোতা তাই আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করো এবং সর্বজ্ঞাতা তাই আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তুমি সবিশেষ অবহিত। হে আমাদের আল্লাহ্! তুমি তোমার সকল নির্দেশের প্রতি আমাদেরকে বিশুদ্ধ সংকল্পবিশিষ্ট ও পূর্ণসমর্পিত করে দাও। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, সেই প্রকৃত মুসলমান যার বাক ও রসনা থেকে অন্য মুসলমানেরা নিরাপদ। একথার তাৎপর্য হচ্ছে যে, প্রকৃত মুসলমান সেই, যে পাপমুক্ত। যার দ্বারা অন্য মানুষের কোনো ক্ষতির আশংকা নেই। ইসলামের প্রকৃত রূপ এরকমই। প্রবৃত্তি প্রশান্ত (মোতমাইন্না) হলেই কেবল এই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায়।

আমার বংশধর থেকে তোমার অনুগত এক উম্মত সৃষ্টি করো— একথার মাধ্যমে বুঝা যায়, পরবর্তী বংশধরদের জন্য তাঁর স্নেহসিক্ত প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে— কিন্তু সে প্রার্থনা সামগ্রিকভাবে সকলের জন্য নয়। তাই 'মিন জুররিয়্যাতিনা

www.eelm.weebly.com

(আমার বংশধর থেকে) এরকম বলেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর পরবর্তী বংশধরগণের সবাই বিশ্বাসী হবেন না। কেউ কেউ হবে কাফের।

'মানাসিকানা' অর্থ ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি। প্রধানতঃ হজের নিয়ম পদ্ধতি। 'নুছক্' শব্দের প্রকৃত অর্থ কঠোর উপাসনা। হজ শ্রমসাধ্য ইবাদত বলেই 'মানাসিক' শব্দের মর্ম গ্রহণ করা হয়েছে হজ রূপে। বাগবী বলেছেন, আল্লাহ্পাক পিতাপুত্রের এই প্রার্থনাও কবুল করেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে আরাফার দিনে হজরত জিব্রাইলের মাধ্যমে হজের সকল অনুষ্ঠান শিক্ষা দিয়েছিলেন। আরাফার মাঠে হজের নিয়মপদ্ধতি শিক্ষাদানের পর হজরত জিব্রাইল, হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসমাইলকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন- আপনারা কি হজ অনুষ্ঠানের পরিচয় লাভ করেছেন। তাঁরা জবাব দিয়েছিলেন, হ্যাঁ। সেদিন থেকে ওই স্থানের নাম হয় আরাফাহ্। যার অর্থ পরিচয় বা পরিচিতি।

আমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হও (ওয়াতুব আলাইনা) —এ কথার অর্থ আমাদের তওবা কবুল করো। নবী রসুলগণের এরকম প্রার্থনা পাপ থেকে অব্যাহতির উদ্দেশ্যে নয়, কারণ তাঁরা পাপহীন। প্রার্থনার এরকম বাকভঙ্গির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্ পাকের সকাশে চরমতম বিনয় প্রকাশ করা, উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা এবং এ কথার সত্য সাক্ষ্য ঘোষণা করা যে— নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু (তাওয়াবুর রহীম)।

সুরা বাকারাঃ আয়াত ১২৯

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

❒ হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এক রসুল প্রেরণ করিও যে তোমার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট আবৃত্তি করিবে; তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবে। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

এই আয়াতটিও একটি পবিত্র প্রার্থনা। বলা বাহুল্য, এই প্রার্থনাও আল্লাহ্পাক মঞ্জুর করেছিলেন। যে মহান রসুলের জন্য ছিলো হজরত ইব্রাহিম আ.– এর আর্তি; সেই রসুল অবশেষে এসেছিলেন। তিনি হচ্ছেন—রহ্মাতুল্লিল আলামিন— হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্ সাল্লাম।

www.eelm.weebly.com

তিনি এরশাদ করেছেন, হজরত আদম যখন মাটি ও পানিতে, আমি তখনও নবী। আমি হজরত ইব্রাহিমের প্রার্থনা, হজরত ঈসার ভবিষ্যত বাণী আর আমার সম্মানিতা মায়ের স্বপ্নফল। আমার জন্মের সময়ে আমার মা দেখেছিলেন আমার মধ্য থেকে এমন একটি জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে; যার আলোকচ্ছটায় সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ এসে পড়েছে দৃষ্টিসীমানায়। শরহে সুন্নাহ্ গ্রন্থে বাগবী এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। হজরত আবু উমামা থেকে ইমাম আহমদও এরূপ বলেছেন।

আয়াতসমূহ আবৃত্তি করবেন– এখানে আয়াত অর্থ তওহীদ (এককত্ব) ও নবুয়তের নিদর্শনাবলী। হিকমত শিক্ষা দিবেন– এ কথার অর্থ মারেফাতে ইলাহী (আল্লাহ্ পরিচিতি) এবং শরিয়তের বিধানাবলী শিক্ষা দিবেন। হিকমতের আরেক অর্থ সুন্নতে রসুল (রসুলের আদর্শ)। আরেক অর্থ তকদীর অথবা ইলমে ফিকাহ্ হওয়াও সম্ভব। তাদেরকে পবিত্র করবেন—এ কথার অর্থ মানুষকে শিরিক ও পাপ থেকে পবিত্র রাখবেন। কেউ কেউ বলেছেন, জাকাত আদায় করবেন। ইবনে ফিসল বলেছেন, তিনি কিয়ামতের দিন মানুষের ফাসেক হওয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে 'ইন্নাকা আন্তাল আযীযুল হাকীম।' হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আযীয অর্থ সমকক্ষতাহীন। কালাবী বলেছেন, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। কেউ কেউ বলেছেন, যিনি অজেয় তিনিই আযীয। কেউ আবার বলেছেন, অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই যিনি বিজয়ী তিনিই আযীয। 'হাকীম' শব্দের অর্থ কুশলী। চরম কুশলী। সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানী। আল্লাহপাকই সমধিক অবগত।

হজরত ইবনে আসাকের বলেছেন—একবার হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সালমা এবং মুহাজিরকে বললেন, তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। তোমরা তো জানোই তওরাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, আমি ইসমাইলের বংশে একজন নবী প্রেরণ করবো যার নাম হবে আহ্মদ। সেই নবীকে যে বিশ্বাস করবে সে পথপ্রাপ্ত হবে। যে বিশ্বাস করবে না সে হবে অভিশপ্ত। পিতৃব্যের কথা শুনে সালমা মুসলমান হয়ে গেলেন। আর মুহাজির করলো অস্বীকার। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো–

সুরা বাকারাঃ আয়াত ১৩০, ১৩১, ১৩২

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرٰهِيْمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى

www.eelm.weebly.com

الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ وَوَصّٰى بِهَا إِبْرٰهِيمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

❒ যে নিজেকে নির্বোধ করিয়াছে সে ব্যতীত ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ হইতে আর কে বিমুখ হইবে। পৃথিবীতে তাহাকে আমি মনোনীত করিয়াছি; পরকালেও সে সৎকর্ম পরায়ণগণের অন্যতম।

❒ তাহার প্রতিপালক যখন তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর' সে বলিয়াছিল 'বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।'

❒ এবং ইব্রাহীম ও ইয়াকুব এই সম্বন্ধে তাঁহাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছিল, 'হে পুত্রগণ। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করিয়াছেন। সুতরাং, আত্মসমর্পণকারী না হইয়া তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করিও না।'

মিল্লাতে ইব্রাহিম বা হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ ।।বালোকের মতো উদ্ভাসিত। এই অনন্যসাধারণ ধর্মমত অবিশ্বাসী, অংশীবাদী, ইহুদী, খৃষ্টান সকলের নিকট সমাদৃত। যারা প্রকৃতার্থে নির্বোধ তারাই এই ধর্মমত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, 'যে নির্বোধ সে ছাড়া কে এমন আছে, যে ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ থেকে বিমুখ!'

'সাফিহা নাফ্সাহু' অর্থ, যে নিজেকে নির্বোধ করেছে। 'সাফিহা' শব্দের প্রকৃত অর্থ– চঞ্চল, অপরিণামদর্শী। লাভক্ষতির চিন্তা না করেই যে কর্মসম্পাদন করে, তাকেই বলে নির্বোধ (সাফিহা)। এই নির্বুদ্ধিতা কখনো সত্তাগত, কখনও মতাদর্শগত। যখন নির্বুদ্ধিতার কারণে অপমান, লাঞ্ছনা বা ধ্বংস অবধারিত হয়, অথবা আদর্শগত চাঞ্চল্য মূর্খতাকে প্রকট করে দেয়, তখন চঞ্চলমতি সেই ব্যক্তিকে রূপক অর্থে সাফিহা বা নির্বোধ বলা হয়। নির্বোধ ওই ব্যক্তি যে লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের মুখে নিজেকে ঠেলে দেয়। এজন্যে কোনো কোনো ভাষ্যকার এমতো অর্থ করেছেন যে, যে নিজের সত্তাকে লাঞ্ছিত করেছে সেই স্রষ্টাকে অস্বীকার করেছে। সে তখন প্রকৃত স্রষ্টাকে ছেড়ে তারই অনুরূপ অন্য কোনো সৃষ্টির উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে। ইবনে কিসান এবং জুযাজ বলেছেন, 'সাফিহা নাফসাহু' এর অর্থ, স্বীয় সত্তা সম্পর্কে অজ্ঞ। যারা গায়রুল্লাহ্র ইবাদত করে তারা আপন অস্তিত্বের পরিচয় রাখে না। তাই বলা হয়েছে, 'মান আরাফা নাফসাহু ফাক্বদ আরাফা রব্বাহু (যে নিজেকে জানে সে তার প্রভু প্রতিপালককে জানে)।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, 'মান আরাফা নাফসাহু' অর্থ, যে নিজে এই সত্য অবহিত হয়েছে যে, সে সম্ভাব্যের বৃত্তবাসী– সে তার অস্তিত্বের সংরক্ষক নয়। অস্তিত্ব, স্থিতি ও স্থায়ীত্ব – সকল কিছুই তার চিন্তার অতীত। আপন সত্তার প্রতি তার কোনো নির্ভরতা নেই। আল্লাহ্পাক যতোক্ষণ তাকে সংরক্ষণ করেন, ততোক্ষণই তার বিদ্যমানতা। আর সেই পরম সত্তা সম্ভাব্য জগতের আয়নায় প্রতিফলিত। প্রতিবিম্বরূপে বিরাজমান তিনিই গগনমন্ডল ও মেদিনীমন্ডলের নূর। সৃষ্টি তাঁর সত্তার যতোটুকু নিকটে, তিনি তদপেক্ষা অধিক সন্নিকটবর্তী। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই। যিনি এই জ্ঞান অর্জন করেছেন, তিনি মারেফাত (পরিচিতি) লাভ করেছেন। যে ব্যক্তি স্বীয় সত্তার এই অসহায়ত্বের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অনবহিত সে তার পরমপ্রতিপালকের মারেফাত থেকে বঞ্চিত।

আল্লাহ্পাক একবার দাউদ আ. – কে বললেন, হে দাউদ! তুমি তোমার সত্তার অনুসন্ধান করো, তাহ্লে আমার পরিচয় লাভ করবে। হজরত দাউদ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি কি করে আমার সত্তা ও আপনার পরিচয় লাভ করবো? আল্লাহ্পাক বললেন, তোমার অক্ষমতা, দুর্বলতা ও ক্ষয়িষ্ণুতা সম্পর্কে চিন্তা করো। সেই সাথে চিন্তা নিবদ্ধ করো আমার ক্ষমতা, স্থায়ীত্ব ও কর্মকুশলতা সম্পর্কে।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, যে জ্ঞান প্রত্যক্ষ, যে জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত হয় নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস- শরিয়তের পরিভাষায় সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। অজ্ঞতা ও মূর্খতা এর বিপরীতার্থক বস্তু। জ্ঞান লাভ করার কয়েকটি উপায় রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে দর্শন নির্ভর, আরেকটি দলিল প্রমাণ নির্ভর এবং আরেকটি ওহী (প্রত্যাদেশ) নির্ভর। এলহাম বা ওহীর প্রতিবিম্ব দ্বারাও কখনো কখনো জ্ঞান অর্জিত হয়। মারেফাত হচ্ছে প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল। মারেফাতবিদগণের কৃপাদৃষ্টিও মারেফাত লাভের মাধ্যম। মূর্খতা যেমন জ্ঞানের বিপরীত, তেমনি মারেফাত বা পরিচয়েরও পরিপন্থী। আলোচ্য আয়াতে সাফিহা শব্দের মাধ্যমে যে নির্বুদ্ধিতার কথা বলা হয়েছে, সেই মূর্খতা বা অজ্ঞতা মারেফাতের পরিপন্থী। এমতাবস্থায় যে নির্বোধ বা নিজেকে নির্বোধ করেছে, একথার অর্থ দাঁড়াবে এরকম– যে দিব্যদৃষ্টিতে স্বীয় সত্তাকে চিনেনি।

পৃথিবীতে আমি তাঁকে মনোনীত করেছি– একথার অর্থ হবে, আমি তাঁকে (হজরত ইব্রাহিমকে) খলিল বা বন্ধু বলে সম্বোধন করেছি। আর তিনি পরকালেও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত, বরং অন্যতম। 'সলিহিন' অর্থ সৎকর্মশীল হওয়া। সলেহ শব্দটি ফাসাদ শব্দের বিপরীত শব্দ। সলেহ শব্দের প্রকৃত অর্থ, অপরাধমুক্ত। হৃদয় অথবা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংক্রান্ত সকল অপরাধ থেকে মুক্ত। এই বিশুদ্ধতা নিষ্পাপ অবস্থাজাত। পাপ থেকে দূরত্ব যতো বাড়বে বিশুদ্ধতাও ততো অর্জিত হবে। বর্ণিত আয়াতে সলেহ অর্থ হবে, সলেহে কামেল বা পূর্ণ বিশুদ্ধতা। এই আয়াতটি যেনো পূর্ববর্তী আয়াতের প্রতিধ্বনি বা প্রমাণ। সার বক্তব্য হচ্ছে এই

www.eelm.weebly.com

যে, যে ব্যক্তির মধ্যে এতাদৃশ গুণাবলী বিদ্যমান— একমাত্র চঞ্চলমতি, নির্বোধ ও মূর্খ ছাড়া অন্য কেউ তাঁর আনুগত্যবিমুখ হবে না।

আল্লাহ্পাক যখন তাঁকে (হজরত ইব্রাহিমকে) বলেছিলেন, 'আসলিম' (আত্মসমর্পণ করো)। তখন তিনি বলেছিলেন, মহাবিশ্বের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আতা বলেছেন, আসলিম অর্থ, সত্তা ও সত্তাজাত সকল ক্রিয়াকলাপ আল্লাহ্র নিকট সমর্পণ করা। কালাবী বলেছেন, ধর্ম ও উপাসনারীতিকে বিশুদ্ধতার অলংকারে অলংকৃত করা। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম যখন পর্বত গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, তখন আল্লাহ্পাক তাঁকে 'আত্মসমর্পণ করো' কথাটি বলেছিলেন। তাই আয়াতের মর্ম হবে— সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন আল্লাহ্পাক তাঁকে এমতো সম্বোধন করেছিলেন এবং তিনি নির্দ্বিধায় তাঁর প্রতিপালকের নিকট সমর্পণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। যদি তোমরা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হও, তবে বুঝবে ইব্রাহিম আমার কতো প্রিয়।

হজরত ইব্রাহিমের সমর্পণের ঘোষণার প্রতিদান নির্ধারিত হলো এভাবে—নমরুদ তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে চড়কের সাহায্যে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করলো। তৎক্ষণাৎ হজরত জিবরাইল এসে বললেন, আমি কি আপনার প্রয়োজনে আসতে পারি? হজরত ইব্রাহিম বললেন, না। আপনার কোনোই প্রয়োজন নেই। তিনি পুনরায় বললেন, আল্লাহ্পাকের নিকট প্রার্থনা করুন। নবী ইব্রাহিম বললেন, তিনি আমাকে দেখছেন। সুতরাং প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহ্পাকের প্রতি তাঁর এই নির্ভরতা ও সমর্পণের বরকতে আল্লাহ্পাক অগ্নিকুন্ডকে তাঁর জন্য শান্তিদায়ক কুঞ্জে পরিণত করে দিলেন। দীর্ঘদিনের প্রজ্বলিত লেলিহান অগ্নি তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারলো না।

হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইয়াকুব এই মর্মে তাঁদের পুত্রগণকে নির্দেশ (অসিয়ত) করেছিলেন, হে পুত্রগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ো না। শুভকর্মের নির্দেশ দানকে বলে অসিয়ত। অসিয়ত শব্দের প্রকৃত অর্থ মিলন। অসিয়তকারী তাঁর অসিয়তকে অসিয়তকৃতের সঙ্গে মিলিয়ে দেন বলে এ রকম নির্দেশ-উপদেশকে বলে অসিয়ত।

হজরত ইব্রাহিমের সন্তান ছিলেন আটজন। হজরত ইসমাইল ছিলেন হজরত হাজেরা কিবতীয়ার গর্ভজাত। হজরত ইসহাক ছিলেন হজরত সারার পুত্র। অবশিষ্ট ছয় সন্তানের জননী ছিলেন কেনানবাসী ইয়াকতিনের কন্যা কানতুরা। হজরত সারার মৃত্যুর পর হজরত ইব্রাহিম তাঁর পাণি গ্রহণ করেছিলেন। এই আট সন্তানকে অসিয়ত করেছিলেন হজরত ইব্রাহিম। আর হজরত ইয়াকুব অসিয়ত করেছিলেন তাঁর দ্বাদশ পুত্রকে।

www.eelm.weebly.com

যে দ্বীনকে মনোনীত করার কথা আয়াতে বলা হয়েছে, সে দ্বীন হচ্ছে দ্বীন ইসলাম। আর সেই পরিস্থিতিতেই মৃত্যু কামনা করা উচিত, যখন বিশুদ্ধ বিশ্বাস অটুট থাকে এবং সকল কার্যকলাপ সমর্পিত হয় আল্লাহ্‌র সমীপে। নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসবেই। সুতরাং মৃত্যুবরণ করা না করা কোনো ইচ্ছাধীন বিষয় নয়। তাই আয়াতের মর্ম হবে এরকম— সদাসতর্ক হও! সমর্পিতপ্রাণ এবং ইসলাম যেনো কোনো অবস্থাতেই আয়ত্তচ্যুত না হয়। সমর্পণ ও ইসলামবিহীন অবস্থায় যদি মৃত্যু সমুপস্থিত হয়— তবে পরিণামে কল্যাণের বদলে আসবে অকল্যাণ। তাই 'মৃত্যুবরণ কোরো না'— একথায় মৃত্যুর প্রতি নয়, ইসলামবিচ্যুতির প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।

অভিশপ্ত ইহুদীরা মহানবী স. এর সকাশে একবার নিবেদন করলো, আপনার কি জানা নেই যে, হজরত ইয়াকুব তাঁর অন্তিম সময়ে সন্তানদের প্রতি এই মর্মে অসিয়ত করেছিলেন যে, তাঁরা যেনো ইহুদী ধর্মের প্রতি অটল থাকে। এখন দেখি আপনি আমাদেরকে ইহুদীবাদ থেকে পৃথক করতে চাইছেন। তাদের এহেন অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৩৩, ১৩৪

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ
مِن بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم
مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

❑ ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু আসিয়াছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করিবে?' তাহারা তখন বলিয়াছিল, 'আমরা আপনার এক আল্লাহের ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইস্হাকের আল্লাহেরই ইবাদত করিব। এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

www.eelm.weebly.com

❐ এই উম্মত অতীত হইয়াছে— তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের; তোমরা যাহা অর্জন করিবে তাহা তোমাদের। তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না।

ইহুদীদের মিথ্যাচারের জবাবে আল্লাহ্পাক জানাচ্ছেন, হে ইহুদীরা— তোমরা হজরত ইয়াকুব সম্পর্কে অযথা অপবাদ দিচ্ছো কেনো? তিনি যখন অসিয়ত করছিলেন, তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে? ছিলে না। তবে কেনো তোমরা এমতো দাবি পেশ করছো যে, হজরত ইয়াকুব তাঁর সন্তানদেরকে ইহুদীবাদের উপর স্থির থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে— এই প্রশ্নটি মুমিনদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। যদি তাই হয়, তবে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে বিশ্বাসীরা! হজরত ইয়াকুব যখন অসিয়ত করেছিলো তোমরা কি তখন সেখানে ছিলে? ছিলে না। বরং আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তোমাদেরকে সে সময়ের প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে জানাচ্ছেন। প্রকৃত ঘটনা হলো হজরত ইয়াকুব তাঁর সন্তানদেরকে ইসলামের উপরে স্থির থাকবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আতা বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার নিয়ম এই যে, অন্তিম সময়ে নবী ও রসুলগণকে পৃথিবীতে থাকা না থাকা— উভয়টির অধিকার দান করেন। এই নিয়ম অনুসারে হজরত ইয়াকুবের অন্তিম সময়ে জানিয়ে দেয়া হলো, মৃত্যু সমুপস্থিত, এখন আপনার ইচ্ছা— আপনি এখুনি যাবেন, যাত্রা বিলম্বিত করবেন; না কি যাবেনই না। হজরত ইয়াকুব অসিয়ত সম্পাদন পর্যন্ত থাকতে সম্মত হলেন এবং তাঁর সন্তানদেরকে আয়াতে বর্ণিত নির্দেশ দানের পর যাত্রা করলেন পরপারে।

হজরত ইয়াকুব বলেছিলেন, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে? পুত্রগণ বলেছিলেন, আমরা আপনার এক আল্লাহর ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের আল্লাহ্র ইবাদত করবো। এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী। এখানে তাঁদের আসল পিতৃপুরুষ হচ্ছেন— হজরত ইব্রাহিম, হজরত ইসহাক এবং হজরত ইয়াকুব। হজরত ইসমাইল ছিলেন হজরত ইসহাকের ভ্রাতা। তাঁর বংশধারা ভিন্ন। তবুও পিতৃব্য হওয়ার সূত্রে তিনিও এখানে বনী ইসরাইলদের পিতৃপুরুষ হিসেবে উচ্চারিত হয়েছেন। আরববাসীদের নিয়ম হচ্ছে— তাঁরা পিতৃব্যকে পিতা বলে সম্বোধন করেন। আবার খালাকেও আম্মা বলে ডাকেন। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, পিতৃব্য পিতা সদৃশ। হজরত আলী থেকে তিরমিজি এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানি এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। একবার রসুল পাক স. তাঁর চাচা হজরত আব্বাস সম্পর্কে বলেছিলেন, আমার আব্বাকে আমার নিকট নিয়ে এসো, আমার আশংকা হচ্ছে কুরাইশরা তাঁর সাথে ওই আচরণই করবে যেমন ওরওয়া বিন মাসুদের সাথে করেছিলো সকিফ (সকিফ তাঁকে হত্যা করেছিলো)।

www.eelm.weebly.com

'ইলাহা ও ওয়াহিদা' অর্থ এক আল্লাহ্। শুধু আল্লাহ্ বললেই তৌহিদ বা একত্ববাদের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠতো। তবুও ইলাহা ও ওয়াহিদা বলা হয়েছে এই কারণে যে, আল্লাহ্পাকের অতুলনীয় এককত্ব যেনো অধিকতর বিশ্বাস্য বলে প্রতিভাত হয়। এক আল্লাহ্ বলে আরেকটি সন্দেহের সুযোগ রুদ্ধ করা হয়েছে। তা হচ্ছে কেউ হয়তো এমনও কুধারণা করতে পারতো যে, হজরত ইয়াকুব এবং তাঁর পিতৃপুরুষের উপাস্য এক ছিলো না। ইলাহা ও ওয়াহিদা বলে ওই সন্দেহের সুযোগটি নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, এই উম্মত অতীত হয়েছে— এখানে উম্মত অর্থ হজরত ইয়াকুব ও তাঁর সন্তান-সন্ততি। উম্মত শব্দটির আসল অর্থ উদ্দেশ্য। দল বা সম্প্রদায়কে এ কারণেই উম্মত বলা হয় যে, সাধারণত মানুষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের পথ নির্দেশকেই উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়।

তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। তোমরা যা অর্জন করেছো তা তোমাদের— একথার অর্থ প্রত্যেককে তার নিজ কার্যের জন্য প্রশ্ন করা হবে। অন্যের কৃতকর্ম সম্পর্কে তার কোনো দায় নেই। আয়াতের শেষে সে কথাই স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যা করতো সে সম্পর্কে তোমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামা এবং সাঈদের পদ্ধতিতে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন— ইহুদী ইবনে সুরিয়া একবার রসুলপাক স.-কে বললো, এটাই প্রকৃত হেদায়েত যার উপর আমরা রয়েছি। আপনি যদি আমাদের অনুসরণ করেন, তবে আপনিও হেদায়েত পাবেন। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, মদীনার কতিপয় বিশিষ্ট ইহুদী কাব বিন আশরাফ, মালিক বিন হানিফ, ওয়াহাব বিন ইয়াহুদ, আবু ইয়াসির বিন আফতাব এবং নাজরানের খৃষ্টানেরা মিলে একবার মুসলমানদের সঙ্গে তুমুল বচসায় লিপ্ত হয়েছিলো। খুব হৈ চৈ বাঁধিয়েছিলো তারা। ইহুদীরা বলেছিলো, আমাদের নবী হজরত মুসা সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের কিতাবও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। আর আমাদের ধর্মও সকল ধর্ম অপেক্ষা উত্তম। খৃষ্টানেরা বলেছিলো, আমাদের নবীর কিতাব ও ধর্ম সকল নবী, কিতাব ও ধর্মের চেয়ে মহান। এভাবে কথা বলে ইহুদীরা এবং খৃষ্টানেরা তারস্বরে মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মের প্রতি আহবান জানাতে শুরু করলো। তখন অবতীর্ণ হলো—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৩৫, ১৩৬

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ

www.eelm.weebly.com

اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ

عِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

❐ তাহারা বলে, 'ইহুদী বা খৃষ্টান হও' ঠিক পথ পাইবে। বল, 'বরং একনিষ্ঠ হইয়া আমরা ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করিব।' এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

❐ তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহীম, ইস্‌মাঈল, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে ঈসা, মুসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হইয়াছে। আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণকারী।'

ইহুদী ও খৃষ্টানদের আহবানের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌পাক মুসলমানদেরকে একথা বলার শিক্ষা দিচ্ছেন যে, বরং আমরা হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শকেই আশ্রয় করবো। তিনি কখনোই অংশীবাদী ছিলেন না। ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ অর্থ দ্বীনে হানিফ। 'হানিফ' শব্দটি উদগত হয়েছে 'হানফুন' শব্দ থেকে— যার অর্থ কোনো বিশেষ পদ্ধতি থেকে বিমুখ বা বিচ্ছিন্ন হওয়া। এখানে একথাটির অর্থ দাঁড়াবে— এই সকল বিকৃত ধর্মমত থেকে পৃথক হয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করবো একথাটি প্রকারান্তরে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি সত্যের আহবান। প্রচ্ছন্ন অর্থ হচ্ছে আমরা ইব্রাহিমের ধর্মমতানুসারী। সুতরাং তোমরাও তার ধর্মমতাদর্শের দিকে এসো। তিনি যেমন সকল বিকৃত ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, আমরাও সেইরূপ করেছি। তোমরাও সেরূপ করবে।

তিনি অংশীবাদী ছিলেন না। – এ বাক্যটিও ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মমতের প্রতি চরম প্রতিবাদ। একথার মাধ্যমে যেনো বলা হচ্ছে, তোমরা যেমন অংশীবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছো, হজরত ইব্রাহিম কিছুতেই সেরকম ছিলেন না।

আল্লাহ্‌পাক আরো শিক্ষা দিয়েছেন, হে মুসলমানেরা– তোমরা একথাও বলো, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী এবং বিশ্বাসী কিতাব সমূহের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল এবং ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের উপর এবং ঈসা, মুসা ও অন্য নবীগণের উপর– এখানে এ বক্তব্যে অবতারিত কিতাব সমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে কোরআন মজীদের কথা। এই বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে একথাই বুঝতে হবে যে, কোরআন মজীদই অন্য সকল আসমানী কিতাব বিশ্বাসের গুরু, শিরোনাম বা কারণ।

www.eelm.weebly.com

ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব হচ্ছে ওই দশটি সহিফা— যা প্রকৃত পক্ষে হজরত ইব্রাহিমের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিলো। তাঁর সন্তানদের জন্যই ওই সহিফা নাজিল হয়েছিলো বলেই বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ— এরকম বলা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে রসুলপাক স. এর উপর। এতদসত্ত্বেও যদি এরূপ বলা হয় যে, আমাদের প্রতি অথবা শেষ উম্মতের প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে তবুও তা রীতিবিরুদ্ধ হবে না।

বংশধর বুঝাতে এখানে 'আসবাত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বনী ইসরাইলের গোত্রগুলোকে আসবাত বলে। তাদের গোত্রসংখ্যা ছিলো বারোটি। হজরত ইয়াকুব ছিলেন দ্বাদশ সন্তানের পিতা। তাঁর প্রতিটি সন্তানের বংশধারা পৃথক পৃথক গোত্র হিসেবে পরিচিত। কতিপয় ভাষ্যকারের অভিমত এই যে, হজরত ইয়াকুবের দ্বাদশ পুত্র নিজেরাই আসবাত। তাদেরকে একারণেই আসবাত বলা হয় যে, তাদের সন্তানেরা ছিলো পৃথক পৃথক বারোটি দলে বিভক্ত। এরকমও বলা যায় যে, তাদের মধ্যে সন্তানের সন্তানকে সাবত্ বলার রেওয়াজ ছিলো। রসুলপাক স. হজরত হাসান ও হজরত হোসাইনকে সাব্তাঈন বলে সম্বোধন করেছেন। আর হজরত ইয়াকুবের সন্তানেরা ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের প্রপৌত্র। এদিক দিয়ে তাঁরা হজরত ইব্রাহিমের আসবাত।

'আমরা তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না'— একথার অর্থ, আমরা সকল নবীকেই নবী বলে মান্য করি। খৃষ্টান এবং ইহুদীরা কাউকে মানে এবং কাউকে মানে না। আমরা সেরূপ নই। কাউকে বিশ্বাস করবো কাউকে করবো না— এরকম বিশ্বাস— অপবিশ্বাস বরং অবিশ্বাস। আমরা স্বীকার করি, আল্লাহ্পাকের সকল নবী ও রসুলই সত্য।

আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী— একথার অর্থ, আমাদের ধর্ম প্রকৃতপক্ষে হজরত ইব্রাহিম আ. এর-ই ধর্ম। হজরত ইব্রাহিম ছিলেন আত্মসমর্পণকারী। আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ স.ও আত্মসমর্পিত। সকল নবী রসুলও তাই। তাঁদের আত্মসমর্পণের বিষয়ে কোনো পার্থক্য নেই, আমরাও সেরকম পার্থক্যরহিত আত্মসমর্পনকারী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, ইহ-পরকাল উভয়স্থানে হজরত ঈসা আমার নিকটতর। তাঁর নবুয়তের সময়ও আমার সময়ের সর্বাপেক্ষা নিকটে। সকল নবী ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ যদিও তাঁরা পৃথক মায়ের সন্তান। তাঁদের সকলের দ্বীন এক। আমার ও হজরত ঈসার মাঝখানে আর কোনো নবীর আগমন ঘটেনি। বোখারী ও মুসলিম।

আমি বলি, নবীগণের ভ্রাতৃত্ববন্ধন এবং মাতৃত্বের পৃথকতা বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে নবীগণের মূল এক। আর তা হলো ওহী বা প্রত্যাদেশ— যদ্দারা নবীগণ নবুয়তপ্রাপ্ত হন। আর মাতৃত্ব পৃথক বলার কারণ এই যে, শরিয়তের শাখা প্রশাখায় তাঁরা

www.eelm.weebly.com

ছিলেন ভিন্ন। দ্বীন এক হওয়ার মর্ম হচ্ছে সকল নবীর মূল শিক্ষা এই– আল্লাহ্‌র আদেশকে শিরোধার্য করো, নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত থাকো। প্রবৃত্তির কামনামুক্ত হও। আল্লাহ্‌পাকের পরম সত্তা, গুণাবলীর প্রতি এবং শুরু ও শেষ অবস্থার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, ইহুদীরা হিব্রু ভাষায় তওরাত পাঠ করতো এবং তা আরবীতে মুসলমানদের সামনে ব্যাখ্যা করতো। এ ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি রসুলপাক স. এর নির্দেশ ছিলো যে, তোমরা তাদের কথায় বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনোটাই কোরো না। বরং বলো আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বোখারী।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৩৭,১৩৮

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ؕ صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ

❒ তোমরা যাহাতে বিশ্বাস করিয়াছ, তাহারা যদি সেইরূপ বিশ্বাস করে তবে নিশ্চয় তাহারা পথ পাইবে। আর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে তাহারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন। এবং তাহাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❒ আমরা গ্রহণ করিলাম আল্লাহের রং; রঙে আল্লাহ্‌ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? এবং আমরা তাঁহারই ইবাদতকারী।

'ফাইন আমানু মিসলি মা আমানতুম বিহি' (তোমরা যাতে বিশ্বাস করেছো তারা যদি সেররম বিশ্বাস করে) এই বাক্যের 'মিসাল' শব্দটি অতিরিক্ত। হজরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস এই শব্দটি ছাড়াই এ আয়াত পাঠ করতেন। তিনি পাঠ করতেন, 'ফাইন আমানু বিমা আমানতু বিহি।' অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বাসকে যদি তারা বিশ্বাসরূপে গ্রহণ করে তবে নিশ্চয়ই তারা পথপ্রাপ্ত হবে।

'আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চয়ই তারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন।' বিরুদ্ধভাবাপন্ন বুঝাতে আয়াতে 'শিক্বাক্ব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যা সত্যের বিপরীত তাই শিক্বাক্ব। অনেকে বলেছেন, শিক্বাক্ব মানে শত্রুতা। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তারা নিশ্চয়ই তোমাদের শত্রু।

www.eelm.weebly.com

'তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট'— এই বাক্যটির মাধ্যমে বিশ্বাসীদের জন্য সংরক্ষণ ও সাহায্যের অঙ্গীকার প্রদত্ত হয়েছে। আল্লাহ্পাক এই অঙ্গীকার এভাবে পূরণ করেছেন যে, কিছুকাল পরেই বনী নাজির গোত্র দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে। সমাপ্ত হয়েছে বনী কুরাইজার নিধনপর্ব এবং অন্য ইহুদী খৃষ্টানদের প্রতি আরোপিত হয়েছে জিজিয়া।

'তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'— একথার অর্থ, আল্লাহ্ বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলের কথোপকথন শোনেন এবং তাদের উদ্দেশ্য ও অবস্থা সম্পর্কে জানেন। তিনি সর্বজ্ঞ বলেই একথা ভালোভাবে জানেন যে, প্রত্যেকে অবশেষে কী প্রতিফল প্রাপ্ত হবে?

জ্ঞাতব্যঃ অসংখ্য সূত্রে এই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে যে, মিসরের বিদ্রোহীরা হজরত ওসমানের গৃহ অবরোধ করে রেখেছিলো। কিছুকাল অবরোধের পর তারা একদিন তাঁর বাড়ির প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে বসে। হজরত ওসমান তখন কোরআন মজীদ পাঠরত ছিলেন। বিদ্রোহীরা তাঁকে তলোয়ারের আঘাত করলো। ফিন্‌কি দিয়ে ছুটলো রক্ত। সে রক্ত গিয়ে পড়লো উন্মুক্ত কোরআন মজীদের পাতায়— যেখানে লেখা ছিলো, 'ফাসাইয়াক ফিকাহুমুল্লাহ্' (তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট)। হজরত ওসমান তখন তাঁর আঘাতপ্রাপ্ত হাতের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম হস্ত, যা বিনা দোষে রক্তরঞ্জিত হলো। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, ওই পাষন্ড হন্তারকেরা পরবর্তীতে অপঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে।

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, খৃষ্টানদের ঘরে কোনো শিশু ভূমিষ্ঠ হলে সাতদিন পর তাকে মামুদিয়া নামক রঙিন পানিতে চুবিয়ে দেয়া হতো। তারা ধারণা করতো, এতে শিশু পবিত্র হয়ে যায় এবং তার সমস্ত ক্লেদ দূরীভূত হয়। একর্মটি তারা করতো খতনার বদলে। ওই জলরঞ্জনের সময় তারা বলতো, শিশুটি এবার খাঁটি খৃষ্টান হয়ে গেলো। তাদের এই অলীক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে- 'রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর?' এখানে রঙ অর্থ হবে আল্লাহ্র দ্বীন, ফিতরত বা প্রকৃতি। অর্থাৎ শিশুকে রঞ্জিত করার বিধান অপেক্ষা আল্লাহ্র বিধানই শ্রেয়তর। তাই শিক্ষা দেয়া হয়েছে— বরং তোমরা এরকম বলো, আমরা আল্লাহ্র ইবাদতকারী।

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৩৯,১৪০,১৪১

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ

www.eelm.weebly.com

لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ○ اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَ
الْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ
مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○
تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

❑ বল, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাও? যখন তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক! আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; এবং আমরা তাঁহার প্রতি অকপট।

❑ তোমরা কি বল যে ইব্রাহীম, ইস্মাইল, ইস্হাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণ ইহুদী কিংবা খৃষ্টান ছিলো? বল, ' তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ্? আল্লাহের নিকট হইতে তাহার কাছে যে প্রমাণ আছে তাহা যে গোপন করে তাহার অপেক্ষা অধিকতর সীমালংঘনকারী আর কেহ হইতে পারে? তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।

❑ এই উম্মত অতীত হইয়াছে। তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের। তোমরা যাহা অর্জন করিয়াছ তাহা তোমাদের, তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না।

আল্লাহ্পাক এখানে মুসলমানদেরকে একথা বলার শিক্ষা দিচ্ছেন যে– বলো, আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমরা আমাদের সঙ্গে কি বিতর্ক করতে চাও? একথার অর্থ, আল্লাহ্‌র দ্বীন সম্পর্কে তোমরা কি প্রতর্কে লিপ্ত হতে চাও? তিনি যেমন তোমাদের প্রতিপালক তেমনি আমাদেরও। বনী ইসমাইল গোত্রে কেনো নবী আর্বিভূত হলেন আর বনী ইসরাইল গোত্রে কেনো হলেন না– এমতো কুটতর্কে লিপ্ত হয়ে কী লাভ? আসলে কোনো গোত্রেরই বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। আল্লাহ্পাক নবী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি যে কোনো গোত্রভূতকে নবুয়তের সম্পদ প্রদানের জন্য মনোনীত করতে পারেন। এতে তোমাদের, আমাদের কারো

www.eelm.weebly.com

কিছু বলার নেই। তোমরা যদি না মানো তবে নাই বা মানলে, কিন্তু আমরা তো মানি। তোমরা মুশরিক আর আমরা মুখলিস (অকপট)।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, এখলাস (অকপটতা) অর্থ, কেবল আল্লাহ্‌পাকের প্রসন্নতা প্রাপ্তির জন্য কর্ম সম্পাদন। লোক দেখানো মনোভাবের সেখানে কোনোই প্রশ্রয় নেই। ফজল বলেছেন, লোকনিন্দার কারণে মন্দকর্ম পরিত্যাগ করা রিয়া। আর মানুষের প্রশংসা অর্জনার্থে সৎকর্ম সম্পাদন করা শিরিক। এখলাস এই রিয়া এবং শিরিক থেকে মুক্ত থাকার নাম।

তোমরা কেনো এরকম বলো যে, হজরত ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের বংশধরেরা ইহুদী অথবা খৃষ্টান। তোমরা তাদেরকে ইহুদী খৃষ্টান বলছো আর আমি (আল্লাহ্) বলছি, তাঁরা ছিলেন বিশুদ্ধ মুসলমান। তাঁরা সকলেই ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের ধর্মমতানুসারী। তওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে হজরত ইব্রাহিমের পরে। সুতরাং তিনি কীভাবে ইহুদী খৃষ্টান হতে পারেন? তওরাত নাজিলের পূর্বে হজরত মুসা ছিলেন হজরত ইব্রাহিমেরই একনিষ্ঠ অনুসারী। তোমরাও একথা জানো। জেনে শুনে তোমরা তওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত বিষয়াবলী গোপন করে যাচ্ছো। সুতরাং তোমাদের চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? এ প্রশ্নের আগেই আল্লাহ্‌তায়ালা যে মোক্ষম প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন তার জবাব ইহুদী খৃষ্টান সম্প্রদায় দিতে অক্ষম। প্রশ্নটি হচ্ছে, তোমরা কি বেশী জানো, না আল্লাহ্‌পাক? যারা সাক্ষ্য গোপন করে তারা জালেম (সীমালংঘনকারী)। তওরাতে এই সাক্ষ্যটি লিপিবদ্ধ ছিলো যে, হজরত ইব্রাহিম মুশরিক ছিলেন না, ছিলেন মুখলিস (বিশুদ্ধাচারী)। ছিলেন ইহুদীবাদ ও খৃষ্টানবাদের অপবিত্রতা থেকে অনেক উর্ধ্বে। তদুপরি রসুলপাক স.ও তাঁর বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এর পরেও যারা প্রমাণকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে, তারা যে আল্লাহ্‌র ভাষায় অধিকতর সীমালংঘনকারী সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

আল্লাহ্‌পাক অবিশ্বাসী ইহুদী ও খৃষ্টানদের কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাই সতর্ক করে দিয়েছেন একথা বলে যে, তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।

শেষ আয়াতটি পূর্বোল্লিখিত একটি আয়াতের (১৩৪) পুনরালোচনা। পূর্বে উল্লেখিত আয়াতের মতো এই আয়াতেও অতীত উম্মতের (পূর্ব পুরুষদের) বিকৃত আমলের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমাদের অর্জন সম্পর্কেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। পূর্বপুরুষদের কর্মকান্ড সম্পর্কে তোমাদেরকে কোনোই প্রশ্ন করা হবে না। কেউ কেউ বলেছেন, পূর্বের আয়াতটির (১৩৪) লক্ষ্য ছিলো গ্রন্থধারীরা (ইহুদী খৃষ্টানেরা)। আর এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে। যাতে করে মুসলমানেরাও পূর্বপুরুষদের বিকৃত আমলের দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, পূর্ববর্তী আলোচনাটি ছিলো নবীদের সম্পর্কে, আর এই আয়াতে অতীত উম্মত বলতে বুঝানো হয়েছে যারা নবী নন এরকম পিতৃপুরুষদেরকে। আল্লাহ্‌পাকই অধিক জ্ঞাত।

www.eelm.weebly.com

২য় পারা

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৪২

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

☐ নির্বোধ লোকেরা বলিবে যে, তাহারা এযাবৎ যে ক্বিবলা অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল উহা হইতে কিসে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিল? বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহেরই। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।'

রসুল পাক স. হিজরতের পর মদীনায় এসে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে যাচ্ছিলেন। কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ্পাকের নির্দেশে কেবলা পরিবর্তিত হয়। নতুন নির্দেশ অনুসারে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে থাকেন তিনি। এতে করে মদীনার ইহুদী ও মুশরিকরা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হলো। ইব্নে জারীর আল্লামা সুদ্দীর পদ্ধতিতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্পাক যখন তাঁর প্রিয় নবীকে বায়তুল মাকদিসের পরিবর্তে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ পাঠের নির্দেশ দিলেন, তখন মক্কার মুশরিকেরা বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদ তার ধর্ম সম্পর্কে নিজেই সংশয়াচ্ছন্ন। তারা ভাবতে শুরু করলো আমরাই ঠিক আছি, তাই মোহাম্মদ শেষ পর্যন্ত আমাদের কেবলাই গ্রহণ করেছে। এভাবে আস্তে আস্তে সে আমাদের ধর্মকে গ্রহণ করতে থাকবে। বাগবী বলেছেন, মদীনার ইহুদীরা বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদ হিংসার বশবর্তী হয়ে আমাদের কেবলা পরিত্যাগ করেছে।

আয়াতে বলা হয়েছে— নির্বোধ লোকেরা বলবে তারা এযাবৎ যে কেবলা অনুসরণ করে আসছিলো, কি কারণে তা পরিত্যাগ করলো? এখানে নির্বোধ লোক বলতে 'সুফাহা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির উৎপত্তি 'সাফাহাত' থেকে। 'সাফাহাত' এর আভিধানিক অর্থ চঞ্চলতা, চটুলতা, নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি। এখানে 'সুফাহা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে মুনাফিক, ইহুদী ও মুশরিকদেরকে। নির্বুদ্ধিতার

www.eelm.weebly.com

আগমন ঘটে তিনটি পথে— ১.পূর্বসুরীদের অন্ধ অনুকরণপ্রবৃত্তি ২. ঐতিহ্যঅন্ধতা, প্রবৃত্তির তাড়না, গোত্রাভিমান এবং ৩. অনুসন্ধিৎসাহীনতা, চিন্তাবদ্ধতা।

কোনোকিছুর সম্মুখে অবস্থান নেয়াকে বলে কেবলা। যেমন বসার অবস্থাকে বলে উপবেশন। কিন্তু কেবলার প্রকৃত অর্থ ওই দিক যেদিকে মুখ করে নামাজ আদায় করা হয়। এখানে 'কিবলাতিহিম' অর্থ বায়তুল মাকদিস। এই কেবলার পরিবর্তন একটি মহান বিপ্লব। ইহুদী এবং মুশরিকদের স্থবির চিন্তায় এটি একটি প্রচন্ড প্রত্যাদেশাঘাত।

'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই'— একথার অর্থ, সকল দিক, সকল স্থান, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্‌রই অধিকারাধীন। কেবলামুখী হওয়া ইবাদত। কিন্তু দিকের অনুগমণের কারণে নয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশের কারণেই ইবাদত। নির্দেশবিহীন দিক ও স্থানের কোনোই মাহাত্ম্য নেই।

শেষে বলা হয়েছে, 'তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন'। অর্থাৎ প্রকৃত কেবলার দিকে তিনি তাদেরকেই পরিচালিত করেন, যাদেরকে ইচ্ছা করেন। প্রকৃত সরল পথ, প্রকৃত কেবলা মূলতঃ আল্লাহ্‌পাকের বিধানের অনুসরণ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৪৩

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ
عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ
الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ
هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

❒ এইভাবে আমি তোমাদিগকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী স্বরূপ হইতে পার এবং রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হইবে। তুমি এযাবৎ যে ক্বিবলা অনুসরণ করিতেছিলে উহাকে এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যাহাতে জানিতে পারি কে রসুলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরিয়া যায়? আল্লাহ্ যাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন তাহারা ব্যতীত অপরের নিকট ইহা নিশ্চয় কঠিন। আল্লাহ্ এইরূপ নহেন যে তোমাদের বিশ্বাসকে ব্যর্থ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

'কাজালিকা' (এভাবে) — একথার অর্থ, আল্লাহ্‌পাকের কার্যক্রমের যে চিরন্তন ধারাটি বয়ে চলেছে সেভাবে। অথবা এরকম অর্থ হতে পারে, পূর্বের আয়াতে যে

www.eelm.weebly.com

বিধান বর্ণিত হয়েছে সেভাবে। অথবা সেই সূত্র ধরে অর্থাৎ সরল পথ প্রদর্শনের সূত্রে। ইতোপূর্বে বর্ণিত 'আমি ইব্রাহিমকে পৃথিবীর জন্য মনোনীত করেছি'— আয়াতটির সঙ্গেও এই আয়াতের 'এভাবে' কথাটি সংযোগ সাধন হওয়া সম্ভব। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে— ১. যেভাবে আল্লাহ্‌র চিরন্তন বিধান বহমান ২. যেভাবে আমি যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথ প্রদর্শন করি অথবা ৩. যেভাবে আমি ইব্রাহিমকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি, সেভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি; যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হতে পারো এবং রসুল স. তোমাদের জন্য সাক্ষী হতে পারেন।

'তোমরা মধ্যপন্থী জাতি বা উম্মত' একথার অর্থ—ন্যায়নিষ্ঠতা, প্রজ্ঞা ও মারেফাতে এলাহীতে তোমরা পূর্ববর্তী উম্মত অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে মারফু পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ সূত্রে আহ্‌মদ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, 'ওয়াসাত' শব্দের অর্থ মধ্যপন্থা। যে স্থলের চতুষ্পার্শ্ব সমদূরত্বসম্পন্ন সেই স্থানের কেন্দ্রকে বলে 'ওয়াসাত'। রূপক অর্থে সুন্দর স্বভাবকেও 'ওয়াসাত' বলা হয়। নূন্যতা ও অতিরিক্ততাবর্জিত স্বভাবই হচ্ছে উত্তম বা মধ্যবর্তী স্বভাব। যেমন অপব্যয় ও কৃপণতার মধ্যবর্তী পন্থা দানশীলতা। কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতার মধ্যবর্তী অবস্থা বীরত্ব ইত্যাদি। অতঃপর 'ওয়াসাত' শব্দটি ওই ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য- যার স্বভাব সৌন্দর্যমন্ডিত ও প্রশংসনীয়। উম্মতে মোহাম্মদীকে তাই 'উম্মাতাঁও ওয়াসাতান' (মধ্যমপন্থী বা উত্তম) বলা হয়েছে।

কালাবী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে সম্বন্ধ পদ উহ্য আছে। তদস্থলে সম্বন্ধকৃতকে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে প্রতিপাদ্য বক্তব্য হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে মধ্যবর্তী ধর্মাবলম্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি। ইসলামের শরিয়তে কোনো ঘাটতি নেই। আবার বাড়তিও নেই। তাই এই ধর্মকে বলা হয়েছে মধ্যম পন্থার ধর্ম।

মাসআলাঃ আলেম সম্প্রদায় আলোচ্য আয়াতটিকে ঐকমত্যের (এজমার) দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেনোনা উম্মতে মোহাম্মদীর ঐকমত্যকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা না করা হলে উম্মতের ন্যায়পরায়ণতাকে উপেক্ষা করা হয়। যদি প্রশ্ন করা হয়— মুজ্‌তাহিদ (বিধানোদ্ধারকারী) যদি ভুল বিধান উদ্ধার করে বসেন, তবে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা কি হ্রাস পায় না? এভাবে উম্মতেরা যদি কোনো ভুল বিধানের প্রতি একমত হয় তবে তাদের ন্যায়পরায়ণতার যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকবে কিভাবে? জবাবস্বরূপ বলা যেতে পারে, আমরা প্রথমে বলেছি 'ওয়াসাত' শব্দটি প্রশংসিত স্বভাবের প্রতি রূপক অর্থে প্রযোজ্য। এই অর্থটি আমরা প্রয়োগ করেছি ব্যক্তিত্বের উপর। কালাবীর মতানুসারে মধ্যম পন্থার এ সৌন্দর্য দ্বীন বা শরিয়তের প্রতি প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত ভাবে বা সামগ্রিকভাবে সকল উম্মতের প্রতি কিংবা শরিয়তের প্রতি 'ওয়াসাত' শব্দটি যেভাবেই প্রয়োগ করা হোক না কেনো

www.eelm.weebly.com

মূল কথা হচ্ছে- এ উম্মতের সকল কিছুই প্রশংসিত। বিস্মৃতি বা অক্ষমতাজনিত ত্রুটি সেই সৌন্দর্যকে কখনো ম্লান করতে পারে না।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. একবার আসর নামাজ শেষে মিম্বরে দন্ডায়মান হলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, একটি একটি করে সেগুলোর বিবরণ দিলেন। তখন পড়ন্ত বেলার রোদ বৃক্ষরাজিতে এবং প্রাচীর সমূহের শীর্ষদেশে শোভা পাচ্ছিলো। তিনি স. এরশাদ করলেন— সূর্যাস্ত পর্যন্ত যতোটুকু সময় বাকী পৃথিবীর আয়ু ততোটুকু। আর অতীত অতিক্রান্ত দিবসের মতো। স্মরণ রেখো! আমার উম্মত অন্য নবীর সত্তর জন উম্মতের সমপর্যায়ের। আল্লাহ্পাকের নিকট সকল উম্মতের চেয়ে আমার উম্মতেরাই অধিকতর উত্তম ও মর্যাদাশীল। বাগবী, তিরমিজি, ইবনে মাজা এবং দারেমীও এরকম বর্ণনা এনেছেন বাহাজ বিন হাকেম থেকে। দারেমী আরও বর্ণনা করেছেন— হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস একবার হজরত কাব ইব্নে আহবারের নিকট জানতে চাইলেন, তওরাত কিতাবে রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে কি কি লেখা আছে? সে বললো, তওরাতে রয়েছে— তাঁর নাম মোহাম্মদ, তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ্। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন। হিজরতের পর মদীনাবাসী হবেন। সিরিয়া হবে তাঁর করতলগত। তিনি কটুভাষী হবেন না। বাজারের অসৎ ব্যক্তিদের মতোও হবেন না। তিনি মন্দের মাধ্যমে মন্দের প্রতিবিধান করবেন না। কারণ, তিনি হবেন ক্ষমাপরবশ। তাঁর উম্মতগণ আল্লাহ্পাকের অত্যধিক গুণকীর্তন করবে। সুখ-দুঃখ আনন্দ-নিরানন্দ— সকল অবস্থায় তাঁরা হবেন আল্লাহ্পাকের প্রতি কৃতজ্ঞ। উচ্চভূমিতে আরোহনের সময় তাঁরা তকবীর উচ্চারণ করবেন। তাঁদের যুগল হস্ত এবং যুগল চরণ হবে অজুর উজ্জ্বলতা বিশিষ্ট। পরিধেয় হবে লুঙ্গি। যুদ্ধের মাঠে সারিবদ্ধ সেনাদলের মতো তাঁরা নামাজে সারিবদ্ধরূপে দন্ডায়মান হবেন। মৌমাছির গুঞ্জরনের মতো মসজিদ সমূহে তাঁদের তাসবীহ্ ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকবে : তাঁরা অতি উচ্চকিত হবেন না। আবার এ রকম প্রচ্ছন্নতাপ্রবনও হবেন না যাতে পার্শ্ববর্তীরা কথা না শুনতে পায়।

উম্মতে মোহাম্মদী অন্য নবীর উম্মতগণ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। তাঁরা আল্লাহপাক সকাশে এই মর্মে সাক্ষ্য দিবেন যে- নবীগণ তাঁদের উম্মতের নিকট আল্লাহ্পাকের বিধানাবলী পৌঁছে দিয়েছেন। আয়াতে তাই বলা হয়েছে— 'যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হতে পারো'। সাক্ষ্য-প্রদানের যোগ্যতার কারণে এ কথাটিই প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মোহাম্মাদী ন্যায়পরায়ণ। আরো প্রমাণিত হয়— সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ন্যায়পরায়ণতা অপরিহার্য।

'রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হবেন'— এ কথার অর্থ, তিনি উম্মতে মোহাম্মদী সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। অর্থাৎ উম্মতের সাক্ষ্যের সমর্থনে বা পক্ষে সাক্ষ্য দান করবেন।

www.eelm.weebly.com

বাগবী বলেছেন— আল্লাহ্পাক কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী পরবর্তী সকলকে একত্রিত করবেন। পূর্ববর্তী উম্মতের অবিশ্বাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবেন— তোমাদের নিকট কি কোনো সতর্ককারী গমন করেন নি? তারা বলবে, না। আমাদের কাছে তো সে রকম কেউ আসেনি। আল্লাহ্পাক তখন নবীগণকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করবেন। তাঁরা বলবেন— হে বিচার দিবসের মালিক! এরা মিথ্যাবাদী। আমরা তাদের নিকট আপনার বিধান প্রচার করেছি। আল্লাহ্পাক সর্বজ্ঞ, তবুও তিনি সর্বসমক্ষে বিষয়টি স্পষ্ট করার নিমিত্তে সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ ও বর্জনের ভিত্তিতে বিষয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। তিনি তখন নবীগণকে সাক্ষ্য দিতে বলবেন। তখন সেখানে উপস্থিত হবেন উম্মতে মোহাম্মদী। তাঁরা বলবেন, নবীগণ তাঁদের উম্মতের নিকট আল্লাহ্পাকের সকল বিধান পৌঁছে দিয়েছেন। অবিশ্বাসীরা বলবে, নবীরা যে বিধান পৌঁছে দিয়েছেন তা তোমরা কি করে জানলে। তোমরা তো পৃথিবীতে আমাদের অনেক পরে এসেছিলে। উম্মতে মোহাম্মদী জবাবে বলবেন, আল্লাহ্পাক আমাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন একজন মহান রসুলকে, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন কোরআন। আমরা সেই কোরআনে নবীগণের আবির্ভাব ও তাঁদের বিধানাবলী প্রচারের বিবরণ পেয়েছি। আল্লাহ্পাক সত্য। অতুলনীয়। মহাসত্য। এর পর রসুল স. কে আহবান করা হবে। তাঁকে তাঁর উম্মতগণের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তিনি তাদের সত্যবাদিতা ও ন্যায়ানুগতার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী, তিরমিজি ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন— কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক হজরত নুহ্ আ. কে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন— তুমি কীভাবে ধর্ম প্রচার করেছো? হজরত নুহ্ নিবেদন করবেন, হে আমার দয়াময় প্রভু! আমি যথারীতি আপনার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। আল্লাহ্পাক তখন হজরত নুহের উম্মতদের জিজ্ঞেস করবেন— নুহ্ কি তোমাদের নিকট আমার বাণী পৌঁছায়নি? তারা বলবে, না। আমাদের নিকট কেউ আসেনি। আল্লাহ্পাক তখন হজরত নুহ্কে বলবেন, তোমার পক্ষে সাক্ষী পেশ করো। হজরত নুহ বলবেন, আমার সাক্ষী মোহাম্মদ স.এর উম্মতগণ। তখন উম্মতে মোহাম্মদী সেখানে উপস্থিত হয়ে হজরত নুহের পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। এরপর রসুল পাক স. আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করলেন। পুনরায় বললেন- তোমরা নুহের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে আর আমি সাক্ষ্য দিবো তোমাদের পক্ষে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, নাসাঈ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন— রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন্ এমন একজন নবী উপস্থিত হবেন যাঁর সাথে থাকবে একজন মাত্র উম্মত। আরেকজন নবীর উম্মত থাকবেন দু'জন মাত্র। আল্লাহ্ পাক তাঁদের উম্মতদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, এরা তোমাদের নিকট আমার বাণী পৌঁছিয়েছিলো কি? উম্মতেরা বলবে, না। আল্লাহ্পাক তখন নবীদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার বিধান পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করেছিলে?

www.eelm.weebly.com

নবীদ্বয় বলবেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলবেন, তবে সাক্ষ্য পেশ করো। নবীদ্বয় তখন সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করবেন উম্মতে মোহাম্মদীকে। উম্মতে মোহাম্মদী তখন নবীদ্বয়ের পক্ষে সাক্ষ্যদান করবেন। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কীভাবে জানলে? তাঁরা বলবেন, আমাদের নবীর উপরে যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো আমরা সে কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ দেখেছি যে, সকল নবী তাঁদের উম্মতের প্রতি আল্লাহ্র বিধান পৌঁছে দিয়েছেন। তখন তাঁদের জানানো হবে, তোমরা সত্য বলেছো।

কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশটি ছিলো একটি পরীক্ষা। রসুলের অনুসারী এবং পশ্চাদাপসরণকারীদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ই ছিলো কেবলা পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য। আয়াতে এ উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করার পর আল্লাহ্ পাক একথা জানাচ্ছেন যে, তিনি যাদেরকে সুপথে পরিচালিত করেছেন তারা ব্যতীত অন্য কারো নিকট এমতো নির্দেশ পালন নিশ্চয়ই অত্যন্ত কঠিন।

'তুমি এযাবত যে কেবলার অনুসারী ছিলে'— এই উক্তিটির কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যেমন— ১. এখানে ওই কেবলার কথা বলা হয়েছে, যেদিকে মুখ করে আপনি এতো দিন নামাজ পাঠ করে আসছিলেন। সেই কেবলা হচ্ছে বায়তুল মাকদিস। ২. আপনি সর্বপ্রথমে যে কেবলামুখী ছিলেন, অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে যে কেবলাকে (কাবা শরীফকে) আপনি আশ্রয় করেছিলেন- আমি তা রহিত করিনি। হিজরতের পরে বায়তুল মাকদিসকে কেবলা বানানো ছিলো একটি সাময়িক ব্যবস্থা। ৩. প্রকৃত কেবলাকে পুনরায় আমি প্রতিষ্ঠিত করলাম। এর কারণ হচ্ছে, এ বিষয়টি পরীক্ষা করে নেয়া যে, কে আপনার প্রকৃত অনুসারী এবং কে নয়। কতিপয় ভাষ্যকার বলেছেন, আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে একথাটি সুস্পষ্ট হয় যে, হিজরতের পূর্বে রসুলুল্লাহ স. কাবামুখী হয়ে নামাজ আদায় করতেন। কিন্তু পূর্ববর্তী আয়াতের বর্ণনানুযায়ী বুঝা যায়, বায়তুল মাকদিসই ছিলো রসুল স. এর প্রথম কেবলা। আসল কথা হচ্ছে, বর্ণনাভঙ্গি যে রকমই হোক না কেনো— কাবা শরীফের পর বায়তুল মাকদিস পুনরায় কাবা শরীফ কিংবা প্রথমে বায়তুল মাকদিস পরে কাবা শরীফ– এমতো কেবলা পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, রসুল পাক স. এর প্রকৃত অনুসারীগণকে সুচিহ্নিত করা। আল্লাহ্পাকের বক্তব্য যেনো এ রকম যে, আমি সর্বসমক্ষে বিষয়টি পরিষ্কার করে দিতে চাই— কোন্ কোন্ ব্যক্তি নামাজের মধ্যে রসুলুল্লাহ্ স. এর আনুগত্য করেন। আর কোন্ কোন্ হতভাগ্যরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে কিংবা বিরোধিতা করে। এভাবে সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্য সুসাব্যস্ত হয়ে যাক।

কেবলা পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছু লোক ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছিলো। তারা হয়ে পড়েছিলো বিশ্বাসবিচ্যুত। তাই আয়াতে তাদের উল্লেখ মাত্র না করে, বিশ্বাসীদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক এরূপ নন যে, বিশ্বাসীদের

www.eelm.weebly.com

বিশ্বাসকে ব্যর্থ করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি দয়াপরবশ, পরম দয়ালু (রউফুর রহীম)।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে— কেবলা পরিবর্তনের পর মুসলমান নামধারী একদল দুর্বলচিত্ত লোক ইহুদীদের অনুসারী হয়েছিলো। তারা বলেছিলো, মোহাম্মদ তাঁর পিতৃপুরুষের ধর্মে ফিরে গিয়েছে। আল্লাহ্ পাক সর্বজ্ঞ। কেবলা পরিবর্তনের ফলে কি হবে না হবে তা তিনি অবশ্যই জানেন। তবুও আয়াতে— যাতে জানতে পারি কে রসুলের অনুসরণ করে, কে করে না- এই ধরনের কথা বলা হচ্ছে। ভাষ্যকারগণ এর জবাবে বলেছেন, ১. ইল্লা লিনা'লামা (যেনো জানতে পারি) বাক্যে ব্যবহৃত লাম অক্ষরটি পরিণতিপ্রকাশক নয়, বরং উদ্দেশ্যপ্রকাশক। সুতরাং এই জানার সম্পর্কটি অতীত কালের সঙ্গে। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এরকম— একথা তো আমি জানতামই যে, কে রসুল পাক স. এর প্রকৃত অনুসারী এবং কে নয়। তবুও এই উদ্দেশ্যে কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দান করেছি যাতে করে সত্যমিথ্যার পার্থক্যরেখা সর্বসমক্ষে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাতে জানতে পারি— একথার আসল অর্থ এ রকমই। ২. কেউ কেউ বলেছেন, যাতে জানতে পারি— একথার অর্থ যাতে পার্থক্য করতে পারি বা পার্থক্য করে ফেলি, কে প্রকৃত অনুসারী এবং কে কপট। ৩. কেউ আবার বলেছেন, এখানে সম্বন্ধপদ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রচ্ছন্ন সম্বন্ধ পদসহযোগে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— যেনো আমার প্রিয় রসুল এবং প্রকৃত বিশ্বাসীরা জেনে নিতে পারে। এভাবে জানার সম্বন্ধ স্থাপিত হবে রসুল এবং প্রকৃত বিশ্বাসীদের সঙ্গে। আল্লাহ্পাক এখানে তাঁর প্রিয় রসুল ও প্রিয় বিশ্বাসীদের সঙ্গে সম্বন্ধিত পদটি উহ্য রেখে বিষয়টি রূপকভাবে স্বীয় সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। প্রিয় রসুল ও তাঁর প্রিয়ভাজন অনুসারীদের মর্যাদা প্রকাশই এরকম বর্ণনাভঙ্গির উদ্দেশ্য। হাদিসে কুদসীতে এ রকম বর্ণনাভঙ্গির দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক এক বান্দাকে বলবেন, আমি অসুস্থ ছিলাম— তুমি সেবা করোনি। এই হাদিসে আল্লাহ্পাক বান্দার অসুস্থতাকে নিজের অসুস্থ হওয়া হিসেবে প্রকাশ করেছেন। এই আয়াতেও তেমনি রসুল ও তাঁর প্রিয়ভাজনদের জেনে নেয়ার বিষয়টিকে, 'যাতে জানতে পারি'— এরকম বর্ণনারীতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

শায়েখ আবুল মানসুর মাতুরিদি বলেছেন, আয়াতের মর্ম হলো— যা অস্তিত্বশীল হয়নি, তা আমি পূর্ব থেকে জানতাম— অস্তিত্বশীলতার পরেও জানি (জেনে নিতে পারি)। অস্তিত্ববিহীনতা এবং অস্তিত্বশীলতা উভয়টি আমার জানার আওতায়। অস্তিত্বহীনকে জানি অস্তিত্বহীন অবস্থায় এবং অস্তিত্বশীলকে জানি অস্তিত্বশীল অবস্থায়। সুতরাং অনস্তিত্বের জানা এবং অস্তিত্বের জানা নিশ্চয়ই এক নয়। আয়াতে ঘটনাটি অস্তিত্বশীল হিসেবে জানার কথাই বলা হয়েছে। তাঁর জ্ঞান অপরিবর্তনীয়। জ্ঞাত বস্তু অনস্তিত্বতা পরিত্যাগ করে বা পরিবর্তন করে অস্তিত্বশীলতায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই রূপান্তর ঘটে তাঁর অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের

www.eelm.weebly.com

আওতায়। বান্দাদের পুরস্কার তিরস্কার নির্ভর করে অস্তিত্বশীলতার উপর। এখানে সেই অস্তিত্বশীলতার কথাই বলা হয়েছে— যা আল্লাহ্পাক জানেন বা জেনে নিতে পারেন।

'আল্লাহ্ পাক বিশ্বাসীদের বিশ্বাস ব্যর্থ করেন না'— আলোচ্য আয়াতে বিশ্বাস বা ইমান বলতে 'সুদৃঢ় বিশ্বাস' মর্ম গ্রহণ করা হয়েছে। অথবা কেবলা পরিবর্তনের বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতে বর্ণিত বিশ্বাস অর্থ নামাজ। যেহেতু হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে— ইহুদী হুয়াই বিন আখতাব ও তার সাথীরা সাহাবাগণকে প্রশ্ন করেছিলো, তোমরা যে এতো দিন বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছো, সেটা সত্য ছিলো না মিথ্যা? যদি সত্য হয়, তবে তোমরা এখন সত্যবিচ্যুত। আর যদি মিথ্যা হয়, তবে তোমরা এতোদিন মিথ্যা ইবাদতে লিপ্ত ছিলে। সাহাবাগণ জবাব দিয়েছিলেন, প্রকৃত সত্য হচ্ছে- আল্লাহ্পাকের বিধান। আর আল্লাহ্পাকের বিধানবিরোধী যা কিছু সেগুলো হচ্ছে মিথ্যা। যতোদিন কেবলা হিসেবে বায়তুল মাকদিস আল্লাহ্পাকের বিধানাবদ্ধ ছিলো, ততোদিন সেটাই ছিলো হেদায়েত। এখন সেই বিধান পরিত্যক্ত হয়েছে, তাই এখন তা গোমরাহী।

কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে বনী নাজ্জার গোত্রের আসাদ বিন জুরাহ্ এবং বনী সালমা গোত্রের বারাহ্ বিন মারুর ইন্তেকাল করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন সমাজপতি। আরো কতিপয় মুসলমান মৃত্যুবরণ করেছিলেন কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে। তাঁদের প্রিয়জন ও আত্মীয়স্বজনেরা রসুল পাক স. এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, আল্লাহ্পাক আপনাকে এখন হজরত ইব্রাহিমের কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের ভাইয়েরা বায়তুল মাকদিসমুখী হয়ে নামাজ আদায়ের সময়ে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁদের কি অবস্থা হবে? আল্লাহ্পাক তখন নাজিল করলেন, 'ওয়ামা কানাল্লাহু লি ইউদ্বিয়া ইমানাকুম।' (আল্লাহ্পাক এমন নন যে, তোমাদের বিশ্বাসকে ব্যর্থ করেন)। তাই বর্ণিত আয়াতে উল্লেখিত ইমান অর্থ হবে নামাজ, যে নামাজ পাঠ করা হয়েছিলো বায়তুল মাকদিস মুখী হয়ে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত বারা বিন আজিব থেকে বর্ণিত হয়েছে— কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে কেউ কেউ শহীদ অবস্থায় এবং কেউ কেউ স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দানের পর বিষয়টি আমাদের নিকট স্পষ্ট হচ্ছিলো না যে, তাঁদের নামাজের কি অবস্থা হবে। তাঁরা কি সওয়াব পাবেন, নাকি বঞ্চিত হবেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৪৪

---

www.eelm.weebly.com

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۖ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۚ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

❑ আকাশের দিকে তোমার বার বার তাকানকে আমি প্রায় লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন ক্বিবলার দিকে ফিরাইয়া দিতেছি যাহা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাও এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, ইহা তাহাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। তাহারা যাহা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নহেন।

এই আয়াতটি কেবলা পরিবর্তনের প্রারম্ভিকা, যদিও এটি পরে সন্নিবেশিত হয়েছে। আসল ঘটনাটি হলো এই, রসুল পাক স. হিজরতের পরে মদীনায় এসে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করে যাচ্ছিলেন। ইহুদীরা এতে করে বেশ প্রসন্নই ছিলো। তারা বলতো, মোহাম্মদ আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধবাদী, কিন্তু আমাদের কেবলাকে মান্য করে। রসুল পাক স. এর ঐকান্তিক বাসনা ছিলো এই যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফ যেনো কেবলা হিসাবে নির্ধারিত হয়। একবার তিনি হজরত জিব্রাইলকে একথা বলেও ছিলেন। হজরত জিব্রাইল জবাব দিয়েছিলেন— ভ্রাতঃ! আমিও আপনার মতোই আল্লাহ্পাকের এক দাস। আপনি আমা অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল। আপনি বরং আল্লাহ্পাক সকাশে প্রার্থনা পেশ করুন। একথা শুনে তিনি স. তাঁর প্রার্থনা পেশ করলেন। তারপর থেকে তিনি প্রায়ই আকাশের দিকে তাকাতেন। এভাবে প্রত্যাদেশের অপেক্ষায় থাকতেন তিনি। তাঁর প্রতীক্ষার অবসান হলো। অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

প্রথম কেবলা বায়তুল্লাহ্ না বায়তুল মাকদিস এ বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, মক্কাবাসের সময় রসুল পাক স. কাবা শরীফকে সামনে রেখে বায়তুল মাকদিস অভিমুখী হয়ে নামাজ আদায় করতেন। হাদিসটি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। হাদিসটির সনদ উত্তম। আবার কেউ বলেছেন, মক্কায় অবস্থানের সময় তিনি বায়তুল মাকদিসমুখী হয়ে নামাজ পাঠ করতেন। বায়তুল্লাহ্ শরীফকে সামনে রাখতেন— একথা তাঁরা বলেন নি।

www.eelm.weebly.com

বাগবী বলেছেন, রসুলে আকরম স. হিজরতের পূর্বে বায়তুল্লাহ্মুখী হয়ে নামাজ আদায় করতেন। হিজরতের পর নামাজ পড়তেন বায়তুল মাকদিসমুখী হয়ে। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন— রসুল পাক স. যখন মদীনায় এলেন তখন আল্লাহ্ পাক তাঁকে বায়তুল মাকদিসমুখী হয়ে নামাজ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, প্রথম দিকে বায়তুল্লাহ শরীফমুখী হয়ে রসুল স. নামাজ আদায় করতেন। অতঃপর তাঁর মক্কাবাসের সময়ই বায়তুল মাকদিসমুখী হয়ে নামাজ পাঠের বিধান বলবৎ হয়। প্রায় তিন বৎসর তিনি এভাবে নামাজ আদায় করেছিলেন। এমতাবস্থায় হিজরত সম্পাদিত হয়। বর্ণনাগুলো পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, বাগবী বর্ণিত বর্ণনাটিই অধিকতর সঠিক ও শক্তিশালী। অন্য বর্ণনাগুলোও প্রায় সেরকমই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মদীনার জীবনে তিনি স. বায়তুল মাকদিসমুখী হয়ে কতোদিন নামাজ আদায় করেছিলেন সে বিষয়েও মতানৈক্য রয়েছে। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনানুসারে ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, সতেরো মাস। আমর বিন আউফ এবং ইবনে আবী শায়বার মাধ্যমে তিবরানি ও বায্যার বলেছেন ষোলো মাস। হজরত আব্দুল্লাহর অন্য একটি বর্ণনানুযায়ী এবং হজরত সাইদ ইবনে মুসাইয়্যেব এর মাধ্যমে ইমাম মালেকও বলেছেন ষোলো মাস। হজরত বারা বিন আজিব থেকে বোখারীর বর্ণনাতেও ষোলো অথবা সতেরো মাসের কথা রয়েছে। আসল সময়সীমা হচ্ছে ষোলো মাস কয়েকদিন। রসুল পাক স. মক্কা থেকে পাঁচই রবিউল আউয়াল সোমবার মদীনাভিমুখে রওয়ানা হয়ে বারোই রবিউল আউয়াল মদীনায় উপনীত হয়েছিলেন। আর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে পনেরোই রজব দ্বিপ্রহরের পর কেবলা পরিবর্তিত হয়। ঘটনাটি ঘটেছিলো বদর যুদ্ধের দুই মাস আগে। এ ব্যাপারে আলেমগণের ঐকমত্য রয়েছে। আর যাঁরা সতেরো মাসের কথা বলেছেন— তাঁরা মাসের খন্ড অংশকেও পুরো মাস ধরে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আরো কতিপয় বর্ণনা রয়েছে— যেগুলোতে বলা হয়েছে আঠারো বা উনিশ মাস— দুই মাস— দুই বৎসর ইত্যাদি। বর্ণনাগুলো দুর্বল তাই অগ্রহণীয়।

'তোমাকে এমন কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ করো'— কয়েক রকম অর্থ হতে পারে এই বাক্যটির। যেমন- ১. আমি আপনাকে আপনার পছন্দসই কেবলা গ্রহণ করার ক্ষমতা দান করলাম। ২. আপনার প্রিয় কেবলা বায়তুল্লাহর সঙ্গে আমি আপনাকে মিলিয়ে দিলাম এবং ৩. আপনি যে কেবলার অভিলাষী সেই কেবলার দিকেই আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। 'তারদ্বহা' বাক্যটির মর্ম হচ্ছে, যে মহান উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের লক্ষ্যে আপনি কেবলার পরিবর্তন প্রত্যাশী ছিলেন, সেই কেবলার প্রতি আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। (পরিবর্তনপূর্ব কেবলার প্রতি রসুল পাক স. অপ্রসন্ন ছিলেন এরকম কথা কিছুতেই বলা যাবে না। কারণ, আগের নির্দেশটিও ছিলো আল্লাহ্তায়ালারই নির্দেশ। আর

www.eelm.weebly.com

তিনি আল্লাহ্তায়ালার সকল নির্দেশের প্রতি সদাসন্তুষ্ট ছিলেন। তবে ধর্মের কতিপয় মহান উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে তিনি কেবলা পরিবর্তনকামী হয়েছিলেন)।

'শতর' ওই বস্তুকে বলে যা অন্য বস্তু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আরবী বাকভঙ্গি অনুযায়ী 'দারুশ্ শুতুর' অর্থ একটি পৃথক ঘর। শব্দটি এখানে পৃথক দিক নির্ধারণসূচক হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও একদিক কখনো অন্যদিক থেকে পৃথক নয়।

কাবা শরীফকে বলা হয় মসজিদে হারাম। মসজিদে হারাম বলার হেতু এই যে- এই মসজিদের এলাকায় যুদ্ধ বিগ্রহ, শিকার, বৃক্ষকর্তন ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কেবলা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রকাশ্যতঃ মসজিদুল হারাম না বলে কাবা বলাই সঙ্গত ছিলো। কিন্তু এখানে স্থান নির্ধারণই ছিলো মূল উদ্দেশ্য। তাই মসজিদে হারাম উল্লেখিত হয়েছে। গৃহের অবস্থান নির্ধারণ করলে দুরবর্তীদের জন্য কাবাগৃহমুখী হওয়া অসম্ভব হতো। তাই কাবা নয়, কাবা গৃহের দিকে মুখ করাই উদ্দেশ্য বলে মসজিদে হারাম উল্লেখিত হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন- রসুল পাক স. বলেছেন, পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝামাঝি কেবলা। এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দূরবর্তীদের জন্য কাবার দিকই কেবলা।

আমি বলি, হাদিসে উল্লেখিত পূর্ব বলতে সংক্ষিপ্ততম দিনের পূর্ব দিক ও পশ্চিম বলতে সংক্ষিপ্ততম দিনের পশ্চিম দিক বুঝতে হবে। এর মাঝামাঝি দিক হলো দক্ষিণ। আর সেটাই মদীনাবাসীদের কেবলা। এই নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন দেশের কেবলা বিভিন্ন রকম হবে। যেমন বাংলাদেশ ও ভারতের কেবলা হবে দুই পশ্চিমের মাঝামাঝি। অর্থাৎ শীতে ও গ্রীষ্মে সূর্য যে স্থলে অস্ত যায় ওই দুই অস্তস্থলের মাঝামাঝি। মাওয়াহেব এবং ছাবিলুর রাশাদ কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে-- রসুল পাক স. বারা বিন মা'রূর এর ইন্তিকালের পর তাঁর স্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের জন্য কবিলায়ে বনী সালমাতে গমন করলেন। হজরত বারার পুত্রের নাম ছিলো বাশার। তাঁর মাতা রসুল পাক স.এর জন্য আহার্য প্রস্তুত করতে শুরু করলেন। ইত্যবসরে জোহরের নামাজের সময় হলো। উপস্থিত সাহাবাগণকে নিয়ে তিনি মসজিদে জোহরের নামাজ পড়তে শুরু করলেন। দু'রাকাত নামাজ শেষ হতেই হজরত জিব্রাইল এই মর্মে প্রত্যাদেশ নিয়ে এলেন যে, এখন বায়তুল্লাহ্ই কেবলা। তিনি স. তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ জামা'ত সহ কাবা শরীফের দিকে মুখ করে অবশিষ্ট দু'রাকাত আদায় করলেন। এই পরিবর্তনের সময় পুরুষদের স্থানে রমণীদেরকে এবং রমনীদের স্থানে পুরুষদেরকে দাঁড়াতে হলো। তখন থেকে বনী সালমার ওই মসজিদকে জু কেবলাতাইন (দু'কেবলা বিশিষ্ট) বলা হয়। ওয়াহিদী বলেছেন, এ ঘটনাটি আমার নিকট অত্যন্ত শক্তিশালী বর্ণনাসূত্রে সুসাব্যস্ত। আসল কথা হচ্ছে, রসুল পাক স. ওই মসজিদে জোহরের নামাজের প্রথম দুই রাকাত বায়তুল মাকদিসের দিকে এবং অবশিষ্ট দুই রাকাত মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে পাঠ

www.eelm.weebly.com

করেছিলেন। ওই নামাজে সাহাবী ইবাদ বিন বাশার শরীক ছিলেন। নামাজ শেষে তিনি গৃহগমনের পর একস্থানে দেখলেন, বনী হারিছার লোকেরা বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে আসরের নামাজ আদায় করেছেন। তিনি তখন চিৎকার করে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি জোহরের নামাজ রসুল স. এর সঙ্গে কাবামুখী হয়ে পাঠ করেছি। তাঁর কথা শুনে নামাজীরা তৎক্ষণাৎ বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে মুখ করলেন। হজরত বারা বিন আজিব থেকে সহীহ্ বোখারীতে বর্ণিত হয়েছে— পরিবর্তিত কেবলার প্রথম নামাজ ছিলো আসরের নামাজ। আরেক সূত্রে বলা হয়েছে জোহরের নামাজ। এই দ্বন্দ্ব নিরসনার্থে তিনটি জবাব উপস্থাপন করা যাবে। ১. সম্ভবত হজরত বারা বিন আজিবের নিকট মসজিদে বনী সালমায় রসুল স. যে জোহরের নামাজ আদায় করেছিলেন সে সংবাদটি পৌঁছেনি। ২. কেবলা পরিবর্তনের পর পূর্ণাঙ্গ নামাজ ছিলো আসরেরই নামাজ। জোহর নামাজের অর্ধাংশ কেবল কাবামুখী হয়ে পাঠ করা হয়েছিলো। ৩. হজরত বারা বিন আজিব রসুল পাক স. এর সঙ্গে কাবামুখী হয়ে সর্বপ্রথম যে নামাজ পড়েছিলেন তা ছিলো আসরের নামাজ।

কোবা এলাকার মুসলমানদের নিকট কেবলা পরিবর্তনের সংবাদ পৌঁছেছিলো পরদিন ফজরের সময়। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, কোবাবাসীরা ফজরের নামাজ পাঠ করছিলেন, এমন সময় একজন এসে জানালেন, কেবলা পরিবর্তিত হয়েছে। এখনকার কেবলা বায়তুল্লাহ। এই কথা শুনে নামাজিরা তৎক্ষণাৎ বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গেলেন। হজরত রাফে বিন খাদিজ বর্ণনা করেছেন, আমরা বনি আবদুল আসহাল গোত্রের মসজিদে নামাজ আদায় করছিলাম— এক লোক এসে চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ্ পাক এখন থেকে রসুল স. কে কাবামুখী হয়ে নামাজ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইমাম কেবলা পরিবর্তন করলেন। আমরাও কেবলা পরিবর্তন করলাম।

'তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো উহার দিকে মুখ ফিরাও'— এই নির্দেশটি ঘোষিত হয়েছে সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীর প্রতি। রসুল পাক স.কে সম্বোধন করা হলেও সেই সম্বোধনের অন্তর্ভূক্ত হতেন তাঁর সকল উম্মত কিন্তু উম্মতকে অধিকতর সতর্ককরণের উদ্দেশ্যে এমতোন সম্বোধন উচ্চারিত হয়েছে। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. কাবাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু সেখানে নামাজ পাঠ করেননি। গৃহের প্রতিটি কোণে দাঁড়িয়ে কেবল দোয়া করেছিলেন। এরপর বাইরে এসে কাবার দিকে মুখ করে তিনি নামাজ আদায় করলেন এবং এরশাদ করলেন, এটাই হচ্ছে কেবলা। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ স. হজরত ওসামা, হজরত বেলাল এবং হজরত ওসমান বিন তালহাকে সঙ্গে নিয়ে কাবা শরীফের ভিতর প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন, যখন তাঁরা বাইরে এলেন তখন আমি হজরত বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম— রসুল স. গৃহাভ্যন্তরে কি করলেন? হজরত বেলাল বললেন, গৃহের দু'টি স্তম্ভকে বাঁয়ে, একটিকে ডানে এবং তিনটিকে পিছনে রেখে তিনি নামাজ আদায় করলেন। এই বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্ট জানা যায় যে, ওই সময়ে কাবা শরীফ ছিলো ছয় স্তম্ভ বিশিষ্ট। বর্ণিত হাদিস দু'টির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। ব্যাপারটা এরকম হওয়াই যুক্তিযুক্ত যে— একবার তিনি কাবাগৃহে প্রবেশ করার পর বাইরে এসে নামাজ আদায় করেছেন। আর একবার নামাজ পড়েছেন কাবাভ্যন্তরে।

গ্রন্থধারীগণ ভালোভাবে জানতো যে, কেবলা পরিবর্তন একটি স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা। কারণ, তওরাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, সর্বশেষ নবী দুই কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করবেন। একথা জানা সত্ত্বেও ক্ষোভ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেছিলো। আয়াতে তাই বলা হয়েছে- যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এই নির্দেশটি তাদের প্রতিপালক প্রেরিত একটি সত্য নির্দেশ। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অনবহিত নন। আয়াতের সর্বশেষে উল্লেখিত 'ইয়া'মালুন' শব্দটিকে ক্বারী আবু জাফর, ইবনে আমের, হামজা এবং কাসায়ী পড়তেন 'তা'মালুন'। এরকম পড়লে 'তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নন'— একথাটি সম্বন্ধিত হবে মুমিনদের সঙ্গে। তখন অর্থ দাঁড়াবে এরকম— 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা করছো আল্লাহ্পাক সে সম্পর্কে বেখবর নন, অবশ্য তার প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে। শেষ বাক্যটি মূলতঃ অঙ্গীকার। 'ইয়া' মালুন' শব্দ সহযোগে এই অঙ্গীকারের স্বরূপ হবে এ রকম- হে ইহুদীরা! তোমরা যে অপকর্মসমূহ করে যাচ্ছো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক উদাসীন নন। কর্মফলের শাস্তি অবধারিতই রয়েছে।

ইহুদী— খৃষ্টানেরা রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে কেবলা পরিবর্তনের প্রমাণ জানতে চাইলো। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা বাকারাঃ আয়াত ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ وَمَآ اَنْتَ

بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ

بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ

www.eelm.weebly.com

الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

❒ যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তুমি যদি তাহাদের নিকট সমস্ত দলিল পেশ কর তবুও তাহারা তোমার ক্বিবলার অনুসরণ করিবে না; এবং তুমিও তাহাদের ক্বিবলার অনুসারী নও, এবং তাহাদের কতক পরস্পরের ক্বিবলার অনুসারী নহে। তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর নিশ্চয়ই তখন তুমি সীমালঙ্ঘনকারীগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

❒ আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহা সেইরূপ জানে; যেইরূপ তাহারা নিজেদের সন্তানগণকে চিনে এবং তাহাদের একদল জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিয়া থাকে।

❒ সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হইওনা।

যতোই দলিল প্রমাণ পেশ করা হোক না কেনো— ইহুদীদের সন্দেহ ঘুচবে না। তারা প্রকৃতপক্ষে প্রমাণপ্রত্যাশী নয়। চরম হিংসা ও বিদ্বেষের কারণেই তারা বার বার সত্যের বিরোধিতা করে চলেছে। আয়াতে তাই বলা হয়েছে— 'আপনি যদি তাদের নিকট সমস্ত দলিল পেশ করেন, তবুও তারা আপনার কেবলার অনুসারী হবে না।'

'তুমিও তাদের কেবলার অনুসারী নও'— একথার অর্থ, এখন থেকে বায়তুল্লাহ শরীফই স্থায়ী কেবলা—যা আর কস্মিনকালেও রহিত হবে না। এরকম বলার উদ্দেশ্য এই— রসুল স. পুনরায় আবার কখনো বায়তুল মাকদিসমুখী হবেন- ইহুদীদের এরূপ অপআকাঙ্খা যেনো আর অবশিষ্ট না থাকে।

'তাদের কেবলার অনুসারী নও'— এখানে তাদের বলতে ইহুদী ও খৃষ্টান উভয়ের কেবলা বুঝানো হয়েছে। যদিও তাদের কেবলা পৃথক। কিন্তু আয়াতে তাদের কেবলাকে একবচনে প্রকাশ করা হয়েছে। সত্যবিমুখতা ও বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে যেহেতু তারা এক, তাই এখানে তাদের কেবলাকে প্রকাশ করা হয়েছে একবচনে। ইহুদীদের কেবলা বায়তুল মাকদিসের পশ্চিম দিকে এবং খৃষ্টানদের কেবলা পূর্ব দিকে। এ জন্যই আয়াতে বলা হয়েছে- তাদের কেউ একে অপরের কেবলার অনুসারী নয়।

'তোমার নিকট জ্ঞান আগমণের পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো, তবে নিশ্চয়ই তুমি সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে'— এখানে তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো- বাক্যটি শর্তসম্বলিত। এরকম শর্ত সম্বলিত

www.eelm.weebly.com

বাক্যের দু'টি দিক থাকে। একটি বাস্তব। অপরটি অবাস্তব। যেমন কোনো বৃদ্ধ লোক বললো, আমি যদি যুবক হয়ে যাই তবে তিনটি বিয়ে করবো। এখানে বৃদ্ধটির যুবক হওয়া অসম্ভব— কাজেই তার বক্তব্যের একটি দিক বাস্তবায়নও অসম্ভব। আলোচ্য বাক্যটিও তেমনি, যার একটি দিকের বাস্তবায়ন সম্পূর্ণতই অসম্ভব। সেদিকটি হচ্ছে— 'যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর'। দৃষ্টান্ত হিসাবে কোরআন মজীদের ওই আয়াতটি উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে বলা হয়েছে, 'আপনি বলুন! যদি আল্লাহ্পাকের সন্তান থাকতো তবে আমি তার প্রথম উপাসক হতাম।' এই বাক্যটিও একটি এমন শর্তসম্বলিত বাক্য যার একটি দিক অসম্ভব। সেদিকটি হচ্ছে- যদি আল্লাহপাকের সন্তান থাকতো। এমতাবস্থায় অপর দিকটি সঙ্গত কারণেই অসম্ভব হয়ে পড়বে। আল্লাহ্পাকের সন্তান থাকা যেহেতু অসম্ভব, সেহেতু তার উপাসক হওয়াও অসম্ভব। তেমনি এই আয়াতের বর্ণনায় রসুল পাক স. এর পক্ষে যেহেতু ইহুদীদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা অসম্ভব, সেহেতু তার পক্ষে সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়াও অসম্ভব। প্রশ্ন হতে পারে— যদি অসম্ভবই হয়, তবে এ ধরনের বর্ণনায় কি লাভ? প্রথম জবাব হচ্ছে— বর্ণিত আয়াত উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়। যার মর্ম হচ্ছে— সাবধান! নবীর পক্ষে যে কাজ সম্ভব নয়, তোমরা তাঁর উম্মত হয়ে কস্মিনকালেও আল্লাহ্পাকের বিধানের বিরুদ্ধে ইহুদী খৃষ্টানদের বাসনার অনুবর্তী হয়ো না। এ রকম সাবধানবাণীর আরো কিছু কারণ রয়েছে- যেমন, ১. বিষয়বস্তুকে শক্তিশালী করা, ২. শপথের পর্যায়ভূক্ত করা, ৩. ন্যূনতম অনুসরণকেও নিষিদ্ধ করা, ৪. প্রিয়জনের প্রতি একটি অনুসরণীয় সতর্কবাণীর রূপ নির্ণয় করা। ৫. 'মা জা'আকা'- এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর পরই 'মিনাল ইলমি'- এই রীতির সংযুক্তি দ্বারা বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তোলা। ৬. এলেম বা জ্ঞানকে সুনির্দিষ্ট করা, ৭. 'জাযা' শব্দটিকে লামে তাকীদ এবং 'জুমলা'ই ইছমিয়া' দ্বারা মুয়াক্কাদ করা। ৮. 'ইজা' শব্দটিও মুবালিগার অর্থবহ, ৯. 'মীন' অব্যয়টি আংশিক অর্থবহ যদ্দারা অধিক মুবালিগা ধর্তব্য, ১০. 'আজ্জোয়ালিমীন' শব্দে আল যুক্ত করে জুলুমকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং ১১. জুলুমকে কোনো শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়নি। যারা জুলুম করে তারা সাধারণ্যে জালেম হিসেবেই পরিচিত।

'আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেইরূপ চিনে, যেমন চিনে নিজেদের সন্তানদেরকে'— এখানে তাকে চেনে অর্থ, রসুলুল্লাহ স. কে চেনে। চেনে এই কারণেই যে, তওরাতে তাঁর সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। তওরাতে তাঁর প্রতি ইমান আনার জন্য তারা নির্দেশিত হয়েছে। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে 'ইয়া'রিফুনাহু' শব্দের 'হু' (তাঁকে) সর্বনামটি মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. এর প্রতি সম্বন্ধিত। কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, সর্বনামটি কোরআন পাকের সঙ্গে অথবা কেবলা পরিবর্তনের বিধানের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে সম্বন্ধ রসুলুল্লাহ স. এর সঙ্গে হওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কোরআন অথবা কেবলা পরিবর্তনের বিধানের

www.eelm.weebly.com

সঙ্গে সম্বন্ধিত হলে, পরবর্তী বাক্যের সঙ্গেও সামঞ্জস্য বজায় থাকে না। কারণ পরক্ষণেই বলা হয়েছে, 'যেরূপ তারা নিজেদের সন্তানদেরকে চিনে।' এরকম উপমা প্রদর্শনের কারণ এই যে, সন্তানেরা স্বগৃহে লালিত পালিত হয় বলে তাদের আকার আকৃতি অবয়ব কোনোকিছুই অবিদিত থাকে না। রসুল পাক স. সম্পর্কেও তেমনি তারা অনবগত নয়। তাঁর আকার, অবয়ব ও পরিচিতি স্পষ্টাক্ষরে তওরাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি যে প্রকৃতই নবী— তা তারা ভালোভাবেই জানে। হিংসা, হঠকারিতা ও জাত্যাভিমানের কারণেই তারা তাঁর নবুয়তকে অস্বীকার করে যাচ্ছে। যদি 'ইয়া'রিফুনাহু' শব্দের 'হু' সর্বনামটি কোরআন পাকের সঙ্গে সম্বন্ধিত হতো, তবে ' যেরূপ তারা নিজেদের সন্তানদেরকে চিনে' একথা না বলে ' যেরূপ তারা তওরাতকে জানে বা চিনে' এরূপ বলা হতো।

হজরত ওমর একবার হজরত আবদুল্লাহ বিন সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কী করে আপন সন্তানদের মতো রসুলে পাক স. কে চিনেন? তিনি বললেন, যখন আমি সর্বপ্রথম রসুলপাক স. কে দেখেছি তখন আমি তেমনিভাবে চিনেছি যেমন চিনি আপন সন্তানদের। হজরত ওমর বললেন, কিন্তু তা কিভাবে? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্ পাক আমাদের কিতাবে তাঁর আকৃতি, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যাবলীর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। সে কারণেই তাঁকে চিনতে আমার কোনোই অসুবিধা হয়নি। বরং আপন সন্তান সম্পর্কেও সংশয় থেকে যেতে পারে। কারণ, সন্তানের মা হয়তো মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারে (অন্যের সন্তানকেও তার স্বামীর সন্তান বলে ঘোষণা দিতে পারে)। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনোপ্রকার সংশয়েরই অবকাশ নেই। যেহেতু এখানে সাক্ষ্য দিচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্পাক। হজরত ওমর বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। আল্লাহ্ পাক আপনার কল্যাণ করুন।

'তাদের একদল জেনে শুনে সত্য গোপন করে থাকে'— একথার অর্থ অবিশ্বাসী ইহুদীরা মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. এর গুণাবলী, নবুয়ত, দুই কেবলার বিধান— এ সকল কিছুই তওরাতের মাধ্যমে জানা সত্ত্বেও প্রকাশ করে না।

'সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত'- একথার অর্থ, হে নবী! সত্য সেটাই যা আপনার প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত এবং যার উপরে আপনি প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। গ্রন্থধারীরা যার উপর প্রতিষ্ঠিত তা সত্য নয়। কিছুতেই নয়। সুতরাং হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি তাদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে সন্দিহানদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না। শেষ ব্যাক্যটির কয়েক রকম অর্থ হতে পারে। যেমন, ১. আপনি তাদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না, যারা আল্লাহর বিধান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। ২. সত্য সম্পর্কে জেনেও যারা সত্য গোপন করে, আপনি তাদের দলভুক্ত হবেন না। ৩. অথবা রসুল পাক স.কে সম্বোধনের মাধ্যমে তাঁর উম্মতকে এখানে এই মর্মে শিক্ষা দান করা হয়েছে যে, তারা যেনো আরেফ বিল্লাহ (আল্লাহর পরিচয় লাভকারী) গণের সঙ্গে থেকে মারেফাত অর্জন করে এবং এভাবে সকল সন্দেহের উর্ধ্বে অবস্থান নিতে সক্ষম হয়। সন্দেহবাদীদের সংসর্গ মানুষকে বিশ্বাসচ্যুত করে। তাই

www.eelm.weebly.com

এখানে এই চিরন্তন সদুপদেশটি দেয়া হয়েছে এভাবে— সন্দিহানদের অন্তর্ভূত হয়ো না।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৪৮,১৪৯,১৫০

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۭ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ
جَمِيْعًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُوْنَ ○ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَ
حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۤ ۙ
اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۤ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۤ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

❑ প্রত্যেকের একটি দিক রহিয়াছে, যে দিকে সে মুখ করিয়া দাঁড়ায়। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্র করিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❑ যেখান হইতেই তুমি বাহির হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। ইহা নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নহেন।

❑ এবং তুমি যেখান হইতে বাহির হওনা কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাইবে, যাহাতে তাহাদের মধ্যে সীমালংঘণকারীগণ ব্যতীত অপর কোন লোক তোমাদের সহিত বিতর্ক না করে। সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না, শুধু আমাকেই ভয় কর যাহাতে আমি আমার সম্পদ তোমাদিগকে পূর্ণরূপে দান করিতে পারি ও যাহাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হইতে পার।

---

www.eelm.weebly.com

প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে যেদিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক কেবলা। আল্লাহ্ পাকের বিধান এরকমই। আল্লাহ্ পাক হজরত মুসার জন্য যেমন কেবলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তেমনি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর জন্যও স্বতন্ত্র কেবলা বিধিবদ্ধ করেছেন। কেবলা নির্ধারণ হচ্ছে ইবাদত সংক্রান্ত ব্যাপার, যে সম্পর্কে কারো মতামত প্রদানের অধিকার নেই। সুতরাং, এ বিষয়ে বিবাদ বিসম্বাদের কোনো অবকাশ নেই। তাই বলা হয়েছে, 'অতএব তোমরা সৎ কর্মে প্রতিযোগীতা করো।' অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধান পালনের দিকে অগ্রসর হও। যখন তিনি বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার বিধান জারি করেন, তখন সেই দিকে মুখ করো। আবার যখন বায়তুল্লাহ মুখী হতে বলেন, তখন নির্বিবাদে বায়তুল্লাহ্কে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করো। বিনাবাক্যে আল্লাহ্র বিধানকে মেনে নেয়াই ইমান এবং এই বিধান অনুযায়ী আমল করার নামই ইবাদত। যদি বিধান অমান্য করো তবে মনে রেখো- সম্মুখে রয়েছে মৃত্যু, মৃত্যুত্তর জীবন, হাশর। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি তোমাদেরকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেনই। অতএব তাঁর আজ্ঞাবহ হও। পরিবর্তিত কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করো।

বায়তুল্লাহ্ শরীফই হচ্ছে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত কেবলা। কিছুতেই কেবলা স্থির করা যাচ্ছে না- এমন অবস্থায় পড়লে, অন্তরের প্রবল ধারণা অনুযায়ী যেদিককে কেবলা মনে হবে সেদিকে মুখ করেই নামাজ আদায় করতে হবে। ভ্রাম্যমান অবস্থায় বাহন যেদিকে চলবে সেদিকেই কেবলা ধরে নিয়ে নফল নামাজ আদায় করা যাবে। নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করতে হবে এবং তা আদায় করতে হবে কেবলামুখী হয়ে। সেই কেবলা পশ্চিমে হোক বা পূর্বে। গৃহে, প্রবাসে, সকল অবস্থায় নামাজের সময় কেবলামুখী হওয়া ফরজ। আয়াতে তাই বলা হয়েছে, ' যেখান থেকেই তুমি বের হওনা কেনো— মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও।' এই বিধানটি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হচ্ছে এ কারণে যে— গৃহে, প্রবাসে সকল অবস্থায় কেবলার হুকুম একই। হজরত হুজায়ফা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. বলেছেন, আমাকে এবং আমার উম্মতবর্গকে তিনটি বিশেষত্বের মাধ্যমে মর্যাদামন্ডিত করা হয়েছে। ১. আমাদের নামাজের জামাতগুলো ফেরেশতাদের সারিবদ্ধ জামাতের অনুরূপ। ২. আমাদের জন্য সমগ্র পৃথিবীই মসজিদ। যেখানে খুশী সেখানে আমরা নামাজ আদায় করতে পারবো। ৩. মাটির মাধ্যমে আমাদেরকে পবিত্র হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। পানি না পেলে অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আংশকা থাকলে আমরা মাটি দ্বারা 'তায়াম্মুম' করে পবিত্র হতে পারি।

কতিপয় ভাষ্যকারের অভিমত এই যে, কেবলা পরিবর্তনের মধ্যে তিনটি উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। ১. রসুলুল্লাহ্ স. এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা। কারণ, তাঁর বাসনানুযায়ী কেবলা পরিবর্তন করা হয়েছে। ২. আল্লাহ্ পাকের স্বাভাবিক সাধারণ

www.eelm.weebly.com

বিধান হচ্ছে, শ্রেষ্ঠ নবীগণের জন্য স্বতন্ত্র কেবলা নির্ধারণ। তাই তাকেও হজরত ইব্রাহিম ও হজরত মুসার মতো স্বতন্ত্র কেবলা দেয়া হয়েছে। ৩. বিরুদ্ধবাদীদেরকে নির্বাক করে দেয়াও কেবলা পরিবর্তনের আরেকটি উদ্দেশ্য। বাহ্যতঃ মনে হচ্ছে, বিষয়টি বার বার উল্লেখ করা হচ্ছে। কিন্তু এর প্রতি গভীর অভিনিবেশ নিবদ্ধ করলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, কেবলা পরিবর্তন একটি বহুল আলোচিত, আলোড়িত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক বিধান রহিত করে তদস্থলে অন্য বিধান বলবৎ করলে স্বভাবতই বিশৃংখলা মাথা তুলে দাঁড়াবার অবকাশ পায়। তাই সন্দেহের মূলোৎপাটনকল্পে বিষয়টিকে বার বার উল্লেখের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যৌক্তিকতাবিরোধী নয়। আয়াতে তাই বলা হয়েছে, সীমালংঘনকারীগণ ব্যতীত অপর কেউ যেনো তোমাদের সাথে বিতর্ক না করে। অর্থাৎ হে মুমিনগণ! কেবলা পরিবর্তন করা হয়েছে এই কারণে যে, ইহুদীরা যেনো তোমাদের প্রতি দোষারোপ করার সুযোগ না পায়। কারণ তাদের কিতাবেই লিপিবদ্ধ হয়েছে, ইব্রাহিমের কেবলা বায়তুল্লাহ, শেষ নবীর কেবলাও বায়তুল্লাহ্। এখন কেবলা পরিবর্তন না করা হলে তারাই আপত্তি উত্থাপন করে বলবে, দেখো! ইনি শেষ নবী নন— যদি হতেন, তবে তওরাতের বর্ণনানুযায়ী তিনি বায়তুল্লাহকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করতেন। বায়তুল্লাহ্ শরীফকে কেবলা করার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরে এখন থেকে মুশরিকেরাও তোমাদের প্রতি দোষারোপ করতে পারবে না। কারণ, তারা জানে, কাবা শরীফ হচ্ছে হজরত ইব্রাহিমের কেবলা আর রসুল পাক স. ইব্রাহিমী মিল্লাতের দাবীদার। সুতরাং এখন থেকে তাদের একথা বলার অধিকারও রহিত হয়ে গেলো যে, রসুলুল্লাহ স. ইব্রাহিমী মিল্লাতের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কেবলাকে গ্রহণ করেননি।

'সীমালংঘনকারীগণ বা জালেমগণ ব্যতীত অন্য কেউ বির্তকে লিপ্ত হবে না'— — এ কথার অর্থ, যারা সচেতন ও বুদ্ধিমান তারা একথা সহজেই বুঝে নিতে পারবে যে, কেবলা পরিবর্তনের এই বিধানের বিরুদ্ধে কোনো রকম যুক্তি প্রমাণই দাঁড় করানো যাবে না। কিন্তু সীমালংঘনকারীরা সত্তাগতভাবে হিংসা ও বিদ্বেষভাবাপন্ন। তারা তো বিভিন্ন রকম কথা বলবেই। বাস্তবেও তাই দেখা গেলো— কোরাইশদের দলপতিরা বলতে শুরু করলো, এতোদিনে মোহাম্মদের হুঁশ হলো। সে আমাদেরকে বলতো, পথচ্যুত। শেষ পর্যন্ত আমাদের কেবলাকেই গ্রহণ করতে বাধ্য হলো সে। ওদিকে ধূর্ত ইহুদীরা বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদ ভালো করেই জানে যে, বায়তুল মাকদিসই হচ্ছে প্রকৃত কেবলা। তবুও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে এবং জাতিগত স্বার্থের কথা চিন্তা করে সে কেবলা পরিবর্তন করে ফেললো। যারা সত্য বিদ্বেষী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, তারা দলিল প্রমাণের কোনো ধার ধারে না। তারা অবিশ্বাসী। বিদ্রোহী। সুতরাং তারা অনর্থক বাক বিতন্ডা করতেই থাকবে। এ বিষয়ে শংকাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাদেরকে ভয় কোরো না, শুধু আমাকেই ভয় করো- যাতে

www.eelm.weebly.com

আমি আমার সম্পদ তোমাদেরকে পূর্ণরূপে দান করতে পারি এবং যাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হতে পারো।'

'যাতে আমি আমার সম্পদ তোমাদেরকে পূর্ণরূপে দান করতে পারি'—এ কথার অর্থ, আমাকে ভয় করো আমি তোমাদেরকে রক্ষা করবো এবং যে অক্ষয় বৈভব তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছি, তা দান করবো। এই অক্ষয় বৈভব আর নেয়ামত সম্পর্কে হাদিস শরীফে উল্লেখ এসেছে এরকম- রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, নেয়ামতের পূর্ণত্ব হচ্ছে- জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি ও বেহেশতে বসবাসের অধিকার। হজরত মুআজ থেকে বোখারী ও তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হজরত আলী বলেছেন, নেয়ামতের পূর্ণত্ব অর্থ, ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করা।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৫১, ১৫২

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○ فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ○

❒ যেমন আমি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট এক রসুল প্রেরণ করিয়াছি যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট আবৃত্তি করে, তোমাদিগকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যাহা জানিতে না তাহা শিক্ষা দেয়।

❒ সুতরাং তোমরা শুধু আমাকেই স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হইও না।

'যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট এক রসুল প্রেরণ করেছি'— এখানে তোমাদের বলতে বুঝানো হয়েছে কোরাইশ এবং তাদের অনুসারীদেরকে। আল্লাহ্ পাক হজরত ইব্রাহিমকে জানিয়েছিলেন, আমি তোমাকে ইমাম মনোনীত করবো। তিনি বলেছিলেন, হে আমার আল্লাহ! আমার বংশধরকেও ইমাম বানিয়ে দিও। তাঁর এই প্রার্থনা কবুল হয়েছিলো- তাই কোরাইশরা অন্যদের নেতা। রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, অন্যান্য মানুষ কোরাইশদের অনুসারী।

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদ ইবনে জারীর বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম কয়েকটি প্রার্থনা করেছিলেন- তার মধ্যে একটি এই— 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার আনুগত্য দান করো। আমার সন্তানদের এক দলকেও তোমার অনুগত করে নিও।'

আরেকটি প্রার্থনা ছিলো— 'আয় আল্লাহ! তাদের মধ্য থেকে একজন রসুল প্রেরণ করো।' এই প্রার্থনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এরকম–এখন আমি ইব্রাহিমের প্রার্থনা বাস্তবায়ন করবো। তোমাদেরকে হেদায়েত দান করবো। মুসলমান বানিয়ে দেবো এবং আমার নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণরূপে দান করবো। এই উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের মধ্যে রসুল প্রেরণ করেছি। এই রসুল প্রেরণের সঙ্গে পরবর্তী আয়াতের সংযোগ সাধিত হয়েছে এভাবে— রসুল প্রেরণ করে আমি তোমাদের স্মরণ করেছি, কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ করো। যদি স্মরণ করো, তবে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। একথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, বান্দা যদি আল্লাহ্পাককে স্মরণ করে, তবে সেই স্মরণের পূর্বে ও পরে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে স্মরণ করেন। আল্লাহপাকের প্রথম স্মরণ করার অর্থ হলো— তিনিই বান্দাকে স্মরণ করার তৌফিক দেন। পরে স্মরণ করার অর্থ হলো— সেই স্মরণের প্রতিদান দেন।

এখানে রসুল অর্থ মোহাম্মদ মোস্তফা আহম্মদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সাল্লাম। তিনি আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন। মানুষকে পবিত্র করবেন। কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং মানুষ যা জানেনা সেই জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। এখানে দু'বার শিক্ষা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে কিতাব ও হিকমত এবং অন্যটি হচ্ছে এলমে লাদুন্নী। এই এল্মে লাদুন্নী সম্পর্কে বলা হয়েছে, তোমরা জানতে না। এই অজানা জ্ঞান কোরআনের অন্তর্নিহিত জ্ঞান। রসুলুল্লাহ স.এর পবিত্র বক্ষাধার সেই জ্ঞানের আধার। এই জ্ঞান সকল জ্ঞানের ঊর্ধ্বে।

জ্ঞাতব্য ঃ জ্ঞান দু'ধরনের। ১. অর্জিত জ্ঞান (এলমে হুছুলী), ২. আত্মজ্ঞান (এলমে হুজুরী)। অর্জিত জ্ঞান ইন্দ্রিয়নির্ভর এবং আত্মজ্ঞান ইন্দ্রিয়াতীত। নবী রসুলগণ এই আত্মজ্ঞানের অধিকারী। তাই তাঁদের অন্তর— দর্পণে মারেফাতের সূর্যালোক প্রতিবিম্বিত হয়। প্রকৃত বিশ্বাসীরা নিজেদের অন্তরের আয়নায় সেই প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব ধারণ করে আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে থাকেন। ওই আয়নার প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটন দুরূহ। এই জ্ঞান সত্তাসন্নিহিত, সত্তাস্থিত। সত্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে যেমন কোনো দলিল প্রমাণের আবশ্যক করে না। আমিই যে আমি— একথা সহজেই বুঝা যায়। আত্মজ্ঞানে জ্ঞানীরাও তেমনি সহজেই বুঝেন যে, আল্লাহ্ই আল্লাহ্। সন্দেহ প্রমাণ কোনোকিছুরই প্রবেশাধিকার নেই সে অতুলনীয় বিশ্বাসে। কোরআন মজীদের প্রকাশ্য বর্ণনা দলিল প্রমাণ অর্জিত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। আর আত্মজ্ঞান যেহেতু সত্ত্বানির্ভর তাই এই জ্ঞান মানুষ তার

www.eelm.weebly.com

অস্তিত্বের আধারেই বহন করে চলেছে। সত্তা থেকে সত্তায় বয়ে চলেছে এই জ্ঞানপ্রবাহ। সেই প্রবাহের শিক্ষক ও পরিচালক হচ্ছেন মহান সুফী সম্প্রদায়।

হজরত হানজালা বিন রবীয় উসাইয়েদী থেকে মুসলিমের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে (হজরত হানজালা বলেন) —একবার হজরত আবু বকরের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর? আমি বললাম, হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, সোবহানাল্লাহ্! সে কি কথা। আমি বললাম, যতোক্ষণ আমি রসুলের দরবারে অবস্থান করি ততোক্ষণ তাঁর পবিত্র সংসর্গে নিজেও পবিত্র হয়ে যাই। তিনি যখন বেহেশত্ ও দোজখের বিবরণ দেন তখন মনে হয় বেহেশ্ত দোজখ সব কিছুই প্রত্যক্ষ করি। যখন গৃহে ফিরে আসি তখন সেই পবিত্র অবস্থা আর থাকে না। স্ত্রী-পুত্র পরিজনের সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে যাই বলেই আমার এই অধঃপতন। হজরত আবু বকর বললেন, আমারওতো ওই একই অবস্থা। দু'জনে তখন একত্রে রসুলে পাক স.এর দরবারে গমন করলেন। হজরত হানজালা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। যতোক্ষণ আমরা আপনার পবিত্র সাহচর্যে অবস্থান করি ততোক্ষণ আমাদের এমতোন অবস্থা থাকে যে, আপনার বর্ণিত বেহেশ্ত দোজখ যেনো আমাদের নিকট প্রত্যক্ষগোচর থাকে। আর যখন নিজেদের সংসারে ফিরে যাই তখন এই অবস্থা আর থাকে না। রসুলপাক স. বললেন, যার অধিকারে আমার জীবন সেই পরম সত্তার শপথ, আমার সংসর্গে তোমাদের যে অবস্থা হয় তা যদি স্থায়ী হতো তবে তোমাদের চলাফেরার সময়, শয়নকক্ষে— সকল অবস্থায় ফেরেশতারা তোমাদের সঙ্গে করমর্দন করতো। এই হাদিসের অর্থ হচ্ছে সার্বক্ষণিক পবিত্রাবস্থা যা ফেরেশ্তা জগতের জন্য শোভনীয়। ফেরেশ্তা জগত প্রতিষ্ঠিত হলে জড়জগতের অস্তিত্ব আর থাকবে না। তাই এই পবিত্রাবস্থা হবে সাময়িক, সার্বক্ষণিক নয়।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন— আমি হজরত রসুল স. থেকে জ্ঞানের দু'টি পাত্র অর্জন করেছি। একটি তোমাদের মধ্যে বিতরণ করেছি। অন্যটি করিনি। যদি করতাম, তবে আমার কণ্ঠদেশ কর্তিত হতো। বোখারী। হাদিসের ভাষ্যকারগণ বলেন— দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান ছিলো অত্যাচারী সম্রাট ও শাসকদের পরিচিতিসম্ভূত জ্ঞান। যেমন, অপর একটি হাদিসে উল্লেখ রয়েছে— রসুল পাক স. বলেছেন, আয় আল্লাহ! আমি ষাট হিজরীর প্রারম্ভে ওই সকল অপ্রবীনদের যে রাজত্ব শুরু হবে তা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। একথার মধ্যে এজিদের রাজত্বের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিস থেকে ভাষ্যকারগণ যে মর্ম উদ্ধার করেছেন, তা হাদিসের প্রকৃত মর্ম নয়। কারণ আংশিক কতকগুলো ঘটনাপঞ্জিকে জ্ঞানের পাত্র বলা এবং শরিয়ত সম্পর্কিত বিদ্যার পাত্র স্থির করা কোনোক্রমেই হাদিসের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়। প্রচারযোগ্য জ্ঞানকে যেমন একটি পাত্র বলা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে। তেমনি অপ্রচারযোগ্য জ্ঞানকেও আরেকটি পাত্র বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝে নিতে হবে যে, প্রকাশ্য জ্ঞানের পাত্র গোপন জ্ঞানের পাত্রের সমান্তরাল অর্থাৎ সমগুরুত্ব সম্পন্ন। তাই আমি বলি, সেই গোপন জ্ঞান হচ্ছে এল্‌মে লাদুন্নী। এবার কেউ যদি প্রশ্ন করে, যদি তাই হয় তবে কণ্ঠচ্ছেদনের প্রশ্ন আসে কেনো? জবাবে বলতে হয়, হাদিসের প্রকৃত বক্তব্য এরকম— আমি সেই জ্ঞানের কথা ভাষায় প্রকাশ করলে লোকে আমার গলা কেটে দেবে। আসল কথা হচ্ছে এই যে, এলমে লাদুন্নীর অধিকারী ব্যক্তি তার ওই বিদ্যাকে ভাষায় রূপ দিতে অপারগ। ভাষার মৌখিক ও লিখিত রূপের মাধ্যমে এ বিদ্যা শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। এই বিদ্যা গ্রহণ করতে হয় অন্তর থেকে অন্তরে, আত্মা থেকে আত্মায়। মৌখিক বা লিখিত জ্ঞানকে বলে এল্‌মে হুছুলী বা অর্জিত জ্ঞান। বিষয়বস্তু, শব্দসম্ভার, শ্রুতি, ইন্দ্রিয়ানুভূতি— এ সকল কিছুর সহযোগে যে বিদ্যা অর্জিত হয় তাকেই বলে অর্জিত বিদ্যা। পক্ষান্তরে এল্‌মে লাদুন্নী হচ্ছে— আত্মসমাহিতিসম্ভূত জ্ঞান। এই জ্ঞানকে এলমে হুজুরী বলা যেতে পারে। এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়াতীত। এই জ্ঞানের বিবরণ দিতে গেলে বক্তাকে রূপক ভাষার আশ্রয় নিতে হয়।

জ্ঞাতব্য ঃ ভাষাবিদগণের নিকট রূপক অর্থ গ্রহণের শর্ত হচ্ছে— প্রকৃত ও রূপকের মধ্যে সুনিবিড় সম্পর্ক থাকতে হবে। কোরআন মজীদে অনেক স্থানে রূপক অর্থের ব্যাবহার লক্ষ্য করা যায়। সে সকল রূপক অর্থ প্রকাশ্য অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু প্রকৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও দিব্যজ্ঞান শুধু আরবী কেনো, পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কথক অথবা লেখকের রূপক ভাষা অযোগ্য শ্রোতা ও পাঠকের চিন্তায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে বাধ্য। এরকম অযোগ্য ব্যক্তিরা রূপক বিষয়কে তাদের অপবিত্র ও অপরিণত ধারণায় আবদ্ধ করে ফেলে। ফলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে। তারা তখন বক্তাকে কাফের ফাসেক ইত্যাদি বলতে শুরু করে। শায়েখ মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবীর তত্ত্বকথা পাঠ করে এবং তাঁর রূপক বর্ণনা সমূহের মর্ম বুঝতে সক্ষম না হয়ে অনেক আলেম শিরক প্রভাবিত তৌহিদকে আশ্রয় করেছিলো। কেউ কেউ তার বিরুদ্ধে কাফের ফতোয়া জারী করেছিলো। তবে ওই সকল আলেম এই ফেতনা থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন যাঁরা শায়েখ আরাবীর বক্তব্যকে এল্‌হাম অথবা আধ্যাত্মিক যোগ্যতা দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। তার অভিমত সমূহকে তারা রূপক অর্থে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবে তাদের নিকট উন্মোচিত হয়েছিলো এল্‌মে লাদুন্নীর অলৌকিক তোরণ। সেই সূত্রে তাঁরা তখন সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এলমে হুছুলী ও এলমে হুজুরীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সমূহকে।

যে জ্ঞানের শব্দায়ন অসম্ভব, সে জ্ঞানের কথা প্রকাশ করতে গেলে বিশৃংখলা অনিবার্য; এরকম যদি কেউ করে, তবে তাকে কাফের ফাসেক ইত্যাকার নানা বিশেষণে নিন্দিত হতে হয়। হজরত আবু হোরায়রা এবিষয়ে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই বলেছিলেন— দ্বিতীয় পাত্রটি প্রকাশ করলে আমার

www.eelm.weebly.com

কণ্ঠচ্ছেদ করা হবে। অর্থাৎ জনসাধারণ যেহেতু অজ্ঞ, অযোগ্য— তাই কেউ আমার বক্তব্যভঙ্গিমা বুঝবে না এবং আমাকে ধর্মত্যাগী মনে করে হত্যা করে বসবে।

প্রশ্ন হতে পারে, যে জ্ঞানের ভাষা নেই এবং যে জ্ঞান প্রকাশোদ্যত হলে রক্তপাত অনিবার্য হয়, সে জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় কি লাভ? অথচ আমরা দেখছি, আধ্যাত্মিক সাধকগণ এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন, ফুসুসুল হিকাম, ফতুহাতে মাক্কিয়া ইত্যাদি। এ প্রশ্নের জবাব এই— ওই সকল গ্রন্থ প্রনয়নের উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, ওগুলো পাঠ করে কারো এল্‌মে লাদুন্নী লাভ হবে অথবা ওগুলো অধ্যায়ন করে কেউ হয়তো কিছুটা নৈকট্য বা বেলায়েত লাভ করবে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, আধ্যাত্মিক পথে যে পথিক চলমান অথবা প্রেমাপ্লুত (সালেক ও মজ্জুব বা জজ্‌বা প্রাপ্ত) সে তার সংক্ষিপ্ত আত্মিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ লাভ করবে। এভাবে পূর্বসূরীগণের আধ্যাত্মিক অবস্থার সঙ্গে নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থার সমন্বয় সাধন করবে। দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে, ওই মহাত্মাগণ ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রন্থাবলী সংকলন করেননি। আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রাবল্যের প্রেক্ষিতে তাঁরা কখনো কখনো রহস্যপূর্ণ কথা উচ্চারণ করেছেন। তাঁদের অনুসারীরা সেকথা লিপিবদ্ধ করে প্রচার করেছেন। ওই সকল কিতাবকে অস্বীকার না করাই সমীচীন। শরিয়তের সমান্তরালে সেগুলো বুঝা সম্ভব হলে বুঝতে হবে অথবা এরূপ বলতে হবে— আল্লাহ্‌তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত। ওই সকল গ্রন্থের অধিকাংশ বিবরণই রূপক। তাদের কোনো কথাই শরিয়ত বিরুদ্ধ নয় বরং প্রকৃত অর্থে সেগুলো কিতাব ও সুন্নাহ্‌রই নিগুঢ় তত্ত্ব। আল্লাহ্‌পাক তাঁর আপন মহিমায় আমাকেও ওই নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে কিঞ্চিত জ্ঞান দান করেছেন।

জ্ঞাতব্যঃ মহান সুফীগণ নিমগ্নতা, বিভোরতা ও অবস্থার প্রাবল্যে (গালবায়ে হালের সময়ে) তাঁদের আধ্যাত্মিক অবস্থার বিভিন্ন বিবরণ প্রদান করেন। সেগুলো প্রকাশ্যত শরিয়ত বিরোধী মনে হলেও মূলতঃ দূষনীয় নয়। যখন বাহ্যিক জ্ঞান লুপ্ত হয় তখন মানুষের পাপ পুণ্য লিখন কার্য্যও স্থগিত থাকে। সুফী সম্প্রদায়ের বাণীগুলো ওই অবস্থার বিবরণ যা পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। শরিয়তবিরুদ্ধ কোনো তরিকত প্রতিষ্ঠা সেগুলোর কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না। অবশ্যই ছিলো না।

পরম তত্ত্বের পরিচিতি লাভ হয় অন্তরের বিবর্তন এবং অলৌকিক প্রাপ্তির মাধ্যমে। অধিক জিকির ও মোরাকাবা ওই প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে। সেই জিকির ও মোরাকাবা সম্মিলিতভাবে হোক অথবা এককভাবে। আল্লাহ্‌পাক সেই জিকিরের প্রতি আয়াতে ইঙ্গিত করেছেন এভাবে- 'ফাজকুরুনী' (তোমরা আমার স্মরণ কর)। এরপর বলেছেন, 'আজকুরকুম' (আমি তোমাদের স্মরণ করবো)। আবু শাইখ এবং দায়লামী মস্‌নদে ফিরদাউস গ্রন্থে জোবায়েরের মাধ্যমে, তিনি জুহাকের মাধ্যমে এবং তিনি হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলে

www.eelm.weebly.com

করীম স. 'ফাজকুরুনী আজকুরকুম' আয়াতের শানে এরশাদ করেছেন— আল্লাহ্ পাক বলেন, হে বান্দাসকল তোমরা আমাকে ইবাদতের মাধ্যমে স্মরণ করো। আমি মাগফিরাত সহ তোমাদেরকে স্মরণ করবো। অর্থাৎ তোমরা আমার ইবাদত করো আমি তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে আকরম স. বলেছেন— আমার বান্দা আমার প্রতি যে ধারণা পোষণ করে, আমি তার সেই ধারণার অনুকূল। সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমিও তাকে স্মরণ করি। সে যদি কোনো অনুষ্ঠানে আমাকে স্মরণ করে, তবে অধিকতর উত্তম অনুষ্ঠানে আমি তার স্মরণ করি। সে যদি আমাকে অন্তরে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে অন্তরে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে তবে আমি অগ্রসর হই এক হাত। সে যদি এক হাত আসে তবে আমি গমন করি দুই হাত। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে তবে আমি তার দিকে অগ্রসর হই দৌড়ে। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাস থেকে বাগবীও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার সাথে একথাটিও রয়েছে যে, হজরত আনাস বলেছেন, নিজের পাঁচটি আঙ্গুল গণনা করার মতো স্পষ্টরূপে এই হাদিসটি আমি রসুলপাক স. এর নিকট থেকে শুনেছি।

হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন শাকীক থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স.এরশাদ করেছেন, মানুষের অন্তর দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। একটি কক্ষে ফেরেশ্তা ও অপর কক্ষে শয়তানের অবস্থান। যখন মানুষ আল্লাহ্ পাকের জিকির করে তখন শয়তান তার কুঠরী ছেড়ে পালিয়ে যায়। আর যখন জিকির থেকে অমনোযোগী হয়, তখন শয়তান তার ঠোঁট অন্তরে প্রবেশ করিয়ে কুমন্ত্রনা দেয়। ইবনে আবি শায়বা।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল আকরম স. বলেছেন, মুফ্রিদিন অতীত হয়েছেন। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! মুফরিদ কারা? তিনি বললেন— অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র জিকিরে রত পুরুষ ও রমণীরা। মুসলিম।

অমনোযোগীতা বা ঔদাসীন্য বিদূরিত করাই জিকিরের মূল উদ্দেশ্য। অমনোযোগীতার কারণেই অন্তর কঠিন হয়। শরিয়ত সমর্থিত কথা কর্ম চিন্তা গবেষণা— এসব কিছুই জিকিরের অন্তর্গত। তবে শর্ত হচ্ছে এসকল কিছুই হতে হবে বিশুদ্ধ অন্তর সহযোগে। অসৎ উদ্দেশ্য ও অমনোযোগিতার সাথে সম্পাদিত আমল আল্লাহ্ পাকের দরবারে গ্রহণীয় নয়। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— যারা স্বীয় নামাজে বিনয়ী প্রকৃতপক্ষে তারাই সফলকাম। আরো এরশাদ করেছেন, ওই সকল নামাজী ক্ষতিগ্রস্ত যারা তাদের নামাজে অমনোযোগী থাকে।

হজরত জাবের থেকে নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান এবং মালেক বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন— রসুল পাক স. বলেছেন, উত্তম জিকির হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' আর উত্তম দোয়া হচ্ছে 'আল হামদুলিল্লাহ্।' হজরত সামুরা বিনতে জুন্দুব থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. এরশাদ করেন, চারটি বাক্য অতি

www.eelm.weebly.com

উত্তম ১. সোবহানাল্লাহ্ ২. আলহামদুলিল্লাহ্ ৩. লা—ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং ৪. আল্লাহু আক্‌বার। মুসলিম। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, কালাম পাকের পরে এই বাক্যগুলোই সর্বোত্তম। প্রকৃতপক্ষে বাক্যগুলো কোরআন মজীদ থেকেই সংগৃহীত। আহমদ। হাদিসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্‌পাক বলেন— যে ব্যক্তি কোরআন মজীদে বিভোর সে যদি প্রয়োজন পূরণের জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করার অবকাশ না পায় তবে আমি প্রার্থনাকারীদের চেয়েও অধিক তাকে দান করবো। আল্লাহ্‌পাক আরও বলেন, সকল বাণীর চেয়ে আল্লাহ্‌র বাণী ওইরূপ মর্যাদাশীল যেমন আল্লাহ্‌পাক মর্যাদাশীল সকল সৃষ্টির তুলনায়। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি ও দারেমী।

উপরোক্ত হাদিসগুলোর বর্ণনানুসারে মহান সুফী সাধকগণ প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে 'লা—ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমার জিকিরকেই প্রধান আমল বলে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী র. এর নিকট কোরআন মজীদ তেলাওয়াত অধিক পছন্দনীয়। কারণ কোরআন পাক—কালাম সিফাতেরই গুঢ়তত্ত্ব। তাঁর পবিত্র বাণীর মর্যাদা অবিসংবাদিত, অতুলনীয়। আল্লাহ্‌পাক ও তাঁর বান্দার মধ্যে এই কালাম এক অতুলনীয় সেতুবন্ধন। এই অতুলনীয় জ্যোতিচ্ছটায় যে আলোকিত হয়েছে, সে ইহ ও পরকালের নেয়ামত লাভ করতে পেরেছে। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী অধিক পরিমানে নফল নামাজ আদায় করতেন। যেহেতু নামাজ হচ্ছে মুমিনদের মিরাজ। এভাবে নফল নামাজে অধিক কোরআন তেলাওয়াত ছাড়াও আত্মবিনাশনের (ফানায়ে নফ্‌সের) প্রতি তিনি সকলকে উদ্বুদ্ধ করতেন। ফানার পূর্বক্ষণেও নফী এসবাত এর জিকির আবৃত্তি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। কারণ ফানা বা বিনাশনের পূর্বে কালাম পাকে নিমগ্ন হওয়া সঙ্গত নয়। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— পবিত্র জন ব্যতীত কেউ এই কোরআন স্পর্শ করতে পারে না। একথার অর্থ হচ্ছে, যে সকল লোক এখনো অন্তরের পাপপঙ্কিলতা থেকে পবিত্র হতে পারেনি, তাদের জন্য কোরআন শরীফ পাঠ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জিকির করাই বাঞ্ছনীয়।

'তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, কৃতঘ্ন হইওনা'— একথার অর্থ তোমরা আমার দানকে গ্রহণ করে আমার প্রতি কৃতজ্ঞভাজন হও। রসুল প্রেরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে পথপ্রদর্শনের যে ব্যবস্থা আমি করেছি সেই করুনাসিক্ত ব্যবস্থাকে মেনে নাও।

শেষে বলা হয়েছে 'কৃতঘ্ন হইও না'—একথার অর্থ নবী প্রেরণের যে নেয়ামত তোমাদেরকে দান করেছি, তাকে অস্বীকার কোরো না। তাঁর সত্য প্রচারের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি কোরো না। সময় অপচয় করে আল্লাহ্‌র জিকির থেকে বিমুখ হয়ো না।

www.eelm.weebly.com

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

❒ হে বিশ্বাসীগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত আছেন।

❒ আল্লাহ্র পথে যাহারা নিহত হয় তাহাদিগকে মৃত বলিও না, তাহারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উহা উপলব্ধি করিতে পার না।

'ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো'—একথার অর্থ, দ্বীন দুনিয়ার সকল প্রয়োজন মিটাতে, বিশেষ করে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য ও মারেফাত অর্জনের লক্ষ্যে সবর ও নামাজের সাহায্য গ্রহণ করো। 'সবর' শব্দের আভিধানিক অর্থ বাধা দেয়া। অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তিকে বাধা দেয়া। রোজাকেও সবর বলা যায়। নামাজকেও। কারণ নামাজ, রোজা কুপ্রবৃত্তিকে বাধা প্রদান করে। নির্জন ইবাদতও আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে। নির্জনবাস সম্পর্কে রসুলে পাক স. এরশাদ করেছেন, ফেৎনার সময় মুসলমানের উত্তম সম্পদ হবে তাঁর ছাগল। ফেৎনামুক্ত থাকার মানসে ছাগল নিয়ে পর্বতশিখরে আত্মগোপন করাই বাঞ্ছনীয়। নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম। নামাজ ইবাদতের মূল ও মুমিনগণের মেরাজ। হজরত আলী থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে, নামাজ ধৈর্যের খুঁটি। মসনদে ফেরদৌস প্রণেতা এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— নামাজ মু'মিনগণের নূর। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী র. বলেছেন, ইবাদতকারীর সর্বোচ্চ মর্যাদাই নামাজের গূঢ় তত্ত্ব।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন'—তাফসীরকারকগণ বলেছেন, একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক সাহায্য সহানুভূতি ও প্রার্থনা গ্রহণের শুভেচ্ছা নিয়ে ধৈর্যশীলগণের সাহচর্যে থাকেন। আমি বলি, এই সাহচর্য এক অতুলনীয় নৈকট্যের নাম। আল্লাহ্র পরিচয়প্রাপ্তগণ এর মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম। অবশ্য এর অন্তর্নিহিত মূল তত্ত্ব আল্লাহ্ আলিমুল গায়েবই জানেন।

'আল্লাহ্র পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বোলো না, তারা জীবিত'—এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে বদর যুদ্ধের শহীদগণের সম্পর্কে। বদর যুদ্ধে শহীদগণের মধ্যে ছয়জন ছিলেন মোহাজির আর আটজন ছিলেন আনসার। তাঁদের সম্বন্ধে লোকজন বলাবলি করতো, হায়! অমুক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো। দুনিয়ার নেয়ামত তার হাতছাড়া হয়ে গেলো ইত্যাদি। তাদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদনার্থে আল্লাহ্ পাক অবতীর্ণ করলেন এই আয়াত। জানালেন, তারা মৃত নয় বরং

www.eelm.weebly.com

জীবিত। শহীদগণকে জীবিত বলার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্পাক তাঁদের রূহ্ সমূহকে শরীর বিশিষ্ট মানুষের মতোই শক্তি দান করেছেন। তাঁরা আকাশ, পৃথিবী, বেহেশত—সকল স্থানে পরিভ্রমণ করতে সক্ষম। বন্ধুর সাহায্য, শত্রুর ধ্বংসসাধনও তাদের ক্ষমতাভূত। আর তাঁরা এমতো মাহাত্মের অধিকারী যে, মাটি তাঁদের দেহ ও কাফন ভক্ষণ করতে পারে না।

বাগবী বলেছেন, বদর যুদ্ধের শহীদগণের রূহসমূহ প্রতি রাতে আরশের নিচে সেজদাবনত হয়। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরা এ রকমই করতে থাকবেন। অন্য একটি হাদিসে এসেছে—রসুল পাক স, এরশাদ করেছেন, শাহাদত লাভের পর শহীদদেরকে আল্লাহ্পাক অনিন্দ্য সুন্দর দেহ দান করেন। নির্দেশ দেয়া হয়, এই দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করো। রূহ তখন সেই সুন্দর শরীরে প্রবেশ করে, অনুভব করে এ যেনো তাঁর আগেরই শরীর। তাঁরা তখন বলেন ও উপলব্ধি করেন, মানুষ আমাদের কথা শুনছে ও দেখছে। তখন বেহেশতের হুর এসে তাঁদেরকে নিয়ে যায়। ইবনে মান্দা মুরসাল পদ্ধতিতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিম শরীফে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল পাক স. এরশাদ করেন, শহীদগণের রূহ্ সবুজ পাখি হয়ে যায়। পাখিরা জান্নাতে যত্রতত্র উড়াল দিয়ে বেড়ায়। আবার কখনো আরশের নিম্নে ঝুলন্ত ঝাড়বাতিতে বসে বিশ্রাম নেয়। বর্ণিত হাদিসগুলোর প্রেক্ষিতে কতিপয় বিদ্বানের অভিমত এই যে, বর্ণিত মর্যাদা কেবল শহীদগণের জন্যই নির্দিষ্ট। আমি বলি, এই অনন্যসাধারণ জীবন লাভ কেবল শহীদগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং নবীগণও এ রকম জীবনের অধিকারী। তাঁদের জীবন পার্থিব জীবনের মতোই প্রভাবশীল। রসুলুল্লাহ্ স. এর জন্য এই অনন্য মর্যাদা অধিকতর শক্তিশালী। তাই তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পবিত্র সহধর্মীনীগণের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ। শহীদগণের স্ত্রীদের প্রতি এ রকম নিষেধাজ্ঞা নেই। আবার সিদ্দিকগণের মর্যাদা শহীদগণেরও উর্ধ্বে। সলেহীন, অর্থাৎ আউলিয়া-ই- কেরামের মর্যাদা শহীদগণের নিম্নে—কিন্তু তাঁরাও এই মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন আল্লাহ্পাক বলেছেন, এরা তাঁরাই যাঁদেরকে আল্লাহ্ অনুগ্রহভাজন করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সলেহীন। এই আয়াতে তাঁদের মর্যাদার ক্রমধারা সূচিত হয়েছে। এ কারণেই সুফী সাধকগণ বলেছেন, আমাদের আত্মাগুলি আমাদের দেহ এবং আমাদের দেহগুলি আমাদের আত্মা। শতসহস্র নির্ভরযোগ্য ঘটনাপঞ্জীর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, অলি আল্লাহ্গণ তাঁদের বন্ধুদেরকে সাহায্য করেন এবং শত্রুদেরকে নিপাত করেন। তাঁরা আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী পথপ্রদর্শনও করেন।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী র.বলেছেন, কামালাতে নবুয়ত উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছে। যাঁরা কামালাতে নবুয়তের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যমন্ডিত, শরিয়তের পরিভাষায় তাঁরাই সিদ্দিক। তাঁরা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে অনশ্বর জীবন প্রাপ্ত। নিম্নোক্ত হাদিস সমূহের দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, নবী,

www.eelm.weebly.com

সিদ্দিক, শহীদ ও সলেহ্গণের দেহ মৃত্তিকা ভক্ষণ করতে পারে না। হজরত আউস বিন আউস থেকে বর্ণিত হয়েছে- মহানবী স. বলেছেন, আল্লাহ্ পাক নবীগণের দেহ মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। হজরত আবু দারদা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা। হজরত আবদুর রহমান ইবনে মায়সারা থেকে ইমাম মালেক বলেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট এ বিষয়টি পৌছেছে যে, আমি এ কথা জানতে পেরেছি, হজরত আমর বিন জামুহ্ ও হজরত আবদুর রহমান ইবনে জোবায়েরের কবর বন্যার তোড়ে ধ্বসে পড়েছিলো। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন উহুদ যুদ্ধের শহীদ। তাঁরা দু'জনেই একই কবরে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। তাঁদের কবর উন্মোচিত হলে দেখা গেলো, তাঁদের শরীর ও কাফন সতেজ এবং স্বচ্ছ। মনে হচ্ছিলো, যেনো গতকালই তাঁদেরকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। অথচ তাঁরা সমাধিস্থ হয়েছিলেন ছেচল্লিশ বছর আগে। তিবরানী থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল পাক স. বলেছেন, কবর যেনো খনন করা না হয়। খনন করলে কবরবাসীদের গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। কেনোনা তাঁদের সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের একটি গোপন সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি আরো বলেছেন, মৃতকে সমাহিত করার পর কবর থেকে বের করা উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, নিম্নবর্ণিত অবস্থায় কবরবাসীদের মরদেহ বের করা যেতে পারে। যেমন, কবরস্থানের জমি যদি কেউ জবর দখল করে, কবরের জমি যদি অংশীদারদের প্রাপ্য হয়, জলাশয় বা নদীর নিকটবর্তী হওয়ায় যদি বিধ্বস্ত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, শত্রুর দেশে যদি সমাধিস্থ করা হয় অথবা জনবসতি সংলগ্ন হওয়ার কারণে যদি কবরের প্রতি সমীহবোধ উঠে যাবার আশংকা থাকে কিংবা কেউ যদি কবরের স্থানে উট বা অন্য কোনো জন্তুর বসবাস নির্ধারণ করে— এসমস্ত ক্ষেত্রে কবর স্থানান্তর করা যাবে বলে আলেমগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিরমিজি বলেছেন, মৃতকে কবর থেকে বের করা উচিত নয়, যদি না কোনো আপত্তি উত্থাপিত হয়। এখানে আপত্তি উত্থাপিত হওয়ার অর্থ, যদি উপরোক্ত কারণগুলো দেখা দেয়। মৃতকে তাঁর সমাধিস্থ স্থানেই থাকতে দেয়া মোস্তাহাব। অনেক সাহাবীকে শত্রুদেশে সমাধিস্থ করা হয়েছিলো। কিন্তু তাঁদেরকে মুসলমানদের এলাকায় স্থানান্তর করা হয়নি। স্থানান্তর করার কারণ দেখা দিলে অবশ্য এরূপ করাতে দোষ নেই। ফতোয়ায়ে খানিয়াতে উল্লেখ রয়েছে, কোনো লোক যদি দূরের কোনো শহরে মৃত্যুবরণ করে, তবে তাকে সেখানেই কবরস্থ করা মোস্তাহাব। শহরান্তরিত করা হলেও দোষ নেই। হজরত ইয়াকুব মিশরে পরলোকগমণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে দাফন করা হয়েছিলো সিরিয়ায়। হজরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস ইন্তেকাল করেছিলেন মদীনা থেকে বারো মাইল দূরের একস্থানে। সেখানেই সমাহিত হয়েছিলেন তিনি। পরে তাঁর পবিত্র মরদেহ উঠিয়ে এনে মদীনায় দাফন করা হয়। মরদেহ স্থানান্তরের এ রকম আরো অনেক বিবরণ রয়েছে।

www.eelm.weebly.com

বায়হাকী শরীফে বর্ণিত হয়েছে— হজরত আমীর মোয়াবিয়া নহরে কুজামা খনন করলেন। সেই নহরের প্রবাহ-পথে পড়লো উহুদের শহীদগণের কবর। তিনি ঘোষণা দিলেন, শহীদগণের ওয়ারিশেরা যেনো তাঁদের পবিত্র লাশ অন্যত্র সরিয়ে নেয়। ঘোষণা শুনে নিকটজনেরা উহুদ প্রান্তরে একত্রিত হলেন। কবর খনন করা হলো। দেখা গেলো, শহীদগণের পবিত্র মরদেহসমূহ সম্পূর্ণ সতেজ। মনে হচ্ছিলো, তাঁদের কেশগুচ্ছ এখনো বর্ধনশীল। খুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ একজন শহীদের পায়ে কোদালের আঘাত লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো রক্তপ্রবাহ। শহীদগণের কবরগুলো ছিলো মেশ্‌ক আম্বরের সুবাসে ভরপুর। ঘটনাটির বিবরণ দিয়েছেন ইবনে আবী শায়বা। বায়হাকী ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন হজরত জাবের থেকে। তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত একথাটি রয়েছে যে, কোদালের আঘাতটি লেগেছিলো শহীদসমাজের নেতা হজরত হামজার পায়ে। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন— রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেন, কোরআন অন্তরে ধারণকারী কেউ যখন ইন্তেকাল করেন, তখন আল্লাহ্পাক মাটিকে এই মর্মে নির্দেশ দেন, যেনো সে ওই ব্যক্তির লাশ ভক্ষণ না করে। মৃত্তিকা তখন আল্লাহ্পাকের দরবারে নিবেদন জানায়, বারে এলাহী। আমি তার লাশ ভক্ষণ করি কীরূপে! সে যে আপনার কালামের ধারক।

ইবনে মান্দা বলেছেন, এ বিষয়টির উপর হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এর বহুসংখ্যক বর্ণনা রয়েছে। আমি বলি, কোরআন পাকের ধারক বলতে সম্ভবতঃ সিদ্দিকগণকে বুঝায় এবং কোরআন পাকের বরকত বিশেষভাবে তাঁদের সাথে জড়িত। আল্লাহ্ পাকের এরশাদ এরকম, 'পবিত্র লোক ব্যতীত কেউ কালাম পাক স্পর্শ করতে পারে না।' অর্থাৎ যাঁরা অসৎ স্বভাব থেকে পবিত্র, তাদেরই রয়েছে কোরআন স্পর্শ করার প্রকৃত অধিকার। আর তাঁরা হচ্ছেন সিদ্দিক। মারুজী বর্ণনা করেছেন— হজরত কাতাদা বলেছেন, এই কথাটি আমার উত্তমরূপে জানা আছে যে, যিনি পাপমুক্ত, মাটি তার লাশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আমি বলি, তাঁরাই আল্লাহ্পাকের অলী। তাঁরা গোনাহ্ থেকে সুসংরক্ষিত। তাঁদের দেহ মন এমন এক যোগ্যতা লাভ করে যাতে করে তাঁদের দ্বারা গোনাহ্ সংঘটিত হয় না। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

শেষ বাক্যটি এই—'ওয়া লা কিল্লা তাশউরুন'—একথার অর্থ, কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না। অর্থাৎ জীবনের সামগ্রিক রূপ প্রকৃত অর্থে রহস্যাচ্ছন্ন। বিষয়টি সর্বজনবোধ্য নয়। প্রত্যাদেশ অথবা দিব্যদৃষ্টি ব্যতিরেকে জীবনের নিগুঢ় তত্ত্ব অননুভব্য। তাই এখানে সাধারণ বিধানটি ঘোষিত হয়েছে এই বলে যে, তোমরা (এই গুঢ়তত্ত্ব) উপলব্ধি করতে সক্ষম নও।

www.eelm.weebly.com

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ○ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ○ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ○

❑ আমি তোমাদিগকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের স্বল্পতার দ্বারা অবশ্য পরীক্ষা করিব। তুমি ধৈর্যশীলগণকে শুভ সংবাদ দাও;

❑ তাহারাই ধৈর্যশীল যাহারা তাহাদের উপর বিপদ আপতিত হইলে বলে 'আমরা তো আল্লাহেরই এবং আমরা নিশ্চিতভাবে তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।'

❑ ইহারাই তাহারা যাহাদের প্রতি তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আশীস ও দয়া বর্ষিত হয়, আর ইহারাই সৎপথে পরিচালিত।

আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো—একথার অর্থ, হে উম্মতে মোহাম্মদী! আমি তোমাদের প্রতি কিছু লঘু বিপদ অবতীর্ণ করবো। যে বিপদের সঙ্গে থাকবে বেহেশতি বরকত। বিপদের মাধ্যমে এই মর্মে পরীক্ষা নেয়া হবে যে, তোমরা আমার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট কিনা। আমার বিধানে অবিচল কিনা। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তোমাদের প্রতি আপতিত হতো বহুসংখ্যক বিপদ। আল্লাহ্‌পাক সেগুলোকে দয়া করে স্থগিত রেখেছেন। অল্প কিছু বিপদ দিয়েছেন কেবল পরীক্ষার জন্য, যাতে করে একটি মহৎ উদ্দেশ্য সম্পাদিত হয়—তোমরা সকল অবস্থায় যেনো আল্লাহ্‌মুখী হয়ে চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারো। মনে রেখো, সুখ-দুঃখ কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহ তোমাদের নিকট থেকে পৃথক হয় না। ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের স্বল্পতা— সম্পর্কে তাফসীরবিদশ্রেষ্ঠ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, ভয় অর্থ শত্রুভীতি। ক্ষুধা অর্থ দুর্ভিক্ষ। ধনসম্পদের স্বল্পতা অর্থ সম্পদহানি। জীবনের স্বল্পতা অর্থ নিহত হওয়া অথবা মৃত্যুবরণ করা কিংবা রোগব্যাধি বা বার্ধক্য। ফল-ফসলের স্বল্পতা অর্থ বিপদগ্রস্ততার দরুন রিজিকের স্বল্পতা। ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণিত রয়েছে, ভয় অর্থ আল্লাহ্‌র ভয়, ক্ষুধা অর্থ রমজানের রোজা, সম্পদের স্বল্পতা অর্থ

www.eelm.weebly.com

জাকাত—সদকা, জীবনের স্বল্পতা অর্থ রোগব্যাধি এবং ফল-ফসলের স্বল্পতা অর্থ সন্তান সন্ততির মৃত্যু।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে বর্ণিত রয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন— যখন কোনো শিশু মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্‌পাক তখন ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছো? ফেরেশতাগণ বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্‌পাক বলেন, এ চরম বিপদের সময় সে কি বলে? ফেরেশতাগণ বলেন, আপনার বান্দা উচ্চারণ করে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রজিউন (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ্‌র প্রতিই আমাদের প্রত্যাবর্তন)। আর আপনার বান্দা আপনার প্রশংসাও বর্ণনা করে। আল্লাহ পাক তখন বলেন— আমার বান্দার জন্য বেহেশতে একটি গৃহ প্রস্তুত করো এবং তার নাম রাখো 'বায়তুল হামদ'। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করে বলেছেন, হাদিসটি হাসান।

'ধৈর্যশীলগনের জন্য শুভসংবাদ'—তাঁরাই ধৈর্যশীল যাঁরা বিপদগ্রস্ত হলে উচ্চারণ করে আমরা তো আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চিতভাবেই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। – একথার অর্থ, আমরা আল্লাহর বান্দা। আমরা সম্পূর্ণতই তাঁর অধীন। তাঁর নির্দেশের প্রতি সন্তুষ্ট। সুখ-দুঃখ সকল অবস্থায় আমরা তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করি। পৃথিবীর এই জীবন সাময়িক। একথায় কোনো সন্দেহই নেই যে, আমরা সকলে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবো। যখন সকল অবস্থায় তিনিই আমাদের নির্ভরতা ও প্রকৃত আশ্রয়, তখন তাঁর সকল দানেরই আমরা সম্মান করি। সে দান আনন্দ রূপে আসুক অথবা বেদনারূপে। আমরা তাই সুখে কৃতজ্ঞতাকে আশ্রয় করেছি এবং বিপদে আশ্রয় করেছি ধৈর্যকে। কারণ, তিনি বলেছেন, ধৈর্যশীলগণকে শুভ সংবাদ দাও। আয়াতে উল্লেখিত 'মুসিবাত' শব্দটির অর্থ ওই অশুভ বিষয় যা মানুষের কষ্টের কারণ হয়। একবার রসুল পাক স. এর পবিত্র পাদুকার ফিতা ছিঁড়ে গেলো। তৎক্ষণাৎ তিনি উচ্চারণ করলেন—'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন'। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আমাদের প্রিয় নবী! এটাও কি বিপদ। তিনি এরশাদ করলেন, মুমিনরা যা অপছন্দ করে, তাই বিপদ। হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলপাক স. বলেছেন—কারো জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে সে যেনো বলে, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন।' কেনোনা এটাও একটা বিপদ।

ইবনে আবি হাতেম, তিবরানী এবং বায়হাকী শো'বুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন—যে ব্যক্তি বিপদের সময় 'ইন্না লিল্লাহ' পাঠ করে আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করেন। সে দানের পরিমাণ এমন যাতে সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে যায়। হজরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের বলেছেন, উম্মতে

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদীকে বিপদের সময় পঠিতব্য যে দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সে রকম দোয়া অন্য উম্মতকে শিক্ষা দেয়া হয়নি। হজরত ইউসুফ নিরুদ্দেশ হওয়ার পর তাঁর পিতা হজরত ইয়াকুব বলেছিলেন 'হায়' ইউসুফের জন্য আক্ষেপ। যদি আগের নবী এবং উম্মতকে বিপদাপন্ন অবস্থায় পাঠ করার জন্য কোনো দোয়া শিক্ষা দেয়া হতো, তবে হজরত ইয়াকুব অবশ্যই তা পাঠ করতেন।

'তাদের প্রতি আল্লাহ্পাকের আশীস (সালাওয়াত)'—এখানে তাদের বলতে নির্দেশ করা হয়েছে ওই সকল ধৈর্য অবলম্বনকারীদেরকে যারা বিপদকালে প্রসন্নচিত্তে 'ইন্না লিল্লাহ' দোয়াটি পাঠ করে। সালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ আশীর্বাদ। শব্দটি আল্লাহ্পাকের সঙ্গে সম্বন্ধিত হলে অর্থ হবে রহমত বা অনুগ্রহ। আর বান্দার সঙ্গে সম্বন্ধিত হলে অর্থ হবে আশীর্বাদ বা দোয়া এবং দোয়ার বিনিময় হিসেবে ক্ষমা অনুগ্রহ ইত্যাদি। ক্ষমা ও রহমতের রয়েছে অনেক স্তর। তাই সালাত শব্দটি এখানে বহুবচন হিসেবে সালাওয়াত হয়েছে। তদুপরি রহমত শব্দটি পুনঃসংযোজিত হয়ে বিষয়টিকে করে তুলেছে আরো অধিক গুরুত্ববহ।

শেষে বলা হয়েছে 'ওয়া উলাইকা হুমুল মুহ্তাদুন'—তারাই সৎপথ প্রাপ্ত।' বিপদে ধৈর্যাবলম্বনকারীদের সম্পর্কে এই ঘোষণাটি একটি অনন্যসাধারণ সম্মাননা। বর্ণিত হয়েছে—একবার হজরত মুআজের এক পুত্র ইন্তেকাল করলেন। রসুল পাক স. স্বয়ং তাঁর সম্পর্কে একটি শোকগাথা রচনা করলেন। তাতে লিপিবদ্ধ ছিলো, হে মুআজ! মহান বিচারক আল্লাহ্ অশেষ পুণ্যের বিনিময়ে তোমার সন্তানকে গ্রহণ করেছেন। সেই পুণ্য হচ্ছে সালাত, রহমত ও হেদায়েত। কাজেই এই অমূল্য সম্পদগুলোর প্রতি তুমি দৃষ্টিনিবদ্ধ করো। বিরত থাকো বিলাপ থেকে। হজরত ওমর বলেছেন, দুটি বিষয় পরস্পর সম্পৃক্ত। এদের সঙ্গে রয়েছে আর একটি শুভ সম্পদ। পরস্পরসম্পৃক্ত বিষয় দু'টি হচ্ছে সালাত ও রহমত আর শুভ সম্পদটি হচ্ছে হেদায়েত (সৎপথপ্রাপ্তি)। বিপদে ধৈর্য অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে বহু হাদিস রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে সেগুলো থেকে নিম্নে কতিপয় হাদিস উপস্থাপন করা হলো।

হজরত জাবের থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন—মহানবী স. বলেন হাশরের দিন পৃথিবীতে বিপদাপদ ভোগকারীরা যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হবেন, তখন পৃথিবীর বিপদমুক্তরা বলবে, হায়! দুনিয়ায় যদি আমাদের চামড়া কেটে ফেলা হতো তাহলে আমরাও আজ পুরস্কৃত হতাম। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেন, যদি কোনো মুসলমান দুঃখযাতনাক্লিষ্ট হয়, এমন কি যদি তার পায়ে কাঁটাও বিদ্ধ হয়, তবু আল্লাহ্পাক তার পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন। হজরত উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি রসুল পাক স.কে বলতে শুনেছি- যদি আল্লাহর কোনো বিপদগ্রস্ত বান্দা পাঠ করে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন' এবং 'আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুসীবাতি ওয়াখলুফনী খাইরুম মিনহু'—তবে আল্লাহ তাকে অশেষ পুণ্য দান করেন এবং

www.eelm.weebly.com

উৎকৃষ্টতর বিনিময় প্রদানে ধন্য করেন। মোহাম্মদ বিন খালেদ সালামী তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন—যদি কোনো বান্দার অদৃষ্টে কোনো বিশেষ মর্যাদা লিপিবদ্ধ থাকে আর সেই বান্দা যদি আমলের মাধ্যমে সে মর্যাদায় উন্নীত হতে না পারে, তবে আল্লাহ্পাক তাকে শারীরিক ও বৈষয়িক বিপদের মাধ্যমে অথবা সন্তান-শোকের কারণে কথিত মর্যাদা দান করবেন। আহমদ, আবু দাউদ। হজরত মুআজ বর্ণনা করেছেন, এক বার এক লোক মহানবী স.কে জিজ্ঞেস করলেন—কোন ব্যক্তি সর্বাধিক বিপর্যস্ত? তিনি স. জবাব দিলেন, নবীগণ। এরপর তাদের চেয়ে নিম্নমর্যাদাধারীগণ। তৎপর পরবর্তী মর্যাদাধারীগণ—এভাবে। ধর্মের ধারক বাহক ও প্রচারকেরা সাধারণ মুসলমান অপেক্ষা অধিক বিপদগ্রস্ত হয়ে থাকেন। এভাবে বিভিন্ন বিপদাপদের মাধ্যমে বিশ্বাসীরা অবশেষে পাপমুক্ত হয়ে যান।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৫৮

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ○

❑ 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহের নির্দশন-সমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেহ কাবা গৃহের হজ কিংবা ওমরা সম্পন্ন করে, এই দুইটি প্রদক্ষিণ করিলে তাহার কোন পাপ নাই, এবং কেহ স্বতঃস্ফুর্তভাবে সৎকার্য করিলে আল্লাহ্ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

সাফা ও মারওয়া মক্কা মোয়াজ্জামার দু'টি পাহাড়ের নাম। 'শায়াইর' শব্দটি শাইরাহ্ শব্দের বহুবচন। শব্দটির আভিধানিক অর্থ নিদর্শন। এখানে অর্থ হবে, ইবাদত পদ্ধতি। পাহাড় দু'টিকে শায়াইর বলার কারণ হচ্ছে, ওগুলো আল্লাহ্র আনুগত্যের নিদর্শন। সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সায়ী (দৌড়াদৌড়ি) করা সুন্নত—একথা বলেছেন ইমাম আহমদ। অন্য ইমামেরা বলেছেন ওয়াজিব। ইমাম আহমদ তাঁর অভিমতের দলিল হিসেবে পেশ করেছেন ওই আয়াতটি, যেখানে বলা হয়েছে—কেউ কাবা গৃহে হজ করে বা ওমরা করে তার জন্য পাহাড় দু'টির তাওয়াফ করাতে কোনো দোষ নেই। এই আয়াত অনুসারে বুঝা যায়, সায়ী করা মোবাহ্। এ ছাড়া এই আয়াতে বলা হয়েছে 'কেউ স্বতঃস্ফুর্তভাবে সৎ কাজ করলে'। স্বতঃস্ফুর্তভাবে যে সৎকর্ম করা হয় তা নফলের পর্যায়ভুক্ত। ওয়াজিব

www.eelm.weebly.com

হচ্ছে সুনির্ধারিত ইবাদত; আর মোবাহ ও নফল হচ্ছে সাধারণ ইবাদত। একথাও ঠিক যে, ওয়াজিব সম্পন্ন করলে নফল ও মোবাহ আপনা আপনিই সম্পাদিত হয়।

'হজ' শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা বা অভিলাষ। ওমরা অর্থ পরিদর্শন। আলোচ্য আয়াতে হজ ও ওমরাকে দু'টি পৃথক ইবাদত হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দু'টি বিগ্রহ-মূর্তি ছিলো। মূর্তি দু'টির নাম ছিলো আসফ ও নায়লা। আসফ ছিলো সাফা পাহাড়ে এবং নায়লা মারওয়ায়। মূর্খতার যুগে প্রতিমা দু'টির সম্মানে পাহাড় দু'টি প্রদক্ষিণ করা হতো। প্রদক্ষিণকারীরা তখন মূর্তিগুলোকে স্পর্শ করতো। ইসলামের আর্বিভাবের পর মুসলমানেরা আর সে রকম ভাবে প্রদক্ষিণ করতো না। ওদিকে মদীনাবাসীদের পুজনীয় প্রতিমা ছিলো মানাত। মানাতের কাছেই তারা চিৎকার করে প্রার্থনা জানাতো। আসফ ও নায়লা মূর্তিদ্বয়ের প্রতি তারাও ছিলো বীতশ্রদ্ধ। তাই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মোহাজির ও আনসারদের স্বভাবের অনুকূলে। নিম্নোক্ত হাদিসগুলো থেকে এ বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

হাকেম হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, মূর্খতার যুগে শয়তান সারারাত সাফা মারওয়ার মধ্যস্থলে সায়ী করতো। মুসলমানেরা রসুল পাক স. এর খেদমতে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমরা মূর্খতার যুগে সেখানে সায়ী করতাম—এখন করি না। তাদের এই নিবেদনের প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আসেমের উদ্ধৃতি দিয়ে বোখারী বর্ণনা করেছেন—আমি হজরত আনাসের নিকট সাফা মারওয়ার দৌড় সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন—আমরা ইসলামপূর্ব যুগের এই সায়ীকে মূর্খতার সংস্কৃতি বলে ধারণা করতাম। ইসলাম গ্রহণের পর আমরা একে পরিত্যাগ করেছিলাম। তাই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

মাসআলাঃ বোখারী ও মুসলিমে হজরত ওরওয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—আমি জননী আয়েশার নিকট জিজ্ঞেস করলাম, কালাম মজীদে বলা হয়েছে—'ওই দু'টি (সাফা ও মারওয়া) প্রদক্ষিণ করলে তার কোনো পাপ নেই'—একথায় সায়ী যে ওয়াজিব তা বুঝা যায় না। হজরত আয়েশা বললেন, হে ভাগিনেয়! তুমি একথা কিরূপে অবগত হলে? তোমার ধারণা অনুযায়ী সায়ী যদি ওয়াজিব না হয়, তবে আয়াতের বর্ণনাভঙ্গী হতো এ রকম—যদি তারা সাফা মারওয়ার মধ্যে না দৌড়াতো তবে কোনো গোনাহ হতো না। আসলে আয়াতটি নাজিল হয়েছে আনসারদের সম্পর্কে। ইসলাম পূর্ব সময়ে তারা ছিলো মানাত প্রতিমার উপাসক— – ইসলাম কবুলের পর তাঁরা সাফা মারওয়ার মধ্যস্থলে দৌড়ানো পছন্দ করলেন না। রসুলে পাক স. এর নিকট আবেদন জানালেন, হে আল্লাহর রসুল! আমরা মূর্খতার যুগে সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করতাম। তাই এখন সায়ী করতে মন

www.eelm.weebly.com

চায় না। তাঁদের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। হাবীবা বিনতে আবি তাজারাত থেকে সাফীয়া বিনতে আবী শায়বার মাধ্যমে বর্ণিত হাদিস দ্বারাও সাফা মারওয়ার সায়ী ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। হাদিসটি এই—হজরত হাবীবা বলেন, আমি রসুলপাক স. কে দেখলাম, তিনি সাফা ও মারওয়ায় সায়ী করেছেন। তাঁর অগ্রে ছিলেন আরো অনেকে। তিনি ছিলেন পশ্চাতে। তখন আবহাওয়া ছিলো তপ্ত। তাঁর পরিধেয় আন্দোলিত হচ্ছিলো। তিনি তখন এরশাদ করেছিলেন, হে মানব মন্ডলী! শুনে নাও, —আল্লাহপাক তোমাদের উপর সায়ীর বিধান বলবৎ করেছেন। এই হাদিসের একজন বর্ণনাকারীর নাম আবদুল্লাহ ইবনে মুয়ামিল। দারা কুতনী এবং বহুসংখ্যক আলেম তাকে বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল বলেছেন। ইবনে জাওজী বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মুয়ামিলের মধ্যে কোনো দুর্বলতা নেই। দারা কুতনী এই হাদিসটি অন্য একটি পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনাসূত্রভূতদের একজনের নাম মনসুর বিন আব্দুর রহমান। আবু হাতেম বলেছেন, তাঁর বর্ণনা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, যায়। প্রসিদ্ধ পদ্ধতি ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গ থেকে জাহাবীও তাই বলেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, তিবরানীর মতে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদিসটির আরো অনেক সনদ রয়েছে। সেগুলোকে প্রথমোক্ত সনদের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে বর্ণনাটি অধিকতর শক্তিশালী হয়। হজরত আবু মুসা আশআরী কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে—তোমরা কাবা গৃহের তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ায় সায়ী করবে। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়— সাফা মারওয়ার সায়ী ওয়াজিব। এইরূপ নির্দেশ ওয়াজিব হওয়াকেই সাব্যস্ত করে।

যাঁরা বলেন সায়ী ওয়াজিব, তাঁদের মধ্যেও মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সায়ী ফরজ। কারণ, তাঁর মতে ওয়াজিব অর্থ ফরজই।

এটা ঐকমত্য যে, সাফা মারওয়ার মধ্যে দৌড়াতে হবে সাতবার। দৌড় শুরু হবে সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত একবার। মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত হলে দুই. এভাবে সাতবার। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মধ্যে ইবনে জারীর, আবু বকর, সুদ্দী এবং হানাফীগণের মধ্যে তাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফা একবার। যেমন কাবা গৃহের তাওয়াফ যেখান থেকে শুরু হয় সেখানে গিয়েই শেষ হয়। তাই সাফা থেকে মারওয়ায় গিয়ে পুনরায় সাফায় ফিরলে একবার ধরতে হবে। আমাদের দলিল হচ্ছে হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটি, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. সায়ী শেষ করতেন মারওয়ায়। তাছাড়া জমহুর ওলামার সুবিদিত আমলই আমাদের প্রমাণ। ওলামায়ে কেরাম একবার সায়ীর জন্য কয়েকটি পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন।

www.eelm.weebly.com

১. সায়ী হবে সাফা থেকে এবং শেষ হবে মারওয়ায়। রসুল পাক স. এরূপই করতেন। হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি স. বলেছেন—আল্লাহ্পাক প্রথমে যে পাহাড়ের নাম উল্লেখ করেছেন আমি সেখান থেকেই শুরু করছি বলেই তিনি সাফা পাহাড়ে অবস্থান নিলেন। এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম, আহমদ, মালেক, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান এবং নাসাঈ। দারা কুতনী বলেছেন, হাদিসটি নির্দেশসূচক। ইবনে হাজম বলেছেন হাদিসটি বিশুদ্ধ। নির্দেশ সূচক বর্ণনা নির্ভরযোগ্যতায় পৌঁছলে নির্দেশটি স্পষ্টতই ওয়াজিব হিসেবে পরিগণিত হয়। নির্ভরযোগ্যতায় না পৌঁছালেও ওয়াজিব না হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেনোনা রসুল স. বলেছেন, তোমরা আমার নিকট থেকে হজের পদ্ধতি শিখে নাও। সম্ভবতঃ আমি আর কখনো হজ করবো না। আর একথা সর্ববাদীসম্মত যে, রসুল স. সাফা থেকে সায়ী শুরু করেছিলেন।

২. কোনো কোনো তাওয়াফের পর সায়ী করা শর্ত। সেটা আগমনী তাওয়াফ (তাওয়াফে কুদুম) হোক অথবা বিদায়ী তাওয়াফ কিংবা তাওয়াফে জিয়ারত হোক। কিন্তু তাওয়াফ এবং সায়ীর মধ্যবর্তীতে আরাফায় অবস্থান করা যাবে না। যদি কেউ আগমনী তাওয়াফের পূর্বে সায়ী করে তবে গ্রহণীয় হবে না। কিন্তু হজরত আতা থেকে আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, আতা বলেছেন, যদি সায়ী করার পর তাওয়াফ করে তবে তা সিদ্ধ হবে। প্রমাণ হিসেবে তিনি উসামা বিন শরীফের হাদিসটি পেশ করেন—যেখানে বলা হয়েছে, জনৈক ব্যক্তি নবী পাক স. এর নিকট নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি তাওয়াফের আগেই সায়ী করেছি। তিনি স. বললেন, কোনো অসুবিধা নেই। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে: রসুলের উম্মতগণ এই আমলটি পরিত্যাগ করেছেন। হাদীসটি 'শাজ' (বিরল) প্রকৃতির বলে চিহ্নিত হয়েছে। আমরা আরো বলি, সায়ী করা কিয়াস বিরুদ্ধ ইবাদত। যে পদ্ধতিতে এটার সূচনা হয়েছে সেই পদ্ধতিটিই জারী রাখা কর্তব্য। প্রথম থেকেই তাওয়াফের পর সায়ীর বিধান চালু রয়েছে। তাই এর বিরুদ্ধবাদী হওয়া সঙ্গত নয়। জননী আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে—তিনি বলেছেন, আমি একবার মক্কা মোকাররমায় আগমন করলাম, সে সময়ে আমি ছিলাম ঋতুবতী; তাই আমি তাওয়াফ এবং সায়ী কোনোটিই করতে পারছিলাম না। রসুলুল্লাহ স.কে আমি একথা জানালাম। তিনি স. এরশাদ করলেন, তুমি তাওয়াফ ব্যতিরেকে অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করো—যা অন্যান্য হাজীগণ করে চলেছেন। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিস থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, রসুলুল্লাহ স. হজরত আয়েশাকে কেবল তাওয়াফ ছাড়া হজের সকল অনুষ্ঠানগুলো পালনের অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই হজরত আয়েশা তখন তাওয়াফ ও সায়ী করেননি, করেছিলেন পবিত্রতা লাভের পর।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখিত ঘটনা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, সাফা মারওয়ার সায়ী তাওয়াফের অনুষঙ্গ। এই ঘটনা থেকে আরও একটি বিধানের উৎপত্তি হয়েছে। তা হচ্ছে— কেউ যদি তাওয়াফে কুদুম অথবা তাওয়াফে জিয়ারতের পর সায়ী না করে তবে তার প্রতি একটি ছাগল কোরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়। এ দিকে সায়ী যেহেতু তাওয়াফের অনুষঙ্গ—কোনো স্বতন্ত্র ইবাদত নয়, তাই সায়ীর কোনো কাজা হয় না। সে কারণেই ছাগল কোরবানী ওয়াজিব হবে। তাওয়াফ ও সায়ী দু'টিই যদি বাদ পড়ে যায়, তবে দুটিরই কাজা আদায় করতে হবে। সায়ী করার সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে— সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তিনবার তকবীর উচ্চারণ করবে। তারপর পাঠ করবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকালাহু লাহুল মুলক, ওয়ালাহুল হামদ, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর।' এরপর দোয়া করবে। এভাবে তিনবার করবে। মারওয়া পাহাড়েও দোয়া করতে হবে একই নিয়মে। সাফা পাহাড় থেকে অবতরণের সময় দৌড়ে নয়, স্বাভাবিকভাবে অবতরণ করবে। এরপর শুরু করবে দৌড়। মারওয়া পাহাড়েও উঠানামা করতে হবে স্বাভাবিকভাবে। বোখারী ও মুসলিমের মাধ্যমে হজরত জাবের থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

'ওয়ামান তাত্বাওয়া খইরান' অর্থ, কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে। তাত্বাওয়া শব্দের অর্থ আনুগত্য- ফরজ নফল সকল রকমের আনুগত্য। এই শব্দটি সহযোগে বাক্যাংশটির অর্থ হচ্ছে—যারা স্বেচ্ছায় সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে দৌড়াদৌড়ি করে—এরকম করা সুন্নত। এরকম বলেছেন মুজাহিদ। মুকাতিল এবং কালাবী বলেছেন, বাক্যাংশটির অর্থ যারা ওয়াজিব তাওয়াফের অতিরিক্ত (নফল) তাওয়াফ করে। কতিপয় ভাষ্যকার বলেছেন, যারা ফরজ হজের পর পুনরায় হজ ও ওমরা করে। হাসান বলেছেন, কেবল হজের ক্ষেত্রে নয়, অন্য আমলের ক্ষেত্রেও 'স্বতস্ফূর্ত সৎ কাজ করলে' কথাটি প্রযোজ্য হবে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে—এরকম স্বতস্ফূর্তভাবে বা স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত ইবাদত (নামাজ, জাকাত, তাওয়াফ ইত্যাদি) উত্তম।

'আল্লাহ পুরস্কার দাতা, সর্বজ্ঞ'—একথার অর্থ আল্লাহ্পাক মর্যাদাশীলদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত। অর্থাৎ তিনি গুণগ্রাহী ও পুরস্কারদাতা। এবং সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতায়।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—সাহাবী হজরত মুআজ বিন জাবাল, সাদ বিন মুআজ এবং খারীজ বিন জায়েদ ইহুদী আলেমদের নিকট তওরাতের একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলেন; কিন্তু ইহুদী আলেমরা জানাতে অস্বীকার করলো। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো— নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَٰتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَٰبِ ۙ أُولَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّٰعِنُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ
تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ ۝ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ۝

❑ আমি যে সব স্পষ্ট নির্দশন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের জন্য কিতাবে উহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যাহারা উহা গোপন রাখে আল্লাহ তাহাদিগকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারিগণও তাহাদিগকে অভিশাপ দেয়।

❑ কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং নিজ-দিগকে সংশোধন করে আর আল্লাহের আয়াতকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে ইহারাই তাহারা যাহাদের প্রতি আমি ক্ষমা-পরবশ হই; কারণ আমি ক্ষমা-পরবশ, পরম দয়ালু।

❑ এবং যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদিগকে আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেই অভিশাপ দেয়।

❑ উহাতে তাহারা স্থায়ী হইবে। তাহাদের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং তাহাদিকে কোন বিরাম দেওয়া হইবে না।

❑ এক ইলাহ্, তিনিই তোমাদের ইলাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু।

স্পষ্ট নিদর্শন বুঝাতে আয়াতে 'আল বায়্যিনাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। রসুলুল্লাহ স. এর নবুয়তের সাক্ষ্য প্রমাণকেই এখানে 'আল বায়্যিনাত' বলা হয়েছে। আর পথনির্দেশ বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'আল হুদা' শব্দটি। এখানে 'আল-হুদা' বা পথনির্দেশ অর্থ হজরত মোহাম্মদ স. এর অনুসরণের পথনির্দেশ।

'মানুষের জন্য কিতাবে উহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা উহা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাদেরকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারিগণও তাদের অভিশাপ দেয়'— এখানে কিতাব অর্থ তওরাত। 'লা আনুন' অর্থ অভিশাপ দেয়া। 'লায়ীনুন' অর্থ অভিশাপ দেয়ার যোগ্যতাধারী। এই অভিশাপ দাতারা—ফেরেশতা, জ্বিন, মানুষ

www.eelm.weebly.com

এমনকি অন্য সকল প্রাণীরাও। আয়াতের মর্ম হচ্ছে, অভিশাপ দাতারা— আল্লাহ্পাকের নিকট অভিশাপ প্রদানের আবেদন করে। হজরত বারা বিন আজিব থেকে বর্ণিত হয়েছে—তিনি বলেছেন, আমি রসুলপাক স. এর সঙ্গে একটি জানাজায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি স. এরশাদ করলেন, অবিশ্বাসীরা মৃত্যুবরণ করলে তাদের গন্ডদেশে প্রহার করা হয়। মানুষ ও জ্বিন ছাড়া অন্য সকল প্রাণী তাদের আর্তচিৎকার শুনতে পায় এবং তাদেরকে অভিশম্পাত দেয়। সেই অভিশম্পাত দানের কথাই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা, ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে জারীর। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে অভিশাপদানকারিগণ অর্থ মানুষ ও জ্বিন ছাড়া অন্য সকল প্রাণী। হজরত কাতাদা বলেছেন, অভিশাপদানকারিগণ অর্থ ফেরেশতামন্ডলী। হজরত আতা বলেছেন, জ্বিন ও ইনসান। হজরত হাসানও তাই বলেছেন। হজরত মুজাহিদ বলেছেন, যখন খরা ও দুর্ভিক্ষ আসে তখন প্রাণীকুল পাপীষ্ঠদেরকে অভিশাপ দেয় এবং বলে এই হতভাগ্যদের জন্যই এতো বালামুসিবত।

কিন্তু যারা তওবা করে ও সংযত হয়, আল্লাহ্র আয়াতকে সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে; তাদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালা ক্ষমাপরবশ। — তওবা অর্থ বিরত থাকা। শব্দটি বান্দার সঙ্গে সম্পর্কিত হলে অর্থ হবে পাপ থেকে বিরতি। এবং আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কিত হলে অর্থ হবে, শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি।

হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে—নবীপাক স. বলেছেন, বান্দা পাপ স্বীকার করলে এবং তওবা করলে আল্লাহ্পাক তার তওবা কবুল করেন। হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুলুল্লাহ স. এরশাদ করেছেন, বান্দা তওবা করলে আল্লাহ্পাক ওই ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন, যার উট বিজন বনে হারিয়ে যায়, যার পিঠে ছিলো পানাহারের সামগ্রী। লোকটি সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে থাকে। তারপর চেতনাশূন্য হয়ে যায়। চেতনা ফিরে পেতেই দেখে হারানো উটটি তার সামনে দাঁড়িয়ে। তখন লোকটি উটের লাগাম ধরে আত্মহারা হয়ে বলে উঠে, 'আল্লাহ তোমার কতো রহমত! তুমি আমার বান্দা আমি তোমার প্রভু'— অতি আনন্দিত হওয়ার কারণেই সে এরকম বলতে থাকে। পাপীরা তওবা করলে আল্লাহ্পাক ওই আত্মহারা ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন।

'যারা সত্য প্রত্যাখ্যান (কুফ্রী) করে এবং কুফ্রী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদেরকে আল্লাহ, ফেরেশতা, ও মানুষ সকলেই অভিশাপ দেয়।'—এখানে কুফ্রী করার অর্থ আল্লাহ্র কালাম গোপন করা এবং কুফ্রী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা অর্থ, তওবা ব্যতিরেকে মারা যাওয়া। আবুল আলীয়া বলেছেন—আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষের যে অভিশাপের কথা এখানে বলা হয়েছে; তা দেয়া হবে হাশরের দিন। সেদিন কাফেরদেরকে একত্রিত করে আল্লাহ্ পাক অভিশম্পাত দিবেন। মানুষ ও ফেরেশতারা অভিশম্পাত করবেন। যারা অভিশাপগ্রস্ত তারাও অভিশাপ করবে। তাই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে—'তারা পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ দিবে।' কেউ কেউ বলেছেন, সেদিন মানুষেরা বলবে জালেমদের প্রতি অভিশাপ। এভাবে যারা জালেম তাদের অভিশাপও তাদের নিজেদের উপরেই বর্তাবে।

www.eelm.weebly.com

'কাফেরদের শাস্তি লঘু করা হবে না। শাস্তি হবে বিরামহীন।'—বাগবী বলেছেন, কাফের কুরাইশরা একবার বললো, মোহাম্মদ! তুমি তোমার প্রতিপালকের গুণাবলী এবং বংশপরম্পরা বর্ণনা করো। তাদের এই অবিমৃশ্যকারিতার জবাবেই অবতীর্ণ হলো—এক ইলাহ্। তিনি তোমাদের ইলাহ্। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু'— এ কথার অর্থ, হে জগতবাসী! তোমাদের উপাসনার অধিকারী সেই পরমতম সত্তা যিনি একক; যার কোনো অংশী নেই তিনি ব্যতীত উপাসনা গ্রহণকারী কেউ নেই, থাকা সম্ভবও নয়। এরূপ সম্বোধন পূর্বের আয়াতে বর্ণিত ইহুদীদের প্রতি হওয়াও সম্ভব। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে রসুল পাক স. এর গুণাবলী গোপন করায় ইতোপূর্বে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছিলো। তেমনি এখানে তিরস্কার করা হয়েছে তৌহিদের মূলতত্ত্ব গোপন করার জন্য। গ্রন্থধারীরা আল্লাহ্ পাকের এককত্বের ধারণাটিও বিকৃতকারী। তাই তারা হজরত উযায়ের ও হজরত ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে।

হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ বলেছেন, আমি রসুলপাক স. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—'ইলাহুকুমু ইলাহুঁ ওয়াহিদ' এবং 'লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম'—আয়াত দু'টিতে ইসমে আজম রয়েছে। আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা। হজরত আবি সাখার থেকে ইবনে মানসুর ও বায়হাকী বলেছেন, 'ইলাহুকুম ইলাহুঁ ওয়াহিদ, লা-ইলাহা ইল্লা হুয়ার রহমানুর রহীম'—আয়াতটি অবতীর্ণ হলে মুশরিকেরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলেছিলো, উপাস্য যদি একজনই হন তবে তার প্রমাণ কী? তখন অবতীর্ণ হয় নিম্নোক্ত আয়াতটি।

সুরা বাকারাঃ আয়াত ১৬৪

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَ
السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

---

www.eelm.weebly.com

❐ আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, যাহা মানুষের হিতসাধন করে তাহা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল জলযান সমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

আল্লাহ্ পাকের বিশাল সৃষ্টি তাঁর এককত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বহুবিচিত্র সৃষ্টির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর কথা। পরক্ষণেই বলা হয়েছে এতদুভয়ের মধ্যে বিরাজমান চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জলধি, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, জলবতী নদী, প্রাণীকুল, অনুপরমাণু এবং বহুবিচিত্র মৃত্তিকার কথা– কোথাও হিমশীতল বরফাচ্ছাদন। কোথাও খরতপ্ত মরুভূ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রপরম্পরায় বর্ণনা করেছেন—অবিশ্বাসী কোরাইশরা একবার নবী পাক স.কে বললো, আপনি আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রার্থনা করুন— তিনি যেনো সাফা পাহাড়টিকে সোনার পাহাড়ে রূপান্তরিত করে দেন। যেনো আমরা শত্রুর উপরে বিত্তবিজয়ী হতে পারি। আল্লাহ্ পাক তখন নবী পাক স.কে জানিয়ে দিলেন, একটি শর্তে তাদের আবেদন মঞ্জুর করা যেতে পারে। যদি তারা স্বর্ণপাহাড় লাভের পর পুনরায় কুফ্রীকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তাদেরকে আমি এমন কঠিন শাস্তি দেবো যা কাউকে কখনো দেয়া হয়নি এবং ভবিষ্যতেও দেয়া হবে না। দয়াল নবী স. তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ পাকের দরবারে নিবেদন করলেন, হে আমার মহান প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে বর্তমান অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট রাখুন। আমি ক্রমাগত তাদেরকে সত্যপথের দিকে আহবান জানাতেই থাকবো। আল্লাহ্ পাক তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন। বর্ণিত হাদিসের প্রেক্ষিতে আয়াতটির মর্ম হচ্ছে—সোনার পাহাড় প্রত্যাশীদের সম্মুখে এর চেয়ে অনেক বিচিত্র বিস্ময়কর প্রমাণপঞ্জি রয়েছে। যাঁরা জ্ঞানবান তাঁরা এ সকল নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না কেনো?

আলোচ্য আয়াতে আকাশকে বহুবচনে এবং পৃথিবীকে একবচনে প্রকাশ করা হয়েছে। কাফেরেরা ধারণা করতো অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রমুদ্রিত আকাশ অনেক আর পৃথিবী একটি। তাই আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি তাদের ধারণার অনুকূলে করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রতিটি আকাশ যেহেতু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, তাই আকাশের উল্লেখ করা হয়েছে বহুবচনে; এবং জমিনের মৌল উপাদান যেহেতু এক, তাই পৃথিবীর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে একবচন। আবার কেউ বলেছেন, আকাশের স্তর সমুহ পৃথক। তাই আকাশকে বহুবচনে এবং পৃথিবীর স্তর যেহেতু সম্মিলিত— তাই

www.eelm.weebly.com

পৃথিবীকে একবচনে প্রকাশ করা হয়েছে। আমি বলি, এ সম্পর্কিত কোনো ব্যাখ্যাই সামগ্রিকতাকে স্পর্শ করে না। এ যেনো জলগাত্রে চিত্রাংকন সদৃশ।

আকাশ পৃথিবীর উল্লেখের পর বলা হয়েছে, দিবস রাত্রির আবর্তনের কথা। সময়ের এই বহমান বিভঙ্গতা আরেকটি বিস্ময়কর নিদর্শন। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে ঋতুবৈচিত্র, আলো অন্ধকারের হ্রাস বৃদ্ধি এবং শীতগ্রীষ্মের অবস্থান্তরতা।

সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানসমূহ আরেকটি রহস্যময় নিদর্শন। মানুষের হিতসাধনার্থে সেগুলোর মাধ্যমে আবহমানকাল ধরে বয়ে চলেছে মুখরিত বেসাতি। বিশাল জলধিতরঙ্গে ভাসমান নিরাপদ এই বাণিজ্যবহর সমূহ এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

ভাসমান মেঘমালা, পরিমিত বৃষ্টিবর্ষণ এবং বর্ষণসিক্ত মৃত ধরিত্রীর বুকে তৃণরাজি ও বৃক্ষের লীলারহস্য নিরন্তর বিস্ময়কর নিদর্শন হয়ে রয়েছে। ফল ও ফসলের অফুরন্ত সমাহার, প্রাণীকুলের অস্তিত্ব ও বিস্তারণে স্থবিরতাহীনতাকে সুনিশ্চিত করেছে। প্রাণীকূলেও সঞ্চারিত রয়েছে কত সহস্র বিস্ময়। এমন অসংখ্য প্রাণী রয়েছে, যা অবলোকনের অতীত। আরো রয়েছে শান্ত হিংস্র ক্ষুদ্র বৃহৎ কতো অগণিত জীবন। তৃণ-উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল পশুকুল ও মানুষ। আবার প্রতিবেশের সজীবতা নির্ভর করে পানির উপর। বায়ুর দিক পরিবর্তনও আরেক রহস্য। কখনো দক্ষিণে, কখনো উত্তরে, কখনো পূবে, কখনো পশ্চিমে, কখনো বিচিত্র কৌণিক গতিতে বয়ে চলেছে, ক্ষিপ্র অথবা শ্লথ গতিসম্পন্ন সমীরণ। এই প্রবাহ কখনো আনে উপকার, কখনো ক্ষতি। মন্দ মলয় সৃষ্টিকুলে আনে প্রসন্নতা। ঝঞ্ঝাবায়ুতে বিধ্বস্ত হয় শহর, নগর, জনপদ। কখনো তপ্ত, কখনো শীতল বায়ু পরিবর্তনের এই বহুধা বৈচিত্র বিস্ময়কর নিদর্শন ব্যতীত আর কী হতে পারে!

শেষে বলা হয়েছে, সুনিয়ন্ত্রিত মেঘমালার কথা যা পৃথিবীর উপরে এবং আকাশের নিম্নে শত সহস্র রঙে ও রহস্যে ভাসমান। এ নিয়ন্ত্রণ কার? জ্ঞানবানরা কি এই রহস্যের প্রতি তাদের চিন্তাকে সংবদ্ধ করবে না। হজরত আবদুল ওয়াহাব বলেছেন, তিনটি বস্তুর উৎস কোথায় তা কেউ জানে না। সেই তিনটি বস্তু হচ্ছে— বজ্র, বিদ্যুৎ ও মেঘ।

জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে— একথার মাধ্যমে সৃষ্টির নিত্যনতুন রূপ ও আয়োজনের প্রতি চিন্তাশীলদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সত্যান্বেষণের প্রতি এই মর্মে আহবান জানানো হয়েছে যে, নিশ্চয় সৃষ্টির এই রহস্যাভিসারের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক কেউ রয়েছেন। কে তিনি? তিনি নিশ্চয়ই একক,চিরঞ্জীব, সর্বজ্ঞ, কুশলী ও অপার ক্ষমতাধর। তিনি নিশ্চয়ই ত্রুটি ও ঔদাসীন্যমুক্ত। কেউ তাঁর সমতুল নয়। সকল গুণের অধিকারী তিনি। তাই সৃষ্টির বহমানতায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এমন শৃংখলা। তাঁর সমান্তরাল কেউ থাকলে নিশ্চয়ই এই সৌন্দর্যমন্ডিত শৃংখলায় দেখা দিতো বিপত্তি। শুরু হতো অনাসৃষ্টি। অতএব তিনি এক, একক এবং অংশীহীন।

www.eelm.weebly.com

হজরত আয়েশা থেকে ইবনে আবিদ্দুনইয়া তাঁর আত্তাফাক্কুর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন— এই আয়াত পাঠ করে রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, আক্ষেপ ওই সকল লোকের জন্য! যারা এই আয়াত আবৃত্তি করে অথচ এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৬৫

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ○

❐ তথাপি কেহ কেহ আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে আল্লাহের সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাহাদিগকে ভালবাসে; কিন্তু যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে আল্লাহের প্রতি তাহাদের ভালবাসা দৃঢ়তম। সীমালংঘনকারীগণ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেমন বুঝিবে, হায়! এখন যদি তাহারা তেমন বুঝিত যে সমস্ত শক্তি আল্লাহেরই এবং আল্লাহ্ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর!

'অপরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করে'—এখানে অপরকে অর্থ, মুশরিকদের পূজ্য প্রতিমাসমূহকে। এই প্রতিমাগুলোকে তারা ভালোবাসতো। এই ভালোবাসাই আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধকতাকে আয়াতে 'আন্দাদ' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। বিশ্বাসীরা যেমন আল্লাহ্কে ভালোবাসে, পৌত্তলিকেরা তেমনি ভালোবাসে তাদের বিগ্রহগুলোকে। জুযাজ বলেছেন, মনের টানকে ভালোবাসা বা মহব্বত বলে।

বিগ্রহপূজকদের বিগ্রহপ্রেম এবং বিশ্বাসীদের আল্লাহ্প্রেম বাহ্যতঃ এক রকম মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তা এক নয়। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা বিশ্বাস করেছে আল্লাহ্র প্রতি, তাদের ভালোবাসা দৃঢ়তম।' বিশ্বাসীরা আনন্দের সময় কৃতজ্ঞতাকে আশ্রয় করে এবং বিপদের সময় অবলম্বন করে ধৈর্যকে । আল্লাহ্ প্রেমে অটল থাকে। আনন্দের উদ্বেলতা এবং বিপদের বিস্বাদ তাঁদেরকে আল্লাহ্ প্রেম থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। কাফেরদের প্রতিমাপ্রেম কিন্তু এ রকম নয়। তাদের ভালোবাসা ভঙ্গুর। কোনোনা কোনো আকাঙ্খা পূরণের জন্য তারা বিগ্রহবন্দনায় লিপ্ত হয়। আকাঙ্খা পূরণ না হলে ভালোবাসা উবে যায়। তখন তারা এক বিগ্রহ ছেড়ে অন্য বিগ্রহের উপাসনার প্রতি ধাবিত হয়।

www.eelm.weebly.com

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, আল্লাহ্ পাক হাশরের দিন ওই সকল প্রতিমাসমর্পিতদের বলবেন, তোমরা এই প্রতিমাগুলোকে মনে প্রাণে ভালোবাসতে। এবার তবে তাদের সঙ্গে নরকাগ্নিতে প্রবিষ্ট হও। বিগ্রহপূজকেরা তখন এই সিদ্ধান্তকে কিছুতেই পছন্দ করবে না। তাদের উপস্থিতিতেই আল্লাহ্ পাক তখন তাঁর প্রেমিক বান্দাদেরকে বলবেন, যদি তোমরা সত্যিই আমাকে ভালোবাসো তবে দোজখে চলে যাও। এই নির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দোজখের দিকে রওয়ানা হয়ে যাবেন। তখন নেপথ্য থেকে উচ্চারিত হবে, 'ওয়াল্লাজিনা আমানু আশাদ্দু হুব্বাল লিল্লাহ্' (যাঁরা ইমানদার তাঁরা নিজের চেয়ে আল্লাহ্কে অধিক ভালোবাসে)।

আমি বলি, উদ্ধৃত বাক্যের আরেকটি অর্থ হতে পারে- পৃথিবীতে যার সঙ্গেই মহব্বত থাকুক না কেনো, মু'মিনদের অন্তরে আল্লাহ্ পাকের ভালোবাসাই হবে দৃঢ়তম। পার্থিব ভালোবাসার প্রকৃতি এরকম—মানুষ অন্যকে ভালোবাসে হয়তো কিছু উপকার অর্জনের জন্য অথবা তার ক্ষতি থেকে নিষ্কৃতি পাবার নিমিত্তে। অথবা পার্থিব ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হয় সৌন্দর্য সম্ভোগের উপর।

ভালোবাসার বন্ধন বংশগত সম্পর্কের উপরেও নির্ভরশীল থাকে। পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা ইত্যাদি এ ধরনের মহব্বতের প্রমাণ। মোট কথা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ভালোবাসার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য চরিতার্থতার লক্ষ্যই থাকে প্রধান। উদ্দেশ্য অচরিতার্থ হলে ভালোবাসায় ধরে ফাটল। আর আল্লাহ্ পাকের ভালোবাসা এ ধরনের উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র। তাই তা চিরন্তন। স্মরণ রাখা প্রযোজন যে, অবিশ্বাসীদের মূল উদ্দেশ্য জাগতিক কল্যাণ এবং ভোগ লিপ্সা। তারা কেবল নামেই জানে যে, সকল কিছুর স্রষ্টা একজনই। কিন্তু বাস্তবে মানুষ, গ্রহ নক্ষত্র অথবা কল্পিত দেবদেবীর সঙ্গেই থাকে তাদের কামনাবাসনাকন্টকিত ভালোবাসা। তাৎক্ষণিক অর্জনই তাদের কাছে বড়ো। তাই তারা গায়রুল্লাহ্র উপাসক। যুক্তিবিদ মোতাজিলা, রাফেজী, খারেজী ইত্যাদি বাতিল সম্প্রদায়গুলোও আল্লাহ্পাকের ভালোবাসার দাবীদার। প্রকৃত সত্যানুরাগীদের মতো তারাও বলে, চিরস্থায়ী কল্যাণ সম্পূর্ণতই আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহনির্ভর। পার্থিব ভালোমন্দের সিদ্ধান্ত তাঁর। আর তিনি শেষ বিচার দিনের মালিক। বিশুদ্ধ ধর্মানুরাগীদের বিশ্বাস এরকমই। সুতরাং যারা পার্থিব বিত্তবিলাসমগ্ন, তারা ইসলাম বহির্ভূত। কারণ, তারা আলাহ্পাকের ভালোবাসার সঙ্গে পার্থিব ভালোবাসাকেও অংশীদার করেছে। ভালোবাসাই সকল লাভ লোকসানের নিয়ামক। আর লাভ লোকসানের নিরংকুশ অধিকার কেবল আল্লাহ্র। যারা বান্দাকে তার আপন কর্মের স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে (যেমন মোতাজিলারা), তারা কি আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করলো না? যতোই শাণিত যুক্তি তারা প্রদর্শন করুক না কেনো, প্রকৃতপক্ষে তারা কি মুশরিক নয়?

www.eelm.weebly.com

আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাতই হচ্ছে প্রকৃত সত্যানুরাগী। এদের মধ্যে একদল হচ্ছে সাধারণ জন। আরেক দল হচ্ছেন দৃঢ়চিত্ত সুফী সম্প্রদায়। সাধারণ জনেরা প্রকাশ্যতঃ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করে না। তাদের সকলের বিশ্বাস, আল্লাহ্‌ পাক যেমন সকল কিছুর স্রষ্টা তেমনি বান্দার সকল কাজেরও স্রষ্টা। আর তিনিই হলেন সকল লাভলোকসানের নিয়ামক। তারা গায়রুল্লাহ্‌র অনুরাগী হলেও একথা নিশ্চিত জানেন যে, আল্লাহ্‌ যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের বেহেশতে এবং যাদের প্রতি অসন্তুষ্ট তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করবেন। মহান সুফীগণের বিশ্বাস এই সর্বসাধারণের বিশ্বাস অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। তাঁদের অন্তরের প্রজ্বলিত প্রেমের আগুন একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য সকল কিছুকেই ভস্মীভূত করে দিয়েছে। ভস্মীভূত করে দিয়েছে বেহেশতের লোভ ও দোজখের ভীতিকেও। তাঁরা স্বীয় সত্তা অপেক্ষা আল্লাহ্‌তায়ালার অধিকতর নিকটে। তাঁরা শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যখন প্রেমাস্পদ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রশ্ন উচ্চারিত হয়, 'মানুষের প্রতি কি এমন একটি সময় সমাগত হয় যখন সে আর স্মরণের যোগ্যই থাকে না।' তখন এই প্রকৃত প্রেমিকেরা আত্মহারা হয়ে অন্তরের ভাষায় জবাব দেন, হ্যাঁ। হে আমার আল্লাহ! মানুষের নিকট এমন সময় এসেছে। বরং এমন সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে স্মরণের যোগ্য নয়। অধিকন্তু তখন তার সত্তার অনুভূতিও অবলুপ্ত।

সাধারণ মানুষের নিকটতম লক্ষ্যবস্তু হলো তার আপন সত্তা। সে যখন কাউকে ভালোবাসে তখন নিজের কারণেই ভালোবাসে। আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসাও তার নিজের কারণেই। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপাসনা সে এজন্যই করে যে, এতে করে তার শান্তিদায়ক আবাস নিশ্চিত হবে এবং সে নরকানল থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। কিন্তু সুফী সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহ্‌ পাক স্বীয় সত্তাপেক্ষাও প্রিয়। অস্তিত্বাপেক্ষাও নিকটতর। তাদের অবস্থা সম্পর্কে কালামে মজীদে এমর্মে উল্লেখিত হয়েছে, 'তিনি তোমাদের প্রাণরগ অপেক্ষাও অধিকতর নিকটে।' এই পুণ্যাত্মাগণের ভালোবাসা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যখন তাঁরা অন্যকে ভালোবাসেন বটে, তবে সে ভালোবাসা হয় আল্লাহ্‌র জন্যই। আল্লাহ্‌ পাক তখন যদি তাঁদেরকে দুঃখ কষ্ট দান করেন তখন তাঁরা সেটাকে মনে করেন, প্রেমাস্পদ প্রদত্ত স্বর্গীয় দান। প্রিয়তম যেহেতু প্রাণাধিক প্রিয়। তাই তাঁর আনন্দ বেদনা সকল প্রকার দানই স্বর্গীয় সুধায় ভরপুর। বরং আনন্দাপেক্ষা বিষাদই তখন অধিক আস্বাদ্য হয়। কারণ, আনন্দ আস্বাদনে থাকে প্রবৃত্তির অংশগ্রহণ, সে আনন্দ স্বর্গীয় হলেও। কিন্তু যন্ত্রণা ও তিক্ততায় প্রবৃত্তির কোনো অংশগ্রহণ নেই। প্রবৃত্তি প্রশান্ত হলেও তিক্ততা আস্বাদনে অপারগ। এই মহান ব্যক্তিবর্গকেই হাশরের দিন আল্লাহ্‌পাক অবিশ্বাসীদের উপস্থিতিতে বলবেন, 'যদি তোমরা আমার বন্ধু হও, তবে জাহান্নামে গমন করো।' তাঁরা তৎক্ষণাৎ জাহান্নামের দিকে পথ চলতে শুরু করবেন। ঠিক তখনই আওয়াজ আসবে, 'আল্লাহ্‌র প্রতি এঁদের ভালোবাসা দৃঢ়তম।' তাঁদের

www.eelm.weebly.com

মর্যাদা অননুধাবনীয়। যারা বেহেশতের সুখসন্দর্শনের আশায় এবং দোজখের অনলাশংকায় আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তারা নিশ্চয়ই দোজখ প্রবেশের নির্দেশ পেয়ে অবলীলায় মান্য করতে পারবে না।

যখন সীমালংঘনকারীগণ শাস্তির সম্মুখীন হবে, তখনই হবে তাদের প্রকৃত জ্ঞানোদয়। তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করার বিষয়টিকে 'ইয়ারা' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। নাফে, ইবনে আমর এবং ইয়াকুব 'ইয়ারা' শব্দটিকে পড়েছেন 'তারা'। অন্যেরা ইয়ারা-ই পড়েছেন। 'তারা' পড়লে শব্দটি সম্বন্ধিত হবে নবীপাক স. এর সঙ্গে। অর্থ হবে, হে নবী! আপনি তখন প্রত্যক্ষ করবেন। অথবা সাধারণভাবে ধরলে অর্থ হবে, সকলেই প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু এখানে 'তারা' নয় ইয়ারা' শব্দটি বসানো হয়েছে। সুতরাং অর্থ হবে, সীমালংঘনকারীরা দেখবে। সেই জ্ঞানোদয় যদি পৃথিবীতে হতো তবে তা তাদের জন্য কতোই না উত্তম হতো। সেই প্রকৃত জ্ঞানটি হচ্ছে এই—সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর। আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও ক্ষমতাবলেই বান্দার সমস্ত কিছু সম্পাদিত হয়। আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় যা ঘটবার, তা ঘটবেই। কেউ তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। আর তিনি যা ঘটাবেন না, তা ঘটাবার হিম্মতও কারো নেই। বিশ্বাসীরা এ বিষয়ে সম্যক অবগত। তাই তাঁরা তাঁর সঙ্গে অংশী সাব্যস্ত করে না এবং আল্লাহ্ ছাড়া কারো সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। আয়াতের এ রকম মর্মও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, জালেমরা হাশর প্রান্তরে যখন আল্লাহ্‌তায়ালার শাস্তির ভয়াবহতা অবলোকন করবে তখন বুঝতে পারবে সকল ক্ষমতার নিরঙ্কুশ অধীশ্বর একমাত্র আল্লাহ্। তখন তাদের লজ্জার সীমা পরিসীমা থাকবে না। হায়! সেই বোধোদয় যদি তাদের এখন হতো তাহলে বিশ্বাসীদের মতো তারা বুঝতো, সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৬৬, ১৬৭

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ
بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا
تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ
مِنَ النَّارِ ۝

www.eelm.weebly.com

❒ যখন অনুসৃতগণ অনুসরণকারীগণ সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করিবে এবং অনুসারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে ও তাহাদের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে,

❒ এবং যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল তাহারা বলিবে, হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরাও তাহাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম; যেমন তাহারা আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিল। এইভাবে আল্লাহ্ তাহাদের কার্যাবলী তাহাদের পরিতাপরূপে তাহাদিগকে দেখাইবেন আর তাহারা কখনো অগ্নি হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

হাশরের দিন অবিশ্বাসীদের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে অনুসারীদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন শয়তান তখন তার অনুসারীদের নিকট থেকে সম্পর্কচ্যুত হতে চাইবে। যে সব কারণের জন্য পৃথিবীতে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয় সেই কারণগুলো সেখানে থাকবে না। যেমন প্রতিমা পূজার মাধ্যমে কোনো আকাঙখা পূরণের প্রত্যাশা, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব বা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা, আপনজনের সাহায্য লাভ। এ ধরনের কোনো প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা সেই দিন চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে। অবিশ্বাসী নেতা, প্রতিমা কিংবা শয়তানের অনুসারীরা চরম অসহায়ত্বের মধ্যে সেই দিন বলতে শুরু করবে হায় একবার যদি আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারতাম, তবে আমরা তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতাম; যেমন তারা আজ আমাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে।

নবী রসুলগণের অনুসরণ পরিত্যাগ করে দুষ্কর্ম ও অনাসৃষ্টিতে সময় ব্যয় করার জন্য কাফেরদের তখন অনুশোচনার সীমা পরিসীমা থাকবে না। আত্মধিক্কারে জর্জরিত হতে থাকবে তারা। দ্বীনের উপর দুনিয়ার প্রাধান্য দেয়ার কারণে তাদের সামনে থাকবে শুধু পরিতাপ ও আক্ষেপ। সুদ্দী বলেছেন, অবিশ্বাসীরা ইমান আনলে আখেরাতে যে সকল পুরস্কার পেতো হাশরের দিন আল্লাহ্তায়ালা সে সকল পুরস্কার তাদেরকে দেখাবেন। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে— দেখো! এসকল ছিলো তোমাদের জন্যই—যদি তোমরা পৃথিবীতে বিশ্বাসকে গ্রহণ করতে। তাদের সামনে তখন বিভিন্ন পুরস্কার ও মর্যাদা বিশ্বাসীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। বিষয়টির চাক্ষুষ অবলোকন করে তারা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে, আক্ষেপে জর্জরিত হয়ে কাঁদতে শুরু করবে। আর যখন শুনবে তাদের শাস্তি চিরস্থায়ী, নরকাগ্নি থেকে তারা আর কোনো দিন মুক্ত হতে পারবে না; তখন তাদের সামনে থাকবে শুধু নিরাশার অন্তহীন অন্ধকার। তাদের চিরকালীন অগ্নিবাসের বিষয়টিই আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে এভাবে— তারা কখনো আগুন থেকে বের হতে পারবে না।

www.eelm.weebly.com

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا
عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

❒ হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যাহা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্য বস্তু রহিয়াছে তাহা হইতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

❒ সে তো কেবল তোমাদিগকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা জান না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়।

'হালালান ত্বইয়্যেবা'—অর্থ বৈধ ও পবিত্র। আয়াতে মানুষকে কেবল বৈধ এবং পবিত্র খাদ্য বস্তু আহার করতে বলা হয়েছে। অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে— 'জগতে যা কিছু বর্তমান, সবই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।' এ কথায় বুঝা যায়, সকল কিছুই বৈধ। কেবল ওই সকল বিষয় বৈধ নয় যেগুলো অবৈধ বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না—একথার অর্থ, রিপুর তাড়ণায় হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বোলো না। ক্বারী আবু জাফর, ইবনে আমের, কাসায়ী, হাফ্‌স এবং ইয়াকুব 'খুতুয়াত' শব্দটির 'তোয়া' বর্ণকে পেশ যুক্ত অবস্থায় পাঠ করেছেন। অন্য ক্বারীগণ পাঠ করেছেন সাকিন যুক্ত অবস্থায়। যে অবস্থায়ই পাঠ করা হোক না কেনো 'খুতুওয়াত' এবং 'খুত্ওয়াত'— দুটি শব্দই খুতুয়া শব্দের বহুবচন। পদবিক্ষেপকালে দুই পায়ের মধ্যবর্তী দূরত্বকে আরবী ভাষায় বলে খুতাওয়াত্। এই আয়াতে 'খুতুয়াতুশ শয়তান' বলে শয়তান যে পথে পদচারণা করে সেই পথকে বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে, শয়তানের পদাংক অনুসরণ কোরো না।

'নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'—'মুবীন' অর্থ প্রকাশ্য। দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন খাঁটি ইমানদারদের নিকট শয়তানের শত্রুতা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। তাই এখানে তাকে প্রকাশ্য শত্রু বলা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ জনেরা তার শত্রুতা উপলব্ধি করতে পারে না। শয়তান যাকে প্রবঞ্চনা দেয়, তার সাথে সে বন্ধুত্ব রক্ষা করে। তার এই আচরণ সম্পর্কে অন্য একটি আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে 'আউলিয়াউ হুমুত্তাগুত'। প্রকাশ্য শত্রু অর্থ শত্রুতা প্রকাশকারীও হতে পারে।

www.eelm.weebly.com

যেমন সে হজরত আদমকে সেজ্‌দা করতে প্রকাশ্যে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো। তাঁকে জান্নাত থেকে বহিষ্কারের ষড়যন্ত্র করেছিলো এবং তাঁর পরবর্তী বংশধরকে প্রবঞ্চিত করার অঙ্গীকার করেছিলো। পরের আয়াতে শয়তানের এই শত্রুতার বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—'সে তোমাদেরকে কেবল মন্দ ও অশ্লীল কার্যের এবং আল্লাহ সমন্ধে তোমরা যা জানো না এমন সব বিষয়ে বলার নির্দেশ দেয়।'

'সু' অর্থ মন্দ। 'ফাহ্‌শা' অর্থ অশ্লীলতা। মন্দ ও অশ্লীলতা উভয়টিই পাপ। পাপের প্রকারভিন্নতা বুঝাতে এখানে শব্দটি 'এবং' অব্যয়ের মাধ্যমে পাশাপাশি ব্যক্ত করা হয়েছে। যাঁরা বিবেকবান তাঁরা মন্দকাজে অনুতপ্ত হন এবং অশ্লীলতাকে সকল সময়েই দূষণীয় মনে করেন। তাঁরা সাধারণ পাপকে মন্দ এবং অশ্লীলতাকে কবীরা গোনাহ্ মনে করেন। কেউ কেউ বলেছেন, যে পাপের কারণে শরিয়তে 'হদ' বা প্রাণসংহারের বিধান প্রয়োগ করা হয়—এখানে ওই পাপের কথাই বলা হয়েছে। শয়তান পাপের কুমন্ত্রণা দেয় কিন্তু তার কুমন্ত্রণা যে সব সময় বাস্তবায়িত হয়—একথা ঠিক নয়। যাঁরা প্রকৃত বিশ্বাসী তাঁদের প্রতি তার কুমন্ত্রণার কোনোই প্রতিক্রিয়া নেই। হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন—অভিশপ্ত শয়তান পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে তার অনুসারীদেরকে প্রবঞ্চনা দানের জন্য পৃথিবীর মানুষের নিকট প্রেরণ করে। তারা পৃথিবীতে অনেক অনাসৃষ্টি ঘটায়। বিভিন্ন অপকর্ম সম্পাদনের পর তারা শয়তানের সকাশে প্রতিবেদন পেশ করে। একজন বলে, আজ আমি একটি বিরাট দুষ্কর্ম ঘটিয়েছি। ইবলিস তার কথা শুনে বলে, নাহ্। তুমি তেমন কিছু করতে পারোনি। এভাবে একেক শয়তান একেক অপকর্মের ফিরিস্তি পেশ করবে। সেগুলোর কোনোটাই শয়তানের সম্পূর্ণ মনঃপুত হবে না। একজন বলবে, আমি আজ এক দম্পতির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। শয়তান তখন বলবে, তুমিই একমাত্র কাজের মতো কাজ করেছো। একথা বলে ইবলিস তাকে প্রধান সহচর হিসেবে গ্রহণ করবে। মুসলিম। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. বলেছেন—মানুষের প্রতি দু'টি প্রভাব কার্যকরী। একটি শয়তানের আর একটি ফেরেশতার। শয়তানের প্রভাব অশ্লীলতাকে অঙ্গীকার করে এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর ফেরেশতার প্রভাব করে সত্যের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং স্বীকৃতি দান করে সত্যের। যাঁরা শুভচিন্তা এবং সৎকর্মের প্রতি ধাবিত, নিঃসন্দেহে তাঁরা আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহভাজন। তাঁদের উচিৎ তাঁরা যেনো আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হন। আর যারা অশুভচিন্তা ও কর্মের প্রতি আকৃষ্ট তাঁদের উচিৎ তরিৎ তওবা করা এবং শয়তানের চক্রান্তমুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয়প্রার্থী হওয়া। এরপর নবী পাক স. পাঠ করলেন—'শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং লজ্জাজনক কাজের আদেশ দেয়।' হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স, বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের

www.eelm.weebly.com

শোকর, তিনি দয়া করে প্রবঞ্চনা পর্যন্তই শয়তানের কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আবু দাউদ।

সূরা বাকারা : আয়াত ১৭০,১৭১

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

❒ যখন তাহাদিগকে বলা হয় 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা তোমরা অনুসরণ কর,' তাহারা বলে, 'না, না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহার অনুসরণ করিব।' এমন কি, তাহাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝিত না এবং তাহারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না তথাপিও?

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের উপমা যেমন কোন ব্যক্তি এমনকিছুকে ডাকে যাহা ডাক-হাঁক ছাড়া আর কিছুই শ্রবণ করে না— বধির, মূক, অন্ধ; সুতরাং তাহারা বুঝিবে না।

এখান থেকে নতুন প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, রসুল পাক স. ইহুদীদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানালেন, জান্নাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন এবং অবাধ্যতার জন্য শাস্তি যে অবধারিত সে কথাও বললেন। তখন রাফে বিন হারমিলা এবং মালেক বিন আউফ ইহুদী বললো, হে মোহাম্মদ! আমরা আপনার অনুসরণ করবো না, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে পথে চলতে দেখেছি সে পথে চলবো। কারণ, তারা ছিলো আমাদের চেয়ে অধিক বিজ্ঞ ও উত্তম। তখন এই আয়াত (১৭০) অবতীর্ণ হয়।

'মা আনযালাল্লাহু' (আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন) — একথার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে তওরাত শরীফকে। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মুশরিক ও কোরাইশ কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে। যদি তাই হয় তবে আয়াতটি সম্পর্কিত হবে ইতোপূর্বে উল্লেখিত ১৬৮নং আয়াতের সঙ্গে— যেখানে সম্বোধন করা হয়েছে, 'হে মানবজাতি' (ইয়া আইয়্যুহান্নাস)। এরকম হলে মুশরিক ইহুদীসহ সকল অবিশ্বাসীরা হবে এই আয়াতের লক্ষ্য। সকল অবিশ্বাসীদেরকে বিশেষ করে ইহুদীদেরকে এখানে মধ্যম পুরুষ হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। এর

www.eelm.weebly.com

কারণ হচ্ছে, তাদের নির্বুদ্ধিতার বিষয়টি যেনো দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেনো সকলের প্রতি বিষয়টিকে পরিষ্কার করার জন্য এই মর্মে বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে, ওই নির্বোধগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন করার পরেও তারা কি রকম মূর্খজনোচিত কথা বলছে।

সত্যের আহবান পেয়েও ইহুদীরা বলে বসলো, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছি সে পথের অনুসারী হবো। আল্লাহ্‌পাক তাদের একথার জবাবে বলেছেন, তাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝতো না এবং তারা সৎপথের পথিকও ছিলো না। তথাপিও কি তারা তাদের বিভ্রান্ত পিতৃপুরুষদেরকে অনুসরণীয় হিসেবে মেনে নিবে? 'তাদের পিতৃপুরুষেরা কিছুই বুঝতো না'— একথার অর্থ, তারা ছিলো ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত, যদিও পার্থিব ব্যাপারে তারা ছিলো যথেষ্ট প্রাজ্ঞ। যদি প্রশ্ন করা যায়— তাদের পিতৃপুরুষতো ছিলো তওরাতের অনুসারী। যদি তাই হয়, তবে তারা যে ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত তা কি করে বলা যায়? এর জবাব হচ্ছে— তারা তওরাতধারী বলে দাবী করলেও প্রকৃতার্থে তওরাতের অনুসারী ছিলো না। তওরাতের অনুসারী হলে তারা হজরত ঈসার উপর ইমান আনতো এবং ইসলামও গ্রহণ করতো। কারণ, তওরাতে এ বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে।

পরের আয়াতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ইহুদী ও মুশরিকদের উপমা দেয়া হয়েছে এরকম- যেমন কোনো ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যা কেবল তাদের চিৎকারই শ্রবণ করে। প্রকৃতার্থে তারা মূক, বধির ও অন্ধ। সুতরাং তারা বুঝবে না। মুশরিকেরা তাদের পূজণীয় প্রতিমাগুলোকে ডাকে। কিন্তু সেগুলো মূক, বধির ও অন্ধ। ইহুদীরাও তাদের বিকৃত বিশ্বাসের প্রতি মনোযোগী। তাদের আহবান প্রান্তরে বিচরণরত পশুপালকে আহবানকারী রাখালের মতো। পশুগুলো রাখালের ডাক শুনে বটে কিন্তু সে ডাকের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। চিৎকার শোনা এবং আহবানের মর্মোপলব্ধি করা এক কথা নয়। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'সুতরাং তারা বুঝবে না।' প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে এরকম— হে আমার রসুল। আপনি যেনো মানবতার মরমী রাখাল আর অবিশ্বাসীরা চতুষ্পদ জন্তু তুল্য। আপনার আহবানের আওয়াজ কেবল তারা শুনতে পায়, কিন্তু মর্ম বুঝে না। চিরাচরিত অর্থে স্থিত করলে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— সত্যের প্রতি আহবানপ্রাপ্তরা জন্তুজানোয়ার সদৃশ। আর অবিশ্বাসীদের প্রতি আহবানকারী হচ্ছেন ওই সংবেদী রাখাল, অবিশ্বাসীরা যার আওয়াজ মাত্র শোনে কিন্তু অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

রসুলুল্লাহ্ স. এর আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদীরা তওরাতের কোনো কোনো বিধান প্রতিপালন করতো। তারা তওরাতে বর্ণিত শেষ নবীর জন্য প্রতীক্ষারতও ছিলো। কিন্তু তিনি যখন এলেন, তখন তারাই হয়ে গেলো প্রধান প্রতিপক্ষ। তাদের এই

www.eelm.weebly.com

প্রতিপক্ষতা তওরাতের বিরুদ্ধাচরণেরই নামান্তর। কারণ, তওরাতের স্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে, শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ স. এবং শেষ অবতারিত গ্রন্থ কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো।

'মূক, বধির, অন্ধ'— একথার পূর্বে অবিশ্বাসীদের প্রতি একটি সম্বোধন উহ্য রয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে-নির্বোধেরা বধির, মূক ও অন্ধ। তারা কোরআনের আয়াত শ্রবণে অমনোযোগী, তাই বধির। সত্যের স্বীকৃতি তাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় না, তাই তারা মূক। আর হেদায়েতের পথের দিকে তাদের দৃষ্টিপাত মাত্র নেই, তাই তারা অন্ধ। 'সুতরাং তারা বুঝবে না'- একথার অর্থ, সত্য কী, তা তারা বুঝবে না। পূর্বপুরুষদের অসুন্দর আদর্শের প্রতি তারা মোহাচ্ছন্ন। তাই তাদের শ্রুতি, রসনা ও দৃষ্টি স্থবির, অকর্মন্য।

ইতোপূর্বে আল্লাহ্ পাক বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তুকে আহার্যরূপে নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছিলেন (আয়াত ১৬৮)। এখন বিবৃত হচ্ছে, হালাল বা পবিত্র খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য। পবিত্র রিজিক গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, রিজিকদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। নিম্নের আয়াতে রয়েছে এ বিষয়টিরই বিবরণ। আর অবিশ্বাসীরা নয়, বিশ্বাসীরাই কৃতজ্ঞ। তাই তাদেরকে সম্বোধন করেই অবতীর্ণ হয়েছে—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৭২, ১৭৩

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

❑ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদিগকে আমি যাহা দিয়াছি তাহা হইতে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তাঁহারই ইবাদত কর।

❑ নিশ্চয় আল্লাহ্ মরা, শূকর রক্ত-মাংস এবং যাহা জবাই কালে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নাম লওয়া হইয়াছে তাহা তোমাদের জন্য অবৈধ করিয়াছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তাহার কোন পাপ হইবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাক স্বয়ং পবিত্র এবং তিনি পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করে থাকেন। তাই তিনি বিশ্বাসীদেরকেও পবিত্র (হালাল) বস্তু ভক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। নবীগণকেও বিশেষভাবে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, 'ইয়া আইয়্যুহাররসুলু কুলু মিনাত্ তাইয়্যেবাত' (হে রসুলগণ! পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করুন)। হজরত আবু হোরায়রা আরো বলেছেন, অবিন্যস্ত কেশরাজি এবং ধূলিধূসরিত বেশবাস নিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেও যদি কেউ আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রার্থনা করে, তবুও তার প্রার্থনা আল্লাহ্ পাকের সকাশে গৃহীত হবে না; যদি তার পানাহার ও পরিধেয় হারাম উপার্জন থেকে হয়।

আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো- একথার অর্থ, যদি তোমরা বিশেষভাবে আল্লাহ্ পাকের উপাসনা প্রত্যাশী হও এবং তাঁকে প্রতিপালক হিসেবে মান্য করো, তবে তাঁর শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করো। কারণ, কৃতজ্ঞচিত্ততা ছাড়া পরিণত উপাসনা হয় না। রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাক বলেন, মানব দানবের সঙ্গে আমার অতি গুরুত্ববহ সম্পর্ক নির্ধারিত রয়েছে— তা হচ্ছে, আমিই তাদের স্রষ্টা। অথচ তারা অন্যের উপাসক। আমি তাদেরকে রিজিক দান করি, আর তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অন্যের। তিবরানী ও শামী তাঁদের গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, এবং বায়হাকী উল্লেখ করেছেন তাঁর শো'বুল ইমানে; আর দায়লামী বর্ণনা করেছেন হজরত আবু দারদা থেকে।

আল্লাহ্পাক মৃতদেহ, রক্ত, শূকরের গোশ্ত এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে জবাইকৃত পশুকে খাদ্যবস্তু রূপে হারাম ঘোষণা করেছেন। আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে, 'ইন্নামা হাররামা'। 'ইন্না' অর্থ নিশ্চয়। কোনোকিছুকে সীমাবদ্ধ করাই এ শব্দটির উদ্দেশ্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এখানে হারাম হিসেবে যে বস্তুগুলোকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া আরো অনেক হারাম বস্তু রয়েছে। এই জটিলতা নিরসনার্থে বলা যেতে পারে যে, হানাফী মাজহাবের অনুসারীগণ কুফাবাসী ব্যাকরণবিদগণের সিদ্ধান্তকে পছন্দ করেন এবং গ্রহণযোগ্য বলে মানেন। তাঁদের মতে 'ইন্না' শব্দটি সুনিশ্চিত অর্থে ব্যবহৃত। কোনোকিছুকে সীমাবদ্ধ করা এর উদ্দেশ্য নয়। যদি সীমাবদ্ধ বলে মেনে নেয়াও যায়, তবে মনে করতে হবে, এই সীমাবদ্ধতা চূড়ান্ত সীমাবদ্ধতা নয়। অবিশ্বাসীরা যে সকল বস্তুকে নিজেদের ধারণার বশবর্তীতানুযায়ী হারাম করে নিয়েছিলো, সেই সকল হারামের প্রাসঙ্গিকতাকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এই আয়াতে। সেগুলো হচ্ছে-১.'মাইতাত' অর্থাৎ মৃতপশু, যেগুলো জবেহ করার আগেই মরেছে। তবে দেখতে হবে শরিয়তের বিধান মতে সেগুলো জবেহযোগ্য কি না। পানির মাছ ও মৃত টিড্ডি কিন্তু হারাম নয়। কারণ, ওগুলোকে শরিয়তে জবেহযোগ্য মনে করা হয়নি। এরকমও বলা যেতে পারে যে, মৃত মাছ ও মৃত টিড্ডিও মৃত পশু ও প্রাণীর

www.eelm.weebly.com

অন্তর্ভূত। কিন্তু রসুল পাক স. এর একটি হাদিস অনুসারে এ দু'টোকে হারাম বহির্ভূত মনে করতে হবে। হাদিসটি হচ্ছে— হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল পাক স. বলেছেন, আমাদের জন্য দু'টো মৃত বস্তুকে এবং দু'টো রক্তপিন্ডকে হালাল করা হয়েছে। মৃতবস্তু দু'টো হচ্ছে, মাছ ও টিড্ডি এবং রক্তপিন্ড দু'টো হচ্ছে, যকৃৎ ও পিত্ত। জীবিত কোনো পশুপ্রাণী থেকে পৃথক করে নেয়া গোশ্‌তও মৃত পশুতুল্য, তাই হারাম। এ প্রসঙ্গে রসুল পাক স. বলেছেন, যে গোশ্‌ত কোনো জীবন্ত পশু থেকে কেটে নেয়া হয়, সেটা মৃত তুল্য। হজরত আবু ওয়াকেদ লাইসী থেকে হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন আবু দাউদ ও তিরমিজি।

আলেমগণ বলেছেন, মৃত প্রাণীর ক্রয়বিক্রয় হারাম। বিক্রয়লব্ধ অর্থও হারাম। মৃতপ্রাণীর চর্বি ও অপক্ক চামড়া ব্যবহার করাও অবৈধ। হজরত জাবের থেকে বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে— তিনি মক্কা বিজয়ের বছরে রসুলে পাক স. থেকে একথা শুনেছেন যে, আল্লাহ্‌পাক— মদ, মৃতপশু, শূকর এবং বিগ্রহ বিক্রয় হারাম করেছেন। তখন কেউ একজন আরজ করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! মৃত পশুর চর্বির বিধান কী? যেগুলোকে লোকে নৌকায় লাগায়, তেল হিসেবে গায়ে মাখে এবং আলো জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করে? তিনি এরশাদ করলেন, সব হারাম। পুনঃ এরশাদ করলেন, ইহুদীরা নিপাত যাক। আল্লাহ্ পাক তাদের উপর এই মর্মে বিধান জারী করেছিলেন যে, মৃত পশুর চর্বি ব্যবহার হারাম। কিন্তু তারা এই বিধান মানতো না। অবলীলায় মৃতের চর্বি কেনাবেচা করতো এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভক্ষণ করতো। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, আল্লাহ্ পাক ইহুদীদেরকে ধ্বংস করুন। মৃতের চর্বি ব্যবহারে নিষিদ্ধতা ছিলো তাদের উপর। কিন্তু তারা গলিত চর্বি ক্রয়বিক্রয় করতো। বোখারী ও মুসলিম। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হাকেম থেকে শাফেয়ী, আহমদ এবং সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় বলেছেন, বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের নিকট রসুলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই মর্মে পত্র পৌঁছেছিলো যে, হুঁশিয়ার! মৃতের অপক্ক চামড়া এবং তার নিতম্ব থেকে উপকৃত হতে চেয়ো না। আবু দাউদের বর্ণনায় একথাটি অতিরিক্ত রয়েছে — ঘটনাটি ঘটেছিলো তাঁর মহাতিরোধানের এক মাস আগে। আহমদের বর্ণনায় রয়েছে এক মাস অথবা দু'মাসের কথা। হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুলে করীম স. বলেছেন, মৃতের কোনো অংশ থেকে উপকার গ্রহণ কোরো না। আবু বকর, শাফেয়ী এই হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন, বর্ণনাটি উত্তম।

হজরত উসামা থেকে হাকেম, আবু দাউদ এবং নাসাঈ বর্ণনা করেছেন- রসুলুল্লাহ্ স. মাংসভুক প্রাণীর চামড়া নিষিদ্ধ করেছেন। হাকেম এর সঙ্গে অতিরিক্ত যে কথাটি বলেছেন সেটি হচ্ছে, মাংসাশী প্রাণীর চামড়া শয্যারূপে ব্যবহার করা

www.eelm.weebly.com

নিষিদ্ধ। হজরত মুয়াবিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. চিতাবাঘের চামড়ায় বসতে নিষেধ করেছেন। হজরত মেকদাম বিন মাদী কারাব থেকে আহমদ ও নাসাঈ বলেছেন— রসুল স. রেশম, সোনা এবং চিতার চামড়া দ্বারা বালিশ ইত্যাদি তৈরী করা নিষেধ করেছেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, চিতার চামড়াযুক্ত পোশাক থেকে ফেরেশতারা দূরে থাকেন।

মৃতের চামড়া পাকা (দাবাগত) করার পরে তার ব্যবহার বিধানসম্মত কি না, সে সম্পর্কে ওলামাগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, চামড়া পাকা করলে তা পবিত্র হয়ে যায়, তাই তার ব্যবহার এবং ক্রয় বিক্রয় বৈধ। তাদের দলিল এই— হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— একবার রসুলপাক স. একটি মৃত ছাগলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, তোমরা এর চামড়া কাজে লাগাচ্ছো না কেনো? লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! এটা যে মৃত। তিনি বললেন, এটা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু পানি এবং করত দ্বারা এটিকে বিশুদ্ধ করা যায় নাকি? (করত একটি রাসায়নিক পদার্থ যদ্দারা চামড়া পাকা করা হয়)। অন্যান্য বর্ণনায় রয়েছে, মৃতের গোশত হারাম কিন্তু তার চামড়া ব্যবহার বৈধ। ইমাম দারা কুতনী বলেছেন, এই হাদিসের সবগুলো সনদ বিশুদ্ধ। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে- আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, দাবাগত করা চামড়া পবিত্র। এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদিস রয়েছে। যেমন, জননী আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. বলেছেন, দাবাগত সব ধরনের চামড়াকে পবিত্র করে দেয়। তিনি আরো বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, দাবাগত করা চামড়া থেকে তোমরা উপকার গ্রহণ করতে পারো। জননী সাওদা বলেছেন, আমার একটি ছাগল মারা গিয়েছিলো। আমি তার চামড়া দাবাগত করে নিয়েছিলাম।

ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদের মতে মৃতের কোনোকিছুই বৈধ নয়। দলিল হিসেবে তাঁরা ওই হাদিসটিকে পেশ করেন যেখানে বলা হয়েছে— রসুল স. এরশাদ করেন, মৃতের অংশ বিশেষ থেকে উপকার গ্রহণ করা সিদ্ধ নয়। তাঁরা আরো বলেছেন, এটাই রসুল স. এর শেষ নির্দেশ। ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে— হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হাকেমের নিকট রসুল স. এই মর্মে পত্র প্রেরণ করেছিলেন যে, মৃতের অপক্ক চামড়া এবং নিতম্ব থেকে উপকৃত হতে চেয়ো না। ঘটনাটি ঘটেছিলো তাঁর মহাতিরোধানের এক অথবা দুই মাস আগে।

হানাফীদের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে বলা যায় যে, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হাকেমের সনদ ও বর্ণনাভঙ্গি উভয়টি সমালোচনাযোগ্য। তাই আমরা বিশুদ্ধ হাদিসগুলোকে দলিল হিসেবে পেশ করেছি। আরেকটি কথা এই— হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হাকেম বর্ণিত হাদিসে 'ইহাব' শব্দটি রয়েছে। ইহাব বলে অপক্ক

www.eelm.weebly.com

চামড়াকে। অপক্ক বা কাঁচা চামড়া তো আমাদের নিকটও অসিদ্ধ। কেউ যদি একথা বলেন, তিবরানী ও ইবনে আদী আওসাত গ্রন্থে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হাকেমের হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এভাবে— আমরা সে সময় জুহ্নিয়া অধ্যুষিত এলাকায় ছিলাম। তখন রসুল স. আমাদেরকে লিখে জানালেন, ইতোপূর্বে আমি তোমাদেরকে মৃতের চামড়া ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ নির্দেশ দিচ্ছি, মৃতের চামড়া ও নিতম্ব ব্যবহার কোরো না। এই হাদিস থেকে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়, মৃতের চামড়া ব্যবহার সকলাবস্থায় অসিদ্ধ। এটাও জানা যায় যে, এটাই ছিলো রসুল পাক স, এর শেষ নির্দেশ— এই আপত্তির প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, হাদিসটি বর্ণনাকারীদের একজন হলো, ফুজালা বিন মোফাজ্জল। ইমাম আবু হাতেম রাজী বলেছেন, সে হাদিস বর্ণনার অযোগ্য। মুহাদ্দিসগণ তার বর্ণনা গ্রহণ করেননি।

মৃতের পশম, হাড়, নিতম্ব, শিং এবং বিষ ব্যবহার করা না করা সম্পর্কে আলেমগণ একমত হতে পারেননি। ইমাম শাফেয়ীর মতে, বর্ণিত সকল অঙ্গই অপবিত্র। ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেকের মতে কেবল পশম পবিত্র, অন্যগুলো নয়। তাদের দলিল হচ্ছে এই— রসুল স. বলেছেন, মৃতের কোনো অংশ থেকেই উপকার গ্রহণ করা যাবে না। পশম অপবিত্র হওয়ার দলিল হচ্ছে এই— হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, নখ, রক্ত এবং চুল পুঁতে রাখো, এগুলো মৃত।

ইমাম আবু হানিফা দলিল পেশ করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণিত ওই হাদিস থেকে যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, মৃত প্রাণীর কেবল গোশ্ত ভক্ষণ করা হারাম। দ্বিতীয় দলিল হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণিত ওই হাদিসটি, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. কেবল মৃত প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া হারাম বলেছেন। চামড়া ও চুল ব্যবহার অবৈধ বলেননি। এই হাদিসটি অবশ্য বিপর্যস্ত সনদবিশিষ্ট। কারণ, এর বর্ণনাকারীদের একজন দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত। তার নাম আবদুল জাব্বার। ইবনে হাব্বান অবশ্য তাঁকে দুর্বল বলেননি। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে— আমি রসুল পাক স.কে বলতে শুনেছি, মৃতের সেই অংশটি হারাম যা ভক্ষণযোগ্য। সেক্ষেত্রে অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ চামড়া, চুল, পশম, দাঁত, হাড় হালাল। এ হাদিসটির সনদ সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কারণ, এর সূত্রসংযুক্ত বর্ণনাকারী আবু বকর হাজালী পরিত্যক্ত। গুনদার তাকে মিথ্যাবাদি বলেছেন। ইয়াহ্ইয়া বিন নাঈম এবং আদী বলেছেন, আবু বকর হাজালী হাদিস শাস্ত্রের কেউ নয়। হজরত সাওবান থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. তাঁর কন্যা হজরত ফাতেমার জন্য একটি আসবের হার এবং একটি হাতির দাঁতের চিরুনী ক্রয় করেছিলেন। এই হাদিসটির সনদও নিষ্কন্টক নয়। কেনোনা এর দুই বর্ণনাকারী হুমাইদ এবং সুলায়মান অখ্যাত।

www.eelm.weebly.com

আমাদের শেষ দলিল হচ্ছে নিম্নের বিবরণটি। বিবরণটি লিপিবদ্ধ করেছেন বোখারী। এই বিবরণে লিখিত হয়েছে, ইমাম জুহুরী বলেছেন, আমি পরবর্তী আলেমগণকে হাতির দাঁতের চিরুনী দ্বারা চুল আঁচড়াতে দেখেছি। তাঁরা হাতির দাঁতের পেয়ালায় রক্ষিত তেলও ব্যবহার করতেন। এ রকম করাকে তাঁরা দূষণীয় মনে করতেন না। আমি বলি, ইমাম জুহুরী যাদের কথা বলেছেন, তাঁরা হয় সাহাবা নয় তো তাবেঈন— একথা জানার পর আমাদের আর অতিরিক্ত বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ কোথায়? হাম্মাদ বিন সালমা বলেছেন, মৃত জীবের পশম দ্বারা উপকার লাভ করায় কোনো অসুবিধা নেই। ইবনে সিরিন এবং ইব্রাহিম বলেছেন, হাতির দাঁতের ব্যবসায় ক্ষতি নেই।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম মালেক বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, তাঁদের প্রথমে বর্ণিত হাদিসগুলোর সকল সনদই অগ্রহণীয় (মুনকার)। পরে বর্ণিত হাদিসের এক রাবির নাম আবদুল্লাহ্ বিন আজীজ। তার বর্ণনাগুলো সম্পর্কে আবু হাতেম রাজী বলেছেন, তার হাদিসগুলো মুনকার। আর আমার বিবেচনায় সে সত্যের মাপকাঠি নয়। হজরত আলী ইবনে হোসাইন বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে আজীজ অপদার্থ। তার মিথ্যা বর্ণনা আমি গ্রহণ করি না। যদি ধরে নেয়া যায়, প্রথমোক্ত হাদিসটি শুদ্ধ তবুও তা এ কারণে পরিত্যাজ্য হবে যে, বর্ণনাটি হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত একটি বিশুদ্ধ হাদিসের প্রতিকূল।

রক্ত ও শুকরের গোশত হারাম। রক্ত অর্থ, প্রবাহিত রক্ত। প্রবাহিত রক্ত অপবিত্র। আর শুকরের সবকিছুই অপবিত্র। আলোচ্য আয়াতে কেবল গোশ্তের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু গোশ্ত বলতে এখানে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বুঝতে হবে। অর্থাৎ গোশ্ত যখন হারাম তখন অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও হারাম। এমন কি চুল ও পশমও হারাম। শুকর এমন একটি প্রাণী যা মূলতঃই অপবিত্র (আঈনি নাজাসাত)। ইনশাআল্লাহ্ সুরা আনআমে বিষয়টির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হবে।

শুকরের পশম ব্যবহার সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেকের মতে, শুকরের পশম দ্বারা জুতা বা মশক তৈরী করা যায়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যায় না। আর ইমাম মালেক বলেছেন, এরকম করলে মাকরূহ হবে। এভাবে বিষয়টির উপর জায়েয, হারাম, এবং মাকরূহ হওয়ার ফতোয়া এসেছে।

অল্প পানিতে শুকরের চুল পড়ে গেলে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, হবে না। ইমাম ইউসুফ বলেছেন, প্রয়োজন পূরণের জন্য শুকরের চুল ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। প্রয়োজন নির্ণীত হবে ব্যবহারের দিক থেকে। কাজেই পানিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া এক কথা আর ব্যবহার অন্য ব্যাপার। এখানে প্রয়োজনের কোনো দিক নির্দেশনা নেই। হেদায়া গ্রন্থে এ রকমই বলা হয়েছে। ফকীহ্ আবুল লাইস বলেছেন, ক্রয়যোগ্য হলেও শুকরের চুল ক্রয় করা বৈধ নয়। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, চুলের দ্বারা সেলাই করা প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে

www.eelm.weebly.com

না। কারণ অন্য বস্তু দ্বারাও সেলাই করা যায়। তিনি আরো বলেছেন, ইবনে সিরীন শুকরের চুল দ্বারা সেলাইকৃত মোজা ব্যবহার করতেন। তিনি এরপর বলেছেন, কিন্তু তাই বলে চুলের ক্রয় বিক্রয় বৈধ নয়। এভাবে উপকার বা লাভ গ্রহণ করাও তাই বৈধ নয়।

'যা জবাই কালে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নাম নেয়া হয়েছে'— এ প্রসঙ্গে রবী বিন আনাস বলেছেন, যে পশু জবাইয়ের সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনোকিছুর নামোচ্চারণ করা হয়। 'ইহলাল' শব্দের অর্থ, সজোরে চিৎকার করা। আরববাসীরা নতুন চাঁদ দেখলে উল্লসিত হয়ে সজোরে তকবীর ধ্বনি দিতো। অবিশ্বাসীরা পশু জবাই করার সময় চিৎকার করে তাদের দেবতাদের নাম উচ্চারণ করতো। এরকম উচ্চস্বরে চিৎকারের নামই ইহলাল। যারা এরকম করতো তারা 'মুহিল'। এভাবে গায়রুল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গীকৃত (জবাইকৃত) পশু হারাম।

যারা ক্ষুধার্তাবস্থায় অনন্যোপায় হয়ে (সীমালংঘন না করে) হারাম বস্তু ভক্ষণ করে তাদের কোনো পাপ হবে না। কেনোনা তারা অন্যায়কারী নয়। আর এমতাবস্থায় খাদ্য আস্বাদনও তাদের উদ্দেশ্য থাকে না। উদ্দেশ্য থাকে কেবল জীবন ধারণের অমোঘ প্রয়োজন। এ রকম নিরুপায় অবস্থায় যতোটুকু খাদ্য গ্রহণ করলে মৃত্যুর আশংকা রোধ হয়, ততোটুকুই কেবল গ্রহণ করা বৈধ। এর অতিরিক্ত নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, পরিতৃপ্ত আহারেরও অনুমতি রয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদও এরকম বলেছেন। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা এই যে, ইমাম শাফেয়ীর মত হচ্ছে, শীঘ্রই হালাল খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকলে অতিরিক্ত ভক্ষণ করা সিদ্ধ হবে না। আর নিশ্চয়তা মাত্র না থাকলে পেট পুরে খেতে পারবে। বরং কিছু কিছু সংরক্ষণও করে রাখতে পারবে।

বায়হাকী বলেছেন, ইমাম আহমদ ও শাফেয়ীর মত হচ্ছে, অবৈধ উদ্দেশ্যে ভ্রমণকারীরা প্রয়োজনের সময়েও হারাম খাদ্য ভক্ষণ করতে পারবে না। বৈধ উদ্দেশ্যে ভ্রমণকারীদের জন্য জীবন রক্ষার্থে হারাম গ্রহণের যে শিথিলতা দেয়া হয়েছে— তাদের জন্যও তওবা জরুরী। অর্থাৎ তওবা ব্যতিরেকে তাদের অনন্যোপায়তা ক্ষমার্হ হবে না। বাগবী বলেছেন, এই বিধানের প্রবক্তা হচ্ছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং সাঈদ বিন জোবায়ের। আমি বলি, খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন বিধান মান্য করতে হবে তেমনি সীমারেখাও বজায় রেখে চলতে হবে (শিথিলতাকে আশ্রয় করতে হবে এবং অতিরিক্ত ভোজন থেকেও বেঁচে থাকতে হবে)। মুকাতিল বিন হাব্বান বলেছেন, পবিত্রতা ও বৈধতা সম্পর্কে জানতে হবে এবং শিথিলতার বিধানকেও বিধান হিসেবে মেনে নেয়ার ব্যাপারে সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।

'আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু'— এখানে একথার অর্থ, উপায়বিহীন অবস্থায় হারাম ভক্ষণের অনুমতি দান আল্লাহ্ পাকের দয়ার একটি অনন্য নিদর্শন। এ ধরনের অনন্যোপায়তাকে তিনি ক্ষমা করবেন। এখানে আরো একটি কথা স্পষ্ট

www.eelm.weebly.com

হয়ে উঠেছে যে, কেউ যদি অনন্যোপায় অবস্থায় হারাম গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে তার আত্মহননের পাপ হবে না। কারণ, এখানে জীবন রক্ষার্থে হারামের অনুমতি দেয়া হয়েছে— আদেশ দেয়া হয়নি। অর্থাৎ বর্ণিত নিরুপায়তা ওয়াজিব (অপরিহার্য) নয়, বরং মোবাহ্ (বৈধ)। ইমাম শাফেয়ী এ রকম বলেছেন। আর ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, উপায়বিহীন অবস্থায় হারাম ভক্ষণ করা ওয়াজিব। শিথিলতার এই বিধান মান্য না করার কারণে যদি কারো মৃত্যু হয়, তবে সে গোনাহ্গার হবে। তার দলিল হচ্ছে এই আয়াত— 'আর বিস্তারিত রূপে তিনি বর্ণনা করেছেন, 'তোমাদের উপর যা হারাম করে দিয়েছেন, হ্যাঁ যে সময় নিরুপায় হয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী হও'— এই আয়াতে নিরুপায় অবস্থাকে আল্লাহ্ তায়ালা আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, অপারগ অবস্থায় হারাম বস্তুগুলো মোবাহ সমতুল্য। আর ওই মোবাহ্ বস্তুগুলোর মাধ্যমে জীবন রক্ষা করা (ভক্ষণ করা) ওয়াজিব। বলাই বাহুল্য যে, এই শিথিলতা সাধারণ কোনো বিধান নয়। বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে দান করা হয়েছে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু আল্লাহ্র অনুগ্রহ (শিথিলতার বিধান)।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ
وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ○ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ○

❑ আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহারা তাহা গোপন রাখে ও বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে তাহারা নিজেদের জঠরে অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই পূরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না—তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

www.eelm.weebly.com

❑ তাহারাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করিয়াছে; আগুন সহ্য করিতে তাহারা কতই না ধৈর্যশীল!

❑ ইহা এই হেতু যে আল্লাহ্ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং যাহারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে নিশ্চয়ই তাহারা অশেষ মতভেদে রহিয়াছে।

'আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন'— অর্থ, যে তওরাত শরীফ তাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। 'যারা তা গোপন রাখে' —একথার মাধ্যমে ওই সকল লোককে চিহ্নিত করা হয়েছে যারা তওরাতে বর্ণিত রসুল পাক স. সম্পর্কিত তথ্যগুলোকে গোপন করে।

ইহুদী নেতা ও আলেমেরা দরিদ্র লোকদের নিকট থেকে উপঢৌকন, পানাহারের সামগ্রী ইত্যাদি গ্রহণ করতো। তারা ধারণা করতো, শেষ যুগের রসুল তাদেরই গোত্রভূত হবেন। কিন্তু তা যখন হলো না তখন তাদের আশাভঙ্গের জ্বালা পরিণত হলো বিদ্বেষে। তারা তখন তওরাতে উল্লেখিত রসুলে পাক স. সম্পর্কিত বিবরণগুলো বিকৃত করে ফেললো। সাধারণ জনতা বিভ্রান্ত হলো। তারা বিকৃত বর্ণনার সঙ্গে রসুল স. এর বাস্তব অবস্থার মিল খুঁজে পেলো না। সামাজিক ও ধর্মীয় নেতাদের মতো তারাও তখন আশ্রয় নিলো বিরোধী শিবিরে। এরকম পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতগুলো। বাগবী বলেছেন, এটাই শানে নুজুল। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে আবু সালেহ্ এর মাধ্যমে ছা'লাবীও এ রকম বলেছেন। ইবনে জারীর বলেছেন, আলোচ্য আয়াতগুলো এবং সুরা আলে ইমরানের কতিপয় আয়াত ইহুদীদের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে।

'বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করে'- একথার অর্থ, পরকালের তুলনায় পৃথিবীকে প্রাধান্য দেয়। পৃথিবীর বিপুল বৈভব আখেরাতের তুলনায় কিছুই নয়। তাই পৃথিবীপ্রাপ্তিকে এখানে স্বল্পমূল্য বলে অভিহিত করা হয়েছে।

তারা নিজেদের জঠরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই প্রবেশ করায় না— একথার অর্থ, তারা ঘুষ গ্রহণকারী এবং হারাম বস্তু ভক্ষণকারী। এই হারাম তাদেরকে আগুনের সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দেবে। অথবা আখেরাতে ওই নিষিদ্ধ বস্তুগুলোই আগুনে রূপান্তরিত হবে। কিংবা হারাম ভক্ষণকারীরা তখন আগুন দ্বারা উদরপূর্তি করবে।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না—একথার অর্থ, তাদেরকে সাদর-সম্ভাষণ জানাবেন না। দয়ার্দ্রচিত্ততা প্রকাশ পায়— এ মতোন বাক্যালাপও করবেন না। যারা অবিশ্বাসের কারণে শাস্তির উপযোগী তারা সমাদর ও শুভ সম্বোধনের উপযোগী নয়। কিছুতেই নয়।

'তাদেরকে পবিত্র করবেন না'—এর অর্থ, শাস্তি তাদের পাপপ্রক্ষালনের কারণ হবে না। অর্থাৎ পাপী বিশ্বাসীরা যেমন পাপের শাস্তি ভোগ করার পর পবিত্র হয়ে যাবে, তারা সে রকম হবে না। তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন মর্মন্তুদ শাস্তি।

www.eelm.weebly.com

'তারা সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ ক্রয় করেছে'—একথার অর্থ তওরাতের বিবরণবিকৃতির মাধ্যমে তারা সত্যপথ ত্যাগ করেছে। গ্রহণ করেছে ভ্রান্ত পথ। উপনীত হয়েছে ধ্বংসের মুখোমুখি।

ক্ষমার পরিবর্তে ক্রয় করেছে শাস্তি— একথার অর্থ মাগফিরাত ও মুক্তি ছেড়ে দিয়ে শাস্তিকে আবাহন করেছে তারা।

'আগুন সহ্য করতে তারা কতোই না ধৈর্যশীল'— এ বাক্যটির অর্থ, হে বিশ্বাসীরা! দেখো কী অবাক ব্যাপার! তারা জেনে শুনে জাহান্নামের পাথেয় সংগ্রহে কতোই না একাগ্রচিত্ত। মনে হয়, দোজখের আগুনে বসেও তারা কেমন নির্বিকার ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী। কী হেতু এই নির্বুদ্ধিতার? শেষ আয়াতে আল্লাহ্পাক এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

'হেতু এই যে, আল্লাহ্ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন'—এখানে কিতাব অর্থ, তওরাত অথবা অন্য সকল আসমানী কিতাব। মানবতা দ্বিখন্ডিত হয়েছে এই কিতাব নাজিলের কারণেই। স্পষ্ট হয়েছে সত্য এবং মিথ্যা। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কারা বিশ্বাসী— কারাই বা অবিশ্বাসী। অবিশ্বাসীরাই শাস্তির উপযোগী—যার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে সকল আসমানী কিতাবে। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে কিতাব অর্থ,ওই আয়াত যেখানে বলা হয়েছে- তাদের ভীতি প্রদর্শন করা না করা সমান। তারা ইমান গ্রহণ করবে না। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মোহরাংকিত করে দিয়েছেন। এই দৃষ্টান্তটি গ্রহণ করা হলে আয়াতের মর্ম হবে, ইহুদীদের পাপানুবর্তন ও দৌরাত্ম্য অনড়- অনপসারণীয়। তাই আল্লাহ্ তাদের এই অনড়তা লক্ষ্য করেই সিদ্ধান্তমূলক ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, তারা ইমানই গ্রহণ করবে না। আর ইহুদীরাও তেমনি, ভয়ভাবনার লেশমাত্রও তাদের নেই। অমোঘ ধ্বংস তাদের একগুঁয়েমিকে টলাতে পারেনি। 'যারা কিতাব সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি করেছে'- এর অর্থ, তারা আসমানী কিতাবেও ঘটিয়েছে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, রূপান্তর। কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করেছে, আবার কিছু অংশ করেছে পরিত্যাগ। তারা যেমন তওরাতের নির্দেশ অমান্য করেছে, তেমনি অমান্য করেছে কোরআনেরও নির্দেশ। তওরাত ও কোরআন উভয় কিতাবের নির্দেশ এই যে, শেষ নবীর উপর ইমান আনতে হবে। এই নির্দেশ তারা মানেনি। তওরাত মেনেছে আংশিকভাবে, যা না মানারই নামান্তর। আর কোরআন মজীদ সম্পর্কে কখনো বলেছে—এটা যাদু। কখনো বলেছে, আল্লাহ্ নয় মানুষই এর রচয়িতা। আবার কখনো বলেছে এ সব তো প্রাচীন কাহিনীর সমাহার মাত্র।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই তারা অশেষ মতভেদে রয়েছে। অর্থাৎ তাদের মতবিরোধ অন্তহীন। তাই তারা সত্যচ্যুত, বুদ্ধিরহিত।

www.eelm.weebly.com

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى
حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى
الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ
الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

❑ পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেহ আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে বিশ্বাস করিলে এবং আল্লাহ্প্রেমে আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থদান করিলে, সালাত কায়েম করিলে ও জাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে, অর্থ-সংকটে দুঃখ-দারিদ্রে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণ করিলে। ইহারাই তাহারা যাহারা সত্যপরায়ণ এবং ইহারাই সাবধানী।

হজরত কাতাদা থেকে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন— ইহুদীরা পশ্চিমমুখী হয়ে এবং খৃষ্টানেরা পূর্বমুখী হয়ে বায়তুল মাকদিসকে কেবলা করে উপাসনা করতো। এই আয়াতের শুরুতেই এই কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, পূর্ব পশ্চিম মুখী হওয়াতে কোনো লাভ নেই। কারণ শেষ কিতাবের মাধ্যমে তাদের কেবলা রহিত হয়েছে। তাই রহিত কেবলার দিকে মুখ করাতে কোনো কল্যাণ নেই। আর আল্লাহ্র নির্দেশবিরোধী কাজ কস্মিনকালেও কোনো পুণ্যের কাজ নয়। এ রকম বলেছেন আবী হাতেম আবুল আলীয়া থেকে। বাগবী বলেছেন, হজরত কাতাদা এবং মুকাতিলও এই অভিমত পোষণ করেন। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে। তাঁরা আরো বলেছেন, ইসলামের প্রথম দিকে শরিয়তের বিধানাবলী সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হয়নি। তখন কেবল তওহীদ ও রেসালতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হতো। বিশ্বাসীরা তখন যে দিকে ইচ্ছা মুখ করে নামাজ আদায় করতেন। নামাজ ছাড়া অন্য আমলের হুকুম তখনো আসেনি। রসুল পাক স. এর হিজরতের পর শরিয়তের সকল বিধান অবতীর্ণ হলো। এভাবে শরিয়তের পরিপূর্ণতা সাধনের পর এই

www.eelm.weebly.com

আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে এরকম— দেখো, শুধু পূর্বে অথবা পশ্চিমে মুখ ফেরানোর মধ্যে পূর্ণ সফলতা নেই। সৎআমল রয়েছে আরো অনেক প্রকারের। পরক্ষণেই সেগুলোর বিবরণ দেয়া হয়েছে। বাগবী বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং জুহাকও এই অভিমতের সমর্থক। এর পোষকতা রয়েছে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং হজরত কাতাদা থেকে। আমি বলি, আল্লাহ্ পাক এখানে কেবল মুখ ফেরানোর কথা বলেছেন, নামাজ আদায়ের কথা উল্লেখ করেন নি। এতে করে প্রমাণিত হয়, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদী খৃষ্টানদেরকে লক্ষ্য করে, বিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে নয়। কেননা আল্লাহপাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, তিনি তোমাদের নামাজ অসফল করেন না। পুবে ও পশ্চিমে মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই— একথা বলার পর পুণ্য লাভের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে বিশ্বাসের কথা। বিশ্বাস্য বিষয়গুলো হচ্ছে- আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতামন্ডলী, আসমানী কিতাবসমূহ এবং প্রেরিত পুরুষগণ। আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থ, তাঁর মহান সত্তার অতুলনীয় এককত্বকে মেনে নেয়া। সত্তা, গুণাবলী, কার্যাবলী সকল কিছুতেই তিনি এক, একক। তিনি নশ্বরতার স্পর্শমুক্ত। সমকক্ষতা ও সমান্তরালতা থেকে পবিত্র। অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে তিনি নিজে যেমনটি বর্ণনা দিয়েছেন, ঠিক তেমনটিই বিশ্বাস করতে হবে।

পরকাল অর্থ, কিয়ামত দিবস থেকে পরবর্তী জীবন। অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে কবর থেকে উত্থিত হওয়ার পর সেই অন্তহীন ও চিরস্থায়ী অধ্যায়। আমলের হিসাব, মিজান, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, শাফায়াত, মাগফিরাত, চিরস্থায়ী পুরস্কার ও শাস্তি— এ সকলই পরকালের অধ্যায়ভূত।

ফেরেশতামন্ডলীর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে এরকম— তারা আল্লাহ্ পাকের বান্দা। আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা অনেকেই চারটি, ছয়টি কিংবা আটটি ডানা বিশিষ্ট। রসুল পাক স. তাঁদের নেতা হজরত জিব্রাইলের ছয়শত ডানা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ফেরেশতারা পানাহার করেন না। আল্লাহ্পাকের জিকিরই তাঁদের পানাহার। তাঁরা না নারী না পুরুষ। তাই তাঁরা বিবাহের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। আল্লাহ্পাকের নির্দেশ পালনে তাঁরা নিখুঁত। তবুও তাঁদের মৃত্যু আছে। সকল সৃষ্টির মতো তাঁরাও মৃত্যুর পর পুনরোত্থিত হবেন। তাদের কেউ কেউ আল্লাহ্ পাকের দূত। আল্লাহ্পাক এবং রসুলের সঙ্গে চলে তাঁদের এই দৌতকর্ম। আল্লাহ্পাকের নৈকট্য ও সন্তোষই তাঁদের ইবাদতের প্রতিফল। তাঁদের জন্যে না বেহেশত রয়েছে না দোজখ। বরং তাঁদের অনেকেই বেহেশতের প্রহরী। দোজখের রক্ষক। এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, সাধারণ বিশ্বাসীরা ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম নয়। বিশ্বাসীদের কেউ পাপী, কেউ পুণ্যবান। পাপী পুণ্যবান সকলেই আবার শাস্তির মাধ্যমে অথবা শাস্তি ব্যতিরেকে লাভ করবেন

www.eelm.weebly.com

বেহেশতের অধিকার। ফেরেশতাদের এই অধিকার নেই। কিন্তু তাঁরা পবিত্র। তাই সাধারণ বিশ্বাসীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিশেষ বিশ্বাসীরা ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁরা জাতী তাজাল্লী (মহান সত্তার জ্যোতিচ্ছটা) লাভ করেছেন, যা কেবল মৃত্তিকাজাত সৃষ্টির পক্ষেই লাভ করা সম্ভব। ফেরেশতারা নূর থেকে জাত। মৃত্তিকা তাদের সৃষ্টির উপাদান নয়। তাই জাতী তাজাল্লী ধারণের যোগ্যতাও তাদের নেই। এটাও জেনে নিতে হবে যে, পুণ্যকর্মের বিনিময়েও ফেরেশতারা যেমন জান্নাতের অধিকারী হবেন না, তেমনি প্রেরিত পুরুষগণ আবার জান্নাতে গমনের পূর্বেই (পৃথিবীতেই) জান্নাতের উপকরণসমূহ প্রাপ্ত হন। তাই আল্লাহ্ পাক হজরত ইব্রাহিমকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, আমি ইব্রাহিমকে তাঁর প্রতিদান এজগতেই প্রদান করেছিলাম। আর আখেরাতে সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূত থাকবে।

কিতাবসমূহ অর্থ, কোরআন মজীদসহ পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব। কোরআন মজীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সর্বশেষে অবতীর্ণ এই গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেই কিতাবের বিশ্বাস পূর্ণ হবে। অর্থাৎ সকল আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হবে। সকল কিতাবই আল্লাহ্ পাকের বাণী। আল্লাহ্পাকের বাণীও তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর মতো চিরন্তন— সৃষ্ট নয়। এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে যে, কোনটা কোরআন, মর্ম না শব্দসমাহার? বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, শব্দ ও মর্ম উভয়ের মিলিত নামই কোরআন। শুধু শব্দ যেমন কোরআন নয়, তেমনি শুধু মর্মও কোরআন নামে অভিহিত হতে পারে না। শব্দ যদিও নশ্বর বলে মনে হয় এবং শ্রুতির গোচরে আসে— তবু তা কেবল নশ্বর শব্দ নয়, বরং আল্লাহ্পাকের চিরন্তন ও অতুলনীয় বাণীসম্ভার।

নবী হিসেবে সকল নবী এক। তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সর্বপ্রথম নবী হজরত আদম আ. আর সর্বশেষ ও সর্বোত্তম নবী হজরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স.। নবীগণের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় ও নির্দেশ করা হয়নি। সুতরাং তাঁদের সংখ্যা নির্ণয়ে প্রতর্ক পরিহার করতে হবে। আল্লাহ্পাক স্বয়ং এরশাদ করেছেন, 'তাদের কিছু সংখ্যকের কাহিনী আপনাকে জানিয়েছি, আর কিছু সংখ্যকের কথা জানাইনি।' যে সকল হাদিসে তাঁদের সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলো কিন্তু খবরে ওয়াহেদ (এককবর্ণিত)। খবরে ওয়াহেদ থেকে অকাট্য বিশ্বাস অর্জিত হয় না। সুতরাং সংখ্যা নিরুপণে গলদঘর্ম হওয়া নিরর্থক। নবীগণ ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল পাপ থেকে পবিত্র। তাঁদের সকলের বিশ্বাস এক। বিধানগত শাখা প্রশাখায় অবশ্যই ভিন্নতা রয়েছে। বিধানাবলীর ক্ষেত্রে রহিতকরণ নীতি (নাসেখ মনসুখের নিয়ম) প্রচলিত বলেই এরকম পার্থক্য ঘটেছে।

রাফেজী সম্প্রদায় বলে, নবীগণের প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে ইমামগণের প্রতি বিশ্বাসের কথাও রয়েছে। আমি বলি, এখানে বরং নবীগণ ছাড়া অন্য সকলের প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হয়েছে। যদি ইমামগণ বিশ্বাস্য বিষয়গুলোর অন্তর্ভূত হতেন, তবে

www.eelm.weebly.com

নবী ও ফেরেশতার মতো ইমাম প্রসঙ্গটিও পাশাপাশি উল্লেখিত হতো। আল্লাহ্পাকই সমধিক জ্ঞাত।

কল্যাণকর বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ বর্ণনার পর পুণ্য কর্মসমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে। প্রথমেই এসেছে দানের কথা। আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে দান করা হয়, তিনি তার যথাপুরস্কার দিবেন। আর যে দানের সঙ্গে আল্লাহ্ প্রেমের সংশ্রব নেই সে দান পুণ্যবিহীন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. এরশাদ করেন, হাশরের প্রান্তরে সর্বপ্রথমে যে বিষয়টির নিষ্পত্তি হবে তাতে জড়িত থাকবে তিন প্রকারের মানুষ। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা হবে এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ পাক এক বিত্তশালীকে তখন জিজ্ঞেস করবেন, পৃথিবীতে আমি তোমাকে বিপুল বিত্তের অধিকারী করেছিলাম, সেকথা কি তোমার মনে আছে? লোকটি বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্পাক বলবেন, তোমার বিত্তরাশি দিয়ে তুমি আমার কোন কর্ম সম্পাদন করেছো? সে বলবে, হে আমার প্রভুপালয়িতা! তুমি দানের যতোগুলো পথ খুলে দিয়েছিলে, সে সকল পথেই আমি আমার সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি আমার উদ্দেশ্যে দান করোনি। তোমার দানের উদ্দেশ্য ছিলো দানবীর নামে খ্যাত হওয়া। পৃথিবীতে সেই খ্যাতি তুমি পেয়েছো। এর'পর আল্লাহ্ নির্দেশ দিবেন একে অধঃমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে— মহানবী স. বলেছেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদের অবস্থা ও সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করেন না, লক্ষ্য করেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি। মুসলিম। আরো বর্ণিত হয়েছে— আল্লাহ্ বলেন, আমি সকল মুশরিকের শিরিক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি শিরিককারীকে এবং তার কর্মকান্ডকে পরিত্যাগ করি। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে- আমি তাদের প্রতি বিমুখ এবং যার সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত তাদের থেকে বিমুখ।

'আলা হুব্বিহি' অর্থ, আল্লাহ্ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে। সম্পদের প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এরকম অর্থ করা যেতে পারে। সম্পদের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে অর্থ, সম্পদ নিমজ্জিত অবস্থায়। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এরকম বলেছেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে— এক ব্যক্তি রসুল পাক স. কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! অধিক পুণ্যার্জন করা যায় কীরূপ দানের মাধ্যমে? তিনি স. বললেন, সম্পদ হতে হবে ক্রটিমুক্ত, আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয়। সম্পদ হ্রাসের ভয় এবং ধনী হওয়ার লালসা থাকা সত্ত্বেও যে দান করা হয়, সেই দানেই রয়েছে অধিকতর পুণ্য। দানের সময় টালবাহানা করা চলবে না। প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার সময় দানের অঙ্গীকার করাতে কোনো লাভ নেই। কারণ, তখন ধনসম্পদ উত্তরাধিকারীদের অধিকারে প্রায়। বোখারী। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেছেন, প্রিয় সামগ্রী দান না করা পর্যন্ত পুণ্য অর্জিত হবে না। এই আয়াত দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াতের 'আলা হুব্বিহি' কথাটির অর্থ হবে আল্লাহ্র প্রেমে উদ্বুদ্ধ

www.eelm.weebly.com

হয়ে, সম্পদপ্রিয়তায় উজ্জীবিত হয়ে নয়। এখানে 'হা' সর্বনামটি সম্পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারে আরেকটি ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, এমন সম্পদ দান করতে হবে, যে সম্পদ সর্বাধিক প্রিয়। এই মতের পোষকতায় রয়েছে ওই আয়াতটি যেখানে বলা হয়েছে, 'তোমাদের অর্জিত সম্পদ থেকে পবিত্র বস্তু দান করো। আর আমি যা উদগত করি ভূমি থেকে এবং দূষণীয় বস্তু দান করার অভিপ্রায় কোরো না। 'আল্লাহ্‌র প্রেমে অথবা সম্পদের প্রেমে ছাড়াও দানের প্রেমে— এ রকম অর্থও করা যেতে পারে। অর্থাৎ যে দানে অন্তর প্রসন্ন হয়— অন্তরের উদগ্র আকর্ষণে যে দান সম্পাদিত হয়।

দান করতে হবে আত্মীয়স্বজনকে। 'আত্মীয়স্বজন' অর্থ, সকল আত্মীয়। রক্ত সম্পর্কধারী অথবা রক্তসম্পর্কবহির্ভূত। তবে নিকটাত্মীয়দের দান করাই অধিকতর উত্তম।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— মহানবী স. বলেছেন, যদি তুমি এক দিনার আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো, এক দিনার দাও অভাবগ্রস্তকে এবং আরেক দিনার ব্যয় করো পরিবার পরিজনের জন্য— তবে জেনো, শেষোক্ত ব্যয়ে রয়েছে অধিকতর পুণ্য। মুসলিম। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সহধর্মিণী হজরত জয়নাব থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুলপাক স. বলেছেন, হে রমণীকুল! দান খয়রাত করো, অলংকার থেকে হলেও। হজরত জয়নাব এবং অন্য এক রমণী তখন বললেন, হে দয়াল নবী! স্বামী এবং পোষ্য এতিমদের যদি দান করা হয়, তবে কি তা দান বলে গণ্য হবে? তিনি স. বললেন, এরকম দানে রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। একটি সওয়াব আত্মীয়তার অধিকারকে সম্মান জানানোর জন্য এবং আরেকটি কেবল দানের জন্য। হজরত সুলায়মান বিন আমের থেকে বর্ণিত হয়েছে— তিনি স. এরশাদ করেছেন, দরিদ্রকে দান করার জন্য রয়েছে একটি পুন্য। আত্মীয়দের দান করলে রয়েছে দু'টি— একটি আত্মীয়তার হক প্রতিপালন, অন্যটি নিছক দান। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী।

'পিতৃহীন' একথার অর্থ, ওই সকল এতিম বালক অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় যাদের পিতৃবিয়োগ ঘটেছে অথবা পিতা নিরুদ্দেশ হয়েছে। বায়যাবী বলেছেন, 'ইয়াতামা' অর্থ ইয়াতিম এবং 'জাবিল কুরবা' অর্থ, অভাবী আত্মীয়বর্গ। আল্লাহ্‌ পাক এ আয়াতে দানের নির্দিষ্ট সীমা নির্দেশ করেননি। আমি বলি, সীমা নির্দেশের প্রয়োজনও নেই। সকল প্রকার দানই এই আয়াতে উল্লেখিত দানের অন্তর্ভুক্ত। সে দান ফরজ হোক অথবা নফল। এখানে যদি কেবল ফরজ দানের কথা বলা হতো তবে তার স্পষ্ট সীমা রেখাও চিহ্নিত করে দেয়া হতো। আর নফল দান যে কেবল অভাবীকে দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। নফল দান কেবল মনোরঞ্জনের কারণেও হতে পারে। এক্ষেত্রে গ্রহীতাকে যে অভাবী হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। আর আত্মীয় বলতে কেবল মুসলমান আত্মীয়ই বুঝায় না।

www.eelm.weebly.com

মুসলমানদের অমুসলমান আত্মীয় থাকাও সম্ভব। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'এজগতে তাদেরকে (অমুসলমান পিতা মাতাকে) উত্তম সঙ্গ দিবে।'

হজরত আবু বকরের কন্যা হজরত আসমা বলেছেন, আমার মা তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তখনো তিনি ছিলেন পৌত্তলিক। একদিন তিনি আমার কাছে এলেন। আমি রসুলে আকরম স.কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আমার মূর্তিপূজারিণী মায়ের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করবো। তিনি স. এরশাদ করলেন, আপনজনোচিত ব্যবহার কোরো।

হজরত আমর ইবনে আস বলেছেন, আমি মহানবী স.কে বলতে শুনেছি, ওমুক গোত্রের লোক আমার বন্ধু নয়। আল্লাহ্ পাক ও বিশ্বাসীরাই আমার বন্ধু। তবে অবিশ্বাসী ওই গোত্রের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান। সে সম্পর্ক আমি অবশ্যই সংরক্ষণ করবো।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ আত্মীয়দের সঙ্গে সমান্তরাল আচরণকারী, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী নয়। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী সে-ই যে ছিন্ন সম্পর্কের একত্রীকরণে সচেষ্ট হয়। বোখারী।

রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, জান্নাতে এতিমের প্রতিপালনকারী ও আমার মধ্যে নৈকট্য থাকবে তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীর নৈকট্যাপেক্ষা অধিক। বোখারী, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি।

পর্যটক অর্থ মুসাফির, পথিক। যারা প্রবাসী, পরিবার পরিজন থেকে পৃথক তারাই পর্যটক বা পথিক। কেউ কেউ বলেছেন, পর্যটক অর্থ অতিথি। হজরত আবু শোরাইহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল পাক স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরলোকে বিশ্বাসী, সে যেনো অতিথিবৎসল হয়। বোখারী, মুসলিম।

সাহায্যপ্রার্থীগণকেও দান করার কথা এসেছে। হজরত উম্মে বুজাইদ থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, যাঞ্চাকারীকে কিছু না কিছু দিও। ছাগলের পোড়া খুর হলেও। অন্য বর্ণনায় এসেছে, হে উম্মে বুজাইদ! ছাগলের পোড়া খুর ছাড়া আর অন্য কিছু যদি তোমার না থাকে, তবে তাই দিও প্রার্থীকে। আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিজি।

হজরত হোসাইন বিন আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, যাঞ্চাকারীদের অধিকার রয়েছে— যদিও তারা অশ্বারোহী হয়ে আগমণ করে। হজরত আলী থেকে আবু দাউদ, হজরত ফাতেমা থেকে রাহ্ওয়াইহ্, হজরত হারমাস বিন মিয়াদ থেকে তিবরানী এবং আয্যোহদ গ্রন্থে ইমাম আহমদ, সালাম বিন আবীল জা'য়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন—হজরত ঈসা বলেছেন, যাঞ্চাকারীর একটি হক রয়েছে—যদিও সে তোমাদের নিকট রৌপ্যের কণ্ঠহার শোভিত অশ্বারোহী হয়ে আসে। আমি বলি, এই হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে,

www.eelm.weebly.com

সম্পদশালীর জন্য যাঞ্চা করা হারাম। তবু যদি সে যাঞ্চা করে তবে তাকে কিছু দান করা অত্যাবশ্যক।

সবশেষে দাসমুক্তির জন্য অর্থদানের কথা বলা হয়েছে। আয়াতে উল্লেখিত 'রিকাব' শব্দটির অর্থ মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস)। মুকাতাব ওই ক্রীতদাসকে বলা হয়, যে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মুক্তিলাভের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এখানে এরকম ক্রীতদাসদেরকে অর্থ দানের কথা বলা হয়েছে। যে দাস চুক্তিবদ্ধ নয়, তাকে মুক্ত করার জন্য অর্থ দানও এই বাক্যটির অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের সরল নির্দেশ হলো, মুক্তিপণ প্রদান করে দাস মুক্ত করো।

এরপর দেয়া হয়েছে নামাজ পাঠের নির্দেশ। তারপর জাকাত প্রদানের। নামাজ পাঠ অর্থ ফরজ নফল সুন্নত মোস্তাহাব— সকল বিধানসহ নামাজ পাঠ করা। নামাজের মতো জাকাত আদায় করাও ফরজ। আর 'আতাল মালা' বলে বুঝানো হয়েছে, নফল সদকাকে অথবা সাধারণ দান খয়রাতকে। সাধারণ দান খয়রাতের মধ্যে ফরজ, নফল সকল প্রকার দানই অন্তর্ভূত। কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, প্রথমে বর্ণিত 'আতাল মালা' এবং পরে বর্ণিত 'আতাজ জাকাত' বলতে ফরজ জাকাতকেই বুঝানো হয়েছে। প্রথম বর্ণনাটির উদ্দেশ্য ছিলো জাকাতের খাত নির্ণয় করা এবং পরের বর্ণনাটি হচ্ছে, জাকাত প্রদানে উৎসাহিত করা। আমি বলি, প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটি অধিকতর যুক্তিসংগত। পুণ্যকর্ম সমূহের বিবরণ প্রদান করাই এই আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য। সে পুণ্যকর্ম ফরজ হোক অথবা নফল। আর আল্লাহ্ পাকের নিকট পছন্দনীয় বিষয় হচ্ছে, পুণ্যকর্ম। এ প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি হাদিস রয়েছে। যেমন, হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, সম্পদে জাকাত ব্যতীত আরো হক রয়েছে। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করে শোনালেন। তিরমিজি, ইবনে মাজা ও দারেমী। হক অর্থ দাবী বা অধিকার। ফরজ, ওয়াজিব, মোস্তাহাব সকল দাবীই হক। হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. এর খেদমতে এক ব্যক্তির আগমন ঘটলো। সে ইসলামের বিশেষত্বসমূহ সম্পর্কে জানতে চাইলো। তার প্রশ্নের উত্তরে রসুল পাক স. বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমজান মাসের রোজা এবং জাকাতের কথা। লোকটি আরজ করলো, অতিরিক্ত আরো কিছু আছে কি? তিনি স. বললেন, তুমি যদি ইচ্ছা করো তবে অতিরিক্ত (নফল) কোরো।

'প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে'— একথার অর্থ, আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করলে। যেমন রূহের জগতে সকল রূহ অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলো। এখন সেই অঙ্গীকার পূরণের সময়। এছাড়া পৃথিবীতে কৃত সকল বৈধ অঙ্গীকার পূর্ণ করতে হবে। মানত করলে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। মানুষের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারও পূর্ণ করতে হবে। সদা সত্য কথা বলতে হবে। সাক্ষ্যের প্রয়োজন পড়লে সত্য সাক্ষ্য দিতে হবে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে- মুনাফিকদের নিদর্শন তিনটি। ১. মিথ্যা বলা। ২. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। ৩. গচ্ছিত বস্তু আত্মসাৎ করা। বোখারী ও মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় একথাটিও রয়েছে, যদিও সে (মুনাফিক) নামাজ রোজা সম্পাদনকারী হয় এবং নিজেকে মুসলমান

www.eelm.weebly.com

বলে দাবী করে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে- আল্লাহ্‌র রসুল স. এরশাদ করেছেন, যার মধ্যে চারটি স্বভাব রয়েছে, সে নির্ভেজাল মুনাফিক। একটি স্বভাব থাকলে বুঝতে হবে সে একটি মুনাফিকির অধিকারী। সেই চারটি স্বভাব হচ্ছে-১. আমানতের খেয়ানত। ২. মিথ্যাচারীতা। ৩. অঙ্গীকার ভঙ্গ। ৪. বাদানুবাদের সময় অশ্লীল বাক্য ব্যবহার।

সবশেষে বলা হয়েছে, ধৈর্যধারণের কথা। ধৈর্যশীলদেরকে আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়াস সবিরিন।' ধৈর্যের সম্পর্ক বিশ্বাসের সঙ্গে। কিন্তু এখানে বিশ্বাস ও ধৈর্যের মধ্যে আরো অনেক পুণ্য কর্মের কথা বলা হয়েছে। ধৈর্যধারণ অন্য সকল আমল থেকে উত্তম। ধৈর্য সংরক্ষণ একটি সার্বক্ষণিক ব্যাপার। তাই অন্য পুণ্যকর্ম থেকে এ আমলটি অধিক উত্তম। এই ব্যাখ্যাসূত্রে আয়াতের মর্ম হবে, আমি ধৈর্যশীলদেরকে অধিক পুণ্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট করি অথবা অধিক পুণ্যের কারণে আমি ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করি। এমতাবস্থায় একটি বাক্য অপর বাক্যটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কতিপয় তাফসীরবিদ বলেছেন, 'ওয়াস সবিরিন' এর সম্পৃক্তি জাবিল কুরবা'র (আত্মীয়স্বজনের) সঙ্গে। এমতাবস্থায় প্রতিপাদ্য বাক্য দাঁড়াবে এ রকম— আর ধৈর্যশীল (আত্মীয়) দেরকে দান করে। এই ব্যাখ্যাসূত্রে আলোচ্য আয়াতটি ওই আয়াতের সমার্থসম্পন্ন যেখানে বলা হয়েছে,'দান করো অভাবীদেরকে যারা আল্লাহ্‌র পথে নিয়োজিত। স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম নয়; প্রার্থী না হওয়ার কারণে মূর্খ লোকেরা যাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে।' আলোচ্য আয়াতে বিভিন্ন পর্যায়ের ধৈর্য সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, অর্থ সংকটে, দুঃখ দারিদ্রে এবং সংগ্রাম সংকটে ধৈর্যধারণের কথা।

বিশ্বাস এবং পুণ্যকর্মের যে বিবরণসমূহ দেয়া হলো, সেগুলো আয়ত্তকারী যারা তারাই সত্যপরায়ন এবং সাবধানী। তাই সবশেষে ঘোষিত হয়েছে, 'উলা-ইকাল্লাজিনা সদাকূ ওয়া উলাইকা হুমুল মুত্তাকুন।'

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৭৮,১৭৯

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

www.eelm.weebly.com

❒ হে বিশ্বাসীগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী, কিন্তু তাহার ভাইয়ের পক্ষ হইতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হইলে প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তাহার দেয় আদায় বিধেয়। ইহা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। ইহার পরও যে সীমালংঘন করে তাহার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

❒ হে বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যেই তোমাদের জীবন রহিয়াছে— যাহাতে তোমরা সাবধান হইতে পার।

হজরত কাতাদা, শা'বী এবং কালাবী বলেছেন, ইসলামের অভ্যুদয়ের কিছুকাল পূর্বে দু'টি বিবদমান গোত্রের মধ্যে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ি সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সে সংগ্রামে নিহত হয়েছিলো উভয় পক্ষের অনেক লোক। মুকাতিল বিন হাব্বান বলেছেন, ওই সংগ্রাম ঘটেছিলো বনী কুরাইজা এবং বনী নাজিরের মধ্যে। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, আউস এবং খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিলো ওই যুদ্ধ। সাঈদ এবং মুকাতিল উভয়ের বর্ণনায় রয়েছে—এক গোত্র অপর গোত্র অপেক্ষা ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অধিক প্রভাবশালী। প্রভাবশালী গোত্র অপর গোত্রের রমণীদেরকে মোহর নির্ধারন ব্যতিরেকেই বলপূর্বক বিবাহ করতো। আরও অনেক প্রকারের জুলুম করতো তারা। অত্যাচারিত গোত্র এক সময় রুখে দাঁড়ালো। তারা এই মর্মে শপথ করে বসলো যে, আমরা দাসের পরিবর্তে স্বাধীন লোককে, নারীর পরিবর্তে পুরুষকে এবং একজনের পরিবর্তে দুইজনকে হত্যা করবো। একটি আঘাতের পরিবর্তে হানবো দু'টি আঘাত। তাদের এই ক্ষিপ্ত শপথের সংবাদ রসুলেপাক স. এর গোচরীভূত হলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতে রয়েছে সমতার নির্দেশনা। তাই সকলেই এই নির্দেশনাকে সন্তুষ্টচিত্তে সমর্থন করলো। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেম। আমি বলি, 'ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আ'মানু' বলে এখানে কেবল ইমানদারদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের উদ্দেশ্য ছিলো, আউস ও খাজরাজ সম্প্রদায়। কারণ, তাঁরা ছিলেন ইমানদার এবং দ্বীনের সাহায্যকারী। বনী নাজির এবং বনী কুরাইজা এই আয়াতের লক্ষ্য নয়।

হত্যাকান্ডের দন্ডঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, পরিকল্পিত হত্যাকান্ডের দন্ড হচ্ছে কিসাস (খুনের বদলে খুন)। অপরিকল্পিত বা অনিচ্ছাকৃত হত্যার দন্ড কিসাস নয়। ইমাম আজমের মতে এই আয়াতে উল্লেখিত কিসাসের বিধান কেবল ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি কিসাস। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন— ইমাম শাফেয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা এবং নাসাঈ। হাদিসটি

www.eelm.weebly.com

মুত্তাসিল না মুরসাল সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। দারা কুতনী বলেছেন, হাদিসটি মুরসাল। আর মুরসাল হাদিস আমাদের নিকট দলিল হিসাবে গণ্য। দারা কুতনী কর্তৃক এই হাদিসটি আবু বকর বিন মোহাম্মদ বিন হাজম থেকে তাঁর পিতা ও দাদার মাধ্যমে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটিতে রয়েছে ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য কিসাস আর অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য দিয়ত (রক্তপণ)। এই হাদিসটির সূত্রপরম্পরাতেও দুর্বলতা দৃষ্ট হয়।

ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ থেকে এ সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে— কিসাস ওয়াজিব। কিন্তু নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের প্রতি এই বিধানটি প্রযোজ্য যে, তারা যেনো হত্যাকারীর সম্মতি ব্যতিরেকেই কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ গ্রহণ করে। অপর অভিমতটি হচ্ছে কিসাস ও রক্তপণ— এর যে কোনো একটি ওয়াজিব। যে কোনো একটি বিধান কার্যকর করতে হবে। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা যদি রক্তপণের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে বলে, আমরা কিসাস ক্ষমা করে দিলাম; তবে প্রথমোক্ত অভিমতের প্রেক্ষিতে কিসাস স্থগিত হবে। কিন্তু রক্তপণ স্থগিত হবে না। আর শেষোক্ত অভিমতের প্রেক্ষিতে কিসাস স্থগিত হওয়ার সাথে সাথে রক্তপণ প্রতিষ্ঠিত হবে। বর্ণিত তিন ইমাম উত্তরাধিকারের সম্মতি ব্যতীতও রক্তপণ গ্রহণের দলিল হিসাবে নিম্নে বর্ণিত হাদিসগুলি উপস্থাপন করেছেন।

হজরত আবু শুরাইহ্ কারাবী বলেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী স. এক নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, কিসাস এবং রক্তপণ —এ দু'টির যে কোনো একটিকে তারা গ্রহণ করতে পারে। তিরমিজি, শাফেয়ী। হজরত আবু শুরাইহ্ খাজাঈ থেকে ইবনে জাওজী এবং দারেমী বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল পাক স.কে বলতে শুনেছি যদি কারো প্রিয়জনকে হত্যা করা হয় কিংবা তাকে আঘাত করা হয়, তাহলে সে তিনটি বিধানের যে কোনো একটিকে গ্রহণ করতে পারে। ১. কিসাস ২. ক্ষমা ৩. রক্তপণ। এই তিন বিধানের যে কোনো একটিকে গ্রহণ করার পর যদি সে সীমালংঘন করে তবে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে চিরস্থায়ী নরক। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল পাক স. এরশাদ করেন— যে ব্যক্তির আপনজন নিহত হয় সে কিসাস অথবা দিয়ত— যে কোনো একটিকে গ্রহণ করতে পারবে। আমর বিন শুয়াইব তাঁর পিতা ও দাদার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন— রসুলপাক স. বলেছেন, পরিকল্পিত হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের দায়িত্বে ছেড়ে দাও। তারা তাকে হত্যা করুক অথবা রক্তপণ গ্রহণ করুক। আর রক্তপণের পরিমাণ হলো তিরিশটি হিক্কা, তিরিশটি জাম'আ এবং চল্লিশটি খালফা। আহমদ তিরমিজি, ইবনে মাজা। ইমামত্রয়ের বর্ণিত দলিল প্রমাণ সমূহের প্রেক্ষিতে হানাফীগণ মন্তব্য করেছেন তারা হাদিসগুলোর প্রকৃত মর্ম বুঝতে অপারগ হয়েছেন। বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে মহানবী স. এর প্রকৃত বক্তব্য ছিলো এই—

www.eelm.weebly.com

উত্তরাধিকারীদের সামনে দু'টি পথ খোলা— হয় তারা কিসাস গ্রহণ করবে অথবা হত্যাকারীর সঙ্গে একটি সমাধানে উপনীত হবে। বলা বাহুল্য, হত্যাকারীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ব্যতিরেকে সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। এ কথাটিও সুস্পষ্ট যে, হত্যাকারী তার জীবন বাঁচাতে চাইবে। তাই রসুল পাক স. হত্যাকারীর সম্মতির উল্লেখ করেননি। আল্লাহপাকই সমধিক জ্ঞাত।

'স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি। দাসের পরিবর্তে দাস ও নারীর বদলে নারী'— একথার অর্থ স্বাধীন ব্যক্তি নিহত হলে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। ক্রীতদাস নিহত হলে ক্রীতদাসকে এবং নারী নিহত হলে নারীকে হত্যা করাই আল্লাহ্তায়ালার বিধান। তবে একথা বলা যাবে না যে, স্বাধীন ব্যক্তি কোনো ক্রীতদাসকে হত্যা করলে সে স্বাধীন হত্যাকারীকে হত্যা করা যাবে না। কিংবা নারী যদি কোনো পুরুষকে হত্যা করে, তবে সেই নারীকে হত্যা করা যাবে না। বরং আয়াতের অর্থ সাবলীল এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করতে হবে। কিসাস কার্যকর করার ক্ষেত্রে একের প্রভাব প্রতিপত্তি অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে না। হত্যাকারী প্রভাবশালী হলেও বিধান নড়চড় হবে না। নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী স্বাধীন, ক্রীতদাস বা নারী যেই হোক না কেনো সকলের প্রতি কিসাস প্রযোজ্য।

হত্যার বিনিময়ে হত্যাঃ স্বাধীন ব্যক্তি ক্রীতদাসকে হত্যা করলে, ক্রীতদাস স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করলে কিংবা রমণী কোনো পুরুষকে হত্যা করলে কোন বিধান প্রযোজ্য হবে? ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, একটি প্রাণের বিনিময়ে একটি প্রাণ সংহার করা হবে। সে স্বাধীন, ক্রীতদাস, নর কিংবা নারী, মুসলমান কিংবা কাফের যেই হোক না কেনো। কারণ, আল্লাহ্ পাকের বিধানে এ সম্পর্কে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। সাধারণভাবে বলা হয়েছে, আমি (বনী ইসরাইলদের সম্পর্কে তাদের তওরাতে) লিখে দিয়েছি, অবশ্যই একটি জীবনের বিনিময়ে একটি জীবন সংহার করা হবে। সুতরাং দেখা যায় কিসাসের বিধান সব সময় ছিলো একই। আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রসুল এই বিধানেরই বর্ণনা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বিচারক এক। বিধানও একটি। তাই এই বিধানের আনুগত্য অপরিহার্য। এমতো ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের এরশাদ এরকম, 'আপনি তাদের পদ্ধতির অনুসরণ করুন।' আরো এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য সেই পথ নির্ধারণ করেছেন, যে পথনির্দেশ দিয়েছিলেন নূহকে, আর যে প্রত্যাদেশ আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। আর সেই নির্দেশনাও, যা অবতীর্ণ করেছিলাম ইব্রাহিম, মুসা এবং ঈসার প্রতি।' পূর্ববর্তী কিতাবের কোনো বিধান রহিত করা না হলে, সেই বিধানটি কার্যকর অবস্থায় রয়েছে বলে বিশ্বাস করতে হবে। এই কার্যকারিতা সম্পর্কে এখানে দু'টি হাদিস উপস্থাপন করা যেতে পারে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের এককত্ব এবং রেসালাতকে স্বীকার করে ও এই

www.eelm.weebly.com

মর্মে সাক্ষ্য দেয়— তিনটি কারণ ব্যতীত তার রক্তপাত ঘটানো অবৈধ হবে। ১. হত্যা। ২. বিবাহিতাবস্থায় ব্যভিচার। ৩. ধর্মত্যাগ। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত হয়েছে—অবরুদ্ধ হজরত ওসমান তাঁর গৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে অবরোধকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের শপথ সহযোগে জিজ্ঞেস করছি তোমরা কি জানো— রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, তিনটি কারণ ব্যতীত মুসলমানের রক্ত নির্গত করা যায় না? যাদেরকে হত্যা করা যায় তারা হচ্ছে— ১. বিবাহিত ব্যভিচারী ২. ধর্মত্যাগী (মোরতাদ) ৩. হন্তারক। শাফেয়ী, আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা। হজরত আয়েশা থেকে মুসলিম, আবু দাউদ ও অন্যান্যরাও এরকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা এই কথাটি জোর দিয়ে বলেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি আপন ক্রীতদাস, মালিকের মৃত্যুর পরে মুক্তির চুক্তিতে আবদ্ধ ক্রীতদাস, মুক্তিপণের চুক্তিতে আবদ্ধ ক্রীতদাস, আংশিক মালিকানাধীন ক্রীতদাস অথবা আপন পুত্রের ক্রীতদাসকে হত্যা করে, তবে তার উপর কিসাস প্রযোজ্য হবে না। শেষোক্ত অবস্থায় পুত্র পিতার নিকট রক্তপণও গ্রহণ করতে পারবে না। দাউদ জাহেরী বলেছেন, বর্ণিত ক্ষেত্রগুলোতেও কিসাস প্রযোজ্য। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও দারেমী বর্ণিত হাদিসকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। হজরত সামুরা থেকে হাসান বলেছেন, মহানবী স. এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে হত্যা করে, আমি তাকে হত্যা করবো। যে তার ক্রীতদাসের নাসিকা কর্তন করে আমি তার নাসিকা কর্তন করবো। সাধারণ আলেমগণ এই হাদিস সম্পর্কে বলেছেন, হাদিসটি মুরসাল ও প্রশাসন সংক্রান্ত। মুরসাল এই কারণে যে, হজরত সামুরার সঙ্গে হাসানের সাক্ষাত হয়েছিলো- এমতো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পক্ষান্তরে হজরত আমর বিন শুয়াইব থেকে তাঁর পিতা ও দাদার মাধ্যমে দারা কুতনী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- এক ব্যক্তি জেনেশুনে তার ক্রীতদাসকে হত্যা করেছিলো। রসুল স. সেই হত্যাকারীর জন্য একশত দোররা, দেশান্তর এবং গনিমতের অধিকার হরণের শাস্তি নির্ধারণ করেছিলেন-কিসাস কার্যকর করেননি। উপরন্তু তাকে বলেছিলেন, একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দাও। অবশ্য এই হাদিসটির এক বর্ণনাকারী ইসমাইল ইবনে আয়াশ দুর্বলতার দোষে দুষ্ট। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ইমাম আবু হানিফা ছাড়াও ইমাম মালেক, শাফেয়ী এবং আহমদের অভিমত হচ্ছে, কিসাসের বিধানে স্বাধীন লোকের বদলে ক্রীতদাসকে এবং পুরুষের বিনিময়ে স্ত্রীলোককে হত্যা করা যাবে। এভাবে কাফেরের পরিবর্তে মুসলমানকেও হত্যা করা যাবে। এই নিয়মে উর্ধ্বস্তরধারীর বিনিময়ে নিম্নস্তরের লোককে হত্যা করা যায়। কিন্তু এর বিপরীত করা যাবে না। অর্থাৎ নিম্নস্তরের নিহতদের জন্য উর্ধ্বস্তরের লোকদের হত্যা করা যাবে না। তবে এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত

www.eelm.weebly.com

যে, একজন নারীর বিনিময়ে একজন পুরুষকে হত্যা করা যাবে। যেহেতু আমর বিন হিশাম থেকে বর্ণিত হয়েছে—মহানবী স. ইয়ামেনবাসীদের নিকট প্রেরিত একটি ফরমানে লিখেছিলেন, নারীর বিনিময়ে পুরুষ হত্যা বৈধ। একথাটি ইমাম মালেক ও শাফেয়ী বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ হাদিসের অংশ বিশেষ। হাদিস বিশেষজ্ঞগণ এ সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। ইবনে হাজম বলেছেন, আমর বিন হাজমের যে পুস্তিকাতে এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ রয়েছে, ওই পুস্তকটি প্রামান্য নয়। উপরন্তু ওই হাদিসের এক বর্ণনাকারী সুলায়মান বিন দাউদ, বর্ণনাকারী হিসেবে সকলের নিকট পরিত্যক্ত। আবু দাউদ বলেছেন, কেউ হয়তো ভুলবশতঃ সুলায়মান বিন দাউদের উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তার নাম হবে সুলায়মান বিন আরকাম। ইমাম হাকেম, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। ইমাম আহমদও এই মত ব্যক্ত করেছেন। আবার আবু জারয়া, আবু হাতেম এবং একদল হাদিসের হাফেজ সুলায়মান বিন দাউদ সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করেছেন। ইমামগণের একটি বিরাট দল এই হাদিসটির ব্যাপক বিদিতির দিকে লক্ষ্য করে শুদ্ধ হাদিস হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যদিও তাঁরা হাদিসটির সনদের ব্যাপারে বিশুদ্ধতার মত ব্যক্ত করেননি। ইমাম শাফেয়ী তাঁর পুস্তিকায় বলেছেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত পত্রটি রসুল পাক স. এর বলে প্রমাণিত না হবে, ততোক্ষণ এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, পত্রটি ঐতিহাসিকগণের নিকট সুপরিচিত এবং বিদ্বানদের নিকট দিবালোকের মতো সত্য ও সমাদৃত।

অন্যের ক্রীতদাসকে হত্যা করলে হত্যাকারীর উপর কিসাস কার্যকর হবে কি না— সে বিষয়ে ইমামগণ একমত হতে পারেননি। মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের মত হচ্ছে, হত্যা করা যাবে না। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যাবে। ইমামত্রয়ের দলিল হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত ওই হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে- রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, ক্রীতদাসের বিনিময়ে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। দারা কুতনী, বায়হাকী। হানাফীদের পক্ষ থেকে হাদিসটির উপর এমতো মন্তব্য করা হয় যে, এর সূত্রসংযুক্ত জোবায়ের এবং উসমান বিন বাজা বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল ও পরিত্যক্ত। ইবনে জাওজী এবং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীও এ রকম বলেছেন। এ প্রসঙ্গে হজরত আলী থেকেও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ওই হাদিসের একজন বর্ণনাকারী জাবির জু'ফীকে হাদিস বর্ণনাকারীগণ মিথ্যাবাদী বলেছেন।

হত্যাকারী যে বস্তু দ্বারা হত্যাকান্ড সমাধা করেছে সেই বস্তু দ্বারা কিসাস বিধান কার্যকারী করা হবে, না তলোয়ার দ্বারা? ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ বলেছেন তলোয়ার দ্বারা। দলিল পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদের দ্বিতীয় অভিমতে— ওই বস্তু দ্বারা কিসাসের বিধান কার্যকারী হবে; যদ্দারা হন্তারক আঘাত এনেছে। কারণ, কোরআনে উল্লেখ হয়েছে কিসাস শব্দ।

www.eelm.weebly.com

যার অর্থ সমতুল্য। বোখারী ও মুসলিমের হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে— এক ইহুদী কোনো এক রমণীর মস্তক গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো প্রস্তর দ্বারা। রসুল স. ও প্রস্তর দ্বারা তার মস্তক গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, হত্যাকারীর ব্যবহৃত অস্ত্র দ্বারাই কিসাস বিধান তার উপর কার্যকর করতে হবে। তিরমিজির হাদিসে আরও বলা হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন, কেউ যদি কাউকে পানিতে ডুবিয়ে মারে তবে তাকেও ডুবিয়ে মারতে হবে। আর আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করার অপরাধের ক্ষেত্রে আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করাই হবে কিসাস। হাদিসটি ইমাম বায়হাকী মায়'রিফা বিন আমর বিন নওফেল বিন এজিদ বিন বারা থেকে আমর তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন।

কাফেরের বিনিময়ে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে কি না সে সম্পর্কেও ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ী এবং আহমদ বলেছেন, হত্যা করা যাবে না। কেনোনা আবু জুহাইফা বর্ণনা করেছেন, তিনি হজরত আলীকে প্রশ্ন করলেন, আপনার নিকট কোরআন পাক ব্যতীত আরো কিছু আছে কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্পাকের শপথ! আর কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, একটি জ্ঞান এমন রয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ্র কালাম হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আরেকটি বিষয়ও পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমি বললাম, কী? তিনি বললেন, রক্তপণ ও বন্দীর মুক্তিপণ। আর সেখানে এই বিধানটিও লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, কাফেরের বিনিময়ে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না। বোখারী, আহমদ। আহমদের বর্ণনায় একথাটিও রয়েছে- আশ্রিতকে আশ্রয়কালীন অবস্থায় হত্যা করা যাবে না। বর্ণিত ইমামদ্বয় প্রমাণ হিসেবে হজরত আমর বিন শোয়াইব থেকে তাঁর পিতা ও দাদার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন— রসুল পাক স. এই মর্মে সিদ্ধান্ত দান করেছেন যে, মুসলমানকে কাফেরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না। ইমাম আহমদ এবং নাসাঈ ব্যতীত অন্যান্য সুনান রচয়িতাগণও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে এবং ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে। হজরত আতা, তাউস, হামাস এবং মুজাহিদ থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে শাফেয়ী বর্ণনা করেছেন— রসুলপাক স. মক্কাবিজয়ের দিন বলেছেন, অবিশ্বাসীর পরিবর্তে বিশ্বাসীকে হত্যা করা যাবে না। এই হাদিসটি ইমরান থেকে বর্ণনা করেছেন বায়হাকী। জননী আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুলপাক স. বলেছেন, তিনটি অপরাধে অপরাধী না হওয়া পর্যন্ত কোনো মুসলমানকে কিছুতেই হত্যা করা যাবে না। ১. বিবাহিত ব্যভিচারী। ২. পরিকল্পিতভাবে মুসলমানকে হত্যাকারী। ৩. ইসলাম পরিত্যাগকারী। রসুল পাক স. এর বিরুদ্ধাচরণ করলে কার্যকর করতে হবে হত্যা, শূলদন্ড অথবা দেশান্তর। আবু দাউদ, নাসাঈ। আবদুর রাজ্জাক মুয়াম্মার থেকে, তিনি জুহুরী থেকে, তিনি সালিম থেকে, সালিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন— একবার এক মুসলমান

www.eelm.weebly.com

এক জিম্মিকে (নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কাফেরকে) হত্যা করলো। বিষয়টি হজরত ওসমানের সামনে পেশ করা হলো। তিনি ওই মুসলমানকে হত্যা করেননি। বরং রক্তপণের বিধান প্রয়োগ করেছিলেন। অবশ্য ওই রক্তপণের বিধান ছিলো অত্যন্ত কঠোর। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, ইবনে হাজমের মতে হাদিসটি শুদ্ধ। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— এমতাবস্থায় কিসাস প্রয়োগযোগ্য। তৎপর বর্ণিত হয়েছে, তবে এক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর না করে রক্তপণের বিধানকে গ্রহণ করো। বর্ণিত হাদিসগুলো সম্পর্কে এরকম বলা যায়, হাদিসগুলোয় বিবৃত কাফের বলতে শত্রুদেশের কাফের বুঝতে হবে। তারা জিম্মি নয়। রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, নিরাপত্তাপ্রাপ্তদেরকে হত্যা করা যাবে না। এ সমস্ত বিবরণের মাধ্যমে বুঝা যায়, নিরাপত্তার অধিকার বহাল থাকাবস্থায় কাফেরের বিনিময়ে জিম্মিকে হত্যা করা যাবে না। আবার এখানে একথাটিও স্পষ্ট যে, কাফেরের বিনিময়ে জিম্মিকে হত্যা করা যাবে না। এভাবে সহজেই প্রতীয়মান হয়, হাদিসে উল্লেখিত কাফের অর্থ শত্রুদেশের কাফের। হজরত ওমর এবং হজরত ওসমানের মন্তব্য সম্পর্কে বলা যায়, তাঁদের মন্তব্য ছিলো ইজতেহাদ (গবেষণা) লব্ধ। তাই হজরত ওমরের মন্তব্যে দ্ব্যর্থবোধকতা লক্ষণীয় আর হজরত আয়েশার হাদিসে 'ইসলাম' শব্দটি সম্ভবত অসাবধানতাবশতঃ সংযুক্ত হয়েছে।

জিম্মির বিনিময়ে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে— এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে হেদায়া প্রণেতা একটি হাদিস সংগ্রহ করেছেন, যেখানে রসুল পাক স. এর বাচনিক বর্ণনায় এসেছে, মুসলমানকে জিম্মির বিনিময়ে হত্যা করা যাবে। আমি বলি, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুলপাক স. বলেছেন, জিম্মির হত্যাকারী হিসেবে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে। আরো বলেছেন, আমি জিম্মাদারী পূর্ণকারী, আমি অত্যন্ত দয়ালু। দারা কুতনী বলেছেন, এই হাদিসটি ইব্রাহিম ইবনে ইয়াহ্ইয়া ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি। আর হাদিসশাস্ত্রবিদগণের নিকট ইব্রাহিম ইবনে ইয়াহ্ইয়া পরিত্যক্ত। ইবনে জাওজী বলেছেন, ইব্রাহিম ইবনে ইয়াহ্ইয়া মিথ্যুক। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, বর্ণনাটির সনদ ইবনে সুলায়মান পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়েছে। কাজেই হাদিসটি মুরসাল। হাদিসটি যদি মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হতো, তবুও তা দুর্বলতামুক্ত হতে পারতো না।

আমি বলি, সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে, 'ইন্নানাফসা বিন্নাফসি'— এই আয়াত দৃষ্টে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হজরত ওসমান এবং হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসগুলোকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করাই যথেষ্ট। অন্য হাদিসগুলো পরিত্যাগ করাই সঙ্গত।

এখানে আরেকটি বিষয় সমস্যা হিসেবে থেকে যায়। সমস্যাটি হচ্ছে, পুত্রের বিনিময়ে পিতাকে হত্যা করা যাবে কি না? এ বিষয়টিও মতানৈক্যমন্ডিত। ইমাম মালেক বলেছেন, পিতা যদি পুত্রকে শায়িত অবস্থায় জবাই করে তবে পিতাকে

www.eelm.weebly.com

হত্যা করা যাবে। ইমাম আবু হানিফা, দাউদ জাহেরী, শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, কোনো অবস্থাতেই পিতাকে হত্যা করা যাবে না। হানাফীদের দলিল হজরত ওমর বিন খাত্তাব বর্ণিত হাদিসটি। তিনি বলেছেন, আমি রসুল পাক স. থেকে শুনেছি, পুত্র হন্তারক পিতার উপর কিসাস কার্যকর করা যাবে না। তিরমিজি। হাদিসটির এক বর্ণনাকারীর নাম হাজ্জাজ বিন আরতাত। ইমাম আহমদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন অন্য সূত্রে— যে সূত্রটি অধিকতর বিশুদ্ধ। বায়হাকীও এর বিশুদ্ধতার সমর্থক। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত সুরাকা থেকে। কিন্তু তাঁর সনদ দুর্বলতাদুষ্ট। উপরন্তু বর্ণনাকারী আমর বিন শুয়াইবের নিকটে এসে সূত্রটি জটিলতাক্রান্ত হয়েছে। ফলে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন আমর থেকে। আবার কেউ করেছেন, সুরাকা থেকে। মাধ্যম ব্যতিরেকে আমর বিন শুয়াইব থেকে বর্ণনা করেছেন আহমদ। কিন্তু তাঁর উর্ধ্ব সূত্রভূত ইবনে লেহিয়া দুর্বল বর্ণনাকারী। এই হাদিসটি আবার তিরমিজি ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে। কিন্তু এই সূত্রসংযুক্ত ইসমাইল বিন মুসলিমও দুর্বল। অথচ বায়হাকী বলেছেন, হাসান বিন আবদুল্লাহ্ আমবরী তার অনুসরণ করেছেন আমর বিন দিনারের সূত্রে। শায়েখ আবদুল হক বলেছেন, এ সকল বর্ণনা ক্রটিমুক্ত নয়। শাফেয়ী বলেছেন, আমি অনেক বিজ্ঞজন থেকে এই সিদ্ধান্তটি সংরক্ষণ করেছি যে, পুত্রহন্তারক পিতাকে হত্যা করা যাবে না। এটাই আমার মত।

কয়েকজন মিলে একজনকে হত্যা করলে তার বিধান কী? এই প্রশ্নটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। বলা যেতে পারে সকলে যদি একযোগে আঘাত করে, তবে সকলের উপর কিসাস কার্যকর করতে হবে। কিন্তু ছিনতাইকারীর বিধান স্বতন্ত্র। কেনোনা ছিনতাইকারীকে হত্যা করতে একে অপরাপেক্ষা অগ্রগামী হয়। সকলেরই উদ্দেশ্য থাকে হত্যাকান্ড ঘটানো। মসনদ এবং চলপিতে উল্লেখিত হয়েছে—হত্যাকারীদের সকলের উপর কিসাস প্রয়োগ করতে হবে। তবে দলভূতদের কেউ কেউ যদি আঘাত করা থেকে বিরত থাকে তবে তাদের উপর কিসাস প্রযোজ্য হবে না, যদিও তারা হত্যাকারীদের সহচর ও সাহায্যকারী হয়। কিসাসের বিধান কেবল আঘাতকারীদের উপর।

ছিনতাইকারীর সকল হন্তারকের উপর কিসাস ওয়াজিব। সকলকে হত্যা করতে হবে। আবু দাউদ বলেছেন, ইমাম আহমদের একটি বর্ণনায় দেখা যায়—তাদেরকে কতল করা যাবে না। বরং রক্তপণ গ্রহণ করতে হবে। হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব থেকে বর্ণিত হয়েছে—সাময়াতে একজনকে হত্যা করা হয়েছিলো। হজরত ওমর তার বিনিময়ে সাতজনকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এই হত্যাকান্ডে যদি সাময়াবাসীরা সকলে জড়িত থাকতো, তবে আমি সবাইকে হত্যার নির্দেশ দিতাম। মালেক, শাফেয়ী এবং ভিন্ন সনদে বোখারী।

www.eelm.weebly.com

এক ব্যক্তি যদি একটি দলের সকলকে হত্যা করে— এ ব্যাপারেও ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা এবং মালেক বলেছেন, তার উপর কেবল কিসাস প্রযোজ্য হবে। শাফেয়ী বলেছেন, হন্তারক যদি তাদেরকে একজন একজন করে হত্যা করে, তবে প্রথম জনের জন্য কিসাস এবং পরবর্তীদের জন্য দিয়ত কার্যকর হবে। আর যদি সে একযোগে সকলকে হত্যা করে, তবে নিহতদের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে লটারী করতে হবে। যার নাম প্রথমে উঠবে তার জন্য হবে কিসাস এবং অবশিষ্টদের জন্য দিয়ত। ইমাম আহমদ বলেছেন, উত্তরাধিকারীদের সকলকে আহবান করলে সকলেই যদি কিসাসের দাবীদার হয়, তবে সকলের পক্ষ থেকে কিসাস কার্যকর হবে। রক্তপণ কার্যকর হবে না। আর যদি কিছু সংখ্যক কিসাসের দাবী তোলে এবং কিছু সংখ্যক যদি দাবীদার হয় রক্তপণের, তবে কিসাসের দাবীদারদের জন্য কিসাস এবং রক্তপণের দাবী উত্থাপণকারীদের জন্য রক্তপণ ওয়াজিব হবে। সবাই যদি রক্তপণের দাবীদার হয়, তবে একটি রক্তপণের পরিমাণ অর্থ সকলের মধ্যে বন্টন করা হবে।

এ ব্যাপারে সকল ইমামই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কিসাসের বিধান পরিকল্পিত হত্যাকান্ডের জন্য। ভুলক্রমে হত্যাকারীর জন্য নয়। তবে ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের সংজ্ঞা নির্ণয়ে ইমামগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, অস্ত্র বা ধারালো কাষ্ঠখন্ড কিংবা পাথর বা অগ্নি দ্বারা হত্যাকান্ড ঘটানো হলে, তা ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে গণ্য হবে। ইমাম শা'বী, নাখয়ী ও হাসান বসরী বলেছেন, ইচ্ছাকৃত হত্যা হলো লোহার অস্ত্র দ্বারা হত্যা। লৌহনির্মিত অস্ত্র কিংবা ধারালো কোনো বস্তু ছাড়া জেনেশুনে হত্যা করলেও তা প্রকৃত ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে গণ্য হবে না। এরকম হত্যাকান্ডকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের অনুরূপ হত্যাকান্ড বলে অভিহিত করতে হবে। এমতো ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব হবে না। রক্তপণ ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী, আবু ইউসুফ ও মোহাম্মদ বলেছেন, যদি বিশাল পাথর কিংবা ভারী কাষ্ঠখন্ড দ্বারা আঘাতকালে মৃত্যু অবধারিত এরকম দৃঢ় ধারণা থাকে, তবে এ অবস্থাটিও ইচ্ছাকৃত হত্যা। এক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর হবে। যদি পানিতে কাউকে ডুবিয়ে দেয়া হয় অথবা কয়েকদিন যাবত কারো পানাহার বন্ধ করে দেয়া হয়, আর এ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত যদি কেউ হয়— তবে এ অবস্থাটিও কিসাসের আওতায় এসে যাবে। ইমাম মালেক বলেছেন, যদি লাঠি, ছড়ি অথবা ছোট পাথর দ্বারা আঘাত করা হয়, যাতে করে মৃত্যুর আশংকা থাকে না, তবু যদি আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি মারা যায়— তবে এটিও হবে ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং কিসাসও ওয়াজিব হবে। সাধারণ আলেমগণের মত হচ্ছে, এরকম অবস্থাকে ইচ্ছাকৃত ভুল হত্যা বলা যেতে পারে। তাই এক্ষেত্রে কিসাস নয়, বরং রক্তপণ ওয়াজিব হবে। মোদ্দা কথা, ইমাম আবু হানিফা ছাড়া অন্য সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, ধারবিহীন ভারী বস্তু দ্বারা আঘাত হেনে হত্যাকান্ড ঘটালে কিসাস ওয়াজিব। তাঁরা প্রমাণ হিসেবে হজরত আনাস বিন মালেক থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত ওই

www.eelm.weebly.com

হাদিসটি উপস্থাপন করেন, যেখানে বলা হয়েছে— এক ইহুদী এক রমণীর মস্তক দুই পাথরের মাঝে রেখে পিষে ফেলে হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিলো। ঘটনাটি যখন রসুল পাক স. এর গোচরীভূত হলো, তখন তিনিও হত্যাকারীর মস্তক দুই পাথরের মধ্যে রেখে পিষে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি হজরত ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, আমি সে সময় উপস্থিত ছিলাম— যখন রসুল পাক স. গর্ভস্থিত সন্তান সম্পর্কে বিধান বর্ণনা করছিলেন। ঘটনাটি ছিলো এই- ইবনে মালিক এলেন। তিনি রসুল পাক স. সকাশে আরজ পেশ করলেন, আমাদের ওখানে দুই রমণী মারামারিতে লিপ্ত হয়েছিলো। তখন একজন অপরজনকে তাবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করে। আঘাতপ্রাপ্তা সে আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে। নিহত রমণী ছিলো গর্ভবতী; এ আঘাতে তার গর্ভস্থিত সন্তানও মৃত্যুবরণ করেছে। রসুল পাক স. গর্ভস্থিত সন্তানের বিনিময়ে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার নির্দেশ দিলেন এবং নিহত রমণীর বিনিময়ে প্রয়োগ করলেন কিসাস। আহমদ।

জমহুর ওলামা বলেছেন, ছড়ি বা লাঠির আঘাতে মারা গেলে কিসাস ওয়াজিব হবে না। তাদের প্রমাণ হচ্ছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন— ভুল এবং ভুলের অনুরূপ ইচ্ছাকৃত হত্যা হচ্ছে, ছড়ি বা লাঠির আঘাতে হত্যা। এরকম হত্যার রক্তপণ একশত উট, যেগুলোর মধ্যে চল্লিশটিকে হতে হবে গর্ভবতী। আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা। ইবনে হাব্বান হাদিসটির শুদ্ধতার সমর্থক। হজরত আবু হোরায়রা বলেন, হুজাইল গোত্রের দুই নারী মারামারি করার সময় একে অন্যকে পাথর ছুঁড়ে মারে। আঘাতপ্রাপ্তা রমণীটি তখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার পেটের সন্তানটিও মারা যায়। রসুল পাক স. তখন সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, গর্ভের নিহত সন্তানের জন্য একজন ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে দিতে হবে। আর মৃতার জন্য রক্তপণ দিতে হবে। হজরত মু'গীরা বিন শো'বা থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে—অসতর্ক ও বিচলিত অবস্থায় ছুঁড়ে মারা পাথরের কিংবা ছড়ির বা লাঠির আঘাতে যদি কেউ মারা যায়, তবে হত্যাকারীর উপর ভ্রমবশতঃ হত্যার বিধান প্রযোজ্য হবে। তার রক্তপণও ভুলের রক্তপণ সদৃশ। আর যে ব্যক্তি জেনে শুনে হত্যা করেছে, তার উপর কিসাস ওয়াজিব। আবু দাউদ ও নাসাঈ। ইমাম আবু হানিফার মতে, ভারী ভোঁতা বস্তু দ্বারা হত্যা করলে কিসাস ওয়াজিব হবে না। প্রমাণ এই— হজরত আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, লোহা নয় এমন বস্তুর আঘাতে নিহত হলে কিসাস প্রযোজ্য নয়। দারা কুতনী। কিন্তু এই হাদিসের সূত্রসংযুক্ত মুয়াল্লা বিন জালাল সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন বলেছেন, সে নিজে হাদিস প্রস্তুতকারী। জমহুর আলেমগণ বলেছেন, যদি ধরে নেয়া যায় যে, হাদিসটি শুদ্ধ নয়, তবু ওই হাদিসটি তো

www.eelm.weebly.com

নির্ভরযোগ্য যেখানে বলা হয়েছে—তলোয়ার ব্যতীত অন্য বস্তু দ্বারা মৃত্যু ঘটানো হলে কিসাস ওয়াজিব নয়। এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ। কিন্তু এর সূত্রসংশ্লিষ্ট আবু মুয়াজ সুলায়মান বিন আরকাম পরিত্যক্ত বলে চিহ্নিত। অন্য সূত্রে হজরত আবু বকরা ও হজরত নোমান বিন বশীর থেকেও বর্ণিত হয়েছে এই হাদিসটি। কিন্তু এই সূত্রের বর্ণনাকারী মুবারক বিন ফুজালা ইমাম আহমদের নিকট অনির্ভরযোগ্য। আবার হজরত নোমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, তলোয়ার ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু দ্বারা হত্যা ভ্রমাত্মক হত্যা। এমতো ক্ষেত্রে রক্তপণ ওয়াজিব। অন্য বর্ণনায় এসেছে- লোহা ব্যতীত অন্য বস্তু দ্বারা হত্যা বিভ্রমজনিত হত্যা। কিন্তু এই বর্ণনাসূত্রভূত জাবির জু'ফী মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত।

কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমাপ্রদর্শন করা হলে প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা কর্তব্য। এখানে ক্ষমা করা বুঝাতে 'উফিয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'উফিয়া' বা 'আফউন' শব্দটির অর্থ ক্ষমা করা বা শাস্তিযোগ্য কাউকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া। কামুস অভিধান প্রণেতা এরকম বলেছেন। তার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হলো— একথা বুঝাতে আরবীভাষীগণ বলে থাকেন 'উফিয়ালাহু জামবুহু' অথবা 'আফালাহু জামবাহু'। কামুস অভিধান রচয়িতার অভিমত এই যে, জাম্বুন (পাপ) শব্দটি উল্লেখ না থাকলেও পাপের ক্ষমা বুঝাতে আফউন উল্লেখই যথেষ্ট। এখানে তার ভাই বলতে বুঝানো হয়েছে— নিহত ব্যক্তির ভাই, অভিভাবক, উত্তরাধিকারী। এর পরে উল্লেখিত 'শাইয়ুন' শব্দটির অর্থ হবে অপরাধ। 'মিন আখিহি শাইয়ুন' অর্থ হত্যাকারীকে কিছুটা ক্ষমাপ্রদর্শন (রক্তের দাবীর আংশিক ক্ষমা)। অর্থাৎ এভাবে ক্ষমা করলে হত্যাকারীর কিছুটা অপরাধ মাফ হবে— পুরোটা নয়। তাই সে কিসাস থেকে অব্যাহতি পাবে। কিন্তু তাকে দিয়ত বা রক্তপণ পরিশোধ করতেই হবে। আয়াতের আরেকটি ব্যাখ্যা এরকম হতে পারে যে, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা ক্ষমা করে দিলে হত্যাকারীর পুরো অপরাধ ক্ষমা হয়ে যায়। কিন্তু রক্তপণ পরিশোধ ওয়াজিব হয়। এরকম ব্যাখ্যাই ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীদের দলিল।

আজহারী বলেছেন, 'আফু' শব্দটি মূলতঃ উত্তরসূরী বা অবশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন- 'হে নবী! তারা আপনার নিকট জানতে চায়, কোন বস্তু ব্যয় করা হবে। আপনি বলে দিন, 'আফু' (যা অবশিষ্ট থাকে)। (ইয়াস আলু নাকা মাজা ইউনফিকুন কুলিল আফু)। এখানে আফু শব্দটি অবশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাউকে অবশিষ্ট কোনো কিছু দান করলে আরববাসীরা বলে থাকে আফাউতু ফুলানা বি মালী। এই বিশ্লেষণসূত্রে আয়াতে উল্লেখিত ভাই-এর অর্থ হবে, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশকে তার মুসলমান ভাই (হত্যাকারী) তার সম্পদ থেকে

www.eelm.weebly.com

মীমাংসা স্বরূপ কিছু দেয়া। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, হত্যাকারী, নিহত ব্যক্তি ও নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) সকলকেই আল্লাহ্পাক 'ভাই' উল্লেখের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। জাহেলিয়াত (মূর্খতা) এবং ইসলামের মধ্যে এভাবেই পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। ভাই শব্দটি উল্লেখের মাধ্যমে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, হত্যাকারীর প্রতি ক্ষমার্হ দৃষ্টি নিবদ্ধ করো। কারণ, সে তোমার ভাই। এখানে একথাটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, হত্যাকান্ড গুরুতর পাপ এবং হত্যাকারী পাপী হলেও মুসলমানই থাকে, কাফের হয়ে যায় না। যদি কাফের হতো তবে 'ভাই' শব্দটির উল্লেখ থাকতো না। তাছাড়া আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে 'হে ইমানদারগণ'— এই সম্বোধনটিও প্রমাণ করে যে, লঘু বা গুরু যে পাপই সংঘটিত হোক না কেনো— পাপ সংঘটনকারী ইমানদার নামেই অভিহিত হন।

'প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করার বিধান তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভার লাঘবের নিমিত্তে করা হয়েছে। আর এটা আল্লাহ্পাকের নিছক অনুগ্রহ'— একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, নিহত ব্যক্তির উত্তরসূরীগণের এই সহজ বিধানকে মেনে নেয়া উচিত। প্রতিশোধস্পৃহার উপরে অনড় থাকা শোভনীয় নয়। শিষ্টাচার, সম্প্রীতি ও সৌজন্যমনস্কতাকে মান্য করা বাঞ্ছনীয়। এখানে একথাটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, হত্যাকারীকে অবকাশ দেয়া না দেয়া নিহত ব্যক্তির উত্তরসূরীদের অধিকারভূত। হত্যাকারী যেনো একথাটি উত্তমরূপে অবগত হয় এবং টালবাহানা না করে দেয় রক্তপণ পরিশোধে ব্রতী হয়। রক্তপণের পরিমাণ নিয়ে দরকষাকষি যেনো না করে এবং সময়মতো তা পরিশোধ করে। সে যেনো স্মরণ করে, ভার লাঘবের এই অবকাশ আল্লাহ্পাকের নিছক অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছু নয়।

ইবনে জারীর বলেছেন, হজরত কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে— আল্লাহ্পাকের মহান মেহেরবানী এই যে, উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য রক্তপণ হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ হালাল। পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য এরকম সহজ বিধান ছিলো না। ইহুদীদের প্রতি বিধান ছিলো, কিসাস অথবা নিঃশর্ত ক্ষমা। রক্তপণের কোনো কথা ছিলোই না। আর খৃষ্টানদের প্রতি বিধান ছিলো, কেবলই ক্ষমা। কিসাসের কোনো উল্লেখ ছিলো না। আর শেষ নবীর উম্মতের জন্য কতোই না সুন্দর ও সহজ বিধান। কিসাস, ক্ষমা অথবা রক্তপণ।

'এরপরও যে সীমালংঘন করে তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' —একথার অর্থ, ক্ষমা করে দেয়া অথবা রক্তপণ গ্রহণের পরও যদি কেউ হত্যাকারীকে হত্যা করে ফেলে, তবে আখেরাতে তার উপর আপতিত হবে কঠোর শাস্তি। তার জাহান্নামবাস হবে সার্বক্ষণিক। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, এরকম সীমালংঘনকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব। সে ক্ষমার অযোগ্য। যেহেতু হাদিস

www.eelm.weebly.com

শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, হজরত সামুরা বলেছেন—রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রক্তপণ গ্রহণ করার পর রক্তপণ প্রদানকারীকে হত্যা করে তাকে কিছুতেই ক্ষমা করা যাবে না।

'আর কিসাসের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জীবন। ওহে বিবেচকগণ'—একথার অর্থ কিসাসের মধ্যেই রয়েছে মহাজীবনের মহাসাফল্য। একথার মর্ম উপলব্ধি করতে পারলে কিসাসের ভয়াবহ রূপ অন্তরাত্মায় আমূল চিহ্নিত থাকবে। এতে করে কেউ আর হত্যাকান্ডে উৎসাহ বোধ করবে না। অন্যকে হত্যা করলে নিজেকেও নিহত হতে হবে— এ বিশ্বাসের কারণে সম্ভাব্য নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারী উভয়ের জীবন রক্ষা পাবে। ইসলামপূর্ব যুগের অধিবাসীরা একজন নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ নিতে গিয়ে অনেক লোককে হত্যা করতো। এতে করে প্রজ্বলিত হতো অন্তহীন জিঘাংসার অনল। কিসাসের দন্ডাদেশ প্রবর্তিত করে সে অনলকে নির্বাপিত করা হয়েছে। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যানুসারে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, কিসাস বিধিবদ্ধ হওয়াতে তোমাদের জীবন রক্ষা পেয়েছে। আর শেষোক্ত ব্যাখ্যানুসারে অর্থ হবে, কিসাসের বিধি প্রবর্তন করাতে হত্যাকারী ব্যতীত অন্যদেরও প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। এরকমও অর্থ করা যেতে পারে যে, কিসাসের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের পারলৌকিক জীবনের স্বচ্ছতা। যে হত্যাকারীর উপর কিসাস কার্যকর হবে, সে হয়ে যাবে অপরাধমুক্ত। আখেরাতে তার এই অপরাধের বিচার আর হবে না। বরং সে লাভ করবে পবিত্র চিরস্থায়ী জীবন।

'হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ'— এই সম্বোধনটির মাধ্যমে একথাটি বুঝানো হয়েছে যে, যারা বিবেচক এবং জ্ঞানী তাঁরাই কেবল শরিয়তের বিধানের রহস্য ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে সক্ষম। যেহেতু তাঁরা জ্ঞানী তাই কেবল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে সর্বসাধারণকে আয়াত শেষে এই মর্মে সদুপদেশ দেয়া হয়েছে, 'যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো।'

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮০, ১৮১, ১৮২

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ فَمَنْ بَدَّلَهُ
بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

www.eelm.weebly.com

❐ তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যায় তবে প্রচলিত প্রথামত তাহার পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের জন্য অসিয়ৎ করার বিধান তোমাদিগকে দেওয়া হইল। ইহা সাবধানীদের জন্য একটি কর্তব্য।

❐ উহা শ্রবণ করিবার পর যদি কেহ উহার পরিবর্তন সাধন করে তবে যাহারা পরিবর্তন করিবে অপরাধ তাহাদেরই। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❐ তবে যদি কেহ অসিয়ৎকারীর পক্ষপাতিত্ব কিংবা অন্যায়ের আশংকা করে, অতঃপর সে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয়, তবে তাহার কোন অপরাধ নাই। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ,পরম দয়ালু।

মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী— এরকম নিশ্চিত হলে অসিয়ত করার নিয়ম। বিপুল বিত্তাধিকারীরা কেবল অসিয়ত করার যোগ্য। আয়াতে উল্লেখিত 'খইর' শব্দটির অর্থ, অধিক সম্পদ। কতিপয় ভাষ্যকার এরকম বলেছেন। হজরত আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে— তাঁর এক মুক্ত ক্রীতদাস অসিয়ত করতে মনস্থ করলেন। তাঁর অধিকারে ছিলো মাত্র নয়শত দিরহাম। হজরত আলী তাঁকে অসিয়ত করতে নিষেধ করে বললেন, অসিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'ইনতারাকা খইর।' 'খইর' অর্থ অধিক সম্পদ। অতএব তুমি অসিয়ত কোরো না। ইবনে আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। জননী আয়েশা বলেছেন, এক লোক অসিয়তের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলো। আমি তাঁকে বললাম, তোমার সম্পদের পরিমাণ কতো? সে বললো, তিন হাজার দিরহাম। আমি বললাম, পোষ্য কতজন? সে বললো, চারজন। আমি তখন তাকে বললাম, যারা অধিক সম্পদের অধিকারী তারাই অসিয়ত করার যোগ্য। আল্লাহ্পাকের বিধান এরকমই। সুতরাং তুমি তোমার সম্পদ পরিবার পরিজনের জন্য রেখে যাও। ইসলামের প্রাথমিক যুগে অসিয়ত সম্পর্কিত এই আয়াতের বিধান ফরজ ছিলো। পরে এই বিধান রহিত হয়ে যায়। আলেমগণ বলেছেন, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হয়, তখন এই আয়াতটি রহিত হয়ে যায়। তাছাড়া রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাক সকল দাবীদারের দাবী মিটিয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমরা সাবধান হয়ে যাও। অংশীদারদের জন্য কোনো অসিয়ত নেই।

আমি বলি, বিষয়টি চিন্তাভাবনা সাপেক্ষ। আসলে উত্তরাধিকার ও অসিয়তের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বরং অসিয়ত উত্তরাধিকারের বিধানকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলেছে। তবে একথা ঠিক যে, অসিয়তের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে আগে এবং মিরাসের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে পরে। এই দুই বিধানের মধ্যে যেহেতু বিরোধ নেই, সেহেতু রহিত করা বা হওয়ারও অবকাশ এখানে নেই। আর এ সম্পর্কিত হাদিস সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে যে, হাদিসগুলো খবরে ওয়াহিদ (একক বর্ণিত)। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কোরআনের আয়াত রহিত হয় না।

www.eelm.weebly.com

সমাধানঃ আলোচ্য আয়াতটি রহিত হয়েছে এজমার দ্বারা। এজমা বা ঐকমত্যের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে, অংশীদারদের সম্মতি ব্যতীত অসিয়ত সিদ্ধ নয়। উপরন্তু ইমাম চতুষ্টয় ও বিদ্বানগণ এ বিষয়ে ঐকমত্যে এসেছেন যে, যারা অংশীদার নয় তাদের জন্য অসিয়ত ওয়াজিব নয়। আবার ইমাম জুহুরী, আবু বকর হাম্বলী এবং আসহাবে জাওয়াহির মন্তব্য করেছেন, আত্মীয়দের মধ্যে যারা ওয়ারিশ নয়, তাদের জন্য অসিয়ত ওয়াজিব। এই উক্তিটি জমহুরের মতের বিপরীত। এ বিষয়ে এজমা যখন হয়েছে, তখন এটা মানতেই হবে, নিশ্চয়ই পূর্বসূরীদের নিকট কোনো অকাট্য দলিল ছিলো। তাই তাঁরা কোরআনের বিবরণকে পরিত্যাগ করেছেন, যদিও সে দলিল প্রামাণ্যসূত্রে আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেনি। পরিশেষে ওই ঐকমত্যের সমর্থনে এখানে কিছুসংখ্যক হাদিস উপস্থাপন করা হলো।

হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল পাক স. বিদায় হজের ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন, আল্লাহ্‌পাক নিশ্চিতরূপে প্রত্যেক দাবীদারের দাবী পূরণ করে দিয়েছেন। তাই এখন থেকে অংশীদারদের কোনো অসিয়ত নেই। আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা ও নাসাঈ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা। আমর বিন খারেজা থেকে, ইবনে মাজা, তিনি সাঈদ বিন আবু সাঈদ থেকে, তিনি হজরত আনাস থেকে এবং বায়হাকী ইমাম শাফেয়ী পদ্ধতিতে ইবনে উয়াইনা থেকে, তিনি সুলায়মান আহওয়াল থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন— অংশীদারদের জন্য অসিয়ত নেই। হজরত জাবের থেকে দারা কুতনীও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি মুরসাল। হজরত আলী থেকেও দারাকুতনী দুর্বল সনদ সহযোগে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন উত্তম সনদে। আমর বিন শোয়াইব থেকে তাঁর পিতা ও দাদার মাধ্যমে দারা কুতনী আরো বর্ণনা করেছেন— রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, অংশীদারদের সম্মতি ব্যতীত অংশীদারদের জন্য অসিয়ত করা বিধেয় নয়। অবিকল এই শব্দ সমূহের মাধ্যমে হজরত আতা খোরাসানী থেকে আবু দাউদও মুরসাল রূপে এ বিবরণটি উল্লেখ করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে মুত্তাসিল পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন ইকরামা, আতা, ইউনুস বিন রাশেদ। বর্ণিত হাদিস সমূহ দৃষ্টে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অসিয়তের এই আয়াতটি রহিত হয়েছে। কিন্তু যে সকল নিকটাত্মীয় অংশীদার নয়, তাদের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। তবে অসিয়ত ওয়াজিব না হওয়া সম্পর্কে ইবনে জাওজী একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যার বিষয়বস্তু এরকম— হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. বলেছেন, যে ব্যক্তির উপর দুই অথবা তিনরাত অতিবাহিত হলো; তার নিকট কিছু সম্পদ সঞ্চিত হলো। সে যদি এমতাবস্থায় অসিয়ত করে তবে তার

www.eelm.weebly.com

অসিয়ত লিপিবদ্ধ হবে (সে অসিয়তের পুণ্য অর্জন করবে)। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়— অসিয়ত ওয়াজিব নয়। কারণ, এখানে 'সে যদি অসিয়ত করতে ইচ্ছা করে' এরকম কথা বলা হয়েছে। এরকম ইচ্ছানির্ভর কর্মকে ওয়াজিব বলা যায় না। তবে অংশীদার নয় এমন নিকটাত্মীয়দের জন্য অসিয়ত বৈধ, এটা ঐকমত্য। এরকম অসিয়ত উত্তম এবং পুণ্যার্জনের সহায়ক। কেনোনা এধরনের অসিয়তের মাধ্যমে দান বা অনুদান কার্যকর হয় এবং আত্মীয়তার হকও আদায় হয়ে যায়।

এটাও ঐকমত্য যে, অংশীদারদের সম্মতি ছাড়া এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদ অসিয়ত করা যাবে না। ইমাম শাফেয়ীর একটি অভিমত হচ্ছে, অংশীদারেরা সম্মত হলেও এক তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত সিদ্ধ নয়। এসম্পর্কে হাদিসে এসেছে, হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, আমি গুরুতর অসুস্থ ছিলাম। রসুল পাক স. আমাকে দেখতে এলেন। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তো দেখছেন, আমি মৃত্যুপথযাত্রী। এমতাবস্থায় আমি আমার সকল সম্পদ অসিয়ত করে মরতে চাই। তিনি স. বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেকের জন্য অসিয়ত করে মরতে চাই। তিনি স. এবারও বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি এক তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, হ্যাঁ; এক তৃতীয়াংশ। এক তৃতীয়াংশই অনেক। সন্তান-সন্ততিকে সম্বলহীন করে যাওয়ার চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রেখে যাওয়া উত্তম। বোখারী, মুসলিম। দারা কুতনী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন— রসুলপাক স. বলেছেন, হে মানব সন্তান! আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে মৃত্যুর প্রাক্কালে এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা পুণ্যার্জনের সুযোগ দান করেছেন, যেনো তা জাকাত হিসেবে গণ্য হয়। এই হাদিসের বর্ণনাকারী ইসমাইল বিন আয়াশ এবং তার ওস্তাদ— দু'জনই দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে চিহ্নিত। আহমদ, আবু দাউদ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মাজা ও বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের বর্ণনাসূত্রও দুর্বল। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন হজরত আবুবকর সিদ্দিক থেকে হাফস বিন আমরের পদ্ধতিতে উকাইলী। কিন্তু হাফস বিন আমর পরিত্যক্ত বলে পরিগণিত।

'ইহা সাবধানীদের জন্য একটি কর্তব্য'— একথার অর্থ, ন্যায়নিষ্ঠতার সঙ্গে অসিয়ত করা অত্যাবশ্যক। আত্মীয়ের একজনকে অন্যজনাপেক্ষা প্রাধান্য দেয়া অনুচিত। এরকমও যেনো না হয় যে, সম্পদশালীরা অসিয়তের লক্ষ্য হয়, আর সম্পদহীনেরা থেকে যায় বঞ্চিত।

অসিয়তের পরিবর্তন সাধন করা অন্যায়। অংশীদার, সাক্ষ্যদাতা এবং অসিয়তপ্রাপ্তদের কেউই কৃত অসিয়তকে রূপান্তরিত করতে পারবে না। যে এ রকম করবে, সে বিধান রূপান্তরের অপরাধে অপরাধী হবে। তাই বলা হয়েছে, 'উহা (অসিয়ত) শ্রবণ করিবার পর যদি কেহ ইহার পরিবর্তন সাধন করে তবে

www.eelm.weebly.com

যাহারা পরিবর্তন করিবে অপরাধ তাহাদেরই; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' (অতএব তিনি পরিবর্তন সাধনকারীদের সম্পর্কে অনবহিত নন)।

অসিয়তকারীকে পক্ষপাতিত্ব করতে দেখলে কিংবা অন্যায় অসিয়ত করতে দেখলে কেউ যদি মীমাংসাকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়, তবে সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে না। ব্যাপারটা এরকম— কেউ দেখলো মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি ন্যায়বিচার বহির্ভূত অসিয়ত করার উদ্যোগ নিচ্ছে। তখন সে তাকে ন্যায়ানুগতার দিকে পথ প্রদর্শন করবে। যেমন রসুল পাক স. হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসকে এক তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত করতে নিষেধ করেছিলেন। স্বল্প সম্পদের অধিকারীকে একারণে হজরত আলী এবং হজরত আয়েশা অসিয়ত থেকে বিরত রেখেছিলেন। হজরত হাসান বিন বশীর বলেছেন, আমার পিতা আমাকে রসুলপাক স. এর সকাশে হাজির করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্ রসুল! আমি আমার এই সন্তানকে কিছু দিয়েছি। তিনি স. জানতে চাইলেন, তুমি তোমার এই পুত্রকে যা দিয়েছো, অন্য পুত্রদেরকেও কি সে রকম দিয়েছো? পিতা বললেন, না। তাদেরকে কিছু দেয়া হয়নি। তিনি বললেন, তবে একে যা দিয়েছো তা ফিরিয়ে নাও। অন্য বর্ণনায় এসেছে- রসুল স. শেষে বলেছিলেন, আমি অন্যায়ের সাক্ষী হতে পারি না। বোখারী, মুসলিম। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আয়াতটির (১৮২) মর্ম হচ্ছে, অসিয়তকারী অন্যায় অসিয়ত করলে অভিভাবক অথবা মুসলমান বিচারক অসিয়ত বাতিল করে দিয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন।

আমি বলি, আয়াতের ব্যাখ্যা এরকম হওয়া উচিত, যাতে দু'রকম অর্থই অন্তর্ভূত থাকে। 'তবে তার কোনো অপরাধ নেই'— একথার অর্থ, অন্যায় অসিয়ত রহিতকারী গোনাহ্গার হবে না। বরং গোনাহ্ হবে তার যে অন্যায় অসিয়ত করবে। আর মীমাংসাকারী বা সংশোধনকারী হবে পুণ্যের অধিকারী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. এরশাদ করেছেন, দীর্ঘ ষাট বৎসর আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যশীল থাকার পরও যদি কেউ মৃত্যুকালে অন্যায় অসিয়ত করে তবে সে হয়ে যায় জাহান্নামের যোগ্য। আবু দাউদ, তিরমিজি।

অসিয়তের রূপান্তর করা নিষিদ্ধ। কিন্তু অন্যায় অসিয়তের সংশোধন নিষিদ্ধ নয় বরং কল্যাণকর। তাই সংশোধনকারীকে এই বলে অভয় দেয়া হয়েছে যে, তার কোনো অপরাধ নেই। 'আল্লাহ্ পাক ক্ষমাপরায়ণ পরম দয়ালু'—একথার মাধ্যমে সংশোধনকারীকে ক্ষমালাভের সুসংবাদসহ আয়াতের ইতি টানা হয়েছে।

সুরা বাকারা : আয়াত ১৮৩, ১৮৪

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ

www.eelm.weebly.com

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا

اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ

طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হইল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে তোমরা সাবধান হইয়া চলিতে পার—

❒ নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে বা ভ্রমণে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। ইহা যাহাদিগকে সাতিশয় কষ্ট দেয় ইহার পরিবর্তে একজন অভাবগ্রস্তকে অন্নদান করা তাহাদের কর্তব্য। যদি কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে উহা তাহার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। যদি তোমরা উপলব্ধি করিতে তবে বুঝিতে সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ।

'সওম' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা বা থেমে থাকা। ঠিক দুপুর বেলাকে আরববাসীরা বলে থাকে 'সামান্ নাহার'—এ কথার অর্থ দিবস থেমে আছে। সূর্য যখন মধ্যগগণে অবস্থান করে তখন সূর্যকে অসচল বলেই মনে হয়। শরিয়তের পরিভাষায় সওম এর অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সহকারে পানাহার ও রতিক্রিয়া থেকে বিরত থাকা।

এই আয়াতের মাধ্যমে সিয়ামের (রোজার) বিধান দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, পূর্ববর্তীদের উপরও এই বিধান বলবৎ ছিলো। অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের উপর যেমন রোজা ফরজ ছিলো তেমনই ফরজ করা হলো এখন। পূর্ববর্তীদের রোজার সংখ্যা, নিয়ম বা অবস্থা পুনরায় বলবৎ করা হলো একথা এখানে বলা হয়নি। বলা হয়েছে কেবল ফরজ হুকুমের কথা।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ার পর থেকে পরবর্তী রাত পর্যন্ত রোজা রাখতে হতো। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায়ও এরকম বিধান ছিলো। আলেমগণের একটি দল বলেছেন, আমাদের মতো খৃষ্টানদের প্রতিও রমজানের রোজা ফরজ ছিলো। গ্রীষ্মকালে রমজান মাস পড়লে তারা পিপাসায় কষ্ট পেতো। আবার শীত মৌসুমে পড়লে কষ্ট পেতো ক্ষুধায়। এ কষ্ট থেকে অব্যাহতি পাওয়ার নিমিত্তে তাদের আলেম ও নেতৃস্থানীয়রা স্থির করলো, এখন থেকে বসন্তকালে রোজা রাখা হবে। এই

www.eelm.weebly.com

পরিবর্তনের জন্য তারা রোজার সংখ্যা বাড়িয়ে দিলো আরো দশদিন। এভাবে রোজার মোট সংখ্যা দাঁড়ালো চল্লিশে। একবার তাদের রাজা রোগাক্রান্ত হলো। সে তখন মানত করলো, আরোগ্য লাভ করলে রোজা আরো সাতদিন বাড়িয়ে দেয়া হবে। আরোগ্য লাভের পর সেই রাজা রোজা বৃদ্ধি করলো আরো সাতদিন। পরবর্তী রাজা রোজার সংখ্যা নির্ধারণ করলো পঞ্চাশ দিন। মুজাহিদ বলেছেন, একবার মহামারীতে তাদের অনেক লোক মৃত্যুবরণ করলো। তখন সকলে মিলে পরামর্শ করে আরো দশদিন রোজা বাড়িয়ে দিলো। কিছুদিন পর বাড়ালো আরো দশদিন।

শা'বী বলেছেন, আমি যদি সারাবছর রোজা রাখি তবুও সন্দেহের দিন, অর্থাৎ যেদিন শাবান না রমজান ঠিক করা যায় না, সেদিন রোজা ভঙ্গ করি। কারণ, খৃষ্টানদের প্রতি যখন রোজা ফরজ করে দেয়া হয়েছিলো, তখন তারা রমজানের পূর্বে ও পরে একদিন করে রোজা বাড়িয়ে নিয়েছিলো। এভাবে প্রতি বছর তারা রোজার সংখ্যা বাড়িয়ে দিতো। এরকম করতে করতে তাদের রোজার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো পঞ্চাশে। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। সুদ্দী থেকে ইবনে জারীরও এরকম বলেছেন।

'যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পারো'— এ কথার অর্থ, যেনো তোমরা অবাধ্যতা থেকে রক্ষা পাও। কারণ, রোজা প্রবৃত্তির অবাধ্যতাকে খর্ব করে। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. বলেছেন, হে যুবকেরা! তোমরা যারা সমর্থ তারা বিয়ে করো। বিবাহ দৃষ্টিকে আনত করে এবং গুপ্তাঙ্গকে নিষিদ্ধতা থেকে বিরত রাখে। আর যারা বিয়ে করতে সমর্থ নয়, তারা যেনো রোজা রাখে। বোখারী, মুসলিম। 'সাবধান হয়ে চলতে পারো'— এ কথার অর্থ এরকম হতে পারে যে, তোমরা যাতে রোজার ব্যাপারে শৈথিল্য থেকে বেঁচে থাকতে পারো। শৈথিল্যের ব্যাপারটি ছিলো এরকম— লোকেরা কখনো রোজা রাখতো, কখনো রাখতো না। আর যেহেতু এখন রোজা ফরজ করা হলো যাতে তোমরা শিথিলতা থেকে সাবধান হয়ে চলতে পারো।

'নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য'— এ কথার মাধ্যমে রমজান শরীফের রোজাকে বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে ওই স্বল্প সংখ্যক রোজা কয়টির কথা—যেগুলো রমজান শরীফের রোজার বিধানের পূর্বে পালিত হতো। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'আইয়ামাম মা'দুদাত (নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য)' অর্থ প্রতিমাসের তিনদিন এবং আশুরার রোজা। এই রোজাগুলো ছিলো ওয়াজিব। এরপর রমজানের ফরজ বিধান অবতীর্ণ হলে, ওয়াজিব রোজাগুলো রহিত হয়ে যায়। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, হিজরতের পর পূর্বের কেবলা ও রোজার বিধান রহিত হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন, রমজানের রোজা ফরজ হয়

www.eelm.weebly.com

বদর যুদ্ধের একমাস আগে। আর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, দ্বিতীয় হিজরী রমজানের সতেরো তারিখে।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল পাক স. রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার আগে আশুরার রোজা রাখার জরুরী নির্দেশ দিতেন। এরপর যখন রমজানের রোজা ফরজ হলো, তখন আশুরার রোজা হয়ে গেলো ইচ্ছাধীন। যে ইচ্ছা করতো, রাখতো। যে ইচ্ছা করতো না, ছেড়ে দিতো। বোখারী, মুসলিম। হজরত সালমা বিন আকওয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুলপাক স. একজন ঘোষণাকারীকে এই মর্মে ঘোষণা দিতে বলতেন— আজ আশুরার দিন। যারা পানাহার করেছে, তারা যেনো সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকে। আর যারা পানাহার করেনি, তারাও যেনো আর পানাহার না করে— রোজার নিয়ত করে। কারণ, আজ আশুরা। বোখারী ও মুসলিম। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এই আয়াত রমজানের রোজা সম্পর্কিত। পূর্বের ওয়াজিব রোজা সম্পর্কে নয়। তাই এই আয়াতটি রহিত হয়েছে— একথা বলা যায় না। হজরত ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, আশুরার রোজা আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে ফরজ করা হয়নি। রসুলপাক স.-ই আশুরার রোজাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। এরকমও হতে পারে যে, রসুলপাক স. আশুরার রোজা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে পালন করতেন। তাই অন্যদেরও এই নির্দেশ দিতেন। আর তিনি চাইতেন, রোজা সম্পর্কিত কোনো ফরজ হুকুম অবতীর্ণ হোক। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহানবী স. যখন মদীনা শরীফে এলেন, তখন দেখলেন, ইহুদীরা আশুরার দিন রোজা রাখে। তিনি ইহুদীদের নিকট এর কারণ জানতে চাইলেন। তারা বললো, আশুরা একটি মহান দিবস। এই দিনে আল্লাহ্ পাক বনীইসরাইলদেরকে শত্রুর হাত থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। সেই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে হজরত মুসা এই দিনে রোজা প্রতিপালন করতেন। তাই আমরাও রোজা রাখি। রসুল পাক স. বললেন, যদি তাই হয়, তবে আমি তো তোমাদের চেয়ে মুসার অধিক অনুসরণের দাবীদার। একথার পর থেকে তিনি আশুরার রোজা ছাড়েননি। নিজে রাখতেন এবং অপরকেও রাখতে বলতেন। বোখারী, মুসলিম। জননী আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে, মূর্খতার যুগে কোরাইশরা আশুরার রোজা রাখতো। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব থেকে রসুল পাক স.ও আশুরার রোজা পালন করতেন। মদীনা শরীফে এসেও তিনি আশুরার রোজা ছাড়েননি। নিজে রাখতেন এবং অপরকেও রাখতে বলতেন। এরপর যখন রমজান শরীফের ফরজ বিধান অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি আশুরার রোজা ছেড়ে দিলেন। বোখারী, মুসলিম। জালালুদ্দিন সুয়ুতী বলেছেন, হজরত মুআজ বিন জাবাল থেকে আহমদ, আবু দাউদ এবং হাকেম আশুরা এবং প্রতিমাসের তিনদিনের রোজা ওয়াজিব হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন। ওই রোজাগুলো রমজান শরীফের ফরজ বিধান জারী

www.eelm.weebly.com

হওয়ার পূর্বে ওয়াজিব ছিলো। রমজানের ফরজ বিধানের মাধ্যমে ওই রোজাগুলোর ওয়াজিব হুকুম রহিত হয়ে যায়। উপরোক্ত বিবরণগুলোর মাধ্যমে এখন একথা পরিষ্কার যে, 'আইয়ামাম মা'দুদাত' অর্থ রমজান মাসের রোজা।

কেউ পীড়িত হলে তার উপরে রোজার ফরজ হুকুম আর বলবৎ থাকে না। এই অব্যাহতি ওই অসুস্থ ব্যক্তির জন্য, রোজা রাখলে যার রোগ বৃদ্ধি পায় অথবা আরোগ্য বিলম্বিত হওয়ার আশংকা থাকে। অথবা বর্তমানে সুস্থ কিন্তু রোজা রাখলে যার অসুস্থ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ওই গর্ভবতী অথবা দুগ্ধদাত্রী মাতাও অব্যাহতির আওতায় পড়বে— যে রোজা রাখলে শিশুর প্রাণনাশের আশংকা থাকে।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, রুগ্ন ব্যক্তির জন্য রোজা রাখার অনুমতি রয়েছে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু ইমাম আহমদ বলেছেন, রুগ্ন ব্যক্তি যদি রোজা না রাখে, পানাহার করতে পারবে, তবে রোজাকালীন সময়ে স্ত্রী সহবাস করতে পারবে না। তাঁর মতে রোজা ভঙ্গকারী মুসাফিরের জন্য একই বিধান। যদি তারা ওরকম করে, তবে কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর প্রথমে পানাহার এবং পরে সহবাস করলে কাফ্ফারাও দিতে হবে না। রোগ বৃদ্ধি অথবা উপশম বিলম্বিত হওয়ার আশংকা থাকলে রোজা না রাখার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে। ইবনে সিরীন বলেছেন, রোগ সামান্য হলেও রোজা পরিত্যাগ করতে পারবে। কারণ, আয়াতে রোগের কোনো সীমাচিহ্ন নেই। হাসান এবং ইব্রাহিম বলেছেন, ওই ব্যক্তিকে রুগ্ন বলা যাবে, উপবিষ্ট অবস্থায় নামাজ আদায় করা যার জন্য জায়েয।

ভ্রমণে থাকলে রোজা পরিত্যাগ করা বৈধ। এখানে 'আলা' অব্যয়টি এই ইঙ্গিত বহন করে যে, রোজাদার অবস্থায় কেউ ভ্রমণে বহির্গত হলে, সে রোজা ভঙ্গ করতে পারবে না। এটা ঐকমত্য। দাউদ জাহেরী বলেছেন, দীর্ঘ অথবা নাতিদীর্ঘ সকল অবস্থার মুসাফির ইচ্ছা করলে রোজা ভঙ্গ করতে পারবে।

কতো দূরে গেলে নামাজ কসর করা যাবে বা রোজা ভঙ্গ করা যাবে—— এ সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের মতে, সফরের নিম্নতম দূরত্ব হতে হবে আটচল্লিশ মাইলের সামান্য ঊর্ধ্বে। কেনোনা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল পাক স. বলেছেন, হে মক্কাবাসী। তোমরা চার বুরিদ এর কম দূরত্বে নামাজে কসর কোরো না। চার বুরিদের পরিমাণ হচ্ছে, মক্কা থেকে আসফান পর্যন্ত। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী। কিন্তু এর বর্ণনাসূত্রভূত ইসমাইল বিন আয়াশ অত্যধিক দুর্বল বলে চিহ্নিত। আরেক বর্ণনাকারী আবদুল ওয়াহাবও অত্যন্ত দুর্বল। আহমদ এবং ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন বলেছেন, আবদুল ওয়াহাব অপদার্থ। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী। আর নাসাঈ বলেছেন, মাতরুকুল হাদিস। স্বাভাবিক গতিতে উট অথবা মানুষ একদিনে যতোটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম, ততোটুকু দূরত্বকে একদিনের দূরত্ব বলে। এভাবে অতিক্রান্ত তিনদিনের

www.eelm.weebly.com

পথকে বলে তিনদিনের দূরত্ব। আলেমগণ এই দূরত্বকে কেউ আটচল্লিশ মাইল আবার কেউ বায়ান্ন মাইল বলে নির্ধারণ করেছেন। ইমাম আওজায়ী বলেছেন, একদিনের দূরত্ব সম্পন্ন সফরেও নামাজে কসর করা যাবে।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, তিনদিনের দূরত্ব অতিক্রম করলে নামাজে কসর সিদ্ধ হবে এবং রোজা রাখা না রাখার অনুমতি লাভ করতে পারবে। ইমাম আবু ইউসুফ এই অব্যাহতির দূরত্ব নির্ধারণ করেছেন, পূর্ণ দুইদিন এবং তৃতীয় দিনের অধিকাংশ। ইমাম আবু হানিফার দলিল ওই হাদিসটি, যাতে মোজার উপর মসেহ করার বিধান বর্ণিত হয়েছে। হজরত আলী একবার মোজার উপর মসেহ করার সময়কাল সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি স. তখন বললেন, মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিনরাত এবং গৃহবাসীর জন্য একদিন একরাত। মুসলিম। হাদিসটি বিশুদ্ধ। কিন্তু এর থেকে দলিল গ্রহণ দুর্বলতামুক্ত নয়।

আলোচ্য আয়াত থেকে সাধারণভাবে প্রতীয়মান হয় যে, গোনাহের কাজে বহির্গত মুসাফিরও রোজার অব্যাহতি লাভ করবে। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেছেন। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী বলেছেন, পাপকাজে ভ্রমণকারীর জন্য রোজা পরিত্যাগের অনুমতি নেই। কেনোনা আল্লাহ্পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'বিদ্রোহী হয়ে নয় এবং সীমালংঘন করেও নয়।' এব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তটি এই— — বিদ্রোহ ও সীমালংঘন সফরের আওতায় পড়ে না।

'অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে।' অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তি বা মুসাফির যদি রোজা পরিত্যাগ করে, তবে পরিত্যক্ত রোজা রোগমুক্তির পর কিংবা সফর শেষে আদায় করতে হবে। তবে পরিত্যক্ত রোজা ধারাবাহিকভাবে করতে হবে, এমন কথা বলা নেই। বিষয়টি ঐকমত্যসম্মত।

দাউদ জাহেরী বলেছেন, পরিত্যক্ত রোজা ধারাবাহিকভাবে আদায় করা জরুরী। আয়াতে যদিও সেরকম কথা নেই। কিন্তু হাদিস শরীফে একথার সমর্থন রয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে—মহানবী স. রমজানের কাজা রোজা সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, ধারাবাহিক অথবা ধারাবাহিকতারহিত— যেভাবে ইচ্ছা কাজা রোজা আদায় করতে পারো। দারা কুতনী হাদিসটি মুত্তাসিল ও মুরসাল— উভয় পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে— মোহাম্মদ বিন মুনকাদির বলেছেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে, কেউ একজন রসুল পাক স. কে কাজা রোজা একাদিকক্রমে আদায় করা যাবে কিনা, জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, সেটা তোমার ইচ্ছা। যেভাবে পারো আদায় করো। মুরসাল পদ্ধতিতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী। কিন্তু এর সনদভূত বর্ণনাকারী ওয়াকেদী এবং লেহিয়া দুর্বল হিসেবে গণ্য। সাঈদ বিন মানসুরও হজরত আনাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন আবু উবাইদ, হজরত মুআজ বিন জাবাল, হজরত

www.eelm.weebly.com

আনাস, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত রাফে বিন খাদিজ থেকে। রমজানের কাজা রোজা ধারাবাহিক নিয়মে রাখার প্রবক্তা দাউদ জাহেরী হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত একটি হাদিস থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, কাজা রোজা আদায় করতে হবে বিরতিহীনভাবে। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী— যার সূত্রভূত আবদুর রহমান বিন ইব্রাহিম বিন আস সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, সে কিছুই নয়। দারা কুতনী বলেছেন, সে শক্তিশালী বর্ণনাকারী নয় বরং সে দুর্বল।

জেনে রাখা প্রয়োজন, দুগ্ধদাত্রী ও গর্ভবতী নারী সন্তানের অনিষ্টের আশংকায় যদি রোজা রাখতে না পারে তবে পরে সুবিধামতো বাদ পড়ে যাওয়া রোজাগুলো কাজা করতে হবে এবং ফিদিয়াও দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, শুধু কাজা আদায় করতে হবে। ফিদিয়া দিতে হবে না। এক বর্ণনানুযায়ী ইমাম মালেকও এই অভিমত পোষণ করেন বলে জানা যায়। অপর বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায়, কেবল দুগ্ধদাত্রী রোজার সাথে ফিদিয়াও আদায় করবে। গর্ভবতীরা আদায় করবে শুধুই রোজা। ফিদিয়া নয়। ইমাম আহমদ এবং শাফেয়ী বলেছেন, কাজার সঙ্গে ফিদিয়া ওয়াজিব। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের মতে কাফফারা ওয়াজিব। কাজা ওয়াজিব নয়।

কাজা রোজা আদায় করতে যদি খুব বেশী বিলম্ব হয়, যদি পরবর্তী রমজান অত্যাসন্ন হয়ে পড়ে তবে কী করতে হবে সে সম্পর্কে ইমামগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আহমদ ও শাফেয়ী বলেছেন, কাজা এবং ফিদিয়া উভয়টি ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন যতোই বিলম্ব ঘটুক না কেনো কেবল কাজাই ওয়াজিব। ফিদিয়া নয়। যদি ফিদিয়া ওয়াজিব বলা হয়, তবে কোরআনের বিধান লংঘন করা হবে। পুনরায় পীড়িত হওয়ার কারণে কিংবা সফররত থাকার কারণে যদি পরবর্তী রমজানও অতিক্রান্ত হয়ে যায় তবে কাজা ব্যতীত অন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না। এই সিদ্ধান্তে ইমামগণ একমত। আবদুর রাজ্জাক এবং ইবনে মুনজির বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে নাফে থেকে, তিনি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, অসুস্থতার কারণে যদি পর পর দুই রমজান অতীত হয়ে যায় তবে তার উপর দ্বিতীয় রমজানের কাজা এবং প্রথম রমজানের কাফফারা ওয়াজিব। তাহাবী বলেছেন, এ অভিমতটি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের। হাফেজে হাদিস ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ থেকে ইবনে জুরাইজের মাধ্যমে আবদুর রাজ্জাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এটাই হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের অভিমত। কিন্তু হজরত ওমরের প্রসিদ্ধ মতটি এর বিপরীত।

ফিদিয়াসহ কাজা ওয়াজিবের দলিল হচ্ছে এই— হজরত আবু হোরায়রা বলেন, এক ব্যক্তি রমজান মাসে রোগগ্রস্ত হলো। সুস্থ হওয়ার পরও কাজা আদায় করলো না। এসে পড়লো পরবর্তী রমজান। রসুল পাক স. ওই লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন, সে যেনো বর্তমান রমজানের রোজা রাখে। এরপর বাদ পড়ে যাওয়া

www.eelm.weebly.com

রমজানের রোজা রাখতে হবে এবং প্রতিটি রোজার বিনিময়ে একজন দরিদ্রকে খাদ্য দিতে হবে। দারা কুতনী। এই হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ নয়। কারণ ইব্রাহিম ইবনে নাফে সম্পর্কে আবু হাতেম বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী। আরেক বর্ণনাকারী আমর বিন মুসা সম্পর্কে বলেছেন, সে নিজে নিজে হাদিস তৈরী করে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, কাফফারা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো মারফু হাদিস নেই। অবশ্য সাহাবাগণের বক্তব্য রয়েছে এ সম্পর্কে। ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্যরা বলেছেন, কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে হজরত আলী, হজরত জাবের এবং হজরত হোসাইন বিন আলী থেকে। আমি বলি, আমার নিকট হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বক্তব্য (আসার) ব্যতীত আর কোনো বক্তব্যই বিশুদ্ধ বলে মনে হয় না। যদি এ সম্পর্কে কোনো একটি মারফু হাদিস থেকেও থাকে তবুও তা দলিল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। কারণ, খবরে ওয়াহিদ (একক বর্ণিত হাদিস) দ্বারা কোরআনের বিধান অপসারণ করা যায় না।

'ইহা (রোজা) যাহাদিগকে সাতিশয় কষ্ট দেয়, ইহার পরিবর্তে একজন অভাবগ্রস্তকে অন্ন দান করা তাহাদের কর্তব্য'— বাগবী বলেছেন এই আয়াতটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। অধিকাংশ আলেম বলেছেন, আয়াতটি রহিত। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং হজরত সালমা বিন আক্ওয়া বলেছেন, আয়াতটির বিধান রহিত।

শানে নুজুল ঃ প্রথম দিকে এই অবকাশ দেয়া ছিলো— যারা সক্ষম তারা রোজা রাখবে আর রোজা রাখতে না পারলে ফিদিয়া দেবে। রোজায় অভ্যস্ত করার জন্য দেয়া হয়েছিলো এরকম শিথিল বিধান। পরে এই শিথিলতা রহিত করা হয়।

আমি বলি, রোজা সম্পর্কে মুসাফিরদের জন্য তিনটি বিষয়ে অবকাশ লক্ষ্য করা যায়। ১. রোজা ২. কাজা করার উদ্দেশ্যে বিরতি ৩. ফিদিয়া। ফিদিয়া রহিত হওয়ার পর অবকাশ থাকে দু'টি। রোজা রাখবে অথবা পরে কাজা করার উদ্দেশ্যে ভঙ্গ করবে। হজরত কাতাদা বলেছেন, অতিবার্ধক্যের কারণে রোজা রাখতে অসমর্থ ব্যক্তির উপর রোজা রাখা অথবা ফিদিয়া দেয়ার প্রাথমিক বিধানটি রহিত হয়ে যায়। হজরত হাসান বলেছেন, এ আয়াত ওই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে যে রোজা রাখতে সক্ষম। এখানে তার জন্য এই অবকাশ রয়েছে যে, সে রোজা রাখবে অথবা ফিদিয়া দেবে। পরে এই বিধান রহিত হয়ে যায়। রহিত স্থলে আর নূতন বিধান অবতীর্ণ হয়নি। অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধদের জন্য নূতন কোনো নির্দেশনা আর নেই। একারণেই ইমাম মালেক ও শাফেয়ীর একটি মতে নিতান্ত অক্ষম বৃদ্ধের জন্য রোজা না রাখাই সমীচীন। কারণ, সে সম্পূর্ণতই অসমর্থ। আর আল্লাহ্ পাক কাউকে সামর্থের অধিক ভার বহনের নির্দেশ দেন না। তাদের জন্য ফিদিয়া প্রদান অপরিহার্য নয়, কারণ এরকম কোনো দলিল নেই। আর বিষয়টি

www.eelm.weebly.com

বিবেচনাবিরোধীও। একদল আলেম বলেছেন, যে ব্যক্তি যৌবন কালে রোজা রাখতে সক্ষম ছিলো সে যদি বৃদ্ধ বয়সে রোজা রাখতে অসমর্থ হয় তবে তার জন্য রোজার স্থলে ফিদিয়া ওয়াজিব হবে। কিন্তু কোরআন মজীদে এই মতটির স্বীকৃতি নেই। জালালউদ্দিন সুয়ূতী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে 'ইউতিকুনা' শব্দটির পূর্বে 'লা' শব্দটি উহ্য আছে বলে ধরে নিতে হবে। এভাবে 'লা' ইউতিকুনা' বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে রোজা রাখতে সক্ষম নয়— তাদের দায়িত্বে ফিদিয়া। যেমন, ইয়ু বায়্যিনুল্লাহু লাকুম আন তাদ্বিল্লু —এই আয়াতটির 'আনতাদ্বিল্লু' এর 'লা' যুক্ত না করলে অর্থ বিকৃতি ঘটে। আমি বলি, এখানে 'লা' উহ্য আছে এরকম মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক। কারণ, এরকম মন্তব্য কোরআনের বাকভঙ্গির অনুকূল নয়। প্রথমে ইতিবাচক এবং পরক্ষণেই নেতিবাচক—এরকম বাকভঙ্গি অচল। কেউ যদি বলেন ইমাম আবু হানিফা, আহমদ, শাফেয়ী এবং হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের মত প্রকাশ করেছেন, অসমর্থ বৃদ্ধকে রোজার বদলে ফিদিয়া দিতে হবে। তদুত্তরে আমি বলবো, এ আয়াতটি তাঁদের বক্তব্যের দলিল। আর এখানে বিষয়টি পরিষ্কার নয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে অতিবৃদ্ধদের করণীয় সম্পর্কে এখানে নির্দেশ মাত্র নেই। তবে দলিল আর রইলো কোথায়?

আমি পুনরায় বলি, প্রথমে উল্লেখিত ব্যাখ্যাটিই উত্তম ও সমালোচনার উর্ধ্বে যার সার কথা হচ্ছে এই—ইসলামের প্রাথমিক যুগে সক্ষম লোকেরাও রোজা অথবা ফিদিয়ার যে কোনো একটিকে গ্রহণ করতে পারতো; অক্ষম লোকের প্রসঙ্গ সেখানে টানা হয়নি। এতেই বুঝা যায় অতি বৃদ্ধ ও অসমর্থ ব্যক্তিরা প্রথম থেকেই আলোচনার বাইরে। অর্থাৎ প্রথম থেকেই তাঁরা রোজা এবং ফিদিয়া উভয়ের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য যখন রোজা অথবা ফিদিয়া—এই অবকাশ দেয়া হয়েছে তখন অক্ষমেরা তো অধিকতর সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য। একারণেই প্রথম ব্যাখ্যাতেই আমি বলেছিলাম, পীড়িত এবং মুসাফিরদের জন্য রয়েছে তিনটি অবকাশ। এর পর যখন 'ফামান শাহিদা মিনকুমুশ শাহরা' (আয়াত ১৮৫) — এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন রোজার বিধানভূত হয়ে পড়ে তিন ধরনের লোক। ১. যারা রোজা রাখতে সম্পূর্ণ সক্ষম তাদেরকে রোজা রাখতেই হবে। ২. গ্রহণযোগ্য আপত্তির কারণে যাদের পক্ষে রোজা রাখা সম্ভব নয় যেমন পীড়িত ব্যক্তি ও মুসাফির। পীড়িত ব্যক্তি রোগ মুক্তির পর এবং মুসাফির সফর শেষে কাজা আদায় করবে। ফিদিয়া চলবে না। ৩. ওই বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি যার সক্ষমতা ফিরে পাওয়ার আশা নেই এবং ওই রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যার রোগমুক্তি সুদূর পরাহত— তারা বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে কখনই রোজা রাখতে সক্ষম হবে না। তারা পড়ে যায় বিধানের বাইরে। তারা 'ফামান শাহিদা মিন কুমুশ শাহরা' এই বিধানের আওতাবহির্ভূত। এই বিধানে কেবল সক্ষম ব্যক্তিরাই অন্তর্ভূত। আলোচ্য আয়াতে 'ফামান কানা মিনকুম মারিদ্বা' (কেউ পীড়িত হলে) একথার মাধ্যমে

www.eelm.weebly.com

বুঝানো হচ্ছে ওই সমস্ত রোগগ্রস্তদেরকে যাদের নিরাময়ের সম্ভাবনা আছে। এমতাবস্থায় দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণতই অক্ষমদের জন্য কোনো বিধানই নেই। কাজার নির্দেশ তাদের প্রতি বলবৎ হতেই পারে না, কারণ তারা যোগ্যতারহিত। তাই দায়িত্ব বহির্ভূত। মোদ্দা কথা তারা রোজার দায়িত্ব মুক্ত। তাই তাদেরকে কেবল ফিদিয়া দিতে হবে। আল্লাহ্তায়ালা সমধিক জ্ঞাত।

ফিদিয়া অর্থ বিনিময়। ইমাম আবু হানিফার মতে ফিদিয়ার পরিমাণ ফিতরার মতো। অর্থাৎ গম অর্ধ 'সা' এবং যব বা খেজুর পূর্ণ 'সা'। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, একজন মিসকিনকে এক মুদ বা দুই রতল প্রচলিত খাদ্য দান করতে হবে। ইমাম আহমদ বলেছেন যবের অর্ধ সা এবং গমের এক মুদ দেয়া ওয়াজিব। কোনো কোনো ফকীহ্ বলেছেন, প্রাত্যহিক প্রস্তুতকৃত খাদ্য থেকে ফিদিয়া দিবে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, একজন মিসকিনকে প্রথম রাত্রির ও সেহরীর আহার্য দান করবে।

'যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে উহা তাহার জন্য অধিক কল্যাণকর'— এখানে স্বতঃস্ফূর্ত সৎকর্ম বলতে ওয়াজিব ফিদিয়ার অতিরিক্ত দানকে বোঝানো হয়েছে। পরক্ষণেই বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা উপলব্ধি করতে, তবে বুঝতে সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ। একথার অর্থ, ফিদিয়া প্রদান অপেক্ষা রোজা রাখা কষ্টকর না হলে মুসাফিরের জন্য রোজা পালন করাই উত্তম। এটাই জমহুর ওলামার অভিমত।

ইমাম আহমদ, আওজায়ী ও সাঈদ বিন মুসাইয়েব বলেছেন, কষ্ট হোক বা না হোক মুসাফিরের জন্য সর্বাবস্থায় রোজা না রাখাই শ্রেয়। তাঁদের দলিল হচ্ছে, হজরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণিত ওই হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে— রসুল পাক স. তখন প্রবাসে। দেখলেন, একব্যক্তিকে ঘিরে লোকেরা জটলা করছে। তিনি বললেন, কী ব্যাপার? তারা বললো, লোকটি রোজাদার। তিনি বললেন, সফরে রোজা রাখা কোনো সৎকর্ম নয়। বোখারী, মুসলিম। হজরত জাবের বলেছেন, মক্কা বিজয়ের বছর রসুল পাক স. অভিযান করেছিলেন রমজান মাসে। তিনি তখন রোজাদার ছিলেন। তাঁর সহচরবৃন্দও ছিলেন রোজাদার। তিনি 'কিরায়ে গমীম' নামক স্থানে পৌঁছে একপাত্র পানি চাইলেন। একটি পানিপূর্ণ পানপাত্র দেয়া হলো তাঁকে। তিনি পাত্রটি উঁচু করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তারপর পানি পান করলেন। কেউ কেউ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এখনো অনেকে রোজাদার। তিনি বললেন, এমন করা অনুচিত। মুসলিম। হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফ থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, সফরে রোজা পালনকারী স্বগৃহে অবস্থানকারী রোজাবিহীন লোকের মতো। ইবনে মাজা। এসকল হাদিস সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন এই যে, হাদিসগুলো ওই সকল লোকের উদ্দেশ্যে বর্ণিত, যাদের পক্ষে রোজা রাখা অত্যন্ত কষ্টকর। তাঁদের পক্ষে রোজা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। তারা মুসাফির হোক অথবা রোগগ্রস্ত। আর জেহাদে

www.eelm.weebly.com

গমনকারীদের জন্য উত্তম হলো রোজা পরিত্যাগ। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, হে সেনাদল! তোমরা শত্রুর নিকটবর্তী হয়েছো। কাজেই এখন সামর্থ অনুযায়ী ইফতার করা উচিত। হজরত আবু সাঈদ বলেছেন, ইফতারের ওই নির্দেশ ছিলো আমাদের জন্য অবকাশ (রুখসত)। আমাদের কেউ কেউ তখন রোজা ভেঙে ফেলেছিলেন এবং কেউ কেউ রেখেছিলেন। আমরা চলতে চলতে পরবর্তী মঞ্জিলে পৌঁছলাম। তিনি স. এরশাদ করলেন, হে জনতা। প্রভাতে তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হবে। কাজেই তোমরা সাধ্যমতো ইফতার করে নাও। এই নির্দেশটি ছিলো আমাদের জন্য অবশ্যপালনীয় (আজিমত)। মুসলিম। এ হাদিসটিই কতিপয় সাহাবী থেকে ইমাম মালেক, হজরত আবু সাঈদ থেকে ইমাম শাফেয়ী এবং আবু দাউদ, হাকেম ও ইবনে বারও বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু দারদা বলেছেন, আমি ছিলাম রসুল পাক স. এর এক সফরের সহযাত্রী। প্রচন্ড গরম ছিলো তখন। খররৌদ্র থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা মাথায় হাত রেখে পথ চলছিলাম। আমাদের মধ্যে রসুল পাক স. এবং আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা ব্যতীত আর কেউ রোজা ছিলেন না।

আমি বলি, কেবল সফরই মুসাফিরদের অবকাশ প্রাপ্তির কারণ। কষ্ট হওয়া না হওয়া কোনো কারণ নয়। আর বয়ঃবৃদ্ধ পীড়াগ্রস্ত, দুর্বল, গর্ভবতী ও দুগ্ধধাত্রীদের জন্য অবকাশ লাভের কারণ হচ্ছে— রোজাজনিত ক্লেশ। কষ্ট না হলে এদেরকে অবকাশ দেয়া হতো না।

আয়াত শেষে বলা হয়েছে, 'ইন কুনতুম তা'লামুন' (যদি তোমরা উপলব্ধি করতে) — একথার অর্থ, যদি তোমরা রোজার মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হতে, তবে রোজা ভঙ্গ অথবা ফিদিয়ার উপরে রোজাকে প্রাধান্য দিতে। মনে রাখা উচিত, রোজা রাখা অথবা ফিদিয়া প্রদান করার অবকাশ সম্বলিত বিধান এখন রহিত। তাই এখন কেউ যদি শরিয়ত সমর্থিত আপত্তি না থাকা সত্ত্বেও রোজা পরিত্যাগকে বৈধ মনে করে, তবে সে হবে অবিশ্বাসী (কাফের)। আর যদি বৈধ মনে না করে রোজা পরিত্যাগ করে তবে সে হবে ফাসেক। তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। শরিয়তসম্মত ওজরের কারণে যারা রোজা পরিত্যাগ করে তাদের উপরে যদি কাজা ওয়াজিব হয় তবে বিনা ওজরে রোজা পরিত্যাগকারীদের উপরে কাজা ওয়াজিব হবে না কেনো? প্রকৃত কথা এই যে, তাদের জন্য কাজা এবং ইসতেগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) দু'টোই ওয়াজিব। ইমামগণ এব্যাপারে একমত। ইমাম নাখয়ী বলেছেন, ওজর ব্যতীত কেউ যদি রোজা ছেড়ে দেয় তবে এর পরিবর্তে হাজার বছর রোজা রাখলেও তার সমান্তরাল মর্যাদা লাভ হবে না। হজরত আলী ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, সারাজীবন রোজা রাখলেও ক্ষতির পরিপূরণ হবে না।

www.eelm.weebly.com

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيٓ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ
الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا
اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۖ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

❑ রমজান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এই মাস পাইবে তাহারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। এবং কেহ পীড়িত হইলে কিংবা ভ্রমণে থাকিলে অন্য সময় সংখ্যা পূরণ করিতে হইবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা সহজ তাহা চাহেন এবং যাহা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তাহা চাহেন না, এই জন্য যে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করিবে এবং তোমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য তোমরা আল্লাহের মহিমা কীর্তন করিবে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

'শাহরু রমাদ্বান' বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। রমজানের মাস অথবা একথা বুঝানো যে, তোমাদের জন্য রমজানের রোজা বিধিবদ্ধ করা হলো। আয়াতটি যদি পূর্বোক্ত আয়াত, 'কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম' আয়াতের সঙ্গে একযোগে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে বর্ণিত অর্থ প্রণিধানযোগ্য হবে। আর আয়াতটি যদি পূর্বোক্ত আয়াতের রহিতকারী (নাসিখ) হয়, তবে এর মর্ম হবে অন্যরকম। 'শাহ্র' অর্থ প্রসিদ্ধি। রমজান শব্দটি রমজ ধাতু থেকে উৎপন্ন যার অর্থ নির্বাপিত হওয়া অথবা ভস্মীভূত হওয়া। রমজানের সঙ্গে শাহার শব্দটি সংযুক্ত হয়েছে বলে রমজানের পরিচিতি ঘটেছে প্রসিদ্ধ মাস হিসেবে। হজরত আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুলুল্লাহ্ স. বলেন, পাপরাশিকে ভস্মীভূত করে দেয় বলে এই মাসের নাম রমজান। হাদিসটি ইস্ফাহানী তাঁর তারগিব গ্রন্থে লিখেছেন।

এই মাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনের আভিধানিক অর্থ একত্রিত করা। আয়াতের বাণীবৈভব, নির্দেশ নিষেধাজ্ঞা এবং পুরস্কার তিরস্কারের সমাহার এই কোরআন। এভাবে বিভিন্ন বিষয় একত্রিত করা হয়েছে এখানে। কোরআন শব্দটি ক্বিরআত শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। এমতাবস্থায়, কোরআন শব্দটির অর্থ হবে পঠিত। ইবনে কাসির আল কোরআন এবং কোরআনাহু— যেখানেই থাকুক না কেনো, শব্দটিকে তিনি 'হামজাকে' বিলুপ্ত করে তার হরকত 'র' বর্ণের সঙ্গে যুক্ত করে পাঠ করেছেন। ক্বারী হামজা যতিপাতের সময় অনুসারী হয়েছেন ইবনে কাসিরের। অন্য ক্বারীগণ পাঠ করেছেন হামজা সহযোগে। বাগবী বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী কোরআন শব্দটি পাঠ করতেন হামজাবিহীন অবস্থায় এবং বলতেন, 'ক্বিরআত' শব্দটির উৎপত্তিস্থল নয়। বরং

www.eelm.weebly.com

তওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি গ্রন্থের মতো এটিও একটি মহাগ্রন্থের নাম। বাগবী আরো বলেছেন, মুকাদ্দিস বলেন, জনৈক ব্যক্তি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্পাক বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে কোরআন নাজিল করেছেন। যেমন কখনো বলেছেন, 'আমি রমজান মাসের ক্বদর রাত্রিতে কোরআন নাজিল করেছি।' আবার কখনো বলেছেন, 'আমি পবিত্র রজনীতে কোরআন অবতীর্ণ করেছি।' কখনো আবার এরশাদ করেছেন, 'আমি বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে কোরআন নাজিল করেছি।' এ সকল বর্ণনার তাৎপর্য কী?

এই জটিল প্রশ্নটির জবাবে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, সম্পূর্ণ কোরআন পাক রমজান মাসে ক্বদর রাত্রিতে লওহে মাহফুজ থেকে পৃথিবীর নিকটতম আকাশের বাইতুল ইজ্জতে অবতীর্ণ হয়। তারপর সেখান থেকে হজরত জিব্রাইলের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে রসুল পাক স. এর উপরে অবতীর্ণ হয়। 'বি মাওয়াকিইন নুযুম' আয়াতের অর্থ এরকমই। দাউদ ইবনে হিন্দ বলেছেন, আমি শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্পাকের বানী অনুসারে কোরআন পাক রমজান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে কি বৎসরের অন্য মাসগুলোতে অবতীর্ণ হয়নি? তিনি জবাব্ দিলেন, তা হবে না কেনো। তবে রমজান মাসে অবতীর্ণ হওয়ার কথা একারণেই বলা হয়েছে যে, সারা বছর ধরে যে পরিমাণ আয়াত নাজিল হতো, সে সমস্ত আয়াত হজরত জিব্রাইল এ মাসে পুনরাবৃত্তি করতেন। তন্মধ্যে আল্লাহ্ পাকের যতোটুকু ইচ্ছা ততোটুকু প্রতিষ্ঠিত রাখতেন আর যতোটুকুর ইচ্ছা নয় ততোটুকু ভুলিয়ে দিতেন। হজরত আবু জর গিফারী থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের সহিফা প্রথম অথবা তৃতীয় রমজানে অবতীর্ণ হয়েছে। হজরত মুসার উপর তওরাত অবতীর্ণ হয়েছে ষষ্ঠ রমজানে। হজরত ঈসার উপর ইঞ্জিল নাজিল হয়েছে ত্রয়োদশ রমজানে। অষ্টাদশ রমজানে হজরত দাউদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে যবুর। আর সর্বশেষ কিতাব কোরআন মজীদ শেষ নবী মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে রমজানের শেষ ছয়টি রাতে। ওয়াসিলা বিন আসকায়া থেকে আহমদ এবং তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিমের সহিফাগুলো রমজানের প্রথম রাতে অবতীর্ণ হয়েছে। রমজানের ছয় তারিখে অবতীর্ণ হয়েছে তওরাত এবং ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে রমজানের তেরো তারিখে। 'ওয়াল্লাহু আ'লাম'।

পূর্ববর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছিলো রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার বিধান। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে— রমজান মাসে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা। এবং বলা হয়েছে— কোরআন মানুষের দিশারী, সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী। কোরআন পাক আপন মহিমা বলে মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে নিষ্কৃতি দেয়। কোরআনে রয়েছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যেগুলো মানুষকে হালাল, হারাম এবং শরিয়তের সীমারেখার প্রতি পথপ্রদর্শন করে। সত্য ও

www.eelm.weebly.com

অসত্যকে পৃথক করে দেয়। বৈধ ও অবৈধকে সুস্পষ্ট করে তোলে। দিশারী (হুদা) এবং পার্থক্যকারী (ফুরকান) শব্দ দু'টি কোরআন এর সমার্থক।

'যারা এই মাস পাবে তারা যেনো রোজা পালন করে'— একথার অর্থ তোমাদের মধ্যে যারা রমজানে উপনীত হবে, তারা যদি সুস্থ, সক্ষম ও স্বগৃহবাসী (মুকিম) হয়, হায়েজ নেফাস্ থেকে পবিত্র থাকে, তবে অবশ্যই রোজা পালন করবে। পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, মুসাফির এবং পীড়িত ব্যক্তিরা রোজা না রাখার অনুমতিপ্রাপ্ত। তাই আলোচ্য আয়াতে সুস্থ ও স্বগৃহবাসীদের আলাদা করা হয়েছে। হায়েজ নেফাস গ্রস্তারা যে রোজা রাখতে পারবে না সে কথা প্রসিদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আর এ ব্যাপারে ঐকমত্যও রয়েছে।

হাদিস শরীফে এসেছে—এক মহিলা সাহাবী রসুল পাক স. এর নিকট নিবেদন জানালেন, হে দয়াল নবী স.! রমণীদের ধর্ম প্রতিপালন অপূর্ণ হলো কিভাবে? তিনি স. বললেন, তোমরা কি লক্ষ্য করো না, তোমরা যখন ঋতুবতী হও তখন নামাজ-রোজা কিছুই করতে পারো না। বোখারী, মুসলিম। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ঋতুবতীদের জন্য রোজা হারাম। ঋতুবতী নারী রোজা রাখলে তা শুদ্ধ হবে না। কাজা অপরিহার্য হবে।

রমজান পেলে রোজা রাখবে— এ কথার অর্থ প্রথম দিকে রোজা অথবা ফিদিয়া যে কোনো একটির যে অবকাশ ছিলো এখন সে অবকাশ আর নেই। এখন রমজানের রোজা রাখতেই হবে। বাগবী বলেছেন, রমজান এসে পড়ার পর কোনো মুকিম যদি সফর শুরু করে তবে সে রোজা প্রতিপালন করবে কি করবে না সে ব্যাপারে বিদ্বানেরা মতানৈক্য করেছেন। হজরত আলী বলেছেন, তার পক্ষে রোজা ভঙ্গ করা সঙ্গত নয়। উবায়দা সালমানও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ পাক বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে রমজান মাস প্রত্যক্ষ করবে সে (যদি সুস্থ ও মুকিম হয়) রোজা রাখবে। অর্থাৎ সারা মাসের রোজা রাখবে। তাই এ রকম বলা হয়েছে যে, মুকিম অবস্থায় রমজান পেলে রোজা ভঙ্গ করা সংগত নয়। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবা এবং ফকীহ্গণ বলেছেন, রমজান মাসে সফর শুরুর দিনে রোজা ভঙ্গ করা সিদ্ধ হবে না। পর দিন থেকে রোজা ভঙ্গ করতে পারবে। সুতরাং রমজান পেলে রোজা রাখবে— এ কথার প্রকৃত অর্থ এই—রমজানের যে কয়দিন সুস্থ ও মুকিম থাকে সেই কয়দিন রোজা রাখবে। যদি এই অবস্থায় সারা মাস পায় তবে সারা মাসই রোজা রাখবে। আর যে কয়দিন সফরে থাকে অথবা পীড়িত হয় সে কয়দিন রোজা ভঙ্গ করতে পারবে। এ কথার প্রমাণ হিসাবে হজরত জাবের এবং হজরত আবদুল্লাহ্র বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করা যায় যেখানে বলা হয়েছে, রসুল পাক স. মক্কাবিজয়ের বছরে অভিযান শুরু করেছিলেন রমজান মাসে। তখন তিনি ছিলেন রোজাদার। কাদিদ নামক স্থানে পৌঁছে তিনি রোজা ভঙ্গ করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামও এরকম করেছিলেন।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ দিবসের প্রথম ভাগে যে মুকিম রোজাদার ছিলো সে যদি ওইদিন সফর শুরু করে, তবে রোজা ভাঙতে পারবে না। কেনোনা সে ওই রোজাটি পেয়েছে। এটা হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত। আর ইমাম আহমদ ও দাউদ জাহেরীর অভিমত হচ্ছে, ওই দিন রোজা ভঙ্গ করা বৈধ। তাঁরা তাঁদের অভিমতের সমর্থনে জাওজী ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদিসটি পেশ করেছেন— যেখানে বলা হয়েছে, সাহাবাগণকে নিয়ে রসুল পাক স. গামীম নামক স্থানে পৌঁছে রোজা ভেঙে ফেললেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স, একবার রমজান মাসের সফরে আসফান নামক স্থানে পৌঁছে এক পেয়ালা পানি চাইলেন। পানি দেয়া হলে তিনি সেই পানি পান করলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তিনি এরকম রোজাবিহীন অবস্থায় ছিলেন (হাদিস দু'টির মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, মুকিম ব্যক্তি রোজাদার অবস্থায় সফর শুরু করলেও ওই দিন রোজা ভঙ্গ করতে পারবে)। আমরা বলি, হাদিস দু'টিতে উল্লেখিত গামীম এবং আসফান মদীনা মনওয়ারার পথে প্রথম মঞ্জিলে অবস্থিত।

মাসআলাঃ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি অসুস্থাবস্থায় এবং মুসাফির সফররত অবস্থায় রোজা রাখার পরও রোজা ভেঙে ফেলতে পারবে। ইমাম আহমদ একথা বলেছেন। মিনহাজ রচয়িতা বলেছেন, ইমাম শাফেয়ীও এই মতের প্রবক্তা। ফতহুল কাদির প্রণেতা ইমাম ইবনুল হুমাম বলেছেন, ইমাম আবু হানিফার মত হচ্ছে, রোজার নিয়ত না করে থাকলে রোজা ভঙ্গ করা সিদ্ধ। যদি রাত্রিভাগে রোজার নিয়ত ক'রে প্রত্যুষের পূর্বে নিয়ত পরিবর্তন না করে, তবে রোজা ভঙ্গ করা তার জন্য সিদ্ধ নয়। এতদসত্ত্বেও রোজা ভেঙে ফেললে কেবল কাজা ওয়াজিব হবে. কাফফারা নয়।

'কেউ পীড়িত হলে কিংবা ভ্রমণে থাকলে অন্য সময় সংখ্যা পূরণ করতে হবে'— পূর্বের আয়াতেও একথা বলা হয়েছে। বার বার এরকম বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এতে করে যেনো এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে, রোজা অথবা ফিদিয়া—এই বিধানটি রহিত। আর অক্ষমতার কারণে রোজা ভঙ্গ করলে তার কাজা আদায় করতে হবে— এই বিধানটি রহিত নয়। যদি এ রকম না হতো তবে পীড়িত ও মুসাফির ব্যক্তির বিধানের পুনরালোচনা আসতো না।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এজমা ও হাদিসের ভিত্তিতে ঋতুবতী মহিলার বিধান, পীড়িত ও মুসাফিরের বিধানের মতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, হজরত মায়াজা আদুবিয়া হজরত আয়েশার নিকট জানতে চাইলেন, ঋতুবতী রমণী রোজার কাজা আদায় করে অথচ নামাজের কাজা আদায় করে না— এর কারণ কী? হজরত আয়েশা বললেন, রসুল পাক স. এর পৃথিবীবাসের সময় আমরা ঋতু অবস্থায় ছেড়ে দেয়া রোজার কাজা আদায় করতাম। কিন্তু নামাজের কাজা আদায় করতাম না।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, রমজানের পরে সফর শেষে মুসাফির যে কয়দিন মুকিম এবং সুস্থ থাকবে সে কয়দিনের রোজা তাকে কাজা করতে হবে। পীড়িত ব্যক্তিও তেমনি নিরাময়ের পর যে কয়দিন সুস্থ থাকবে সে কয়দিনের কাজাই তাকে আদায় করতে হবে।

রমজান অতীত হওয়ার পর কাজা আদায়ের অবকাশ পেয়েও কাজা আদায় না করে কেউ যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার রোজার কাজা অথবা ফিদিয়া ওয়ারিশগণের উপর ন্যস্ত হবে কি না— সে বিষয়ে আলেমগণ একমত হতে পারেন নি। ইমাম আবু হানিফা ও মালেকের মতে ওয়ারিশদের উপর কাজা আদায় কিংবা ফিদিয়া প্রদান কোনোটাই ওয়াজিব নয়। তবে মৃত ব্যক্তি যদি এই মর্মে অসিয়ত করে যেয়ে থাকে তবে তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে অসিয়ত পালন করা ওয়াজিব। উত্তরাধিকারীদের সম্মতি ব্যতিরেকে এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদ থেকে অসিয়ত পূরণ করা যাবে না। অনুরূপ মানত অথবা কাফফারা আদায় না করে কেউ মৃত্যুবরণ করলে, তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে মানত ও কাফফারা পরিশোধ করা যাবে। ইমাম শাফেয়ী থেকে এ বিষয়ে দু'টি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। একটি হচ্ছে, মানতের রোজা অথবা রমজানের রোজার কাজা তার পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারীরা আদায় করবে। অন্যটি হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারীগণ মিসকিনকে আহার করাবে। কেবল রোজা রাখলে যথেষ্ট হবে না। তবে তারা মানতের রোজা আদায় করতে পারবে। এই মতের সমর্থনে রয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণিত ওই হাদিসটি যেখানে তিনি বলেছেন, এক মহিলা রসুল আকরম স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি এক মাসের রোজা রাখতে পারেননি। তাঁর পক্ষ থেকে ওই রোজাগুলো আমি পালন করতে চাই। তিনি বললেন, বেশ তো। তোমার মায়ের ঋণ থাকলে কি তুমি আদায় করতে না? মহিলা আরজ করলেন, অবশ্যই। তিনি স. বললেন, তবে তো আল্লাহ্ পাকের ফরজ আদায় করাই সমীচীন। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু বুরাইদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন- এক রমণী নবী করীম স. কে বললেন, হে অনুগ্রহের নবী! আমার জননীর দায়িত্বে একমাস রোজা কাজা রয়েছে। আমি যদি সেগুলো আদায় করে দেই তবে কি তা বিধানসম্মত হবে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আহমদ। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— এক মহিলা সাহাবী সমুদ্রবক্ষে ভ্রমণরত ছিলেন। তিনি মানত করলেন, আল্লাহ্‌পাক যদি তাঁকে সমুদ্রের বিপদ থেকে পরিত্রাণ দেন তবে তিনি কৃতজ্ঞতা পালনার্থে একমাস রোজা রাখবেন। মহিলা নির্বিঘ্নে সফর সম্পন্ন করলেন। কিন্তু মানত পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর এক নিকটাত্মীয় বিষয়টি রসুল পাক স. কে জানালেন। তিনি স.বললেন, তুমি তাঁর পক্ষ থেকে রোজা রাখো। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত সা'দ বিন উবাদা মহানবী স. সকাশে নিবেদন

www.eelm.weebly.com

জানালেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার আম্মার দায়িত্বে একটি মানত ছিলো। তিনি তা আদায় না করেই পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছেন। তিনি স. বললেন, তুমি তাঁর পক্ষ থেকে মানত আদায় করো। বর্ণিত হাদিসগুলোর কয়েকটিতে মানতের উল্লেখ রয়েছে, কয়েকটিতে নেই। তাই ইমাম আহমদ বলেছেন, মানতের কথা সুস্পষ্ট জানা গেলে উত্তরাধিকারীর উপর মানত পূরণ করা ওয়াজিব। আর যেগুলোতে মানতের কথা নেই সেগুলো রোজা সম্পর্কিত বলে ধরে নিতে হবে।

আমি বলি, হাদিসগুলোতে যখন শর্তসীমা ব্যতিরেকে মানতের কথা বলা হয়েছে তখন সেগুলোকে মানত হিসেবে গ্রহণ করার কোনো কারণ নেই। বরং হাদিসের বর্ণনানুসারে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মৃতের পক্ষ থেকে ওলীর রোজা রাখা সাধারণভাবে জায়েয। সে রোজা মানতের হোক অথবা রমজানের। কিন্তু হাদিসগুলোতে এমন প্রমাণ নেই যে, ওলীগনের উপরে কাজা আদায় করা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফার সিদ্ধান্তানুসারে বর্ণনাগুলো আপত্তিজনকও নয়। উপরন্তু আল্লাহ্ পাক স্বয়ং বলেছেন, 'কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না।' এ ক্ষেত্রে রোজা রাখা যদি ওয়াজিব বলা হয়, তবে রোজা না রাখলে ওয়াজিব লংঘন করার দায়ে শাস্তিযোগ্য হতে হবে। আর সে শাস্তি হবে অপরের আমলের জন্য। অথচ এরশাদ হয়েছে, 'বোঝাবহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না।' সুতরাং এটা নিঃসন্দেহ যে, মৃতের কোনো পরিত্যক্ত আমলের কাজা আদায় করা ওয়াজিব নয়।

যারা পরিত্যক্ত রোজার বিনিময়ে দরিদ্রকে আহার করাতে হবে— এই মতের পক্ষপাতি তাঁদের সমর্থন রয়েছে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণিত ওই হাদিস যেখানে বলা হয়েছে- রসুল আকরম স. বলেছেন, একমাসের পরিত্যক্ত রোজার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে, তার পক্ষ থেকে প্রতি রোজার বিনিময়ে একজন মিসকিনকে আহার করানো উচিত। তিরমিজি। তিরমিজি আবার নিজেই হাদিসটির সনদের সমালোচনা করে বলেছেন, বর্ণনাটি সম্ভবত হজরত ইবনে ওমরের নিজস্ব উক্তি।

ইমাম আবু হানিফার মতে রোজা রাখা অথবা আহার করানো কোনোটাই যথেষ্ট নয়। কারণ একথা সর্বজনবিদিত যে, আনুগত্যের বেলায় স্থূলবর্তিতার অবকাশ নেই। আনুগত্যের বেলায় নিয়ত ও মান্যতার যোগ্যতা বিচার্য। নিয়ত ও মান্যতার যোগ্যতার উপর পুরস্কার ও তিরস্কার নির্ভর করে। তাই উত্তরসূরীদের জন্য রোজা পালন অথবা সম্পদ ব্যয় ওয়াজিব নয়। তবে অসিয়ত করে গিয়ে থাকলে তা পূরণ করা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেছেন, 'অসিয়ত ও ঋণ আদায়ের পর মিরাস।' অতএব অসিয়তকৃত রোজা আদায় করলে তা কবুল হওয়ার আশা করা যেতে পারে। আল্লাহ্ পাক সমধিক জ্ঞাত।

আমি বলি, একথা বিচার্য যে, মৃতের পক্ষ থেকে দয়াদক্ষিণা প্রদর্শন করে কেউ যদি রোজা রাখে বা দান করে (মিসকিনকে আহার্য দেয়) তবে আল্লাহ্ পাক তাঁর

www.eelm.weebly.com

অশেষ করুণার কারণে তা কবুল করে নেবেন। হাদিসের প্রেক্ষিতে একথাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু এরকম করা ওয়ারিশগণের নিকট ওয়াজিব নয়। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা থেকে বায্যারের বর্ণনায় রয়েছে-ওলী যদি মনে করে মৃতের পক্ষ থেকে সে রোজা রাখবে— একথার মাধ্যমে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মৃতের পরিত্যক্ত রোজা পালন ওলীর দায়িত্বভূত নয়। হাদিসটির সনদ অবশ্য দুর্বল।

'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান। তোমাদের জন্য যা ক্লেশদায়ক তা চান না'— একথার অর্থ, আল্লাহ্পাক তোমাদের জন্য সহজসাধ্যটি পছন্দ করেছেন বলেই রোগগ্রস্ত ও মুসাফিরদের ছেড়ে দেয়া রোজার কাজা করার বিধান দিয়েছেন। এটা তাদের জন্য অবকাশ (রুখসত) — আজিমত (শ্রমসাধ্য) নয়। সুতরাং কষ্ট সত্ত্বেও পীড়িত ব্যক্তি ও ভ্রমনকারী যদি রোজা রাখে, তবে তা প্রতিপালিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। কিন্তু হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, হজরত আবু হোরায়রা, উরওয়া বিন জোবায়ের এবং আলী বিন হোসাইন থেকে বর্ণিত হয়েছে— সফররত অবস্থায় রোজা রাখা সিদ্ধ নয়। যদি কেউ রাখে, তবে কাজা ওয়াজিব হবে। তাঁদের অভিমতের স্বপক্ষে রয়েছে এই আয়াতের, 'তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে' এই বাক্যটি। এই বাক্যটির মাধ্যমে বুঝা যায়, মুসাফিরের জন্য রমজান মাসের রোজা রাখা ফরজ থাকে না। যদি কেউ রাখে তবে তা শরিয়তের বিধান বহির্ভূত বলে গণ্য হবে।

আমি বলি, রোজা ফরজ হওয়ার মূল উপলক্ষ্য হলো, রমজান মাস। আর ভ্রমণ হচ্ছে সেই ফরজ আদায়ের প্রতিবন্ধক। প্রতিবন্ধক বটে, তবে মূল ফরজ উচ্ছেদকারী নয়। তাই কেউ যদি সফররত অবস্থায় রোজা রাখে তবে ফরজ হিসেবেই রাখবে। আর তার রোজা শুদ্ধও হবে। দৃষ্টান্তটি এরকম- যেনো কেউ বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই জাকাত আদায় করলো। জমহুর ওলামার এই মতটির পক্ষে রয়েছে হজরত আবু সাঈদ বর্ণিত ওই হাদিসটি যেখানে তিনি বলেছেন, আমরা রসুল পাক স. এর সঙ্গে ষোলোই রমজান এক যুদ্ধযাত্রা করলাম। আমাদের মধ্যে কেউ রোজা ভাঙলেন, কেউ রাখলেন। ভঙ্গকারীরা রোজাদারদেরকে এবং রোজাদারেরা ভঙ্গকারীদেরকে তখন কিছুই বলেননি। মুসলিম। এপ্রসঙ্গে হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের থেকে মুসলিম এবং হজরত আনাস থেকে আহমদ।

এই জন্য যে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে— এ কথার অর্থ, যে কয়টি রোজা বাদ পড়েছিলো সেই কয়টি রোজার কাজা আদায় করে রমজান মাসের সকল রোজার হিসাব পুরা করবে।

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, চান্দ্র মাস উনত্রিশ দিনে হয়ে থাকে। কাজেই চাঁদ না দেখে রোজা শুরু কোরো না ও চাঁদ না দেখে রোজাও ছেড়ে দিও না। যদি উনত্রিশ তারিখে চাঁদ না দেখা যায় তবে তিরিশটি রোজা পূর্ণ করো। বোখারী ও মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে একথা বলা হয়েছে রুগ্ন ও মুসাফির ব্যক্তিদেরকে লক্ষ্য করে যাতে রোজা পালন তাদের জন্য সহজতর হয়। ছেড়ে দেয়া রোজার কাজা পরে আদায় করে রমজানের সংখ্যা যেনো পূর্ণ করা যায়। পাঠভিন্নতার কারণে আয়াতের এরকম অর্থও গ্রহণ করা যায় যে, আল্লাহ্পাক তোমাদের প্রতি সহজতর পন্থার ইচ্ছে রাখেন যেনো তোমরা গণনাকৃত কাজা রোজা আদায় করে রমজান মাস পূর্ণ করো ও আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করো।

এবং তোমাদের সৎপথে পরিচালনা করবার জন্য তোমরা আল্লাহ্র মহিমাকীর্তন করবে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে— এ কথার অর্থ তোমরা হেদায়েতের (পথপ্রদর্শনের) জন্য আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, তোমরা আল্লাহ্ পাকের ওই সকল বিষয়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো যার প্রতি তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন। এই পথ প্রদর্শনের কারণেই তোমরা আল্লাহ্পাকের সন্তোষ অর্জনের সুযোগ পেয়েছো— নিষ্কৃতির নিয়ম কানুন জেনেছো এবং পুণ্য লাভের অধিকারী হয়েছো। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, এ আয়াতে 'ওয়া লিতুকাব্বেরুল্লাহ্' শব্দটির অর্থ হবে ঈদুল ফিতরের তকবীর সমূহ। হজরত ইবনে মুসাইয়েব, ওরওয়া এবং আবী সালমা থেকে শাফেয়ী বর্ণনা করেছেন, তখনকার জনতা ঈদুল ফিতরের রাতের তকবীর উচ্চস্বরে পাঠ করতেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে যে তকবীরের কথা বলা হলো তা ঈদুল ফিতরের রাতের নয়, দিনের তকবীর মনে করতে হবে।

আমি বলি, এখানে তকবীর অর্থ সম্ভবত ঈদের নামাজ অথবা নামাজের অন্তর্ভূত তকবীর সমূহ। এ মর্মটি গ্রহণ করলে একটি শরিয়তের বিধানের উদ্ভব হয়। বিধানটি হচ্ছে, ঈদের তকবীর ওয়াজিব এবং ঈদের নামাজও ওয়াজিব। যেহেতু নামাজ ব্যতীত দিবা রাত্রির তকবীর সমূহ কারুর নিকট ওয়াজিব নয়; তাই নামাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত তকবীরগুলো ওয়াজিব। পক্ষান্তরে 'অংশও মূলের সঙ্গে'— এ নিয়মে ঈদের নামাজও ওয়াজিব বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের যেহেতু কয়েকরকম ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব তাই ঈদের নামাজকে ফরজ বলা যায় না। মহানবী স. ঈদের নামাজের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন, তাই এই নামাজ ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ্ পাকই সমধিক জ্ঞাত।

রমজান মাস ও রোজার মাহাত্ম্যঃ হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন— রমজান মাসের শুভাগমন ঘটলে শয়তান ও বিদ্রোহী জ্বিনগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। দোজখের সবগুলো দরোজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং উন্মোচিত করে দেয়া হয় জান্নাতের সকল তোরণ। নেপথ্যের ঘোষক এই মর্মে ঘোষণা দেন, হে কল্যাণ অন্বেষণকারী, হে পরিত্রাণকামী— জাহান্নামের পথযাত্রা বন্ধ করো। এই ঘোষণা দেয়া হয় রমজানের প্রতিটি রাতে।

www.eelm.weebly.com

তিবরানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে হজরত ওমরের বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, যারা রমজান মাসে আল্লাহ্ পাকের জিকির করে তারা ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। যারা প্রার্থনা করে তারা বঞ্চিত হয় না। আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. বলেছেন, যারা বিশুদ্ধ নিয়তে পুণ্য লাভের আশায় রমজানের রোজা পালন করে তাদের অতীতের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। ক্ষমা করে দেয়া হয় ওই ব্যক্তির সকল গোনাহ্ও যে বিশুদ্ধচিত্তে পুণ্যপ্রাপ্তির অভিলাষে কৃদরের রাত্রিতে নামাজরত থাকে। বোখারী, মুসলিম। হজরত সালমান বর্ণনা করেছেন, রসুল পাক স. শাবানের ত্রিশ তারিখে প্রদত্ত ভাষণে বললেন, উপস্থিত জনমন্ডলী! এক মহামর্যাদাশালী মাসের শুভাগমন ঘটেছে। এ মাস অত্যন্ত বরকত পূর্ণ। এ মাসের মধ্যে রয়েছে লাইলাতুল কৃদর যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ্পাক এ মাসের রোজা ফরজ করে দিয়েছেন আর রাতের নামাজকে করেছেন নফল। এমাসে কোনো উত্তম কর্ম সম্পাদন করলে ফরজ আমল প্রতিপালনতুল্য সওয়াব দেয়া হয়। এই মাসে একটি ফরজ সত্তরটি ফরজতুল্য। এ মাস সবরের মাস। আর সবরের প্রতিদান হচ্ছে বেহেশ্ত। এ মাস (আল্লাহ্র ভয়ে বা মহব্বতে) ক্রন্দনের মাস। এ মাসে রিজিক বৃদ্ধি পায়। যে একজন রোজাদারকে ইফতার করায় তার পাপ মোচন হয় এবং সে একজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দেয়ার প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। নিজের রোজার পুণ্য তো সে পাবেই তদুপরি পাবে আরেক রোজাদারের সমান সওয়াব। এই ভাষণ শুনে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, সকলের তো আর ইফতার করানোর সামর্থ নেই। রসুল পাক স. বললেন, এক চুমুক দুধ অথবা একটি খেজুর কিংবা এক কোষ পানি দ্বারা কাউকে ইফতার করালেও সে বর্ণিত প্রতিদানসমূহ পাবে। আর যে ব্যক্তি রোজাদারকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানাহার করাবে আল্লাহ্ পাক আমার হাউজে কাউসার থেকে তাকে এমন পরিতৃপ্ত করাবেন যে, জান্নাতে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত সে আর পিপাসিত হবে না। এ মাসের প্রথম ভাগে রহমত, মধ্যভাগে মাগফেরাত এবং শেষ ভাগে (দোজখ থেকে) পরিত্রাণ। চারটি অভ্যাস তোমাদের আয়ত্তে রাখা উচিৎ। দু'টি অভ্যাস তাঁর সন্তোষ লাভের উপায়। ১. এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। ২. কেবল তাঁর নিকটই ক্ষমা ভিক্ষা করা।

অপর দু'টি আমল হচ্ছে। ১. জান্নাত যাঞ্ছা করতে থাকা। ২. জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি চাওয়া। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী বলেছেন, রসুলুল্লাহ স. এরশাদ করেন— আদম সন্তানেরা প্রতিটি পুণ্য কর্মের জন্য দশ থেকে সাতশ গুণ কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। রোজা ওই পুণ্য কর্ম সমূহের মধ্যে পড়ে না। রোজা সম্পর্কে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, রোজা আমার জন্য (করা হয়) তাই আমি রোজার প্রতিদান (দাতা)। তারা আমার উদ্দেশ্যেই পানাহার, রতিক্রিয়া পরিত্যাগ করে।

রোজাদারের জন্য রয়েছে দু'টি আনন্দ। একটি ইফতারের আর অন্যটি আল্লাহ্ সন্দর্শনের, যা জান্নাতে সংঘটিত হবে। আল্লাহ্ পাকের নিকট রোজাদারের মুখের

www.eelm.weebly.com

গন্ধ মেশ্‌ক আম্বরের চেয়েও প্রিয়। শুনে রাখো, রোজা হচ্ছে ঢাল (রক্ষাকবচ)। রোজাদারদের উচিৎ তারা যেনো অনাবশ্যক বাক্যালাপ থেকে বিরত থাকে। কেউ যদি রোজাদারকে অন্যায় কথা বলে বচসায় লিপ্ত হতে চায় তবে তাকে বিনয়ের সঙ্গে বলো, আমি রোজাদার। বোখারী, মুসলিম। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল করীম স. বলেছেন— রোজা এবং কোরআন পাক কিয়ামতের দিন বান্দাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে পরোয়ারদিগার! আমি এই ব্যক্তিকে রমজান মাসের দিবাভাগে পানাহার ও রতিকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম; কাজেই তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো। কোরআন বলবে, হে বিশ্বসমূহের প্রতিপালক! আমি এই ব্যক্তির নিশিথের নিদ্রা হরণ করেছিলাম; কাজেই তুমি আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। বায়হাকী। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল আকরম স. বলেছেন— রমজানের শেষ রাতে আমার উম্মত ক্ষমা লাভ করে। একজন বললো, হে প্রিয়তম নবী! সে রাত কি ক্বদরের রাত? তিনি স. বললেন, না (বরং রমজান মাসের সকল রাত)। শ্রম শেষে শ্রমিক তার মুজুরী পায়। বান্দাও তার ফরজ রোজা আদায়ের বিনিময়ে শেষ রাতে মাগফেরাত লাভ করে। আহমদ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া, আবুশ শাইখ ও অন্যান্যরা জারীর বিন আব্দুল হামিদ সিজিস্তানীর পদ্ধতিতে, তিনি সুল্লাত বিন হাকেম বিন জোবায়ের বিন জোবাইর থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন— এক বেদুঈন রসুল পাক স. এর নিকটে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের মহান প্রতিপালকের অবস্থান কতোদূরে। যদি তিনি নিকটে থাকেন তবে আমরা অনুচ্চস্বরে প্রার্থনা জানাবো। আর যদি তিনি দূরবর্তী হন তবে আমরা উচ্চস্বরে আমাদের প্রার্থনা পেশ করবো। বেদুঈনের কথা শুনে রসুলপাক স. নীরব হয়ে গেলেন। তখন অবতীর্ণ হলো—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৬

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ○

www.eelm.weebly.com

❒ আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে আমি তো নিকটেই থাকি। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে তাহার আহবানে সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারে।

হাসান থেকে আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, একবার সাহাবায়ে কেরাম রসুলুল্লাহ্ স. এর নিকট আরজ জানালেন, হে অনুগ্রহের নবী! আমাদের প্রতিপালকের অবস্থান কোথায়? এই প্রশ্নটির প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। আমি বলি, বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইতোপূর্বে বলা হয়েছে এরকম প্রশ্ন করেছিলো এক বেদুঈন। হজরত আলী থেকে ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, রসুলে পাক স. বলেছেন, তোমরা দোয়ার ব্যাপারে স্বল্পতাকে প্রশ্রয় দিওনা, কেনোনা 'তোমরা আমার নিকট দোয়া করো আমি কবুল করবো'— আল্লাহ্পাক এ আয়াত আমার উপর অবতীর্ণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আমাদের প্রিয়তম নবী! আমরা কি করে বুঝবো কখন দোয়া করতে হবে। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এর শানে নুজুল সম্পর্কে বাগবী বলেছেন, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে আবু সালেহ্র মাধ্যমে কালাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মদীনার ইহুদীরা রসুলুল্লাহ্ স. এর নিকট জানতে চাইলো, হে মোহাম্মদ! আমাদেরকে বলে দিন আমাদের প্রতিপালক আমাদের প্রার্থনা কিরূপে শ্রবণ করেন। আপনি বলে থাকেন, প্রথম আসমানের দূরত্বই পাঁচ শত বছরের পথের দূরত্বের সমান আর প্রতিটি আসমান একে অপরের নিকট থেকে পাঁচ শত বছর পথের দূরত্বে অবস্থিত। তাহলে তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন কিভাবে? আয়াতটি নাজিল হয় এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে।

আমি বলি, আয়াতে বলা হয়েছে 'আমার দাসগণ'— এরকম মর্যাদাপূর্ণ সম্বোধন ইহুদীদের সঙ্গে সম্বোধিত হতেই পারে না। ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে প্রশ্নটি ছিলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের মহান প্রতিপালক কতোদূরে? তিনি যদি নিকটে হন তবে আমরা অনুচ্চস্বরে দোয়া করবো, আর দূরে হলে উচ্চস্বরে দোয়া করবো। এই ঘটনাটি যদি আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হয়, তবে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, জিকির গোপনেই করা উচিৎ। হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, খায়বার যুদ্ধের সময় সেখানে উপস্থিত হয়ে সাহাবাগণ একটি উপত্যকায় বিচরণ করছিলেন এবং উচ্চস্বরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার' পাঠ করছিলেন। রসুল পাক স. তাঁদেরকে ডেকে বললেন, হে জনতা! তোমরা আপন সত্তার প্রতি অনুকম্পাপরবশ হও। তোমরা কোনো বধির ও অনুপস্থিত সত্তাকে আহবান করছো না, বরং এমন পরম সত্তাকে ডাকছো যিনি অত্যধিক শ্রবণকারী এবং অতিনিকটে এবং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। বোখারী। কোরআন মজীদের ভাষ্যকারগণ বলেছেন, 'ইন্নি ক্বরীব' বাক্যটির মর্ম হলো জ্ঞানের দিক থেকে আমি তোমাদের নিকটে, কোনো

www.eelm.weebly.com

বস্তুই আমার জ্ঞান বহির্ভূত নয়। বায়যাবী বলেছেন, 'ইন্নি ক্বরীব' বাক্যটি মানুষের বোধের অনুরূপ সাদৃশ্যপূর্ণ অবস্থায় উচ্চারিত হয়েছে। নতুবা তিনিতো শ্রুতির রীতিনীতি ছাড়াই মানুষের কর্ম, কথোপকথন ও অবস্থা সম্পর্কে সতত জ্ঞাত।

আমি বলি, কোনো কোনো ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় বর্ণিত সন্নিকটবর্তীতা স্থানগত অর্থরূপে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি তো স্থান, কাল ও পাত্রের অতীত। উপমা ও সাদৃশ্য থেকে তিনি পবিত্র। তাঁর কোনো উপমা হয় না। নিকট বা দূর শব্দ দু'টির প্রয়োগ ঘটতে পারে কেবল আকার বিশিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে। বস্তুনিচয় একে অপরের নিকটে দূরে কিংবা উপরে নিচে বামে দক্ষিণে অবস্থান করে। এ ধরনের নৈকট্যচিন্তাও আল্লাহ্ পাকের জন্য অচল। প্রত্যাদেশজাত বাণী কেবল তাঁর অবস্থান নির্ণায়ক ধারণা দিতে সক্ষম। বিষয়টি এভাবে বুঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে— যেমন একটি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা। তার বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটায় সকল বস্তু আলোকিত। এখন প্রশ্ন, ওই আলোচ্ছটা এবং অগ্নিশিখা কি অভিন্ন না ভিন্ন? যদি বলা যায় অভিন্ন তবে প্রশ্ন উঠবে অগ্নিশিখায় রয়েছে দহনক্রিয়া। কিন্তু আলোকচ্ছটায় তা নেই। অগ্নিশিখা পোড়ায়। কিন্তু আলোকচ্ছটা পোড়ানোর ক্ষমতা রহিত। পুনশ্চ যদি প্রশ্ন করা হয়, অভিন্ন যদি না হবে তবে অগ্নিশিখা নিভিয়ে দেয়া হলে আলোকচ্ছটাও অপসৃত হয় কেনো? অতএব সিদ্ধান্তে আসতে হবে— আলো ও অগ্নিশিখা অভিন্ন নয়। আবার ভিন্নও নয়। আবার একথাটিও ভালো করে বুঝে নিতে হবে, আলোর সূচনা অগ্নিশিখার সন্নিকটেই, কিন্তু তার বিস্তার দূরবর্তী। আবার আলোকচ্ছটার অন্তিমে রয়েছে অন্ধকার। মানুষের অজ্ঞতার ওই অন্ধকার, আলোকচ্ছটার স্পর্শ না পেলে নিকট ও দূরের রহস্য সমুদ্ভাসিত হয় না। আল্লাহ্ পাকই সমধিক জ্ঞাত।

'তারা আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক'—একথার অর্থ, তারা যেনো দৃঢ় ধারণা রাখে যে, আমি একমাত্র দোয়া কবুলকারী (তাদের ডাকে আমি সাড়া দেই। সুতরাং তারা যেনো আমার ডাকে সাড়া দেয়)। দোয়া হচ্ছে ইবাদত। কেউ কেউ বলেছেন, 'ফাল ইয়াসতাজিবু লি (তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক)' এই বাক্যটির অর্থ, আমি যখন তাদের দোয়া কবুল করি, তখন তাদেরও উচিত আমার আনুগত্যের নির্দেশ অবতীর্ণ হলে তারা যেনো তা সাথে সাথে মেনে নেয়। 'ওয়াল ইউ'মিনুবি' বাক্যটির অর্থ ইমানের উপর দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা। তাই বলা হয়েছে, 'আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক।' একথার মাধ্যমে আরো বুঝা যায় যে, সম্বোধনকৃতরা অবিশ্বাসী নয়, বরং বিশ্বাসী। পূর্ব থেকেই তাঁরা ইমানদার ছিলেন। সেই ইমানকেই এখানে জোরদার করতে বলা হয়েছে। বাক্যটির সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হবে এই- সাধারণ ইমান গ্রহণের পর তারা যেনো তাদের কুপ্রবৃত্তিকে বিলোপ করে প্রকৃত ইমান (ইমানে হাকিকি) অর্জন করে।

www.eelm.weebly.com

আয়াত শেষে বলা হয়েছে, 'যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে (লাআল্লাহুম ইয়ারশুদুন)। এখানে 'রুশদ' শব্দটির অর্থ, গন্তব্যে পৌঁছানো। শব্দটি 'গাই' (ভ্রষ্টতা শব্দের বিপরীতার্থক)।

'আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই'— — এ বাক্যটি সম্পর্কে যদি কেউ প্রশ্ন তোলে, আল্লাহ্ পাক এখানে দোয়া কবুলের অঙ্গীকার করেছেন। আর অঙ্গীকার ভঙ্গ তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, অনেকে দোয়া করে কিন্তু তাদের দোয়া কবুল হয় না। বাগবী বলেছেন, বিষয়টির বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। ১. কারো কারো মত হচ্ছে, এখানে দোয়ার অর্থ, আনুগত্য এবং কবুল করার অর্থ সওয়াব প্রদান করা। এই ব্যাখ্যাকে মেনে নিলে প্রশ্নের অবকাশ আর থাকে না। ২. কেউ কেউ বলেছেন, বাক্যটির মর্ম হচ্ছে, আমি যদি ইচ্ছা করি তবে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা মঞ্জুর করি। যেমন, অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'ফাইয়াকশিফু মা তাদউনা ইলাইহি ইনশাআ।' অর্থাৎ বিপদমুক্তির জন্য তোমরা যে প্রার্থনা করছো, আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে সে বিপদ বিদূরিত করতে সক্ষম। একথার মাধ্যমে 'আল্লাহ্ পাক আমাদের ডাক শোনেন না'— অবিশ্বাসীদের এই অপবিশ্বাসের অপনোদন করা হয়েছে। ৩. এরকম অর্থ করা যেতে পারে যে, হ্যাঁ আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো বটে, যদি তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণবহ হয়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে— মহানবী স. এরশাদ করেছেন, যদি তোমরা পাপাভিলাষী না হয়ে অথবা আত্মীয়তার সূত্র ছিন্ন করার লক্ষ্যে দোয়া না করে এবং তাড়াহুড়া না করে দোয়া করো, তবে আল্লাহ্ পাক দোয়া কবুল করবেন। সাহাবাগণ বললেন, তাড়াহুড়া না করে দোয়া করা আবার কী রকম? তিনি স. বললেন, তোমরা বলে থাকো, আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এতো দোয়া করলাম, তবু তুমি কবুল করলে না! এরকম মনোভাব নিয়ে তোমরা দোয়া করা ছেড়ে দাও। মুসলিম। ৪. এরকম ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, বান্দা যদি কোনো বিষয় কামনা না করে, তবে আমি তার দোয়া কবুল করি। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে দোয়া কবুল করার অর্থ হবে, আমি তার ডাক শুনি। ৫. কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, আল্লাহ্ পাক প্রার্থনাকারীর সকল প্রার্থনা কবুল করেন। তকদীরের অনুকূল হলে প্রার্থনাকারীর কাঙ্খিত প্রাপ্তি ঘটে। আর তকদীরের প্রতিকুল হলে সেই দোয়ার বদৌলতে সে পৃথিবীতে কোনো অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণ পায়। অথবা পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করে। হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে পাক স. বলেছেন, আল্লাহ্ পাক প্রার্থনাকারীকে তার প্রার্থিত বিষয় দান করেন, অথবা কোনো অমঙ্গল তার উপর থেকে সরিয়ে দেন— যদি সে নিষিদ্ধ বস্তুর জন্য প্রার্থনাকারী না হয়, অথবা স্বজন বিচ্ছিন্নতাকামী না হয়। বাগবী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— মহানবী স. বলেছেন, যে

www.eelm.weebly.com

মুসলমান তার প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি মনোযোগী হয়, আল্লাহ্ পাক তার প্রয়োজন পূরণ করেন অথবা পরজগতের জন্য সংরক্ষণ করেন। কিছু শাব্দিক পরিবর্তনসহ হজরত জাবের থেকে তিরমিজিও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। ৬. কেউ কেউ আবার এরকম মর্ম গ্রহণ করেছেন যে, মু'মিন ব্যক্তি প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাক সাড়া দেন। তবে প্রার্থনা পূরণ করেন বিলম্বে। কারণ আল্লাহ্ পাক তার আর্তি ও মিনতি শুনতে বড়োই ভালোবাসেন। আল্লাহ্ পাকের প্রিয়ভাজন যাঁরা তাঁদের কারো কারো সঙ্গেই করেন আল্লাহ্ পাক এই আচরণ। আর যারা নৈকট্যরহিত, তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দেন সঙ্গে সঙ্গে। কতিপয় ভাষ্যকারের অভিমত হচ্ছে, দোয়া কবুল হওয়ার জন্য কতকগুলো সীমারেখা ও শর্ত রয়েছে। ওগুলো দোয়ার বাহন স্বরূপ। সীমা ও শর্ত বজায় রেখে দোয়া করলে সঙ্গে সঙ্গে সে প্রার্থনা গৃহীত হয়। নতুবা তার গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। যেমন হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল করীম স. বলেছেন, অবিন্যস্ত কেশাধিকারী বেদনাহত হয়ে আকাশের দিকে তার হস্ত প্রসারিত করলো, তবুও তার প্রার্থনা গৃহীত হলো না। কী করে হবে? তার আহার এবং পরিচ্ছদ ছিলো অবৈধ উপার্জনের। মুসলিম।

আমি বলি, দোয়া কবুল হওয়া না হওয়া সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করা হলো তার সবগুলোই সঠিক। কিন্তু আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, দোয়ার উদ্দেশ্য আসলে কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে, কবুল হওয়া। আল্লাহ্ পাক পরম দাতা। দয়া তাঁর অন্তহীন, ক্ষমতা অপার। এরকম পবিত্র সত্তা কখনো যাঞ্চাকারীকে বিমুখ করতে পারেন না। হজরত সালমান থেকে তিরমিজি ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন- রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেন, তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এবং করুণাপরবশ। তাই যখন তাঁর বান্দা তাঁর নিকট হস্ত প্রসারিত করে, তখন আত্মমর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে তিনি সেই হাত ফিরিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করেন।

পরিশেষে দোয়া মঞ্জুর না হওয়া অথবা মঞ্জুর হতে বিলম্ব হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো প্রচ্ছন্ন রহস্য রয়েছে। অজানা কোনো বাধা বিঘ্নও বর্তমান থাকা সম্ভব। হয়তো কোনো প্রায়শ্চিত্ত কিংবা সীমারেখা ও নিয়মের অনুপস্থিতি প্রার্থনা পূরণকে বিলম্বিত করে দেয়।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৭

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا

www.eelm.weebly.com

عَنكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

☐ সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ জানিতেন যে তোমরা আত্মপ্রতারণা করিতেছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হইয়াছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাহাদের সহিত সঙ্গত হও এবং আল্লাহ্ যাহা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হইতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে এতেকাফরত অবস্থায় তাহাদের সহিত সঙ্গত হইওনা। এইগুলি আল্লাহের সীমারেখা। সুতরাং এইগুলির নিকটবর্তী হইওনা। এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার নিদর্শনাবলী মানব জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তাহারা সাবধান হইয়া চলিতে পারে।

রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে— এখানে 'রফ্স' শব্দটির অর্থ স্ত্রীসম্ভোগ। জুযাজ বলেছেন, 'রফ্স' বলতে আদর, উপভোগ, সম্ভোগ— সবকিছুকেই বুঝায়। আলোচ্য আয়াতে 'রফ্স' শব্দটি 'ইলা' শব্দটির মাধ্যমে বিশেষিত হয়েছে। তাই এখানে 'রফ্স' এর সুনির্দিষ্ট অর্থ হবে স্ত্রীসম্ভোগ। আহমদ, আবু দাউদ এবং হাকেম আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা থেকে এবং তিনি হজরত মুআজ বিন জাবাল থেকে বর্ণনা করেছেন— ইসলামের প্রথমাবস্থায় মুসলমানেরা রাতের প্রথমভাগে পানাহার ও স্ত্রীসম্ভোগ করতেন। শয্যাগ্রহণের পর সকাল পর্যন্ত পানাহার ও সম্ভোগ বন্ধ থাকতো। ফলে রোজা রাখতে হতো ক্ষুধা তৃষ্ণার কষ্ট, অতিরিক্ত কষ্ট সহ্য করে। হিরসা নামের এক আনসারী একদিন পানাহার না করেই এশার নামাজ অন্তেই শুয়ে পড়লেন। সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখন পানাহারের সময় শেষ। তিনি ক্ষুধা ও পিপাসায় অস্থির হয়ে পড়লেন। আরেক ঘটনা ঘটালেন হজরত ওমর। শয়নের পর তিনি স্ত্রী সহবাস করলেন। রসুল আকদাস স. এর নিকট যখন এসকল সংবাদ পৌঁছলো তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াতটি। এই হাদিসটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে ইবনে আবী লায়লার মাধ্যমে।

www.eelm.weebly.com

যদিও তিনি হজরত মুআজ বিন জাবাল থেকে সরাসরি হাদিসটি শোনেননি। কিন্তু হাদিসটির স্বপক্ষে সাক্ষ্য রয়েছে অনেক।

হজরত বারা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন— সাহাবাগণের অভ্যাস ছিলো, রাতের আহারের আগেই তাঁরা শয্যা গ্রহণ করতেন। এভাবে ভোর হতো। তাঁরা পানাহারের সুযোগ পেতেন না। ফলে তাঁদের রোজা প্রতিপালিত হতো অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে। একবার এরকম ঘটলো, হজরত কায়েস বিন সারমা আনসারী ইফতারের সময় তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, খাবার কিছু আছে কি? স্ত্রী বললেন, ঘরে তো কিছুই নেই। আপনিও কর্মক্লান্ত। দেখি কিছু সংগ্রহ করতে পারি কি না। স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন কায়েস। খাদ্য সংগ্রহ করে তাঁর স্ত্রী ঘরে ফিরে দেখলেন, তাঁর স্বামী গভীর ঘুমে অচেতন। ভোর হলো। ঘুম ভাঙতেই তিনি দুর্বলতা অনুভব করলেন এবং বেহুঁশ হয়ে গেলেন। ঘটনাটি রসুল স. কে জানানোর পর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরাও তাদের পরিচ্ছদ— আভিধানিক দৃষ্টিতে এই বাক্যটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। সম্ভাব্য প্রশ্নটি ছিলো, রোজার রাতে স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ হওয়ার কী কারণ? জবাবে বলা হচ্ছে, এ বিষয়ে ধৈর্যধারণ করা সুকঠিন। স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। এই অতিনৈকট্যের কারণে মনে হয় যেনো তারা একে অপরের পরিচ্ছদ। সম্ভোগবিরতি অত্যন্ত কঠিন বলেই একে বৈধতা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমরা একে অপরের আবরণ (লেবাস)।' অথবা এরকম অর্থ হতে পারে- পরিধেয় বস্ত্র যেমন শরীরাচ্ছাদনকে নিশ্চিত করে, তেমনি স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে পরগামীতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। তাই হাদিস শরিফে বলা হয়েছে, যে বিয়ে করলো, সে ইমানের দুই তৃতীয়াংশ অর্জন করলো।

আল্লাহ্ পাক জানতেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে— একথার অর্থ, তোমাদের শয়নের পরের স্ত্রীসম্ভোগ সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত। এহেন ধৈর্যচ্যুতি আত্মঅত্যাচারের নামান্তর। এতে করে তোমাদের পুণ্যার্জনে লঘুতাকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছিলো।

হজরত জাবের থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন- যখন রমজানের রোজা ফরজ করা হলো, তখন সাহাবাগণ সারা রমজান মাস স্ত্রীগ্রহণ করতেন না। এতদসত্ত্বেও কোনো না কোনো বিচ্যুতি ঘটে যাচ্ছিলো। তাই আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। ইমাম আহমদ, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম আব্দুল্লাহ্ ইবনে কা'বের পদ্ধতিতে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন—তখনকার নিয়ম ছিলো, শয্যাগ্রহণের আগেই পানাহার এবং স্ত্রীগমণ সম্পন্ন করা। শয়নের পর আর এ দু'টি কর্ম বৈধ নয়। একবার রসুল পাক স. এর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে বিলম্বে গৃহে ফিরে এলেন হজরত ওমর। তিনি তাঁর স্ত্রীকে সহবাসের আকাঙ্খা জানালেন। স্ত্রী বললেন, আমি তো শয়ন করেছিলাম। হজরত ওমর বললেন, আমি তো আর শয়ন

www.eelm.weebly.com

করিনি। এরপর তিনি স্ত্রীগমন করলেন। ওদিকে হজরত কা'ব বিন মালেকও এরকম করলেন। সকালে বিষয়টি রসুলে করীম স. এর গোচরীভূত করা হলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। বাগবী বলেছেন, ইসলামের প্রথম দিকে এশার নামাজের আগে যদি কেউ শুয়ে পড়তো তবে অবশিষ্ট রাতের জন্য পানাহার ও সহবাস নিষিদ্ধ হয়ে যেতো। হজরত ওমর একদিন এই নিষিদ্ধতা ভেঙে ফেললেন। পরদিন তিনি রসুল আকদাস স. এর নিকট ঘটনাটি জানালেন। তিনি স. বললেন, ওমর। তোমার পক্ষে এমতো আচরণ শোভনীয় হয়নি। তখন আরো কিছুসংখ্যক সাহাবী দাঁড়িয়ে স্বীকার করলেন যে, এরকম ঘটনা আমাদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। তখনই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

এরপরের বাক্যে এমর্মে সাক্ষ্য এসেছে, তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়ে তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে রাতের যে কোনো অংশে সঙ্গত হওয়া বৈধ।

আল্লাহ্ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা করো— একথার অর্থ, আল্লাহ্পাক তোমাদের ভাগ্যে যে সন্তান-সন্ততি নির্ধারণ করেছেন, স্ত্রীসম্ভোগের মাধ্যমে সেই নির্ধারণের অন্বেষী হও। একথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, সন্তান কামনাই স্ত্রীসম্ভোগের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ইন্দ্রিয়ের চাহিদা পূরণই যেনো প্রধান উদ্দেশ্য না হয়। রসুলে আকদাস স. এরশাদ করেছেন, তোমরা এমন রমণীকে বিবাহবদ্ধ করো, যে তার স্বামীকে ভালোবাসে এবং অধিক সন্তান প্রসবের যোগ্যা হয়। কেনোনা তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি অন্য নবীদের উম্মতের সংখ্যা অতিক্রম করার গর্ব অনুভব করবো। হজরত মা'কাল বিন ইয়াসের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও নাসাঈ। আয়াতের এই বাক্যটি দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়- সহবাসের সময় আজল (স্ত্রী অঙ্গের বাইরে শুক্রপাত করা) মাকরূহ (অনভিপ্রেত)। বাক্যটির মাধ্যমে একথাও বোঝা যায় যে, যথাঅঙ্গের মাধ্যমে সম্ভোগ তৃষ্ণা চরিতার্থ করা মোবাহ্ (বৈধ)। বাগবী বলেছেন, হজরত মুআজ বিন জাবালের মতে 'মা কাতাবাল্লাহু লাকুম' বাক্যটির মর্ম লাইলাতুল ক্বদর। আমি বলি, বাক্যটির বাকভঙ্গিমা অভিমতটিকে সমর্থন করে না।

'আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হইতে উষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়'— এই বাক্যে উল্লেখিত 'খাইতে আব্ইয়াদ' অর্থ দিবসের আলো এবং 'খাইতি আসওয়াদ' অর্থ রাত্রির কৃষ্ণতা। ফজরের সূচনায় পুবের আকাশে উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত দীর্ঘ একটি রেখা পরিদৃষ্ট হয়। ওই রেখাকে নির্দেশ করতেই এখানে 'খাইত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'খাইতিল আবইয়াদ' ফজর (দিন) হলে 'খাইতিল আসওয়াদ' অর্থ রাত্রি হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়। 'মিনাল ফাজরি' বাক্যাংশটির মিন অব্যয়টি আংশিক অবস্থাকে প্রকাশ করে। আর 'খাইতিল আবইয়াদ' ফজরের অবস্থা প্রকাশক। এখানে ফজর অর্থ ফজরের কিয়দাংশ। ফজর প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত— এরকম কথা এখানে বলা

www.eelm.weebly.com

হয়নি। কারণ, ফজরের ন্যূনতম চিহ্ন প্রকাশের সাথে সাথে পানাহার হারাম হয়ে যায়। এই ন্যূনতম চিহ্নকে বলে সুবহে কাজেব (বঙ্গানুবাদে যদিও সরাসরি বলা হয়েছে উষার শুভ্ররেখা স্পষ্ট হওয়ার কথা। সে অবস্থার নাম আসলে সুবহে সাদেক)। সুবহে কাজেব এবং সুবহে সাদেকের পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য এরকম বাকভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে পশ্চিমাকাশে দৃষ্ট হয় কৃষ্ণরেখা। তারপর পুবাকাশে দৃষ্ট হয় উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত একটি দীর্ঘ শুভ্ররেখা। ওই শুভ্ররেখাটি ফজরে কাজেব। আর কৃষ্ণরেখাটি সুবহে কাজেব। তারপর যে শুভ্ররেখাটি প্রকাশিত হয়, তা হচ্ছে সুবহে সাদেক। এজন্য ফজরের কৃষ্ণরেখা ও শুভ্ররেখা দু'টিকেই পানাহারের শেষসীমানা নির্দেশ করা যায়। শেষ সীমানাটি স্পষ্ট হওয়া অর্থ— সীমাচিহ্নটি দৃষ্টিগোচর হওয়া। পূর্ণ উদ্ভাসিত হওয়া নয়। পূর্ণ উদ্ভাসিত বা স্পষ্ট কথাটির উপর জোর দিলে সীমাচিহ্নটি আর থাকে না।

হজরত সামুরা বিন জুন্দুব থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুলপাক স. বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা বেলালের আজান এবং সুবহে কাজেবের কারণে পানাহার বন্ধ কোরো না। ওই সময় বন্ধ কোরো যখন সুবহে সাদেক হয়। তিরমিজি। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- রসুলুল্লাহ্ স. বলেন, বেলাল রাত থাকতেই আজান দেয়। তোমরা ইবনে উম্মে মাকতুমের আজান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারো। বর্ণনাকারী বলেছেন, হজরত ইবনে উম্মে মাকতুম ছিলেন অন্ধ। সুবেহ সাদেক হয়েছে- একথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি আজান দিতেন।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি আসার (সাহাবাগণের উক্তি) জটিলতার অবতারণা করেছে। যেমন, হজরত আলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি ফজরের নামাজ সমাপ্ত করার পর বলতেন, এখন শুভ্ররেখা ও কৃষ্ণরেখার পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এই বর্ণনাটি করেছেন ইবনে মুনজির। তিনি বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত আবু বকরের উক্তি হিসেবে আরো বর্ণনা করেছেন, যদি পানাহারের আগ্রহ অনুভব না হতো তবে আমি সেহরী করতাম ফজরের নামাজের পর। ইবনে মুনজির, ইবনে আবী শাইবা হজরত আবুবকর থেকে আরো একটি বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, তিনি (হজরত আবুবকর) ফজর সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত গৃহের দরোজা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণিত আসারগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, সুবহে সাদেক হওয়ার পরও পানাহার করা যায়। এ জটিলতা নিরসনের উপায় কী? আমি বলি, অদৃশ্যের সংবাদ আল্লাহ্পাকই ভালো জানেন। তবে আমার মতে, এসকল আসার দ্বারা বোঝা যায়— মিনাল ফাজরি কথাটির মিন অব্যয়টির অর্থ, হজরত আবু বকর ও হজরত আলীর নিকট সববীয়া বা কারণ সঙ্গত। আর 'খাইত' অর্থ প্রকৃত রেখা। অথচ হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে— মিন অব্যয়টির অর্থ বর্ণনামূলক বা বয়ানিয়া। আর 'খাইতিল আবইয়াদ' অর্থ সুবহে সাদেক। এই সমাধানটি ঐকমত্যাগত। হজরত আদী বিন হাতেম থেকে বর্ণিত হয়েছে— 'যখন কৃষ্ণরেখা থেকে উষার

www.eelm.weebly.com

শুভ্ররেখা স্পষ্টভাবে...' এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন আমি একটি কালো এবং একটি শাদা সুতা বালিশের নিচে রেখে দিলাম। কিন্তু রাতে আমি সুতা দু'টির বর্ণনির্ণয় করতে পারলাম না। সকালে রসুল আকরম স. এর নিকট আমি বিষয়টি নিবেদন করলে তিনি বললেন, আয়াতে এ কথার দ্বারা রাতের অন্ধকার এবং দিনের আলোকে বুঝানো হয়েছে। বোখারী, মুসলিম। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. বললেন, তোমরা স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন। এখানে বিষয়টি হচ্ছে, দিবসের আলো ও নিশীথের আঁধার।

হজরত সহল বিন সা'দ থেকে বর্ণিত হয়েছে- এই আয়াতটির সঙ্গে প্রথমে মিনাল ফাজরি কথাটি ছিলো না। তাই কতিপয় সাহাবী তাঁদের পায়ে শাদা ও কালো সুতা বেঁধে রাখতেন। সুতা দু'টি স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা পানাহার করতেন। তারপর যখন মিনাল ফাজরি বাক্যাংশটি অবতীর্ণ হয়ে মূল বাক্যের সঙ্গে সংযোজিত হলো, তখন সকলে বুঝতে পারলেন, এখানে কৃষ্ণরেখা ও শুভ্ররেখা কথা দু'টোর অর্থ হবে রাত ও দিন। বোখারী, মুসলিম। প্রশ্ন উঠতে পারে, বর্ণিত হাদিসানুযায়ী মিনাল ফাজরি কথাটি অবতীর্ণ হয়েছে কিছুদিন পরে। যদি তাই হয়, তবে বাক্যাংশের (মিনাল ফাজরি) এমতো সংযোজন ভাষাবিদগণের নিকট সুসঙ্গত বলে গৃহীত হয় না। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনের সময় কথাটি মূল বাক্যের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় অবতীর্ণ হয়নি। আমি বলি, শাদা ও কালো রেখা বলতে দিন ও রাতকেই বুঝায়——এরকম ধারণা সুপ্রচলিত। কোনো বর্ণনাবিশ্লেষণের আবশ্যকীয়তা এখানে নেই। কতিপয় ব্যক্তি যদি স্বল্পবুদ্ধির কারণে ভিন্নতর অর্থ গ্রহণ করে তবে তা অবোধ্য বা দুর্বোধ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। তবে এটি একটি সমস্যা বটে। মানতে হবে বক্তব্যের পূর্ণ উন্মোচন এখানে ঘটেনি। তাই পরবর্তীতে মিনাল ফাজরি কথাটি সংযুক্ত করে বক্তব্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো হয়েছে। এতে করে স্বল্পবুদ্ধিজাত সমস্যা আর সৃষ্টি হবে না। বিষয়টি হবে তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট ও সহজ। বিষয়টিকে যদি দুর্বোধ্য বলে চিহ্নিত করা হয়ও, তবুও জটিলতার প্রশ্ন এখানে নেই। কারণ, বিধানদাতার (আল্লাহ্‌র) প্রত্যাদেশের ধরণ দু'টি। একটি হচ্ছে, ওহীয়ে মাতলু। আরেকটি হচ্ছে, ওহীয়ে গায়ের মাতলু। কোরআন হচ্ছে, ওহীয়ে মাতলু আর হাদিসকে বলা হয় ওহীয়ে গায়ের মাতলু। ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত আদী বিন হাতেমের হাদিস (ওহীয়ে গায়ের মাতলু দ্বারা) বিষয়টির ধারণা স্পষ্ট করা হয়েছে।

তাহাবী বলেছেন, খাইতিল আবইয়াদ ও খাইতি আসওয়াদ দু'টি শব্দের অর্থই স্পষ্ট। 'মিনাল ফাজরি' কথাটি তার নাসেখ বা রহিতকারী। তাহাবীর সমর্থনে রয়েছে হজরত হুজায়ফা বর্ণিত একটি হাদিস যেখানে বলা হয়েছে- আমরা মহানবী স. এর সঙ্গে এমন সময় সেহেরী করেছি, যখন দিনের আলো প্রস্ফুটিত ছিলো। শুধু সূর্য ওঠা বাকি ছিলো। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন মানসুর। এটা কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, মিনাল ফাজরি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে হজরত

www.eelm.weebly.com

হুজায়ফা রসুল পাক স. এর সঙ্গে সেহেরী করেছেন। একথা মেনে নিলেও সমস্যা থেকে যায়। সেগুলো হচ্ছে— ১.'মিনাল ফাজরি' কথাটি পূর্ণ বাক্য নয়। অথচ রহিতকারী বাক্যটি একটি পূর্ণ বাক্য হওয়াই যুক্তিগ্রাহ্য। ২. যদি ধরে নেয়া যায় মিনাল ফাজরি পরে অবতীর্ণ হয়েছে তবে তা পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে মিলিতরূপ নিলো কী করে? (মিলিত হলে তো একযোগেই অবতীর্ণ হতো)। সুতরাং সমস্যাটি এখানে এই যে, মিনাল ফাজরি কথাটি এখানে রহিতকারী নয় এবং মিলিতও নয়। এই জটিলতার নিরসনে স্বয়ং ভাষ্যকার বলেছেন, বাক্যটি প্রথমে মিনাল ফাজরি ব্যতিরেকেই অবতীর্ণ হয়েছিলো। পুনরায় অবতীর্ণ হয়েছে মিনাল ফাজরি সহযোগে। তাই পরের মিনাল ফাজরি সংযুক্ত পূর্ণ বাক্যটি পূর্বের মিনাল ফাজরি বিহীন বাক্যটিকে রহিত করে দিয়েছে।

বিঃ দ্রঃ হজরত আদী বিন হাতেমের ঘটনাটি ঘটেছিলো পূর্ণ বাক্যটি অবতীর্ণ হওয়ার পর। তার কারণ হচ্ছে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন নবম হিজরীতে। আর রোজার বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়েছে দ্বিতীয় হিজরীতে। আনুমানিক একবছর পর অবতীর্ণ হয়েছে মিনাল ফাজরি সংবলিত বাক্যটি। সুতরাং তিনি বালিশের নিচে সুতা রেখেছিলেন মিনাল ফাজরি এর মিন অব্যয়টির কারণগত অর্থ গ্রহণ করার জন্য। আল্লাহ্পাকই সমধিক জ্ঞাত।

বিঃ দ্রঃ ফজর পর্যন্ত স্ত্রীসম্ভোগ সিদ্ধ— একথায় বুঝা যায়, ফজরের পরে গোসল করা যাবে এবং সূর্যোদয় ঘটার পর নাপাক অবস্থায় থাকলেও রোজা শুদ্ধ হবে। এটা ঐকমত্য। 'অতঃপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর'— এ কথার মাধ্যমে রোজার শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। হজরত ওমর বিন খাত্তাব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যখন সূর্য্য অস্তমিত হয়—দিন শেষে শুরু হয় রাতের অন্ধকার- তখন ইফতারের সময়। বোখারী। সুবহে সাদেক থেকে সূর্য্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্র ইবাদতের উদ্দেশ্যে পানাহার ও রতিকর্ম থেকে বিরত থাকার নাম রোজা। এখানে রোজার এই সংজ্ঞাটি স্পষ্টরূপে উদ্ধৃত হয়েছে। 'সুম্মা আতিম্মু' অর্থ অতঃপর (রোজা) পূর্ণ কর— একথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, রোজার জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (নিয়ত) থাকতে হবে। পূর্ণকরণ কার্য্যটি আমরে এখতেয়ারী (ইচ্ছামূলক কর্ম)। আর ইচ্ছামূলক কর্ম কখনও নিয়ত ছাড়া পূর্ণ হয় না। প্রতিটি ইবাদতের জন্য নিয়ত থাকা ফরজ। রোজাও ইবাদত। তাই রোজার নিয়তও ফরজ। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন 'ওয়ামা উমিরূ ইল্লালিয়া বুদুল্লাহা মুখ্লিসিনা লাহুদ্দিন (আর তাদেরকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে— শুধু তাঁর ইবাদত মনে করে তারা যেনো তাদের উপাসনা সম্পন্ন করে) রসুল স. বলেছেন প্রতিটি কর্মের ভিত্তি হচ্ছে নিয়ত। নিয়তের প্রতি নির্ভর করে কর্মফল। তাই কেউ যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের জন্য হিজরত করে তবে সে তার নিয়তের প্রতিফল পাবে। পার্থিব উদ্দেশ্যে যে হিজরত করবে, পার্থিবতাই হবে তার অর্জন। আবার রমণী লাভের

www.eelm.weebly.com

উদ্দেশ্য যার থাকবে, রমণীপ্রাপ্তিই হবে তার প্রতিফল। এই হাদিসটি ইমাম মালেক ব্যতীত সকল মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বোখারী অবশ্য বর্ণনা করেছেন ইমাম মালেকের মাধ্যমেই। হাদিসটি সর্বজনবিদিত। আর এই বিষয়ে ওলামা সম্প্রদায় একমত যে, উদ্দেশ্যমূলক ইবাদত নিয়ত ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। নিয়তের ভিত্তিতে ইবাদত সুসম্পন্ন হতে হবে। ইবাদতের সম্পূর্ণ পরিসরে থাকতে হবে নিয়তের উপস্থিতি। এরকম সার্বক্ষণিক নিয়ত রক্ষা করা একটি দুরূহ ব্যাপার। তাই বিষয়টি সুরাহা করা হয়েছে এভাবে। নামাজের জন্য নিয়ত করতে হবে তকবীরে তাহরীমার সময়। এই নিয়তই নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রয়েছে বলে গণ্য করা হবে। রোজার নিয়ত করতে হবে সেহেরীর সময়। এই নিয়তই সন্ধ্যা পর্যন্ত (শেষ পর্যন্ত) রয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে, যদি রোজা ভঙ্গ হওয়ার কোনো কারণ না ঘটে। নিদ্রাবস্থায় রোজা থাকা না থাকা কোনটিই স্মরণে রাখা সম্ভব নয়। আবার সর্বক্ষন রোজার কথা মনে রাখাও দুরূহ ব্যাপার। তাই রোজার সূচনালগ্নের নিয়তকেই সার্বক্ষণিক নিয়ত বলে ধরে নেয়া হয়।

সুবহে সাদেক হয়ে গেলে কিংবা সূর্যোদয়ের পর রোজার নিয়ত করলে রোজা সিদ্ধ হবে কিনা সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, শরিয়ত সমর্থিত দিবসের অর্ধাংশ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে রমজানের রোজা, মানতের রোজা ও নফল রোজা শুদ্ধ হবে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, মধ্যাহ্নের পূর্বে নিয়ত করলে কেবল নফল রোজা শুদ্ধ হবে। অন্য কোনো রোজা শুদ্ধ হবে না। ইমাম মালেক বলেছেন, দিনে নিয়ত করলে কোনো রোজাই শুদ্ধ হবে না। ইমাম মালেকের দলিল হজরত হাফসা বর্ণিত ওই হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোজার নিয়ত না করবে তার রোজা হবে না। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে খুজাইমা, ইবনে মাজা, দারা কুতনী, দারেমী। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে- যে ব্যক্তি রাত থেকেই রোজার দৃঢ় বাসনা না রাখে, তার রোজা হয় না। অন্য আরেক বর্ণনায় রয়েছে— যে ব্যক্তি ফজরের আগে রোজা নির্ধারণ করলো না, তার রোজা হলো না। কেউ যদি এ বিষয়ে আপত্তি তুলে বলে যে, ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রে মারফু প্রমাণিত হয়নি। আবার ইমাম তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি মওকুফ হওয়াই সমধিক শুদ্ধ— এই আপত্তির প্রেক্ষিতে আমাদের জবাব হচ্ছে, ইবনে জুরাইজ ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আবুবকর বলেছেন, হাদিসটি মারফু (সরাসরি রসুল পাক স. এর উক্তি)। দু'জন বর্ণনাকারীই এই হাদিসটি ইমাম জুহরী থেকে, তিনি সালেম থেকে, সালেম তাঁর পিতা থেকে তিনি জননী হাফসা থেকে এবং তিনি মহানবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে জুরাইজ এবং ইবনে আবুবকর দুজনই সেকাহ্। হাদিসটিকে মারফু বললে অতিরিক্ত বলা হয়। কিন্তু যাঁরা সেকাহ্, তাদের অতিরিক্ত কথনও গ্রহণযোগ্য। আর মুহাদ্দিসগণের রীতি হচ্ছে, তাঁরা মুরসাল হাদিসগুলোকে মওকুফ বলেন। আর মওকুফ হাদিসের অধিক

www.eelm.weebly.com

বিশুদ্ধতা মারফু হওয়ার অন্তরায় নয়। ইমাম হাকেম হাদিসটিকে বলেছেন, মারফু প্রকৃতির। তারপর বলেছেন, ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের নীতিমালা অনুযায়ী হাদিসটি শুদ্ধ। মুস্তাদরাক গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইমাম বোখারীর নীতিমালা অনুযায়ী হাদিসটি শুদ্ধ। ইমাম বায়হাকী ও দারেমী বলেছেন, হাদিসটির সকল বর্ণনাকারী সেকাহ্ (বলিষ্ঠ)।

এ বিষয়টির উপর জননী আয়েশা থেকেও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোজা নির্ধারণ করলো না, তার রোজাই হলো না। দারা কুতনী। তিনি বলেছেন, হাদিসটির সকল বর্ণনাকারীই বলিষ্ঠ। কিন্তু এই সূত্র শৃঙ্খলের এক বর্ণনাকারীকে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ইবনে হাব্বান; অন্য এক বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইয়ুবও তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। মায়মুনা বিনতে সা'দ থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি রাত থাকতেই দৃঢ় বাসনা করলো যে, আগামীকাল রোজা রাখবো— তার রোজা শুদ্ধ হবে। আর ফজরের আগে যে এরকম দৃঢ় ইচ্ছা করলো না, তার রোজাই হবে না। এই হাদিসটি বর্ণনাকারীদের একজন ওয়াকেদী। তার সম্পর্কে দারা কুতনীর মন্তব্য হচ্ছে, সে কিছুই নয়।

যারা নফল রোজার জন্য দিবাভাগে নিয়ত করা যথেষ্ট মনে করেন, তাদের সমর্থনে রয়েছে হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসটি— যেখানে তিনি বলেছেন, রসুল স. আমার নিকটে এলে বলতেন, আহারের ব্যবস্থা আছে কি? আমি যদি বলতাম, না। তবে তিনি বলতেন, তাহলে আমি রোজা রাখলাম। একবারের ঘটনা— তিনি আমার গৃহে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার নিকট কিছু হায়স (মধু ও ঘি সহযোগে প্রস্তুত আহার্য বিশেষ) আছে যা হাদিয়া হিসেবে এসেছে। তিনি স. বললেন, নিয়ে এসো, আমি তো সকাল থেকে রোজাদার ছিলাম। মুসলিম। ঘটনাটি আসলে এরকম— রসুল স. বললেন, খাবার আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে। আমি তাহলে রোজাদার। এরপর তিনি বাইরে গেলেন। তখন আমার কাছে হাদিয়া হিসেবে হায়স উপস্থিত হলো। রসুল স. যখন পুনরায় ঘরে এলেন, তখন আমি বললাম, হাদিয়া এসেছে। তিনি স. বললেন, কী বস্তু? আমি বললাম, হায়স। তিনি স. বললেন, নিয়ে এসো। আমি নিয়ে এলাম। তিনি স. হায়স খেয়ে বললেন, সকাল থেকে তো আমি রোজাদার ছিলাম।

ইমাম মালেক হাদিসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, তিনি স. দিবাভাগে নফল রোজার নিয়ত করেছিলেন- একথা ঠিক নয়। বরং নিয়ত তিনি করেছিলেন রাতেই, দিনে সেকথা বলেছিলেন মাত্র। পরে হাদিয়া গ্রহণ করে রোজা ভেঙে ফেলেছিলেন। রোজাটি ছিলো নফল। আর নফল রোজা রেখেও ভাঙা যায়। সকাল

www.eelm.weebly.com

থেকে আমি রোজাদার— একথাটি প্রমাণ করে যে, তিনি রোজার নিয়ত করেছিলেন রাত থাকতেই।

'তোমরা মসজিদে এতেকাফরত অবস্থায় তাদের সাথে সঙ্গত হয়ো না'— এখানে এতেকাফ বলতে 'উকুফ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে— যার আভিধানিক অর্থ কোনোকিছুর উপর অবস্থান করা, স্থির থাকা। শরিয়তবেত্তাগণের ভাষায়, সুনির্দিষ্ট সংকল্প (নিয়ত) সহকারে ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করার নাম এতেকাফ। বাগবী বলেছেন, কতিপয় সাহাবীকে লক্ষ্য করে এই বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা এতেকাফ অবস্থায় স্ত্রীগমণ করতেন— তারপর গোসল সেরে এসে পুনরায় মসজিদে অবস্থান নিতেন। আয়াতের এই বাক্যটি দ্বারা এতেকাফ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সঙ্গম নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গত হলে এতেকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেবল ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ভুলক্রমে স্ত্রী সহবাস করলে যেমন রোজা ভঙ্গ হয় না, তেমনি এতেকাফও ভঙ্গ হয় না।

আমরা বলি, এতেকাফ ও রোজা এক প্রকৃতির ইবাদত নয়। এতেকাফকারীদের অবস্থান প্রকাশ্য। আর রোজা প্রকাশ্যে পরিদৃষ্ট হয় না।

ইমাম হাসান বসরী ও জুহরী বলেছেন, এতেকাফ অবস্থায় স্ত্রীসম্ভোগ করলে শপথের কাফ্ফারার মতো কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু এটা ঐকমত্য যে, এমতাবস্থায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। যদি কামোত্তেজনার বশে স্ত্রীকে স্পর্শ করে কিংবা স্ত্রীকে চুম্বন দেয়— আর তাতে করে যদি রেতপাত হয়ে যায়, তবে এতেকাফ ভেঙে যাবে। রেতপাত না হলে কাজটি হারাম হবে, কিন্তু এতেকাফ ভাঙবে না। ইমাম মালেক বলেছেন, ভাঙবে। আর যদি স্ত্রী স্পর্শের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা না হয়, তবে তাতে দোষ নেই। যেমন হজরত আয়েশা বলেছেন, রসুল স. এতেকাফ অবস্থায় আমার দিকে তাঁর পবিত্র মস্তক প্রসারিত করে দিতেন। আমি তাঁর পবিত্র কেশ চিরুনী করে দিতাম। বোখারী, মুসলিম।

মুসলিমের বর্ণনায় একথাটি অতিরিক্ত রয়েছে— রসুল স. কেবল প্রকৃতিগত প্রয়োজনে অন্দর মহলে আসতেন।

'মসজিদে এতেকাফরত অবস্থায়'— একথার মাধ্যমে বুঝা যায়, মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে এতেকাফ সিদ্ধ নয়। আর মসজিদ অর্থ জামে মসজিদ, ওয়াক্তিয়া মসজিদ নয়। মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববী—— এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের বিশেষত্ব প্রকাশও এখানে উদ্দেশ্য নয়। হজরত হুজায়ফা বলেছেন, ওই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য মসজিদে এতেকাফ শুদ্ধ হবে না। আতা বলেছেন, কেবল মসজিদে হারামেই এতেকাফ শুদ্ধ। ইবনে মুসাইয়েব বলেছেন, এতেকাফ কেবল মদীনার মসজিদের জন্যই সীমাবদ্ধ। ইমাম মালেক বলেছেন, জামে মসজিদে এতেকাফ জায়েয। ইমাম

www.eelm.weebly.com

শাফেয়ীর একটি মতও অনুরূপ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও শত্রুতামূলক কাজ হচ্ছে, বেদাত। আর ওয়াক্তিয়া মসজিদের এতেকাফও বেদাত। বায়হাকী। হজরত আলী বলেছেন, জামে মসজিদ ছাড়া অন্য মসজিদে এতেকাফ শুদ্ধ হবে না। এই উক্তিটি ইবনে আবী শায়বা এবং আব্দুর রাজ্জাক তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। হজরত হুজায়ফা বলেছেন, হে জনতা! জেনে রাখো, আমি এ বিষয়টি উত্তমরূপে অবগত যে, জামে মসজিদ ব্যতীত অন্য স্থানে এতেকাফ সিদ্ধ নয়। তিবরানী। ইবনে জাওজী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— হজরত হুজায়ফা বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্ স. কে বলতে শুনেছি, যে মসজিদে ইমাম ও মুয়াজ্জিন নির্ধারিত রয়েছে, সেই মসজিদে এতেকাফ শুদ্ধ হবে। ইবনে জাওজীর মন্তব্য হচ্ছে, হাদিসটি নিতান্ত দুর্বল। জননী আয়েশা বলেছেন, এতেকাফকারীর জন্য রুগীর পরিচর্যা, জানাযায় অংশগ্রহণ, স্ত্রীস্পর্শ ও সহবাস নিষিদ্ধ। এতেকাফ হতে হবে রোজাবস্থায়। রোজা ব্যতীত এতেকাফ শুদ্ধ নয়। জামে মসজিদ ব্যতীত অন্যত্রও শুদ্ধ নয়। অন্য একটি বর্ণনাতেও রয়েছে একথা।

মাসআলাঃ রমজান মাসের শেষ দশদিন এতেকাফ করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. রমজানের শেষ দশদিন এতেকাফ করতেন। পৃথিবী পরিত্যাগ পর্যন্ত তিনি এই আমল করে গিয়েছেন। তাঁর পবিত্র সহধর্মিনীগণও এতেকাফ করতেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, মহানবী স. রমজান মাসের শেষ দশ দিন এতেকাফ করতেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাসও বলেছেন, রসুল স. রমজানের শেষ দশরাতে এতেকাফ করতেন। কোনো রমজানে করতে না পারলে, পরবর্তী রমজানে করতেন শেষ কুড়ি দিন। তিরমিজি। উবাই বিন কা'ব থেকে আবু দাউদ ও ইবনে মাজাও এরকম বলেছেন।

আমি বলি, রসুল স. ও তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণের মাধ্যমে এতেকাফের বিষয়টি অবশ্যই সুসাব্যস্ত। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবা তা পরিত্যাগ করেছেন।

নাফে বলেছেন, এতেকাফ সওমে বেসালের (পরস্পরমিলিত রোজার) মতো। তিনি স. এতেকাফ করেছেন। কিন্তু অন্যান্যদের করতে নিষেধ করেছেন। আমার ধারণা এতেকাফ অত্যন্ত কঠিন বলে অধিকাংশ সাহাবা এতেকাফে আগ্রহী হননি। তিনি আরো বলেছেন, আবুবকর বিন আব্দুর রহমান ব্যতীত পূর্ববর্তীদের অন্য কারো কাছ থেকে এতেকাফের প্রমাণ নেই। ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, অধিকাংশ সাহাবীর এতেকাফ পরিত্যাগের বিষয়টি সুপ্রমাণিত। আমি বলি, অধিকাংশ সাহাবী যেহেতু এতেকাফ পরিত্যাগ করেছেন, তাই হানাফীগণের মত হচ্ছে এতেকাফ সুন্নতে মোয়াক্কাদা কেফায়া।

'এগুলো আল্লাহ্র সীমারেখা, সুতরাং এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না'— এখানে 'তিলকা' শব্দটি একটি ইঙ্গিতসূচক শব্দ। শব্দটির মাধ্যমে বর্ণিত বিধানাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে— রোজার নিয়ম, নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা, এতেকাফ ইত্যাদি যা

www.eelm.weebly.com

এতোক্ষণ ধরে বর্ণনা করা হলো। 'হুদুদুল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র সীমারেখা— যে সীমারেখার মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। হদ শব্দের আভিধানিক অর্থ বাধা দেয়া— নিষেধাজ্ঞার সীমারেখার মাধ্যমে যে বাধা আরোপিত হয়েছে সেই বাধাকে এখানে বলা হয়েছে হুদুদুল্লাহ্।

'এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না'— এ কথার অর্থ, ওই সকল নিষিদ্ধ বিষয়ের ধারে কাছে যেও না। এরকম বাকভঙ্গি অধিক গুরুত্ববহতাকে প্রকাশ করে (যেমন বলা হয়ে থাকে ওই সব কাজের ফাঁদে পড়ো না)। ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। এতোদুভয়ের মধ্যবর্তীতে রয়েছে সন্দেহ ও প্রতারণা। অনেকে তা উপলব্ধি করতে পারে না। যারা ওই সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে তাঁরা স্বীয় সম্মান ও ধর্মকে রক্ষা করেছে। আর যারা সন্দিগ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে, তারা নিপতিত হয়েছে নিষিদ্ধতায়। যেমন, যে রাখাল সরকারী চারণ ক্ষেত্রের নিকটে পশুপাল চরায়, সরকারী চারণ ক্ষেত্রে ঢুকে পড়া তার জন্য বিচিত্র কিছু নয়। সাবধান হয়ে যাও। রাজার জন্য নির্দিষ্ট চারণ ক্ষেত্র থাকতেই পারে। সর্বসাধারণের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। মনে রেখো, হারাম বিষয়গুলো হচ্ছে আল্লাহ্পাকের সংরক্ষিত চারণ ক্ষেত্র। কাজেই যারা সেই সংরক্ষিত চারণ ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করবে তারা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য হবে। হারাম কার্য্যের নিকটবর্তী হওয়াও হারাম। তাই আমাদের ইমামগণ বলেছেন, যে সকল কাজ রোজাদারদেরকে সম্ভোগের প্রতি উৎসাহিত করে তোলে সে সকল কাজ হারাম। যেমন স্ত্রীকে চুম্বন করা, কামভাবের সঙ্গে স্পর্শ করা— ইত্যাদি। এসকল কাজ এতেকাফকারীদের জন্যও হারাম। স্পর্শ ও চুম্বনের কারণে যদি রেতপাত হয় তবে রোজা ও এতেকাফ ভেঙে যাবে।

প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর নিদর্শনসমূহ মানুষের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন। মানুষ যাতে সাবধান হয়ে চলতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই সুস্পষ্ট বর্ণনা করা আল্লাহ্পাকের রীতি। এরকম কথা বলেই এই আয়াতের ইতি টানা হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৮

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

❐ তোমাদের নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জানিয়া শুনিয়া অন্যায় রূপে গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে উৎকোচ দিও না।

---

www.eelm.weebly.com

অন্যায়রূপে অর্থ সম্পদ গ্রাস করা অনেক প্রকারে হতে পারে। যেমন ১. কারো সম্পদের উপর মিথ্যা মালিকানা উপস্থাপন করা। ২. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। ৩. কারো ন্যায্য দাবী অস্বীকার করে শপথ করা। ৪. অন্যের সম্পদ ছিনতাই, লুট, চুরি বা আত্মসাৎ করা। ৫. নিষিদ্ধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ যেমন, ব্যভিচারের বিনিময়, সঙ্গীতের বিনিময়, ভাগ্যগণনার পারিশ্রমিক, পশুপ্রজননের বিনিময়, শরিয়তবিরোধী চুক্তির মাধ্যমে উপার্জন, ঘুষ ইত্যাদি অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রাস তুল্য।

শানে নুজুলঃ একবার রবীয়া বিন আবদান হাজরামী রসুল স. নিকট ইমরাউল কায়েসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেন। অভিযোগটি হচ্ছে, ইমরাউল কায়েস হাজরামীর একটি জমিন জোর পূর্বক দখল করেছে। রসুল স. হাজরামীকে বললেন, তোমার পক্ষে কোনো সাক্ষী আছে কী? হাজরামী বললেন, না। রসুল স. বললেন, তাহলে ইমরাউল কায়েসের শপথের উপর মীমাংসা হবে। এ কথা শুনে ইমরাউল কায়েস শপথ করতে প্রস্তুত হলো। তিনি স. বললেন, যদি অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাতের লক্ষ্যে মিথ্যা শপথ করো, তবে জেনে রেখো কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাকের দরবারে উপনিত হবে তাঁর অপ্রসন্ন অবস্থায়। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেম।

'বিচারকগণকে উৎকোচ দিও না' অর্থ, শাসকদের হাতে তুলে দিও না। মুজাহিদ বলেছেন একথার অর্থ, তোমরা পরস্পরের প্রতি অত্যাচারীরূপ ধারণ করে বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হয়ো না। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আয়াতের উদ্দেশ্য ওই সকল লোক যারা সাক্ষীবিহীন গচ্ছিত সম্পদ মূল মালিককে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃত হয়। শেষে বিষয়টি বিচারক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেখানেও তারা মিথ্যা শপথ করে। কালাবী বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে মিথ্যা সাক্ষ্য দাতাদের সম্পর্কে। আমি বলি, বর্ণিত সকল ব্যাখ্যাই এই আয়াতের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত। সাধারণভাবে সবগুলো ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য।

যারা অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রাস করতে চায় তারা জেনে শুনেই এরকম করে। আর বিষয়টি প্রশাসক পর্যন্ত গড়ালে তাঁরা প্রকৃত অবস্থা না জেনেই সিদ্ধান্ত দিতে বাধ্য হন। এরকম সিদ্ধান্ত ভুল হওয়া সম্ভব। এই আয়াতের মাধ্যমে একথাটিও প্রমাণিত হয় যে, বিচারক কর্তৃক হারাম বস্তু হালাল হয় না। যেমন হজরত উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত হয়েছে-রসুল স. বলেছেন, হে জনতা! আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ। তোমরা বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করার জন্য আমার শরণাপন্ন হও। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ চতুর ও বাক্যবাগীশ, উপস্থাপনা-চাতুর্যে অন্যাপেক্ষা অগ্রগামী। আর আমি তো উপস্থাপিত বিবরণের উপরই মীমাংসা করি। কিন্তু তোমাদের উচিত তোমাদের মুসলমান ভাইয়ের ন্যায্য প্রাপ্য যদি তোমাদেরকে দিয়ে দেই, তবে সেটাকে গ্রহণ না করা। মনে করো, এমতাবস্থায় আমি যেনো তোমাদেরকে এক অগ্নিপিন্ড দিলাম। শাফেয়ী ও মালেক।

www.eelm.weebly.com

বোখারী ও মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরকম সম্পদ অবৈধ ও অপবিত্র। তাঁর এই অভিমতটি অন্য আলেমগণের অনুরূপ। কিন্তু তিনি আরো বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও বিবাহের চুক্তি অথবা চুক্তিভঙ্গের মীমাংসা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই হয়। জমহুর আলেমগণ ইমামে আজমের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। ইমাম আবু হানিফার দলিল হচ্ছে, একবার দু'জন সাক্ষী হজরত আলীর সম্মুখে এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করলো যে, এই লোকটির সঙ্গে এই মেয়েটির বিয়ে হয়েছে। তখন সাক্ষ্যদাতাদের সাক্ষ্যের উপর হজরত আলী বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত দিলেন এবং মেয়েটিকে তার কথিত স্বামীর হাওয়ালা করে দিলেন। মেয়েটি বললো, আমাদের তো বিয়েই হয়নি। আপনি যদি মনে করেন হয়েছে তবে বিয়ে পড়িয়ে দিন। হজরত আলী বললেন, সাক্ষীগণ তোমাদের বিয়ে সম্পন্ন করেছেন।

জ্ঞাতব্যঃ সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করেই বিচারককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এরকম সাক্ষ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত ভুল হলেও বিচারক আল্লাহ্তায়ালার নিকট অপরাধী সাব্যস্ত হবেন না। আর তার সিদ্ধান্ত কার্যকরও হবে। এরকম অবস্থায় অপরাধী হবে মিথ্যা দাবীদার ও মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা। ইমাম আবু হানিফার উদ্দেশ্য এটাই। হজরত আলী সাক্ষ্যদাতাগণের সাক্ষ্যের উপরই রায় দিয়েছিলেন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৯

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

❒ লোকে তোমাকে নূতন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, উহা মানুষ এবং হজ্বের জন্য সময়-নির্দেশক। পশ্চাৎ দিক দিয়া তোমাদের গৃহ-প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নাই কিন্তু পুণ্য আছে কেহ সাবধান হইয়া চলিলে। সুতরাং তোমরা দ্বার দিয়া গৃহ-প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

হজরত মুআজ বিন জাবাল আনসারী ও হজরত সায়লাবা বিন গানাম আনসারী রসুলুল্লাহ্ স. এর নিকট নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! এ বিষয়টি আবার কী রকম? একটি ক্ষীণকায় নতুন চাঁদ বাড়তে বাড়তে পূর্ণ চন্দ্র হয়ে যায়। পুনরায় ক্ষয় হতে হতে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এরকম হ্রাস বৃদ্ধির কারণ কী? এরকম প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। বাগবী। আবু নাঈম ও ইবনে

www.eelm.weebly.com

আসাকের সুদীর পদ্ধতিতে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তারিখে দামিস্ক। ইবনে আবী হাতেম আওফার সনদে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, লোকেরা চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধির ব্যাপারে রসুল স. এর নিকট জানতে চাইলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইবনে আবী হাতেম আবুল আলীয়া থেকে বর্ণনা করেছেন— তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম রসুল স. এর নিকট চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধির রহস্য জানতে চাইলে আয়াতটি নাজিল হয়।

মানুষ এবং হজের জন্য সময় নির্দেশক— একথার মাধ্যমে প্রশ্নের যথাউত্তর দেয়া হয়েছে। এই জবাবে চাঁদের সৃষ্টিরহস্যের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে, চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধির কল্যাণকর দিকটির কথা। এরকম জবাব দানের মাধ্যমে একথাটিও প্রমাণিত হয়, নিছক জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা মানুষের জন্য কল্যাণজনক কিছু নয়। দিন, মাস, বছর গণনা, রোজা ও রমজানের সময় নির্ধারণ এবং হজের মাস চিহ্নিত করার সুবিধার্থে চাঁদের এই বৃদ্ধি ও ক্ষয় ঘটানো হয়। এভাবে ইবাদতের সময় নির্ণয় করার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত কল্যাণ। তাই কল্যাণদাতা আল্লাহ্ এই জবাবের মাধ্যমে কল্যাণের প্রতি পথপ্রদর্শন করেছেন। আয়াতে উল্লেখিত 'মাওয়াক্বিত' শব্দটি 'মিক্বত' শব্দের বহুবচন। মাওয়াক্বিত বলে বোঝানো হয়েছে হজ, রোজা, ইদ্দত, ঋণের সময়সীমা নির্ধারণ ইত্যাদি।

'পশ্চাৎদিক দিয়ে গৃহ-প্রবেশ করাতে কোনো পুণ্য নেই'— এসম্পর্কে হজরত বারা বিন আমের থেকে বোখারী লিখেছেন, মূর্খতার যুগের মানুষেরা হজের এহরাম বেঁধে পিছনের দরোজা দিয়ে হেরেম শরীফে প্রবেশ করতো। সাধারণভাবে সারা বছর অপবিত্র শরীরে তারা সদর দরোজা দিয়ে গমনাগমন করতো— তাই মনে করতো, এহরাম অবস্থায় সেই দরোজা দিয়ে যাওয়া আসা অনুচিত। হজরত জাবের থেকে ইবনে আবী হাতেম এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন— বিশেষ মর্যাদাশীল হওয়ার কারণে কোরাইশদেরকে বলা হতো খুসুস। তারা ছাড়া আরবের অন্যস্থানের লোকেরা প্রধান দরোজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারতো না। এই শ্রেণীবিভাজনের বিরুদ্ধে আয়াতে প্রতিবাদ এসেছে।

একবার রসুল স. এক বাগানে উপবিষ্ট ছিলেন। সেখান থেকে তিনি সদর দরোজা দিয়ে বের হয়ে আসছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কুতবা বিন আসির আনসারী। লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কুতবা অভিজাত শ্রেণীর নয় অথচ সে আপনার সাথে সদর দরোজা দিয়ে বের হলো। তিনি স. কুতবাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এমন করলে কেনো? কুতবা বললেন, হে অনুকম্পার নবী! আমি আপনাকে যেমন করতে দেখেছি, তেমনই করেছি। তিনি স. বললেন, আমি তো বাতিল দ্বীন থেকে পৃথক। কুতবা বললেন, আপনার ধর্মই আমার ধর্ম। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

www.eelm.weebly.com

ইমাম জুহরী এই আয়াতের শানে নুজুল বর্ণনা করেছেন এরকম— ওমরা পালনকারীরা উন্মুক্ত আকাশের নিচে এহরাম বাঁধতেন। তাঁরা মনে করতেন, এহরাম বাঁধার সময় গৃহের ছাদ বা বৃক্ষের আড়াল থাকা উচিত নয়। এহরাম বাঁধার পর হঠাৎ যদি গৃহগমনের প্রয়োজন পড়তো তবে তাঁরা গৃহের বহির্দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতেন না। ছাদের আড়াল থেকে বেঁচে থাকার জন্যই ছিলো এই চেষ্টা। তাঁরা তখন পেছনের প্রাচীর ভেঙে গৃহাঙ্গনে প্রবেশ করে গৃহবাসীদের সঙ্গে দরকারী কথাবার্তা সেরে নিতেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রসুল পাক স. যখন এহরাম বাঁধলেন তখন তাঁর সাথে সাথে কিছুসংখ্যক আনসারীও এহরাম বাঁধলেন। এরপর রসুল স. তাঁর হুজরায় প্রবেশ করলেন সদর দরোজা দিয়ে। একজন আনসারীও তাঁর অনুগমন করলেন। তখন অন্য সাহাবীরা আপত্তি তুললেন। এরপর রসুল স. এর প্রশ্নের উত্তরে ওই সাহাবী বললেন, যেটা আপনার দ্বীন, সেটা আমারও দ্বীন। আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই।

'লাইসাল বিরুরু'(কোনো পুণ্য নাই) — একথাটির সম্পর্ক 'লোকে আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে' এর সঙ্গে। সম্পর্কটি এরকম— সম্ভবতঃ লোকেরা একই সময়ে দু'টি বিষয়ে জানতে চেয়েছিলো। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, জানতে চেয়েছিলো কেবল নতুন চাঁদ সম্পর্কে। তাদের ওই কৌতূহলে কল্যাণ ছিলো না এবং কৌতূহলোদ্দীপনাও ছিলোনা নবুয়তের জ্ঞানের অনুকূল। তাই তাঁদের প্রশ্নের সঙ্গে 'কোনো পুণ্য নেই' বাক্যটি সম্বন্ধিত হয়েছে। আর এভাবে যেনো বলা হয়েছে, নবীর সকাশে যথাযোগ্য প্রশ্ন উত্থাপন করা সমীচীন। অযথার্থ বিষয়ে কৌতূহলী হওয়া গৃহের পশ্চাৎদ্বার দিয়ে প্রবেশ করার মতোই অযৌক্তিক। জ্ঞানগৃহে প্রবেশের জন্য রয়েছে উন্মুক্ত বহির্দরোজা। আর দরোজা কেবল মাধ্যম বা কারণ মাত্র; মূল উদ্দেশ্য নয়। তাই কারণের প্রতি মনোনিবদ্ধ না করে মূল বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত, যাতে রয়েছে অক্ষয় কল্যাণ। সে কারণেই এখানে বলা হয়েছে, পশ্চাদ্দিক দিয়ে গৃহপ্রবেশ করাতে পুণ্য নেই। পুণ্য রয়েছে সাবধানতায়। অতএব, স্রষ্টার নৈকট্যার্জনের উপায় সম্পর্কে জানতে চাওয়া উচিত। তাঁর সৃষ্ট কারণ নিয়ে অপ্রয়োজনীয় আগ্রহকে প্রশ্রয়দান করা অর্বাচীন- জনোচিত। সুতরাং সাবধান।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের উক্তি ওয়াহেদীর মাধ্যমে আবু সালেহের বর্ণনায় এসেছে এরকম— হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তিতে লিখিত ছিলো, এবার নয় আগামীবারে রসুল স. তাঁর সহচরবৃন্দকে নিয়ে হজ করতে পারবেন। তাই রসুল স.কে ফিরে যেতে হলো। দেখতে দেখতে কেটে গেলো একটি বছর। এসে পড়লো হজের মরশুম। তিনি স. তাঁর সহচরগণকে নিয়ে মক্কাভিমুখে চললেন। সকলে এহরাম বেঁধে নিলেন। অবিশ্বাসীরা এবারও বাধা সৃষ্টি করবে— এরকম আশংকা তখন পর্যন্ত সকলের অন্তরে বিদ্যমান ছিলো। যদি সেরকম কিছু হয়, তবে যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু এহ্রাম অবস্থায় যুদ্ধ হবে কী করে? এসকল

www.eelm.weebly.com

চিন্তা সকলের অন্তরকে অশান্ত করে তুলছিলো। তাঁদের এই অস্বস্তি দূর করার উদ্দেশ্যে তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ○ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ○

❒ যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহের পথে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করিও না। আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীগণকে ভালবাসেন না।

❒ যেখানে তাহাদিগকে পাইবে হত্যা করিবে এবং যে স্থান হইতে তাহারা তোমাদির্গকে বহিষ্কৃত করিয়াছে তোমরাও সেই স্থান হইতে তাহাদিগকে বহিস্কার করিবে। ফিত্না হত্যা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। মসজিদুল হারামের নিকটে তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না যে পর্যন্ত তাহারা সেখানে তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে। যদি তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিবে, ইহাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম।

❒ যদি তাহারা বিরত হয় তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❒ তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যাবত ফিত্না দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহের দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তাহারা বিরত হয় তবে সীমালঙ্ঘনকারীগণ ব্যতীত আর কাহাকেও আক্রমণ করা চলিবে না।

'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে'— একথার অর্থ যাদের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। আর 'সীমালঙ্ঘন কোরো না' কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— নারী, শিশু, বয়োবৃদ্ধ, ধর্মযাজক এবং সন্ধিসূত্রে আবদ্ধদের বিরুদ্ধে লড়াই কোরো না। অভিযানে প্রেরিত সেনাদলকে রসুল পাক স. এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করতেন,

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র পথে লড়াই করো। যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি অবিশ্বাসী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। কিন্তু সীমাতিক্রম কোরো না, অঙ্গিকার ভঙ্গ কোরো না। রমণী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা কোরো না। বাগবী। মুসলিমের বর্ণনায় এই হাদিসটির সঙ্গে সংযোজিত রয়েছে একথাগুলো— নাক কান কেটো না এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হত্যা কোরো না। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. শিশু ও নারী হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন। হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল করীম স. সৈন্য প্রেরণকালে বলতেন, আল্লাহ্র নামের উপর এবং আল্লাহ্র রসুলের দ্বীনের উপর যুদ্ধযাত্রা করো। বৃদ্ধ, শিশু ও ললনাকুলকে হত্যা কোরো না। গণিমত আত্মসাৎ কোরো না। গণিমতকে একত্রিত কোরো। সংযমী হয়ো। অনুকম্পাশীল হয়ো। নিশ্চয় আল্লাহ্ পুণ্যবানদের বন্ধু। আবু দাউদ। বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে বুঝা যায়, আয়াতটি রহিতও নয়। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদেরও এই মত। কতিপয় ভাষ্যকার বলেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে আল্লাহ্ পাক তাঁর রসুলকে অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন তাঁর হিজরতের পর এ আয়াতটির মাধ্যমে। হজরত রবী বলেছেন, এ আয়াতটি প্রথম জেহাদ সম্পর্কিত আয়াত। এরপর নাজিল হয়েছে, 'মুশরিকদেরকে হত্যা করো।' তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করুক বা না করুক।' এ নির্দেশের প্রেক্ষাপটে 'সীমালঙ্ঘন কোরো না' কথাটির অর্থ হবে, তোমরা লড়াইয়ের সূচনা কোরো না। এমতাবস্থায় 'আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না'— একথার অর্থ হবে সীমাতিক্রমের প্রতি আল্লাহ্পাকের সমর্থন নেই। 'তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো'— এ সম্পর্কে হজরত মুকাতিল এবং ইবনে হাব্বান বলেছেন, এ আয়াতটি রহিত হয়েছে ওই আয়াত দ্বারা যেখানে বলা হয়েছে, মসজিদে হারামের নিকট তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কোরো না।

আমি বলি, এ নির্দেশটি রহিত হয়নি। বরং সুনির্দিষ্ট হয়েছে। কারণ রহিতকারী বাক্যটি এ বাক্যটির সঙ্গে সম্মিলিত। এরকম সম্মিলিত বাক্য একে অপরকে রহিত করে না। যেমন একস্থানে এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ্ পাক ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।' এখানে ক্রয়-বিক্রয় ও সুদ দু'টি বিষয়ই সুস্পষ্ট এবং একটি অপরটিকে রহিত করেনি। রহিতকারী আয়াত সবসময় পৃথক রূপে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং 'যেখানে পাবে হত্যা করবে'— একথাটির অর্থ যেখানে তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। এ সক্ষমতাকে এখানে 'সাক্বিফতুম' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। সক্বফ শব্দের আভিধানিক অর্থ হবে কোনো বস্তু অতিদ্রুত ও উত্তমরূপে অর্জন করা- জ্ঞানগত কিংবা কর্মগত যে বিষয়ই হোক না কেনো।

'যে স্থান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে, সেস্থান থেকে তোমরা তাদেরকে বহিষ্কার করো'-একথার অর্থ, তারা তোমাদেরকে মক্কা মোয়াজ্জমা থেকে বহিষ্কার করেছিলো সেই মক্কা আজ বিজিত। সুতরাং তোমরাও এখন তাদেরকে

www.eelm.weebly.com

বহিষ্কার করো। এরকমই করা হয়েছিলো। মক্কাবিজয়ের পরও যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের প্রতি কার্যকর করা হয়েছিলো এই নির্দেশ।

'ফেৎনা হত্যা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর'— এখানে ফেৎনা অর্থ আল্লাহ্পাকের অংশী নির্ধারণ, বিশ্বাসীদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা প্রদান। ফেৎনা আল্লাহ্পাকের বিবেচনায় মহা অপরাধ। এই মহাঅপরাধটিকে এখানে 'আশাদ্দু' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। আর এখানে হত্যা অর্থ হচ্ছে, মুসলমানেরা যে হত্যা করে। অবিশ্বাসীদেরকে হত্যার এই নির্দেশ মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে কিছুক্ষণের জন্য বৈধ করা হয়েছিলো। ইবনে জারীর, মুজাহিদ, জুহাক, কাতাদা, রবী এবং ইবনে জায়েদ এরকম বলেছেন।

'মসজিদুল হারামের নিকটে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে। যদি তারা এরকম করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে।' একথার অর্থ অবিশ্বাসীরা যদি হেরেম শরীফে যুদ্ধের সূচনা করে তবে তোমরাও যুদ্ধ কোরো। ক্বারী হামজা ও কাসায়ীর উচ্চারণভঙ্গি অনুসারে এখানে যুদ্ধের স্থলে হত্যা শব্দটি বলবৎ হবে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— — তোমরা অবিশ্বাসীদেরকে হত্যা কোরো না যদি না তারা তোমাদেরকে হত্যা করে। আরববাসীরা বলে থাকে, 'কৃতল্না বনু ফুলান' (আমাদেরকে ওমুক গোত্র হত্যা করেছে)। একথার প্রকৃত অর্থ, অমুক গোত্রের লোক আমাদের কতিপয় লোককে হত্যা করেছে।

কতিপয় ভাষ্যকার বলেছেন, বিধানটি ছিলো ইসলামের প্রাথমিক সময়ের। তখন মক্কা নগরীতে যুদ্ধের অনুমতি ছিলো না। পরে এই বিধানটি রহিত হয়। রহিতকারী আয়াতটি হচ্ছে, এমনভাবে যুদ্ধ করো যেনো ফেৎনা উচ্ছেদ হয়। কাতাদা এরকম বলেছেন। মুকাতিল বলেছেন, বিধানটি সুরা তওবার আয়াতে সাইফ বা তরবারীর আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়েছে।

আমি বলি, প্রকৃত কথা এই যে, উক্ত আয়াতের বিধান রহিত হয়নি। বরং বিধানটি অদ্যাবধি কার্যকর। হেরেম শরীফে যুদ্ধ করা এখনো হারাম। মুজাহিদ এবং আরো অনেক আলেম এই মতের প্রবক্তা। আর এই মতের সমর্থনে রয়েছে বোখারী, মুসলিম বর্ণিত হাদিস। যেমন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, আল্লাহ্পাক এই নগরীকে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মর্যাদামন্ডিত করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। আমার পূর্বে কাউকে এখানে যুদ্ধ বিগ্রহের অনুমতি দেয়া হয়নি। আমার জন্য অনুমতি রয়েছে কেবল দিবসের একঘন্টাকাল। পুনরায় কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ নিষিদ্ধ হয়ে গেলো। এখানকার ঘাস পাতা গুল্মলতা কর্তন করা যাবে না। আশ্রিত শিকারকে তাড়িয়ে দেয়া যাবে না। হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. বলেছেন, মক্কা শরীফে অস্ত্র উত্তোলন হালাল নয়।

www.eelm.weebly.com

'এটাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম'— একথার অর্থ হত্যাই অবিশ্বাসীদের প্রকৃষ্ট শাস্তি।

'যদি তারা বিরত হয় তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'— এই বাক্যটির মাধ্যমে বলা হয়েছে, যদি অবিশ্বাসীরা তাদের অবিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে এবং সমরপ্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকে তবে আল্লাহ্পাক তাদের অতীতের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করবেন এবং তাদের প্রতি প্রদর্শন করবেন অশেষ করুণা।

'তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো যতোক্ষণ না ফেৎনা দূর হয় এবং আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়'। ফেৎনা অর্থ শিরক ও ফাসাদ। আর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ, অংশীবাদীতাহীন ইবাদত ও আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, আমাকে ওই সময় পর্যন্ত সমরাভিযান চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতোক্ষণ না মানুষ বলে, আল্লাহ্পাক ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, মোহাম্মদ স. তাঁর রসুল এবং নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয়। যখন মানুষ এরকম করবে তখন তাঁদের জীবন ও সম্পদ থাকবে আমার তত্ত্বাবধানে। আর তার হিসাবের দায়িত্ব থাকবে আল্লাহ্পাকের অধিকারে। বাগবী বলেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, পৌত্তলিকদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাতে হবে। যদি তারা এই আহবানে সাড়া না দেয় তবে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। আমি বলি, একথা ঠিক নয়। কারণ, পৌত্তলিকতা, অগ্নিউপাসনা, ইহুদীবাদ— এসকলকিছুই কুফরীর অন্তর্ভূত। আল্লাহ্পাকের নিকট একমাত্র গ্রহণীয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। পৌত্তলিকতা থেকে যেমন ফেতনার উদ্ভব হয় তেমনই ফেৎনা উদ্ভাবিত হয় ইহুদীবাদ ও অগ্নিউপাসনা থেকে। তারা সকলেই অবিশ্বাসী। তারা যদি ইমান গ্রহণ করে ও অনুগত হয়, তবে ফেৎনা দূর হয়ে যাবে। যদি না হয়, তবে তাদেরকে জিজিয়া দিতে সম্মত হতে হবে। জিজিয়া দিতে স্বীকৃত হলেও ফেৎনা উচ্ছেদ হয়ে যায়। তাই অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'হাত্তা ইয়া'তুল জিজিয়াতা' (যতক্ষণ না তারা জিজিয়া প্রদান করে)। এই আয়াত দ্বারা জিজিয়ার বিধান বলবৎ হয়েছে ইহুদী, অগ্নিপূজক ও পৌত্তলিক— সকলের উপর। ইমাম আবু হানিফা একথা বলেছেন। অন্য ইমামগণ এই অভিমতটির পোষণকারী নন। আল্লাহ্ চান তো সুরা তওবার ব্যাখ্যায় জিজিয়ার আলোচনা করা হবে। যদি তারা বিরত হয়-একথার অর্থ যদি তারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করে, অংশীবাদীতা ছেড়ে ইমানকে আশ্রয় করে, অথবা জিজিয়া দিতে স্বীকৃত হয়। এরকম করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না, তাদেরকে বন্দী করা যাবে না, তাদের সম্পদও ছিনিয়ে নেয়া যাবে না।

'সীমালংঘনকারীগণ ব্যতীত আর কাউকে আক্রমণ করা চলবে না'— একথার অর্থ, যারা ইমান, আনুগত্য কিংবা জিজিয়া— কোনোটাতেই সম্মত হবে না— তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈধ হবে। তাদেরকে বন্দী করা যাবে, হত্যা করা যাবে এবং তাদের সম্পদও ছিনিয়ে নেয়া যাবে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত আব্দুল্লাহ্

www.eelm.weebly.com

ইবনে আব্বাস। অথবা বলা যায় যে, যারা আক্রমণকারী তাদেরকে আক্রমণ করা বৈধ। তাই নির্দেশ করা হয়েছে, তারা যেমন তোমাদের উপর সীমাতিক্রম করেছে তোমরাও তেমনি করো।

আমি বলি, আয়াতের এরকম অর্থ হতে পারে যে, সীমালংঘনকারীরাই সীমাতিক্রমের অপরাধে অপরাধী। অবিশ্বাসী ও যুদ্ধ থেকে বিরতদেরকে যারা আক্রমণ করবে তারাও সীমালংঘনকারী। এই ব্যাখ্যাটি পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার বিপরীত। হজরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ বলেছেন, একবার আমি রসুল আকদাস স. সকাশে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! যদি এরকম হয়, আমি কোনো কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধরত- সে তার তরবারীর আঘাতে আমার একটি হস্ত ছেদনের পর কোনো বৃক্ষের আড়ালে আত্মরক্ষা করলো। আমি তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলাম। সে চিৎকার করে বললো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এমতাবস্থায় আমি কি তাকে হত্যা করতে পারবো? তিনি স. বললেন, না। ধরো তুমি ওকে হত্যাই করলে। হত্যার পূর্বে তুমি যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলে তখন সে-ই ওই মর্যাদার অধিকারী। আর হত্যার পরে তোমার অবস্থা হবে ওরকম, যেরকম অবস্থায় সে ছিলো (কলেমা পাঠের পূর্বে)। বোখারী ও মুসলিম।

হজরত কাতাদা থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেন— রসুল স. তাঁর সহচরবৃন্দ সমভিব্যাহারে ওমরা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কাভিমুখে চললেন। সঙ্গে ছিলো তাঁদের অনেক কোরবানীর পশু। হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে মুশরিকেরা তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়ালো। সেখানে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলো। চুক্তির শর্ত অনুসারে তাঁকে স. মদীনায় ফিরে যেতে হলো। পরের বছর (হিজরী সপ্তম বর্ষে) তিনি স. ওমরা আদায় করতে সক্ষম হলেন। মক্কায় অবস্থান করলেন তিন দিন। আগের বছর রসুল স. কে বাধা দিতে সক্ষম হয়েছিলো মুশরিকেরা। সেই ঘটনাটি নিয়ে তারা গর্ববোধ করতো। এই প্রসঙ্গটি নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯৪

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

www.eelm.weebly.com

❒ পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। সমস্ত পবিত্র বিষয় যাহার অবমাননা নিষিদ্ধ তাহার জন্য কিসাস। সুতরাং যে কেহ তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে তোমরাও তাহাকে অনুরূপ আক্রমণ করিবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ সাবধানীদের সহিত থাকেন।

'শাহ্‌রুল হারাম' অর্থ পবিত্র বা সম্মানিত মাস। কথাটি এখানে দু'বার উল্লেখিত হয়েছে। প্রথম উল্লেখের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে সপ্তম হিজরীর জিলক্বদ মাসকে। এবং দ্বিতীয় উল্লেখের মাধ্যমে বলা হয়েছে ষষ্ঠ হিজরীর জিলক্বদ মাসের কথা যে মাসে মুশরিকেরা তাঁর স. এবং তাঁর বাহিনীর পথরোধ করেছিলো। এখানে 'কিসাস' শব্দটির অর্থ সমতা। কথাটির উদ্দেশ্য সম্মানিত বিষয়ের উভয়দিকের সাম্য রক্ষা করতে হবে। ষষ্ঠ হিজরীতে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তির শর্তানুযায়ী রসুল স. মদীনায় ফিরে গিয়েছিলেন। পরেব বৎসর ওমরা করতে কোনো বাধা ছিলো না। তাই তিনি ওমরা সম্পাদনার্থে মক্কাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। তখন তাঁর সহচরবৃন্দ আশংকা করলেন মুশরিকেরা যদি আবার পথরোধ করে দাঁড়ায়; কৃত অঙ্গীকার যদি ভঙ্গ করে, তখন যুদ্ধ ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। কিন্তু এহ্‌রাম অবস্থায় যুদ্ধ করা হারাম। আর এই জিলক্বদ মাসে যুদ্ধ বিগ্রহও হারাম। তদুপরি মসজিদে হারামের দিকেই চলেছে এই অভিযাত্রা। যুদ্ধ যদি বেঁধেই যায় তবে কী উপায় হবে, তাঁদের এই চিন্তাভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতে আল্লাহ্‌পাক তাঁর স্বতঃসিদ্ধ বিধান প্রকাশ করে দিচ্ছেন এভাবে—'আশ্‌শাহ্‌রুল হারাম বিশ্ শাহ্‌রিল হারাম।' অর্থাৎ 'হে মুসলিম বাহিনী! মুশরিকেরা যদি সম্মানিত মাসের সম্মান রক্ষা না করে যদি যুদ্ধ শুরু করে তবে তোমরাও যুদ্ধ শুরু করো। এটাই সমতা। এটাই তাদের অপকর্মের উপযুক্ত জবাব।

'যে তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে'- একথার অর্থ, তারা যতোটুকু সীমাতিক্রম করবে ততোটুকু সীমাতিক্রমের অধিকার রয়েছে তোমাদেরও। সম্মানিত মাস, সম্মানিত স্থান এবং এহ্‌রামের তোয়াক্কা যদি তারা না করে; তবে তোমরাও তাদের তোয়াক্কা না করে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দিও।

'তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো'- এ কথার অর্থ যে বিষয়ে তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়নি সে বিষয়ে লিপ্ত হয়ো না। তোমাদের সীমতিক্রম যেনো তাদের সীমাতিক্রম অপেক্ষা অতিরিক্ত না হয়। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। অতিরিক্ততায় লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক হও।

'আল্লাহ্ সাবধানীদের সঙ্গে'- একথার অর্থ, আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য মুত্তাকী বা সাবধানীদের সঙ্গে রয়েছে (আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং কারো সঙ্গী নন। এরকম হওয়া অসম্ভবও। কারণ তিনি আকার ও প্রকার বিহীন)।

www.eelm.weebly.com

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

❒ এবং আল্লাহের পথে ব্যয় কর। তোমরা নিজের হাতে নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না। তোমরা সৎকার্য কর, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ লোককে ভালবাসেন।

'সাবিলিল্লাহ্' অর্থ জেহাদ। এখানে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করো, একথা বলে জেহাদের জন্য সম্পদ ব্যয়ের নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখিত 'বি আইদিকুম' শব্দের 'বা' অব্যয়টি অতিরিক্ত। অনেকে বলেছেন, এখানে প্রকৃত কথাটি হবে এরকম— 'ওয়ালা তুলক্বু আনফুসাকুম বি আইদিকুম।' অর্থাৎ নিজের প্রাণকে নিজ হাতে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ কোরো না। এখানে 'ইলক্বা' শব্দটিকে 'ইলা' অব্যয় দ্বারা সকর্মক করা হয়েছে। ইলক্বা হচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়ের নিক্ষেপণ। আরববাসীরা নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকারক বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে জড়িয়ে পড়লে বলে, 'উলকিয়া বি ইয়াদিহ্।' ধ্বংস বোঝাতে এখানে 'তাহ্লুকাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাহ্লুকাত ও হালাক সমার্থক। কেউ কেউ বলেছেন, যে কাজের পরিণতি অত্যন্ত ক্ষতিকর তাকে বলে তাহ্লুকাত। আবার কেউ বলেছেন, যে ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব সেটাই তাহলুকাত। এবং যে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয় সেটা হালাক।

হজরত হুজায়ফা থেকে বোখারী বর্ণনা করেন- এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে জেহাদে অর্থ ব্যয় সম্পর্কে। হজরত আবু আইয়ুব আনসারী থেকে আবুদাউদ, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, হাকেম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের(আনসারীদের) উদ্দেশ্যে। ঘটনাটি হলো- আল্লাহ্পাক যখন ইসলামকে বিজয়ী করলেন, প্রতিষ্ঠিত করলেন সত্য ধর্মের শক্তিমত্তাকে। তখন আমাদের মধ্যে এরকম বলাবলি হতে লাগলো যে, ইসলাম এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, তাই জেহাদ নিস্প্রয়োজন। জেহাদের জন্য এতোদিনে আমাদের অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে। এখন সময় এসেছে ঘাটতি পূরণের। পরিবার পরিজনের জন্য কিছু সঞ্চয়েরও তো প্রয়োজন। এই মনোবৃত্তির প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াতটি। এখানে তাহ্লুকাত অর্থ সম্পদ সংরক্ষণ, ঘাটতি পূরণ এবং জেহাদে অর্থ ব্যয়ে অনিচ্ছা।

আমি বলি, আয়াতটির মর্ম এরকম— হে মুসলিমবৃন্দ! জেহাদ পরিত্যাগ করলে শত্রুরা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠবে। পুনরাক্রমণ করতে সচেষ্ট হবে। তখন

www.eelm.weebly.com

তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। বাগবী বলেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত আবু আইয়ুব আনসারী পুনরায় জেহাদে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলেন। পরিশেষে এক জেহাদের প্রান্তরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সমাহিত হলেন ইস্তাম্বুলে। ইস্তাম্বুলবাসীরা তাঁর অসিলা ধরে আল্লাহ্পাকের নিকট বৃষ্টিপ্রার্থী হতেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি জেহাদে অংশগ্রহণ ছাড়া অথবা অন্তরে জেহাদের স্পৃহা না নিয়েই মৃত্যুবরণ করলো, মনে করতে হবে তার মৃত্যু হলো নিফাকের (কপটতার) একটি শাখায়।

কতিপয় ভাষ্যকার বলেছেন, আয়াতটি কৃপণ ও জেহাদে ব্যয় করতে অনীহদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এই মতের সমর্থনে রয়েছেন- হজরত হুজায়ফা, হাসান, ইকরামা, আতা এবং হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। আবু জুরায়রা বিন জুহাক এর বিশুদ্ধ সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন,সাহাবাগণ আল্লাহ্র পথে যথেষ্ট ব্যয় করতেন। ফকির মিসকিনদের দান করতেন। হঠাৎ দেখা দিলো দুর্ভিক্ষ। তখন তাঁদের দানের হাত সংকুচিত হলো। আর ঠিক তখনই অবতীর্ণ হলো এ আয়াত। মোহাম্মদ বিন সিরিন এবং উবাইদা সালমানী বলেছেন, ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করার অর্থ আল্লাহ্ পাকের করুণা থেকে নিরাশ হওয়া। আবু কেলাবা বলেছেন, হজরত নোমান বিন বশীরের বিশুদ্ধ সূত্রে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— মানুষের অবস্থা এরকম হলো, কোনো পাপকার্য অকস্মাৎ সংঘটিত হলেই সকলে বলাবলি করতেন, আল্লাহ্পাক আমাকে আর ক্ষমা করবেন না। তখনই এই আয়াতটি নাজিল হয়। হজরত বারা বিন আজিব থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে।

'সৎকাজ করো, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন'- একথার অর্থ, তোমরা কর্ম ও স্বভাবের সংস্কার করো। সৎকর্মে সমর্পিত হও। অভাবীদের অভাব মেটাও। ইবাদতের মধ্যেও রয়েছে সৌন্দর্য। আবার সৌন্দর্য রয়েছে ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনেও। ইবাদতের সৌন্দর্য সম্পর্কে রয়েছে দীর্ঘ একটি হাদিস, যা হাদিসে জিব্রাইল নামে খ্যাত। হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত ওই হাদিসের একাংশে রয়েছে, হজরত জিব্রাইল রসুল স. এর নিকট জানতে চাইলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! সৌন্দর্য (এহসান) কী? তিনি স. বললেন, এমনভাবে আল্লাহ্পাকের ইবাদত করো যেনো তোমরা তাঁকে দেখছো। আর যদি এরকম করতে সক্ষম না হও তবে মনে রেখো, তিনিতো তোমাদেরকে দেখছেন। একথার তাৎপর্য হচ্ছে, বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রচিত্ততা সহ নামাজ আদায় করো। এরকম নামাজই সৌন্দর্যমন্ডিত নামাজ। আর ব্যবহারিক জীবনের সৌন্দর্য সম্পর্কে রসুল স. বলেছেন, তোমরা নিজের জন্য যা উত্তম মনে করো, অপরের জন্যও তেমনটি করো। আর নিজের জন্য যা অপছন্দ করো, অপরের জন্যও তা অপছন্দনীয় মনে করো। হজরত মুআজ বিন জাবাল থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ। তিনি স. আরো বলেছেন, সেই প্রকৃত মুসলমান যার হস্ত ও রসনা থেকে অন্যেরা নিরাপদ। সুনান রচয়িতাগণ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। হজরত আমর বিন

www.eelm.weebly.com

আম্বাসা থেকে ইমাম আহমদ বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, সেই ব্যক্তি আমার প্রিয়ভাজন, যার চরিত্র সুন্দর। তিনি স. আরও এরশাদ করেন, আল্লাহ্‌পাক সকল কার্যাবলীর সৌন্দর্যমন্ডিত হওয়াকে সাব্যস্ত করেছেন। কাজেই তোমাদের হত্যাকান্ডেও যেনো সৌন্দর্যচেতনা জাগ্রত থাকে (যেনো নাক কান কাটা না হয়, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও নারী হত্যা করা না হয়)। পশু জবাই করার ব্যাপারেও সৌন্দর্যের দাবী পূরণ কোরো। ছুরিটাকে করো সুশানিত যাতে করে জবাইয়ের সময় পশুকে অতিরিক্ত ক্লেশ দেয়া না হয়। হজরত শাদ্দাদ বিন আউস থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯৬

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَ
لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا
أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا
أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ
لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ
كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

❒ তোমরা আল্লাহের উদ্দেশ্যে হজ্ব ও ওমরা পূর্ণ কর, কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানী করিও। যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু উহার স্থানে না পৌছে তোমরা মস্তক মুন্ডন করিওনা। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদ্‌কা অথবা কুরবানীর দ্বারা উহার ফিদ্‌য়া দিবে। যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্বের প্রাক্কালে ওমরা দ্বারা লাভবান হইতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করিবে। কিন্তু যদি কেহ উহা না পায় তবে তাহাকে হজ্বের সময় তিন দিন এবং গৃহপ্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন এই পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করিতে হইবে। ইহা তাহাদের জন্য যাহাদের পরিজনবর্গ মসৃজিদুল হারামের বাসিন্দা নহে।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্‌ মন্দকাজের প্রতিফল দানে কঠোর।

'আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরা পূর্ণ করো'—এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, হজ ও ওমরার সকল অনুষ্ঠান ওয়াজিব। ঐকমত্য এই যে, হজ ফরজে আইন— যা কস্মিনকালেও রহিতযোগ্য নয়। হজ ইসলামের স্তম্ভ সমূহের মধ্যে একটি স্তম্ভ। আল্লাহ্‌পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র গৃহের হজ মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ফরজ, যাদের পাথেয় রয়েছে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, পাঁচটি স্তম্ভের উপরে ইসলামের ভিত্তি।১. এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, মোহাম্মদ স. তাঁর রসুল। ২. নামাজ প্রতিষ্ঠা। ৩. জাকাত সম্পাদন। ৪. হজ প্রতিপালন। ৫. রমজান মাসের রোজা পালন। বোখারী, মুসলিম। এ প্রসঙ্গে আরো অনেক হাদিস রয়েছে। আর ওমরা ওয়াজিব- এরকম বলেছেন ইমাম আহমদ। এক বর্ণনানুযায়ী ইমাম শাফেয়ীর নিকটও ওমরা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা থেকেও ওয়াজিব প্রমাণিত হয়েছে। ইমাম মালেক বলেছেন, ওমরা সুন্নত। ইমাম আবু হানিফার প্রসিদ্ধ অভিমতও এরকম। অন্য বর্ণনায় ইমাম শাফেয়ীও ওমরাকে সুন্নত বলেছেন বলে কথিত আছে। যারা ওমরা সুন্নত হওয়ার সমর্থক তাঁদের নিকট আয়াতটির ব্যাখ্যা এরকম— ওমরা শুরু করার পর শেষ করা ওয়াজিব। হজের নিয়মও এমনই। ইমাম আহমদের মাজহাবের পোষকতায় রয়েছে আলকামা এবং নাখয়ী এর উচ্চারণবিধি (ক্বেরাত) 'ওয়াআতিম্মুল হাজ্জা ওয়াল ওমরাতা লিল্লাহ্‌।' হজরত আলীর ক্বেরাতও এরকম। ওমরা যে ওয়াজিব তা আরো অনেক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন হাদিসে জিব্‌রাইলে রয়েছে— হজরত জিব্‌রাইল রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্‌! ইসলাম কী? তিনি স. এরশাদ করলেন, এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মোহাম্মদ তাঁর রসুল। আর নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, জাকাত পরিশোধ করা, হজ ও ওমরা সম্পাদন করা, অপবিত্র হলে অজু বা গোছল করা এবং রমজান মাসে রোজা রাখা। বোখারী ও মুসলিমে অবশ্য রোজার উল্লেখ নেই তবে শক্তিশালী সনদসম্ভূত অন্যান্য বর্ণনায় ওমরার কথা এসেছে।

ওই বর্ণনাগুলোকে ইমাম দারা কুতনী বিশুদ্ধ বলেছেন। আর আবুবকর তাঁর জুমায়া গ্রন্থে বর্ণনাগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন এবং সেগুলো গৃহীতও হয়েছে। হজরত আয়েশা প্রশ্ন করেছিলেন, হে প্রিয় নবী! জেহাদ কি মেয়েদের উপরে ফরজ? তিনি স. বলেছিলেন, যাতে হত্যা নেই সেই জেহাদই রমণীদের জন্য বিধিবদ্ধ। সেই জেহাদ হচ্ছে হজ ও ওমরা। ইবনে মাজা। সাহাবায়ে কেরামের আসার থেকেও প্রতিপন্ন হয় যে, ওমরা ওয়াজিব। হজরত উবাই বিন মা'বাদ হজরত ওমরের নিকট নিবেদন করলেন, আমি হজ ও ওমরা উভয়টির জন্য এহরাম বেঁধেছি। হজরত ওমর বললেন, তোমাকে রসুল স. এর আদর্শের উপরে চলার তওফিক দান করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, এমন কোনো সমর্থ ব্যক্তি নেই যার উপর হজ ও ওমরা ওয়াজিব নয়।এই বর্ণনাটি এনেছেন ইবনে খুজাইমা, দারা কুতনী, হাকেম। বর্ণনাটির সনদ বিশুদ্ধ। ইমাম বোখারী হাদিসটি তালিক পদ্ধতিতে উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে আরো রয়েছে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের আসার, যার বর্ণনাকারী ইমাম শাফেয়ী। ইমাম বোখারীও আসারটি তালিক পদ্ধতিতে উল্লেখ করেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের দলিল হজরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ কর্তৃক ওই বর্ণনাটি যেখানে বলা হয়েছে— এক বেদুঈন রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে বলুন ওমরা ওয়াজিব কিনা।' তিনি স. বললেন, ওয়াজিব নয়। তবে তুমি যদি ইচ্ছে করে আদায় করো তবে তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। তিরমিজি, আহমদ, বায়হাকী। কিন্তু হাদিসটির বর্ণনাকারীদের একজন হাজ্জাজ বিন আরতাত অযোগ্য ও পরিত্যক্ত। ইবনে মাহ্দী, আত্তান, হুয়াই ইবনে মুঈন, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইবনে মোবারক এবং নাসাঈ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। তবে ইমাম জাহাবী তাঁকে সত্য বলে মেনেছেন। ইমাম তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি হাসান, সহীহ্। এ হাদিসটিই বায়হাকী বর্ণনা করেছেন অন্য এক বর্ণনাসূত্রে। সেই সূত্রভূত ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইয়ুবকে দুর্বল স্মৃতিসম্পন্ন বলে আখ্যায়িত করেছেন আহমদ। আবু হাতেম বলেছেন, তাঁর বর্ণনা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনে আদী বলেছেন, তিনি সত্যবাদী।

আমি বলি, হজরত জাবের থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে- হজ এবং ওমরা উভয়ই ফরজ। ইবনে লেহিয়ার পদ্ধতিতে ইবনে আদী এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনে লেহিয়া বর্ণনাকারী হিসেবে অত্যন্ত দুর্বল। হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন— যে ব্যক্তি ফরজ নামাজের জন্য যাত্রা করলো, সে হজের সওয়াব পাবে। আর যে নফল নামাজের জন্য রওয়ানা করলো, সে পাবে ওমরার সওয়াব। ইয়াহ্ইয়া বিন হারিস এর পদ্ধতিতে বর্ণনাটি এনেছেন তিবরানী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আব্দুল্লাহ্ ইবনে কানেয় বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, হজ জেহাদতুল্য এবং ওমরা নফল স্বরূপ। আবু সালেহ্ হানাফীয়া থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন শাফেয়ী। এ প্রসঙ্গে হজরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ্ এবং হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন বায়হাকী। দারা কুতনী বলেছেন, আব্দুল্লাহ্ বিন কানেয় স্মৃতিবিভ্রমতা দোষে দুষ্ট। আর ইবনে হাজাম আবু সালেহ্ হানাফিয়াকে বলেছেন জয়ীফ (দুর্বল)। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, তাঁকে জয়ীফ বলা ঠিক নয়। ইবনে মুঈন বলেছেন, আবু সালেহ্ হানাফিয়া নির্ভরযোগ্য। মুহাদ্দিসগণের বড় একটি দল তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। হজরত তালহা থেকে বর্ণিত হাদিসের বর্ণনাকারী আজর বিন কায়েসকে জয়ীফ বলেছেন হাফেজ ইবনে হাজার। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে অনেক অখ্যাত বর্ণনাকারী। আর ওমরা

www.eelm.weebly.com

যে ওয়াজিব নয় সে সম্পর্কে অনেক আসার রয়েছে। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, হজ ফরজ আর ওমরা নফল। ইবনে আবী শায়বা। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর অনুসরণ জরুরী। এ পর্যন্ত বর্ণিত হাদিস ও আসার সমূহের মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ দৃষ্ট হয়। তাই ইবনে হুম্মাম বলেছেন, এরকম দ্বন্দ্বপূর্ণ বিষয়কে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা যায় না। হেদায়া রচয়িতা বলেছেন, বিরোধপূর্ণ বর্ণনার মাধ্যমে ফরজ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাঁর উক্তি যুক্তিসঙ্গত। কেনোনা ফরজের জন্য থাকতে হবে অকাট্য প্রমাণ। তাই বিষয়টিকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করাই উত্তম।

জমহুর ওলামার অভিমত হচ্ছে— হজকে ওমরা দ্বারা বাতিল করা সিদ্ধ নয়। 'আতিম্মুল হাজ্জা ওয়াল ওমরাতা'— এই বাক্যটিই তাঁদের দলিল। ইমাম আহমদ বলেছেন, হজকে ওমরার দ্বারা বাতিল করা যাবে। তাঁর দলিল হচ্ছে— বিদায় হজের সময় সাহাবাগণের এহ্‌রাম ছিলো হজের। তখন রসুল পাক স. তাঁদেরকে নির্দেশ দিলেন তোমরা হজকে ওমরাতে পরিণত করো। পুনরায় বললেন, তোমরা হজের এহ্‌রামকে ওমরার এহ্‌রামে পরিণত করো। কিন্তু কোরবানী নির্বাচন করলে তা বাতিল কোরো না। এরকম দশটি হাদিস জমহুর আলেমগণের সমর্থনে রয়েছে। সুতরাং বিষয়টি সন্দেহাতীত বলে গণ্য করা যায়। হাদিসগুলোর মধ্যে একটি এরকম— হজরত আবু মুসা আশআরী বলেছেন, রসুল পাক স. আমাকে ইয়েমেনে বসবাসরত আমার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করলেন। নির্দেশানুযায়ী আমি সেখানে গেলাম। ফিরে এসে আমি রসুল পাক স. কে পেলাম বুত্‌হা নামক স্থানে। তিনি স. বললেন, তুমি কিসের নিয়ত করেছো? আমি বললাম, আপনার যা নিয়ত আমারও সেই নিয়ত। তিনি বললেন, তোমার নিকট কি কোরবানীর পশু আছে? আমি বললাম, না। এরপর আমি তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী বায়তুল্লাহ্ এবং সাফা মারওয়ার তাওয়াফ সমাপ্ত করে এহ্‌রাম থেকে মুক্ত হলাম। এরপর এলো তাল্‌বিয়ার দিবস। তখন হজের এহ্‌রাম বাঁধলাম। হজরত ওমর তাঁর খেলাফতের সময়ে বলেছেন, আমরা আল্লাহ্‌পাকের কিতাবের উপর আমল করবো। আল্লাহ্‌পাক বলেছেন—'তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরা পূর্ণ করো।' আর আমরা রসুল পাক স. এর সুন্নতের উপর আমল করি। তিনি স. কোরবানী না হওয়া পর্যন্ত এহ্‌রাম পরিত্যাগ করেননি। হজরত জাবের বলেছেন, সকল সাহাবী কেবল হজের এহ্‌রাম বেঁধেছেন। রসুল স. তাঁদেরকে বললেন, বায়তুল্লাহ্ এবং সাফা মারওয়া প্রদক্ষিণ শেষ করে এহ্‌রাম খুলে ফেলো, কেশ কর্তন করো এবং সময়াতিপাত করতে থাকো এহ্‌রামবিহীন অবস্থায়। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হজকে ওমরায় পরিবর্তিত করো। জননী হাফসা থেকে জননী আয়েশা এ বিষয়ে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। সেগুলোতে যে কথাগুলো অতিরিক্ত রয়েছে সেগুলো হচ্ছে- আমরা বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনি আমাদের মতো এহ্‌রাম মুক্ত হননি কেনো? তিনি স. বললেন, আমি

www.eelm.weebly.com

কোরবানীর পশু নির্বাচন করেছি। তাই কোরবানী না করা পর্যন্ত এহ্‌রাম মুক্ত হবো না। এরকম বর্ণনা এসেছে হজরত ইবনে ওমর থেকেও। সবগুলো বর্ণনাই লিপিবদ্ধ রয়েছে বোখারী ও মুসলিমে। মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমরা হজযাত্রা করলাম। সকলে লাব্বাইক লাব্বাইক উচ্চারণ করে যাচ্ছিলাম— যখন আমি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ শেষ করলাম তখন তিনি স. বললেন, ওমরা আদায় করো। কিন্তু যারা কোরবানীর পশু নিয়ে এসেছে তারা আপনাপন অবস্থার (এহ্‌রাম অবস্থার) উপরই থাকবে। হজরত আনাস বলেছেন, রসুল সঃ এরশাদ করেন— আমার সঙ্গে কোরবানীর পশু না থাকলে আমিও এহ্‌রাম মুক্ত হতাম। হজরত বারা বিন আজিব এবং রবি বিন ছুবরাহ্ থেকেও এরকম অনেক বর্ণনা এসেছে। আমি সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছি মৎপ্রণীত মানারুল আহ্‌কাম পুস্তকে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে কোরআনের দলিল অকাট্য। আর কোরআনে বলা হয়েছে—'আতিম্মুল হাজ্জা ওয়াল ওমরাতা'(তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরা পূর্ণ করো)। এই অকাট্য দলিল খবরে আহাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা কীভাবে বৈধ হবে? উত্তরে আমি বলতে চাই, এই প্রসঙ্গের হাদিসগুলোর সংখ্যা এতোবেশী যে, সেগুলোকে কোনোক্রমেই অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। 'তোমরা হজ ও ওমরা পূর্ণ করো' এই বাক্যটি একটি সাধারণ নির্দেশ এবং পরে উল্লেখিত 'তোমরা যদি বাধা প্রাপ্ত হও' বাক্যটি বিশেষ অবস্থা জ্ঞাপক। এভাবে সাধারণ নির্দেশের মধ্যে বিশেষ অবস্থাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিষয়টির সমাধান এভাবেও দেয়া যায় যে, আল্লাহ্ পাকের সাধারণ নির্দেশের মধ্যে রসুল স. ওই সকল লোকের জন্য বিধানটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাদের হজ বাতিল হয়েছে- তাদের জন্যই রয়েছে হজ থেকে ওমরার অনুষ্ঠানগুলোকে পৃথক করার অনুমতি।

জমহুর আলেমগণ ইমাম আহমদের দলিল সমূহের জবাব দিয়েছেন এভাবে— বর্ণিত হাদিসগুলোর দ্বারা হজ বাতিল হওয়ার ব্যাপারটা কেবল সাহাবাগণের জন্যই নির্দিষ্ট। এই নির্দিষ্টকরণের প্রমাণ হচ্ছে— হজরত বেলাল বিন হারিস রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলেন, হজ বাতিল করার বিষয়টি কি কেবল আমাদের প্রতি প্রযোজ্য না সকলের জন্য? তিনি স. বললেন, শুধু আমাদের জন্য। আবু দাউদ, নাসাঈ। হজরত ওমর বলেছেন, হজ ও ওমরাকে পৃথক করো। হজ করো হজের মাসে এবং ওমরা করো অন্য সময়ে।

আমি বলি, সম্ভবতঃ হজরত ওমর উত্তম নিয়মটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে জাওজী বলেছেন, আবদুল আজীজ বিন মোহাম্মদ দারাওয়ারদি ব্যতীত অন্য কেউ এই হাদিসটি বর্ণনা করেননি। আবু হাতেম বলেছেন, হাদিসটি দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আহমদ বলেছেন, হজ বাতিল করার নিয়ম যে কেবল সাহাবাগণের জন্যই নির্দিষ্ট — এরকম কোনো সহীহ্ হাদিস নেই। আমি বলি, হজরত ওমর বলেছেন, রসুল স. এর সময়ে দু'টি মাত্আ প্রচলিত ছিলো (একটি

www.eelm.weebly.com

হজের মাতাআ। অর্থাৎ ওমরা দ্বারা হজকে বাতিল করা। দ্বিতীয়টি নিকাহে মাতাআ— যা সর্ববাদিসম্মতভাবে হারাম)। আমি দু'টিকেই হারাম জানি। হজরত ওমরের সিদ্ধান্ত দ্বারা পূর্বোল্লিখিত হাদিসগুলো অকার্যকর হয়ে যায়। হজরত ওমরের বর্ণিত বক্তব্যটি না পাওয়া গেলে কেবল বেলালের হাদিস দ্বারা ওই সকল হাদিসের কার্যকারিতা রোধ করা যেতো না। কারণ, হজরত বেলালের হাদিসে রয়েছে দূর্বলতা। এক ব্যক্তি হজরত ওসমানের নিকট হজের মাতাআ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, ওটা তোমাদের জন্য নয়, আমাদের জন্য। আবু দাউদ। ওমরার দ্বারা হজের বাতিল হওয়ার নিয়মটি কেবল সাহাবাগণের জন্য নির্ধারিত— এ কথাটি যদি হজরত ওমর ও হজরত ওসমানের নিকট সুসাব্যস্ত না হতো, তবে তাঁরা রসুল স. এর নির্দেশের বিরুদ্ধে বলতেন না। স্মর্তব্য যে, হজে তামাত্তু একটি পৃথক বিষয়, যা কোরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। হজে তামাত্তু শরিয়তসিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হজরত দ্ববী বিন মা'বাদ একই সঙ্গে হজ ও ওমরার এহরাম বেঁধেছিলেন। হজরত ওমর তাই বলেছিলেন, তোমাকে তোমার নবীর সুন্নতের উপর আমল করার তৌফিক দেয়া হয়েছে। আবু দাউদ।

একব্যক্তি হজের নিয়ত করেছিলেন। অতঃপর ওমরার দ্বারা তা বাতিল করে দেন। এটা জানতে পেরে হজরত আবু জর বলেছিলেন, এরকম ব্যবস্থা কেবল রসুল স. এর সহচরদের জন্য সিদ্ধ। হজরত আবু জরের এই উক্তি ইতোপূর্বে বর্ণিত বেলাল বিন হারিসের বর্ণনার পোষকতা করে। হজরত আবু জরের উক্তি সম্পর্কে ইবনে জাওজী বলেছেন, এটি এমন এক ব্যক্তির বর্ণনা যাঁর সঙ্গে হজরত আবু জরের সাক্ষাত হয়নি। আমি বলি, তবে আসারটি মুরসাল পদবাচ্য। আর মুরসাল আমাদের নিকট দলিল।

'তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও'— একথার অর্থ, নির্দেশিত হজ ও ওমরা পালনে তোমরা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হও। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে হুদাইবিয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। এতে করে আরো প্রমাণিত হয়, হুদাইবিয়ার বৎসর তিনি স. ওমরার জন্য এহ্‌রাম পরেছিলেন। অতঃপর তিনি বাধাপ্রাপ্ত হলেন এবং এহ্‌রাম খুলে ফেললেন। ইমাম মালেক বলেছেন, বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি স. হজের এহ্‌রাম খুলে ফেলেছিলেন, ওমরার নয়। তাঁর এই অভিমতটি অবিশুদ্ধ। 'উহ্‌সিরতুম' কথাটির অর্থ এরকম—হে মুসলিমবৃন্দ! তোমরা যদি অবিশ্বাসীদের শত্রুতার কারণে কিংবা অসুস্থতার কারণে অথবা পাথেয় নিঃশেষ হওয়ায় বা রমণীদের ক্ষেত্রে মুহরিম এর পরলোকগমণের কারণে বায়তুল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌঁছুতে বাধাপ্রাপ্ত হও। ইহ্‌সার বা হাসার শব্দের অর্থই হচ্ছে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। ইমাম আবু হানিফা এ রকমই বলেছেন। ফাররা, কাসায়ী, আখফান, আবু ওবায়দা, ইবনে সাকিদ প্রমুখ ভাষাবিদগণ বলেছেন, ইহসার অর্থ অসুস্থতার কারণে অন্তরায়

www.eelm.weebly.com

সৃষ্টি হওয়া এবং হাসার অর্থ শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। আবু জাফর নুহাস বলেছেন, এ সিদ্ধান্তের উপর সকল ভাষাবিদ একমত।

আমি বলি, ভাষাবিদগণের উক্তির মর্ম হচ্ছে—শব্দটি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। তাহলে বর্ণিত দু'টি অর্থই যে গ্রহণীয় সে কথা বলা যায় না। যদি তাই হতো তবে 'ফাইন উহ্সিরতুম' বাক্যটি কেবল হুদাইবিয়ার ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতো না। আর হুদাইবিয়ার বাধাপ্রাপ্তির ঘটনা অসুস্থতার কারণে ছিলো না। এখানে উল্লেখিত শব্দটি হচ্ছে, ইহ্সার। বাগবী বলেছেন, হাসার ও ইহ্সার সমার্থসম্পন্ন। যেমন আরববাসীরা বলে থাকে, হাসারতুররজুলা আন হাযাতিহি (আমি লোকটিকে তার প্রয়োজন পূরণে বাধা দিয়েছি)। তারা আরো বলে, আহ্সারাহুল আদুউ (তাকে শত্রু বাধা দিয়েছে)। এতে করে প্রমাণিত হয়, শব্দটির সাধারণ ব্যবহারিক নিয়মই ইমাম আবু হানিফার দলিল। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ 'হাসার' শব্দটি দ্বারা কেবল শত্রু কর্তৃক বাধাগ্রস্ত হওয়ার অর্থই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আয়াতের বাকভঙ্গিমা তাঁদের অভিমতের বিরুদ্ধে। এই তিন ইমামের অভিমত হচ্ছে, হুদাইবিয়ার অবরোধ ছিলো কেবল শত্রুর দ্বারা।

আমি বলি, এখানে শব্দ ব্যবহারের দিকটি প্রধান হিসেবে ধরতে হবে। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো কারণ এখানে ধর্তব্য বিষয় নয়। এরপরও যদি কেউ বলে, আয়াতের প্রকাশভঙ্গি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এখানে বিষয়টি (শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্তি) সুনির্দিষ্ট। কেনোনা ক্ষণিক পরেই আল্লাহ্ বলেছেন, 'যখন তোমরা নিরাপদ হও।' আর এই নিরাপদ কথাটি আসে বিপদের পরেই। এর জবাবে আমি বলি, একথার মাধ্যমে এমনটি বুঝা যায় না যে, প্রতিবন্ধকতা কেবল শত্রুর মাধ্যমে হয়। বরং এখানে একথাই বুঝা যায় যে, শত্রুর দ্বারা যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় সেটাও ইহ্সার (বাধা)। আর অসুস্থতাও যে প্রতিবন্ধক হতে পারে, তার প্রমাণ হজরত আয়েশা বর্ণিত ওই হাদিসটি যেখানে উল্লেখিত হয়েছে— একবার রসুল স. দুবায়াহ্ বিনতে জোবায়েরকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হজের ইচ্ছা করেছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু আমি তো অসুস্থ। তিনি স. এরশাদ করলেন, ঠিক আছে। তুমি এরকম নিয়ত করো, হে আল্লাহ্! যেখানে অসুস্থতা আমার বাধা হয়ে দাঁড়াবে, সেখানেই আমি এহরামমুক্ত হবো। বোখারী, মুসলিম। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজিও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। উকাইলী বলেছেন, দুবায়াহ্ এর ঘটনাটি শুদ্ধ। এ হাদিসের দ্বারা ইমাম আহমদ ও শাফেয়ী এই বিধান উদ্ভাবন করেছেন যে, শত্রু কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত না হলেও অসুস্থতার কারণে শর্ত সাপেক্ষে এহ্রাম থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। শর্তের ব্যাপারটি হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত আম্মার, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং হজরত আয়েশা থেকে প্রমাণিত। ইমাম জাওজী বলেছেন, অসুস্থতার কারণে যখন এহ্রাম মুক্ত হওয়া সিদ্ধ তখন শর্তের ব্যাপারটা অনর্থক। আমরা বলি, দুবায়ার হাদিস হচ্ছে খবরে ওয়াহিদ যা কোরআনের

www.eelm.weebly.com

প্রতিপক্ষ হতে পারে না। কেউ কেউ বলেছেন, শর্তের বিষয়টি রহিত হয়েছে। এরকম বর্ণনা এসেছে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের হাদিসে। আমি বলি, হজরত দুবায়ার হাদিস মোস্তাহাবের অর্থবহ। ইমাম আবু হানিফার দলিল হচ্ছে হাজ্জাজ বিন আমর আনসারীর হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন—এহ্রাম অবস্থায় যদি কারো শরীরের কোনো অঙ্গ জখম হয় অথবা সে যদি খোঁড়া হয়ে যায় তবে এহ্রাম মুক্ত হতে পারবে। তবে তাকে পরের বছর হজ্জ সম্পাদন করতে হবে। তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী। বাগবী কিন্তু এ হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন।

'সহজলভ্য কোরবানী করো'— এ বাক্যটির অর্থ কয়েক রকম হতে পারে। যেমন— ১. তোমাদের উচিৎ যা সহজলভ্য তাই কোরবানী করা। ২. তোমাদের প্রতি ওয়াজিব যা সহজলভ্য তাই কোরবানী করা অথবা ৩. কোরবানী করো যা সহজে পাওয়া যায়— উট, ছাগল, গরু ইত্যাদি। কোরবানী ওয়াজিব হওয়ার কথা যারা বলেন তাদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যদি কোরবানী দুষ্প্রাপ্য হয় তবে একটি ছাগলের মূল্য ব্যয় করে মিস্কিনদেরকে খাওয়াবে। অথবা রোজা রাখবে। তিনি ত্রুটির কারণে কোরবানীর সঙ্গে কোরবানীর প্রতিবন্ধকতাকে তুলনীয় করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোরবানীর পরিবর্তে অন্য কোনো কিছু সিদ্ধ হবে না। অনুমানের উপর নির্ভর করে বিকল্প নির্ধারণ করা ঠিক নয়। আর ত্রুটিপূর্ণ হজের কোরবানী সাধারণ ওয়াজিব কোরবানীর তুল্য ভাবা জায়েয হবে না। কারণ, ইহ্সার এবং জিনায়েতের (জরিমানার) মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

'যে পর্যন্ত কোরবানীর পশু তার স্থানে না পৌছে সে পর্যন্ত তোমরা মস্তক মুন্ডন করো না।'— কোরবানীর স্থান সম্পর্কে মতানৈক্য দৃষ্টিগোচর হয়। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন কোরবানীর স্থান হলো হেরেম শরীফ। আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'কোরবানীর অবতরণস্থল হলো বায়তুল্লাহ্। প্রকৃতপক্ষে রক্তপ্রবাহ করা ইবাদত নয়। ইবাদত হলো কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বা সময়ে কোনো অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়া। হেরেম শরীফে যদি কোরবানী সম্পন্ন না হয় তবে ইবাদত হবে না। আর ইবাদত না হলে এহ্রাম মুক্ত হওয়াও যাবে না। কাজেই অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হলো কোরবানীর পশুকে হেরেম শরীফে পৌছে দিতে হবে— বলে দিতে হবে পশুটি অমুক দিন জবাই করতে হবে। সেই দিন এসে গেলে অবরুদ্ধ ব্যক্তি এহ্রাম মুক্ত হতে পারবে। ইমামে আজমের মতে দশ তারিখেই কোরবানী করতে হবে এমন কোনো বিধান নেই। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের মতে যারা বাধাপ্রাপ্ত তাদের কোরবানী দশ তারিখেই হতে হবে। অন্য তারিখ নির্ধারণের প্রয়োজন নেই। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত হচ্ছে— হজে যাত্রাকারী যে স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হবেন সে স্থানই হবে তাঁর কোরবানীর স্থান। সে স্থান হেরেম শরীফের ভিতরে বাহিরে যেখানেই হোক না কেনো। হজরত মুছাওয়ার বিন

www.eelm.weebly.com

মাখরিমা থেকে বর্ণিত হয়েছে— যখন হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হলো তখন রসুল স. বললেন, পশু কোরবানী করো এবং মস্তক মুন্ডন করো। একথা তিনবার বললেন তিনি। হজ করতে না পারার কারণে সাহাবায়ে কেরামের হৃদয় ছিলো ভারাক্রান্ত। তাই রসুল স. এর নির্দেশ তাঁদের কর্ণগোচর হলো না। তখন তিনি, তাঁর নিজের কোরবানীর জন্য নির্ধারিত উটটি জবাই করলেন। তারপর পবিত্র মস্তক মুন্ডন করলেন। এ দৃশ্য দেখে সাহাবাগণও তাঁদের কোরবানীর পশুগুলো জবাই করলেন এবং মস্তক মুন্ডন করলেন। তখন তাঁরা ছিলেন মনোবেদনায় মুহ্যমান। দেখে মনে হচ্ছিলো যেনো তাঁরা একে অন্যকে খুন করেছেন। বোখারী। মাজমা বিন ইয়াকুবের পদ্ধতিতে ইয়াকুব বিন সুফিয়ান তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দ যখন অবিশ্বাসীদের দ্বারা হুদাইবিয়ায় পথরুদ্ধ হলেন, তখন তাঁরা সেখানেই কোরবানী করলেন এবং মস্তক মুন্ডন করলেন। আল্লাহ্পাকের কুদরতে তাঁদের মুন্ডিত কেশরাজি বাত্যাতাড়িত হয়ে হেরেম শরীফে নিক্ষিপ্ত হলো। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় উল্লেখ করেছেন— রসুল স. তাঁর সহচারবৃন্দ সমভিব্যাহারে হুদাইবিয়ায় তাঁবু ফেললেন এবং সেখানেই কোরবানী সম্পাদন করে মস্তক মুন্ডন করলেন ও এহরাম মুক্ত হলেন। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী বলেছেন, হুদাইবিয়ার অবস্থান হেরেম শরীফের বাইরে। বর্ণিত অভিমত ও হাদিস সমূহের প্রেক্ষিতে হানাফী আলেমগণ বলেছেন— ১. তাহাবী ও নাসাঈ'র হাদিসে দেখা যায় রসুল স. তাঁর কোরবানী হেরেমে অবস্থিত নাজিয়া বিন জুন্দুব আসলামীর নিকট পাঠিয়েছিলেন। ২. হুদাইবিয়ার কিছু অংশ হেরেম শরীফের ভিতরে এবং কিছু অংশ বাইরে। তিনি স. হুদাইবিয়ার বাইরের অংশে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং কোরবানী করেছিলেন ভিতরের অংশে।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসটি অসম্পূর্ণ। তাছাড়া হাদিসটি প্রসিদ্ধ হাদিসগুলোর বিপরীত। এ হাদিসটিকে মেনে নিয়ে অন্য হাদিসগুলোর সঙ্গে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যে—রসুল স. কিছু কোরবানীর পশু হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে পাঠিয়েছিলেন এবং কিছু জবাই করেছিলেন হেরেমের বাহিরে। উপরন্তু আল্লাহ্পাকের ঘোষণা এই, ওই সকল অবিশ্বাসী যারা তোমাদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলো এবং কোরবানীগুলোকেও যথাস্থানে পৌঁছাতে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলো। এ কথার দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, কোরবানী যথাস্থানে পৌঁছায়নি। আর এ কথাটিও প্রমাণিত হয়ে যায় যে, কোরবানীর স্থান হচ্ছে হেরেম শরীফ। সুতরাং এ রকম বলাই উত্তম যেমন বলা হয়েছে তা'লিক পদ্ধতিতে বোখারী বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের হাদিসে। হাদিসটিতে বলা হয়েছে কোরবানী যদি যথাস্থানে পৌঁছানো সম্ভব না হয় তবে, যেখানে বাধা প্রাপ্ত হও সেখানেই জবাই করো। কোরবানীর পশু যথাস্থানে পৌঁছানো ওয়াজিব— এ অভিমতের প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা দাঁড়াবে—এরকম

www.eelm.weebly.com

যদি তোমরা সক্ষম হও তবে কোরবানী যথাস্থানে পৌঁছাও এবং মস্তক মুন্ডন করো।

ইমাম আবু দাউদ মোহাম্মদ বিন ইসহাক এবং আমর বিন মায়মুনের একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আবু হাজিব হুমায়রী থেকে শুনেছি, তিনি আবু মায়মুন থেকে বর্ণনা করেছেন— যে বৎসর সিরিয়াবাসীরা হজরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরকে মক্কা মোয়াজ্জমায় অবরুদ্ধ করেছিলো— সেই বৎসর আমি ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমার সাথে ছিলো অনেকের কোরবানীর পশু। অবরোধের কারণে আমি হেরেম শরীফে পৌঁছুতে সক্ষম হলাম না। অগত্যা যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হলাম সেখানেই কোরবানীর পশু জবাই করে ফিরে এলাম। পরের বছর কাজা ওমরা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রা করলাম। মক্কায় পৌঁছে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাসের নিকট ঘটনাটি বললে তিনি জানালেন, গত বছরের জন্য একটি কোরবানী পাঠিয়ে দাও; যেহেতু রসুল স. সাহাবাগণকে বলেছিলেন, তোমরা হুদায়বিয়ায় যে কোরবানী করেছিলে, সেগুলোর বিনিময়ে একটি করে কোরবানী করো। এই ঘটনাটি উল্লেখ করে কেউ যদি বলে, হেরেম শরীফের বাইরে কোরবানী করা যদি সিদ্ধ হতো তবে দ্বিতীয়বার কোরবানীর নির্দেশ আসতো না- তবে আমি বলবো, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাকের হাদিস আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফার মতে হজ ও ওমরা একত্রকারীর উপর দু'টি কোরবানী ওয়াজিব। কারণ তাঁদের জন্য দু'টি এহরাম। একটি হজের, একটি ওমরার। জমহুরের অভিমত হচ্ছে এহরাম একটি। কোরবানীও একটি।

মাসআলাঃ হজ বা ওমরার পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে, বাধাপ্রাপ্তির সাথে সাথে কি এহরাম মুক্ত হবে, না এহরাম মুক্তির নিয়তে কোরবানীর পশু জবাই করা জরুরী হবে। নাকি নিয়ত, জবাই, মস্তকমুন্ডন একসাথে হবে? এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, নিয়ত, জবাই ও মস্তক মুন্ডন একসাথেই হবে। কেনোনা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে হজের অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। বাকি থাকে কেবল এহরাম। এহরামের জন্য শরিয়ত মস্তক মুন্ডনের বিধান দিয়েছে। হ্যাঁ, মাথা মুন্ডন করতে হয় কোরবানীর পর। মাথামুন্ডন ও কেশকর্তনের মধ্যে মাথামুন্ডনই উত্তম। হুদাইবিয়ার দিবসে রসুল স. বলেছিলেন, মস্তক মুন্ডনকারীদের প্রতি আল্লাহ্পাক করুণা বর্ষণ করুন। সাহাবাগণ আরজ করলেন, আর কেশকর্তনকারীদের উপর? এ প্রশ্নটি তিনবার করার পর তিনি স. বলেছিলেন, কেশকর্তনকারীদের উপরেও। তাহাবী। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, যদি হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ হয় তবে মস্তক মুন্ডন ওয়াজিব। অন্যথায় নয়। কারণ, স্থান ও কালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মস্তক মুন্ডন ইবাদত বলে গণ্য হয় না। এরকম বর্ণনা রয়েছে কাফী পুস্তকে। আর হেদায়া পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে- ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদের নিকট মস্তকমুন্ডন ওয়াজিব নয়। পশু জবাই করলে এহরাম মুক্ত

www.eelm.weebly.com

হওয়া যায়। ইমাম আবু ইউসুফের নিকট মস্তকমুন্ডন অতি জরুরী। তবে না করলে দোষ নেই। কেবল জবাই করলে এহরাম মুক্ত হওয়া যাবে। ইমাম মালেক বলেছেন, বাধাপ্রাপ্ত হলেই এহরাম মুক্ত হবে। জবাই ওয়াজিব নয়। কিন্তু এই আয়াত ইমাম মালেকের বিপক্ষে। ইমাম মালেকের দলিল হজরত জাবের বর্ণিত ওই হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে- হুদাইবিয়ায় আমরা সত্তরটি উট জবাই করেছিলাম। প্রতিটি উটের অংশীদার ছিলাম সাত জন। রসুল স. বলেছিলেন, একটি উটের অংশীদার সাত জন। দারা কুতনী। হজরত জাবের থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— ষষ্ঠ হিজরীতে রসুল স. ওমরার জন্য এহরাম বেঁধেছিলেন। তাঁর সহচরের সংখ্যা ছিলো এক হাজার চারশ'। বর্ণিত হাদিস দু'টি মিলিতভাবে পাঠ করলে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অবরুদ্ধদের জন্য কোরবানী ওয়াজিব নয়। শুধু নিয়তের মাধ্যমে এহরাম মুক্ত হওয়া যায়। সত্তরটি উট পাঁচশ' লোকের জন্য যথেষ্ট নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অবশিষ্টরা কোরবানী ব্যতিরেকেই এহরামমুক্ত হয়েছিলেন।

আমি বলি, সম্ভবত অন্যেরা ছাগল কোরবানী করেছিলেন। তাছাড়া ইমাম মালেকের অভিমত অকাট্য প্রমাণের পরিপন্থী। কাজেই গ্রাহ্য নয়।

মাসআলাঃ হজ ও ওমরার এহরাম ধারণকারীগণ যদি বাধাগ্রস্ত হন, তবে তাদের উপর কাজা ওয়াজিব কি না সে সম্পর্কে আলেমগণের মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের মতে, কাজা ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল হচ্ছে—বায়যাবী বলেছেন, আল্লাহ্পাক ইহসারের আয়াতে কেবল কোরবানীর আলোচনা করেছেন। কাজার কথা বলেননি। সুতরাং কাজা ওয়াজিব নয়। ইবনে জাওজী বলেছেন, ষষ্ঠ হিজরীতে রসুল স. যখন ওমরা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন তখন তাঁর সহযাত্রীর সংখ্যা ছিলো এক হাজার চারশ'। পরের বছর সংখ্যা ছিলো অনেক কম। যদি কাজা ওয়াজিব হতো, তবে তিনি পূর্ববর্তী বছরে সকলকে কাজা আদায়ের নির্দেশ দিতেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আমি অনেক হাদিসে দেখেছি পরের বছর কাজা আদায়ের সময় ওজর আপত্তি ছাড়াই অনেকে কাজা আদায় থেকে বিরত ছিলেন। যদি কাজা ওয়াজিব হতো তবে তিনি স. অবশ্যই আগের বছরের সকলকে পুনরায় সহযাত্রী হওয়ার নির্দেশ দিতেন।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে হজের এহ্রাম মুক্ত হলে একটি হজ ও একটি ওমরা— ওমরার এহরাম মুক্ত হলে একটি ওমরা এবং হজ ও ওমরার (হজে কিরান) এহরাম মুক্ত হলে এক হজ ও দুই ওমরা কাজা করা ওয়াজিব। তাঁর দলিল হচ্ছে, হজ ও ওমরা শুরু করলে তা আদায় করা সর্বসম্মতরূপে ওয়াজিব। আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'হজ ও ওমরা পূর্ণ করো।' কাজেই কাজা আদায়ের জন্য নতুন কোনো দলিলের আবশ্যক নেই। আর বাধাগ্রস্ত হওয়ার বর্ণনায় (ফা'ইন উহ্সিরতুম) কেবল প্রতিবন্ধকতার কারণে এহরাম মুক্ত হওয়ার পদ্ধতিটি বিবৃত হয়েছে। এতে কাজা রহিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

www.eelm.weebly.com

উপরে বর্ণিত ইমামগণের দলিল প্রমাণাদির প্রেক্ষিতে বলা যায়- প্রথমত আমরা একথা মানতেই পারি না যে, পরের বছর রসুল স. এর সহচরের সংখ্যা ছিলো অল্প। একথাও মানতে পারি না যে, তিনি ওমরার কাজা আদায় করতে বলেননি। বোখারী শরীফের মাগাজী অধ্যায়ে ওয়াকেদী তাঁর শায়েখগণের একটি বিরাট দল থেকে বর্ণনা করেছেন— সপ্তম হিজরীর জিলক্বদ মাসে রসুল স. এই মর্মে নির্দেশ জারী করেছিলেন যে, যাঁরা গত বছর হুদাইবিয়ায় অবরুদ্ধ হয়েছিলো তাঁরা যেনো কাজা আদায় করে। কেউ যেনো বাদ না পড়ে। ইতোমধ্যে খায়বর যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁরা ছাড়া অন্য সকলে তাঁর সহগামী হয়েছিলেন। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন নতুন কিছু সহযাত্রী। সপ্তম হিজরীতে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন দুই হাজারের অধিক। তাছাড়া আরো বলা যায়, যাঁরা পরের বছর সহগমন করেননি তাদের নিশ্চয়ই কোনো ওজর ছিলো। তাঁরা পরে কাজা আদায় করেছিলেন। রসুল স. ঘোষণা দিয়েছিলেন, যে খোঁড়া কিংবা আহত হয়েছে সে এহরাম মুক্ত। আগামী বছর সে কাজা আদায় করবে। হজতো তাঁর দায়িত্বে রইলোই।

কেউ যদি বলে, কাজা ওয়াজিব না হলে ওমরাতুল কাজা কেনো বলা হয়? উত্তরে আমি বলি, ওমরার কাজা ছিলো বলেই একে ওমরাতুল কাজা বলা হয়নি। বরং এখানে কাজা মীমাংসা অর্থে ব্যবহৃত। যেহেতু বিগত বৎসর কোরাইশদের সঙ্গে এই মর্মে মীমাংসা হয়েছিলো যে, মুসলমানেরা আগামী বছর ওমরা আদায় করতে পারবে। তাই ওই ওমরার নাম রাখা হয়েছিলো ওমরাতুল কাজা।

'যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে রোজা কিংবা সদকা অথবা কোরবানী দ্বারা তার ফিদিয়া দেবে'— এ আয়াতে 'মিনকুম' বলতে এহরামধারীদের কথা বলা হয়েছে। 'মারিদ্ব' শব্দটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাদেরকে যাদের জন্য মস্তক মুন্ডন করা কষ্টকর। 'আজাম মির রসিহি' অর্থ, মাথার কোনো অভিযোগ বা কষ্ট। এরকম কষ্টের কারণে যদি কেউ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মস্তক মুন্ডন করে ফেলে তবে তাকে ফিদিয়া দিতে হবে। যদি কেউ সুগন্ধি ব্যবহার করে অথবা সেলাই করা কাপড় পরে তবে তার উপর ফিদিয়া বাধ্যতামূলক। আর এখানে যে রোজার কথা বলা হয়েছে সে রোজা হচ্ছে তিন দিন। একটানা তিন দিন নয়। কিন্তু তিন দিন। এখানে সদকার পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। সদকা নির্ধারিত হয়েছে হাদিস দ্বারা। হজরত কাআব বিন আজারা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন- রসুল স. যখন কাব বিন আজারাকে দেখলেন তাঁর মাথা ভর্তি উকুন মুখ পর্যন্ত নেমে এসেছে— তখন তিনি স. বললেন উকুনগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? হজরত কাব বললেন, জ্বী। রসুল স. তাঁকে মস্তক মুন্ডন করার কথা বললেন, তখন তাঁরা ছিলেন হুদাইবিয়ায়। যাত্রা ছিলো মক্কাভিমুখী। কিন্তু কাফেরদের বাধার কারণে অগ্রসর হতে পারলেন না। তিনি স. সিদ্ধান্ত নিলেন সেখানে এহরাম মুক্ত হবেন। আর ঠিক সে সময়ই অবতীর্ণ হলো ফিদিয়ার এই আয়াত। তিনি স. হজরত কাবকে বললেন, এক ফরক খাদ্য শস্য ছয়জন

www.eelm.weebly.com

মিসকিনের মধ্যে বিলিয়ে দাও অথবা একটি ছাগল কোরবানী দাও কিংবা তিন দিন রোজা রাখো।

আমি বলি, ফরকের পরিমাণ তিন সা এর সমান। এখানে উল্লেখিত নুসুক শব্দটি বহুবচন— যার একবচন হচ্ছে 'নুসাইকা' বা 'নাসিকাহ'— যার অর্থ উন্নত পর্যায়ের কোরবানীর উট, মধ্যম পর্যায়ে গাভী এবং নিম্ন পর্যায়ে ছাগল। এহরামধারীদের ফিদিয়ার কোরবানী মক্কা মোয়াজ্জমায় জবাই করা ওয়াজিব। এটা ঐকমত্য। বাধাগ্রস্ত হলে যে কোরবানী করতে হয় সেই কোরবানীর পশু মক্কা মোয়াজ্জমায় জবাই করা ওয়াজিব নয়।

'যখন নিরাপদ হবে তখন যে ব্যক্তি হজের প্রাক্কালে ওমরা দ্বারা লাভবান হতে চায়'— এ কথার অর্থ, যখন শত্রুদ্বারা অবরুদ্ধ হবে না কিংবা অসুস্থতা অন্তরায় সৃষ্টি করবে না কিংবা প্রথম থেকেই নিরাপদ থাকবে— এ অবস্থাকে এখানে 'ফা ইজা আমিনতুম' বাক্যের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে। 'ফামান তামাত্তাআ' অর্থ হজ এবং ওমরার মিলিতাবস্থায় লাভবান হওয়া। এর মধ্যে রয়েছে 'কিরান' ও 'তামাত্তু' উভয় প্রকার হজের কথা। ওমরা ও হজকে একত্রে সম্পাদন করাকে বলে 'কিরান'। আর ওমরা সম্পন্ন করে এহরাম খুলে ফেলে স্বাভাবিক অবস্থার সুবিধা ভোগ করে (স্ত্রী সহবাস এবং অন্য সুবিধাদি ভোগ করে) হজের সময় পুনরায় এহরাম গ্রহণ করে হজ সম্পাদন করার নিয়মটিকে বলে 'তামাত্তু।' কেউ কেউ বলেছেন, এখানে লাভবান হওয়ার অর্থ হচ্ছে ওমরা সম্পাদনের পর হজের এহরাম পরিধানের পূর্ব পর্যন্ত স্বাভাবিক জীবনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করা। এ ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করলে 'কিরান' হজ এ বিধানের বাইরে পড়ে যাবে। সুতরাং প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটি কোরআনের অর্থগত ও শব্দগত দিক থেকে অধিকতর উত্তম।

'সে সহজলভ্য কোরবানী করবে'—এ কথার অর্থ 'তামাত্তু' হজ সম্পাদনকারীরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে যে কোনো ধরনের কোরবানী করবে। উর্ধ্ব পর্যায়ে উট অথবা নিম্ন পর্যায়ে ছাগল— যে কোনো একটি। এরকম করা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদের মতে এ কোরবানী কৃতজ্ঞতার কোরবানী। সুতরাং কোরবানীদাতা তার গোশত্ খেতে পারবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এটা জরিমানার কোরবানী— তাই কোরবানীদাতা এর গোশত খেতে পারবে না। হজরত জাবের বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসটি প্রথমোক্ত অভিমতের দলিল যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. প্রতিটি কোরবানীকৃত উট থেকে এক টুকরো করে গোশত নিয়ে একত্রিত করলেন এবং একই পাত্রে রন্ধনের নির্দেশ দিলেন। রন্ধনের পর তিনি স. এবং হজরত আলী সে গোশত ও তার সুরুয়া ভক্ষণ করলেন। এ কারণে হাদিসটি দলিল হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে যে, রসুল স. স্বয়ং 'কিরান' হজ সম্পাদন করেছিলেন। সকল উটের গোশত একত্রিত করার উদ্দেশ্য ছিলো কোরবানীদাতার জন্য তার কোরবানীর গোশত ভক্ষণ করা যে মোস্তাহাব সে বিষয়টিকে প্রমাণ করা। ইবনে জাওজীর মতে দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে— হজরত আলী

www.eelm.weebly.com

থেকে আবদুর রহমান ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনাটি। হজরত আলী বলেছেন, রসুল স. আমাকে আহারের পর বেঁচে যাওয়া গোশত বিলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতে করে প্রমাণিত হয়, এরূপ কোরবানীর গোশত খাওয়া সিদ্ধ।

ইমাম শাফেয়ীর মতে, যে সকল কোরবানী ওয়াজিব সেগুলোর গোশত ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ওই সকল গোশত মিসকিনদের হক। তাঁর দলিল হচ্ছে—হজরত নাজিয়া খাজামী যিনি রসুল স. এর উটের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন- তিনি রসুল স.কে প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! কোনো উটের ক্ষতির আশংকা দেখলে কী করবো? তিনি স. বললেন, জবাই করো। জুতায় রক্ত মাখাও। তারপর উটের শরীরের পাশে দাগ দিয়ে ছেড়ে দাও। মিসকিনেরা খেয়ে নেবে। মালেক, আহমদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজা। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। ওয়াকেদীর বর্ণনায় অতিরিক্ত সংযোজিত রয়েছে একথাটি- তুমি বা তোমার কোনো বন্ধু (ওই গোশত) খাবে না। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. একজনকে আমীর নিযুক্ত করে তাঁর তত্ত্বাবধানে ষোলোটি উট দিলেন এবং বলে দিলেন, তুমি বা তোমার কোনো লোক এগুলোর গোশত খাবে না। মুসলিম। এ প্রসঙ্গে আরও অনেক হাদিস রয়েছে।

আমি বলি, এ হাদিসগুলোর সঙ্গে 'কিরান' বা 'তামাত্তু' হজের কী সম্পর্ক? এগুলো হুদাইবিয়ার ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। নাও পারে। তিনি স. হিজরতের পরে কেবল বিদায় হজ ব্যতীত অন্য কোনো হজ করেন নি। বর্ণিত হাদিসগুলোতে যে কোরবানীর উল্লেখ দেখা যায় সেগুলো কি হজের সঙ্গে সম্পর্কিত? মনে হয় না। বরং সেগুলো নফল কোরবানী হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর আমরাও নফল কোরবানী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকি যে, ওগুলোর গোশত খাওয়া সিদ্ধ নয়— যদি পথে ক্ষতির আশংকায় সেগুলোকে জবাই করা হয়ে থাকে।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী ও আহমদের মতে তামাত্তু হজের কোরবানী, কোরবানীর দিন অর্থাৎ দশই জিলহজের পূর্বে জবাই করা সিদ্ধ নয়। দশই জিলহজ কংকর নিক্ষেপের পর কোরবানী করা উচিৎ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, দশই জিলহজের আগেও কোরবানী করা যাবে। আমাদের দলিল হচ্ছে- জননী হাফসা, রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনি আমাদের সঙ্গে এহরাম মুক্ত হলেন না কেনো? তিনি স. বললেন, কোরবানী পাঠিয়ে দিয়েছি। এখনো মাথা মুন্ডন করিনি। কোরবানী সম্পাদনের পর এহরাম মুক্ত হবো। এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদিস এই— রসুল স. এরশাদ করেন, আমি কোরবানী না নিয়ে এলে এহরাম মুক্ত হতাম। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় 'কিরান' এর কোরবানী দশই জিল হজের আগে জবাই করা সিদ্ধ নয়। যদি হতো, তবে রসুল স. এহরাম মুক্ত হতে আপত্তি করতেন না।

যদি কেউ না পায় তবে তাকে হজের সময় তিন দিন রোজা রাখতে হবে। গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর রাখতে হবে সাতটি রোজা। এভাবে মোট দশদিন রোজা রাখতে

www.eelm.weebly.com

হবে তাকে। প্রথমোক্ত তিন দিনের শেষ রোজাটি হতে হবে আরাফার দিবসে। এই তিন দিনের রোজা ওয়াজিব। যদি এহরাম অবস্থায় আরাফা দিবসের পূর্বেই রোজা তিনটি পালন করে তবে ঐকমত্যসূত্রে সিদ্ধ হবে না। বরং কোরবানীর দিনে রোজা রাখা হারাম। তাই এহরামমুক্ত হওয়ার পর রোজা রাখলে ওয়াজিব আদায় হবে না।

হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. দুইদিন রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। ঈদুল ফিতরের দিন ও কোরবানীর দিন; যে দিন কোরবানীর গোশত খাওয়া হয়। হজরত আবু সাঈদ ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। হজরত আমর বিন আস বলেছেন, রসুল স. কোরবানীর দিন রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ ও ইবনে মুনজির। ইবনে খুজাইমা ও হাকেম হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। হজরত কাব বিন মালেক থেকে মুসলিম বলেছেন, এ দিনগুলো পানাহারের দিন। মুসলিমের বর্ণনায় নাবিসা হাজালী কর্তৃকও এরকম বলা হয়েছে। বিশর বিন সুহাইল থেকে নাসাঈর মাধ্যমে অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। বিশুদ্ধ সনদে উকবা বিন আমের থেকে সুনান প্রণেতাগণ, হাকেম এবং ইবনে হাব্বানও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে ইবনে আবদুল বার বলেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেন, তাশরিকের দিন— পানাহার ও নামাজের দিন। ওই দিন রোজা রাখবে না। এ সম্পর্কে আরও অনেক হাদিস রয়েছে।

ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, তামাত্তু হজ সম্পাদনকারী যদি কোরবানী করতে সমর্থ না হয় এবং কোরবানীর আগে রোজা না রাখে তবে তাশরিকের দিন তাঁর জন্য রোজা রাখা সিদ্ধ। তবে কোরবানীর দিনে রোজা রাখা ঐকমত্য সূত্রে 'নাজায়েজ। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও জননী আয়েশা বলেছেন, 'আইয়ামে তাশরিকে' রোজা রাখা যায় না। তবে যে কোরবানী সংগ্রহ করতে পারেনি তাঁর জন্য অনুমতি রয়েছে। বোখারী। হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী আরও বর্ণনা করেন, 'তামাত্তু' সম্পাদনকারীদের জন্য আরাফার দিন পর্যন্ত রোজা রাখা জায়েয। তবে যে কোরবানী সংগ্রহ করতে অসমর্থ এবং আরাফার দিন পর্যন্ত যে রোজাও রাখেনি সে মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে রোজা রাখবে। ইমামত্রয় বলেছেন, যদিও এটা আসার- তবুও বিধানের দিক দিয়ে মারফুর স্থলাভিষিক্ত।

আমরা বলি, আসার বিধান হিসেবে মারফু- এ সিদ্ধান্ত আমরা মানি না। মনে হয় হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত আয়েশা 'হজের তিন দিন' কোরআনের এই নির্দেশ থেকে আইয়ামে তাশরিকের তিন দিনকে ধরে নিয়েছেন। ওই তিন দিন হজের কিছু অনুষ্ঠান থাকে। যেমন কাঁকর নিক্ষেপ ইত্যাদি। তাই তাঁরা ওই তিন দিনের মধ্যে রোজা রাখা সিদ্ধ বলেছেন। কেউ যদি বলে, হজরত ইবনে ওমর থেকে দারা কুতনীর বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. কোরবানীর পশু নেই— এরকম

www.eelm.weebly.com

তামাত্তু হজ সম্পাদনকারীকে আইয়ামে তাশরিকে রোজা রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। ইমাম তাহাবী ও হজরত আয়েশা থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের মত হচ্ছে, হজরত ইবনে ওমরের হাদিসের সনদভুক্ত ইয়াহ্ইয়া বিন সাম্মাম বর্ণনাকারী হিসেবে নির্ভরযোগ্য নয়। দারা কুতনী ও তাহাবী হাদিসটিকে জয়ীফ বলেছেন। আরেক বর্ণনাকারী ইবনে আবী লায়লা সম্পর্কে তাহাবী এনেছেন স্মৃতিভ্রষ্টতার অভিযোগ। হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসের সনদও দুর্বল। তাই এই হাদিসগুলো নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদিসের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে কীরূপে? তাহাবী বলেছেন, অনেক আসার দ্বারা সুসাব্যস্ত হয়েছে যে, রসুল স. যখন মিনায় অবস্থান করছিলেন, তখন হাজ্জাজও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীদের অনেকেই ছিলেন তামাত্তু হজ সম্পাদনকারী। আমি বলি, সকল হাজীই ছিলেন তামাত্তু অথবা কিরান হজ সম্পাদনকারী। কারণ, রসুল স. ওই বছর এহরাম ভঙ্গ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এহরাম পুনর্গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন তালবীয়ার দিনে। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি স. ওই দিনগুলোতে রোজা রাখতে নিষেধ করেছিলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের উক্তি অনুযায়ী 'হজের সময় তিন দিন' বলতে কী বুঝানো হয়েছে? ওই তিন দিন কি হজের রোকন না ওই তিন দিন হজের দিন?

আমি বলি, হজের রোকনগুলো প্রতিপালনের সময়, রোজার সময় নয়। আরাফার দিনেই হজের সময় শেষ হয়ে যায়। 'আলহাজ্জু আশহুরুম মা'লুমাত'— বলতে হজের সময় দু'মাস দশ দিন ধার্য করা হয়েছে—শাওয়াল, জিলক্বদ ও জিলহজের দশ তারিখ পর্যন্ত। পরের আয়াতে স্ত্রীসম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহবিবাদ বিধেয় নয় বলা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে আইয়ামে তাশরিক পড়ে না। কারণ, এ দিবসগুলোতে পানাহার, রতিকর্ম, শিকার ইত্যাদি জায়েয।

মাসআলাঃ কেউ যদি মাথামুন্ডনের পূর্বে রোজা রাখা অবস্থায় অথবা রোজার পরে কোরবানীর পশু পেয়ে যায়, তবে আমাদের মতে কোরবানী করা ওয়াজিব। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের মতে ওয়াজিব নয়। আমাদের দলিল হচ্ছে- প্রথম অবস্থায় কোরবানী ওয়াজিব ছিলো। দ্বিতীয় স্তরে রোজা বিধিবদ্ধ হয়েছে- এই দ্বিতীয়াবস্থায় কোরবানী সহজলভ্য হওয়ার কারণেই কোরবানী ওয়াজিব হবে। যেমন তায়াম্মুম আদায়ের সময় পানি পেয়ে গেলে অজু করে নিতে হয়। আর যদি হজের সময় রোজা বাদ পড়ে যায় তবে একটি কোরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী বলেছেন, আলোচ্য রোজা তিনটি পালন করতে হবে হজের পরে। আমরা বলি, রোজা করতে হয় কোরবানীর পরিবর্তে। ইচ্ছে করলেই এই পরিবর্তন করা যায় না। আর রোজার বিনিময়ে কোরবানী শরিয়তের ভিত্তিতে সাব্যস্ত।

www.eelm.weebly.com

'গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন'— এ কথার অর্থ হজ অনুষ্ঠানসমূহ সম্পাদনের পর সাতটি রোজা করতে হবে। একথা বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী বলেছেন, একথার অর্থ যখন তোমরা হজ সমাপ্ত করে বাড়ির দিকে যাত্রা করবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কেউ যদি হজের পরে মক্কাতে বসবাস করতে চায়। অথবা যার বাড়িঘর বলতে কিছু নেই— সে কী করবে? কাজেই হজ সম্পাদনকারী যেখানেই অবস্থান করুক না কেনো, সেখানেই রোজা আদায় করবে।

'এই পূর্ণ দশদিন'— একথা বলা হয়েছে রোজাগুলোকে গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্য। অর্থাৎ পূর্বে উল্লেখিত তিন এবং পরের সাত— এই দশদিন রোজা পালন করতে হবে।

'এই বিধান তাদের জন্য যাদের পরিজনবর্গ মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়'। —এই কথাটির মাধ্যমে স্পষ্ট বুঝা যায় বিধানটি মক্কাবাসীদের উপরে কার্যকর নয়। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেছেন। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, মক্কাবাসীদের জন্য হজে তামাত্তু জায়েয। কিন্তু তাদের জন্য কোরবানী ওয়াজিব নয়। তাদের মতে এই বিধান (ইহা) কোরবানীর প্রতি প্রযোজ্য। আমরা বলি, আমাদের ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা হজরত ইবনে ওমর ও হজরত ইবনে আব্বাসও করেছেন। একবার হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের নিকট কাদের উপর তামাত্তু হজ সিদ্ধ বা অসিদ্ধ— সে সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, মক্কাবাসী ব্যতীত সকলের জন্য সিদ্ধ। আল্লাহ্পাকও বলেছেন, 'ইহা তাদের জন্য যাদের পরিবারবর্গ মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়।' ইবনে হুম্মাম উল্লেখ করেছেন, মক্কাবাসীদের জন্য কিরান ও তামাত্তু হজ জায়েয নয়। হজরত ইবনে ওমর ও ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে—মিকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীরাই মসজিদে হারামের বাসিন্দা। হজরত ইকরামাও এরকম বলেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যাঁরা মক্কা মোয়াজ্জমা থেকে সফরের (তিন দিনের) দূরত্বের ভিতরে বাস করেন তাঁরাই মসজিদে হারামের অধিবাসী। তাউস ও অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন, তাঁরা হচ্ছেন হেরেম শরীফের অধিবাসী। যেহেতু মসজিদুল হারাম জনবসতির স্থান নয়, সেহেতু মসজিদে হারামের বাসিন্দা বলতে হেরেম শরীফের অন্তর্ভুক্ত বাসিন্দাদের বুঝতে হবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'কাবার (প্রতি চালিত) কোরবানী সমূহ।' আরেক আয়াতে মসজিদে হারাম বলতে হেরেম শরীফকেই বুঝানো হয়েছে। ইমাম মালেক বলেছেন, মসজিদুল হারামের বাসিন্দা অর্থ বিশেষভাবে মক্কার বাসিন্দা। নাফে, আয়রাজ ও তাহাবীও এ মতের সমর্থক। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কোনো মক্কাবাসী যদি তামাত্তু হজ করে, তবে তাকে একটি ছাগল কোরবানী দিতে হবে। কারণ, সে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছে। এই কোরবানীর স্থলে রোজা রাখলে

www.eelm.weebly.com

চলবে না এবং ওই কোরবানীর গোশত সে খেতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী ও অন্য ইমামগণ বলেছেন, তাঁকে কিছুই করতে হবে না।

'আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে আল্লাহ মন্দকাজের প্রতিফল দানে কঠোর'— এ কথার অর্থ, আল্লাহ্‌র ভয়ে আদেশ প্রতিপালন করো এবং নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত হও। কারণ, তিনি মন্দ কাজের কঠোর শাস্তি দানকারী।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ্‌পাক এই আয়াতে হজ ও ওমরার বিবরণ দিয়েছেন। দু'টিকে আবার মিলিতাবস্থায় আদায় করতে বলেছেন। হাদিসের বর্ণনা দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, হজ ও ওমরার সম্মিলিত প্রতিপালন দুই প্রকৃতির হতে পারে। একটি হচ্ছে একই সাথে হজ ও ওমরার এহরাম গ্রহণ করে হজ ও ওমরা সমাধার পর এহরাম মুক্ত হওয়া— এরকম হজকে বলে হজে কিরান। দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রথমে ওমরার এহরাম গ্রহণ করে ওমরা সম্পাদনের পর এহরামমুক্ত হয়ে হজ প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় অবস্থান করা। এ অবস্থায় সঙ্গে থাকতে হবে কোরবানীর পশু। তালবীয়ার দিবস এলে পুনরায় হজের এহরাম পরিধান করা এবং হজ সম্পাদনের পর দশই জিলহজ্জ কোরবানী করে এহরাম মুক্ত হওয়া। এই প্রকৃতির হজকে বলে হজে তামাত্তু। এই দুই প্রকৃতির হজই বৈধ। তবে কোনটি উত্তম, সে সম্পর্কে মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রসুল স. বিদায় হজে কোন প্রকৃতির হজ করেছিলেন? ইফরাদ, কিরান না তামাত্তু? আরো প্রশ্ন হতে পারে, হজ ও ওমরার জন্য একটি তাওয়াফই যথেষ্ট না একাধিক? জমহুর বলেছেন, এক তাওয়াফ ও এক সায়ী যথেষ্ট। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, দুই তাওয়াফ ও দুই সায়ী করতে হবে। প্রসঙ্গটির বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার লেখা মাসরুল আহকাম দেখে নেয়া যেতে পারে।

প্রকৃত কথা এই যে, রসুল স. হজে কিরান সম্পাদন করেছিলেন। তাই তামাত্তু অপেক্ষা কিরান উত্তম। তবে শর্ত হচ্ছে- সঙ্গে কোরবানীর পশু থাকতে হবে। আর তামাত্তু উত্তম হবে তখনই, যখন কোরবানীর পশু সঙ্গে থাকবে না। হজে কিরান ও হজে তামাত্তু হজে ইফরাদ অপেক্ষা উত্তম। রসুল স. মক্কা মোয়াজ্জমায় এসে তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন করেছিলেন। এরপর আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের আগে আর কোনো তাওয়াফ করেন নি। বোখারী।

আমি বলি, রসুল স. কৃত তাওয়াফ ও সায়ী ছিলো ওমরার জন্য। আর এই তাওয়াফই তাওয়াকে কুদুম এর জন্য যথেষ্ট। তিনি স. তাওয়াফ সম্পন্ন করেছিলেন পায়ে হেঁটে। হজরত হাবীবা বিনতে আবী তুজারা, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং হজরত জাবের থেকে এ সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন মুসলিম। রসুল স. তাওয়াফে জিয়ারত সম্পন্ন করে সাফা মারওয়ায় সায়ী করেছিলেন। হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে— তিনি সায়ী করেছিলেন বাহনে উপবিষ্ট হয়ে। এ রকম করেছিলেন এ জন্য যে, জনতা যেনো তাঁর দর্শন লাভে ধন্য হতে পারে এবং তাঁকে হজ সম্পর্কিত বিভিন্ন মাসায়েল জিজ্ঞেস করতে পারে।

www.eelm.weebly.com

মুসলিম। অপর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়— বিদায় হজে তিনি তাওয়াফ করেছিলেন উষ্ট্রারোহী হয়ে এবং যষ্টি দ্বারা চুম্বন করেছিলেন হাজারে আসওয়াদ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯৭

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ ○

❑ হজ্ব হয় সুবিদিত মাসে। অতঃপর যে কেহ এই মাসগুলিতে হজ করা তাহার কর্তব্য মনে করে তাহার জন্য হজ্বের সময়ে স্ত্রী- সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহবিবাদ বিধেয় নহে। তোমরা উত্তম কাজের যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা জানেন। এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করিও, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।

হজের মাস সুনির্দিষ্ট ও সুবিদিত। হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, হজের মাস হলো শাওয়াল, জিলক্বদ ও জিলহজ। আমি বলি, শাওয়াল ও জিলক্বদ সম্পূর্ন মাস এবং জিলহজ মাসে নয় দিন অর্থাৎ কোরবানীর দিনের সকাল পর্যন্ত। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, শাওয়াল, জিলক্বদ ও জিলহজ্ব মাসের দশদিন। বাগবী বলেছেন, বর্ণিত দু'টি হাদিসই শুদ্ধ। নয় দিন অর্থ জিলহজ মাসের পুরো নয় দিন এবং দশদিন অর্থ দশ রাত্রি। আরববাসীদের নিয়ম হচ্ছে— সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশের উল্লেখ না করা। তাই এখানে নয় অথবা দশ বলা হয়েছে। তাই একস্থানে নয় দিনের পরের রাতকে না ধরে বলা হয়েছে নয় এবং আরেক স্থানে দশম রাত্রিকে দিন সহ ধরে বলা হয়েছে দশ। কোরআন মজীদের বর্ণনাতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন একস্থানে বলা হয়েছে—পবিত্র সেই পরম সত্তা, তিনি তাঁহার বান্দাকে নিয়ে গেলেন রাতে। মেরাজ সম্পর্কিত এ আয়াতে রাতের কিছু অংশ ব্যবহৃত হয়েছিলো— কিন্তু বর্ণনায় এসেছে পুরো রাতের কথা। হজরত ওরওয়া বিন জোবায়ের বলেছেন, হজের মাস বলতে বুঝানো হয়েছে শাওয়াল, জিলক্বদ এবং পুরো জিলহজ মাস। কারণ, হজের পরেও হজ সম্পর্কিত অনেক অনুষ্ঠান বাকী থেকে যায়। যেমন— কোরবানী, কংকর নিক্ষেপ, তাওয়াফে জিয়ারত, মিনার প্রান্তরে অবস্থান ইত্যাদি। এগুলোকেও হজের মাসের মধ্যে সীমায়িত করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, জিলহজ মাসের তের তারিখের মধ্যে হজ সম্পর্কিত সকল অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। কাজেই পুরো জিলহজ মাসকে হজের মাসের মধ্যে গণ্য করা ঠিক নয়। বায়যাবী বলেছেন, জিলহজ মাস পুরাপুরিই হজের মাস। তিনি আরো বলেছেন, জিলহজ মাসের মধ্যে হজ অপেক্ষা অন্য কোনো অনুষ্ঠান সর্বোত্তম নয়। ইমাম মালেক বলেছেন, জিলহজ মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে ওমরা করা মাক্‌রূহ। আমি বলি, ব্যাখ্যাটি সুসংগত নয়। কারণ, ওই সময় বিদেশাগতদের জন্য ওমরা করা সর্বসম্মতভাবে জায়েয। স্বয়ং রসুল স. জিলক্বদ মাসে চারবার ওমরা করেছিলেন। তাই ইমাম মালেক এবং শাফেয়ী বলেছেন মক্কাবাসীদের জন্য তামাত্‌তু হজ সিদ্ধ। ইমাম শাফেয়ী এ আয়াত থেকেই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, হজের সময়ের পূর্বে হজের এহরাম গ্রহণ সিদ্ধ নয়। দাউদ বলেছেন, হজের সময়ের পূর্বে হজের এহরাম অনর্থক। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, হজের সময়ের আগে যদি কেউ এহ্‌রাম গ্রহণ করে তবে তাঁর হজ হবে। তবে তা হবে মাকরূহ। তাঁদের দলিল হচ্ছে— এহরাম হচ্ছে হজের শর্ত— এ রকম নয়। কেউ যদি হজ বা ওমরার সংকল্প না করে এহরাম গ্রহন করে এবং পরে হজে কিরান বা তামাত্‌তু অথবা ওমরার নিয়ত করে তবে তা জায়েয হবে। হজরত আনাস বিন মালিকের বর্ণনাটিকে তাঁরা তাঁদের এই বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। হজরত আলী ইয়ামান থেকে রসুল স. এর সকাশে উপস্থিত হলেন। রসুল স. বললেন, আলী তোমার উদ্দেশ্য কী? কিসের এহরাম গ্রহণ করেছো? হজরত আলী বললেন, রসুল স. এর যা নিয়ত আমারও তাই। হজরত আবু মুসা আশআরী থেকেও এ ধরনের হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হাদিস দু'টি রয়েছে বোখারী ও মুসলিমে। সুতরাং এটা সাব্যস্ত হলো যে, এহরাম হজের রোকন নয় বরং শর্ত। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে শর্তের বাস্তবায়ন শরিয়ত সমর্থিত। যেমন, নামাজের শর্ত হচ্ছে অজু। আর নামাজের সময়ের আগেই অজু করা জায়েয। তবে এ কথাও ঠিক যে, নামাজের জন্য অজু কেবলই শর্ত। এহরামও শর্ত বটে, কিন্তু রোকনের সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন ক্রীতদাস যদি এহরাম গ্রহণ করার পর আরাফার দিবসের আগে আজাদ হয়ে যায় তবে তার ফরজ আদায় হবে না। এ কারণেই আমরা মাকরূহ বলি। আবার এহরাম যেহেতু হজের শর্তও তাই হজের পূর্বে এহরাম গ্রহণকে সিদ্ধ বলা হয়েছে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পূর্বে হজ সম্পন্ন হবে না। যেমন বিতির নামাজের জন্য এশার নামাজ শর্ত। কিন্তু তাই বলে বিতির আদায়ের জন্য কেউ যদি মাগরিবের পরপরই এশার নামাজ আদায় করে বিতির পড়ে তবে কি তা সিদ্ধ হবে? আল্লাহপাক সমধিক জ্ঞাত।

'যে এই মাসগুলোতে হজ করা তার কর্তব্য বলে মনে করে'— একথার অর্থ, যে হজের মাসে হজ সম্পাদনার্থে এহরাম গ্রহণ করে। এহরাম সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্নরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ বলেছেন, এহরাম হলো রোজার মতো মনে মনে হজের জন্য সংকল্পবদ্ধ হওয়া। এখানে

www.eelm.weebly.com

তালবিয়া (লাব্বায়িক) উচ্চারণ করা কোনো শর্ত নয়। তবে ইমাম মালেক বলেছেন, এহরামের সময় লাব্বায়িক বলা ওয়াজিব। যদি কেউ এই ওয়াজিব পরিত্যাগ করে, তবে তাঁকে একটি কোরবানী দিতে হবে। শাফেয়ী ও আহমদও এরকম বলেছেন। তবে তাঁদের প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে— তালবিয়া সুন্নত। ইমাম আবু হানিফার মতে, তালবিয়া সহ এহ্রামের নিয়ত করতে হবে। যেমন, নামাজের নিয়তের সঙ্গে তাকবীর উচ্চারণ করতে হয়। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, হজের তালবিয়া পাঠ ফরজ। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, তালবিয়া ফরজ। ইবনে আবী শাইবা বলেছেন, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদও এই অভিমত পোষণ করেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিসটিই আমাদের দলিল— যাতে বলা হয়েছে রসুল স. এরশাদ করেছেন, মদীনাবাসীদের জন্য জুলহুলাইফা থেকে তালবিয়া পাঠ করা উচিৎ। মাতা আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. এরশাদ করেন, যার সংগ্রহে কোরবানীর পশু রয়েছে, সে যেনো হজ ও ওমরা উভয়টির জন্য এহ্রাম গ্রহণ করে। দেখা যাচ্ছে, রসুল স. তালবিয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তালবিয়া হচ্ছে উচ্চ স্বরে লাব্বায়িক বলা। আল্লাহ্ ও রসুল স. এর আদেশ ওয়াজিব। হাদিস শরীফের মাধ্যমে তালবিয়া ওয়াজিব প্রমাণিত হয়েছে। যারা তালবিয়াকে ওয়াজিব বলেন না, হাদিস শরীফ তাদের বিপক্ষে। প্রকৃত কথা এই যে, এহ্রামই হলো তালবিয়া। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা একথা বলেছেন যে, যে যাত্রার জন্য উট সজ্জিত করে হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো, সে এহ্রাম গ্রহণকারী হয়ে গেলো;তালবিয়া উচ্চারণ না করলেও। এতে করে বুঝা যায়, ইমাম আবু হানিফা আমলকে (কর্মকে) উচ্চারণের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। কারণ, জিকির যেমন কথা দ্বারা হয়, তেমনি হয় কর্ম দ্বারা। যে ব্যক্তি বসে বসে আজানের জবাব উচ্চারণ করে এবং যে ব্যক্তি আজানের প্রাক্কালে মসজিদ অভিমুখে যাত্রা করে- দু'জনই আজানের জবাব দানকারী। একজনের জবাব কথা। আরেক জনের জবাব কাজ। আর কাজই আজানের মূল জবাব। তেমনি তালবিয়ার অর্থ, স্বয়ং উপস্থিত হওয়া এবং আনুগত্যের প্রস্তুতি। পক্ষান্তরে 'লাব্বায়িক' (আমি উপস্থিত) বলা কেবল মৌখিক ঘোষণা।

আমি বলি, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে যে, হজের ইচ্ছে নেই— এমন কেউ যদি মক্কা মোয়াজ্জমায় কোরবানীর পশু পাঠিয়ে দেয়, তবে সেও এহ্রাম গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য। তাঁর উপরও ওই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হবে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এহ্রাম গ্রহণকারীদের উপর। আসার দু'টির মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয়ে যে, এটাই ছিলো হজরত দ্বয়ের মাজহাব। তবে ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে এর বিপক্ষে। বোখারী বলেছেন, জিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান মাতা আয়েশার নিকট এই মর্মে একটি লিখিত অভিযোগ পেশ করলেন যে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস

www.eelm.weebly.com

বলেন, যারা মক্কা শরীফে কোরবানী পাঠিয়েছে, তাদের প্রতিও ওইসব বিষয় নিষিদ্ধ- যে সকল নিষিদ্ধতা থাকে এহরামকারীদের উপর। মাতা আয়েশা তখন বলেছিলেন, এটা ঠিক নয়। আমি স্বহস্তে কোরবানীর পশুর জন্য মালা বানিয়েছি। রসুল স. স্বয়ং তা পশুর গলায় বেঁধে দিয়ে আমার পিতার দায়িত্বে মক্কা শরীফে পাঠিয়েছেন; কিন্তু তিনি নিজের উপর কোনো কিছু হারাম করেননি। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, ঘটনাটি নবম হিজরীর।

'স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ বিবাদ বিধেয় নয়'—জুযাজ বলেছেন, স্ত্রী সম্ভোগ বুঝাতে এখানে 'রাফাস' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, রাফাস অর্থ অশ্লীলতা। আমি বলি, অশ্লীলতা তো সকল সময়ের জন্যই হারাম। সুতরাং এই আয়াতে রাফাস শব্দটির অর্থ অশ্লীলতা নয়, স্ত্রী সম্ভোগই বুঝতে হবে।

অন্যায় আচরণ সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, এহরাম গ্রহণকারীদের জন্য যা নিষিদ্ধ তাই অন্যায় আচরণ বা ফুসুক্ব। এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধকর্ম ছয়টি। ১. রতিক্রিয়া ও রতিকর্মের প্রতি প্ররোচনা। এ বিষয়টি প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ এই নিষেধাজ্ঞাটি লংঘন করলে হজ ও ওমরা দু'টিই বিনষ্ট হয়। অন্য নিষেধাজ্ঞাগুলো লংঘন করলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কোরবানী অপরিহার্য হয়। এভাবে হজ ও ওমরা বিনষ্টি থেকে রক্ষা পায়। অবশ্য আরাফা দিবসের পর স্ত্রী সম্ভোগ হজকে বিনষ্ট করে কিনা—সে সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু আরাফা দিবস পর্যন্ত নিষিদ্ধতা সম্পর্কে কোনোই মতানৈক্য নেই। ২. স্থলভাগে শিকার করা বা কোনো শিকারীকে শিকার দেখিয়ে দেয়া। যেমন, অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'এহরাম অবস্থায় শিকার কোরো না।' আরেক স্থানে বলা হয়েছে, 'তোমাদের উপর স্থলভাগের শিকার হারাম— যখন এহরামে থাকো।' ৩. চুল ও নখ কর্তন করা। যেমন আল্লাহপাক বলেছেন, 'মাথা মুন্ডন কোরো না যতোক্ষণ না— কোরবানীর স্থানে কোরবানীর পশু পৌঁছে যায়।' শরীরে উপবিষ্ট মাছি, মশা এবং উকুন মারাও কেশকর্তনের পর্যায়ভূত। ৪. শরীরে বা বস্ত্রে আতর ব্যবহার করা। রসুল স. এরশাদ করেন, এমন পোশাক পরিধান কোরো না, যাতে ব্যবহৃত হয়েছে জাফরান বা অরস। বোখারী, মুসলিম। এই চারটি নিষেধাজ্ঞা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। অবশিষ্ট দু'টি নিষেধাজ্ঞা কেবল পুরুষের জন্য। সে দু'টো হচ্ছে— ১. সেলাই করা পোশাক পরিধান করা যাবে না ও মোজা পরিধান করা যাবে না। তবে কারো নিকট লুঙ্গি না থাকলে সে পাজামা পরতে পারবে আর জুতা না থাকলে পরতে পারবে মোজা। ২. মাথা ঢেকে রাখা যাবে না। ইমাম আবু হানিফা ও মালেক বলেছেন, পুরুষ রমণী উভয়ের জন্য মুখমন্ডল আবৃত করা হারাম। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, মুখমন্ডল আবৃত করা হারাম কেবল রমণীদের জন্য। যেহেতু হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, পুরুষের জন্য মাথা আর নারীর জন্য মুখ ঢেকে রাখা হারাম। দারা কুতনী, বায়হাকী।

www.eelm.weebly.com

হজরত ওসমান বলেছেন, রসুল পাক স. এহরাম অবস্থায় তাঁর পবিত্র মুখাবয়ব ঢেকে রাখতেন। দারা কুতনী। তিনি বলেছেন, হাদিসটি মওকুফ। ফারাকেছা বিন উমায়ের হালাফী হজরত ওসমানকে আরজ নামক স্থানে এহরামের অবস্থায় মুখমন্ডল আবৃত রাখতে দেখেছিলেন। আমাদের দলিল হচ্ছে—হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক এহরামধারীকে তার বাহন আঘাত করলে সে মারা যায়। কাফনের সময় তাঁর মুখমন্ডল ঢেকে দেয়ার প্রাক্কালে রসুল স. বললেন, মাথা ও মুখ ঢেকো না। সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠ করতে করতে পুনরুত্থিত হবে।

এহরাম অবস্থায় বিবাহ করা যাবে কি না সে সম্পর্কে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের মতে, এহরাম অবস্থায় নিজের কিংবা অন্যের বিবাহ সম্পাদন করা চলবে না। কাউকে উকিলও বানানো যাবে না। এরকম কিছু করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। হজরত ওসমান বর্ণিত হাদিসটি তাঁদের দলিল—যেখানে বলা হয়েছে, এহরাম অবস্থায় বিয়ে করা যাবে না, করানোও যাবে না। পাত্রীও দেখা যাবে না। মুসলিম, আবু দাউদ। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বিয়ে করা যাবে। বিয়ের চুক্তিও গ্রহণীয় হবে। যেহেতু আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. জননী মায়মুনাকে এহরাম অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন। তিনি স. অবশ্য নব পরিণীতার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এহরাম মুক্ত অবস্থায়। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিস সম্পর্কে জমহুরগণ বলেছেন, হাদিসের বর্ণনা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। ইয়াজিদ বিন আসেম থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন— জননী মায়মুনা বিনতে হারিস স্বয়ং আমাকে বলেছেন, রসুল স. যখন আমাকে বিয়ে করেন, তখন তিনি ছিলেন এহরাম মুক্ত। ইয়াজিদ বলেছেন, হজরত মায়মুনা আমার ও ইবনে আব্বাসের খালা। জমহুর বলেছেন, হজরত মায়নুনার বর্ণনাই অধিক গুরুত্ববহ। তিনি নিশ্চয় হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের চেয়ে আপন অবস্থা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাছাড়া হজরত ওসমানের হাদিসে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট। তদসত্ত্বেও হজরত ওসমানের হাদিস কওলী (কথা) এবং মাতা মায়মুনার হাদিস ফেলী (কর্ম)। এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে রসুল স. এর এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো অন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এঘটনাটি হয়তো সে রকমই বৈশিষ্ট্যভূত।

কলহ বিবাদ বিধেয় নয় (আলা জিদালা ফিল হাজ্জ)—ক্বারী আবু জাফর এখানে 'লা জিদালা' বাক্যাংশটিকে পড়তেন লা জিদালু এবং 'লাজিদ লুনা' অন্য ক্বারীগণ লা জিদালা-ই পড়েছেন।

মূর্খতার যুগের রীতি ছিলো হাজীরা আরাফার ময়দানের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করতো। প্রত্যেকে মনে করতো আমি হজরত ইব্রাহিমের অবস্থানে আছি। এ মনোভাবের কারণে তাদের মধ্যে লেগে যেতো ঝগড়া ও মারামারি। ফলে তারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়তো। কেউ থাকতো আরাফায় আবার কেউ অবস্থান গ্রহণ

www.eelm.weebly.com

করতো মুজদালিফায়। কেউ হজ করতো জিলক্বদ মাসে কেউ জিলহজে। প্রত্যেকে ধারণা করতো তারা ঠিক কাজই করছে। এই ভ্রান্ত ধারণা উচ্ছেদ করতেই আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন-'আলা জিদালা ফিল হাজ্জ।' একথার মাধ্যমে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, সাবধান! রসুল স. যেভাবে হজ সমাপণ করলেন সেভাবেই হজ সম্পন্ন করতে হবে। ফলে এতে কোনো কলহ বিবাদ নেই। মুজাহিদ বলেছেন- একথার অর্থ হজ জিলহজ মাসেই অনুষ্ঠিত হবে। এতে কোনো সন্দেহ বিবাদ নেই। এর মাধ্যমে 'নাসিয়া' কে বাতিল করে দেয়া হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ মোজার গোত্রগুলোর মধ্যে জীবন ধারণের উপকরণ ছিলো সামান্য। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারও তাদের ছিলো না। সামান্য চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতো তারা। ওদিকে ইয়ামেনের হুমাইর গোত্রের অবস্থা ছিলো বেশ উন্নত। তাদের চাষাবাদের জমি ছিলো উর্বর। তদুপরি ব্যবসা বাণিজ্যেও তারা ছিলো অগ্রগামী। শিল্পসম্ভারেও এগিয়ে ছিলো তারা। মোজার গোত্রেরই একটি শাখার নাম কোরাইশ। সে হিসেবে ধর্মীয় নেতৃত্ব ছিলো মোজার গোত্রের অধীনে। লুণ্ঠন, ছিনতাই, রাহাজানি এসকল ছিলো মোজার গোত্রের জীবিকার মূল মাধ্যম। তারা যাত্রীদের উপর হামলা করে তাদের ধন-সম্পদ ও পশুপাল ছিনিয়ে নিতো। নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করতো। তারপর তাদেরকে বিক্রয় করে অর্থ উপার্জন করতো। এটা হয়ে পড়েছিলো একটি সাধারণ নিয়ম। ফলে তাদের মধ্যে সবসময় লেগেই থাকতো যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঝগড়া ফাসাদ। কিন্তু হজের মাসগুলো ছিলো এর ব্যতিক্রম। তখন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও বসে যেতো তিনটি প্রসিদ্ধ মেলা—জুলমাজাজ, জুলমাজান্নাহ্ এবং ওকাজ। মেলা যাত্রীদের গমণাগমণ ও পণ্যসামগ্রীর সুষ্ঠ আমদানী রফতানীর জন্য তখন পথের নিরাপত্তা ছিলো অত্যন্ত জরুরী। তাই তারা রজব, জিলক্বদ, জিলহজ ও মহররম মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। মানুষেরা এ চারমাস নির্ভয়ে চলাচল করতে পারতো। যেখানে যখন খুশী যেতে পারতো। কিন্তু এতে করে লুণ্ঠনকারীদের স্বার্থ সংকুচিত হয়ে এলো। তারা তখন আবিষ্কার করলো এক নতুন ফন্দি। এ নতুন ফন্দির নাম 'নাসিয়া'। হজের পরে ওকাজের মেলায় কোরাইশদের সর্দার ঘোষণা দিলো—আগামী বছর মহররম মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকবে না। বন্ধ থাকবে সফর মাসে। পরের বছরের মেলায় সফর মাসের পরিবর্তে অন্য কোনো মাসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতো। এভাবে এক এক বছর এক এক রকম বিধান জারী করে তারা লুটপাটের সুযোগ সৃষ্টি করতো। কোরাইশরা ছিলো হজ অনুষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক। তাদের এই জঘন্য 'নাসিয়া' রীতির মূলোৎপাটন করতেই আল্লাহ্পাক এখানে ঘোষণা করেছেন—'হজের সময়ে কলহ বিবাদ বিধেয় নয়।'

রসুল করীম স. এরশাদ করেন, শোনো! সেই যুগে ফিরে এসো— যে সময়ে সৃষ্টি হয়েছিলো আসমান ও জমিন। এ নিয়মের কমবেশী করা যাবে না। বোখারী, মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

'তোমরা যে সকল উত্তম কাজ করো আল্লাহ্পাক তা জানেন'—এ বাক্যটির মাধ্যমে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের বর্ণনা শেষে উত্তমতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। নিষিদ্ধতার পর দেয়া হয়েছে সৎকর্মের নির্দেশনা।

'তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়'— এ সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইয়ামেনবাসীরা পাথেয় না নিয়েই হজ যাত্রা করতো—বলতো আমরা মুতাওয়াক্কিল (আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীল)। মুখে তারা এরকম বলতো বটে। কিন্তু মক্কায় পৌঁছে শুরু করে দিতো ভিক্ষাবৃত্তি। বোখারী। বাগবী বলেছেন, তারা লুটপাটও করতো। একারণেই আল্লাহ্পাক বলেছেন, তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো যেনো মক্কায় পৌঁছে প্রাত্যাহিক প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো এবং পরমুখাপেক্ষিতার গ্লানি থেকে রক্ষা পাও।

'আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়'— যাঞ্চা ও লুণ্ঠন থেকে আত্মরক্ষা করাকেই এখানে আত্মসংযম বা তাকওয়া বলা হয়েছে।

এ আয়াতের শেষে বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে— 'আমাকে ভয় করো।' এ কথার মাধ্যমে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আল্লাহ্কে প্রকৃত অর্থে ভয় করা কেবল বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বা জ্ঞানীগণের কাজ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯৮

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ○

❑ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নাই। যখন তোমরা আরাফাত হইতে দ্রুত গতিতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন মাশয়ারুল হারামে পৌঁছিয়া আল্লাহ্কে স্মরণ করিবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়াছেন ঠিক সেই ভাবে তাহাকে স্মরণ করিবে। যদিও পূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

এখানে প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করার অর্থ—হজের সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য করা। আয়াতে বলা হয়েছে এ সময়ে ব্যবসা করা কোনো পাপকর্ম নয়।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবুদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখনকার প্রসিদ্ধ বাজার ছিলো তিনটি। ওকাজ, জুলমাজান্নাহ ও জুলমাজাজ। মুসলমানেরা ওই বাজারগুলোতে পণ্য বিপণন করাকে পাপ মনে করতেন। কিন্তু তা যে পাপ নয় সে কথাই আল্লাহপাক এ আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন। বোখারী।

ইমাম আহমদ, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের নিকট হজরত আবু উমামা তাহমী জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আমাদের বাহনগুলোকে মক্কা পর্যন্ত খাটাই। তাই কেউ কেউ বলে আমাদের হজ হয়নি। হজরত ইবনে ওমর বললেন, তোমরা কি অন্যের মতো হজের এহরাম গ্রহণ করো না? তাওয়াফ, সায়ী, কংকর নিক্ষেপ ইত্যাদি করো না? হজরত আবু উমামা বললেন, অবশ্যই করি। হজরত ইবনে ওমর বললেন, তবে তো তোমাদের হজ হয়েছেই। এক ব্যক্তি রসুল স. এর নিকট তোমার মতোই প্রশ্ন করেছিলো। রসুল স. চুপ করেছিলেন। তখন অল্প সময়ের মধ্যেই অবতীর্ণ হলো 'তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই।'

'যখন তোমরা আরাফা থেকে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করবে'— এখানে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন বুঝাতে ইফাদা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর আরাফাত একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর। ওই প্রান্তরের প্রতিটি অংশই আরাফা। তাই সমগ্র প্রান্তরকে বহুবচনে আরাফাত বলা হয়েছে। আরাফাতের নামকরণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন— ১. হজরত ইব্রাহিম আ.কে আরাফাত প্রান্তরের কতিপয় নিদর্শনের কথা বলা হয়েছিলো। সে নিদর্শনগুলো থেকে তিনি আরাফার মাঠ সনাক্ত করতে পেরেছিলেন। তাই ওই মাঠের নাম আরাফাত। ২. হজরত জিব্রাইল,হজরত ইব্রাহিমকে হজের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো পরিদর্শন করালেন। তখন হজরত ইব্রাহিম বললেন, আরিফতু (আমি চিনলাম) — আরাফা নামকরণ করা হয়েছে একথা থেকেই। ইবনে জারীর বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং হজরত আলী এ বক্তব্যের সমর্থক। ৩. হজরত জুহাক থেকে বাগবী বলেছেন— হজরত আদম পৃথিবীতে এসে ভারত ভূমিতে নামলেন এবং হজরত হাওয়া নামলেন জেদ্দায়। দীর্ঘ বিরহের পরে তাঁদের পুনর্মিলন ঘটেছিলো এ মাঠে। এ যেনো ছিলো নতুন করে চেনা। তাই ওই মাঠের নাম হয়েছে আরাফা। ৪. সুদ্দী বলেছেন— হজরত ইব্রাহিম সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রতি হজের আহবান জানালেন। কেউ কেউ সে আহবানে সাড়া দিলো। তাঁরা তালবিয়া পড়তে পড়তে হজরত ইব্রাহিমের নিকট সমবেত হলো। আল্লাহপাক নির্দেশ করলেন— সবাই আরফাতের মাঠে যাও। হজরত ইব্রাহিমকে ওই মাঠের পরিচিতি দান করলেন আল্লাহ্পাক। তিনি তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে আরাফা অভিমুখে চললেন। পথিমধ্যে আকাবা নামক স্থানে একটি গাছের নিকট এসে মুখোমুখি হলেন শয়তানের। থমকে দাঁড়ালো শয়তান। হজরত ইব্রাহিম তার প্রতি নিক্ষেপ করলেন সাতটি কংকর। প্রতিটি নিক্ষেপের সময় তিনি তকবীর ধ্বনি দিলেন। শয়তান পালিয়ে

www.eelm.weebly.com

গেলো। হজরত ইব্রাহিম অগ্রসর হলেন দ্বিতীয় জুমরার স্থানে। সেখানেও তিনি তকবীর ধ্বনিসহ কংকর নিক্ষেপ করলেন। তৃতীয় জুমরার স্থানেও তিনি এ রকম করলেন- শয়তান আর পথরোধ করার সাহস পেলো না। হজরত ইব্রাহিম জুলমাজাজ নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখান থেকে আরও অগ্রসর হয়ে পৌঁছলেন আরাফায়। যে নিদর্শন সমূহ আল্লাহ্পাক তাঁকে জানিয়েছিলেন সেই নিদর্শন সমূহের মাধ্যমে তিনি সহজেই চিনে নিলেন আরাফা। সেদিন থেকেই এই ময়দানের নাম হলো 'আরাফা।' আরাফা প্রান্তরে সূর্য অস্তমিত হলো। হজরত ইব্রাহিম প্রত্যাবর্তনের পথ ধরলেন। ফিরে এলেন মুজদালিফায়। ইজদিলাফ অর্থ নিকটে। তখন যে স্থানটির নিকটবর্তী হয়েছিলেন তিনি, সে স্থানের নামই হয়ে গেলো মুজদালিফা। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে আবু সালেহ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিম তালবিয়ার রাতে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি তাঁর সন্তানকে জবাই করছেন। স্বপ্নভঙ্গের পর তিনি ভাবতে শুরু করলেন ইঙ্গিতটি কোন দিক থেকে আসছে। আল্লাহ্র দিক থেকে, না শয়তানের দিক থেকে। তারবিয়া শব্দটির ধাতুগত অর্থ, চিন্তাভাবনা করা। তাই ওই দিনক'টির নাম হয়েছে ইয়াওমি তারবিয়া। স্বপ্নটি তিনি দেখেছিলেন আরাফার রাতে। চিন্তাভাবনার পর হজরত ইব্রাহিম বুঝতে পেরেছিলেন, স্বপ্নে ইঙ্গিত এসেছে আল্লাহর দিক থেকেই। যে স্থানে তিনি এই ইঙ্গিতের পরিচিতি পেয়েছিলেন, সেই স্থানের নামই আরাফা (পরিচয়)।

'তখন মাশয়ারুল হারামে পৌছে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে'— মুজদালিফার দু'পাশের পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের নাম মাশয়ারুল হারাম। এই স্থানের বিস্তৃতি মাজমান থেকে মুহাস্সার উপত্যকা পর্যন্ত। অবশ্য মাজমান ও মুহাস্সার মুজদালিফার অন্তর্গত নয়। 'মাশআর' শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে শিয়ার থেকে। 'শিয়ার' অর্থ নিদর্শন। হজের দর্শণীয় স্থান বলেই এই স্থানকে মাশআর বলা হয়েছে। আর হেরেম শরীফের অন্তর্ভূত বলেই বলা হয়েছে মাশয়ারুল হারাম। হজের বিধানবহির্ভূত কোনো কিছুই এখানে হালাল নয়। উর্না ব্যতীত আরাফার সকল স্থানই যেমন হাজীদের অবস্থানস্থল, তেমনি ওয়াদি মুহাস্সার ব্যতীত মুজদালিফার সকল স্থানও হাজীদের অবস্থানস্থল। এখানে মাগরিব ও এশা— এশার ওয়াক্তে একত্রে আদায় করতে হয়। রসুল স. এরশাদ করেন, উর্না ব্যতীত আরাফার সকল স্থানে অবস্থান গ্রহণ কোরো। তেমনি মুজদালিফায় অবস্থানকালে ওয়াদি মুহাস্সার থেকে পৃথক থেকো। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিবরানী, তাহাবী ও হাকেম। বায়হাকী মাওকুফ ও মারফু উভয় পদ্ধতিতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এরকম আরো হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত জোবায়ের বিন মুতয়েম, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আবু রাফে

www.eelm.weebly.com

থেকে। হাদিসগুলোর সনদ সমালোচনামুক্ত নয়। কিন্তু ইমাম মালেক এ সম্পর্কিত হাদিস বর্ণনা করেছেন মারফু পদ্ধতিতে।

আল্লাহ্পাক যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করার অর্থ, মুর্খতার যুগের স্বকপোলকল্পিত স্মরণরীতিকে পরিত্যাগ করে খাঁটি তাওহীদের পদ্ধতিতে আল্লাহ্কে স্মরণ করো। এই সঠিক স্মরণ পদ্ধতি আল্লাহ্পাকই জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি জানানোর আগে তোমরা এ সম্পর্কে ছিলে নিতান্তই অজ্ঞ, ইমান ও আনুগত্যের প্রকৃতি সম্পর্কে বেখবর।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯৯

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

❒ অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান হইতে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেই স্থান হইতে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করিবে। আর আল্লাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, বস্তুতঃ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন-আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা হজের সময় সমবেত হতো আরাফায়। আর কোরাইশরা সমবেত হতো মুজদালিফায়। এই বৈসাদৃশ্যের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি। হজরত আসমা বিনতে আবু বকর থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন-কোরাইশরা হজের সময় মুজদালিফায় অবস্থান গ্রহণ করতো। অন্যেরা অবস্থান নিতো আরাফায়। কেবল শায়বা ইবনে রবীয়া ছিলেন ব্যতিক্রম। এই বিভাজনের বিরুদ্ধে আয়াতটি নাজিল হয়েছে। বাগবী বলেছেন, কোরাইশরা নিজেদেরকে মনে করতো কুলীন। তাই অন্যদের সঙ্গে অবস্থান গ্রহণ করাকে মনে করতো কৌলিন্যবিরোধী। বলতো, আমরা হলাম আল্লাহ্র পরিবারের সদস্য। আমরা হেরেমের অধিবাসী। তাই হেরেম পরিত্যাগ করা আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। অন্য লোকেরা যখন আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করতো, তখন কোরাইশরা প্রত্যাবর্তন করতো মুজদালিফা থেকে। তাই আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অন্যান্য লোকজন যেখান থেকে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেস্থান থেকে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করবে। একথার মধ্যে এই ইঙ্গিতটিও রয়েছে যে, আরাফায় অবস্থান করা হজরত ইব্রাহিম আ. ও হজরত ইসমাঈল আ. এর সুন্নত। আয়াতে অন্যান্য লোক (আন্নাস) কথাটির মধ্যে আত্মঘোষিত কুলীনরা ছাড়া অন্য সকলেই অন্তর্ভূত। জুহাক বলেছেন, এখানে আন্নাস অর্থ হজরত ইব্রাহিম। যেমন আম ইয়াহ্সুদুনান্নাস এর অর্থ গ্রহণ করা হয় হজরত মোহাম্মদ স.। এভাবেই 'ইজকুলা লাহুমুন্নাসু কৃদ জাময়া লাকুম বাকি' আননাস বলে বুঝানো

www.eelm.weebly.com

হয়েছে নাঈম বিন মাসউদ আশজায়ীকে। জুহ্‌রী বলেছেন, এখানে আন্নাস কথাটির অর্থ হবে হজরত আদম। তাঁর দলিল হচ্ছে, সাঈদ বিন জোবায়ের এ আয়াতটি উচ্চারণ করেছেন এভাবে— 'ছুম্মা আফিদু মিন হাইসু আফাদান্নাসু।' এই নাসু অর্থ হজরত আদম। কেনোনা নাসু অর্থ বিস্মৃত। হজরত আদম আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকারের কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। কতিপয় ভাষ্যকারের অভিমত হচ্ছে- আয়াতে ছুম্মা (অতঃপর) বলে আরাফাত থেকে মুজদালিফায় আগমনের পর মিনায় প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদগণের মত হচ্ছে, এখানে বলা হয়েছে আরাফা থেকে মুজদালিফায় প্রত্যাবর্তনের কথা। বস্তুতঃ এই ব্যাখ্যাটির সঙ্গে 'ছুম্মা' শব্দটি সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ, আরাফাত থেকে রওনা হতে হয় মুজদালিফা থেকে রওনা হওয়ার পূর্বে। তাই কোনো কোনো ভাষ্যকার ছুম্মা অব্যয়টির অর্থ 'অতঃপর' না করে 'এবং' করেছেন। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে— এখানে ছুম্মা অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে আরাফায় ও মুজদালিফায় অবস্থানের গুরুত্ব বর্ণনার লক্ষ্যে। আরাফায় অবস্থান হজের রোকন, যা আদায় করা ফরজ। এই ফরজ পরিত্যাগ করলে হজই হবে না। মুজদালিফায় অবস্থান করা ফরজ নয়। সর্বসম্মত মত এই যে, মুজদালিফায় অবস্থান হজের রোকন নয়। কেবল লাইস এবং আলকামা বলেছেন, মুজদালিফায় অবস্থান হজের রোকন। তাঁরা তাঁদের পক্ষে কোরআনের এই নির্দেশটিকে পেশ করেছেন, 'ক্রীতদাস মুক্ত করো। ক্ষুধার অন্ন দান করো, আত্মীয়, এতীম এবং অভাবগ্রস্তদেরকে, অতঃপর তাদেরকেও যারা ইমানদার।' এই আয়াতের মাধ্যমে তাঁরা বলতে চেয়েছেন, ইমান সকল সৎকর্মের শীর্ষে।

জ্ঞাতব্যঃ আরবী ভাষায় 'ছুম্মা' শব্দটি ব্যবহারে কর্মের পরম্পরা সূচিত হয়। ছুম্মা (অতঃপর) উল্লেখ করে পূর্বে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে পরে বর্ণিত বিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়। দুই বর্ণনার ব্যবধান হিসেবে বসানো হয় এই শব্দটিকে। এই আয়াতে ছুম্মা ব্যবহৃত হয়েছে মুজদালিফার উল্লেখের পরে। এতে করে অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, মুজদালিফার পরে আরাফা। অথচ বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত। তাই মনে হয় ছুম্মা অব্যয়টি এখানে প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ব্যবহৃত হয়েছে রূপক অর্থে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানের ক্রমন্নোতির পর্যায়েও এই অব্যয়টির ব্যবহার লক্ষ্যগোচর হয়। যেমন দাসমুক্ত করা সম্পর্কিত আয়াতটির শেষ দিকে ছুম্মা উল্লেখের পর ইমানের উল্লেখ এসেছে। সেখানে উল্লেখিত বিষয়গুলোর শীর্ষস্থানই হচ্ছে ইমান। উর্দু অনুবাদকের নিকট ব্যাখ্যাটি তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন 'ছুম্মা কানা' দ্বারা হ্যাঁ বাচক বাক্য উল্লেখ করা হবে। কিন্তু অনেক ভাষ্যকার 'ছুম্মা কানা'কে না সূচক অর্থে নিয়েছেন। তারা বলেছেন, 'ছুম্মা কানা' সংশ্লিষ্ট হবে 'ইকতামাহাল আকাবাহ্' এর সঙ্গে। আর দু'টো বাক্যই না সূচক। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— তাঁরা মু'মিনদের দলের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এখানে ছুম্মার ব্যবহার প্রকৃত অর্থে উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ, সর্বজনসমর্থিত

www.eelm.weebly.com

কর্মগুলোই উত্তম কর্ম। যেমন পিতৃহীনের প্রতিপালন, অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য দান, ক্রীতদাস মুক্তি- এ সকল কাজ কাফেরদের দৃষ্টিতেও উত্তম। যদিও কেউ কেউ এ সকল প্রশংসিত স্বভাব থেকে বঞ্চিত। ওই লোকগুলো যেমন বর্ণিত সৎকার্যসমূহ থেকে বঞ্চিত তেমনি ইসলামের আবির্ভাবের পরে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইমান থেকেও বঞ্চিত হয়ে রইলো। আল্লাহ্‌পাকই ভালো জানেন।

একথা নিশ্চিত যে, সর্ববাদিসম্মত মতানুযায়ী মুজদালিফায় অবস্থান হজের রোকন নয়। তবে এটা ওয়াজিব কিনা এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, মুজদালিফায় অবস্থান ওয়াজিব। জমহুর বলেছেন, এই ওয়াজিব পরিত্যাগ করলে একটি কোরবানী ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোরবানীর দিন ফজরের পর থেকে মুজদালিফায় অবস্থান ওয়াজিব। ইমাম মালেক বলেছেন, এক ঘন্টার জন্য হলেও কোরবানীর রাতে মুজদালিফায় থাকা ওয়াজিব। ওয়াজিবের দলিল পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে (যখন তোমরা আরাফাত থেকে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করবে)। মুজদালিফা বা মাশয়ারুল হারামে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার যে কথা বলা হয়েছে, তার জন্য আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন শর্ত। তাই মুজদালিফায় অবস্থান ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি সুসাব্যস্ত। কেউ যদি বলে, মুজদালিফায় আল্লাহ্‌র স্মরণ করার বিষয়টি মোস্তাহাব বলে মনে হয়— এর জবাবে বলা যেতে পারে, ঔদাসিন্য অপসারণ করাই জিকির বা আল্লাহ্-স্মরণের উদ্দেশ্য। আর জিকির যেমন উচ্চারণের মাধ্যমে হতে পারে, তেমনি হতে পারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারাও।

হাদিসবেত্তাগণ বলেন, যে আল্লাহ্‌পাকের অনুগত নিঃসন্দেহে সে আল্লাহ্‌পাকের স্মরণকারী। মুজদালিফায় অবস্থান আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশ। এ নির্দেশ পালন ওয়াজিব। নির্দেশ পালনকারীও তাই আল্লাহ্‌পাকের জিকিরকারী। তাছাড়া মুজদালিফায় তালবিয়া পড়তে হয়, দোয়া করতে হয় এবং নামাজও পাঠ করতে হয়। এগুলোও জিকির। মুজদালিফায় অবস্থান যে ওয়াজিব সে কথা কোরআন দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এই ওয়াজিব হাদিস শরীফ দ্বারাও সুসাব্যস্ত। যেমন— ওরওয়া বিন মাজরাম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোরবানীর দিন ফজরের নামাজে আমাদের সঙ্গে মুজদালিফায় উপস্থিত থাকবে এবং বিগত দিন অবস্থান করবে আরাফায় তাঁর হজ হয়ে যাবে। সুনান প্রণেতাগণ, ইবনে হাব্বান এবং হাকেম এ বর্ণনাটি এনেছেন। বর্ণনাটিতে আরাফার সাথে সাথে মুজদালিফায় অবস্থানের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সুতরাং মুজদালিফায় অবস্থান ওয়াজিব। নাসাঈ বলেছেন, যে ব্যক্তি মুজদালিফায় তার ইমামকে পেয়েছে সে পেয়েছে তার হজকে; যে পায়নি সে হজও পায়নি। আবু ইয়া'লী বলেছেন, যে ব্যক্তি মুজদালিফা পায়নি সে হজও পায়নি। এতে করে বুঝা যায়, মুজদালিফায় সুবহে সাদেকের পর অবস্থান গ্রহণ করা ওয়াজিব। এটাই ইমাম আবু হানিফার মাজহাব। উপরন্তু আলোচ্য আয়াত দ্বারাও মুজদালিফায় অবস্থান যে ওয়াজিব সে

www.eelm.weebly.com

কথা পরিষ্কার বুঝা যায়। এখানে আরাফায় অবস্থানের সাথে সাথে মুজদালিফায় অবস্থানের কথাও রয়েছে।

ঐকমত্যসম্মত অভিমত এই যে, আরাফায় অবস্থানের সময় শেষ রাত পর্যন্ত। তাই কেউ যদি দশম জিলহজ্জের রাত পর্যন্ত একঘন্টার জন্যও আরাফায় অবস্থান করেন তবে তার হজ্জ সম্পন্ন হবে। নিঃসন্দেহে মুজদালিফায় অবস্থানের সূচনা হয় প্রত্যুষের পরে। হজরত আবদুর রহমান বিন ইয়াম্মার দায়লামী বলেছেন, আমি প্রত্যক্ষদর্শী যে, রসুল পাক স, আরাফার মাঠে অবস্থান নিয়েছিলেন। লোকজন সেখানে সমবেত হচ্ছিলো। এক সময় নজদবাসীরাও এলো। তারা জিজ্ঞেস করলো, হজ্জ কী? রসুল করীম স. বললেন, নবম জিলহজ্জে আরাফার প্রান্তরে অবস্থান নেয়ার নামই হজ্জ। যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের আগেই মুজদালিফায় উপস্থিত হলো সে হজ্জ পেয়ে গেলো। এরপর মিনায় অবস্থানের দিনগুলো আইয়ামে তাশরিক। সেখানে যে ব্যক্তি দু'দিন অবস্থান করে চলে গেলো তার কোনো অপরাধ নেই। আর যে সেখানে দু'দিনের বেশী থাকলো তারও কোনো দোষ নেই। তাহাবী। এ হাদিসের প্রেক্ষিতে ইমাম মালেক বলেছেন, ফজরের পূর্বেই মুজদালিফায় উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। কিন্তু ধারণাটি ঠিক নয়। কেনোনা সুনান প্রণেতা, হাকেম, দারা কুতনী ও বায়হাকী যে উদ্দেশ্যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; তাতে করে বুঝা যায়, আরাফায় অবস্থানই প্রকৃত হজ্জ। আরাফায় অবস্থানের পর ফজরের আগেই যদি কেউ মুজদালিফায় পৌছে যায়, তবে সে তার হজ্জকে পূর্ণ করেই নেয়। মুজদালিফায় গমনের সময় নির্ধারণ করা এ হাদিসের উদ্দেশ্য নয়। এ হাদিসটি থেকে আবার ইমাম আহমদ এই দলিল গ্রহণ করেছেন যে, মুজদালিফায় রাত্রি যাপন ওয়াজিব। কেনোনা রসুল স. মুজদালিফায় রাত্রি যাপন করেছেন এবং ফজরের নামাজের পরেও সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তিনি স. আরও বলেছেন, তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্জের পদ্ধতি শিখে নাও।

আমি বলি, বর্ণিত দলিলের প্রেক্ষিতে বুঝা যায়, মুজদালিফায় রাত্রিবাস ও সেখানের ফজরের নামাজে অংশ গ্রহণ দু'টোই ওয়াজিব। কিন্তু তিনি স. তাঁর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যাঁরা দুর্বল তাঁদেরকে ভোরবেলাতেই মুজদালিফা থেকে মিনায় যাত্রা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যুষের পরে মুজদালিফায় অবস্থান ওয়াজিব নয়। যেমন বোখারী ও মুসলিম তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. ভোরবেলায় যাঁদেরকে মিনায় পাঠিয়েছিলেন আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আসমা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. চাঁদ ডুবে যাওয়ার সাথে সাথেই মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং উম্মে হাবীবা থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। এ সকল বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, দুর্বল ব্যক্তিদের অনুমতি লাভের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় না যে, যাঁরা দুর্বল নয় তাঁদের জন্য

www.eelm.weebly.com

মুজদালিফায় অবস্থান ওয়াজিব নয়। কেউ যদি বলে, আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টির প্রমাণ রয়েছে যে, আরাফা ও মুজদালিফায় অবস্থান গ্রহণ করা ওয়াজিব। অথচ বলা হচ্ছে, মুজদালিফায় অবস্থান হজের রোকন নয়— তবে আরাফার অবস্থান কী করে হজের রোকন হয়? এর জবাব হচ্ছে, আরাফায় অবস্থান যে হজের রোকন একথা সাব্যস্ত হয়েছে ঐকমত্যের মাধ্যমে। তাই আরাফায় অবস্থান না করলে হজ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু মুজদালিফায় অবস্থান না নিলে হজ বাতিল হবে না। ঐকমত্যের সনদ হচ্ছে এই, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আরাফায় অবস্থানের নামই হজ। এই একক বর্ণনাটির (খবরে ওয়াহেদের) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঐকমত্য। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ঐকমত্য পোষণকারীগণ রসুল স. এর উক্তি থেকেই আরাফায় অবস্থানের রোকন হওয়াকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আরাফা প্রান্তরে অবস্থানের সময়সীমা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত লক্ষ্য করা যায়। ইমাম আহমদ বলেছেন, আরাফায় অবস্থান গ্রহণ করতে হবে নয়ই জিলহজ সকাল থেকে। ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ী বলেছেন, দ্বিপ্রহরের পর থেকে। আর ইমাম মালেক বলেছেন, নয়ই জিলহজ সূর্যাস্তের পর থেকে দশ তারিখের সুবহে সাদেক পর্যন্ত। হজরত আবদুর রহমান বিন ইয়াম্মার দায়লামী বর্ণিত হাদিসটি ইমাম মালেকের দলিল, যেখানে পরিষ্কাররূপে বলে দেয়া হয়েছে— ওই ব্যক্তির হজ সমাধা হয়েছে, যে দশই জিলহজ সুবহে সাদেকের পূর্বে মুজদালিফায় উপস্থিত হতে পেরেছে। ইমাম আহমদের দলিল হচ্ছে, ওরওয়া বিন নাদরানের ওই হাদিস— যেখানে বলা হয়েছে, যারা আরাফার দিনের পূর্বে দিনে বা রাতে আরাফায় উপস্থিত হলো, তাদের হজ হয়ে গেলো। হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ী। মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এই হাদিসটির বর্ণনাকারী। হাদিসটিতে বলা হয়েছে- রসুল স. তালবিয়ার দিনে (আটই জিলহজ) বাহনে আরোহী হয়ে মিনায় গমন করলেন। সেখানে তিনি আদায় করলেন জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর। সূর্যোদয় হলো। তিনি স. লোক মারফত আরাফার মাঠে তাঁবু খাটানোর ব্যবস্থা করলেন। তারপর যাত্রা করলেন আরাফা অভিমুখে। সেখানে তাঁর জন্য নির্মিত তাঁবুর সম্মুখে অবতরণ করলেন তিনি। দ্বিপ্রহরের পর তিনি আরোহন করলেন তাঁর কোসওয়া নামক উস্ট্রীতে। কোসওয়া উপনীত হলো বাতন উপত্যকায়। এই বিবরণটির মাধ্যমে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, আরাফায় প্রকৃত অবস্থানের সময় হচ্ছে দ্বিপ্রহরের পর। আরাফায় অবস্থানের সময় যদি দ্বিপ্রহরের পূর্বে হতো, তবে তখনই তিনি স. বাতন উপত্যকায় অবস্থান গ্রহণ করতেন, তাঁবুতে থাকতেন না। এ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, হাদিসের বিবরণে কেবল এতটুকুই বুঝা যায়, দ্বিপ্রহরের পরে আরাফায় অবস্থান গ্রহণ উত্তম। এতে করে একথা বুঝা যায় না যে, দ্বিপ্রহরের পূর্বে সেখানে অবস্থান নেয়া যাবেই না। আর সালিম বিন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর আরাফার দিন দুপুরের পর

www.eelm.weebly.com

হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত হলেন। আমিও ছিলাম তাঁর সঙ্গে। হজরত ইবনে ওমর বললেন, হাজ্জাজ যদি তুমি সুন্নতসম্মত আমল করতে চাও, তবে এক্ষুণি যাত্রা করো। হাজ্জাজ বললো, ঠিক আছে। এক্ষুণি রওনা হচ্ছি। এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্বিপ্রহরের পর আরাফায় অবস্থান উত্তম। কিন্তু এতে করে একথা বুঝা যায় না যে, দ্বিপ্রহরের পূর্বে অবস্থান গ্রহণ জায়েয নয়।

'আর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'— একথার মধ্যে এই মর্মে নির্দেশ এসেছে যে, মূর্খতার যুগে তোমরা হজের নামে যে সকল অশোভন কর্মকান্ড করতে, সে সকলের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও। আল্লাহ্‌পাক তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করবেন। কারণ, তিনি ক্ষমা পরবশ, পরম দয়ালু।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২০০, ২০১, ২০২

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا
فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ○
وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ○ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

❒ অতঃপর যখন তোমরা অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিবে তখন আল্লাহ্‌কে এমনভাবে স্মরণ করিবে যেমন তোমবা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করিতে, অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে। মানুষের মধ্যে অনেকে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে ইহকালেই দাও।' বস্তুতঃ পরকালে তাহাদের জন্য কোন অংশ নাই।

❒ এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে অগ্নি-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর।'

❒ তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহার প্রাপ্য অংশ তাহাদেরই। বস্তুতঃ আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

---

www.eelm.weebly.com

'যখন তোমরা অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করবে'— এখানে হজের অনুষ্ঠান বলতে বুঝানো হয়েছে আকাবার কংকর নিক্ষেপ, কোরবানী, মস্তক মুন্ডন, তাওয়াফ ও সায়ী। কোরবানীর দিন এগুলো সম্পন্ন করতে হয়। জানা প্রয়োজন যে, হজের মূল অনুষ্ঠান বা রোকন তিনটি- এহরাম, আরাফায় অবস্থান ও তাওয়াফে জিয়ারত। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সায়ী এবং মস্তক মুন্ডনও রোকনের অন্তর্ভূত। ইতোপূর্বে সায়ীর আলোচনা হয়েছে। আর মস্তক মুন্ডনের আলোচনা আসবে সুরা হজে।

'তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে'— এখানে আল্লাহ্র স্মরণের অর্থ, অধিক পরিমাণে হামদ, সানা ও তকবীর পাঠ। পিতৃপুরুষের স্মরণ প্রসঙ্গে মূর্খতার যুগের ওই কুসংস্কারটির কথা উল্লেখ করতে হয়- জাহিলিয়াতের যুগে আরববাসীরা হজ সমাধা করার পর বায়তুল্লাহ্র সামনে দাঁড়াতো আর বর্ণনা করতে থাকতো পিতৃপুরুষদের বীরত্ব গাথা ও প্রশংসা। আল্লাহ্পাক এখানে সেই কুসংস্কারটির মূলোৎপাটনের নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, পিতৃপুরুষদের নয়, প্রশংসা ও প্রশস্তি বর্ণনা করতে হবে পরম প্রভুপ্রতিপালকের যিনি তোমাদের পিতৃপুরুষদের এবং সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। তিনি জাতও নন, জন্মদানকারীও নন। কিন্তু তিনিই সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করেন। যেমন, এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে, 'তোমরা কি লক্ষ্য করেছো, যা নিক্ষেপ করো স্ত্রীজরায়ুতে তার স্রষ্টা কি তোমরা-না আমি।' হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির মর্ম হচ্ছে- শিশু সন্তানেরা যেভাবে পিতামাতাকে স্মরণ করে তোমরাও সেভাবে স্মরণ করো আল্লাহ্কে। আমি বলি, এ বক্তব্যটি অধিকতর সুসংহত হতো, যদি পিতৃপুরুষের স্থলে মাতার কথা উল্লেখ থাকতো।

'ওয়াআশাদ্দু জিকরা' (অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে)— একথার মাধ্যমে জিকিরের গভীরতর আবেদন সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, পিতৃপুরুষদের স্মরণের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আল্লাহ্তায়ালার স্মরণ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্র জিকির কখনো পিতৃপুরুষদের জিকিরের সমান্তরাল নয়। সুতরাং জিকিরে আরো অধিক মগ্নতা ও গভীরতা বাঞ্ছনীয়।

অনেকে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দাও'— আখেরাতের কল্যাণই সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণ। হাদিস শরীফে কল্যাণ প্রার্থনার বিবরণ এসেছে এরকম— আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিনাল খইরি কুল্লুহু আজিলুহু ওয়া আজালুহু মা আমিলতু মিনহু ওয়া মালাম আ'লাম।

অবিশ্বাসী মুশরিকেরা আখেরাতের কল্যাণ চায় না। পৃথিবী পাওয়াই তাদের কাছে চরম ও পরম পাওয়া। অনেকে বলে— একথার মাধ্যমে ওই সকল অবিশ্বাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা পৃথিবীর দাস। তারা বলে, আমাদেরকে ইহকালেই দান করো। আল্লাহ্পাক জানাচ্ছেন, এদের জন্য পরকালে কোনো কল্যাণ নেই।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'এবং তাদের মধ্যে অনেকে বলে'— একথার অর্থ মানুষের মধ্যে যাঁরা ইমানদার তাঁদের প্রার্থনার বাণী এ রকম— 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও, পরকালে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নিযন্ত্রণা থেকে রক্ষা করো।' 'ওয়াফিল আখিরতি হাসানা' অর্থাৎ পরকালের কল্যাণ অর্থ আল্লাহ্পাকের সন্তোষ ও আখেরাতের নেয়ামতের অফুরন্ত সম্ভার। বিশ্বাসীদের প্রার্থনায় অগ্নিযন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার নিবেদনটিও রয়েছে। তাই পৃথিবী ও আখেরাতের কল্যাণ প্রার্থনার সঙ্গে তাঁদের কণ্ঠে একথাটিও উচ্চারিত হয় যে, আমাদেরকে অগ্নিযন্ত্রণা থেকে রক্ষা করো।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে স্বসূত্রে বাগবী বলেছেন, রসুল স. এক দুর্বল আগন্তুকের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সে ছিলো ডিমের খোলস থেকে বেরিয়ে আসা পক্ষীশাবকের চেয়েও দুর্বল। রসুল স. বললেন, তুমি কি আল্লাহ্পাকের নিকট কিছু যাঞ্চা করেছিলে? লোকটি বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আল্লাহ্পাককে বলেছিলাম, হে মেহেরবান আল্লাহ্! তুমি পৃথিবীতেই আমাকে পরকালের শাস্তি দিয়ে দাও। রসুল স. বললেন, সুবহানাল্লাহ্! সেই আযাব সহ্য করার শক্তি কি তোমার রয়েছে? তুমি এরকম প্রার্থনা করলে না কেনো, 'রব্বানা আতিনা ফিদ্ দুন্ইয়া হাসানা, ওয়া ফিল আখিরতি হাসানা, ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।'

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. প্রায়শঃই 'রব্বানা আতিনা........' এই প্রার্থনাটি করতেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সাঈব বলেছেন, এই দোয়াটি রসুল স. পাঠ করতেন রোকনে জামাহ্ এবং রোকনে আসওয়াদে। আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান, হাকেম ও ইবনে আবী শায়বা। আবুল হাসান বিন জুহাক বর্ণনা করেছেন--হজরত আনাস বলেছেন, রসুল আকরম স. শতবার দোয়া করলেও সকল দোয়ার শুরু এবং শেষে থাকতো, 'রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও.....' এই প্রার্থনাটি। এক সঙ্গে দু'টি প্রার্থনাবাণী উচ্চারিত হলে এই প্রার্থনাটি উচ্চারিত হতো দু'বার। হজরত আনাস থেকে নক্বী বিন মাখলাদ বর্ণনা করেছেন- রসুল স. এর প্রার্থনার প্রথমে, মধ্যস্থলে এবং শেষে থাকতো, 'রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।'

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২০৩

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۭ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

www.eelm.weebly.com

❒ তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবে। যদি কেহ তাড়াতাড়ি দুই দিনে চলিয়া আসে তবে তাহার কোন পাপ নাই। আর যদি কেহ বিলম্ব করে তবে তাহারও কোন পাপ নাই। ইহা তাহার জন্য যে সাবধানে চলে। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে তোমাদিগকে তাহার নিকট একত্র করা হইবে।

পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত দ্বিতীয় দল (যারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণকামী) কে লক্ষ্য করে এখানে নির্দেশ এসেছে, তোমরা নির্দিষ্টসংখ্যক দিনগুলোতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম দল (যারা কেবল পৃথিবী চায়) এবং দ্বিতীয় দল— এই দুই দলকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে এই নির্দেশ। পূর্বের আয়াতের শেষে বলা হয়েছিলো, আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। এ সম্পর্কে হাসান বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক চোখের পলক নিক্ষেপের চেয়েও দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, একথার উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত সমাগত, সুতরাং সত্বর আখেরাতমুখী হও।

'আইয়ামে মা'দুদাত' অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন। একথা বলে বোঝানো হয়েছে আইয়ামে তাশরিকের দিনগুলোকে (জিলহজের ১১, ১২, ১৩ তারিখকে আইয়ামে তাশরিক বলা হয়)। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ এরকম বলেছেন— 'যদি কেউ তাড়াতাড়ি দুই দিনে চলে আসে'— একথার অর্থ আইয়ামে তাশরিকের তিনদিন পুরো না ক'রে যারা দু'দিন অবস্থান করে প্রত্যাবর্তন করে। এ ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, দু'দিনের পর তৃতীয় দিন যারা মিনার ময়দানে অবস্থান করে, তাদের জন্য তৃতীয় দিনের কংকর নিক্ষেপ ওয়াজিব। তবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, তৃতীয় দিন বলতে তৃতীয় রাত না তৃতীয় দিন ধর্তব্য। জমহুর বলেছেন, রাত ধর্তব্য। অর্থাৎ তৃতীয় রাতে যারা মিনায় অবস্থান করবে তারা প্রস্তর নিক্ষেপ ব্যতীত প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, তৃতীয় রাতের আগমন ঘটলেও কংকর নিক্ষেপ জরুরী নয়। তবে রাত শেষে সুবেহ সাদেক এসে গেলে কংকর নিক্ষেপ ওয়াজিব হবে। আর সুবেহ সাদেকের আগে চলে গেলে প্রস্তর নিক্ষেপ ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু হানিফার মতে কংকর নিক্ষেপের বিধান কার্যকর হয় দিবাভাগে। সুতরাং যে রাতে প্রস্থান করে তার উদাহরণ ওই ব্যক্তির মতো, যে জুমআর নামাজের আগেই সফরে রওয়ানা হয়ে যায় (মুসাফিরের উপর জুমআ ফরজ হয় না)। অধিকাংশ আলেম বলেছেন, রাতের বেলা কংকর নিক্ষেপের বিধান নেই। কিন্তু মিনায় যেহেতু রাত্রিবাস ঘটেছে, তাই রাত্রিশেষে আগত দিনে কংকর নিক্ষেপ ওয়াজিব হবে। রাত এসে গেলে সন্নিহিত দিবসের কংকর নিক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রস্থান করা সিদ্ধ নয়। বলা হয়েছে, যারা দু'দিন (মিনায়) অবস্থান করে তাড়াতাড়ি চলে যায় এবং যারা বিলম্ব ক'রে তিনদিন অবস্থানের পর প্রস্থান করে,

www.eelm.weebly.com

তাদের কারো জন্যই কোনো পাপ নেই। তাড়াতাড়ি গমনকারীরা আমল করে রুখসতের (সহজসাধ্যতার) উপর এবং বিলম্বে গমনকারীরা আমল করে আজিমতের (শ্রমসাধ্যতার) উপর। এই বিধানটি ঘোষণার মাধ্যমে মূর্খতার যুগের একটি জঘন্য মানসিকতার অপনোদন করা হয়েছে। মূর্খতার যুগে কেউ কেউ দ্রুত প্রস্থানকারীদেরকে পাপী মনে করতো। আবার কেউ কেউ পাপী মনে করতো বিলম্বে প্রস্থানকারীদেরকে।

'লিমানিত্তাক্বা' (এটা তাদের জন্য যারা সাবধানে চলে)— এই বাক্যটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, সাবধানতা বা আল্লাহ্‌ভীতি প্রতিটি কর্মের মূল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, যে সাবধানে চলে অর্থ, যে ব্যক্তি হজের আদিষ্ট অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে এবং পরিত্যাগ করে নিষিদ্ধ বিষয়সমুহ। এরূপ সাবধানী ব্যক্তি দ্রুততার সঙ্গে অথবা বিলম্বে– যেভাবেই প্রস্থান করুক না কেনো, সে অপরাধী নয়। হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ এরকম অভিমতই পোষণ করেন। বাগবী একথা বলেছেন। এর সমর্থনে একটি মারফু হাদিসও রয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত ওই হাদিসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি হজের সময়ে স্ত্রীসম্ভোগ এবং দূষণীয় কর্ম থেকে মুক্ত থাকে, সে হয়ে যায় সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর মতো নিষ্পাপ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. এরশাদ করেন, হজে মাবরুর (শরিয়তসম্মত হজ) এর প্রতিদান হলো জান্নাত। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, কামারের ভাটি যেমন লোহার মরিচা দূর করে, তেমনি হজ ও ওমরা দূর করে অভাব ও পাপকে। শাফেয়ী, তিরমিজি। হজরত ওমর থেকে আহমদও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, মিনায় রাত্রিযাপন, প্রস্তর নিক্ষেপ- এসব হজের রোকন (মূল অনুষ্ঠান) নয়। মূল অনুষ্ঠানসমূহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে পূর্বের আয়াতগুলোতে। সুতরাং পরের বিধানগুলো যে হজের রোকন নয়, সে কথা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু পরের অনুষ্ঠানগুলো (আলোচ্য আয়াত যার বিবরণদানকারী) কোনটি ওয়াজিব এবং কোনটি ওয়াজিব নয়, সে ব্যাপারে মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। ইমাম আহমদ বলেছেন, মিনা প্রান্তরে রাত্রিবাস ও কংকর নিক্ষেপ— দু'টিই ওয়াজিব। ইমাম মালেক বলেছেন, রাত্রিযাপন ওয়াজিব এবং কংকর নিক্ষেপ সুন্নতে মোয়াক্কাদা। এর বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইমাম আবু হানিফা। তাঁর মতে, রাত্রিবাস সুন্নত এবং কংকর নিক্ষেপ ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী থেকে দু'টি অভিমতের বর্ণনা এসেছে। একটি মত ইমাম আহমদের অনুকূল। অন্যটি ইমাম আবু হানিফার। কোনো কোনো আলেমের অভিমত হচ্ছে—— তকবীরের হেফাজতই কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য। তাই কেউ যদি কংকর নিক্ষেপ ছাড়াই কেবল তকবীর উচ্চারণ করে, তবে তাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। জননী আয়েশা ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইবনে জারীর এরকমই

www.eelm.weebly.com

বলেছেন। এই অভিমতটি আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের অনুকূলে, কিন্তু ঐকমত্যের প্রতিকূল।

ইমাম আহমদের দলিল, আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যটি। এখানে নির্দিষ্টসংখ্যক দিনগুলোতে আল্লাহ্র স্মরণ— রাত্রিযাপন ও কংকরনিক্ষেপ উভয়টির ওয়াজিব হওয়াকে সম্ভাবনাময় করে তুলেছে। এখানে রাত্রি যাপন ও কংকর নিক্ষেপকে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়নি। রসুল স. এর আমল থেকেও এ দু'টির ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। তিনি স. একথাও বলেছেন যে, আমার নিকট থেকে তোমরা হজের পদ্ধতি শিখে নাও। ইমাম আবু হানিফা বলেন, প্রস্তর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যেই মিনায় অবস্থান গ্রহণ করতে হয় এবং দিবসের প্রতীক্ষায় রাত্রি যাপন করতে হয়। কেবল রাত্রি যাপন মিনায় অবস্থানের উদ্দেশ্য নয়। দলিল হিসাবে তিনি বোখারী বর্ণিত হাদিসটিকে গ্রহণ করেছেন- যেখানে বলা হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বাতনে ওয়াদি (ওয়াদি উপত্যকা) থেকে কাঁকর ছুঁড়ে মারছিলেন। লোকেরা বললো, অন্য সকলে তো উপর দিক থেকে পাথর ছুঁড়েছে। হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, যিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাস্য নেই সেই পরম সত্তার শপথ! যেস্থান থেকে আমি কাঁকর ছুঁড়ছি, সেস্থানটি ছিলো ওই মহামানবের যাঁর উপর সুরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্র স্মরণ অর্থ, কংকর নিক্ষেপণ। ইমাম আবু হানিফার দ্বিতীয় দলিল— হজরত আসেম বিন আদী বলেছেন, রসুল স. মিনায় পৌঁছে উটের রাখালদেরকে রাতেই চলে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কোরবানীর দিনের প্রস্তর নিক্ষেপ সেরে নাও। এরপর এগারো, বারো এবং প্রত্যাবর্তনের দিনের নিক্ষেপ সম্পন্ন করো। নাসাঈ বলেছেন, রসুল স. রাতেই প্রস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, কোরবানীর দিনের এবং পরের দু'দিনের কংকর নিক্ষেপন একই সঙ্গে সম্পন্ন করো (একই দিনে তিন দিনের প্রস্তর নিক্ষেপ সেরে নাও)। ইমাম মালেক বলেছেন, হাদিসটির ব্যাখ্যা হচ্ছে, কোরবানীর দিনে কংকর নিক্ষেপ করবে। কোরবানীর দিনের পরের দিন অতিবাহিত হলে, অর্থাৎ বারো তারিখের কংকর নিক্ষেপের পূর্বে এগারো তারিখের কংকর নিক্ষেপের কাজা আদায় করবে। কংকর নিক্ষেপ ওয়াজিব। তাই রসুল স. এর কাজা আদায় করতে বলেছেন। মিনায় অবস্থানের কাজা আদায় করতে হবে একথাটি তিনি বলেননি। এতে করে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, প্রস্তর নিক্ষেপই মূল বিষয় এবং মিনায় অবস্থান ও রাত্রিক্ষেপন ওই উদ্দেশ্যের অনুষঙ্গ।

এই হাদিসের জবাবে ইমাম আহমদ বলেছেন, রাখালদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছিলো প্রয়োজনবশতঃ। এই অনুমতিদানের অর্থ এই নয় যে, মিনায় অবস্থান করা ওয়াজিব নয়। এরকম ওয়াজিব বিধানের ক্ষেত্রেই তো অনুমতি ও অবকাশ (রুখসত) দেয়া হয়ে থাকে। ইমাম মালেকের দলিল হচ্ছে- হজরত ওমর এবং

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে ওমর ওই সময় নামাজের বাইরের সকল অবস্থায় তকবীর উচ্চারণ করতেন। তাদের তকবীর ধ্বনি শুনে অন্য মানুষেরাও তকবীর উচ্চারণ করতেন। এই আয়াতকে তাঁরা দলিল হিসাবে গ্রহণ করতেন এবং বলতেন আইয়ামে তাশরিকে একমাত্র মিনা ব্যতীত অন্য কোথাও তকবীর বলা ওয়াজিব নয়। ইবাদত প্রতিপালন ও সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে মিনায় অবস্থান করাই জিকির। এর সঙ্গে মুখে যদি দোয়া ও তকবীর ধ্বনি উচ্চারিত হয় তবে তা উত্তম। কাজেই আয়াতের মূল নির্দেশ হচ্ছে মিনায় অবস্থান গ্রহণ— কংকর নিক্ষেপ নয়। আমরা বলি, অবস্থান ও কংকর নিক্ষেপ দু'টিই আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয়। জেনে রাখার প্রয়োজন যে, আয়াতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও এ সম্পর্কিত হাদিস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে— কোরবানীর দিনে আকাবায় কংকর নিক্ষেপের সময় সাতটি কংকর ব্যবহার করা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, কংকর নিক্ষেপের সময় শুরু হয় কোরবানীর দিনে ফজরের পর থেকে। ইমাম আহমদ ও শাফেয়ীর মতে চাঁদের দশ তারিখের অর্ধ রাত্রির পর থেকে। মুজাহিদের মতে সূর্যোদয়ের পর থেকে।

মুজাহিদের দলিল হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণিত ওই হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে— রসুল স. তাঁর পরিবারের দুর্বল সদস্যদেরকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত পাথর ছুঁড়ো না। তিরমিজি। আমরা বলি, এই নির্দেশটি মোস্তাহাব প্রকৃতির। প্রকৃত কথা হচ্ছে— সুবহে সাদেকের পরে সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রস্তর নিক্ষেপ জায়েয। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে স্বসূত্রে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত ইবনে আব্বাস ও অন্য দুর্বলদেরকে সুবহে সাদেকের পূর্বেই প্রেরণ করেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, সুবহে সাদেকের পূর্বে প্রস্তর নিক্ষেপ জায়েয নয়। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন সুবহে সাদেকের পূর্বে প্রস্তর নিক্ষেপ জায়েয। তাঁদের দলিল হচ্ছে, হজরত আয়েশা বলেছেন, রসুল স. হজরত উম্মে সালমাকে দশ তারিখের রাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ফজরের পূর্বে প্রস্তর নিক্ষেপ করে আরও অগ্রসর হয়ে 'তাওয়াফে ইফাদা' সম্পন্ন করেছিলেন। দারা কুতনী। আমরা বলি এই হাদিসটির সূত্রভূত জুহাক বিন ওসমান একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে, হজরত উম্মে সালমা ফজরের নামাজের পূর্বে প্রস্তর নিক্ষেপ করেছিলেন। ফজরের সময় হওয়ার পূর্বে নয়। এই দলিলটি আমাদের পক্ষে এবং মুজাহিদের বিপক্ষে।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, প্রস্তর নিক্ষেপের শেষ সময় দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। জমহুরের মতে প্রস্তর নিক্ষেপের শেষ সময় সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কেনোনা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোরবানীর দিন রসুল স. কে যে সকল প্রশ্ন করা হয়েছিলো সেগুলোর উত্তরে তিনি বলেছিলেন কোনোই অসুবিধা নেই। যেমন এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি তো জবাইয়ের পূর্বেই মাথা

www.eelm.weebly.com

মুড়িয়েছি। তিনি স. বললেন কোনো অসুবিধা নেই। এখন জবাই করো। আরেকজন জিজ্ঞাসা করলেন, হে প্রিয় নবী! আমি তো এশার নামাজের পরে প্রস্তর নিক্ষেপ করেছি। তিনি স. বললেন, কোনো অসুবিধা নেই। বোখারী। তবে এখানে এশার পরে কথাটির অর্থ হবে দ্বিপ্রহরের পরে- সূর্যাস্তের পরে নয়। যেহেতু কোরবানীর দিন সূর্যাস্ত পর্যন্তই থাকে।

প্রস্তর নিক্ষেপের শেষ সময় হচ্ছে— এগারো তারিখের ফজরের উদয়কাল পর্যন্ত। কেনোনা রসুল পাক স. রাখালদেরকে রাতের বেলায় কংকর নিক্ষেপের অনুমতি দিয়েছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবি শায়বা এ রকম বলেছেন। এই অনুমতিদান থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অক্ষমদের জন্য রাতে প্রস্তর নিক্ষেপ জায়েয। কিন্তু যারা সমর্থ তাদের জন্য এরকম করা মাকরূহ। আইয়ামে তাশরিকের দিনগুলোতে (এগারো, বারো ও তেরোই জিলহজে) প্রস্তর নিক্ষেপ করা উচিৎ। প্রতিটি স্তম্ভের জন্য সাতটি প্রস্তর নির্ধারিত। প্রথম দিন প্রস্তর নিক্ষেপ করতে হবে ফজরের পরে। দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরের পরে। যেহেতু হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত রসুল স. প্রস্তর নিক্ষেপ করেননি।

প্রস্তর নিক্ষেপের সময়সীমা সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। অক্ষমদের জন্য পরবর্তী দিনের সুবহে সাদেক পর্যন্ত। যারা সমর্থ তাদের জন্য সুবহে সাদেক পর্যন্ত প্রস্তর নিক্ষেপ বিলম্বিত করা মাকরূহ। তৃতীয় দিবসেও প্রস্তর নিক্ষেপ করতে হবে দ্বিপ্রহরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে। [illegible] বলেছেন ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ। এটা ঐকমত্য যে, তৃতীয় দিবসে সূর্যাস্তের পর প্রস্তর নিক্ষেপ বৈধ নয়। কারণ আইয়ামে তাশরিকের শেষ সীমা তৃতীয় দিবসের সূর্যাস্ত পর্যন্তই। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, তৃতীয় দিবসে (১৩ই জিলহজে) দ্বিপ্রহরের পূর্বেও প্রস্তর নিক্ষেপ জায়েয। ইবনে হুম্মাম বলেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, প্রস্থানের দিন (১৩ই জিলহজ) সূর্যকিরণ প্রখর হতে শুরু করলে প্রস্তর নিক্ষেপ ও তাওয়াফের সময় হয়ে যায়। বায়হাকী। কিন্তু এই হাদিসের এক বর্ণনাকারী তালহা বিন ওমরকে জয়ীফ বলে আখ্যায়িত করেছেন বায়হাকী, ইবনে মুঈন ও দারাকুতনী। ইমাম আহমদ তাকে বলেছেন পরিত্যক্ত।

পর্যায়ক্রমে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে হবে, না যেভাবে খুশী নিক্ষেপ করা যাবে— সে সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। জমহুরের নিকট তারতিব (পর্যায়ক্রম) ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফার মতে সুন্নত। জমহুরের বক্তব্য হচ্ছে- ইবাদত সম্পর্কিত বিষয় কারও মতামতের উপর নির্ভরশীল নয়। এক্ষেত্রে তারতিব লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কাজেই তারতিব ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা বলেন, যদি তিনটি জুমরাতে প্রস্তর নিক্ষেপ একটি ইবাদতের অন্তর্ভূত হতো তবে তারতিব ওয়াজিব হতো। কিন্তু তিনটি জুমরায় প্রস্তর নিক্ষেপ পৃথক পৃথক তিনটি ইবাদতের পর্যায়। সুতরাং প্রস্তর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমকে মান্য করা ওয়াজিব নয়।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, ইমাম আবু হানিফার অভিমতানুযায়ী তারতিব শর্ত নয় বটে কিন্তু ওয়াজিব। কারণ প্রস্তরনিক্ষেপ পরিত্যাগকারীর জন্য কোরবানী ওয়াজিব হয়। যেমন ওয়াজিব হয় কোরবানী, মস্তক মুন্ডন ও প্রস্তর নিক্ষেপের তারতিব ভঙ্গ করলে। সুতরাং তিনটি জুমরায় প্রস্তর নিক্ষেপের ক্রম ভঙ্গ করলেও কোরবানী ওয়াজিব হওয়া উচিৎ।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে— তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং একথা স্মরণে রেখো যে আল্লাহ্‌র নিকটই তোমাদের সকলকে সমবেত হতে হবে। তখন তোমাদের বিশুদ্ধচিত্তসম্বলিত সৎকর্মসমূহের প্রতিদান দেয়া হবে তোমাদেরকে।

কালাবী, মুকাতিল ও আতার উদ্ধৃতি দিয়ে বাগবী বলেছেন, আখনাস্ বিন শরিফ ছিলো বনি জোহরার মিত্র। আখনাস্ অর্থ অতিপশ্চাদবর্তী। বদর যুদ্ধে আখনাস্ রসুল স. এর সহযোগী হয়নি। সে তার তিনশ' অনুগামী নিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলো। আখনাস্ ছিলো মিষ্টভাষী ও সৌম্যকান্ত। সে প্রায়শঃই রসুল স. দরবারে উপস্থিত হয়ে সুচতুর বাক্যালাপের মাধ্যমে একথা বুঝাতে চেষ্টা করতো যে, সে রসুল স.কে একনিষ্ঠভাবে ভালোবাসে। রসুল স. তার এই ভালোবাসাকে মনে করতেন অকৃত্রিম। কিন্তু আখনাস্ ছিলো খাঁটি মুনাফিক। সেই আখনাস্ সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ○ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ○ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ○ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ○

❑ মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যাহার পার্থিব জীবন সম্বন্ধে কথা-বার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তাহার অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃত পক্ষে সে কিন্তু ঘোর বিরোধী।

www.eelm.weebly.com

❒ যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্য-ক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ্ অশান্তি পছন্দ করেন না।

❒ যখন তাহাকে বলা হয়, 'তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর' তখন তাহার আত্মাভিমান তাহাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে। সুতরাং জাহান্নামই তাহার জন্য যোগ্য। নিশ্চয় উহা নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।

❒ মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহের সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্ম-বিক্রয় করিয়া থাকে। আল্লাহ্ তাহার দাসগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি বলতে মুনাফিক আখনাস্কে বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে, হে প্রিয় রসুল! আখনাসের কথাবার্তা আকর্ষণীয় হলেও তার অন্তর অপবিত্র। সুদ্দী বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল পাক স. একটি ক্ষুদ্র সেনাদলকে একটি বিশেষ অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। ওই সেনাদলে ছিলেন হজরত আসেম এবং হজরত মাশহাদ। সেনা দলটি পরাস্ত হলো। তখন মুনাফিকদের মধ্যে দুই ব্যক্তি বললো, এরা কতোই না হতভাগ্য। তারা পরিবার পরিজনকে হারালো। আবার তাদের নেতা মোহাম্মদের নির্দেশও প্রতিপালন করতে পারলো না। মুনাফিকদ্বয়ের এই কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতেই এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

যার পার্থিব জীবন সম্বন্ধে কথা-বার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে— এ কথার অর্থ তার কথাগুলো সুমিষ্ট ও আকর্ষণীয়। কিন্তু তার কথাগুলো অন্তর থেকে উৎসারিত নয়। তাই পৃথিবীতে মনোমুগ্ধকর হলেও আখেরাতে ওগুলোর কোনোই মূল্য নেই। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, মুনাফিকেরা যে ইমান ও ভালোবাসার কথা বলছে (আপনি সরল ও পবিত্র তাই) সে কথা শুনে মুগ্ধ হচ্ছেন— কিন্তু তাদের কথার সঙ্গে জড়িত রয়েছে কেবল পার্থিব স্বার্থ, মিথ্যাচারিতা। আল্লাহর নামে তারা মিথ্যা শপথ করে চলেছে। সেই শপথকে বিশ্বাস্য মনে করে আপনি চমৎকৃত হচ্ছেন। 'আল্লাহর শপথ! আমি ইমানদার। আপনাকে খুব ভালোবাসি'— এ সকল কথা কেবল তাদের মুখেরই কথা। প্রকৃত পক্ষে তারা আপনার ঘোর বিরোধী।

ঘোর বিরোধী বুঝাতে এখানে 'খিসাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটি খাসামতু শব্দের ধাতু। জুজায বলেছেন, শব্দটি খাসাম শব্দের বহুবচন। বাহার শব্দের বহু বচন যেমন বিহার, তেমনি খাসাম শব্দের বহু বচন খিসাম। শব্দটির অর্থ ঘোর বিরোধী অথবা চরম কলহপ্রিয়। হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন- আল্লাহ্র নিকট ওই ব্যক্তি সবচেয়ে ঘৃণ্য যে 'আলাদ্দুল খিসাম' (চরম কলহপ্রিয়)। কাতাদা বলেছেন, ওই ব্যক্তি আলাদ্দুল খিসাম যে অবাধ্যতায় দৃঢ়, বাকচাতুর্যে দক্ষ এবং মিথ্যাচারে সুপ্রতিষ্ঠিত।

www.eelm.weebly.com

'যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্য-ক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে'— এখানে আখনাসের জঘন্য মানসিকতা ও আচরণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সাক্বিফদের সঙ্গে ছিলো আখনাসের চরম বিরোধ। আখনাস রাতে হত্যাকান্ড ঘটাতো। সাক্বিফদের শস্য-ক্ষেত্র জ্বালিয়ে দিতো এবং তাদের পশুপালের অনিষ্ট সাধন করতো। মুকাতিল বলেছেন, একবার আখনাস তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। সেখানে গিয়ে সে ফসলের ক্ষেত জ্বালিয়ে দিলো এবং একটি স্ত্রী গাধার চার পা-ই কেটে ফেললো। তখন আল্লাহপাক 'ওয়া ইজা তাওয়াল্লাহ্'— এই আয়াতটি নাজিল করলেন। জীব-জন্তুর বংশ বুঝাতে এখানে নসল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষ পশু সকল প্রাণীর বংশকেই বলা হয় নসল। জুহাক বলেছেন, 'ইজা তাওয়াল্লাহ্' অর্থ যে শাসনকর্তা ফেৎনা সৃষ্টি করে। মুজাহিদ বলেছেন, যে শাসক নিযুক্ত হলে অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে আল্লাহ্পাক বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন— চরম খরায় ধ্বংস হয়ে যায় ক্ষেত-খামার ও পশুপাল। সেই ধরনের অশান্তি সৃষ্টি করার কথাই এখানে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে আল্লাহ পাক অশান্তি (ফেৎনা) পছন্দ করেন না।

'যখন তাকে বলা হয় তুমি আল্লাহকে ভয় করো, তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে'— এখানে 'ক্বিলালাহু' বাক্যাংশটির হু (তাকে) সর্বনামটির মাধ্যমে আখনাসকে বুঝানো হয়েছে। সে ছিলো জাত্যাভিমানী, মূর্খতার যুগের অহংকার ও আত্মাভিমানে নিমজ্জিত। আরববাসীরা বলে 'আখাজতু হু বিকায়া'- একথার অর্থ, আমি তাকে অমুক কাজে উৎসাহিত করেছি। এ আয়াতেও পাপ কর্মের প্রতি উৎসাহদানকারী হিসাবে আত্মাভিমানের (আখাজতুহুল ইজ্জাত) কথা বলা হয়েছে। এখানে 'বিল ইসমি' অর্থ যে পাপ তার অন্তরে আছে। মুনাফিকের অন্তরে থাকে কুফরী বা অবিশ্বাস। সেই অবিশ্বাসী অভিমানই মুনাফিকদেরকে পাপের প্রতি প্ররোচিত করে। তাই তারা রসুল স. এর সঙ্গে প্রতারণার মতো জঘন্য কর্মে লিপ্ত হতে দ্বিধাগ্রস্থ হয় না।

'জাহান্নামই তার জন্য যোগ্য'— এ কথার অর্থ, জাহান্নামই তাদের প্রকৃত পরিণাম। জাহান্নাম হচ্ছে শাস্তির স্থান। আভিধানিকভাবে শব্দটি অগ্নির সমার্থবোধক।

'নিশ্চয়ই উহা নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল'— বাগবী বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- আল্লাহ্পাকের নিকট সবচেয়ে বড় গোনাহ্ হচ্ছে— যদি কেউ কাউকে বলে আল্লাহকে ভয় করো, তদুত্তরে ওই ব্যক্তি বলে 'আরে মিয়া নিজের চরকায় তেল দাও।' এক বর্ণনায় এসেছে— এক লোক হজরত ওমরকে বললো, আল্লাহকে ভয় করুন। সাথে সাথে হজরত ওমর বিনীতভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা করলেন।

www.eelm.weebly.com

'মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্মবিক্রয় করে থাকে'- এখানে ওই সকল লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা জেহাদ অথবা সৎকার্যের আদেশ দান কার্যে নিজের জীবনকে করে উৎসর্গীকৃত। এরকম উৎসর্গ বা আত্মবিক্রয়ের কথা অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে। যেমন 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন বিশ্বাসীদের জীবন.....।' হজরত আবু উমামা বলেছেন, এক ব্যক্তি হজরত রসুল স.কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কোন জেহাদ সর্বোত্তম? তিনি স. বললেন, সর্বোত্তম জেহাদ হচ্ছে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা। হজরত আবু সাঈদ থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, ইবনে মাজা, তিবরানী ও বায়হাকী।

আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তোষ লাভই হতে হবে জেহাদের মূল উদ্দেশ্য। তাই এখানে 'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি' লাভার্থে বলা হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাহার দাসগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।' অর্থাৎ তিনি দয়ার্দ্র বলেই আত্মবিক্রয়ের মতো অমূল্য নেয়ামতের সন্ধান দিয়েছেন। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব থেকে হারিস বিন আবী উসামা এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন- হজরত সুহাইব হিজরত করে রসুল স. এর কাছে যাচ্ছিলেন। একথা জানতে পেরে কতিপয় কোরাইশ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলো। হজরত সুহাইব তাঁর বাহন থেকে অবতরণ করলেন। তুন থেকে তীর টেনে নিয়ে কোরাইশদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা ভালো করেই জানো, আমি তুখোড় তীরন্দাজ। আল্লাহ্‌র কসম, আমার তীরাধারে একটি তীর থাকা পর্যন্ত তোমরা আমাকে বশীভূত করতে পারবে না। আরও জেনে নাও আমার তরবারীর কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকা পর্যন্তও তোমরা আমার কাছ ঘেঁষতে পারবে না। এখন ভেবে দেখো, তোমরা কী করবে? আমি মক্কায় রক্ষিত আমার সম্পদের সন্ধান দিচ্ছি। যদি চাও, তবে সেগুলো দখল করে নাও। আমার পথ ছেড়ে দাও। পশ্চাৎধাবনকারীরা তাঁর সম্পদের সন্ধান জেনে নিয়ে পশ্চাৎধাবনে ক্ষান্ত হলো। মদীনায় পৌঁছে রসুল স. এর নিকটে এই ঘটনাটি বর্ণনা করলেন হজরত সুহাইব। রসুল স. অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বললেন, হে আবু ইয়াহ্‌ইয়া! তুমি বাণিজ্যে প্রচুর লাভ করেছো। খুবই লাভজনক হয়েছে তোমার ব্যবসা। রসুল স. এর এ কথার পর 'ওয়ামিনান্নাসি মাই ইয়াশরী ...' এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হাতেম এই হাদিসটি ইবনে মুসাইয়েবের সূত্রে খোদ হজরত সুহাইব থেকে বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু তিনি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন মোহাম্মদ বিন সালমা, হজরত সাবেত, হজরত আনাস সূত্রে। হাকেম আরও বলেছেন, মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদিসটি বিশুদ্ধ।

ইবনে জারীর বলেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে সুহাইব বিন সানান রুমী সম্পর্কে। ঘটনাটি ছিলো এই- একবার হজরত সুহাইব আরো কয়েকজন মুসলমানের সঙ্গে মুশরিকদের হাতে বন্দী হলেন। মুশরিকেরা তাঁকে অসহনীয় কষ্ট

www.eelm.weebly.com

দিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি বললেন, দেখো! আমি বয়োবৃদ্ধ। আমি কারো পক্ষে কিংবা বিপক্ষে গেলে তেমন কিছু যাবে আসবে না। তোমরা বরং আমার ধনসম্পদ নিয়ে আমাকে রেহাই দাও। মুশরিকেরা তাঁর কথা মেনে নিলো। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে রাজি'এর পথের যাত্রীদের উদ্দেশ্যে। ইবনে ইসহাক, মোহাম্মদ বিন সায়াদ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হোজাইলের একটি গোত্রের নাম ছিলো লেহ্ইয়ান। তাদের এক লোককে হত্যা করেছিলেন হজরত আবু সুফিয়ান। তখন হোজাইলের কতিপয় লোক কারা নামক এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট গিয়ে বললো, তোমরা মোহাম্মদ স. এর নিকটে গিয়ে কিছু হাদিয়া পেশ করো। যখন ইসলামের পয়গাম নিয়ে তাঁর স. কতিপয় সাহাবী তোমাদের কাছে আসবেন, তাঁরা তোমাদেরকে ধর্মের কথা শোনাবেন, তখন আমরা তোমাদের জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করবো। তারা মনে মনে স্থির করলো, ওই ধর্মপ্রচারক সাহাবাগণকে এভাবে নিজেদের আওতায় নিয়ে এলে তাঁদের কয়েকজনকে হত্যা করা যাবে এবং বাকীগুলোকে মক্কার বাজারে বিক্রয় করে অর্থ উপার্জনও করা যাবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজল ও কারা গোত্রের লোকেরা রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলো। নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের জনপদে কয়েকজন ধর্মপ্রচারক পাঠিয়ে দিন। তাঁদের নিকট থেকে আমরা ধর্মজ্ঞান লাভ করতে পারবো। রসুল স. তখন হজরত আসেম বিন সাবেত আনসারীকে দলপতি নিযুক্ত করে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঠালেন- হজরত খোবাইব বিন আবি আনসারী, হজরত মারসাদ বিন আবি মারসাদ, হজরত গানাভী, হজরত খালিদ বিন বকর, হজরত আবদুল্লাহ বিন তারিক এবং হজরত জায়েদ বিন দাসনা কে। সহীহ্ বোখারীর ভাষ্যমতে তাঁরা ছিলেন দশজন— হজরত আসেম বিন সাবেত আনসারী ছিলেন তাঁদের অধিনায়ক। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে। ধর্মপ্রচারক সাহাবাগণ যখন কাফেরদের জনপদে গেলেন তখন একশ' জন তীরন্দাজ তাঁদেরকে ঘিরে ফেললো। অপর বর্ণনায় দেখা যায়, যারা ঘিরে ফেলেছিলো তাদের সংখ্যা ছিলো দুইশ'। আমি বলি, তারা দুইশ' জনই ছিলো। তবে তীরন্দাজের সংখ্যা ছিলো একশ'। হজরত আসেম ও তাঁর সঙ্গীরা তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন পাহাড়ের একটি টিলায়। অবিশ্বাসীরা তাঁদেরকে ঘিরে ফেলে বললো, আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমাদেরকে হত্যা করা হবে না। হত্যার উদ্দেশ্য আমাদের নেই। আমরা তোমাদেরকে মক্কাবাসীদের নিকট বিক্রয় করে কিছু অর্থ উপার্জন করতে চাই। সুতরাং তোমরা নির্ভয়ে নিচে নেমে এসো। হজরত আসেম বললেন, অবিশ্বাসীদের দেয়া প্রতিশ্রুতিতে আমরা বিশ্বাস করি না। তিনি দোয়া করলেন, হে আমাদের আল্লাহ্! তোমার দ্বীনের সাহায্যকারী হতে গিয়ে আজ আমরা দুর্দশাগ্রস্ত। আমাদের রক্ত ও গোশতের হেফাজত করো। রসুল স.কে আমাদের বর্তমান অবস্থা জানিয়ে দাও। তাঁর দোয়া কবুল হলো। যখন তাঁরা শহীদ হলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁদের শাহাদাতের

www.eelm.weebly.com

সংবাদ পৌঁছে গেলো রসুল স. এর নিকটে। অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ করেছিলেন সাহাবাগণ। কাফেরদের তীব্র তীর বর্ষণের ফলে সাতজন শহীদ হলেন। বেঁচে রইলেন কেবল হজরত খোবাইব, হজরত আবদুল্লাহ বিন তারিক ও হজরত জায়েদ। হোজাইল বংশের লোকেরা হজরত আসেমের পবিত্র মস্তক কর্তন করার উদ্যোগ নিতেই সহসা এক ঝাঁক বোলতা এসে তাঁর পবিত্র মরদেহ ঘিরে ফেললো। ফলে অবিশ্বাসীরা তাঁর পবিত্র মস্তকের নিকটে যেতে পারলো না। এ ঘটনার কারণেই হজরত আসেমের একটি নাম হয়েছে 'হামীউদ্দুবার' (বোলতা কর্তৃক আশ্রিত)। এরপর হঠাৎ মেঘ জমতে শুরু করলো আকাশে। মুষলধারে শুরু হলো বৃষ্টি। সেই ঘনঘোর বর্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেলো হজরত আসেমের পবিত্র লাশ।

জ্ঞাতব্যঃ উহুদ যুদ্ধে সালাফা নাম্নী এক রমণীর পুত্রকে হজরত আসেম হত্যা করেছিলেন। তখন ওই রমণীটি শপথ করেছিলো যদি সে কোনো দিন হজরত আসেমের ছিন্ন মস্তক পায়, তবে সে ওই মস্তকের খুলিতে মদ্য পান করবে। আর সে ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যেই অবিশ্বাসীরা হজরত আসেমের মস্তক কর্তন করতে উদ্যত হয়েছিলো।

হজরত আসেম আল্লাহ্পাকের নিকট থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার লাভ করেছিলেন যে, তিনি কোনো মুশরিককে স্পর্শ করবেন না। কোনো মুশরিকও যেনো তাঁকে স্পর্শ না করে। আল্লাহ্পাক বোলতাবাহিনীর মাধ্যমে তাঁর সে অঙ্গীকার পূরণ করেছিলেন। হজরত খোবাইব, হজরত আবদুল্লাহ বিন তারিক ও হজরত জায়েদ বন্দী হলেন মুশরিকদের হাতে। মুশরিকেরা বন্দীত্রয়কে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে যাত্রা করলো। যাহরান নামক স্থানে পৌঁছলে হজরত আবদুল্লাহ্ তাঁর হাতকড়া ভেঙে ফেলে অসি উত্তোলন করলেন। মুশরিকেরা প্রস্তর বর্ষণ করে তাঁকে শহীদ করে দিলো। যাহরানেই তিনি সমাহিত হলেন। অবশিষ্ট সাহাবাদ্বয়কে মক্কার বাজারে বিক্রয় করে ফেললো মুশরিকেরা। ইবনে ইসহাক ও ইবনে সায়াদ বলেছেন, হজরত জায়েদকে কিনে নিলো সাফওয়ান বিন উমাইয়া। তার ছেলের হত্যার প্রতিশোধ নেয়া ছিলো তার ইচ্ছা। এই সাফওয়ান পরে মুসলমান হয়েছিলেন।

সাফওয়ান হজরত জায়েদকে নিয়ে তার ক্রীতদাস ফুসতাস এর হাতে ন্যস্ত করলো। এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো তানয়ীম নামক স্থানে। আবু সুফিয়ানসহ কোরাইশদের একটি বিরাট দল সেখানে উপস্থিত হলো। আবু সুফিয়ান বললো, জায়েদ। আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি এই সিদ্ধান্তটিকে তুমি কেমন মনে করো? তুমি মোহাম্মদের স্থলে এবং তিনি তোমার স্থলে অধিষ্ঠিত হোক। তার মস্তক কর্তিত হোক আর তুমি রেহাই পেয়ে যাও- এটা কি তোমার জন্য কল্যাণকর নয়? হজরত জায়েদ বললেন, আল্লাহর কসম! কখনই এ রকম সম্ভব নয়। তিনি আমার স্থলে এবং আমি তাঁর স্থলে— এ রকম আমি কখনোই চাই না। তাঁর স. পবিত্র

www.eelm.weebly.com

চরণে কাঁটা বিদ্ধ হওয়াও আমার মৃত্যু অপেক্ষা অধিক কষ্টকর। আবু সুফিয়ান বললো, মোহাম্মদের সাথীরা তাঁকে যে রকম ভালোবাসে সে ভালোবাসার কল্পনাও আমার মাথায় আসে না। এরপর ক্রীতদাস ফুসতাস হজরত জায়েদকে নির্মমভাবে শহীদ করে দিলো।

হজরত খোবাইবকে ক্রয় করেছিলো হারিসের সন্তানেরা। বদর যুদ্ধে তাদের পিতা নিহত হয়েছিলো হজরত খোবাইবের হাতে। বন্দী অবস্থায় একদিন একটি চুল কামানোর ক্ষুর হারিসের মেয়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন খোবাইব। একটি শিশু হঠাৎ ঢুকে পড়েছিলো হজরত খোবাইবের বন্দীকক্ষে। কিছুক্ষণ পর শিশুটির মা দেখলো শিশুটি বসে আছে হজরত খোবাইবের কোলে আর তাঁর হাতে রয়েছে সেই ধারালো অস্ত্র। মেয়েটি তখন ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। হজরত খোবাইব বললেন, তুমি কী মনে করেছো? আমি কি একটি অবোধ শিশুর ক্ষতি করতে পারি? অঙ্গীকার ভঙ্গ করা আমার স্বভাব নয়। মেয়েটি পরে বলেছিলো হজরত খোবাইবের মতো বন্দী আমি কোনো দিন দেখিনি। আমি বন্দী অবস্থায় তাঁকে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ সারা মক্কা জুড়ে কোথাও তখন আঙ্গুর পাওয়া যেতো না। নিশ্চয়ই আল্লাহপাকই তাঁকে আঙ্গুর খেতে দিয়েছিলেন।

একদিন হেরেম শরীফের বাহিরে নিয়ে যাওয়া হলো হজরত খোবাইবকে। অবিশ্বাসীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো— তাঁকে শূল বিদ্ধ করে হত্যা করা হবে। হজরত খোবাইব নামাজ পাঠের জন্য কিছু সময় চেয়ে নিলেন। আদায় করলেন দু'রাকাত নামাজ। তখন থেকেই বধ্যভূমিতে প্রাণদানের পূর্বে নামাজ পাঠের প্রথা চালু হয়ে গেলো। নামাজ পাঠের পর হজরত খোবাইব বললেন, তোমরা হয়তো মনে করবে মৃত্যুভয়ে আমি আমার নামাজ দীর্ঘায়িত করছি। তাই আমি আমার নামাজকে সংক্ষেপ করলাম। এরপর তিনি প্রার্থনা করলেন, হে আমার আল্লাহ! তুমি এদেরকে একজন একজন করে ধ্বংস করে দিও। এরপর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন— আমি মুসলমান অবস্থায় নিহত হচ্ছি! সুতরাং আমার মনে এরকম আশংকা নেই যে আমি মৃত্যুর পর কিভাবে পড়ে থাকবো। আর এটাতো হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে জীবন সমর্পণ। যদি আল্লাহ্‌পাক ইচ্ছা করেন তবে আমার ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও রহমতে বরকতে বিভূষিত করে দেবেন। হজরত খোবাইবকে শূলীতে চড়ানো হলো। প্রাণবিয়োগের পূর্ব মুহূর্তে তিনি বললেন— হে আমার পরম প্রভুপ্রতিপালক! তুমি তোমার রসুলকে এই সংবাদটি জানিয়ে দাও।

কেউ কেউ বলেছেন, সালমান মাইসারা হজরত খোবাইবের বুকে বল্লম স্থাপন করলো। হজরত খোবাইব বললেন, রে দুরাচার! আল্লাহকে ভয় কর। এ কথা শুনে সালমান মাইসারা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং বল্লমের আঘাতে তাঁকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলো। আত্মবিক্রয়ের এই অনন্য নিদর্শনের কথাই বিবৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

www.eelm.weebly.com

হজরত উসামা বিন জায়েদ বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, হজরত জিব্‌রাইল এখনই আমাকে খোবাইবের সালাম পৌঁছে দিলেন। সমবেত সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, কে এমন আছো যে শূলী থেকে খোবাইবের লাশ আনতে পারবে? যে তাঁর লাশ আনতে পারবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। লাব্বাইক (আমি হাজির) বলে উঠে দাঁড়ালেন হজরত জোবায়ের। বললেন, আমি এবং মিকদাদ বিন আসওয়াদই এ কাজের জন্য যথেষ্ট। মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন হজরত জোবায়ের এবং হজরত মেকদাদ। দিনে তাঁরা পথ চলতেন এবং রাতে আত্মগোপন করে থাকতেন। এভাবে খোঁজ নিতে নিতে তাঁরা পৌঁছে গেলেন তানয়ীম নামের বধ্যভূমিতে। দেখলেন, হজরত খোবাইবের পবিত্র দেহ তখনও শূলবিদ্ধ অবস্থায় রয়েছে আর সেখানে পাহারা দিচ্ছে চল্লিশজন ভয়ংকরদর্শন কাফের। রাতে এক সময় পাহারাদারেরা সব ঘুমিয়ে পড়লো। তখন তাঁরা দু'জনে মিলে শূলী থেকে লাশ নামালেন। তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, চল্লিশদিন আগের শহীদ হজরত খোবাইবের লাশ সম্পূর্ণ সতেজ। শরীরের একটি জখমের উপরে ছিলো তাঁর হাত। সেই ক্ষতস্থান থেকে তাজা লাল রক্ত ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। সে রক্তের সুবাস মেশক্ আম্বরকেও হার মানায়। হজরত জোবায়ের তাঁর ঘোড়ায় দ্রুত লাশ উঠিয়ে নিলেন। তারপর দু'জনে যাত্রা করলেন মদীনার দিকে। ওদিকে প্রহরীরা জেগে গেলো। তৎক্ষণাৎ তারা লাশ অপহরণের সংবাদ পৌঁছে দিলো কোরাইশ নেতাদের নিকট। সতেরোজন অশ্বারোহী বেরিয়ে পড়লো লাশের সন্ধানে। খুঁজতে খুঁজতে তারা হজরত জোবায়েরের সন্ধান পেলো। হজরত জোবায়ের বিপদ আঁচ করতে পেরে হজরত খোবাইবের লাশ রেখে দিলেন মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে মাটি তাঁকে উদরস্থ করে নিলো। এ জন্যই তাঁর নাম 'বলিউল আরদ্' (মৃত্তিকা কর্তৃক গ্রাসিত)। হজরত জোবায়ের এবং হজরত মেকদাদ যখন মদীনায় ফিরে গেলেন তখন হজরত জিব্‌রাইল আবির্ভূত হয়ে বললেন, ভাই মোহাম্মদ স.! ফেরেশতারা জোবায়ের এবং মেকদাদকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তখনই অবতীর্ণ হলো 'মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্মবিক্রয় করে থাকে.......।' এ পটভূমির প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের মর্ম হবে এরকম— যে ব্যক্তি হজরত খোবাইবকে শূলী থেকে উদ্ধার করতে জীবন উৎসর্গ করে।

হজরত ইকরামা থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেন, ইহুদীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম, হজরত সায়লাবা, হজরত ইবনে ইয়ামীন, হজরত ইবনে কাব, হজরত আসাদ, হজরত উসাইয়েদ, হজরত সাঈদ বিন আমর এবং হজরত কায়েস বিন জায়েদ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমরা সপ্তাহের বিশেষ দিনের মর্যাদা রক্ষা করে চলতাম। আপনার অনুমতি সাপেক্ষে আমরা এখনও বিশেষ দিনটির মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে চাই। আর তওরাত তো আসমানী কিতাব। রাতে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তওরাত পাঠ করতে চাই। এ রকম বর্ণনা করেছেন বাগবী। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, ইসলাম গ্রহণ করা

www.eelm.weebly.com

সত্ত্বেও তাঁরা উটের গোশত ও দুধ হারাম মনে করতেন। তাঁদের এহেন চিন্তাচেতনার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে এ আয়াত—

সুরা বাকারা ঃ ২০৮, ২০৯

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পূর্ণ রূপে ইসলাম গ্রহণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

❒ সুস্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের নিকট আসিবার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তবে জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

'তোমরা পূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ কর'— এখানে ইসলাম শব্দের অর্থ সততা ও আনুগত্য। ইসলাম বললেই সততা ও আনুগত্যের বিষয়টি ভালোভাবে বুঝা যায়। নাফে ইবনে কাসির ও কাসায়ীর মতে 'আসলিমু' শব্দটির সীন জবর যুক্ত। অন্য ক্বারীগণ পাঠ করেছেন যের সহযোগে। এখানে কাফ্ফা শব্দটির অর্থ পূর্ণরূপে। আর 'উদখুলু' শব্দটির অর্থ প্রবেশ করো বা গ্রহণ করো। পূর্ণ বাক্যটির মর্ম হবে এরকম- তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা আল্লাহ্পাকের প্রতি পূর্ণ অনুগত করে তোলো।

আমি বলি, জাহেরী ও বাতেনী আনুগত্য সুফী অর্থাৎ পীর আউলীয়া ছাড়া অন্য কেউ লাভ করতে পারে না। এ বাক্যটির মোটামুটি অর্থ হচ্ছে ইসলামে পুরাপুরি দাখিল হয়ে যাও। ইসলামের সঙ্গে অন্য কিছুর সংমিশ্রণ ঘটিও না। অর্থাৎ ইসলামের প্রতিটি শাখা প্রশাখা ও আদেশ নিষেধের মধ্যে পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত হও। হজরত হুজাইফা বিন ইয়ামিন বলেছেন, এ আয়াতের তাফসীর হচ্ছে, ইসলামের আটটি বিষয় পুরোপুরি আঁকড়ে ধরতে হবে। এর যে কোনো একটি বাদ পড়লে সে পুরোপুরি মুসলমান বলে গণ্য হবে না। সে আটটি বিষয় হচ্ছে- নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, ওমরাহ, জেহাদ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।

আমি বলি, হজরত হুজাইফা দৃষ্টান্ত স্বরূপ আটটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এখানে ইসলামের প্রতিটি দিককে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সকল আদেশ যেমন সর্বান্তকরণে মেনে নিতে হবে, তেমনি সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে

www.eelm.weebly.com

পূর্ণরূপে মুক্ত থাকতে হবে। এরকমও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ— এ বিধানটির মধ্যেই রয়েছে ইসলামের সকল বিধান। তাই কাউকে সদুপদেশ দিতে গেলে নিজেও সৎ কাজ করতে হবে এবং সকল অসদাচারণ থেকে রক্ষা পেতে হবে।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. বলেন, ইমানের সর্বোত্তম শাখা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' আর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ। লজ্জাও ইমানের একটি অঙ্গ। মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

'শয়তানের পদাংক অনুসরণ কোরো না'— এ কথার অর্থ সপ্তাহের বিশেষ দিনের মর্যাদা রক্ষা করতে যেয়ো না। উটের গোশতকেও হারাম জেনো না। কারণ, পূর্বেকার বিধান এখন রহিত।

'নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'- এ বিষয়টি একটি হাদিসের মাধ্যমে ভালো করে বুঝে নেয়া যেতে পারে। হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে, একবার রসুল পাক স. এর খেদমতে হজরত ওমর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ইহুদীদের কথা বার্তাতো ভালোই। অনুমতি দান করলে আমি তাদের কিছু কিছু কথা লিখে রাখতাম। রসুল স. বললেন, তোমরাও কি ইহুদী খৃষ্টানদের মতো সীমাতিক্রমকারী হবে? আমিতো তোমাদেরকে দিয়েছি সূর্যসম উজ্জ্বল শরিয়ত। হজরত মুসা যদি এখন থাকতেন তবে তাঁকেও আমার অনুসারী হতে হতো। আহমদ, বায়হাকী। হাদিসটি লিপিবদ্ধ রয়েছে 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে।

'সুস্পষ্ট নিদর্শন আগমণের পর যদি তোমরা স্খলিত হও তবে জেনো আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়'- এখানে সুস্পষ্ট নিদর্শন বলতে 'আল বাইয়্যেনাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতের মাধ্যমে এমর্মে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামের সুদৃঢ় অবস্থান থেকে যদি তোমরা সরে যাও তবে স্মরণে রেখো, আল্লাহ্পাক কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণকারী। স্খলনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিশোধ বাস্তবায়ন করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। কিন্তু তিনি একারণেই অবকাশ দান করে থাকেন যে, তিনি প্রজ্ঞাময় (হাকিম)। তাঁর এ অবকাশ দানের মধ্যে রয়েছে অপার এক রহস্য।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২১০

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ

ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۝

www.eelm.weebly.com

❑ তাহারা শুধু ইহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে যে আল্লাহ্ মেঘের ছায়ায় ফেরেশতা-সহ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবেন, তৎপর সব কিছুর মীমাংসা হইয়া যাইবে। সমস্ত বিষয় আল্লাহেরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

এখানে 'ইয়ানজুরুনা' শব্দটির অর্থ হবে 'ইয়ানতাজিরুনা' (প্রতীক্ষায় রয়েছে)। 'জুলাল' শব্দটি এসেছে 'জুল্লাতুন' শব্দ থেকে। আর বাগবীর মতে 'আল গামাম' অর্থ শ্বেতশুভ্র মেঘমালা। 'গম' অর্থ আচ্ছাদন। তাই গামাম অর্থ আড়াল বা ছায়া। মুজাহিদ বলেছেন, মেঘ ছাড়া অন্য কিছুকে বলে 'গামাম।' বনি ইসরাইলেরা সেই গামামের ছায়াই পেয়েছিলো মেঘের ন্যায়।

'আল্লাহ মেঘের ছায়ায় ফেরেশতাসহ তাদের নিকট উপস্থিত হবেন'— এ প্রসঙ্গে পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী সকলেই অভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, আল্লাহপাক দেহবিশিষ্ট নন— নশ্বর প্রকৃতির কোনো কিছুর মতোও নন। তাঁরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় দু'টি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন— একটি হচ্ছে এই, এ ব্যাপারে নীরবতা পালন করতে হবে এবং বলতে হবে বিষয়টি আল্লাহ্পাকই সমধিক জ্ঞাত। আল্লাহ্পাকের এ কালামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই আমাদের কর্তব্য বলে জানতে হবে। কালাবী বলেছেন, বিষয়টি গোপনীয় ও ব্যাখ্যার অতীত। এ ধরনের আয়াত সম্পর্কে মাকহুল, আওজায়ী, মালেক, ইবনে মোবারক, সুফিয়ান সাওরী, আবু লাইস, আহমদ ও ইসহাক বলেছেন- এ রকম আয়াত যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবেই রক্ষা করতে হবে। সুফিয়ান বিন ওয়াইনা বলেছেন, আল্লাহ্পাক তাঁর কিতাবে যে সকল গুণবত্তা দ্বারা বিশেষিত হয়েছেন, সেগুলোকে তেলাওয়াত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আলোচনাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। আল্লাহপাক এবং তাঁর রসুলই কেবল এ সকল আয়াতের তাফসীর করতে পারেন। ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এরকম। তিনি বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া এ সকল আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য কেউ জানে না। আর 'ওয়ার রসিখুনা' (যাঁরা জ্ঞানে সুগভীর) — তাঁরাও এ সকল ব্যাখ্যা থেকে পৃথক।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে— সুসংগত পদ্ধতিতে এ ধরনের আয়াতের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এ পদ্ধতির প্রবক্তারা বলেন, যাঁরা জ্ঞানে সুগভীর তাঁরাও এ ধরনের আয়াতের ব্যাখ্যা জানেন। বায়যাবী বলেছেন ইল্লা আঁই ইয়া'তিয়া হুমু ল্লাহু বাক্যটির ব্যাখ্যায় আল্লাহ্পাকের হুকুম ও আল্লাহ্র ভয় অর্থ গ্রহণ করা যায়। তিনি এখানে সম্বোন্ধিতকে উহ্য মনে করেছেন।

প্রকৃত কথা এই— যে মেঘমালা রহমত লাভের মাধ্যম, সেই মেঘমালা থেকেই নেমে আসবে শাস্তি। অর্থাৎ কঠিন লাঞ্ছনার বর্ণনা দেয়াই উদ্দেশ্য। আমি বলি, এ আয়াত সম্পর্কে যে সকল হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো বায়যাবীর ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে না।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে হাকেম, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন 'ইয়াউমা তাশাক্কাকুস্ সামাউ বিল গামামী'— আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক মানব-দানব, ভূচর-খেচর সকল সৃষ্টিকে একত্রিত করবেন। সে দিন বিদীর্ণ হবে আকাশ ও পৃথিবী। পৃথিবীবাসীদের চেয়েও অধিকসংখ্যক আকাশবাসী অবতরণ করবেন। তাঁরা পৃথিবীবাসীদেরকে ঘিরে ফেলবেন। পৃথিবীবাসীরা তাঁদেরকে বলবে আমাদের প্রতিপালককে কি তোমরা দেখেছো? তাঁরা বলবেন, না। এরপর অবতীর্ণ হবে দ্বিতীয় আকাশের অধিবাসীরা। তাঁদের সংখ্যা হবে আগের দুই দল অপেক্ষা বেশী। পৃথিবীবাসী ও প্রথম আকাশবাসীরা একযোগে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে— আমাদের প্রভুপালয়িতা কি তোমাদের মধ্যে রয়েছেন? তারা বলবে, না। এভাবে একে একে নেমে আসবে— তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশের অধিবাসীরা। প্রতিটি নতুন আগমনকারী দলের সংখ্যা হবে পূর্ববর্তী দলের চেয়ে অধিক। পূর্ববর্তীরা নতুন আগমনকারী দলকে একই প্রশ্ন করে যাবেন। পরে আগমনকারীরা প্রশ্নের উত্তরে বলতে থাকবে না, কেবলই না। অবশেষে মেঘমালার ছত্রছায়ায় আল্লাহ্পাক অবতরণ করবেন স্বয়ং। চতুষ্পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করবেন নৈকট্যভাজন ফেরেশতাবৃন্দ। তাদের সংখ্যা হবে পৃথিবী ও সাত আকাশের ফেরেশতাদের চেয়েও বেশী। সেখানে আরও উপস্থিত থাকবেন, আরশবাহী ফেরেশতারা। বর্শাফলকের মতো ধারালো হবে তাদের শিং। তাদের দুই পায়ের ব্যবধান হবে অনেক অনেক (বর্ণনাকারী ব্যবধান পরিমাপ করতে সমর্থ নন বলে অনেক অনেক বলেছেন)। তাদের পদতল থেকে টাখনু পর্যন্ত পরিসর হবে পাঁচশ বৎসর দূরত্বের সমান। তেমনি টাখনু থেকে হাঁটু এবং হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত পাঁচশ বছর পথের সমদূরত্ব সম্পন্ন হবে। কোমর থেকে কণ্ঠনালী পর্যন্ত তেমনি একই দূরত্ব থাকবে। ঘাড় থেকে কানও একই দূরত্ব সম্পন্ন হবে।

আমি বলি, বায়যাবী এখানে সম্বোন্ধিতকে লোপ করে যে অর্থের অবতারণা করেছেন, যদি সে অর্থ ধর্তব্য হয় তবে ব্যাপারটা হবে 'তুমি জিজ্ঞেস করো গ্রামকে'। আয়াতের অর্থ 'তুমি জিজ্ঞেস করো গ্রামবাসীকে'—এর মতো। এরকম অর্থ করা হলে কোরআন মজীদের কোনো আয়াতই আর মোতাশাবেহ আয়াত থাকবে না। অথচ আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, এর মধ্যে কতিপয় আয়াত মোহকাম যা কোরআনের মূল আর অন্যগুলো মোতাশাবিহাত।

সম্মানিত সুফী সম্প্রদায় এরকম আয়াত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভিন্নতর পদ্ধতিকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। তাদের অভিমত হচ্ছে, কিছু সংখ্যক মানুষের নিকট আল্লাহ্ পাকের বিকাশ অনির্ণেয় পরিবেশে প্রতিভাত হয়, যেমন আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। বিশ্বাসীদের হৃদয়ে এবং কাবা শরীফে আল্লাহপাকের বিশেষ বিকাশ (তাজাল্লী) প্রতিভাসিত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে এ বিকাশ প্রতিটি

www.eelm.weebly.com

মানুষের উপরেই বর্ষিত হয়। কারণ, মানুষ মহান সৃষ্টি এবং আল্লাহ্পাকের প্রতিনিধি (খলিফা)। এ বিকাশ কখনো হয় বিদ্যুৎ চমকের মতো- একে বলে 'তাজাল্লীয়ে বরকী।' আবার কখনো হয় স্থায়ী- এ সকল তাজাল্লীর কারণে আকার প্রকারহীন পরম সত্ত্বার অবিনশ্বরতায় ন্যূনাধিক্য ঘটে না। তিনি যেমন চিরবিদ্যমান, চিরঅক্ষয় ও অতুলনীয় পবিত্র—তেমনি থাকেন। পক্ষান্তরে এ নশ্বর সৃষ্টি লয়, ক্ষয় ও নতুনত্বের কলংকে কলংকিত। যেমন সূর্য ও আয়না। আয়না স্বচ্ছ হলে সূর্যকিরণের প্রতিফলন লাভ করে ধন্য হয়। আয়নায় আলো পড়লে সে আলো যেমন সূর্যের মৌলিকতায় কোনোই প্রভাব বিস্তার করে না, তেমনি সৃষ্টির তাজাল্লী লাভে আল্লাহপাকের কোনোই ক্ষতি বা বৃদ্ধি হয় না। তাই আল্লাহ পাক একস্থানে এরশাদ করেছেন, 'আর তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ে তাজাল্লী নিক্ষেপ করলেন'। তেমনি এখানেও বলা হয়েছে — মেঘের ছায়ায় ফেরেশতাসহ তাঁর উপস্থিত হওয়ার কথা। এখানে উপস্থিত হওয়া অর্থ তাজাল্লী নিক্ষিপ্ত হওয়া বুঝতে হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক মেঘমালার উপর তাঁর তাজাল্লী নিক্ষেপ করবেন। যাদের অর্ন্তজগত এ জগতেই নূর ও দিব্য দৃষ্টি পেয়েছে, তাঁদের সেই জ্যোতির্ময় দিব্যদৃষ্টি পৌঁছে যায় ওই মেঘমালারও উর্ধ্বে। একজন সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি মহাশূন্যের উর্ধ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সক্ষম। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, জান্নাতে তাঁর দর্শন হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো। অতএব মেঘমালার উর্ধ্বে দিব্য দৃষ্টিতো গমন করতে পারবেই। আর যে সকল লোক এ পৃথিবীতে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে সক্ষম হয়নি, তারা দৃষ্টিহীন। তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে অন্ধ। ওই মেঘমালাই তাদের দৃষ্টির অন্তরায়।

আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ুতী তাঁর 'বদরু স্সাকিরাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আমি শায়েখ বদরুদ্দীন জারাক্সীর হাতের লেখায় দেখেছি সালমা বিন কাসেম গারাইবে উসুল পুস্তকে এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন—কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাকের তাজাল্লী দৃষ্টিগোচর হবে। মেঘচ্ছায়ায় তাঁর উপস্থিতির অর্থ তিনি সৃষ্টির দৃষ্টিশক্তি পরিবর্তন করে দেবেন, তখন তারা পরিবর্তিত দৃষ্টিতে সেরকমই দেখবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাঁর উদাহরণরহিত অধিষ্ঠান আরশের উপরেই থাকবে। তিনি পরিবর্তন ও রূপান্তরের অতীত। আর স্থানান্তরেরতো প্রশ্নই ওঠে না।

আমি বলি, একথার আরও অধিক সূক্ষ্ম মর্ম এই যে, সৃষ্টি তখন তাঁকে দেখবে স্বচ্ছ মেঘপুঞ্জ থেকে অন্তহীনতার দিকে। জালালউদ্দীন সুয়ূতী বলেছেন, আবদুল আজীজ মাজেশুন থেকে বর্ণিত হয়েছে- আল্লাহ্পাক সৃষ্টির দৃষ্টিশক্তিকে এমন করে দিবেন, যাতে করে তারা আল্লাহ্পাকের নেমে আসা অবলোকন করতে সক্ষম হবে। বিচ্ছুরিত তাজাল্লীর মাধ্যমে তিনি সঙ্গোপনে বান্দাদেরকে আহবান করবেন অথচ প্রকৃতার্থে তিনি রূপান্তরাতীত, স্থানান্তরাতীত ও কালাতীত। বিভিন্ন হাদিসের সূত্রে আমরা জানতে পারি হজরত জিব্রাইল তাঁর আপনাকৃতিতে রসুল স. এর

www.eelm.weebly.com

সকাশে উপস্থিত হতেন, আবার কখনো হাজির হতেন হজরত দাহিয়াতুল কালবীর আকৃতিতে। অথচ তিনি হজরত দাহিয়াতুল কালবী অপেক্ষা মহান।

আমি বলি, আমি এখানে যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছি উত্তরসূরীরা তার অনুভূতিকেও স্পর্শ করতে পারবে না। আর পূর্বসূরীদের বক্তব্য এরকম— তিনি আরশে অধিষ্ঠিত, তিনি মেঘচ্ছায়া ইত্যাদিতে অবতরণ করবেন। আয়াতের এরকম বর্ণনা যথাস্থানেই রাখতে হবে। তাঁর পবিত্র সত্তার প্রতি অসমীচীন কোনো ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা যাবে না।

যারা বিষয়টির প্রকৃত তত্ত্ব অবগত তারা এর যথাব্যাখ্যা দিতে সক্ষম নন। যদি দিতে চান তবে শ্রোতাদের বুদ্ধিবৈকল্য ঘটবে এবং প্রকৃত মর্ম যা নয় তাই বুঝে ফেলবে। সুতরাং এ সকল বিষয়ে মৌনতাবলম্বনই শ্রেয়। আয়াতের প্রতি নির্বিবাদ বিশ্বাস ওয়াজিব। আল্লাহপাক ও তাঁর প্রিয় রসুল ছাড়া এ রকম আয়াতের ব্যাখ্যা করার সাহস ও সামর্থ্য কারো নেই।

সমস্ত বিষয় আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে (ওয়া ইলাল্লাহি তুরজ্বাউল উমুর)— ক্বারী ইবনে আমের, হামজা, কাসায়ী এবং ইয়াকুব 'তুরজ্বাউল উমুর' কথাটি কোরআন মজীদের যেখানেই থাকুক না কেনো সেখানেই 'তা' অক্ষরে জবর এবং 'জীম' অক্ষরে যের দিয়ে 'তারজীউল উমুর' পড়েছেন। অন্য ক্বারীগণ পড়েছেন 'তুরজ্বাউল উমুর'— যেমন এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২১১, ২১২

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُم مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا ۘ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

❒ বনি ইস্রাইলকে জিজ্ঞাসা কর আমি তাহাদিগকে কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করিয়াছি। আল্লাহের অনুগ্রহ আসিবার পর কেহ উহার পরিবর্তন করিলে আল্লাহ্ মন্দ কার্যের প্রতিফল দানে কঠোর।

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের নিকট পার্থিব জীবন সুশোভিত। তাহারা বিশ্বাসীগণকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া থাকে; অথচ যাহারা সাবধানে চলে

www.eelm.weebly.com

কিয়ামতের দিন তাহারা তাহাদের উর্ধ্বে থাকিবে। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

এখানে বনী ইসরাইল বলতে বুঝানো হয়েছে মদীনার ইহুদীদেরকে। 'বনী ইসরাইলদেরকে জিজ্ঞেস কর'— এই জিজ্ঞেস করার কথা বলে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং সাবধান করে দেয়া হয়েছে। 'আমি তাদেরকে কতো স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি'— একথার মর্ম হচ্ছে আমি তাদেরকে অসংখ্য সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম কিন্তু তারা সেগুলোকে বিকৃত করে ফেলেছে। 'কাম অতাইনাহুম' বাক্যের 'কাম' অব্যয়টি প্রশ্নবোধক হওয়ার কারণে সাল বনী ইসরাইল (বনী ইসরাইলকে জিজ্ঞেস কর!) বাক্যটির অবস্থা জ্ঞাপক হয়েছে এভাবে— বনী ইসরাইলদেরকে জিজ্ঞেস করুন আমি তাদেরকে কতোইনা দিয়েছি। আবার কাম শব্দটি বিজ্ঞপ্তিসূচক হওয়ার কারণে প্রশ্নাকারে অর্থ দাঁড়াবে এরকম— (হে রসুল!) আপনি বনী ইসরাইলদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদের নিকট অসংখ্য নিদর্শন ছিলো কিনা? আর ওই নিদর্শনগুলো ছিলো সরাসরি প্রকাশ্য মোজেজা। তওরাত শরীফ ছিলো হজরত মুসার নবুয়তের প্রমাণ। আর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর নবুয়তের নিদর্শনও লিপিবদ্ধ ছিলো ওই কিতাবে।

'আল্লাহ্র অনুগ্রহ আসবার পর কেউ তার পরিবর্তন করলে আল্লাহ্ মন্দকাজের প্রতিফল দানে কঠোর'— এখানে মোজেজা সমূহকেই নেয়ামত বা অনুগ্রহ বলা হয়েছে। কারণ, মোজেজাই হচ্ছে হেদায়েতের (পথপ্রাপ্তির) উপকরণ। আর এখানে অনুগ্রহ বলতে বুঝতে হবে আল্লাহ্র কিতাবকে। পরিবর্তন করার অর্থ হবে কিতাবানুযায়ী আমল না করাকে। এখানে আরেকটি ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায় যে, অনুগৃহীত বাণী বিশ্লেষণের অবকাশ ছিলো। আর ইহুদীরা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেগুলোকে পরিবর্তন করে ফেলেছে।

'আল্লাহ্পাক মন্দ কাজে প্রতিফল দানে কঠোর'— এ কথায় বুঝা যায় ইহুদীদের অপরাধ সীমাহীন। তাই এখানে কঠোর প্রতিফল দানের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

কাফেরদের নিকট পার্থিব জীবন সুশোভিত। পার্থিব অপার্থিব সকল সৌন্দর্যের স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালা। সীমালংঘনকারীদের সৌন্দর্যবোধ, ভোগস্পৃহা এবং তাদের সৌন্দর্যের উপকরণ— সবকিছু তাঁরই দান। তাই সীমালংঘনকারীরা সুশোভন পার্থিবতায় মগ্ন। জুজায বলেছেন, শয়তান অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে পার্থিব সৌন্দর্যকে আরো অধিক মোহনীয় করে তোলে।

আমি বলি, আল্লাহ্পাক বান্দাদের ক্রিয়াকর্মেরও স্রষ্টা। শয়তানও আল্লাহ্র সৃষ্টি। পার্থিব সৌন্দর্যের সঙ্গে অধিকতর সৌন্দর্যের সংযোগ ঘটানোর ক্ষমতা শয়তানের নেই। তবে সে কুমন্ত্রণা দানের যোগ্যতা লাভ করেছে। তাই সে কুমন্ত্রণার মাধ্যমেই মানুষকে শোভন পৃথিবীপ্রেমে ডুবিয়ে রাখে। কেউ কেউ

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, এ আয়াতের (২১২) শুরুতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বলে বুঝানো হয়েছে আবু জেহেলকে।

'তারা বিশ্বাসীগণকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে থাকে'—একথার অর্থ কাফেরেরা দরিদ্র বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন দরিদ্র বিশ্বাসী ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হজরত আম্মার, হজরত খোবাইব, হজরত বেলাল, হজরত সুহাইব প্রমুখ। হজরত মুকাতিল বলেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সঙ্গী মুনাফিকদেরকে লক্ষ্য করে। তারা পার্থিব সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত থাকতো। আর দরিদ্র মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলতো— দেখো! দেখো! মোহাম্মদ এদের নিয়েই বিজয়ের স্বপ্ন দেখে। আতা বলেছেন, আয়াতটি নাজিল হয়েছে ইহুদীদের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে লক্ষ্য করে। তারা মুসলমানদেরকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতো। তাই আল্লাহ্পাক মুসলমানদের নিকট এই অঙ্গীকার করেছিলেন যে, বিনা যুদ্ধে তিনি বনী কুরাইজা ও বনী নাজিরের সকল সম্পদ মুসলমানদের অধিকারে দিয়ে দিবেন।

'অথচ যারা সাবধানে চলে'- একথা বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল দরিদ্র মুসলমানদেরকে যারা আল্লাহর ভয়ে সতর্ক জীবন যাপনকে বেছে নিয়েছে। একথার মাধ্যমে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ১. তারাই মুত্তাকী (সাবধানী)। ২. তাকওয়া বা সাবধানতাই তাদের উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ। ৩. আমল ও ইমান ভিন্নবস্তু— পূর্ববর্তী বাক্যে বিশ্বাসীগণকে (আল্লাজিনা আমানু) বলে ইমানের কথা বলা হয়েছে। পরক্ষণেই সাবধানতার কথা বলে আমলকে আলাদা করে নির্দেশ করা হয়েছে।

কিয়ামতের দিন তাঁরা তাদের উর্ধ্বে থাকবে। এ কথায় বুঝা যায় তাকওয়া অবলম্বনকারীরা উন্নত মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা আল্লাহ্পাকের নিকট সম্মানিত। পৃথিবীতে কাফেরেরা তাঁদেরকে দেখে যেমন বিদ্রুপের হাসি হাসছে তেমনি কিয়ামতের দিন তাঁদের দৃষ্টিতে কাফেরেরাও হাস্যাস্পদ হবে। কারণ, সেদিন কাফেরদেরকে বরণ করে নিতে হবে চরম লাঞ্ছনা।

কেবল কিয়ামতের দিনে নয়, পৃথিবী ও আখেরাত উভয় জগতে অবিশ্বাসীদের চেয়ে বিশ্বাসীরা আল্লাহ্পাকের অধিক প্রিয়। হজরত সহল বিন সা'আদ বলেছেন, একবার এক ব্যক্তি দরবারে নববী থেকে বিদায় গ্রহণ করলে রসুল স. উপস্থিত সাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কেমন? একজন বললেন, খুবই অভিজাত। যদি সে কোথাও বিবাহের পয়গাম প্রেরণ করে তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পয়গাম কবুল করা হবে। কারও জন্য সুপারিশ করলে সেই সুপারিশ সাথে সাথে গ্রহণ করা হবে। রসুল পাক স. নীরব রইলেন। ইত্যবসরে আর একজনের আগমন ঘটলো। রসুল স. বললেন, এই লোকটি কেমন? পূর্বে যিনি জবাব দিচ্ছিলেন তিনি বললেন, ইনি একজন দরিদ্র মুসলমান। তিনি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে অগ্রাহ্য হবে। কারো জন্য সুপারিশ করলে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে

www.eelm.weebly.com

না। ইনি কিছু বললে কেউ তার কথা শুনবেও না। রসুল স. বললেন, আগের লোকটির মতো যতো লোক পৃথিবীতে থাকুক না কেনো এই একজনই তাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট। বোখারী। হজরত উসামা বিন জায়েদ বলেছেন— নবী পাক স. এরশাদ করেন, আমি জান্নাতের দরোজায় দাঁড়িয়ে দেখবো অধিকাংশ মিসকিনই জান্নাতী। দোজখের দরোজায় দাঁড়ালে দেখবো অধিকাংশ নরকবাসী রমণীরা। আর বিত্তশালীরা অপেক্ষমান থাকবে। তাদের মধ্যে যারা নরকবাসী তাদেরকে নরক গমনের নির্দেশ দেয়া হবে।

'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন'— এখানে উভয় জগতের দানের কথা বলা হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, অপরিমিত অর্থ এতো অধিক যার হিসাব রাখা যায় না। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে অপরিমিত বলার কারণ হচ্ছে আল্লাহ্পাক যা দেন তাঁর হিসাব রাখার প্রয়োজন হয় না। কারণ, তাঁর নিকট কৈফিয়ত চাইবার কেউ নেই। তিনি কখনও কোনো কোনো লোককে প্রয়োজনাতিরিক্ত দান করেন, আবার যার প্রয়োজন তাকে দান করেন অল্প। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে অপরিমিত বলার অর্থ তাঁর দানের ভান্ডার অফুরন্ত— সেখানে ঘাটতির আশংকা মাত্র নেই।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২১৩

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ص وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ج فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

❑ মানুষ এক মতাদর্শী ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেন। মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার মীমাংসার জন্য তিনি তাহাদের সহিত সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন। এবং যাহাদিগকে তাহা দেওয়া হইয়াছিল স্পষ্ট নিদর্শন তাহাদের নিকট আসিবার পরে তাহা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিরোধিতা করিত। যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করিত আল্লাহ্ তাহাদিগকে সে বিষয়ে নিজ

www.eelm.weebly.com

অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

বায্‌যার তাঁর মসনদে, হাকেম তাঁর মুস্‌তাদরাকে এবং ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মুনজির তাঁদের তাফসীরে বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এরকম— হজরত আদম ও হজরত নুহ এর মধ্যে দশটি যুগের ব্যবধান ছিলো। ওই সকল যুগের লোকেরা ছিলো সঠিক ধর্মের অনুসারী। পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। হজরত কাতাদা থেকে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, দশটি যুগের ব্যবধানেই ছিলেন হজরত আদম ও হজরত নুহ। তাঁদের মধ্যবর্তী লোকেরা ছিলেন বিদ্বান ও পথপ্রাপ্ত। পরে তাদের একতা বিনষ্ট হয়। তখন হজরত নুহ্‌কে আল্লাহ্‌পাক নবী হিসেবে প্রেরণ করলেন। তিনিই ছিলেন প্রথম প্রেরিত রসুল। আতা ও হাসান বলেছেন, হজরত আদমের মহাপ্রস্থানের পর থেকে হজরত নুহ আ. এর আবির্ভাবকালের মধ্যবর্তী সময়ে মানুষেরা ছিলো চতুষ্পদ জন্তুর মতো-অবিশ্বাসী। আল্লাহ্‌পাক তখন হজরত নুহ আ. কে প্রেরণ করেন। প্রকাশ্যতঃ পরস্পরবিরোধী হাদিসগুলোর দ্বন্দ্ব এভাবে নিরসন করা যেতে পারে যে, প্রথম দিকে মানুষেরা তো মুসলমানই ছিলো। কিন্তু হজরত নুহের আবির্ভাবের প্রাক্কালে তারা অধোপতিত হয়েছিলো। হজরত নুহের মাতা-পিতা ছাড়া সকলেই হয়ে গিয়েছিলো কাফের। তাঁর পিতা-মাতা যে ইমানদার ছিলেন তা প্রমাণিত হয় কোরআন মজীদে উল্লেখিত হজরত নুহের দোয়ার মাধ্যমে। হজরত নুহ দোয়া করেছিলেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করো।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, তদানীন্তন আরবের সকল মানুষই এই আয়াতের লক্ষ্য। ইবনে কাসীর বলেছেন, আমর বিন আমের খাজায়ী মক্কার শাসনকর্তা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সকল আরববাসী ছিলেন দ্বীনে ইব্রাহিমের অনুসারী। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, আরব ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম ষাঁড় ছেড়ে দেয়া ও প্রতিমা পূজার প্রচলন করেছিলো আবু খাজাআ আমর বিন আমের। আমি তাকে ছিন্ন নাড়ীভূঁড়িসহ নরকাগ্নিতে জ্বলতে দেখেছি। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন- আমি আমর বিন আমের বিন লেহিয়া বিন কাসআ বিন খন্দককে নাড়ীভূঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জাহান্নামে জ্বলতে দেখেছি। সেই ছিলো সর্বপ্রথম ষাঁড় ছেড়ে দেয়ার রীতি প্রচলনকারী। ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে হজরত আবু হোরায়রা সূত্রে এরকমই বলেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, আমর বিন আমেরই দ্বীনে ইব্রাহিমের উচ্ছেদসাধনকারী।

মানুষ এক মতাদর্শী ছিলো (কানান্নাসু উম্মাতাঁউ ওয়াহিদা) — এখানে নাস বা মানুষ বলতে যদি আরববাসীকে বুঝানো হয়ে থাকে তবে আয়াতের অর্থ সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। কারণ, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. ব্যতীত আরব

www.eelm.weebly.com

উপদ্বীপে আর কোনো নবীর আবির্ভাব ঘটেনি। দলিলস্বরূপ বলা যেতে পারে, আল্লাহ্পাক বলেছেন— (রসুল স. এর আগমন) 'এমন একটি সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শনের জন্য যাদের পিতৃপুরুষকে কখনো ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি, বাস্তবে তারা উদাসীন'। হজরত উবাই বিন কাআব থেকে আবুল আলিয়া বর্ণনা করেন (আত্মার জগতে হজরত আদমের বুকের পাশ থেকে তাঁর সন্তানদেরকে বের করে তাঁর সামনে রাখা হলো। তখন সকলেই ছিলো এক মতাদর্শী। সকলেই তখন আল্লাহ্তায়ালার প্রতিপালকত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিলো। পরে আর কখনও তারা একমতে থাকেনি। বরং সকল যুগেই তাদের মধ্যে বিরাজ করেছে মতদ্বৈততা।

আমি বলি, 'মানুষ এক মতাদর্শী ছিলো'— কথাটির ব্যাখ্যা হবে এ রকম- সকল মানুষের মধ্যেই সত্য গ্রহণের যোগ্যতা বিদ্যমান। ফিতরত বা স্বভাব ধর্মের উপরেই সকলকে সৃজন করা হয়েছে। এরপর মানব ও দানবরূপী শয়তানেরা তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। এভাবেই একে একে সত্যস্খলিত হয়ে গিয়েছে মানুষেরা। হজরত আবু হোরায়রা বলেন- রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি শিশু ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। পরে তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে ইহুদী খৃষ্টান অগ্নিপূজক ইত্যাদিতে পরিণত করে। চতুষ্পদ জন্তু যেমন তাদের নিজেদের মতো শাবক প্রসব করে— সেগুলোর কোনোটির কান (বা অন্য কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) নেই- এমনটি কি দেখা যায়? বোখারী, মুসলিম।

'অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেন'— এই বাক্যটিকে যদি 'কানান্নাসু উম্মাতাঁউ ওয়াহিদা' এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় এবং যদি ধরা হয় সকল মানুষ অবিশ্বাসে একীভূত ছিলো— তবে তাদের একতাভঙ্গের কারণ হিসেবে ধরতে হবে নবী প্রেরণকে। নবী প্রেরণের মাধ্যমেই সমীভূত অবিশ্বাস থেকে ঈমানদারদেরকে আলাদা করে নেয়া হয়। অবিশ্বাস ও অশান্তি দূর করার মানসেই তাঁরা প্রেরিত হয়ে থাকেন। হজরত আবু জর বলেছেন, আমি 'নাবীঈন' শব্দটি সম্পর্কে রসুল স.কে এই মর্মে প্রশ্ন করেছিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! নবীগণের মোট সংখ্যা কতো? তিনি স. বললেন, দুই লাখ চব্বিশ হাজার। তাঁদের মধ্যে রসুল ছিলেন তিনশত পনেরোজন। আহমদ। হজরত আবু জরের অপর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, রসুলগণের সংখ্যা তিনশত দশের কিছু অধিক। বাগবী বলেছেন, তাঁদের মধ্যে রসুলগণের সংখ্যা ছিলো তিনশত তেরো। আর আটাশজনের নাম কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে।

আমি বলি, কোরআন শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে ছাব্বিশ জনের নাম। তন্মধ্যে আঠারো জনের উল্লেখ এরকম- ওয়া তিলকা হুজ্জাতুনা আতাইনাহা ইবরহীমা আলা ক্বওমিহি, ওয়া ওয়াহাবনা লাহু ইসহাকা ওয়া ইয়াকুবা কুল্লান হাদাই না ওয়া নুহান হাদাইনা মিন ক্বলু ওয়া মিন জুররিইয়াতিহি দাউদা ওয়া সুলাইমানা ওয়া আইয়্যুবা ওয়া ইউসুফা ওয়া মূসা ওয়া হারুনা ওয়া কাজালিকা নাজ্জিল মুহসিনিন। ওয়া

www.eelm.weebly.com

জাকারিয়া ওয়া ইয়াহ্ইয়া ওয়া ঈসা ওয়া ইলইয়াসা কুল্লুম মিনাস সলিহিন। ওয়া ইসমাইলা ওয়া ইয়াসাআ ওয়া ইউনুসা ওয়া লূতান ওয়া কুল্লান ফাদ্দালনা আলাল আলামীন। অবশিষ্ট আটজন হচ্ছেন, আদম, ইদ্রিস, হুদ, সলেহ, শুয়াইব, জুলকিফল, উযায়ের ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাইয়্যেদুল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম। কোনো কোনো তাফসীরবিদগণের অভিমত হচ্ছে, সুরা মু'মিনুনে উল্লেখিত ইউসুফ হজরত ইয়াকুবের পুত্র ইউসুফ নন। তিনি হচ্ছেন ইউসুফ বিন ইব্রাহিম বিন ইউসুফ বিন ইয়াকুব। এই হিসেবে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় সাতাশে। অনেকে আবার হজরত ঈসার মাতা মরিয়মকে নবী বলে মনে করেন। এই হিসেব ধরলে আটাশজন হয়। কিন্তু কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে- আর আপনার পূর্বে পুরুষ ব্যতীত কাউকে প্রেরণ করিনি। এই আয়াতের মাধ্যমে হজরত মরিয়মের নবুয়ত স্বীকৃত হয় না। সম্ভবতঃ আটাশতম নবী লোকমান হাকীম। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

বলা হয়েছে, নবী প্রেরণ করা হয়েছে সুসংবাদ দান ও ভীতিপ্রদর্শনের জন্য। নবীগণ জানিয়ে দেন— অনুগতদের জন্য রয়েছে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুসমাচার এবং অবাধ্যদের জন্য রয়েছে ভীতিপ্রদ শাস্তি। মানুষের মধ্যে সৃষ্ট মতভেদের মীমাংসার জন্য আল্লাহ্পাক নবীদেরকে সত্যের সাক্ষ্যবাহী কিতাবসহ প্রেরণ করেছেন। এখানে কিতাব অর্থ কিতাব জাতীয় সকল আকাশী পুস্তক। সত্যসহ অর্থ সত্যের সাক্ষ্যসহ। নবীগণ তাঁদের প্রতি অবতারিত কিতাবের বিধান অনুযায়ী মীমাংসা প্রদান করেন। 'যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিলো'— একথার অর্থ, যে সকল বিষয়ে দেখা দিয়েছিলো সন্দেহ।

'যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিলো স্পষ্ট নিদর্শন তাদের নিকট আসবার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিরোধিতা করতো'— একথার লক্ষ্য ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়। স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরেও তারা বিরুদ্ধবাদী হয়েছে। এই বিরোধিতার কারণ ছিলো কেবলই পারস্পরিক অসূয়া। নিছক অসূয়াবশতঃই তারা অবজ্ঞা করেছে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকে। গোপন করেছে মহানবী মোহাম্মদ স. এর আবির্ভাব সম্পর্কিত বিবরণসমূহ। তারা এই মর্মে মতভেদ সৃষ্টি করেছে যে, আমাদের কাছে কিতাবের কিয়দংশ বিশ্বাস্য ও অবশিষ্টাংশ অস্বীকার্য।

'যারা বিশ্বাস করে তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতো আল্লাহ্পাক তাদেরকে সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্যপথে পরিচালিত করেন'— এ সম্পর্কে হজরত ইবনে জায়েদ বলেছেন, তাদের মতবিরোধ ছিলো কেবলা সম্পর্কে । কেউ নামাজ পড়তো পুবমুখী হয়ে। কেউ নামাজ পড়তো পশ্চিম দিকে মুখ করে। আবার কেউ তাদের নামাজে বায়তুল মাক্দিস মুখী হতো। আর আল্লাহ্পাক আমাদেরকে কাবামুখী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। রোজা সম্পর্কেও ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে রয়েছে প্রচন্ড মতবিরোধ। আল্লাহ্পাক আমাদের উপর রমজান

www.eelm.weebly.com

শরীফের রোজা ফরজ করে দিয়েছেন। সাপ্তাহিক উপাসনার বিশেষ দিন নিয়েও তাদের মধ্যে রয়েছে চরম অমিল। ইহুদীরা শনিবার ও খৃষ্টানেরা রবিবারকে সাপ্তাহিক বিশেষ ইবাদতের দিন বলে ধার্য করে নিয়েছিলো। আল্লাহ্পাক আমাদের জন্য শুক্রবার নির্ধারণ করেছেন। হজরত ইব্রাহিম সম্পর্কেও ছিলো তাদের মধ্যে ভয়ানক মতানৈক্য। ইহুদীরা বলতো, তিনি ছিলেন ইহুদী এবং খৃষ্টানেরা বলতো, তিনি ছিলেন খৃষ্টান। আল্লাহ্পাক আমাদেরকে তাঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্য দান করেছেন। হজরত ঈসা সম্পর্কেও বিপরীতমুখী ছিলো তারা। ইহুদীরা তাঁকে বলতো, চরিত্রহীনার পুত্র (আল্লাহ্পাক রক্ষা করুন)। আর খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করতো, তিনি ছিলেন আল্লাহর পুত্র (আল্লাহ পাক নিরাপদ রাখুন)। আল্লাহ্পাক এ সম্পর্কে আমাদেরকে সঠিক বিশ্বাসের সংবাদ দিয়েছেন। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করার কথা। সবশেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথের প্রতি পথ প্রদর্শন করেন। এই সরল পথই সফলতার পথ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২১৪

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ○

❒ তোমরা কি মনে কর যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসে নাই! অর্থ-সংকট ও দুঃখ দারিদ্র তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং তাহারা ভীত ও কম্পিত হইয়াছিল। এমন কি রসুল এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলিয়া উঠিয়াছিল, 'আল্লাহের সাহায্য কখন আসিবে?' হাঁ, হাঁ, আল্লাহের সাহায্য নিকটেই।

আয়াতের শুরুতে ব্যবহৃত 'আম' অব্যয়টি প্রসঙ্গান্তর জ্ঞাপক। আগের আয়াতগুলোতে ইহুদী খৃষ্টানদের মতবিরোধ, বিশ্বাসীদের বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্তি ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এই আয়াতে শুরু হয়েছে নতুন প্রসঙ্গ। এই আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে— বিশ্বাসীদেরকে বিরূপ পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে; শত বিপদ মুসিবতের মধ্যেও এগিয়ে যেতে হবে মূল উদ্দেশ্যের দিকে।

www.eelm.weebly.com

আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আহজাব (খন্দক) যুদ্ধের দিন। ওই যুদ্ধে রসুল স. এবং তাঁর প্রিয় সহচরবৃন্দ মুশরিক বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন। মুসলমান বাহিনীর উপর নেমে এসেছিলো চরম দুঃখ-কষ্ট ও শংকা। উহুদ যুদ্ধের সময়েও এরকম বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন মুসলমানগণ। আল্লাহ্‌পাক সে সম্পর্কে এরশাদ করেছিলেন, 'তোমাদের জীবন ওষ্ঠাগত হয়েছিলো। আল্লাহপাক সম্পর্কে তোমরা বিভিন্নরূপ অলীক ধারণাকে আশ্রয় করেছিলে। সেখানেই পরীক্ষা করা হলো বিশ্বাসীদেরকে। আর আহত করা হলো প্রচন্ড আঘাতে।'

আতা বলেছেন, হিজরতের পর রসুল স. ও তাঁর সঙ্গী মুহাজিরগণ বিভিন্ন রকম বিপদাপদের সম্মুখীন হতে লাগলেন। বসত-বাটী, সম্পদ— সবকিছু তাঁরা পরিত্যাগ করে মদীনায় এসেছিলেন। কিন্তু মদীনাতেও তাঁরা সুস্থির হতে পারছিলেন না। আহার, আবাস— এ সকল চিন্তাতো ছিলোই, তার উপরে ছিলো ইহুদীদের জ্বালাতন। তাদের ষড়যন্ত্র ও শত্রুতা উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছিলো। এ রকম সঙ্গীন অবস্থায় অবতীর্ণ হলো এই আয়াতটি।

এখানে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, তোমরা কি মনে কর ইমানের পরীক্ষায় কৃতকার্য না হয়েই বেহেশতে প্রবেশ করবে? তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে যারা লাভ করেছিলো বেহেশতের অধিকার তাঁদের কথা স্মরণ করো। অর্থসংকটে পতিত হয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদেরকে স্পর্শ করেছিলো দুঃখ দারিদ্র। বিপদে ভীত ও কম্পিত হয়ে তাঁরা বলে উঠতেন, আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে? জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটেই।

রসুল স. বলেছেন, জান্নাত আচ্ছাদিত রয়েছে বিপদাপদ দ্বারা। আর জাহান্নামের আচ্ছাদন হচ্ছে লোভনীয় বস্তুসমূহ। হজরত আনাস ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম এবং আহমদ বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে।

ইবনে হাব্বান থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, আমর বিন জমুহ একবার প্রশ্ন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমরা কোন সম্পদ কোথায় ও কিভাবে ব্যয় করবো। ইবনে জুরাইজ থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, মুসলমানেরা যখন এরকম প্রশ্ন করলো তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২১৫

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۖ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى

وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝

www.eelm.weebly.com

❑ লোকে কি ব্যয় করিবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'যে ধন সম্পদ তোমরা ব্যয় করিবে তাহা পিতা মাতা, আত্মীয়স্বজন, অভাবগ্রস্ত, পিতৃহীন এবং পর্যটকদের জন্য। উত্তম কাজের যাহা কিছু তোমরা কর না কেন আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অবহিত।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এই বিধানটি অবতীর্ণ হয়েছিলো জাকাত ফরজ হওয়ার আগে। জাকাতের বিধান সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এই বিধানটি রহিত হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে- এই আয়াতটি জাকাতের প্রতিদ্বন্দ্বি নয়। তাই এখানে রহিত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। বরং বিধানটি এখনও সচল। এখানে মাতা-পিতা, নিকটজন, এতিম-মিসকিন ও মুসাফিরের জন্য অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। শেষে বলা হয়েছে— তোমাদের সকল উত্তম কাজ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা সম্যক অবগত। ওই সকল সৎকাজের নিয়ত অনুযায়ী তোমরা প্রতিফলও প্রাপ্ত হবে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২১৬

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

❑ তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল যদিও তোমাদের নিকট ইহা অরুচিকর; কিন্তু তোমরা যাহা পছন্দ কর না সম্ভবতঃ তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যাহা পছন্দ কর সম্ভবতঃ তাহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন; তোমরা জান না।

আতা বলেছেন, জেহাদ নফল। এই আয়াতে যে ফরজের কথা বলা হয়েছে তা কেবল রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দের প্রতি প্রযোজ্য। ইমাম সওরীও এরকম বলেছেন। তাঁর সমর্থনে রয়েছে ওই হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, জীবন ও সম্পদসহ যারা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করে, তারা গৃহবাসীদের চেয়েও উত্তম। আল্লাহ্‌পাক তাঁদেরকে অধিক মর্যাদাশালী করেছেন এবং যারা জেহাদ করে এবং যারা জেহাদ করে না উভয়ের সঙ্গে আল্লাহ্‌পাক কল্যাণের অঙ্গীকার করেছেন। আতা ও সওরী বলেছেন, জেহাদ যদি ফরজ হতো তবে আল্লাহ্‌পাক যারা জেহাদ করে না তাদের সঙ্গে কল্যাণের অঙ্গীকার করতেন না। হজরত সাইয়েদ বিন মুসাইয়েব বলেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মুসলমানের উপর জেহাদ ফরজ। আর এই আয়াতটি তার দলিল। এছাড়া তিনি দলিল হিসাবে আরও হাদিস পেশ

www.eelm.weebly.com

করেছেন। যেমন হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো অথচ জেহাদ করলো না— এমন কি জেহাদের ইচ্ছাকেও অন্তরে স্থান দিলো না, সে মৃত্যুবরণ করলো এক ধরনের নেফাকের (অপবিত্রতার) উপর। মুসলিম। জমহুরের মতে জেহাদ হচ্ছে ফরজে কেফায়া। কিছুসংখ্যক মানুষ জেহাদ করলে অন্য সকলে জেহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায়। যেমন জানাজার নামাজ। এ অভিমতটির উপরে ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে। সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, শহরবাসীদের উপর জেহাদ ফরজ। তারা জেহাদ করবে নিকটবর্তী অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে। যদি তাদের দ্বারা জেহাদ সম্ভব না হয় অথবা তারা পরাজিত হয়, তবে তাদের পার্শ্বস্থ মুসলমানদের উপর জেহাদ ফরজ হয়ে যাবে। তারাও যদি পর্যুদস্ত হয় তবে তাদের পার্শ্ববর্তীরা জেহাদে অংশগ্রহণ করবে। এভাবেই ধারাবাহিক অংশগ্রহণ চলতে থাকবে। এ ব্যাপারেও সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, যখন শত্রুরা মুসলমানদের উপর চড়াও হবে এবং সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে জেহাদের আহ্বান জানানো হবে, তখন শহরবাসী গ্রামবাসী সকলের উপর একযোগে জেহাদ ফরজ হয়ে যাবে। এটাও ঐকমত্য যে, যাদের প্রতি জেহাদ সুনির্দিষ্ট নয়, তারা পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতিরেকে জেহাদে যেতে পারবে না। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিও মহাজনের অনুমতি ব্যতিরেকে জেহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস বলেছেন, এক ব্যক্তি রসুল স. এর নিকট জেহাদের অনুমতি চাইলেন। রসুল স. বললেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, গৃহগমন করো এবং মাতাপিতার খেদমতে রত হও। বোখারী ও মুসলিম। আবু দাউদ এবং নাসাঈও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। 'যুদ্ধের বিধান তোমাদের জন্য অরুচিকর'— এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে, জেহাদ তোমাদের নিকট স্বভাবজাত অনীহার কারণ। এতে রয়েছে জীবনহানির আশংকা ও অবধারিত অর্থ ব্যয়— যা সাধারণতঃ স্বভাববিরুদ্ধ। একথার অর্থ এরকম নয় যে, আল্লাহ্পাকের নির্দেশ প্রতিপালনে সাহাবাগণ অসম্মত ছিলেন।

'তোমরা যা পছন্দ করো না সম্ভবতঃ তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর'— জেহাদে যেমন জীবনহানী ও সম্পদঘাটতির সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিজয় ও গনিমত প্রাপ্তির আনন্দ। তদুপরি রয়েছে শাহাদত লাভের সৌভাগ্য ও পুণ্যার্জনের সুযোগ। এগুলো নিশ্চয়ই কল্যাণকর।

'তোমরা যা পছন্দ করো সম্ভবতঃ তাই তোমাদের জন্য অকল্যাণকর'—এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, জেহাদ পরিত্যাগের মধ্যে রয়েছে পাপ, লাঞ্ছনা, গনিমত ও পুণ্যের সুযোগ বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি। এগুলো নিশ্চয়ই কল্যাণবিরোধী।

সম্ভবতঃ 'আ'সা' শব্দটি সন্দেহের স্থলে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে শব্দটি এ জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে, প্রবৃত্তি পবিত্র হওয়ার পর সকল আশা-আকাংখা

www.eelm.weebly.com

শরিয়তের অনুকূল হয়ে যায়। তখন তার নিকট ওই সকল বস্তু নিকৃষ্ট মনে হয় যা আল্লাহ্পাকের নিকট নিকৃষ্ট। আর আল্লাহ্পাকের নিকট যা অভিপ্রেত, তাই হয়ে যায় তার প্রসন্ন অভিপ্রায়।

'আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না'— একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে সত্বর আল্লাহপাকের নির্দেশানুগত হও। তিনিই জানেন কিসে দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! সর্বোৎকৃষ্ট আমল কোনটি? তিনি স. বললেন, সময়মতো নামাজ পাঠ। আমি বললাম, তারপর? তিনি বললেন, মাতা পিতার সেবা। আমি পুনরায় বললাম, তারপর? তিনি স. এরশাদ করলেন, আল্লাহর পথে জেহাদ। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি আরো প্রশ্ন করলে তিনি স. আরো উত্তর দিতেন। বোখারী। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— এক ব্যক্তি রসুল স. এর নিকট প্রশ্ন করলেন, কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি স. এরশাদ করলেন, রসুলের উপর বিশ্বাস স্থাপন। ওই ব্যক্তি বললেন, তারপর? তিনি স. বললেন, আল্লাহর পথে জেহাদ। ওই ব্যক্তি পুনরায় জানতে চাইলেন, তারপর কী? তিনি স. এরশাদ করলেন, মকবুল হজ। বোখারী ও মুসলিম। এই হাদিসটি পূর্বোক্ত হাদিসের বিরুদ্ধ বলে মনে হয়। প্রথম হাদিসে বলা হয়েছে, জেহাদ অপেক্ষা নামাজ উত্তম। পরের হাদিসে সেরকম বলা হয়নি। হাদিস দু'টির সামঞ্জস্য বিধান এভাবে সম্ভব যে, প্রশ্ন উত্থাপনকারীর যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য করে তিনি স. জবাব দিয়েছিলেন। অথবা বলা যেতে পারে, হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে বর্ণিত রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মধ্যে নামাজ ও জাকাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইমরান বিন হাশিম থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, জেহাদের মাঠে মুজাহিদদের কাতারে একদিন দাঁড়িয়ে থাকা ষাট বৎসর দাঁড়িয়ে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। হাকেম এই হাদিসটি বর্ণনা করে বলেছেন, বোখারীর শর্তানুযায়ী বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র পথে একবার দন্ডায়মান হওয়া স্বগৃহে সত্তর বছর নামাজ পড়ার চেয়ে শ্রেয়। তিরমিজি। হজরত আবু হোরায়রা আরো বর্ণনা করেছেন— এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! জেহাদের সমতুল্য কোনো আমল আছে কি? তিনি স. বললেন, আছে। তবে সে আমল প্রতিপালনের সাধ্য তোমাদের নেই। প্রশ্নকারী দুই কিংবা তিনবার একই প্রশ্ন করলেন এবং তিনি স. একই জবাব দিলেন। তারপর বললেন, আল্লাহর পথে যে জেহাদ করে সে ওই ব্যক্তির মতো, যে সার্বক্ষণিক দন্ডায়মান অবস্থায় কোরআন মজীদ পাঠ করে এবং নামাজ ও রোজা রত থাকে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু উসামা বলেছেন, আমি রসুল স. এর সেনাদলে ছিলাম। যুদ্ধযাত্রাকালে আমরা একটি নিচু ভূমি অতিক্রম করছিলাম। দেখলাম, স্থানটি জলমগ্ন ও শ্যামল। আমার এক সঙ্গী স্থানটি দেখে বিমোহিত হলেন। সংসার ত্যাগ

www.eelm.weebly.com

করে সেখানেই বসবাস করতে মনস্থ করলেন তিনি এবং এর জন্য রসুল স. এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রসুল স. বললেন, আমি তোমাদেরকে ইহুদী-খৃষ্টান বানাতে আসিনি। আমি প্রেরিত হয়েছি একটি সমুজ্জ্বল আদর্শ নিয়ে। আমার জীবনাধিকারী সেই পরম সত্তার শপথ! জেহাদের উদ্দেশ্যে একটি সকাল বা সন্ধ্যা পথচলা পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ সকল বস্তু হতে উত্তম। জেহাদের কাতারে একবার দাঁড়ানো ষাট বছরের নামাজ থেকে শ্রেয়। আহমদ।

আমি বলি, হাদিসে যে নামাজের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা নফল নামাজ। আর নফল নামাজ অপেক্ষা জেহাদ উত্তম। এর কারণ হচ্ছে, বিধানগতভাবে জেহাদ ফরজে কেফায়া। একজন জেহাদ করলেও সকলের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। আর জেহাদ সব সময় আদায় করাও যায় না। কিন্তু জেহাদ শাহাদাতের উপলক্ষ্য, যা মর্যাদার দিক দিয়ে নবুয়তের নিকটবর্তী। নামাজ রোজার ব্যাপারটি অন্য রকম। নির্দিষ্ট সময় ছাড়া নামাজ রোজা আদায় করা যায় না। নির্দিষ্ট সময় ছাড়া যে নামাজ রোজা পালন করা সম্ভব, তা নফল পর্যায়ভুক্ত। আবার নফল ফরজের তুল্যও নয়। যদি কেউ বলে রসুল স. এরশাদ করেছেন, জিকির ব্যতীত আল্লাহ্র শাস্তি থেকে মুক্তি দানকারী অন্য কিছুই নেই। সাহাবাগণ বললেন, তবে জেহাদ? তিনি বললেন, জেহাদও নয়। যদিও কাফেরদের উপর তলোয়ার চালাতে চালাতে তলোয়ার খন্ডবিখন্ড হয়ে যায়। তিনি স. পরপর তিনবার এরকম বলেছিলেন। আহমদ, তিবরানী, ইবনে আবী শাইবা হজরত মুআজ সূত্রে এই বর্ণনাটি এনেছেন। প্রকাশ্যতঃ এই হাদিসটি প্রথমে বর্ণিত হাদিসগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বি। দ্বন্দ্ব নিরসনার্থে এখানে একথা বলা যেতে পারে যে, এখানে জিকির অর্থ হুজুরে দায়েমী (সার্বক্ষণিক মগ্নতা)। এই মগ্নতা নিরবচ্ছিন্ন। এরকম মগ্ন ব্যক্তি নামাজ রোজাও যথাযথরূপে পালন করেন। এ ধরনের মানুষই সংসারাসক্তি মুক্ত। এই অবস্থাকে বলা হয় জেহাদে আকবর। বর্ণিত হয়েছে– একবার এক জেহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রসুল স. এরশাদ করেছিলেন, এবার আমরা জেহাদে আসগর (গৌণ জেহাদ) থেকে জেহাদে আকবরের (মূখ্য জেহাদের) দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। প্রশ্ন উঠতে পারে, জেহাদে আসগরে লিপ্ত থাকাবস্থায় রসুল স. কি জেহাদে আকবরে মগ্ন ছিলেন না? জবাবে আমি বলি, হ্যাঁ। তিনি তখনও নিমগ্নচিত্ত ছিলেন। কিন্তু বাইরের কোলাহল ও ক্রিয়াকর্মের প্রচন্ডতায় তাঁর সেই মগ্নতা ছিলো নিস্প্রভ। বাইরের কর্মমুখরতা যখন সমাপ্ত হলো তখন পুনরায় প্রবল হয়ে উঠলো নিমগ্নতার বৈভব।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক থেকে বর্ণিত হয়েছে— যার পা আল্লাহর পথে ধূলিধূসরিত হবে, আল্লাহ্পাক তার জন্য দোজখের আগুন হারাম করে দিবেন। হজরত ওসমান বলেছেন— আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি যুদ্ধক্ষেত্রে একরাত পাহারায় নিযুক্ত থাকা হাজার রাতের ইবাদত ও হাজার দিনের রোজা থেকে উত্তম। হজরত আবু বকর সিদ্দিক আরো বলেছেন— রসুল স. এরশাদ করেন, যে

www.eelm.weebly.com

সম্প্রদায় জেহাদ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্‌পাক তাদের উপর সাধারণ বিপদাপদ অবতীর্ণ করবেন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. বলেছেন, জান্নাতে রয়েছে একশত দরোজা। সেগুলো আল্লাহ্‌পাক শহীদদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। এক দরোজা থেকে আরেক দরোজার ব্যবধান আকাশ ও পৃথিবীর সমান। জান্নাত প্রার্থনা করলে জান্নাতুল ফেরদৌস প্রার্থনা করা উচিত। কারণ, জান্নাতুল ফেরদৌস সকল জান্নাতের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এ জান্নাতই সর্বোত্তম ও সর্বোন্নত। এর উপরেই রয়েছে আরশে আজীম। অন্যান্য জান্নাতের নদীগুলো জান্নাতুল ফেরদৌস থেকে উৎসারিত। বোখারী। হজরত আবু হোরায়রা আরও বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, বিত্ত বৈভব বিধ্বংসী বস্তু, সম্পদ থাকলে আনন্দ, না থাকলে নিরানন্দ। প্রকৃত আনন্দ রয়েছে ওই মানুষের জন্য, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষমান। যার কেশগুচ্ছ অবিন্যস্ত ও পদযুগল ধূলিধূসরিত সে যদি প্রহরী হয়, তবে পাহারার স্থানেই তার অবস্থান। আর যদি সে অগ্রগামী বাহিনীর সদস্য হয়, তবে সেখানেই তাকে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হয়। তার জন্য অন্যত্র গমনের অনুমতি নেই। যুদ্ধকালে তার স্বতন্ত্র কোনো বক্তব্য থাকে না। বোখারী।

সকল সৎকর্মের তুলনায় জেহাদের শ্রেষ্ঠত্ব এ কারণেই যে, জেহাদই ইসলামের প্রচার ও মানুষের হেদায়েত লাভের উপকরণ। তাই কোনো মুজাহিদের চেষ্টায় যদি কারো হেদায়েত লাভ হয়, তবে হেদায়েত ও জেহাদ উভয়ের জন্য সে পুরস্কৃত হবে। তবে জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান শিক্ষা দেয়া জেহাদের চেয়ে অধিক গুরুত্ব সম্পন্ন। কারণ, এর মধ্যে রয়েছে ইসলামের মূলতত্ত্ব।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২১৭, ২১৮

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۖ وَصَدٌّ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ
اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ
عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ

www.eelm.weebly.com

هُمْ فِيهَا خٰلِدُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

❐ পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বল, 'উহাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহের পথে বাধাদান করা, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং উহার বাসিন্দাকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহের নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিত্‌না হত্যা অপেক্ষা ভীষণতর অন্যায়।' তাহারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যে পর্যন্ত তোমাদিগকে তোমাদের দ্বীন হইতে ফিরাইয়া না দেয়, যদি তাহারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্বীয় দ্বীন হইতে ফিরিয়া যায় এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ইহকাল ও পরকালে তাহাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। ইহারাই অগ্নিবাসী, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে।

❐ যাহারা বিশ্বাস করে এবং যাহারা আল্লাহের পথে স্বদেশ ত্যাগ করে এবং জিহাদ করে তাহারাই আল্লাহের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, তিবরানী, ইবনে সা'আদ এবং বায়হাকী হজরত জুন্দুব বিন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন- দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। যুদ্ধের দু'মাস আগে রসুল স. তাঁর ফুফাত ভাই হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহাশের নেতৃত্বে আটজনের একটি বাহিনীকে অভিযানে পাঠালেন। তাঁরা ছিলেন সকলেই মুহাজির। ওই দলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম হচ্ছে— হজরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস, জুহুরী, ওক্কাসা বিন মাহসিন আসাদী, উৎবা বিন গজওয়ান সালামী, আবু হুজায়ফা বিন উৎবা বিন রবীয়া, সুহাইল বিন বাইজাহ, আমের বিন রবীয়া, ওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ এবং খালেদ বিন বুকাইর। কোনো কোনো বর্ণনায় সুহাইল বিন বাইজার নাম রয়েছে কিন্তু সহল, খালেদ এবং ওয়াক্কাসের নাম নেই। কেউ কেউ আবার মিকদাদ বিন আমরের নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনে সা'আদ বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন বারো জন। প্রতিটি উটে তাঁরা দু'জন করে আরোহন করতেন। রসুল স. তাঁদের অধিনায়ক হজরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশকে একটি লিখিত নির্দেশনামা দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র নামে যাত্রা করো। দু'দিন পথ চলার পর দ্বিতীয় মঞ্জিলে উপস্থিত হয়ে এ নির্দেশনামাটি খুলবে এবং খুলে সকলকে পড়ে শুনাবে। নির্দেশনামা অনুযায়ী কাজ করবে। যারা স্বেচ্ছায় তোমার সহগামী হতে চায় কেবল তাদেরকেই সঙ্গে নিও।

www.eelm.weebly.com

কাউকে সঙ্গী হতে পীড়াপীড়ি কোরো না। অধিনায়ক বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এখন আমরা কোনদিকে যাত্রা করবো? তিনি স, বললেন, নজদের দিকে।

বিশেষ বাহিনীটি পথ চলতে শুরু করলো। দু'দিন পর একস্থানে থেমে শিবির স্থাপন করলেন তাঁরা। সেখানে বাহিনীর অধিনায়ক নির্দেশনামাটি পাঠ করতে শুরু করলেন—'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। সকলের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্পাকের বরকত ও রহমতের উপর নির্ভর করে অগ্রসর হও। বাত্নে নাখলাতে পৌছে কোরাইশ বাহিনীর আগমনের অপেক্ষায় থাকো। তারা এলে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো এবং যা কিছু হস্তগত হয় তাই নিয়ে আমার কাছে ফিরে এসো।' নির্দেশনামাটি শোনার সাথে সাথে বাহিনীর সকল সদস্য বললেন, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। অধিনায়ক বললেন, যদি শহীদ হওয়ার বাসনা থাকে তবে আমার সহগামী হও। নতুবা অন্যত্র গমন করো। রসুল স. আমাকে এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতে নিষেধ করেছেন। অধিনায়ক আবদুল্লাহ্ নির্দেশিত গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হলেন। সকলে স্বেচ্ছায় তাঁর অনুগমন করলেন। বাহিনী পৌছলো মারজানে। স্থানটি ছিলো হেজাজ এলাকায়। একটি উচ্চ ভূমির নাম নাজরান। সেখানে হজরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাসের উটটি হারিয়ে গেলো। উটটি খুঁজতে যেয়ে তিনি পিছনে পড়ে গেলেন। অধিনায়ক আবদুল্লাহ্র সঙ্গে অন্যান্যরা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী বাত্নে নাখলায় উপস্থিত হলেন। তাঁরা দেখলেন, কোরাইশদের একটি বাণিজ্যবাহিনী তায়েফ থেকে মক্কার পথে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের সঙ্গে ছিলো চামড়া, কিসমিস ইত্যাদি। বাণিজ্যবাহিনীটিতে ছিলো আমর বিন হাজরামী, হাকাম বিন ইমাম, ওসমান বিন আবদুল্লাহ বিন মুগীরা মাখজুমী ও তার ভাই নওফেল বিন আবদুল্লাহ মাখজুমী। মুসলমান বাহিনীকে সামনে দেখতে পেয়ে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হলো। অধিনায়ক হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহাশ তাঁর সাথীদেরকে বললেন, ওরা ভয় পেয়েছে। তোমরা কেউ একজন মস্তক মুন্ডন করে তাদের সাথে সাক্ষাত করো। তাহলে তাদের ভয় কেটে যাবে। হজরত ওয়াক্কাস মাথা মুন্ডন করে তাদের সাথে সাক্ষাত করলেন। তারা বললো, আরে তুমিতো দেখছি আমাদের গোত্রের লোক। তবে তো আমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। তারা কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো। মুসলিম বাহিনী মনে করেছিলো দিনটি ছিলো জমাদিউল আখের মাসের শেষ তারিখ। কিন্তু সে দিনটি ছিলো পহেলা রজব। তাঁরা স্থির করলেন, আজকের মধ্যেই রসুল স. এর নির্দেশ প্রতিপালন করতে হবে। নতুবা কাল থেকে শুরু হবে সম্মানিত রজব মাস। আর সম্মানিত মাসে রক্তপাত হারাম। একথা ভেবে তাঁরা কোরাইশদের বাণিজ্যবাহিনীকে আক্রমণ করলেন। হজরত ওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ্র তীরের আঘাতে নিহত হলো আমর বিন হাজরামী। বন্দী হলো ওসমান বিন আবদুল্লাহ বিন মুগীরা এবং হাকাম বিন কীসান। আর নওফেল পালিয়ে গেলো। পণ্য সম্ভার ও বন্দীদেরকে নিয়ে নির্বিঘ্নে মুজাহিদবাহিনী ফিরে এলো রসুল স. এর নিকট।

www.eelm.weebly.com

কতিপয় ভাষ্যকার বলেছেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (গণিমতের) এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে রেখে অবশিষ্ট অংশ যোদ্ধাগণের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়েছিলো। এই বন্টন পদ্ধতি এ ঘটনা থেকেই প্রচলিত হয়। প্রথম মুশরিক বন্দী হয় এ ঘটনায় এবং কোনো মুশরিক প্রথম নিহত হয় এ ঘটনাতেই। নিহত হয়েছিলো আমর বিন হাজরামী এবং বন্দী হয়েছিলো ওসমান বিন হাকাম।

হজরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ তাঁর বাহিনী, বন্দীদ্বয় ও গণিমত নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হলে রসুল স. বললেন, আমিতো তোমাদেরকে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করতে বলিনি। ওদিকে মক্কার কোরাইশরা সেখানকার মুসলমানদেরকে বলতে লাগলো, দেখো! মুসলমানেরা কী রকম। তোমরা সম্মানিত মাসের মর্যাদা রক্ষা করো না। একথা শুনে মুসলমানেরা লজ্জিত হলো এবং আক্ষেপ প্রকাশ করতে লাগলো। অভিযানে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদরাও ভীষণ অনুতপ্ত হলেন। তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমরাতো হাজরামীকে হত্যা করার পর সন্ধ্যাবেলা আকাশে নতুন চাঁদ দেখেছিলাম। আমরা মনে করেছিলাম, সেদিনটি ছিলো জমাদিউল আখের মাসের শেষ তারিখ। রজব মাসের প্রথম তারিখ বুঝতে পারলে আমরা এ ঘটনা ঘটাতাম না। কিন্তু তাদের এ কৈফিয়ৎ রসুল স. ও অন্যান্য মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলো না। তখন অবতীর্ণ হলো এ আয়াতটি। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. গণিমতের এক পঞ্চমাংশ নিজের কাছে রেখে বাকী চতুর্থাংশ যোদ্ধাগণের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ এরকমও বলেছেন যে, বদর যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পূর্ব পর্যন্ত বাত্নে নাখলার গণিমত বন্টনহীন অবস্থায় ছিলো। বদর যুদ্ধের গণিমতের সঙ্গে মিলিয়ে সেগুলোকে বন্টন করা হয়।

মক্কার মুশরিকেরা ফিদিয়ার বিনিময়ে বন্দীমুক্তির প্রস্তাব পাঠালো। রসুল স. তাদেরকে বলে পাঠালেন, সা'আদ এবং উতবা মদীনায় প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত বন্দীদেরকে মুক্তি দেয়া যাবে না। কারণ, আমরা আশঙ্কা করি তোমাদের লোককে ছেড়ে দিলে তোমরা সা'আদ ও উতবাকে হত্যা করে প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করবে। কিছু দিন পর সা'আদ এবং উতবা মদীনায় পৌছলেন। তখন রসুল স. প্রত্যেক বন্দীর জন্য চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু হাকাম বিন কিসান মক্কায় আর ফিরে গেলেন না। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মদীনাতেই থেকে গেলেন। পরে তিনি বীরে মাউনার অভিযানে শাহাদাৎ বরণ করেছিলেন। অপর বন্দী ওসমান বিন আবদুল্লাহ মক্কায় ফিরে গেলো। তার মৃত্যু হয়েছিলো অবিশ্বাসী অবস্থায়। আর নওফেল তার নিজের ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে নিহত হয়েছিলো খন্দক যুদ্ধের সময়।

'উহাতে (সম্মানিত মাসে) যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়'— এ বিধানটি 'তোমরা যেখানে পাও মুশরিকদের হত্যা কর' আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। অধিকাংশ বিদ্বান

www.eelm.weebly.com

এরকম বলেছেন। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, 'হাইছু' শব্দটি সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ 'যখনই পাও' নির্দেশের মাধ্যমে বুঝা যায় এ আয়াতটি আসলে রহিতই।

আমি বলি 'হাইছু' শব্দটি স্থান বা কালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট — এরকম প্রমাণ কারো কাছে নেই। স্থান ও কাল সম্পৃক্তির কথা যদি মেনেও নেয়া যায়, তবু তা সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপার সন্দেহ থেকেই যায়। এরকম সন্দিগ্ধতা দ্বারা কোনো বিধানকে রহিত মনে করা সঙ্গত নয়। বায়যাবী বলেছেন, এখানে রহিত করার ব্যাপারটা অনির্দিষ্ট বিষয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়কে রহিত করার মতো। তাই বিধানটি রহিত না হওয়া প্রসঙ্গে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, অনির্দিষ্ট বিধান দ্বারা নির্দিষ্ট বিধান রহিত হওয়া সম্ভব। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সম্ভব নয়। ইমাম আবু হানিফার মতে অনির্দিষ্টি (আম) নির্দিষ্টির (খাস)এর মতোই অকাট্য। আর শাফেয়ীর মতে আম হচ্ছে বিবেচনাধীন বিষয়। কিন্তু খাস এর বিপরীত। কেনোনা এমন কোনো আম নেই যার কিছু অংশ খাস নয়।

বায়যাবী বলেছেন, উত্তম অভিমত হচ্ছে- সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। সাধারণ নিষিদ্ধতার সমর্থনে এ আয়াতটিকে দলিল হিসাবে উপস্থাপন না করাই উত্তম। 'কিতাল' (যুদ্ধ) শব্দটি অনির্দিষ্ট হ্যাঁ সূচক। সুতরাং একে নির্দিষ্ট বলা যায় না। আমি বলি, হ্যাঁ সূচক ক্রিয়ার অধীনে অনির্দিষ্টিও নির্দ্দিষ্টির পর্যায়ভূত হয়। ওদিকে ইবনুল হুম্মাম মনে করেন, হাদিসের মাধ্যমেও কোরআন রহিত হওয়া সম্ভব। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে— 'সকল মুশরিককে হত্যা করো।' আর হাদিসে বলা হয়েছে, মানুষ যতোক্ষণ না এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই একথা স্বীকৃতি দেয় আমি ততোক্ষণ তাদের হত্যার জন্য আদিষ্ট।

আমি বলি, ইমাম বায়যাবীর দলিল যথাযথ নয়। কারণ, এ আয়াতের সাধারণ হওয়া না হওয়া নির্ভর করে মুকাল্লিফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত) দের অবস্থার উপর। বিষয়টি কালসম্পৃক্ত নয়। সুতরাং সম্মানিত মাস আগমনের সাথে সাথে রহিত করণের নীতি যে প্রযোজ্য হবেই— সে কথা বলা যাবে না। বরং কালের সঙ্গে সাধারণ সম্পৃক্তির কথা মেনে নেয়া গেলেও দলিলের প্রয়োজন থেকেই যায়। কিন্তু এখানে দলিলের প্রয়োজন বিদ্যমান নেই। তাই রহিতকরণ কিংবা নির্দ্দিষ্টকরণ কোনোটিই এখানে থাকে না। যাঁরা আয়াতটি রহিত হয়েছে বলে মনে করেন, তাঁরা অনুগ্রহ করে ওই আয়াতটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন যেখানে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বিধান ও গণনার মাস বারোটি, আসমান সমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে সম্মানিত মাস চারটি। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম কোরো না। আর তোমরা সমবেতভাবে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করো। যেমন তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছে তোমাদের সাথে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো আল্লাহ্ আল্লাহ্ভীরুদের সাথে রয়েছেন। মাসের অগ্র পশ্চাৎ করা শুধু মাত্র বৃদ্ধি করে

www.eelm.weebly.com

কুফরী। যদ্দরুন কাফেরেরা পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় একে এক বছর এবং হারাম করে অন্য বছর; যাতে তারা গণনা পূরণ করে নেয় আল্লাহ্র নিষিদ্ধ মাসগুলোকে। তাদের মন্দ কাজগুলো শোভনীয় করা হলো তাদের জন্যই। আর আল্লাহ্ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের হেদায়েত করেন না।'

নবম হিজরীতে অবতীর্ণ এই আয়াতটিই যুদ্ধ সম্পর্কিত সর্বশেষ আয়াত। এই আয়াতকে বলে তলোয়ারের আয়াত। এখানেও সম্মানিত মাসের উল্লেখ রয়েছে। কাজেই এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, জেহাদ ওয়াজিব হওয়া এ মাসগুলো সম্মানিত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত নয়। আল্লাহ পাকই সমধিক জ্ঞাত।

মহাতিরোধানের দু'মাস পূর্বে রসুল স. বিদায় হজ সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি তখন এই চারমাস যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মনে রেখো, আকাশ পৃথিবী সৃজনের সময় যেমন ছিলো, তেমনি সময় ফিরে এসেছে আজ। বছরের বারো মাসের মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। তার মধ্যে তিনটি মাস পরস্পরলগ্ন এবং একটি পৃথক। সংলগ্ন মাস তিনটি হচ্ছে— জিলক্বদ, জিলহজ ও মুহররম এবং পৃথক মাসটি রজব। ওই ভাষণের শেষ দিকে তিনি বলেছেন, তোমাদের পরস্পরের রক্ত এবং সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম। যেমন হারাম এই শহর, এই মাস এবং আজকের দিবস। হজরত আবু বকর সিদ্দিক থেকে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, রসুল স. জিলহজ মাসের বিশ তারিখে তায়েফ অবরোধ করেছিলেন। মাসাধিককাল স্থায়ী ছিলো ওই অবরোধ। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, আলোচ্য আয়াতটি রহিত। কিন্তু মন্তব্যটি ঠিক নয়। কারণ বিশই জিলহজ নয়, তায়েফ অবরুদ্ধ হয়েছিলো অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, মক্কাবিজয়ের বছর রমজান মাসে আমরা রসুল স. এর সঙ্গে মদীনা থেকে যাত্রা করি। বিশুদ্ধ সনদসহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ। বিশুদ্ধ সূত্রে বায়হাকী ও জুহুরীর বর্ণনাতেও এসেছে, মক্কাবিজয় সংঘটিত হয়েছিলো পবিত্র রমজানের তেরো তারিখে।

আমি বলি, উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, রমজানের প্রথম বারো দিন রসুল স. পথিমধ্যে ছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি স. তখন মক্কায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন সতেরো কিংবা আঠারো দিন। বোখারীও এ রকম বর্ণনা এনেছেন। অপর এক বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে আঠারো দিনের কথা। মক্কাবিজয়ের পর শাওয়াল মাসের ছয় তারিখ রবিবার তিনি রওনা হয়েছিলেন হুনায়েন অভিযানে। ইবনে ইসহাক বলেছেন, হুনায়েন যাত্রার তারিখ ছিলো পাঁচই শাওয়াল। এ সম্পর্কে ওরওয়া এবং ইবনে জারীরের অভিমত অভিন্ন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. হুনায়েনে উপস্থিত হয়েছিলেন শাওয়ালের দশ তারিখে। হাওয়াজেন গোত্রের লোকেরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করলো। রসুল স. তখন গণিমত একত্রিত করলেন। এরপর তায়েফে আবির্ভূত

www.eelm.weebly.com

হলো সকীফ গোত্রের নেতা নওফেল। সে তায়েফবাসীদেরকে নগরীর অভ্যন্তরে সমবেত করলো। তারপর বন্ধ করে দিলো নগরের প্রধান তোরণ। যুদ্ধপ্রস্তুতিও শুরু করে দিলো তারা। রসুল স. তায়েফ পুনঃঅবরোধ করলেন। হজরত আনাসের উদ্ধৃতি দিয়ে মুসলিম বলেছেন, ওই অবরোধ স্থায়ী ছিলো চল্লিশ দিন। হেদায়া প্রণেতা বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য (শাজ)। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় তিরিশ দিন অবরোধের কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ আবার বলেছেন বিশ দিনের কথা। অবরোধ শেষে তিনি স. মক্কাভিমুখী হলেন। জিলক্বদ মাসের পাঁচ তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি পৌঁছলেন জিইররানা নামক স্থানে। সেখানে অবস্থান করলেন তেরো দিন। এরপর মক্কায় ওমরা পালন শেষে জিলক্বদের আঠারো তারিখ বুধবারে তিনি মদীনার পথে যাত্রা শুরু করলেন এবং মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছলেন ২৭শে জিলক্বদ শুক্রবারে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, মক্কা যাত্রা, বিজয়, হাওয়াজেন সম্প্রদায়কে আক্রমণ, তায়েফ অবরোধ ইত্যাদি শেষ করে তাঁর স. এর সময় লেগেছিলো দুই মাস ষোলো অথবা ছাব্বিশ দিন। সুতরাং তায়েফ অবরোধ কাল ছিলো, জিলহজের বিশ তারিখ থেকে মুহররমের শেষ পর্যন্ত- ইবনে হুম্মামের এই মন্তব্য অসঠিক। সার কথা এই যে, সম্মানিত মাসের বিধান রহিত হয়নি। তবে হ্যাঁ, এ আয়াত দ্বারা পূর্বোক্ত ওই আয়াতটি রহিত হয়েছে; যেখানে বলা হয়েছে, সম্মানিত মাসের বিনিময়ে সম্মানিত মাস। আর কিসাসই হলো সম্মান; 'যারা যেমন সীমাতিক্রম করবে, তোমরাও তেমনি সীমাতিক্রম কোরো'— এ আয়াত দ্বারা সম্মানিত মাসের যুদ্ধবিগ্রহ বৈধ মনে হয়, যদি সে যুদ্ধ কাফেরদের পক্ষ থেকে হয়। কিন্তু আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে বদর যুদ্ধের আগে। আর সম্মানিত মাসে যুদ্ধবিগ্রহ্ নিষিদ্ধতার বিধান অবতীর্ণ হয়েছে পরে।

'আল্লাহ্র পথে বাধাদান করা, আল্লাহ্কে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেয়া এবং তার বাসিন্দাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্র নিকট অধিকতর অন্যায়'— একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে অবিশ্বাসীরা সকল অন্যায় কর্মে ব্যাপৃত। তাদের এ সকল অন্যায় অধিনায়ক আবদুল্লাহ্ বিন জাহাশ ও তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত অন্যায় অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুতর। আর ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, ভুলবশতঃ তাঁরা এই ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। তাঁরা ওই দিনটিকে মনে করেছিলেন জমাদিউল আখেরের শেষ দিন। সেই দিনটি যে পহেলা রজব তা তাঁরা বুঝতে পারেননি।

'ফেৎনা হত্যা অপেক্ষা ভীষণতর অন্যায়'— একথার অর্থ, হাজরামীকে হত্যা করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু সে হত্যার চেয়ে কাফেরদের সৃষ্ট ফেৎনাগুলো অনেক বেশী গুরুতর। হত্যার জন্য তারা মুসলমানদেরকে দোষারোপ করে চলেছে। কিন্তু মুসলমান বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত ওই হত্যাকান্ডটি ছিলো ভ্রমজনিত। আর অবিশ্বাসীরা ফেৎনার পর ফেৎনা করে যাচ্ছে অবলীলায়, সজ্ঞানে।

www.eelm.weebly.com

'তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, তোমাদেরকে ধর্মচ্যুত করার অভিপ্রায়ে— যদি তারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে ধর্ম পরিত্যাগ করে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহকাল ও পরকালে তাদের কর্ম নিষ্ফল। তারা জাহান্নামের অধিবাসী, আর জাহান্নামই তাদের স্থায়ী আবাস'— ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ধর্ম ত্যাগ করে অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত কৃতকর্ম নিষ্ফল হয় না। যেমন, জোহরের নামাজ আদায়ের পর কেউ ধর্মত্যাগী হলো, আবার জোহরের সময় অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় পুনরায় মুসলমান হয়ে গেলো—এমতাবস্থায় তাকে জোহরের নামাজ পুনঃ আদায় করতে হবে না। তেমনি হজ সম্পন্ন করার পর ধর্মত্যাগী ব্যক্তি কিছুদিন পর পুনরায় ইসলামে ফিরে এলে তার উপর পুনঃ হজ সম্পাদন জরুরী নয়। ইমাম শাফেয়ীর মতে, কৃতকর্ম সবসময় উৎসের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, উৎসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর উৎস বলে আর কিছু থাকে না। সুতরাং নামাজের সময় অবশিষ্ট থাকাবস্থায় কোনো ধর্মত্যাগী পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করলে ওই ওয়াক্তের নামাজ আদায় করা ফরজ। ঠিক তেমনি দ্বিতীয় বার হজ করাও ফরজ— যদি প্রথম হজের পরে কেউ ধর্ম পরিত্যাগ করে।

যে ধর্ম ত্যাগ করে তার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দেয়া যাবে না। তাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ধর্মত্যাগীকে তিন দিন অবকাশ দেয়া ওয়াজিব। এর মধ্যে যদি সে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে তবে সে জান মালের নিরাপত্তা লাভ করবে।

ধর্মত্যাগী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের ইহকাল যেমন নিরাপদ নয়, তেমনি পরকালও নিরাপত্তাহীন। উভয় জগতে নিষ্ফল যারা— তাদের জন্য রয়েছে অগ্নিঅধিবাস। এটাই অবিশ্বাসীদের পরিণতি। তাদের দোজখবাস চিরস্থায়ী।

বাত্নে নাখলার অভিযানে অংশগ্রহনকারী সৈনিকবৃন্দ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের এই অভিযানের বিনিময় কি আমরা পাবো? আমাদের এই অভিযানকে কি জেহাদ নামে অভিহিত করা যায়? তাঁদের এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো, 'যারা বিশ্বাস করে এবং যারা আল্লাহ্র পথে স্বদেশ ত্যাগ করে এবং জেহাদ করে, তারাই আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।' এখানে অনুগ্রহ প্রত্যাশার কথা বলা হয়েছে একারণে যে, কেউ যেনো মনে না করে, সৎকর্মের প্রতিদান দেয়া আল্লাহ্র জন্য অপরিহার্য। সৎকর্মই সওয়াব প্রাপ্তির একমাত্র উপলক্ষ্য নয়। সবকিছুই নির্ভর করে পরিণতি ও পরিণামের উপর। ওই ব্যক্তি উত্তম যার শেষ অবস্থা উত্তম। অতএব বিশ্বাসের সঙ্গে পৃথিবীপরিত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত নিশ্চিতি নেই। তাই শেষ সময় পর্যন্ত সৎকর্মে নিয়োজিত থাকতে হবে। আর প্রত্যাশী হয়ে থাকতে হবে আল্লাহ্র অনুগ্রহের।

www.eelm.weebly.com

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ
اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ○
فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ
تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ
لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

❒ লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল,'উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে; কিন্তু উহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।' লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কী তাহারা ব্যয় করিবে? বল, 'যাহা উদ্বৃত্ত।' এই ভাবে আল্লাহ্ তাঁহার নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন যাহাতে তোমরা চিন্তা কর,

❒ ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে। লোকে তোমাকে পিতৃহীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বল, 'তাহাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম।' তোমরা যদি তাহাদের সহিত একত্র থাক তবে তাহারা তো তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে তোমাদিগকে কষ্টে ফেলিতে পারিতেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, মদীনাবাসীরা মদ্য পান করতো ও জুয়া খেলতো, রসুল স. এর মদীনা আগমনের পর মদীনাবাসীরা তাঁর নিকট মদ্যপান ও জুয়া খেলা বৈধ কিনা জানতে চাইলেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতের বিবরণদৃষ্টে বৈধা-বৈধ নির্ণয় করা যায় না। তাই মদ্যপান ও জুয়া বন্ধ হলো না। এর মধ্যে ঘটলো একটি অনভিপ্রেত ঘটনা। এক মুহাজির মাগরিবের নামাজ পাঠকালে এমন নেশাগ্রস্ত হলেন যে, তাঁর কোরআন আবৃত্তি বার বার ভুল হতে লাগলো। তখন আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যাদেশ করলেন, হে মুসলিমবৃন্দ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না। এর কিছুদিন

www.eelm.weebly.com

পরে জুয়ার বিষয়ে প্রত্যাদেশ হলো, হে বিশ্বাসীরা! নিঃসন্দেহে শরাব, জুয়া, প্রতিমা পূজা ও শুভাশুভ নির্ঘন্ট শয়তানের কাজ, অপবিত্র— এরকম অবতীর্ণ হওয়ার পর সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, শরাব ও জুয়া হারাম।

বাগবী বলেছেন, মদ সম্পর্কে চারটি আয়াত নাজিল হয়। প্রথমে মক্কায় নাজিল হলো, 'তোমরা খেজুর, আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল থেকে মাদকদ্রব্য ও উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করো।' তখন অনেকেই মদ্যপান করতেন এবং তখন মদ্যপান করা ছিলো হালাল। একবার হজরত ওমর, হজরত মুআজ বিন জাবাল প্রমুখ রসুল স. এর সকাশে নিবেদন করলেন, শরাব ও জুয়ার কারণে মানুষের জান-মালের ক্ষতি হচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনি আমাদের জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করুন। তাঁদের এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতে মদ ও জুয়ার মধ্যে মহাপাপ ও উপকার উভয়টি রয়েছে বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, উপকার অপেক্ষা পাপই অধিক। আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর মহাপাপের আশংকায় কেউ কেউ মদ্যপান পরিত্যাগ করলেন। আর উপকারের দিকে লক্ষ্য রেখে অনেকেই মদ্যপান চালিয়েই যেতে লাগলেন। এক দিনের ঘটনা— হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফ কিছুসংখ্যক সাহাবীকে নিমন্ত্রণ করলেন। আহারের পর নিমন্ত্রিত অতিথিরা প্রচুর মদ্যপান করলেন। মাগরিবের নামাজের সময় হলো। নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই তাঁরা সকলে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। নেশাচ্ছন্নতার কারণে ইমামের কোরআন পাঠে মারাত্মক ভুল হয়ে গেলো। সুরা কাফেরুন পাঠ করছিলেন তিনি। ওই সুরায় যে কয়টি 'লা' শব্দ ছিলো তার সব কয়টি তিনি বাদ দিয়ে সুরাটি পাঠ করলেন। তখন আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশ করলেন, 'হে বিশ্বাসীবৃন্দ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না।' এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সকলে মনে করলেন, নামাজের সময়ই কেবল মদ্যপান হারাম। তাই তাঁরা নামাজের সময় ছাড়া অন্য সময় মদ্যপান চালিয়ে যেতে লাগলেন। কেউ কেউ পান করতেন ফজরের নামাজের পর যাতে জোহরের আগেই নেশা ছুটে যায়। আবার কেউ কেউ পান করতেন এশার পর যাতে ফজরের আগেই নেশার প্রতিক্রিয়া অবলুপ্ত হয়ে যায়। একদিন হজরত উতবা বিন মালিক কয়েকজন সাহাবাকে দাওয়াত দিলেন। মেহমানদের জন্য বিরাট উট জবাই করা হলো। উটের গোশ্ত খাওয়ার পর মেহমানেরা প্রচুর পরিমাণে শরাব পান করলেন। নেশার ঘোরে তাঁরা কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করলেন। কখনও কখনও একে অপরের প্রতি কটুবাক্য বর্ষণ করতে থাকলেন। হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস আনসারদের প্রতি কটাক্ষ পূর্বক একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। আবৃত্তি শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে এক আনসার সাহাবী আহার শেষে পড়ে থাকা উটের মাথা দিয়ে আঘাত করলেন হজরত সা'দ এর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথা ফেটে গেলো। রসুল স. এর নিকট এই ঘটনাটি জানানো হলো। রসুল স. তখন আল্লাহ্পাকের নিকট প্রার্থনা করলেন— হে আমার আল্লাহ্! একি অবস্থা আমার উম্মতের। দয়া করে মদ্যপান সম্পর্কে একটি বিধান

www.eelm.weebly.com

দান করুন। সঙ্গে সঙ্গে সুরা মায়েদার ওই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো— 'হে বিশ্বাসীরা! নিঃসন্দেহে মদ, জুয়া, প্রতিমা, শুভাশুভ নির্ণয় শয়তানের কাজ যা অপবিত্র।'

শরাবের সংজ্ঞাঃ শরাব বা খামারের সংজ্ঞা নির্ণয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আঙ্গুরের কাঁচা রসে ঝাঁঝ ও ফেনার সৃষ্টি হলে মাদকতাপূর্ণ সেই রসকে বলে শরাব। সাহেবাইন বলেছেন, আঙ্গুরের রসে ফেনা সৃষ্টি না হলেও তা শরাব। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, যে কোনো পানীয় হোক না কেন অধিক পরিমাণে পান করলে যদি মাদকতা আসে তবে সেটাই খামার। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ভাষাবিদগণের নিকট যা খামার বলে পরিচিত সেই বিশেষ পানীয়ের নামই খামার। অন্যান্য নেশাজাত দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন, মুসাল্লাস, তেলা, মুনাসসাফ, বাজেক ইত্যাদি। জমহুর বলেছেন, যে বস্তু বিবেককে চঞ্চল করে সেই বস্তুই খামার। আমার অভিমত হচ্ছে, খামার একটি দ্ব্যর্থবোধক শব্দ। সাধারণ ও বিশেষ দুই অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। তবে সচরাচর সাধারণ অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কামুস অভিধান রচয়িতা বলেন, যে পানীয়ের মধ্যে মাদকতা রয়েছে, তাকেই খামার বা শরাব বলা হয়। সে পানীয় আঙ্গুরের রস থেকে হোক অথবা অন্য যে কোন পানীয় হোক। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন, যখন শরাব হারাম ঘোষিত হয়, তখন আঙ্গুরের রস দিয়ে শরাব প্রস্তুতির প্রচলন ছিলো না। বোখারী। হজরত আনাস বলেছেন, যেদিন মদ্যপান হারাম ঘোষিত হয় সেদিন আমি ছিলাম শরাব পরিবেশনকারী। তখন কাঁচা পাকা নিষিক্ত মদ ব্যতীত অন্য কোনো মদ পাওয়া যেতো না। বোখারী, মুসলিম। তাঁর অপর বর্ণনায় রয়েছে, আমি তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবু তালহা এবং অন্যান্যদেরকে মদ পান করাচ্ছিলাম। অন্য একটি বর্ণনায় আবু তালহার সঙ্গে আবু ওবায়দা বিন জাররা এবং উবাই বিন কা'আব শুহাইলের নাম এসেছে। বর্ণিত হয়েছে, ইত্যবসরে একজন এসে জানালেন, মদ হারাম হয়ে গিয়েছে। মদ্যপায়ীগণ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আনাস। মদের পাত্র উপুড় করে দাও। তখন থেকে তাঁরা আর মদ্য পান করেননি। তাঁরা তখন সংবাদদাতা কর্তৃক আনীত মদ্য পান হারাম সম্বলিত সংবাদটিকে যাচাই করতে উদ্যোগীও হননি। হজরত আনাস আরও বলেছেন, যখন মদ হারাম হয় তখন আঙ্গুরের তৈরী মদ খুব কমই পাওয়া যেতো। তখন মদ তৈরী হতো সাধারণত কাঁচা পাকা ভুট্টা থেকে।

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'খামার' শব্দটি কখনো কখনো বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কোরআন মজীদে শব্দটি সাধারণ অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির সাধারণ অর্থ গ্রহণ না করলে ওই প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের জবাব যথাযথ হয় না। প্রশ্ন বা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিলো তৎকালীন প্রচলিত মদ সম্পর্কে। হজরত ওমর ও হজরত মুআজ বলেছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্ স. আমাদেরকে ওই নেশাশক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিন যা বিবেককে বিপর্যস্ত করে।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌পাকও তাই বলেছেন, 'নিশ্চয়ই মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুরাও অনৈক্য সৃষ্টি করতে চায়। আর উদাসীন রাখতে চায় আল্লাহ্‌র জিকির ও নামাজ থেকে।'— এখানে বিশেষভাবে আঙ্গুরের রসের কথা বলা হয়নি। আর তখনকার সমাজে আঙ্গুরের রসের প্রচলনও ছিলো না।

হজরত ওমর ফারুক থেকে বর্ণিত হয়েছে, শরাব নিষিদ্ধ। আর শরাব প্রস্তুত হয় আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব ও মধু থেকে। ওই পানীয়কে শরাব বলে যা বিবেককে বিভ্রান্ত করে দেয়। বোখারী, মুসলিম।

শরাবের উপকরণঃ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, মাদক দ্রব্য তৈরী হয় গম, যব, খেজুর, কিসমিস ও মধু থেকে। মারফু পদ্ধতিতে হজরত নোমান বিন বশীর থেকে এরকম বর্ণনা এসেছে। তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা। ইমাম আহমদের একটি বর্ণনার শেষ দিকে দেখা যায়, রসুল স. বলেছেন, নেশা সৃষ্টি করে এমন সকল বস্তুই হারাম। মুসলিম। হজরত আনাস বলেছেন, মদ প্রস্তুত হয় আঙ্গুর, খেজুর, মধু ও ভুট্টা থেকে। অল্প বা অধিক সকল পরিমাণ মদই হারাম ও অপবিত্র। মদ্যপানকারীকে শরিয়তসম্মত শাস্তি দিতে হবে। মদের বেচাকেনাও হারাম। কেউ মদ নষ্ট করলে তাকে জরিমানা দিতে হবে না। মতভেদ ও বস্তু পার্থক্যহেতু আঙ্গুরের কাঁচা রস ছাড়া যব, গম, ভুট্টার পানীয় হালাল- এগুলো যে পান করে তাকে কাফের বলা যায় না।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, শরাব জাতীয় তিন বস্তু হারাম। ১. তেলা-যা আঙ্গুরের রস থেকে প্রস্তুত হয়। এ জাতীয় শরাব প্রস্তুত হয় আঙ্গুরের রস জ্বাল দিয়ে এক তৃতীয়াংশ কমিয়ে ফেললে। ২. আঙ্গুরের রস জ্বাল দিয়ে অর্ধেক কমিয়ে ফেললে যে শরাব হয় তার নাম মুনাস্‌সাফ। ৩. জ্বাল দেয়া রস যদি অর্ধেকের কম হয়ে যায় তখন সেই শরাবকে বলে বাজেক। খেজুরের শরবত থেকে প্রস্তুত শরাবকে বলে 'সাকার'। যখন খেজুরের রস ঝাঁঝালো হয় ও তা থেকে ফেনা নির্গত হতে থাকে তখনই তা হারাম হয়ে যায়। তৃতীয় আরেক ধরনের শরাব প্রস্তুত হয় কিসমিসের রস থেকে। যখন কিসমিসের রসের ফেনা বের হতে থাকে তখনই তা শরাব পদবাচ্য হয়। ইমাম আবু ইউসুফ অবশ্য ঝাঁঝালো হওয়ার কথা বলেননি।

সকল প্রকার মদ হারাম ও অপবিত্র। এক বর্ণনামতে লঘু অপবিত্র (নাজাসাতে খফিফা) এবং অন্য বর্ণনামতে গুরু অপবিত্র (নাজাসাতে গালিজা)। অল্প পরিমাণ মদ্যপান করাও হারাম। যেমন হারাম অল্প পরিমাণ প্রস্রাবও। নেশাগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত মদ্যপানকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে না। প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি অনুমানের পর্যায়ে থেকে যাবে। আর অনুমানে কাউকে শাস্তি আরোপ করা যায় না।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নিঃসন্দেহে শরাবে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত যে কোনো পানীয় বিক্রয় করা যাবে। এবং সেই পানীয় কেউ বিনষ্ট করলে তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও আদায় করা যাবে। সাহেবাইন একথায় একমত হননি। খেজুর,

www.eelm.weebly.com

আঙ্গুর ও কিসমিসের রসের অধিকাংশই যদি অল্প পরিমাণে ঝাঁঝালো হয়ে যায় এবং তা পান করলে যদি মাদকতা না আসে তবে তা পান করা বৈধ— ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম ইউসুফ এরকম বলেছেন। ইমাম মালেক বৈধ বলেননি। তবে বলেছেন, শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য পান করলে দোষ নেই। আর যদি স্ফূর্তি তামাশার উদ্দেশ্যে পান করা হয় তবে তা ঐকমত্যানুযায়ী হারাম হবে। পানকারীর উপর প্রযোজ্য হবে শরিয়তের শাস্তি (হদ)। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, যদি তিন পেয়ালা পান করলে মাদকতা সৃষ্টি হয় তবে শেষ পেয়ালাটি পান করা হারাম হবে। কারণ শেষেরটির কারণে মাদকতা সৃষ্টি হয়েছে। গম, যব, ভুট্টা, মধু, নাবিজ, দুধ, ইত্যাদি পান করা বৈধ। এসব পান করলে যদি মাদকতা আসে তবে পানকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে না। অপর বর্ণনায় রয়েছে, এসব পানীয় পান করে নেশাগ্রস্ত হলে পানকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে। হেদায়া গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে— আলেমগণ বলেন, এইরূপ পানকারীর উপর শাস্তি আরোপিত হবে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। ইমাম মোহাম্মদও এরকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ তিনজনই বলেছেন, বর্ণিত পানীয়গুলো অপবিত্র (নাপাক) নয়। কারণ ওগুলোর অল্প পরিমাণকে তাঁরা হারাম বলেন না। ফতওয়ায়ে নাসাফী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে— ভাঙ হারাম। ভাঙখোর যদি তালাক প্রদান করে তবে তা কার্যকর হবে। ভাঙকে যে হালাল মনে করবে তাকে হত্যা করা যাবে। মদ্যপানকারীর মতোই সে শাস্তিযোগ্য।

অনেক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, নেশাজাত দ্রব্য হারাম— অল্প অধিক যে পরিমাণই হোক না কেনো। হজরত জাবের বলেছেন, একবার ইয়েমেন থেকে এক লোক এসে নবী পাক স. কে জিজ্ঞেস করলো, ভুট্টা থেকে তৈরী মদ হালাল না হারাম? আমাদের অঞ্চলের লোকেরা ভুট্টার রস পান করে। রসুল স. জানতে চাইলেন ওই রস পান করলে কি নেশা হয়? লোকটি বললো, হাঁ। রসুল স. বললেন, নেশাজাত দ্রব্য অল্প বিস্তর সবই হারাম। মুসলিম। হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, অল্প কিংবা বেশী সকল পরিমাণ নেশা আনয়ণকারী বস্তুকে রসুল স. হারাম বলেছেন। নাসাঈ, ইবনে হাব্বান, বায্যার। হজরত জাবের বলেছেন— রসুল স. এরশাদ করেন, যা মত্ততা আনে তার অল্প পরিমাণও হারাম। তিরমিজি,আবু দাউদ, ইবনে মাজা। যেমন জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. বলেন, যে বস্তু অধিক পান করলে মত্ততা আসে সে বস্তু অল্প পান করাও হারাম। আবু দাউদ, তিরমিজি, আহমদ, ইবনে হাব্বান।

হজরত উম্মে সালমা বলেছেন, মত্ততা আনয়নকারী ও বিবেক লোপকারী প্রতিটি বস্তুকে রসুল স. হারাম বলেছেন। আবু দাউদ। হজরত দাইলাম হুমাইরি বলেছেন— আমি নিবেদন করলাম, হে অনুকম্পার নবী! আমরা শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী। আমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কর্মশক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং শৈত্যাধিক্য থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে আমরা গমজাত পানীয় পান করি। রসুল স.

www.eelm.weebly.com

বললেন, তাতে কি মত্ততা আসে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি স. বললেন, ওসব পরিত্যাগ করো। আমি বললাম, কিন্তু জনসাধারণ তো পরিত্যাগ করতে চাইবে না। তিনি স. বললেন, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। আবু দাউদ। হজরত আবু মালেক আশআরী বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতগণের অনেকে মদ্যপান করবে। তারা মদকে অন্য নামে অভিহিত করবে। আবু দাউদ। হজরত আলী থেকে দারা কুতনীও এরকম বর্ণনা করেছেন। মুসতাদরাক গ্রন্থে খাওয়াত বিন জোবায়ের থেকে এরকম বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো আলেম কিছু সংখ্যক হাদিসের মাধ্যমে নাবীজ মোবাহ হওয়া প্রমাণ করেছেন। যব ও খেজুরের তৈরী মদকে বলে নাবীজ। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, নবী পাক স. এর জন্য রাতে খেজুর ভিজিয়ে রাখা হতো। সকালে তিনি তা পান করতেন। কখনো কখনো সেই রস পরের দিন সকালে সন্ধ্যায় অথবা রাতে এবং পরের দিন আসরের সময় পর্যন্ত পান করতেন। তাঁর পানের পর অবশিষ্ট শরবত তিনি ফেলে দিতেন অথবা তাঁর কোনো খাদেমকে পান করতে বলতেন। এই হাদিসটি বর্ণনা করে মুসলিম বলেছেন, যদি ওই রস হারাম হতো তবে রসুল স. তাঁর খাদেমকে তা পান করতে দিতেন না। একথার জবাবে বলা যায়, তখন পর্যন্ত ওই রস নেশার দ্রব্যে পরিণত হয়নি। কিন্তু তাতে নেশা হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। তাই তিনি সম্ভাবনা না থাকলে খাদেমকে পান করতে দিতেন। আর সম্ভাবনা থাকলে ফেলে দিতেন। এক মাসআলায় বলা হয়েছে, মদ ব্যতীত অন্যান্য পানীয়ের ক্ষেত্রে কেবল শেষ পেয়ালা হারাম। অর্থাৎ অল্প পরিমাণ গ্রহণ করলে তা হারাম নয়। এ সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রতিটি মত্ততা বিশিষ্ট বস্তুই হারাম। একথা বলে ওই সকল পানীয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যেগুলো মত্ততা আনে। দারা কুতনী। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, হাদিসটি জয়ীফ। হাজ্জাজ বিন আরতাত এবং আম্মার বিন মাতার এই হাদিসের বর্ণনাকারী। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে নাখয়ীর উক্তি। আর এর সূত্র জড়িত রয়েছে ইবনে মোবারকের সঙ্গে। একজন এই হাদিসটি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সম্মুখে বর্ণনা করলে তিনি বলেছিলেন, হাদিসটি বাতিল। আবার ওই সকল আলেম এই হাদিস থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন যাঁরা মদকে সরাসরি হারাম করেছেন। উপরন্তু মত্ততাজাত পানীয়কেও হারাম বলেছেন। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনে জাওজী হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন হজরত আবু সাঈদ থেকে এবং বলেছেন, হাদিসটি মওকুফ (সাহাবীর উক্তি)। -এর সনদ হজরত আবু সাঈদ পর্যন্ত পৌঁছেনি। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, উত্তম সনদে হাদিসটি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস পর্যন্ত পৌঁছেছে যার বিবরণ এরকম— সকল প্রকার শরাবই হারাম— অল্প হোক কিংবা অধিক। যে পানীয় নেশা সৃষ্টি করে— তাও হারাম।

আমি বলি, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উক্তির মর্ম হচ্ছে, কম হোক বেশী হোক— প্রতিটি নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যই হারাম। কিন্তু হজরত আবু মাসউদ

www.eelm.weebly.com

আনসারীর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. কাবা শরীফ তওয়াফ করছিলেন। তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন তিনি। পানি চাইলে একজন মশক থেকে নাবীজ এনে দিলেন। নাবীজ দেখে অসন্তুষ্ট হলেন তিনি স.। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসুল! এটা কি হারাম পানীয়? তিনি স. বললেন, না। তবে জমজমের এক মশক পানি নিয়ে এসো। জমজমের পানি আনা হলে তিনি সেই পানির সঙ্গে নাবীজ মিশিয়ে পান করলেন এবং তাওয়াফ সম্পূর্ণ করলেন। তারপর বললেন, অধিক পিপাসিত হলে এভাবেই পান কোরো। নেশার ঝাঁঝ বিশিষ্ট নাবীজ সম্পর্কে একবার হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। তিনি তখন বলেছিলেন, রসুল স. একবার এক বৈঠকে উপবিষ্ট ছিলেন। কোথা থেকে যেনো নাবীজের ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছিলো। তিনি স. একজনকে পাঠিয়ে সেই নাবীজ নিয়ে এলেন। ঘ্রাণ নিয়ে বুঝতে পারলেন নেশার ঝাঁঝ শুরু হয়েছে। তিনি তখন নাবীজের সঙ্গে পানি মিশালেন এবং সেই পানি পান করলেন। তারপর বললেন, নেশার ঝাঁঝবিশিষ্ট নাবীজ এভাবেই পানি মিশিয়ে পান করতে হয়। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। দারা কুতনী এ ধরনের হাদিসগুলো উদ্ধৃত করেছেন।

হজরত আবু মাসউদ আনসারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রসুল স. এর নিকট জানতে চাইলেন, নাবীজ হালাল না হারাম? তিনি স. বললেন, হালাল। এ বর্ণনাটি এনেছেন ইবনে জুরাইজ। সায়ি বিন জিলকুয়াহ্ বলেছেন, একলোক নাবীজ পান করে নেশাগ্রস্ত হয়েছিলো। হজরত ওমর তাকে দোররা মেরেছিলেন। লোকটি তখন বলেছিলো, আমি তো আপনার পাত্র থেকে পান করেছি। হজরত ওমর বলেছিলেন, আমি দোররা মেরেছি তোমার মাতাল হওয়ার কারণে। এ হাদিস সম্পর্কে বলা যায় যে, দারা কুতনী বলেছেন, আবু মাসউদ ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়ামান নামে পরিচিত। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়ামান বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। তাঁকে একজন বলেছিলেন, আর কেউ কি এরকম বর্ণনা করেছে? তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। আরেকজন বর্ণনা করেছেন— কিন্তু সে ইয়াহ্ইয়ার চেয়েও দুর্বল। নাসাঈ বলেছেন, তার বর্ণনাকে দলিল হিসেবে নেয়া যায় না। আবু হাতেম বলেছেন, তার বর্ণনা অসঙ্গতিপূর্ণ। নাসাঈ ও দারা কুতনী বলেছেন, এ হাদিসটি পরিত্যক্ত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বর্ণনাকারী দেখেই বুঝা যায়— সে মিথ্যাবাদী। হজরত ইবনে ওমরের সনদসংযুক্ত একজনের নাম আবদুল মালেক বিন রাফে— সে অখ্যাত ও দুর্বল। হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে কাসেম বিন বাহরাম সম্পর্কে ইবনে হাব্বান বলেছেন, তার বর্ণনা প্রামাণ্য নয়। হজরত আবু মুসা বর্ণিত হাদিসের এক বর্ণনাকারীর নাম আবদুল আজিজ বিন আবান— ইমাম আহমদ বলেছেন, তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনে লুমাইর বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী। সাঈদ বিন লাকওয়াকে দাজ্জালের ওস্তাদ বলে অভিহিত করেছেন আবু হাতেম। হজরত ওমর থেকে ইবনে আবী শাইবা অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্ণনাটির সূত্র অটুট নয়। নাবীজ

www.eelm.weebly.com

সম্পর্কে আসলে কোনো মতভেদ নেই। ঐকমত্যসূত্রে নেশা সৃষ্টিকারী নাবীজ হারাম— কম বা বেশী যে পরিমাণই হোক না কেনো। আর ঐকমত্যসূত্রে ওই নাবীজ হালাল যা পান করলে নেশা হয় না। আল্লাহ্‌পাকই অধিক জ্ঞাত।

মদের মতো জুয়াও হারাম। জুয়ার মাধ্যমে অতি সহজে এক জনের সম্পদ অন্যজনের কুক্ষিগত হয়। আরবীতে জুয়াকে বলে মাইসির। শব্দটি ক্রিয়ামূল। আতা, তাউস ও মুজাহিদের মিলিত মত এই যে, যে কাজের সঙ্গে জুয়ার লেশ থাকে সে কাজ হারাম। ছেলেদের আখরোট ও কড়ি খেলাও জুয়ার তুল্য। হজরত আলী থেকে বায়হাকী বলেছেন, সতরঞ্জ হচ্ছে অনারবদের জুয়া। হজরত বুরাইদা বলেন, নারোদ ও সতরঞ্জ সম্পর্কে নবী পাক স. বলেছেন, যে ব্যক্তি নারোদ খেলে সে যেনো শুয়োরের গোশত নিজের হাতে মাখে।

হাব্বাহ্ বিন মুসলিম থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে আবদান আবু মুসা বিন হাজম বর্ণনা করেন— সতরঞ্জ খেলোয়াড়রা অভিশপ্ত আর দর্শকেরা শুয়রের গোশত ভক্ষনকারী তুল্য। হজরত আবু মুসা আশয়ারী কর্তৃকও বর্ণিত হয়েছে— যে ব্যক্তি সতরঞ্জ খেলে সে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে। আহমদ, আবু দাউদ। হজরত আবু মুসা কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, গোনাহ্‌গার ব্যতীত অন্য কেউ সতরঞ্জ খেলে না। সতরঞ্জ সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন, সতরঞ্জ একটি বাতিল খেলা। এ খেলা আল্লাহপাকের অপছন্দনীয়। বায়হাকী। হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন— মদ, জুয়া ও গুটি খেলা নিষিদ্ধ। মারফু সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। আবু দাউদ। অনেকে গুটি খেলার স্থলে বলেছেন, তবলা বাজানোর কথা। বায়হাকী। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একবার রসুল স. কবুতরের পশ্চাদ্ধাবনকারী এক লোককে দেখে বললেন, এক শয়তানের পিছনে আর এক শয়তান দৌড়াচ্ছে। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, বায়হাকী। মোটকথা কোন কিছুর বিনিময়ে খেলা হারাম— এটা ঐকমত্য। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সতরঞ্জ খেলা মোবাহ্। পরে অবশ্য তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্তগুলো পাল্টিয়ে ছিলেন। সতরঞ্জ খেলা অপব্যয়ের নামান্তর। এতে সম্পদ নষ্ট হয়। তাই এ খেলা হারাম। তাই সুদ, ঘুষ ও জুয়াকেও হারাম বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌পাক বলেন, অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। জুয়ার ক্ষতি দু'টি— সম্পদ ক্ষয় ও সময়ের অপচয়। তাই জুয়া হারাম এটা ঐকমত্য। সতরঞ্জ ও জুয়া জাতীয় সকল খেলাই গোনাহে কবীরা।

মদ ও জুয়া থেকে বিভিন্ন ধরনের অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি হয়। এ দু'টো মহাপাপকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় ঝগড়া, ফাসাদ ও মারামারি। বন্ধু হয়ে যায় শত্রু। আল্লাহ্‌র জিকির কিংবা নামাজের কথা তাদের মনেই থাকে না। হজরত মুআজ বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন— মদ্যপান কোরো না। মদ্যপান সকল অশ্লীলতার মূল। আহমদ। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. বলতেন— ব্যভিচারের প্রাক্কালে ব্যভিচারী— অপহরণের প্রাক্কালে অপহরণকারী এবং মদ্যপানের প্রাক্কালে মদ্যপায়ী

www.eelm.weebly.com

ইমানদার থাকে না। বোখারী। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, মহানবী স. বলেন, মদ্যপানই সকল অশ্লীলতার মূল এবং কবীরা গোনাহ্ সমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি গোনাহ্। মদ্যপায়ী নামাজ পরিত্যাগকারী; নামাজ পড়লেও তাদের নামাজ হয় না। সে মাতা, ভগ্নী, ফুফু, খালার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্তদের মতো অপরাধী। তিবরানী। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের বর্ণনায় রয়েছে— যে মদ্যপান করে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহ্তায়ালা তার নামাজ কবুল করেন না। তবে যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ্পাক তাকে মাফ করে দেন। সে এ রকম সুযোগ পায় তিনবার। চতুর্থবার এ রকম করলে আল্লাহপাক তার চল্লিশ দিনের নামাজ গ্রহণ করেন না এবং তার তওবাও কবুল করেন না। কিয়ামতের দিন তাকে পান করানো হবে পুঁজমিশ্রিত পানি। নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন— মদ যাবতীয় অসৎকর্মের মূল। মদ্যপানকারীর চল্লিশ দিনের নামাজ কবুল হয় না। মাতাল অবস্থায় মৃত্যু কুফরীর মৃত্যু। তিবরানী। হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান, জুয়াড়ী, উপকারের পর খোঁটাদানকারী ও সদা মদ্যপানকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। দারেমী। মারফু সূত্রে হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিন ব্যক্তির উপর জান্নাত হারাম। ১. সর্বদা মদ্যপানকারী। ২. মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান। ৩. দাইউস। আহমদ, নাসাঈ।

হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন— আমি মানুষের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রহমত ও হেদায়েত। কর, প্রতীমা, ক্রুশ ও মূর্খতা যুগের সকল কুসংস্কার উচ্ছেদ করার নির্দেশ পেয়েছি আমি। আল্লাহপাক তাঁর আপন সত্তার শপথ করে বলেছেন, আমার যে বান্দা এক চুমুক শরাব পান করবে আমিও তাকে সেই পরিমাণ পুঁজ পান করাবো। আর যে আমার ভয়ে শরাব পরিত্যাগ করবে আমি তাকে পান করাবো কাওসারের পানি। হজরত আবু মুসা আশআরীর বর্ণনায় এসেছে— যাদুর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী, সদা মদ্যপানকারী এবং নির্দয় ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের অধিকার পাবে না। আহমদ। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন— প্রতিদিন যারা মদ খায় এবং এরকম অবস্থায় মারা যায় তারা আল্লাহপাকের সমীপে হাজির হবে মুশরিকদের মতো। আবু দাউদ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ, ইবনে মাজা এবং বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু মুসা বলতেন, আমার নিকট মদ্যপান এবং আল্লাহপাককে ছেড়ে দিয়ে ওই খুঁটির উপাসনা একই ব্যাপার। মদ ও জুয়ার মধ্যে উপকারী একটি দিকও রয়েছে, কিন্তু এ দু'টোর মধ্যে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি। তাই এ দু'টোকে আয়াতে মহাপাপ বলা হয়েছে। মদ্যপানের ফলে যে উপকারগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে এই— নেশার আনন্দ, কর্মস্পৃহা, সাহসের উজ্জীবন, আহার্যের

www.eelm.weebly.com

পরিপাকে সহায়তা লাভ, কোনো কোনো রোগ থেকে অব্যাহতি ইত্যাদি। আর জুয়াতে রয়েছে বিনা পরিশ্রমে সম্পদ অর্জনের সুযোগ।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে শরাব থেকে উপকার গ্রহণ সিদ্ধ নয় তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে উপকার গ্রহণ সিদ্ধ। কেনোনা আল্লাহ্পাক বলেছেন 'হ্যাঁ, যদি তোমরা নিরুপায় হও।' আরও বলেছেন, যারা উপায়হীন; তাদের কোনো গোনাহ্ নেই। যেমন, কারো গলায় খাদ্য জাতীয় কিছু আটকে গেলো তখন যদি মদ ব্যতীত সে অন্য কোনো পানীয় না পায় তবে জীবন রক্ষার্থে মদ্যপান করতে পারবে। ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী ও আহমদ এই অভিমত পোষণ করেন। ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ অভিমত ঠিক এর বিপরীত।

মদ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে কিনা সে বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও আহমদ বলেছেন, যাবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অল্প পরিমাণ হলে ব্যবহার করা যাবে— বেশি পরিমাণে যাবে না। হেদায়া প্রণেতা বলেছেন, মদের পাত্রের তলানীটুকুও পান করা জায়েজ হবে না। হারাম বস্তু থেকে উপকার গ্রহণ করাও হারাম। তাই ঘায়ের উপর এবং পশুর গায়ের পোকার উপর শরাব ব্যবহার করা যাবে না। শিশু ও জিম্মীকেও শরাব পান করানো যাবে না। কেউ পান করালে তাকে শাস্তি দিতে হবে। পশুকেও মদ পান করানো যাবে না। উজায়ীর বিন হাজাফ বলেছেন, এক লোক ঔষধ হিসেবে মদ ব্যবহার সম্পর্কে রসুল স. এর সমীপে জিজ্ঞেস করলেন। রসুল স. বললেন, হারাম। লোকটি বললেন, যদি কেবল ঔষধের জন্যই প্রস্তুত করা হয়? তিনি স. বললেন, এর দ্বারা রোগের প্রতিকার হয় না, বরং বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। মুসলিম। তারিক বিন সুমাঈদ বলেছেন, আমি একবার রসুল স.কে বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা আঙ্গুরের রসকে পানীয় ও শরবত হিসাবে ব্যবহার করি। তিনি স. বললেন, এরকম অনুচিত। আমি পুনরায় একই কথা বললাম, তিনি পুনরায় একই জবাব দিলেন। আমি বললাম ঔষধ হিসেবেও কি ব্যবহার করা যাবে না? তিনি স. বললেন, এতে করে ব্যাধিমুক্ত হওয়া যায় না বরং নিশ্চিতরূপে নতুন ব্যাধির সৃষ্টি হয়। আহমদ। জননী উম্মে সালমা বলেছেন, আমি একবার এক পেয়ালা নাবীজ তৈরী করেছিলাম রসুল স. গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাবীজের ঝাঁঝ অনুভব করলেন। বললেন, কি তৈরী করেছো? আমি বললাম মেয়েটার অসুখ, তাই ওষুধ তৈরী করেছি। তিনি স. বললেন, আল্লাহপাক তোমাদের জন্য এটা হারাম করেছেন। এর মধ্যে তিনি তোমাদের জন্য নিরাময় রাখেননি। বায়হাকী, ইবনে হাব্বান। ইবনে হাব্বানের বর্ণনা এরকম— আল্লাহ্পাক হারাম বস্তুতে তোমাদের জন্য আরোগ্য রাখেন নি। বোখারী।

আমি বলি, হারাম বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্পাক তোমাদের জন্য নিরাময় রাখেননি— একথার অর্থ এই নয় যে, হারাম বস্তুর মধ্যে রোগের প্রতিষেধক নেই। এরকম অর্থ গ্রহণ করলে কোরআনের আয়াতের বিরুদ্ধাচরণ হয়। কারণ এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোনো হেরফের নেই। কোনো বস্তু হারাম ঘোষিত হলে তার

www.eelm.weebly.com

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ও গুনাবলী লোপ পায় না। সুতরাং বর্ণিত উক্তিটির মর্ম এই যে, তোমাদের জন্য হারাম বস্তু থেকে রোগ মুক্তির অনুমতি নেই। কখনো কখনো হারাম দ্রব্যকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যেমন হজরত আনাস বলেছেন, একবার উকাল ও উরাইনা গোত্রের কিছু লোক মদীনায় এলো। মদীনার আবহাওয়া ছিলো তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। তারা অসুস্থ হয়ে পড়লো। রসুল স. নির্দেশ দিলেন, তোমরা উটের বাথানের সাথে জঙ্গলে অবস্থান গ্রহণ করো। এবং উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করো। তারা নির্দেশ পালন করে আরোগ্য লাভ করলো। শেষে একদিন রাখালকে হত্যা করে উটের পালসহ পালিয়ে গেলো। বোখারী, মুসলিম।

বর্ণিত হাদিসটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হাদিসে বর্ণিত নির্দেশটি পরে রহিত হয়েছে। কথিত ঘটনাটি ঘটেছিলো সুরা মায়েদার আয়াত নাজিল হওয়ায় পূর্বে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যে পশুর গোশত ভক্ষণ করা হয় সেগুলোর প্রস্রাব পান করা যায়। তৎসত্ত্বেও একথা বলা যাবে না যে, হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা সিদ্ধ।

শরাব দ্বারা সিরকা প্রস্তুত করা যাবে কি না— সে সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফার মতে যাবে। সিরকায় পরিণত হলে শরাব পাক হয়ে যায়। ইমাম মালেক বলেছেন, এরকম করা মাকরূহ্। তবে সিরকায় পরিণত শরাব পবিত্র। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন শরাব দ্বারা প্রস্তুতকৃত সিরকা পান করা নাজায়েয এবং তা পবিত্রও নয়। জননী উম্মে সালমা বর্ণিত ওই হাদিসটি ইমাম আবু হানিফার দলিল— যেখানে বলা হয়েছে, আমার একটি দুগ্ধবতী ছাগল ছিলো। সেটিকে দেখতে না পেয়ে একদিন রসুল স. বললেন, তোমার ছাগল কই? আমি বললাম, মরে গেছে। তিনি স. বললেন, তুমি তার চামড়াটা কাজে লাগালে না কেনো? আমি বললাম, ওটাতো মৃত। তিনি বললেন, চামড়া পাকা করলেই পাক হয়ে যেতো। যেমন শরাব থেকে সিরকা প্রস্তুত করলে পাক হয়ে যায়। দারা কুতনী। ফারাহ বিন ফুজালা এই হাদিসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দারা কুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনে হাব্বান বলেছেন, সে সনদ উল্টা পাল্টা করে। তাই তার হাদিস দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর দ্বারা অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলোর মূল নেই। তাছাড়া এখানে উল্লেখিত তার বর্ণনাটি প্রসিদ্ধও নয়।

হজরত আনাস বর্ণিত হাদিসটিকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ। ওই হাদিসে বলা হয়েছে হজরত আবু তালহা ওই সকল এতিম সম্পর্কে জানতে চাইলেন, যাদের সঙ্গে সম্পদের অংশ হিসেবে শরাবও ছিলো। রসুল স. বললেন, ওসব ফেলে দাও। হজরত আবু তালহা বললেন, ওই শরাবগুলোকে কি সিরকায় পরিণত করা যায় না? তিনি স. বললেন, না। মুসলিম। অপর এক সূত্রে ওই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে হজরত আবু তালহা বললেন, আমি কয়েকটি এতিমের প্রতিপালক। আমি তাদের জন্য কিছু শরাব তৈরী করেছি। রসুল স. বললেন, ওগুলো ফেলে দাও। আর পাত্রগুলোও ভেঙে ফেলো। তিনি তিনবার এরকম বললেন। দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে— হজরত আবু সাঈদ

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, মদ্যপান নিষিদ্ধ হলে আমি রসুল স. এর সমীপে নিবেদন করলাম, আমার কয়েকজন এতিম পোষ্য আছে। তাদের কিছু মদও মওজুদ আছে। তিনি স. বললেন, ওগুলো ফেলে দাও। সাথে সাথে আমি মদগুলো ফেলে দিলাম।

বাগবী বর্ণনা করেন, জুহাক বলেছেন, উপকার অপেক্ষা পাপ অধিক— একথার অর্থ নিষিদ্ধ হওয়ার পর মদ দ্বারা উপকার লাভ করা নিষিদ্ধপূর্ব উপকার অপেক্ষা অধিকতর পাপ। কেউ কেউ বলেছেন, এ কথার অর্থ- হারাম হওয়ার পূর্বে মদের উপকারের চেয়ে পাপই ছিলো বেশী। আর আমার মতে হারাম হওয়ার পর মদের উপকারের চেয়ে পাপ বেশী। কারণ পাপের ক্ষতিকর দিকটি আখেরাতসম্পর্কিত যা চিরস্থায়ী। আর উপকারের দিকটি পৃথিবী সম্পর্কিত যা ক্ষণস্থায়ী।

ইবনে আবি হাতেম, সাঈদ এবং ইকরামা সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়ের নির্দেশ অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! এই সম্পদ ব্যয়ের উদ্দেশ্য কী এবং এই ব্যয় কোথায় কীভাবে করতে হবে? ইয়াহ্ইয়া থেকে ইবনে আবী হাতেমের আরেক বর্ণনায় রয়েছে, হজরত মুআজ বিন জাবাল ও হজরত সায়লাবা রসুল স. নিকট নিবেদন করলেন, হে অনুগ্রহের নবী! আমাদের নিকট আমাদের পরিবারবর্গ এবং কয়েকজন ক্রীতদাস আছে। এখন আমরা সম্পদ ব্যয় করবো কীভাবে? এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে,'লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে কী তারা ব্যয় করবে। বলো, যা উদ্বৃত্ত।' উদ্বৃত্ত বুঝাতে 'আল আফওয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ক্বারী আবু আমর শব্দটিকে 'আল আফবু' উচ্চারণ করতেন। এরকম উচ্চারণ করলে অর্থ দাঁড়াবে— তোমরা যা ব্যয় করবে তাই হবে অতিরিক্ত। আতা, সুদ্দী ও কাতাদা বলেছেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদকেই 'আল আফবু' বলে। এই বিধানানুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম সারা দিন ধরে যা উপার্জন করতেন, তার দ্বারা প্রয়োজন নির্বাহের পর অতিরিক্ত উপার্জন দান করে দিতেন।

হজরত আবু উমামা বলেছেন, আসহাবে সুফফাগণের একজন ইন্তেকাল করলে দেখা গেলো তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে রয়েছে একটি আশরাফি। রসুল স. বললেন, এটা হচ্ছে দোজখের অগ্নির একটি নিদর্শন। আরেকজনের মৃত্যুর পর দেখা গেলো, তিনি রেখে গিয়েছেন দু'টি আশরাফি। রসুল পাক স.বললেন, এ দু'টো হচ্ছে দোজখের দু'টি নিদর্শন। আহমদ, বায়হাকী। হজরত আবু হাশেম বিন উকবা বলেছেন, রসুল স. আমাদের নিকট থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, সম্পদ পুঞ্জীভূত করার কোনো আবশ্যকতা নেই। একজন চাকরও প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা। পরে জাকাতের বিধান অবতীর্ণ হলে এই নির্দেশটি রহিত হয়ে যায়।

আমি বলি, সিদ্ধান্তটি সঠিক নয়। কারণ, জাকাতের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে প্রথম অথবা দ্বিতীয় হিজরীতে। অর্থাৎ এই আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে। তাই বলা যেতে পারে, এই বিধানটির দ্বারা যে শর্তটি বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে— জাকাত দিতে

www.eelm.weebly.com

হবে ঋণ পরিশোধ ও প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পরে অবশিষ্ট সম্পদের উপর। অথবা বলা যেতে পারে, সাহাবাগণের সম্পদ ব্যয় সম্পর্কিত প্রশ্নটি ছিলো নফল সদকা সংক্রান্ত। আয়াতের মর্ম হচ্ছে, অভাবহীন অবস্থার সদকাই হলো উত্তম সদকা। মুজাহিদ বলেছেন, 'আল আফবু' এর অর্থ যারা দান করতে সমর্থ তাদের দান করা। যারা সমর্থ তারা যদি দান করে তবে তা কঠিন হয় না।

হজরত আমর বিন দিনার বলেছেন, আফবু অর্থ মধ্যবর্তী অবস্থার দান— যা অতিরিক্ত নয়, কার্পন্যও নয়। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে 'তারা অপব্যয় করে না আবার কৃপণতাও করে না।' তাউস বলেছেন, আফবু অর্থ, যে দান যার পক্ষে সহজ অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে যার পক্ষে যা দেয়া সহজ হয়, তাই দান করা। এ রকম ব্যয়ে কষ্ট নেই। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, সামর্থবানদের সদকাই উত্তম সদকা। আর সদকা শুরু করতে হবে নিকটজন থেকে। বোখারী, আবু দাউদ। হাকেম বিন হাজাম থেকেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তিনি অতিরিক্ত যে কথাটি বলেছেন, তা হচ্ছে নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে সামর্থবানদের দানই উত্তম দান। তিবরানী।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে— এক ব্যক্তি রসুল স.এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে প্রিয় নবী! আমার নিকট একটি আশরাফি আছে। কাকে দান করবো? তিনি স. এরশাদ করলেন, নিজের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, তাঁর জন্য আরেকটি আশরফি আছে। তিনি স. বললেন, তোমার সন্তানদের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আরো একটি আছে। তিনি স. বললেন, পরিবারের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আরো একটি আছে। তিনি স. বললেন, তোমার চাকরকে দিয়ে দাও। সে বললো, আরো একটি রয়েছে। তিনি স. বললেন বিষয়টি এখন তোমার বিবেচনাধীন। আবু দাউদ, নাসাঈ। হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে— এক ব্যক্তি গণিমত হিসেবে একটি সোনার মুকুট পেয়েছিলো। সে মুকুটটি রসুল স. সকাশে উপস্থাপন করে বললো, হে আমার প্রাণপ্রিয় নবী! এটিকে আমার পক্ষ থেকে সদকা হিসেবে গ্রহণ করুন। রসুল স. তাঁর পবিত্র মুখমন্ডল অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। সেই ব্যক্তি বারবার একই নিবেদন জানাতে লাগলো। তিনি স. রাগতঃ স্বরে বললেন, দাও। তারপর মুকুটটি নিয়ে এতো জোরে ছুঁড়ে মারলেন যে, সেটি তার মাথায় লাগলে মাথা ফেটে যেতো। এরপর রসুল স. এরশাদ করলেন, তোমরা তোমাদের সকল সম্পদ সদকা করার জন্য হাজির করছো, পরে আবার পথে বসে হাত পাততে হবে। মনে রেখো, সামর্থবানদের দানই শ্রেষ্ঠ দান। বাযযার, আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান, হাকেম। বায্যারের বর্ণনায় এরকম রয়েছে— ওই লোকটি মুকুটখানি পেয়েছিলো গণিমত হিসেবে। অন্যান্য হাদিসবিদগণের বর্ণনায় রয়েছে কোনো এক যুদ্ধে ওই মুকুটটি তাঁর হস্তগত হয়েছিলো। বর্ণিত হাদিসগুলো এবং আলোচ্য বিধানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, সকল সম্পদ ব্যয় করা মাকরুহ। কপর্দকহীনের

www.eelm.weebly.com

শ্রমলব্ধ সম্পদ ব্যয় করাও মাকরূহ। ব্যয় করবে সামর্থবানেরা। সামর্থহীনেরা নয়। কিন্তু হজরত আবু উমামা বর্ণিত হাদিসে দেখা যায়, সমুদয় সম্পদ ব্যয় করা ওয়াজিব। শ্রমলব্ধ সম্পদ ব্যয় করার কথাও হাদিস শরীফে এসেছে। এক লোক তাঁকে স. জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন ধরনের সম্পদ ব্যয় সর্বোৎকৃষ্ট? তিনি স. এরশাদ করলেন দৈন্যদশায় অর্জিত উপার্জন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে এই হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন আবু দাউদ। হজরত আবু হোরায়রা আরো বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড়ের সমান সোনা থাকতো, তবে আমি তিন দিনের মধ্যে ওগুলো নিঃশেষ করে দিতাম। শুধু ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু রেখে দিতাম। বোখারী। হজরত আসমা বলেছেন, প্রিয়তম নবী আমাকে বলেছেন, আসমা! দান করতে থাকো। সম্পদ আটকে রেখো না। অন্যথায় আল্লাহ্পাক তোমাকে আটকে রাখবেন। দান বন্ধ করে বিত্ত সঞ্চয় কোরো না। যদি করো, তবে আল্লাহপাক তাঁর দান বন্ধ করে দেবেন। যথাসম্ভব দান করতেই থাকো। বোখারী, মুসলিম।

আমি বলি, অবস্থা, যোগ্যতা ও পরিবেশের পার্থক্যের কারণে প্রবর্তিত বিধানের তারতম্য সূচিত হয়। এরকম লোকও রয়েছে, যারা তাদের সকল সম্পদ দান করে অপরের নিকট প্রার্থী হয়। অভাব অনটনের ফলে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে। এরকম লোকের জন্য সমুদয় সম্পদ আল্লাহ্র পথে দান করা অনুচিত। আর যারা ধৈর্য্যশীল ও দায়িত্বমুক্ত, তাদের জন্য সমুদয় সম্পদ ব্যয় করাই উত্তম। দায়িত্ব অর্থ দায় দেনা ইত্যাদি। অপরের চেয়ে আত্মীয়স্বজন, চাকরবাকরের জন্য ব্যয় করা এ কারণেই উত্তম যে, এদের জন্য ব্যয় অপরিহার্য। দূরবর্তীদের জন্য সে রকম অপরিহার্য নয়। যারা কৃচ্ছসাধনে লিপ্ত, তাদের জন্যই কেবল প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ মওজুদ রাখা মাকরূহ। এঁরা হচ্ছেন রসুল স. এর অনুপম আদর্শানুসারী সাহাবায়ে কেরাম, আসহাবে সুফফা এবং খানকাবাসী সুফী আউলিয়াবৃন্দ। হজরত আবু উমামা বর্ণিত হাদিস এদের প্রতি প্রযোজ্য। তবু একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, জমানো সম্পদের উপরে যে বছরে একবার জাকাত প্রদান করে, সে সম্পাদন করে একটি ফরজ ইবাদত। কিন্তু যারা সঞ্চয়ের চিন্তা না করে ক্রমাগত দান করে যায়, তারা কেবল নফল ইবাদত করে যেতে থাকে। তাহলে নফল কীভাবে ফরজের চেয়ে উৎকৃষ্ট হয়? আমরা বলি, সম্পদের মালিক হওয়াই জাকাত ফরজ হওয়ার উপলক্ষ্য। যিনি সম্পদ দান করেছেন, তাঁর পথে ব্যয় করার নাম কৃতজ্ঞতা। জাকাত প্রদানকারী এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বছরে কেবল একবার। আর ক্রমাগত প্রদানকারী হচ্ছে সার্বক্ষণিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। এক বছর পর জাকাত প্রদানকারী জাকাত প্রদানের যোগ্যতা লাভ করে। সে যোগ্যতা আসার পূর্বেই যারা দান করতে থাকে, তারা তো যোগ্যতার মূলকেই দান করে ফেলে। তাই তাদের নফল ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে ফরজ ইবাদতও আদায় হয়ে যায়। যেমন নামাজের ক্বেরাত সম্পর্কে নির্দেশ এসেছে, 'কোরআন থেকে যা পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ হয়, তাই পাঠ

www.eelm.weebly.com

করো।' এই নির্দেশানুযায়ী একটি বড় অথবা তিনটি ছোট আয়াত পাঠ করলেই ক্বেরাতের ফরজ আদায় হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি এক রাকাতে সমস্ত কোরআন পাঠ করে ফেলে তবে কি তার ক্বেরাত সম্পর্কিত ফরজ আদায় হবে না? নিশ্চয়ই হবে। কারণ, সমস্ত কোরআন পাঠ যদিও নফল, তবুও সে নফল আদায় করতে গিয়ে নিশ্চয় ফরজও আদায় করে ফেলেছে। প্রকৃত কথা এই যে, 'কোরআন থেকে যা পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ হয়, তাই পাঠ করো' এবং 'লোকে যা জিজ্ঞেস করে— তারা কী ব্যয় করবে? বলো, যা উদ্বৃত্ত'। বিধান দু'টি একই পর্যায়ের।

'এভাবে আল্লাহ্ তাঁর নির্দশন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করো ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে'- আল্লাহ্পাক সুস্পষ্টরূপে দলিল-প্রমাণ ও বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেন। এ হচ্ছে আল্লাহ্পাকের নির্দশন। এরকম নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করা কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব। কারণ, তিনি সকল প্রকার ক্রিয়া-কান্ডের কল্যাণজনক পরিণতি সম্পর্কে অবগত। কাজেই নির্বিবাদে তাঁর নির্দেশ ও নিষেধ বাস্তবায়নে মনোযোগী হও। তাহলেই তোমরা লাভ করবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ। এখানে 'কাজালিকা' শব্দের 'কাফ' অক্ষরটি একটি উহ্য মাছদার (মূলধাতু) থেকে বিশেষিত হয়েছে। ফলে অর্থ দাঁড়িয়েছে এরকম— আল্লাহ্পাক তোমাদের নিকট পরিষ্কারভাবে আয়াত বর্ণনা করেন, যেমন— দান-খয়রাত ইত্যাদি। আর 'কাজালিকা' শব্দের মাধ্যমে একবচনসূচক সম্বোধন করা হলেও অর্থ গ্রহণ করতে হবে বহুবচনের। অথবা মনে করতে হবে এখানে রসুল স.কে একক সম্বোধনের মাধ্যমে সকল উম্মতকে একীভূত করা হয়েছে। অন্য আয়াতে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন— 'হে নবী! যখন আপনারা স্ত্রীলোকদেরকে তালাক প্রদান করেন।' কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের অর্থ হবে এরকম— আল্লাহ্পাক তোমাদের জন্য ওই সকল আয়াত বর্ণনা করেন, যেগুলো তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে— ইহকালেও। পরকালেও। কাজেই তোমরা চিন্তাভাবনা করে দেখো। কেউ কেউ আবার বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যা করতে হবে এভাবে— তোমরা ওই সকল বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করো— যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর অবলম্বন করো ওই বিষয়াবলীকে যেগুলো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। জীবন ধারনের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ গ্রহণ করো, অতিরিক্তগুলো দান করে দাও। এভাবে অর্জন করো ইহকাল ও পরকালের সকল কল্যাণ। চিন্তাগবেষণা করে দেখো কোন কাজটি চিরস্থায়ী ও অধিক কল্যাণজনক।

হজরত আলীর বর্ণনায় রয়েছে- রসুল স. বলেছেন, পৃথিবী পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে সরে যায় এবং নিকটবর্তী হতে থাকে পরকাল। তোমরা পরকালেই চিরস্থায়ী হবে, পৃথিবীতে নয়। হিসাববিহীন পৃথিবীতে রয়েছে কেবল আমল এবং আমলবিহীন আখেরাতে রয়েছে কেবল হিসাব। বোখারী। বায়হাকী কর্তৃক এই বর্ণনাটি এসেছে হজরত জাবের থেকে।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় রয়েছে— একবার রসুল স. চাটাইয়ের উপর শুয়ে ছিলেন। উঠে বসলে দেখা গেলো তাঁর পবিত্র শরীরে মুদ্রিত হয়েছে চাটাইয়ের দাগ। আমি নিবেদন করলাম, হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি নির্দেশ করলে আরামদায়ক শয্যার ব্যবস্থা করতাম। তিনি স. বললেন, এ পৃথিবীর সঙ্গে আমার কীইবা সম্পর্ক? এখানে তো আমি ওই পরিব্রাজকের মতো যে বিশ্রামের জন্য ক্ষণকাল বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করে। তারপর উঠে চলে যায়। আহমদ, তিরমিজি। হজরত আবু দারদা থেকে মারফু সূত্রে ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— তোমাদের সম্মুখে রয়েছে গভীর গহ্বর। পাপের বোঝা নিয়ে তোমরা সে গহ্বর অতিক্রম করতে পারবে না। বায়হাকী।

'এতিমদের সম্পদের নিকটবর্তী হইওনা উত্তম পন্থা ব্যতীত' এবং 'নিশ্চয়ই যারা এতিমদের সম্পদ ভক্ষণ করে, তারা জুলুম করে।'— যখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো তখন সকল মুসলমান ভীতসন্ত্রস্ত হলেন। তাঁরা এতিমের সম্পদ নিজেদের সম্পদ থেকে পৃথক করে ফেললেন। আহার্যদ্রব্যও প্রস্তুত হতে লাগলো পৃথকভাবে। খাদ্যভক্ষণের পর এতিমদের বেঁচে যাওয়া খাদ্য কেউ খেতেন না। ফলে তা নষ্ট হয়ে যেতো। এ অপচয়ও তাঁরা মেনে নিতে পারলেন না। তাই রসুল স. এর স্মরণাপন্ন হলেন। আর ঠিক তখনই অবতীর্ণ হলো 'লোকে তোমাকে পিতৃহীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বল! তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সঙ্গে একত্রে থাকো, তবে তারাতো তোমাদের ভাই। আল্লাহ জানেন কে হিতকারী ও কে অনিষ্টকারী।' এ কথার মাধ্যমে এতিমদের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিকে সহজসাধ্যতার মধ্যে এনে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, পিতৃহীনদের বিষয়-আশয় পৃথক করে রাখা যেতে পারে— আবার তাদের সঙ্গে একত্রাহারেও দোষ নেই। কারণ, তারা তোমাদের ভাই। তাঁদের সঙ্গে রয়েছে তোমাদের ধর্মীয় সম্পর্ক। কখনোও আবার বংশগত সম্পর্ক। ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সহানুভূতি শুভেচ্ছা। এ বন্ধনের কারণে একে অপরের সম্পদ থেকে উপকার গ্রহণ করতে পারে। আর আল্লাহপাকতো একথা জানেনই যে, কে হিতকারী— কে অনিষ্টসাধনকারী। আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলে দিতে পারতেন। অর্থাৎ পিতৃহীনদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিধানটিকে শিথিল করতেন না। ফলে পিতৃহীনদের পৃথক তত্ত্বাবধান তোমাদের নিকট হয়ে যেতো কঠিন।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।' অর্থাৎ তিনি তাঁর দাসদের প্রতি যেমন ইচ্ছা তেমনই বিধান বলবৎ করতে পারেন, সহজ অথবা কঠোর। কিন্তু তিনি প্রজ্ঞাময় বলেই আপন মাহাত্ম্যে কুশলতার সঙ্গে সহজসাধ্য বিধান দান করেন।

বাগবী বলেছেন, মক্কায় অন্তরীণ মুসলমানদেরকে গোপনে উদ্ধার করার জন্য রসুল স. হজরত আবু মারসাদকে মক্কায় পাঠালেন। এ সংবাদ জানতে পেরে আনাক নাম্নী এক নারী তাঁর কাছে এলো। মূর্খতার যুগে হজরত আবু মারসাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট

www.eelm.weebly.com

সম্পর্ক ছিলো। সে হজরত আবু মারসাদকে নির্জন সহবাসের প্রস্তাব দিলো। তিনি বললেন, আমি তো এখন মুসলমান। আনাক বললো, তুমিতো আমাকে বিয়ে করতে পারো। তিনি বললেন, রসুল স. এর অনুমতি নিতে হবে। আনাক বললো, বুঝেছি তুমি টালবাহানা করছো— একথা বলেই সে চিৎকার জুড়ে দিলো। চিৎকার শুনে ছুটে এলো মক্কার মুশরিকেরা। তারা হজরত আবু মারসাদকে প্রহার করলো। হজরত আবু মারসাদ মদীনায় ফিরে এলেন। রসুল স. সমীপে নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আনাককে আমি বিয়ে করতে পারবো কিনা? তখন অবতীর্ণ হলো—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২২১

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

❑ অংশীবাদী নারীকে ধর্মে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ করিও না। অংশীবাদী নারী তোমাদিগকে চমৎকৃত করিলেও নিশ্চয় ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তাহা অপেক্ষা উত্তম। ধর্মে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সহিত তোমরা বিবাহ দিও না, অংশীবাদী পুরুষ তোমাদিগকে চমৎকৃত করিলেও ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাস তাহা অপেক্ষা উত্তম। উহারা অগ্নির দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তাহারা উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে।

ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম, ওয়াহেদি এবং মুকাতিল থেকে বর্ণনা করেছেন, সাহাবী হজরত আবু মারসাদ সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়নি। তিনি ব্যভিচারিনী আনাককে বিয়ে করা যাবে কি না জানতে চেয়েছিলেন। এ জানতে চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিলো সুরা নূরের ওই আয়াত যেখানে বলা হয়েছে, ব্যভিচারিনীকে বিয়ে করবে ব্যভিচারী। এ রকম বলেছেন ইমাম সুয়ূতি। আবু দাউদ, তিরমিজি। আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদী ও খৃষ্টান রমণীদের উদ্দেশ্যে। 'তোমাদের পূর্বের গ্রন্থধারীদের সধবা রমণীগণ'– এ আয়াতের মাধ্যমে ইহুদী ও খৃষ্টান নারীদেরকে বিবাহ করা বৈধ করে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু গ্রন্থধারীরা প্রকৃতপক্ষে মুশরিক (অংশীবাদী)। কারণ, তারা হজরত উযায়ের ও হজরত ঈসার পূজা করে। তাই এ আয়াত দ্বারা পূর্বেকার বৈধতা রহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, অংশীবাদী নারীকে বিবাহ কোরো না যতোক্ষণ না তারা ইমান আনে। আরও বলা হয়েছে সম্পদ ও রূপ-যৌবনের দিক দিয়ে অংশীবাদী নারী তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও তাদের চেয়ে বিশ্বাসিনী ক্রীতদাসীই উত্তম। বাগবী বলেছেন, আয়াতটি নাজিল হয়েছে খামাসা সম্পর্কে। খামাসা ছিলেন হজরত হুজায়ফা বিন ইয়ামিনের সুন্দরী ক্রীতদাসী। হজরত হুজায়ফা তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করেছিলেন। আবু মালিক ও ওয়াকিদির উদ্ধৃতি সূত্রে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে ওয়াহেদী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার এক কুদর্শন ক্রীতদাসী ছিলো। একদিন তিনি রাগান্বিত হয়ে তাঁর ওই দাসীকে চড় মেরেছিলেন। পরে অনুতপ্ত হয়ে তিনি ঘটনাটি রসুল স.কে জানালেন। রসুল স. বললেন, ক্রীতদাসীটি কি রকম? হজরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা বললেন, সে ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে রোজা প্রতিপালন করে এবং সুন্দরভাবে অজু করে নামাজ পাঠ করে। রসুল স. বললেন, তাহলে সে তো মু'মিনা (বিশ্বাসিনী)। হজরত ইবনে রাওয়াহা বললেন, হে আল্লাহর প্রিয় রসুল! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আমি তাকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করবো। তিনি তাই করলেন। কিছু লোক এর জন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করলো। ক্রীতদাসীকে বিয়ে করাই ছিলো এই ভর্ৎসনার কারণ। ভর্ৎসনাকারীরা এক স্বাধীনা রমণীকে দেখিয়ে বললো, এই মেয়েটিকে বিয়ে করো। এ ক্রীতদাসী নয়। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতটি। আয়াতের বক্তব্য থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, সম্পদবতী, সুন্দরী ও অসৎচরিত্রা নারীর চেয়ে দরিদ্র, সৎচরিত্রা ও ধর্মপরায়ণা কুদর্শন রমণী উত্তম। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, নারীদেরকে বিয়ে করা হয় ধর্ম, চরিত্র, রূপ ও ধনের কারণে। কিন্তু অগ্রাধিকার দেয়া উচিৎ ধর্মপরায়ণাতাকে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীর সম্পদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হচ্ছে চরিত্রবতী নারী। মুসলিম। হজরত আবু সাঈদ খুদরীও মারফু পদ্ধতিতে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, রমণী সংশ্রব থেকে ব্যবধান রচনা করো। বনী ইসরাইলদের প্রধান ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো রমণীর কারণে। মুসলিম।

আয়াতের পরবর্তী বক্তব্য নারীদের প্রতি। বলা হয়েছে, হে বিশ্বাসিনী রমণীকুল! তোমরা অংশীবাদী পুরুষকে পতি হিসেবে গ্রহণ কোরো না। অথবা সম্বোধন করা হয়েছে অভিভাবককুলকে— হে অভিভাবকবৃন্দ! তোমরা তোমাদের

www.eelm.weebly.com

অভিভাবকত্বাধীন নারীকে মুশরিকদের সঙ্গে বিবাহবন্ধ কোরো না। অর্থাৎ ইহুদী খৃষ্টানদের সাথে বিয়ে দিও না। প্রশাসক বা বিচারকদের প্রতিও এমতো সম্বোধন করা হয়ে থাকতে পারে। আয়াতের বক্তব্যানুযায়ী একথা পরিষ্কার যে, ইমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত বিধর্মীদের সঙ্গে কোনো মু'মিনাকে বিয়ে দেয়া যাবে না। সে বিধর্মী ইহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক যেই হোক না কেনো। বিধর্মীরা রূপবান, সম্পদশালী কিংবা অন্য কোনো গুণসম্পন্ন হলেও তাদের চেয়ে মুসলমান ক্রীতদাস উত্তম। বিধর্মীদের আহবান আগুনের দিকে আর আল্লাহ্‌র আহবান ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। আল্লাহ্‌র আহবান অর্থ নবী রসুলগণের আহবান। অথবা তাঁদের প্রতিনিধি আল্লাহর অলিগণের আহবান। এই আহবানে সাড়া দিলে ক্ষমা ও জান্নাত অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং আউলিয়াগণের সংসর্গে অবস্থান করা উচিত।

'আল্লাহ্‌পাক মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শন সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে'- একথার অর্থ, আল্লাহর নিদর্শনাবলীই মানুষের উপকার গ্রহণের মাধ্যম। আল্লাহু আ'লাম।

হজরত আনাস থেকে বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, ইহুদীরা তাদের ঋতুবতী স্ত্রীদের সঙ্গে একত্রাহার করতো না। তাদের সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করতো না। সাহাবা কেরাম একথা রসুল স. এর নিকট উপস্থাপন করলেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচনা উত্থাপনকারী সাহাবী ছিলেন হজরত সাবেত বিন দাহ্‌দাহ্‌। সুদ্দী থেকে ইবনে জারীর এরকম বলেছেন। এ প্রসঙ্গটির প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহপাক অবতীর্ণ করলেন—

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২২২, ২২৩

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا

تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ

فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ

مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

❑ লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'উহা অশুচি।' সুতরাং তোমরা রজঃস্রাব কালে স্ত্রী-সংগ বর্জন করিবে; এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হওয়া

www.eelm.weebly.com

পর্যন্ত স্ত্রী সংগম করিবে না। সুতরাং তাহারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হইবে তখন তাহাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করিবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন। আল্লাহ্ তওবাকারী এবং যাহারা পবিত্র থাকে তাহাদিগকে পছন্দ করেন।

❒ তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্য-ক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্য-ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করিতে পার। পূর্বাহ্নে তোমরা তোমাদের জন্য কিছু করিও এবং আল্লাহ্কে ভয় করিও। আর জানিয়া রাখিও যে তোমরা আল্লাহের সম্মুখীন হইতে যাইতেছ এবং বিশ্বাসীগণকে সুসংবাদ দাও।

'ইয়াস আলুনাকা' শব্দটি ইতোপূর্বে উল্লেখিত তিনটির স্থলে 'ওয়াও' (এবং) ব্যতীত উল্লেখিত হয়েছে। পরের তিনটির স্থলে উল্লেখিত হয়েছে 'ওয়াও' সহযোগে। এ আয়াতের (২২২) শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে 'ওয়াও' সহযোগে (ওয়া ইয়াস আলুনাকা)। প্রথমে প্রশ্ন করে তার জবাব দিয়েছেন আল্লাহ্পাক। প্রশ্নটি রজঃস্রাব সম্পর্কিত। রজঃশীলা নারীর সঙ্গে কী রকম আচরণ করতে হবে এটাই ছিলো প্রশ্ন। আল্লাহ্পাক তার জবাব দিয়েছেন এভাবে— হে নবী! আপনি বলুন, ওটা হচ্ছে অশুচি। সুতরাং রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গম বর্জন করবে এবং পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীসঙ্গম করবে না। এখানে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করার অর্থ একত্রাহার, এক শয্যায় শয়ন ইত্যাদি পরিত্যাগ করা নয়। পরিত্যাগ করতে হবে কেবল সঙ্গম।

ইতোপূর্বে হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে— এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে রসুল স. বলেছিলেন, সম্ভোগ ছাড়া আর সবকিছুই তোমরা করতে পারবে। জননী আয়েশা বলেছেন— আমার ঋতুবতী অবস্থাতে আমি ও রসুল স. একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তখন শয়নকালে তিনি আমাকে অন্তর্পরিধেয় পরে নিতে বলতেন এবং আমার পাশে শুয়ে পড়তেন। তিনি যখন মসজিদে এতেকাফ করতেন তখন তাঁর পবিত্র মস্তক জানালা দিয়ে হুজরার দিকে এগিয়ে দিতেন এবং আমি ঋতুবতী অবস্থায়ও তাঁর মাথা ধুয়ে দিতাম। বোখারী, মুসলিম। জননী আয়েশা আরও বলেছেন, রজঃশীলা অবস্থায় আমি যে পাত্রের যে স্থানে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতাম তিনিও সেই পাত্রের সেই স্থানে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতেন। খাবার সময় আমি হাড় চুষে তাঁকে দিতাম তিনিও তখন সে হাড়টি চুষতেন। মুসলিম। তিনি আরও বলেছেন, আমার হায়েজ অবস্থাতেও তিনি আমার কোলে মাথা রেখে কোরআন পাঠ করতেন। জননী আরও বলেছেন, তিনি স. মসজিদ থেকে ডেকে বলতেন, আয়েশা আমার বিছানাটা দিয়ে দাও। আমি বলতাম আমি যে অপবিত্রা। তিনি বলতেন, তোমার হাততো অপবিত্র নয়?

জননী মায়মুনা বলেছেন, প্রিয়তম রসুল স. যে চাদর গায়ে জড়িয়ে নামাজ পাঠ করতেন সে চাদরের একপ্রান্ত গায়ে জড়িয়ে শুয়ে থাকতাম আমি। অথচ আমি ছিলাম তখন ঋতুবতী। বোখারী, মুসলিম। তিনি আরও বলেছেন, আমি ঋতুকালীন অবস্থার

www.eelm.weebly.com

পোষাক পরেছিলাম। তিনি স. বললেন, তুমি কি রজঃশীলা? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তখন আমার সঙ্গে এক চাদরের নিচে শয়ন করলেন।

আয়াতে বলা হয়েছে— 'পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম করবে না'— (অলা তাক্বরাবো হুন্নাহ হাত্তা ইয়াত্ হুরনা) ক্বারী আবু বকর, হামজা ও কাসায়ী বলেছেন— ক্বারী আসেম 'ইয়াত হুরনা' শব্দটিকে পড়তেন 'ইয়াত্তাহ হারনা' (ত্বোয়া এবং হা অক্ষরে তাশদীদ সহযোগে)। অন্য ক্বারীগণ 'ইয়াত্ হুরনা'ই পড়েছেন। উচ্চারণভিন্নতার কারণে অর্থগত তারতম্যও হওয়া উচিৎ। কিন্তু ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত হচ্ছে— এখানে অর্থগত তারতম্যের অবকাশ নেই। তাঁদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঋতুস্রাব বন্ধ হলেও স্ত্রী সঙ্গম বৈধ হবে না যতোক্ষণ না তারা গোসল করে পবিত্র হয়। ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে— উচ্চারণ ভিন্নতার কারণে অর্থগত তারতম্য হবে। 'ইয়াত্হুরনা' অর্থ হবে— ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর পবিত্র হলে। আর 'ইয়াত্তাহ্হারনা' অর্থ হবে ঋতুস্রাবের পর গোসলের মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে। অর্থাৎ প্রথম অর্থ অনুযায়ী ঋতুস্রাব বন্ধ হলেই সঙ্গম করা যাবে। কিন্তু পরের অর্থানুযায়ী ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর সঙ্গম বৈধ হবে না যতোক্ষণ না গোসল করা হয়। মোট কথা, ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য হচ্ছে— দশদিন পর ঋতুস্রাব বন্ধ হলে গোসল না করা সত্ত্বেও সহবাস করা যাবে। আর দশদিন হওয়ার আগে বন্ধ হলে গোসল না করা পর্যন্ত সহবাস করা যাবে না। উচ্চারণভিন্নতার কারণে এরকমই অর্থ দাঁড়ায়। কিন্তু 'ইয়াত্তাহ্হারনা' বললে গোসলের পূর্বে সঙ্গম নিষিদ্ধ-এরকম কোনো ইঙ্গিত কিন্তু এখানে নেই। যদি তাই হয় তবে 'ইয়াত্ হুরনা' উচ্চারণের ক্ষেত্রে গোসলের পূর্বে সহবাস বৈধ হয় কীভাবে? এর জবাব হচ্ছে বাক্যের প্রকাশভঙ্গি দ্বারাই অর্থ নিরূপিত হয়। যাই হোক, এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম হারাম।

ঋতুকালীন অবস্থায় স্ত্রীসম্ভোগ করলে কাফফারা দিতে হবে কি না সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, কাফফারা ওয়াজিব নয়। ক্ষমাপ্রার্থনা (ইসতেগফার) করলেই যথেষ্ট হবে। ইমাম শাফেয়ীর দুইটি অভিমতের একটি এরকমই। ইমাম আহমদ বলেছেন, এক দিনার সদকা করতে হবে। না পারলে সদকা করতে হবে অর্ধ দিনার। ইমাম শাফেয়ীর দ্বিতীয় অভিমতটি এই— ঋতুকালীন অবস্থার প্রথমদিকে সম্ভোগ করলে এক দিনার এবং শেষ দিকে করলে অর্ধ দিনার দিতে হবে। হজরত ইবনে আব্বাস ঋতুকালীন অবস্থায় সম্ভোগকারীর বিধান জানতে চাইলে রসুল স. বলেছিলেন, এক অথবা অর্ধ দিনার দান করতে হবে। বর্ণনাটি ইমাম আহমদ ধারাবাহিকরূপে ইয়াহ্ইয়া, শা'বা, হাকাম, আবদুল হামিদ ও মুকিম থেকে উপস্থাপন করেছেন। সুনান রচয়িতাগণ ও দারা কুতনীও এ রকম বর্ণনা এনেছেন। বোখারী ও মুসলিমেও এ রকম বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু মুকিমের বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন কেবল বোখারী। ইবনে কাত্তান, হাকেম এবং দাকিকুল ঈদ বর্ণনাটিকে অতি বিশুদ্ধ বলেছেন। এটিকে মওকুফ পদ্ধতিতে বর্ণনা

www.eelm.weebly.com

করাতেও অসুবিধা নেই। কারণ যারা নির্ভরযোগ্য তাঁদের মওকুফ বর্ণনাও মারফু হিসাবে গৃহিত হয়। ইমাম শাফেয়ীর প্রথম অভিমতের প্রেক্ষিতে আলেমগণ বলেছেন— হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, রক্তের রং যখন হলুদ হয়ে যায় তখন সম্ভোগ করলে অর্ধ দিনার জরিমানা দিতে হবে, আর রক্তের রং লাল হলে, দিতে হবে পুরো দিনার। এই বর্ণনাটির ভিত্তি আবদুল করিম আবু উমামা— যে ঐকমত্যসূত্রে পরিত্যক্ত। আবু আইয়ুব সখতিয়ানী তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। আহমদ এবং ইয়াহইয়ার মতে সে নির্ভরযোগ্য নয়।

ঋতু অবস্থায় সম্ভোগ ছাড়া অন্যান্য আদর অনুরাগ বৈধ কি না সে সম্পর্কে ওলামাগণের মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। রতিক্রিয়া ব্যতীত অন্যান্য উপভোগ বৈধ হওয়ার পক্ষে রয়েছেন ইমাম আহমদ। জমহুর বলেছেন, অন্যভাবে আস্বাদন জায়েয নয়। ইমাম আহমদের সমর্থনে রয়েছে হজরত আনাসের ওই হাদিসটি, যেখানে বলা হয়েছে— রতিকর্ম ছাড়া যা কিছু ইচ্ছা করতে পারো। রসুল স. এর কতিপয় পবিত্র পত্নী থেকে ইকরামা এই বর্ণনাটি এনেছেন— রসুল স. তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীগণের সঙ্গে বাহ্যিকভাবে মেলামেশা করতেন এবং তখন তাঁদের নিম্নাঙ্গে ব্যবহার করতে বলতেন অতিরিক্ত বস্ত্র। ইবনে জাওজী। হজরত মুআজ বিন জাবালের হাদিসটি জমহুরের দলিল। হজরত মুআজ বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম— হে অনুগ্রহের নবী! ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে আমি কী রকম আচরণ করবো? তিনি স. বললেন, পাজামা পরিহিত অবস্থায় সবকিছু করতে পারবে। তবে দূরে থাকাই উত্তম। রজীন। মুহিউস সুন্নাহ বলেছেন, এই হাদিসের সনদগুলো তেমন শক্তিশালী নয়। এরকম বর্ণনা এসেছে আবদুল্লাহ্ থেকেও। আবু দাউদের উদ্ধৃতিতেও এরকম রয়েছে। হজরত জায়েদ বিন আসলাম বলেছেন, এক লোক রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমি আমার রজঃশীলা ভার্যাকে কীভাবে ব্যবহার করবো। তিনি বললেন, তাকে পাজামা পরিয়ে দাও— তারপর যথেচ্ছ ব্যবহার করো। মুরসাল পদ্ধতিতে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন ইমাম মালেক ও দারেমী। এ ব্যাপারে প্রত্যায়িত সিদ্ধান্ত এই যে, রিপু নিয়ন্ত্রণে থাকলে পাজামার উপর যে কোনো ধরনের সম্ভোগ বৈধ। কোরআনের বিধানে কেবল যৌনাচার নিষিদ্ধ। অন্য ব্যাপারে নিষিদ্ধতা নেই।

এ বিষয়ে আলেমগণ একমত যে, ঋতুগ্রস্তা রমণীদেরকে নামাজ পড়তে হবে না। পরে কাজাও আদায় করতে হবে না। কিন্তু রোজার নিয়ম ভিন্ন। ঋতু অবস্থায় রোজা রাখা যাবে না, কিন্তু পরে তার কাজা আদায় করতে হবে। মাতা আয়েশা বলেছেন, রসুল স. আমাদেরকে রোজার কাজা করতে বলতেন কিন্তু নামাজের কাজা করতে বলেননি। মুসলিম, তিরমিজি। হাদিসটি প্রসিদ্ধ ও গুরুত্ববহ। অধিকাংশ সাহাবা এই বর্ণনাটি করেছেন। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এক রমণীকে বলেছিলেন, ব্যাপারটা কী এরকম নয় যে, হায়েজের সময় তোমাদের নামাজ ও রোজা নেই। আরেক মহিলাকে তিনি স. বলেছিলেন, ঋতু শুরু হলে নামাজ পরিত্যাগ কোরো।

www.eelm.weebly.com

ঋতু অবস্থায় নামাজ পড়া, মসজিদে যাওয়া, তাওয়াফ করা, এবং কোরআন মজীদ স্পর্শ করা ঐকমত্যসূত্রে নিষিদ্ধ। রসুল স. বলেছেন, ঋতুবতী নারীদের জন্য মসজিদের প্রবেশ পথ বন্ধ করে দাও। আবু দাউদ। তিনি স. আরও বলেছেন, ঋতুবতীরা যেনো কোরআন না পড়ে। তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারা কুতনী। ইমাম দারা কুতনী বর্ণিত হজরত জাবেরের হাদিসটিও এই বিবরণটির সমর্থক। কিন্তু বর্ণিত দু'টি হাদিসের সনদই সন্দেহযুক্ত। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

'তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন'— এখানে 'তাতাহ্হারনা' শব্দটি সকল ক্বারীর উচ্চারণে একই রকম। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ঋতুত্তর সম্ভোগের জন্য গোসল শর্ত। 'তাদের নিকট সেভাবে গমন করবে'— অর্থ পরিশুদ্ধ অবস্থায় তাদেরকে সম্ভোগ করা বৈধ (মোবাহ)। এতে করে বুঝা যায়— সম্ভোগ বা সহবাস ওয়াজিব (অপরিহার্য) নয় বরং মোবাহ (বৈধ)। আর 'যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন'— একথার অর্থ, আল্লাহপাকের নির্দেশ হচ্ছে, সম্ভোগে যথাঅঙ্গ ব্যবহার করতে হবে। মুজাহিদ, কাতাদা ও ইকরামা বলেছেন, নারীঅঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনো অঙ্গের মাধ্যমে যৌনচরিতার্থতা আল্লাহ্পাকের বিধানানুযায়ী নিষিদ্ধ। হজরত ইবনে আব্বাসও একথা বলেছেন। কতিপয় তাফসীরবিদ বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত মিন (থেকে) অব্যয়টির অর্থ হবে ফি (মধ্যে)। অর্থাৎ যে অঙ্গ সম্ভোগের অনুমতি দেয়া হয়েছে, সে অঙ্গই ব্যবহার করতে হবে। ইবনে হানাফিয়া বলেছেন, যে পথ বৈধ সে পথে, যে পথ অবৈধ সে পথে নয়।

'আল্লাহ তওবাকারী এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন'-অর্থাৎ যারা ঋতুবতীদেরকে সম্ভোগ করে না এবং যৌন মিলনে অবৈধ অঙ্গ ব্যবহার করে না, তারা আল্লাহ্পাকের প্রিয়। অবশ্য যৌনমিলন মাত্রই অপবিত্র। বৈধাবৈধ সকল প্রকার সম্ভোগেই শরীর অপবিত্র হয়। তাই সম্ভোগের পর গোসল ফরজ করা হয়েছে। যথাঅঙ্গে যৌনচরিতার্থতার অনুমতি এজন্যই দেয়া হয়েছে যে, এতে করে মানব বংশের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকবে। তবে এই অনুমতি কতকগুলো বিধানের অধীন। যেমন, বিবাহ করতে হবে; যাদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ কেবল তাদেরকেই। স্ত্রীকে হতে হবে ঋতুগ্রস্তাহীন, নারীঅঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনো অঙ্গ ব্যবহার করা যাবে না। ইত্যাদি।

সমকাম অবৈধ। বিধানটি ঐকমত্যের মাধ্যমে সুসাব্যস্ত। হজরত লুত আ. এর সম্প্রদায় সমকামে লিপ্ত হওয়ার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আর স্ত্রীর সঙ্গে পায়ুসঙ্গম বৈধ নয়। আল্লাহ্পাক তাই পরবর্তী আয়াতে বলেছেন, তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র। একথার অর্থ শস্যক্ষেত্রে যেমন ফসলের বীজ বপন করা হয়, তেমনি শস্যভূমি তুল্য জরায়ুতে বপন করা হয় বীজ তুল্য বীর্য। ভূমিতে যেমন উৎপন্ন হয় ফসল, তেমনি রমনীগর্ভে আবির্ভূত হয় মানব শিশু। আয়াতের

www.eelm.weebly.com

বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে একথাটিই সুস্পষ্ট হয় যে, সম্ভোগ যদিও সুখকর, তবুও তা মূল উদ্দেশ্য নয়। সহবাসের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানববংশ বিস্তার।

'অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পারো'— যেভাবে ইচ্ছা বুঝাতে আয়াতে 'আন্না' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি বহু অর্থবোধক। এখানে যেভাবে ইচ্ছা বা যেমন ইচ্ছা অর্থটি অধিক সংগতিপূর্ণ।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, সম্ভোগকর্মে স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বার ব্যবহার করা বৈধ নয়। ইমাম মালেক থেকে এ সম্পর্কে দু'রকম অভিমত পাওয়া যায়। প্রথমে তিনি এটাকে জায়েয বলেছিলেন। কিন্তু পরে এই অভিমতটি পরিত্যাগ করেছিলেন। ইমাম শাফেয়ী থেকেও দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে এই— — রসুল স. যখন স্পষ্ট করে বিষয়টিকে হালাল বা হারাম বলেন নি তাই হালাল হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। ইবনে আবদুল হাকামের বক্তব্যটি ছিলো এই ধরনের— যেমন কেউ তার স্ত্রীর বগল, পাঁজর, উরু ইত্যাদি অঙ্গে রতিকর্মের স্বাদ অনুভব করতে চায়, তবে তা বৈধ হবে। ইবনে আবদুল হাকামের বক্তব্যকে সনদসহ হাকেম উল্লেখ করেছেন এ রকম— আমি ইমাম শাফেয়ীর সম্মুখে বিষয়টি তুললাম। তিনি বললেন, মোহাম্মদ বিন হাসানও আমাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি তাকে বলেছিলাম, এ সম্পর্কিত বিবরণের সনদগুলো সম্পর্কে তুমি তো জানোই। এখন তুমি কি চাও? বিতর্ক না সমাধান। তিনি বললেন, আমি সমাধান চাই। কিন্তু জানতে চাই কোন দলিলের মাধ্যমে আপনি একে হারাম বললেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন।' আরো বললেন, 'তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পারো।' এতে করে বুঝা যায়, স্ত্রীঅঙ্গ ব্যবহার করাই আল্লাহ্পাকের নির্দেশ এবং এই অঙ্গই শস্যক্ষেত্র তুল্য। এই শস্যক্ষেত্রে যেভাবে খুশী সেভাবে বীজ বপণ করা যায়। ভূমি ব্যতিরেকে যেমন শস্য উৎপাদিত হয় না, তেমনি স্ত্রীঅঙ্গ ব্যতীত মানব শিশুও জন্মলাভ করে না। আমি বললাম, তবে কি ওই একপথ ছাড়া অন্য সকল পথই হারাম? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কেউ যদি স্ত্রীর হাতে, বগলে, কিংবা উরুতে সম্ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করতে চায়, তবে সেটাও কি হারাম? তিনি বললেন, না। আমি পুনঃ প্রশ্ন করলাম, তবে যে আয়াতকে আপনি দলিল হিসাবে পেশ করলেন, সেটা নিশ্চয় সঠিক দলিল নয়। তিনি বললেন, আল্লাহ্পাক অন্যত্র বলেছেন, 'আর যারা তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে।' এখানে স্পষ্ট করে যথাঙ্গের কথা বলা হয়েছে। আমি বললাম, দেখুন এটাই সেই দলিল, যদ্দারা আলেমগণ পশ্চাৎদ্বারের যৌনমিলনকে সিদ্ধ বলেছেন। কারণ, আপনি যে আয়াত উল্লেখ করেছেন, তাতে লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে— একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক ওই সকল লোকের প্রশংসা করেছেন, যারা আপন ক্রীতদাসী ও সহধর্মিণী ব্যতীত অন্যের প্রতি ইন্দ্রিয়লালসা মুক্ত।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, আমাদের অভিমত হচ্ছে, স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বার ব্যবহার হারাম। কারণ, এ কর্মটি অত্যন্ত অপকৃষ্ট ও অশ্লীল। তাই ইমাম শাফেয়ী পরবর্তীতে এই অভিমতটিকেই গ্রহণ করেছেন। হাকেম বলেছেন, পরবর্তীতে তিনি এ কর্মটিকে হারাম বলেই অভিহিত করেছেন। রবী বলেন, এতদ্সম্পর্কে রবীয় হজরত ইমাম শাফেয়ী থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা মিথ্যা। মহামান্য ইমাম তাঁর সুনানে বিষয়টিকে হারামই বলেছেন। অনেক আলেম কর্তৃক বিষয়টি উদ্ধৃত হয়েছে। মাওয়ারদি আবু নসর বিন সাবাহ্ এবং অন্যান্য আলেম রচিত গ্রন্থাবলীতে একথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী আবার ইবনে আবদুল হাকামের সমর্থন করে বলেছেন, তিনিই বিষয়টির একক বর্ণনাকারী নন। বরং তার ভাই আবদুর রহমানও বর্ণনাকারীদের একজন।

ইমাম শাফেয়ীর সর্বশেষ মত জমহুরের সমান্তরাল। অননুমোদিত অঙ্গকে জমহুরও হারাম বলে উল্লেখ করেছেন। এর সমর্থনে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে জাওজী বলেছেন, এ সম্পর্কিত অধিকাংশ হাদিস বর্ণনা করেছেন সাহাবায়ে কেরাম। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত খুজাইমা, হজরত আবু হোরায়রা, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত ইবনে ওমর, হজরত আমর ইবনে আস, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত উকবা বিন আমর, হজরত বারা বিন আজিব, হজরত আবু জর, হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ প্রমুখ।

আমি বলি, আতা বিন সালেহের মাধ্যমে হজরত ওমরের হাদিসে বর্ণনা করেছেন নাসাঈ ও বায্যার। জাম'আ তাউস থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি হাদী থেকে এবং তিনি হজরত ওমর থেকে। জাম'আ দুর্বল— আহমদ ও ইবনে আবী হাতেম এ রকম বলেছেন। জাহাবী বলেছেন, তিনি সালেহুল হাদিস। কিন্তু তাঁর বর্ণনা মওকুফ ও মারফু হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা হজরত আলীর হাদিস বর্ণনা করেছেন— এভাবে সত্য কথা বলতে আল্লাহ্পাক লজ্জাবোধ করেন না। তোমরা রমণীদের সঙ্গে নিকৃষ্ট কর্ম কোরো না। হজরত খুজাইমার হাদিসটি এ রকম— একলোক স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বারে উপগত হওয়া যাবে কি না জানতে চাইলে রসুল স. জবাব দিলেন, যাবে। লোকটি চলে যাচ্ছিলো, তিনি তাঁকে পুনরায় ডেকে বললেন, না। কক্ষনো যাবে না। সত্য কথা বলতে আল্লাহ্পাক দ্বিধাগ্রস্ত হন না। খবরদার! নারীদের পশ্চাৎদ্বার ব্যবহার কোরো না। বর্ণনাটি এনেছেন, শাফেয়ী, আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা ও দারেমী। এই সূত্রভূত আমর বিন আজনাহা একেবারে অপরিচিত। তবে এই বর্ণনাটি আবার নাসাঈ এনেছেন ইবনে সুয়াইদ বিন হেলালের সূত্রে। সূত্রটি এরকম— সুয়াইদ তাঁর পিতা আলী ইবনে সায়েব, হামীম বিন মুহসিন, হারমি বিন আবদুল্লাহ- হজরত খুজাইমা। হারমির সূত্রে আবার আহমদ, নাসাঈ ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন। হাকেম বর্ণনা করেছেন আবু আলী নিশাপুরী থেকে। নাসাঈ বলেছেন, বোখারী বর্ণনা দু'টিকে মেনে নিয়েছেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. এরশাদ

www.eelm.weebly.com

করেন, যারা স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বারে উপগত হয় তারা অভিশপ্ত। আরো বর্ণিত হয়েছে— হাশর প্রান্তরে ওই সকল লোকের প্রতি আল্লাহ্পাক সুদৃষ্টি দিবেন না, যারা নারীর পশ্চাৎদ্বার সম্ভোগ করে।

'পূর্বাহ্নে তোমরা তোমাদের জন্য কিছু করিও এবং আল্লাহ্কে ভয় করিও'— একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের জন্য কিছু সৎকর্ম কোরো। অর্থাৎ স্ত্রী সম্ভোগের মাধ্যমে সৎকর্ম সম্পাদনের ব্যাপারটিকেও যেনো গুরুত্ব দান করা হয়। সম্ভোগের হারাম পদ্ধতিকে যেনো গ্রহণ না করা হয়। আর সম্ভোগের উদ্দেশ্য যেনো এটাও থাকে যে, এই সহবাসের মাধ্যমে সৎ সন্তান জন্মলাভ করুক যারা মৃত মাতাপিতার জন্য ইস্তেগফার করবে এবং হাশরের প্রান্তরে পরিত্রাণের অসিলা হবে।

মোবাহ্ বিষয়গুলো বিশুদ্ধ নিয়তে সম্পাদন করলে ইবাদত হয়। রসুল স. এরশাদ করেন, স্ত্রীসহবাসের মধ্যেও সওয়াব রয়েছে। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমরা ইন্দ্রিয় কামনা চরিতার্থ করবো, অথচ সওয়াবের অধিকারীও হবো! তিনি স. বললেন, যারা হারাম উপায়ে লালসা চরিতার্থ করে তারা কি গোনাহ্গার নয়? তাদের হারাম কার্যে পাপ হলে তোমাদের হালাল কর্মে পুণ্য হবেনা কেনো? হজরত আবু জর থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন- মানুষ মৃত্যুবরণ করলে সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। বাকী থাকে কেবল তিনটি জিনিস। ১. সদকায়ে জারীয়া— জনকল্যাণমূলক কর্ম যার দ্বারা মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম উপকৃত হতে থাকে। ২. এলেম— যা শিক্ষার্থী পরম্পরায় জারী থাকে, মৃত্যুর পরেও যার সুফল মানুষ পেতে থাকে। ৩. সৎ সন্তান— যারা পূর্বপুরুষদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকে। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা আরো বলেছেন, রসুল স. এক আনসার মহিলাকে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে, যাকে তাদের মৃত্যুশোক সহ্য করতে হয়েছে— সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। বোখারী, মুসলিম। এক আনসারী রমণী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! যদি কেউ দু'টি শিশু সন্তান হারায়? রসুল স. বললেন, তবুও বেহেশ্তে যাবে। মুসলিম। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, যার দু'টি শিশু সন্তান মারা যায়, আল্লাহ্পাক তাঁকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। জননী আয়েশা বললেন, একটি মারা গেলে? তিনি স. বললেন, একজন মারা গেলেও। তিরমিজি।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, 'তোমরা পূর্বাহ্নে তোমাদের জন্য কিছু করো' (ওয়া কাদ্দিমু লি আনফুসিকুম) বাক্যটি পূর্বোক্ত 'তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো' এর সঙ্গে সম্বন্ধিত। এভাবে বাক্য দু'টির মিলিত অর্থ হবে এরকম— যে তার শস্যক্ষেত্রে যথানিয়মে চাষাবাদ করে সেই পূর্বাহ্নে নিজেদের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যমন্ডিত হয়।

www.eelm.weebly.com

বিবাহের মাহাত্ম প্রকাশ পায় সুসন্তান জন্মগ্রহণের মাধ্যমে। পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত না হলেও বিবাহ একটি মহৎ কর্ম। কারণ বিবাহই সৎসন্তানের আগমণ নিশ্চিত করে। আতা ও মুজাহিদ বলেছেন, 'পূর্বাহ্নে তোমরা তোমাদের জন্য কিছু কোরো'— একথার অর্থ যৌনমিলনের আগে তোমরা বিসমিল্লাহ পাঠ কোরো এবং দোয়া কোরো। বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে এসেছে, রসুল স. এরশাদ করেন, সহবাসকালে এই দোয়া পাঠ করা উচিৎ— 'আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ্ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রজাকতানা।' এই দোয়া পাঠের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, শয়তান কোনোদিন তার ক্ষতি করতে পারবে না।

'আল্লাহ্কে ভয় করো'— একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে অবৈধ যৌনচরিতার্থতা থেকে রক্ষা পাও।

'তোমরা আল্লাহ্র সম্মুখীন হতে যাচ্ছো'— একথার মাধ্যমে মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে শেষ বিচারের দিনের কথা— যখন সবাইকে তাদের কর্মফল দেয়া হবে। সৎকর্মের পরিণাম শুভ। আর অসৎকর্মের পরিণতি অশুভ।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'বিশ্বাসীগণকে সুসংবাদ দাও।' আসলে বিশ্বাসীদের সকল সংবাদই সুসংবাদ। অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই তাঁদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। সুহাইব থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন, কী বিস্ময়! বিশ্বাসীরা আনন্দিত হলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এ কারণে লাভ করে কল্যাণ। আবার বিপদে ধৈর্য ধারণ করলেও পায় কল্যাণ। মুসলিম।

বাগবী বলেছেন, একবার হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা এবং তাঁর সহোদরাপতি হজরত নোমান বিন বশীরের মধ্যে ভয়ানক বিবাদ দেখা দিলো। তখন হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা শপথ করে বললেন যে, তিনি কখনোই হজরত নোমান বিন বশীরের কাছে যাবেন না, তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাঁর কোনো ব্যাপারে আপোষ মীমাংসায় অংশগ্রহণ করবেন না। তাঁকে কেউ হজরত নোমান বিন বশীর সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন, আমি শপথ করেছি— তাঁর কোনো ব্যাপারেই আমি নেই। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

সুরা বাকারা : আয়াত ২২৪,২২৫

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ

www.eelm.weebly.com

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

❒ তোমরা সৎকার্য, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন হইতে বিরত রহিবে এই শপথের জন্য আল্লাহ্‌কে তোমরা অজুহাত করিওনা। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❒ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে দায়ী করিবেন না; কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল।

'আইমান' অর্থ শপথের বাক্যাবলী। 'উরদ্বাতান' অর্থ প্রতিবন্ধক। আয়াতের শুরুতে নির্দেশ করা হয়েছে, আল্লাহ্‌র শপথকে যেনো সৎকর্মের অন্তরায় করা না হয়। আত্মসংযম, শান্তিস্থাপন — এসবের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌পাকের শপথকে দাঁড় করানো অভিপ্রেত নয়।

কারো সামনে কোনো বস্তু নিশানা বা বাধা হিসাবে প্রোথিত করাকেও 'উরদ্বাতান' বলা যেতে পারে। যেমন আরববাসীরা বলে থাকেন, অমুক কজের জন্য অমুক বস্তু পুঁতে দিয়েছি। এই অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতের মর্ম দাঁড়াবে— কৃত শপথে আল্লাহ্‌পাককে নিশানা বা বাধা হিসেবে দাঁড় করিওনা। অর্থাৎ কথায় কথায় শপথ উচ্চারণ কোরো না।

এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পুণঃ পুণঃ শপথ করা মাকরূহ্ (অনভিপ্রেত)। অধিক শপথকারী আল্লাহ্‌পাককে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করায়— বাহাদুরী প্রদর্শনই থাকে তার এমতো কর্মের উদ্দেশ্য। এই আচরণটি আল্লাহ্‌ভীরুদের আচরণ নয়। রসুল স. বলেছেন, অধিক শপথ করলে ভেঙে ফেলতে হয় অথবা এর জন্য লজ্জিত হতে হয়। বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরায় হজরত ইবনে ওমর থেকে হাকেম এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। বোখারী তাঁর তারীখ পুস্তকেও হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। এর দ্বারা আরো একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, সৎকর্মের বিরুদ্ধে শপথ করার পর তা ভঙ্গ করলে জরিমানা (কাফফারা) দিতে হবে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন— কোনো ব্যক্তি শপথ করার পর যদি দেখে তার শপথ কল্যাণরহিত, তখন তাকে শপথ ভঙ্গ করতে হবে এবং শপথ ভঙ্গের কাফফারা দিয়ে কল্যাণের দিকে ফিরে যেতে হবে। মুসলিম। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আব্দুর রহমান বিন সামুরা থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু মুসার হাদিসে এসেছে— রসুল স. বলেছেন, আমি ইন্‌শাআল্লাহ্ বলে কোনো বিষয়ে কসম করার পর যদি দেখি, কসমের বিপরীতেই রয়েছে কল্যাণ, তবে কসমের কাফফারা দিয়ে অবশ্যই আমি কল্যাণের দিকে ধাবিত হবো। বোখারী, মুসলিম।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবুবকর সম্পর্কে। তিনি এই মর্মে কসম করেছিলেন যে, আমি মিসতাহ্ এর সঙ্গে সদাচরণ করবো না। কারণ মিসতাহ্ আয়েশাকে অপবাদ দিয়েছিলো। হজরত ইবনে জুরাইরা থেকে এই বিবরণটি উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর।

'আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'— একথার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে— আল্লাহ্‌পাক তোমাদের শপথ বাক্যগুলো শোনেন। কারণ, তিনি সর্বশ্রোতা। আর তোমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তিনি জানেন। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না।' এখানে তোমাদের দায়ী করবেন না অর্থ আখেরাতে শাস্তি দিবেন না। এরকম অর্থ হতে পারে যে, দুনিয়া ও আখেরাত— কোনো স্থানেই নিরর্থক কসমের জন্য দায়ী করা হবে না। কেউ কেউ আবার বলেছেন, অর্থহীন শপথ ভঙ্গের কারণে কাফফারা দিলে দুনিয়াতে দায়ী করা হবেনা। অর্থাৎ এখানে কেবল দুনিয়াতে দায়ী না করার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এই মন্তব্যটি ঠিক নয়। কারণ, আল্লাহ্‌র কসমের সঙ্গেই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট। এর মধ্যে পার্থিব সংশ্লিষ্টতা নেই। বিষয়টি জাকাতের মতো বিশুদ্ধ আল্লাহ্‌র হক। একারণেই জাকাত এবং কাফফারা আদায় না করে কেউ মারা গেলে উত্তরাধিকারীদের প্রতি তা আদায়ের দায়িত্ব বর্তায় না। কিন্তু ঋণ, ওশর এবং খাজনা আদায়ের দায়িত্ব মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের উপরে থেকেই যায়। আবার শপথ করলেই কাফফারা দিতে হবে— এমন নয়। বরং কাফফারা দিতে হবে শপথ ভঙ্গ করলে। কাজেই এখানে অভিযুক্ত না করার যে কথা বলা হয়েছে তা পরকালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ আখেরাতে দায়ী করবেন না। আর কাফফারা দিতে হয় অঙ্গীকারাবদ্ধতা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য, আল্লাহ্‌র দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তির জন্য নয়।

অর্থহীন শপথ বুঝাতে এখানে 'লগবু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো বিষয়ের সঙ্গে শব্দটি সংযুক্ত হলে বুঝতে হবে ওই বিষয়টি ধর্তব্যই নয়। এরকম বলা হয়েছে কামুস অভিধানে। অর্থহীন শপথ ওই নিরর্থক অঙ্গীকারের নাম যা ধারণা ও ইচ্ছা ব্যতিরেকেই ব্যক্ত করা হয়। সেই অঙ্গীকার অতীত বা ভবিষ্যৎ কালবোধক হতে পারে। পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে হয়ে থাকতে পারে। এরকম বলেছেন মাতা আয়েশা সিদ্দিকা।

শাফেয়ী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জননী আয়েশা বলেন, নিরর্থক শপথ এরকম— লা ওয়াল্লা, বালা ওয়াল্লা (আল্লাহ্‌র কসম না, আল্লাহ্‌র কসম হাঁ)। আবু দাউদ বিবরণটি পেশ করেছেন মারফু সূত্রে। শাফেয়ী ও ইকরামার মন্তব্যও অনুরূপ। একই কথা

www.eelm.weebly.com

বলেছেন ইমাম শাফেয়ীও। লগবু শব্দটির উদ্দেশ্য এরকমই। যা অনিচ্ছায় ঘটে তা ধর্তব্য নয় এবং তার মধ্যে পাপও নেই। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অর্থহীন শপথ আসলে শপথই নয়। তাই তা ভঙ্গ করার প্রশ্ন যেমন ওঠে না, তেমনি শপথ ভঙ্গের কাফফারা দেয়ার কথাও আসে না। আয়াতে 'দায়ী করা হবে না' বলে সে কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফার মতে এধরনের শপথও কার্যকর। আর এরজন্য কাফফারাও অবধারিত। কারণ রসুল স. এরশাদ করেন, তিনটি বিষয় এমন, যা সত্য বললেও সত্য, আবার ঠাট্টা করে বললেও সত্য। বিষয় তিনটি হচ্ছে— বিবাহ, তালাক ও শপথ। হেদায়া রচয়িতাও এরকম বলেছেন। কিন্তু আমরা হাদিস গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা করেও বর্ণিত হাদিসটি পাইনি। তবে হজরত আবু হোরায়রা থেকে মারফু পদ্ধতিতে আব্দুর রহমান বিন হাবিব, আতা, ইউসুফ বিন জুহাক, আবু হোরায়রা এরকম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনটি বিষয় সত্য হলেও সত্য, ঠাট্টা হলেও সত্য— বিয়ে, তালাক, রজায়াত। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন— আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম ও দারা কুতনী। তিরমিজির মতে হাদিসটি হাসান এবং হাকেমের মতে বিশুদ্ধ। ইবনে জাওজী বলেছেন, সূত্রে উল্লেখিত আতা হচ্ছে আজলানের পুত্র যার বর্ণনা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হয়। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, কথাটি ঠিক নয়। আতা আসলে আবু রিবাহের পুত্র। আজলানের পুত্র নয়। আব্দুর রহমান বিন হাবীব সম্পর্কেও মুহাদ্দিসগণের মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। নাসাঈ বলেছেন, লোকটি হাদিসের সনদ অমান্যকারী। অবশ্য অন্যান্যরা তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কাজেই হাদিসটি হাসান। হাদিসটি ইবনে আদি তাঁর কামেল গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এভাবে— তিনটি বিষয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ চলবে না— বিদ্রূপের সাথে ব্যক্ত করলেও তা সত্য বলে গণ্য হবে। বিষয় তিনটি হচ্ছে— বিয়ে, তালাক ও ক্রীতদাসমুক্তি। হাদিসটির এক বর্ণনাকারী লেহিয়া জয়ীফ।

আব্দুর রাজ্জাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— হজরত ওমর এবং হজরত আলী বলেছেন, তিনটি বিষয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ চলে না— বিয়ে, তালাক ও গোলাম আযাদ। তাদের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে মানতের কথা। মানতও শপথতুল্য।

আমি বলি, শাফেয়ী বর্ণিত হাদিসটি মারফু প্রকৃতির এবং তা আলোচ্য আয়াতের তাফসীর। কাজেই প্রকাশ্য নসের প্রতিপক্ষে কিয়াসের স্থান নেই। উপরন্তু কিয়াস হিসেবে গৃহীত হাদিসটি মওকুফ যা মারফু হাদিসের তুলনায় নিম্নমানের।

ইবনুল হুম্মাম বলেছেন, শপথের হাদিসটি সঠিক হলেও এখানে তা দলিল হিসেবে ধর্তব্য হবে না। কারণ, হাদিসের বক্তব্য শুধু এতোটুকুই যে, ঠাট্টা করে কেউ শপথ করলেও তা শপথ হিসেবে গণ্য হবে। যে ঠাট্টা করে শপথ করে, সে জেনে শুনেই করে। তাই সে শপথকারী হিসেবে গণ্য। কিন্তু ভুলক্রমে যদি কেউ মিথ্যা বলে তবে তাকে মিথ্যাবাদী বলা যায় না। সে হয়তো বলতে চেয়েছে একটি, কিন্তু মুখ ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছে অন্যটি। সুতরাং ঠাট্টা শপথ এবং ভুলে কিছু বলে

www.eelm.weebly.com

ফেলা, এক কথা নয়। আর শপথ ঠাট্টা ভেবে করা হয়েছে কিনা, তা বুঝার উপায় নেই। তাই 'লগবু' শব্দটির ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য হচ্ছে, বুঝে শুনে শপথ করার পর শপথের বিপরীত আচরণ করলেই কেবল বলা যাবে, শপথটি ছিলো 'লগবু' বা নিরর্থক। জুহুরী, হাসান ও ইব্রাহিম নাখয়ীও এরকম বলেন।

হজরত কাতাদা ও মাকহুল বলেন, এধরণের শপথে কোনো পাপ নেই। কাফফারাও নেই। এধরণের শপথকারী জানে যে, তার শপথ আসলে শপথই নয়। তাই তার শপথকে শপথ হিসেবে ধরাই যাবে না।

শাফেয়ীর সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সত্য ধারণার উপর স্বেচ্ছায় শপথের পর শপথ থেকে সরে গেলে কাফফারা ওয়াজিব হবে। কারণ, তা আয়াতে উল্লেখিত নিরর্থক শপথের পর্যায়ভুক্ত নয়। যেহেতু শপথ করা হয়েছে স্বেচ্ছায়। যেমন গমুস জাতীয় শপথ করা হয়। তবে এই শপথের সঙ্গে গমুস শপথের পার্থক্য এতোটুকুই যে, গমুস শপথকারী চিন্তাভাবনা না করেই শপথ করে, তাই তাতে পাপ নেই।

আমি বলি, যদিও এটা নিরর্থক শপথের পর্যায়ভুক্ত নয়, তবুও এতে পাপ নেই, কাফফারাও নেই। পাপ নেই একারণে যে, আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'তোমাদের মুখ থেকে ভুলবশতঃ যা উচ্চারিত হয়, তাতে পাপ নেই। হ্যাঁ, যাতে মনের প্রত্যয় থাকে।' আর এতে পাপ নেই বলে কাফফারাও নেই। পাপ মোচনই কাফফারার উদ্দেশ্য। তাই পাপই যখন নেই, তখন কাফফারাও নেই। আর এই শপথ 'ফীমা আকাত্তুমুল আইমানা' আয়াতটির সঙ্গে সম্পৃক্তও নয়। প্রকৃতপক্ষে কাফফারা ওই আয়াতটির সঙ্গেই সম্পৃক্ত।

কেউ যদি বলে বসে, পাপই যদি কাফফারার কারণ হয় এবং হাদিস ও ঐকমত্যের দৃষ্টিতে ভুলের জন্য যদি কোনো পাপ না থাকে, তবে ভুলক্রমে হত্যাকাণ্ড ঘটালে কাফফারা কি ওয়াজিব হবে না? আমাদের জবাব হচ্ছে— একটি হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকে দু'টি অপরাধ-অন্যায়ভাবে প্রাণ হরণ ও আল্লাহ্র নির্দেশ লংঘন। ইচ্ছাকৃত হত্যা কবীরা গোনাহ। তাই কেবল কাফফারা দিলে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না।

ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের মধ্যে প্রাণহরণ ও নির্দেশলংঘন দু'টোই রয়েছে। কিন্তু ভুলক্রমে হত্যাকান্ডে রয়েছে কেবল প্রাণহরণের অপরাধটি। সুতরাং কেবল আল্লাহ্র নির্দেশ লংঘনের কারণে কাফফারা আদায় করলে হত্যাকারী কখনো দায়মুক্ত হতে পারবে না।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, পাপকর্মের সঙ্গে জড়িত শপথের নাম অর্থহীন শপথ (কসমে লাগবু)। এরকম শপথকারী আল্লাহ্পাকের শাস্তির উপযোগী হবে না। কিন্তু তাদেরকে শপথ ভঙ্গ করে কাফফারা দিতে হবে। একথা মেনে নিলে প্রকৃত শপথ এবং অর্থহীন শপথ একজাতীয় হয়ে পড়ে। অথচ আয়াতের বক্তব্যে প্রতীয়মান হয় যে, বর্ণিত শপথ দু'টি এক প্রকারের নয়। কাফফারা ওয়াজিব হওয়া

www.eelm.weebly.com

এবং দায়ী না হওয়া পরস্পরবিরুদ্ধ। পাপের কারণে কাফফারা ওয়াজিব হয়। আবার দায়ী হতে হয় পাপের কারণেই।

মাসরুক বলেছেন, পাপ কর্মে শপথ করলে কাফফারা ওয়াজিব হয় না। আবার শয়তানী পদস্খলনেও কাফফারা দিতে হয়। পাপকর্মে শপথকারী এক ব্যক্তি সম্পর্কে শা'বী বলেছিলেন, তার কাফফারা হলো তওবা।

আমি বলি, পাপকর্মে শপথকারীর উচিৎ শপথ ভঙ্গ করা। কেউ যদি পাপকর্মে শপথ করে এবং তা পূরণ করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়, তবে ওই শপথ প্রকৃত শপথের পর্যায়ভুক্ত এবং ওই শপথের কারণে সে আল্লাহপাকের শাস্তিযোগ্য হবে। যেমন, তিনি বলেছেন, 'যখন তোমরা সুদৃঢ় শপথ করো, তখন আল্লাহ্‌পাক তা গ্রহণ করেন।' এরকম শপথকে নিরর্থক শপথ বলা যায় না। রসুল স. এর ওই উক্তিতে একথার পোষকতা রয়েছে যেখানে তিনি বলেছেন, কাজেই তার উচিত, সে যেনো কাফফারা দেয় এবং উত্তমকর্ম সম্পন্ন করে। আর আল্লাহ্‌তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত।

'কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন'— একথার অর্থ, মিথ্যা শপথের যে দৃঢ় সংকল্প তোমরা অন্তরে ধারণ করেছো, তার জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। এ ধরনের শপথ অর্থহীন শপথ নয়। এ হচ্ছে পরিপক্ক মিথ্যা শপথ, যা ভঙ্গ করলে পাপ হয়। শুধুমাত্র শপথে কোনো পাপ নেই। কেউ যদি এই মর্মে আপত্তি তোলে যে, সুরা মায়েদায় বর্ণিত হয়েছে, 'যে শপথে তোমরা দৃঢ় প্রত্যয়ী, আল্লাহ্ অবশ্যই তা ধরবেন।' তাহলে প্রমাণিত হয় যে, দৃঢ় সংকল্প পাপ এবং ধর্তব্য বিষয়। যদি তাই হয়, তবে কীভাবে বলা যায় যে, পরিপক্ক শপথ এই ব্যাখ্যার বাইরে?

আমি বলি, ওই আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে— আল্লাহ্‌পাক তোমাদের ওই সকল শপথ ধরবেন, যা তোমরা সংকল্প করেছো এবং ভঙ্গ করেছো। কিন্তু এখানে সেকথা বলা হয়নি। এখানে বিবৃত হয়েছে রূপক অর্থেরই একটি অংশ। আর প্রকৃত ও রূপক অর্থ কখনো একীভূত হয় না। গমুস জাতীয় শপথের বেলায় কেবল শপথ করার সাথে সাথে ধর্তব্য হয়। কাজেই এটা সুস্পষ্ট যে, সুরা মায়েদায় বর্ণিত শপথ হচ্ছে পরিপক্ক শপথ। আর এখানে যে শপথের কথা বলা হয়েছে, সেটা হচ্ছে গমুস শপথ। ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য হচ্ছে, অন্তরের সংকল্প এবং তোমরা যে পরিপক্ক শপথ করেছো— আয়াত দু'টি একই মর্মবোধক। তাঁর ধারণায়, অন্তরের সংকল্পই হচ্ছে পরিপক্ক শপথ, যা অর্থহীন শপথের বিপরীত। কাজেই বর্ণিত আয়াত দু'টির মধ্যে পরিপক্ক, গমুস, নিরর্থক-সকল শপথই রয়েছে। তাই সবগুলোর ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব। আমরা বলি, ব্যাপারটি সে রকম নয়। বরং পরিপক্ক শপথকারীর উপরে রয়েছে একটি দায়িত্ব, যা পূরণ করা ওয়াজিব। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে ইমানদারগণ। তোমাদের শপথ পূর্ণ করো।' কিন্তু এখানে পাপ বা ধর্তব্যের কথা বলা হয়নি। তবে শপথ ভঙ্গের ও অন্তরের সংকল্পের বিষয়টি স্বতন্ত্র। হজরত আয়েশার ব্যাখ্যানুসারে অন্তরের সংকল্প অর্থহীন শপথের বিপরীত।

www.eelm.weebly.com

আর যেহেতু এখানে অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করার কথা বলা আছে, তাই এ ধরনের শপথ পাপ। গমুস শপথেই পাপের ধারণা রয়েছে, তাই এক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব। কাফফারা দিলে এ পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

সবশেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল- একথার অর্থ, আল্লাহপাক ক্ষমাপরবশ। তাই তোমাদের কবীরা গোনাহ তওবার মাধ্যমে অথবা বিনা তওবায় ক্ষমা করে দেন। এই ক্ষমা এখানে 'অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না' বাক্যটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরে উল্লেখিত অন্তরের সংকল্প বা গমুস শপথের সঙ্গেও আল্লাহপাকের ক্ষমাশীলতার সম্পর্ক রয়েছে। প্রমাণ হিসেবে বোখারী বর্ণিত হজরত আয়েশার হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য— যেখানে তিনি বলেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ওই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যিনি বলেছেন, 'লা ওয়াল্লাহ্ ওয়া বালা ওয়াল্লাহ্ (আল্লাহর কসম না আল্লাহর কসম হ্যাঁ)।

জেনে রাখা প্রয়োজন, শপথ অর্থ- শক্তি। যেমন, আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'লা আখজ্নাহু বিল ইয়ামিন (অবশ্যই আমি তাকে শক্তভাবে ধরেছি)।' এই জন্যই ডান হাতের নাম ইয়ামিন। কারণ, ডান হাত বাম হাতের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

শপথ দুই ধরনের। ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত। অনিচ্ছাকৃত শপথ হচ্ছে- ভূতভবিষ্যত,সত্যমিথ্যা, বিবৃতিমূলক বা অবিবৃতিমূলক বচন- যা অচিন্ত্যনীয়রূপে মুখে উচ্চারিত হয়। এ ধরনের শপথকে বলে লগবু বা অর্থহীন শপথ। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এ শপথের কোনো মূল্যই নেই— তাই এ সম্পর্কে কোনো বিধানও নেই। তবে ইমাম আবু হানিফা এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন। ইচ্ছাকৃত শপথ আবার দুই প্রকার। ১. বিবৃতিমূলক— যা বাস্তবে সত্য এবং বক্তার ধারণাতেও সত্য। যেমন, কেউ বললো, আল্লাহর কসম! হজরত মোহাম্মদ স. আল্লাহর রসুল। কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে ইত্যাদি। এতাদৃশ শপথ সমালোচনার উর্ধ্বে। বরং এ হচ্ছে ইবাদত। তবে এ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা যাবে না। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্পাক তোমাদের বাপ দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং শপথ করতে চাইলে আল্লাহ্র নামে শপথ কোরো। অন্যথায় নিশ্চুপ থেকো। বোখারী, মুসলিম। হজরত ইবনে ওমর থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে— আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করলো, সে অবশ্যই শিরিক করলো। তিরমিজি। হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে এসেছে— রসুল স. বলেছেন, পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও প্রতিমার নামে শপথ কোরো না। আর আল্লাহর ওয়াস্তেও শপথ কোরো না, যদি তা মিথ্যা হয়। আবু দাউদ, নাসাঈ।

শপথকারীর শপথ তার ধারণায় সত্য হলেও বাস্তবে তা যদি মিথ্যা হয়, তবে শপথকারীর ধারণার ভিত্তিমূল কী তা বিচার করে দেখতে হবে। দেখতে হবে তার ধারনা নিছক কল্পনার উপর, না একক কোনো বর্ণনার উপর। একক বর্ণনা নির্ভুল হলেও ভুলের সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যায়। তাই ইমাম আবু হানিফার মতে, এ রকম

www.eelm.weebly.com

শপথের নাম ধারণাপ্রসূত শপথ। এ রকম শপথই অর্থহীন শপথ। একে গমুস শপথও বলা যেতে পারে যা শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ।

কারও মিথ্যা কসমের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হলে তা স্পষ্ট রূপে গমুস শপথ হিসাবে প্রমাণিত হয়। যেমন অবিশ্বাসীরা বলে, হজরত ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র, আল্লাহ্‌পাক কবরবাসীদিগকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না ইত্যাদি। এমনও হতে পারে যে, বক্তার উক্তি সত্য কিন্তু সে তা অন্তরে বিশ্বাস করে না, অন্তরে মিথ্যা বলে জানে। যেমন মুনাফিকেরা রসুল স.কে বলতো আল্লাহর কসম— আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রসুল। আপনাকে আমরা ভালোবাসি ইত্যাদি। এ ধরনের শপথও গমুস শপথ। আরেক ধরনের গমুস শপথ হচ্ছে এ রকম— বক্তার উক্তি মিথ্যা এবং বাস্তব অবস্থাও সত্যের অনুকূল নয়। যেমন ইহুদীরা বলে, আল্লাহ্ মানুষের উপর কোনো কিছু অবতীর্ণ করেন না, যারা মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ্ তাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন না, ইত্যাদি।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. বলেন— কবীরা গোনাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্‌পাকের সঙ্গে অংশীস্থাপন, মাতা-পিতার অবাধ্যতা, হত্যা, গমুস শপথ। বোখারী। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. এরশাদ করেন, যদি শপথকারীর উদ্দেশ্য হয় সম্পদ আত্মসাত, তবে সে হাশরের দিন আল্লাহ্‌পাকের সকাশে উপস্থিত হবে তাঁর চরম অসন্তোষ অবস্থায়। এরপর রসুল স. ওই আয়াতটি পাঠ করলেন, যেখানে বলা হয়েছে— 'আর যারা ক্রয় করে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের বিনিময়ে শপথের মাধ্যমে সামান্য কিছু সম্পদ।' হজরত আবু উমামার বিবরণে রয়েছে, রসুল স. বলেন- যে ব্যক্তি শপথের বিনিময়ে কোনো মুসলমানের অধিকার হরণ করে, আল্লাহ্‌পাক তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেন এবং হারাম করে দেন জান্নাত। মুসলিম।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আনিসের বিবরণে রয়েছে— রসুল স. জানিয়েছেন, আল্লাহ্‌পাকের সঙ্গে শিরিক করা, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা শপথ করা কবীরা গোনাহ্। তিরমিজি। এ বিষয়ে আরও অনেক হাদিস রয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২২৬

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

❑ যাহারা স্ত্রীর সহিত সংগত না হওয়ার শপথ করে তাহারা চার মাস অপেক্ষা করিবে। অতঃপর যদি তাহারা প্রত্যাগত হয় তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

www.eelm.weebly.com

'ইলা' শব্দের অর্থ শপথ করা। শব্দটির পর 'মিন' অব্যয়টি থাকলে অর্থ হবে শপথ। এবং 'আলা' অব্যয়টি থাকলে অর্থ হবে বিচ্ছিন্নতা। হজরত কাতাদা বলেছেন, মূর্খতার যুগে 'ইলা' শব্দটি ব্যবহার হতো তালাকের ক্ষেত্রে। হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব বলেছেন, জাহিলী যুগে ইলা দ্বারা রমণীদেরকে লাঞ্ছনা করা হতো। স্ত্রীর সঙ্গে সুসম্পর্ক না থাকলে এবং বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলে স্বামী তার স্ত্রীকে ইলা করে বসতো। ফলে স্ত্রী অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত স্বামী-সন্নিধান বঞ্চিত হতো। অপর স্বামী গ্রহণের অধিকারও থাকতো না তার। ফলে সে না হতো সধবা না হতো বিধবা। এই মূর্খজনোচিত প্রথাটি ইসলামের প্রাথমিক যুগেও অনুসৃত হয়ে আসছিলো। শেষে ইসলাম এর একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিলো।

'চার মাস অপেক্ষা করবে'-একথার অর্থ যারা ইলা করবে তাদের কর্তব্য হচ্ছে চার মাস অপেক্ষা করা। এর মধ্যে তালাক কার্যকর হয় না।

'অতঃপর তারা যদি প্রত্যাগত হয়'— একথার অর্থ চার মাস অতীত হওয়ার পর স্ত্রীসম্ভোগের মাধ্যমে যদি তারা শপথ ভঙ্গ করে— এ রকম অর্থ গ্রহণ করেছেন ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ। কারণ 'ফা' অব্যয়টি অতঃপর অর্থে ব্যবহার হয়। আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, চার মাসের কম হলে 'ইলা' হবে না। আবার চার মাস অতিক্রান্ত না হলেও ইলা হবে না। চার মাস অতিক্রান্ত হলেই কেবল ইলা বিধিবদ্ধ হবে। তাই চার মাস অতীত হলেও তালাক হয়েছে মনে করা যাবে না। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ আয়াতটি পাঠ করেছেন এভাবে 'ফাইন ফাউ ফী হিন্না'— এ কথার অর্থ— ওই চার মাসে যদি প্রত্যাবর্তন করে; এই পাঠভঙ্গির প্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন— চার মাসের জন্য যদি কেউ এ ধরনের শপথ করে, তবে সে হবে ইলাকারী। আর তার পক্ষে উচিৎ হবে ওই চার মাসের মধ্যেই প্রত্যাগত হওয়া। এখানে অর্থগত পার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে 'ক্বেরাতে শাজ্জা' (বিরল ক্বেরাত)। অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন, 'ক্বেরাতে শাজ্জা' হাদিস তো নয়ই— কোরআনের আয়াতও নয়। কোরআনের আয়াত হলে তা সর্বজনবিদিত হতো। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন ক্বেরাতে শাজ্জার উপর আমল করা ওয়াজিব। কারণ ওই ক্বেরাত হয় কোরআনের আয়াত অথবা কোরআনের ব্যাখ্যা হাদিস। আর কোরআন ও হাদিস দু'টিই দলিল। যদি কেউ বলেন, ক্বেরাতে শাজ্জা যদি সর্বজনবিদিত ক্বেরাতের (ক্বেরাতে মুতাওয়াতির) বিরোধী হয় তবে অবশ্যই শাজ্জা পরিত্যক্ত হবে। আমরা বলি, উভয় ক্বেরাতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না হলে পরিত্যক্ত হবে নতুবা নয়। কিন্তু এখানে সামঞ্জস্য বিধায়ন সম্ভব। কারণ 'ফা' অব্যয়টি যেমন অতঃপর অর্থে ব্যবহার হয়, তেমনি ব্যবহৃত হয় সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বিস্তৃত ব্যাখ্যা অর্থেও। যেমন 'ফানাদা নুহুর রব্বাহু', 'ফাক্বলা রব্বি ইন্নাব্নি মিন আহলি'— এই আয়াতগুলোতে 'ফা' অব্যয়টি ব্যাখ্যামূলক অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আয়াতে যখন বলা হয়েছে চার মাস অপেক্ষা করবে, তখন বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কাজেই 'ফাইন ফা'উ' থেকে পরবর্তী আয়াতের শেষ পর্যন্ত

www.eelm.weebly.com

(সামিউন আলিম) ব্যাখ্যার আওতায় আনতে হবে। এছাড়া 'ফা' অব্যয় থেকে কালগত দিক অনুযায়ী পশ্চাতে ধরা হয়, তাহলে সম্ভবতঃ ঘটনাটি ইলার দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার্য হবে। সেক্ষেত্রে'যদি তারা প্রত্যাগত হয় তবে'একথার অর্থ হবে— অতঃপর যদি তারা ইলার পরে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু এখানে সর্বজনবিদিত ক্বেরাত সাধারণভাবে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিকে প্রমাণ করে। সেই প্রত্যাবর্তন চার মাসের মধ্যেও হতে পারে এবং চার মাস পরেও হতে পারে। আর ক্বেরাতে শাজ্জাতে সময়সীমা সুনির্ধারিত হয়ে যায়, অর্থাৎ 'ক্বেরাতে শাজ্জা' অনুযায়ী চার মাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে। ফেকাহ্‌বিদগণের সূত্রানুযায়ী সীমিত অর্থও চূড়ান্ত অর্থ হিসাবে গৃহীত হয় । ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ক্বেরাত অবিখ্যাত (শাজ্জা) নয় বরং মশহুর (প্রসিদ্ধ) । কিতাবুল্লার নির্দিষ্টকরণ ও সাধারণার্থক শব্দকে সীমিতার্থক শব্দের স্থলে ব্যবহার সিদ্ধ।

'তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু'— এ সম্পর্কে হাসান ইবনে ইব্রাহিম ও কাতাদা বলেছেন, ইলাকারী ইলা থেকে প্রত্যাবৃত হলে কাফফারা দিতে হবে না। কারণ, এ আয়াতের শেষে আল্লাহ্ পাক ক্ষমা ও অনুগ্রহের অঙ্গীকার করেছেন। জমহুর বলেছেন, ইলা থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর কাফ্ফারা ওয়াজিব। কারণ, ক্ষমাপ্রার্থনার দ্বারা কাফফারা অপসারিত হয় না। সুরা মায়েদার একটি আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়। হাদিস শরীফেও বিষয়টি প্রমাণিত রয়েছে। যেমন রসুল স. বলেছেন, যদি কেউ শপথ করার পর উত্তম বিষয়ের সন্ধান পায়, তবে সে যেনো শপথ ভঙ্গের কাফফারা দিয়ে ধাবিত হয় উত্তমতার দিকে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২২৭

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

❒ আর যদি তাহারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে তবে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

এখানে তালাক দেয়ার সংকল্পের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'ইলার' চার মাস অতিক্রান্ত হলেও তালাক কার্যকর হবে না। যতোক্ষণ না তালাকের ঘোষণা দেয়া হয়। যদি চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর আপনা আপনি তালাক হয়ে যেতো তবে তালাকের সংকল্পের কথা উঠতো না। আর এ কথা বলার প্রয়োজন হতো না যে, 'আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' একথার অর্থ, আল্লাহ্তায়ালা তালাকের ঘোষণা শোনেন এবং তালাকপ্রদাতার অন্তরের উদ্দেশ্য ভালোভাবে জানেন। এখানে আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, কেউ যদি ইলা করার পর প্রত্যাবর্তন না করে এবং

www.eelm.weebly.com

তালাকও না দেয় তবে এক্ষেত্রে কী বিধান হবে? এমতোক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধান সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ মতপার্থক্য করেছেন। দু'টি দিক রয়েছে তালাকের। একটি হচ্ছে 'ইমসাক বিল মারুফ' (সৎভাবে সংরক্ষণ। অর্থাৎ ইলা থেকে প্রত্যাবর্তন করা তথা তালাক ফিরিয়ে নেয়া)। আরেকটি দিক হচ্ছে 'তাসরীহ বি ইহ্সান' (বিধানগত দেনা পাওনা পরিশোধ করে সম্মানজনকভাবে বিদায় করা)। এই নীতির উপর ভিত্তি করে ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, আদালত ইলাকারীকে তালাক প্রদানে নির্দেশ করবে। ইলাকারী যেহেতু 'সৎভাবে সংরক্ষণ' বিধি কার্যকর করেনি— তাই বিচারক তাকে 'সম্মানজনক বিদায়দান' নীতি মানাতে বাধ্য করবে। যেমন বিধান রয়েছে নপুংশকদের ক্ষেত্রে। অপর এক বর্ণনায় শাফেয়ী ও আহমদের এমন অভিমতও পাওয়া যায় যে, বিচারক ইলাকারীর উপর চাপ সৃষ্টি করে তালাক প্রদান করাবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, একথার অর্থ ইলাকারী ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যাবর্তন না করে চার মাস অতীত হওয়ার সুযোগ দিলে তালাকই কার্যকর করতে হবে। আর এটাই হবে 'আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' বাক্যটির প্রতিফলন। অর্থাৎ এভাবে বাস্তবায়িত তালাক সম্পর্কে তিনি শোনেন এবং জানেন।

আলেমগণ বলেছেন, এভাবে তালাক যদি কার্যকর নাই হয়, তবে চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ইলাকারীর প্রত্যাবর্তন বৈধ হবে। এরকম হলে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ক্বেরাত হয়ে পড়বে অর্থহীন (তাঁর ক্বেরাতের অনুকূল অর্থ হচ্ছে চার মাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করতে হবে)। আবার আমরা যদি বলি, চার মাস পর ফিরিয়ে নেয়া সিদ্ধ হবে না বরং তালাক হয়ে পড়বে অনিবার্য— তবে বিষয়টি হয়ে যাবে ঐকমত্যবিরোধী। এরকম ঐকমত্যবিরুদ্ধ কথা কেউই বলেননি। এরকম ধারণা আয়াতের বক্তব্যের বিরুদ্ধে চলে যায় এবং 'আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ' কথাটির অর্থও হয়ে পড়ে বিসদৃশ। যেমন ইলা প্রত্যাখ্যান না করার পরিণামে যে ঝগড়া লড়াই ও বাকবিতন্ডা শুরু হয়— আল্লাহ্‌পাক তা শোনেন। যেমন তিনি শোনেন শয়তানের কুমন্ত্রণা। অথবা তিনি শোনেন ওই ইলার ঘোষণা যা প্রকৃত অর্থে তালাক— যা নির্ভর করে সম্ভোগবিহীন চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার উপর। আর তিনি সর্বজ্ঞ। তাই ইলাকারীর জুলুম সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। এ রকম ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে আলোচ্য আয়াতটি হবে তিরস্কারসূচক।

এই বিষয়টি সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের অভিমতগুলোও পরস্পরবিরোধী। হজরত ওমর, ওসমান, আলী, জায়েদ বিন সাবেত, ইবনে মাসউদ, ইবনে ওমর এবং ইবনে আব্বাসের অভিমতানুসারে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা। তবে শুধু মাত্র হজরত ওমরের একটি বর্ণনা এর ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমী অভিমতটি তালাকে রজয়ী সম্পর্কিত। ইসহাক থেকে দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন— ধারাবাহিক সূত্রে মুসলিম বিন শিহাব, সাঈদ বিন মুসাইয়েব, আবু বকর বিন আবদুর রহমান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— হজরত ওমর বলেছেন, চার মাস পার হলে এক তালাক হবে। স্ত্রীর ইদ্দত পালনের সময়সীমার মধ্যে তাকে ফিরিয়ে নেয়ার পূর্ণ

অধিকার রয়েছে স্বামীর। আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন— আমার কাছ থেকে ধারাবাহিক সূত্রে মুয়াম্মার, আতা খোরাসানী, আবি সালমা বিন আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, হজরত ওসমান বিন আফ্ফান এবং হজরত জায়েদ বিন সাবেত ইলা সম্পর্কে বলতেন, চার মাস অতিক্রান্ত হলে এক তালাকই হবে। আর স্ত্রী তার প্রাণের অধিকতর অধিকারিনী এবং সে ইদ্দত পালন করবে তালাকপ্রাপ্তা রমণীর মতো। আব্দুর রাজ্জাক আরও বর্ণনা করেন, আমার নিকট থেকে ধারাবাহিক সূত্রে মুয়াম্মার ও কাতাদা বলেছেন, হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ বলতেন, ইলা সম্পন্ন হওয়ার পর চার মাস চলে গেলে এক তালাক হয়েছে ধরে নিতে হবে। স্ত্রী তার আপন প্রাণের অধিকতর দাবীদার। সে তালাকপ্রাপ্তা নারীর মতো ইদ্দত পালন করবে। আব্দুর রাজ্জাক এও বর্ণনা করেছেন যে, আমার নিকট থেকে ধারাবাহিকভাবে মুয়াম্মার, ইবনে উয়াইনিয়া, আবী কিলাবা বর্ণনা করেছেন। আবী কিলাবা বলেন, হজরত নোমান তাঁর স্ত্রীর সাথে ইলা করেছিলেন। একদিন তিনি হজরত ইবনে মাসউদের পাশে বসে ছিলেন। তখন তাঁর উরুতে মৃদু করাঘাত করে হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর কিন্তু এক তালাক মনে করে নিবে। হজরত ইবনে আবি শাইবা বর্ণনা করেন, আমা থেকে ধারাবাহিকরূপে আবু মুয়াবিয়া, আয়মান, হাবিব, সাঈদ বিন জোবায়ের বর্ণনা করেন— হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, ইলা করার পর চার মাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তন না করলে তালাকে বায়েন হবে। আবার হজরত ওসমান, হজরত আলী ও হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এর বিপরীত অভিমত প্রকাশ পেয়েছে যা ইমাম শাফেয়ীর মাজহাবের অনুকূল। অন্যান্য সাহাবা থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। দারা কুতনী বলেছেন, আমার নিকট আবু বকর মায়মানী বলেছেন, আমি হজরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের কাছে আতা খোরাসানীর হাদিস শুনেছি। আতা খোরাসানী হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন হজরত ওসমান থেকে। হাদিসটি উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, আমি বুঝতে পারছি না বর্ণনাটি তাঁরই অভিমতের বিপরীত হলো কেনো? একজন জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে এর বর্ণনাকারী আসলে কে? তিনি বললেন, বর্ণনাসূত্র হলো এরকম— হাবীব বিন সাবেত, তাউস, হজরত ওসমান। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় জাফর বিন মোহাম্মদ— তাঁর পিতা— হজরত আলী— এ ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করেছেন। হজরত আলী বলেন, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে ইলা করে তবু তালাক হবে না— চার মাস অতিক্রান্ত হলেও। দেখতে হবে সে ইলা থেকে প্রত্যাবর্তন করে, না তালাক দেয়। হজরত ইবনে ওমর থেকে সূত্রসহ বোখারী বর্ণনা করেছেন- হজরত ইবনে ওমর বলতেন, আল্লাহ্পাকের বক্তব্যানুযায়ী ইলার সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ওই নারী আর বৈধ থাকে না। তবে খুশী মনে তাকে রাখতে চাইলে রাখা যাবে, অন্যথায় তালাক দিতে হবে। আল্লাহ্পাকের নির্দেশ এরকমই। ইসমাইল বিন তাউস- ইমাম মালেক- নাফে- হজরত ওমর-এই সনদে বোখারী বর্ণনা করেছেন, চার মাস অতিক্রান্ত হলেও তালাকের জন্য অপেক্ষা করা

www.eelm.weebly.com

উচিত। শাফেয়ী বলেছেন, আমি সুফিয়ান সওরী থেকে, তিনি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে, তিনি সুলায়মান বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন— সুলায়মান বলেন, দশ এর অধিক সাহাবার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই বলতেন, ইলাকারীদের জন্য প্রতীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। আমি বলি, এটা তাঁদেরই অভিমত; প্রতীক্ষা করাই যাঁদের সিদ্ধান্ত ছিলো। বাগবী বলেছেন, এই সিদ্ধান্তের সমর্থক ছিলেন হজরত ওমর ও হজরত আবু দারদা। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, আমি হজরত ওসমান ও হজরত জায়েদ বিন সাবেত থেকে যে বিবরণটির উল্লেখ করেছি, সেটি হজরত ওসমানের মাধ্যমে আহমদ কর্তৃক বর্ণনা অপেক্ষা উত্তম। কারণ, আমাদের বিবরণটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এর সূত্রপরম্পরা সুসংহত। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের বর্ণনাসূত্রাধীন হাবীব পর্যন্ত কতিপয় বর্ণনাকারীর পরিচয় জানা যায় না। এটাও নিশ্চিত নয় যে, তাউস হজরত ওসমান থেকে হাদিস শুনেছেন। এদিকে হজরত আলী থেকে মোহাম্মদ বিন আলী কর্তৃক বর্ণনাটি মুরসাল। যেমন মুরসাল হজরত আলী থেকে কাতাদার বর্ণনা। অথচ তাঁরা দু'জনই ছিলেন সমবয়স্ক। আর আমরা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে যে বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছি— সে সকল বর্ণনার বর্ণনাকারী থেকে অনেক হাদিস উদ্ধৃত করেছেন বোখারী ও মুসলিম। বাগবী বলেছেন, ইলায় প্রতীক্ষার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণকারী তাবেয়ীগণ হচ্ছেন সাঈদ বিন জোবায়ের, সুলায়মান বিন ইয়াসের এবং মুজাহিদ। আর এর বিপরীত মত পোষণকারীরা হচ্ছেন— সুফিয়ান সওরী, সাঈদ বিন মুসাইয়েব এবং জুহুরী। দু'টি দলই আবার বলেছেন, এক্ষেত্রে এটি তালাকে রজয়ী হবে। ইমাম আবু হানিফার অভিমত যাঁদের অনুকূলে তাঁরা হচ্ছেন—আতা, জাবের বিন ইয়াজিদ, ইকরামা, সাঈদ বিন মুসাইয়েব, আবু বকর বিন আবদুর রহমান এবং মাকহুল। এরকম বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী, ইবনে হানাফিয়া, শা'বী, নাখয়ী, মাশরুক, হাসান, ইবনে সিরিন— কাবীসা এবং আবী সালমা থেকে। মোট কথা, আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্য নিঃসন্দেহে ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্যের অনুকূল। তবে ইমাম আবু হানিফার অভিমত অধিকতর উচ্চ অর্থসম্পন্ন। কাজেই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা বলেছেন, কোরআনের প্রকাশ্য দিকটিকে প্রাধান্য দিতে হবে— একথা আসলে তাঁদের ব্যক্তিগত মূল্যায়ন। আর যারা ইমাম আবু হানিফার ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তাঁদের বক্তব্য শ্রুতিনির্ভরতার অনুকূলে। ইবনুল হুম্মাম বলেছেন, এটাই হচ্ছে প্রাধান্য প্রদানের একটি সাধারণ নীতি।

এই বিষয়টির আলোচনায় আরো কিছু মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, কেউ যদি আল্লাহ্র শপথ ব্যতিরেকেই ইলা করে বসে, অর্থাৎ তালাক, গোলাম আযাদ অথবা কোনো সদকা বা ইবাদত নিজের উপর অবধারিত করে নেয়, তবে সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তি ইলাকারী হবে কি না? যেমন বলে, যদি আমি এরূপ করি, তবে আমার ক্রীতদাস স্বাধীন। কিংবা আমার দায়িত্বে একটি হজ ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এ রকম বক্তব্য দানকারী ইলাকারীগণের অন্তর্ভূত হবে। যদিও

www.eelm.weebly.com

তার ইচ্ছা থাকে কেবল স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া অথবা উদ্দেশ্য থাকে অপর কোনো কল্যাণের। যেমন, সে রোগাক্রান্ত হলো অথবা কোনো কল্যাণের ধারণায় নিজেই রোগী সেজে বসলো। ইমাম মালেক বলেছেন, এ রকম ব্যক্তি ইলাকারী নয়। সে ইলাকারী হবে তখনই, যখন সে স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার মানসে শপথ করবে। ইমাম আহমদ বলেছেন, শপথ ছাড়া স্ত্রীকে কেবল কষ্ট দেয়ার মানসে এরকম করলে সে ইলাকারী পর্যায়ভূত হবে। ইমাম শাফেয়ী সম্পর্কে দু'রকম বর্ণনা এসেছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতম বর্ণনানুযায়ী তিনি ইমাম আবু হানিফার অনুকূল।

দ্বিতীয় মতবিরোধ হচ্ছে— কেউ যদি তার স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে শপথ ব্যতিরেকে রতিক্রিয়াসম্পর্ক ব্যতীতই চার মাস অতিবাহিত করে, তবে সে ইলাকারী বলে গণ্য হবে কি না? ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেছেন, সে ইলাকারীগণের মধ্যে গণ্য হবে। জমহুর ওলামা বলেছেন, হবে না।

তৃতীয় মতপার্থক্য হচ্ছে— ক্রীতদাসের ইলার সময়সীমা কতো? এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, সময়সীমা চারমাস। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে- আয়াতটির সঙ্গে রয়েছে মানুষের স্বভাবসম্পৃক্ততা। আর রমণীরা স্বভাবতঃ স্বামীবিহীন অবস্থায় চারমাসের অধিক ধৈর্যধারণে অক্ষম। আর স্বভাবের দিক থেকে স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাস সমপর্যায়ের। তাই ক্রীতদাসের সময়সীমাও স্বাধীন মানুষের অনুরূপ। যেমন নপুংশকদের সময়সীমা। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের মতে, ক্রীতদাসের সময়সীমা স্বাধীন মানুষের সময়সীমার অর্ধেক। তবে ইমাম আবু হানিফার মতে এক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে ক্রীতদাসী এবং ইমাম মালেকের মতে ক্রীতদাস। এই পার্থক্যটি সূচিত হয়েছে তাদের তালাক সম্পর্কিত অভিমতের পার্থক্যের দরুন।

চতুর্থ মতভিন্নতা হচ্ছে— কেউ রতিক্রিয়ায় সামর্থহীন হলে তার প্রতি প্রযোজ্য বিধান কেমন হবে? ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরকম ব্যক্তি কেবল মুখে বলবে, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম। এরকম বললেই তার ইলা প্রত্যাহৃত হবে। তবে সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যদি সে রতিক্ষমতাসম্পন্ন হয়, তবে তার জন্য সম্ভোগ ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সম্ভোগ ব্যতীত ইলা থেকে প্রত্যাবর্তন সম্ভবই নয়। কারণ, প্রবৃত্তিচরিতার্থতার জন্য সম্ভোগ অপরিহার্য।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২২৮

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ

يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَ

www.eelm.weebly.com

بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

❑ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকিবে। তাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী হইলে তাহাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন রাখা তাহাদের পক্ষে বৈধ নহে। যদি তাহারা আপোষ নিষ্পত্তি করিতে চায় তবে উহাতে তাহাদের পুনঃগ্রহণে তাহাদের স্বামীগণ অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

এখানে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী বলতে সকল প্রকারের তালাকপ্রাপ্তা রমণীদেরকে বুঝানো হয়েছে। সে তালাক বায়েন হোক অথবা রজয়ী হোক। তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী হোক অথবা গর্ভমুক্ত, সম্ভোগে ব্যবহৃতা হোক অথবা না হোক, ক্রীতদাসী হোক অথবা স্বাধীনা। তবে হাদিস ও এজমার মাধ্যমে ক্রীতদাসীকে এ আয়াতের বিধানের বাহিরে রাখা হয়েছে। রসুল স. এরশাদ করেন, ক্রীতদাসীদের বিধান হচ্ছে- দুই তালাক এবং তাদের ইদ্দত, দুই হায়েজ। তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা। পরবর্তী আয়াতে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

গর্ভবতী রমণীদের ব্যাপারে 'ওয়া উয়ালাতুল আহ্‌মালি আযালু হুন্না'— এ আয়াত দ্বারা আলোচ্য আয়াতটি রহিত হয়েছে। অনুরূপ বিধান রহিত হয়েছে ওই সকল রমণীর ক্ষেত্রে, যারা সহবাসে ব্যবহৃতা হয়নি। তাদের সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে 'ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু ইজা নাকাহ্‌তুমুল মুয়্‌মিনাতি সুম্মা তাল্লাকতুমুহুন্না, মিন কাব্‌লি আন্‌তামুসসুহুন্না, ফামালাকুম আলাইহিন্না মিন ইদ্দাত।'

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কালের প্রতীক্ষায় থাকবে— এ কথার মাধ্যমে তালাকপ্রাপ্তাদেরকে প্রতীক্ষার অন্তরাল গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এই প্রতীক্ষা তাদের আত্মমর্যাদাকে সমুন্নত করে। তাদের এই প্রতীক্ষার সময়সীমা হবে তিন ঋতুস্রাব কাল। এই সময়সীমা বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'কুরু' শব্দটি। শব্দটি বিপরিতার্থক এবং বহু অর্থবোধক। ভাষাবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কুরু অর্থ হায়েজ ও তুহুর উভয়টি হয়। তুহুর অর্থ দুই হায়েজের মধ্যবর্তী পবিত্রাবস্থা। হজরত আয়েশা, হজরত ইবনে ওমর এবং জায়েদ বিন সাবেতের বর্ণনা মতে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক বলেছেন কুরু অর্থ তুহুর। হজরত ইবনে ওমর তাঁর স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। হজরত ওমর বিষয়টি রসুল স. এর

www.eelm.weebly.com

গোচরীভূত করলেন। তিনি স. ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, এখনই তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া উচিৎ। সে হায়েজ থেকে পবিত্র হবার পূর্বেই। পুনরায় হায়েজগ্রস্তা হবে এবং পুনরায় পবিত্র হবে। তারপর যদি তালাকের দৃঢ় সংকল্প হয় তবেই তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তুহুর অবস্থায় যেনো তালাক দিয়ে দেয়। আর এই সময়সীমা হলো আল্লাহ্পাকের নির্দেশিত তালাক প্রদানের সময়সীমা। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিসটিকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করার কারণ হচ্ছে— আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, হে নবী! আপনারা রমণীদেরকে তালাক দিলে তাদের ইদ্দতের মধ্যে দিয়ে দিন। এই ইদ্দতের মধ্যে দিয়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, ইদ্দতের সময়ে তালাক দিয়ে দেয়া। বর্ণিত হাদিসে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইদ্দত হচ্ছে তুহুর— যে সময় স্ত্রীকে স্পর্শ করা হয়নি। কাজেই এখানে একথাটি স্পষ্ট যে, কুরু অর্থ তুহুর। ইমাম শাফেয়ীর এই সিদ্ধান্তের জবাবে আমরা বলি, আলোচ্য আয়াত ও উল্লিখিত হাদিসের ইদ্দত, তালাকের পর প্রতিপালনীয় ওয়াজিব ইদ্দত নয় বরং এই ইদ্দত অর্থ তালাক প্রদানের সময়।

ইমাম শাফেয়ী আরেকটি যুক্তি দাঁড় করানোর প্রয়াস পেয়েছেন— তা হচ্ছে আরবী ভাষায় সাংখ্যক যদি পুংলিঙ্গ হয় তবে দুই থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা তার বিপরীত স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। আর সাংখ্যক স্ত্রীলিঙ্গ হলে সংখ্যা ব্যবহৃত হয় পুংলিঙ্গে। ব্যাকরণবিদগণের এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনে লিপিবদ্ধ 'সালাসাতু' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ায় এর সাংখ্যক কুরু অবশ্যই পুংলিঙ্গ অর্থে ধরতে হবে। আর কুরু শব্দটির দুইটি অর্থে তুহুর হলো পুংলিঙ্গ এবং হায়েজ স্ত্রীলিঙ্গ। কাজেই সমাধানে তুহুরই গ্রহণযোগ্য। এই যুক্তিটিকে আমরা অচল মনে করি। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। আরবীতে 'বুর' এবং 'হিন্তাহ্' অর্থ গম। বুর পুংলিঙ্গ এবং হিন্তাহ্ স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু তাই বলে কী একই বস্তুর (গমের) দু'টি পৃথক লিঙ্গ হয়? বরং বলা যেতে পারে যে, হিন্তাতুন স্ত্রীলিঙ্গবোধক— 'তা' চিহ্নটি বাস্তবে স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন নয়। চিহ্নটি অতিরিক্ত সংযোজন আর এরকম অতিরিক্ত সংযোজনের দৃষ্টান্ত আরবী ভাষায় বহুল পরিমানে বিদ্যমান।

ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ বলেছেন কুরু অর্থ হায়েজ। এই অভিমতের প্রমাণস্বরূপ পাঁচটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করা হলো। ১. হজরত ইবনে ওমরের হাদিস যা দলিল হিসাবে পেশ করেছেন ইমাম শাফেয়ী। হজরত ইবনে ওমরের ক্বেরাত একটি জলজ্যান্ত প্রমাণ। ২. ছালাছা অর্থ তিন— এটি একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা। এই সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি গ্রাহ্য নয়। দলিল প্রমাণ ইজমার ধারায় তালাক প্রদানের পদ্ধতি হচ্ছে- তালাক প্রদান করতে হবে তুহুর অবস্থায় (পবিত্রাবস্থায়)। তবে তুহুর অবস্থায় তালাক প্রদানের পর ছালাছাতা কুরুর (তিন হায়েজ) গণনা করতে হবে। তখন দেখা যাবে তালাক প্রদানের সময় তুহুরের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়েছে এবং কিছু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। সুতরাং ইদ্দত গণনা করতে গেলে পুরো তুহুর অবস্থাটি গণনায় আসছে না। ফলে দেখা যাচ্ছে তিনটি পূর্ণ তুহুর হচ্ছে না, হচ্ছে দুই পূর্ণ তুহুর ও

www.eelm.weebly.com

এক তুহুরের কিয়দংশ। অথবা পুরো তিন তুহুর ও এক তুহুরের কিয়দংশ। অথচ কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে ছালাছাতা কুরু (তিন কুরু)। সুতরাং কুরু শব্দের অর্থ তুহুর হবে কীরূপে? পক্ষান্তরে কুরু অর্থ হায়েজ বললে বিধিমতো তুহুর অবস্থায় তালাক প্রদানের পর একে একে তিনটি হায়েজ পুরোপুরি গণনা করা সম্ভব। ৩. তৃতীয় প্রমাণ হচ্ছে— রসুল স. বলেছেন, ক্রীতদাসীদের তালাক দুইটি এবং তাদের ইদ্দত দুই হায়েজ। তাছাড়া এজমার রীতিতে স্বাধীনা ও ক্রীতদাসীর ইদ্দত পালনে কোনো বৈপরিত্য নেই। শুধু তিন হায়েজ ও দুই হায়েজের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ণ তিন হায়েজ এবং পূর্ণ দুই হায়েজ। অতএব বিষয়টি পরিষ্কার যে, ইদ্দত গণনার ভিত্তি হবে হায়েজ। ৪. গর্ভমুক্ত করাই ইদ্দত পালনের উদ্দেশ্য। আর গর্ভমুক্তি হায়েজের মাধ্যমেই হয়। তুহুরের মাধ্যমে হয় না। তাই কুরু শব্দের অর্থ হায়েজ গ্রহণ করাই যুক্তি সঙ্গত। ৫. যে সকল সাহাবা আমাদের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি তাঁরা হচ্ছেন, হজরত খোলাফায়ে রাশেদীন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উবাই বিন কাব, মুআজ বিন জাবাল, আবু দারদা, উবাদা বিন সামেত, জায়েদ বিন সাবেত এবং আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন। মাবাদ জুহনীকেও এই তালিকাভুক্ত করেছেন আবু দাউদ ও নাসাঈ। এই সিদ্ধান্তের অনুকূল তাবেয়ীগণ হচ্ছেন— সাঈদ বিন মুসাইয়েব, ইবনে জুবায়ের, আতা, তাউস, মুজাহিদ, কাতাদা, ইকরামা, জুহাক, হাসান বসরী, মুকাতিল, শরিফুল কাযী, সওরী, আওযায়ী, ইবনে শুবরামা, রবিহা, সুদ্দী, আবু উবায়দা, এবং ইসহাক রহমতুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন। পরবর্তীতে ইমাম আহমদ তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেছেন। ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আমি ঈসা বিন আবি ঈসা, খাইতাত, সাঈবী— এ সূত্রে তেরো জন সাহাবার মাধ্যমে রসুল স. এর এ সম্পর্কিত হাদিস বর্ণিত হয়েছে দেখেছি। বর্ণনাকারীগণ সকলেই বলতেন, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হকই সর্বাধিক। তাই স্ত্রী যেনো তৃতীয় হায়েজ থেকে গোসল করে নেয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

'তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়'—এ কথার মাধ্যমে বুঝা যায়, ইদ্দত পূরণ করতে হবে যথানিয়মে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। রজয়ী তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীর দাবী বাতিলের লক্ষ্যে গর্ভাবস্থা গোপন করা যাবে না এবং হায়েজকেও গোপন করা যাবে না। এখানে আরও একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, এই সকল বিষয়ে রমণীদের সাক্ষ্য ধর্তব্য। আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হলে'— একথা বলার কারণ এই যে, যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী তারা সত্য গোপন করে না। কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয় না। এভাবে বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে রমণীদেরকে বিশ্বাসভাজনহীনা হওয়া থেকে সর্তক করে দেয়া হয়েছে।

'যদি তারা আপোষনিষ্পত্তি করতে চায় তবে তাতে তাদের পুনগ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার'— এখানে আপোষ নিষ্পত্তি করতে চাইলে কী করতে হবে

www.eelm.weebly.com

তা বলা হয়েছে। আয়াতে আপোষনিষ্পত্তিকামী স্বামীদেরকে বলা হয়েছে 'বুয়ুল'। শব্দটি 'বায়াল' শব্দের বহুবচন। এখানে শব্দটি বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বায়াল অর্থ প্রভূ বা নেতা। আর স্বামী হচ্ছে স্ত্রীর কার্যনির্বাহক বা নেতা। তাই আরবী ভাষায় স্বামীকে বায়াল বলা হয়। এখানে 'হুন্না' সর্বনামটি রজয়ী তালাকপ্রাপ্ত নারীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত (যে তালাকের পর ইদ্দত পালনাবস্থায় স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করা যায় সেই তালাকের নাম তালাকে রজয়ী)। 'তাদের পুনঃগ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার'— একথার অর্থ বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের ক্ষেত্রে স্বামীর অধিকারটি সর্বোচ্চ। তাই তালাকে রজয়ীর ইদ্দতের সময় স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে পুনঃগ্রহণ করতে পারবে— এতে স্ত্রীর স্বীকৃতি থাকুক অথবা নাই থাকুক।

তালাকে রজয়ীর ইদ্দতকালে স্বামী তার স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করতে পারবে একথা ঠিক; কিন্তু তার উদ্দেশ্য থাকতে হবে মহৎ। থাকতে হবে আপোষনিষ্পত্তি ও সংশোধনের মনোভাব। উৎপীড়ন করাই ছিলো মূর্খতা যুগের রীতি। কেউ কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দিতো ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে। আবার তাকে গ্রহণ করতো। আবার তালাক দিতো, আবার ফিরিয়ে নিতো- এভাবে উৎপীড়ন চালাতো তারা। এ আয়াতের মাধ্যমে মূর্খতার যুগের ওই কদর্য আচরণের বিরোধীতা করা হয়েছে। পুনঃগ্রহণকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, পুনঃগ্রহণের উদ্দেশ্য থাকতে হবে মহৎ— আপোষমীমাংসা ও সম্প্রীতি।

রজয়ী তালাকের ইদ্দতাবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে— এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তবে ইদ্দতকালে সম্ভোগ সিদ্ধ হবে কি না সে সম্পর্কে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদের সর্বাধিক সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হচ্ছে সম্ভোগ সিদ্ধ। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁদের সিদ্ধান্ত ইমাম শাফেয়ীর অনুরূপ। শাফেয়ী বলেছেন, তালাক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়, তালাকই হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের অন্তরায়। আমরা বলি, রজয়ী তালাক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অন্তরায় নয়। এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, রজয়ী তালাকের ইদ্দতকালে তালাক কার্যকর থাকে না। তাদের সম্পর্ক তখন পুরোপুরি ছিন্ন হয় না। তখনও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর খোরপোষ ওয়াজিব থাকে এবং সে স্ত্রীর স্বীকৃতি ব্যতীতই তাকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। সুতরাং এ কথাটি স্পষ্ট যে, ইদ্দতের সময় বিবাহবন্ধন অটুটই থাকে। আল্লাহ্পাকের বক্তব্যে সে কথাই প্রমাণিত হয়। তাই আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'তাদের পুনঃগ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার।'

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আয়াতে বলা হয়েছে 'বি রদ্দিহিন্না'— এখানে 'রদ' শব্দটি প্রমাণ করে যে, সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেছে অর্থাৎ বিবাহ বন্ধন আর নেই। আমরা বলি, রদ শব্দটির রূপক অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। রূপক অর্থে 'রদ' শব্দের অর্থ হতে পারে এখতিয়ার (অবকাশ)। আর রদ অর্থ ফিরিয়ে দেয়া। এই ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ হতে পারে এরকম— স্বামী তার স্ত্রীকে পূর্বাস্থায় ফিরিয়ে দেয়ার হকদার। এ সকল ব্যাখ্যার পরেও যদি আপত্তি থাকে তবে 'ইমসাক বি মারূফ' এবং 'আমসিকু

www.eelm.weebly.com

হুন্না বি মারুফ' আয়াত দু'টিতো রয়েছেই। 'ইমসাক বি মারুফ' অর্থ সুন্দরভাবে আবদ্ধ রাখা। 'আমসিকু হুন্না বি মারুফ' অর্থ তাদেরকে বেঁধে রাখো সুন্দর রূপে। এক্ষেত্রে বিবাহের কার্যকারিতা অবশিষ্ট না থাকলে আয়াত দু'টির নির্দেশ এরকম হতো না।

আর একটি বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে, সে বিষয়টি হচ্ছে— স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সময় কিছু বলতে হবে কি না? ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বলতে হবে। তাঁর একথা বলার অর্থ হচ্ছে— তিনি মনে করেন এটি হচ্ছে পুনঃবিবাহ। ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ বলেছেন, স্বামী রজয়াতের অধীনা স্ত্রীকে সম্ভোগ করলে, চুম্বন করলে, কামতাড়নাসহ স্পর্শ করলে অথবা কামুক দৃষ্টিতে গোপণ স্থানের প্রতি লক্ষ্য করলেই ফিরিয়ে নেয়া হয়ে যাবে। তাদের মতে রজায়া নূতন বিবাহের মতো কিছু নয়। বরং এটা প্রথম বিবাহেরই ধারাবাহিকতা। তাই ধারাবাহিকতাটি অক্ষুণ্ন রাখতে এমন ক্রিয়াকলাপই যথেষ্ট যাতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বাবস্থাই বহাল রয়েছে। এ সম্পর্কে ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে— রতিক্রিয়ার সময় রজায়াতের নিয়ত করলেই রজায়াত হবে, অন্যথায় হবে না।

রজায়াতের সময় সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে কি না— সে সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। একদল বলেছেন, সাক্ষী উপস্থিত রাখা শর্ত। অপর দল বলেছেন শর্ত নয়। ইমাম আহমদ ও শাফেয়ীর মতে সাক্ষী উপস্থিত রাখা শর্ত। যেহেতু সুরা তালাকে বর্ণিত হয়েছে 'আর তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়নিষ্ঠ দুজন সাক্ষী রেখে নিও'। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ীর অপর এক বিশুদ্ধ বক্তব্যানুসারে সাক্ষী উপস্থিত রাখা শর্ত নয়। ইমাম আহমদের অভিমতও এরকম। সুরা তালাকের আয়াতে, সাক্ষী উপস্থিত করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে নির্দেশটি আসলে মোস্তাহাব প্রকৃতির। কারণ, রজায়াতের ব্যাপারে সাক্ষী রাখা যদি ওয়াজিব হতো, তবে তালাকের সময়ও সাক্ষী থাকা জরুরী হতো— যা সম্পৃক্ত থাকতো 'ফারিকুহুন্না বিমারুফ' নির্দেশটির সঙ্গে। কিন্তু এরকম কথা কেউই বলেননি। কাজেই রজায়াতকালে সাক্ষী রাখা ওয়াজিব নয়।

'নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের'- এ কথার অর্থ নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি রয়েছে উভয়ের অধিকার। কিন্তু যেহেতু নারী পুরুষ নয় এবং পুরুষ নারী নয় তাই তাদের পারস্পরিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে কিছু প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতা।

ন্যায়সঙ্গত অধিকার অর্থ শরিয়তসম্মত অধিকার। এই অধিকার প্রতিফলিত হতে হবে বৈবাহিক দায়িত্ব পালনে। প্রাত্যহিক সংসার কর্মে রক্ষা করতে হবে পারস্পরিক মর্যাদা ও শিষ্টাচার। মনে রাখতে হবে দাম্পত্য জীবনই সম্প্রীতি ও ভালোবাসার প্রকৃত ভিত্তি। পারস্পরিক তুষ্টি সাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে দু'জনকেই। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমার স্ত্রী আমার মনঃতুষ্টির জন্য যেমন প্রসাধন ব্যবহার করেন, আমিও তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য তেমনই সৌন্দর্য চর্চা করতে ইচ্ছা

www.eelm.weebly.com

করি। যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন, স্ত্রীদের জন্য তেমনি, যেমন তাদের যোগ্য; নীতিগতভাবে। হজরত মুয়াবিয়া কুসাইরিয়া রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, হে প্রিয়তম নবী! আমাদের উপর স্ত্রীদের অধিকার কী রকম? তিনি স. বললেন, যখন তোমরা আহার করবে তখন তাদেরকেও আহার করাবে। যখন পরিধান করবে তখন তাদেরকেও পরিধান করতে দিবে। তাদের মুখমন্ডলে প্রহার করবে না। তাদেরকে মন্দ বলবে না এবং লাঞ্ছনা দিবে না। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা। হজরত জাফর বিন মোহাম্মদ তাঁর পিতা, তিনি হজরত জাবেদ থেকে বর্ণনা করেন, রসূল স. বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় করো। তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্পাকের তত্ত্বাবধানে আপন অধিকারে গ্রহণ করেছো। আল্লাহ্র বিধানানুসারেই তাদের লজ্জাস্থান তোমাদের জন্য হয়েছে হালাল। তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার হচ্ছে —তারা তোমাদের শয্যায় অন্য কাউকে স্থান দিবে না। যদি এমন করে, তবে তোমরা তাদেরকে প্রহার কোরো। কিন্তু সীমাতিক্রম কোরো না। আর তোমাদের প্রতি তাদের অধিকার এই যে, নীতিগতভাবে তোমরা তাদেরকে ভরণ পোষণ দান করবে। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স.বলেন, সৎচরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি পূর্ণ ইমানদার। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই, যে তার সহধর্মিনীর সঙ্গে সৎভাবে বসবাস করে। এই হাদিসের বর্ণনাকারী তিরমিজি বলেছেন হাদিসটি হাসান, বিশুদ্ধ। হজরত আয়েশা থেকেও তিনি অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন জাম'আ থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেন, যেমন তোমরা তোমাদের ক্রীতদাসকে প্রহার করো তেমন করে পত্নীদেরকে প্রহার কোরো না। বোখারী, মুসলিম। জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. বলেন— তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকটে উত্তম। তোমাদের মধ্যে আমিই পরিবার পরিজনের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা উত্তম আচরণ করি। তিরমিজি, দারেমী। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজাও এ রকম বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, পত্নীদের প্রতি সদাচার সম্পর্কিত আমার উপদেশ স্মরণে রেখো। রমণীরা পাঁজরের অস্থি থেকে পরিগঠিত। এই অস্থি উর্ধ্বমুখী বক্রতা বিশিষ্ট। সেই বক্রতা সরল করতে চাইলে ভেঙে যাবে। আবার চেষ্টা ছেড়ে দিলে বক্রই থাকবে। কাজেই তাদের সম্পর্কে আমার উপদেশের কথা স্মরণে রেখো।

'কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে'— এ কথার অর্থ পুরুষেরা রমণীর তুলনায় কিছুটা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। রসুল স. এরশাদ করেন, আমি যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে ললনাকুলকে বলতাম, তারা যেনো তাদের স্বামীগণকে সেজদা করে। আল্লাহ্পাক পুরুষদের জন্য যে মর্যাদা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেই মর্যাদা প্রকাশার্থেই আমি ওরকম বলতাম। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত কায়েস বিন সায়াদ থেকে আবু দাউদ, হজরত

www.eelm.weebly.com

মুআজ বিন জাবাল থেকে আহমদ এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি। হজরত আবু জুরইয়ান এবং হজরত উম্মে সালমা থেকে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— – রসুল স. বলেন, মৃত্যুকালে যে স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি প্রসন্ন থাকে সে স্ত্রী অবশ্যই জান্নাতিনী। তিরমিজি। হজরত তালক বিন আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, স্বামী তার স্ত্রীকে আহবান করলে স্ত্রী যেনো তৎক্ষণাৎ সে আহবানে সাড়া দেয়। উনুনে রান্না চড়ানো থাকলেও। তিরমিজি।

'আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' অর্থাৎ পারস্পরিক হক বিনষ্টকারীদের প্রতি তিনি প্রতিশোধ গ্রহণে পূর্ণ ক্ষমতাবান। আর তিনি প্রজ্ঞাময়, তাই শরিয়তের বিধান অবতীর্ণ করেছেন যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গতরূপে।

সুরা বাকারা : আয়াত ২২৯, ২৩০

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ○
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○

❒ এই তালাক দুইবার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রাখিয়া দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করিয়া দিবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যাহা প্রদান করিয়াছ তন্মধ্য হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নহে; যদি তাহাদের উভয়ের আশংকা হয় যে তাহারা আল্লাহের সীমারেখা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না এবং

www.eelm.weebly.com

তোমরা যদি আশংকা কর যে, তাহারা আল্লাহের সীমারেখা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিলে তাহাতে তাহাদের কাহারও কোন অপরাধ নাই। এইসব আল্লাহের সীমারেখা। তোমরা উহা লংঘন করিও না। যাহারা এইসব সীমারেখা লংঘন করে তাহারাই জালিম।

❒ অতঃপর যদি সে তাহাকে তালাক দেয় তবে সে তাহার জন্য বৈধ হইবে না যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সহিত সংগত না হইবে। তারপর সে যদি তাহাকে তালাক দেয় আর তাহারা উভয়ে যদি মনে করে যে, তাহারা আল্লাহের সীমারেখা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তবে তাহাদের পুনর্মিলনে কাহারও কোন অপরাধ হইবে না। এইগুলি আল্লাহের সীমারেখা, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্ ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

'আত্তালাকু মাররতান' অর্থাৎ এই (রজয়ী) তালাক দুইবার। এ সম্পর্কে এক ব্যক্তি রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে তো দু'টি তালাকের কথা বলা হয়েছে। তৃতীয়টি ? তিনি স. বললেন, তৃতীয়টি হচ্ছে 'তাসরীহ্ বি ইহসান' (সৎভাবে বিদায় দান)। ইবনে মারদুবিয়া ইবনে রজীম আসাদী থেকে বর্ণনাটি এনেছেন এবং এটিকে উল্লেখ করেছেন আবু দাউদ তাঁর নাসিখ গ্রন্থে এবং সাঈদ বিন মানসুর তাঁর সুনান পুস্তকে। বাগবী বলেছেন, হজরত উরওয়া বিন জোবায়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইসলামের প্রথম দিকে লোকেরা যখন তখন স্ত্রীকে তালাক দিতো। ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে রজায়াত করতো। পুনরায় তালাক দিতো। পুনরায় রজায়াত করতো। এভাবে স্ত্রীকে কষ্ট দিতো তারা। পরিস্থিতি যখন এ রকম— তখনই অবতীর্ণ হলো, 'আত্তালাকু মাররতান' তালাক দুইবার (যে তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায়)। লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্পাক বলেছেন, তালাক দুইবার। এরকম বলেননি যে, তালাক দুই প্রকার। এ রকম বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে একযোগে দুই তালাক প্রদান করা মাকরূহ। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি এ কথাটিকেই প্রমাণ করে। একসাথে দুই তালাক গ্রাহ্য হবে না। যদি এ রকমই হয়, তবে তৃতীয় তালাকের তো প্রশ্নই ওঠে না।

কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম হচ্ছে, তালাক দিতে হবে—একটি একটি করে। ব্যাখ্যা স্বরূপ বলা যেতে পারে, তালাককে শরিয়তসম্মত করতে হলে ভিন্ন ভিন্ন তুহুরে (দুই ঋতুর মধ্যবর্তী পবিত্র অবস্থায়) পর্যায়ক্রমে দু'টি তালাক প্রদান করতে হবে। এক সাথে দুই তালাক দেয়া যাবে না। এখানে 'মার্‌রতান' শব্দটিকে কেবল দ্বিবচন মনে করলে হবে না, মনে করতে হবে একের পর এক- এভাবে দুইবার। যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'সুম্মার জিয়েল বাছারা কার্‌রকতাইন ' (অতঃপর দৃষ্টি ফেরাও দু'বার) একথার অর্থ দৃষ্টি ফেরাও একবার। তারপর আরেকবার— এভাবেই দুইবার। এখানে দু'টি দৃষ্টিপাতই হতে হবে পৃথক পৃথক সময়ে; একই সময়ে নয় (আর একই সময়ে তো দু'বার দৃষ্টিপাত করা সম্ভবই নয়)। সুতরাং দু'টি দৃষ্টিপাতকেই হতে হবে পৃথক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ ব্যাখ্যার মধ্যে কিছুটা জটিলতাও রয়েছে। এ রকম ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে 'ফাইম সাক বি মারূফ'

www.eelm.weebly.com

বাক্যটিকে সম্পৃক্ত করা দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি 'ফা ইনতাল্লাকাহাফালা তাহিল্লুলাহু' বাক্যটিকেও এ সম্পর্কিত আলোচনায় আনা যায় না। বর্ণিত ব্যাখাগুলোকে সম্মিলিতভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায়— দুই তালাক বা তিন তালাক এক বাক্যে বা পৃথক পৃথক বাক্যে একই তুহুরে একই সাথে প্রদান করা হারাম বা বেদাত— যা শক্ত গোনাহ্। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এ রকম করলে দোষ নেই। কিন্তু অন্য সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে— তোমাকে তিন তালাক দিলাম— তবে তিন তালাকই কার্যকর হবে।

ইমামীয়া সম্প্রদায় বলে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দেয়, তবে আয়াতের বক্তব্যানুযায়ী এক তালাকও হবে না। হাম্বলী মাজহাবের কতিপয় অনুসারীদের মতে, এ রকম করলে একটি তালাক হবে। যেহেতু বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, আবু সুহবান হজরত ইবনে আব্বাসকে বলেছিলেন, আপনার কি স্মরণ নেই রসুল স. হজরত আবু বকরের সময়ে ও হজরত ওমরের খেলাফতের প্রথম দুই বছরে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হতো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছিলেন, অবশ্যই মানুষ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাড়াহুড়া করেছিলো যেখানে বিলম্ব করাই ছিলো শ্রেয়। আপনি যদি ওই নিয়ম পুনঃপ্রচলন করতে পারেন তবে করুন। ইকরামার মাধ্যমে ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- হজরত ইবনে আববাস বলেছেন, রুকানা বিন আবদ তাঁর বিবিকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিলেন। পরে তিনি এ জন্য খুবই অনুতপ্ত হলেন। রসুল স. তাঁকে বললেন, কীভাবে তালাক দিয়েছো তুমি? তিনি বললেন, হে অনুকম্পার নবী! আমি এক বৈঠকেই তিন তালাক দিয়েছি। তিনি স. বললেন, তবে তো তুমি একটি তালাকই দিয়েছো। সুতরাং রজায়াত করতে পারবে (ফিরিয়ে নিতে পারবে)। তাউস ও ইকরামা বলেছেন, যারা তিন তালাক দিয়েছে তারা সুন্নতবিরোধী কাজ করেছে। কাজেই সুন্নতের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই তাদের কর্তব্য। ইবনে ইসহাকও এ রকম বলেছেন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সহবাসে ব্যবহৃতাদেরকে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হবে। আর সম্ভোগ করা হয়নি এরকম স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে হবে এক তালাক। কারণ মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ উল্লেখ করেছেন- আবু সুহবান হজরত ইবনে আব্বাসকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। একদিন তিনি বললেন, আপনার কি স্মরণ নেই কেউ এক সঙ্গে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে সাহাবায়ে কেরাম তাকে এক তালাক বলে ধরে নিতেন। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, না সে রকম নয় বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে কেউ যদি তার স্ত্রীকে সম্ভোগের পূর্বেই এক সঙ্গে তিন তালাক দিতো, তবে রসুল স.ও হজরত আবু বকরের যুগে এবং হজরত ওমরের খেলাফতের প্রথম দিকে, এক তালাক ধরে নেয়া হতো। কিন্তু যখন দেখা গেলো অধিকাংশ লোকই ওই রকম করতে শুরু করেছে তখন সকলে বললেন, ওই লোকগুলোর খামখেয়ালীপনা থেকে নারী সম্প্রদায়কে রক্ষা করা উচিত।

www.eelm.weebly.com

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, একটি বাক্যের মাধ্যমে একাধিক তালাক দেয়া সিদ্ধ। আর এ রকম করলে কোনো দোষও হবে না। সহল বিন আসআদ এর সনদে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হাদিসটি তাঁর দলিল— যেখানে বলা হয়েছে, হজরত উয়াইমির আবালী নামক এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে 'লেয়ান' করেছিলেন। স্বামী স্ত্রীর উভয়ের লেয়ান সমাপ্ত হওয়ার পর হজরত উয়াইমির রসুল স.কে জানালেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি যদি ওই স্ত্রীলোকটিকে আমার নিকটে রাখি তবে আমি মিথ্যাবাদী হয়ে যাবো। তাই আমি তাকে তিন তালাক দিতে চাই। অপর বর্ণনায় রয়েছে, তাকে তিন তালাক। এতে রসুল স. নিষেধ করেননি। আবার ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেছেন,আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছিলো। তখন রসুল স. আমার খোরপোষের ব্যবস্থা করেননি। বাসস্থানের ব্যবস্থাও করে দেননি। হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ অসুস্থাবস্থায় তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। হজরত হাসান বিন আলীও তাঁর এক পত্নীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন।

আমরা বলি, একসঙ্গে তিন তালাক বললে তিন তালাকই হবে। কিন্তু তালাকদাতা গোনাহ্গার হবে। আমাদের দলিল হচ্ছে এই— হজরত ইবনে ওমর তাঁর এক ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। পরবর্তী দুই ঋতুর সময় আরো দুই তালাক দেওয়ার ইচ্ছা ছিলো তাঁর। বিষয়টি রসুল স. এর গোচারীভূত হলে তিনি বললেন, কী ব্যাপার, আল্লাহ্পাক কি তোমাকে এমন করার আদেশ দিয়েছেন? তুমি তোমার নবীর সুন্নত পরিত্যাগ করেছো। সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে তাকে পবিত্রাবস্থায় আসতে দাও। তারপর প্রতিটি হায়েজের পরে একটি একটি করে তালাক দাও। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমি রসুল স. এর নির্দেশানুযায়ী রজয়াত করলাম। রসুল স. বললেন, যখন সে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাকে হয় তালাক দিও অথবা রেখে দিও। হজরত ইবনে ওমর বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! যদি আমি তাকে এক সাথে তিন তালাক দেই তবে কি ঠিক হবে? তিনি স. বললেন, না। এ রকম করলে সে তো বায়েন তালাকপ্রাপ্তা হবেই। তুমিও হবে গোনাহ্গার। দারা কুতনী এবং ইবনে আবি শায়বা এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন ইবনে হাসান থেকে। হাসান বলেছেন, আমি হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছি। বর্ণনাকারীদের মধ্যে আতা খোরাসানীর সংশ্লিষ্টতার কারণে হাদিসটিকে জয়ীফ বলেছেন বায়হাকী। তিনি বলেছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আতার বর্ণনা এমনই অতিরঞ্জিত যে, অপর বর্ণনাকারীদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য পাওয়া ভার। আর তিনি নিজেও একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। তাই তাঁর একক বর্ণনা গ্রাহ্য নয়। ইবনুল হুম্মাম বলেছেন, আতা সম্পর্কে বায়হাকীর মন্তব্য অগ্রাহ্য। কারণ, আতার সনদ ও মতনের অনুসরণ করেছেন সুয়াইব বিন রুজাইফ— যা তিবরানীও উদ্ধৃত করেছেন। আর হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসেও এ তথ্যটির উল্লেখ রয়েছে যে, নিয়মটি মনসুখ বা রহিত। যেহেতু বহুসংখ্যক সাহাবীর উপস্থিতিতে হজরত ওমরের তিন তালাকের প্রচলন এবং তা কার্যকর করাই প্রমাণ করে যে, নিয়মটি নাসেখ বা রহিতকারী। তাঁর

www.eelm.weebly.com

পূর্বের খলিফা হজরত আবু বকরের যুগেও বিষয়টি ছিলো সন্দেহপূর্ণ। এদিকে হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনার বিপরীতে তাঁর নিজেরই ফতোয়া বিদ্যমান। আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- মুজাহিদ বলেছেন, আমি হজরত ইবনে আব্বাসের পাশে ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে বললেন, আমি আমার বিবিকে তিন তালাক দিয়েছি। একথা শুনে হজরত ইবনে আব্বাস চুপ করে রইলেন। তাঁকে দীর্ঘক্ষণ নিশ্চুপ থাকতে দেখে আমার মনে হলো সম্ভবত তিনি তালাক ফিরিয়ে দেবেন। এমন সময় তিনি বললেন, তোমরা বোকার স্বর্গে আরোহণ করো আর বলো, হে ইবনে আব্বাস এই হয়েছে, সেই হয়েছে। তোমরাতো আল্লাহ্কে ভয় করো না।। অথচ আল্লাহ্পাক বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। যারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ্পাক তাদের জন্য একটা সুরাহা করেই দেন। তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে নাফরমানী করছো আর তোমাদের বিবিরা বায়েন তালাক হয়ে যাচ্ছে। আল্লামা ত্বাহাবীর বর্ণনায় রয়েছে, এক লোক তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়েছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস তাকে বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশ লংঘন করো। আর তোমাদের বিবিরা বায়েন তালাক হয়ে যায়। তোমরা আল্লাহ্পাককে ভয় করো না বলেই আল্লাহ্পাক তোমাদের সমস্যার সমাধান করেন না। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় উল্লেখ করেছেন, এক লোক হজরত ইবনে আব্বাসের নিকটে এসে বললো, আমি আমার স্ত্রীকে একশ' তালাক দিয়েছি। এখন আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, তোমার দিক থেকে তালাক হয়েছে তিনটি। বাকী সপ্তানব্বইটি দ্বারা তুমি আল্লাহ্র কালামের প্রতি বিদ্রুপ করেছো।

তিন তালাকের সমাধানের উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ঐকমত্য সুপ্রসিদ্ধ সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে ফকিহগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় লিখেছেন, এক লোক হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকটে এসে বললো,আমি আমার স্ত্রীকে আটটি তালাক দিয়েছি। তিনি বললেন, আলেমগণ তোমাকে কী বলেছে? লোকটি বললো তাঁরা বলেছেন, তালাকে বায়েন হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, তাঁরা ঠিকই বলেছেন। একথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, বিষয়টি ঐকমত্যসম্ভূত। আলকামা থেকে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, এক লোক হজরত ইবনে মাসউদের নিকট হাজির হয়ে বললো, আমি আমার পত্নীকে নিরানব্বই তালাক দিয়েছি। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, তোমার দেয়া মাত্র তিনটি তালাকই তাকে বায়েন করেছে। আর অবশিষ্ট তালাকগুলো তোমার নাফরমানির চিহ্ন। মোহাম্মদ বিন আজাফ বিন বুকাইর বলেছেন, এক ব্যক্তি সম্ভোগের পূর্বেই তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিলো। পুনরায় তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করলো। কিন্তু এভাবে বিয়ে করা যাবে কি না তা জানার জন্য সে বিজ্ঞ কোনো সাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাত্রা করলো। আমিও চললাম তার সঙ্গে সঙ্গে। প্রথমেই সে হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত আবু হোরায়রার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। তাঁরা জানালেন, ওই মেয়েটির অন্যত্র বিয়ে হওয়ার আগে তুমি আর তাকে বিয়ে

www.eelm.weebly.com

করতে পারবে না। সে বললো, আমিতো তাকে একবারে তিন তালাক দিয়েছি। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, তোমার নিকট যা ছিলো তার সবই তো তুমি দিয়ে দিয়েছো। ইমাম মালেকের মুয়াত্তায় হজরত ইবনে ওমর থেকেও এরকম বর্ণনা রয়েছে। ইমাম তকি, আমাশ থেকে তিনি হাবিব বিন সাবেদ থেকে বর্ণনা করেছেন, এক লোক হজরত আলীর কাছে গিয়ে বললো, আমার স্ত্রীকে আমি এক হাজার তালাক দিয়েছি। তিনি বললেন, ভালোই করেছো। হাজারের মধ্যে তিনটি দ্বারাই তোমার স্ত্রী বায়েন হয়ে গিয়েছে। অবশিষ্টগুলো তোমার অন্য স্ত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দাও। মুয়াবিয়া বিন আবি ইয়াহ্ইয়া থেকে তকি বর্ণনা করেছেন, এক লোক হজরত ওসমানের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি তো আমার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়েছি। এখন শরিয়তের বিধানে কী বলে? তিনি বললেন, মাত্র তিনটি তালাকের মাধ্যমেই সে তোমার নিকট থেকে বায়েন সূত্রে পৃথক হয়েছে।

হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন— তাঁর পিতা তাঁর এক স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়েছিলেন। হজরত উবাদা ঘটনাটি রসুল স. এর গোচরীভূত করলেন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্পাকের সঙ্গে নাফরমানি করা সত্ত্বেও মহিলাটি তিন তালাকের মাধ্যমে বায়েনা হয়েছে। অবশিষ্ট নয়শ' সাতানব্বইটি তালাক দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে জুলুম ও অবাধ্যতা। আল্লাহ্পাক এর জন্য শাস্তি দিতে পারেন অথবা ক্ষমাও করতে পারেন। এ সম্পর্কে হজরত আনাস থেকে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, অন্য লোকের সঙ্গে ওই মহিলাটির বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সে প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। একবারে তিন তালাক প্রদাতা কাউকে পেলে হজরত ওমর তার পিঠে চাবুক মারতেন। হজরত আনাস হজরত ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, কেউ কুমারী মেয়েকে বিয়ে করার পর তালাক দিলে হজরত ওমর বলতেন, অন্য কেউ মেয়েটিকে বিয়ে করে পুনঃতালাক না দেওয়া পর্যন্ত মেয়েটি প্রথম জনের জন্য হালাল নয়। প্রতিপক্ষগণের বর্ণিত হাদিসের জবাবে বলতে হয় যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে ইসলামের প্রাথমিক যুগের কথা। তখন একটি তালাকের কথায় তোমাকে তালাক, তোমাকে তালাক এইভাবে বলা হতো। গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই এ রকম বলা হতো। এই নিয়মটিকেই পরে লোকেরা তিন তালাক প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে শুরু করে। তখন বিধান দাতাও এরকম করলে তিন তালাকের সিদ্ধান্ত দান করেন। অথবা কেবল সাবধানতা বশতঃই এ রকম বিধান চালু করা হয়েছে। আর রুককানার হাদিস মুনকার (পরিত্যক্ত)। তবে তার হাদিসটিকে এভাবে নিষিদ্ধ বলে মেনে নেয়া যেতে পারে যে— আবু দাউদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেন, রুককানা তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। কিন্তু রসুল স. বলেছেন, তাঁর ইচ্ছে ছিলো এক তালাকের। তাই রসুল স. তাঁর স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে বলেছিলেন। পরে রুককানা হজরত ওমরের যুগে দ্বিতীয় তালাক দিয়েছিলেন এবং তৃতীয় তালাক দিয়েছিলেন হজরত ওসমানের যুগে। আবু দাউদ বলেছেন, এই বর্ণনাটিই সমধিক শুদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য মাসআলা প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিস এবং সাহাবাগণের আসারের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হবে। একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি পাপ কর্ম ও বেদাত। শাফেয়ী উল্লেখ করেছেন, লিয়ান করার পর উয়াইমির তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। যদি তাই হয় তবে তাঁর নিজের উক্তি তাঁর বিরুদ্ধেই এভাবে দলিল হয়ে যাবে যে, রসুল স. তাঁকে নিষেধ করেননি। আর নিষেধ না করার উপর সাক্ষী বিদ্যমান। আবার অপর একটি ঘটনায় দেখা যায়, রসুল স. নিষেধ করেছেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে— হয়তো তিনি স. নিষেধ করেছিলেন কিন্তু বর্ণনাকারী ভুল করে সে কথা উল্লেখ করেননি। অথবা এ রকমও হতে পারে যে, তিনি নিষেধই করেন নি। কারণ, লিয়ান করার পর তালাকের অবকাশ আর থাকে না। আর তিন তালাকের উল্লেখ সম্বলিত ফাতেমা বিনতে কায়েসের বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, তার স্বামী তাকে তালাকে বায়েন দিয়েছিলো। তালাক দেয়ার সময় তার স্বামী কোনো এক সেনাদলে ছিলো। সামনাসামনি তালাক না দেয়ার কারণে তার স্ত্রী, প্রদত্ত তালাকের কথা হুবহু শুনতে পায়নি। অন্যদের মাধ্যমে জানা গিয়েছিলো তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছিলো। উপরন্তু হজরত ওমর ফাতেমা বিনতে কায়েসের কথা বিশ্বাস করেননি। তিনি বলেছিলেন, আমি জানি না মহিলাটি সত্য বলছে না মিথ্যা বলছে। বিষয়টি কি তার স্মরণে আছে? নাকি সে বিস্মৃত হয়েছে। এদিকে হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ এবং হজরত হাসানের 'আসার' মারফু হাদিসের সমান্তরাল হিসেবেও গণ্য করা যায় না।

মাসআলাঃ তিন তালাক এক সাথে দেয়া হারাম ও বেদাত। প্রতি তুহুরে এক তালাক প্রদান করা 'ফাইন তাল্লাকাহা' আয়াত অনুসারে জায়েয ও মোবাহ্। তবে সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো, যদি কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়া ব্যতীত গত্যন্তর না থাকে, তবে এক তালাকে রজয়ী প্রদান করে ছেড়ে দেবে। যদি ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা না থাকে তবে ইদ্দত শেষে বায়েন হয়ে যাবে। মোবাহ কাজগুলোর মধ্যে আল্লাহ্পাকের নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ হচ্ছে তালাক। তাই উত্তম পন্থায় একটি তালাক প্রদান করলেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়। জাদুর অপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, তারা তাদের নিকট থেকে শিখতো ওই জ্ঞান যা, বিভেদ সৃষ্টি করতো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। এতে প্রমাণিত হয় যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি একটি অতি নিকৃষ্ট কর্ম।

হজরত জাবের বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, ইবলিস পানির উপর সিংহাসন পেতে বসে। তারপর তার লোকদেরকে পাঠিয়ে দেয় মানুষের মধ্যে ফেৎনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। তাদের মধ্যে সেই শয়তানই ইবলিসের প্রিয়ভাজন হয়, যে অধিক পরিমাণে অনাসৃষ্টি ঘটাতে পারে। তাদের মধ্যে কেউ যদি বলে, আমি অনেকগুলো অপকীর্তি করেছি। ইবলিস তখন বলে, তুমি কিছুই করতে পারোনি। কেউ যদি বলে, আমি এক দম্পতির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছি। ইবলিস তখন বলে,

www.eelm.weebly.com

হ্যাঁ। তুমি একটা কাজের মতো কাজ করেছো। হজরত আনাস বলেছেন, আমার মনে হচ্ছে হজরত জাবের একথাও বলেছেন যে, ইবলিস তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। মুসলিম। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, বৈধ বিষয়গুলোর মধ্যে আল্লাহ্‌পাকের নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে তালাক। আবু দাউদ।

মাসআলাঃ ঋতুগ্রস্ত অবস্থায় তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে। ইমামিয়া সম্প্রদায় বলে, হবে না। আমরা বলি, তালাক হবে কিন্তু এ রকম কাজ হারাম। তবে এতে রজায়াত করা ওয়াজিব। ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত ইবনে ওমরের হাদিসে তালাক হওয়া, হারাম হওয়া ও রজায়াত ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ রয়েছে।

কেউ রজায়াত করার পর সুন্নত পদ্ধতিতে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করলে তা কী প্রকারে সমাধা করবে, সে বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যে হায়েজের সময় তালাক দেয়া হয়েছিলো, সেই হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়ার পর আরেক হায়েজ শেষে পবিত্র হলে দ্বিতীয় বার তালাক দিতে হবে। ইমাম মোহাম্মদ মাবসুত গ্রন্থে এ রকম লিখেছেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইনের (তাঁর সহচরদ্বয়ের) বিপরীত কিছু বলেননি। ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদও এ ব্যাপারে একমত। ইমাম শাফেয়ীর প্রসিদ্ধ অভিমতটিও এ রকম। মুসলিমে উল্লেখিত হজরত ইবনে ওমরের হাদিসের প্রেক্ষাপটেই এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়েছে। রসুল স. হজরত ওমরকে বলেছিলেন, ইবনে ওমর যেনো রজায়াত করে নেন। হায়েজ থেকে পবিত্র হবে, আবার হায়েজ হওয়ার পর পবিত্র হবে— তখন তালাক দিতে ইচ্ছা করলে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দিবে। আর এটা হলো তার ইদ্দত, যে ইদ্দতের কথা কোরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে— যে হায়েজে তালাক দেয়া হয়েছে, সেই হায়েজ ব্যতীত আরো একটি হায়েজ আসতে দাও (অতঃপর তালাক দাও)। ইমাম আবু হানিফার উক্তিকে তাহাবী বর্ণনা করেছেন এভাবে— ওই তুহুরে তালাক দিবে যা ওই হায়েজের পরে যে হায়েজে তালাক দেয়া হয়েছিলো। শাফেয়ীর উক্তিও এ রকম। তাহাবী আরো বলেছেন, প্রথম উক্তিটি ইমাম আবু ইউসুফের। আর দ্বিতীয় উক্তির দলিল হচ্ছে হজরত ইবনে ওমরের পূর্বোল্লেখিত ওই হাদিস, যা বর্ণিত হয়েছে সালেম কর্তৃক। ওই হাদিসে বলা হয়েছে- তাকে বলো এখন রজায়াত করবে, পরে তুহুর বা গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দিবে। এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন মুসলিম ও সুনান প্রণেতাগণ। কিন্তু প্রথমোক্ত উক্তিটি অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দ্বিতীয় উক্তির চেয়ে সমধিক শুদ্ধ। সেখানে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও ব্যাপকতা রয়েছে। ব্যাপকতার উপরেই আমল করা উত্তম।

ইবনুল হুমাম বলেছেন, রসুল স. হজরত ইবনে ওমরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাকে নিজের কাছে রেখে দাও; যতোক্ষণ না সে পবিত্র হয়। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, রজায়াতের মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব হওয়ার বিধান ওই

www.eelm.weebly.com

হায়েজের সাথে সংশ্লিষ্ট, যাতে তালাক দেয়া হয়েছিলো। যদি সে তখন রজায়াত না করে এবং তার স্ত্রী ওই অবস্থায় হায়েজ থেকে পবিত্র হয়, তবে তার গোনাহ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

'বিধিমতো রেখে দিবে'— একথার অর্থ, রজায়াত করে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ দুই তালাকের পরেও স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যাবে যদি স্বামী স্ত্রী দু'জনেই স্বাধীন হয়। তবে ক্রীতদাস-দাসীর ক্ষেত্রে দুই তালাকের পর আটকে রাখা বৈধ নয়, যদি সে কোনো ক্রীতদাসের স্ত্রী হয়।

স্বাধীন স্বামীর ক্রীতদাসী স্ত্রী এবং ক্রীতদাস স্বামীর স্বাধীনা স্ত্রীর ক্ষেত্রে কী বিধান— সে সম্পর্কে আলেমগণ মতান্তর করেছেন। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, স্বাধীন স্বামীর ক্রীতদাসী স্ত্রীও তিন তালাক প্রাপ্তির অধিকারিনী। আর ক্রীতদাস স্বামীর স্বাধীনা স্ত্রী পাবে দুই তালাক। হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত জায়েদ বিন সাবেত এ রকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মত এর বিপরীত। তাঁর মতে তালাকের ক্ষেত্র হচ্ছে স্ত্রী। হজরত আলী ও হজরত ইবনে মাসউদ এই অভিমতের প্রবক্তা। উভয় দলের বক্তব্যের সমর্থনে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর সবকটি জয়ীফ। ইবনে জাওজী এ রকম বলেছেন। জননী আয়েশা থেকে জাওজী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, ক্রীতদাস দিতে পারবে দুই তালাক এবং ক্রীতদাসীকে ইদ্দত পালন করতে হবে দুই হায়েজ। হজরত আয়েশা থেকে আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারেমী ও দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন—ক্রীতদাসীদের তালাক দুইটি আর ইদ্দত দুই হায়েজ। ইবনে জাওজী বলেছেন, বর্ণিত হাদিসদ্বয়ের সূত্রভূত মুজাহির বিন আসলাম সম্পর্কে ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদের মন্তব্য হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করা যায় না। ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, মুজাহির মুনকারুল হাদিস। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, ইবনে হাব্বান মুজাহিরকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন। হাকেম বলেছেন, মুজাহির ছিলেন বসরাবাসীদের ওস্তাদ। আমাদের পূর্বসূরীগণ মুজাহিরকে দোষারোপ করেননি। ইবনে জাওজী বলেছেন, তালাককে যাঁরা পুরুষনির্ভর বলে মনে করেন, তাঁরা হজরত ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ করেছেন যে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তালাক পুরুষনির্ভর এবং ইদ্দত নারীনির্ভর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই উক্তিটি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের। দারা কুতনী সূত্রে ইবনে জাওজী হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, ক্রীতদাসীদের জন্য দুইটি তালাক আর তাদের ইদ্দত দুই হায়েজ। ইবনে জাওজী একথাও বলেছেন যে, বর্ণিত হাদিস দু'টি নির্ভরযোগ্য নয়। এ জন্যই নির্ভরযোগ্য নয় যে, এর মধ্যে রয়েছে একজন অবিশ্বস্ত বর্ণনাকারী—ইবনে মোবারক তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ বলেছেন, তার বর্ণনার উপর নির্ভর করা যায় না। সা'দ বলেছেন, সুলাইম বিশ্বস্ত (সেকাহ্) নয়। দ্বিতীয় হাদিসটি মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়নি। এর বর্ণনাকারীদের একজন আমর বিন শাবীব

www.eelm.weebly.com

জয়ীফ। ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ বলেছেন, শাবীবকে নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে গণ্য করা যায় না। আবু জারয়া বলেছেন, লোকটি খেয়ালখুশী মতো হাদিস বর্ণনা করে। বিশুদ্ধ সমাধান এই যে, বর্ণনাটি আসলে হজরত ওমরের উক্তি, মারফু হাদিস নয়। ইমাম আবু হানিফার অভিমতটি এভাবে প্রাধান্য পেতে পারে যে, তুহুরের উপর ভিত্তি করে তালাকের বিধান দেয়া হয়েছে। আর আলেমদের ঐকমত্য এই যে, ক্রীতদাসীর ইদ্দত দুই হায়েজ। এতে করে প্রমাণিত হয়, তাদের তালাকও দুইটি।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতে একটি জটিলতাও দৃষ্ট হয়। তাঁর নীতি অনুসারে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ (আম) তার সকল একককে সম্মিলিত করে। একারণেই খবরে ওয়াহেদ ও কিয়াস দ্বারা আম শব্দকে বিশিষ্টার্থক করা সিদ্ধ নয়। খবরে ওয়াহেদ বা কিয়াস দ্বারা মনসুখও সম্ভব নয়। অথচ 'আল মুতালাক্বাতু ইতারা ব্বাসনা' এবং 'আত্তালাকু মার্‌রতান' আয়াত দু'টি স্বাধীনা ও ক্রীতদাসী— দুই ধরনের রমণীকেই সম্মিলিত করে। অর্থাৎ এ আয়াতের বিধান সাধারণভাবে সকল নারীর প্রতি প্রযোজ্য। স্বাধীনা অথবা ক্রীতদাসী সকলের ইদ্দতকাল তিন হায়েজ এবং সকলের জন্যই বিধিবদ্ধ দুই ধরনের তালাক। রসুল স. এর এরশাদ (ক্রীতদাসীদের জন্য তালাক দুইটি আর ইদ্দত দুই হায়েজ) এখানে খবরে ওয়াহেদ (একক বর্ণনাসম্ভূত)। সুতরাং এই খবরে ওয়াহিদ দ্বারা বর্ণিত আয়াত দু'টির বিশিষ্টার্থকতা নির্ণয় করা ঠিক নয়। তাই বলা যেতে পারে যে, হজরত সাহাবায়ে কেরাম রসুল স. থেকে এমন কিছু শুনেছেন, যার উপর ভিত্তি করে একটি অকাট্য প্রমাণকে খবরে ওয়াহিদের মাধ্যমে বিশিষ্টার্থকতা দেয়া হয়েছে। আর তাঁরা বিষয়টি সম্যক অবগত ছিলেন বলেই এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে।' কতিপয় তাফসীরবিদ বলেছেন, একথার অর্থ তৃতীয় তালাক। আমি বলি এ রকম বলা ঠিক নয়। কারণ একথাটি 'বিধিমত রেখে দিবে' কথাটির সঙ্গে সংযোজিত। সুতরাং পূর্বের কথাটির অর্থ হবে এরকম–– দু'টি নীতির মধ্যে যে কোনো একটিকে গ্রহণ করো। সানন্দে রেখে দাও অথবা সৎভাবে বিদায় করো। অথচ বিধান কিন্তু তা নয়। বরং তার জন্য বৈধ হলো রাখবেও না ছেড়েও দিবে না। বরং ইদ্দত পূরণ করা পর্যন্ত ওই অবস্থাতেই ছেড়ে দিবে।

কেউ কেউ বলেছেন, রজায়াত না করে এমনি এমনি থাকতে দাও। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর পৃথক হয়ে যাবে। বাগবী ও অন্যান্য ভাষ্যকারগণ দু'টি অভিমতই উল্লেখ করেছেন। তবে উত্তম অভিমত হলো 'সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে' কথাটির ব্যাখ্যা এমনভাবে করা— হয় তালাক দিবে অথবা ইদ্দত পুরো করে তাকে পৃথক করে দিবে। এইভাবে পুরো কথাটি দাঁড়াচ্ছে এরকম— তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে সানন্দে তাকে নিজের সাথে রাখো অথবা সদয়ভাবে তাকে পৃথক করে দাও। তৃতীয় তালাক দাও বা না দাও। বাক্যটির আসল বক্তব্য হচ্ছে, অযথা

www.eelm.weebly.com

নীতিবর্জিতরূপে স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করা হারাম। এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে 'যদি তাকে তালাক দেয়, তবে এরপর তার জন্য হালাল হবে না' আয়াতের সম্ভাব্য দু'টি ব্যাখ্যার একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা এটাই। আর সদয়ভাবে মুক্ত করে দেয়াকে পৃথক তালাক মনে করে নিলে সেটা হবে চতুর্থ তালাক।

এক লোক রসুল স. কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রসুল! আত্তালাকু মাররতান (তালাক দুইবার) তাহলে তৃতীয় তালাকের উল্লেখ কোথায়? তিনি স. বললেন, তৃতীয়টি হচ্ছে, 'তাসরিহ্ বি ইহসান' (সদয়ভাবে মুক্ত করে দেয়া)। হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর নাসেখ গ্রন্থে এবং সাঈদ বিন মনসুর তাঁর সুনান পুস্তকে বর্ণনা করেছেন। আর মুরসাল পদ্ধতিতে আবু রজীন আসাদী থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে মারদুবিয়া।

ইমাম বায়হাকী বলেছেন, বর্ণনাটি যথাযথ নয়। এছাড়া ইমাম দারা কুতনী ও বায়হাকী আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদের সূত্রে তিনি ইসমাইল থেকে এবং তিনি হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। দারা কুতনী ও বায়হাকী দু'জনেই বলেছেন, বর্ণনাটি উত্তম সনদে ইসমাইল—আবু রজীন থেকে এবং তিনি রসুল স. থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী বলেছেন, মুহাদ্দিসগণের মধ্য থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ কর্তৃক এভাবেই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাত্তান বলেছেন, এই বিবরণটি মারফু এবং বিশুদ্ধ। আমি বলি তৃতীয় তালাক সম্পর্কিত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রসুল স. জবাব দিয়েছিলেন 'তাসরিহ্ বি ইহসান' (সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে)।

আবু দাউদ বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের হাদিসে বলা হয়েছে, ইসলামের প্রথম দিকে স্ত্রীরা তাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে স্বামীদেরকে কিছু দিলে, স্বামীরা তা ভক্ষণ করাকে বৈধ মনে করতো। মনে করতো এই সম্পদ ভক্ষণ করলে কোনো গোনাহ্ হবে না। এই ধারণার অপনোদনার্থে অবতীর্ণ হলো 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা প্রদান করেছো, তার মধ্য থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়।' নির্দেশটি অবতীর্ণ হয়েছে স্বামীদের প্রতি। আর এখানে কোনো কিছু গ্রহণ করা অর্থ, মোহর থেকে কিছু গ্রহণ করা। কেউ কেউ বলেছেন, নির্দেশটি বিচারকদের প্রতি প্রযোজ্য। কারণ, আদান-প্রদানের মাধ্যম তাঁরাই। তাঁরাই স্বামী স্ত্রীর কলহবিবাদ মীমাংসা করে দেন। কিন্তু এই শেষোক্ত মন্তব্যটি শুদ্ধ নয়।

'যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না'—একথার অর্থ, স্ত্রীর যদি দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, স্বামীর অনুগত হলে আল্লাহ্পাকের অবাধ্য হতে হবে। আবার স্বামীর যদি এ রকম ধারণা প্রবল হয় যে, আমার দ্বারা এই স্ত্রীর অধিকার পূরণ হবে না। অথবা অর্থ হবে এরকম, এই স্ত্রীকে তালাক না দিলে তার প্রতি জুলুম করা হবে। কেউ কেউ এমনও বলেছেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি পারস্পরিক জুলুমের আশংকা করে।

www.eelm.weebly.com

'তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না'— এ কথার অর্থ, হে বিচারকমন্ডলী! তোমরা যদি আশংকা করো যে, স্বামী স্ত্রী উভয়েই আল্লাহর বিধানের উপর স্থির থাকতে পারবে না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এই বিধান দেয়া হয়েছে যে, যদি স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চায়; তবে স্বামী স্ত্রী কেউই অপরাধী হবে না। ক্বারীগণ বলেছেন, 'আলাই হিমা' (তাদের উপর) বলতে এখানে কেবল স্বামীকেই বুঝানো হয়েছে। স্বামী স্ত্রী মিলে দাম্পত্য জীবন। এই মিলিত জীবনের কারণে এখানে 'তাহারা' শব্দটি এসেছে। যেমন অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'মুসা এবং তার খাদেম মৎসটির কথা ভুলে গিয়েছে।' বাস্তবে কেবল খাদেমই মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলেন, হজরত মুসা ভোলেননি। তবুও ভুলের উল্লেখ করতে গিয়ে দু'জনের কথাই চলে এসেছে।

আমি বলি, এই সম্পদ গ্রহণ স্বামীর পক্ষে যেমন অপরাধ তেমনি অপরাধ স্ত্রীর পক্ষেও। তাই আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যা দিয়েছো, তার মধ্য থেকে কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়। আর স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে রসুল স. বলেছেন, ভীতিজনক অবস্থা ছাড়া যে নারী তার স্বামীর নিকট তালাক কামনা করে; তার জন্য জান্নাতের বাতাসও হারাম। আহমদ, তিরমজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও দারেমী- এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত সাওবান থেকে। গোনাহ্‌ হওয়ার কারণে এক পক্ষে সম্পদ দেয়া যেমন হারাম, তেমনি অপর পক্ষে সম্পদ অপচয় করাও নিষিদ্ধ। এরমধ্যে দ্বীন-দুনিয়ার কোনো কল্যাণ নেই। তবে আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন ও পাপে পতিত হওয়ার আশংকা যদি দেখা দেয়, তাহলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে আদান প্রদানে দোষ নেই। বিধানটি তখনই কার্যকর হবে, যখন উভয় পক্ষ কলহ-বিবাদের আশংকা করবে। কেবল স্বামীর পক্ষ থেকে যদি সমস্যার উদ্ভব হয়, তবে স্বামী কিছু গ্রহণ করলে তা বৈধ হবে না। হেদায়া গ্রন্থ রচয়িতা বলেছেন, তার পক্ষে কিছু গ্রহণ করা মাকরুহ তাহরিমী হবে। প্রকৃত পক্ষে এটা হারামই। যার প্রমাণ ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছে। হারাম হওয়ার দ্বিতীয় দলিল এই যে, অন্যায়ভাবে মুসলমানদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া, কষ্ট দেয়ার জন্য স্ত্রীকে সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে আটকে রাখা হারাম। স্ত্রীর দিক থেকে যদি বাড়াবাড়ি হয় তবুও তালাক নেয়ার উদ্দেশ্যে সম্পদ দেয়া হারাম। এরকম করলে স্ত্রী গোনাহগার হবে।

খোলা তালাকের বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র বিষয়। ইমামগণের ঐকমত্য এই যে, খোলার ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীকে সম্পদ দান করবে এরকম করা ওয়াজিব। যদিও জাহেরিয়া ফেরকা এই অভিমতের বিরুদ্ধে। আমাদের দলিল হচ্ছে খোলা বা বিবাহ বিচ্ছেদ সকল ক্ষেত্রেই শরিয়তের বিধান স্বতন্ত্র। আর শরিয়তের বিধান নিষিদ্ধ হওয়া নির্ভর করে তার প্রয়োগ ও বিধিবদ্ধতার উপর— যাতে রয়েছে পরীক্ষা নিরীক্ষার অনুষঙ্গটি।

www.eelm.weebly.com

মাসানীদের মতাদর্শ হচ্ছে—শরিয়তে খোলার নির্ভরযোগ্যতা নেই। তারা বলে, খোলার এই বিধানটি 'ওয়া ইন আরাদতুমুল ইসতাবদালা যওযিন' আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। তাদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়, বর্ণিত আয়াতে স্বামী স্ত্রীর সম্মতিনির্ভর আদান-প্রদান অথবা বিনিময়ের কোনো উল্লেখ নেই। ফলে আলোচ্য আয়াতটির সঙ্গে বর্ণিত আয়াতের কোনো বিরোধ নেই। আর পরস্পরবিরুদ্ধ না হলে মনসুখ বা রহিত হওয়ার প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

খোলা বাস্তবে তালাক না বিবাহবিচ্ছেদ— সে সম্পর্কে মতান্তর রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ীর প্রসিদ্ধ মত এই যে, খোলা এক ধরণের তালাক। ইমাম আহমদও এ কথাই বলেছেন। তবে অপর একটি বর্ণনা মতে আহমদ ও শাফেয়ী বলেছেন, খোলা আসলে কোনো তালাক নয় বরং বিবাহ বিচ্ছেদ।

যারা খোলাকে বিবাহ বিচ্ছেদ বলেন, তাদের নিকট খোলা দ্বারা তালাকের সংখ্যা হ্রাস পায় না। এবং খোলায় দ্বিতীয় তালাকের সুযোগও থাকে না। আবার ইদ্দত পালনকালে স্বামী-স্ত্রীর কোনো প্রকার দায়িত্বও এখানে অনুপস্থিত।

এ সম্পর্কে মতবিভেদকারী উভয় পক্ষ কোরআনের এই একই আয়াত দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। খোলাকে যাঁরা বিবাহবিচ্ছেদ বলেন, তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, আল্লাহ্পাক আলোচ্য আয়াতের প্রথমে দুই তালাকের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর আলোচিত হয়েছে খোলা প্রসঙ্গ। অতঃপর পরবর্তী আয়াতে বিবরণ দিয়েছেন তৃতীয় তালাকের। খোলা যদি একটি তালাকই হয় তবে তালাকের সংখ্যা হয়ে যাবে চারটি। অথচ ইমামগণের ঐকমত্য এই যে, তালাক সর্বমোট তিনটি। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এই মতটির সমর্থন বিবৃত হয়েছে।

সনদসহ তাউস থেকে ইবনে জাওজী বলেছেন, আমি (তাউস) ইব্রাহিম বিন সায়াদের নিকট থেকে শুনেছি, তিনি (ইবনে সায়াদ) হজরত ইবনে আব্বাসের নিকট ওই লোক সম্পর্কে জানতে চাইলেন, যে তার স্ত্রীকে দুই তালাক দেয়ার পর খোলা করেছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছিলেন, লোকটি যদি ইচ্ছা করে তবে তালাক দেয়া ওই স্ত্রীকে বিয়ে করে নিতে পারে। কারণ, আল্লাহ্পাক তালাকের আলোচনা করেছেন প্রথমে ও শেষে। আর খোলার আলোচনা করেছেন মাঝখানে। আবদুর রাজ্জাকও এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, খোলা একটি পৃথক বিষয়। হজরত ইবনে ওমরের মুক্ত ক্রীতদাস নাফে থেকে বর্ণিত হয়েছে- তিনি মুআজ ইবনে আফরা এর কন্যা রবীহ্ থেকে শুনেছেন, তিনি হজরত ইবনে ওমরের সামনে বলেছিলেন, আমি হজরত ওসমানের যুগে, আমার স্বামীর সঙ্গে খোলা করেছিলাম। অতঃপর আমার পিতৃব্য হজরত ওসমানের নিকট হাজির হয়ে আবেদন জানালেন, মুআজের কন্যা তার স্বামীর সাথে খোলা করেছে। এমতাবস্থায় সেকি তার নিজের বাড়িতে চলে যাবে? হজরত ওসমান বলেছিলেন,

www.eelm.weebly.com

অবশ্যই চলে যাবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এখন আর কোনো অংশীদারিত্ব নেই (স্বামীর দায়িত্বে খোরপোষ এবং স্ত্রীর দায়িত্বে ইদ্দত নেই)। তবে হ্যাঁ একটি হায়েজ আগমন না করা পর্যন্ত সে বিয়ে করতে পারবে না। বিবরণটি শুনে হজরত ইবনে ওমর বললেন, হজরত ওসমান ছিলেন উত্তম মানুষ আর তিনি বিজ্ঞ আলেমও ছিলেন।

আমরা বলি, আলোচ্য আয়াতে রজায়াতসংশ্লিষ্ট তালাকের আলোচনা করা হয়েছে দু'বার। তারপর আলোচনা এসেছে স্ত্রীর ফিদিয়া বা দায়মুক্তি সম্পর্কে। এতদ্বসত্ত্বেও বিষয়টি স্বামী স্ত্রী উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। স্বামীকে কিছু দেয়ার সম্পর্ক স্ত্রীর সঙ্গে এবং তা গ্রহণ করে পৃথক করে দেয়ার সম্পর্ক স্বামীর সঙ্গে। এভাবে প্রমাণিত হয় যে, তালাক কেবল স্বামীরই অধিকারাধীন।

প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্‌পাক দুই প্রকার তালাকের আলোচনা করেছেন। একটি তালাক সম্পদবিশিষ্ট এবং অপরটি সম্পদবিহীন। এরপর বর্ণনা করেছেন, 'ফাইন তাল্লাক্বহা ফালা তাহিল্লু লাহু।' আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী 'ফা' অব্যয়টি বিষয়ের পরম্পরা নির্ণায়ক। ফিদিয়া বা দায়মুক্তির আলোচনার পরে আল্লাহ্‌পাক তালাকের আলোচনা করেছেন। খোলা যদি তালাক না হয়, তাহলে ফা অব্যয়টি ব্যবহারের উদ্দেশ্য থাকে কি? যদি কেউ বলে, মাঝখানের খোলা সম্পর্কিত আলোচনাটি অপ্রাসঙ্গিক। তবে এটিকে মেনে নেয়া যেতে পারে না। কারণ, এর কোনো প্রমাণ নেই। এতে করে আল্লাহ্‌পাকের কালামের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। আর আয়াতের প্রথমে তালাক, শেষে তালাক এবং মাঝখানে খোলার আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ীর উক্তিটিও সঠিক নয়। কারণ, আলোচ্য আয়াতে খোলা এবং বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো আলোচনাই করা হয়নি। শুধু স্ত্রী কর্তৃক কিছু বিনিময় দেয়ার কথা বলা হয়েছে। স্বামীর কর্তব্য সম্পর্কে কোনো কথা নেই। কাজেই স্বামীর কর্তব্যটি ওই তালাকই যা ইতোপূর্বে বলে দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় স্পষ্টতই বিষয়টি এ রকম দাঁড়ায় যে, প্রথমে আলোচিত তালাক যদি বিনিময়শূন্য হয়, তবে তা হবে রজয়ী। আর যদি বিনিময় সংশ্লিষ্ট হয়, তবে তা হবে বায়েন। স্বামীর উপর এক সাথে বিনিময় ও তালাক প্রদান একত্রিত হতে পারে না। এই একত্রিত হতে না পারাকে তালাক অথবা খোলা যে কোনো নামে অভিহিত করা যেতে পারে। ব্যবহারিক ভাষার মাধ্যমে এই অবস্থাটিকে বলা হয়েছে খোলা। শব্দটি কালাম পাক থেকে উচ্চারিত নয়।

আলোচ্য আয়াতের শানে নুজুল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খোলা আসলে তালাক। আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের কন্যা হারিস বিন করিমের স্ত্রী জমিলা অথবা দারা কুতনীর সূত্রে ইবনে হাজার বলেছেন, তাঁর নাম জয়নাব (সম্ভবত তাঁর দু'টি নাম ছিলো)। অপর একটি হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে তাঁর নাম হাবিবা বিনতে সহল। ইবনে হাজার বলেছেন, দু'জন নারী সম্পর্কে দু'টি পৃথক ঘটনা ঘটেছিলো। হাদিস দু'টি খুবই মশহুর। সনদও বিশুদ্ধ। তবে বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছুটা গরমিল

www.eelm.weebly.com

লক্ষ্য করা যায়। ঘটনাটি ছিলো এরকম— ওই স্ত্রীলোকটি রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলেন। স্বামীর প্রহারের চিহ্ন ছিলো তাঁর শরীরে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসুল ! আমি আমার স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট নই, তিনিও আমার প্রতি সন্তুষ্ট নন। রসুল স. তখন তাঁর স্বামীকে ডেকে এনে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি বিবাদ হয়েছে? তিনি (সাবেত) শপথ করে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্ ! আপনার পর আমার এই স্ত্রী পৃথিবীতে আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। রসুল স. জমিলাকে বললেন, তুমি কী বলো? জমিলা বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি তো আপনার নিকট একটি অভিযোগ পেশ করেছি। এখন ওই অভিযোগের বিরুদ্ধে আমিতো কিছু বলতে পারি না। তবে একথা ঠিক যে, সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে। কিন্তু আমার মন বসে না। তাই আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট নই। সেও আমার প্রতি অপ্রসন্ন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন— সাবেত বিন করিমের স্ত্রী রসুল স.কে বলতে শুরু করলেন, হে দয়ার নবী! কায়েসের ধর্মাচরণে ও স্বভাবে কোনো দোষ নেই। কিন্তু ইসলামের সঙ্গে কুফরীর সংমিশ্রণ করা আমার নিকট অপছন্দনীয়। রসুল স. বললেন, তুমি কি তার বাগানটা ফেরৎ দিতে পারো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. তখন সাবেতকে বললেন, তুমি বাগানটা নিয়ে তাকে তালাক দিয়ে দাও। ভিন্ন একটি সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, জমিলা খোলা করার উদ্দেশ্যে রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর বলেছেন, ইসলামের সর্বপ্রথম খোলা হয় সাবেত বিন কায়েসের স্ত্রীর সঙ্গে। তিনি রসুল স.এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমার আর সাবেতের মাথা আর একত্রিত হতে পারে না। অন্যদের সঙ্গে আমি যখন তাকে তুলনা করি তখন দেখি, সে সবচেয়ে কালো ও বেঁটে। সে দেখতেও অতি কদর্য্য। রসুল স. তাঁকে বলেছিলেন, তুমি তাঁর বাগানটিকে ফেরৎ দিতে পারো? জমিলা বলেছিলেন, হ্যাঁ। সে চাইলে আমি আরো কিছু অতিরিক্ত দিতে পারি। রসুল স. তখন দু'জনকে পৃথক করে দিয়েছিলেন।

হজরত হাবিবা বিনতে সহল থেকে আবু দাউদ, ইবনে হাববান এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, সাবেতের স্ত্রী (হাবিবা) নবী পাক স. এর নিকট নিবেদন করলেন, আমরা কেউ কারো প্রতি সন্তুষ্ট নই (হাদিসের শেষ পর্যন্ত)।

হজরত ইবনে জুরাইজ থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াতটি সাবেত ও হাবিবার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। হাবিবা রসুল পাক স. এর নিকট হাজির হয়ে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেন। রসুল পাক স. বললেন, তুমি কি তার বাগানটাকে ফেরৎ দিতে সম্মত আছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রসুল পাক স. তখন সাবেতের মতামত চাইলেন। সাবেত বললেন, আপনি কি আমার ব্যাপারে এটাই উত্তম ধারণা করেছেন? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ।

www.eelm.weebly.com

সাবেত বললেন, ঠিক আছে আমি নিষ্কৃতি দিলাম। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, খোলা তালাক পর্যায়ভূত। হাদিসের ভাষ্যেও তাই সরাসরি বলা হয়েছে, তুমি বাগানটি নিয়ে তাকে তালাক দাও।

যদি কেউ প্রশ্ন করে বর্ণনাগুলোর বিপরীত কার্যক্রম দ্বারা ইমাম আবু হানিফার ভাষ্য নাসেখ (রহিতকারী) প্রতীয়মান হয়। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারীর বর্ণনায় খোলার পরে তালাকের প্রমাণ রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস পুনঃ মন্তব্য করেছেন যে, খোলা হলো বিবাহবিচ্ছেদ। খোলার পরে তালাকের আর প্রয়োজন নেই।

আমরা বলি, সম্ভবত হজরত ইবনে আব্বাস ধারণা করেছিলেন, হজরত সাবেত রসুল স. এর নির্দেশানুযায়ী তাঁর বিবিকে তালাক দিয়েছিলেন। আর ওই তালাক ছিলো সম্পদের বিনিময়ে। খোলা ছিলো না। অতঃপর তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা অনুসারে এই ফতোয়া জারী করে দিয়েছেন যে, খোলা হলো বিবাহবিচ্ছেদ। কাজেই হজরত ইবনে আব্বাসের ফতোয়া ছিলো তাঁরই ধারণানির্ভর। হাদিসের বিপরীত ছিলো না। হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি (এটাই ছিলো ইসলামের সর্বপ্রথম খোলা) রূপক অর্থে ব্যবহৃত হবে। আর হজরত ইবনে আব্বাসের ধারণার অনুসরণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য নয়।

খোলা তালাক সম্পর্কে যে সকল দলিল বর্তমান, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে— আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনা যা তিনি সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব থেকে উদ্ধৃত করেছেন; যেখানে বলা হয়েছে, রসুল পাক স. খোলাকে তালাকের একটি পর্যায় সাব্যস্ত করেছেন। বিবরণটি মুরসাল ও বিশুদ্ধ। আমাদের নিকট মুরসাল হাদিসও দলিল হিসাবে গ্রহণীয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের মুরসাল হাদিসও সনদ বিশিষ্ট হাদিসের পর্যায়ভূত। কারণ, আমি সেগুলোকে সনদ সহই পেয়েছি। খোলা যে আসলে এক প্রকার তালাক, তা হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন, খোলা এবং ইলা দ্বারাও বায়েন তালাক হয়। এ রকম বলেছেন ইবনে আবি শাইবা। উম্মে বকরার অনুরূপ বিবরণ হজরত আলী থেকেও বর্ণিত হয়েছে। উম্মে বকরা বলেছেন, তিনি তাঁর স্বামীর নিকট খোলা করে নিয়েছিলেন। ঘটনাটি যখন হজরত ওসমানের আদালতে পৌঁছলো, তখন তিনি সেখানে গিয়ে বললেন, এটা হলো তালাকে বায়েন। স্বামী স্ত্রী যদি অন্য কোনো সমাধানে আসে তবে সেটা আলাদা বিষয়। মালেক। তবে এই বিবরণটি সম্পর্কে কেউ কেউ আপত্তি উত্থাপণ করে বলেন যে, এর মধ্যে জুমহান নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি মশহুর নন। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, জুমহান ছিলেন আবু ইয়ালী আসলামিয়াইনের মুরিদ। আবার কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন ইয়াকুব কিব্‌তির মুরিদ এবং ছিলেন তাবেয়ী। হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, হজরত ওসমান বিন আফফান, হজরত আবু হোরায়রা, এবং হজরত

www.eelm.weebly.com

উম্মে বকরা থেকে তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন উরওয়া বিন জোবায়ের, মুসা বিন উবাইদা জোবাইদি এবং আরও অনেকে। ইবনে হাব্বান মনে করেন, তিনি ছিলেন ধীশক্তিসম্পন্ন বর্ণনাকারী।

মাসআলাঃ আয়াতের সাধারণ বক্তব্যানুসারে এ বিষয়টিতে সকলে একমত যে, মোহর থেকে অতিরিক্ত খোলা নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ বলেছেন, এ রকম করলে মাকরূহ হবে। আলেমদের অধিকাংশ বলেছেন মাকরূহ হবে না। আর এটা হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা থেকে জামিউস সগিরের বিবরণ। এই মাসআলাটিতে সাহাবায়ে কেরামের মতভিন্নতার কথা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। মাকরূহ হওয়ার কারণ আবু দাউদের মারাসিল গ্রন্থভূত ইবনে আবি শাইবা ও আবদুর রাজ্জাকের ওই বর্ণনাটি, যেখানে বলা হয়েছে রসুল স. তাঁকে (সাবেতের স্ত্রীকে) বলেছিলেন, সাবেত মোহরস্বরূপ তোমাকে যে বাগানটি দিয়েছিলো তা তুমি ফেরৎ দিতে রাজি কি না? তিনি বলেছিলেন, রাজি। বরং চাইলে আরও বেশী কিছু দিবো। রসুল স. বলেছিলেন, অতিরিক্ত প্রদান অনুচিৎ। দারা কুতনীও অনুরূপ বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এরকম বর্ণনা করেছেন ওয়ালিদ—ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি আতা থেকে এবং তিনি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। ইবনে জাওজী দারা কুতনী থেকে এবং তিনি আবু জোবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুলের কন্যা জয়নাব সাবেত বিন কায়েসের স্ত্রী ছিলেন। সাবেত তাঁকে মোহর হিসেবে একটি বাগান দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বনিবনা হলো না। জয়নাব তখন রসুল স. এর দরবারে অভিযোগ পেশ করলেন। রসুল স. বললেন, তুমি কি বাগানটি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারো? তিনি বলেছিলেন, পারি। বরং কিছু অতিরিক্ত দিতে পারি। তিনি স. বললেন, অতিরিক্তের প্রয়োজন নেই। শুধু বাগানটা দিলেই চলবে। একথা বলে রসুল স. বাগানটি সাবেতকে দিয়ে দু'জনকে পৃথক করে দিলেন। সাবেত বললেন, আমি রসুল পাক স. এর মীমাংসা অবনত মস্তকে মেনে নিলাম। ইবনে জাওজী বলেছেন, বর্ণনাটির সনদ বিশুদ্ধ। দারা কুতনী বলেছেন, আবু জোবায়ের অনেকের নিকট থেকে ঘটনাটি শুনেছেন। আতা থেকে সনদসহ দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, মহানবী স. এরশাদ করেন— খোলা প্রাপ্তাদের নিকট থেকে যা দেয়া হয়েছে তার অতিরিক্ত নিও না। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজা বলেছেন, সুলুল তনয়া রসুল স. সকাশে হাজির হলেন। রসুল স. সাবেতকে আদেশ করলেন, শুধু বাগানটি নিয়ে নাও, অতিরিক্ত নিও না।

সার কথা হচ্ছে, বিশুদ্ধ মুরসাল হাদিসে অতিরিক্ত গ্রহণের প্রমাণ রয়েছে। হজরত আলী থেকে এরকম প্রমাণ বিদ্যমান। স্বামী তার স্ত্রীকে মোহর হিসেবে যা দিয়েছে তার অতিরিক্ত নিতে পারবে না— এ রকম বর্ণনা করেছেন আবদুর রাজ্জাক এবং তকী। আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, রবীয় বিনতে মুআজ থেকে। ওই বর্ণনাটিতে রয়েছে তিনি তাঁর স্বামীর নিকট তাঁর সকল সম্পদ

www.eelm.weebly.com

প্রত্যার্পণ করে খোলা করেছিলেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছিলো বিবাদ। বিষয়টি হজরত ওসমানের আদালতে পেশ করা হলে, তিনি পূর্বের আদেশই বহাল রেখেছিলেন এবং রবীয়কে বলেছিলেন, টুপি ও অন্যান্য যা কিছু আছে সব দিয়ে দাও। নাফে কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমরের স্ত্রীর এক মুক্ত ক্রীতদাসী সকল সামগ্রী এমন কি পরিধেয় বস্ত্রের বিনিময়ে খোলা করেছিলেন। বর্ণিত আসার দুইটিতে এমন কোনো কিছু উল্লেখ নেই যা মকরূহ্ সিদ্ধান্তের বিপরীতে যায়। বরং আসার দু'টি খোলার প্রচলিত বিধানকেই সমর্থন করে। কেউ এটাকে অস্বীকার করেন নি।

যাঁরা মকরূহ হওয়াকে স্বীকার করেন না, তাঁরা আলোচ্য আয়াতের ওই বাক্যটিকেই দলিল হিসাবে গ্রহণ করেন— যেখানে বলা হয়েছে, 'ফালা জুনাহা আলাইহিমা ফি মাফতাদাত্ বিহী' (তবে স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে কারো কোনো অপরাধ নেই)। এখানে 'মা' শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক। এর দ্বারা কম বেশী দু'টিই বুঝায়। কোরআনের বিধানের প্রতিকূলে যাবে না— এই নীতিতেই খবরে ওয়াহিদ গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে প্রতিকূলতা লক্ষ্যণীয়।

আমি বলি, ইমাম আবু হানিফার আচরণীয় সূত্র হচ্ছে, যে আম অন্তর্ভুক্তি হিসেবে অকাট্যরূপে প্রমাণিত সেই আম (সাধারণ) কে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা যাবে না। কিন্তু যদি আমরা বলি যে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সুনির্দিষ্টকরণ সিদ্ধ তবে আমরা এও বলতে পারি—আয়াতের বিধান মোহরের পরিমাণের উপর সংযুক্ত। আর পরিমাণের হ্রাস সংশ্লিষ্ট ওই হাদিসগুলোর সঙ্গে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত একটি হাদিস মকরূহ না হওয়াকে প্রমাণ করেছে। তিনি বলেছেন, আমার বোন এক আনসারীর স্ত্রী ছিলেন। ওই আনসারী মোহরানা হিসেবে একটি বাগান দিয়েছিলেন তাকে। হাদিসটির শেষ দিকে উল্লেখিত হয়েছে— রসুল স. আমার বোনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যদি ওই বাগানটি ফেরৎ দাও তবে সে তোমাকে তালাক দিবে। আমার বোন বললো, তাই হোক। বাগানটার সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু দাও। ইবনে জাওজী বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ নয়। বর্ণনাকারীদের একজন আতিয়া আওফি সম্পর্কে ইবনে হাব্বান বলেছেন, তার হাদিস শিক্ষা করা জায়েয নয়। অপর এক বর্ণনাকারী হাসান বিন আম্মারাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করেছেন শো'বা।

'এই সব আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা এই সীমালংঘন কোরো না। যারা এ রকম করে তারা জালেম'— আল্লাহ্পাকের বিধানে দু'টি সম্ভাবনা ছিলো। একটি হচ্ছে বিধিমতো রেখে দেয়া এবং অন্যটি হচ্ছে সদয়ভাবে ছেড়ে দেয়া। 'ফাইন তাল্লাক্বাহা' (অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়) বাক্যটি হচ্ছে দ্বিতীয় সম্ভাবনা (আয়াত ২৩০)। আল্লাহ্পাক এর পর তাঁর বিধান করেছেন এভাবে— 'তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সঙ্গে সঙ্গত না হবে।'— একথার অর্থ, তালাকপ্রাপ্তাকে বিশুদ্ধভাবে দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ

www.eelm.weebly.com

হতে হবে। এখানে আমি বিশুদ্ধ কথাটির উল্লেখ এজন্যই করলাম যে, চূড়ান্ত অর্থবোধক (মুতলাক) থেকেই পূর্ণ একক মর্ম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বৈবাহিক সম্পর্কের সঙ্গে স্বামী স্ত্রী উভয়েই জড়িত। কারণ, এই সম্পর্কটি হয় ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে। আয়াতের অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব ও দাউদ বলেছেন, দ্বিতীয় স্বামীর সম্ভোগ ব্যতিরেকে প্রথম স্বামী পুনঃবিবাহ করতে পারবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, প্রথম স্বামীর পুনঃবিবাহ শুদ্ধ করতে চাইলে দ্বিতীয় স্বামীকে সম্ভোগ করতেই হবে। একারণেই অনেক ভাষ্যকার বলেন, এখানে নিকাহ্ (বিবাহ) শব্দটির অর্থ সম্ভোগ।

কেউ যদি একথা বলে জটিলতা সৃষ্টি করে যে, সম্ভোগ করা স্বামীর কর্ম, স্ত্রীর নয়। স্ত্রী কেবল সম্ভোগের ক্ষেত্র। তাহলে সম্ভোগের শর্ত স্ত্রীর প্রতি করা হয়নি। এই জটিলতা অপনোদনার্থে আমরা বলি, মাজাজী (মাধ্যমিক) অর্থ হিসেবে এ রকম বলা জায়েয। কিন্তু আয়াতটি চূড়ান্ত অর্থ প্রকাশক। মাজাজ (মাধ্যমিক) নয়। কারণ নিকাহ্ অর্থ যদি চুক্তি হয় তবে জওজ শব্দটি মাজাজ হিসাবে ব্যবহৃত হবে। কারণ তখনও চুক্তি হয়নি। তবে সে স্বামী হয় কেমন করে। এ জন্য তাকে বলা হলো আগাম স্বামীর কথা। তেমনি যদি নিকাহ্ শব্দের অর্থ ধরা হয় সম্ভোগ তবে সম্পর্কগতভাবে সেটাও হবে মাজাজী। এও বলা যেতে পারে যে, নিকাহ্ এর মাজাজী মর্ম হবে— সে সম্ভোগ করতে পারে। আয়াতটির এ রকম জটিল ব্যাখ্যা করার কারণ হজরত আয়েশা সিদ্দিকার একটি হাদিস, যে হাদিসে তিনি বলেছেন, আমি এবং আমার পিতা আবু বকর রসুল স. এর কাছে ছিলাম। তখন রেফায়া কারজীর স্ত্রী এসে বললো, রেফায়া আমাকে মুসাল্লাসা তালাক দিয়েছিলো। তারপর আবুদর রহমান আমাকে বিয়ে করেছিলো। তার নিকট আমি পেলাম যেমন সুতার গুচ্ছ, বলেই সে উড়নার সুতার গুচ্ছ ধরে দেখালো। রসুল স. তার কথায় মৃদু হাসলেন। বললেন, তাহলে তুমি আবার রেফায়ার নিকটে যেতে চাও? কিন্তু তাতো হতেই পারে না যতোক্ষণ না সে তোমার এবং তুমি তার স্বাদ গ্রহণ করেছো। মুহাদ্দিসগণের এক বড় দল এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। বোখারী ও মুসলিম। একটি বর্ণনায় দেখা যায়, সে প্রথমে ছিলো রেফায়ার স্ত্রী। রেফায়া তাকে তিন তালাক দিয়েছিলো। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে মুসাওয়ার বিন রেফায়া কারজী থেকে, তিনি জোবায়ের বিন আবদুর রহমান বিন জোবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন— রসুল স. এর যুগে রেফায়া বিন সামওয়াল তার স্ত্রী তাসিমা বিনতে ওয়াহাবকে তিন তালাক দিয়েছিলো। এরপর তাকে বিয়ে করেছিলো আবদুর রহমান বিন জোবায়ের। কিন্তু সে ছিলো নপুংসক। তাসিমা তাই তার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো। এরপর রেফায়া তাকে পুনরায় বিয়ে করতে চাইলে রসুল স. তাকে নিষেধ করেন এবং বলেন, যতোক্ষণ না আবদুর রহমান তাকে সম্ভোগ করবে ততোক্ষণ তোমার বিবাহ হালাল হবে না। বহুসংখ্যক

www.eelm.weebly.com

মুহাদ্দিস হজরত আয়েশার হাদিস বর্ণনা করেছেন এভাবে— এক ব্যক্তি রসুল স.এর নিকট জানতে চাইলো এক লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলো। এরপর সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলো। দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে তার নির্জন বাস হয়েছিলো ঠিকই কিন্তু সঙ্গম হওয়ার পূর্বেই দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দিলো। এখন ওই রমনীকে তার প্রথম স্বামী বিয়ে করতে পারবে কি না? তিনি স. বললেন, না— যতোক্ষণ না প্রথম স্বামীর মতো দ্বিতীয় স্বামী তাকে সম্ভোগ করে। মুকাতিল বিন হাব্বান থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় আবদুর রহমান বিন আতিকের কন্যা আয়েশা সম্পর্কে। সে ছিলো রেফায়া বিন ওয়াহাব বিন আতিকের স্ত্রী। রেফায়া ছিলো তার চাচাত ভাই। রেফায়ার বায়েন তালাকের পর তাকে বিয়ে করেছিলো আবদুর রহমান বিন জোবায়ের কারেজী। আবদুর রহমানও তাকে তালাক দিলেন। সে তখন রসুল স. এর সকাশে উপস্থিত হয়ে জানালো, দ্বিতীয় স্বামী সম্ভোগ করার আগেই আমাকে তালাক দিয়েছে। আমি কি এখন প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবো? তিনি স. বললেন, না— যতোক্ষণ না সে তোমাকে সম্ভোগ করে। সেই সময় অবতীর্ণ হলো 'অতঃপর যদি তাকে তালাক দেয় তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না—যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সঙ্গে সঙ্গত না হয়।' দ্বিতীয় স্বামী সম্ভোগ করার পর তালাক দিলে কি হবে সে কথা বলা হয়েছে পরক্ষণেই 'তারপর সে যদি তাকে তালাক দেয় আর তারা উভয়ই যদি মনে করে যে তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোন অপরাধ হবে না।'

বাগবী বলেছেন, এ ঘটনার পর আয়েশা কিছুদিন চুপচাপ রইলো। পুনরায় রসুল স. এর নিকটে আবেদন জানালো, হে আল্লাহর রসুল! আমার দ্বিতীয় স্বামী আমার সঙ্গে সঙ্গত হয়েছে। রসুল স. বললেন, তুমি তোমার কথাকেই মিথ্যা প্রমাণ করছো (আগে বলেছো সে নপুংশক)। তাই তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আয়েশা নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। কিছুদিন পরেই রসুল স. দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক হলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। তাঁর নিকট গিয়ে আয়েশা বললো, আমার দ্বিতীয় স্বামী আমাকে সম্ভোগ করার পর তালাক দিয়েছেন। হজরত আবু বকর বললেন, তুমি তো রসুল পাক স. এর নিকটে একথা বলেছো। এ ঘটনা সকলেই জানে। সুতরাং তুমি প্রথম স্বামীর নিকটে আর যেতে পারছো না। কিছুদিন পর হজরত আবু বকর সিদ্দিকও পরলোকগমন করলেন। আয়েশা তখন হাজির হলো দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের নিকট। হজরত ওমর তার কথা শুনে বললেন, যদি তুমি প্রথম স্বামীর নিকট যাও, তবে আমি তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলবো।

এখানে নিকাহ্ শব্দটির অর্থ যদি চুক্তি ধরা হয়, তবে এ হাদিসের দ্বারা কোরআনের বিধানকে পরিবর্তন করা হবে। খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কোরআনের ব্যাখ্যা করা যদিও সিদ্ধ কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মাজহাবে এ রকম করা সিদ্ধ

www.eelm.weebly.com

নয়। কতিপয় আলেম বলেছেন, হাদিসটি খবরে ওয়াহিদ নয় বরং মশহুর। আর মশহুর হাদিস দ্বারা কিতাবুল্লাহর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা যায়; কথাটি যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, হাদিসটি আসলে খবরে ওয়াহিদ, মশহুর নয়। তবে বলা যেতে পারে হাদিসটির অনুকূলে যখন ঐকমত্য সংগটিত হয়েছে এবং জমহুর আলেম তা স্বীকারও করে নিয়েছেন তখন হাদিসটি মশহুর হাদিসের পর্যায়ভূত হয়েছে। তাই এ হাদিসের মাধ্যমে কিতাবুল্লাহকে অতিক্রম করা সিদ্ধ হয়েছে।

'ইয়াতারজাআ' শব্দটি স্বামী স্ত্রী উভয়ের প্রতি সম্বন্ধিত। তাই বলা হয়েছে 'তারা উভয়ে যদি মনে করে' এই সম্মিলক সম্বোধনটি পূর্ববর্তী আয়াতের একটি বাক্যের বিপরীত যেখানে বলা হয়েছে— তাদের পুনগ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার— সেখানে স্বামীরাই ছিলো এককভাবে সম্বোধনকৃত।

'তারা উভয়ে যদি মনে করে যে তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে'—এখানে মনে করা বুঝাতে 'জন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে মনে করা অর্থ বিশ্বাস করা। এই বিশ্বাস এলেম বা জ্ঞান দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ অদৃশ্যের বা ভবিষ্যতের জ্ঞান কারো জানা নেই। সুতরাং এখানে 'জন' বলতে বিশ্বাস করা, মনে করা অথবা ধারণা করা বুঝতে হবে। অর্থাৎ তাদের দু'জনেরই এরকম প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, আমরা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবো।

এ বিষয়ে ইমামগণ একমত যে, দ্বিতীয় স্বামীর সম্ভোগ প্রথম স্বামীর তিন তালাকের বিলোপ সাধন করে। ওই রমণী যদি প্রথম স্বামীর সঙ্গে পুনঃবিবাহবদ্ধ হয় তবে প্রথম স্বামী পুনরায় তিনটি তালাকের অধিকার লাভ করবে। তবে এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে যে, তিন তালাকের কম হলে তা লোপ পাবে কিনা। অর্থাৎ প্রথম স্বামী যদি এক কিংবা দুই তালাক প্রদান করে থাকে, তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দতও পূর্ণ হয়ে যায়, তারপর দ্বিতীয় স্বামী তাকে বিবাহ করে পুনরায় তালাক দেয়— তারপর ইদ্দত পালন শেষে প্রথম স্বামী তাকে পুনঃবিবাহ করলে তিন তালাকের অধিকারী হবে, না আগের দুই অথবা এক তালাকের অধিকারী হবে? এমতাবস্থা সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফের বক্তব্য হচ্ছে, দ্বিতীয় স্বামীর সম্ভোগ প্রথম স্বামীর প্রথম তালাকের সমুদয় অধিকার অবলুপ্ত করে দেয়। দ্বিতীয় স্বামীর তালাকের পর প্রথম স্বামী পুনঃবিবাহ করার সাথে সাথে পুনরায় পূর্ণ তিন তালাকের অধিকারী হয়। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, তিনের কম তালাক অবলুপ্ত হয় না। যেহেতু আল্লাহপাকের নির্দেশ 'তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সঙ্গে সঙ্গত না হবে।' এর দ্বারা ওই গুরুতর নিষিদ্ধ বিষয়ের সমাপ্তি ঘটেছে যা তিন তালাক দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিলো, আর এই বিধানটি শুধুমাত্র তিন তালাকের জন্য নির্দিষ্ট। মনে রাখতে হবে যে কোনো বস্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে নিষিদ্ধ হয় না।

www.eelm.weebly.com

আমাদের দলিল হচ্ছে, আলোচ্য বিধানটি (দ্বিতীয় স্বামীর সম্ভোগের পর তালাক প্রদান) প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার একটি উপলক্ষ। তাই বলা হয়েছে 'ফালা জুনাহা আলাইহিমা আঁই য়াতারজায়া' অর্থাৎ এবার তাদের পুনর্মিলনে কারো কোনো অপরাধ নেই। তদুপরি রয়েছে রসুল স. এর ওই নির্দেশ 'আল্লাহ্পাক হালালকারী ও হালালকৃতকে অভিশম্পাত দিয়েছেন।' এখানে দ্বিতীয় স্বামীকে প্রথম স্বামীর জন্য হালালকারী গণ্য করা হয়েছে। আর হালাল হওয়ার বিধান হয়েছে এজন্য যে, সবকিছুই যেনো হালাল পন্থায় সম্পাদিত হয়। একারণে প্রথম স্বামী তিন তালাকেরই অধিকারী হবে। এ ছাড়া দ্বিতীয় স্বামীর সম্ভোগ যখন গুরুতর নিষিদ্ধ বিষয়ের বিনাশ সাধন করতে সক্ষম, তখন লঘু নিষিদ্ধতাও নিশ্চয়ই বিনাশ সাধন করতে পারবে।

প্রথম স্বামীর ছেড়ে দেয়া স্ত্রী যদি দ্বিতীয় স্বামীকে এই শর্তে গ্রহণ করে যে, আমাকে তালাক দিতে হবে; আর দ্বিতীয় স্বামীও যদি তার শর্ত মেনে নিয়ে পুনরায় তালাক দেয় তবে ইদ্দতান্তে প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করতে পারবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরকম বিবাহ বৈধ যেহেতু সে বিশুদ্ধ বিবাহের আওতায় সম্ভোগ করেছে। শর্তের দ্বারা বিবাহ বাতিল হয় না। ইমাম মোহাম্মদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ শুদ্ধ হবে ওই দলিল অনুসারে যা আমি পূর্বেই পেশ করেছি। কিন্তু প্রথম স্বামীর জন্য এটা বৈধ হবে না, কারণ সে এমন একটি বিষয়ে ক্ষিপ্রতা দেখিয়েছে, শরিয়ত যেটাকে রেখে দিয়েছে পশ্চাতে। কাজেই শরিয়তের উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে তাকে শাস্তি দিতে হবে। যেমন, অংশীদারিত্ব দ্রুত হস্তগত করার জন্য কেউ যদি কোন উত্তরাধিকারীকে হত্যা করে তবে সে অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। ইমাম মালেক, আহমদ ও আবু ইউসুফের বক্তব্য হচ্ছে, ওরকম করলে বিয়েই শুদ্ধ হবে না। ইমাম শাফেয়ী থেকেও এ ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতর মতটি হচ্ছে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কারণ, এটা নির্ধারিত সময়ের (মুত্আ) বিয়ের বিধানের মধ্যেই পড়ে। আর বিয়েই যদি শুদ্ধ না হয় তবে প্রথম স্বামীর জন্য হালালও হবে না। কারণ হালাল হওয়ার নিয়ম এখানে পালন করা হয়নি। অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিবাহের রীতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ইমামত্রয় এরকম বিবাহ বিশুদ্ধ না হওয়ার সমর্থনে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের হাদিসটিকে পেশ করেছেন। হাদিসটিতে বলা হয়েছে, রসুল পাক স. হালালকারী এবং হালালকৃতের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন। দারেমী ও তিরমিজি হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ্ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত উকবা বিন আমের থেকে।

আমরা বলি, বর্ণিত হাদিসটিতো আমাদেরই পক্ষে। কেনোনা রসুল স. দ্বিতীয় স্বামীকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন। হাদিসের 'মুহলিল' শব্দটি বৈধতাকেই সমর্থন করে। তাই এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ শুদ্ধ হবে। তবে এ প্রসঙ্গটি ভিন্ন যে, দ্বিতীয় স্বামী অন্য একটি নিষিদ্ধ বিষয়ের অপরাধে অপরাধী। আমরাও সে কথা

www.eelm.weebly.com

বলি— প্রকাশ্যে নয়, মনে মনে যদি কেউ বিবাহ করার পর প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে কাউকে পরিত্যাগ করে তবে বিবাহ ও তালাক দু'টিই বিশুদ্ধ হবে। ইমাম আবু হানিফা, তাঁর সহচরদ্বয় এবং ইমাম শাফেয়ী একথা বলেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক বলেছেন, মনে মনে ছেড়ে দেয়ার উদ্দেশ্য থাকলেও শুদ্ধ হবে না। হালালা কর্মটি ইমামদের ঐকমত্যানুযায়ী মাকরূহ। বাগবী বলেছেন, নাফে কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- জনৈক ব্যক্তি হজরত ইবনে ওমরের নিকটে উপস্থিত হয়ে বললো, এক লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলো, তখন তার ভাই তাকে কিছু না বলেই ভাইয়ের পরিত্যক্তাকে বিয়ে করলো। মেয়েটিকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করাই ছিলো তার ইচ্ছা। এখন আপনি কি বলেন? হজরত ইবনে ওমর বললেন, হালাল হবে না। মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয় অধিকারে রাখার জন্য, পরিত্যাগ করার জন্য নয়। রসুল স. এর যুগে ওই লোককে আমরা ব্যভিচারী পর্যায়ে ফেলতাম। আল্লাহ্পাক হালালকারী এবং হালালকৃতের প্রতি অভিশম্পাত দিয়েছেন।

সবশেষে বলা হয়েছে, বর্ণিত বিধানসমূহ হচ্ছে আল্লাহপাকের সীমারেখা। এ সকল বিধান আল্লাহপাক ওই সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাদের জ্ঞান আছে, এবং যারা জ্ঞান অনুযায়ী আমলও করে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৩১

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

❑ যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তাহারা ইদ্দতকাল পূর্ণ করে তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাহাদিগকে রাখিয়া দিবে অথবা বিধিমত মুক্ত করিয়া দিবে। কিন্তু অন্যায়রূপে তাহাদের ক্ষতি করিয়া সীমালংঘন উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে তোমরা

www.eelm.weebly.com

আটকাইয়া রাখিও না। যে এইরূপ করে সে নিজের প্রতি জুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহের নিদর্শনকে ঠাট্টা তামাশার বস্তু করিও না এবং তোমাদের প্রতি অবদান ও কিতাব এবং হিকমত যাহা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন ও যদ্দারা তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দেন তাহা স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানময়।

আয়াতের 'আযল' (আযালাহুন্না থেকে) শব্দটি সময়সীমা ও সময়সীমার শেষ প্রান্তকে নির্দেশ করে। মানুষের আয়ুষ্কালকেও আযল বলে। আবার মৃত্যুকেও আযল বলে, যা আয়ুর প্রান্তসীমা। এখানে আযল বলে বুঝানো হয়েছে ইদ্দতের সময়সীমার শেষ প্রান্তকে। কারণ, ইদ্দতের সূচনা হয় তালাকের পরক্ষণেই।

'বুলুগ' অর্থ কোনো বস্তু পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। কখনো আবার রূপক অর্থে কোনো কিছুর নিকটবর্তী হওয়াকেও বুলুগ বলে। আলোচ্য আয়াতে 'ফা বালাগনা' বলে দ্বিতীয় অর্থটিকে নির্দেশ করা হয়েছে, যেনো পূর্বোক্ত আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা অটুট থাকে।

'তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে অথবা বিধিমতো মুক্ত করে দিবে।'(ফা আমসিকুহুন্না বি মা'রূফ আও সাররিহু হুন্না বি মা'রুফ) — একথার অর্থ, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর একটি নন্দিত পরিসমাপ্তি হওয়া বাঞ্ছণীয়। তাকে (স্ত্রীকে) অনর্থক আবদ্ধ করে রাখা বৈধ হবে না। নিশ্চিত করতে হবে সুন্দর প্রত্যাবর্তন অথবা সুশিষ্ট বিদায়।

'কিন্তু অন্যায়রূপে তাদের ক্ষতি করে সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে তোমরা আটকে রেখো না। যে এমন করে সে নিজের প্রতি জুলুম করে'— একথার অর্থ দীর্ঘদিন তাকে আটকে রেখে কিছু আদায় করতে চেষ্টা কোরো না। 'দ্বেরার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কর্মপদে। কর্তৃপদে ব্যবহৃত হয় অবস্থা জ্ঞাপক হিসেবে। 'লি তা'তাদু' শব্দের 'লাম' অক্ষরটি 'লা তুমসিকুহুন্না'র সাথে সম্বন্ধিত। এটাও কর্মপদ হিসেবে 'দ্বেরার' শব্দের ব্যাখ্যা। অথবা 'লি তা'তাদু' শব্দের 'লাম' 'দ্বেরার' শব্দটির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এটি 'দ্বেরার' শব্দের ব্যাখ্যারূপে ব্যবহৃত। দ্বেরার একটি চূড়ান্ত অর্থবোধক শব্দ। জুলুম বা উৎপীড়নের চূড়ান্ত অবস্থা বুঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্‌পাক সৌজন্যের সাথে রাখতে বলেছেন অথবা ছেড়ে দিতে বলেছেন শিষ্টাচারের সঙ্গে। আর নিষিদ্ধ করেছেন উৎপীড়নকে। এরপর বলেছেন, যে এ রকম করে, সে নিজের প্রতি জুলুম করে। অর্থাৎ সে নিজেই নিজেকে শাস্তিযোগ্য করে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আওফীর সূত্রে ইবনে জারীর বলেছেন, প্রথম দিকে এমন অবস্থা ছিলো যে, কোনো কোনো লোক লাঞ্ছনা দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের স্ত্রীদের তালাক দিতো। ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে ফিরিয়ে নিতো, পুনরায় তালাক দিতো। ক্রমাগত এ রকমই করতে থাকতো তারা। এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ওই পরিস্থিতিকে লক্ষ্য করেই। বাগবী, সুদ্দী ও ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, এ আয়াত এক আনসারীকে লক্ষ্য করে

www.eelm.weebly.com

অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁর নাম ছিলো সাবেত বিন ইয়াসার। সাবেত তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিতেন। ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তাঁকে ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে পত্নীপীড়নই ছিলো তাঁর ইচ্ছা। এ অবস্থাকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করলেন, 'এবং তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনকে ঠাট্টা তামাশা কোরো না।' অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধানাবলীকে উপেক্ষা কোরো না এবং তার বাস্তবমান্যতায় অলসতাকে প্রশ্রয় দিও না। নাসাঈ বলেছেন, একথার অর্থ 'সন্তোষের সঙ্গে গ্রহণ এবং সম্প্রীতির সঙ্গে বিদায়'— আল্লাহ্পাকের এই কথাকে ঠাট্টা মনে কোরো না। এই নির্দেশটি আল্লাহ্র বিধানের বিপরীত আচরণকারী সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, তারা সকলে আল্লাহ্র বিধানকেই উপহাস করে। ইবনে আবী আমর তাঁর মাসনাদ গ্রন্থে এই বিবরণটি লিপিবদ্ধ করেছেন। হজরত আবু দারদা থেকে ইবনে মারদুবিয়াও এই বিবরণটি এনেছেন। তিনি বলেছেন, ইসলামের প্রথমাবস্থায় এমন ছিলো যে, কেউ কেউ তালাক দিয়ে বলতো, আমি তো ঠাট্টা করেছি। কেউ আবার ক্রীতদাস এবং ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে দিয়ে বলতো,আমি তো একটা তামাশা করলাম। হজরত আবু দারদা থেকে বাগবী বলেছেন, কেউ কেউ বিয়ে করেও বলতো, আমি একটি মশকরা করলাম। মানুষের এ সকল অশিষ্টাচরণের প্রতিবাদে আল্লাহ্পাক বললেন, 'তোমরা আল্লাহর নির্দেশকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু বানিও না।' ইবনে মারদুবিয়া হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এবং ইবনে জারীর হাসান থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন—ঠাট্টা- উপহাস করে বললেও তিনটি বিষয় কার্যকর হবে— তালাক, দাসমুক্তি ও বিয়ে। ইতোপূর্বে হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে বলা হয়েছে— রসুল স. এরশাদ করেন, হেসে খেলে বললেও তিনটি বিষয় সত্য হবে— বিয়ে, তালাক, রজায়াত।

'এবং তোমাদের প্রতি অবদান ও কিতাব এবং হিকমত, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন ও যদ্দারা তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন তা স্মরণ করো'— একথার মাধ্যমে মানুষকে প্রদত্ত আল্লাহ্পাকের প্রধান অনুগ্রহগুলোকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সবশেষে বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ সকল কিছুই জানেন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৩২

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ

www.eelm.weebly.com

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

☐ তোমরা যখন স্ত্রীদিগকে তালাক দাও এবং তাহারা তাহাদের ইদ্দত কাল পূর্ণ করে, তাহারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয় তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদিগকে বিবাহ করিতে চাহিলে তোমরা তাহাদিগকে বাধা দিও না। ইহা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাহাকে উপদেশ দেওয়া হয়। ইহা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

এ নির্দেশটি দেয়া হয়েছে মেয়েদের অভিভাবকদেরকে লক্ষ্য করে। বলা হয়েছে, তালাকের পর ইদ্দত পূর্ণ হলে মেয়েরা যদি পুনঃবিবাহে আবদ্ধ হতে চায় তবে, হে অভিভাবকবৃন্দ! তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না। বাধা দেয়া বুঝাতে এখানে 'আযালাহুন্না' বলা হয়েছে। আযল অর্থ বাধা। মূলতঃ আযল শব্দের অর্থ সংকীর্ণতা, কঠোরতা। যে রোগের কোনো চিকিৎসা নেই সে রোগকে আরববাসীরা বলে, আদ্দাউল আযাল (কঠিন রোগ)। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বুলুগ (বালাগ্না) শব্দটি পূর্ববর্তী আয়াতে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিলো এখানে সে অর্থ হবে না। অর্থ হবে 'পৃথক'।

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মা'কাল বিন ইয়াসারের বোন জুমলা বিন ইয়াসারকে লক্ষ্য করে। বদাহ বিন আসিম বিন আজলাম তাকে তালাক দিয়েছিলো। বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিজি এবং আরো অনেকে মা'কাল বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন— এক লোকের সঙ্গে আমি আমার বোনের বিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার বোনকে সে তালাক দিয়ে দিলো। ইদ্দতের সময় পার হয়ে যাওয়ার পর সে পুনরায় বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলো। আমি বললাম, আমি তো তোমার সাথে আমার বোনের বিয়ে দিয়েই ছিলাম। তোমার সংসারও গুছিয়ে দিয়েছিলাম আমি। তুমি হতভাগা, তাই স্বচ্ছন্দ সংসারকে ভেঙে দিয়েছো। এখন আবার বিয়ে করতে চাও কোন বিবেচনায়? না, আমার বোন আর কিছুতেই তোমার সংসারে যাবে না। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। আমি হাজির হলাম রসুল স. এর খেদমতে। বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি অবশ্যই তার সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে দিয়ে দেবো। এরপর তার সাথেই বিয়ে হয়ে গেলো আমার বোনের।

ইবনে জারীর কয়েকটি পদ্ধতিতে সুদ্দীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন— এ আয়াত নাজিল হয়েছে হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ আনসারীকে লক্ষ্য করে। তার এক বোনকে তার স্বামী তালাক দিয়েছিলো। ইদ্দত পুরো হয়ে গেলে সে পুনরায় তার বোনকে বিয়ে করতে চাইলো। কিন্তু হজরত জাবের বিয়ে দিতে অস্বীকৃত হলেন।

www.eelm.weebly.com

প্রথম বর্ণনাটি অধিকতর বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। এ রকম হতে পারে যে, দু'টো ঘটনাই ছিলো এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। আয়াতের সম্বোধনভঙ্গি দৃষ্টে মনে হতে পারে— যারা তাদের স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলো তাদেরকেই যেনো এখানে সম্বোধন করা হয়েছে। যেনো বলা হয়েছে, তারা যেনো তালাকপ্রাপ্তাদেরকে অন্য স্বামী গ্রহণে বাধা না দেয়। কিন্তু আমি বোখারী ও অন্যান্য বর্ণনাসূত্রে আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার যে কারণ উল্লেখ করেছি তাতে করে একথা স্পষ্ট যে, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে অভিভাবকদেরকে। কারণ, বাধাটা ছিলো জুমলার ভ্রাতা মা'কাল বিন ইয়াসারের পক্ষ থেকে। আমার মনে হয়, উৎকৃষ্ট পন্থা এই যে, এখানে সাধারণভাবে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা পুনঃবিবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। একজনের মাধ্যমে কোনো কর্ম সম্পাদিত হলে যেমন তার পুরো সম্প্রদায়কে সম্বোধন করা হয়, এখানে ব্যাপারটি সে রকমই। আল্লাহ্পাকের কালামে এর দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন, 'তোমরা পরস্পর পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কোরো না।' আরো বলা হয়েছে, 'তোমাদের নিজেদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিও না।' এমতাবস্থায় আয়াতটির মর্ম দাঁড়াবে এ রকম— যখন তোমাদের মধ্যে কেউ পত্নীকে তালাক দেয় এবং সেই তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দতকালও পূর্ণ করে তখন, হে অভিভাবকবৃন্দ! তোমরা তাদেরকে প্রথম স্বামী অথবা নতুন স্বামী গ্রহণে বাধা দিও না। এখানে সকল অবস্থায় স্বামী উল্লেখ করা হয়েছে— বিবাহে রাখার সময়, তালাকের পর এবং পুনঃবিবাহের পর।

এখানে অভিভাবকদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা তাদেরকে বাধা দিওনা। তাই শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ বলেন, এ আয়াতই একথার প্রমাণ যে, মেয়েরা স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে পারে না। যদি পারতো তবে অভিভাবকদেরকে 'বাধা দিও না' একথা বলা হতো না। শাফেয়ীগণ বলেন, মেয়েদের মতামতকে মাজাজী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাই বলা হয়, তাদের স্বীকৃতি ব্যতীত বিয়ে শুদ্ধ হয় না। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার এরকম নয়। কারণ, অভিভাবকগণ ওই সময়েও বিবাহে বাধা দিতে পারবেন, যখন বিবাহকে নারীর স্বেচ্ছাকর্ম বলে স্থির করা হবে। রসুল স. এরশাদ করেন, আল্লাহ্র দাসীদেরকে আল্লাহর গৃহে যাতায়াতে বাধা দিও না।—এ নির্দেশটি তখনই দেয়া হয়েছিলো যখন মসজিদে যাতায়াত মেয়েদের জন্য স্বেচ্ছাকর্ম ছিলো। আমাদের জেনে রাখা উচিত, স্বেচ্ছাকর্মের ক্ষেত্রেই বাধা দেয়ার বা উৎসাহিত করার সুযোগ রয়েছে।

মাসআলাঃ স্বাধীনা, বুদ্ধিমতি এবং প্রাপ্তবয়স্কা নারী কি অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ করতে পারে? এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, পারে। তাদের স্বীকৃতি সাপেক্ষে প্রতিনিধির মাধ্যমে বিয়ে হতে পারে। অভিভাবক যদি এতে সম্মত না থাকে— তবুও। কুফু (বংশীয় সমতা) না থাকলেও। অবশ্য বংশগত অসাম্যের ক্ষেত্রে অভিভাবক আপত্তি উত্থাপন করতে

www.eelm.weebly.com

পারে। অপর এক বর্ণনায় দেখা যায়- বংশগত অসাম্যের ক্ষেত্রে বিবাহ শুদ্ধ হয় না। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, বংশগত সাম্য অসাম্য সকল ক্ষেত্রে বিবাহ সিদ্ধ। তবে তা নির্ভর করবে অভিভাবকের স্বীকৃতির উপর। ইমাম মালেক বলেছেন, অধিকাংশ মানুষই চান সৎবংশ জাতিকা, রূপবতী ও সম্পদবতীকে বিয়ে করতে। এরকম কন্যার বিবাহ অভিভাবকগণের স্বীকৃতি ব্যতীত জায়েয হবে না। বর্ণিত গুণসম্পন্ন না হলে কন্যার সম্মতিতে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গেও বিয়ে হয়ে যেতে পারে। তাই বলে কন্যার সম্মতিই চূড়ান্ত নয়। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, ওলী (অভিভাবক) ব্যতীত বিয়েই হবে না। ইমাম আবু ইউসুফও এরকম বলেছেন। এ মতের প্রবক্তাদের দলিল এই আয়াতটিই। তাঁরা আরো কিছু দলিল সংগ্রহ করেছেন হাদিস শরীফ থেকে। তাছাড়া হজরত আয়েশা সিদ্দিকার একটি বর্ণনাতেও রয়েছে— যে রমনী অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তার বিবাহ বাতিল। তার বিবাহ বাতিল। তার বিবাহ বাতিল। তবে যদি সে সম্ভোগিত হয়, তবে মোহরের দাবীদার হবে। যদি কলহ বাধে তবে যার অভিভাবক নেই, তার অভিভাবক হবে সুলতান (প্রশাসক)। সুনান প্রণেতাগণ ইবনে জুরাইজের সূত্রে— তিনি সুলাইমান বিন মুসা থেকে— তিনি জুহুরী থেকে— তিনি উরওয়া থেকে এবং তিনি হজরত আয়েশা থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি হাসান। তাহাবী বলেছেন, আমি ইবনে আবী ইমরান থেকে— তিনি ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন থেকে— তিনি ইবনে উতবা থেকে এবং তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে এই বিবরণটি এনেছেন। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আমি ইমাম জুহুরীকে এই হাদিসটি শোনালাম। তিনি হাদিসটি অস্বীকার করে বসলেন। আমি বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা কী। ইবনে জাওজী এ সম্পর্কে বলেছেন, ইমাম জুহুরী সুলাইমান বিন মুসার খুব প্রশংসা করেছেন। বর্ণনাকারীদের মধ্যে তাঁর নাম না থাকায় ইমাম জুহুরী বর্ণনাটিকে অস্বীকার করেছেন। হজরত আয়েশার অপর একটি হাদিসে রয়েছে রসুল স. এরশাদ করেন, ওলী ব্যতীত বিবাহ হয় না। যার ওলী নেই তার ওলী সুলতান নিজে। তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা। এই হাদিসের বর্ণনাকারী হাজ্জাজ বিন আরতাত জয়ীফ। হজরত আয়েশা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, ওলী এবং দুই ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ হবে না। দারা কুতনী। এই হাদিসের বর্ণনাকারী ইয়াজিদ বিন সানান এবং তার পিতাকে দারা কুতনী জয়ীফ আখ্যা দিয়েছেন। নাসাঈ বলেছেন, তারা পরিত্যক্ত। আহমদও তাদেরকে জয়ীফ বলেছেন। হজরত আয়েশা সিদ্দিকার অন্য এক হাদিসে রয়েছে— রসুল স. বলেন, বিবাহে চারজন লোক অত্যাবশ্যক— ওলী, স্বামী ও দু'জন সাক্ষী। দারা কুতনী। এ হাদিসের বর্ণনাকারী নাফে বিন ইয়াসার, আবু খতীব মাজহুল অখ্যাত। হজরত আবু বুরদাহ্ তাঁর পিতা হজরত আবু মুসার মাধ্যমে রসুল স. থেকে বর্ণনা করেছেন— ওলী ব্যতীত বিবাহ হয় না। যার ওলী নেই তার ওলী

www.eelm.weebly.com

প্রশাসক। আহমদ এই হাদিস বর্ণনা করেছেন হাজ্জাজ বিন আরতাতের সনদে— যিনি জয়ীফ বলে চিহ্নিত। হাদিসটি অন্য একটি সনদেও বর্ণিত হয়েছে, যে সনদের বর্ণনাকারী আদী বিন ফজল এবং আবদুল্লাহ্ বিন ওসমান জয়ীফ। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেন, যে কন্যা নিজে নিজেই বিয়ে করে, সে ব্যভিচারিণী। ওলী, দু'জন সাক্ষী ও মোহর ব্যতীত বিয়ে হয় না। কম হোক, বেশী হোক মোহর হতেই হবে। ইবনে জাওজী। এ হাদিসের এক বর্ণনাকারী তেহাসকে জয়ীফ বলেছেন ইয়াহ্ইয়া। ইবনে আদী বলেছেন, সে অযোগ্য। হজরত ইবনে ওমর ও হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেন, দু'জন ন্যাপরায়ণ সাক্ষী ও ওলী ব্যতীত বিয়ে হয় না। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদিসের একজন বর্ণনাকারী বুকাইর বিন বিকার সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, সে কোনো বর্ণনাকারীই নয়। আরেক বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ্ বিন মাহরাজকে পরিত্যক্ত বলেছেন দারা কুতনী। হজরত ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিসের বর্ণনাকারী সাবেত বিন জুহাইর নিজেই হাদিস অস্বীকারকারী। আবী হাতেমও এ রকম বলেছেন। ইবনে হাব্বান বলেছেন, তার হাদিস প্রামাণ্য নয়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, এক নারী যেমন অপর নারীকে বিয়ে করে না, তেমনি কোনো নারী নিজে নিজে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। যে রমণী ব্যভিচারিণী সে-ই কেবল নিজে নিজে বিয়ে করে। দারা কুতনী এ হাদিসটি দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একটি সূত্রের জামিল বিন হাসান এবং অপর সূত্রের মুসলিম বিন আবী মুসলিম অখ্যাত। হজরত জাবের বর্ণিত একটি মারফু হাদিসে রয়েছে— ওলীর নির্দেশনা ও দু'জন সাক্ষী ব্যতীত বিয়ে হয় না। ইবনে জাওজী। এ হাদিসের এক বর্ণনাকারী মোহাম্মদ বিন ওবায়দুল্লাহ্ আজরামীকে মাতরুক বলেছেন নাসাঈ ও ইয়াহ্ইয়া। তার হাদিস লিপিবদ্ধযোগ্য নয়। আরেক বর্ণনাকারী কতর বিন ইয়াসির জয়ীফ। হজরত মুআজ বিন জাবাল বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে— রসুল স. এরশাদ করেন, অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে যে নারী বিবাহ করে সে তো ব্যভিচারিণী। দারা কুতনী। এই হাদিসের এক বর্ণনাকারীর নাম আবু আসমা এসিম বিন আবী মারিয়াম। তার সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, সে কিছুই নয়। দারা কুতনী বলেছেন, সে মাতরুক।

হানাফীগন 'তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সঙ্গে সঙ্গত না হবে' (আয়াত ২৩০) এবং 'তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীগণকে বিবাহ করতে চাইলে' (আয়াত ২৩২) — এই দুই আয়াত থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন। আয়াত দু'টি স্পষ্ট অর্থবোধক অর্থাৎ মেয়েরা নিজেরাই বিয়ে করতে পারবে। স্বামী নির্বাচনের অধিকার তাদের রয়েছে। তাছাড়া এ সম্পর্কে একটি মারফু হাদিসও রয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণিত ওই হাদিসে বলা হয়েছে, বিধবা নারীগণ ওলী অপেক্ষা নিজেরাই অধিক দায়িত্বশীলা। আর বিবাহে কুমারী নারীদের স্বীকৃতি নেয়া অত্যন্ত জরুরী। মৌনতাই তাদের স্বীকৃতি। মুসলিম,

www.eelm.weebly.com

মালেক, আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসাঈ। হাদিসটি থেকে দলিল সংগ্রহের কারণ একথা বুঝে নেয়া যে, বিবাহ বন্ধনের আয়োজন ছাড়া ওলীগণের আর কোনো হক নেই। আর বিধবা নারীরা ওলীদের চেয়ে নিজেরাই অধিকতর হকদার। তাই তাদের জন্য নিজে নিজেই বিবাহের সিদ্ধান্ত নেয়া উত্তম। হজরত আবু সালমা বিন আবদুর রহমান বর্ণিত হাদিসটিও এই বিষয়ের আরেকটি দলিল। তিনি বলেছেন, এক নারী রসুল স. এর নিকটে হাজির হয়ে বললো, আমার পিতা এক লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করেছেন। আমি এ বিয়েতে সম্মত নই। রসুল স. তাঁর পিতাকে বললেন, বিয়ে দেয়ার অধিকার তোমার নেই। আর মেয়েটিকে বললেন, যাও তোমার যাকে পছন্দ হয় তাকে বিয়ে করো। ইবনে জাওজী। শাফেয়ীগণ বলেছেন, হাদিসটি মুরসাল— আর মুরসাল হাদিস তাঁদের নিকট দলিল হিসাবে গণ্য নয়। আমরা বলি, মুরসাল হাদিস আমাদের নিকট । হজরত আয়েশার হাদিসে রয়েছে— কাতাদাহ্ নামের এক মেয়ে আমাকে বললো, আমার আব্বা বংশমর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর আপন ভাতিজার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন। এ বিয়ে আমার পছন্দ নয়। আমি বললাম ঠিক আছে, বসো। ইত্যবসরে রসুল স. ঘরে এলেন। মেয়েটি তাঁকেও স. ঘটনাটি খুলে বললো। রসুল স. তার পিতাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, কন্যার মতামতই চূড়ান্ত। মেয়েটি বললো, হে আল্লাহ্র রসুল, আমি আমার পিতার দেয়া বিয়েকেই কবুল করে নিলাম। কন্যার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত একথাটা সকল মেয়েকে জানিয়ে দেয়াই ছিলো আমার এখনকার অভিযোগের উদ্দেশ্য। নাসাঈ। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান পিতা কিংবা অভিভাবকের অধিকার বহির্ভূত। এই বিষয়ে একটি বিরোধও লক্ষ্যণীয়। কারণ, ইতোপূর্বে হজরত আয়েশা বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে, ওলীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ হবে না। হানাফীগণ এই বিরোধের নিরসন করেছেন এ কথা বলে যে, দু'টি বর্ণনার মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হলে দেখতে হবে কোনটি অধিক প্রাধান্য পাওয়ার উপযোগী। অথবা দু'টি বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের কোনো পথ আছে কিনা। এভাবে পরীক্ষা করতে যেয়ে দেখা যাচ্ছে, মুসলিম বর্ণিত হাদিসটির সনদ অধিকতর শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ। তাই তাঁর মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। অন্য বর্ণনাগুলোর সনদ দুর্বল। তাই সেগুলোকে অপেক্ষাকৃত কম প্রাধান্য দেওয়াই সমুচিত। আমরা বলি, ১. ওলীগণের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ হয় না। হাদিসটির অর্থ হচ্ছে এ রকম— বিবাহ সুন্নত পদ্ধতিতে হয় না। ২. যে সকল ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব বিদ্যমান সে সকল ক্ষেত্রে বিবাহ হবে। যে সকল ক্ষেত্রে অভিভাবকত্বের সুযোগ নেই, সে সকল ক্ষেত্রে বিবাহ হবে না। যেমন কন্যা সম্মত থাকলেও মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে বিবাহ হবে না। মুহরিমের (নিষিদ্ধ পুরুষের) সঙ্গে বিবাহ হবে না এবং প্রথম স্বামীর ইদ্দত পালনকারিণী বিবাহ করতে পারবে না। হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসটির আরেকটি অর্থ হচ্ছে,

www.eelm.weebly.com

বংশগত সাম্য না থাকলে বিবাহ হবে না। ওলীর অনুমতির কথা বলা হয়েছে এ সকল ক্ষেত্রে। আমরা বলি, হজরত আয়েশার হাদিস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত যদি কোনো মেয়ে বিয়ে করে, তবে সে বিয়ে শুদ্ধ হবে। এরকম বিবাহ জায়েয। কারণ, এখানে বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়নি। বরং বুঝতে হবে এতে করে ওলীর অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওলী যে বিবাহের অনুমতির অধিকারী সেই বিবাহই সম্পন্ন হয়েছে— তাকে বাদ দিয়ে হলেও। কারণ, বিবাহের চূড়ান্ত সম্মতিদানের অধিকার কন্যার। এ হচ্ছে কুমারী রমণীর প্রসঙ্গ। আর বিধবা রমণীরা তো বিবাহ করার ব্যাপারে অভিভাবক অপেক্ষা অধিক অধিকার সম্পন্না। আর অভিভাবকেরা ওই সকল বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যা অপেক্ষা অধিক অধিকার রাখেন যে সকল বিবাহে কুফু (বংশগত সমতা) রক্ষিত হয়নি।

'তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়' এ কথাটি প্রমাণ করে যে, প্রাপ্তবয়স্কা বিধবা নারীর উপর মতামত চাপিয়ে দেওয়া জায়েয নয়। বিধানটি ঐকমত্যপুষ্ট। কুমারী প্রাপ্তবয়স্কাদের ক্ষেত্রে মতামত চাপিয়ে দেয়া যাবে কি না- সে সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতপৃথকতা রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, প্রাপ্তবয়স্কা কুমারীর বিয়ে তার সম্মতি ব্যতীত তার পিতামহ ও পিতা সম্পন্ন করতে পারেন। ইমাম মালেক বলেছেন, কেবল তার পিতা পারেন। ইমাম আহমদের প্রসিদ্ধ বক্তব্য এ রকমই।

আলোচ্য আয়াতটি বিধবাদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত একটি মারফু হাদিসে রয়েছে— বিবাহিত নারীর অধিকার তার অভিভাবক অপেক্ষা অগ্রগামী। আর কুমারী নারীর পিতা নিজে তার কন্যা থেকে সম্মতি আদায় করবে। ইবনে জাওজী এ হাদিসটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমরা বলি, এরকম দলিল গ্রহণ কোরআনের আয়াত ও হাদিসবিরুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে হাদিসটি আমাদেরই পক্ষে। কারণ, এখানে কুমারী নারীর নিকট থেকে তার অভিভাবক সম্মতি আদায় করবে বলা হয়েছে। সম্মতি বা অনুমতি চাওয়া এবং মতামত চাপিয়ে দেয়া নিশ্চয়ই এক কথা নয়। এ আয়াতেই বলা হয়েছে, 'এটা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম।' এ কথাতে প্রমাণ হয় যে, মেয়েদেরকে বিবাহে বাধা দেয়া যাবে না। তাদের সম্মতিগ্রহণ অপরিহার্য। অর্থাৎ বিধবা বা কুমারী কারো ক্ষেত্রেই মতামত চাপানোর উৎপীড়ন করা যাবে না।

যদি কেউ বলে, বিবাহের সম্মতি দানের ক্ষেত্রে বিধবা ও কুমারীর বিধান যদি একই হয়, তাহলে হাদিস শরীফে কেবল 'বিবাহিত নারীদের অধিকার ওলীদের চেয়ে অগ্রগামী' একথা বলা হলো কেনো? কুমারীদের ক্ষেত্রে তো এরকম বলা হয়নি। আর মুসলিমের বর্ণনায় বিধবা এবং কুমারীদেরকে পৃথক করে উল্লেখ করার কারণই বা কী? এই দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে আমরা বলি, কুমারী ও বিধবাদের সম্মতি প্রদানের ধরন যে ভিন্ন, সেকথা বুঝাতেই তাদেরকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে। বলা হয়েছে, কুমারীর অনুমতি হলো মৌনতা। কিন্তু বিধবার মৌনতা অথবা তার অনুমতি প্রদানকে সম্মতি মনে করা যাবে না। বরং তার জন্য জরুরী যে, সে প্রথম থেকেই একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। অথবা সরব বক্তব্য প্রকাশ করবে। এছাড়া কুমারীর বিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ব-উদ্যোগে হয় না। তাই হাদিস শরীফে কুমারী ও বিধবাকে সাধারণভাবে উল্লেখ করার পর বিশেষভাবে তাদের সম্মতি দানের পার্থক্য প্রকাশ করা হয়েছে।

হাসান থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদিসগুলোকে দলিল হিসেবে নিয়েছেন ইবনে জাওজী। তিনি বলেছেন, বিয়ের সময় কুমারী নারীদের অনুমতি নেয়া উচিৎ। যদি তারা অস্বীকার করে তবে বলপ্রয়োগ করতে হবে। হাদিসটি সনদ এবং মতন উভয় দিক থেকেই দুর্বল। মতনের দিক থেকে দুর্বল এ কারণে যে, এখানে অনুমতি ও বলপ্রয়োগের কথা একই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুমতি গ্রহণের প্রশ্ন অবান্তর। আর সনদের দুর্বলতা এই যে, এই সনদের একজন বর্ণনাকারী আবদুল করিম কুখ্যাত। তার কুখ্যাতি সম্পর্কে সকল মুহাদ্দিস একমত। আমরা আমাদের মতের সমর্থনে ইতোপূর্বে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছি। এখানে এ সম্পর্কে আরো একটি হাদিস বর্ণনা করা হচ্ছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক কুমারী রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো, আমার পিতা আমার বিয়ে ঠিক করেছেন, আর এ বিয়ে আমার পছন্দ নয়। রসুল স. তাকে স্বমতে বিয়ে করার পূর্ণ অধিকার দিলেন। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা। হাদিসটির সনদ মুত্তাসিল এবং এর বর্ণনাকারীগণ পরীক্ষিত। বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি মুরসাল। হতে পারে কোনো সূত্রে এটি মুরসাল। কিন্তু মুরসাল আমাদের নিকট দলিল। হাদিসটির কোনো কোনো সূত্র মুত্তাসিল। ইবনে কাত্তান বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের এই হাদিসটি বিশুদ্ধ। মেয়েটির নাম ছিলো খানসা বিনতে জুজাম। কিন্তু সে কুমারী ছিলো না ছিলো বিধবা। আর তার বিবাহে সে সন্তুষ্ট ছিলো না। তাই রসুল স. তার বিবাহ বাতিল করে দিয়েছিলেন। বোখারী এরকম বলেছেন। ইবনুল হুম্মাম বলেছেন, নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, খানসা ছিলো কুমারী। কিন্তু বোখারীর বর্ণনায় 'বিধবা ছিলো' কথাটি প্রাধান্য পেয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে দারা কুতনীর বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. কুমারী ও বিধবা দু'জন নারীর বিবাহ ভঙ্গ করে দিয়েছিলেন— যাদেরকে তাদের পিতা তাদের সম্মতি ছাড়া বিয়ে দিয়েছিলেন। হজরত ইবনে ওমর থেকে দারা কুতনী বলেছেন, এক লোক তাঁর কুমারী মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন যাতে সে সন্তুষ্ট ছিলো না। রসুল স. সে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন। হজরত ইবনে ওমরের আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে— যে নারী পিতার দেয়া বিয়েতে সন্তুষ্ট থাকতো না, রসুল স. তার সে বিয়ে ভেঙে দিতেন। সে সধবা হোক অথবা বিধবা।

www.eelm.weebly.com

হজরত জাবের থেকে দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন— এক লোক কন্যার সম্মতি ছাড়াই তাকে বিয়ে দিলো। মেয়েটি রসুল স. এর নিকটে তার অসন্তোষের কথা জানালো। রসুল স. তখন তার বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে, কাতাদাহ নাম্নী এ মহিলা রসুল স.এর নিকটে এসে বললো, আমার পিতা বড়োই সজ্জন ব্যক্তি। তিনি আমার অমতে তার ভাতিজার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের অসৎ স্বভাব দূর করাই ছিলো তার এ বিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য। রসুল স. তাকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রদান করলেন। সে বললো, আমি আমার পিতার দেয়া বিয়ে মেনে নিয়েছি। এখন আমার অভিযোগ পেশ করার উদ্দেশ্য এই যে, অন্য মেয়েরা যেনো জানতে পারে— বিয়ের ব্যাপারে পিতাদের কোনো অধিকার নেই। দারা কুতনী বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত জাবের এবং হজরত আয়েশার হাদিসগুলো মুরসাল। হজরত আয়েশা থেকে ইবনে বরীদের হাদিস শোনা প্রমাণিত হয়নি। হজরত জাবেরের হাদিসটিকে ইমাম আহমদও গ্রহণ করেননি। দারা কুতনী বলেছেন, এটাই বিশুদ্ধ কথা যে, হাদিসটি আতা থেকে মুরসাল। হাদিসটির মারফু হওয়াকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন সুয়াইব। ইবনে জাওজী বলেছেন, হজরত ইবনে ওমরের হাদিস প্রামাণ্য নয়। কারণ, নাফে থেকে ইবনে আবু জিব হাদিস শুনতেই পারেন না। বরং তিনি শুনেছেন ওমর বিন হোসাইন থেকে। এ সম্পর্কে ইমাম আহমদকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন, হাদিসটি বাতিল। আমরা বলি, মুরসাল হাদিস হুজ্জত (দলিল) বিশেষ করে সাক্ষ্য গ্রহণের সময় এবং প্রমাণকে শক্তিশালী করার সময়। ইবনে জাওজী বলেছেন, বংশগত সমতাহীন প্রতিবেশী কুমারী নারীর বিবাহ প্রসঙ্গে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু একথা ঠিক নয়। কারণ, হজরত আয়েশার হাদিসে রয়েছে— মেয়েটি বলেছে তার পিতা তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলো। পিতার ভ্রাতষ্পুত্র অর্থাৎ কন্যার চাচাতো ভাই তো একই বংশভূত। সুতরাং বংশগত অসাম্যের কথা এখানে ওঠে না। যদি বলা হয়, সে ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলো মায়ের সম্পর্কের দিক থেকে। তবে তাকে স্বকপোলকল্পনা ছাড়া আর কিছু বলা যেতে পারে না। আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত।

মাসআলাঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী কন্যার বিবাহে পিতার এখতিয়ার (অধিকার) সংরক্ষিত— এ বিষয়ে ফেকাহ তত্ত্ববিদগণ একমত। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বিধবার বিবাহের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, অপ্রাপ্ত বয়স্কা বিধবার বিবাহ জায়েয নয়। বরং বিধবার বিবাহে কন্যার সম্মতি চূড়ান্ত কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্কা না হলে তার মতামতের কোনো মূল্য নেই। মতামত গ্রহণ করতে হবে বিবেকবতীর। অথচ অপ্রাপ্ত বয়স্কাকে বিবেকবতী বলা যায় না। তাই তার বিবাহ জায়েজ হবে না।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে— বিধবার বিবাহ তার অনুমতি ব্যতিরেকে দেয়া যাবে না। তিরমিজি এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন

www.eelm.weebly.com

হাদিসটি শুদ্ধ। ইতোপূর্বে বোখারী বর্ণিত খানসা সম্পর্কিত হাদিসে বলা হয়েছে যে, তাঁর পিতা তার সম্মতি ছাড়াই বিয়ে দিয়েছিলেন এবং রসুল স. সে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে রয়েছে বিধবার বিয়েতে ওলীর কোনো এখতিয়ার নেই। দারা কুতনী বর্ণিত এই হাদিসটি জয়ীফ। তিনি নিজেই হাদিসটির ক্রটি নির্দেশ করেছেন। এই বিষয়টি ঐকমত্যসিদ্ধ যে, অপ্রাপ্ত বয়স্কা বিধবার নিকট থেকে অনুমতি নেয়া যাবে না। আর সে অনুমতি দিলেও, সে অনুমতিকে অনুমতি মনে করা যাবে না। এটাও ঐকমত্য সাব্যস্ত যে, সে স্ব-উদ্যোগে বিবাহ করতে পারবে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, পিতা তার অপ্রাপ্ত বয়স্কা বিধবা কন্যাকে বিয়ে দিতে পারবে। কন্যা এতে সম্মত না থাকলেও। অপ্রাপ্ত বয়স্কা এবং কুমারী— এই দুই ক্ষেত্রেই রয়েছে অভিভাবকদের অধিকার। সুতরাং কন্যা কুমারী না হয়ে বিধবা হলেও অভিভাবকের অধিকার থেকেই যায়। তাই অভিভাবক তাকে বিয়ে দিতে পারবে।

'তারা যদি বিধিমতো পরস্পর সম্মত হয়'— এখানে বিধিমতো বলতে বুঝানা হয়েছে শরিয়তের বিধান মোতাবেক এবং শালীনতার বিধি অনুসারে। এখানে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট যে, যে বিবাহ বিধিমতো সম্পন্ন হয় না সেই বিবাহে বাধা দান করা বৈধ। যেমন, যে বিবাহ সমতা সম্পন্ন নয় অথবা ইদ্দত পালনকালে বিবাহবদ্ধ হয়— এ সকল বিবাহকে বিধিমতো বলা যায় না। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে বাধা দেয়া যাবে।

পরবর্তী বাক্যটি শুরু হয়েছে এভাবে— 'জালিকা ইউয়াযুবিহি মানকানা মিনকুম।' এখানে 'ইহা' (জালিকা) শব্দটি একটি ইঙ্গিতসূচক অব্যয়। শব্দটির মাধ্যমে ওই সকল লোককে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা বিধিসম্মত বিবাহে প্রতিবন্ধক হয় না। শব্দটির মাধ্যমে পৃথক পৃথকভাবে তাদের সকলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা শব্দটি কেবলই ইঙ্গিত। কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সুনির্দিষ্টভাবে এই ইঙ্গিতের লক্ষ্য নয়। কিংবা কেবল রসুল স.ই এই ইঙ্গিতের উদ্দেশ্য।

'ইহা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেয়া হয়।' —একথার মাধ্যমে বুঝা যায়, শরিয়তের বিধিবিধান কেবল বিশ্বাসীদের প্রতি প্রযোজ্য। অবিশ্বাসীরা শরিয়তের বিধানের আওতায় পড়ে না।

'ইহা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম'— অর্থাৎ বিধিসম্মত বিবাহে বাধা না দেয়ার এই বিধানের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য কল্যাণ। এই বিধি লংঘিত হলে শুদ্ধতম ও পবিত্রতম জীবন কলুষিত হবে। বিস্তার ঘটবে ব্যভিচারের। আর বিবাহে পরস্পর সম্মতির বিধান দেয়া হয়েছে এই জন্য যে, এতে করে প্রতিষ্ঠিত হবে দাম্পত্য জীবনে শান্তি। যদি এই বিধান জারী করা না হতো তবে এক পক্ষ সম্মত না হলেও অন্য পক্ষ বল প্রয়োগ করতো অথবা মনান্তর ও মতান্তর শেষ

www.eelm.weebly.com

পর্যন্ত এ রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি করতো; যাতে করে খোলা তালাক হয়ে পড়তো অনিবার্য। তাই বলা হয়েছে, 'ইহা' (আল্লাহ্‌পাক প্রবর্তিত এই বিধান) তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম।

শেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।' অর্থাৎ তোমরা জানো না কিসে তোমাদের কল্যাণ অথবা অকল্যাণ। আর আল্লাহ্‌পাক সব কিছুই জানেন। তাই তোমাদের কল্যাণকে নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যেই দেয়া হচ্ছে এই উপদেশ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৩৩

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

❑ যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করিতে চাহে তাহার জন্য জননীগণ তাহাদের সন্তানগণকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাইবে। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাহাদের ভরণপোষণ করা। কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত কার্যভার দেওয়া হয় না। কোন জননীকে তাহার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তাহার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না। এবং উত্তরাধিকারীগণেরও অনুরূপ কর্তব্য। কিন্তু যদি তাহারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্য পান বন্ধ রাখিতে চায় তবে তাহাদের কাহারো কোন অপরাধ নাই। তোমরা যাহা বিধিমত দিতে চাহিয়াছিলে তাহা যদি অর্পণ কর তবে ধাত্রী দ্বারা স্তন্য পান করাইতে চাহিলে তোমাদের কোন পাপ নাই। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ উহার দ্রষ্টা।

---

www.eelm.weebly.com

মায়ের জন্য তার শিশুকে দুধ পান করানো বাধ্যতামূলক। তবে মা অসমর্থ হলে এই বাধ্যবাধকতা আর থাকে না। তখন শিশু অন্য দুগ্ধবতী রমণীর দুধ পান করতে পারবে। যেমন, অন্যত্র বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা পরস্পর সংকীর্ণ হও তবে দুধ পান করাও অপর রমণী থেকে।' অথবা 'শিশুর কারণে মাকে কষ্ট দিবে না' আয়াত দ্বারা এই বিধানটি বিশিষ্টার্থক করা হয়েছে। শিশুর দুধ পান করানোর মূল দায়িত্ব তার মায়েরই। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে অথবা তার ইদ্দত পালনকারিণীকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার সন্তানের দুগ্ধদাত্রী হিসেবে নিয়োগ করে, তবে তা জায়েয হবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হবে। আমাদের দলিল হচ্ছে, মায়ের দুধ শিশুর আমানত। সুতরাং মাবে দুধ পান করাতেই হবে। তবে দুধ পান করাতে অসমর্থ হলে ভিন্ন কথা। মা দুধ পান করাতে না চাইলে তাকে অক্ষম (মাজুর) মনে করতে হবে। কিন্তু সে যদি অর্থের বিনিময়ে দুগ্ধ দান করতে রাজী হয়, তবে তাকে আর অক্ষম মনে করা যাবে না। এবং তাকে দুগ্ধ পানের বিনিময় প্রদানও সিদ্ধ হবে না। যদি কেউ বলে, এই আয়াতের বিধানানুযায়ী তালাকপ্রাপ্তাদের ইদ্দত পুরো হওয়ার পর তার সন্তানকে অর্থের বিনিময়ে দুগ্ধদাত্রী নিযুক্ত করা জায়েয নয় অথচ এ বিষয়টি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্যসিদ্ধতা রয়েছে— কারণ কি? আমরা বলি, অর্থের বিনিময়ে মাতাকে তার সন্তানের দুগ্ধদান কর্মী নিযুক্ত করা হয়েছে এই আয়াত দ্বারা, 'যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করায় তবে মজুরী দিয়ে দাও।' এই আয়াতেও বলা হয়েছে, জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের (স্ত্রীদের) ভরণ পোষণ করা। সুতরাং স্ত্রীর ভরণপোষণ দান যেমন স্বামীর প্রতি আবশ্যিক তেমনি সন্তানকে দুগ্ধদানও স্ত্রীর প্রতি বাধ্যতামূলক। এই উভয় বাধ্যবাধকতা বলবৎ থাকে ইদ্দত পূরণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। ইদ্দতের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব আর থাকে না। তাই তখন দুগ্ধ দানের দায়িত্ব থেকেও মুক্ত হয়ে যায় স্ত্রী। আর তখনই মজুরী খোরপোষের স্থলবর্তী হয়। 'পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাবে'— কোনো কোনো মা তার সন্তানকে দুগ্ধ দানে আলস্য করে। তাই এখানে দু'বছর সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বলা হয়েছে, দু'বছর পর্যন্ত দুগ্ধদান আবশ্যিক।

এই সীমা বেঁধে দেয়ার অর্থই হচ্ছে দু'বছরের সীমা কিছুতেই অতিক্রম করা যাবে না। কারণ, মানুষের মূল অঙ্গ থেকে অন্য মানুষ উপকার গ্রহণ করতে পারে না। কেবল অসহায়ত্বের কারণে দু'বছর এই অবকাশ ছিলো। দু'বছর পর শিশুরা বিকল্প খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। তাই তখন থেকে বলবত হয়েছে দুগ্ধপানের নিষিদ্ধতা।

আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছিলো, 'যে স্তন্য পান কাল পূর্ণ করতে চায়'— পূর্ণ স্তন্য দান কাল যে দু'বছর, সে কথা এখানে স্পষ্ট করেই বলে দেয়া হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, খোরপোষ দানের দায়িত্ব পিতার এবং দুগ্ধ দানের দায়িত্ব

www.eelm.weebly.com

মাতার— যদি মাতা অসমর্থ না হয়। কাতাদা বলেছেন, পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করানোকে আল্লাহ্পাক ফরজ করেছিলেন। অতঃপর 'যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায়' এ কথা বলে ফরজের গুরুভার লাঘব করা হয়েছে। এখানে আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, দু'বছর পর স্তন্যদান বৈধ হবে না। দু'বছর পরের স্তন্য পানকে স্তন্য পান হিসেবে গণ্যই করা হবে না। তাই স্তন্য পানের কারণে যে সকল রমণীর সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে যায়, সে সকল নিষিদ্ধতা দু'বছর পরের পানকারীর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। এ রকম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আবু ইউসুফ, শাফেয়ী ও আহমদ। হজরত ওমরও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ রকম বলেছেন ইবনে আবী শায়বাও। ইমাম মালেক বলেছেন, স্তন্য পান কাল দু'বছরের কিছু অধিক। তবে তিনি বলেননি কিছু অধিক অর্থ কতোদিন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এই কিছু অধিক অর্থ তিন মাস। ইমাম জুফার বলেছেন, স্তন্যপান কাল তিন বছর। যারা দু'বছর বলেন তাদের দলিল হচ্ছে, আল্লাহ্পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেন, 'কামেলাইন।' একথার অর্থ, পূর্ণ স্তন্যপান কাল। আর এখানে এই স্তন্যপান কালের কথা স্পষ্টতঃই দুই বছর বলে দেয়া হয়েছে। দুই বছর পরে সকল শিশু মাতৃস্তন্য ব্যতীত অন্য খাদ্য গ্রহণে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয় না। শিশুর এই অভ্যস্ততার তারতম্য অনুসারে ইমামগণের কথিত সময়সীমার তারতম্য সূচিত হয়েছে। আর এ কারণেই ইমাম মালেক সুনির্দিষ্ট সময়সীমার কথা বলেননি।

আমরা বলি, দু'বছর পর শিশুরা মাতৃস্তন্য ব্যতীত অন্য কোনো খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয় কি হয় না— সে রকম বিবরণ দান এই আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। এখানে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করার অর্থ, কেউ যেনো দুই বছরের স্তন্য পান কালের এই সময়সীমাকে কমিয়ে আনার প্রয়াস না পায়। আমাদের এই দাবীর সমর্থনে রয়েছে হজরত ইবনে আব্বাসের ওই হাদিস, যাতে বলা হয়েছে— রসুল স. বলেন, সেটাই হচ্ছে স্তন্যপান কাল যেটা সম্পন্ন হয় দু'বছরে। ইবনে জাওজী, দারা কুতনী। ইবনে উয়াইনা থেকে বর্ণিত হয়েছে— দারা কুতনী মন্তব্য করেছেন, এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারী সঠিক। তবে হাইসুম বিন জামিল সম্পর্কে কিঞ্চিত আপত্তি থাকলেও তিনি ছিলেন হাফেজ ও সেকাহ (বিশ্বস্ত)। তাঁর বিশ্বস্ততাকে সমর্থন করেছেন- আহমদ, আজালী, ইবনে হাব্বান এবং আরো অনেকে।

'জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা'— এ কথার অর্থ, জনকই যেহেতু সন্তানের জন্মদাতা, তাই সন্তানের স্তন্যদাত্রীকে ভরণপোষণ দানের দায়িত্ব তারই। সন্তানের ভরণ পোষণের দায়িত্ব সব সময় তার পিতার উপর। শিশুকালে স্তন্যদাত্রীর মাধ্যমে এবং দুগ্ধ পানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর সরাসরি মাতার উপর ভরণপোষণের কোনো দায়িত্ব নেই। ইমাম আবু হানিফা এ রকম বলেছেন। আবার খাস্সাফ এবং হাসানের বর্ণনায় ইমাম আবু হানিফার অভিমতের কথা বলা হয়েছে এ রকম— সন্তানের ব্যয়ভার জনকজননী উভয়ের

www.eelm.weebly.com

দায়িত্বভূত। অংশীদারিত্ব অনুপাতে এই ব্যয়ভারের দুই ভাগ জনকের এবং এক ভাগ জননীর।

'কাহাকেও তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয় না'। এ কথায় বুঝা যায় যে, সাধ্যাতীত ব্যয়ভার যুক্তিযুক্ত মনে হলেও শরিয়তসম্মত নয়। সাধ্যবহির্ভূত বিধান আল্লাহ্পাক কখনই দান করেন না।

'কোনো জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোনো জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না'— এ কথার অর্থ মা তার সন্তানের জন্য সন্তানের পিতাকে কষ্ট দিবে না। মজুরী সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করবে না অথবা ক্লেশ দিবে না। সন্তানের পরিচর্যায় নিজে উদাস থাকবে, অথচ সন্তানের পিতাকে ব্যতিব্যস্ত রাখবে— এ রকম করবে না। আর সন্তানের পিতাও সন্তানের কারণে সন্তানের মাতাকে কষ্ট দিবে না। যেমন, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মাতা তার সন্তানকে দুগ্ধ পান করাচ্ছিলো— এমতাবস্থায় অন্য মহিলাকে দেওয়ার জন্য সন্তান ছিনিয়ে নিবে না। অথবা পারিশ্রমিক কমিয়ে দেবে না। কিংবা স্তন্য দানে বল প্রয়োগ করবে, অসমর্থ হলেও। এখানে সন্তানকে তার মাতা এবং পিতা উভয়ের সঙ্গে সম্বন্ধিত করা হয়েছে এবং বিধান জারী করা হয়েছে যে, সন্তানের কারণে তার মাতা-পিতা একে অপরকে কষ্ট দিতে পারবে না।

'এবং উত্তরাধিকারীগণেরও অনুরূপ কর্তব্য'— এখানে উত্তরাধিকারীগণ বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এখানে উত্তরাধিকারীগণ বলতে বুঝানো হয়েছে— ওই সকল দুগ্ধপোষ্য শিশুকে যারা তাদের মৃত পিতার উত্তরাধিকারী। তাদের দুগ্ধ পানের যাবতীয় ব্যয় সংকুলান করতে হবে তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে। পিতা কোনো সম্পদ না রেখে গেলে, ব্যয়ভার বহন করবে মাতা। কেনোনা সন্তানের ব্যয়ভার সব সময় পিতা মাতার দায়িত্ব। কেউ কেউ বলেছেন, ভরণপোষণের দায়িত্ব মাতা অথবা পিতার মধ্যে যে জীবিত থাকবে তার। স্তন্যপানের ব্যয়ভার বহণ করবে সেই। আর আহার বস্ত্র ইত্যাদি ব্যয়ভার বহণ করবে পিতা। ইমাম শাফেয়ীও এই মত পোষণ করেন। তবে তার প্রথমোক্ত অভিমতটি ইমাম মালেকের অভিমত সদৃশ। প্রথমোক্ত অভিমতটি সম্পর্কে বলতে হয়, সন্তান যদি তার নিজের সম্পদ থেকে ব্যয়ভার গ্রহণ করে, তবে অন্যান্য দায়িত্বশীল অভিভাবকদের কর্তব্য কী হবে? একটু আগেই পিতার ব্যয়ভারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে উত্তরাধিকারীগণের কথা। সুতরাং পিতা ও উত্তরাধিকারীর পৃথক উল্লেখের উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। দ্বিতীয় অভিমত সম্পর্কে একই ধরনের পুনরুক্তির প্রশ্নটি এসে যায়। সুতরাং মাতাপিতা ও উত্তরাধিকারীগণ নিশ্চয়ই এক নয়। উত্তরাধিকারের ব্যাখ্যা এখানে অন্য কিছু হবে।

ইমাম আহমদ, ইসহাক, কাতাদা এবং ইবনে আবী লায়লা বলেছেন, উত্তরাধিকারী অর্থ সন্তানের উত্তরাধিকারী। সে নারী হোক অথবা পুরুষ। অর্থাৎ

www.eelm.weebly.com

প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর নিকট থেকে তাদের উত্তরাধিকারের অংশানুপাতে বলপ্রয়োগ করে সন্তানের ভরণপোষণ আদায় করতে হবে। এই বিধানের আওতায় রক্ত সম্পর্কীয় এবং রক্ত সম্পর্ক বহির্ভূত সকল উত্তরাধিকারী অন্তর্ভূত হবে। সন্তান ওই উত্তরাধিকারীর অংশীদার কি না, সে প্রশ্নে কিছু যাবে আসবে না। যেমন, চাচাতো ভাই, ভাতিজা জেঠাতো বোনের অংশীদার হয়। অথচ এর বিপরীতরা তা অংশীদার হয় না। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম আহমদ বলেন, বলপ্রয়োগ সেখানেই প্রযোজ্য, যেখানে পারস্পরিক অংশীদার বিদ্যমান। ইমাম আবু হানিফার অভিমত ইমাম আহমদের প্রথমোক্ত অভিমতের মতো। আর আয়াতের বক্তব্যও এ রকম। তবে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, উত্তরাধিকারীগণকে হতে হবে নিকটাত্মীয়। এভাবে উত্তরাধিকারীগণকে সীমাবদ্ধ করার সমর্থনে রয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের ক্বেরাত— 'ওয়া আলাল ওয়ারিসি (জিরিহ্মিল মুহ্‌রিমি) মিসলি জালিকা।' আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে উত্তরাধিকারী অর্থ রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় (আসাবা)। অর্থাৎ সন্তানের পিতৃ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের প্রতি তার প্রতিপালনের জন্য বলপ্রয়োগ করা যাবে। যেমন, চাচা, দাদা, ভাই ইত্যাদি।

বাগবী বলেছেন, হজরত ওমর ফারুক এই অভিমত পোষণ করেছেন। আর এর অনুসরণ করেছেন ইব্রাহিম, হাসান, মুজাহিদ, আতা ও সুফিয়ান। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে ভরণপোষণের ব্যয়ভারের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে কল্যাণকামীতার কথা। অর্থাৎ উত্তরাধিকারীগণ যেনো ওই সন্তানের কল্যাণকামী হয়, তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টায় না থাক। বাগবী বলেছেন, এই অভিমতটি ইমাম জুহুরী ও শা'বীর। আমি বলি, এ রকম অর্থ করা ঠিক নয়। কারণ, ক্ষতির চেষ্টা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ কেবল উত্তরাধিকারীদের মধ্যেই সীমিত হতে পারে না। আর ক্ষতির প্রসঙ্গ পূর্বোক্ত বাক্যে উল্লেখই করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সন্তানের পিতা-মাতা একে অপরের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। কিন্তু এখানে পৃথক বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে উত্তরাধিকারীগণের কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে। সে কর্তব্য হচ্ছে ভরণপোষণ জনিত কর্তব্য। আল্লাহ্পাকই সমধিক জ্ঞাত।

এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নিকট আত্মীয়দের ব্যয়ভার বহন করা সম্পদশালীদের জন্য ওয়াজিব। যদি সেই নিকটাত্মীয় হয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং অভাবগ্রস্ত অথবা অভাবগ্রস্তা। অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক পুরুষ ও বয়স্কা নারী। এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে শিশুদের উদ্দেশ্যে। তবুও অভাবী নিকটাত্মীয় নারী-পুরুষেরাও এর অন্তর্ভূত হবে। কিন্তু উপার্জনক্ষম অভাবীরা এর অন্তর্ভূত হবে না। তাদের ব্যয়ভার বহণ করা কারোর প্রতি বাধ্যতামূলকও হবে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, প্রত্যেকের উপর তার মাতা-পিতা ও দাদা-দাদীর ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব। যদি তারা মুখাপেক্ষি, অভাবী অথবা

www.eelm.weebly.com

কাফেরও হয়। এ দায়িত্ব পুত্র-কন্যা উভয়ের উপর। আর এ দায়িত্ব উত্তরাধিকারের বিষয়াবলীর অন্তর্ভূত নয়। এ বিধানের ব্যাপারে ইমাম আহমদ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই দায়িত্ব দুইভাগ পুরুষের এবং এক ভাগ নারীর। ইমাম আবু হানিফা থেকেও এইরূপ একটি অভিমত পাওয়া যায়। তবে এই আয়াত তাঁর বক্তব্যের ভিত্তি নয়। বরং তিনি বলেছেন, তাদের ব্যয়নির্বাহের দায়িত্ব আদি অধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। অংশীদারিত্বের সূত্রে নয়। কাফের পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, 'তোমাদের পিতা-মাতা যদি তোমাদেরকে এ বিষয়ে বাধ্য করে যে, তুমি আমার সাথে— ওই সবের শরিক করো, যার সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না— সেক্ষেত্রে তুমি তাদের অনুসরণ কোরো না। পৃথিবীতে সৎভাবে তাদের সাথে অবস্থান করো।' সুতরাং এটা কোনো সৎ অবস্থান নয় যে, পিতা-মাতা নিরাহারের কষ্ট সহ্য করবে আর সম্পদ সঞ্চয় করবে সন্তান। রসুল স. বলেছেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতার। সাহাবায়ে কেরামের একটি বিরাট দল এই হাদিসটির বর্ণনাকারী। সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আয়েশা থেকে— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ সেটাই যা মানুষ ভক্ষণ করে পুত্রের উপার্জন থেকে। যেহেতু পুত্রই তার উপার্জন। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি হাসান। আবু দাউদ ও ইবনে মাজা ধারাবাহিক সূত্রে আমর বিন সোয়াইব, তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল স. এর নিকট নিবেদন করলো, আমি বিত্তাধিকারী। আর আমার পিতা আমার অর্থবিত্তের মুখাপেক্ষী। রসুল স. বললেন, তুমি এবং তোমার অর্থবিত্ত তোমার পিতার। সন্তান-সন্ততি সর্বোৎকৃষ্ট উপার্জন। কাজেই তোমরা সন্তানের উপার্জন থেকে আহার করো। হাদিসের বর্ণনানুসারে দেখা যায়, পিতা তার পুত্রের সম্পদের মালিক কিন্তু উম্মতের ঐকমত্য—উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত ও অন্যান্য কারণে সরাসরি এরকম বলা যাবে না। বরং এতোটুকুই বলা সঙ্গত যে, প্রয়োজনে পিতা তার পুত্রের সম্পদাধিকারী হতে পারে। তাই পিতা-মাতার ব্যয়ভার বহণ পুত্রের উপর ওয়াজিব। উত্তরাধিকারীদের কারো প্রতি এ রকম দায়িত্ব নেই। মনে রাখতে হবে, এই বিধানটি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানের আওতাভূত নয়। এ হচ্ছে, দাদা-দাদী ও পিতা-মাতা সংক্রান্ত নির্দেশনা। এই নির্দেশনানুযায়ী পিতা-মাতার অবর্তমানে দাদা-দাদী অংশ পায় এবং বিবাহে দাদা ওলী হয়। আমর বিন সোয়াইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল পাক স. এর নিকটে হাজির হয়ে নিবেদন করলো, আমি সহায়সম্বলহীন। এক এতিম শিশু আমার পোষ্য। তিনি স. বললেন, ওই এতিম শিশুর সম্পদ থেকে আহার করো। কিন্তু অপব্যয় কোরো না, অথবা নিজের নিকট সঞ্চয় কোরো না। আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

www.eelm.weebly.com

ইমাম মালেক বলেছেন, পিতা-মাতা ও নিজের সন্তান ব্যতীত অন্য কারো জন্য খোরপোষ ওয়াজিব নয়। দাদা-দাদী, কিংবা নাতি-পুতির জন্যও ওয়াজিব নয়। আর ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মূল ও শাখা অর্থাৎ পিতা, দাদা এবং পুত্র, পৌত্র, উভয় সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক খোরপোষ প্রদান সাধারণভাবে বাধ্যতামূলক। তিনি আরও বলেছেন, খোরপোষের দায়িত্ব বর্তে কেবল পুরুষের উপর, নারীদের উপর নয়। যেমন দাদা, পিতা, পুত্র, পৌত্র। ইমাম মালেক বলেছেন, ঔরসজাত সন্তান-সন্ততি সকলের প্রতি খোরপোষের দায়িত্ব বিদ্যমান। এর মধ্যে যে ধনী সে অভাবীর ব্যয়ভার বহণ করবে।

কিন্তু যদি তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্য পান বন্ধ রাখতে চায় তবে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই— একথার অর্থ পিতা-মাতা উভয়ে পরামর্শক্রমে শিশুর স্তন্যপান দুই বছরের আগেই বন্ধ করে দিতে চায়। এই পরামর্শ করার সুযোগ রয়েছে দুই বছরের আগেই। কারণ, আয়াতে দুই বছরে দুধ ছাড়ানো বাধ্যতামূলক বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কেউ কেউ দ্বিধান্বিত হয়ে বলেছেন, পিতা-মাতা দুধ ছাড়ানোর প্রয়োজন যদি অনুভব করে দুই বছর পূর্ণ করার পর, তখন যদি তারা পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চায়......। কিন্তু এ রকম বক্তব্য গ্রহণীয় নয়। কারণ, এই বাক্যে উল্লেখিত 'ফা' অব্যয়টির মাধ্যমে দুধ পানের সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাফসীরে মাদারেক প্রণেতা বলেছেন, এখানে পরামর্শসংক্রান্ত বিধানটি একটি সাধারণ বিধান। এই পরামর্শ দু'বছর পূর্ণ হওয়ার আগেও হতে পারে কিংবা হতে পারে পরেও। বস্তুত দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণার পর এই হচ্ছে কিছুটা অবকাশ। তাফসীরে মাদারেক রচয়িতার এই ব্যাখ্যাটি ইমাম আবু হানিফার অভিমতপুষ্ট। অভিমতপুষ্ট একারণে যে, তাঁর মাজহাবের নিয়মানুযায়ী স্তন্যপানের সময়সীমা দুই বছর ছয় মাস। ইনশাআল্লাহ্ সুরা নেসার আলোচনায় বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করে দেয়া হবে।

কেউ যদি বলেন, দুগ্ধ পান বন্ধের পরামর্শের কথা বলে স্তন্য পানের বাধ্যতামূলক সময়সীমাকে কি রহিত করা হয়নি? আমরা বলি, আল্লাহ্পাকের বর্ণনাভঙ্গি এ রকম 'যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায়'—এতে করে বুঝা যায়, দুগ্ধপানের পরামর্শ একটি মোবাহ বিধান। অর্থাৎ পিতা-মাতার জন্য স্তন্যপান বন্ধ সংক্রান্ত পরামর্শকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এ রকম পরামর্শ তারা করতে পারবে। যদি করে তবে তাদের কোনো অপরাধ হবে না। সুতরাং এই মোবাহ বিধান বাধ্যতামূলক বিধানের বিপরীত নয়। তাই, রহিত হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন এখানে আসে না।

বর্ণিত পরামর্শ সম্পাদন করতে হবে শিশুর শারীরিক প্রয়োজনকে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ একথা ভেবে দেখতে হবে যে, বন্ধ করা অথবা না করা— কোনটি শিশুর জন্য অধিক উপকারী। এ রকম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে কারো কোনো অপরাধ হবে না। একথার মাধ্যমে একতরফা সিদ্ধান্ত

www.eelm.weebly.com

গ্রহণের সুযোগ রহিত করে দেয়া হয়েছে। কারণ, একপেশে সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হওয়া সম্ভব। আর পারস্পরিক পরামর্শ সেই সম্ভাবনাকে রহিত করে। তাই বলা হয়েছে, এ রকম করলে পিতা-মাতা কেউই অপরাধী সাব্যস্ত হবে না।

'তোমরা যা বিধিমতো দিতে চেয়েছিলে তা যদি অপূর্ণ করো তবে ধাত্রী দ্বারা স্তন্য পান করাতে চাইলে তোমাদের কোনো পাপ নেই'— একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে ওহে শিশুর পিতাগণ, শিশুর মাতা যদি দুগ্ধ দানে অস্বীকৃত হয় বা কোনো অসুবিধার কারণে অক্ষম হয় অথবা তার দুগ্ধপ্রবাহ শুকিয়ে যায় কিংবা সে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে উদ্যোগী হয়; তবে তোমরা পারশ্রমিকের বিনিময়ে অন্য ধাত্রী নিয়োগ করতে পারবে। এ রকমও হতে পারে— শিশুর মাতা অধিক পারিশ্রমিক দাবী করে বসলো। এ রকম অবস্থাতেও শিশুর পিতা অন্য ধাত্রী নিয়োগ করতে পারবে।

এখানে উল্লেখিত 'মা আতাইম' কথাটির অর্থ হচ্ছে, দুধ পান করানোর সময়সীমার জন্য বিধিমতো বা নির্ধারিত পারিশ্রমিক অর্পণ করো। ঐকমত্যসূত্রে এ রকম অর্পণ মোস্তাহাব। জায়েযের কোনো শর্ত নেই। ইবনে কাসীর এই আয়াতে এবং সুরা রূম-এ 'আতাইতুম' শব্দটি আলিফ মাকসুরা সহ পাঠ করেছেন। এ রকম পাঠ করলে অর্থ দাঁড়াবে— তোমরা যা করেছো। আর 'সাল্লামতুম' এর অর্থ দাঁড়াবে নির্বিবাদ আনুগত্য।

এখানে 'বিধিমতো' কথাটি সম্পৃক্ত রয়েছে 'সাল্লামতুম' এর সঙ্গে। এভাবে কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে, প্রথাটি যেনো শরিয়তসমর্থিত হয়। এই শরিয়তসম্মত অবস্থাকে এখানে 'বিধিমতো' শব্দটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ উহার দ্রষ্টা।' অর্থাৎ শিশু ও স্তন্যদাত্রী সম্পর্কে এখানে যা কিছু আলোচনা করা হলো সেগুলোকে আল্লাহ্‌র ভয়ে মান্য করে চলো। আল্লাহ্‌পাক সকল কিছুর দ্রষ্টা। তাই তিনি অবশ্যই দেখছেন কে তাঁর পবিত্র বিধানে সমর্পিত এবং কে নয়।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৩৪

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ

اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ

بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

www.eelm.weebly.com

❐ তোমাদের মধ্যে যাহারা স্ত্রী রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদের স্ত্রীগণ চারি মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকিবে। যখন তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করিবে তখন তাহারা যথাবিধি নিজেদের জন্য যাহা করিবে তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই। তোমরা যাহা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

আয়াতে উল্লেখিত 'তাওফি' বা 'তুয়াফ্ফা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ কোনো বস্তুকে তার পূর্ণত্বসহ অর্জন করা। এখানে অর্থ হবে নির্ধারিত সময়সীমা (চার মাস দশ দিন) পূর্ণ করা। 'ইয়াতারাব্বাছ্না' শব্দের সর্বনামটি স্ত্রীগণের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে— যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষা করবে। যারা গর্ভবতী এবং যারা গর্ভবতী নয়— সকল স্ত্রীদেরকে এখানে নির্দেশ করা হলেও গর্ভবতীদেরকে অন্য আয়াত দ্বারা আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে এভাবে—'আর গর্ভবতী নারীদের জন্য সময়সীমা হলো গর্ভপাত পর্যন্ত।'

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, সুরা বাকারার পরেই অবতীর্ণ হয়েছে সুরা তালাক। মুসাওয়ার বিন মাখরিমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, সাবিয়া আসলাম নেফাসগ্রস্তা হয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পনেরো দিন পরে তিনি সন্তান প্রসব করেছিলেন। তিনি রসুল স.এর নিকটে হাজির হয়ে বিবাহ করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রসুল স. অনুমতি দিলেন। আর তিনি শীঘ্রই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধা হলেন। বোখারী। সাবীয়া থেকেও অনুরূপ হদিস উদ্ধৃত হয়েছে বোখারী ও মুসলিমে। উম্মে সালমা থেকেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। ইমাম নাসাঈ উল্লেখ করেছেন, স্বামীর মৃত্যুর পনেরো দিন পরেই সাবীয়ার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো। বোখারীর এক বর্ণনায় চল্লিশ দিন এবং অপর এক বর্ণনায় দশ রাতের কাছাকাছি— এ রকম বলা হয়েছে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে— স্বামীর পরোলোকগমনের পনেরো দিন পর সাবীয়ার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলো। হজরত আলী এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, বিধবা রমনী ইদ্দতের ওই সময়সীমা পূর্ণ করবে যে সময়সীমা হবে সর্বাধিক। অর্থাৎ চার মাস দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তবে ওই বর্ধিত সময়ই হবে তার ইদ্দত। আর চার মাস দশ দিনের কম সময়ে প্রসব হলে ইদ্দতের সময়সীমা হবে চার মাস দশ দিন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই বর্ণনাটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর নাসিখ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হজরত ওমর বলেছেন, স্বামীর জানাযার সময় যদি কোনো রমণী সন্তানের জন্ম দেয়, তবে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। মালেক, শাফেয়ী, ইবনে আবি শাইবা।

মাসআলাঃ ক্রীতদাসীর স্বামী মারা গেলে ঐকমত্যানুযায়ী তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে দুই মাস পাঁচ দিন।

www.eelm.weebly.com

জ্ঞাতব্যঃ ঐকমত্যানুসারে সাব্যস্ত হয়েছে যে, মৃত স্বামীর ইদ্দত পালনকারীনির জন্য শোক প্রকাশ করা ওয়াজিব। হাসান এবং শা'বী থেকে বর্ণিত হয়েছে— ওয়াজিব নয়। ঐকমত্যানুযায়ী একথাও সাব্যস্ত হয়েছে যে, রজয়ী তালাকের ইদ্দতের শোক প্রকাশ করা যাবে না। বায়েন তালাকের ইদ্দতের শোক প্রকাশ করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এমতোক্ষেত্রে শোক প্রকাশ ওয়াজিব। ইমাম মালেক বলেছেন, ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ থেকে যাবে ও যাবে না— উভয় প্রকার উক্তি পাওয়া যায়। আমাদের মতে, অপ্রাপ্ত বয়স্কাদের জন্য কোনো শোক নেই। কারণ সে পরিণত বয়সে পৌঁছেনি। জিম্মি নারীদের জন্য কোনো শোক নেই। কারণ তারা শরিয়তের আওতাধীন নয়। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, অপ্রাপ্ত বয়স্কা ও জিম্মি রমণীদের জন্যও শোক ওয়াজিব। শোক প্রকাশ করতে হবে এভাবে— সুরমা লাগাবে না, মেহেদী ব্যবহার করবে না, রূপচর্চা করবে না, জাফরানরঞ্জিত প্রসাধন ব্যবহার করবে না। রূপচর্চার উদ্দেশ্যে অলংকার ও রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে না। মাথা ও শরীরে সুবাসিত অথবা অসুবাসিত তেল লাগাবে না। সুরমা ব্যবহার অত্যাবশ্যক হলে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন আলেমগণ। শাফেয়ী বলেছেন, সুরমা লাগাতে হবে রাতে এবং মুছে ফেলতে হবে সকালে। এ রকম অত্যধিক প্রয়োজন পড়লে খেজাবের ব্যবহারেও দোষ নেই।

রজয়ী অথবা বায়েন তালাক প্রাপ্তাদের জন্য দিনে কিংবা রাতে ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয নয়। কারণ আল্লাহ্পাক বলেছেন, খবরদার, তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিও না; আর তারা নিজেরাও যেনো ঘর থেকে বের না হয়। আর যার স্বামীবিয়োগ ঘটেছে, সে দিন অথবা রাতের কোনো এক সময়ে ঘর থেকে বের হতে পারবে। তবে অন্যের ঘরে রাত্রি যাপণ করবে না। শাফেয়ী বলেছেন, বিধবাদের জন্য দিনে ও রাতে ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয। আর যে স্বামী কর্তৃক বায়েন তালাক পেয়েছে তার পক্ষে কেবল দিবাভাগে বের হওয়া জায়েয। আতা বলেছেন, মিরাসের আয়াত দ্বারা মেয়েদেরকে গৃহাবদ্ধ রাখার বিধান রহিত হয়েছে।

জননী উম্মে হাবিবা ও জননী জয়নাব বিনতে জাহাশ থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. এরশাদ করেন, যে নারী আল্লাহ্র প্রতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসিনী, তার পক্ষে জায়েয হবে না কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা। তবে মৃত স্বামীর জন্য তাকে শোক প্রকাশ করতে হবে চার মাস দশ দিন। বোখারী, মুসলিম। উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে- রসুল স. বলেন, কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোকাকুলা থাকা কোনো নারীর পক্ষে বৈধ নয়। কিন্তু মৃত স্বামীর জন্য শোক পালন করতে হবে চার মাস দশ দিন। শোক পালনের নিদর্শন হচ্ছে, রঙ্গিন বস্ত্র পরিধান করতে পারবে না। লাগাতে পারবে না সুরমা কিংবা সুগন্ধি। তবে পবিত্রাবস্থায় ব্যবহার করতে পারবে কিস্ত অথবা

www.eelm.weebly.com

আজফার। বোখারী, মুসলিম। এর সঙ্গে খেজাব ব্যবহার করা চলবে না। এ কথা বলেছেন, আবু দাউদ। জননী সালমা বলেছেন, এক রমণী রসুল স. এর নিকট হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমার কন্যা বিধবা হয়েছে। তার চোখে রয়েছে পীড়া। সে কি চোখে সুরমা লাগাতে পারবে? রসুল স. বললেন, না। ওই রমণী এ রকম প্রশ্ন করলেন দুই অথবা তিনবার। তিনি স. প্রতিবারই জবাব দিলেন, না। পুনরায় বললেন, এখন থেকে তোমাদের ইদ্দতের সময়সীমা হচ্ছে চার মাস দশ দিন। ইতোপূর্বে তোমাদের অবস্থা ছিলো কতই না শোচনীয়। তখন এক বৎসর শোক পালনের পরও তোমাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হতো উটের নাড়িভূঁড়ি। বোখারী, মুসলিম। জননী উম্মে সালমা বলেছেন, আমার স্বামী আবু সালমার পৃথিবী পরিত্যাগের পর রসুল স. আমার নিকট দয়া করে এলেন। আমি তখন মুখমন্ডলে মালিশ করছিলাম মুসাব্বর। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, উম্মে সালমা, ওটা কী? আমি বললাম, মুসাব্বর। এতে কোনো সুগন্ধ নেই। তিনি স. এরশাদ করলেন, মুসাব্বর চেহারাকে উজ্জ্বল করে। কাজেই তুমি এটা রাতে ব্যবহার করতে পারো কিন্তু দিনে মুছে ফেলবে। অন্য কোনো সুগন্ধি বা মেহেদীও ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ এটা হলো খেজাব। আমি বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! তাহলে আমি কেশবিন্যাস করবো কীভাবে? রসুল স. বললেন, শুধু বরই পাতা নিষিক্ত পানি দ্বারা মাথা ধৌত করো। আবু দাউদ, নাসাঈ। জননী উম্মে সালমা আরও বর্ণনা করেছেন, বিধবারা কুসুম ও গোলাপী রঙের বস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না। অলংকারও ব্যবহার করতে পারবে না। আর ব্যবহার করতে পারবে না খেজাব এবং সুরমা। আবু দাউদ, নাসাঈ। হজরত জয়নাব বিনতে কায়াব থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বোন এবং মালিক বিন সানানের কন্যা ফারিয়াহ্ বলেছেন, আমি রসুল স. এর নিকটে গিয়ে বললাম, আমার স্বামী ক্রীতদাসের সন্ধান করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। তাঁর ঘর বাড়ী নেই। ঘরে আহারের ব্যবস্থাও নেই। এমতাবস্থায় আমি আমার পিত্রালয়ে যেতে পারবো কি? তিনি স. বললেন, হাঁ, যেতে পারো। তবে চার মাস দশ দিন ঘর থেকে বের হয়ো না। আমি তাই করেছি। মালেক ইবনে হাব্বান, তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও দারেমী। হাকেম দু'টি পদ্ধতিতে এই বিবরণটি উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন, দু'টি পদ্ধতিরই সূত্রপরম্পরা বিশুদ্ধ। তিরমিজিও এরকম বলেছেন। ইবনে আব্দুল বার বলেছেন, হাদিসটি মশহুর। আলেমগণ এই হাদিস থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন। দারা কুতনী বলেছেন, রসুল স. এক বিধবাকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করবে। কেউ কেউ বলেছেন, আবু মালিক আশআরি ব্যতীত অন্য কেউ হাদিসটিকে মারফু বলেননি। আর আবু মালিক জয়ীফ। ইবনে কাত্তান বলেছেন, এই বর্ণনার সূত্রভূত বর্ণনাকারিনী মাহবুবা বিনতে মুহরার জয়ীফ। তাই দারা কুতনী বর্ণনাটিকে দূষণীয় বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মৃত স্বামীর গৃহে মাথা গোঁজার

www.eelm.weebly.com

ঠাই না হলে বিধবা সেখান থেকে প্রস্থান করবে। তবে তাঁর প্রস্থানের সমর্থনে সঙ্গত কারণ থাকতে হবে। যেমন, গৃহ ধ্বসে পড়ার আশংকা, ঘর ভাড়া পরিশোধে অসামর্থতা, ইত্যাদি।

'যখন তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে তখন তারা যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই'— একথার অর্থ ইদ্দত পালন শেষে বিধবারা রূপচর্চা করতে পারবে। ঘরের বাইরে যেতে পারবে, অথবা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। যথাবিধি (বিল মারুফ) অর্থ শরিয়তসমর্থিত। অর্থাৎ বিধবারা শরিয়তের অনুমোদন সাপেক্ষে সবকিছু করতে পারবে। যদি তাদের আচরণ শরিয়ত বিগর্হিত হয়, তবে বাধা দেয়া ওয়াজিব। আর তখন যে বাধা দিতে কার্পণ্য করবে সে হবে অপরাধী।

শেষে বলা হয়েছে, 'তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।' অর্থাৎ তিনি তোমাদের সবকিছুই জানেন। তাই তিনি তোমাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী তোমাদেরকে প্রতিফল দান করবেন, ভালো অথবা মন্দ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৩৫

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا
قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۠

❑ স্ত্রীলোকদের নিকট তোমরা ইংগিতে বিবাহ্ প্রস্তাব করিলে অথবা তোমাদের অন্তরে তাহা গোপন রাখিলে তোমাদের কোন পাপ নাই। আল্লাহ্ জানেন যে তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিবে; কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাহাদের নিকট কোন অংগীকার করিও না; নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করিওনা। এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ তোমাদের মনোভাব জানেন। সুতরাং তাঁহাকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ ক্ষমা পরায়ণ, সহনশীল।

এখানে 'খিত্বা' শব্দের অর্থ বিবাহের প্রস্তাব। 'তায়রীদ্ব' অর্থ ইঙ্গিত বা ইশারা। এসম্পর্কে একটি ঘটনা রয়েছে। ঘটনাটি হচ্ছে, সাকিনা বিনতে হানযালা

www.eelm.weebly.com

বিধবা হয়েছিলেন। ইদ্দত পালন অবস্থায় তার নিকট উপস্থিত হলেন আবু জাফর মোহাম্মদ বিন আলী আল বাকের।

তিনি বললেন, হে হানযালা নন্দিনী! আমিতো সেই ব্যক্তি, রসুল পাক স. যার নিকট আত্মীয়। তুমিতো ভালো করেই জানো আমার পিতামহ হজরত আলী কেমন ছিলেন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ এবং ছিলেন প্রথম দিকের মুসলমান। সাকিনা বললেন, তুমি দেখছি আমার ইদ্দতের মধ্যেই বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছো। এটাতো অপরাধ। আবু জাফর বললেন, আমিতো রসুল পাক স. এর সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক বিবৃত করছিলাম। আর তিনি স.ও হজরত উম্মে সালমার নিকট তাঁর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগেই বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আল্লাহ্‌পাকের নিকট তাঁর মহামর্যাদার কথা। সে সময়ে তাঁর স. এর পবিত্র হস্তে ছিলো একটি চাটাই। তার ভারে তাঁর স. হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিলো।

আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দৃষ্টে একথা পরিষ্কার যে, ইদ্দত পালনরতাদের নিকট ইশারা-ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব করা যাবে। এতে কোনো অপরাধ নেই। আর ওই সময়ে মনে মনে বিবাহের ইচ্ছা করলেও কোনো অন্যায় হবে না। পরক্ষণেই হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলা হয়েছে, কিন্তু গোপনে তাদের নিকট কোনো অঙ্গীকার করা যাবে না। অর্থাৎ শরিয়তের বাইরে কোনো কিছু করা যাবে না। অন্তর্নিহিত বক্তব্যটি এরকম— তোমরা মনে মনে ইদ্দত পালনরতাদেরকে বিবাহের ইচ্ছা করতে পারো, ইশারা-ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাবও দিতে পারো; কিন্তু প্রকাশ্যতঃ বিবাহ বা সম্ভোগের প্রস্তাব করতে পারবে না। সম্ভোগের প্রস্তাবকেই এখানে গোপন অঙ্গীকার বলা হয়েছে। আর 'নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প কোরো না'— একথা বলে বিবাহের প্রকাশ্য প্রস্তাব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোটকথা, ইদ্দত পালনরতাদের নিকট প্রকাশ্যে বা গোপনে সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব পেশ করা যাবে না। আর সম্ভোগ প্রস্তাবতো প্রকাশ্য ও গোপন —সকল অবস্থায় হারাম।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, যে রমণী স্তন্যপান করানোর জন্য বা অন্য কোনো কারণে পৃথক বাস বা ইদ্দত পালন করছে কিংবা 'লিয়ানের' কারণে বায়েন হচ্ছে, অথবা তিন তালাক পাওয়ার কারণে যাকে প্রথম স্বামী ফিরিয়ে নিতে অক্ষম, তাকে অপরিচিত কোনো ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারবে। কেউ যদি দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হয়, তবে তাকে কেবল প্রথম স্বামী ইঙ্গিতবহ প্রস্তাব দিতে পারবে। অন্যেরা পারবে না। তবে কেউ কেউ বলেছেন, পারবে। কারণ এ হচ্ছে নতুন বিবাহ প্রস্তাব। প্রথম বিবাহের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। এ অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য। কারণ তালাকের পর বিবাহের প্রভাব আর থাকে না।

ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ। এ বিধানটি স্পষ্ট। তাই বলা হয়েছে— বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প কোরো না। কিন্তু মনের সংকল্প এই বিধানের বাইরে। 'আল্লাহ জানেন যে তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে'— একথায় বুঝা যায় আন্তরিক সংকল্প মোবাহ্। তবে অন্তরে দৃঢ় সংকল্পকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে

www.eelm.weebly.com

না। কারণ, দৃঢ় সংকল্পকে রোধ করা কঠিন। দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই 'নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ সম্পন্ন করার সংকল্প কোরো না' বলা হয়েছে।

ইদ্দত পালন ফরজ। তাই একে কিতাব আখ্যা দেয়া হয়েছে। কিতাব অর্থ ফরজ। যেমন আল্লাহ্‌পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'কুতিবা আলাইকুমুস্‌ সিয়াম' (তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে)।

'এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ্‌ তোমাদের মনোভাব জানেন'— এ কথার অর্থ তোমাদের মনের সংকল্প সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। এতে করে বুঝা যায় অন্তরের সংকল্প মাকরূহ্‌।

'সুতরাং তাঁকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে আল্লাহ্‌ ক্ষমাপরায়ণ সহনশীল'—— এ কথার মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে, যারা সংকল্প করলো এবং পরক্ষণেই আল্লাহ্‌র ভয়ে সে সংকল্প পরিত্যাগ করলো; আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও সহনপরায়ণ।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৩৬, ২৩৭

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْتَفْرِضُوْلَهُنَّ فَرِيْضَةً
وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ○ وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْيَعْفُوَ
الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَلَاتَنْسَوُا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِمَاتَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

❒ যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়াছ অথবা তাহাদের জন্য মোহর ধার্য করিয়াছ তাহাদিগকে তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নাই। তোমরা তাহাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করিও। বিত্তবান তাহার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তাহার সামর্থ্যানুযায়ী বিধিমত সংস্থানের ব্যবস্থা করিবে। ইহা সত্যপরায়ণ লোকের কর্তব্য।

❒ তোমরা যদি তাহাদিগকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, অথচ মোহর ধার্য করিয়া থাক; তবে যাহা তোমরা ধার্য করিয়াছ তাহার অর্ধেক, যদি না স্ত্রী অথবা

www.eelm.weebly.com

যাহার হাতে বিবাহ বন্ধন রহিয়াছে সে মাফ করিয়া দেয়; এবং মাফ করিয়া দেওয়াই আত্মসংযমের নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হইও না। তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্ তাহার দ্রষ্টা।

শরিয়তে মোবাহ্ বিষয়গুলোর মধ্যে তালাকই হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট বিষয়। তাই আল্লাহ্ পাক বিষয়টিকে উল্লেখিত শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এখানে বলা হয়েছে, স্পর্শ করার পূর্বে যদি তালাক দেয়া হয় তবে মোহরানা দেয়া বাধ্যতামূলক নয়, যদি মোহরানা নির্ধারিত না হয়ে থাকে। মোহরানা নির্ধারিত হয়ে থাকলে স্পর্শের পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক এবং স্পর্শের পরে তালাক দিলে পুরো মোহর পরিশোধ করতে হবে। যেহেতু আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'ফা'তুহুন্না উযুরাহুন্না বিল মারূফ' এটা ঐকমত্য যে, মোহর নির্ধারিত না হয়ে থাকলে পরিশোধ করতে হবে মোহরে মিসাল।

'তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা কোরো'- এ কথার অর্থ স্পর্শের আগে তোমরা যাদেরকে তালাক দিয়েছো তাদেরকে কিছু লাভ দাও। ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন, যে নারীর বিবাহের মোহরানা নির্ধারিত হয়নি এবং যাকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দেয়া হয়েছে, তাকে কিছু না কিছু দিতেই হবে। এটা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম মালেক বলেছেন, ওয়াজিব নয়। তবে কিছু দিলে তা হবে মোস্তাহাব। আমরা বলি, এখানে আল্লাহ্পাকের কথা এ রকম 'হক্কান আলাল মুহসিনিন' এখানে 'হাল' ও 'আলা' শব্দ দুটিমোস্তাহাবের বিপরীত। আরবী ভাষায় আদেশসূচক বাক্য ফরজকে নির্দেশ করে।

অনির্ধারিত মোহরের অনাঘ্রাতাদেরকে কি পরিমাণ সম্পদ দেয়া ওয়াজিব হবে, সে সম্পর্কে ইমামগণের মতপৃথকতা রয়েছে। কেউ বলেছেন, তিনটি কাপড় দিতে হবে— জামা, চাদর ও ওড়না। কাপড় দিতে হবে ওই ধরনের যা সে সাধারণত পরিধান করে থাকে। ইমাম আবু হানিফা মেয়েদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে এরকমই বলেছেন। এই সম্পদ দান মোহরে মিসাল তুল্য। তাই এর পরিমাণ মোহরে মিসালের অর্ধেকের বেশী হওয়া চলবে না। আর পাঁচ দিরহাম অপেক্ষা কমও হওয়া যাবে না। ইমাম কারখী এ রকম বলেছেন। বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, এই দান হতে হবে দাতার যোগ্যতার অনুকূল। তাই আল্লাহ্পাক পরক্ষণেই বলেছেন, 'বিত্তবান তার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তার সামর্থ্যানুযায়ী বিধিমতো সংস্থানের ব্যবস্থা করবে।' ইবনে হুম্মাম বলেছেন, এটাই এক্ষেত্রে সম্পদের নির্ধারিত পরিমাণ— যা নির্ভর করে স্বামীর সম্পদ— ক্ষমতার উপর। এ রকম বর্ণনা এসেছে হজরত আয়েশা, হজরত ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, আতা ও শা'বী থেকে।

বাগবী বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— এক্ষেত্রে উন্নতমানের দান হচ্ছে একটি ক্রীতদাসের মুক্তি মূল্য। মধ্যম মান হচ্ছে একটি জামা, একটি ওড়না ও একটি পাজামা— এই তিনটি কাপড়। আর নিম্নতম মান হচ্ছে এমন একটি পরিধেয় যদ্দারা শরীর আবৃত করা যায়। অথবা কিছু পরিমাণ

www.eelm.weebly.com

রুপা। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ থেকে প্রাপ্ত দুটিঅভিমতের মধ্যে বিশুদ্ধতর অভিমতটি হচ্ছে—এটা নির্ভর করবে বিচারকের সিদ্ধান্তের উপর। তাঁর নির্ধারণই চূড়ান্ত। ইমাম শাফেয়ী থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে— এই দানের পরিমাণ হচ্ছে কম বেশী যে কোনো সম্পদ পদবাচ্য বস্তু। তবে মোস্তাহাব পদ্ধতি হচ্ছে, তিন দিরহামের কম যেনো না হয়। ইমাম আহমদের একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে দিতে হবে কমপক্ষে এমন পরিমাণ পরিচ্ছদ যদ্দারা নামাজ শুদ্ধ হয়। আর তা হচ্ছে দুটিকাপড়— একটি জামা ও একটি ওড়না। বাগবী বলেছেন, আবদুর রহমান বিন আউফ তালাক প্রদানের পর তাঁর এক স্ত্রীকে দিয়েছিলেন একটি হাবসী ক্রীতদাস। হজরত হাসান বিন আলী তাঁর এক তালাক প্রাপ্তাকে দিয়েছিলেন দশ হাজার দিরহাম।

'ইহা সত্যপরায়ণ লোকের কর্তব্য'— এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে শরিয়ত যাকে উত্তম বলে, তোমরা তালাক প্রাপ্তাদেরকে সে রকম উত্তম অনুদান প্রদান করো। বিষয়টি বিচারকের বলপ্রয়োগ পর্যন্ত যেনো না গড়ায়।

'তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দাও, অথচ মোহর ধার্য করে থাকো, তবে যা তোমরা ধার্য করেছো তার অর্ধেক'- এ কথার অর্থ অনাঘ্রাতাদেরকে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক প্রদান করা ওয়াজিব। এই নির্দেশনার প্রেক্ষিতে জমহুর ওলামার সিদ্ধান্ত হচ্ছে— অর্ধেক মোহরের অতিরিক্ত কোনো অনুদান দেয়া ওয়াজিব নয়। কিন্তু হাসান ও সাঈদ বিন জোবায়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তাকে অতিরিক্ত অনুদান বা কল্যাণভাতা দিতে হবে। যদিও মোহর ও নির্দ্ধারণ স্পর্শ করার পূর্বে তালাক কার্যকর করা হয়। অথবা নির্দ্ধারণ করার পর স্পর্শ করার পূর্বে। কারণ, আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করো। সুরা আহযাবে রয়েছে, হে বিশ্বাসীরা! যখন তোমরা মুসলমান নারীদেরকে বিবাহ করো, তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তবে তাদেরকে ইদ্দত পালন করানোর অধিকার তোমাদের নেই। তাদেরকে কিছু কল্যাণভাতা দিয়ে উত্তম পন্থায় বিদায় নিশ্চিত করো। এই নির্দেশটি সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তাদের প্রতি প্রযোজ্য।

জমহুর ওলামা এ রকম মনে করে থাকতে পারেন যে, কল্যাণ ভাতাই তাদের অর্ধমোহর। মোহর হলো শ্লীলতা সম্ভোগের প্রতিদান। আর এক্ষেত্রে তাদের শ্লীলতা ও সম্ভোগ সুসংরক্ষিত। যেহেতু তারা এখানে আঘ্রাত হয়নি, তাই অর্ধমোহরই অনিবার্যরূপে এখানে কল্যাণভাতা।

যদি না স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহ্‌ বন্ধন রয়েছে সে মাফ করে দেয় এবং মাফ করে দেয়াই আত্মসংযমের নিকটতর— এখানে বলা হয়েছে স্ত্রী যদি তার প্রাপ্য মোহরানার দাবী পরিত্যাগ করে বা মাফ করে দেয় তবে স্বামী হয়ে যাবে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত।

'যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে'— একথা বলে বুঝানো হয়েছে স্বামীকে। অর্থাৎ স্বামী যদি মোহরানা পূর্বেই পরিশোধ করে দেয় এবং তালাকের পর অর্ধেক

www.eelm.weebly.com

মোহরের দাবী না তুলে মাফ করে দেয়, তবে স্ত্রীও অর্ধেক মোহর ফেরৎ দেয়া থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তিবরানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে আমর বিন শোয়াইব থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন, যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে, অর্থ স্বামী। কারণ, স্বামীই মোহরানার মাধ্যমে বিবাহ কার্যকর করে। এরকম মন্তব্য করেছেন হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব, সাঈদ বিন জোবায়ের, শা'বী, শুরাইহ্, মুজাহিদ ও কাতাদা। বায়হাকী তাঁর সুনান গ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম উদ্বৃতি দিয়েছেন। আর এটাই হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীর সর্বশেষ অভিমত। এখানে মাফ করার কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে, বিবাহের প্রাক্কালে স্বামী মোহরানা পরিশোধ করেছিলো আর তাই হয়েছিলো সম্ভোগের দাবীদার। এখন সম্ভোগ ব্যতীতই যখন তাকে তালাক দিলো, তখন দাবী প্রতিষ্ঠিত হলো অর্ধেক মোহরের। স্বামী সেই অর্ধেক মোহর ফেরৎ চাইলো না, তার মানে সে মাফ করে দিলো। অথবা 'ইয়া'ফুনা' শব্দের সাথে সম্পৃক্ত বলে এর তাৎপর্য হচ্ছে— ক্ষমার ঔদার্য্য। হজরত জোবায়ের বিন মুত্য়ীম থেকে বর্ণিত হয়েছে— তিনি এক রমণীকে বিয়ে করে সম্ভোগের পূর্বেই তালাক দিয়েছিলেন এবং তাকে পরিশোধিত পূর্ণ মোহর মাফ করে দিয়ে বলেছিলেন,মার্জনা করার অধিকার আমারই। বায়হাকী।

'কেউ কেউ বলেছেন, 'যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে'—বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে কন্যার অভিভাবককে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন বায়হাকী। ইমাম আবু হানিফা এই ব্যাখ্যাটিকে তাঁর অভিমত হিসেবে গ্রহণ করেছেন আর প্রথমোক্ত অভিমতটি ছিলো ইমাম শাফেয়ীর। ইমাম আহমদ থেকে দু'টি বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর নিকট এই আয়াতের অর্থ—স্ত্রী যদি প্রাপ্তবয়স্কা হয় তবে সে তার প্রাপ্য মোহর ক্ষমা করে দিতে পারবে, আর যদি অপ্রাপ্তবয়স্কা হয় তবে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দিতে পারবে তার অভিভাবক। অবস্থা যদি এমন হয় যে, কন্যার কথা ধর্তব্য নয়, তবে তার অভিভাবকের পক্ষে ক্ষমা করে দেয়া জায়েয হবে। এরকম বলেছেন আলকামা, আতা, হাসান, জুহুরী ও রবীয়াহ্। আমরা বলি, মোহর রমণীদের ন্যায্য প্রাপ্য। তাই মোহরের ক্ষেত্রে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। তাই তার অভিভাবক দাবী মাফ করতে পারে না। ঐকমত্যানুযায়ী জায়েযও হবেনা তালাকের পূর্বে তার মোহর থেকে দান করে দেয়া।

'তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হইওনা।'— এই নির্দেশটি পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি প্রযোজ্য। এখানে প্রাধান্য পুরুষেরই। তাই দান এবং ক্ষমা উভয় ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে অগ্রগামী হতে হবে। দেখাতে হবে সদাশয়তার নিদর্শন। মনে রাখতে হবে দাতাই গ্রহীতা অপেক্ষা উত্তম।

এতোক্ষণ সাংসারিক বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। দেয়া হয়েছে বিবাহ, তালাক, ইদ্দত, দুগ্ধপান, ইত্যাদির প্রকৃষ্ট নির্দেশনা। এবার আলোচিত হচ্ছে ইবাদত প্রসঙ্গ। নামাজ ধর্মের স্তম্ভ। নামাজ আল্লাহ্‌পাকের স্মরণের বিশেষ অনুশীলন। নামাজ

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্পাকের প্রসন্নতা লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। সেই নামাজ সম্পর্কে বিবরণ এসেছে নিম্নের আয়াতে।

সুরা বাকারা : আয়াত ২৩৮,২৩৯

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ○ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○

❐ তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হইবে, বিশেষতঃ মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহের উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াইবে;

❐ যদি তোমরা আশংকা কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়; যদি তোমরা নিরাপদ বোধ কর তবে আল্লাহ্কে স্মরণ করিবে যেভাবে তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তোমরা জানিতে না।

এখানে নামাজের জন্য যত্নবান হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে নামাজ পাঠ করতে হবে। নামাজের প্রতি মনোযোগ ও মহব্বত থাকতে হবে। এবং নামাজের স্তম্ভ ও বৈশিষ্ট্য সমূহ যথানিয়মে সম্পাদন করতে হবে।

নামাজ নিশ্চিতরূপে ফরজ। এ বিষয়ে সকল উম্মত একমত। নামাজ অস্বীকারকারী কাফের। ইমাম আহমদ বলেছেন, যে জেনে শুনে নামাজ পরিত্যাগ করে সে কাফের। তাঁর অপর একটি উক্তিতে কাফের নয় বলা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকও এ অভিমত পোষণ করেন। তবে তাঁরা বলেন, নামাজ পরিত্যাগকারীকে তওবা করাতে হবে। তওবা করলে উত্তম। নতুবা তাকে হত্যা করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হত্যা করা যাবে না। তবে তাকে যাবজ্জীবন কারাবন্দী করে রাখতে হবে। তখন তার জন্য যে কোনো একটি পথ খোলা থাকবে—তওবা অথবা জেলখানায় জীবনাবসান।

হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসটি ইমাম আহমদের দলিল— যেখানে বলা হয়েছে রসুল স. এরশাদ করেছেন, মুমিন ও কাফেরের মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে নামাজ। মুসলিম। হজরত বুরাইদা থেকে আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন- রসুল পাক স. বলেন, নামাজই তাদের এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্য

www.eelm.weebly.com

সূচিত করেছে। তারাই কুফরী করলো, যারা নামাজ পরিত্যাগ করলো। ইবনে মাজা বর্ণিত হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমরের হাদিসে রয়েছে— একবার রসুল পাক স. নামাজের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করতে যত্নবান হবে, হাশরের দিনে তার নামাজ হবে তার জন্য নূর, বোরহান এবং পরিত্রানের একটি উপলক্ষ্য। আর যে নামাজের হেফাজত করবে না, হাশরের দিনে থাকবে না তার জন্য কোনো নূর, বোরহান এবং পরিত্রানের উপলক্ষ্য। সেদিন সে অবস্থান করবে কারূন, ফেরাউন, হামান এবং উবাই বিন খাল্ফের সঙ্গে। আহমদ। জমহুর ওলামা হাদিসগুলো ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলেছেন, নামাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ইমানের সঙ্গে সম্পর্কিত। হাদিসগুলোর সারকথা হচ্ছে, নামাজ সকল ইবাদতের চেয়ে অধিক গুরুত্ববহ। তাই যে নামাজ পরিত্যাগ করলো সে যেনো কাফের হয়ে গেলো। আর যে নামাজকে ঘৃণ্য ও তুচ্ছ মনে করে পরিত্যাগ করলো, সে অবশ্যই কাফের হয়ে গেলো।

নামাজের মর্যাদাঃ নামাজের মর্যাদা প্রসঙ্গে বহুসংখ্যক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে এসেছে— রসুল স. বলেন, ধরো তোমাদের গৃহের সম্মুখে রয়েছে একটি প্রবহমান নদী। ওই নদীতে যদি তোমরা প্রতিদিন পাঁচ বার অবগাহন করো তবে বলো, তোমাদের শরীরে কি কোনো অপরিচ্ছন্নতা থাকবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না। রসুল স. বললেন. এটাই হলো নামাজের উপমা। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মাধ্যমেই আল্লাহ্পাক সকল পাপ পরিচ্ছন্ন করে দেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত উবাদা বিন সামেতের হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেন, আল্লাহ্পাক পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ অপরিহার্য করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি সুচারুরূপে অজু সম্পন্ন করে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ আদায় করে— সঠিকভাবে রুকু ও সেজদা সম্পাদন করে— আল্লাহ্পাক তার পরিত্রানের জিম্মাদার হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি এরূপ করতে অনীহ, আল্লাহ্পাক তার জিম্মাদার নন। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে অব্যাহতি দিতে পারেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন। আহমদ, আবু দাউদ। ইমাম মালেক ও নাসাঈ থেকে এরকম আরও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। জমহুর ওলামা এই হাদিসটিকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করে বলেছেন, নামাজ পরিত্যাগকারী কাফের নয়। আল্লাহ্পাকই সমধিক অবহিত।

'বিশেষতঃ মধ্যবর্তী সালাতের'— মধ্যবর্তী নামাজ বুঝাতে এখানে বলা হয়েছে 'ওয়াস্ সালাতিল উস্তা' বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্য এখানে বিশেষ হুকুমকে সাধারণ হুকুমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখিত 'উসতা' শব্দটি 'আওসাত' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গরূপ। বাগবী বলেছেন, পূর্ববর্তী যুগে সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী যুগে ওলামায়ে কেরাম সালাতে উস্তা সম্পর্কে অনেক মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ বলেছেন, সালাতে উস্তা হচ্ছে প্রত্যুষের নামাজ। হজরত ওমর, হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত

www.eelm.weebly.com

মুআজ বিন জাবাল এরকমই বলেছেন। আতা, ইকরামা এবং মুজাহিদও এই মতের অনুসারী। এটাই ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মাজহাব।

জোহরের নামাজকে কেউ কেউ সালাতে উস্‌তা বলেছেন। এই দলে রয়েছেন হজরত জায়েদ বিন সাবেত, হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত উসামা। জোহরের নামাজ পড়তে হয় দিবসের মধ্যভাগে। আর এই নামাজই দিবাভাগের নামাজের মধ্যস্থিত নামাজ। বোখারী বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রসুল স. জোহরের নামাজ পড়েছেন রৌদ্রের কেন্দ্রবিন্দুতে। হজরত জায়েদ বিন সাবেত থেকে অনুরূপ বর্ণনা এনেছেন আহমদ, আবু দাউদ, বায়হাকী ও ইবনে জারীর। বর্ণিত সময়ে নামাজ আদায় করতে অসুবিধা বোধ করছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হজরত জায়েদ বিন সাবেত থেকে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আহমদ বর্ণনা করেছেন, ঠিক দুপুরে জোহরের নামাজ পাঠ করতেন রসুল পাক স.। তখন তাঁর পশ্চাতে এক অথবা দুই কাতার লোক হতো। ওই সময়টি ছিলো সাংসারিক ও ব্যবসায়িক ব্যস্ততার সময়। তখন নামাজী কম হতো বলে রসুল পাক স. বলেছিলেন, লোকেরা নামাজে যোগ দিবে, অন্যথায় আমি তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিবো। তখন অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

আমরা বলি, বর্ণিত হাদিস দুইটির মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় না যে, ওই নামাজ ছিলো জোহরের। সর্বাধিক প্রামাণ্য বক্তব্যানুসারে ওই নামাজ ছিলো আসরের নামাজ। অধিক সংখ্যক আলেমের অভিমত এটাই। রসুল পাক স. থেকে এক বিরাট দলের বর্ণনানুসারে আসরের নামাজই সালাতে উস্‌তা। একথা বলেছেন হজরত আলী, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আবু আইয়ুব, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আয়েশা সিদ্দিকা। ইব্রাহিম নাখয়ী, কাতাদা এবং হাসানও এই মতের অনুসারী। আর এটাই হচ্ছে ইমাম আবু হানিফার মাজহাব। হজরত আলী বলেছেন, রসুল পাক স. খন্দকের যুদ্ধের সময়ে বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক ওই সকল লোকের ঘর-দরোজা ও কবর আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন— যারা আমাদেরকে সালাতে উস্‌তা থেকে দূরে রেখেছে। আর এদিকে সূর্যও অস্তমিত হয়েছে। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, খন্দকের যুদ্ধের সময়ে কাফের বাহিনী আসরের নামাজ পড়তে দেয়নি। আল্লাহ্‌পাক তাদের অন্তর্দেশ ও আবাসস্থলগুলো অনলপূর্ণ করে দিন। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার মুশরিকেরা রসুল স. কে আসরের নামাজ পড়তে দেয়নি। সূর্যের রং হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিলো অথবা বলেছেন লাল রং ধারণ করেছিলো। তখন রসুল স. বলেছিলেন, তারা আমাকে সালাতে উসতা আদায় করতে দিলো না। আল্লাহ্‌পাক তাদের উদর ও কবরগুলোকে অগ্নিস্তুপে ভর্তি করে দিন। মুসলিম। আবু ইউনুস (হজরত আয়েশার মুক্ত ক্রীতদাস) বলেছেন, আমাকে হজরত আয়েশা আদেশ দিলেন, আমার জন্য একখন্ড কোরআন পাক লিখে দাও। তারপর বললেন, ওই আয়াতে পৌঁছলে আমাকে জানাবে। নির্দেশিত আয়াতে পৌঁছলে আমি উম্মত জননীকে জানালাম। তিনি বললেন, 'হাফিজু

www.eelm.weebly.com

আলাস্‌সালাওয়াতি ওয়াস্‌ সালাতিল উস্‌তা ওয়া সালাতিল আসর।' তিনি আরও বললেন, আমি একথা শুনেছি রসুল স. থেকে। মুসলিম। হজরত বারা বিন আজিব বলেছেন, আয়াতটি প্রথমে ছিলো এরকম— 'হাফিজু আলাস্‌সালাওয়াতি ওয়াস্‌সালাতিল আসর। এরপর আল্লাহ্‌পাক আয়াতটি রহিত করে দেন; তদস্থলে অবতীর্ণ করেন 'হাফিজু আলাস্‌সালাওয়াতি ওয়াস সালাতিল উস্‌তা।' মুসলিম। ইমাম মালেক ও অন্যান্যদের বর্ণিত হজরত আমর বিন রাফের হাদিসে রয়েছে, আমি রসুল স. এর সহধর্মিণী হজরত হাফসার কোরআন শরীফে দেখেছি— সেখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে 'হাফিজু আলাস সালাওয়াতি ওয়াস সালাতিল উস্‌তা, ওয়া সালাতিল আসর।' ইমাম আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আব্‌দ বিন রাফে বলেছেন, আমি জননী উম্মে সালমার কোরআন শরীফে এই আয়াতটি লিপিবদ্ধ দেখেছি এভাবে— 'হাফিজু আলাস সালাওয়াতি ওয়াস সালাতিল উস্‌তা, ওয়া সালাতিল আসর।' আবু দাউদ বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস আয়াতটি এভাবেই পাঠ করতেন। আবু দাউদ আরো বলেছেন, জননী হাফসার মুক্ত ক্রীতদাস আবু রাফে কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—আমি কোরআন শরীফ লিখতাম। জননী মহোদয়া বললেন, এই আয়াতটি এভাবে লিখো—'হাফিজু আলাস সালাওয়াতি ওয়াস সালাতিল উস্‌তা, ওয়া সালাতিল আসর। এরপর আমি হজরত উবাই বিন কা'ব এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন, জননী ঠিকই বলেছেন। আমরা কি জোহরের সময় উট ছাগল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকি না? ইমাম শাফেয়ী ও তার সহচরবৃন্দ জননীদ্বয়ের (হজরত আয়েশা ও হজরত হাফসার) হাদিস দু'টোকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করে বলেন, এখানে সালাতে উস্‌তা ও সালাতে আসর বলা হয়েছে। এতে করে বুঝা যায়, সালাতে উস্‌তা ও সালাতে আসর পৃথক পৃথক নামাজ। আমরা বলি, না। এখানে সালাতে আসর কথাটি এসেছে সালাতে উস্‌তার ব্যাখ্যা হিসাবে। বাগবী তাঁর তাফসীরে হজরত আয়েশার বিবরণটিকে 'ওয়াও (এবং)' বিহীন অবস্থায় এভাবে উল্লেখ করেছেন— 'হাফিজু আলাস্‌ সালাওয়াতি ওয়াস্‌সালাতিল উস্‌তা, সালাতিল আসর।' ওয়াল্লাহু আ'লাম।

আবু কাবিসা বিন জুয়াইব বলেছেন, সালাতে উস্‌তা হচ্ছে মাগরিবের নামাজ। কারণ, এই নামাজ মধ্যম প্রকৃতির অর্থাৎ চার রাকাত বিশিষ্টও নয়, আবার দু'রাকাত বিশিষ্টও নয়। বরং তিন রাকাত বিশিষ্ট। উত্তরসুরীগণের মধ্যে এরকম কোনো ব্যাখ্যা নেই যে, সালাতে উস্‌তা হচ্ছে ইশার নামাজ। তবে কিছু সংখ্যক পূর্বসুরী উল্লেখ করেছেন, ইশার নামাজই সালাতে উস্‌তা। কারণ, এই নামাজ হ্রস্বও নয় দীর্ঘও নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে যে কোনো ওয়াক্তকে সালাতে উস্‌তা বলা যেতে পারে। এরকম অর্থ গ্রহণ করলে প্রতিটি নামাজই যত্ন সহকারে সম্পাদনের অনুপ্রেরণা লাভ করা যেতে পারে। এভাবে প্রতিটি নামাজকে বিশেষভাবে নির্দেশ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌পাক যেমন শবেকদর, জুম্মার নামাজের সময় এবং ইসমে আজমকে অস্পষ্ট রেখেছেন, তেমনি

www.eelm.weebly.com

এই আয়াতের মাধ্যমে সালাতে উস্‌তা বা মধ্যবর্তী নামাজকে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছেন।

অনেকের বক্তব্য থেকে একথা প্রকাশ পায় যে, মধ্যবর্তী নামাজ একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির নামাজ যা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বাইরে। আমার মতে এই ধারণাটি বাস্তবসম্মত নয়। বরং আয়াতের বাকভঙ্গিমার মাধ্যমে দেখা যায়— সাধারণভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বর্ণনা করার পর বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাজকে গুরুত্ববহ করা হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যবর্তী নামাজটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আসরের নামাজের সময় সাধারণতঃ লোকজন বাজারে ব্যস্ত থাকে— তাই এই নামাজের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বেশী। যেনো পার্থিব ব্যতিব্যস্ততার কারণে এই নামাজ পাঠে বিঘ্নসৃষ্টি না হয়। যেনো খেয়াল রাখা হয় জামাতের এবং যেনো বিলম্বের কারণে মাকরূহ ওয়াক্তে নামাজ পঠিত না হয়। এই নীতিমালায় একেক সময় ও একেক পরিস্থিতিতে একেক ওয়াক্তের নামাজ মধ্যবর্তী নামাজ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। যেমন শীতকালের ফজর ও ইশার নামাজ, গ্রীষ্মকালের জোহরের নামাজ, হাট বাজার এলাকায় আসরের নামাজ এবং চারণক্ষেত্রে মাগরিবের নামাজ।

'এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে' (ওয়াকুমু লিল্লাহি কৃানিতিন)। 'কুনুত' শব্দের অর্থ মানুষের সঙ্গে কথোপকথন না করা। হজরত জায়েদ বিন আরকাম বলেছেন, আমরা রসুল স. এর পশ্চাতে নামাজ পাঠকালে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতাম। আমাদের এই আচরণের প্রেক্ষিতেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে আমাদের উপর নামাজে নিশ্চিত থাকার নির্দেশ এসেছে। পাঁচ জন ইমাম থেকে এরকম বর্ণিত হয়েছে। মুজাহিদ থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, লোকজন নামাজের মধ্যে আলাপচারিতা করতো, একে অন্যকে কাজের কথা বলতো, তখন আল্লাহ্‌পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, কুনুত অর্থ বিনয়াবনত হওয়া। আরও বলেছেন, রুকু দীর্ঘ করা, দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা এবং মস্তক অবনত করা। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নামাজীদের অবস্থা এরকম হলো যে, তাঁরা আর এদিক সেদিক তাকাতেন না। পাথর সরাতেন না, কিংবা অন্তরে কোনো কিছু ধারণাও করতেন না। আল্লাহ্‌র ভয়ে তাঁরা এরকম করতেন। কেউ কেউ বলেছেন, কুনুতের মর্ম হচ্ছে— নামাজে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা। হজরত জাবের থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর নিকট একজন জানতে চাইলেন, উত্তম নামাজ কোনটি? তিনি স. বললেন, দীর্ঘতম নামাজ। দীর্ঘতম নামাজ একটি অবাস্তব ধারণা। এরকম দীর্ঘতম দন্ডায়মানতা ওয়াজিব বা অপরিহার্য নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এখানে কুনুত অর্থ দোয়া কুনুত। আর হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে— সুলাইম, বায়াল, জাকওয়ান ও আসীয়া এই গোত্রগুলোর উপর রসুল স. দোয়া কুনুত পাঠের মাধ্যমে বদদোয়া করেছিলেন। এই উক্তিটি অসঙ্গত। আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা বিনীতভাবে নামাজে দাঁড়াবে (অকুমুলিল্লাহি

www.eelm.weebly.com

কুনিতিন)। ইমাম শাফেয়ীর বর্ণিত উক্তিটি গ্রহণ করলে প্রতি ওয়াক্তের নামাজে দোয়া কুনুত পাঠ করা অত্যাবশ্যক হয়ে যায়, যা অযৌক্তিক।

ফজরের নামাজে দোয়া কুনুত পাঠ করা সম্পূর্ণতই বেদাত। আবু মালেক আশয়ারী বলেছেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে পিতা, আপনিতো রসুলে পাক স. এর অনুসারী হয়ে নামাজ পড়েছেন। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের পশ্চাতে দাঁড়িয়েও নামাজ আদায় করেছেন; তাঁরা কি নামাজে দোয়া কুনুত পাঠ করতেন? তিনি বললেন, বৎস! এটাতো বেদাত। আমিতো রসুল স. এর পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছি, তিনি দোয়া কুনুত পাঠ করেননি। এরপর হজরত আবু বকর সিদ্দিক, হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আলীর পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছি, তাঁরা নামাজে কখনোই দোয়া কুনুত পাঠ করেননি। আবু মালেক আশয়ারীর প্রকৃত নাম সা'য়াদ বিন তারিক বিন আসলাম। ইমাম বোখারী বলেছেন, তিনি ছিলেন সাহাবী। তাঁর হাদিসের সূত্র বিশুদ্ধ। ফজরের নামাজে দোয়া কুনুত পাঠ করার সপক্ষে নয়টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে— যার সবগুলোই জয়ীফ অথবা অপরিচ্ছন্ন। আর কুনুতে নাজিলা (যা অভাবিত ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) সম্পর্কে জানতে হলে দীর্ঘ আলোচনা করতে হবে। শা'বী, আতা, সাঈদ বিন জোবায়ের, হাসান, কাতাদাহ্ এবং তাউসের মতে কুনুত অর্থ আনুগত্য। আল্লাহ্পাক একস্থানে বলেছেন, 'উম্মাতন কুনিতান' (অনুগত উম্মত)। কালাবী এবং মুকাতিল বলেছেন, এক ওয়াক্ত করে নামাজ নির্ধারিত ছিলো পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য। এতো সহজ হুকুম সত্ত্বেও তাদের নামাজে দন্ডায়মান হওয়ার ভঙ্গিমা ছিলো অনমনীয়। তাই এই উম্মতের জন্য আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে, তোমরা নমনীয়ভাবে দাঁড়াবে। কেউ কেউ বলেছেন, কুনুত অর্থ নামাজ। যেমন আল্লাহ্পাক এক জায়গায় বলেছেন, 'আম্মান হুয়া কুনিতুন আনা আল লাইলী'— এখানে কুনিত অর্থ নামাজী। আবার কেউ বলেছেন, কুনুত অর্থ জিকির (স্মরণ)। তাই এখানে অর্থ হবে তোমরা দন্ডায়মান অবস্থায় আল্লাহ্পাকের জিকির করতে থাকো। স্মর্তব্য যে, কুনুত শব্দটির সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন মর্ম প্রথম দিকে বিবৃত হয়েছে। হজরত জায়েদ বিন আরকাম বর্ণিত হাদিসে উল্লেখিত মর্মই অধিকতর সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ। পরের বর্ণনাগুলো সে তুলনায় অপরিচ্ছন্ন ও অনিশ্চিত।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষোক্তটিতে বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা আশংকা করো তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় যদি তোমরা নিরাপদ বোধ করো তবে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে; যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন— যা তোমরা জানতে না'— এ আয়াতের আলোচনাসূত্রে ইমাম আহমদ বলেছেন, ছুটন্ত অশ্বারোহী অশ্বোপরি নামাজ আদায় করতে পারবে। এ আয়াতকে তিনি তাঁর পক্ষে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইবনে জাওজী দলিল গ্রহণ করেছেন বোখারী থেকে— যে বর্ণনাটি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে উপস্থাপন করেছেন নাফে। হজরত ইবনে ওমরকে জনৈক ব্যক্তি, আতংকাবস্থার নামাজ (সালাতে খওফ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস

www.eelm.weebly.com

করলেন। তিনি বিস্তারিত জবাব দানের পর বললেন, এর চেয়েও অধিক ভীতির সম্মুখীন হলে, যে প্রকারে সম্ভব নামাজ আদায় করে নিও। পদচারী অবস্থায় অথবা আরোহী অবস্থায়, কেবলামুখী অবস্থায় অথবা অন্য যে কোনো মুখী অবস্থায়। নাফে বলেছেন, আমার মনে হলো অবশ্যই হজরত ইবনে ওমর এ কথা শুনেছেন রসুল পাক স. থেকে। মনগড়া কোনো কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভবই নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, পদচারণা কালে অথবা অশ্বারোহী অবস্থায় গমনকালে নামাজ পাঠ করা সিদ্ধ নয়। দৌড়রত অশ্বের আরোহী অবস্থায় নামাজ পাঠের কথা এই আয়াতে নেই। কারণ, এখানে উল্লেখিত 'রিজালান' শব্দটি 'রাজিল' শব্দের বহুবচন। আর রাজিল শব্দের অর্থ পদবিক্ষেপরত নয়। বরং শব্দটির প্রকৃত অর্থ দু'পায়ের উপর দন্ডায়মান ব্যক্তি। তেমনি হাদিসে উল্লেখিত রিজালান ও রুকিয়ামান শব্দদ্বয়ের সংযোজিত উপস্থাপনাও চলন্ত অবস্থায় নামাজ সিদ্ধ হওয়াকে প্রমাণ করে না। হাদিসটিকে নাফে মারফু মনে করেছেন। কিন্তু বর্ণনাটির মারফু হওয়া সুস্পষ্ট নয়।

যদি কেউ বলে, আতংকজনক অবস্থায় নামাজের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করা ঐকমত্যানুসারে জায়েয। তাহলে চলন্ত অবস্থায় নামাজ সঠিক হবে না কেনো?

আমরা বলি, শরিয়তের বিধানের উপর নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দেয়ার অবকাশ নেই। চলন্ত অবস্থায় ব্যাপারটা এ রকম- নামাজরত অবস্থায় অজু ভেঙে গেলে অজুর জন্য চলে যাওয়া যায়। এ রকম চলন্ত অবস্থায় নামাজ জায়েয একথা বলা যায় না।

মাসআলাঃ এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে ইমামগণ একমত হয়েছেন যে, চরম ভয়সঙ্কুল পরিবেশে কেবলামুখী হওয়া সম্ভব না হলে, আরোহী অবস্থাতে যে দিকে মুখ করা সম্ভব সে দিকেই মুখ করে নামাজ আদায় করে নিতে হবে। রুকু সেজদা সম্পন্ন করতে হবে ইশারায়। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এ রকম অবস্থায় নামাজ আদায় করতে হবে এককভাবে। জামাতবদ্ধভাবে নয়। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, জামাতবদ্ধভাবে আদায় করতে হবে। হেদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইমাম মোহাম্মদের বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ ভয়সঙ্কুল পরিস্থিতিতে জামাত করা সম্ভব নয়।

মাসআলাঃ ইমাম চতুষ্টয় ও জমহুর ওলামার অভিমত হচ্ছে— এমতাবস্থায় নামাজের রাকাত হ্রাস করা যাবে না। মুজাহিদের মাধ্যমে মুসলিম কর্তৃক হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্য এসেছে এ রকম— রসুল স. বলেন, আল্লাহ্পাক আবাসে চার রাকাত, প্রবাসে দুই রাকাত এবং ভীতিসঙ্কুল পরিস্থিতিতে এক রাকাত নামাজ পড়া ফরজ করে দিয়েছেন। আতা, তাউস, হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদাও একথা বলেছেন। সুরা নিসায় এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হবে ইন্শাআল্লাহ্।

অতঃপর নিরাপদ অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করার (নামাজ আদায় করার) কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ নিরাপদ অবস্থায় সকল বিধিবিধানসহ পূর্ণাঙ্গ নামাজ আদায় করতে হবে। যে নামাজ আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর রসুলের মাধ্যমে।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে, 'যা তোমরা জানতে না' — একথার অর্থ আল্লাহ্পাক তাঁর রসুলের মাধ্যমে নামাজের সম্যক পরিচয় দানের পূর্বে তোমরা এ বিষয়ে কিছুই জানতে না।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৪০, ২৪১, ২৪২

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ○ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

❒ তোমাদের মধ্যে সপত্নীক অবস্থায় যাহাদের মৃত্যু আসন্ন তাহারা যেন তাহাদের স্ত্রীদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কার না করিয়া তাহাদের এক বৎসরের ভরণপোষণের অসিয়ত করে। কিন্তু যদি তাহারা বাহির হইয়া যায় তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তাহারা যাহা করিবে তাহাতে তোমাদের কোন পাপ নাই। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

❒ তালাক প্রাপ্তা নারীদিগকে প্রথামত ভরণপোষণ করা সাবধানীদের কর্তব্য।

❒ এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার নিদর্শন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

এখানে উল্লেখিত 'অসিয়ত' শব্দটি ক্বারী আবু আমর, ইবনে আমের, হামজাহ ও হাফস্ পাঠ করেছেন 'যবর' সহযোগে। এরূপ পাঠে 'ফাল ইয়া উস্' একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্মপদ হবে। অন্য ক্বারীগণ অসিয়ত শব্দটি পাঠ করেছেন পেশ সহযোগে। এমতাবস্থায় বর্ণনাভঙ্গিটি হবে এ রকম— 'কুতিবা আলাইকুম অসিয়াতুন'। 'কুতিবা আলাইকুমুল অসিয়াতু'-এ রকম পাঠরীতিও পরিদৃষ্ট হয়। সকল পাঠরীতির ভাষাগত ও শব্দগত সমন্বয় সাধিত হওয়া প্রয়োজন। এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে, মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিরা তাদের সহধর্মিণীদের জন্য অসিয়ত করাকে কর্তব্য মনে করবে। সেই অসিয়ত অনুযায়ী সহধর্মিণীরা তার সম্পদ থেকে উপস্বত্ব ভোগ করতে পারবে। এ আয়াত অনুসারে স্ত্রী সম্পর্কে অসিয়ত করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। যেমন ওয়াজিব পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের জন্য অসিয়ত—যার সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'কুতিবা আলাইকুম ইজা হাদ্বারা আহাদুকুমুল মাউতু ইনতারকা খইরা নিল ওয়াসিয়াতু লিল

www.eelm.weebly.com

ওয়ালিদাইনে ওয়াল আকরবিনা বিল মা'রুফ'। পরে বিধানটি রহিত হয়। যেমন রহিত হয় এই আয়াতে বর্ণিত অসিয়ত সম্পর্কিত বিধানটি। ইতোপূর্বে উল্লেখিত মীরাস সম্পর্কিত আয়াতের মাধ্যমে অসিয়ত সম্পর্কিত আয়াতগুলো রহিত হয়েছে। রসুল আকরম স. বলেছেন, উত্তরাধিকারীদের জন্য অসিয়ত করার প্রয়োজন নেই। ইবনে আবি হাতেম, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াতের মাধ্যমে মেয়েরা এক চতুর্থাংশ ও এক অষ্টমাংশের অংশীদার হওয়ার কারণে খোরপোষের প্রসঙ্গটি অপসৃত হয়েছে।

মূর্খতার যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে সারা বৎসর শোক পালন করতে হতো। কেউ কেউ বলেছেন, সারা বৎসরের শোক পালন সম্পর্কিত মেয়াদ চার মাস দশ দিনের আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। আয়াতটি তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে অগ্রে কিন্তু অবতরণের ক্ষেত্রে পশ্চাতে। হজরত ওসমান বিন আফফান থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, সারা বছর শোক পালনের বিধান চার মাস দশ দিনের আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। বাগবী বলেছেন, আয়াতটি তায়েফবাসী হাকিম বিন হারিসকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর পরলোকগমনের পর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো। রসুল পাক স. পরিত্যক্ত সম্পদ তাঁর পিতামাতা ও সন্তানদের দিয়েছিলেন। স্ত্রীকে কিছুই দেননি। বলেছিলেন, মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে বিধবা স্ত্রীকে দিতে হবে এক বৎসরের ভরণপোষণ। ইসহাক বিন রহ্ওয়াইহ্ মুকাতিল বিন হাব্বান থেকে এ রকম তাফসীর করেছেন। তবে তার ব্যাখ্যায় ওই হিজরতকারীর নামোল্লেখ করা হয়নি।

আমি বলি, বর্ণিত বক্তব্য অসঠিক নয়। তবে আয়াতের গতিধারা হাদিসের বিপরীত। আয়াতে বলা হয়েছে, অসিয়ত ওয়াজিব হওয়ার কথা। আর হাদিসে বলা হয়েছে, মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে এক বৎসরের খোরপোষ দেয়ার কথা। অর্থাৎ আয়াত অনুসারে অসিয়ত ওয়াজিব এবং হাদিস অনুসারে খোরপোষ ওয়াজিব। সম্ভবতঃ ওই তায়েফবাসীর মৃত্যুর পর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো। আর তিনিও পূর্বাহ্নে স্ত্রীর এক বৎসরের খোরপোষের অসিয়ত করেছিলেন। রসুল পাক স. সেই অসিয়ত কার্যকর করেছিলেন। হাদিসের বক্তব্যানুসারে বুঝা যায়, এই আয়াতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে 'তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহ্ উপদেশ দেন।' আবার কেউ বলেছেন, পরে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াতটি —'আর তাদের (স্ত্রীদের) জন্য এক চতুর্থাংশ।'

'কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায় তবে বিধিমতো নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই'— এখানে সম্বোধন করা হয়েছে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে। বাগবী একথা বলেছেন। পাপ না হওয়ার কারণ এখানে দু'টি। একটি আগেই আলোচিত হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই— বিধবারা এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বের হয়ে গেলে তোমরা যদি খরচ বন্ধ করে দাও তবে কোনো দোষ নেই। আমি বলি, এ রকম ব্যাখ্যা আয়াতের বক্তব্যভঙ্গির পরিপন্থী। বক্তব্য

www.eelm.weebly.com

যদি এরকমই হতো তবে 'তারা যা করবে' এর স্থলে বলা হতো— 'তোমরা যা করবে।' তখন ব্যাখ্যাটি যুক্তিযুক্ত মনে হতো। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সারা বৎসর শোক পালন করা এবং ইদ্দত পালন করা ইতোপূর্বেও ওয়াজিব ছিলো না। বরং অন্ধকার যুগে কুসংস্কারবশতঃ পতিবিচ্ছেদিনীরা বিরহকাতরতার অনুষ্ঠান করতো। আল্লাহ্পাক তাই মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে সারা বৎসর খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব করে দিয়েছেন। বিধান দিয়েছেন সারা বৎসর শোক পালনের সময় তোমরা তাদেরকে গৃহহারা কোরোনা এবং তাদের ব্যয়ভারও বহন করে যেতে থেকো। ফলকথা.মৃত ব্যক্তির ইদ্দতের বেলায় অবতীর্ণ হয়েছে চার মাস দশ দিনের বিধান। আর আলোচ্য বিধানটি নতুন আরেকটি বিধান যা কোনো বিধানকে রহিত করেনি।

এ আয়াত (২৪০) এর শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।' অর্থাৎ তিনি পরাক্রান্ত তাই বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন; আর প্রজ্ঞাময় বলেই তিনি সার্বজনীনতার অনুকূলে কল্যাণকর বিধান দান করেছেন।

'তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে প্রথমত ভরণপোষণ করা সাবধানীদের কর্তব্য'— একথার অর্থ তালাকপ্রাপ্তাদেরকে ইদ্দত পর্যন্ত খোরপোষ দিতে হবে। আর এই খোরপোষ দেয়ার ব্যাপারে অবলম্বন করতে হবে সাবধানতা। বিত্তশালী ও অবিত্তশালীরা তাদের স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে খোরপোষ দিবে। এরকম সাবধানতাসম্পন্ন খোরপোষ প্রদান করা ওয়াজিব। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতের 'মাতা' শব্দটির উদ্দেশ্য ইদ্দতকালীন খোরপোষ। প্রসঙ্গটি ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। পূর্বের আয়াত এবং এই আয়াত সমার্থক হওয়ার কারণ হচ্ছে— মৃত্যু ও তালাক উভয় অবস্থাতেই রমণীরা ইদ্দত পালন পর্যন্ত স্বামীর অধিকারাধীনা থাকে। আর ওই সময়ের জন্য স্বামীর সম্পদ থেকে তাদের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব থাকে।

ইমামগণের ঐকমত্য এই যে, রজয়ী তালাকের ইদ্দতকালে স্ত্রীকে খোরপোষ প্রদান করা ওয়াজিব। কিন্তু বায়েন তালাকের ইদ্দতকালে খোরপোষ প্রদান ওয়াজিব কিনা— সে কথা স্পষ্ট নয়। কারণ, এই আয়াতে তালাকের বিবরণ এসেছে সাধারণভাবে। তালাকের প্রকার এখানে নির্দেশ করা হয়নি।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বায়েন তালাকের ইদ্দতেও খোরপোষ প্রদান ওয়াজিব। অপর একটি দলিল হচ্ছে এই— 'আর তাদেরকে বসবাস করতে দাও, যেখানে বসবাস করো তোমরা, নিজের সামর্থ অনুসারে'। হজরত ইবনে মাসউদের পাঠ ভঙ্গিমায় এ রকমও এসেছে— 'আর তাদেরকে বাসস্থান দান করো যেখানে বসবাস করো তোমরা, আর তাদেরকে খোরপোষ দাও তোমাদের সাধ্যানুসারে'। হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসটি হচ্ছে তৃতীয় দলিল যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন, তিনি তালাকপ্রাপ্তা রমণীগণের জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ

www.eelm.weebly.com

অপরিহার্য। দারা কুতনী। কেউ যদি এই বলে অনুযোগ তোলে যে, এ হাদিসের এক বর্ণনাকারী হারিস বিন আবুল আলীয়াকে জয়ীফ বলেছেন ইহাহ্ইয়া বিন মুয়ীন। আমি বলতে চাই, হারিস বিন আবুল আলীয়া ছিলেন, আবু মুয়াজ, আবদুল্লাহ্ কাওয়ারিরীর ওস্তাদ। তাঁর জয়ীফ হওয়া প্রামাণ্য নয়। চতুর্থ দলিল হচ্ছে— খোরপোষ পাওয়ার অজুহাত আগে যেমন বর্ণিত হয়েছে— এখানেও তেমনি বর্ণনা করা হয়েছে। ইদ্দত পালন করা অর্থ গর্ভসঞ্চারের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া। এই নিশ্চিতি লাভ হওয়া পর্যন্ত তাই খোরপোষ পরিশোধের দায়িত্ব থাকে স্বামীর।

বিধবাদের খোরপোষের বিষয়টিকে শরিয়তে সম্পূর্ণ বাতিল করে দেয়া হয়নি। বরং এর পরিবর্তে ওয়ারিশী স্বত্ব অনুমোদন করেছে। তাই এই বিধানকে সম্পূর্ণ রহিত হয়েছে বলা যায় না। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বিধবাদেরকে খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব নয়। বাসস্থান দেয়া ওয়াজিব। ইমাম আহমদের একটি অভিমতও এ রকম। তাঁর অপর অভিমতটি হচ্ছে— খোরপোষ কিংবা বাসস্থান কোনোটিই দিতে হবে না। এ অভিমতের সমর্থনে ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদিসকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর স্বামী আমর বিন হাফস্ দূরদেশ থেকে তাঁর নামে তালাকনামা পাঠিয়েছিলেন এবং আহার্য হিসেবে পাঠিয়েছিলেন সামান্য গম। ফাতেমা তখন অত্যন্ত অপ্রসন্নচিত্তে রসুল স. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিযোগ পেশ করলেন। রসুল স. বললেন—'লাইসা লাকি নাফকু' (তোমার জন্য কোনো খোরপোষ নেই)। তুমি উম্মে শরীফের গৃহে ইদ্দত পালন করো। পুনরায় বললেন, উম্মে শরীফের গৃহে তো অনেক লোক যাতায়াত করে— তোমার পর্দার অসুবিধা হবে। তুমি বরং ইবনে উম্মে মাকতুমের বাড়িতে চলে যাও এবং সেখানে ইদ্দত পুরা করো। মুসলিম। অপর এক বর্ণনায় দেখা যায়— ফাতেমাকে তিন তালাক দিয়েছিলেন তাঁর স্বামী। তিনি তখন রসুল স. এর স্মরণাপন্ন হলেন। রসুল স. জানিয়ে দিলেন তোমার জন্য কোনো খোরপোষ নেই। ইমাম আহমদ এ হাদিসটি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন— যেখানে বলা হয়েছে— ফাতেমা বিনতে কায়েস তাঁকে বলেছেন, রসুল স. আমার বাসস্থান কিংবা খোরপোষের ব্যবস্থা করেননি। এ হাদিসের বর্ণনাকারী হাজ্জাজ বিন আরতাত্ জয়ীফ। ইমাম আহমদ ফাতেমা থেকে বর্ণনা করেছেন এভাবে— রসুল স. বলেছেন, মেয়েরা বাসস্থান ও খোরপোষ পাবে তখনই যখন তাকে দেয়া হবে রজয়ী তালাক। অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা বাসস্থান ও খোরপোষের অধিকারিণী নয়। এ হাদিসের প্রেক্ষিতেই ইমাম আহমদ বলেছেন, তাদের জন্য বাসস্থানও নেই।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আল্লাহ্পাকের এরশাদ 'তাদেরকে বাসস্থান দাও' অনুসারে বাসস্থান দেয়া ওয়াজিব। তাঁর সহচরগণও একথায় একমত। হয়তো তাঁরা কোনো কারণে এই হাদিসের কার্যকারিতা মেনে নিতে চাননি। আমরা বলি, ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদিস আল্লাহ্র কালামের বিপরীত। তাই পরিত্যাজ্য। হজরত ওমর বহুসংখ্যক সাহাবীর সম্মুখে এই হাদিসের কার্যকারিতা পরিত্যাগ করেছেন।

www.eelm.weebly.com

এই হাদিসের সূত্রপরম্পরায় তিরমিজি মুগিরা থেকে, তিনি শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন, ফাতেমা বিনতে কায়েসের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স.এর যুগে আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। রসুল স. আমাকে তখন বলেছিলেন, তোমার জন্য তোমার স্বামীর দায়িত্বে খোরপোষ নেই, বাসস্থানও নেই। মুগিরা বলেছেন, আমি এই হাদিসের বিষয়ে ইব্রাহিমের সঙ্গে আলোচনা করলে তিনি জানালেন, ফাতেমার কথা শুনে হজরত ওমর তাঁর খেলাফতকালে বলেছিলেন, এক নারীর বিবৃতির উপর আমরা আল্লাহ্‌র কালাম এবং রসুল স. এর আদর্শ পরিত্যাগ করতে পারি না। জানি না, প্রকৃত অবস্থা তাঁর মনে আছে কিনা। হজরত ওমর এরকম তালাকপ্রাপ্তাদেরকে প্রায়শঃই বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিতেন। ইবনে জাওজী বলেছেন, ইব্রাহিম হজরত ওমরের যুগের মানুষ নয়। এদিকে অধিকাংশ বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় এসেছে-তাঁর বক্তব্যের উপর আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে পরিত্যাগ করতে পারি না। এ সব বর্ণনায় রসুল স. এর আদর্শের কথা উল্লেখিত হয়নি। এই বর্ণনাগুলোই বিশুদ্ধ। আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, রসুল স. এর সিদ্ধান্তবিরোধী কোনো সাহাবীর উক্তি গ্রহণীয় নয়।

আমরা বলি, ১. ইব্রাহিম যদি হজরত ওমরের যুগ না পেয়ে থাকেন তবে হাদিসটি মুরসাল। আর মুরসাল হাদিস আমাদের নিকট দলিল। ২. হজরত ওমরের উক্তি 'আমরা আমাদের নবীর আদর্শ পরিত্যাগ করতে পারি না'— প্রমাণ করে যে হাদিসটি মারফু। ৩. যদি আমরা তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নিই তবে 'আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব পরিত্যাগ করতে পারি না'- ইবনে জাওজী কর্তৃক উপস্থাপিত এ বিবরণটিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ, হজরত ওমরের উক্তি হজরত ইবনে মাসউদের উচ্চারণ ভঙ্গিমার বিশুদ্ধতার প্রমাণ, যার অর্থ হয় এ রকম—'তাদের খোরপোষ দাও তোমাদের সামর্থ অনুয়ায়ী' এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, 'মাতাউম বিল মা'রুফ' এর মর্ম হচ্ছে— কল্যাণ ভাতা যা খোরপোষ থেকে পৃথক আর কল্যাণভাতা হলো তিনটি কাপড়। কল্যাণভাতা ওই রমণীর প্রাপ্য যে অনাঘ্রাতা অবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানিফার নিকট 'লিল মুতালাককৃতি' আয়াতের জন্য প্রামাণ্য বর্ণনা হচ্ছে—ইবনে জায়েদ থেকে বর্ণিত ইবনে জারীরের বর্ণনাটি। তিনি বলেছেন, 'তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করো। বিত্তবান তার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তার সামর্থানুযায়ী বিধিমতো সংস্থানের ব্যবস্থা করবে। এ রকম করা সত্য-পরায়ণ লোকের কর্তব্য।'— এ আয়াত অবতীর্ণ হলে এক ব্যক্তি বললো, তাহলে আমি স্ত্রীর প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করতেও পারি— নাও পারি। অর্থাৎ তার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন আমার জন্য অপরিহার্য নয়। তখন আল্লাহ্‌পাক অবতীর্ণ করলেন 'তালাকপ্রাপ্তারা বিধিসম্মত কল্যাণভাতার অধিকারিণী। এ কল্যাণভাতা পরিশোধ করা মুত্তাকীদের দায়িত্ব।' সুতরাং অনাঘ্রাতা, তালাকপ্রাপ্তা রমণীর কল্যাণভাতার অধিকারটি সুপ্রমাণিত। এটাই ইমাম আবু হানিফার অভিমত।

কেউ যদি অনুযোগ করে বলে, যদি এ রকমই হয় তবে ইমাম আবু হানিফা কেনো বলেছেন— ওই নারীকে কল্যাণভাতা দেয়া মোস্তাহাব যাকে সম্ভোগ করার পর তালাক দেয়া হয়েছে— মোহরানা নির্ধারিত না হলেও।

www.eelm.weebly.com

আমরা বলি, সম্ভোগের পরে তালাক দেয়া নারীর কল্যাণভাতা মোস্তাহাব হওয়ার বিষয়টি এ আয়াতের মাধ্যমে সুপ্রমাণিত নয়। এর প্রমাণ রয়েছে সুরা আহযাবের ওই আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে- 'এসো, তোমাদের কল্যাণ ভাতা দিবো এবং সুন্দরভাবে বিদায় করে দিবো।'

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন—সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তাদেরকে কল্যাণভাতা প্রদান করা ওয়াজিব। কেবল তাদেরকে দেয়া ওয়াজিব নয় যারা সম্ভোগের পূর্বে এবং নির্ধারিত মোহরযুক্ত অবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে।

আমি বলি, সকল তালাকপ্রাপ্তাই যদি এ বিধানের অন্তর্ভূত হয় তবে সম্ভোগপূর্বরা আবার ব্যতিক্রম হলো কেনো? যদি বলা হয় 'ইস্‌তিস্‌না' বা ব্যতিক্রম প্রকাশক অব্যয় এর কারণে এরকম হয়েছে। তবে আমরা বলবো অর্ধেক মোহরই তো তাদের কল্যাণভাতা। বিষয়টি আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি। ইমাম শাফেয়ীর ব্যাখ্যা সুনির্ধারিত নয়। বরং সম্ভাব্য অর্থবোধক। বিষয়টি সার্বজনীন হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আর এরকম সন্দিগ্ধতার মাধ্যমে ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। তাই আমরা এক্ষেত্রে মোস্তাহাবের উপর আমল করার প্রবক্তা।

শেষোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— 'এভাবে আল্লাহ্ তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পারো।' এখানে এ অঙ্গীকার প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, সত্বরই আল্লাহ্‌পাক এমন প্রমাণ ও বিধান বর্ণনা করবেন, যা হবে তোমাদের ইহ-পারলৌকিক জীবনের অতিআবশ্যকীয় অবলম্বন। তোমাদের জ্ঞানকে আল্লাহ্‌তায়ালার বিধান অনুধাবনে নিয়োজিত করতে পারো তোমরা। যদি বুঝো তবে নিশ্চয়ই এরকম করবে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৪৩,২৪৪,২৪৫

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ○ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

www.eelm.weebly.com

❒ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা মৃত্যু ভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল? অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের মৃত্যু হউক।' তারপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে জীবিত করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

❒ তোমরা আল্লাহের পথে সংগ্রাম কর এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❒ কে সে যে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ প্রদান করিবে? তিনি তাহার জন্য ইহা বহু গুণে বৃদ্ধি করিবেন। আর আল্লাহ্ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁহার পানেই তোমরা প্রত্যানীত হইবে।

'আলাম তারা' একটি বিস্ময় প্রকাশক সম্বোধন। শ্রোতাদের অভিনিবেশকে আকর্ষণ করার জন্য এরকম সম্বোধন ব্যবহৃত হয়। 'আলাম তারা' অর্থ তুমি (তোমরা) কি দেখ নাই? এরকম সম্বোধনের মাধ্যমে অশ্রুতপূর্ব, অদর্শিত ও বিস্ময়কর ঘটনার অবতারণা করাই সমীচীন। যারা এসব কথা শ্রবণ করেছে — সেই আহ্লে কিতাবের নিকট এরকম ঘটনা আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশের প্রমাণ। এর মর্মার্থ যেনো এরকম—ওহে সম্বোধিত ব্যক্তি (ব্যক্তিবর্গ) এই আয়াত যে আমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তা কি তোমরা বুঝ না? কোরআন মজীদের সকল স্থানে 'আলাম তারা' সম্বোধনটির মর্মার্থ এরকমই মনে করতে হবে।

'যারা মৃত্যুর ভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিলো।'— এসম্পর্কে আতা খোরাসানী বলেছেন, তাদের সংখ্যা ছিলো তিন হাজার। ওয়াহাব বলেছেন চার হাজর। হাকেমও তাই বলেছেন। আরও বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এই হাদিসটি বিশুদ্ধ। কেউ কেউ বলেছেন, তারা ছিলো সর্বমোট আট হাজার। সুদ্দী বলেছেন, ত্রিশ হাজার। ইবনে জুরাইজ বলেছেন চল্লিশ হাজার। ইবনে জারীর হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্রে একবার চল্লিশ হাজার আরেকবার আট হাজারের কথা বলেছেন। আতা বিন রিবাহ্ বলেছেন সত্তর হাজারের কথা।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, এখানে ব্যবহৃত 'উলুফ' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'উলফাত' থেকে— যার মর্ম হচ্ছে তারা ছিলো চিত্তাকর্ষক, অর্থাৎ সুশ্রী। বাগবী বলেছেন, (জর্দানে অবস্থিত) ওয়াসিত এর উপকণ্ঠে ছিলো দাওয়ারদান নামে একটি গ্রাম। সেই গ্রামে একবার প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলো। কিছু লোক সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। যারা রয়ে গেলো তাদের সকলেরই জীবনাবসান হলো। মহামারীর অধ্যায় শেষ হলে পলায়নকারীরা পুনরায় ফিরে এলো গ্রামে। দু'চারজন তখনও বেঁচে ছিলো। তারা প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে দেখে বলতে শুরু করলো, তোমরা খুবই হুঁশিয়ার। আমরা তোমাদের সঙ্গে পালালে সকলেই জীবিত

www.eelm.weebly.com

থাকতে পারতাম। আবার যদি কখনও প্লেগ আসে, তবে একজনও আমরা গ্রামে থাকবো না। সকলেই পালিয়ে যাবো এখান থেকে। পরের বছর পুনরায় প্লেগ দেখা দিলো। অধিকাংশ গ্রামবাসী তখন পালিয়ে গিয়ে দূরে এক তরুলতাহীন উন্মুক্ত প্রান্তরে একত্রিত হলো। প্লেগমুক্ত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো তারা। কিন্তু মৃত্যুর বিধান অলঙ্ঘনীয়। হঠাৎ একজন ফেরেশতা জঙ্গলের দিক থেকে এবং অন্য একজন আকাশের দিক থেকে কর্ণবিদারী আওয়াজ তুললেন— মৃত্যু। এই আওয়াজ শুনে সকলেই মরে গেলো। এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেম, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। হজরত উসামা বিন জায়েদ থেকে আহমদ, বোখারী, মুসলিম ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন— রসুল স. এরশাদ করেন, কোথাও মহামারীর প্রাদুর্ভাব জানতে পারলে তোমরা সেখানে যেয়ো না। আর তোমাদের জনপদে যদি মড়ক এসে পড়ে তবে অন্যত্র গমন কোরো না।

বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বিন খাত্তাব সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। সিরিয়ার সন্নিকটে সারাসা নামক স্থানে উপস্থিত হলে সংবাদ পেলেন সিরিয়ায় দেখা দিয়েছে ভয়াবহ প্লেগ। সঙ্গী হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফ তখন সবাইকে বর্ণিত হাদিসটি শুনিয়ে দিলেন। হজরত ওমর আর অগ্রসর হলেন না। ফিরে এলেন মদীনায়।

কালাবী, মুকাতিল ও জুহাক বলেছেন, প্লেগ থেকে নয়, ওই লোকগুলো পলায়ন করেছিলো জেহাদ থেকে। ঘটনাটি ছিলো এ রকম— ইসরাইল বংশীয় এক রাজা প্রজাবৃন্দের উপর নির্দেশ জারী করলেন— রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে চলো। শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত প্রজারা যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হলো ঠিকই; কিন্তু পেশ করতে শুরু করলো বিভিন্ন রকমের ওজর আপত্তি। বললো, মহারাজ! আমরা সংবাদ পেয়েছি— যে দেশে যুদ্ধ করতে যাবো সেখানে এখন ভয়াবহ মহামারী। সুতরাং মহামারী শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রাখাই সমীচীন। রাজা তাদের কোনো ওজর আপত্তি শুনলেন না। তখন ভীত প্রজারা গোপনে পালিয়ে যেতে শুরু করলো। রাজা আল্লাহ্‌পাকের নিকট প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! হে হজরত ইয়াকুবের প্রতিপালক! হে হজরত মুসার মা'বুদ! অব্যাধ্যদের প্রাণ সংহার করে এমন একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করো যাতে তারা বুঝে, পলায়ন করলেও মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের মৃত্যু হোক।'— এই হুকুমের ফলে গৃহপালিত পশুসহ সব লোক একই সঙ্গে মরে গেলো। পরে বাইরে থেকে কিছু লোক এসে এলাকাটি ঘিরে রেখে দিলো। যেনো মানুষ ও পশুদের লাশ হেফাজতে থাকে। এভাবে অতিবাহিত হলো কিছু দিন। কেউ কেউ বলেছেন, আট দিন অতিবাহিত হয়েছিলো এভাবে। কেউ বলেছেন, মৃতদের লাশ গলে গিয়েছিলো। আবার কেউ বলেছেন, অবশিষ্ট ছিলো কেবল তাদের অস্থিসমূহ।

www.eelm.weebly.com

'তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন।'—একথার অর্থ মৃত ব্যক্তিরা আল্লাহ্র হুকুমেই পুনর্জীবিত হলো। ইবনে জারীর সুদ্দীর সূত্রে আবু মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন— হজরত হিযকিল আ. দাওয়ারদান গ্রামটির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সেখানে দেখতে পেলেন মৃত ব্যক্তিদের হাড়গোড়গুলো রোদের তাপে চকচক করছে। প্রতিটি হাড় ছিলো সংযোগচ্যুত। হজরত হিযকিল এই দৃশ্য দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন, আল্লাহ্পাক তাদেরকে কীভাবে আবার জীবন দান করবেন। অকস্মাৎ প্রত্যাদেশ হলো— 'অস্থিগুলোর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলো, 'কুমু বিইজনিল্লাহ্ (আল্লাহ্র আদেশে দাঁড়িয়ে যাও)। প্রত্যাদেশানুযায়ী তিনি ডাক দিলেন, কুমু বিইজনিল্লাহ্। সঙ্গে সঙ্গে জীবিত হয়ে গেলো মৃতের দল। হজরত হিযকিল বিন ইউজা ছিলেন হজরত মুসা পরবর্তী খলিফাবৃন্দের মধ্যে তৃতীয় খলিফা। হাসান এবং মুকাতিল বলেছেন, তিনিই ছিলেন জুলকিফল আ.। কিন্তু হিযকিল নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে তিনি ছিলেন সত্তরজন নবীর জিম্মাদার। তাঁদেরকে তিনি মৃত্যুদন্ডের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। মুকাতিল এবং কালাবী বলেছেন, পুনর্জীবনপ্রাপ্ত লোকগুলো ছিলো হজরত হিযকিলেরই সম্প্রদায়ভূত। তাদেরকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন হজরত হিযকিল। কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় তাদেরকে না পেয়ে পেয়েছিলেন কেবল অস্থিসমূহ। এই নিদারুণ পরিণতি দেখে তিনি খুব কাঁদলেন। প্রার্থনা জানালেন, হে আমাদের দয়াময় প্রভু-প্রতিপালক! এই লোকগুলো তো তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করতো, পাঠ করতো তোমারই নামের তাসবীহ, ঘোষনা করতো তোমারই মহিমা। স্বীকার করতো তোমার এককত্ব। সবাইকে তুমি এভাবে মৃত্যুদান করলে— আর আমি রয়ে গেলাম একা। এ দৃশ্য বড়ই মর্মবিদারক, বেদানবিধূর। আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশ করলেন, হে হিযকিল! যাও, তাদেরকে পুনর্জীবিত করবার অনুমতি আমি তোমাকে দান করলাম। হজরত হিযকিল তখন চিৎকার করে বললেন, 'আহ্ইউ বিইজনিল্লাহ্' (আল্লাহর নির্দেশে জীবিত হয়ে যাও)। সঙ্গে সঙ্গে সকলে জীবিত হয়ে গেলো। মুজাহিদ বলেছেন, 'সুব্হানাকা রব্বানা ওয়া বিহাম্দিকা লা ইলাহা ইল্লা আংতা' পুনর্জীবনপ্রাপ্তরা আপন আপন গৃহে ফিরে গেলো। কিছুকাল পরেই তাদের চেহারায় ফুটে উঠলো বার্ধক্যের ছাপ। তারপর তাদের পরিধেয় বস্ত্র হয়ে গেলো কাফনের মতো। একে একে মৃত্যুর স্বাভাবিক বিধানকে আলিঙ্গন করলো তারা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রথমে বার্ধক্য তারপর মৃত্যু। এ নিয়মটিই পরবর্তীদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। কাতাদা বলেছেন, পলাতকদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন আল্লাহ্পাক। তাই তাঁর একটি হুকুমই তাদের সকলকে একসঙ্গে মৃত্যু দান করেছিলো। পরে হজরত হিয্কিলের মাধ্যমে আল্লাহ্পাক পুনরায় জীবন দান করেছিলেন সকলকে। পৃথিবীতে কিছুদিন অবস্থানের পর আবার ঘটেছিলো তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল।'- একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, পুনর্জীবনদানের ঘটনাটি ছিলো আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহশীলতার নিদর্শন। এতে করে

www.eelm.weebly.com

এই শিক্ষা দেয়াই উদ্দেশ্য ছিলো যে, আল্লাহ্‌তায়ালার অতুলনীয় পরাক্রম অবলোকন করে ওই মানুষগুলো যেনো সৎকর্মপরায়ণতার দিকে ধাবিত হতে পারে। আর ওই ঘটনা এখন যাদেরকে শোনানো হচ্ছে— তারাও যেনো আল্লাহ্‌র প্রতি অধিকতর মনোনিবদ্ধ করে। যেনো বুঝতে পারে সত্যি আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল।

'কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না'— আল্লাহ্‌পাকের এই এরশাদ, যাঁরা কৃতজ্ঞ তাঁদের প্রতিই সদুপদেশ ও সৎপ্রেরণা। এতে করে তারা অধিকতর আল্লাহ্‌নিষ্ঠ হবে এবং তকদীরের অনড় লিখনকে মেনে নিবে মনে প্রাণে। এভাবে মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে জেহাদের দিকে।

'তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করো এবং জেনে রাখো যে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'— একথার মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকে জেহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। মৃত্যুকে অতিক্রম করার সাধ্য কারও নেই। তাই মৃত্যুকে এড়ানোর চেষ্টা নয় বরং মৃত্যুকে জেহাদের মাধ্যমে মহিমান্বিত করাই শ্রেয়। তাই বিশ্বাসীগণের উচিৎ — তারা হয় শাহাদতের মাধ্যমে মৃত্যুকে দান করবে মহিমা নয়তো বিজয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর জীবনকে করবে পুরস্কৃত। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ। সুতরাং মনে রেখো তোমাদের অন্তর ও বাহিরের সকল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কথা তিনি যেমন শোনেন তেমনি জানেনও।

এবার আলোচনা করা হচ্ছে কর্জে হাসানা সংক্রান্ত শেষোক্ত আয়াতটি। এই আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে বোখারীর বর্ণনা রয়েছে তাঁর সহীহ্ বোখারীতে। ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া হজরত ইবনে ওমর থেকেও এ বিষয়ের বিবরণ দিয়েছেন। বিবরণটি এই— 'তাদের দৃষ্টান্ত হলো-যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে.......।' এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. দোয়া করলেন, হে বিশ্বসমূহের প্রতিপালক! আমার উম্মতকে আরও বেশী দান করো। তখন এই আয়াতটি (২৪৫) অবতীর্ণ হয়।

এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে 'কে সে যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ প্রদান করবে?' কর্জে হাসানা অর্থ উত্তম ঋণ। করজ শব্দটির আভিধানিক অর্থ কর্তন করা। অর্থাৎ বিনিময় কেটে নেয়া। কাউকে কোনো কিছু দিয়ে তার নিকট থেকে পুনরায় সমপরিমাণ সম্পদ ফিরিয়ে নেয়াকে করজ বলা হয়। এইভাবে প্রদত্ত সম্পদ নয় বরং তার বিনিময় কর্তন করার নামই করজ। এখানে করজ শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। এখানে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দেয়ার অর্থ আল্লাহ্‌র বান্দাকে উত্তম ঋণ দেয়া। এখানে সরাসরি শাব্দিক অর্থ নয় বরং রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হবে। হাদিস শরীফেও এরকম রূপক অর্থ সম্পন্ন বাকভঙ্গিমার ব্যবহার রয়েছে। যেমন, মারফু পদ্ধতিকে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের নিকট থেকে আহার্য চেয়েছিলাম কিন্তু তোমরা দাওনি। মানুষেরা বলবে, হে পরোয়ারদিগার! তুমিতো মুখাপেক্ষিতা থেকে পবিত্র। বিশ্বসমূহের প্রতিপালক তুমি। সকল সৃষ্টির আহার্য্য তুমিইতো দয়া করে দান করো।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌পাক বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলো, তুমি দাওনি। তুমি যদি সেদিন তাকে খাদ্য দান করতে তবে আজ আমার নিকট থেকে পেতে উত্তম প্রতিদান। মুসলিম।

ঋণদানের মহিমা বিষয়েও হাদিস রয়েছে অনেক। তার মধ্যে হজরত ইবনে মাসউদের হাদিসটিও রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে— রসুল স. এরশাদ করেন, প্রত্যেক করজই সদকা। হাদিসটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন তিবরানী ও বায়হাকী। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে একবার করজ দিলে তা হবে দু'বার দানের সমতুল্য। ইবনে মাজা। বর্ণনাটি প্রত্যয়ন করেছেন ইবনে হাব্বান। দু'টি পদ্ধতিতে মারফু সূত্রে বায়হাকীও এই হাদিসটির বর্ণনাকারী।

এখানে করজের অর্থ রূপক হিসেবেও বলা হয়ে থাকতে পারে। এমতাবস্থায় মর্ম হবে পৃথিবীতে এমন সৎকর্ম সাধন যার মাধ্যমে উত্তম প্রতিদান লাভের আকাঙ্খা করা যেতে পারে। এ আয়াতের শানে নুজুলের বর্ণনা কালে বোখারীর উদ্ধৃতিতে এরকম উল্লেখিত হয়েছে।

উত্তম ঋণ বা কর্জে হাসানা দিতে হবে বিশুদ্ধতার সঙ্গে সন্তুষ্ট চিত্তে। ইবনে আবী হাতেম থেকে বর্ণিত হয়েছে— হজরত ওমর বলেছেন, সৎসাধনা ও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ব্যয়ের নামই কর্জে হাসানা।

'তিনি তার জন্য উত্তম ঋণ বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন।' এ সম্পর্কে সুদ্দী বলেছেন, এই বহুগুণে বৃদ্ধির পরিমাণ কতো- তা আল্লাহ্‌পাক ব্যতীত আর কেউ জানে না। কেউ কেউ বলেছেন, এই বিনিময় হবে সাত শত গুণ পর্যন্ত। প্রথমোক্ত অভিমতটি অধিকতর বিশুদ্ধ।

'আর আল্লাহ্‌ সংকুচিত ও প্রসারিত করেন এবং তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যানীত হবে'—এখানে সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করার অর্থ রিজিকের সংকোচন ও প্রসরণ। আল্লাহ্‌পাক তাঁর আপন অভিপ্রায়ে কারো প্রতি আপতিত করেন অনটন এবং কারোর জন্য নির্ধারণ করেন প্রাচুর্য। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন, প্রতি প্রত্যূষে যখন মানুষ জেগে উঠতে থাকে তখন আকাশ থেকে অবতরণ করেন দু'জন ফেরেশতা। একজন বলেন, হে পরোয়ারদিগার! দাতাকে বিনিময় দাও। দ্বিতীয়জন বলেন, হে মা'বুদ! কৃপণের বিত্ত বিনষ্ট করো। বোখারী, মুসলিম।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সংকোচন ও প্রসরণের ব্যাপারটি অন্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ তিনি কারো অন্তঃকরণ সংকুচিত করে দেন—ফলে দানের অনুপ্রেরণা সেখানে ঠাঁই পায় না। আর যাঁদেরকে দান করেন সম্প্রসারিত হৃদয়, তাঁদের অন্তঃকরণ থাকে দানের আনন্দে ভরপুর। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেন, দাতা ও কৃপণের দৃষ্টান্ত লৌহবস্ত্র পরিহিত ওই ব্যক্তিদ্বয়ের মতো যাদের বস্ত্রের হাতগুলো লেগে থাকে তাদের বুকের সাথে। দাতা

www.eelm.weebly.com

দান করতে চাইলে বুক থেকে ওই হাত দুটো আলগা হয়ে যায়। আর বখিল দান করতে চাইলে হাত দু'টো থাকে অনড়। বোখারী, মুসলিম। রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, প্রতিটি মানুষের অন্তর আল্লাহ্পাকের হাতের দুই আঙ্গুলের মধ্যে। তিনি সকলের অন্তঃকরণকে যেদিকে খুশী সেদিকে ঘুরিয়ে দেন।

কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের মর্ম হচ্ছে— আল্লাহ্ পাক দান খয়রাত গ্রহণ করেন। আর বাড়িয়ে দেন প্রতিদান ও সওয়াব। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, স্বোপার্জিত সম্পদ থেকে খেজুরের দানা পরিমাণ দানকে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করেন আল্লাহ্পাক। তারপর তিনি এই দানকে প্রতিপালন করতে থাকেন যেমন তোমরা প্রতিপালন করো গোবৎসকে। এভাবে সে দান হয়ে যায় পাহাড়ের মতো। আর আল্লাহ্পাক কেবল হালাল উপার্জনকেই গ্রহণ করেন। বোখারী, মুসলিম। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের মর্ম হবে এরকম- আল্লাহ্পাক মৃত্যুর সময় হস্তগত করেন রূহ্ এবং নফ্সকে। আর যাদের মৃত্যুলগ্ন এখনও আসেনি তাদেরকে হস্তগত করেন সুপ্তির সময়। যাদের মৃত্যু সমুপস্থিত তাদেরকে পাকড়াও করেন আর অবশিষ্টদেরকে দান করেন এক নির্দিষ্ট সময়ের অবকাশ।

'এবং তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যানীত হবে।' —একথার অর্থ অবশেষে তোমরা যখন তাঁর নিকটেই ফিরে যাবে তখন তিনি তোমাদেরকে সকল সৎকর্মের (বিশেষ করে উত্তম ঋণের) বিনিময় দান করবেন। কাতাদা বলেছেন, এখানে তাঁর দিকে কথাটির অর্থ হবে মাটির দিকে। অর্থাৎ তোমরা মৃত্যুর পর মাটির দিকেই ফিরে যাবে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৪৬,২৪৭,২৪৮

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰىۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ
ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْاؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا
مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَاؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا
مِّنْهُمْؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

www.eelm.weebly.com

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا أَنَّىٰ يَكُونُ
لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ
يُؤْتِي مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن
رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَٰٓئِكَةُ ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَءَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○

❒ তুমি কি মূসার পরবর্তী বনীইস্রাইল — প্রধানদিগকে দেখ নাই? তাহারা যখন তাহাদের নবীকে বলিয়াছিল, 'আমাদের জন্য এক রাজা নিযুক্ত কর যাহাতে আমরা আল্লাহের পথে সংগ্রাম করিতে পারি', সে বলিল, 'ইহাতো হইবে না যে, তোমাদের প্রতি সংগ্রামের বিধান দেওয়া হইলে তখন আর তোমরা সংগ্রাম করিবে না?' তাহারা বলিল, 'আমরা যখন স্ব স্ব আবাসভূমি ও স্বীয় সন্তান-সন্ততি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি তখন আল্লাহের পথে কেন সংগ্রাম করিব না? 'অতঃপর যখন তাহাদের প্রতি সংগ্রামের বিধান দেওয়া হইল তখন তাহাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। এবং আল্লাহ্ সীমালঘংনকারীগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

❒ তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্ তালুতকে তোমাদের রাজা করিয়াছেন'; তাহারা বলিল, 'আমাদের উপর তাহার কর্তৃত্ব কিরূপে হইবে, যখন আমরা তাহা অপেক্ষা কর্তৃত্বের অধিক হকদার! এবং তাহাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেওয়া হয় নাই!' নবী বলিল, 'আল্লাহ্ই তাহাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তাহাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।' আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

❒ তাঁহার কর্তৃত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট এক তাবুত আসিবে যাহাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে চিত্ত-প্রশান্তি এবং মূসা ও হারুন সম্প্রদায় যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার অবশিষ্টাংশ থাকিবে, ফেরেশতাগণ ইহা

www.eelm.weebly.com

বহন করিয়া আনিবে। তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে তোমাদের জন্য উহাতে নিদর্শন আছে।

বনী ইসরাইল প্রধানগণ তাদের নবীকে তাদের জন্য এক রাজা নির্বাচন করে দিতে বললো। যে নবীর নিকট তারা এ প্রস্তাব পেশ করেছিলো, সে নবীর নাম হজরত ইউশা ইবনে নুন। সুদ্দী বলেছেন, তিনি ছিলেন হজরত সামউন। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হচ্ছে— সে নবী ছিলেন হজরত শামুয়েল। ওয়াহাব ইবনে আবী ইসহাক, কালাবী এবং আরও অনেকে বলেছেন, হজরত মুসার মহাপ্রস্থানের পর বনী ইসরাইলদের নবী হয়েছিলেন হজরত ইউশা ইবনে নূন। তাঁর তিরোধানের পর নবী হয়েছিলেন হজরত হিয্কিল। তাঁর পরলোকগমনের পর বনী ইসরাইলদের মধ্যে দেখা দিলো নতুন নতুন মতবাদ। তারা আল্লাহ্পাকের অঙ্গীকার বিস্মৃত হয়ে লিপ্ত হয়ে পড়লো বিগ্রহ বন্দনায়। তওরাতের বিধান পুনঃপ্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্পাক তখন পাঠালেন হজরত ইলিয়াস নবীকে। তাঁর জীবনাবসানের পর এলেন হজরত আল ইয়াসায়া। তিনি যখন পৃথিবী পরিত্যাগ করলেন, তখন পুনরায় দেখা দিলো বিশৃংখলা, মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো অসংখ্য শরিয়তবিরোধী মতবাদ।

বনী ইসরাইলদের পাপানুষ্ঠান ও ধৃষ্টতা চরমরূপ ধারণ করলো। তখন আমালিকা সম্প্রদায়ের লোকেরা চড়াও হলো তাদের উপর। তারা ছিলো মিশর ও প্যালেষ্টাইনের মধ্যবর্তী সাগর তীরে বসবাসকারী জালুত্ সম্প্রদায়ের লোক। তারা বনী ইসরাইলদেরকে বন্দী করলো। রাজার বংশের চারশ' চল্লিশ জন তরুণও হয়েছিলো বন্দী। বনী ইসরাইলদের উপর জিজিয়া কর আরোপিত হলো। লুণ্ঠিত হলো তওরাত। লাঞ্ছনা ও অপমানের সীমা পরিসীমা আর রইলো না। বনী ইসরাইল তখন নবীবিহীন। নবীবংশে অবশিষ্ট ছিলেন কেবল একজন গর্ভবতী রমণী। আল্লাহ্পাকের অনুকম্পা হলো, তিনি ওই রমণীকে দান করলেন এক পুত্র সন্তান। আর তার নাম রাখলেন শামুয়েল। সেই শামুয়েল নবীকে ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠানো হলো বাইতুল মাক্দিসে। তাঁর শিক্ষক ও ব্যবস্থাপক হিসেবে নিযুক্ত হলেন এক প্রবীণ ব্যক্তি। তাঁর তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠতে থাকলেন হজরত শামুয়েল। একদিন তিনি ওই প্রবীণ ব্যক্তির পাশে শায়িত ছিলেন। অকস্মাৎ হজরত জিব্রাইল আবির্ভূত হয়ে প্রবীণ ব্যক্তিটির স্বরে ডাক দিলেন, শামুয়েল! শামুয়েল তৎক্ষণাৎ উঠে প্রবীণ তত্ত্বাবধায়কের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, পিতঃ! আপনি কি আমাকে ডেকেছেন? তিনি হাঁ না কিছুই বললেন না। শুধু বললেন, বৎস! যাও, শুয়ে পড়ো। তরুণ নবী শামুয়েল পুনরায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। হজরত জিব্রাইল এসে পুনরায় ডাক দিলেন। হজরত শামুয়েল পুনরায় উঠে গিয়ে প্রবীণকে বললেন, আপনি আমায় ডেকেছেন কি? পর পর তিনবার একই ঘটনা ঘটলো। তখন তিনি বুঝলেন, ইনি হচ্ছেন হজরত জিব্রাইল আমিন। হজরত জিব্রাইল তাঁকে বললেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাও। তাদের নিকট তোমার প্রতিপালকের বাণী প্রচার করো। আল্লাহ্পাক তোমাকে তাঁর বাণীবাহক নিযুক্ত করেছেন। হজরত শামুয়েল তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে

www.eelm.weebly.com

এলেন। সত্যের প্রতি আহবান জানালেন তাদেরকে। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস করলো না। বললো, যদি তুমি সত্যি সত্যি নবী হয়ে থাকো তবে আমাদের জন্য একজন সম্রাট নিযুক্ত করে দাও। আমরা তার অনুগামী হয়ে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করবো।

হজরত শামুয়েল নবী তখন তাদেরকে বললেন, তোমাদের প্রতি জেহাদ ফরজ করা হলে- এরকমতো হবে না যে, তোমরা যুদ্ধযাত্রা পরিত্যাগ করবে ? তারা বললো, কেনো পরিত্যাগ করবো? আমরাতো আমাদের আবাসভূমি এবং সন্তান-সন্ততিদের নিকট থেকে পৃথক হয়েছি। তবে আল্লাহ্‌র পথে আমরা সংগ্রাম করবো না কেনো। তারা এরকম বললো বটে, কিন্তু শেষে অধিকাংশই পশ্চাদাপসরণ করলো। কেবল কিছুসংখ্যক ব্যক্তি একটি নদী অতিক্রম করে নদীর অপর তীরে পৌঁছতে সক্ষম হলো। যারা পিছনে পড়ে রইলো তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, সীমালংঘনকারীগণ সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

হজরত শামুয়েল আল্লাহ্‌পাকের নিকট একজন সম্রাটের জন্য প্রার্থনা করলেন। হজরত শামুয়েলকে তখন দেয়া হলো একটি লাঠি ও একটি তেল ভর্তি পাত্র। ওই তেল ছিলো বাইতুল মাকদিসের। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হলো—— এক লোক আসবে —যার শরীর হবে এই লাঠির সমান লম্বা। সে এলে পাত্রে রক্ষিত এই তেলে সৃষ্টি হবে এক তরঙ্গ। সেই আগন্তুকের মাথায় তেল মালিশ করে দিয়ে তাকে বনী ইসরাইলদের রাজা হিসাবে মনোনয়ন দান করবে তুমি।

তালুত্ ছিলেন একজন চর্মশিল্পী অথবা ভিস্তিওয়ালা। কয়েকটি গাধা ছিলো তাঁর। হঠাৎ তাঁর গাধাগুলো একটি একটি করে হারিয়ে গেলো। গাধাগুলোর খোঁজ করতে করতে তিনি হজরত শামুয়েলের গৃহে পদার্পন করলেন। হারানো গাধাগুলোর সন্ধান জানতে চাইলেন তাঁর নিকট। । হজরত শামুয়েল দেখলেন তালুত্ আসার সাথে সাথে সেই পাত্রে রক্ষিত তেলে সৃষ্টি হয়েছে তরঙ্গ। তিনি ওই লাঠি দ্বারা মাপ নিলেন তালুতের। দেখলেন তালুত্ এবং লাঠির দৈর্ঘ এক সমান। তিনি তখন তালুতের মাথায় তেল মালিশ করে দিয়ে তাঁকে নিযুক্ত করলেন বনী ইসরাইলদের নৃপতিরূপে। বনী ইসরাইলদের ডেকে বললেন, আল্লাহ্‌পাক তালুত্‌কে তোমাদের নৃপতিরূপে মনোনয়ন দিয়েছেন। বনী ইসরাইলদের মধ্যে লাদী বিন ইয়াকুব থেকে বংশপরম্পরায় নবী প্রেরিত হয়ে আসছিলো। আর রাজবংশ জারী ছিলো ইহুদীদের মধ্য থেকে। কিন্তু তালুত্ ছিলেন বিন ইয়ামিন বংশের এক দরিদ্র ব্যাক্তি। তাই বনী ইসরাইলরা বলে বসলো, আমরা এ লোকের কর্তৃত্ব মানবো কীভাবে। তারতো প্রচুর ঐশ্বর্য নেই। আমরাই বরং তার চেয়ে অধিক ঐশ্বর্যের অধিকারী। সুতরাং কর্তৃত্ব করার দিক থেকে আমরাই তাঁর চেয়ে অধিকতর যোগ্য।

নবী বললেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁকেই তোমাদের সম্রাট হিসেবে নিযুক্তি দিয়েছেন এবং তাঁকে দিয়েছেন জ্ঞান ও শারীরিক সৌষ্ঠব। কালাবী বলেছেন, তালুত্ ছিলেন রণনিপূন ও সুদর্শন। দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ শরীরের অধিকারী ছিলেন তিনি। কেউ উর্ধ্বে হাত

www.eelm.weebly.com

প্রসারিত করলে সে হাতের অগ্রভাগ হতো তাঁর মস্তক বরাবর। অন্যদের তুলনায় এরকমই দীর্ঘদেহী ছিলেন তিনি। তিনি রাজত্ব লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাদেশ আসতে শুরু করলো।

আমি বলি, আয়াতে তালুত্ সম্পর্কে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক তাঁকে রাজা মনোনীত করেছেন। আরো বলা হয়েছে আল্লাহ্পাক তাঁকে সমৃদ্ধ করেছেন জ্ঞানে ও দেহে। এই জ্ঞান ছিলো শরিয়তের জ্ঞান। আল্লাহ্পাক তাঁর দ্বারা ধর্মীয় ও পার্থিব সমস্যা সমূহ সমাধান করে দিয়েছিলেন। সুতরাং যারা তাঁকে হজরত দাউদ নবীর পিতামহ বলে থাকে আরও বলে তাঁর প্রহারের ভয়ে দাউদ নবী পালিয়ে গিয়েছিলেন।—বনী ইসরাইলের আলেমগণ একারণে তাকে ভর্ৎসনা করেছিলো—ফলে রাগান্বিত হয়ে তালুত্ অনেক আলেমকে হত্যা করেছিলেন— ইত্যাদি ঘটনা সম্পূর্ণ অলীক, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় কর্তত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়'—একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক যাকে ইচ্ছে করেন তাকেই নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও রাজত্ব দান করেন। তিনি প্রাচুর্যময় বলেই যাকে ইচ্ছে করেন তার দারিদ্র বিমোচন করে সচ্ছলতা দানে ধন্য করেন। আর তিনি প্রজ্ঞাময় তাই ভালোভাবে জানেন, কে সম্রাট হওয়ার যোগ্য। বনী ইসরাইলরা নিতান্তই মূর্খ ও অপরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী। তাই তারা জানে না এবং মানে না যে, যোগ্যতার মনোনয়ন ও প্রতিষ্ঠা একান্তভাবে আল্লাহ্তায়ালারই নিয়ন্ত্রনভূত। বংশপরিচয় কোনো যোগ্যতা নয়। রাজাকে জনতার সমস্যা সমাধানের নির্দেশনা দিতে হয়। আর নির্দেশনা দিতে গেলে প্রয়োজন হয় জ্ঞানের। জ্ঞানানুসৃত সমাধান প্রতিষ্ঠা করতে গেলে শারীরিক শক্তিও প্রয়োজন। সেই জ্ঞান ও বাহ্যিক ক্ষমতা আল্লাহ্পাক দিয়েছিলেন তালুত্কে। সুতরাং বনী ইসরাইলদের জানা উচিৎ যে,ঐশ্বর্যকে বনী ইসরাইলেরা যোগ্যতার মাপকাঠি মনে করেছে, সেই বিত্ত-ঐশ্বর্য আসলে কোনো যোগ্যতাই নয়। অর্থাগমের কোনো নিশ্চিতি নেই। কখনও আসে। কখনও চলে যায়। সুতরাং তা ধর্তব্য নয়। তদুপরি এ হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ। এ নির্দেশ অলংঘনীয়।

এর পরের আয়াতে (আয়াত ২৪৮) আল্লাহ্পাক হজরত তালুতের কর্তৃত্বের নিদর্শন বিবৃত করেছেন। বলেছেন, তাঁর কর্তৃত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট আসবে এক বিশেষ সিন্দুক (তাবুত)। 'তাবুত' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'তাওব' থেকে যার অর্থ প্রত্যাবর্তন। 'তাবুত' থেকে যা বের হয় তা পুনরায় তাবুতেই ফিরে যায়। তাই এর নাম 'তাবুত' বা বিশেষ সিন্দুক। কেউ কেউ বলেছেন, ওই সিন্দুকটি ছিলো শেমশাদ কাঠের এবং স্বর্ণের কারুকার্য খচিত। ইবনে মুনজির, ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, সিন্দুকটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছিলো যথাক্রমে তিন হাত ও দুই হাত। কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, আল্লাহ্পাক হজরত আদমের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন একটি বিশেষ সিন্দুক। যার মধ্যে ছিলো অনেক নবীর প্রতিকৃতি। হজরত আদম সেই সিন্দুকটি সংরক্ষণ করেছিলেন। পরবর্তীতে ওই

www.eelm.weebly.com

সিন্দুকের সংরক্ষক হোন হজরত শীশ। শেষ পর্যন্ত নবী পরম্পরায় ওই সিন্দুকটি এসে পৌঁছে হজরত মুসার কাছে। ওই সিন্দুকে তিনি তওরাত শরীফ রাখতেন। হজরত মুসার মহাতিরোধানের পর সিন্দুকটির সংরক্ষণাধিকার লাভ করেন পরবর্তী নবীগণ। কেউ কেউ বলেছেন, তওরাত সংরক্ষণের জন্যই সিন্দুকটি নির্মিত হয়েছিলো। যুদ্ধগমনকালে ওই সিন্দুকটি রাখা হতো সকলের সামনে। আর ওই সিন্দুকের বরকতেই বিজয়ী হতো বনী ইসরাইলেরা। সামনে চলতো সিন্দুক। পেছনে চলতো বনীইসরাইল যোদ্ধবৃন্দ। সিন্দুক থেমে গেলে তারাও থেমে যেতো।

'যাতে থাকবে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে চিত্ত প্রশান্তি'— একথার অর্থ ওই বিশেষ সিন্দুক দেখলে তোমাদের হৃদয়ে নেমে আসবে প্রশান্তি। তখন তালুতের রাজত্ব সম্পর্কে তোমাদের আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না। এখানে 'ফিহি'(যাতে) সর্বনামটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই বিশেষ সিন্দুকটিকে। অর্থাৎ ওই সিন্দুকে সংরক্ষিত বস্তু দৃষ্টিগোচর হলেই তোমাদের অন্তরে নেমে আসবে শান্তি। ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ্ থেকে ইবনে ইসহাক ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন— যুদ্ধকালে হজরত মুসা সিন্দুকটি স্থাপন করতেন সকলের সম্মুখে। এর ফলে বনী ইসরাইলেরা দৃঢ় সংবদ্ধ হতো। তখন আর পলায়নের চিন্তা করতে পারতো না তারা। আমি বলি, এটা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্পাকের নিদর্শন, আল্লাহর নবী ও তাঁদের অনুসারী পুণ্যবানদেরকে দেখলে অন্তরে নেমে আসে প্রশান্তি। শয়তান তখন আর তার প্ররোচনার প্রভাব ফেলতে পারে না।

ইবনে আসাকের কালাবী থেকে, তিনি আবি সালেহ থেকে, তিনি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন— চিত্তপ্রশান্তি আনয়নকারী সাকিনা হচ্ছে জবরজদ ও ইয়াকুতের তৈরী একটি প্রতিচ্ছবি যা সংরক্ষিত ছিলো ওই সিন্দুকে। তার মস্তক ও লেজ ছিলো বিড়ালের মস্তক ও লেজের মতো। দু'টিডানা ছিলো তার। সে কাঁদ্তো ও চিৎকার করতো। ওই সাকিনাবাহী সিন্দুকটি শত্রুদের পশ্চাৎধাবন করতো। বনীইস্রাইল সেনারা তখন তার পিছনে পিছনে দৌড় দিতো। সিন্দুকটি থেমে গেলে সৈনিকেরাও থেমে পড়তো। তারপর অবতীর্ণ হতো আল্লাহ্পাকের বিশেষ সাহায্য। মুজাহিদ থেকে বাগবী উল্লেখ করেছেন, হজরত আলী বলেন, সাকিনা ছিলো একটি ঝটিকা প্রবাহ। কালাবী বলেছেন, তার ছিলো দু'টিমস্তক এবং মুখাবয়ব ছিলো মানুষের মতো। হজরত আলী থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন— রসুল স. বলেন, সাকিনা একটি ঝটিকা প্রবাহের নাম। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে সাকিনা হচ্ছে ওই স্বর্গীয় আধারের নাম, যেখানে নবীগণের অন্তঃকরণ প্রক্ষালন করা হয়ে থাকে।

'এবং মুসা এবং হারুন সম্প্রদায় যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ থাকবে'- এখানে হজরত মুসা ও হজরত হারুনের নামের পূর্বে 'আল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ রকম করা হয়েছে তাঁদের বিশেষ মর্যাদা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। অথবা আলু মুসা ওয়া আলু হারুন বলে নির্দেশ করা হয়েছে

www.eelm.weebly.com

বনী ইসরাইলদের পরবর্তী নবীগণকে। পরবর্তী নবীগণ ছিলেন তাঁদের পিতৃব্যের বংশধর। কেউ কেউ বলেছেন, ওই সিন্দুকে ছিলো তওরাতের অক্ষত ও বিক্ষত ফলকসমূহ। ছিলো হজবত মুসার যষ্টি; উভয়ের পাদুকা, হজরত হারুনের পাগড়ী, লাঠি এবং কিয়ৎ পরিমাণ মান্না। পরবর্তীতে বনী ইসরাইল হয়ে পড়লো অবাধ্য। ধর্মের নামে সৃষ্টি করলো নতুন নতুন মতবাদ। বায়তুল মাকদিসকে করে ফেললো অপকর্মের কেন্দ্রস্থল। তখন একদিন আকস্মাৎ উধাও হয়ে গেলো সিন্দুকটি। কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহপাক সিন্দুকটি আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। কারো কারো বক্তব্য হচ্ছে- বিজয়ী শত্রুরা অধিকার করেছিলো ওই সিন্দুকটি।

'ফেরেশতাগণ ইহা বহন করে আনবে।'— এ কথায় বুঝা যায় সিন্দুকটি আল্লাহ্পাকই আকাশে উঠিয়ে নিয়েছিলেন, তাই ফেরেশতার মাধ্যমে পুনরায় পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। আর বিজয়ী শত্রুদের সিন্দুক দখল সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে এরকম- তারা সিন্দুকটি স্থাপন করলো তাদের প্রতিমা গৃহে। ওই সিন্দুকের উপরেও তারা স্থাপন করলো একটি প্রতিমা। কিন্তু দেখা গেলো সিন্দুকটি রয়েছে প্রতিমার মস্তকের উপর এবং অন্য সকল প্রতিমা ভেঙে চুরমার হয়ে আছে। তখন তারা সিন্দুকটি স্থাপন করলো একটি গৃহাঙ্গণে। কিন্তু দেখা গেলো সে গৃহের সকল লোক মরে পড়ে আছে। মহাবিপদে পড়লো আমালিকেরা। তারা তখন সিন্দুকটি পাঠিয়ে দিলো দূরের একটি গ্রামে। সেখানে প্রাদুর্ভাব ঘটলো একটি ইঁদুরের। গ্রামবাসীরা রাত্রে শয্যাগ্রহণ করলে বের হতো ইঁদুরটি। সকালে দেখা যেতো রাতের মধ্যে ঘুমন্ত মানুষের নাড়িভূঁড়ি খেয়ে ফেলেছে ইঁদুরটি। তাদের কাছে এক বন্দিনী বনীইসরাইল রমণী তখন বললো, এই সিন্দুকটি যতোদিন তোমাদের কাছে থাকবে ততোদিন এ রকম ঘটনা ঘটতেই থাকবে। কাজেই ভালো যদি চাও তবে শীঘ্রই সিন্দুকটি কোথাও রেখে এসো। গ্রামবাসীরা তখন সিন্দুকটি একটি বৃষভযানে স্থাপন করলো। তারপর গাড়ীটি হাঁকিয়ে দিলো দূর দেশের দিকে। অজানার দিকে এগিয়ে চললো তওরাতের সিন্দুকবাহী বলদ। আল্লাহ্পাক সেই গরুর গাড়ীর সঙ্গে নিযুক্ত করলেন চারজন ফেরেশতা। ফেরেশতারা বলদটিকে হাঁকিয়ে দিলো বনী ইসরাইলের জনপদ অভিমুখে। কেউ কেউ বলেছেন, সিন্দুকটি ছিলো তীহ্ মরুপ্রান্তরে। হজরত মুসা সেই সিন্দুকটি গ্রহণ করেছিলেন এবং তা রেখে গিয়েছিলেন পরবর্তী নবী হজরত ইউশা বিন নুনের কাছে। তালুতের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সিন্দুকটি সেখানেই ছিলো। তালুতের রাজত্ব লাভের পর সেই সিন্দুকটি তাঁর গৃহে পৌছে দেয়া হলো।

'তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে তোমাদের জন্য ওতে রয়েছে নিদর্শন।' এ কথাটি সম্ভবতঃ শামুয়েল নবীর। অথবা এটি আল্লাহ্পাকের একটি পৃথক বক্তব্য। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসার লাঠি ও সিন্দুক রয়েছে বুহাইরা তিররিয়াত নামক স্থানে। কিয়ামতের পূর্বক্ষণে সেগুলো প্রকাশিত হবে।

www.eelm.weebly.com

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ
فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا
مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ
لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ
قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ○

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَ
عَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ○

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

❑ অতঃপর তালুত যখন সৈন্যবাহিনীসহ বাহির হইল সে তখন বলিল, 'আল্লাহ্ এক নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করিবেন। যে কেহ উহা হইতে পান করিবে সে আমার দলভুক্ত নহে, আর যে কেহ উহার স্বাদ- গ্রহণ করিবে না সে আমার দলভুক্ত; ইহা ছাড়া যে কেহ তাহার হস্তে এক কোষ পানি গ্রহণ করিবে সে-ও।' অতঃপর অল্প সংখ্যক ব্যতীত তাহারা উহা হইতে পান করিল। সে এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ যখন উহা অতিক্রম করিল তখন তাহারা বলিল, 'জালুত ও তাহার

www.eelm.weebly.com

সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নাই'; কিন্তু যাহাদের প্রত্যয় ছিলো যে আল্লাহের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিবে তাহারা বলিল, 'আল্লাহের অনুমতিক্রমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করিয়াছে!' আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন।

❒ তাহারা যখন যুদ্ধার্থে জালুত ও তাহার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইল তাহারা তখন বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে ধৈর্য দান কর, আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য দান কর।

❒ সুতরাং তাহারা আল্লাহের অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে পরাভূত করিল; দাউদ জালুতকে সংহার করিল, আল্লাহ্ তাহাকে কর্তৃত্ব এবং হিক্‌মত দান করিলেন, এবং যাহা তিনি ইচ্ছা করিলেন তাহা তাহাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তবে পৃথিবী কলুষিত হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতি মঙ্গলময়।

❒ এই সব আল্লাহের নিদর্শন; আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে আবৃত্তি করিতেছি, নিশ্চয় তুমি রসুলগণের অন্যতম।

জনতা যখন সেই বিশেষ সিন্দুকটি প্রত্যক্ষ করলো তখন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, তাঁরা আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত। তালুতের ডাকে তখন সকলেই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। হজরত তালুত বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা অসংসারী ও সুঠামদেহী কেবল তারাই আমার সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করবে। মুকাতিলের বর্ণনানুযায়ী তালুতের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করেছিলো সত্তর হাজার যুবক। তখন ছিলো তাপদগ্ধ গ্রীষ্মকাল। সেনাদল হজরত তালুতের নিকট নিবেদন করলো, আপনি আল্লাহ্পাকের অনুমোদনক্রমে একটি নদী প্রবাহিত করে দিন। হজরত তালুত বললেন, আল্লাহ্পাক এক নদীর মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। হজরত তালুত যদি নবী হয়ে থাকেন, তবে তিনি সরাসরি প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত হয়ে এরকম বলেছিলেন; আর যদি নবী না হয়ে থাকেন তবে নবীর নির্দেশক্রমে একথা বলেছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস ও সুদ্দী বলেছেন নদীটি ছিলো ফিলিস্তিনের। কাতাদা বলেছেন, জর্দান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী ছিলো নদীটি।

'ফাসলা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া বা বহির্গত হওয়া। আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে হজরত তালুত তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের জনপথ থেকে বর্হিগত হলেন। তখনই বললেন, আল্লাহ্পাকের পরীক্ষার কথা। আয়াতে উল্লেখিত 'ইব্‌তিলা' শব্দটির অর্থ পরীক্ষা। নদীটি ছিলো পরীক্ষার মাধ্যম। ওই নদীর মাধ্যমে অনুগত ও অবাধ্যদের পৃথক করে ফেলাই ছিলো আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা। হজরত তালুত তাই বললেন, যে ওই নদীর পানি পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়। আর যে পান করবে না সেই আমার দলভুক্ত। আর যে মাত্র এক আঁজলা পান করবে সেও আমার দলে থাকতে পারবে। এখানে পান করা বুঝাতে 'তায়াম' শব্দটি ব্যবহৃত

www.eelm.weebly.com

হয়েছে। এর অর্থ কোনো আহার্য বা পানীয়ের আস্বাদ গ্রহণ করা। আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গির মাধ্যমে বুঝা যায়, যারা মাত্র এক আঁজলা পানি পান করবে, তারাও হজরত তালুতের দলে থাকতে পারবে। কিন্তু যারা আদৌ পান করবে না তারাই হবে অধিকতর মর্যাদাশীল।

বিষয়টি বুদ্ধিগত দিক থেকে বিশ্লেষিত হলে প্রতীয়মাণ হবে যে, প্রচন্ড দাবদাহের সময় অধিক পানি পান করা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। যারা এ রকম করবে তারা যুদ্ধ করার শক্তি হারিয়ে ফেলবে। এমন কি এতে করে তাদের মৃত্যুরও সম্ভাবনা রয়েছে। হজরত তালুত তাই তাঁর সৈন্যদেরকে অতিরিক্ত পানি পান করতে নিষেধ করেছিলেন।

এক কোষ বা এক আঁজলা পানি বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, 'ইগ্‌তারফা' শব্দটি। হেজাজ ও বসরার অধিবাসীগণ শব্দটিকে উচ্চারণ করতেন 'গারফাতুন।' অন্য ক্বারীগণ পড়তেন 'গুরফাতুন'। ক্বারী কাসায়ী বলেছেন, আঁজলা ভর্তি করার সময় যে পানিটুকু হাতে থাকে সেটাই গুরফাতুন। আর সাধারণভাবে আঁজলা ভর্তি পানিকে বলে গারফাতুন।

এ রকম বলা যেতে পারে যে, পানি পানের মাধ্যমে পরীক্ষা করার বিষয়টি ছিলো আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে এক প্রকার শাস্তি। প্রচন্ড গরমের কারণে ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়েছিলো যোদ্ধারা। আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির অপেক্ষা না করেই তারা ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলো একটি নদীর জন্য। তাই ওই নদীর মাধ্যমেই তাদেরকে পরীক্ষারূপী শাস্তি দেয়া হয়েছিলো।

পিপাসিত সেনানীরা অধিকাংশই ধৈর্য ধারণ করতে পারলো না। তারা তাৎক্ষণিক পিপাসা নিবৃত্তির জন্য নদী থেকে পান করলো প্রচুর পানি। অল্প কিছু সংখ্যক সৈন্য কেবল দৃঢ়রূপে ধৈর্য অবলম্বন করলো। পানি পান করা থেকে বিরত রাখলো নিজেদেরকে। সুদ্দী বলেছেন, ওই ধৈর্যশীলদের সংখ্যা ছিলো চার হাজার। কিন্তু এ সম্পর্কে বোখারীর বর্ণনাটি অধিকতর বিশুদ্ধ। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে— হজরত বারা বিন আজিব বলেছেন, আমরা কয়েকজন বলাবলি করছিলাম আমাদের বদর যুদ্ধের সৈন্য এবং তালুতের নদী অতিক্রমকারী সৈন্যদলের সংখ্যা ছিলো একই। তাঁরা ছিলেন মুসলমান। তাঁদের সংখ্যা ছিলো তিনশত দশের মতো। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁদের সংখ্যা ছিলো তিন শত তের জন। যাঁরা এক আঁজলা পানি পান করেছিলেন তাঁদের অন্তকরণও হয়েছিলো শক্তিশালী। পানির পিপাসা আর ছিলো না তাঁদের। আর যারা প্রচুর পানি পান করে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ লংঘন করেছিলো, তারা হয়েছিলো দুর্বলচিত্ত, কাপুরুষ। তাদের ওষ্ঠদ্বয় হয়ে গিয়েছিলো ঘোর কৃষ্ণবর্ণের। তারা নদীর এ পারেই রয়ে গিয়েছিলো। নদী অতিক্রম করার সামর্থ তাদের হয়নি। কেউ কেউ বলেছেন, তারাও নদী অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলো। কিন্তু এই অভিমতটি বাস্তবসম্মত নয়।

www.eelm.weebly.com

নদীর ওপারে গমণকারী পরীক্ষিত সৈন্যদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে শুরু করলো, জালুত ও তার সৈনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো শক্তি আজ আমাদের নেই। পিপাসা, দুর্বলতা, অথবা সৈন্যসংখ্যা হ্রাসের কারণে এক আর্জলা পানি পানকারীরা এরকম বলেছিলো মনে হয়। কিন্তু যাঁরা আদৌ পানি পান করেননি তাঁরা বলেছিলেন অন্য কথা। তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা আয়াতে বলেছেন, কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিলো যে, আল্লাহ্র সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে তারা বললো, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ ধৈর্যশলীদেরকে সাহায্য করতে ও প্রতিদান দিতে সদা বিদ্যমান। সুফী দার্শনিকগণ বলেছেন, আল্লাহ্পাকের এই সঙ্গী হওয়ার ব্যাপারটির অবস্থানগত কোনো রূপ নেই। বিষয়টি ধারণার অতীত।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, তালুত বাহিনী যখন জালুত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সমরপ্রান্তরে উপস্থিত হলেন তখন বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করো। অবিচলিত রাখো আমাদের পদদ্বয়কে এবং আমাদেরকে সাহায্য দান করো সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। — নবী ও পুণ্যবানদের রীতি এরকমই। সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে তাঁরা এভাবেই আল্লাহ্পাকের দরবারে প্রার্থনা জানিয়ে থাকেন।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে, তাঁরা আল্লাহ্র অনুমতিসাপেক্ষে শত্রুদেরকে পরাভূত করলো। দাউদ নামের এক বীর সেনানী সংহার করলো জালুতকে। আল্লাহ্ তখন দাউদকে দান করলেন কর্তৃত্ব ও হিকমত। এবং তিনি যে রকম ইচ্ছা করলেন, সেরকমই শিক্ষা দিলেন তাঁকে। হজরত দাউদ, তাঁর পিতা ও তাঁর তেরোজন ভ্রাতা ছিলেন হজরত তালুতের সেনাবাহিনীর সদস্য। তাঁরা সকলেই নদী অতিক্রম করে হজরত তালুতের সহগামী হয়েছিলেন। ভ্রাতাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন দাউদ। তিনি চারণ ভূমিতে ছাগল চরিয়ে বেড়াতেন। আল্লাহ্পাক বনী ইসরাইলের নবীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এই ছেলেটিই জালুতের জীবনাবসান ঘটাবে। পথিমধ্যে তিনটি পাথর দাউদকে বলেছিলো, তুমি জালুতের জীবন সংহারক। দাউদ পাথর তিনটি তুলে নিয়ে তাঁর ঝুড়িতে রেখে দিলেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে হজরত তালুত তাঁকে দিতে চাইলেন একটি অশ্ব, একটি জেরা ও একটি তলোয়ার। কিন্তু দাউদ সেগুলো গ্রহণ করলেন না। বললেন, আল্লাহ্পাক যদি আমাকে সাহায্য না করেন তবে এগুলো কোনো কাজেই আসবে না। শুধুমাত্র ঝুলিটি সঙ্গে নিয়ে বীরদর্পে জালুতের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন হজরত দাউদ। তিনি ছিলেন খর্বাকৃতি, রোগাটে ও হরিদ্রাভ বর্ণবিশিষ্ট। আর জালুত ছিলো প্রচন্ড শক্তিশালী, ক্ষিপ্র ও উদ্ধত। অনেক সৈনিককে একাই তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারতো সে। কিন্তু দুর্বল দাউদকে দেখে কেনো যেনো ভীত হয়ে পড়লো সে। বললো, কে তুমি? পাথর নিয়ে কুকুর তাড়াতে এসেছো না কি? হজরত দাউদ বললেন, তুমি কুকুর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। তারপর একে একে

www.eelm.weebly.com

তিনটি পাথর ছুঁড়ে মারলেন তিনি। ছুঁড়ে মারলেন ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের প্রতিপালকের নামে। পাথরগুলো জালুতের মস্তিষ্কের সম্মুখ দিকে প্রবেশ করে পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে গেলো। এভাবে জালুতবধ সম্পন্ন হলো। তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে হজরত তালুত তাঁকে আপন কন্যা দান করেছিলেন।

হজরত তালুতের মৃত্যুর পর আল্লাহ্পাক হজরত দাউদকে রাজত্ব দান করেছিলেন। আয়াতে সে কথা বুঝাতে বলা হয়েছে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দানের কথা। আরও দান করেছিলেন হিকমত অর্থাৎ নবুয়ত। বনীইসরাইলদের মধ্যে এককভাবে রাজত্ব ও নবুয়তের সর্বপ্রথম অধিকারী ছিলেন তিনি। ইতোপূর্বে রাজবংশ ও নবীবংশ ছিলো পৃথক। আল্লাহ যা ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন— এ কথার অর্থ, আল্লাহ্পাক হজরত দাউদকে দান করলেন যবুর শরীফ। তিনি হাত দিলে লোহা মোমের মতো গলে যেতো। এটা ছিলো আল্লাহ্পাক প্রদত্ত অলৌকিক নিদর্শন (মোজেজা)। কিন্তু রাজত্বাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আপন হস্তে উপার্জন করতেন তিনি। সেই উপার্জনেই ব্যয় নির্বাহ করতেন সংসারের। হজরত মেকদাদ বিন মা'দী কারাব বলেছেন— রসুল পাক স. এরশাদ করেন, আপন হস্তে উপার্জনের মাধ্যমে সংগৃহীত আহার্যের চেয়ে উত্তম আহার্য নেই। আল্লাহ্র নবী দাউদ নিজ হাতে উপার্জনের মাধ্যমে ক্রয়কৃত আহার্য ভক্ষন করতেন। বোখারী। আল্লাহ্পাক হজরত দাউদকে পাখির ভাষা এবং পিপীলকা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন। তদুপরি দান করেছিলেন চিত্তহরণকারী কণ্ঠস্বর। অনেকে বলেছেন, তিনি যখন যবুর শরীফ পাঠ করতেন, তখন অরণ্যের পশুকুল তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে যেতো। মাথার উপরে ছায়া বিস্তার করতো পক্ষীকুল। থেমে যেতো প্রবহমাণ স্রোত। থমকে দাঁড়াতো বাতাস। রসুল পাক স. হজরত আবু মুসা আশআরীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হে আবু মুসা, তুমি দাউদ বংশের ভুবনমোহিনী কণ্ঠস্বরগুলোর একটি। বোখারী, মুসলিম।

হজরত দাউদের প্রতি আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহ সমূহের বর্ণনার পর বলা হয়েছে, আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী কলুষিত হয়ে যেতো। একথার মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে আল্লাহ্পাকের মানবতা রক্ষার চিরাচরিত রীতি। এই রীতির মাধ্যমেই সত্যানুসারীরা প্রতিহত করে থাকে সীমালংঘনকারীদেরকে। এই শাশ্বত রীতি প্রবর্তিত না হলে অবিশ্বাসীরা ও পৌত্তলিকদের দল পৃথিবীতে একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তার করে বসতো। ধ্বংস করে দিতো নগর, বন্দর, জনপদ। শুরু করতো বিরতিহীন হত্যাযজ্ঞ। ধুলির সঙ্গে মিশিয়ে দিতো উপাসনালয়গুলোকে। আল্লাহ্পাকের গুণকীর্তনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিতো তারা। চিরপ্রতিবন্ধক হয়ে যেতো ইমানের, ইবাদতের। এ রকম বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ। আল্লাহ্পাকের এই অনুপম নীতিমালার মাধ্যমে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, অনাসৃষ্টির বিলোপ সাধনার্থেই আল্লাহ্পাক জেহাদকে ফরজ

www.eelm.weebly.com

করেছেন। 'লা ইকরাহা ফিদ্দিন' আয়াতের আলোচনায় এ বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

কতিপয় ভাষ্যকার আলোচ্য আয়াতটির এ রকম অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ্পাক যদি বিশ্বাসী ও পুণ্যবানদের মাধ্যমে কাফের ও ফাসেকদেরকে শায়েস্তা না করতেন তবে সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যেতো। আবদুর রহমান বিন আহমদের সূত্রে হজরত ইবনে ওমর থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন— রসুল স. এরশাদ করেন, একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর অসিলায় তার এক শত প্রতিবেশীকে নৈসর্গিক বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখেন আল্লাহ্পাক। এরপর রসুল স. এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে নামাজী, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও নিষ্পাপ পশুকূল না থাকলে তোমাদের উপর নেমে আসতো সীমাহীন শাস্তি।

শেষে বলা হয়েছে— কিন্তু আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতি মঙ্গলময়। এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, নবুয়তের মাধ্যমে প্রদত্ত মঙ্গল বা কল্যাণের কথা। আর ইঙ্গিত করা হয়েছে এতোক্ষণ ধরে বর্ণিত ঘটনাবলীর দিকে। হজরত তালুত, বিশেষ সিন্দুক, জালেম জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা, জালুত বধ, হজরত দাউদ, তাঁর রাজত্ব ও নবুয়তপ্রাপ্তি ইত্যাদি কল্যাণদায়ক সকল ঘটনাবলীর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এ কথায়।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে, 'এসব হচ্ছে আল্লাহ্র নিদর্শন; আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে আবৃত্তি করছি, নিশ্চয়ই তুমি রসুলগণের অন্যতম।' —একথার মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে রসুল মোহাম্মদ স. এর নবুয়তের অবিসংবাদিত প্রমাণ। অবিশ্বাসীরা বলতো, আপনি আল্লাহ্র নবী নন। তাদের সেই হঠকারিতার প্রতিবাদে এখানে 'ইন্না' (নিশ্চয়ই) শব্দ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স.এর রেসালতের অকাট্য প্রমাণপঞ্জি। তিনি ছিলেন উম্মি (অক্ষরের অমুখাপেক্ষী)। তিনি কোনো বই পুস্তক পাঠ করেননি। খৃষ্টান কিংবা ইহুদী পন্ডিতের সংসর্গেও যাননি। অথচ তিনিই আবৃত্তি করে চলেছেন আদিকালে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে। আল্লাহ্পাক বলেছেন, আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে আবৃত্তি করছি। আল্লাহ্পাকই তাঁর প্রিয়তম রসুলের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন পূর্ববর্তী নবী-রসুলগণের বিস্মৃত ইতিহাস। সুতরাং আল কোরআনের বাহক এই সর্বশেষ রসুল সম্পর্কে কোনোপ্রকার সন্দেহকে প্রশ্রয় দেয়া যায় কি?

প্রথম খন্ড শেষ

www.eelm.weebly.com

তৃতীয় পারা

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ۚ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝

❑ এই রসুলগণ, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে এমন কেহ রহিয়াছে যাহার সহিত আল্লাহ্ কথা বলিয়াছেন, আবার কাহাকেও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। মরিয়ম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের পরবর্তীরা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পর পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইত না ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিল। ফলে তাহাদের কতক বিশ্বাস করিল এবং কতক সত্য প্রত্যাখান করিল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহারা পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইত না ; কিন্তু আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

'তিলকার রুসুল' অর্থ এই রসুলগণ — এখানে 'তিলকা' দ্বারা রসুলদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে — 'নিশ্চয়ই আপনি রসুলগণের একজন' — এই বাক্যটিতে রসুলদের সম্পর্কে জানা যাচ্ছে। 'আর রুসুল' এর লামটি লামে এসতেগরাকী (সমষ্টিভূতিজ্ঞাপক লাম)।

www.eelm.weebly.com

'তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি' — অর্থাৎ রসুলগণের মধ্যে একজন অপেক্ষা অন্যজনকে অধিক সম্মান দিয়েছি। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সম্মানবৃদ্ধি — সমস্ত বিশেষত্ব একত্র করে এক বিশেষত্বকে অপর বিশেষত্ব অপেক্ষা প্রাধান্য দেয়া। পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে মর্যাদা সমূহের এতবেশী পূর্ণতা লাভ যাতে পৃথিবীতে কল্যাণ এবং পরকালে পূণ্যার্জন হয়। তাঁদের মর্যাদা ও বিশেষত্বের ধরন ভিন্ন। কিন্তু সামগ্রিক সম্মান তাঁরই যিনি অধিক পূণ্যশীল এবং আল্লাহ্তায়ালার অধিক নৈকট্যধারী। সমস্ত নবী এবং রসুলগণ রেসালাত ও নবুয়তের গুণসম্পন্ন ও পূণ্যশীল হলেও পূণ্যার্জনে, মর্যাদায় এবং নৈকট্যে তাঁদের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। যে পার্থক্যের প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ্ই রাখেন।

তবে আল্লাহ্ যদি এ সম্পর্কে বলেন, তবেই তা জানা যেতে পারে। আল্লাহ্ এরশাদ করেন, 'তাঁহাদের মধ্যে এমন কেহ রহিয়াছে যাহার সহিত আল্লাহ্ কথা বলিয়াছেন'—ব্যাখ্যাকারকগণ বলেন, এখানে হজরত মুসা আ. এর কথা বলা হয়েছে। কারণ অন্যস্থানে আল্লাহ্তায়ালা উল্লেখ করেছেন, 'অতপর যখন প্রতিশ্রুত সময়ে মুসা এলো এবং তাঁর প্রভূ তাঁর সাথে কথা বললেন।' তবে এই উল্লেখে মুসা আ. অধিক মর্যাদাশালী — একথা প্রমাণিত হয় না। শুধু প্রমাণিত হয় আল্লাহ্পাক তাঁর সাথে কথা বলেছেন। এরকম কথোপকথন অন্য কোনো নবীর সঙ্গেও হওয়া সম্ভব। কেউ কেউ বলেন, এই আয়াত দ্বারা হজরত মুসা আ. এবং রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম — এই দু'জনকে বোঝানো হয়েছে। হজরত মুসা আ. এর সঙ্গে কথা হয়েছে তুর পর্বতে। আর রসুলেপাক স. এর সঙ্গে কথা হয়েছে মেরাজের রহস্যময় রাত্রিতে যখন দূরত্ব ছিলো ধনুকের দুই প্রান্তের সমান। অথবা তার চেয়ে কম। এই দুই অবস্থার মধ্যে ব্যবধান অনেক।

'আবার কাহাকেও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন' — এখানে বোঝা যাচ্ছে, একজনকে অন্য একজনের উপর অথবা একজনকে অন্য সকলের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। একারণেই কোনো কোনো নবী অন্যান্য নবীগণের তুলনায় অধিক মর্যাদাশালী। আবার নবীগণ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশালী রসুলগণ। আবার রসুলগণ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশালী উলুল আজম রসুলগণ। আর সমস্ত নবী এবং রসুলগণের চেয়ে অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাশালী শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্মদ মুজতাবা স.। একথা বিশুদ্ধ হাদিস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত। এর উপর সমস্ত উম্মত একমত।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ সাল্লালালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানগণের নেতা হবো — একথা গৌরবপ্রকাশক নয়। তখন প্রশংসার পতাকা থাকবে আমারই হাতে —

www.eelm.weebly.com

একথাও গৌরবপ্রকাশক নয়। আল্লাহ্ ছাড়া সবাই আমার পতাকার নিচেই থাকবে এবং সর্বপ্রথম পুনরুত্থিত হবো আমিই — একথাও গৌরবপ্রকাশক নয়। আমিই সর্ব প্রথম সুপারিশকারী হবো। এবং আমার সুপারিশ কবুলও হবে। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, সাহাবীগণ কথপোকথন করছিলেন, এমন সময় রসুলে আকদাস স. উপস্থিত হলেন। একজন সাহাবী বললেন, আল্লাহ্ হজরত ইব্রাহিম আ. কে খলিল বানিয়েছেন। দ্বিতীয়জন বললেন, আল্লাহ্ মুসা আ. এর সঙ্গে কথা বলেছেন। তৃতীয়জন বললেন, ঈসা আ. কলেমাতুল্লাহ্ এবং রুহুল্লাহ্। চতুর্থজন বললেন, হজরত আদম আ. সফিউল্লাহ্। রসুল স. বললেন, তোমরা ঠিকই বলেছো। কিন্তু আমি যে আল্লাহ্তায়ালার বন্ধু। একথা গৌরব প্রকাশার্থে নয়। আমিই প্রথম বেহেশ্তের দরোজায় করাঘাত করবো। আল্লাহ্ আমার জন্য বেহেশ্ত উন্মুক্ত করে দেবেন। বেহেশ্তে প্রথম প্রবেশকারী আমি। এসময় আমার সঙ্গে থাকবে একদল ফকির ও মিসকিন — একথাও গৌরব প্রকাশার্থে নয়। আমি সেসময় পূর্বাপর সকল মানুষের চেয়ে অধিক সম্মানিত হবো। একথাও গৌরব প্রকাশার্থে নয়। তিরমিজি, দারেমী।

হজরত জাবের রা. বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, রসুলে পাক স. বলেছেন, আমি সমস্ত নবী ও রসুলদের সর্দার — একথা আত্মগৌরবমূলক নয়। আমি শেষ নবী—একথাও আত্মগৌরবমূলক নয়। আমি সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং সর্বাগ্রে আমার সুপারিশ গৃহীত হবে — একথাও আত্মগৌরবমূলক নয়। দারেমী।

হজরত উবাই ইব্নে কাব রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে করিম স. বলেছেন, কিয়ামতের দিনে নবীদের ইমাম হবো আমিই। তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্যপ্রদানকারী এবং সুপারিশকারীও হবো আমি — একথা আত্মগৌরবমুক্ত। তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, মৃত্তিকা থেকে আমিই প্রথম উত্থিত হবো। আল্লাহ্তায়ালা আমাকে বেহেশ্তি পোশাক পরাবেন। আমি আরশের ডানপাশে দাঁড়াবো। এখানে আর কেউ দাঁড়াতে পারবেনা। তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রা হতে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে অসিলা করবেন। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল, অসিলা কী? রসুল স. বললেন, বেহেশ্তের উচ্চ স্থান, সেখানে একব্যক্তি পৌছবে। আমি ইচ্ছা করি সে ব্যক্তি হবো আমিই। তিরমিজি।

এই সমস্ত হাদিস একজন বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হলেও উম্মতেরা একে গ্রহণ করেছেন। ইমাম বাগবী র. লিখেছেন, অন্য নবীগণকে পৃথক পৃথক ভাবে দেয়া

www.eelm.weebly.com

মোজেজাসমূহকে সম্মিলিতভাবে দেয়া হয়েছে রসুলুল্লাহ্ স. কে। এছাড়া আরো অনেক মোজেজা তাঁকে দান করা হয়েছে। যেমন আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, সতুনে হান্নানার কান্না, পাথর ও বৃক্ষরাজির সালাম, চতুষ্পদ জন্তুর নবুয়তের সাক্ষ্যদান, হাতের আঙ্গুল থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি। আরো অনেক মোজেজা আছে। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে কোরআন মজীদ। আসমান ও জমিনের অধিবাসীগণ এসমস্তের বিবরণ দিতে অক্ষম। ইমাম বাগবী হজরত আবু হোরায়রা থেকে আরো বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, নবীগণকে দেয়া মোজেজা মানুষের আয়ত্তাতীত। আমাকে তো সেই মোজেজা দেয়া হয়েছে যা আল্লাহ্র কালাম এবং যা আমাকে দেয়া হয়েছে ওহির মাধ্যমে। একারণেই আমি মনে করি, কিয়ামতের দিনে আমার অনুসারীদের সংখ্যা বেশী হবে। বোখারী ও মুসলিম।

ইমাম বাগবী হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্পাক আমাকে পাঁচটি বিশেষত্ব দান করেছেন যা ইতিপূর্বে কেউ পায়নি।

১. আমি একমাস সময়ের দূরত্বে থাকলেও শত্রুরা ভীত হয়।

২. জমিনকে আমার জন্য মসজিদ করে দেয়া হয়েছে — এজন্য আমার উম্মতেরা পৃথিবীর সকল মাটিতে নামাজ পড়তে পারবে (মসজিদ, বাড়ি, মাঠ যেখানেই হোক না কেনো)।

৩. আমার জন্য গণিমতের মাল হালাল করা হয়েছে যা অন্য নবীদের জন্যে হালাল ছিলোনা।

৪. আমাকে দেয়া হয়েছে সুপারিশ করার অধিকার।

৫. অন্যান্য নবীগণকে পাঠানো হয়েছে কেবল তাঁদের আপন সম্প্রদায়ের জন্য, কিন্তু আমাকে সমস্ত মানুষের জন্য।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত ইমাম বাগবী উল্লেখিত আরেকটি হাদিস, নবী করিম স. বলেছেন, ছয়টি বিষয়ে আমি অন্যান্য নবী অপেক্ষা স্বতন্ত্র।

১. আমাকে দেয়া হয়েছে এমন কতগুলো বাক্য যার শব্দাবলী সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থ ব্যপক, যা জ্ঞানীদের জ্ঞানকে পরিবেষ্টিত রেখেছে।

২. শত্রুদের অন্তরে আমার সম্পর্কে ভীতি ঢেলে দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।

৩. গণিমতের মাল হালাল করা হয়েছে।

৪. মাটিকে করা হয়েছে মসজিদ এবং পবিত্র।

৫. আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে জ্বিন ও মানুষ সকলের জন্যে।

৬. আমার মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়েছে নবুয়ত। মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

'মরিয়ম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছি' — হজরত ঈসা আ. মায়ের কোলে থেকে মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন, জন্মান্ধকে চক্ষুদান করতেন, কুষ্ঠরোগ নিরাময় করতেন, মৃতকে করতেন জীবিত। আর আকাশ থেকে তাঁর জন্য খাদ্য অবতীর্ণ হতো।

'ও পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁহাকে শক্তিশালী করিয়াছি' — এর ব্যাখ্যা আগে দেয়া হয়েছে। ইহুদী এবং নাসারারা তাঁর ব্যাপারে সীমালংঘন করতো। ইহুদীরা বলতো, তিনি অসৎ মায়ের সন্তান আর নাসারারা বলতো তিনি আল্লাহ্‌র সন্তান (আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যপ্রার্থী)।

'আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের পরবর্তীরা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পর পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইত না; কিন্তু তাহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিল। ফলে তাহাদের কতক বিশ্বাস করিল এবং কতক সত্য প্রত্যাখান করিল'—'আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে' একথায় আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছার সর্বময়তা প্রমাণিত হচ্ছে। তিনি হেদায়েতকারী, বিপথে পরিচালনকারী, ক্ষমাশীল, রোষসম্পন্ন, প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং করুণাময়। তাই তাঁর ইচ্ছার প্রতিফলনের কারণে মানুষও বিভিন্ন রকমের হয়। কেউ সত্যপথানুসারী। কেউ ভ্রষ্ট।

হজরত আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা সমস্ত সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাদের উপর নিক্ষেপ করেছেন নিজের নূর। সেই নূর যে পেয়েছে সে হেদায়েতপ্রাপ্ত, যে পায়নি সে ভ্রষ্ট। তাই আমি বলি, আল্লাহ্‌তায়ালার জ্ঞান অনুযায়ী কলমের লেখা শেষ। আহমদ ও তিরমিজি।

ইমাম বাগবী বলেন, একব্যক্তি হজরত আলী রা. কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমিরুল মুমিনিন! আমাকে তকদীরের বিষয়ে বলুন। তিনি জবাব দিলেন, এপথ দুর্জ্ঞেয়। অগ্রসর হয়োনা। সে পুনরায় একই কথার অবতারণা করলে তিনি বললেন, এ এক গোপন রহস্য। অনুসন্ধিৎসু হয়োনা। লোকটি আবারো তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। তখন তিনি বললেন, সে এক সুগভীর সমুদ্র। সেখানে প্রবেশ করতে চেয়োনা। মানুষের জ্ঞান গবেষণা এ বিষয়টিকে স্পর্শ করতে পারেনা। অতলান্ত সমুদ্রে ডুবে যাওয়া যেমন আত্মহনন বই কিছু নয়, তেমনি অদৃষ্টের অনুসন্ধানও নিশ্চিত ক্ষতিসাধন।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্ স. কে বলতে শুনেছি, অদৃষ্টের বিষয়ে যে বাক্যালাপ করবে, কিয়ামতের দিনে সে জিজ্ঞাসিত হবে। যে এব্যাপারে প্রশ্ন করবেনা, তাকেও প্রশ্ন করা হবে না। ইবনে মাজা।

হজরত উবাই ইবনে কাব বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক যদি আসমান ও জমিনের অধিবাসীদের শাস্তি দেন তবে তাকে জুলুম বলা যাবে না। যদি দয়া করেন তবে

www.eelm.weebly.com

তাঁর রহমত তাদের আমলের চেয়ে উত্তম হবে। অর্থাৎ কর্মফলই শাস্তিকে অপরিহার্য করে। আর অপরাধীকে শাস্তি দেয়া জুলুম নয়। তাঁর অনুগ্রহ নিছক অনুগ্রহই, যা আমলের মুখাপেক্ষি নয়। বরং আমলের প্রতিফলের চেয়ে তাঁর দান উৎকৃষ্টতর। উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা দান করলেও আল্লাহ্ কবুল করবেন না যদি তোমরা তকদীরে বিশ্বাসী না হও। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, যা নেই তা হবে না — এ বিশ্বাস ব্যতিরেকে অন্য বিশ্বাসসহ মৃত্যু হলে দোজখ অনিবার্য। হজরত ইবনে মাসউদ রা. এবং হজরত হুজায়ফাও এবিষয়টির বিবরণ দিয়েছেন। ফরমানে নববীতে হজরত জায়েদ বিন সাবেতও একথা বলেছেন। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

পুনরালোচনা

একথা নিশ্চিত যে, কিছুসংখ্যক নবী অন্যদের চেয়ে শ্রেয়তর ছিলেন, কিন্তু হজরত আবু সাঈদ ও হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন — আল্লাহ্‌র নবীদের মধ্যে একজনকে অন্যদের চেয়ে উৎকৃষ্ট মনে করোনা। অন্য বর্ণনায় আছে, একজনকে দ্বিতীয়জনের উপরে সম্মান দিয়ো না। বোখারী ও মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রার আর এক বর্ণনায় আছে, রসুল স. বলেছেন, আমাকে মুসার চেয়ে উত্তম মনে করোনা। অন্য এক হাদিসে রয়েছে, আমি বলিনা যে, কেউ ইউনুস বিন মুতই হতে উত্তম। বোখারী, মুসলিম।

রসুল স. বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালার বর্ণনা ব্যতিরেকে নিজ অভিমতে এক নবীকে অন্য নবীর উপরে সম্মান দেয়া বৈধ নয়। মর্যাদা নির্ভর করে সওয়াবের আধিক্য এবং আল্লাহ্‌তায়ালার অধিক নৈকট্যের উপর। মানুষের অভিমতে এর ফয়সালা হতে পারেনা। তবে কোরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলে তাঁদের সম্মানের মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে। বরং দলিল অকাট্য হলে মর্যাদা দেয়া জরুরী। দলিল অনুযায়ী নবী ছাড়াও অন্যান্যদের প্রতিও সঠিক ধারণা রাখতে হবে। এই নিয়মেই সাহাবী, তাবেয়ী ও ওলামাদের মর্যাদা নির্ণিত হলে ক্ষতি নেই। যে হাদিসগুলোতে এক নবীকে অন্য নবীর উপরে সম্মান দিতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলো সম্ভবত ওই সময়ের, যখন তিনি এ বিষয়ে জ্ঞাত হননি। আল্লাহ্‌তায়ালাই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা ঃ মোতাজিলাদের মত এই যে, বান্দার হিতসাধন আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য অপরিহার্য। আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হচ্ছে, আল্লাহ্‌তালার উপরে কোনোকিছুই অপরিহার্য নয়। সমস্ত কিছুই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন। সকল কিছু করার ক্ষমতা তাঁর আছে। যেমন — ভালো মন্দ, ইমান, কুফর ইত্যাদি। এই আয়াতই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের এই অভিমতের দলিল।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রা. বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, সমস্ত মানুষের অন্তর আল্লাহ্তায়ালার দুই আঙ্গুলের মধ্যে। তিনি যেমন চান সেভাবেই সকলের অন্তরকে ঘুরিয়ে দেন। এজন্যেই রসুল স. প্রার্থনা করেছেন, হে আমার অন্তর আবর্তনকারী। আমাদের অন্তরকে তোমার দিকে ঘুরিয়ে দাও। মুসলিম, আহমদ, তিরমিজি এবং ইবনে মাজা। ইবনে মাজা হজরত আনাস থেকে এবং ইমাম আহমদ হজরত আবু মুসা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫৪

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

❐ হে বিশ্বাসীগণ ! আমি যাহা তোমাদিগকে দিয়াছি তাহা হইতে তোমরা ব্যয় কর সেই দিনের পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকিবেনা। এবং সত্য প্রত্যাখানকারীগণই সীমালংঘনকারী।

'ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকিবে না' — এখানে না (আরবী লা) এর পর এবং সুরা ইব্রাহিমের দুটি শব্দে (সে দিন কোনো কেনাবেচা নেই, বন্ধুত্ব নেই) এবং সুরা তুরের দু'টি শব্দে (যাতে অসার বাক্য নেই এবং পাপকর্ম নেই) আবু আমর ও ইবনে কাসীর র. ফাতার পরিবর্তে তানবীন পড়েছেন (অর্থাৎ জবরের পরিবর্তে দুই পেশ পড়েছেন)। আসল ব্যবহার এ রকমই। কোনো কোনো ক্বারী প্রত্যেক স্থানে 'লা'এর পরে 'পেশ' এর স্থলে 'তানবীন' পড়েছেন। কেননা এগুলো হচ্ছে উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নগুলো হলো, সেদিন কেনাবেচা, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ হবে কি? উত্তর হচ্ছে, না। কেনাবেচা হবে না। বন্ধুত্ব হবে না। সুপারিশও হবে না।

'সত্য প্রত্যখ্যানকারীগণই সীমালংঘনকারী' — সীমালংঘনকারী কাফেররা অপাত্রে উপাসনা করে এবং অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন করে। তারা আল্লাহতায়ালার নির্দেশ লংঘনকারী। আযাবের উপযোগী। আত্মঅত্যাচারী। অতএব, হে ইমানদারগণ ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না। এই আয়াতে 'কাফিরূনা' শব্দটির দ্বারা ঐ কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা ফরজ জাকাতকে অস্বীকার করে। বায়যাবী র. লিখেছেন, এখানে কাফিরূন উদ্দেশ্য জাকাত দিতে অস্বীকৃত ব্যক্তি। জাকাত অস্বীকার করা কুফুরী। যেমন হজ অস্বীকার করাও কুফরী।

www.eelm.weebly.com

হজরত ওমর রা. বলেছেন, রসুল স. এর তিরোধানের পর আরবের কিছুসংখ্যক লোক কাফের অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে গেলো। তারা বললো, আমরা জাকাত দেবো না। হজরত আবু বকর রা. বললেন, তোমরা উটের সামান্য রশি দিতে অস্বীকার করলেও আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো। আমি বললাম, আপনিতো রসুল স. এর স্থলাভিষিক্ত। মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার করুন। হজরত আবু বকর বললেন, মূর্খতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। দুর্বলতামুক্ত হও। ওহি বন্ধ হয়েছে। দ্বীন পূর্ণ হয়েছে। আমার নিকটে এসে কি দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হবে?

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫৫

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

❑ আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, অনাদি, স্বাধিষ্ঠ, বিশ্বধাতা। তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার। কে সে যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে? তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না। তাঁহার আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত; ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না; তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।

'আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নাই। তিনি চিরঞ্জীব'—অর্থাৎ আল্লাহ্ই একমাত্র উপাসনার উপযুক্ত। তিনি ছাড়া কেউ ইবাদত গ্রহণ করতে পারে না। তাঁর জ্ঞান, শ্রুতি, অলৌকিকত্ব, অভিলাষ — সকল গুণাবলীই তাঁর সত্ত্বানির্ভর। তিনি সর্বময় বৈশিষ্টমণ্ডিত। সদা বিদ্যমান। সদা বিদ্যমান ছিলেন। সদা বিদ্যমান আছেন। সদা বিদ্যমান থাকবেন। স্থান কাল পাত্রের ক্ষতি তাঁকে ছুঁতে (স্পর্শ করতে) পারে না। অমরতাই তাঁর সমস্ত গুণাবলীকে পূর্ণ করেছে।

www.eelm.weebly.com

'ক্বাইউম' (চিরঞ্জীব) অর্থ নিজ সত্ত্বায় বিদ্যমান থাকা এবং অন্যকে বিদ্যমান রাখা। আমর ইবনে মাসউদ উচ্চারণ করতেন 'আল ক্বিইয়ামু'। অল কামার পড়তেন 'আল ক্বাইয়িমু'। ইমাম বাগবী লিখেছেন, এগুলোরও অর্থ একই। 'ক্বিইয়ামু' অর্থ দৃষ্টিদানকারী (ইবনে মুজাহিদ)। অথবা সমস্ত কিছুর আমলের হেফাজতকারী (কালবী)। ক্বাইউম এর অর্থ ওই সমস্ত কার্যাবলী যা শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পাদিত হয়। হজরত আবু ওবায়দা রা. বলেছেন, ক্বইউমের অর্থ যার ধ্বংস নেই। বায়যাবী লিখেছেন, ক্বইউম এর অর্থ যা সবসময় সৃষ্টিকে সুসংগতরূপে রক্ষা করে। সুয়ুতী র. বলেছেন, যা সবসময় স্থায়ী থাকবে। আমি বলি, এসমস্ত কথার সম্মিলিত অর্থ এরকম — আল্লাহ্ ধ্বংসশীল নন। তিনি তাঁরই অস্তিত্বনির্ভর। তিনি সকল কিছুর সংরক্ষণকারী। অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দানকারী। তিনি ব্যতীত কেউ স্থায়ী থাকবে না। সৃষ্টি অস্তিত্ব, স্থায়িত্বের জন্য তাঁরই মুখাপেক্ষী। কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। প্রত্যেকের ছায়া যেমন মূলবস্তুর মুখাপেক্ষী। তাঁর চেয়েও বেশী মুখাপেক্ষী সৃষ্টি, তাঁর প্রতি।

'তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করেনা' — তন্দ্রা হচ্ছে নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব যা মস্তিষ্ককে অসাড় করে দেয়। আর নিদ্রা ওই অক্ষম অবস্থা যখন অনুভূতি অপসৃত হয়।

হজরত আবু মুসা আশআরী বলেন, রসুলে পাক স. একদিন আমাদের সম্মুখে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করলেন — আল্লাহ্ শয়ন করেন না। শয়ন করা তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত নয়। তিনি মিজানকে উঁচু নিচু করান। রাতের পূর্বে দিনের এবং দিনের পূর্বে রাতের কার্যাবলী তাঁর সামনে উপস্থিত করা হয়। তাঁর নূর পর্দা আবরিত। পর্দা উঠে গেলে তাঁর সৌন্দর্যরাজি দৃষ্টিকে বিপন্ন করবে। মুসলিম।

'আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার' — এই কথা আল্লাহ্পাকের একত্ববাদের দলিল। তিনি এসবকে কায়েম রেখেছেন। আকাশ ও পৃথিবী বিদ্যমান রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার জন্যই। আর তিনি স্বয়ং বিদ্যমানতা।

'কে সে যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে' — এখানে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর সত্ত্বার পরাক্রম প্রকাশ করেছেন। কার সাধ্য এই পরাক্রমের মোকাবেলা করে ?

'তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত' — অর্থাৎ অগ্র পশ্চাতের সমস্তকিছুই তিনি জ্ঞাত। মানুষের জ্ঞান কিন্তু এরকম নয়। তাঁদের কাছে কিছু বিষয় প্রকাশ্য আর কিছু বিষয় গোপন। আর আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান সমস্ত কিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে। সমস্তকিছুর অর্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু। জ্ঞানী ও অজ্ঞ সবাই এর অন্তর্ভূক্ত। কে আছে এমন—এই কথার ইঙ্গিত। জ্ঞানীগণের মধ্যে শামিল রয়েছেন নবী এবং ফেরেশ্তাগণ।

www.eelm.weebly.com

'যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না'–কোনো জ্ঞান তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না। সর্বপরিবেষ্টিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্যই। কামেল ব্যক্তিগণের জ্ঞানও এ রকম নয়। এখানে জ্ঞান বলতে এলমে গায়েবকে বোঝানো হয়েছে যা কেবল আল্লাহতায়ালার জন্যই বিশিষ্ট। এখানে কারো কোনো অংশ নেই। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্‌তায়ালা যাকে যতটুকু জ্ঞান দান করতে চান, সে ততটুকুই পায়। অন্যস্থানে আল্লাহপাক উল্লেখ করেছেন 'এবং আমি তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞান দিয়েছি।'

'তাঁহার আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত।'-ইমাম বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহতায়ালার পরাক্রম প্রকাশই এ বাক্যের উদ্দেশ্য। অন্যথায় তাঁর আসনও নেই এবং তিনি আসনে উপবেশনকারীও নন। হজরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের রা. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের মতে আসন হচ্ছে এলেম (জ্ঞান)। মুজাহিদের মতও তাই। কতিপয় আলেম 'আসন' অর্থ নিয়েছেন আল্লাহতায়ালার অলৌকিক রাজত্ব। আমি বলি আসন অর্থ, এলেম ও অলৌকিকত্ব দুইই। এই আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহতায়ালার অলৌকিকত্ব এবং শেষাংশে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে। মুহাদ্দিসগণের সুবিখ্যাত বর্ণনা হলো, আসন দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতা বিশিষ্ট।

হজরত আবু হোরায়রা বলেন, আসন (কুরসী) হচ্ছে আরশের ছাদ যা আকাশ ও জমিনের সমান প্রশস্ত।

ইবনে মারদুবিয়া হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত রসুল স. বলেছেন, সাত আকাশ ও সাত জমিন কুরসীর তুলনায় এ রকম, যেমন প্রকান্ড প্রান্তরে পড়ে থাকা একটি আংটি। আরশের তুলনায় কুরসীও তদ্রূপ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, কুরসীর নিকট সাত আকাশ এরকম, যেনো ঢালের মধ্যে সাতটি দেরহাম।

হজরত আলী ক. ও হজরত মুকাতিল রা. বর্ণনা করেন, কুরসীর প্রতিটি স্তম্ভ সপ্ত আকাশ ও সপ্ত জমিনের সমান। কুরসী আরশের সামনে আছে। চারজন ফেরেশতা এর বাহক। তাঁদের চারটি করে মুখ। তাঁদের পা স্থাপিত রয়েছে সপ্তজমিনের নিচে পাথরের উপর। এক ফেরেশতা হতে আরেক ফেরেশতার ব্যবধান পাঁচশত বৎসরের পথ। একজনের চেহারা হজরত আদম আ. এর মতো। তিনি মানুষের রিজিকের জন্য দোয়া করতে থাকেন। দ্বিতীয় জনের চেহারা চতুষ্পদ প্রাণীর মতো অথবা গাভীর মতো। তিনি দোয়া করতে থাকেন চতুষ্পদ জন্তুর রিজিকের জন্য। যখন বাছুরের পূজা করা হয় তখন তাঁর মুখ মলিন হয়ে যায়। তৃতীয় ফেরেশতার আকৃতি সিংহের মতো। হিংস্র জানোয়ারের রিজিকের জন্য দোয়া করাই তাঁর কাজ। চতুর্থ ফেরেশতার অবয়ব শকুনের মতো। পাখিদের

www.eelm.weebly.com

রিজিক প্রার্থনাই তাঁর কাজ। বিভিন্ন হাদিসে এসেছে, আরশ ও কুরসী বহনকারীদের মধ্যে সত্তুরটি নূরের এবং সত্তুরটি অন্ধকারের পর্দা আছে। প্রতিটি পর্দা পাঁচশত বছরের। পর্দাসমূহ না থাকলে কুরসী বহনকারীগণ আরশবহনকারীদের নূরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। প্রকৃত পক্ষে কুরসী এমন স্থান যাতে উপবেশন করা যায়। প্রশস্ত স্থানকে কুরসী বলা যায় না। কিন্তু কুরসী ও আরশ আল্লাহতায়ালার জন্যই বিশিষ্ট। অন্য কারো জন্য শব্দ দু'টি প্রযোজ্য হতে পারে না। অন্য একটি আয়াতের উল্লেখ এ রকম, 'অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন সাতটি আকাশ'—এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় আমরা লিখেছি আরশ বৃত্তাকার। হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, কুরসী আকাশসমূহকে বেষ্টন করে আছে এবং কুরসীকে বেষ্টন করে আছে আরশ। আর এক আকাশকে বেষ্টন করে আছে অন্য আকাশ। প্রত্যেক আকাশ গোলাকার। এ জন্য বিভিন্নজন বলেছেন, অষ্টম আকাশ কুরসী এবং নবম আকাশ আরশ। কিন্তু আল্লাহতায়ালা আকাশের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন সাতটি। আরশ ও কুরসীকে তিনি আকাশ বলেননি। সম্ভবত এর কারণ এই যে, আরশ কুরসী এবং আকাশের হকিকত পৃথক। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

'ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না' — আকাশ, পৃথিবী, কুরসী এবং কুরসী যে সমস্ত কিছুকে বেষ্টন করে আছে সে সমস্তের সংরক্ষণে তিনি ক্লান্ত নন। বিব্রতও নন। তাঁর জ্ঞান, পরাক্রম, স্থায়িত্ব এই আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ ইউনানী ও মিসরীয় আলেমগণ বলেন, পৃথিবী গোল। পেঁয়াজের মতো। যার পরত রয়েছে তেরটি। উপরের পরত ভিতরের পরতকে বেষ্টন করে আছে। নবম আকাশটি অত্যন্ত চাকচিক্যপূর্ণ। তার নিচে অষ্টম আকাশে রয়েছে স্থির তারকারাজি। তার নিচের সপ্তম আকাশের তারকাসমূহ ধীরগতিসম্পন্ন। ষষ্ঠ আকাশে রয়েছে একটি তারা। পঞ্চম আকাশে মঙ্গল গ্রহ এবং চতুর্থ আকাশে রয়েছে সূর্য। তৃতীয় আকাশের তারাটির নাম জোহরা, যে নামের রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের পদস্খলন ঘটেছিলো। দ্বিতীয় আকাশে আছে বুধ গ্রহ। আর চাঁদ ওঠে প্রথম আকাশে। এই আকাশই আমাদের নিকটতম। নবম আকাশের নিচে রয়েছে গোলাকৃতির আগুন। তার নিচে গোলাকৃতির বাতাস। তার নিচে পানি। তার নিচে জমিন। এই জমিনই পৃথিবীর কেন্দ্র। মিথ্যাকে আশ্রয় করে কোনো কোনো পন্ডিত আকাশগুলোকে চিরন্তন বলেছেন। কিন্তু ইসলামী আলেমগণ ইউনানী দার্শনিকদেরকে স্বীকার করেন নি।

দার্শনিকেরা কিছুসংখ্যক হাদিসকে তাদের অভিমত প্রমাণ করার কাজে ব্যবহার করেছে। তারা আরো বলে, আকাশগুলো চিরন্তন। এগুলো আল্লাহ্তায়ালার সমসাময়িক। আর আগুন পানি মাটি বাতাস বিনাশশীল নয়। এ রকম বিশ্বাস ও চিন্তা কোরআনের ব্যাখ্যার অনুকূল নয়। কোরআনের আংশিক অথবা বিপরীত অর্থ

www.eelm.weebly.com

করা কোরআন অবমাননার নামান্তর। ওই সমস্ত দার্শনিকেরা বিশ্বাসভাজন নয়। তারা একজন অপরজনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তারা কল্পনাবিলাসী। বর্তমানের বিজ্ঞানীরা আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। বলে, আকাশ নেই। কখনো বলে, আকাশ দশকোটি কখনো ত্রিশ কোটি। কখনো বলে, আকাশ চল্লিশ কোটি জরদা রঙের শূন্যস্থান। স্বাভাবিক সৃষ্টিকৌশলে ঝুলন্ত। উঁচু নীচু যা কিছু দৃষ্ট হয়, প্রকৃতপক্ষে তা চিহ্নহীন। এসবের দূরত্ব এতো বেশী যে বেষ্টন অসম্ভব। সূর্য, পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ এ সমস্ত গোলাকার। এগুলো আবর্তনশীল। কোনোটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। কোনোটি বৃহৎ। বিজ্ঞানীরা এমন নয় যে তাদের মতের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু কোরআন অপরিবর্তনীয়।

হজরত আবু জর রা. হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, কুরসীর বেষ্টন কোরআনের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। গবেষণা দ্বারা নয়। কুরসী হচ্ছে আল্লাহতায়ালার পরাক্রমের প্রকাশ। আকাশগুলো কুরসীর কাছে এতো ছোট যেমন ঢালের মধ্যে সাতটি আঙটি অথবা প্রান্তরে পড়ে থাকা কোনো ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয়। কুরসীর বেষ্টন কি আকৃতিসম্ভূত। নাকি অলৌকিকতাচ্ছাদিত। নাকি জ্ঞানাবৃত। না হুকুম ও ইচ্ছাবরিত–তা অনুমান সাপেক্ষ নয়। ইমানদারদের অন্তরগুলো আল্লাহ রহমানের দুই আঙ্গুলের মধ্যে — এ অবস্থাটিও অননুমানীয়। যা সম্ভব নয় দার্শনিকেরা তাই করতে চেষ্টা করেছে। তাই তারা ভ্রষ্ট। অতএব এই ফকিরের দৃষ্টিতে প্রকৃত পথ এই যে, নিজেদের অভিমতানুসারে কোরআন মজিদ ও হাদিস শরীফের ব্যাখ্যাগুলোকে যেনো মেলানোর চেষ্টা করা না হয়। হ্যাঁ, যদি কোনো দার্শনিক কোরআনের ব্যাখ্যায় নির্ভর করে তবে তাতে দোষ নেই।

'তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ' — আল্লাহতায়ালাই শ্রেষ্ঠ ও মহান। কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়। মর্যাদার দিক থেকে নয়। গুণের দিক থেকেও নয়। প্রশংসাকারীগণ তাঁর প্রশংসা করে। গুণ বর্ণনাকারীগণ গুণকীর্তন করে। কিন্তু তিনি তাদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন অপেক্ষা উচ্চ।

তাঁর মর্যাদা কেবল তাঁর জন্যই শোভনীয়। তিনি এমনই মহান যা সৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই আয়াতে (আয়াতুল কুরসীতে) আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বের বর্ণনা আছে, কিছু গুণাবলীরও বর্ণনা আছে। আছে হায়াত (জীবন) এর অনুসরণে এলেম, কুদরত, ইচ্ছা, শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি এবং বাকশক্তি — এসব গুণাবলীর বর্ণনা। তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তাদেরকে রক্ষা করছেন। কিন্তু সৃষ্টি তাঁর সঙ্গী নয়। কোনো কোনো আলেম বলেন, পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর দিকে মুখ করে আছে, কিন্তু তারা আল্লাহর সাথে মিলিত নয়। আল্লাহর সঙ্গে সৃষ্টির সঙ্গতা এবং মিলনের ধরন আমরা অবগত নই। আল্লাহ আমাদের শাহরগের চেয়েও নিকটে। কিন্তু এই নৈকট্য আমাদের বোধবহির্ভূত। স্থান ও বস্তুর নৈকট্য থেকে তিনি

www.eelm.weebly.com

পবিত্র। তাদের দুর্বলতা হতেও মুক্ত। তিনি সকল কিছুর মালিক। তিনি কঠিন হাতেধারণকারী, প্রতিশোধ গ্রহণে কঠোর। তাঁর অনুমোদন ব্যতিরেকে সুপারিশও উপস্থাপিত হতে পারে না। তাঁর অসীম জ্ঞান আমাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে। কোনোকিছু তাঁর হিকমত, কুদরত বহির্ভূত নয়। নির্দেশদান তাঁর পক্ষে কঠিন ও কষ্টকর নয়। কারো ব্যস্ততা তাঁকে অমনোযোগী করতে সক্ষম নয়। অনপযুক্ততা থেকে তিনি পূত-পবিত্র। তিনি প্রশংসার অতীত।

রসুলে পাক স. কিয়ামতের দিনে যাঁর হাতে থাকবে প্রশংসার পতাকা; তিনিও আল্লাহতায়ালার উপযোগী প্রশংসা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রার্থনায় বলেছেন, তুমি তেমনই যেমন তোমার বর্ণনা। মহান আল্লাহর তুলনায় সবকিছু অত্যন্ত নিকৃষ্ট। তাঁর মহত্ত্বের সম্যক ধারণা সৃষ্টি জানে না। তাঁর উপযোগী ইবাদতও করতে পারে না। রসুলে পাক স. বলেছেন, আমরা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ইবাদত করতে পারি না। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রসুল, কোরআনের সবচেয়ে মর্যাদামণ্ডিত আয়াত কোনটি? তিনি বললেন, আয়াতুল কুরসী। তারপর বলা হলো, সবচেয়ে সম্মানিত সুরা কোনটি। তিনি বললেন, সুরা এখলাস। দারেমী। হজরত উবাই ইবনে কাব বলেন, আবুল মুনজার রসুলে পাক স. কে যখন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসুল, সবচেয়ে সম্মানিত আয়াত কোনটি? তিনি বললেন, আয়াতুল কুরসী। তারপর তিনি তাঁর বুকে হাত রেখে দোয়া করলেন, তোমার বরকতপূর্ণ জ্ঞানার্জন হোক। তারপর রসুলে পাক স. বললেন, ওই জাত পাকের কসম, আমার জীবন যাঁর হাতে, আল্লাহ তায়ালার আরশের পায়ের কাছে এক ফেরেশতা এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার পবিত্রতা ঘোষণা করছে। আর আলমে মেসালেও ফেরেশতাগণ এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার প্রশংসা জ্ঞাপন করেন (জড় জগত ও রুহের জগতের প্রকাশিতব্য বিষয়সমূহ আলমে মেসালে বিদ্যমান)। ইবনে মারবিয়া, ইবনে মাসউদ এবং ইবনে রাহবিয়া তাঁদের সনদে হজরত আউফ বিন মালেক থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক বর্ণনা করেছেন হজরত আবুজর গিফারী থেকে। হজরত আবু হোরায়রা মারফু হাদিসে বর্ণনা করেন, আয়াতুল কুরসী কোরআনের আয়াতের সরদার। তিরমিজি, হাকেম।

হজরত আনাস রা. বলেন, আয়াতুল কুরসী সওয়াবের দিক দিয়ে কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। আহমদ।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী এবং হা মীম, তানযিলুল কিতাবি মিনাল্লাহিল আযিযিল আলীম-এই আয়াত দু'টি দিনে পাঠ করে, সে সমস্ত দিন আল্লাহতায়ালার

www.eelm.weebly.com

হেফাজতে থাকে। আর যে ব্যক্তি রাতে পাঠ করে, সে সমস্ত রাত হেফাজতে থাকে। তিরমিজি, দারেমী।

হজরত আবু হোরায়রা আরো বলেন, রসুলে পাক স. আমাকে জাকাতের মালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রাতে এক ব্যক্তি মাল চুরি করতে এলো। আমি তাকে ধরে ফেললাম। বললাম, তোমাকে রসুলুল্লাহ্র কাছে নিয়ে যাবো। সে বললো, আমি ছেলেমেয়েদের কারণে একাজে প্রবৃত্ত হয়েছি। আমার দয়া হলো, আমি তাঁকে ছেড়ে দিলাম। সকালে আমি যখন রসুল স. এর খেদমতে হাজির হলাম তখন তিনি বললেন, আবু হোরায়রা তোমার বন্দি কোথায়? আমি বললাম, সে তাঁর ছেলেমেয়েদের দুঃখকষ্টের কথা বলেছিলো, তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সাবধান হও। সে মিথ্যা বলেছে। কাল সে আবার আসবে। আমি অপেক্ষায় রইলাম। সে এলো। আমি তাকে আবার ধরে ফেললাম। সে আবারো তার দুঃখ দুর্দশার কথা জানালো। আমি আবারো তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে রসুল স. ওই কথাই বললেন যে কথা তিনি প্রথমে বলেছিলেন। সে কিন্তু তৃতীয়বারও চুরি করতে এলো। আমি বললাম, দুই দুই বার তুমি চুরি করতে আসবে না বলেছো, তবু এলে। এখন আমি অবশ্যই তোমাকে রসুল স. এর কাছে নিয়ে যাবো। সে বললো, আমি তোমাকে কতকগুলো বাক্য শেখাবো যা তোমার উপকারে আসবে। শয্যাগ্রহণের সময় আয়াতুল কুরসী পড়ো। আল্লাহতায়ালা তোমার জন্য হেফাজত নির্ধারণ করবেন। ফলে সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। একথা শুনে আমি তাকে মুক্তি দিলাম। সকালে আমি রসুল স. এর খেদমতে হাজির হলে তিনি বললেন, রাতের কয়েদী কোথায়? আমি বললাম, সে আমাকে এমন কতগুলো বাক্য শিখিয়েছে, যাতে আমার উপকার হয়। রসুল স. বললেন, সে মিথ্যুক। কিন্তু সে তোমাকে যা শিখিয়েছে তা সত্য। তুমি জানো ঐ লোকটি কে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সে শয়তান। বোখারী, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান।

রসুল স. এরশাদ করেন, ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে মৃত্যু ব্যতীত আর পর্দা নেই। অন্য বর্ণনায় আছে, শয্যাগ্রহণের সময় আয়াতুল কুরসী পাঠকারী এবং তার প্রতিবেশীগণ নিরাপদ থাকে। শো'বুল ইমান কিতাবে ইমাম বায়হাকী হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি নামাজের পরে আয়াতুল কুরসী পড়ে নামাজের সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত সে হেফাজতে থাকবে এবং তার প্রতি রসুল স. অথবা কোনো সিদ্দিক বা কোনো শহীদ খেয়াল রাখবেন।

www.eelm.weebly.com

'মোজালেস' গ্রন্থে হজরত হাসান লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, জিব্রাইল আমাকে বলেছেন, শয়তান নারীরূপে তোমাদেরকে ধোঁকা দিতে উদ্যত হয়, তাই শয্যাগ্রহণের সময় আয়াতুল কুরসী পড়ে নিও।

'ফেরদাউস' পুস্তকে হজরত কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে, অশান্তির সময় আয়াতুল কুরসী পড়লে আল্লাহ্ সাহায্য করেন।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমর একদিন বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে বলে দিতে পারে সবচেয়ে মর্যাদামণ্ডিত, সবচেয়ে অনুগ্রহজ্ঞাপক এবং ভীতিপ্রদ ও সবচেয়ে আশাদায়ক আয়াত কোনটি?

হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, অত্যধিক মর্যাদামণ্ডিত আয়াত হচ্ছে — 'আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নাই তিনি চিরঞ্জীব।' সবচেয়ে অনুগ্রহজ্ঞাপক আয়াত 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক (সমগ্র মানবকে) সৎকার্য করতে, হিতসাধন করতে, আত্মীয় স্বজনদের প্রতি দান ধ্যান করতে নির্দেশ দিয়েছেন' সবচেয়ে ভীতিপ্রদ আয়াত 'সে দেখতে পাবে তাই, অনু পরিমাণ পুণ্য অথবা অনু পরিমাণ অন্যায়, যা সে করে' আর সর্বাধিক আশাপ্রদ আয়াতটি হচ্ছে 'আপনি বলে দিন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছো ..... ।'

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫৬

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

❒ দ্বীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নাই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করিবে ও আল্লাহে বিশ্বাস করিবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরিবে যাহা কখনও ভাঙ্গিবেনা। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।

'দ্বীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নাই' — আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে হাব্বান হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, ইসলাম প্রচারের পূর্বে মদীনার যে মহিলাদের সন্তান জীবিত থাকতো না, তারা মান্নত করতো, আমার সন্তান জীবিত থাকলে তাকে ইহুদী বানাবো। আনসার গোত্রের মহিলারা এরকম করতো।

যখন বনু নাজির ইহুদীদেরকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়, তখন তাদের সঙ্গে ছিলো আনসারদের কিছু সন্তান যারা ইহুদী হয়ে গিয়েছিলো। আনসারগণ

www.eelm.weebly.com

বললো, এরা আমাদের সন্তান। আমরা এদেরকে তোমাদের সঙ্গে যেতে দেবোনা। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। আয়াত নাজিলের পর রসুল স. বললেন, তোমরা তাদেরকে তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দাও। যদি তারা তোমাদের সাথে থাকতে চায়, থাকবে। আর যদি ইহুদীদের সঙ্গে থাকতে চায়, তবে তাদের সঙ্গে চলে যাবে।

মুজাহিদ র. বলেন, আউস গোত্রের কিছু লোক তাদের সন্তানদেরকে ইহুদীদের দ্বারা দুধ পান করাতো। ইহুদীদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার সময় তারা বললো, আমরাও চলে যাবো। অথবা কমপক্ষে তাদের ধর্মভূক্ত হবো। সন্তানদের অভিভাবকগণ বাধা দিলে এই আয়াত অবতীর্ন হয়। ইবনে জারীর, সাঈদ অথবা ইকরামার মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, সালেম বিন আউফ গোত্রের আনসারীদের এক ব্যক্তির নাম ছিলো হোসাইন। তার দুই ছেলে খৃষ্টধর্মাবলম্বী ছিলো। কিন্তু তিনি হয়ে গেলেন মুসলমান। তিনি রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, আমার দুই ছেলে খৃষ্টান। আমি কি তাদেরকে জোর করে মুসলমান বানাবো? এসময় এই আয়াত নাজিল হয়।

এই আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হলো, জোর করে কাউকে ইমান দেয়া যায় না। কারণ, ইমান অন্তরের ব্যপার। ইমান ও অন্যান্য ইবাদতের আদেশ পরীক্ষামূলক। যেমন আল্লাহ্ বলেন, 'যেনো তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে উত্তম আমল করে।' আমলের বিষয়টি এখলাস নির্ভর। অন্যস্থানে আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমরা খাঁটি মনে (এখলাসের সঙ্গে) আল্লাহর ইবাদত করো, এটাই সঠিক ধর্ম।' জবরদস্তি করে এখলাস অথবা পরীক্ষা কোনোটাই সম্পন্ন হতে পারে না। এই হুকুমটি কি কতিপয় লোকের জন্য না সাধারণভাবে সকলের জন্য প্রযোজ্য? এর উত্তরে কোনো কোনো আলেম বলেন, এই আয়াত আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদীদের জন্যই নির্ধারিত। কেননা আনসারদের ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী সন্তানদের উদ্দেশ্যে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

আমি বলি, এই হুকুম সাধারণ। কোনো কোনো আলেম বলেন, 'মুশরিকদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করো' এবং 'কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো' — আল্লাহ্তায়ালার এই হুকুম দ্বারা উক্ত আয়াতটি রহিত হয়েছে। বাগবী এবং হজরত ইবনে মাসউদ এরকমই বলেছেন।

আমি বলি, রহিত ওই সময়ে হতে পারে, যখন দুটি হুকুমের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। কিন্তু এখানে একটি আয়াত অপরটির প্রতিদ্বন্দী নয়। যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য বলপূর্বক ইমানদার বানানো নয়। বরং পৃথিবীতে অশান্তি ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ দূর করার জন্যই জেহাদ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্পাক চান মানুষ সহজ সরল পথে চলুক এবং তাঁর ইবাদত করুক। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কাফেররা হিংস্র সাপ

www.eelm.weebly.com

বিচ্ছু ও উন্মাদ কুকুরের মতো। তাই তাদেরকে হত্যা করতে বলা হয়েছে। এজন্যই আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের উপর জিজিয়া কর বিধিবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, 'যে পর্যন্ত তারা অধীনতা স্বীকার না করে এবং প্রজারূপে জিজিয়া কর দিতে সম্মত না হয়' । রসুলুল্লাহ্ স. শিশু, নারী, সহায়-সম্বলহীন, দুনিয়াত্যাগী আলেম, অচলব্যক্তি এবং অন্ধকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ তারা অশান্তি ও ধবংসাত্মক কার্যকলাপ করতে পারে না।

'সত্যপথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে' — রসুলে পাক স. এর মোজেজাসমূহ এবং সুস্থ বিবেক সাক্ষী দেয় যে, ইমানই সরল সঠিক পথ। যা স্থায়ী এবং পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছায়। আর কুফরের পথ বঙ্কিম। যার গতি অন্যায়ের দিকে। এখন আর ওজর আপত্তি চলবে না। বলপ্রয়োগের আর প্রয়োজন নেই।

বায়যাবী এই আয়াতের ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন যে, বলপ্রয়োগের অর্থ কাউকে দিয়ে এমন কাজ করানো যাতে তার কল্যাণ রয়েছে। দ্বীন কেবলই কল্যাণ। এবং কল্যাণ ভ্রষ্টতা থেকে অবশ্যই পৃথক। জ্ঞানীদের সামনে হেদায়েত প্রকাশ করা হয়েছে। এখন মুক্তিকামী ও সৎকর্মান্বেষণকারী হেদায়েত কবুল করার দিকে অগ্রসর হবে। এটাই স্বাভাবিকতা। কাজেই বল প্রয়োগের প্রয়োজন অবান্তর।

বায়যাবীর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, প্রকৃত জ্ঞানী দ্বীনের মধ্যে কল্যাণ দেখতে পায়। আর বিকৃত জ্ঞানধারীরা তাদের বক্রদৃষ্টির কারণে ইমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

'যে তাগুতকে অস্বীকার করিবে ও আল্লাহে বিশ্বাস করিবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরিবে যাহা কখনও ভাংগিবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়' — তাগুত অর্থ হচ্ছে অন্যান্য উপাস্যসমূহ অথবা ওই সমস্ত উপাস্য যাদের উপাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহিলাকৃতির শয়তান হোক অথবা মানুষ। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহকে এমনভাবে মেনে নেয় যেভাবে মানতে বলেছেন রসুল পাক স., তারাই দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে মজবুত হাতল অথবা মজবুত রশি। স্মর্তব্য যে, রসুলে পাক স. কে মান্য করা ব্যতীত অথবা তাঁর নির্দেশনা থেকে সরে এসে আল্লাহকে বিশুদ্ধভাবে মানা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

হজরত আবু দারদা রা. বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন,-আমার পরে আবু বকর এবং ওমরকে অনুসরণ করাই মজবুত রশিকে ধারণ করা। যে রশি ছিঁড়বে না।

'আল্লাহ সর্ব শ্রোতা, প্রজ্ঞাময়' — যারা তোমরা সত্যের প্রতি আহবান জানাচ্ছো এবং যাদের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে, সকলের কথাই আল্লাহ পাক

www.eelm.weebly.com

শোনেন এবং সকলকেই জানেন। অর্থাৎ তোমরা কতটুকু আগ্রহের সঙ্গে ইমান গ্রহণ করেছো সে সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। এই আয়াতের দ্বারা আমল ও ইচ্ছাকে বিশুদ্ধ করতে এবং অবিশ্বাস ও অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে।

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫৭

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۬ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۟

❑ যাহারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তাহাদের অভিভাবক তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোকে লইয়া যান। আর যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাগুত তাহাদের অভিভাবক, ইহারা তাহাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়। উহারাই অগ্নি অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

ইমানদারদের বন্ধু ও পরিচালক আল্লাহ্। তিনি তাদেরকে সাহায্য করেন। প্রবৃত্তির অন্ধকার, কুমন্ত্রণা এবং কুফরী থেকে বের করে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। যে পথে রয়েছে ইমান। ওয়াকেদি লিখেছেন, কোরআনের বিভিন্নস্থানে উল্লেখিত অন্ধকার ও আলোর অর্থ হচ্ছে কুফর ও ইমান। কেবল সুরা আনআমে উল্লেখিত অন্ধকার ও আলোর অর্থ হচ্ছে রাত এবং দিন। এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় ইমান অর্জন করা যায় না। এ নিছক আল্লাহর দান। ইমান অস্বীকারকারীদের বন্ধু শয়তান। এই শয়তান জ্বিন ও মানুষ উভয়ই হতে পারে। মানুষরূপী শয়তানদের মধ্যে কাব ইবনে আশরাফ এবং হুয়াই ইবনে আখতাব ইহুদীদ্বয়ও ছিলো। তাগুত অর্থ সকল ভ্রষ্টতা। প্রবৃত্তির প্ররোচনা হোক অথবা শয়তানি কুমন্ত্রণা। কাফেররা মনে করে এসব তাদের বন্ধু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো তাদের দুশমন। কাফেরদের তথাকথিত বন্ধুরা তাদেরকে নূর থেকে বহিষ্কৃত করে। সন্দেহে পতিত করায়। প্রবৃত্তিপূজায় লিপ্ত করে এবং অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।

হজরত আবু হোরায়রা বলেন, রসুলে পাক স. বলেছেন, মানব সন্তান ইসলামী স্বভাবের উপর জন্ম নেয়। তারপর তাদের পিতামাতা তাদেরকে ইহুদী, খৃষ্টান এবং অগ্নি উপাসক বানায়। বোখারী, মুসলিম।

ইবনে জারীর, হজরত উবাদা বিন আবী লুবাবা রা. থেকে বর্ণনা করেন, এখানে কাফের অর্থ ওই সমস্ত খ্রিস্টান যারা হজরত ঈসা আ. কে মেনে নিয়েছিলো, কিন্তু রসুল স. কে মানেনি।

www.eelm.weebly.com

তাগুতই মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এই বের করার সম্পর্ক আল্লাহর কুদরত এবং ইচ্ছার সঙ্গে নেই। জানা দরকার যে, আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছা ছাড়া সৎ অসৎ কোনো কাজই সংঘটিত হতে পারে না। কিন্তু অসৎ কাজ সংঘটনের কারণ হচ্ছে শয়তান। তাগুত শব্দের দ্বারা স্ত্রী, পুরুষ, এক বচন, বহুবচন সবই বোঝায়।

ইবনে জারীর মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন, কিছু লোক হজরত ঈসা আ. এর উপর ইমান এনেছে কিন্তু রসুল স. এর উপর আনেনি। আবার কিছু লোক হজরত ঈসা আ. এর নবুয়তকে অস্বীকার করেছে, কিন্তু মেনে নিয়েছে রসুলে পাক স. এর নবুয়তকে। এই দুই দল সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

তাফসীরে কবীরে তিবরানী এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেন, এই আয়াত ওই সকল লোকের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হজরত ঈসা আ. এর উপর ইমান আনলেও রসুলে পাক স. এর উপর ইমান আনেনি।

'উহারাই অগ্নি অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে' — এই কথায় কাফেরদেরকে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে, কিন্তু মুমিনদের সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি। ইমানদারদের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ তাই ইতোপূর্বে আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক, একথা বলে দেয়া হয়েছে। নতুন করে আর সাহায্য ও প্রতিদান প্রদানের কথা আসে না।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫৮

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

❑ তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখ নাই, যে ইব্রাহীমের সহিত তাহার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাহাকে কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলিল, 'তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান,

www.eelm.weebly.com

সে বলিল, 'আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইব্রাহিম বলিল, 'আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হইতে উদয় করান, তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদয় করাও।' অতঃপর যে সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল সে হতবুদ্ধি হইয়া গেলো। আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

এই আয়াতটি কাফের বাদশাহ নমরুদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। নমরুদই প্রথম ব্যক্তি যে রাজাসনে বসে খোদাই দাবী করেছে। আল্লাহ তাকে বিশাল রাজত্ব দান করেছিলেন। তার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ এটাই। আরবীয় প্রবাদে রয়েছে, 'তুমি আমার শত্রুতা করছো কারণ আমি তোমার উপকার করেছি।'

মোতাজিলা সম্প্রদায় বলে, আল্লাহ কাফেরদেরকে রাজ ক্ষমতা দেন না। এই আয়াত তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ। বাগবী লিখেছেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন চারজন। এর মধ্যে দু'জন ইমানদার এবং দু'জন কাফের। মুমিন বাদশাহ্ ছিলেন নবী সোলায়মান আ. এবং জুলকারনাইন। আর কাফের সম্রাট দু'জন হচ্ছে নমরুদ ও বখতে নসর। যখন ইব্রাহিম আ. মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলেছিলেন তখন নমরুদ তাঁকে বন্দী করেছিলো। পরে বন্দিশালা থেকে তাঁকে বের করে সে জিজ্ঞেস করলো, তোমার প্রতিপালক কে? হজরত ইব্রাহিম আ. বললেন, আমার প্রতিপালক তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, যখন তাঁকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হলো, তখন আল্লাহ্তায়ালাই তাঁকে হেফাজত করলেন। এদিকে নমরুদের রাজত্বে দেখা দিলো দুর্ভিক্ষ। মানুষেরা খাদ্যের জন্য নমরুদের কাছে ভীড় জমালো। নমরুদ প্রশ্ন করতে লাগলো, তোমার প্রতিপালক কে? উত্তর হ্যাঁ বাচক হলে নমরুদ তার সাথে কেনাবেচা করতো। এ সময় হজরত ইব্রাহিম আ. তার নিকট গেলেন। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, আমার আল্লাহ্ জীবন দান করেন ও মৃত্যু নিশ্চিত করেন। নমরুদ প্রত্যুত্তোর করতে পারলো না। ফেরার পথে তিনি একটি বালুময় টিলার নিকটে গেলেন এবং ঘরের লোকদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য কিছু বালু থলিতে ভরে নিলেন। এরপর ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী থলি খুলে দেখলেন, তার মধ্যে রয়েছে উত্তম আটা। সেই আটা দিয়ে তিনি আহার্য প্রস্তুত করে হজরত ইব্রাহিম আ. এর সামনে হাজির করলেন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, আহারের আয়োজন হলো কেমন করে? স্ত্রী বললেন, আপনিই তো আটা এনেছেন। হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ্তায়ালাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। নমরুদের ধারণা ছিলো, সমস্ত কিছু আপনা হতেই হয় এবং বিলয়ও হয় আপনাআপনি। নমরুদের আরো ধারণা ছিলো, জ্ঞানীরা তাদের আপন কাজের স্রষ্টা। যেমন এই উম্মতের মোতাজিলা ও রাফেজীদের ধারণা। সে দু'জন লোককে ডেকে এনে একজনকে হত্যা করলো, আরেকজনকে ছেড়ে দিলো এবং বললো, দেখো আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু

www.eelm.weebly.com

ঘটাই। হজরত ইব্রাহিম বুঝলেন, নমরুদ তো দেখি নির্বোধশ্রেষ্ঠ। তিনি তখন বললেন, আমার আল্লাহ্ সূর্য পূর্ব দিক থেকে ওঠান। তুমি যদি তাঁকে অস্বীকার করো তবে সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে ওঠাও। নমরুদ নির্বাক হয়ে গেলো। সে তখন বুঝলো, ইব্রাহিম দোয়া করলে তাঁর প্রতিপালক সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করবেন। কারণ, ইতোপূর্বে সে দেখেছে অগ্নিকুন্ডকে তিনি শীতল ও শান্তিদায়ক করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা সীমালংঘনকারীদেরকে সরল পথ দেখান না। যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিতে পতিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের জ্ঞানোদয় হয় না।

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫৯

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى
يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ
قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ
مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَ
انْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ
كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ
اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

❐ অথবা তুমি সেই ব্যক্তিকে কি দেখ নাই যে এমন এক নগরে উপনীত হইয়াছিল যাহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সে বলিল, 'মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ্ ইহাকে জীবিত করিবেন?' তৎপর আল্লাহ্ তাহাকে একশত বৎসর মৃত রাখিলেন। পরে তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। আল্লাহ্ বলিলেন, 'তুমি কতকাল অবস্থান করিলে?' সে বলিল, 'একদিন অথবা একদিনেরও কিছু কম অবস্থান করিয়াছি।' তিনি বলিলেন, 'না না, বরং তুমি একশত বৎসর অবস্থান করিয়াছ। তোমার খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, উহা অবিকৃত রহিয়াছে এবং

www.eelm.weebly.com

তোমার গর্দভটির প্রতি লক্ষ্য কর; কারণ তোমাকে মানব জাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ করিব। আর অস্থিগুলির প্রতি লক্ষ্য কর, কিভাবে সেগুলিকে সংযোজিত করি এবং মাংস দ্বারা ঢাকিয়া দেই।' যখন ইহা তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল তখন সে বলিয়া উঠিল, 'আমি জানি যে আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।'

ধ্বংসস্তূপে পরিণত নগরটি ছিলো বায়তুল মুকাদ্দাস। অথবা বস্তি হারকিল। এ ঘটনা আগে বর্ণনা করা হয়েছে। নগরে উপনীত ব্যক্তি ছিলেন আরমিয়া। হজরত ইবনে ইসহাক বলেন, আরমিয়া হলেন খিজির আ. কিন্তু হাকেম, হজরত আলী ক. এবং ইসহাক বিন বশির, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তিনি আরমিয়া ছিলেন না। ছিলেন উযায়ের আ.। মুজাহিদ এই ঘটনাকে নমরুদের ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তাতে মনে হয় ওই ব্যক্তি কোনো কাফের ছিলো। কিন্তু মুজাহিদের ব্যাখ্যাটি ভুল। কেননা কাফের এ রকম সম্মান পাওয়ার উপযোগী নয়। যদি এ রকম বলা হয়, সে কাফেরই ছিলো কিন্তু কুদরতের নিদর্শন দেখার পর মুমিন হয়েছে তবে আমি বলবো, ওই ব্যক্তি গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তাই সে এ মতন সম্মান পেতে পারে না। এখানে দু'টি ঘটনা একত্রিত হয়েছে। যে ব্যক্তি প্রতি পদে প্রতি মুহূর্তে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে, তার কাছে দ্বিতীয় বার জীবিত হওয়া আশ্চর্যজনক তো মনে হবেই। বীর্য হতে মানুষ এবং বীজ হতে বৃক্ষ — এ রকম তো অহরহই হচ্ছে। তবু কি তা বিস্ময়কর নয়! সেই ব্যক্তিটি নগরটিকে প্রাণচঞ্চল দেখতে চাইলো এবং দোয়া করলো। তার দোয়া কবুলও হলো।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক, হজরত ওহাব বিন মুনাব্বাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহতায়ালা হজরত আরমিয়া আ. কে বনি ইসরাইলের বাদশাহ নাশিয়া বিন আমওয়াসের সাহায্যার্থে প্রেরণ করলেন। নাশিয়া ছিলেন পুণ্যবান। হজরত আরমিয়া তাঁর নিকট আল্লাহর পয়গাম নিয়ে গেলেন। যখন বনি ইসরাইলদের অপরাধ প্রবণতা বেড়ে গেলো, তখন আল্লাহ হজরত আরমিয়া আ. কে ওহির মাধ্যমে জানালেন, বনি ইসরাইলদেরকে বিপদগ্রস্ত করা হবে। এক জালেমকে তাদের জন্য নির্ধারণ করা হবে। যে তাদের অনেক লোককে ধ্বংস করবে। এ কথা শুনে হজরত আরমিয়া ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তখন তাঁকে জানানো হলো, যতক্ষণ তুমি নির্দেশ না করবে ততক্ষণ আমি তাদেরকে ধ্বংস করবো না। আরমিয়া খুশী হলেন। তিন বৎসর অতিবাহিত হলো। বনি ইসরাইলদের অবাধ্যতা বেড়েই চললো। ওহিও আসতে লাগলো কম। বাদশাহ তাদেরকে কয়েকবার তওবা করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তারা মানলো না। তখন বাবেলের বাদশাহ বখত নসর তার সেনাবাহিনী নিয়ে বনি ইসরাইলের দিকে

www.eelm.weebly.com

রওয়ানা হলো। বাদশাহ ভয় পেলেন। হজরত আরমিয়া বললেন, আল্লাহর প্রতিশ্রুতির উপর রয়েছে আমার পূর্ণ নির্ভরতা। এরই মধ্যে আল্লাহর আদেশে একজন ফেরেশতা বনি ইসরাইলদের মতো পোশাক পরে আরমিয়ার নিকটে এলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি আমার গৃহবাসীদের সম্বন্ধে আপনাকে জানাতে চাই। আমি তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করি। তবুও তারা আমার উপর নারাজ। হজরত আরমিয়া বললেন, তুমি ভালো আচরণ করতে থাকো। সম্পর্কচ্ছেদ কোরো না এবং সুসংবাদ গ্রহণ কোরো। ফেরেশতা চলে গেলেন। কিছুদিন পর ওই ফেরেশতা মানুষের পরিচ্ছদাবৃত হয়ে ফিরে এলেন। পুনর্বার তিনি একই অভিযোগ তুললেন এবং জবাবও পেলেন প্রথমবারের মতোই। কয়েক বছর পর বখত নসর বায়তুল মুকাদ্দাসকে ঘিরে ফেললো। হজরত আরমিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দেয়ালের উপর বসে ছিলেন। বনি ইসরাইলের বাদশাহ তাঁকে বললেন, আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুতির কী হলো? হঠাৎ ওই ফেরেশতাটি এলেন এবং তাঁর গৃহবাসীদের অপ্রশংসা করলেন। হজরত আরমিয়া বললেন, এখন পর্যন্ত তারা মন্দ আচরণ থেকে ফিরলো না। ফেরেশতা বললেন, আমি তো এতোদিন ধৈর্য ধারণ করেই এসেছি। কিন্তু এখন তাদের অপরাধ প্রবণতা বেড়েছে অনেক বেশী। এ জন্য আল্লাহর প্রতি আমি অভিমানী হয়ে পড়ছি। আপনার প্রতি নিবেদন, আপনি তাদের জন্য বদদোয়া করুন। হজরত আরমিয়া প্রার্থনা জানালেন, 'হে আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহ! তারা যদি তোমার অসন্তোষভাজন হয়ে থাকে তবে তুমি তাদেরকে ধ্বংস করে দাও।' হঠাৎ জ্বলে উঠলো ভয়ংকর বিদ্যুৎ। আর জমিন খুলে দিলো সাতটি দরোজা। হজরত আরমিয়া আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার প্রতিশ্রুতির কী হলো? আওয়াজ এলো, তাদের উপর আযাব এসে পড়েছে। এই আযাব এসেছে তোমার প্রার্থনার কারণেই। হজরত আরমিয়া তখন বুঝতে পারলেন আগন্তুক ব্যক্তিটি মানুষ নয়। ফেরেশতা। তিনি অরণ্যে চলে গেলেন।

বখত নসর এসে বায়তুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে দিলো। তারপর শামদেশে চলে গেলো। সেখান থেকে সে বাবেলে চলে গেলে আরমিয়া তাঁর গাধায় চড়ে জঙ্গল থেকে ফিরে এলেন। ঐ সময় তাঁর থলের মধ্যে ছিলো কিছু ইরাকী আঙ্গুর ও ডুমুর। ধ্বংস স্তূপ দেখে তিনি মনে মনে বললেন, মৃত্যুর পর আল্লাহ কেমন করে আবার জীবন দান করবেন। তিনি তাঁর গাধাটিকে রশি দিয়ে বাঁধলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঢলে পড়লেন গভীর নিদ্রায়। তাঁর নিদ্রা ছিলো মৃত্যুর মতো। সাঈদ ইবনে মনসুর, হাসান বসরী থেকে এবং ইবনে হাতেম, হজরত কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর নিদ্রা শুরু হয়েছিলো চাশতের সময় থেকে। একশ' বছর পর্যন্ত তিনি মৃতবৎ পড়ে রইলেন। তাঁর গাধা, আঙ্গুর এবং ডুমুর তাঁর পাশেই পড়ে

www.eelm.weebly.com

থাকলো। সত্তর বছর পর আল্লাহ্ এক ফেরেশতাকে পারস্যের বাদশাহ নোশেকের নিকট পাঠালেন। ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ তোমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস ও তাঁর পার্শ্ববর্তী শহর নতুন করে আবাদ করতে আদেশ দিচ্ছেন। নোশেক হুকুম পালনে তৎপর হলেন। ওদিকে একটি মশা বখত নসরের মস্তিষ্কে প্রবেশ করলো এবং তাঁর জীবনাবসান ঘটালো। বাবেলের ইহুদীরা মুক্তি লাভ করলো। তারা ফিরে গেলো বায়তুল মুকাদ্দাস ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। নগরনির্মাণের কাজ চললো তিরিশ বছর ধরে। এ সময় হজরত আরমিয়া পুনর্জীবিত হলেন। সূর্য তখন অস্তমিত প্রায়। আল্লাহ্ তাঁর নিকটে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। তিনি বললেন, আপনি কতোক্ষণ ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন? অস্তাচলের দিকে চেয়ে হজরত আরমিয়া বললেন, একদিন। বরং পুরো একদিনও নয়। ফেরেশতা বললেন, আপনি ঘুমিয়েছেন একশ' বছর ধরে। দেখুন, এই হচ্ছে আপনার আঙ্গুর আর এই হচ্ছে ডুমুর। আপনার গাধাটির দিকে তাকান। আরমিয়া তাকালেন। তার গলায় যেমন নতুন রশি বাঁধা ছিলো তেমনি আছে। কেউ কেউ বললেন, গাধাটি মরেই গিয়েছিলো। অস্থি চর্ম সব মিশে গিয়েছিলো মাটিতে। আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা ছিলো হজরত আরমিয়ার দৃষ্টির সামনে গাধাটি জীবিত হোক। তাই হুকুম হয়েছে, তাকাও।

আমি বলি, আঙ্গুর ও ডুমুর ছিলো অক্ষত। গাধাটি নয়। তাই 'তাকাও' নির্দেশটি কেবল গাধার জন্য এসেছে। আল্লাহ্তায়ালা এই ঘটনাটিকে তাঁর নিদর্শন হিসাবে পেশ করেছেন। এখানে আরেকটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে, গাধাটি মরে মাটিতে মিশে গিয়েছিলো। কিন্তু হজরত আরমিয়ার শরীর ছিলো অক্ষত। নবীদের শরীর অক্ষতই থাকে। হাদিস শরীফে এসেছে, নবীদের শরীর গ্রাস করা জমিনের জন্য হারাম।

হজরত কাতাদা হজরত কাব থেকে এবং জুহাক ইবনে আসাকির হজরত ইবনে আব্বাস থেকে, সুদ্দী এবং মুজাহিদ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ করেছেন, যখন আল্লাহ একশ' বছর মৃতবৎ থাকার পর উযায়ের আ. কে জীবিত করলেন। তখন তিনি গাধায় আরোহণ করে নিজ গ্রামে এলেন কিন্তু কাউকে চিনতে পারলেন না। নিজের ঘরও চিনতে পারলেন না। লোকেরাও তাঁকে চিনতে পারলো না। হঠাৎ তাঁর দেখা হলো অন্ধ অচল এক বৃদ্ধার সাথে। তাঁর বয়স ছিলো একশ' বিশ বছর। এ বৃদ্ধা ছিলো উযায়ের আ. এর বাঁদী। একশ' বছর আগে বাঁদীর বয়স ছিলো বিশ। হজরত উযায়ের বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাস করলেন, এই গৃহটি কি উযায়েরের? বুড়ি বললো, হ্যাঁ। একশ' বছর পর তার নাম শুনলাম। তুমি কে? হজরত বললেন, আমি উযায়ের। সে বললো, উযায়ের ছিলেন আল্লাহ্র খাঁটি বান্দা। তুমি যদি উযায়ের হয়ে থাকো, তবে দোয়া করো যাতে আল্লাহ পাক আমার চোখ ভালো করে দেন। হজরত দোয়া করলেন এবং তার চোখে হাত

www.eelm.weebly.com

বুলিয়ে দিলেন। বুড়ির চোখ ভালো হয়ে গেলো। হজরত তার হাত ধরে বললেন, আল্লাহর হুকুমে ওঠে দাঁড়াও। বুড়ি দাঁড়ালো এবং তাঁকে চিনতে পেরে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনিই উযায়ের। এরপর দেখা হলো তাঁর ছেলের সঙ্গে। যার বয়স হয়েছিলো একশ' বছর। তাঁর নাতি পুতিগুলোও হয়ে গিয়েছিলো বৃদ্ধ। কিন্তু হজরতের চুল দাড়ি তখনও কালো। বাঁদী তাঁকে নিয়ে বনি ইসরাইলদের মজলিশে উপস্থিত হয়ে বললো, ইনি উযায়ের। তারা বিশ্বাস করলো না। বাঁদী বললো, আমি তাঁর বাঁদী। তাঁর দোয়াতেই আমি চক্ষু ফিরে পেয়েছি এবং সচল হয়েছি। আল্লাহতায়ালা তাঁকে একশ' বছর মৃত অবস্থায় রেখেছিলেন, এখন জীবিত করে দিয়েছেন। হজরতের ছেলে বললো, আমার পিতার বুকে চন্দ্রাকৃতির একটি কালো দাগ আছে। হজরত জামা খুলে দেখালেন। সবাই দেখলো তাঁর বুকে চন্দ্রাকৃতির কালো দাগ। সুদ্দী এবং কালাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত উযায়ের যখন আপন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলেন, তখন তওরাত কিতাব ছিলো না। এই মহাগ্রন্থটিকে বখত নসর পুড়িয়ে দিয়েছিলো। তিনি কেঁদে ফেললেন। এমন সময় এক ফেরেশতা এসে তাঁকে এক পেয়ালা পানি পান করালেন। সঙ্গে সঙ্গে তওরাতের পূর্ণচিত্র তাঁর হৃদয়ে ভেসে উঠলো। লোকেরা যখন তাঁকে উযায়ের বলে মানতে চাইছিলো না, তখন তিনি তওরাত মুখস্ত বলতে শুরু করলেন। এভাবে পূর্ণ তওরাত লিপিবদ্ধ করা হলো। লোকেরা বিশ্বাস করলো না। বলতে লাগলো, তওরাত তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬০

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰى وَلٰـكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۠

❑ যখন ইব্রাহিম বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করো আমাকে দেখাও।' তিনি বলিলেন,'তবে কি তুমি বিশ্বাস কর নাই?' সে বলিল, 'কেন করিব না, তবে ইহা কেবল আমার চিত্ত-প্রশান্তির জন্য!' তিনি বলিলেন, 'তবে চারিটি পাখি লও এবং উহাদিগকে তোমার বশীভূত করিয়া লও।

www.eelm.weebly.com

তৎপর তাহাদের এক এক অংশ পাহাড়ে স্থাপন কর। অতঃপর উহাদিগকে ডাক দাও, উহারা দ্রুত গতিতে তোমার নিকট আসিবে। জানিয়া রাখ যে আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

হাসান, কাতাদা, আতা খোরাসানী এবং ইবনে জারীর বর্ণনা করেন, হজরত ইব্রাহিম আ. একটি গাধার লাশ সমুদ্রতীরে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। জোয়ারের সময় সমুদ্রের হিংস্র প্রাণীরা তার গোশত খেয়ে যেতো। জোয়ার সরে গেলে জঙ্গলের হিংস্র প্রাণী ও পাখিরা তার গোশত খেতো। হজরত ইব্রাহিম আ. বিস্মিত হলেন এবং আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি জানি তুমি এই মৃত গাধাটির বিভিন্ন অংশ সমুদ্র ও জঙ্গল থেকে এনে একত্রিত করে জীবিত করতে পারো। তবে আমাকে দেখিয়ে দাও, কিভাবে তুমি জীবিত করো। অন্য বর্ণনায় আছে, নমরুদ দুই ব্যক্তিকে ডেকে এনে একজনকে হত্যা করলো এবং অন্যজনকে ছেড়ে দিলো এবং বললো, আমি জীবন দেই এবং মৃত্যু ঘটাই। তুমি কি তোমার আল্লাহকে এমন করতে দেখেছো? এ সময় হজরত ইব্রাহিম এ রকম প্রশ্ন করেছিলেন।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেন, হজরত ইব্রাহিম খলিল পদমর্যাদায় ভূষিত হলেন। তাঁকে এই সুসংবাদ দিলেন মৃত্যুর ফেরেশতা। হজরত ইব্রাহিম বললেন, এই সুসংবাদের নির্দশন কী? ফেরেশতা বললেন, আপনি প্রার্থনা জানালে আল্লাহ তায়ালা মৃতকে জীবিত করে দেখাবেন। হজরত ইব্রাহিম আ. এর প্রশ্নটি ছিলো ওই সময়ের।

যখন আল্লাহ বললেন, 'তবে কি তুমি বিশ্বাস কর নাই?' তিনি বললেন, 'কেন করিব না, তবে ইহা কেবল আমার চিত্ত-প্রশান্তির জন্য !' — মানব প্রকৃতি এই যে, প্রত্যক্ষ-গোচর না হওয়া পর্যন্ত অন্তর প্রশান্ত হয় না। এখানে সন্দেহের প্রশ্ন আসে না। এখানে সন্দেহ আল্লাহ তায়ালার শক্তিমত্তা সম্পর্কে নয়। বরং সন্দেহ ছিলো আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন কিনা তাই দেখা। রসুলে পাক স. এরশাদ করেন, দেখার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, শোনার মাধ্যমে তা হয় না।

গোবৎস পূজার সংবাদ শুনেও হজরত মুসা আ. এর রোষ তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনেই ছিলো। তখনও তিনি ধরে রেখেছিলেন তওরাতকে। কিন্তু যখন তিনি নিজ চোখে তাদেরকে পূজা করতে দেখলেন, তখন তওরাত খন্ডগুলো ফেলে দিলেন এবং তা ভেঙে গেলো।

এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর বিভিন্ন লোক বললেন, হজরত ইব্রাহিম সন্দেহ পোষণ করেছেন, কিন্তু আমাদের রসুল স. সন্দেহ করেননি। আমি বলি, এ রকম উক্তি দুর্বল। কেননা হজরত ইব্রাহিমের সন্দেহবাদী না হওয়াটা এই আয়াত

www.eelm.weebly.com

দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। 'চিত্ত প্রশান্তির জন্য' — এ রকম কথা বলার পর তাঁর প্রতি সন্দেহ শব্দটি প্রয়োগ করা যায় কি? ধারণা সঠিক রাখা প্রয়োজন।

আত্মিক ভ্রমণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে বিষয়টি ভালো বুঝা যাবে। আল্লাহতায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্তির পথে বিভিন্ন মাকামের (স্তরের) অবস্থা, বিস্তৃতি এবং পর্যবেক্ষণকে আত্মিক ভ্রমণ বা সুলুক বলে। সুলুকের দু'টি অবস্থা। উরুজ (উর্ধারোহণ) এবং নুজুল (অবরোহণ)। উরুজের সময় মানবীয় স্বভাবের পরিচ্ছদ খ'সে যায়। ফেরেশতা স্বভাব বলবত হয়। রসুল পাক স. কখনো কখনো একাধারে রোজা রাখতেন। কিন্তু সাহাবাগণকে এ রকম করতে নিষেধ করেছেন। সাহাবাগণ আরজ করলেন, আপনি একাধারে রোজা রাখেন, অথচ আমাদেরকে নিষেধ করেন। রসুল স. বললেন, আমি তোমাদের মতো নই। আমার প্রতিপালক আমাকে আহার করান। এই হাদিসটি উরুজের প্রমাণ। আল্লাহওয়ালাগণ এই অবস্থাকে বলেন, সায়ের ফিল্লাহ বা আল্লাহর মধ্যে ভ্রমণ। নুজুল হচ্ছে, এর বিপরীত অবস্থা। অবরোহণের এই অবস্থা মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। এই সাদৃশ্যের কারণে মানুষ নবী, রসুল এবং আল্লাহওয়ালাগণের নিকটতর হয় এবং উপকার লাভ করে। আহবানকার্য এই মাকামের উপযোগী। হজরত ইব্রাহিমের প্রশ্নটি ছিলো এই মাকামের।

জ্ঞাতব্য ঃ উরুজের সময় আরেফের (আল্লাহর পরিচয় লাভকারী) দৃষ্টি কেবল আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ থাকে। এ সময় আল্লাহর পরিচিতি লাভ হয়। সূর্যকিরণ যেমন দর্পণকে পূর্ণ আলোকোজ্জ্বল করে দেয়, উরুজাবদ্ধ আরেফের অবস্থা হয় তেমনি। সে সময় পানাহারের ইচ্ছা, সুখ দুঃখের অনুভূতি তাঁর মধ্যে আর থাকে না। নুজুলের অবস্থায় তাঁর মানবীয় প্রকৃতিসমূহ উরুজের রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে যায়। তখন ক্ষুধা, পিপাসা, বিভিন্ন প্রকার মানবীয় প্রকৃতি দৃষ্টিগোচর হলেও অবিকল তা সাধারণ মানুষের মতো নয়। তখন তিনি উরুজাবস্থায় দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়গুলো অন্যদের বলতে পারেন। অন্যরাও তখন তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ-পরিচিতি প্রাপ্ত হয়। যারা তাদের সঙ্গে যতবেশী ঘনিষ্ঠ হন তারা ততবেশী কামালিয়াত (পূর্ণতা) লাভ করেন। উরুজ নবী, ওলী সকলেরই হয়। কিন্তু এর স্তরগত পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের নুজুলের মধ্যেও রয়েছে বিরাট পার্থক্য। এ জন্যই তাঁদের কারো মাধ্যমে অল্প সংখ্যক এবং কারো মাধ্যমে অধিক সংখ্যক লোক ফয়েজ প্রাপ্ত হন। এই ফয়েজ আদান প্রদানের জন্য সাদৃশ্য থাকা জরুরী। এ জন্যই মানুষের হেদায়েতের জন্য মানুষের মধ্য থেকেই নবী বানানো হয়েছে। নবীদের মাধ্যম ব্যতীত সাধারণ মানুষ আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে না। আল্লাহ হচ্ছেন নূর। আর সাধারণ মানুষ অপবিত্রতা ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সুতরাং মাধ্যমের প্রয়োজন। যিনি

www.eelm.weebly.com

আলো অন্ধকার দু'দিকেই সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম। ফেরেশতাগণও নূর। তাই তাদের মধ্য থেকে নবী বানানো হয়নি।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বসবাস করতো, তবে আমি তাদের হেদায়েতের জন্য আকাশের ফেরেশতাকে রসুল করে পাঠাতাম।' অন্যত্র বলেন, 'আমি যদি ফেরেশতাদেরকে নবী করে পাঠাতাম তবে তাদেরকে দিতাম পুরুষের রূপ এবং পরিধান করাতাম মানবীয় পোশাক।' যাঁর নুজুলের অবস্থা পূর্ণ, তাঁর প্রচারও সফলতাপূর্ণ। উচ্চ স্থানে অবস্থানকারী শিকারীর তীর অধিকাংশই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।। শায়েখে আকবর মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী কু. বলেন, হজরত নূহ আ. এর উরুজ ছিলো অত্যধিক। তাই অল্প সংখ্যক লোক তাঁর দাওয়াত কবুল করেছিলেন। আর রসুল স. এর উরুজ ও নুজুল উভয়ই পূর্ণ ছিলো বলে বিশাল জনগোষ্ঠী তাঁর অনুসারী হয়েছিলো।

আরেফে কামেল (আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভকারী ব্যক্তি) উরুজ শেষে যখন নুজুলে প্রত্যাবর্তন করেন তখন সাধারণ মানুষের প্রকাশ্য বিষয়াবলীর সঙ্গে সাযুজ্য অনুভব করেন। রসুলে পাক স. যুদ্ধকালে তাঁর শরীর মোবারক হেফাজতের জন্য লোহার বর্ম পরিধান করতেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় তিনি পরিখা খনন করিয়েছিলেন। এটা ছিলো নুজুলের অবস্থা। এই মাকামে আরেফ চিত্তপ্রশান্তির জন্য অকাট্য প্রমাণ অন্বেষণ করেন। হজরত ইব্রাহিমের চিত্ত প্রশান্তির অভিলাষ এই মাকামেরই অবস্থাজ্ঞাপক। 'তিনি এক শক্তিশালী সাহায্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চাচ্ছেন' — হজরত লুত আ. এর এই অবস্থাও ছিলো অনুরূপ। রসুলে পাক স. এর নুজুল হজরত ইব্রাহিম আ. এর নুজুলাপেক্ষা অধিকতর পূর্ণ ছিলো তাই তিনি বলেছিলেন, 'সন্দেহের অধিকার ইব্রাহিম আ. এর চেয়ে আমারই বেশি।' এই বাক্যটির অর্থ, চিত্তপ্রশান্তির প্রয়োজন আমারই অধিক। কারণ, আমার নুজুল তাঁর চেয়ে অধিক। বিশ্ববাসীর হেদায়েতের জন্য তাই তাঁকেই প্রেরণ করা হয়েছে। হজরত লুত আ. এর নুজুল এবং হজরত ইউসুফ আ. এর উরুজ অধিক পূর্ণ ছিলো। আর রসুল স. এর উরুজ নুজুল উভয়ই ছিলো পরিপূর্ণ।

'তবে চারিটি পাখী লও' — মুজাহিদ, আতা বিন বিরা এবং জারীর বর্ণনা করেন, ওই চারটি পাখি ছিলো, ময়ুর, মোরগ, কবুতর ও কাক।

আতা খোরাসানী বলেন, পাখিগুলো ছিলো হাঁস, কালো কাক, শাদা কবুতর এবং লাল মোরগ।

আমি বলি, মানুষ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণী চারটি জিনিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলো হলো—রক্ত, কফ, ক্রোধ ও পিত্ত। এগুলো সৃষ্ট হয়েছে ভূত চতুষ্টয় থেকে। ভূত চতুষ্টয় হচ্ছে, আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস। লাল মোরগ রক্তের সঙ্গে, সাদা কবুতর কফের সঙ্গে, কালো কাক ক্রোধের সঙ্গে এবং হাঁস

www.eelm.weebly.com

পিত্তের সঙ্গে সম্পর্কিত। আখেরাতে মানুষের পুনর্জীবন এদেরই পুনর্জীবনের মতো।

বায়যাবী লিখেছেন, পুনর্জীবন (চিরস্থায়ী জীবন) সংঘটিত হয় বিলয়ের পর। রূপসজ্জা, কামনা ও প্রেম ময়ূরের স্বভাবজাত। ভয়, জ্ঞান ও প্রতিবাদী স্বভাব হচ্ছে মোরগের। মন্দ স্বভাব, উচ্চাশা কাকের বৈশিষ্ট্য। দূরান্বেষণ যেমন বায়ু প্রবাহ— এটা হচ্ছে কবুতরের স্বভাব।

আল্লাহ্‌তায়ালা এখানে ইব্রাহিম আ. কে শিখিয়েছেন হেদায়েতের পদ্ধতি। শিখিয়েছেন ফানা ও বাকা। ফানা ওই অবস্থা যে অবস্থায় সৃষ্টবস্তুর জ্ঞান পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। এই অবস্থায় আল্লাহ্‌পাকের নাম, গুণাবলী ও মহত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহের রঙে সাধক রঞ্জিত হয়। তারপর সে যখন পুনঃঅস্তিত্ব লাভ করে তখন তা হয় স্থায়ী, যাকে বাকাবিল্লাহ্ বলা হয়। প্রাণীগুলোর অস্তিত্বহীনতা ফানা। 'অতপর উহাদিগকে ডাক দাও' — এই অবস্থা হচ্ছে জজবা (আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেমাকর্ষণ)। আর তাদের পুনর্জীবন লাভ হচ্ছে বাকা। আমাদের এই ব্যাখ্যা কাশ্‌ফ (আত্মিকবিজ্ঞপ্তি) জাত। আত্মিক অবস্থার উপলব্ধি। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

ইবনে আবি হাতেম, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমে হজরত ইব্রাহিম পাখিগুলোকে যবেহ্ করে তাদের টুকরোগুলোকে একত্রিত করলেন এবং সেগুলো সাত ভাগে ভাগ করে সাতটি পাহাড়ে রেখে দিলেন। মাথাগুলো রাখলেন নিজের কাছে। ইবনে জারীর ও সুদ্দী এরকমই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনে জারীর, ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে এবং হজরত কাতাদা, হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে বলেছেন, ইব্রাহিম আ. ভাগ করেছিলেন চারটি এবং চারটি পাহাড়ে সেগুলো রেখে দিয়েছিলেন। ইব্রাহিম আ. যখন বললেন, আল্লাহ্‌র হুকুমে এসে যাও, তখন পাখিদের রক্তকণিকাগুলো, পালকগুলো এবং হাড়গুলো একত্রিত হতে লাগলো। সবশেষে সংযোজিত হলো মস্তকসমূহ।

'জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' — অর্থাৎ তাঁর পরাক্রমশীলতার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। কোনোকিছুই এতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। তিনি হাকিম, কৌশলী। মৃতকে জীবিত করা তাঁর অপার হিকমত এবং অসীম প্রজ্ঞার নিদর্শন। হজরত ইব্রাহিম, হজরত উযায়ের অথবা হজরত আরমিয়ার বিবরণ তাঁর নিদর্শনসমূহকে উপস্থাপিত করেছে।

জ্ঞাতব্য ঃ মৃতকে জীবিত করা অসাধারণ ঘটনা। যারা আল্লাহ্‌তায়ালার এই ক্ষমতার কথা শুনে বিশ্বাস করে, তারা দেখতেও চায়। জেনে বিশ্বাস করার নাম, এলমুল একিন। দেখে বিশ্বাস করার নাম আইনুল একিন। হজরত ইব্রাহিম এবং হজরত উযায়েরের দেখতে চাওয়ার ইচ্ছা ছিলো বিস্ময়। অবিশ্বাস নয়। তাঁরা আইনুল একিনের ইচ্ছাই প্রকাশ করেছিলেন।

---

www.eelm.weebly.com

বায়যাবী লিখেছেন, পুনর্জীবনের ঘটনা হজরত উযায়ের দেখেছিলেন একশ বছর পর। আর হজরত ইব্রাহিম দেখেছিলেন প্রার্থনা করার সাথে সাথে। এতে প্রমাণিত হয়, হজরত উযায়ের অপেক্ষা হজরত ইব্রাহিম আ. এর মর্যাদা অধিক। হজরত উযায়েরের কথায় ছিলো শুধুই বিস্ময়। হজরত ইব্রাহিমের বিস্ময়ে ছিলো চিত্তপ্রশান্তির জন্য বিনয়াবনত আর্তি।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬১

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

❒ যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহের পথে ব্যয় করে তাহাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যাহা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যকণা। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

এখানে আল্লাহর পথে ব্যয় করার অর্থ, জেহাদে অথবা সকল কল্যাণকর্মে ব্যয় করা। এই ব্যয়ের উপমা এসেছে শস্যবীজের সঙ্গে। শস্যবীজ এবং শস্য সৃষ্টি করেন আল্লাহ্। কিন্তু এখানে সে কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। কেবল কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। কারণের স্রষ্টার উল্লেখ রয়েছে প্রচ্ছন্ন।

বাগবী, কালাবী থেকে উল্লেখ করেছেন, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ চার হাজার দিরহাম নিয়ে রসুল স. এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমার কাছে আট হাজার দিরহাম আছে। চার হাজার সন্তান-সন্তুতিদের জন্য রেখে দিয়েছি। আর চার হাজার আল্লাহকে কর্জ দিতে এসেছি। রসুল স. বললেন, যা তুমি নিজের কাছে রেখেছো এবং যা তুমি আল্লাহর রাস্তায় দিয়েছো সবগুলিতে আল্লাহ্ বরকত দান করুন।

হজরত ওসমান রা. তাবুক যুদ্ধের সময় এক হাজার উট আসনসহ দান করেছিলেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

কালাবী, হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. থেকে বর্ণনা করেন, হজরত ওসমান সেনাবাহিনীর সাহায্যার্থে রসুলে পাক স. এর সকাশে এক হাজার দিনার পেশ করলেন। রসুল স. তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে সেগুলো নাড়াচাড়া করে বললেন, আজকের পর কোনোকিছুই ওসমানের জন্য ক্ষতিকারক হবে না। এরপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আহমদও হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথা সেখানে উল্লেখিত হয়নি।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬২

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

❑ যাহারা আল্লাহের পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে এবং যাহা ব্যয় করে তাহার কথা বলিয়া বেড়ায় না ও ক্লেশও দেয় না তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

সাধারণতঃ দানশীলেরা নিজেকে উত্তম ধারণা করে। জাগতিক বিনিময় চায়। কিন্তু এ রকম দান আল্লাহ্তায়ালার দরবারে গৃহীত হয় না।

বাগবী বলেন, আবদুর রহমান বিন জায়েদ বিন আসলাম বলেছেন, আমার পিতা বলতেন, তুমি কাউকে কিছু দিলে যদি দেখো, দানের কারণে তোমাকে সে সালাম দিচ্ছে তখন তুমি তাকে সালাম কোর না। বিনিময়াকাঙ্খী তো হওয়া উচিত আল্লাহ্তায়ালার নিকটেই।

দানকারীরা সাধারণ যাঞ্চাকারীকে কষ্ট দেয়। যেমন বলে, আমাকে আর কতো বিরক্ত করবে? কতোবার চাইবে? এ জন্য আল্লাহতায়ালা 'ক্লেশও দেয় না' শর্তটির উল্লেখ করেছেন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬৩

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۗ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ ○

❑ যে দানের পর ক্লেশ দেওয়া হয় তাহা অপেক্ষা ভাল কথা ও ক্ষমা শ্রেয়। আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।

www.eelm.weebly.com

কালাবী বলেছেন, ভালো কথার অর্থ নেক দোয়া যা কোনো মুসলমান তার অন্য মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে করে থাকেন। জুহাক বলেছেন, পারস্পরিক শত্রুতা দূর করার জন্য এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর মতে ভালো কথার উদ্দেশ্য সেই কথা, যা পারস্পরিক বিবাদ দূর করার জন্য বলা হয়।

যে বার বার চেয়ে বিব্রত করে তাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। কর্কশ ব্যবহার করা যাবে না।

বাগবী লিখেছেন, 'ক্ষমা করা' অর্থ যাঞ্চাকারীর গোপনীয়তা বজায় রাখা, তার অক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা। বিভিন্ন আলেম বলেন, নম্র কথার মাধ্যমে যাঞ্চাকারীকে ফিরিয়ে দেয়া। তবেই আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমা পাওয়া যাবে। কালাবী ও জুহাকের মতে বিব্রতকারীকে সুন্দরভাবে এড়িয়ে যাওয়া। নম্র বাক্য ব্যবহার ও ক্ষমা প্রদর্শন ক্লেশদায়ক দান অপেক্ষা উত্তম। খোঁটা দানকারী দাতাকে আল্লাহ্তায়ালা পছন্দ করেন না কিন্তু তাঁকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন না এই কারণে যে, তিনি পরম সহনশীল।

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬৪

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ۝

❑ হে বিশ্বাসীগণ! দানের কথা প্রচার করিয়া এবং ক্লেশ দিয়া তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করিওনা যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করিয়া থাকে, এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করেনা। তাহার উপমা একটি শক্ত পাথর যাহার উপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর তাহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাহাকে মসৃণ করিয়া রাখিয়া দেয় যাহা তাহারা উপার্জন করিয়াছে তাহার কিছুই তাহারা তাহাদের কাজে লাগাইতে পারিবে না। আল্লাহ্ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

---

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাসের নিকট অনুগ্রহের অর্থ আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ স্মরণে রাখা এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণের নিকট এর অর্থ দানগ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ রাখা।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস রা. বর্ণনা করেন, রসুলে পাক স. এরশাদ করেছেন, খোঁটাদানকারী দাতা এবং মাতা পিতার অবাধ্য সন্তান বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না গ্রহীতা দাতাকে এবং মাতা পিতা সন্তানকে ক্ষমা করে। নাসাঈ, দারেমী।

লোক দেখানো সৎকাজ নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হয়, দাতা মুমিন হলেও। এরকম করা মুমিনের মর্যাদার অনুকূল নয়। বরং এটা মুনাফিকদের স্বভাব। অহংকার (রিয়া) কাফেরদের স্বভাব। অহংকারীরা অকৃতজ্ঞ। সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আল্লাহ্ তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, 'আমি শিরিককে পরওয়া করি না। যে তার আমলের সাথে অন্যকে শরীক করে (কেবল আমার সন্তুষ্টির জন্য আমল না করে) আমি তাকে শিরিককারীর সাথে রেখে দেই।' অন্য বর্ণনায় আছে, 'আমি তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন হই। এবং তার আমল তারই সঙ্গে (প্রবৃত্তির সঙ্গে)।' মুসলিম।

হজরত জুনদুব রা. বর্ণনা করেন, রসুলে পাক স. এরশাদ করেছেন, দম্ভ প্রকাশ এবং যশলাভের জন্য যে ব্যক্তি আমল করে আল্লাহ্তায়ালা তার আমলকে রেখে দেন সেই ব্যক্তিরই দম্ভ এবং যশের সঙ্গে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু সাঈদ বিন ফোজালা রা. বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি ডেকে বলবেন, যে ব্যক্তি তার আমলে আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক বানিয়েছে সে যেনো তার সওয়াব সেই শরীকের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। আল্লাহ্ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। আহমদ।

হজরত মোহাম্মদ বিন লবীদ রা. বর্ণনা করেন, রসুলে পাক স. আমাকে বলেছেন, ভয়ংকর শিরিক হচ্ছে শিরিকে আসগর (ছোট শিরিক)। সাহাবা গণ আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! শিরিকে আসগর কী? তিনি বললেন, রিয়া। আহমদ, বায়হাকী।

হজরত সাদ্দাদ বিন আউস রা. বর্ণনা করেন, আমি রসুলে পাক স. কে বলতে শুনেছি, 'আমার উম্মতের শিরিক ও নফসের গোপন ইচ্ছা সম্পর্কে আমি শংকিত।' আমি আরজ করলাম, সে কী রকম! রসুল স. বললেন, না। তারা সূর্য, চন্দ্র, পাথর বা মূর্তি পূজা করবে না। বরং আত্মপ্রদর্শনের জন্য আমল করবে। তারা রোজা রাখবে কিন্তু কামনা চরিতার্থ করার সুযোগ এলে রোজা ভেঙে ফেলবে। আহমদ, বায়হাকী।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, কিয়ামতের সময় সর্বপ্রথম একজন শহীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আল্লাহ্তায়ালা তাকে দেয়া অনুগ্রহরাজির উল্লেখ করলে সে তা মেনে নিবে। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি সেগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছো কীভাবে? সে বলবে, আমি তোমার পথে জেহাদ করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যাবাদী। বীর নামে খ্যাত হওয়াই তোমার কামনা ছিলো। তুমি তা পেয়েছো। এরপর আল্লাহর হুকুমে তাকে নিম্নমুখী করে দোজখে ফেলে দেয়া হবে।

এরপর বিচারের সম্মুখীন হবে একজন আলেম, যে দ্বীনি এলেম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। কোরআনও অধ্যয়ন করেছে। তাকে প্রদত্ত অনুগ্রহসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ্তায়ালা প্রশ্ন করবেন, অনুগ্রহসম্ভারের কৃতজ্ঞতা তুমি কীভাবে পালন করেছো? সে বলবে, আমি দ্বীনের এলেম শিখেছি, অপরকে শিখিয়েছি; তোমার সন্তোষভাজন হওয়ার জন্য কোরআন অধ্যয়ন করেছি। আল্লাহ বলবেন, তোমার কথা অসত্য। আলেম এবং ক্বারী নামে খ্যাত হওয়াই ছিলো তোমার ইচ্ছা। তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ হয়েছে। অতঃপর ফেরেশ্তাদেরকে আদেশ দেয়া হবে, তাঁরা তাকে উপুড় করে দোজখে নিক্ষেপ করবে। এরপর বিচার হবে একজন সম্পদশালী ব্যক্তির। আল্লাহ্ পাক তাকে দেয়া অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে স্বীকার করবে। জিজ্ঞেস করা হবে, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তুমি কী করেছো? সে বলবে, যে সব ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা তোমার পছন্দ তার একটিও আমি বাকি রাখিনি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য সকল ক্ষেত্রেই আমি দান করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যাবাদী। দানবীর নামে খ্যাত হওয়াই ছিলো তোমার ইচ্ছা। তোমার অভিলাষ তো পূর্ণই হয়েছে। অতঃপর আল্লাহতায়ালার নির্দেশে ফেরেশ্তারা তাকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে দোজখে ফেলে দেবে। মুসলিম।

বাগবী এই হাদিসের শেষে আরো বর্ণনা করেছেন, অতঃপর রসুল স. আমার উরুতে করাঘাত করে বললেন, আবু হোরায়রা, এই তিন প্রকার লোক দোজখে প্রবেশ করবে প্রথমে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬৫

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ
تَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ
أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

❒ যাহারা আল্লাহের সন্তুষ্টিলাভার্থে ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করণার্থে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে তাহাদের উপমা কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান,

www.eelm.weebly.com

যাহাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তাহার ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে শিশিরই যথেষ্ট। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

ওই সম্পদই আপন সম্পদ যা আখেরাতে কাজে আসে। এছাড়া অন্য সম্পদ তো ধ্বংসশীল।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রসুলে পাক স. বলেছেন, কোন সম্পদ তোমাদের বেশী প্রিয়? আপন সম্পদ না উত্তরাধিকারীদের সম্পদ। সাহাবাগণ আরজ করলেন, আপন সম্পদ। রসুল স. বললেন, তোমাদের আপন সম্পদ ওগুলোই, যেগুলো তোমরা আখেরাতের জন্য জমা করেছো। আর যা পেছনে ফেলে যাবে তা তো উত্তরাধিকারীদের। বোখারী।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বর্ণনা করেন, লোকেরা একটি বকরি জবেহ্ করলো। রসুল স. বললেন কতোটুকু (দেয়ার ও খাওয়ার পর) বাকি রইলো। সাহাবীগণ, আরজ করলেন, কেবল সীনা। অন্য কিছু নেই। হুজুর স. বললেন, বরং বলো, সীনা বাদে সবই বাকি রয়েছে। অর্থাৎ, সীনার সওয়াবই কেবল জমা হয়নি, বাকি গোশতের সওয়াব জমা হয়ে গিয়েছে। তিরমিজি বলেছেন, এই হাদিসটি সহীহ্।

সম্পদ জীবনের পাথেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষ লাভের জন্য সম্পদ ব্যয় করে, তাঁর ইমান আত্মিকশক্তি সম্পন্ন হয়। আর যে, জীবন ও সম্পদ দু'টিই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে সে তার অস্তিত্বের সমস্ত শক্তি ইমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করে।

বায়যাবী লিখেছেন, এই আয়াতে এই নির্দেশনা রয়েছে যে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়, কৃপণতা ও সম্পদপ্রীতি থেকে নফস্কে পবিত্র করে। আমি বলি, ইমাম আবু হানিফা র. বলেছেন, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সম্পদের উপর জাকাত ওয়াজিব নয়। অভিভাবকগণ তাদের পক্ষ থেকে জাকাত আদায় করবে। কারণ, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার মাধ্যমে সম্পদশালীর পরীক্ষা নেয়া হয়। পরীক্ষা নেয়া হয় — অন্তরে আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশপালনপ্রীতি না বৈভবপ্রীতি, কোনটা প্রবল। শিশুদের পক্ষে অভিভাবকগণের ব্যয় করা এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে।

'উচ্চ ভূমি' অর্থ উঁচু সমতল স্থান, যেখানে নহর প্রবাহিত হয়। যার দুই তীর নহর থেকে উঁচুও নয় নিচুও নয়। জমি উঁচু কিন্তু পানি নিচু নয় এমন বাগান সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এমন বাগানে বৃষ্টি না হলে যতোটুকু ফল জন্মে, বৃষ্টি হলে জন্মে তার দ্বিগুণ। বৃষ্টিপাত কম বেশী হলেও এ রকম বাগানে ফসলের ফলন ব্যহত হয় না। আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়কারীর অবস্থা এ রকম বাগানের মত। অল্প বৃষ্টিতেও ফসল জন্মে, আর বেশী বৃষ্টিতে জন্মে আরো বেশী। ইমানদারগণের আমলও তদ্রুপ। আমলের বিনিময় তো থাকবেই। কখনো কখনো আল্লাহর ইচ্ছায় দ্বিগুণও হয়ে যাবে।

আল্লাহতায়ালা 'সম্যক দ্রষ্টা', তিনি দু'দলের অবস্থাই দেখেন। দেখেন, ওই দলকে যারা লোক দেখানো ব্যয় করে। ওই দলকেও যাদের দানের মূলে থাকে আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনের ঐকান্তিকতা।

www.eelm.weebly.com

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۙ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ○

❑ তোমাদের কেহ কি চায় যে তাহার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকুক যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাহাতে সর্বপ্রকার ফলমূল আছে, আর সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয়, যখন তাহার সন্তান-সন্তুতি দুর্বল, অতঃপর উহাকে এক অগ্নিখরা ঘূর্ণিঝড় আক্রমণ করে ও উহা জ্বলিয়া যায়? এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার।

খেজুর ও আঙ্গুর বেশী উপকারী। তাই খেজুর ও আঙ্গুরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে অন্যান্য ফলের গাছ সম্পর্কে। এ রকম সর্ববিধ ফলের গাছবিশিষ্ট বাগানের মালিকের বার্ধক্যাবস্থায় যদি বিপর্যয় নেমে আসে, যদি অগ্নিখরায় ও ঘূর্ণিবাত্যায় সবকিছু দগ্ধীভূত কিংবা বিনষ্ট হয়, তবে তার আক্ষেপ কোন পর্যায়ের হতে পারে, অনুধাবনীয়। একে তো রোজগারে অক্ষম বৃদ্ধ বয়স, তার উপর এই বিপদ। এ অবস্থা কাম্য হতে পারে কার? কিয়ামতের দিন যখন একমাত্র প্রয়োজন হবে পূণ্য, তখন সমস্ত আমল বাতিল হলে তার উপমা তো দগ্ধীভূত বাগানের মতোই হবে।

উবায়েদ বিন উমায়ের বলেন, হজরত ওমর রা. সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, এই আয়াত সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কী? এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত কী? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ই ভালো জানেন। হজরত ওমর রেগে গেলেন, এ কেমন কথা। আল্লাহ্তো সবই জানেন। তোমরা কী জানো তাই বলো? হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, জ্বী। আমি কিছু জানি। হজরত ওমর বললেন, ভাতিজা বলে ফেলো? তোমার কম বয়সের কারণে সংকোচ কোর না। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, এই আয়াতে আমলের উপমা দেয়া হয়েছে। হজরত ওমর বললেন, হ্যাঁ। এই আয়াত ওই ব্যক্তির উপমা, যে আল্লাহ্তায়ালার

www.eelm.weebly.com

সন্তোষজনক আমল করতে চায়। অতঃপর আল্লাহ্ তার উপর শয়তানকে প্রবল করে দেন। তখন সে পাপমুখী হয়ে আপন আমলকে নষ্ট করে ফেলে।

এমনিভাবেই আল্লাহতায়ালা মানুষের জন্য নিদর্শনসমূহ উপস্থাপন করেন। যাতে মানুষ বুঝতে পারে এবং উপদেশ গ্রহণ করে।

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬৭

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ○

❐ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যাহা উপার্জন কর এবং আমি যাহা ভূমি হইতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করিয়া দেই তন্মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা ব্যয় কর; এবং উহার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করিও না; যেহেতু তোমরা উহা গ্রহণ করনা, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করিয়া থাক। এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

'উপার্জন' অর্থ বৈধ উপার্জন। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, হারাম উপায়ে উপার্জিত সম্পদ দান করলে কবুল করা হবে না।

হারাম সম্পদ ব্যয় করাতে বরকত নেই। এ রকম ব্যয় দোজখের শাস্তিকে দূর করতে পারবে না। ভালো মন্দকে মিটিয়ে দেয়। কিন্তু অপবিত্রতা দ্বারা অপবিত্রতা দূর হয় না। আলেমরা এখানে একমত। এই আয়াত আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের স্থিরনিশ্চিত দলিল। দাউদ জাহেরী কিন্তু এ বর্ণনা থেকে সরে এসে বলেন, পণ্যসামগ্রী ব্যতীত সোনা রূপা এবং অন্য বস্তুতে জাকাত নেই। অধিকাংশ আলেমের মত, আসবাবপত্র, টাকা, বাড়িঘর জায়গা ব্যবসা সংক্রান্ত হলে জাকাত ওয়াজিব। ব্যবসার শর্ত এ জন্যে জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, বাণিজ্য ব্যতীত সম্পদ বৃদ্ধি ঘটে না।

হজরত ইবনে ওমর বলেন, ব্যবসার জন্য না হলে আসবাবপত্রের জাকাত ওয়াজিব নয়। দারা কুতনী।

হজরত সামুরা বিন জুনদুব বর্ণনা করেন, ব্যবসা সামগ্রীর জাকাত আদায় করার জন্য রসুলুল্লাহ স. আমাকে হুকুম দিয়েছেন। দারাকুতনী, আবু দাউদ, বায্যার। বায্যা'র সুলায়মান বিন সামুরার বর্ণনা সামুরা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু তার এই বর্ণনার সনদে রয়েছে কিছু অপরিচিত বর্ণনাকারী।

www.eelm.weebly.com

আসবাবপত্রে জাকাত ওয়াজিব হয়েছে হজরত হাম্মাস বর্ণিত একটি হাদিস দ্বারা। তিনি বলেছেন, আমি একবার কিছু কাঁচা চামড়া মাথায় নিয়ে হজরত ওমরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, তুমি কি জাকাত আদায় করনি? আমি বললাম, এগুলো ছাড়া আমার আর কোনো সম্পদ নেই। তিনি বললেন, এগুলোই তো সম্পদ। নিচে নামাও। নিচে নামালে তিনি চামড়াগুলো গুণলেন এবং বললেন, এগুলোর জাকাত ওয়াজিব। তিনি চামড়াগুলোর জাকাত নিয়ে নিলেন। শাফেয়ী, আহমদ, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে আবী শাইবা, সাঈদ বিন মানসুর, দারা কুতনী।

আবু জর বর্ণনা করেন, রসুলে পাক স. এরশাদ করেছেন, উট, গাভী, মহিষ এবং কাপড়ের জাকাত ওয়াজিব। দারা কুতনী এই হাদিসকে তিনটি দুর্বল পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। দু'টি পদ্ধতি এসেছে মুসা বিন উবায়দা জায়েদী থেকে। যার সম্পর্কে ইমাম আহমদ বলেন, তার বর্ণনা গ্রহণ করা বৈধ নয়। তৃতীয় পদ্ধতিটি এসেছে আব্দুল্লাহ বিন মুয়াবিয়া বিন আসেম থেকে, নাসাঈ যাকে যয়ীফ (দুর্বল) বলেন এবং বোখারী যাকে মুনকার (পরিত্যক্ত) মনে করেন।

এই বর্ণনার একজন রাবী (বর্ণনাকারী) ছিলেন ইবনে জারীহ্। তিনি ইমরান বিন আনিস থেকে শুনে এই হাদিসটি লিখেছেন। কিন্তু বোখারী বলেন, ইবনে জারীহ্ ইমরান বিন আনিস থেকে হাদিস শুনেননি। চতুর্থ এক পদ্ধতিতে দারা কুতনী এবং হাকেম এই হাদিসকে এইভাবে উল্লেখ করেছেন যে—উট, বকরী, গরু, মহিষ এবং পোশাক পরিচ্ছদের জাকাত ওয়াজিব। যে ব্যক্তি দিরহাম এবং দিনার (স্বর্ণ ও রৌপ মুদ্রা) জমা করে রাখে, কর্জ দেয় না, আল্লাহর রাস্তায় খরচও করে না, তার সম্পদ খনিজ সম্পদ বলে গণ্য হবে। কিয়ামতের দিন এগুলো দিয়ে তাকে দাগ দেয়া হবে। এই বর্ণনাটির সনদে কোনো দোষ নেই।

যদি কোনো ব্যবসায়ী কয়েক বৎসর পর্যন্ত তার পণ্যসামগ্রী বেচা-কেনা না করে তবে এক্ষেত্রে মত রয়েছে বিভিন্ন রকমের। ইমাম মালেকের মতে জাকাত ওয়াজিব নয়, কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়ে গেলেও। পরে বেচাকেনা শুরু করলে কেবল এক বৎসরের জাকাত আদায় করতে হবে। অন্য তিন ইমামের মত হচ্ছে, প্রতি বছরের জাকাত ওয়াজিব, বেচাকেনা না করলেও। কেননা রসুলে পাক স. বলেছেন, পণ্য সামগ্রীর জাকাত দাও।

'আমি যাহা ভূমি হইতে উৎপাদন করিয়া দেই' — কোনো কোনো আলেম মনে করেন, এখানে নফল (ঐচ্ছিক) সদকার কথা বলা হয়েছে। হজরত আনাস বিন মালেক বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, মানুষ, পাখি অথবা চতুষ্পদ জন্তু বৃক্ষের ফল অথবা খেতের ফসল খেয়ে ফেললে তার ভূস্বামীর পক্ষে দান হিসাবে বিবেচিত হবে অর্থাৎ দানের সওয়াব দেয়া হবে। আহমদ, শায়খাইন

www.eelm.weebly.com

ও তিরমিজি। আমি বলি, এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, চাষাবাদ করা মোস্তাহাব (পছন্দনীয়)। কিন্তু হজরত আবু উমামা বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, ক্ষেতের ফসল জাকাতবিহীন অবস্থায় যে সম্প্রদায়ের গৃহে প্রবেশ করে সে সম্প্রদায় লাঞ্ছনার উপযুক্ত। বোখারী। এরকম চাষাবাদ অবশ্যই বদনসীবীর প্রমাণ। ওয়াল্লাহু আলাম।'

বিশুদ্ধ মত এই যে, এই আয়াতে জাকাতের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে হুকুমের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, সামগ্রীর প্রকার সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন নেই।

মাসআলা ঃ খেজুর, আঙ্গুর এবং প্রতিটি আহার্য দ্রব্য যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তার দশভাগের এক ভাগ জাকাত আদায় করা ওয়াজিব। যদি বৃষ্টির পানি, নদীর জোয়ারের পানি ইত্যাদি জমিতে দিতে পরিশ্রম করতে না হয়। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। কিন্তু ফসল ফলাতে যেয়ে যদি সেচের প্রয়োজন পড়ে, তবে বিশ ভাগের একভাগ দিতে হবে। ঘাস এবং জ্বালানী কাঠের উপর জাকাত ওয়াজিব নয়। উপরোল্লিখিত ফসলগুলো ছাড়া অন্যান্য ফসলের জাকাত দেয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, প্রত্যেক প্রকার জমির ফল এবং শাকসব্জির জাকাত ওয়াজিব। কারণ, এই আয়াতের হুকুম সাধারণ। রসুল স. বলেছেন, আপনাআপনি বৃষ্টি এবং নদীর পানি পাওয়া গেলে দশ ভাগের একভাগ দিতে হবে। আর পানিসিঞ্চনের প্রয়োজন পড়লে বিশ ভাগের একভাগ দেয়া জরুরী। বোখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান, ইবনে জারুদ। মুসলিম, হজরত জাবের থেকে এবং তিরমিজি ও ইবনে মাজা হজরত আবু হোরায়রা থেকে, নাসাঈ ও ইবনে মাজা হজরত মুআজ থেকে এবং আবু দাউদ হজরত আলী থেকে এই হাদিস উদ্ধৃত করেছেন।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ওই সমস্ত ফসলের জাকাত দিতে হবে যা আহার্যরূপে গণ্য করা হয়। যেমন — খেজুর, আঙ্গুর, বুট, যব, গম, চাল ইত্যাদি। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মতে ওই সমস্ত ফসল যা অনুমান করে অথবা ওজন করে জমা রাখা হয় এবং জমা রাখলে নষ্ট হয় না। যেমন তিল, বাদাম, ফুন্দুক (এক প্রকার ফল) জাফরান, জিরা ইত্যাদি।

ক্ষিরা, কাকরোল, খরবুজা, তরমুজ, আনার এবং শাকসব্জির জাকাত রসুল স. অব্যাহতি দিয়েছেন। দারা কুতনী, হাকেম, বায়হাকী।

হজরত মুআজ রসুলে পাক স. কে লিখিতভাবে বলেছিলেন, সব্জি ও তরকারীর হুকুম কী? রসুল স. বলেছিলেন, এসবের জাকাত নেই। তিরমিজি

www.eelm.weebly.com

লিখেছেন, এই হাদিসটি সহীহ্ নয়। তবে মুসা বিন তালহা রসুল স. থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দারা কুতনী একে দূষণীয় বলেছেন। বলেছেন, হাদিসটি মুরসাল হওয়াই বিশুদ্ধ। বায়হাকী মুসা বিন তালহা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, আমাদের নিকট মুআজের চিঠি আছে। হাকেম লিখেছেন, মুসা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন তাবেয়ী ছিলেন। হজরত মুআযের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিলো। কিন্তু ইবনে আবদুল বার বলেছেন, দেখা হয়নি। দারা কুতনী মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে, সব্জির জাকাত নেই।

দারা কুতনী হজরত আয়েশা থেকে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে, সব্জির জাকাত নেই।

হাকেম এবং বায়হাকী হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু মুসা এবং মুআজ কে দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার জন্য ইয়ামেনে প্রেরণ করার সময় রসুলে পাক স. বলেছিলেন, গম, কিসমিস, যব ও খেজুর ব্যতীত অন্য কোনোকিছুর উপর জাকাত আদায় কোর না।

তিবরানী মুসা বিন তালহার মাধ্যমে হজরত ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এই চারটি বস্তুর মধ্যেই জাকাতের নিয়ম জারি করেছেন।

হজরত শা'বী থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেন, রসুলে পাক স. ইয়ামেনবাসীদেরকে লিখেছিলেন, চারটি ফলের উপর জাকাত ওয়াজিব। খেজুর, খোরমা, যব ও কিসমিস। পঞ্চম আরেকটি বস্তু আছে — ভুট্টা। ভুট্টারও জাকাত ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা এসেছে। কিন্তু বর্ণনাটি দুর্বল। আমি বলি, আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, জাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ ওই চারটি বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যদিও হাদিস শরীফে ওগুলোর উল্লেখ আছে। সীমাবদ্ধতার হুকুমটি রহিত হয়ে গিয়েছে।

ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী বলেন, খাদ্যরূপে ব্যবহারোপযোগী বস্তুর জাকাত ওয়াজিব। তবে খাদ্যদ্রব্যগুলো যেনো পচনশীল না হয়। যেমন, শাক পাতা, সব্জি, তরকারী ইত্যাদি।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং পাগলের উপরও জাকাত ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, জাকাত হচ্ছে ইবাদত। আর ইবাদতের জন্য নিয়ত জরুরী। আর বিশুদ্ধ নিয়ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং পাগল করতে পারে না। তাই তাদের উপর জাকাত ওয়াজিব নয়। যেমন তাদের উপর নামাজ ওয়াজিব নয়।

ইবাদত করার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। তাই কাফেরের উপরে জাকাত (ওশর) ওয়াজিব নয়। তাদের জন্য রয়েছে খেরাজ (খাজনা)। ওশরী জমি কোনো কাফের কিনে নিলেও তাকে খেরাজই দিতে হবে, ওশর নয়। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ বলেন, ওশরী জমির মালিককে ওশরই দিতে হবে। মালিক মুসলমান কিংবা অমুসলমান যেই হোক।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আজমের মতে ওশরের কোনো নেসাব নেই। কম বেশী সকল অবস্থাতেই উৎপন্ন দ্রব্যের ওশর দিতে হবে। কেননা এ সম্পর্কিত হাদিসগুলোর নির্দেশনা সাধারণভাবে প্রযোজ্য। ওমর বিন আবদুল আজিজ, মুজাহিদ এবং ইব্রাহিম নখয়ী এ রকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদের মতে, ওশরের জন্য নেসাব থাকতে হবে। এর পরমিাণ হচ্ছে পাঁচ ওসাক। তাঁদের দলিল হলো এই যে, রসুল স. পাঁচ ওসাকের কম হলে জাকাত ওয়াজিব নয় বলেছেন। হজরত আবু সাঈদ থেকে বোখারী ও মুসলিম এরকমই বর্ণনা করেছেন।

<u>মাসআলা</u> ঃ জমিতে উৎপন্ন সকল প্রকার শস্যের উপর ওশর ওয়াজিব। কোনো মুসলমান খেরাজের জমিনের মালিক হলে, তাকে ওশর দিতে হবে, খেরাজ নয়। যদি খেরাজ ও ওশর দু'টিই দিতে হয় তবে জমির জন্য খেরাজ এবং ফসলের জন্য ওশর দিতে হবে। এ মতটি অধিকাংশ আলেমদের। কারণ, খেরাজ হচ্ছে জমির খাজনা। উৎপন্ন ফসলের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। ওশর উৎপন্ন ফসলের জাকাত, জমির নয়। এ রকম অবস্থায় নেসাব শর্ত। ইমাম আবু হানিফা বলেন, খেরাজী ভূমি খেরাজী থাকে। ওশর ও খেরাজ এক সাথে মিলে না। কিন্তু এক সাথে যে মিলবে না এ রকম দলিল শরিয়তে নেই। তাই খেরাজী জমির মুসলমান মালিককে ওশর ও খেরাজ দু'টিই দিতে হবে। এ রকমই মত ব্যক্ত করেছেন জমহুর ওলামা।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কোনো মুসলমানের উপর ওশর ও খেরাজ একত্রিত হয় না। কিন্তু আবু হাতেম বলেন, এই কথা রসুল স. এর নয়। এ কথা বলেছে এই হাদিসটির বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া বিন আমবাসা। এটা তার কথা। সে-ই ইমাম আবু হানিফা এবং তার পূর্বসূরীদেরকে অযথা অপবাদ দিয়েছে। সে উদ্ধৃতি দিয়েছে ইব্রাহিম আল কামারের। কিন্তু ইব্রাহিম বর্ণনাকারী হওয়ার উপযুক্ত নয়। তার কথা দলিল নয়। ওদিকে হেদায়া প্রণেতা এই মাসআলায় এজমার (ঐকমত্যের) দাবী করেছেন। লিখেছেন, ফাসেক (অসৎ) অথবা আদেল (ন্যায়পরায়ণ) বাদশাহ ওশর ও খেরাজকে একত্রিত করার হুকুম দেয়নি। কিন্তু হেদায়া প্রণেতার এ দাবী মানা যায় না। কেননা ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন যে, ওমর বিন আবদুল আজিজ র. খেরাজ ও ওশরকে একত্রিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন হজরত ওমর রা. এর অনুসারী। মাসআলাটি যদি সর্বসম্মত হতো তবে ওমর বিন আবদুল আজিজ একে গোপন করতেন না।

'আমি যাহা ভূমি হইতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করিয়া দেই' — এই কথার মধ্যে খনিজ সোনা ও রূপার কথাও আছে। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ীর মত এই যে, খনিজাত সোনা ও রূপা নেসাব পরিমাণ হলে জাকাতের নিয়মে

www.eelm.weebly.com

চল্লিশ ভাগের একভাগ দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেন, এগুলো খরচ করার খাত জাকাতের খাতের মতো। কিন্তু ইমাম মালেকের নিকট ওই সমস্ত খাতে খরচ করতে হবে, যে সমস্ত খাতে খরচ করতে হয় কাফেরদের সম্পদ (যুদ্ধ ছাড়া যা হাতে আসে)। ইমাম আহমদের মতও এ রকম। কিন্তু ইমাম মালেকের মত গণিমতের মালের মতো। যার একপঞ্চমাংশ দিতে হয়। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আর এ কথাও জেনে রাখবে যে, গনিমত হিসাবে যা কিছু লব্ধ হয় তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র জন্য।' আমাদের নিকট (হানাফী আলেমদের নিকট) এই আয়াতে খনিজ বস্তু অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানে 'এখরাজ' এর অর্থ উৎপন্ন করা। এটাই প্রকৃত অর্থ। ইমাম শাফেয়ী একই সঙ্গে প্রকৃত এবং পারিভাষিক দুই অর্থই নিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা নেননি। ইমাম আহমদ বলেন, খনিজ বস্তুর এক পঞ্চমাংশ দান করা ওয়াজিব। চুনাপাথর, সোনা, রূপা, লোহা, তেল — সকল বস্তুর নিয়ম একই। এগুলোকে গণিমতের মালের মতো মনে করতে হবে। জাকাতও দিতে হবে গণিমতের মালের নিয়মে — একপঞ্চমাংশ। হাদিস শরীফে এরকম উল্লেখ আছে।

ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সোনা ও রূপার জন্যই জাকাত। লোহা বা অন্যান্য স্বল্পমূল্যের খনিজ বস্তুর উপরে জাকাত ওয়াজিব নয়। আমি বলি, ভূমি থেকে উৎপন্ন সকল বস্তুরই মূল্য আছে এবং এগুলো বর্ধনশীলও। বর্ধনশীল জিনিসের উপরে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের ঐকমত্য আছে। এ জন্যই জমিতে উৎপন্ন ফসল, গেল্লা (জমিতে উৎপন্ন এক প্রকার ফসল) ফল ইত্যাদির জাকাতের জন্য এক বৎসর ধরে সংরক্ষণ করা শর্ত নয়। তাই খনিজ বস্তুর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য এক বৎসর ধরে থাকা অথবা তার মূল্যের তারতম্য বিচার করার প্রয়োজন নেই।

এক পঞ্চমাংশ নয় — খনিজ বস্তুর চল্লিশভাগের একভাগ জাকাত দিতে হবে, ইমাম শাফেয়ীর এই মতের দলিল ওই হাদিসটি যা ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় লিখেছেন। রবীয়া বিন আবদুর রহমান বর্ণনাকারীর নাম জানা নাই এমন একজনের বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ করেন, রসুলুল্লাহ্ স. বেলাল বিন হারেস মাজানিকে কোনো এক গোত্রের খনির অভিভাবক করে জায়গীর দান করেছিলেন। খনিগুলো ছিলো খুব চাকচিক্যময়। ওই খনিগুলো থেকে জাকাত ব্যতীত অন্য কিছুই নেয়া হতো না। ইবনে আবদুল বার বলেন, এই হাদিসটি মুনকাতেহ (ধারাবাহিকতাহীন)। ইবনে জাওজী বলেন, রবীয়া সাহাবীগণকে পেয়েছিলেন, তবু বর্ণনাকারীর নাম মনে রাখতে পারেননি — এটা তাঁর দুর্বলতা।

আবু উবায়েদ কিতাবুল আমওয়ালে লিখেছেন, হাদিসটি মুনকাতেহ হওয়ার কারণেই রসুল স. যে জাকাতের হুকুম দিয়েছিলেন, এরকম স্পষ্ট উল্লেখ নেই। ইমাম শাফেয়ী বলেন, হাদিস সংকলনকারীগণ এই হাদিসকে গ্রহণ করেননি।

www.eelm.weebly.com

কারণ, জায়গীর দানের উল্লেখ থাকলেও এতে রসুল স. কর্তৃক জাকাত দানের হুকুম নেই।

ইমাম হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে রবীয়া হারেস বিন বেলাল বিন হারেস মাজানি থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর সম্প্রদায়ের খনির জাকাত তাঁর পিতা থেকে গ্রহণ করেছিলেন। ইবনে জাওজীও এ রকম উদ্ধৃতি দিয়েছেন দারওয়ার্দীর বর্ণনা থেকে। ইমাম আজম আবু হানিফা দলিল পেশ করেছেন হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিস থেকে, যা সিহাসিত্তায় সংকলিত আছে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, 'খনির মধ্যে এক পঞ্চমাংশ।' আরবী রিকাজ শব্দটির অর্থ খনিজাত বস্তু এবং মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পূর্বে মাটিতে প্রোথিত সম্পদ — দু'টোই হয়। আমি বলি, দু'টোকে আলাদা রাখাই উচিত। প্রোথিত সম্পদ কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ হলে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা ওয়াজিব (ইমাম বোখারী কিন্তু বলেন, রিকাজ শব্দটি মুসতারেক খনিজ বস্তু ও প্রোথিত সম্পদ দুই-ই)। আমি বলি ঘটনা এরকম নয়। রিকাজের অর্থ একটিই-খনিজ বস্তু। বস্তুত 'এক পঞ্চমাংশ' মতটিই অধিক বিশুদ্ধ এবং শক্তিশালী। ওয়াল্লাহু আলাম।

'নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করিও না' — হাকেম, তিরমিজি, ইবনে মাজা, হজরত বারাহ থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে আমাদের আনসারদের সম্পর্কে। আমরা খেজুর বাগানের মালিক ছিলাম। আমাদের মধ্যে কিছু লোক দানের ব্যাপারে আন্তরিক ছিলো না। তারা খোসা উঠে যাওয়া খেজুর দান করতো। আবু দাউদ, নাসাঈ এবং হাকেম, হজরত সাহল বিন হানীফের বর্ণনা থেকে লিখেছেন, কিছু লোক ওশর হিসাবে খারাপ ফল দিতো, তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে। হাকেম, হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এক সা অর্থাৎ সাড়ে তিন সের খেজুর, খোরমা সদকায়ে ফেতের হিসাবে দিতে বলেছিলেন। আমি খারাপ খেজুর, খোরমা নিয়ে এসেছিলাম তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে। ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে লিখেছেন, কেউ কেউ খারাপ শস্য কিনে সদকা দিতো, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

'যেহেতু তোমরা উহা গ্রহণ কর না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করিয়া থাক' — অর্থাৎ তোমরা নিজের বেলায় তো এ রকম মাল গ্রহণ করো না। তবে আল্লাহর রাস্তায় এ রকম করো কেনো। চক্ষু বন্ধ করা অর্থ অসম্মত হওয়া। অথবা মুখ ফিরিয়ে নেয়া। এ কথা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, কোনো পাওনাদারই খারাপ মাল গ্রহণ করে না। হাসান বসরী ও হজরত কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ — তোমরা বাজারে খারাপ সামগ্রী বিক্রি করতে দেখলে কিনতে না। অন্য এক বর্ণনায় হজরত বারাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি বলতেন, খারাপ সামগ্রী হাদিয়া দিলেও তুমি গ্রহণ করতে না। না গ্রহণ করলে দান পেশকারী লজ্জা পাবে ভাবলে যদি গ্রহণও করতে, তবুও অপ্রসন্নভাবে করতে।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহর রাস্তায় খারাপ মাল দান করা নিষেধ, যদি ভালো মাল থাকে। কিন্তু সব মাল খারাপ হলে ওশর হিসাবে খারাপ মাল দেয়া নিষিদ্ধ নয়। আর যদি কিছু ভালো এবং কিছু খারাপ হয় তবে কিছু কিছু করে উভয় প্রকারের মাল হতে দিতে পারবে।

'এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত' — অর্থাৎ মনে রেখো, আল্লাহ্ তোমাদের সদকার মুখাপেক্ষী নন। বরং তোমরাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি অভাবমুক্ত। তোমরাই অভাবী। সদকার সওয়াব তোমাদের দিকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। আরো মনে রেখো, আল্লাহর সমস্ত কাজ প্রশংসনীয়।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬৮

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

❒ শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।'

'ফক্বর্' অর্থ দারিদ্র — সম্পদের স্বল্পতা। শয়তান এই বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, যদি দান করো তবে গরীব হয়ে যাবে। এখানে 'ফাহ্শা' শব্দটির অর্থ নেয়া হয়েছে কৃপণতা অর্থাৎ জাকাত না দেয়া। আসলে ফাহ্শা বলতে সকল প্রকার গোনাহকেই বোঝায়। কালাবী বলেন, এই আয়াত ব্যতীত কোরআনের অন্য যে সমস্ত স্থানে ফাহ্শা শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, সে সমস্ত স্থানে ফাহ্শা শব্দের অর্থ হবে ব্যভিচার (জেনা)। অপরপক্ষে আল্লাহতায়ালা ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন যে, তিনি তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম বিনিময় দান করবেন। তিনি প্রকৃত প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞও।

হজরত আবু হোরায়রার এক বর্ণনায় আছে, সকাল বেলা দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। একজন বলেন,'হে আল্লাহ্! উত্তম দানকারীকে উত্তম বিনিময় দাও।' দ্বিতীয়জন বলে, 'হে আল্লাহ্! কৃপণকে ধ্বংস করো।' বোখারী, মুসলিম। হজরত আসমা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আমাকে বলেছেন, বিনা হিসাবে ব্যয় করো। আল্লাহ্ও তোমাকে বিনা হিসাবে দান করবেন। জমা করে রেখোনা। তাহলে আল্লাহ্ও জমা করে রাখবেন। তোমাকে দিবেন না। বোখারী ও মুসলিম।

হজরত আবু জর থেকে বর্ণিত হয়েছে. রসুল স. কাবার প্রভুর কসম খেয়ে বলেছেন, ওই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি বললাম, কে? রসুল স. বললেন, যে অতিসম্পদশালী। কিন্তু ওই অতিসম্পদশালী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত নয়, যে অগ্র-পশ্চাৎ

www.eelm.weebly.com

বাম-দক্ষিণ না ভেবে দান করে। এ ধরনের লোক অত্যন্ত কম। বোখারী ও মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ, জান্নাত ও মানুষের নিকটবর্তী এবং দোজখ থেকে দূরবর্তী। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ, জান্নাত ও মানুষ থেকে দূরে, আর দোজখের নিকটে। মূর্খ দাতা কৃপণ আবেদ অপেক্ষা উত্তম। তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রা অন্যস্থানে বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, দানের বিনিময়ে জান্নাতে একটি বৃক্ষ উৎপন্ন হবে, যার ডালপালাগুলো জান্নাতের বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়বে। সেই বৃক্ষের কোনো একটি ডাল ধরলে সেটি তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কৃপণতা দোজখের একটি বৃক্ষ। যার ডালগুলো থাকবে দোজখের বাইরে। সে ডাল ধরলে ডালটি তাকে নিয়ে যাবে দোজখে। বায়হাকী।

হজরত আলী বলেছেন, দান করো দ্রুততার সঙ্গে। কেননা বিপদ দানকে অতিক্রম করে তোমাদের কাছে আসতে পারবে না। রজীন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬৯

يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُوا الْأَلْبَابِ ○

❑ তিনি যাহাকে ইচ্ছা হিকমত প্রদান করেন এবং যাহাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাহাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়; এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে।'

হিকমত অর্থ বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানানুযায়ী আমল যা আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনের কারণ হয়। এমন জ্ঞান ওহি ছাড়া হাসেল হয় না এবং ওহি (প্রত্যাদেশ) আসে নবীগণের কাছে। তাই হিকমত নবী, রসুল এবং পরে তাদের মাধ্যমে অন্যেরা লাভ করেন।

ইবনে মারদুবিয়া, জুআইবিরের পদ্ধতিতে জুহাকের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মারফু হাদিস উদ্ধৃত করে বলেন, হিকমত অর্থ কোরআন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, কোরআন অর্থ কোরআনের তাফসীর (ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ)। যাকে হিকমত দান করা হয়েছে, তাকে দেয়া হয়েছে অতি বৃহৎ কল্যাণ। হজরত মুয়াবিয়া বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে ধর্মের বিধি বিধানের জ্ঞান দান করেন। আর আমি ধর্মের বিধি বিধান বন্টনকারী (বর্ণনাকারী)। দাতা হচ্ছেন আল্লাহ্। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, মৃত্যুর পর সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, বাকি থাকে কেবল তিন প্রকারের আমল - ১. সদকায়ে জারিয়া (যেমন নির্মিত কূপ, রাস্তা, মাদ্রাসা, সড়ক, মুসাফিরখানা ইত্যাদি) ২. এমন জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় (যেমন রচিত

www.eelm.weebly.com

গ্রন্থাদি, সৎকর্মপরায়ণ আলেমের যোগ্য ছাত্র) ৩. সৎ ও সাধু সন্তান যারা পিতা মাতার জন্য দোয়া করে। মুসলিম। হজরত আবু মাসউদ আনসারী রা. বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কল্যাণের পথপ্রদর্শকদেরকেও কল্যাণকর্মে ব্যাপৃতদের সমান সওয়াব দান করা হবে। মুসলিম।

হজরত আবু দারদা থেকে বর্ণিত হয়েছে রসুল স. এরশাদ করেছেন, মূর্খ আবেদের উপর দ্বীনি আলেমের মর্যাদা এ রকম — যেমন তারকারাজির মধ্যে চতুর্দশীর চাঁদ।

আম্বিয়া আ. গণ দিরহাম ও দিনার (পার্থিব সম্পদ) রেখে যাননি। রেখে গিয়েছেন এলেম (জ্ঞান)। যে এই জ্ঞানকে গ্রহণ করে সেই সৌভাগ্যশালী। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারেমী।

হজরত আবু উমামা বাহেলী রা. বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আবেদের উপরে আলেমের মর্যাদা এ রকম যেমন আমার মর্যাদা সাধারণ মানুষের উপর। একথা নিশ্চিত যে আল্লাহ্, ফেরেশতা এবং পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত অধিবাসী এমন কি গহবরের পিপীলিকা এবং পানির মাছ সকলেই ওই ব্যক্তির উপরে রহমত প্রেরণ করেন যিনি মানুষকে সৎকর্ম শিক্ষা দেন। অর্থাৎ রহমত অবতীর্ণ করেন আল্লাহ্ আর তাঁর সমস্ত সৃষ্টি করে রহমতপ্রাপ্তির প্রার্থনা। তিরমিজি।

বোধশক্তিসম্পন্ন বা জ্ঞানবান যাঁরা তারাই আল্লাহ্র আয়াত থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। তাঁরা এমন জ্ঞানী যাঁদের চিন্তাস্রোত শয়তানী ধারণা থেকে পবিত্র। আমি বলি, এমন চিন্তা ওই সময়ে অর্জিত হতে পারে, যখন নফস পূর্ণরূপে ফানা হয়ে যায় (ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান তিরোহিত হওয়ার পর অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্ পাকের জাতের জ্ঞান লাভ হওয়ার অবস্থাকে ফানা বলে)।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭০

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۝

❒ যাহা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা যাহা কিছু তোমরা মানত কর আল্লাহ্ তাহা জানেন। সীমালংঘনকারীগণের কোন সাহায্যকারী নাই।

মানুষ যা কিছু ব্যয় করে, আল্লাহ্তায়ালা তার সবই জানেন, প্রকাশ্যে হোক অথবা গোপনে। সঠিক পথে হোক বা অন্যায় পথে। যা ওয়াজিব এবং মানতের মাধ্যমে নিজের উপরে ওয়াজিব করে নেয়া হয় যেমন, আল্লাহ্ আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করলে দশদিন রোজা রাখবো অথবা দশজন মিসকিনকে খাওয়াবো — এসবকিছুই আল্লাহ্তায়ালা জানেন এবং এর জন্য তিনি বিনিময়ও দিবেন। লোক

www.eelm.weebly.com

দেখানো দান অথবা অন্যায় পথে ব্যয়কারীদেরকে আল্লাহ্তায়ালার অসন্তোষ থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তারা সীমানালংঘনকারী। আর সীমানালংঘনকারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭১

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

❒ তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে উহা ভাল; আর যদি তাহা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও তবে তাহা তোমাদের জন্য আরও ভাল; এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করেন; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা অবহিত।'

প্রকাশ্য গোপন উভয় প্রকার দানই আল্লাহ্তায়ালার পছন্দ। দানে পাপমোচন হয়।

হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, গোপন দান আল্লাহ্তায়ালার শাস্তির আগুনকে নিভিয়ে দেয়। আর অভাবগ্রস্তদের সাথে উত্তম আচরণ হায়াত বৃদ্ধি করে। তিবরানী।

হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন, যেদিন আল্লাহ্র ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না সেদিন সাত প্রকারের মানুষ আল্লাহ্র ছায়া লাভ করবেন ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক ২. যে যুবক তার যৌবনের প্রারম্ভেই আল্লাহ্র ইবাদতে নিমগ্ন হয়েছেন ৩. ওই ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হওয়ার পরও পুনঃ প্রবেশ পর্যন্ত যার অন্তর মসজিদ সংলগ্ন থাকে ৪. ওই সমস্ত ব্যক্তি যাঁরা আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে — একত্রিত হয় আল্লাহ্র জন্য, বিচ্ছিন্নও হয় আল্লাহ্র জন্য ৫. ওই ব্যক্তি যে নীরবে নিভৃতে আল্লাহ্র স্মরণমগ্ন থাকে এবং কাঁদে ৬. ওই ব্যক্তি যে সুন্দরী রমনীর ব্যভিচারের আহবানকে এই কথা বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, আমি আল্লাহ্কে ভয় করি ৭. ওই ব্যক্তি যার দান এতো গোপন যে, ডান হাত করলে বাম হাত জানে না। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে মাসউদ রা. মারফু হাদিসে বর্ণনা করেছেন, তিন ধরনের মানুষ আল্লাহ্র অতি প্রিয় — ১. ওই ব্যক্তি যে রাতে উঠে কোরআন তেলাওয়াত করে ২.

www.eelm.weebly.com

ওই ব্যক্তি যে ডান হাতে দান করে অথচ বাম হাত তার সংবাদ রাখে না ৩. ওই ব্যক্তি, জেহাদের ময়দানে সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও যে শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

হজরত আবু জর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তিন ধরনের মানুষ আল্লাহ্‌তায়ালার প্রিয় এবং তিন ধরনের মানুষ তাঁর অপ্রিয় - ১. অনাত্মীয় যাঞ্চাকারীকে যখন কেউ কিছু দেয় না তখন যে ব্যক্তি তাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে কিছু দান করে ২. যুদ্ধরত কোনো দল প্রায় সারা রাত অভিযান শেষে যখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তখন যে ব্যক্তি দোয়া ও কোরআন পাঠে রত হয় ৩. যুদ্ধকালে সাথীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও শহীদ বা গাজী হওয়া পর্যন্ত যে শত্রুর মোকাবেলা করে।

আল্লাহ্‌তায়ালার অপ্রিয় ব্যক্তিরা হচ্ছে — ১. বৃদ্ধ ব্যভিচারী ২. দাম্ভিক ফকির ৩. জালেম ধনী। তিরমিজি, নাসাঈ।

'তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করেন' — একথার মাধ্যমে সগীরা গোনাহ্ মাফ করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। রসুল স. বলেছেন, গোপন দানে পাপমোচন হয়। তিবরানী।

'তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা অবহিত' — এ কথায় গোপন দানকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। গোপন দান বিফল হয় না।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭২

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝

❑ তাহাদের সৎপথ গ্রহণের দায় তোমার নহে; বরং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন; যে ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহা তোমাদের নিজেদের জন্য; এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করিয়া থাক। যে ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহার পুরস্কার তোমাদিগকে পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হইবে, তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে না।

নাসাঈ, তিবরানী, বায্যার এবং হাকেম, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, প্রথম দিকে সাহাবীগণ তাঁদের কাফের আত্মীয় স্বজনকে দান করতে

www.eelm.weebly.com

অনীহা প্রকাশ করতেন। রসুল স. এ রকম করতে নিষেধ করলেন তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইবনে আবী শাইবা হজরত মোহাম্মদ বিন হানাফীয়ার মুরসাল বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, ইবনে আবী হাতেম ও হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. কেবল মুসলমানদেরকে দান করতে বলেছিলেন, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি সকল সম্প্রদায়কে দান করার অনুমতি দিয়ে দেন। বাগবী, সাঈদ ইবনে জুবায়ের রা. থেকেও এ রকম উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

ইবনে আবী শাইবা, হজরত সাঈদ বিন জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, আপন ধর্মানুসারী ছাড়া অন্যকে দান কোর না। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। আল্লাহ্র কথার মর্ম এই যে, হে রসুল! ধর্মের সুমতি দানে আপনি দায়বদ্ধ নন।

কালাবী বলেছেন, মুসলমানদের কিছু ইহুদী আত্মীয় ছিলো। মুসলমানদের সাহায্য ছাড়া তারা ছিলো নিরুপায়। মুসলমানরা এই উদ্দেশ্যে দান থেকে বিরত হলো যে, তারা যেনো মুসলমান হয়ে যায়।

'আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন' — এতে বোঝা যায় সৎপথ প্রাপ্তি আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ও অনুগ্রহেই হয়ে থাকে।

দানের বিনিময় দাতার দিকেই ফিরে আসে, সওয়াব দ্বারা তারাই উপকৃত হয়। আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি সাধনই দান করার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাই অবৈধ সম্পদ দান, গ্রহীতাকে খোঁটা দেয়া — এসব থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহতায়ালার সন্তোষবিহীন দান অপব্যয়ের নামান্তর। আর অপব্যয় নিষিদ্ধ।

যে দাতা গ্রহীতার কাছে সম্মান কিংবা অন্য কোনো বিনিময় প্রত্যাশী হয়, আল্লাহ্তায়ালার কাছে তার কোনো বিনিময় নেই। পণ্য বিনিময়কারী ক্রেতা বিক্রেতা যেমন, অন্যের কাছে তাদের কোনো পাওনা থাকে না।

ফরজ দান - জাকাত, ওশর কেবল মুসলমানদেরকে দিতে হবে। এছাড়া অন্য সকল দান মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকলকেই দেয়া বৈধ। সদকায়ে ফেতের, কাফফারা এবং মানতের ব্যাপারে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমামে আজম বলেছেন, এ সব দান অমুসলমানকেও দেয়া যাবে। কোরআন মজীদের হুকুম অবশ্য সাধারণভাবে সকলের জন্য প্রযোজ্য।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, হজরত মুআজ কে ইয়ামেনে জাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণকালে রসুল স. বলেছিলেন, ধনীদের কাছ থেকে ফরজ জাকাত আদায় করে গরীবদেরকে দিও। বোখারী, মুসলিম। এ হাদিসটি কোরআনের হুকুমের অনুকূল। কিন্তু কোরআনের পরবর্তী হুকুম দ্বারা

www.eelm.weebly.com

অমুসলমানদেরকে জাকাত প্রদান অবৈধ করে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে এর অনুসরণে হাদিসও বর্ণিত হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭৩

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

❑ ইহা অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য; যাহারা আল্লাহের পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে জীবিকার সন্ধানে ঘুরাফিরা করিতে পারে না; যাঞ্চা না করার জন্য অজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে অভাবমুক্ত বলিয়া মনে করে; তুমি তাহাদের লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে। তাহারা মানুষের নিকট নাছোড় হইয়া যাঞ্চা করে না। যে ধন সম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ তাহা সবিশেষ অবহিত।

দান অভাবগ্রস্তদেরই প্রাপ্য। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার উপযোগী যারা তাদের কথা বিশেষভাবে এই আয়াতে বলা হয়েছে। তারা আল্লাহর পথে এমনভাবে নিমগ্ন যে, উপার্জনের অবসর তাদের নেই। তারা মানুষের কাছে চায় না। তাই অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবীও মনে করে না। আল্লাহ্তায়ালা বিভিন্ন নিদর্শন দেখে তাদেরকে চিনে নিতে নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা দ্বীনের জ্ঞানার্জন অথবা জেহাদে নিয়োজিত। তারা অল্পে তুষ্ট। তাই যাঞ্চাবিমুখ। মানুষকে বিব্রত করা তাদের স্বভাব নয়। চেহারার মলিনতা ও পোশাক পরিচ্ছদের দীনতা দেখে তাদেরকে চিনে নিতে হবে।

কারো কাছে যাঞ্চা না করাই আল্লাহতায়ালার পথে নিমগ্ন ব্যক্তিদের প্রধান নিদর্শন। ইমাম আহমদ, ইবনে আবী মালিকার বর্ণনা থেকে লিখেছেন, একবার উষ্ট্রারোহী অবস্থায় হজরত আবু বকররে হাত থেকে উটের রশি পড়ে গেলো। তৎক্ষণাৎ তিনি নেমে রশিটি তুলে নিলেন। লোকেরা বললো, আমাদেরকে বললেই তো পারতেন। তিনি বললেন, আমার বন্ধু মোহাম্মদ স. আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেনো কারো কাছে কিছু না চাই।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ পাকের পথে নিমগ্ন ব্যক্তি বলতে এখানে প্রধানত আসহাবে সুফফাগণকে বোঝানো হয়েছে। তাদের সংখ্যা ছিলো চার'শ। থাকতেন মসজিদের বারান্দায়। অসহায় মোহাজের ছিলেন তাঁরা। সারাক্ষণ ইবাদত ও জ্ঞানচর্চাই ছিলো তাঁদের কাজ। রসুল স. কখনো কখনো তাঁদেরকে জেহাদে পাঠাতেন। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহায়ালা তাঁদেরকেই সাহায্য করতে আহবান করেছেন। অকুণ্ঠচিত্তে এই আহবানে সাড়া দিয়েছেন সাহাবীগণ। তাঁরা তাঁদের অতিরিক্ত আহার্য আসহাবে সুফফাগণকে পৌঁছে দিতেন।

হজরত জুবাইর বিন আওয়াম রা. বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তি উত্তম, যে মানুষের কাছে প্রার্থী না হয়ে শ্রমস্বীকার করে জঙ্গলের কাঠ কেটে পিঠে করে নিয়ে বাজারে বিক্রি করে। এভাবে আল্লাহতায়ালা তার ইজ্জত রক্ষা করেন। বোখারী।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, একবার রসুল স. তাঁর মিম্বরে উঠে যাঞ্চা করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিলেন। বললেন, উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও যাঞ্চা করবে, কিয়ামতের দিন তার মুখ হয়ে পড়বে চর্ম ও গোশ্‌তবিহীন। আরজ করা হলো, হে রসুল! সম্পদশালী কে? রসুল স. বললেন, পঞ্চাশ দিরহাম অথবা এর সমপরিমাণ স্বর্ণের অধিকারী। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী।

হজরত সাহল বিন হানযালা রা. বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, ধনী যাঞ্চাকারী নিজের জন্য আগুন জমা করে। তিনি আরো বলেন, ধনী কে এ সম্পর্কে আমি রসুল স. কে প্রশ্ন করেছি। রসুল স. বলেছেন, যার সকাল সন্ধ্যার আহার আছে। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, একদিন ও এক রাতের পূর্ণ খোরাক যার আছে। আবু দাউদ। আমি বলি, উল্লিখিত হাদিসগুলো বাহ্যত সামঞ্জস্যহীন। হাদিসগুলোর বর্ণনা এক রকম নয়। কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাঞ্চা করা হারাম হবে তার বিধান একরকম দেয়া হয়নি। অবশ্য মানুষের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই এ রকম বলা হয়েছে বোঝা যায়। যার আজকের আহারের আয়োজন আছে তার কালকের জন্য যাঞ্চা করা বৈধ নয়। প্রয়োজনীয় আহারের ব্যবস্থা থাকলেও যার পরিবারের মহিলাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র নেই, সে প্রয়োজনানুপাতে যাঞ্চা করতে পারবে। কিন্তু চল্লিশ দিরহামের মালিক অন্ন, বস্ত্র, কোনকিছুই চাইতে পারবে না।

—৫

www.eelm.weebly.com

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

❒ যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাহাদের পুন্যফল তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। সুতরাং তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

ইবনে মুনজির, হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়েবের বাণী উল্লেখ করে বলেন, হজরত ওমর এবং আবদুর রহমান বিন আউফ সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা তবুক যুদ্ধের সেনাদলের জন্য অর্থ ব্যয় করেছিলেন।

ইবনে জারীর, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে আবী হাতেম এবং তিবরানী দুর্বল সূত্রের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের বাণী উল্লেখ করে বলেন, হজরত আলীর শানে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর নিকট চারটি রৌপ্য মুদ্রা ছিলো। তিনি রাতে দিনে প্রকাশ্যে গোপনে একটি করে রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় করেছিলেন।

বাগবী, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হলে হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ আসহাবে সুফ্‌ফাদেরকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন। হজরত আলী রা.ও রাতে এক ওসাক খেজুর পাঠিয়েছিলেন। প্রকাশ্যে অর্থদান এবং গোপনে খেজুর দানের দিকেই ছিলো এই আয়াতের ইঙ্গিত।

বাগবী, হজরত আবু উমামা, হজরত আবু দারদা, মাকহুল এবং আওজায়ীর উক্তি উল্লেখ করে বলেন, এই আয়াতটি ওই সকল লোকের শানে নাজিল হয়েছে যারা জেহাদের জন্য ঘোড়া পালতেন এবং দিনে, রাতে, প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে সেগুলোর পরিচর্যা করতেন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য বলে মানে, সে যদি জেহাদের জন্য ঘোড়া প্রতিপালন করে তবে ঘোড়ার আহার বিহার বর্জ্য পদার্থ কিয়ামতের দিন মিজানের পাল্লায় রাখা হবে। সেগুলো পূণ্যের পাল্লাকে ভারী করবে।

www.eelm.weebly.com

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۭ فَمَنْ جَاۗءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۭ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

❒ যাহারা সুদ খায় তাহারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াইবে যাহাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। ইহা এই জন্য যে তাহারা বলে, 'বেচাকেনা তো সুদের মতো।' অথচ আল্লাহ্ বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করিয়াছেন। যাহার নিকট তাহার প্রতিপালকের উপদেশ আসিয়াছে এবং যে বিরত হইয়াছে অতীতে যাহা হইয়াছে তাহা তাহারই; এবং তাহার ব্যাপার আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে। আর যাহারা পুনরায় আরম্ভ করিবে তাহারাই অগ্নি-অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

এখানে শয়তান অর্থ জ্বিন। জ্বিনে ধরা মানুষ অপ্রকৃতিস্থ হয়। জ্বিন স্পর্শ করলে রোগব্যাধিরও সৃষ্টি হয় — একথা কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কোরআনে হজরত আইয়ুব আ. সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তিনি নিজ প্রতিপালককে ডেকে বললেন, শয়তান আমাকে দুঃখ-কষ্ট দিয়েছে।' এস্তেহাজা (মেয়েলী রোগ) সম্পর্কে হাদিসে এসেছে এ হচ্ছে এক প্রকার হালকা জখম যা শয়তানের স্পর্শের কারণে হয়।

কেউ কেউ বলেন, আরববাসীরা মনে করতো জ্বিন মানুষকে পাগল বানিয়ে দেয়। এই আয়াতে তাদের ধারণানুযায়ী উপমা দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ সুদখোরদের পেট বড় করে দিবেন। সাপ দিয়ে তার পেট ভরে দেয়া হবে। তাই সে ঠিকমতো দাঁড়াতে পারবে না।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, রসুল স. শবেমেরাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এরশাদ করেন, জিব্রাইল আমাকে এমন কতগুলো মানুষের কাছে নিয়ে গেলেন যাদের পেট ছিলো বড় ঢোলের মতো। ফেরআউনের সাথীদের পথে পড়ে থাকবে তারা। সকাল বিকাল ফেরআউনের অহংকারী অনুসারীদেরকে দোজখে

www.eelm.weebly.com

নিক্ষেপ করা হবে। তারা লেলিহান মশাল হয়ে পশমধারী উটের মতো উন্মত্ত অবস্থায় পাথর গাছ সবকিছুকে পিষে পথ চলতে থাকবে। তারা কিছু শুনবেও না। বুঝবেও না। তাদের পদশব্দ পেয়ে সুদখোরেরা রাস্তা থেকে সরে যাবার জন্য দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা তাদের বিশাল পেট নিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারবেনা। যতোবার উঠে দাঁড়াতে চাইবে ততোবার চিৎ হয়ে পড়ে যাবে। ফেরআউনের অহংকারী অনুসারীরা তাদেরকে পায়ে পিষে যেতে আসতে থাকবে। তাদের এ শাস্তি হবে আলমে বরযখে।

রসুল স. ফরমান, অহংকারীগণ বলতে থাকবে, হে আল্লাহ্ ! কিয়ামত কখনো যেনো না আসে। আল্লাহ্ বলেন, 'কিয়ামতের দিন ফেরআউনের অনুসারীকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।' আমি জিব্রাইলকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিব্রাইল বললেন, সুদখোর। তারা উঠে দাঁড়াতে পারবে না। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে তাদেরকে মনে হবে যেনো জ্বিনে ধরা রোগী। বাগবী। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, শবে মেরাজে রসুল স. এমন লোকদের কাছে পৌঁছলেন, যাদের বড় ঢোলের মতো পেট সাপে পরিপূর্ণ। বাইরে থেকেও সেগুলোকে দেখা যায়। রসুল স. প্রশ্ন করলেন, এরা কারা? হজরত জিব্রাইল বললেন, সুদখোর। আহমদ, ইবনে মাজা।

আবু ইয়ালী, হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, কিয়ামতের দিন সুদখোরদের আলামত হবে এই যে, তারা দাঁড়াতে পারবে না। দাঁড়াতে চাইলে জ্বিনে ধরা রোগীদের মতো তারা কেঁপে কেঁপে উঠবে।

ইবনে আবী হাতেম, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বিশুদ্ধ সনদে উল্লেখ করেন, কিয়ামতের দিন সুদখোরেরা পাগল হয়ে উঠবে। তিবরানী, হজরত আউফ বিন মালেক থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন। এখানেও পাগলামীর কথা আছে। এর অর্থ এভাবেও করা যায় যে, সুদের আয় ভক্ষণ করার সাথে সাথে সুদখোরের অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন সে সত্য মিথ্যা, হালাল হারামের পার্থক্য বুঝতে পারে না। যেমন পাগল, যাদের ভালোমন্দের জ্ঞান থাকে না।

রসুল স. সুদখোরদেরকে অভিসম্পাত দিয়েছেন। বলেছেন, সুদ খাওয়া ব্যভিচার অপেক্ষা ঘৃণ্য। মুসলিম ,হজরত জাবের এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এবং বোখারী, হজরত আবু হোযায়ফা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. সুদ গ্রহীতা এবং দাতা উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন। আবু দাউদ এবং তিরমিজি হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় এবং মুসলিম হজরত জাবেরের বর্ণনায় আরো সংযোজন করেছেন যে, রসুল স. সুদের দলিল লিখক এবং সুদের স্বাক্ষীদেরকেও অভিশাপ দিয়েছেন। বলেছেন, তারা সকলেই সমান। নাসায়ী, হজরত আলী থেকে এ রকমই বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় সুদের সাক্ষীর পরিবর্তে জাকাত

www.eelm.weebly.com

অস্বীকারকারীর কথা বলেছেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন হানযালা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জেনে বুঝে এক দিরহাম সুদ খাওয়া ছত্রিশবার ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য। আহমদ, দারা কুতনী।

ইবনে আবীদ্দুনিয়ার বর্ণনাও এ রকম। তিনি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে। আর বায়হাকী যে হাদিসটি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন তাতে রয়েছে অতিরিক্ত এই কথাটি, হারাম খেয়ে যার শরীর পরিপুষ্ট হয়েছে, আগুনই তার জন্য উপযুক্ত। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, সুদের মধ্যে রয়েছে, সত্তুরটি গোনাহ্। তার মধ্যে নিম্নতম গোনাহটি হচ্ছে, মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মতো। ইবনে মাজা, বায়হাকী।

'তাহারা বলে, 'বেচাকেনা তো সুদের মত।' — এ রকম কথা আল্লাহ্তায়ালার শাস্তিকে অবধারিত করে। এ রকম কথা যারা বলে, তারা হারামকে মনে করে হালাল। এ রকম ধারণা কুফরী। তাই এই আয়াতের শেষে তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সুদখোর মুমিনের অবস্থা এ রকম নয়। যেহেতু তারা গোনাহ্ করলেও গোনাহ্কে গোনাহ্ বলে স্বীকার করে। হারামে নিপতিত হলেও হারামকে হারামই জানে, হালাল মনে করে না। তাই তাদের শাস্তি হলেও তা হবে সাময়িক। স্থায়ী নয়। তাদের এই অব্যাহতি লাভ হবে নবীর শাফায়াত, আল্লাহর দয়া এবং তৌহিদ ও রোসালতের স্বীকৃতির কারণে। কাফেরদের উক্তি, 'বেচাকেনা তো সুদের মতো' — এখানে সুদকে মূল অবস্থানে রেখে বেচাকেনাকে তার সমতূল্য করা হয়েছে। তাদের বিশ্বাস এ রকম যে, সুদতো হালালই সেই সঙ্গে বেচাকেনাও সুদের মতো হওয়ার কারণে হালাল। এ রকম ধারণা নির্ভেজাল কাফেরদের পক্ষেই করা সম্ভব। যদি এ রকম বলা হতো, সুদতো বেচাকেনার মতো তবে তা নিরেট কুফরীর মতো হতো না। এক্ষেত্রে বেচাকেনাকে মূল অবস্থানে রেখে সুদকে করা হতো তার অনুগামী। তবুও তো নিরেট কুফরী থেকে তাদের কথা হতো কিঞ্চিত পরোক্ষ। কিছুটা দূরবর্তী।

'অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করিয়াছেন।' — ফখরুল ইসলাম 'বাজদুবী' অভিধানে লিখেছেন, পণ্য বিনিময়কে বেচাকেনা বলা হয়। শরিয়তের সিদ্ধান্ত এরকম। তবে এর সঙ্গে আরো একটি শর্ত রয়েছে যে, এতে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের সন্তুষ্টি থাকতে হবে। সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে পণ্য বিনিময় ছিনিয়ে নেয়ার মতো। সন্তুষ্টিও বুদ্ধিনির্ভর হতে হবে। এ জন্যে পাগল ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বেচাকেনা বৈধ নয়। কেননা তাদের বুদ্ধি বিকৃত অথবা অপরিণত। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কেউ বুদ্ধিমান হলে — এ সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন মত রয়েছে।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মতে তাদের বেচাকেনাও অবৈধ। ইমামে আজম ও ইমাম আহমদের মতে বৈধ, যদি এতে তাদের অভিভাবকের সায় থাকে।

www.eelm.weebly.com

অপরিণত জ্ঞান, পরিণত জ্ঞানের সমর্থন পেলে, ক্ষতির সম্ভাবনা আর থাকে না। এর সপক্ষে কোরআন মজীদে সমর্থন রয়েছে এ রকম — ১. 'অতঃপর তার অভিভাবক ইনসাফের সাথে মুসাবিদা করে দিবে।' ২. 'আর এতীমদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে বিবাহযোগ্য বয়সে পৌছা পর্যন্ত, বুদ্ধি বিবেচনার উন্মেষ অনুভব করতে পারলে তাদের সম্পদ তাদেরকে অর্পণ করতে পারবে।'

বেচাকেনা হচ্ছে পণ্য বিনিময়ের চুক্তি (ইজাব ও কবুল)। বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে, এই পণ্য এতো মূল্যে নিতে পারো। ক্রেতা বলবে, এতো মূল্যে দাও। বিক্রেতা বলবে, বেচলাম। ক্রেতা বলবে, কিনলাম। এ রকম বিনিময় ক্রেতা বিক্রেতা বিনা বাক্য ব্যয়ে মৌনতার মাধ্যমেও সম্পন্ন করতে পারে। এ কথা বলেছেন ইমাম আজম এবং ইমাম মালেক। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, ইমাম আহমদ এবং ইমাম শাফেয়ীও এরকম মত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফেয়ীর মত এই যে, শাব্দিক ইজাব ও কবুল ছাড়া শুধু আদান প্রদানের মাধ্যমে বেচাকেনা হয় না। আমরা বলি, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পারস্পরিক সন্তুষ্টি। বেচাকেনা হবে অর্থ ও পণ্যের মালিকদের মধ্যে অথবা তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে।

অতিরিক্ত বেচাকেনা (ক্রেতা বিক্রেতার সম্মতি ব্যতিরেকে অন্য কারো মাধ্যমে যে বেচাকেনা হয়) সম্পর্কে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আজম এবং ইমাম মালেক বলেন, এ রকম করা বৈধ, যদি বিক্রয়কারী পরে তার ক্রয় বিক্রয়কে সমর্থন করে। এ রকম অবস্থা আগে অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মতো। এতে প্রমাণিত হবে যেনো তার প্রথম থেকেই ক্রয়বিক্রয়ের ইচ্ছা ছিলো।

ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফের নিকট ক্রেতার অনুমতির পর বেচাকেনা বৈধ হবে। তবে শর্ত এই যে, অতিরিক্ত বেচাকেনার সময় বলতে হবে, আমি ওমুক ব্যক্তির জন্য ক্রয় করছি। তুমিও ওমুক ব্যক্তির জন্য বিক্রয় করো। এ রকম কথা না বললে বৈধ হবে না।

ইমাম শাফেয়ীর নিশ্চিত উক্তি এই যে, অতিরিক্ত বেচাকেনা বৈধ নয়। ইমাম আহমদ উল্লিখিত দু'টি উক্তিই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম শাফেয়ীর দলিল এই যে, রসুল স. হাকেম বিন হাজামকে বললেন, তোমার কাছে যা নেই তা বেচাকেনা কোর না।

ইবনে জাওজী সনদসহ ওমর বিন শোয়াইব থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে বস্তু তোমার কাছে নেই তা বিক্রি করা বৈধ নয়। ঐ বস্তুও বিক্রি করা বৈধ নয়, যা তোমার অধিকারবহির্ভূত।

অধিকারবহির্ভূত বিক্রয় এ রকম — মাল মওজুদ না থাকা সত্ত্বেও বিক্রয় সম্পন্ন করার পর বিক্রয়কারী অন্য স্থান থেকে মাল ক্রয় করে এনে ক্রেতাকে দেয়। হজরত হাকেম বিন হাজামের ঘটনা আমাদেরকে এ বিষযটি বুঝতে সাহায্য করে।

www.eelm.weebly.com

হজরত হাকেম আরজ করলেন, মানুষেরা আমার কাছে এমন সামগ্রী কিনতে আসে যা আমার কাছে থাকে না। তবু আমি বিক্রয় করি। পরে বাজার থেকে ওই সামগ্রী কিনে এনে তাকে দিই। রসুল স. বললেন, তোমার কাছে যা নেই তা বিক্রয় কোর না।

এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইউসুফ বিন মালেক। ইমাম আহমদ এবং আসহাবে সুনানেও এর উদ্ধৃতি আছে। ইবনে হাব্বানও এ রকম বর্ণনা করেছেন। ইউসুফ বলেছেন, এই হাদিসটি আমাকে বলেছেন হাকেম। অন্যান্য সনদে ইউসুফ এবং হাকেম ছাড়াও আবদুল্লাহ বিন আসেমার নাম এসেছে। কিন্তু শায়েখ আবদুল হক আবদুল্লাহকে দুর্বল এবং ইবনে হাজম অখ্যাত বলেছেন। কিন্তু ইবনে হাজার এই দলিলকে গ্রহণ করেননি।

আসহাবে সালাসা হজরত আবদুল্লাহর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন এবং নাসাঈ এই বর্ণনাকে দলিল হিসাবে পেশ করেছেন। আর তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি হাসান সহীহ্ (যে হাদিসের বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি দুর্বল প্রমাণিত হয় তাকে হাসান বলে আর সহীহ্ বলে ওই হাদিসকে যার ধারাবাহিকতা অবিচ্ছিন্ন, সনদের প্রতিটি স্তরে বর্ণনাকারীর নামোল্লেখ আছে এবং বর্ণনাকারীগণও নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, প্রখর স্মরণশক্তিসম্পন্ন)।

আমরা এখানে প্রমাণ হিসাবে আরেকটি হাদিস পেশ করছি। রসুল স. হাকেমকে এক দিনার দিয়ে একটি ছাগল কিনতে পাঠালেন। তিনি এক দিনার দিয়ে কিনলেন দু'টি ছাগল। একটি বিক্রি করলেন এক দিনার মূল্যে। তারপর অন্য ছাগলটি ও একটি দিনার নিয়ে রসুল স. এর কাছে হাজির হলেন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ তোমার ক্রয় বিক্রয়ে বরকত দান করুন। এরপর এমন অবস্থা হলো যে, হজরত হাকেম মাটি কিনে বিক্রি করলেও লাভ হতো। আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিজি, দারা কুতনী।

মুসলিম এই হাদিসটিকে সঠিক ধারাবাহিকতার সাথে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই ধারাবাহিকতায় আবু লবীদ লিমাজাহ বিন জিয়াদাহ উল্লেখিত হয়েছেন যাকে বাদ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু ইবনে সা'দ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইমাম আহমদও তাঁর সুখ্যাতি করেছেন এবং মুনজেরী ও নববী লিখেছেন, তার সনদগুলো হাসান সহীহ্। ইমাম শাফেয়ী এবং কারখী এই হাদিসটিকে অন্য এক পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন যার সনদ এ রকম — ইবনে ওয়ায়ীনা, শাবীব বিন এরফেদা থেকে, শাবীব তার সম্প্রদায়ের নিকট থেকে এবং তার সম্প্রদায় ওরওয়া বারেকি থেকে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এই হাদিসটি সহীহ্ হলে আমি তার অনুরাগী হতাম। বায়হাকী লিখেছেন, শাবীবের সম্প্রদায় খ্যাতিমান নয়। এ জন্যই শাফেয়ী একে দুর্বল মনে করেছেন। সন্দেহ নেই যে, হাদিসটি মুরসাল (যে হাদিসের শেষের দিকের বর্ণনাকারীর নাম নেই, হাদিস শেষ হয়েছে কোনো

www.eelm.weebly.com

তাবেয়ী পর্যন্ত — এ রকম সনদের হাদিসকে মুরসাল বলে)। ইমাম শাফেয়ী মুরসাল হাদিসকে দলিলের উপযুক্ত মনে করেন না। খাত্তাবীও অনুরূপ মত পোষণ করেন। এই হাদিসটি কারখী একই সনদের সঙ্গে পেশ করেছেন। কিন্তু এই সনদে শাবীব ও ওরওয়ার মধ্যে হাসানের নাম এসেছে। এ জন্যে হাদিসের ধারাবাহিকতা ঠিক আছে। অতএব বর্ণনাটি আর মুরসাল রইলো না। মুরসাল আমাদের নিকট দলিল। তাছাড়া এর অনুকূলে এসেছে মুসনাদ বর্ণনা (যে মারফু হাদিসের সনদ সম্পূর্ণ মুত্তাসিল তাকে মুসনাদ বলে)।

তিরমিজি, হাবিব বিন সাবেতের মাধ্যমে হজরত হাকেম বিন হাজামের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, রসুল স. আমাকে কোরবানীর জানোয়ার কেনার জন্য এক দিনার দিলেন। আমি একটি বকরী কিনলাম। বকরীটি দুই দিনার মূল্যে বিক্রি করে আরেকটি বকরী কিনলাম এক দিনার দিয়ে। তারপর বকরী ও দিনার নিয়ে রসুল স. এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ তোমার ক্রয় বিক্রয়ে বরকত দান করুন। তিনি স. বকরীটি কোরবানী করলেন। দিনারটিও দান করে দিলেন।

তিরমিজি লিখেছেন, হাদিসটি প্রসিদ্ধ নয়। আমি বলি, এই বর্ণনা হাবীব হজরত হাকেম থেকে শোনেননি। আবু দাউদ লিখেছেন, মদীনার কোনো এক বৃদ্ধার মাধ্যমে হজরত হাকেম এই বর্ণনাটি দিয়েছেন। বায়হাকী লিখেছেন, সেই বৃদ্ধা অপ্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে এই হাদিসটি দুর্বল। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

বেচাকেনা মালের বিনিময়ে মাল এবং মালের বিনিময়ে অর্থ দুই প্রকারেরই হয়ে থাকে — ১. ওই মাল যা হুবহু উদ্দেশ্য হয়, যা মানুষ কামনা করে। প্রকৃত মাল বলতে এটাই বোঝায় ২. ওই মাল যা হুবহু উদ্দেশ্য হয় না — এমন মাল যা অন্য বস্তুর বিনিময়ে হস্তগত করা যায়, একেই বলে মূল্য; যা নির্ধারিত হয় সোনা ও রূপার নিরীখে। এ রকম বেচাকেনা চার প্রকার — ১. সোনা রূপার মাধ্যমে বেচাকেনা। সাধারণ বেচাকেনা এই প্রকারের। এ রকম বেচাকেনার সময় মাল সামনে মওজুদ থাকতে হবে এবং তা বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে। হজরত হাকেমের হাদিস দ্বারা বেচাকেনার সময় মাল মওজুদ থাকা শর্ত বোঝা যায়।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. পাত্রের মাপের পরিবর্তে পাত্রের মাপে বিক্রয় নিষেধ করেছেন — ওই বস্তু হুবহু অথবা অবিকল ওই প্রকারের অন্য বস্তু দেয়া ক্রেতার উপর ওয়াজিব হয়। যেমন, কোনো বস্তুর মূল্য দশ টাকা-এ রকম স্থানে অবিকল একটি দশ টাকার নোট দেয়া জরুরী নয়। এক টাকার দশটি অথবা পাঁচ টাকার দুটি - যেভাবে হোক মোট দশ টাকা দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু যদি বিক্রয়কারীর পণ্য মওজুদ না থাকে তবে বস্তুর গুণগতমান নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। ব্যাপারটি তখন হবে অনুমাননির্ভর। তাই হাদিস শরীফে এ রকম বেচাকেনা

www.eelm.weebly.com

অবৈধ বলা হয়েছে। হজরত ইবনে ওমরের হাদিস উদ্ধৃত করেছেন ইমাম দারা কুতনী। এতে বোঝা যায়, ক্রেতার কাছে মালের মূল্য থাকা জরুরী নয় বরং পরিশোধ করা জরুরী। তাৎক্ষণিকভাবে মূল্য পরিশোধ না করলে চারটি শর্ত থাকা জরুরী হবে — ১. পরিশোধের সময় নির্ধারণ ২. পণ্যের প্রকৃত মূল্য ৩. আনুমানিক মূল্য ৪. গুণগত বিবেচনা। বিবাদ বিসংবাদ এড়ানোর জন্যই এই শর্তগুলো আরোপ করা হয়েছে। বিবাদ বেচাকেনাকে অবৈধ করে দেয়। হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. এক ইহুদীর কাছ থেকে কিছু তরকারী বা খাদ্য ক্রয় করলেন এবং তাঁর লৌহবর্মটি বন্ধক রাখলেন। সাথে সাথে তরকারীর মূল্য পরিশোধের সময় নির্ধারণ করে নিলেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত আয়েশার দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, ইন্তেকালের সময় রসুল স. তাঁর জেরা (যুদ্ধের পোশাক) তিরিশ সা যবের বিনিময়ে এক ইহুদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। বোখারী।

এই হাদিসটি-ই ইমাম আহমদ এবং তিরমিজি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি এটিকে সহীহ্ বলেছেন।

ওলামাগণ ঐকমত্যের সঙ্গে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, বেচাকেনার ক্ষেত্রে চারটি শর্ত নির্ধারণ থাকা জরুরী।

১. বিক্রয়যোগ্য বস্তু নির্দিষ্ট করতে হবে। বস্তুর মূল্যমানও নির্ধারণ করতে হবে। বস্তু সামনে হাজির থাকা অথবা ক্রেতার আয়ত্তাধীনে থাকা জরুরী নয়।

এ ধরনের ক্রয় বিক্রয়ের নাম বায়ে সালয়া।

২. বস্তু বিনিময়। এক প্রকার বস্তুকে দ্বিতীয় প্রকার বস্তুর সঙ্গে বিনিময়। এ ধরনের বেচাকেনায় দু'দিকেই কেনা অথবা দুদিকেই বিক্রয় বোঝা যায়। তবে শর্ত হলো দু'দিকের সামগ্রী এক রকম হওয়া চলবে না। একদিকে মূল্যধারী বস্তু এবং অপরদিকে মূল্যধারী বস্তুর অনুরূপ বস্তু। মূল্যধারী বস্তুর মূল্যকে মূল্য এবং অনুরূপ বস্তুকে বিক্রয়যোগ্য বস্তু মনে করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বস্তু উপস্থিত থাকা জরুরী নয়। ক্রেতাকে তাই মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তবে বস্তুর প্রকার ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে তার জানা থাকতে হবে। মূল্যধারী বস্তুর মূল্য যেমন নির্ধারণ করতে হবে, বিক্রয়যোগ্য বস্তু পরিশোধের সময়ও তেমনি নির্ধারণ করতে হবে। দুটি বস্তুই যদি মূল্যধারী ধরা যায় তবে হানাফী আলেমগণের মতে, বিক্রিত বস্তু আগে দিয়ে দিতে হবে এবং অপর বস্তুর মূল্যমান স্বীকার করতে হবে।

আমাদের মতে, দুই দিকের বস্তুই উপস্থিত থাকতে হবে এবং সেগুলোর মূল্যও নির্ধারণ করতে হবে। কেননা দুদিকের বস্তুকেই মূল্যধারী অথবা বিক্রয়যোগ্য বস্তু ধরে নিয়ে যে বিনিময় হয় তাকেই বলে হুবহু বেচাকেনা অর্থাৎ বায়ে মুকাইয়েজা। রসুল স. এরশাদ করেছেন, বিক্রয়যোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে পরিমাণগত ও গুণগত পার্থক্য থাকলে যেভাবে ইচ্ছা বেচাকেনা করতে পারবে।

www.eelm.weebly.com

তবে বেচাকেনা হতে হবে সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাতে। অন্য এক বর্ণনায় 'হাতে হাতে' এর স্থলে এসেছে হুবহু।

৩. তৃতীয় প্রকার বেচাকেনার মধ্যে দু'দিকেই মূল্য নির্ধারণ হওয়া জরুরী। এ রকম বেচাকেনা সোনা রূপা অর্থাৎ নগদ বস্তু ছাড়া হতে পারে না। এখানে অনুমান করে বস্তুর বিক্রয় ও মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। এ রকম অবস্থায় দু'দিককেই বিক্রয়ের দিক বলা যেতে পারে। কারণ দু'দিকেই নগদ মূল্য নির্ধারণ থাকে। তাই কেনাবেচার স্থানে দু'দিকেরই দখল বা আয়ত্ত থাকা ওয়াজিব। এধরনের বেচাকেনাকে বায়ে সরফ বলে।

৪. চতুর্থ প্রকার বেচাকেনার নাম সলম। এ ক্ষেত্রে পণ্য গ্রহণের পূর্বেই মূল্য দিয়ে দেয়া হয়। এ অবস্থাটি সাধারণ বেচাকেনার বিপরীত। সাধারণ বেচাকেনায় পণ্য মওজুদ থাকে এবং ক্রেতার উপর তার মূল্য পরিশোধ করাও ওয়াজিব হয়। বায়-ইস্-সলম এ কর্মস্থলে পণ্য মওজুদ থাকে না কিন্তু মূল্য মওজুদ থাকে। এক্ষেত্রে ক্রেতা তাৎক্ষণিকভাবে মূল্য পরিশোধ করবে এবং বিক্রেতাও তা অধিকার করে নিবে। যখন একথা প্রমাণ হয়ে গেলো যে, বেচাকেনার জন্য মূল্যধারী পণ্য হওয়া প্রয়োজন তখন মৃতদেহ, রক্ত, শরাব অথবা শুকর এসবের বেচাকেনা বৈধ নয়। কারণ শরিয়তের দৃষ্টিতে এ সমস্ত পণ্য, পণ্য হিসাবে গণ্য নয়। এ সমস্তের বেচাকেনাকে শরিয়ত বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। এসবের মূল্য নির্ধারণ করে যদি নগদ মুদ্রা বিনিময়ের বদলে কাপড় জুতা বা অন্য কোনো হালাল বস্তুকে বিনিময় করা হয় তবুও তা শরিয়তের দৃষ্টিতে বাতিল।

রিবা (সুদ) এর আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। জমহুর আলেমদের মত এই যে, এই আয়াতে সংক্ষেপে কেবল সুদ হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর বিপরীতে বেচাকেনা যে হালাল সে কথাটি উহ্য রয়েছে। অন্য আয়াতে বেচাকেনার উল্লেখ রয়েছে এরকম, আপন প্রতিপালকের অনুগ্রহে ব্যবসায় লাভ অন্বেষণ করায় কোনো গোনাহ্ নেই। সুতরাং বুঝা যায়, ব্যবসায় লাভ অতিরিক্ত হলেও হারাম নয়। একথা অবশ্য স্পষ্ট করে এ আয়াতে বলা হয়নি।

হজরত উবাদা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, সোনার বদলে সোনা, রূপার বদলে রূপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর এবং লবনের বদলে লবন সমান সমান হাতে হাতে লেনদেন করো এবং যখন এ সমস্তের প্রকার ভিন্ন হবে তখন যেমন কম ও বেশীর সঙ্গে চাও লেনদেন করো। কিন্তু লেনদেন হাতে হাতে হতে হবে। মুসলিম।

দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, লেনদেন করো সোনাকে সোনার বদলে, রূপাকে রূপার বদলে, গমকে গমের বদলে, যবকে যবের বদলে, খেজুরকে খেজুরের বদলে, লবনকে লবনের বদলে — কিন্তু সমান সমান, নগদা নগদি, হাতে হাতে। হ্যাঁ,

www.eelm.weebly.com

সোনা রূপার বদলে, রূপা সোনার বদলে, গম যবের বদলে, যব গমের বদলে. খেজুর লবনের বদলে, লবন খেজুরের বদলে বেচাকেনা করো। হাতে হাতে যেভাবে চাও। কম অথবা বেশী। এক ধরনের পণ্য লেনদেনে বেশী অথবা কম দিলে তা হবে সুদ। শাফেয়ী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত ওবায়দা থেকে মুসলিম এরকমই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনা শেষে যে কথাগুলো অতিরিক্ত আছে তা হলো এই — যে বেশী দিলো সে সুদ দিলো এবং যে বেশী নিলো সে সুদ নিলো। এখানে দাতা ও গ্রহীতা সমান দোষী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর সনদের দ্বিতীয় সিলসিলায় বর্ণিত হয়েছে, সোনাকে সোনার বদলে বিক্রয় কোর না। রূপাকে রূপার পরিবর্তে বিক্রয় কোর না। অনুপস্থিত পণ্যকে নগদের পরিবর্তে বিক্রয় কোর না। বোখারী, মুসলিম। এক বর্ণনায় এসেছে, সোনাকে সোনার পরিবর্তে এবং রূপাকে রূপার পরিবর্তে বেচাকেনা কোর না। কিন্তু সমান সমান হলে করতে পারবে।

নিম্নলিখিত হাদিস সমূহে ছয়টি বস্তুর ক্ষেত্রে সুদ হারাম হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। সিহাহ্ সিত্তায় হজরত ওমর থেকে, মুসতাদরাকে হাকেমে হজরত আলী থেকে, মুসলিম শরীফে হজরত আবু হোরায়রা থেকে, দারাকুতনীর হাদিসে হজরত আনাস থেকে, বোখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত আবুবকর থেকে, বায্যারে হজরত বেলাল রা. থেকে এবং বায়হাকীতে হজরত ওমর থেকে।

সংখ্যাগত দিক থেকে দাউদ জাহেরী এবং তার অনুসারীগণ এবং আকীল হাম্বলীর উক্তি এরকম যে, মাত্র ছয়টি বস্তুর ক্ষেত্রে সুদ হারাম। এই হাদিসের সম্পর্ক রয়েছে হজরত কাতাদা এবং তাউসের দিক থেকে। জমহুরের নিকট উল্লিখিত ছয়টি বস্তুর ক্ষেত্রে সুদ হারাম হওয়া নিশ্চিত। নির্দেশনা হয় কারণের ভিত্তিতে। হারাম হওয়ার কারণ পাওয়া গেলে হারাম তো হবেই।একদলের নিকট মালই হলো মূল কারণ। একথা মেনে নিলে, সকল মালের ক্ষেত্রে সুদ হওয়া প্রমাণিত হবে। অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, সকল ক্ষেত্রে কারণ একরকম হয় না। সোনা, রূপা এবং অন্যান্য বস্তুর কারণ বিভিন্ন। কেননা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক সোনা ও রূপায় বস্তুগত নয় মূল্যগত কারণকে গ্রহণ করেছেন। এরকম অবস্থায় সোনা রূপা ছাড়াও যে সমস্ত বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা যায়, সে সমস্ত বস্তু কমবেশীর সঙ্গে বিনিময় হারাম। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ বস্তুর ওজনকে কারণ বলেছেন। সুতরাং যে সমস্ত বস্তুর বেচাকেনা ওজনের মাধ্যমে হয় যেমন — লোহা, রাংতা এসমস্ত বস্তুতেও সুদ হারাম। সোনা রূপা ছাড়া অন্য চারটি বস্তু এক রকম হলে যন্ত্র বা পাল্লার সাহায্যে মেপে যদি বেচাকেনা করা হয় তবে সুদ হারাম হওয়ার কারণ হবে। চাই তা খাদ্যবস্তু হোক অথবা নাই হোক।

www.eelm.weebly.com

ইমাম মালেকের নিকট বস্তু এক রকম হওয়া এবং আহার্য বস্তু হওয়াই কারণ। ইমাম শাফেয়ীর মতে খাদ্যবস্তু (আনুমানিক অথবা ওজনযুক্ত) হওয়াই কারণ। কেননা ওজনযুক্ত খাদ্যবস্তু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সুদের হুকুম প্রযোজ্য হয়। কিন্তু অনুমানে অথবা যন্ত্রের মাধ্যমে যা নির্ণয় করা যায়না তার মধ্যে সুদ প্রযোজ্য নয়। যেমন ডিম। ইমাম শাফেয়ীর শেষ বর্ণনা এই যে, একজাতীয় আহার্য বস্তু হওয়াই হারাম হওয়ার কারণ। ফল, তরিতরকারী, ঔষধ, মিষ্টান্ন এক জাতীয় হলে সুদ হবে। ইমাম শাফেয়ী বস্তুর মূল্যধারী হওয়া এবং সেগুলো আহারোপযোগী হওয়াকে কারণ বলেছেন। আর ইমাম মালেক কারণ বলেছেন কেবল আহারোপযোগী হওয়াকে। তাঁদের উক্তির দলিল হাদিস শরীফে 'সমান সমান এবং হাতে হাতে' এরকম ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এ দু'টি শর্তে বুঝা যায় যে, বেচাকেনা মর্যাদার ভিত্তিতে এবং সময়ানুযায়ী হতে হবে। যেমন বিবাহ। বিবাহের জন্য সাক্ষী থাকা শর্ত। আর স্ত্রী দ্বারা উপকার লাভ করা সময়ের ব্যাপার। বিষয়টির কারণ সময়নির্ভর মর্যাদায় অভিষিক্ত। যেমন, স্থায়ী থাকা, উভয়ে জীবিত থাকা এবং দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। ধার্যকৃত মোহরানার মূল্যমান জানা থাকা প্রয়োজন। কেননা, বস্তু লাভ হয় মূল্যের মাধ্যমে।

হুকুমের গুরুত্ব শর্তের উপরে হয়ে থাকে। শর্ত না পাওয়া গেলে হুকুম কার্যকরী হতে পারে না। যেমন ব্যাভিচারের শাস্তি সঙ্গেসার করা (ব্যভিচারীকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুতে উপর্যুপরি পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা)। কিন্তু এর শর্ত হলো ব্যভিচারীকে বিবাহিত হতে হবে। বিবাহিত না হলে সঙ্গেসার করা যাবে না।

হজরত মুয়াম্মার বিন আবদুল্লাহ্‌র মারফু হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, খাদ্যবস্তু হওয়াই কারণ। রসুল স. বলেছেন, খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য সমান সমান বেচাকেনা করো। মুসলিম।

কথা হচ্ছে, কারণ এবং হুকুম একই প্রকৃতির হওয়া বাঞ্ছনীয়। যা জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তার জন্য সাধারণ অনুমতি থাকা প্রয়োজন। এতে কোনো শর্তের কারণে যেনো ন্যূনাধিক্য না হয়। যেমন, পানি ঘাস ইত্যাদি সাধারণভাবে হালাল। ইমাম আবু হানিফার উক্তিতে একজাতীয় হওয়া এবং ওজন নির্ধারণ করাই হুরমতে ইল্লত (হারামের কারণ)। সুদকে হারাম করার উদ্দেশ্য সম্পদকে অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করা। আর হেফাজতের জন্য মাপ ও ওজনের প্রয়োজন। আল্লাহ্‌তায়ালাও মাপ ও ওজনে ইনসাফ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, 'তোমরা ইনসাফের সাথে ওজন করো।' 'অন্যত্র বলেছেন, 'যারা মাপে কম দেয় তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। তারা নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং দেয়ার সময় ওজনে কম দেয়।'

www.eelm.weebly.com

রসুল স. অতিরিক্ত দেয়া নেয়াকে হারাম করে দিয়েছেন এবং সমান সমান লেনদেনকে করেছেন ওয়াজিব। সমান সমান নির্ধারিত হয় মাপের মাধ্যমেই। এজন্য পরিমাণ ও পরিমাপই কারণ। রসুলে পাক স. নিজে এরকম আমল করেছেন এবং বলেছেন, এক জাতীয় জিনিস সমান সমান হলে বিনিময় কোর। আর যদি প্রকার ভিন্ন হয় তবে কমবেশী করাতে গোনাহ্ নেই। এই হাদিসটি হজরত আবু ওবায়দা এবং হজরত আনাস থেকে দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু সাঈদ এবং হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জাওয়াদ বিন ওরওয়াকে খয়বরের আমীর করে পাঠালেন। জাওয়াদ সেখানকার উৎকৃষ্ট খেজুর রসুল স. এর খেদমতে পেশ করলেন। তিনি স. বললেন, ওখানকার সমস্ত খেজুর কি এরকমই ? জাওয়াদ বললেন, জী না। আমরা সেনাশিবিরে মিলিত হওয়ার সময় দুই সা দিয়ে এক সা এবং তিন সা দিয়ে দুই সা কিনেছি। রসুল স. বললেন, এরকম কোর না। মূল্য নির্ধারণ করে বিক্রি কোর। তারপর ওই মূল্য দিয়ে কিনে নিও। ওজনসাপেক্ষ বস্তুর হুকুম এরকমই। দারা কুতনী।

আমি বলি, সুদের পরিসর সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাপক। সীমাবদ্ধ বা সংক্ষিপ্ত বিষয় সহজে বোঝা যায়না। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণের বর্ণনা থেকে একথা পরিস্কার বোঝা যায়। রিবা (সুদ) শব্দের আভিধানিক অর্থ স্পষ্ট। অর্থাৎ বেশী হওয়া। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'যতোটুকু সে তোমার জন্য করেছে তুমিও ততোটুকু করো।' অতিরিক্ত করার সুযোগ এখানে নেই। বেচাকেনা এবং ঋনের বেলায় এরকম করাই ওয়াজিব। যে পরিমাণ নিবে সে পরিমাণই দিবে। কিন্তু ওজনসাপেক্ষ বস্তুর ক্ষেত্রে এরকম বাধ্যবাধকতা নেই। এক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমেই বিনিময় বৈধ। ক্রয় বিক্রয় সাধারণত এই নিয়মেই হয়। এক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতাকে পরস্পরের সিদ্ধান্ত জেনে নিতে হবে। বিনিময় হতে হবে হাতে হাতে। হাতে হাতে না হলে বস্তুর পরিমাণে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। একদিকে সাথে সাথে গ্রহণ আর অন্যদিকে একযুগ পরে গ্রহণ সুদের মতো। এ ক্ষেত্রে সমতা অটুট থাকেনা। দেরীতে গ্রহণের কারণে মূল্যমান বাড়িয়ে দেয়া হয়। যেমন, দশ দেরহাম নিয়ে এগারো দেরহাম দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হারাম। এভাবে ভালোর বদলে মন্দ বস্তু বেশী দেয়া এবং ভালো বস্তু দেয়ার কথা থাকলেও মন্দ বস্তু বেশী দিয়ে পুষিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা বৈধ নয়। কম ওজনের ভালো বস্তু ভালো হলেও ওজনে কিন্তু কমই। আবার মন্দ বস্তু ওজনে বেশী হলেও ভালো হয়ে যায়না। তাই পরিমাপ ও পরিমাণে দু'টি বস্তু সমান সমান হলে ভালো বস্তুটি ভালো হওয়ার কারণে সুদ হয়ে যায়। কিন্তু জমহুরের উক্তি এই যে, ভালোমন্দ বিবেচ্য বিষয় নয়। পরিমাপ ও পরিমাণ ঠিক থাকতে হবে। গুণগত পার্থক্যের কারণে সুদ হবেনা।

হেদায়া প্রণেতা এই মতের সমর্থনে রসুল স. এর এরশাদ উল্লেখ করেছেন এইভাবে, ভালো ও মন্দ এক বরাবর। এই হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ হলে আর কোনো

www.eelm.weebly.com

দলিল আবশ্যক করেনা। আমাদের কথা এই যে, বস্তুর গুণগত উৎকর্ষ নির্ধারণ করা শক্ত। ইবনে হাম্মাস লিখেছেন, গুণগত পার্থক্যের কারণে সুদ নির্ণীত হলে বেচাকেনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। আমি বলি, বন্ধ হবেনা। কেননা মন্দ বস্তু বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ভালো বস্তু ক্রয় করা যায়। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'যদি তোমাদের কারো নিকট কোন কর্জ (পাওনা) থাকে তবে সে যেনো ভালো বস্তুর পরিবর্তে মন্দ বস্তু না লয়। কিন্তু লজ্জাবশত মন্দ বস্তু নিলে উত্তম।' এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় কর্জ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে বস্তুর ভালোমন্দ বিচার করা জরুরী নয়। ভালোর বিনিময়ে মন্দ নেয়া যেতে পারে। কিন্তু পাওনাদার যদি মন্দ নিতে অস্বীকার করে তবে এটা তার অধিকার। তাকে ভালোর বদলে ভালোই দিতে হবে।

মাসআলা ঃ খোরমার পরিবর্তে খেজুর এবং আঙ্গুরের পরিবর্তে কিস্‌মিস্ বেচাকেনা করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। সমান হলেও নয়, কম বেশী হলেও নয়। জমহুরের উক্তি এরকম। ভেজা ও শুকনো গমের বিনিময় অথবা শুকনো এবং পাকা বা ভুনা গমের বিনিময়ও বৈধ নয়। কিস্‌মিস্ ও আঙ্গুরের বিনিময় সম্বন্ধে ইমাম আবু হানিফার দুই রকম মত জানা যায়। একটি হ্যাঁ বাচক অন্যটি না বাচক। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি খোরমা ও খেজুরের বিনিময়কে বৈধ বলেছেন।

জমহুরের উক্তির দলিল হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের হাদিসটি। তিনি বলেছেন, রসুল স. এর নিকট খেজুর ও খোরমার বিনিময় প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তিনি এরশাদ করেছেন, খেজুর শুকিয়ে গেলে ওজনে কম হয়ে যায় না কি? আরজ করা হলো, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, একারণেই বৈধ নয়। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এরকম করতে নিষেধ করেছেন। শাফেয়ী, আহমদ, ইবনে খাজিমা, ইবনে হাব্বান। হাকেম, দারা কুতনী, আলবায্যার বায়হাকী, আসহাবে সুনান, জায়েদ আবুল আয়াশ এর হাদিস থেকে। হেদায়া প্রণেতা লিখেছেন আলেমগণ এই হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন। আমি বলি, বর্ণনাগুলোতে জয়ীফ (দুর্বল) হওয়ার অকাট্য কোনো প্রমাণ নেই। ইবনে জাওজী লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা বলেন, জায়েদ আবুল আয়াশ অখ্যাত।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফার নিকট তিনি অখ্যাত হলেও অন্যান্য আলেমগণের নিকট অখ্যাত নন। ইবনে হাজার বলেন, তিরমিজি জায়েদের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি একে সহীহ্ বলেছেন। ইমাম মুসলিমও এর উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন তিনি (জায়েদ) হজরত সা'দ এবং আব্দুল্লাহ্ বিন এজিদের বর্ণনাও উল্লেখ করেছেন। দারাকুতনী তাকে (জায়েদকে) নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আসলে এই হাদিসটি সহীহ্। খেজুরের জলীয় অংশ আসলে খেজুর নয়। আর জলীয় অংশের

www.eelm.weebly.com

পরিমাণ নির্ধারণযোগ্য নয়। তাই খোরমা ও খেজুরের বিনিময় সমান সমান অথবা কমবেশী কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। হানাফীগণ বলেন, খেজুর খোরমার সমগোত্রীয় হলে সম ওজনে বেচাকেনা বৈধ। কারণ রসুল স. বলেছেন, একই প্রকৃতির বস্তু সমানে সমানে বেচাকেনা করো। বস্তু সমগোত্রীয় না হলেও বেচাকেনা করা যাবে। কেননা রসুল স. বলেছেন, পৃথক প্রকৃতির বস্তু যেভাবে চাও বেচাকেনা করো। গণনা ও পরিমাণের পার্থক্য যেখানে কম, সেখানে গণনা দ্বারা বিনিময় বৈধ হওয়া উচিত নয়। প্রকাশ্য নির্দেশ এরকমই। যেমন আখরোট এবং একজাতীয় প্রাণীর ডিম। এসব ক্ষেত্রে পরিমাপ ও গণনা ঠিক থাকলেও পরিমাণে পার্থক্য হওয়া সম্ভব। এ সমস্ত ক্ষেত্রে ওজনের মাধ্যমে বিনিময় বৈধ। এ কারণেই সমতা ঠিক রাখার জন্যে শরিয়তে ওজন নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ভিন্ন জাতীয় প্রাণীর ডিম গণনার মাধ্যমে বিনিময় হতে পারে।

মাসআলা ঃ যব ও গমের কমবেশী বিনিময় বৈধ হতে পারে যদি ক্রেতা বিক্রেতা তা মেনে নেয় এবং দেয়া নেয়ার কাজ তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করে। বিনিময় সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন না হলে মূল্যমানে সমতা ঠিক থাকতে পারেনা। এ ক্ষেত্রে কমবেশী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। আর কমবেশী করাটাই সুদ।

মাসআলা ঃ লোহা ইত্যাদির সঙ্গে গম কমবেশী হলেও বিনিময় বৈধ। কিন্তু বিনিময়ের কাজ সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদন করতে হবে। কেননা রসুল স. ভিন্ন প্রকৃতির পণ্য বিনিময় হাতে হাতে যেভাবে ইচ্ছা করতে বলেছেন। এই হুকুমটি সাধারণ।

মাসআলা ঃ পশু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। মূল্য সাথে সাথে পরিশোধ করা জরুরী নয়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতি থাকলেই চলবে। অবশ্য কিয়াস (চিন্তাভাবনা) এই সিদ্ধান্তের অনুকূল নয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কোরআন, হাদিস ও এজমার অনুকূল। তাই কিয়াস এখানে বর্জনীয়।

মাসআলা ঃ ভিন্ন প্রকৃতির পশু বিনিময় বৈধ। কিন্তু বিনিময় সঙ্গে সঙ্গে হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে না হলে বৈধাবৈধ সম্পর্কে আলেমগণ মতপার্থক্য করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে না হলে বৈধ নয়। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন বৈধ। ইমাম মালেক বলেছেন, একই প্রকৃতির বস্তুর বিনিময় সঙ্গে সঙ্গে না হলেও বৈধ হবে যদি কমবেশী করা না হয়। আর পৃথক প্রকৃতির বস্তুর বিনিময় সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে। নতুবা তা বৈধ হবে না। দলিল হিসাবে তিনি হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আসের বর্ণনা পেশ করেছেন। বর্ণনাটি এই, রসুল স. যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করতে বললেন। আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস নিবেদন করলেন, আমার কোনো বাহন নেই। রসুল স. বললেন, জাকাত আদায়কারী ফিরে এলে মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাহন কিনে নাও। তিনি

www.eelm.weebly.com

দুইটি উট দেয়ার অঙ্গীকার করে একটি উট কিনলেন। ইমাম আবু হানিফার অভিমতের ভিত্তি দুটি। একটি যুক্তিসম্মত, আর একটি প্রমাণসম্মত। যুক্তি বলে, পশু-প্রাণী নগদ মূল্যের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। ক্রেতার পক্ষে মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব। এই ওয়াজিব নগদ মূল্যের মাধ্যমেই পালন করা সম্ভব। পশু-প্রাণীর মাধ্যমে সম্ভব নয়। কারণ পশু-প্রাণীর ক্ষেত্রে মূল্যমান নির্ধারণ করা সহজ নয়। পশুর আকার প্রকার ও গুণাগুণের সুনির্দিষ্ট মূল্যমান থাকেনা। সলম (গ্রহণ করার আগেই মূল্য পরিশোধ করা) প্রকৃতির বেচাকেনা পশু বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ, দেখার আগে পশুর প্রকৃতি ও গুণাগুণ নির্ধারণ করা যায় না। ইমাম আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, দারেমী, ইবনে মাজা এবং আবু দাউদ, হজরত সামুরা বিন জুনদুব থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. পশুর বিলম্বিত বিনিময় নিষিদ্ধ করেছেন। বিলম্ব এক দিক থেকে হোক বা উভয় দিক থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে দারাকুতনীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি এবং ইমাম আহমদ বাসিল, হেজাজ বিন আরতাত, আল জুবাইর ও হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পশু বেচাকেনার পরে বিলম্বে হস্তগত করা দুরস্ত নয়।

বেচাকেনা হাতে হাতে হতে হবে। তিরমিজি এই হাদিসকে হাসান বলেছেন। তিবরানী হজরত ইবনে ওমর থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন। ইবনে জাওজী হজরত সামুরা, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত জাবের থেকে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এই হাদিসের সনদ দোষমুক্ত। এ প্রসঙ্গের হাদিসগুলোর মধ্যে প্রকাশ্যতঃ দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এখানে উল্লেখিত হাদিসকে ইতোপূর্বে উল্লেখিত এক উটের বিনিময়ে দুই উটের হাদিস অপেক্ষা অধিকতর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কারণ, সতর্কতামূলক হাদিস সাধারণভাবে বৈধতা বর্ণনাকারী হাদিস অপেক্ষা অগ্রগামী। কিয়াস সমর্থিত বলে এই হাদিসটি আমাদেরকে বারবার উল্লেখ করতে হচ্ছে।

মাসআলা ঃ বেচাকেনার সময় অতিরিক্ত কোনো শর্ত সংযোজন করা হলে বৈধ হবেনা। এতে যদি ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েরই উপকার হয় তবুও নয়। অতিরিক্ত শর্ত সুদতুল্য। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী এরকমই বলেছেন। ইবনে আবী লায়লা, নাখয়ী এবং হাসান বলেছেন, বেচাকেনা বৈধ হবে কিন্তু অতিরিক্ত শর্তকে বাতিল করতে হবে। ইবনে শুবরাম এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, বেচাকেনা ও শর্ত উভয়ই বৈধ। ইমাম মালেক বলেছেন, যতোটুকু শর্ত বেচাকেনার অনুকূল ততটুকু বৈধ। এর অতিরিক্ত বৈধ নয়।

ইমাম আবু হানিফা পণ্য বিনিময়ে বিলম্বিত করা অথবা বিনিময়কে ঠেকিয়ে রাখাকে বৈধ বলেননি। একজাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে পরিমাণ সমান হতে হবে।

www.eelm.weebly.com

একজাতীয় না হলে মূল্য ও পণ্য সাথে সাথে অধিকারে আনতে হবে। পণ্য বিনিময়ে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে কেউ অতিরিক্ত লাভবান হলে তা হবে বিলম্বে বিনিময়ের মতো। বিনিময়ের সিদ্ধান্তবিরোধী শর্ত তাই বৈধ নয়। এ ধরনের শর্ত বাতিল। এবং সিদ্ধান্তও বাতিল। যেমন, কেউ যদি বাঁদী ও গোলাম কেনার সময় এই শর্ত সংযোজন করে যে, কেনার পর সে বাঁদী ও গোলামকে আজাদ করে দেবে, অথবা বাঁদীকে সন্তানবতী করে দেবে তবে তা বৈধ হবেনা। এ ধরনের শর্ত বেচাকেনার মূল নিয়মের অতিরিক্ত। ইবনে হাজাম, তিবরানী, হাকেম।

ইবনে সাঈদ বলেন, আমি মক্কায় পৌঁছে আলাদাভাবে আবু হানিফা, ইবনে আবী লায়লা এবং ইবনে শুবরামার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করলাম, বেচাকেনার সঙ্গে অতিরিক্ত শর্ত সংযোজনের হুকুম কী? ইমাম আবু হানিফা বললেন, বেচাকেনা ও শর্ত দুই-ই বাতিল। আবী লায়লা বললেন, বেচাকেনা বৈধ। কিন্তু শর্ত বাতিল। ইবনে শুবরাম বললেন, বেচাকেনা ও শর্ত উভয়ই বৈধ। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এতো মতবিরোধ! ইবনে আবী লায়লা এবং ইবনে শুবরামের মত যখন ইমাম আবু হানিফাকে জানালাম, তখন তিনি বললেন, আমি জানিনা তাঁরা এমন বললেন কেনো। আমর বিন শোয়াইব তাঁর পিতা এবং পিতামহের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. অতিরিক্ত (ফাসেদ) শর্তযুক্ত বেচাকেনাকে নিষিদ্ধ করেছেন। এমতাবস্থায় বেচাকেনা ও শর্ত উভয়ই বাতিল।

এরপর আমি গেলাম ইবনে আবী লায়লার কাছে। অন্য দু'জনের মত তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, বুঝতে পারছিনা তাঁরা এমন বললেন কেনো। হিশাম বিন ওরওয়া তাঁর পিতার মাধ্যমে হজরত আয়েশার উক্তি বর্ণনা করেছেন। হজরত আয়েশা বলেছেন, রসুল স. আমাকে বলেছেন, বোরায়রাকে (আজাদ করার কথা বলে) কিনে নাও এবং তাকে আজাদ করে দাও (এমতাবস্থায় গোলামের মূল্য পাবে তার মালিক)। অতঃপর কেনাবেচা জায়েয, শর্ত বাতিল।

শেষে গেলাম ইবনে শুবরামার কাছে। সব শুনে তিনি বললেন, আমি জানিনা তাঁরা এরকম বলছেন কেনো। আমার কাছে তো মুসয়ার, মোহাবের বিন দিসার হজরত জাবেরের উক্তি বর্ণনা করেছেন। হজরত জাবের বলেছেন, আমি রসুল স. এর মাধ্যমে এই শর্তে একটি উটনী কিনলাম যে, আমি তাতে চড়ে মদীনায় যাবো। এতেই বোঝা যায়, বেচাকেনা ও শর্ত উভয়ই বৈধ।

প্রশ্ন ঃ ইমাম আবু হানিফা বর্ণিত হাদিসটিকে অধিকাংশ আলেম মুরসাল বলেছেন। অন্য দু'জনের হাদিস দু'টি মুসনাদ। আর মুসনাদ মুরসালের চেয়ে উত্তম ও শক্তিশালী।

উত্তর ঃ মুরসাল বলে ওই হাদিসকে যাতে সনদ অস্পষ্ট থাকে। কিন্তু আবু দাউদ, তিরমিজি এবং নাসাঈর উদ্ধৃতিতে 'তাঁর দাদা হতে' আবদুল্লাহ বিন আমর

বিন আস সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এই সনদে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ক্রয় বিক্রয়ের সঙ্গে কর্জ এবং শর্ত বৈধ নয়। কোনো পণ্য অধিকারবহির্ভূত রেখে বেচাকেনা কোর না। তিরমিজি বলেছেন, এই হাদিসটি হাসান সহীহ্। এর সমর্থনে আরেকটি হাদিস রয়েছে ইমাম মালেকের মুয়াত্তায়। বর্ণনা করেছেন, হজরত হাকেম বিন হিশাম। তিবরানী, মোহাম্মদ বিন শিরিনের মাধ্যমে হজরত হাকেমের যে বর্ণনাটির উল্লেখ করেছেন, সেটি হচ্ছে এই, রসুল স. ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চারটি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন — ১. কর্জ ২. অতিরিক্ত শর্ত সংযোজন ৩. আয়ত্তবহির্ভূত বেচাকেনা ৪. এবং আওসের ক্রয় বিক্রয় (আওস হচ্ছে এক প্রকার হিংস্র জন্তু)। কর্জ অর্থ, ক্রেতা বিক্রেতাকে কিছু টাকা কর্জ দিবে — একথা বলা। এক্ষেত্রে ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে যে কোনো একজনের অতিরিক্ত লাভের সুযোগ রয়েছে।

ইবনে আবী লায়লা বর্ণিত হাদিসটি রয়েছে বোখারী ও মুসলিমে। হজরত আয়েশা বলেছেন, বোরায়রা বললেন, নয় উকিয়া পরিশোধের শর্তে আমার মালিকের সঙ্গে আমার একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বৎসরে এক উকিয়া দিতে হবে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমি বললাম, তোমার মালিক সম্মত হলে আমি একবারে পরিশোধ করে দেবো এবং তোমাকে মুক্ত করে দেবো। কিন্তু ত্যাজ্য সম্পদের সত্ত্ব থাকবে আমার। রসুল স. আমাকে বললেন, তুমি বোরায়রাকে (তাঁর মালিকের শর্তের উপর) আজাদ করে দাও। এরপর তিনি স. মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। আল্লাহ্ তায়ালার স্তব ও স্তুতি প্রকাশের পর বললেন, মানুষ কেনো এরকম শর্ত করে, যার উল্লেখ আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে করেননি। এরকম শর্ত বাতিল, একশতবার করা হলেও। আল্লাহ্তায়ালাই সত্য। তাঁর হুকুম শর্তাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী।

দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, হজরত আয়েশা রসুল স. কে বললেন, বোরায়রার মালিক শর্ত ছাড়া তাকে বিক্রয় করবেনা। ত্যাজ্য সম্পদের অধিকার তারই থাকবে। রসুল স. বললেন, অধিকারের শর্ত মেনে নিয়ে তুমি তাকে কিনে নাও। অধিকার থাকবে তার, যে আজাদ করবে। বোখারী, মুসলিম।

রাফেয়ী বলেন, কেবল হিশামের বর্ণনাতেই শর্ত মেনে নেয়ার কথা আছে। অন্য কোনো বর্ণনাকারী এর উল্লেখ করেননি। ইবনে হাজার বলেছেন, বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে শর্ত মেনে নেয়ার কথা এসেছে। যেমন, আবদুর রহমান বিন আইমানের বর্ণনাটি। তাঁর বর্ণনায় জুহরী ও ওরওয়া রয়েছেন। হজরত জাবের বর্ণিত একটি হাদিস বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন বোখারী ও মুসলিম। হজরত জাবের বলেছেন, এক যুদ্ধের সময়ের ঘটনা — আমার উটটি ছিলো দুর্বল, আরোহী বহনে অক্ষম। রসুল স. আমার কাছে এসে বললেন, তোমার উটের কী হয়েছে? আমি

www.eelm.weebly.com

বললাম, উটটি দুর্বল। রসুল স. উটটিকে ধমক দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। ফল হলো এই যে, আমার উটটি সকল উটের আগে চলতে লাগলো। রসুল স. বললেন, এখন কী অবস্থা? আমি বললাম, অনেক ভালো। এতো আপনার দোয়ারই বরকত। তিনি স. বললেন, উটটি এক উকিয়া মূল্যে বিক্রয় করতে সম্মত আছো কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু এতে চড়ে মদীনা পর্যন্ত আমাকে যেতে দিতে হবে। মদীনায় গিয়ে সেই উটটির পিঠে চড়েই আমি রসুল স. এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি স. আমাকে উটের মূল্যতো দিলেনই, উটটিও দিয়ে দিলেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আমাকে বললেন, এক উকিয়ার বিনিময়ে উটটি আমার কাছে বিক্রয় করো। আমি বিক্রয় করলাম। শর্তারোপ করলাম এই যে, গৃহগমন পর্যন্ত এটিই হবে আমার বাহন। বোখারী, মুসলিম।

বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. হজরত বেলালকে বললেন, মূল্য পরিশোধ করে দাও। তারপর কিছু বেশীও দিও। হজরত বেলাল রা. এক কিরাত বেশী দিয়ে দিলেন। ইবনে জাওজী এই হাদিস দ্বারা শর্তযুক্ত ক্রয় বিক্রয় বৈধ হওয়ার দলিল দিয়েছেন। ইবনে জাওজী আরেকটি দলিল দিয়েছেন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বর্ণিত হাদিস দ্বারা যাতে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মুসলমান আপন অধিকারের অনুকূল শর্ত মেনে চলবে। হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, মুসলমান আপন শর্ত অনুসরণ করবে, যা হবে সত্যের অনুকূল। উল্লেখিত হাদিস সমূহের দৃশ্যতঃ দ্বন্দ্বের নিরসন হওয়া প্রয়োজন। প্রথম হাদিসে বলা হয়েছে, শর্ত আল্লাহর কিতাবের অনুকূল না হলে বাতিল। একশ'বার করা হলেও। দ্বিতীয় হাদিসে বলা হয়েছে, মুসলমানগণ আপন শর্তের অনুসরণ করবে, যদি তা সত্যের অনুকূল হয়। আসলে এই হাদিস দু'টিতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। দু'টি হাদিস থেকেই একথা পরিষ্কার বোঝা যায়, ক্রয় বিক্রয়ে শর্তসংযোজন বাতিল। কিন্তু বৈধতার অনুকূল হলে বাতিল নয়। একথায় আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে। হজরত সামুরা বর্ণিত যে হাদিসটিতে শর্তের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাধারণ ক্ষেত্রে নয়। শর্তের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে যেয়ে এমন কিছু কিছু শর্ত এসেছে যাতে শর্ত আপনাআপনি অবৈধ হয়ে পড়ে। এতে বেচাকেনা বাতিল হয়না — তবে শর্ত বাতিল হয়। হজরত বোরায়রার ঘটনাটি ছিলো এরকমের। কিন্তু কোনো কোনো শর্ত এমন, যাতে মূল ক্রয় বিক্রয়ই অবৈধ হয়ে যায়। হজরত সামুরা বর্ণিত হাদিসে এ রকম শর্তেরই উল্লেখ আছে। আবার কিছু শর্ত আছে এমন, যা সঠিক বলে মেনে নিতে হয়। হজরত আনাস এবং হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসে উল্লেখিত শর্ত এই প্রকারের। অযথা সংযোজিত শর্তের কারণে বেচাকেনা বাতিল হয়না। এর একটি প্রকার এই যে, যার জন্য শর্ত করা হয় তার পক্ষে শর্ত মানা অসম্ভব। যেমন, বিক্রেতা এই শর্ত আরোপ করলো,

www.eelm.weebly.com

ক্রয়ের পর ক্রেতা গোলাম আজাদ করে দিলেও আজাদ হবে না। অথবা ত্যাজ্য সম্পদের অধিকার বিক্রেতার থাকবে। এরকম একশত শর্ত করা হলেও তা অগ্রাহ্য হবে। এ ধরনের শর্তের কারণে ক্রয় বিক্রয় বাতিল হয়না। হজরত বোরায়রার ঘটনা এর সাক্ষী।

শায়েখ ইবনে হাজার লিখেছেন, এই ঘটনায় আজাদের কথাটি মুখ্য নয় বরং বিক্রেতার অধিকার বলবত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এ ধরনের শর্ত স্বীকারোক্তিবিরুদ্ধ। এতে ক্রেতা বিক্রেতার কোনো বিশেষ লাভও নিহিত নেই যে সুদের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। এ ধরনের শর্ত অর্থহীন। তাই এ কারণে বেচাকেনা বাতিল হয়না। যেমন, কোনো কাপড় বিক্রেতা যদি বলে, ক্রেতাকে এই কাপড় ঈদের সময় পরতে হবে। অথবা কোনো ঘোড়া বিক্রেতা এই শর্তে ঘোড়া বিক্রি করে যে, ক্রেতা ঘোড়াটিকে উত্তমরূপে পানাহার করাবে — এ ধরনের শর্ত অনর্থক। ক্রয় বিক্রয়ের উপরে এর কোনোই প্রভাব নেই। দ্বিতীয় হাদিসে বর্ণিত শর্ত কিন্তু অনর্থক নয়। বরং এক্ষেত্রে শর্ত পূর্ণ করা জরুরী। যেমন, বিক্রেতা বললো, মূল্য হাতে না পাওয়া পর্যন্ত পণ্য থাকবে আমার অধিকারে। এ ধরনের শর্তে দোষ নেই। কারণ এতে রয়েছে কেবল পরিশোধের তাগিদ। শরিয়তসম্মত শর্ত বর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন, সাধারণ ক্রয় বিক্রয়। এতে মূল্য আদায়ের সময় নির্ধারণ করতে হয়। অথবা সলম প্রকৃতির ক্রয় বিক্রয় — যেখানে কেনার পূর্বে মূল্য পরিশোধ করতে হয়, বিক্রেতাকে পণ্য হস্তান্তরের সময় বলে দিতে হয়। এ ধরনের শর্ত কিয়াস বহির্ভূত হলেও হাদিস সম্মত। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হাদিসের দলিল সহ সাহাবীদের সময়ের বাস্তব ঘটনার উল্লেখ থাকতে হবে। ব্যাপারটি এ রকম যেমন, জুতা ক্রয়কারী বিক্রেতাকে বললো, জুতায় চামড়ার টুকরা লাগিয়ে দিতে হবে।

অতিরিক্ত শর্তবহির্ভূত ক্রয়বিক্রয়ের আরেকটি প্রকার এই যে, বিক্রেতা ক্রেতার নিকট জিম্মাদার চাইবে অথবা কোনো বস্তু জিম্মা রাখার কথা বলবে। এরকম অবস্থাও ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার বিরুদ্ধে যায়না। বরং ক্রয়বিক্রয়কে মজবুত করে। তাই এ রকম ক্রয়বিক্রয় বৈধ। জিম্মা হিসাবে কোনো মানুষ অথবা কোনো সামগ্রী বিক্রেতার অধিকারে এলে তখন ক্রয়বিক্রয়, জিম্মাদার, জিম্মাকৃত বস্তু সবকিছুই বিশুদ্ধ হবে। এরকম অবস্থায় ক্রেতা শর্ত পূরণ করে দিলে তো ভালোই। যদি না দেয় তবে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের হুকুম দেয়া হবে। ক্রেতা মূল্য পরিশোধে অক্ষম হলে বিক্রেতা ক্রয়বিক্রয় বাতিল করতে পারবে।

ক্রয়বিক্রয়কে বাতিল করার শর্ত সমূহ এর বিপরীত। যেমন, গম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এরকম শর্ত যে, বিক্রেতাই গম পিষে দিবে অথবা তার ঘরে একদিন, একমাস অথবা এক বৎসর রাখবে। কাপড় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ রকম শর্ত যে,

www.eelm.weebly.com

বিক্রেতা কাপড় সেলাই করে দিবে। উট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ রকম শর্ত, বিক্রেতা তার উপর আরোহন করে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত যাবে অথবা ক্রেতা ক্রয় করে নির্ধারিত ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করে দিবে। এ ধরনের শর্ত দ্বারা ক্রয় বিক্রয় ফাসেদ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধাটুকুই সুদ।

এ ব্যাখ্যার পর হাদিসের মধ্যে দ্বন্দ্ব আর অবশিষ্ট থাকেনা। সুদের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ হয়ে যায়। হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসটি (যাতে মদীনা পর্যন্ত পৌঁছার শর্ত আরোপিত ছিলো) সম্পর্কে আলেমগণ বলেন, মদীনা পর্যন্ত যাওয়ার শর্ত এখানে মূল ক্রয়বিক্রয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলোনা। ইবনে হাম্মাস ও ইমাম শাফেয়ী এরকম বলেছেন।

আমি বলি, বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিসের শব্দগুলি এর প্রতিকূল। হাদিসের বর্ণনায় একথা পরিষ্কার যে, নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত গমন ক্রয়বিক্রয়ের সঙ্গে করা হয়েছে। ইমাম মালেক বলেন, সামান্য উপকারের ব্যাপারে ক্রেতাবিক্রেতা উভয়েই যদি সম্মত হয় তবে তাতে ক্ষতি নেই। আমি বলি, এই হাদিস সুদের আয়াতের সমকক্ষ নয়। তাই সুদের আয়াত দ্বারা এই হাদিসটি মনসুখ (রহিত) হয়ে গিয়েছে বলে ধরে নেয়াই উত্তম। কেননা সুদের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশেষ পর্যায়ে। শাবী, হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিতে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. এর উপর সবশেষে অবতীর্ণ আয়াত সমূহের অন্যতম ওই আয়াতে হারামের হুকুমই বলবৎ হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনই শ্রেয়। তাই এমন হাদিস বার বার সামনে আনা উচিত নয়। সুদের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সাবধান!

আল্লাহ তায়ালা সুদের শাস্তির কথা পাঁচ রকমভাবে বর্ণনা করেছেন।

১. 'তাহারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াইবে যাহাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে।'

২. 'আর যাহারা পুনরায় (সুদ) আরম্ভ করিবে তাহারাই অগ্নি-অধিবাসী।'

৩. 'আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন।'

৪. 'সুদের যাহা বকেয়া আছে তাহা ছাড়িয়া দাও যদি তোমারা বিশ্বাসী হও।'

৫. 'যদি তোমরা না ছাড় তবে জানিয়া রাখ যে, ইহা আল্লাহ্ ও রসুলের সহিত যুদ্ধ।'

হজরত ওমর বলেছেন, সুদের আয়াত নাজিল হয়েছে সকলের শেষে। তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত রসুল স. বলেছেন, সুদ ছেড়ে দাও, সুদের সন্দেহকেও ছেড়ে দাও। অতএব, সুদ হারাম — একথা নিশ্চিত। হারাম হওয়ার আগে যে সুদ গ্রহণ করা হয়েছে তা মাফ করে দেয়ার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। বিষয়টি সম্পূর্ণতই

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাধীন। ক্ষমা অথবা শাস্তি যে কোনোটির সিদ্ধান্ত গ্রহণে আল্লাহ্‌তায়ালা পূর্ণ ক্ষমতাবান। আলেমগণ বলেন, সুদ থেকে বিরতি যদি খাঁটি নিয়তে হয় তবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে উত্তম বিনিময় দিবেন। কেউ কেউ বলেছেন, নিষেধাজ্ঞার পর বিরত ব্যক্তির ব্যাপারটি আল্লাহ্‌তায়ালার উপরে নির্ভরশীল। তিনি তাকে রক্ষা করবেন যদি চান। যদি না চান তবে সে হবে সাহায্যহীন। পুনরায় সে সুদের দিকেই ফিরে যাবে। অবশ্যই তারা দোজখবাসী। দোজখই তাদের চিরকালের আবাস। তবে হ্যাঁ, যদি সে সুদ গ্রহণ করা সত্ত্বেও হারামকে হারাম বলে জানে তবে চিরস্থায়ী আবাস না হলেও তার দোজখবাস হবে দীর্ঘস্থায়ী।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭৬

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۝

❑ আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি দেন। আল্লাহ্ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, রসুল স. বলেছেন, সুদের মাধ্যমে সম্পদবৃদ্ধি ঘটলেও শেষ পর্যন্ত তা ঘাটতির দিকেই যাবে। ইবনে মাজা। হাকেম বলেছেন হাদিসটি বিশুদ্ধ। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, সুদের মাধ্যমে সম্পদ বেড়ে গেলেও পরিণামে তা কমের দিকেই যাবে।

আল্লাহ্ পাক দানকে বর্ধিত করেন। দানকারীর সম্পদে বরকত দান করেন এবং অনেক সওয়াবও দান করেন। হজরত আবু হোরায়রা রা. বলেন, রসুল স. বলেছেন, দানের কারণে সম্পদ কমে না। এবং ঋণগ্রস্তকে ক্ষমা করে দিলে আল্লাহ্‌তায়ালা তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যে বিনম্র হয়, আল্লাহ্‌তায়ালা তার মর্যাদা সমুন্নত করেন। মুসলিম, তিরমিজি।

ইতোপূর্বে এক হাদিসে আমরা উল্লেখ করেছি, প্রতিদিন দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। একজন বলতে থাকেন, হে আল্লাহ্! দাতাকে বিনিময় দান করুন। দানকারীকে আল্লাহ্‌তায়ালা ভালোবাসেন। রসুল স. বলেছেন, সমস্ত প্রাণী আল্লাহ্‌তায়ালার পরিবারের সদস্য। সে-ই আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে সর্বাধিক প্রিয় যে তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়। বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমানে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে এই বর্ণনাটির উল্লেখ করেছেন।

www.eelm.weebly.com

অকৃতজ্ঞ পাপীকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন না। অকৃতজ্ঞ পাপী ওই কাফের যে হালাল ফেলে হারামকে গ্রহণ করে এবং সতত ধাবমান থাকে গোনাহের দিকে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭৭

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

❑ যাহারা বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত দেয়, তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে ; তাহাদের কোনো ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

ইমানের পরে নামাজ এবং তার পরে জাকাতের বিশেষ গুরুত্ব এই আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। দৈহিক ইবাদতে নামাজ এবং আর্থিক ইবাদতে জাকাতই শ্রেষ্ঠ। নামাজ এবং জাকাত আদায়কারী ইমানদারগণকে এই আয়াতে পুরস্কার প্রাপ্তির সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তাঁদের কোনো শংকা নেই। তাঁরা চিন্তিতও হবেন না। বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল মানুষের জন্য অতীতের আক্ষেপ এবং ভবিষ্যতের বিপদ থাকতেই পারে না।

ইবনে মানদাহ্ এবং আবুল ইয়ালী মুসনাদে এবং কালাবীর উদ্ধৃতিতে আবু সালেহ্ হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এইভাবে, আমাদের কাছে এই কথাটি পৌঁছেছে যে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় আমর বিন আউফ সাকাফির গোত্র মুগীরা বিন আবদুল্লাহ্ বিন উমাইর বিন মাখজুমের গোত্রকে সুদী কর্জ দিতো। মক্কাবিজয়ের পর রসুল স. সমস্ত সুদকে বাতিল করে দেন। বনী মুগীরা বললেন, আল্লাহ্তায়ালা সকল সুদ বাতিল করেছেন। আমরা এমন হতভাগ্য নই যে, এর পরেও সুদকে কায়েম রাখবো। বনি আমর বললো, আমাদের সাথে তো এই শর্তেই সন্ধি ছিলো যে, আমাদের সুদ ঠিক থাকবে। এই দুই সম্প্রদায় হজরত ইতাব রা. এর কাছে তাদের মন্তব্য পেশ করলে, তিনি রসুল স. নিকট লিখিতভাবে এই সমস্যাটি উত্থাপন করলেন। তখন নিম্নের আয়াত দু'টি অবতীর্ণ হয়।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭৮

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

❑ হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সুদের যাহা বকেয়া আছে তাহা ছাড়িয়া দাও যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

www.eelm.weebly.com

ইবনে জারীর, হজরত ইকরামার উক্তি উল্লেখ করেছেন এভাবে — সাকীফ গোত্রের চার ভাই সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের নাম মাসউদ, আবদে ইয়ালিল, হাবীব এবং রবীয়া। তাদের পিতার নাম ছিলো আমর বিন উমাইর। মুকাতিলও এরকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাগবী, সুদ্দীর মাধ্যমে লিখেছেন যে, হজরত আব্বাস এবং হজরত খালেদ বিন ওলীদের শাণে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা মুর্খতার যুগে সাকীফ গোত্রের বনি আমর বিন উমাইর সুদী কর্য দিতেন। ইসলাম গ্রহণের পর যখন সুদ হারাম করা হলো, তখন তাঁদের সুদের অনেক টাকা মানুষের কাছে পাওনা ছিলো। এই আয়াতে বকেয়া বলতে সেই বকেয়ার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

বিদায় হজের সময় আরাফাতের ময়দানে রসুল স. ঘোষণা করলেন, উপস্থিত জনমন্ডলী! মনোযোগের সঙ্গে শোনো। মূর্খতার সময়ের প্রত্যেক বিষয় আমার পদতলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ওই সময়ের সকল হত্যা বাতিল। এখন তার কেসাস (হত্যার বদলে হত্যা) নেয়া চলবেনা। আপন গোত্রের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম রবীয়া বিন হারেসের হত্যাকে বাতিল করলাম। (রবীয়া বনু হারেস গোত্রের কোনো এক মহিলার দুধ পান করেছিলো। বনু হুজাইল তাকে হত্যা করে)। মূর্খতার সময়ের সমস্ত সুদ বাতিল। সর্বপ্রথম আমি আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদকে বাতিল করলাম। আব্বাসের সমস্ত সুদ ছেড়ে দেয়া হলো। মুসলিমও হজরত জাবেরের মাধ্যমে রসুল স. এর বিদায় হজের ভাষণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাতে শানে নজুলের উল্লেখ নেই।

বাগবী, ইকরামা ও আতার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব এবং হজরত ওসমান বিন আফ্‌ফান কিছু খেজুর সলম হিসাবে কিনেছিলেন ; ফসল কাটার সময় খেজুরওয়ালা তাঁদেরকে বললো, আপনারা যদি এ সময় সমুদয় পাওনা নিয়ে নেন তবে আমার ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন মিটবে না। আপনারা বরং অর্ধেক নিন এবং বাকি পাওনার জন্যে একটি সময় নির্ধারণ করে দিন। আমি তখন দ্বিগুণ দেবো। তাঁরা রাজী হয়ে গেলেন। নির্ধারিত সময়ে তাঁরা পাওনা আদায়ের উদ্যোগ নিলে এই সংবাদটি রসুল স. এর নিকট পৌঁছলো। তিনি স. উভয়কে নিষেধ করলেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। তখন তাঁরা কেবল আসল পাওনাটুকু নিয়ে সুদ ছেড়ে দিলেন।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৭৯

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ○

❐ যদি তোমরা না ছাড় তবে জানিয়া রাখ যে, ইহা আল্লাহ্ ও রসুলের সহিত যুদ্ধ; কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। ইহাতে তোমরা অত্যাচার করিবেনা অথবা অত্যাচারিতও হইবে না।

---

www.eelm.weebly.com

সাঈদ বিন জোবায়ের রা. হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, কিয়ামতের দিন সুদখোরকে যুদ্ধের জন্য আহবান করে বলা হবে, নিজ হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত হও।

হজরত ইবনে আব্বাসের এক বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে খোরমা ক্রয় করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, যখন কোনো জনপদে সুদ সহজলভ্য হয়ে যায়, তখন সেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের প্রতি আল্লাহ্‌র আযাবকে নামিয়ে নেয়। বর্ণনাটিকে হাকেম শুদ্ধ বলেছেন।

হজরত আমর বিন আস রা. বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেন, যে জাতির মধ্যে সুদের অধিক প্রচলন হয়, তাদেরকে শাস্তিদান গজবরূপে প্রতিভাত হয়। ব্যাপক হারে সুদ গ্রহণকারীরা শত্রুর ভয়ে সদা শংকিত থাকে। আহমদ।

আলেমগণ বলেন, আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধ অর্থ দোজখ এবং রসুলের সাথে যুদ্ধ হলো তরবারী। এই সূত্র ধরে বায়যাবী বলেন, সুদখোরের কাছ থেকে রাষ্ট্রদ্রোহীর মতো তওবা তলব করতে হবে। সে যদি আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করে তো ভালো। নচেৎ তার সাথে যুদ্ধ করা যাবে।

আমি বলি, যদি সুদখোর হীনবল হয়, যুদ্ধের সামর্থ যদি তার না থাকে তবে তওবা না করা পর্যন্ত তাকে বন্দী রাখা ওয়াজিব। আর যদি সুদখোর বিরুদ্ধাচরণে প্রবল হয়, তখন তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী ঘোষণা করতে হবে এবং যতক্ষণ না সে তওবা করে ততোক্ষণ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। এই হুকুম প্রত্যেক ফরজ অমান্যকারীর প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন, নামাজ, জাকাত তরককারী এবং কবীরা গোনাহকারী। প্রকাশ্য গোনাহে লিপ্ত থাকাবস্থায়ও ওই একই হুকুম।

রজীন, মুনাকেবে আবী বকরের মধ্যে হজরত ওমর বিন খাত্তাব রা. এর এই বর্ণনাটি উদ্বৃত করেছেন, রসুল স. এর তিরোধানের পর কোনো কোনো সম্প্রদায় ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলতে থাকে, আমরা জাকাত দিবোনা। আমীরুল মুমিনীন হজরত আবুবকর রা. ঘোষণা করেন, এসমস্ত লোক জাকাতের হিসেবে উটের পায়ের রশি দিতে অস্বীকার করলেও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। আমি আরজ করলাম, হে রসুলের খলিফা। মানুষকে একত্রিত রাখুন এবং নম্রতা প্রদর্শন করুন। তিনি বললেন, তুমি তো মূর্খতার যুগে খুবই শক্তিশালী ছিলে, ইসলাম কি তোমার শক্তি হরণ করেছে? ওহি স্থগিত। দ্বীন পরিপূর্ণ। এখন আমরা বেঁচে থাকতে কি দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হবে?

বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবুবকর ঘোষণা দিলেন আল্লাহ্‌র কসম! আমি ওই ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করবো, যে নামাজ এবং জাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। সম্পদের জন্য জাকাত ফরজ। তারা রসুল স. কে যেমন দিতো তেমনিভাবে বকরীর বাচ্চা দিতে অস্বীকার করলেও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। হজরত ওমর বলেছেন, হজরত আবু বকরের সিদ্ধান্তই সঠিক।

www.eelm.weebly.com

কর্জ গ্রহণকারীর নিকট থেকে কর্জের অতিরিক্ত গ্রহণ করা জুলুম। কর্জ গ্রহীতাও আসল অপেক্ষা কম দিতে পারবেনা।

হজরত আবু হোরায়রা বলেন, রসুল স. বলেছেন, আসল ঋণ পরিশোধের বেলায় টালবাহানা করলে জুলুম হবে। বায়যাবী লিখেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমে এ কথাও বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি সুদকে হালাল মনে করে এবং তওবা না করে, আসল মালও সে পাবেনা। এ ক্ষেত্রে সুদ দাতা মুরতাদ বলে গণ্য হবে। কারণ সে হারামকে হালাল বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তার দূষিত সম্পদ গণিমতের মতো। বায়যাবীর এই বর্ণনা ইমাম শাফেয়ীর মতের অনুকূল। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মুরতাদের সম্পদ মূল্যবিবর্জিত, গণিমতের মতো।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মুরতাদ যদি ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যায় অথবা শাস্তি স্বরূপ তাকে হত্যা করা হয় তবে তার ইসলামে থাকাকালীন সম্পদ তার মুসলমান উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। আর মুরতাদ অবস্থার সম্পদ গণিমতের অন্তর্ভূত হবে। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হলে বনি আমর ও অন্যান্য সুদখোরেরা বললো, আমরা তওবা করছি। কারণ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। সবাই তখন তাদের আসল মাল নিতে রাজী হলো। আবু ইয়ালীর হাদিসেও এরকম কথা বলা হয়েছে। বাগবী লিখেছেন, বনী মুগীরা অভাব অনটনের কথা উল্লেখ করে ফসল কাটা পর্যন্ত সময় প্রার্থনা করলো। কিন্তু ঋণ দাতারা রাজি হলো না। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৮০

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

❐ যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দেওয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছাড়িয়া দাও তবে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানিতে।

এই আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা অক্ষম ও অসচ্ছল খাতকের প্রতি অনুগ্রহশীল হতে নির্দেশ দিয়েছেন। সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিতে বলেছেন এবং তাদের কর্জ ক্ষমা করে দিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে অভাবগ্রস্তকে অবকাশ দিবে আল্লাহতায়ালা তাকে ইহকাল ও পরকালে অবকাশ দিবেন। মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইমরান বিন হোসাইনের একটি মারফু হাদিস এই যে, কর্জ আদায়ের সময়ে কর্জগ্রহীতাকে অবকাশ দিলে প্রত্যেক দিনের বদলে একটি সদকার সওয়াব পাওয়া যাবে। ইমাম আহমদ বলেন, উদ্দেশ্য এই যে, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়া অতি উত্তম।

হজরত আবু হোরায়রা বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তি প্রথম আল্লাহ্র ছায়া পাবে, যে কর্জ আদায়কালে খাতককে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছে। অথবা তার পাওনা মাফ করে দিয়েছে। বলেছে, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আমার অধিকার ছেড়ে দিলাম। তারপর কর্জের চুক্তিপত্র সে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তিবরানী।

বাগবী শরহে সুন্নায় বর্ণনা করেন, যে ঋণগ্রহণকারীর ঋণ মাফ করে দেয়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশের ছায়ায় থাকবে। হজরত ওসমান বিন আফফানও এ রকম বর্ণনা করেছেন। বাগবী, হজরত আবুল ইয়াসেরের এরকম আরো একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

হজরত কাতাদা রা. বর্ণনা করেন, আমি একজন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর আমার পাওনা তলব করলাম। সে আত্মগোপন করলো। আমি দেখে ফেললাম। বললাম, এমন করলে কেনো? লোকটি বললো, অভাবের কারণে। এ ব্যাপারে কসম করতে বললে লোকটি তাই করলো। আমি তাকে ঋণের চুক্তিনামাটি দিয়ে দিলাম এবং বললাম, আমি রসুল স. এর নিকট শুনেছি, যে অভাবগ্রস্তকে অবকাশ দিবে অথবা তার কর্জকে ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের কঠিন মুসিবত থেকে হেফাজতে রাখবেন। মুসলিমও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ হজরত আবু বকর বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি চায় তার দোয়া কবুল হোক এবং তার দুনিয়া ও আখেরাত বিপদমুক্ত হোক, সে যেনো অভাবগ্রস্তকে কর্জ আদায়কালে অবকাশ দেয় এবং তাগাদা না দেয়। আর যে ব্যক্তি চায় কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচিয়ে তাঁর আপন ছায়ায় আশ্রয় দেন, সে যেনো মুমিনদের প্রতি কঠোর না হয় এবং বিনম্র আচরণ করে।

হজরত ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, অতীতকালের এক ব্যক্তির জান কবজ করার পর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কোনো নেক কাজ করেছে কি? সে বললো, না। ফেরেশতা বললেন, ভেবে দেখো। সে বললো, তেমন তো কিছু নেই, তবে হ্যাঁ। আমি মানুষকে কর্জ দিতাম এবং আমার কর্মচারীকে বলে দিতাম কর্জগ্রহীতা অসচ্ছল হলে অবকাশ দিও এবং অক্ষম হলে মাফ করে দিও। আল্লাহ্ ফেরেশতাগণকে বললেন, তোমরা এই ব্যক্তিকে অব্যাহতি দাও। মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

'যদি তোমরা জানিতে' — এ কথার দ্বারা বলা হয়েছে এই আমল তোমাদের জন্য মোটেও কঠিন নয়, যদি এর মর্যাদা তোমরা উপলব্ধি করতে পারো। বিনিময়ের প্রসঙ্গ অবশ্য এখানে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৮১

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

❒ তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যে দিন তোমরা আল্লাহের দিকে প্রত্যানীত হইবে। অতঃপর প্রত্যেককে তাহার কর্মের ফল পুরাপুরি প্রদান করা হইবে। আর তাহাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হইবে না।

এরশাদ হচ্ছে, মানুষ প্রস্তুত হও। একদিন তো আল্লাহতায়ালার সামনে আপন কর্মফলের জবাবদিহি করতে দাঁড়াতেই হবে। ভালো ও মন্দের উপযুক্ত বিনিময় পাওয়া যাবে সেই দিনই। কারো পুণ্য কমানো হবে না। অপরাধের তুলনায় অধিক শাস্তিও দেয়া হবে না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, রসুল স. এর প্রতি অবতীর্ণ এই আয়াতটি সুরা বাকারার শেষ আয়াত। হজরত জিব্‌রাইল আ. তখন বলেছিলেন, একে সুরা বাকারার দুইশত আশি আয়াতের পাশে রাখুন। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। সায়লাবী সায়দী, সগীরের মাধ্যমে কালাবীর বর্ণনা এবং আবু সালেহ, হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এভাবে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. পৃথিবীর জীবন পেয়েছিলেন মাত্র একুশ দিন। ফারইয়ানীও হজরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তিটি বর্ণনা করেছেন। তিনি অবশ্য বলেছেন, এরপর রসুল স. মাত্র সাত দিন জীবিত ছিলেন। ইবনে আবী হাতেম, হজরত সাঈদ বিন জোবায়েরের উক্তিতে উল্লেখ করেছেন, তাঁর স. ওফাতের দিন ছিলো সোমবার। তারিখ রবিউল আউয়ালের তিন। সময় সূর্য ঢলে পড়ার পর। হিজরী এগারো।

www.eelm.weebly.com

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ
ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَ
ٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ
إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا
مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ
وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ○

❑ হে বিশ্বাসীগণ তোমরা যখন একে-অন্যের সহিত নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন উহা লিখিয়া রাখিও; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন

www.eelm.weebly.com

ন্যায্যভাবে লিখিয়া দেয়; লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না। যেহেতু আল্লাহ্ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, সুতরাং সে যেন লিখে; এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লিখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয় এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, আর উহার কিছু যেন না কমায়; কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লিখার বিষয়বস্তু বলিয়া দিতে না পারে তবে যেন তাহার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লিখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাহাদের উপর তোমরা রাজী তাহাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখিবে, যদি পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রী লোক; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করিলে তাহাদের অপরজন স্মরণ করাইয়া দিবে। সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হইবে তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে। ইহা ছোট হউক অথবা বড় হউক মিয়াদসহ লিখিতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হইও না। আল্লাহের নিকট ইহা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর; কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান-প্রদান কর তাহা তোমরা না লিখিলে কোন দোষ নাই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখিও, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগস্ত কর তবে ইহা তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। এবং তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ই সবিশেষ অবহিত।

রসুল স. অনুমাণ করে বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন। হজরত ইবনে ওমর এই হাদিসের বর্ণনাকারী এবং দারাকুতনী এর উদ্ধৃতি-দাতা। এই আয়াতের হুকুম বায় সলম (পণ্য গ্রহণের পূর্বে মূল্য পরিশোধ করা), ভাড়া, ঋণ, বিবাহ, খোলা, সন্ধি সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (খোলার আভিধানিক অর্থ বন্ধনমুক্ত করা — শরিয়তের পরিভাষায় স্ত্রীর প্রস্তাবানুসারে তার নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দেয়া)। তাৎক্ষণিকভাবে বেচাকেনার ক্ষেত্রে লিখিত চুক্তির প্রয়োজন নেই। আয়াতে উল্লিখিত 'মুসাম্মা' শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট করা। অর্থাৎ দিন মাস বৎসর নির্ধারণ করা। মাল গ্রহণের পূর্বে মূল্য পরিশোধ করে দেয়া অথবা মূল্য পরিশোধের পর মাল গ্রহণের অপেক্ষায় থাকা—এই দুই অবস্থাতেই সময়ের নির্ধারণ থাকতে হবে। না হলে বেচাকেনা শুদ্ধ হবে না। কারণ এতে ঝগড়া সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। তবে কর্জ আদায়ের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ করা জরুরী নয়। নির্ধারণ করে দিলেও তা নির্ধারণ বলে গণ্য হবে না। কর্জদাতা যে কোনো সময় চাইতে পারবে। শরিয়তে কর্জ ধার দেয়ার মতো। ধার ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার দাতার জন্য সর্বক্ষণই বিদ্যমান।

সলম প্রকৃতির বেচাকেনা বৈধ। একথা আগেই বলা হয়েছে। এর ভিত্তি আল্লাহতায়ালার কালামের উপর যেমন আল্লাহাতয়ালা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ যখন

www.eelm.weebly.com

তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদানপ্রদান করো তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও।' ওদিকে কিয়াস (বুদ্ধিবৃত্তিক অনুমান) চায় সলম যেনো জায়েয না হয়, বেচাকেনার পূর্ণ ধরণ এতে পাওয়া যায় না। বেচাকেনার জন্য ক্রয়ের মূল্য এবং বিক্রয়ের বস্তু একই স্থানে উপস্থিত থাকতে হয়। এ জন্যে হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, বেচাকেনা হতে হবে হাতে হাতে, নগদে নগদে। কিন্তু বায় সলম এর ব্যতিক্রম। কারণ এর বৈধতা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এর উপরে এজমা (ঐকমত্য)ও হয়েছে। এক্ষেত্রে কিয়াসকে বাদ দিতেই হবে। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুল স. মদীনায় এসে দেখলেন, মানুষেরা এক বৎসর দুই বৎসরের প্রতিশ্রুতিতে বায় সলম করছে। অন্যান্য বর্ণনায় তিন বৎসরেরও উল্লেখ আছে। রসুল স. বলেছেন, ফলের বায় সলম করলে পরিমাপ, পরিমাণ এবং সময় নির্ধারণ করে নাও। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবদুল্লাহ বিন আবী আউফা বর্ণনা করেন, আমরা রসুল স. এর যুগে এবং পরবর্তীতে হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরের যুগে গমকে খোরমা এবং কিসমিসের পরিবর্তে বায় সলম করতাম। বোখারী।

ইবনে জাওজী, ইমাম আহমদের বর্ণনাও এভাবেই উদ্ধৃত করেছেন। আমি ইবনে আবী আউফাকে জিজ্ঞেস করলাম, রসুল স. এর যুগে আপনারা কি গম, যব এবং জয়তুন বায় সলম করতেন? ইবনে আবী আউফা বললেন, হ্যাঁ। আমরা তখন গণিমতের মাল পেতাম, তাই দিয়ে খোরমা, জয়তুন, যব ইত্যাদি কিনতাম। আমি বললাম, কার কাছ থেকে কিনতেন? তিনি বললেন, যে চাষাবাদ করে এবং যে করে না সকলের কাছ থেকে (আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম না যে, তোমরা কৃষি কাজ করো কি না)। এরপরে বর্ণনাকারী ইবনে আবী আবজীর কাছে গিয়ে একই কথা জিজ্ঞেস করলে তিনিও একই উত্তর দিলেন।

বিক্রয়ের বস্তু বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতার হাতে তুলে দিতে হয় না — এ অবস্থার নামই সলম। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেছেন, সাথে সাথে তুলে দিলে বায় সলম বিশুদ্ধ হবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হবে। কেননা দেরীতে দিলেও যদি দুরস্ত হয় তবে সাথে সাথে দিলেও হবে।

আমরা বলি, দরিদ্র মানুষের উপকারার্থেই সলম বৈধ করা হয়েছে। বিক্রয়মূল্য আগে পেলে তার অভাব মোচন হবে। পণ্য পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময়ের অবকাশও সে পাবে। হাতে হাতে নগদে নগদে বেচাকেনার ক্ষেত্রে এ রকম সুযোগ নেই। দরিদ্র ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে অসহায়।

<u>মাসআলা</u> ঃ বায় সলম জায়েযের ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্য এই যে, বিক্রিত বস্তুর প্রকার, অবস্থা, পরিমাণ, আদায়ের স্থান, আদায়ের সময় সব কিছুর স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে বাদানুবাদের অবকাশ না থাকে। মূল্যের উল্লেখও জরুরী।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বায় সলম বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত সাতটি। পণ্যপ্রদানের স্থান উল্লেখ থাকতে হবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মূল্য প্রদানের স্থানই পণ্য প্রদানের স্থান। ইমাম আজমের নিকট অষ্টম শর্তটি এই যে, মূল্য গ্রহণের সময় থেকে আদায়ের সময় পর্যন্ত বিক্রয়ের বস্তু বাজারে অথবা শহরে মওজুদ থাকতে হবে। জমহুরের নিকট এই শর্ত জরুরী নয়। আদায়ের সময় বিক্রয়ের বস্তু (বাজারে অথবা শহরে) সহজে পেয়ে যাওয়াই যথেষ্ট হবে (বিক্রয়কারীর কাছে আপন জমির ফসল না থাকলে অন্য স্থান থেকে কিনে এনে দিতে হবে)। কেননা আপন জমির ফসল দেয়ার শর্ত শরিয়ত নির্ধারণ করে দেয়নি।

ইমাম আবু হানিফার দলিল ওই হাদিসটি যা আবু দাউদ এবং ইবনে মাজা ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এক নাজরানী ব্যক্তি এর বর্ণনাকারী। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, গাছে খেজুরের কলি আসার আগেই আমি খোরমার বায় সলম করি। তিনি বললেন, এ রকম কোর না। আমি বললাম, কেনো? তিনি বললেন, রসুল স. এর যুগে এক ব্যক্তি এরকম করেছিলো। কিন্তু ওই বৎসর খেজুরের গাছগুলোতে কোনো কলি আসেনি। তখন ক্রেতা বললো, আগামী বৎসর অথবা তার পরের বৎসর ফল এলে আমি আমার পাওনা উসুল করে নিবো। বিক্রেতা বললো, ঠিক আছে। কিন্তু ফল না এলে তোমার পাওনা বাতিল হয়ে যাবে। বচসা শুরু হলো। দুজনই তখন উপস্থিত হলেন রসুল স. এর দরবারে। তিনি স. বিক্রেতাকে বললেন, সে কি তোমার গাছ থেকে তার পাওনা নিয়ে নিয়েছে? বিক্রেতা বললেন, না। তিনি স. বললেন, তবে তুমি তার মালকে হালাল মনে করছো কেনো? মূল্য ফিরিয়ে দাও। এরপর গাছে ফল না আসা পর্যন্ত আর কখনো বায় সলম কোর না।

বোখারী, হজরত আবুল বোখতরী থেকে লিখেছেন, আমি হজরত ইবনে ওমরকে বায় সলম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, খেজুরের ফুল বের হওয়ার সময় বেচাকেনা কোর না। ফল পরিণত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। এরপর আমি হজরত ইবনে আব্বাসের নিকট এই ব্যাপারটি জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, রসুল স. খেজুর বৃক্ষের ফুল প্রকাশের প্রাক্কালে বেচাকেনা নিষেধ করেছেন। খাওয়ার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছেন।

আমি বলি, হাদিসটি দুর্বল। কারণ নাজরানী ব্যক্তিটি অখ্যাত। এবং ইবনে ইসহাকের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারেও অনৈক্য আছে। এ ধরনের বর্ণনাকে দলিল হিসাবে পেশ করা যায় না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার উক্তিটি ছিলো সম্ভাবনা নির্ভর। কেননা এখানে সলমের স্বীকারোক্তিটি জায়েয কিয়াসের অনুকূল হয়নি। এক্ষেত্রে সম্ভাবনা আরো বেশী শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন ছিলো।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ আলেমদের ঐকমত্য এই যে, যন্ত্রের সাহায্যে অথবা গজ দিয়ে মেপে কিংবা ওজন করে যদি বায় সলম করা হয় তবে দুরস্ত হবে। কাপড় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ প্রস্থের উল্লেখ থাকতে হবে। যে সমস্ত বস্তু গণনা করে বিক্রয় করা হয়, তাদের প্রকারে কোনো পার্থক্য না থাকলে (অথবা পার্থক্য ধর্তব্য না হলে) বায় সলম দুরস্ত হবে। যেমন, আখরোট, ডিম ইত্যাদি। ইমাম আহমদের এক দুর্বল বর্ণনায় জায়েযের যোগসূত্র পাওয়া যায়। পার্থক্যপ্রবণ বস্তু যেমন, খরবুজা, তরমুজ, আনার ইত্যাদির সলম ইমাম আজমের মতে দুরস্ত নয়। গণনা, পরিমাণ ও ওজন—কোনোপ্রকারেই দুরস্ত নয়। এই হুকুম ওই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে এ সমস্তের বিক্রয় গণনার মাধ্যমে করা হয়। এ সমস্তের বিক্রয় ওজনের মাধ্যমে হলে বায় সলম দুরস্ত হবে। ইমাম মালেকের মতে পরিমাণ, গণনা এবং ওজনের পার্থক্য থাকলেও বায় সলম জায়েয। ইমাম শাফেয়ীর মতে কেবল ওজনের মাধ্যমেই জায়েয। ইমাম আহমদের বর্ণনাও এ রকম।

মাসআলা ঃ ইমাম আজমের মতে প্রাণীর বায় সলম দুরস্ত নেই। অন্যান্য তিন ইমামের মতে দুরস্ত আছে। হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রসুল স. হজরত আবদুল্লাহকে সৈন্য প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু উটের সংখ্যা ছিলো খুবই কম (সৈন্যদের জন্য যথেষ্ট নয়)। রসুল স. বললেন, জাকাতের উট আমদানী হওয়ার সময়ে পরিশোধের শর্তে উট সংগ্রহ করো। হজরত আবদুল্লাহ এক উটের পরিবর্তে দুইটি উট দেয়ার শর্তে উট সংগ্রহ শুরু করলেন। এই হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ। সনদ এ রকম — মোহাম্মদ বিন ইসহাক,ইয়াজিদ বিন আবী হাবীব, মুসলিম বিন জুবাইর, আবু সুফিয়ান, আমর বিন হারেস, আবদুল্লাহ বিন আমর। হাকেমও এই হাদিস উদ্ধৃত করেছেন। মুসলিম একে সহীহ্ বলেছেন। ইবনে কাত্তান বলেছেন, এই হাদিসের সনদ এলোমেলো। আগের বর্ণনাকারীকে পরে এবং পরের বর্ণনাকারীকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের হাদিসকে মুজতাবের বলা হয়।

হাম্মাদ বিন সালমাও উল্লিখিত সনদের সাথে রয়েছেন। কিন্তু জারীর বিন হাজেমের বর্ণনায় ইয়াজিদ বিন আবী হাবীবের উল্লেখ নেই। আবার আবু সুফিয়ানের আগে মুসলিম বিন জুবাইরের উল্লেখ করা হয়েছে। আমি বলি, ইবনে জাওজীও গুরুত্ব সহকারে এরকম বর্ণনা করেছেন। আফফান তার বর্ণনায় হাম্মাদ বিন সালমাকে এই সনদের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন — ইবনে ইসহাক, ইয়াজিদ, আবু হাবীব, মুসলিম, আবু সুফিয়ান, আমর বিন হারেস। ইয়াজিদ থেকে আবু হাবীব এবং আবু হাবীব থেকে মুসলিম। আবু বকর বিন আবী শাইবা আবদুল আলার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এই বর্ণনায় ইয়াজীদ বিন আবী হাবীবের উল্লেখ

www.eelm.weebly.com

নেই। আবু সুফিয়ানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে মুসলিমের আগে। মুসলিমের পিতা জুবাইর নন। আর আমর বিন হারিশ অখ্যাত এবং মুসলিম বিন জুবাইরের উল্লেখ আমি কোথাও পাইনি। আবু সুফিয়ানের অবস্থাও সন্দেহাতীত নয়। শায়েখ ইবনে হাজার, ইবনে ইসহাকের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলেছেন। বায়হাকী এই হাদিসকে সনদসহ আমর বিন শোয়াইব থেকে এবং শোয়াইব তার দাদা থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ বলেছেন। আমি বলি, ইবনে জাওজীও এই সিলসিলাকে উপস্থাপন করেছেন। এই হাদিস পূর্ববর্তী হাদিসের বিপরীত। হজরত সামুরা, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. জানোয়ারকে জানোয়ারের পরিবর্তে বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন। তাই নিয়মানুযায়ী হারাম ঘোষণাকারী হাদিসকে হালালকারী হাদিসের উপরে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জানোয়ারের বায় সলম অবৈধ। হাকেম এবং দারা কুতনী বর্ণনা করেন, ইসহাক বিন ইব্রাহিম বিন হুতাহ, আবদুল মালেক জিমারী, সুফিয়ান সওরী, মুয়াম্মার ইয়াহিয়া বিন আবী কাসীর,ইকরামা বিন আব্বাস সূত্রে এসেছে, রসুল স. জানোয়ারের বায় সলম নিষেধ করেছেন। হাকেম এই সনদকে সহীহ্ বলেছেন। অন্যদিকে ইবনে জাওজী, আবু জারআর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, আবদুল মালেক জামারী বর্ণনাকারী হিসাবে অত্যধিক দূর্বল। রাজী বলেছেন, এর সনদ শক্তিশালী নয়। কিন্তু হাল্লাস বলেছেন শক্তিশালী। আমি বলি, সম্ভবত হাকেম ইসহাক সম্বন্ধে জানতেন। এজন্য তিনি তার বর্ণনাকে সহীহ্ বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই হাদিসটি হাসান। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, ইয়াহিয়া বিন মুঈন, ইবনে হুতাকে সন্দেহবশতঃ দূর্বল বলেছেন। নতুবা তার বর্ণিত সহীহ্ এবং হাসান হাদিসসমূহ পৃথক পৃথক ভাবে সত্য বলে গণ্য হয়েছে। একই হাদিস পৃথক পৃথক সূত্রে বর্ণিত হলে তা দলিল হিসাবে গৃহীত হয়। ইমাম আবু হানিফা তার মতের সমর্থনে হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদিসকে গ্রহণ করেছেন যাতে বলা হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ, জায়েদ বিন খোয়াইলাকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন। জায়েদ আরীস বিন এরকুব শাইবানী থেকে কিছু উটনী সলম রূপে খরিদ করেছিলেন। উটনী হস্তান্তরের সময় এলে জায়েদ কিছু উটনী গ্রহণ করলেন আর কিছু বাকী রয়ে গেলো। আরিস ছিলেন অপারগ। এদিকে সংবাদ পাওয়া গেলো যে, আসল মাল হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের। তখন তিনি হাজির হলেন রসুলর স. এর খেদমতে। ব্যাপারটা তাঁকে জানালেন। তিনি স. বললেন, কে এমন করেছে? জায়েদ? আরিস বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. জায়েদকে ডেকে বললেন, আসল মাল নিয়ে অতিরিক্তগুলো ফেরত দিয়ে দাও। কখনো জানোয়ারকে সলম ক্রয় কোর না।

www.eelm.weebly.com

সাহেবুত্ তানকীহ্ লিখেছেন, এই হাদিসের সনদে ধারাবাহিকতা নেই। ইবনে হুমাম লিখেছেন, এতে কোনো দোষ নেই। আমি বলি, হাদিসটি সহীহ্। কারণ জানোয়ারের বায়ে সলম রসুলে পাক স. নিষেধ করেছেন। ইমাম আবু হানিফাও বলেছেন, জানোয়ারকে কর্জ দেয়া দুরস্ত নয়। অন্যদিকে ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ বলেছেন দুরস্ত আছে। তাঁরা দলিল হিসাবে এই হাদিসটি পেশ করেছেন, রসুল স. এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক উট কর্জ নিয়েছিলেন। পরে তার কাছে উট এসে গেলে বললেন, একটি উট ওই ব্যক্তিকে দিয়ে দাও। সাহাবীগণ আরজ করলেন, আমাদের কাছে তো মাত্র চার বৎসর বয়স্ক ভালো উট আছে (কিন্তু তার কাছ থেকে কর্জ নেয়া হয়েছিলো একটি পূর্ণবয়স্ক উট)। রসুল স. বললেন, তাই দিয়ে দাও। উত্তম ওই ব্যক্তি যে উত্তমরূপে কর্জ পরিশোধ করে। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তির নিকট রসুলে পাক স. এর কিছু কর্জ ছিলো। সে রসুল স. এর সঙ্গে কর্কশ ব্যবহার শুরু করলে সাহাবীগণ উত্তেজিত হলেন। রসুল স. বললেন, পাওনাদারকে কিছু বলা ঠিক নয়। তাকে এক বৎসরের একটি উট কিনে নিয়ে দিয়ে দাও। সাহাবীগণ আরজ করলেন, আমাদের কাছেতো তার উট থেকেও ভালো উট আছে। তিনি স. বললেন, তাই দাও। ওই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমরূপে কর্জ পরিশোধকারী। বোখারী।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, জানোয়ারের গুণগত বিবরণ নির্দিষ্ট না হওয়ায় এধরনের কর্জ দুরস্ত নেই। কিন্তু উল্লেখিত দুইটি সহীহ্ হাদিসের মোকাবেলায় ইমাম আজমের মতটি নিছক অনুমান (কিয়াস) যা অগ্রহণীয় — যতোক্ষণ পর্যন্ত জানোয়ারের সলম বেচাকেনার হাদিস সহীহ্ বলে প্রমাণিত না হয়। সহীহ্ প্রমাণিত হলে সলম করা এবং কর্জ দেয়া দুটোই না জায়েয হয়ে যাবে। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে সলম ও কর্জ দুটোই সামিল আছে। জানোয়ারের কর্জ বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে উপরে যে হাদিসটি বলা হয়েছে তাতে কেবল উট কর্জ নেয়ার কথা পাওয়া যায়। কিন্তু উট বাদে অন্যান্য জানোয়ারের কথা এতে বলা হয়নি। সুতরাং অন্যান্য জানোয়ারের প্রসঙ্গ অবৈধই থেকে যাবে।

দিয়তের প্রসঙ্গটি আবার অন্যরকম (হত্যার বিনিময়কে দিয়ত বলে)। এক্ষেত্রে বায় সলম জায়েয। কারণ, উট দ্বারা দিয়ত প্রদান করাই শরিয়তের নির্দেশ। আমরা বলি, মালের বিনিময়ে মালের ক্ষেত্রে মালের গুণগত পার্থক্য নির্দেশ বলবৎ থাকতে হবে। যেমন, কেনাবেচা এবং ইজারা — এরা একে অপরের সাথে সন্ধি করেছে। কিন্তু যেখানে মালের বিনিময়ে মাল না হয় যেমন, বিবাহ, খোলা, রক্তপনের বিনিময়ে সন্ধি — এ সমস্ত অবস্থায় মালের গুণগত পরিমাণ নির্ধারণ করা জরুরী নয়।

www.eelm.weebly.com

আলেমদের ঐকমত্য এই যে, স্বাধীনা গর্ভবতী নারী গর্ভপাত ঘটালে তার দিয়ত হচ্ছে একটি গোলাম অথবা একটি বাঁদী। গর্ভবতী ক্রীতদাসী গর্ভপাত ঘটালে তার দিয়ত কিন্তু গোলাম বা বাঁদী নয় — নগদ অর্থ। ইমাম আবু হানিফার মতে গর্ভপাতকৃত শিশু ছেলে হলে দশ ভাগের একভাগ এবং মেয়ে হলে বিশ ভাগের একভাগ দিয়ত নির্ধারিত হবে। অন্যান্য আলেমদের মতে দিয়ত নির্ধারিত হবে গর্ভপাতকারিণী কৃতদাসীর মূল্যের দশভাগের একভাগ। আর জানোয়ারের বাচ্চার গর্ভপাত ঘটালে তার দিয়ত হবে, গর্ভপাতের কারণে ওই জানোয়ারের মূল্য যতটুকু কমে গিয়েছে ততটুকু।

মালের বিনিময়ে মালের ক্ষেত্রে বিবাদ-বিসংবাদ, পরিশোধে বাহানা ইত্যাদির সুযোগ বেশী। এক্ষেত্রে মাল নয় বরং পরিশোধের ব্যাপারটিই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। উটের কর্জ এবং বায় সলম জায়েয হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, উটের মূল্যমানের পার্থক্য নিতান্তই কম, যা ধর্তব্য বলে গণ্য হয় না।

কর্জের ব্যাপারটি এ রকম — এক পক্ষ থেকে নগদ টাকা দেয়া হবে, অন্য পক্ষ নির্ধারিত সময়ের পর ওই পরিমাণ টাকা ফিরিয়ে দিবে। অথবা কোনো বস্তু দিলে কিছুকাল পরে ঐ প্রকারের বস্তু ফিরিয়ে নিবে। এ রকম অবস্থায় সুদের আশংকা বিদ্যমান। কারণ, টাকা ও বস্তুর মূল্যমানে হ্রাসবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে এ ধরনের লেনদেনকে শরিয়ত বৈধ করে দিয়েছে। এই বৈধতার উপর এজমাও হয়েছে। আলেমগণ কর্জের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ রকম — ঋণ গ্রহণকারী টাকা পয়সা এবং আহার্য বস্তু ঋণ নিয়ে ব্যবহার করলে অথবা খরচ করে ফেললে অবিকল ওই বস্তু ফিরিয়ে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। পরিশোধের সময় সমমূল্যের এবং সমপরিমাণের অন্য টাকা ও আহার্য বস্তু দিলেও কোনো ক্ষতি নেই। শরিয়ত এ রকম অনুমতি দিয়েছে। যে ক্ষেত্রে ধার নেয়া বস্তু অবিকল ফিরিয়ে দেয়া জরুরী হয়, সেক্ষেত্রে কর্জ দেয়া জায়েয নয়। যেমন, বাঁদী, গোলাম, কাপড়, আসবাবপত্র, জানোয়ার ইত্যাদি। ইমামে আজম এরকমই বলেছেন। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কাউকে আপন বাঁদী কর্জ দেয়া নাজায়েয।

মাসআলা ঃ পূর্ব সম্পর্ক ছাড়াই যদি ঋণগ্রহণকারী ঋণদাতাকে কিছু উপঢৌকন দেয়, বাহন ব্যবহার করতে দেয়, বাড়িতে থাকতে দেয়, গৃহীত কর্জ অপেক্ষা অতিরিক্ত প্রদান করে অথবা যা নেয় তার চেয়ে উত্তম বস্তু দিয়ে দেয় তবে তা গ্রহণ করা ঋণগ্রহীতার জন্য বৈধ হবে কিনা — এ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ বলেন, জায়েয নয়।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, বিনা শর্তে দিলে জায়েয।

www.eelm.weebly.com

আইম্মায়ে সালাসা (ইমামত্রয়-ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল) হজরত আনাসের হাদিস থেকে এই দলিলটি উপস্থাপন করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কর্জগ্রহীতা কর্জদাতাকে হাদিয়া দিলে সে যেনো গ্রহণ না করে তার সওয়ারীতে ভ্রমণ করাতে চাইলে সে যেনো ভ্রমণ না করে। তবে পূর্বসম্পর্ক থাকলে এ রকম করাতে দোষ নেই। ইবনে মাজা।

সালেম বিন আবী জু'দ রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হজরত ইবনে আব্বাস কে বললো, আমি একজনকে বিশ দেরহাম মূল্যের গালিচা কর্জ দিয়েছিলাম। এরপর সে আমাকে হাদিয়া হিসাবে একটি মাছ দিলো, যার মূল্য তের দেরহাম। হজরত আব্বাস বললেন, তুমি তার নিকট থেকে সাত দেরহাম নিও। ইবনে জাওজী।

হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম বলেন, তোমাদের নিকট কর্জ গ্রহণকারী তোমাদেরকে পোশাক, আঞ্জির, যব ইত্যাদি দিতে চাইলে নিও না। কারণ তা সুদ। বোখারী।

হজরত আলী বর্ণনা করেন, রসুল স. ওই ধরনের কর্জ দিতে নিষেধ করেছেন যাতে স্বার্থ রয়েছে।

বায়হাকী আল মারেফা'র মধ্যে ফোজালা বিন উবাইদের বর্ণনা থেকে এই হাদিসটি উপস্থাপন করেছেন, কর্জের সাথে অতিরিক্ত লাভ গ্রহণ করা একপ্রকার সুদ।

ইমাম শাফেয়ী হজরত আবু রাফে এবং হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিসকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সাহাবীগণ আরজ করলেন, পরিশোধের জন্য আমাদের এই উটনী কর্জ হিসাবে গ্রহণ করা উটনী থেকে উত্তম। রসুল স. বললেন, তাই দাও। তোমাদের মধ্যে উত্তম ওই ব্যক্তি যে ঋণ পরিশোধ করে উত্তমরূপে। জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. কে বললাম, কিছু খামীর অথবা রুটি প্রতিবেশীরা পরস্পরকে কর্জ দেয় এবং গ্রহণ করার বেলায় কমবেশী গ্রহণ করে। রসুল স. এরশাদ করলেন, এতে কোনো দোষ নেই। উত্তম আচরণ ব্যতীত এতে অন্য কিছু নেই।

হজরত মুআজ বিন জাবালের কাছে খামীর এবং রুটি কর্জ দেয়া নেয়ার নিয়ম জানতে চাইলে তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! এটা তো অতি উত্তম আচরণ। কম নিয়ে বেশী দেয়া এবং বেশী নিয়ে কম দেয়ায় ক্ষতি নেই। তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি উত্তম যে পরিশোধের বেলায় উত্তম। আমি রসুল স. এর কাছে এ রকমই শুনেছি। ইবনে জাওজী।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, কর্জ লেনদেন ওজনের মাধ্যমে হওয়া উচিত। কেউ কেউ বলেন গণনার মাধ্যমে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

www.eelm.weebly.com

ঋণ লেনদেনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার হুকুমটি ঐচ্ছিক। ওয়াজিব নয়। এই হুকুমটি ওই আয়াতে উল্লেখিত হুকুমের মতো যেখানে বলা হয়েছে, যখন নামাজ শেষ হয় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো।

কোনো কোনো আলেম বলেন, লিপিবদ্ধ করার হুকুমটি ওয়াজিব। শা'বী বলেন, ঋণ লেনদেনের বিষয় সাক্ষীদের সাক্ষ্যসহ লিখে রাখা ফরজ। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে এ রকম বলা হয়েছে, 'তোমরা একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেনো আমানত প্রত্যর্পণ করে।' — এতে বোঝা যায় লিপিবদ্ধ করার আবশ্যকতা রহিত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ওয়াজিব মনসুখ হয়ে গিয়েছে। আমি বলি, পরে অবতীর্ণ আয়াত দ্বারা পূর্বে অবতীর্ণ আয়াত মনসুখ হয়। কিন্তু এখানে তা হয়নি। দু'টি আয়াতই অবতীর্ণ হয়েছে এক সাথে। এতে বোঝা যায় লিপিবদ্ধ করার হুকুমটি ঐচ্ছিক।

লেখককে হতে হবে ন্যায়পরায়ণ। দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে তাকে। তাই নিয়ম হচ্ছে, লেখার কাজে নিয়োগ করতে হবে ধর্মভীরু এবং ন্যায়বান লেখককে। আর লেখকের উচিত যেনো লিখতে অস্বীকৃত না হয়। আল্লাহতায়ালা যেমন তাকে অনুগ্রহ করে লিখতে শিখিয়েছেন, তাই সে আল্লাহতায়ালার বান্দাদের প্রতিও অনুগ্রহশীল হবে। এটাই কাম্য। অন্যত্র আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'আল্লাহ যেমন তোমাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন, তোমরাও মানুষের সাথে তেমনই করো।'

লেখকের উপর লেখা এবং সাক্ষীদের উপর সাক্ষ্য দেয়া ওয়াজিব কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। মুজাহিদ বলেন, ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো, লেখক ও সাক্ষীকে ডাকতে হবে। হাসান বসরীও ওয়াজিব বলেন। তবে প্রয়োজন মতো। অর্থাৎ নির্বাচিত হওয়ার পর লেখকের উপর ওয়াজিব। জুহাক বলেন, লেখার জন্য লেখককে এবং সাক্ষ্য দেয়ার জন্য সাক্ষীকে নির্ধারণ করার পর তাদের উপর লেখা ও সাক্ষ্যদান করা ওয়াজিব। কিন্তু বলা হয়েছে, 'লেখক এবং সাক্ষী যেনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।' সুতরাং ব্যাপারটির ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

লেখককে বলা হয়েছে সে যেনো আল্লাহ্কে ভয় করে। এবং প্রকৃত বিষয় অবিকৃতভাবে লিপিবদ্ধ করে। আর লিপিবদ্ধ করাবে ওই ব্যক্তি যে দাবীদার। তার দাবী হবে কর্জগ্রহণকারীর সম্মতিসাপেক্ষ। দাবীদার অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বৃদ্ধ অথবা উন্মাদ হলে তার পক্ষে তার অভিভাবক লিপিবদ্ধ করাবার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আয়াতে 'দুর্বল' বলতে স্বল্পস্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। কর্জ দাতা বোবা, বন্দী, ব্যাধিগ্রস্ত হলে তাঁর পক্ষে অভিভাবক কিংবা উকিল নিযুক্ত করতে হবে। পর্দানশীন মহিলার প্রতিও একই হুকুম। মানুষের স্মৃতিশক্তি সব সময়

www.eelm.weebly.com

নির্ভরশীল অবস্থায় থাকে না। লিপিবদ্ধ করাতে তাই দাতা গ্রহীতা উভয়েই ভুল ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে পারে। মূল্য, বিবরণ, পরিমাণ, আদান প্রদানের সময়, বায় সলম — সবকিছুই যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, যাতে স্মৃতি প্রতারক হয়ে না দাঁড়াতে পারে।

সাক্ষ্যদাতা স্বাধীন, মুসলমান, পুরুষ, জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া প্রয়োজন। অপ্রাপ্তবয়স্কদের জ্ঞান অপরিণত। পাগল জ্ঞানহীন। তাই ঐকমত্য এই যে, এদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কৃতদাসের সাক্ষ্যও অগ্রহণীয়। ইমাম আহমদ বলেছেন, গ্রহণীয়। হজরত আনাস বিন মালেক এ রকমই মত প্রকাশ করেছেন। ইসাহাক এবং দাউদ জাহেরীও এরকম বলেছেন। বোখারী।

হজরত আনাস বলেছেন, গোলামের সাক্ষ্য জায়েয। তবে শর্ত হলো, সে যেনো ফাসেক না হয়। এছাড়া জায়েযের পক্ষে আরো রয়েছেন শোরাইহ এবং জুরারাহ্। ইবনে শিরিন বলেছেন, গোলামের সাক্ষ্য জায়েয। কিন্তু মনিবের পক্ষে হলে জায়েয নয়। হাসান ও ইব্রাহিম মনিবের পক্ষে হলেও জায়েয বলেছেন। শোরাইহ্ বলেছেন, তোমরা তো সবাই গোলাম ও বাঁদীর সন্তান। বোখারী।

কাফেরের সাক্ষ্য জায়েয নয়। কাফেরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেও। ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এই মত ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'কাফেরেরা সবাই জালেম।'

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কাফেরের বিরুদ্ধে কাফেরের সাক্ষ্য জায়েয। যদিও তাদের ধর্মমত পৃথক হয়। কেননা জিম্মি কাফের অভিভাবক হওয়ার যোগ্য (ইসলামী রাষ্ট্রে জিজিয়া কর দিয়ে যে কাফের স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাকে বলে জিম্মি)। জিম্মিকে তাদের সম্প্রদায়ের অপ্রাপ্ত বয়স্কদের অভিভাবক হিসাবে মানা যায়। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'তারা একে অপরের বন্ধু।' এজন্য এক ধর্মের কাফেরের সাক্ষ্য অন্য ধর্মের কাফেরের বিরুদ্ধে দুরস্ত আছে। তারা তাদের আপন সম্পদের মালিক। প্রকৃতপক্ষে কাফেররা কাফেরই। ফাসেকরা ফাসেক। কিন্তু তারা আল্লাহাতায়ালার হুকুমের বাইরে। আল্লাহ এবং তাঁর হুকুমে তাদের আস্থা নেই, কিন্তু তাদের ধারণায় কুফরই ধর্ম। মিথ্যা বলা তাদের ধর্মেও হারাম।

ইবনে আবী লায়লা এবং আবু ওবায়দা বলেন, এক ধর্মের কাফেরের সাক্ষ্য অন্য ধর্মে কাফেরের বিরুদ্ধে গ্রহণীয় নয়। যেমন ইহুদীর সাক্ষ্য খৃষ্টানের বিরুদ্ধে। বায়যাবী লিখেছেন, 'মিররিজালিকুম' শব্দটি ইসলামের শর্তকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমি বলি, এই আয়াত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে। তাই সাক্ষীদের মুসলমান হওয়া জরুরী। আর যার উপর দাবী করা হয় সেও যেনো মুসলমান হয়। ইবনে জাওজী বলেন, মুসলমান ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বীর সাক্ষ্য অন্য কোনো

www.eelm.weebly.com

ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ নয়। ইবনে জাওজীর দলিল হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিসটি। তিনি বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, এক ধর্মের উত্তরাধিকার অন্য ধর্মে বলবৎ হয় না। এবং আমার উম্মত ছাড়া অন্য কেউ অন্য কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে বৈধ নয়। তবে আমার উম্মতের সাক্ষ্য অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বৈধ। দারা কুতনী, ইবনে আদী। এই হাদিস ইবনে আবী লায়লারও পক্ষে। কিন্তু ইমাম আহমদের বিপক্ষে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, সমস্ত কাফেরই প্রকৃতপক্ষে একধর্মভূত। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'অতঃপর তাদের মধ্যে যারা ইমানদার এবং তাদের মধ্যে যারা কাফের' — বোঝা যাচ্ছে, দল মোটে দু'টি। মুমিনদের দল এবং কাফেরদের দল। এই ধারণার প্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানিফার মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখিত হাদিসের সনদভুক্ত এক রাবীর নাম ওমর বিন রাশেদ, দারাকুতনী যাকে জয়ীফ বলেছেন। অপরদিকে ইমাম আবু হানিফা আশ্রয় করেছেন হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসটিকে, যেখানে বলা হয়েছে রসুল স. আহলে কিতাবদের এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়াকে বৈধ করে দিয়েছেন। ইবনে মাজা।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় এসেছে — এক ইহুদী পুরুষ ও একজন ইহুদী নারীকে রসুল স. এর দরবারে হাজির করা হলো। এ দু'জন ছিলো ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী। রসুল স. ইহুদীদেরকে বললেন, এদু'জন আমাদের ধর্মের হলে শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি দেয়া হতো। কিন্তু আমরা অপারগ। তোমরা বরং তোমাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠ দু'জন আলেমকে নিয়ে এসো। ইহুদীরা সুরিয়ার দুই ছেলেকে নিয়ে এলো। তিনি স. বললেন, তোমরা কি তোমাদের সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় আলেম? তারা বললো, লোকেরা এরকমই বলে। রসুল স. বললেন, আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি যিনি মুসা আ. এর উপর তওরাত অবতীর্ণ করেছেন। তোমরা বলো, তওরাতে কী শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে? তারা বললো, চারজন লোক যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তারা কোনো পুরুষকে স্ত্রীলোকের ভিতর এভাবে প্রবেশ করতে দেখে যেমন সুরমাদানীর মধ্যে সুরমাদন্ড প্রবেশ করানো হয়, তবে তাদেরকে সঙ্গেসার করতে হবে (কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতে হবে)। রসুল স. এরশাদ করলেন, সাক্ষী উপস্থিত করো। চারজন সাক্ষ্য দিলো। রসুল স. সঙ্গেসারের আদেশ দিলেন। আবু দাউদ, ইসহাক বিন রহ্ওয়াইহ্, আবুল ইয়ালী আল মুসলী, আল বায্যার, দারা কুতনী। তাহাবীর বর্ণনায় শব্দগুলো রয়েছে এরকম, তোমাদের মধ্য থেকে চারজনকে আমার কাছে নিয়ে এসো, যারা সাক্ষ্য দেবে। এই হাদিস দু'টি সনদের দিক দিয়ে অবশ্য দুর্বল। দু'টি হাদিসেরই বর্ণনাকারী হিসেবে রয়েছে মুজালিদ বিন সাঈদ। যার সম্পর্কে

www.eelm.weebly.com

ইমাম আহমদ বলেছেন, সে কিছুই ছিলো না। ইয়াহিয়া র. বলেছেন, তার বর্ণিত হাদিস দলিল হিসেবে পেশ করা যায় না।

সাক্ষী হতে হবে দু'জন। দু'জনই পুরুষ। পুরুষ দু'জন না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। অর্থাৎ একজন পুরুষের সাক্ষ্য দু'জন মহিলার সাক্ষ্যের সমান। তবে মহিলাদের সাক্ষ্য না নেয়াই উত্তম। বরং ঐকমত্য এই যে, মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। রসুল স. এর পরে প্রথম দু'জন খলিফার আমল এরকমই ছিলো। অর্থাৎ হুদুদ ও কেসাসে মহিলাদের সাক্ষ্য জায়েয ছিলো না (সঙ্গেসারকে হদ এবং খুনের বদলে খুনকে কেসাস বলে)। জুহুরী এই হাদিসটি ইবনে আবী শাইবা, হাফস্ ইজাজ থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি মুরসাল। আর মুরসাল হাদিস আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের কথা এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাদের সময়ে শরিয়তের বেশীর ভাগ নিয়ম কানুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাহাবীদের এজমাও হয়েছে। পরবর্তীতে হয়েছে অনেক কম। রসুল স. এরশাদ করেন, তোমরা এই দু'জনের অনুসরণ করো, কারণ তারা আমার পরে খলিফা হবে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত হুজায়ফা। তিরমিজি।

ইবনে হাজার লিখেছেন, ইবনে আবী শাইবার বর্ণনাসূত্রে ইমাম মালেক, হজরত আকীল জুহুরীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এই বর্ণনায় এই কথা কয়টি অতিরিক্ত আছে, হুদুদ ও কেসাসে মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয নয়। বিবাহ এবং তালাকেও জায়েয নয়। কিন্তু ইমাম মালেকের এই হাদিস সহীহ্র পর্যায়ে পৌঁছেনি। ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেকের অনুসরণে বলেন, কেবল পণ্যবিনিময়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয। যেমন ইজারা, খিয়ার (যে বেচাকেনায় শর্ত থাকে তাকে খিয়ার বলে)। শোফা (অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট বাড়ি বা জমি বিক্রয়ের পর বিক্রেতার অংশীদার অথবা প্রতিবেশী যথামূল্য পরিশোধ করে মালিক হওয়ার যে অধিকার পায় তাকে শোফা বলে)। ভুলক্রমে হত্যা, ওই প্রকারের অপরাধ যাতে জরিমানা দিতে হয় — এ সমস্ত কাজে মেয়েদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। বিবাহ, তালাক, উকিল, ওসিয়ত, গোলাম আজাদ করা, তালাক থেকে ফিরে আসা, বংশনির্ণয় — এসব কাজেও গ্রহণীয় নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, কেসাস ও হুদুদ ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে রমণীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক বলেছেন, দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এবং দুজন রমণীর সাক্ষ্য একটি সম্মিলিত সংবাদ — এতে ভুলের সম্ভাবনা আছে। এর দ্বারা দাবীদারের দাবী নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নাও হতে পারে। সাক্ষীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে দাবীদার তা মানতে বাধ্য নয়। কিন্তু যেহেতু কোরআন দ্বারা এবং কোরআনের সমর্থনে সাক্ষী নির্ধারিত হয়, তাই তাদেরকে মেনে নিতে হয়। এজন্য নারীর সাক্ষ্য ওই সমস্ত ক্ষেত্রে জায়েয, যে সমস্তের উল্লেখ কোরআনে রয়েছে (অর্থাৎ পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে)। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

'এবং সাক্ষ্য দিবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি।' রসুল স. বলেছেন, অভিভাবক এবং ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ সম্পন্ন হতে পারেনা।

জ্ঞাতব্য ঃ বিবাহের প্রচার করা জরুরী। আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে এব্যাপারে। তারা বলেন, দু'জন পুরুষ সাক্ষ্যদাতার মাধ্যমেই একাজ সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু ইমাম মালেক একথা মেনে নেননি। তাঁর মতে প্রচার শর্ত নয়। কারণ আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'তোমরা যাকে পছন্দ করো, বিবাহ করো।' অন্যত্র বলেছেন, 'আর ওই নারী ব্যতীত অন্যান্য নারীগণ তোমাদের জন্য হালাল।' প্রচারের শর্ত এগুলোতে নেই।

ইমাম আহমদ বলেন, বিবাহের সাক্ষী জরুরী — একথা কোনো বর্ণনায় নেই। ইবনে মুনজিরও একথা বলেন।

আমি বলি, সহীহ্ হাদিসে রয়েছে, তোমরা বিবাহের প্রচার করো। ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান, তিবরাণী।

মুস্তাদরেকে হাকেম এবং হুলিয়ায় আবু নাঈম হজরত ইবনে জুবায়ের থেকে এবং তিরমিজি জননী আয়েশার মাধ্যমে এরকম হাদিস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাদিসে প্রচারের সীমারেখা বেঁধে দেয়া হয়নি। ক'জনের নিকট প্রচার — দু'দশ জন কিংবা হাজার লক্ষ অথবা সমস্ত পৃথিবীবাসীর নিকট প্রচার, এরকম সীমানির্ধারিত নেই বলে ইমাম আবু হানিফা কমপক্ষে দু'জন সাক্ষ্যদাতা জানলেই তাকে প্রচার বলে ধরে নিতে বলেছেন। দু'জন জানার পর বিষয়টি আর গোপন থাকে না। কারখী বলেন, কিছু মানুষের মজলিশে বিবাহ হলে সাক্ষ্যদানের বিষয়টি আর জরুরী থাকে না। কারণ, প্রচারের কাজটি এতেই সমাধা হয়ে যায়। ইমাম মালেক বলেন, দফ বাজালেও প্রচারের কাজ হয়ে যাবে। দু'জন মানুষকে সাক্ষী বানানোর পর যদি তাদেরকে একথা বলে দেয়া হয় যে, সংবাদটি গোপন রেখো, তবে প্রচার বাতিল হয়ে যায়।

আমি বলি, প্রচারের শর্তের ব্যাপারে ঐকমত্য নেই। তাই বিবাহের পরে গোপন করায় অথবা অস্বীকার করায় বিবাহ বাতিল হবে না। দফ বাজানো কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। এজন্যই আমরা ইজাব ও কবুলের সময় দু'জন সাক্ষীর উপস্থিত থাকা এবং তাদের নিজ কানে ইজাব ও কবুলের স্বীকারোক্তি শোনা জরুরী করে দিয়েছি, যেনো প্রচারের কাজটি সুসম্পন্ন হয়। অর্থাৎ গোপনে না হয়ে সাক্ষীদের সামনে হয়।

এই হাদিস জননী আয়েশা, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে ওমর এবং হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে দারা কুতনী লিখেছেন (বর্ণিত হাদিসের নির্দেশানুযায়ী মহিলাদের সাক্ষ্যকে মুহাদ্দিসগণ গ্রহণীয় বলেছেন)।

ইমাম আজমের মতে, সকল ক্ষেত্রে সাক্ষী মেনে নেয়া যৌক্তিকতাবিরোধী। কিন্তু এই আয়াতে মহিলাদের সাক্ষ্য মেনে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এর অনুসরণে

www.eelm.weebly.com

তাদের সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা অন্যান্য ক্ষেত্রেও মেনে নেয়া উত্তম। হুকুমটি সাধারণ। তাই সম্পদবিষয়ক এবং মানসম্মানবিষয়ক সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত না হওয়ার কোনো কারণ নেই। রসুল স. এরশাদ করেন, মালের হেফাজত করা জীবন ও মানসম্মান রক্ষা করার মতো।

বিদায় হজের সময় রসুল স. তার ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছেন, তোমাদের রক্ত, সম্পদ এবং মান সম্মান হানি করা তোমাদের কারো পক্ষে বৈধ নয়। অন্যায়ভাবে হত্যা করা, রক্ত প্রবাহিত করা অথবা সম্পদ আত্মসাৎ করা অবৈধ। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম আহমদ ও ইবনে হাব্বান হজরত সাঈদ বিন জায়েদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, আপন সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে যে নিহত হয়, সে শহীদ। জীবন রক্ষা করতে গিয়ে যে মারা যায়, সেও শহীদ। আর ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেতো শহীদই। পরিবার পরিজনের হেফাজত করতে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিও শহীদ।

আসল কথা হলো, হুদুদ ও কেসাসে নারীর সাক্ষ্য মেনে নেয়া যায় না। এটা ঐকমত্য। কারণ এই যে, হুদুদ ও কেসাস নিঃসন্দেহ হওয়া বাঞ্ছণীয়। বিবাহের অবস্থা এরকম নয়।

হজরত আয়েশার মাধ্যমে উপরে বর্ণিত হাদিসটির একজন বর্ণনাকারীর নাম, মোহাম্মদ বিন ইয়াজিদ বিন সানাম। ইমাম আহমদ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহিয়া বলেছেন, সে ন্যায়পরায়ন ছিলো না। নাসাঈ বলেছেন, সে মাতরুকুল হাদিস (যে বর্ণনাকারী সাধারণভাবে মিথ্যাবাদী বলে পরিচিত)। দারাকুতনী তাকে এবং তার পিতাকে দুর্বল প্রমাণ করেছেন। দ্বিতীয় সনদের নাফে বিন ইয়াসিরুল আবুল খতীব অখ্যাত। হজরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণিত হাদিসের একজন বর্ণনাকারী ছিলো নাহ্‌হাশ। তাকে ইয়াহিয়া বলেছেন দুর্বল। ইবনে আদী বলেছেন, অযোগ্য। হজরত ইবনে মাসউদ রা. বর্ণিত হাদিসের রাবী (বর্ণনাকারী) বকর বিন বিকার সম্পর্কে ইয়াহিয়া বলেছেন, সে কিছুই ছিলো না। এই সনদের অন্য রাবী আবদুল্লাহ বিন মাহরাজ দারাকুতনীর দৃষ্টিতে মাতরুকুল হাদিস। হজরত ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিসের সাবেত বিন জুবায়ের মুনকিরুল হাদিস বলে গণ্য। তার মধ্যে ন্যায়পরায়নতা পূর্ণরূপে ছিলোনা। আবুল হাতেম, ইবনে আদ্দী এবং ইবনে হাব্বানও এরকম বলেছেন।

<u>মাসআলা</u> ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, সম্পদবিষয়ক নয়, এরকম ক্ষেত্রে একজন সাক্ষ্যদাতার সাক্ষ্য গ্রহণ করে দাবীদারের পক্ষে রায় দেয়া যাবে না। সম্পদ সংক্রান্ত ব্যাপারেও একই নিয়ম। এক্ষেত্রে দাবীদার যদি কসম করে তবুও না। জমহুরের নিকট সম্পদ সংক্রান্ত নয়, এমন ক্ষেত্রে একজন সাক্ষ্যদাতার

www.eelm.weebly.com

সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তবে শর্ত হলো, দাবীদারের নিকট থেকে হক ইনসাফ ও সততার কসম নিতে হবে। কেননা রসুল স. একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং দাবীদারের কসমের উপর ভিত্তি করে রায় দিয়েছিলেন। এই হাদিস ইবনে জাওজী হজরত জাবের এবং হজরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন। হজরত ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু হোরায়রা, হজরত ইবনে ওমর, হজরত জায়েদ বিন সাবেত, হজরত আবু সাঈদ খুদরী, হজরত সাঈদ বিন ওবাদা, হজরত আমের বিন রবীয়া, হজরত সহল বিন সাঈদ, হজরত আম্মার বিন হাজম, হজরত আমর বিন হাজম, হজরত মুগীরা বিন শোবা, হজরত বেলাল বিন হারেস, হজরত সালমা বিন কায়েস, হজরত আনাস বিন মালেক, হজরত তামীমে দারী, হজরত জয়নব বিনতে সায়লাবা এবং হজরত বিরক (রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন) থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে।

আমি বলি, হজরত জাবের থেকে এই হাদিসটি ইমাম আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা এবং তাহাবী সূত্রপরম্পরায় আবদুল ওহাব বিন আবদুল মজীদ সাকাফীর মাধ্যমে জাফর বিন মোহাম্মদ তাঁর পিতা থেকে উল্লেখ করেছেন। তিরমিজি বলেছেন, এই হাদিস ইমাম সওরী ও অন্যান্যরাও বর্ণনা করেছেন। সওরী এটিকে মালেক, জাফর ও মোহাম্মদের বর্ণনা থেকে মুরসাল হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। এই সনদই সবচেয়ে বিশুদ্ধ। দারাকুতনী হজরত আলী থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. একজন সাক্ষী এবং একজন হকদারের কসমের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। এই সনদে অবশ্য ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি। দারাকুতনী বলেন, হাদিসটি মুআল্লাল (গোপন দুর্বলতাদুষ্ট যা বিশুদ্ধ হওয়ার অন্তরায়)। আরো বলেছেন, হজরত জাফর একে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আবার কখনো করেছেন মাউসুল হিসেবে (মিলিতভাবে)। ইমাম শাফেয়ী এবং বায়হাকী বলেছেন, আবদুল ওহাব বর্ণনা করেছেন মাউসুল হিসেবে। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য।

আমি বলি, জাহাবী লিখেছেন, আবদুল ওহাব ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এবং বিশৃঙ্খল বোধসম্পন্ন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দাবীদারের কসমের সঙ্গে একজনের সাক্ষীর উপর রসুল স. রায় দিয়েছেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও তাহাবী। তিরমিজি একে হাসান বলেছেন। তাহাবী বলেছেন মুনকার। এই হাদিসের রাবী কায়েস বিন সা'দ এবং আমর বিন দিনার সম্পর্কে তাহাবী বলেছেন, আমি জানতে পারিনি কায়েস আমর বিন দিনার থেকে আদৌ কোনো হাদিস বর্ণনা করেছেন কিনা।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এক সাক্ষী ও এক কসমের উপর রায় দিয়েছিলেন। বর্ণনা করেছেন ইমাম শাফেয়ী, আসহাবে সুনান ও ইবনে

www.eelm.weebly.com

হাব্বান। ইবনে আবি হাতেম একে সহীহ্ বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী ও তাহাবী একে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসটিকেই বায়হাকী মুগীরা বিন আবদুর রহমান, আবু জিয়াদ আ'রাজ, আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ বলেছেন, এই হাদিসের সিলসিলা সর্বাধিক সহীহ্। ইমাম আজম বলেন, সহীহ্ হলেও এই হাদিসটি খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ভূক্ত (এককভাবে বর্ণিত)। তাই কিতাবুল্লাহ্র বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা এর নেই। অধিক শক্তিশালী হাদিসের বিরুদ্ধেও একে গ্রহণীয় ভাবা যায়না।

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের বর্ণনা, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, মানুষের দাবী সহজে মেনে নিলে কিছু লোক মানুষের রক্ত ও সম্পদের দাবী করে বসবে। তখন দ্বিতীয় পক্ষও কসম করতে উদ্যত হবে। বায়হাকীর বর্ণনাতেও এরকম রয়েছে। সাক্ষ্য উপস্থাপন করা দাবীদারের দায়িত্ব। সাক্ষী পেশ করতে না পারলে তার কসম স্বীকৃত হবেনা। আমর বিন শোয়াইবের বর্ণনা, সাক্ষী পেশ করা দাবী উত্থাপকের দায়িত্বভুক্ত এবং কসম দ্বিতীয় পক্ষের দায়িত্বে। দারা কুতনী, তিরমিজি। হজরত ওয়ায়েল বিন হাজার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এক দাবীদারকে বললেন, সাক্ষী আনো। সে বললো, আমার কোনো সাক্ষী নেই। রসুল স. বললেন, কসম করো। সে বললো, ইতোমধ্যে সে তো তার জমি নিয়ে যাবে। তিনি স. বললেন, উপায় নেই।

উল্লেখিত হাদিস দু'টির সমাধান তাহাবী এভাবে করেছেন, রসুল স. কসমের দায়িত্ব দিলেন দ্বিতীয় পক্ষকে। দাবীদারের পাওনা ফিরে পাওয়ার আর কোনো উপায়ই রইলোনা। দু'জনকে দু'রকম দায়িত্ব দেয়া হলো। একজনকে সাক্ষী অন্যজনকে কসম। অতঃপর কসম ও সাক্ষী একত্রিত থাকবে কীভাবে? কাজেই পার্থক্য হয়ে গেল। তাহাবী, শাফেয়ী কর্তৃক উপস্থাপিত হাদিসের জবাব এভাবে দিয়েছেন, সাক্ষ্য ও কসমের উদ্দেশ্য — দাবীদারের কসম, যে সাক্ষী উপস্থাপন করতে অসমর্থ। এরকম ক্ষেত্রে রসুল স. সাক্ষীর পরওয়া না করে দ্বিতীয় পক্ষের কসম নিয়েছেন, যেনো কসমে কসমে ফয়সালা হয়ে যায়। পরিণাম দাঁড়ালো এই যে, শুধু দাবী করার মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষ কসমের অধিকার লাভ করে। এমন নয় যে, দাবীদার প্রথমে তার দাবী প্রমাণ করে ও সাক্ষী হাজির করে। পূর্ব সম্পর্কের কারণে উভয়ের লেনদেনে রদবদল হয়ে যেতে পারে, ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে শেষে দাবীর ব্যাপারটি প্রবল হয়।

রসুল স. হজরত খাজিমার সাক্ষ্যের উপর ফয়সালা দিয়েছিলেন। তিনি স. তাকে দু'জন সাক্ষীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। এরকম বিশেষত্ব কেবল তাঁকে দেয়া হয়েছিলো। এ কথা অবশ্য হাদিসে প্রকাশ্যভাবে বলা হয়নি, তাই এর প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসমীচীন। সাক্ষী পেশ করার উদ্দেশ্য, বিবাদ বিসংবাদ দূর করা। সাক্ষীর সংখ্যা দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন

www.eelm.weebly.com

নারী। কসমের প্রশ্ন উঠতে পারে তখনই যখন সাক্ষী অনুপস্থিত থাকবে। রসুল স. ফয়সালা দিয়েছেন সাক্ষ্য ও কসমের ভিত্তিতে। সাক্ষ্য ও কসম সত্য হলেও মিথ্যা হলেও।

মূল কথা এই যে, এই মাসআলাটি মতানৈক্যমন্ডিত। একজন রাবীর বর্ণনা (খবরে আহাদ) কিতাবুল্লাহ্‌র মোকাবেলায় গ্রহণ করাকে অন্যান্য ইমামগণ জায়েয বলেছেন। ইমাম আজম বলেননি। উল্লেখিত হাদিসে একজন সাক্ষীর সাথে দাবীদারের কসমকে যথেষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোরআনে নির্দেশ রয়েছে, দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ দু'জন নারী।

মাসআলা ঃ যে সমস্ত বিষয় সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, সে সমস্ত বিষয়ে রমণীদের সাক্ষ্য গ্রহণীয়। যেমন শিশুর জন্ম সংবাদ, রমণীদের অভ্যন্তরীণ ব্যাধি ইত্যাদি। এটা ঐকমত্য। ইমাম আজম বলেন, এ সমস্ত বিষয়ে একজন মুসলমান স্বাধীনা পুণ্যবতী রমণীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। দু'জন হলে উত্তম। ইমাম মালেক বলেছেন, দু'জন হওয়া জরুরী, একজন যথেষ্ট নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, চারজন হওয়া জরুরী। কেননা শরিয়তে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য চারজন নারীর সমান। রসুল স. বলেছেন, মেয়েদের সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক।

ইমাম মালেক বলেন, সাক্ষীর জন্য দু'টি ব্যাপার জরুরী। সংখ্যা ও পুরুষ সাক্ষী। প্রয়োজনবশতঃ পুরুষ হওয়ার শর্ত রহিত করা গেলেও সংখ্যার শর্ত এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। অপরদিকে হানাফীদের দলিল এই, ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান, ইমাম আবু ইউসুফ, গালিব বিন আবদুল্লাহের মাধ্যমে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, সাঈদ বিন মুসাইয়েব, আতা বিন আবী রেবাহ্‌ এবং তাউস বলেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে সমস্ত বিষয় পুরুষদের গোচরীভূত হয়না সে সমস্ত বিষয়ে নারীদের সাক্ষ্য জায়েয। হাদিসটি মুরসাল। এতে কোনো সাহাবীর উল্লেখ নেই। আয়াতে উল্লেখিত 'আন্‌ নিসা' শব্দটিতে সংখ্যার নির্ধারণ নেই। কাজেই এক সাক্ষী যথেষ্ট — বেশী হলে উত্তম।

আবদুর রাজ্জাক ইবনে জারীর জুহুরীর বর্ণনা থেকে উল্লেখ করেছেন, যা ইবনে আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন, এ পদ্ধতি রসুল স. এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে প্রচলিত ছিলো। পুরুষদের অবগতিবহির্ভূত বিষয়ে (প্রসব সংবাদ, বিশেষ বিশেষ মেয়েলী রোগ) মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয। অন্যান্য ক্ষেত্রে জায়েয নয়।

আয়াতে সাক্ষীর যোগ্যতা নির্ণয় করা হয়েছে এরকম — সাক্ষী যেনো ফাসেক ও প্রবৃত্তিপূজক না হয়। যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হবে তার সঙ্গে পার্থিব শত্রুতা যেনো না থাকে। দাবীদারের সঙ্গে তার আঁতাত থাকাও চলবে না। ফাসেকের সাক্ষ্য অগ্রহণীয়—এটা ওলামাদের ঐকমত্য। সাক্ষীকে হতে হবে প্রথম শ্রেণীর

www.eelm.weebly.com

ন্যায়পরায়ণ। কারণ, সত্য সিদ্ধান্ত নির্ভর করে তার সাক্ষ্যের উপরেই। ন্যয়পরায়নতার অর্থ এই, ওয়াজিব সমূহ যথা নিয়মে আদায় করা। সকল সময় কবীরা গোনাহ্ পরিহার এবং সগীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা। তাফসীরে কবীরে এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তায়ালার সমকক্ষ মনে করা, যাদু, হত্যা, সুদ, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন, সাধ্বী রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া — এগুলো কবীরা গোনাহ্। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা শপথ করা। বোখারী, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। বোখারী, মুসলিম হজরত আনাস ও হজরত আবু বকর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবোনা কোন্ গোনাহ্ সবচেয়ে বড় — আল্লাহ্‌র সাথে শিরিক করা, পিতা মাতার অবাধ্যতা। এ সময় রসুল স. বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন, আরো শোনো — মিথ্যা বলা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। একথা বারবার বলতে বলতে তিনি স. একসময় নীরব হয়ে গেলেন।

রসুল স. আরো বলেছেন, ইমান থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করতে পারেনা। চুরি, মদ্যপান, সম্পদলুণ্ঠন, গণিমতের মাল আত্মসাৎ — এগুলোও কবীরা গোনাহ্। বোখারী।

হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে, সে খাঁটি মুনাফিক। একটি থাকলে সে প্রকৃত মুনাফিক না হলেও মুনাফিকের স্বভাববিশিষ্ট বলে গণ্য হবে। ওই চারটি স্বভাব হচ্ছে, আমানত খেয়ানত করা, কথায় কথায় মিথ্যা বলা, প্রতিশ্রুতি ছিন্ন করা, বাদানুবাদের সময় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা। এ হাদিসটি এসেছে হজরত আবদুল্লাহ বিন আমরের সুত্রে। লিপিবদ্ধ করেছেন বোখারী ও মুসলিম। তাঁরা আরো লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে এসেছে, মুনাফিকীর নিদর্শন তিনটি — অঙ্গীকার ভঙ্গ, আমানত খেয়ানত ও মিথ্যাচার।

কোনো কোনো আলেম বলেন, যে সমস্ত ব্যাপারে শরিয়ত শাস্তি নির্ধারণ করেছে, ওগুলোই কবীরা গোনাহ্। কেউ কেউ বলেন, যে সমস্ত গোনাহ্‌র কথা কোরআনে উল্লেখ রয়েছে, কবীরা গোনাহ্ সেগুলোই। যেমন, সমকাম। আমর বিন শায়েব তাঁর পিতার মাধ্যমে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমরের বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, খেয়ানতকারী নারী পুরুষের সাক্ষ্য বৈধ নয়। যে ব্যাক্তি তার ভাই অথবা তার পরিবার পরিজনের উপার্জননির্ভর, তার সাক্ষ্য তার ভাই ও তার পরিবার পরিজনের বিরুদ্ধে গ্রহণীয় নয়। অন্যদের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে দাকিকুলঈদ, বায়হাকী।

www.eelm.weebly.com

ইবনে জাওজী লিখেছেন, এই হাদিসের এক রাবী মোহাম্মদ বিন রাশেদ দুর্বল।কিন্তু তানকি নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ইমাম আহমদ তাঁকে নির্ভরযোগ্য মেনেছেন।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, খেয়ানতকারী নারী ও পুরুষের সাক্ষ্য বৈধ নয়। ওই ব্যক্তিও বৈধ নয় যাকে শাস্তিস্বরূপ দোররা মারা হয়েছে। ওই ব্যক্তি যে আপন ভাইয়ের শত্রু, সেও সাক্ষী হিসেবে বৈধ নয়। রোজগার নির্ভর পরিজনের বিরুদ্ধে — খরচবহনকারী ব্যক্তির এবং ওই ব্যক্তির যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান, তাদের সাক্ষ্যও অগ্রহণীয়। পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের, পুত্রের বিরুদ্ধে পিতার সাক্ষ্যও গ্রহণীয় নয়। নিকটতম এক আত্মীয়ের বিরুদ্ধে আরেক আত্মীয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইয়াজিদ বিন দামেসকী থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, দারাকুতনী এবং বায়হাকী।
ইয়াজিদ বিন জিয়াদ কিন্তু রাবী হিসেবে দুর্বল।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, পিতামাতা সন্তানের বিরুদ্ধে, স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে, স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে, গোলাম মনিবের বিরুদ্ধে, মনিব গোলামের বিরুদ্ধে এবং এক শরীক অন্য শরীকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে তা বৈধ বলে গণ্য হবে না। কারণ এরা একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। তবে অপরের বিরুদ্ধে এদের সাক্ষ্য জায়েয। শ্রমিকের সাক্ষ্যও তার নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে গ্রহণীয় নয়। বর্ণনা করেছেন খস্সাফ।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, বিচারক সাক্ষীর কেবল প্রকাশ্য দিকই দেখবে। তবে দ্বিতীয় পক্ষ সাক্ষী সম্পর্কে আপত্তি তুললে বিচারক তার বিস্তারিত অবস্থা জেনে নিবে। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, সাক্ষীর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় অবস্থা জেনে নেয়া বিচারকের জন্য জরুরী — দ্বিতীয় পক্ষ আপত্তি না তুললেও। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ এই মতই পোষণ করেন। ইমাম মালেক বলেছেন, যার ন্যায়পরায়ণতা প্রসিদ্ধ তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করা ঠিক নয়। আর যার ফাসেক হওয়া প্রসিদ্ধ তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা ঠিক নয়। যার কোনো দিকেই প্রসিদ্ধি নেই, তার সম্পর্কে জেনে নিতে হবে।

ইমাম আবু হানিফার দলিল এই যে, রসুল স. বলেছেন, ব্যভিচারের কারণে যাকে শাস্তিযোগ্য বলে নির্ধারণ করা হয়েছে, সে ছাড়া অন্য সকল মুসলমানকে ন্যায়পরায়ণ ধরতে হবে। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারবে। ইবনে আবী শাইবা।

হজরত ওমর বিন খাত্তাবের খেলাফতের সময় তিনি হজরত আবু মুসা আশআরীর নিকট একটি চিঠি লিখেছিলেন, যাতে এই কথাগুলো ছিলো — সকল মুসলমান আদেল (ন্যায়পরায়ণ)। সবার সাক্ষ্য সবার জন্য গ্রহণ করা যাবে, ওই ব্যক্তি ব্যতীত যে ব্যভিচারের অপরাধে শাস্তি পেয়েছে। ওই ব্যক্তিও, যে মিথ্যা

www.eelm.weebly.com

সাক্ষ্য দেয়ার কারণে শাস্তি পেয়েছে। ওই সমস্ত ব্যক্তিও যারা প্রভু, ভৃত্য এবং আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। এই বর্ণনার এক রাবী আবদুল্লাহ্ আবু হামিদের বিরুদ্ধে দুর্বলতার অভিযোগ রয়েছে। অন্য সূত্রে দারাকুতনী একে হাসান বলেছেন। অন্য আরেক সূত্রে বায়হাকী এই হাদিসের উল্লেখ করেছেন। হানাফী আলেমদের উক্তি এই যে, ফতওয়া হয়েছে সাহেবাঈনের মতের উপর। তারা আরো বলেছেন, ইমাম সাহেব ও সাহেবাঈনের মতানৈক্য দলিলের উপর ভিত্তি করে হয়নি। যুগের পার্থক্যের কারনে হয়েছে। ইমাম সাহেবের যুগে সাধারণ মানুষ ছিলো পুণ্যবান, ফাসেকের সংখ্যা ছিলো অনেক কম। সাহেবাঈনের যুগের অবস্থা ছিলো বিপরীত। আমি বলি, আমাদের যুগে ইমাম সাহেবের মতের উপরেই ফতওয়া হওয়া বাঞ্ছনীয়।কেননা এই জামানায় কিতাবের শর্তানুসারে পুণ্যবান মানুষের দেখা পাওয়া ভার। প্রায় সকলেই কোনো না কোনোভাবে ফাসেক। এখন যদি আমরা সাক্ষ্যদাতাদের পরিসর কমিয়ে দেই, তবে হুকুম কার্যকর হবে কীভাবে। এতে যে ফয়সালার সমস্ত পথই বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের সময়ে ফাসেকের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা দরকার। তবে শর্ত হলো, পৃথিবীবাসীর দৃষ্টিতে তাকে সম্মানিত বলে বিবেচিত হতে হবে। ধারণা করতে হবে, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না। পূর্ববর্তী যুগে সাক্ষীদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা জিজ্ঞেস করা হতো না। কসম নেয়া হতো এবং কসমকেই যথেষ্ট মনে করা হতো।

একটি আপত্তি ঃ এটা তো কোরআনের অকাট্য প্রমাণের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত ধারণা মাত্র, যা গ্রহণ করা যায়না।

উত্তর ঃ না, ব্যাপারটা এরকম নয়। কোরআনের উদ্দেশ্য এরকম, 'আর তোমাদের পছন্দ মতো দু'জন পুরুষকে সাক্ষী করে নাও।'

প্রত্যেক যুগেই উত্তম মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা দরকার। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বর্ণিত যোগ্য সাক্ষ্যদাতা এ যুগে কোথায় ?

একদা রসুল স. সাহাবীগণকে বললেন, যে কাজ করতে তোমরা নির্দেশপ্রাপ্ত তার দশভাগের একভাগ ছেড়ে দিলেও তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর এমন এক যুগ আসবে, যে যুগের মানুষেরা দশভাগের একভাগ পালন করলেও মুক্তি পেয়ে যাবে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, হজরত আবু হোরায়রা থেকে। হাদিসটির উদ্দেশ্য এই যে, পরের জামানার মানুষেরা আল্লাহ্তায়ালা ও আখেরাত আকাঙ্খী হওয়া সত্ত্বেও গোনাহ্ করবে অনেক বেশী। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে মাফ করে দেবেন। কিন্তু পূর্বের লোকদের এমন গোনাহ্ মাফ করা হবে না। প্রথম যুগের মানুষের গোনাহ্ পরের যুগের মানুষের জন্য মোবাহ্ হবে। এর উপমা এরকম — যোদ্ধাদের অগ্রগামী দল সর্বক্ষণ যুদ্ধরত। পশ্চাৎবর্তী দল সেরকম নয়। কিন্তু পুরস্কারের সময় পশ্চাৎবর্তী ও পূর্ববর্তী দল একসঙ্গে সামগ্রিক সেনাবাহিনী হিসেবে গণ্য হয়। বরং কখনো কখনো পশ্চাৎবর্তী দলকেই অধিক পুরস্কৃত করা হয়। ফজল তো আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাধীন — তিনি যাকে ইচ্ছা দান

www.eelm.weebly.com

করেন। যাকে চান তার কবীরা গোনাহ্ও ক্ষমা করে দেন। আবার যাকে চান তার সগীরা গোনার জন্যও শাস্তি নির্ধারণ করেন।

আয়াতে মিনাশ্ শোহাদা (সাক্ষীদের মধ্যে অর্থ, বিভিন্ন সাক্ষী)। এর দ্বারা বোঝা যায়, ফাসেকের সাক্ষ্য দেয়ার সুযোগ আছে। যদি হাকিম (বিচারক) সাক্ষ্য গ্রহণ করেন তবে জায়েয। কিন্তু গোনাহ্গার হলেও তার কাছ থেকে কাজ আদায় করা যাবেনা কেনো?

'দু'জন স্ত্রী লোক; স্ত্রী লোকদের মধ্যে একজন ভুল করিলে অপরজন স্মরণ করাইয়া দিবে।' — একথায় বোঝা যায়, মেয়েদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল। রসুল স. বলেছেন, বুদ্ধি ও ধর্মের ব্যপারে অপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও একজন পুরুষের জ্ঞান তোমাদের চেয়ে বেশী। মেয়েরা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের বুদ্ধি ও ধর্মের অপূর্ণতা কীরকম? রসুল স.বললেন, নারীর সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, এটাই বুদ্ধির অপূর্ণতার প্রমাণ। তিনি স. পুনরায় বললেন, ঋতুবতী হলে নামাজ ও রোজা তোমাদের জন্য নিষেধ — তাই নয় কি? তাঁরা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, তোমাদের দ্বীনের অপূর্ণতা এটাই ।

'সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হইবে তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে।' — আলেমগণ বলেন, ডাকা মানে সাক্ষী হয়ে যাওয়া। কেউ কেউ বলেন, এই হুকুমটি ওয়াজিব। আবার কেউ কেউ বলেন, অন্যকোনো সাক্ষী না পাওয়া গেলে ওয়াজিব। অন্য সকলের জন্য ওয়াজিব নয়, ইচ্ছাধীন। হাসান বসরী বলেছেন, কোনো কোনো আলেম ডাকা শব্দের অর্থ করেছেন সাক্ষ্যদান করা। মুজাহিদ, ইকরামা ও সাঈদ বিন জুবাইর এর তাফসীর করেছেন, সাক্ষ্যদান করা ওয়াজিব। কেননা অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা সাক্ষ্য গোপন কোরনা।'

হজরত আবু মুসা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, কাউকে সাক্ষ্য দিতে বলা হলে সে যদি সাক্ষ্যকে গোপন করে, তবে তার অবস্থা হবে মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারীর মতো। তিবরানী।

এই সনদের এক রাবীর নাম আবদুল্লাহ্ বিন সালেহ্। তিনি ছিলেন লাইস বিন সাআদের কাতেব (লেখক)। ইমাম বোখারী তার নির্ভরযোগ্যতা মেনে নিয়েছেন।

<u>মাসআলা</u> ঃ যদি সাক্ষীকে হাকিমের এজলাসে সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকা হয় তখন সে ডাকে সাড়া দেয়া ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো হাকিমের এজলাস কাছে হতে হবে। দূরে হলে যাওয়া ওয়াজিব নয়। কেননা আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।' নাসের বলেছেন, দিনে দিনে আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে ঘরে ফিরে আসা সম্ভব হলে ওয়াজিব।

<u>মাসআলা</u> ঃ বয়োবৃদ্ধ হওয়ার কারণে দাবীদার যদি সাক্ষীকে তার নিজ বাহনে করে নিয়ে যায় তবে ক্ষতি নেই। তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। সোলায়মান বলেন,

www.eelm.weebly.com

কোনো ব্যক্তি তার সাক্ষীকে ভাড়া করা বাহনে করে নিয়ে গেলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। আন নাওয়াজেল গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা রয়েছে এরকম, যে বৃদ্ধ সাক্ষী পায়ে হেঁটে পথ চলতে পারেনা, সওয়ারীর ভাড়াও দিতে পারেনা, তার ভাড়া দাবীদার দিয়ে দিলেও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। ইমাম ইবনে হুমাম বলেন, এই ফতওয়া সাক্ষীকে সম্মানিত করার জন্য হয়েছে। পায়ে হেঁটে পথ চলা অসম্মান।

মাসআলা ঃ নিজেদের জন্য আহার প্রস্তুত করার পর, সাক্ষীকে খাওয়ালে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সাক্ষীদের জন্য আলাদা আহারের আয়োজন করলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আজম এরকম বলেছেন। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, দুই অবস্থার কোনো অবস্থাতেই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, উভয় অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য। ইমাম ইবনে হুমাম বলেন, সবচেয়ে উত্তম যদি কোনো সম্মানিত ব্যক্তি কারো ঘরে গেলে গৃহকর্তা তাকে আহার করান। সে সাক্ষী হলেও। না হলেও। খাওয়ার শর্ত না থাকলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, শর্ত থাকলে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং তা ঘুষ হবে, যা গ্রহণ করা হারাম। সাক্ষী অন্বেষণকারী ও সাক্ষ্যদাতার জন্য কোনোকিছু দেয়া ও গ্রহণ করা জায়েয নয়। অন্য কোনো সাক্ষী না থাকলে এবং বিনিময় নির্ধারিত থাকলে জায়েয। ইমাম শাফেয়ী বলেন, নির্ধারিত সাক্ষী ছাড়া অন্য কোনো সাক্ষী না থাকলে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয। সাক্ষী নির্ধারিত না থাকলেও বিনিময় জায়েয। কারণ এ অবস্থায় সাক্ষ্য দেয়া ফরজ নয়। আমরা বলি, অন্য সাক্ষী না থাকলে সাক্ষ্য দেয়া ফরজে আইন। অন্যথায় ফরজে কেফায়া। ফরজ স্বীকার না করলে সকল অবস্থায় মোস্তাহাব হবে। অর্থাৎ নফল ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। ইবাদতের বিনিময় নেয়া আমাদের মতে জায়েয নয়। রসুল স. এরশাদ করেছেন, ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই দোজখী। তিবরানী।

'ছোট হউক অথবা বড় হউক, মিয়াদসহ লিখিতে তোমরা কোনোরূপ বিরক্ত হইওনা।' — লিখিত বিষয়ে সন্দেহের সম্ভাবনা নাই। স্মৃতিদৌর্বল্যের কারণে ভুলক্রটি হলেও লিখিত বিষয় ভুলসংশোধন করতে সহায়ক। এতে কোনো পক্ষই অসৎ উদ্দেশ্য লালনের সুযোগ পায়না। এজন্যই ছোটবড় সব লেনদেনই লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়েছে। সাক্ষীর নাম, কর্জের বিষয়বস্তু, প্রদান ও পরিশোধের সময়, সকল বিষয়ই লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। এতে ন্যায়প্রতিষ্ঠার কাজ সহজ হয়। এই সহজ শিক্ষাই আল্লাহপাক এখানে দিয়েছেন।

মাসআলা ঃ সাক্ষীকে স্মৃতি থেকে বলতে হবে। স্বাক্ষরকৃত লেখা দেখে সাক্ষ্য দেয়া জায়েয নয়। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেন। কিন্তু সাহেবাইন স্বাক্ষর দেখে সাক্ষ্য দেয়াকে জায়েয বলেছেন। কোনো কোনো ফকিহ্ স্বাক্ষর দেখে সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। লিখিত বিষয়বস্তু মনে না থাকলে লেখা দেখে সাক্ষ্য দিলে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই — সাহেবাইন এই যুক্তি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু

www.eelm.weebly.com

ইমামে আজম এ যুক্তি মানেননি। তিনি বলেছেন, সাক্ষ্যের ভিত্তি প্রত্যক্ষগোচরতার উপর। রসুল স. এরশাদ করেছেন, তোমরা যখন কোনো বিষয় সূর্যের মতো পরিষ্কার দেখবে, তখন সাক্ষ্য দিবে। সুতরাং লিখিত বিষয়বস্তু মুখস্থ করা যেতে পারে; কিন্তু সাক্ষ্য দিতে হবে লিখিত সাক্ষ্য না দেখে।

নগদ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে লেখালেখির প্রয়োজন নেই।

'তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর' — এই আয়াতাংশে সাক্ষী রাখার কথা বলা হচ্ছে। জুহাক এবং আবু দাউদ এ কথার প্রকাশ্য অর্থ নিয়েছেন। তাই তাদের মতে নগদ অথবা ধারে, সব রকমের বেচাকেনাতেই সাক্ষী নির্ধারণ করা ওয়াজিব। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, প্রথমে ওয়াজিবই ছিলো। কিন্তু 'আর যদি একে অপরকে বিশ্বাস করে'— এই আয়াতাংশ দ্বারা ওয়াজিব হওয়ার ধারণা রহিত হয়ে গিয়েছে। জমহুরের নিকট হুকুমটি ইচ্ছাধীন। তবে সাক্ষী নির্ধারণ করা উত্তম।

ইমাম আহমদ, আম্মার বিন খাজিমা, তাঁর চাচা যিনি ছিলেন সাহাবা— তাঁর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এক বেদুইনের কাছ থেকে একটি ঘোড়া কিনলেন। ঘোড়ার মূল্য পরিশোধের জন্য রসুল স. ওই স্থান ত্যাগ করলে অন্য লোকেরা এসে ঘোড়ার দরদাম করতে লাগলো— রসুল স. যে ঘোড়াটি কিনেছেন, এ তথ্য তাদের জানা ছিলোনা। তারা মূল্য বেশী বলতে লাগলো। বেদুইনটি রসুল স. কে ডেকে এনে বললো, কিনলে কিনে নাও; না হলে আমি বিক্রি করে দেবো। রসুল স. বললেন, আমি কি কিনিনি? বেদুইন বললো, না। আল্লাহর কসম আমি বিক্রি করিনি। রসুল স. বললেন, নিশ্চয়ই আমি কিনেছি। বেদুইন বললো, সাক্ষী হাজির করো। উপস্থিত লোকেরা বলতে লাগলো, আরে বেদুইন, আল্লাহর রসুল মিথ্যা বলেন না। এমন সময় হজরত খাজিমা এলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমার ও রসুল স. এর মধ্যে ক্রয়বিক্রয় হয়েছে। রসুল স. তাকে বললেন, তুমি কীভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছ, তখনতো তুমি উপস্থিত ছিলেনা। খাজিমা বললেন, সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনার সততার উপর ভিত্তি করে। কারণ, আপনি কখনো মিথ্যা বলেন না। রসুল স. খাজিমার সাক্ষ্যকে দু'জনের সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন।

না দেখে সাক্ষ্য দেয়া বৈধ নয়। কিন্তু রসুলে পাক স. এখানে না দেখা সাক্ষ্যকে গ্রহণ করেছেন। আমরা বলি যে, এখানে ব্যাপারটি অন্যরকম। বেদুইনের মিথ্যাবাদিতা সম্পর্কে রসুলে পাক স. জানতেন। তাই এরকম করেছেন। হজরত খাজিমার সাক্ষ্যের উপর তিনি স. সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। লক্ষ্যণীয়, তাঁর সাক্ষ্যকে দু'জনের সাক্ষ্য হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছেন। এতে করে খাজিমার ইমান ও জ্ঞানের দৃঢ়তা প্রমাণিত হয়েছে। এই হাদিস থেকে এই মাসআলা স্পষ্ট হয়েছে যে, পূর্বে জানা থাকলে হাকিম তাঁর জ্ঞান মোতাবেক সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন। দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা ধারণা লাভ করা যায় বটে, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করা যায়না। পূর্বে জানা থাকলে দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণা দুই-ই লাভ করা যায়। এ কারণেই রসুল

www.eelm.weebly.com

স. এর ইন্তেকালের পর হজরত ফাতেমা রা. যে বাগানের দাবী করেছিলেন, হজরত আবুবকর রা. তা নাকচ করে দিয়েছিলেন। কারণ, হজরত আবু বকরের সরাসরি জানা ছিলো, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি নবী, আমার সম্পদে কারো উত্তরাধিকার নেই। এই হাদিস দ্বারা আরো একটি মাসআলা বের হয়েছে। বাদশাহ অথবা হাকিম তাদের আপন অধিকার বলবৎ করতে পারবে। সাক্ষী না থাকলেও। তবে, হ্যাঁ। ব্যাপারটি যদি অন্য কোনো হাকিমের এজলাসে যায়, তবে ওই হাকিম সাক্ষ্য তলব করতে পারবে।

'লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।' — এর অর্থ, তাউস, হাসান এবং কাতাদা এরকম করেছেন যে, যেখানে লেখক ও সাক্ষী নির্ধারিত থাকে সেখানে তাদেরকে অস্বীকার করে ক্রেতা বিক্রেতাকে কষ্ট দেয়া যাবেনা। এটা তাদের জন্য ক্ষতি। অন্য অর্থ এও হতে পারে যে, আচরণগত দিক থেকে তাদেরকে কষ্ট দেয়া যাবে না। লেখকের বিনিময় না দেয়া, সাক্ষীর ব্যস্ততার সময় তাকে তলব করা অথবা ঘটনাস্থলে অন্য কোনো সাক্ষী উপস্থিত থাকলেও রোগী অথবা দুর্বল ব্যক্তিকে সাক্ষ্যদানের জন্য পীড়াপিড়ি করা— তাদেরকে কষ্ট দেয়ার শামিল। এরকম করা পাপ। তাই সবশেষে আল্লাহ্ তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করেছেন। 'তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন' — এ কথা বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আল্লাহ্র শিক্ষার মধ্যেই দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সকলের শেষে বলেছেন, 'আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।' এ কথায় প্রকাশিত হয়েছে আল্লাহ্ তায়ালার পরাক্রম ও মাহাত্ম্য।

সুরা বাকারা ঃ আয়াত ২৮৩

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

☐ যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোনো লেখক না পাও তবে বন্ধক রাখা বৈধ। তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করিলে, যাহাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন আমানত প্রত্যর্পণ করে। এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে। তোমারা সাক্ষ্য গোপন করিও না, যে কেহ উহা গোপন করে তাহার অন্তর অপরাধী। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবহিত।

---

www.eelm.weebly.com

বন্ধককৃত বস্তু ফেরত পাওয়া যাবে তখনই, যখন তার পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হবে। যৎসামান্য মূল্য বাকি থাকলেও ফেরত পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। কোনো শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস কালে লেখক না পাওয়া গেলে, বন্ধক রাখা যাবে। পাওয়া গেলেও রাখা যাবে।

মুজাহিদ ও দাউদ বর্ণনা করেছেন, এই নিয়মটি শুধু সফরের সময়ে প্রযোজ্য। অন্য সময়ে নয়। অন্য সময়ে লেখক না থাকলে বন্ধক বৈধ। অন্যথায় নয়। এখানে সমস্ত সহীহ্ হাদিস গ্রন্থে উল্লেখিত হজরত আয়েশা রা.এর বর্ণনা এবং বোখারীতে উল্লেখিত হজরত আনাস রা.এর বর্ণনাকে আমরা দলিল হিসেবে পেশ করছি। রসুল স. তাঁর যেরা (বর্ম) বিশ সা যবের বিনিময়ে এক ইহুদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। তাঁর তিরোধান পর্যন্ত যেরাটি ইহুদীর কাছেই ছিলো।

বিনিময় ছাড়া বন্ধক রাখা যাবে না। ইমাম আজম, ইমাম আহমদ এবং ইমাম শাফেয়ী এই মত পোষণ করেন। ইমাম মালেক বলেছেন, বিনিময় দিতে স্বীকৃত হলেও বন্ধক রাখা যাবে। কিন্তু বন্ধকদাতার নিকট থেকে বন্ধক গ্রহণ করার অধিকার বাধ্যতামূলক। আমরা বলি, অধিকৃত বন্ধকের দ্বারাই বন্ধক জায়েয হওয়া প্রমাণিত হয়েছে।

ইমাম আজম বলেছেন, বন্ধকের জন্য অধিকার শর্ত। তাঁর মতে, বন্ধকের বস্তুর উপর বন্ধক দাতার একক মালিকানা থাকতে হবে। যে বস্তুর মালিক একাধিক সেই বস্তু বন্ধক দেয়া যায় না। সে বস্তুটি ভাগ করার উপযোগী হোক বা না হোক। সম্মিলিত মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি দাঁড়াবে এরকম — এক মালিক বন্ধক দিলো অন্য মালিক অথবা মালিকেরা দিলোনা। বন্ধকদাতা যদি বলে, একদিনের জন্য বন্ধক দিলাম। পরের দিন বন্ধক থাকবে না। কারণ, আমি ছাড়াও এ বস্তুর অন্য মালিক আছে যে বন্ধক দেয়নি। এভাবে তৃতীয় দিন থাকবে, চতুর্থ দিন থাকবে না — এ পদ্ধতিটি ভুল। কারণ (রেহেন) বন্ধক অর্থ আবদ্ধ করে রাখা (কর্জ আদায় পর্যন্ত)। বন্ধক গ্রহণকারীর সার্বক্ষণিক অধিকার থাকা চাই। যা কেবল একজনের মালিকানাধীন বস্তুর ক্ষেত্রেই সম্ভব। বন্ধক কিন্তু হেবার (দানছত্রের) মতো নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যে সমস্ত বস্তু ভাগ করা সম্ভব, সে সমস্ত বস্তুর ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত হেবা শুদ্ধ হয় না। ভাগ করে দেয়া হেবাকারীর দায়িত্ব। পক্ষান্তরে যে সমস্ত বস্তু ভাগ করা যায় না যেমন, রাজ্য, জায়গীর ইত্যাদি — এ সমস্ত ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলেও বৈধ।

মাসআলা ঃ সকল অবস্থায় বন্ধকের বস্তুর উপর বন্ধক দাতার মালিকানাই বলবৎ থাকে। বন্ধক দেয়ার পর বন্ধক গ্রহণকারীর কেবল সাময়িক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তার অধিকারে থাকা পর্যন্ত বন্ধক দাতা বন্ধককৃত বস্তু থেকে

www.eelm.weebly.com

কোনো প্রকার উপকার গ্রহণ করতে পারবে না। আরোহনের জন্তু, পোশাক পরিচ্ছদ, বাড়ি — যে কোনো জিনিসই বন্ধক দেয়া হোক না কেনো, বন্ধকাবস্থায় বন্ধক গ্রহীতা তার কোনোকিছুই ব্যবহার করতে পারবে না। বন্ধক দাতা অনুমতি দিলে ভিন্ন কথা — এটা ইমাম আজমের অভিমত।

হজরত ইমাম শাফেয়ী বলেন, রেহেন দেয়া মালের দ্বারা উপকার গ্রহণ করা রেহেন দাতার জন্য জায়েয। কেননা রসুল স. বলেছেন, রেহেনের জন্তুর উপর আরোহন করা যায় এবং দুধ দোহন করা যায়। এই হাদিস দারাকুতনী এবং হাকেম, আমাস থেকে, তিনি আবু সালেহ্ ও আবু হোরায়রা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, হাদিসটি মুআল্লাল (দুর্বল সনদযুক্ত)। বলেছেন, আমার পিতা অবশ্যই এই হাদিসকে একবার মারফু হিসেবে বলেছেন। পরে বর্ণনা করেছেন মওকুফ হিসাবে (সূত্র পরম্পরা রসুল পাক স. পর্যন্ত পৌঁছলে মারফু এবং সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছলে মওকুফ বলা হয়)। দারাকুতনী ও বায়হাকী মওকুফের পরিবর্তে মারফুকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

আমরা বলি, হাদিসটি সংক্ষিপ্ত। এখানে বন্ধক দেয়া জন্তুর উপরে আরোহন করা রেহেন দাতার জন্য হতে পারে, আবার রেহেনগ্রহীতার জন্যও হতে পারে। এখানে বরং রেহেনদাতার জন্য নাজায়েয হওয়াটাই প্রমাণিত হয়েছে।

মাসআলা ঃ রেহেনকৃত মালের উপর রেহেনদাতার অধিকার না থাকাই শরিয়তসম্মত। অধিকারের প্রমাণ পাওয়া গেলে, বুঝতে হবে — এক্ষেত্রে রেহেন গ্রহণকারীর আদেশ অথবা অনুমতি আছে। এরকম অধিকার বাতিল। কিন্তু বেচাকেনা এবং হেবার ক্ষেত্রে অধিকার বাতিল হয়না। যেমন, গোলাম আযাদ করা — এ ক্ষেত্রে বাতিলের সুযোগ নেই। মালিকানা রেহেন দাতার, তাই অধিকার রেহেনগ্রহীতার হওয়াই যুক্তিযুক্ত। রেহেন দাতা সম্পদশালী হলে আজাদ করা গোলামের সমমূল্যের মাল রেহেন গ্রহীতাকে দিবে। দরিদ্র হলে দিবে গোলামের শ্রমের সমমূল্য — বলেছেন ইমাম আজম ও ইমাম আহ্মদ। ইমাম মালেক বলেন, বেচাকেনার মতো রেহেনগ্রহণকারীর হুকুম অথবা রেহেন ছেড়ে দেয়ার উপর নির্ভরশীল থাকবে। ইমাম শাফেয়ী বলেন, রেহেনদাতা সম্পদশালী হলে সকল অবস্থাতেই তার অধিকার বলবৎ থাকবে। তাকে রেহেনকৃত মালের পরিবর্তে অন্য মাল রেহেন গ্রহণকারীর নিকট জমা রাখতে হবে। দরিদ্র রেহেন দাতার কোনো অধিকার থাকবে না।

মাসআলা ঃ রেহেন দাতা যেহেতু রেহেনকৃত বস্তুর মালিক, তাই রেহেনকৃত বস্তুর সম্পূর্ণ খরচ তাকেই বহন করতে হবে। রেহেনকৃত বস্তু থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়— যেমন, বাচ্চা, দুধ, ফল ইত্যাদি রেহেন দাতাই পাবে। রসুল স.

www.eelm.weebly.com

এরশাদ করেছেন, যা কিছু লাভ হবে, তা রেহেন দাতার এবং যা কিছু ক্ষতি হবে, তাও তারই।

বিভিন্ন বর্ণনায় বলা হয়েছে, ইমাম আহমদের মতে, রেহেনকৃত বস্তু থেকে উৎপন্ন বস্তুর মালিকানা রেহেন গ্রহণকারীর। কিন্তু অনুসন্ধান করে ইবনে জাওজী লিখেছেন, রেহেনকৃত বস্তুজাত বস্তুর মালিক রেহেন দাতাই। এটাই আসলে ইমাম আহমদের মত। তিনি আরো লিখেছেন, রেহেনগ্রহীতা রেহেনকৃত বস্তুর জন্য যদি কিছু খরচ করে, তবে তা রেহেনকৃত বস্তুর দুধ, ফসল ইত্যাদি থেকে উসুল করতে পারবে।

মাসআলা ঃ রেহেনকৃত বস্তুর মতোই রেহেনকৃত বস্তুজাত সবকিছুর অধিকার রেহেন গ্রহণকারীর থাকবে। মালিকানা থাকবে রেহেন দাতার। এজন্য রেহেনগ্রহীতা রেহেনকৃত বস্তুর জন্য কোনো খরচও করতে পারবে না, তা থেকে কোনো উপকারও গ্রহণ করতে পারবে না। করলে সুদ হবে।

মাসআলা ঃ রেহেন গ্রহণকারী যদি রেহেন দাতার হুকুমে রেহেনকৃত মালের জন্য কিছু খরচ করে, তবে তা হবে তার পাওনা। হুকুম ব্যতীত খরচ করলে, সে এক প্রকার উপকার করলো। পাওনা দাবী করতে পারবে না। ইমাম আহমদ বলেছেন, হুকুম বেহুকুম সকল অবস্থাতেই রেহেন গ্রহীতা পাওনাদার হবে। সে রেহেনকৃত বস্তুজাত জিনিস হতে তার পাওনা নিয়ে নিতে পারবে। ইবনে জাওজী এ মতের সমর্থনে — 'আরোহন করতে পারবে, দুধ দোহন করতে পারবে' — ওই হাদিসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে শা'বীর মাধ্যমে বোখারী বর্ণিত হাদিসটিকে তিনি দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। হাদিসটি এই, রসুল স. এরশাদ করেছেন, রেহেনগ্রহণকারী রেহেনকৃত বস্তুর জন্য কিছু খরচ করলে, সে তার দুধ ও সওয়ারী থেকে উপকার গ্রহণ করতে পারবে — ওই পরিমাণ, যে পরিমাণ সে খরচ করেছে।

আবু দাউদের বর্ণনায় দুধ পান করার স্থলে দুধ দোহন করার কথা রয়েছে। তাহাবী বলেছেন, আরোহী হতে ও দুধ দোহন করে পান করতে পারবে। ইবনে জাওজী আরো বলেছেন, রেহেনকৃত বস্তুজাত জিনিসের জন্য খরচ করলে সে আরোহণ করার এবং দুগ্ধবতী পশুর দুধপান করার অধিকার রাখবে। খরচের দায়িত্বও তার।

আমরা বলি, এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, রেহেনকৃত বস্তুর খরচের দায়িত্ব রেহেনগ্রহীতার। কিন্তু ঐকমত্য এই যে, খরচের দায়িত্ব রেহেন দাতার। সুতরাং বুঝতে হবে, এই হুকুম সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে ছিলো।

এই হাদিসের উদ্দেশ্য এই যে, কর্জের বিনিময়ে রেহেন রাখলে রেহেনের মাল কর্জের জিম্মাদার হিসেবে থাকে। কর্জ রেহেনকৃত মালের সমমূল্যেরও হতে পারে।

www.eelm.weebly.com

কম কিংবা বেশীও হতে পারে। রেহেনকৃত মাল বিনষ্ট হয়ে গেলে কর্জ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ওই আমানতটুকু বাকী থাকবে, যতটুকু হবে কর্জমূল্য অপেক্ষা বেশী।

মাসআলা ঃ বন্ধক দাতার মৃত্যু হলে বন্ধককৃত মাল বিক্রয় করে বন্ধক গ্রহণকারীর ঋণ পরিশোধ করা হবে। বন্ধককৃত বস্তুর উপর বন্ধক গ্রহণকারীর অধিকার থাকে বলে তার মালিকানাই এখানে অগ্রগণ্য। বন্ধকের শর্ত এরকম যে, বন্ধক দাতা কর্জ পরিশোধ করতে না পারলে বন্ধক গ্রহণকারী বন্ধককৃত বস্তু থেকে তার কর্জ উসুল করে নিবে।

মাসআলা ঃ বন্ধক থাকাবস্থায় বন্ধক গ্রহণকারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধকের মাল নষ্ট হয়ে গেলে বন্ধক গ্রহণকারীকে জরিমানা দিতে হবে — বলেছেন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক। জরিমানা অর্থ পুরাপুরি পরিশোধ হয়ে যাওয়া। এরপর বন্ধক দাতার নিকট কর্জ দাবী করলে তা হবে সুদ। ইমাম মালেকের মতে, বন্ধককৃত বস্তুর প্রচলিত বাজার মূল্য দিতে হবে বন্ধক দাতাকে। ইমাম আজমের মতে, বন্ধক গ্রহণকারীর জরিমানার পরিমাণ হবে ততটুকু, বন্ধককৃত মালের যতটুকু মূল্য হবে কর্জের তুলনায় বেশী। বাকি অংশ আমানত হিসেবে থাকবে। তাহাবী এবং হজরত ওমর রা.এর সিদ্ধান্ত এরকম। কাজী শোরাইহ্ হাসান বসরী এবং শা'বা বলেছেন, বন্ধককৃত বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে তার মূল্য কম হোক বা বেশী হোক ব্যাপারটার এখানেই নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। কারো উপরে কারো দাবী অবশিষ্ট থাকবে না।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, রেহেনের মাল আমানত। গ্রহণকারীর ভুলে নষ্ট হলে তাকে জরিমানা দিতে হবে। অন্যথায় দিতে হবে না। রসুল স. এরশাদ করেছেন, বন্ধক দাতা বন্ধকের মাল নিজের কাছে রাখতে পারে না। মাল বন্ধক গ্রহণকারীর কাছে থাকলেও মালিকানা বন্ধক দাতারই। মাল থেকে প্রাপ্ত উপকার ও ক্ষতি দু'টোই তার। ইবনে হাব্বান বলেছেন, হাদিসটি সহীহ্। দারাকুতনি এবং হাকেম জিয়াদ বিন সাআদ জুহ্রী থেকে, তিনি সাঈদ বিন মুসাইয়েব থেকে, তিনি হজরত আবু হোরায়রা থেকে মারফু হিসেবে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনি লিখেছেন, জিয়াদ বিন সাআদ হাফেজ ও সিকাহ্ ছিলেন (যে হাদিসের মধ্যে আদালত ও জব্ত পূর্ণ মাত্রায় থাকে তাকে সিকাহ্ বলে)। জিয়াদ আরো বলেছেন, হাদিসটি হাসান ও মোত্তাসিলুস্ সনদ (দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন রাবীর সনদকে হাসান বলে। আর পূর্ণ ধারাবাহিকতাসম্পন্ন হাদিসকে বলে মুত্তাসিল)। ইবনে মাজা ইসহাক বিন রাশেদ থেকে জুহ্রীর মাধ্যমে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাকেম বর্ণনা করেছেন মারফু হিসেবে বিভিন্ন নিয়মে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আওজায়ী, ইউনুস এবং ইবনে আবী জি-ব জুহ্রীর বর্ণনা থেকে, তিনি সাঈদ বিন মুসাইয়েব থেকে মুরসাল হিসেবে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

www.eelm.weebly.com

ইমাম শাফেয়ী, ইবনে আবী ফদিক ও ইবনে আবী শা'বা থেকে, তিনি ওয়াকিহ্ থেকে তিনি আবী জি-ব থেকে এবং আব্দুর রাজ্জাক, সওরীর বর্ণনা থেকে, তিনি আবী জি-ব থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ, বায্যার এবং দারা কুতনি বলেছেন, হাদিসটি মুরসাল। দারাকুতনি এবং বায়হাকী একে অন্য সনদ থেকেও উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু ওই সমস্ত সনদ দুর্বল। ইবনে হাজাম এবং দারা কুতনি শাবাবা — ওয়ারাকা — ইবনে আবী জি-ব-জুহ্রী — সাঈদ বিন মুসাইয়েব ও আবু সালমা বিন আবদুর রহমান থেকে, তিনি আবু হোরায়রা থেকে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, রেহেনকে বন্ধ করে রাখা যায় না। রেহেন, রেহেন দাতার। রেহেনের লাভও তার ক্ষতিও তার। হাদিসটিকে ইবনে হাজম হাসান, ইবনে আবদুল বার সহীহ্ এবং আবদুল হক মুত্তাসিল বলেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, এই সনদের এক রাবীর নাম আব্দ বিন নসর। তার বর্ণিত হাদিসগুলো মুনকার (অত্যধিক দুর্বল রাবীর হাদিসকে মুনকার বলে)। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এই হাদিস দৃষ্টে বোঝা যায়, বন্ধক দাতাই বন্ধককৃত মালের আসল মালিক। বন্ধক গ্রহণকারীর শুধু আবদ্ধ করে রাখার অধিকার আছে। আমরা বলি, আসল অর্থ প্রকাশিত হয়েছে ইবনে জাওজী বর্ণিত হাদিসে। তিনি ইব্রাহিম নাখয়ীর মাধ্যমে লিখেছেন, মানুষ যার নিকট বন্ধক রাখে তাকে বলে, আমি অমুক যদি কর্জ আদায় করি তবে তো ভালোই। নয়তো মাল তোমার হয়ে যাবে। অতঃপর রসুল স. বলেছেন, নির্ধারিত সময়ে বন্ধকের মূল্য পরিশোধ করা না হলেও ওই মালের উপর গ্রহণকারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাহাবীও নিজ সূত্রে ইব্রাহিম নাখয়ীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। মালেক বিন আনাস এবং সুফিয়ান বিন সাঈদও এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। মাল ভালো থাকলেও বন্ধক দাতার, নষ্ট হয়ে গেলেও বন্ধক দাতার। বন্ধককৃত মাল থেকে প্রাপ্ত সুবিধা, যেমন বাচ্চা, দুধ — এগুলোও বন্ধক দাতার। বন্ধককৃত মালের খরচ যেমন, পশুদের খানাপিনা — ইত্যাদিও বন্ধক দাতার।

আমরা জরিমানা ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেছি। দলিল ওই হাদিস যা তাহাবী ধারাবাহিকভাবে মোহাম্মদ বিন খুজাইমা থেকে, তিনি ওবায়দুল্লা বিন মোহাম্মদ তাইমি থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক থেকে, তিনি মাসআব বিন সাবেত থেকে, তিনি আতা বিন আবী রাবাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, একজন এক ঘোড়া বন্ধক নিলো এবং বন্ধক থাকাবস্থায় সেটা মরে গেলো। রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, তার হক চলে গেলো। এই হাদিসটি মুরসাল। এক্ষেত্রে মুরসাল আমাদের নিকট দলিল হিসেবে গণ্য। অর্থ এই যে, বন্ধককৃত মালের মূল্যের অতিরিক্ত অংশ কর্জ হিসেবে গণ্য হবে এবং আমানত হিসেবে থাকবে।

www.eelm.weebly.com

বন্ধক দাতা ও বন্ধক গ্রহীতা পরস্পর বিশ্বাসভাজন হলে লেখার প্রয়োজন পড়েনা। বলা হয়েছে, তারা যেনো আমানত পরস্পরকে প্রত্যর্পণ করে। হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. তাঁর এক ভাষণে বলেছেন, যার আমানতদারী নেই তার ইমান নেই এবং যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন নেই তার ধর্ম নেই। বায়হাকী।

প্রকৃত ইমানদার আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং আমানত খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকে। মুনাফিকরা এর বিপরীত। আমানত খেয়ানত করাই তাদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে সাক্ষীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এই বলে, যেনো তারা সাক্ষ্য গোপন না করে। সত্য সাক্ষ্য দিতে হবে। যার বিরুদ্ধেই যাক। যে সাক্ষ্য গোপন করে তার অন্তর অপরাধী। অন্তর হচ্ছে মানুষের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্রাট। রসুল স. এরশাদ করেছেন, মানুষের শরীরে এক টুকরো গোশত আছে। ওই গোশতখন্ডটি শুদ্ধ হলে সমস্ত শরীরই শুদ্ধ হয়ে যায়। নষ্ট হয়ে গেলে সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রাখো, ওই গোশতখন্ডটিই অন্তর (কল্‌ব)। বোখারী, মুসলিম।

এই আয়াতের শেষ কথা, 'ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালূনা আলীম' — অর্থ তোমরা যা কিছু করো তিনি সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। সাক্ষ্য দেয়া অথবা গোপন করা কোনো কিছুই তাঁর জানার বাইরে নয়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সাক্ষ্য গোপন করা হারাম। সাক্ষীকে ডাকা না হলেও নিজ উদ্যোগে সাক্ষ্য দিতে যেতে হবে। যার জন্য সাক্ষ্য প্রয়োজন সে যদি না যায়, তবুও সাক্ষীর দায়িত্ব এই যে — এ সংবাদ তাকে জানাবে। কোনো কোনো আলেম বলেন, না ডাকলে সাক্ষ্য দিতে যাওয়া ভালো নয়। হজরত ইমরান বিন হোসাইন বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ। এরপর সাহাবীদের যুগ। তারপর তাবেয়ীদের যুগ। এরপর এমন যুগ আসবে যে যুগের মানুষেরা বিনা ডাকে সাক্ষ্য দিতে যাবে। তারা আমানতদার হবে না। মান্নত পুরা করবে না। সাধারণত তারা হবে ধোঁকাবাজ। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, প্রয়োজন না পড়লেও তারা কসম খাবে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার সাহাবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো। এরা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। তার পরের মর্যাদা ওই সমস্ত মানুষের, যারা তাদের ঘনিষ্ঠতম। এর পরের মর্যাদা তাদের নিকটতম জনদের। এরপর মিথ্যার বিস্তৃতি ঘটবে। এমনকি মানুষ অপ্রয়োজনে কসম খাবে এবং বিনা আহ্বানে সাক্ষ্য দেবে। নাসাঈ। এই হাদিসের সনদ সহীহ্‌। হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এরকম বর্ণনা রয়েছে। হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনা এরকম, তাদের সাক্ষ্য কসমের আগে এবং কসম সাক্ষ্যের আগে হবে।

আমরা বলি, মন্দ সাক্ষী অর্থ মিথ্যা সাক্ষী। শেষ দিকের অবস্থা হবে এরকম — আমানতের খেয়ানত, মিথ্যা কসম, মান্নত অমান্য এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ।

www.eelm.weebly.com

অন্যদিকে তাহাবী, মালেকের মাধ্যমে হজরত জায়েদ বিন খালেদ জেহেনীর বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন এভাবে, রসুল স. বলেছেন, শোনো, উত্তম সাক্ষী কে। উত্তম সাক্ষী ওই ব্যক্তি যে প্রয়োজনের আগেই সাক্ষ্য দেয় অথবা সাক্ষ্য তলব করার আগেই নিজের সাক্ষী হওয়ার সংবাদ জানিয়ে দেয়।

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৮৪

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

❐ আসমান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহেরই। তোমাদের মনে যাহা আছে তাহা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ আল্লাহ্ উহার হিসাব তোমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন। অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে খুশী শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

কোনো কোনো আলেম বলেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকল বস্তুর অবয়ব আছে। কোনো সৃষ্ট বস্তুই অবয়বহীন নয়। নিরাবয়ব কোনো কিছুর মালিকানা দাবী করা দুস্কর। তাই এই আয়াতের শুরুতেই আকাশ ও পৃথিবীর সকল শরীরবিশিষ্ট সৃষ্টির মালিকানা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এই দলিল ভুল। সকল সৃষ্টি শরীরবিশিষ্ট নয়। শরীরহীন সৃষ্টিও রয়েছে অনেক। যেমন, রূহ সমূহ, ফেরেশতা ইত্যাদি। তারা কি জানেন না, রূহ, সের, খফি, আখফা — এ সমস্ত কিছুই আকারবিহীন। আল্লাহ্তায়ালাই জানেন তার সাকার ও নিরাকার সৃষ্টির সংখ্যা কতো। এই আয়াতে কেবল আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে দৃশ্যমান সৃষ্টবস্তু সমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সকলের দৃষ্টি এসবের প্রতি নিবদ্ধ। তাই সৃষ্টির অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য এই উল্লেখকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। আরশ কুরসীর কথাও এখানে বলা হয়নি। কারণ, এগুলো আকাশ ও পৃথিবীর সীমাভূত নয়। এগুলোর অস্তিত্ব সর্বসাধারণের দৃষ্টিবহির্ভূত। আল্লাহ্তায়ালা অন্তর বাহির সবই জানেন। মানুষের বাইরের দোষ তবু দেখা যায়। অন্তরের দোষ দেখা যায়না। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা সবকিছুই দেখেন। অন্যায় চিন্তা, পৃথিবীপ্রীতি, রোষ, অহংবোধ, কামনাবাসনা, লোভ, নৈরাশ্য, ধৈর্যচ্যুতি, পরশ্রীকাতরতা — এ সমস্ত হচ্ছে অন্তরের ব্যাধি।

www.eelm.weebly.com

হজরত জুবাইর বিন মুতঈম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, ওই ব্যক্তি আমার উম্মত নয়, যে অন্তরে মূর্খতার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে অথবা আক্ষেপ করে। আবু দাউদ।

হজরত হারেসা বিন ওহাব বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জানাবোনা বেহেশতী কে? বেহেশতী ওই ব্যক্তি যে তোমাদের দৃষ্টিতে দুর্বল। সে আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করে কসম করলে, আল্লাহ্তায়ালা কসম পূর্ণ করে দেন। তিনি স. আরো বলেছেন, আমি কি তোমাদের বলবোনা, দোজখবাসী কে? দোজখবাসী ওই ব্যক্তি যে দাম্ভিক। বোখারী , মুসলিম।

হাসান বসরী মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, পৃথিবীপ্রেম সমস্ত পাপের অগ্রণী। বায়হাকী।

হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আবুবকর ও ওমরের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করাই ইমান। এবং তাদের প্রতি হিংসা পোষণ করা মুনাফিকী। ইবনে আদী।

হজরত জাবের মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবুবকর ও হজরত ওমরকে ভালোবাসা ইমানের অঙ্গ। তাদেরকে হিংসা করা কুফরী। আনসারদেরকে মহব্বত করা ইমান এবং তাদের সাথে হিংসা রাখা কুফরী। আরবদের সাথে মহব্বত রাখা ইমানের নিদর্শন এবং তাদের সাথে শত্রুতা করা কুফরী। যে আমার সাহাবাকে গালি দিবে, তার উপর আল্লাহ্র লানত। আর যে আমার ভালোবাসার কারণে তাদেরকে ভালোবাসবে, কিয়ামতের দিন আমি তার সাথে উত্তম আচরণ করবো। ইবনে আসাকের।

হজরত রসুল স. এরশাদ করেছেন, আলীকে ভালোবাসা ইবাদত। হজরত আলী বলেছেন, যিনি বীজ থেকে সবুজ ঘাস সৃষ্টি করেন এবং জীবনবিশিষ্ট অস্তিত্বের সৃজন নিশ্চিত করেন, ওই জাতের কসম দিয়ে বলছি, আমাকে রসুল স. জানিয়েছেন, ইমানদার ছাড়া অন্য কেউ তোমাকে ভালোবাসতে পারেনা এবং মুনাফিক ছাড়া অন্য কেউ তোমার শত্রু হতে পারে না। মুসলিম।

হজরত আলী আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তোমার দৃষ্টান্ত হজরত ঈসা নবীর মতো। ইহুদীরা শত্রুতাবশতঃ তাঁর জননীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে। অপর দিকে খৃষ্টানেরা অতি ভালোবাসার কারণে তাঁকে এমন মর্যাদায় পৌঁছিয়েছে, যা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। (অর্থাৎ তারা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলেছে)। এই হাদিস বর্ণনা করার পর হজরত আলী বলেছেন, আমার কারণে দু'ধরনের মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। একদল ধ্বংস হবে সীমাতিরিক্ত ভালবাসার কারণে, আরেক দল ধ্বংস হবে হিংসাজাত শত্রুতার কারণে। আহমদ।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, অহংকার আমার উত্তরীয় এবং মহত্ত্ব আমার পরিধেয় — যে ব্যক্তি এগুলো ছিনিয়ে নিতে চাইবে, আমি তাকে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করাবো। মুসলিম।

হজরত আতিয়া, সায়দীর মারফু বিবরণে বলেছেন, রাগ শয়তানের প্রভাবে হয়ে থাকে। আবু দাউদ।

বাহাস বিন হাকিম তার দাদার মাধ্যমে হাকেমের মারফু বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, রাগ ইমানকে এইভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়, যেমন মুসাব্বার নষ্ট করে মধুকে। বায়হাকী।

আমর বিন শোয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদার মারফু বিবরণ দিয়েছেন এভাবে, এই উম্মতের প্রথম প্রাপ্তি বিশ্বাস এবং দুনিয়াবিমুখতা এবং প্রথম ক্ষতি কার্পণ্য ও কামনা। বায়হাকী।

হজরত সা'দ বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্র সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা সৌভাগ্য এবং অসন্তুষ্ট থাকা হতভাগ্যতা। আহমদ, তিরমিজি।

হজরত মুআজ বিন জাবালের মারফু বর্ণনায় আছে, শাবান মাসের পনের তারিখের রাতে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং শিরিক ও পরশ্রীকাতরতা ব্যতীত অন্য সকল গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন। দারা কুতনি।

ভালো ও মন্দের নির্দেশ করে উপরোক্ত হাদিসগুলো বর্ণিত হলো। এই আয়াতের তাফসীর শা'বী ও ইকরামা এভাবে করেছেন, অন্যের দোষ প্রকাশ করার ইচ্ছা তোমাদের অন্তরে উদয় হলে তা স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশ কোর না। আল্লাহ্তায়ালাই হিসাব গ্রহণকারী। মুকাতিল তাফসীর করেছেন এভাবে — কাফেরের সঙ্গে বন্ধুত্বের বাসনা অন্তরে জাগ্রত হলে, একে প্রকাশ করো অথবা গোপন করো — আল্লাহ্ তার হিসাব গ্রহণ করবেন। এই আয়াতে এই ইঙ্গিতই রয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, 'মা ফী আনফুসিকুম' এর উদ্দেশ্য, পাপ কাজের নিশ্চিত সংকল্প। আবদুল্লাহ্ বিন মোবারক সুফিয়ান সওরীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, অন্তরের ইচ্ছার হিসাবও কি আল্লাহ্তায়ালা গ্রহণ করবেন? তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। যদি ইচ্ছা দৃঢ়সংকল্পের রূপ পরিগ্রহ করে।

আমরা বলি, দৃঢ় সংকল্প, সংকল্পই। এই পাপ অন্তরের পাপ রূপে গণ্য। যদিও ভিতর ও বাহিরের সব পাপের হিসাব গ্রহণ করা উচিত, তবুও সহীহ্ হাদিসে এসেছে রসুল স. এরশাদ করেছেন, পাপধারণা অন্তরে লালন করলেও তা কার্যে রূপ না দেয়া পর্যন্ত লেখা হবে না। লেখা হবে ততটুকুই যতটুকু সে আমল করে।

কিয়ামতের হিসাব সত্য। আল্লাহ্তায়ালা যাকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করবেন, তার হিসাব গ্রহণ করবেন সহজভাবে। আর যাকে শাস্তি দিবেন, তার হিসাব করে

www.eelm.weebly.com

দেবেন কঠিন। কারণ, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর শাস্তি ও ক্ষমার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করবে, এমন সাধ্য কার? ছোট পাপের কারণে শাস্তি এবং বড় পাপের কারণে ক্ষমা নির্ধারণ করতে তিনি পূর্ণ স্বাধীন।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য এই যে, জ্ঞানের দাবী অনুযায়ী বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ছোট ও বড় সকল গোনাহ্র জন্য শাস্তি নির্ধারিত হওয়াই সমীচীন। কিন্তু এরকম করতে আল্লাহ্তায়ালা বাধ্য নন।

মোতাজিলা ও রাফেজী সম্প্রদায় পরকালের হিসাব বিশ্বাস করে না। মোতাজিলারা বলে, পাপের শাস্তি দেয়া বাধ্যতামূলক।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি আরজ করলাম, আল্লাহ্তায়ালা কি বলেননি, 'তবে তার নিকট থেকে সহজ হিসাব নেয়া হবে।' রসুল স. এরশাদ করলেন, তখনতো শুধু উপস্থিতিই হবে। কিন্তু যার হিসাব বারবার হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বিশ্বাসী বান্দাকে অতি নিকটে রাখবেন। আপন হাতে ঢেকে রাখবেন তাকে। বলবেন, তোমার ওই গোনাহ্র কথা কি মনে আছে, ওই পাপের কথা কি স্মরণ আছে? বান্দা আরজ করবে, হে আমার আল্লাহ্! আমার মনে আছে। পাপের স্বীকৃতি দানের পর সে ভাববে আমি তো ধ্বংস হয়ে গেলাম। আল্লাহ্ বলবেন, পৃথিবীতে আমি তোমার পাপ গোপন রেখেছিলাম (তোমাকে লজ্জিত করি নাই) আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। এরপর তার হাতে দেয়া হবে উত্তম আমলনামা। আর কাফের এবং মুনাফিকের হিসাব নিকাশের পর বলা হবে, 'এরা ওই লোক যারা তাদের প্রতিপালকের উপর মিথ্যারোপ করেছিলো। জেনে নাও, এমন জালেমের উপর আল্লাহ্র লানত।' বোখারী, মুসলিম।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসুল স. এর নিকট নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার কতিপয় গোলাম আছে। তারা আমার সাথে মিথ্যা বলে, আমার সম্পদ নষ্ট করে এবং অবাধ্যতা করে। আমি তাদেরকে গাল দেই এবং প্রহার করি। এরকম আচরণ সঙ্গত কি? রসুল স. বললেন, কিয়ামতের দিনে তাদের মিথ্যা, খেয়ানত, নাফরমানী এবং তোমার শাস্তির হিসাব নেয়া হবে। তোমার শাস্তি তাদের ভুলের সমান হলে, ব্যাপারটা মিটে যাবে তখনই। এতে করে তোমার উপকারও হবেনা, ক্ষতিও হবে না। শাস্তি ভুলের চেয়ে কম হলে তোমার উপকার হবে (যে গোনার শাস্তি তুমি দাওনি তার সওয়াব পাবে) আর যদি শাস্তি ভুলের চেয়ে বেশী হয়, তবে বেশীর বিনিময় তোমার কাছ থেকে নিয়ে তাদেরকে দেয়া হবে। তিরমিজি।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো মানুষ বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার প্রতিপালক আমাকে কথা দিয়েছেন, তিনি আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষকে হিসাব কিতাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাদের প্রত্যেকের সাথে আরো সত্তর হাজার করে মানুষ থাকবে। তারাও জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পাবে। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করার পর একজন আহ্বানকারী দাঁড়িয়ে বলবে, ওই লোকেরা কোথায়? যাদের বাহু পোষাক সংলগ্ন নয়। — এই আহ্বান শুনে অল্পসংখ্যক লোক দাঁড়িয়ে যাবে। তাদেরকে হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। অবশিষ্ট মানুষকে হিসাবের জন্য প্রস্তুত করা হবে। বায়হাকী।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুলে পাক স. এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের সত্তুর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ওই সমস্ত লোক যারা ঝাড়ফুক করেনি, নজর নেয়াজ নেয়নি, আল্লাহ্ই ছিলেন তাদের নির্ভরতা। বোখারী, মুসলিম।

আমার বক্তব্য এই যে, কোরআন ও হাদিসের বর্ণনায় বোঝা যায়, বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারীরা হবে তাসাউফপন্থী। কারণ তারা আল্লাহ্প্রেমিক। এই আয়াতের নির্দেশনা প্রকাশ্য, গোপন দুই দিকের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। দু'টি দিকই হিসাবের আওতাভূত। বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলের হিসাব নেয়া হবে। সরাসরি নফসের হিসাব নেয়া হবে না। তবুও নফসের প্রতিক্রিয়া হবে ভয়াবহ ও কঠিন। কারণ মূল দোষ তারই। শরীরের বিভিন্ন অংশের গোনাহ্ তার সিদ্ধান্তেই সাধিত হয়েছে। নফসের পরিশুদ্ধি এবং কলবের পবিত্রতা অর্জিত হওয়ার পর গোনাহ্র আমল হয় খুব কম — এজন্যই বাতেনী গোনাহ্র হিসাবের কথা বলা হয়েছে। কলবের পবিত্রতার উপর শারীরিক পবিত্রতা নির্ভরশীল — এ সম্পর্কীয় হাদিসটি ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

নফস ও কলবের পরিচ্ছন্নতা ও প্রশান্তি অর্জিত হওয়ার পরও কোনো কোনো সময়ে হঠাৎ গোনাহ্ হয়ে যাওয়া সম্ভব। এরকম হলে তাৎক্ষণিক অনুতাপ, লজ্জা ও তওবার মাধ্যমে গোনাহ্র সংশোধন হয়। এমনকি গোনাহ্গুলোকে পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেয়া হয়। আল্লাহ্ গফূরুর রহীম।

হজরত ইবনে মাসউদ মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন, গোনাহ্ থেকে তওবাকারী গোনাহ্হীনের মতো। ইবনে মাজা, বায়হাকী।

শরহে সুন্নায় হজরত ইবনে মাসউদের মওকুফ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, গোনাহ্র জন্য অনুতপ্ত হওয়াই তওবা।

www.eelm.weebly.com

সুফী বলে ওই সমস্ত মানুষকে, যাদেরকে হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে ফোকারা ও মোমেনীন নামে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমিই প্রথম জান্নাতের দরোজার শিকল নাড়াবো। জান্নাতের দরোজা প্রথম খুলে দেয়া হবে আমার জন্যই। আমি প্রবেশ করবো — ঐ সময় আমার সঙ্গে থাকবে ফকির ও মোমেনীন। আমার এই কথা গৌরববিমুক্ত।

যার কিছুই নেই তাকে বলে ফকির। সুফীদের কিছুই থাকে না। তাঁরা তাঁদের অস্তিত্বকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুকূলে উৎসর্গ করে দেন। উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ্‌প্রাপ্তি। প্রবৃত্তির পীড়া এবং গোপন পাপ তাঁদেরকে ছেড়ে চলে যায়। তাঁরাই পূর্ণ মানুষ। কামালত বা পূর্ণতাকে তাঁরা ভাবেন আল্লাহ্‌র আমানত এবং অনুগ্রহমন্ডিত বৈভব। তাঁরা তাঁদের প্রত্যেক পুণ্য কাজের সম্পর্ক দেখেন আল্লাহ্‌র দিক থেকে। এজন্য পুণ্য লাভ করার পর তাঁরা আত্মগৌরবের শিকার হননা। উল্লেখিত হাদিসে রসুল স. সত্তর হাজার উম্মতের বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করার কথা বলার পর, আরো বলেছেন, ওই লোকদের প্রত্যেকের সঙ্গে আরো সত্তর হাজার লোক থাকবে। অর্থাৎ তাঁরা কামেল এবং অন্যদের কামেল হওয়ার পথ প্রদর্শক। তাঁরা আম্বিয়া, আউলিয়া, মোর্শেদ। তাঁদের প্রত্যেকের সাথে যে সত্তুর হাজার মানুষেরা থাকবে তাঁরা ওলামায়ে রাসেখীন, আউলিয়া, সিদ্দিকীন এবং সালেহীন। প্রথম দল পথ-প্রদর্শক এবং মোর্শেদ। প্রথম দল কামেলদের। এবং দ্বিতীয় দল যাঁদেরকে কামেল বানানো হয়েছে তাঁদের। এরপর তিনদল লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে। একদল হবে আল্লাহর রাস্তায় জীবন দানকারী শহীদদের। দ্বিতীয় দল হবে তাঁরা যাঁরা আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য সমস্ত জীবন সত্যানুসরণের কাজে ব্যয় করছে। তাঁরা এমন মুরিদের দল — যাঁরা সম্পর্ক স্থাপন করেছেন কামেলীন ও মোকাম্মেলীনদের সঙ্গে। তৃতীয় দল তাঁরা, যাঁরা আল্লাহর সন্তোষার্থে তাঁদের সম্পদ ব্যয় করেছেন।এই দল প্রথম ও দ্বিতীয় দলের অনুসারী।

আল্লাহ্‌নির্ভরতা সুফীদের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। তাঁদের গভীর রাতের জিকির ও ইবাদত বাহ্যিক নিদর্শনস্বরূপ।

বোখারী, মুসলিম এবং ইমাম আহমদ হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনা থেকে এবং মুসলিম ও অন্যান্যরা হজরত ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ করেছেন যে, 'তোমাদের মনে যাহা আছে তাহা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ আল্লাহ উহার হিসাব তোমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন।' — এই আয়াত নাজিল হলে সাহাবীগণ খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। ব্যাপারটি তাঁদের কাছে কঠিন মনে হতে লাগলো। তাঁরা নতজানু হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনার নির্দেশিত নামাজ, রোজা, জেহাদ এবং দান খয়রাত পালন করার শক্তি আমাদের আছে। কিন্তু সদ্য অবতীর্ণ এই আয়াত সহ্য করার শক্তি আমাদের নাই। রসুল স.

www.eelm.weebly.com

বললেন, তোমরা যে পূর্বের উম্মতের মতো কথা বলতে শুরু করেছো। তারা বলেছিলো, 'আমরা শুনলাম। কিন্তু আমল করতে পারবোনা।' এমন কথা বোল না। বরং এ রকম বলো, 'তারা সকলে বললো—আমরা শুনলাম এবং সানন্দে আনুগত্য স্বীকার করলাম্, আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' এরপর সাহাবীগণ এই আয়াত বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিচের আয়াতটি।

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৮৫

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

❑ রসুল, তাহার প্রতি তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং বিশ্বাসীগণও। তাহাদের সকলে আল্লাহে, তাঁহার ফেরেশতাগণে, তাঁহার কিতাবসমূহে এবং তাঁহার রসুলগণে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। তাহারা বলে, 'আমরা তাহার রসুলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না' আর তাহারা বলে, 'আমরা শুনিয়াছি এবং পালন করিয়াছি! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট।'

আমি বলি, পূর্ববর্তী আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর যখন সাহাবীগণ বুঝলেন, আল্লাহ নফসের ভুলেরও (ওয়াসওয়াসা) হিসাব গ্রহণ করবেন, তখন তাঁরা নফসের কুমন্ত্রণার সঙ্গে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত দেখতে পেয়ে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলেন। রসুল স. তখন তাঁদেরকে তসলীম, রেজা এবং তাওয়াক্কুলের উপায় বলে দিলেন। নফসে মোতমাইন্নার বৈশিষ্ট্য এরকমই। আল্লাহতায়ালা তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিলেন এই বলে যে, তোমাদের ইমান সত্য। নিয়তও বিশুদ্ধ। তোমাদের নফস পবিত্র এবং অন্তরও পরিচ্ছন্ন। অপবিত্র নফস পবিত্র করা ইমানের দাবী। এই আয়াতে সাহাবীগণ যে মুমিন তার সাক্ষ্য দিয়েছেন আল্লাহ্ পাক। এখানে ইমান অর্থ পূর্ণ (কামেল) ইমান। নফসের দোষত্রুটি ফানা হয়ে যাওয়াই পূর্ণ ইমানের চাহিদা। এই আয়াতে বিশ্বাসীগণ বলতে সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে। তখন মুমিন ছিলেন তাঁরাই। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে নবী, আল্লাহ্ই আপনার ও

www.eelm.weebly.com

বিশ্বাসীদের জন্য যথেষ্ট।' এখানেও বিশ্বাসীগণের অর্থ সাহাবায়ে কেরাম। অবশিষ্টরা হচ্ছেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভূত। তাঁদের ইমান সাহাবীদের ইমানের মতো। তাদের আমলও সাহাবীদের আমলের মতো।

রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, বনি ইসরাইলরা ছিলো বাহাত্তর দলে বিভক্ত। আর আমার উম্মতেরা বিভক্ত হবে তিয়াত্তর দলে। একদল ছাড়া অন্য সব দলগুলো হবে জাহান্নামী। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল! নাজাতপ্রাপ্ত দল কোনটি! তিনি স. বললেন, যে দল হবে আমার এবং আমার সাহাবীদের অনুসারী।

আয়াতের প্রথমে রসুলের বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। পরে বলা হয়েছে 'এবং বিশ্বাসীগণ'। বোঝা যায় রসুলের ইমান প্রত্যক্ষ। সাহাবা ও অন্যদের ইমান তাঁর মাধ্যমে পরোক্ষ। রসুলের ইমান চাক্ষুস দর্শনভিত্তিক। আর অন্যদের ইমান দলিল — প্রমাণ নির্ভর।

বিশ্বাস্য বিষয় সমূহ হচ্ছে, আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রসুলগণ। নবী ও রসুলগণের ব্যাপারে ইমানের বিশেষ ঘোষণা এই যে, 'আমরা তাঁর রসুলগণের মধ্যে তারতম্য করি না।' অর্থাৎ আমরা তাঁদের কারো প্রতি ইমান রাখি কারো প্রতি রাখিনা — এরকম নয়। সকলের প্রতিই আমাদের বিশ্বাস আছে। ইহুদীরা বলতো, আমরা কারো প্রতি ইমান রাখি কারো প্রতি রাখি না। এ রকম কথায় ইমান থাকে না।

আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি — এ রকম কথা পূর্ণ ইমানের নির্দশন। বাগবী হজরত জাবেরের মাধ্যমে বর্ণনা করেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত জিব্রাইল রসুল স. কে বললেন, আল্লাহ আপনার ও আপনার উম্মতের প্রশংসা করেছেন। আপনি আল্লাহর নিকট কিছু যাঞ্চা করুন। আপনার প্রার্থনা গৃহীত হবে। রসুল স. নিবেদন জানালেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই। আর প্রত্যাবর্তন তো তোমার দিকেই। 'প্রত্যাবর্তন' শব্দটিতে হাশরের স্বীকৃতি রয়েছে। সুতরাং আখেরাতের বিশ্বাসও ইমানের অন্তর্ভূত।

সামি'না (আমরা শুনেছি) সাহাবা কেরামের এই কথাটি ছিলো এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে। পরে আল্লাহতায়ালা তাঁর কালামে এই শব্দের উদ্ধৃতি দিয়ে সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করেছেন — এই ব্যাখ্যাই সঠিক।

www.eelm.weebly.com

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ٙ وَاغْفِرْ لَنَا ٙ وَارْحَمْنَا ٙ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۟

❑ আল্লাহ্ কাহারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যাহা তাহার সাধ্যাতীত। সে ভাল যাহা উপার্জন করে তাহা তাহারই এবং সে মন্দ যাহা উপার্জন করে তাহাও তাহারই। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদিগকে অপরাধী করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করিও না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে জয়যুক্ত কর।

আল্লাহ্ কাউকে আদেশ পালনে বাধ্য করেন না। তাঁর হুকুম প্রতিপালন অবশ্যই মানুষের সাধ্যভূত।

জ্ঞাতব্য ঃ আশায়েরাদের মত এই যে, কোরআন মজীদে করা অসম্ভব এমন কোনো আমলের হুকুম দেয়া হয়নি। বোবাকে কথা বলতে বলা, পঙ্গুকে হাঁটতে বলা, উন্মাদকে চৈতন্যোদয়ের নির্দেশ দেয়া — এ রকম অসম্ভব হুকুম কোরআনে নেই। যেমন, যারা সম্পদশালী নয় তাদেরকে জাকাত দিতে বলা হয়নি। আল্লাহ্র আহকাম প্রয়োজন নির্ভর নয়। তাঁর হুকুম পালন করা না করার প্রয়োজন থেকে পবিত্র (বায়যাবী)। এজন্য মানুষকে অসম্ভব কাজের হুকুম যদি দেয়াও হয়, তবু তাকে জ্ঞানবিরুদ্ধ বলা যাবে না। সাধ্য থাকলে করবে, অন্যথায় করবে না। সকল অবস্থায় হুকুম, হুকুমই থাকবে।

www.eelm.weebly.com

মানুষ তার প্রকৃতিগত স্বভাবের উপরই দাঁড়িয়ে থাকে। আমলের নির্দেশ আসে পরে। প্রকৃতিগত স্বভাব অবস্থান নেয় হুকুমের পক্ষে আবার কখনো বিপক্ষে। হজরত নূহ আ. এর সম্প্রদায়, ফেরাউন, আবু জেহেল এবং আবু লাহাব দাঁড়িয়ে ছিলো আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে। তাদেরকে উল্লেখ করে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাদের অন্তরে ঔদাসীন্যের মোহর এবং চোখে মূর্খতার যবনিকা স্থাপন করেছেন। বলেছেন, তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। কোরআন ওই ব্যক্তিকে হেদায়েত দান করবে যে প্রকৃত পথান্বেষী। হেদায়েত লাভ করতে যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছু মানুষকে দেয়া হয়েছে। যেমন, দৃষ্টির জন্য চোখ, শ্রুতির জন্য কান, বুঝবার জন্য মস্তিষ্ক। নবী রসুলগণের মাধ্যমে হেদায়েতের আহবান জানানো হয়েছে। তাঁরা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন। মানুষকে স্থাপন করেছেন তাঁদের আহবানের পরিসরে। এখন, যে চায় সে সোজা পথে চলতে পারে আর যে চায় না, সে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমাদের কোনো ইচ্ছা নেই।' আল্লাহর ইচ্ছা মানুষের আয়ত্তের অতীত। মানুষের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা সহজ নয়। একে তওফিকে এলাহি বলে।

জ্ঞাতব্য ঃ তাফসীরকার লিখেছেন, শক্তি ও ফিতরত আসলে দু'টি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য। এ সবের ভিত্তিতে মানুষ কাজ করে। বান্দার কাজের ক্ষমতা তার স্বভাবজ ব্যাপার। কিন্তু জমহুরের মতে, ক্ষমতা কার্য সম্পাদনের জন্য শর্ত নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বান্দা কোনো কাজের ইচ্ছা করলে তার যোগ্যতার ভিত্তিতে আল্লাহ্তায়ালাই ক্ষমতা দান করেন। ফলে সে ভালো অথবা মন্দ কাজ করে থাকে। এই ক্ষমতাদান অবিলম্বে হওয়াই সমীচীন। না হলে তা হবে জড় পদার্থতুল্য। ক্ষমতাদানের অর্থ দু'রকম। প্রথমত কেবল যোগ্যতা ও সম্ভাবনা — যা দেয়া হয় প্রথমেই। এই ক্ষমতা অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয় প্রকার ক্ষমতাদানকে বলে তওফীক। এই দ্বিতীয়টি প্রথমটির সঙ্গে সংযোজিত হলেই কার্য সুস্পষ্ট হয়।

মোতাজিলারা বলে, যোগ্যতা প্রদর্শনের ক্ষমতা মানুষের মধ্যে থাকে প্রথম থেকেই। কাজের সময় ক্ষমতা সংযোজন হয় না। এ রকম হলে, ক্ষমতা ও কাজ একত্রিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়। কেননা শক্তি লাভ হয় যোগ্যতা অনুসারে। আর কাজ প্রকাশ্য ব্যাপার। এই ধারণার ভিত্তিতে মোতাজিলাদের বিশ্বাস জন্মেছে, বান্দারা নিজেরাই তাদের কাজের স্রষ্টা। তাদের ধারণা ভ্রান্ত ও ঐকমত্যবিরোধী।

বিষয়টি জটিল। সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম। এই স্থানে চিন্তাভাবনাকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেয়া সমীচীন নয়। আল্লাহ্তায়ালার কথা বিশ্বাস করার নামই ইমান। বুঝতে পারার জ্ঞান হচ্ছে অতিরিক্ত সংযোজন। বিশ্বাস রাখতে হবে—বুঝতে পারলেও না পারলেও। সুতরাং নীরবতাই শ্রেয়।

www.eelm.weebly.com

বোখারী ও মুসলিম, হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াত যখন সাহাবীদের কাছে অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হচ্ছিলো, তখন রসুল পাক স. তাঁদেরকে বলতে বলেছিলেন, 'আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি।' এরপর আল্লাহ্তায়ালা, 'কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না' এই আয়াত অবতীর্ণ করে পূর্ববর্তী আয়াতটি রহিত করে দেন।

আমি বলি, হজরত আবু হোরায়রা রহিত বলেছেন রূপক হিসাবে। কেননা রহিতকরণ প্রকৃত পক্ষে হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। রহিতকরণের অর্থ নতুন হুকুমের প্রবর্তনার মাধ্যমে পূর্বের হুকুমকে অকার্যকর ঘোষণা করা। বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত ঘোষণায় সে রকম সুযোগ নেই। আলোচ্য দু'টি আয়াতই বিজ্ঞপ্তি বিষয়ক। প্রথম আয়াতে অন্তরের গোনাহ্র জিজ্ঞাসাবাদের সংবাদ দেয়া হয়েছে। এবং পরের আয়াতে দেয়া হয়েছে, সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ না করার সংবাদ। তাই এখানে রহিতকরণ প্রসঙ্গ আসে না।

বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত হলেও অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এই আয়াতকে হুকুম সংক্রান্ত বলার অবকাশও আছে। কারণ, পরোক্ষভাবে নফসের অপবিত্রতা যে হারাম এ কথা এখানে বোঝা যায়। যেমন অন্যত্র উল্লেখিত, 'তোমাদের উপর সওম বা রোজা ফরজ করা হয়েছে।' — এই আয়াত বিজ্ঞপ্তি হওয়া সত্ত্বেও রোজার হুকুম ফরজ হওয়ার প্রমাণ। অতএব, 'আর যা তোমাদের অন্তরে তা প্রকাশ করো বা গোপন রাখো তার হিসাব আল্লাহতায়ালা তোমাদের কাছ থেকে নিবেন' এই আয়াতটিও বিজ্ঞপ্তি হওয়ার সাথে সাথে নফসের অপবিত্রতা হারামের হুকুমটিকেও প্রমাণ করছে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, অন্তরের কুমন্ত্রণা কথা ও কাজে রূপ না নেয়া পর্যন্ত পাপ বলে গণ্য হবে না। আল্লাহতায়ালা এই উম্মতের জন্য এটা ক্ষমা করে দিয়েছেন। বোখারী, মুসলিম।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, আতা এবং অধিকাংশ তাফসীরকারদের নিকট, 'তোমাদের মনে যা আছে......'এই আয়াতে অন্তরের কুমন্ত্রণার কথাই বলা হয়েছে। আমি বলি, দু'টি আয়াতের হুকুমই সাধারণ। অবশ্য নফসের অপবিত্রতার বিশেষ হুকুমও এতে শামিল আছে। আর এই বিশেষ হুকুমটি রহিত হয়েছে ধরা যায়।

জ্ঞাতব্য ঃ যখন প্রমাণিত হলো, নফসের অপবিত্রতার হিসাব শারীরিক আমলের হিসাবের চেয়ে কঠিন এবং সাধ্যতীত দায়িত্ব মানুষকে অর্পণ করা হবে না, তখন বান্দার তো উচিত হবে, অন্তরের কুমন্ত্রণাসমূহ দূর করার চেষ্টায় রত থাকা এবং কামনা বাসনার অনুসারী না হওয়া। অপবিত্রতা দুর করার জন্য যারা সুফীদের (হক্কানী পীর মোর্শেদের) সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখার চেষ্টায় রত থাকে,

www.eelm.weebly.com

আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তাদের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দিবেন। হিসাব নিবেন না। কেননা, তারা সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। সাধ্যতীত বিষয় তো আল্লাহতায়ালা ধরবেনই না। পক্ষান্তরে যারা উদাসীনতার বশবর্তী হয়ে এ রকম চেষ্টা সাধনা থেকে বিমুখ থাকবে, তারা অবশ্যই দোজখে যাবে।

প্রমাণিত হলো যে, সুফীগণের তরিকায় চলা, ফকির দরবেশদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা ফরজ। যেমন ফরজ আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত এবং তার আহকাম শিক্ষা করা। রসুলে পাক স. এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, কিতাবুল্লাহ ও আহলে বাইত (বংশধর)। অতঃপর আল্লাহর কিতাবের হুকুম মেনে চলা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহর কালামকে আশ্রয় করা জরুরী। সাথে সাথে আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভার্থে বিশুদ্ধ অন্তর এবং প্রশান্ত প্রবৃত্তি অর্জনের জন্য রসুল স. এর বংশধরদের (রুহানী ও জিসমানী) সাথে সম্পর্ক রাখাও জরুরী।

আয়াতে ভালো ও মন্দ উভয় প্রকার আমল সম্পর্কে বলা হয়েছে। ভালো মন্দের প্রতিফল আমলকারীই পাবে। 'কাসাব' শব্দের অর্থ অর্জন বা উপার্জন। পূণ্য কাজের দিকে প্রবৃত্তির আকর্ষণ থাকে কম। সেই জন্য ভালো কাজের জন্য কাসাব (অর্জন) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ শ্রমসাধ্য কাজের বিনিময়কেই অর্জন বা উপার্জন বলা যেতে পারে। অপরদিকে মন্দ কাজের ক্ষেত্রে 'আকসাব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আকসাব অর্থ নিজের জন্য কোনো কাজ করা। নিষিদ্ধ কাজের দিকে স্বভাবগতভাবেই মানুষ আকর্ষণ বোধ করে। তাই ভালো কাজ অপেক্ষা মন্দ কাজ সহজসাধ্য। কাসাব ও আকসাব শব্দ দু'টি শ্রমসাধ্য ও সহজসাধ্য কাজের পার্থক্যকে এখানে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

শেষ প্রার্থনায় বলা হয়েছে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ভুল করলে, তুমি আমাদেরকে অপরাধী কোর না — অর্থাৎ বিস্মৃতিবশত কোনো অপরিহার্য নির্দেশ যদি লংঘন করি কিংবা উন্নাসিকতার প্রভাবে কোনো কাজ সুষ্ঠু সম্পাদনে যদি ত্রুটি করি তবে তুমি তা উপক্ষা কোর।

গোনাহ্ বিষ তুল্য। ভুল করে পান করলেও যার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। গোনাহ্ শাস্তি ডেকে আনে। অন্তরকে করে কালিমালিপ্ত। হজরত শেখ শহীদ তাঁর শায়েখ নুর মোহাম্মদ বদায়ুনী সম্পর্কে বলেছেন, শায়েখ বদায়ুনীর নিকট আহার্য বস্তু অথবা অন্য কোনো হাদিয়া এলে তিনি সেদিকে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। তারপর কখনো কখনো খেয়ে ফেলতেন অথবা ব্যবহার করতেন, না হয় অন্যকে দিয়ে দিতেন। আবার কখনো হাদিয়ার সামগ্রী মাটিতে পুঁতে ফেলতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এমন করেন কেনো? অন্য

www.eelm.weebly.com

কাউকে দিয়ে দিলেই তো পারেন। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্! বিষ মিশানো খাদ্য কি খাওয়া যায় না অন্যকে দেয়া যায়।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, মুফতীর ফতোয়া পাওয়ার পরও অন্তরের ফতোয়া তলব করো। অন্তর সায় না দিলে কোর না। দিলে কোর।

হাদিস ও এজমা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই উম্মতের ভুলত্রুটি আল্লাহতায়ালা মাফ করে দিবেন। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের ভুল ও অক্ষমতাজনিত ত্রুটি হিসাবের আওতাবহির্ভূত করে দেয়া হয়েছে। এই হিসাব আখেরাতের হিসাব। আখেরাতে এ ব্যাপারে অভিযুক্ত করা হবে না। কিন্তু দুনিয়াতে ভুল হলে, স্মরণ হওয়া মাত্র সংশোধন করে নিতে হবে। যেমন, নামাজ পড়ার কথা ভুলে গেলে, স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে নিতে হবে। নামাজের ভিতরে ভুল হলে সোহ সেজদা ওয়াজিব হয়। ভুলবশতঃ করলে কাফফারা ওয়াজিব হয়।

মাসআলা ঃ নামাজে ভুলবশতঃ কথা বললে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়। ইমামে আজম এ কথা বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ভঙ্গ হয় না। কেননা হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. একবার জোহর অথবা আসরের নামাজ দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরালেন। এরপর মসজিদের কিবলার দিকে এগিয়ে গিয়ে একটি গাছের কান্ডে হেলান দিয়ে উপবেশন করলেন। তখন তিনি ছিলেন রোষতপ্ত। হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কথা বলতে পারছিলেন না। কেউ কেউ তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, নামাজ কসর হয়ে গিয়েছে। জুলিয়াদাইন দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি কি ভুলে গিয়েছেন না নামাজ কসর হয়ে গিয়েছে (স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে বেশী লম্বা হাত বিশিষ্ট জনৈক সাহাবীকে জুলিয়াদাইন বলা হতো)। রসুল স. ডানে বামে দেখে নিয়ে বললেন, জুলিয়াদাইন বলে কী! অন্যান্যরা বললেন, সে ঠিকই বলেছে। আপনি দু'রাকাতই পড়েছেন। তৎক্ষণাৎ রসুলে পাক স. দু'রাকাত পড়ে নিয়ে সালাম ফিরালেন। তকবীর বললেন, সেজদা করলেন আবার তকবীর বলে মাথা ওঠালেন। পুনরায় তকবির বলে সেজদা করলেন আবার তকবীর বলে মাথা ওঠালেন (এভাবে সোহর দুই সেজদা করলেন)। বোখারী, মুসলিম।

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য, 'তোমরা আল্লাহর জন্য চুপচাপ দাঁড়িয়ে যাও' — এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে উল্লেখিত হাদিসটি মনসুখ (রহিত) হয়ে গিয়েছে।

মাসআলা ঃ জমহুরের নিকট হজ অবস্থায় ভুল করে সহবাস করলে হজ ফাসেদ হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ীর মত এর বিপরীত। আমাদের নিকট ভুলবশতঃ

www.eelm.weebly.com

ও বলপ্রয়োগ উভয় অবস্থায় তালাক সাব্যস্ত হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হয় না। তিনি বলেন, দুনিয়াতেও ভুলের শাস্তি দেয়া যাবে না। আমরা বলি, ভুলের অভিযোগ আখেরাতে আনা হবে না, কিন্তু দুনিয়াতে হবে।

মাসআলা ঃ ভুলে কিছু খেয়ে ফেললে রোজা ভঙ্গ হয় না — বলেছেন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ, এবং ইমামে আজম। জমহুরের মতেও ফাসেদ হয় না। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন রসুল স. এরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যদি (ভুলে) খায় অথবা পান করে তবে সে যেনো তার রোজাকে পূর্ণ করে। আল্লাহ্ই তাকে পানাহার করিয়েছেন। বোখারী, মুসলিম।

মাসআলা ঃ জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে জবেহ হারাম হয়ে যায় একথা বলেছেন ইমাম মালেক। আমাদের নিকট হারাম হয় না। ইনশাল্লাহ এই মাসআলার আলোচনা আমরা সুরা আনআমে করবো।

'হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার অর্পণ করিও না'—এখানে বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী ইহুদীদের উপর যে কঠিন বোঝা চাপানো হয়েছিলো; আমাদের উপর সে রকম বোঝা চাপিও না। ইহুদীদের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ ছিলো। জমানো সম্পদের এক চতুর্থাংশ জাকাত ফরজ ছিলো। হুকুম ছিলো, কাপড়ে নাপাকি লেগে গেলে কাপড় কেটে ফেলে দিতে হবে। কেউ গোনাহ করলে সকালে সে দেখতে পেতো তার ঘরের দরোজায় লেখা রয়েছে 'গোনাহগার'। গোবৎসের পূজা করার পর হুকুম দেয়া হলো, 'এখন তোমরা আপন স্রষ্টার সমীপে তওবা করো, তারপর একে অপরকে হত্যা করো।' তাদের ধর্মের নিয়ম ছিলো, কবীরা গোনাহকারীকে হত্যা করতে হবে। যারা বাছুর পূজা করেছিলো তাদেরকে হত্যা করেছিলো তারা যারা পূজা করেনি। আয়াতে 'ইসরান' বলতে ওই গোনাহ্কেই বোঝানো হয়েছে, যার তওবা হয় না। কোনো কোনো আলেম একথা বলেছেন। মোট কথা, প্রার্থনার অর্থ এ রকম — এমন গোনাহ থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখো অথবা আমাদের শরিয়তে এমন গোনাহ দিও না, যার তওবা হয় না।

আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানী আমাদের শরিয়তে এমন কোনো কঠিন নির্দেশই নেই যা বহন করতে আমরা অপারগ। অতএব আমাদের প্রার্থনা, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ মোচন করো, দয়া করো। পাপমুক্তি ও পূণ্যার্জন তো তোমার দয়ারই প্রতিফল। তুমি আমাদের অভিভাবক, সংরক্ষক, আমাদেরকে বিজয়ী করো অবিশ্বাসীদের উপর। এখানে অবিশ্বাসী বলতে অবিশ্বাসী জিন, ইনসান, নফসে আম্মারা সবকিছুই হতে পারে। এই দোয়া সকল ধরনের অবাধ্যতার উপরে বিজয়ী হওয়ার দোয়া।

বাগবী লিখেছেন, হজরত মুআজ সুরা বাকারা পাঠ শেষে আমীন বলতেন। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সুরা বাকারার শেষ চারটি বাক্য পাঠ করার সময় প্রতিবাক্যের শেষে আল্লাহতায়ালা বলেন, সাধু, সাধু। যেমন, 'আও আখত্বা'না শেষে, 'মিন ক্ববলিনা' শেষে; 'মা লা ত্ব ক্বতালা নাবিহ' শেষে, এবং 'ফাংসুরনা আলাল ক্বওমিল কাফেরীন' শেষে।

www.eelm.weebly.com

মুসলিম ও তিরমিজিতে হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় 'সাধু, সাধু' এর পরিবর্তে বলা হয়েছে, 'আমি এমনই করেছি'।

হজরত আব্বাসের দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, 'গোফরানাকা' পড়ার পর আল্লাহ্ বলেন, ক্বদ গফারতু লাকুম (আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি)। আও আখত্ব'না পড়ার পর বলেন, লা উয়াখিযুকুম (আমি তোমাদের হিসাব নিব না)। লা তাহমিল আলাইনা এর পরে বলেন, লা আহমিল আলাইকুম, লা তুহাম্মিলনা এর পরে লা উহাম্মিলকুম এবং ওয়াফু আন্নার পরে বলেন, 'আমি তোমাদের গোনাহ মাফ করে দিয়েছি, ক্ষমা করে দিয়েছি। তোমাদের উপর রহমত দান করেছি এবং কাফেরদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করেছি।'

এই হাদিস প্রমাণ করছে যে, আল্লাহর নিকট থেকে দোয়া কবুল করিয়ে নেয়া হয়েছে। ভুলত্রুটির অভিযোগ তোলা হবে না। এ অবস্থা সমস্ত উম্মতের জন্যে। এটা ঐকমত্য। কারণ, এই কোরআনের কোনো হুকুম, বিজ্ঞপ্তি আর কখনো রহিত হবে না। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিতও হবে না। সুতরাং বিজয়ের সংবাদ সকল উম্মতের জন্য। তবে রসুল স. ও সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে এর সম্পর্ক বিশেষভাবে, অন্যদের সঙ্গে সাধারণভাবে।

আয় আল্লাহ্! উম্মতে মোহাম্মদী স. কে ক্ষমা করে দিন। তাদের উপর রহমত করুন। এবং তাদের আমল সংশোধন করে দিন। আমীন।

সুরা ফাতিহার ফযীলত প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে এসেছে, এক ফেরেশতা আকাশ থেকে নেমে এসে রসুল স. কে বললেন, আপনাকে দু'টি নূরের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে, যা আগের কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। ফাতিহাতুল কিতাব (সুরা ফাতিহা) এবং সুরা বাকারার শেষ আয়াত। আপনি ওই দু'টি থেকে যা পাঠ করবেন তা আপনাকে অবশ্যই দেয়া হবে। যেমন, 'ইহ্দিনাস সিরত্বল মুস্তাক্বীম' (আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন) পড়লে আল্লাহ অবশ্যই সরল পথ দেখাবেন। আবার 'রব্বানা লা তোয়াখিযনা ইন্নাসিনা' থেকে সুরার শেষ পর্যন্ত পড়লে আল্লাহ্ কবুল করবেন এবং ওতে যা চাওয়া হয়েছে সবই দান করবেন। এ কারণেই আপনার পরে আপনার উম্মত কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার উম্মত পথভ্রষ্টতার উপর একত্রিত হবে না।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বর্ণনায় এসেছে, আমার উম্মতের একদল সর্বদা আল্লাহর হুকুমের উপর কায়েম থাকবে। কেউ তাদের সাহায্য না করলেও ক্ষতি নেই। বিরুদ্ধবাদীরা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। এ রকম অবস্থাতেই কিয়ামতের হুকুম এসে যাবে।

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বর্ণনা করেন, মেরাজ রজনীতে তিনি স. সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌছলেন। সিদরাতুল মুনতাহার অবস্থান ষষ্ঠ আকাশে। পৃথিবীবাসীদের আমল ওই স্থান পর্যন্ত পৌছে থেমে যায়। এবং উর্ধ্বজগতের হুকুম প্রথমে ওই স্থানে অবতীর্ণ হয়। সিদরাতুল মুনতাহাকে ঘিরে রয়েছে স্বর্ণ পতঙ্গতুল্য ফেরেশতাদের ঝাঁক। তাঁরা রসুল স. এর সন্দর্শন চাইলে আল্লাহ অনুমতি প্রদান করেন। এখানে রসুল স. লাভ করলেন তিনটি নেয়ামত। ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ

www.eelm.weebly.com

২. সুরা বাকারার শেষ আয়াত এবং ৩. তাদের জন্য শাফায়াতের অনুমতি, যারা শিরিকমুক্ত কিন্তু কবীরা গোনাহ্ করেছে।

মুশরিক না হলে কবীরা গোনাহের ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহপাক। এই ক্ষমা প্রদর্শন তওবার কারণে হতে পারে। তওবা ব্যতীত শুধু রহমতের মাধ্যমে হতে পারে। আযাব ব্যতীত অথবা আযাবের পরেও হতে পারে। আসল কথা হলো, কবীরা গোনাহর কারণে কোনো মুমিনের চিরস্থায়ী দোজখ বাস হবে না।

মোতাজিলা ও রাফেজীদের ধারণা সঠিক নয়। মোতাজিলারা কবীরা গোনাহকারীকে ইমানহীন বলে। কিন্তু কাফের বলে না। রাফেজীরা কাফের বলে। আবার দু'দলই বলে কবীরা গোনাকারীর দোজখ বাস চিরস্থায়ী।

হজরত আবু মাসউদ আনসারী বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, সমস্ত রাতের জন্য সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করাই যথেষ্ট। আল আয়েম্মাতুস্ সিত্তাহ্।

হজরত নোমান বিন বশীর বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দু'হাজার বছর আগেই আল্লাহপাক লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, যে ঘরে এই দুই আয়াত তিন রাত পড়া হবে, সেই ঘরের অধিবাসীর নিকট শয়তান আসতে পারবে না। বাগবী।

হজরত আবু মাসউদ আনসারীর মারফু বর্ণনা এই যে, আল্লাহ জান্নাতের সম্পদসম্ভারের অন্তর্ভূত রেখেছেন এই দুই আয়াতকে। মখলুক সৃষ্টির দু'হাজার বছর আগে তিনি এই আয়াত দু'টি আপন হাতে লিখে রেখেছিলেন। যে ব্যক্তি এশার নামাজের পরে পড়ে নিবে, রাতের জন্য তা—ই তার পক্ষে যথেষ্ট হবে। আখজা বিন আবী কামেল।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, ওই সুরা যার মধ্যে সুরা বাকারার উল্লেখ আছে, তা হচ্ছে কোরআনের মিজান (তুলাদন্ড)। তোমরা একে শিক্ষা করো। এই শিক্ষায় রয়েছে বরকত। ছেড়ে দিলে আক্ষেপ। বাতিলগণ এ থেকে নূর নিতে পারবে না। আরজ করা হলো, বাতিলিন কে? রসুল স. বললেন, যাদুকর। দায়লামী।

আলহামদুলিল্লাহ্। সুরা বাকারার তাফসীর এখানেই শেষ। আল্লাহতায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তিনিই এই ফকিরকে সুরা বাকারার তাফসীর সমাপ্ত করবার তওফিক দিয়েছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ বায়হাকী শোয়াবুল ইমানে সলসালের বর্ণনা থেকে দুর্বল সনদে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি সুরা বাকারা পড়বে তাকে জান্নাতের তাজ পরানো হবে। দায়লামী মারফু হিসাবে হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, কোরআনের দুইটি আয়াত আছে সুরা বাকারার শেষে। এই আয়াত দু'টি শাফায়াত করবে। দু'টিই আল্লাহর প্রিয়। হজরত আবু ওবাদা বর্ণিত এক হাদিসে রয়েছে, যে ঘরে সুরা বাকারা পড়া হয়, সে ঘর থেকে শয়তান বের হয়ে যায়। এ রকম হাদিস আরো এসেছে হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন মোগাফ্ফাল থেকে। ইমাম আহমদ, হজরত বোরায়রা

www.eelm.weebly.com

থেকে বলেছেন, সুরা বাকারা শেখো। এ শেখায় বরকত আছে। ছেড়ে দিলে আক্ষেপ করতে হবে। যাদুকরেরা এ থেকে নূর গ্রহণ করতে পারে না। সুরা বাকারা ও সুরা আলে ইমরান শেখো। এই দুইটি আনন্দের দুটি ফুল (কিয়ামতের দিন পাঠকারীর উপর ছায়া স্বরূপ হবে)।

ইবনে হাব্বান ও অন্যান্যরা হজরত সহল বিন সাআদ থেকে উল্লেখ করেছেন, সবকিছুর একটি উচ্চ শৃঙ্গ আছে। কোরআনের উচ্চ শৃঙ্গ হচ্ছে সুরা বাকারা। যে ঘরে দিনে পড়া হবে, সে ঘরে তিন দিন পর্যন্ত শয়তান প্রবেশ করতে পারবে না। আর যে ঘরে রাতে পড়া হবে সেখানে সে তিন রাত পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবে না। হজরত আবু ওবাদা হজরত ওমর থেকে বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরা বাকারা ও আলে ইমরান রাতে তেলাওয়াত করবে সে হবে বিনয়ী।

দারেমী, হজরত মুগীরা বিন শাফীয় থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি শয্যাগ্রহণের সময় সুরা বাকারার দশ আয়াত পড়বে, সে কোরআনকে ভুলবে না। প্রথম দিক থেকে চার আয়াত, আয়াতুল কুরসীর এক আয়াত, এর পরের দুই আয়াত, তার পরে শেষের তিন আয়াত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১,২,৩,৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓ ○ اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ○ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ○
مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۵ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بِاٰيٰتِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۵ وَاللهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

❒ আলিফ — লাম — মী — ম। 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তিনি চিরঞ্জীব ও অনাদি স্বাধিষ্ঠ, বিশ্বধাতা।

❒ তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহা উহার পূর্বের কিতাবের সমর্থক। আর তিনি অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাওরাত ও ইনজীল—

❒ পূর্বে তিনি মানব জাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য; এবং তিনি ফুরকানও অবতীর্ণ করিয়াছেন। যাহারা আল্লাহের নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক, দাতা।

---

www.eelm.weebly.com

ইবনে আবী হাতেম, রবী বিন আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন কতিপয় খৃষ্টান রসুল স. এর দরবারে হাজির হয়ে হজরত ঈসা আ. সম্বন্ধে বির্তক শুরু করে দিলো। তখন আল্লাহ্তায়ালা সুরা আলে ইমরানের শুরু থেকে আশি নং আয়াত পর্যন্ত নাজিল করেন। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, চুরাশি আয়াত পর্যন্ত। তার পরের আয়াত শুরু হয়েছে পথভ্রষ্টদের সম্পর্কে। ইবনে ইসাহাক বর্ণনা করেন, আমাকে মোহাম্মদ বিন সহল বিন আবী উমামা বলেছেন, নাজরানের এক খৃষ্টান প্রতিনিধিদল রসুল স. এর সকাশে হাজির হয়ে হজরত ঈসা বিন মরিয়ম আ. সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। তখন সুরা আলে ইমরানের প্রথম আশিটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। বায়হাকী। বাগবী ও কলবী, রবী বিন আনাসের উক্তি উল্লেখ করে লিখেছেন, এই আয়াতসমূহ নাজরানের ষাটজন খৃষ্টান সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা উটে চড়ে এসেছিলো। প্রধান দলপতির নাম ছিলো আকেব। নেতা ছিলো তিনজন। উপনেতা ছিলো চৌদ্দজন। দলপতির পরামর্শ ছাড়া তারা কোনো কাজ করতো না। দলপতি আকেবের আরেক নাম ছিলো আবদুল মসীহ। এক আমিরের নাম ছিলো আইহাম। তাদের সঙ্গে ছিলো মাজহাবী আলেম, পাদরী আবুল হারেসা বিন আলকামাহ। আছরের নামাজের পর এই দলটি মসজিদে প্রবেশ করলো। তাদের পরিচ্ছদ ছিলো ইয়ামেনী নকশা খচিত। দেখতে মনে হচ্ছিলো তারা খুব ভালো মানুষ। সবাই বলাবলি করছিলো, এ ধরনের প্রতিনিধি দল আগে দেখিনি। নামাজের সময় হয়ে গেলো। রসুল স. তাদেরকে অনুমতি দিলেন, তারা পূর্বদিকে মুখ করে নামাজ পড়লো। এরপর শুরু হলো কথাবার্তা। রসুল স. তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন। দলপতি আকেব এবং নেতা আইহাম উত্তরে বললো, আমরা আপনার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি। রসুল স. বললেন, ভুল বলেছো। তোমরা আল্লাহর পুত্র স্বীকার করে থাকো। ক্রুশের পূজা করো এবং শুকরের গোশত খাও। তারা বললো, ঈসার পিতা যদি খোদা না হয় তবে তার পিতা কে? রসুল স. এরশাদ করলেন, তোমরা কি জানো না আমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব। কিন্তু ঈসা আ. এর মৃত্যু হবে। প্রতিনিধি দল বললো, জানি। রসুল স. পুনরায় বললেন, তোমাদের কি এ কথা জানা নেই যে, তিনিই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। সবকিছু সংরক্ষণ ও রিজিক দানের দায়িত্ব তাঁরই। তারা উত্তর দিলো, জানি। রসুল স. বললেন, এ রকম গুণ কি ঈসার আছে! তারা উত্তর দিলো, না—নেই। রসুল স. বললেন, তোমরা কি এই জ্ঞান রাখো না যে, আকাশ,পৃথিবীর কোনোকিছুই আল্লাহর আগোচর নয়। তারা বললেন, জানবো না কেনো। রসুল স. বললেন, এ রকম গুণ কি ঈসার আছে? তারা বললো, না। তিনি স. বললেন, আমাদের প্রতিপালক ঈসাকে তাঁর মায়ের উদরে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের আল্লাহ পানাহারের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তারা বললো , হ্যাঁ। রসুল স.

www.eelm.weebly.com

বললেন, তোমরা কি এটুকুও বোঝনা, তাঁর মা হজরত ঈসাকে অন্যান্য গর্ভধারিনী স্ত্রীলোকদের মতই আপন উদরে ধারন করেছিলেন। প্রসবও করেছিলেন অন্য মহিলাদের মতো। তারপর তিনি আহার দিয়েছিলেন যেমন অন্য শিশুদেরকে দেয়া হয়। তিনি পানাহার করতেন এবং প্রকৃতির প্রয়োজন পুরো করতেন। তারা বললো, একথা আমরা জানি। রসুল স. বললেন, এরপরও তোমরা তাকে আল্লাহর পুত্র মনে করো কিভাবে? খৃষ্টানেরা নির্বাক হয়ে গেলো। তখন আল্লাহ সুরা আলে ইমরানের প্রারম্ভ থেকে আশি আয়াত পর্যন্ত অবতীর্ণ করলেন। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সকল কিছুর সংরক্ষণকারী। ইতোপূর্বে আয়াতুল কুরসীর ব্যাখ্যায় এ বিষয়টি আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

ইবনে আবী শা'বা, তিবরানী এবং মারদুবিয়া হজরত আবু উমামার মারফু হাদিসে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহর ইসমে আজম তিনটি সুরায় রয়েছে। বাকারা,আলে ইমরান ও তোয়া হা'য়। আবু উমামার ছাত্র কাশেম বলেছেন, আমি অনুসন্ধান করে 'হাইউল ক্বইয়ুম' শব্দটি তিনটি সুরার মধ্যে পেয়েছি। সুরা বাকারায় পেয়েছি আয়াতুল কুরসীর মধ্যে, আলে ইমরানে পেয়েছি এই আয়াতে এবং তোয়াহা'য় উল্লেখ দেখেছি, 'ওয়ানাছিল উজুহু লিল হাইয়্যুল ক্বইয়ুম' (আর সকল চেহারাই সেই চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহ্র সম্মুখে অবনমিত থাকবে)।

জাজরী তাঁর পুস্তক হেসনে হাসিনে লিখেছেন যে, আমি বলি ইসমে আজম হলো, 'লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়ুম।' এই বাক্যটি এই তিনটি সুরায় আছে। আমি আরও বলি, ইসমে আজম হলো, 'লা ইলাহা ইল্লা হুয়া'। হাদিস শরীফে এরকমই বলা হয়েছে। হজরত আসমা বিন ইয়াজিদ বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, ইসমে আজম রয়েছে এই দুই আয়াতের মধ্যে— 'ওয়া আল হিকমুল্লাহু ওয়াহিদ লা ইলাহা ইল্লা হুয়ার রহমানুর রহীম (আর যিনি তোমাদের মাবুদ হওয়ার যোগ্য তিনি এক। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নাই। তিনি পরম দয়ালু ও করুণাপরবশ) এবং আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়ুম।' তিরমিজি, ইবনে মাজা, আবু দাউদ ও দারেমী।

হজরত সা'দ বিন আবী ওক্কাস বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, হজরত ইউনুস আ. মাছের পেটে থাকাবস্থায় তাঁর আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লা আংতা সুবহানাকা ইন্নি কুংতু মিনাজ্ জ্বলেমিন।' (তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই। তুমি পবিত্রতম। নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভূত)। কেউ যদি এই দোয়ার সাথে আল্লাহ্তায়ালার কাছে কিছু চায়, আল্লাহ্পাক তা কবুল করেন। আহমদ, তিরমিজি।

www.eelm.weebly.com

এই দোয়ার নাম দোয়ায়ে ইউনুস। হাকেম লিখেছেন, দোয়ায়ে ইউনুসই আল্লাহ্‌র ইসমে আজম। এই দোয়ার মাধ্যমে দোয়া করলে আল্লাহ্ কবুল করবেন এবং কিছু চাইলে দান করবেন।

হজরত ইয়াজিদ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি এক ব্যক্তিকে এই বলে দোয়া করতে দেখেছি, আয় আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট চাই, আমি যেনো সাক্ষ্য দেই তুমি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তুমি এক, অমুখাপেক্ষী, তুমি কারো সন্তান নও। তোমারও কোনো সন্তান-সন্ততি নেই। তোমার সমতুল্য কেউ নেই। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্‌র নিকট এমন ইসমে আজম পড়ে দোয়া করে কেউ কিছু চাইলে তিনি দান করেন, দোয়া করলে কবুল করেন। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিজি, হাকেম, ইবনে হাব্বান।

হজরত আনাস বলেছেন, আমি মসজিদে বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি নামাজ পাঠরত অবস্থায় বলতে লাগলো, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমারই নিকট প্রার্থনা করি। সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তুমি অতি দয়ালু ও অনুগ্রহ দাতা। আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা। হে প্রতাপশালী ও সম্ভ্রমশালী! হে চিরঞ্জীব হে সংরক্ষণকারী! রসুল স. এরশাদ করলেন, ওই ব্যক্তি এমন ইসমে আজম নিয়ে দোয়া করলো, যে নাম নিয়ে দোয়া করলে আল্লাহ্ কবুল করেন এবং কিছু চাইলে প্রদান করেন। উল্লেখিত হাদিসগুলোর ব্যাখ্যায় ও তিনটি সুরায় ইসমে আজম রয়েছে।

হজরত জাবেরের একটি মারফু হাদিস এই যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উত্তম জিকির। তিরমিজি।

হজরত মুআজের মারফু হাদিসও এরকম, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' জান্নাতের চাবি। হাদিসটি বহুবিদিত (মুতাওয়াতির)।

জ্ঞাতব্য ঃ লা ইলাহা ইল্লাহু, লা ইলাহা ইল্লা আংতা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ — এগুলোকে হাদিস শরীফে ইসমে আজম বলা হয়েছে, হুয়া (তিনি) এবং আংতা (তুমি) এর উদ্দেশ্য আল্লাহ্ই। এই সর্বনাম দু'টির মাধ্যমে বর্ণিত বাক্যের মর্যাদা অনেক বেশী। এগুলোর উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র জাতের (অস্তিত্বের) প্রতি প্রবর্তিত হয়। আর জাত, সিফাতের (গুণাবলীর) সম্মিলিত অবস্থা। এ জন্যই সকল গুণবাচক নামের তুলনায় জাতী নামের (আল্লাহ্) গুরুত্ব অধিক। আল্লাহ্ শব্দে সমস্ত সিফাত (গুণ) একত্রিত রয়েছে। অন্যান্য নাম ও গুণ সমূহ জাতকে পূর্ণরূপে নির্দেশ করেনা। সুফীগণ সবচেয়ে বেশী ফলদায়ক জিকির হিসেবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কে বেছে নিয়েছেন — উদ্দেশ্য, অন্যান্য নাম এবং গুনসমূহ ব্যতীতই যেনো খালেছ জাত পর্যন্ত সম্পর্কিত হওয়া সম্ভব হয়।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, ইসমে আজম দু'রকম। হ্যাঁ বোধক এবং না বোধক। এর কারণ রয়েছে। হ্যাঁ বোধক ইসমে আজমের মাধ্যমে বোঝা যায়, সমস্ত কামালিয়াত বা পূর্ণতা তাঁর জাতের মধ্যে বিদ্যমান। এবং এর মধ্যে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতিই নেই। জাত সমস্ত গুণকে একত্রিতকারী। আর ত্রুটিবিচ্যুতিমুক্ত না হলে মাবুদ হওয়ার যোগ্যতা থাকেনা। এই অবস্থায় যে কলেমা 'আল্লাহ্ ব্যতীত' ঘোষণার দ্বারা সমস্ত কিছুর উপর আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণ করবে তাকেই ইসমে আজম বলা হবে। এ কারণেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ইসমে আজম হয়েছে।

আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তানযিল এবং আনযালা। তওরাত ও ইঞ্জিল নির্ধারিত সময়ে সম্পূর্ণ কিতাব একত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। আর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে অল্প অল্প করে ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় ধরে। এজন্য কোরআনের ক্ষেত্রে তানযিল শব্দটি এসেছে। ইঞ্জিল ও তওরাতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে আনযালা শব্দটি। পূর্ণ কিতাব একই সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে বুঝতে আনযালা শব্দটি অধিক উপযোগী। তওরাত মুসা আ. এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের নাম — শব্দটি ইবরানী। ইঞ্জিল সুরিয়ানি শব্দ। ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে হজরত ঈসা আ. এর উপর। আর কোরআন আরবী শব্দ। নাযিল হয়েছে আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতাবা স. এর উপর। আয়াতে হুদাল্লিন্ নাস বলতে, সমস্ত মানুষের হেদায়েতের জন্য একথা বোঝানো হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে আন্ নাস বলে হজরত মুসা আ. ও হজরত ঈসা আ. এর উম্মতগণকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু একথা বলার কোনো কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে 'আন্নাস' অর্থ সমস্ত মানুষ। কারণ, কোরআন সমস্ত আসমানী কিতাব এবং পূর্ববর্তী সমস্ত নবী রসুলকে মেনে নেয়ার জন্য সকল মানুষকে দাওয়াত দিয়েছে। কোরআন পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সত্যায়নকারী। আর মোহাম্মদ স. এর প্রসঙ্গ পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাব উল্লেখ করেছে।

ভুলের অপনোদন ঃ কোরআন মজীদের হুকুম দ্বারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের হুকুম আহকাম মনসুখ হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় 'সমস্ত মানুষের হেদায়েতের জন্য' একথা বলার অর্থ কী? উত্তর এই যে, পূর্ববর্তী কিতাবের কোনো কোনো হুকুম রহিত হওয়া সত্ত্বেও সকল মানুষের হেদায়েতের নির্দেশাদি কোরআনে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। খোদ কোরআনেরই অনেক আহকাম অন্য আহকাম দ্বারা মনসুখ হয়ে গিয়েছে। একথার অর্থ এই নয় যে, পূর্ববর্তী আহকাম ভুল ছিলো। বরং অর্থ এই — পূর্ববর্তী হুকুম ছিলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। মেয়াদ শেষে তাই নতুন হুকুম জারি করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আগের নবীদের শরিয়ত অনুযায়ী কোনো আমল করা আমাদের জন্য অপরিহার্য নয়। কিন্তু আমাদের জন্য সবকিছু জানা জরুরী এবং মনসুখ হুকুম আহকাম ছাড়া অন্যান্য বিষয় থেকে ধারণা নেয়া জরুরী।

www.eelm.weebly.com

'ওয়া আনযালা ফুরকান'—অর্থ হক ও বাতিলের পার্থক্য সূচক আসমানী কিতাবসমূহ। এই শব্দটির মধ্যে শামিল রয়েছে তওরাত, ইঞ্জিল এবং কোরআন ছাড়াও অন্যান্য সকল আসমানী কিতাব অথবা শুধু কোরআন মজীদ। 'ফুরকান' শব্দটি প্রশংসা, মহত্ত্ব ও সম্মান প্রকাশার্থে দু'বার কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সকল কিতাবই প্রেরিত কিতাব। কিন্তু কোরআন মোজেজা হওয়ার কারণে স্থায়ী পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। দু'বার আনযালা উল্লেখ করার কারণ দু'টি। ১. দু'বার উল্লেখিত না হলে সন্দেহের অবকাশ ছিলো যে, ফুরকান, তওরাত ও ইঞ্জিলের সমার্থক। ('ফুরকান' শব্দটির মধ্যে তওরাত, ইঞ্জিল এবং কোরআন ছাড়াও অন্যান্য সকল আসমানী কিতাব রয়েছে)। ২. আনযালা দু'বার উল্লেখের অর্থ, কোরআন মজীদ দু'বার নাজিল হয়েছে। একবার সম্পূর্ণ কোরআন দুনিয়ার আসমানে। দ্বিতীয়বার কিছু কিছু করে পৃথিবীতে।

সুদ্দী বলেছেন, আনযালা শব্দ দু'বার উল্লেখ করার কারণ, আগে এবং পরের বর্ণনার ভিন্নতা। আগে বলা হয়েছে 'মানুষের হেদায়েতের জন্য' এবং পরে বলা হয়েছে 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ আয়াতকে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি'।

ওয়াল্লাহু আজীজ অর্থ, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী। তিনি শাস্তি দিতে চাইলে রদ করার কেউ নেই। 'জুনতিকাম' অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণকারী, দন্ড বিধায়ক, দাতা। আসমানী কিতাব মানবীয় ক্ষমতাভূত নয়। তাই তাকে মেনে নিতে হবে। অস্বীকারকারী নিশ্চিত শাস্তিযোগ্য।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৫, ৬

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

❑ আল্লাহ, আসমান ও জমিনে কিছুই তাঁহার নিকট গোপন থাকে না। তিনিই মাতৃ-গর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ্‌তায়ালা সব কিছুই জানেন। কোনোকিছুই আল্লাহ্‌তায়ালার দৃষ্টি থেকে গোপন নয়। এই আয়াতে প্রথমে পৃথিবী, তার পরে আকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, বান্দার আমলের স্থান পৃথিবী। পৃথিবীবাসীদের আমল

www.eelm.weebly.com

তাঁর সম্যক জানা আছে বলেই তিনি তাদের পুরস্কার অথবা শাস্তি নির্ধারণ করেন। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তাঁর জ্ঞান ছাড়া কোনো জ্ঞান নেই। তাঁর ক্ষমতা ছাড়া কোনো ক্ষমতাও নেই। সৃষ্টি করেন তিনিই। মাতৃগর্ভে মানব শিশুর আকৃতিদান করেন তিনিই। তিনি পরাক্রমশালী, মহা জ্ঞানী।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, আল্লাহর সত্য নবী মোহাম্মদ স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে মাতৃ উদরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীজ আকারে, তার পরে চল্লিশ দিন রক্তপিন্ডের আকারে তার পরে চল্লিশ দিন মাংশপিন্ডের আকারে রাখেন। তারপর আল্লাহ্‌ ফেরেশতাকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন। হুকুম অনুযায়ী ফেরেশতা তার রিজিক, হায়াত, আমল এবং শেষ পরিণাম লিপিবদ্ধ করেন।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ কেউ নেক আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছবে যখন জান্নাত ও তার মধ্যে দূরত্ব থাকবে এক গজ। তখন তকদীর প্রবল হবে এবং ওই ব্যক্তি দোজখীদের ন্যায় আমল করতে থাকবে এবং দোজখে চলে যাবে। আবার কেউ কেউ দোজখের উপযোগী আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছবে, যখন দোজখ ও তার মধ্যে দূরত্ব থাকবে মাত্র একগজ। সহসা তকদীর প্রবল হবে এবং সে বেহেশতের অনুকূল আমল শুরু করবে এবং বেহেশতে চলে যাবে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত হোজায়ফা বিন উসাইদ মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন, মাতৃ উদরে চল্লিশ অথবা পয়তাল্লিশ দিন থাকার পর মানবশিশুর নিকট এক ফেরেশতা আসবে এবং আরজ করবে, হে আল্লাহ। সে কি বদবখত নাকি নেকবখত? যে নির্দেশ আসবে ফেরেশতা তাই লিখে দিবেন। অতঃপর আরজ করবে, হে প্রভু। নারী না পুরুষ? ফেরেশতা তাই লিখে দিবেন যা তাকে নির্দেশ করা হবে। বাগবী।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৭

هُوَ الَّذِىٓ اَنۡزَلَ عَلَيۡكَ الۡكِتٰبَ مِنۡهُ اٰيٰتٌ مُّحۡكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الۡكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيۡنَ فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ زَيۡغٌ فَيَتَّبِعُوۡنَ مَا تَشَابَهَ مِنۡهُ ابۡتِغَآءَ الۡفِتۡنَةِ وَابۡتِغَآءَ تَاۡوِيۡلِهٖ ۚ وَمَا يَعۡلَمُ تَاۡوِيۡلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوۡنَ فِى الۡعِلۡمِ يَقُوۡلُوۡنَ اٰمَنَّا بِهٖۙ كُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ○

❒ তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন; এইগুলি কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলি রূপক;

www.eelm.weebly.com

যাহাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রহিয়াছে শুধু তাহারাই ফিৎনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যাহা রূপক তাহার অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ ইহার ব্যাখ্যা জানে না। আর যাহারা জ্ঞানে সুগভীর তাহারা বলে, 'আমরা ইহা বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আগত;' এবং বোধ-শক্তি সম্পন্নেরা ব্যতীত অপর কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে না।

কোরআন শরীফের কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, কিছু আয়াত রূপক। সুস্পষ্ট আয়াতের শব্দসম্ভার, বাক্যাবলী, সবই সুস্পষ্ট। সন্দেহমুক্ত। গভীর অভিনিবেশ ছাড়াই এগুলোর অর্থ বোঝা যায়। যেমন, 'আপনি বলে দিন তোমরা এসো এবং পড়ো যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর হারাম করেছেন, তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক আদেশ করেছেন; তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করো না; তাঁর সমতুল্য কিছুই নেই; তিনি সবকিছু শোনেন এবং দেখেন' ইত্যাদি। কিছু আয়াত বুঝতে অবশ্য যৎসামান্য অভিনিবেশ প্রয়োজন। এগুলোও সুস্পষ্ট আয়াতের আওতায় পড়ে। যেমন, চুরি সংক্রান্ত আয়াত। এর মধ্যে যে পকেট কাটাও পড়ে, সামান্য চিন্তাতেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। আবার কাফন চুরি এই আয়াতের হুকুমের মধ্যে পড়ে না। কারণ মৃত ব্যক্তি কাফনের মালিক নয়। মৃতের উত্তরাধিকারীরাও কাফনের মালিক নয়। অন্য এক আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'পা ধৌত করো টাখনু পর্যন্ত'। এই আয়াতে ধৌত করার শেষ সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায়, এখানে 'টাখনু পর্যন্ত' অর্থ হবে টাখনুসহ। এই ব্যাপারে তাই ঐকমত্য হয়েছে। এক বর্ণনায় আছে, 'সালাসাতা কুরু' — এর অর্থ ইমাম শাফেয়ীর নিকট ঋতু থেকে পবিত্রাবস্থা। হানাফীদের মতে ঋতু (হায়েজ) অবস্থা। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় এখানে তিন ঋতুই উদ্দেশ্য। তুহুর বা পবিত্র অর্থ হলে তিন সংখ্যা পুরা হয় না। কেননা তালাক তুহুর থেকে শুরু হয়। ইদ্দতের সময় তুহুর থেকে গণনা করলে তিন তুহুর পুরা হয় না। গণনা না করলে তিন তুহুরের বেশী হয়ে যায়। এজন্যই বুঝতে হবে, এখানে তিন হায়েজই অর্থ। অন্য একটি আয়াত 'ঐ কাঁচ রৌপ্য নির্মিত হবে;' একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, কাঁচ বলতে ওই পাত্র বোঝানো হয়েছে যা তৈরী হবে রূপা দিয়ে এবং যার পরিচ্ছন্নতা হবে চকচকে সীসার মতো। এ ধরনের আয়াতকেই আয়াতে মোহকামাত বা সুস্পষ্ট (মোহকাম) আয়াত বলে। হজরত ইবনে আব্বাসের বদৌলতে আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট নয় এ রকম আয়াতও মোহকাম আয়াতের অন্তর্ভূত হয়েছে। এ রকম হয়েছে তাঁর বিজ্ঞজনোচিত তাফসীর (ব্যাখ্যা) এর কারণে। মোহাম্মদ জাফর বিন জোবায়ের বলেছেন, 'মোহকাম'এর অর্থ দ্ব্যর্থহীনতা। বিকল্প অর্থের সম্ভাবনা যাতে নেই। কেউ কেউ বলেছেন, 'মোহকাম' অর্থ প্রসিদ্ধ। এর উপস্থাপনা সম্পূর্ণতই প্রকাশ্য।

www.eelm.weebly.com

বলা হয়েছে, এই মোহকাম আয়াতগুলোই কিতাবের মূল ভিত্তি (উম্মুল কিতাব)। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'উম' শব্দের অর্থ মা। প্রত্যেক বস্তুর আসল উৎসকে বলা হয় উম্মুল কওম। 'উম' এর আরেক অর্থ একত্রকারী। আমি বলি, এখানে কিতাব শব্দের অর্থ হবে মাকতুব। মাকতুব অর্থ ফরজ করা। যেমন বলা হয়েছে, 'কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম' (তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে)' এখানে কুতিবা অর্থ ফরজ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই মোহকাম আয়াতগুলোই কোরআনের ভিত্তিমূল।

দ্বিতীয় প্রকারের আয়াত হচ্ছে আয়াতে মোতাশাবেহাত (রূপক আয়াত)। এ সমস্ত আয়াত বুঝতে গেলে বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারীদের যথাযথ ব্যাখ্যার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। কেবল ভাষা বা সাহিত্য জানলেই এগুলোর অর্থ বোঝা যাবে না। বিভিন্ন সুরার শুরুতে উল্লেখিত হরফে মোকাত্তায়াত (বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি যেমন, আলিফ লাম মীম, ইয়া সীন, ত্বোয়াহা ইত্যাদি) — এগুলোও রূপক। কোরআন মজীদে রূপক আয়াত রয়েছে অনেক। যেমন, 'আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর', 'আল্লাহ আরশের উপরে অধিষ্ঠিত' — এগুলোর সোজাসুজি অর্থ বোঝা দুরূহ। কোনো কোনো আল্লাহর পরিচয়প্রাপ্ত ব্যক্তি (আরিফ) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান এবং এলহামের মাধ্যমে এ সমস্ত আয়াতের অর্থ বুঝতে পারেন। যেমন, হজরত আদম আ. কে আল্লাহ সমস্ত কিছুর শিরোনাম সম্ভূত জ্ঞান দান করেছিলেন। এ সমস্ত আয়াতের জ্ঞান লাভ হয় মেশকাতুন নবুয়ত (নবুয়তের তাক) থেকে শরহে ছুদুরের (বক্ষ সম্প্রসারণের) পর। ভাষার মাধ্যমে এই জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়। আলোচনা এখানে অচল। অক্ষমতা এই পথের পরিণতি। তাই অতিরিক্ত আলোচনা অসমীচীন।

একটি ধারণা ঃ আলিফ লাম র কিতাবি আহকামাতি — অর্থ এটা এমন কিতাব যার আয়াতগুলো প্রমাণাদি দ্বারা সুদৃঢ়। এ কথায় প্রমাণ হয় যে, সমস্ত আয়াতই মোহকাম। কিতাবি মোতাশাবিহা — এ কথায় বোঝা যায় সম্পূর্ণ কোরআনই মোতাশাবেহ। — এর কারণ কী?

জবাব ঃ মোহকাম হওয়ার অর্থ এই যে, সম্পূর্ণ কোরআন অসঙ্গতি ও বর্ণনার দুর্বলতা হতে সুরক্ষিত। এর কোনো আয়াতের ত্রুটি নির্দেশ করা এবং এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা কারো নেই। অপরদিকে মোতাশাবেহ বলার অর্থ এই যে সম্পূর্ণ কোরআনই সৌন্দর্য ও পূর্ণতার এক রহস্যময় সমন্বয়। এই অর্থে সম্পূর্ণ কোরআনই মোতাশাবেহ। তাই এই আয়াতে দু'টি দিককেই একই সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে বলা হচ্ছে, এর কিছু অংশ মোহকাম এবং কিছু অংশ মোতাশাবেহ, যা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যতীত বোঝা যায় না।

www.eelm.weebly.com

'যাহাদের অন্তরে সত্য—লংঘন প্রবণতা রহিয়াছে' — এই কথায় ইঙ্গিত করা হয়েছে নাজরানের সেই খৃষ্টান প্রতিনিধিদলের প্রতি। তারা রসুল স. কে বলতে লাগলো, আপনি ঈসা আ.কে কলেমাতুল্লাহ ও রুহুল্লাহ বলেন না। তিনি স. বললেন, কেনো বলবো না। তারা বললো, আমাদের জন্য এই যথেষ্ট। তখন এই আয়াত নাজিল হলো।

কালাবী বলেছেন, এই আয়াত এক দল ইহুদীদের উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, হুয়াই ইবনে আখতাব এবং কাব বিন আশরাফ সহ ইহুদীদের এক দল রসুল স. এর নিকটে এলো। হুয়াই বললো, আমরা জানতে পারলাম আপনার উপর আলিফ লাম মীম অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা আপনাকে কসম দিয়ে বলছি, ঘটনাটি কি সত্যি? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। আবজাদ গণনার মাধ্যমে হুয়াই বললো, এ কথা সত্য হলে আপনার উম্মতের স্থায়ীত্ব হবে একাত্তর বৎসর — গণনাতে তাই আসে। এছাড়া অন্য কিছু কি অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি স. বললেন হ্যাঁ। আলিফ লাম মীম ছুদ নাজিল হয়েছে। হুয়াই বললো, তবে তো সময় বেড়ে গেলো। এবার হলো একশ' একষট্টি বৎসর। আর কিছু—। রসুল স. এরশাদ করলেন, আলিফ লাম, র। সে বললো, তবে তো আরো বেশী হয়ে গেলো—দু'শো একুশ বৎসর। আর কী নাজিল হয়েছে? রসুল স. বললেন, আলিফ লাম মীম র। সে বললো, অনেক সময় হয়ে গেলো যে—দুইশ একাত্তর বৎসর। আপনি যে আমাদের গণনা বিশৃঙ্খল করে দিলেন। আমরা বুঝতে পারছিনা, বেশী সময় নির্ধারণ করবো না কম সময়। আমরা এসব মানি না। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

ইবনে জারিহ্ বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে। হাসান বলেছেন, খারেজীদের উদ্দেশ্যে। ইমাম আহমদ ও অন্যান্যরা হজরত আবু উমামা থেকে বলেছেন, কাতাদা রা. যখন এই আয়াত পড়তেন — তখন বলতেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য হরোরিয়া এবং সাবীয়া দল যদি না হয় তবে আমি জানি না তারা কে। কেউ কেউ বলেছেন, যাদের উদ্দেশ্যে হোক না কেনো তারা সবাই বেদাতী।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. একবার এই আয়াত পাঠ করার পর বললেন, যদি কাউকে দেখো কোরআনের মোতাশাবেহ আয়াত নিয়ে মেতে আছে তখন বুঝবে তারা ওই লোক — যাদের কথা আল্লাহ্তায়ালা এই আয়াতে উল্লেখ করেছেন। তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত থাকবে। বোখারী। হজরত আবু মালেক আশআরী বর্ণনা করেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, আমি আমার উম্মতের তিনটি বিষয়ে আশংকা করি। একটি এই যে, কোনো কোনো মানুষ কিতাব খুলে মোতাশাবেহ্ আয়াতের ব্যাখ্যা উদ্ধারে গলদঘর্ম হবে।

www.eelm.weebly.com

এসমস্তের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ই জানেন। বিদ্যানগণ বলেন, আমরা এই কোরআনে বিশ্বাস রাখি। এই কোরআন এসেছে আমাদের প্রভূপ্রতিপালক থেকে। এর উপদেশ ইমানদার ও জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যতীত কেউ গ্রহণ করে না।

যাদের অন্তরে সীমালংঘন প্রবণতা (বক্রতা) রয়েছে, তারাই কেবল মোতাশাবেহ্ আয়াত সম্পর্কে অনাবশ্যক অনুসন্ধিৎসা দেখায়। অর্থাৎ যারা বেদাতী তারা তাদের প্রবৃত্তিপ্রসূত অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য মোতাশাবেহ্ আয়াতের আশ্রয় নেয়। তারা মোহকাম আয়াতের দিকে আকৃষ্টি বোধ করে না, হাদিস শরীফেরও দ্বারস্থ হয় না। কর্তব্য এই যে, আমল করতে হবে মোহ্কাম আয়াত ও হাদিস শরীফ অনুযায়ী। মোতাশাবেহ্ আয়াত সম্পর্কে কেবল একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, মোহ্কাম আয়াতের মতো মোতাশাবেহ্ আয়াতও আমার প্রভুপ্রতিপালকের বাণী। আনুমানিক ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে নিষিদ্ধ।

উম্মতের ঐকমত্য এবং সুবিদিত হাদিস শরীফের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, কিয়ামতের দিন ইমানদারগণ আল্লাহতায়ালাকে দেখবেন চতুর্দশী চাঁদের মতোন। সুতরাং একথা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। নিবৃত্ত হতে হবে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা থেকে। অন্য আয়াতে যেমন বলা হয়েছে, 'কিয়ামতের দিন বহু মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে এবং আপন প্রতিপালকের দিকে তাকাবে।' এক্ষেত্রেও করনীয় একই। অর্থাৎ বিশ্বাস করতে হবে, কিন্তু অনাবশ্যক ব্যাখ্যার দিকে অগ্রসর হওয়া যাবেনা। 'আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর', 'আল্লাহ্ আরশের উপরে অধিষ্ঠিত' — এ সমস্ত আয়াত মোতাশাবেহ্। এগুলোকে মোহ্কাম আয়াত 'তার মতো কোনো কিছুই নয়' এর আওতায় এনে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। যারা এরকম করবেনা তারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী (ফেতনাবাজ)।

জ্ঞাতব্য ঃ দারেমী হজরত ওমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, অতিসত্ত্বর তোমাদের নিকট এমন লোকের আবির্ভাব হবে, যে বচসা শুরু করবে কোরআনের মোতাশাবেহ্ আয়াত নিয়ে। তখন তোমাদের কর্তব্য হবে রসুল স. এর সুন্নত দ্বারা এর মোকাবেলা করা। কেননা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতই কিতাবুল্লাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, আমরা একবার হজরত ওমরের নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় একব্যক্তি এসে কোরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করলো। সে বললো, কোরআন মখলুক না গায়ের মখলুক (সৃষ্ট না অসৃষ্ট)? হজরত ওমর তাকে ধরে ফেললেন এবং তাকে টেনে নিয়ে হজরত আলীর কাছে গিয়ে বললেন, হে আবুল হাসান! এই লোকের কথা শুনুন। সে বলছে, কোরআন মখলুক না গায়ের মখলুক? হজরত আলী বললেন, এই অনাসৃষ্টি আপনার খেলাফত কালে প্রকাশিত হচ্ছে। আমার খেলাফতে হলে আমি এর

www.eelm.weebly.com

শিরোশ্ছেদ করতাম। দারেমীর গ্রন্থে হজরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি মদীনায় এসে কোরআনের মোতাশাবেহাত আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন শুরু করলো। তার নাম ছিলো সাবিগ। হজরত ওমর খেজুরের খোলা চাবুক হাতে নিয়ে তাকে তলব করলেন। সে এলে বললেন, তুমি কে? সে জবাব দিলো, আমি আল্লাহ্র বান্দা সাবিগ। হজরত ওমর বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা ওমর, একথা বলেই তিনি চাবুক দিয়ে তাকে মারতে শুরু করলেন এবং তার মাথা রক্তাক্ত করে দিলেন। সাবিগ চিৎকার করে বলে উঠলো, আমিরুল মুমিনীন থামুন! যে চিন্তা আমার মাথায় ছিলো, এখন আর তা নেই।

আবু ওসমান সূত্রপরম্পরায় বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বসরায় এই কথা বলে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, সাবিগের সাথে কেউ ওঠাবসা কোর না। এরপর থেকে আমাদের মজলিশে সাবিগ এসে পড়ার সাথে সাথে আমরা পৃথক হয়ে যেতাম। মজলিশই ভেঙে দিতাম, শতলোকের মজলিশ হলেও। হজরত মোহাম্মদ বিন শিরিন বলেছেন, হজরত ওমর হজরত আবু মুসা আশআরীকে লিখেছিলেন, সাবিগের সাথে ওঠাবসা কোরনা এবং তার মাসিক বেতনের পারিশ্রমিক দিওনা।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আহলে কালাম (মোতাজিলা, ক্বদরিয়া ইত্যাদি) দের শাস্তি এটাই যা হজরত ওমর নির্ধারণ করেছিলেন সাবিগের জন্য। তাদেরকে কশাঘাত করতে হবে এবং উটে চড়িয়ে তাদের আপন গোত্রের দিকে পাঠিয়ে দিতে হবে এবং বলে দিতে হবে, যারা কোরআন ও সুন্নতকে ছেড়ে দিয়ে এলমে কালামের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হয়েছে তাদের শাস্তি এটাই।

বর্ণিত হয়েছে, ইসলামের ব্যাপক প্রসার দেখে ইহুদীরা হিংসার আগুনে দগ্ধ হতে লাগলো। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো, মুসলমানদের এই উন্নতি ইসলামের কারণেই হচ্ছে। ইসলামকে প্রতিহত করবার জন্য তারা দু'টি উপায় অবলম্বন করলো — ধোঁকা দেয়ার জন্য প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং ভুল ব্যাখ্যা দিতে লাগলো মোতাশাবেহ আয়াত সমূহের। গড়ে তুললো ইসলামের নামে ইসলামবিরোধী দল উপদল। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে উঠতে লাগলো, হারুরিয়া, মোতাজিলা, রাফেজী ইত্যাদি বাতিল সম্প্রদায়।

মোতাশাবেহ আয়াতের মর্মার্থ কেবল আল্লাহ্ই জানেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল জ্ঞান মোতাশাবেহ আয়াতের অর্থ জানার জন্য যথেষ্ট নয়। তবে, রসুলে পাক স. এবং তাঁর উম্মতের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরা এর অর্থ জানেন। আল্লাহ্ জানান বলেই জানেন। যেমন, এক আয়াতে এসেছে, 'আকাশ ও পৃথিবীর কেউ গায়েব জানে না, আল্লাহ্ ব্যতীত' — একথার অর্থ আল্লাহ্ না জানালে নিজে নিজে কেউ গায়েব জানেনা। এক আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, ছুম্মা ইন্না

www.eelm.weebly.com

আলাইনা বায়ানাহ (অতঃপর এটা বর্ণনা করে দেয়া আমার দায়িত্ব) — এই আয়াতদৃষ্টে বোঝা যায়, কোরআনের মোহকাম এবং মোতাশাবেহ উভয় প্রকারের আয়াতের অর্থ জানা রসুলপাক স. এর জন্য জরুরী। কোরআনের কিছু অংশ জানা এবং কিছু অংশ অজানা — এরকম অবস্থা রসুল স. এর জন্য শোভনীয় নয়। অন্যথায় কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এবং আল্লাহ্‌তায়ালা হবেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী (কারণ তিনি বলেছেন, বর্ণনা করে দেয়া আমার দায়িত্ব)।

বিশুদ্ধ মত এটাই, যা আমরা সুরা বাকারার ব্যাখ্যায় প্রথমে লিখে দিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে মোতাশাবেহ একটি গোপন রহস্য, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসুলের মধ্যে। এই জ্ঞান সাধারণের জন্য নয়, বরং সাধারণদের পক্ষে এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভবই নয়। তবে কামেল ব্যক্তিরা এর ব্যতিক্রম। তাঁরা এলমে লাদুন্নীর মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ করতে পারেন। আল্লাহ্‌তায়ালার জাত এবং সেফাতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারীরা এই জ্ঞান পেয়ে থাকেন। চেষ্টা কিংবা চিন্তা গবেষণা এক্ষেত্রে অচল।

'যাহারা জ্ঞানে সুগভীর তাহারা বলে, 'আমরা ইহা বিশ্বাস করি' — জ্ঞানে সুগভীর যারা তারাই সুন্নত ওয়াল জামাত। তাঁরা সুদৃঢ়ভাবে মোহকামকে ধারণ করেছে এবং কোরআন মজীদের তাফসীরে সাহাবা এবং তাবেয়ীদের এজমাকে মেনে নিয়েছে। মোতাশাবেহকে করেছে মোহকামের অনুকূল। তাঁরা কুপ্রবৃত্তির কামনা ও অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত। কেউ কেউ বলেছেন, 'জ্ঞানে সুগভীর' বলতে ওই সমস্ত আহলে কিতাবদেরকে বোঝানো হয়েছে যাঁরা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। আমি বলি, এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। মারেফাতবিদগণ বলেন, জ্ঞানে সুগভীর ওই সমস্ত লোক, যাঁরা নফস ও ইন্দ্রিয়প্রবণতাকে ফানা করে কামনাবাসনা থেকে পুরাপুরি পৃথক হতে পেরেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালার জাতী নূরের রহস্যময়তায় তাঁরা এরকম নিমজ্জিত যে, সন্দেহের উদ্রেক তাঁদের মধ্যে হয়ই না। তাঁরা এমন বলেন, পর্দা উঠিয়ে দিলেও যতোটুকু বিশ্বাস আমাদের রয়েছে তার চেয়ে বেশী হবে না। অর্থাৎ আমাদের বিশ্বাসে অতিরিক্ত কিছুর প্রবেশাধিকার নেই। আমাদের ইমান আইনে মোশাহেদা (প্রত্যক্ষগোচরতা নির্ভর)। আমাদের হক্কুল একীন হাসিল হয়ে গিয়েছে (সুফীগণের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র নূর অবলোকন করাকে মোশাহেদা বলে)।

তিবরানী ও অন্যান্যরা হজরত আবু দারদা থেকে উল্লেখ করেছেন, একবার রসুল স. কে ওয়ার রসেখীনা ফিল ইলম (জ্ঞানে সুগভীর) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, যার জিহ্বায় সত্য কসম উচ্চারিত হয়, অন্তর স্থির থাকে এবং উদর ও লজ্জাস্থান হারাম থেকে মুক্ত তারাই জ্ঞানে সুগভীর। আমি বলি, এই বৈশিষ্ট্য সুফীদের মধ্যে পাওয়া যায়। আয়াতের শব্দবিশ্লেষণের মধ্যে হানাফী ও শাফেয়ীদের মতানৈক্য রয়েছে। একদল বলেন যে, 'ওয়ার রসিখূন' বাক্যের

www.eelm.weebly.com

'ওয়াও' অব্যয়টি সংযোজক হওয়ার কারণে অর্থ দাঁড়াবে এরকম — মোতাশাবেহাত আল্লাহ্ জানেন এবং ওলামায়ে রসিখিনও জানেন। ইয়াকুলূনা আমান্না বিহি - অর্থাৎ ওলামায়ে রসিখিন বলেন, মোতাশাবেহাত এর এই জ্ঞানটুকু আমরা রাখি যে, সম্পূর্ণ কোরআনই আমাদের প্রভুপ্রতিপালক অবতীর্ণ করেছেন আর আমরা এর উপর ইমান এনেছি। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়েছে — লিল ফুক্বারাইল্লাজিনা উখরিজু মিন দিয়ারিহিম — ওয়াল্লাজীনা তাবাউউয়াযু দ্দারা ওয়াল ইমান. অতঃপর বলা হয়েছে ওয়াল্লাজীনা জা-উ মিমবা'দিহিম ইয়াকুলূনা রব্বানাগ্ফিরলানা ওয়ালিইখওয়া মিনাল্লাজীনা সাবাকুনা বিল ইমান। এখানে ইয়াকুলূনা অর্থাৎ 'তারা বলে' এই কথাটি ওলামায়ে রসিখিনের বিশ্বাসগত অবস্থা - এরকম বর্ণনা করেছেন মুজাহিদ। এবং হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আমি 'ওয়ার রসিখূনা ফিল ইলম' এর অন্তর্ভূত— অর্থাৎ আমি মোতাশাবেহ্র তাফসীর জানি। অন্য বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, যাঁরা মোতাশাবেহ্র অর্থ জানেন আমিও তাদের মধ্যে একজন।

অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, 'ওয়ার রসিখূন' এর 'ওয়াও' বিগত বাক্য ইল্লাল্লাহ্ এর উপর শেষ হয়েছে। শুরু হয়েছে নতুন বাক্য। হজরত উবাই বিন কাব, হজরত আয়েশা এবং হজরত ওরওয়া বিন জুবায়েরের বর্ণনাও এরকম ছিলো। তাউসের বর্ণনায় এই বক্তব্যের সম্পর্ক হজরত ইবনে আব্বাসের দিকেও প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। হাসান বসরী এবং অধিকাংশ তাবেয়ীদের মত ছিলো এরকমই। কুসাই, ফারা এবং আখফাসের নিকট এই বক্তব্যই পছন্দনীয় ছিলো। এর সমর্থন রয়েছে হজরত ইবনে মাসউদের দ্বিতীয় ক্বেরাতের দ্বারাও। তাঁর ক্বেরাত অনুযায়ী 'ওয়ার রসিখুন' এর সংযোগ আল্লাহ্র উপর হওয়া সম্ভব নয়। হজরত উবাই ইবনে কাবের ক্বেরাতেও এই ধারণার সমর্থন মিলে। এইজন্য ওমর বিন আবদুল আজীজ র. বলেছেন, তফসীরে কোরআনের বিদ্যায় 'আমরা ইহা বিশ্বাস করি' এই কথাটি রসিখীন (জ্ঞানে সুগভীর) এর জ্ঞানের শেষ সীমা।

'সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আগত' — এখানে সমস্ত বলতে মোহকাম, মোতাশাবেহ্, নাসেখ, মনসুখ এবং যার মর্মার্থ জানা যায় এবং যার মর্মার্থ জানা যায় না — সমস্ত কিছুকেই বোঝানো হয়েছে।

আমি বলি, রসেখীনের হাল ওই সমস্ত লোকের হালের বিপরীত, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার প্রভাবে যাদের অন্তর্বিকৃতি ঘটেছে। তাদের মত প্রবৃত্তিপ্রসূত। যখন জ্ঞানের আলো তাদের সম্মুখে প্রতিভাসিত হয় এবং শরিয়তের কোনো হুকুম তাদের ধারণার অনুকূলে আসে তখন সেই প্রতিভাস তাদেরকে অল্প কিছুদূর যেতে সাহায্য করে। তখন তারা তাকে মেনে নেয়। কিন্তু কোরআনের কোনো হুকুমের ব্যাখ্যা না বুঝলে তারা হয়ে পড়ে হতবিহ্বল। শরিয়তের হুকুম তখন হয়ে উঠে তাদের মতের প্রতিকূল। তারা হয়ে পড়ে অমান্যকারী।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, এই বক্তব্য আয়াতের প্রকাশ্য অর্থমন্ডিত এবং আরবী ব্যাকরণের পূর্ণ অনুকূল।

'এবং বোধশক্তি সম্পন্নেরা ব্যতীত অপর কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে না' — বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরিচয় এই বাক্যাংশটিতে ফুটে উঠেছে। যার জ্ঞান নেই তাকে জ্ঞানীদের উপর নির্ভর করতে হবে। না জানার কারণে জানার ইচ্ছাকে রুদ্ধ করা, মুর্খদের সাথে একাত্ম হয়ে অজ্ঞতাকে মেনে নিয়ে বিভ্রান্তিতে নিপতিত থাকা কোনো জ্ঞানীর কাজ নয়।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৮

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ○

❑ হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য-লংঘন প্রবণ করিওনা এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে করুণা দাও, তুমিই মহা দাতা।

এই আয়াতটি একটি পবিত্র প্রার্থনা। বক্তব্য হচ্ছে, হে আমাদের প্রতিপালক! কুটিলতাকন্টকিত মানুষের মতো আমাদের অন্তরকে সত্যবিমুখ কোর না। তুমি আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ করে আমাদেরকে পথ-প্রদর্শন করেছো। মোহকাম ও মোতাশাবেহ্র উপর বিশ্বাসবান হতে সুযোগ দান করেছো। আমাদেরকে রহমত অর্থাৎ সহায়তা এবং ইমানী শক্তি দান করো। নিশ্চয়ই তোমার দান সুপ্রচুর। প্রয়োজন পূরণ করো তুমি-ই।

এখানে প্রমাণিত হচ্ছে, হেদায়েত কিংবা গোমরাহী সবকিছুই আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্তনির্ভর। সবকিছুই নির্ভর করে তাঁর সহায়তা (তওফিক) দেয়া না দেয়ার উপর। তিনি আপন বান্দাদের প্রতি মেহেরবান। কিন্তু মেহেরবানী করতে বাধ্য নন।

হজরত নাওয়াস বিন সাময়ান বর্ণনা করেন, কোনো অন্তরই আল্লাহ্তায়ালার দুই আঙ্গুলের আওতাবহির্ভূত নয়। তিনি অন্তরসমূহকে ইচ্ছা করলে সোজা রাখেন, ইচ্ছা করলে বক্র করে দেন। রসুল স. প্রার্থনা করতেন, হে অন্তরের আবর্তনবিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরসমূহ তোমার ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখো।

সম্মান, অসম্মান আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্ত অনুসারেই হয়ে থাকে। কিয়ামত পর্যন্ত তিনি কোনো সম্প্রদায়কে সম্মানিত এবং কোনো সম্প্রদায়কে অসম্মানিত করতে থাকবেন। এই ধরনের হাদিস ইমাম আহমদ এবং তিরমিজি হজরত উম্মে

www.eelm.weebly.com

সালমা থেকে এবং মুসলিম হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে এবং তিরমিজি ও ইবনে মাজা হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। বোখারী ও মুসলিম জননী আয়েশা এবং হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, অন্তর সমূহ এরকম — যেমন কোনো পালক খোলা মাঠে পড়ে রয়েছে এবং বাতাস তাকে এদিক ওদিক করে দিচ্ছে। আহমদ।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৯

رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ

❑ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানবজাতিকে একদিন একত্রে সমাবেশ করিবে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই; আল্লাহ্ নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না।

এই আয়াতটিও একটি পুতপবিত্র প্রার্থনা। বলা হচ্ছে, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করি, কিয়ামত নিশ্চিত। তুমি সেদিন বিচারের জন্য সকলকে একত্রিত করবে — একথাও নিশ্চিত। তোমার নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম হয় না। তোমার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। অঙ্গীকার ভঙ্গ তোমার মর্যাদার পক্ষে অশোভনীয়।

এই বাক্যের প্রেক্ষিতে ক্ষমা করার উদ্দেশ্যে শাস্তির মেয়াদকে দীর্ঘায়িত করা আমাদের মতে বৈধ। তওবা করা হলেও। না হলেও। মোতাজিলারা বলে, শাস্তির অঙ্গীকার বিলম্বিত হওয়া বৈধ। প্রমাণ হিসাবে তারা এই আয়াতকে পেশ করে।

আমরা বলি, এই আয়াত মতলক নয় মুকাইয়েদ অর্থাৎ আসল নয় বরং শর্ত। মন্দের শাস্তি শর্তযুক্ত। ফাসেক যদি তওবা না করে তবে শাস্তি হবে। তওবা করলে হবে না। তওবা না করার কারণে শাস্তি হলে, ক্ষমা না করার কারণে শাস্তি হবে। অর্থাৎ পাপীদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা না করলে আযাব হবে। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। অন্যান্য পাপগুলো তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন।' আরো বলেছেন, 'তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন — যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন।' অন্যত্র বলেছেন, 'বিপথগামীরা ব্যতীত আল্লাহ্র রহমত থেকে কেউ নিরাশ হয়না।' আবারো বলেছেন, 'আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।' এই প্রসঙ্গের হাদিস রয়েছে অনেক।

www.eelm.weebly.com

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ
اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ○ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ
وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ
وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ
إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান সন্তুতি আল্লাহের নিকট কোন কাজে লাগিবেনা; এবং ইহারাই অগ্নির ইন্ধন।

❒ ফেরাউনী সম্প্রদায় ও তাহাদের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করিয়া অস্বীকার করিয়াছিল, ফলে আল্লাহ্ তাহাদের পাপের জন্য তাহাদিগকে শাস্তিদান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ দন্ডদানে অত্যন্ত কঠোর।

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে বল, 'তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হইবে এবং তোমাদিগকে জাহান্নামে একত্রিত করা হইবে। আর উহা কত নিকৃষ্ট আবাস স্থল!'

কাফের (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী) বলতে এখানে ইহুদী, খৃষ্টান এবং সকল প্রকার মূর্তিপূজককে বোঝানো হয়েছে। তাদের সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি আসল কাজের বেলায় নিষ্ফল হবে। এসবের কারণে তারা আল্লাহ্ পাকের রহমতও লাভ করতে পারবে না, আল্লাহ্তায়ালার আজাবও রোধ করতে পারবে না। তারাই দোজখের ইন্ধন। তাদের আচরণ ফেরাউন সম্প্রদায়ের মতো। ফেরাউন সম্প্রদায় নবীদেরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করতো। এরাও তাই করে। ফেরাউন সম্প্রদায়ের পূর্বে যারা ছিলো, তাদের সাথেও এদের বিশ্বাস ও কর্মগত সাযুজ্য রয়েছে। তারা আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহকে মিথ্যাচ্ছন্ন করেছে — তাই আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেছেন এবং শাস্তি দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী। আর তাঁর শাস্তিও সুদৃঢ়।

www.eelm.weebly.com

আবু দাউদ, ইবনে জারীর এবং বায়হাকী মোহাম্মদ বিন ইসাহাকের ধারাবাহিকতায় সাইদ বিন জোবায়ের ও ইকরামার মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এভাবে, বদরবিজয়ের পর রসুলে পাক স. মদীনায় ফিরে এসে বনী কায়নুকার বাজারে ইহুদীদেরকে একত্রিত করলেন। বললেন, শোনো ইহুদীরা! ইতোপূর্বে তোমাদের উপর কোরায়েশদের মতো বিপদ নেমে এসেছিলো, সুতরাং মুসলমান হয়ে যাও। ইহুদীরা বললো, মোহাম্মদ! কোরায়েশদের কিছু লোকদের হত্যা করেছো বলে অহংকার কোর না। তারা তো অনভিজ্ঞ। যুদ্ধবিদ্যা তারা জানেই না। আমাদের সাথে যুদ্ধ করলে বুঝবে আমরা কেমন। আমাদের তুল্য কেউ নেই। এই কথোপকথনের পর আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, 'হে নবী ! আপনি কাফেরদেরকে অর্থাৎ ওই সমস্ত ইহুদীদেরকে বলে দিন, অতি সত্বর তোমরা পরাজিত হবে।' আল্লাহ্তায়ালার ঘোষণা সফল হলো। বনী কোরাইজাকে হত্যা করা হলো। বনি নাজিরকে তাড়িয়ে দেয়া হলো। খয়বর দুর্গ বিজিত হলো। এবং সেখানকার ইহুদীদের উপর জিজিয়া কর নির্ধারিত হলো।

মুকাতিল রা. বর্ণনা করেন, এই আয়াত বদর যুদ্ধের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। 'কাফের' দ্বারা এখানে মক্কার মূর্তিপূজকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ বলা হয়েছে, আপনি মক্কার কাফেরদেরকে বলে দিন, তোমরা বদরে পরাজিত হবে। রসুল পাক স. তাদেরকে বদরের দিন বলেছিলেন, আল্লাহ তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত। তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

আবু সালেহের বর্ণনা থেকে কালাবী, হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন, বদর যুদ্ধে অংশীবাদীরা পরাজিত হলে মদীনার ইহুদীরা বলতে শুরু করলো, আল্লাহর কসম! তিনি তো ওই নবী যার সুসংবাদ হজরত মুসা আ. দিয়েছিলেন। তাঁর পতাকা অপ্রতিরোধ্য। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, রসুল স. এর অনুসারী হওয়াই উত্তম। কেউ কেউ বললো, এতো তাড়াতাড়ি কেনো? আরো দু'একটি ঘটনা দেখে নাও। এরপর উহুদ যুদ্ধে সাহাবীগণ পরাজিত হলে ইহুদীরা দ্বিধাদীর্ণ হয়ে পড়লো। প্রবৃত্তি প্রবল হলো, তারা আর মুসলমান হলো না। মুসলমান ও ইহুদীর মধ্যে যে সন্ধি ছিলো, তা তারা ভঙ্গ করে ফেললো নির্ধারিত সময়ের আগেই। কাব বিন আশরাফ সাত সদস্যের এক দল নিয়ে মক্কায় পৌঁছলো এবং মক্কাবাসীদেরকে যুদ্ধে উৎসাহিত করতে লাগলো। সিদ্ধান্ত হলো, তারা একযোগে রসুল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তখন আল্লাহতায়ালা ওহি অবতীর্ণ করে জানালেন, তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আর জাহান্নাম কতোই না নিকৃষ্ট আবাস।

www.eelm.weebly.com

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ۝

❒ দুইটি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিলো। একদল আল্লাহের পথে সংগ্রাম করিতেছিল, অন্যদল সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ছিলো; তাহারা উহাদিগকে চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখিতে ছিল। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় ইহাতে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন লোকের জন্য শিক্ষা রহিয়াছে।

যুদ্ধের প্রান্তরে মুখোমুখি দুই দল—এই অবস্থা আল্লাহতায়ালার মহান নিদর্শন। সত্য প্রত্যাখ্যানকারী দল ইহুদী অথবা মুশরিক। আয়াতের উদ্দেশ্য ইহুদীরা। যদি পূর্ববর্তী আয়াতের উদ্দেশ্য ইহুদীরা হয়, অথবা মুশরিকেরা যদি পূর্ববর্তী আয়াতের উদ্দেশ্য মক্কার মুশরিকরা হয়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, হে মুশরিকের দল দেখো, আমার নবুয়তের নিদর্শন এবং প্রমাণ কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহর পথে সংগ্রামকারীরা সংখ্যায় ছিলেন তিনশ' তেরজন। সত্তরজন মুহাজির এবং দুইশ' ছত্রিশজন আনসার। মোহাজিরদের পতাকা বহন করছিলেন হজরত আলী — এটাই বিশুদ্ধ বর্ণনা। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন পতাকা বহনকারী ছিলেন হজরত মুসয়াব বিন উমাইর। আনসারদের নিশানবাহী ছিলেন, হজরত সা'দ বিন ওবাদা। সেনাদলের উট ছিলো সতেরটি, ঘোড়া দুইটি। একটি হজরত মেকদাদ বিন আমরের এবং অন্যটি হজরত মারসাদ বিন আবী মারসাদের। এছাড়া অন্য সবাই ছিলেন পদাতিক। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিলো, ছয়টি বর্ম এবং আটটি তরবারী।

অপর দলটি মক্কার মুশরিকদের। তাদের সৈন্য সংখ্যা নয়শত পঞ্চাশ। সেনাপতি ছিলো উৎবা বিন রবীয়া বিন আবদে শামশ। পাঁচশ ঘোড়া ছিলো তাদের। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো বদর প্রান্তরে। এ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন রসুল পাক স. স্বয়ং। এটাই মুসলমান ও কাফেরদের প্রথম যুদ্ধ। হিজরতের আঠার মাস পরে দ্বিতীয় হিজরীতে রমজান মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। কাফেররা মুসলমান বাহিনীকে দ্বিগুণ দেখছিলো। এখানে কাফের বলতে ইহুদীদেরকে বোঝানো হলে, বুঝতে হবে, ওই সমস্ত ইহুদীরা যারা বদর প্রান্তরে পৌঁছেছিলো এই উদ্দেশ্যে যে, দেখা যাক যুদ্ধের মোড় কোন দিকে ঘোরে। অবস্থা এ রকম

www.eelm.weebly.com

ছিলো যে, কখনো মুসলমানরা কাফেরদেরকে দ্বিগুণ দেখছিলো আবার কখনো কাফেররা দ্বিগুণ দেখছিলো মুসলমানদেরকে। 'দ্বিগুণ' অর্থ এখানে অধিক অথবা অত্যাধিক। সংখ্যাগত গণনার ভিত্তিতে দ্বিগুণ নয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে কাফেররা দেখেছিলো, মুসলমানদের সংখ্যা অনেক কম। এই অবস্থা তাদেরকে উদ্ধত করে তুললো। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তারা দেখলো মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণ। তখন তারা ভীত হলো, মুষড়ে পড়লো। পরিশেষে পরাজয় বরণ করলো। অপর দিকে কাফেরদের সংখ্যা কম দেখতে পেয়ে মুসলমানরা দৃঢ়চিত্ত হলো। আর দৃঢ়চিত্ততার ফল স্বরূপ বিজয়ী হলো। তাদের দৃঢ়চিত্ততার মূল কারণ অবশ্য ছিলো, আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুতি, 'অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে একশতজন দৃঢ়পদ থাকে, তবে তারা দুইশত জনের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে।'

হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, প্রথমে আমরা কাফেরদেরকে দ্বিগুণ দেখতে পাচ্ছিলাম। পরে দেখলাম, তারা ও আমরা সমান সংখ্যক। এরপরে আমাদের দৃষ্টিতে তাদের সংখ্যা গেলো কমে। আমি আমার সামনের জনকে বললাম, আশ্চর্য! আমাদের একজনকে তো সত্তরজন মনে হচ্ছে। তিনি বললেন, আমার তো মনে হচ্ছে, একশ'।

আল্লাহতায়ালা যাকে চান তাকে আপন শরণ দানে শক্তিশালী করেন। এই ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কমকে বেশী দেখানো এবং প্রায় নিরস্ত্রদেরকে পূর্ণ সশস্ত্রদের উপরে বিজয়ী করা আল্লাহতায়ালা ইচ্ছা ও সাহায্যেই সম্ভব। এই ঘটনা প্রত্যক্ষকারী যারা একদল অপর দলকে দেখেছে অথবা যারা উভয় দলকে দেখেছে তাদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۝

❑ নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং ক্ষেত খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুন্দর করা হইয়াছে। এই সব ইহ-জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ, তাহার নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল।

---

www.eelm.weebly.com

সৌন্দর্যের প্রতি আসক্তি মানুষের স্বভাবজ ব্যাপার। কাম্য বস্তু সকল সময়ের জন্যই প্রিয়। পার্থিব সৌন্দর্য পৃথিবীপ্রেমীদেরকে মোহিত করে। শারীরিক শক্তি, সুন্দর অবয়ব, সুন্দর পোশাক, ঘোড়া অথবা বৈভব, সম্মান — এ সমস্তকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। নৈসর্গিক সৌন্দর্য মানুষকে অভিভূত করে। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করেছি।' অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের দিকেও মানুষের আকৃষ্টি রয়েছে। এই আকৃষ্টি বিশুদ্ধতার দিকেও হতে পারে। অবিশুদ্ধতার দিকেও হতে পারে। যেমন, অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'এবং তিনি তোমাদের অন্তরকে দিয়েছেন ইমানের প্রতি অনুরাগ।' বিপরীত দিকের দৃষ্টান্ত এ রকম, 'তাদের মন্দ আমল তাদের চোখে সুশোভিত করা হয়েছে।'

কামনা বাসনা প্রিয় বস্তুসমূহের প্রতি ধাবিত হয়। সৌন্দয্য নির্ধারিত হয় অন্তরের আকর্ষণের ভিত্তিতে। প্রেম, প্রেমাস্পদ, কামনা, দুই ধরনের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে।

১. সদুপদেশ এবং সত্যান্বেষণ মিলিতভাবে এক প্রকার আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

২. স্বাভাবিক বৃত্তি মানুষকে মগ্ন করে রাখে সম্পদ, সন্তান সন্তুতি ও রমণীদের প্রতি। বিশুদ্ধতার প্রশ্ন এক্ষেত্রে মুখ্য কিছু নয়। লাইলী এবং লাইলীর মহব্বত — দুইই ছিলো কায়েসের কাছে প্রিয়। সে বলেছিলো,ইয়া ইলাহি, লাইলীর মহব্বত থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন কোর না।

সাহেবে কাশ্‌শাফ লিখেছেন, আল্লাহতায়ালার নিকট থেকে পুণ্যার্জনের অভিলাষকে প্রবল করার মাধ্যমে পার্থিব শোভন সামগ্রীসমূহের আকর্ষণমুক্ত হওয়া সম্ভব। সতর্কতা ও বিরত থাকার অনুশীলন থাকতে হবে। পার্থিব আকর্ষণ মূলত আপন প্রবৃত্তিরই আকর্ষণ। এই আকর্ষণ মানবসত্তাকে পূণ্যপথ থেকে সরিয়ে রাখে। সুশোভিত বস্তুসমূহের স্রষ্টা আল্লাহ। এ সমস্তের প্রতি আকর্ষণও সৃষ্টি করেছেন তিনিই। করেছেন এ কারণে যে, বিপরীত পরিস্থিতির মাধ্যমেই পরীক্ষা সম্পন্ন হতে পারে। যেমন তিনি বলেছেন, 'ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছুকে আমি সৌন্দর্যের উপকরণ করে দিয়েছি, যেনো আমি মানুষকে পরীক্ষা করে নিই — অধিকতর উত্তম আমল সম্পাদনকারী কারা।' দ্বিতীয়তঃ পৃথিবী আমলের স্থান। তৃতীয়তঃ পার্থিব সৌন্দর্যরাজি যেনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ হয়। চতুর্থতঃ আখেরাতের কল্যাণ নিষিদ্ধতা বর্জনের মধ্যেই। পঞ্চমতঃ এই পরীক্ষার মাধ্যমে ফেরেশতাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। ষষ্ঠতঃ কাফেরদের পতনের পথ সুগম করে দেয়া হয়। যেমন বলা হয়েছে, 'তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ ভ্রষ্ট করেন।' অতপর এ কথা সহজে অনুমেয় যে, জীবনের এই বৈপরীত্যের মধ্যে রয়েছে হিকমত। রয়েছে চিরস্থায়ী জীবন লাভের নন্দিত সাধনার সুযোগ।

www.eelm.weebly.com

সৌন্দর্যের স্রষ্টা আল্লাহ। সাধারণভাবে সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্টি ক্ষতিকর নয়। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'আপনি বলুন কে হারাম করলো আল্লাহর সৃষ্ট পোশাক যা তিনি স্বীয় বান্দাদের জন্য বানিয়েছেন।' কিন্তু সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ যদি সৌন্দর্যের স্রষ্টা সম্পর্কে উদাসীন করে দেয়, তবেই বিপদ। এই বিস্মরণের কারণ শয়তান এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা। বিস্মৃত মানুষ তার আপন কর্মেই মগ্ন। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'আর এমনিভাবে আমি সুশোভিত করে দিয়েছি প্রত্যেক উম্মতের জন্য তাদের কার্যসমূহকে।'

এবং আমি সুসজ্জিত করেও রেখেছি তাদের কার্যাবলীকে। তাই তারা উদভ্রান্তির শিকার।' অন্যত্র বলেছেন, 'শয়তান তাদের কাজগুলোকে তাদের দৃষ্টিতে লোভনীয় করে রেখেছে।' আরো বলেছেন, 'শয়তান তাদের কার্যগুলোকে আকর্ষণীয় করে রেখেছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে দূরে রেখেছে।' এই আয়াতে পার্থিব সৌন্দর্যের তালিকায় রমণী, সন্তান-সন্তুতি, বিপুল বিত্ত-বৈভব, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেতখামারের কথা বলা হয়েছে। বিপুল বিত্ত-বৈভবের সংজ্ঞা সুনির্ধারিত নয়। হজরত মুআজ বিন জাবাল বলেছেন, এর পরিমাণ দুইশত আউকিয়া। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বার শত মিসকাল অথবা বার হাজার দিরহাম অথবা এক হাজার দিনার। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের এবং হজরত ইকরামা বলেছেন, শত হাজার এবং শত সের শত রেতল (পাউন্ড) এবং শত মেসকাল এবং শত দিরহাম (অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর পরিমাণ একশত)। সুদ্দী বলেছেন, চার হাজার মিসকাল। হাকেম বলেছেন, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছুকেই বিপুল বিত্ত-বৈভব (কিনতর) বলা যেতে পারে। কেউ কেউ বলেন, গাভীর চামড়া ভর্তি মেশক হলো কিনতর। বিষয়টি মতানৈক্যদীর্ণ।

কিনতরের পরের শব্দটি 'মুকানতর' এর অর্থ, পুঞ্জীভূত সম্পদ বা রাশিকৃত বৈভব। জুহাক বলেছেন, এর অর্থ — সুদৃঢ় (মজবুত)। সাদী বলেছেন, এর অর্থ সম্পদ জমানোর স্থান (ব্যাংক)। ফারাহ বলেছেন, কয়েক গুণ অর্থাৎ দ্বিগুণ চর্তুগুণ — এ রকম।

মুকানতরের পরের শব্দ যাহাব-এর এক অর্থ যাওয়া। আসল অর্থ স্বর্ণরৌপ্য। যাওয়া আসা স্বর্ণরৌপ্যের স্বভাব।

এর পরের উল্লেখে রয়েছে চিহ্নিত অশ্ব এবং গবাদিপশু — উট, গাভী, মহিষ, বকরী ইত্যাদির কথা। সব শেষে রয়েছে শস্যক্ষেত্র। আল্লাহ্তায়ালা জানিয়েছেন, এ সমস্ত বস্তু মনকে ভোলায়। এমনভাবে ভোলায় যে, এ সবের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালার কথা আর মনে পড়ে না। আল্লাহতায়ালা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, এ সমস্ত কিছু ধ্বংসশীল; প্রকৃত আশ্রয় আল্লাহতায়ালাই। হজরত কাতাদা বলেন, হজরত ওমর এই আয়াত পাঠ শেষে বলতেন, হে আমার আল্লাহ! আমার ও

www.eelm.weebly.com

আমার সন্তান সন্তুতির জন্য ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ নির্ধারণ করুন এবং দান করুন আখেরাতের উত্তম অংশ। আর আখেরাতই তো স্থায়ী।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৫

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ○

❒ বল, আমি কি তোমাদিগকে এই সব বস্তু হইতে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দিব? যাহারা সাবধান হইয়া চলে তাহাদের জন্য উদ্যানসমূহ রহিয়াছে যাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে, তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহের নিকট হইতে সন্তুষ্টি রহিয়াছে। আল্লাহ্ তাহার দাসদের দ্রষ্টা।

পার্থিব ধ্বংসশীল সৌন্দর্যের বিপরীতে আল্লাহতায়ালা সংবাদ দিয়েছেন জান্নাতের, পূতপবিত্র রমণীদের, যারা ঋতুবতী হওয়া থেকে পবিত্র, প্রাকৃতিক প্রয়োজনাদি থেকে মুক্ত এবং কুমারী। শেষে বলেছেন, আল্লাহতায়ালার সন্তোষভাজন হওয়ার কথা। সন্তান সন্তুতির উল্লেখ করেন নি। কেননা, সন্তান লাভের ইচ্ছা এবং প্রয়োজন হয় পৃথিবীতে। ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু এবং স্বর্ণরৌপ্যেরও উল্লেখ করেননি। কারণ এ সমস্তের প্রয়োজনও বেহেশতবাসীরা অনুভব করবেন না।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহতায়ালা বলবেন, হে বেহেশতীবৃন্দ। বেহেশতীরা উত্তর দিবে, হে আল্লাহ্, আমরা উপস্থিত। কল্যাণসমূহ তোমারই। আল্লাহতায়ালা বলবেন, তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা কি আরো বাড়িয়ে দেবো? তাঁরা বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আরো কিছু কি আছে! আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের উপর অবতীর্ণ করবো আমার সন্তোষ। কখনো আর অসন্তুষ্ট হবো না। বোখারী, মুসলিম।

আমি বলি, এই আয়াতে বেহেশতের উল্লেখ করে মানুষের অন্তরের সমস্ত কামনা বাসনা চরিতার্থ হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, বেহেশতে তোমরা যা চাইবে তাই পাবে। তোমাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে। সন্তান সন্তুতি,

www.eelm.weebly.com

আপনজন বেহেশতে একত্রিত হবে। পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎও হবে। আল্লাহ বলেছেন, আমি তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে সমমর্যাদাভূত করবো। তাদের আমলসমূহ বিন্দু পরিমাণও সংকুচিত করবো না। একবার রসুলে পাক স. কে জিজ্ঞেস করা হলো, জান্নাতে কি কোনো শিশু ভূমিষ্ঠ হবে? রসুল স. বললেন, সন্তান লাভের ইচ্ছা হলে গর্ভধারণের ঘটনা ঘটবে এক ঘন্টার মধ্যেই। জন্মলাভ করার পর শিশুর বয়স নির্ধারিত হবে জান্নাতবাসীর ইচ্ছানুসারে। তিরমিজি।

তিরমিজি বলেছেন, এই হাদিসটি হাসান। বায়হাকীও এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। হান্নাদ তাঁর জুহুদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন হজরত আবু সাঈদের বর্ণনা থেকে। আরো উল্লেখ করেছেন হাকেম এবং ইসপাহানী।

জান্নাতে স্বর্ণরৌপ্যও থাকবে। বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহতায়ালার এক জান্নাত এ রকম, যার ভবনসমূহ নির্মিত হয়েছে রূপা ও সোনার ইট দিয়ে, এগুলোকে জোড়া দেয়া হয়েছে মেশক আম্বর দিয়ে। বায্যার, তিবরানী। বায়হাকী হজরত আবু সাঈদ থেকে মারফু হাদিস বর্ণনা করেছেন, দুটি বেহেশত থাকবে রৌপ্য নির্মিত, যার তৈজসপত্র এবং আসবাবসামগ্রী সবই হবে রূপার। দু'টি বেহেশত হবে সোনার, তার তৈজসপত্র এবং আসবাবাদি সোনারই হবে। বোখারী, মুসলিম।

বেহেশতে ঘোড়া ও চতুষ্পদ জন্তু থাকার কথাও জানা যায়। একবার এক বেদুইন বললেন, হে আল্লাহর রসুল, আমি ঘোড়া ভালোবাসি। বেহেশতে কি ঘোড়া থাকবে? রসুল স. বললেন, তুমি বেহেশতে প্রবেশ করলে তোমাকে দেয়া হবে ইয়াকুতের ঘোড়া। তার দু'টি পাখা হবে। তোমাকে তাতে বসানো হবে। তারপর তুমি যেমনটি চাইবে, ঘোড়া তোমাকে তেমনিভাবে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, হজরত আবু আইয়ুব থেকে।

ইবনে মোবারক হজরত শফী বিন মানে থেকে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতের আনন্দসম্ভারের মধ্যে এরকম ব্যবস্থা থাকবে যে, তাঁরা একে অপরের নিকট সাক্ষাত করতে গেলে উট এবং ঘোড়ায় চড়ে যাবে এবং জুমআর দিনে তাদেরকে দেয়া হবে লাগামবিশিষ্ট জীন সজ্জিত ঘোড়া। সেগুলো কখনো মলমূত্র পরিত্যাগ করবে না। আল্লাহ জান্নাতীদেরকে এগুলোর উপরে চড়িয়ে যেখানে নিতে ইচ্ছা করেন নিয়ে যাবেন।

হজরত ইবনে আবুদ্দুনিয়া এবং আবু শায়েখ ও ইসপাহানী হজরত আলীর মারফু হাদিসে বর্ণনা করেন, বেহেশতের এক বৃক্ষের উচ্চ অংশ থেকে পোশাক পরিচ্ছদ এবং নিচের অংশ থেকে শাদা কালো মিশ্রিত সোনার ঘোড়া সৃষ্ট হবে। সেগুলোর জীন হবে মোতির এবং লাগাম হবে ইয়াকুতের তৈরী। সেগুলোর দু'টি করে ডানা থাকবে। ডানাগুলো হবে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। ঘোড়াগুলো মলমূত্র পরিত্যাগ করবে না। এগুলোর আরোহী হবেন আল্লাহর ওলীগণ। তাঁরা উড়ন্ত

www.eelm.weebly.com

ঘোড়ায় চড়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবেন। নিচের মানুষেরা বলবেন, তাঁরা তো আমাদের আলোকে অন্ধকার করে দিয়েছেন। (আল্লাহ অথবা ফেরেশতা) বলবেন, তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করতো আর তোমরা করতে কার্পণ্য। তারা করতো জেহাদ আর তোমরা ছিলে জেহাদবিমুখ।

ইবনে মোবারক, হজরত ইবনে ওমরের উক্তি উল্লেখ করেছেন, জান্নাতে উত্তম অশ্ব এবং উচ্চ মানের উট থাকবে। ওগুলোর আরোহী হবে জান্নাতিরা। ইবনে ওহাব, হাসান বসরীর উক্তি উল্লেখ করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, সবচেয়ে নিম্নমর্যাদাধারী জান্নাতবাসীর থাকবে হাজার হাজার গেলমান (অল্পবয়স্ক পরিচারক)। তারা ইয়াকুতের লাল ঘোড়ার উপর চড়বে। ঘোড়াগুলোর ডানা হবে স্বর্ণনির্মিত।

জান্নাতে চাষাবাদের বিবরণও পাওয়া যায়। বোখারী হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, একজন জান্নাতবাসী আল্লাহতায়ালার নিকট কৃষিকর্মের অনুমতি চাইলে আল্লাহ বলবেন, জান্নাত কি তোমার অভিলাষ পূরণে যথেষ্ট নয়? বেহেশতবাসী আরজ করবেন, কেনো নয়। কিন্তু আমি যে চাষাবাদ করতে চাই। সে চাষাবাদ শুরু করবে। চোখের পলকে তার প্রান্তর হয়ে উঠবে শস্যময়। ফসল কর্তনের পর তার ফসল জমা হয়ে যাবে পাহাড় পরিমাণ। আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার কোনো ইচ্ছা অপূরণীয় রাখবো না।

তিবরানী এবং আবু শায়েখও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় আরো রয়েছে, ক্ষেতের একেকটি সজী হবে বারো হাত লম্বা এবং এর জন্য তাকে কোনো পরিশ্রমও করতে হবে না। স্তূপীকৃত ফসল হয়ে যাবে টিলার মতো।

এবার সন্তান সন্তুতি প্রসঙ্গ। সন্তান-সন্তুতি তারাই লাভ করবে পৃথিবীতে যাদের সন্তান হয়েছিলো। যাদের হয়নি তারাও ইচ্ছা করলে সন্তান সন্তুতি লাভ করবে। সাধারণভাবে জান্নাতবাসীদের সন্তান লাভের বাসনা থাকবে না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, জান্নাতবাসী কেউ সন্তান চাইলে, পাবে। কিন্তু এ ধরনের ইচ্ছা সাধারণত হবে না।

এরপর আল্লাহ পাক এমন এক নেয়ামতের উল্লেখ করবেন, যা অনুভবসাপেক্ষ নয়। এটাই সর্বোচ্চ নেয়ামত — আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি। আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টিই পৃথিবীর নেয়ামত থেকে জান্নাতের নেয়ামতসমূহকে সম্মানিত করেছে। পৃথিবী অভিসম্পাতগ্রস্ত এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই অভিশপ্ত। অবশ্য পৃথিবীর জাকেরীণ (আল্লাহর স্মরণকারী), আলেমে দ্বীন এবং দ্বীনের এলেম অন্বেষণকারীগণ এর ব্যতিক্রম। তিবরানী হজরত ইবনে মাসউদ থেকে, হজরত আবু দারদা থেকে এবং ইবনে মাজা হজরত আবু হোরায়রা থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন।

www.eelm.weebly.com

রবিয়া হারাসী রা. বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমাকে স্বপ্নে বলা হয়েছে, একজন নেতা একটি গৃহ নির্মাণ করলেন। আপ্যায়ণের জন্য আহার্য প্রস্তুত করলেন। তারপর নিযুক্ত করলেন একজন আহবানকারীকে। যে সাড়া দিলো, সে ওই ঘরে প্রবেশ করতে পারলো এবং পানাহার করে পরিতৃপ্ত হলো। গৃহস্বামী (নেতা)ও আনন্দিত হলেন। যে বিমুখ থাকলো সে গৃহে প্রবেশ করতে পারলো না, পানাহারের সুযোগও পেলো না। তার প্রতি গৃহস্বামী অসন্তুষ্ট হলেন। এর ব্যাখ্যায় রসুল স. বললেন, গৃহস্বামী হলেন আল্লাহ। আহবানকারী মোহাম্মদ স.। গৃহটি ইসলামের গৃহ। আর নিমন্ত্রণের স্থান বেহেশত। দারেমী।

আমি বলি, পৃথিবীর বিত্ত-বৈভবকে আল্লাহ ভালোবাসেন না। তাই এদিকে মগ্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'আর আপনি কখনো ওই সমস্ত বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন না, যদ্বারা ভোগোন্মত্ত কাফেরেরা পরিতৃপ্ত হয়, ওসব তো শুধু পার্থিব জীবনের চমক।' জান্নাতের বিত্ত-বৈভব আল্লাহতায়ালার পছন্দনীয়। এর প্রতি যারা আকৃষ্ট হয় তারাই প্রশংসার পাত্র। এ মতন আকৃষ্টিই আল্লাহতায়ালা চান। যেমন আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'এ রকম বস্তুর প্রতি লালসা করা উচিত।' পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংসশীল, নতুনত্বের কলংকে কলংকিত। এ সমস্ত ধ্বংসশীল বস্তু আল্লাহতায়ালার পূর্ণত্বের প্রতিচ্ছবিকে অবলম্বন করে অস্তিত্ব লাভ করে এবং চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এ সমস্তের অস্তিত্ব আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের প্রতিচ্ছায়া তুল্য। যেমন, অজ্ঞতা অস্তিত্বশীল হয় প্রজ্ঞারূপে আল্লাহতায়ালার জ্ঞানের আবির্ভাবে। অক্ষমতা রূপ নেয় ক্ষমতার, আল্লাহতায়ালার ক্ষমতার সহায়তায়। সৃষ্টির এ রকম জ্ঞান ও ক্ষমতা প্রতিবিম্বনির্ভর। এভাবেই চলেছে নিত্য নতুন সৃজনশীলতা। এতে কোনো কল্যাণ নেই, পূর্ণতাও নেই। এর পরিণাম নিশ্চিত ধ্বংস। কিন্তু আখেরাত এর বিপরীত। আখেরাত আল্লাহতায়ালার গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত বলে এর অস্তিত্ব হবে অক্ষয়, চিরস্থায়ী। তাই আখেরাতের আকর্ষণ আল্লাহতায়ালার আকর্ষণের মতো। আখেরাতের ভালোবাসা প্রকৃত অর্থে আল্লাহতায়ালারই ভালোবাসা।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী র. লিখেছেন, নবী এবং ওলীগণের আকর্ষণ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো দিকে হয় না। কিন্তু দেখা যায় হজরত ইয়াকুব আ. হজরত ইউসুফ আ. এর প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট ছিলেন। রহস্য এই যে, হজরত ইউসুফ আ. এর সৌন্দর্য ছিলো অবিকল জান্নাতবাসীদের সৌন্দর্য। তাই তাঁর প্রতি মহব্বত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতায়ালারই মহব্বত ছিলো। রসুলে পাক স. এরশাদ করেছেন, আমি যদি কাউকে খলিল (বন্ধু) হিসাবে গ্রহণ করতাম, তবে গ্রহণ করতাম আবু বকরকে। কিন্তু তোমাদের সাথী যে আল্লাহকেই খলিল রূপে গ্রহণ করে নিয়েছে। মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

জ্ঞাতব্য ঃ মুমকিনুল ওজুদ বা প্রত্যেক সম্ভাব্য বস্তুই বিলয়শীল। চিরন্তন নয়।

ইস্কান্দরের ইহুদীরা এবং তাদের অভিভাবকগণ সম্ভাব্য বস্তুনিচয়কে চিরন্তন বলে থাকে। তারা বলে, প্রত্যেক সম্ভাব্য বস্তু নিজে নিজেই হয়, কেউ সৃষ্টি করে না। কিন্তু কারণের দিক থেকে এদের অস্তিত্ব চিরন্তন, যার কোনো আরম্ভ নেই। আমরা বলি, সম্ভাব্য বস্তু সমূহের মূল বিনষ্টি ও ক্ষতিগ্রস্ততা। ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে অস্তিত্বের অভ্যুদয় সম্ভব নয়। সৃষ্টজগতের সকল কর্মকান্ড আল্লাহতায়ালার জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সৃষ্টজগতের উপর আল্লাহাতায়ালার গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া পতিত হলে সৃষ্টি বিকশিত হয়ে ওঠে। অজ্ঞ মানুষ এই ছায়াকেই প্রকৃত অস্তিত্ব মনে করে থাকে। অস্তিত্ব অর্থ, চিরন্তন অস্তিত্ব। কিন্তু সৃষ্টি তো চিরন্তন নয়। চোখের সামনে আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি, সবকিছুর গতি ও পরিণতি ধ্বংস ও ক্ষতির দিকে। সুতরাং বিলিয়মানতাই যার পরিণতি তা কখনো কল্যাণকর হতে পারে না। পূর্ণ সৌন্দর্যমন্ডিতও হতে পারে না। প্রতিচ্ছায়ার প্রকৃত ভিত্তি নেই। স্থায়ী সৌন্দর্যও নেই। অপরদিকে আখেরাতের নেয়ামত সম্ভার এবং বিপদ মুসিবত চিরস্থায়ী। তার শুরু আছে শেষ নেই। বরং তা যেনো আল্লাহতায়ালার পূর্ণ গুণাবলীর প্রকাশ। সেখানে প্রতিবিম্বজাত কিছু নেই। আল্লাহতায়ালার দয়া এবং নির্দয়তা সেখানে চিরস্থায়ী। তাই নবী এবং ওলিগণ এবং তাদের পথ প্রদর্শন প্রচেষ্টা কল্যাণকর। কারণ, তাঁরা পৃথিবীতে অবস্থানকালেও আখেরাতের অভিলাষী। আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৬, ১৭

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ۝

❒ যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করিয়াছি; সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে আগুনের আজাব হইতে রক্ষা কর;'

❒ তাহারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী এবং উষাকালে ক্ষমা প্রার্থী।

আমরা বিশ্বাস করেছি, সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো — এ রকম কথায় প্রমাণিত হচ্ছে, শুধুমাত্র ইমানই ক্ষমা লাভের জন্য যথেষ্ট। হজরত মুআজ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, বান্দাদের উপর আল্লাহর দাবী এই যে, তারা তাঁর

www.eelm.weebly.com

ইবাদত করবে আর কোনোকিছুকে তাঁর অংশী করবে না। এবং আল্লাহর উপর বান্দাদের দাবী এই যে, মুশরিক (অংশীবাদী) ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেয়া হবে না। হজরত মুআজ বললেন, হে আল্লাহর রসুল। আমি কি মানুষকে এই সুসংবাদটি জানাবো না? রসুল স. বললেন, না। কারণ, এ কথার উপর ভরসা করে মানুষ বসে থাকবে (আমল করবে না)। বোখারী, মুসলিম।

'ধৈর্যশীল' অর্থ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণকারী। পরিত্যাগ করতে হবে প্রবৃত্তির লেলিহান আকাঙ্খা এবং যা কিছু অসৎ। মেনে নিতে হবে আল্লাহতায়ালার আনুগত্য এবং যা কিছু শুভ।

'সত্যবাদী' অর্থ কথোপকথনে, প্রার্থনায় এবং সাক্ষ্য প্রদানে সত্যনিষ্ঠ হওয়া। আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সত্যটিকে প্রকাশ করা। সে সত্যটি হচ্ছে — "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু।"

জ্ঞাতব্য ঃ সত্য শব্দটির পরিসর ব্যাপক। মিথ্যা শব্দটিও ব্যাপক অর্থসম্পন্ন। সাধারণভাবে বক্তব্য, দাবী, ঘটনার বিবরণ, সাক্ষ্যদান — সকল ক্ষেত্রেই সত্য মিথ্যার ব্যাপক সীমানা রয়েছে। সুফীগণের পরিভাষায়, সত্য মিথ্যার অন্য অর্থেরও অবকাশ আছে। সালেক (আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমণকারী) যখন সুলুকের (আধ্যাত্মপথে) পথে বিভিন্ন মঞ্জিল অতিক্রম করতে থাকে তখন অসতর্কতা ও অজ্ঞতার কারণে এ সমস্ত মঞ্জিলের কোনো একটিকে মূল গন্তব্যস্থল বলে ভুল করে বসে। এ রকম অবস্থায় তারা যা কিছু বলে তা অসত্য। এ রকম অবস্থাও প্রকৃত সত্যবাদী বলে বিবেচিত হওয়ার অন্তরায়। ওয়াল্লাহু আলাম।

'অনুগত' অর্থ প্রতিনিয়ত আল্লাহতায়ালার আনুগত্যসংলগ্ন থাকা। উদ্দেশ্য, আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ।

'ব্যয়কারী' অর্থ আপন সম্পদ আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে ব্যয়কারী।

'উষাকালে ক্ষমা প্রার্থনা' বলতে বোঝানো হয়েছে আল্লাহতায়ালার ভয়ে আপন অক্ষমতাকে স্বীকার করে ক্ষমা যাঞ্চা করা। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহতায়ালার পরাক্রম ও মর্যাদার উপযোগী ইবাদত বান্দার আওতায় নেই, তাই বান্দা যদি মনে করে আমার সমস্ত সৎকর্ম ও অন্যান্য কার্যনিচয় আল্লাহতায়ালাই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সুযোগ দান করেছেন ইবাদতের, তখন সে জানতে পারে ইবাদত কবুল হওয়াও আল্লাহতায়ালার নিছক অনুগ্রহ বৈ অন্য কিছু নয়। এই নেয়ামতের প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশও সম্ভবপর নয়। তাই আল্লাহ তাঁর ক্ষমা ও সন্তোষ দ্বারা যদি সমস্তকিছুকে আবৃত করে নেন, তবেই মুক্তি। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'তিনি নিজ অনুগ্রহে মুসলমান করে দিয়েছেন। হে আমার প্রেমাস্পদ, আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন — মুসলমান হয়ে যাওয়ায় আমাকে কোনো অনুগ্রহ করা হয়নি বরং আল্লাহতায়ালাই তাঁর আপন অনুগ্রহে তোমাদেরকে ইমান গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন (তোমরা স্বীকার করবে) যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

www.eelm.weebly.com

উষাকালে প্রার্থনা বলতে এখানে সেহেরীর সময় ক্ষমা প্রার্থনাকে বোঝানো হয়েছে। এই সময়ই প্রার্থনা গৃহীত হওয়ার প্রকৃষ্ট লগ্ন। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহতায়ালা প্রেমাতিশয্যবশতঃ অবতরণ করেন পৃথিবীর নিকটতম আকাশে এবং বলেন, 'আমি বিশ্বসমূহের অধিপতি। কেউ প্রার্থনা জানালে আমি প্রার্থনা মঞ্জুর করবো, যাঞ্ঞা করলে দান করবো, ক্ষমাপ্রার্থী হলে ক্ষমা করবো। বোখারী ও মুসলিম।

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, পরম প্রভুপ্রতিপালক তাঁর যুগল বাহু বিস্তার করে বলতে থাকেন, 'কে আছো ঋণপীড়িত আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো।' উষার অভ্যুদয় পর্যন্ত অনুরণিত হতে থাকে প্রেমময় প্রভুপ্রতিপালকের এই আহবান।

বাগবী হাসান বসরীর উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, হজরত লোকমান তাঁর ছেলেকে বললেন, তুমি মোরগের চেয়ে পশ্চাদবর্তী হয়ো না। সেহেরীর সময় মোরগ জেগে ওঠে আর তুমি তখন শয্যাশায়ী থাকো।

হজরত জায়েদ বিন আসলাম বলেছেন, উষাকালে ক্ষমাপ্রার্থী তারাই যারা ফজরের নামাজ জামাতের সাথে সম্পন্ন করে থাকেন। হাসান বসরী বলেছেন, ওই ব্যক্তি যিনি তার তাহাজ্জুদ নামাজকে সেহেরী পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। নাফে বলেছেন, হজরত ইবনে ওমর সারারাত ইবাদত করতেন। বলতেন, হে নাফে! সেহেরীর সময় হয়েছে নাকি? আমি বলতাম, এখনো হয়নি। তিনি পুনরায় নামাজ শুরু করতেন। আবারো প্রশ্ন করলে, আমি যখন বলতাম জী হ্যাঁ, তখন তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং সকাল পর্যন্ত দোয়া করতে থাকতেন।

এই আয়াতে ধৈর্য্যশীল বলতে পবিত্র অন্তর এবং পবিত্র প্রবৃত্তিধারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। সুফী সম্প্রদায় এ সমস্ত গুণের অধিকারী। মুজাহিদ এবং শহীদও ধৈর্যশীল সম্বোধনের যোগ্য। সত্যবাদী বলতে ওই সমস্ত আলেমকে বোঝায়, যাঁরা দ্বীনের বিভিন্ন বিবরণকে অবিকৃতভাবে বর্ণনা করে থাকেন।

অনুগত বান্দা তাঁরাই, যাঁদের নামাজ দীর্ঘ ক্বেরাত বিশিষ্ট হয়। যাঁদের প্রার্থনা উপস্থাপিত হয় ভয় ও আশার মাধ্যমে।

ব্যয়কারী বান্দা তাঁরা, যাঁরা তাঁদের বৈধ উপার্জন আল্লাহতায়ালার পথে খরচ করেন। আর ক্ষমাপ্রার্থী বান্দারা হলেন সেই সমস্ত মানুষ, যাঁরা অসাবধানতাবশতঃ ভুল করে ফেললে তওবা করে ফেলেন। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, কসম ওই পবিত্র ব্যক্তিত্বের যাঁর কুদরতের আওতায় আমার জীবন, তোমরা পাপ না করলে আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে উঠিয়ে নিতেন (ধ্বংস করে দিতেন) এবং তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতেন ওই সমস্ত মানুষকে

www.eelm.weebly.com

যারা পাপ করতো। তওবাও করতো। এবং আল্লাহ্ তাদের পাপ ক্ষমা করে দিতেন। মুসলিম, ইমাম আহমদ।

আবু ইয়ালী হজরত আবু সাঈদ থেকে এ রকমই বর্ণনা করেছেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৮

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

❒ আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই এবং তিনি ন্যায়-নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

বাগবী, কালাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, শামদেশের দু'জন ইহুদী আলেম রসুল পাক স. এর দরবারে হাজির হলেন। মদীনায় এসেই তাঁরা বলতে শুরু করলেন, এ তো সেই শহর যেখানে আবির্ভূত হবেন শেষ নবী মোহাম্মদ। রসুল স. কে দেখেই তাঁরা চিনতে পারলেন। বললেন, আপনি কি মোহাম্মদ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁরা পুনরায় বললেন, আপনি কি আহমদ? রসুল স. বললেন, আমি আহমদও। মোহাম্মদও। তাঁরা বললেন, আমরা একটি প্রশ্ন করতে চাই? উত্তর দিতে পারলে আমরা আপনাকে মেনে নেবো। রসুল স. বললেন, বলুন। তাঁরা বললেন, আল্লাহর কিতাবে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য কোনটি? এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর ইহুদী আলেম দু'জন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ সকল প্রাণীর শরীর তৈরীর চার হাজার বছর আগে রূহ (প্রাণ) সৃষ্টি করেছেন। তারও চার হাজার বছর আগে নির্ধারণ করেছেন তাদের রিজিক। সৃষ্টির অভ্যুদয়ের পূর্বে আল্লাহ্ ছিলেন একা। আকাশ পৃথিবী ছিলো না। পাপ পুণ্যও ছিলো না। তখনই তিনি তাঁর এককত্বের সাক্ষ্য ঘোষণা করেছিলেন।

আল্লাহতায়ালার সাক্ষ্য ঘোষণার পর এই আয়াতে ফেরেশতা এবং ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণের সাক্ষ্য দানের কথা বলা হয়েছে। ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণ আল্লাহতায়ালাকে ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বাস রাখেন। দান এবং জ্ঞান — সকল বিষয়েই আল্লাহ্ ন্যায়নীতিতে সুস্থির। তিনি মালিকুল মুলক, সারা জাহানের অধিপতি। আপন পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি তাঁর বিশাল রাজ্য পরিচালনা করেন। পুণ্য প্রদান করতে অথবা শাস্তি প্রদান করতে তিনি বাধ্য নন। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিতে পারেন। এই আয়াতের তাফসীর মোতাজিলা মতের সম্পূর্ণ

www.eelm.weebly.com

বিরুদ্ধে। তাদের মতে পুণ্যশীল এবং পাপীদেরকে সওয়াব ও শাস্তি প্রদান করতে তিনি বাধ্য (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহতায়ালা মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। প্রথমে ক্ষমতা এবং পরে জ্ঞান। তাই এখানে হাকিম (মহাজ্ঞানী) এর পূর্বে আজিজ (মহাপরাক্রমশালী) এর উল্লেখ করা হয়েছে (আজিজুল হাকিম)।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৯

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

❑ ইসলাম আল্লাহের নিকট একমাত্র দ্বীন। যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটাইয়াছিল। আর, কেহ আল্লাহের নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিলে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

হজরত কাতাদা বর্ণনা করেন, সমস্ত নবী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই) এই সাক্ষ্যসহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে আউলিয়া সম্প্রদায়ের মাননীয় ও আচরণীয় মত এটিই। এই মত ও পথই ইসলাম। এই ইসলামই আল্লাহতায়ালার নিকট একমাত্র দ্বীন হিসাবে গৃহীত।

ইমানকে ইসলামের অন্তর্ভূত বলে মেনে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু ইমানকে মূল ইসলামের সমার্থক না বলে আংশিক ইসলাম ধরা হয়েছে। যেমন, ইসলামের ব্যাখ্যায় রসুল স. বলেন, এ কথার স্বীকৃতি দেয়া যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (ইমান), নামাজ কায়েম করা, জাকাত দেয়া, রমজান শরীফের রোজা রাখা এবং সামর্থে কুলালে হজ করা। ইসলামের এই ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন জিব্রাইল আ.এর প্রশ্নের প্রেক্ষিতে। হাদিসটি দীর্ঘ, যার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে বোখারী ও মুসলিমে।

ইসলাম বলতে কেবল শরিয়তে মোহাম্মদী স. কেও বুঝে নেয়া যেতে পারে। পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্মমত রহিত করে মোহাম্মদ স. এর শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, এখন নবী মুসা জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিলো না। হজরত জাবের থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও বায়হাকী। হজরত আনাস তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠকালে যখন শাহেদ আল্লাহ আয়াতটি পড়তেন তখন বলতেন, আমি ওই সাক্ষ্যই দিচ্ছি যা আল্লাহ

www.eelm.weebly.com

দিয়েছেন। আমি আমার সাক্ষ্যকে আল্লাহ্র নিকট জমা রাখছি। আর ইসলাম আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দ্বীন — আমার এই সাক্ষ্য আল্লাহর নিকট আমার জমানো সম্পদ। নামাজ শেষে তাঁর এ সমস্ত কথা সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিতেন, আমাকে আবদুল্লাহর বর্ণনাসূত্রে আবু ওয়ায়েল বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, এ রকম সাক্ষ্যদাতাকে যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সকাশে দন্ডায়মান করানো হবে; তখন আল্লাহ বলবেন, 'এই বান্দার জন্য আমার নিকটে রয়েছে এক অঙ্গীকার, এখনই আমার অঙ্গীকার পূরণের সময়। আমি আমার এই বান্দাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবো।' বাগবী, তিবরানী, বায়হাকী।

বায়হাকীর বর্ণনাসূত্রটি অবশ্য দুর্বল।

আল্লাহতায়ালার মনোনীত ধর্ম যে ইসলাম — একথা তওরাত ও ইঞ্জিলেও ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু আহলে কিতাবগণ আল্লাহতায়ালার এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও মতানৈক্য করবার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। তাদের কেউ কেউ অস্বীকার করেছে মোহাম্মদ স. এর নবুয়তকে। আবার কেউ কেউ বলেছে, তিনি কেবল আরববাসীদের নবী। তাদের এ সমস্ত মতানৈক্য অজ্ঞতাবশতঃ ছিলো না, ছিলো হিংসাবশতঃ। নেতৃত্ব ও রাজত্বের অবসান চিন্তাই তাদেরকে হিংসুক করে তুলেছিলো।

ইবনে জারীর, হজরত মোহাম্মদ বিন জাফরের উক্তি উল্লেখ করেছেন, এই আয়াত নাজরানের খৃষ্টানদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো ইঞ্জিল, যাতে তাদের বিকৃতবিশ্বাসবিরোধী প্রমাণ মওজুদ ছিলো। তবু তারা প্রচার করতো, হজরত ঈসা আল্লাহতায়ালার পুত্র। অপরদিকে ইহুদীরাও ছিলো আল্লাহতায়ালার প্রমাণের সাথে মতানৈক্যকারী। তারা আল্লাহতায়ালার এই ঘোষণা জানতো যে, হজরত ঈসা আল্লাহতায়ালার বান্দা ও রসুল। তবুও কুটিলতাশ্রয়ী ইহুদীরা হিংসা বশতঃ মতানৈক্য করলো। হজরত ঈসার নবুয়তকে অস্বীকার করলো তারা, তাঁর পবিত্রা জননীকে দিলো ব্যভিচারের অপবাদ।

ইবনে আবী হাতেম, রবী'র উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, হজরত মুসা আ. মৃত্যুর পূর্বক্ষণে বনী ইসলাইলের সত্তরজন আলেমকে ডাকলেন এবং তাদের কাছে আমানত রাখলেন পবিত্র তওরাত। তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন ইউশা ইবনে নুনকে। তিনশ' বছর অতিবাহিত হলো, তার পর দেখা দিলো মতপার্থক্য। এই আয়াতে মতপার্থক্য বলতে ওই সত্তরজন আলেমের অধস্তন অপদার্থ সন্তানদেরকেই বোঝানো হয়েছে। কেবল মতপার্থক্য নয়, তারা শুরু করলো রক্তক্ষয়ী হানাহানি। বিশৃংখলা যখন চরম রূপ নিলো, তখন আল্লাহতায়ালা তাদের উপরে অত্যাচারী রাজা বখত নসরকে প্রবল করে দিলেন।

আয়াতের শেষে আল্লাহতায়ালা কাফেরদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন এই বলে যে, আল্লাহতায়ালার নিদর্শন প্রত্যাখ্যানকারীদের হিসাব গ্রহণে অথবা শাস্তি প্রদানে তিনি অত্যন্ত তৎপর।

www.eelm.weebly.com

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَٰغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌۢ بِالْعِبَادِ ○

❐ যদি তাহারা তোমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে তুমি বল, 'আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি।' এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে ও নিরক্ষরদিগকে বল, 'তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করিয়াছ?' যদি তাহারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয় তাহারা পথ পাইবে। আর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তোমার শুধু প্রচার করা কর্তব্য। আল্লাহ্ দাসদের দ্রষ্টা।

আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয় নবীর মাধ্যমে কাফেরদের প্রতর্কপ্রবণতার জবাব শিক্ষা দিয়েছেন এই আয়াতে। তাদের বিতর্কবিদ্বিষ্টতার জবাবে জানিয়ে দিতে হবে, আমরা তো আল্লাহ্তায়ালার নিকট আত্মসমর্পণকারী। আমরা আমাদের অন্তর বাহির আল্লাহতায়ালার নির্দেশে সমর্পণসর্বস্ব করে নিয়েছি। হে নবী আপনি বলে দিন, যখন একথা স্বতঃপ্রমাণিত এবং তওরাত ও ইঞ্জিল সমর্থিত যে, আল্লাহতায়ালার নিকট মনোনীত ধর্ম ইসলাম — এরপরও কি হে কাফের সম্প্রদায় তোমরা দৃঢ়পদ থাকবে তোমাদের কুফরীর উপরেই? এই প্রশ্নটি এক অর্থে আদেশও। বলা হচ্ছে তোমরাও মুসলমান হয়ে যাও। বার বার তোমরা বাদানুবাদে লিপ্ত হচ্ছো। তোমরা কি এতোটুকুও জানো না যে, ঝগড়াবিবাদের কোনো প্রশ্রয় প্রকৃত ইসলামে নেই। দেখো, প্রকৃত ইসলাম পেশ করেছি আমরাই। তোমরা আল্লাহ্তায়ালার শরিয়ত মানো না। কোনো নবীকে বলো, আল্লাহ্র পুত্র। কোনো নবীকে বলো, ব্যভিচারজাত। লজ্জাহীন তোমরা। আল্লাহতায়ালার সাথে শরীক করতে, আল্লাহতায়ালার পয়গম্বর এবং তাঁর কিতাব সমূহকে অস্বীকার করতে তোমরা এতোটুকু লজ্জাও অনুভব করোনি। অথচ তোমরা তোমাদের জঘন্য মতবাদকে বলে থাকো ইসলাম। দেখো আমাদেরকে। আমাদের ইসলামকে। আত্মঅহমিকা এবং প্রবৃত্তিজাত কামনা বাসনা আমাদের নেই। আমরা তো আমাদের প্রবৃত্তিকে আল্লাহতায়ালার সন্তোষনির্ভর করেছি। তোমরা লজ্জিত হও। পরিত্যাগ করো সকল অশুভকে। মুসলমান হয়ে যাও আমরা যেমন হয়েছি। আহলে কিতাবগণ জবাব দিলো এভাবে, আমরা তো প্রথম থেকেই মুসলমান। রসুল পাক স. বললেন, আমরা তো ঈসা আ. কে আবদুল্লাহ, আল্লাহর রসুল এবং

www.eelm.weebly.com

কালেমাতুল্লাহ বলি। তোমরা কি একথা স্বীকার করো? তারা বললো, আল্লাহর সাহায্য চাই। ঈসা কি বান্দা? আল্লাহতায়ালা প্রত্যুত্তোরে তাঁর প্রিয়তম নবীকে জানালেন, হে নবী! আপনার কর্তব্যকর্ম তো কেবল প্রচার করা। তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে এতে আপনার কোনো ক্ষতি নেই। হেদায়েত দান নয়, হেদায়েতের বাণী পৌঁছে দেয়াই আপনার কাজ। আমার দৃষ্টি মুমিন ও কাফের সকলের প্রতি নিবদ্ধ। তাদের উপযুক্ত প্রতিদান আমারই আওতাভূত।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ২১

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

❒ যাহারা আল্লাহের নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করে, অন্যায় রূপে নবীদের হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যাহারা ন্যায় পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাহাদিগকে হত্যা করে তুমি তাহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

আল্লাহতায়ালার নিদর্শন প্রত্যাখ্যানকারীরূপে এখানে ইহুদীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তারা প্রত্যাখ্যান করেছে কোরআন ও ইঞ্জিলকে এবং তওরাতের ওই সমস্ত আয়াতকে, যাতে রসুল স. এর প্রশংসাসূচক বিবরণ ছিলো। তাদের পূর্বপুরুষরা নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। রসুল স. এর সঙ্গে তারা সে রকমই আচরণ করতে চায়। তারা রসুল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে। যাদুর মাধ্যমে তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। আমন্ত্রিত অতিথি করে খাদ্যে বিষমিশ্রিত করে দিয়েছে। পরবর্তীতে সেই বিষক্রিয়াই হয়েছিলো তাঁর পার্থিব জীবনাবসানের কারণ। কেবল নবী রসুলই নন, তাঁদের প্রকৃত অনুসারী ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দানকারীদেরকেও তারা হত্যা করেছে।

ইবনে জারীর বর্ণনা করেন, বনী ইসরাইলের নবীদের নিকট ওহি আসতো। কিন্তু সকলে পূর্ণ কিতাবধারী ছিলেন না। তাঁরা ওহি অনুসারে মানুষকে সদুপদেশ দিতেন। তাঁদেরকেও শহীদ করে দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে তাঁদের অনুসারীরা সদুপদেশ দানের দায়িত্ব স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন, তাঁদেরকেও শহীদ করে দেয়া হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

বাগবী, হজরত ওবায়দা বিন জাররাহ্র উক্তি বর্ণনা করেন, হজরত জাররাহ বলেছেন, আমি রসুল স. এর নিকট আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসুল! কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে কার? রসুল স. বললেন, যে ব্যক্তি কোনো নবীকে হত্যা করেছে অথবা তাঁকে অমান্য করতে উদ্যত হয়েছে এবং সৎকাজ করতে নিষেধ করেছে। এরপর রসুল স. 'যারা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে.....তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই' — এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর পুনঃ এরশাদ করলেন, হে ওবায়দুল্লাহ! বনী ইসরাইলেরা একই সময়ে তেতাল্লিশজন নবীকে হত্যা করেছিলো। এ হত্যাকান্ডগুলো সংঘটিত হয়েছিলো দিনের প্রথম ভাগে। তাদের প্রকৃত অনুসারী একশত বিশজন পুণ্যশীল ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে যখন উদ্যত হলেন, তখন তাঁদেরকেও শহীদ করে দিলো পাপিষ্ঠরা। এ হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিলো দিবসের শেষ ভাগে। ওই পাপিষ্ঠদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এই আয়াতে। আয়াতের শেষাংশে আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয়তম নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ২২

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝

❒ এই সব লোক, ইহাদের ইহকাল ও পরকালের কার্যাবলী নিষ্ফল হইবে এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

ইবনে মুনজির, ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম, হজরত ইকরামার বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন, রসুল স. একবার ইহুদীদের এক বিদ্যায়তনে গমন করে ইহুদীদেরকে আল্লাহতায়ালার দিকে আহবান জানালেন। ইহুদী নাঈম বিন আমর এবং হারেস বিন জায়েদ জিজ্ঞেস করলো, মোহাম্মদ তুমি কোন ধর্মে আছো? তিনি স. বললেন, ইব্রাহিমের ধর্মে আছি। তারা বললো, ইব্রাহিম তো ইহুদী ছিলেন। রসুল স. বললেন, তবে এসো। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা হোক তওরাতের মাধ্যমে। এ প্রস্তাব তারা মানলোনা। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত —

www.eelm.weebly.com

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَٰبِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ○

❒ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে কিতাবের কিছু অংশ প্রদান করা হইয়াছিলো? তাহাদিগকে আল্লাহের কিতাবের দিকে আহবান করা হইয়াছিলো যাহাতে উহা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয়; অতঃপর তাহাদের একদল ফিরিয়া দাঁড়ায়, আর তাহারাই পরাঙমুখ;

এখানে আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তওরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সামান্যই। তাছাড়া তওরাতের সকল হুকুম আহকামের প্রতি তারা বিশ্বাসীও নয়। তাই রসুল স. তাদেরকে তওরাতের সিদ্ধান্তের প্রতি আহবান জানালে তারা গড়িমসি করেছে।

কালাবী, আবু সালেহর বর্ণনা হতে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন, খয়বরের একজন পুরুষ ও একজন নারী ব্যভিচার করলো। তওরাতের নির্দেশ হচ্ছে, তাদেরকে রজম করতে হবে (কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে)। অপরাধী ও অপরাধিনী ছিলো প্রভাবশালী। তাই ইহুদীরা তাদেরকে রজম করার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হলো। তারা বিষয়টি রসুল স. এর নিকটে এই ধারণায় পেশ করলো যে, হয়তো রজম থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু রসুল স. অপরাধীদ্বয়কে রজম করতে নির্দেশ দিলেন। নোমান বিন আউফা এবং বাহরী বিন আমর বললো, মোহাম্মদ! আপনার সিদ্ধান্ত ভুল। রসুল স. এরশাদ করলেন, তওরাত আনো। মীমাংসা হবে তওরাত অনুযায়ীই। তারা বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন। রসুল স. বললেন, তোমাদের মধ্যে তওরাতের সবচেয়ে বড় আলেম কে? তারা বললো, ফদকের অধিবাসী ইবনে সুরিয়া। এর পর ইবনে সুরিয়াকে ডেকে আনা হলো মদীনায়। ইত্যবসরে তার অবস্থা সম্পর্কে হজরত জিব্রাইল আ. রসুল স. কে জানিয়ে দিলেন। সে হাজির হলে রসুল স. বললেন, তুমি কি ইবনে সুরিয়া? সে জবাব দিলো, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, ইহুদীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম কি তুমি? সে বললো, মানুষেরা এ রকমই মনে করে। রসুল স. তাকে তওরাত পড়তে নির্দেশ দিলেন। সে পড়তে শুরু করলো। পড়তে পড়তে সে যখন রজমের আয়াতের নিকট এলো, তখন আয়াতটি

www.eelm.weebly.com

হাত দিয়ে ঢেকে ফেললো। এবং এর পর থেকে পড়তে শুরু করলে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, হে আল্লাহর রসুল! সে রজমের আয়াত ছেড়ে দিয়েছে। এই বলে তার কাছ থেকে তওরাত কিতাবটি নিয়ে তিনি নিজেই ইহুদীদেরকে শুনিয়ে দিলেন যে, বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারীর ব্যভিচার সাক্ষ্যসহ প্রমাণিত হলে সঙ্গেসার করে দাও। আর ব্যভিচারিণী গর্ভবতী হলে প্রসবকাল পর্যন্ত শাস্তি স্থগিত রাখো। রসুল স. এবার সঙ্গেসারের জন্য চূড়ান্ত নির্দেশ দিলেন। ইহুদীরা মনঃক্ষুণ্ন হয়ে চলে গেলো। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো।

হজরত কাতাদা বলেন, আয়াতের অর্থ — ইহুদীদেরকে আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কোরআনের দিকে ডাকা হলো। কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে জুহাক বলেছেন, আল্লাহতায়ালা ইহুদী ও নাসারা সম্প্রদায় এবং রসুল স. এর মধ্যে কোরআনকে মীমাংসাকারী নির্ধারণ করেছেন। আর কোরআন সিদ্ধান্ত দিয়েছে, ইহুদী ও নাসারাগণ সত্যানুসারী নয়। তাই তারা কোরআনের প্রতি বিমুখ।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ২৪, ২৫

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۖ وَّغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○ فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۗ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

❒ এই হেতু যে তাহারা বলিয়া থাকে 'অগ্নি দিন কতক ব্যতীত আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না।' তাহাদের নিজেদের দ্বীন সম্বন্ধে তাহাদের মিথ্যা উদ্ভাবন তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে।

❒ কিন্তু সেই দিন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তাহাদের কী অবস্থা হইবে? যে দিন আমি তাহাদিগকে একত্র করিব এবং প্রত্যেককে তাহার অর্জিত কর্মের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হইবে না!

আল্লাহতায়ালার আযাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে ইহুদীরা বিষয়টিকে হাল্কা মনে করতো। তাদের ধারণা, দোজখের আগুন তাদেরকে স্পর্শ করতেই পারে না। যদি করে তবে তা মাত্র চল্লিশ দিনের জন্য করবে। এবং তা করবে তাদের পূর্বপুরুষদের চল্লিশ দিনের বাছুর পূজার জন্য। আর সে শাস্তিও পূর্ণ

www.eelm.weebly.com

শাস্তি হবে না। শাস্তি হবে নামমাত্র। তাদের এই মনগড়া ধারণাই তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে। তারা আরো ধারণা করে, তাদের পূর্বপুরুষগণ যেহেতু নবী ছিলেন, তাই তাঁদের সুপারিশ তারা পাবেই। তাদের সামনে হজরত ইয়াকুব আ. এর সঙ্গে আল্লাহতায়ালার কৃত প্রতিশ্রুতির বিষয়টিও ছিলো। আল্লাহতায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ইয়াকুব আ. এর বংশধরদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন না।

কিন্তু সেই দিন তাদের কী অবস্থা হবে, যেদিন আল্লাহতায়ালা তাদেরকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যেকের অর্জিত কর্মের প্রতিফল দান করবেন। হজরত কাতাদা বলেছেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে, রসুল স. প্রার্থনা করেছেন, হে আমার প্রতিপালক! পারস্য ও রোমের শাসনভার আমার উম্মতকে দান করো।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আনাস বিন মালেক বলেছেন, মক্কা বিজয় শেষে রসুল স. তাঁর উম্মতের পারস্য ও রোম রাজ্যের শাসনভার লাভের সুসংবাদ পেলেন। মুনাফিক ও ইহুদীরা বলতে লাগলো, কোথায় মোহাম্মদ আর কোথায় প্রবল পরাক্রান্ত পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য । মোহাম্মদ স. এর জন্য কি মক্কা এবং মদীনাই যথেষ্ট নয় । তাদের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করলেন পরবর্তী আয়াত ।

উপরের বর্ণনা দু'টিতে বিরোধাভাস রয়েছে । কিন্তু আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত একটিই । আল্লাহ্তায়ালার নিকট রোম ও পারস্য রাজ্যের শাসনভার লাভের প্রার্থনা এবং সরাসরি বিজয়লাভের সংবাদ প্রচার দু'টোই সঠিক । প্রথমে প্রার্থনা । তারপর প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়ার পর সুসংবাদ প্রচার। প্রার্থনা মঞ্জুরের বিষয়টি তিনি জানতে পেরেছিলেন ওহির মাধ্যমে। বায়যাবী লিখেছেন, খন্দক যুদ্ধের সময় যখন রসুল স. পরিখা খনন শুরু করলেন, তখন এই সিদ্ধান্ত দিলেন যে, প্রতি দশজন মিলে বিশ হাত মাটি খনন করতে হবে। খনন কার্য চলার সময় একস্থানে দেখা গেলো একটি বৃহৎ পাথর, যা ভাঙা সম্ভব হচ্ছিলোনা। অপসারণ ছিলো দুরূহ। হজরত সালমান ফারসীর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে রসুল স. ঘটনাস্থলে এলেন এবং কোদাল দিয়ে পাথরটির গায়ে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, পাথরটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো। আঘাতকালে এমন একটি আলো বিচ্ছুরিত হলো, যাতে দৃষ্টিগোচর হলো মদীনার দুই প্রান্তরেখা। রসুল স. তকবীর উচ্চারণ করলেন। সাহাবীগণও উচ্চারণ করলেন, আল্লাহু আকবর। রসুল স. বললেন, এই আঘাতের আলোয় আমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো হেরা (পারস্যের গুরুত্বপূর্ণ শহর)। রসুল স. পুনরায় আঘাত করলেন এবং বললেন, এই আঘাতে আমার দৃষ্টির সম্মুখে প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠলো রোম সাম্রাজ্যের লাল টিলা সমূহ। পুনরায় আঘাত করলেন রসুল স.। বললেন, এবার আমার সামনে প্রতিভাসিত হলো ইয়ামেনের সানায়া শহরটি। জিব্রাইল আমাকে জানিয়ে দিলেন, আমার উম্মতেরা এ সমস্ত রাজ্য জয় করবে।

www.eelm.weebly.com

মুনাফিকেরা বলতে লাগলো, কী আশ্চর্য কথা! মোহাম্মদ যে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কারণ, তোমরা তো মদীনা হেফাজত করতেই হিমসিম খাচ্ছো। শত্রুর ভয়ে মদীনার চার পাশে খনন করছো পরিখা। বায়হাকী এবং আবু নাঈমও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা এই ঘটনাকেই পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলে উল্লেখ করেন। অপরদিকে ইবনে খাজিমা হজরত কাতাদা থেকে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণটি দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, এই ঘটনাটি নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ২৬

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

❐ বল হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ক্ষমতা কাড়িয়া লও; যাহাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাহাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। তুমি সকল বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

মালিকুল মুলক অর্থ সাম্রাজ্য সমূহের মালিক। সাম্রাজ্য সমূহের নিরঙ্কুশ অধিকার তাঁর। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন তেমনটিই হয়। যাকে যত ইচ্ছা দান করেন । তাঁর অনুমোদন ব্যতিরেকে রাজ্যাধিপতি হওয়ার অধিকার কারো নেই। যাকে ইচ্ছা তিনি সম্মানিত করেন। যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। সহায়তা দানের মাধ্যমে কাউকে করেন পুণ্যলাভের উপযোগী। মর্যাদামন্ডিত করেন পৃথিবী ও আখেরাত উভয় স্থানে। আবার সহায়তা সংকোচন করে কাউকে করেন অপমানিত, শাস্তিযোগ্য। সমূহ কল্যাণ তাঁরই অধিকারাধীন। আলেমগণ বলেন, এই আয়াতে কেবল কল্যাণের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বিষয়টি ছিলো রসুলে পাক স. এর উম্মতের রোম ও পারস্য বিজয় সম্পর্কিত সুসংবাদ। কেউ কেউ বলেন, কল্যাণই মূল । কল্যাণ দানের সংবাদে অকল্যাণের প্রসঙ্গ অনুল্লেখ্য থাকাই শোভনীয় । অথবা এমন বলা যায়, কেবল আদব রক্ষার্থেই এখানে অকল্যাণ প্রকাশের বক্তব্য স্থগিত রাখা হয়েছে।

আমি বলি, আল্লাহ্তায়ালা কেবলই কল্যাণ। তাঁর পবিত্র সত্তা সকল ক্ষতি ও বিনষ্টি থেকে পবিত্র। অকল্যাণ তো মুমকিনাতে অজুদের (সম্ভাব্য অস্তিত্বের) জন্য।

www.eelm.weebly.com

অজুদে হাকিকী (প্রকৃত অস্তিত্ব অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা) নিছক কল্যাণ। সম্ভাব্য অস্তিত্ব তো মূলে ছিলো আদম (নাস্তি)। সুতরাং আদম বা নাস্তি জাত অকল্যাণের উল্লেখ এই আয়াতের প্রার্থনায় নেই । তাই 'কল্যান তোমার হাতেই' - একথা বলা সঙ্গত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ মুমকিনুল অজুদ (সম্ভাব্য অস্তিত্ব) আসলে বিলিনতা (ফানা) আর বিলিনতায় কোনো কল্যাণ থাকেনা । সুতরাং সম্ভাব্য অস্তিত্ব যেহেতু প্রতিবিম্বজাত, মূল নয় — তাই আমরা বলি, প্রতিবিম্বের অধিকারও যেহেতু তাঁর, সেহেতু যাবতীয় ক্ষতি ও মন্দ তাঁর অধিকারভূত । কিন্তু এর মালিকানা উল্লেখ করা অর্থহীন । কারণ অস্তিত্বহীনতার মালিকানা হয় না।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন। বান্দাদের ক্ষমতা একধরনের ধারণানির্ভর ব্যাপার। যার কারণে তাদেরকে কর্মক্ষম বলা যেতে পারে। তাদের অস্তিত্ব ও কর্ম সমূহের স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালাই। যেমন তিনি বলেছেন, 'এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা কি জানো না?'

আমরা বলি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মন্দ সমূহের উপরেও ক্ষমতাবান। যেমন ক্ষমতাবান কল্যাণের উপর। অতঃপর এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্ কল্যাণের ইচ্ছা করলেই কল্যাণ লাভ হয়। না করলেই ক্ষতি। কারণ ক্ষতি সৃষ্টির মূল অবলম্বন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ২৭

تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

❑ তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর; তুমিই মৃত হইতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর।

আল্লাহতায়ালা রাতের এক অংশকে দিনের মধ্যে এবং দিনের এক অংশকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। একটিকে বৃদ্ধি করে অপরটিকে সংকুচিত করেন। এভাবে এগিয়ে চলেছে সময় — দিনের পরে রাত, রাতের পরে দিন। তিনিই মৃত থেকে জীবনের উদ্ভব ঘটান। জীবনকে করে তোলেন মৃত্যুনিথর। যেমন, ডিম থেকে বাচ্চা, বাচ্চা থেকে ডিম। বীজ থেকে বৃক্ষ, বৃক্ষ থেকে বীজ। হজরত ইবনে মাসউদ, সাঈদ বিন জোবায়ের, মুজাহিদ, কাতাদা, ইকরামা,

www.eelm.weebly.com

কালাবী এবং যুজাজ এরকমই বলেছেন। কিন্তু হাসান বসরী এবং আতা বলেছেন, আল্লাহ কাফের থেকে মুমিন এবং মুমিন থেকে কাফের সৃষ্টি করেন। কাফের মৃত, মুমিন জীবিত।

যাকে খুশী তাকে অপরিমিত রিজিক দান করেন আল্লাহ। বাগবী তাঁর আপন বর্ণনাসূত্রে হজরত আলী রা. থেকে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, সুরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সুরা আলে ইমরানের দুই আয়াত (আয়াত নং ১৮, ইন্নাদ্দিনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম পর্যন্ত এবং আয়াত নং ২৬ — ২৭) শাফায়াতের জন্য কবুল করে নিয়েছেন। আল্লাহর সঙ্গে এগুলোর কোনো পর্দা নেই। তারা বলে থাকে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি পৃথিবীতে আমাদেরকে এমন মানুষের নিকট পাঠাতে চাও, যারা তোমার অবাধ্য হবে। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন, আমার জাতের কসম! আমার বান্দাদের মধ্যে যারা প্রত্যেক নামাজের পর তোমাদের কাউকে তেলাওয়াত করবে, আমি তাদের আবাস হিসাবে নির্ধারণ করবো জান্নাতকে। দান করবো খাতিরাতুল কুদস (একটি সম্মানিত স্থান)। আমি অবশ্যই তাদের প্রতি নিবদ্ধ করবো রহমতের দৃষ্টি এবং প্রতিদিন তাদের প্রয়োজন পূরণ করবো সত্তর রকমের, যার নিম্নতম স্তরটি হবে গোনাহসমূহের মাগফেরাত। প্রয়োজনসমূহ হবে আখেরাত সম্পর্কিত। পৃথিবীর প্রয়োজন নয়। আর গোনাহসমূহের ক্ষমা আখেরাতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে নিম্নতম। আমি তাদেরকে শত্রু এবং শত্রুর হিংসানল থেকে রক্ষা করে বিজয়ী করে দেবো।

তিবরানী, হজরত মুআজ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি তোমাকে এমন একটি দোয়া শিক্ষা দেবো, যা পড়লে আল্লাহ তোমার ঋণ পরিশোধ করে দেবেন, ঋণ পাহাড় সমতুল্য হলেও। আল্লাহুম্মা মালিকুল মূলক থেকে বিগইরি হিসাব পর্যন্ত এবং রহমানাদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাতে ওয়া রহিমাহু মা তু'তি মানতাশাউ মিনহুমা ওয়া তামনাউ মানতাশাউ ইরহামনি রহমাতান তুগনিনি বিহা আন রহমাতি বিমান সিওয়াকা।

'হে পৃথিবী ও আখেরাতের করুণাশীল আল্লাহ। আমার প্রতি করুণা বর্ষণ করো উভয় জগতের। তুমি যাকে ইচ্ছা দান করো এবং যাকে ইচ্ছা দান থেকে বিরত থাকো। তোমার রহমত দ্বারা আমাকে অভাব মুক্ত করে দাও, তুমি ছাড়া রহমত বর্ষণকারী আর কেউ নেই।'

ইবনে জারীর, সাঈদ এবং ইকরামার বর্ণনাসূত্রে হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে উল্লেখ করেছেন, হেজাজ বিন আমর, আমর বিন আশরাফের মিত্র ছিলো এবং ইবনে আবীল হাকীক এবং কায়েস বিন জায়েদের সাথে আনসারদের কিছু লোকের গোপন বন্ধুত্ব ছিলো এই মর্মে যে, যেনো ধর্ম থেকে তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

www.eelm.weebly.com

রেফায়া বিন মুনজির এবং আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের এবং সাঈদ বিন খাইসুমা আনসারদের বললেন, আপনারা ইহুদীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন যাতে তারা আপনাদেরকে পথচ্যুত না করতে পারে। আনসারগণ বললেন, তাঁরা তাঁদের গোপন বন্ধুত্ব ছাড়তে পারবেন না। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ২৮

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ ○

❑ বিশ্বাসীগণ যেন বিশ্বাসীগণ ব্যতীত অবিশ্বাসীগণকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ না করে। যে কেহ এইরূপ করিবে তাহার সহিত আল্লাহের কোন সম্পর্ক থাকিবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাহাদের নিকট হইতে কোন ভয় আশংকা কর তবে তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে সতর্কতার সহিত সাবধানে থাকিবে। আর আল্লাহ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তোমাদিগকে সাবধান করিতেছেন। এবং আল্লাহের দিকেই প্রত্যাবর্তন।

এই আয়াতে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে মুসলমানদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাগবী মুকাতিলের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, হাতেম ইবনে আবী বালতাকে উদ্দেশ্য করে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি মক্কার কাফেরদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। বাগবী, আবু সালেহের বর্ণনাসূত্রে কলবীর উক্তি উল্লেখ করে আরো বলেছেন, এই আয়াত আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং তার মুনাফিক সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা মুশরিক এবং ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক রাখতো। তাদের মাধ্যমে রসুল স. সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতো কাফেরেরা। কাফেরদের উদ্দেশ্য ছিলো গোপন তথ্যের ভিত্তিতে রসুল স. এর ক্ষতি সাধন করা। আল্লাহতায়ালা এই আয়াত নাজিলের মাধ্যমে বিশ্বাসীগণকে কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত করে দেন।

জ্ঞাতব্য ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা ইমানের একটি মহামর্যাদামন্ডিত স্তর। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, মানুষ তারই সাথী হবে, যার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব থাকবে। অর্থাৎ যে যে সম্প্রদায়ের অনুসরণ করবে, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সে তাদের সঙ্গে

www.eelm.weebly.com

থাকবে। হজরত আনাসের বর্ণনার শব্দগুলো এ রকম, তারই সঙ্গী হবে তুমি যার প্রতি থাকবে তোমার ভালোবাসা। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু মুসা বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ স. এরশাদ করেছেন, সৎ এবং অসৎ মানুষের সংসর্গ যথাক্রমে কস্তুরী বিক্রেতা ও কর্মকারের মতো। কস্তুরী বিক্রেতা হয়তো তোমাকে কিছু কস্তুরী দিয়ে দিতে পারে অথবা তুমি তার নিকট থেকে কিছু কস্তুরী কিনে নিতে পারো। কমপক্ষে কস্তুরীর সুবাস তো পাবেই। পক্ষান্তরে কর্মকারের পাশে থাকলে আগুনের ফুলকি এসে তোমার পরিধেয়কে পুড়িয়ে দিতে পারে। কমপক্ষে ধোয়ার দুর্গন্ধ তো পাবেই। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. হজরত আবু জর রা. কে বললেন, হে আবু জর! ইমানের কোন স্তরটি সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ়? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসুলই সম্যক জ্ঞাত। রসুল স. বললেন, কেবল আল্লাহতায়ালার সন্তোষার্থে পারস্পরিক সখ্য স্থাপন করা। আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করা। বায়হাকী।

হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, মহব্বত ফিল্লাহ ও বুগযু ফিল্লাহ (আল্লাহর জন্যই বন্ধুত্ব ও আল্লাহর জন্যই শত্রুতা) আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আহমদ, আবু দাউদ। এ ধরনের হাদিস রয়েছে অনেক।

কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে আল্লাহতায়ালার সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না। মুমিনদের সঙ্গে যেমন কাফেরদের মহব্বত হতে পারে না; তেমনি আল্লাহতায়ালার সাথেও কাফেরদের সখ্য হতে পারে না। তবে কাফেরদের দ্বারা যদি কোনো বিপদাশংকার সম্ভাবনা থাকে, তখন বাহ্যিকভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করা বৈধ। অন্তরের বন্ধুত্ব কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়। সকল অবস্থায় সতর্ক থাকতে হবে যেনো মুসলমানদের কোনো গোপন তথ্য তারা জানতে না পারে। কারণ, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে কাফেররা মুসলমানদের ক্ষতি করতে সদা সচেষ্ট থাকে। কেউ কেউ বলেন, ইসলাম পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাকিয়া করা নাজায়েজ (তাকিয়া অর্থ মন চায়না তবুও বিপদাশংকার কারণে করতে হয়)। হজরত মুআজ বিন জাবাল বলেন, প্রথম দিকে যখন ইসলাম পূর্ণবিকশিত হয়নি, তখন তাকিয়া জায়েয ছিলো। কিন্তু এখন শত্রুর সাথে তাকিয়া করা মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়।

আল্লাহতায়ালা নিজের সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছেন। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে সকলকে। তখন তাঁর কঠোর হিসাবের আওতা থেকে বের হওয়ার শক্তি কারো হবে না। সুতরাং সাবধান! কাফেরদের বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করতেই হবে।

www.eelm.weebly.com

قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝

❒ বল, তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা যদি তোমরা গোপন অথবা ব্যক্ত কর আল্লাহ উহা অবগত আছেন এবং আসমান ও জমিনে যাহা কিছু আছে তাহাও অবগত আছেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❒ যে দিন প্রত্যেকে সে যে — ভাল কাজ করিয়াছে এবং সে যে — মন্দ কাজ করিয়াছে তাহা বিদ্যমান পাইবে, সেদিন সে কামনা করিবে তাহার ও উহার মধ্যে দূর ব্যবধান। আল্লাহ্ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তোমাদিগকে সাবধান করিতেছেন। আল্লাহ দাসদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

আল্লাহতায়ালাই সকল কিছুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তাই তাঁর কাছে কোনোকিছু গোপন থাকতেই পারে না। সুতরাং অবাধ্যতা ও উন্নাসিকতা চরম বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক নয় কি? আল্লাহতায়ালার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। আখেরাতে শাস্তি তো হবেই, পৃথিবীতেও শাস্তি হতে পারে। সুতরাং কাফেরদের মহব্বত অবশ্য বর্জনীয়।

সামনে সেই দিন, যেদিন সকলের সামনে এসে দাঁড়াবে ভালো অথবা মন্দ। নবী রসুলদের সামনে উপস্থিত হবে শুধুই পুণ্য, মন্দ কোনোকিছুই তাঁদের আমলনামায় নেই। কাফেরদের অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। অবিশ্বাস ও অংশীবাদীতার কারণে তাদের সকল আমলই হবে মন্দ, শুধুই মন্দ। আর সাধারণ ইমানদারদের হবে কিছু ভালো, কিছু মন্দ, কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র। তিনি মুমিনদের উত্তম আমল প্রকাশ্যে তাদের সামনে উপস্থিত করবেন। কিন্তু মন্দ আমল প্রকাশ করবেন না। আমলকারী তার পাপসমূহ দেখতে পাবে এবং চাইবে আল্লাহ যদি গোনাহ সম্পর্কে না জানাতেন, জানালেও যদি পর্দার ভেতরে কেবল তাকেই অবগত করাতেন। বোখারী ও

www.eelm.weebly.com

মুসলিমে হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনাসূত্রে এসেছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহতায়ালা মুমিনকে ডেকে তার উপর আপন হাত স্থাপন করে একান্তে বলবেন, তোমার কি ওই গোনাহের কথা মনে পড়ে? তোমার কি ওই অপরাধ স্মরণে আছে'? বান্দা আরজ করবে, নিশ্চয় হে আমার আল্লাহ্! অপরাধ স্বীকারের পর বান্দা যখন শাস্তির জন্য শংকিত হবে, তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার গোনাহ গোপন রেখেছিলাম। আজ সে গোনাহ মাফ করে দিচ্ছি। এরপর পুণ্যের আমলনামা তাকে দিয়ে দেয়া হবে। কাফের ও মুনাফিকদের অবস্থা হবে অন্য রকম। তাদের অপরাধসমূহ সকলের সামনে প্রকাশ করে দেয়া হবে। বলা হবে, 'যারা আপন প্রতিপালককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, শুনে নাও এ রকম জালেমদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত (লানত)।

আখেরাতে অবস্থা হবে এ রকম, প্রত্যেক মানুষ তার পুণ্য, পুণ্যের আমলনামা এবং পুণ্যের সওয়াব পাবে। পুণ্য, আমলনামা ও সওয়াব উপস্থিত থাকবে তাদের সামনে। অথবা মন্দ আমল, মন্দ আমলনামা এবং আযাব লাভ করবে। তাদের সামনে উপস্থিত হবে, গোনাহ, গোনাহের আমলনামা এবং তার শাস্তি। ওই সময় তারা কামনা করবে, তাদের এবং বিনিময় দিনের মধ্যে যদি দূর ব্যবধান থাকতো। পুণ্যবানেরাও সেদিন আযাবের ভয়ে পুণ্য লাভের ইচ্ছা করবে না। হাসান বসরী বলেন, কোনো প্রকার মন্দই যেনো তাদের সামনে উপস্থিত না হয়, প্রত্যেক মানুষ এরকমই ইচ্ছা করবে। কেউ কেউ বলেছেন, মানুষেরা মনে করতে থাকবে, হায়। যদি সে মন্দ আমল কোনোদিনই না করতো।

হজরত আদী বিন হাতেম বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তোমাদের সঙ্গে আল্লাহ এমনভাবে বাক্যালাপ করবেন যে, মধ্যবর্তী কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষক থাকবে না। থাকবে না কোনো আড়াল। ডান দিকে দৃষ্টি করলে সে দেখবে তার নেক আমলসমূহ। বাম দিকে তাকালে দেখবে মন্দ আমলসমূহ। আর সামনে দেখানো হবে আগুন। অতএব; তোমরা সেই আগুন থেকে বাঁচতে চেষ্টা করো, এক টুকরা খেজুর অথবা খোরমা দান করে হলেও। পূর্বের আয়াতে কাফেরদের প্রতি আল্লাহতায়ালার ব্যবহারের বর্ণনা ছিলো। এই আয়াতের শেষে রয়েছে মুমিনদের প্রতি আল্লাহতায়ালার ব্যবহারের বর্ণনা। বলা হয়েছে, 'আল্লাহতায়ালা তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।' তাই ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে দাসদের সংশোধনই দয়াময় প্রভু প্রতিপালকের অনুগ্রহপ্রবণ অভিপ্রায়।

www.eelm.weebly.com

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ○

❑ বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'

❑ বল, 'আল্লাহ ও রসুলের অনুগত হও।' যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণকে ভালবাসেন না।

ইবনে জারীর এবং ইবনে মুনজির, হাসান বসরী থেকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর উপস্থিতিতে কিছু লোক বলেছিলো, হে মোহাম্মদ! আল্লাহর কসম আমরা আপনার প্রতিপালককে ভালোবাসি। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

ইবনে ইসহাক এবং ইবনে জারীর, মোহাম্মদ বিন জাফর বিন জোবায়েরের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, নাজরানের প্রতিনিধিদল যখন বললো, আমরা মসীহের উপাসনা করি আল্লাহর মহব্বতে। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

বাগবী লিখেছেন, ইহুদী ও নাসারাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়েছে। তারা বলতো, আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তার প্রিয় পাত্র। হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি জুহাক বর্ণনা করেছেন এভাবে, কতিপয় কোরাইশ কাবাগৃহের ভিতরে মূর্তি স্থাপন করলো এবং তার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলো শতর মোরগের ডিম (শতর খুব বড় ধরনের মোরগ যা আফ্রিকা ও আরবে পাওয়া যায়) আর কানে পরিয়ে দিলো বালী। তারপর সেজদা করতে শুরু করলো। এমন সময় রসুল স. এলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, হে কোরাইশবৃন্দ, তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহিম ও ইসমাইলের ধর্মমতের বিরুদ্ধাচরণ করছো। তারা বললো, আমরা তো আল্লাহর মহব্বতেই মূর্তিপূজা করছি। যেনো মূর্তি আমাদেরকে আল্লাহর নিকট পৌঁছে দেয়। অতঃপর এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

প্রেমিকজন প্রেমাষ্পদের স্মরণেই বিভোর থাকে। তার মগ্নতা এ মতোন প্রবল হয় যে, অন্য কোনোকিছুর খেয়াল থাকেই না। চিন্তা জুড়ে কেবলই বিরহবিভোরতা। উপায়বিহীনতা। প্রেম ভালোবাসার প্রকৃতিই এই। প্রেম হচ্ছে অন্তরের আগুন, যে আগুনে প্রিয়তম ব্যতীত অন্য সব কিছু ভস্মীভূত হয়ে যায়। এমনকি আপন অস্তিত্বের অনুভূতি পর্যন্ত তার দৃষ্টিগোচর হয় না। পরিণাম দাঁড়ায়

www.eelm.weebly.com

এই যে, সে পছন্দ করতে থাকে তাই; যা তার প্রেমাস্পদের পছন্দনীয় এবং ঘৃণা করতে থাকে ওই সমস্ত বস্তুকে যা তার প্রিয়তমের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য। তার প্রিয়তমের ইচ্ছাই হয় তার ইচ্ছা। তখন সওয়াব লাভের বাসনা আর থাকে না। শাস্তির ভয়ও অন্তরে জাগে না। যদিও তার পথযাত্রায় পরীক্ষিত হতে থাকে পুণ্যাকাংখা ও পাপাশংকা। তার উদ্দেশ্যের সকল পরিসর ভরে যায় প্রিয়তমের সন্তোষ কামনায়। বান্দার মহব্বতের প্রকৃত তত্ত্ব এই।

আল্লাহ্‌র মহব্বত এরকম নিমগ্নতা এবং বিরহবিধুরতা থেকে পবিত্র। তাঁর মহব্বতে বিস্মৃতি নেই। তাঁর প্রেম এমন এক শক্তি যা তাঁর বান্দাকে আপন সন্নিধানে টেনে আনে, যে আকর্ষণ ছিন্ন করার ক্ষমতা তাঁর প্রেমিক বান্দার নেই। তাঁর মহব্বতের প্রতিক্রিয়াতে বান্দা লাভ করে অক্ষয় প্রেমের আকুতি। সর্মপিত হয় প্রেমপথে। বান্দার মহব্বত আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বতের শাখা কিংবা ছায়া। প্রেম এসে থাকে আল্লাহ্‌তায়ালার দিক থেকেই। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, 'আর আমি আপন সকাশ থেকে তোমার উপর প্রেম ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছি।' অন্যস্থলে বলেছেন, 'তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তাঁরাও তাঁকে ভালোবাসে।' এতে প্রমাণিত হয় মহব্বতের সূচনা হয় আল্লাহ্‌তায়ালার দিক থেকেই। বান্দা তার অন্তরে তা ধারণ করে প্রেমিক হয়।

আমাদের এই বর্ণনা মহব্বতে জাতী সম্পর্কীয় (সত্তাগত মহব্বতই মহব্বতে জাতী)। কিন্তু বায়যাবী মহব্বতের বিবরণ দিয়েছেন এই ভাবে, প্রেমিক তাঁর প্রেমাস্পদের বিশেষ কোনো গুণ বা কতিপয় গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্খী হয় — এরকম মহব্বতের নাম মহব্বতে সিফাতী যা মহব্বতে জাতী থেকে কিছুটা দূরবর্তী। সন্তানের প্রতি মায়ের মহব্বত মহব্বতে জাতীয়ার নমুনা। কারণ গুণ নয় অন্তরের অন্তঃস্থলের আকর্ষণই এখানে প্রধান। মহব্বতে ইলাহীর স্তর কিন্তু এরকম অবস্থা থেকে অনেক উর্ধ্বে। রক্তের সম্পর্ক, বংশের সম্পর্ক সেখানে কোনোই প্রশ্রয় লাভ করে না।

বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা, হজরত ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্য সাহাবীগণের যে সমস্ত মারফু বিবরণ এসেছে, সেগুলোর শব্দবিন্যাস ভিন্ন হলেও অর্থ এক। আল্লাহ্‌তায়ালার একশত রহমতের মধ্যে একটি রহমত তিনি সৃষ্টিকুলকে বন্টন করে দিয়েছেন, যার কারণে তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করে। বাকী নিরানব্বইটি রহমত তিনি রেখে দিয়েছেন তাঁর আউলিয়াদের জন্য (যার পূর্ণ প্রকাশ হবে কিয়ামতের দিন)। বাগবী বলেছেন, আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার ভালোবাসার নিদর্শন এই যে, সে তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে, আনুগত্যকে আশ্রয় করবে এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে জীবন যাপন করবে। আর বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বতের নিদর্শন এই যে, তিনি বান্দাদেরকে গ্রহণ করবেন, সওয়াব দান করবেন এবং ক্ষমা করবেন। বাগবীর এই বর্ণনা অবশ্য প্রকৃত মহব্বত নয়, মহব্বতের নিদর্শন মাত্র।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌তায়ালার ভালোবাসা পেতে হলে নবীর অনুসরণ মেনে নিতে হবে। মহব্বত যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালার দান, আর সকল দানের মাধ্যম যেহেতু নবী রসুলগণ, তাই তাঁদের অনুসরণের মাধ্যম ব্যতিরেকে ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌র রসুলের অনুসরণ না হওয়াই ভালোবাসা না হওয়ার প্রমাণ। এরকম ভালোবাসার দাবীকে আল্লাহ্‌তায়ালার কিতাব মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌তায়ালা ভালোবাসবেন তখনই, যখন মানুষ নবী-আনুগত্যকেই একমাত্র আচরণীয় জীবনাদর্শ করবে।

একটি প্রশ্ন ঃ এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, নবী আনুগত্যের পরিণামফলই আল্লাহ্‌তায়ালার ভালোবাসা। অর্থাৎ প্রথমে বান্দার ভালোবাসা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি। পরে আল্লাহ্‌তায়ালার ভালোবাসা বান্দাদের প্রতি। কিন্তু ইতোপূর্বে বলা হয়েছে মহব্বতের সূচনা হয় আল্লাহ্‌তায়ালার দিক থেকেই। জবাবে একথা বলা যেতে পারে, দু'টি অবস্থাই সঠিক। আল্লাহ্‌তায়ালার ভালোবাসা বান্দারা পায় দুই ভাবেই। প্রথমে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট থেকে দান হিসেবে পরে নবী আনুগত্যের পরিণাম হিসেবে। প্রেম ভালোবাসার শেষ ফল ক্ষমা প্রাপ্তি। আল্লাহ্‌তায়ালা তাই বলেছেন, 'আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের গোনাহ্ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ্‌তায়ালা ক্ষমাশীল দয়াময়।'

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার সঙ্গীদেরকে বললো, দেখেছো, মোহাম্মদ তাঁর আনুগত্যকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য হিসাবে চালিয়ে দিতে চায়। ভাবখানা এই যেনো আমরা তাঁকে ওরকম ভালোবাসি যেমন খৃষ্টানেরা ঈসাকে ভালোবাসে। তখন অবতীর্ণ হলো, 'বলো আল্লাহ্ ও রসুলের অনুগত হও।' এর অর্থ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের অনুসরণ সমার্থক। রসুল স. এর অনুসরণই আল্লাহ্‌তায়ালার অনুসরণ। এজন্য তিনি স. এরশাদ করেছেন, আমার সকল উম্মত বেহেশ্‌তী, অস্বীকারকারীরা ছাড়া। সাহাবী রা. গণ আরজ করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসুল, অস্বীকারকারী কারা? তিনি বললেন, আমার কথা যারা মানবে তারা বেহেশ্‌তী আর যারা মানবেনা তারা অস্বীকারকারী। বোখারী ও মুসলিম।

এই হাদিসে রসুল স. তাঁর অনুসারীদের জান্নাতী বলেছেন। অন্যত্র বলেছেন, যে ব্যক্তি মোহাম্মদের অনুসরণ করলো, সে আল্লাহ্‌তায়ালারই অনুসরণ করলো এবং যে মোহাম্মদের অবাধ্য হলো সে আল্লাহ্‌তায়ালার অবাধ্য হলো। বোখারী।

আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুসরণ থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা কাফের। কাফেররা আল্লাহ্‌তায়ালার ভালোবাসার পাত্র নয়। আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বত কেবল মুমিনদের জন্যই নির্ধারিত। মূলকথা এই যে, রসুলের অনুসরণ থেকে বিরত থাকাই

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌তায়ালার ভালোবাসা না পাওয়ার প্রমাণ। ভালোবাসা না পাওয়ার কারণে তারা ক্ষমা থেকেও বঞ্চিত হবে।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৩৩, ৩৪

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

❑ আদম, নূহ ও ইব্রাহিমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে আল্লাহ্‌ বিশ্বজগতে মনোনীত করিয়াছেন।

❑ বংশানুক্রমে ইহারা একে অপর হইতে জাত। আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

আদম আ. সকল মানুষের পিতা। বেহেশতে ফেরেশতারা তাঁকে সেজদা করে সম্মান জানিয়েছিলো। তিনিই প্রথম নবী। সকল নবী রসুল তাঁরই অধস্তন পুরুষ। এর পর প্রেরিত হলেন হজরত নূহ আ., যখন মানুষ হয়ে পড়েছিলো দ্বিধাবিভক্ত। আশ্রয় নিয়েছিলো পরস্পরবিরোধী বলয়ে, বিশ্বাসে অথবা অবিশ্বাসে। হজরত নূহ আ. এর বদদোয়ায় নেমে এসেছিলো মহাপ্লাবন। নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো অবিশ্বাসীরা। অতঃপর হজরত ইব্রাহিম আ. এর বংশধর এবং ইমরানের বংশধরের মধ্য থেকে আল্লাহতায়ালা মনোনীত করেছিলেন নবী ও রসুল। হজরত ইব্রাহিম আ. থেকে ইসমাইল আ., ইসহাক আ., ইয়াকুব আ., ইসবাত আ., ইমরান আ. এবং সর্বশেষে মোহাম্মদ স.। মুকাতিলের উক্তিতে বংশানুক্রমের বর্ণনা এরকম — ইমরান বিন ইয়াসহার বিন কাহাত বিন লাবী বিন ইয়াকুব আ.। এই ইমরানই হজরত মুসা আ. এবং হজরত হারুন আ. এর পিতা ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, ইমরান ছিলেন মাসানের পুত্র। মাসান ছিলেন হজরত সুলায়মান আ. এর বংশধর। এই ইমরান ছিলেন হজরত মরিয়ম আ. এর পিতা। হাসান বসরী এবং ওহাব বলেছেন, এই আয়াতে ইমরান বলতে ইমরান বিন মাসানকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তিনি মরিয়ম আ. এর পিতা ছিলেন না। বরং মরিয়ম আ. এর পিতা ইমরান ছিলেন আশহামের পুত্র। আশহাম ছিলেন আমুনের পুত্র। আমুন ছিলেন হজরত সুলায়মান আ. এর বংশভূত। ইমরান বিন মাসান এবং ইমরান বিন আশহামের মধ্যে এক হাজার আশি অথবা এক হাজার আটশত বছরের ব্যবধান ছিলো। উল্লেখ্য যে, এখানে ইমরান বলতে মরিয়ম আ. এর পিতাকেই বোঝানো হয়েছে। হজরত আদম, হজরত নূহ, হজরত ইব্রাহিম এবং হজরত ইমরান — এই চারজনের পৃথক উল্লেখ এ জন্যই করা হয়েছে যে, সকল নবী রসুল অথবা অধিকাংশ নবী রসুল

www.eelm.weebly.com

তাঁদের বংশসূত্রেই এসেছেন। 'আলাল আলামীন' অর্থ সমগ্র বিশ্বজগত, যাতে মনুষ্যজগত ও ফেরেশতা জগতও অন্তর্ভূত। ইব্রাহিমের বংশধরের মধ্যে তিনি সহ মুসা আ. ঈসা আ. এবং হজরত মোহাম্মদ স. ও শামিল। প্রকাশ থাকে যে, তাঁরা সকল ফেরেশতা এবং সকল মানুষ থেকে উত্তম ছিলেন। তাই এই আয়াত বিশেষ মানুষকে বিশেষ ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম প্রমাণিত করেছে। বাগবী হজরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, ইহুদীরা বলতো, আমরা ইব্রাহিম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের সন্তান। আমরাই তাঁদের দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তখন আল্লাহতায়ালা এই আয়াত নাজিল করেন। উদ্দেশ্য, তাঁদের বংশ বা তাঁদের বংশের শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ স. আল্লাহতায়ালার মনোনীত। অথচ তোমরা তাঁর অনুসরণ বিমুখ। সুতরাং তোমাদের দাবী কীভাবে সত্য বলে গণ্য হতে পারে! বায়যাবী লিখেছেন, ইতোপূর্বে উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহতায়ালা রসুলের আনুগত্যকে অপরিহার্য করে দিয়েছেন এবং প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, রসুলের অনুসরণই আল্লাহতায়ালার ভালোবাসা লাভের কারণ। তাই পরের আয়াতে পূর্ববর্তী নবী রসুলদের মর্যাদা বর্ণনা করে নবীদের আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াতে নবী — আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ লাভের কথা যেমন বিবৃত হয়েছে তেমনি অনুসরণবিমুখতার কারণে তাঁদের শত্রুদের লাঞ্ছনা এবং ধ্বংসের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, আদম আ. এর দুশমন ইবলিসকে দেয়া হয়েছে অভিসম্পাত, নূহ আ. এর শত্রুদেরকে দেয়া হয়েছে সলিলসমাধি, হজরত ইব্রাহিম আ. এর সময়ের সমস্ত মানুষ ছিলো কাফের। তাদের বিরুদ্ধে তিনি নবী ইব্রাহিমকে মনোনীত করেছেন এবং তাঁর শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। হজরত মুসা আ. এবং হারুন আ. কে যাদুকরদের উপর বিজয়দান করেছিলেন। ফেরাউন ও তার সৈন্যদের বিশাল বাহিনীকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন নীল দরিয়ায়।

আমি বলি, হজরত ঈসা আ. কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হলে তাঁর অনুসারীরা অত্যন্ত বিপর্যস্ত বোধ করলেন। কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাঁদেরকে প্রবল করলেন এবং কাফেরদের উপরে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদেরকে প্রবল থাকার ঘোষণা দিলেন, 'আর যারা তোমার কথা মান্য করে তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে বিজয়ী করবো।' হজরত আদম আ. হজরত নূহ আ. এবং আলে ইব্রাহিম ও আলে ইমরানের কথা এ কারণেই উল্লেখ করা হয়েছে। রসুলে পাক স. এর কথা উল্লেখ করা হয়নি এ কারণে যে, সমগ্র মানবতার উপরে তাঁর বিশাল বিজয়ের পরিকল্পনা রয়েছে সামনে। তাঁর বিজয়ের সূচনা হবে অতি সত্বরই।

উপরোল্লিখিত নবী চতুষ্টয়ের মাধ্যমে ব্যাপক বংশবিস্তৃতি ঘটেছে। তাঁরা ছিলেন একে অন্যের বংশ সম্পর্কিত এবং পরস্পর পরস্পরের সাহায্যপুষ্ট। তাঁদের

www.eelm.weebly.com

বহুবিচিত্র সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে আল্লাহতায়ালা মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং কোরাইশদের মধ্য থেকেও রসুল পাক স.কে আল্লাহতায়ালা মনোনীত করেছেন — এতে কোরাইশদের বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ্তায়ালা ওই ব্যক্তিদের কথা উত্তমরূপে শ্রবণ করেন এবং উত্তমরূপে জানেন, যারা সন্দেহ, বিস্ময়ের দোলায় দোদুল্যমান থাকে। তাদের অন্তরের উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবগত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৩৫

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَٰنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

❑ স্মরণ কর, যখন ইমরানের স্ত্রী বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যাহা আছে তাহা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করিলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হইতে ইহা কবুল কর, তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

ইমরানের পিতার নাম ছিলো মাসান অথবা আশহাম। মাসানের সন্তানেরা ছিলেন বনি ইসরাইলের নেতা। তাঁদের মধ্যে অনেকে হয়েছিলেন আলেম। কেউ কেউ হয়েছিলেন বাদশাহ। ইমরানের স্ত্রীর নাম হান্না বিনতে ফাকুদ। তিনি তখন বৃদ্ধা। ইবনে জারীর, ইবনে ইসহাক ও ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, একদিন একটি গাছের ছায়ায় বসেছিলেন তিনি। হঠাৎ দেখলেন, একটি পাখি তার বাচ্চার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে খাওয়াচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে সন্তান লাভের অভিলাষ জেগে উঠলে তাঁর অন্তরে। তিনি সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানালেন। আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন। গর্ভবতী হলেন তিনি। বললেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! আমার উদরের সন্তানকে আমি বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমতে উৎসর্গ করবো। পৃথিবীর ব্যস্ততায় আমি তাকে সংশ্লিষ্ট করবো না। সে স্বাধীনভাবে যেনো কেবল তোমার উপাসনায় নিয়োজিত থাকতে পারে।

ইহুদীদের ধর্মমতে এ ধরনের মানতের ব্যাপক প্রচলন ছিলো। ইবনে জারীর, কাতাদা ও রবী থেকে এরকম বলেছেন,তাদের আলেম এবং নবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যারা তাদের সন্তানকে বাইতুল মুকাদ্দাসের সেবায় উৎসর্গ না করেছেন। এ ধরনের উৎসর্গীকৃত সন্তানেরা যৌবনে পদার্পণ না করা পর্যন্ত গির্জার সেবায় মগ্ন থাকতেন। যৌবনে পৌঁছার পর ব্যাপারটি হতো তাঁদের ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে তাঁরা বাকি জীবন সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারতেন। ইচ্ছা করলে অন্য কোথাও চলে যেতে পারতেন। উল্লেখ্য, এ নিয়ম ছিলো শুধু পুত্রসন্তানের

www.eelm.weebly.com

বেলায়। কন্যাসন্তানকে উৎসর্গ করার নিয়ম ছিলো না। স্ত্রীর প্রার্থনা শুনে ইমরান বললেন, কী বলছো তুমি? মেয়ে হলে কেমন হবে! দু'জনই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সন্তান প্রসবের আগেই মৃত্যু হলো ইমরানের। তারপর একটি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন বিবি হান্না।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৩৬

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○

❐ অতঃপর যখন সে উহাকে প্রসব করিল তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করিয়াছি।' সে যাহা প্রসব করিয়াছে আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবগত। 'ছেলে তো মেয়ের মতো নয়, আমি উহার নাম মরিয়ম রাখিয়াছি।' 'এবং অভিশপ্ত শয়তান হইতে তাহার ও তাহার বংশধরদের জন্য তোমার শরণ লইতেছি।'

প্রসবের পর বিবি হান্না বললেন, 'আমি যে কন্যা সন্তান প্রসব করেছি।' চিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি। এই মেয়ে কীভাবে খেদমত করবে বাইতুল মুকাদ্দাসের। মেয়েদের যে কিছু শারিরীক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যা সার্বক্ষণিক খেদমতের অন্তরায়। কিন্তু আল্লাহতায়ালার সকল সিদ্ধান্তই কল্যাণময়। বিশ্বাসিনী হান্না আল্লাহতায়ালার সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য করে কন্যা সন্তানকেই উৎসর্গ করে প্রার্থনা জানালেন, অভিশপ্ত শয়তান থেকে এই শিশু কন্যা এবং তার বংশধরগণ যেনো নিরাপদ থাকে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল পাক স. বলেছেন, এমন কোনো মানব শিশু নেই, ভূমিষ্ঠকালে শয়তান যাকে স্পর্শ না করে। কিন্তু মরিয়ম এবং তাঁর পুত্র ঈসা এর ব্যতিক্রম। সদ্যজাত শিশু কেঁদে ওঠে শয়তানের স্পর্শের কারণেই। হজরত আবু হোরায়রার দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে, সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর চিৎকার শয়তানের স্পর্শাঘাতেরই প্রতিক্রিয়া। মরিয়ম এবং ঈসাকেও শয়তান স্পর্শ করতে উদ্যত হয়েছিলো, কিন্তু আল্লাহতায়ালার হেফাজতের অনড় অন্তরাল ছিলো মাঝখানে।

আমি বলি, বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, হজরত ফাতেমা এবং হজরত আলীর বিবাহকালে রসুল স. বলেছিলেন, ইলাহি আমি তাঁকে ও তাঁর আওলাদকে

www.eelm.weebly.com

বিতাড়িত শয়তানের আক্রমণ থেকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করলাম। হজরত আলী এরকম বলেছেন। হজরত আনাস থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে হাব্বান। উল্লেখ্য, বিবি হান্নার প্রার্থনা অপেক্ষা রসুল পাক স. এর প্রার্থনা গৃহীত হওয়ার অধিক উপযোগী। আমি ধারণা করি, হজরত ফাতেমা এবং তাঁর বংশধরদেরকেও আল্লাহতায়ালা শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৩৭

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَـٰمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَـٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

❑ অতঃপর তাহার প্রতিপালক তাহাকে ভালভাবেই গ্রহণ করেন এবং তাহাকে ভালভাবে মানুষ করেন এবং তিনি তাহাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। যখনই যাকারিয়া কক্ষে তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে যাইত তখনই তাহার নিকট খাদ্য সামগ্রী দেখিতে পাইত। সে বলিত, 'হে মরিয়ম! এই সব তুমি কোথায় পাইলে?' সে বলিত, 'উহা আল্লাহের নিকট হইতে।' আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন।

আল্লাহতায়ালা পূর্ণ সন্তুষ্টির সঙ্গে কবুল করে নিলেন মরিয়মকে। সারা পৃথিবীর রমণীদের উপরে মর্যাদাবতী করলেন তাঁকে। পূর্ণ নিরাপদ করলেন পাপ থেকে এবং ঋতুস্রাব থেকে। আল্লাহতায়ালার বিশেষ দৃষ্টিতে প্রতিপালিত হতে লাগলেন বিবি মরিয়ম। অন্যান্য শিশু এক বৎসরে যতটুকু বেড়ে উঠতো তিনি ততটুকু বেড়ে উঠতেন একদিনেই।

ইবনে জারীর, ইকরামা, কাতাদা এবং সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, বিবি হান্না শিশু মরিয়মকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে মসজিদের মাশায়েখের সামনে রেখে দিলেন। মাশায়েখ ছিলেন হারুনের সন্তান এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের মোতাওয়াল্লী। হান্না বললেন, 'একে গ্রহণ করুন।' মরিয়ম ছিলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের ইমামের কন্যা। তাই সকল মাশায়েখ তাকে গ্রহণ করতে চাইলেন। হজরত যাকারিয়া বললেন, আমার অধিকার বেশী। এই শিশুর খালা আমার স্ত্রী। মরিয়মের খালার নাম ছিলো

www.eelm.weebly.com

আসিয়া বিনতে ফাকুদ। নবী ইয়াহিয়া আ. এর জননী ছিলেন তিনি। তখন বাইতুল মুকাদ্দাসের মাশায়েখ ছিলেন সর্বমোট সাতাশ জন। তাঁরা লটারীর মাধ্যমে শিশু মরিয়মের অধিকার নিশ্চিত করতে সম্মত হলেন। গেলেন এক নদীর তীরে। সুদ্দী বলেছেন, নদীটির নাম উরদুন। সবাই নিজেদের কলম নদীতে ফেলে দিলেন। যার কলম পানিতে স্থির দাঁড়িয়ে থাকবে, তাঁরই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে — এই ছিলো সিদ্ধান্ত। হজরত যাকারিয়া আ. এর কলম পানিতে স্থির হয়ে ভেসে রইলো, অন্যদের কলম গেলো ভেসে।

শিশু মরিয়মের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন হজরত যাকারিয়া। তিনি ছিলেন এজেনের সন্তান। এজেন ছিলেন মুসলিমের এবং মুসলিম ছিলেন সুদুনের সন্তান। সুদুন ছিলেন হজরত সুলায়মান আ. এর পুত্র। হজরত যাকারিয়া মরিয়মের জন্য একটি প্রকোষ্ঠ (হুজরা) নির্মাণ করলেন। দুগ্ধদানের জন্য এক মহিলাকে নিয়োজিত করলেন। পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত করলেন ইয়াহিয়া জননীকে। যখন যৌবনবতী হলেন মরিয়ম, তখন মসজিদের মধ্যে একটি বালাখানা (মেহরাব) তৈরী করে দিলেন হজরত যাকারিয়া, যার দরোজা ছিলো মসজিদের ভিতরের দিকে। সিঁড়ি ছাড়া সে বালাখানায় ওঠা যেতো না। হজরত যাকারিয়া ছাড়া মরিয়মের বালখানায় প্রবেশ করতো না কেউ। হজরত যাকারিয়া দেখতে পেতেন, মরিয়মের সামনে রয়েছে অমৌসুমী ফল। গ্রীষ্মের ফল শীতে এবং শীতের ফল গ্রীষ্মে দেখতে পেতেন তিনি। বলতেন, ফলগুলো কোত্থেকে এসেছে? মরিয়ম উত্তর দিতেন, আল্লাহর নিকট থেকে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, মরিয়মের আহার্যবস্তু আসতো জান্নাত থেকে। হাসান বসরী বলেছেন, হজরত মরিয়ম কারো দুগ্ধ পান করেননি। তাঁর রিজিক আসতো জান্নাত থেকে। তাঁর পুত্র ঈসার মতো তিনিও শিশুকালে কথা বলতেন।

'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন' — এই বাক্যটি বিবি হান্নারও হতে পারে, আল্লাহতায়ালারও হতে পারে।

এই ঘটনা থেকে আউলিয়াদের কারামতের প্রমাণ পাওয়া যায়। কেউ কেউ একে হজরত যাকারিয়ার মোজেজা বলেছেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। যাকারিয়ার জানা ছিলো না বলেই বলতেন, এ সব কোত্থেকে এসেছে?

হজরত জাবের থেকে আবুল ইয়ালী বলেছেন, হজরত সাইয়্যেদা ফাতেমা একবার রসুল স. এর খেদমতে সামান্য রুটি ও যৎসামান্য গোশত্ হাদিয়া পাঠালেন। রসুল স. হাদিয়াসহ নিজেই হজরত ফাতেমার নিকট গিয়ে বললেন, প্রিয় কন্যা। এগুলো নাও। হজরত ফাতেমা নিলেন এবং ঢাকনা খুলে দেখলেন, প্রচুর রুটি ও গোশত্। রসুল স. বললেন, এসব কোত্থেকে এসেছে? ফাতেমা বললেন, আল্লাহর নিকট থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে চান তাকে অপরিমিত

www.eelm.weebly.com

রিজিক দান করেন। রসুল স. বললেন, আল্লাহতায়ালার অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনিই তোমাকে বনীইসরাইলের নারীদের নেত্রী মরিয়মের মতো করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি স. তাঁর কন্যা, জামাতা এবং দুই নাতিসহ আহার করলেন। উদ্বৃত্ত আহার্য বন্টন করে দেয়া হলো প্রতিবেশীদের মধ্যে।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ○ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ○ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ○ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ○

❑ সেখানেই যাকারিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হইতে সৎ বংশধর দান কর। তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী।'

❑ যখন যাকারিয়া কক্ষে সালাতে দাঁড়াইয়াছিলেন তখন ফেরেশতাগণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিতেছেন, সে হইবে আল্লাহের বাণীর সমর্থক, নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী।'

❑ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র হইবে কিরূপে? আমার তো বার্ধক্য আসিয়াছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা!' সে বলিল, 'এইভাবেই।' আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

www.eelm.weebly.com

❑ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' তিনি বলিলেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি ইংগিতে ব্যতীত কথা বলিতে পারিবে না। আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করিবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিবে।'

বিবি মরিয়মের অলৌকিক রিজিক প্রাপ্তি থেকে একটি সুপ্ত ইচ্ছে জেগে উঠলো হজরত যাকারিয়া আ. এর মনে। বয়োবৃদ্ধ ছিলেন তিনি। তাঁর স্ত্রীও গর্ভধারণের বয়স পেরিয়েছিলেন অনেক আগেই। তবুও হজরত যাকারিয়া আ. আল্লাহতায়ালার কাছে প্রার্থনা জানালেন একটি সন্তানের জন্যে। আল্লাহতায়ালার ক্ষমতা অপার। তিনি যা চান তাই হয়। তিনি যেমন মরিয়মকে অলৌকিক উপায়ে আহার্য দান করতে পারেন তেমনি সন্তান লাভের সময় বিগত হলেও সন্তান দিতে পারেন। তাই তিনি প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট থেকে সৎ সন্তান দান করো।

হজরত যাকারিয়া ছিলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রধান মাশায়েখ। কোরবানী উপস্থাপন করা, কোরবানী গাহের দরোজা উন্মুক্ত করা — এ সমস্ত দায়িত্ব ছিলো তাঁর। বিনা অনুমতিতে তাঁর প্রকোষ্ঠে কেউ প্রবেশ করতে পারতো না। কিন্তু একদিন তিনি যখন নামাজে দন্ডায়মান, তখন শ্বেতবস্ত্র পরিহিত এক যুবকরূপে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন হজরত জিব্রাইল আ.। তিনি সম্বোধন করলেন, যাকারিয়া! আল্লাহতায়ালা তোমাকে সুসংবাদ জানাচ্ছেন, তোমার পুত্র সন্তান হবে। তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। সে হবে আল্লাহের বাণীর সমর্থক (ঈসা কালেমাতুল্লাহের সমর্থক)। হবে পুণ্যবানদের অন্তর্ভূত একজন নবী, নেতা এবং ইন্দ্রিয় বিজয়ী। হজরত যাকারিয়া জিব্রাইল আ. এর প্রতি দৃষ্টিপাত না করেই তাঁর প্রার্থনায় নিবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি বয়োবৃদ্ধ। আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা। পুত্রসন্তান কেমন করে হবে! — এ রকম বিস্ময়বোধ মানুষের স্বভাবজাত। প্রকৃতপক্ষে সন্তান লাভের অলৌকিক ঘটনাটি কীভাবে ঘটবে তাই জানতে চাইছিলেন তিনি। তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে কি যৌবনকাল ফিরিয়ে দেয়া হবে। না কেবল স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দূর করে দেয়া হবে। নাকি অন্য কোনো স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান দেয়া হবে, ইত্যাকার অনেক কৌতুহলের দোলায় দোদুল্যমান ছিলেন তিনি।

হজরত যাকারিয়ার বয়স ছিলো তখন বিরানব্বই বৎসর, কালাবী এ কথা বলেছেন। আর জুহাক বলেছেন, তাঁর বয়স ছিলো একশ' বিশ বছর এবং তাঁর স্ত্রীর বয়স ছিলো অষ্টানব্বই বছর।

আল্লাহতায়ালা কর্তৃক প্রেরিত সুসংবাদে পূর্ণ আস্থা রেখে হজরত যাকারিয়া যখন একটি নিদর্শন চাইলেন, তখন তাঁকে জানানো হলো, এক সময় যখন এমন হবে যে, আল্লাহতায়ালার অত্যধিক জিকির এবং সন্ধ্যা ও সকালে তাঁর পবিত্রতা ও

www.eelm.weebly.com

মহিমা ঘোষণায় ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও তিনি কথা বলতে পারবেন না। কিছু বলতে চাইলে ইঙ্গিতে বোঝাতে হবে। আতা বলেন, কথা না বলতে পারার অর্থ তিন দিন রোজা রাখা। ওই সময়ের নিয়ম ছিলো, রোজাদারদেরকে ইশারায় কথা বলতে হবে। মুখে কথা বলা যাবে না।

নিদর্শন প্রকাশিত হলো একদিন। যথা সময়ে জন্মগ্রহণ করলেন আল্লাহ্‌র নবী হজরত ইয়াহ্‌ইয়া আ.। হজরত ঈসা আ. এর চেয়ে ছয় মাসের বড় ছিলেন তিনি। ছিলেন ঈসা আ. এর সর্বপ্রথম সমর্থনকারী। বাল্য বেলায় খেলাধুলায়রত কিছু বালকের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে সমবয়সীরা তাঁকে খেলাধুলার জন্য আহবান জানালে তিনি বলেছিলেন, খেলাধুলার জন্য আমি জন্মগ্রহণ করিনি। তিনি ছিলেন নিষ্পাপ।

ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে আসাকের হজরত আমর বিন আস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহতায়ালার এমন কোনো বান্দা নেই, যে গোনাহ ব্যতীত তাঁর সম্মুখে দন্ডায়মান হবে। ব্যতিক্রম কেবল ইয়াহ্‌ইয়া বিন যাকারিয়া। তিনি ছিলেন নেতা। এলেম, ইবাদত, পরহেজগারী, চরিত্র সুষমা, সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয়। ছিলেন ইন্দ্রিয়বিজয়ী। এবং অবশ্যই নবীর বংশধর।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৪২, ৪৩

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

❒ স্মরণ কর যখন ফেরেস্তাগণ বলিয়াছিল, 'হে মরিয়ম! আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের নারীর মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করিয়াছেন।'

❒ হে মরিয়ম! 'তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজ্‌দা করো এবং যাহারা রুকু করে তাহাদের সহিত রুকু কর।'

আল্লাহ্‌তায়ালা বিবি মরিয়মকে মনোনীত করেছিলেন জাতী তাজাল্লীর জন্য। সুফীগণ বলেছেন, এর অর্থ কামালিয়াতে নবুয়ত। নবীগণ মাধ্যম ব্যতীত সত্তাগতভাবে এই কামালিয়াত লাভ করে থাকেন। আর সিদ্দিকগণ এই কামালিয়াত লাভ করে থাকেন সাধারণ মর্যাদাধারী নবীগণের মাধ্যমে। মরিয়ম ছিলেন সিদ্দিকা। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে পবিত্র করেছিলেন। এর অর্থ পাপ থেকে রক্ষা করে অথবা পাপপ্রভাব মিটিয়ে দিয়ে শয়তানের পথ চিররুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁকে পুরুষের স্পর্শ থেকে পবিত্র

www.eelm.weebly.com

রেখেছিলেন। এই পবিত্রতার মধ্যে ঋতুবতী হওয়া থেকে পবিত্র হওয়ার কথাও রয়েছে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে রমণীকুলের নেতৃত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন।

হজরত আলী বলেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, মরিয়ম বিনতে ইমরান তাদের সময়ে নারীদের মধ্যে উত্তম ছিলেন। আর আমাদের সময়ের সর্বোত্তমা হচ্ছেন হজরত খাদিজা। হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, বিশ্বের সমস্ত রমণীদের মধ্যে মরিয়ম বিনতে ইমরান, খাদিজা বিনতে খোয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া সর্বোত্তমা। তিরমিজি।

হজরত আবু মুসা আশআরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামেল (পূর্ণ) কিন্তু নারীদের মধ্যে কামেল মরিয়ম বিনতে ইমরান এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া। আর অন্য নারীদের তুলনায় হজরত আয়েশার ফযীলতের দৃষ্টান্ত এরকম যেমন সাধারণ আহার্যের তুলনায় ঝোলে ভেজা রুটি (শুরুয়ায় ভেজানো নরম রুটি)।

আমি বলি, এই এরশাদের অর্থ, মরিয়ম ও আসিয়া শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁদের সময়ের নারীদের মধ্যে। কিন্তু হজরত আয়েশার ফযীলত সকল নারীদের উপর। এমনকি মরিয়ম এবং আসিয়ার উপরেও।

বোখারী ও মুসলিমে জননী আয়েশা বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ফাতেমা তুমি বেহেশ্‌তী রমণীদের নেত্রী হবে। অথবা বলেছেন, বিশ্বাসবতীদের নেত্রী হবে। এ সংবাদে কি তুমি আনন্দিত নও?

আবু দাউদ, নাসাঈ এবং হাকেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, বেহেশ্‌তিনীগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাশালিনী হজরত খাদিজা বিনতে খোয়াইলিদ এবং ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ স.।

আহ্‌মদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান এবং হাকেম হজরত হোজায়ফা থেকে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, এক ফেরেশতা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হলেন। আমাকে সালাম করলেন এবং সুসংবাদ দিলেন যে, ফাতেমা জান্নাতিনীগণের নেত্রী। অন্য এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ফাতেমা জান্নাতবাসিনীগণের অগ্রবর্তিনী, মরিয়ম ব্যতীত। হজরত উম্মে সালমার উদ্ধৃতি দিয়ে তিরমিজি বলেছেন, হজরত ফাতেমা বলেন, আমাকে রসুল স. জানিয়েছেন, তুমি জান্নাতী ললনাদের নেত্রী, মরিয়ম বিনতে ইমরান ব্যতীত।

এই বর্ণনাদ্বয় দৃষ্টে বোঝা যায়, হজরত ফাতেমা মরিয়মের তুলনায় অনুত্তমা। কিন্তু এখানে একথাও প্রমাণিত হয়না যে, মরিয়ম ফাতেমা অপেক্ষা উত্তম। বোখারী ও মুসলিম হজরত মুসাওয়ার বিন মাখরামার বর্ণনাসুত্রে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, ফাতেমা আমার অংশ। এরকম বর্ণনা করেছেন আহমদ,

www.eelm.weebly.com

তিরমিজি এবং হাকেম হজরত ইবনে জোবায়ের থেকে। এতে প্রমাণিত হয় যে, সকল পুরুষ ও রমণীদের উপর হজরত ফাতেমার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছে। ইমাম মালেক বলেছেন, আমাদের কাউকে রসুল স. এর টুকরার মতো মনে করা হয়নি। কিন্তু জমহুর আহলে সুন্নতের মত, নবী রসুল এবং সিদ্দিকীন ছাড়া অন্যদের উপরে এই শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে হবে।

অতঃপর হজরত মরিয়মের প্রতি এরশাদ হচ্ছে, 'বিনয়াবনত হও, সেজদা করো এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু করো।' একথায় প্রমাণিত হয় নামাজের ইমাম কোনো নারী হতে পারে না। তাই এই আয়াতে রুকুকারিণী নয়, রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করতে বলা হচ্ছে।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৪৪

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ○

❒ ইহা অদৃশ্যলোকের সংবাদ — যাহা তোমাকে ঐশী-বাণী দ্বারা অবহিত করিতেছি। মরিয়মের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাহাদের মধ্যে কে গ্রহণ করিবে ইহার জন্য যখন তাহারা তাহাদের কলম নিক্ষেপ করিতেছিলো তুমি তখন তাহাদের নিকট ছিলেনা। এবং তাহারা যখন বাদানুবাদ করিতেছিল তখনও তুমি তাহাদের নিকট ছিলেনা।

জ্ঞান অর্জিত হয় দেখে এবং শুনে। কিন্তু রসুলপাক স. এই ঘটনা সমূহ দেখেনওনি, শোনেনওনি। তিনি অক্ষরের অমুখাপেক্ষী (উম্মী) ছিলেন। তাই কোনো পুস্তক পাঠ করে এসমস্ত সংবাদ তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। এমন কোনো সংবাদদাতাও ছিলোনা যার মাধ্যমে সংবাদ জানা সম্ভব। তাঁর সময় এবং বিবি মরিয়ম ও হান্নার সময়ের ব্যবধান প্রায় পাঁচশত বৎসর। অতীতের এই ঘটনারাজি আল্লাহ্তায়ালা জানাচ্ছেন প্রত্যাদেশের (ওহির) মাধ্যমে। এতেই তাঁর স. নবুয়তের প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁকে জানানো হচ্ছে, মরিয়মের অভিভাবকত্ব নিয়ে বাদানুবাদের সংবাদ, লটারীর মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সংবাদ, নদীর পানিতে কলম নিক্ষেপের সংবাদ ইত্যাদি।

www.eelm.weebly.com

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ق اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ○

❐ স্মরণ কর যখন ফেরেস্তাগণ বলিল, হে মরিয়ম! আল্লাহ্ তাহার একটি কথার সুসংবাদ দিতেছেন। তাহার নাম মসীহ্ মরিয়ম তনয় ঈসা, সে ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হইবে।'

হজরত জিব্রাইল জানালেন, 'হে মরিয়ম! আল্লাহ্তায়ালার সুসংবাদ শ্রবণ করো। তিনি তোমাকে দান করবেন এক বাণী, যাঁর নাম হবে মসীহ্। ইহলোকে এবং পরলোকে তিনি হবেন সম্মানিত ও নৈকট্যভাজনদের অন্যতম। মসীহ্ ইবরানী শব্দ, এর অর্থ বরকতময়। কেউ কেউ বলেছেন তাঁকে মসীহ্ বলা হয়েছে এ কারণে যে, তিনি অপবিত্রতামুক্ত এবং পাপমুক্ত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাঁর পবিত্র হাতের স্পর্শে রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা নিরাময় লাভ করতেন — তাই তাঁর নাম মসীহ্। আবার কেউ বলেছেন, স্থায়ী আবাস ছিলোনা তাঁর; থাকতেন মুসাফিরি হালে, তাই তাঁকে মসীহ্ বলা হয়েছে। ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, সত্যবাদী মসীহ্ হচ্ছেন হজরত ঈসা আ. আর মিথ্যাবাদী মসীহ্ হচ্ছে দাজ্জাল। অনেকে বলেছেন, মসীহ্ ওই ব্যক্তি যে এক চক্ষুবিশিষ্ট। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, দাজ্জাল বাম চক্ষু বিশিষ্ট এবং হজরত ঈসা ডান চক্ষু বিশিষ্ট। অর্থাৎ দাজ্জাল থেকে যেমন উত্তম চরিত্র দূর করে দেয়া হয়েছে, তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে ইমান, এলেম, জ্ঞান, ধৈর্য এবং অন্যান্য উত্তম গুণসমূহ থেকে; তেমনি হজরত ঈসাকে মুক্ত করা হয়েছে সকল মন্দ স্বভাব — মূর্খতা, লোভ, পৃথিবীপ্রীতি, কৃপণতা ইত্যাদি থেকে। এক চক্ষু বিশিষ্ট হওয়ার প্রকৃত অর্থ এই। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, আমি শরহে মাশারেকুল আনোয়ার পুস্তকে মসীহ্ শব্দের পঞ্চাশ প্রকার অর্থ দেখেছি।

ঈসা শব্দটি আরবী। এর ইবরানী প্রতিশব্দ ছিলো ইউশায়ু, অর্থ নেতা বা সর্দার। নাম ঈসা উপাধি মসীহ্ এবং উপনাম ইবনে মরিয়ম বা মরিয়ম তনয়। সাধারণভাবে নামের সঙ্গে পিতৃনাম সংযুক্ত করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন পিতা ব্যতিরেকেই। পরিচিতি দিয়েছেন মায়ের দিক থেকে। বলেছেন ইবনে মরিয়ম। এটা আল্লাহ্তায়ালার অসীম কুদরত। আল্লাহ্ জানিয়েছেন ইহ-পরকালে তাঁর সম্মানপ্রাপ্তির কথা। আরো জানিয়েছেন, সান্নিধ্যপ্রাপ্ত যাঁরা তিনি তাঁদের অন্যতম।

www.eelm.weebly.com

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ قَالَتْ رَبِّ
اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ۗ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ
مَا يَشَآءُ ۗ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ وَيُعَلِّمُهُ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝

❒ সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিবে এবং সে হইবে পুণ্যবানদের একজন।

❒ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই আমার সন্তান হইবে কী ভাবে?' তিনি বলিলেন, 'এই ভাবেই।' আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।

❒ এবং তিনি তাহাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জিল।

সদ্যভূমিষ্ঠ হজরত ঈসা আ. দোলনায় থাকা অবস্থায় কথা বলবেন, এটা তাঁর প্রথম মোজেজা (অলৌকিকত্ব)। পরিণত বয়সে কথা বলবেন তখন, যখন তিনি তাঁর বর্তমান আবাস চতুর্থ আকাশ থেকে নেমে আসবেন পৃথিবীতে। কারণ, পরিণত বয়সে পৌছানোর আগেই আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। দুগ্ধপানকালে কথা বলার সংবাদ দিয়ে আল্লাহ্তায়ালা সান্ত্বনা দিয়েছেন বিবি মরিয়মকে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে, আল্লাহ্তায়ালার কুদরত সম্পর্কে সন্দিহান মানুষদের প্রশ্নবাণ প্রতিহত করবেন সদ্যজাত শিশু নিজেই। এতে প্রমাণিত হয় আল্লাহ্তায়ালার কুদরত, হজরত ঈসা আ. এর রেসালত এবং তাঁর পুণ্যবাদীতা।

বিস্মিত হলেন হজরত মরিয়ম। কুদরত সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে নিবেদন করলেন, আমি তো পুরুষের স্পর্শমুক্ত, তবে হে আমার প্রতিপালক! আমি জননী হবো কী ভাবে? আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, এইভাবেই — আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা এবং কুদরত যেভাবে অবয়বশীল হয় স্বামী স্ত্রীর মাধ্যমে অথবা কেবল স্ত্রীর মাধ্যমে — সকল প্রকারই আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমতাভূত। তিনি যদি বলেন, 'হও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। তাঁর ইচ্ছা, কেবল মাতার মাধ্যমে ঈসাকে সৃষ্টি করবেন। শুনে নাও

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্ তাঁর অপার ক্ষমতার নিদর্শন হিসাবে হজরত ঈসাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, প্রজ্ঞা (হিকমত)। শিক্ষা দিবেন তওরাত এবং ইঞ্জিল।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৪৯

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝

❒ এবং তাঁহাকে বনি ইসরাইলের জন্য রসুল করিবেন। সে বলিবে, 'আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন আনিয়াছি। আমি তোমাদের জন্য কর্দম দ্বারা একটি পক্ষী সদৃশ আকৃতি গঠন করিব; অতঃপর উহাতে আমি ফুৎকার দিব; ফলে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে উহা পাখী হইয়া যাইবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্তকে নিরাময় করিব এবং আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবন্ত করিব। তোমরা তোমাদের গৃহে যাহা আহার কর ও মওজুদ কর তাহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব। তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে ইহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।'

হজরত ঈসা আ. বনী ইসরাইলের জন্য রসুল। তাদের সামনে তিনি আল্লাহ্প্রদত্ত নিদর্শন পেশ করবেন। প্রথম নিদর্শন এই যে, তিনি মাটি দ্বারা প্রস্তুত করবেন একটি পাখির অবয়ব। তাতে ফুঁ দিবেন। আল্লাহ্‌র হুকুমে তখন পাখিটি জীবিত হবে। বাগবী বলেছেন, বাদুড় প্রস্তুত করেছিলেন হজরত ঈসা। প্রাণীদের মধ্যে বাদুড়ের গঠন প্রকৃতি অধিকতর দৃঢ় এবং পূর্ণ। তারা স্তন্যপায়ী, সুন্দর দন্তবিশিষ্ট। আবার স্ত্রী বাদুড় ঋতুবতীও হয়। এসব বৈশিষ্ট্য অন্য পাখিদের নেই। ওহাব বলেছেন, ফুৎকারের মাধ্যমে জীবিত পাখি উড়তে পারতো কেবল মানুষের দৃষ্টি সীমানায়। কিন্তু চোখের আড়াল হলেই মাটিতে পড়ে মরে যেতো। এ হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার সরাসরি সৃষ্টি এবং বান্দার মাধ্যমে সৃষ্টির পার্থক্য। সৃষ্টি

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌তায়ালারই ক্ষমতাধীন। তাই আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমে পাখি জীবিত হবে — হজরত ঈসা আ. একথাটিও বলবেন।

দ্বিতীয় নিদর্শন এই, তিনি জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান করবেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ ওই ব্যক্তি যার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল এবং চোখ দিয়ে পানি পড়ে। ইকরামা বলেছেন, ওই ব্যক্তি যে দিনে বা রাতে কখনোই দেখতে পায়না।

তৃতীয় নিদর্শন — তিনি কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করবেন। তাঁর সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান পৌছেছিলো অত্যন্ত উচ্চস্তরে। তাই তাঁকে এই মোজেজা দেয়া হয়েছিলো, যাতে প্রমাণিত হয় মানুষের অর্জিত জ্ঞানবিজ্ঞান অপেক্ষা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শনই শ্রেষ্ঠ। হজরত মুসা আ. এর সময়ে যাদুবিদ্যার উন্নতি ছিলো তুঙ্গে। তাই তাঁকে দেয়া হয়েছিলো এমন মোজেজা, যাতে যাদুর দর্পচূর্ণ হয়। হজরত রসুলে পাক স. এর সময়ে ভাষা ও সাহিত্যের সৌকর্য ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে গর্বিত ছিলো আরববাসীরা। তাই কোরআন নাজিল হয়েছে শ্রেষ্ঠতম ভাষাশৈলী এবং সাহিত্যসুষমামন্ডিত হয়ে। এতে করে তাদের সাহিত্যদর্প তো চূর্ণ হয়েছেই তদুপরি এমন এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে তারা, যার জবাব দেয়া কখনোই সম্ভব নয়। বলা হয়েছে, তোমরা কোরআনের সুরার অনুরূপ একটি সুরা রচনা করতো দেখি। আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বা মোজেজার উদ্দেশ্য এটাই, যেনো মানুষ তার অহংকার চূর্ণ হতে দেখে বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে সহজে স্বীকার করে নিতে পারে সত্যকে।

ওহাব বিন মুনাব্বাহ্‌ বর্ণনা করেছেন, কোনো কোনো দিন হজরত ঈসার কাছে পঞ্চাশ হাজারের মতো রোগী জমা হয়ে যেতো। কেউ আসতে না পারলে তিনি নিজে তার কাছে চলে যেতেন এবং জন্মান্ধ ও কুষ্ঠগ্রস্তদের জন্য দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ্‌! তুমি আকাশ ও পৃথিবীবাসীদের প্রতিপালক। আকাশ ও পৃথিবীতে তুমিই উপাস্য। নভঃমন্ডল ও ভূমন্ডলের সবকিছুর উপরই তোমার নিরঙ্কুশ প্রতাপ। তুমি ছাড়া আকাশ — পৃথিবীতে প্রতাপশালী কেউ নেই। তুমিই নভঃবাসী এবং মৃত্তিকাবাসীদের প্রভূ। তুমি ছাড়া নভঃমন্ডল ও ভুমন্ডলের প্রভু কেউ নেই। তোমার অপার ক্ষমতা — মাটিতে, আকাশে, সবখানে। তুমি আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীদের মহামহিম সম্রাট। আমি তোমার জ্যোর্তিময় অবয়ব এবং তোমার মহামর্যাদামন্ডিত নাম নিয়ে তোমার সকাশে প্রার্থনা জানাই। তোমার সাম্রাজ্য চিরন্তন। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাশালী।'

www.eelm.weebly.com

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اِلٰهُ مَنْ فِى السَّمَآءِ وَاِلٰهُ مَنْ فِى الْاَرْضِ لَآ اِلٰهَ فِيْهِمَا
غَيْرُكَ وَاَنْتَ جَبَّارُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَجَبَّارُ مَنْ فِى الْاَرْضِ لَا جَبَّارَ
فِيْهِمَا غَيْرُكَ وَاَنْتَ مَلِكُ مَنْ فِى السَّمَآءِ وَمَلِكُ مَنْ فِى الْاَرْضِ
لَا مَلِكَ فِيْهِمَا غَيْرُكَ قُدْرَتُكَ فِى الْاَرْضِ كَقُدْرَتِكَ فِى السَّمَآءِ
سُلْطَانُكَ فِى الْاَرْضِ كَسُلْطَانِكَ فِى السَّمَآءِ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ
الْكَرِيْمِ وَوَجْهِكَ الْمُنِيْرِ وَمُلْكِكَ الْقَدِيْمِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ
شَئٍ قَدِيْرٌ

ওহাব লিখেছেন, এই দোয়া পড়ে পাগল এবং ভীতিগ্রস্তদেরকে ফুঁ দিলে অথবা লিখে পানি পান করালে ইনশাআল্লাহ্তায়ালা নিরাময় হয়।

জ্ঞাতব্য ঃ হজরত ঈসা আ. এর মাতৃভাষা ছিলো ইবরানী অথবা সুরিয়ানী। এই দোয়া তাঁর দোয়ারই আরবী রূপে বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ নিদর্শন হচ্ছে মৃতকে জীবিত করা। বলা হয়েছে, 'বি ইজনিল্লাহ্' (আল্লাহ্র হুকুমে)। জীবন দান আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়ভূত। একথার প্রমাণ রয়েছে এই শব্দটিতে। ইমাম বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ঈসা চারজনকে জীবিত করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন — ১. আজর ২. জনৈকা বৃদ্ধার ছেলে ৩. আশেরের কন্যা এবং ৪. শাম বিন নুহ্। আজর ছিলেন তাঁর বন্ধু। মৃত্যুকালে আজরের বোন তাঁকে সংবাদ পাঠালেন যে, আপনার বন্ধু মরণোম্মুখ। বন্ধুর আবাস ছিলো তিন দিনের দূরত্বে। মৃত্যুর তিনদিন পর হজরত ঈসা সহচরবৃন্দ সহ সেখানে পৌছলেন। তার বোনকে বললেন, আমাকে আজরের কবরের কাছে নিয়ে চলো। তারপর তার বোনের সঙ্গে আজরের কবরের নিকট গিয়ে হজরত ঈসা আল্লাহ্তায়ালার কাছে আজরের জীবনভিক্ষা চাইলেন। আজর জীবিত হয়ে কবর থেকে উঠে এলেন। এরপর দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন তিনি। তাঁর সন্তানও হয়েছিলো।

জনৈকা বৃদ্ধার ছেলের জানাযা যাচ্ছিলো হজরত ঈসার পাশ দিয়ে। তিনি দোয়া করলেন। বৃদ্ধার ছেলে জীবিত হয়ে তাকে বহনকারী খাটের উপর বসে পড়লো। তারপর কাপড় পরিধান করে নিচে নেমে এসে সে খাটটি উঠিয়ে নিলো নিজের কাঁধে। তারপর নিজের ঘরে চলে গেলো। সেও অনেক দিন জীবিত ছিলো এবং সন্তানের পিতাও হয়েছিলো।

www.eelm.weebly.com

তার নাম ছিলো আশের। আশের অর্থ ওশর আদায়কারী। তার এক কন্যা মারা যাওয়ার একদিন পর হজরত ঈসার দোয়ায় পুনর্জীবিত হয়েছিলো। পরবর্তী জীবনে সে সন্তানের জননী হয়েছিলো।

শাম বিন নুহের কবরের কাছে গেলেন হজরত ঈসা। আল্লাহ্‌র ইসমে আজম নিয়ে ডাকলেন তাকে। শাম বের হয়ে এলেন কবর থেকে। ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। মনে করলেন কিয়ামত সংঘটিত হবে বুঝি। ওই সময়ে মানুষের মাথার চুল পাকতো না। কিন্তু ভয়ে শামের মাথার অর্ধেক চুল শাদা হয়ে গেলো। বললেন, কিয়ামত কি হয়ে গিয়েছে? হজরত ঈসা বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র ইসমে আজম নিয়ে ডেকেছি। এখন তুমি ইচ্ছা করলে আবার মরে যেতে পারো। শাম বললেন, রাজি আছি, যদি মৃত্যুর শাস্তি থেকে রক্ষা পাই। হজরত ঈসা তার উদ্দেশ্য পুরণের জন্য দোয়া করলেন। দোয়া কবুলও হলো।

হজরত ঈসার আরেকটি নির্দর্শন এই যে, মানুষেরা গৃহে যা কিছু আহার করতো এবং যা জমা করে রাখতো তিনি তার বিবরণ দিতে পারতেন। সুদ্দী বলেছেন, হজরত ঈসা বিদ্যালয়ের শিশুদেরকে বলতেন, তোমাদের পিতা ঘরে এই সমস্ত খাবার তৈরী করেছেন। কোনো কোনো শিশুকে বলতেন, গিয়ে দেখো তোমার ঘরের লোকেরা অমুক জিনিস খেয়েছে এবং অমুক জিনিস উঠিয়ে রেখেছে। শিশুরা ঘরে গিয়ে খাবারের জন্য কাঁদতো। পিতামাতারা শেষ পর্যন্ত তাদেরকে খাবার দিতো এবং জিজ্ঞেস করতো, এ কথা তোমাদের কে বলেছে ? শিশুরা বলতো, হজরত ঈসা। গৃহবাসীগণ বলতো, ওই যাদুকরের সঙ্গে কখনো মেলামেশা করোনা। একবার এলাকার সকল শিশুকে একটি ঘরে আটকে রাখা হলো। হজরত ঈসা খোঁজ নিতে নিতে সেখানে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, শিশুরা কোথায় ? লোকেরা বললো, এখানে কোনো শিশু নেই। তিনি বললেন, ওই আবদ্ধ ঘরে কারা? লোকেরা বললো, শুকর। তিনি বললেন, তাই হবে। ঘর খুললে দেখা গেলো সব শিশুরাই পরিণত হয়েছে শুকর শাবকে। সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। বনীইসরাইলেরা সিদ্ধান্ত নিলো, ঈসাকে হত্যা করতে হবে। বিবি মরিয়ম আশংকিত হলেন। তিনি প্রণাধিক পুত্রকে নিয়ে গাধায় আরোহন করলেন। চলে গেলেন মিশরে।

কাতাদা বলেছেন, ঘটনাটি মায়েদা সম্পর্কিত। বনী ইসরাইলেরা যেখানে থাকতো, সেখানে তাদের কাছে আকাশ থেকে মায়েদা (খাঞ্চা ভর্তি আহার্য) অবতীর্ণ হতো। ওই আহার্য ছিলো মান্না ও সাল্‌ওয়ার মতো। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো, ওই আহার্য আত্মসাৎ করা যাবে না। লুকিয়েও রাখা যাবে না। কিন্তু তারা নির্দেশ অমান্য করলো। হজরত ঈসা তাদের এমতো অপকর্মের কথা

www.eelm.weebly.com

বলে দিতে পারতেন। ওই অবাধ্যতার জন্যই আল্লাহ্পাক তাদেরকে শূকর বানিয়ে দেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৫০, ৫১।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ○ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ○

❐ আমি আসিয়াছি আমার সম্মুখে তওরাতের যাহা রহিয়াছে উহার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহার কতকগুলিকে বৈধ করিতে। এবং আমিও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন আনিয়াছি। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর।

❐ 'আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক সুতরাং তোমরা তাঁহার ইবাদত করিবে। ইহাই সরল পথ।'

প্রত্যেক নবী তাঁর পূর্ববর্তী নবীকে সমর্থন করেন। নবুয়তের সূত্রপরম্পরার নিয়মই এই। হজরত ঈসা তাই বলেছেন, তওরাতে যা রয়েছে আমি তা সমর্থন করি। বলেছেন, 'তওরাতের কিছু নিষেধাজ্ঞাকে আমি বৈধতা দিতে এসেছি।' যেমন, চর্বি এবং গোশ্ত তওরাতে হারাম ঘোষিত হলেও এখন তা হালাল। এভাবে পূর্ববর্তী হুকুম রহিত হওয়াকে মনসুখ বলে। যে সমস্ত হুকুম বিশেষ কোনো সময়ের জন্য হয় সেগুলোকে পরবর্তী নবীর মাধ্যমে মনসুখ করাই আল্লাহ্তায়ালার নিয়ম। কোরআনুল করীমেও এরকম কিছু হুকুম রয়েছে যা পরবর্তীতে রসুল স. এর উপস্থিতিতেই রহিত করা হয়েছে। নতুন হুকুম জারি করার অর্থ এই নয় যে, পূর্ববর্তী হুকুমটি ভুল ছিলো। পূর্ববর্তী হুকুমও ঠিক। পরবর্তী হুকুমও ঠিক। একটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় অন্যটি বলবৎ হয়েছে।

নিদর্শনাবলীর উল্লেখ ইতোপূর্বে হওয়া সত্ত্বেও এখানে হজরত ঈসা পুনরায় নিদর্শন এনেছেন বলেছেন। পূর্বের নিদর্শন সমূহ ছাড়াও এখানে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ইঞ্জিল শরীফের সংযোজন করা হয়েছে। অথবা এও হতে পারে গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য এখানে পূর্ববর্তী নিদর্শন সমূহের পুনরোল্লেখ করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

শেষে তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন, আল্লাহ্ কে ভয় করতে এবং তাঁকে অনুসরণ করতে। অর্থাৎ তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশাবলীকে মান্য করতে।

আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের প্রতিপালক — সুতরাং তাঁহার ইবাদত কর — এই বাক্যটিতে পূর্ণ ইমান এবং পূর্ণ আমল সম্পাদনের আহবান রয়েছে। প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহ্তায়ালাকে স্বীকার করলে এবং তাঁর ইবাদতে সমর্পিত হলে সকল ফেৎনার অবসান অবশ্যম্ভাবী। তাই বলা হচ্ছে, ইহাই সঠিক পথ। এরকম কথা বলে গিয়েছেন রসুলে পাক স. ও। একব্যক্তি যখন বলেছিলো, আমাকে এমন কথা বলে দিন যেনো অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতে না হয়। রসুল স. বলেছিলেন, বলো আমি আল্লাহ্র উপর ইমান এনেছি এবং এই কথার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকো।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৫২, ৫৩, ৫৪

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۚ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○ رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ○ وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ع

❒ যখন ঈসা তাহাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করিল তখন সে বলিল, 'আল্লাহের পথে কাহারা আমার সাহায্যকারী?' শিষ্যগণ বলিল, 'আমরাই আল্লাহের পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহে বিশ্বাস করিয়াছি। আমরা আত্মসমর্পণকারী, তুমি ইহার সাক্ষী থাক।'

❒ 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছ তাহাতে আমরা বিশ্বাস করিয়াছি এবং আমরা এই রসুলের অনুসরণ করিয়াছি। সুতরাং আমাদিগকে সাক্ষ্য বহনকারীদের তালিকাভুক্ত কর।'

❒ এবং তাহারা চক্রান্ত করিয়াছিল আল্লাহ্ও চক্রান্ত করিয়াছিলেন, আল্লাহ্ চক্রান্তকারীদের শ্রেষ্ঠ।

হজরত ঈসা আ. এর মোজেজা যখন বারবার প্রত্যাখ্যাত হতে লাগলো, চতুর্দিকে মাথা তুলে দাঁড়ালো অবিশ্বাস, তখন তিনি চূড়ান্ত আহবান জানালেন, আল্লাহ্তায়ালার পথে কারা আমার সাহায্যকারী? তখন সাড়া দিলেন

www.eelm.weebly.com

হাওয়ারীবৃন্দ। বললেন, আমরা। আমরা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করি এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করি। আমরা বলি, আমরা বিশ্বাস করেছি আমাদের প্রতিপালক কর্তৃক অবতীর্ণ কিতাবে এবং অনুসরণ করি এই রসুলের। সুতরাং হে আমাদের আল্লাহ্! আমরা যেনো সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভূত হই।

'হাওয়ারী' অর্থ খাঁটি বন্ধু। আরেকটি অর্থ অত্যধিক শুভ্র। খন্দক যুদ্ধের সময় রসুল স. তিনবার উচ্চ আওয়াজে যখন মানুষকে ডেকেছিলেন তখন তিনবারই ত্বরিৎ সাড়া দিয়েছিলেন জোবায়ের বিন আওয়াম। রসুল স. বলেছিলেন, প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী থাকে আর আমার হাওয়ারী জোবায়ের। বোখারী, মুসলিম।

কামুস অভিধানে বলা হয়েছে, হাওয়ারী অর্থ সাহায্যকারী। অথবা নবীদের সাহায্যকারী। কিংবা ধোপা ও খাঁটি বন্ধু। হজরত ঈসার সহচরবৃন্দকে তাদের বিশুদ্ধতার জন্য অথবা সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য হাওয়ারী বলা হয়। এরকম বলেছেন হাসান ও সুফিয়ান। কেউ কেউ বলেন, শাদা পোশাক পরিধান করতেন বলে তাদেরকে হাওয়ারী বলা হতো। ইবনে জারীর বলেছেন, তাঁরা ছিলেন ধোপা। মানুষের বস্ত্র ধৌত করতেন তাঁরা। জুহাক বলেছেন, তাঁদের অন্তর ছিলো নির্মল, পাপমুক্ত। ইবনে মোবারক বলেছেন, তাঁদের মুখমন্ডলে ছিলো ইবাদতের চিহ্ন এবং নূরের প্রভাব। কালাবী এবং ইকরামা বলেছেন, মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা, সংখ্যায় ছিলেন তাঁরা বারোজন। রূহ্ বিন কাসেম বলেন, আমি হজরত কাতাদাকে হাওয়ারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তাঁরা ছিলেন নবীর প্রতিনিধি। মুজাহিদ এবং সুদ্দী বলেছেন, তাঁরা জেলে ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, মাঝি।

একবার ইহুদীদের এক দল হজরত ঈসাকে যাদুকর বললো এবং তাঁর পবিত্রা জননীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলো। হজরত ঈসা তাদেরকে অভিসম্পাত দিলেন। আল্লাহ্তায়ালার হুকুমে তৎক্ষণাৎ তারা হয়ে গেলো শূকর। তাদের নেতা ইহুদা এই ঘটনা দেখে ভয়ার্ত হলো। সে সবাইকে নিয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলো, হজরত ঈসা নবীকে হত্যা করতে হবে। যখন তারা হত্যা করতে উদ্যত হলো, আল্লাহ্তায়ালা হজরত জিব্রাইল পাঠালেন। তিনি হজরত ঈসাকে আকাশে উঠিয়ে নিলেন। ইহুদা গৃহাভ্যন্তরে গিয়ে হজরত ঈসাকে হত্যা করার জন্য তিতিয়ানুস্কে নির্দেশ দিলো। আল্লাহ্তায়ালা তার আকৃতি হজরত ঈসার মতো করে দিলেন। লোকেরা ঈসা মনে করে তাকে হত্যা করলো। তাই আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, তারা চক্রান্ত করেছিলো, আল্লাহ্তায়ালাও চক্রান্ত করেছিলেন। আর আল্লাহ্তায়ালার চক্রান্তই ফলবতী হয়। এ হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার অপার ক্ষমতা। তাঁর ক্ষমতার কাছে সকল কিছুই পরাভব মানতে বাধ্য।

www.eelm.weebly.com

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ ۖ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِى الدُّنْيَا وَالْءَاخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ الصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّٰلِمِينَ ۝

❒ স্মরণ কর যখন আল্লাহ্ বলিলেন, ‘হে ঈসা ! আমি তোমার কাল পূর্ণ করিতেছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলিয়া লইতেছি এবং যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে তোমাকে মুক্ত করিতেছি। আর তোমার অনুসারীগণকে কিয়ামত পর্যন্ত সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতেছি, অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।’ তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটিতেছে আমি উহার মীমাংসা করিয়া দিব।

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে আমি তাহাদিগকে ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করিব এবং তাহাদের কোনো সাহায্যকারী নাই।

❒ আর যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং সৎকার্য করিয়াছে তিনি তাহাদের প্রতিফল পুরাপুরিভাবে প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীগণকে ভালোবাসেন না।

হাসান, কালাবী এবং জারিহ্ এই আয়াতের প্রথম বাক্যটির অর্থ করেছেন, আমি তোমাকে উত্তোলন করবো, মৃত্যু ব্যতীতই পৃথিবী থেকে উঠিয়ে আমার সকাশে আনবো। বাগবী অর্থ করেছেন দু'রকম। ১. আমি তোমাকে পুরাপুরি নিজের কাছে উঠিয়ে নেবো, তারা (ইসরাইলীরা) তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। ২. আমি তোমাকে আপন হেফাজতে নিয়ে আসবো অর্থাৎ নিরাপদ

www.eelm.weebly.com

রাখবো। ইবনে জারীর, রবী বিন আনাসের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'তাওয়াফ্ফি' অর্থ নিদ্রা, অর্থাৎ হজরত ঈসা নিদ্রাভিভূত হয়েছিলেন এবং নিদ্রাবস্থায়ই তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন তাওয়াফ্ফি অর্থ মৃত্যু। হজরত আলী বিন আবী তালহা থেকে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইন্নি মুতাওয়াফ্ফিকা অর্থ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মৃত্যু প্রদান করবো। বাগবী লিখেছেন, এই দৃষ্টিকোন থেকে আয়াতের অর্থ হবে দু'রকম — ১. ওহাব বলেছেন, দিবসকালে তিন ঘন্টার জন্য হজরত ঈসাকে মৃত অবস্থায় রেখে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, ঈসায়ীরা বলেন, আল্লাহ্তায়ালা ঈসা আ. কে দিবসকালে সাত ঘন্টা মৃতাবস্থায় রাখার পর পুনর্জীবিত করে উঠিয়ে নিয়েছেন। ২. জুহাক বলেছেন, অর্থ এই যে, আকাশ থেকে অবতরণ করার পর ইহুদীদের হত্যা পরিকল্পনা থেকে নিরাপদ রেখে জীবনের আয়ু পূর্ণ করে আমি তোমাকে মৃত্যু প্রদান করবো — কিন্তু এর পূর্বে আমি তোমাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেবো।

আমরা মনে করি, তাওয়াফ্ফি অর্থ মৃত্যু ব্যতীতই আকাশে উঠিয়ে নেয়া। কেননা অন্যত্র বলা হয়েছে, 'তারা ঈসাকে হত্যাও করেনি শূলেও দেয়নি।'

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার জীবনাধিকারী ওই জাত পাকের কসম! অতিসত্ত্বর ঈসা ইবনে মরিয়ম ন্যায় বিচারক হয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিজিয়া কর রহিত করবেন এবং ধনসম্পদ এমন বিপুলাকার করে দেবেন যে, কেউ ধন গ্রহণে আগ্রহী হবেনা। তখন একটি সেজদা হবে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু অপেক্ষা উত্তম। হাদিসটি বর্ণনা শেষে হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, যদি তোমরা তাঁকে মান্য করতে চাও তবে পড়, 'এবং নিশ্চয় আহলে কিতাবগণ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উপর ঈমান আনবে।' বোখারী, মুসলিম।

বোখারী, মুসলিমের দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ওই সময়ের অবস্থা কেমন হবে যখন হজরত ঈসা তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন এবং তোমাদের ইমাম হবে তোমাদের মধ্যে থেকেই। মুসলিমের এক বর্ণনায় অতিরিক্ত কয়েকটি কথা এসেছে, উটনীগুলোকে ছেড়ে দেয়া হবে, কিন্তু সেগুলোতে আরোহী হয়ে আক্রমণ করা যাবেনা। শত্রুতা, হিংসা এবং পরশ্রীকাতরতা উধাও হয়ে যাবে। মানুষকে সম্পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হবে কিন্তু কেউ আগ্রহ প্রকাশ করবেনা

বাগবী হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তাঁর যুগে মুসলমান ছাড়া অন্য সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। দাজ্জালও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পৃথিবীতে তিনি অবস্থান করবেন চল্লিশ বছর। তারপর মৃত্যুবরণ করবেন স্বাভাবিক নিয়মে। মুসলমানেরা তাঁর জানাজা পড়বেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে ইবনে জাওজী বর্ণনা করেছেন, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, ঈসা ইবনে মরিয়ম পৃথিবীতে নেমে এসে বিয়ে করবেন।

www.eelm.weebly.com

সন্তানের জনক হবেন। পঁয়তাল্লিশ বছর পর ইন্তেকাল করবেন। তাঁকে দাফন করা হবে আমার কবরের পাশে। আমি, ঈসা, আবুবকর এবং ওমর একসঙ্গে থাকবো।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল পাক স. বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সত্যপ্রতিষ্ঠ হয়ে জেহাদরত থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারাই বিজয়ী হবে। তারপর নেমে আসবেন নবী ঈসা। মুসলমানদের নেতা তাঁকে নামাজ পড়াতে বললে তিনি রাজী না হয়ে বলবেন, তোমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন জনের নেতা। তিনি একথা বলবেন কেবল এই উম্মতের সম্মান প্রকাশার্থে। মুসলিম।

মেরাজের হাদিসে এসেছে, রসুলুল্লাহ্ স. ঈসা ইবনে মরিয়মকে দ্বিতীয় আকাশে দেখেছেন। বোখারী ও মুসলিম।

আল্লাহ্তায়ালা ঘোষণা করেছেন, 'তোমার অনুসারীদেরকে আমি প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী করে রাখবো।' এর অর্থ তোমার অনুসরণকারীগণ দলিল প্রমাণে এবং অধিকাংশ সময়ে শক্তির দিক থেকেও কাফেরদেরকে পরাভূত করে রাখবে। রসুল স. এর পূর্বে হজরত ঈসার অনুসারীরা ছিলেন ইসরাইলী হাওয়ারীগণ। তাঁর স. আর্বিভাবের পর তাঁর অনুসারী বলতে মুসলমানদেরকে বুঝতে হবে। কারণ, মুসলমানরা তাঁকে নবী বলে মান্য করেছে এবং তাঁর তৌহিদের আহবানকে কবুল করেছে। মেনে নিয়েছে তাঁর সেই সুসংবাদকে, আমার পরে একজন নবী আসবেন যাঁর নাম আহমদ — আমি তাঁর সুসংবাদদানকারী। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর অনুসরণকারী বলতে কেবল খৃষ্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে। তারা সব সময় ইহুদীদের উপরে বিজয়ী থাকবে।

'অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন' — এই অমোঘ ঘোষনা হজরত ঈসা, তাঁর অনুসারী, সত্যপ্রত্যাখানকারী — সকলের জন্য। এর পরেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পৃথকভাবে সম্বোধন করে ইহকালে ও পরকালে কঠিন শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। এই শাস্তি থেকে বাঁচাবে এরকম সাহায্যকারী তাদের নেই। থাকতে পারে না। ইহকালে হত্যা, জিজিয়া করারোপ, লাঞ্ছনা এবং পরকালে দোজখের শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত। আর ইমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য দেওয়া হয়েছে তাদের সৎকর্ম সমুহের পূর্ণ বিনিময় প্রদানের আশ্বাস। সীমালংঘনকারীদেরকে আল্লাহ্তায়ালা ভালোবাসেন না তাই তারা শাস্তিযোগ্য। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হজরত মরিয়মের তের বছর বয়সে হজরত ঈসা জন্মগ্রহণ করেন। বাবেল শহরে সিকান্দারের আক্রমণের পঁয়ষট্টি বছর পর ছিলো তাঁর আর্বিভাব কাল। ওহি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তাঁর বয়স পৌছেছিলো তিরিশ বছরে। বয়স তেত্রিশে পৌছলে রমজান মাসের শবে কদরের দিন বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে তাঁকে আল্লাহ্পাক আকাশে উঠিয়ে নেন। তাঁর নবুয়তের সময় ছিলো মাত্র তিন বছর। এই ঘটনার পর হজরত মরিয়ম বেঁচে ছিলেন মাত্র ছয় বছর।

www.eelm.weebly.com

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তিকে যখন ঈসা আ. এর আকৃতিবিশিষ্ট করে দেয়া হলো তখন তাকে ধরে ক্রুশবিদ্ধ করলো ইহুদীরা। হজরত মরিয়ম এবং অন্য এক মহিলা (হজরত ঈসার দোয়ায় যিনি উন্মাদিনী অবস্থা থেকে নিরাময় হয়েছিলেন) কাঁদতে কাঁদতে ক্রুশবিদ্ধ লাশের নিকটে গেলেন। হঠাৎ হজরত ঈসা প্রকাশিত হয়ে বললেন, কাঁদছেন কেনো? আল্লাহ্তায়ালা আমাকে প্রচুর কল্যাণসহ উঠিয়ে নিয়েছেন। তারা আমাকে কোনো কষ্ট দিতে পারেনি। এরপর অদৃশ্য হলেন তিনি। সাত দিন পর আল্লাহ্তায়ালা হুকুম করলেন, হে ঈসা ! পাহাড়ে ক্রন্দনরতা মরিয়মের নিকট অবতরণ করো। কারণ সে চিন্তিত, ব্যথিত এবং রোরুদ্যমান। ওখানে গিয়ে হাওয়ারীগণকেও একত্রিত করো। তাদেরকে পাঠিয়ে দাও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে। নির্দেশ দাও, যেনো তারা আল্লাহ্তায়ালার দিকে মানুষকে ডাকতে থাকে। হজরত ঈসা অবতরণ করলেন। নূর প্রজ্জ্বলিত হলো পাহাড়ে। হাওয়ারীগণ একত্রিত হলেন। তিনি তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিলে আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে পুনরায় উঠিয়ে নিলেন আকাশে। সকাল হলো। হাওয়ারীগণ আদিষ্ট স্থানে পৌঁছে ওই স্থানের প্রচলিত ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৫৮

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ○

❑ যাহা আমি তোমার নিকট বিবৃত করিতেছি তাহা নিদর্শন ও সারগর্ভ বাণী হইতে।'

এই আয়াতটিও রসুলে পাক স. এর নবুয়তের প্রমাণ। এটা তাঁর মোজেজার অন্তর্ভূত। কেননা অতীতের এসমস্ত ঘটনাবলী আল্লাহ্তায়ালা না জানালে তিনি জানতেন না। অতএব তিনি যে আল্লাহ্র রসুল — এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। ওয়াজ্জিক্‌রিল হাকিম (সারগর্ভ বাণী হইতে) অর্থ লাওহে মাহফুজ। লাওহে মাহফুজ শাদা মোতি নির্মিত এমন একটি দীর্ঘ ফলক যা পৃথিবী ও আকাশের মধ্যবর্তী শূন্য স্থানে আরশের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় বিদ্যমান।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৫৯, ৬০

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

❑ আল্লাহের নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তারপর তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'হও', ফলে সে হইয়া গেল।

www.eelm.weebly.com

❒ এই সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে, সুতরাং সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

হজরত আদম আ. সৃষ্ট হয়েছেন পিতা মাতা ব্যতিরেকেই। আর হজরত ঈসা আ. সৃষ্ট হয়েছেন পিতা ব্যতিরেকে। দু'জনেরই সৃষ্টি বিস্ময়কর। বরং হজরত ঈসা অপেক্ষা হজরত আদমের সৃষ্টি অধিক বিস্ময়কর।

এই আয়াত নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি দলের বাদানুবাদের কারণে অবতীর্ণ হয়েছে। একবার তারা রসুল স. এর সকাশে এসে বললো, আপনি নাকি ঈসা আ. কে গালি দেন। তিনি বললেন, না তো। তারা বললো, আপনি যে তাঁকে বান্দা বলেন। রসুল স. বললেন, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা, আল্লাহ্‌র রসুল এবং কালেমাতুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র একটি হুকুম)। আল্লাহ্ তাঁকে মরিয়মের উদরে স্থাপন করেছিলেন। খৃষ্টানেরা রাগান্বিত হয়ে বললো, আপনি কি কখনো কোনো মানুষকে পিতা ছাড়া জন্ম নিতে দেখেছেন? তাদের প্রশ্নের জবাবে অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেম, আউফ রা. এর মাধ্যমে এবং হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাসূত্রে। ইবনে আবী হাতেম আরেকটি বর্ণনা করেছেন হাসান বসরীর মাধ্যমে। বর্ণনাটি এই — নাজরানের দু'জন পাদ্রী রসুলুল্লাহ্ স. এর খেদমতে হাজির হলো। একজন জিজ্ঞেস করলো, নবী ঈসার পিতা কে? রসুলে পাক স. এই প্রশ্নের জবাব আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট থেকে কামনা করলেন। তখন নাজিল হলো এই আয়াত। হতবাক হয়ে গেলো পাদ্রীদ্বয়। তারা এমত মূর্খ যে, অহরহ দেখছে যে ছাগলের বাচ্চা মানুষ থেকে অথবা মানুষের বাচ্চা ছাগল থেকে কখনোই জন্মলাভ করেনা কারণ, জাত এখানে ভিন্ন। সৃষ্টির মধ্যেই যদি এরকম সম্ভব না হয়, তবে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে তা সম্ভব হবে কীভাবে। আল্লাহ্‌তায়ালা একক, অমুখাপেক্ষী, চিরন্তন এবং আনুরূপ্যবিহীন। সুতরাং তিনি ঈসা আ. এর পিতা হবেন কেমন করে। হজরত ঈসা তো শরীর বিশিষ্ট অবক্ষয়শীল এক সৃষ্টি, যিনি পানাহার করেন। শয়ন করেন। মৃত্যু তাঁর অমোঘ নিয়তি। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা কারো পিতা বা পুত্র নন। কেউ তাঁর সমকক্ষও নয়।

জ্ঞাতব্য ঃ এই আয়াত থেকে শরয়ী কিয়াস প্রমাণিত হয়েছে। কেননা, হজরত আদমের সৃষ্টির উপর কিয়াস করে হজরত ঈসার পিতা ব্যতীত সৃষ্টি হওয়ার বৈধতা আল্লহ্‌তায়ালা এখানে প্রমাণ করেছেন। অতএব, যারা কেবল কোরআন সুন্নত ও এজমাকেই আহকাম মনে করেন, কিয়াস মানেন না; এই আয়াত তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ।

'সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইওনা' — অর্থ ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো সন্দেহে পতিত হয়োনা। ইহুদীরা হজরত ঈসা আ. এর পবিত্রা মাতাকে বলতো,

www.eelm.weebly.com

ব্যভিচারিণী। আর খৃষ্টানেরা হজরত ঈসাকে বলে আল্লাহ্‌র পুত্র। দুই দলই সংশয়বাদী, অবিশ্বাসী।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৬১, ৬২, ৬৩।

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۝ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ۝

❑ তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পর যে কেহ এই বিষয়ে তোমার সহিত তর্ক করে তাহাকে বল, 'আইস আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজদিগকে ও তোমাদের নিজদিগকে; অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং রাখি মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহের অভিশাপ।'

❑ নিশ্চয়ই ইহা সত্য কাহিনী। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য ইলাহ্ নাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়।

❑ যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

আল্লাহ্‌তায়ালা এখানে রসুল পাক স. কে খৃষ্টানদের সঙ্গে মোবাহিলা করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। মোবাহিলা অর্থ পরস্পর পরস্পরকে অভিসম্পাত প্রদান। দুই পক্ষই আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট এই মর্মে প্রার্থনা করবে, মিথ্যাবাদীদের এবং তার আপনজনদের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার অভিশাপ বর্ষিত হোক। আল্লাহতায়ালার নির্দেশক্রমে রসুল স. মোবাহিলা করতে প্রস্তুত হলেন। মুসলিম এবং তিরমিজি হজরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাসের এর মাধ্যমে লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. হজরত আলী, হজরত ফাতেমা, হজরত হাসান এবং হজরত হোসেন কে ডাকলেন। বললেন, হে আমার আল্লাহ্! এরাই আমার আহলে বাইত (আপনজন)।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, রসুল পাক স. নাজরানের খৃষ্টানদের সামনে এই আয়াত পাঠ করলেন, এবং তাদেরকে মোবাহিলা করতে আহ্বান জানালেন। তারা বললো, আমরা পরামর্শ করে আগামীকাল আমাদের সিদ্ধান্ত জানাবো। তাদের মধ্যে আকিব ছিলো সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী। খৃষ্টানেরা তাকে প্রশ্ন করলো, হে আবদুল মসীহ্! আপনি কী বলেন? আকিব বললো, ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা ভালো করে ভেবে দেখো। মোহাম্মদ কিন্তু সত্য নবী। আল্লাহ্র কসম! নবীর সাথে মোবাহিলা করে কেউ জীবিত থাকতে পারেনা। তোমরা এরকম করলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমরা বরং মোহাম্মদের সঙ্গে সন্ধি করে দেশে ফিরে যাও। একথায় সবাই একমত হলো। পরদিন সকালে তারা যখন রসুল স. এর সকাশে হাজির হলো, তখন তাঁর স. কোলে ছিলেন হজরত হোসেন। হাত ধরে ছিলেন হজরত হাসান। পিছনে ছিলেন হজরত ফাতেমা এবং হজরত ফাতেমার পিছনে ছিলেন হজরত আলী। রসুল স. তাঁদেরকে বললেন, যখন আমি দোয়া করবো, তখন তোমরা বলবে আমিন। এই অবস্থা দেখে নাজরানের পাদ্রী বলতে লাগলো, হে খৃষ্টানেরা! আমি তো স্পষ্ট দেখছি, তিনি দোয়া করলে আল্লাহ্তায়ালা পাহাড়কেও স্থানচ্যুত করে দেবেন। কাজেই তোমরা মোবাহিলা কোর না। করলে সবাই মরে যাবে এবং রোজ কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আর কোনো খৃষ্টান অবশিষ্ট থাকবেনা। প্রতিনিধিরা বললো, হে আবুল কাসেম! আমরা আপনার সাথে মোবাহিলা করতে চাইনা। আপনি আপনার মতো থাকুন। আমরা আমাদের মতো থাকবো। রসুল স. বললেন, মোবাহিলা না করতে চাইলে মুসলমান হয়ে যাও। মুসলমানদের মতো তোমরাও সমঅধিকারসম্পন্ন হবে। তারা মুসলমান হতে অস্বীকার করলো। রসুল স. বললেন, এবার তোমাদের ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধ হবে। তারা বললো, আরবদের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি আমাদের নেই। আমরা এই শর্তে সন্ধি করছি, আপনি আমাদের উপর সেনা আক্রমণ চালাবেন না, আমাদেরকে সন্ত্রস্ত করবেন না এবং আমাদেরকে ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করবেন না। আমরা আপনাকে প্রতি বছর দুই হাজার জোড়া কাপড় দেবো। এক হাজার সফর মাসে এবং বাকি এক হাজার রজব মাসে। শর্ত অনুযায়ী তাদের সাথে সন্ধি করলেন রসুল স.। তিনি স. বলেছেন, আমার জীবনাধিপতি যিনি, তাঁর কসম দিয়ে বলছি, নাজরানবাসীদের মাথার উপর আযাব এসে গিয়েছিলো। তারা মোবাহিলা করলে বানর ও শুকর হয়ে যেতো এবং সমস্ত উপত্যকা অগ্নিময় হয়ে বর্ষিত হতো তাদের উপর। নাজরানের সমস্ত অধিবাসী এমন কি সেখানকার পক্ষীকুলও ধ্বংস হয়ে যেতো এবং বৎসর অতিবাহিত হওয়ার আগেই সমস্ত খৃষ্টান সম্প্রদায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। আবু নাঈম তাঁর দালায়েল নামক পুস্তকে হজরত ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। এই আয়াত থেকে রাফেজী সম্প্রদায় হজরত আলী রা. কে প্রথম খলিফা হিসেবে

www.eelm.weebly.com

প্রমাণ করে এবং অন্য তিন খলিফার খেলাফতকে বাতিল হিসেবে গণ্য করে। তাদের বক্তব্য, আয়াতে পুত্রগণ বলতে হজরত হাসান এবং হজরত হোসাইনকে, নারী বলতে হজরত ফাতেমাকে এবং নিজদিগকে (আনফুসানা) বলতে হজরত আলী রা. কে বোঝানো হয়েছে। অর্থ দাঁড়ায়, হজরত আলী মোহাম্মদ স. এর সমকক্ষ। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'নবী মুমিনদের সঙ্গে তাদের আত্মার চেয়েও অধিক সম্পর্ক রাখেন।' হজরত আলী এরকমই ছিলেন। কাজেই তিনি রসুল পাক স. এর পরে প্রথম ইমাম হওয়ার যোগ্য।

রাফেজীদের এই মত ভুল। কারণ, ১. রসুল স. এর সত্তা হজরত আলীর সত্তা থেকে অবশ্যই পৃথক। ২. পুত্রগণ শব্দটির মধ্যে হজরত আলী অন্তর্ভূত; কেননা জামাতা পুত্রেরই মতো। ৩. বংশগত আত্মীয় হলেই মর্যাদা সমান হবে, এমন বাধ্যকতা নেই ৪. রেসালতের সম্মাননায় হজরত আলীর প্রবেশাধিকার নেই। তিনি ইমাম হলেও রসুল নন। তাই সমকক্ষতার ধারণা আসতেই পারেনা ৫. এই আয়াত হজরত আলীর প্রথম খলিফা হওয়ার প্রমাণ হলে, রসুল পাক স. এর জীবদ্দশাতেই একথা সর্বজনবিদিত হতো। কিন্তু এরকম কোনো প্রমাণ নেই। অবশ্য এই ঘটনা থেকে এতোটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, হজরত আলী রসুল পাক স. এর প্রিয়জন।

আল্লাহ্তায়ালার ঘোষণা, হজরত ঈসার কাহিনীটি নিশ্চিত সত্য। আর তিনি ব্যতীত যেহেতু কোনো উপাস্য নেই, তাই হজরত ঈসাকে তাঁর পুত্র মনে করা স্পষ্ট অংশীবাদিতা। আল্লাহ্তায়ালার প্রতাপ, প্রজ্ঞা সমকক্ষতাবিহীন। সুতরাং কার সাধ্য তাঁর প্রতিপালকত্বের অংশী হয়। এরপরও যারা তৌহিদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়, স্পষ্ট প্রমাণ অস্বীকার করে এবং বিশ্বাসের বাগানকে করে বিপর্যস্ত — তাদেরকে আল্লাহ্তায়ালা ভালো করেই জানেন। তারা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য।

মুফাসসিরগণ লিখেছেন, নাজরানের প্রতিনিধি দল মদীনায় এলে ইহুদীদের সাথে তাদের সাক্ষাত হলো। বিতর্কে প্রবৃত্ত হলো তারা। খৃষ্টানেরা বললো, ইব্রাহিম ছিলেন নাসারা। কাজেই আমরা তাঁর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখি। তাঁরই দ্বীনের অনুসরণ করি আমরা। ইহুদীরা বললো, ইব্রাহিম ইহুদী ছিলেন। আমরা তাঁর নিকটতম এবং তাঁর ধর্মমতের অনুসারী। রসুল পাক স. এই বিতর্কের মাঝখানে পড়ে বললেন, তোমরা দু'দলই নবী ইব্রাহিমের ধর্মমত থেকে বিচ্যুত। তিনি সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য হয়ে গিয়েছেলেন। আমিই তাঁর ধর্মমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই তোমরা সবাই ইব্রাহিমের দ্বীনের অর্থাৎ ইসলামের অনুসারী হও। ইহুদীরা বললো, খৃষ্টানেরা যেমন হজরত ঈসাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, আপনি তো চাইছেন, আমরাও আপনার সেইরূপ উপাসনা করি। খৃষ্টানেরা বললো, আপনি কি চান ইহুদীরা হজরত উযায়েরকে যেরূপ মনে করে আমরাও আপনাকে সেরূপ মনে করি? এই বাদানুবাদের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

❑ তুমি বল, 'হে কিতাবীগণ! আইস সে কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করি না, কোন কিছুকেই তাঁহার শরীক করি না এবং আমাদের কেহ আল্লাহ্ ব্যতীত কাহাকেও প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করে না।' যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে বল, 'আমরা আত্মসমর্পণকারী, তোমরা সাক্ষী থাক।'

তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের মূল কথা একই। আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত না করা, কোনোকিছুকে তাঁর সাথে শরীক না করা এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে প্রতিপালক সাব্যস্ত না করা — সকল আসমানী কিতাবের মূল নির্দেশ এরকমই। ইহুদী এবং নাসারারা এই নির্দেশচ্যুত। আল্লাহ্তায়ালা এখানে তাঁর প্রিয় রসুল মোহাম্মদ স. কে এই মূল নির্দেশের প্রতি আহবান জানাতে বলেছেন।

হজরত আদী বিন হাতেম বর্ণনা করেছেন, যখন এই আয়াত নাজিল হলো — 'তারা আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে তাদের আলেম ও ধর্ম যাজকদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে,' তখন আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল ! আমরা তো আলেম ও মাশায়েখদের পুজা করিনা। তিনি স. বললেন, তারা কি হালালকে হারাম সাব্যস্ত করেনি। আর তোমরা কি তাদের অভিমত অনুযায়ী আমল করনি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারাতো গায়রুল্লাহ্কে প্রতিপালক বানিয়েছে। তিরমিজি এই বর্ণনাটিকে হাসান বলেছেন।

রসুলের আনুগত্যই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র আনুগত্য। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'যে রসুলের অনুসরণ করলো নিশ্চয় সে আল্লাহ্তায়ালারই অনুসরণ করলো।' ওলামা, আউলিয়া এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহের হুকুম শরিয়ত সম্মত হলে তাও আল্লাহ্তায়ালার অনুসরণ বলে গণ্য হবে। আল্লাহ্তায়ালার এরশাদ এরকম, 'তোমরা আল্লাহ্কে মানো, তাঁর রসুলকে মানো এবং তোমাদের নেতাদেরকেও মানো।' হজরত আলী রা. বলেছেন, যারা আল্লাহ্তায়ালার অবাধ্য, তাদের অনুসরণ বৈধ নয়। কেবল সৎকাজেই অনুসরণ জরুরী। বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইমরান বিন হাসিন এবং হজরত হাকিম বিন আমরে গিফারী বর্ণনা করেছেন, স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির অনুসরণ নাজায়েয।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে। কোনো মারফু হাদিস সহীহ্ প্রমাণিত হলে, দেখতে হবে — এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কোনো হাদিস রয়েছে কি না। অথবা এই মারফু বর্ণনাটি অন্য কোনো হাদিস দ্বারা রহিত হয়েছে কি না। যদি দ্বিতীয় হাদিস না থাকে অথবা বর্ণনাটি রহিত বলে প্রমাণিত না হয় — এমতাবস্থায় যদি ইমাম আবু হানিফার অভিমত হাদিসটির প্রতিকূল হয়, তবে তাঁর অভিমত পরিত্যাগ করে সহীহ্ হাদিসটি গ্রহণ করতে হবে। এ অবস্থায় কেউ ইমামে আজমের অভিমত আঁকড়ে ধরে থাকলে তা হবে গায়রুল্লাহ্‌কে মেনে নেয়ার মতো। বায়হাকী তাঁর মাদখাল গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদে আবদুল্লাহ বিন মোবারকের একটি উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্তিটি এই, আমি ইমাম আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি, যদি কোনো বর্ণনা রসুল পাক স. এর সঙ্গে মিলে যায়, তবে আমরা তা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবো। সাহাবীর সঙ্গে মিলে গেলে তবে আমরা তাঁদের জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেবো। আর তাবেয়ীর সঙ্গে মিলে গেলে আমরা তার সমান্তরালে দাঁড়াবো। বায়হাকী লিখেছেন, ইমামে আজম বলেছেন, রসুল স. এবং সাহাবীদের বাণীর অনুকূল না হলে আমার কথাকে অগ্রাহ্য করো। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, সহীহ্ প্রমাণিত হাদিসই আমার মাজহাব।

আমরা বলি, আমল করার জন্য চার ইমামের যে কোনো একজনের অভিমতের সমর্থন থাকা জরুরী। অন্যথায় ঐকমত্যের (এজমার) বিরুদ্ধাচারণ অবশ্যম্ভাবী হবে। কেননা, তৃতীয় অথবা চতুর্থ যুগের পরে শাখাগত মাসআলায় আহলে সুন্নতের চারিটি মাজহাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পঞ্চম কোনো মাজহাব নেই। অতঃপর ঐকমত্য এই যে, যা চার ইমামের বিরূদ্ধে তা বাতিল। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর একমত হবে না। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন, 'এবং যে মুসলমানদের পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন করবে, তাকে আমি যা খুশী তাই করতে দেবো এবং অবশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।'

প্রশ্ন উঠতে পারে, এমনও তো হতে পারে যে, কোনো হাদিস চার ইমামের কেউই জানাতে পারেন নি এবং তাঁরা সম্মিলিতভাবে হাদিসের বিরুদ্ধে একমত হয়েছেন তখন কি হবে? এর উত্তর হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে এই হাদিসটি অবশ্যই অন্য কোনো সহীহ্ হাদিস দ্বারা মনসুখ হয়ে গিয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ শরিয়তের কোনো আলেম কোনো মাসআলাকে জায়েয অথবা নাজায়েয বললে, তার বিরুদ্ধাচরণ করা ঠিক নয়। সুফী মাশায়েখগণ এই নিয়ম মেনে চলেন। প্রকৃতপক্ষে সুফীয়ায়ে কেরাম শরিয়ত বিগর্হিত কোনো কাজ করেন

www.eelm.weebly.com

না। তাদের পরিচয়ে একদল মূর্খই শরিয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়। এই সমস্ত মূর্খের দ্বারা মাজারে সেজদা করা, তাওয়াফ করা, বাতি জ্বালানো, মাজারের উপরে মসজিদ তৈরী করা, ওরশের নামে মাজারে ঈদের মতো মেলা করা ইত্যাকার নাজায়েয কাজ সংঘটিত হয়।

হজরত আয়েশা রা. এবং হজরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, রসুল স. মৃত্যুশয্যায় একবার কম্বল দিয়ে তাঁর পবিত্র চেহারা ঢেকে নিলেন এবং শ্বাসকষ্টের কারণে পুনরায় মুখমণ্ডল অনাবৃত করে বললেন, ইহুদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহতায়ালার অভিসম্পাত, তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সেজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে। হজরত আয়েশা বলেছেন, এই কথার মাধ্যমে তিনি স. ইহুদী ও খৃষ্টানদের এ রকম কাজ থেকে মুসলমানদেরকে বিরত থাকতে বলেছেন। বোখারী, মুসলিম।

উসামা বিন জায়েদ রা. থেকে এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, এবং তায়ালসি। হাকেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদিস বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। বলেছেন, কবর জিয়ারতকারিণীদের উপর এবং কবরকে যারা সেজদার স্থান বানায় এবং যারা কবরে চেরাগ জ্বালায় তাদের উপর আল্লাহর লানত। মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন, হজরত জুন্দুব বিন আবদুল মালেক রা. এর উক্তি, ওফাতের পাঁচ রাত পূর্বে আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, সাবধান! কবরকে সেজদার স্থান বানিওনা। আমি তোমাদেরকে এ রকম করতে কঠোরভাবে নিষেধ করছি।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, যারা তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের মূল শিক্ষা থেকে বিমুখ হয়, তাদেরকে হে নবী, আপনি জানিয়ে দিন আমরা আসমানী কিতাবসমূহের মূল নির্দেশ মান্য করি; কিন্তু তোমরা মানো না।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আবু সুফিয়ান বিন হরব আমাকে জানিয়েছেন, হারকেল আমাকে (আবু সুফিয়ানকে) এবং কোরাইশদের এক দলকে ডাকলেন। তখন রসুল স. এর সঙ্গে আমাদের সন্ধি বলবৎ ছিলো। আমরা তাই শামদেশে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করে যাচ্ছিলাম। স্থানটির নাম ছিলো ঈলিয়া। সেখানেই হারকেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম আমরা। তখন তার দরবারে উপস্থিত ছিলো রোমের সর্দারগণ। হজরত দাহিয়া রা. এর মাধ্যমে রসুল স. যে চিঠিটি বসরার গভর্নরের নিকট পাঠিয়েছিলেন, হারকেল সেই চিঠিটি চেয়ে নিলেন। চিঠিটি ছিলো নিম্নরূপ।

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর রসুল মোহাম্মদের নিকট থেকে রোমের প্রশাসক হারকেলের প্রতি। যে হেদায়েতের পথে চলে তার উপর শান্তি বর্ষিত

www.eelm.weebly.com

হোক। অতঃপর আমি তোমাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। মুসলমান হয়ে যাও। নিরাপত্তা লাভ করবে। আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। আর যদি অস্বীকার করো তবে প্রজাদের পাপও তোমার উপর পতিত হবে। হে আহলে কিতাব! সেই বাক্যের দিকে আগমন করো, যার মধ্যে তোমরা ও আমরা সমান। বাক্যটি এই, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না, কাউকে তাঁর সাথে শরীক করি না। এবং আল্লাহতায়ালার অনুমোদন ব্যতিরেকে কারো অনুসরণ করি না। এরপরও যদি তারা অমান্য করে তবে মুসলমানগণ তোমরা বলে দাও যে, 'হে আহলে কিতাবগণ, আমরা মান্য করি, আল্লাহতায়ালার আনুগত্য স্বীকার করি।' বোখারী, মুসলিম।

জ্ঞাতব্য ঃ রসুল পাক স. এই আয়াত নাজরান প্রতিনিধিদেরকে পড়ে শোনালেন। হারকেলের নিকটও লিখে পাঠালেন। সবাই সমর্থন করলো, অস্বীকার করলো না। কিন্তু প্রতিনিধিদল যাবার সময় এ রকম বলতে বলতে গেলো যে, একথা আমাদের কিতাবে নেই। এই আয়াতটি রসুলে পাক স. এর নবুয়তের অকাট্য প্রমাণ।

হজরত ঈসা এবং হজরত উযায়ের আল্লাহর পুত্র — এরকম কথা কোনো আসমানী কিতাবে নেই। তাই খৃষ্টানেরা কিতাব থেকে উদ্ধৃতি না দিয়ে মনগড়া প্রশ্ন করেছিলো, আপনি কি কোনো মানুষকে পিতা ব্যতীত জন্মলাভ করতে দেখেছেন?

বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহতায়ালা কতই না সুন্দররূপে হজরত ঈসার অবস্থা বর্ণনা করেছেন, হজরত আদমের প্রসঙ্গ টেনে সকল সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছেন। তবুও যখন তারা অবিশ্বাসে অটল রইলো, তখন জানালেন মোবাহিলার আহবান। এই আহবানেও যখন তারা সাড়া দিলো না, তখন উত্থাপন করলেন এই কথা — তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের মূল শিক্ষার দিকে এসো। তবু তারা নিঃসাড় রইলো। তাই পরিসমাপ্তি টানা হলো এইভাবে, তবে তোমরা সাক্ষী থাকো নিশ্চয়ই আমরা মুসলমান।

ইবনে ইসহাক তাঁর আপন সনদে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, নাজরানের খৃষ্টানেরা যখন বললো, হজরত ইব্রাহিম নাসারা ছিলেন। এবং ইহুদীরা বললো, তিনি ইহুদী ছিলেন। তখন রসুলে পাক স. এর প্রতি আল্লাহতায়ালা অবতীর্ণ করলেন নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

❒ হে কিতাবীগণ! ইব্রাহীম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, যখন তওরাত ও ইঞ্জিল তাহার পরে অবতীর্ণ হইয়াছিল? তোমরা কি বুঝনা?

❒ দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান আছে তোমরাই সে বিষয়ে তর্ক করিয়াছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই সে বিষয়ে কেন তর্ক করিতেছ? আল্লাহ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নহ।

❒ ইব্রাহীম ইহুদীও ছিল না, খৃষ্টানও ছিলো না; সে ছিলো একনিষ্ঠ, আত্মসমর্পণকারী এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

তওরাত ও ইঞ্জিল নাজিল হয়েছে হজরত ইব্রাহিমের অনেক পরে। হজরত ইব্রাহিমের এক হাজার বছর পরে হজরত মুসা নিয়ে এসেছিলেন তওরাত। তওরাতের ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয়েছিলো ইহুদী ধর্মমত। আর হজরত মুসার দুই হাজার বছর পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন হজরত ঈসা। তিনি ছিলেন বনি ইসরাইলের শেষ নবী। তাঁর উপরে অবতীর্ণ হয়েছিলো ইঞ্জিল। নাসারা বা খৃষ্টান ধর্মমত সৃষ্টি হয়েছে ইঞ্জিলকে কেন্দ্র করে। আল্লাহতায়ালা তাই বলছেন, যিনি তোমাদের ধর্মমত সৃষ্টির বহু পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁকে তোমরা কিভাবে তোমাদের ধর্মমতভূত মনে করো? তোমাদের কি এতোটুকু জ্ঞানও নেই? আল্লাহ তায়ালার নিয়ম এই যে, পরবর্তী শরিয়ত দ্বারা পূর্ববর্তী শরিয়তের শাখাগত অনেক নিয়ম রহিত হয়। আবার অনেক নিয়ম পূর্বাপর একই থাকে। যেমন, গায়রুল্লাহর ইবাদত, মিথ্যা ও জুলুম হারাম হওয়া, তওবার আহ্বান ইত্যাদি হুকুম সকল শরিয়তেই এক। সুতরাং এসব ব্যাপারে তওরাত ও ইঞ্জিলে উল্লেখিত নিয়মের সঙ্গে হজরত ইব্রাহিমের মতাদর্শের মিল থাকলেও তাঁকে ইহুদী বা নাসারা হিসাবে কিছুতেই চিহ্নিত করা যায় না।

তাফসীরে মাযহারী/২২০

www.eelm.weebly.com

আল্লাহতায়ালা জানাচ্ছেন, তোমাদের বিতর্ক অনর্থক। না জেনে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া অসমীচীন। তওরাত ও ইঞ্জিলে মোহাম্মদ স. এর গুণাবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে। একথাও লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, মোহাম্মদ স. এর শরিয়ত দ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত শরিয়ত রহিত করে দেয়া হবে। তোমরা কি তা জানো না? নাকি জেনেও গোপন করছো? কিন্তু আল্লাহতায়ালা প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করে তোমাদেরকে অপদস্থ করে দিচ্ছেন। অতএব, হে মূর্খের দল তোমরা কি তর্ক পরিত্যাগ করবে? ইহুদী কিংবা খৃষ্টান বিশ্বাস কেবল নয়, হজরত ইব্রাহিম ছিলেন সমস্ত বিকৃত বিশ্বাসের অস্বীকারকারী। প্রবৃত্তিবিরোধী, আল্লাহতায়ালার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী, ধর্মনিষ্ঠ। কিছুতেই তিনি অংশবাদীতার বৃত্তভূত নন। আর তোমরা আল্লাহতায়ালার নির্দেশ অমান্যকারী, নবী রসুলদের আদর্শচ্যুত। আল্লাহতায়ালা অংশীবাদীতাকে হারাম করেছেন। অথচ তোমরা একের মধ্যে তিন — এরকম কথা বলে, উযায়ের আ. ও ঈসা আ. কে আল্লাহর পুত্র বলে সুস্পষ্ট শিরিকে লিপ্ত আছো। তাই শিরিকের মূলোৎপাটনকারী নবী ইব্রাহিমের অনুসরণের দাবী তোমরা কিছুতেই করতে পারো না।

সুরা আল ইমরান আয়াত ৬৮

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرٰهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ○

❒ যাহারা ইব্রাহিমের অনুসরণ করিয়াছিল তাহারা এবং এই নবী ও বিশ্বাসীগণ মানুষের মধ্যে ইব্রাহিমের ঘনিষ্টতম। আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক।

হজরত ইব্রাহিমের জীবদ্দশায় যাঁরা তাঁর অনুসারী হয়েছিলেন এবং রসুল মোহাম্মদ স. এর অনুসরণকারী মুমিনগণই হজরত ইব্রাহিমের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। এরা সকলে আল্লাহতায়ালার এককত্বে বিশ্বাসী। এরা কোরবানী করেন, খতনা করেন, কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়েন এবং হজ ও ওমরাহ প্রতিপালন করেন।

আল্লাহতায়ালা ইমানদারদের বন্ধু, অভিভাবক। ইমানদারগণ প্রথম নবী থেকে শুরু করে সকল নবীকে মান্য করেন। ইহুদী এবং খৃষ্টানেরা এ রকম নয়। বাগবী, কালাবীর বর্ণনাসূত্রে এবং মোহাম্মদ বিন ইসহাক জুহুরীর বর্ণনাসূত্রে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এরকমভাবে, হজরত জাফর বিন আবু তালেব কিছু সংখ্যক সাহাবীকে নিয়ে মক্কা থেকে হাবশায় চলে গেলেন। পরে রসুল স.ও মদীনায় হিজরত করলেন। বদর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। ওই যুদ্ধে নিহত হলো

www.eelm.weebly.com

কোরাইশদের শ্রেষ্ঠ নেতারা। বন্দী হলো অনেকে। কোরাইশগণ পরামর্শ করলো, কিভাবে এর বদলা নেয়া যায়। তারা ঠিক করলো, হাবশার অধিপতি নাজ্জাশীর দরবারে উপঢৌকনসহ একটি প্রতিনিধিদল পাঠাতে হবে এবং তার কাছে ফেরত চাইতে হবে জাফর বিন আবু তালেব ও অন্যান্য হিজরতকারী সাহাবীদেরকে। সম্ভবত নাজ্জাশী তাদেরকে ফেরত দিবেন। তখন তাদেরকে হত্যা করে এর বদলা নিতে হবে। তাদের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমর বিন আস এবং আম্মার বিন আবু মুইতকে তায়েফের কিছু উৎকৃষ্ট চামড়া এবং অন্যান্য সামগ্রীসহ নাজ্জাশীর দরবারে পাঠানো হলো। তারা হাবশায় পৌঁছলো সমুদ্রপথে। নাজ্জাশীর দরবারে পৌঁছে তাকে সেজদা করলো এবং শান্তি প্রার্থনা করে নিবেদন করলো, আমাদের সম্প্রদায় আপনার কুশল কামনা করে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদেরকে আপনার খেদমতে এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যে, আমাদের ধর্মমত ত্যাগকারী কিছু লোক আপনার এখানে পালিয়ে এসেছে — তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। তারা রসুলের দাবী উত্থাপনকারী এক মিথ্যাবাদীর অনুসারী। একদল অজ্ঞ লোক রয়েছে সেই তথাকথিত রসুলের সঙ্গে। আমরা তাদেরকে এক পাহাড়ের উপত্যকায় আটকে রেখেছি। সেখান থেকে তারা বাইরে আসতে পারে না। বাইরে থেকেও কেউ তাদের কাছে যায় না। ক্ষুৎপিপাসায় জর্জরিত তারা। উপায়ান্তর না দেখে সেই রসুল তাঁর আপন চাচাতো ভাইকে একটি ক্ষুদ্র দলসহ আপনার দেশে পাঠিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য — তারা আপনার ধর্মমতকে বিপর্যস্ত করবে, আপনার সাম্রাজ্যে আনবে বিশৃংখলা এবং ধ্বংস করবে আপনার প্রজাদেরকে। পূর্বাহ্নে সতর্ক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আপনি বরং তাদেরকে আমাদের হাতে সমর্পণ করুন। আমরা তাদেরকে নিয়ে যাই। আপনিও নিরাপদ হোন। আপনি তাদেরকে তলব করুন। তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে আমরা যা বলেছি তা সত্য। দেখবেন, তারা আপনাকে সেজদা করবে না। তাদের উদ্দেশ্য মহৎ হলে অবশ্যই তারা সেজদাবনত হয়ে সম্রাটের সম্মান রক্ষা করবে।

নাজ্জাশী, আবু জাফর ও তাঁর সঙ্গীদেরকে তলব করলেন। শাহী দরবারের সন্নিকটে পৌঁছতেই আবু জাফর রা. উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, আল্লাহর দল উপস্থিত। তারা প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায়। নাজ্জাশীর কানে পৌঁছলো এই আওয়াজ। তিনি হুকুম দিলেন, তাদেরকে বলো তাঁরা যেনো পুনরায় তাঁদের পরিচয় উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন। হজরত জাফর তাই করলেন। নাজ্জাশী বললেন, জী হ্যাঁ। আল্লাহর জিম্মাদারীর সঙ্গে প্রবেশ করুন। হজরত জাফর ও নাজ্জাশীর এই কথপোকথন শুনে খুব দুঃখিত হলো আমর বিন আস ও আম্মার। হজরত জাফর ও তাঁর সঙ্গীগণ দরবারে প্রবেশ করলেন, কিন্তু সম্রাটকে সেজদা করলেন না। আমার বিন আস বললো, দেখুন তারা কেমন অহংকারী। নাজ্জাশী বললেন, আপনারা

www.eelm.weebly.com

সেজদা করলেন না কেনো? সকলেই তো শাহী সম্মান রক্ষা করে। হজরত জাফর বললেন, আমরা কেবল আল্লাহকেই সেজদা করি। যিনি আপনাকে ও অন্যান্য সম্রাটকে সৃষ্টি করেছেন। এই নিয়ম আমরা প্রতিপালন করতাম তখন, যখন মূর্তিপূজায় আবদ্ধ ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদের মধ্যে একজন সত্য নবী প্রেরণ করেছেন। আমরা তার অনুসারী হয়েছি। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করতে নিষেধ করেছেন। সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের সম্মান রক্ষা করাকে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। বেহেশতবাসীরা এরকম সালাম বিনিময় করবে। নাজ্জাশী তওরাত ও ইঞ্জিলের মূল নীতি জানতেন। তিনি বুঝলেন, এঁদের কথাই সত্য। বললেন, চিৎকার করে দরবারে প্রবেশের অনুমতি চেয়েছিলেন কে? হজরত জাফর বললেন, আমি। একথা নিশ্চিত যে, আপনি পৃথিবীর সম্রাটদের মধ্যে একজন সম্রাট। আমি চাই, আপনি দুই দলের সঙ্গে একেক করে কথা বলুন। আমর, হজরত আবু জাফরকে বললেন, তুমি আগে বলো। হজরত আবু জাফর বললেন, ওদেরকে জিজ্ঞেস করুন আমরা কি গোলাম ছিলাম না স্বাধীন। আমর বললো, না তোমরা স্বাধীন এবং সম্মানী। নাজ্জাশী বললেন, গোলাম হওয়ার অপবাদ থেকে আপনারা মুক্ত। আবু জাফর বললেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমরা কি কোনো অন্যায় হত্যাকান্ড সংঘটিত করেছি? যার কারণে আমাদের প্রতি প্রতিশোধ নেয়া যায়। আমর বললো, না তোমরাতো কাউকে হত্যা করনি। আবু জাফর বললেন, আমরা কি অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ অপহরণ করে এনেছি? নাজ্জাশী বললেন, তোমরা কারো সম্পদ নিয়ে এলে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমি নিলাম। আমর বললো, এ রকম ঘটনা আদৌ ঘটেনি। নাজ্জাশী বললেন, তবে তোমরা কী চাও? আমর বললো, আমরা সকলে এক ধর্মের অনুসারী ছিলাম। কিন্তু এরা আমাদের ধর্মমত পরিত্যাগ করেছে। এ জন্যে আমাদের সম্প্রদায় এদেরকে ধরে নিয়ে যেতে এখানে পাঠিয়েছে। নাজ্জাশী বললেন, তোমাদের নতুন ধর্মমতের পরিচয় দাও। আবু জাফর বললেন, আগে শয়তানের ধর্ম পালন করতাম আমরা। আল্লাহ্কে অস্বীকার করতাম। পাথরের পূজা করতাম। এখন আমরা গ্রহণ করেছি দ্বীন-ই-ইসলাম। এই ধর্ম নিয়ে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন একজন রসুল। তিনি কিতাব নিয়ে এসেছেন। যেমন কিতাব নিয়ে এসেছিলেন হজরত ঈসা ইবনে মরিয়ম। নাজ্জাশী বললেন, তোমরা মহৎ কথা বলেছো। অত্যন্ত কোমল পথে চলেছো। নাজ্জাশী নহবত বাজাতে বললেন। নহবতের আওয়াজ শুনে দরবারে উপস্থিত হলো নাসারা আলেম ও মাশায়েখগণ। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে নাজ্জাশী বললেন, যিনি ঈসা আ. এর উপর ইঞ্জিল শরীফ নাজিল করেছিলেন, সেই আল্লাহর কসম দিয়ে আমি তোমাদেরকে বলছি, বলো, হজরত ঈসা ও কিয়ামতের মধ্যবর্তীতে কোনো নবী

www.eelm.weebly.com

আবির্ভূত হবেন কি? ওলামাগণ বললেন, নিশ্চয়। হজরত ঈসা তাঁর সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনো। যে তাঁর প্রতি ইমান আনবে সে আমার উপরও ইমান আনবে। যে তাঁকে অস্বীকার করবে সে আমাকেও অস্বীকার করবে।

নাজ্জাশী, আবু জাফরকে বললেন, তিনি তোমাদেরকে কী বলেন? তাঁর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জানাও। আবু জাফর বললেন, তিনি আমাদেরকে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে শোনান। ভালো কাজ করতে বলেন, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করেন। প্রতিবেশীদের প্রতি উত্তম আচরণ করতে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং এতিমদের সহায়তা করতে নির্দেশ দেন। আরো বলেন, আমরা যেনো কেবল আল্লাহরই ইবাদত করি — তাঁর সঙ্গে যেনো শরীক না করি। নাজ্জাশী বললেন, তিনি যা তোমাদেরকে পাঠ করে শুনিয়েছেন, তা থেকে আমাকে কিছু শোনাও। হজরত আবু জাফর সুরা আনকাবুত ও সুরা রুম থেকে পাঠ করলেন। কোরআনের মর্মস্পর্শী আবৃত্তি শুনে নাজ্জাশী ও তার সহচরদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হলো। নাজ্জাশীর সঙ্গীরা বললেন, আরো কিছু শোনাও। হজরত আবু জাফর সুরা কাহাফ পাঠ করলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে আমর বিন আস বললো, তারা হজরত ঈসা ও তাঁর মাকে গালি দেয়। নাজ্জাশী বললেন, হজরত ঈসা ও তাঁর মা সম্পর্কে তোমরা কী বলো? আবু জাফর সুরা মরিয়ম পাঠ করে শোনালেন। নাজ্জাশী একটি মেসওয়াকের এক ক্ষীণ অংশ ছিঁড়ে নিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! এই বর্ণনায় যা রয়েছে, তা থেকে হজরত ঈসা এই ক্ষীণ তন্তুটি অপেক্ষা এতোটুকু বেশী ছিলেন না। অতঃপর হজরত জাফর ও তাঁর সাথীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, যাও তোমরা আমার রাজ্যে নিরাপদ। যারা তোমাদেরকে মন্দ বলবে অথবা কষ্ট দেবে, আমি তাদেরকে বিতাড়িত করবো। নির্ভয়ে ও সন্তুষ্টচিত্তে বসবাস করতে থাকো তোমরা। আমি নিশ্চিত হলাম, হজরত ইব্রাহিমের দল এখনো অবিকৃত। আমর জিজ্ঞেস করলো, সম্রাট, ইব্রাহিমের দল কোনটি? নাজ্জাশী বললেন, এই দল। মুশরিকেরা এ কথা মানে না, অথচ হজরত ইব্রাহিমের অনুসারী হওয়ার দাবী করে। অতঃপর নাজ্জাশী উপঢৌকনের সামগ্রীসমূহ ফেরত দিয়ে বললেন, তোমাদের এই হাদিয়া সুদতুল্য। এ সমস্ত তোমাদের কাছেই থাক। আল্লাহ আমাকে সুদ ছাড়াই সাম্রাজ্য দান করেছেন। আবু জাফর বর্ণনা করেছেন, আমরা ফিরে এলাম এবং উত্তম স্থানে সম্মান ও আন্তরিক আতিথেয়তার সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করলাম। ওদিকে মদীনায় রসুল পাক স. এর উপর অবতীর্ণ হলো হজরত ইব্রাহিমের দ্বীনের অনুসারী হওয়ার দাবী সম্পর্কিত এই আয়াতগুলো।

হজরত মুআজ বিন জাবাল, হজরত হোজায়ফা বিন ইয়ামান ও হজরত আম্মার বিন ইয়াসিরকে ইহুদীরা তাদের ধর্ম গ্রহন করতে আহবান জানালো, তখন নিম্নের আয়াত নাজিল হয়।

www.eelm.weebly.com

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

❒ কিতাবীদের এক দল তোমাদিগকে বিপথগামী করিতে চাহিয়াছিল; অথচ তাহারা তাহাদের নিজদিগকেই বিপথগামী করে, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না।

❒ হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন আল্লাহের নিদর্শনকে অস্বীকার কর, যখন তোমরাই সাক্ষ্য বহন কর?

❒ হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন কর, যখন তোমরা জান?

মুসলমানদেরকে আল্লাহতায়ালাই হেফাজত করেন। বিধর্মীরা তাদেরকে বিপথগামী করতে চাইলে তাদের প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া গিয়ে পড়ে তাদের উপরেই। তবু তারা তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। কতোই না অবুঝ তারা। তওরাত ও ইঞ্জিলে মোহাম্মদ স. এর নবুয়ত ও বৈশিষ্ট্যাবলীর স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তারা তা গোপন করে চলেছে। তাই আল্লাহতায়ালার প্রশ্ন, তোমরাই যদি তওরাত ও ইঞ্জিল বহনকারী তবে সাক্ষ্য গোপন করো কেনো? সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করো কেনো? গোপনে স্বীকার করো, অথচ প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করো কেনো?

তোমাদের শাস্তি হবে দ্বিগুণ। প্রথমতঃ নিজেদের পথভ্রষ্টতার কারণে। দ্বিতীয়তঃ অন্যদেরকে পথচ্যুত করার অপচেষ্টার কারণে। গ্রন্থকার একথা বলেছেন। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, ইহুদী আবদুল্লাহ বিন জাইফ, আদী বিন জায়েদ এবং হারেস বিন আউফ পরামর্শ করে ঠিক করলো, আমাদের উচিত দিনের প্রথমাংশে মোহাম্মদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা মেনে নেয়া এবং দিনের শেষাংশে তা অস্বীকার করা। আমরা এ রকম করলে মুসলমানেরা সন্দেহে পড়ে যাবে। হতে পারে তারাও আমাদের মতোন আচরণ করবে। তখন আল্লাহতায়ালা এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।

www.eelm.weebly.com

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِىْ أُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝ وَلَا تُؤْمِنُوْا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ۖ قُلْ إِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ أَنْ يُّؤْتٰى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ أَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

❒ কিতাবীদের একদল বলিল, 'যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাহাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে দিনের প্রারম্ভে তাহাতে বিশ্বাস কর এবং উহার শেষে তাহা প্রত্যাখ্যান কর; হয়ত তাহারা ফিরিতে পারে।'

❒ 'এবং যাহারা তোমাদের দ্বীনের অনুসরণ করে তাহাদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। বল, আল্লাহের নির্দেশিত পথই পথ।' বিশ্বাস করিও না যে তোমাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে অনুরূপ আর কাহাকেও দেওয়া হইবে অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করিবে।' বল, অনুগ্রহ আল্লাহেরই হাতে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহা দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

❒ তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাহাকে ইচ্ছা বিশেষ করিয়া বাছিয়া লন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

দিনের প্রথমাংশে স্বীকৃতি এবং শেষাংশে প্রত্যাখ্যান এই নীতিতে একমত হয়েছিলো খয়বর এবং ওরায়না গ্রামের বারোজন ইহুদী আলেম। এ রকম বর্ণনা করেছেন বাগবী, হাসান বসরী থেকে। ইবনে জারীরও সুদ্দীর বর্ণনাসূত্রে এরকম বলেছেন। মুজাহিদ, মুকাতিল এবং কালাবী বলেছেন, এ আলোচনা বারোজন ইহুদীর মধ্যে হয়েছিলো। রসুল পাক স. যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ আদায় করতে শুরু করলেন, তখন ইহুদীরা খুব দুঃখিত হলো। কাব বিন আশারাফ এবং তার সঙ্গীরা বললো, তোমরাও দিনের প্রথম ভাগে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ পড়ো এবং শেষ ভাগে নামাজ পড়ো

www.eelm.weebly.com

বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেবলা করে। দোদুল্যমান চিন্তাধিকারী নামধারী মুসলমানেরা ইহুদীদের চক্রান্তে বিভ্রান্ত হলো। তখন আল্লাহতায়ালা জানালেন, হে প্রিয় নবী! আপনি কাফেরদেরকে জানিয়ে দিন, খাঁটি মুসলমানেরা যে হেদায়েত লাভ করেছে, তা আল্লাহতায়ালার দান। আল্লাহতায়ালাই এই নূরকে পূর্ণত্ব দান করবেন। এই আলো নেভাবার ক্ষমতা তাদের নেই। তাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। মুসলমানদের কোনো ক্ষতি তারা করতে পারবে না। আল্লাহর নির্দেশ অভ্রান্ত। অতএব; মুসলমানেরা যেনো এ কথা বিশ্বাস না করে যে, তারা যা লাভ করবে তা অবিশ্বাসীদেরকে দেয়া হবে। যাতে করে কাফেরেরা কিয়ামতের দিবসে আল্লাহর সম্মুখে তাদের সমর্থনে কোনো যুক্তি উত্থাপন করতে পারে। অনুগ্রহ আল্লাহতায়ালারই। যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তাঁর অনুগ্রহ দান করেন। প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ তিনিই। তিনি বিশেষভাবে তাঁর আপন রহমত প্রদানার্থে যাঁকে ইচ্ছা করেন তাঁকে নবুয়ত দান করেন। তিনি এ বিষয়ে সম্যক অবহিত যে, তাঁরা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ লাভের যোগ্য।

'তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করিবে' - একথার অর্থ হলো, কিয়ামতের দিন ইমানদারেরা তোমাদের (ইহুদীদের) উপরে জয়ী হবে। কারণ, তোমরা বিভ্রান্ত আর তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৭৫, ৭৬

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ
مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ
عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى
فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

☐ কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রহিয়াছে যে, বিপুল সম্পদ আমানত রাখিলেও ফেরৎ দিবে; আবার এমন লোকও আছে যাহার নিকট একটি দীনারও আমানত রাখিলে তাহার পিছনে লাগিয়া না থাকিলে সে ফেরৎ দিবে না, ইহা এই কারণে যে তাহারা বলে 'নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্য-বাধকতা নাই,' এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহের সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

www.eelm.weebly.com

❒ হ্যাঁ, কেহ তাহার অঙ্গীকার পূর্ণ করিলে এবং সাবধান হইয়া চলিলে আল্লাহ্ সাবধানীকে ভালবাসেন।

এখানে দুই দল আহলে কিতাবের পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। একদল ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছেন। অপর দল কাফেরই রয়ে গিয়েছে। মুসলমান আহলে কিতাবদের মধ্যে হজরত আবদুল্লাহ বিন সালামের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এই আয়াতে। ইমাম বাগবী সূত্রপরম্পরায় জোবায়ের এবং জুহাকের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তি হজরত আবদুল্লাহ বিন সালামের নিকট বারো শত উকিয়া স্বর্ণ আমানত রেখেছিলেন। যথাসময়ে তিনি তা ফেরত দিয়ে দেন। অপর দিকে কাব বিন আশরাফের মতো ইহুদীরা আমানত ফেরত দিতে অভ্যস্ত ছিলো না। নাছোড়বান্দা হয়ে জোর তাগাদা দেয়া ছাড়া অথবা মামলা রুজুর মাধ্যমে বাধ্য করা ছাড়া তারা আমানত ফেরত দিতো না। বাগবী লিখেছেন, জনৈক কোরাইশ ফাখ্খাস বিন আজরা ইহুদীর নিকট এক দিনার আমানত রেখেছিলো। কিন্তু সে তা আত্মসাৎ করে। কাফের ইহুদীরা বলতো, যারা আহলে কিতাব নয়, তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা হালাল। আল্লাহর নিকট এজন্য কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। তারা যেহেতু আমাদের ধর্মমতানুসারী নয়, তাই তাদের উপর সকল প্রকার জুলুম আমাদের জন্য বৈধ। আমাদের কিতাবে তাদের জন্য কোনো হুকুম নেই। তাদের এই মনোভাবের বিরোধিতা করে আল্লাহ্তায়ালা জানাচ্ছেন, তারা জেনে বুঝে আল্লাহ্তায়ালার উপর মিথ্যারোপ করছে। সকল আমানত সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হবে।

কাফেরদের সম্পদ রক্ষার উপায় দুইটি। হয় মুসলমান হয়ে যাবে অথবা মুসলমানদের জিম্মি হয়ে যাবে (জিজিয়া কর প্রদানের মাধ্যমে)। ইহুদীরা বুঝেছে মুসলমানদের মাল তাদের জন্য বৈধ। অথচ প্রকৃত অবস্থা এর বিপরীত। বরং তাদের সম্পদ মুসলমানদের জন্য সকল অবস্থায় বৈধ। তাদের সম্পদ সংরক্ষণের উপায় দুইটি। মুসলমান হয়ে যেতে হবে। নতুবা জিজিয়া দিতে হবে। হজরত আবু মুসা বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমাকে ওই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ বলে, সঠিকভাবে নামাজ পড়ে এবং জাকাত আদায় করে। যারা এমন করবে তারা সব দিক দিয়ে আমাদের হেফাজতে থাকবে। আর প্রকৃত হিসাব আল্লাহতায়ালার অধিকারাধীন — তারা এই স্বীকৃতি অন্তরের সঙ্গে দিচ্ছে,না প্রবঞ্চনার সঙ্গে।

সোলায়মান বিন বারীদ, হজরত বারীদ থেকে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে এই হুকুমটি, যদি তারা ইসলাম স্বীকার না করে, তবে জিজিয়া চাও। যদি দেয় তবে গ্রহণ করো, যুদ্ধ কোর না। বোখারী, মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

মুত্তাকী বা পরহেজগারগণকে আল্লাহতায়ালা ভালোবাসেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। ফরজ হুকুম সমূহ প্রতিপালন করেন এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকেন। মুনাফিকরা এর বিপরীত। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যার মধ্যে চারটি স্বভাব থাকবে, সে প্রকৃত মুনাফিক। একটি থাকলে বুঝতে হবে তার মধ্যে একটি মুনাফিকী স্বভাব রয়েছে। যতক্ষণ না সে ওই স্বভাব পরিত্যাগ করবে ততক্ষণ খাঁটি মুমিন বলে বিবেচিত হবে না। মুনাফিকদের চারটি স্বভাব হচ্ছে — ১. তার কাছে আমানত রাখা হলে খেয়ানত করবে ২. যখন সে কথা বলবে মিথ্যা বলবে ৩. অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে ৪. কারো সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করবে। বোখারী, মুসলিম।

বোখারী, মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। কথা বললে মিথ্যা বলবে। প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করবে এবং কিছু গচ্ছিত রাখলে আত্মসাৎ করবে। ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এই বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে — যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং দাবী করে, সেও একজন মুসলমান।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৭৭

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

❒ যাহারা আল্লাহের প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাহাদের কোনো অংশ নাই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদের দিকে চাহিবেন না এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিবেন না; তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

বোখারী ও মুসলিমে আবু ওয়ায়েল রা. এর মাধ্যমে হজরত আবদুল্লাহ রা. এর বর্ণনা রয়েছে এ রকম, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম করে, আল্লাহতায়ালার রোষতপ্ত অবস্থায় সে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। এই আয়াতে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, আসয়াস বিন কায়েস বাইরে থেকে ভিতরে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আবদুর রহমান তোমার কাছে কোন হাদিস বর্ণনা

www.eelm.weebly.com

করেছে? উপস্থিত লোকেরা বললো, এই কথা বলেছেন তিনি। হজরত আসয়াস বললেন, আমার সম্বন্ধে নাজিল হয়েছে এই আয়াত। আমার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে আমার একটি কূপ নিয়ে বিবাদ ছিলো। কূপটি দখলে ছিলো তার। বিষয়টি আমি রসুল স. এর দরবারে উপস্থাপন করলে তিনি বললেন, প্রমাণ পেশ করো। অন্যথায় তার কসম দ্বারা মীমাংসা হবে। আমি বললাম, আমার কোনো প্রমাণ নেই। কসম করতে বললে সে তো তাই করবে। কূপটি হাত ছাড়া হয়ে যাবে আমার। রসুল স. বললেন, মুসলমানের সম্পদ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে ভোগ করবে, সে আল্লাহতায়ালার অপ্রসন্ন অবস্থায় তাঁর সাথে মিলিত হবে। বাগবী তার নিজ সূত্রে বোখারী থেকে এ রকমই বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও অন্যান্যের বর্ণনায় হজরত আসয়াস বিন কায়েসের ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে — এক ইহুদীর সঙ্গে আমার জমি নিয়ে বিবাদ ছিলো। ইহুদী আমার হক অস্বীকার করে বসলো। তাকে নিয়ে আমি রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বিবৃত করলাম। তিনি বললেন, তোমার কি কোনো প্রমাণ আছে? আমি বললাম নেই। তিনি ইহুদীকে বললেন, কসম খাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! সে তো কসম খেয়েই ফেলবে এবং আমার সম্পদ নিয়ে যাবে। অতঃপর এই আয়াত নাজিল হয়।

বোখারী, হজরত আবদুল্লাহ বিন আবী আউফা থেকে লিখেছেন, এক ব্যক্তি কিছু ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারে নিয়ে গেলো। একজন মুসলমান তা কিনে নিলো। সে ওই মুসলমানকে অভিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে কসম খেয়ে বলতে লাগলো, আমি এই মালের সম্পূর্ণ মূল্য পাইনি। অথবা ঘটনাটির প্রকৃত বিবরণ এও হতে পারে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে লাগলো — আমি এই মাল এতো টাকায় কিনেছি। প্রকৃত পক্ষে তার ক্রয়মূল্য এতো টাকা ছিলো না। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

হাফেজ ইবনে হাজার বোখারীর টিকা ভাষ্যে লিখেছেন, এই হাদিস দু'টি এমন নয় যে, একটিকে মেনে নিলে অপরটিকে ভুল বলতে হয়। অর্থাৎ আয়াত নাজিলের কারণ একটি নয়, দুইটিই ছিলো।

আখেরাতের নেয়ামতের তুলনায় দুনিয়ার সম্পদরাজি নিতান্তই নগন্য। সুতরাং পৃথিবীর সম্পদ মিথ্যা কসমের বিনিময়ে লাভ করার মূল্য স্বল্পই। ইবনে জারীর, ইকরামা রা. এর উক্তি উল্লেখ করেছেন, এই আয়াত কাব বিন আশরাফ, হুয়াই বিন আখতাব এবং তাদের মতো অন্যান্য ইহুদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা তওরাতে উল্লেখিত হজরত মোহাম্মদ স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনা গোপন করেছে অথবা বদলে ফেলেছে এই কারণে যেনো তাদের অনুসারীদের থেকে প্রাপ্য ঘুষ-উৎকোচ হাতছাড়া না হয়। শায়েখ ইবনে হাজার বলেছেন, এই ঘটনাটিও গ্রহণযোগ্য। তবে এ ব্যাপারে সহীহ্ হাদিসই অধিকতর গ্রাহ্য।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, এই আয়াত নাজিল হওয়া সম্পর্কে ইবনে জারীর ও ইকরামার বর্ণনা বিশুদ্ধ। প্রথমোক্ত হাদিস দু'টির সঙ্গে হজরত ইকরামার বর্ণনাটিকেও এই আয়াত নাজিল হওয়ার কারণ হিসাবে মেনে নেয়া দরকার। অর্থাৎ আয়াত নাজিল হওয়ার কারণ দু'টি নয়, তিনটি। আলকামা তাঁর পিতা ওয়ায়েলের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর খেদমতে দুই ব্যক্তি উপস্থিত হলো। প্রথমজন ছিলো হাজারে মাওতের অধিবাসী এবং দ্বিতীয়জন কান্দা'র। প্রথম জন বললো, হে আল্লাহর রসুল! সে আমার জমি দখল করে নিয়েছে। দ্বিতীয় জন বললো, ওই জমি আমারই। রসুল স. প্রথম জনকে বললেন, তোমার পক্ষে কি কোনো সাক্ষী আছে? সে বললো, না। রসুল স. বললেন, তবে তুমি কিভাবে জমি পাবে? প্রথম জন বললো, হে আল্লাহর রসুল! এই ব্যক্তি তো নিশ্চিত ফাসেক। তার কোনো কিছুরই ভয় নেই। কসম খাওয়ার পরওয়া সে করে না। রসুল স. বললেন, আমি তাকে কসম ব্যতীত অন্য কিছু করার কথা বলতে পারিনা। দ্বিতীয়জন কসম করতে উদ্যত হলো। রসুল স. বললেন, দুনিয়ার সম্পদ লাভের জন্য সে যদি মিথ্যা কসম করে, তবে যখন সে আল্লাহতায়ালার নিকট হাজির হবে তখন আল্লাহ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, কান্দার অধিবাসী ব্যক্তির নাম ছিলো ইমরুল কয়েস বিন আবেস এবং বিপক্ষজনের নাম ছিলো রবীয়া বিন আবদান।

আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে অন্যের মাল আত্মসাৎ করবে, সে আল্লাহতায়ালার কাছে উপস্থিত হওয়ার সময় বিপদগ্রস্ত হবে। এ কথা শুনে কান্দার অধিবাসী বললো, এ জমি আমার নয়, তারই। বাগবীর এক বর্ণনায় এসেছে, যখন কান্দাবাসী কসম খেতে উদ্যত হলো, তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে। অবশেষে সে কসম না করে বিপক্ষের দাবি স্বীকার করে নিলো এবং জমি ফেরত দিয়ে দিলো।

হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কসম খেয়ে কোনো মুসলমানের অধিকার বিনষ্ট করবে, আল্লাহ্ তার জন্য দোজখ নির্ধারিত করে দিবেন। জান্নাত হারাম করে দিবেন। এক ব্যক্তি আরজ করলো, হে আল্লাহর রসুল! যদি তা সামান্য বস্তু হয়? রসুল স. বললেন, পিলু গাছের একটি ডাল হলেও। বর্ণনা করেছেন মুসলিম। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. শেষ বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। মিথ্যা কসমকারীদের প্রতি আল্লাহ পাক এমন বাক্যালাপ করবেন না, যাতে তারা খুশী হয়। তিনি তাদেরকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না। আল্লাহ্ তাদেরকে পবিত্র করবেন না, অর্থাৎ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

www.eelm.weebly.com

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আমলনামা তিন প্রকারের— এক প্রকারের হিসাব নেওয়া হবে সহজে, যা আল্লাহ্‌র হক। যেমন— নামাজ, রোজা ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকারের হিসাব হবে কঠোরতার সঙ্গে। কেননা তা শিরিক। আর তৃতীয় প্রকারের আমল তিনি মার্জনা করবেন না। কারণ তা হবে বান্দার অধিকার (হক্কুল ইবাদ) সম্পর্কিত। হাকেম, আহমদ।

এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন তিবরানী, হজরত সালমান এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং বায্‌যার বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে। রসুলে পাক স. এর নিদর্শন সমূহ গোপন করা কুফরী। এই কুফরীর কারণেই আল্লাতায়ালা ইহুদীদেরকে ক্ষমা করবেন না।

আল্লাহতায়ালার আযাব সম্পর্কে হজরত আবু জর বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তিন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আল্লাহ্‌পাক কিয়ামতের দিন বাক্যালাপ করবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের কঠিন শাস্তি হবে। এরপর রসুল স. এই আয়াত তিনবার পাঠ করলেন। হজরত আবু জর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অকৃতকার্য ও হতভাগ্য ওই ব্যক্তিদের পরিচয় কী? রসুল স. বললেন, যারা অহংকারবশত টাখনুর নিচে কাপড় পরবে, দান করার পর খোঁটা দেবে এবং ওই ব্যক্তি যে কসম খেয়ে তার পণ্য উত্তম বলে বিক্রয় করবে। মুসলিম, আবু দাউদ, আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তিন ধরনের লোকের সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের দিকে শুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না এবং তাদেরকে বিশুদ্ধ করবেন না। তাদের কঠিন শাস্তি হবে। ১. ওই ব্যক্তি, যে দুর্গম পথ পরিভ্রমণকালে সঙ্গে পানি থাকা সত্ত্বেও অন্য মুসাফিরকে পিপাসার্ত রাখে। ২. ওই ব্যক্তি, যে আছর নামাজের পরে বাজারে গিয়ে তার মাল বিক্রির সময়ে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলে, আমি এই মাল এতো দিয়ে কিনেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কথা অসত্য — কিন্তু মানুষ তা সত্য বলে মেনে নেয়। ৩. ওই ব্যক্তি যে কেবল দুনিয়া লাভের জন্য ইমামের নিকট বায়াত গ্রহণ করে। ইমাম তাকে কিছু দুনিয়ার সুবিধা দিলে সে বায়াতের অঙ্গীকার পূর্ণ করে, না দিলে করে না। অর্থাৎ বিশ্বাস ভঙ্গ করে। আসহাবে সিত্তা ও আহমদ।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রা থেকে মারফু বর্ণনা এসেছে, তিন ধরনের লোকের সাথে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ্‌তায়ালা বাক্য বিনিময় করবেন না। তাদের দিকে তাকাবেন না। ১. ওই ব্যক্তি যে পণ্য বিক্রয়কালে কসম খেয়ে প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্য ঘোষণা করে। ২. ওই ব্যক্তি যে সম্পদ আত্মসাতের

www.eelm.weebly.com

উদ্দেশ্যে আছরের পরে মিথ্যা কসম খায়। ৩. ওই ব্যক্তি, যে তার প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি তৃষ্ণার্ত মুসাফিরকে দিতে অস্বীকার করে। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, আজ আমি তোমাকে আমার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করবো, যেভাবে তুমি বঞ্চিত করেছিলে তৃষ্ণার্তকে। পানি তো তুমি সৃষ্টি করোনি।

উল্লেখিত তিন শ্রেণীর মানুষের বিবরণ দিয়েছেন তিবরানী ও বায়হাকী, হজরত সালমানের বর্ণনা সূত্রে। বলেছেন, এক শ্রেণী হচ্ছে বৃদ্ধ ব্যভিচারী। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে অহংকারী ফকির। তৃতীয় শ্রেণী ওই সকল মানুষ যারা ক্রয়বিক্রয়কালে মিথ্যা কসম করে।

তিবরানী হজরত আসমা বিন মালেক থেকে এ রকম একটি মারফু বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৭৮, ৭৯, ৮০

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَٰبِ
وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ
عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○ مَا كَانَ
لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ
لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّٰنِيِّينَ بِمَا
كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ○ وَلَا يَأْمُرَكُمْ
أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ
إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ○

❑ তাহাদের মধ্যে একদল লোক আছেই যাহারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে যাহাতে তোমরা উহাকে আল্লাহের কিতাব বলিয়া মনে কর; কিন্তু উহা কিতাবের অংশ নহে এবং তাহারা বলে, উহা 'আল্লাহের নিকট হইতে;' কিন্তু উহা আল্লাহের নিকট হইতে প্রেরিত নহে। তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহের সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

www.eelm.weebly.com

❒ কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবুয়ত দান করিবার পর সে মানুষকে বলিবে যে, 'আল্লাহের পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হইয়া যাও' ইহা তাহার জন্য শোভন নহে; বরং সে বলিবে, 'তোমরা রব্বানী হইয়া যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।'

❒ ফেরেশতাগণকে ও নবীগণকে প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করিতে সে তোমাদিগকে নির্দেশ দিবে না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদিগকে কাফের হইতে বলিবে?

ইহুদীদের এক দল নিজেদের মনগড়া কথা আল্লাহতায়ালার কিতাবের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করে বলতো, এটাই আল্লাহতায়ালার কিতাব। আল্লাহতায়ালা রসুল স. এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে তাদের সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছেন, যেনো তাদের কথা বিশ্বাস করা না হয়। জেনে শুনে এই অপকর্মে লিপ্ত ছিলো যারা তাদের নাম হচ্ছে, কাব বিন আশরাফ, হুয়াই বিন আখতাব, আবুল ইয়াসের, মালেক বিন যাইফ এবং সাফনা বিন আমর শায়ের।

ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম তাদের আপনাপন সূত্রে এবং বায়হাকী হজরত ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, যখন ইহুদী ওলামা এবং নাজরানের নাসারাগণ একত্রিত হয়ে রসুল স. এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আহবান প্রাপ্ত হয়, তখন মদীনাবাসী আবু রাফে কুরজী বললো, মোহাম্মদ তুমি কি চাও, আমরা তোমার এমন উপাসনা করি যেমন উপাসনা করে খৃষ্টানেরা হজরত ঈসার। রসুল স. বললেন, আমি আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী। আল্লাহ্তায়ালা আমাকে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেননি। তখন আল্লাহতায়ালা নাজিল করলেন ৭৯ এবং ৮০ নং আয়াত। আবদ তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, আমার নিকট এই সংবাদটি পৌঁছেছে — এক ব্যক্তি নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! সালাম বিনিময়ের ক্ষেত্রে আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যে আচরণ করি; আপনার সঙ্গেও করি সেই একই আচরণ। আপনাকে সালাম করার কি বিশেষ কোনো নিয়ম নেই। আমরা কি আপনাকে সেজদা করে সালাম জানাতে পারবো না! তিনি স. বললেন, না। আপন নবীর সম্মান রক্ষা কর এবং দাবীদারদের দাবী মিটিয়ে দাও। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সেজদা করার বিধান নেই। এরপর অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

মুকাতিল এবং জুহাক বর্ণনা করেছেন, নাজরানের খৃষ্টানেরা বলতো, হজরত ঈসা আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন, আমরা যেনো তাঁকেই প্রভুপ্রতিপালক বলে মেনে নেই। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

কিতাব, হিকমত ও নবুয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁদের উপাসনার দিকে মানুষকে আহবান করতে পারেন না। একমাত্র আল্লাহ্তে সমর্পিত হওয়ার আহবান

www.eelm.weebly.com

জানানোই তাঁদের কাজ। তাঁরা বলেন, আল্লাহতায়ালার হয়ে যাও এবং আল্লাহর নির্দেশ প্রচার করো। রব্বানী অর্থ আল্লাহ্ওয়ালা, ফকীহ আলেমগণ। বলেছেন হজরত আলী এবং হজরত ইবনে আব্বাস। হজরত কাতাদা বলেছেন, হুকামায়ে ওলামা। সাঈদ বিন জোবায়েরের বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে এ রকম — রব্বানী অর্থ ফকীহ্, শিক্ষকবৃন্দ। আতা বলেছেন, প্রাজ্ঞ ওলামা সম্প্রদায়, যাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের হিতাকাংখী। সাঈদ বিন জোবায়ের বলেন, সৎকর্মপরায়ণ আলেম। আবু ওবায়েদ বলেছেন, আমি এক আলেম সাহাবীর নিকট শুনেছি যিনি হালাল, হারাম এবং নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা সমূহ জানেন এবং উম্মতের অতীত ও ভবিষ্যত অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তিনিই রব্বানী। কেউ কেউ বলেন, সাধারণ অসাধারণ সকল আলেমই রব্বানী বলে অভিহিত হতে পারেন। বিশেষ করে ওই শ্রেণীর আলেমই রব্বানী যাঁরা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।

উপরোক্ত অভিমত সমূহের সার কথা এই যে, রব্বানী ওই ব্যক্তি যিনি এলেম আমল এখলাস যথানিয়মে সম্পাদন করে আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভে পূর্ণ হয়েছেন এবং শিক্ষা ও প্রতিপালনের মাধ্যমে অন্যকেও পূর্ণ করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাসের মৃত্যু হলে মোহাম্মদ বিন হানাফিয়া বলেছিলেন, এই উম্মতের রব্বানীর ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছে।

এরশাদ হয়েছে, তোমরা যারা অধ্যয়ন করো ও শিক্ষা দাও, তারা রব্বানী হয়ে যাও। যা জানো তা আমল করো এবং নিজেকে সংশোধন করো। সংশোধন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু অন্যকে সংশোধন করার পূর্বে নিজে সংশোধিত হতে হবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহতায়ালা বলেছেন, ' কেনো এমন বলো যা করো না।' আরো বলেছেন, 'কী আশ্চর্য! অন্যকে সৎকর্মের আদেশ দাও, অথচ নিজে কেমন উদাসীন।'

কোরাইশ এবং সাবেয়ীন সম্প্রদায় ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর পুত্র বলতো। ইহুদীরা উযায়ের আ. কে এবং খৃষ্টানেরা ঈসা আ.কে আল্লাহর সন্তান বলতো। নবী ও রসুলগণ এবং রব্বানীগণ এ রকম নির্দেশ দিতে পারেন না। বরং এইরূপ অংশীবাদিতার কঠোর বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁরা। যে মুসলমান সে কি কখনো কাউকে কাফের হওয়ার আহবান জানাতে পারে?

www.eelm.weebly.com

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ
أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ
فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ○ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○

❐ স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার লইয়াছিলেন 'কিতাব ও হিকমত যাহা কিছু দিলাম তাহার শপথ, তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে যখন একজন রসুল আসিবে তখন নিশ্চয় তোমরা তাহাকে বিশ্বাস করিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে।' তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি স্বীকার করিলে? এবং আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করিলে?' তাহারা বলিল, 'আমরা স্বীকার করিলাম।' তিনি বলিলেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী রহিলাম।

❐ ইহার পর যাহারা মুখ ফিরাইবে তাহারাই সত্য — ত্যাগী।

আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক নবী থেকে এই মর্মে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদের আপনাপন উম্মতকে পরবর্তী নবীদেরকে মেনে নেয়ার নির্দেশ দিবেন। অর্থাৎ বলবেন, আমার পরে যে নবী আসবেন, তোমরা অবশ্যই তাঁর অনুসরণ করবে। এ কথা বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। হজরত আলী বলেছেন, হজরত আদম এবং তাঁর পরবর্তী সকল নবীর নিকট থেকে আল্লাহতায়ালা এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তোমরা এবং তোমাদের উম্মত মোহাম্মদ স. কে মেনে নিবে। জীবদ্দশায় তাঁকে পেলে তাঁর সাহায্যকারী হবে। কেউ কেউ বলেছেন, মান্য করার এই নির্দেশ কেবল আহলে কিতাবদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, তারা মনে করতো মোহাম্মদ স. অপেক্ষা তারাই নবুয়তের অধিক দাবীদার। আবার কেউ বলেছেন, এই অঙ্গীকার নিয়েছেন নবীগণ তাঁদের আপন উম্মতের কাছ থেকে। তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে তাঁরা পেশ করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত উবাই বিন কাবের ক্বেরাত (পাঠ)। যাতে 'নাবীঈন' শব্দের বদলে 'কিতাব' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বিশুদ্ধ অর্থ সেটাই যা বর্ণনা করা হয়েছে প্রথমে। এটাই প্রচলিত

www.eelm.weebly.com

ক্বেরাত সম্মত অর্থ। আল্লাহতায়ালা হজরত মুসার নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তুমি হজরত ঈসাকে স্বীকৃতি দাও এবং তোমার উম্মতকে হুকুম দাও তারা যেনো হজরত ঈসার উপর ইমান আনে। হজরত ঈসাকেও আল্লাহতায়ালা এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ করেছেন যে, তুমি মোহাম্মদ স.কে মান্য করো এবং তোমার উম্মতকে মোহাম্মদ স. এর প্রতি ইমান আনতে এবং সাহায্যকারী হতে নির্দেশ দাও। এ জন্যেই হজরত ঈসা বলেছেন, হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রসুল। আমি আমার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সত্যায়ণকারী। এবং আমার পরে যে রসুল আসবেন তাঁর সুসংবাদ প্রদানকারী। তাঁর নাম আহমদ।

প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত ক্বেরাত এবং হজরত ইবনে মাসউদের ক্বেরাতে কোনো বিরোধ নেই। কেননা নেতার প্রতিশ্রুতি অনুসারীদের প্রতিশ্রুতি হিসাবে গৃহীতব্য। যখন নেতার নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে, তখন উম্মতের নিকট থেকেও প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে বুঝতে হবে।

আয়াতে বলা হয়েছে, কিতাব ও হিকমতের কথাও। অর্থাৎ কিতাব সত্যায়ণকারী নবী আবির্ভূত হলে তাঁকে মেনে নিতে হবে। হিকমত অর্থ সুন্নত বা দ্বীনের জ্ঞান।

পূর্বাপর সকল উম্মতের জন্য সকল নবীর উপর ইমান আনা ওয়াজিব এবং 'আমরা রসুলদের মধ্যে পার্থক্য করি না' বলা জরুরী। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সেই ধর্মই বিধিবদ্ধ করেছেন যার নির্দেশ পেয়েছিলেন নূহ এবং আমি আপনার প্রতি সেই প্রত্যাদেশই অবতীর্ণ করেছি। আমি ইব্রাহিম, মুসা এবং ঈসাকেও এই একই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, যেনো এতে কোনো বিভেদ সৃষ্টি না হয়।'

হজরত আলী এবং হজরত ইবনে ওমরের অভিমতানুসারে কেবল রসুল পাক স. সম্পর্কে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে — এ কথা পূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু রসুল পাক স. ছাড়া অন্য নবীগণ এতে শামিল হতেই পারেন না, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। কেবল রসুল পাক স. এর উল্লেখ তাঁর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনেরই পরিচায়ক। আর এতে আহলে কিতাবদের প্রতি সতর্কবাণী রয়েছে যে, অন্যান্য নবীদেরকে মান্য করার বেলায় যেমন তাদের কোনো মতদ্বৈততা নেই তেমনি রসুল স. কেও মান্য করতে হবে। তাঁকে অমান্য করা পূর্ববর্তী সমস্ত নবী ও কিতাবকে অমান্য করার নামান্তর। তাই এরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয় তোমরা তাহাকে বিশ্বাস করিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে।'

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহতায়ালা হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সকল সন্তানকে প্রকাশিত করলেন। সকলের মধ্যে নবী ও রসুলগণ ছিলেন প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের মতো দ্যুতিময়। তখন আল্লাহতায়ালা সকলের নিকট থেকে মোহাম্মদ স.

www.eelm.weebly.com

সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা প্রশ্নাকারে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন সকলের। সবাই অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো। আল্লাহ্‌তায়ালা নির্দেশ দিলেন, যেনো তারা এই সাক্ষ্য দেয় কিয়ামতের দিবসে। বললেন, তিনিও সকলের সঙ্গে এর সাক্ষ্যদাতা হবেন। এই অঙ্গীকার থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নিবে তারা কাফের।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৮৩, ৮৪, ৮৫

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلٰٓى إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

❑ তাহারা কি চাহে আল্লাহের দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে! তাহার দিকেই তাহারা প্রত্যানীত হইবে।

❑ বল, 'আমরা আল্লাহে এবং আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়ছিল এবং যাহা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছি, আমরা তাহাদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা; এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী।

❑ কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন চাহিলে তাহা কখনও কবুল করা হইবে না এবং সে হইবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্‌র ধর্মের সঙ্গে অন্য কোনো ধর্মের সহাবস্থান হতে পারেনা। বাগবী লিখেছেন, ইহুদী ও নাসারারা প্রত্যেকেই দ্বীনে ইব্রাহিমের অনুসারী হওয়ার দাবী করেছিলো। কিন্তু রসুল স. দুই দলই ইব্রাহিম আ. ধর্ম থেকে বিচ্যুত — এই অভিমত প্রকাশ করলেন। তারা অসন্তুষ্ট হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো, আমরা

www.eelm.weebly.com

আপনার সিদ্ধান্ত মানি না। আপনার ধর্মমতকেও পছন্দ করি না। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে। আকাশের ফেরেশতা এবং পৃথিবীর জ্বিন ও মানুষ সকলেই ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহতায়ালার বিধান মেনে চলছে। বনী ইসরাইলদের মাথার উপর পাহাড় উঠিয়ে তাদেরকে সত্যে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করা হয়েছিলো। ফেরাউনের দলকে পানিতে ডুবে মৃত্যুর বিধানকে মেনে নিতে হয়েছিলো। এভাবে আল্লাহতায়ালার বিধানকে মেনে নিচ্ছে সকলেই। মুমিন, কাফের সবাই।

এরশাদ হচ্ছে, হে নবী আপনি আপনার মুমিন সঙ্গীগণসহ ইমানের ঘোষণা দিন। বলুন, আমরা ওই সমস্ত কিতাব ও সহীফাসমূহ বিশ্বাস করি, যা অবতীর্ণ হয়েছিলো ইব্রাহিম আ. ইসমাইল আ. ইসহাক আ. ইয়াকুব আ. মুসা আ. ঈসা আ. এবং অন্যান্য বনী ইসরাইলের নবীদের প্রতি। আয়াতে আলাদাভাবে মুসা আ. ও ঈসা আ. এর উল্লেখ তাঁদের বিশেষ মর্যাদার কারণে হয়েছে। তাঁদের সম্পর্কে ইহুদী নাসারাদের প্রচন্ড বিতন্ডা ছিলো। তাদের ধারণা ছিলো, মুসলমানেরা হজরত মুসা এবং হজরত ঈসাকে মানে না। এই কারণে তাদের ধারণাকে নির্মূল করার জন্য বিশেষভাবে একত্রে হজরত মুসা ও হজরত ঈসার উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানেরা তাদের ইমানের ঘোষণায় বলবে, আমরা নবী রসুলদের মধ্যে তারতম্য করি না। কারণ, আল্লাহতায়ালার যে আদেশে তাঁরা নবী ও রসুল আমরা সেই আদেশের অধীন। আমরা মুসলমান।

দ্বীনে মোহাম্মদী পূর্ববর্তী দ্বীন সমূহকে রহিত করে দিয়েছে। সুতরাং মোহাম্মদ স. এর দ্বীন ছাড়া এখন আর অন্য কোনো দ্বীন কবুল করা হবে না। এই সিদ্ধান্ত যারা মানবে না, পরকালে তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে নিরেট বঞ্চনা ও ক্ষতি।

জ্ঞাতব্য ঃ বায়হাকী হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এরকম, ভ্রমণকালে কারো বাহন (জানোয়ার) অবাধ্য হলে তার কানের কাছে এই আয়াত পাঠ করবে। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত এবং পরবর্তী আয়াত বারোজন ধর্মত্যাগী ব্যক্তির জন্য নাজিল হয়েছে, যারা মদীনা থেকে মক্কায় পালিয়ে গিয়েছিলো। তাদের দলে হারিস বিন সুয়ায়িদও ছিলেন; তিনি অবশ্য পরে খাঁটি অন্তরে তওবা করে ফিরে এসেছিলেন।

www.eelm.weebly.com

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

❒ বিশ্বাসের পর ও রসূলকে সত্য বলিয়া সাক্ষ্যদান করিবার পর এবং তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসিবার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে উহাকে আল্লাহ্ কিরূপে সৎপথের নির্দেশ দিবেন? আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথের নির্দেশ দেন না।

❒ ইহারাই তাহারা যাহাদের প্রতিফল আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ, সকলেরই অভিশাপ!

❒ তাহারা ইহাতে স্থায়ী হইবে, তাহাদের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং তাহাদিগকে বিরামও দেওয়া হইবে না।

যারা ধর্ম গ্রহনের পর ধর্ম পরিত্যাগ করে, তাদেরকে আল্লাহতায়ালা প্রশ্নাকারে হেদায়েত প্রদানে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। এমন ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্ জান্নাতের পথ প্রদর্শন করবেন না। তাদের উপর আল্লাহতায়ালার অভিসম্পাত। তারা আল্লাহতায়ালার সন্তোষ ও রহমত থেকে দূরবর্তী। এই দূরবর্তীতাই আল্লাহতায়ালার অভিসম্পাত। ফেরেশতাদের অভিসম্পাতের অর্থ তাদের বদদোয়া। মানুষের অভিসম্পাত অর্থ কেবল মুমিনদের অথবা মুমিন, বেঈমান নির্বিশেষে সকলের অভিসম্পাত। কাফেরেরাও সত্য অস্বীকারকারীদের প্রতি অভিসম্পাত করে থাকে। কিয়ামতের দিন কাফেরেরা একে অপরের প্রতি লানত দিবে। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, তারা একে অপরের প্রতি কুফরী করবে এবং একে অপরের প্রতি লানত করবে।

কাফেরদের উপর আল্লাহতায়ালার এই অভিসম্পাত হবে চিরস্থায়ী। যদিও আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ নেই, তবুও বোঝা যায় চিরস্থায়ী অগ্নিবাসই তাদের পরিণাম। তাদের শাস্তি কখনো লঘু হবে না। আর তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি তাদের জন্যই নির্ধারিত।

www.eelm.weebly.com

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝

❑ তবে ইহার পর যাহারা তওবা করে, ও নিজদিগকে সংশোধন করে তাহারা ব্যতিরেকে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❑ বিশ্বাস করার পর যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং যাহাদের সত্য — প্রত্যাখ্যান প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহাদের তওবা কখনও কবুল করা হইবে না। ইহারাই তাহারা যাহারা পথভ্রষ্ট।

❑ 'যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে যাহাদের মৃত্যু ঘটে তাহাদের পক্ষে পৃথিবী — পূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করিলেও কখনও কবুল করা হইবে না। ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে; ইহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

তওবার অর্থ পুনরায় ফিরে আসা। ইমানবিচ্যুত হওয়ার পর পুনরায় ইমানকে আশ্রয় করে সংশোধিত হওয়া। কুফরীর অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়ার পর পুনরায় ইমানের আলোয় স্থির হওয়া। আল্লাহতায়ালা অভয় দিয়েছেন, তিনি তওবাকারীর তওবা কবুল করবেন। ইতোপূর্বের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। কারণ তিনি ক্ষমাপরবশ এবং দয়ার্দ্র। তওবাকারীকে দয়াবৃত করে তিনি তার জন্য নির্ধারণ করবেন জান্নাত।

নাসাঈ, ইবনে হাব্বান এবং হাকেম, হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, এক আনসারী মুসলমান হওয়ার কিছুদিন পর মুরতাদ হয়ে গেলো। কিছুদিন পর তার অন্তরে ইমান গ্রহণেচ্ছা প্রবল হলে তার বংশের একজনের মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. দরবারে সংবাদ পাঠালো যে, আমার জন্য কোনো তওবার সুযোগ রয়েছে কি না? তখন কাইফা ইয়াহদি থেকে গফুরুর রহীম (আয়াত —

www.eelm.weebly.com

৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯) পর্যন্ত নাজিল হলো। তার বংশের লোকেরা তওবা কবুল হওয়ার এই সংবাদ পাঠালে তিনি পুনরায় মুসলমান হয়ে গেলেন।

ইবনে মুনজির এবং আবদুর রাজ্জাক, মুজাহিদের উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, হারিস বিন সুয়ায়িদ মুসলমান হওয়ার কিছুদিন পর কাফের হয়ে তার আপন সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট ফিরে গেলো। আল্লাহ্ তার সম্পর্কে কাইফা ইয়াহ্দি থেকে গফুরুর রহীম পর্যন্ত নাজিল করলেন। তার বংশের লোকেরা যখন এই সংবাদ তাকে শুনিয়ে দিলো তখন তিনি সংবাদদাতাকে বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি সত্যাশ্রয়ী। আর রসুলুল্লাহ স. তোমার চেয়ে অধিক সত্যাশ্রয়ী এবং আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সত্যবাদী। এরপর হারিস মদীনায় ফিরে এলেন এবং খাঁটি মুসলমান হয়ে গেলেন।

হজরত কাতাদা এবং হাসান বসরী বলেছেন, পরবর্তী আয়াতটি ইহুদীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা হজরত মুসা এবং তওরাতের প্রতি ইমান আনার পর হজরত ঈসা এবং ইঞ্জিলকে অস্বীকার করলো। তারপর অতিরিক্ত কুফরী করলো রসুল পাক স. ও কোরআনকে না মেনে। আবুল আলীয়া বলেছেন, এই আয়াত ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় দল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। দুই দলই তাদের কিতাবে রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলী ও অবস্থা সম্পর্কে জেনেছে। কিন্তু রসুল স. এর আবির্ভাবের পরে তাঁর প্রতি ইমান আনেনি। মুজাহিদ বলেছেন, সকল কাফেরের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে এই আয়াত। তারা আল্লাহকে খালেক (স্রষ্টা) বলে মেনে নেয়ার পরও শিরিকে লিপ্ত এবং মৃত্যু পর্যন্ত কুফরীর উপরে দন্ডায়মান। হাসান বলেছেন, সত্য প্রত্যাখ্যানের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ অবতীর্ণ আয়াত অস্বীকার করা। কালাবী বলেছেন, আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হারিস বিন সুয়ায়িদ এবং তার সঙ্গী সাথীরা। হারিস দুইবার মুসলমান হওয়ার পরও কুফরীর উপরেই দন্ডায়মান ছিলো এবং মক্কায় চলে গিয়েছিলো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আয়াতে আল্লাযিনা কাফারু বলে মুনাফিকদেরকে বোঝানো হয়েছে। সরাসরি কুফরীর চেয়ে মুনাফিকদের কুফরী অধিক মারাত্মক। তারা কুফরীকে গোপন রেখে প্রকাশ্যে নামাজ, রোজা ইত্যাদি আদায় করে। কুফরীর প্রতি তাদের আকর্ষণ সর্বোচ্চ।

যারা কুফরীর অনুবর্তনে বিরামহীন তাদের তওবা কখনো গৃহীত হবে না। ইহুদী, খৃষ্টান এবং সাধারণ কাফেরের কুফরীর উপরে নিরবচ্ছিন্ন অবস্থানই তওবা গৃহীত হওয়ার অন্তরায়। তবে হ্যাঁ, খাঁটি তওবা মৃত্যুকষ্ট সন্নিকটবর্তীকালেও গৃহীত হয়। মক্কা বিজয়ের পর হারিস বিন সুয়ায়িদের সাথীদের মধ্যেও যারা তওবা করেছিলেন, তাদের তওবা কবুল করেছিলেন রসুলে পাক স.। মুনাফিকদের

www.eelm.weebly.com

সম্পর্কেও একই কথা। যতোক্ষণ তাদের অন্তর অবিশ্বাসাচ্ছন্ন থাকবে, ততোক্ষণ কেবল মুখের তওবায় কাজ হবে না।

ইমান সকল প্রকার দান ও ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত। ইমানের সঙ্গে বিশুদ্ধ নিয়তে ইবাদত না করলে তা কবুল হয় না। পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ দান করলেও না। আলেমগণ বলেছেন, বিশুদ্ধ নিয়ত ব্যতিরেকে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ অথবা তদপেক্ষা কম কোনো দানই গ্রহণযোগ্য হবে না। কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। চিরদিনের জন্য তারা ক্ষমার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আযাব বন্ধ করে দিতে পারে অথবা কমিয়ে দিতে পারে এ রকম কোনো সাহায্যকারী তাদের নেই।

হজরত আনাস বিন মালেক বলেছেন, রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন লঘু শাস্তিপ্রাপ্ত এক দোজখীকে আল্লাহ বলবেন, যদি তোমার নিকট পৃথিবীর সমস্ত সামগ্রী থাকতো তবে কি তুমি আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবকিছু দিয়ে দিতে? দোজখী বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ বলবেন, তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে, তখন আমি চেয়েছিলাম এর চেয়ে অনেক সহজ বস্তু — পৃথিবীতে গিয়ে তুমি যেনো আমার সাথে কাউকে শরীক কোর না, তখন তুমি শিরিকমুক্ত ছিলে না কেনো? বোখারী ও মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

www.eelm.weebly.com

চতুর্থ পারা

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৯২

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

❑ তোমরা যাহা ভালবাস তাহা হইতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করিবে না। তোমরা যাহা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

বির্‌রা শব্দের অর্থ অনেক কয়টি। যেমন, পুরস্কার, জান্নাত, কল্যাণ, প্রচুর বিনিময়, সততা, অনুসরণ ইত্যাদি। 'কামুস' অভিধানের রচয়িতা বলেছেন, বির্‌রা শব্দের সম্পর্ক বান্দার সঙ্গে করা হলে অর্থ হবে সত্যানুসরণ অথবা প্রচুর প্রতিদান। তখন এর বিপরীত শব্দ হিসাবে আসবে পাপ অথবা অবাধ্যতা। আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে শব্দটির সম্বন্ধ করা হলে অর্থ হবে সন্তুষ্টি, রহমত অথবা জান্নাত। তখন বিপরীত শব্দ হিসাবে আসবে অসন্তোষ, শাস্তি অথবা গজব।

হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ এর অর্থ নিয়েছেন, বেহেশত। মুকাতিল বিন হাব্বান অর্থ করেছেন, তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, অনুসরণ। কেউ কেউ বলেছেন, কল্যাণ। হাসান বসরী এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন, তোমরা পুণ্যবান হতে পারবে না অর্থাৎ অধিক কল্যাণ, প্রচুর বিনিময় লাভ করতে পারবে না এবং অনুসরণকারী হতে পারবে না। বায়যাবী লিখেছেন, তোমরা কল্যাণের পূর্ণতায় পৌঁছতে পারবে না, আল্লাহ্‌র পুরস্কার অর্থাৎ রহমত, সন্তোষ এবং বেহেশত পাবে না।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমাদের জন্য উচিত যে, তোমরা সত্যানুসারী হবে। সত্যানুসরণ পূণ্যপথপ্রদর্শনকারী। আর পূণ্য বেহেশতের পথপ্রদর্শক। যে সব সময় সত্য কথা বলে অথবা বলতে চেষ্টা করে আল্লাহতায়ালার দরবারে সে সত্যবাদী বলে গণ্য। তোমাদের আরো উচিত, মিথ্যাচার থেকে মুক্ত থাকা। মিথ্যা পাপাচারের পথপ্রদর্শক এবং পাপ দোজখের

www.eelm.weebly.com

পথপ্রদর্শনকারী। যে মিথ্যা বলে বা বলতে সচেষ্ট থাকে আল্লাহতায়ালার দপ্তরে সে মিথ্যুক হিসাবে লিপিবদ্ধ। মুসলিম, আহমদ, তিরমিজি।

হজরত আবু বকরের মারফু বর্ণনায় রয়েছে, সত্যকে গ্রহণ করো। সত্য পূণ্যের সঙ্গী। পূণ্য ও সত্য বেহেশতে নিয়ে যায়। মিথ্যামুক্ত থাকো। মিথ্যা পাপের সঙ্গী। মিথ্যা ও পাপ দোজখে প্রবেশ করায়। আহমদ, ইবনে মাজা, বোখারী।

পুণ্য লাভ করতে পারবে না আল্লাহর রাস্তায় প্রিয় বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্ত — এতে বোঝা যায়, সকল প্রকার সম্পদই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা উচিত। কারণ, অন্তরের মহব্বত সকল প্রকার মালের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। সুতরাং কেউ যদি দান না করে, এমন কি জাকাত দিতে অনীহ হয়, তবে সে পূণ্যবঞ্চিত ও পাপী হবে। হালাল ও হারাম সম্পদ একত্রিত হয়ে গেলে, অবশ্যই হালাল থেকে হারামকে পৃথক করে কেবল হালাল সম্পদ থেকে দান করতে হবে। হারাম অগ্রহণীয়। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'হে ইমানদারগণ! আপন উপার্জন থেকে উত্তম বস্তু ব্যয় করো। আর ওই সমস্ত বস্তু হতেও ব্যয় করো, যা আমি তোমাদেরকে ভূমি থেকে উৎপন্ন করে দিয়েছি। আর নিকৃষ্ট বস্তু থেকে দান করতে চেয়ো না।'

সম্পদের কতোটুকু ব্যয় করা আবশ্যক, সে সম্পর্কে এ আয়াতে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। জাকাতের নির্ধারিত পরিমাণ হাদিস সমূহের মাধ্যমে জানা যায়। প্রত্যেক সম্পদের জাকাত ওয়াজিব — এই আয়াতের মাধ্যমে এ রকম ধারণা লাভ করার সুযোগ থাকলেও অন্য আয়াত ও হাদিস দ্বারা জাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিশেষ ধরণ ও অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জানা যায়। এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে নবী! মানুষ আপনাকে প্রশ্ন করে, তারা কোন বস্তু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন, যা কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত।'

এক হাদিসে এসেছে, গৃহকর্মের জন্য নিয়োজিত এবং বোঝা বহনে ব্যবহৃত পশুর জাকাত নেই। অন্য হাদিসে এসেছে, এক ব্যক্তির প্রশ্নোত্তরে রসুল স. বলেছেন, ইহা (জাকাত) ব্যতীত তোমার উপর অন্য কিছু ফরজ নয়। তবে তুমি আপন ইচ্ছায় যদি অতিরিক্ত (নফল) দান করো, তবে উত্তম। আরেকটি হাদিসে এসেছে, সম্পদশালী ব্যতীত অন্যের উপর জাকাত ওয়াজিব নয়।

এ সমস্ত হাদিস ও আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, জঙ্গলে বিচরণরত পশু, যাদের জন্য আলাদা আহার যোগাতে হয় না সেগুলোর উপরে জাকাত ওয়াজিব নয়। নেসাব পরিমাণ সোনা ও রূপা এবং নেসাব পরিমাণ বাণিজ্য সামগ্রী এক বৎসর মালিকানাধীনে থাকলে জাকাত ওয়াজিব হবে। ফল ও ফসলের উপরও জাকাত ওয়াজিব। এই আয়াতটি জাকাত সম্পর্কিত হলেও, হুকুমটি সাধারণ। জাকাতের বিভিন্ন প্রকার এতে উল্লেখিত না হওয়ায়, জাকাত সম্পর্কিত অন্য স্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে এই সাধারণ হুকুমটি রহিত হয়েছে — এ কথা বলেছেন মুজাহিদ ও কালাবী। আর ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করে জুহাক বলেছেন, বিভিন্ন

www.eelm.weebly.com

প্রকারের উল্লেখ না থাকলেও এই আয়াতটি জাকাত সম্পর্কিত বটে। তবে হুকুমটি রহিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বিশেষ হুকুম দ্বারা সাধারণ হুকুম অথবা সাধারণ হুকুম দ্বারা বিশেষ হুকুম রহিত হয় না। হুকুম পরস্পর দ্বন্দ্বশীল হলেই কেবল একটি দ্বারা অপরটি রহিত হয়। বরং অধিক প্রিয় বস্তু আল্লাহর পথে দান করা উত্তম — এ কথাটুকু জানানোই আয়াতের উদ্দেশ্য। এখানে বোঝা যায়, সম্পদের কিছু অংশ দান করা ওয়াজিব। কিন্তু সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করা সর্বাপেক্ষা উত্তম। হাসান বসরী র. বলেছেন, আল্লাহর সন্তোষ লাভার্থে যা কিছু ব্যয় করা হোক না কেনো, এমন কি যে একটি খেজুরও দান করবে সেও পূণ্যাধিকারী হবে - এ কথাই আয়াতে বলা হয়েছে। এই আয়াতে ওয়াজিব ও মোস্তাহাব দুই ধরনের দানের কথাই বিদ্যমান। হজরত আতা এই আয়াতের তাফসীর করেছেন এভাবে, তোমরা দ্বীনের ফযীলত ওই সময় পর্যন্ত পাবে না যতক্ষণ না যথাসময়ে অথবা প্রয়োজনকালে দান করো।

হজরত আনাস বিন মালেক বলেছেন, হজরত আবু তালহা ছিলেন আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী। মসজিদে নববীর সম্মুখস্থ বিরহা নামক বাগানটি ছিলো তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়। রসুল স. সেখানে মাঝে মাঝে যেতেন এবং সেখানকার কূপের স্বচ্ছ সুপেয় পানি পান করতেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত আবু তালহা, রসুল স. এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ এই বাগানটি। পরম কল্যান অর্জনার্থে আমি এই বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। আপনি যেভাবে ইচ্ছা বাগানটি বণ্টন করে দিন। রসুল স. আনন্দিত হলেন। বললেন, বেশ! সম্পদটি উত্তম। এর দ্বারা মানুষের অনেক উপকার হবে। তবে আমি বলি, তুমি তোমার এ বাগানটি তোমার আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দাও। তালহা বললেন, ঠিক আছে। এরপর তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বাগানটি বণ্টন করে দিলেন।

হজরত জায়েদ ইবনে হারিসা উপস্থিত হলেন তাঁর প্রিয় ঘোড়াটিকে নিয়ে। নিবেদন করলেন, এই ঘোড়াটি আমার প্রিয়। আমি এটিকে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করতে চাই। মহানবী স. ঘোড়াটি নিয়ে তাঁরই পুত্র ওসামাকে দিলেন। দানকৃত বস্তু স্বগৃহে ফিরতে দেখে জায়েদ ইবনে হারিসা কিঞ্চিত মনক্ষুণ্ন হলে রসুল স. বললেন, তোমার দান গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এ দানের বিনিময় তুমি পাবে। ইবনে মুনজির এই হাদিসকে মোহাম্মদ বিন মুনকাদেরের বর্ণনাসূত্রে মুরসাল হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। এতে অতিরিক্ত উল্লেখ রয়েছে ঘোড়াটির নাম ছিলো সাবিলসিল। ইবনে জারীর হজরত আমর বিন দিনার থেকে মুরসাল হিসেবে এবং আউয়ুব সেজেস্তানী থেকে মু'দাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বাগবী মুজাহিদের বর্ণনাসূত্রে লিখেছেন, জালওয়ালার যুদ্ধের দিন হজরত ওমর হজরত আবু মুসা আশআরীকে লিখেছিলেন — যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে একটি বাঁদী কিনে নাও। নির্দেশানুসারে হজরত আবু মুসা একটি বাঁদী ক্রয় করে হজরত ওমরের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। হজরত ওমর বাঁদীকে খুব পছন্দ করলেন, কিন্তু এই আয়াতটি পড়ে তাকে মুক্তি দিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের পুত্র হজরত হামজা

www.eelm.weebly.com

বলেন, এই আয়াত পাঠের পর আমার সম্মানিত পিতা চিন্তা ভাবনা করে ঠিক করলেন, তাঁর প্রিয় বস্তু তাঁর এক বাঁদী। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বাঁদীকে ডেকে বললেন, যাও। তুমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মুক্ত। তিনি বলেছেন, দানের পর ফিরিয়ে নেয়া গেলে আমি তাকে বিয়ে করতাম।

এই সমস্ত হাদিস এবং সাহাবীগণের কার্যাবলীর মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করাটা সাধারন হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। আর নিকটতম স্বজনকে দান করা সর্বাপেক্ষা উত্তম।

এই ব্যয় সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা সম্যক অবগত। তিনি নিয়ত অনুসারে এর বিনিময় দিবেন। দানের পরিমান কম হোক অথবা বেশী। অতীতে হোক বা এখন অথবা আগামীতে। ইঙ্গিতে এ কথাও বোঝা যায় যে, যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালা প্রকাশ্য, গোপন সকল বিষয়ই জানেন তাই কেবল প্রকাশ্যে দান করা জরুরী নয়। বরং গোপন দানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। বাগবী লিখেছেন, ইহুদীরা রসুল স. কে বললো, আপনি ইব্রাহিমী মিল্লাতের দাবী করেন অথচ উটের গোস্ত খান। হজরত ইব্রাহিম উটের গোস্ত খেতেন না উটের দুধও পান করতেন না। রসুলে পাক স. এরশাদ করলেন, হজরত ইব্রাহিমের জন্য এ সমস্ত বস্তু হালাল ছিলো। তারা বললো, যে সমস্ত বস্তুকে আমরা হারাম বলছি তা নূহ আ. এর জন্যও হারাম ছিলো। তখন থেকে এ বিধান চলে এসেছে। ইহুদীদের মিথ্যাবাদীতাকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৯৩, ৯৪, ৯৫

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۟ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

❑ তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইস্রাইল নিজের জন্য যাহা অবৈধ করিয়াছিল তাহা ব্যতীত বনি-ইসরাইলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই বৈধ ছিল। বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তওরাত আন এবং পাঠ কর।'

www.eelm.weebly.com

❑ ইহার পরও যাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা সৃষ্টি করে তাহারাই সীমালংঘনকারী।

❑ বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলিয়াছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর, সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত নহে।'

খাদ্য বস্তু হালাল, হারাম প্রসঙ্গে এই আয়াতে বলা হয়েছে। সুতরাং যা খাদ্য পদবাচ্য নয় তা এই আয়াতের হুকুম বহির্ভূত। সেগুলো সকল সময়ের জন্যই হারাম। যেমন, মৃত পশু, রক্ত, শূকর এবং হিংস্র প্রাণীর গোশত্।

তওরাতে যে সমস্ত খাদ্যবস্তু হারাম করা হয়েছে, তা প্রথম আরোপিত হয়েছিলো হজরত ইয়াকুব আ. এর বংশধরদের জন্য। কিন্তু তাঁর পিতা ও পিতামহ হজরত ইসহাক ও ইব্রাহিমের জন্য সেগুলো হারাম ছিলো না। উটের গোশ্ত ও দুধ হজরত ইয়াকুব আ. এর প্রিয় খাদ্য ছিলো। তিনি একবার উরুর ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন মানত করেছিলেন, নিরাময় লাভ করলে তিনি তাঁর এই প্রিয় খাদ্য দু'টি পরিত্যাগ করবেন। এ সম্পর্কিত হাদিস বর্ণনা করেছেন আহমদ এবং হাকেম, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। বাগবী বর্ণনা করেছেন আবুল আলীয়া, আতা, মুকাতিল এবং কালাবী থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে জোবায়েরের বর্ণনায় রয়েছে, উরুসন্ধির ব্যথায় আক্রান্ত হলে চিকিৎসকগণ হজরত ইয়াকুব আ.কে উটের গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি এই নিষেধাজ্ঞা মেনে নিয়েছিলেন। বাগবী লিখেছেন, হাসান বসরী এ কথা বলেছেন যে, আল্লাহ্তায়ালার ইবাদতের অত্যাধিক আকর্ষণ হেতু হজরত ইয়াকুব নিজের জন্য উটের গোশ্ত হারাম করে নিয়েছিলেন এবং প্রার্থনা করেছিলেন, এই বিধান যেনো বলবৎ থাকে। তাঁর প্রার্থনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক তাঁর সন্তানদের জন্য উটের গোশ্ত হারাম করেছিলেন। ইবনে আতিয়া বলেছেন, ইসরাইলের (হজরত ইয়াকুব আ. এর) সন্তানদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে উটের গোশ্ত হারাম করা হয়নি। বরং হজরত ইয়াকুব নিজের এবং সন্তানদের জন্য হারামের এই বিধান চেয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর মানত ছিলো, আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করলে আমি ও আমার সন্তানেরা উটের গোশ্ত খাবো না।

ইহুদীদের অবাধ্যতার কারনে তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার আগেই আল্লাহ্তায়ালা তাদের জন্য অনেক কিছু হারাম করে দেন। যেমন আল্লাহ্তায়ালা অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'অতঃপর ইহুদীদের এ সমস্ত বড় বড় অপরাধের কারনে বহু পবিত্র বস্তু হারাম করে দিয়েছি, যা ছিলো তাদের জন্য হালাল।' অন্য একস্থানে বলেছেন, 'আর আমি ইহুদীদের জন্য সকল নখর বিশিষ্ট প্রাণী হারাম করে দিয়েছি। গরু ও ছাগলের চর্বি, সেগুলোর পিঠের উপর অথবা অন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত অথবা হাড়ের সঙ্গে মিলিত অংশ হারাম করে দিয়েছি। এই শাস্তি ছিলো তাদের দুষ্টাচরণের জন্য।'

কালাবী লিখেছেন, বনি ইসরাইলেরা যখন সম্মিলিতভাবে বড় বড় গোনাহ্ করতে উদ্যত হলো, তখন আল্লাহ্ শাস্তি স্বরূপ তাদের জন্য এই সমস্ত পবিত্র বস্তু হারাম করে দিয়েছেন।

www.eelm.weebly.com

জুহাক বলেছেন, বনি ইসরাইলের জন্য কোনো খাদ্যই হারাম ছিলো না। তওরাতেও এ সমস্ত বিষয়ে হারামের নির্দেশ আসেনি। বরং তারা তাদের পিতা ইসরাইলের (ইয়াকুব আ. এর) অনুসরন করতে গিয়ে বিভিন্ন খাদ্য হারাম করে নিয়েছিলো। পরে তারা হারামের বিধান আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কিত করে দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মিথ্যাকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। জুহাকের এই বর্ণনাটি ভুল। ইতোপূর্বে আল্লাহ্ আয়ালার এরশাদ থেকে আল্লাহ্ কর্তৃক তাদের জন্য বিভিন্ন খাদ্য বস্তুর হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বোখারী, মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ইহুদীদের উপর আল্লাহ্‌তায়ালার অভিসম্পাত। চর্বি হারাম ছিলো বলে তারা চর্বি খেতো না বটে কিন্তু চর্বির বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভক্ষণ করতো।

আল্লাহ্‌তায়ালা ইহুদীদেরকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন, তোমরা সত্যবাদী হলে তওরাত আনো এবং পড়ে দেখো যে, তওরাতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, তাদের জন্য সমস্ত খাদ্যই হালাল ছিলো। তারা নিজেরা ইচ্ছা করেই কোনো কোনো খাদ্যকে হারাম করে নিয়েছিলো। এই ঘোষণা শুনে নির্বাক হয়ে গেলো ইহুদীরা। প্রতিষ্ঠিত হলো হজরত রসুলুল্লাহ স. এর নবুয়তের সত্যতা এবং মিল্লাতে ইব্রাহিমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রমান। যারা প্রতিষ্ঠিত সত্যকে প্রশ্নাকীর্ণ করতে চায়, তারা অবশ্যই সীমালংঘনকারী, জালেম।

আল্লাহ্‌তায়ালার কথা স্বতঃসিদ্ধ, সত্য। তাই সত্য এরশাদ হচ্ছে, একনিষ্ঠ ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো। এই ধর্মাদর্শ যেমন হজরত ইব্রাহিমের, তেমনি হজরত মোহাম্মদ স. এরও। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের ধর্মাদর্শ সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ বরং এক।

তিনি স. ইসরাইলী নবীদের মতো নন। হজরত মুসা আ. এর শরিয়ত প্রচার ব্যপদেশেই প্রেরিত হয়েছিলেন বনি ইসরাইলের নবীগন। কিন্তু হজরত মোহাম্মদ স. নিজেই সাহেবে শরিয়ত। হজরত ইব্রাহিমের নয়, বরং হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শের অনুসরন করার নির্দেশ এসেছে এজন্য যে, হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ মূলতঃ রসুল স. এর ধর্মাদর্শ। এই ধর্মাদর্শের নাম ইসলাম।

মিল্লাত (ধর্মাদর্শ) শব্দটি এসেছে আমলাত শব্দ থেকে। নবীগণ এই ধর্মাদর্শ পেয়ে থাকেন আল্লাহতায়ালার নিকট থেকে। কিন্তু ধর্মাদর্শ তাঁদের। যেমন, মিল্লাতে ইব্রাহিম, মিল্লাতে মুসা, মিল্লাতে মোহাম্মদ স.। নামাজ, জাকাত অথবা রোজাকে মিল্লাত বলা যায়না। মিল্লাত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ শরিয়ত। মিল্লাতের পরিচিতি আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। তাই মিল্লাতে আল্লাহ বলা বৈধ নয়। অপরদিকে, এই পরিচয় বান্দাদের সঙ্গেও সম্পৃক্ত নয়। যেমন, মিল্লাতে জায়েদ, মিল্লাতে ওমর — এরকমও বলা যায় না। নবীগণের মিল্লাত বা ধর্মাদর্শের মাধ্যমে মানুষ

www.eelm.weebly.com

আল্লাহতায়ালার নৈকট্যশীল হতে পারে। ইহ, পরকাল দুই জগতের সফলতা লাভ করতে পারে। নবীদের মিল্লাতের অনুসরণ তাই সাধারন মানুষের জন্য অপরিহার্য।

মিল্লাতে ইব্রাহিমী শব্দটির সঙ্গে হানীফা শব্দটি যুক্ত হয়েছে। হজরত ইব্রাহিমের মতাদর্শ ছিলো হানীফ। অর্থাৎ মধ্যবর্তীতার সৌন্দর্যমন্ডিত। কম নয় বেশীও নয়। ইহুদীদের মতো অতি কঠোর নয়। খৃষ্টানদের মতো অতি কোমলও নয়। ওই দুই অতিরিক্ততা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন প্রকৃত মধ্যবর্তীতার উপর, সত্যের উপর। ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো অংশীবাদিতা থেকেও তিনি ছিলেন পূর্ণ মুক্ত।

বাগবী লিখেছেন, ইহুদীরা মুসলমানদের নিকট বলে বেড়াতো, আমাদের কেবলা প্রাচীন এবং নবীগণের হিজরতের স্থান। তাই আমাদের কেবলা কাবার চেয়ে উত্তম। মুসলমানগণ উত্তর দিতেন, তোমাদের কেবলা অপেক্ষা আমাদের কেবলাই উত্তম। এ রকম বিতর্ক ব্যপদেশেই অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৯৬

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَٰرَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ ○

❐ মানব জাতির জন্য সর্ব প্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তো বাক্কায়, উহা আশীস-প্রাপ্ত ও বিশ্ব-জগতের দিশারী।

সর্বপ্রথম গৃহ অর্থ সর্বপ্রথম ইবাদতের গৃহ। মানুষের হজ সম্পাদনের জন্য আল্লাহ্ যে গৃহ নির্মাণ করেছিলেন, সেই গৃহ। হাসান ও কালাবী বলেছেন, এর অর্থ সর্বপ্রথম মসজিদ যা আল্লাহ্তায়ালার ইবাদতের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। সেই প্রথম ইবাদতের গৃহের অবস্থানস্থল মক্কা। এই আয়াতে অবশ্য মক্কার স্থলে বাক্কা শব্দটি এসেছে। বাক্কা ও মক্কা মূলতঃ একই অর্থবোধক শব্দ। আরববাসীরা মিম এর স্থলে বা উচ্চারন করতে অভ্যস্ত। তাই মক্কা হয়েছে বাক্কা। কেউ কেউ বলেছেন, পুরো শহরের নাম মক্কা আর বাক্কা শুধু ওই স্থানটুকু যেখানে রয়েছে কাবা শরীফ। অথবা আয়তাকার তাওয়াফের স্থান সহ কাবা শরীফ। বাক্কা এর আরেক অর্থ ভীড়। হজের সময় মক্কায় মানুষের ভীড় হয় অত্যধিক — এজন্য মক্কাকে বাক্কা বলা হয়।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জোবায়ের বর্ণনা করেন, শ্রেষ্ঠ অত্যাচারীরা এখানে পর্যুদস্ত হয়েছে যেমন, আবরাহা তার সৈন্যসামন্ত সহ কাবা শরীফ ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিলো – আল্লাহ্ তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। মক্কায় ছিলো পানির প্রচন্ড সংকট। তাই এই শহরের নাম হয়েছে মক্কা। কারণ, মক্কা অর্থ — পানিসংকট।

www.eelm.weebly.com

'সর্বপ্রথম গৃহ' সম্পর্কে আলেমদের মত রয়েছে বিভিন্ন রকমের। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, মুজাহিদ, কাতাদা এবং সুদ্দী বলেছেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির সময় পানির উপর সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছে কাবার স্থানটুকু। প্রথমে ওই স্থানটুকু শাদা হয়ে জমাট বেঁধেছিলো। পৃথিবী সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে ঘটেছিলো এই ঘটনা। তারপর এর নিচ থেকে উদ্ভাসিত হয়েছিলো পৃথিবী।

হজরত আলী বিন হোসেইন এবং জয়নাল আবেদীন বলেছেন, আল্লাহ্ আরশের নিচে একটি ঘর নির্মাণ করেছিলেন এবং আকাশের ফেরেশতাদেরকে সেই ঘর তাওয়াফ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে ঘরের নাম বায়তুল মামুর। এরপর পৃথিবীর ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেনো পৃথিবীতে বায়তুল মামুরের অনুরূপ একটি ঘর বানায়। এই নির্দেশানুসারে নির্মিত হলো কাবা। এর নাম রাখলেন, সুরাহ্। পৃথিবীবাসীকে পুনঃনির্দেশ দিলেন, আকাশবাসীদের বায়তুল মামুর তাওয়াফের মতো তোমরাও সুরাহ্ তাওয়াফ করো। বিভিন্ন আলেম বলেছেন, হজরত আদম আ. এর জন্মের দুই হাজার বছর আগে ফেরেশতারা কাবা শরীফ নির্মান করেছেন এবং হজ করেছেন। হজরত আদম আ. এর হজ সমাধার পর ফেরেশতারা বলেছিলেন, আপনার হজ কবুল হয়েছে। আমরা আপনার দুই হাজার বছর আগে হজ করেছি।

এক বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাসের মত উল্লেখ রয়েছে এরকম, সর্বপ্রথম পৃথিবীতে কাবা নির্মান করেছিলেন হজরত আদম আ.। আজরুকী তার মক্কার ইতিহাসে একথা লিখেছেন।

হজরত আবু জরের বর্ণনায় এসেছে, হে আল্লাহ্র রসুল! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি স. বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, তারপর? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি বললাম, এ দুই মসজিদ নির্মানকালের ব্যবধান কতোটুকু? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। অতঃপর যেখানে নামাজের সময় হয়ে যায় পড়ে নিও। এতেই রয়েছে ফযীলত। বোখারী, মুসলিম। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, সর্বপ্রথম কাবা নির্মাণ করেছিলেন হজরত আদম আ.। নূহ আ. এর মহাপ্লাবনের সময় কাবাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, মহাপ্লাবনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো কাবা শরীফ। পরবর্তীতে ইব্রাহিম আ. কাবা পুনঃনির্মাণ করেন। তারপর করেন যুরহাম গোত্র। তারপর আমালেকা সম্প্রদায়। তারপর কোরাইশগণ।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং বায়হাকী বলেছেন, মহাপ্লাবনের সময় আল্লাহ্ কাবা ঘরটি উঠিয়ে নিয়েছিলেন। পরে হজরত ইব্রাহিম আ. পুনঃনির্মাণ করতে চাইলে আল্লাহ্ তাঁকে কাবার স্থান দেখিয়ে দেন এভাবে — হিজুজ নামে এক পশু পাঠালেন আল্লাহ্ । সেই পশুটি মাটি উঠিয়ে কাবা শরীফের

www.eelm.weebly.com

ভিত্তি চিহ্নিত করে দেয়। ওই ভিত্তির উপরেই হজরত ইব্রাহিম কাবা পুনঃনির্মাণ করেন। হিজুজ পশু, কিন্তু তার পাখির মত দু'টি ডানা ছিলো; আর আকৃতি ছিলো সাপের মতো।

হজরত আলী বলেছেন, সময়ের দিক থেকে নয়, কাবা শরীফ সর্বপ্রথম অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট ইমারত সম্মানের দিক থেকে। জুহাক বলেছেন, কাবা শরীফই সর্বপ্রথম ঘর যাকে বরকত দান করা হয়েছে। কাবা দর্শনের বিনিময় ও সওয়াব অত্যধিক। বিভিন্ন ইবাদত কাবার সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন, হজ, হজের কোরবানী, ওমরাহ, তাওয়াফ ইত্যাদি।

কতিপয় ইবাদত এমন যা অন্য স্থানে সম্পাদনের তুলনায় কাবা শরীফে সম্পাদনে সওয়াব তুলানমূলকভাবে বেশী। যেমন, নামাজ, রোজা, ইতেকাফ। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, মসজিদে হারামে মানতকৃত দু'রাকাত নামাজ সেখানেই পড়তে হবে। অন্য স্থানে পড়লে হবে না। হজরত আনাস ইবনে মালেকের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, বাসগৃহে নামাজ পড়লে একগুন, মহল্লার মসজিদে পঁচিশগুন, জামে মসজিদে পাঁচশতগুন, মসজিদে আকসায় এক হাজার, আমার মসজিদে (মদীনায়) পঞ্চাশ হাজার এবং মসজিদে হারামে একলক্ষ গুন সওয়াব পাওয়া যায়। ইবনে মাজা, তাহাবী।

হজরত আতা বিন জোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার এই মসজিদের এক নামাজ মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য মসজিদের হাজার নামাজ অপেক্ষা উত্তম এবং মসজিদে হারামের এক নামাজ আমার এই মসজিদের শত নামাজ অপেক্ষা উত্তম। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জোবায়ের, হজরত ওমর থেকেও এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে গায়ের মারফু হিসেবে। হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে মারফু হিসেবে ইবনে জাওজীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, মসজিদে হারামের এক নামাজ এক লক্ষ নামাজ থেকে উত্তম। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, নামাজের এই ফযীলত কেবল ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নফলের ক্ষেত্রে নয়। কেননা হজরত জায়েদ বিন সাবেতের বর্ণনা সূত্রে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ফরজ নামাজ ব্যতীত অন্যান্য নামাজ নিজ গৃহে পাঠ করাই উত্তম। বোখারী, মুসলিম।

আমি বলি, ইতেকাফের হুকুমও ফরজ নামাজের মতো। কেননা ইতেকাফকারী এমন অবস্থায় ফরজ নামাজের অপেক্ষা করতে থাকে, যেমন সে যেনো নামাজের মধ্যেই রয়েছে।

ইবনে জাওজী তাঁর ফাজায়েলে মক্কা কিতাবে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আদী বিন আল হামরা থেকে লিখেছেন, রসুল স. মক্কার বাজারের হারুরা নামক স্থানে দাঁড়িয়ে এরশাদ করলেন, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র পৃথিবীতে তুমি সর্বাপেক্ষা

www.eelm.weebly.com

উত্তম এবং আল্লাহ্‌র নিকট তুমি সবচেয়ে বেশী প্রিয়। যদি আমাকে তোমার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া না হতো, তবে আমি স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হতাম না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে জাওজী এই হাদিসটি মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে — এই গৃহ বিশ্বজগতের দিশারী, হেদায়েতের প্রাণ কেন্দ্র এবং সকলের কেবলা (লক্ষ্যস্থল)। এতে করে আল্লাহ্‌ এবং রসুল স. এর উপর ইমান আনয়নের দিশা দেয়া হয়েছে।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৯৭

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ○

❒ উহাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন ইব্রাহীমের দাঁড়াইবার স্থান; এবং যে কেহ সেথায় প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যাহার সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে আল্লাহের উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্ব করা তাহার অবশ্য কর্তব্য। এবং কেহ প্রত্যাখ্যান করিলে সে জানিয়া রাখুক আল্লাহ্‌ জগতের উপর নির্ভরশীল নহেন।

কাবা শরীফের সীমানায় অনেক প্রকার নিদর্শন রয়েছে। যেমন, পাখি কাবা গৃহের উপর দিয়ে উড়েনা। শিকারযোগ্য কোনো প্রাণী তাড়া খেয়ে কাবার সীমানায় প্রবেশ করলে শিকারী প্রাণী সেখানে প্রবেশ করে না। হজরত ইব্রাহিমের দাঁড়াবার স্থান (মাকামে ইব্রাহিম) আরেকটি বিস্ময়কর নিদর্শন। মাকামে ইব্রাহিম ওই পাথরের নাম যার উপর দাঁড়িয়ে হজরত ইব্রাহিম আ. বায়তুল্লাহ্‌র দেয়াল গেঁথেছিলেন। ওই পাথরে রয়েছে তাঁর পদচিহ্ন। হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও সেই পবিত্র চিহ্ন এখনো স্পষ্ট। অসংখ্য শত্রু থাকা সত্ত্বেও সেই চিহ্ন এখনো সুসংরক্ষিত। এখনো কাবা সকল কিছুর কেবলা, লক্ষ্যস্থল। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হেরেম শরীফের পুরো সীমানাই মাকামে ইব্রাহিম। এই সীমানায় যে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। ইসলাম পূর্ব সময়েও হেরেমে প্রবেশকারী ব্যক্তির উপর কোনো অত্যাচার করা হতো না, যদিও তখন আরববাসীরা হত্যাকান্ড, লুটতরাজ ইত্যাকার কর্মে লিপ্ত ছিলো। হাসান, কাতাদা এবং অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে এই আয়াতের মতো অন্য আরেকটি আয়াত রয়েছে সুরা

www.eelm.weebly.com

আনকাবুত পারা ২১ আয়াত নং ৬৭। যেমন, 'এবং তারা কি দেখেনি যে আমি মক্কাকে নিরাপদ হরম বানিয়েছি এবং তার পার্শ্ববর্তী লোকদের বহিষ্কার করা হচ্ছে।'

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হেরেমের অভ্যন্তরে আগত ব্যক্তি নিরাপদ, তাকে হত্যা করা অবৈধ। কেউ হেরেমের বাইরে অপরাধ করার পর হেরেম শরীফে আশ্রয় নিলে, যতোক্ষণ সে সেখানে থাকবে ততোক্ষণ কেসাস অথবা হদ কার্যকর করা যাবে না (খুনের বদলে খুনকে কেসাস এবং শরিয়ত নির্ধারিত সকল শাস্তিকে হদ বলে)। এরকম ব্যক্তির পানাহার বন্ধ করে দিতে হবে। লেনদেনও স্থগিত রাখতে হবে, যেনো অপারগ হয়ে সে হেরেম শরীফ থেকে বের হয়ে আসতে বাধ্য হয়। তখনই কেবল তার প্রতি শাস্তি কার্যকর করা যাবে। হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বাইরে অপরাধ করে হেরেমে প্রবেশ করলে সেখানে তার কেসাস নেয়া যাবে। তবে এ ব্যাপারে ওলামাদের ঐকমত্য রয়েছে যে, হেরেমের অভ্যন্তরে অপরাধ সংঘটনকারীকে সেখানেই শাস্তি দেয়া যাবে। কোনো কাফের পরাজিত হয়ে হেরেমে আশ্রয় নিলে, তাকে ধাক্কা দিয়ে অথবা তলোয়ার উঁচিয়ে অথবা চাবুক মেরে সেখান থেকে বের করে দিতে হবে অথবা সেখানেই তাদেরকে বন্দী রেখে তাদের পানাহার ও প্রয়োজনীয় রসদপত্র বন্ধ করে দিতে হবে। যেনো তারা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বেরিয়ে আসার পর তাদেরকে হত্যা করা যাবে। আর যদি কোনো কাফের হেরেমের ভিতরে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে, তবে মুসলমানদের জন্য হেরেমের ভিতরেই যুদ্ধ করা বৈধ।

হেরেমে প্রবেশকারী নিরাপদ — এ কথাটি বিজ্ঞপ্তিমূলক হলেও এতে রয়েছে এরকম হুকুম, যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করে তাকে নিরাপত্তা দাও। কোনো কোনো আলেম অর্থ করেছেন, যে ব্যক্তি হেরেমের সম্মান বজায় রেখে আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য অর্জনার্থে সেখানে প্রবেশ করবে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তায়ালার আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে। আবু দাউদ, তায়ালুসি মসনদে এবং বায়হাকী শোয়াবুল ইমানে হজরত আনাসের বর্ণনাসূত্রে এবং তিবরানী কবীরের মধ্যে, বায়হাকী শোয়াবুল ইমানে হজরত সুলায়মানের বর্ণনাক্রমে এবং তিবরানী আওসাতের মধ্যে হজরত জাবেরের বর্ণনা থেকে এবং দারাকুতনী সুনানের মধ্যে হজরত হাতেবের বর্ণনাসুত্রে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দুই হেরেমের যে কোনো একটিতে মৃত্যুবরণ করবে কিয়ামতের দিন সে হবে দোজখ থেকে নির্ভয়।

হারেস বিন আবু উসামা মসনদের মধ্যে সালেম বিন আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আমাকে আবুবকর ও

www.eelm.weebly.com

ওমরের সাথে উঠানো হলে আমরা জান্নাতুল বাকীতে যাবো। জান্নাতুল বাকীর অধিবাসীরাও উঠে আমাদের সঙ্গে যোগ দিবেন। অতঃপর আমরা মক্কাবাসীদের প্রতীক্ষায় থাকবো। তারা এসে গেলে আমাকে রাখা হবে দুই হেরেমের অধিবাসীদের মধ্যবর্তী স্থানে। আবু নাঈম তাঁর দালায়েলে নবুয়ত পুস্তকে সালেম বিন আবদুল্লাহ্‌র মাধ্যমে হজরত আবদুল্লাহ্‌র মিলিত বর্ণনায় এবং খতিব, নাফে এর মাধ্যমে হজরত ওমরের বর্ণনায় বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আমাকে উঠানো হবে আবুবকর ও ওমরের মধ্য থেকে। আমি তখন হারামাঈনের (মক্কা ও মদীনার) মধ্যস্থলে গিয়ে দাঁড়াবো। মক্কা ও মদীনাবাসীরা সেখানে আমার সাথে মিলিত হবে।

কাবা গৃহে উপস্থিত হয়ে হজ সম্পাদন করা সামর্থবান ব্যক্তির জন্য ফরজ। তদেরকে হতে হবে স্বাধীন, জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও উন্মাদের জন্য হজ ফরজ নয়। গোলামের উপরও ফরজ নয়। এই সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যনির্ভর।

কাফের, বুদ্ধিমান বালক ও গোলাম হজ্ব করলে কাফেরের জন্য মুসলমান হওয়ার পর, বালকের জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর এবং গোলামের জন্য আজাদ হওয়ার পর হজ ওয়াজিব হবে। আগের হজ ধর্তব্য নয়। এ মতের সমর্থনে রয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদিস। এই হাদিস বর্ণনা করেছেন হাকেম। ইসলামপূর্ব সময়ে দূরবর্তী গ্রামের অমুসলমানেরা ও আরবের অন্যান্য মুশরিকেরাও হজ করতো। শায়েখাইনের শর্ত মোতাবেক হাকেম বর্ণিত এই হাদিসটি ইবনে আবী শাইবা তাঁর মোসান্নাফের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। মোহাম্মদ ইবনে কা্‌াব কুরজী থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ । তাঁর বর্ণনা মুরসাল । হজরত জাবের থেকেও এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার সুত্রশৃঙ্খল দুর্বল। উম্মতেরা এই সমস্ত হাদিস কবুল করেছেন। এগুলোর বিষয়বস্তুর উপর উম্মতেরা একমত হয়েছেন । কারন, একজন বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হলেও বর্ণনাগুলো সর্বজনবিদিত (মোতাওয়াতির)। তাই আয়াতে কেবল সামর্থবান মানুষের কথা উল্লেখ থাকলেও বালক, পাগল ও গোলাম হজের হুকুমবহির্ভূত হবে।

হজ অর্থ ইচ্ছা করা। এ স্থানে এর অর্থ হবে এক বিশেষ ইবাদতের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা। ব্যাপারটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। রসুল স. এর জীবনযাপনে যেমন এর ব্যাখ্যা রয়েছে, তেমনি ব্যাখ্যা রয়েছে কোরআনের অন্যান্য আয়াতেও। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, 'অতঃপর তোমরা সেই স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করো যেস্থান থেকে অন্য লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে।' অন্য স্থানে বলেছেন, 'এবং তারা ওই সম্মানিত গৃহের তাওয়াফ করে।' প্রথম আয়াতে রয়েছে আরাফাতে রওয়ানা হওয়ার বর্ণনা। পরের আয়াতে রয়েছে কাবা শরীফ তাওয়াফের নির্দেশ।

www.eelm.weebly.com

হজ শব্দটির হা এর নিচে যের দিয়ে পাঠ করেছেন আবু জাফর, হামজা, কুসায়ী এবং হাফ্স। এরকম পাঠ নজদবাসীদের মধ্যে প্রচলিত। অন্যান্য ক্বারীগণ হজকে হা এর উপর জবর দিয়ে পড়েছেন। হেজাজবাসীগণ এরকম পাঠে অভ্যস্ত। দু'টি পাঠই একার্থবোধক। মাদারেক রচয়িতা লিখেছেন, হা এ যের দিলে বিশেষ্য এবং জবর দিলে কৃদন্ত পদ হয়।

মাসআলা ঃ উম্মতের ঐকমত্য এই যে, হজ ইসলামের একটি স্তম্ভ — ফরজে আইন। হজরত ইবনে ওমর রা. বলেছেন, রসুল স. এর এরশাদ রয়েছে, পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি — লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স্বীকার করা, নামাজ আদায় করা, জাকাত দেয়া, হজ করা এবং রমজান শরীফে রোজা রাখা। বোখারী, মুসলিম। হজ ফরজ হওয়া সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

হজরত ওমর বলেছেন, যে হজ ছেড়ে দেবে তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করবো; যেমন যুদ্ধ করবো নামাজ রোজা ছেড়ে দিলে।

হজরত কাতাদার অনুকূলে ঐকমত্য পোষন করে ইমাম আবু হানিফার মত সহ কাজীখান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, সমুদ্র প্রতিবন্ধক হলে হজ ফরজ নয়। স্মর্তব্য যে, জিহুন, সিহুন, দজলা ও ফোরাত কিন্তু সমুদ্র নয়। আলেমদের ঐকমত্য এই যে, হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য পথের নিরাপত্তা জরুরী। পথ পরিক্রমণকালে পানাহারের ব্যবস্থা থাকাও জরুরী। পথের শংকাকুলতা হজ ফরজ হওয়ার প্রতিবন্ধক। পথে সমুদ্র পড়লে শান্তিপূর্ণভাবে সমুদ্র পাড়ি দেয়া সম্ভব হলে হজ ওয়াজিব হবে। পাড়ি দেয়া সম্ভব না হলে ওয়াজিব হবেনা। কেবল সমুদ্র থাকলেই হজ বন্ধ করা যাবেনা। ইমাম শাফেয়ীর মত অবশ্য অন্যরকম। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, হজ্বের জন্য শারীরিক সুস্থতাও শর্ত। অত্যধিক দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তির উপর হজ ওয়াজিব নয়। এরকম ব্যক্তি অন্য কাউকে প্রতিনিধি করে হজ্বে পাঠাতে পারে। হজ শারীরিক ইবাদত। এই ইবাদতে শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে হয়। অন্য কাউকে পাঠালে অবশ্য ইবাদতের আসল উদ্দেশ্যটি অনর্জিত থেকে যায়।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, শারীরিক সুস্থতা শর্ত নয়। তাঁদের মতে অক্ষম, পঙ্গু এবং দুর্বল ব্যক্তিও সামর্থবান। কেননা তারা সম্পদশালী। বাগবী এই মতের সমর্থনে লিখেছেন, ওই সম্পদশালী ব্যক্তি অবশ্যই গৃহ প্রস্তুত করতে সক্ষম, যে সম্পদ খরচ করতে পারে। নিজে শ্রম দিতে সক্ষম না হলেও সে যে গৃহ প্রস্তুত করার সামর্থ রাখে একথা বলতেই হবে।

আমরা বলি, শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিকে হজ করতে সামর্থবান বলা যায় না। তবে অন্যের দ্বারা সে বদলী হজ করাতে পারবে। গৃহনির্মাণের সঙ্গে হজ সম্পাদন তুলনীয় হতে পারেনা। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মোহাম্মদ হজরত

www.eelm.weebly.com

ইবনে আব্বাসের বর্ণনাসূত্রে উপস্থাপিত করেছেন যে, ফজল বিন আব্বাস রসুল স. এর পশ্চাতে ছিলেন, এমন সময় খায়সাম গোত্রের এক মহিলা এলেন। ফজল তার দিকে তাকালেন, তিনিও ফজলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রসুল স. ফজলের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। মহিলা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার পিতার উপর যখন হজ ফরজ হলো, তখন তিনি অতিশয় বৃদ্ধ। উটের পিঠে তিনি হেলান দিয়ে বসতেও সমর্থ নন। আমি কি তার বদলে হজ করতে পারবো? দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, তিনি ঠিকমতো উটের পিঠে বসতেই পারেন না। আমি তার পরিবর্তে হজ করলে কি তা আদায় হবে? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। এই ঘটনা বিদায় হজ্বের সময়ের। বোখারী, মুসলিম।

এই হাদিসটি আহাদ (একজন বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত)। ক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে কোরআন দ্বারা। হাদিসে আহাদ দ্বারা কোরআন রহিত করা যায় না। কোরআনে রয়েছে সামর্থবান হওয়ার শর্ত। এমতাবস্থায় মহিলার প্রশ্নটি হবে এ রকম, আমার পিতা তো সামর্থই রাখেন না। আমি কি তার পরিবর্তে হজ করবো? অর্থাৎ আমি তার পক্ষে হজ করলে বৈধ হবে কি? অথবা এ রকম অর্থ হতে পারে, আমি হজ করলে তাঁর সওয়াব লাভ হবে কি? হুজুর স. এর এরশাদের অর্থ হবে এ রকম, তার উপর হজ ফরজ না হলেও তার পক্ষে তুমি হজ আদায় করলে অবশ্যই তার উপকার হবে।

ওই বৃদ্ধ ব্যক্তির উপরে হজ ফরজ ছিলো কি না, এ কথা স্পষ্ট বোঝা না গেলেও মহিলার কথায় বোঝা যায়, তিনি বুঝেছিলেন যে, তার পিতার উপরে হজ ফরজ হয়েছিলো। মহিলার এ ধারণা সঠিক না হলে রসুল স. বলে দিতেন, তোমার ধারণা ভুল। বৃদ্ধ পিতার পক্ষে হজ করতে পারবে কি না জিজ্ঞেস করায় রসুল স. অনুভব করেছিলেন, ওই মহিলার অন্তরে বৃদ্ধ পিতাকে সওয়াব পৌছানোর আকাংখা প্রবল। এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে। আবদুর রাজ্জাক ওই বর্ণনাটি উপস্থাপিত করেছেন এইভাবে, রসুল স. বলেছেন, পিতার পক্ষ থেকে হজ করে নিও। এতে তার কল্যাণ না হলেও অকল্যাণ তো আর হবে না। হাদিসবেত্তাগণ বর্ণনাটিকে শাজ বলেছেন (ন্যায়ানুগতাবিহীন ও স্মৃতিবিশৃঙ্খলাহীন বর্ণনাকে শাজ বলে)। প্রমাণ হিসাবে শাজ গ্রহণীয় নয়।

এই আলোচনাটির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসাই শোভনীয় যে, সুস্থাবস্থায় হজ ফরজ হলে ফরজ আদায়ের পূর্বেই যদি কেউ দৈহিকভাবে সামর্থহীন হয়ে পড়ে তবে ফরজ রহিত হবে না। জীবিত অবস্থায় তাকে আপন সম্পদ ব্যয় করে কাউকে দিয়ে হজ করাতে হবে। মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলে হজ্বের অসিয়ত করে যেতে হবে।

www.eelm.weebly.com

হজ ব্যতীত মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেউ তার পক্ষ থেকে হজ করবে। অথবা তার সম্পদ খরচ করে অন্য কাউকে দিয়ে হজ করাতে হবে। তার হজের কাজা আদায় করা জরুরী। তবে এই মতটি কিয়াস বহির্ভূত। বিষয়টি বুদ্ধিবাদিতাবিরোধী হলেও এই হাদিসে এর হুকুম পরিদৃষ্ট হয়। বুদ্ধি-বিরুদ্ধ বিষয়ও মান্য করতে হয়। যেমন, রোজা রাখতে অসমর্থ অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি রোজার ফিদিয়া প্রদান কিতাবুল্লাহর ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে (বুদ্ধিবিরুদ্ধ হলেও বিষয়টিকে মেনে নেয়া ওয়াজিব)।

হুদাইবিয়ার সন্ধির বছরে অর্থাৎ ষষ্ঠ হিজরীতে হজ ফরজ হয়েছে। তখন আল্লাহতায়ালা জানিয়েছেন, 'তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরাহকে পূর্ণ করো।' হুদাইবিয়ার প্রসঙ্গ এ কারণে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সম্ভবত ওই মহিলার পিতা ষষ্ঠ হিজরীর পরে বিদায় হজ্বের পূর্বে অসমর্থ হয়ে পড়েছিলেন। আল্লাহ্তায়ালাই ভালো জানেন।

ইমাম সাহেবের নিকট হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য দৃষ্টিশক্তি থাকা শর্ত। দৃষ্টিহীন ব্যক্তির উপর হজ ওয়াজিব নয় যদিও তার পথপ্রদর্শনকারী থাকে। নিজে সমর্থ হওয়া এবং অন্যের সাহায্যে সমর্থশীল হওয়া এক কথা নয়। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ এবং অন্য অনেকের মতে দৃষ্টিহীন ব্যক্তির উপরও হজ ফরজ। তবে শর্ত হলো, তার নিকট পথপ্রদর্শক থাকতে হবে। এই ধরনের মতবিরোধ রয়েছে জুমআ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রেও।

ইমাম আবু হানিফার মতে ওই মহিলার হজ আদায় করা ওয়াজিব, যার সাথে তার স্বামী অথবা অন্য কোনো মাহরাম (যে পুরুষের সঙ্গে বিবাহ অসিদ্ধ) থাকে এবং মক্কার দূরত্ব হয় তিন মঞ্জিল। ইমাম আহমদের মতে, দূরত্ব কমবেশী ধর্তব্য নয়। সকল অবস্থায় মাহরাম ব্যতীত মহিলার উপর হজ ওয়াজিব হবে না। মাহরাম না থাকলে অথবা থাকা সত্ত্বেও সাথে যেতে না চাইলে অথবা মহিলার পক্ষে আদায় করা সম্ভব নয় এমন বিনিময় চাইলে হজ ওয়াজিব হবে না। কেননা শরিয়তে স্বামী অথবা মাহরাম ব্যতীত সফর করা মেয়েদের জন্য নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। কাজেই মাহরাম ব্যতীত মেয়েদেরকে সামর্থশালিনী মনে করা যাবে না।

ইমাম সাহেবের মতের সমর্থনে রয়েছে ওই হাদিসটি যা বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর। তিনি বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কোনো নারী যেনো মাহরাম ব্যতীত তিন মঞ্জিলের অধিক দুরত্বের সফর না করে (এক মঞ্জিলের দূরত্ব এক দিনে অতিক্রমযোগ্য পথ) বোখারী, মুসলিম।

মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসবতী রমনীর জন্য মাহরাম ব্যতীত তিন রাতের সমদূরত্বের পথ সফর করা বৈধ নয়। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিন রাতের বেশী দূরত্বের পথ। এই বর্ণনাটি

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা থেকে উদ্ধৃত করেছেন তাহাবী। তিনি আরেকটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন আমর বিন শোয়ায়েবের পিতামহ থেকে। হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় রয়েছে, তিন দিন অথবা তদপেক্ষা বেশী দূরত্বের কথা। বর্ণনাকারী মুসলিম ও তাহাবী। তিন রাতের উপর অথবা তদপেক্ষা বেশীর উল্লেখ রয়েছে মুসলিমের বর্ণনায়।

ইমাম আহমদ বলেন, ঘটনাক্রমে তিন রাত অথবা বেশী শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সময় নির্দিষ্ট করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। ইমাম আবু হানিফার মতে মহিলাদের জন্য মাহরাম ব্যতীতই তিন দিনের কম দূরত্বের সফর জায়েয। ইমাম আহমদ বলেছেন, নাজায়েয। তাঁর কথার সমর্থনে রয়েছে হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত এবং বোখারী ও মুসলিম পরিবেশিত একটি হাদিস। সেখানে একদিন ও এক রাতের কথা বলা হয়েছে। মুসলিমের এক বর্ণনায় একদিনের এবং অন্য বর্ণনায় এক রাতের দুরত্বের কথা বলা হয়েছে। হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনা রয়েছে দুই দিনের এবং তাহাবীর বর্ণনায় রয়েছে দুই রাতের কথা।

আবু দাউদ এবং তাহাবী, হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, স্বামী অথবা মাহরাম ব্যতীত কোনো নারী যেনো এক মঞ্জিলও সফর না করে। ইবনে হাব্বান বলেছেন হাদিসটি বিশুদ্ধ। হাকেম বলেছেন, এই শর্তটি মুসলিমের অনুরূপ। তিবরানী বলেছেন তিন মাইলের কথা। বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা এ কথাই বোঝা যায় যে, একদিন, দুই দিন, তিন দিনের শর্ত কেবলই দৃষ্টান্ত — এ ক্ষেত্রে সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য নয়। নিম্নতম সংখ্যা এক। আধিক্য শুরু হয় দুই থেকে এবং বহুবচনের প্রথম স্তর হলো তিন। কোনো কোনো হাদিসে মহিলাদের সফর শর্ত ব্যতিরেকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, কোনো রমনী যেনো মাহরাম ব্যতীত সফর না করে এবং মাহরামের অনুপস্থিতিতে তার নিকট কোনো অপরিচিত ব্যক্তি না আসে। এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি অমুক যুদ্ধে যেতে চাই। আর আমার স্ত্রী যেতে চায় হজ্বে। রসুল স. বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে যাও। বোখারী, মুসলিম। এ ধরনের হাদিস রয়েছে হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনাতেও।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মহিলারা কোনো বিশ্বস্ত মহিলার সাথে হজ্বে যেতে পারে। কিন্তু ওই সমস্ত বিশ্বস্ত মহিলাদের কোনো একজনের সঙ্গে মাহরাম পুরুষ থাকতে হবে। মিনহাজ কিতাবে কিন্তু এ শর্তের উল্লেখ নেই। এক বর্ণনায় ইমাম শাফেয়ীর মত হিসাবে এ রকম এসেছে যে, মহিলারা বিশ্বস্ত মহিলা ছাড়াই হজ করতে পারবে। ইমাম মালেক বলেছেন, পথ ভয়ভাবনা মুক্ত হলে পুরুষ ব্যতীতই মহিলারা দলবদ্ধভাবে হজ্বে যেতে পারবে। এই দুই ইমামের প্রতিকূলে আমাদের

www.eelm.weebly.com

হাতে প্রমাণ হিসাবে রয়েছে ওই হাদিস, যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। সক্ষমতা অর্থ এমন সক্ষমতা যাতে হজ্বে যেতে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। এ জন্য জমহুরের মতে সফরের বিবিধ প্রয়োজন ব্যতীত পাথেয় ও বাহন সমর্থশীল হওয়ার জন্য জরুরী। ঋণগ্রস্ত না হওয়াও জরুরী। পরিবার পরিজনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করে যাওয়াও জরুরী। পাথেয় ও বাহন না থাকলে সাধারণভাবে সে সফর করার অযোগ্য। শরিয়ত সকল প্রকার অসুবিধা থেকে মুক্ত থাকা শর্ত করে দিয়েছে, বল প্রয়োগ করেনি।

মক্কাবাসী নয় এমন ব্যক্তিকে তার সন্তানেরা পাথেয় ও বাহনের ব্যবস্থা করে দিলেও তাকে সক্ষম মনে করা যাবে না। ইমাম শাফেয়ীর মত এই মতের বিরুদ্ধে। পাথেয় ও বাহনের ব্যবস্থাকারী যদি অন্য ব্যক্তি হয়, তবে এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী থেকে দুই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি হাঁ বাচক, অন্যটি না বাচক। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, এ রকম ব্যক্তিকে ইমাম শাফেয়ী ক্ষমতাহীন বলেই মনে করেন।

দাউদ জাহেরী বলেছেন, হজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য পথখরচ ও বাহনের প্রয়োজন নেই। ইমাম মালেক বলেছেন, যদি কেউ ভিক্ষা করে অথবা পথে রোজগার করতে পারে তবে তার জন্য পথ খরচের শর্ত নেই। আর পায়ে হাঁটতে সক্ষম হলে বাহনেরও শর্ত নেই। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন, 'মানুষের নিকট ঘোষনা করে দাও। তারা তোমার নিকট পদব্রজে এবং দুর্বল উট সমূহে আরোহন করে চলে আসবে সেগুলো পৌছবে দূর পথ অতিক্রম করে।' আমরা বলি, এখানে পায়ে হেঁটে এবং উটে চড়ে আসার সংবাদ দেয়া হয়েছে, এটি সরাসরি কোনো হুকুম নয়। তাই বাহন ব্যতীত এখানে হজের ওয়াজিব প্রমাণিত হয়নি। আর পায়ে হাঁটার ক্ষমতা সব সময় এক রকম থাকে না। পথে চলৎশক্তিহীন হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারণেই হজের সফরের শুরুতেই পথখরচ ও বাহন থাকা আবশ্যক, যেনো পেরেশানীর সম্মুখীন হতে না হয়। শরিয়তের হুকুম সকলের জন্য একই রকম। বিশেষ লোকের জন্য বিশেষ নিয়ম নেই। সফরে বাদশাহর কোনো কষ্ট হয় না, তবুও সকলের মতো বাদশাহও কসরের নামাজ পড়তে পারবে এবং ইচ্ছা করলে রোজা রাখতে অথবা ভাঙতে পারবে। আবার স্বগৃহবাসী অবস্থায় কষ্ট হলেও সর্বসাধারণের মতো বাদশাহকেও অবশ্যই রোজা রাখতে হবে।

জমহুরের অভিমতের প্রমাণ রয়েছে হজরত আনাস বর্ণিত হাদিসে, যেখানে রসুলে পাক স. "মানিস্ তাতাআ 'ইলাইহি সাবীলা" — এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, সাবীলা অর্থ পথখরচ ও বাহন। হজরত আনাস থেকে দারাকুতনী, বায়হাকী এবং হাকেমও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বোখারী ও মুসলিমের মতোই সহীহ্। হাকেম এ রকম হাদিস হজরত হাম্মাদ বিন

www.eelm.weebly.com

সালমা থেকে বর্ণনা করে সেটিকে মুসলিমের মতো সহীহ্ বলেছেন। হজরত সাঈদ বিন মনসুর, হজরত হাসান বসরী থেকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে ওমর থেকে আরেকটি বর্ণনা ইমাম শাফেয়ী, তিরমিজি, ইবনে মাজা এবং দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন এ রকম, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! কোন বস্তু হজকে ওয়াজিব করে? তিনি স. বললেন, সম্পদ ও সওয়ারী। এই সিলসিলাকে তিরমিজি বলেছেন হাসান। কিন্তু ইব্রাহিম বিন জাওজী, আহমদ এবং নাসাঈ একে বলেছেন মাতরুকুল হাদিস। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজা এবং দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সম্পদ ও সওয়ারী। অর্থাৎ এই আয়াতের তাফসীরে পথ খরচের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি সম্পদ ও সওয়ারীর কথা বলেছেন। এই সনদটি দুর্বল।

দারা কুতনী এই বর্ণনাটির সম্পর্ক স্থাপন করেছেন হজরত জাবের, হজরত আলী, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আয়েশা এবং হজরত আমর বিন শোয়ায়েবের দাদার সঙ্গে। কিন্তু এই সনদটিও দুর্বল।

হজের সফরে প্রয়োজনীয় সম্পদ সঙ্গে নেয়া ওয়াজিব। কেননা আল্লাহতায়ালা বলেছেন, "ওয়া তাজাউয়াদু ফা ইন্না খইরযাদিত্ তাক্বওয়া।"

পাথেয় অবশ্যই সঙ্গে নিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, ভিক্ষাবৃত্তি থেকে তো বেঁচে থাকতে হবে।

বোখারী ও অন্যান্যরা হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, ইয়েমেনবাসীরা পাথেয় ছাড়াই হজে বেরুতো এবং বলতো, আমরা তাওয়াক্কুল (আল্লাহর প্রতি নির্ভর) করি। পরে মক্কায় পৌঁছে তারা মানুষের নিকট ভিক্ষা চাইতো। তখন নাজিল হয়েছে এই আয়াত।

জ্ঞাতব্য : ফতোয়ায়ে কাজীখানে রয়েছে, বিভিন্ন আলেম বলেন, ব্যবসার মাধ্যমে যার জীবিকা নির্বাহ হয়, সেই ব্যক্তি পাথেয় ও বাহনসহ হজ করে ফিরে আসা পর্যন্ত তার পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণের খরচ ছাড়াও যদি এমন সম্পদ অতিরিক্ত থাকে যদ্বারা পুনরায় ব্যবসা করা যায়, তবে সেই ব্যক্তির উপর হজ ফরজ হবে। অন্যথায় হবে না। পথখরচ, সওয়ারী, পরিবার পরিজনের প্রয়োজন — এ সমস্ত বাদে কোনো ব্যক্তির যদি এমন সম্পদ থাকে যার আয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ সম্ভব, তবে সেই ব্যক্তির উপর হজ ফরজ হবে। পাথেয়, বাহন এবং স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতির প্রয়োজন পূরণের পর কোনো কৃষকের যদি হাল, গরু ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ প্রস্তুত থাকে যার মাধ্যমে হজ থেকে ফিরে এসে চাষাবাদ শুরু করতে পারে তবে তার উপর হজ ফরজ।

আয়াতের মধ্যে উল্লেখিত, 'কেহ প্রত্যাখ্যান করিলে' — এ কথার অর্থ হবে, কেউ হজ্বের ফরজ অস্বীকার করলে। হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী এবং

www.eelm.weebly.com

আতা খোরাসানী এ রকমই ব্যাখ্যা করেছেন। আবদ বিন হুমাইদ তাঁর তাফসীরে নাকীয় এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এই আয়াতটি পাঠকালে হুজাইল গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরজ করলো, হে আল্লাহর রসুল! যে হজ তরক করেছে, সে কি কাফের? তিনি স. বললেন, যদি এই মনোভাবের সঙ্গে সে হজ তরক করে যে, আল্লাহর আজাবের ভয় এবং হজ পালনের সওয়াব প্রাপ্তির ইচ্ছা তার না থাকে (তবে কাফের হয়ে যাবে)। আবদ বিন হুমাইদ নাকীয় ছিলেন তাবেয়ী। তাই এই হাদিসটি মুরসাল। সাঈদ বিন মুসাইয়েব বলেছেন, এই আয়াতটি ইহুদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বলতো, মক্কার হজ ওয়াজিব নয়। সাঈদ বিন মনসুর এবং ইবনে জারীর, জুহাকের কথা বর্ণনা করে বলেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদেরকে একত্রিত করে এক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি স. বলেন, আল্লাহ তোমাদের উপর হজ ফরজ করেছেন, অতএব তোমরা হজ করো। মুসলমানেরা এই হুকুম মেনে নিলেন। কিন্তু ইহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক, সাবেইন এবং অগ্নিপূজক — এই পাঁচটি দল মানলো না। তখন আল্লাহতায়ালা নাজিল করলেন, 'কেহ প্রত্যাখ্যান করিলে সে জানিয়া রাখুক আল্লাহ জগতের উপর নির্ভরশীল নহেন'। সাঈদ বিন মনসুর, ইকরামা থেকে বর্ণনা করেন, যখন এই আয়াত নাজিল হলো, 'সে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম তালাশ করে।' তখন ইহুদীরা বললো, আমরা তো মুসলমান। রসুল স. বললেন, আল্লাহ মুসলমানদের উপর হজ ফরজ করেছেন। ইহুদীরা স্বীকার করলো না। বললো, আমাদের উপর হজ ফরজ করা হয়নি। অতঃপর আল্লাহ, 'কেহ প্রত্যাখ্যান করিলে.........।' এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

হজ প্রকৃতপক্ষে সম্পদের প্রাচুর্য এবং শারিরীক সুস্থতার কর্মরূপী কৃতজ্ঞতা। হজ না করা এই নেয়ামতের প্রতি কুফরী। রসুল স. বলেছেন, শরিয়তসম্মত প্রয়োজন, ব্যাধি অথবা অত্যাচারী শাসক কর্তৃক বাধাগ্রস্ত না হয়েও যে হজ তরক করে, সে ইহুদী অথবা খৃষ্টান যেভাবে খুশী মৃত্যুবরণ করতে পারে (আল্লাহ তার কোনো পরওয়া করেন না)। দারেমী মসনদের মধ্যে এবং বাগবী ও ইবনে জাওজী মউজু এর মধ্যে এই হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদিসবেত্তাগণ অবশ্য এতে আপত্তি তুলেছেন। হজরত আলীর বর্ণনায় রয়েছে, বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য পাথেয় এবং সওয়ারী যার রয়েছে সে হজ না করলে ইহুদী বা খৃষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে সে দূরে নয়। তিরমিজি।

আল্লাহ্ পৃথিবীবাসীর মুখাপেক্ষী নন। মানুষের ইবাদতের প্রয়োজন থেকে তিনি মুক্ত। যে ইবাদত করবে সে তার আপন কল্যাণের জন্যই করবে। 'মানুষের মধ্যে যাহার...........নির্ভরশীল নহেন' পর্যন্ত হজের হুকুমকে যে সমস্ত প্রমাণের

www.eelm.weebly.com

মাধ্যমে গুরুত্ববহরূপে বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে — ১. ওয়াজিবের হুকুম বিজ্ঞপ্তিরূপে জানিয়ে দেয়া হয়েছে ২. হুকুম এসেছে নামবাচক বাক্যরূপে ৩. আল্লাহর অবশ্যম্ভাবী অধিকার প্রকাশ করা হয়েছে ৪. প্রথমে হুকুম দেয়া হয়েছে সাধারণভাবে (ওয়া লিল্লাহি আলান্নাস হিজ্জুল বাইত) এবং পরে শর্ত সহযোগে বিশেষ করে দেয়া হয়েছে (মানিস্ তাতাআ ইলাইহি সাবিলা)। দুই হুকুমের একটি পরোক্ষ অন্যটি প্রত্যক্ষ ৫. হজ তরককে কুফর বলা হয়েছে। কারণ কাফেররা হজ করে না ৬. আল্লাহতায়ালার ক্ষমতা ও অমুখাপেক্ষীতা প্রকাশ করে হজ তরককারীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে ৭. আল্লাহ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে দু'বার, সর্বনাম ব্যবহার করা হয়নি। এতে তাঁর শর্তবিহীন অভাবশূন্যতা সাধারণভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যাতে আল্লাহর সর্বোচ্চ শাস্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

'হিজ্জুল বাইত' অর্থাৎ ওই গৃহের হজ, এর অর্থ ওই একটি গৃহই অর্থাৎ কাবাশরীফ। এ জন্য জীবনে একটিবার মাত্র হজ করা ফরজ হয়েছে। গৃহ একটি, হজও একটি। রসুল স. এরশাদ করেছেন, হজ একবার ফরজ, বেশী করলে তা হবে নফল (অতিরিক্ত)। আহমদ ও নাসাঈ।

কাবা কোনো শামিয়ানা, গেলাফ অথবা মাটি ও পাথরের দেয়ালের নাম নয়। অন্য কোনো স্থানে কাবার আকৃতিতে কোনো গৃহ নির্মাণ করা হলেও তা কেবলা হবে না। বরং কাবা আল্লাহ প্রদত্ত এক আস্বাদ — ধারণাতীত এক অবতরণ, সেখানে আল্লাহতায়ালার জাতী নূরের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। প্রকাশ্যতঃ কাবা সৃষ্ট বস্তু এবং জড়জগতে দৃশ্যমান। কিন্তু কাবার হকীকতের রয়েছে অন্য এক আধ্যাত্মিক সংশ্লিষ্টতা, যা জ্ঞান, বুদ্ধি ও ধারণা দ্বারা অননুভব্য। বরং প্রকাশ্যতই কাবাকে অনুভব করা দুরূহ। কাবার নির্দিষ্ট কোনো দিক নেই, এটাও কাবার এক অনন্য মর্যাদা।

কাবার হকীকত বোঝে কার সাধ্য! পবিত্র ওই জাত যিনি সম্ভাব্য জগতকে অবশ্যম্ভাবীতার দর্পণ বানিয়েছেন এবং অনস্তিত্বতাকে অস্তিত্বময়তা দিয়েছেন। হকীকতে কাবার সঙ্গে রয়েছে হকীকতে কোরআন এবং হকীকতে কোরআনের সম্পৃক্তি রয়েছে হকীকতে সালাতের সঙ্গে। নবী রসুলদের মাধ্যমে এই মাকামে পৌঁছে সালেকের (আধ্যাত্মিক পথিকের) পথযাত্রা থেমে যায় এবং ফানা ও বাকা (বিলীনতা ও স্থায়ীত্ব) পরিণতি লাভ করে। এর পরে রয়েছে খালেছ মাবুদিয়াতের মাকাম (মাবুদিয়াতে ছেরফা)। এ মাকামের পথ পরিক্রমণ আত্মিক দৃষ্টিনিক্ষেপের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। পদযাত্রা (আত্মিক) এখানে অচল। ওয়াল্লাহু আলাম।

www.eelm.weebly.com

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ○ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

❑ বল, 'হে কিতাবীগণ! তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ যখন উহার সাক্ষী তখন তোমরা আল্লাহের নিদর্শনকে কেন প্রত্যাখ্যান কর?'

❑ বল, 'হে কিতাবীগণ! যখন তোমরাই সাক্ষী তখন যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহের পথকে বাঁকা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে কেন উহা হইতে ফিরাইয়া দাও? তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।'

জেনে অস্বীকার করা সর্বাপেক্ষা গর্হিত কাজ। তাই বলা হচ্ছে, মোহাম্মদ স. যখন হজ ফরজ হওয়ার দাবীকে সত্য বলে প্রচার করছেন, তখন হে আহলে কিতাবগণ! কেনো তোমরা সত্য গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হচ্ছো।

আল্লাহ্ তোমাদের অবিশ্বাস এবং কিতাব পরিবর্তনের গর্হিত কাজের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। সত্য গোপন করার অপরাধে তোমরা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য। হে নবী! আপনি বলে দিন, যে পথ আল্লাহর সন্নিকটবর্তী করে, সেই ইসলামের পথ গ্রহণ করতে তোমরা বাঁধার সৃষ্টি করছো কেনো? তোমরা চাও আল্লাহতায়ালার পথ বঙ্কিম হোক। তোমাদের এই অভিপ্রায় আযাবকে অপরিহার্য করেছে।

ইহুদীরা বলতো, তাদের ধর্মমত চিরস্থায়ী। মুমিনদের মধ্যে তারা অনৈক্য সৃষ্টি করতে সচেষ্ট থাকতো। তওরাতে উল্লেখিত রসুলে পাক স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীকে বিকৃতরূপে উপস্থাপিত করতো। আউস ও খাজরাজ গোত্রের অতীতের শত্রুতাকে টেনে এনে তাদেরকে গোত্রীয় দ্বন্দ্বে লিপ্ত করার চেষ্টা করতো। তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, মুখে স্বীকার না করলেও তোমরা অবশ্যই জানো, ইসলামই আল্লাহতায়ালার প্রকৃত দ্বীন এবং রসুল পাক স.ই সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর — একথা লিখিত রয়েছে তোমাদেরই তওরাতে।

ইবনে ইসহাক, আবু শাইখ এবং ইবনে জারীর জায়েদ র. থেকে মুরসাল হাদিস বর্ণনা করেছেন — বাগবী বলেছেন, সাম্মাস বিন কায়েস ইহুদীদের মধ্যে শক্ত কাফের ছিলো। সে মুসলমানদেরকে অপবাদ দিতো। সে একদিন এক মজলিশে আউস এবং খাজরাজ গোত্রের কিছু লোককে সহৃদয় কপোকথনে লিপ্ত দেখে হিংসায় জ্বলতে শুরু করলো। ইসলাম পূর্ব যুগে আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা বিবাদ বিসংবাদে লিপ্ত ছিলো। ইসলাম তাদেরকে পরস্পর পরস্পরের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছে। সাম্মাস প্রচন্ড রাগান্বিত হয়ে তার গোত্রের লোকের কাছে বলতে লাগলো এ সমস্ত লোক তো কখনো একত্রিত হয়নি। তাদের একত্রিত সভায়

www.eelm.weebly.com

আমাদের উপস্থিতির সুযোগ কোথায়? সাম্মাসের এক সাথী বললো, উভয় সম্প্রদায়ের গোত্র-গৌরবের উত্তেজনাবর্ধক পরস্পরবিরুদ্ধ অনেক কবিতা রয়েছে, যাও ওই সভায় গিয়ে তুমি ওই কবিতাগুলো শুনিয়ে এসো। সাম্মাস তার কথামত তাঁদের কাছে গিয়ে বুয়াস যুদ্ধের সময়ের চরম উত্তেজক কবিতাগুলো আবৃত্তি করতে লাগলো। জ্বলে উঠলো দ্বন্দ্বমুখরতার আগুন। শুরু হলো রোষতপ্ত বাদানুবাদ। সকলেই লিপ্ত হয়ে পড়লো গোত্রগৌরব প্রকাশে।

আউস গোত্রের এক ব্যক্তির নাম আউস বিন কিবতী। তিনি ছিলেন হারেসার বংশোদ্ভূত। অপরদিকে খাজরাজ গোত্রভূত বনী সালমার বংশের একজন ছিলেন জব্বার বিন সাখার। মুখোমুখী দাঁড়ালেন দু'জন। একজন অপরজনকে বলতে লাগলেন, আমরা জঙ্গে বুয়াসের ঘটনা পুনর্জীবিত করতে প্রস্তুত। পুনরায় শক্তি পরীক্ষা হোক। মদীনার বাইরে হেরা নামক স্থানে যুদ্ধ হবে। উভয় গোত্রই তখন রণধ্বনি দিতে দিতে হেরার দিকে চললো। সংবাদ পেয়ে মোহাজিরদের একটি দল নিয়ে সেখানে হাজির হলেন রসুলে পাক স.। বললেন, হে ইসলামী দল! আমি তো এখনো বর্তমান। আল্লাহ তোমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। অতীত মূর্খতাকে নিভিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের পরস্পরকে করে দিয়েছেন পরস্পরের বন্ধু। মূর্খতার উচ্চারণকে প্রশ্রয় দিয়ে তোমরা কি আগের মতো কাফের হয়ে যাবে? আল্লাহকে ভয় করো! আল্লাহর ভয়ে ভীত হও! রসুল পাক স. এর কথা শুনে সংবিত ফিরে পেলো সকলে। বুঝতে পারলো শয়তানই তাঁদেরকে প্ররোচিত করেছে। তখন তাঁরা একে অপরকে জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করলেন, তওবা করলেন এবং রসুল স. কে অনুসরণ করে ফিরে এলেন মদীনায়।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১০০, ১০১

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ۝ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

❒ হে বিশ্বাসিগণ! যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তোমরা যদি তাহাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর তবে তাহারা তোমাদিগকে বিশ্বাসের পর আবার সত্য প্রত্যাখ্যানকারীতে পরিণত করিবে।

তাফসীরে মাযহারী/২৬৬

www.eelm.weebly.com

❒ আল্লাহের আয়াত তোমাদের নিকট পাঠ করা হয় এবং তোমাদের মধ্যেই তাঁহার রসুল রহিয়াছে; তবে কিরূপে তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করিবে? কেহ আল্লাহকে অবলম্বন করিলে সে সরল পথে পরিচালিত হইবে।

ইমানদাদের প্রতি হেদায়েত হচ্ছে, তাঁরা যেনো ইহুদী সাম্মাস ও তার সঙ্গীদের প্ররোচনায় প্রভাবান্বিত না হয়। এ রকম করলে বিশ্বাসী উত্থানের পর অবিশ্বাসী পতন অনিবার্য।

জায়েদ বলেন, হজরত জাবের বলতেন, আমি ওই দিনের পূর্বে কোনোদিন এতো শংকা ও আনন্দ অনুভব করিনি।

পূর্বের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদী সাম্মাস বিন কায়েস সম্পর্কে। বলা হয়েছে, হে নবী! আপনি আহলে কিতাবদেরকে জিজ্ঞেস করুন (কুল ইয়া আহলাল কিতাব)। সরাসরি আল্লাহপাক আহলে কিতাবদেরকে সম্বোধন করেননি। তারা এর উপযুক্তও ছিলো না। তবে উদ্দেশ্য ছিলো তারাই। এভাবে আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্য যেমন সফল হয়েছে তেমনি ইমানদারদের মহত্ব ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ফারইয়ানী ও ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, মূর্খতার যুগে আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। ইসলাম গ্রহনের পর তাঁরা হয়ে গিয়েছিলেন এক। কিন্তু পূর্বস্মৃতি তখনও অবশিষ্ট ছিলো। একদিন তারা সকলে মিলে বসেছিলেন এক সভায়। হঠাৎ শুরু হলো পূর্বশত্রুতার আলোচনা। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তাঁরা। অস্ত্র ধারণ করলেন একদল অপরদলের বিরুদ্ধে। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। এখানে বিস্ময়বোধক প্রশ্নের মাধ্যমে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র পবিত্র বাণী পাঠ করা হচ্ছে। রসুল স.ও স্বয়ং উপস্থিত। তিনি সদুপোদেশ দিচ্ছেন। দ্বিধা সন্দেহের অপনোদন করছেন। তবুও হে ইমানদারেরা তোমরা কি সতর্ক হবে না!

হজরত কাতাদা বলেছেন, এই আয়াতে হেদায়েতের অবলম্বন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে দু'টি বিষয় - আল্লাহ্র কিতাব ও আল্লাহ্র রসুল। রসুল স. অন্তরাল গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্র কিতাব এখনো বিদ্যমান।

আমি বলি, কিয়ামত পর্যন্ত যে সমস্ত নায়েবে নবী (নবীর প্রতিনিধি) আসবেন তাঁরা তো সকল যুগেই বিদ্যমান। তাঁরাই রসুল স. এর স্থলাভিষিক্ত। হজরত জায়েদ বিন আরকাম বলেছেন, একবার রসুল স. বললেন, হে মানবমন্ডলী! শোনো। আমি মানুষ, অতিসত্ত্বর আমার প্রতিপালকের দূত এসে পড়বে। আমি তাঁর আমন্ত্রন গ্রহণ করবো। রেখে যাবো দু'টি মহৎ বস্তু। একটি আল্লাহ্র কিতাব, যা হেদায়েত ও নূর। তোমরা আল্লাহ্র কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কোর। দ্বিতীয় বস্তু আমার আহলে বাইত। আমি আমার আহলে বাইত সম্পর্কে তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

www.eelm.weebly.com

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্‌র কিতাবই আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌঁছানোর কারণ। কিতাবে উল্লেখিত নির্দেশানুসারে যে চলবে সে হেদায়েত পাবে। যে চলবেনা সে হবে পথভ্রষ্ট। মুসলিম।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, এমন দু'টি বস্তু আমি তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। ওই দু'টি বস্তু একটি অন্যটি অপেক্ষা অধিক সম্মানিত। একটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব। যা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত একটি ঝুলন্ত রশি, যা ধারণ করে আসমানে পৌঁছানো যায়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার আহলে বাইত। হাউজে কাউসার পর্যন্ত পৌঁছানোর আগে একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। একারনেই তোমাদের অনুধাবন করা উচিত যে, কিভাবে এ দু'টির প্রতিনিধিত্ব করছো।

তিরমিজির অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, আমি আরাফার দিন রসুল স. কে তাঁর উটনীর উপর উপবিষ্ট অবস্থায় ভাষণ দিতে দেখেছি। তিনি বলছিলেন, হে মানুষেরা। আমি এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা ধারণ করলে তোমরা কখনো পথবিচ্যুত হবেনা। আল্লাহ্‌র কিতাব ও আমার আহলে বাইত।

আমি বলতে চাই, আহলে বাইতকে ধারণের আদেশ দানের উদ্দেশ্য এই যে, আহলে বাইতই বেলায়েতের সিলসিলার পথ প্রদর্শকগণের নেতা। পূর্বাপর কেউই তাঁদের অসীলা ব্যতীত বেলায়েতের স্তরে উন্নীত হতে পারবেনা। প্রথমে হজরত আলী এবং পরে তাঁর দুই সন্তান (ইমাম হাসান, ইমাম হোসেইন) এরপরে ইমাম হাসান আসকরী পর্যন্ত। শেষে গউসুস্‌ সাকালাইন মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জীলানী পর্যন্ত এই সিলসিলা প্রবহমান। এরকম বর্ণনা করেছেন ইমাম মোজাদ্দেদে আলফেসানী র.। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন আউলিয়া এবং ওলামায়ে উম্মতগণ। তাঁরা সকলেই আহলে বাইতের স্থলবর্তী। রসুল স. এরশাদ করেছেন, ওলামাগণ নবীগণের প্রতিনিধি।

আল্লাহ্‌র নির্দেশিত এই পথই সরল পথ। এই পথ যে ধারণ করবে, সে নিশ্চয়ই হেদায়েত পাবে।

বাগবী মুকাতিল বিন হাব্বান এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে লিখেছেন, অজ্ঞতার যুগে আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় যুদ্ধরত ছিলো। হিজরতের পর রসুল স. তাঁদের মধ্যে সন্ধি করে দিলেন। দুই দলই মুসলমান হয়ে গেলো এবং সন্ধির সম্মান মেনে চললো। ঘটনাক্রমে কিছুদিন পর শায়লাবা বিন গানাম আওসী এবং আসাদ বিন জুরারাহ্‌ খাজরাজী নিজ নিজ দলের আভিজাত্য বর্ণনায় লিপ্ত হয়ে পড়লো। আওসী ব্যক্তি বললেন, আমাদের রয়েছে এমন চার ব্যক্তি যাদের মতো কেউ তোমাদের দলে নেই — ১. খাজিমা ইবনে সাবিত যিনি একাই দুই সাক্ষীর সমান ২. হানযালা

www.eelm.weebly.com

— শাহাদতের পর যাঁকে ফেরেশতারা গোসল করিয়েছেন ৩. আসিম ইবনে সাবিত যিনি ছিলেন দ্বীনের পূর্ণ সাহায্যকারী এবং ৪. সা'দ বিন মুআজ যাঁর মৃত্যুতে প্রকম্পিত হয়েছিলো আল্লাহ্‌র আরশ। বনু কোরাইজাদের সম্পর্কে দেয়া তাঁর সিদ্ধান্ত ছিলো আল্লাহ্‌তায়ালার পছন্দনীয়। এরপর খাজরাজী বলতে শুরু করলেন, আমাদের মধ্যেও এমনি চার মহাজন রয়েছেন যাঁদের মতোন তোমাদের দলে কেউ নেই। তাঁরা কোরআন শরীফকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন। তাঁরা বিশুদ্ধ ক্বারী এবং বিজ্ঞ, জ্ঞানী। এই চারজন হচ্ছেন — ১. উবাই ইবনে ক্বাব ২. মুআজ ইবনে জাবাল ৩. সাঈদ বিন সাবিত ৪. আবু জায়েদ। এ ছাড়া আমাদের মধ্যে রয়েছেন আনসারদের খতীব ও নেতা সা'দ বিন ওবাদা। ক্রমেই বিতর্ক উঠলো তুঙ্গে। শুরু হলো যুদ্ধোন্মাদনা। রণসজ্জায় প্রবৃত্ত হলেন সকলে। সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন রসুলে পাক স. তখন এই আয়াত অবতীর্ন হলো।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১০২

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে ভয় কর এবং দেখিও তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হইয়া মরিও না।

আবদুর রাজ্জাক, ফারইয়ানী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া তাঁদের তাফসীরে, তিবরানী তাঁর মো'জামে, হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে এবং আবু নাঈম তাঁর হুলিয়ায় হজরত ইবনে মাসউদ থেকে মওকুফ বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, হক ও তাকওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহর আহকামের অনুসরণ করা। অবাধ্য না হওয়া। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অকৃতজ্ঞ না হওয়া। স্মরণ রাখা। বিস্মৃত না হওয়া। বাগবী হজরত ইবনে মাসউদ থেকে কেবল প্রথম অংশটুকু বর্ণনা করেছেন (আহকামের অনুসরণ করা। অবাধ্য না হওয়া)। আবু নাঈম এই হাদিসটিকে বলেছেন মারফু। আমি বলি, স্মরণ করা ও বিস্মৃত হওয়া কলবের ফানা হওয়া না হওয়ার উপর নির্ভরশীল। অনুসরণ করা, অবাধ্য হওয়া, কৃতজ্ঞচিত্ত হওয়া, অকৃতজ্ঞ থাকা – এ সমস্তের ভিত্তিও নফসের ফানা হওয়া না হওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত ইমান এবং অন্তরের প্রশান্তির উপরই পূর্ণ অনুসরণ এবং স্থায়ী কৃতজ্ঞতার ভিত্তি। অতএব এই আয়াতের অভিপ্রায়ানুসারে কামালতে বেলায়েত অর্জন করা ওয়াজিব। আয়াত নাজিলের উদ্দেশ্য এটাই। আউস ও খাজরাজদের গোত্র গৌরব অসুস্থ প্রবৃত্তির পরিচায়ক। এই কারণেই অভ্যন্তরীন ব্যাধি থেকে প্রবৃত্তিকে পবিত্র করে চরিত্রের পূর্ণতা সাধন করতে, আল্লাহর ভয় অন্তরে প্রতিষ্ঠিত

www.eelm.weebly.com

করতে এবং সার্বক্ষণিক জিকির দ্বারা কলব ও নফসকে পবিত্র করতে হুকুম দেয়া হয়েছে।

মুজাহিদ ব্যাখ্যা করেছেন এরকম, আল্লাহর পথে জেহাদ করার হক আদায় করো। আল্লাহর হুকুম মান্য করো। এ সমস্ত করতে কেনো দোষারোপকারী যেন বাধা সৃষ্টি করার সুযোগ না পায়। আল্লাহর জন্যে ন্যায়ানুগতা প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হও, যদিও তা তোমাদের পিতামাতা ও সন্তানদের বিরুদ্ধে যায়। হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে, বান্দা ওই সময় পর্যন্ত তাকওয়ার হক আদায় করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জবানকে হেফাজত করবে।

আমি বলি, মুজাহিদ এবং হজরত আনাস ওই পথেরই বর্ণনা করেছেন, যার গতি কামালতে বেলায়েতের দিকে। স্বল্পাহার, স্বল্পনিদ্রা, নিরবচ্ছিন্ন জিকির, অনর্থক কথপোকথন থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখা, সাধারণ মানুষের সাথে প্রয়োজনাতিরিক্ত সঙ্গ দান না করা এবং আল্লাহর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেপরোয়া হওয়াই কামালতে বেলায়েত লাভের উদ্দেশ্য।

বাগবী লিখেছেন, তাফসীরকারগণের বর্ণনা, এই আয়াত নাজিল হলে সাহাবীগণ চিন্তিত হলেন। আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল! এই হুকুম পালন করার যোগ্যতা কার রয়েছে? এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা নাজিল করলেন, 'আল্লাহকে ভয় করো তোমাদের সাধ্যানুসারে।' এই আয়াত দ্বারা আগের আয়াতটি রহিত করে দেয়া হয়েছে। মুকাতিল বলেছেন, আলে ইমরানের এই আয়াত ব্যতীত অন্য কোনো আয়াত রহিত হয়নি।

আমি বলি, এ কথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাকওয়ার হক রহিত হয়ে গিয়েছে। কেননা অহংকার, রোষ, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, দুশ্চরিত্রতা, পৃথিবী-আসক্তি, জিকির বিমুখতা, সৃষ্টির প্রতি অতিআকর্ষণ — এগুলো সর্বাবস্থায়ই হারাম। এই সমস্তের হুকুম রহিত হওয়ার ধারণা অসম্ভব। তাই এ সমস্ত বুজুর্গবৃন্দের উক্তি সমূহের উদ্দেশ্য এই যে, রাতারাতি সকল প্রবৃত্তির পীড়া থেকে মুক্ত হওয়া মানুষের সাধ্যভূত নয়। তাই এমনভাবে আল্লাহর পথে সাধনায় লিপ্ত থাকতে হবে যেনো বিশুদ্ধ অন্তর ও পরিশুদ্ধ প্রবৃত্তির অধিকারী মহাজনদের সংসর্গের মাধ্যমে ক্রমাগত উন্নত হওয়া যায়। পূর্ণত্ব লাভ একদিনেই সম্ভব নয় বলে 'সাধ্যানুসারে' এ কথা বলা হয়েছে এবং চেষ্টা সাধনাকে ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি সাধনাবিমুখ এবং প্রবৃত্তির অনুসারী, সে অবাধ্য। অন্তরের অসৎ কামনা বাসনা প্রকাশ করা হোক অথবা নাই হোক, আল্লাহতায়ালা সকল কিছুর হিসাব গ্রহণ করবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। নফসের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পীড়া দূর করতে যাঁরা সচেষ্ট, তাঁরা পূর্ণতার প্রান্তে পৌছান অথবা নাই পৌছান তাঁরা আল্লাহতায়ালার ফরজ হুকুম

www.eelm.weebly.com

পালনে রত আছেন। আশা করা যায় পূর্ণতায় না পৌঁছতে পারেলেও তাঁরা আল্লাহতায়ালার ক্ষমা লাভ করবেন।

এরশাদ হচ্ছে, মৃত্যুর আগেই পূর্ণ মুসলমান হও। আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ো না। সমর্পিত হও, আল্লাহতায়ালার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকো — এমতাবস্থায় যেনো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারো। এখানে মরতে নিষেধ করা হয়নি। মৃত্যুর পূর্বে ইসলামের সাজে পূর্ণসজ্জিত হতে বলা হয়েছে।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, হে মানুষ! আল্লাহ্‌কে প্রকৃত অর্থে ভয় করো। অতঃপর 'হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো, যেমন ভয় করা উচিত' এই আয়াত পাঠ করে পুনরায় বললেন, এক টুকরা জাক্কুম (দোজখীদের খাদ্য) পৃথিবীতে পতিত হলে পৃথিবীর অধিবাসীদের জীবন চিরতরে তিক্ত হয়ে যেতো। অতএব ওই ব্যক্তির কি অবস্থা হবে যার খাদ্য হবে জাক্কুম। বর্ণনাকারী তিরমিজি হাসিদটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১০৩

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

❑ এবং তোমরা সকলে আল্লাহের রশি দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইওনা। তোমাদের প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহকে স্মরণ কর ঃ তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করেন। ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তোমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই রূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা সৎপথ পাইতে পার।

আল্লাহের রশি অর্থ ইসলাম। অন্যত্র আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শয়তানকে অমান্য ক'রে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে ধারণ করে সুদৃঢ় শৃংখল – যা অবিচ্ছিন্ন।' আল্লাহের রশি অর্থ কিতাবুল্লাহও হতে পারে। কেননা রসুল স. বলেছেন, আল্লাহর কিতাব এমন এক রশি যা বিস্তৃত হয়ে রয়েছে আকাশ

www.eelm.weebly.com

ও পৃথিবীতে। ওই রশি ধারণ করে মানুষ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এই রশি সকলে সম্মিলিতভাবে যেনো ধারণ করে, সেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সম্মিলিতভাবে অর্থ আল্লাহ্র কালামের বিস্তৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে অথবা উম্মতের ঐকমত্যের মাধ্যমে। ঐকমত্যবিরোধী অভিমতসমূহ অভিপ্রেত নয়। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তিনটি বিষয় আল্লাহতায়ালার পছন্দ এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ। তোমরা আল্লাহতায়ালার ইবাদত করো, তাঁর সমকক্ষ বানিয়ো না। সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। আর তোমাদের শাসকবৃন্দের কল্যাণ কামনা করো। এ তিনটি বিষয়কে আল্লাহ্ পছন্দ করেন এবং অপছন্দ করেন বাচালতা, সম্পদের অপচয় এবং অধিক যাঞ্চাপ্রবণতাকে। মুসলিম, আহমদ।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত হবে না। আল্লাহ্র হাত রয়েছে যুথবদ্ধতার উপর। যে এই যুথবদ্ধতা (জামাত) থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, সে দোজখে পতিত হবে। তিরমিজি। হজরত ইবনে ওমর আরো বর্ণনা করেন, সবচেয়ে বড় জামাতের অনুসারী হও। দলবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি দোজখী। ইবনে মাজা।

জ্ঞাতব্য ঃ হজরত মুফাসসির কুঃ এর বিবরণ থেকে মনে হতে পারে, যে দলের লোকসংখ্যা বেশী সে রকম দলই বড় দল, এরকম অর্থ ভুল। কেননা সত্য সংখ্যাধিক্যনির্ভর নয়। সংখ্যাধিক্য বোঝানো উদ্দেশ্য হলে হাদিস শরীফে আজিম শব্দের স্থলে আকবর শব্দটি উল্লেখিত হতো। আজিম অর্থ আজমতওয়ালা অর্থাৎ মর্যাদামন্ডিত। ওয়াল্লাহু আলাম।

হজরত মুআজ বিন জাবাল বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ছাগ শিশুই বাঘের আক্রমণস্থল হয়, যে হয়ে পড়ে দলবিচ্ছিন্ন। দলবিচ্ছিন্ন মানুষও তেমনই বাঘরূপী শয়তানের শিকার হয়। সুতরাং দলবদ্ধ থাকো। বেঁচে থাকো এদিক ওদিক ছোটাছুটি থেকে। আহমদ।

হজরত আবু জর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে যুথবিচ্ছিন্ন, তার স্কন্ধদেশ ইসলামের রশি থেকে মুক্ত। আহমদ, আবু দাউদ।

সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্র কিতাবকে ধারণ করার নির্দেশ এসেছে। আর ধারণ করতে হবে সুদৃঢ়ভাবে। সম্পূর্ণ কিতাবকেই ধারণ করতে হবে। কিছু অংশ মান্য করা এবং কিছু অংশ অমান্য করা দৃঢ়তাবিরোধী। কেউ মানবে কেউ মানবে না, এরকমও নয়। দৃঢ়ভাবে সম্পূর্ণ কিতাবকে সবাই মিলে ধারণ করতে হবে। আহলে কিতাবদের মতো মতবিরোধজাত দ্বন্দ্ব থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, বনী ইসরাইলের যে অবস্থা হয়েছে, আমার উম্মতের সে অবস্থাই হবে, যেমন দুই পায়ের

www.eelm.weebly.com

জুতা সমমাপের হয়। তারা যদি মায়ের সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, তবে এরাও হবে। বিশ্বাসগত দিক থেকে তারা ছিলো বাহাত্তরটি দল। আর আমার উম্মতের দল হবে তিয়াত্তরটি। তিয়াত্তরের মধ্যে একটি দল ছাড়া অন্য দলগুলো দোজখী। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল। সত্য দল কোনটি? রসুল স. বললেন, যারা আমার ও আমার সাহাবীদের দলভুক্ত। তিরমিজি। আহমদ ও আবু দাউদ, হজরত মুয়াবিয়া রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিয়াত্তর দলের মধ্যে বাহাত্তরটি দোজখী এবং একটি জান্নাতী। ওই একটি দলই মুক্তিপ্রাপ্ত। অতিসত্ত্বর আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতিপয় দলের আবির্ভাব হবে, যারা প্রবৃত্তিপীড়িত এবং ধ্বংসাভিমুখী। যেমন, কোনো বিশেষ রোগগ্রস্ত কুকুর যাদের শরীরের রগ ও সকল গ্রন্থি ব্যাধি জর্জরিত।

আমি বলি, রসুল স. ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে ভ্রষ্ট দলগুলোর অস্তিত্ব ছিল না। প্রথম খলিফাত্রয় হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং হজরত ওসমানের যুগেও ছিলো না। হজরত ওসমানের খেলাফতের শেষ দিকে মিশরবাসীদের মধ্য থেকে শত্রুতা শুরু হয়। হজরত মুয়াবিয়ার সময় থেকে খেলাফত প্রসঙ্গে প্রথম মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। প্রথম বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হারুরীয়া গোত্র অর্থাৎ খারেজী সম্প্রদায়। হজরত আলীর বিরুদ্ধাচরণকারী ছিলো তারা। এর পরের বিরুদ্ধাচরণকারী রাফেজী আবদুল্লাহ বিন সাবাহ ও তার দল। তাবেইনদের যুগে উদ্ভুত হয় মোতাজিলা মতবাদ। তারা দর্শন শাস্ত্রে অনুরাগী হয়ে প্রতর্কপ্রবণতায় প্রবিষ্ট হয়েছিলো। ছেড়ে দিয়েছিলো কিতাবুল্লাহর প্রকাশ্য আয়াত, রসুল স. এর সুন্নত এবং সলফে সালেহীনের আদর্শ। তারা ছিলো ভ্রষ্টতানুসারী এবং অসৎ প্রবৃত্তির অনুকারক।

আয়াতে আনসারদের উদ্দেশ্য করে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহরাজী স্মরণ করো। ভেবে দেখো, তোমাদের পারস্পরিক শত্রুতা কিভাবে বিদুরিত করে দিয়েছেন তিনি। তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সম্প্রীতি। তাই পরিদৃষ্ট হচ্ছে তোমাদের এই ভ্রাতৃত্ববন্ধন।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় ছিলো একই বংশভূত। একটি হত্যাকান্ডের কারণে তাদের মধ্যে শুরু হয় বিসংবাদ। যুদ্ধ চলতে থাকে এক'শ বিশ বছর ধরে। ইসলাম তাদের শত্রুতার আগুন নিভিয়ে দিয়েছে। রসুল স. এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রেমময় ভ্রাতৃত্ববন্ধন। এই প্রেমবন্ধনের স্বরূপ বোঝা যাবে একটি ঘটনায়। ঘটনাটি হচ্ছে—

কবিলায়ে বনী আমর বিন আউফ গোত্রের এক ব্যক্তির নাম ছিলো সুয়ায়িদ বিন সামেত। প্রতাপ ও আভিজাত্যের কারণে মানুষ তাকে সাধুপুরুষ বলতো। হজ অথবা ওমরাহ উপলক্ষে তিনি মক্কায় গিয়ে রসুল স. এর সাক্ষাত পেলেন। রসুল স.

www.eelm.weebly.com

তাঁকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন। সুয়ায়িদ বললেন, আমার কাছে যা আছে তোমার নিকটও তা আছে কি? রসুল স. বললেন, কি আছে তোমার কাছে? সুয়ায়িদ বললেন, লোকমানের পুস্তিকা। রসুল স. বললেন, পাঠ করো দেখি। সুয়ায়িদ পাঠ করলেন। রসুল স. বললেন, বেশ! কিন্তু আমার কাছে যা আছে তা এর চেয়ে অনেক উত্তম। আমার রয়েছে কোরআন, যা নূর ও হেদায়েত। তিনি স. কোরআন পাঠ করলেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সুয়ায়িদ বললেন, হ্যাঁ। উত্তমই বটে! এরপর তিনি মদীনায় ফিরে গেলেন এবং কিছু দিন পর যুদ্ধ শুরু হলে খাজরাজ গোত্রের লোক তাঁকে হত্যা করে ফেললো। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, মুসলমান অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়েছে। তখন আবুল হাসির আনাস বিন রাফে, বনী আশহালের একটি দল নিয়ে কোরাইশদের সাহায্য অর্জনার্থে মক্কায় উপস্থিত হলো। সেই দলে ছিলেন আয়াছ বিন মুআজও। রসুল স. তাদেরকে বললেন, তোমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছো, তার চেয়ে উত্তম বস্তুর সংবাদ তোমরা জানতে চাও কি? তারা বললো, কী সেই সংবাদ? তিনি স. বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রসুল। আমি এই আহবানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি যে, হে মানুষ আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক কোর না। আল্লাহ আমার উপর কিতাব নাজিল করেছেন। রসুল স. কোরআন থেকে পাঠ করে শোনালেন। যুবক আয়াছ বিন মুআজ বলে উঠলেন, হে আমার সম্প্রদায়! যে উদ্দেশ্যে তোমরা এসেছো, আল্লাহর কসম! এই বানী তদপেক্ষা উত্তম। একথা শুনে আবুল হাসির এক মুষ্টি কংকর ছুঁড়ে মারলো আয়াছের মুখে। বললো, রাখো তোমার কথা। আমরা অন্য উদ্দেশ্যে এসেছি। আয়াছ নির্বাক হয়ে গেলেন। রসুল স. উঠে দাঁড়ালেন। তারা সকলে ফিরে গেলো মদীনায়। সেখানে শুরু হলো ভয়াবহ যুদ্ধ — জঙ্গে বুয়াস। এর কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করলেন আয়াছ। অন্য অনেক স্থানের লোকের মতো মদীনাবাসীরাও প্রতি বছর মক্কায় যেতো। এক হজ্বের সময় আনসারদের একটি দল বনী তাই এবং খাজরাজী গোত্রের সঙ্গে মিলিত হলো আকাবা নামক স্থানে। খাজরাজীদের দলে ছিলেন ছয়জন, আসাদ বিন জুরারাহ, আউফ বিন হারেস, রাফে বিন মালেক,আমর বিন সাওয়াদ, উকবা বিন আমের এবং জাবের বিন আবদুল্লাহ। আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা ছিলো তাঁদের কল্যাণ হোক।

রসুল স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন গোত্রের? তাঁরা উত্তর দিলেন, খাজরাজ গোত্রের। তিনি স. বললেন, ইহুদীরা কি তোমাদের বন্ধু? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা কি আমার কথা শুনবে? তাঁরা বললেন, কেনো শুনবো না? সবাই বসে পড়লেন। রসুল স. তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন। কোরআন পাঠ করে শোনালেন। তাঁরা মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কারণটি ছিলো এই —

www.eelm.weebly.com

ইহুদীরা ছিলো আহলে কিতাব এবং জ্ঞানী। আর তাঁরা ছিলেন মূর্তিপূজক। একবার ইহুদীদের সঙ্গে বচসা হলো তাঁদের। তখন ইহুদীরা বললো, অতিসত্ত্বর একজন নবী আবির্ভূত হবেন। আমরা তাঁর অনুসারী হবো এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদেরকে আদ সম্প্রদায়ের মতো ধ্বংস করবো। রসুল স. এর কথা শুনে খাজরাজীদের মনে পড়ে গেলো সেই ঘটনা। পরস্পর তাঁরা বালাবলি করতে লাগলেন, দেখো দেখো ইনিই সেই নবী যাঁর প্রসঙ্গ তুলে ইহুদীরা আমাদেরকে ভয় দেখাতো। আমাদের উচিত ইহুদীদের আগেই তাঁর অনুসারী হওয়া। তারা মুসলমান হয়ে গেলেন এবং আরজ করলেন, আমরা খাজরাজ ও আউস সম্প্রদায় চরম শত্রুমনোভাবাপন্ন এবং প্রায়শই যুদ্ধরত থাকি। এতো শত্রুতা আর কোনো গোত্রের মধ্যে নেই। আমরা আশা করি, আল্লাহ্ আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে একতাবদ্ধ করবেন। আমরা সত্ত্বর তাঁদের কাছে ফিরে গিয়ে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবো। আল্লাহপাক যদি আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে মিলিয়ে দেন তবে আমাদের নিকট সর্বাধিক সম্মানীয় আপনি ছাড়া আর কেউ হবেন না। তাঁরা ফিরে গেলেন মদীনায়। মদীনাবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আহ্বানের অনুরনণ স্পন্দিত হতে লাগলো মদীনার গৃহে গৃহে। প্রতি গৃহে তাঁর স. এর প্রসঙ্গ ও প্রশংসা নিরন্তর ধ্বনিত হয়ে চললো।

পরের বছর হজ্বের মওসুমে মক্কায় উপস্থিত হলেন বারোজন আনসার। খাজরাজ গোত্রের দশজন – আসাদ বিন জুররাহ্, আউফ বিন আফরাহ, মুআজ বিন আদরাহ, রাফে বিন মালেক আজলানী, জাকওয়ান বিন আবদে কায়েস, উবাদা বিন সামেত, জায়েদ বিন সা'লাবা, আব্বাস বিন উবাদা, উকবা বিন আমের, আতিয়া বিন আমের। বাকি দু'জন আউস গোত্রের, আবুল হাইসাম বিন তাইহান এবং আউস আমের বিন সায়দা। প্রথম আকাবা প্রান্তরে তাঁরা রসুল স. এর সঙ্গে মিলিত হলেন। সেখানে তারা বায়াত গ্রহণ করলেন। মহিলাদের বায়াতও সংঘটিত হলো। তাঁরা এ মর্মে বায়াত গ্রহণ করলেন যে, তাঁরা শিরিক ও ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন না। রসুল স. বললেন, যদি তোমরা এর অঙ্গীকার পূর্ণ করো তবে জান্নাত লাভ করবে। যদি ত্রুটি করো তবে গোনাহের কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) স্বরূপ শাস্তি হবে পৃথিবীতেই। পাপের পর্দা যদি পড়ে যায়, তবে তা আল্লাহতায়ালার বিবেচনাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে পারেন, ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো যুদ্ধের আগে। প্রত্যাবর্তনের সময় রসুল স. মুসয়াব বিন উমায়ের বিন হাশেম বিন আবদে মনাফকে তাঁদের সঙ্গী করে দিলেন। তাঁকে দায়িত্ব দিলেন — তিনি কোরআন শিক্ষা দিবেন ও ইসলামের হুকুম আহকাম বোঝাবেন। মদীনায় তিনি গিয়ে উঠলেন আসাদ বিন জাররাহ এর গৃহে। সেখানে তিনি খ্যাত হলেন মাক্বরী (কোরআন পাঠ দানকারী) নামে।

www.eelm.weebly.com

কিছুদিন পরের ঘটনা। আসাদ বিন জাররাহ্ মুসআবকে সঙ্গে নিয়ে বনী জুফারের এক বাগানে প্রবেশ করে বসে পড়লেন। অন্যান্য মুসলমানরাও সমবেত হলেন। অন্য দিকে সা'দ বিন মুআজ আসাদ বিন হুদায়েরকে বললো, এই দুইজন আমাদের এখানে এসে আমাদের নিরীহ লোকদেরকে দলে ভেড়াতে চায়। তুমি ওই দুইজনকে বকাবকি করে বের করে দাও। আসাদ আমার মামাতো ভাই। নয়তো আমি নিজেই বলতাম, তোমার প্রয়োজন হতো না।

সা'দ এবং উসাইয়েদ বনী আশহালের সর্দার ছিলো। তারা ছিলো মুশরিক। উসায়েদ একটি ছোট বল্লম নিয়ে মুসআব ও আসআদের নিকট গেলো। বাগানে পাশাপাশি বসে ছিলেন আসাদ এবং মুসআব। আসাদ বললেন, আগমণকারী ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের নেতা। তাকে মুসলমান করুন। মুসআব বললেন, তিনি আগে এসে বসুন, তারপর আমি কথা বলবো। উসায়েদ সামনে এলো কিন্তু বসলো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গালি দিতে লাগলো। বললো, কেনো এসেছো তোমরা? আমাদের নিরীহ লোকদেরকে ধোঁকা দিচ্ছো কেনো? বাঁচতে চাইলে সরে যাও এস্থান থেকে। মুসআব বললেন, বসুন। আমাদের কথা শুনুন। ভালো লাগলে মেনে নিবেন, না হলে মানবেন না। উসায়েদ বললো, ঠিক আছে। বল্লম মাটিতে গেড়ে বসে পড়লো সে।

মুসআব ইসলামের কথা বললেন। কোরআন পাঠ করে শোনালেন। আনন্দের আভাস ফুটে উঠলো উসায়েদের মুখমন্ডলে। ইসলামের অপার্থিব নূরের ঝলক ফুটে উঠলো তাঁর চেহারায়। বললেন তিনি, সুন্দর তো! এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে হলে কী করতে হবে? তাঁরা বললেন, গোসল করো। পবিত্র বস্ত্র পরিধান করো। তারপর কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে নাও। উসাইয়েদ সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে গোসল করে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে এলেন। তারপর কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করলেন। তারপর বললেন, আমার সঙ্গে রয়েছে আরেকজন — সা'দ বিন মুআজ। তাকে যদি এপথে আনা যায় তবে তার সম্প্রদায়ের সবাই এসে পড়বে। আমি এখনই গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি — একথা বলে তাঁর বল্লমটি উঠিয়ে নিয়ে উসাইয়েদ সা'দ বিন মুআজের নিকট চলে গেলেন। সা'দ বললেন, কী খবর? উসাইয়েদ বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তাদের মধ্যে মন্দ কিছু পাইনি। আমি প্রতিবাদ করলাম, তারা বললো — আগে শুনুন আমাদের কথা। তারপর যা পছন্দ তাই করবেন। ইতোমধ্যে আমি সংবাদ পেলাম, বণি হারেসা আসাদকে হত্যা করার জন্য বের হয়েছে। আসাদ তোমার মামাতো ভাই। তাকে মেরে তারা চুক্তি ভঙ্গ করতে চায়।

www.eelm.weebly.com

সা'দ রাগান্বিত হলেন। বল্লম হাতে নিয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে দাড়িয়ে বললেন, আমার মনে হচ্ছে তুমি কিছুই করোনি। দেখলাম তারা বাগানে আরামে বসে আছে। এখন বুঝলাম আসাদই তোমাকে পাঠিয়েছে। ঠিক আছে আমি নিজেই যাচ্ছি। বাগানে গিয়ে সা'দ, মুসআব এবং আসআদের প্রতি গালি বর্ষণ করতে লাগলো। আর উসাইয়েদকে বললো, আমাকে অপবাদ দিওনা। তুমি এমন কথা বলেছো যা আমরা পছন্দ করি না। মুসআব বললেন, বসুন। আমাদের কথা শুনুন। আমাদের কথা ভালো লাগলে মেনে নিবেন, না হলে আমরাই আপনার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাবো। সা'দ বললো, ঠিক আছে। বল্লম মাটিতে গেঁড়ে বসে পড়লো সে। মুসআব ইসলামের কথা বললেন এবং কোরআন থেকে আবৃত্তি করলেন। কোরআনের বাণী হৃদয় স্পর্শ করলো তাঁর। চেহারায় ফুটে উঠলো অপার্থিব জ্যোতি। তিনি বললেন, এধর্মে কিভাবে দাখিল হতে হয়? মুসআব বললেন, গোসল করে পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদাবৃত হয়ে কলেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করে দু'রাকাত নামাজ পড়তে হয়। সা'দ উঠে গিয়ে গোসল করে পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে এলেন, কলেমায়ে শাহাদাতের ঘোষনা দিলেন এবং দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। এরপর তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের দিকে রওয়ানা দিলেন। সঙ্গী হলেন উসাইয়েদ বিন হুদায়ের। গোত্রের লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, আল্লাহ্র কসম! সা'দের তো আগের চেহারা আর নেই। সা'দ বললেন, হে বনী আবদে আশহাল! আমার সম্পর্কে তোমাদের ধারনা কী? লোকেরা বললো, আপনি আমাদের অগ্রনী। আপনার অভিমত সম্মানার্হ। আপনার কথা ও কাজ কল্যাণমন্ডিত। সা'দ বললেন, তবে শোনো। তোমাদের সকল পুরুষ ও নারীদের সঙ্গে আমার কথা বলা নিষিদ্ধ যতক্ষন না তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। সা'দের কথা শুনে তাঁর সম্প্রদায়ের সকল নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করলো।

আসাদ রা. এর গৃহে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন হজরত মুসআব রা.। ইসলামের প্রতি আহবান অব্যাহত রাখলেন তিনি। আনসারদের সকল এলাকার নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করলেন। কেবল বনী উমাইয়া বিন জায়েদ, হাতামা, ওয়ায়েল এবং ওয়াকেব গোত্রের লোকেরা মুসলমান হলো না। কবি আবুল কায়েস বিন আসলতের কথা শুনতো তারা। সে ছিলো ইসলামবিরোধী। রসুল স. এর মদীনায় আগমণের পর বদর, উহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধ শেষ হলে এই গোত্রগুলো মুসলমান হয়েছিলো।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হজ সম্পাদনার্থে সত্তরজন মুসলমান আনসার এবং কতিপয় মুশরিকসহ হজরত মুসআব বিন উমায়ের মক্কায় পৌছলেন। আইয়ামে তাশরিকের সময় দ্বিতীয় আকাবায় রসুল স. এর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাত হয়। তাঁরা সেখানে বায়াত গ্রহণ করেন। এই বায়াতকে দ্বিতীয় আকাবার বায়াত বলা হয়।

www.eelm.weebly.com

ক্বাব বিন মালেক রা. বলেছেন, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। হজ তখন শেষ। প্রতিশ্রুত রাত এলো। আমরা আমাদের মুশরিক সাথীদেরকে এ প্রতিশ্রুতির কথা জানাইনি। কেবল একজনকে জানিয়েছিলাম। তার নাম আবু জাবের আবদুল্লাহ বিন আমর। আমরা তাকে বললাম, আপনি সম্মানিত জন। আমাদের নেতাদের মধ্যে একজন নেতা। আমরা চাইনা আপনি আগুনের ইন্ধন হোন। আমরা আপনার এই অবস্থা (মুশরিক অবস্থা) পছন্দ করি না। ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করুন। তিনি গ্রহণ করলেন এবং মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁকে নিয়ে আমরা গভীর রাতে অঙ্গীকার গ্রহণের স্থানে পৌঁছলাম। এক তৃতীয়াংশ রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা চুপিসারে উপস্থিত হলাম আকাবায়। আমরা ছিলাম সত্তর জন পুরুষ, দু'জন নারী — একজন বনী নাজ্জারের উম্মে আম্মারা নুসাইবা বিনতে ক্বাব এবং অন্যজন সালমা গোত্রের উম্মে মানীয় আসমা বিনতে আমর বিন আদ্দীর।

আমরা অপেক্ষা করছিলাম। এক সময় রসুল স. হজরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। হজরত আব্বাস বললেন, হে খাজরাজ গোত্র! তোমরা জানো মোহাম্মদ স. আমাদের সঙ্গে আছেন। এখানে আমরা যারা তাঁর অনুসারী, তাঁকে স. হেফাজত করার দায়িত্ব তাদেরই। তিনি এখানে সম্মানিত এবং সুরক্ষিত। তোমরা যদি তাঁকে নিয়ে যেতে চাও, তবে মক্কাবাসীদের কোপানলে পড়বে। সুতরাং ব্যাপারটি ভেবে দেখো। আমরা বললাম, আপনার কথাতো শুনলাম। এখন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি নিজে কিছু বলুন। আপনার পক্ষ থেকে এবং আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমাদের অঙ্গীকার নিতে চাইলে নিন।

রসুল স. পবিত্র কোরআন পাঠ করলেন। ইসলামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, আমি তোমাদের নিকট থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করছি যে, আমরা মদীনায় গেলে তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনকে যেভাবে রক্ষা করে থাকো আমাদেরকেও সেভাবে রক্ষা করবে। এগিয়ে গেলেন বারাহ বিন মারুর। তিনি রসুল স. এর পবিত্র হস্ত ধারণ করে নিবেদন করলেন, আমাদের পরিবার পরিজন অপেক্ষা আপনার হেফাজত অধিক কাম্য। হে আল্লাহর রসুল! আমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করুন। আপনার সঙ্গীদের রক্ষা করার জন্য আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছি—একথা বলতে না বলতেই আবুল হাইসাম বলে উঠলেন, কতিপয় মানুষের নিকট আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। হে আল্লাহর রসুল! এমন তো হবে না যে, সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের পর আল্লাহ আপনাকে বিজয়ী করলে আপনি আমাদেরকে ছেড়ে আপনার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসবেন। রসুল স. মৃদু হাসলেন। বললেন, না। তোমরা আমার। আমিও তোমাদের। তোমরা যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে আমিও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। যাদের সঙ্গে সন্ধি করবে, আমিও সন্ধিবদ্ধ

www.eelm.weebly.com

হবো তাদের সঙ্গে। বারোজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করো তোমরা, যারা হবেন তোমাদের নেতা। হজরত ঈসার হাওয়ারীদের মতো তাঁরা তাদের আপন সম্প্রদায়ের সংরক্ষক হবে। মনোনীত করা হলো বারোজনকে। নয়জনকে খাজরাজদের মধ্যে থেকে এবং তিনজনকে আউসদের মধ্য থেকে।

আসেম বিন আমর বিন কাতাদা বর্ণনা করেন, যখন সকলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে উদ্যত হলেন, তখন আব্বাস বিন উবাদা বিন নাদেলা আনসারী বললেন, হে খাজরাজ সম্প্রদায়! অনুধাবন করো, কোন বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছো তোমরা। অশ্বারোহী হয়ে যুদ্ধ করতে হবে। যদি তোমাদের সম্পদ বিধ্বংস হয়, নেতারা মৃত্যুবরণ করে, তখন যদি পিছিয়ে যাও; তবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকো। আল্লাহর কসম! অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে দুনিয়া ও আখেরাতে অসম্মান নেমে আসবে। সম্পদ ধ্বংসের পর এবং নেতৃবৃন্দের মৃত্যুর পরও যদি তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করতে পারো, তবেই কেবল দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভের অধিকারী হবে তোমরা। আনসারগণ উত্তর দিলেন, আমাদের সম্পদ ধ্বংস হলে এবং নেতৃবৃন্দ নিহত হলেও অঙ্গীকার পূর্ণ করবো আমরা। কিন্তু হে আল্লাহর রসুল! আপনি আমাদরকে জানিয়ে দিন, অঙ্গীকার পালনের বিনিময় কী? রসুল স. বললেন, জান্নাত। আনসারগণ বললেন, তবে হস্ত প্রসারিত করুন। রসুল স. হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর পবিত্র হাতে হাত রেখে একে একে সকলে বায়াত গ্রহণ করলেন। প্রথমে বারাহ বিন মারুর। তৎপর অন্যান্যরা।

সকলের বায়াত গ্রহণ শেষ হলে আকাবার শৃঙ্গ থেকে শয়তান অতি উচ্চ স্বরে চিৎকার করে বললো, বন্ধুগণ! তোমাদের সর্বনাশ! রসুল স. শুনলেন এ কথা। শয়তান বললো, অমুসলমানেরা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করতে একতাবদ্ধ। রসুল স. জবাব দিলেন, হে আল্লাহর দুশমন! হে আজীব (শয়তানটির নাম আজীব, আজীবের আভিধানিক অর্থ সাপ) আমি তোমাকে প্রতিহত করতে প্রস্তুত।

রাত্রি তখন অনেক। রসুল স. বললেন, আপন আবাসে ফিরে যাও সকলে। আব্বাস বিন উবাদা বিন নাদেলা আরজ করলেন, কসম ওই জাতের যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে কাল সকালেই মিনা প্রান্তরে আমরা তলোয়ার নিয়ে হাজির হবো। রসুল স. বললেন, এ রকম নির্দেশ নেই। তোমরা এখন নিজ আবাসে ফিরে যাও।

আমরা ফিরে এলাম। সকালে কোরাইশদের শ্রেষ্ঠ নেতারা এসে আমাদেরকে বলতে লাগলো, হে খাজরাজ দল! আমরা সংবাদ পেয়েছি তোমরা আমাদের সাথীকে নিয়ে যেতে চাও। তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বায়াতও গ্রহণ করেছো। আল্লাহ্‌র কসম! আরবের অন্য গোত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমরা মোটেও অনীহ নই। কিন্তু তোমরা দুর্বল — তাই ঘৃণার পাত্র। এ কথা শুনে

www.eelm.weebly.com

খাজরাজ ও আউস গোত্রের মুশরিকেরা দাঁড়িয়ে গেলো এবং বললো, আল্লাহর কসম! এ রকম ঘটনা তো ঘটেনি। আমরা তো কিছুই জানি না। মুসলমানেরা কিছু বললেন না। নীরবে একে অপরকে দেখতে লাগলেন।

আনসারগণ মদীনায় ফিরে গেলেন। মক্কার মুসলমানেরা একে একে গিয়ে উপস্থিত হতে লাগলেন মদীনায়। হুজুর স. তাঁদেরকে জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে কল্যাণ দান করেছেন। শান্তিতে বসবাসের জন্য একটি স্থানও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তোমরা মদীনায় চলে যাও এবং তোমাদের আনসার ভাইদের সাথে নিরাপদে বসবাস করতে থাকো। প্রথমে সালমা বিন আবদুল্লাহ মাখজুমীর ভাই মদীনায় হিজরত করলেন। তারপর গেলেন আমের বিন রবীয়া। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ। তারপর অন্যান্যরা। এমনিভাবে ইসলামের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন মদীনার মুসলমানেরা। আউস ও খাজরাজ গোত্রের শত্রুতা দূর হয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো শান্তিময় একতা।

তাই এরশাদ হচ্ছে, শত্রুতা ও অবিশ্বাসের কারণে তোমরা ছিলে অগ্নিকুন্ডের প্রান্তবর্তী। সত্বরই সেই হুতাশনে পতিত হতে তোমরা। কিন্তু আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে তোমাদেরকে সেই পতন থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহতায়ালা তাঁর নিদর্শন সুস্পষ্ট করে তোলেন, যাতে তোমরা পথপ্রাপ্ত হও।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১০৪

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

❒ তোমাদের মধ্যে এমন একদল হউক যাহারা কল্যাণের দিকে আহবান করিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্য নিষেধ করিবে; ইহারাই সফলকাম।

সৎ কাজের আদেশ প্রদান এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা ফরজে কেফায়া। এই কাজ সকলের উপরে ফরজ নয়। কেননা আদেশ ও নিষেধ জারী করার জন্য এলমে শরিয়তের মাধ্যমে প্রতিটি বিষয় যাচাই বাছাই করার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। সবাই এই যোগ্যতাধারী নয়। এই আয়াত সকল মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বিবৃত হয়েছে, এবং তোমাদের মধ্যে একটি দল—একথা বলে কতিপয় ব্যক্তিকে আহবান কার্যের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যদি এই আহবান কার্যে কেউই নিয়োজিত না থাকে তবে সবাইকে অভিযুক্ত করা হবে। আর যদি কেউ কেউ এ কাজে নিয়োজিত থাকে, তবে সবার পক্ষ থেকে ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

www.eelm.weebly.com

কল্যাণের দিকে আহবান অর্থ দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণের দিকে আহবান। ইবনে মারদুবিয়া হজরত ইমাম বাকের র. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, কোরআন ও আমার সুন্নতের উপর চলাই কল্যাণ। আল্লামা সুয়ুতী এ হাদিসটিকে মু'দাল বলেছেন। হজরত ওসমান এই আয়াত বিশেষ গুরুত্বসহ খুব বেশী তেলাওয়াত করতেন।

সৎকার্য ওগুলোই যেগুলোকে শরিয়ত উত্তম বলে নির্ধারিত করেছে। আর শরিয়ত নির্ধারিত মন্দ কাজগুলোই অসৎকার্য। যাঁরা সৎ কাজের আদেশ দেন এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখেন, তাঁরাই সফলকাম। যারা এ কাজ করে না, তারা অসফল এবং ক্ষতিগ্রস্ত।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, শরিয়তবিরোধী কার্যকলাপ দেখলে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বন্ধ করে দিও। না পারলে মুখের কথায় প্রতিবাদ কোর। তাও না পারলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা কোর। এমতো ঘৃণা দুর্বল ইমানের পরিচয়বাহী। মুসলিম।

হজরত নোমান ইবনে বশীর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, অসৎকাজে বাধা সৃষ্টি না করার বিষয়টি এ রকম, যেমন কোনো দ্বিতল নৌকার আরোহীবৃন্দ লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করলো, কেউ কেউ উপরে এবং কেউ কেউ নিচে অবস্থান করবে। নিচের লোকদের পানি আনতে যেতে হতো উপরে। উপরের লোকেরা এতে বিরক্ত হয়ে নিচের লোকদেরকে এভাবে আসা যাওয়া করতে নিষেধ করে দিলো। নিচের লোকেরা ভাবলো, নৌকা ফুটো করলেই তো পানি পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি তখন নৌকার তলায় কুঠারাঘাত করতে লাগলো। উপরের লোকেরা এসে জিজ্ঞেস করলো, সর্বনাশ! তুমি করছো কী? লোকটি বললো, আমাদের কারণে তোমরা কষ্ট পাচ্ছো। আবার আমাদের পানিরও একান্ত প্রয়োজন। নৌকা ফুটো করছি এজন্যই। এমতাবস্থায় যদি উপরের লোকেরা লোকটিকে নিবৃত্ত করে তবে সেই ব্যক্তি এবং অন্য সবাই রক্ষা পাবে। নিবৃত্ত না করলে সেও যেমন ধ্বংস হবে, তেমনি অন্য সকলেও ধ্বংস হবে। বোখারী।

হজরত হোজায়ফা থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবীয়ে করীম স. এরশাদ করেছেন, ওই পবিত্র সত্তার শপথ! যিনি আমার জীবনাধিপতি। দু'টি বিষয় অবশ্যম্ভাবী। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ জারী রাখবে। নতুবা অনতিবিলম্বে আল্লাহতায়ালা তোমাদের উপর আযাব নাজিল করবেন। তখন তোমরা প্রার্থনা করবে কিন্তু প্রার্থনা কবুল করা হবে না। তিরমিজি।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক এক জনসমাবেশে এই মর্মে ভাষণ দিয়েছিলেন, হে জনতা। তোমরা নিশ্চয়ই এই আয়াত পাঠ করো, 'হে বিশ্বাসীবৃন্দ! তোমরা

www.eelm.weebly.com

নিজেদের উপর একথা অপরিহার্য করে নাও-'পথভ্রষ্ট ব্যক্তি তোমাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। যদি তোমরা হেদায়েতের উপর সুস্থির থাকো।' সতর্ক হও হে জনতা। মন্দ কাজ কখনোই আমাদের জন্য ক্ষতিকারক হবে না যদি আমরা তার প্রতিবন্ধক হই। আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, অসৎ কাজ দেখলে বলপ্রয়োগ, মৌখিক প্রতিবাদ অথবা অন্তর দ্বারা ঘৃণা না করলে সকলের উপরে নেমে আসবে শাস্তি। ইবনে মাজা। তিরমিজি হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, জারীর বিন আবদুল্লাহ থেকে।

হজরত আদী বিন আদী কুন্দি থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমাদের মুক্তিপ্রাপ্ত এক গোলাম আমাদেরকে বলেছেন, আমি আমার দাদার নিকট থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়কে তাদের বিশেষ কোনো লোকের পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করেন না, যতক্ষণ তাদের অধিকাংশ লোক পাপের কথা জানতে পেরে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিরোধ না করে নীরব থাকে। প্রতিরোধ না করলে আল্লাহতায়ালা সকলকেই শাস্তি দান করেন। বাগবী।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, বনী ইসরাইলগণ পাপাসক্ত হয়ে পড়লে তাদের আলেমগণ তাদেরকে সর্তক করলেন। কিন্তু তারা বিরত হলো না। এরপর আলেমগণ নিজেরাই তাদের সভায় ওঠা বসা করতে লাগলো। ক্রমশঃ তাদের সাথে একত্রাহার ও মদ্যপান সবই চললো। তাদের তমসাচ্ছন্ন অন্তরের প্রভাবে আলেমদের অন্তরও তমসাচ্ছাদিত হয়ে পড়লো। তাই হজরত দাউদ এবং হজরত ঈসা তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। এই অভিসম্পাত তাদের অপরাধাসক্তি ও সীমালংঘনের কারণে হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেছেন, রসুল স. শায়িত ছিলেন, একথা বলেই উঠে পড়লেন তিনি এবং বললেন, আমার জীবনাধিকারী ওই পবিত্র সত্তার শপথ! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা অত্যাচারী ও পাপীদের পাপকার্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াও। তিরমিজি, আবু দাউদ।

একটি প্রশ্ন ঃ যদি কেউ নিজে সৎকর্মশীল না হয় এবং মন্দ থেকে মুক্ত না থাকে, তবে অন্যকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার হুকুমটি কি তারও উপরে ওয়াজিব?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। আয়াতের মর্ম একথাই প্রমাণ করে। কিন্তু তার জন্য আত্মসংশোধিত হওয়াও জরুরী। এ মর্মে অন্য আয়াতে এসেছে, 'আশ্চর্য! অন্যকে সৎকর্মশীল হতে বলো আর নিজে থাকো উদাসীন।' অন্য আরেক আয়াতে বলা হয়েছে, 'কেনো এমন কথা বলো, যা নিজে করো না। এ রকম আচরণ আল্লাহতায়ালার অসন্তুষ্টির কারণ।'

www.eelm.weebly.com

হজরত উসামা বিন জায়েদ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে ফেলে দেয়ার সাথে সাথে তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। গাধা যেমন আটার চাক্কিকে কেন্দ্র করে ঘোরে, তেমনি সে তার নাড়িভুঁড়িকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকবে। তখন দোজখবাসীরা তার পাশে সমবেত হয়ে বলবে, কী খবর তোমার? পৃথিবীবাসের সময় তুমি না আমাদেরকে ভালো কাজ করতে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতে। লোকটি বলবে, আমি তোমাদেরকে ভালো কাজ করতে বলতাম। কিন্তু নিজে করতাম না। খারাপ কাজ করতে নিষেধ করতাম। অথচ নিজে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতাম না। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, মেরাজ রজনীতে আমি দেখেছি, আগুনের কাঁচি দ্বারা অনেক লোকের ঠোঁট কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিব্‌রাইল! এরা কারা? হজরত জিব্‌রাইল বললেন, এরা আপনার উম্মতের ওয়াজকারী (বক্তা)। এরা মানুষকে ভালো কাজ করতে বলতো। কিন্তু নিজেরা করতো না। শরহে সুন্নায় ইমাম বাগবী এবং শোয়াবুল ইমানে ইমাম বায়হাকী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১০৫

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَتُ

وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

❐ তোমরা তাহাদের মত হইওনা যাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসিবার পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের জন্য মহা শাস্তি রহিয়াছে।

তাদের মত হয়ো না অর্থাৎ ইহুদীদের মতো হয়ো না, যারা উত্তম দল থেকে বিচ্ছিন্ন। আর মতান্তর বলতে এখানে বুঝতে হবে আল্লাহতায়ালার স্পষ্ট অর্থ বোধক আয়াত এবং সর্ববিদিত (মুতাওয়াতির) হাদিসসমূহ। ইজমায়ে উম্মত (উম্মতের ঐকমত্য)ও এর অন্তর্ভুত। ইখতিলাফ (মতান্তর) ব্যাপক অর্থ বোধক শব্দ। যেমন, আহলে সুন্নত ও আহলে বিদাত (মোতাজিলা, খারেজী ইত্যাদি) এর মত বিরোধ। শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রেও এ শব্দটি প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন, অজুর মধ্যে পা ধোয়া এবং মোজার উপরে মসেহ, চার খলিফার খেলাফত। এ সমস্ত ক্ষেত্রে মতভেদ নিষিদ্ধ। অবশ্য যে সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয় — সে সমস্ত

www.eelm.weebly.com

বিষয়ে মতানৈক্য বৈধ। এই বিষয়টি ইজতেহাদী বিষয়। যাঁরা বিষয়গুলোকে সুগভীর অভিনিবেশ সহ বুঝতে চেষ্টা করেন তাঁরা মুজতাহিদ। এই বুঝতে চেষ্টা করার নাম ইজতেহাদ। ইজতেহাদ সঠিকও হতে পারে ভুলও হতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ থাকার কারণে ভুল ইজতেহাদকারীগণ ক্ষমাপ্রাপ্ত। বরং তাঁদের এই সৎ প্রচেষ্টার কারণে সওয়াব রয়েছে। আর মানুষের জন্য এই জাতীয় মতানৈক্য রহমত স্বরূপ।

আব্দ বিন হুমাইদী, দারেমী এবং ইবনে মাজা, বোখারী ও মুসলিমের মধ্যে এবং ইবনে আসাকের ও হাকেম হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আমার অন্তর্ধানের পর আমার সহচরবৃন্দের মতানৈক্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আল্লাহতায়ালা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমাকে জানিয়েছেন, তোমার সহচরবৃন্দ আমার নিকট নক্ষত্র তুল্য। তারা একজন অপেক্ষা অন্যজন অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন ও আলোকিত।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তারা একজন অপেক্ষা অন্য জন উজ্জ্বলতর কিন্তু সকলেই উজ্জ্বল। তাদের মত সমূহ থেকে কোনো একটি যদি কেউ গ্রহণ করে, তবে সে পথপ্রাপ্ত হবে। দারা কুতনী, ফাজায়েলে সাহাবা এবং ইবনে আবদুল বার হজরত জাবের থেকে। আরো বর্ণনা করেছেন বায়হাকী তাঁর মাদখাল গ্রন্থে।

শিথিল সনদের সঙ্গে বায়হাকী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আরো বর্ণনা করেছেন যে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহর কিতাবে উল্লেখিত নির্দেশানুসারে আমল করো। কিতাব তরক করার কোনো অজুহাতই গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো বিষয় আল্লাহতায়ালার কিতাবে স্পষ্ট না দেখতে পেলে নবী করীম স. এর সুন্নত অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সুন্নতে স্পষ্ট না পেলে সাহাবীগণের মত অনুযায়ী আমল করতে হবে। আমার সাহাবীগণ আকাশের নক্ষত্ররাজি তুল্য। তাঁদের যে কোনো একজনের অনুসরণ করলেই তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। সাহাবীগণের মতবিরোধ তোমাদের জন্য রহমত।

মাদখাল গ্রন্থে বায়হাকী এবং তবকাত পুস্তকে ইবনে সা'দ, কাসেম বিন মোহাম্মদের উক্তি উল্লেখ করেছেন এইভাবে, মোহাম্মদ স. এর সহচরবৃন্দের মতানৈক্য আল্লাহর বান্দাদের জন্য রহমত। ওমর বিন আবদুল আজীজ র. থেকে বায়হাকী এরকম উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন।

অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপনের পর অর্থাৎ কোরআন, হাদিস ও ইজমার ক্ষেত্রে মতবিরোধ ক্ষমার্হ নয়। এ রকম ক্ষেত্রে মতবিরোধ শাস্তিযোগ্য।

www.eelm.weebly.com

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ○ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ○ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ○

❒ সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হইয়া যাইবে এবং কতক মুখ কাল হইয়া যাইবে; যাহাদের মুখ কাল হইবে তাহাদিগকে বলা হইবে, 'বিশ্বাসের পর কি তোমরা সত্য প্রত্যাখান করিয়াছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা সত্য প্রত্যাখান করিতে।'

❒ যাহাদের মুখ উজ্জ্বল হইবে তাহারা আল্লাহের অনুগ্রহে থাকিবে, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

❒ এইগুলি আল্লাহের আয়াত, তোমার নিকট যথাযথভাবে আবৃত্তি করিতেছি। আল্লাহ্ বিশ্ব-জগতের প্রতি জুলুম করিতে চাহেন না।

❒ আসমান ও জমিনে যাহাকিছু আছে সব আল্লাহেরই ; আল্লাহের নিকটই সব কিছু প্রত্যানীত হইবে।

কিয়ামতের দিন বিশ্বাসীদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। আর অবিশ্বাসীদের মুখমন্ডল হবে কৃষ্ণকায়। সাঈদ বিন জোবায়ের, হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এরকম, আহলে সুন্নতের চেহারা হবে উজ্জ্বল এবং আহলে বেদাতের চেহারা হবে কালো। মসনদে ফেরদাউস গ্রন্থে দায়লামী অশক্ত সূত্রের মাধ্যমে হজরত ইবনে ওমরের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এভাবে — রসুল স. বলেছেন, আহলে সুন্নতের মুখাবয়ব হবে জ্যোতির্ময় এবং আহলে বেদাতের মুখাবয়ব হবে তমাসাচ্ছাদিত। কৃষ্ণ মুখাবয়বধারীদেরকে বলা হবে, তোমরা নবী ও কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করার পর সুস্পষ্ট প্রমাণকে অস্বীকার করেছো, দ্বীনকে করেছো দ্বিধাদীর্ন এবং মোতাশাবেহাতের (অস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াতের) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছো। তাই তোমাদের অবিশ্বাস ও অকৃতজ্ঞতার শাস্তি আস্বাদন করো এখন। হজরত আবু উমামা এবং হজরত কাতাদা বর্ণনা করেছেন, এই উম্মত এবং পূর্ববর্তী উম্মতের বেদাতপন্থীদেরকে লক্ষ্য করে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আহমদ ও অন্যান্যরা হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তারা খারেজী। হজরত আসমা বর্ণিত হাদিসে এসেছে, এই আয়াতের লক্ষ্য আহলে রায় (ব্যক্তিগত অভিমত পোষণকারীগণ)। রসুল স. এরশাদ করেন, আমি যখন হাউজে কাউসারের সন্নিকটে উপস্থিত থাকবো, তখন দেখতে পাবো কেউ কেউ আমার নিকটে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাদেরকে হাউজের নিকট আসতে দেয়া হবে না। আমি বলবো, হে আমার আল্লাহ! এরা তো আমারই উম্মত। উত্তর আসবে, তুমি কি জানো তারা কি কি কুকর্ম করেছে? এরা সব সময় ছিলো পশ্চাদাপসরণকারী (হেদায়েত বিমুখ)।বোখারী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ফেতনা আগমনের আগেই সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করো। অন্ধকার রাতের মতো এগিয়ে আসছে ফেতনা। ওই সময় মানুষ সকালে হবে বিশ্বাসী সন্ধ্যায় অবিশ্বাসী। অপরাহ্নে অবিশ্বাসী, প্রত্যূষে বিশ্বাসী। তারা দ্বীনকে দুনিয়ার নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে। আহমদ, মুসলিম, তিরমিজি।

অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াত মুরতাদদের (ধর্মত্যাগীদের) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা ইসলামে আগমণের পর পুনরায় প্রত্যানীত হয়েছে কুফরীতে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সকল আহলে কিতাবদেরকে লক্ষ্য করে, যারা হজরত মুসা এবং তওরাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে কিন্তু রসুল স.কে মেনে নেয়নি। অথবা তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করতো কিন্তু আবির্ভাবের পর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সমস্ত কাফের এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল। কেননা রূহের জগতে আল্লাহ পাক সকলের নিকট তিনি প্রতিপালক কি না এই মর্মে সাক্ষ্য নিয়েছেন। সবাই তখন তাঁকে বিশ্বাস করেছে। কিন্তু পৃথিবীতে এসে হয়ে গিয়েছে অবিশ্বাসী। এমনও বলা যায় যে, দলিল প্রমাণাদি এবং বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে ইমান গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যারা ইমান গ্রহণ করেনি, তারাই এই আয়াতের লক্ষ্য।

উজ্জ্বল মুখাবয়ববিশিষ্ট দল হবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। জান্নাত এবং চিরস্থায়ী সওয়াবের অধিকারী হবেন তাঁরা। আয়াতে 'রহমত' শব্দ দ্বারা জান্নাতকে বোঝানো হয়েছে। বিশ্বাসীরা তাঁদের জীবন অতিবাহিত করবেন আল্লাহতায়ালার নির্দেশ অনুসারে। কিন্তু জান্নাতে প্রবিষ্ট হওয়া সম্পূর্ণতই আল্লাহপাকের অনুগ্রহের কারণেই হবে।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, হেদায়েত অবলম্বন করো। মধ্যবর্তী পন্থায় জীবন যাপন করো এবং প্রসন্নচিত্ত থাকো। মনে রেখো, বেহেশতপ্রাপ্তি আমলনির্ভর নয়। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল! এ অবস্থা কি আপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য (আপনার জান্নাত প্রাপ্তিও কি আমলনির্ভর

www.eelm.weebly.com

নয়)? তিনি স. বললেন, না। তবে আল্লাহ্তো আমাকে তাঁর মাগফেরাত ও রহমতের দ্বারা আবৃত করেছেন (তাই আমার জান্নাত প্রাপ্তি নিশ্চিত)। বোখারী, মালেক। এই হাদিসটি হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম, হজরত জাবেরের মাধ্যমে এ রকম উল্লেখ করেছেন যে, তোমাদের আমল তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না, দোজখ থেকেও রক্ষা করবে না। আল্লাহর রহমত ব্যতীত আমাকেও না।

এরকম হাদিস আরো বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম আহমদ, আবু মুসা আশআরী এবং হজরত শারীক বিন তারিক থেকে বায্যার এবং হজরত উসামা বিন শারীক এবং হজরত আসাদ বিন কারজী থেকে তিবরানী। বাহ্যত এই হাদিসগুলো আল্লাহতায়ালার ওই আয়াতের বিপরীত মনে হয় — যাতে বলা হয়েছে, 'উদখুলুল জান্নাতা বিমা কুংতুম তা'মালূন।' এ প্রসঙ্গের উত্তর এই হতে পারে যে, জান্নাতে রয়েছে বিভিন্ন স্তর। তাই উন্নততর স্তর প্রাপ্তি আমলের উপরে নির্ভরশীল। প্রবেশ ও স্থায়ী বসবাস আল্লাহতায়ালার ফজল ও রহমতের কারণেই হবে।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, পুলসিরাত অতিক্রম আল্লাহর মাগফেরাতের মাধ্যমে, জান্নাতে প্রবেশ রহমতের মাধ্যমে এবং জান্নাতের বিভিন্ন স্তর প্রাপ্তি আমলের কারণে হবে। বর্ণনা করেছেন হান্নাদ তাঁর জুহ্দ গ্রন্থে আর আবু নাঈম উল্লেখ করেছেন, আউন বিন আবদুল্লাহ্র সূত্রপরম্পরায়।

বেহেশতবাস স্থায়ী। বেহেশতের সুখ ও দোজখের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালার অঙ্গীকার সত্য। জগৎবাসীদের প্রতি জুলুম করা তাঁর অভিপ্রায় নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, তিনিই তো সকলকিছুর নিরঙ্কুশ প্রভু। ঔচিত্য ও বাধ্যতা থেকে তিনি পবিত্র। তিনি যা ইচ্ছা তাই করার ক্ষমতাধারী। তবে জুলুমের কথা এলো কেনো।

আমি বলি, আয়াতের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য এই যে, সৎকর্মশীলদের পূণ্য কমিয়ে দেয়া অথবা পাপিষ্ঠদের প্রাপ্য শাস্তি বাড়িয়ে দেয়া, এ সমস্ত জুলুম থেকে তিনি পবিত্র। অবিশ্বাস-ই সবচেয়ে বড় পাপ। তাই কুফরীর জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আজাব। আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুর অধিকর্তা আল্লাহতায়ালা। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর সাম্রাজ্যাধীন। সকলকিছুই প্রত্যানীত হবে তাঁর নিকটেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকারানুযায়ী সকলের জন্য নির্ধারণ করবেন স্বস্তি অথবা শাস্তি।

www.eelm.weebly.com

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ○

❐ তোমরাই শ্রেষ্ঠদল, মানবজাতির জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হইয়াছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্য নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর। কিতাবীগণ যদি বিশ্বাস করিত তবে উহা তাহাদের জন্য ভাল হইত। তাহাদের মধ্যে বিশ্বাসী আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

ইমাম বাগবী, হজরত ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন, মালেক বিন জঈফ এবং ওহাব বিন ইহুদ এই দুইজন ইহুদী — হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত মুআজ বিন জাবাল, হজরত সালেম বিন মাওলা এবং আবী হুজায়েফাকে বললো, আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম। আর আমাদের ধর্মমত তোমাদের ধর্মমত অপেক্ষা উত্তম। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। 'খইরা উম্মাতি' শব্দ দু'টির মধ্যে অর্থের দিক থেকে 'খইর' শব্দটি বিশেষ্য এবং 'উম্মাতুন' শব্দটি বিশেষণ।

একটি ধারণা ঃ 'কুংতুম' অতীতকাল বোধক। এতে বোঝা যায় অতীতে তোমরা উত্তম উম্মত ছিলে, এখন নেই। আগামীতেও থাকবে না।

উত্তর ঃ 'কানা' শব্দটি অতীতকাল বোধক। তবে অতীতকালের এই সম্বোধন এখন রহিত হয়ে গিয়েছে অথবা আগামীতে রহিতাবস্থা বলবত থাকবে। এতে এ কথা বোঝা যায় না 'এখন নেই' অথবা 'আগামীতে হবে না' - এ কথা স্পষ্ট। যেমন আল্লাহ্ বলেন, 'কানাল্লাহু গফুরার রহীমা।' এখানে আল্লাহ্র ক্ষমাশীল হওয়াটা কোনো বিশেষকালের জন্য নির্দিষ্ট নয়, যদিও এখানে 'কানা' শব্দটি অতীতকালবোধক। অতএব 'কুংতুম খইরা উম্মাতি' অর্থ হবে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সকল কালেই উত্তম। তাই এর পরেই উল্লেখ করা হয়েছে তা'মুরুনা বিল মারুফ (সৎকাজের নির্দেশ দান করো) একথায় বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে সৎকাজের নির্দেশ দান করো বোঝা যায়। উম্মতে ইসলামকে উত্তম উম্মত বলে এ কথা বোঝানো হতে পারে যে, তোমরা আল্লাহর জ্ঞানে বরাবরই উত্তম উম্মত ছিলে অথবা স্মৃতিচারণের মাধ্যমে অতীত উম্মতদের মধ্যেও উত্তম উম্মত বলে বিবেচিত ছিলে।

www.eelm.weebly.com

'উখরিজাত লিন্নাস' — অর্থাৎ মানুষের মধ্য থেকে প্রকাশিত বা বিকশিত বলতে উত্তম উম্মতের বর্তমান বিদ্যমানতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কুংতুম অর্থাৎ 'তোমরা' বলতে সাহাবায়ে কেরামদের জামাত সরাসরি সম্বোধিত হয়েছে। জুহাক, জোবায়ের থেকে বর্ণনা করেন, হজরত ওমর বিন খাত্তাব বলেছেন, উত্তম উম্মত বলতে আমাদেরকে অর্থাৎ প্রথম যুগের মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে, পরবর্তীদেরকে নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উত্তম উম্মত তাঁরাই যাঁরা রসুল স. এর সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। হজরত ওমর বলেছেন, আল্লাহতায়ালা কুংতুম এর পরিবর্তে আংতুম ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কুংতুম শব্দটি নির্দিষ্ট করেছেন কেবল সাহাবীদের জন্য এবং ওই সমস্ত মানুষের জন্য যাঁরা সাহাবীদের মতো। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমস্ত উম্মতই অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। উম্মতের ঐকমত্য এ রকমই — উম্মতে ইসলামী অন্য সমস্ত উম্মত অপেক্ষা উত্তম এবং উম্মতে ইসলামীর মধ্যে সাহাবীদের যুগ উত্তম।

জ্ঞাতব্য ঃ হজরত কাতাদা বলেছেন, হজরত ওমর কুংতুম খইরা উম্মাতিন — এই আয়াত পাঠ করার পর বলতেন, যাঁরা এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হতে অভিলাষী হয়, তাদেরকে সমস্ত মানুষের হেদায়েতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে তাদেরকে অবশ্যই এই উম্মতের জন্য নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যসমূহ আত্মস্থ্ করতে হবে।

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আর আমি (আসমানী) কিতাবসমূহে একথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছি (বেহেশত) ভূমির অধিকারী আমার সৎকর্মশীল বান্দাগণ।' অন্যত্র বলেছেন, 'অতপর এই কিতাবটি ওই সমস্ত লোকের হাতে অর্পণ করেছি, যারা আমার বান্দাগণের মধ্যে পছন্দনীয়।' রসুলে পাক স. এরশাদ করেন, আমার বেহেশতে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে অন্য নবীগণের বেহেশতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর আমার উম্মতের বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে অন্যান্য উম্মতের বেহেশতে প্রবেশও নিষিদ্ধ। উত্তম সনদে হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী। হজরত ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে তিনি মারফু সূত্রে আরো বর্ণনা করেছেন, অন্যান্য উম্মতের বেহেশতে প্রবেশ হারাম যতক্ষণ না আমার উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করবে।

আহমদ, বাযযার এবং তিবরানী বিশুদ্ধ সনদে হজরত জাবের থেকে বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, বেহেশতবাসীদের মধ্যে আমার উম্মতের সংখ্যা হবে এক চতুর্থাংশ। আমার ইচ্ছা তাঁরা এক তৃতীয়াংশ হোক। বরং অর্ধেক হোক। উত্তম সনদে তিরমিজি এবং বিশুদ্ধ সনদে হাকেম বলেন, একশ' বিশটি কাতার হবে জান্নাতবাসীদের। আশি কাতার উম্মতে মোহাম্মদীর। বাকিগুলো অন্যান্য উম্মতের। ওই হাদিসের বর্ণনাকারী হজরত আবু মুসা, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত মুয়াবিয়া বিন জুনদাহ্ এবং হজরত ইবনে মাসউদ। রসুল স. এরশাদ

www.eelm.weebly.com

করেন, তোমরা সত্তর অংশের এক অংশ হবে এবং সকলের চেয়ে উত্তম হবে। আল্লাহর নিকট হবে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদামন্ডিত। এই হাদিস বায ইবনে হাকিমের দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা এবং দারেমী। তিরমিজি একে উত্তম বলেছেন। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম বাগবীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

রসুলুল্লাহ স. বলেন, আমার উম্মত বৃষ্টিপাতের মতো। বোঝা যায় না এর প্রথম অংশ উত্তম না শেষ অংশ। বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, হজরত আনাস এবং হজরত আবু জাফর বিন মোহাম্মদ থেকে। বায়হাকী এবং ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, আমার উম্মতের ভুলত্রুটি ক্ষমার্হ। তাদের ওই সমস্ত ভুলত্রুটিও ক্ষমাপ্রাপ্ত, যা তারা বাধ্য হয়ে করে।

রসুল স. এরশাদ করেন, উত্তম মানুষ, আমার যুগের মানুষ। এরপর তার পরবর্তীগণ। তারপর তার পরবর্তীগণ। এর পরে আসবে এমন মানুষ যাদের সাক্ষ্য হবে শপথের পূর্বে এবং শপথ হবে সাক্ষ্যের পূর্বে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি, আহমদ এবং তিবরানী। এ রকম আরো হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আয়েশা থেকে মুসলিম এবং হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে তিরমিজি ও হাকেম।

রসুল স. এরশাদ করেন, আমার সাহাবীগণের মন্দ বোল না। তোমরা আল্লাহর রাস্তায় উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করলেও তাদের এক সের অথবা আধা সের যব দান করার সমতুল্য হবে না। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম, হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। হজরত বোরায়দা থেকে তিরমিজি বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, যে মাটিতে আমার কোনো সাহাবী মৃত্যুবরণ করবে, কিয়ামতের দিন ওই এলাকার মানুষের জন্য সে হবে পথপ্রদর্শক এবং পথের আলো।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, মানুষের মধ্যে সবচাইতে উত্তম সে, যে শৃংখলাবদ্ধ (সিলসিলাভুক্ত) হয়ে আসে। তোমরা তাদেরকে ইসলামের অন্তর্ভুত করো।

আমি বলি, অতীত উম্মতের চেয়ে এই উম্মতের ধর্মপ্রচারক ও মোর্শেদের আল্লাহর পথে আকর্ষণ ক্ষমতা বেশী। হজরত আলী কুতুবুল এরশাদ এবং সাহেবে বেলায়েত ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক মাধ্যম ব্যতীত অতীত উম্মতের কেউ বেলায়েতের স্তরে উপনীত হতে পারেননি। এরপর তাঁর বংশধরদের মধ্যে এই পথের ফয়েজের সিলসিলা ইমাম হাসান আসকারী এবং শায়েখ আবদুল কাদের জীলানী পর্যন্ত পৌঁছেছে। শায়েখ জীলানী বলেছেন, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত এ পথের ফয়েজ হয়ে থাকবেন। আরো বলেছেন, প্রথম যুগের সূর্য অস্তমিত। এখন আমাদের সূর্য জ্বলছে।

www.eelm.weebly.com

উম্মতে মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা পুণ্যকর্ম করতে নির্দেশ দিবে এবং মন্দ কর্ম থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে তাদের অন্তরে বলবৎ রাখবে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসসহ অন্যান্য বিশ্বাস্য বিষয়সমূহে আস্থা রাখা। ওই ধরনের বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস যা গ্রহণীয়। আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও নবীগণের এক বা একাধিক জনকে অস্বীকার করা অথবা কিয়ামতকে সত্য না জানা ইমান বিরোধী। আহলে কিতাবেরা বিভিন্ন কিতাব ও বিভিন্ন নবীদেরকে মানে বটে কিন্তু সকল নবী এবং সকল কিতাবকে মানে না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, 'যদি আহলে কিতাবগণ ইমান গ্রহণ করতো।'

হজরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তোমরা কি জানো আল্লাহর প্রতি ইমান আনা কাকে বলে? জুহাক আরজ করলেন, এ বিষয়ে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলই অধিক অবগত। তিনি স. বললেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ সাক্ষ্য দেয়া, নামাজ কায়েম করা, জাকাত দেয়া, রমজানের রোজা রাখা এবং গণিমতের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর রাস্তায় দান করা। বোখারী, মুসলিম।

অনুযোগঃ সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের পূর্বে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিলো। কেননা প্রথমে ইমান তারপর সৎআমল। ইমানের পরেই তো সৎকাজ সংঘটিত হয়। কিন্তু এখানে সৎকাজের পরে ইমানের উল্লেখ করা হয়েছে।

উত্তরঃ এখানে সতর্ক করাই উদ্দেশ্য যে, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ তারা অন্তরের বিশ্বাসের কারণেই করবে। মানুষের কাছে প্রকাশ করার জন্য করবে না। কেননা সৎকাজের আদেশ দানের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি ইমান অতি অবশ্যই প্রয়োজন। অথবা এমনও হতে পারে যে, পরবর্তী বাক্যের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের জন্যই এখানে ইমানের উল্লেখ করা হয়েছে। পরের বাক্যে বলা হয়েছে, কিতাবীগণ যদি বিশ্বাস স্থাপন করতো তা তাদের জন্য কতই না উত্তম হতো। এরকম করলে উত্তম উম্মত সম্বোধনের অন্তর্ভূত হতে পারতো।

আমি বলি, এখানে আল্লাহ্‌র প্রতি ইমান অর্থ প্রকৃত ইমান। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছুর ধারণা থেকে মুক্ত প্রকৃত ইমান। এমন ইমান যা প্রবৃত্তির কুধারণা থেকে মুক্ত। এমন ইমান যা প্রেমপূর্ণ ও আন্তরিক, যে ইমান ইহ-পরকালের সকল আকর্ষণ ও লালসা থেকে পবিত্র।

কিতাবীদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য প্রকৃত ইমানদার। যেমন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম ও অন্যান্যরা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

www.eelm.weebly.com

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ۚ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۗ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ○ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

❒ সামান্য ক্লেশ দেওয়া ছাড়া কদাচ তাহারা তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তবে তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে, তারপর তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবেনা।

❒ আল্লাহের প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাহিরে যেখানেই তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে সেখানেই তাহারা হীনতাগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহের ক্রোধের পাত্র হইয়াছে এবং দারিদ্রগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা এই হেতু যে তাহারা আল্লাহের আয়াত প্রত্যাখান করিত এবং অন্যায়রূপে নবীগণকে হত্যা করিত; ইহা এইজন্য যে তাহারা অবাধ্য হইয়াছিল এবং সীমালংঘন করিত।

যখন ইহুদী নেতারা আবদুল্লাহ্ বিন সালাম ও অন্যান্য মুসলমান আহলে কিতাবদের ক্ষতি করতে প্রবৃত্ত হলো, তখন আল্লাহ্তায়ালা সান্ত্বনা প্রদানার্থে বললেন, কাফের আহলে কিতাবীরা বড় কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেনা। মৌখিক বাদানুবাদের মধ্যেই তাদের ক্ষতি সীমাবদ্ধ। জীবনহানি কিংবা সম্পদ বিনষ্টি, এরকম বড় কোনো ক্ষতি করা তাদের আওতাবহির্ভূত। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে তাদের জন্য পৃষ্ঠপ্রদর্শন নিশ্চিত। তোমরাই বিজয়ী। কারণ তোমরা আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যপ্রাপ্ত। বনি কোরাইজা, বনি নাজির এবং খয়বরবাসী ইহুদীদের লাঞ্ছনাগ্রস্ত জীবন এর সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহুদীদের জীবন, পরিবার পরিজন, সম্পদ তোমাদের জন্য হালাল। যদি তারা নিরাপত্তাপ্রার্থী হয় তবে ইসলামে তার অবকাশ রয়েছে। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, 'আর যদি মুশরিকদের মধ্যে কেউ আপনার নিকট আশ্রয়ার্থি হয় তবে আপনি তাকে আশ্রয় দিন।' অন্যত্র

www.eelm.weebly.com

এরশাদ করেন, 'যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিজিয়া দিতে স্বীকৃত হয়।' জিজিয়া দিলে তাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ। তাই বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্‌র জিম্মাদারী এবং মানুষের জিম্মাদারী' অর্থাৎ মুসলমানরা জিম্মাদার হলে তা আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকেই হবে। এই জিম্মাদারীর বাইরে গেলেই তাদের জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা অনিবার্য। তারা আল্লাহ্‌তায়ালার ক্রোধের পাত্র। দারিদ্র ও লোভ তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে।

কৃপণ ব্যক্তি সম্পদ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত। তাদের অবস্থা নিঃসম্বল ব্যক্তিদের মতোই। আর লোভীরা সম্পদ অর্জনের জন্য অস্থির। বায়যাবী লিখেছেন, ইহুদীরা অধিকাংশই ফকির মিসকিনদের মতো। কারণ, তারা সম্পদশালী হলেও ভিখারীদের মতো যাঞ্ঝা করে। সম্পদ গোপন করতে চায় বলে দারিদ্র প্রদর্শন করে। তাদের এই অপমানজনক অবস্থা আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত। তারা আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যানকারী, অন্যায়ভাবে নবী রসুলদেরকে হত্যাকারী। তাই তাদের জীবন লাঞ্ছনাহত।

দু'টি কারণে তাদের এই অপদস্থতা। ১. কুফরী ও নবীহত্যা। ২. পাপাসক্তিতে সীমালংঘন। পৃথিবীর অপদস্থতা এবং পরকালের শাস্তি তাদের জন্য অপরিহার্য।

ইবনে মান্দাহ্ তার আস্ সাহাবা গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, যখন হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম, সালাবা বিন শোবা, উসাইদ বিন তাবীয়া, আসাদ বিন উবায়েদ এবং তাদের সাথে অন্যান্য ইহুদীগণ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলেন, তখন ইহুদী আলেমরা বলতে শুরু করলো, আমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট, তারাই মোহাম্মদ স. এর ধর্মমত গ্রহণ করেছে। তারা ভালো হলে কিছুতেই বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করে অন্যধর্ম গ্রহণ করতো না। তখন পরবর্তী আয়াত দু'টি নাজিল হয়েছে। ইবনে আবী হাতেম।

আহমদ, নাসাঈ এবং ইবনে হাব্বান, হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুল স. ইশার নামাজ বিলম্ব করলেন। সাহাবীগণ অপেক্ষমাণ ছিলেন। নবী পাক স. তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, জেনে নাও। অন্য কোনো ধর্মমতের লোকেরা এ সময় আল্লাহ্‌তায়ালার স্মরণরত হয়না। তখন অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

لَيْسُوْا سَوَآءً ۚ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ۝ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝

❒ তাহারা সকলে এক রকম নহে। কিতাবীদের মধ্যে অবিচলিত একদল আছে; তাহারা রাত্রিকালে সিজদারত অবস্থায় আল্লাহের আয়াত আবৃত্তি করে।

❒ তাহারা আল্লাহ্ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎকার্যের নির্দেশ দেয়, অসৎকার্য নিষেধ করে এবং তাহারা সৎকার্যে প্রতিযোগিতা করে। তাহারাই সজ্জনদিগের অন্তর্ভূক্ত।

❒ উত্তম কাজের যাহা কিছু তাহারা করে তাহার প্রতিদান হইতে তাহাদিগকে কখনও বঞ্চিত করা হইবে না। আল্লাহ্ সাবধানীদের সম্বন্ধে অবহিত।

সকল ইহুদী এরকম নয়। তাঁদের একদল মুসলমান। তাঁরা নামাজে দন্ডায়মান হন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাঁরা পথপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশের সীমানায় অবস্থান করেন। মুজাহিদ বলেন, তাঁরা ন্যায়পরায়ণতাপ্রিয়। সুদ্দী বলেছেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম এবং অন্যান্য মুসলমান আহলে কিতাবগণ। তাঁরা আয়াত আবৃত্তিকারী রাত্রিকালে নামাজরত অবস্থায়। তাঁরা সিজদারত থাকেন অর্থাৎ নামাজ আদায় করেন। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রাত্রির নামাজ বলতে ইশার নামাজকে বোঝানো হয়েছে। ইহুদীরা ইশার নামাজ পড়তো না। কারণ, তাদের ধর্মমতে ইশা ফরজ ছিলোনা।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর বলেছেন, এক রাতে আমরা ইশার নামাজের জন্য অপেক্ষমান ছিলাম। এক তৃতীয়াংশ রাত্রি গত হওয়ার পর রসুল স. মসজিদে এলেন। বিলম্বের হেতু কি, আমরা জানতাম না। রসুল স. বললেন, তোমরা ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীরা নামাজের জন্য প্রতীক্ষমান থাকেনা। উম্মতের

www.eelm.weebly.com

কষ্ট হবে মনে না করলে আমি এরকম সময়েই নামাজ আদায় করতাম। অতঃপর তিনি ইকামতের নির্দেশ দিলেন এবং সকলকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন। মুসলিম।

আমি বলি, রসুল স. এর উল্লেখিত বাক্য ছিলো তাহাজ্জুদ নামাজ সম্পর্কে। ইশা সম্পর্কে নয়। এই আয়াতে এই ইঙ্গিতই দেয়া হয়েছে যে, রাত্রিকালে নামাজে দন্ডায়মান হওয়া ছিলো সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ নিয়ম। ইশার নামাজে বিলম্ব একটি ব্যতিক্রমী ব্যাপার। সাধারণ নিয়ম নয়। আয়াত নাজিল হয়েছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই। বোখারী ও মুসলিমে অবশ্য একথার উল্লেখ নেই।

আতা বলেন, রাত্রিকালে নামাজরত দল বলতে নাজরানের চল্লিশ জন, হাবসার তিরিশ জন এবং রোমের আটজন খৃষ্টানের কথা বলা হয়েছে, যাঁরা রসুলে পাক স. কে তাঁর পৃথিবীতে আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই বিশ্বাস করতেন। তাঁর স. হিজরতের পূর্বে তাঁরা ছিলেন আনসারদের বন্ধু। তাঁদের আনসার বন্ধুরা হলেন, আসাদ বিন জারারাহ, বারা বিন মারুর, মোহাম্মদ বিন মুসলিমাহ্, এবং আবু কাইস সেরমা বিন আনাস। মিল্লাতে ইব্রাহিম সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন তারা। স্ত্রী সহবাসের পরে গোসল করে যা জানতেন, তা পালন করতেন। রসুল স. এর আবির্ভাবের পর তাঁরা তাঁর স. এর প্রতি ইমান আনলেন এবং সাহায্যকারী হলেন।

'তারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী। তারা ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে এবং উত্তম কাজে পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী হয়'। রসুল স. এরশাদ করেন, বার্ধক্যের শক্তিহীনতা এবং স্মৃতিভ্রষ্টতা আসার পূর্বে অথবা রোগাক্রান্ত হয়ে ক্ষমতাহীন হওয়ার পূর্বে এবং নৈরাশ্য আসার আগে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করো। বর্ণনা করেছেন বায়হাকী, আবু উমামা থেকে।

ইহুদী চরিত্রের দোষগুলো হচ্ছে, সত্যবিচ্যুত হয়ে উদাসীনতায় রত থাকা, শিরিক করা, আল্লাহ্তায়ালার গুনাবলী সম্পর্কে বঙ্কিম বিশ্বাস এবং আখেরাত সম্পর্কে বিকৃত ধারণা। তারা মন্দ কাজে প্ররোচিত করতো, সৎকাজের প্রতিবন্ধক হতো এবং অতি দ্রুত পতিত হতো অসততায়। এই আয়াতে ইহুদীদের মন্দ স্বভাবের বিপরীত বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ পুণ্যবানদের চরিত্রে সম্যক বিদ্যমান। যাঁরা সরল অন্তঃকরণ এবং পবিত্র প্রবৃত্তির অধিকারী তাঁদের অন্তর বাহির উভয়ই পবিত্র। আল্লাহ্তায়ালা জানাচ্ছেন, তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করা হবে। তাঁরাই সজ্জন, মুত্তাকী।

www.eelm.weebly.com

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ○

❑ যাহারা সত্য — প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র নিকট কখনও কোন কাজে লাগিবেনা। তাহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

❑ এই পার্থিব জীবনে যাহা তাহারা ব্যয় করে তাহার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ু, যাহা যে জাতি নিজেদের প্রতি জুলুম করিয়াছে তাহাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি কোন জুলুম করেন নাই, তাহারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে।

❑ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অপর কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিওনা; তাহারা তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে ত্রুটি করিবে না; যাহা তোমাদিগকে বিপন্ন করে তাহাই তাহারা কামনা করে। তাহাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাহাদের হৃদয় যাহা গোপন রাখে তাহা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর।

সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বৈভব, সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র কাছে কোনো কাজে লাগেনা। তাদের অগ্নিবাস চিরস্থায়ী। পার্থিব জীবনে তারা যে সমস্ত ধনসম্পদ ব্যয় করে তার উপমা দেয়া হয়েছে এরকম — যেনো ভয়ানক ঠান্ডা

www.eelm.weebly.com

বাতাস কোনো শস্যক্ষেত্রকে বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। কাফেরদের সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্র বিভিন্ন রকম। যেমন, রসুলপাক স. এর শত্রুতা সম্পাদনার্থে ব্যয় অথবা আত্মম্ভরিতা প্রকাশের জন্য ব্যয়। কাফের কোরাইশদের যুদ্ধপ্রস্তুতি সংক্রান্ত খরচ, মূর্তি প্রস্তুত সংক্রান্ত খরচ, ইহুদী আলেমদের জন্য ইহুদীদের সম্পদ ব্যয়, মুনাফিকদের অসৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত খরচ — এসমস্ত কিছুই নিষ্ফল। যদিও এসমস্তের পিছনে রয়েছে তাদের মনগড়া পুণ্যার্জনের ইচ্ছা। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, ভয়ানক ঠান্ডা বাতাস অর্থ অতি উত্তপ্ত লু হাওয়া। অতিশীতল অথবা অতি উত্তপ্ত ঝঞ্ঝা বায়ু যাই হোক না কেনো, বাতাসের ঝন্ঝাক্ষুব্ধতা শস্যক্ষেত্রকে অথবা শস্যরাজিকে তেমনিভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমন ধ্বংস সাধন করে নফসানিয়াত (প্রবৃত্তিপরায়ণতা) নির্মল মানবতাকে। এভাবেই কাফেররা (সত্য প্রত্যাখানকারীরা) হয় আত্মঅত্যাচারী। আপন নফসের উপর জুলুমকারী। তাদের এহেন পাপাচরণকে তারা নিজেরাই স্বাগত জানিয়েছে। আল্লাহ্ তাদের উপর কোনো জুলুম করেননি।

ইবনে জারীর এবং ইবনে ইসহাক, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, কতিপয় মুসলমান তাদের ইহুদী প্রতিবেশীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতেন। মূর্খতার যুগ থেকেই তাদের এ বন্ধুত্ব চলে আসছিলো। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, হে ইমানদারগণ! স্বসম্প্রদায়ভূত ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কোর না। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসীদের সঙ্গে অবিশ্বাসীদের বন্ধুত্ব অসম্ভব। কারণ, উৎকৃষ্টতা কখনো নিকৃষ্টতার সঙ্গে সমীভূত হয়না। এতে মুসলমানদের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। মন্দের সঙ্গে সম্পর্ক মন্দের, ভালোর সঙ্গে সম্পর্ক ভালোর, এটাই নিয়ম। এতে করে আরো বোঝা যায়, মন্দের সংসর্গ অপেক্ষা নিঃসঙ্গতা উত্তম। এবং নিঃসঙ্গতা অপেক্ষা উত্তম মানুষের সাহচর্য শ্রেয়। সুতরাং রাফেজী, খারেজী এবং অন্যান্য বেদাতীদের সঙ্গেও অন্তরঙ্গতা বৈধ নয়।

কাফেরদের প্রচেষ্টা সর্বাত্মক। তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে উদ্যত। মুসলমানদের ক্ষতিসাধন করাই তাদের সার্বক্ষণিক পরিকল্পনা। মুসলমানেরা বিপন্ন হোক, ক্ষতিগ্রস্ত হোক — এটাই তাদের একমাত্র কামনা। তাদের থেকে বাহ্যিক বিদ্বেষ যা প্রকাশ পায় তদপেক্ষা তাদের অন্তরের অবস্থা আরো বেশী ভয়াবহ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নিদর্শন বিবৃত করেছেন। তাই মুমিনদের উচিত অন্য মুমিনদের সঙ্গে যেনো অন্তরঙ্গতা স্থাপন করে এবং কাফেরদের প্রতি যেনো শত্রু মনোভাবাপন্ন হয়। মুমিনদের জন্য এরকম শত্রুতা রাখা ওয়াজিব। তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো কাফের যদি ইসলাম গ্রহণের কারণে দুশমনি না করে, ফেতনা ফাসাদ যদি তার উদ্দেশ্য না হয় অথবা আত্মীয় কিংবা প্রতিবেশী হওয়ার কারণে যদি মুসলমানদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে চায় তবে এ রকম

www.eelm.weebly.com

সুসম্পর্ক বজায় রাখতে দোষ নেই। যেমন, মুসলমান হওয়ার পূর্বে হজরত আব্বাস রসুল স. এর সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতেন। তাঁর স. সঙ্গে আবু তালেবও এরকম শুভ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন।

হজরত আব্বাস বর্ণনা করেন, আমি রসুল স. এর নিকট আরজ করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আবু তালিব কি আপনার শুভাকাঙ্খী? তিনি তো দেখি আপনার আশপাশেই থাকেন (আপনার হেফাজত করেন)। আপনার প্রতি বিদ্বেষ মনোভাবাপন্নদের প্রতি রাগান্বিত হন। তিনি স. বললেন, তাঁর টাখনু পর্যন্ত আগুনে প্রবিষ্ট থাকবে। আমাকে না পেলে তিনি হতেন দোজখের সর্বনিম্ন স্তরবাসী। মুসলিম। বায্‌যার, হজরত জাবের থেকে এবং মুসলিম, হজরত হোজায়ফা ও আবু সাঈদ খুদরী থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১১৯, ১২০।

هَٰٓأَنتُمْ أُولَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا۟ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۝ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا۟ بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝

❑ দেখ তোমরাই তাহাদিগকে ভালবাস; কিন্তু তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে না। এবং তোমরা সমস্ত কিতাবে বিশ্বাস কর। তাহারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন তাহারা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি'; কিন্তু তাহারা যখন একা হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তাহারা নিজেদের অঙুলির অগ্রভাগ দাঁতে কাটিয়া থাকে। বল, আক্রোশেই তোমরা মর। অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

❑ তোমাদের মঙ্গল হইলে তাহারা দুঃখিত হয়, আর তোমাদের অমঙ্গল হইলে তাহারা আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং সাবধানী হও তবে তাহাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহা পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

---

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্ মুমিনদেরকে এই মর্মে সাবধান করে দিচ্ছেন যে, হে মুমিনগণ! তোমরা তো সরল বিশ্বাসী বলে অন্তরে লালন করো নিষ্কলুষ ভালোবাসা। কিন্তু কাফেররা বঙ্কিম পথানুসারী। তাদের ধর্মমত ভিন্ন। তাই তাদের অন্তরে তোমাদের জন্য কোনো ভালোবাসাই নেই। তোমরা সকল আসমানী কিতাবকে মান্য করো। যেমন মেনে নাও কোরআনকে, তেমনি তওরাতকেও। কিন্তু কাফেররা কোরআনকে মানে না, তওরাতের প্রতিও তাদের পূর্ণ মান্যতা নেই। সত্যের প্রতি তোমাদের দৃঢ়তা যতোটুকু, বাতিলের প্রতি তাদের দৃঢ়তা তদপেক্ষা বেশী। তবু দেখো তাদের মুনাফিকি কিরকম, তোমাদের সাথে মিলিত হলে তারা বলে, আমরাও তোমাদের মতো মোহাম্মদ স. কে মানি, কোরআনকেও মানি। কিন্তু তারা যখন স্বসমাজভুক্ত থাকে তখন তোমাদের সত্যনিষ্ঠতা দেখে তোমাদের কোনো ক্ষতি করার পথ না পেয়ে আক্রোশে ফেটে পড়ে। তোমাদের সামনে তারা নিজেদেরকে ইমানদার বলে জাহির করে এজন্য যে, এছাড়া তাদের গত্যান্তর নেই।

আল্লাহ্ পাক, নবী পাক স. অথবা সকল মুমিনকে কাফেরদের প্রতি এই বদদোয়া দিতে হুকুম করছেন যে, ক্রোধের আগুনে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হও তোমরা। আল্লাহ্তায়ালা কাফেরদের অনিষ্ট চিন্তা সম্পর্কে সম্যক অবগত। কাফেরদের অন্তরের প্রজ্জ্বলিত ক্রোধাগ্নি সম্পর্কেও তিনি জানেন। তাই এরশাদ হয়েছে, হে মুমিনেরা তোমরা জানোনা, তাই আল্লাহ্ তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন, তোমরা কাফেরদেরকে ঘৃণা করো। তাদের বাহ্যিক ভালোবাসায় আকৃষ্ট হয়ো না। তোমাদের কল্যাণ তাদের কাছে অসহনীয়। যুদ্ধবিজয়, পার্থিব শ্রীবৃদ্ধি, গনিমতের সম্পদ লাভ অথবা প্রতিবন্ধকতাহীন জীবন যাপন তাদের জন্য বড়ই কষ্টের কারণ। তোমাদের সামান্য কল্যাণও তারা সহ্য করতে পারেনা। পক্ষান্তরে যুদ্ধে পর্যুদস্ত হলে, উপার্জন কমে গেলে অথবা তোমাদের মৃত্যু হলে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। কিন্তু হে মুমিনগণ! তোমরা যদি বিপদে ধৈর্যধারণ করো, আল্লাহ্ ভীতিকে আশ্রয় করে সাবধানী হও এবং তাদের সঙ্গে হৃদ্যতা স্থাপন থেকে বিরত থাকো, তবে তাদের অকল্যাণ কামনা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা।

ধৈর্য ও আল্লাহ্ভীতি অবলম্বনকারী সাবধানী ব্যক্তিগণ দুঃখের তীব্রতা কম অনুভব করেন। কারণ, বিপদের বিনিময়ে পুন্যপ্রাপ্তির আশা সদা উদ্ভাসিত থাকে তাঁদের সামনে। তাঁরা তাই অনুগ্রহের আস্বাদ অপেক্ষা বিপদগ্রস্ততায় অধিকতর আনন্দচিত্ত হন। প্রেমাস্পদের নিকট থেকে আগত দুঃখের আস্বাদ অনুগ্রহের আস্বাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। এরকম বিপদে যেহেতু প্রেমাস্পদের অভিপ্রায় সংযুক্ত থাকে, তাই প্রেমিকেরা এরকমই কামনা করেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, একদিন

www.eelm.weebly.com

আমি রসুল স. কে অনুসরণ করছিলাম। তিনি স. এরশাদ করলেন, বৎস। আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কিত হও। আল্লাহ্‌ই তোমাকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ্‌র প্রতি সম্ভ্রমশীল হও, তবে তুমি তাঁকে সঙ্গে পাবে। আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থী হও, যদি কোনো প্রয়োজন অনুভব করো। জেনে নাও, যদি সমস্ত মানুষ সম্মিলিতভাবে তোমার প্রতি কোনো কিছু নিষিদ্ধ করে, তবে সফলকাম হবে না আল্লাহ্‌তায়ালার নির্ধারণ ব্যতিরেকে। আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা ব্যতিরেকে এতোটুকু ক্ষতিসাধন করার ক্ষমতাও কারো নেই। তকদির লিপিবদ্ধ করার কলমকে স্থগিত করা হয়েছে। শুকিয়ে গিয়েছে লেখার কালি। আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন হাদিসটি হাসান সহীহ্‌।

হজরত আবু জর বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার এমন একটি আয়াত জানা আছে যা সমস্ত মানুষের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন, 'যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্‌ তাকে মুক্তির পথ দেখান এবং অকল্পনীয় সূত্র থেকে তাকে রিজিক দান করেন।' আহমদ, ইবনে মাজা, দারেমী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন, আমার বান্দা যদি আমার পূর্ণ অনুগত হতো, তবে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করতাম রাত্রিতে এবং দিনকে করতাম মেঘমুক্ত। বিদ্যুতের আওয়াজও তারা শুনতে পেতো না (অর্থাৎ দিবা ভাগের ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য সাংসারিক কাজের ক্ষতি হতো না এবং চতুস্পদ জন্তুরাও পিপাসিত ও ক্ষুধার্ত থাকতো না। কারণ, বৃষ্টিপাতের ফলে পিপাসার পানি পাওয়া যেতো এবং তৃণরাজি উৎপন্নের ব্যবস্থা হতো)। আহমদ।

হজরত সুহাইব বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীদের জীবন বিস্ময়কর। তাদের সকল কিছুই কল্যাণ। অবিশ্বাসীরা এরকম কল্যাণ লাভের উপযুক্ত নয়। মুমিনেরা অনুগ্রহমন্ডিত হলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই কৃতজ্ঞতা বোধই কল্যাণ লাভকে অপরিহার্য করে। আর বিপদগ্রস্ত হলে তারা ধৈর্যধারণ করে। আর এই সহনীয়তাই কল্যাণ অর্জনকে অবধারিত করে দেয়। মুসলিম।

বিশ্বাসীদের কর্ম সমূহকে পরিবেষ্টন করে আছেন আল্লাহ্‌ স্বয়ং। তাই কাফেরদের ক্ষতি থেকে তারা নিরাপদ। তিনি কাফেরদেরকে শাস্তি দিবেন। ইচ্ছা করলে কাফেরদের গোপন চক্রান্ত থেকে রক্ষা করবেন, আবার ইচ্ছা করলে কাফেরদের দিক থেকে আগত বিপদ মুসিবতের বিনিময় প্রদান করে ধন্য করবেন।

www.eelm.weebly.com

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

❒ স্মরণ কর, যখন তুমি তোমার পরিজন বর্গের নিকট হইতে প্রত্যুষে বাহির হইয়া যুদ্ধের জন্য বিশ্বাসীগণকে ঘাঁটিতে স্থাপন করিতেছিলে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ;

❒ 'যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং আল্লাহ্ উভয়ের সহায়ক ছিলেন। আল্লাহের প্রতিই যেন বিশ্বাসীগণ নির্ভর করে।'

হজরত হাসান বসরী বলেন, প্রসঙ্গটি বদর যুদ্ধের। হজরত মুকাতিল বলেন, আহযাব যুদ্ধের। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, উহুদ যুদ্ধের - এটাই বিশুদ্ধ মত।

ইবনে আবী হাতেম এবং আবুল ইয়ালী বর্ণনা করেন, হজরত মুসাওয়ার বিন মাখরিমা, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফকে বললেন, আমাদেরকে উহুদ যুদ্ধের ঘটনা বলুন। হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ বললেন, সুরা আলে ইমরানের একশত বিশ আয়াতের পরের আয়াত পড়লে ঘটনাটি জানতে পারবে। আল্লাহ্তায়ালা সেখানে বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে দু'টি দল সাহস হারাতে বসেছিলো। কাফেরদের নিকট থেকে নিরাপত্তা লাভই ছিলো তাদের বাসনা।' অন্যত্র বলেছেন, 'মৃত্যুর আশংকা করছিলে তোমরা।' আরেক স্থানে উল্লেখ করেছেন, 'যদি তিনি মৃত্যু বরণ করেন অথবা নিহত হন তবে কি তোমরা তাঁর আদর্শচ্যুত হয়ে বিপরীত দিকে প্রত্যাবর্তন করবে?' সেই উহুদ যুদ্ধের দিন শয়তান চিৎকার করে বলেছিলো, মোহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ্পাক তখন মুসলমানদেরকে শান্ত করবার জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিয়েছিলেন যেনো তন্দ্রাবিভোরতার মাধ্যমে তাদের শংকা ও অক্ষমতা বোধ দূর হয়ে যায়।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আলে ইমরানের ষাটটি আয়াত উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ওই যুদ্ধে অনুপস্থিত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

মুজাহিদ, কালাবী, ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন, রসুল পাক স. সকাল বেলা হজরত আয়েশার ঘর থেকে বের হয়ে পদব্রজে উহুদ প্রান্তরে পৌছলেন এবং যেমন করে তীরকে সোজা করা হয়, তেমনি বিন্যস্ত করতে লাগলেন আপন বাহিনীকে। ইবনে জারীর এবং বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে এবং আবদুর রাজ্জাক মুসান্নাফ গ্রন্থে মামুরীর মাধ্যমে জুহ্রীর বিবরণ দিয়েছেন এরকম, তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের বারো তারিখ বুধবারে তিন হাজার মুশরিক সৈন্য উহুদ প্রান্তরে পৌছলো। রসুল স. পরামর্শ সভা বসালেন। আবদুল্লাহ্ বিন উবাইকেও ডাকা হলো। ইতোপূর্বে কোনো পরামর্শ সভায় রসুল স. তাকে ডাকেননি। আবদুল্লাহ্ এবং অধিকাংশ আনসার আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! মদীনায় অবস্থান করাই শ্রেয়। মদীনার বাইরে গেলে শত্রুরাই জয়লাভ করতে পারে। আর এখানে অবস্থান করলে আমাদেরই জয়লাভের সম্ভাবনা। আপনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমাদের আর শংকা কিসের। মুশরিকেরা যদি আর অগ্রসর না হয়, তবে তো ভালোই। যদি এগিয়ে আসে, তবে আমাদের নেতৃস্থানীয় বীরেরা তাদেরকে প্রতিহত করবে। বালক ও রমনীরা উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করবে। তাদের প্রত্যাবর্তন হবে অকৃতকার্যতার সঙ্গে।

রসুল স. এই অভিমতটি পছন্দ করলেন। প্রবীন মোহাজির এবং আনসারদের অভিমতও এরকমই ছিলো। কিন্তু হজরত হামজা, হজরত সা'দ বিন উবাদা, হজরত নোমান বিন মালেক এবং আনসারদের কতিপয় যুবক (যারা অপ্রাপ্ত বয়স্কতার কারণে বদরে যুদ্ধ করতে পারেনি) এদের ইচ্ছা ছিলো, শহীদ হওয়ার এই সুযোগ গ্রহণ করতেই হবে। আল্লাহ্তায়ালা উহুদ যুদ্ধের দিন তাদের অভিলাষ পূর্ণ করেছিলেন। তাদের অভিমত ছিলো, ওই সমস্ত কুকুরদের দিকে ধাবিত হতে হবে যেনো তারা আমাদেরকে দুর্বল অথবা কাপুরুষ ভাববার সুযোগ না পায়।

রসুল স. বলেছেন, আমি স্বপ্নে গাভী দেখেছি। এর অর্থ উত্তম। স্বপ্নে আরো দেখলাম, আমার তলোয়ারের ধার নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এর অর্থ পরাজয়। আরো দেখলাম, আমি আমার হাত মজবুত বর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছি, এর অর্থ মদীনায় অবস্থান করাই উত্তম। তিনি স. চাইছিলেন যে, শত্রুরা যেনো মদীনায় এসে পড়ে এবং এখানেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

আহমদ, দারেমী এবং নাসাঈর বর্ণনা এরকম, আমি আমার হাতকে মজবুত জেরার মধ্যে প্রবিষ্টাবস্থায় দেখেছি এবং গাভী জবাই করতে দেখেছি। বুঝলাম, মজবুত জেরা অর্থ মদীনা এবং গাভী জবাই করতে দেখাও উত্তম আলামত।

বায্যার ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন আবু সুফিয়ান তার সাথীদেরকে নিয়ে উহুদ প্রান্তরে তাবু ফেললো, তখন রসুল স. সাহাবীগণ বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার তরবারী জুলফিকার অবনত।

www.eelm.weebly.com

আরো দেখলাম, একটি গাভীকে জবাই করা হচ্ছে, এসমস্ত হচ্ছে মুসিবতের আলামত। স্বপ্নে আরো দেখেছি আমার শরীর যুদ্ধবস্ত্রাচ্ছাদিত। এই মদীনা তোমাদেরই শহর। ইনশাআল্লাহ্ তারা এই শহরে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না।

ইবনে ইসহাক, ইবনে উকবা এবং আবু সাঈদ বর্ণনা করেন, রসুল স. এই স্বপ্ন দেখেছিলেন জুমআর রাত্রিতে। ওরওয়া বলেছেন, তরবারী অবনত হওয়া ছিলো তাঁর স. এর পবিত্র অবয়বে আঘাতের প্রতি ইঙ্গিত। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তরবারী অবনত হওয়ার অর্থ ছিলো, আপনজনের মৃত্যু। রসুল স. বলেছেন, আমি আমার তরবারীকে দুইবার আন্দোলিত করলাম। প্রথম অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থা উত্তম পরিদৃষ্ট হলো।

হজরত হামজা বলেছিলেন, যিনি আপনার উপর কোরআন নাজিল করেছেন সেই আল্লাহ্র কসম! মদীনার বাইরে গিয়ে আমি তাদেরকে প্রতিহত না করা পর্যন্ত পানাহার করবো না। হজরত হামজা জুমআর দিন রোজাদার ছিলেন। পরের দিনও রোজা রেখেছিলেন।

হজরত নোমান বিন বশীর আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আমাদেরকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন না। যার অধিকারে আমার জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! জান্নাতে আমি প্রবেশ করবোই। রসুল স. বললেন, কীভাবে? নোমান বললেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে ভালোবাসি। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ স. আল্লাহ্র রসুল। যুদ্ধে কিছুতেই আমি পশ্চাদাপসরণ করবো না। রসুল স. বললেন, তুমি সত্যবাদী। ওই দিনই হজরত নোমান শহীদ হয়েছিলেন।

মালেক বিন সানান খুদরী এবং আয়াজ বিন আতীকও মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার ব্যাপারে অত্যধিক উৎসাহী ছিলেন। তাঁদের এই উৎসাহব্যঞ্জকতার মধ্যে সকলকে নিয়ে জুমআর নামাজ আদায় করলেন রসুল পাক স.। সদুপদেশ দিলেন, অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করতে বললেন। শেষে জানিয়ে দিলেন যদি তোমরা ধৈর্যশীল হও, তবে বিজয় তোমাদেরই। শত্রুর প্রতি ধাবিত হওয়ার আদেশ শুনে সবাই আনন্দিত হলেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কারো কারো মনঃপূত হলো না। আসরের নামাজের পর তিনি স. রমনী ও শিশুদেরকে উঁচু টিলায় নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। হজরত আবুবকর ও হজরত ওমরকে সঙ্গে নিয়ে গৃহাভ্যন্তরে গেলেন। জনতা সারিবদ্ধ হয়ে রসুল স. এর আগমন প্রতীক্ষায় রইলেন। এমন সময় হজরত সা'দ বিন মুআজ এবং হজরত উসায়েদ বিন হুজাইর এসে প্রতিক্ষারত জনতাকে বললেন, তোমরা রসুল স. এর অভিমত বিরোধী। তাঁর প্রতি আকাশ থেকে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়। তোমাদের প্রতি হয় না। অতএব এটাই সঙ্গত যে, তোমরা তাঁর প্রতি নির্ভর করো। যে নির্দেশ তিনি দেন, তাই

www.eelm.weebly.com

পালন করতে সচেষ্ট থাকো। সহসা উপস্থিত হলেন রসুল স.। তিনি তখন রণবস্ত্র পরিহিত এবং অস্ত্রধারী। কটিদেশে কোষাবদ্ধ অসি। মস্তক শিরোস্ত্রাণশোভিত। জনতা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা অত্যন্ত অনুচিত কাজ করেছি। আপনার অভিমতের বিরুদ্ধাচারী হয়েছি। এখন আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে ক্ষান্ত হোন। তিনি স. বললেন, আমি তো এটাই বলেছিলাম। কিন্তু তোমরা সমর্থন করোনি। রণসাজে সজ্জিত হওয়ার পর যুদ্ধ সম্পাদনের পূর্বে রণসজ্জা পরিত্যাগ করা নবীদের সম্মানের অনুকূল নয়। সিদ্ধান্ত অনড়। চলো, আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে যুদ্ধযাত্রা করো। ধৈর্যশীল হও। বিজয় তোমাদেরই।

একটু অগ্রসর হতেই রসুল স. দেখলেন, মালেক বিন আমর নাজ্জারীর জানাজা প্রস্তুত। তিনি জানাজা পড়লেন। তারপর বহির্বাটিতে এসে তাঁর ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। ঘোড়াটির নাম সাকিব। স্কন্ধে ধনুক তুলে নিয়ে অগ্রসর হলেন তিনি। তাঁর বামে দক্ষিণে চলছিলেন সা'দ বিন উবাদা এবং সা'দ বিন মুআজ। সকল সেনানীকে নিয়ে তিনি যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হলেন। সেখানে দেখলেন মদীনা থেকে আগত আরেকটি শক্তিশালী দল। জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? বলা হলো, এরা আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের ইহুদীমিত্র দল (সাহায্য করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলো তারা)। রসুল স. জানতে চাইলেন, তারা কি মুসলমান হয়েছে? উত্তর দেয়া হলো, না। তিনি স. বললেন, মুশরিকদের সাহায্য আমরা চাইনা। একটু অগ্রসর হয়ে তিনি পৌছলেন শাইখাইন নামক স্থানে। সেখানকার দু'টি টিলার সম্মিলিত নাম ছিলো শাইখাইন।

চৌদ্দ বছর বয়সের কতিপয় বালক এসে উপস্থিত হলো। তারা সেনাদলে ভর্তি হতে ইচ্ছুক। রসুল স. তাদের ফিরিয়ে দিলেন। তাদের সংখ্যা ছিলো সতের জন। এরপর এগিয়ে এলো পনের বছর বয়সী কতিপয় বালক। তাদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ্ বিন ওমর, উসামা বিন জায়েদ, জায়েদ বিন আরকাম, বারা বিন আজীব, আবু সাঈদ খুদরী এবং আউস বিন সাবেত। রাফে বিন খাদিজকে ফিরিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু যখন বলা হলো তিনি দক্ষ তীরন্দাজ, তখন রসুল স. তাকে গ্রহণ করলেন। সামুরা বিন জুন্দুব বললেন, রাফে বিন খাদিজকে তো নেয়া হলো আর আমাকে ফিরিয়ে দেয়া হলো। অথচ আমি মল্লযুদ্ধে তাকে পরাস্ত করতে পারবো। এই সংবাদ রসুল স. এর কানে এলে তিনি বললেন, দু'জনের মধ্যে কুস্তি লাগিয়ে দাও। কুস্তি হলো। সামুরা রাফেকে পরাজিত করলেন। তখন সামুরাকেও সেনাদলের অন্তর্ভূত করা হলো।

সূর্য অস্তমিত হলো। আযান দিলেন হজরত বেলাল। রসুল স. তাঁর সহচরদের নিয়ে মাগরিবের নামাজ সম্পন্ন করলেন। ক্রমে এগিয়ে এলো ইশা। আযানের পর ইশার নামাজও সমাপ্ত হলো। রাত্রি গভীরতর হলো। মোহাম্মদ বিন মুসলিমার

www.eelm.weebly.com

নেতৃত্বে পঞ্চাশ জনের একটি দল রাতের পাহারাদার নিযুক্ত হলেন। অবশিষ্ট সৈন্যরা বিশ্রামের অনুমতি পেলেন। রসুল স. শয্যা গ্রহণ করলেন। নীরবে অতিবাহিত হলো শাইখাইনের রাত্রি। ফজরের নামাজ সমাপনান্তে রসুল স. বললেন, এমন কেউ কি আছো যে আমাকে শত্রুর সম্মুখবর্তী এই পাহাড় থেকে কিছুক্ষণের জন্য অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারে। আবু খাইসুমা দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি পারবো। তিনি রসুল স. কে বনী হারেসার মাঠ ও বাগান ঘেঁষে নিয়ে চললেন। এসে পৌছলেন মিরবা বিন কানাতীর বাগানে। সে ছিলো মুনাফিক। তার দু'ই চোখ ছিলো দৃষ্টিহীন। রসুল পাক স. এর আগমন টের পেয়ে সে বলতে লাগলো, তুমি যদি রসুল হয়ে থাকো, তবে জেনে রাখো এ বাগানে প্রবেশের অনুমতি নেই। সে হাতে কিছু মাটি তুলে নিয়ে বললো, যদি নিশ্চিত বুঝতাম এই মাটি নিক্ষেপ করলে তোমার মুখের উপর পড়বে তবে এক্ষুণি ছুড়ে মারতাম। তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন রসুল স. এর সাথীগণ। রসুল স. বললেন, তাকে হত্যা কোর না, সে অন্ধ। কিন্তু রসুল স. এর নিষেধাজ্ঞার পূর্বেই সা'দ বিন জুবদা আশহালী ধনুকের আঘাতে তাকে আহত করলেন।

সহস্র সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে রসুল স. উহুদ অভিমুখে চললেন। বিভিন্ন বর্ণনায় মোট লোকসংখ্যা নয়শত পঞ্চাশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শত্রুর সম্মুখবর্তী হওয়ার আগেই মুনাফিক আবদুল্লাহ্ বিন উবাই তার তিনশত লোককে নিয়ে মদীনায় ফিরে গেলো। সে বলতে লাগলো, আমরা ও আমাদের সন্তানেরা জীবন দিতে যাবো কেনো? আবু জাবের সালামী তাদেরকে বললেন, যেওনা তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদেরই। আবদুল্লাহ্ বললো, আমরা যদি যুদ্ধবিদ্যা জানতাম তবে তোমাদের সঙ্গে থাকতাম।

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন মুসলমানদের সাতশতজন অকুতভয় যোদ্ধা। ঘোড়া মাত্র দু'টি। একটি রসুল স. এর অপরটি হজরত আবু বুরদার। ইবনে উকবা বর্ণনা করেন, মুসলমান সেনাদলে আর কোনো অশ্বারোহী ছিলো না। খাজরাজ গোত্রের বনু সালমা এবং আউস গোত্রের বনু হারেসা ছিলেন মুসলিম সেনাদলের দুই অন্যতম বাহু। এই গোত্র দু'টিও আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের সাথে ফিরে যেতে চাইলো। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁদেরকে হেফাজত করলেন, তাঁরা ক্ষান্ত হলেন। সেদিকে লক্ষ্য করে এরশাদ হয়েছে, ওই দু'টি দল যারা সাহসিকতা থেকে প্রায় স্খলিত হয়ে যাচ্ছিলো, আল্লাহ্তায়ালা সহায় ছিলেন বলে শেষাবধি তারা রক্ষা পেয়েছিলো। ইমানদারদের উচিত তারা যেনো আল্লাহ্নির্ভর হয়। মুনাফিকদের পশ্চাদাপসরণ এবং ইত্যাকার সকল প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বলেছেন, এই আয়াত আমাদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরাই পশ্চাদাপসরণ করতে চেয়েছিলাম। এরকম অসুন্দর

www.eelm.weebly.com

প্রবণতা সত্ত্বেও আমরা এ কারণে আনন্দিত যে, আল্লাহ্তায়ালা আমাদের মতো অকিঞ্চনদেরকে তাঁর বিশেষ সহায়তা দ্বারা আবৃত করেছেন। আল্লাহ্তায়ালার এই অনুপম অনুগ্রহ প্রাপ্তিতে আমরা আনন্দিত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১২৩, ১২৪।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ۝

❒ বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে আল্লাহ্ তো তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

❒ স্মরণ কর, যখন তুমি বিশ্বাসীগণকে বলিতেছিলে, ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন সহস্র ফেরেশতা দ্বারা তোমাদিগকে সহায়তা করিবেন?

সংখ্যাল্পতা এবং যুদ্ধোপকরণের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেছিলেন। এই ঘটনা বিস্মৃত হওয়া ঠিক হয়নি। ওই কথা মনে থাকলে পশ্চাদাপসরণের চিন্তা মাথায় আসতো না।

অনেকের মতে বদর মক্কা, মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান। কেউ কেউ বলেছেন, সেখানকার একটি কূপের নাম বদর। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ওই কূপটির মালিকের নাম বদর। এরকম বর্ণনা করেছেন শা'বী। ওই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিলো তিনশত। উট ছিলো সত্তরটি। সৈন্যরা তাদের উপর পালাক্রমে আরোহী হতেন। ঘোড়া ছিলো মাত্র দু'টি। একটি হজরত মেকদাদের অপরটি হজরত জোবায়ের বিন আওয়ামের। অপ্রতুল রণপ্রস্তুতি সত্ত্বেও বিজয় লাভের এই দুর্লভ নেয়ামতের কারণে এই আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্কে ভয় করো যাতে কৃতজ্ঞচিত্ততার হক আদায় হয়।

তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণের প্রসঙ্গটিও বদর যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত। হজরত কাতাদা বলেছেন, ঘটনাটি ছিলো বদর প্রান্তরের। ইবনে আবী শা'বা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে এবং ইবনে আবী হাতেম শা'বীর উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, বদর প্রান্তরে রসুল স. ও মুসলমান বাহিনী জানতে পারলেন যে, করজ বিন জাবের

www.eelm.weebly.com

যুদ্ধরত মুশরিকদেরকে সাহায্য করতে চায়। এই সংবাদ মুসলমান বাহিনীর নিকট ছিলো অত্যন্ত পীড়াদায়ক। একদিকে নিজেদের সৈন্যস্বল্পতা, রণসম্ভারের অপর্যাপ্ততা। অপরদিকে শত্রুদের সংখ্যাধিক্য ও রণোন্মত্ততা। এ অবস্থায় নৈরাশ্য তার ছায়া বিস্তার করে যাচ্ছিলো। তখন আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ সহায়তা সংবলিত সুসংবাদটি অবতীর্ণ হয়।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১২৫

بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ○

❑ হ্যাঁ, নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং সাবধান হইয়া চল তবে তাহারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমন করিলে আল্লাহ্ পাঁচ সহস্র চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিবেন।

পূর্ববর্তী আয়াতে তিন হাজার ফেরেশতার সহায়তা কি যথেষ্ট নয়, এরকম প্রশ্ন করে এই আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা জানাচ্ছেন, তিন হাজার কেনো; পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা আল্লাহ্পাক সাহায্য করবেন। তবে শর্ত হচ্ছে, ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ যুদ্ধে অটল থাকতে হবে এবং রসুল পাক স. এর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

আমি বলি, বাক্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করার জন্যই এরকম প্রকাশভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। প্রথমে প্রশ্ন এবং প্রশ্নের পরপরই জবাব। অর্থাৎ তিন হাজার ফেরেশতাই কি যথেষ্ট নয়? সাথে সাথে বলা হয়েছে, হ্যাঁ তিন হাজার কেনো পাঁচ হাজার ফেরেশতার সহায়তা দেয়া হবে যদি তোমরা আক্রান্ত হও। এবং আক্রান্তাবস্থায় অবলম্বন করো ধৈর্য এবং তাকওয়া।

জ্ঞাতব্য ঃ তিবরানী এবং ইবনে মারদুবিয়া শিথিল সনদের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন, রসুল স. 'মুসাইয়িমীন' শব্দের অর্থ করেছেন, 'মোয়াল্লিমীন' — নিশানাধারী শিক্ষকবৃন্দ। তিনি (ইবনে আব্বাস) আরো বলেছেন, বদর যুদ্ধে ফেরেশতাদের নিশানা ছিলো কালো পাগড়ী এবং উহুদে তাদের নিশানা ছিলো লাল পাগড়ী।

ইবনে আবী শা'বা এবং ইবনে আবী হাতেম শা'বীর বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত করে বলেছেন, করজ বিন জাবের বদর যুদ্ধে মুশরিকদের পরাজয় সংবাদ শুনে লজ্জিত হয়েছিলো (কেননা বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ একরকম অসম্ভব ছিলো)। মুশরিকদের সাহায্য করা তার পক্ষে তো সম্ভবই নয়। আর পাঁচ হাজার ফেরেশতার

www.eelm.weebly.com

সাহায্যের অতিরিক্ত সাহায্যের প্রয়োজনও ছিলো না মুসলমান বাহিনীর। মুসাওয়িন অর্থাৎ চিহ্ন যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে কাতাদা এবং জুহাক বলেছেন, ফেরেশতাগণ তাদের ঘোড়াগুলোর কপাল, গলা বিশেষভাবে চিহ্নিত করে নিয়েছিলেন। ইবনে আবী শা'বা তার মুসান্নাফ গ্রন্থে আমর বিন ইসহাকের মুরসাল বর্ণনা উল্লেখ করেছে রসুল স. বদর যুদ্ধের দিন সাহাবীগণকে বললেন, তোমরাও আপনাপন নিশানা লাগিয়ে নাও। ফেরেশতারা তাঁদের লৌহ শিরোস্ত্রাণে শাদা পশমের নিশানা লাগিয়েছিলেন। এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর। তিনি আরো লিখেছেন, এটাই ছিলো প্রথম যুদ্ধ এবং এটাই প্রথম নিশানা লাগানোর ঘটনা। ওরওয়া বিন জোবায়ের বলেন, ফেরেশতাগণ আবলাক নামক ঘোড়ার উপরে আরোহণ করেছিলেন (শাদা কালো মিশ্রিত রং কে আবলাক বলে)। তাঁদের মস্তকে ছিলো পশমের পাগড়ী। কিন্তু হজরত আলী ও হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাঁদের পাগড়ী ছিলো শাদা। পাগড়ীর প্রান্তদেশ ঝুলছিল তাঁদের স্কন্ধে। হিসাম বিন ওরওয়া এবং কালাবী বলেন, হলুদ বর্ণের পাগড়ী তাঁদের কাঁধ বরাবর ঝুলন্ত ছিলো।

কাতাদা বলেছেন, বদর যুদ্ধে মুসলমানেরা সুস্থির ছিলেন। অটল ছিলেন রসুল পাক স. এর নির্দেশের প্রতি। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে পাঁচ হাজার ফেরেশতার সাহায্য প্রেরণ করেছিলেন। হাসান বলেন, এই পাঁচ হাজার ফেরেশতা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মুসলমানদের সাহায্যকারী হয়ে থাকবেন। তবে তাঁদের সাহায্য লাভের শর্ত হচ্ছে ধৈর্য ও তাকওয়া। হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ বর্ণনা করেন, বদর ব্যতীত অন্য কোনো যুদ্ধে ফেরেশতাগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করেন নি। তবে তাঁরা উপস্থিত থাকতেন। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সাহয্যের জন্য সদাপ্রস্তুত থাকাই ছিলো তাঁদের দায়িত্ব।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বদর যুদ্ধে আল্লাহ্তায়ালা মুসলমানদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যদি তোমরা সুস্থির থাকো এবং নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত হও, তবে সকল যুদ্ধেই সাহায্য লাভ করবে। কিন্তু আহ্যাবের যুদ্ধ ব্যতীত মুসলমানেরা অন্য কোনো যুদ্ধে পরিপূর্ণ সুস্থিরতা অবলম্বন করতে সক্ষম হননি। আহ্যাব যুদ্ধের সময় বনু কোরাইজা এবং বনু নাজিরদেরকে অবরোধ করার সময় নেমে এসেছিলো আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ সাহায্য। হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু আউফা বর্ণনা করেন, আমরা বনী কোরাইজা এবং বনী নাজিরকে অবরোধ করলাম। কিন্তু জয়লাভ করতে সমর্থ হলাম না। রসুল স. পানি চাইলেন কিন্তু পেলেন না। হজরত জিবরাইল এসে বললেন, তোমরা রণসজ্জা ত্যাগ করেছো অথচ দেখো ফেরেশতাগণ এখনো অস্ত্রসজ্জিত। একথা শুনে রসুল স. একটি বস্ত্র চেয়ে নিয়ে তাঁর আপন মস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত করলেন। সকলকে কাছে ডাকলেন। আমরা প্রস্তুত হলাম এবং কোরাইজা ও নাজিরদের বস্তিতে গিয়ে পৌছলাম।

www.eelm.weebly.com

আমাদের সাহায্যকারী হিসেবে ছিলেন তিন হাজার ফেরেশতা। সহজেই জয়লাভ করলাম আমরা।

জুহাক ও ইকরামা বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতটি উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কিত (বদর সম্পর্কিত নয়)। উহুদ যুদ্ধে সাহাবীগণ অটলতা ও সাবধানতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন বজায় রাখতে সক্ষম হননি বলে আল্লাহ্তায়ালার প্রতিশ্রুত সাহায্য পাননি। মুজাহিদ ও জুহাক বলেছেন, বদরের পরাজয় কাফেরদেরকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলো তাই উহুদে এসেছিলো তারা প্রতিশোধস্পৃহা পূর্ণ করতে। বদরের মতো উহুদেও রসুল স. অটল ছিলেন। ছিলেন আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশের প্রতি সমর্পিতপ্রাণ। তাই জিব্রাইল এবং মিকাইল ছিলেন তাঁর সাহায্যকারী। হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন, উহুদের দিন আমি রসুল স. এর সাহায্যকারী রূপে শ্বেতবস্ত্র পরিহিত দুই ব্যক্তিকে যুদ্ধ করতে দেখেছি। যুদ্ধের আগে ও পরে কখনো আমি তাদেরকে আর দেখিনি। এই দুইজন ছিলেন হজরত জিব্রাইল এবং হজরত মিকাইল। বোখারী, মুসলিম।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেন, রসুল স. থেকে সবাই ছিলেন দূরবর্তী। তাঁর কাছে ছিলেন কেবল সা'দ বিন মালেক। তিনি তীর নিক্ষেপ করছিলেন। এক যুবক তীর সংগ্রহ করে দিচ্ছিলেন। তীর শেষ হয়ে গেলে এক যুবকের আকৃতিতে হজরত জিব্রাইল তীর এনে দিলেন। বললেন, আবু ইসহাক নিক্ষেপ করো। যুদ্ধ শেষ হলে ওই যুবকটিকে আর দেখা গেলোনা।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১২৬, ১২৭

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ؕ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ۝

❒ তোমাদের জন্য সুসংবাদ ও তোমাদের চিত্ত-প্রশান্তি-হেতু আল্লাহ্ ইহা করিয়াছেন — এবং সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহের নিকট হইতেই হয়।

❒ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করার অথবা লাঞ্ছিত করার জন্য; ফলে তাহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়।

প্রকাশ্য উপকরণের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া মানুষের স্বভাব। তাই আল্লাহ্তায়ালা প্রকাশ্য উপকরণ হিসেবে ফেরেশতার সহায়তার কথা উল্লেখ করেছেন যাতে নিশ্চিতি ও স্বস্তি লাভ হয়। বস্তুতপক্ষে মানুষ ও ফেরেশতা

www.eelm.weebly.com

সবকিছুই আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টি। তিনি কখনো মাধ্যমে কখনো বিনা মাধ্যমে সাহায্য সহায়তা প্রদান করেন। আবার কাউকে রাখেন সাহায্যবিহীন। তিনি সাহায্য করেন নিতান্ত অনুগ্রহের কারণেই। এরকম করতে তিনি বাধ্য নন। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

জ্ঞাতব্য ঃ হজরত আয়াজ আশআরী বর্ণনা করেছেন, আমি ইয়ারমুকের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। সেনানায়ক ছিলেন পাঁচজন — হজরত আবু ওবায়দা, হজরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান, হজরত ইবনে হাসান, হজরত খালিদ বিন ওলীদ এবং হজরত আইয়াজ। হজরত ওমর নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধান সেনাপতি হবেন হজরত আবু ওবায়দা। আমরা হজরত ওমরকে লিখলাম, সামনে মৃত্যু। সাহায্য প্রেরণ করুন। হজরত ওমর প্রত্যুত্তরে লিখলেন, তোমাদের চিঠি পেয়েছি। তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করেছো। কিন্তু আমি তোমাদেরকে এমন এক সত্তার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হতে বলছি, যাঁর সেনাবাহিনী সর্বক্ষণ বিদ্যমান। সেই পবিত্র আল্লাহ্তায়ালার শরণ যাঞ্চা করো। বদর যুদ্ধে রসুল স. এর যুদ্ধোপকরণ এবং সেনাসংখ্যা তোমাদের চেয়েও কম ছিলো। তবু তাঁরা বিজয়ী হয়েছিলেন। পত্র পাঠ মাত্র যুদ্ধে লিপ্ত হও। আমার নিকট থেকে কোনো সাহায্যের অপেক্ষা করো না। পত্র পাঠ মাত্র আমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। শত্রুদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম চার ফারসাখ দূরে।

কাফেরদের একটি দলকে নিশ্চিহ্ন অথবা লাঞ্ছিত করার কথা বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে অথবা উহুদ যুদ্ধের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। বদরে কাফেরদের সত্তরজন নেতা মারা যায় এবং বন্দী হয় সত্তরজন। উহুদ যুদ্ধে কাফেরদের ষোলজন নেতা মারা গিয়েছিলো। প্রথমে বিজয় ছিলো মুসলমান বাহিনীর অনুকূলে। কিন্তু পরে রসুল পাক স. এর নির্দেশ পালনে শিথিলতার কারণে বিজয় পর্যবসিত হয়েছিলো পরাজয়ে।

নিরাশ করে ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ কঠোরভাবে পশ্চাদাপসরণে বাধ্য করা। কামুস গ্রন্থে বলা হয়েছে, এর অর্থ অপদস্থ করা, ধ্বংস করা, প্রবল রোষের সাথে ফিরিয়ে দেয়া, লাঞ্ছনায় নিপতিত করে দেয়া ইত্যাদি। আমি বলি, এসমস্ত কথাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর সাহায্যের মাধ্যমে কাফেরদের কাউকে ধ্বংস করে দেন এবং অবশিষ্টদেরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন।

মুসলিম এবং ইমাম আহমদ হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, উহুদ যুদ্ধে রসুল স. আহত হয়েছিলেন। তাঁর সামনের দাঁত ভেঙে গিয়েছিলো এবং পবিত্র অবয়ব হয়েছিলো রক্তাক্ত। তখন তিনি স. বলেছিলেন, এই সম্প্রদায় কিভাবে সত্যানুসারী হতে পারবে, যারা তাদের নবীর সাথে এরকম আচরণ করে — যে নবী তাদেরকে আল্লাহ্তায়ালার দিকে আহবান করছেন। তখন নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ۝ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

❒ এবং তিনি তাহাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হইবেন অথবা তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই; কারণ তাহারা সীমালংঘনকারী।

❒ আসমান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্‌রই। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই — এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ ও ইমাম বোখারীর মাধ্যমে হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি নিজে রসুল স. কে বলতে শুনেছি, তিনি স. বলেছেন, হে আল্লাহ্, অমুক ব্যক্তির উপর লানত বর্ষণ করো। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আবু সুফিয়ানের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করো। হারেছ বিন হিসামের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করো। সোহেল বিন আমর এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়ার উপরও লানত বর্ষণ করো। পরবর্তীতে এরা সকলেই তওবা করেছিলেন। বোখারী হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

শায়েখ ইবনে হাজার উপরোক্ত হাদিস দু'টিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। রসুল স. এর বদদোয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে জানিয়েছেন যে, এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই।

সাঈদ বিন মুসাইয়েব এবং মোহাম্মদ বিন ইসাহাক বর্ণনা করেছেন, উহুদ প্রান্তরে যখন কাফেরেরা শহীদগণের নাক, কান ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে নিচ্ছিলো, তখন রসুল স. এবং সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ্‌পাক আমাদেরকে বিজয় দান করলে আমরাও এরকম করবো। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. যখন তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য দোয়া করতে ইচ্ছা করলেন, তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে। কারণ, আল্লাহ্‌তায়ালা জানতেন, পরবর্তীতে তাদের অনেকেই মুসলমান হয়ে যাবে।

অপর একটি বর্ণনা এই বর্ণনার আপাতবিরুদ্ধ বলেই মনে হয়। হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ফজরের নামাজে

www.eelm.weebly.com

পড়তেন, 'আল্লাহুম্মাল আন্ রাআল ওয়া জাকওয়ান ওয়া উসাইয়া' অতঃপর আল্লাহ্তায়ালা এই আয়াত নাজিল করেন। তখন রসুল স. বদদোয়া বন্ধ করে দেন। বিরে মাউনার ঘটনার কারণেই রসুল স. বদদোয়া করতেন। তিনি স. ওই গোত্রসমূহের নিকট প্রেরণ করেছিলেন সত্তর জন কোরআন আবৃত্তিকারক (ক্বারী)। তাঁদের নেতা ছিলেন মানজার বিন আমর। আমের বিন তোফায়েল প্রতারণার মাধ্যমে তাঁদেরকে হত্যা করেছিলো। এই ঘটনায় রসুল স. অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন এবং মাসাধিক কাল ধরে নামাজে তাদের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার এই বর্ণনাটিকে মাদরাজ করে দিয়েছেন (যে হাদিসের মধ্যে বর্ণনাকারী তার নিজের অথবা সাহাবী বা তাবেয়ীর উক্তি প্রক্ষেপিত করেন তাকে মাদরাজ বলে)। এই মর্মবিদারক ঘটনাটি ঘটেছিলো উহুদ যুদ্ধের চারমাস পর। হতে পারে উহুদ এবং বিরে মাউনা দু'টি ঘটনাকে লক্ষ্য করেই এই আয়াত নাজিল হয়েছে। কিন্তু বোখারী তার ইতিহাসে এবং ইবনে ইসহাক সালেম বিন আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই ঘটনাটি — এক কোরাইশ ব্যক্তি রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললো, তুমি একেক বার একেক কথা বলো। একবার নিষেধ করো, আবার আদেশ করো। এই কথা বলে সে অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। রসুল স. অপ্রসন্ন হলেন এবং অপপ্রার্থনা করলেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে। পরে ওই ব্যক্তি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। বর্ণনাটি মুরসাল ও গরীব।

আল্লাহ্তায়ালা ওই সীমালংঘনকারীদেরকে শাস্তি দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন। তারা মুসলমান হয়ে গেলে তোমরা সকলে আনন্দিত হবে। অথবা অবিশ্বাসে দৃঢ়পদ থাকার কারণে তাদেরকে শাস্তি দিলে তোমরা স্বস্তি লাভ করবে। আল্লাহ্তায়ালা তাই জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের প্রতি রহম করা বা শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদানকারী। এক্ষেত্রে তোমার করণীয় কিছু নেই। তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা অথবা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আদেশ প্রতিপালন করতে হবে, পরিণাম নির্দ্ধারণ করবেন আল্লাহ্তায়ালা। ইমাম তাফতাজানী রসুল স. এর প্রতি অবতীর্ন এ নির্দেশনাটিকে সকল মুসলমানের উপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য বলেছেন।

আমি বলি, এই আয়াতটিকে পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে সংযুক্ত করলে অর্থ দাঁড়াবে এরকম, আল্লাহ্ বদরে তোমাদেরকে একারণে সাহায্য করেছেন যে, কাফেরদের একটি দলকে তিনি ধ্বংস করে দেবেন অথবা পরাজয়ের মাধ্যমে তাদের একটি দলকে নিষ্ক্রিয় করে দেবেন কিংবা মুসলমান হয়ে যাওয়ার কারণে তাদেরকে রহমত দান করবেন নয়তো তাদেরকে শায়েস্তা করবেন। এখানে কাফেরদের চারটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। অপপ্রার্থনা থেকে বিরত রাখার কারণেই 'তোমার করণীয় কিছুই নাই,' এই আপত্তিসূচক বাক্যটি নাজিল হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

আকাশ ও পৃথিবীর সকলকিছুই আল্লাহ্তায়ালার অধিকারাধীন। তিনি কাউকে ক্ষমা করতে চাইলে ইসলামে প্রবেশের সুযোগ করে দেবেন। কারো জন্য নির্ধারণ করবেন শাস্তি। তবে আল্লাহ্তায়ালা কাউকে শাস্তি দিতে বাধ্য নন। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়াপরবশ। কাজেই অপপ্রার্থনার দিকে অগ্রসর হয়ো না।

ফারইয়ানী মুজাহিদের উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, মানুষ মূল্য পরিশোধের একটি সময় নির্ধারণ করে ক্রয় বিক্রয় করে থাকে এবং যখন পরিশোধের সময় এসে যায় তখন এরকম হয় যে, হয়তো অধিক মূল্য পরিশোধ করে কিংবা পরিশোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়। এই প্রেক্ষিতটি বিবেচনায় রেখে নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

❑ হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাইওনা এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

❑ এবং তোমরা সেই অগ্নিকে ভয় কর যাহা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

❑ তোমরা আল্লাহ্ ও রসুলের আনুগত্য কর যাহাতে তোমরা কৃপা লাভ করিতে পার।

❑ তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট হইতে ক্ষমা এবং জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতা কর, যাহার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের ন্যায়, যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে সাবধানীদের জন্য;

চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়োনা — এর অর্থ এই নয় যে, চক্রবৃদ্ধি সুদ ছাড়া অন্য সুদ বৈধ। বরং সুদ কম হোক বেশী হোক অর্থাৎ যে প্রকৃতিরই হোকনা কেনো সকল সুদই হারাম। এক্ষেত্রে আল্লাহ্কে ভয় করতে বলা হয়েছে, যদি সফলতা বা মুক্তি কাম্য হয়। ভয় করতে বলা হয়েছে সেই অগ্নিকে যা কাফেরদের জন্য

www.eelm.weebly.com

নির্দিষ্ট। বায়যাবী লিখেছেন, আগুন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য এবং গোনাহ্গার বিশ্বাসীদের জন্য।

আমি বলি, কাফেরদের জন্য প্রস্তুতকৃত আগুন এবং পাপিষ্ঠ বিশ্বাসীদের জন্য আগুন এক নয়। তবে এখানে এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সুদ অন্তরে একরকম তমসার সৃষ্টি করে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুফরীতে উপনীত করে। তাফসীরে মাদারেকে বলা হয়েছে, ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এই আয়াতটি কোরআনের সবচেয়ে ভীতিকর আয়াত। আল্লাহ্র নির্দেশ লংঘন করলে বিশ্বাসীদেরকে এখানে ওই আগুনের ভয় দেখানো হয়েছে, যা অবিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত। এর পরেই আল্লাহ্তায়ালার কৃপা লাভের শর্ত হিসাবে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করতে হবে। প্রকৃত পক্ষে দোজখের আগুন সকল অবস্থায় কাফেরদের জন্যই। পাপী মুমিনগণ সেখানে প্রবিষ্ট হলেও সাময়িকভাবে হবে। আর অবিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত আগুন এবং পাপী বিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত আগুন পৃথক প্রকৃতির। এই আয়াতের মর্ম মারজিয়া ফেরকার বিশ্বাসবিরোধী। মারজিয়াদের মত এই যে, ইমান থাকলে গোনাহ্ দ্বারা কোনো ক্ষতি হয় না।

এর পরে বলা হয়েছে, ক্ষমা ও জান্নাতের জন্য প্রতিযোগীতা করতে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ক্ষমার দিকে ধাবিত হওয়ার অর্থ ইসলামের দিকে ধাবিত হওয়া। ইকরামা বলেছেন, আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হওয়া। অর্থাৎ ক্ষমা অর্থ ইসলাম অথবা তওবা। হজরত আলী বলেছেন, ফরজ আদায় করা এবং হজরত আনাস বিন মালেক বলেছেন, নামাজের তাকবীরে উলা (প্রথম তাকবীর) আয়ত্তে রাখা। এসমস্ত মতামতের শেষ ফল এই যে, ক্ষমা বা মাগফিরাত অর্থ এমন বিশ্বাস, উত্তম চরিত্রাবলী এবং পূণ্যকর্ম যার মাধ্যমে পাপ সমুহের ক্ষমা, দোজখ থেকে মুক্তি এবং রহমতের সুশীতল ছায়া লাভ হয়। এ প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে হজরত আবু উমামা বর্ণিত একটি হাদিসে এরকম বলা হয়েছিলো, অক্ষমতা আগমনের পূর্বে সৎকর্ম সম্পাদন করো। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, সাতটি বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার আগেই আমল সম্পাদন করো। এমন দরিদ্রতা যা অন্যমনস্ক করে, এমন সম্পদ যা অহংকার নিয়ে আসে, এমন ব্যাধি যা সুস্থতাবিরোধী, এমন ষাটোর্ধ্ব বার্ধক্য যা বিস্মৃতি ঘটায়, আকস্মিক মৃত্যুর, অথবা দাজ্জালের। এ সমস্ত পরিস্থিতি আগমনের প্রতীক্ষা করা নিকৃষ্ট আচরণের অন্তর্ভুক্ত। সবচেয়ে বেশী তিক্ত ও ভয়ংকর বিপদ হচ্ছে কিয়ামত। তিরমিজি, হাকেম।

বেহেশতের বিস্তৃতি আকাশ পৃথিবীর বিস্তৃতির মতো — এটি হচ্ছে উপমা। প্রকৃতপক্ষে বেহেশতের প্রশস্ততা এর চেয়ে বেশী। মানুষের জ্ঞান অনুযায়ী বেহেশতের প্রশস্ততার উপমা এখানে দেয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে যেমন বলা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে, 'খলিদীনা ফীহা মা দামাতিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' — এখানে জান্নাতে বসবাসের স্থায়িত্বকে আকাশ ও পৃথিবীর স্থায়িত্বের সঙ্গে তুলনীয় করা হয়েছে। কারণ সর্বসাধারণের বিবেচনায় আকাশ ও পৃথিবী সর্বাপেক্ষা অধিক স্থায়ী।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বিন মালেককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, জান্নাত আকাশে না পৃথিবীতে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আকাশ ও পৃথিবীতে কিভাবে জান্নাতের সংকুলান হতে পারে। এরপর প্রশ্ন করা হয়েছিলো, তবে কোথায়? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, সপ্তম আকাশের উপরে এবং আরশের নিচে।

কাতাদা বলেছেন, সাহাবীগণ মনে করেন, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপরে এবং জাহান্নাম সপ্তস্তর মাটির নিচে। আবু শায়েখ আজিমা গ্রন্থে আবু জা'রা সূত্রে হজরত আবদুল্লাহ্‌র উক্তি উল্লেখ করেছেন এরকম, জান্নাত সকল কিছুর উপরে, সাত আসমানেরও উপরে। আর দোজখ সবচেয়ে নিচে, সপ্তস্তর জমিনেরও নিচে। মুত্তাকীদের (সাবধানীদের) জন্যই বেহেশত নির্ধারিত। ওই ব্যক্তি মুত্তাকী, যিনি কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত, তিনি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুকে অন্তরে স্থাপন করেন না। মুত্তাকীগণ সরাসরি এবং পাপী বিশ্বাসীগণ শাস্তির মাধ্যমে পাপক্ষয়ের পর জান্নাত লাভের অধিকার লাভ করবেন। তাঁদের জান্নাত পৃথক প্রকৃতিরও হতে পারে।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৩৪

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

❑ যাহারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়নদিগকে ভালবাসেন;

'আস্‌সররাই' অর্থ ওই আস্বাদ যা সম্পদের কারণে অর্জিত হয়। আর 'আদ্‌দররাই' অর্থ সম্পদের স্বল্পতা। 'কামুস'। ইমাম বাগবী লিখেছেন, জান্নাত লাভের অধিকার তাকওয়া অবলম্বনকারীরা অর্জন করবেন — আর তাঁদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দানশীলতা। এই আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র, বেহেশতের এবং মানুষের অধিক নৈকট্যধারী এবং দোজখ থেকে দূরবর্তী। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্, বেহেশত এবং মানুষ থেকে দূরবর্তী, কিন্তু দোজখের নিকটবর্তী। মূর্খ দাতা কৃপণ আবেদের চেয়ে উত্তম। তিরমিজি। এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে।

www.eelm.weebly.com

বাগবী বর্ণিত হাদিসে কৃপণ আবেদের পরিবর্তে কৃপণ আলেম শব্দ এসেছে। এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন, বায়হাকী হজরত জাবের থেকে এবং তিবরানী হজরত আয়েশা থেকে। হজরত ইবনে আব্বাসের মারফু বর্ণনায় এসেছে, দানশীলতা আল্লাহ্‌তায়ালার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। ইবনে নাজ্জার।

রসুল স. এরশাদ করেন, দানশীলতা জান্নাতের বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ, যার শাখাপ্রশাখাগুলো পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত। যে ব্যক্তি এসমস্ত শাখা প্রশাখার একটি ধারণ করবে, সে দোজখ থেকে দূরবর্তী হয়ে যাবে। এরকম বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী ও বায়হাকী, হজরত আলী এবং হজরত আদী থেকে। বায়হাকী আবু হোরায়রা থেকেও এরকম বর্ননা করেছেন। আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের এবং হজরত আবু সাঈদ থেকে। ইবনে আসাকের হজরত আনাস থেকে এবং দায়লামী হজরত মুআজ থেকে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, এক দিরহাম একলক্ষ দিরহামের বাজী মেরে দিয়েছে। একজন আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল স. এটা কিরকম? তিনি স. বললেন, অত্যন্ত সম্পদশালী এক লোক একলক্ষ দিরহাম দান করলো। দুই দিরহামের মালিক আরেক ব্যক্তি দান করলো একটি দিরহাম। তাঁর এই একটি দিরহাম ওই একলক্ষ দিরহাম অপেক্ষা উত্তম। নাসাঈ, ইবনে খাজিমা, ইবনে হাব্বান, হাকেম। হাকেম একে বিশুদ্ধ বলেছেন।

বেহেশতের অধিকারী ব্যক্তিদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য, ক্রোধ সংবরণ। এ সম্পর্কে রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার ক্রোধকে সংবরণ করবে, আল্লাহ্ তার অন্তরকে ইমান ও আমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেবেন। আহমদ, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে আবিদ্ দুনিয়া। বাগবী হজরত আনাসের মারফু বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার রোষের প্রচন্ডতাকে সন্তাস্থ করে ফেলবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সকলের সামনে উপস্থিত করে তার ইচ্ছামতো হুর নির্বাচিত করে নিতে বলবেন।

ইবনে আবিদ্ দুনিয়া হজরত ইবনে ওমরের মারফু হাদিসে বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক রোষ দমনকারীদের দোষ গোপন রাখেন।

বেহেশতিদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ক্ষমাশীলতা। বাঁদী এবং গোলামদের প্রতি ক্ষমাশীল হওয়া অথবা ন্যায়বিরোধী এবং অসুন্দর আচরণকারীদেরকে ক্ষমা করা। বর্ণনা করেছেন জায়েদ বিন আসলাম ও মুকাতিল। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে এরকম লোক হবে অল্প সংখ্যক। আল্লাহ্ই তাদের হেফাজতকারী। সায়লাবী, মুকাতিল থেকে এবং বায়হাকী ইবনে মালেক থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন।

'আল মুহ্‌সিনীন' এর লাম বর্ণটি এই উম্মতের বৈশিষ্ট্যাবলীকে সম্পৃক্ত করেছে। অথবা এই আয়াতের প্রথমে বর্ণিত সমস্ত উম্মতকে অন্তর্ভূত করেছে।

www.eelm.weebly.com

সুফিয়ান সওরী বলেছেন, মন্দ আচরণকারীর প্রতি উত্তম আচরণ করাই এহ্সান। উত্তম আচরণকারীর প্রতি উত্তম আচরণ করাও এহ্সান। হজরত ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, যখন হজরত জিব্রাইল আ. রসুলুল্লাহ্ স. এর নিকট এহ্সানের অর্থ জানতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি স. বলেছিলেন, এহ্সান (উত্তম ইবাদত) হচ্ছে, তুমি এমনভাবে আপন প্রতিপালকের ইবাদতে লিপ্ত হও যেনো তুমি তাঁকে দেখছো। অথবা এরকম মনে করো তিনি তো অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।

আমি বলি, আহলে এহ্সান বলতে সুফিয়ায়ে কেরামকে বোঝানো হয়েছে। ফানায়ে নফ্স (কু প্রবৃত্তির বিলীনতা)ই এখানে উদ্দেশ্য। অহংকার, ঘৃণা, বিবাদ, কৃপণতা — এসমস্ত মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহ গজবকে অবধারিত করে। এখানে ফানায়ে কল্বের (অন্তরের কামনা বাসনার বিলীনতা) ইঙ্গিতও রয়েছে। কল্বের ফানা হলে মানবতার সাধারণত্বের যবণিকা উন্মোচিত হয়। সকল কার্যের প্রকৃত কর্তা যে আল্লাহ্তায়ালাই তা সম্যক পরিস্ফুট হয়ে উঠে। তখন মানুষকে অভিযুক্ত করার মনোবৃত্তি আর থাকে না। লক্ষ্য থাকে কেবল আল্লাহ্তায়ালার হুকুমের দিকে। সম্পদের স্বল্পতা এবং পর্যাপ্ততা — এই দুই অবস্থাতেই তখন দানশীলতা প্রবহমান রাখা সম্ভব হয়। আল্লাহ্তায়ালাই অধিক জ্ঞাত।

এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে আহলে তাকওয়া এবং আহলে এহ্সানদের বৈশিষ্ট্যাবলী। এখন বর্ণিত হচ্ছে গোনাহ্গার মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য সমুহ যারা তওবার মাধ্যমে তাকওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৩৫

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

❑ যাহারা কোন অশ্লীল কার্য করিয়া ফেলিলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করিলে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করিবে? এবং তাহারা যাহা করিয়া ফেলে জানিয়া শুনিয়া তাহাই করিতে থাকেনা।

অশ্লীল কার্য (ফাহেশা) অর্থ কবীরা গোনাহ্ (বড় অপরাধ)। হজরত জাবের বলেছেন, ফাহেশা অর্থ ব্যভিচার (জেনা)। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, মুসলমানগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের চেয়ে তো বনী ইসরাইলেরাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অধিক সম্মানীয়। তারা রাতে গোনাহ্ করলে

www.eelm.weebly.com

সকালে তাদের দরোজার চৌকাঠে গোনাহের কথা লিপিবদ্ধ দেখতে পেতো। গোনাহের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তারা নিজেদের নাক অথবা কান কেটে ফেলতো। একথা শুনে রসুল স. নীরব রইলেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

আতা বলেছেন, এই আয়াত নাবহান নামক এক খেজুর বিক্রেতার কারণে অবতীর্ণ হয়েছে। তার ডাক নাম ছিলো আবু মাবাদ। খেজুর বিক্রয়কালে একদিন এক সুন্দরী রমণী তার নিকট খেজুর কিনতে এলো। সে ভনিতা করে বললো, এই খেজুরগুলো খারাপ। আমার ঘরে ভালো খেজুর আছে। একথা বলে নাবহান রমণীটিকে তার ঘরে এনে নিজের দিকে আকর্ষণ করলো এবং তাকে চুমু খেলো। রমণী বলে উঠলো 'ইত্তাকিল্লাহ্' — আল্লাহ্কে ভয় করো! নাবহান তৎক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে দিলো এবং অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে রসুল স. এর দরবারে এলো। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

মুকাতিল ও কালাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এক আনসার ও এক সাকাফীর মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। সাকাফী রসুল স. এর সঙ্গে এক যুদ্ধে গিয়েছিলেন। আনসারের দায়িত্ব ছিলো তার এবং আনসার পরিবারের তত্ত্বাবধান করা। একদিন আনসার বাজার থেকে গোশ্ত কিনে আনলেন। সাকাফীর স্ত্রী যখন গোশ্ত নিতে এলেন তখন আনসারী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন এবং তাঁকে চুমু খেলেন। সাকাফীর স্ত্রী বলে উঠলেন, 'ইত্তাকিল্লাহ্' — আল্লাহ্কে ভয় করো! তিনি লজ্জিত হলেন এবং পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন। সাকাফী গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর স্ত্রী আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, আল্লাহ্ এরকম ভাইয়ের প্রতিপালন যেনো না করেন। সাকাফী তখন খুঁজতে খুঁজতে পাহাড়ের দিকে গিয়ে দেখলেন লজ্জিত আনসারী পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছেন এবং আল্লাহ্র তসবী পাঠ করছেন। তিনি তাঁর অপরাধ স্বীকার করলেন। দু'জনে মিলে তখন হজরত আবুবকর সিদ্দিকের নিকট গেলেন। হজরত আবুবকর বললেন, আমি জানিনা তোমার মুক্তি কিভাবে হবে। এরপর দু'জনে গেলেন হজরত ওমরের কাছে। হজরত ওমরও একই উত্তর দিলেন। শেষে তাঁরা রসুলে পাক স. এর নিকটে গিয়ে বললেন, আমাদের মুক্তির উপায় কি? তখন এই আয়াত অবতীর্ন হয়।

নিজেদের প্রতি জুলুম করা অর্থ সগীরা গোনাহ্, ব্যাভিচারের চেয়ে নিম্নস্তরের গোনাহ্। যেমন চুম্বন করা, জড়িয়ে ধরা অথবা স্পর্শ করা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, জুলুম অর্থ মুখে বা কাজে আমল করে জুলুম করা। কেউ কেউ বলেন, সীমাতিরিক্ত গোনাহ্ ফাহেশা এবং যা সীমাতিরিক্ত নয়, তা জুলুম।

ফাহেশা অথবা জুলুম সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহ্তায়ালার স্মরণ হওয়ার অর্থ আল্লাহ্র আযাবের কথা স্মরণ হওয়া, জবাবদিহীর কথা মনে পড়া। গোনাহ্কারী

www.eelm.weebly.com

তখন লজ্জিত হয়ে তওবা ও ইস্তেগফার করলে ক্ষমা লাভ হয়। মুকাতিল বিন হাব্বান বলেছেন, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা অর্থ মৌখিকভাবে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা।

আমি বলি, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার অর্থ নামাজ ও ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)। হজরত আলী, হজরত আবুবকর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, গোনাহ্ করার পর কেউ যদি উত্তমরূপে অজু করে নামাজ পড়ে নিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, তবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন। তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান। তিরমিজির বর্ণনায় অতিরিক্ত সংযোজন রয়েছে, অতঃপর রসুল স. পাঠ করলেন, 'ওয়াল্লাজিনা ইজা ফাআলু ফাহিশাতান আও জালামু আনফুসাহুম জাকারুল্লাহ্' .... ক্ষমা করার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌র। অধিকার ক্ষুন্ন হলে মানুষ কেবল অধিকার ক্ষুন্ন হওয়ার দায় থেকে অন্যায়কারীকে অব্যাহতি দিতে পারে। কিন্তু গোনাহ্ মাফ করতে পারে না। আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করার নামই গোনাহ্। মানুষের অধিকার তো তাঁর নির্দেশের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই প্রকৃতপক্ষে গোনাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার অধিকারের বিরুদ্ধাচরণ। মানুষ যখন অন্যকে ক্ষমা করে তখন উদ্দেশ্য থাকে এই যে, এরকম করলে আল্লাহ্ও তাকে ক্ষমা করে দিবেন। ব্যাপারটা ব্যবসায়ের মতো, যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই লাভবান হয়। লাভ ও উদ্দেশ্য ব্যতীত ক্ষমা প্রদর্শন কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই শোভনীয়। তাই প্রশ্নের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে, আল্লাহ্ ছাড়া ক্ষমাকারী কে?

সগীরা, কবীরা সব ধরনের গোনাহ্‌র জন্যই লজ্জিত হওয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। গোনাহ্ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করাও প্রয়োজন, যাতে পরবর্তী স্খলন থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হয়। রসুল স. এরশাদ করেছেন, ক্ষমাপ্রার্থনাকারী সীমালংঘনকারী নয়, যদিও তার দ্বারা প্রতিদিবসে সত্তরবার গোনাহ্ সংঘটিত হয়। আবু দাউদ, তিরমিজি।

রসুলে পাক স. আরো বলেছেন, গোনাহে প্রতিষ্ঠিত থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করা আপন প্রতিপালকের প্রতি উপহাসতুল্য। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী ও ইবনে আসাকের।

মাসআলা ঃ সগীরা গোনাহে সুদৃঢ় থাকা কবীরা গোনাহ্। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কবীরা গোনাহ্ আর গোনাহ থাকেনা যদি ক্ষমাপ্রার্থনা করা হয়। অন্যদিকে সগীরা গোনাহ্ও কবীরায় পরিণত হয় যদি তাতে সীমালংঘন করা হয়। সীমালংঘনপরায়ণতাই কবীরা গোনাহ্।

গোনাহে সীমাতিক্রম না করার কারণ হতে হবে আল্লাহ্‌র ভয়। স্বভাবগত অনীহা, আলস্য, লোকলজ্জা অথবা সুযোগ না পাওয়া — এসমস্ত কারণে গোনাহ্ থেকে বিরত থাকলে পুণ্য লাভ হয় না। তবে এতে করে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে মুক্ত থাকা যায়। যে গোনাহ্ আদৌ সংঘটিত হয় না, তার জন্য আযাব নেই। সওয়াব লাভের কারণ সওয়াবপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য ও আশা। আল্লাহ্তায়ালার স্মরণ।

www.eelm.weebly.com

তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা প্রতিপালন। আয়াতের শেষে উল্লেখিত হয়েছে 'ওয়াহুম ইয়ালামুন' - এর অর্থ তারা জেনে শুনে অপরাধ করেনা। জুহাক বলেছেন, 'ওয়াহুম ইয়ালামুন' অর্থ তারা আল্লাহ্‌কেই মাগফিরাতের মালিক মনে করে। হোসাইন বিন ফজল বলেছেন, তারা জানে যে, এ কাজের মালিক আল্লাহ্। তিনিই একমাত্র গোনাহ্ মাফকারী। কোনো আলেম বলেছেন, তাদের বিশ্বাস এই যে, গোনাহ যত বেশীই হোক তা আল্লাহের ক্ষমাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখেনা। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের নিশ্চিত প্রত্যয় রয়েছে, ক্ষমাপ্রার্থনা করলে আল্লাহ্‌তায়ালা ক্ষমা করে দিবেন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি গোনাহ্ করার পর আরজ করলো, হে আমার প্রতিপালক! আমি অন্যায় করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করো। আল্লাহ্‌তায়ালা তখন বলেন, আমার বান্দা জানে যে তার পাপ ক্ষমাকারী এক প্রতিপালক আছেন। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। কিছুদিন পর সে আবার গোনাহ্ করে ফেললো। আরজ করলো, পরোয়ারদিগার আমিতো গোনাহ্ করে ফেলেছি। আমাকে মাফ করে দাও। আল্লাহ্ পাক বলবেন, আমার বান্দা জানে তার এক মালিক আছেন যিনি ক্ষমা করতে পারেন অথবা পাকড়াও করতে পারেন। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। কিছুদিন পর আবারও পাপ করলো সে। তারপর প্রার্থনা জানালো, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করো। আল্লাহ্ তখন বলবেন, আমার বান্দা বুঝে যে, তার প্রভু তাকে ক্ষমা করতে অথবা শাস্তি দিতে সক্ষম। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। সে যা খুশী করতে পারে। বোখারী, মুসলিম।

তিবরানী ও হাকেম বিশুদ্ধ সনদে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস রাখে, আমিই গোনাহ্ ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখি - আমি তাকে ক্ষমা করে দিই। অধিক গোনাহের পরওয়া আমি করিনা যতক্ষণ না সে আমার সাথে শরীক করে।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৩৬

أُولَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ○

❒ উহারাই তাহারা যাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। এবং কর্মে সিদ্ধদিগের পুরস্কার কত উত্তম।

---

www.eelm.weebly.com

তাকওয়া এবং তওবা অবলম্বনকারীদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার পুরস্কার — ক্ষমা এবং স্বর্গোদ্যান। সেই স্বর্গোদ্যানের পাদদেশে রয়েছে প্রবহমান স্রোতস্বিনীসমূহ। তবে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের চেয়ে তওবাকারীদের পুণ্যপ্রাপ্তি কম হবে। ইতোপূর্বের আয়াতে প্রথমে উল্লেখিত হয়েছে তাকওয়া ধারণকারীদেরকে (সৎকর্মপরায়নদিগকে) আল্লাহ্ ভালোবাসেন। তাঁরা আল্লাহ্ পাকের প্রিয়জন, আল্লাহ্র মহব্বত ধারণের উপযোগী। পরের আয়াতে বলা হয়েছে ক্ষমাকৃত বান্দাদের কথা। এতেই সুস্পষ্ট হয় যে, উভয় দল জান্নাত লাভ করলেও তওবা অপেক্ষা তাকওয়াই অধিক মর্যাদাশালী। তওবার বিনিময় সওয়াব। আর তাকওয়ার বিনিময় সওয়াব সহ প্রেম।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, পাপ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির মতো। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আসাকের হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এবং কুশাইরি, ইবনে নাজ্জার এবং হজরত আলী থেকে।

জ্ঞাতব্য ঃ তাকওয়া অবলম্বনকারী ও তওবাকারীরাই জান্নাতের অধিকারী। কিন্তু এটাও ঠিক যে পাপাচ্ছন্ন ইমানদারও এক সময় জান্নাত লাভ করবেন। অপরদিকে দোজখ কেবল কাফেরদের জন্য নির্ধারিত হলেও পাপী বিশ্বাসীরাও দোজখে প্রবেশ করবেন যদিও তারা সেখানে স্থায়ী হবেন না। অর্থ এরকমও হতে পারে যে, কবীরা গোনাহকারীদেরকে দোজখাগ্নির শাস্তির মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে, কর্মকারের অগ্নিকুন্ডে পুড়িয়ে যেমন খনিজবস্তুকে বিশুদ্ধ করা হয়। আল্লাহ্তায়ালা বড় পাপীদেরকে আযাব না দিয়ে নিছক ক্ষমার মাধ্যমেও পরিশুদ্ধ করে দিতে পারেন। এরকম ক্ষমাপ্রাপ্তরা তওবার মাধ্যমে ক্ষমাপ্রাপ্তদের মতো।

সাবেত বুনানী বলেছেন, আমি সংবাদ পেয়েছি, 'ওয়াল্লাজিনা ইজা ফায়ালু ফাহিশাতান' — এই আয়াত নাজিল হলে শয়তান খুব কেঁদেছিলো।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ○ هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ○ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

❒ অতীতে তোমাদের পূর্বে বহু বিধান ছিল, সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমন কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কী পরিণাম!

www.eelm.weebly.com

❒ ইহা মানব জাতির জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সাবধানীদের জন্য দিশারী ও শিক্ষা।

❒ তোমরা হীনবল হইওনা এবং দুঃখিত হইওনা; বিশ্বাসী হইলে তোমরাই শ্রেষ্ঠ।

'সুনানুন' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'সুন্নাতুন, অর্থ ভালো অথবা মন্দ যা অনুসরণ করা হয়। রসুল স. বলেছেন, হেদায়েতের প্রতি আহ্বানকারী ব্যক্তি তার ডাকে সাড়া দানকারী ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে। সাড়া দানকারী অনুসারীর সওয়াব তাতে একটুও কমবেনা। আর ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বানকারী ব্যক্তির জন্য রয়েছে তার ডাকে সাড়া দানকারী ব্যক্তির সমপরিমাণ গোনাহ্। অথচ তার অনুসরণকারী ব্যক্তির গোনাহ্ তাতে একটুও কমবে না। এই হাদিসের প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ এরকম দাঁড়ায় — তোমাদের পূর্বে ভালো মন্দ উভয় সম্প্রদায়ের অনেক লোক চলে গিয়েছে। তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখো মিথ্যাশ্রয়ীদের কী পরিণতি হয়েছিলো। মুজাহিদ বলেছেন, এর অর্থ অতীতের কাফেরদের প্রতি আমার নিয়ম ছিলো, আমি তাদের জীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম, তারপর তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আমি আমার পয়গম্বর ও তাঁদের অনুসারীদেরকে বিজয়ী করেছি। তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে অপরাধীদের ধ্বংসচিহ্ন দেখে নাও এবং উপদেশ গ্রহণ করো। কালাবী বলেছেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ছিলো পথপ্রাপ্তির বিশেষ পদ্ধতি। সে পদ্ধতিকে যারা মান্য করেছে,তারা লাভ করেছে আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষ। যারা মানেনি আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের ধ্বংসের নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করো।

মানুষের জন্যই আল্লাহ্তায়ালা এসবের স্পষ্ট বিবরণ দান করেছেন। যারা সাবধানী (মুত্তাকী) পথনির্দেশ কেবল তাদের জন্যই। এর মাধ্যমে কেবল তারাই উপকৃত হয়।

উহুদ যুদ্ধে বিপর্যস্ততার কারণে হীনবল এবং দুঃখিত হওয়া অনুচিত। তোমরা যেহেতু মুমিন তাই প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদেরই। বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার এই সান্ত্বনা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হচ্ছে পরবর্তীতে। আল্লাহ্তায়ালা জানিয়েছেন, হত্যাকারীদের হত্যাকান্ডের কারণে বিষন্নচিত্ত হয়োনা। প্রকৃত বিজয় তোমাদেরই। কারণ, এই বিপদগ্রস্ততার কারণে মুমিনদের জন্য রয়েছে সওয়াব। কাফেরদের জন্য কিছু নেই। কাফেরদেরকে যারা হত্যা করেছে তারা লাভ করবে জান্নাত এবং তোমাদেরকে যারা হত্যা করেছে তারা প্রবিষ্ট হবে দোজখে।

উহুদ যুদ্ধে হজরত হামজা এবং মোসয়াব সহ মুহাজিরদের পাঁচজন এবং আনসারদের সত্তর জন শহীদ হয়েছিলেন। উহুদের বিপদ সম্পর্কে অন্য আয়াতে

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'নিরুৎসাহিত হয়োনা, শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবণ করো। আঘাত কেবল তোমরাই পাওনি, আঘাত পেয়েছে তারাও। আল্লাহ্‌র সকাশে রয়েছে তোমাদের সওয়াব প্রাপ্তির আশা অথচ অবিশ্বাসীরা আশাহীন।' কালাবী বর্ণনা করেছেন, উহুদের বিপর্যস্ততার পর রসুল স. মুসলমানদেরকে দুশমনদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হুকুম দিয়েছিলেন। শ্রান্ত ও বিপর্যস্ত মুসলমান বাহিনীর নিকট এই হুকুম ছিলো কষ্টকর। তাদের এ অবস্থা দেখে আল্লাহ্‌তায়ালা সান্ত্বনা প্রদানার্থে এই আয়াত নাজিল করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, খালিদ বিন ওলীদ ছিলেন তখন শত্রুপক্ষে। তার বাহিনী অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে পাহাড়ে উঠে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিলো। হুজুর স. তখন দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! এরা যেনো আমাদের কাছে না আসতে পারে। তোমার শক্তি ব্যতীত আমরা শক্তিহীন। মুসলমান তীরন্দাজদের একটি দল তখন উঠে গেলো পাহাড়ে। সারা রাত তারা সেখানে কাটালো এবং তীর বর্ষণের মাধ্যমে ঠেকিয়ে রাখলো মুশরিক বাহিনীকে। পরে এই ব্যূহ ভেঙে পড়ায় মুসলমান বহিনী পর্যুদস্ত হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা তাই সান্ত্বনা জানিয়ে বলেছেন, তোমরা যেহেতু মুমিন তাই তোমরাই শ্রেষ্ঠ। আপাতবিপর্যস্ততার কারণে মনঃক্ষুন্ন হওয়া বা ভেঙে পড়া ইমানের অনুকূল আচরণ নয়।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪০

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ○

❑ যদি তোমাদের আঘাত লাগিয়া থাকে তবে অনুরূপ আঘাত উহাদেরও তো লাগিয়াছে। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলির পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই, যাহাতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণকে জানিতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হইতে কতককে সাক্ষী করিয়া রাখিতে পারেন এবং আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

'ক্বরহুন' এবং 'কুরহুন' শব্দ দু'টির অর্থ যথাক্রমে আঘাত এবং আঘাতের কষ্ট। এই কষ্ট কারো একচেটিয়া নয়। উহুদে যেমন মুসলমানেরা জখম হয়েছেন, তেমনি ইতোপূর্বে বদরে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলো কাফেরেরা। আল্লাহ্‌তায়ালা তাই

www.eelm.weebly.com

এখানে জানিয়েছেন বিজয় আবর্তিত হয়। কখনো বিজয় লাভ করে এই দল, কখনো ওই দল।

হজরত বারা বর্ণনা করেন, রসুল স. হজরত জোবায়ের বিন মুতইমের নেতৃত্বে পঞ্চাশজন তীরন্দাজের একটি বাহিনীকে গিরিপথে মোতায়েন করে নির্দেশ দিলেন, পুনঃর্নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেনো এই স্থান ত্যাগ না করে। বললেন, তোমরা যদি এরকম দেখো যে, পাখিরা আমাদের গোশ্‌ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, তবুও পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত স্থান ত্যাগ কোর না। আর যদি এরকম দেখো যে, আমরা শত্রুদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছি, তবুও পুনঃনির্দেশের অপেক্ষা কোর। বর্ণনাকারী বলেন, প্রথম দিকে রসুল স. শত্রুদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি নিজে দেখলাম, মহিলারাও কাপড় চোপড় গুটিয়ে নিয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করছে। এ সমস্ত দেখে তীরন্দাজ বাহিনী বলতে লাগলো, দেখো তোমাদের সাথীরা বিজয় লাভ করেছে। তবে আর অপেক্ষা কেনো? আবদুল্লাহ্‌ বিন জোবায়ের বললেন, তোমরা রসুল স. এর নির্দেশ বিস্মৃত হচ্ছো। লোকেরা বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এগিয়ে গিয়ে গণিমতের মাল সংগ্রহ করবো। একথা বলে তারা যখন নির্দেশিত স্থান ত্যাগ করলেন তখনই ঘুরে গেলো যুদ্ধের মোড়। গিরিপথ উন্মুক্ত পেয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালালো কাফের বাহিনী। মুসলমান বাহিনী হয়ে পড়লো ছত্রভঙ্গ। রসুল স. সকলকে সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন। তাঁর কাছে তখন উপস্থিত ছিলেন মাত্র বারোজন সাহাবী। কাফেরদের আক্রমনে শহীদ হন সত্তরজন। বদর যুদ্ধে মুশরিকদের সত্তরজন নিহত এবং সত্তরজন বন্দী হয়েছিলো। সেই প্রতিশোধ কার্যকর করে এই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি তিনবার উচ্চস্বরে ডেকে বললো, তোমাদের মধ্যে মোহাম্মদ এখনো বেঁচে আছে নাকি? রসুল স. এর নির্দেশে সকলেই নিরুত্তর রইলেন। আবু সুফিয়ান পুনরায় তিনবার চিৎকার করে বললো, আবু কোহাফার ছেলে (হজরত আবু বকর) আছো নাকি? সবাই নিরুত্তর রইলেন। আবু সুফিয়ান পুনরায় চিৎকার করে বললো, খাত্তাবের পুত্র (হজরত ওমর) আছো নাকি? এবারও সে কোনো জবাব না পেয়ে তার সাথীদেরকে বলতে লাগলো, নেই। সব মরে গিয়েছে। হজরত ওমর আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন, হে আল্লাহ্‌র দুশমন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি মিথ্যাবাদী। আমরা সবাই এখনো জীবিত। তোমার দুঃখের কাঁটা এখনো অটুট। আবু সুফিয়ান বললো, বদরের প্রতিশোধ দেয়া হলো। যুদ্ধ চড়ক গাছের দোলনার মতো উঁচু নিচুতে এবং নিচু উঁচুতে উঠে যায়। তোমাদের কিছু লোকের নাক, কান অথবা অন্য কোনো অঙ্গ কর্তিত হয়েছে। আমি অবশ্য এর হুকুম দেইনি। তবে একে মন্দও মনে করিনা। এরপর কাফের সেনারা সমস্বরে গেয়ে উঠলো, জয় হোবলের জয়! তাদের কল্পিত এই হোবল দেবতার

www.eelm.weebly.com

উপাসনাকারী ছিলো তারা। রসুল স. বললেন, তোমরা উত্তর দাও। তাঁরা আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা কী বলবো? তিনি স. বললেন, বলো আল্লাহ্ সর্বোচ্চ এবং সম্মানার্হ। আবু সুফিয়ান বললো, আমাদের উজ্জা আছে তোমাদের নেই (উজ্জা কাফেরদের একটি কল্পিত দেবী — রমণীমূর্তি)।

রসুল স. এরশাদ করলেন, তোমরা নিরুত্তর কেনো? সাহাবীগণ আরজ করলেন, আমরা কী বলবো? রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ আমাদের মাওলা। তোমাদের কোনো মাওলা নেই।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু সুফিয়ান হজরত ওমরকে বললো, নির্ভয়ে এগিয়ে এসো। রসুল স. বললেন, এগিয়ে যাও। দেখো সে কী বলে। হজরত ওমর এগিয়ে গেলেন। আবু সুফিয়ান বললো, আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি; বল আমরা কি মোহাম্মদকে হত্যা করেছি? তুমি আমার দৃষ্টিতে ইবনে কামিয়া অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী ও সত্য কসমকারী। ইবনে কামিয়া কোরাইশদেরকে বলেছে যে, সে নাকি মোহাম্মদকে হত্যা করেছে? হজরত ওমরকে নিরুত্তর দেখে আবু সুফিয়ান পুনরায় বললো, এক বছর পর ছোট বদরে আবার তোমাদের সাথে মোকাবেলা হবে। রসুল স. বললেন, বলে দাও। আমরাও রাজি। আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলো।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, আবু সুফিয়ান বললো, দিন আবর্তিত হয়। যুদ্ধ চড়ক গাছের দোলনার মতো পালাক্রমে উঁচু নিচু হয়। হজরত ওমর বললেন, তোমাদের ও আমাদের অবস্থা একরকম নয়। আমাদের নিহত ব্যক্তিরা প্রবেশ করবেন বেহেশতে। আর তোমাদের নিহত ব্যক্তিরা অবস্থান করবে দোজখে।

জুযাজ বলেন, মুসলমানরাই বিজয়ী। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, আমাদের সৈন্যরাই বিজয় লাভ করবে। উহুদের সময় পরাজয়ের কারণ এই ছিলো যে, মুসলমানদের তীরন্দাজ বাহিনী রসুল পাক স. এর নির্দেশ পালনে ব্যত্যয় ঘটিয়েছিলো।

যুদ্ধের জয় পরাজয়, উত্থান পতনের হিকমত এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা এর মাধ্যমে এই বিষয়টি স্পষ্ট করেন যে, বিশ্বাসীরা বিপদে ধৈর্যশীল থাকেন এবং ইমানে প্রতিষ্ঠিত থেকে সম্মানার্হ হতে পারেন। কালের জয় পরাজয় একথাই প্রমাণ করে যে, সৃষ্টি ও ধ্বংস আল্লাহ্‌তায়ালার নির্ধারিত বিধান। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় কে সাচ্চা ইমানদার। অবশ্যই আল্লাহ্‌তায়ালা আদি অন্তের সমস্ত কিছু জানেন। কিন্তু পুরস্কার ও তিরস্কারের উপযোগী হতে হলে বাস্তব পৃথিবীতে তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তাই এই উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়।

www.eelm.weebly.com

উহুদের শহীদগণ বিপর্যস্ততার কারণে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা লাভ করেছেন। অন্যান্যরাও তাদের এই আত্মদানের জ্বলন্ত সাক্ষী। এই সাক্ষ্যদাতাদেরকে স্পষ্ট করাও ছিলো আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রেত।

ইবনে আবী হাতেম হজরত ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন মদীনার রমনীকুল দীর্ঘ অপেক্ষার পর যুদ্ধের সংবাদ না পেয়ে উহুদের পথে এগিয়ে গেলেন। উষ্ট্রারোহী দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, রসুল পাক স.কেমন আছেন? আরোহীদ্বয় বললেন, জীবিত আছেন। এক রমনী বললেন, এখন আমরা আর কোনো কিছুর পরোয়া করি না। আল্লাহ্ আমাদের কিছুসংখ্যক লোককে শহীদ করে দিলেও আর কোনো চিন্তা আমাদের নেই। ওই রমনীটির উক্তি লক্ষ্য করে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

অবিশ্বাসী কাফের ও মুনাফিক সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌তায়ালা পছন্দ করেন না। কিন্তু কখনো তাদেরকে বিজয় দান করেন — এটা তাদের জন্য অবকাশ (গোনাহ্ বৃদ্ধি অথবা তওবার সুযোগ দানার্থে) এবং মুসলমানদের জন্য পরীক্ষা।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪১, ১৪২

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

❒ এবং যাহাতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণকে পরিশোধন করিতে পারেন এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারেন।

❒ তোমরা কি মনে কর যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যখন আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করিয়াছে এবং কে ধৈর্যশীল তাহা এখনও জানেন না?'

যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকে পরিশুদ্ধ করা এবং অবিশ্বাসীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়াই আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্য। অবিশ্বাসীদেরকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে পরীক্ষা করা, শহীদ হওয়ার সুযোগ প্রদান এবং গোনাহ্ থেকে পাক পবিত্র করা। আর বিশ্বাসীদেরকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্য কাফেরদেরকে ধ্বংস করা এবং তাদের নিদর্শন সমূহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্তায়ালা মুসলমানদেরকে জানাচ্ছেন, জেহাদ না করলে, জেহাদের বিভীষিকায় ধৈর্যশীল বলে পরীক্ষিত না হলে কী করে তোমরা অধিকার করবে জান্নাত। আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞানে যা রয়েছে,তা বাস্তব পৃথিবীতে স্পষ্ট হলেই কেবল জান্নাতের অধিকার লাভ করা যায়। ইবনে আবী হাতেম, আওফার মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এরকম — বদর যুদ্ধে শহীদদের মর্যাদা অবহিতির পর সাহাবীগণ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যদি আমরা সুযোগ পেতাম তবে আমরাও শাহাদাত বরণ করে সৌভাগ্যশালী হতে পারতাম এবং শহীদের দলভুক্ত হয়ে জান্নাতের পবিত্র রিজিকের অধিকারী হতে পারতাম। কিন্তু উহুদে যখন পরীক্ষা করা হলো, তখন আল্লাহ্ যাদেরকে চেয়েছিলেন তারা ব্যতীত অন্য কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকতে পারেনি। একথাই আল্লাহ্তায়ালা উল্লেখ করেছেন নিম্নের আয়াতে।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪৩

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ○

❑ মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা উহা কামনা করিতে, এখন তোমরা তো তাহা চোখে দেখিলে?

স্নেহসিক্ত ভর্ৎসনার মাধ্যমে বলা হচ্ছে, তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতে দেখেছো। অভিলাষ প্রকাশ করেছো সুযোগ পেলে তোমরাও ওই মর্যাদায় ভূষিত হতে চাও। কিন্তু তোমাদের আচরণ ছিলো তোমাদের অভিলাষবিরুদ্ধ। তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে অচঞ্চল থাকতে পারোনি। সরে এসেছো। বিজয় যেমন কাফেরদের একমাত্র ইচ্ছা হয়ে থাকে তেমনি মুসলমানদের একান্ত কামনা শাহাদাতই হওয়া উচিত।

ইবনে আবী হাতেমও রবী'র উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন এরকম, কাফেরদের অতর্কিত আক্রমণের মুখে মুসলমানেরা যখন রসুল স. এর নিরাপত্তাচিন্তায় চঞ্চল হয়ে পড়লেন, তখন কেউ কেউ বললো, তিনি তো শহীদ হয়ে গিয়েছেন। কেউ কেউ বললো, তিনি নবী হলে নিহত হতেন না। আবার কেউ বললো, যে কাজের জন্য নবী স. জেহাদ করছেন, তোমরাও সেই কাজের জন্য জেহাদ করতে থাকো আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন, অথবা তোমরা রসুল পাক স. এর সঙ্গে মিলিত হবে।

www.eelm.weebly.com

ইবনে মুনজির, হজরত ওমরের উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন এরকমভাবে — উহুদ যুদ্ধে আমরা রসুল পাক স. এর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। আমি একটি পাহাড়ে উঠে গিয়ে এক ইহুদীকে বলতে শুনলাম, মোহাম্মদ নিহত হয়েছেন। আমি বললাম, একথা যে বলবে আমি তার শিরোশ্ছেদ করবো। এমন সময় আমি দেখলাম, রসুল স. কয়েকজনকে সঙ্গে করে ফিরে আসছেন।

বায়হাকী তাঁর দালায়েলে আবু নাযীহ্'র বর্ণনা থেকে লিখেছেন, এক মোহাজির কোনো এক আহত আনসারের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আনসার সাহাবী রক্তসাগরে যেনো হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। মোহাজের সাহাবী তাঁকে বললেন, এবিষয়ে কি তুমি নিশ্চিত যে, মোহাম্মদ স. শহীদ হয়েছেন? তিনি উত্তর দিলেন, মোহম্মদ স. তোমাদেরকে আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি শহীদ হলে হয়েছেন। তোমরা তোমাদের দ্বীনের পক্ষ থেকে জেহাদ চালিয়ে যাও।

জ্ঞাতব্য ঃ বোখারী হজরত ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, (ইন্তেকালের পর) রসুলে পাক স. এর গৃহ থেকে বের হয়ে হজরত আবু বকর দেখলেন হজরত ওমর মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। হজরত আবু বকর বললেন, ওমর বসে যাও। অতঃপর বললেন, যারা মোহাম্মদ স. এর পূজারী তারা জেনে নিক তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহ্তায়ালার ইবাদত করে, তারা শুনে নাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ চিরঞ্জীব। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'অমা মোহাম্মাদুন ইল্লা রসুল .... শাকিরিন।' বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্র কসম ! আমাদের মনে হচ্ছিলো হজরত আবু বকরের তেলাওয়াতের পূর্বে যেনো এই আয়াত নাজিলই হয়নি। তাঁর তেলাওয়াতের পর সকলেই এই আয়াত তেলাওয়াত শুরু করে দিলেন। তেলাওয়াত করছেন না এমন কাউকেই পেলাম না।

হজরত আবু হোরায়রা এবং ওরওয়া বলেছেন, তাঁর খেলাফত কালে জাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে হজরত আবুবকর বলেছিলেন, জাকাত হিসাবে প্রাপ্য উটের পা বাঁধার রশিও যদি কেউ দিতে অস্বীকার করে, তবে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করবো। অতঃপর তিনি 'অমা মোহাম্মাদুন ইল্লা রসুল' এই আয়াত শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করেছিলেন। নিম্নে রয়েছে এই আয়াতের পূর্ণ উদ্ধৃতি।

www.eelm.weebly.com

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ اَفَاْئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ○

❑ মুহাম্মদ রসুল ব্যতীত কিছু নয়; তাহার পূর্বে বহু রসুল গত হইয়াছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে নিহত হয় তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে? এবং কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে কখনও আল্লাহের ক্ষতি করিবে না এবং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করিবেন।

কামুস গ্রন্থে হজরত মোহাম্মদ স. এর হামদ ও তাহমীদ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, হামদ অর্থ কৃতজ্ঞতা, সন্তুষ্টি, প্রতিদান এবং হক আদায় করা এবং তাহমীদ অর্থ সর্বক্ষণ প্রশংসা করা। চূড়ান্ত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মোহাম্মদ স. এমন ব্যক্তিত্ব, সর্বক্ষণ যাঁর প্রশংসা করা যায়। আমি বলি, মোহাম্মদ স. ওই মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর গুণগান সর্ব অবস্থায়, সকল সময়ে চূড়ান্তভাবে করা যায়। ইমাম বাগবী লিখেছেন, মোহাম্মদ স. তিনি, যিনি সকল প্রশংসাকে সম্মিলিত করেছেন। ওই ব্যক্তিত্বই প্রশংসার উপযুক্ত যিনি পূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী। আর তাহ্মীদের মর্যাদা হামদ অপেক্ষা অধিকতর। অধিক বর্ণবিশিষ্ট শব্দ অধিক অর্থবোধক, তাই ওই ব্যক্তি তাহমীদের উপযুক্ত, যিনি চূড়ান্ত সীমার পূর্ণত্বকে বেষ্টন করে আছেন। হাসান বিন সাবেত বলেছেন, তোমরা কি জানো না, আল্লাহ্ তাঁর আপনতম বান্দাকে তাঁর নিজস্ব দলিল (কোরআন) দিয়ে প্রেরণ করেছেন? সর্বোচ্চ মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্তায়ালারই। তিনি সম্মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের নাম থেকে তাঁর আপনতম বান্দার নাম সংকলিত করেছেন। অতএব, আরশের মালিক প্রশংসিত এবং তাঁর প্রশংসাধন্য মোহাম্মদ স. ও প্রশংসিত। ইতোপূর্বে আবির্ভূত নবী ও রসুলগণ সকলেই ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রণীত দ্বীন ছিলো প্রবহমান। তাই আল্লাহ্তায়ালা এখানে প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন এইভাবে, মোহাম্মদ স.ও একজন রসুল। তিনি ইন্তেকাল করলে তোমরা কি তাঁর প্রতিষ্ঠিত দ্বীন থেকে সরে পড়বে? এরপর সকলকে সতর্ক করা হয়েছে একথা বলে যে, দ্বীন থেকে সরে পড়লে আল্লাহ্র কোনো ক্ষতি নেই। কারণ আল্লাহ্ মুখাপেক্ষিতারহিত। যাঁরা দ্বীনে অটল, অবিচল, তাঁরাই কৃতজ্ঞচিত্ত। আর কৃতজ্ঞচিত্তদের জন্য রয়েছে পুরস্কার যা তারা অচিরেই লাভ করবে।

www.eelm.weebly.com

হজরত আলী বলেছেন, শাকিরিন অর্থাৎ 'কৃতজ্ঞচিত্ত' তাঁরাই, যাঁরা দ্বীনের উপর অনড়তাসহ দন্ডায়মান, যেমন দণ্ডায়মান ছিলেন হজরত আবু বকর। হজরত আলী আরো বলেছেন, হজরত আবু বকর শাকিরিনদের সরদার।

উহুদ যুদ্ধের কাহিনী ঃ রসুলে পাক স. সাতশত সৈন্য সহ উহুদ প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। মুসলমান বাহিনীর বাম পাশের একটি গিরিপথ রক্ষা করতে নিযুক্ত হলো পঞ্চাশ জনের একটি তীরন্দাজ বাহিনী। তাঁদের নেতা ছিলেন আবদুল্লাহ্ বিন জোবায়ের। শত্রু সৈন্য এগিয়ে আসতে লাগলো। তাদের অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতা ছিলো খালেদ বিন ওলীদ। পশ্চাদবর্তী বাহিনীর নেতা ছিলো ইকরামা বিন আবু জাহেল। কাফের বাহিনীর সঙ্গে অনেক মহিলাও এসেছিলো। তারা দফ বাজিয়ে কবিতা আবৃত্তি করে সৈন্যদেরকে উত্তেজিত করতে লাগলো। যুদ্ধ শুরু হলো। রসুল স. একটি তলোয়ার হাতে নিয়ে বললেন, এই তলোয়ারের হক আদায় করবে কে? শত্রুদেরকে হত্যা করে রক্ত প্রবাহিত করবে কে? আবু দাজানা বিন সিমাক বিন হারসা আনসারী তলোয়ারটি গ্রহণ করলেন এবং লাল পাগড়ী মাথায় বেঁধে তলোয়ার হাতে নিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। রসুল স. বললেন, এরকম বীরত্বব্যাঞ্জক পদবিক্ষেপই আল্লাহ্র পছন্দ। ক্ষিপ্রগতিতে মুসলমান বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো কাফের বাহিনীর উপর। তারা পিছু হটতে লাগলো। কেউ কেউ নিহত হলো। বাঁ পাশের গিরিপথ বেয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলো কাফেরদের অশ্বারোহী দল। কিন্তু মুসলমানদের তীব্র তীর বর্ষণের মুখে তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো। হজরত আলী এগিয়ে গিয়ে মুশরিকদের ঝান্ডাবাহী তালহা বিন তালহাকে হত্যা করলেন। মুসলমানদের আল্লাহু আকবর রণধ্বনিতে প্রকম্পিত হলো আকাশ। কাফেরেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। হজরত জোবায়ের বিন আওয়াম বলেছেন, আমি দেখলাম হিন্দা এবং তার সঙ্গিনীরা দ্রুতবেগে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে আমি বন্দী করতে পারতাম। কাফের বাহিনীর ছত্রভঙ্গ অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে উঠলেন মুসলমান তীরন্দাজ বাহিনী। গণিমতের মাল সংগ্রহের জন্য তারা তাদের অবস্থান ত্যাগ করতে লাগলেন। তাদের নেতা আবদুল্লাহ্ বিন জোবায়ের তাদেরকে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। জেগে উঠেছে লুণ্ঠনের লোভ। মাত্র জনাদশেক তীরন্দাজ রইলেন হজরত জোবায়েরের সঙ্গে। দূর থেকে সব কিছু লক্ষ্য করলো খালেদ বিন ওলীদ। সে কাফের অশ্বারোহীদেরকে একত্র করে পিছন দিক থেকে মুসলমান বাহিনীকে আক্রমণ করলো। মুসলমানদের ব্যূহ ভেঙে পড়লো। অনেকে শহীদ হলেন। স্বস্থানে থেকে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন আবদুল্লাহ্ বিন জোবায়ের। কাফেররা তাঁকে নির্বস্ত্র করলো। নাক, কান ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেললো। ওদিকে মুসলমানদের কেউ কেউ

www.eelm.weebly.com

তখনও লুণ্ঠনরত। খালেদ বিন অলীদ রসুলুল্লাহ্ স. কে বেষ্টনকারী বাহিনীকে আক্রমণ করলো। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন তাঁরা। কেউ কেউ শহীদ হলেন। গণিমতের মাল এবং বন্দী সবকিছুই হাতছাড়া হয়ে গেলো মুসলমানদের। দিনের প্রথমাংশে যদিও ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিলো কিন্তু শেষাংশে পশ্চাদাপসরণে বাধ্য হলেন মুসলমানেরা। ত্রিধাবিভক্ত অবস্থা তখন মুসলমান বাহিনীর। কেউ শহীদ। কেউ আহত। আবার কেউ পশ্চাদাপসরণ করে আত্মরক্ষায় রত।

ইমাম বায়হাকী হজরত মেকদাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এভাবে, ওই পবিত্র সত্তার শপথ! যিনি রসুল স. কে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন। তিনি স. তাঁর আপন অবস্থানে অটল ছিলেন। একটুও হটেন নি। অতিসত্বর সাহাবীদের একটি ক্ষুদ্র দল তাঁর নিকটে এসে একত্রিত হলেন। তাঁরা ছিলেন পনের জন মাত্র। মুহাজিরদের আটজন — হজরত আবুবকর, ওমর, আলী, তালহা, জোবায়ের, আব্দুর রহমান বিন আউফ, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং আবু উবাদা বিন জাররাহ্ (রাদিআল্লাহু আনহুম)। সাতজন আনসারী সাহাবী ছিলেন — হাব্বাব বিন মুনজার, আবু দাজানা, আসেম বিন সাবেত, হারেস বিন সুময়া, সহল বিন হানীফ, মোহাম্মদ বিন মুসলিমা এবং সা'দ বিন মুআজ (রাদিআল্লাহু আনহুম)। কোনো কোনো বর্ণনায় সা'দ বিন মুআজের স্থলে সা'দ বিন উবাদার কথা বলা হয়েছে। কাফেরদের পক্ষ থেকে প্রচন্ড আক্রমণ এসে পড়লো এই ক্ষুদ্র বাহিনীটির উপর। দিশাহারা অবস্থা সকলের। কিন্তু নিঃশংকচিত্ত রসুলে পাক স. সহজ সাহসিকতার সঙ্গে কখনো তীর নিক্ষেপ করছেন, কখনো নিক্ষেপ করছেন পাথর।

আব্দুর রাজ্জাক, জুহুরীর মুরসাল বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এরকম, রসুল স. সতেরটি আঘাত পেলেন। ওতবা বিন ওয়াক্কাস রসুল স. এর প্রতি চারটি প্রস্তর নিক্ষেপ করেছিলো। প্রস্তরাঘাতে রসুল স. এর সামনের নিচের মাড়ির রুবাইয়া নামক দাঁতটি ভেঙে গেলো। জখম হয়ে গেলো নিম্নের ওষ্ঠাধার। হাফেজ বলেছেন, ওই পবিত্র দাঁতটি ছিলো কেটে নেওয়া ও চিবানোর দাঁতের মধ্যবর্তী একটি দাঁত। হাতেব বিন বোলতা বলেছেন, আমি ওতবাকে হত্যা করেছি এবং তার দেহচ্ছিন্ন মস্তক রসুল স. এর খেদমতে হাজির করে দিয়েছি। রসুল স. আমার এই খেদমতে আনন্দিত হয়েছিলেন এবং আমার জন্য দোয়া করেছিলেন। হাকেম।

আবদুল্লাহ্ বিন শিহাব জহুরীর নিক্ষেপিত পাথর গিয়ে পড়লো রসুল স. এর পবিত্র মস্তকে। তাঁর পবিত্র মস্তক এবং পবিত্র শ্মশ্রু রক্তরঞ্জিত হলো। এই পাথর নিক্ষেপকারী অবশ্য পরে মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আবদুল্লাহ্ বিন কামিয়া পাথর ছুঁড়ে রসুল স. এর গন্ডদেশ জখম করে দিলো। লৌহশিরস্ত্রানের দু'টি কড়া তাঁর গন্ডদেশে বিদ্ধ হলো। সে হত্যা করতে উদ্যত হলো রসুল স. কে। বাধা হয়ে দাঁড়ালেন সাহাবী মুসায়াব বিন উমায়ের। তিনি ছিলেন রসুল স. এর

www.eelm.weebly.com

পতাকাধারী। ইবনে কামিয়া তাঁকে শহীদ করে দিলো। সে ভেবেছিলো রসুল স.ই শহীদ হয়েছেন। সে তৎক্ষণাৎ তার বাহিনীতে ফিরে গিয়ে বললো, আমি মোহাম্মদকে হত্যা করেছি। কে যেনো তখন চিৎকার করে বলতে লাগলো, মোহাম্মদ স. কে মেরে ফেলা হয়েছে। এই চিৎকার ছিলো ইবলিসের। তিবরানী, হজরত আবু উমামার মাধ্যমে লিখেছেন, রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ ইবনে কামিয়ার মূলোচ্ছেদ করুন। বদদোয়ার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হলো। আল্লাহ্ একটি পাহাড়ী বকরীকে তার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিলেন। সেই বকরী শিং দ্বারা আঘাত করতে করতে তাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিলো। রসুল স. অবস্থান বদল করে প্রশস্ত স্থানে যেতে চাইলেন। দু'টি রণবস্ত্র পরিহিত ছিলেন তিনি। তাই সহজে উঠতে পারছিলেন না। হজরত তালহা তাঁকে উঠিয়ে নিলেন এবং প্রশস্ত একটি স্থানে পৌছলেন। রসুল স. বললেন, তালহা নিজের জন্য জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিয়েছে।

ওদিকে কাফের বাহিনীতে আনন্দের হিল্লোল। হিন্দা ও তার সঙ্গিনীরা শহীদগণের নাক ও কান কেটে নিলো। সেসব দিয়ে হিন্দা তৈরী করলো হার। হজরত হামজার কলিজা বের করে চিবাতে লাগলো সে। এদিকে রসুল স. ডাক দিলেন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! উঠে এসো। তাঁর ডাক শুনে সেখানে তিরিশজন এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, আমাদের উপরে আঘাত এসে পড়ুক। আপনি নিরাপদে থাকুন। শান্তিতে থাকুন। কাফেরদের উপুর্যপরি আক্রমণ প্রতিহত করলেন সকলে মিলে। তুখোড় তীরন্দাজ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস এতো অধিক তীর নিক্ষেপ করলেন যে, একে একে ছয়টি ধনুক ভেঙে গেলো। তীরাধার থেকে তীর বের করে দিচ্ছিলেন রসুল পাক স. স্বয়ং। তিনি বললেন, নিক্ষেপ করো। তোমার উপর কোরবান হোক আমার মাতা পিতা। বোখারী।

তীর নিক্ষেপে হজরত আবু তালহা ছিলেন অত্যন্ত ক্ষিপ্র। তিনিও দুই তিনটি ধনুক ভেঙে ফেললেন। তীরবাহী কাউকে দেখলে তিনি ক্রমাগত বলে যাচ্ছিলেন, আবু তালহার জন্য তীর বের করে দাও। তাঁর তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যস্থল বারবার দেখছিলেন রসুল স.। অতি দ্রুত তীর বর্ষণ করছিলেন তিনি। এক সময় তাঁর তীর শেষ হয়ে গেলো। আবু দাউদ তায়ালুসি এবং ইবনে হাব্বান, হজরত আয়েশার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকর বলেছেন, ওই সময়ে তালহার কারণেই হেফাজতে ছিলেন রসুলে পাক স.। মোহাম্মদ বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, হঠাৎ হজরত তালহা মাথায় আঘাত পেলেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। হজরত আবু বকর পানি ছিটিয়ে দিলেন। সংজ্ঞা ফিরে আসতেই হজরত তালহা উদ্বেগাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, রসুলে পাক স. এর কী হয়েছে? হজরত আবু বকর বললেন, ভালো আছেন। হজরত তালহা বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

আমাকে রসুল স. এর সকাশে হাজির করা হোক। আল্লাহ্তায়ালার অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমি দেখলাম যুদ্ধের বিভীষিকা তখন স্তিমিতপ্রায়। হজরত কাতাদা বিন নোমানের চোখে আঘাত লেগেছিলো। একটি চোখ নেমে এসেছিলো গন্ডদেশের উপর। রসুল স. তাঁর পবিত্র হাতে চোখটিকে যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন। ফলে এমন অবস্থা হলো যেনো তার চোখে কিছুই হয়নি।

যুদ্ধের প্রান্তর থেকে ফিরে আসছিলেন রসুল স.। পথে দেখা হলো উবাই বিন খালফ্ জামাহীর সাথে। সে বললো, আমার হাত থেকে বেঁচে যেতে পারলে আল্লাহ্ যেনো আমাকে না বাঁচায় (এখন আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করবো)। সঙ্গী সাহাবীগণ আরজ করলেন, আমরা কি প্রতিশোধ গ্রহণ করবো (তাকে হত্যা করবো)? রসুল স. বললেন, না। থাক। উবাই নিকটতর হয়ে বললো, আমার একটি কালো রং এর মাদি ঘোড়া আছে তাকে আমি প্রতিদিন একপাত্র যব খাওয়াই। ওই ঘোড়ায় চড়ে আমি তোমাকে হত্যা করবো। রসুল স. বললেন, পারবে না। বরং আমিই তোমাকে হত্যা করবো। রসুল স. হারেস বিন সামাহ'র নিকট থেকে একটি বল্লম নিয়ে উবাই এর স্কন্ধে আঘাত করলেন। উবাই ঘোড়া থেকে পড়ে গেলো এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো ছটফট করতে করতে বললো, মোহাম্মদ আমাকে মেরে ফেললো ! তার সঙ্গীরা বললো, ঘাবড়াচ্ছো কেনো আঘাত তো অতি সামান্য? সে বললো, তোমরা জানো না (মোহাম্মদের কোপানল কতো ভয়াবহ)। এ আঘাত রবিয়া এবং মোজার গোত্রের উপর আপতিত হলে তাদের জনপদের সমস্ত মানুষই মরে যেতো। আমি তোমাকে হত্যা করবো, এরকম কথাতো কেউ কোনোদিন আমাকে বলেনি। এরপর বেশী সময় অতিবাহিত হয়নি। যন্ত্রনাদগ্ধ উবাই সেরফ নামক স্থানে পৌঁছেই মরে গেলো।

বোখারী, হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এরকম, যাকে নবী পাক স. হত্যা করেছেন এবং যে ব্যক্তি রসুল স. এর পবিত্র অবয়ব রক্তাক্ত করে দিয়েছিলো, তাদের উপর আপতিত হয়েছে আল্লাহ্র কঠিনতম গজব।

ইতিহাসবেত্তাগণ লিখেছেন, রসুল স. এর শহীদ হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই হতবিহ্বল হয়ে গেলেন মুসলমানেরা। কেউ কেউ বললেন, চলো আবদুল্লাহ্ বিন উবাই এর নিকটে যাই। সে আমাদের জন্য আবু সুফিয়ানের নিকট থেকে নিরাপত্তা লাভের ব্যবস্থা করে দিবে। কেউ কেউ হতবাক হয়ে বসে রইলেন। মুনাফিকেরা বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদ নিহত হলে তোমরা বসে থাকবে কেনো? আগের ধর্মেই ফিরে যাও। হজরত আনাস বিন মালেকের চাচা হজরত আনাস বিন নজর বললেন, শোনো সকলে! রসুলুল্লাহ শহীদ হয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিপালক তো চিরঞ্জীব। আল্লাহ্র রসুলই যদি শহীদ হয়ে যান, তবে তোমরা আর বেঁচে আছো কেনো? যে উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধ করেছেন, তোমরাও

www.eelm.weebly.com

সেই উদ্দেশ্যে যুদ্ধে রত হও। যে উদ্দেশ্যে শহীদ হয়েছেন তিনি, তোমরাও সে উদ্দেশ্যে পান করো শাহাদাতের শরাব। তিনি আরও বললেন, হে আমার আল্লাহ্! আমার ভ্রাতৃবৃন্দের অক্ষমতা স্বীকার করছি আমি। আর মুনাফিকদের বাক্যাবলীর প্রতি প্রকাশ করছি আমাদের অসন্তোষ, এই বলে সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। তারপর অসমসাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। রসুল স. একটি প্রশস্ত প্রস্তর প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সবাইকে আহবান করছিলেন। সর্বপ্রথম হজরত কাব বিন মালেক তাঁকে চিনে ফেললেন। তিনি বলেছেন, আমি রসুল স. কে চিনতে পেরেই উচ্চ স্বরে ঘোষণা করলাম, হে মুসলিম বাহিনী। সুসংবাদ শ্রবণ করো! এই যে এখানে । রসুল স. ইঙ্গিতে বলেলেন, নীরব থাকো। সাহাবায়ে কেরাম একে একে রসুল স. এর নিকট জমায়েত হতে লাগলেন। পশ্চাদাপসরণের কারণে তিনি মৃদু ভর্ৎসনা করলেন সকলকে। তাঁরা আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল। আমাদের জনক-জননী আপনারই উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। আমরা সংবাদ পেয়েছিলাম আপনি শাহাদাৎ বরণ করেছেন। এই মর্মন্তুদ সংবাদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম আমরা। তাই পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে। আপনার শাহাদাতের সংবাদই আমাদেরকে উদ্দীপনারহিত করে দিয়েছে, এরপর নাজিল হলো - 'ওয়া মা মোহাম্মাদুন ইল্লা রসূল... ।'

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪৫, ১৪৬

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ○ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِىٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ○

❒ আল্লাহের অনুমতি ব্যতীত কাহারও মৃত্যু হইতে পারে না, যেহেতু উহার মিয়াদ অবধারিত। কেহ পার্থিব পুরস্কার চাহিলে আমি তাহাকে তাহার কিছু দেই এবং কেহ পারলৌকিক পুরস্কার চাহিলে আমি তাহাকে তাহার কিছু দেই এবং শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করিব।

www.eelm.weebly.com

❒ এবং কত নবী যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের সাথে বহু রব্বানী ছিল। আল্লাহের পথে তাহাদের যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহাতে তাহারা হীনবল হয় নাই, দুর্বল হয় নাই এবং নত হয় নাই। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদিগকে ভালবাসেন।

উৎসাহব্যঞ্জকতাশোভিত এই আয়াতে মুসলমানদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মৃত্যু অবধারিত এবং তা সঠিক সময়েই এসে পড়বে। এক মুহূর্ত আগেও নয়, পরেও নয়। গনিমতের মালের প্রতি ধাবিত হওয়ার ইঙ্গিত করে বলা হচ্ছে, পৃথিবীকামীদেরকে পৃথিবী-ই যৎকিঞ্চিত দেয়া হয়। আর আখেরাতকামীদের দেয়া হয় আখেরাত। আর যাঁরা কৃতজ্ঞ ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ তাদের জন্য রয়েছে প্রকৃত বিনিময়। আমি বলি, এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, যাঁরা কৃতজ্ঞ তাঁদেরকে দুনিয়া কিংবা আখেরাত নয়, অন্য কোনো মহামর্যাদামন্ডিত বিনিময় প্রদান করা হবে যার সম্যক পরিচয় জ্ঞান দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। এই বিনিময় আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং। এই বিনিময় ধারণাতীত।

জ্ঞাতব্য ঃ কৃতজ্ঞদের মনোভঙ্গি হতে হবে এরকম — 'তোমাকে যে চিনতে পেরেছে সে তাঁর জীবন, পরিবার পরিজন, বংশমর্যাদা, কোনো কিছুই ভ্রুক্ষেপ করে না। প্রেমোন্মাদনায় পূর্ণনিমজ্জিত করার পর তুমি তাকে দান করো উভয় কাল — পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী। তোমার প্রেমবিভোরতাই উভয় জগতের সফলতা।

কামুস গ্রন্থে বলা হয়েছে, কৃতজ্ঞতা (শোকর) অর্থ অনুগ্রহরাজী সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ। হজরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, আখেরাত অর্জনই যাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহ্ তাঁর অন্তরকে দুনিয়া অন্বেষণ থেকে অমুখাপেক্ষি করে দেন। তাঁর উদ্বিগ্নতাকে অপসারিত করেন। দুনিয়া নত হয়ে যায় তাঁর কাছে। আর যার উদ্দেশ্য হয় কেবল দুনিয়া অন্বেষণ, আল্লাহ্ তাঁর সামনে উপস্থাপন করেন অসহায়তা ও উদ্বিগ্নতা। তার দুনিয়ার অর্জন অতি ন্যূন। আল্লাহ্তায়ালা তার জন্য এই ন্যূনতাকেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইমাম বাগবী।

হজরত ওমর বিন খাত্তাব বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমল নিয়তের প্রতি নির্ভরশীল। মানুষ যে রকম নিয়ত করে, সে রকমই পায়। কাজেই যাঁর হিজরত হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দিকে, সে তাঁর আল্লাহ্ ও রসুলের বলেই গণ্য হবে। আর যার হিজরতের উদ্দেশ্য থাকবে দুনিয়া লাভ কিংবা কোনো রমণীকে বিবাহ করা, সে হবে সেই দিকেরই। বোখারী ও মুসলিম।

পূর্বের অনেক নবী যুদ্ধ করেছেন। তাঁদের সাথী ছিলেন বহুসংখ্যক আল্লাহ্প্রেমিক (রব্বানীগণ)। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, রব্বানীগণ অর্থ অসংখ্য সাহায্যকারী। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

হাজার হাজার সাহায্যকারী। কালাবী বলেছেন, দশহাজার সহায়তাকারী। হাসান বসরী বলেছেন, ফকীহ্ ও আলেম সম্প্রদায়। কেউ কেউ বলেছেন অনুসরণকারীগণ। এরকমও বলা হয়েছে যে, রব্বানী অর্থ আল্লাহ্তায়ালার অনুগত বান্দা বা আল্লাহ্র উপাসনাকারী।

নবী ও তাঁদের সাথী রব্বানীগন বিপর্যয়ের মুখে কখনো হীনবল হননি। হতোদ্যম হননি। নতি স্বীকারও করেননি। এরকম যাঁরা, আল্লাহ্ তাঁদেরকেই ভালোবাসেন। কারণ তাঁরা ধীর, ধৈর্য্যশীল।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪৭, ১৪৮

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ ○ فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ع

❒ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে-সীমালংঘন তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর ইহা ব্যতীত তাহাদের আর কোন কথা ছিল না।

❒ অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে পার্থিব পুরস্কার এবং উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করেন। আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

নবী ও তাঁদের রব্বানী সাথীগণ চরম বিপর্যস্ততার সময় ক্ষমাপ্রার্থী হতেন। বলতেন, হে আমাদের আল্লাহ্! আমাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল গোনাহ্ ক্ষমা করো। আমাদেরকে সরল পথে অধিষ্ঠিত রাখো এবং দান করো যুদ্ধাবস্থানের দৃঢ়তা। কাফেরদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দান করো বিজয়ের। বিজয়ী হওয়ার এই প্রার্থনা বিশ্বাসীদেরকে জানাতেই হয়। কারণ, তাদেরকে বিজয়ী করতে আল্লাহ্তায়ালা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, 'মুমিনদের সহায়তা দান করা আমার দায়িত্ব।' অন্যত্র বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমার সৈন্যরাই তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী।' ত্রুটি ও সীমালংঘনের কারণে বিশ্বাসীদের উপর বিপদ নেমে আসে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমাদের উপর আপতিত বিপদ তোমাদেরই অর্জিত কর্মপরিণাম। আর বহু ত্রুটি তো তিনি এমনিতেই ক্ষমা করে দেন।' বিপর্যস্ততার সময়ে বিশ্বাসীদের কর্তব্য হচ্ছে, গোনাহের জন্য লজ্জিত হতে হবে, ত্রুটি স্বীকার করতে

www.eelm.weebly.com

হবে এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে। এরপর জানাতে হবে দৃঢ়পদ থাকার প্রার্থনা। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত সাহায্যকারী। তাঁর অভিজ্ঞান তুলনারহিত। বিশ্বাসীগণকে গোনাহ্ থেকে পবিত্র করাই তাঁর অভিপ্রায়। তিনি ক্ষমাপ্রার্থনাকে দোয়া কবুলের শর্ত করে দিয়েছেন। দোয়ার প্রতিফল হিসাবে আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় প্রকার পুরস্কার দানে ধন্য করেন। যুদ্ধ জয়, গণিমত, রাজ্য এবং সম্মান এগুলো হচ্ছে পার্থিব পুরস্কার। আর পারলৌকিক পুরস্কার হচ্ছে, জান্নাত, স্থায়ী মর্যাদা, আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য ও সন্তোষ। আল্লাহ্তায়ালার সামান্যতম সন্তোষ সকল কিছু থেকে শ্রেষ্ঠ।

আল্লাহ্তায়ালা সৎকর্মশীলদেরকে (মুহ্সিনিনদেরকে) ভালোবাসেন। মুহ্সিনিন তাঁরাই, যাঁরা আল্লাহ্তায়ালাকে সদা বিদ্যমান জেনে ও মেনে তাঁদের উপাসনা সুসম্পন্ন করেন। তাঁদের অন্তর আল্লাহ্মুখী। অন্যমনস্কতা থেকে মুক্ত।

শান্তি-অশান্তি, সুখ-দুঃখ সবকিছুই আল্লাহ্র নিকট থেকে সমাগত। দয়া তাঁর অপরিসীম। আনুগত্যে অটল থাকা পর্যন্ত তিনি তাঁর অনুগ্রহরাজীকে পরিবর্তন করেন না। আনুগত্য শিথিল হলেই কেবল অনুগ্রহ বর্ষণে ব্যত্যয় ঘটান। কিছু বিপদ মুসিবত দান করেন, যেনো এই বিপদাঘাত তাদের অনুভূতিকে সজাগ করে তোলে। যেনো তারা ক্ষমাপ্রার্থী হয় এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পার্থিব বিপদ ভোগ করে চিরতরে পবিত্র হয়ে যায়।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪৯, ১৫০

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَٰسِرِينَ ۝ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّٰصِرِينَ ۝

❒ হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের আনুগত্য কর তবে তাহারা তোমাদিগকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।

❒ আল্লাহ্ই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

হজরত আলী বলেছেন, এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বলতে মদীনার মুনাফিকদেরকে বোঝানো হয়েছে। তারা বলেছিলো, মোহাম্মদ নবী হলে নিহত হতেন না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অর্থ হবে মক্কার কাফের অর্থাৎ আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গী-সাথীরা। এক্ষেত্রে আল্লাহ্তায়ালার বাণীর উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অনুসরণ

www.eelm.weebly.com

করলে অর্থাৎ মুনাফিক কিংবা আবু সুফিয়ানের দলের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থী হলে তারা তোমাদেরকে তাদের ধর্মমতের দিকে নিয়ে যাবে। তখন তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ততা ও ব্যর্থতা ভিন্ন অন্য কিছু লাভ হবে না। আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক। তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী। সুতরাং কাফেরদের সঙ্গে হৃদ্যতা স্থাপন করা থেকে বিরত থাকো।

যুদ্ধ শেষে ষোলই শাওয়াল তারিখে আবু সুফিয়ান এবং তার অনুসারীরা মক্কা প্রত্যাবর্তনকালে আক্ষেপ করতে লাগলো, কাজটাতো আমরা ভালো করিনি। প্রথম দিকে তো আমরাই তাদেরকে অধিক হারে নিহত করেছি। তারা আমাদেরকে প্রতিহত করতে পারেনি। পশ্চাদাপসরণ করেছিলো। অথচ আমরা তাদেরকে পূর্ণপর্যুদস্ত করার আগেই ফিরে এলাম। এখন ফিরে গিয়ে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়ে আসাই বাঞ্ছণীয়। পুনরাক্রমণের এই ইচ্ছাকে আল্লাহ্তায়ালা অপসারিত করে দিলেন। তাদের অন্তরে ঢেলে দিলেন মুসলমান বাহিনীর আতংক। এই প্রসঙ্গটিকে ইঙ্গিত করেই নাজিল হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৫১

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَاۤ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ○

❒ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিব, যেহেতু তাহারা আল্লাহের শরীক করিয়াছে, যাহার সপক্ষে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠান নাই। জাহান্নাম তাহাদের আবাস ; কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল সীমালংঘণকারীদের।

যখন কাফের বাহিনী পুনরাক্রমণের পরিকল্পনা করছিলো, তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিলেন। কারণ তারা মুশরিক (অংশীবাদী)। তাদের অংশীবাদীতার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। যেমন প্রমাণ রয়েছে রসুল স. এর প্রতি অবতীর্ণ ওহির। আল্লাহ্তায়ালার প্রমাণ অবলম্বনকারীরাই সাহায্যপ্রাপ্ত। তাই আল্লাহ্তায়ালা মুশরিকদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দিয়ে প্রমাণ অবলম্বনকারীদেরকে সাহায্য করেছেন। সীমালংঘনকারীদের প্রকৃত বসবাসস্থল জাহান্নাম। এখানে সীমালংঘনকারীদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে জালেম শব্দ দ্বারা। এই শব্দটির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার অসন্তোষের প্রমাণ। অংশীবাদীতা জুলুম। আবাসস্থল হিসাবে দোজখের স্থায়ী নির্ধারণ এই জুলুমের কারণেই।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. সাহাবীগণ সহ যখন মদীনায় ফিরে এলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম বলাবলি করছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাদেরকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অথচ একি ঘটনা ঘটলো উহুদ প্রান্তরে। তাঁদের এই কথপোকথনের পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৫২

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ○

❐ আল্লাহ্ তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছিলেন যখন তোমরা তাহাদিগকে আল্লাহের অনুমতিক্রমে বিনাশ করিতেছিলে এবং সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারাইয়াছিলে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছিলে এবং যাহা তোমরা ভালবাস তাহা তোমাদিগকে দেখাইবার পর তোমরা অবাধ্য হইয়াছিলে। তোমাদের কতক ইহকাল চাহিতেছিল এবং কতক পরকাল চাহিতেছিল। সুতরাং তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদিগকে তাহাদিগের হইতে ফিরাইয়া দিলেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলেন। এবং আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

অবশ্যই আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে থাকেন। আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্তির শর্ত হচ্ছে ধৈর্য্য ও সাবধানতা (সবর ও তাকওয়া)। যুদ্ধের শুরুতে এই শর্ত বলবৎ ছিলো বলেই আল্লাহ্র বলে বলীয়ান হয়ে মুসলমান বাহিনী কাফেরদেরকে পর্যুদস্ত করে যাচ্ছিলো। কিন্তু যখনই শিথিলতাকে প্রশ্রয় দেয়া হলো, তখন রুদ্ধ হয়ে এলো সাহায্যপ্রাপ্তির পথ। জ্ঞানের শক্তি স্তিমিত হলো। কেননা, সম্পদের লোভ দুর্বল জ্ঞানের পরিচয়বাহী। যুদ্ধাবস্থানে অবিচল থাকা না থাকা নিয়ে শুরু হলো মতভেদ। আবদুল্লাহ্ বিন জোবায়েরের তীরন্দাজ বাহিনীর অনেকেই কাফের বাহিনীকে পিছু হটতে দেখে বলতে লাগলেন, এখানে থাকার তো আর প্রয়োজন নেই। আবদুল্লাহ্ বললেন, তোমরা কি রসুল স. এর এরশাদ বিস্মৃত হয়েছো? তাঁরা উত্তর দিলেন, রসুল স. এর এরশাদের অর্থ এরকম নয় যে,

www.eelm.weebly.com

কাফেররা পরাস্ত হওয়ার পরও তোমরা স্থান ত্যাগ করতে পারবে না। গণিমত সংগ্রহের এইতো সুযোগ। আবদুল্লাহ্ এবং তাঁর স্বল্পসংখ্যক সমর্থকেরা বললেন, আমরা রসুল স. এর হুকুম মোতাবেকেই থাকবো। এই পরিস্থিতিটিকেই আল্লাহ্তায়ালা এভাবে উপস্থাপনা করেছেন যে, তোমরা সাহস হারিয়েছিলে। যুদ্ধাবস্থানে থাকা না থাকা নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলে। দেখিয়েছিলে গণিমতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মতো অবাধ্যতা। কাফেরদের পরিত্যক্ত সম্পদকে ধরে নিয়েছিলে বিজয় বলে। তাই কাফেরদের পুনরাক্রমণের মাধ্যমে পরীক্ষা আপতিত হয়েছিলো তোমাদের প্রতি।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্ স. এর সাথীদের মধ্যে পৃথিবীপ্রাপ্তির লোভ দেখিনি। উহুদ প্রান্তরের কতিপয় সাহাবীর শিথিলতার এই ঘটনাটি ছিলো সাময়িক এবং শিক্ষণীয় বিষয়। এটা ছিলো এমন এক পরীক্ষা যার মাধ্যমে বাস্তবসম্মত জ্ঞান লাভ হয়। উদ্দেশ্য ছিলো, পরীক্ষার প্রতিকূলতার মাধ্যমে মুমিনগণ যেনো পূনঃপবিত্রতা লাভে সক্ষম হন। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, কোনো বাহিনীর কতিপয় সদস্যের শিথিলতার শাস্তি আপতিত হয় সম্পূর্ণ বাহিনীর উপর। আল্লাহ্তায়ালার এই বিধানের হিকমত এই যে, এই শাস্তি যেনো শৈথিল্য প্রদর্শনকারীদের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং দৃঢ়তা অবলম্বনকারীদের জন্য অধিক পূণ্য অর্জনের কারণ হয়।

মুমিনদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালা অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁদের স্খলনকে শাস্তি ব্যতিরেকেই ক্ষমা করে দিতে পারেন। আর যদি শাস্তি দেন তবুও তা অনুগ্রহই। কারণ, এই শাস্তির উদ্দেশ্য, অবাধ্যতার অপরিচ্ছন্নতা থেকে বিশুদ্ধ করা।

ইমাম বাগবী হজরত আলী থেকে বলেছেন, আমি তোমাদের নিকট ওই বরকতপূর্ণ আয়াতটি বিবৃত করছি, যা রসুল স. আমাদেরকে জানিয়েছেন। আয়াতটি এই - 'ওয়ামা আসাবাকুম মিম মুসিবাতিন ফা বিমা কাসাবাত আইদিকুম ওয়া ইয়া'ফূ আ'ন কাসীর।'

রসুলে পাক স. এরশাদ করেছেন, হে আলী! এই আয়াতের তাফসীর শুনে নাও, রোগ-ব্যাধি অথবা পার্থিব বিপদাপদ তোমাদের আমলের কারণেই আসে। পৃথিবী ও আখেরাত দু'ই স্থানে শাস্তি দেয়া আল্লাহ্তায়ালার মর্যাদার অনুকূল নয়। কারো অপরাধের শাস্তি পৃথিবীতে না দিলে আখেরাতে শাস্তি দান সম্পূর্ণতই তাঁর ইচ্ছানির্ভর।

www.eelm.weebly.com

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُنَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَّالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَٰبَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَٰبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

❑ স্মরণ কর তোমরা যখন উপরের দিকে পালাইতেছিলে এবং পিছনে কাহারও প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলে না যদিও রসুল তোমাদিগকে পিছন দিক হইতে আহবান করিতেছিল। পরে তিনি তোমাদিগকে দুঃখের উপর দুঃখ দিলেন যাহাতে তোমরা যাহা হারাইয়াছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর আসিয়াছে তাহার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।

উপরের দিকে পলায়ন করার অর্থ পাহাড়ে আরোহন করা। পাঠভিন্নতার কারণে সমতল ভূমিতে নেমে যাওয়া অথবা দূরে চলে যাওয়া, এরকমও অর্থ হতে পারে। ইমাম বাগবী লিখেছেন, দু'রকম অবস্থাই হয়েছিলো। কেউ সমতল ভূমিতে দূর ব্যবধানে চলে গিয়েছিলেন এবং কেউ কেউ উঠে গিয়েছিলেন পাহাড়ে। কেউ কারো দিকে তাকানোর ফুরসত পাচ্ছিলেন না। রসুল স. আহবান করছিলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আমার দিকে এসো। আমি আল্লাহ্‌র রসুল। যে আমার দিকে আসবে, সে জান্নাতের অধিকারী হবে।

এই দুঃখ-কষ্টের উপর আরো দুঃখ-কষ্ট অবতীর্ণ করলেন আল্লাহ্তায়ালা। দুঃখের উপরে দুঃখ অর্থ ক্রমাগত আঘাত, পরাজয়ের বিষন্নতা, শত্রু পক্ষের বিজয়োল্লাস এবং রসুল স. এর শাহাদাতের মর্মন্তুদ প্রচারণা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, প্রথম দুঃখ হচ্ছে গণিমত হস্তচ্যুত হওয়া। পরের দুঃখ হচ্ছে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া,অথবা প্রথম দুঃখ আঘাত প্রাপ্ত হওয়া এবং দ্বিতীয় দুঃখ রসুল পাক স. এর শাহাদাতের সংবাদ পাওয়া।

একত্রিত হওয়ার আহবান জানাতে জানাতে রসুল পাক স. একটি কংকরময় স্থানে পৌছলেন। সেখানে ছিলেন কতিপয় মুসলমান সৈন্য। বিপর্যস্ততা, বিশৃঙ্খলা এবং ভীতিবিহ্বলতার কারণে তাঁরা প্রথমে রসুলে পাক স. কে চিনতেই পারলেন না। একজন তীর নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলেন। তিনি স. বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রসুল। সম্বিত ফিরে পেলেন তাঁরা। রসুল স. কে অক্ষত দেখে আনন্দিত হলেন। রসুল স.ও ক্ষুদ্র বাহিনীটিকে পেয়ে খুশী হলেন। ধনুর্ধর বাহিনীর সদস্যদের অবস্থানচ্যুত হওয়া এবং সেই সাথে অনেকের শাহাদাৎ প্রাপ্তির সংবাদ রসুল স.

www.eelm.weebly.com

জানিয়ে দিলেন তাঁদেরকে। সহসা সামনের ঘাঁটির মুখে আবু সুফিয়ান তার বাহিনী সহ আর্বিভূত হলো। মুসলমান বাহিনীকে দেখে হতচকিত হয়ে গেলো তারা। ভীত হয়ে গেলো এই ভেবে যে, নিশ্চয়ই এরা আমাদেরকে হত্যা করবে। আক্রমণের চিন্তা বাদ দিয়ে তখন তারা আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত হয়ে পড়লো। রসুল স. সাথীদেরকে বললেন, ওরা আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না। তিনি প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! এই ক্ষুদ্র দলটির মৃত্যু হলে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার জন্য আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি উচ্চ স্বরে ছত্রভঙ্গ মুসলমান বাহিনীকে একত্রিত হতে আহবান জানালেন। সাহাবীগণ পুনঃএকত্রিত হয়ে কাফেরদেরকে পাথর মারতে মারতে হটিয়ে দিলেন। আমি বলি, এই পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে 'সানুলক্বি ফি কুলুবিল্লাজিনা কাফারুর'। আল্লাহ্তায়ালা আবু সুফিয়ান ও তার বাহিনীর সদস্যদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দিয়েছিলেন। আমি আরো বলি, দুঃখের পরে দুঃখ অর্থ্যাৎ দ্বিতীয় দুঃখ হচ্ছে, মদীনায় যাঁরা আছেন তাঁদের জন্য দুশ্চিন্তা। আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে যখন মক্কায় ফিরে যাচ্ছিলো, তখন রসুল স. ও সাহাবীগণ আতংকিত হলেন এই ভেবে যে, ওরা হয়তো মদীনায় পৌঁছে অসহায় শিশু ও নারীদেরকে নির্যাতন করবে। মদীনা রক্ষার জন্য রসুল স. হজরত আলী এবং হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসকে নিযুক্ত করলেন। বললেন, যদি দেখো তারা উটের পিঠে উঠে অশ্বগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে তবে মনে করবে তারা মক্কাতেই যাচ্ছে। আর যদি তারা ঘোড়ায় চড়ে উটগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেতে থাকে, তবে বুঝবে তাদের এই যাত্রার উদ্দেশ্য মদীনা লুণ্ঠন করা। আমার জীবনাধিকারী পবিত্র সত্তার শপথ! তারা মদীনা আক্রমণ করলে আমিই তাদের মোকাবেলা করবো। হজরত আলী এবং সা'দ, আবু সুফিয়ান বাহিনীকে অনুসরণ করলেন। দেখলেন, তারা উষ্ট্রারোহী হয়ে অশ্বগুলোকে সাথে নিয়ে চলেছে। মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলো তারা। কিন্তু তাদের সাথী সাফওয়ান বিন উমাইয়া তাদেরকে একাজ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলো।

'দুঃখের পরে দুঃখ' এর আরো একটি অর্থ এরকম হয় যে, তোমরা রসুল স. কে দুঃখ দিয়েছো তাই ওই দুঃখের পরে আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে দুঃখ দিয়েছেন। এই দুঃখ দানের উদ্দেশ্য মহৎ। এতে করে বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করার মতো মহান গুণ লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে রয়েছে আগামী ঘাত প্রতিঘাতময় জীবনকে অতিক্রম করার মহান শিক্ষা। আমি বলি, এতে রয়েছে উপর্যুপরি দুঃখবরণের বিনিময় (সওয়াব) লাভের সুযোগ। রয়েছে নবীর মাধ্যমে আগত সুসংবাদ। সুতরাং বিষণ্নতা পরিহার করে নির্বিকারচিত্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তোমাদের বিপদে তোমরা একা নও, তোমাদের রসুলও এই দুঃখবেদনার

www.eelm.weebly.com

অংশীদার। সুতরাং অনানন্দিত হওয়ার অবকাশ কোথায়। আর আল্লাহ্তায়ালাতো জানেনই তোমাদের আমল কীরকম। আমলের উদ্দেশ্যই বা কীরকম।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৫৪

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

❑ অতঃপর দুঃখের পরে তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিলেন নিরাপত্তা, যাহা তোমাদের একদলকে তন্দ্রাভিভূত করিয়াছিল। এবং একদল প্রাগ-ইসলামী অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করিয়া নিজেরাই নিজদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল এই বলিয়া যে, 'আমাদের কি কিছু করণীয় আছে? ' বল, 'সমস্ত বিষয় আল্লাহ্রেই এখ্তিয়ারে।' যাহা তাহারা তোমার নিকট প্রকাশ করেনা তাহা তাহারা তাহাদের অন্তরে গোপন রাখে এই বলিয়া যে 'এই ব্যাপারে আমাদের কোন কিছু করণীয় থাকিলে আমরা এই স্থানে নিহত হইতাম না।' বল, 'যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করিতে তবুও নিহত হওয়া যাহাদের অবধারিত ছিল তাহারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বাহির হইত;' ইহা এই জন্য যে আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা পরীক্ষা করেন ও তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা পরিশোধন করেন। অন্তরে যাহা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।

মুসলমান বাহিনীকে তন্দ্রাভিভূত করে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন আল্লাহ্তায়ালা। এই তন্দ্রাভিভূত প্রশান্তির উত্তরাধিকার লাভ করেছেন সুফিয়ায়ে কেরাম।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ রহমত বর্ষণের সময় সুফিয়ায়ে কেরাম তন্দ্রাভিভূতির এই মগ্নতা লাভ করেন। এই মগ্নতা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল কিছুর সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়।

হজরত আনাসের মাধ্যমে ইমাম বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু তালহা বলেছেন, উহুদ প্রান্তরে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে ছিলাম। আমাদেরকে এমন এক তন্দ্রা আচ্ছাদিত করলো যে, আমরা বার বার চেতনাচ্যুত হচ্ছিলাম। হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যাচ্ছিলো। সামান্য চৈতন্য হতেই তলোয়ার তুলে নিচ্ছিলাম। আবার পড়ে যাচ্ছিলো। আবার তুলে নিচ্ছিলাম। হজরত সাবেত ও হজরত আনাসের মাধ্যমে আরো বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু তালহা বলেছেন, আমি মাঝে মাঝে মাথা উঠিয়ে দেখছিলাম, এমন কেউই নেই যিনি তন্দ্রাচ্ছন্নতার কারণে টলে টলে পড়ছিলেন না।

মুনাফিকদের অবস্থা ছিলো অন্যরকম। তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও মগ্নতা তাদেরকে এতোটুকু প্রভাবান্বিত করেনি। মগ্নতার প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত ছিলো তারা। তারা তাদের অপবিত্র ধারণায় এই ভেবে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলো যে, আল্লাহ্ মোহাম্মদকে সাহায্য করবেন না। কখনো ভাবছিলো মোহাম্মদ যদি নবীই হতেন তাহলে নিহত হতেন না। কখনো আক্ষেপ করছিলো, আল্লাহ্ বিজয়ের ওয়াদা করেছিলেন কিন্তু আমরা তো তার কিছুই পেলাম না। এক বর্ণনায় এসেছে, বনী খাজরাজ গোত্রের কতিপয় সাহাবীর শাহাদাতের সংবাদ শুনে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই এরকম বলেছিলো। মুনাফিকরা একথা ভেবেও বিক্ষুব্ধ হচ্ছিলো যে, কেনো আমাদেরকে পীড়াপিড়ি করা হচ্ছে। কবে আমরা বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হতে পারবো।

ইবনে রাহওয়াইহ্, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জোবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত জোবায়ের বলেছেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে উহুদ প্রান্তরে আতংকিত অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় আল্লাহ্ আমাদেরকে তন্দ্রামগ্ন করলেন। মগ্নতার কারণে সকলেরই চিবুক বুকের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছিলো। তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে আমি স্বপ্নে দেখলাম, মা'তাব বিন কুশায়ের বলছেন 'লাও কানা লানা মিনাল আমরি শাইয়ুঁম মা কুতিল্না হাহুনা।' তার কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা 'ছুম্মা আনযালা আলাইকুম থেকে ওয়াল্লাহু আলিমুম বিজাতিস্ সুদুর' পর্যন্ত নাজিল করলেন। মুনাফিকেরা বলেছিলো, বিজয়ের প্রতিশ্রুতি আর প্রতিপালিত হলো কোথায়? বরং আমাদের অনেকেই নিহত হলেন। আমাদেরতো মতামত দেয়ার অধিকারই নেই। আমরা মদীনা থেকে বের না হলে শত্রুপক্ষ আমাদেরকে এভাবে হত্যা করতে পারতো না। তাদের এই মনোভাবকে স্পষ্ট করে দিয়ে আল্লাহতায়ালা তাঁর রসুলকে জানালেন, হে নবী আপনি বলে দিন, মৃত্যুর সময় ও স্থান নির্ধারিত। যথাসময়ে মৃত্যু অবশ্যই উপস্থিত হবে, তোমরা আপন গৃহে অবস্থান করলেও

www.eelm.weebly.com

মৃত্যুর নির্ধারিত স্থানে তোমাদেরকে আসতেই হবে। আল্লাহতায়ালার সিদ্ধান্তই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। প্রকৃত বিজয় অবশ্যই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্যই। বাহ্যিক বিপর্যয় ধর্তব্য নয়। মুমিনদেরকে ধৈর্যের প্রতিদান প্রদান এবং মুনাফিকদের কপটতা স্পষ্ট করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ রকম বিপদ অবতীর্ণ করা হয়েছে। এই বিপদের মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তর শয়তানের কুমন্ত্রণামুক্ত হয়। হৃদয় ভরে যায় নির্মলতার আলোকচ্ছটায়।

সকলের অন্তরের অবস্থা আল্লাহতায়ালা তো নিশ্চিতভাবেই জানেন। তবুও পার্থিব বাস্তবতায় মুমিন ও মুনাফিকদেরকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে এ রকম ঘটনার প্রয়োজন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৫৫

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

❐ যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল সেই দিন যাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাহাদের পদস্খলন ঘটাইয়াছিল। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। আল্লাহ্ ক্ষমা পরায়ণ ও পরম সহনশীল।

উহুদ প্রান্তরে চরম বিপর্যস্ততার মুহূর্তে রসুল স. এর কাছে মাত্র তেরজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। ওদিকে তীরন্দাজ বাহিনীতে অনড় ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের সহ দশজন। অন্যান্যরা ছিলেন ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। শয়তানের কুমন্ত্রণার কারণে গণিমত লুণ্ঠনের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন একদল। লুণ্ঠনের প্রতি তাঁদের এই ধাবমানতা ছিলো শয়তানের কুমন্ত্রণাপ্রসূত। তাঁদের অনুপস্থিতিতে অরক্ষিত গিরিপথ বেয়ে কাফের বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ করতে সাহসী হয়েছিলো। আল্লাহ্তায়ালা এই আয়াতে লুণ্ঠনের প্রতি ধাবিতদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার কথা ঘোষণা করে বলেছেন, শয়তানই তাদের এই স্খলন ঘটিয়েছে।

পরবর্তীতে মিশরবাসীরা যখন উহুদ যুদ্ধে পশ্চাদাপসরণ এবং বদর যুদ্ধে ও বায়াতে রিদওয়ানে অনুপস্থিত থাকা নিয়ে হজরত ওসমানকে অভিযুক্ত করেছিলো তখন ইবনে ওমর তাদেরকে বলেছিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তাঁদের স্খলনকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর হজরত ওসমানের বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকার

www.eelm.weebly.com

কারণ ছিলো এই, তাঁর স্ত্রী রসুল স. এর কন্যা হজরত রোকেয়া তখন অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ স্ত্রীর পরিচর্যার কারণেই রসুল স. তাঁকে বদর অভিযানে অংশগ্রহণের অনুমতি দেননি। রসুল স. তাঁকে বলেছিলেন, তুমি বদর যুদ্ধে গমনকারীদের মতো সওয়াব লাভ করবে। বায়াতে রেদওয়ানের ঘটনাটি ছিলো এ রকম, তিনি স. তাঁকে দূত হিসাবে মক্কার কোরাইশদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। কারণ, তিনি ছিলেন সম্মানিতজন। তাঁর চেয়ে বেশী সম্মানিত কেউ থাকলে রসুল স. তাঁকেই পাঠাতেন। হজরত ওসমান সেখান থেকে ফিরে আসার আগেই বায়াতে রেদওয়ান অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। রসুল স. তাঁর দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে বললেন, এটাই ওসমানের হাত। তারপর দুই হাত মিলিয়ে বললেন, এটাই ওসমানের বায়াত। হজরত ইবনে ওমর দোষারোপকারীদেরকে বললেন, এই কথাগুলো স্মরণে রেখো। বোখারী। উহুদ যুদ্ধে পশ্চাদাপসরণকারী সাহাবীদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা বৈধ নয়। তাছাড়া পশ্চাদাপসরণের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ঘটনাটি ঘটেছিলো। তাই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার দোষারোপ থেকে তাঁরা মুক্ত।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও ধৈর্য্যশীল। তিনি পশ্চাদাপসরণ-কারীদেরকে অভিযুক্ত করেননি। ক্ষমামন্ডিত করে ধন্য করেছেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৫৬

يَآيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

❑ হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে ও তাহাদের ভ্রাতাগণ যখন দেশে দেশে সফর করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহাদের সম্পর্কে বলে, 'তাহারা যদি আমাদের নিকট থাকিত তবে তাহারা মরিত না।' ফলতঃ আল্লাহ্ ইহাই তাহাদের মনস্তাপে পরিণত করেন; আল্লাহ্ই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার দ্রষ্টা।

---

www.eelm.weebly.com

মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এবং তার সঙ্গীদের অনুসরণ না করার জন্য নির্দেশ এসেছে এই আয়াতে। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কোনো সম্প্রদায়ের অনুসারী ব্যক্তিকে ওই সম্প্রদায়ভূত বলেই গণ্য করা হবে। এই হাদিস হজরত ইবনে ওমর থেকে আবু দাউদ এবং হজরত হোজায়ফা থেকে তিবরানী মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কুফরী ও মুনাফিকির অনুসরণ থেকে বিরত থাকা ফরজ। এ ধরনের অনুসরণ কুফর পর্যন্ত উপনীত করায়। তারা আমাদের সঙ্গে থাকলে মরতো না — এ ধরনের কথা তকদীরের প্রতি বিশ্বাসকে বিনষ্ট করে। তকদীর অস্বীকার করা কুফরী। এই উম্মতের ক্বদরিয়া ফেরকার বিশ্বাসও এরকম। তকদীরের প্রতি আস্থা তাদের নেই।

এই আয়াতে 'তাহাদের ভ্রাতাগণ' বলতে সফর কিংবা যুদ্ধে নিহতদেরকে বোঝানো হয়েছে। যারা এখনো জীবিত তাদেরকে লক্ষ্য করেও এই শব্দটির উল্লেখ করা হতে পারে। আমি বলি, 'তাহাদের ভ্রাতাগণ' বলতে তাদের সম্মুখে উপস্থিত ব্যক্তিদেরকেই বোঝানো হয়েছে। যারা মৃত তারাও এই সম্বোধনের অন্তর্ভূত। কারণ, কোনো দলের কিছু সংখ্যক লোক যদি কোনো ক্রিয়ার কর্তা হয়, তবে ওই ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ দলটি সম্পৃক্ত হয়ে যায়। যারা যুদ্ধবিজয়ী (গাজী) তারা মুনাফিকদের ভ্রাতা হলেও মুনাফিক নন। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ এই যে, কোনো অবস্থাতেই যেনো বিশ্বাস ও বক্তব্যকে মুনাফিকির অনুকূল না করা হয়।

আল্লাহ্তায়ালা যেমন জীবন দান করেন, তেমন মৃত্যুও ঘটান। সফর অথবা জেহাদ না করলে হায়াত বাড়বে না। আর হায়াত শেষ না হলে ভ্রমণকালে অথবা যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যু আসবে না।

আয়াতের শেষে, 'তোমরা যাহা করো আল্লাহ্ তাহার দ্রষ্টা' একথা বলে মুমিনদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের বিশ্বাস ও আচরণের অনুসরণ তাঁর দৃষ্টির আওতা বহির্ভূত নয়। সুতরাং সাবধান!

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৫৭, ১৫৮

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝ وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ۝

❒ তোমরা আল্লাহের পথে নিহত হইলে অথবা মৃত্যুবরণ করিলে যাহা তাহারা জমা করে, আল্লাহের ক্ষমা এবং দয়া তাহা অপেক্ষা শ্রেয়।

www.eelm.weebly.com

❒ এবং তোমাদের মৃত্যু হইলে অথবা তোমরা নিহত হইলে আল্লাহেরই নিকট তোমাদিগকে একত্র করা হইবে।

জীবন ও মৃত্যুতে সফর এবং জেহাদের কোনো অধিকার নেই। জীবন-মৃত্যুর নিরঙ্কুশ অধিকার কেবল আল্লাহ্তায়ালার। সকল কার্যকারণের স্রষ্টা তিনিই। সফর ও জেহাদ যদি মৃত্যুর কারণ বলে প্রতিভাত হয়, তবে তাতে চিন্তিত হওয়ার কী আছে? বরং এ রকম মৃত্যু আল্লাহ্তায়ালার রহমত ও মাগফিরাত অর্জনের সহায়। এবং আল্লাহ্তায়ালার রহমত, মাগফিরাত পৃথিবীর সকল বৈভব অপেক্ষা নিঃসন্দেহে উত্তম। পরকালের কল্যাণাকাঙ্ক্ষীদের জন্য পরিত্যাজ্য পৃথিবীর জন্য আক্ষেপ নিরর্থক।

যারা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং যারা শাহাদাতের অবিনশ্বর গৌরব লাভে ধন্য হয় — সকলকে আল্লাহ্র সকাশেই উপস্থিত হতে হবে। এর জন্য পৃথিবীর জীবনে সকল চেষ্টা ও সাধনাকে আল্লাহ্র মহব্বত অর্জনার্থে নিয়োজিত করতে হবে, যাতে নির্ধারিত মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবীর বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্র মাহবুবিয়াতের স্থায়ী সৌভাগ্য লাভ সহজ হয়।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৫৯

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝

❒ আল্লাহের দয়ায় তুমি তাহাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হইয়াছিলে, যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হইতে তবে তাহারা তোমার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাহাদের সহিত পরামর্শ কর এবং তুমি কোন সংকল্প করিলে আল্লাহের প্রতি নির্ভর করিবে; যাহারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন।

যারা রসুল স. এর হুকুম পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছিলেন, রসুল স. তাঁদের প্রতি রুষ্ট হননি বরং কোমল আচরণ করেছিলেন। এই কোমলতা আল্লাহ্তায়ালার দান। ভুল বুঝবার পর এমনিতেই অন্তর অনুতাপে জর্জরিত হতে থাকে। ওই সময়ে তাদেরকে ক্ষমার্হ ভাবা এবং তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করাই বাঞ্ছনীয়।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু এ রকম উত্তম আচরণ আল্লাহ্‌তায়ালার নিছক রহমত ছাড়া সম্ভব নয়। কর্কশ ভাষণ ও কঠোরতা মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। অনুতাপবিক্ষতদেরকে কর্কশ ভাষায় ভর্ৎসনা করা হলে ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ রকম হেদায়েত হয়েছে যে, এ রকম করলে তারা আপনার নিকট থেকে সরে যেতো। শেষ পর্যন্ত ইসলামের গন্ডি থেকেই বেরিয়ে যেতো হয়তো, হয়ে যেতো জান্নাত লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। অনুসরণকারীদের সংখ্যা কম হওয়ার অর্থ সওয়াব কম হওয়া। এ সমস্ত কিছুকে সদয় বিবেচনায় রেখে হে নবী, আপনি আপনার হক ক্ষমা করে দিন। আর তারা যে আল্লাহ্‌র হক নষ্ট করেছে সে জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাগফেরাত কামনা করুন।

যুদ্ধকালে এবং অন্যান্য সকল অবস্থায় সমস্যা সমুপস্থিত হলে, কর্তব্যকর্ম নির্ধারণার্থে পরামর্শ বিনিময় করা প্রয়োজন। এখানে আল্লাহ্‌র রসুলকে পরামর্শ বিনিময় করতে বলা হয়েছে। যেনো পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত লাভ সহজতর হয় এবং পরমর্শসভায় উপস্থিত সকলের অন্তর সন্তোষ লাভ করে। আর এই উম্মতের জন্য এই নিয়মটিও জারি হয়ে যায়। ইমাম বাগবী তাঁর সূত্রপরম্পরায় উল্লেখ করেছেন, হজরত আয়েশা বলেছেন, আমি কাউকে রসুল স. অপেক্ষা অধিক পরামর্শ করতে দেখিনি। পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহনের পর প্রয়োজন আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি পূর্ণনির্ভরতা। রসুল স. এমনই করতেন। এজন্যই রণসাজে সজ্জিত হয়ে উহুদ প্রান্তরের দিকে যাত্রার প্রাক্কালে যখন তাঁকে ক্ষান্ত হতে বলা হয়েছিলো, তখন তিনি বলেছিলেন, রণসজ্জিত হওয়ার পর যুদ্ধ না করে যুদ্ধসজ্জা খুলে ফেলা নবীদের জন্য শোভনীয় নয়।

সকল সময় নির্ভর করতে হবে আল্লাহ্‌র উপরেই। কেননা তিনিই অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। পরামর্শ বিনিময়ের উপকার এই যে, এতে করে সর্বোত্তম সিদ্ধান্তটির স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু মানুষের সিদ্ধান্ত সর্বোত্তম হলেও সম্পূর্ণ নির্ভূল নয়। তাই ভরসা (তাওয়াক্কুল) আল্লাহ্‌র প্রতি করতে হবে। আল্লাহ্ সম্পর্কে এ রকম বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তিনি নিশ্চয়ই উত্তম বিনিময় প্রদানে সক্ষম।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, রিজিক অর্জনকালে আল্লাহ্‌তায়ালার অবাধ্য না হওয়ার নামই তাওয়াক্কুল। রিজিকপ্রাপ্তির বিষয়টি আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি সমর্পণ করতে হবে। অবৈধ বিষয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার উপর ভরসা করার কোনো সুযোগ নেই। কেউ কেউ বলেছেন, তাওয়াক্কুল অর্থ আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যকারী, রিজিক দাতা এবং তত্ত্বধায়ক মনে না করা।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তাদের পরিচয় কী? তিনি স. বললেন, তারা ওই

www.eelm.weebly.com

সমস্ত লোক যারা দেহে দাগ দেয় না, যাদু মন্ত্র পড়ে না এবং শুভাশুভ নির্ণয় করে না; তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি নির্ভরশীল। বোখারী ও মুসলিম। ইমরান বিন হোসেন থেকে বাগবীও এ রকম হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন।

হজরত ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার অধিকার অনুসারে যদি তাওয়াক্কুল করতে সমর্থ হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে এমনভাবে রিজিক দান করবেন, যে রকম দান করেন পাখিদেরকে। পাখিরা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় অন্ন অন্বেষণে বের হয়। আর বিকালে ফিরে আসে পরিতৃপ্ত হয়ে। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে এ রকম ধারণার সৃষ্টি হয় যে, বস্তুসামগ্রী পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করাই তাওয়াক্কুল। যেমন, আঘাতপ্রাপ্ত হলে এ জন্য কাউকে দোষী সাব্যস্ত না করা। আমি বলি, এ রকম সন্দেহের সুযোগ এখানে নেই। দ্রব্যসামগ্রী পরিত্যাগ করা তাওয়াক্কুল নয় বরং এ সবের প্রতি ভরসা না করা তাওয়াক্কুল। পরামর্শবিনিময়ও এক প্রকারের দ্রব্যসামগ্রীর মতো, যা গ্রহণ করতে হবে কিন্তু এর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাবে না। বস্তুসামগ্রীর মাধ্যম গ্রহণ তাওয়াক্কুলবিরোধী নয়। বিনা হিসাবে বেহেশতীগণ বস্তু সামগ্রীর মাধ্যম গ্রহণ করেন না — এর অর্থ অতিরিক্ত অথবা মাকরূহ বস্তু সমূহকে তারা পরিত্যাগ করেন। জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। যেমন, পানাহার, প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ। নামাজ রোজাও জান্নাতে প্রবেশ করার কারণ বা মাধ্যম। কিন্তু নামাজ রোজা প্রতিপালন করা জরুরী।

জ্ঞাতব্য ঃ গ্রন্থকার বলেন, হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে, এই আয়াতে হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের নিকট থেকে পরামর্শ নেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াত হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরের শানে নাজিল হয়েছে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, তোমরা দু'জনে ঐকমত্য স্থির করলে আমি তার বিরোধিতা করবো না। ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর একবার ওমরকে বললেন, যুদ্ধের ব্যাপারে রসুল স. পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। তুমিও পরামর্শ গ্রহণ করো। জুহাক বলেছেন, হজরত ওমর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এমনকি রমণীদের নিকট থেকেও।

যাঁরা তাওয়াক্কুল করেন, আল্লাহ্ তাঁদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ্‌র ভালোবাসা সর্বোত্তম নেয়ামত। তাওয়াক্কুলকারীদেরকে আল্লাহ্‌ই সাহায্য করেন এবং দ্বীন-দুনিয়ার সংশোধন দানে ধন্য করেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্‌র উপরে ভরসাকারীদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।' হাদিসে

www.eelm.weebly.com

কুদসীতে এসেছে, আমি আমার বান্দার ধারণার অনুকূল। অর্থাৎ বান্দা ভালো বা মন্দ যে রকম ধারণা আমার প্রতি রাখে, আমি সে রকমই আচরণ করি তাদের সাথে।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৬০

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

❑ আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিলে তোমাদের উপর জয়ী হইবার কেহই থাকিবে না। আর তিনি তোমাদিগকে সাহায্য না করিলে তিনি ছাড়া কে সে যে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? বিশ্বাসীগণ আল্লাহের উপরই নির্ভর করুক।

যাঁরা আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যপ্রাপ্ত, কেউই তাদেরকে পরাস্ত করতে পারে না। আর যাদেরকে তিনি সহায়তাবিহীন অবস্থায় পরিত্যাগ করেছেন, কেউ তাদেরকে সাহায্য করতে সমর্থ নয়। প্রশ্নাকারে এই কথাটিই উপস্থাপন করা হয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে কে সাহায্য করবে? এ রকম সাহায্যের প্রত্যাশা অকল্পনীয়। এই আয়াতে ইমানদারদের কর্তব্যকর্ম এটাই সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, তারা যেনো কেবল আল্লাহ্তায়ালার প্রতি তাওয়াক্কুল করতে ব্রতী হয়। এটাই তাদের ইমানের অনুকূল আচরণ।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৬১, ১৬২, ১৬৩

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ○

❑ নবী অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করিবে, ইহা অসম্ভব। এবং কেহ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করিলে যাহা সে অন্যায়ভাবে গোপন করিবে কিয়ামতের

www.eelm.weebly.com

দিন সে তাহা লইয়া আসিবে। অতঃপর প্রত্যেককে যাহা সে অর্জন করিয়াছে তাহা পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে। তাহাদের প্রতি কোন জুলুম করা হইবে না।

❒ আল্লাহ্ যাহাতে রাজী, যে তাহারই অনুসরণ করে সে কি উহার মত যে আল্লাহের ক্রোধের পাত্র হইয়াছে এবং জাহান্নামই যাহার আবাস? এবং উহা কত নিকৃষ্ট পরিণামস্থল!

❒ আল্লাহের নিকট তাহারা বিভিন্ন স্তরের; তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহার দ্রষ্টা।

নবীর জন্য অন্যায়ভাবে কোনো বস্তু গোপন করা সম্ভব নয়। গোপন করা অর্থ গণিমতের সম্পদ গোপন করা বা খেয়ানত করা। মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, এখানে গোপন করার অর্থ ওহি বা প্রত্যাদেশ গোপন করা। অর্থাৎ লোভ, ভয় অথবা সুবিধার কারণে ওহির কোনো অংশ বিশেষকে গোপন করা নবীর জন্য বৈধ নয়। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, কতিপয় প্রতাপশালী ব্যক্তি তাদের অধিকারবহির্ভূত দাবী পেশ করে গণিমতের সম্পদপ্রার্থী হলো, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। উদ্দেশ্য এই যে, বিধানবহির্ভূতভাবে কোনো দলকে গণিমত দেয়া অথবা বঞ্চিত করা নবীর জন্য শোভনীয় নয়। গণিমতের সুষম বন্টন জরুরী। বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, আবু দাউদ, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। তিরমিজি বলেছেন বর্ণনাটি হাসান। বদর যুদ্ধে গণিমতের মাল থেকে একটি নকশী লাল চাদর হারিয়ে গিয়েছিলো। কেউ কেউ ধারণা করেছিলেন, চাদরটি রসুলপাক স. নিয়েছেন। তখন এই আয়াত নাজিল করে আল্লাহ্তায়ালা জানালেন যে, মালে গণিমতের খেয়ানত করা নবীর জন্য দুরস্ত নয়।

কালাবী এবং মুকাতিল বলেছেন, উহুদের যুদ্ধলব্ধ গণিমত সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়েছে। তীরন্দাজ বাহিনীর সদস্যরা তাদের অবস্থানস্থল পরিত্যাগের সময় বলেছিলেন, মনে হচ্ছে রসুল স. এ রকম বলেছেন যে, যে ব্যক্তি যে বস্তু সংগ্রহ করবে সেটা তারই। তারা ধারণা করছিলেন, বদরের মতো এবারও মনে হয় গণিমতের সকল মাল বন্টন করা হবে না। এ রকম চিন্তাই তাদেরকে গণিমতের দিকে ধাবিত করেছিলো। পরে রসুল স. যখন বলেছিলেন, আমি কি তোমাদেরকে একথা বলিনি যে, আমার পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত স্থান ত্যাগ কোর না। তখন তারা বলেছিলেন, আমাদের অন্য সাথীরা তো সেখানেই দাঁড়িয়েছিলেন। রসুল স. বলেছিলেন, তোমরা মনে করেছো গণিমতের মাল খেয়ানত করা হবে। যথাবন্টন হবে না। এই সময় এই আয়াত নাজিল হয়। মুসান্নিফ গ্রন্থে ইবনে আবী শাইবা এবং জুহাকের মাধ্যমে ইবনে জারীরের মুরসাল বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. কিছুসংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিলেন। গণিমতের মাল বন্টন করা হয়েছিলো তাদের অনুপস্থিতিতে। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. তাদেরকে গণিমত দেননি। কিন্তু এটাকে খেয়ানতও বলা যায় না। নবীকে খেয়ানতকারী বলা জায়েয নয়।

হজরত কাতাদা বলেছেন, আমাদের নিকট বর্ণনা পৌঁছেছে যে, সাহাবীগণ কেউ হয়তো গণিমতের মাল খেয়ানত করে থাকবেন। এই আয়াত নাজিল হয়েছে তাদের সম্পর্কেই। কবীর পুস্তকে তিবরানী সুদৃঢ় সনদের মাধ্যমে ইবনে আব্বাসের উক্তি এ মতো উল্লেখ করেছেন যে, রসুল স. কতিপয় সৈন্যকে কোনো এক জায়গায় পাঠালেন। তাঁরা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলেন। পুনরায় পাঠালেন। পুনরায় তাঁরা ফিরে এলেন। কারণ ছিলো, তাঁরা হরিণের মস্তক পরিমাণ একটি স্বর্ণখন্ড খেয়ানত করেছিলেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

যে খেয়ানত করবে কিয়ামতের দিন সে তার খেয়ানতসহ উপস্থিত হবে। কালাবী বলেছেন, দোজখে খেয়ানতকৃত বস্তুর আকৃতিতে কোনো বস্তু প্রস্তুত করে রাখা হবে। খেয়ানতকারীকে বলা হবে, নিচে নেমে গিয়ে ওই বস্তুটি নিয়ে এসো। সে নিচে গিয়ে ওই বস্তুটি পিঠে করে নিয়ে উঠে আসবে। তখন বস্তুটি পড়ে যাবে। পুনরায় তাকে হুকুম দেয়া হবে তলদেশে গিয়ে বস্তুটি নিয়ে এসো। এভাবেই চলতে থাকবে তার অবরোহন ও আরোহন (আল্লাহ্ই জানেন এ অবস্থা কতোদিন ধরে চলবে)। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, খয়বর অভিযানে আমরা রসুল পাক স. এর সঙ্গে উষ্ট্রারোহী হয়ে গমন করেছিলাম। ওই যুদ্ধ থেকে গণিমত হিসাবে সোনা রূপা কিছু পাওয়া যায়নি। পাওয়া গিয়েছিল উট, কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী। আমরা এক ঘাঁটিতে পৌছলে মোদয়াম নামক এক হাবশী গোলাম রসুল স. এর উটের হাওদা নামানোর সময় তীরবিদ্ধ হলো। মোদয়াম ছিলো রসুল স.কে হেবা কৃত রেফায়াহ্ বিন জায়েদের গোলাম। তীরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো মোদয়াম। কে তীর মেরেছিলো তা জানাও সম্ভব হলো না। সাহাবীগণ দোয়া করলেন, তার জন্য বরকতপূর্ণ জান্নাত নসীব হোক। রসুল স. বললেন, কখনোই নয়। সে খয়বর যুদ্ধের গণিমত থেকে ছোট একটি কম্বল নিয়েছিলো, যা তার প্রাপ্য ছিলো না। সে তার জন্য আগুণ প্রজ্বলিত করেছে। এই কথা শুনে এক ব্যক্তি দু'টি চামড়ার টুকরা এনে রসুল স.এর সামনে পেশ করে বললেন, এই টুকরা দু'টিও আগুনের (যদি ফেরত না দিতাম তবে এই টুকরা দু'টিই হতো আমার জন্যে প্রজ্বলিত আগুন)। বাগবী।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, কোনো এক ব্যক্তি মোদয়াম নামক গোলামকে রসুল স. এর নিকট হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করেছিলো।

হজরত ইয়াজিদ বিন খালেদ জুহনী বর্ণনা করেছেন, খয়বর অভিযানকালে এক জনের মৃত্যু হলো। সাহাবীগণ তার কথা রসুল স. কে জানালেন। রসুল স.

www.eelm.weebly.com

বললেন, তোমরাই তোমাদের সাথীর নামাজ পড়ো। এরশাদ শুনে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলেন সকলে। রসুল স. বললেন, তোমাদের সাথী আল্লাহ্র রাস্তায় খেয়ানত করেছে। বর্ণনাকারী বলেছেন, আমরা তার মালপত্র খুঁজে ইহুদীদের নিকট থেকে লুণ্ঠন করা দু'টি মুক্তা দেখতে পেলাম, যার মূল্য হবে দুই দিরহাম। মালেক, নাসাঈ।

হজরত আবু হোমায়েদ সায়েদী বর্ণনা করেছেন, আজদ গোত্রের এক ব্যক্তির নাম ছিলো ইবনে কাতিবা। রসুল স. তাকে জাকাত আদায় করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ফিরে এসে সে কিছু মাল জমা দিলো এবং কিছু নিজের কাছে রেখে বললো, এগুলো আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। রসুল স. ভাষণ দানের জন্য দন্ডায়মান হলেন। আল্লাহর স্তুতি প্রশস্তি বর্ণনার পর বললেন, আল্লাহ আমাকে দায়িত্ব দান করেছেন। আর আমি প্রতিনিধি হিসাবে তোমাদের কতিপয় ব্যক্তিকে দায়িত্ব দান করেছি। জাকাত আদায়ের দায়িত্ব সমাপনান্তে কেউ যদি কিছু মাল জমা দিয়ে কিছু মাল নিজের কাছে রেখে সেটাকে হাদিয়া বলে তবে সে নিজ গৃহে বসে থেকে দেখলো না কেনো হাদিয়া তার কাছে আসে কি না? আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো বস্তু গ্রহণ করবে, ওই ব্যক্তি অবশ্যই সেই বস্তুর বোঝা নিয়ে আল্লাহর সকাশে উপস্থিত হবে। সেদিন কেউ কেউ উট, গাভী অথবা বকরীর বোঝা নিয়ে উপস্থিত হবে। বোখারী, মুসলিম।

দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর রসুল স. দুই হাত উত্তোলন করে বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি তোমার হুকুম পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? হজরত আদী বিন উমায়ের বলেন, আমি রসুল স. কে এ রকম বলতে শুনেছি, আমি তোমাদেরকে যে দায়িত্ব দেই, সে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কেউ যদি একটি সুঁচ অথবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কোনো বস্তু গোপন করে ফেলে, তবে তা হবে চুরি। কিয়ামতের দিন ওই চুরিসহই তাকে হাজির হতে হবে। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একদা রসুল স. ভাষণ দেয়ার জন্য দন্ডায়মান হলেন। জাকাত অথবা গণিমতের মাল আত্মসাৎ করা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, শুনে রাখো। কেউ যেনো স্কন্ধদেশে উট নিয়ে আমার সামনে হাজির না হয়। যখন সে বলতে থাকবে, হে আল্লাহর রসুল! সাহায্য করুন। আমি তখন বলবো, আল্লাহর সামনে এখন আমার কিছুই করার নেই। আমি তো তোমাকে আল্লাহর হুকুম পৌঁছে দিয়েছিলাম। এরপর রসুল স. ওই সমস্ত লোকের কথা উল্লেখ করলেন, যাদের ঘাড়ে থাকবে ঘোড়া, বকরী অথবা সোনা রূপার বোঝা। তারাও রসুল স. এর সাহায্যপ্রার্থী হবে। তিনি স. তাদেরকে একই উত্তর দিবেন। বোখারী, মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

হজরত ওমর থেকে আবু ইয়া'লী এবং বায্যার, হজরত সা'দ বিন আবু উবাদা ও হালাব থেকে আহমদ, হজরত ইবনে ওমর এবং হজরত আয়েশা থেকে বায্যার এবং হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে তিবরানীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ সমস্ত হাদিসে জাকাতের মাল আত্মসাৎ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

হজরত আবু মালেক আশআরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সবচেয়ে বড় আত্মসাৎ হচ্ছে চুরি। একটি জমির দু'জন অংশীদারের মধ্যে একজন যদি অন্যজনের অংশ থেকে একগজ অধিকার করে নেয় তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ ওই ব্যক্তিকে সপ্তস্তর জমির শিকল পরিয়ে উঠাবেন।

হজরত মুআজ বিন জাবাল বলেছেন, আমাকে রসুল স. ইয়ামেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। বললেন, আমার আদেশ ব্যতীত কোনো বস্তু গ্রহণ কোর না। করলে তা হবে আত্মসাৎ ও চুরি। 'ওয়া মাইয়াগলুল ইয়া'তি বিমা গাল্লা ইয়াউমাল কিয়ামাহ।' — যে ব্যক্তি আত্মসাৎ বা চুরি করে সে তার চুরির মালসহ কিয়ামতে হাজির হবে।

হজরত আমর বিন শোয়ায়েবের দাদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স., হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর আত্মসাৎ ও চুরির সামগ্রী পুড়িয়ে দিতেন। আবু দাউদ।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বলেছেন, সম্পদ সংরক্ষণের জন্য রসুল স. এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন। যার নাম ছিলো করকরা। করকরার মৃত্যু হলে রসুল স. বললেন, সে দোজখী। সবাই দেখতে পেলো তার ব্যক্তিগত মালপত্রের মধ্যে রয়েছে একটি আবা (এক প্রকার আরবীয় পোশাক), যা সে আত্মসাৎ করেছিলো। বোখারী।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, হজরত ওমর বলেছেন, খয়বর যুদ্ধের সময় কতিপয় সাহাবী বললেন, অমুক অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়েছে। একজনের জানাজা পড়ে তাঁরা বললেন, এই ব্যক্তি শহীদ। রসুল স. বললেন, কখনোই নয়। আমি তাকে আগুনপরিবেষ্টিত দেখলাম। কারণ, সে একটি চাদর আত্মসাৎ করেছে। অথবা বললেন, একটি আবা আত্মসাৎ করেছে। এরপরে বললেন, হে মানুষেরা! তিনবার উচ্চস্বরে ঘোষণা করে দাও, জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল মুমিন। হুকুম মোতাবেক আমি সবাইকে উচ্চস্বরে জানিয়ে দিলাম, জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল মুমিন। মুসলিম।

কিয়ামত দিবসে মানুষকে তার কৃতকর্মের ফলাফল দেয়া হবে। নেক আমলের সওয়াবও কম দেয়া হবে না। মন্দ আমলের জন্য আযাবও অতিরিক্ত করা হবে না। যাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী তাঁরা কখনো আল্লাহ্র গজবে পরিবেষ্টিতদের মতো নয়। অর্থাৎ মোহাজির ও আনসাররা কখনো মুনাফিক ও

www.eelm.weebly.com

ফাসেকদের সমতুল্য নয়। দুই দলের গতিপথ দু'দিকে। একদিকে রয়েছে সওয়াব আর অন্যদিকে আযাব। তবে বিশ্বাসীরা আল্লাহর নৈকট্যের পথে একজন অন্যজন অপেক্ষা অগ্রগামী হবেন। তেমনি দোজখীরাও একজন অপরজন অপেক্ষা অধিক অপরাধী হবে। কারো শাস্তি হবে লঘু। কারো গুরু। আল্লাহ ভালো ও মন্দ উভয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে সম্যক অবগত। তিনিই উপযুক্ত বিনিময় দানকারী।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৬৪

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

❐ তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট রসুল প্রেরণ করিয়া আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন; সে তাহার আয়াত তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে, তাহাদিগকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়; এবং তাহারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলো।

ইমানদারদের প্রতি আল্লাহতায়ালার সবিশেষ অনুগ্রহ এই যে, তিনি তাদের মধ্য থেকে একজন মহান রসুল নির্বাচিত করেছেন। কোনা কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে ইমানদারগণ বলতে রসুল স. এর বংশীয় কোরাইশ মুমিনদেরকে বোঝানো হয়েছে। রসুল স. বলেছেন, সমস্ত মানুষই কোরাইশদের অনুগামী। সাধারণ মুমিন যেমন কোরাইশ মুমিনদের অনুগামী। তেমনি সাধারণ কাফেররাও অনুগামী কোরাইশ কাফেরদের। বোখারী, মুসলিম।

রসুল স. বলেছেন, খেলাফতের অধিকার কোরাইশদের, যতোক্ষণ কমপক্ষে তাদের দু'জনও অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য এই হুকুমের শর্ত হলো যোগ্যতা এবং তাকওয়া। ফাসেক ও জালেমদেরকে এই বাক্যের মাধ্যমে খলিফা নির্বাচিত করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ইমানদার বলতে আরবের সকল মুসলমানকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, বনী তাগলীব ছাড়া আরবের সমস্ত গোত্রই কোরাইশ বংশসম্পৃক্ত। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, 'হুয়াল্লাজি বা'য়াসা উম্মিয়্যিনা রসুলাম মিনহুম।'

'তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে' — অর্থ আরব জাতির মধ্য থেকে। উদ্দেশ্য এই যে, যেনো তারা তাদের রসুলের সত্যনিষ্ঠতা ও আমানতদারী সম্পর্কে স্পষ্ট

www.eelm.weebly.com

ধারণা লাভ করতে পারে এবং এই মহান রসুলের জন্যে ধন্য এবং গৌরাবান্বিত হতে পারে। হজরত সালমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আমাকে বললেন, আমার প্রতি ঘৃণা পোষণ কোর না। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি এরকম কেমন করে করবো? আল্লাহতায়ালা তো আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন। রসুল স. বললেন, আরবদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করলেই আমার প্রতি ঘৃণা পোষণ করা হবে। এই হাদিস তিরমিজি বর্ণনা করে বলেছেন, হাদিসটি হাসান।

কোনো কোনো আলেম ধারণা করেন, এখানে ইমানদারগণ বলতে সকল ইমানদারদের বোঝানো হয়েছে। তিনি আরব হন অথবা অনারব। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'লাক্বদ জায়াকুম রসুলুম মিন আনফুসিকুম।' — এখানে মানব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে রসুল নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ রসুল মানব সম্প্রদায়ভূত। তিনি ফেরেশতা কিংবা অন্য কোনো সম্প্রদায়ভূত নন। মানুষের জন্য মানুষের ভিতর থেকেই নবী নির্বাচিত হওয়া যুক্তিযুক্ত। যেমন, আল্লাহ বলেছেন, 'পৃথিবীতে যদি স্বাভাবিকভাবে ফেরেশতারা বিচরণ করতো, তবে আমি তাদের জন্য আসমানের ফেরেশতাকেই রসুল হিসাবে পাঠাতাম।'

নবী আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শোনান। মানুষের অন্তরকে ভুল বিশ্বাস থেকে এবং গায়েরুল্লাহর ইবাদত করার স্পৃহা থেকে পরিশুদ্ধ করেন। মানুষের ভিতর বাহির পবিত্র করেন। তিনি আল্লাহর কিতাব থেকে শিক্ষা দান করেন এবং হিকমতের তালিম দেন। নবীর এই কর্মকান্ড জারি হওয়ার পূর্বে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ছাড়া মানুষের জন্য অন্য কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৬৫

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

❑ যখন তোমাদের উপর মুসীবত আসিয়াছিল, যাহার দ্বিগুণ তোমরা ঘটাইয়াছিলে, তখন কি তোমরা বলিয়াছিলে 'ইহা কোথা হইতে আসিল?' বল, 'ইহা তোমাদের নিজেদেরই নিকট হইতে;' আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

ইমাম আহমদ, বোখারী, মুসলিম এবং নাসাঈ, হজরত বারা'র এরকম উক্তি উল্লেখ করেছেন যে, উহুদ যুদ্ধে মুশরিকেরা আমাদের সত্তর জনকে শহীদ

www.eelm.weebly.com

করেছিলো আর বদর যুদ্ধে আমরা মুশরিকদের সত্তর জনকে হত্যা এবং সত্তর জনকে বন্দী করেছিলাম।

আমি বলি, বন্দীদেরকে হত্যা করাই ছিলো আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রেত। মুসলমানেরা তাদেরকে হত্যাও করতে পরতো। হত্যা করাই সমীচীন ছিলো। ফিদইয়া গ্রহণ করে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি ছিলো আল্লাহতায়ালার অভিপ্রায়বিরোধী।

উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলমান বাহিনী পর্যুদস্ত হলো , তখন কেউ কেউ বলতে লাগলেন, এরকম হলো কেনো? আল্লাহতায়ালা তো মুসলমানদেরকে বিজয় দান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের মধ্যে আল্লাহর রসুলও উপস্থিত। এই আয়াতে আল্লাহতায়ালা এই সন্দেহের নিরসন করছেন। খন্ডিত নয়, সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিষয়টি অনুধাবন করতে বলেছেন। বদর ও উহুদ যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে একই সঙ্গে চিন্তা করলে দ্বিধা-সন্দেহ আর থাকে না। বিজয় দানের সঙ্গে দুটি শর্ত ছিলো — ধৈর্য্য এবং তাকওয়া। বদর যুদ্ধের সময় এই শর্তদ্বয় প্রতিপালিত হয়েছিলো বলেই যুদ্ধের ফলাফল ছিলো মুসলমানদের পক্ষে। উহুদে শর্ত দু'টি থেকে স্খলন ঘটেছিলো। তাই আল্লাহতায়ালার অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হয়নি। অতএব এই পরাজয়ের গ্লানি যে তোমাদের কারণেই তা ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত। তোমরা বলছো, আল্লাহর রসুল উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এহেন বিপদ আপতিত হবে কেনো? তোমরা বিপদকে রসুলের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চাচ্ছো, অথচ ভেবে দেখা উচিৎ,রসুলের উপস্থিতির কারণেই তোমাদের শেষ রক্ষা হয়েছে। তাঁর উপস্থিতি আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ বই অন্য কিছু নয়। আল্লাহ তাঁর রসুলকে নির্দেশ করছেন এই কথাটি জানিয়ে দিতে যে, সবর ও তাকওয়ার শর্ত প্রতিপালিত হয়নি বলেই তোমাদের এই দুরবস্থা।

ইবনে আবী হাতেম হজরত ওমর বিন খাত্তাবের উক্তি উল্লেখ করেছেন এ রকম, বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়ার কারণেই মুসলমান বাহিনীকে উহুদ যুদ্ধে পর্যুদস্ত করা হয়েছে। ফিদইয়া গ্রহণ করে তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার কারণে উহুদ যুদ্ধে সত্তর জন মুসলমান শহীদ হন, মুসলমান বাহিনী বিপর্যস্ত হয় এবং রসুল স. এর সামনের দাঁত শহীদ হয়। তাঁর পবিত্র মস্তক ও অবয়ব হয় রক্তাক্ত।

ইমাম বাগবী হজরত আলী থেকে বর্ণনা করেন, হজরত জিব্রাইল রসুলুল্লাহ স. কে বললেন, বন্দীদেরকে ফিদইয়া নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, এই সিদ্ধান্তটি আল্লাহতায়ালার অপছন্দ। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী আপনি আপনার অনুসারীদেরকে হত্যা করা অথবা ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলেছিলেন। তারা বলেছিলো, হে আল্লাহর রসুল!এরা তো আমাদের স্বজন। আমরা বরং ফিদইয়া গ্রহণ করে তাদেরকে ছেড়ে দেই। ফিদইয়ার এই সম্পদ আমাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে অধিক শক্তিশালী হতে সাহায্য করবে। তাদেরকে ছেড়ে দিলে তাদের সমসংখ্যক মুসলমান শহীদ হবে জেনেও তারা বলেছিলো,

www.eelm.weebly.com

আমরা রাজী। উহুদ যুদ্ধে তাই ঘটেছে। শহীদ হয়েছেন সত্তরজন মুসলমান, সেই সত্তরজন মুক্তিপ্রাপ্ত কাফেরের পরিবর্তে।

জ্ঞাতব্য ঃ সাঈদ বিন মনসুর আবু সাখার থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন, উহুদের সত্তরজন শহীদের মধ্যে চারজন ছিলেন মুহাজির এবং অবশিষ্ট ছিষট্টি জন ছিলেন আনসার। মুহাজির শহীদগণ হচ্ছেন, হজরত হামজা, হজরত মুসয়াব বিন উমায়ের, হজরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ এবং হজরত সাম্মাস বিন ওসমান। কিন্তু ইবনে হাব্বান এবং হাকেম হজরত উবাই বিন কা'ব থেকে বর্ণনা করেছেন, আনসারী শহীদ ছিলেন চৌষট্টিজন এবং মুহাজির শহীদ ছিলেন ছয়জন। পঞ্চম মুহাজির শহীদ হচ্ছেন, হাতেম বিন বালতা'র মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম সা'দ এবং ষষ্ঠ শহীদ হচ্ছেন, সাকিফ বিন আমর আসলামী। বর্ণনা করেছেন হাফেজ।

বোখারী হজরত কাতাদা থেকে বলেছেন, আনসারদের চেয়ে বেশী শহীদ আরবের অন্য কোনো গোত্র থেকে হয়েছে, এ রকম তথ্য আমাদের জানা নেই। হজরত আনাস বলেছেন, উহুদ যুদ্ধে সত্তর জন, বিরে মাউনার ঘটনায় সত্তরজন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে সত্তর জন আনসার শহীদ হয়েছিলেন। হাফেজ মুহিব তাবারী, মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন, উহুদ যুদ্ধে শহীদগনের সংখ্যা ছিলো পঁচাত্তর জন। তন্মধ্যে একাত্তর জন ছিলেন আনসার।

ইমাম শাফেয়ী শহীদগণের সংখ্যা বাহাত্তর জন বলে উল্লেখ করেছেন। আইয়ুন গ্রন্থে উহুদ যুদ্ধে শহীদগণের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। তাতে উল্লেখিত হয়েছে ছিয়ানব্বই জনের নাম। এগার জন মুহাজির, আটত্রিশজন আউস এবং সাতচল্লিশজন খাজরাজ। দিমিয়াতীর মাধ্যমে একশ' চার অথবা একশ' পাঁচ জনের কথা এসেছে। কোরআনের বর্ণনায় বলা হয়েছে সত্তর জনের কথা।

আল্লাহপাক কখনো সাহায্য করেন। কখনো সাহায্যবিহীন রাখেন। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা সর্ব পরিব্যাপ্ত। সকল কিছুই তাঁর ক্ষমতাধীন।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৬৬, ১৬৭

وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَ
لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ
ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ
مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ
بِمَا يَكْتُمُوْنَ ۝

www.eelm.weebly.com

❒ যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহা আল্লাহের অনুমতিক্রমেই ঘটিয়াছিল; ইহা বিশ্বাসীগণকে জানিবার জন্য।

❒ এবং মুনাফিকদিগকে জানিবার জন্য; এবং তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'আইস, তোমরা আল্লাহের পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরক্ষা কর।' তাহারা বলিয়াছিল, 'যদি জানিতাম যুদ্ধ হইবে তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করিতাম।' সেদিন তাহারা বিশ্বাস অপেক্ষা সত্য প্রত্যাখ্যানের নিকটতর ছিলো। যাহা তাহাদের অন্তরে নাই তাহারা তাহা মুখে বলে; তাহারা যাহা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।

উহুদের বিপর্যয় নেমে এসেছিলো আল্লাতায়ালার অনুমোদনক্রমেই। এর উদ্দেশ্য ছিলো ইমানদারদের ইমান এবং মুনাফিকদের নেফাক (অপবিত্রতা) যেনো সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। তাদেরকে বলা হয়েছিলো, আল্লাহর পথে জেহাদ করো অথবা শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে আপন অবস্থানে অটল থাকো যাতে মুসলমানবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি হয়। তিনশ' মুনাফিকের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই তখন বলেছিলো, যুদ্ধপদ্ধতি ভালোভাবে জানা থাকলে তোমাদের সঙ্গে যেতে আমাদের আপত্তি ছিলো না।

'যদি জানতাম যুদ্ধ হইবে' - একথার অর্থ যদি আমরা বিশ্বাস করতাম তোমরা সত্যের উপরে আছো এবং এই যুদ্ধ যে সত্যি সত্যিই আল্লাহর পথে যুদ্ধ, এরকম প্রতীতি থাকলেই না যুদ্ধে যোগদানের কথা আসে। তাছাড়া মক্কার মুশরিকদের যুদ্ধ তো তোমাদের বিরুদ্ধেই। আমাদের বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে তো তারা যুদ্ধোদ্যোত হয়নি। তোমরাও চাও তাদেরকে পরাস্ত করতে। এসব তো তোমাদেরই পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপার। সুতরাং আমরা এই ঝামেলায় জড়াতে যাবো কেনো।

মুনাফিকদের এরকম চিন্তাভাবনা তাদেরকে ইমানের নিকটবর্তিতা থেকে অপসারিত করে দিচ্ছিলো। মুসলমান ও মুনাফিক এতোদিন মিলে মিশে ছিলো। কিন্তু যুদ্ধের মাধ্যমেই তাদের অভ্যন্তরীন অপবিত্রতা স্পষ্ট হয়ে পড়লো। তাদের স্বভাব হচ্ছে সুবিধা দেখলে সাথে থাকে আর বিপদ দেখলে দূরে সরে যায়। উহুদ যুদ্ধের মাধ্যমেই মুনাফিকদেরকে প্রথম চিহ্নিত করা হয়েছিলো। এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছিলেন কেবল বিশ্বাসীরাই। ইমানের ভান করলেও মুনাফিকরা যে অবিশ্বাসী তা প্রমাণিত হয়েছিলো উহুদের ঘটনায়। তাদের অন্তর ও বাহির এক নয়। মনে অবিশ্বাস। মুখে বিশ্বাসের ঘোষনা। এরকম কপটচারীরাই মুনাফিক। আল্লাহ্ তাদের অন্তরের কলুষ বিশ্বাস সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞাত। আর যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি সর্বসমক্ষে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

www.eelm.weebly.com

জ্ঞাতব্য ঃ রসুল স. একবার ইসলাম প্রচারের জন্য সত্তরজন ক্বারী সাহাবীকে এক আরব সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। ওই সম্প্রদায়ের কিছু লোক, তাদের সকল মানুষ ইসলাম গ্রহন করবে একথা বলে সাহাবীদেরকে বিরে মাউনায় নিয়ে যায় এবং শহীদ করে দেয়। তাদের এই প্রবঞ্চনায় রসুল স. মর্মাহত হয়েছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে বদদোয়া করেছিলেন। এখন কথা হচ্ছে, এই মর্মবিদারক অবস্থা এবং উহুদের পর্যুদস্ততা — এসমস্ত যদি আল্লাহ্তায়ালার অনুমতিক্রমেই সংঘঠিত হয় (যেমন বলা হয়েছে, 'যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিলো তাহা আল্লাহের অনুমতিক্রমেই ঘটিয়াছিলো') তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, বৈধ অবৈধ সকল কার্যই কি আল্লাহ্তায়ালার অনুমোদন প্রাপ্ত? উত্তরে এই বলা যায় যে, ভালো মন্দ কোনো কাজই আল্লাহ্তায়ালার হুকুম ছাড়া সংঘঠিত হয় না। এটা তকদীরের লিখন। এই তকদীর বিশ্বাসীদেরকে মানতেই হয়। কিন্তু সুখ অথবা বিপদ কোনো অবস্থাই ইমানদারদের জন্য ক্ষতিকর নয়। কারণ তাঁরা সুখে কৃতজ্ঞ এবং দুঃখে ধৈর্য্যশীল। তাই সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থাই তাদেরকে উত্তম বিনিময় লাভের উপযোগী করে তোলে। কাফের ও মুনাফিকেরা এর বিপরীত। সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থাই তাদের অবিশ্বাস ও অপরিচ্ছন্নতাকে প্রবলতর করে।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৬৮, ১৬৯

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○

❒ যাহারা ঘরে বসিয়া তাহাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলিত যে তাহারা তাহাদের কথা মত চলিলে নিহত হইত না। তাহাদিগকে বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কর।'

❒ যাহারা আল্লাহের পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে কখনোই মৃত মনে করিওনা। না, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত ও তাহারা জীবিকা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মৃত্যুর সময় ও স্থান নির্ধারিত। মৃত্যু সমুপস্থিত হলে ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য কারো নেই। মৃত্যু নিশ্চিত। মুনাফিকেরা অজ্ঞ, তাই বলেছে, তাদের শহীদ স্বজনেরাও বেঁচে থাকতে পারতো যদি তাদের মতো যুদ্ধে না যেতো। আল্লাহ্ তাই

www.eelm.weebly.com

তাঁর প্রিয়তম নবীর মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, তোমরা যদি তোমাদের কথায় আস্থাশীল হও তবে মৃত্যুকে সরিয়ে দিও। এটা যে অসম্ভব — তা বুঝিয়ে দেয়াই এই বাক্যটির উদ্দেশ্য।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁরা মৃত নন। মহিমান্বিত জীবনের অধিকারী তাঁরা। ইবনে মাজা ও বাগবী বলেছেন, হাসান সনদে তিরমিজী এবং বিশুদ্ধ সনদে ইবনে খুজাইমা উল্লেখ করেছেন, হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বলেছেন, একবার রসুলে পাক স. আমাকে দেখে বললেন, জাবের! তুমি বিষন্নচিত্ত কেনো? আমি বললাম, আমার পিতা শহীদ হয়েছেন। তাঁর সন্তান-সন্তুতি, সম্পদ সব কিছুই পড়ে থাকলো। রসুল স. বললেন, আমি কি তোমাকে জানাবো না, তোমার পিতা কীভাবে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয়েছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল, জানিয়ে ধন্য করুন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ কারো সঙ্গে কথা বললে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলেন। কিন্তু তোমার পিতাকে জীবিত করে আল্লাহ্ অন্তরালবিহীন বাক্যলাপ করেছেন। বলেছেন, বান্দা, বলো, অভিলাষ কী? আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করবো। তোমার পিতা বললেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আবার আমাকে পৃথিবীতে পাঠাও যেনো আমি পুনরায় তোমার রাস্তায় শহীদ হতে পারি। আল্লাহ বলেছেন, আমার সিদ্ধান্ত চিরন্তন। মৃত্যুর পর পুনরায় পৃথিবীবাস আমার বিধান নয়। বর্ণনাকারী বলেছেন, এ সমস্ত শহীদদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, 'যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে কখনোই মৃত মনে করিও না।'

মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, হাকেম এবং বাগবী, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, উহুদের শহীদগণের রূহকে আল্লাহতায়ালা সবুজ পাখির মধ্যে স্থাপন করলেন। পাখিরা জান্নাতের নির্ঝরিনীর পানি পান করে, জান্নাতের ফল ভক্ষন করে, ইচ্ছামতো উড়াল দেয়। ফিরে ফিরে এসে বিশ্রাম গ্রহণ করে আল্লাহর আরশের সোনালী বিভায়। এই চিরস্থায়ী সুখ সন্দর্শনে পাখিরা বললো, এই আনন্দের সংবাদ আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষদেরকেও দেয়া হোক, যেনো তারাও আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার সুযোগ অন্বেষণ করতে পারে। আল্লাহ বললেন, আমি তাঁদেরকে এই সংবাদ জানিয়ে দিব। আল্লাহতায়ালার এই ঘোষণায় শহীদগণ পুলকিত হলেন। আল্লাহতায়ালা তখন এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

এরকমও বলা যেতে পারে, শহীদগণের পৃথিবীবাসী আত্মীয় স্বজন পার্থিব নেয়ামত আস্বাদনকালে আক্ষেপ করে বলে যে, তারা যদি বেঁচে থাকতো তাহলে আমাদের মতো নেয়ামত ভোগ করতে পারতো। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

'মৃত মনে করিওনা' — এই সম্বোধন রসুলে পাক স. কে করা হয়েছে। অথবা শহীদগণের আত্মীয় স্বজনকে কিংবা মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

ইবনে মুনজির হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, উহুদে হজরত হামজা ও তাঁর সাথীগণ শাহাদাত লাভের পর অবিস্মরণীয় নেয়ামত প্রাপ্ত হয়ে বলেছিলেন, কোনো সংবাদদাতা যদি আমাদের এই অভূতপূর্ব বিনিময় লাভের কথা আমাদের স্বজনদেরকে পৌঁছে দিতো! তাঁদের এই অভিলাষ পূর্ণ করতেই আল্লাহ্‌পাক এই আয়াত নাজিল করেছেন।

'সাবিলিল্লাহ্' অর্থ জেহাদ। যাঁরা আল্লাহ্‌র পথে অটল ও সাধনারত তারাও জেহাদে শামিল। শ্রেষ্ঠ জেহাদ হচ্ছে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এটাকে জেহাদে আকবর বলে। সশস্ত্র যুদ্ধ হচ্ছে জেহাদে আসগর বা ছোট যুদ্ধ। কিন্তু এই আয়াতে আল্লাহ্‌র পথে নিহত হওয়া বলতে কেবল সশস্ত্র যুদ্ধে শহীদদেরকেই বিশেষভাবে বোঝানো হয়েছে। এই শহীদগণ অতুলনীয় নেয়ামতের অধিকারী হবেন।

'তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত' — এই মর্মে আবুল আলীয়া বলেছেন, তাঁরা সবুজ পাখির আকার নিয়ে জান্নাতের মধ্যে যথেচ্ছা ওড়াউড়ি করতে পারবেন। বর্ণনা করেছেন ইবনে হাতেম। ইমাম বাগবী লিখেছেন, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আল্লাহ্‌র আরশের নিচে তাঁদের রূহ সমূহ রুকু ও সেজদারত থাকবে।

ইবনে মান্দা বর্ণনা করেছেন, হজরত তালহা বিন আবদুল্লাহ্ বলেছেন, আমি জঙ্গলে আমার হারানো উট অনুসন্ধান করছিলাম। খুঁজতে খুঁজতে রাত হয়ে গেলো। সেখানে আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারামের কবর ছিলো। আমি কবরের পাশে দাঁড়ালাম। শুনলাম কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ। কোরআনের এরকম সুমিষ্ট আবৃত্তি আগে কখনো শুনিনি। আমি রসুলে পাক স. এর খেদমতে হাজির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। রসুল স. বললেন, শহীদদের এরকম অবস্থাই হয়। শহীদদের রূহ কবজ করে নিয়ে আল্লাহ্‌তায়ালা জমরুদ ও ইয়াকুতের ঝাড়ে স্থাপন করেন এবং সেই ঝাড়কে জান্নাতে ঝুলিয়ে রাখেন। রাত্রি এলে সেই রূহ সমূহ তাদের আপনাপন কবরে চলে আসে। ফজরের সময় সেগুলো আবার জান্নাতে ফিরে যায়। এই বর্ণনাটির মাধ্যমে বোঝা যায় মৃত্যুর পরও শহীদগণ উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত হতে থাকেন। তাঁদের পবিত্র মরদেহ পঁচেনা। মৃত্তিকাও তাঁদেরকে আত্মস্থ করতে পারে না। এটাও তাঁদের জীবিত থাকার একটি নিদর্শন।

আপন সূত্রে বায়হাকী এবং ভিন্ন সূত্রে ইবনে সা'দ ও বায়হাকী ও মোহাম্মদ বিন আমর তাঁর মাশায়েখগণের সূত্রপরম্পরায় উল্লেখ করেছেন, হজরত জাবের বলেছেন, যখন হজরত মুয়াবিয়া নহর খনন করলেন, তখন আমরা ভয়ে ভয়ে উহুদের শহীদগণের মাজারে পৌঁছলাম। খননকালে তাঁদের মাজার উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিলো। আমরা দেখলাম তাঁদের শরীর সম্পূর্ন সতেজ এবং তাঁদের হাত-পা জীবিত মানুষের মতো কোমল। মোহাম্মদ বিন আমর আরো বলেছেন, হজরত

www.eelm.weebly.com

জাবের তাঁর শহীদ পিতাকে দেখলেন, তিনি তাঁর জখমের উপর হাত রেখেছেন। জখম থেকে হাত সরিয়ে দিতেই দেখা গেলো রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তাঁর হাতকে পূর্বস্থানে স্থাপন করা হলো। তখন রক্ত বন্ধ হয়ে গেলো। হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, আমার পিতাকে দেখে মনে হলো তিনি স্বাভাবিকভাবে শুয়ে রয়েছেন। যে কম্বলে আবৃত করে তাঁকে দাফন করা হয়েছিলো, সেটি তেমনই রয়েছে। ছেচল্লিশ বছর পূর্বে তিনি শহীদ হয়েছিলেন। নহর খননকালে একজন শহীদের শরীরে কোদালের আঘাত লেগেছিলো। দেখা গেলো আঘাতের স্থান থেকে তাজা রক্ত বেরুচ্ছে। মাশায়েখগণ বলেছেন, তিনি ছিলেন হজরত হামজা। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, শহীদগণের জীবিত থাকা সবাই স্বীকার করতেন। নহর খননকালে তাদের কবর উন্মোচিত হতেই মেশক আম্বরের সুবাস ছড়িয়ে পড়েছিলো।

ইমাম বাগবী হজরত ওবায়েদ বিন উমায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, উহুদ প্রান্তর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রসুল স. শহীদ মুসআব বিন উমায়েরের কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দাঁড়ালেন এবং দোয়া করলেন। অতঃপর তেলাওয়াত করলেন, "মিনাল মু'মিনিনা রিজালুন সদাকু মা আহাদুল্লাহা আলাইহি" — 'আল্লাহ্র সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ কিছুসংখ্যক মুমিন তাদের কৃত অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করেছে।' তেলাওয়াত শেষে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, কিয়ামতের দিন এসমস্ত মানুষ আল্লাহ্র সকাশে শহীদ পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হবেন। সতর্ক হও! তোমরা শহীদগণের কবর জিয়ারত করবে এবং তাদেরকে সালাম বলবে। আমার জীবনাধিপতি পবিত্র সত্তার শপথ! তারা নিশ্চয়ই সালামের উত্তর দেবে।

ইমাম হাকেম এবং বায়হাকী হজরত আবু হোরায়রা থেকে, ইমাম বায়হাকী হজরত আবু জর থেকে এবং ইবনে মারদুবিয়া হজরত খাব্বাব রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. শহীদ মুসয়াব বিন উমায়েরের কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কবরের নিকটে দাঁড়ালেন এবং দোয়া করলেন। তারপর পড়লেন, 'কতিপয় মুমিন যারা সত্যবাদী, আল্লাহ তাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন।' এরপর বললেন, তোমাকে মক্কায় দেখেছিলাম উত্তম পরিচ্ছদাচ্ছাদিত এবং আনন্দচিত্ত অবস্থায়। আর আজ আল্লাহর পথে তোমার এহেন মুসলা (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্তিত করাকে মুসলা বলে)।

প্রশ্নঃ যারা শহীদ নন তারা কি শহীদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারবেন?

www.eelm.weebly.com

উত্তরঃ হ্যাঁ। পারবেন। শহীদদের মর্যাদার বর্ণনা দৃষ্টে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, অন্যেরা ওই মর্যাদা লাভ করতে পারবেন না। হজরত ওবায়েদ বিন খালেদের মাধ্যমে আবু দাউদ এবং নাসাঈ লিখেছেন, রসুল স. দুই ব্যক্তিকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। একজন আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়ে গেলেন। দ্বিতীয়জন ইন্তেকাল করলেন। এক জুমআ পর তার জানাযার নামাজ সমাধা হলে রসুল স. উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, তোমরা তাঁর জন্য কী বলেছো? তাঁরা বললেন, আমরা তাঁর মাগফেরাত ও রহমত লাভের দোয়া করেছি এবং বলেছি, আল্লাহপাক তাঁকে যেনো তাঁর শহীদ ভ্রাতার মর্যাদা পর্যন্ত উপনীত করেন। রসুল স. বললেন, তবে তার পরের নামাজ, রোজা ও সৎ আমলগুলো কোথায় যাবে? দু'জনের পার্থক্য তো আকাশ-জমীনের মতো (পরে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি প্রথম শহীদ ব্যক্তির চেয়ে অনেক উচ্চ মর্যাদাধারী। কারণ, তাঁর নামাজ রোজা ও নেক আমল বেশী)।

আম্বিয়া, শুহাদা, সিদ্দিকীন ও মুমিনীনের বর্ণনা সুরা মুতাফফিফিনের তাফসীরে আলোচিত হবে। আর বিশেষ করে শহীদগণের জীবিত থাকার প্রসঙ্গটি সুরা বাকারার, 'ওয়ালা তাকুলু লিমাইঁউক্‌তালু ফী সাবীলিল্লাহি আমওয়াত' আয়াতের তাফসীরে ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

'তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত।' অর্থাৎ প্রতিপালকের দৃষ্টিতে তাঁরা এমন নৈকট্যভাজন যা বর্ণনাবোধ্য নয়। মিলিত, প্রবিষ্ট, আকৃতিগত, বস্তুগত — কোনো দিক থেকেই এই নৈকট্যের ধরণ অনুভব যোগ্য নয়।

আমার শায়েখ এবং ইমাম হজরত মীর্জা মাযহারে জানে জানাঁ শাহাদাত লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আমি আমার কাশফের দৃষ্টিতে দেখেছি, আল্লাহ্‌তায়ালার জাতী তাজাল্লী তাঁর প্রতি অঝোর বৃষ্টির ধারার মতো বর্ষিত হচ্ছে। শহীদগণ আল্লাহর পথে জীবনপাত করেছেন। তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেছেন — 'ওয়ামা তুকাদ্দিমু লি আঙফুসিকুম মিন খইরিন তাজিদুহু ইনদাল্লাহ্।'

তোমরা নেক আমল সঞ্চয়ের পূর্বে প্রেরণ করবে, আল্লাহ্‌র সমীপবর্তী হওয়ার পর সে তদপেক্ষা উত্তম বিনিময় লাভ করবে। আল্লাহ্‌র পথে প্রাণপাতকারীগণ তাঁদের আপন অস্তিত্ব বিলীন করে দেন। তাই তাঁরা আল্লাহর অস্তিত্বরঞ্জিত 'জাতী' তাজাল্লী লাভ করেন।

তাঁরা জান্নাত থেকে রিজিক প্রাপ্ত। তাঁরা জীবিত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৭০

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

❒ আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে তাহারা আনন্দিত এবং তাহাদের পিছনের যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই

www.eelm.weebly.com

তাহাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে, এই জন্য যে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

শহীদগণ আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ লাভে ধন্য, আনন্দিত। তাঁদের এই অনন্যসাধারণ মর্যাদা জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করা দুরূহ। আবদুর রাজ্জাক মোসান্নাফ গ্রন্থে ইবনে আবী শায়বা, আহমদ এবং ইবনে মুনজির হজরত মাসরুকের উক্তি উল্লেখ করেছেন এরকম, আমরা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট এই আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, আমি রসুল স. এর নিকট এই আয়াত সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। রসুল স. বলেছেন, তাঁদের রূহসমূহ সবুজ রঙের পাখির বক্ষে সম্পৃক্ত থাকে। আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনায় রয়েছে, শহীদগণের আত্মা হবে সবুজ পাখির মতো। তাঁদের জন্য রয়েছে আরশের স্তম্ভের সঙ্গে ঝুলন্ত স্বর্ণালোকের ঝাড়। তাঁরা জান্নাতে যথা ইচ্ছা উড়াল দিতে পারেন। তাঁরা উড়াল দেন আর ফিরে ফিরে আসেন সেই স্বর্ন আলোকচ্ছটায়। আল্লাহতায়ালা প্রতিদিন তিনবার তাঁদেরকে এই প্রশ্নটি করবেন, তোমরা কি আমার কাছে কিছু চাও? অন্য বর্ণনায় এসেছে আল্লাহ বলবেন, তোমাদের যা ইচ্ছা তাই চাও আমার কাছে। তারা উত্তর দেবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কী চাইবো? আমরা তো জান্নাতে ইচ্ছে মতন ঘুরে বেড়াতে পারি। যখন তাঁরা দেখবেন কিছু যাঞ্চা করাটাই আল্লাহতায়ালার অভিপ্রেত, তখন তাঁরা নিবেদন করবেন, হে আমাদের আল্লাহ! আমরা চাই আমাদের রূহ সমূহকে আমাদের পার্থিব শরীরে পুনঃসংস্থাপিত করা হোক, যেনো আমরা তোমার পথে আরেকবার জেহাদ করতে পারি। আল্লাহ বলবেন, আমি কাউকে পৃথিবীতে পুনরায় পাঠাই না। আমার এই বিধান অলংঘনীয়।

শহীদগণ তাঁদের পৃথিবীবাসী আত্মীয়স্বজনদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত। তাঁদের নিশ্চিন্তির কারণ এই যে, আল্লাহতায়ালাই তাদের পক্ষ থেকে হকদারদের সন্তুষ্ট রাখেন এবং তাদের দাবী পূর্ণ করে দেন। আমি বলি, এ রকম অর্থ হওয়াও সম্ভব যে, শহীদগণ তাঁদের নিকটজনের জন্যে শাফায়াতের অধিকার লাভ করবেন। শাফায়াতের মাধ্যমে আপনজনরা আল্লাহর শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবেন। তাই ফেলে আসা স্বজনদের জন্য তাঁরা ভাবনামুক্ত, আনন্দিত।

আবু দাউদ ও ইবনে হাব্বান হজরত আবু দারদার উক্তি উল্লেখ করেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, তিনি স. বলেছেন, শহীদগণ আপন পরিবারভূত সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন। এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে আহমদ ও তিবরানী এবং হজরত মিকদাম বিন মাদী কারাব থেকে তিরমিজি ও ইবনে হাব্বান। ইবনে মাজা এবং বায়হাকী হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামত

www.eelm.weebly.com

দিবসে নবী আ. গণ শাফায়াত করবেন। তারপর শাফায়াত করবেন আলেমগণ। তার পর শহীদগণ। বায্যার এই হাদিস উল্লেখ করে শেষে লিখেছেন, অতঃপর মুয়াজ্জিন। আমি বলি, হাদিস শরীফে শাফায়াত প্রসঙ্গে শহীদগণের পূর্বে যে আলেমদের কথা বলা হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন ওলামায়ে রসেখীন। তাঁরাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের প্রকৃত আলেম।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৭১

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

❑ আল্লাহের অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তাহারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং ইহা এই কারণে যে আল্লাহ বিশ্বাসীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

শহীদগণ নেয়ামতের সুসংবাদ প্রাপ্ত। নেয়ামতের সঙ্গে এখানে ফযল শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। আমলের বিনিময়ের চেয়েও অনেক বেশী পাওয়াকে ফযল বলে। এখানে ফযলের অর্থ হবে দীদারে এলাহি ও কোরবতে এলাহি অর্থাৎ আল্লাহর দর্শন এবং আল্লাহর নৈকট্য। নেয়ামত ও ফযল ছাড়াও আরো একটি সুসংবাদ এই যে, আল্লাহ ইমানদারদের শ্রমপ্রচেষ্টা বিনষ্ট করেন না। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর কলেমাকে সমুন্নত করার জন্য জেহাদের উদ্দেশ্যে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়, তাঁর জিম্মাদারী গ্রহণ করেন স্বয়ং আল্লাহ্। আল্লাহ্ যদি তাঁর শাহাদাত মঞ্জুর করেন, তবে তাঁর জান্নাত লাভ নিশ্চিত। আর গৃহে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিলে তাঁকে দান করেন গণিমত ও সওয়াব। যাঁর অধিকারে আমার জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! তিনিই জানেন, আল্লাহর পথে যে আহত বা নিহত হয় তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী (আল্লাহর সন্তোষ সাধন, না কেবল যশলাভের জন্য বীরত্ব প্রদর্শন)। কিয়ামত দিবসে শহীদদের আঘাতপ্রাপ্ত স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে। রক্তের গন্ধ হবে মেশক আম্বরের সুবাসের মতো। বাগবী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, শহীদদের মৃত্যুকষ্ট পিপীলিকা দংশনের মতো। দারেমী, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি হাসান গরীব। সুনান গ্রন্থে নাসাঈ এবং ওয়াসাত গ্রন্থে তিবরানী বিশুদ্ধ ধারাবাহিকতার মাধ্যমে হজরত আবু কাতাদা থেকেও এ রকম বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে বদর যুদ্ধের শহীদদের সম্পর্কে। তাঁরা ছিলেন চৌদ্দজন। আটজন আনসার এবং ছয়জন

www.eelm.weebly.com

মুহাজির। কিন্তু এই বর্ণনাটি দুর্বল। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে বিরে মাউনার শহীদদের সম্পর্কে। ঘটনাটি মোহাম্মদ বিন ইসহাক, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই হজরত আনাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন এভাবে, আমের বিন মালেক বিন জাফর আমেরী রসুল স. এর দরবারে হাজির হয়ে দুটি ঘোড়া এবং দু'টি উট হাদিয়া পেশ করলো। রসুল স. বললেন, মুশরিকের দেয়া হাদিয়া আমি কবুল করবো না। যদি চাও আমি হাদিয়া কবুল করি, তাহলে মুসলমান হয়ে যাও। কিন্তু আমের বিন মালেক ও তার সাথীরা ইসলাম গ্রহণ করলো না। ইসলামকে অপছন্দও করলো না। দলনেতা আমের বললো, মোহাম্মদ যে আহবান জানাচ্ছেন তা অত্যন্ত সুন্দর। যদি তিনি তাঁর কতিপয় সঙ্গীকে নজদবাসীদের নিকট প্রেরণ করেন; তবে আমার ধারণা, তারা ইসলামের আহবানে সাড়া দিবে। রসুল স. বললেন, নজদবাসীদের নিকট লোক পাঠাতে আমি শংকা বোধ করি। আবু বারা বললেন, আমি তাদের নিরাপত্তার জিম্মাদারী গ্রহণ করছি। অতঃপর রসুল স. সত্তর জন ক্বারী (কোরআন পাঠক) সাহাবীকে একত্রিত করলেন। নেতা নির্বাচন করলেন হজরত মুনজির বিন ওমর সায়দীকে। হজরত আবু বকরের মুক্ত গোলাম আমের বিন ফাহিরাও ছিলেন এই দলে।

চতুর্থ হিজরীর সফর মাস। ক্বারীদের দল পথ চলতে চলতে গিয়ে পৌঁছলেন বিরে মাউনায়। বিরে মাউনা ছিলো বনু আমের এবং বনু সুলাইম এর মধ্যবর্তী একটি পাথুরে প্রান্তর। সেখান থেকে হজরত হারাম বিন মিলহানকে বনু আমেরের কিছু লোকের সাথে রসুলে পাক স. এর চিঠিসহ আমের বিন তোফায়েলের নিকট পাঠানো হলো। হজরত হারাম বললেন, আমি রসুলের দূত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসুল। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান আনয়ন করো। সহসা সেখানে হাজির হলো বল্লমধারী এক ব্যক্তি। সে বল্লম নিক্ষেপ করে হজরত হারামকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলো। বল্লমবিদ্ধ হজরত হারাম বললেন, আল্লাহু আকবর। কাবার প্রভুর কসম! আমি কামিয়াব। আমের বিন তোফায়েল চিৎকার করে বনি আমেরদেরকে সাহাবীগণকে আক্রমণ করতে বললো। বনি আমের তার আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে বললো, আবু বারা'র জিম্মাদারী ভঙ্গ কোর না। আমের বিন তোফায়েল তখন ডাক দিলো বনু সুলাইমকে। সুলাইম গোত্রের রায়াল, আসিয়া, জাকওয়ান ও অন্যান্যরা লাব্বায়েক বলতে বলতে সাহাবীগণকে ঘিরে ফেললো। অতর্কিত এই আক্রমণের ফলে ক্বাব বিন জায়েদ ছাড়া অন্য সকল সাহাবী শাহাদাত বরণ করলেন। গুরুতর আহত ক্বাব বিন জায়েদ মৃতবৎ পড়েছিলেন সঙ্গী শহীদগণের পাশে। কাফেরেরা তাঁকে মৃত মনে করেছিলো। ক্বাব বিন জায়েদ পরে খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। কাফেরেরা সেখানে উপস্থিত

www.eelm.weebly.com

আমর বিন উমাইয়াকেও বন্দী করলো। আমর বললেন, আমি মোজার গোত্রের লোক। তখন তাঁকে ছেড়ে দেয়া হলো। তিনি রসুল স. এর নিকটে গিয়ে এই মর্মবিদারক ঘটনাটি বিবৃত করলেন। রসুল স. বললেন, এই চক্রান্ত কি তবে আবু বারার? আবু বারা এসে আমর বিন তোফায়েলের বিশ্বাসভঙ্গের কথা জানিয়ে নতশির হয়ে রইলেন।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আমের বিন তোফায়েল তখন বলেছিলো, ওই ব্যক্তিকে পরলোকগমনের সময় আকাশের দিকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। মনে হচ্ছিলো, যেনো আকাশ নেমে এসেছে। লোকেরা বললো, তিনি আমের বিন ফাহিরা। অতঃপর বারার ছেলে রবীয়া আমর বিন তোফায়েলকে আক্রমণ করলেন। আমর তখন তার ঘোড়ার পিঠে। রবীয়া বল্লমের আঘাতে তাকে হত্যা করলেন।

বোখারী ও মুসলিম হজরত কাতাদা এবং হজরত আনাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এ রকম, রায়েল, জাকওয়ান, আসিয়া এবং লেহইয়ান গোত্র চতুষ্টয় রসুল স. এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, আমরা মুসলমান হয়েছি। শত্রুদের মোকাবেলা করতে হবে। আমাদেরকে সৈন্য সাহায্য দিন। রসুল স. সত্তর জন ক্বারী সাহাবীকে তাদের সাহায্যকারী করে দিলেন। তাঁরা সকলে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করতেন। রাতে নামাজে নিমগ্ন হতেন। বিরে মাউনা নামক স্থানে মুসলমান নামধারী কপটেরা তাঁদেরকে শহীদ করে দেয়। এই সংবাদ রসুল স. এর জন্য ছিলো অত্যন্ত মর্মবিদারক। তিনি এক মাস ধরে ফজরের নামাজে দোয়া কুনুত পড়েছিলেন। ওই দোয়া কুনুত ছিলো রায়াল, জাকওয়ান, আসিয়া এবং বনী লেহইয়ানদের জন্য বদদোয়া।

ইমাম আহমদ, মুসলিম এবং বায়হাকী হজরত আনাস থেকে, বায়হাকী হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এবং বোখারী, হজরত ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, একদল লোক রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, কোরআন ও সুন্নার শিক্ষক হিসাবে আমাদেরকে কিছু লোক দিন। রসুল স. আনসার সাহাবীদের মধ্য থেকে সত্তর জন ক্বারীকে তাদের সঙ্গী করে দিলেন। যথাস্থানে পৌছার আগেই ওই কপটচারীরা ক্বারী সাহাবীদেরকে শহীদ করে দিলো। শাহাদাতের প্রাক্কালে তাঁরা বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমাদের এই বিপর্যস্ত অবস্থার সংবাদ আমাদের নবীর কাছে পৌছে দাও। অন্য বর্ণনায় এসেছে, হে আল্লাহ! আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দকে জানিয়ে দাও যে, আমরা তোমাকে পেয়েছি। আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ ওহির মাধ্যমে তাঁর রসুলকে জানিয়ে দিলেন, 'তারা আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।'

www.eelm.weebly.com

হজরত আনাস বলেছেন, প্রথম দিকে আমরা বিরে মাউনার শহীদদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ এই আয়াতটি পড়তাম — 'বাল্লিগু আন্না কাওমানা আন্না ক্বদ লাকীনা রব্বানা ফা রদিয়া আন্না ওয়া আরদনা।' 'আমাদের সম্প্রদায়কে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়ে দাও আমরা তাদের প্রতি রাজী।' পরে এই আয়াতটি রহিত করে দেয়া হয়েছে এবং কোরআন থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হচ্ছে। রসুল স. এই ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি স. একাধারে চল্লিশ দিন ফজরের নামাজে দোয়া কুনুতের মাধ্যমে রায়েল, জাকওয়ান, আসিয়া এবং বনী লেহইয়ানদেরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

ইমাম বাগবী, হজরত আনাস থেকে এই অতিরিক্ত বর্ণনাটি করেছেন যে, আমরা এই আয়াত এক যুগ ধরে পড়েছিলাম। অতঃপর একে উঠিয়ে নেয়া হলো। তৎপরিবর্তে আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, 'ওয়ালা তাহ্ সাবান্নাল্লা জিনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াতা.......শেষ পর্যন্ত। আমি বলি, এই আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে মতদ্বৈধতা রয়েছে। কিন্তু এই আয়াত প্রকৃতপক্ষে বিরে মাউনার শহীদগণসহ সকল শহীদদেরকেই অর্ন্তভূত করেছে। সুতরাং হুকুমটি আম (সাধারণ)।

<u>মাসআলা</u> ঃ আলেমদের ঐকমত্য এই যে, শহীদদেরকে গোসল দিতে হয় না। উহুদ যুদ্ধের শহীদগণকেও গোসল করানো হয়নি। রসুল স. এর নির্দেশে তাঁদের দেহ থেকে অস্ত্র ও চামড়ার জিনিসপত্র খুলে নেয়া হয়েছিলো। তারপর রক্তমাখা কাপড়সহ গোসল ব্যতিরেকেই তাঁদেরকে দাফন করা হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন আবু দাউদ ও ইবনে মাজা।

নির্দোষ সনদের মাধ্যমে নাসাঈ, হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাবা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তাদেরকে রক্তরঞ্জিত অবস্থাতেই দাফন করে দাও। যারা আল্লাহ্র রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেছে, কিয়ামত দিবসে তাঁরা রক্তরঞ্জিত অবস্থাতেই উত্থিত হবে। রক্তের রঙ হবে লাল এবং তার সুবাস হবে মেশক আম্বরের। এ ধরনের আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, হজরত জাবের থেকে। বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি বুকে তীরবিদ্ধ হলেন এবং তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। রক্তাক্ত শরীর এবং পরিচ্ছদসহই তাঁকে দাফন করা হলো। আমি তখন রসুলে পাক স. এর সঙ্গে একই বাহনে উপবিষ্ট ছিলাম।

<u>মাসআলা</u> ঃ শারীরিক অপবিত্রতা অবস্থায় কেউ শহীদ হয়ে গেলে তাঁকে গোসল দিতে হবে কিনা? এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গোসল দিতে হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হবে না। তাঁদের পক্ষে দলিল এই হাদিসটি, রসুল স. বলেছেন, তাদেরকে রক্তমাখা কাপড় সহই দাফন করো। ইমাম আবু হানিফা তাঁর পক্ষে

www.eelm.weebly.com

হানযালা বিন আবী আমেরের ঘটনাটি দলিল হিসাবে পেশ করেন। ঘটনাটি এই, রসুল স. বলেছেন, আমি দেখলাম, ফেরেশ্‌তারা হানযালাকে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি রূপার পাত্রে স্থাপন করে শ্বেতশুভ্র মেঘপুঞ্জমিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করাচ্ছে। হজরত আবু উসাইয়েদ সায়দী বর্ণনা করেন, আমরা হজরত হানযালার সদ্যস্নাত মরদেহ দেখতে পেলাম। দেখলাম তখনো তাঁর মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে পড়ছে। আমি রসুল স. কে জানালাম এ কথা। রসুল স. হজরত হানযালার অবস্থা জানতে চেয়ে তাঁর স্ত্রীর নিকট লোক পাঠালেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, সঙ্গমপরবর্তী গোসল না করেই তিনি যুদ্ধের ময়দানে ছুটে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর বংশধরদেরকে গাছাছুল মালায়িকার (ফেরেশতা কর্তৃক গোসলকৃতের) বংশ বলা হতো।

ইবনে জাওজী এই হাদিসকে মোহাম্মদ বিন সা'দের মুরসাল বর্ণনা থেকে এবং ইবনে হাব্বান, হাকেম ও বায়হাকী ইবনে ইসহাকের সিলসিলার মাধ্যমে উদ্ধৃত করেছেন। হাকেম উদ্ধৃত করেছেন আবু উসাইয়েদ থেকে। কিন্তু তাঁর সনদ শিথিল। হাকেম, তিবরানী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস থেকে। হাকেমের বর্ণনাসুত্রের একজনের নাম মুয়াল্লা বিন আব্দুর রহমান। তিনি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত নন। তিবরানীর সূত্রমধ্যে হাজ্জাজের নাম নেই। আর বায়হাকীর সূত্রসংযুক্ত আবী শায়বাও দুর্বল।

<u>মাসআলা</u> ঃ ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, শহীদদের জানাযার নামাজ পড়তে হবে না। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ থেকে পড়তে হবে ও হবে না—দু'রকমই বর্ণনা পাওয়া যায়।

আমাদের বক্তব্য এই যে, জানাযার নামাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাগফেরাত কামনা, মৃত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন অথবা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির প্রার্থনা। আর শহীদগণ এমনিতেই অনন্যসাধারণ মর্যাদাধারী। তবে জানাযার নামাজ না পড়ার কারণে মৃত ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধি পায় এ কথাও ঠিক নয়। ঠিক হলে রসুল স. এর জন্য এ রকম করা হতো। সৃষ্টির মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। তবুও তাঁর জানাযা পড়া হয়েছিলো। প্রকৃত কথা এই যে, শরিয়তসম্মত নিষিদ্ধতা না থাকলে নামাজ বাদ দেয়া বৈধ নয়। ইমাম শাফেয়ী, হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, উহুদ যুদ্ধের শহীদদেরকে এক বস্ত্রে দু'জন করে দাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন রসুলে পাক স.। দাফন করার আগে রসুল স. জানতে চাইতেন, এ দু'জনের মধ্যে কোরআন সম্পর্কে কে বেশী জানে? কোরআনের জ্ঞান যার বেশী, প্রথমে তাঁকে এবং পরে অন্যজনকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিলো। এই নিয়মে সকলের দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর রসুল স. বললেন, আমি তাদের কিয়ামত দিবসের সাক্ষী। রসুল স. তাঁদেরকে গোসলও করাননি, জানাযার নামাজও পড়াননি। বোখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান।

www.eelm.weebly.com

হজরত আনাস বলেছেন, উহুদ প্রান্তরে এক সঙ্গে দু'জন, কখনও তিনজনকে একই কাফন দিয়ে দাফন করা হয়েছিলো। তাদের জন্য জানাযাও পড়া হয়নি। তিরমিজি, আহমদ, আবু দাউদ, হাকেম। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি হাসান। হাকেম বলেছেন, সহীহ্। আর বোখারী বলেছেন, মুয়াল্লাল। তিনি লিখেছেন, জুহ্‌রী এবং আনাস থেকে উসামা বিন জায়েদের বর্ণনাটি ভুল। তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন হজরত জাবেরের বর্ণনাটিকে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, রসুল স. ছিলেন আহত, রক্তাক্ত। তাঁর পবিত্র দাঁত উৎপাটিত হয়েছিলো। তাই তিনি শহীদদের জন্য জানাযার নামাজ পড়েননি। হয়তো অন্যান্যরা পড়েছিলেন। আবু দাউদ, হাকেম এবং তাহাবী, হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত আমীর হামজার পাশ দিয়ে গমনকালে দেখেছিলেন তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে। তখন তিনি তাঁর জানাযা পড়েছিলেন। অন্য শহীদদের জন্য তিনি জানাযা পড়েননি। তাহাবীর বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে এতোটুকু, রসুল স. বলেছেন, আমি কিয়ামত দিবসে তাদের জন্য সাক্ষী হবো।

একটি ধারণা ঃ দারা কুতনী এই হাদিস উদ্ধৃত করে লিখেছেন, রসুল স. হজরত হামজা ব্যতীত অন্য শহীদদের জানাযা পড়েননি, একথা ওসমান বিন আমর ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণনাকারী বলেননি। আমরা বলি, ইবনে জাওজী লিখেছেন, ওসমান বর্ণিত হাদিস বোখারী এবং মুসলিমও বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য (সিকাহ্)। এরকম বর্ণনাকারীর অতিরিক্ততাও গ্রহণীয়। বায়হাকী লিখেছেন, শহীদদের জানাযা পড়া সুন্নত না হলে রসুল স. হামজার জানাযা পড়তেন না। তিনি হামজার জন্য জানাযা পড়েছিলেন। অন্যদের জন্য পড়েননি। গুরুতর আহত ছিলেন তিনি। হজরত জাবের বলেছেন, যুদ্ধশেষে স. হজরত হামজার অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু পেলেন না। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, আমি দেখলাম একটি বৃক্ষের নিকট রসুল স. হজরত হামজার ক্ষতবিক্ষত মরদেহ দেখতে পেলেন। সশব্দে কেঁদে উঠলেন তিনি। এক আনসারী সাহাবী একটি চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন হজরত হামজার পবিত্র দেহাবয়বকে। রসুল স. তাঁর জন্য জানাযা পড়লেন। অন্যান্য শহীদদেরকেও হজরত হামজার বরাবর এনে একত্রিত করা হলো। সকলের জন্যই তিনি জানাযার নামাজ পড়লেন। বললেন, হামজা শহীদগণের সর্দার। বিশুদ্ধ সনদসহ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম হাকেম। তাঁর সনদসংযুক্ত এক জনের নাম মোফাদ্দল বিন সাদাকাহ্ আবু হাম্মাদ হানাফী। কেউ কেউ তাঁকে বর্জনীয় বলেছেন। নাসাঈ ও ইয়াহ্‌হিয়া বলেছেন, দূর্বল। আহওয়াজী বলেছেন, আতা বিন মুসলিম তাঁকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। তাঁর পুরাপুরি প্রশংসা করেছেন আহমদ বিন মোহাম্মদ বিন শোয়ায়েব। ইবনে আদি বলেছেন, আমি তাঁর মধ্যে খারাপ কিছু পাইনি। তাই এই হাদিসটিকে হাসান পর্যায়ভুক্ত থেকে বিচ্যুত বলা যায় না।

www.eelm.weebly.com

ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর নির্দেশে হজরত হামজার পবিত্র মরদেহ চাদরাবৃত করা হলো এবং তিনি সাত তকবীরের সঙ্গে জানাযার নামাজ আদায় করলেন। এরপর অন্যদের লাশ এনে একত্রিত করা হলো। তিনি স. পুনরায় হজরত হামজাসহ সকলের জানাযা পড়লেন। তিনি হজরত হামজার নামাজ বাহাত্তর বার পড়েছিলেন। ইবনে ইসহাক এই হাদিসটি উল্লেখ করে বলেছেন, এই হাদিসের বর্ণনাকারী এমন এক ব্যক্তি, যিনি মিথ্যাচারের দোষমুক্ত। তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন মোকসাম। তিনি হজরত আব্বাসের মুক্ত দাস। মুসলিমের ভূমিকায় উল্লেখিত পূর্ণ সূত্রটি এ রকম — শায়বা, হাসান বিন আম্মার, হিকাম, মোকসাম, ইবনে আব্বাস। বর্নিত হয়েছে, রসুল স. উহুদের শহীদদের জন্য জানাযার নামাজ পড়েছেন। এ ব্যাপারে আমি হাকেমের নিকট জানতে চাইলে তিনি বললেন, রসুল স. উহুদের শহীদদের জানাযা পড়েননি। সুহাইলি বলেছেন, হাসান বিন আম্মার দুর্বল। হাফেজ লিখেছেন, হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাকেম, ইবনে মাজা, তিবরানী এবং বায়হাকী — ইয়াজিদ বিন জিয়াদ, মোকসাম, ইবনে আব্বাসের সুত্রে। হাফেজ বলেছেন, ইয়াজিদের রয়েছে দুর্বলতা। ইবনে জাওজী বলেছেন, বর্ণনাটি পরিত্যাজ্য। বোখারী ও নাসাঈ বলেছেন, বর্জনীয়।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. হজরত হামজার জানাযা পড়েছেন সত্তর বার। আহমদ। এই বর্ণনাটিও দুর্বল। কিন্তু ইবনে হুম্মাম বলেছেন, হাদিসটি হাসানের স্তরবিচ্যুত নয়। আবু মালেক গাফ্ফারী থেকে বর্ণিত হয়েছে (আবু দাউদও এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন), রসুল স. দশজন দশজন করে একত্রিত করে জানাযা পড়েছেন। প্রতি দশজনের মধ্যে হজরত হামজাকেও শামিল করেছেন। তিনি হজরত হামজার জানাযা পড়েছিলেন সত্তর বার। হাফেজ বলেছেন, এই হাদিসের বর্ণনাকারী সিকাহ্। বর্ণনাকারীর প্রকৃত নাম আজওয়ান বিন মালেক। তিনি ছিলেন তাবেয়ী। ইমাম শাফেয়ী এই হাদিসকে মুয়াল্লাল বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, এর বর্ণনাভঙ্গিতে রয়েছে বিরোধাভাস। দশজন দশজন করে জানাযা পড়লে জানাযার নামাজের সংখ্যা দাঁড়ায় সাত। এই দ্বিধাদীর্ণতার জবাব দেয়া হয়েছে এইভাবে, দশজনকে একত্রিত করে একত্রে একবার জানাযা পড়া হয়েছে, হাদিসটির বক্তব্য এ রকম নয়। বরং ব্যাপারটা এরকম, তিনি প্রতি শহীদের জন্য একবার জানাযা পড়েছেন এবং প্রতিবারই হজরত হামজাকে শামিল করেছেন।

এই হাদিস দ্বারা রসুল স. যে শহীদগণের জানাযার নামাজ পড়েছিলেন, তা প্রমাণ হয়ে যায়। অপরদিকে নামাজ না পড়ার হাদিসগুলোও সঠিক। কারণ ব্যক্তিগতভাবে তিনি জানাযার নামাজে শরীক ছিলেন না। তিনি সাহাবীগণকে

www.eelm.weebly.com

নামাজ পড়ার হুকুম দিয়েছেন। তাই হুকুমদাতা হিসাবে তিনিও জানাযায় শামিল। তাই জানাযা পড়েছেন বলা যেতে পারে। পড়েননি, তাও বলা যেতে পারে। কারণ, তিনি নিজে পড়েননি।

ইমাম নাসাঈ ও তাহাবী সাদ্দাম বিন হাদের মাধ্যমে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন, হিজরতের সময় এক বেদুইন রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে মুসলমান হলেন। তাঁর দেখাশোনার জন্য রসুল স. একজন সাহাবীকে নিযুক্ত করেছিলেন। এর পর এক জেহাদের গনিমতের মাল বন্টনকালে রসুল স. বেদুইনকেও তাঁর অংশ দিলেন। বেদুইন আরজ করলেন, আমি এজন্যে তো আপনার অনুসারী হইনি। নিজের গলা দেখিয়ে তিনি বললেন, আমি চেয়েছি এখানে তীর বিদ্ধ হোক এবং আমি শাহাদাত বরণ করে জান্নাত লাভ করি। পরে ওই বেদুইন শহীদ হলেন। দেখা গেলো তাঁর গলাতে তীর লেগেছে। রসুল স. তাঁকে সামনে রেখে জানাযার নামাজ পড়লেন। তিনি প্রকাশ্যে তাঁর জন্য দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তোমার ওই বান্দা হিজরত করেছে এবং শহীদ হয়েছে, আমি এর সাক্ষী। হাদিসটি মুরসাল। আর আমাদের নিকট মুরসাল হাদিসও কোনো কোনো সময় মাসআলা উদ্ভাবনের স্পষ্ট দলিল হয়।

জ্ঞাতব্য ঃ বোখারী ও অন্যান্যরা উকবা বিন আমের থেকে লিখেছেন, রসুল স. উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের জানাযার নামাজ আট বছর পর অর্থাৎ ইন্তেকালের কিছু আগে পড়েছেন। বায়হাকী এই হাদিসে উল্লেখিত সালাত শব্দটির অর্থ করেছেন দোয়া (অর্থাৎ রসুল স. আট বছর পর শহীদদের জন্য দোয়া করেছেন)। ব্যাখ্যাটি অতিরিক্ত মনে হয়। আট বছর পর কেবল একবার দোয়া করেছেন, এই চিন্তাটি যথাযথ নয়। কারণ তাহাবী ও অন্যান্যের বর্ণনায় এসেছে, একদিন রসুল স. গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে শোহাদায়ে উহুদের জন্য নামাজ পড়েছেন, মৃতদের জন্য যে রকম নামাজ পড়া হয়। হানাফীদের নিকট তিন দিন পর মৃত ব্যক্তির জন্য নামাজ বৈধ নয়। অথচ এখানে আট বছর পর জানাযার নামাজ পাঠের কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে তবে হানাফীগণ কী বলবেন? আমার নিকট এর উত্তর এই যে, তিন দিন পরে জানাযার নামাজ বৈধ নয়, এর কারণ হিসাবে হানাফীগণ উল্লেখ করেছেন, তিন দিন পর কবরস্থ লাশ ফেটে যায়। মৃতব্যক্তির অবয়ব তখন আর অবিকৃত থাকে না। কিন্তু শহীদগণ তো অন্যরূপ। মাটি তাদের শরীরকে ভক্ষণ করার অধিকার রাখে না। তাদের শরীর বিকৃতও হয় না। তাই তাদের ব্যাপার স্বতন্ত্র। আর রসুল স.ও যেহেতু আট বছর পরে তাদের জানাযা পড়েছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে তাই তাঁদের জন্য জানাযা পাঠ অবশ্যই বৈধ।

ফারিয়ানী, নাসাঈ ও তিবরানী বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরায় হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এ রকম, উহুদ যুদ্ধ শেষে মক্কা প্রত্যাবর্তনকালে মুশরিক

www.eelm.weebly.com

বাহিনী বলাবলি করতে লাগলো, বড্ড ভুল হয়ে গেলো! মোহাম্মদ কে হত্যা করা গেলো না। যুবতী মহিলাদের প্রতিও কোনো আক্রমণ পরিচালিত হলো না। চলো আবার ফিরে যাই। রসুল স. এই সংবাদ জানতে পেরে সবাইকে ডাকলেন। লাব্বায়েক বলতে বলতে সাহাবীরা হাজির হয়ে গেলেন।

মোহাম্মদ বিন আমর বর্ণনা করেছেন, সেদিন ছিলো শনিবার। সেদিনই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন রসুল স.। সাহাবীগণ সকলেই রণক্লান্ত। শত্রুদের পুনরাক্রমণের আশংকায় তবুও সবাইকে পুনরায় যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে হলো। রসুল স. এর গৃহের চতুর্দিকে সারা রাত পাহারারত রইলেন সকলে। পরদিন রবিবার। ফজরের আযান দিলেন হজরত বেলাল। সাহাবীগণ নামাজের অপেক্ষায় রইলেন। রসুল স. বেরিয়ে আসতেই এক মাজানী ব্যক্তি মুশরিক বাহিনীর গতিবিধির সংবাদ জানালো। মুশরিকদের কথপোকথন ছিলো এ রকম, তাদের দলনেতা আবু সুফিয়ান বললো, চলো আবার যাই। অবশিষ্টদেরকে উৎপাটিত করি। সাফওয়ান বিন উমাইয়া ভিন্নমত পোষণ করলো। বললো, এ রকম কোর না। তারা তো পরাজিত হয়েছেই। আমার আশংকা, খাজরাজ গোত্রের অবশিষ্ট লোকেরা একাত্রিত হয়ে এবার আমাদেরকে আক্রমণ করবে। তখন আমরা আর পরাজয় ঠেকিয়ে রাখতে পারবো না। তাই চলো মক্কার দিকেই যাই। রসুল স. বলেছেন, সাফওয়ানের কথাই ঠিক। আমার জীবনাধিপতি ওই পবিত্র সত্তার শপথ! মুশরিকদের প্রতি প্রস্তরবর্ষণের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। তারা ফিরে এলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতঃপর রসুল স. হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরকে ডেকে মুশরিক বাহিনীর অবস্থা জানালেন। তাঁরা বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে, যাতে তারা পুনরাক্রমণের দুঃসাহস পরিত্যাগ করে। রসুল স. তখন হজরত বেলালকে ডেকে বললেন, ঘোষণা করে দাও। রসুল স. তোমাদেরকে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। হজরত বেলাল ঘোষণা করলেন। সবাই একত্রিত হলেন। দেখা গেলো হাজির হয়েছেন কেবল তাঁরাই যাঁরা গতকাল যুদ্ধ করেছিলেন। উসাইয়েদ বিন হাদীরের শরীরে ছিলো নয়টি আঘাত। তিনি তাঁর জখমের চিকিৎসা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। পুনরাক্রমণের আহবান শুনে তিনি বললেন, থাক, চিকিৎসার আর দরকার নেই। সকলে চলুন আল্লাহ্র রসুলের ডাকে সাড়া দেই। বনু সালমা গোত্রে আহত হয়েছিলেন চল্লিশ জন। এই যুদ্ধাহতরাও এসে পড়লেন। তোফায়েল বিন নোমান তেরটি, খারাশ বিন সুমহা দশটি, কাব বিন মালেক দশের অধিক এবং আতিয়া বিন আমের নয়টি আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁরাও এসে হাজির হলেন। রক্তাক্ত শরীরের দিকে দৃকপাত ছিলো না তাঁদের। উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে প্রস্তুত হলেন সবাই।

ইবনে ওতবা বর্ণনা করেছেন, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বললো, হে রসুল! আমি আপনার উটের সঙ্গে থাকতে চাই। রসুল স. বললেন, না। ইবনে ইসহাক এবং মোহাম্মদ বিন ওমর বর্ণনা করেন, হজরত জাবের বিন

www.eelm.weebly.com

আবদুল্লাহ আরজ করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি গতকাল যুদ্ধে যাইনি। কারণ এই, আমি যুদ্ধপ্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমার পিতা বললেন, তুমি তোমার বোনদের হেফাজতে থাকো। আমার বোন সাতজন (অথবা নয়জন)। আমার পিতা বললেন, এদেরকে অরক্ষিত রেখে যাওয়া না তোমার জন্য শোভনীয় হবে, না আমার জন্য। বরং আমি যুদ্ধে যাই। তুমি এদের দেখাশোনা করো। আমার একান্ত ইচ্ছা আমি শহীদ হই। যদি শহীদ হই তবে এরা অভিভাবকহীন হবে না। আমি তাই যুদ্ধে যাইনি। আমার পিতা গতকাল শহীদ হয়েছেন। এখন আমার সুযোগ। দয়া করে আমাকে সঙ্গে নিন। রসুল স. রাজী হলেন। হজরত জাবের আরো বলেছেন, যারা যুদ্ধে যায়নি, তাদের অনেকে অনুমতি প্রার্থনা করলো। কিন্তু রসুল স. আমি ছাড়া আর কাউকে অনুমতি দেননি। রসুল স. সত্তরজনকে সঙ্গে নিলেন। শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ওই সত্তর জনের মধ্যে ছিলেন হজরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, জুবায়ের, সাদ, আবদুর রহমান বিন আউফ, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হোজায়ফা বিন ইয়ামান এবং আবু উবাদা (রাদিআল্লাহ আনহুম)। আমরাউল আসাদ নামক স্থানে এসে থামলেন রসুল স.। এই স্থানটি মদীনা থেকে আট মাইল দূরে। এখান থেকে বামদিকে জুল হুলায়ফা পর্যন্ত রাস্তা চলে গেছে। সাদ বিন উবাদা যুদ্ধ যাত্রার জন্য তিরিশটি উট প্রস্তুত করলেন। এ ছাড়া জবেহ করে খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য রাখলেন কয়েকটি উট। সোমবার এবং মঙ্গলবার — এই দুই দিন অবস্থান গ্রহণ করলেন রসুল স.। ওদিকে তখন শত্রুপক্ষের কাছেও এই সংবাদ পৌঁছে গিয়েছে। তারা বুঝলো, প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরা পরাজিত হয়নি। সারাদিন রসুল স. সকলকে নিয়ে অনেক লাকড়ি সংগ্রহ করলেন। সন্ধ্যায় আগুন জ্বালানো হলো। রসুল স. এর নির্দেশ মতো পাঁচশত স্থানে আগুন প্রজ্বলিত করা হলো। উদ্দেশ্য, দূর থেকে মুশরিকেরা যেনো আগুন দেখে বুঝতে পারে তাদেরকে আক্রমণ করতে এসেছে মুসলমানদের বিশাল বাহিনী।

তিহামা নামক স্থানের মুশরিকেরা বনী খোজায়া গোত্রের মুসলমান এবং কাফেরদের সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক রাখতো। রসুল স. এর সঙ্গে সন্ধি ছিলো তাদের। তারা ছিলো মুসলমানদের শুভাকাঙ্খী। ওই মুশরিক গোত্রের মা'বাদ খাজায়ী রসুল স. এর বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলো। সম্ভবত তখনো তিনি মুশরিক। কিন্তু আবু আমর ও ইবনে জাওজী তাঁকে মুসলমান বলেছেন। তিনি বললেন, হে মোহাম্মদ! আমি আপনার ও আপনারা সঙ্গীদের বিপর্যস্ততায় ব্যথিত। আমার একান্ত কামনা ছিলো, আল্লাহ যেনো আপনাকে বাঁচিয়ে রাখেন। মা'বাদ খাজায়ী তখন ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে রাওয়াহা নামক স্থানে গিয়ে আবু সুফিয়ানের বাহিনীর

www.eelm.weebly.com

সাথে মিলিত হলো। তারা পুনরাাক্রমণের সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলো। বলাবলি করছিলো, মুসলমানদের বড় বড় নেতাদেরকে আমরা হত্যা করেছি। এখন আবার হামলা করে তাদরেকে পুরাপুরি ধ্বংস করে দিয়েই আমরা নিশ্চিন্ত হবো। মা'বাদ খাজায়ীকে দেখে আবু সুফিয়ান বললো, খবর কী? মা'বাদ বললেন, মোহাম্মদ বিশাল বাহিনী নিয়ে তোমাদের সন্ধানে বের হয়েছেন। এমন যুদ্ধপ্রস্তুতি আমি আর কখনো দেখিনি। তারা রোষে ফেটে পড়ছে। যারা যুদ্ধে ছিলো না, তারাও এবার যোগ দিয়েছে। যুদ্ধে যোগ না দেয়ায় তারা অনুতপ্ত। আবু সুফিয়ান বললো, তোমার অকল্যাণ হোক। কী বলছো তুমি? মা'বাদ বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমার মনে হয় তোমরা আর স্থানান্তরে যেতে পারবে না। আবু সুফিয়ান আরো বললো, আমরা তো সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আবার তাদেরকে আক্রমণ করবো। মা'বাদ বললেন, আমি তোমাদেরকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিচ্ছি। সাফওয়ানও এই পরামর্শ দিয়েছিলো। আবু সুফিয়ান দ্রুত তার সিদ্ধান্ত বদলে ফেললো। অতি দ্রুত তার বাহিনী নিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে গেলো। পথে আবদুল কাইসের কতিপয় লোকের সঙ্গে দেখা হলো তাদের। আবু সুফিয়ান বললো, কোথায় যাচ্ছো তোমরা? তারা বললো, মদীনার জমিতে উৎপন্ন ফসল আনতে যাচ্ছি। আবু সুফিয়ান বললো, তোমরা যদি আমার একটি কথা মোহাম্মদ কে জানিয়ে দিতে পারো, তবে আগামী উকাজের মেলায় আমি তোমাদের উটগুলোকে কিসমিস দিয়ে ভরে দেবো। পারবে? তারা বললো, হ্যাঁ। আবু সুফিয়ান বললো, তোমরা মোহাম্মদকে বলো আমরা পুনরাক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তোমাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়াই আমাদের ইচ্ছা। তারা এসে উপস্থিত হলো রসুল স. এর অবস্থান স্থলে এবং আবু সুফিয়ানের সংবাদটি জানালো। রসুল স. বললেন, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি' মাল ওয়াকিল।' রসুল স. সেখানে সোম, মঙ্গল ও বুধ এই তিনদিন অবস্থান করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো —

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৭২

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

❑ জখম হওয়ার পর যাহারা আল্লাহ ও রসুলের ডাকে সাড়া দিয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎকার্য করে এবং সাবধান হইয়া চলে তাহাদের জন্য মহা পুরস্কার রহিয়াছে।

---

www.eelm.weebly.com

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহতায়ালা যুদ্ধাহত সাহাবীদেরকে মহাপুরস্কার প্রদানের সুসমাচার জানিয়েছেন। তাদের গুণ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তাঁরা সৎকর্মশীল এবং মুত্তাকী।

জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য আয়াতে এহসান ও তাকওয়া বিশিষ্ট মানুষদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই দুটি গুণ হচ্ছে 'মহাপুরস্কার' লাভের যোগ্যতার মাপকাঠি।

অধিকাংশ তাফসীরকারদের অভিমত, এই আয়াত নাজিল হয়েছে উহুদের যুদ্ধাহত সাহাবীদের সম্পর্কে। মুজাহিদ এবং ইকরামা অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, ছোট বদর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে এই আয়াত।

উহুদ প্রান্তর পরিত্যাগের সময় আবু সুফিয়ান বলেছিলো, মোহাম্মদ তুমি কি চাও আগামী বছর ছোট বদরে আমাদের মোকাবেলা হোক? রসুল স. বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ্! তাই হবে। বৎসর অতিক্রান্ত হলে আবু সুফিয়ান তার বিশাল বাহিনী নিয়ে ছোট বদর অভিমুখে চললো। তার সৈন্য সংখ্যা ছিলো দুই হাজার। অশ্বারোহী ছিলো পঞ্চাশজন। মুশরিক বাহিনী এসে উপনীত হলো মাররুজ জাহরানের পার্শ্ববর্তী মুজান্না নামক স্থানে। তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন আল্লাহতায়ালা। তারা ফিরে যেতে মনস্থ করলো। নাঈম বিন মাসউদ আশজায়ী ওমরা করার জন্য মক্কাভিমুখে যাচ্ছিলেন। পথে দেখা হলো আবু সুফিয়ানের সাথে। আবু সুফিয়ান বললো, নাঈম। আমি তো মোহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে কথা দিয়েছিলাম। এক বছর পর ছোট বদরে তাদেরকে মোকাবেলা করবো। কিন্তু এখন তো শুষ্ক মওসুম। এরকম সময়ে যুদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা বরং আমাদের পশুগুলোকে সবুজ মাঠে চরিয়ে নিয়ে বেড়াবো এবং তাদের দুধ পান করবো। ছোট বদরে আমরা আর যাবো না। কিন্তু এটাও ঠিক নয় যে, আমরা যাবো না, অথচ মুসলমানরা এসে পড়বে। এতে করে তাদের সাহস যাবে বেড়ে। আর আমাদের কৃত অঙ্গীকারও ভঙ্গ হয়ে যাবে। উত্তম এই যে, আমরা চাই মুসলমানরাও যেনো না আসে। তুমি বরং মদীনায় পৌছে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করো। তাদেরকে বলো, আবু সুফিয়ানের অনেক সৈন্য। তাকে মোকাবেলা করার সাধ্য তোমাদের নেই। যদি তুমি একাজটুকু করতে পারো, তবে আমি তোমাকে দশটি উট দেবো। উটগুলো সুহাইল বিন আমরের নিকট জামানত স্বরূপ রেখে দিচ্ছি। সুহাইল তৎক্ষণাৎ দশটি উটের জিম্মাদার হয়ে গেলো। নাঈম ওমরা শেষে মদীনায় ফিরে গিয়ে দেখলো, বিশাল যুদ্ধপ্রস্তুতি চলছে। নাঈম বললো, এ কি করছো তোমরা? সাহাবীগণ বললেন, আবু সুফিয়ানের সঙ্গে ছোট বদরের মিলা নামক স্থানে যুদ্ধ করতে আমরা অঙ্গিকারাবদ্ধ। নাঈম বললো, তোমাদের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত মন্দ। তোমরা আপনাপন গৃহেই অবস্থান করো। যদি সেখানে যাও, তবে পালাবার পথ পাবে না। তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

www.eelm.weebly.com

তোমরা সেখানে গেলে আর বেঁচে থাকতে হবে না। সাহাবীগণ কিছুটা হতোদ্যম হলেন। মুনাফিক ও ইহুদীরা খুব খুশী হলো। তারা বলতে লাগলো, মোহাম্মদকে আর বাঁচতে হবে না। রসুল স. সব কথা শুনে চিন্তিত হলেন এই ভেবে যে, অঙ্গীকার পূরণের কী হবে? হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহর রসুল! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনকে বিস্তৃত করবেন। অবশ্যই তিনি তাঁর নবীকে বিজয়ী করবেন। আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ সুতরাং পিছপা হতে পারি না। আপনি যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা দিন। এটাই উত্তম। রসুল স. তাঁদের কথা শুনে প্রীত হলেন। বললেন, কসম ওই জাতের যিনি আমার জীবন রক্ষক। কেউ না গেলেও আমি একাকী যুদ্ধযাত্রা করবো।

সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে রসুল স. ছোট বদর অভিমুখে চললেন। ছোট বদরে উপস্থিত হলো মুসলমান বাহিনী। সেখানকার মুশরিকদের নিকট তাঁরা জানতে চাইলেন, তোমরা কুরাইশ বাহিনীর সংবাদ জানো কি? মুশরিকেরা বললো, অনেক সৈন্য নিয়ে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। মুসলমান বাহিনী বললেন, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল (আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট — তিনিই সর্বোত্তম কর্মনির্বাহী)।

মুর্খতার যুগে বদরে বিরাট মেলা বসতো। মেলা চলতো আটই জিলকদ পর্যন্ত। তারপর ভেঙে যেতো। পড়ে রইতো খোলা প্রান্তর। রসুল স. সেখানে আবু সুফিয়ানের বাহিনীর অপেক্ষায় রইলেন। ওদিকে আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে মুজান্না থেকে মক্কায় ফিরে গেলো। যুদ্ধ হলো না। মুসলমানদের সাথে ছিলো কিছু ব্যবসা সামগ্রী। সেগুলো মেলায় বিক্রয় করে তাঁরা দ্বিগুণ মুনাফা পেলেন। তারপর মদীনায় ফিরে গেলেন তাঁরা। এই আয়াত নাজিল হলো তখনই। ইমাম বোখারীর প্রথম বর্ণনা এরকমই। ইবনে জারীরও এরকম বলেছেন।

আমি বলি, আয়াতের বিবরণে এটা স্পষ্ট যে, যুদ্ধাহত অবস্থায় সাহাবীগণ পুনরাক্রমনের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। ছোট বদরের যুদ্ধ তো ছিলো এক বছর পরে। তখন কেউ আর আহতাবস্থায় ছিলেন না। সবাই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। যদি এ রকম বলা যায় যে, ছোট বদরের যুদ্ধ ছিলো উহুদের অব্যবহিত পরেই, তবে ছোট বদরের প্রাক্কালে এই আয়াত নাজিল হয়েছে, একথা মেনে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু ছোট বদরের ঘটনা তখনি ঘটেনি — ঘটেছে এক বছর পরে। সুতরাং এই আয়াতটি উহুদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছোট বদরের সঙ্গে নয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

www.eelm.weebly.com

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝

❑ ইহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল যে 'তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হইয়াছে সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর;' কিন্তু ইহা তাহাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়াছিল এবং তাহারা বলিয়াছিল, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট; এবং তিনি কত উত্তম কর্ম-বিধায়ক।'

যদি এই আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতটির সাথে একই সঙ্গে নাজিল হয়েছে বলে মনে করা যায়,তবে 'আল্লাজীনা ক্বলা' পূর্ববর্তী 'আল্লাজীনা তাজালু' এর স্থলবর্তী হবে। যদি মনে করা যায় পৃথকভাবে আয়াত দুটি নাজিল হয়েছে, তবে প্রথমটি হবে উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়টি বিধেয়।

অধিকাংশ তাফসীরকারগণ বলেছেন, 'লোকে বলিয়াছিলো' বলতে ওই লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা আবু সুফিয়ানের বাহিনীর সঙ্গে হামরাউল আসাদে সাক্ষাত করেছিলো,যেখানে উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে অবস্থান গ্রহণ করেছিলো আবু সুফিয়ানের বাহিনী। মুজাহিদ এবং ইকরামা বলেছেন, এই লোক হচ্ছে নাঈম বিন মাসউদ আশজায়ী,যে ওমরা করতে যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান বাহিনীর সাক্ষাত পেয়েছিলো, যাকে দশটি উট দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলো আবু সুফিয়ান। এরকমও বলা যেতে পারে যে, নাঈম বিন মাসউদ আশজায়ীর সঙ্গে মদীনার আরো কিছু লোক জুটে গিয়েছিলো। তারা সকলে মিলে আবু সুফিয়ানের কথাটি প্রচার করেছে। 'লোকে বলিয়াছিল' বলতে এখানে ওই সকল লোকদেরকে বোঝানো হয়ে থাকবে। আমাদের নিকট এই মতটি গ্রহণীয় যে, এই আয়াত ছোট বদরের যুদ্ধ সম্বন্ধে আর পূর্ববর্তী আয়াতটি ছিলো হামরাউল আসাদে অবস্থানকালীন সময়ের। এ দুটি ঘটনার ব্যবধান ছিলো এক বছর।

'লোক জমায়েত হইয়াছে' — এ কথায় বোঝা যায়, প্রথমেই জমায়েত ছিলো না পরে জমায়েত হয়েছে। এরকম জমায়েত ছোট বদর যুদ্ধের জন্যই হয়েছিলো। উহুদ যুদ্ধের সময়ে তো মুশরিক বাহিনী জমায়েত অবস্থাতেই ছিলো।

ইমাম রাজীর উক্তি আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে আসতে সহায়তা করেছে। তিনি লিখেছেন, উহুদ এবং ছোট বদর এই দুই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুমিনদের প্রশংসা আল্লাহ্ পাক এই দুই আয়াতে করেছেন। প্রথমটিতে পুনরাক্রমণের জন্য হামরাউল আসাদে একত্রিত মুমিনগণের জন্য। দ্বিতীয়টিতে ছোট বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্যে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

www.eelm.weebly.com

তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমা হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো, এরকম ভীতি সঞ্চারক সংবাদ নাঈমের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে — একথা উল্লেখ করার পর আল্লাহ্তায়ালা জানাচ্ছেন, তিনি ইমানদারদের ইমান দৃঢ়তর করে দিয়েছিলেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে ইমানদারগণ অতি সহজেই উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন, 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি কতো উত্তম কর্মবিধায়ক।' অবস্থা হলো এই যে, সাহাবীগণ নাঈমের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করলেন না। তাঁদের ইমান হলো অধিকতর শক্তিশালী। আশায়েরা এবং অন্যান্য সুন্নত জামাতের ইমামগণ ইমানকে একক আকার বিশিষ্ট বস্তু বলেন। যার আকার বেড়ে যাওয়া অথবা কমে যাওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু ইমান এই অর্থে বাড়ে এবং কমে যে, বিশ্বাসী নৈকট্য বাড়ে অথবা কমে। এই অর্থে ইমান বেড়ে গেলে অধিকতর মর্যাদা লাভ হয়। এভাবে প্রকৃত ইমান উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। যতোবেশী নৈকট্য লাভ হয় ইমান ততোটুকু বর্ধিত অথবা বলশালী হয়।

'হাসবুনাল্লাহ' — অর্থ আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। 'হাসব' শব্দটি এসেছে মুহসিবুনা, মুহসিবুন অথবা আহ্সাব শব্দ থেকে। আল্লাহ্ই যথেষ্ট এ কথায় আল্লাহতায়ালার অতিরিক্ত কোনো প্রশংসা বর্ণিত হয় না। এটি একটি সত্য উচ্চারণ। সত্যানুসারী ইমানদারগণই কেবল একথাটি উচ্চারণ করার যোগ্য।

'ওয়াকীল' শব্দের অর্থ যাঁর কাজে পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া যায় তিনিই ওয়াকিল। অর্থাৎ উত্তম কর্মবিধায়ক। সৃষ্টির সকল কর্মকান্ডের জিম্মাদার তিনি। কেউ কেউ বলেছেন, 'হাসবুনাল্লাহ ওয়া 'নিয়ামুল ওয়াকীল' বাক্য বিশ্বাসীদের বাক্য নয়। বাক্যটি আল্লাহ্র। বিশ্বাসীগণ 'এবং' শব্দের মাধ্যমে একত্রে উচ্চারণ করেছে মাত্র।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. 'হাসবুনাল্লাহ্ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' বলেছেন। অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে হজরত ইব্রাহিম আ. ও একথা বলেছিলেন। রসুল স. এর সাহাবীগণও এই বাক্যটি উচ্চারণ করেছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা তোমাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য অনেক মানুষ ও অস্ত্রসম্ভার একত্রিত করেছে। যাতে তোমরা তাদেরকে ভয় করো এবং ছোট বদরের দিকে অগ্রসর না হও। তাদের কথার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্তায়ালা ইমানদারদের ইমান বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁরা বলেছেন, 'হাসবুনাল্লাহ্ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল'। বোখারী।

'হাসবুনাল্লাহ' এবং 'নি'মাল ওয়াকীল' একটিই বাক্য। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় তাই একক সর্বনাম উল্লেখ করা হয়েছে। বাক্য দু'টি হলে সর্বনাম ব্যবহৃত হতো দ্বিবচনের। 'হাসবুনাল্লাহ্' বাক্যটি বিবৃতিমূলক। 'ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' বাক্যটি প্রশ্নবোধক। বিবৃতিমূলক বাক্যের প্রতি প্রশ্নবোধক বাক্যের আতফ করা (সংযোগ করা) আরবী ভাষাতে একটি রীতিবিরুদ্ধ প্রয়াস। সেক্ষেত্রে ব্যকরণবিদগণের নিকট থেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়। হতে

www.eelm.weebly.com

পারে হাসবুনাল্লাহ ও নি'মাল ওয়াকীল' বাক্য দু'টির মাঝখানে ব্যবহৃত ওয়াও অব্যয়টি মু'মিনগণের উক্তি নয়। বর্ণনাকারীর উক্তি। আবার হতে পারে বাক্য দু'টি নীতিগতভাবে ভিন্নার্থে ব্যবহৃত। কিন্তু বাস্তবে প্রশ্নবোধক বাক্যটিও বিবৃতমূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই সংযোগবিধান শুদ্ধ।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ
اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ○ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ
اَوْلِيَآءَهٗ ۪ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ وَلَا يَحْزُنْكَ
الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ يُرِيْدُ
اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○ اِنَّ
الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

❒ তারপর তাহারা আল্লাহের অবদান ও অনুগ্রহসহ ফিরিয়া আসিয়াছিল, কোন অনিষ্ট তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই, এবং আল্লাহ্ যাহাতে রাজী তাহারা তাহারই অনুসরণ করিয়াছিল এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

❒ শয়তানই তোমাদিগকে তাহার বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিওনা, আমাকেই ভয় কর।

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানে ত্বরিতগতি তাহাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। তাহারা কখনও আল্লাহের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ পরকালে তাহাদিগকে কোন অংশ দিবার ইচ্ছা করেন না, তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে।

❒ যাহারা বিশ্বাসের বিনিময়ে অবিশ্বাস ক্রয় করিয়াছে তাহারা কখনও আল্লাহের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

---

www.eelm.weebly.com

ছোট বদর থেকে মুসলমান বাহিনী ফিরে এসেছেন ইমান, সম্পদ ও সম্মানের সঙ্গে। এটাই আল্লাহ্‌র অবদান ও অনুগ্রহ। আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে সকলের ইমান উন্নত হয়েছে। ব্যবসার মাধ্যমে অর্থাগম ঘটেছে। শত্রুরা ভীত হয়েছে বলে বীর যোদ্ধাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো প্রকার অনিষ্ট তাঁদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি। অর্থাৎ তাঁরা আহতও হননি, নিহতও হননি। তাঁরা ছিলেন আল্লাহর সন্তোষানুসারী। ইমাম বাগবী লিখেছেন, মুসলমান বাহিনী বলেছিলেন, এটা কি জেহাদ (এখানে তো আঘাত প্রত্যাঘাত বলে কিছু নেই)? আল্লাহ্‌তায়ালা মহা অনুগ্রহশীল। এই প্রচেষ্টাকেই আল্লাহতায়ালা জেহাদ বলে গণ্য করলেন। এতে অংশগ্রহণকারীদেরকে সওয়াব দান করলেন এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টও হলেন।

যারা জেহাদে যোগ দেয়নি তারা শয়তানের বন্ধু। আবু সুফিয়ান এবং নাঈমের মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে ভীত করতে সক্ষম হয়েছে। অথচ বিশ্বাসীদের জন্য এ রকম আচরণ একান্ত অশোভনীয়। তাই এরশাদ হচ্ছে, যদি তোমরা বিশ্বাসকেই একমাত্র আশ্রয়স্থল বলে গ্রহণ করে থাকো, তবে আর অন্যকে ভয় করবে কেনো? আমাকেই ভয় করো। বিজয় দান করি আমিই। সুতরাং আমার নির্দেশ অমান্য কোর না এবং আমার রসুলের আনুগত্যে স্থিত হও। আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং সকল বিষয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করাই ইমান। রসুল স. এরশাদ করেছেন, যদি কিছু যাঞ্চা করতে ইচ্ছ করো, তবে আল্লাহর নিকটই যাঞ্চা করো। সাহায্য চাইলে আল্লাহর নিকট চাও। জেনে রেখো, সকল মানুষ একত্রিত হয়ে তোমার উপকার করতে চাইলেও পারবে না, আল্লাহ যদি তা অনুমোদন না করেন। সকলে মিলে ক্ষতি করতে চাইলেও পারবে না, যদি না তাতে আল্লাহ সায় দেন। তাই হবে, যা লিপিবদ্ধ রয়েছে অদৃষ্টলিপিতে। অদৃষ্ট লিপিবদ্ধকারী কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। কালিও শুকিয়ে গিয়েছে। বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

'সত্য প্রত্যাখ্যানে ত্বরিতগতি' বলতে বোঝানো হয়েছে কাফের কোরাইশদেরকে — একথা বলেছেন জুহাক। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এ কথায় রয়েছে মুনাফিকদের প্রতি ইঙ্গিত। তারা কাফেরদেরকে সাহায্য করতে তৎপর। এরশাদ হয়েছে, তাদের এই তৎপরতা যেনো তোমাদেরকে চিত্তক্ষুন্ন না করে। আখেরাতের সওয়াব তাদের নসীবে নেই। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। আল্লাহতায়ালার হাদী (পথ প্রদর্শনকারী) গুণের প্রতিবিম্ব পড়েছে তোমাদের উপর, তাই তোমরা লাভ করেছো পথপ্রাপ্তির নিশ্চিন্ততা। আর ওদের উপরে পড়েছে আল মুদিল্লু (পথ ভ্রষ্টকারী) গুণের প্রতিচ্ছায়া। তাই তারা ভ্রষ্টতার পথে তৎপর। তোমরা চাও ইমান। তারা চায় কুফরী। উভয় দলের আকাঙ্খাই বাস্তবায়িত করা হয়েছে। সুতরাং তাদের পথভ্রষ্টতা তোমাদেরকে ক্ষুন্ন করবে কেনো? আল্লাহ চান না তারা পরকালে কোনো কল্যাণ লাভ করুক। মহাশাস্তি অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে। বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাসকেই তারা আরাধ্য

www.eelm.weebly.com

করেছে। আহলে কিতাবেরা রসুল স. এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করেছে। আবির্ভাবের পরে করেছে প্রত্যাখ্যান। তিনি প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, তবু তারা মানলো না। লোভ ও হিংসাই তাদেরকে ইমানচ্যুত করেছে। তাদের এই অবাধ্যতার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি — যা অবধারিত।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৭৮

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ○

❒ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে আমি কাল বিলম্বিত করি তাহাদের মঙ্গলের জন্য; আমি কাল বিলম্বিত করি যাহাতে তাহাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

পৃথিবীতে সাধারণতঃ অবিশ্বাসীদেরকে নিরুপদ্রব জীবন যাপন করতে দেয়া হয়। এটা অব্যাহতি নয়। তারা যেনো মনে না করে এতে কল্যাণকর কিছু রয়েছে। এই আপাত অব্যাহতি দানের উদ্দেশ্য এই যে, অনুকূল অবস্থা পেয়ে তারা যেনো অধিকতর পাপাসক্ত হয়ে কঠিনতর শাস্তির উপযোগী হয়। এই আয়াতের মাধ্যমে আরো একটি বিষয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে, পাপও সংঘটিত হয় আল্লাহতায়ালার ইচ্ছায়। প্রাথমিক পাপাসক্তি বান্দা থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু তা আল্লাহ্তায়ালার অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত বাস্তবায়িত হতে পারে না। বান্দারা তাদের পাপের কারণেই অভিযুক্ত হবে যেহেতু পাপের সূচনা করেছে তারাই এবং একান্তভাবে কামনা করেছে যেনো তাদের পাপাভিপ্রায় বাস্তবে রূপ লাভ করে।

অপমানজনক শাস্তি রয়েছে তাদের জন্যে। মুকাতিল বলেছেন, মক্কার মুশরিকদের জন্য এই অপমানজনক শাস্তির ঘোষণা এসেছে। আতা বলেছেন, লাঞ্ছনাদায়ক এই শাস্তির ঘোষনা এসেছে বনু কোরাইজা ও বনু নাজিরের ইহুদিদের জন্যে।

হজরত আবু বকর বর্ণনা করেন, রসুল স. এর নিকট একবার জানতে চাওয়া হলো, সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি স. বললেন, যাঁর বয়স বেশী এবং আমল উত্তম। আবার বলা হলো, সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যার বয়স বেশী এবং আমল মন্দ। আহমদ, তিরমিজি, দারেমী।

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন পৃথিবীতে ষাট বছর বয়স পেয়েছিলো যারা তাদেরকে ডাকা হবে। তাদের সামনে উচ্চারণ

www.eelm.weebly.com

করা হবে ওই আয়াত — 'আওয়ালাম নুয়াম্মির কুম মা ইয়াতাজাক্কারু ফিহি মাংতাজাক্কারা ওয়া জায়াকুমুন নাজির।' আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদের আয়ু এতোটুকু দেইনি যে, তোমরা বুঝতে চাইলে বুঝতে পারতে। তাছাড়া তোমাদের নিকট ভয় প্রদর্শকও এসেছিলো। বায়হাকী।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৭৯

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

❐ অসৎকে সৎ হইতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রহিয়াছ আল্লাহ বিশ্বাসীগণকে সেই অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদিগকে অবহিত করা আল্লাহের কাজ নয়; তবে আল্লাহ তাঁহার রসুলগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলদিগকে বিশ্বাস কর। তোমরা বিশ্বাস করিলে ও সাবধান হইয়া চলিলে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রহিয়াছে।

ইমানদারদের বিশুদ্ধতা এবং মুনাফিকদের অপবিত্রতা সম্মিলিত থাকতে পারে না। এখানে ইমানদার অর্থ সাহাবীগণসহ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল ইমানদার। আর পরবর্তী সকল মুনাফিকও মদীনার প্রথম মুনাফিকদের সঙ্গে সম্বন্ধিত। ইমান ও নিফাককে পৃথক করা সম্পর্কে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, 'মুনাফিকদের আশংকা এমন সুরা আবার নাজিল হয়ে না পড়ে, যাতে তাদের অন্তরের কথা প্রকাশ করে দেয়া হয়। (হে নবী!) আপনি বলে দিন, তোমরা বিদ্রুপ করে যাও নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সেই বিষয়কে প্রকাশ করে দেবেন, যার আশংকা তোমরা করো।' উহুদ যুদ্ধের দিন মুনাফিকেরা এই আশংকাতেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলো।

অদৃশ্যের (গায়েবের) জ্ঞান জানানোর ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি কোনো বাধ্যবাধ্যকতা নেই। তবে তিনি তাঁর নবীদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে অদৃশ্য বিষয়ে অবগতি দান করেন। যেমন রসুল মোহাম্মদ স. কে তিনি মুনাফিকদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবহিতি দিয়েছিলেন। এলমে গায়েব সম্পর্কে সুরা

www.eelm.weebly.com

জ্বিনের আয়তাটিও প্রনিধাণযোগ্য; যেখানে বলা হয়েছে, তিনি গায়েবী বিষয় পরিজ্ঞাত। গায়েব সম্পর্কে তিনি কাউকে জানান না, তবে মনোনীত কোনো রসুল এর ব্যতিক্রম।

ইমাম বাগবী, সাদীর বর্ণনার মাধ্যমে লিখেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার সামনে আমার উম্মতকে মৃত্তিকাস্থিতাবস্থায় হাজির করা হলো। যেমন আদম আ. এর সামনে হাজির করা হয়েছিলো তাঁর বংশধরদেরকে। আমার উপর কারা ইমান আনবে, কারা আনবে না, সবই আমাকে বলে দেয়া হয়েছে। এ কথা মুনাফিকদের কানে পৌঁছলে তারা বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদ দাবী করে যে, যারা এখনো জন্মলাভ করেনি তাদের মধ্যে কারা ইমানদার হবে কারা হবে না–সে বিষয়ে তিনি বলে দিতে পারেন। অথচ আমরা তাঁর সাথে থাকি, তবু তিনি আমাদেরকেই চিনতে পারেননি।

মুনাফিকদের এই কথপোকথনের সংবাদ শুনে রসুল স. মসজিদের মিম্বরে দন্ডায়মান হলেন। আল্লাহ তায়ালার স্তুতি, প্রশংসা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, তারা আমার জ্ঞান সম্পর্কে সন্দিহান। তোমরা এখন কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারো। আমি জবাব দিতে পারবো। আবদুল্লাহ্ ইবনে হোযাফা দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার পিতা কে? রসুল স. বললেন, হোযাফা। হজরত ওমর তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমরা আল্লাহ্তায়ালাকে প্রতিপালক মেনে নিয়ে, ইসলামের অনুসারী হয়ে, কোরআনকে বিশ্বাস করে এবং আপনাকে নবী হিসাবে পেয়ে পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্ত। আপনি ক্ষমাপ্রাপ্ত। আমাদেরকেও ক্ষমা করে দিন। রসুল স. এরশাদ করলেন, তোমরা কি ফিরে এসেছো? তোমরা কি প্রত্যাবর্তনকামী হয়েছো? মিম্বর থেকে নেমে এলেন রসুল স.। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

শায়েখ জালালুদ্দিন সুয়ুতি লিখেছেন, এরকম বর্ণনা আমার নিকট পৌঁছেনি। আমি বলি, এই সহীহ্ বর্ণনাটির মাধ্যমে এবং এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, রসুল স. গায়েবের জ্ঞান লাভের জন্য আল্লাহর মনোনীত। তিনি গায়েবের এলেম সম্পর্কে অবহিত নন — এরকম কথা এই হাদিসের মাধ্যমে রদ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু রসুল স. এর জন্য এটা বৈধ নয় যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত অন্য কাউকে এই গায়েবী এলেমের অংশী বানাবেন। নবীগণ কাফেরদের কুফরী সম্পর্কে অবগত। কিন্তু তাঁরা তা প্রকাশ করেন না। কারণ, এটা তাঁদের ব্যক্তিগত জ্ঞান। আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যকে অবগত করানোর অধিকার তাঁদের নেই। কর্তব্যকর্ম হচ্ছে এই যে, বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করতে হবে। অপরিচ্ছন্নতা ও পাপাসক্তি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। তবেই রয়েছে পুরস্কার। মহা পুরস্কার।

www.eelm.weebly.com

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۸۰﴾

❒ এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যাহা তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহাতে যাহারা কৃপণতা করে তাহাদের জন্য উহা মঙ্গল ইহা যেন তাহারা কিছুতেই মনে না করে। না, ইহা তাহাদের জন্য অমঙ্গল। যাহাতে তাহারা কৃপণতা করিবে কিয়ামতের দিন উহাই তাহাদের গলার বেড়ি হইবে। আসমান ও জমিনের চরম স্বত্বাধিকার আল্লাহেরই। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।

সম্পদ আল্লাহর দান। আল্লাহ্তায়ালা হুকুম করেছেন, সম্পদশালীদেরকে জাকাত দিতে হবে। যারা কৃপণ তারা জাকাত দিতে অনীহ। তাদের অনীহার কারণ, জাকাত দিলে সম্পদ কমে যাবে। বরং না দেয়াতেই লাভ। তাদের মনোভাবের বিরুদ্ধেই এই আয়াতে বলা হয়েছে, তারা যাকে লাভজনক মনে করেছে, আসলে তা লাভজনক নয়। তাদের জাকাত না দেয়া সম্পদ তাদের জন্য নিশ্চিত অকল্যাণকর। তাদের এই অশুভ সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলার বেড়ি করে দেয়া হবে।

হজরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, আবু ওয়ায়েল, শায়বী এবং সুদ্দী বলেছেন, যারা জাকাত দেয় না, তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ কাউকে ধনী করেছেন অথচ সে জাকাত দেয়নি, কিয়ামতের দিন তার বিত্ত-বৈভবকে সাপের আকৃতি দেয়া হবে। ওই সাপের মাথা হবে কেশহীন, তার চোখের উপর থাকবে কালো দাগ। সে ওই ব্যক্তির কণ্ঠাদেশ বেষ্টন করবে এবং দংশন করতে করতে বলবে, আমি তোমার সম্পদ। আমি তোমার জাকাত না দেয়া ধন। এর পর রসুল স. এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন। বোখারী।

হজরত আবু জর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অনেক উট, গাভী, মহিষ অথবা ছাগলের মালিক হয়, সে যদি জাকাত আদায় না করে, তবে সে কিয়ামতের দিন দেখতে পাবে, তার পশুগুলো অনেক মোটা তাজা হয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। উট উত্তেজিত হয়ে তাকে পিষ্ট করতে থাকবে। গাভী ও ছাগলগুলো তাকে শিং দিয়ে আঘাত করতে থাকবে। তাদের আঘাতের আক্রমণে

www.eelm.weebly.com

সে কখনো হবে পশ্চাদবর্তী কখনো বা সম্মুখবর্তী। বিচার সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থাই চলতে থাকবে। বোখারী, মুসলিম।

আতীয়া বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদি আলেমদের সম্পর্কে। তারা তওরাতের মাধ্যমে রসুল স. এর নবুয়ত ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা খুব ভালোভাবেই জানতো। তাদের এই জ্ঞান গোপন করাকে বখিলি বা কৃপণতা বলা হয়েছে। আর 'গলার বেড়ি হবে'—একথার অর্থ, তাদেরকে তাদের পাপের বোঝা ওঠাতে হবে।

আল্লাহ্ই আকাশ ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকারী। সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত রয়েছে বিলয়। মৃত্যুকালে মানুষকে সম্পদচ্যুত হতেই হয়। এরপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক বানিয়ে দেন। পরবর্তী মালিক হয়তো তার বংশভূত হবে অথবা হবে বংশবহির্ভূত। সম্পদের মোহ যার রয়েছে, তার সঙ্গী হবে বৈভব বিচ্যুতির আক্ষেপ। আর তার জন্যে নির্ধারিত হবে আযাব।

আল্লাহ্ সকলের কর্মকান্ড সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। তিনি অবশ্যই সৎকর্মের বিনিময় প্রদান করবেন।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম, হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে লিখেছেন, রসুল স. হজরত আবু বকরকে একটি লিখিত ফরমানসহ বনী কায়নুকার ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করলেন। ফরমানটিতে ছিলো ইসলাম গ্রহণের আহবান। নামাজ, জাকাত এবং আল্লাহ্র জন্য করজে হাসানা প্রদান করার নির্দেশনা। হজরত আবু বকর ইহুদীদের একটি শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, প্রখ্যাত ইহুদী আলেম ফাখ্খাজ বিন আজুরকে ঘিরে বসে আছে ইহুদী জনতা। তার পাশে বসে আছে আশীয় নামক আরেকজন আলেম। হজরত আবু বকর ফাখ্খাজকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহকে ভয় করো। মুসলমান হয়ে যাও। আল্লাহর কসম! একথা তোমরা ভালোভাবেই জানো যে, মোহাম্মদ স. আল্লাহ্র নিকট থেকে সত্যের আহবান নিয়ে এসেছেন। তাঁর বিবরণ রয়েছে তওরাতেও। সুতরাং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো এবং আল্লাহকে করজে হাসানা দাও। আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাত দান করবেন এবং দ্বিগুণ সওয়াব দিবেন। ফাখ্খাজ বললো, আবু বকর তুমি বলছো আল্লাহ্ আমাদের কাছে ঋণপ্রার্থী? 'যারা নিঃসম্পদ তারাই তো সম্পদশালীদের নিকট যাঞ্চা করে। তোমার কথা ঠিক হলে বুঝতে হবে আল্লাহ্ ফকির আর আমরা ধনী। আল্লাহ্ তোমাদেরকে সুদ দিতে নিষেধ করেছেন। আমরা সুদ পাবো না, আবার দানও করবো? রোষান্বিত হলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক । তিনি ফাখ্খাজের মুখে আঘাত করলেন এবং বললেন, আমার জীবনাধিপতি ওই পবিত্র সত্তার শপথ! তুমি আল্লাহ্র দুশমন। আমরা তোমাদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ বলে নিরুপায়, তা না

www.eelm.weebly.com

হলে এক্ষুণি তোমার শিরোশ্ছেদ করতাম। ফাখ্খাজ রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো, দেখো মোহাম্মদ! তোমার সাথী আমার সঙ্গে এই আচরণ করেছে। হজরত আবু বকর বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! এই আল্লাহর দুশমন বলেছে, আল্লাহ ফকির আর আমরা ধনী। তার একথা শুনেই আমি ক্ষিপ্ত হয়েছিলাম এবং তার মুখে আঘাত করেছিলাম। ফাখ্খাজ হজরত আবু বকরের একথাকে অস্বীকার করলো। (হজরত আবু বকরের পক্ষে কোনো সাক্ষ্য ছিলো না) অতঃপর আল্লাহ্ ফাখ্খাজের কথাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে হজরত আবু বকরের পক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে অবতীর্ণ করলেন নিম্নের আয়াত। ইকরামা, সুদ্দী ও মুকাতিল।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৮১, ১৮২

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

❒ যাহারা বলে 'আল্লাহ অভাবগ্রস্ত ও আমরা অভাবমুক্ত' তাহাদের কথা আল্লাহ্ শুনিয়াছেন; তাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা ও নবীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখিয়া রাখিব এবং বলিব 'তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর।'

❒ ইহা তোমাদের কৃতকর্মের ফল এবং উহা এই কারণে যে আল্লাহ্ দাসদের প্রতি জালিম নহেন।

আল্লাহ দরিদ্র আর আমরা ধনী — এই চরম গর্হিত বাক্যটি আল্লাহ্ শুনেছেন। ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উপস্থাপন করেছেন এভাবে, ইহুদীরা রসুল স.এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো, আল্লাহ্ তাহলে দরিদ্র। না হলে আমাদের কাছে কর্জ চাইবেন কোনো? করজে হাসানা প্রদান সম্পর্কিত আয়াত নাজিল হওয়ার সময় ইহুদীরা একথা বলেছিলো। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে। হাসান বলেছেন, 'আল্লাহ দরিদ্র আমরা ধনী' একথাটি বলেছিলো ইহুদী হুয়াই বিন আখতাব। আয়াতে বলা হয়েছে এ বিষয়টি আমি লিখে রাখবো, এর অর্থঃ আমার হুকুমে আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতারা লিখে রাখবে। আমল লিপিবদ্ধ করার কাজ ফেরেশতাদের। আল্লাহর নয়। অন্য আয়াতে যেমন বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই' আমি অর্থাৎ আমার ফেরেশতারা লিখে নিবে।'

www.eelm.weebly.com

ইহুদীরা তাদের পূর্ববর্তী নবীদেরকে হত্যা করেছিলো। তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের এই আচরণকে পছন্দ করে যাচ্ছে। তাদের এই অশুভ পছন্দকে লিখে রাখা হচ্ছে। কিয়ামতে তাদের শাস্তির প্রাক্কালে আমার ফেরেশতারা বলবে, এবার আস্বাদ গ্রহণ করো জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিশিখার। 'আজাবুল হারীক্ব' অর্থ যন্ত্রণাদায়ক লেলিহান আযাব। আস্বাদ গ্রহণ করা বোঝাতে এখানে 'জুক্ব' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। রূপক অর্থে সকল অনুভূতিকে এই শব্দটির অন্তর্ভুত করা যায়। দুর্বল ব্যক্তিদের কাছ থেকে সুদ গ্রহণ করে ইহুদীরা এক ধরনের আনন্দানুভব করতো। তাদের এই আনন্দানুভূতির অনুকূলে ব্যাঙ্গার্থে তাই 'জুক্ব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'ইয়াদ' অর্থ হাত। আয়াতে এর বহুবচন হিসাবে 'আইদি' উল্লেখ করা হয়েছে। এই শব্দটির সরাসরি অর্থ গ্রহণ করা হলে, হাত সমূহের মাধ্যমে তারা যা অর্জন করেছে–এ রকম বলতে হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থ হবে 'কৃতকর্ম'। দহন যন্ত্রণা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যাচারী নন। অর্থাৎ কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তির অতিরিক্ততা তিনি করেন না।

আশায়েরাদের একটি সন্দেহমূলক মাসআলা ঃ আল্লাহতায়ালা সকল প্রকার মন্দ থেকে মুক্ত। জুলুম নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম। তাই তাঁর জন্য জুলুম থেকে পবিত্র থাকা জরুরী। জুলুম না করলে ইনসাফ করা আবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়। ইনসাফের জন্য জরুরী পূণ্যের প্রতিদান এবং পাপের শাস্তি নিশ্চিত করা। এরকম দৃষ্টিভঙ্গি মোতাজিলাদের। তারা বলে ইনসাফ করতে অর্থাৎ সওয়াব ও আযাব দিতে আল্লাহতায়ালা বাধ্য। এরকম ধারণা সুন্নত জামাতের অন্তর্ভুত আশায়েরাদের বিশ্বাসবিরুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালা কোনোকিছু করতে বাধ্য নন। তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, তেমনই হয়। ঔচিত্য ও বাধ্যতাজ্ঞাপক সকল কিছু থেকে তিনি মুক্ত, পবিত্র।

জুলুম শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনোকিছুর স্থানচ্যুতি ঘটানো।হ্রাসবৃদ্ধি কিংবা পরিবর্তন পরিবর্ধন যেভাবেই হোক না কেনো। এভাবে কোনোকিছুর যথাঅধিকার ক্ষুন্ন করা আল্লাহর মর্যাদার জন্য শোভনীয় নয়। একথাও ভালোভাবে জেনে নেয়া দরকার যে, অপরাধ ব্যতিরেকেই যদি আল্লাহ পাক সমস্ত সৃষ্টিকে শাস্তিদান করেন, তবুও জুলুম হবে না। কারণ তিনি একক মালিক। তাঁর হস্তক্ষেপ তাঁর আপন মালিকানার ভিতরেই (অন্যের মালিকানায় হলে জুলুম হতো)। যার অস্তিত্ব অথবা সম্ভাবনা রয়েছে, তাকেই কেবল অপসারণ করা সম্ভব। তাই আল্লাহ্র জন্য জুলুম শব্দটির প্রয়োগই সম্ভব নয়। তবু এখানে তিনি জালেম নন — একথা উল্লেখ করা হয়েছে। যা নাই তা অপসারণ করার প্রশ্নও আসতে পারে না। কিন্তু কোনো

www.eelm.weebly.com

সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে চিন্তায় অনুমানকেও প্রশ্রয় দিতে হয়। এবং অনুমানকৃত বিষয়ও অপসারণযোগ্য বলে প্রমাণ করে দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হয়। মানুষের পারস্পরিক অধিকারক্ষুন্নতাকে বলে জুলুম। এ রকম জুলুম থেকে আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র। এ রকম অবস্থা আল্লাহ্‌তায়ালার সীমাহীন অনুগ্রহের নিদর্শন।

নবীগণকে যারা কষ্ট দিয়েছে অথবা হত্যা করেছে তাদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে আল্লাহতায়ালা বাধ্য নন, তবুও তা তিনি করবেন। কারণ নবীদের প্রতি রয়েছে তাঁর বিশেষ ফজল ও করম। তাঁর ইচ্ছা, তিনি তাঁদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। নবী হন্তারকদেরকে শাস্তি দিবেন। তাদেরকে (কাফেরদেরকে) শাস্তি না দেয়াই বরং জুলুম। তিনি তাঁর প্রকৃত বান্দাদের (নবীদের) প্রতিও জুলুম করবেন না। তাই তাঁদের শত্রুদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন, তাদেরকে আযাব দিবেন। — এই ব্যাখ্যাভঙ্গিতে নবীদের প্রশংসাও বর্নিত হয়েছে যে, তাঁরা আল্লাহর ইবাদত করেই পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। লাভ করেছেন বান্দা নামে অভিহিত হবার মহাসৌভাগ্য। তাঁদের কামালিয়াত লাভের অন্তর্নিহিত অর্থ এটাই। 'আল্লাহ্ দাসদের প্রতি জালিম নহেন' — একথার প্রকৃত অর্থ তিনি এমন জালিম নন যে,অবিশ্বাসী বান্দা কাফেরদেরকে শাস্তি না দিয়ে তাদের অধিকার নষ্ট করবেন অথবা হন্তারকদের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে বিশ্বস্ত বান্দা নবীদের অধিকার নষ্ট করবেন।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৮৩

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ۭ قُلْ قَدْ جَاۗءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْھُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

❑ যাহারা বলে, 'আল্লাহ আমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন যে, আমরা যেন কোন রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি যতক্ষণ পর্যন্ত সে এমন কুরবানী না করিবে যাহা অগ্নি গ্রাস করিবে,' তাহাদিগকে বল, 'আমার পূর্বে অনেক রসুল স্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা সহ তোমাদের নিকট আসিয়াছিল; যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কেন তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলে?'

---

www.eelm.weebly.com

গনিমতের মাল এবং কোরবানীর পশুর গোশত্ বনি ইসরাইলদের জন্য হালাল ছিলো না। পূর্ববর্তী শরিয়তের নির্দেশ ছিলো, গণিমতের সামগ্রী একত্রিত করে কোনো খোলা প্রান্তরে রেখে দিতে হতো। তখন আকাশ থেকে নেমে আসতো শাদা আগুন। ওই লেলিহান আগুন এসে গণিমতের সম্পদকে জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতো। এটা ছিলো জেহাদ কবুল হওয়ার নিদর্শন। আগুন নেমে আসবার সময় বাঘের গর্জনের মতো আওয়াজ শোনা যেত। আগুণ না নেমে এলে বুঝা যেতো জেহাদ কবুল হয়নি।

কালাবী বলেছেন, কাব বিন আশরাফ, মালেক বিন জয়িফ, ওয়াহাব বিন ইয়াহুদা, জায়েদ বিন তাবুত, ফাখখাজ বিন আজুর এবং হুয়াই বিন আখতাব রসুল স. এর নিকট হাজির হয়ে বললো, মোহাম্মদ! তুমি বলছো, আল্লাহ্ তোমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন। আর তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। যদি তাই হয়, তবে তওরাত নির্দেশিত প্রমাণ দেখাও। তওরাতে বলা হয়েছে, যদি কেউ নবী হবার দাবী করে, তবে যতক্ষণ না সে তোমাদের সামনে এমন কোরবানী হাজির করে যা আকাশী আগুনে ভস্মীভূত হয়, ততক্ষন পর্যন্ত তোমরা তাকে বিশ্বাস করো না। এখন তুমি যদি তোমার কোরবানী আকাশী আগুন দ্বারা ভস্মীভূত হয়েছে দেখাতে পারো, তবে আমরা তোমার প্রতি ইমান আনবো।

ইমাম সুদ্দী বলেছেন, আল্লাহ পাক বনি ইসরাইলদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি কেউ নবী বলে দাবী করে তবে তাকে এমন কোরবানী উপস্থিত করতে বলো যা আগুন এসে গ্রাস করে। যদি সে তা না পারে তবে তাকে বিশ্বাস কোরো না। তবে হজরত ঈসা এবং হজরত মোহাম্মদ স. এর ব্যতিক্রম। তাদেরকে এ রকম প্রমাণ হাজির করতে হবে না। এই প্রমাণ ছাড়াই তাঁদেরকে মান্য করতে হবে।

ইহুদীদের এ রকম কুটতর্কের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীর মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছেন, তোমাদের উদ্দেশ্য অসৎ। স্পষ্ট প্রমাণকে অমান্য করা তোমাদের বৈশিষ্ট্য। ইতোপূর্বে এ রকম প্রমাণ তো সকল নবীই পেশ করেছিলেন, কিন্তু তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো। কোনো কোনো নবীকে হত্যা করতেও পিছপা হওনি (হজরত যাকারিয়া ও হজরত ইয়াহিয়া নবী প্রমাণ পেশ করা সত্ত্বেও তাঁরা তোমাদের হাতে নিহত হয়েছিলেন)। তোমরাও তোমাদের পূর্বপুরুষদের মতো। কপট ও অবিশ্বাসী। বিশ্বাস স্থাপনের পূর্বশর্ত হিসাবে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশকে মান্য করা নিশ্চয় তোমাদের অভিপ্রায় নয়। তাই যদি হতো তবে যাকারিয়া এবং ইয়াহিয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হতো। তোমাদের কথা সত্য নয়। তোমরা হিংসুক এবং বংশগৌরবে মগ্ন। আল্লাহ্র নির্দেশের কারণে নয় — হিংসা এবং গোত্র অহমিকার কারণেই তোমরা ইমান বিমুখ। তোমরা যা বলছো তা বাহানা মাত্র।

www.eelm.weebly.com

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ

[illegible]

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

[illegible]

www.eelm.weebly.com

আমার অংশ নিয়ে নেয়া হলো। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিলেন, তোমার কাছ থেকে যা নেয়া হয়েছে, তা ফিরিয়ে দেয়া হবে। মৃত্যুর পর তাকে এবং তার সকল বংশধরকে তোমার অভ্যন্তরেই স্থাপন করা হবে।

পৃথিবী কর্মের স্থান। ফল প্রদান করা হবে মৃত্যুত্তোর জীবনে। বিনিময় দেয়া হবে যথানিয়মে। মন্দের বদলে মন্দ। ভালোর বদলে ভালো। বিশ্বাসীদের ধৈর্য ও আনুগত্য এবং অবিশ্বাসীদের অস্বীকৃতি ও মিথ্যাচার — সবকিছুর পূর্ণবিনিময় দানের স্থান হিসাবে আখেরাতকেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে কিঞ্চিত প্রতিফল অবশ্য কখনো কখনো দুনিয়াতেও মিলবে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ বলেছেন, 'আমি ইব্রাহিমকে পৃথিবীতে বিনিময় দান করেছি। আখেরাতেও সে হবে সৎকর্মপরায়নদের অন্তর্ভূত।'

পৃথিবী ও আখেরাতের মধ্যবর্তী স্থান কবর। আখেরাতের বিনিময় লাভের প্রক্রিয়া শুরু হবে এই কবর থেকেই। হজরত আবু সাইদ খুদরী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কবর হবে জান্নাতের উদ্যানের মধ্য থেকে একটি উদ্যান অথবা দোজখের অগ্নিগহবরগুলোর মধ্য থেকে একটি গহবর।

পার্থিব জীবন প্রতারণা বৈ অন্য কিছু নয়। এখানকার সৌন্দর্য, সম্পদ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। অন্তরকে করে উদাসীন। দ্বিধা, সন্দেহ আর প্রচারনাপীড়িত এই পৃথিবী অনন্ত জীবনের বাস্তবতায় স্বপ্নের মতো ধুসর, অস্তিত্বহীন। পৃথিবী মগ্নরা সংকীর্ণ চিত্ত, অস্বচ্ছ দৃষ্টি সম্পন্ন।

হজরত কাতাদা বলেছেন, এই আয়াতের শেষ শব্দটির (গুরূর) অর্থ বাতিল। দুনিয়া অন্যের জন্য রেখে চলে যেতে হয়। পার্থিবতা অপসৃত হবে শ্রীঘ্রই। তাই পার্থিব জীবনে তোমরা আল্লাহর আনুগত্যকে আশ্রয় করো।

হাসান বসরী বলেছেন, দুনিয়া তৃণগুল্মাদির সজীবতার মতো (সাময়িক)। কিশোর কিশোরীদের ক্রীড়াকর্মের মতো (অস্থায়ী)।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন, আমি পুণ্যবানদের জন্য দর্শনাতীত এবং শ্রবণাতীত নেয়ামতসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছি, যা উপলব্ধিতেও ধারণ করা যায় না। প্রমাণ চাইলে পাঠ করো 'ফালা তা'লামু নাফ্‌সুম মা উখ্‌ফিয়ালাহুম মিন কুররতি আইয়ুনিন জাযা আম বিমা কানূ ইয়া'মালূন।' জান্নাতের একটি বৃক্ষের বিস্তৃতি এমন যে, একশ বছর ভ্রমণ করেও সেই বৃক্ষছায়ার সীমানা অতিক্রম করা যায় না। যদি প্রমাণ চাও তবে পড়ো — 'ওয়া জিল্লিম মামদূদ।' সুবিস্তৃত ছায়া থাকবে সেখানে। জান্নাতের যষ্টি পৃথিবী ও পার্থিবতা থেকে শ্রেয়। যদি চাও তবে পড়তে পারো — 'ফামান জুহ্‌জিহা আনিন্নার ওয়া উদ্‌খিলাল জান্নাতা ফা কৃদ ফাজা।' বাগবী। অন্য সনদে বোখারী, মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

لَتُبْلَوُنَّ فِىٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○

❑ তোমাদিগকে নিশ্চয় তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইবে। তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের এবং অংশীবাদীদের নিকট হইতে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনিবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সাবধান হইয়া চল তবে উহা হইবে কর্মে দৃঢ় সংকল্প।

পৃথিবী পরীক্ষার স্থান। এখানের বিত্তবৈভব এবং জীবনসম্পৃক্ততার বিভিন্ন সূত্র থেকে নেমে আসবে অনেক বিপদ। এখানে নামাজ রোজা হজ জাকাত এবং জেহাদ সম্পাদনের তিক্ত দায়িত্বকে যেমন নির্বিবাদে বরণ করে নিতে হবে, তেমনি ধৈর্যের সঙ্গে মেনে নিতে হবে কখনো কখনো সম্পদ বিনষ্টিকে, ব্যবসার অসফলতাকে। বুক পেতে নিতে হবে নিরাময়যোগ্য অথবা নিরাময়রহিত রোগব্যধিজনিত অসহায়ত্বকে। স্বজনহারানোর শোককে। তদুপরি শুনতে পাবে মর্মবিদারক বাক্যাবলী আহলে কিতাবদের। কখনো মুশরিকদের। ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, অপবাদ – অনেক কিছুই মেনে নিতে হবে বিশ্বাসবানদেরকে। সুতরাং ধৈর্য ধারণ করতে হবে। ত্যাগ তিতিক্ষায় অটল থাকতে হবে।

ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম তাঁদের গ্রন্থে উত্তম সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এ রকম, এই আয়াতের শানে নুজুল ওই ঘটনাটি যা সংঘটিত হয়েছিলো হজরত আবু বকর এবং ফাখখাজ ইহুদীর মধ্যে। ফাখখাজ বলেছিলো, আল্লাহ দরিদ্র আর আমরা ধনী। ইকরামা, মুকাতিল, কালাবী এবং ইবনে জারীহ্‌ও এরকম বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, রসুল স. হজরত আবু বকরকে বনু কায়নুকার সর্দার ফাখখাজ বিন আজুরার নিকট একটি চিঠিসহ প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিলো কিছু সম্পদ সংগ্রহ করা। হজরত আবু বকরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তিনি যেনো উত্তেজিত না হন। তিনি গলায় একটি তলোয়ার ঝুলিয়ে ফাখ্‌খাজ এর নিকট গেলেন এবং বরকতপূর্ণ চিঠিটি দিলেন। চিঠি পড়ে ফাখখাজ বললো, এখন তোমাদের প্রতিপালক আমাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা শুনে হজরত আবু বকর তাকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করতে চাইলেন কিন্তু রসুল স. এর নির্দেশ স্মরণ করে সংযত হলেন। তিনি ফিরে এলেন। তখন নাজিল হলো এই আয়াত।

www.eelm.weebly.com

আবদুর রাজ্জাক জুহরীর বর্ণনা থেকে আবদুল্লাহ বিন কাব বিন মালেকের উক্তি উল্লেখ করেছেন এরকম, এই আয়াত নাজিল হয়েছে কাব বিন আশরাফ সম্পর্কে। সে তার কবিতায় রসুল স.কে বিদ্রূপ করতো এবং মুসলমানদেরকে গালি দিতো। কবিতার মাধ্যমে সে রসুল স. ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে উত্তেজিত করে তুলতো।

আমি বলি, ঘটনাটি বদর যুদ্ধের পরের। কাব যখন দেখলো, তার চোখের সামনে কোরাইশদের বড় বড় নেতারা মারা গেলো, তখন সে মক্কায় চলে গেলো। মুশরিকদেরকে একত্রিত করে পুনরাক্রমণের জন্য প্রস্তুত করতে সচেষ্ট হলো সে। কোরাইশরা তাকে জিজ্ঞেস করলো, বলো। আমাদের দল সত্যানুসারী না মোহাম্মদের দল? সে বললো, তোমাদের দল। কবিতার জবাব কবিতার মাধ্যমে দেয়াই সমীচীন। রসুল স. তাই হজরত হাস্‌সানকে কবিতার মাধ্যমে জবাব দিতে নির্দেশ দিলেন। হজরত হাস্‌সান কাবের ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপের উপযুক্ত জবাব দিলেন। বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কাব বিন আশরাফ তার কবিতার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে দুঃখ দিয়েছে এবং মুশরিকদেরকে উদ্দীপিত করেছে। তাকে হত্যা করতে পারবে কে? মোহাম্মদ বিন মোসলেমা বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এই খেদমত সম্পাদন করবো আমি। তিনি আমার মামা। আমিই তাকে হত্যা করবো। রসুল স. বললেন, তথাস্তু।

মোহাম্মদ বিন মোসলেমা নিজ গৃহে ফিরে এলেন। পানাহার পরিত্যাগ করলেন তিনি। তিনদিন অতিবাহিত হলো এভাবে। রসুল স. তাঁকে ডেকে বললেন, তুমি পানাহার ছেড়ে দিয়েছো কেনো? তিনি বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি চিন্তিত — কৃত অঙ্গীকারটি পূর্ণ করতে পারবো কিনা। রসুল স. বললেন, চেষ্টা করাই তোমার কাজ। সা'দ বিন মুআজ এর সাথে মতবিনিময় করো। নির্দেশমতো তিনি হজরত সা'দের সাথে পরামর্শ করলেন। সা'দ বললেন, তুমি তার নিকট গিয়ে ধার হিসাবে কিছু খাদ্যসামগ্রী চাও।

কাবকে হত্যা করার জন্য ছোট একটি দল প্রস্তুত হলো। মোহাম্মদ বিন মোসলেমার সঙ্গে যোগ দিলেন ওবাদ বিন বিশর, আবু নায়েলা, সুলকান বিন সালামা, হারেস বিন আবাস এবং হারেস বিন আউস বিন মুআজ। তাঁরা মিলিত হলেন আবু আবাস বিন হিবরের সঙ্গে। সকলে মিলে রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁরা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমরা কাবকে হত্যা করতে গিয়ে কৌশল অবলম্বনার্থে আপনার বিরুদ্ধে কিছু অসঙ্গত কথা উচ্চারণ করতে পারি – এ ব্যাপারে আমাদেরকে অনুমতি দিন। রসুল স. বললেন, ঠিক আছে। যা প্রয়োজন হয় বোল। তখন সকলে মিলে প্রথমে পাঠালেন আবু নায়েলাকে। আবু নায়েলা ছিলেন কবি। কাব্যসূত্রে তিনি কাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কবিতা বিষয়ক

www.eelm.weebly.com

আলোচনা জুড়ে দিলেন। দুই কবি কিছুক্ষণ তাদের কবিতাপরস্পরকে আবৃত্তি করে শোনালেন। এরপর আবু নায়েলা বললেন, আমি তোমার কাছে এসেছি এক কাজে। কিন্তু আগে কথা দাও ব্যাপারটা গোপন রাখবে? কাব বললো, ঠিক আছে। আবু নায়েলা বললেন, আমাদের হয়েছে এক মুসিবত! এমন এক ব্যক্তি আমাদের এখানে এসেছে, যার জন্য সমগ্র আরব দেশই আমাদের শত্রু। সকলের সঙ্গেই আমরা সম্পর্কছিন্ন। ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে আমাদের পরিবার পরিজনেরা। কাব বললো, আমি তো আগেই বলেছি, শেষ পর্যন্ত এরকমই হবে। আবু নায়েলা বললেন, আমার সঙ্গী রয়েছে আরো কয়েকজন। আমরা তোমার কাছে খাদ্য কিনতে এসেছি। এর জন্য আমরা বন্ধক রাখতে প্রস্তুত। কাব বললো, তোমাদের সন্তানদেরকে বন্ধক রাখো। আবু নায়েলা বললেন, এরকম বন্ধক রাখাতো অত্যন্ত লজ্জাকর। বরং পরিশোধের সময় আমরা এক ওসকের বিনিময়ে দুই ওসকের বন্ধক রাখলাম। কাব বললো, তবে তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখো। আবু নায়েলা বললেন, তা কি করে সম্ভব! তুমি আরবদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত, সুপুরুষ। তোমার সৌন্দর্য দেখে কোনো মহিলাই আত্মসংবরণ করতে পারবে না। আমরা বরং আমাদের যুদ্ধাস্ত্রগুলো বন্ধক রাখবো। তুমি তো জানোই অস্ত্রের প্রয়োজন আমাদের কতোটুকু। কাব বললো, আচ্ছা। আবু নায়েলা তাঁর দলের নিকট ফিরে এলেন। এই কৌশলটিকে পছন্দ করলেন সকলে। তাঁরা রসুল স.কে পূর্ণ ঘটনা জানালেন।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক এবং ইমাম আহমদ বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাসের বিবরণ উল্লেখ করেছেন এরকম, রাত্রিকালে রসুল স. এই দলটিকে বাকীয়ে গারকাদ পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বললেন, আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে এগিয়ে যাও। হে আল্লাহ, তুমি এদেরকে সাহায্য করো।

চৌদ্দই রবিউল আউয়ালের রাত্রি। চরাচর জুড়ে জ্যোৎস্নার প্লাবন। রসুল স. ফিরে এলেন। সাহাবীদের ক্ষুদ্র দলটি চললেন কাব বিন আশরাফের গৃহাভিমুখে। আবু নায়েলা বললেন, আমি কাবের মাথার চুল যখন শক্ত করে ধরবো, তখন তোমরা তরবারী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপরে। কাবের বাড়িতে পৌঁছে আবু নায়েলা ডাক দিলেন। নতুন বিবাহিত কাব ডাক শুনে চাদর মুড়ি দিয়ে উঠে পড়লো। তার স্ত্রী তার চাদরের কোনা ধরে টেনে বললো, তুমি একটা জংলী। জংলী না হলে কেউ এসময়ে বের হয়। আমার তো ভয় করছে। বাইরে বেরিও না। ঘরে থেকেই তুমি তাদের সাথে কথা বলো। কাব বললো, আমি তাদের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আর ওরাতো আমার আত্মীয়ই। মোহাম্মদ বিন মোসলেমা আমার ভাগ্নে আর আবু নায়েলা আমার দুধ ভাই। তারা আমাকে ডেকে তুলবেই। আর এরকম নেতিবাচক আচরণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির জন্য অশোভন। চাদর বেষ্টিত কাব

www.eelm.weebly.com

বাইরে বেরিয়ে এলো। তার চাদর থেকে ছড়িয়ে পড়ছিলো সুঘ্রাণ। আবু নায়েলার দল বললেন, চলো। শোয়াবে আজুয পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে যাই। ওখানে বসেই কথাবার্তা বলি। কাব বললো, চলো। আবু নায়েলা বললেন, খুব সুঘ্রাণ যে! কাব বললো, আরবের সর্বাপেক্ষা রূপসী রমনী এখন আমার স্ত্রী। আবু নায়েলা বললেন, অনুমতি হলে আমি একটু সুবাস নেই। কাব বললো, নাও। আবু নায়েলা কাবের মাথায় হাত রাখলেন এবং হাতে খুশবু মেখে নিয়ে বললেন, এই রাতের মতো এতো সুগন্ধ আর কোনোদিন পাইনি। কাব ছিলো সুদর্শন। মাথায় ছিলো কোঁকড়ানো চুল। মেশকের পানির সঙ্গে আম্বর মিশিয়ে কানে পিঠে লাগাতো সে। আবু নায়েলা চলতে চলতে বারবার তার মাথায় হাত ঘষে ঘষে সুঘ্রাণ নিচ্ছিলেন। একসময় অতর্কিতে তিনি তার চুল মজবুতভাবে ধরে ফেললেন এবং সাথীদেরকে বললেন, আল্লাহর দুশমনকে হত্যা করো। উপর্যুপরি চললো তলোয়ারের আঘাত। মোহাম্মদ বিন মোসলেমা বলেছেন, আমি আমার কোষাবদ্ধ ধারালো খঞ্জরটি বের করলাম। কাব খুব জোরে চিৎকার করে উঠলো। তার চিৎকার শুনে আশপাশের ঘরগুলোতে আলো জ্বলে উঠলো। আমি আমার খঞ্জরটি আমূল বিদ্ধ করে দিলাম তার পেটে। মাটিতে পড়ে গেলো খঞ্জরবিদ্ধ কাব। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, আবু আবাস কাবের বগলে আঘাত করলেন। অন্য সকলে কেটে নিলেন তার মাথা। একটি আঘাত এসে লাগলো হারেস বিন আউস বিন মুআজের মাথায়। পাহারারত ইহুদীদের ভয়ে আমরা দ্রুত চলে আসছিলাম। রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিলো হারেস বিন আউসের মাথা থেকে। কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিলেন তিনি। তিনি বলে উঠলেন, রসুল স. এর নিকট আমার সালাম পৌছে দিও। তাঁর কথা শুনে অন্য সকলে পিছিয়ে এলেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চললেন রসুল স. এর খেদমতে। বাকীয়ে গারকাদ যখন তারা পৌছলেন, তখন রাত্রি প্রায় শেষ। তাঁরা সমস্বরে উচ্চারণ করলেন, আল্লাহু আকবর। রসুল স. তখন নামাজ পড়ছিলেন। তকবীর ধ্বনি শুনে তিনিও তকবীর উচ্চারণ করলেন। বুঝলেন, কাবকে হত্যা করা হয়েছে। একটু পরেই তাঁরা মসজিদে নববীতে পৌছে দেখতে পেলেন, রসুল স. দরোজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি স. বললেন, তোমাদেরকে খুব খুশী দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা বললেন, হে রসুল স.! আপনাকেও আমরা আনন্দচিত্ত দেখছি। তাঁরা কাবের মস্তক রেখে দিলেন রসুল স. এর সামনে। তিনি স. আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। আহত হারেসের জখমের উপর তিনি তাঁর পবিত্র থুথু লাগিয়ে দিলেন। জখম যন্ত্রনা চলে গেলো তৎক্ষণাৎ। আপনাপন গৃহে ফিরে গেলেন সকলে।

সকাল হলো। রসুল স. বললেন, ইহুদীদেরকে হত্যা করো — যাকে হাতের কাছে পাও। মাহিসা বিন মাসউদ হত্যা করলেন ইহুদী ব্যবসায়ী শাগিনাকে।

www.eelm.weebly.com

মাহিসার ভাই খাভিসা ছিলো কাফের। তারা দুজনই ছিলো ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত। খাভিসা বললো, তুমি শাগিনাকে মারলে কেনো? আল্লাহর কসম! তোমার পেটের অধিকাংশ চর্বি তার সম্পদ থেকে সৃষ্ট। মাহিসা বললেন, আল্লাহর কসম! ভ্রাতৃহন্তার হুকুম পেলে আমি তোমাকেও হত্যা করবো। খাভিসা বললো, মোহাম্মদের হুকুমে তুমি তোমার ভাইকেও হত্যা করবে! মাহিসা বললেন, হ্যাঁ। খাভিসা বললো, আশ্চর্য! মোহাম্মদের দ্বীন তোমাকে এতোদূর পৌঁছে দিয়েছে! এরপর খাভিসাও মুসলমান হয়ে গেলেন। কাব নিহত হওয়ার পর ইহুদীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেলো। তাদের নেতারা অবনত হলো। ষড়যন্ত্র ও শত্রুতা থেকে বিরত হলো তারা।

ইবনে সা'দ বলেন, ইহুদীরা ভীত হলো। তারা রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো, আমাদের সরদারকে অজ্ঞাতসারে হত্যা করা হয়েছে। রসুল স. কাবের অসৎ আচরণের বিবরণ দিলেন। সে মক্কার মুশরিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেছে। কাব্য চর্চার নামে দুঃখ দিয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে। রসুল স. তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। একটি সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করা হলো। সন্ধিপত্রটি তিনি গচ্ছিত রাখলেন হজরত আলীর কাছে।

<u>মাসআলা</u> ঃ ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যদি কেউ রসুল স. কে গালি দেয়, অসম্মানজনক উক্তি করে অথবা অন্য কোনো উপায়ে দুঃখ দেয় তবে তাকে হত্যা করা বৈধ। সে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাক অথবা নাই থাক। ইমাম আবু হানিফা বলেন, সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কেউ রসুল স.কে গালি দিলে তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। তাঁকে স. গালি দেয়া কুফরী। এবং কাফেরদের সঙ্গে সন্ধি বৈধ (সন্ধি তো পূর্বাহ্নেই হয়) তবে কাবের হত্যাকান্ডটি এই কারণে যে, সে ছিলো সন্ধির অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সহায়তা দান করা হবে না এরকম সন্ধিপত্র পূর্বাহ্নেই সম্পাদিত থাকা সত্ত্বেও সে মক্কায় গিয়ে মুশরিকদেরকে রসুল স. বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করেছিলো।

<u>মাসআলা</u> ঃ এই হত্যাকান্ডের জন্য মোহাম্মদ বিন মোসলেমা এবং আবু নায়েলাকে বিশ্বাসঘাতক বলা বৈধ নয়। হজরত আলীর মজলিসে এক ব্যক্তি এরকম বলতেই তিনি তাকে কতল করেছিলেন। নিরাপত্তার অঙ্গীকার দেয়ার পর হত্যা করলেই কেবল বিশ্বাস ঘাতকতার প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু এখানে মোহাম্মদ বিন মোসলেমা এবং তাঁর সঙ্গীগণ নিরাপত্তা দানের অঙ্গীকার করেননি। তাঁদের কথাবার্তা ছিলো খাদ্য ক্রয় এবং বন্ধক দান সম্পর্কিত।

জ্ঞাতব্য ঃ বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, কাবের সঙ্গে কথা বলেছিলেন মোহাম্মদ বিন মোসলেমা। কিন্তু অধিকাংশ বর্ণনাকারী বলেছেন, আবু নায়েলা কথা বলেছিলেন

www.eelm.weebly.com

তার সাথে। সামঞ্জস্য সাধনার্থে একথা বলা যেতে পারে যে, দু'জনই ছিলেন কাবের সঙ্গে কথোপকথনকারী।

আয়াতের শেষে সবর ও তাকওয়ার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি হয় সবর ও তাকওয়ার মাধ্যমেই। কর্মে দৃঢ়সংকল্প মূলতঃ ধৈর্য ও সাবধানতারই সমীভূত পরিনাম। আতা বলেছেন, 'আজমিল উমুর' (দৃঢ় সংকল্প) অর্থ প্রকৃত ইমান।

আমি বলি, সবর অর্থ পরীক্ষাক্ষণে অসতর্ক না হওয়া, আনুগত্যশীলতা বজায় রাখা এবং আপতিত বিপদে আক্ষেপ না করা। কিন্তু অনিষ্ট করতে উদ্যত কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা সবর বিরোধী নয়। যেমন কাব বিন আশরাফের এই ঘটনা।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৮৭

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ○

❒ স্মরণ কর, যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল আল্লাহ তাহাদের প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন 'তোমরা উহা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবে এবং উহা গোপন করিবে না;' ইহার পরও তাহারা উহা অগ্রাহ্য করে ও স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে' সুতরাং তাহারা যাহা ক্রয় করে তাহা কত নিকৃষ্ট।

হজরত কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ আলেমদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, যা জানো তা অন্য লোককে জানাও। কোনো কিছু গোপন করো না। ইল্‌মকে গোপন করলে ধ্বংস অনিবার্য।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আল্লাহ্ আহলে কিতাবদের নিকট থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমি তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করি তা গোপন কোর না। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন। পুনরায় বললেন, যে তার জ্ঞানকে গোপন করবে কিয়ামতের দিন তার মুখে লাগিয়ে দেয়া হবে আগুনের লাগাম। বিশুদ্ধ সূত্রে এই বর্ণনাটি পেশ করেছেন আহমদ ও হাকেম। ইবনে মাজা উল্লেখ করেছেন হজরত আনাস থেকে। বাগবী লিখেছেন, হাসান বিন আম্মারা বর্ণনা করেন, হাদিস বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছেন জেনেও জুহরীর নিকট গেলাম।

www.eelm.weebly.com

বললাম, উত্তম মনে করলে আমার নিকট কোনো হাদিস বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, একথা কি তুমি জানো না, আমি আর হাদিস বর্ণনা করিনা? আমি বললাম, জানি। তবুও আমার ইচ্ছা, আপনি একটি হাদিস বর্ণনা করুন। আমিও একটি হাদিস বর্ণনা করবো আপনার নিকটে। তিনি বললেন, বলো। আমি বললাম, আমার কাছে হাকাম বিন উয়াইনা ইয়াহিয়া জাযারের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, জাযার বলেন, আমি হজরত আলীর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ জাহেলদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জনের অঙ্গীকার ততোক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করবেন না, যতোক্ষণ না গ্রহণ করবেন আলেমদের অঙ্গীকার। এরপর জুহরী আমার কাছে চল্লিশটি হাদিস বললেন। সা'লাবী তাঁর তাফসীরের মধ্যে এই হাদিসটি হারেসের সূত্রে আবু ওসামার বর্ণনা থেকে লিখেছেন। মসনাদে ফেরদাউস গ্রন্থে হজরত আলী এই হাদিসটি মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৮৮, ১৮৯

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ ع

❒ যাহারা নিজেরা যাহা করিয়াছে তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যাহা নিজেরা করে নাই এমন কার্যের জন্য প্রশংসিত হইতে ভালবাসে তাহারা শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবে এরূপ তুমি কখনও মনে করিও না। তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

❒ আসমান ও জমিনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহেরই; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

মুনাফিকের স্বভাব এই যে, তারা বিভ্রান্তি, ধোকা, সত্যগোপন ইত্যাকার গোনাহ্ অবলীলায় করে যায়। অপরাধবোধ ও অনুতাপ বলে তাদের কিছু নেই। এরা অন্যায় সম্পাদনের পরও পরিতুষ্ট থাকে। তাদের মুখে বিশ্বাস, অন্তরে অবিশ্বাস। আবার তারা এটাও চায় যে, তাদের মৌখিক বিশ্বাস এবং বাহ্যিক আনুগত্যকে গ্রহণ করা হোক, এজন্যে তাদের প্রশংসাও করা হোক। এই আয়াতে আল্লাহতায়ালা তাদের মুখোশ উন্মোচিত করে দিয়েছেন। তাঁর প্রিয় রসুলকে জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের বর্তমান অবস্থা যাই হোক, ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। কপটতার জন্য মহাশাস্তি অপেক্ষা করছে তাদের জন্য।

www.eelm.weebly.com

বোখারী ও মুসলিম, হামিদ বিন আব্দুর রহমান বিন আউফের মাধ্যমে এবং বাগবী, বোখারী সূত্রে আলকামা বিন ওয়াক্কাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেন, মারওয়ান তাঁর দরবার থেকে অন্য এক স্থানে গিয়ে হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা তো সকলেই আপনাপন কর্মকান্ডে পরিতুষ্ট। আর আমরা এ রকমও চাই যে, সৎকার্যের মূল্যায়ন হোক। তবে কি আমাদেরকেও শাস্তি দেয়া হবে?' ইবনে আব্বাস বললেন, এই আয়াতের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কোথায়? মুনাফিকদের একটি ঘটনা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে এই আয়াত। একবার রসুল স. ইহুদীদের নিকট কতিপয় প্রশ্ন করলেন। তারা সঠিক জবাব না দিয়ে অন্য কথা বললো। এভাবে আল্লাহর রসুলকে ধোকা দিতে পেরেছে ভেবে তারা খুশী হলো খুব। আবার সঠিক জবাব দিয়েছে বলে প্রশংসাও পেতে চাইলো। এ পর্যন্ত বলে হজরত ইবনে আব্বাস এই আয়াতটি পাঠ করলেন।

বোখারী ও মুসলিম হজরত আবু সাইদ খুদরী থেকে লিখেছেন, কতিপয় মুনাফিকের অভ্যাস ছিলো এমন — তারা যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে বসে থাকতো। এভাবে বাহানা করে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি লাভ করে তারা খুশী হতো খুব। রসুল স. জেহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর কাছে কসম খেয়ে নানা ওজর আপত্তি পেশ করতো তারা। আবার আশা করতো, ওজর না থাকলে তারা যুদ্ধযাত্রা করতে পিছপা হতো না, যুদ্ধের খাঁটি উদ্দেশ্য তাদের ছিলো, তাই তাদের প্রশংসা করা হোক। সাহাবীগণ যুদ্ধ করে যে প্রশংসাভাজন হয়েছেন, যুদ্ধ না করেই মুনাফিকরা সেই প্রশংসার দাবীদার হতো। তাদের এহেন আচরনের পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

আবদ তাঁর তাফসীরে জায়েদ বিন আসলামের বর্ণনা থেকে লিখেছেন, মারওয়ানের দরবারে উপস্থিত ছিলেন হজরত রাফে বিন খাদীজ এবং জায়েদ বিন ছাবেত। মারওয়ান জিজ্ঞাস করলেন, এই আয়াত কার শানে নাজিল হয়েছে? হজরত রাফে বললেন, কতিপয় মুনাফিক জেহাদ থেকে বিরত থাকতো। তারা বলতো, আমরা আন্তরিকভাবে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু বিশেষ কারণে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ওই মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে এই আয়াত। এই জবাব মারোয়ানের মনঃপুত হলো না। তিনি জায়েদ বিন ছাবেতকে বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি আপনি কি বিষয়টি জানেন? হজরত জায়েদ বললেন, হ্যাঁ। বিষয়টি এরকমই।

উপরে বর্ণিত দুটি ঘটনাই এই আয়াত নাজিলের কারণ। মদীনার ইহুদী এবং মুশরিক উভয় শ্রেণীর মুনাফিকদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে এই আয়াত। এভাবেই ঘটনা দু'টির সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে।

www.eelm.weebly.com

ফারা বলেছেন, ইহুদীরা বলতো, আমরা আগে থেকেই বিশ্বাস, সালাত ও আনুগত্য নিয়ে আছি। তারা এরকম বলতো বটে, কিন্তু রসুল স.এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতো না। তাদের কারণেই এই আয়াত নাজিল হয়েছে। ইবনে আবী হাতেম বিভিন্ন সূত্রে তাবেয়ীনদের একটি দল থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাটিও এই আয়াত নাজিলের আর একটি কারণ হওয়াতে কোনো বাধা নেই।

বাগবী হজরত ইকরামার মাধ্যমে লিখেছেন, এই আয়াত ফাখখাজ এবং অন্য একজন ইহুদী আলেম আশাইয়া'র সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা আলেম বলে গর্ববোধ করতো এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করতো।

মুজাহিদ বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের বিশেষ মর্যাদার কথা শুনে ইহুদীরা আনন্দিত হতো,কিন্তু প্রকৃত অর্থে তারা তাঁকে মানতো না। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, খয়বরের ইহুদীরা রসুল স. এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললো, আমরা আপনাকে চিনি এবং মান্য করি। মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। আমরা তাদের সাহায্যকারী। মুসলমানেরা তাদের ছলছাতুরী ধরতে পারতেন না বলে তাদের প্রশংসা করতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। বলতেন, তোমরা ঠিকই বলেছো। ওই সমস্ত ইহুদীদেরকে চিহ্নিত করতেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

আসমান ও জমিনের নিরঙ্কুশ আধিপত্য কেবল আল্লাহর। বৃষ্টিপাত, রিজিক বন্টন, শস্যোৎপাদন, খনিজ সম্পদ — সব কিছুই তাঁর অধিকারাধীন। তাই তিনি যা খুশী তাই করতে পারেন। যেমন ইচ্ছা হুকুম জারী করতে পারেন।

আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। অবিশ্বাসী কপটদেরকে শাস্তিদান করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। একথা বলে ইহুদীদের ন্যাককারজনক উক্তি 'আল্লাহ ফকির' - এর জবাব দেয়া হয়েছে।

তিবরানী এবং ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, কুরাইশরা ইহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করলো, হজরত মুসা কী মোজেজা নিয়ে এসেছিলেন? ইহুদীরা বললো, লাঠি এবং শুভ্র হস্ত। এরপর কোরাইশরা গেলো খৃষ্টানদের কাছে। বললো, হজরত ঈসা কী মোজেজা নিয়ে এসেছিলেন? খৃষ্টানেরা বললো, তিনি জন্মান্ধকে চক্ষু দান করতেন, কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করতেন এবং মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। তাদের কথা শুনে কুরাইশরা এসে উপস্থিত হলো রসুল স. এর কাছে। আবেদন জানালো, দোয়া করুন, আল্লাহ যেনো আমাদের জন্য এই সাফা পাহাড়কে সোনার পাহাড় বানিয়ে দেন। রসুল স. দোয়া করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

❒ আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রি পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রহিয়াছে বোধ শক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য;

আকাশ পৃথিবীর সকল সৃষ্টি ছিলো অস্তিত্বহীন। তিনিই এ সবকিছুকে অনস্তিত্বতা থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। এটা তাঁর অপার মাহিমা ও ক্ষমতার নিদর্শন। এ এক অসীম বিস্ময়। দিনরাত্রির বিবর্তনও তেমনি। এ সমস্ত কিছু হচ্ছে আল্লাহতায়ালার পূর্ণত্ব, জ্ঞান, পরাক্রম ও অভিপ্রায়ের প্রমাণ। এই প্রমাণ বুঝতে পারেন কেবল তাঁরাই যাঁরা প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিমান, যাঁরা প্রবৃত্তিপ্রসুত ধারণা এবং শয়তানী কুমন্ত্রণামুক্ত।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আক্ষেপ তাদের প্রতি যারা এই আয়াত পাঠ করে কিন্তু এ বিষয়ে গবেষণা করেনা। এই হাদিসটি সিহাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন আখরাজা বিন হাব্বান।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক রাতে আমি রসুল স. এর গৃহে শয়ন করলাম। দেখলাম, তিনি স. ঘুম থেকে উঠে মেসওয়াক করলেন। অজু করলেন এবং 'ইন্না ফী খলক্বিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' শেষ পর্যন্ত পড়লেন। তারপর দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। নামাজের কেয়াম, রুকু ও সেজদা করলেন অনেকক্ষণ ধরে। নামাজ শেষে শুয়ে পড়লেন তিনি। নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর জেগে উঠে আবার আগের মতো মেসওয়াক, অজু, তেলাওয়াত ও নামাজ পড়লেন। আবার শুয়ে পড়ে নিদ্রাভিভুত হলেন। তৃতীয় বারও এ রকম করলেন। এই নিয়মে মোট ছয় রাকাত নামাজ পড়লেন তিনি।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৯১

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

❒ যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শুইয়া আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টির সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইহা অনর্থক সৃষ্টি করো নাই, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদিগকে অগ্নি শাস্তি হইতে রক্ষা করো।'

www.eelm.weebly.com

জ্ঞানীগণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে — তাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর স্মরণমগ্ন থাকেন। সার্বক্ষণিক জিকির, ফিকির, তাসবীহ, ইস্তেগফার, দোয়া, বিনয় — ইমানের ও জ্ঞানের পরিচয়। যারা এই বৈশিষ্ট্যাবলীবিমুক্ত তারা চতুস্পদ জন্তু অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কারণ চতুস্পদ জন্তুরাও তাদের নিজস্ব নিয়মে তাসবী পাঠ করে।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস, নাখয়ী এবং কাতাদার অভিমত, এই আয়াতের জিকির অর্থ নামাজ – দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া, না পারলে বসে, তাও না পরলে শুয়ে। এর সমর্থনে রয়েছে সুরা নিসার ওই আয়াতটি যেখানে বলা হয়েছে, 'যখন তোমরা নামাজ সম্পন্ন করো তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণে রাখো দাঁড়ানো অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায় এবং শায়িত অবস্থায়।

হজরত ইমরান বিন হোসাইন বলেন, আমি রসুল স. কে অসুস্থ ব্যাক্তির নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি স. বললেন, দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো, না পারলে বসে পড়ো। তাও না পারলে শুয়ে নামাজ পড়ো। বোখারী, আসহাবে সুনানে আরবা। নাসাঈ এই হাদিসের সঙ্গে সংযোজন করেছেন, শুয়ে কাত হয়ে না পড়তে পারলে চিৎ হয়ে পড়ো। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যবহির্ভূত নির্দেশ দেন না।

হজরত আলী বর্ণনা করেন, রোগগ্রস্ত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে চেষ্টা করবে। না পারলে বসে নামাজ পড়বে। সেজদা আদায় করতে সক্ষম না হলে ইশারায় সেজদা করবে। সেজদার ইশারা রুকু অপেক্ষা অধিক নত হয়ে করবে। বসতে সক্ষম না হলে ডান কাত হয়ে কেবলার দিকে মুখ করে শুয়ে নামাজ পড়বে। এ রকম না পারলে পা কেবলার দিকে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ পাঠ করবে। দারা কুতনি। এই হাদিসের একজন বর্ণনাকারীর নাম হোসাইন বিন জায়েদ — ইবনুল মাদিনী তাকে দুর্বল বলেছেন। অন্য আরেক বর্ণনাকারী হাসান বিন হাসান মাতরুক (অনির্ভরযোগ্য)। এই হাদিসের প্রেক্ষিতেই ইমান শাফেয়ী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, রোগী ব্যক্তি দাঁড়াতে অসমর্থ হলে বসে-বসতে না পারলে ডান কাতে শুয়ে-তাও না পারলে কেবলার দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ইশারায় রুকু সেজদা আদায় করে নামাজ সম্পন্ন করবে।

ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদের অভিমতও প্রায় এরকমই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ডান কাতে শুতে অক্ষম হলে চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ আদায় করতে হবে। আর ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মতে ডান কাতে শোয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ আদায় করতে পারবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বসতে অক্ষম হলে কেবলার দিকে পা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ আদায় করবে। চিৎ হতে না পারলে ডান কাতে শুয়ে নামাজ পড়তে পারবে। তিনি আরো বলেছেন, এই আয়াতে কিংবা সুরা নিসার উপরোল্লিখিত

www.eelm.weebly.com

আয়াতে রোগীদের নামাজের কথা বলা হয়নি। সাধারণ তাফসীরকারদের মত এই যে, সার্বক্ষণিক জিকিরের কথা বলা হয়েছে এই আয়াতে। কেননা সকল সময় মানুষ দাঁড়ানো, বসা কিংবা শোয়া অবস্থাতেই থাকে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের বাগানে পরিভ্রমণ করতে পছন্দ করে, সে যেন আল্লাহর জিকির অত্যাধিক পরিমাণে করে। হাদিসটি হজরত মুয়াজ থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা এবং তিবরানী।

একথা যদি মেনেও নেয়া যায় যে, আয়াতটি রোগীদের নামাজ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, তবুও এখানে চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ পড়াতে কোনো বাধা নেই। ইমাম শাফেয়ী বর্ণিত নিয়ম এখানে সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয় না। ইবনে হুমাম হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইমরানের ফোঁড়া হয়েছিলো। হাদিস শরীফে চিৎ হয়ে শোয়ার বর্ণনা ছিলোনা বলে তিনি চিৎ হয়ে শুতে পারতেন না। তাই তাঁর বর্ণনায় চিৎ হয়ে শোয়ার কথা আসেনি। তবে নাসাঈ বর্নিত হাদিসের সূত্র সঠিক প্রমাণিত হলে অবশ্য ইমাম শাফেয়ীর দলিল মজবুত হতে পারে। হজরত আলীর মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসের সূত্রশৃংখলে দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে – তাই এ হাদিসটিও দলিল বলে গ্রহণীয় হতে পারে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, চিৎ হয়ে শুতে হবে। না পারলে কাত হয়ে নামাজ পড়বে। কারণ তাঁর মতে, নামাজে রুকু সেজদার গুরুত্ব অত্যধিক। তিনি বলেছেন, যে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু রুকু সেজদা করতে সমর্থ নয়, তার পক্ষে বরং বসে নামাজ পড়াই উত্তম। কারণ উপবিষ্ট অবস্থার ইশারা সেজদার নিকটবর্তী। দাঁড়ানো অবস্থার ইশারা সেজদা থকে দূরবর্তী। কিন্তু জমহুরের অভিমত, দাঁড়াতে সমর্থ হলে বসে নামাজ পড়া বৈধ হবে না। সেজদার গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করতে গেলে কেয়ামের (দাঁড়ানোর) গুরুত্বকে খাটো করতে হয় (রুকু সেজদার মতো কেয়ামও ফরজ)। চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ পড়লে ইশারা কাবার দিকেই হয়। কাত হয়ে শুলে ইশারা হবে পায়ের দিকে। কাজেই কাত হওয়া অপেক্ষা চিৎ হওয়ার গুরুত্বই বেশী।

ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ এবং ইমাম শাফেয়ীর নিকট রুকু সেজদার গুরুত্ব কেয়াম অপেক্ষা বেশী নয়। নামাজের স্তম্ভ হিসাবে তিনটি অবস্থাই সমান গুরুত্ববহ। এ কারণেই দাঁড়াতে সমর্থদের জন্য উপবেশন করা বৈধ নয়। তার জন্য দন্ডায়মান অবস্থাতেই রুকু সেজদার ইশারা করা আবশ্যিক। এবার আসা যাক চিৎ হয়ে শোয়ার ব্যাপারটিতে। চিৎ হয়ে শুলে মুখ কাবার দিকে থাকে না। থাকে আকাশের দিকে। ডান কাতে শুলেই বরং কাবার দিকে মুখ থাকে। পায়ের দিকে নয়। নির্দেশ রয়েছে, 'যেখানেই থাকুন, মুখ মন্ডল রাখবেন কাবার দিকে।' কালাম পাকের এই আয়াতটি লক্ষণীয়।

www.eelm.weebly.com

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করা ইবাদত। একে বলে তাফাক্কুর। এই বিশাল রহস্যময় সৃষ্টি আল্লাহ্‌তায়ালার অপার ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। তাঁর প্রজ্ঞা, কৌশল এবং এককত্বকে প্রমাণিত করে। হজরত আলী বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, তাফাক্কুরের মতো কোনো ইবাদত নেই। শোয়াবুল ইমানে বায়হাকী এবং দোয়াফায় ইবনে হাব্বান এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। অবশ্য উভয়েই বলেছেন, হাদিসটি দুর্বল।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, এক ব্যক্তি রাতে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো বিস্ময়ঘেরা নক্ষত্রমন্ডলে। তিনি অভিভূত হলেন এবং সাক্ষ্য দিলেন, নিশ্চয়ই আমার প্রভুপ্রতিপালক সত্য, আমার স্রষ্টা সত্য। হে আমার আল্লাহ! তুমি আমাকে মার্জনা করো। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করলেন এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। আবু শায়েখ, ইবনে হাব্বান, সা'লাবী।

যুক্তিবিদগণের নিকট ফিকিরের অর্থ হলো অজানা কোনোকিছুকে জানবার চেষ্টায় চিন্তাকে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করা। কামুস অভিধানে রয়েছে, কোনোকিছুকে জ্ঞানায়ত্ব করার প্রয়াসকে ফিকির বলে। সিহাহ্ গ্রন্থে জুহরী লিখেছেন, ফিকির হলো জ্ঞানের পথ বা পদ্ধতি যা চূড়ান্ত বোধ পর্যন্ত পৌঁছাতে সহায়তা করে। ফিকির করবার যোগ্যতা কেবল মানুষেরই আছে। প্রজ্ঞা দেয়া হয়েছে কেবল মানুষকেই। অন্য সকল সৃষ্টির অনুভূতি আছে কিন্তু প্রকৃষ্ট বুদ্ধি নেই। যা চিন্তার আওতায় আনা সম্ভব সে বিষয়েই কেবল ফিকির বা গবেষণা করা সম্ভব। এ জন্য বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর অনুগ্রহরাজি সম্পর্কে চিন্তা করো, আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি চিন্তা পরিচালিত কোর না। কারণ, তিনি বোধাতীত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফিকির শব্দটি ফারাক শব্দের বিপরীত। ফারাক অর্থ পৃথক হওয়া। আর ফিকির হচ্ছে পৃথকতাবিরুদ্ধ। ফিকির সম্মিলিত তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম।

আমি বলি, সকল বিষয়ে গবেষণা করো, কিন্তু আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের গবেষণা থেকে বিরত হও। কেননা সপ্তম আসমান থেকে আল্লাহ্‌র কুরসী পর্যন্ত রয়েছে সাত হাজার নূরের আড়াল। তার পরে আল্লাহর অস্তিত্ব, যা অবোধ্য। আবু শায়েখ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, গবেষণা নিবদ্ধ রাখো সৃষ্টির সীমানায়, স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ো না। কারণ, তিনি অননুমানীয়। হজরত আবু জরের বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করো, আল্লাহ্‌কে চিন্তায়ত্ত করতে চেয়ো না। এরকম করলে ধ্বংস হয়ে যাবে। ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করো, আল্লাহ্‌র জাত সম্পর্কে গবেষণা কোর না। আওসাত পুস্তকে তিবরানী শিথিল সনদের মাধ্যমে উল্লেখ

www.eelm.weebly.com

করেছেন, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসম্ভার নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হও, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে বোধগম্য করতে চেয়ো না। আবু শায়েখ, ইবনে আদী এবং বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

এ সমস্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা গবেষনায় লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ। চিন্তা গবেষণা করতে হবে আল্লাহর নাম, গুণাবলী এবং কার্যাবলীর প্রতিফলন সম্পর্কে। এখানে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট যে, নাম গুণাবলীর প্রতিফলনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ব্যতিরেকে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব নয়। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী কু. বলেন, কেবল আল্লাহর অস্তিত্বের মাধ্যমে ইলমে হুজুরীর (আত্মজ্ঞানের) সম্পর্ক নির্ণয় করা কঠিন। কেননা আত্মজ্ঞান প্রেম ভালোবাসা নির্ভর। আত্মজ্ঞান নফসের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা মাধ্যমবিহীন। আত্মজ্ঞান তাই জ্ঞানীর অস্তিত্বনির্ভর। বিশ্বাস অবিশ্বাসের তত্ত্বও তাই নফস বা প্রবৃত্তিনির্ভর। আল্লাহ আমাদের নফস বা সত্তাপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী। এই অতি নিকটবর্তীতাই বিস্মরণের কারণ। অতি নিকটবর্তীতাকে জ্ঞান ধারণ করতে পারে না। অতিনৈকট্যের এই পর্দা অতিক্রামসাধ্য নয়। তাই কেবলই পর্দা, কেবলই পর্দা। দূরত্ব সে যতো দূরত্বই হোক না কেনো তা অতিক্রম করা সম্ভব। কিন্তু অতিনৈকট্য অনতিক্রমণীয়। এই অতিনৈকট্যের কারণেই আল্লাহ অদর্শিত ও সংগুপ্ত। এই অদৃশ্যতা ও সংগুপ্তি ইলমে হুজুরী লাভের অন্তরায়। সুফিয়ায়ে কেরাম ইলমে লাদুন্নী লাভ করে থাকেন। এই ইলমে লাদুন্নী কিন্তু হুসুলিও নয় হুজুরীও নয় (অর্জনযোগ্য কিংবা অনুধাবনযোগ্য নয়)। তাঁদের জ্ঞান নিছক জাত কর্তৃক দন্ডায়মান। এর তত্ত্ব ও অবস্থা গবেষণাযোগ্য নয় বলে এক্ষেত্রে গবেষণা বৈধও নয়। তবে রূপকভাবে একে গবেষণা বলা যেতে পারে। যেমন কোনো কোনো সুফী বলেছেন। তাঁদের উক্তিসমূহ শরিয়তসম্মত ব্যাখ্যার পটভূমিতে উপস্থাপিত করতে হয়েছে।

হাদিস শরীফে এসেছে, রসুল স. সর্বক্ষণ আল্লাহর জিকিররত থাকতেন — এই জিকির হুসুলিও নয় হুজুরীও নয়। মুখের জিকির তো নয়ই। সার্বক্ষণিক মৌখিক জিকির অসম্ভব। সার্বক্ষণিক জিকিরই মূল জিকির। এই জিকিরের স্তর অত্যন্ত উচ্চ। তাফাক্কুর বা ফিকিরই কেবল ওই মূল জিকিরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। এ জন্য আল্লাহ 'উলুল আলবাব' বা বোধশক্তিসম্পন্নদের বৈশিষ্ট্যকে সার্বক্ষণিক জিকিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। এর পরে উল্লেখ করেছেন চিন্তা গবেষণার কথা। চিন্তা গবেষণা ওই জিকির পর্যন্ত পৌঁছতে সহায়তা করে। ওই জিকির মূল প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ, যা অক্ষয়, অব্যয়। তাই দাঁড়িয়ে বসে এবং শুয়ে জিকির করা অর্থ সর্বক্ষণ জিকির করা। তাফাক্কুরের পূর্বে জিকিরের উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, কেবল জ্ঞান বা চিন্তা গবেষণা বিশুদ্ধ নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত

www.eelm.weebly.com

প্রণয়নে সক্ষম নয়, যদি না সে জ্ঞান জিকিরের নূর এবং আল্লাহ্‌র পথপ্রদর্শন দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হয়। গবেষণার ভিত্তি জিকির এবং জিকিরের নূর। আল্লাহর নূর ব্যতিরেকে যারা চিন্তা গবেষণায় লিপ্ত, তারা তাই পবিত্রতম সত্তা আল্লাহতায়ালার প্রতি বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত। তারা গবেষণাকারী, কিন্তু বিশ্বাসী নয়। যাদের অন্তরে জিকিরের জ্যোতি প্রতিভাসিত, সে রকম প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প।

বিশ্বাসী ও বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলেন, হে আল্লাহ! তোমার এই সৃষ্টি নিরর্থক নয়। অর্থপূর্ণতা ও নিরর্থকতা সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থপূর্ণতাই সত্য। তিনটি উপায়ে সত্যানুসরণ সম্ভব। ১. ওই অস্তিত্ব যা প্রকৃত অস্তিত্ব পর্যন্ত পৌছতে সচেষ্ট, যা অন্য কোনোকিছুর মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহই জানেন, এর পূর্ণত্ব কতোদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ২. ওই বিদ্যমানতা, যা অনুমাণ ও ধারণারহিত। সৃষ্টিরহস্যের গবেষণা ওই ধারণারহিত অবস্থার প্রতি পথপ্রদর্শন করতে পারে। আকাশ, পৃথিবী, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রসলিল, বৃক্ষরাজি, প্রাণীকুল, মনুষ্যসমাজ এই পথপ্রদর্শনের সহায়ক ৩. ওই অস্তিত্বশীলতা, যার অবস্থান প্রজ্ঞাময়, রহস্যাচ্ছন্ন ও ফলদায়ক। যা নিরর্থক বঞ্চনাপ্রবণ, কৌশলরহিত কিংবা অর্জনহীন নয়। বাতিল বা নিরর্থকতারও তিনটি বিপরীত দিক রয়েছে। রসুল স. বলেছেন, উত্তম কথা লবীদ বিন রবীয়ার কথা। তিনি তাঁর কবিতায় বলেছেন,হুঁশিয়ার! আল্লাহ ছাড়া সকল কিছুই বাতিল (অর্থাৎ আপন অস্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্যাবলীর জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী। কোনোকিছুই প্রকৃত অস্তিত্বসম্পন্ন কিংবা স্বতিষ্ঠ নয়)। দ্বিতীয় দিকটির ইঙ্গিতও রয়েছে এই কবিতায়। বলা হয়েছে, যা স্বপ্রতিষ্ঠিত নয়,তার উপাসনা কেবলই ধারণা সম্ভূত — যার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। তৃতীয় দিকটিতে রয়েছে শয়তান। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন 'লা ইয়া'তিহিল বাতিলু মিম বাইনি ইয়াদাইহি ওয়া লা মিন খলফিহী।'

'রব্বানা মা খলাক্বতা হাজা বাতিলা' (তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করো নাই) — এই বাক্যটিতে বাতিল বা নিরর্থক বলতে কৃপণতা অথবা সংকীর্ণতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। নিরর্থক নয় অর্থ আকাশ ও পৃথিবী হকীকত বিহীন নয়। এ সমস্ত কিছু মায়া — এ রকম ধারণা মিথ্যা। আহলে হক (আশায়েরা সম্প্রদায়) আকাশ পৃথিবীর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বলেছেন, বস্তুপুঞ্জের হকীকত (তত্ত্ব) এই দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এই বস্তুপুঞ্জের হকীকত জানাই প্রকৃত জ্ঞান। অপর দিকে সুফেসতাইয়া সম্প্রদায় মায়াবাদকে আশ্রয় করেছে। তাদের মতে পৃথিবী একটি প্রতারণা ও ধারণা। এর কোনো হকীকত নেই। এর প্রেক্ষিতে সত্য পন্থীগণ বলেছেন, বাতিল বলতে যদি সংকীর্ণতাকে গ্রহণ করা হয়, তবে এই আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম, হে আল্লাহ! তুমি একে কেবল উদ্দেশ্যহীন অথবা ক্রীড়াকর্মের উপকরণ স্বরূপ সৃষ্টি

www.eelm.weebly.com

করোনি। বরং সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে রয়েছে হিকমত বা অভিজ্ঞান, যা তোমার পরিচিতি লাভের উপকরণ। যা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আনুগত্যকে অপরিহারনীয় করে।

আয়াতের শেষে প্রার্থনার প্রকৃষ্ট ভঙ্গিটি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহতায়ালার পবিত্রতার স্বীকৃতি দেয়ার পর কামনা করা হয়েছে, আমাদেরকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচাও। আকাশ পৃথিবীর সৃষ্টি নিছক ক্রীড়াকর্ম নয়। উদ্দেশ্যবিহীনও নয়। সৃষ্টির রহস্যকে অবলম্বন করতে না পারলেও যেনো আমরা শাস্তিযোগ্য না হই। চিন্তাগবেষণা যেনো আমাদের পুন্য লাভের ইচ্ছাকে প্রবল করে। আর তোমার আযাবের আশংকাকে প্রবল করে। আমরা তো তোমার পবিত্রতাকে স্বীকার করে নিয়েছি। অতএব তুমি আমাদেরকে দোজখাগ্নি থেকে রক্ষা করো।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৯২

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ۖ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۝

❑ হে আমাদের প্রতিপালক! কাহাকেও তুমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহাকে তো তুমি নিশ্চয়ই হেয় করিলে এবং সীমালংঘনকারীদের কোনো সাহায্যকারী নাই।

এখানে পূর্বাপর আয়াতগুলোতে পুনঃ পুনঃ রব্বানা (হে আমাদের প্রভুপালক) শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। এই শব্দটির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রভুপালকত্বের স্বীকৃতি, তাঁর প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা, তাঁর সমুচ্চ মহিমার ঘোষণা এবং বিনয়নম্রতার বহিঃপ্রকাশ। এভাবে 'রব্বানা' সম্বোধনের পর একথার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে যে, যারা আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত, অপমাণিত। তারা জালিম। তাদের এই লাঞ্ছনা জুলুমের কারণেই। তারা সীমালংঘনকারী। আর সীমালংঘনকারীদের কোনো সহায় নেই। সহায়তাকারী নেই।

একটি ধারণা ঃ অন্য এক স্থানে আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ নবীকে এবং ওই সমস্ত লোকদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না — যারা তাঁর সাথে ইমান এনেছে। আবার এই আয়াতে দোজখীরা যে লাঞ্ছিত, সে কথার স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। একথাও সত্য যে, কেবল কাফের নয়, কিছু কিছু মুমিনও দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে (সাময়িকভাবে হলেও)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মুমিনরা কি লাঞ্ছিত?

www.eelm.weebly.com

উত্তর ঃ আমরা বলি যে, দোজখবাসী সে কাফের হোক অথবা মুমিন, উভয়েই লাঞ্ছিত। যতোক্ষণ তারা অগ্নিমধ্যে অবস্থান করে। লাঞ্ছনা থেকে পূর্ণ নিষ্কৃতির অঙ্গীকার করা হয়েছে কেবল তাঁদের জন্য যাঁরা কামেলে মুমিন (পূর্ণ ইমানদার)।

হজরত আনাস এবং হজরত কাতাদা বলেছেন, এখানে সেই সব লাঞ্ছিতদেরকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে যাদের দোজখবাস চিরস্থায়ী। সাঈদ বিন মানসুর বলেছেন, এই আয়াতে উল্লিখিত লাঞ্ছনার বাইরে রয়েছেন ওই সকল মানুষ যাঁরা কস্মিনকালেও দোজখে প্রবেশ করবেন না। হজরত জাবের বলেছেন, মুমিনদেরকে লাঞ্ছিত করার কথা ধরে নেয়া হলেও তাদের জন্য এই লাঞ্ছনা হবে সংশোধনমূলক, শাস্তিমূলক নয় (সংশোধন এবং শাস্তি এখানে ইমান ও কুফরের পার্থক্যকে চিহ্নিত করেছে)।

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৯৩

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۝

❒ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে বিশ্বাসের দিকে আহবান করিতে শুনিয়াছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।' সুতরাং আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা করো, আমাদের মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত কর, এবং আমাদিগকে সৎকর্মপরায়নদের মৃত্যুর মত মৃত্যু দাও।

হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে আব্বাস এবং অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, 'আহবানকারী' অর্থ রসুল স.। কুরতুবী বলেছেন, কোরআন। কারণ রসুল স. এর আহবান তো পরবর্তী সময়ের মানুষের পক্ষে শোনা সম্ভব নয়। আমি বলি এর অর্থ রসুল স. এর মাধ্যমে কোরআন শোনা। সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে। তাঁর সরাসরি আহবান মান্য করলে যেমন ইমানদার হওয়া যায়। তেমনি তাঁর প্রতিনিধিত্বের ধারাবাহিকতায় আগত পরবর্তী আহবানকারীদের আহবানকে মান্য করলেও ইমানদার হওয়া যায়। আয়াতে উল্লেখিত আহবানকারী নির্দিষ্ট নয়। তাই বলা হয়েছে 'এক আহবায়ককে'। শেষ আহবান হচ্ছে ইমানের প্রতি আহবান। আর এ রকম আহবানকারীরাই সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। আহবানকারীর আহবানই ইমানের ভিত্তি। ইমান বুদ্ধিবিবেচনাপ্রসূত নয়। শায়েখ আবুল মনসুর মাতুরিদি বলেছেন, ইমান জ্ঞাপনার্থে 'ইনশাল্লাহ আমি ইমানদার' এ

www.eelm.weebly.com

রকম বলা অনুচিত। এতে করে নিঃসন্দিদ্ধতা প্রমাণিত হয় না। বরং এ রকম বলা ওয়াজিব যে, 'নিশ্চিত আমি ইমানদার।'

ইমান ব্যতীত ফানা লাভ হয় না। তাই আহবানকারীর আহবানে বিশ্বাস স্থাপন করার পর প্রথমে 'জুনুবানা' শব্দের মাধ্যমে কবীরা গোনাহের জন্য এবং পরে 'সাইয়িআতিনা' শব্দটির মাধ্যমে সগীরা গোনাহের জন্য ক্ষমা যাচনা করা হয়েছে। সগীরা গোনাহের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে 'আমাদের মন্দ কার্যগুলোকে দূরীভূত করো'। শেষে বলা হয়েছে আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের মৃত্যুর মতো মৃত্যু দাও। এককভাবে নিজেকে সৎকর্মশীল হবার প্রার্থনা জানানো হয়নি – এই ভঙ্গিটিতে রয়েছে নম্রতা ও বিনয়। নম্রতা আল্লাহতায়ালার পছন্দনীয়। বিনয়াবনতদেরকে আল্লাহতায়ালা ভালোবাসেন। সৎকর্মপরায়নদের মৃত্যুর মতো — একথার অর্থ এই নয় যে, তাঁরা যখন মৃত্যুবরণ করবেন তখন যেনো আমরা মৃত্যুবরণ করি। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সৎকর্মশীলদের যে দল, সেই দলে যেনো আমরা অন্তর্ভূত হই। এবং তাঁরা যেমন ইমানসহ পৃথিবী পরিত্যাগ করে থাকেন, আমাদেরও যেনো সে রকম অবস্থা হয়।

একটি ধারণা ঃ এটা তো মৃত্যুর অভিপ্রায় জ্ঞাপন ও মৃত্যুর জন্য দোয়া করার মতো। অথচ রসুল স. মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। ইতোপূর্বে সুরা বাকারার 'ফাতামান্নাউল মাউতা ইন কুনতুম সদিক্বীন' আয়াতের তাফসীরে একথা বলা হয়েছে।

সমাধান ঃ এই মাসআলাটি নিশ্চিত যে, মৃত্যুর জন্য, সম্পদ বিনষ্টির জন্য অথবা শারিরীক কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে জীবনাবসানের জন্য প্রার্থনা জানানো নাজায়েয। কিন্তু এই আয়াতটিতে মৃত্যু যাচনা করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে মৃত্যু যখনই আসুক – আমরা যেনো মৃত্যু পর্যন্ত পুণ্যময় ও সংশোধিত জীবন লাভ করতে পারি। আর যথাসময়ে মৃত্যু এলে যেনো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারি তেমনিভাবে, যেমন মৃত্যু লাভ করেন সৎকর্মশীলগণ। তাৎক্ষণিক মৃত্যু প্রার্থনা এখানে উদ্দেশ্য নয়। যেমন অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা আংতুম মুসলিমুন' (মুসলমান না বানিয়ে আমাদেরকে মৃত্যু দান কোর না)। এখানে ইসলামবিহীন মৃত্যুর প্রতি অনাকাঙক্ষা প্রকাশ করা হয়েছে। মৃত্যুকে বিলম্বিত করার প্রার্থনা এখানে জানানো হয়নি। নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু তো আসবেই। মানুষ তো জানে না সে সময়টি কখন। যখনই হোক না কেনো প্রার্থনা এই যে, তৎপূর্বে আমরা যেনো মুসলমান অবস্থায় থাকি এবং সে অবস্থাতেই মৃত্যুকে স্বাগত জানাই।

www.eelm.weebly.com

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

❑ হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রসুলগণের মাধ্যমে আমাদিগকে যাহা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহা আমাদিগকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে হেয় করিও না। তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।

আল্লাহতায়ালা অনুগ্রহ করে যা কিছু দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন, এই আয়াতে সে সমস্ত কিছু পাওয়ার আকুতি উপস্থাপন করা হয়েছে। চাওয়া হয়েছে আখেরাতের কল্যাণ এবং পৃথিবীতে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়। চাওয়া হয়েছে জান্নাত, আল্লাহতায়ালার নৈকট্য ও দীদার। বলা হয়েছে, পয়গম্বরদের মাধ্যমে আপনি যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন, তা দান করুন। আমাদেরকে তাদের দলভূত করুন। তাদেরকে যেমন প্রিয় করেছেন, আমাদেরকেও তেমনি করুন। পয়গম্বরদের সাহচর্যের বরকতে আমাদেরকেও আপনার বরকতের অন্তর্ভুত করে নিন।

একটি ধারণাঃ আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করার অর্থ কী? প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কি কোনো আশংকা রয়েছে যে, প্রার্থনার মাধ্যমে তা পূরণ করতে হবে?

উত্তরঃ না। বরং এখানে রয়েছে ভয় এবং বিনয়। আল্লাহতায়ালা সম্পূর্ণ স্বাধীন, অমুখাপেক্ষী—একথা মেনে নিলে ভয় ও বিনয় স্বভাবতই এসে পড়ে। তাঁর নিছক অনুগ্রহ লাভের প্রতি আকুতি এই প্রার্থনায় প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আশংকা তো অবিশ্বাস। 'তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না' বলে সত্বর প্রতিফল লাভ করাই এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আমরা জানি এবং নিশ্চিত বিশ্বাসও করি, তুমি নিশ্চয়ই অঙ্গীকারবিচ্যুত নও। কিন্তু আমরা তো সহিষ্ণুতার অবসান চাই। সত্বর দেখতে চাই কাফেরদের লাঞ্ছনা, পরাজয় এবং প্রতিশ্রুত বিজয়। এটাও সত্বর দেখতে চাই যে, লাঞ্ছনা আমাদেরকে স্পর্শ করেনি আর আমরা দোজখেও প্রবেশ করিনি। আমরা বেঁচে থাকতে চাই ওই সমস্ত কর্মকান্ড থেকে যা কিয়ামতের দিন হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার কারণ হবে। আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যাচনা করছি ভুলত্রুটি সমূহের আড়াল।

হজরত আবু হোরায়রা বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর বান্দাকে আপন সান্নিধানে এনে তাকে অন্য সকলের আড়াল করবেন। তারপর তাঁর পবিত্র হস্ত স্থাপন করবেন তাঁর উপর। বলবেন, দেখো তোমার আমলনামা। বান্দা তার আমলনামা পড়তে থাকবে। পুণ্যসমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে দেখে আনন্দে আন্দোলিত হবে তাঁর অন্তর। অবয়ব হবে সমুজ্জ্বল। আল্লাহ্ বলবেন, দেখলে তো। বান্দা বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ বলবেন, আমি তোমার পুণ্যকর্মসমূহ কবুল করেছি। বান্দা তৎক্ষণাৎ সেজদাবনত হবে। আল্লাহ বলবেন, মস্তক উত্তোলন করো। আরেকবার

www.eelm.weebly.com

দৃষ্টি নিবদ্ধ করো আমলনামায়। হুকুম মোতাবেক বান্দা তার আমলনামায় দৃষ্টি পুনঃনিবদ্ধ করলে সে দেখবে গোনাহ্ সমূহ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বান্দা তখন ভীত হবে। তাঁর চেহারা হবে অনুজ্জ্বল। আল্লাহ বলবেন, দেখেছো? বান্দা বলবে, হ্যাঁ, আল্লাহ বলবেন, আমলনামায় লিপিবদ্ধ না থাকলেও আমি তোমার গোনাহ্ সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। কিন্তু আমি তোমার গোনাহ্সমূহ মাফ করে দিলাম। এমনি করে বান্দা বারবার পড়তে থাকবে তার পুণ্যলিপি ও মন্দ সমূহের বিবরণ। আল্লাহ্ বারবার ক্ষমা ঘোষণা করতে থাকবেন এবং সে হতে থাকবে বারবার সেজাদাবনত। অন্যেরা এসবকিছু জানবেও না। দেখবেও না। তারা কেবল দেখবে বার বার সে সেজদাবনত হচ্ছে। তারা অনুচ্চ স্বরে বলাবলি করতে থাকবে, ওর কী সৌভাগ্য। আল্লাহর নাফরমানী বলতে ওর কিছু নেই। জাওয়ায়েদ পুস্তকে আবদুল্লাহ বিন আহমদ এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। আবু মুসার মাধ্যমে বায়হাকীও এ রকম উল্লেখ করেছেন। হজরত ইবনে ওমর সূত্রে বোখারী ও মুসলিমেও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই হাদিসটি।

জ্ঞাতব্য ঃ কিয়াম শব্দের অর্থ দাঁড়ানো বা উঠে দাঁড়ানো। বিচারের দিন সকল মানুষ উঠে দাঁড়াবে। সকল মানুষকে সেদিন উঠে দাঁড়াতে হবে। এই আয়াতে সেই কিয়ামতের কথাই বলা হয়েছে। আরেক অর্থে প্রতিটি মৃত্যুই কিয়ামত। কিন্তু এখানে সে কথা বলা হয়নি। কিয়ামতের পরিসর হচ্ছে কবর থেকে জান্নাত অথবা দোজখ। হিসাব কিতাব, মিজান, পুলসিরাত–এ সকলকিছুও কিয়ামতের অন্তর্ভূত

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৯৫

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ○

❑ অতঃপর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের ডাকে সাড়া দিয়া বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মে নিষ্ঠ নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমাদের এক অপরের সমান। সুতরাং যাহারা দেশ ত্যাগ করিয়া পরবাসী হইয়াছে, নিজ গৃহ হইতে উৎখাত হইয়াছে, আমার পথে নির্যাতিত হইয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে ও

www.eelm.weebly.com

নিহত হইয়াছে আমি তাহাদের মন্দ কার্যগুলি অবশ্যই দূরীভূত করিব এবং অবশ্যই তাহাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। ইহা আল্লাহের নিকট হইতে পুরস্কার; উত্তম পুরস্কার আল্লাহেরই নিকট।

আল্লাহ্পাক তাদের দোয়া কবুল করেন এবং তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, পুরুষ অথবা নারী যে কেউ হোক না কেনো, কারো কর্মফলকে আমি ব্যর্থ করবো না। হজরত উম্মে সালমা বলেছেন, যখন একথা বলাবলি হতে লাগলো যে, আল্লাহ্ কেবল মোহাজির পুরুষদের প্রশংসায় আয়াত নাজিল করেছেন — এই আয়াত নাজিল হয়েছে তখনই। হাকেম, সিহাহ্, তিরমিজি, ইবনে আবী হাতেম, আবদুর রাজ্জাক, সাঈদ বিন মানসুর।

বিশ্বাসবান পুরুষ এবং বিশ্বাসবতী নারী একই রকম। তারা একে অপরের সহায়তাকারী। সকলেই হজরত আদম এবং হজরত হাওয়ার সন্তান-সন্তুতি। প্রত্যেক পুরুষ যেমন নারীর উদরজাত। তেমনি প্রতিটি রমনীও পুরুষের ঔরসজাত। তাই সওয়াব প্রাপ্তির ব্যাপারে তারা উভয়েই সমান। কোনো তারতম্য এখানে নেই।

তারা তাদের গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। সত্যের পথে নির্যাতনকে বরণ করে নিয়েছে। জেহাদ করেছে, শহীদ হয়েছে। (আল্লাহ বলেন) এ সমস্ত করেছে কেবল আমার জন্যেই। আমি তাদেরকে ক্ষমা করবো। দান করবো বেহেশতে প্রবেশের অধিকার, যেখানে রয়েছে প্রবহমান স্রোতস্বিনী।

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতে কেবল বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীর কর্মফল বিনষ্ট না করার প্রতিশ্রুতি এসেছে। অবিশ্বাসীদের সকল কর্মই বিনষ্ট। কারণ, সৎকর্মসমূহ গৃহীত হওয়ার শর্ত হচ্ছে ইমান। ইমান ব্যতীত কোনো আমলই (আখেরাতের জন্য) গ্রহনীয় নয়। এরপর বলা হয়েছে সওয়াব প্রদানের কথা। এই সওয়াবই জান্নাত লাভের কারণ। আর সওয়াব কেবল বিনিময় নয়। সওয়াব হচ্ছে আল্লাহতায়ালার নিছক মেহেরবানী। সওয়াব হচ্ছে আল্লাহর অপার মহিমা — অনুগ্রহসিক্ত পুরস্কার।

সবশেষে বলা হয়েছে, উত্তম সওয়াব প্রদাতা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ নয়। এই উত্তম সওয়াব অর্জন বান্দার ক্ষমতাবহির্ভূত। উত্তম সওয়াবের প্রকৃত অর্থ আল্লাহর নৈকট্য। উত্তম সওয়াব জান্নাত এবং জান্নাতের নেয়ামতসমূহ অপেক্ষা উত্তম।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, মুসলমানেরা বলাবলি করছিলেন, দেখো মুশরিকেরা আল্লাহর দুশমন হওয়া সত্ত্বেও কেমন আরামে আছে। ঘর সংসার করছে, ব্যবসা বাণিজ্য করছে। আর আমরা ইমানদার হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রকম অনটন ও সমস্যায় জর্জরিত। এর প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۝ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, দেশে দেশে তাহাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।

❒ ইহা সামান্য ভোগ মাত্র; অতঃপর জাহান্নাম তাহাদের আবাস; আর উহা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।

কাফেরদের নিরুপদ্রব জীবন দেখে প্রতারিত হওয়ার কিছু নেই। বাণিজ্য ব্যাপদেশে তাদের বাহ্যিক উৎকণ্ঠাহীনতা, স্বাভাবিক সংসার যাপন সাময়িক। এখানে 'তোমাকে' বলে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। কিন্তু হেদায়েত পেশ করা হয়েছে তাঁর উম্মতের জন্যে। কারণ, প্রতারিত হওয়ার সুযোগ তাঁর স. একেবারেই নেই। কিন্তু উম্মতের জন্য রয়েছে দ্বিধা সন্দেহের আশংকা। তাই এই হেদায়েত।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, পথভ্রষ্টদের উত্তম অবস্থা দেখে তাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ কোর না। তোমরা জানো না, তাদের মৃত্যুত্তোর জীবন কীরকম। তাদের জন্য আল্লাহ এমন এক স্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন, যেখানে আর কখনো তারা মরবে না (অর্থাৎ দোজখ)। শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে ইমাম বাগবী এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

কাফেরদের এই উপভোগ অতি সামান্যই (মহাজীবনের তুলনায়)। তাদের এই নিশ্চিন্ততা অত্যন্ত নিম্নস্তরের (কারণ পার্থিব জীবনের অবসানের সাথে সাথেই তা অবলুপ্ত হবে)। হজরত মোসাওয়ার বিন শাদ্দাদ বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আখেরাতের তুলনায় পৃথিবীর দৃষ্টান্ত এ রকম যেমন, সমুদ্র এবং সমুদ্রনিমজ্জিত হাতের আঙ্গুলের পানি। মুসলিম।

কাফেরদের চূড়ান্ত গন্তব্য জাহান্নাম। তাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতাই তাদেরকে ওই চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌছতে সহায়তা করে যাচ্ছে।

www.eelm.weebly.com

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝١٩٨

❒ কিন্তু যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। ইহা আল্লাহের পক্ষ হইতে আতিথ্য; আল্লাহের নিকট যাহা আছে তাহা সৎকর্মপরায়ণদিগের জন্য শ্রেয়ঃ।

বিশ্বাসীদের জন্য এখানে পুনরায় দেয়া হয়েছে স্বর্গোদ্যানের সুসংবাদ। স্বর্গের ওই বসতি চিরকালীন। সেখানকার নির্ঝরিণীও নিরন্তর। ওই অসীম প্রাপ্তি অবিশ্বাসীদের অদৃষ্টে নেই। তাদের পার্থিব আনন্দ শেষ হবে পৃথিবীতেই। ওই অন্তহীন সুখের অধিকার লাভ করবেন তাঁরাই, যাঁরা বিশ্বাসী ও বাধ্য। সুতরাং পার্থিব সীমাবদ্ধতা ও সংকটে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। অবিশ্বাসীরা অজ্ঞ বলেই মনে করে তারাই সফল এবং মুসলমানেরা ক্ষতিগ্রস্ত। বিশ্বাসীগণ আল্লাহ্র অতিথি। আল্লাহ্ তাঁর সীমাহীন অনুগ্রহের মাধ্যমে তাঁদের জন্য আতিথ্যের আয়োজন করবেন। ওই আয়োজনের অন্তর্ভূত থাকবে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ সম্ভারসমূহ — সওয়াব, আল্লাহর নৈকট্য এবং তাঁর সন্তোষ ও রহমত। যাঁরা সৎকর্মপরায়ন (আবরার) — ওই সফলতা কেবল তাঁদের জন্যই। আয়াত শেষে তাই আবরারগণের প্রশংসা ও মর্যাদা ঘোষিত হয়েছে।

হজরত ওমর বিন খাত্তাব বলেন, আমি একদিন রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে দেখলাম, তিনি স. খেজুরের চাটাইয়ের উপর বিশ্রাম গ্রহণ করছেন। তাঁর মাথার নিচে খেজুরের ছালভর্তি চামড়ার বালিশ। পায়ের পাশে কিছু পাকা চামড়া স্তুপীকৃত। মাথার কাছেও রয়েছে পাকা চামড়ার স্তূপ। চাটাইয়ের দাগ মুদ্রিত হয়ে আছে তাঁর পবিত্র পৃষ্ঠদেশে। আমি কেঁদে ফেললাম। রসুল স. বললেন, কাঁদছো কেনো? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! রোম ও পারস্যের সম্রাটেরা কী বিশাল আরাম আয়েশের মধ্যে আছে। আর আপনি আল্লাহর রসুল হওয়া সত্ত্বেও কষ্ট ভোগ করছেন! রসুল স. বললেন, তুমি কি এই সিদ্ধান্তে সম্মত নও যে, তাদের রয়েছে দুনিয়া আর আমার রয়েছে আখেরাত। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসুল! আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ যেনো আপনার উম্মতকে সম্পদশালী করে দেন। আল্লাহ পারস্য ও রোমবাসীদেরকে বিত্তাধিকারী করেছেন। অথচ তারা আল্লাহর উপাসনা বিমুখ। তিনি স. বললেন, হে ইবনে

www.eelm.weebly.com

খাত্তাব। তুমি কি জানো না, আল্লাহ তাদেরকে ওসব দিয়েছেন নিতান্ত স্বল্প সময়ের জন্য। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনে আস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবী হচ্ছে বিশ্বাসীদের জন্য কারাগার। পৃথিবী পরিত্যাগের মাধ্যমেই তাঁরা এই বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাবেন। বাগবী।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাকে পৃথিবীর অপপ্রভাব থেকে রক্ষা করেন, যেমন তোমরা পানি থেকে পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করো। আহমদ, তিরমিজি।

সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৯৯

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

❑ কিতাবীদের মধ্যে অনেকে আছে যাহারা আল্লাহের নিকট বিনয়াবনত হইয়া তোমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তাহাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করে; এবং আল্লাহের আয়াত স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে না; ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য আল্লাহের নিকট পুরস্কার রহিয়াছে। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

হজরত আনাস থেকে নাসাঈ এবং হজরত জাবের থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রসুল স. বলেছিলেন, তাঁর নামাজ পড়ো। একজন বললেন, হে রসুল! আমরা তবে একজন হাবসী গোলামের নামাজ (জানাযা) পড়বো? এ প্রেক্ষিতেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

হজরত জোবায়ের বলেন, এই আয়াত নাজ্জাশীর শানে নাজিল হয়েছে। হাকেম।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, হজরত জিব্রাইল আ. নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ রসুল স. কে জানিয়েছিলেন। তিনি স. সাহাবীদেরকে তখন বলেছিলেন, তোমরা শহরের বাইরে একত্রিত হয়ে তোমাদের ভাই নাজ্জাশীর নামাজ পড়ো। তিনি দূর দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন। জানাযা পাঠের সময় রসুল স. এর দৃষ্টি থেকে দূরত্বের

www.eelm.weebly.com

অন্তরাল উঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তিনি নাজ্জাশীর মৃতদেহ স্বচক্ষে দেখে জানাযার নামাজ আদায় করেছিলেন। নামাজে তিনি চার তকবীর বলেছিলেন এবং নাজ্জাশীর মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। মুনাফিকরা বলাবলি করছিলো, দেখো দেখো এরা একজন হাবসী খৃষ্টান কাফেরের জানাযার নামাজ পড়ছে। এরা কোনোদিন তাকে দেখেইনি। মুনাফিকদের এই কথোপকথনের প্রেক্ষিতেই এই আয়াত নাজিল হয়েছে। আতা বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে চল্লিশজন নাজরানবাসী মুসলমানের জন্য। বত্রিশজন ছিলেন আবিসিনিয়ার এবং আটজন ছিলেন রোমের। প্রথম দিকে তারা সকলে হজরত ঈসা আ. এর ধর্মমতানুসারী এবং পরে রসুল স. এর প্রতি ইমান এনেছিলেন। ইবনে জারীর ইবনে জুরাইজ সূত্রে বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে আবদুল্লাহ বিন সালাম এবং তাঁর সাথীদের সম্পর্কে। মুজাহিদ বলেছেন, আহলে কিতাবীদের মধ্য থেকে যারা ইমান এনেছেন তাদের সকলের জন্যই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

আহলে কিতাবদের সকলেই অবিশ্বাসী নয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইমান এনেছেন। আল্লাহতায়ালার সত্তা এবং নাম-গুণাবলী সম্পর্কে তাঁদের ধারণা বিশুদ্ধ। তাঁরা কোরআনকে বিশ্বাস করেছে এবং ইতোপূর্বে অবতীর্ণ তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর সহ সকল আসমানী কিতাবেও বিশ্বাস রাখে। অবিশ্বাসী আহলে কিতাবেরা যেমন তওরাতে উল্লেখিত রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলী গোপন করতে অভ্যস্ত, এঁরা সে রকম নন। আল্লাহ্‌র কালামকে পরিবর্তন করা, সুদ গ্রহণ করা — এ সমস্ত অসদভ্যাস থেকে এঁরা মুক্ত।

আল্লাহতায়ালার নিকট রয়েছে ওই সকল বিশ্বাসী আহলে কিতাবদের জন্য মহাপুরস্কার। অন্যান্য বিশ্বাসীদের চেয়ে অতিরিক্ত বিনিময় লাভ করবেন তাঁরা। যেমন অন্যস্থানে এরশাদ হয়েছে, 'তাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে।' হজরত আবু মুসা আশআরী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তিন ধরনের মানুষ দ্বিগুণ বিনিময়ে ভূষিত হবেন। এর মধ্যে এক ধরনের মানুষ হচ্ছেন ওই সকল আহলে কিতাবী যাঁরা ইমান এনেছিলেন তাঁদের নবীগণের প্রতি এবং পরে ইমান এনেছিলেন মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. এর প্রতি।

আল্লাহ সকল কিছুর হিসাব গ্রহণকারী। তাঁর হিসাবগ্রহণ কর্মে শিথিলতার অবকাশ নেই। সদাসতর্কতা তাঁর হিসাবগ্রহণের বৈশিষ্ট্য। সকল কিছু সম্পর্কেই তিনি সম্যক অবগত। এই অবগতি তাঁর সহজাত। চিন্তাভাবনা নির্ভর নয়। বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহতায়ালা সকল সৃষ্টির হিসাব অর্ধ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করবেন। অর্ধদিন অর্থ পৃথিবীর একদিনের অর্ধেক। 'তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর' — এ কথার অর্থ বিশ্বাসীদের বিনিময় লাভ বিলম্বিত হবে না, সত্ত্বরই তাদেরকে পুরস্কার প্রদানে ধন্য করা হবে।

www.eelm.weebly.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ع

❐ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর,ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা প্রস্তুত থাক; আল্লাহকে ভয় কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

বিশ্বাসীগণ তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। ধর্মনিষ্ঠ হও। আদেশ নিষেধ প্রতিপালনে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে, প্রেমময় প্রভু পালয়িতার প্রেম ভালোবাসাকে আশ্রয় করো। সংকটে ও শান্তিতে আল্লাহর প্রেমবিচ্ছিন্নতা থেকে নিঃসংশয় হও। আল্লাহর সন্তোষ লাভার্থে জেহাদে প্রবৃত্ত হও। আঘাতে প্রত্যাঘাতে অটল থাকো। বিপদ মুসিবতে মুক্ত থাকো উদাসীনতা ও আক্ষেপের প্ররোচনা থেকে। স্মরণ রেখো, কেবল তোমরাই নও ,অবিশ্বাসীরাও বিপদগ্রস্ত হয়। তাদেরকেও মেনে নিতে হয় মৃত্যু, রক্তপাত এবং ক্ষুৎপিপাসার আতংক। অথচ দেখো, প্রতিদান বলতে তাদের জন্য কিছু নেই। আর তোমরা সফলতার সুসংবাদ প্রাপ্ত। তোমাদের জন্য রয়েছে আখেরাত, জান্নাত এবং আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষ। পৃথিবীর সফলতা লাভের জন্য দেখো অবিশ্বাসীদের কী প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। সফলতার জন্য তো শ্রম ও সাধনা অবশ্যই প্রয়োজন। তাদের দুশ্চেষ্টা পৃথিবীর জন্য,আর তোমাদের সৎপ্রচেষ্টা আখেরাতের জন্য। হে বিশ্বাসীরা, এই সৎপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তোমরা পরস্পরের প্রতিযোগী হও। যুদ্ধের জন্য অশ্ব ও অস্ত্রসম্ভার প্রস্তুত রাখো। ভিতর বাহির দু'দিকেই চলুক তোমাদের যুদ্ধযাত্রা। বাইরে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে এবং অভ্যন্তরে শয়তানী কুমন্ত্রণা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে। অন্তরকে জাগ্রত রখো আল্লাহর নিরবচ্ছিন্ন স্মরণে। নামাজ শেষে প্রস্তুত থাকো পরবর্তী নামাজের জন্যে। মধ্যবর্তী সময়গুলোকে ভরে তোলো মোরাকাবায়, মোশাহেদায় এবং জিকিরের সমাবেশে।

বলা হয়েছে 'ওয়া সাবিরু ওয়া রবিতু' (ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো এবং সদা প্রস্তুত থাকো)। 'রবিতু' শব্দের অর্থ সদাপ্রস্তুত থাকা। এর আভিধানিক অর্থ বন্ধন, কোনোকিছুকে বেঁধে রাখা। এর উদ্দেশ্য যুদ্ধাশ্বকে বেঁধে রাখা, সদা প্রস্তুত রাখা। এ কথাটির গুরুত্ব এই যে, বিশ্বাসী ও স্থায়ী অধিবাসী যেনো যুদ্ধে সদা প্রস্তুত থাকে। সে অশ্বাধিকারী হোক অথবা না-ই হোক। এর আরো অধিকতর গুরুত্ব রয়েছে এ রকম — শত্রুরা তো রণসম্ভার নিয়ে প্রস্তুত। তোমাদের উচিত তাদের চেয়েও অধিক যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করা।

www.eelm.weebly.com

হজরত সহল বিন সা'দ সায়দী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, জেহাদের সময় মুসলিম ভুখণ্ডের সীমানা রক্ষায় একদিনের পাহারা দুনিয়ার সমস্ত বস্তু অপেক্ষা উত্তম। আর জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ স্থান পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকে শ্রেয়। যে বান্দা এক সকাল বা এক বিকাল আল্লাহর পথে সময় যাপন করে সে দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম মুনাফা অর্জন করে। বাগবী। এই হাদিসটির প্রথম অংশ বোখারী ও মুসলিমে হজরত সহলের বর্ণনাসূত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের বর্ণনা এসেছে হজরত আনাস থেকে।

হজরত সালমান বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন ও একরাত পাহারারত থাকে; সে একটানা একমাস রোজা পালনকারীর সওয়াব পাবে। পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার এই আমল জারি থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। শহীদগণের মতো সে রিজিকপ্রাপ্ত হবে এবং কবরের ফেতনা থেকে (ভয়াবহ অবস্থা থেকে) নিরাপদ থাকবে। বাগবী।

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে, একদিন একরাত মুসলিম রাজ্যের সীমানা সুরক্ষা করা, পূর্ণ একমাসের দিনের রোজা এবং রাতের নামাজ থেকে উত্তম। সীমানা সুরক্ষাকালে মৃত্যুবরণ করলে তার এই আমল কিয়ামত পর্যন্ত বহমান থাকবে। তার রিজিকপ্রাপ্তি হবে বন্ধকতাহীন এবং সে রক্ষা পাবে ফেতনা থেকে। আহমদ এবং ইবনে আবী শাইবা বর্ণিত হাদিসে এসেছে, সারাদিন সারা রাত আল্লাহর পথে পাহারারতদের আমল, রমজান মাসের দিনের রোজা এবং রাতের নামাজ আদায়কারীদের মতো — যে রোজায় বিরতি নেই এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত যে নামাজে নেই অপ্রতিপালনীয়তা।

হজরত ফোজালা বিন উবাইদ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, মৃত্যু সকল আমলের অবসান ঘটায়, কিন্তু আল্লাহর পথে সীমানারক্ষীরা এর ব্যতিক্রম। তাঁদের আমল মৃত্যুর পরেও প্রবহমান থাকবে। কবরের বিপর্যস্ততা তাঁদেরকে স্পর্শ করবে না। হজরত উকবা বিন আমের থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, আবু দাউদ এবং দারেমী। হজরত ওসমান বর্ণিত হাদিসে রয়েছে রসুল স. বলেছেন, আল্লাহর পথের একদিনের প্রহরা অন্য স্থানের হাজার প্রহরা থেকে উত্তম। তিরমিজি, নাসাঈ।

ইমাম বাগবী, আবু সালমা আবদুর রহমানের উক্তি উল্লেখ করেছেন এরকম, রসুল স. এর জামানায় সীমানা রক্ষার প্রয়োজন হতো এমন কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তখন এক নামাজ শেষে অন্য নামাজের প্রতীক্ষায় থাকাই ছিলো প্রহরা। এই আয়াতের ইঙ্গিত সেদিকেই। এই ব্যাখ্যাটির প্রমাণ রয়েছে হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত একটি হাদিসে যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে এমন একটি আমলের বর্ণনা দিচ্ছি, যার কারণে আল্লাহ

www.eelm.weebly.com

তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করবেন। আমলটি হলো, পূর্ণরূপে অজু করা (শৈত্যপ্রাবল্য ও অসুস্থতা সত্ত্বেও), মসজিদের দিকে পদব্রজে অধিক পথ অতিক্রম করা এবং নামাজ শেষে পরবর্তী নামাজের প্রতীক্ষায় থাকা। এটাই তোমাদের জন্য সদাপ্রস্তুত থাকা। এটাই তোমাদের জন্য সদাসতর্ক থাকা। এটাই তোমাদের জন্য সদাসাবধান থাকা। বাগবী। ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিজিও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। ধৈর্য ধারণ, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা এবং সদাপ্রস্তুতির নির্দেশ দানের পর এরশাদ হয়েছে, আল্লাহকে ভয় করো। তবেই সফলতা তোমাদের পদচুম্বন করবে।

সুরা আলে ইমরান পাঠের উপকার ঃ হজরত ওসমান বিন আফফান বলেন, যে ব্যক্তি আলে ইমরানের শেষ অংশ রাতে তেলাওয়াত করবে সে লাভ করবে সমস্ত রাত্রি নামাজে রত থাকার সওয়াব। দারেমী। হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, সুরা বাকারা এবং সুরা আলে ইমরান আবৃত্তি করো। এই সুরা দু'টির আবৃত্তিকারীর মাথার উপর কিয়ামতের দিন পাখির দু'টি ডানার মতো ছায়া দান করবে মেঘমালা অথবা শামিয়ানা। সুরা দু'টি তখন হবে তার (আবৃত্তিকারীর) সহায়। মুসলিম।

হজরত নুয়াস বিন সাময়ান বর্ণনা করেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন কোরআন আবৃত্তিকারী এবং তদানুযায়ী আমলকারীদেরকে আল্লাহ্‌র সকাশে সমুপস্থিত করা হবে। পুরোভাগে থাকবে সুরা বাকারা ও আলে ইমরান। যেনো দুটি ভাসমান মেঘপুঞ্জ অথবা দু'টি কৃষ্ণ আচ্ছাদন কিংবা পাখির প্রসারিত পাখা। তা থেকে বিচ্ছুরিত হবে আলোকচ্ছটা। সুরা দু'টি হবে তার (আবৃত্তিকারের) সাহায্যকারী। মুসলিম। মাকহুল বলেছেন, জুমআর দিন যে ব্যক্তি সুরা আলে ইমরান পাঠ করবে, ফেরেশতারা রাত্রি আগমন পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করতে থাকবে।

জ্ঞাতব্য ঃ (গ্রন্থকার বলেন) তিবরানী শিথিলসূত্রপরম্পরায় ইবনে মালিকের একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন এরকম, যে ব্যক্তি জুমআর দিন এই সুরা পড়বে, আল্লাহ্‌পাক সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার উপর রহমত বর্ষণ করবেন এবং ফেরেশতাগণও তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকবেন।

হে আমাদের আল্লাহ্! হে রাজাধিরাজ! আমরা তোমারই স্তব ও স্তুতি জ্ঞাপন করি। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্যাধিকারী করো এবং যাকে ইচ্ছা রাজ্যচ্যুত করো। যাকে চাও তাকে করো মর্যাদাভূষিত এবং অপমানিত করো তাকে, যাকে চাও। তুমিই সকল কল্যাণাধিকারী। সমস্ত কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তোমার অপার

www.eelm.weebly.com

ক্ষমতা। হে আমাদের প্রিয়তম আল্লাহ! আমাদের বৃহৎ অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও। বিচ্যুতিসমূহ বিদূরিত করো এবং আমাদেরকে মৃত্যুদান করো পুন্যবানদের দলভুক্ত অবস্থায়। অবতীর্ণ করো তোমার শান্তি, রহমত ও বরকত। তোমার হাবীব মোহাম্মদ স. আমাদের পরিচালক, সুপারিশকারী এবং সরদার। তাঁর পবিত্র নাম মোহাম্মদ স.। তাঁকে তুমি করেছো অক্ষরের অমুখাপেক্ষী (উম্মী)। করেছো সকল মানুষের জন্য, সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমত ও হেদায়েত। তাঁর উপর আল্লাহর রহমত এবং সালামত, তাঁর পবিত্র বংশধর, অন্তরঙ্গ সহচর বৃন্দ এবং তাঁদের পরবর্তী অনুসারীদের প্রতিও। আমিন।

সূরা নিসা

এই সূরার আয়াত সংখ্যা একশত ছেচল্লিশ। সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। ইমাম বায়হাকী হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ করেছেন, এই সুরা মদীনায় নাজিল হয়েছে। ইবনে মুনজির সূত্রে হজরত কাতাদাও এরকম বলেছেন। কাতাদা সূত্রে ইমাম বোখারীও বলেছেন একথা।

সূরা নিসা ঃ আয়াত ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○

❒ হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার সঙ্গিনী সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী পৃথিবীতে বিস্তার করেন; এবং আল্লাহকে ভয় করো যাহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করো এবং ভয় করো জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করাকে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

---

www.eelm.weebly.com

'হে মানব' বলে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন এবং যাঁরা পরে আসবেন — সকলকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো'-অর্থাৎ তার শাস্তির কথা স্মরণে রেখে তাঁর নির্দেশসমূহ পালনে ব্রতী হও। তিনি সেই প্রতিপালক, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। সেই ব্যক্তিটি হচ্ছেন হজরত আদম আ.। তিনিই সকল মানুষের প্রথম পিতা। আর তাঁর থেকে সৃষ্টি করেছেন হজরত হাওয়াকে। তিনিই সকল মানুষের প্রথম মাতা।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, মেয়েদেরকে হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বোখারী, মুসলিম।

আবু শায়েখ হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এরকম, হজরত হাওয়াকে হজরত আদমের পিছন দিককার হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মুজাহিদের বক্তব্যে এসেছে, হজরত আদম ঘুমন্ত ছিলেন। তখন হাওয়াকে সৃষ্টি করা হলো। জেগে উঠে তিনি হাওয়াকে দেখে বিস্মিত হলেন। এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন ইবনে আবী শাইবা, আব্‌দ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম।

হজরত আদম এবং হজরত হাওয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছে মানুষের বংশধারা। পৃথিবীর সকল পুরুষ ও রমণী তাঁদের বংশেই এসেছেন, আসছেন, আসবেন। 'রিজালন কাছিরাও ওয়া নিসাআ'-বলতে বুঝানো হয়েছে বহুসংখ্যক পুরুষ ও রমণী। বর্ণনাভঙ্গিতে স্পষ্ট হয় যে, রমণীদের সংখ্যা হবে পুরুষদের চেয়ে অধিক। আর এই বিষয়টিকে স্বীকার করে নিলে প্রয়োজনবোধে একজন পুরুষের অধিক সংখ্যক স্ত্রী (সর্বোচ্চ চারজন) গ্রহণের বৈধতা সপ্রমাণিত হয়।

হজরত আদম — হজরত হাওয়া — তারপর মানুষের বংশস্রোতের এই বহমানতা আল্লাহতায়ালার অপার ক্ষমতা ও অসীম অনুগ্রহের স্পষ্ট নিদর্শন হয়েছে। এই সৃষ্টির রহস্য বিস্ময়কর, অভাবিত। তাই এরশাদ হয়েছে, তোমরা সেই পরম করুনাময় ও অসীম ক্ষমতাধারী আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর সৃষ্টি রহস্য অনুধাবন করতে সচেষ্ট হও। তাঁর দোহাই দিয়েই তোমরা তোমাদের অধিকার উপস্থাপন করো একে অপরের নিকট। একথা বলে 'হক্কুল ইবাদ' (মানুষের অধিকার) সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। এভাবে মানুষের হক আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, 'ভয় করো জ্ঞাতি বন্ধন ছিন্ন করাকে।' এতে করে আত্মীয়তা রক্ষা করার নির্দেশও এসেছে।

হজরত আয়শা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে পাক স. বলেছেন, আত্মীয়তা ঝুলন্ত রয়েছে আল্লাহর আরশের সঙ্গে। সে বলে, যে ব্যক্তি আমাকে সংযোজন

www.eelm.weebly.com

করবে (আত্মীয়তা বজায় রাখবে) আল্লাহ্ সংযোজিত হবেন তার সাথে। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহও তাকে সম্পর্কচ্যুত করবেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, সমস্ত সৃষ্টি সম্পাদনের পর আত্মীয়তা ফরিয়াদি হিসাবে দাঁড়ালো। আল্লাহ বললেন, কী চাও? আত্মীয়তা বললো, এই সন্নিধানস্থল নির্বাচিত হোক তার জন্য, যে বেঁচে থাকে আত্মীয়তার সম্পর্কবিচ্ছিন্নতা থেকে। আল্লাহ বললেন, তুমি কি এ কথায় সম্মত যে, আমি তার সঙ্গেই সদাচার করবো যে তোমাকে অটুট ও উন্নত রাখবে। আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছিন্ন করবো? আত্মীয়তা নিবেদন জানালো, হে আল্লাহ্, আমি এতে পূর্ণসম্মত। আল্লাহ বললেন, ঠিক আছে। এই অঙ্গীকারই বলবত রইল। বোখারী, মুসলিম।

জ্ঞাতব্য ঃ হজরত ইবনে ইসহাক এবং ইবনে আসাকের হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এ রকম, হজরত আদমের সন্তান সন্তুতি ছিলেন চল্লিশ জন। বিশ জন পুত্র এবং বিশ জন কন্যা।

হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী সে নয়, যার সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করা হয়েছে (অর্থাৎ আত্মীয়তা রক্ষা করা হয়েছে বলে আত্মীয়তা রক্ষা করতে হবে এ রকম নয়)। বরং সেই ব্যক্তিই আত্মীয়তা রক্ষাকারী, যে ছিন্ন সম্পর্ককে পুনঃযোজন করে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। বোখারী।

হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে জীবিকার প্রাচুর্য এবং বিলম্বিত মৃত্যুর অভিলাষী সে যেনো আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে উত্তম আচরণে অভ্যস্ত হয়। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আমার কতিপয় স্বজন এমন যে, আমি তাদের সঙ্গে সদাচার করতে চাইলেও তারা আমাকে এড়িয়ে চলে। আমি তাদের প্রতি অনুগ্রশীল হলেও তারা আমার ক্ষতিসাধনে লিপ্ত থাকে। আমি তাদের এহেন আচরণকে উপক্ষা করি এবং ধৈর্য ধারণ করি। কিন্তু তারা আমার প্রতি প্রদর্শন করে বর্বরতা। রসুল স. বললেন, তুমি যেন তাদের প্রতি ছাই নিক্ষেপ করছো। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি বর্নিত বৈশিষ্ট্যাবলীকে আশ্রয় করে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত থাকবে, যে তোমাকে তোমার অসৎ আত্মীয়দের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে যাবে। মুসলিম।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।' — এ কথার অর্থ আল্লাহ তোমাদের অবস্থা সম্যক অবগত। অতএব সাবধান হও। অন্যমনস্কতা থেকে বেঁচে থাকো।

www.eelm.weebly.com

মুকাতিল এবং কালাবী বর্ণনা করেছেন, গাতফান গোত্রের এক ব্যক্তি ছিলো তার এতিম ভ্রাতুষ্পুত্রদের বিপুল বৈভবের রক্ষণাবেক্ষণকারী। প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তাদের সম্পদের অধিকার চাইলে সে তাদের সম্পদ দিতে অস্বীকৃত হলো। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত রসুল স. এর গোচরীভূত করা হলে তিনি পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রদেরকে ডেকে আনলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত —

সুরা নিসা ঃ আয়াত ২

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ۝

❒ পিতৃহীনকে তাহাদের ধনসম্পদ সমর্পণ করিবে এবং ভালর সহিত মন্দ বদল করিবে না। তোমাদের সম্পদের সহিত তাহাদের সম্পদ মিশাইয়া গ্রাস করিও না; ইহা মহা পাপ।

এতিমদের সম্পদ সমর্পণের এই নির্দেশ শুনে পিতৃব্য বললেন, আমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের অনুসারী। আমরা কবীরা গোনাহ থেকে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। একথা বলে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের সম্পদ সমর্পণ করলেন।

রসুল স. বললেন, যে ঐশ্বর্যলিপ্সা থেকে বিরত থাকে, তাকে আল্লাহ অবশ্যই জান্নাতের প্রবেশাধিকার দিবেন। ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তাদের সম্পদ হস্তগত করার পর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করলেন। রসুল স. বললেন, ওদের পুণ্য পূর্ণ হলো। ওদের পিতার সম্পদার্জনও সার্থক হলো (তারও পুণ্য লাভ হলো)। সা'লাবী, বাগবী।

অভিধানগত অর্থে অপ্রাপ্ত বয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্ক — সকল পিতৃহীনদেরকেই এতিম বলা যেতে পারে। কিন্তু বিখ্যাত কবি উরফীর মতানুসারে এই আয়াতে কেবল অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকেই এতিম বলে নির্দেশ করা হয়েছে। রসুল স. বলেছেন, বালেগ হলে (পিতৃবিয়োগের সময় অথবা পরে) এতিম থাকে না। আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নীরব থাকাকেও রোজা বলে না। এই হাদিসটি উত্তম সূত্রে হজরত আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে। কবি উরফীর মন্তব্যের ভিত্তিও এই হাদিস।

আভিধনিক অর্থ যাই হোক না কেনো, এখানে শরিয়তসম্মত অর্থই গ্রহণীয়। এতিমেরা বালেগ হলে নিজেদের সম্পদ নিজেরাই সংরক্ষণের যোগ্য হয়। তাই এ ব্যাপারে আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, যেহেতু এতিমেরা বালেগ হলে আর এতিম থাকে না, তাদের অভিভাবকত্বও হয়ে পড়ে নিষ্প্রয়োজন, তাই তাদের সম্পদ তাদেরকে প্রত্যর্পন করতে হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'নির্বোধদেরকে তাদের সম্পদ দিওনা।' নির্বোধদেরকে (পিতৃহীন অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে) তাদের সম্পদ না দেয়াই সমীচীন। কারণ, সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা তাদের নেই।

www.eelm.weebly.com

একটি সন্দেহঃ বালেগ হওয়ার পর এতিম তো আর এতিম থাকে না। কিন্তু এই আয়াতে বলা হয়েছে, পিতৃহীনকে (এতিমকে) তাদের সম্পদ সমর্পণ করো। তবে বালেগ হওয়ার শর্ত এলো কোত্থেকে?

সন্দেহের অপনোদনঃ আভিধানিক দিক থেকে নাবালেগ, বালেগ — সকল পিতৃহীনই এতিম। আয়াতের নির্দেশ এসেছে আভিধানিক দিক থেকেই। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, নাবালেগ ও বালেগের সীমারেখাতো সম্মিলিতই। বালেগ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তটি নাবালকত্ব। আয়াতের উদ্দেশ্য তাই এরকমই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, বালেগ হওয়ার সাথে সাথেই যেনো তাদের সম্পদ দিয়ে দেয়া হয়। ক্ষণকাল পূর্বেও যে এতিম ছিলো এখন সে আর এতিম নয়, প্রাপ্তবয়স্ক। সুতরাং সদ্য প্রাপ্তবয়স্কদের সম্পদ যেনো যথারীতি সমর্পণ করা হয়।

সম্পদ প্রত্যর্পণের পর নির্দেশ এসেছে, ভালোর সঙ্গে যেনো মন্দ মিশ্রিত না হয়। এতিমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত অভিভাবকের জন্য তাদের সম্পদ ভোগ করা হারাম। সুতরাং অভিভাবকদেরকে সতর্ক থাকতে হবে — তাদের বৈধ উপার্জিত সম্পদের সঙ্গে যেনো হারাম সম্পদ মিশ্রিত না হয়।

সাইদ বিন জোবায়ের থেকে জুহুরী ও সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, এতিমদের কোনো কোনো অভিভাবক এতিমদের উত্তম সম্পদ নিয়ে তাদের জন্য রেখে দিত নিজের অনুত্তম সম্পদ। কখনো তাদের মোটা তাজা ছাগল নিয়ে রেখে দিত নিজের রুগ্ন অথবা কৃশ ছাগল। ভালো দেরহাম নিয়ে রাখতো খারাপ দেরহাম। এই অসৎ অভ্যাসকে এই আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মুজাহিদ বলেছেন, আয়াতের অর্থ — তাৎক্ষণিকভাবে হারাম রিজিক গ্রহণ কোর না। হালাল রিজিক দানের যে অঙ্গীকার আল্লাহতায়ালা করেছেন, সেই রিজিক অধিকারে আসার পূর্বে হারাম গ্রহণের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ো না।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে মন্দ বলতে এতিমদের ধনসম্পদ সংরক্ষণে অবহেলাকে বুঝানো হয়েছে। আর ভালো বলতে বুঝানো হয়েছে, এতিমদের মালামাল যথাসংরক্ষণ করাকে। সময়মতো সম্পদ সমর্পণে প্রস্তুত থাকাকে এবং সঠিক সময়ে আসল মালিকের সম্পদ সামগ্রী ফেরত দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হওয়াকে।

এরপর নির্দেশ এসেছে, এতিমের মাল নিজের মালের সঙ্গে মিশিয়ে আত্মসাৎ কোর না। এ রকম করা মহাপাপ — কবীরা গোনাহ। হজরত ইবনে আব্বাস এ রকমই অর্থ করেছেন। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সাতটি বিধ্বংসী বিষয় থেকে বেঁচে থাকো। রসুল স. সাতটি বিধ্বংসী বিষয়ের মধ্যে এতিমের মাল ভক্ষণ করাকেও গন্য করেছেন। বোখারী, মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

وَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تُقۡسِطُوۡا فِى الۡيَتٰمٰى فَانۡكِحُوۡا مَا طَابَ لَـكُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ مَثۡنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ‌ ۚ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَةً اَوۡ مَا مَلَـكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ‌ ؕ ذٰلِكَ اَدۡنٰٓى اَلَّا تَعُوۡلُوۡا ؕ‏

❐ তোমরা যদি আশংকা করো যে, পিতৃহীনদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না তবে বিবাহ করিবে নারীদের মধ্যে যাহাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন অথবা চার; আর যদি আশংকা করো যে সুবিচার করিতে পারিবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। ইহাতেই পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।

ইমাম বোখারী বিশুদ্ধ সূত্রে জুহরীর বর্ণনা থেকে লিখেছেন, হজরত ওরওয়া বিন জোবায়ের বর্ণনা করেছেন, আমি হজরত আয়শাকে এই আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছেন, এই আয়াতের শুরুতে ওই নারীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে,যারা এতিম অবস্থায় তাদের মুহরিম নয় (যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়) এমন অভিভাবকের অধীনে থাকে - যেমন চাচাত ভাই, সেই অভিভাবক যদি ওই নারীর রূপ ও সম্পদ দেখে বিবাহ করতে চায় তবে মোহরানা হিসাবে মোহরে মেছেল (কমপক্ষে) দিতে সম্মত হতে হবে। (বোন ও ফুফুর বিবাহে যে মোহরানা নির্ধারণ করা হয় তাকে মোহরে মেছেল বলে)। এই আয়াতে অভিভাবকত্বের অধীন নারীকে বিবাহের শর্ত হিসাবে বলা হয়েছে, মোহর পূর্ণ করা ব্যতিরেকে বিবাহ করা যাবে না। এরকম আশংকা থাকলে অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করতে হবে। হজরত আয়শা আরো বলেছেন, যখন মানুষেরা এতিম রমণীদেরকে বিবাহ করার বিষয়ে জানতে চাইল,তখন আয়াত ইয়াসতাফতুনাকা ফিন্নিসা থেকে আনতানতিহু হুন্না পর্যন্ত অবতীর্ণ হলো। এই আয়াতে আল্লাহ পরিস্কার বিবরণ দিয়েছেন যে, রূপসী ও সম্পদশালিনী পিতৃহীনা নারীকে বিবাহ করতে আগ্রহী হয় অনেকেই,কিন্তু উপযুক্ত মোহরানা দিতে চায় না। আবার রূপবতী ও সম্পদবতী না হলে তারা পিতৃহীনাদেরকে বিবাহ করতে আগ্রহ দেখায় না। এরকম হওয়া ঠিক নয়। উভয় অবস্থায় বিবাহ বৈধ হবে কেবল তখনই, যখন তাদের অধিকার মেনে নেয়া হবে এবং যথোপযুক্ত মোহরানা পরিশোধ করা হবে।

www.eelm.weebly.com

ইমাম বাগবী লিখেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, মদীনার কিছু কিছু অভিভাবক তাদের অধীনস্থ এতিমাদেরকে বিবাহ করতো সম্পদের লোভে। অন্য কারো সঙ্গে বিবাহ হলে সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার আশংকাতেই তারা এরকম করতো। অথচ এরকম করা শোভনীয় ছিলো না।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইকরামা বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আতা'র বক্তব্যে এসেছে, কোনো কোনো কুরাইশ দশটি, আবার কেউ দশের অধিক বিয়ে করতো। তারা যখন স্ত্রীদের ভরণ পোষণ দিতে অসমর্থ হতো তখন এতিমদের সম্পদ খরচ করতো। তাদের এই আচরণকে লক্ষ্য করেই আয়াতে এই নির্দেশ এসেছে যে, তারা যেনো চার জনের অধিক বিয়ে না করে যাতে অধিক খরচ বহন করতে যেয়ে এতিমদের সম্পদ ব্যয় থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয়।

এরকমও বলা হয়েছে যে, যখন এতিমদের মাল খরচ করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হলো, তখন এতিমা রমণীদেরকে যথেচ্ছ বিবাহ করার প্রবণতা গেল বেড়ে। যাকে ইচ্ছা বিয়ে করে স্ত্রীদের সংখ্যা বাড়াতে লাগলো মানুষেরা। কিন্তু স্ত্রীদের প্রতি সমবিবেচনা বজায় রাখতো না তারা। তখনই অবতীর্ণ হলো, পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার না করতে পারলে ক্ষান্ত হও। আল্লাহকে ভয় করো। এমন নারীদেরকে বিয়ে কোর যাদেরকে সমবিবেচনায় রাখা সম্ভব। সাঈদ বিন জোবায়ের এই বিবরণটি দিয়েছেন। আরো বর্ণনা করেন ইবনে জারীর, জুহাক এবং সুদ্দী।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, লোকেরা এতিমদের অভিভাবকত্ব করতে কষ্ট অনুভব করতো, কিন্তু গোপনে চলতো অবৈধ প্রণয়। এই অবস্থা দৃষ্টে নির্দেশ এলো বিবেচনাহীনতা থেকে শংকিত হও, বন্ধ করো ব্যভিচার। বরং পছন্দ হলে উপযুক্ত মোহরানা দিয়ে বিবাহ করো। এরকম বক্তব্য রেখেছেন মুজাহিদ।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'মা ত্বলাবা লাকুম মিনান্ নিসায়ি'- এর অর্থ এতিম নারীগণ সাবালিকা হয়ে গেলে তাকে বিবাহ করতে পারো। সাবালিকা অর্থ প্রচলিত আরবী ভাষায় খোরমা পাড়ার বয়সে পৌঁছানো। ইমাম বোখারী বলেছেন, এ ব্যাপারে হজরত আয়েশার বর্ণনাকে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এই মত গ্রহণ করলে অর্থ দাঁড়াবে এতিম মেয়েদের বিয়ে কোর না। অন্য সাবালিকাদেরকে বিয়ে করো। এরকমও ব্যাখ্যা করা যায় যে, মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্কা হলে তাদেরকে বিয়ে করো। প্রকাশ্যতঃ এই অর্থ ভুল। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে অর্থ হবে - যে রমণীগণ তোমাদের জন্য হালাল তাদেরকে বিয়ে করো। কিন্তু এ মতও গ্রহণীয় নয়। কেননা কাকে বিয়ে করা হালাল, কাকে বিয়ে করা হালাল নয় - এ সম্পর্কিত আয়াত পরে আসছে। এই মতটি অবশ্য মুজাহিদের তাফসীরেরও অনুকূল। তিনি

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, ব্যভিচারকে ভয় করো। আর তোমাদের জন্য যারা হালাল তাদেরকে বিয়ে করো। কিন্তু এ ধরনের তাফসীর পূর্ণ অর্থবোধক নয়। উত্তম এই যে, 'যাকে তোমাদের পছন্দ হয় এবং যার দিকে তোমরা আকর্ষণ বোধ করো, তাকেই বিয়ে করো' — এই ব্যাখ্যাটি অধিকাংশ তাফসীরকারদের অনুকূল। হজরত আয়েশার মতও এরকম, যেমন তিনি এর ব্যাখ্যা হিসেবে বলেছেন, এতিম নারীরা অসহায়, তাদের সাহায্যকারী কেউ নেই। তাই তোমরা যদি তাদের হক আদায় করতে না পারো এবং সুবিচার করতে না পারো - তবে তোমাদের পছন্দানুসারে বিবাহের সিদ্ধান্ত নাও। চাই সে এতিম নাবালিকা হোক অথবা সাবালিকা। এরকম করলে তোমরা সুরক্ষিত থাকবে, জেনা ব্যভিচারের আশংকা থাকবে না। বিবাহের সর্বোচ্চ সংখ্যা চার। তাও শর্তসাপেক্ষ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মাসআলা ঃ বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর আগে কন্যার চেহারা দেখা দরকার। কুফুর বিষয়টিও দেখতে হবে (কুফু অর্থ সমতা, সামঞ্জস্যতা - সামাজিকতা, আর্থিক অবস্থা, রুচিগত অবস্থা ইত্যাকার ক্ষেত্রে)। এটা ঐকমত্য। দাউদ জাহেরী বিয়ের আগে কন্যার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে নেয়াকে বৈধ বলেছেন। হজরত জাবের বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে চাইলে, দেখে নেয়া জরুরী। যেনো বিবাহের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আবু দাউদ। হজরত মুগীরা বিন শোবা বর্ণনা করেন, আমি এক রমণীকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালাম। রসুল স. বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছো? আমি বললাম, না। রসুল স. বললেন, দেখে নাও। এই দেখাদেখি তোমাদেরকে সম্মিলিত করতে আগ্রহী করে তুলবে। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী।

দুই দুই তিন তিন চার চার পুনঃপৌনিক সংখ্যা থেকে গৃহীত। দুই দুই থেকে দুই। তিন তিন থেকে তিন। চার চার থেকে চার। শব্দগুলি রূপান্তরিত শব্দ। মূলতঃ গায়ের মুনসারিফ উদুল পদ্ধতিতে সিনতাইনি হতে মাসনা (দুই)। আবার সালাস থেকে সুলাসা (তিন)। আরবায়ু থেকে রুবায়া (চার) রূপান্তরিত শব্দ।

মাসআলা ঃ রাফেজীরা বলে একই সাথে নয়জন মহিলাকে বিবাহ বন্ধনে রাখা বৈধ। আর এই আয়াতকেই তারা দলিল হিসেবে পেশ করে। এরকম বক্তব্যের সম্পর্ক রয়েছে নাখয়ী ও ইবনে আবী লায়লার সঙ্গে। তারা এই আয়াতের 'ওয়াও' কে বহুবচন ধরেছে। এভাবে অর্থ করলে দুই, তিন এবং চারের সম্মিলিত সংখ্যা হয় নয়। খারেজীরা বলে একসঙ্গে আঠারো জনকে বিবাহ বন্ধনে রাখা বৈধ। তাদের মতে যদিও এখানে সংখ্যাগুলো একবচন কিন্তু অর্থগত দিক থেকে তারা দ্বিগুণ ধরেছে। এভাবে নয় এর দ্বিগুণ আঠারো ধরা হয়েছে। রাফেজী ও খারেজীদের বক্তব্য ভুল। খারেজীদের ভুল এই যে, আয়াতের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। এখানে পুনপৌনিকতার অবকাশ নেই। কেউ যদি কতিপয় ব্যক্তিকে বলে এই

www.eelm.weebly.com

দেরহামগুলো থেকে দু'টো দু'টো করে নিয়ে যাও - এর অর্থ হবে প্রত্যেকেই দু'টা করে দেরহাম নাও। দু'টো দু'টো করে চারটি এরকম অর্থ কিছুতেই হবে না। এরকম অর্থ আয়াতের উদ্দেশ্যের বিপরীত। কেননা সকলের পক্ষে দুই, তিন, চার, নয় অথবা আঠারো জন স্ত্রী রাখা অসম্ভব। এ জন্যেই কাশ্শাফ প্রণেতা লিখেছেন, দুই, তিন, চার এই শব্দগুলোকে একাকার করে ফেললে কোনো অর্থই বোধগম্য হবে না।

রাফেজীদের মতও ভুল। ভাষা ও সাহিত্যের দিক থেকে নয় সংখ্যাকে নির্দেশ করতে দুই, তিন, চার এরকম বলা শোভনীয় নয়। তাদের মতানুসারে অর্থ দাঁড়ায় এরকম - দুইয়ের অধিক, তিনের অধিক, চারের অধিক বিবাহ করা বৈধ।

বায়যাবী আও এর পরিবর্তে ওয়াও উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা করেছেন এরকম - 'আও' বললে সংখ্যাগত বৈধতা সম্বন্ধে মতবিরোধ থাকতো না। কিন্তু এরকম সন্দেহ উত্থাপিত হতো যে, 'ওয়াও' এর কারণে একতা তাহলে কোথায়?

প্রকৃত কথা এই যে, 'ওয়াও' অথবা 'আও' যাই হোক না কেনো,এখানে ধারণা ও উদ্দেশ্য একই রকম। এমন যেনো মনে করা হয় যে, সমস্ত উম্মতকে দুই, তিন, চার - এই তিন প্রকারের কোনো এক প্রকারে একমত হবে। কিন্তু প্রকার এখানে বিভিন্ন। বহুবচনের পাশাপাশি উল্লেখিত হলে 'ওয়াও' বা 'এবং' শব্দ দ্বারা সংখ্যাগুলোকে সংযুক্ত করাই সমীচীন। হুকুমটি যখন সাধারণ, তখন একথা সহজেই অনুমেয় যে, সকলেই নয় - কেউ কেউ দু'টি, কেউ তিনটি এবং কেউবা চারটি পর্যন্ত বিবাহ করতে পারবে।

<u>মাসআলা</u> ঃ আয়েম্মায়ে আরবা (চার ইমাম- ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ) এবং জমহুরের অভিমত, একত্রে চার স্ত্রীর বেশী বিবাহ করা বৈধ নয়।

কেউ কেউ বলে, বৈধ বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। যতজনকে ইচ্ছা ততজনকেই বিবাহাধীনে রাখতে পারবে। কেননা আয়াতে চারের অধিক বিয়ে করতে পারবে না - এরকম নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়নি। যেমন, এরকম বলা হয়ে থাকে- এই সমুদ্র থেকে যতটুকু ইচ্ছা পানি সংগ্রহ করো, এক মশক, দুই মশক কিংবা তিন মশক। এক্ষেত্রে অধিক গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা নেই। এই আয়াতেও সেরকমই চারটি বিবাহের বৈধতা স্বীকৃত হয়েছে; কিন্তু চারের অধিককে অস্বীকার করা হয়নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই আয়াতটি পেশ করা যায়, 'জায়িলিল মালাইকাতি রসুলান উলি আজনিহাতিন মাসনা ওয়া সুলাসা ওয়া রুবায়া'- এই আয়াতটিতে আরবা অর্থাৎ চার শব্দটির উল্লেখের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট নয় যে, ফেরেশতাদের পাখা চারটির অধিক হবেই না। বরং রসুল স. হজরত জিব্রাইলের ছয়শত পাখা দেখেছিলেন বলে সহীহ্ হাদীসের বর্ণনায় এসেছে। আলোচ্য এই আয়াতটিতেও

www.eelm.weebly.com

সেরকমই সংখ্যাসীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, 'ওয়া উহিল্লা লাকুম মা ওয়া রাআ জালিকুম' (এই নারীরা ব্যতীত অন্য নারীদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে)। অন্য আরেক আয়াতে এরশাদ করেছেন, 'ওয়াল মুহসনাতি মিনাল মু'মিনাতি ওয়াল মুহসিনাতি মিনাল্লাজিনা উতুল কিতাব' (এবং নিজেদের মধ্য থেকে মুসলমান ক্রীতদাসীদেরকে ও আহলে কিতাবীদের সতীসাধ্বী রমণীদেরকে)। সহীহ্ হাদিসে একথাও প্রমাণিত হয়েছে রসুল স. এর বিবাহাধীনে নয় জন স্ত্রী ছিলেন। এ ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো দলিলের প্রয়োজন ছিলো। নতুবা বিশেষভাবে সংখ্যা নির্দিষ্ট করার যৌক্তিকতা নেই।

আমরা বলি যে, এই আয়াত নাজিল হয়েছে কায়েস বিন হারেস সম্পর্কে। বাগবী লিখেছেন, কায়েস বিন হারেসের আটজন স্ত্রী ছিলেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. তাকে বললেন, চার জনকে তালাক দিয়ে দাও এবং চার জনকে রাখো। কায়েস বলেছেন, আমি স্ত্রীদের মধ্যে যারা সন্তানবতী তাদেরকে রাখলাম এবং নিঃসন্তানদেরকে ছেড়ে দিলাম। রসুল স. বললেন, এই হলো আয়াতের বিবরণ। আল্লাহ্র কথা ও উদ্দেশ্য তিনিই সবচেয়ে ভালো বুঝতেন। এই ঘটনার দ্বারা বোঝা যায় যে, বিবাহ মূলে হালাল নয় হারাম। হ্যাঁ, ততোটুকু হালাল যতোটুকু আল্লাহ্ হুকুম করেছেন। যেমন, সুরা বাকারার এক আয়াতে এসেছে, 'যখন তারা উত্তমরূপে পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তোমরা গমন কোরওই পথে যে পথে যেতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন'- এই স্থানের তাফসীরে আমরা যথা স্থানে বলে দিয়েছি- বিবাহ আসলে হালাল নয়, আল্লাহ্র অনুমোদন ব্যতীত। 'ওয়া উহিল্লা লাকুম মা ওয়া রাআ জালিকুম' এই আয়াতের উদ্দেশ্য - উল্লেখিত হারাম নারী ব্যতীত অন্যদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। এখানে যেমন সংখ্যার নির্দিষ্টতা নেই তেমনি সকল নারী হালাল হওয়ার প্রমাণও নেই (বোঝা যায় না নিষিদ্ধ নারী ব্যতীত অন্য নারীদেরকে যতোখুশী ততো বিয়ে করা যাবে- আবার একথাও বোঝা যায় না যে, কেবল চার জনই হালাল)। 'ওয়াল মুহসিনাতি মু'মিনাত' এই আয়াতে বহুবচনের বিরুদ্ধে রয়েছে বহুবচনের ব্যবহার।

আলোচ্য আয়াতটি কেবল বিবাহ হালাল হওয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি। বরং অবতীর্ণ হয়েছে বিবাহের সংখ্যা নিরূপণ প্রসঙ্গে। বিবাহ হালাল হওয়ার বিষয়টি অন্য আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আর এই আয়াতটি কেবলই সংখ্যা নিরূপক।

চারের অধিক বিবাহ বৈধ না হওয়া প্রসঙ্গটি হজরত ইবনে ওমরের বর্ণিত হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। গায়লান বিন সালমায়ে সাকাফী যখন মুসলমান হলেন, তখন তার অধিকারে ছিলো দশজন স্ত্রী। তাঁরাও মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। রসুল স. বললেন, চারজনকে রেখে অবশিষ্টদেরকে ছেড়ে দাও। শাফেয়ী, আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

www.eelm.weebly.com

হজরত নওফেল বিন মুয়াবিয়া বলেন, ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে আমার ছিলো পাঁচজন স্ত্রী। বিষয়টি আমি রসুল স. এর গোচরীভূত করলাম। তিনি স. বললেন, চারজনকে রাখো, একজনকে ছেড়ে দাও। আমি তখন ছেড়ে দিলাম আমার সবচেয়ে প্রবীণা এবং বন্ধ্যা স্ত্রীটিকে। বাগবী শরহে সুন্নায় বলেছেন, সর্বাধিক চারজনকে বিবাহ করার ব্যাপারে রয়েছে উম্মতের ঐকমত্য। এই ঐকমত্যবিরোধী সকল অভিমত পরিত্যাজ্য।

মাসআলা ঃ ইসলাম গ্রহণের পর যদি দেখা যায় কারো চারের অধিক স্ত্রী রয়েছে এবং তাঁর স্ত্রীরাও যদি হয় মুসলমান কোনো আহলে কিতাবী - তবে তাকে চারের অতিরিক্ত স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে হবে। যদি দেখা যায় দুই সহোদরা বোন বিবাহাধীনে রয়েছে, তখন যে কোনো একজনকে রেখে অন্যজনকে ছেড়ে দিতে হবে। কন্যা ও মাতা একই সঙ্গে বিবাহাধীনে থাকলে যে কোনো একজনকে রেখে অন্যকে পরিত্যাগ করতে হবে। এরকম বলেছেন ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম মোহাম্মদ। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, সকল স্ত্রীকে যদি একই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বিবাহ করা হয়ে থাকে, তবে সকলকেই ছেড়ে দিতে হবে (এরকম স্বীকারোক্তি অগ্রহণীয়)। একে একে বিবাহ করে থাকলে প্রথমজন স্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতি পাবে। এভাবে চারজন পূর্ণ হওয়ার পর বাকীরা পরিত্যক্ত হবে। দুই বোনের ক্ষেত্রে প্রথমজন পরিত্যক্ত হবে। মা ও মেয়ের ক্ষেত্রে উভয়ের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে।

বর্ণিত হাদিস সমূহে দেখা যায় রসুল স. দুই বোনের যে কোনো একজনকে বিবাহের জন্য নির্ধারণ করার অধিকার দিয়েছেন। এই বর্ণনা এবং নিম্নের বর্ণনা ইমাম আবু হানিফার অভিমতের বিরুদ্ধে যায়। জুহাক বিন ফিরোজ দায়লামী তার পিতার মাধ্যমে বলেছেন, জুহাকের পিতা বলেন, আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি মুসলমান হয়েছি। দুই বোন রয়েছে আমার বিবাহাধীনে। তিনি স. বললেন, যাকে পছন্দ করো তাকে রেখে অন্যজনকে ছেড়ে দাও।

মাসআলা ঃ তিন ইমামের মতে গোলামের জন্য স্ত্রী রাখা বৈধ নয়। ইমাম মালেকের মতে গোলামও সর্বোচ্চ চারজনকে একই সঙ্গে স্ত্রী হিসাবে রাখতে পারবে। কারণ এই আয়াতের সংখ্যা নির্দেশনায় আজাদ, গোলাম সবাই শামিল।

নির্দেশটি সাধারণ। স্বাধীন কিংবা ক্রীতদাস - কারো কথাই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি। দাউদ জাহেরী এবং রবীয়াও এরকম বলেছেন।

আমরা বলি, এই আয়াতের নির্দেশটি স্বাধীন পুরুষদের জন্য। কেবল তারাই সর্বোচ্চ চারজনকে বিয়ে করতে পারবে। বলা হয়েছে, যদি সুবিবেচনা না করতে পারো, তবে একজনকে বিয়ে কোর, কিংবা অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসীকে। এখানে স্পষ্ট

www.eelm.weebly.com

হয়ে উঠেছে যে, নির্দেশটি কেবল স্বাধীন পুরুষদের জন্য।ক্রীতদাসীরা তাদেরই অধিকারে থাকে। ক্রীতদাসের কোনো অধিকার বা মালিকানা নেই।

ইবনে জাওজী নিশ্চিতির সঙ্গে লিখেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, গোলাম দুই স্ত্রী রাখতে পারবে। তালাক দিতে চাইলে দুই তালাক দিবে। তালাকপ্রাপ্ত বাঁদীর ইদ্দত পালনের সময় দুই হায়েজ বা দুই ঋতুস্রাব পর্যন্ত। বাগবীও এরকম লিখেছেন। আরো বলেছেন, হায়েজ না হলে দুই অথবা দেড় মাস ইদ্দত পালন করবে। ইবনে জাওজী হাকেমের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এরকম, সাহাবীগণের ঐকমত্য এই যে, ক্রীতদাস দুই এর অধিক স্ত্রী রাখতে পারবে না। ইবনে আবী শায়বা, বায়হাকী।

<u>মাসআলা</u> ঃ স্ত্রীদের সমঅধিকার নিশ্চিত করতে পারলে অধিক বিবাহ উত্তম। যৌনবাসনা অনিয়ন্ত্রণের আশংকা থাকলে অধিক বিবাহ ফরজ। তবে সমবিবেচনার নিশ্চিতি থাকতে হবে। যৌনাকাংখা চরিতার্থ করা একমাত্র উদ্দেশ্য না হলে অধিক বিবাহ হবে সুন্নত। এরকম ক্ষেত্রেও সমবিবেচনা জরুরী। ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, হে যুবক সম্প্রদায়- যারা বিবাহের যোগ্য তারা বিয়ে করে নাও। যদি অযোগ্য হও তবে রোজা থাকো। এটাই তোমাদের জন্য খাসী হওয়া (খাসী বা নপুংসক হওয়া বৈধ নয়; বিবাহের সুযোগবঞ্চিতদেরকে তাই রোজা প্রতিপালনের মাধ্যমে যৌনাকাংখাকে অবদমিত রাখতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে - এটাই ব্যাভিচারাশংকা থেকে বেঁচে থাকার উপায়)। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আমি রোজা রাখি এবং রোজা থেকে বিরতও থাকি। আর আমি বিবাহিতও। আমার এই আদর্শের বাইরের লোকেরা আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। হজরত আনাস আরো বলেছেন, রসুল স. বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। অবিবাহিত জীবনকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন, ওই রমণীদেরকে বিয়ে কোর যারা স্বামীঅন্তপ্রাণ এবং অধিক সন্তানবতী। কিয়ামতের দিন আমি আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য নবীর উম্মতকে অতিক্রম করবো। আহমদ।

হজরত আবু জর বর্ণনা করেন, রসুল স. উকাফ বিন খালেদকে বললেন, তোমার স্ত্রী আছে? তিনি বললেন, না। রসুল স. বললেন, ক্রীতদাসী? উকাফ বললেন, তাও নেই। তিনি স. বললেন, তুমি কি সম্পদশালী নও? উকাফ বললেন, হাঁ, আমি সম্পদশালী। তিনি স. বললেন, তুমি কি শয়তানের মতো হতে চাও? তোমার মতো স্ত্রী-পুত্রবিহীনরা আমাদের আদর্শানুসারী নয়। তোমরা জীবন বিমুখ। তোমরা শয়তানের জনক।

দাউদ জাহেরী বলেছেন, বিবাহ করা ফরজে আইন। তবে শর্ত হলো পৌরুষ থাকতে হবে। তার সঙ্গে থাকতে হবে স্ত্রীর প্রতিপালনযোগ্যতা। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

www.eelm.weebly.com

এই আয়াতের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে 'পক্ষপাতিত্ব' প্রসঙ্গটি। হজরত আয়শা থেকে ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, পক্ষপাতিত্ব না করা অর্থ হক বিন্না করা - বিশেষ কোনো দিকে ঝুঁকে না পড়া - সুবিবেচনা বিমুখ হওয়া - উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের যথাবন্টন নিশ্চিত না করা ইত্যাদি। মুজাহিদ বলেছেন, পক্ষপাতিত্ব না করার অর্থ পথভ্রষ্ট না হওয়া। ফারা বলেছেন, এর অর্থ আল্লাহর নির্ধারিত ফরজ অতিক্রম না করা। আভিধানিক অর্থ এরকমই হয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এর অর্থ অধিক সন্তান যেনো না হয় (অধিক সন্তানসন্তুতির ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা বেশী)। এই অর্থটিও আভিধানসম্মত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এটা ইয়ামানীদের ভাষাভঙ্গিসম্মত অর্থ। বায়যাবী বলেছেন, ওই ব্যক্তি স্ত্রী ও সন্তান সন্তুতির ভার উত্তোলনকারী অর্থাৎ পরিবারের সদস্যসংখ্যা অধিক হওয়ায় তার ব্যয়ভারও অধিক। এরকম অবস্থায় সম্পদস্বল্পতাই শেষ পর্যন্ত পক্ষপাতিত্বহীনতাকে প্রতিহত করতে পারে। তাই এই আয়াতের শেষে অধিক বিবাহ থেকে বিরত থাকার সুপরামর্শ দেয়া হয়েছে। ক্রীতদাসী বিবাহের উৎসাহদানের কারণও তাই। ক্রীতদাসীরা স্বাধীন নারীদের তুলনায় কমসংখ্যক সন্তান ধারণ করে। আর তাদের সঙ্গে আজল করাও (সঙ্গমস্থলের বাইরে বীর্যপাত ঘটানো) বৈধ। দুই, তিন কিংবা চারটি বিয়ে করলে পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক হবার সম্ভাবনা। আর এরকম ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বহীনতা বজায় রাখা দুষ্কর। তাই এক স্ত্রী অথবা দাসী বিবাহের মাধ্যমে সংযত হতে বলা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, 'ইহাতেই পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।'

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৪

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ○

❒ এবং তোমরা নারীদিগকে তাহাদের মোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রদান করিবে; সন্তুষ্টচিত্তে তাহারা মোহরের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলে তোমরা তাহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবে।

কালাবী ও আলেমদের একটি দল বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মেয়েদের অভিভাবকদেরকে লক্ষ্য করে। ইবনে আবী হাতেম, আবু সালেহ এর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এরকম, কোনো কোনো অভিভাবক কন্যাদের বিয়ের

www.eelm.weebly.com

মোহরানা নিজেদের অধিকারভূত করতো। কন্যারা মোহরানা বঞ্চিত হতো। অভিভাবকদের এই মোহরানা আত্মসাৎ নিষিদ্ধ করতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, বিয়ের পর যে মেয়েরা অভিভাবকের গৃহে বসবাস করতো - তাদের মোহরানা অভিভাবকেরাই আত্মসাৎ করতো। আর যারা স্বামীর ঘরে যেতে চাইতো তাদেরকে একটি উটে চড়িয়ে স্বামীগৃহের দিকে রওয়ানা করিয়ে দেওয়া হতো। ওই উটটিই পেতো তারা। মোহরানার অর্থ পেতো না।

হজরত খাজরামী রা. বলেছেন, কোনো ব্যক্তি বা ওলী কোনো মেয়েকে এভাবে বিয়ে দিতো যে, যার সঙ্গে বিয়ে করানো হলো, তার পরিবারভূত কাউকে সেই ব্যক্তি বা ওলী বিয়ে করে নিতো - যা বদলী বিয়ে হিসেবে স্বীকৃত হতো এবং কোনো পক্ষেই মোহরানা আদায় করা হতো না। পরে এটা নিষেধ করা হয়েছে এবং মোহর নির্ধারিত হয়েছে।

মাসআলা ঃ ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের নিকট বদলী বিবাহ নিষিদ্ধ। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বিবাহের স্বীকারোক্তির সময় যদি বলা হয় - যে কন্যাদের বদলী করা হবে তাদের লজ্জাস্থান একে অপরের মোহর তাতে উভয় বিবাহই বাতিল হবে। আর যদি বলে, আমি আমার কন্যার বিবাহ তোমার সাথে এই শর্তে দিচ্ছি যে, তোমার কন্যার বিবাহ আমার সাথে মোহর ব্যতীতই দিবে। দ্বিতীয় জন যদি তার উত্তরে বলে - আমি আমার কন্যার বিবাহ তোমার সঙ্গে দিলাম। এরকম করলে উভয় বিবাহই বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু উভয়কেই মোহরে মেসাল পরিশোধ করতে হবে। অবশ্য ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেছেন- এরকম করলেও বিবাহ বাতিল হবে। প্রকৃতপক্ষে এরকম বিবাহ বদলী বিবাহ বলে গণ্য। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এরকম অবস্থাকে বদলী বিবাহ বলেন না। আর ইমাম আবু হানিফা বলেন, লজ্জাস্থান বদল অথবা মোহর ব্যতীত কন্যা বদল উভয় প্রকার স্বীকারোক্তিতেই বিবাহ বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই মোহরে মেসাল অবশ্যম্ভাবী হবে। যদি কেউ বলে আমি আমার কন্যার বিবাহ তোমার সাথে এই শর্তের উপর দিচ্ছি যে, তুমি তোমার কন্যার বিবাহ আমার সঙ্গে দিবে। যদি তার কথায় মোহর ব্যতীত অথবা মোহর সহ কোনো কিছুরই উল্লেখ না থাকে, তবে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে — এ ব্যাপারে চার ইমামই একমত। এরকম বিয়ে বদলী বিয়ে নয়। এরকম যদি কেউ বলে যে, আমার কন্যার গুপ্তস্থান তোমার কন্যার মোহর। তার একথার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় জন যদি মুখে কিছু না বলে প্রথম জনের সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ মোহরের উল্লেখ ব্যতীত সম্পন্ন করে, তবে দ্বিতীয় জনের বিয়ে বিশুদ্ধ হবে বলে ইমামগণ একমত হয়েছেন। কিন্তু মোহরের উল্লেখ না থাকলেও মোহরে মেসাল দিতেই হবে। হজরত ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিস দ্বারা

www.eelm.weebly.com

একথা প্রমাণিত যে, বদলী বিবাহ নিষিদ্ধ। এই হাদিস উল্লেখ করেছেন বোখারী ও মুসলিম। আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাও এরকম বলেছেন। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, ইসলামে বদলী বিবাহ নেই। এই হাদিস দৃষ্টে একথা স্পষ্ট যে, বদলী বিবাহ সম্পূর্ণতঃই নিষিদ্ধ (এরকম বিবাহের পর মোহরে মেসাল পরিশোধ করলেও শুদ্ধ হবে না)। বিষয়টি যৌক্তিকতাবিরোধী। মোহরানা কন্যাদের প্রাপ্য, কিন্তু এক্ষেত্রে লজ্জাস্থানের মালিক তাদের স্বামীরা। লজ্জাস্থানকে মোহর ধরা হলে স্বামীরাই মোহরের (লজ্জাস্থানের) অধিকারী হয় — কন্যারা থাকে বঞ্চিত। তাই এ ধরনের বিবাহ বাতিল।

এর উত্তরে হানাফীগণ বলেছেন, বদলী বিবাহের দু'টি অংশ। ১. মোহরের অনুপস্থিতি ২. গুপ্তস্থানকে মোহর সাব্যস্ত করা। দু'টি অংশই বিবাহের বৈধতা বিরোধী। কিন্তু মোহরে মেসাল পরিশোধ করলে আর অবৈধতার সুযোগ থাকে না। কারণ, তখন নিষিদ্ধতার রূপটি অপসৃত হয়। প্রকৃত অর্থে বিবাহ সবসময়ই বৈধ। কন্যা বদল করা হলেও। বদলী নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো মোহরানা উল্লেখ না থাকার কারনে। তাই মোহরে মেসাল পরিশোধের পর বিবাহের অশুদ্ধতা থাকে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরো বলা যায় - কোনো বিবাহে শরাব এবং শুকরকে যদি মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়, তবুও বিবাহ বাতিল হবে না; যদি মোহরে মেসাল পরিশোধ করা হয়। বরং বিবাহের বৈধতা দিতে গেলে এক্ষেত্রে মোহরে মেসাল ওয়াজিব। সুতরাং বোঝা গেলো, বদলী বিবাহের ধরন দু'রকমের। প্রথম ধরনটি লজ্জাস্থানকে মোহর নির্ধারণ করা এবং মোহরের উল্লেখ মাত্র না করা, এরকম বিবাহ অবশ্যই বাতিল। আমরা কখনো বলি না যে, এরকম বিবাহ বৈধ। বৈধ বলি দ্বিতীয় ধরনটিকে, যেখানে মোহরে মেসাল পরিশোধ করাকে অপরিহার্য বলা হয়েছে। এই আয়াতে পুরুষদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেনো তারা তাদের স্ত্রীদের মোহরানা পরিশোধ করে।

মোহরানা দিতে বলা হয়েছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, আনন্দচিত্তে। যে সম্পদ অনুগ্রহ করে আল্লাহ দিয়েছেন, সেই সম্পদ থেকে। অন্য কারো সম্পদ থেকে নয়। অথবা সন্দেহজনক সম্পদও নয়। আবু ওবাদা বলেছেন, এই দান হয় সুনির্দিষ্ট । কেউ কেউ বলেছেন, এই দান উপহার স্বরূপ। অর্থাৎ বিবাহিতাদের প্রতি এ হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার মেহেরবাণী। আর আল্লাহ্তায়ালার নির্ধারিত এ দান (মোহর) পরিশোধ করা বিবাহিতদের জন্য ফরজ। তাই হজরত কাতাদা বলেছেন, আয়াতের নিহ্লাতান শব্দের অর্থ ফরজ। ইবনে জারীর বলেছেন, মোহারানা নির্ধারণ করা ফরজ। জুযাজ বলেছেন, এ হচ্ছে কর্জ বা দায়- যা পরিশোধ করতেই হবে। অতএব, অর্থ দাঁড়াচ্ছে এরকম - যেহেতু এটা আল্লাহ্তায়ালার নির্ধারিত নিয়ম,তাই তোমরা স্ত্রীদেরকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মোহরানা প্রদান করো।

www.eelm.weebly.com

স্ত্রীগণ মোহরানার পূর্ণ হকদার একথা প্রমাণের পর বলা হয়েছে, স্ত্রীরা যদি স্বেচ্ছায় মোহরানার কিছু অংশ ছাড় দেয়, তবে তাকেই যথেষ্ট মনে করতে হবে। এর বেশী আশা করা সিদ্ধ নয়। এর অধিক অথবা সম্পূর্ণ মোহর ক্ষমা পাবার আশা করা যাবে না। ছাড় দেয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণতঃই পাওনাদারের ইচ্ছাধীন। সুতরাং পাওনাদারের ইচ্ছাকেই মান্য করতে হবে। ছাড়কৃত অংশ ভোগ করতে অবশ্য কোনো বাধা নেই। এটা ক্ষতিকর নয়, অবৈধও নয়।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ○

❑ তোমাদের সম্পদ, যাহা আল্লাহ্ তোমাদের উপজীবিকা করিয়াছেন, তাহা নির্বোধদিগের হাতে অর্পণ করিওনা; উহা হইতে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাদের সহিত সদালাপ করিবে।'

নির্বোধদেরকে সম্পদ অর্পন না করার এরশাদ হয়েছে এই আয়াতে। নির্বোধ বলে বোঝানো হয়েছে স্ত্রী ও শিশুদেরকে। কারণ, শরিয়তের দৃষ্টিতে মেয়েরা ও শিশুরা বুদ্ধিগত দিক থেকে দুর্বল। জুহাক, মুজাহিদ, জুহুরী এবং কালাবী এরকমই বর্ণনা দিয়েছেন। সম্পদ হচ্ছে জীবনের প্রয়োজনীয় উপজীবিকা। এই নিয়ম নির্ধারণ করেছেন আল্লাহ্ই। জীবনের বিভিন্নমুখী প্রয়োজন মেটাতে সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জুহাক বলেছেনে, সম্পদ প্রয়োজনীয় জীবিকা এই অর্থে যে, হজ, জেহাদ এবং দোজখাগ্নি থেকে পরিত্রাণের জন্য দান-সদকা সম্পদের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

হজরত ইবনে আব্বাস এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে সম্পদ আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করেছেন, জীবন ধারনের উপকরণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন,তা স্ত্রী ও সন্তানদের অধিকারে দিয়ো না। অন্যথায় তারা তোমার বিরুদ্ধবাদী হবে। সুতরাং তোমার হাতকে সংযত রাখো এবং একে আপন অধিকারে রাখো এবং একে ব্যবহার কোর যথাপ্রয়োজন মেটাতে। পরিবার পরিজনদের পানাহার ও পরিচ্ছদের প্রয়োজন পূর্ণ করো। তাদের সঙ্গে কোর সঙ্গত আচরণ। তাদের সন্তোষ সাধন কোরও সদালাপী হয়ো।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের এবং ইকরামা বলেছেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য ওই সমস্ত এতিম যারা তোমাদের প্রতিপালনাধীন, তাদেরকে ধনসম্পদ দিয়ো না। তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ কোর নিজ দায়িত্বে। আয়াতে 'তোমাদের সম্পদ'

www.eelm.weebly.com

বলে এতিমদের সম্পদ বোঝানো হয়েছে, যা বর্তমানে তোমাদের অধিকারাধীন। বর্তমানে তোমরাই তাদের সম্পদের সংরক্ষক এবং এক হিসেবে সাময়িক মালিক। এখানে আরেকটি উদ্দেশ্য এই হয়েছে যে, মূল সম্পদ তাদেরকে হস্তান্তর কোরনা অথবা তাদের জন্য খরচ কোর না। অন্যথায় সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই তাদের সম্পদকে ব্যবসায় বিনিয়োগ কোর এবং তার মুনাফা দ্বারা তাদের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহ্ করো।

জ্ঞাতব্য ঃ বায়হাকী এবং হাকেম বিশুদ্ধ সূত্র পরম্পরায় উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিন প্রকার ব্যক্তি এমন, তারা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবে কিন্তু তাদের দোয়া কবুল করা হবে না। ১. ওই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতা সম্পর্কে নিঃসন্দিহান হয়েও তাকে পরিত্যাগ করে না। ২. ওই লোক, যার কাছে অন্যের আমানত গচ্ছিত আছে কিন্তু গচ্ছিত সম্পদ ফেরত চাইলে সে অস্বীকার করে। ৩. ওই ব্যক্তি যে নির্বোধদেরকে সম্পদ অর্পণ করে। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন, নির্বোধদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ো না।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

❑ পিতৃহীনদিগের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে যে পর্যন্ত না তাহারা বিবাহ-যোগ্য হয় এবং তাহাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখিলে তাহাদের সম্পদ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবে। তাহারা বড় হইয়া যাইবে বলিয়া অন্যায়ভাবে উহা তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেলিও না। যে অভাবমুক্ত সে যেন যাহা অবৈধ তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাহাদিগকে তাহাদের সম্পদ সমর্পণ করিবে তখন সাক্ষী রাখিও। হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

লক্ষ্য রাখতে হবে এতিমেরা প্রাপ্তবয়স্ক হলো কিনা। প্রথমে অল্প কিছু সম্পদ দিয়ে দেখতে হবে তাদের সম্পদ ব্যবহারের প্রকৃতি কী; ব্যবসায়িক লেনদেন তারা

www.eelm.weebly.com

কীভাবে করছে। এর মধ্যে তাদের বুদ্ধিমত্তা ধরা পড়বে। একথা বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ব্যবসায়িক পরীক্ষা নেয়ার প্রয়োজন নেই, এই আয়াতে লক্ষ্য রাখা বলতে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, বিয়ে করার পূর্বেই যেনো তাদের সম্পদ ফেরত দেয়া হয়। এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফার অভিমতই অধিক গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয়েছে।

লক্ষ্য রাখতে হবে এতিমেরা বিয়ের বয়স পর্যন্ত পৌঁছেছে কিনা। ছেলেদের জন্য যৌনউত্তেজনা ও বীর্যস্খলন শুরু হয়েছে কিনা। আর মেয়েদের জন্য ঋতুস্রাব এবং গর্ভধারনের যোগ্যতা এসেছে কিনা। ছেলে ও মেয়ে এ অবস্থায় না পৌঁছলেও তাদের বয়স যদি পনের বছর হয়, তবে তাদেরকে সাবালক সাবালিকা ধরতে হবে। এরকম বলেছেন ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আবু ইউসুফ। একটি বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এরকম। এর উপর ফতোয়াও হয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার অধিক বিদিত অভিমতটি এই যে, মেয়েদের জন্য সতের এবং ছেলেদের জন্য আঠার বা উনিশ হলে প্রাপ্ত বয়স্ক ধরতে হবে। জমহুর মাসআলার প্রমাণ স্বরূপ হজরত আনাস থেকে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, ছেলে মেয়েদের বয়স পনের বছরে পৌঁছলে তাদের পাপপুণ্য লেখা হয় এবং প্রয়োজন হলে তাদের প্রতি শরিয়তসম্মত শাস্তি আরোপ করা যায়। এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী। হাদিসের সনদ অবশ্য শিথিল। সহীহাইনে হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, উহুদ যুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিলো চৌদ্দ। তখন যুদ্ধে যেতে আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও রসুল স. আমাকে অনুমতি দেননি। পরে খন্দক যুদ্ধে অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন আমি পনের পেরিয়েছি।

ইমাম আহমদ বলেছেন, যৌনকেশ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার একটি আলামত (মুশরিক ও মুমিন উভয়ের জন্য)। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মুশরিকদের এই আলামত দেখতে যাওয়া মুসলমানদের দায়িত্ব নয়। এই দুই ধরনের বর্ণনাই এসেছে ইমাম শাফেয়ী থেকে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যৌনকেশ পরীক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের পক্ষে রয়েছে ওই হাদিসটি যার বর্ণনা এসেছে সুনান গ্রন্থে, ইবনে হাব্বান, হাকেম এবং জুহাকের মাধ্যমে। তিরমিজি হাদিসটিকে সহীহ্ বলেছেন। বর্ণিত হয়েছে, আতীয়া কারজী বলেছেন, বনু কোরায়জাদের যে দিন বন্দী করে হত্যার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন আমি বালক মাত্র। আমি সাবালক না নাবালক তা নিয়ে সন্দেহ উত্থাপিত হয়েছিলো। রসুল স. তখন হুকুম দিলেন পরীক্ষা করে দেখো, তার যৌনকেশ উদগত হয়েছে কিনা। আমাকে তখন পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিলো। আমি তখন যৌনকেশবিহীন ছিলাম বলে হত্যা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলাম। ঠাঁই পেয়েছিলাম বন্দীদের দলে।

www.eelm.weebly.com

এতিমদের ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান হলো কিনা তা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আয়াতের 'রুশদা' শব্দটির অর্থ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ এরকমই বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ী অর্থ করেছেন, তাদের বিষয় সম্পত্তির উন্নতি করার চেষ্টা আছে কিনা এবং দ্বীনধর্ম প্রসঙ্গে তাদের সহায়তা চিন্তা আছে কিনা।

বায়হাকী, আলী বিন তালহার সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যানুযায়ী শব্দটির অর্থ উপস্থাপন করেছেন এরকম - তাদের মধ্যে দ্বীনের পূর্ণতা এবং সম্পদ সংরক্ষণের ন্যূনতম যোগ্যতা আছে কিনা। ইমাম সাওরী মানসুরের বর্ণনা এবং মুজাহিদের বক্তব্য থেকে এরকমই অর্থ গ্রহণ করেছেন। বায়হাকী এই অভিমতকে সম্পৃক্ত করেছেন ইয়াজিদ বিন হারুন এবং হিশাম বিন হাস্সানের বর্ণনা সূত্রে হাসান বসরীর বক্তব্যের সঙ্গে। এখানে মতবিরোধের কারণ এই যে, ইমাম শাফেয়ীর অভিমতানুসারে যারা ফাসেক (ধর্মপ্রাণ নয়), তারা ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান রাখে না। অন্যেরা বলেন, ফাসেকরাও ভালোমন্দের জ্ঞানসম্পন্ন।

আয়াতের নির্দেশে এসেছে, সাবালক হলে এতিমদের সম্পত্তি দিতে দেরী কোরনা। তবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে তাদের প্রাপ্তবয়স্কতা নিশ্চিত কিনা। প্রাপ্তবয়স্কতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার বিষয়টিও রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ এবং সাহেবাইন (ইমাম ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ) বলেছেন, জ্ঞানস্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সম্পত্তি হস্তান্তর কোর না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, পঁচিশ বছরে পৌছলে সম্পত্তি দিতেই হবে। জ্ঞানানুভূতি জাগ্রত হোক কিংবা না হোক। কেননা নিষিদ্ধতা ছিলো শৈশবস্থার জন্য। যৌবনে পৌছলে আর নিষিদ্ধতা থাকে না। ইমাম সাহেবের বক্তব্যের উদ্দেশ্য এরকম — শৈশব থেকে যৌবনে পৌছলে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়াই নিয়ম। তারপর যদি জ্ঞানানুভূতি লোপ পায় (অসুস্থতার কারণে) — তবু তাকে প্রাপ্তবয়স্ক বলেই মেনে নিতে হবে। কারণ, এই জ্ঞানস্বল্পতার কারণে সে আর শৈশবে ফিরে যায় না। যুবকই থাকে। তিনি আরো বলেছেন, রুশদান শব্দটির শেষ অক্ষরের তানবীন্ (দুই যবর) ন্যূনতম জ্ঞানকে নির্দেশ করেছে। সুতরাং এর অর্থ হবে, জ্ঞানের উন্মেষকালেই সম্পদ প্রত্যর্পণ কোর। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ পর্যন্ত অপেক্ষা কোর না। আর পঁচিশ বছরে পৌছলে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া নিশ্চিত। এই বয়সে কম হোক বেশী হোক জ্ঞানলাভ হবেই। কাজেই এর বেশী কিছুতেই অপেক্ষা কোর না। বিষয়সম্পত্তি অর্পণের নিষিদ্ধতা ছিলো আদবজ্ঞানের অভাবে। কিন্তু এই বয়সে আদবজ্ঞানের অভাব থাকে না। তাই সম্পদ প্রত্যর্পণ করা জরুরী।

মাসআলা ঃ জ্ঞানসম্পন্ন না হলে তাকে সম্পদ দেয়া যাবে না। সে ক্রয়-বিক্রয়, গোলাম আজাদ - কোনোকিছুই করতে পারবে না। এই অভিমত দিয়েছেন ইমাম

www.eelm.weebly.com

শাফেয়ী। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, যে জ্ঞান সম্পন্ন নয় তার ক্রয়-বিক্রয় বাতিলযোগ্য নয়। কিন্তু তার অভিভাবক তার ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করতে পারবে। কিন্তু ইমাম ইউসুফ ও অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, কাযীর নিষেধাজ্ঞা ব্যতীত জ্ঞান না হওয়া এতিমদের অধিকার বলবত থাকবে। কাযী তার সকল অধিকারকে স্থগিত রাখতে পারবে। কিন্তু গোলাম আজাদের ব্যাপারকে রহিত করতে পারবে না। কিন্তু আজাদ না করা গোলাম তার শ্রমলব্ধ অর্থ তার অপরিণতবয়স্ক মালিককে দিতে বাধ্য থাকবে। ইমাম মোহাম্মদ থেকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক — দুই ধরনের অভিমতই বর্ণিত হয়েছে। একটি বর্ণনা ইমাম ইউসুফের অনুরূপ। অন্যটিতে বলা হয়েছে, গোলাম তার উপার্জন তার নাবালক মালিককে দিতে বাধ্য নয় (এমতাবস্থায় সে তার উপার্জন জমা করবে নাবালক এতিমের অভিভাবকের নিকট)।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কাযীর এই অধিকার নেই যে, তিনি জ্ঞানসল্পতা ও ধর্মীয় শিথিলতার প্রসঙ্গ তুলে কারো অধিকারকে স্থগিত রাখেন। কারণ মানুষের হক স্বীকার না করলে তাকে চতুষ্পদ জন্তুতুল্য মনে করা হয়। সম্পদবিনষ্টির আশংকার চেয়ে কাউকে অধিকারবঞ্চিত করা অধিকতর মারাত্মক। এরকম করলে ছোটো ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা যাবে ঠিকই,কিন্তু বড় ক্ষতিকে স্বীকার করা হবে।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন, যারা জ্ঞানবান নয় তাদের অধিকার স্থগিত রাখা বৈধ। তাঁদের সমর্থনে রয়েছে - 'নির্বোধদেরকে সম্পদ দিও না' এই নির্দেশটি। কেবল তাদের হাতকে বাধা দিলেই চলবে না - মুখকেও বাধা দিতে হবে। (কারণ বেচাকেনা কেবল হাত দ্বারা হয় না, কথার মাধ্যমেও হয়)। তাই কাযী তাকে সবদিক দিয়েই বাধা দিবেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, তাদের খরচকে (কেবল হাতকে) বাধা দেয়া যাবে। মৌখিক অনুদান বা বেচাকেনাকে বাধা দেয়া যাবে না। হজরত আনাস বর্ণিত হাদিসটি তাঁর দলিল যেখানে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন না হওয়া সত্ত্বেও এবং ধর্মীয় শিথিলতা সত্ত্বেও ক্রয়-বিক্রয় করতো। তার পরিবার পরিজনেরা রসুল স. এর কাছে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করার আবেদন জানালেন। রসুল স. তাকে নিষেধ করলেন। ওই ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি ক্রয়-বিক্রয় না করে থাকতেই পারি না। রসুল স. বললেন, ঠিক আছে। তবে বলে দিও ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যেনো তোমাকে ধোকা না দেয়া হয় (প্রয়োজনবোধে আমার বাতিল করার ক্ষমতা থাকবে)। তিরমিজি, আহমদ। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি সহীহ্। এই হাদিসটিতে ক্রয়-বিক্রয়কে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়নি।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ওই ব্যক্তি এমন ইচ্ছা করে না যে,তার সম্পদ নষ্ট হোক। কিন্তু তার জ্ঞানের স্বল্পতাই ক্ষতি ডেকে আনে। রসুল স. তাই বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

যেনো ধোকাবাজি না হয়। আমাদের আপত্তি এই কারণেই। বাগবী লিখেছেন, যে জ্ঞানসম্পন্ন নয় তার সমস্ত অধিকারকে স্থগিত রাখার ব্যাপারটিতে সাহাবীগণ একমত ছিলেন।

ওরওয়া — হিশাম — কাযী ইউসুফ — ইমাম মোহাম্মদ — ইমাম শাফেয়ী— এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ বিন জাফর ষাট হাজার দেরহাম মূল্যে একটি বালুকাময় স্থান ক্রয় করলেন। হজরত আলী বললেন, আমি ওসমানের নিকট অভিযোগ করে তোমার এই ক্রয়কে বন্ধ করে দিবো। তখন হজরত আবদুল্লাহ হজরত জোবায়েরকে এই কথা জানালে তিনি বললেন, আমি এই ক্রয়ে শরীক। হজরত আলী হজরত ওসমানকে বললেন, আপনার ভাতিজার সম্পত্তির অধিকার নিষিদ্ধ করুন। হজরত ওসমান বললেন, কীভাবে নিষিদ্ধ করি। তার সঙ্গে যে রয়েছেন জোবায়ের। আবু উবাইদা কিতাবু আমওয়ালে নিজস্ব সূত্রে ইবনে শিরীন থেকে লিখেছেন, হজরত ওসমান হজরত আলীকে বললেন, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাধা দিবেন না কেন? সে ষাট হাজার দেরহাম দিয়ে কি রকম অনুপযুক্ত জমি কিনেছে। আমি তো ওই জমি আমার জুতার বিনিময়েও নিতাম না (বর্ণনাটিতে অসাবধানতাবশতঃ হজরত ওসমান হজরত আলীকে বললেন উল্লেখ রয়েছে। আসলে এ কথাটি আলীই ওসমানকে বলেছিলেন)। বাগবী লিখেছেন, এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নির্বোধদের বেচাকেনা বন্ধ করার ব্যাপারে সাহাবীগণ একমত ছিলেন। হজরত জোবায়েরও তাই বেচাকেনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আমি এই বেচাকেনায় অংশগ্রহণ করবো। এই অসিলায় তিনিও চেয়েছিলেন, নির্বোধদের বেচাকেনার অধিকার ক্ষুণ্ন হোক।

মাসআলা ঃ সাবালক ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার পর কারো মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে তার অধিকার অস্বীকৃত হবে বলে একদল আলেম মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মনে করেন, কেবল সাবালক হলেই চলে না। অধিকারপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানসম্পন্ন হওয়াও জরুরী। এই মতেরই পোষকতা রয়েছে আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরের ঘটনায়।

এবার ঋণ গ্রহণ প্রসঙ্গ। ঋণের অধিকারকেও বন্ধ করে দিতে হবে। কাব বিন মালেক তাঁর পিতা থেকে বলেছেন, রসুল স. হজরত মুআজের ঋণনির্ভর বেচাকেনাকে নিষেধ করে দিলেন। এবং তাঁর সম্পদ বিক্রি করে তাঁর ঋণ পরিশোধ করলেন। দারা কুতনী, হাকেম, বায়হাকী।

আবু দাউদ মুরসাল পদ্ধতিতে আবদুর রাজ্জাক থেকে সাঈদ তাঁর সুনানে এবং ইবনে জাওজী, ইবনে মোবারক মা'মার-জুহরী-আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত মুআজ বিন জাবাল ছিলেন দানশীল যুবক। তিনি ডান বাম চিন্তা না করে একাধারে ঋণ গ্রহণ করতেন। এভাবে ঋণভারে জর্জরিত হলেন তিনি। শেষে পাওনাদারদেরকে শান্ত করার

www.eelm.weebly.com

সুপারিশ নিয়ে হাজির হলেন রসুল স. এর দরবারে। বললেন, ওদেরকে কিছু বলুন। রসুল স. সুপারিশ পেশ করলেন। কিন্তু পাওনাদারেরা নাছোড়বান্দা। তখন মুআজের সম্পত্তি বিক্রয় করে পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধ করলেন রসুল স.। হজরত মুআজ দাঁড়িয়ে রইলেন নির্বিকার চিত্তে। আবদুল হক বলেছেন, ওই হাদিসটি অধিকতর বিশুদ্ধ।

ইবনে সালাহ তাঁর আহকাম গ্রন্থে লিখেছেন, এই ঘটনাটি নবম হিজরীর। রসুল স. পাওনাদারদেরকে তাদের প্রাপ্য পাওনার সাত ভাগের পাঁচ অংশ পরিশোধ করেছিলেন। পাওনাদারেরা বললেন, বাকি সাত ভাগের দুই অংশ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হোক। রসুল স. বললেন, অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধের আর উপায় নেই।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কাযী ঋণ গ্রহণকারীর অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারেন না। তার সম্পত্তিও বিক্রয় করতে পারেন না। সম্পত্তি বিক্রয়ের হুকুম জারীও অধিকার ক্ষুণ্নতার পর্যায়ে পড়ে। তাছাড়া পারস্পরিক সম্মতি ব্যতীত ব্যবসা-বাণিজ্য সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেছেন, কিন্তু তোমাদের ব্যবসা পারস্পরিক অনুমোদনসাপেক্ষ হতে হবে। 'ইল্লা আনতাকুনা তিজারাতান আন তারাজিন।' কাযী বরং এই কাজটি পারেন, তিনি ঋণী ব্যক্তিকে বন্দী করবেন, যাতে সে বাধ্য হয়ে তার সম্পত্তি বিক্রয় করে ঋণ শোধ করে। কাযীর দিক থেকে জুলুম বৈধ নয়। হজরত মুআজের উল্লেখিত ঘটনা থেকে একথা আমরা স্বীকার করি না যে, তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকে তাঁর সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়েছিলো। আবার রসুল স. এর এমত অধিকার ছিলো না — তাও বলা যাবে না। বরং ব্যাপারটি আসলে ছিলো এরকম, যেমন কোনো ব্যক্তির প্রতিনিধি তার মাল বিক্রয় করলো, পরে সে এই বিক্রয়ে সম্মতি দিল। হজরত মুআজ সম্পর্কিত এই হাদিসটির শেষে উদ্ধৃত হয়েছে, রসুল স. সান্ত্বনা প্রদানার্থে হজরত মুআজকে ইয়ামনের গভর্নর করে পাঠালেন। বায়হাকী এই হাদিসটিকে বর্ণনা করেছেন ওয়াকেদীর নিয়মে। রসুল স. সরাসরি হস্তক্ষেপ করে হজরত মুয়াজের ঋণ পরিশোধ করলেন — এটি বর্ণনাকারীর নিজস্ব ধারণা (ওয়াকেদীর বর্ণনায় সাধারণতঃ এরকম নিজস্ব ধারণার সংযোজন পরিদৃষ্ট হয়)।

তিবরানী তাঁর কবীর পুস্তকে লিখেছেন, যখন রসুল স. হজ্জ সমাপন করলেন তখন তিনি মুআজকে ইয়ামনের হাকিম হিসাবে নিযুক্তি দিলেন। তিনিই হলেন সর্বপ্রথম আজীর (পারিশ্রমিক সহ নিযুক্ত জাকাত ও রাজস্ব আদায়কারী)। তাঁর এই ঘটনাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তিনি স. মুআজকে তাঁর আচরনের জন্য অভিযুক্ত করেন নি।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে গেলে কাযী তার সম্পত্তি বিক্রয় করে পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। এরপরও পাওনা বাকি থাকলে কাযী তাকে গায়ে খেটে পাওনা পরিশোধের হুকুম দিবেন। ইমাম আহমদ বলেছেন এরকম। অন্য বর্ণনায় এসেছে তাঁর বিরুদ্ধ মত। অন্যান্য ইমাম গায়ে খেটে পাওনা পরিশোধের হুকুম জারীর বিরুদ্ধে।

ইমাম আহমদের প্রথম বর্ণনার পোষকতায় রয়েছে এই হাদিসটি — দারা কুতনী জায়েদ বিন আসলাম থেকে লিখেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ইস্কান্দারিয়ায় এক বয়োবৃদ্ধকে দেখেছি। তার নাম সারাক। আমি বললাম, এ কি রকম নাম। তিনি বললেন, রসুল স. এই নাম রেখেছেন। এ নাম আমি কখনোই পরিত্যাগ করবো না। আমি বললাম, কেন তিনি স. এই নাম রেখেছেন? তিনি বললেন, আমি আমার বাণিজ্যসামগ্রী পৌঁছানোর আগেই মদীনায় গিয়ে আগাম বিক্রয়ের ঘোষণা দিলাম। আগাম ক্রয় করলেন অনেকেই। পণ্যমূল্য গ্রহণ করে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু পণ্যসামগ্রী এলো না। পথিমধ্যে সে সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। পাওনাদারেরা তখন রসুল স. এর দরবারে আমাকে হাজির করলেন। তিনি স. সব শুনে বললেন, তুমি সারাক (চোর)। এরপর তিনি চারটি উটের মূল্যে আমাকে বিক্রয় করে দিলেন। যিনি আমাকে কিনলেন, তাঁকে পাওনাদারেরা জিজ্ঞেস করলেন, একে নিয়ে তুমি কী করবে? তিনি বললেন, মুক্তি দিবো। পাওনাদারেরা বললেন, পুণ্যান্বেষী হিসেবে আমরাই বা পশ্চাতবর্তী হবো কেনো? একথা বলে পাওনাদারগণই আমাকে আজাদ করে দিলেন। কিন্তু আমার সারাক নামটি রয়েই গেল।

ইবনে জাওজী লিখেছেন, এই ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে রসুল স.ওই ব্যক্তিকে বিক্রয় করেননি। বিক্রয় করেছেন তার শ্রমকে। ওই ব্যক্তি ছিলেন আজাদ। আজাদকে গোলাম হিসাবে বিক্রয় করা যায় না। এখানে তাকে আজাদ করে দেয়ার অর্থ হবে তাকে শ্রমের উপার্জন থেকে অব্যাহতি দেয়া।

আমি বলি, এখানে ওই ব্যক্তি অথবা তার শ্রম কোনোটিকেই বিক্রয় বুঝানো হয়নি। এরকম ধারণা কষ্টকল্পনা বৈ কিছু নয়। কারণ, এরকম ধারণা আলেমগণের সর্ববাদীসম্মত অভিমতবিরুদ্ধ (আজাদকে গোলাম বানানোর অবৈধতা সম্পর্কে ঐকমত্য রয়েছে)। রসুল স. এর আমল জীবনের বিনিময়েও গ্রহণ করার সুযোগ আছে। কিন্তু অন্য কেউ এরকম অধিকার রাখে না।

হজরত আবু সাঈদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর সময়ে এক লোক বাকিতে অনেক মাল খরিদ করলো। কেনার পর তার মালগুলো লুণ্ঠিত হলো। অনেক ঋণের বোঝা চাপলো তার মাথায়। রসুল স. সকলকে বললেন, একে দান করো। যে যা পারলেন চাঁদা দিলেন। এতেও তার ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করা গেলো না।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. পাওনাদারদের বললেন, তোমরা যা পেয়েছো তাতেই সন্তুষ্ট হও। আর পাবার সম্ভাবনা নেই। এই হাদিসের ঘটনায় এ কথা পরিষ্কার যে, দেনাদারের উপর পাওনার দাবী ছাড়া পাওনাদারের আর কোনো হক নেই। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবরোধ করা অথবা মজুরী বা চাকুরী কোনোটিতেই বাধ্য করা যাবে না। আল্লাহই ভালো জানেন।

এরপর নির্দেশ এসেছে, এতিমের মাল ভক্ষণ কোর না। এ ব্যাপারে সীমালংঘন কোর না। তারা বড় হয়ে গেলে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে হবে। এ কথা মনে করে তাড়াতাড়ি তাদের সম্পদ তসরুফ কোর না। সীমালংঘন অন্যায়। এই অন্যায়কে এখানে 'সারাফুন' শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে এই শব্দটি ইনসাফ শব্দের বিপরীত অর্থবোধক। সিহাহ্ কিতাবে রয়েছে, 'সারাফ' অর্থ যে কোনো বিষয়ে সীমা অতিক্রমণ। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, 'লা তুসরিফু ফিল কতলি' — হত্যাকান্ডে সীমা অতিক্রম কোর না। আরেক আয়াতে রয়েছে, 'ইয়া ইবাদিইয়াল্লাজিনা আসরাফু আলা আনফুসিহুম' — হে আমার বান্দারা, যারা আত্মঅত্যাচারে সীমালংঘন করেছো। বিষয় সম্পত্তির ক্ষেত্রেই সীমালংঘন প্রবণতা বেশী দেখা যায়। সীমালংঘন হয় কখনো অবস্থাগত, কখনো পরিমাণগতভাবে। এ জন্য সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, আল্লাহর পথ থেকে সরে গিয়ে যা কিছু খরচ করা হয় তাই ইসরাফ বা সীমা অতিক্রমণ - তার পরিমাণ নিতান্ত কম হলেও। অন্যত্র আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন, পানাহার করো এবং সীমালংঘন থেকে সুরক্ষিত থাকো। আর এক জায়গায় বলেছেন, নিশ্চয় সীমালংঘনকারী দোজখী। এই আয়াতের অর্থ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যের অনুকূল। কেননা তিনি সীমালংঘনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে গিয়ে এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সুতরাং সীমালংঘনকারী বলতে তাকেই নির্দেশ করা হবে যে নাফরমান, পাপী, আনুগত্যস্খলিত। কর্মগত, দৃষ্টিগত, সম্পদগত - সকল ক্ষেত্রের সীমালংঘনকারীরাই দোজখী।

আমি বলি, এতিমের প্রতিপালক সম্পদশালী হলে যেনো সে এতিমের মাল মোটেও না নেয়। বেশী কম কোনটাই না। আর দরিদ্র হলে প্রচলিত নিয়মানুসারে খোরপোষ নিতে পারবে। হজরত আমর বিন শোয়ায়েব তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, এক লোক রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি অভাবী। আমি এক এতিমের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তার সম্পদের রক্ষক। রসুল স. বললেন, তুমি তার মাল থেকে কিছু খাও। কিন্তু সীমা অতিক্রম কোর না। তাড়াহুড়াও কোর না। পারিশ্রমিক বাঁচিয়ে খেও না। আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, একজন রসুল স. এর নিকট নিবেদন করলেন, এক এতিম রয়েছে আমার প্রতিপালনাধীনে। আমি কি তার মাল থেকে খেতে পারবো? তিনি স. বললেন, পারবে। তবে তোমার সম্পদ বাঁচিয়ে খেতে

www.eelm.weebly.com

পারবে না। সা'লাবী। এ কথার অর্থ এই যে, এতিমের রক্ষণাবেক্ষণের বিনিময়ে খেতে পারবে। হজরত আয়েশা এরকম বলেছেন। আমরাও এ কথার সমর্থক। আতা এবং ইকরামা বলেছেন, এ কথার অর্থ আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে খাও। সীমা অতিক্রম কোর না। এতিমের অর্থে বস্ত্র ক্রয় কোর না। নাখয়ী বলেছেন, এতিমের টাকায় ভালো কাপড় ও কম্বল কিনো না। তার অর্থে কেবল ক্ষুধা নিবৃত্ত কোরএবং ছতর ঢাকার জন্য অপরিহার্য বস্ত্রের ব্যবস্থা কোর। এরকম নিতান্ত আবশ্যকীয় খরচ ফেরত দেয়া জরুরী নয়। হাসান বসরী এবং একদল আলেমের মত — এতিমের বৃক্ষের ফল খেতে পারবে, পশুর দুধ পান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে প্রচলিত নিয়ম। এর বিনিময় পরিশোধ করা অত্যাবশ্যকীয় নয়। তবে সোনারূপা গ্রহণ করলে বিনিময় দিতে হবে। এটা জরুরী। কালাবী বলেছেন, এতিমের সওয়ারীতে আরোহন করা, তাদের খাদেমের নিকট থেকে খেদমত নেয়া এবং তার সম্পদ থেকে কিছু খাওয়া জায়েয নয়।

বাগবী তাঁর নিজস্ব সূত্রে কাসেম বিন মোহাম্মদ থেকে লিখেছেন, লোকটি বললো, আমি কি তাদের উট থেকে দুধ পান করতে পারবো? তিনি স. বললেন, পারবে যদি তার হারানো উট খোঁজাখুঁজির কাজ করো, উটের পানি পান করার স্থান প্রস্তুত করো এবং নির্ধারিত সময়ে পানি পান করাও অথবা তার উটের ক্ষতস্থানে মলম লাগাও। আরো দেখতে হবে উটের বাচ্চার যেনো ক্ষতি না হয়। ওলান থেকে সম্পূর্ণ দুধ বের কোর না (যাতে বাচ্চা তার প্রয়োজনীয় দুধ পায়)। শা'বী বলেছেন, মুর্দার গোশত খেতে বাধ্য হতে হয় — এরকম নাচার না হওয়া পর্যন্ত এতিমের মাল খেও না।

মুজাহিদ এবং সাইদ বিন জোবায়ের ভক্ষণ করার অর্থ করেছেন, কর্জ করা। অর্থাৎ যদি প্রয়োজন হয় তবে এতিমের মাল থেকে ধার নিতে পারবে। পরে অভাবমুক্ত হলে পরিশোধ করবে। হজরত ওমর বিন খাত্তাব বলেছেন, আমি আল্লাহর মাল (বায়তুল মাল) সংরক্ষিত রেখেছি এতিমদের অভিভাবক হয়ে (হে অভিভাবকেরা) ধনী হলে বেঁচে থেকো, আর দরিদ্র হলে ইনসাফের সঙ্গে খাও (ঋণ গ্রহণ করো)। যখন অনটনমুক্ত হও তখন ঋণ পরিশোধ কোর।

এতিমেরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদেরকে সম্পদ অর্পণের সময় সাক্ষী রাখতে হবে। আয়াতের শেষে এসেছে এই নির্দেশ। নির্দেশটি ওয়াজিব নয়। তবে এরকম করা উত্তম। এরকম করলে পরবর্তীতে অপবাদ অথবা দ্বিধা-সন্দেহ কিংবা বচসার সুযোগ থাকে না। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক এই আয়াতের দলিল পেশ করে বলেছেন, এতিমেরা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই তাদের সম্পদ দাবী করলে সাক্ষী ব্যতীত তাদের দাবী গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। ইমাম আজম বলেছেন, তখন তারা সাক্ষী পেশ করতে না পারলে তাদের দাবীকে কসমের সঙ্গে

www.eelm.weebly.com

গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা তারা সম্পত্তির ক্ষতি হওয়ার আশংকাকে অস্বীকার করে (অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে কসম কবুল করা যায়।)।

সবশেষে বলা হয়েছে, হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। এর অর্থ প্রতিদান দেয়ার ক্ষেত্রে এবং সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। অন্য সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। সুতরাং প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্র উপরেই ন্যস্ত করতে হবে।

আবু শায়েখ বিন হাব্বান কিতাবুল ফরায়েজে কালাবী আবু সালেহে'র মাধ্যমে ইবনে আব্বাসের বক্তব্য উপস্থিত করেছেন এরকম, মূর্খতার যুগে মানুষেরা নারী ও নাবালকদের উত্তরাধিকার স্বীকার করতো না। আওস বিন ছাবেত নামক এক আনসারী দুই কন্যা এবং এক নাবালক পুত্র রেখে মারা যান। তাঁর দুই চাচাত ভাই — খালেদ ও আরফাজাহ্ পরিত্যক্ত সম্পত্তি অধিকার করে বসে। তখন তাঁর বিধবা পত্নী রসুল স. এর নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেন। রসুল স. সব শুনে বললেন, কী বলবো — এই বিষয়ে তো আমাকে কিছু জানানো হয়নি। তখন এই বিষয়ে জানানো হলো। অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াতটি-

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৭

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ○

❒ পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, উহা অল্পই হউক অথবা বেশীই হউক, এক নির্ধারিত অংশ।

কেবল পুরুষ নয়, নারীদেরও অংশ রয়েছে পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে। নারীদের গুরুত্ব প্রতিভাত করার জন্যই এখানে পুরুষদের অধিকার সম্বলিত বাক্যের পুনারাবৃত্তি করা হয়েছে রমণীদের ক্ষেত্রেও। অল্প অধিক - সকল সম্পত্তিতেই মীরাস (উত্তরাধিকার) জারী থাকবে। এক্ষেত্রে সম্পত্তির সকল পরিমাণই সমান গুরুত্ববহ। উত্তরাধিকারের এই অংশ সমূহ যথাপাত্রে প্রদান করা ফরজ। এই নির্ধারণ পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। এখানকার 'মাফরুদা' এর উদ্দেশ্য, অংশীদারের বৈমুখ্য অথবা অনিচ্ছা তার মালিকানাকে রহিত করে না।

www.eelm.weebly.com

এই আয়াতের দু'টি বিষয় নির্ধারিত। ১. অংশের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি ২. আকুরাবূনা (আত্মীয়স্বজন) শব্দটির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। অবশ্য এর ব্যাখা দেয়া হয়েছে হাদিস শরীফের মাধ্যমে। পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনরা পৃথকভাবে উল্লেখিত হয়েছে এই আয়াতে। উদ্দেশ্য, সর্বাপেক্ষা নিকটস্বজন পিতামাতাকে গুরুত্ববহ করে তোলা। এদের সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আগেই। তাই এখানে অন্যান্য স্বজনকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আওস বিন ছাবেত আনসারী দুই কন্যা এবং এক পুত্র রেখে মারা গেলেন। তাঁর দুই চাচাতো ভাই সুয়ায়েদ ও আরফাজাহ্ তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল করে নিলো। বিধবা ও এতিমেরা হলো বঞ্চিত। তখন নারী ও এতিমদেরকে মীরাস দেয়া হতো না। মীরাস দেয়া হতো কেবল প্রাপ্তবয়স্কদেরকে। তারা বলতো, আমরা শুধু তাদেরকেই অংশ দিবো যারা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে এবং গনিমত নিয়ে ফিরবে। আনসারী সাহাবীর বিধবা পত্নী রসুল স. এর নিকটে যেয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আওস বিন ছাবেত মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর তিনজন সন্তানসন্ততি সহ আমি এখন বিধবা। তাঁর সম্পত্তি সম্পূর্ণ দখল করে নিয়েছে সুয়ায়েদ এবং আরফাজাহ্। এখন আমার কাছে এমন কিছুই নেই যা দিয়ে সন্তানদের পানাহারের ব্যবস্থা করতে পারি। রসুল স. সুয়ায়েদ এবং আরফাজাহ্কে ডেকে আনলেন। তারা বললো, এই মহিলার সন্তানেরা উপযুক্ত নয়। তারা অশ্বারোহন করতে পারবে না। ক্ষতিপূরণ বা বিনিময় দিতে পারবে না। শত্রুর সাথে যুদ্ধও করতে পারবে না। তখন এই আয়াত নাজিল হলো। রসুল স. তাদেরকে বললেন, দেখ। তোমরা অংশ দিতে চাওনি। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে অংশীদার বানিয়েছেন। কিন্তু এখনো পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। আমি এ সম্পর্কিত হুকুমের অপেক্ষায় আছি। আল্লাহ আয়াত নাজিল করেলেন 'ইউসিকুমুল্লাহ ... 'শেষ পর্যন্ত। তখন রসুল স. বললেন, তোমরা আট ভাগের এক অংশ উম্মে কোহাকে (আওস বিন ছাবেতের বিধবা পত্নীকে) এবং তিন ভাগের দুই অংশ তার সন্তানদেরকে দিয়ে দাও। অবশিষ্ট অংশ তোমাদের।

আমি বলি, যখন 'লিররিজালি নাসিবুন ...'এই আয়াতের পরে 'ইউসিকুমুল্লাহ ...' এই আয়াত নাজিল হয়েছে, এখন সময়ের হেরফের সম্পর্কে অনুযোগ করার সুযোগ এখানে নেই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

সুদ্দী লিখেছেন, গ্রহণযোগ্য গ্রন্থাবলীর বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, হজরত আওস বিন ছাবেত হাস্সান বিন ছাবেতের ভাই ছিলেন। তিনি শহীদ হয়েছিলেন উহুদ যুদ্ধে। এই বর্ণনাটিতে আপত্তি তুলেছেন আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি। তিনি বলেছেন, আপন ভাইয়ের উপস্থিতিতে চাচাতো ভাইয়েরা পরিত্যক্ত সম্পত্তি

www.eelm.weebly.com

অধিকার করতে পারে না। তাঁর আপন ভাই হাস্সান তখনো জীবিত। বাগবী লিখেছেন, ইবনে হাজার তাঁর 'আছাবা' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, বর্ণিত শানে নুজুলের ঘটনাটি ভুল। কেননা হাস্সানের কোনো ভাইয়ের নাম আওস ছিলো না এবং খালেদ বা আরফাতা বলে তাঁর চাচতো ভাইও কেউ ছিলেন না। (সম্ভবত এ স্থানে লেখক ভুল করে আরফাজাহ্কে আরফাতা লিখেছেন। আসল বর্ণনায় আরফাজাই রয়েছে — আরফাতা নয়)। আল্লামা সুয়ুতী পরে লিখেছেন, আওস নামে বেশ কয়েকজন সাহাবী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন বংশভুত। তাঁদের কোনো একজনের ঘটনায় নাজিল হয়েছে এই আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ○

❒ সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, পিতৃহীন এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে উহা হইতে কিছু দিবে এবং তাহাদের সহিত সদালাপ করিবে।

সম্পদের ভাগ বাটোয়ারার সময় উত্তরাধিকারী নয় এমন আত্মীয় উপস্থিত হলে তাদেরকেও কিছু না কিছু দিতে হবে। হাসান বলেছেন, পুরনো কাপড় অথবা এ ধরনের সামগ্রী যা তেমন মূল্যবান না হওয়ায় বন্টনযোগ্য বলে বিবেচনা করতে লজ্জাবোধ হয় - তাই দিয়ে দাও। সাঈদ বিন জোবায়ের এবং জুহাক বলেছেন, পরবর্তী আয়াত ইউসিকুমুল্লাহ্ (আয়াত নং ১১) দ্বারা এই আয়াতটি রহিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ইবনে আব্বাস, শা'বী, নাখয়ী, জুহরী, মুজাহিদ এবং আলেমদের একটি দল এই আয়াত রহিত নয় বলেছেন। হজরত ইয়াহিয়া বিন ইয়ামার রা. এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, মদীনায় অবতীর্ণ তিনটি সুস্পষ্ট (মোহকাম) আয়াতকে মানুষেরা আমলে আনেনি। একটি হচ্ছে এই আয়াত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'ইয়া আইয়্যুহাল লাজীনা আমানু লিইয়াসতা'জিন কুমুল্লাজীনা মালাকাত আইমানুকুম' এবং তৃতীয়টি হচ্ছে 'ইয়া আইয়্যুহান নাসু ইন্না খলাক্বনাকুম মিন জাকারিউ ওয়া উনসা ....' শেষ পর্যন্ত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, উত্তরাধিকারী নয় এমন আত্মীয়কে দান করা ওয়াজিব। প্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তবয়স্ক সকল অংশীদারের জন্যই এতিম, মিছকীন ও দূরবর্তী আত্মীয়কে দান করা জরুরী। অংশীদার প্রাপ্তবয়স্ক হলে নিজেই দিবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের পক্ষ থেকে দান

www.eelm.weebly.com

করবে তাদের অভিভাবক। মোহাম্মদ বিন শিরিন বলেছেন, এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতেই ওবায়দা সালমানী রা. এতিমের সম্পদ বন্টন শেষে কিছু অংশ রেখে দিয়েছিলেন। তা দিয়ে একটি ছাগল কিনে নিয়ে তার গোশত রান্না করে এই আয়াতে উল্লেখিতদেরকে খাইয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, এই আয়াত না হলে এই সম্পদ হতো আমার। তবে এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত এই যে, এই আয়াতের হুকুমটি ওয়াজিব নয়। বরং মোস্তাহাব।

ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রাপ্তবয়স্ক অংশীদার নিজে দান করবে, দানকে সামান্য মনে করবে এবং এর জন্য গ্রহীতাদেরকে খোঁটা দিবে না। আর অংশীদার নাবালক হলে তার অভিভাবক দান করতে অস্বীকৃত হবে। বলবে, এই সম্পত্তির মালিক নাবালেগ- আমি নই। আমার হলে অবশ্যই আমি কিছু দিতাম। এই নাবালেগ বড় হলে তোমাদেরকে দান করতে পারবে - যখন বুঝবে। এখন তো নির্বোধ। এই আয়াতের শেষে এরকমই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তাহাদের সহিত সদালাপ করিবে।'

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৯

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ○

❐ তাহারা যেন ভয় করে যে অসহায় সন্তান পিছনে ছাড়িয়া গেলে তাহাদের সম্বন্ধে তাহারাও উদ্বিগ্ন হইবে। সুতরাং তাহারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে।

অসমর্থ সন্তানদেরকে পরিত্যাগ করা অন্যায়। তাদের যথাঅধিকার নিশ্চিত না করা উদ্বেগের কারণ। এখানে সমর্থ অংশীদারকে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যেন তারা মহিলা ও নাবালকদের উত্তরাধিকারের অংশ দিতে কুণ্ঠিত না হয়। দূরের আত্মীয় এবং ফকির মিছকিনদেরকেও যেনো কিছু দিয়ে দেয়। যেনো লক্ষ্য রাখে অসহায়দের প্রতি। তাদের অবর্তমানে তাদের স্ত্রী-পুত্র পরিজনের কী অবস্থা হবে - একথা স্মরণে রেখেই যথাবন্টন নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে নিজের মৃত্যুর পর স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিরাও হয়ে পড়বে এমনি সহায়হীন। সুতরাং এখন যারা দুর্বল অংশীদার তাদের প্রাপ্য নিশ্চিত করো। আল্লাহকে ভয় করো। মনে রেখো, তাঁর নিকট জবাবদিহি করতেই হবে। 'খশিয়া' শব্দের চূড়ান্ত অবস্থা হচ্ছে তাকওয়া। 'খশিয়া' অর্থ ভয় করা এবং তাকওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে

www.eelm.weebly.com

ভয়ে সাবধান হয়ে যাওয়া। আয়াতের প্রথম খশিয়া শব্দের মাধ্যমে আপন বিপদাশংকার তুলনা দিয়ে দুর্বল অংশীদারদের বিপদ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হতে বলা হয়েছে। আর শেষে দেখানো হয়েছে জবাবদিহির ভয়।

কালাবী বলেছেন, এই হুকুমটি আরোপিত হয়েছে এতিমের অভিভাবকের প্রতি। অথবা যাদের প্রতি অছিয়ত করা হয়েছে — তাদের প্রতি। নির্দেশের মর্ম এই যে, এতিম প্রসঙ্গে আল্লাহকে ভয় করো। তাদের প্রতি উত্তম আচরণশীল হও। যেমন আচরণ তুমি পছন্দ করো পৃথিবীতে রেখে যাওয়া তোমার এতিম সন্তান সন্ততিদের প্রতি। এই আয়াতকে ৬ ও ৭ নং আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করলে অর্থ হবে এরকম, যতোক্ষণ না তোমরা জাহেলিয়াতের নিয়ম থেকে বেরিয়ে আসবে। মুর্খতার যুগের নিয়ম ছিলো, নারী ও নাবালকদেরকে উত্তরাধিকার অর্পণ করা হবে না। অংশ দিতে হবে কেবল যুদ্ধযাত্রায় সক্ষমদেরকে। এই অসমীচীন আচরণ থেকে বেরিয়ে না এলে অশুভ পরিণাম নিশ্চিত। এরকমও অর্থ হওয়া সম্ভব যে, এখানে উত্তরাধিকারহীন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়, এতিম ও সম্বলহীনদের প্রতি করনীয় আচরণ নির্দেশ করে বলা হয়েছে 'এবং সংগত কথা বলে।' যেনো সামর্থশীল অংশীদারেরা মনে করে, এরা যদি আমাদের সন্তানসন্তুতি হতো — তবে কি আমরা তাদেরকে এমত অসহায় দেখতে পছন্দ করতাম।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য ওই ব্যক্তি, যে মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী। তার পাশে জড়ো হওয়া মানুষেরা যখন বলে, তোমার উত্তরাধিকারীরা কোনো কাজে আসবে না। অমুক গোলামকে আজাদ করে দাও। অমুক অমুকদেরকে বেশী বেশী করে দান করো। বরং তোমার উচিত সমস্ত সম্পত্তি দান করে যাওয়া। এরকম উপদেশ প্রদানকারীদেরকে আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন, আল্লাহকে ভয় করো। এই মৃত্যুপথযাত্রীর সন্তানসন্তুতিদেরকে আপন সন্তান মনে করো। এরকম পরামর্শ দিওনা যাতে কেউ অধিকারবঞ্চিত হয়।

অথবা এই নির্দেশ অর্পিত হয়েছে অছিয়তকারীদের উপর। তাদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে তারা যেনো অংশ আদায়ে অসমর্থ উত্তরাধিকারীদের বিপন্ন অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে। অছিয়ত প্রতিপালনের ক্ষেত্রে যেনো সীমা বজায় রাখা হয়। যেনো (আল্লাহর পথে) দানের অছিয়ত কার্যকর করা হয় মোট সম্পদের সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশের উপর। এর বেশী করা উত্তরাধিকারের বিধানকে অকার্যকর করার নামান্তর।

ক্ষমতাশালী অংশীদার তার দুর্বল অংশীদের সঙ্গে নম্র আচরণ করবে। ভদ্রজনোচিত কথা বলবে যেমন কথা বলা হয় আপন সন্তানদের সঙ্গে। আর মৃত্যুপথযাত্রীদেরকে এই পরামর্শ দিবে, যেনো দান করা হয় সর্ব্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ। সম্পদ বন্টনকালে উত্তরাধিকারবিবর্জিত আত্মীয় ও সহায় সম্বলহীনদের

www.eelm.weebly.com

সঙ্গেও যেনো শিষ্ট আচরণ করা হয়। কিছু দান করে তাদের আক্ষেপকেও যেনো প্রশমিত করা হয়। অছিয়ত প্রতিপালনের উদ্দেশ্য যেনো হয় আল্লাহর সন্তোষ অর্জন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১০

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

❑ যাহারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তাহারা তাহাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে; তাহারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলিবে।

মুকাতিল বিন হাব্বান বলেছেন,মারসাদ বিন জায়েদ গাতফানী যখন তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের সম্পদ ভক্ষণ করলো, তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। বলা হলো, এতিমের সম্পদ আত্মসাৎকারী তার উদরকে পূর্ণ করেছে আগুন দিয়ে। অর্থাৎ এমন জিনিস দিয়ে সে উদরপুর্তি করেছে যা তাকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মেরাজ রাত্রিতে আমি এরকম কিছু লোককে দেখেছি যাদের ওষ্ঠ উটের মতো। তাদের উপরের ঠোঁট সংকোচিত ও নাসিকা সংলগ্ন আর নিচের ঠোঁট ঝুলছে বুক অবধি। তাদের মুখে প্রবেশ করানো হচ্ছে দোজখের অঙ্গার ও পাথর। আমি জিব্‌রাইলকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এরা অন্যায়ভাবে এতিমের মাল ভক্ষণকারী। এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম আবু সাইদ খুদরী থেকে।

ইবনে আবী শাইবা মসনদ গ্রন্থে, ইবনে আবী হাতেম তাঁর তাফসীরে এবং ইবনে আবী হাব্বান সহীহ্ পুস্তকে হজরত আবু বোরদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কবর থেকে এমন কতিপয় ব্যক্তিকে উঠানো হবে যাদের মুখ থেকে বের হবে লেলিহান আগুন। নিবেদন করা হলো, এরা কারা? তিনি স. বললেন, তোমার কি জানা নেই আল্লাহ বলেছেন, যারা এতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদর পূর্ণ করে আগুন দিয়ে। তারা প্রবিষ্ট হবে জ্বলন্ত আগুনে।

বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা লিখেছেন, হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ বলেছেন, মক্কার বনু সালমায় একবার অসুস্থাবস্থায় আমাকে দেখতে এসেছিলেন রসুল স. এবং হজরত আবু বকর । আমি ছিলাম বস্ত্রাবৃত, প্রায় অচেতন। তিনি স. পানি চেয়ে নিয়ে অজু করলেন।

www.eelm.weebly.com

তারপর আমার উপর কিছু পানি ছিটিয়ে দিলেন। আমার চেতনা ফিরে এলো। আরজ করলাম, আমি কি আমার সম্পদ থেকে কিছু অছিয়ত করতে পারি? এ ব্যাপারে বিধান কী? তখন নাজিল হলো পরবর্তী আয়াতটি।

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা এবং হাকেম হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন, হজরত সা'দ বিন রবীর স্ত্রী রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে রসুল। সা'দ আপনার সঙ্গে উহুদে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। এখন তাঁর দু'টি কন্যা নিয়ে আমি বড়ই বিপাকে পড়েছি। কারণ, তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণ অধিকার করে নিয়েছে কন্যাদ্বয়ের চাচা। কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। সম্পত্তি ছাড়া তো তাদের বিয়েও দেয়া যাবে না। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ই এর সিদ্ধান্ত দান করবেন। এরপর অবতীর্ণ হলো উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত। রসুল স. তখন এতিম কন্যাদ্বয়ের চাচাকে ডেকে জানিয়ে দিলেন, তিন ভাগের দুই ভাগ কন্যাদের, আট ভাগের এক ভাগ তাদের মায়ের এবং অবশিষ্ট তোমার।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, যাঁরা এই হাদিসটিকে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াতের শানে নুজুল বলেন, তাঁরা ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত জাবেরের হাদিসটিকে সঠিক বলেন না। তাঁদের দলিল এই যে, মক্কাবাসের সময় তো হজরত জাবেরের সন্তান সন্তুতিই ছিলো না। জবাবে বলা যায়, উপরোক্ত দুটি বর্ণনাই এই আয়াত নাজিলের কারণ। এরকমও হতে পারে যে, আয়াতের প্রথম অংশ সা'দের কন্যাদ্বয়ের সঙ্গে এবং শেষ অংশ (সে নিঃসন্তান হলে) হজরত জাবেরের সঙ্গে সম্বন্ধিত। হজরত জাবের সম্পূর্ণ আয়াত উদ্ধৃত করেছেন (ইউসিকুমুল্লাহু থেকে শেষ পর্যন্ত)। কিন্তু তিনি নিজে সংশ্লিষ্ট ছিলেন শেষ অংশের সঙ্গে (যেখান থেকে 'সে নিঃসন্তান হলে' শুরু হয়েছে)। কারণ তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াতগুলোর শানে নুজুল সম্পর্কে আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর। তিনি সুদ্দী'র বর্ণনাসূত্রে লিখেছেন, মুর্খতার যুগের মানুষেরা মহিলা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে উত্তরাধিকার দিতো না। যারা প্রাপ্তবয়স্ক এবং শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে সমর্থ কেবল তারাই উত্তরাধিকার পেতো। হজরত হাস্সান বিন সাবেতের ভাই আবদুর রহমান মারা গেলে তাঁর পত্নী উম্মে কোহা তাঁর পাঁচ কন্যা নিয়ে অসহায় হয়ে পড়লেন। পরিত্যক্ত সম্পত্তি অধিকার করে নিলো অন্যান্য অংশীরা। উম্মে কোহা অভিযোগ পেশ করলেন রসুল স. এর কাছে। তখন পরবর্তী আয়াতটি নাজিল হয়েছে। এর সঙ্গে উম্মে কোহা এবং সা'দ বিন রবী'র বিধবা পত্নী ওমরা বিনতে হারাম উভয়েই সংশ্লিষ্ট। কাযী ইসমাইল তাঁর আহকামুল কোরআন পুস্তকে আবদুল মালেক বিন মোহাম্মদ বিন হাজমের নিয়মে বর্ণনা করেছেন, ওমরা ছিলেন সা'দ বিন রবী'র স্ত্রী। তিনি

www.eelm.weebly.com

ছিলেন সা'দের এক কন্যা সন্তানের গর্ভধারিণী। তিনিও উত্তরাধিকার লাভের জন্য রসুল স. এর শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

সূরা নিসা ঃ আয়াত ১১

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ○

❑ আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছেন ঃ এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান; কিন্তু দুই এর অধিক থাকিলে তাহাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকিলে তাহার জন্য অর্ধাংশ। তাহার সন্তান থাকিলে তাহার পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যাক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ; সে নিঃসন্তান হইলে এবং শুধু পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হইলে তাহার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ; তাহার ভাইবোন থাকিলে মাতার জন্য এক ষষ্ঠাংশ; এ সবই সে যাহা অসিয়ৎ করে তাহা দেওয়ার পর ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তাহা তোমরা অবগত নহ। ইহা আল্লাহের বিধান; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

এক ছেলের অংশ দুই মেয়ের সমান। এই নিয়ম ছেলে ও মেয়ে থাকলে। এক পুত্র এবং এক অথবা একাধিক কন্যা কিংবা এক কন্যা এবং এক বা একাধিক পুত্র। পুত্র কন্যা উভয়েই সন্তান। তাই কেউ অধিকারবঞ্চিত হবে না। কিন্তু ছেলেরা পাবে মেয়েদের দ্বিগুণ। এতে করে পুরুষদের অধিকতর মর্যাদা সপ্রমাণিত হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

ছেলে না থাকলে দুই বা ততোধিক মেয়েদের জন্য নির্ধারিত অংশ হচ্ছে মোট পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। কেবল এক কন্যার বেলায় অর্ধাংশ। আয়াতে দুই কন্যার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দুই কন্যা মিলে ওই অংশই পাবে যা এক কন্যার বেলায় নির্ধারিত হয়েছে। কেননা (দুই তৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধেক — এ বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও) মেয়েদের ন্যূনতম অংশ নিশ্চিত। তাই সন্দেহকে পরিত্যাগ করে ন্যূনতম অংশকেই ধরে নিতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত এই যে, দুই বা দুইয়ের অধিক — উভয় অবস্থাতেই দুই তৃতীয়াংশ নির্ধারিত হয়েছে। এই মতের উপরই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গের বর্ণনায় আয়াতে 'ফাওকা' শব্দটি এসেছে। এই শব্দটির অর্থ অতিরিক্ত বা অধিক (দুই বা ততোধিক — সকল সংখ্যাই একের অধিক)। এই মতের পোষকতায় রয়েছে সা'দ বিন রবী সম্পর্কিত হাদিসটি। তাঁর ছিলো দুই কন্যা। কোনো কোনো আলেম দুই কন্যার অংশ দুই বোনের অংশের মতো বলেছেন। আল্লাহ এক বোনের অংশ তার ভাইয়ের অংশের অর্ধেক নির্ধারণ করেছেন। এরকম কেবল এক কন্যা থাকলে নির্ধারণ করেছেন মোট সম্পত্তির অর্ধেক। ভাই ও বোনের অংশের অনুপাত ২ ঃ ১। এক বা একাধিক ভাই বোনদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বোন পাবে প্রত্যেক ভাইয়ের অর্ধেক। ভাই না থেকে শুধু দুই বোন থাকলে পাবে দুই তৃতীয়াংশ। ভাই না থাকলে দুইয়ের অধিক বোনেরাও ওই দুই তৃতীয়াংশই পাবে। বিষয়টি কোরআন, সুন্নাহ ও এজমার (ঐকমত্যের) সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কেবল এক কন্যার আইনে দুই কন্যাও সম্মিলিতভাবে মোট সম্পত্তির অর্ধেক পাবে — এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই।

একজন ছেলে এবং একজন মেয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের অংশ এক তৃতীয়াংশের কম হলে চলবে না। এমতাবস্থায় দুই তৃতীয়াংশ ছেলের আর এক তৃতীয়াংশ মেয়ের। মেয়ে দু'জন হলেও এই নিয়ম- প্রত্যেকেই হবে এক তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী (এর কম নয়)। আয়াতে 'পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান' বলা হয়েছে। কিন্তু কন্যা যদি আদৌ না থাকে তবে পুত্রের কি হবে তা বলা হয়নি। এতে করে পুত্রের অধিকারবঞ্চিত হওয়ার সন্দেহ অমূলক। এরকম অবস্থায় পুত্র আসাবা সূত্রে লাভ করবে পুরো সম্পত্তির অধিকার। কারণ আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, পুত্র পাবে কন্যার দ্বিগুণ। আর এক কন্যা পাবে মোট সম্পত্তির অর্ধেক। এই বর্ণনাভঙ্গিতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এক কন্যা অর্ধেক পেলে এক পুত্র পাবে পুরোটাই। কন্যার অধিকার যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে পুত্রের অধিকার এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত (উল্লেখ না থাকলেও)। আর এক পুত্র পুরো সম্পত্তির মালিক না হলে তার অংশ কতখানি তা বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিলো। সুতরাং সে যে পুরো সম্পত্তির মালিক হবে তা অনুল্লেখ থাকাতেই যেনো নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছে। আর

www.eelm.weebly.com

স্বতঃপ্রতিষ্ঠ বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন সম্পূর্ণতই যুক্তিযুক্ত। এক কন্যার অধিকার নিশ্চিত না করা পর্যন্ত যেমন অন্য আসাবার (মূল ওয়ারিশের অংশ সুসাব্যস্ত হওয়ার পর যারা অংশ পায়) অংশ লাভের প্রশ্ন ওঠেনা, তেমনি এক পুত্রের বেলাতেও। এক কন্যা অর্ধেক এবং এক পুত্র সম্পূর্ণ সম্পত্তির অধিকারী। নাতিপুতিদের কোনো অংশ এখানে নেই।

মাসআলা ঃ আলেমদের ঐকমত্য এই যে, সন্তান জীবিত না থাকলে তার ছেলেমেয়েরা সেই সন্তানের স্থলবর্তী হবে। তার একজন ছেলে (নাতি) এবং কয়েকজন মেয়ে (নাতনী) থাকলে সমস্ত সম্পদ তারাই পাবে। শুধু একজন নাতনী অর্ধেক পাবে। একাধিক হলে দুই তৃতীয়াংশ পাবে। নাতি নাতনী সবাই থাকলে প্রত্যেক নাতি পাবে প্রত্যেক নাতনীর দ্বিগুণ। যদি মৃত ব্যক্তির এক বা একাধিক কন্যা থাকে এবং তার সাথে নাতি নাতনী থাকে, তবে কন্যা অথবা কন্যাদের অংশ দেয়ার পর বাকি অংশ বন্টন করা হবে নাতি নাতনীদেরকে (ছেলের অংশ মেয়ের অংশের দ্বিগুণ- এই নিয়মে)। তাহাবী বলেছেন হজরত আয়েশা দুই কন্যা ও নাতি নাতনীদের (অন্য মৃত সন্তানের ছেলেমেয়েদের) অংশ বন্টন করেছেন এভাবে — দুই তৃতীয়াংশ দুই কন্যার এবং বাকি এক তৃতীয়াংশ নাতি নাতনীদের। নাতি নাতনীদের অংশ বন্টন করেছেন নাতনী একগুণ নাতি দ্বিগুণ এই নিয়মে। এক পিতা ও দুই মায়ের সন্তানদের মধ্যে এই নিয়মে বন্টন করতে হবে। আর যদি এক বা একাধিক কন্যার সঙ্গে এক নাতি অথবা কয়েকজন নাতনী থাকে, তবে কন্যাদের অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট অংশ দিতে হবে নাতি নাতনীদেরকে। বোখারী ও মুসলিমে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন রসুল স. বলেছেন, ফরজ অংশ আহলে ফারায়েজকে দাও (কোরআন ও হাদিস দ্বারা যাদের অংশ নির্ধারিত, তাদেরকে আহলে ফারায়েজ বলে)। আহলে ফারায়েজদেরকে দেয়ার পর অবশিষ্ট অংশ দিতে হবে নিকটতমদেরকে। এক কন্যা এবং এক বা একাধিক নাতি নাতনী থাকলে প্রথমে কন্যা পাবে অর্ধেক। তারপর নাতি নাতনীদের ছয় ভাগের এক ভাগ। কন্যাদের, নাতনীদের এবং বোনদের প্রাপ্য দুই তৃতীয়াংশ এর বেশী নয়। এজন্য প্রথমে দুই তৃতীয়াংশ দিয়ে পরে এক ষষ্ঠাংশ নাতনীদেরকে দিতে হবে।

বোখারী, হুজাইল বিন শারাহবিলের বর্ণনা থেকে লিখেছেন, এক ব্যক্তি হজরত আবু মুসা ও সালমান বিন রবীয়া সকাশে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, মৃত ব্যক্তির এক কন্যা, এক নাতনী এবং এক সহোদরা থাকলে, পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের নিয়ম কী? তার প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবীদ্বয় সিদ্ধান্ত দিলেন যে, কন্যাকে অর্ধেক এবং বোনকে অর্ধেক দিতে হবে- নাতনী কিছু পাবে না। তারপর বললেন, তুমি ইবনে মাসউদ কে এই বিষয়ে প্রশ্ন কোর- দেখো, আমরা যা বলেছি

www.eelm.weebly.com

তিনিও তাই বলবেন। ওই ব্যক্তি যখন হজরত ইবনে মাসউদের কাছে গিয়ে এ বিষয়ে জানতে চাইলেন তিনি বললেন, আমি এরকম সিদ্ধান্ত দিলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো। তিনি তখন ওই সিদ্ধান্তই দিলেন যা রসুলে পাক স. দিয়েছেন। বললেন, মেয়ে অর্ধেক, নাতনী ছয়ভাগের একভাগ এবং বাকি এক তৃতীয়াংশ পাবে বোন। ওই ব্যক্তি পুনরায় আবু মুসার নিকট গিয়ে ইবনে মাসউদের এই অভিমত জানালো। তাঁরা বললেন, যতোদিন ওই প্রজ্ঞাবান বেঁচে থাকবেন, ততোদিন আমাদের কাছে ফতোয়া অন্বেষণ কোর না। হজরত ইবনে মাসউদের ফতোয়ার মর্ম এই যে, মৃত ব্যক্তির বংশ অপেক্ষা তার পিতার বংশ অধিকতর নিকটে নয়, তাই কন্যা ও নাতনীর উপস্থিতিতে বোনের অংশ ফরজ নয়। বোন পাবে আসাবা হিসেবে। কন্যা ও নাতনী দুই তৃতীয়াংশ, অবশিষ্টাংশ বোনের।

দুই সহোদরার উপস্থিতিতে নাতনীগণ কোনো অংশ পাবে না। কেননা দুই কন্যাই পাবে তিন ভাগের দুই ভাগ। মেয়েদের অংশ সম্মিলিতভাবে তিন ভাগের দুই ভাগের বেশী নয়। নাতনীদের সঙ্গে সমসংখ্যক নাতি থাকলে অথবা নাতনীদের নিচের স্তরের নাতি থাকলে তখন তারা সবাই আসাবা হবে। তখন তারা নিজের সমস্তরের নাতনীদেরকেও আসাবা বানিয়ে নেবে। এরকম অবস্থায় উপরের স্তরের নাতনীরাও আসাবা হবে।

মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার (মৃত ব্যক্তির) পিতামাতা প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। সম্মিলিতভাবে ছয় ভাগের এক ভাগ নয়। অর্থাৎ প্রত্যেকে বার ভাগের এক ভাগ নয়। পিতাও ছয় ভাগের এক ভাগ। মাতাও ছয় ভাগের এক ভাগ। ছেলে অথবা মেয়ে অথবা ছেলের সন্তান (ছেলের সন্তান কন্যা হলে) থাকলে পিতা পাবে ষষ্ঠাংশ ফরজ হিসাবে। তারপর অন্যদের ফরজ অংশ বন্টনের পর অবশিষ্ট অংশ পাবে আসাবা হিসাবে। কেননা মেয়েদের ও নাতনীদের পর পিতাই নিকটতম আসাবা।

মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হলে পিতামাতাই তার উত্তরাধিকারী। এরকম অবস্থায় মা পাবে এক তৃতীয়াংশ যদি অন্য কোনো অংশী না থাকে। আর বিপত্নীক পুরুষ অথবা বিধবা নারী থাকলে তাদের অংশ দেয়ার পর যা থাকবে তার এক তৃতীয়াংশ পাবে। সন্তান ও নাতনী না থাকলে পিতামাতা উপস্থিত থাকলে বিপত্নীক স্বামী অথবা বিধবা স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ উত্তরাধিকার পাবে না।

বোন, ভাই এবং দাদা- পিতার উপস্থিতিতে ওয়ারিশ নয়। মাতার দাদী, নানী থাকলেও তারা কোনো অংশ পাবে না। অর্থাৎ ওয়ারিশ যদি কেবল পিতামাতা হয় তবে মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ। আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, এরকম অবস্থায় মা পাবে এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু মা ও বাবা দুজনই যদি বেঁচে থাকে, তবে মা কতো পাবে — তা কিন্তু আয়াতে উল্লেখ নেই। তবে একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি

www.eelm.weebly.com

পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হয় যে — এ অবস্থায়ও মা পাবে তিন ভাগের একভাগ এবং পিতা পাবে বাকি দুই ভাগ। আর মৃতের পতি অথবা পত্নী বেঁচে থাকলে তার অংশ দিয়ে দেয়ার পর যা থাকবে তার এক তৃতীয়াংশ পাবে মা।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, আমরা মনে করি হজরত ওমর যে পথে চলেছেন, সেই পথই সবচেয়ে সহজ পথ। আমরা ওই পথই অনুসরণ করি। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, মৃত ব্যক্তির এক স্ত্রী ও পিতামাতা বেঁচে থাকলে কী হুকুম? তিনি বললেন, প্রথমে এক চতুর্থাংশ দিতে হবে স্ত্রীকে। তারপর অবশিষ্ট অংশের তিন ভাগের একভাগ মায়ের এবং দুই ভাগ বাপের। এ ব্যাপারে জায়েদ বিন ছাবেতের বক্তব্য এই যে, মৃতের মা-বাবা ও স্বামী কিংবা মা-বাবা ও স্ত্রী ওয়ারিশ হলে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর বাকি সম্পদকে তিন ভাগ করে একভাগ মাকে এবং দুই ভাগ বাবাকে দিতে হবে। এটাই ঐকমত্য। মৃতের পিতা বেঁচে না থেকে যদি দাদা বেঁচে থাকে, তবুও তার মা পাবে এক তৃতীয়াংশ।

বায়হাকী ইকরামার বক্তব্য উল্লেখ করে বলেছেন, ইবনে আব্বাসের মতে উপরে বর্ণিত দুই অবস্থাতেই সমস্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশের অধিকারিণী হবে মা। শোরাইহ্ও এরকম মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইবনে শিরীন বলেছেন, মৃতের স্ত্রী ও পিতামাতা ওয়ারিশ হলে মা যে এক তৃতীয়াংশ পাবে এ কথা ঠিক। কিন্তু মৃতের স্বামী ও মাতাপিতা থাকলে তাদের অংশ সাব্যস্ত করা সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস যে অভিমত দিয়েছেন, সেটি খেলাফ। তাঁর মতটি ফারায়েজ বিরুদ্ধ। এই আয়াতে পিতার অংশ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এই না বলাই প্রমাণ করে যে পিতার দুই তৃতীয়াংশ (যেহেতু মাতার এক তৃতীয়াংশ)। পিতার বর্তমানে অন্য কোনো আসাবার অংশ নেই। কারণ তিনিই নিকটতম আসাবা। আয়াতের বিবরণে অবশ্য একথাটি স্পষ্ট যে, পিতা না থাকলে মা পাবে এক তৃতীয়াংশ। এর বেশী নয়।

মৃতের ভাই বোন (বৈপিত্রেয় অথবা বৈমাত্রেয়) থাকলে মা পাবে এক ষষ্ঠাংশ। এটাই ঐকমত্য। কিন্তু ইবনে আব্বাস বলেছেন, ভাই বোনের সংখ্যা হতে হবে কমপক্ষে তিনজন। তিনজনের কম হলে মায়ের অংশ এক তৃতীয়াংশ থেকে এক ষষ্ঠাংশ করা যাবে না। হাকেম এই বক্তব্যটিকে বিশুদ্ধ প্রমাণিত করেছেন এভাবে - ইবনে আব্বাস হজরত ওসমানের নিকট গিয়ে বললেন, আপনি দুই ভাইয়ের কারণে মায়ের অংশ এক তৃতীয়াংশ থেকে কমিয়ে এক ষষ্ঠাংশ করলেন কী ভাবে? কারণ, দুই ভাই দ্বিবচনবোধক। কিন্তু আয়াতে বহুবচন উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত ওসমান বললেন, এই নিয়মটি আগে থেকেই অনুসৃত হয়ে আসছে। আর এটাই সকলে মান্য করে চলে। আমি আর এই নিয়মকে পরিবর্তন করতে চাই না। হজরত ওসমান এই ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্যকে দলিল হিসাবে

www.eelm.weebly.com

পেশ করেছেন। জায়েদ বিন ছাবেত কে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, আরববাসীগণ দুই ভাইকেও বহুবচন হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। (তিনি আরবী অভিধান সূত্রে এ কথা বলে ইশারা করেছেন যে, আমাদের অভিমত অভিধানবহির্ভূত নয়)।

মৃতের ভাই ও বোন থাকলে মা পাবে এক ষষ্ঠাংশ - এ কথা ঠিক । কিন্তু শুধু এক ভাই থাকলে পাবে এক তৃতীয়াংশ। শুধু এক বোন থাকলেও এক তৃতীয়াংশ। এটাই উত্তম পন্থা। পিতা থাকলে মা পায় এক তৃতীয়াংশ। সুতরাং শুধু এক ভাই এবং শুধু এক বোন থাকলেও এক তৃতীয়াংশ পাবে।

মাসআলা ঃ মাতা পিতা এবং কয়েকজন ভাই বোন থাকলে পিতা পাবে দুই তৃতীয়াংশ। মা পাবে এক ষষ্ঠাংশ। ভাইবোন কিছুই পাবে না। এই অভিমত জমহুরের। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পিতাকে দুই তৃতীয়াংশ এবং মাকে এক ষষ্ঠাংশ দেয়ার পর যা বাকি থাকবে তা ভাইবোনদেরকে দিতে হবে। ভাইবোনেরা বঞ্চিত হবে না।

মাসআলা ঃ দাদা ও পরদাদা - এভাবে উর্ধতনরা অংশ পাবে পিতা না থাকলে। নানা কিছু পাবে না। নানা পিতার স্থলাভিষিক্ত নয়। মাতার স্থলবর্তীও নয়, কেননা উভয়ের জাত ভিন্ন। তাই সম্পর্কটি এখানে জাদ্দে ফাসেদ (মাতামহ এবং তার উর্ধতন পুরুষেরা জাদ্দে ফাসেদ)। মৃত নিঃসন্তান হলে দাদা আসাবা হবে। অর্থাৎ আসহাবে ফারায়েজদেরকে দেয়ার পর যা থাকবে তা হবে দাদার। মৃতের পুত্র থাকলে দাদা পাবে সমস্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ। কন্যা থাকলেও ওই এক ষষ্ঠাংশ পাবে। যথাবন্টনের পর যা থাকবে তাও শেষ পর্যন্ত আসাবা হিসাবে দাদা পাবে।

পিতা ও দাদা সম্পর্কিত মতবিরোধ ঃ দাদার কারণে মায়ের অংশ এক তৃতীয়াংশ থেকে এক ষষ্ঠাংশে নেমে আসে না। দাদা, মা ও স্বামী থাকলে- মাতার অংশ হবে এক ষষ্ঠাংশ। বিশুদ্ধ মাসআলা হচ্ছে - এমতক্ষেত্রে সম্পত্তিকে ছয় ভাগ করে তিন ভাগ স্বামীকে, এক ভাগ দাদাকে এবং দুই ভাগ মাতাকে দিতে হবে। আর যদি পিতা, মা ও স্বামী ওয়ারিশ হয় তবে স্বামী তিন, পিতা দুই এবং মাতা এক ভাগ পাবে (ষষ্ঠ অংশ ভাগ করতে হবে এভাবে)। পুরুষের বেলায় মৃতের দাদা, মা ও স্ত্রী পাবে এরকম- সম্পত্তি বারো ভাগ করতে হবে। তারপর স্ত্রীকে তিন, মাকে চার এবং দাদাকে পাঁচ ভাগ দিতে হবে। দাদার স্থলে যদি পিতা থাকে তবে সম্পত্তি হবে চার ভাগ - এক ভাগ পাবে স্ত্রী, এক ভাগ মা এবং দুই ভাগ পিতা। পিতার মতো দাদার ক্ষেত্রেও সহোদর, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভাইবোনেরা কিছুই পাবে না। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। হজরত আবু বকর এবং অধিকাংশ সাহাবী এই অভিমতের অনুসারী। অন্য তিন ইমাম এবং সাহেবাইন

www.eelm.weebly.com

(ইমাম ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ) বলেছেন, দাদা বৈমাত্রেয় ভাইবোনদেরকে বঞ্চিত করে দেয়। এমতক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় ও সহোদর ভাইবোনেরাও অধিকারবঞ্চিত হয়।

ইবনে জাওজী বলেছেন তারা অধিকারবঞ্চিত হবে না। কারণ এদের অধিকারবঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারে কোরআনে দলিল থাকা উচিত। কিন্তু দাদা সম্পর্কিত স্পষ্ট কিছু কোরআনে নেই।

আমরা বলি, দাদা পিতার স্থলবর্তী। বৈমাত্রেয়দের ওয়ারিশ হওয়ার কথা কোরআনে রয়েছে ঠিকই, কিন্তু নাতি তাদেরকে অধিকারবঞ্চিত করে এ কথাও সঠিক। দাদাও তেমনি উর্ধতন পুরুষ হিসেবে পিতার স্থলাভিষিক্ত। ইমাম আবু হানিফার দলিল ওই হাদিসটি যেখানে রসুল স. বলেছেন, ফারায়েজ নির্ধারিত অংশীদারকে দিয়ে দাও। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ দাও মৃতের নিকটতম পুরুষদেরকে। এ কথাও মানতে হবে যে, নাতির চেয়ে দাদা অধিকতর শক্তিশালী। কারণ নাতির অস্তিত্ব এসেছে দাদা থেকেই। ভাইদের এরকম বংশগত নৈকট্য নেই।

দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, দাদা ও ভাইবোনদের নৈকট্য ভিন্ন রকমের। ভাইয়ের কারণে দাদাকে বঞ্চিত করার কথা কেউ বলেননি। কারণ দাদা ভাইবোনদের চেয়ে নিকটতম। কিন্তু দাদার কারণে ভাইবোনদেরকে বঞ্চিত করা যায়। কারণ তারা দাদার চেয়ে কম নিকটের।

শায়েখ ইবনে হাজার এ ব্যাপারে আপত্তি তুলে বলেছিলেন, ইবনে হাজম কতিপয় ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ভাইবোনেরাই দাদার তুলনায় অগ্রগণ্য। তাহলে দাদা বঞ্চিত না হওয়ার ব্যাপারটিতে ঐকমত্য আর রইল কোথায়?

আমরা বলি যে, ঐ ব্যক্তিরাতো দুনিয়া থেকে চলেই গিয়েছেন। এখন তাদের অনুসারী কেউ নেই। সুতরাং বলা যায় উম্মতের এজমা এ কথার উপর হয়ে গিয়েছে যে, ভাইবোন বঞ্চিত হবে অথবা হবে বণ্টনকারী। কাজেই ঐকমত্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত।

হজরত জায়েদ বিন ছাবেতের নিকট সহোদর অথবা বৈপিত্রেয় ভাইবোন দাদার সাথে যদি থাকে তবে দাদার জন্য সমস্ত মালের এক তৃতীয়াংশ বন্টন করা যাবে। যা দাদার জন্য উত্তম হবে তা তাকে দিতে হবে, তবে শর্ত হলো কোনো ফরজ অংশীদার যেনো না থাকে। বন্টন করার ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে - বন্টন করার সময় দাদাকে এক ভাইয়ের মত মেনে নিতে হবে এবং যতটুকু এক ভাইয়ের অংশ হয় ততটুকু দাদাকেও দিতে হবে। ওই সময় দাদার অংশ কম করার জন্য বৈপিত্রেয়, সহোদর ভাইবোনেরা সাথে শরীক হয়ে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিবে,

www.eelm.weebly.com

যেনো দাদার অংশ পরিমানে এক ভাইয়ের চেয়ে কম হয়ে যায় এবং দাদা যখন আপন অংশ পাবেন তখন বৈপিত্রেয়রা বন্টন থেকে বাদ পড়ে যাবে, শুধু সহোদর ভাইবোন অংশীদার হবে, বৈপিত্রেয়রা পাবে না। কিন্তু যদি এক বোন ব্যতীত অন্য কোন সহোদর ভাইবোন না হয় এবং দাদার সাথে বৈপিত্রেয় ভাইবোন উপস্থিত থাকে তখন দাদার অংশ এবং সহোদর বোনের অংশ (অর্থাৎ সমস্ত মালের অর্ধেক) দেয়ার পর যা কিছু বাকি থাকবে, বৈপিত্রেয়দেরকে দুই এবং এক গুণ হিসাব করে দিতে হবে। আর যদি বাকি না থাকে তবে কিছুই দিতে হবে না। যেমন - দাদা, এক সহোদর বোন এবং দুই বৈপিত্রেয় বোন—এ অবস্থায় দাদাকে এক ভাইয়ের মতো মনে করতে হবে এবং এক ভাই দুই বোনের সমান হয়, যেন পাঁচ বোন হয়ে গিয়েছে। আসল মাসয়ালা দশ দিয়ে হবে, দাদা যেহেতু দুই বোনের স্থানে এজন্য তাকে চার এবং সহোদর বোনকে সমস্ত সম্পদের অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচ দেয়ার পর এক বাকি রইল, যা দুই বৈপিত্রেয় বোনের হবে। কিন্তু এক দুই জনের উপর বন্টন করা সহীহ্ নয়। এজন্য মাসয়ালা বিশুদ্ধকরনের জন্য বিশ (২০) দিয়ে করতে হবে। আট (৮) দাদাকে, দশ(১০) সহোদর বোনকে এবং দুই(২) বৈপিত্রেয় বোন পাবে। কিন্তু যদি এ মাসয়ালায় দুই আল্লাতী বোন না হয় (বৈপিত্রেয় বোনকে আল্লাতী বোন বলে) শুধু এক আল্লাতী বোন যদি হয় তখন মীরাস চার বোনের হবে। দাদা দুই বোনের স্থানে হবে। এজন্য দশ(১০) ভাগ তার জন্য হবে এবং সহোদর বোন দশ(১০) ভাগ পাবে, আল্লাতী কোনোকিছুই পাবে না।

যদি দাদা এবং ভাইবোনদের সাথে অন্য কোনো অকাট্য ফরজ উত্তরাধিকারী থাকে তখন দাদাকে সমস্ত মালের এক ষষ্ঠাংশ অথবা ফরজ অংশ দেয়ার পর বাকি মালের এক ষষ্ঠাংশ অথবা বন্টনকৃত অংশ তিনজনের মধ্যে যা উত্তম, তাকে দিতে হবে। যেমন, দাদা-দাদী, কন্যা এবং দুই ভাই থাকলে আসল মাসয়ালার বন্টন ছয় দ্বারা হবে। তিন কন্যাকে এক, দাদীকে এক, দাদাকে এক এবং এক দুই ভাইকে দিতে হবে। এই মাসআলায় দাদাকে সমস্ত মালের ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ এক দেয়াই ভাল কেননা বন্টনের প্রেক্ষিতে সে তিন ভাই হয়ে গিয়েছে এবং দুই অংশকে তিন ভাইয়ের মধ্যে বন্টন করায় এক এক অংশের মধ্যে এক অংশের তিন ভাগের দুই অংশ এসে যায়, পুরো অংশ আসে না এবং বাকি মালের ষষ্ঠাংশের কম হয়ে যায়।

এভাবে বন্টন করলে ব্যাপারটি এরকম দাঁড়ায় যে, ফরজ অংশ দেয়ার পর কিছুই বাকি থাকে না। নিরুপায় হয়ে মাসআলায় আওল করতে হবে (আওল হলো মীরাসের অংশ নিরুপণকারী সংখ্যা বর্ধিতকরণ)। অর্থাৎ সংখ্যা বৃদ্ধি করে দাদাকে ষষ্ঠাংশ দিতে হবে। যেমন — যদি দুই কন্যা, মা, স্বামী এবং দাদা (তখন কন্যাদেরকে দুই তৃতীয়াংশ, স্বামী চার এবং মা ষষ্ঠাংশ পাবে। কিন্তু কম করার

www.eelm.weebly.com

অনুমতি নেই। কাজেই বাধ্য হয়ে বারোকে পনের এর দিকে আওল করতে হবে) এবং পনের এর বন্টন এভাবে করতে হবে — কন্যাগণ আট, স্বামী তিন, মা দুই এবং দাদা দুই।

কখনো জাবিল ফুরুজুকে (কোরআন হাদিসে যাদের অংশ নির্ধারিত তারা হলেন জাবিল ফুরুজ) দেয়ার পর কিছু বাকি থাকে; কিন্তু এক ষষ্ঠাংশ থেকে কম যেমন — যদি দুই কন্যা এবং স্বামী — এ অবস্থায় আসল তাসীহ্ বারো দ্বারা হবে। কন্যাগণ আট এবং স্বামীকে তিন দেয়ার পর এক অবশিষ্ট থাকে যা বার ভাগের এক ভাগ হবে, ছয় ভাগের এক ভাগ হবে না। কাজেই আওল করে তের দিয়ে তাসীহ্ বর্ধিত করে বিশুদ্ধ করতে হবে এবং দাদাকে দুই অংশ দিতে হবে। কোনো সময় ষষ্ঠাংশ বাকি থাকে। যেমন — যদি দুই কন্যা এবং মা এবং দাদা বর্তমান থাকে তখন(তাসীহ্ এর আভিধানিক অর্থ বিশুদ্ধকরণ। আর পারিভাষিক অর্থ যখন অংশীদারের অংশ সমূহে ভগ্নাংশ হয় তখন যথাসম্ভব অপেক্ষাকৃত ছোট সংখ্যা দ্বারা এমনভাবে অংশ বের করতে হবে যেনো সকল অংশীদারের মধ্যে শরিয়তের নির্ধারিত অংশ ভগ্নাংশ ব্যতিরেকে বন্টিত হয়ে যায়) তাসীহ্ ছয় দ্বারা করে কন্যাদেরকে চার, মাকে এক এবং দাদাকে এক দিবে। তিন অবস্থাতেই ভাই থাকলে বঞ্চিত থাকবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, দাদার জন্য সম্পদের ষষ্ঠাংশ দিবে (অথবা বন্টন করে অংশ দেয়ার চেয়ে অবশিষ্ট মালের ষষ্ঠাংশ বেশী উপকারী হবে) যদি দাদা, দাদী, দুই ভাই ও এক বোন থাকে, তবে আসল তাসীহ্ ছয় দিয়ে হবে। ছয় অংশ দাদীকে দেয়ার পর পাঁচ থাকবে এবং পাঁচের তৃতীয়াংশ ভগ্নাংশ ব্যতীত বের করা যায় না। কাজেই তিন বের করতে আসল তাসীহ্ ছয়ের মধ্যে ধাক্কা দিতে হবে অর্থাৎ তিনের আসল তাসীহ্ ছয় এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে আঠারো হয়ে যাবে। আঠারো হতে তিন দাদীকে দেয়ার পর বাকি পনেরো এর এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ পাঁচ দাদাকে, প্রত্যেক ভাইকে চার এবং বোনকে দুই দিয়ে দেবে। যদি দাদাকে সমস্ত সম্পদের ছয় দেয়া হয়, তবে আসল মাসআলা ছয় দ্বারা হবে। এক দাদাকে দেবে এবং এই এক পনেরো এর এক তৃতীয়াংশ পাঁচ থেকে বেশী এবং বন্টন থেকেও দাদার এই পাঁচ অতিরিক্ত হবে। কেননা যখন দাদাকে এক ভাইয়ের স্থানে মেনে নেয়া হয়, তখন তিন ভাই এবং এক বোন এবং এক দাদী অংশীদার হবে এবং দাদার অংশ এক ভাইয়ের সমান হবে, অর্থাৎ এক সমস্ত সাত ভাগের তিন। আর যদি দাদীর অংশ আদায় করার পর বাকি মালের এক তৃতীয়াংশ দাদাকে দেয়া হয়, তবে এক সমস্ত তিন ভাগের দুই হবে এবং প্রকাশ থাকে যে, এক সমস্ত তিন ভাগের দুই বেশী হবে এক সমস্ত সাত ভাগের তিন থেকে।

www.eelm.weebly.com

আকদারীয়ার মাসআলা ঃ হজরত জায়েদ বিন ছাবেতের নিকট দাদার বর্তমানে সহোদর অথবা বৈপিত্রেয় বোন অংশীদার নয়। শুধু নিচের ধারণাটি পৃথক। এর মধ্যে বোন অংশীদার। মাসআলা এই যে, স্বামী, মা, দাদা, বোন (আসল মাসআলা ছয় দিয়ে হবে)। স্বামীকে অর্ধেক, মাকে এক তৃতীয়াংশ, দাদাকে ষষ্ঠাংশ। ছয় পূর্ণ হয়ে গেল। বোনের জন্য কিছুই রইল না। কিন্তু হজরত জায়েদ বোনকে অংশীদার করা জরুরী মনে করেন এবং এক বোনের জন্য সম্পত্তির অর্ধেক হওয়া দরকার। (আওল শব্দের আভিধানিক অর্থ উঁচু করে দেয়া কোন এক দিকে ঝুঁকে পড়া। পারিভাষিক অর্থ অংশ নির্ণয়ের সংখ্যাটি যদি অংশ প্রদানের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ হয়ে যায়,তখন অংশ নির্ণয়ের সংখ্যাটিকে অংশ থেকে কিছুটা বাড়িয়ে দেয়ার নামই আওল)। তখন আওল করে ছয়কে নয় করে দেয়া যায়। অতঃপর দাদার জন্য এক এবং বোনের জন্য তিন হবে। এভাবে দাদার অংশ বোন থেকে কম হয়ে যায়। এজন্য দাদার অংশ বোনের অংশের সাথে দিতে হবে এবং একত্রে চার হয়ে যাবে এবং দাদা যেহেতু ভাইয়ের স্থানে এবং ভাইয়ের অংশ দুই বোনের সমান, এজন্য দাদা দুই বোনের পর্যায়ে হয়ে গিয়েছে এবং মাসআলায় তিন বোন হয়ে গেলো, যাদেরকে চার অংশ দিতে হবে এবং গণনার সংখ্যা অর্থাৎ তিন অংশ অর্থাৎ চার এর মধ্যে পৃথক পৃথক হয় এজন্য তিন আওলের সংখ্যায় অর্থাৎ নয় এর মধ্যে যদি প্রবেশ করানো যায়,তবে তিন নয় সাতাশ হয়ে যাবে। তখন এবং সাতাশকে তাসীহ্ এর মাসআলায়, স্বামীকে নয়, মাকে ছয়, দাদাকে আট এবং বোনকে চার দিতে হবে। কিন্তু যখন এক বোনের পরিবর্তে এক ভাই অথবা দুই বোন হয় তখন না আওল হবে না মাসআলায়ে আকদারীয়া থাকবে। আসল তাসীহ্ ছয় দ্বারা হবে। স্বামী তিন, মা দুই, দাদা এক, ভাই আসাবা হবে। কিন্তু এখানে কিছু অবশিষ্ট না থাকার কারণে বঞ্চিত হবে। আর যদি ভাইয়ের স্থলে দুই বোন হয়, তখন মায়ের অংশ এক তৃতীয়াংশ হবে না। বরং ছয় হবে। স্বামী তিন, মা এক, দাদা এক, দুই বোনকে এক। কেননা এক এর বন্টন দুইয়ের উপর টুকরা ব্যতীত হতে পারে না। এজন্য দুইকে আসল সংখ্যা অর্থাৎ ছয় এর তাসীহ্ অর্থাৎ ছয় দ্বারা করবে এবং মূলতঃ হবে বারো। এখন বন্টন এরূপে হবে যে, স্বামী ছয়, মাতা দুই, দাদা এক, বোন দুই, দ্বিতীয় বোন দুই। বনী আকাদার গোত্রের এক মহিলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘটনাকে মাসআলায়ে আকদারীয়া বলা হয়।

জ্ঞাতব্য ঃ দাদা, বোন অথবা ভাই এর বন্টনপদ্ধতি সম্পর্কে সাহাবীগণের মতবিরোধ রয়েছে। বায়হাকী লিখেছেন, হাজ্জাজ, শা'বীর নিকট জিজ্ঞেস করলেন — এক মা, এক বোন এবং এক দাদার মধ্যে কীভাবে সম্পত্তি বন্টন করতে হবে। শা'বী বললেন, এ সম্পর্কে পাঁচজন সাহাবার ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। হজরত

www.eelm.weebly.com

ওসমান বলেছেন, এমতো ক্ষেত্রে আমি সমস্ত সম্পত্তিকে তিনভাগ করে প্রত্যেককে একভাগ করে দিয়ে দেবো। হজরত আলী বলেছেন, আমি ভাগ করবো এভাবে - সমস্ত সম্পত্তিকে ছয় অংশে ভাগ করে তিন অংশ বোনদেরকে, দুই অংশ মাকে এবং এক অংশ দাদাকে দেবো। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমিও ছয় ভাগ করবো এভাবে- বোন তিন, দাদা দুই এবং মা এক। হজরত জায়েদ বিন সাবেত বলেছেন, আমি সমস্ত সম্পত্তিকে নয় ভাগে ভাগ করবো। বোনকে তিন, দাদাকে চার এবং মাকে দুই অংশ দেবো। এ বিষয়ে হাজ্জাজ শা'বীর নিকট হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমত জানতে চাননি। শা'বীও বর্ণনা করেননি। বায়হাকী ইব্রাহিম নাখয়ীর সূত্রে বর্ণনা করেন, হজরত ওমর এবং হরজত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ ভাইকে দাদার উপর অগ্রাধিকার দেননি। কিন্তু ইবনে হাজম তাঁর নিজস্ব বর্ণনা পদ্ধতিতে বলেছেন, হজরত ওমর বোনকে অর্ধেক , মাকে এক ষষ্ঠাংশ এবং দাদাকে অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ দিতেন। তিনি ভাইকে গুরুত্ব দেননি, কিন্তু বোনকে দাদার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এমতো ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মাসআলা নস্ (কোরআন ও হাদিস) এবং কিয়াসের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

<u>মাসআলা</u> ঃ ইমাম আবু হানিফার নিকট প্রকৃত দাদী তিনি, যিনি মৃত ব্যক্তির আত্মীয়া হয়েছেন কোনো অপ্রকৃত দাদার কারণে নয়। তিনি বলেছেন, সকল প্রকৃত দাদী-ই ওয়ারিশ। তবে তাদেরকে সমস্তরের হতে হবে এবং প্রকৃতই দাদী হতে হবে। ইমাম মালেক এবং দাউদ জাহেরীর অভিমত এই যে, শুধু দুই দাদী ওয়ারিশ হবে পিতার মা, দাদীর মা, তার মা এবং তার মা অর্থাৎ দাদীর উপর স্তরের সমস্ত দাদীগণ এবং নানী, নানীর মা, তার মা — এভাবে উপরের স্তরের সমস্ত নিকটতম নানী দূরবর্তীদেরকে অধিকারবঞ্চিত করবে। ইমাম শাফেয়ীর একটি মতও এরকম। তাঁর দ্বিতীয় মতটি ইমাম আহমদের অভিমতের অনুরূপ। অভিমতটি এই, পিতা ও মাতার উপরের স্তরের তিন মহিলা ওয়ারিশ হবে — নানী, দাদী এবং দাদার মা। ঐকমত্য এই যে, গুণগত দিক থেকে এক বা একাধিক দাদী সকল অবস্থায় এক ষষ্ঠাংশ পাবে। মৃত ব্যক্তির দাদী যদি এক বংশের হয় — যেমন, দাদীর মা। অথবা অন্য বংশের হয় — যেমন, মায়ের নানী এবং দাদার মা। এমতাবস্থায় প্রথম ও দ্বিতীয় বংশের মধ্যে বিভেদ নেই। ইমাম ইউসুফ একথা বলেছেন। এখানে উভয়কে এক ষষ্ঠাংশ সমভাবে বন্টন করে দিতে হবে। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, আত্মীয়দের গুরুত্ব বিবেচনা করতে হবে। এভাবে প্রথম পর্যায়ের যারা, তাদেরকে প্রথম অংশ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের যারা তাদেরকে দ্বিতীয় অংশ দিতে হবে।

www.eelm.weebly.com

দাদীদের বন্টন সম্পর্কিত ঘটনা কুবাইসার বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, এক দাদী তার মীরাসের দাবী নিয়ে হজরত আবু বকরের খেদমতে হাজির হলেন। হজরত আবু বকর বললেন, আল্লাহর কিতাবে আপনার কোনো অংশ নেই। রসুল স. এর সুন্নতেও নেই। আপনি চলে যান। দেখি আমি এ বিষয়ে মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। বৃদ্ধার সাথে অঙ্গীকার অনুযায়ী হজরত আবু বকর এ ব্যাপারে বিভিন্নজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। প্রশ্ন শুনে হজরত মুগিরা বিন শোবা বললেন, আমি জানি এক দাদী উত্তরাধিকারের দাবী নিয়ে রসুল স. এর দরবারে এসেছিলেন। রসুল স. তাঁকে এক ষষ্ঠাংশ দিয়েছিলেন। আবু বকর বললেন, ওই সময় তোমার সঙ্গে আর কে ছিলেন? মুগীরা বললেন, মোহাম্মদ বিন মোসলেমা ছিলেন। তিনি (হজরত আবু বকর) মোহাম্মদ বিন মোসলেমাকে ডাকলেন। তিনিও একই কথা বললেন। তখন হজরত আবু বকর ওই মহিলার জন্যও একই হুকুম জারী করলেন।

আর একটি ঘটনা। হজরত ওমরের নিকট এক দাদী দাবী করলেন তাঁর উত্তরাধিকার। হজরত ওমর বললেন, ওই এক ষষ্ঠাংশ হবে আপনাদের দুজনের। দুজনকে সমান সমান দেয়া হবে। আর যদি আপনি একা হন তবে পুরো এক ষষ্ঠাংশ হবে আপনারই। মালেক, আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, দারেমী ও ইবনে মাজা। ইবনে ওহাব বর্ণনা করেন, যে দাদীকে রসুল স. অংশ দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন মৃতের নানী। হজরত আবু বকরের নিকট যিনি এসেছিলেন, তিনিও ছিলেন নানী। আর যে মহিলা হজরত ওমরের কাছে এসেছিলেন, তিনি ছিলেন পিতার মা অর্থাৎ দাদী। হজরত ওমর তাঁর অংশ সম্পর্কে মাসআলা অন্বেষণ করলেন। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলো না। হঠাৎ বনু হারেসার এক ছেলে বললো, আমীরুল মোমেনীন, আপনি ওই মহিলার অংশ দিচ্ছেন না কেন? এই মহিলা মরে গেলে মীরাস পেতো এই মৃত, কেননা তার পৌত্র আছে, ছেলে নেই - এ কথা শুনে হজরত ওমর ওই মহিলার অংশ দিয়ে দিলেন।

মুয়াত্তা ও বায়হাকীতে রয়েছে, নানী ও দাদী (দুই দাদী) মিরাস নিতে এলেন হজরত আবু বকরের কাছে। তিনি এক ষষ্ঠাংশ দিতে চাইলেন নানীকে। এক আনসারী বললেন, আপনি এমন মহিলাকে ওয়ারিশ করছেন না কেন, যিনি মরে গেলে এবং এই মৃত জীবিত হলে তাঁর ওয়ারিশ হবেন। এ কথা শুনে হজরত আবু বকর এক ষষ্ঠাংশ দাদী ও নানীকে সমান অংশে ভাগ করে দিলেন। এই পদ্ধতিটি দারা কুতনী ইবনে আইনিয়ার নিয়মে বর্ণনা করেছেন এবং এ কথাও লিখেছেন যে, আনসারী সাহাবী ছিলেন হজরত আবদুর রহমান বিন সহল বিন হারেসা ।

ফকীহগণ বলেছেন, নানী মায়ের স্থলবর্তী। তাই মায়ের মতো এক ষষ্ঠাংশ দেয়া হয়েছিলো এবং দাদী নানীর তুল্য ধরে নিয়ে তাকে অংশী বানানো

www.eelm.weebly.com

হয়েছিলো। আর তিনি ছিলেন পিতার মা। নতুবা দাদী মায়ের স্থলবর্তী হন না। মায়ের কারণে ওই মৃতের বংশও তিনি নন। এবং তিনি পিতার স্থলবর্তীও নন। পিতার বংশ তো পৃথক বংশ। ইমাম আবু হানিফার দলিল এই যে, রসুল স. তিন দাদীকে একত্রে এক ষষ্ঠাংশ দিয়েছিলেন। দুজন ছিলেন মায়ের দিক থেকে। আর একজন ছিলেন পিতার দিক থেকে। দারাকুতনী এই হাদিসকে মুরসাল সা'দ সহ বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ মুরসাল হিসাবে অন্য সনদে ইব্রাহিম নাখয়ী থেকে উদ্ধৃত করেছেন। দারা কুতনী ও বায়হাকী মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন হাসান বসরী থেকে। বায়হাকী বলেছেন, মোহাম্মদ বিন নছর এ ব্যাপারে সাহাবী এবং তাবেয়ীনের ঐকমত্যের কথা বলেছেন। কিন্তু সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস একে স্বীকার করেননি। কিন্তু সা'দের এই অস্বীকৃতি সম্পর্কে কোনো বিশুদ্ধ সনদ নেই।

মাসআলা ঃ মা সকল দাদীকে (পিতার দিক থেকে হোক কিংবা মাতার দিক থেকে) অধিকার বঞ্চিত করে দেন। কেননা হজরত আবু বোরায়দার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. দাদীর জন্য সমস্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন যদি মা না থাকে। আবু দাউদ, নাসাঈ। এই হাদিসের এক বর্ণনাকারীর নাম ওবায়দুল্লাহ আতাকী। তাঁর সম্পর্কে আলেমগণের রয়েছে মতানৈক্য। আবার ইবনে সাকান এই হাদিসকে সহীহ্ বলেছেন।

পিতা তাঁর সকল দাদীর অধিকার লাভের প্রতিবন্ধক। এ সম্পর্কে ইমাম আহমদের দুটি বক্তব্য রয়েছে। একটি বক্তব্য অস্বীকৃতিমূলক। অন্যটি সমর্থনসূচক। অস্বীকৃতিসূচক বক্তব্যের অনুকূলে তিনি হজরত ইবনে মাসউদের এই বর্ণনাটি পেশ করেছেন যে, রসুল স. মৃতের পিতার জীবিত দাদীর জন্য এক ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছিলেন। তিরমিজি, দারেমী।

আমরা বলি, তিরমিজি বলেছেন, এই হাদিসটি দুর্বল। জমহুরের বক্তব্যের প্রমাণ রয়েছে এই ব্যাখ্যাটিতে যাতে বলা হয়েছে, নিকটতম আত্মীয়রা দূরবর্তীদের প্রতিবন্ধক।

এরকম বন্টনপদ্ধতি সম্পর্কে আয়াতে বলা হয়েছে, বন্টন করতে হবে মৃতের অছিয়ত পূর্ণ করার পর। অর্থাৎ মায়ের এক ষষ্ঠাংশ দেয়ার পর। এই আয়াতের শুরু থেকে বন্টনের যে নিয়ম সমূহ বলা হয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ করার পর শেষ বন্টন পদ্ধতিটি কার্যকর বলে বিবেচিত হবে। ধারাবাহিকভাবে এর বিবরণ হচ্ছে, ছেলের জন্য দুই অংশ এবং মেয়ের জন্য এক অংশ। ছেলে না থাকলে শুধু দুই মেয়ের জন্য দুই তৃতীয়াংশ। এক মেয়ের জন্য অর্ধাংশ এবং পিতামাতার প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। আর পিতা না থাকলে শুধু মায়ের জন্য এক তৃতীয়াংশ।

অছিয়ত তো পূর্ণ করতে হবেই, ঋণ থাকলে বন্টনের পূর্বে পরিশোধ করতে হবে। সকল বন্টন শুরু হবে অছিয়ত পূর্ণ করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার

www.eelm.weebly.com

পর। আয়াতে অছিয়তকে উল্লেখ করা হয়েছে ঋণের পূর্বে। আহলে সুন্নতের অভিমত, ঋণ ক্ষমাপ্রাপ্তির (মাগফেরাতের) প্রতিবন্ধক। কেউ আকস্মিক মৃত্যুবরণ করতে পারে। তাই অছিয়তকে আগে এবং ঋণকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত কাতাদা বলেছেন, এক ব্যক্তি রসুল স. এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে রসুল! আমি পুণ্য লাভের ইচ্ছা নিয়ে আল্লাহর পথে ধৈর্য্যের সঙ্গে যদি কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত হই, যুদ্ধে কিছুতেই যদি পশ্চাদপসরণ না করি, তবে কি আল্লাহ আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন? তিনি স. বললেন, হাঁ যদি তোমার ঋণ না থাকে। ঋণ ব্যতীত শহীদদের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করা হবে। মুসলিম। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন, শহীদদের অন্য সকল পাপ ক্ষমা করা হবে। মুসলিম।

মাসআলা ঃ আলেমদের ঐকমত্য এই যে, প্রথমে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর পরিশোধ করতে হবে ঋণ। তারপর তার মোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে পূর্ণ করতে হবে অছিয়ত। এরপর অবশিষ্ট সম্পত্তি বন্টন করতে হবে ওয়ারিশদের মধ্যে। হজরত আলী বলেছেন, তোমরা তো এই আয়াত পাঠ করছোই। রসুল স. কিন্তু অছিয়ত পূর্ণ করার আগেই ঋণ পরিশোধ করতে বলেছেন। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

জ্ঞাতব্য ঃ এই তাফসীরকার বলেছেন, কাফন দাফনের আগেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু এখানে আরো একটি ব্যাপার প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ফারায়েজের আলেমগণ বলেছেন, ঋণ পরিশোধ করতে হবে কাফন দাফনের আগেই। যেমন — জায়েদ দুই শত দেরহাম দিয়ে একটি ঘোড়া কিনলো কিন্তু মূল্য পরিশোধ না করতেই হঠাৎ মারা গেলো। এমতাবস্থায় ঘোড়াবিক্রেতা তার ঘোড়াটি ফেরত নিয়ে যাবে। কাফন দাফনের আগেই এ কাজটি হতে হবে। এ ধরনের ঋণ পরিশোধ হতে হবে কাফন দাফনের আগেই। অন্য ধরনের ঋণ পরিশোধ করতে হবে কাফন দাফনের পর। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মাসআলা ঃ অছিয়ত কার্যকর হবে এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির উপর। এ ব্যাপারে আলেমগণের ঐকমত্য রয়েছে। হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লাম। মনে হলো আর বাঁচবো না। রসুল স. আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমার অনেক সম্পদ। আমার তো এক কন্যা ব্যতীত আর কেউ নেই। আমি কি আমার সমস্ত সম্পত্তি অছিয়ত করতে পারি? তিনি স. বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি দুই তৃতীয়াংশ অছিয়ত করবো? তিনি স. বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক? তিনি স. বললেন, তাও না। বললাম, তবে কি এক তৃতীয়াংশ? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ তা করতে পারো। তবে সন্তানকে যদি সম্পত্তির অধিকারী করে যাও তবে তাই হবে উত্তম। তাদেরকে নিঃস্ব কোর না। আল্লাহর সন্তোষ্টির

www.eelm.weebly.com

জন্য তুমি যা ব্যয় করবে তার সওয়াব তো অবশ্যই পাবে, কিন্তু মনে রেখো স্ত্রীর মুখে যে আহার তুলে দিবে তার জন্যও রয়েছে সওয়াব। বোখারী, মুসলিম।

তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এরকম, রসুল স. বলেন, এক দশমাংশ অছিয়ত করতে পারো। আবার অছিয়তের অনুমতির জন্য বার বার নিবেদন করাতে তিনি স. বলেছিলেন, মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ অছিয়ত করতে পারো। আর এক তৃতীয়াংশই অনেক।

হজরত মুআজ মারফু পদ্ধতিতে বর্ণনা করেন, মৃত্যুকালে এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি অছিয়ত করার ব্যাপারে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। এভাবে তিনি তোমাদের সম্পদকে পবিত্র করেছেন। তিবরানী এই হাদিসকে উত্তম সনদ সহ বিবৃত করেছেন। মারফু সূত্রে আবু দা র দঃ থেকে উল্লেখ করেছেন তিবরানী ও আহমদ। ইবনে মাজা, বায্যার এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। আর উকাইলী বর্ণনা করেছেন হজরত আবু বকর থেকে।

এই আয়াতের শেষে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন, তোমাদের পিতামাতা,না সন্তান সন্তুতি,কে যে বেশী উপকারী হবে তা তোমরা জানো না। অর্থাৎ তোমরা একথা অবগত নও যে, দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের উপকার লাভ হবে কোন বংশধারা দ্বারা। মূলগত না শাখাগত — কোন ধারার মাধ্যমে।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের সময় মানুষেরা তাদের পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের অবস্থা জানতে চাইবে। তখন তাদেরকে বলা হবে,তারা তোমার অবস্থায় উন্নীত হতে পারেনি (এ কারণেই তারা এ স্থানে নেই)। বেহেশ্‌তবাসী তখন নিবেদন করবে, হে আমার প্রভু প্রতিপালক। আমি তো আমার আমলের সাথে সাথে তাদের জন্যও আমল করেছি। তার এই নিবেদনের প্রেক্ষিতে নির্দেশ হবে, তার নিকটতমদেরকে তার সঙ্গী করে দাও। কবীর পুস্তকে তিবরানী এই বর্ণনাটি করেছেন। ইবনে মারদুবিয়াও তাঁর তাফসীরে এরকম লিখেছেন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আনুগত্যশীল ব্যক্তিরাই কিয়ামতের দিন সর্বোচ্চ মর্যাদাধারী হবে। আর আল্লাহ্ এক মুমিনের জন্য অন্য মুমিনের সুপারিশ কবুল করবেন। পিতা জান্নাতের উচ্চস্তর লাভ করলে পুত্রকেও সেখানে পৌঁছানো হবে। সন্তান উচ্চস্তরের অধিকারী হলে পিতাকেও দেয়া হবে উচ্চস্তরের অধিকার, যেনো তাদের চক্ষু শীতল হয়। কাজেই এ কথা কেউ জানে না যে, ওয়ারিশদের মধ্যে কে অধিক উপকারী। তাই সম্পদ বন্টনের নিয়ম তাদের অভিমতানুসারে করা হয়নি। মানুষ যদি জানতো, তবে অধিক উপকারীর দিকেই ঝুঁকে পড়তো। তাই ওয়ারিশদেরকে নিজ অভিমতানুসারে গুরুত্ব দেয়া অনুচিত।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. বলেছেন, ওয়ারিশদের মতের বাইরে কোনো বিশেষ ওয়ারিশদেরকে অছিয়ত করা বৈধ নয়। দারা কুতনী এই হাদিস বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস থেকে। মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, আতা খোরাসানী থেকে এবং ইউনুস, আতা থেকে, তিনি ইকরামা থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস থেকে। দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন আমর বিন শোয়াইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে।

হজরত আবু উমামা থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু উমামা বলেছেন, আমি রসুল স. এর বিদায় হজ্জের ভাষণে শুনেছি, তিনি স. বলেছেন, আল্লাহ্ প্রত্যেক হকদারকে তার হক দান করেছেন। কাজেই কোনো বিশেষ ওয়ারিশকে অছিয়ত করা যাবে না। অর্থ এই যে, ওয়ারিশদের মধ্যে তোমাদের জন্য কে বেশী উপকারী তা তোমরা জানো না। তাই বিশেষ কোনো ওয়ারিশকে অছিয়ত করে যেও না। বরং আল্লাহর বিধানের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হও।

বিধান আল্লাহতায়ালার। সম্পত্তি বন্টন বিষয়ক বিধান সমূহও আল্লাহ তায়ালার। তিনি সর্বজ্ঞ। কিসে কল্যাণ তা তিনি সম্যক অবগত। তাই পরম প্রজ্ঞাধিকারী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর বিধান নির্বিবাদে মান্য করো।

সূরা নিসা ঃ আয়াত ১২

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ○

www.eelm.weebly.com

❑ তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাহাদের কোনো সন্তান না থাকে, এবং তাহাদের সন্তান থাকিলে তোমাদের জন্য তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ। ইহা তাহারা যাহা অসিয়ৎ করে তাহা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ; এই সব তোমরা যাহা অসিয়ৎ করিবে তাহা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি কোন পুরুষ অথবা নারী পিতামাতাহীন অবস্থায় কাহাকেও উত্তরাধিকারী করে এবং তাহার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা ভগ্নী থাকে তবে প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। তাহারা ইহার অধিক হইলে সকলে অংশীদার হইবে এক তৃতীয়াংশের; ইহা যাহা অসিয়ৎ করা হয় তাহা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি ইহা কাহারো জন্য হানিকর না হয়। ইহা আল্লাহের নির্দেশ, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

নিঃসন্তান স্ত্রী মারা গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে স্বামী। স্ত্রী সন্তান রেখে মারা গেলে স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ। তবে প্রথমে পূর্ণ করতে হবে অছিয়ত এবং পরিশোধ করতে হবে ঋণ।

স্বামী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তার স্ত্রী পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ। স্ত্রী একাধিক হলেও সকলে মিলে এই এক চতুর্থাংশই পাবে। সন্তান থাকলে এক স্ত্রী অথবা একাধিক স্ত্রী সম্মিলিতভাবে পাবে এক অষ্টমাংশ। কিন্তু প্রথমেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে অছিয়ত পূর্ণ করতে হবে। তারপর সমস্ত সম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তারপর বণ্টন কার্যকর হবে।

তালাকে রেজয়ী অবস্থায় থাকা স্ত্রীও অংশ পাবে। কিন্তু বায়েন তালাকের ইদ্দতে থাকলে পাবে না। মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তালাকে রেজয়ী দিলেও স্ত্রী অংশ পাবে। এটা ঐকমত্য। অবশ্য এই মাসআলাটির একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা হওয়া আবশ্যক। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এ ধরনের মহিলা স্বামীর মৃত্যুকালে ইদ্দত পালনরত থাকলে অংশ পাবে। ইমাম আহমদ বলেছেন, ইদ্দত পালনের সময় শেষ হয়ে গেলেও অংশ পাবে যদি সে নতুন কোনো বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হয়। ইমাম মালেক বলেছেন, স্বামীর মৃত্যুর আগে ইদ্দত পালন শেষ করে অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে বসলেও ওয়ারিশ হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ীর তিন ধরণের বক্তব্য জানা যায়। এক এক বক্তব্য এক এক রকমের। মৃত্যুরোগে আক্রান্ত স্বামী তালাকে বায়েন দিলে তবুও স্ত্রী তার মীরাস পাবে। এই মত পোষণ করেন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ। তবে ইমাম আবু হানিফার শর্ত হচ্ছে মহিলা যেনো নিজে তালাক না চায়। নিজে তালাক চাইলে বুঝা গেলো সে তার হক বিনষ্ট করতে রাজী (তাই অংশ পাবে না।)। ইমাম শাফেয়ীর শক্তিশালী বক্তব্য এই যে, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ওয়ারিশ হবে না।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আহমদ মুয়াম্মার থেকে লিখেছেন, ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে গায়লান বিন সালমার দশটি স্ত্রী ছিলো। রসুল স. বললেন, মনমতো চারজনকে রেখে বাকিদেরকে ছেড়ে দাও। হজরত ওমরের খেলাফতের সময় গায়লান সকল স্ত্রীকে রেজয়ী তালাক দিয়ে তাঁর সমস্ত সম্পদ ছেলেদেরকে বন্টন করে দিলেন। এই সংবাদ পেয়ে হজরত ওমর বললেন, আমার ধারণা, যে শয়তান ফেরেশ্‌তাদের কথা চুরি করে শোনে, সেই শয়তানই তোমার মৃত্যুর কথা শুনে নিয়ে তোমার অন্তরে ঢেলে দিয়ে বলেছে, তুমি আর বেশী দিন বাঁচবে না। আল্লাহর কসম! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে ফেরত না নিলে আর ছেলেদের কাছ থেকে সম্পত্তি ফেরৎ নিয়ে না এলে আমি তোমার স্ত্রীদেরকে ওয়ারিশ বানিয়ে দিবো। হুকুম দিবো, আবু রেগালকে মাটিতে পুঁতে যেভাবে পাথর মারা হয়েছিলো তোমাকেও যেনো তেমনি করে প্রস্তর নিক্ষেপ (সঙ্গেসার) করা হয়। (আবু রেগাল ছিলো, মূর্খতার যুগের এক ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক)। এই হাদিসটি জমহুরের ওই অভিমতটিকে ভিত্তি দিয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, রেজয়ী তালাকের ইদ্দত পালনরতারাও ওয়ারিশ। আর তালাকে বায়েনের ইদ্দতপালনরতাদের ওয়ারিশ হওয়ার প্রমাণ রয়েছে এই ঘটনাটিতে - হজরত আবুদর রহমান বিন আউফের স্ত্রী ছিলেন তামাজুর বিনতে আছবাগ বিন জিয়াদ। তিনি ছিলেন কোলাব বংশদ্ভুত। তিনি তাঁর এই স্ত্রীকে বায়েন (অকাট্য) তালাক দিলেন এবং ইদ্দতের সময় শেষ হওয়ার আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তখন হজরত ওসমান ওই স্ত্রীকে ওয়ারিশ বলে গণ্য করলেন। এই ঘটনাটি ঘটেছিলো সকল সাহাবীর উপস্থিতিতে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেউ আপত্তি তোলেন নি। তাই এটা ঐকমত্য। হজরত ওসমান আরো বলেছিলেন, আমি আবদুর রহমানের প্রতি অসুন্দর ধারণা রাখি না। আমার উদ্দেশ্য শুধু সুন্নত প্রতিপালন করা। আমাদের মতামতের পোষকতা রয়েছে হজরত ওমর, হজরত আবুদল্লাহ বিন ওমর, হজরত ওসমান, হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত মুগিরার বর্ণনায়। এ প্রসঙ্গে হজরত আলী, হজরত উবাই বিন কাব, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হজরত আয়েশা এবং হজরত জায়েদ বিন ছাবেতের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন আবু বকর রাজী। পরবর্তীদের মধ্যে নাখয়ী, শা'বী, সাঈদ বিন মোসাইয়েব, ইবনে শিরিন, ওরওয়া, শোরাইহ্, রবিয়া বিন আবদুর রহমান, তাউস বিন শুবরামা, সাওরী, হারেস এবং হাম্মাদ বিন আবী সোলায়মানের মাসআলাও এরকম।

এরপর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ওই পুরুষ ও নারীর প্রসঙ্গ যাদের বংশধর বলতে কেউ নেই। উর্ধস্তরের বাবা, দাদা অথবা নিচের স্তরের ছেলে, নাতি - এরকম যার কোনো মূল বা শাখাগত বংশ বলতে কিছু নেই। এরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন বায়যাবী। বাগবী বলেছেন, এখানে উদ্দেশ্য ওই ব্যক্তি যার সন্তান

www.eelm.weebly.com

সন্তুতিও নেই, পিতামাতাও নেই। হজরত আলী ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, যার বংশ দুদিক থেকেই দুর্বল। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, যার বাপ, দাদা, পরদাদা নেই, সন্তানও নেই। এরকম মৃত ব্যক্তি পরিবেষ্টিত হয় বংশবিহীন লোকের দ্বারা যেমন শাহী পট্টি, যে সুসজ্জিত কাপড় মাথার চতুর্দিক বেষ্টন করে রাখে কিন্তু মাথার মধ্যভাগ থাকে নগ্ন। এরকম ব্যক্তিকে এই আয়াতে কালালা বলা হয়েছে। হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসে কালালা শব্দের অর্থ এসেছে এরকম- রসুল স. বলেছেন, আমার ওয়ারিশ কালালা। আমার না সন্তান বেঁচে আছে, না বাপ দাদা বেঁচে আছে। হজরত আবু বকর কে কালালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমি আমার অভিমত ব্যক্ত করছি। যদি সঠিক হয় তবে আল্লাহ্র দিক থেকে। আর ভুল হলে শয়তানের দিক থেকে হবে। আমার অভিমতানুসারে কালালা ওই ব্যক্তি যার বাপ দাদা নেই, সন্তানও নেই। হজরত ওমর খলিফা হওয়ার পর এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, হজরত আবু বকরের বিরুদ্ধে বলতে আমি লজ্জা অনুভব করি। শা'বী থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী। এর উদ্ধৃতি ইবনে আবী হাতেম তার তাফসীরেও দিয়েছেন। আর হাকেম হজরত ওমরের উক্ত বক্তব্যটিকে ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে লিখেছেন। হজরত আবু হোরায়রার মারফু বর্ণনায় রয়েছে, কালালা বলতে ওই সকল ব্যক্তিবর্গকে বুঝায় যারা মৃতের বাপ দাদা নন, সন্তানও নন। হাকেম। আবু শায়েখ বর্ণনা করেন, হজরত বারা বলেছেন, আমি রসুল স. এর নিকট কালালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি স. বলেছিলেন, বাপ দাদা ও সন্তান ছাড়া অন্য ওয়ারিশরাই কালালা। আবু দাউদ মারসীলের মধ্যে আবু সালমা বিন আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার পিতা, দাদা, মা ও সন্তান না রেখে মারা যায় তাকেই কালালা বলে।

আমি বলি, বাপ, দাদা, সন্তান এর অর্থ হলো বংশের মূল ও শাখা। তাই মৃতের মাতা অথবা কন্যা থাকলেও সে কালালা হবে যদি পিতা ও ছেলে না থাকে। এই বক্তব্যের প্রমাণ রয়েছে হজরত জাবেরের হাদিসে। এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়,তখন হজরত জাবেরের কেবল এক কন্যা ছিলো। দাদা ছিলেন না। পিতাও শহীদ হয়েছিলেন উহুদ যুদ্ধে। এমত ক্ষেত্রে বোন ও ভাই, মা ও কন্যার উপস্থিতিতে ওয়ারিশ হন। সাধরণভাবে এতে নাতিও অন্তর্ভুক্ত। এমনকি এরকম ক্ষেত্রে নাতনীর সঙ্গে ভাইও ওয়ারিশ হয়। এ ব্যাপারে কোনো ভিন্নমত নেই। আয়াতের 'ওয়ালাদ' শব্দটির মধ্যে পিতা, দাদা ও পুত্র সকলেই শামিল। আয়াতের এই অংশে ভাই বোন বলতে পৈত্রেয় ভাই-বোন বুঝানো হয়েছে। এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই। হজরত উবাই বিন কাব এবং সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস সম্পর্কে বায়হাকী বর্ণনা করেন, সা'দ (সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস) পড়তেন

www.eelm.weebly.com

'ওয়ালাহু আখুন আওউখতুন লিউম্মি' (এখানে 'লিউম্মি' শব্দটি তিনি অতিরিক্ত পাঠ করতেন)। ইবনে মুনজিরও একথা লিখেছেন। জমখশরী দুজনের ক্বেরাতই উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদের ক্বেরাত এরকমই ছিলো। কিন্তু ইবনে হাজার লিখেছেন, আমি ইবনে মাসউদ সম্পর্কে এরকম কোনো বর্ণনা পাইনি। এখানে এ কথাটিও জানা গেলো যে, ধারাক্রমছিন্ন ক্বেরাতের উপর আমল করা বৈধ। তবে শর্ত হলো তার সনদ বিশুদ্ধ হতে হবে। ইমাম আবু হানিফাও তাই মনে করেন। কিন্তু শাফেয়ী এই মতের বিরুদ্ধে। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, শুনুন। আল্লাহ তায়ালা সুরা নিসার প্রথমে মীরাস সম্পর্কিত যে আয়াত নাজিল করেছেন তা ছিলো পিতা-মাতা ও সন্তান সম্বন্ধে। দ্বিতীয় আয়াত নাজিল হয়েছে স্বামী-স্ত্রী এবং বৈমাত্রেয় ভাই-বোন সম্পর্কে এবং শেষে বলা হয়েছে সহোদর ভাই-বোন সম্পর্কে। আর সূরা আনফালে বলা হয়েছে ওই সকল আত্মীয়দের কথা, যারা আহলে ফারায়েজ নয়। আল্লাহর কিতাবে বিভিন্নজনের সঙ্গে বিভিন্নজনের লঘু গুরু সম্পর্ক সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে।

বৈমাত্রেয় ভাই অথবা বোন পাবে এক ষষ্ঠাংশ। তারা একাধিক হলে সম্মিলিতভাবে পাবে এক তৃতীয়াংশ। সবারই অংশ হবে সমমাপের।

<u>মাসআলায়ে-হেমারিয়া</u> ঃ স্বামী, মা, দুই বৈমাত্রেয় ভাই, এক প্রকৃত (সহোদর) ভাই- এমতক্ষেত্রে ছয় দ্বারা তাসীহ্ করতে হবে। প্রকৃত ভাই আসাবা। আসহাবে ফারায়েজ থেকে কিছুই বাঁচে না, তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, প্রকৃত ভাই কিছুই পাবে না। প্রকৃত ভাই একজন হোক অথবা একের অধিক হোক। ওদিকে ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী সহোদর ভাইকে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সমঅংশী করেছেন।

তাহাবী বর্ণনা করেন, হজরত ওমর সহোদর ভাইকে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সমঅংশী মনে করতেন না। কিন্তু একবার এক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি মত পরিবর্তন করেছেন। এক সহোদর ভাই একবার তাঁকে বললেন, আমিরুল মুমিনীন! মনে করুন আমার পিতা ছিলেন গাধা। আর আমরাও এক মায়ের সন্তান নই। একথা শুনে হজরত ওমর সহোদর ভাইকে বৈমাত্রেয় ভাইদের সমঅংশী করে দিলেন। এই ঘটনাটির কারণেই এই মাসআলাটিকে হেমারিয়া (গাধা) বলা হয়। জায়েদ বিন সাবেতের সঙ্গে সম্পর্কিত করে হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে এবং বায়হাকী তাঁর সুনানে এই মাসআলাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। কিন্তু এই সূত্রের একজন বর্ণনাকারী আবু উমাইয়া বিন ইয়া'লী সাকাফী দুর্বল। হাকেম শা'বী এর মাধ্যমে হজরত আলী, হজরত ওমর এবং হজরত জায়েদ বিন ছাবেতের যে বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে অতিরিক্ত এই

www.eelm.weebly.com

কথাগুলো রয়েছে, পিতা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সহোদর ভাইদেরকে অধিক নৈকট্যশীল করেছে। (অর্থাৎ বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সঙ্গে প্রকৃত ভাইয়ের মতো পেটের দিক থেকেও নৈকট্য রয়েছে)।

দারা কুতনী ওহাব বিন মোনাব্বাহ ও মাসউদ বিন হেকাম সাকাফী থেকে লিখেছেন, কতিপয় লোক হজরত ওমরের খেদমতে হাজির হয়ে এই মাসআলাটি জিজ্ঞেস করলো, কোনো মহিলা মৃত্যুকালে স্বামী, মা, কয়েকজন বৈপিত্রেয় ভাই এবং কয়েকজন সহোদর ভাই রেখে গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন করতে হবে কী ভাবে? তিনি তখন সহোদর ভাইদেরকে বৈমাত্রেয় ভাইদের সঙ্গে এক তৃতীয়াংশের মধ্যে শরীক করে দিলেন। একজন প্রশ্ন করলো, অমুক বছর তো আপনি এরকম অবস্থায় সহোদরদেরকে বৈমাত্রেয়দের সঙ্গে শরীক করেননি। তিনি বললেন, ঠিক আছে। আগে যা করেছি তাও এবং এখন যা করলাম তাও সঠিক। আবদুর রাজ্জাকও এই ঘটনাটিকে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী লিখেছেন মুয়াম্মারের বর্ণনা থেকে। কিন্তু সেখানে বর্ণনাকারীদের মধ্যে মাসউদ বিন হাকামের নাম নেই। বরং হাকামের স্থলে ইবনে মাসউদের নাম উল্লেখ করলে ঠিক হতো। বায়হাকী লিখেছেন, হজরত ওমর সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাইদেরকে সম্মিলিত করেছিলেন। হজরত আলী এমন করেননি।

মাসআলা ঃ যদি মৃতের ছেলে, নাতি, পিতা অথবা দাদা থাকে তবে বৈমাত্রেয় ভাইবোনেরা কোনো অংশ পাবে না। এটা ঐকমত্য। এই মাসআলাটিতে অবশ্য মতবিরোধ রয়েছে যে, দাদা থাকলে বৈপিত্রেয় অথবা সহোদর ভাইবোনেরা অংশ পাবে কিনা। অনুমিত হয় যে, মা বর্তমান থাকলে বৈমাত্রেয় ভাইবোন বাদ পড়ে যাবে। কেননা যিনি আত্মীয়তার সূত্র, তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর মাধ্যমের আত্মীয়রা অবশ্য বঞ্চিত হবে। কিন্তু সলফে সালেহীনের ঐকমত্য এরকম অনুমানের বিরোধী। তাই আমরা কিয়াস (অনুমান)কে বাদ দিয়ে এজমাকে (ঐকমত্যকে) ধরেছি। কিয়াস বাদ দেয়ার আর একটি কারণ এই যে, মা-ই যখন সম্পূর্ণ সম্পত্তির মালিক হলো না তখন বৈমাত্রেয় ভাইয়ের বঞ্চিত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে কী ভাবে?

পুনরায় বলা হচ্ছে, বন্টনের পূর্বে অছিয়ত পূর্ণ করতে হবে। ঋণও পরিশোধ করতে হবে। এ সমস্ত ব্যাপারে যেনো কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা না দেখা দেয়। যেমন অছিয়ত অপেক্ষা বেশী দান করা, ভিত্তিহীন ঋণের প্রশ্ন তুলে ওয়ারিশদের সম্পত্তি কমিয়ে দেয়া ইত্যাদি। উদ্দেশ্য হতে হবে কেবল আল্লাহর সন্তোষ সাধন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কোনো কোনো পুরুষ-রমণী এমন যে, ষাট বছর আল্লাহর আনুগত্যশীল থাকার পর অছিয়তের দ্বারা ওয়ারিশদের ক্ষতিসাধন করে। আর ওই কারণে দোজখ তাদের জন্য হয়ে যায় অনিবার্য। এই হাদিস বর্ণনা করার পর হজরত আবু হোরায়রা এই আয়াতের

www.eelm.weebly.com

শেষ অংশ থেকে পরবর্তী আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। তিরমিজি, ইবনে মাজা, আবু দাউদ, আহমদ।

হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ওয়ারিশদের মীরাস কেটে দিবে,আল্লাহ তার জান্নাতের অংশও কেটে দিবেন। ইবনে মাজা, বায়হাকী।

হজরত আলী বলেছেন, চতুর্থাংশ অছিয়ত করা অপেক্ষা পঞ্চমাংশ অছিয়ত করা আমার নিকট উত্তম। আবার এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ অছিয়ত করাই আমার পছন্দনীয়। বায়হাকী।

জ্ঞাতব্য ঃ এই আয়াতের শেষ বক্তব্যে অছিয়ত ও ঋণের মাধ্যমে ক্ষতি না করার কথা বলা হয়েছে। প্রথমদিকে এরকম বলা হয়নি। এর কারণ এই যে, জন্মসূত্রের এবং বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয়দের আকাংখা এই থাকে যে, ঋণের কারণে যেনো তাদেরকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয়। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাইবোনেরা দূরবর্তী হওয়ার কারণে এই ব্যাপারে সাধারণতঃ উদাসীন থাকে। তাদের উদাসীনতার সুযোগ যাতে গ্রহণ না করা হয়, তাই এখানে ক্ষতি করার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট ঃ অছিয়ত কয়েক প্রকারের। যেমন- ওয়াজিব, মোস্তাহাব, মোবাহ, হারাম এবং মাকরূহ। ঋণগ্রস্থ হলে, জাকাত ফরজ হলে, মান্নত করলে, হজ্জ ফরজ হয়ে থাকলে, কাজা নামাজ, রোজা থাকলে - এ সমস্ত ব্যাপারে অছিয়ত করে যেতে হবে। অতএব, ঋণ পরিশোধ করতে হবে মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ থেকে। একথা বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, প্রত্যেক প্রকার ঋণই সমগুরুত্বসম্পন্ন। তার কারণ জানা থাকুক বা না থাকুক। ঋণ ছাড়া অন্যান্য অছিয়ত এক তৃতীয়াংশের উপর কার্যকর হবে (এর অধিক অছিয়ত গ্রহণীয় নয়)। এরকম ওয়াজিব অছিয়তে গাফিলতি করা নাজায়েয।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, মুসলমানের উপর কারো কোনো হক থাকলে এ সম্পর্কে লিখিত অছিয়ত না করে দুই রাত কাটানো উচিত নয়। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের এক বর্ণনায় দুই রাতের বদলে তিন রাতের কথা বলা আছে। যার উপর কারো কোনো ওয়াজিব হক না থাকে, তার জন্য এক দশমাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশ দান করার অছিয়ত করা মোস্তাহাব। তবে শর্ত হলো তার ওয়ারিশগণ ধনী হতে হবে। ওয়ারিশরা দরিদ্র হলে দান করা মাকরূহে তানযীহী হবে। এরকম অবস্থায় অছিয়ত অমান্য করাই উত্তম। এমত অবস্থায় নিকটতম আত্মীয়রা মীরাসও পাবে। আর এই মীরাস দান বলেও গণ্য হবে।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. বলেছেন, অনাত্মীয় মিসকিনকে দান করা কেবলই দান। কিন্তু অভাবী আত্মীয়কে দেয়া একই সঙ্গে দান এবং আত্মীয়তা সুদৃঢ়করণ। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারেমী। যে অছিয়ত ওয়ারিশদের ক্ষতিসাধন করে সে অছিয়ত হারাম। লক্ষ্য রাখতে হবে — ১. যেনো সর্বাধিক এক তৃতীয়াংশের উপর অছিয়ত করা হয় ২. সন্তান, স্ত্রী ও আত্মীয়দের জন্য অছিয়ত করা না হয় ৩. ভিত্তিহীন ঋণ যেনো প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে ৪. এ ব্যাপারে শরিয়ত অতিক্রম করার চেষ্টা যেনো না থাকে।

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। এটা তাঁর ভলো করেই জানা আছে যে, কে ওয়ারিশদের জন্য স্বার্থহানিকর। কে শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণকারী। কিন্তু তিনি যে সহনশীল। তাই অপরাধের শাস্তিদানে দ্রুততাকে প্রশ্রয় দেন না।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৩, ১৪

تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ
مُّهِيْنٌ ۝ ع

❑ এই সব আল্লাহের নির্ধারিত সীমা। কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিলে আল্লাহ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; যেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহা মহাসাফল্য।

❑ এবং কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের অবাধ্য হইলে এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমা লংঘন করিলে তিনি তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হইবে, এবং তাহার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

এতিমদের সম্পর্কে, অছিয়ত সম্পর্কে এবং ওয়ারিশদের সম্পর্কে বর্ণিত বিধানাবলী আল্লাহর। এই বিধান কারো জন্যই অমান্য করা বৈধ নয়। যারা এ বিধান মান্য করে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্যকে আশ্রয় করবে তাদেরকে আল্লাহ এমন অক্ষয় স্বর্গোদ্যানের প্রবেশাধিকার দিবেন, যার নিম্নদেশে রয়েছে স্রোতবতী নদী। এটাই হচ্ছে সফলতা। মহা সফলতা। আর যে আল্লাহর বিধানাবলীর সীমানা অতিক্রম করে অবাধ্যতাকে নির্বাচন করবে, তাকে তিনি

www.eelm.weebly.com

নিক্ষেপ করবেন আগুনে। এই অগ্নিবাস হবে চিরস্থায়ী। সেখানে রয়েছে আরো অনেক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

এই সুরার শেষে রয়েছে সহোদর ও বৈপিত্রেয় ভাইবোনদের আলোচনা। তার আগেই আমরা ফারায়েজের মাসআলাকে স্পষ্ট করে দেখাতে চাই।

মাসআলায়ে আওল ঃ আওল শব্দের আভিধানিক অর্থ উঁচু করে দেয়া, একদিকে ঝুঁকে পড়া ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে ভগ্নাংশবিহীন অংশ নির্ণয়ার্থে সংকীর্ণ অংশগুলোকে সংখ্যাগত দিক থেকে বাড়িয়ে দেয়া। এই নিয়মটি ঋণ পরিশোধের বেলাতেও ব্যবহৃত হতে পারে। একাধিক পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করতে গিয়ে যদি দেখা যায়, পরিত্যক্ত সম্পত্তি যথেষ্ট হচ্ছে না, তখন পাওনাদারদেরকে কিছু কিছু করে কম দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

হজরত ওমরের জামানায় আওল সম্পর্কে ঐকমত্য হয়েছিলো। একটি সমস্যা উপস্থিত হয়েছিলো তাঁর সামনে। সমস্যাটি হচ্ছে —এক মহিলা তার স্বামী ও দুই বোনকে রেখে মারা গেছেন। এখন সম্পদ বন্টনের পদ্ধতিটি হবে কেমন? এর সমাধান দেয়া হলো এভাবে—স্বামী অর্ধেক এবং দুই বোন দুই তৃতীয়াংশ পাবে। কিন্তু এভাবে ভাগ করলে অংশ যায় বেড়ে। যেমন ছয় ভাগে ভাগ করে স্বামীকে অর্ধেক (তিন ভাগ) দিলে বাকি থাকে তিন। এক্ষেত্রে ভগ্নাংশকে এড়াতে চাইলে দুই বোনের অংশ নির্ণীত হওয়া দরকার দুই যোগ দুই সমান সমান চার। এভাবে স্বামীর তিনের সঙ্গে বোনদের চার যোগ দিলে তিন আর চারে হয় সাত। এভাবে এক অংশ যায় বেড়ে। হজরত ওমর এ ব্যাপারে সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। বললেন, এক লোক মরার পর দেখা গেল তার সম্পত্তি বলতে রয়েছে শুধু ছয়টি টাকা। তার দুজন ওয়ারিশ। একজন পাবে তিন টাকা। অপরজন পাবে চার টাকা। এমতাবস্থায় কি সমস্ত সম্পদকে সাতভাগে ভাগ করতে হবে না? সাহাবীগণ এ ব্যাপারে সম্মত হলেন। এই আমলটি মেনে নিলেন সবাই। হজরত ওমরের ইন্তেকালের পর হজরত ইবনে আব্বাস এই মাসআলাটির বিরুদ্ধাচরণ করে বসলেন। কেউ কেউ বললো, আপনি হজরত ওমরের সামনে এরকম বলেননি কেন? তিনি বললেন, তাঁর তেজস্বীতার কারণে। লোকেরা বললো, আপনার একক অভিমত অপেক্ষা ওই সম্মিলিত সিদ্ধান্তই উত্তম। বায়হাকী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে মানুষ বালু গণতে পারে সে অর্ধেক অংশকে এক তৃতীয়াংশও করতে পারবে। এটা কেমন হিসাব যে, অর্ধেক অর্ধেক করার পর এক তৃতীয়াংশ বাটোয়ারা করা যাবে না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, মীরাসের ব্যাপারে আওলের প্রথম প্রবর্তক কে? তিনি বললেন, হজরত ওমর । এরপর তিনি আওলের সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বললেন। পুনরায় বললেন, আল্লাহর কসম। মীরাসের ব্যাপারে আল্লাহ পাক যা আগে রেখেছেন তাকে আগে এবং যা

www.eelm.weebly.com

পশ্চাতে রেখেছেন তাকে পশ্চাতে রাখলে আওলের প্রশ্নই উঠবে না। ইবনে আব্বাসের এরকম বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন হাকেম। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলো, ফারায়েজের প্রথমে কে? পরে কে? তিনি বললেন, আল্লাহ যাকে প্রথমে রেখেছেন, তার অংশ যেমন নির্ধারিত তেমনি পরবর্তীদের অংশও নির্ধারিত। প্রথম ফরজকৃত ব্যক্তি হচ্ছেন স্বামী, স্ত্রী এবং মা (স্বামীর আসল অংশ হচ্ছে অর্ধেক। স্ত্রীর এক চতুর্থাংশ। মায়ের এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু মৃতের সন্তান থাকলে অর্ধেকের বদলে এক চতুর্থাংশ, এক চতুর্থাংশের স্থলে এক অষ্টমাংশ এবং এক তৃতীয়াংশের স্থলে এক ষষ্ঠাংশ হবে)। পরবর্তী ফরজ ওয়ারিশ হচ্ছে কন্যাকুল ও বোনেরা। এক কন্যা ও এক বোনের জন্য অর্ধেক এবং দুই কন্যা ও দুই বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ হবে। এক কন্যা ও এক বোন থাকলে কন্যা পাবে অর্ধেক। বোন পাবে এক ষষ্ঠাংশ। কিন্তু দুই কন্যা, দুই বোন ও ভাই থাকলে তাদের নির্দিষ্ট কোনো অংশ থাকে না। তখন তারা হয়ে যায় আসাবা। এরকম অবস্থায় প্রথমে ফরজকৃতদের অংশ বন্টনের পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে কন্যা ও বোনদেরকে দিতে হবে। অবশিষ্ট না থাকলে কিছুই দিতে হবে না। এই মাসআলাটিতে মোহাম্মদ বিন হানাফিয়ার অভিমতও হজরত ইবনে আব্বাসের অনুকূল।

মাসআলা ঃ সাহাবীগণের ঐকমত্য এই যে, আহলে ফারায়েজদের সম্পত্তি নির্ধারিত নিয়মে বন্টনের পর যা থাকবে তা ওই পুরুষকে দিতে হবে যে মৃতের অধিক নৈকট্যধারী। একটু আগেই এ সম্পর্কিত হাদিস বলা হয়েছে। এধরনের যারা তাদেরকে বলা হয় আসাবা। আহলে ফারায়েজ কেউ না থাকলে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে আসাবারা। মৃতের নিকটতম আত্মীয় হলেন পুত্র, তারপর পৌত্র এমনি করে অধস্তন পুরুষেরা। এর পরের নিকটতমরা হলেন পিতা, দাদা, পরদাদা —এভাবে উর্ধতন পুরুষেরা। তারপর সহোদর, তারপর বৈপিত্রেয় ভাই, তারপর সহোদর ভাইদের পুত্র, তারপর বৈপিত্রেয় ভাইদের পুত্র। এভাবে অধস্তনদের শাখা প্রশাখা। অতঃপর দাদা — সহোদর ভাইয়ের, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের, তারপর সহোদর ভাইদের পুত্রদের, তারপর দাদার বৈপিত্রেয় ভাইদের পুত্রের- এভাবে পরদাদাদের অধস্তন বংশ ইত্যাদি।

হজরত আলী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, সহোদর ভাই একে অপরের ওয়ারিশ হয়ে থাকে (অর্থাৎ আসাবা হয়ে থাকে)। তাদের বর্তমানে বৈপিত্রেয় ভাই ওয়ারিশ হয় না। তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম। এই সিলসিলায় মতোবিরোধ নেই। তবে দাদাদের বন্টনে মতোবিরোধ আছে।

মাসআলা ঃ আলেমদের ঐকমত্য এই যে, যে মহিলা একজন হলে অর্ধেক, দুইজন হলে দুই তৃতীয়াংশ পায়, সে তার আপন ভাইয়ের সাথে মিললে আসাবা

www.eelm.weebly.com

হয়ে যায়। আহলে ফারায়েজ আর থাকে না। কেননা সন্তানসন্তুতি একত্রে থাকলে তাদের সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেছেন, 'এক ছেলের অংশ দুই মেয়ের সমান।' মহিলারা তাদের আসাবা ভাইয়ের সঙ্গে মিলে গেলেও আসাবা হবে না। যেমন ফুফী, ভাতিজি।

মাসআলা ঃ এটা ঐকমত্য যে, আহলে ফারায়েজের শেষ আসাবা হলো মাওলায়ে আতাকা (যে মনিব গোলামকে আজাদ করে দেয় তাকে মাওলায়ে আতাকা বলে। আজাদ করা গোলাম মারা গেলে সর্বপ্রথম তার ওয়ারিশ হবে আহলে ফারায়েজ, তারপর হবে আসাবা আত্মীয়েরা, তারপর বংশীয় আসাবা, তারপর মাওলায়ে আতাকা বা আসাবায়ে সববী)।

বায়হাকী ও আবুদর রাজ্জাক লিখেছেন, এক ব্যক্তি সাথে করে একজনকে নিয়ে রসুল স. এর নিকট হাজির হয়ে বললেন, আমি একে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিয়েছি। তার মীরাসের হুকুম কী? রসুল স. বললেন, যদি সে বংশীয় আসাবা রেখে যায় তবে (আহলে ফারায়েজের পর) আসাবা সবচেয়ে বেশী হকদার হবে। অন্যথায় মনিবের হক (অর্থাৎ তার মীরাস পাবে তুমি)। সহীহাইনে রয়েছে, সে তার হকদার যে তাকে আজাদ করেছে। তারপর মনিবের (মাওলায়ে আতাকা) আসাবারা। মহিলারা পাবে গোলামের মালিকানা সম্পর্কিত হক, যাকে তারা আজাদ করেছে অথবা আজাদ করা গোলামেরা যাদেরকে আজাদ করেছে।

নাসাঈ ও ইবনে মাজা বিনতে হামজা এর হাদিসের সিলসিলায় লিখেছেন, বিনতে হামজা এক গোলামকে আজাদ করেছিলেন। আজাদ করার পর সে মরে গেলো। তার ছিলো এক কন্যা। রসুল স. তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক কন্যাকে এবং বাকি অর্ধেক বিনতে হামজাকে দিলেন। এই হাদিসটিকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী ও তাহাবী। বায়হাকী লিখেছেন, ঐকমত্য এই যে, গোলাম আজাদ করেছিলেন বিনতে হামজা। তাঁর পিতা নন। ইবনে আব্বাসের এ সম্পর্কিত একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন দারাকুতনী।

মাসআলা ঃ আহলে ফারায়েজদের প্রাপ্য দেয়ার পর আসাবার অংশ দিতে হবে। যদি আসাবা না থাকে তবে পুনরায় আহলে ফারায়েজদেরকে দিতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয়বারের এই বন্টনে স্বামী অথবা স্ত্রীকে কিছু দেয়া যাবে না। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আসাবা না থাকলে তাদের অংশ বায়তুল মালে জমা করে দিতে হবে। আহলে ফারায়েজদের মধ্যে পুনঃবন্টন করা যাবে না। শেষ জামানার শাফেয়ী আলেমগণ অবশ্য ইমাম আবু হানিফার অভিমতকে মেনে নিয়েছেন। কারণ বায়তুল মাল ব্যবস্থাটি উঠে গিয়েছিলো। আবদুল ওহাব মালেকীর বক্তব্যও ছিলো

www.eelm.weebly.com

এরকম। আবুল হাসান বর্ণনা করেন, হজরত আলী, হজরত ওসমান, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে মাসউদ অবশিষ্ট সম্পত্তি আসাবা না থাকলে যাবিল আরহাম (নিকটতম আত্মীয়দের)কে দিতেন না। আহলে ফারায়েজদেরকে পুনঃবন্টন করতেন। আবুল হাসান বলেন, তাহাবী তাঁর নিজস্ব সনদে ইব্রাহিম নাখয়ীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন এরকম, হজরত ওমর ও হজরত আবদুল্লাহ যাবিল আরহামকে ওয়ারিশ করে দিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বলি, হজরত আলীও এরকম করতেন। ইব্রাহিম নাখয়ী আরো বলেন, হজরত আলী এ ব্যাপারে দৃঢ় ছিলেন।

তাহাবী দুটি পদ্ধতিতে সুয়াইদ বিন গাফলাহ'র বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। সুয়াইদ বলেন, এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে রেখে গেলেন এক কন্যা, এক স্ত্রী এবং প্রাক্তন মনিব (যিনি তাঁকে আজাদ করে দিয়েছিলেন)। হজরত আলীর নিকট এব্যাপারে সম্পদ বন্টনের বিধান জানতে চাওয়া হলো। আমি তখন তাঁর পাশেই ছিলাম। হজরত আলী কন্যাকে দিলেন অর্ধেক এবং স্ত্রীকে দিলেন এক অষ্টমাংশ। এরপর যা অবশিষ্ট রইলো তা পুনরায় কন্যাকে দিলেন। প্রাক্তন মনিবকে কিছুই দিলেন না। আবু জাফরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী আহলে ফারায়েজদের অংশ দেয়ার পর বাকি অংশ পুনরায় আহলে ফারায়েজদেরকেই দিতেন।

তাহাবী স্ব সনদে মাসরুকের ওই বিবরণটিও লিপিবদ্ধ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহর নিকট প্রশ্ন করা হলো, কয়েকজন বৈমাত্রেয় ভাই এবং মায়ের মধ্যে মীরাস বন্টনের নিয়ম কী? তিনি ভাইদেরকে এক তৃতীয়াংশ, বাকি সমস্ত সম্পত্তি মাকে দিলেন এবং বললেন, যার আসাবা নেই, তার জন্য মা-ই আসাবা। তিনি মা থাকলে বৈমাত্রেয় ভাইদেরকে অবশিষ্ট সম্পদের কিছুই দিতেন না। সহোদরা কন্যার বর্তমানে পৌত্রীকেও দ্বিতীয় বন্টনে শামিল করতেন না। দ্বিতীয়বারে সহোদর বোনের সঙ্গে বৈমাত্রেয় বোনদেরকে দিতেন না। স্ত্রী, স্বামী ও দাদাকেও দিতেন না। তাহাবী আরো বলেছেন, আমাদের ধারণায় হজরত আলীর মাসআলাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। এ ব্যাপারে ইবনে মাসউদের বক্তব্য আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় বন্টনে আহলে ফারায়েজই অন্তর্ভূক্ত হবে। দূরবর্তী আত্মীয়দেরকে নিকটবর্তীদের তুলনায় প্রাধান্য দেয়া যাবে না। সকলকে তাদের নির্ধারিত প্রাপ্য পরিশোধ করতে হবে। আমরা দেখি, বিভিন্ন সম্পর্কসূত্রে আত্মীয়রা ওয়ারিশ হন। নিকটবর্তীরা অধিকারবঞ্চিত করে দেন দূরবর্তীদেরকে। এই আদর্শ হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইনের (ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম ইউসুফের)।

<u>মাসআলা</u> ঃ আলেমদের ঐকমত্য এই যে, যখন কেউ দুই দিক থেকে অংশী হয় অর্থাৎ একই সঙ্গে আহলে ফারায়েজ ও আসাবা হয় তবে উভয় দিকই রক্ষা

www.eelm.weebly.com

করতে হবে। যেমন এক মহিলা তিনজন চাচাতো ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই এবং স্বামী রেখে মারা গেলো। তার চাচাতো ভাইয়েরা শুধু আসাবা। এ ক্ষেত্রে বন্টন করতে হবে এভাবে — বৈমাত্রেয় ভাই তার ফরজ অংশ এক ষষ্টাংশ পাবে। স্বামী পাবে অর্ধেক। অবশিষ্ট সম্পত্তি তিন আসাবা (চাচাতো ভাই) কে সমান অংশে ভাগ করে দিতে হবে। প্রথমে ছয় ভাগ করতে হবে। তাসীহ্ করতে হবে ১৮। এর মধ্যে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ৫, স্বামীর ১১ এবং আসাবার ২। স্বামীর ফরজ হিসাবে প্রাপ্য ১৮ এর অর্ধেক ৯ এবং আসাবা হিসাবে ২। মোট ১১। বৈমাত্রেয় ভাই ফরজ হিসাবে ৩ এবং আসাবা হিসাবে ২। মোট ৫। আর চাচাতো ভাইয়েরা কেবল আসাবা হিসাবে পাবে ২। এভাবেই সম্পন্ন করতে হবে মোট ১৮ অংশের বন্টন।

যদি কোনো ব্যক্তি দুই দিক থেকেই আহলে ফারায়েজ হয়, তবে তার প্রাপ্যের পরিমাণ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মতে ওই ব্যক্তির শক্তিশালী আত্মীয়তার দিকটি ধরতে হবে। দুর্বল দিকটি বাদ দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, তার আত্মীয়তার উভয় দিকই গ্রহণীয়। তাকে উভয় সম্পর্কের অংশই দিতে হবে। এরকম বন্টনের প্রকৃতি দু'ধরনের। একটি হচ্ছে — যদি কোনো মুসলমান কোনো মাহ্রাম মহিলার সঙ্গে সন্দেহজনক সহবাস করার পর মৃত্যুবরণ করে তবে সহবাসকৃতা মহিলা দু'বার অংশ পাবে। আরেকটি প্রকার হচ্ছে — এক অগ্নিপূজক মাহ্রাম মহিলার সঙ্গে বিয়ে করলো। তারপর মুসলমান হয়ে মারা গেলো। যেমন, সে বিয়ে করলো নিজ কন্যাকে। সেই কন্যার আবার সন্তানও হলো। এরকম সম্পর্কবিভ্রাটের কারণে সে বিভিন্ন দিক থেকে আহলে ফারায়েজ হবে।

<u>মাসআলা</u> ঃ আলেমদের ঐকমত্য এই যে, স্বামী ও স্ত্রী ছাড়া যদি অন্য একজনও আহলে ফারায়েজ অথবা আসাবা থাকে, তবে রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়েরা কিছুই পাবে না। আর কোনো আহলে ফারায়েজ ও আসাবা না থাকলে রক্তের সম্পর্কধারীদের পাওয়া না পাওয়া সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। সাঈদ বিন মুসাইয়েব বলেছেন, কন্যার বর্তমানে মামা মীরাস পাবে।

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদের মতে রক্তের সম্পর্কধারীরা মীরাস পাবে। এরকম মাসআলা বর্ণিত হয়েছে হজরত আলী, ইবনে মাসউদ এবং ইবনে আব্বাস থেকেও। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক যাবিল আরহাম অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কের মীরাস স্বীকার করেননি। তাঁরা বলেছেন, তারা আসাবা না হওয়ায় অবশিষ্ট সম্পত্তি বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। আলেমগণ বলেছেন, এই মাসআলা বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীক, হজরত ওসমান, জায়েদ বিন ছাবেত, জুহ্রী ও আওজায়ী থেকে। শেষ জামানায় আবার শাফেয়ীগণের ফতোয়া হানাফীগণের অনুকূলে এসেছ। আমাদের দলিল হচ্ছে — আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ

www.eelm.weebly.com

করেছেন, উলুল আরহামি বায়দুহুম আউলা বি বাদিন ফি কিতাবিল্লাহি। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু বকর তাঁর ভাষণে বলেছেন, যাবিল আরহামদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যে, তারা একে অন্যের চেয়ে অধিক হকদার। এই মতের বিরুদ্ধাচরণকারীরা বলেছেন, তোমাদের কোনো দলিল নেই। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুর্খতার যুগে ছেলেদেরকেই মীরাস দেয়া হতো। যেমন রসুল স. হজরত জায়েদ বিন হারিসাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করেছিলেন। এরকম কিছু লোক পরস্পরের সঙ্গে ওয়ারিশ হওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হতো। তাদের এহেন আচরণ প্রতিহত করতেই আল্লাহপাক এই আয়াত নাজিল করেছেন যেনো মীরাস যাবিল আরহামদের দিকে চলে যায়। অন্য আয়াতে উলুল আরহাম বলতে নির্দেশ করা হয়েছে যাবিল ফুরুজ এবং আসাবাগণকে।

আমরা বলি, আয়াত নাজিলের এই ধারাবাহিকতার কথা যদি মেনে নেয়া হয় তবুও শব্দগত দিক থেকে তা হবে সাধারণ অর্থবোধক। উলুল আরহাম বলতে আহলে ফারায়েজ, আসাবা এবং অন্যান্য আত্মীয় — সকলকেই বুঝায়। আমাদের বক্তব্যের পক্ষে অনেক হাদিস রয়েছে। উমামা বিন সহল বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তীরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলো। মামা ছাড়া তার নিকটজন বলতে কেউ ছিলো না। এ ব্যাপারে হজরত আবু ওবাদা হজরত ওমরের নিকট লিখিতভাবে জানতে চাইলেন। হজরত ওমর লিখলেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যার ওয়ারিশ জীবিত নেই, তার ওয়ারিশ মামা। আহমদ, বায্যার। তাহাবীর বর্ণনাটি এরকম, যার অভিভাবক নেই তার অভিভাবক আল্লাহ ও তাঁর রসুল। আর যার ওয়ারিশ নেই তার ওয়ারিশ মামা (যদি থাকে)।

হজরত মেকদাম বিন মাদি কারব বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, যার ওয়ারিশ নেই তার ওয়ারিশ মামা। দিয়ত বা হত্যার বিনিময়ও তিনি দিবেন। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, হাকেম বিন হাব্বান। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি সহীহ্। ইবনে আবী হাতেম আবু জুরআর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন এরকম, হাদিসটি হাসান। কিন্তু বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি মুজতারেব। (ধারাবহিকতা ক্ষুণ্ন সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসকে বলা হয় মুজতারেব। যেমন, এক বর্ণনাকারীর বদলে অন্য বর্ণনাকারীর উল্লেখ অথবা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বর্ণনাকারীর অদল বদল)।

তাহাবীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, মানুষ সম্পদ রেখে যায় তার ওয়ারিশদের জন্যই। আর আমি ওই ব্যক্তির ওয়ারিশ যার কোনো ওয়ারিশ নেই। আমি তার মালের অংশীদার হবো। দিয়ত দিব (যদি থাকে)। মামা থাকলে মামাই ওয়ারিশ হবে। মামা তখন দিয়তও দিবে। দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে, আমি তার অংশীদার হবো এবং তাকে ঋণমুক্ত করবো —যার ওয়ারিশ নেই। যদি মামা থাকে তবে মামাই অংশ পাবে। সে তার জান ও মাল বন্ধকমুক্ত করবে।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, রসুল স. এর 'আমি তার ওয়ারিশ হবো' — এ কথার অর্থ তার মাল বায়তুল মালে জমা করবো। তিনিই স. ছিলেন বায়তুল মালের রক্ষক।

হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মামাই তার ওয়ারিশ যার অন্য ওয়ারিশ নেই। তিরমিজি, নাসাঈ, তাহাবী। এই হাদিসটিকে নাসাঈ মুজতারেব, দারা কুতনী রাজেহ (অগ্রগণ্য) এবং বায়হাকী মওকুফ বলেছেন। হজরত ওয়াছে' বিন হাব্বান বর্ণনা করেছেন, ছাবেত বিন দায়াহ্দা ইন্তেকাল করলেন। তিনি ছিলেন বহিরাগত। তাঁর বংশ পরিচয়ও ছিলো অপরিচিত। রসুল স. আছেম বিন আদীকে বললেন, তুমি কি তার বংশ পরিচয় জানো? আছেম বললেন, না। রসুল স. তখন ছাবেতের ভ্রাতুষ্পুত্র আবু লুবাবা বিন মুনজিরকে ডেকে ছাবেতের মীরাস দিয়ে দিলেন। তাহাবী।

তাহাবী হজরত ওমর বিন খাত্তাবের কয়েকটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যাতে বলা হয়েছে, রসুল স. ফুফু ও খালার মধ্যে বন্টন করেছেন এরকম — ফুফু দুই তৃতীয়াংশ আর খালা এক তৃতীয়াংশ। ফুফুর নিকটবর্তী পিতার দিক দিয়ে তাই তাকে দ্বিগুণ আর মায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার কারণে খালাকে দিয়েছেন একগুণ।

হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, ফুফু এবং খালার মীরাস সম্পর্কে রসুল স. জিজ্ঞাসিত হয়ে জবাব দিলেন,জিব্রাইল না আসা পর্যন্ত বলতে পারবো না। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? প্রশ্নকর্তা হাজির হলে তিনি স. বললেন, জিব্রাইল আমাকে চুপিসারে জানালেন, তাদের জন্য কিছুই নেই। এই হাদিসের বর্ণনাকারী দারা কুতনী মন্তব্য করেছেন, হাদিসটি দুর্বল। কারণ, এই হাদিসের একজন রাবী (বর্ণনাকারী) মাসআদা দুর্বল। বরং মিথ্যা হাদিস বানানোর ব্যাপারে তার অখ্যাতি আছে। কিন্তু বিশুদ্ধমত এই যে, হাদিসটি মুরসাল। আহমদ বলেছেন, আমি তার হাদিসে আগুন লাগিয়েছি। হাকেম এই হাদিসকে আবদুল্লাহ বিন দীনারের মাধ্যমে ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। এই সনদের আর একজন রাবী মদীনাবাসী আবদুল্লাহ বিন জাফর দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত। হাকেম অন্য একটি হাদিসকে এই হাদিসের সাক্ষ্যস্বরূপ পেশ করেছেন। শরীফ বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, হারেস বিন আবী আবীদ আমাকে বললেন, রসুল স. কে একবার ফুফু ও খালার মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। এই সনদের সোলায়মান বিন দাউদ ছিলেন মাতরুক (পরিত্যক্ত)। দারাকুতনী এই সনদ ছাড়াও অন্য নিয়মে এই হাদিসখানি মুরসাল হিসেবে সংকলিত করেছেন।

জায়েদ বিন আসলাম থেকে আতা বিন ইয়াসার বর্ণনা করেন, এক আনসারী রসুল স. এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এক ব্যক্তি মরার সময় কেবল

www.eelm.weebly.com

তার এক ফুফু এবং এক খালা রেখে গিয়েছে। ওই সময় তিনি স. গাধায় আরোহণ করতে যাচ্ছিলেন। থেমে পড়লেন। দু'হাত তুলে প্রার্থনা জানালেন, হে আল্লাহ!ওই ব্যক্তি কেবল ফুফু ও খালা রেখে গেছে। প্রশ্নকারী পুনরায় প্রশ্ন করলেন। দ্বিতীয়বারও একই কথা বললেন রসুল স.। তৃতীয়বারের প্রশ্নের জবাবও দিলেন একইভাবে। শেষে বললেন, ওই দুইজনের জন্য কিছুই নেই। কয়েকটি পদ্ধতিতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাহাবী। দারা কুতনী ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন মুরসাল হিসেবে। এই বর্ণনা আবু দাউদও তাঁর পুস্তক মুরাসীলে লিপিবদ্ধ করেছেন। হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে আবু সাঈদের বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ করেছেন। এর সনদ অবশ্য অশক্ত। তিরমিজি তাঁর ছগীর পুস্তকে মোহাম্মদ বিন হারেস মাখজুমীর ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে আবু সাঈদের বর্ণনা থেকে লিখেছেন। এই সিলসিলার অন্য কোনো বর্ণনাকারীই আবু সাঈদের সমতুল্য নন।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য আনা সম্ভব যে, এ সম্পর্কিত আয়াত নাজিল হওয়ার আগেই রসুল স. এর নিকট ফুফু ও খালার মীরাস সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিলো। তাই তিনি স. ঐরকম জবাব দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে যখন যাবিল আরহাম সম্পর্কিত আয়াত নাজিল হলো তখন তিনি বললেন, মামা তার ওয়ারিশ,যার ওয়ারিশ নেই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মাসআলা ঃ যাবিল আরহাম অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির রক্তের সম্পর্কধারী আত্মীয় চার ধরনের। ১. সন্তানগণ ২. আসল বংশ ৩. নিকটতম বংশ ৪. দূরবর্তী বংশ। প্রথম প্রকার ওয়ারিশ না থাকলে দ্বিতীয় প্রকার, দ্বিতীয় প্রকার ওয়ারিশ না থাকলে তৃতীয় এবং তৃতীয় প্রকার না থাকলে চতুর্থ প্রকারের আত্মীয়রা ওয়ারিশ হবে। অর্থাৎ নিকটবর্তীরা দূরবর্তীদেরকে অধিকারবঞ্চিত করবে। নিকটবর্তীতায় সকলে সমান হলে ওয়ারিশরা শুধু আত্মীয়দের তুলনায় অগ্রগণ্য হবে। ভাই, বোন, চাচা, ফুফু, মামা ও খালার বংশ নৈকট্যের দিক দিয়ে শক্তিশালী। নৈকট্যের সীমানায় সকলকে সমান্তরাল হতে হবে। যেমন প্রকৃত চাচার কন্যা বৈপিত্রেয় ভাই থেকে নিকটবর্তী। নৈকট্যের গন্ডি ভিন্ন হলে তারতম্য করা যাবে না। যেমন পিতার বৈপিত্রেয় বোন এবং মাতার প্রকৃত বোন কেউ কাউকে দূরবর্তী করতে পারে না। পরিত্যক্ত সম্পত্তি তিন ভাগ করে দুই ভাগ পিতার নিকটতমদেরকে, এক ভাগ মাতার নিকটজনদেরকে দিতে হবে। তাহাবী হজরত ওমরের বর্ণনায় এরকমই উল্লেখ করেছেন।

যার নৈকট্য দুদিক থেকেই আছে, সে একদিকের নৈকট্যশীলদের তুলনায় দ্বিগুণ পাবে। রক্তের সম্পর্কধারীদের বেলায় সংখ্যা নয়, ব্যক্তিত্ব ধর্তব্য। —এ কথা বলেছেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম ইউসুফ এবং হাসান বিন জিয়াদ। ইমাম মোহাম্মদ মনে করেন, ব্যক্তির সঙ্গে বংশও গুরুত্ব লাভের যোগ্য এবং তা অনুপাত

www.eelm.weebly.com

সাপেক্ষ হবে। (যেমন, একজন মৃতের সঙ্গে দুই দিক থেকে সম্পর্ক রাখেন আর একজন এক দিক থেকে —এমতাবস্থায় সম্পত্তি ওই দুজনকে অর্ধেক অর্ধেক করে দিতে হবে। ইমাম মোহাম্মদের মতে তিনভাগ করে দুই ভাগ দুই দিকের সম্পর্কধারীকে এবং এক ভাগ এক দিকের সম্পর্কধারীকে দিতে হবে)।

মাসআলা ঃ ঐকমত্য এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যা হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির মীরাস থেকে বঞ্চিত করে দেয়। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের মতে ভুলক্রমে হত্যাও হত্যাকারীকে অধিকারবঞ্চিত করে। ইমাম মালেক বলেছেন, ভুলবশতঃ হত্যাকারীর নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ হতে বাধা নেই। কিন্তু সে দিয়ত বা রক্তপন থেকে ওয়ারিশ হবে না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি ও ইবনে মাজা। কিন্তু এই সনদের এক রাবী ইসহাক বিন আবদুল্লাহ হারবী মাতরুকুল হাদিস। নাসাঈ ও দারাকুতনী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আমর বিন শোয়ায়েব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে। আর ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন বায়হাকী ও দারাকুতনী।

ইমাম মালেক তাঁর মতের সমর্থনে হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বর্ণিত হাদিসটি পেশ করছেন যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, ভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা কেউ কারো ওয়ারিশ নয়। স্ত্রী তার স্বামীর রক্তপনের এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। তবে শর্ত এই যে, তারা যেনো একে অপরের হত্যাকারী না হয়। স্বামী, স্ত্রী — যেই হন্তারক হোক না কেন, নিহতের মীরাস পাবে না (হত্যাকান্ড যদি পরিকল্পিত হয়)। দারাকুতনী। এই সনদের এক রাবী হাসান বিন সালেহ মাজরুহ (বিতর্কিত)।

ইমাম মালেক হিশাম বিন ওরওয়াহ ও ওরওয়াহ এর মাধ্যমে অন্য হাদিসটি পেশ করেছেন এরকম, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আপন ওলীকে (যার ওয়ারিশ হবে এমন নিকটাত্মীয়কে) ভুলক্রমে হত্যা করবে, সেও ওয়ারিশ পাবে। কিন্তু তার দেয়া দিয়তের অংশ পাবে না। এই সনদের এক বর্ণনাকারী মুসলিম বিন আলীকে ইয়াহিয়া মোটেই আমল দেননি। দারাকুতনী ওই রাবীর হাদিসকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। আর দারাকুতনী মুরসালরূপে সাইয়েদ বিন মুসাইয়েব থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পরিকল্পিত অথবা অপরিকল্পিত — সকল ক্ষেত্রেই হত্যাকারী দিয়তের অংশীদার হবে না। আবু দাউদ।

আমরা বলি, এ সমস্ত হাদিসের বিষয়বস্তু দ্বারা বুঝা যায়, ভুলক্রমে হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। কিন্তু বিষয়বস্তু আমাদের নিকট দলিল নয়। আর এ কথাটিও অযৌক্তিক যে, হত্যাকারী সম্পত্তির অংশীদার হবে অথচ দিয়তের অংশ পাবে না (দিয়তও তো ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ)।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ ঐকমত্য এই যে, মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ হবে না। রসুল স. বলেছেন, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ নয়। কাফেরও মুসলমানের ওয়ারিশ নয়। উসামা বিন জায়েদ থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম এবং সুনানে আরবায়া। হজরত মুআজ, ইবনে মুসাইয়েব এবং নাখয়ীর বক্তব্যে এসেছে, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হবে। কিন্তু কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ হবে না। যেমন কোনো মুসলমান কিতাবী (ইহুদী ও খৃষ্টান) রমণীকে বিয়ে করলে তার ওয়ারিশ হবে। কিন্তু স্ত্রী তার ওয়ারিশ হবে না।

ইমাম আহমদ ওয়ারিশ না হওয়া সম্পর্কে দুইটি নিয়ম নির্দিষ্ট করেছেন। একটি এই—যদি আজাদ করে দেয়া গোলাম কাফের হয়, তবে তার মরার পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার মুসলমান মনিব পাবে। হজরত জাবেরের মারফু হাদিসে এসেছে, মুসলমান খৃষ্টানের ওয়ারিশ হবে না। তবে গোলাম বা বাঁদী খৃষ্টান হলে ওয়ারিশ হবে। দারাকুতনী। তিনি আরো লিখেছেন, এই হাদিসটি ওয়ারিশ নির্ধারণ করেছে। আমরা বলি, এখানে ওই সমস্ত বাঁদী বা গোলামের কথা বলা হয়েছে, যারা ব্যবসা করার অনুমতিপ্রাপ্ত। তাদের ওয়ারিশ তাদের মুসলমান মনিবই হবে। ব্যবসার মালকে রূপক অর্থে এখানে মীরাস বলা হয়েছে। কেননা মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম তো গোলামই নয়।

ইমাম আহমদ কর্তৃক নির্ধারিত দ্বিতীয় নিয়মটি এই যে, মৃত্যুবরণকারীর কাফের আত্মীয় যদি সম্পদ বন্টন করার আগেই মুসলমান হয়ে যায় তবে ওয়ারিশ পাবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, পাবে না। এই মতটি জমহুরের মতের অনুকূল।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, মুর্খতার যুগের বন্টন হয়েছ তৎকালীন প্রচলিত নিয়মে। আর ইসলামী জামানার বন্টন হবে ইসলামী নিয়মে। আবু দাউদ।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিসের কথাগুলো হচ্ছে, জাহিলিয়াত যুগের বন্টন জাহেলিয়াতের উপরেই থাকবে। আর ইসলামী যুগের বন্টন থাকবে ইসলামী বন্টনের নিয়মে। ইবনে মাজা। বর্ণিত হাদিস দুটি ইমাম আহমদের বক্তব্যের সমর্থক নয়। কেননা হাদিস দুটোতে এ কথা পরিস্কার উল্লেখ রয়েছে যে, ইসলামী জামানার অনুসরণীয় বন্টনপদ্ধতি হচ্ছে ইসলামী পদ্ধতি। জাহেলিয়াতের নিয়ম এখানে অচল।

ওরওয়া বিন জোবায়ের বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, মুসলমান হওয়ার সময় যে বস্তু তার অধিকারে থাকবে সে বস্তু তারই। ইমাম আহমদের পক্ষে কোনো কোনো আলেম এই হাদিসটিকে দলিল করতে চেয়েছেন। কিন্তু একে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করা যায় না। ইবনে জাওজী।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ ইহুদীরা নাসারাদের এবং নাসারারা ইহুদীদের ওয়ারিশ হবে — তারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও। কেননা সকল কাফের একই। এ কথা বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেছেন, কাফেরদের এক দল অন্য দলের ওয়ারিশ হবে না। রসুল স. বলেছেন, দুই ভিন্ন ধর্মের লোক একে অপরের ওয়ারিশ হবে না। আহমদ, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারাকুতনী। সনদ হচ্ছে, আমর ইবনে শোয়ায়েব - তাঁর পিতা- তাঁর দাদা। এই সনদের পরবর্তী এক রাবী ইয়াকুব বিন আতা দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত। ইবনে হাব্বান এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে। তিরমিজি হজরত জাবের থেকে। তিরমিজির মন্তব্য হচ্ছে, হাদিসটি গরীব। এই সনদের ইবনে আবী লায়লাও দুর্বল হিসেবে পরিচিত। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বায্যার বর্ণনা করেছেন, এক ধর্ম অন্য ধর্মের ওয়ারিশ নয়। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন নাসাঈ, হাকেম ও দারাকুতনী হজরত উসামা বিন জায়েদ থেকে। কিন্তু দারাকুতনী বলেছেন, এই হাদিসের শব্দাবলী সুনির্ধারিত নয়। আবদুল হকের অভিমত, তাঁরা এই হাদিসকে কেবল মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কিত ভেবেছেন। ওদিকে হজরত উসামা থেকে বায়হাকী লিখেছেন, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হবে না। কাফেরও মুসলমানের ওয়ারিশ হবে না। দুই ভিন্ন ধর্মের লোকও একে অপরের ওয়ারিশ হবে না। এই সনদের খলিল বিন মাররাহও রাবী হিসেবে দুর্বল। শেষে এ কথাটিও বর্ণিত হয়েছে যে, দুই ধর্ম হচ্ছে ইসলাম ও কুফর। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মাসআলা ঃ ঐকমত্য এই যে, নবী ও রসুলগণের ওয়ারিশ নেই। তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পদ দান করে দিতে হবে। দান সামগ্রীর ওয়ারিশ হয় না। শিয়া সম্প্রদায় এই মতের বিরোধী। তারা হজরত আবু বকর সিদ্দীক কে এ কারণে অভিসম্পাত করে যে, তিনি রসুল স. এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হজরত ফাতেমা কে দেননি। 'আমরা আম্বিয়া সম্প্রদায়। আমরা আমাদের সম্পত্তির ওয়ারিশ রাখি না। আমরা যা কিছু রেখে যাই তা ছদকা'— এই হাদিসটি খবরে ওয়াহেদ (এককবর্ণিত)। তাই শিয়া সম্প্রদায় বলে, এই হাদিস 'নাহনু মায়াশিরুল আম্বিয়ায়ি লা নূরিছু মা তারাকনাহু সদাক্বাতুন' আয়াতের বিরুদ্ধে। এখানে আয়াতের চেয়ে খবরে ওয়াহেদের মূল্য দেয়া হয়েছে। এছাড়া এই হাদিসটি আরো দুটি আয়াতের বিরুদ্ধে। একটি হচ্ছে, 'ওয়া ওয়ারিছা সুলাইমানু দাউদা,' — 'সোলায়মান দাউদের ওয়ারিশ ।' আর একটি - 'রব্বি হাবলি মিল্লাদুনকা ওলীয়ান ইয়ারিছুনী ওয়া ইয়ারিছু মিন আলী ইয়া'কুব।' কিন্তু এ বিষয়ে খবরে ওয়াহেদই অধিকতর শক্তিশালী। কারণ, এ কথাটি হজরত আবু বকর সিদ্দীক নিজ কানে রসুল স. কে বলতে শুনেছিলেন। তাই বহুবিদিত হাদিস অপেক্ষা এর গুরুত্ব

www.eelm.weebly.com

বেশী। আর এটি প্রকৃতপক্ষে খবরে ওয়াহেদও নয়। এর বর্ণনাকারী ছিলেন সাহাবীগণের একটি দল, যে দলে ছিলেন হজরত হোজায়ফা, হজরত আবু দারদা, হজরত আয়েশা এবং হজরত আবু হোরায়রা ।

বোখারী বর্ণনা করেন, হজরত আলী, হজরত আব্বাস, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হজরত জোবায়ের বিন আওয়াম এবং হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস সহ সাহাবীগণের একটি দলের সামনে হজরত ওমর বললেন, যাঁর হুকুমে আসমান ও জমিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই আল্লাহর কসম দিয়ে আমি বলছি, আপনারা কি এ কথা জানেন না যে,রসুল স. এরশাদ করেছেন, 'আমরা কাউকে ওয়ারিশ বানাবো না। আমরা যা রেখে যাবো তা দান করে দিতে হবে।' এ কথা তিনি নিজের সম্পর্কেই বলেছিলেন —এই পবিত্র ঘোষণাটি কি আপনাদের জানা নেই? সাহাবীগণ জবাব দিলেন, আমরা জানি তিনি স. এমনিই বলেছেন। এরপর হজরত ওমর বিশেষভাবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন হজরত আলী এবং হজরত আব্বাসের দিকে। বললেন, আমি আপনাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি। জবাব দিন। দুজনেই জবাব দিলেন, জানি। অবশ্যই জানি।

হাদিসের কিতাব সমূহে এ বিষয়টি বিশুদ্ধতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের নিকট এই বিষয়টি একটি প্রসিদ্ধ বিষয়। সকলেই এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে একমত। শিয়াদের কিতাবেও এই হাদিসের সমর্থনসূচক হাদিস রয়েছে। মোহাম্মদ বিন ইয়াকুব রাজী আবুল বোখতারীর বর্ণনা থেকে হজরত আবু আবদুল্লাহ জাফর বিন মোহাম্মদ সাদেক এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এরকম, তিনি বলেছেন, ওলামাগণই আম্বীয়াগণের ওয়ারিশ। আম্বীয়া সম্প্রদায় দেরহাম বা দিনারের (পার্থিব সম্পত্তি) মীরাস রেখে যাননি। তাঁদের মীরাস হচ্ছে এলেম। যারা এই এলেমের অংশ পেয়েছে, তারা যেনো পূর্ণ মীরাস লাভ করেছে (নবীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি মীরাস হিসাবে বন্টন করা যাবে না)।

এখন ওই আয়াতটির বিষয়ে কিছু বলা যাক যেখানে বলা হয়েছে, 'ওয়া ওয়ারিসা সোলাইমানু দাউদা - সোলায়মান দাউদের ওয়ারিশ।' এখানেও ওয়ারিশ বলতে এলেমের ওয়ারিশ হওয়া বুঝানো হয়েছে। হজরত সোলায়মান বলেছেন, 'হে মানবমন্ডলী। আমাকে পাখিদের ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়েছে।' হজরত যাকারিয়া আ. তাঁর ছেলের জন্য এমনই দোয়া করেছিলেন যেনো তাঁর এলমী মীরাস লাভ হয়। আর এ কথা তো বিশ্বাসযোগ্য হতেই পারে না যে, যাকারিয়াপুত্র ইয়াহহিয়া সমস্ত বনী ইসরাইলীদের সম্পত্তির ওয়ারিশ হবেন। ওয়ারিশ হতে পারেন তিনি কেবল এলেমের। আর তিনি তা হয়েছিলেনও।

www.eelm.weebly.com

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ○

❑ তোমাদের নারীদিগের মধ্যে যাহারা ব্যভিচার করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চার জন সাক্ষী তলব করিবে; যদি তাহারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাহাদিগকে গৃহে অবরুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাহাদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।

এখানে ব্যভিচার বোঝাতে 'ফাহেশা' শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। 'ফাহেশা' বলতে রমণী-পুরুষ, রমণী-রমণী এবং পুরুষ-পুরুষ — সকল অবৈধ যৌন চরিতার্থতাকে বোঝায়। এ ধরনের সকল অশ্লীলতাকেই ব্যভিচার বলা যায়। ব্যভিচারিণীদেরকে শাস্তি দিতে গেলে চারজন পুরুষের সাক্ষ্য প্রয়োজন। তাদেরকে সাক্ষ্য দিতে হবে যে তারা স্বচক্ষে স্পষ্ট এই পুরুষ ও রমণীকে ব্যভিচারলিপ্ত দেখেছে যেমন সুরমাদানীর সঙ্গে সুরমাদন্ড। সাক্ষীগণ খাঁটি ইমানদার হবেন। ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। এ সমস্ত ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্যও গৃহীত হবে না। এটা ঐকমত্য।

চারজন ইমানদার সাক্ষ্য দিলে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে গৃহবন্দী করতে হবে। এই অন্তরীণ অবস্থা চলতে থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত। অর্থাৎ হজরত আজরাইল আ. কর্তৃক তার জান কবজ করা পর্যন্ত।

অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা করে দিবেন —এর অর্থ শরিয়তের হুকুম জারী করে দিবেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের জন্য নতুন কোনো নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে বন্দী করে রাখো। হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে মুসলিম বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করলেন, আমার কাছ থেকে নাও। আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো। মেয়েদের জন্য আল্লাহ্ উপায় করে দিয়েছেন। অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের ব্যভিচারের শাস্তি একশত দোররা এবং এক বছরের দেশান্তর। আর বিবাহিত ও বিবাহিতাদের জন্য একশত বেত্রাঘাত এবং প্রস্তর নিক্ষেপ।

জ্ঞাতব্যঃ গৃহবন্দী রাখার বিধান কি কোনো শাস্তি,না শাস্তিদানের পূর্ব পর্যন্ত আওতাভূত রাখার ব্যবস্থা,এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায় না। তবে এটা ঠিক যে, গৃহবন্দী

www.eelm.weebly.com

রাখার বিধান রহিত (মনসুখ) হয়নি। কারণ অপরাধীকে না আটকালে শাস্তিদানও সম্ভব নয়। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, বিচারক তাকে আটকে রেখে সাক্ষ্যদাতাদের সম্পর্কে তদন্ত করে নিশ্চিত হতে পারবেন যে,তারা সত্যিকার মুমিন না ফাসেক। ইনশাআল্লাহ সুরা নূরের তাফসীরে ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৬

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○

❒ তোমাদের মধ্যে যে দুইজন ইহাতে লিপ্ত হইবে তাহাদিগকে শাসন করিবে; যদি তাহারা তওবা করে এবং নিজদিগকে সংশোধন করিয়া লয় তবে তাহাদিগকে রেহাই দিবে। আল্লাহ ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু।

নির্দেশ হচ্ছে, ব্যভিচার ও সমকামে লিপ্তদেরকে শাস্তি দাও। নারী ও পুরুষ উভয়কেই শাস্তি দাও। আতা ও কাতাদা বলেছেন, তাদেরকে কড়া কথা দ্বারা শাস্তি দাও। বলো, তোমরা জঘন্য, ঘৃণ্য। আল্লাহ কি তোমাদেরকে লজ্জা দেয়নি? তোমাদের অন্তরে কি আল্লাহর ভয় নেই? হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কড়া কথায় লজ্জা দাও, হাত দিয়ে প্রহার করো। জুতা পেটা করো।

এখানে একটি দ্বিধা জেগে উঠতে পারে যে,পূর্ববর্তী আয়াতে যাদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে তাদেরকে এখানে কেবল কড়া শাসনের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে কেন? এই দুই ধরনের নির্দেশের সামঞ্জস্য সাধনের উপায় কী? গুরুশাস্তিদানের নির্দেশের পর লঘু শাসনের কথা বিসদৃশ নয় কি? এর উত্তরে আলেমগণ বলেছেন, আগের আয়াতে বিবাহিত নারীপুরুষদের ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে, অবিবাহিতদের সম্পর্কে। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতটিই আগে নাজিল হয়েছে।

আমাদের নিকট এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াত ছিলো নারীপুরুষের অবৈধ সঙ্গম সম্পর্কে। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে সমকামের অপরাধ প্রসঙ্গে। মুজাহিদের বক্তব্য এরকমই। এবার বিরোধাভাস রইলো না। জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, সমকামের শাস্তি শরিয়ত নির্ধারণ করে দেয়নি। এ ব্যাপারে শাসক ও বিচারকই শাস্তি নির্ধারণ করতে সক্ষম।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এ ব্যাপারে প্রশাসক যা ভালো মনে করেন করবেন। বার বার শাস্তিদান সত্ত্বেও নিবৃত্ত না হলে শাসক সমকামীদ্বয়কে মৃত্যুদন্ড

www.eelm.weebly.com

দিতে পারেন। এমতক্ষেত্রে বিবাহিত অবিবাহিতদের শাস্তির কোনো পার্থক্য নেই। ইবনে হুমাম লিখেছেন, ইমাম আজমের মতে এ ক্ষেত্রে শাস্তির কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। মৃত্যু পর্যন্ত বন্দী করে রাখা যাবে। যারা এ অপরাধে অনড় তাদেরকে হত্যা করতে হবে।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম ইউসুফের মতে সমকামীদেরকে শরিয়তসম্মত শাস্তিদান ওয়াজিব। ইমাম আহমদের চূড়ান্ত বক্তব্য এবং ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমকামের শাস্তি সঙ্গেছার (প্রস্তর বর্ষণ)। এ শাস্তিতে বিবাহিত অবিবাহিতদের কোনো পার্থক্যরেখা নেই। ইমাম শাফেয়ীর অন্য আর একটি বক্তব্য রয়েছে এরকম- তাদেরকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করতে হবে। ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম ইউসুফ, ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ীর মত হচ্ছে, সমকামের শাস্তি ব্যভিচারের শাস্তির অনুরূপ। অবিবাহিতদেরকে দোররা মারতে হবে,আর বিবাহিতদেরকে পাথর মারতে হবে। সমকামও এক রকম ব্যভিচার (জেনা)। বরং তার চেয়েও ভয়াবহ। ব্যভিচারী নারীপুরুষ বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে শুদ্ধ হতে পারে। কিন্তু সমকামের শুদ্ধতা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। আর কোরআনের দলিলে অপরাধ দুটি সমান্তরালবর্তী অবস্থায় উল্লেখিত হয়েছে। এ ছাড়া আবু মুসা থেকে মারফু হাদিসে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, এই অশ্লীলতায় লিপ্ত পুরুষেরা ব্যভিচারী। অবশ্য এই হাদিসের সনদে মোহাম্মদ বিন আবদুর রহমান নামে একজন রাবী রয়েছে, আবুল হাতেম যাকে মিথ্যুক বলেছেন। আর আবুল ফাতাহ্ বলেছেন দুর্বল। হজরত আবু মুসা থেকে অন্য একটি সনদে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী। এই সনদের এক বর্ণনাকারী বশীর বিন ফজল বাজালী আবার অপরিচিত। আবু দাউদ তাঁর মসনদেও এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আভিধানিক অর্থে জেনা ও সমকাম সমার্থক নয়। তাই সাহাবীগণ এ ব্যাপারে শরিয়তের হদ জারী করার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। জেনা অপেক্ষা সমকামের অপরাধ অপেক্ষাকৃত লঘু। কেননা সমকামে দুজনের অভিলাষ পূর্ণ হয় না। হয় একজনের। তাই জেনা ও সমকাম অবিকল একই প্রকৃতির নয়। যারা সমকামের জন্য শরিয়তের শাস্তি জারী করার পক্ষপাতি তাদের দলিল হচ্ছে হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদিসটি। তিনি বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, যাকে লুত আ. এর কওমের মতো অশ্লীলতালিপ্ত দেখতে পাবে, তাকে হত্যা করবে। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম এবং বায়হাকী। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ইকরামা থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। তিরমিজি বলেছেন, ইকরামার মাধ্যমেই ইবনে আব্বাসের বর্ণনা ভালো বোঝা যায়। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। বোখারী বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

ইকরামার ছাত্র আমর বিন আবী আমর নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তিনি ইকরামার মাধ্যমে অনেক দুর্বল হাদিসও এনেছেন। নাসাঈও তাঁকে দুর্বল বলেছেন। ইবনে মুঈন বলেছেন, তিনি সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য)। কিন্তু তাঁর মাধ্যমে বর্ণিত এই হাদিসটি অত্যধিক দুর্বল। তিনি ছাড়াও বেশ কয়েকজন জড়িত রয়েছেন এই বর্ণনাটির সঙ্গে। হাকেম অন্য এক পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন এবং এর শুদ্ধাশুদ্ধ সম্পর্কে তিনি নিশ্চুপ। জাহাবী বলেছেন, আবদুর রহমান ওমরী নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভূত। ইবনে মাজা এবং হাকেম আবার এই হাদিসটি এনেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। কিন্তু এর সনদ প্রথমোক্তটি অপেক্ষাও দুর্বল। হাফেজ বলেছেন, হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হাদিসটি বিশুদ্ধ নয়। বায্যারও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বর্ণনা করেছেন আছেম বিন ওমর ওমারী থেকে। কিন্তু আছেম মাতরুক বলে গণ্য। ইবনে মাজা'র বর্ণনাটি এরকম — উপরের এবং নিচের জনকে পাথর মারো। ইবনে সালাহ তার আহকামে লিখেছেন, রসুল স. এর কথায় সমকামীদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপ করার হুকুম পাওয়া যায় না। তবে তিনি স. বলেছেন, দুজনকেই হত্যা করে ফেলো। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, একক বিশুদ্ধ বর্ণনাও কিতাবুল্লাহ্র চেয়ে অগ্রগণ্য নয়। তাই এখানে কোরআনের নির্দেশই পালনীয়। কোরআনে কষ্ট দেয়ার কথা আছে। হত্যার কথা নেই।

একটি ধারণা ঃ এটা সর্ববাদীসম্মত নয় যে, এই আয়াতটি সমকাম সংক্রান্ত। বরং অধিকাংশ তাফসীরকার এই আয়াতটিকেও পুরুষ রমণীর ব্যভিচার বিষয়ক বলেছেন।

সমাধান ঃ তাফসীরকারগণ ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আয়াতে উল্লেখিত 'ফাহেশা' শব্দটি ব্যাপক অর্থসম্পন্ন। ব্যভিচার, সমকাম ▯ সব রকম অশ্লীলতাই ওই শব্দটির আওতায় পড়ে। আল্লাহ্তায়ালা নবী লুতের সম্প্রদায়ের লোকদের লক্ষ্য করে বলেছেন, 'তোমরা এমন এক অশ্লীল (ফাহেশা) কাজে লিপ্ত হয়েছো, যা আগে কেউ করেনি'। সমকাম সম্পর্কে সাহাবীগণের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। বায়হাকী তাঁর শোয়াবুল ইমান গ্রন্থে ইবনে আবী দ্দুনিয়ার নিয়মে মোহাম্মদ বিন মুনকাদের থেকে বর্ণনা করেন, একবার হজরত খালেদ বিন ওলিদ হজরত আবু বকর সিদ্দীককে লিখে জানালেন, আরবে এমন এক পুরুষ আছে যে, মহিলাদের মতো যৌনসঙ্গমে রত হয়। হজরত আবু বকর সাহাবীগণকে একত্র করে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। কঠিন পরামর্শ দিলেন হজরত আলী। তিনি বললেন, এই অশ্লীলতায় লিপ্ত ছিলো লুত আ. এর সম্প্রদায়। আমরা জানি আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে কী ভয়াবহ শাস্তি দিয়েছিলেন। আমি মনে করি ওই ঘৃণ্য ব্যক্তিটিকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হোক। সকল সাহাবী হজরত আলীর এ কথায় একমত হলেন।

www.eelm.weebly.com

ইবনে আবী শায়বা তাঁর মোছান্নেফ গ্রন্থে এবং বায়হাকী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, এ ধরনের গোনাহগারকে ওই লোকালয়ের সবচেয়ে উঁচু অট্টালিকার উপরে উঠিয়ে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিতে হবে। তারপর তার উপর নিক্ষেপ করতে হবে পাথর। এই বক্তব্যটির মর্ম এই যে, হজরত লুতের কওমকেও এমনি করেই ধ্বংস করা হয়েছিলো। তাদের সমস্ত জনপদকে শূন্যে উঠিয়ে নিয়ে উল্টো করে মাটিতে আছড়ে ফেলা হয়েছিলো। তাদের সাথে সাথে সুদৃশ্য অট্টালিকাগুলোও মৃত্তিকাপ্রোথিত হয়েছিলো।

হজরত ইবনে জোবায়ের বলেছেন, চরম দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে সমকামীদেরকে বন্দী করে রাখতে হবে যেনো তারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়। বায়হাকী একাধিক নিয়মে বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী এক সমকামীকে প্রস্তরবর্ষণ করে হত্যা করেছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাসের মারফু হাদিস ও এ সম্পর্কিত অন্যান্য বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, বার বার কঠোর শাসন সত্ত্বেও যদি কেউ এই কুঅভ্যাস ত্যাগ না করে, তবে তাকে হত্যা করতে হবে। হাদিস শরীফের মর্মও এরকম। বলা হয়েছে, তোমরা যদি কাউকে লুত সম্প্রদায়ের মতো আমল করতে দেখো– অর্থাৎ তাদের মতো অশ্লীলতায় অটল পাও। তাদেরকেও বার বার সতর্ক করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা সংশোধিত হয়নি বলেই শাস্তি দেয়া হয়েছিলো। এরকম বক্তব্য পেশ করেছেন ইমাম আবু হানিফা।

তাওবাকারীদের প্রতি আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ। তওবা অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। বান্দার তওবা হচ্ছে অপরাধ স্থগিত রাখা। আর আল্লাহ্র তওবা হচ্ছে আযাবের সিদ্ধান্ত কার্যকর না করা, বান্দার তওবা কবুল করা, বান্দাকে তওবার সুযোগ প্রদানে ধন্য করা। অপরিসীম দয়ার কারণেই আল্লাহ্পাক ক্ষমার অঙ্গীকার করেছেন। সুতরাং যারা অজ্ঞ, অপরিণামদর্শী তারা যেনো তওবা করে। ফিরে আসে ক্ষমার সীমানায়। এ সম্পর্কে নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে —

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৭

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ○

❑ আল্লাহ্ অবশ্যই সেই সব লোকের তওবা গ্রহণ করিবেন যাহারা ভুলবশতঃ মন্দ কার্য করে এবং সত্বর তওবা করে; ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ্ ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

---

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, হজরত কাতাদা বলেন, রসুল সঃ-এর সাহাবীগণের সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত সকল গোনাহ্‌র ভিত্তিই অজ্ঞতা। আল্লাহ্‌তায়ালার অবাধ্য যারা তারা অবশ্যই মূর্খ। ইবনে জারীর আবুল আলীয়ার বক্তব্যকেও এরকমভাবে উপস্থাপন করেছেন। কলবী 'বিজাহালাতিন' শব্দটির তাফসীরে বলেছেন, গোনাহ্ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে তারা অজ্ঞ নয়, তবে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে অজ্ঞ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, চিরস্থায়ী শান্তির চিন্তা পরিত্যাগ করে অস্থায়ী আনন্দে মত্ত হওয়ার নামই জাহালাত বা অজ্ঞতা। আমি বলি, পশুপ্রবৃত্তির প্রভাবে আনন্দোম্মত্ত হয়ে আল্লাহ্‌র আযাবাশংকা বিস্মৃত হওয়ার নামই জাহালাত।

পাপীষ্ঠেরা যেনো অনতিবিলম্বে তওবা করে নেয়। পাপের শিকল অন্তরে প্রোথিত হওয়ার আগেই তওবা করতে হবে। তওবা করতে হবে পূণ্যকর্মসমূহ বিনষ্ট হওয়ার আগেই। পাপে পূর্ণনিমজ্জনের পূর্বেই। সুদ্দী ও কালাবী বলেছেন, মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার আগেই সুস্থাবস্থায় তওবা করতে হবে। প্রকৃত কথা এই যে, ত্বরিৎ তওবার অর্থ জীবিত থাকতেই তওবা করে নেয়া। আযাবের ফেরেশতা সম্মুখবর্তী হওয়ার আগেই তওবা করা। ইকরামা এবং জুহাকও এরকম বলেছেন। অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে, মৃত্যু সমুপস্থিত হলে তওবা কবুল হয় না। রসুল স. বলেছেন, মৃত্যুকষ্টের (সাখরাতুল মউতের) আগে আল্লাহ্‌র বান্দারা তওবা করে নেন। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, হাকেম।

বায়হাকী হজরত ওমর থেকে হাদিস বর্ণনা করে বলেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। তিনি আর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাইদ খুদ্‌রী থেকে যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, শয়তান আরজ করলো, তোমার মর্যাদা ও মহত্ত্বের শপথ! আমি মানুষকে সব সময় বিভ্রান্ত করতে থাকবো যতক্ষণ তারা জীবিত থাকবে। আল্লাহ্ বললেন, আমার মর্যাদা ও মহিমার শপথ। আমিও সবসময় তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকবো, যখনই তারা ক্ষমাপ্রার্থী হবে। আহমদ, আবু ইয়ালা। হজরত আবু মুসা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা নিশীথে তাঁর বাহুবিস্তৃত করেন যেন দিনের গোনাহ্‌গারেরা তওবা করে (ফিরে আসে) এবং দিবসেও হাত বাড়িয়ে দেন যেন প্রত্যাবর্তন করে রাতের পাপীরা। বিরামহীন ভাবে এই নিয়মই চলতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন না পশ্চিমাকাশে সূর্য উদিত হবে। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, সূর্য পশ্চিমাকাশে উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তওবাকারীদের তওবা কবুল করবেন আল্লাহ্‌পাক। মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। আখেরাতের অন্তহীনতার তুলনায় এখানের জীবন মুহূর্ত মাত্র এবং তাও সম্ভবত নয়। তাই তওবা করা বুদ্ধিমত্তার দাবী।

আল্লাহ্পাক তওবাকারীদের তওবা কবুল করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিনি সবকিছুই জানেন। মহাজ্ঞানী তিনি। পরমতম প্রজ্ঞাময় তিনি। তিনি ভালো করেই জানেন, কে খাঁটি তওবাকারী, কে শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের যোগ্য।

সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৮

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰۤى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

❑ তওবা তাহাদের জন্য নহে যাহারা আজীবন মন্দ কার্য করে এবং তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইলে সে বলে, 'আমি এখন তওবা করিতেছি' এবং তাহাদের জন্যও নহে যাহাদের মৃত্যু হয় সত্য প্রত্যাখানকারী অবস্থায়। ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছি।

যারা পাপাভ্যাসে নিরবচ্ছিন্ন, তাদের তওবার অবকাশ হয় না। মৃত্যুকষ্ট শুরু হলে যখন আযাবের ফেরেশতারা পরিদৃষ্ট হন, তখন তওবা করলে কাজ হবে না। ওই সময় কাফেরদের ইমান এবং পাপিষ্ঠদের তওবা কোনোটিই গৃহীত হয় না। সত্য প্রত্যাখ্যানকারী এবং পাপী অবস্থায় পৃথিবী পরিত্যাগকারীদের জন্য শাস্তি অবধারিত। তারা আখেরাতে গিয়ে তওবার ঘোষণা দিবে। বলবে, 'হে আল্লাহ্ আমরা তোমার আযাব দেখেছি ও শুনেছি। এখন পুনরায় আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও। পুনরায় পৃথিবীতে পাঠালে আমরা উত্তম আমল করবো এবং ইমানদার হয়ে যাবো।' তাদের ওই তওবাও গৃহীত হবে না। যারা পৃথিবীর জীবনে পাপ থেকে তওবা করেছে বটে, কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছে অবিশ্বাসের সঙ্গে — তাদেরকে গুনাহ ও কুফর উভয়ের জন্যই আযাব দেয়া হবে। আর আযাব হবে অত্যন্ত ভয়াবহ, মর্মন্তুদ।

বোখারী, আবু দাউদ ও নাসায়ী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে লিখেছেন, (মুর্খতার যুগের) দস্তুর ছিলো এরকম — কেউ মরে গেলে তার বিধবা স্ত্রীকে অধিকার করে নিত ওই মৃত ব্যক্তিরই কোনো প্রিয়জন। ইচ্ছে করলে সে তাকে বিয়ে করতো। ইচ্ছে না হলে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দিত। এমতাবস্থায় বিধবার

www.eelm.weebly.com

মতামতের মূল্য থাকতো না। এই প্রসঙ্গটিকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৯

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ○

❒ হে বিশ্বাসিগণ! নারীদিগকে জবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নহে; তোমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ তাহা হইতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিও না। যদি না তাহারা প্রকাশ্য ব্যভিচার করে তাহাদের সহিত সৎভাবে জীবনযাপন করিবে; তোমরা যদি তাহাদিগকে ঘৃণা কর তবে এমন হইতে পারে যে আল্লাহ্ যাহাতে প্রভূত কল্যাণ রাখিয়াছেন তোমরা তাহাকে ঘৃণা করিতেছ।

এরশাদ হয়েছে, মেয়েদেরকে বলপ্রয়োগে বশে রাখা বৈধ নয়। তাদেরকে মীরাসের সম্পত্তির মতো মনে করাও অনুচিৎ। বিবাহের ব্যাপারে তাদেরকে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। 'কুরহান' অর্থ যদি তারা না চায়। ক্বারী হামজা ও ক্বারী কুসাই এ স্থানে ও সুরা তওবায় এই শব্দটিকে 'কুরহান' পড়তেন। অন্যান্য ক্বারী সকল স্থানেই 'কারহান' উচ্চারণ করতেন। ফাররা বলেছেন, 'কুরহান' অর্থ কাউকে বাধ্য করা। আর 'কারহান' অর্থ নিজ ইচ্ছা অনুসারে জবরদস্তি কোনো কাজ করা। কুসাই বলেছেন, উভয় শব্দের অর্থ একই। বাগবী লিখেছেন, জাহেলিয়াতের জামানায় নিয়ম ছিলো কেউ মারা গেলে তার বড় ছেলে, ছেলে না থাকলে কোনো নিকটতম আত্মীয় মৃতব্যক্তির স্ত্রীর উপর অথবা তার তাঁবুর উপর আপন পরিধেয় রেখে দিতো। এভাবেই বিধবার উপর প্রতিষ্ঠিত হতো তাদের অধিকার। বিধবারা কিছুই বলতে পারতো না। এরপর ছেলে কিংবা আত্মীয় বিয়ে করতে চাইলে মোহরানা ছাড়াই বিয়ে করতো। পূর্বে প্রদত্ত পিতা বা মৃত আত্মীয়ের মোহরানাকেই যথেষ্ট মনে করতো তারা। আর নিজে বিয়ে না করে বিধবাদের অন্যত্র বিয়ে দিলে মোহরানার টাকা নিয়ে নিতো নিজেরাই। বিধবা

www.eelm.weebly.com

হতো মোহরানাবঞ্চিত। কখনো এরকম হতো — নিজেরাও বিয়ে করতো না। অন্যস্থানেও বিয়ে দিতো না, যেনো বিধবা তার প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া অর্থসম্পদ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এভাবে সম্পত্তি সম্প্রদান করে বিধবারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো।

এই আয়াতে এ সকল অনাচার নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন। এর সঙ্গে বগবী সংযোজন করেছেন, ওই বিধবার মৃত্যু হলে যে তার ওপর কাপড় ফেলে দিতো, সেই হতো ওয়ারিশ। আর একটা ব্যাপার ছিলো এই যে, সদ্য বিধবা নারীর উপর ছেলে বা নিকটাত্মীয়ের কেউ কাপড় ফেলে দেয়ার পূর্বেই যদি সে পিত্রালয়ে চলে যেতে পারতো তবে বেঁচে যেতো। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতো। এ সমস্ত ছিল অন্ধকার যুগের নিয়ম।

ইসলামী যুগের একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে নাজিল হয়েছে এই আয়াত। ঘটনাটি এই — আবু কায়েস বিন আসলত আনসারী মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর স্ত্রী কাবিসা বিনতে মাআ'জ বিধবা হলেন। কাবিসার উপর কাপড় ফেলে দিলো তাঁর ছেলে হোসাইন। মুকাতিল বিন হাব্বান তার নাম কায়েস বিন কায়েস বলেছেন। কাবিসার অধিকার লাভ করার পর তার ছেলে তাকে সকল প্রকার খরচপত্র দেয়া বন্ধ করে দিলো। উদ্দেশ্য, তিনি যেনো তাকে সম্পত্তি দিতে বাধ্য হন। এভাবে কিছু ফিদিয়া নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেয়াই ছিলো ছেলের অভিসন্ধি। কাবিসা তখন রসুল স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আবু কায়েস ইন্তেকাল করেছেন। এখন তার ছেলে আমাকে অধিকার করে নিয়েছে। সে খরচপত্র দেয় না। কাছে আসেনা। পথও ছাড়ে না। তিনি স. বললেন, তুমি তোমার ঘরে বসে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকো। কাবিসা অপেক্ষায় রইলেন। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। আয়াতে বলা হলো, তাদের বিবাহে বাধাদান বৈধ নয়। তাদের ওয়ারিশি সম্পত্তি কুক্ষিগত করার চেষ্টাও বৈধ নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত ওই ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যে তার স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করতো না। যে স্ত্রীসহবাসকে ঘৃণা করতো। সে চাইতো প্রদত্ত মোহরানা ফেরত নিয়ে স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে। আল্লাহ্ তার এই অসৎ উদ্যোগকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

আয়াতের শেষ দিকে বলা হয়েছে, স্ত্রী যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারিণী হয়, তবে মোহরানা ফেরত নেয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু জরিমানা আদায়ের চেষ্টায় তাদের পথরোধ করা যাবে না। বাধা প্রদান বৈধ হবে কেবল অশ্লীলতালিপ্ত দেখলে।

হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত কাতাদা বলেছেন, এখানে 'বি ফাহেশা' শব্দটির অর্থ হবে স্বামীর অবাধ্যতা। হাসান বসরী বলেছেন, অর্থ হবে ব্যভিচার

www.eelm.weebly.com

(জেনা)। অর্থাৎ স্ত্রী যদি অবাধ্য হয় অথবা ব্যভিচার করে তবে তাকে খোলা তালাক দেয়া বৈধ হবে (স্ত্রীর তালাকের প্রস্তাবে স্বামী সম্মত হলে খোলা হয়। এ ক্ষেত্রে মোহরানার দাবী থাকে না)। হজরত কাতাদা আরো বলেছেন, স্ত্রী ব্যভিচারিণী হলে তাকে দেয়া সম্পদ ফিরিয়ে নেবে এবং তাকে বের করে দেবে।

এরশাদ হয়েছে, তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে। সদাচারী হবে। হাসান বসরী বলেছেন, এই নির্দেশটি ওই আয়াতের সমার্থক যেখানে বলা হয়েছে, আনন্দচিত্তে মোহর পরিশোধ করো এবং তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।

আরো এরশাদ হয়েছে, রূপহীনতা অথবা চরিত্রহীনতার কারণে তারা যদি তোমাদের ঘৃণাভাজন হয়,তবুও ধৈর্য ধারণ করাই শ্রেয়। ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে এই ভেবে যে, হয়তো এতেই রয়েছে কল্যাণ। এতে লাভ হবে আখেরাতের সওয়াব । দুনিয়াতে সৎ সন্তানও লাভ হতে পারে। তোমরা যা পছন্দ করো না, তা মন্দ নাও হতে পারে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ২০

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ○

❐ তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাহাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়া থাক তবুও তাহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিও না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা উহা গ্রহণ করিবে?

অবাধ্যতা অথবা ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পুনঃ বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ অশোভন হলেও নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর নিকট থেকে কোনোকিছু গ্রহণ করা যাবে না। মোহরানা হিসাবে প্রচুর অর্থ দেয়া সত্ত্বেও না। 'কিনতরা' অর্থাৎ প্রচুর অর্থের ব্যাখ্যা হিসাবে হাদিস শরীফে এসেছে, ইবনে জারীর হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কিনতরা হলো বারোশ' উকিয়া। এই আয়াত দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয়েছে, মোহরের কোনো সীমা নির্দ্ধারণ নেই। এটাই ঐকমত্য। একবার হজরত ওমর অধিক মোহরানা নির্ধারণ নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তখন এক রমণী এই দলিল পেশ করেছিলেন। হজরত তখন বলেছিলেন, প্রত্যেকেই দেখছি দ্বীন সম্পর্কে ওমরের চেয়ে অধিক ওয়াকিফহাল। পর্দানশীন ললনারাও।

জ্ঞাতব্য ঃ আবদুর রহমান সালমী বর্ণনা করেন, হজরত ওমর নির্দেশ জারী করলেন, অধিক মোহর নির্ধারণ কোর না। এক মহিলা বললেন, আপনি এমত

www.eelm.weebly.com

নির্দেশ দানের অধিকার রাখেন না। কেননা আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন, 'ওয়া আতাইতুম ইহদাহুন্না কিনতরান মিন জাহাব' বর্ণনাকারী বললেন, ইবনে মাসউদের ক্বিরাত এরকমই ছিলো অর্থাৎ 'কিনতরান' এর পরে 'মিন জাহাব' ছিলো।

হজরত ওমর বলেছেন, এক মহিলা ওমরের সঙ্গে বিতর্ক করে বিজয়িনী হয়েছে। বকর বিন আবদুল্লাহ মাজানী রা. বর্ণনা করেন, হজরত ওমর রা. বলেছেন, আমি অধিক মোহর নির্ধারণ করার পক্ষপাতি নই। কিন্তু আমি নিরুপায়। কারণ কোরআনের আয়াত রয়েছে আমার সামনে।

ঐকমত্য এই যে, অত্যধিক মোহর নিধারণ না করাই মোসতাহাব। হজরত ওমর বলেছেন, মোহর অধিক কোর না। অধিক মোহর যদি সম্মানজনক কিছু হতো এবং আল্লাহর নিকট তাকওয়া হিসেবে গৃহীত হতো তবে রসুল স. তাই করতেন। আমি অবগত নই যে, তিনি স. তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং কন্যাগণের জন্য বারোশ' উকিয়ার অধিক মোহরানা নির্ধারণ করেছেন। আহমদ, আসহাবে সুনানে আরবা ও দারেমী।

খাত্তাবী ও ইবনে হাব্বান ' সহীহ' এর মধ্যে হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই রমণীই উত্তম যার মোহরানা অত্যধিক নয়। ইবনে হাব্বান হজরত আয়শা থেকে আরো লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, স্ত্রীর খরচপত্র সহজ হওয়া এবং মোহর কম হওয়া তার জন্য বরকত। আহমদ ও বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, ওই রমণীরাই সবচেয়ে কল্যাণময়ী যার মোহরানা সহজ অর্থাৎ অনধিক। এই বর্ণনাটির সনদ উত্তম। আবু সালমার বর্ণনায় রয়েছে. হজরত আয়শাকে জিজ্ঞেস করলাম রসুল স. এর স্ত্রীগণের মোহরানা কতো ছিলো? তিনি বললেন, তাঁর স্ত্রীগণের মোহর ছিলো বার আউকিয়া এবং নশ। তোমরা কি জানো নশ কাকে বলে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন নশ অর্থ অর্ধেক আউকিয়া। মুসলিম। বারো আউকিয়া এবং এক নশ মিলে হয় পাঁচ শ' দেরহাম। উম্মে হাবিবা রা. ছাড়া অন্য স্ত্রীদের মোহরানার পরিমাণ ছিলো এই। উম্মে হাবিবার মোহরানা ছিলো চার হাজার দিরহাম। রসুল স. এর পক্ষ থেকে এই মোহর পরিশোধ করেছিলেন নাজ্জাশী। আবু দাউদ, নাসাঈ। ইবনে ইসহাক আবু জাফর রা. এর বর্ণনা থেকে লিখেছেন, তাঁর মোহরানা ছিলো চারশ' দীনার।

খুলাসাতুস্ সিয়ার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, রসুল স. হজরত খাদিজার মোহর নির্ধারণ করেছিলেন বারো আউকিয়া সোনা। এক আউকিয়ার পরিমাণ সাত মিছকাল। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, হজরত খাদিজার মোহর ছিলো বিশটি উটনি এবং চারশ' আশরাফী। খুলাসাতুস্ সিয়ার। আহমদ ও আবু দাউদ হজরত আয়শার বর্ণনা থেকে লিখেছেন, হজরত জুয়াইরিয়ার মিলিত অধিকার লাভ করেছিলেন সাবেত বিন কায়েস বিন সাম্মাস এবং তাঁর চাচাতো ভাই। মদীনায়

www.eelm.weebly.com

সাবেতের ছিলো কিছু খেজুর গাছ। ওই গাছগুলি তাঁর চাচাতো ভাইকে দিয়ে তিনি জুয়াইরিয়ার একক অধিকার লাভ করলেন এবং তাঁকে মুকাতাব বানিয়ে দিলেন। (নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে যাকে মুক্তি দানের ঘোষণা দেয়া হয় তাকে মুকাতাব বলে)। রসুল স. সেই নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধ করে দিয়ে জুয়াইরিয়াকে মুক্তি দিলেন এবং বিবাহ করলেন। ওই অর্থকেই তিনি তাঁর মোহরানা সাব্যস্ত করলেন। সাবিলুর রাশাদের মধ্যে আছে, সাবেত এবং তাঁর চাচাতো ভাই জুয়াইরিয়াকে মুকাতাব করেছিলেন। বিনিময় মূল্য ছিলো নয় আউকিয়া সোনা।

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, অনেকের মধ্যে তখন এই কুঅভ্যাসটি প্রচলিত ছিলো যে, তারা পূর্ব স্ত্রী পরিত্যাগ করে নতুন বিবাহ করতে চাইলে প্রথমাকে ব্যাভিচারের অপবাদ দিতো, যেনো সে কিছু অর্থ সম্পদ দিয়ে স্বইচ্ছায় সরে যায়। এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে আল্লাহ পাক এই অন্যায় আচরণটিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এরশাদ করেছেন, তার নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ কোর না। যদি করো তবে তা হবে মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপাচারের অর্জন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ২১

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ○

❐ কিরূপে তোমরা উহা গ্রহণ করিবে, যখন তোমাদের এক অপরের সহিত সংগত হইয়াছ এবং তাহারা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি লইয়াছে?

নির্ধারিত মোহরানা পরিশোধ করা ওয়াজিব। মোহরানা ফেরত নেয়ার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া নির্জন মিলনও সম্পন্ন হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কেবল একত্রে রাত্রি যাপন করলেই মোহরানার দাবী মজবুত হয় না। যৌনসহবাস হতে হবে। যৌনসহবাস ছাড়া রাত্রি যাপনের পর তালাক দিলে অর্ধেক মোহরানা পরিশোধ করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, একত্রে রাত্রি যাপন করলে পূর্ণ মোহর পরিশোধ করতে হবে। যৌনসহবাস হলো কিনা সে সংবাদ নেয়ার প্রয়োজন নেই। ইমাম মালেক বলেছেন, নির্জনে মিলিত হলে যৌনসহবাস ছাড়াই মোহর পরিশোধ ওয়াজিব হয়ে যাবে। তবে নির্জন মিলনের সময় হতে হবে দীর্ঘ। ইবনে কাসেম বলেছেন, দীর্ঘ সময় অর্থ এক বৎসর। ইমাম শাফেয়ীর দলিল ওই আয়াতটি যেখানে বলা হয়েছে, ' তোমরা যদি রমণীদের মোহর নির্ধারণ করে থাকো আর সহবাসের পূর্বে

www.eelm.weebly.com

তালাক দাও তবে পরিশোধ করতে হবে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক। ওয়া ইন ত্বল্লাকতু মুহুন্না মিন ক্ববলি আন তামাসসুহুন্না ওয়া ক্বদ ফারাজতুম লাহুন্না ফরিদাতান ফা নিসফু মা ফারাজতুম।

ইমাম শাফেয়ী এই আয়াতের 'মাস' শব্দটির অর্থ গ্রহণ করেছন সহবাস। আমরা বলি, এ রকম অর্থ রূপক হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু 'মাস' শব্দটির প্রকৃত অর্থ সহবাস নয়, যদিও সহবাস অর্থ এর অর্ন্তভূত। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী সাধারণ অর্থবোধক এই শব্দটিকে বিশেষ অর্থে নিয়েছেন।

আমরা কিন্তু নির্জন মিলন সংঘটিত হলেই সম্পূর্ণ মোহরানা পরিশোধ্য বলি। ইসলামের প্রথম যুগের ঐকমত্য এই যে, নির্জন মিলনকেই সহবাস সহ মিলন ধরে নিতে হবে - সহবাস হোক আর না হোক। আর এমন ক্ষেত্রে মোহরানার অর্থ সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে হবে। শায়েখ আবু বকর রাজী তাঁর 'আহকাম' পুস্তকে এ বিষয়টির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাহাবী বলেছেন, এ ব্যাপারে সাহাবীগণ একমত। ইবনে মুনজির লিখেছেন, এ রকম কথা হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত জায়েদ বিন সাবেত, হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর, মুয়াজ বিন জাবাল এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। বায়হাকী বর্ণনা করেন, হজরত ওমর ও হজরত আলী বলেছেন, যদি দরজা বন্ধ করা হয় অথবা যবনিকাবৃত করা হয় তবে সম্পূর্ণ মোহরই দিতে হবে এবং এরপর তালাক দিলে ইদ্দতও জরুরী হবে।

মোয়াত্তা গ্রন্থে ইয়াহিয়া বিন সাঈদের মাধ্যমে হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়েবের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, যখন পর্দার অন্তরাল করে দেয়া হয় তখন পুর্ণ মোহরানা ওয়াজিব হয়ে যায়। আবদুর রাজ্জাক তাঁর 'মোছান্নেফ' পুস্তকে হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে হজরত ওমরের এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।

হজরত আলী থেকে দারা কুতনী বর্ণনা করেন, কপাট বন্ধ করলে, পর্দার আড়াল করে দিলে এবং স্ত্রীকে নগ্ন অবস্থায় দেখে নিলে স্বামীর উপর পূর্ণ মোহর পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। এর পর তালাক দিলে স্ত্রীকে ইদ্দতও পালন করতে হবে। দারা কুতনী এক মারফু হাদিসে মোহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন সাওবানের বর্ণনা থেকে মুরসাল হিসাবে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি (নির্জনে) স্ত্রীর ওড়না খুলে তাকে একান্তে দেখে নিয়েছে তার উপর মোহরানা (সম্পূর্ণ) ওয়াজিব হবে। সহবাস করুক কিংবা নাই করুক। এই সনদের এক বর্ণনাকারী ইবনে লেহিয়া দুর্বল বলে গণ্য। কিন্তু ইবনে জাওজী বর্ণনা করেন, আলেমগণ আবার ইবনে লেহিয়ার বর্ণনাকে গ্রহণও করেছেন। আবু দাউদও মুরসাল হিসাবে ইবনে সাওবান থেকে এরকম লিখেছেন। এই সনদের সকল বর্ণনাকারীরাই সিকা (নির্ভরযোগ্য)। আর মুরসাল আমাদের নিকট দলিল হিসাবে গ্রাহ্য।

www.eelm.weebly.com

শাফেয়ী মাজহাবের অভিমতের সমর্থনে ইবনে মাসউদ এবং ইবনে আব্বাস থেকে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। কিন্তু বর্ণনাগুলো সহীহ্ নয়। শা'বীর বর্ণনাকে ইবনে মাসউদের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বায়হাকী লিখেছেন, যে মহিলা বিনা সহবাসে নির্জনে মিলিত হয় সে অর্ধেক মোহর পাবে। শাফেয়ীও ইবনে আব্বাস রা. থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সনদ দুর্বল। ইবনে আবী শায়বা এবং বায়হাকীও অন্য সনদে এরকম বলেছেন। কিন্তু এই সনদটিও নির্ভুল নয়।

তারা তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে—এ সম্পর্কে হাসান, ইবনে শিরিন, জুহাক এবং কাতাদা রা. বলেছেন, দৃঢ় প্রতিশ্রুতির অর্থ মেয়েদের অভিভাবকের এই কথা — আমি আমার অভিভাবকাধীনাকে এই শর্তে বিবাহ দিচ্ছি যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়মশৃঙ্খলার সঙ্গে বিবাহাধীনে রাখবে অথবা ছেড়ে দিতে মনস্থ করলে উত্তম পদ্ধতিতে ছেড়ে দিবে।

শা'বী এবং ইকরামা বলেছেন, দৃঢ় প্রতিশ্রুতির অর্থ বর্ণিত হয়েছে মুসলিম শরীফের ওই হাদিসে যেখানে রসুল স. এরশাদ করেছেন, নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহে আস্থা রেখে তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছো। তাদের লজ্জাস্থান তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে আল্লাহর হুকুমেই। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের। ইবনে ওমর থেকে ইবনে জারীরও এ রকম বর্ণনা করেছেন। এ সকল হাদিসের মর্ম এই যে, বিবাহের মাধ্যমে তোমরা পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই অঙ্গীকারকে সম্মান করতে হবে।

ইবনে সা'দ, মোহাম্মদ বিন কাব কারাজীরী বর্ণনায় লিখেছেন, (জাহেলিয়াত যুগের নিয়ম ছিলো) মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর অধিকার লাভ করতো তার বড় ছেলে। আপন মা না হলে বড় ছেলে তাকে বিয়ে করতো। অথবা অন্য কারো সাথে বিয়ে দিয়ে দিতো। আবু কায়েস বিন সালমার ইন্তেকালের পর তার বড় ছেলে তার পিতার স্ত্রীর অধিকার লাভ করলো। আবু কায়েসের বিধবা স্ত্রীকে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ দিলো না। বিধবা তখন রসুল স.কে সব কথা জানালেন। রসুল স. বললেন, এখন তুমি যাও। সম্ভবতঃ তোমার বিষয়ে কোনো হুকুম অবতীর্ণ হবে।

ইবনে আবী হাতেম, ফারইয়ানী এবং তিবরানী হজরত আদীবিন সাবেতের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, আবু কায়েস বিন সালমা আনসারী রা. ছিলেন বড়ই পূণ্যবান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করতে চাইলো তাঁরই বড় ছেলে। বিধবা বললেন, তুমি আমার সন্তান তুল্য। তাছাড়া তুমি পূণ্যবানও (তাহলে কিভাবে বিবাহ হবে)। এরপর তিনি রসুল স.কে আনুপূর্বিক ঘটনা বিবৃত করলেন। রসুল স. বললেন, ঘরে যাও (এবং হুকুমের প্রতীক্ষায় থাকো)। তারপর অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

www.eelm.weebly.com

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ۝

❒ নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিওনা; পূর্বে যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। ইহা অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।

পিতা ও পিতামহদের স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা যাবে না। এ কাজটি অতিশয় অশ্লীল; ঘৃণ্য এবং চরম লজ্জাজনক। অতীতেও কোনোদিন একাজের অনুমতি ছিলো না। তবে যারা ইতোপূর্বে এরকম করে ফেলেছে তাদেরকে আল্লাহপাক ক্ষমা করে দিচ্ছেন। কিন্তু এই ঘোষণার পর এই ধরনের অপরাধ আর ক্ষমা করা হবে না। এ কাজটিকে যেমন আল্লাহতায়ালা অপছন্দ করেন, তেমনি অপছন্দ করেন অভিজাতজনেরাও।

হজরত বারা ইবনে আজিব রা. বর্ণনা করেন, আমার মামা ঝান্ডা হাতে নিয়ে আমার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, এক লোক তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। রসুল স. আমাকে তাঁর মস্তক কর্তন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী। দারেমীর বর্ণনায় এসেছে এরকম, আমাকে রসুল স. এ জন্য পাঠাচ্ছেন যেনো আমি তার গর্দান কেটে ফেলি এবং তার সম্পদ অধিকার করি। এই বর্ণনায় মামা'র স্থলে চাচার শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, পিতৃপুরুষ অর্থ বাপ, দাদা ও নানা। কেউ কেউ বলেছেন, পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছেন – একথার প্রকৃত অর্থ পিতৃপুরুষ যে রমণীদের সঙ্গে সঙ্গম করেছেন। এই অর্থটি গ্রহণ করলে উদ্দেশ্য হবে এরকম, তোমাদের পিতৃপুরুষ শুদ্ধ বিবাহের পর অথবা অশুদ্ধ বিবাহের পর কিংবা বিবাহ ছাড়াই যাদেরকে সম্ভোগ করেছে।

'কামুস' গ্রন্থে 'নিকাহ' (বিবাহ) শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'সহবাস' । আরেক অর্থ স্বীকারোক্তি (আকদ)। 'সিহাহ্' গ্রন্থে জাওহারী লিখেছেন, রূপক অর্থ সহবাস। ' যৌনসম্ভোগ' কথাটি সরাসরি ব্যবহার লজ্জাজনক। তাই যৌনসম্ভোগের বৈধতাকে বিবাহ এবং অবৈধতাকে অশ্লীলতা বা ব্যভিচার (ফাহেশা) বলা হয়। যেমন আল্লাহপাক বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিতদেরকে বিবাহ দিয়ে দাও।' একথার উদ্দেশ্য হবে, অবিবাহিতদেরকে বৈধ যৌন চরিতার্থতার সুযোগ করে দাও।

www.eelm.weebly.com

আমাদের নিকট এটাই বিশুদ্ধ যে, এই আয়াতে উল্লেখিত 'নিকাহ্' শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বীকারোক্তি (আকদ)। সহবাস এখানে উদ্দেশ্য হয়নি। কেননা ঐকমত্য অনুসারেই পিতার স্ত্রী ছেলের জন্য হারাম। সহবাস হোক কিংবা নাই হোক।

একটি আপত্তি ঃ যদি এই আয়াতে বিবাহ (নিকাহ) বলতে স্বীকারোক্তিই (আকদ) বোঝানো হয়ে থাকে, তবে তাকে বিবাহ করা ছেলের জন্য হারাম হবে কেন? কারণ সে তো আর তার পিতার বিবাহিত স্ত্রী নয়।

উত্তর ঃ এই নিষিদ্ধতা কোরআনের উল্লেখের দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। সহবাসই বিবাহের উদ্দেশ্য। সুতরাং বিবাহের স্বীকৃতির (আকদের) পর সহবাসের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর তাকে স্ত্রী বলেই গণ্য করতে হবে। সহবাস হোক কিংবা নাই হোক। কেবল পিতার স্ত্রী নয়, তার (পিতার স্ত্রীর) কন্যা এবং মাতাকেও বিবাহ করা ছেলের জন্য হারাম।

মাসআলা ঃ ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেকের মতে জেনা (ব্যভিচার) দ্বারা হুরমতে মোছাহেরাত হয় না (জেনাকারীণির মা কিংবা মেয়েকে বিবাহ করা হারাম হয় না)। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, জেনা দ্বারা জেনাকারীণির মা ও মেয়ে হারাম হওয়া নিশ্চিত। ইমাম মালেকের একটি বক্তব্যও এই অভিমতের অনুকূল। ইমাম আহমদ আরো বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নারীকে সম্ভোগ করে তবে তার মা অথবা কন্যাকে বিবাহ করা তার জন্য হারাম হবে। আমরা বলি, এই আয়াতকে হুরমতে মোছাহেরাতের সরাসরি দলিল হিসাবে উপস্থাপন করা যায় না। অবশ্য বৈধ সহবাসকে জেনার সঙ্গে তুলনীয় করা যেতে পারে। এই দুই ক্ষেত্রে একই রকম নিষিদ্ধতার কারণ এই যে, হালাল ও হারাম উভয় প্রকার সহবাসের পরে সন্তান জন্ম লাভ করে। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, অন্যের বাঁদী, ছেলের বাঁদী, মুকাতাব বাঁদী (যে অর্থের বিনিময়ে মুক্ত হবে), জেহারওয়ালী স্ত্রী, নেফাস গ্রস্তা রমণী, ইহরাম পালনরতা কিংবা রোজা পালনকারীনি — সকলের সঙ্গে সহবাস হারাম। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, নিষিদ্ধতা বলবত হয়েছে সহবাসের কারণেই। সে সহবাস হালাল হোক কিংবা হারাম হোক। উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে নিষিদ্ধতার বিধান।

ইবনে হুম্মাম বর্ণনা করেন, আমাদের আলেম সম্প্রদায় এই অভিমতের সমর্থনে কিছুসংখ্যক হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন — এক ব্যক্তি নিবেদন করলো, হে আল্লাহ রসুল! ইসলাম পূর্ব যুগে আমি এক মহিলাকে সম্ভোগ করেছি। এখন তার কন্যাকে বিয়ে করতে পারবো কি? রসুল স. বললেন, না। যার গোপন অঙ্গের দিকে তুমি ধাবিত হয়েছিলে, তার কন্যার গোপন অঙ্গের দিকে ধাবিত হতে পারো না। বর্ণনাটি মুরসাল ও মুনকাতে। এই সনদের এক বর্ণনাকারী আবু বকর বিন আবদুর রহমান বিন হাকিম।

www.eelm.weebly.com

ইবনে ওহাব, আবু আইয়ুব সূত্রে বিন জারীহ্ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে কোনো রমণীকে হাত দ্বারা স্পর্শ করেছে,সে যেনো তার কন্যাকে বিবাহ না করে। এই বর্ণনাটিও মুরসাল ও মুনকাতে। (যে হাদিসের শেষ দিকের বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে সে হাদিসকে মুরসাল এবং যে হাদিসের ধারাবাহিকতা মাঝখানের বর্ণনাকারী বাদ পড়ার কারণে ক্ষুণ্ন হয়েছে সে হাদিসকে মুনকাতে বলে)। মুরসাল ও মুনকাতে গ্রহণ করাতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই, যদি সনদে উল্লেখিত বর্ণনাকারীগণ সিকা (নির্ভরযোগ্য) হন। এরকম মন্তব্য করেছেন ইবনে হুম্মাম।

ইমাম শাফেয়ী তাঁর মতের সমর্থনে দুটি হাদিস পেশ করেছেন। একটি হচ্ছে, হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, হারাম হালালকে নষ্ট করতে পারে না। দারা কুতনী। এই সনদের এক রাবী ওসমান বিন আবদুর রহমান ওক্কাসীকে ইয়াহিয়া বিন মুঈন মিথ্যুক বলেছেন। ইবনে মাদিনী বলেছেন, দুর্বল। বোখারী, নাসাঈ, রাজী এবং আবু দাউদ বলেছেন, সে কিছুই ছিলো না। তার বর্ণনা দলিল হিসাবে গ্রহণীয় নয়।

অপর হাদিসটি হজরত আয়েশার হাদিসের মতোই ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী এবং ইবনে মাজা। এই সনদের এক রাবী ত্রুটি ও অশ্লীলতাদুষ্ট বলে গ্রহণযোগ্যতা পায় নি। সে ওবায়দুল্লাহর ভাই আবদুল্লাহ বলে পরিচিত। আর এক রাবী ইসহাক বিন মোহাম্মদ আরুবী সম্পর্কে ইয়াহিয়া বলেছেন, সে কিছুই নয়, মিথ্যুক। বোখারী বলেছেন, আলেমগণ তার বর্ণনাকে পরিত্যাগ করেছেন।

<u>মাসআলা</u> ঃ যে নারীর সঙ্গে জেনা করা হয়েছে তার পুত্র জেনাকারীর স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারবে না। তেমনি সেই পুরুষ সেই রমণীর কন্যাকেও বিয়ে করতে পারবে না। জেনাকারীনি জেনাকারীর স্ত্রী তুল্য। আরবী আাভিধানিক অর্থে জেনাকারীণি নারীর ছেলে মেয়েরা আপন ছেলে মেয়ের মতোই। শরিয়তসম্মত অর্থ অভিধানের খেলাফ না হওয়া পর্যন্ত আভিধানিক অর্থেই গ্রহণীয়। যেমন সালাত শব্দটির শরিয়তগত অর্থ হচ্ছে বিশেষ ধরনের ইবাদত। এক্ষেত্রে অভিধান যাই বলুক তা ধর্তব্য হবে না। শরিয়তের ব্যাখ্যাই গ্রহণীয় হবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে শরিয়তের নিজস্ব কোনো ব্যাখ্যা নেই সেক্ষেত্রে অভিধানই ধর্তব্য। যদি জায়েদ নামক ব্যক্তি তার হিন্দা নাম্নী স্ত্রীর সঙ্গে লেয়ান (শপথ) করে বলে যে, তোমার ছেলে ওমর আমার ছেলে নয় — কাজীও যদি তার এ কথাকে গ্রহণ করে, তবে ওমরের জন্য জায়েদের বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা বৈধ হবে না। এবং জায়েদের জন্যও ওই মহিলার কন্যাকে বিবাহ করা হারাম হবে। কেননা এক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে, জায়েদ তার শপথে ঘোষিত দাবী থেকে সরে যাবে। তখন কাজীর সমর্থনও অনর্থক বলে বিবেচিত হবে।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ কামতাড়নার সঙ্গে কোনো পুরুষ নারীকে অথবা কোনো নারী পুরুষকে স্পর্শ করলে তা সহবাস তুল্য হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরকম করলে হুরমতে মোছাহেরাত হবে অর্থাৎ ওই নারীর মাতা অথবা কন্যাকে বিবাহ করা ওই পুরুষের জন্য হারাম হবে। আবার কোনো পুরুষ কোনো মহিলার অথবা কোনো মহিলা পুরুষের লজ্জাস্থানকে কামতাড়নার সঙ্গে দেখলেও হুরমতে মোছাহেরাত হবে। নারীকে স্পর্শ করার কারণে অথবা তার লজ্জাস্থান দেখার কারণে পুরুষের বীর্য স্খলিত হলে কিংবা নারীর সঙ্গে পায়ুসঙ্গম করার কারণে বীর্যপাত হলেও হুরমতে মোছাহেরাত হয়। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু হানিফার অভিমত এরকমই। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী হুরমতে মোছাহেরাত হয় না। অন্য তিন ইমামের অভিমত, স্পর্শ করলে অথবা লজ্জাস্থান দেখলে হুরমতে মোছাহেরাত হয় না। ইমাম আবু হানিফার নিকট স্পর্শ করা অথবা গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সহবাস তুল্য। তাই এরকম অবস্থাকে সহবাসের স্থলাভিষিক্ত ধরে নেয়া হয়েছে। বীর্য স্খলনের পরক্ষণে স্পর্শ করলে অথবা দেখলে হুরমতে মোছাহেরাত হবে না। কারণ তখন কামোত্তেজনা থাকে না। কামতাড়নার সঙ্গে স্পর্শ করা ও দেখা বলা যাবে তখনই যখন লজ্জাস্থানে কামোত্তেজনা অনুভূত হবে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ২৩

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَ
وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ
الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ
نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ
الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

❒ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুগ্ধমাতা, দুগ্ধ-ভগিনী, শাশুড়ী ও তোমাদের

www.eelm.weebly.com

স্ত্রীদিগের মধ্যে যাহার সহিত সংগত হইয়াছ তাহার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তাহার গর্ভজাত কন্যা, যাহারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে; তবে যদি তাহাদের সহিত সংগত না হইয়া থাক তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই। এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগ্নিকে এক সঙ্গে বিবাহ করা; পূর্বে যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মাতা অর্থ মাতৃবর্গ। যেমন মা, দাদী, পরদাদী, নানী, পরনানী। আলেমগণ বলেন মা অর্থ মূল। এটাই উম্মাহাত এর (মা এর) আভিধানিক অর্থ। কামুস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, মা-ই প্রত্যেক বস্তুর মূল। যেমন উম্মুল কিতাব অর্থ সুরা ফাতিহা অথবা লাওহে মাহফুজ। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, উম্মাহাত বা মাতৃবর্গ বলতে বোঝায় গর্ভধারিণী মা সহ পিতা ও মাতার দিকের উর্ধ্বস্তরের সকল দাদী ও সকল নানীকে।

কন্যা অর্থ কন্যাবর্গ অর্থাৎ সকল কন্যা তুলনীয়াগণ। যেমন নাতনী, পুতনী, এভাবে সকল অধস্তনাগণ।

ভগ্নি অর্থ সহোদরা ভগ্নি এবং বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভগ্নি সকল।

ফুফু ও খালা বলতে বোঝাবে বাপ ও মায়ের সহোদরা সহ বাপ ও মায়ের বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় বোন সকল। এটা ঐকমত্য। এর মধ্যে আরো রয়েছেন, মা ও বাপের ফুফু সকল ও খালা সকল। তাঁরা দূরবর্তী হলেও নিকটবর্তীদের সমান্তরাল। কিন্তু যারা তাদের শাখা তাদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ। যেমন চাচা, ফুফু, মামা অথবা খালাদের কন্যাগণ।

ভ্রাতুষ্পুত্রী ও ভাগিনেয়ী অর্থ ভাইয়ের ও বোনের কন্যাগণ এবং তাদের সূত্রের পৌত্রী ও দৌহিত্রীগণ। বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভাই বোনের কন্যারাও ভ্রাতুষ্পুত্রী ও ভাগিনেয়ী। তারা এবং তাদের সূত্রের পৌত্রী ও দৌহিত্রীরাও হারাম।

বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা সাত প্রকার বংশগত নিষিদ্ধতার বিবরণ দিয়েছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, চার প্রকার মহিলা হারাম। বৈবাহিক সূত্রের মূল শাখা, বংশগত উর্ধ্বতন ও অধস্তন শাখা। এমন দুইজন নারী ও পুরুষের একে অপরের সাথে বিবাহ হারাম যাদের মধ্যে একে অপরের বংশগত সন্তান হবে। কিংবা একজন অপরজনের পিতা অথবা মায়ের শাখা হবে।

দুগ্ধমাতা ও দুগ্ধবোনও হারাম। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, দুগ্ধ ফুফুবর্গ, খালাবর্গ, ভ্রাতুষ্পুত্রীবর্গ ও ভাগনেয়ীবর্গও হারাম। অর্থাৎ বংশগত কারণে যাদের সাথে বিবাহ হারাম, দুধ পান করার কারণে তেমনি দুধ মাতার সম্পর্কীয়াদের সঙ্গেও বিবাহ হারাম। রসুল স. বলেছেন, দুধ পান করার কারণে ওই সকল বিবাহ হারাম যা বংশগত কারণে হারাম হয়েছে। আরেকটি বর্ণনায় বংশগত শব্দটির স্থলে জন্মগত শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। হজরত আয়েশা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা

www.eelm.weebly.com

করেছেন বোখারী ও মুসলিম। হজরত আলী বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসুল! আপনি কি আপনার চাচা হামজার কন্যাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক? সে তো কোরাইশদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রূপবতী। তিনি স. বললেন, তুমি কি জানো না হামজা আমার দুধ ভাই। আর আল্লাহ যে সকল বংশীয় আত্মীয়াদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন, দুধ সম্পর্কীয় সে সকল আত্মীয়াদেরকেও তেমনি নিষেধ করেছেন। মুসলিম।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, আমার দুধ চাচা এলেন এবং আমার ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। আমি অনুমতি দিলাম না। তখনও আমি এই মাসআলাটি জানতাম না। এমন সময় রসুল স. এলেন। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, তিনি তো তোমার চাচা। অনুমতি দাও। আমি বললাম, হে রসুল! আমাকে তো দুধপান করিয়েছে এক নারী। পুরুষ তো পান করায়নি। তিনি স. বললেন, নিঃসন্দেহে তিনি তোমার চাচা। তাকে ভিতরে আসতে দাও। এ ঘটনাটি ঘটেছিলো পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আয়েশা আরো বর্ণনা করেন, রসুল স. আমার কাছে ছিলেন, এমন সময় আমি এ রকম শুনতে পেলাম, কে যেনো তাঁর অন্য স্ত্রী হাফসার গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইছেন। আমি বললাম, হে রসুল! কে যেনো আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইছেন। তিনি স. বললেন, মনে হয় হাফসার দুধ চাচা। একথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমার দুধ চাচা যদি এখনো জীবিত থাকতেন তাহলে তিনি কি আমার ঘরে আসতে পারতেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। জন্মগত কারণে যা নিষিদ্ধ, দুধ সম্পর্কের কারণেও তা নিষিদ্ধ। বাগবী।

জ্ঞাতব্য ঃ ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেকের মতে দুধ পানের পরিমাণ কম হোক অথবা বেশী হোক — সকল অবস্থায় নিষিদ্ধতা বলবৎ হবে। কেননা এখানে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে ওই হাদিসটির মতোই, যেখানে বলা হয়েছে, বংশগত কারণে যা হারাম দুধ পান করার কারণে তাই হারাম। এই আয়াত ও হাদিসে কম অথবা বেশীর উল্লেখ নেই। ইমাম আহমদের মাধ্যমে এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম শাফেয়ীর মত হচ্ছে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় পৃথক পৃথকভাবে পাঁচবার পেট ভরে দুধ পান করলেই কেবল নিষিদ্ধতা প্রযোজ্য হবে। এক বর্ণনা অনুসারে ইমাম আহমদের বক্তব্যও এরকম। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আহমদ পাঁচবারের পরিবর্তে তিনবারের কথা বলেছেন। এ ধরনের আরো বর্ণনা করেছেন আবু সাওর, ইবনে মুনজির, দাউদ এবং আবু ওবাইদ। তিনবার নির্দিষ্ট করা হয়েছে হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসানুসারে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বর্ণনা করেন, এক বার চুষলে অথবা দুই বার চুষলে নিষিদ্ধতা অপরিহার্য হয় না। উম্মে

www.eelm.weebly.com

ফজলের বর্ণনায় একবার চুষা ও দুইবার চুষার পরিবর্তে একবার পান করা ও দুইবার পান করার কথা এসেছে। অবশ্য এ সমস্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য একই। মুসলিম। এই হাদিসটিই হজরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরের মাধ্যমে হজরত আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন আহমদ, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান, এবং তিরমিজি। কিন্তু তাবারী একে মোজতারেব বলেছেন (যে হাদিসের সনদ সুশৃঙ্খলিত নয় তাকে মোজতারেব বলে)। কখনো বর্ণনা এসেছে হজরত আবদুল্লাহ এবং হজরত জোবায়েরের মাধ্যমে রসুল স. থেকে। কখনো বর্ণনায় এসেছে হজরত আবদুল্লাহ — হজরত আয়েশা — রসুল স. এরকম। আবার কখনো রসুল স. থেকে হজরত আবদুল্লাহর বর্ণনা চলে এসেছে সরাসরি। ইবনে হাব্বান সনদের এই বিভিন্নতা সম্পর্কে বলেছেন, সম্ভবতঃ এই হাদিসটি হজরত আবদুল্লাহ তাঁর পিতা হজরত জোবায়ের থেকে শুনেছেন। হজরত আয়েশা থেকেও শুনেছেন। আবার সরাসরি রসুল স.-এর নিকট থেকেও শুনেছেন।

বোখারী লিখেছেন, হজরত আয়েশার মাধ্যেমে হজরত আবদুল্লাহ — এই মাধ্যমটি বিশুদ্ধ। হজরত জোবায়েরের মাধ্যম সম্পর্কে কেবল মোহাম্মদ বিন দিনারের বক্তব্য রয়েছে এরকম — এর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে, মতবিরোধও রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় হজরত আয়েশার উল্লেখ মাত্র নেই। স্মর্তব্য যে, সনদ মুরসাল হলে ক্ষতি নেই। নাসাঈ এই হাদিসটি হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, এই হাদিসটিতে মারফু প্রকৃতির বিশুদ্ধতা নেই। ওলামাগণ এ হাদিসকে তাদের অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন। কেননা এখানে একবার বা দুইবার দুধ পান করলে বিবাহ হারাম হবে না বলা হয়েছে। তাহলে তিনবার পান করলে হারাম হবে — এ কথাটি ধরে নেয়া যায়। যারা কমপক্ষে পাঁচ বার দুধ পান করলে হারাম হবে বলেন, তাঁদের দলিল হলো - হজরত আয়েশার ওই হাদিসটি যেখানে তিনি বলেছেন, কোরআনে দশবার পান করার কথা বলা হয়েছে। তারপর পাঁচবারের কথা বলে পূর্বের আয়াতটি রহিত করে দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচবারের বর্ণনাটি। এরপর রসুল স. এর ইন্তেকাল পর্যন্ত এভাবেই পাঠ করা হয়েছে। আমরা বলি, কোরআনের হুকুম সর্বজনবিদিত। এর প্রতিকূলে হাদিসে আহাদ (এককবর্ণিত হাদিস) গ্রহণীয় নয়। আর নিয়ম হচ্ছে, দ্বিধাসন্দেহের ক্ষেত্রে হারামকেই অধিকতর গুরুত্ব দিতে হয়। হজরত আয়েশা বর্ণিত এই হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে সহীহ্ হলেও এর শেষ অবস্থা হচ্ছে মাতরুক। একথা না মানলে এটাই প্রমাণিত হবে যে, রসুল স. এর ইন্তেকাল পর্যন্ত পাঁচবার দুধ পানের বিষয়টি পাঠ করা হতো (অর্থাৎ তাঁর স. এর ইন্তেকালের পর কোরআন একত্রিত করার সময় ওই আয়াতটিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে)। এতে করে রাফেজীদের মতের পোষকতা অবশ্যম্ভাবী হয়।

www.eelm.weebly.com

যেমন তারা বলে, রসুল স. এর পরে কোরআনের অনেক কিছু ধ্বংস করা হয়েছে। এ ধরনের কথা কুফরী। একথার দ্বারা 'ওয়া ইন্না লাহু লা হাফিজুন' (আমিই ইহা হেফাজত করবো) — আল্লাহর এই অঙ্গীকার মিথ্যা প্রমাণিত হয়। হজরত আয়েশার বক্তব্যকে এরকম ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, রসুল স. এর ইন্তেকাল পর্যন্ত অর্থ ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত। দশবারের কথাতো পাঁচবারের ঘোষণা দ্বারা আগেই রহিত হয়ে গিয়েছে। এরপর ইন্তেকালের অব্যবহিত পূর্বে পাঁচবারের হুকুমটিও রহিত হয়ে গিয়েছে। বিশুদ্ধ বর্ণনাটি হচ্ছে এই যে, হজরত ইবনে আব্বাসকে যখন বলা হলো, একবার দুধপান করায় নিষিদ্ধতা আসে না, তখন তিনি বললেন, প্রথমে এমনই ছিলো পরে এ নিয়ম রহিত হয়েছে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, দুধ পান প্রসঙ্গটির শেষ সিদ্ধান্তটি এরকম – অল্প পান করুক কিংবা বেশী , সকল অবস্থায় নিষিদ্ধতা অপরিহার্য। হজরত ইবনে ওমর বলেন, অল্প পান করাও নিষিদ্ধতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। যখন তাকে বলা হলো, হজরত ইবনে জোবায়ের যে বলেন, একবার বা দুইবার পান করলে হারাম হয় না। তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর সিদ্ধান্ত ইবনে জোবায়েরের সিদ্ধান্ত থেকে উত্তম। আল্লাহর কালামে একবার দুইবার এরকম উল্লেখ নেই। অতএব, শেষ পর্যন্ত পাঁচবার দুধ পানের হুকুমটি বলবৎ ছিলো — হজরত আয়েশার এমতো উক্তিটি ভুল। কারণ, আবৃত্তি শব্দনির্ভর। হুকুম কখনো শব্দবিহীন এবং আবৃত্তিবিহীন হয় না।

মাসআলা ঃ দুধ পান করার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দুধপান করলে তা ধর্তব্য নয়। কারণ, এর দ্বারা প্রবৃদ্ধি এবং প্রতিপালন প্রমাণিত হয় না। দুধ পানের সময় অতিবাহিত হবার পর দুগ্ধ দানকারীকে মা বলা যায় না। দাউদ জাহেরীর মতে, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা পরে যে কোনো সময় দুধ পান করলেই হারাম প্রমাণিত হবে। হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, আবু হোজায়ফার পত্নী সাহলা বিনতে সুহাইল রসুল স. এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, সালেম (যিনি হোজায়ফার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ ছিলেন) আসার কারণে হোজায়ফার চেহারায় অসন্তুষ্টির ছায়া দেখলাম। তিনি স. বললেন, সালেমকে যদি তুমি পাঁচবার দুধ পান করিয়ে দাও তবে সে মুহরিম (নিষিদ্ধ) হয়ে যাবে। শাফেয়ী। মুসলিমের বর্ণনায় সংখ্যার উল্লেখ নেই। আমাদের উত্তর এই যে, আলেমদের ঐকমত্য অনুযায়ী এই হদিসটি মনসুখ (রহিত)। রসুল স. এরশাদ করেছেন, হারাম হওয়া ওয়াজিব হয় স্তনের দুগ্ধ পান করা থেকে। এই হাদিসটি হজরত উম্মে সালমা থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদিসটি সহীহ্। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, ওই দুধ পানই হুরমতকে ওয়াজিব করে,যার কারণে গোশত ও হাড় পরিপুষ্টতা পায়। বোখারী ও

www.eelm.weebly.com

মুসলিমের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আয়েশা বলেন, একবার রসুল স. আমার নিকট এলেন। ওই সময় আমার কাছে একজন উপবিষ্ট ছিলেন যাকে দেখে তিনি বললেন, আয়েশা, ইনি কে? আমি বললাম, আমার দুধ ভাই। তিনি বললেন, আপন ভাই দেখে নাও। ক্ষুধার্ত হয়ে দুধ পান করলে নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয় (যদি দুধ পান করা হয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে)।

মাসআলা ঃ দুধ পান করার সময় সীমা দুই বৎসর। একথা বলেছেন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম মালেক, সাঈদ বিন মুসাইয়েব, ওরওয়া এবং শা'বী। দারা কুতনী, হজরত ওমর এবং ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবী শায়বা, হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত আলী থেকেও এরকম অভিমত পাওয়া যায়। ইমাম মালেকের বক্তব্য সম্পর্ক রয়েছে তিনটি বর্ণনা। প্রথম বর্ণনায় দুই বৎসর এক মাস এবং দ্বিতীয় বর্ণনায় এক বৎসর দুই মাস এর কথা এসেছে। তৃতীয় বর্ণনায় সময়ের কোনো উল্লেখ নেই। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর প্রয়োজন হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুধ পান করতে পারবে। ইমামে আজম বলেছেন, দুগ্ধ পানের সময়সীমা দুই বৎসর ছয় মাস। ইমাম জোফরের মতে তিন বৎসর। আল্লাহ্‌পাক এক আয়াতে বলেছেন, 'আর জননীরা সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য দান করবে। এ নির্দিষ্ট সময় তার জন্য যে নির্ধারিত সময়সীমা পূর্ণ করতে চায়।' অন্য এক আয়াতে এসেছে, 'ওয়াফিছালুহু ফি আমাঈনে।' আর একটি আয়াতে এসেছে, 'আর তাকে গর্ভধারণ করা ও দুধ ছাড়ানো মোট তিরিশ মাস।' গর্ভধারণের সময় ছয় মাস ধরলে দুধ পানের সময় থাকে দুই বৎসর। এভাবে ছয় মাস আর চব্বিশ মাস মিলে তিরিশ মাস পূর্ণ হয়। রসুল স. এরশাদ করেন, দুধ পানের সময়সীমা দুই বৎসর। এর বাইরে ধর্তব্য নয়। দারা কুতনী এই হাদিস হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাইসাম বিন জামিল এই হাদিসকে মারফু বলে মেনে নিয়েছেন (বর্ণনা পরম্পরায় রসুল স. পর্যন্ত সংযুক্ত হাদিসকে মারফু বলে)। হাইসাম ছিলেন সিকা ও হাফেজ। আহমদ এবং আজালীও তাঁকে সিকা বলেছেন। ইবনে আদী বলেছেন, তিনি ভুল করতেন ইবনে উয়াইনীয়ার সাঈদ বিন মানসুর মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন।

গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময় তিরিশ মাস — এই আয়াতটিই ইমামে আজমের দলিল। তাঁর অভিমত, তিরিশ মাস অর্থ গর্ভধারণের জন্য তিরিশ মাস এবং দুধ ছাড়ানোর জন্যও তিরিশ মাস। এরকম অর্থ করা অযৌক্তিক নয়। যেমন এক ব্যক্তি দুই জন ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ করবে। ঋণ পরিশাধের সময়সীমা নির্ধারিত হলো তিরিশ মাস। এর মানে এরকম হয় না যে, একজনকে পনের মাস এবং আর এক জনকে পনের মাস সময় দেয়া হয়েছে। বরং অর্থ হবে দুজন

www.eelm.weebly.com

ঋণদাতাই তিরিশ মাস তিরিশ মাস করে সময় দিয়েছেন। কিন্তু এখানে গর্ভধারণের সময়সীমাকে আমরা তিরিশ মাসের বদলে চব্বিশ মাস বলার পক্ষপাতি। কারণ হজরত আয়শার বর্ণনায় এসেছে, বাচ্চা মায়ের পেটে দুই বৎসরের বেশি থাকে না। কিন্তু সময় নির্ধারণ তো ব্যক্তিগত অভিমতে করা চলে না। তাই মেনে নিতে হবে যে, হজরত আয়শা রসুল স.-এর নিকট শুনেই উপরোক্ত বর্ণনাটি করেছেন। আর আয়াত অনুসারে তো দুধ ছাড়ানোর সময়সীমা স্পষ্টতই তিরিশ মাস বলা হয়েছে।

এই দলিল কয়েকটি কারণে ভুল ১. রসুল স. বলেছেন, দুই বছর পর দুধ পান করানোর হুকুম নেই। আয়াতে এসেছে, 'ইউরদ্বি'না আউলাদাহুন্না হাউলাইনি কামিলাইনি লিমান আরাদা আইয়ুতিম্মার রদ্বাআ'হ্। হাদিসে ও আয়াতে দুধ পানের সীমানা তিরিশ মাস অর্থাৎ আড়াই বৎসর থেকে কমিয়ে দুই বৎসর করা হয়েছে। অতঃপর একথা বলা যায় যে, হজরত আয়শাও গর্ভধারণের সময়সীমাকে এভাবেই কমিয়ে দিয়েছেন। তিরিশ মাসকে চব্বিশ মাস করেছেন। এটা ধর্তব্য নয়। এমত ক্ষেত্রে প্রকৃত ও রূপক উদ্দেশ্য একত্রিত হওয়া জরুরী। গর্ভধারণের ক্ষেত্রে রূপক অর্থে চব্বিশ মাস আর দুধ ছাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে তিরিশ মাস ধরতে হবে। প্রকৃত পক্ষে ফালাসিনা থেকে 'চব্বিশ' অর্থটিই নিতে হবে। কেননা গণনার সংখ্যার বেলায় অন্য অর্থ করার সুযোগ নেই। সংখ্যা তো সুনির্দিষ্ট অর্থবোধকই হয়। অধিকাংশ আহলে তাহকীক বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন।

ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যের আর একটি কারণ এই যে, দুই বৎসর পর্যন্ত দুধের মাধ্যমেই শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সুগঠিত হতে থাকে। এরপর অন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এবং অতিরিক্ত আরো কিছু সময় দেয়ার প্রয়োজন এজন্য যাতে শিশু খাদ্যভ্যাস পরিবর্তনের জন্য কিছুটা সময় পায়। তাই তিনি আরো ছয় মাস যোগ করে আড়াই বৎসর (চব্বিশ মাস) বলেছেন।

ইমাম মালেক সময়সীমা নির্ধারণের পক্ষপাতি নন। ইমাম জোফার নির্ধারণ করেছেন এক বৎসর যেনো বৎসরের চারটি ঋতুই দুধ পান অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যায়।

গর্ভধারণের সময় ইমাম আজম এরকমই নির্ধারণ করেছেন। কারণ এটাই গর্ভধারণের নিম্নতম সময়সীমা। আমরা বলি, দুই বৎসরের ভিতরে শিশুকে মাতৃদুগ্ধ ছাড়া অন্য খাদ্যে অভ্যস্ত করে তোলার ব্যাপারে শরিয়তে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। অতএব, দুধপানের ক্ষেত্রে দুই বৎসরের অতিরিক্ত সময় সংযোজন করার প্রয়োজন থাকে না। দুই বছরে পৌছার আগেই দুধের পাশাপাশি অন্য খাদ্যদ্রব্যও অবলীলায় গ্রহণ করতে পারে শিশুরা। ইবনে হুম্মাম এবং তাহাবী তাই সাহেবাইনের (ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম ইউসুফের) অভিমতটিই গ্রহণ করেছেন।

www.eelm.weebly.com

শাশুড়ী অর্থ স্ত্রীর আপন মা এবং স্ত্রী কিংবা স্ত্রীগণের মাতৃকুল। এভাবে স্ত্রীর নিকটবর্তী ও দূরবর্তী (উর্ধ্বস্তরের) নানী ও দাদীকুল সকলেই শামিল। এছাড়াও রয়েছেন স্ত্রী বা স্ত্রীগণের দুধমাতা এবং দুধমাতা সম্পর্কীয় অন্যান্য নানী ও দাদীরা। মালিকানাভুক্ত হওয়ার কারণে যে সকল ক্রীতদাসীর সঙ্গে সহবাস করা হয়েছে তাদের মা, নানী ও দাদীরাও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে। ইমাম আবু হানিফার অভিমত, যে মহিলার সাথে জেনা করা হয়েছে তার মাতৃকুলও (মা, দাদীকুল, নানীকুল) এই আইনের আওতাভুত। যদি অপরিচিতা কোনো রমণীকে কামোত্তেজনার সঙ্গে স্পর্শ করে তবে তার মাতৃকুল নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

তোমাদের স্ত্রীগণের পূর্ব স্বামীর কন্যা অর্থ কন্যাকুল। অর্থাৎ পূর্ব স্বামীর কন্যা, তার কন্যা এভাবে সমস্ত কন্যাকুল নিষিদ্ধ। যে সমস্ত রমণী মালিকানাধীন অথবা মালিকানাধীনের মতো হওয়ার কারণে যাদের সঙ্গে সহবাস করা হয়েছে তাদের প্রতিও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। ইমাম আবু হানিফার মতে যাদের সঙ্গে জেনা করা হয়েছে তাদের কন্যাকুলও নিষিদ্ধ।

'যাহারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে' — অর্থ বিধবা রমণীদের এতিম কন্যারা সাধারণতঃ পরবর্তী স্বামীর অভিভাবকত্বেই পালিত হয়। এই ধরনের প্রতিপালিতারাও হারাম। তারা যদি প্রতিপালনাধীনা না হয় তবে হালাল হবে। দাউদের অভিমত এরকমই। আবদুর রাজ্জাক এবং ইবনে আবী হাতেম বিশুদ্ধ সনদের সঙ্গে হজরত আলীর বক্তব্য এরকমেই বর্ণনা করেছেন। হজরত আলীর এই বক্তব্যটি বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলেও একে সাহাবা কেরামের ঐকমত্য (এজমা) বলা যাবে না। এজমা অর্থ পূর্ববর্তীদের (সাহাবীগণের) এজমা। পরবর্তীদের এজমা এ বিষয়ে ধর্তব্য নয়।

যে সকল স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা হয়েছে, তাদের কন্যাবর্গ হারাম। সহবাস না করা হলে তাদের কন্যাকুল হারাম হবে না।

তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, কোনো ব্যক্তির জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার স্ত্রীর মাকে বিয়ে করবে। স্ত্রীর সঙ্গে সে সহবাস করে থাকুক অথবা নাই করে থাকুক। তিরমিজী নিজেই এই হাদিস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, সনদের দিক থেকে এই হাদিস বিশুদ্ধ নয়। এই হাদিসের দুজন বর্ণনাকারী ইবনে লেহিয়া এবং মোছান্না বিন সাবাহ দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত।

শায়েখ ইবনে হাজার লিখেছেন, ইবনে আবী হাতেম তাঁর তাফসীরে সুদৃঢ় সনদে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে লিখেছেন, সহবাসের আগেই যদি কারো স্ত্রী মারা যায়, অথবা তাকে তালাক দেয়া হয় তবু তার মাকে ওই ব্যক্তি বিয়ে করতে পারবে না। তিবরাণী বলেছেন, এই মাসআলাটির ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। কিন্তু হজরত জায়েদ বিন সাবেতের বর্ণনা রয়েছে এর প্রতিকূলে। ইবনে আবী

www.eelm.weebly.com

শায়বা বলেছেন, সহবাস না করে স্ত্রীকে তালাক দিলে হজরত জায়েদের মতে তার মাকে বিয়ে করা যাবে। কিন্তু সহবাসের আগে স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলে তার মাকে বিবাহ করা মাকরূহ হবে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। ইয়াহিয়া বিন সাঈদ থেকে মালেক লিখেছেন, হজরত জায়েদকে জিজ্ঞেস করা হলো, যদি সহবাসের আগেই কারো স্ত্রী মারা যায় তবে সেকি তার মাকে বিয়ে করতে পারবে? তিনি জবাব দিলেন, না। ইবনে আবী হাতেম হজরত আলী থেকে লিখেছেন, উভয়ের (মা ও কন্যার) নিষিদ্ধতা সহবাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। মুজাহিদের বক্তব্যও এরকমই। ইবনে আবী শায়বা ও অন্যান্যরা জায়েদ বিন সাবেত এবং ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনাই দিয়েছেন। হজরত আলী এবং মুজাহিদের উল্লিখিত বক্তব্য সহীহ্ প্রমাণিত হলে তিরমিজি কথিত ঐক্যমত্যের অর্থ হবে সাহাবা এবং তাবেয়ীদের পরবর্তী আলেমগণের ঐক্যমত্য। এই ঐক্যমত্যানুসারে কোনো অবস্থাতেই শাশুড়ীর সঙ্গে বিবাহ বৈধ নয়, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা হোক অথবা নাই হোক।

জ্ঞাতব্য ঃ বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর মাকে দেখে পছন্দ করলো। তখন সে স্ত্রীসহবাস করেনি। এমতাবস্থায় সে হজরত ইবনে মাসউদের নিকটে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বললেন, স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার মাকে বিয়ে করতে পারো।

স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না হয়ে থাকলে পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করা যাবে। যে কন্যারা অভিভাবকহীনা তাদের বেলায় নিষিদ্ধতার কথা প্রথমে বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে প্রতিপালনবহির্ভূত পূর্বস্বামীর কন্যাদের কথা। সহবাস করা হয়নি এমন স্ত্রীর মৃত্যু হলে অথবা তালাক হয়ে গেলে তার পূর্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যা হালাল হবে।

ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী হারাম। পুত্র অর্থ পুত্রকুল। পৌত্র, প্রপৌত্র, দৌহিত্র, দৌহিত্রের পুত্র — এরকম সকল অধস্তন পুরুষের স্ত্রীরাও নিষিদ্ধ। তাদের মালিকানাভুক্তা অথবা মালিকানাভুক্ততুল্যা — যাদের সাথে তারা সহবাস করে ফেলেছে — তারাও হারাম। এই মাসআলাটি ঐক্যমতনির্ভর। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ছেলেরা যাদের সঙ্গে জেনা করে ফেলেছে — তারাও হারাম।

পালিত পুত্রদের স্ত্রীদের বেলায় এই নিষিদ্ধতা নেই। আরববাসীরা পালিত পুত্রদেরকেও আপন পুত্র মনে করতা। ইবনে জারীর লিখেছেন, জারীহ বলেন, আমি আতা কে এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রসুল স. তাঁর পালিত পুত্র জায়েদ বিন হারেসার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করলেন। এই ব্যাপারটি নিয়ে অবিশ্বাসীরা নিন্দাবাদ করে যাচ্ছিলো। আমরাও বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। তখন নাজিল হলো, 'আল্লাহ্ তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে প্রকৃত পুত্র

www.eelm.weebly.com

করেননি।' আরো নাজিল হলো, 'মোহাম্মদ স. তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন... ।'

দুগ্ধপুত্রও পুত্র। হাদিস শরীফে এসেছে, বংশীয় কারণে যারা হারাম স্তন্যদানের কারণেও তারা হারাম। সুতরাং দুগ্ধপুত্রকুলের স্ত্রীরাও নিষিদ্ধ। এই মাসআলাটিও ঐকমত্যসিদ্ধ।

দুই বোনকে একত্রে বিবাহ বন্ধনে রাখা হারাম। মালিকানার কারণে দুই বোনকে একত্রিত করা এবং সহোদরা ও দুধবোনদেরকে একত্রে স্ত্রী হিসাবে রাখাও হারাম। তেমনি বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় বোন, দুধ বোনদের বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় বোনও একই নিষিদ্ধতার আওতায় পড়ে। তবে যদি এক বোনের সঙ্গে জেনা করে ফেলে তবে অপর বোনকে বিয়ে করা হারাম নয়। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা হবে একরকম যেমন এক বোনের মৃত্যু হলো কিংবা এক বোনকে তালাক দিয়ে অন্য বোনকে বিবাহ করলো– এরকম করা হালাল।

ফুফু-ভাতিজিকে অথবা খালা ভাগ্নিকেও একত্রে বিবাহে রাখা হারাম। পিতা মাতার ফুফু অথবা খালা কিংবা দাদা, নানা, দাদী, নানীর ফুফু এরকম উর্ধ্বস্তরের সকলেই এই নিষিদ্ধতার পর্যায়ভূত। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, স্ত্রীকে তার ফুফুর সঙ্গে একত্রিত কোর না এবং খালার সঙ্গেও মিলিয়োনা। বোখারী, মুসিলম।

আবু দাউদ, তিরমিজি এবং দারেমীর বর্ণনায় এসেছে, ফুফুর সাথে ভাতিজিকে বিবাহ কোর না। ভাতিজির সঙ্গে ফুফুকেও না। তেমনি খালার সঙ্গে তার বোনঝিকে কিংবা বোনঝির সঙ্গে খালাকে একত্রিত কোর না। কনিষ্ঠাদের সঙ্গে জ্যেষ্ঠাদেরকে কিংবা জ্যেষ্ঠাদের সঙ্গে কনিষ্ঠাদেরকে মিলিয়োনা। নাসায়ীর বর্ণনায় শেষ বাক্যটি নেই। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি সহীহ্! হজরত জাবের থেকে বোখারীও এরকম হাদিস উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে আবদুল বার বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান। শিথিল সনদের সঙ্গে হজরত আবু সাইদ খুদরী থেকে ইবনে মাজা, হজরত আলী থেকে বায্যার এবং ইবনে ওমর থেকে ইবনে হাব্বানের বর্ণনাও এরকমই। হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, হজরত ইবনে মাসউদের স্ত্রী জয়নাব, হজরত আবু উমামা, হজরত আয়শা, হজরত আবু মুসা এবং হজরত সামুরা বিন জুনদুবও এই হাদিসের বর্ণনাকারী। ইবনে আদী, ইবনে হাব্বান ইকরামার মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সম্পূর্ণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। শেষে একথাগুলোও রয়েছে, যদি তোমরা এরকম করতে যাও তবে ওই মহিলাদেরকে আত্মীয়তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

www.eelm.weebly.com

আবু দাউদ তাঁর মারাসীলে ইসা বিন তালহার বর্ণনা থেকে লিখেছেন, রসুল স. আত্মীয়তা ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কাতেই কোনো মহিলাদের সাথে তাদের আত্মীয়দের (মূল অথবা ঔরসজাতদের) বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। ইবনে হাব্বানও তাই তাঁর বর্ণনার শেষ অংশে লিখেছেন, এরকম করতে চাইলে ওই মহিলাদের আত্মীয়তা ছিন্ন হয়ে যাবে।

দুই দুধ বোন একত্রে রাখার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে সলফে সালেহীনের ঐকমত্য রয়েছে। বংশভুত আত্মীয়াকে বিচ্ছিন্ন করা যেমন হারাম, তেমনি দুধসম্পর্কীয় আত্মীয়তাকে কেটে দেয়াও হারাম। হজরত আবু তোফায়েল বলেন, আমি রসুল স. এর কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় এক মহিলা এলেন। রসুল স. তাঁর গায়ের চাদর বিছিয়ে দিয়ে ওই মহিলার বসবার ব্যবস্থা করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি চলে গেলে আমি জানলাম, ইনি রসুল স. এর দুধমা। আবু দাউদ।

এ ব্যাপারে আসল কথাটি এই যে, বংশগত এবং দুধ সম্পর্কগত আত্মীয়তা একই সমান্তরালবর্তী। উভয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে হালাল হারামের আইন একই রকম। এই দুই সম্পর্কের মূলপ্রবাহ ও শাখাপ্রবাহকে একত্রিত করা হারাম। এমতাবস্থায় একটি প্রবাহ অপর প্রবাহটিকে মিটিয়ে দেয়। তাই হারাম। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এরকম কিছু ঘটে থাকলে তা ক্ষমার্হ। কারণ তখন তো এ সম্পর্কিত বিধানই ছিলো না। এখন বিধান বলবত হলো। সুতরাং এই নিষিদ্ধতা আর অমান্য করা যাবে না।

নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ। পরমতম দয়ালু। তাই তিনি তাঁর স্পষ্ট বিধান জারীর পূর্বের অপরাধ মাফ করে দিবেন। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন, 'আল্লাহ্ এমন নন যে, কোনো সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করার পর পথচ্যুত করে দেন, যে পর্যন্ত না তাদেরকে সকল বিষয় সম্পর্কে পরিস্কারভাবে বলে দেন, যাতে তারা সতর্ক থাকে।' আল্লাহ্ আরো বলেছেন, 'আর আমি কখনো শাস্তি দান করি না, যতক্ষণ না রসুল প্রেরণ করি।'

জ্ঞাতব্য ঃ হজরত ওমর কে জিজ্ঞাসা করা হলো, দুই সহোদরা বাঁদীর একজনকে সম্ভোগ করার পর অপরজনকে সম্ভোগ করা কি বৈধ হবে? তিনি বললেন, না। আমি এরকম পছন্দ করি না। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী কুবায়সা থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হজরত ওসমানের নিকট দুই বোনকে মালিকানায় শামিল করা এবং তাদের সঙ্গে সহবাস করা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, এক আয়াতে উভয়কে একত্রিত করাকে হালাল বলা হলেও অন্য আয়াতে হারাম বলা হয়েছে। তাই আমিও একে হারামই বলি। প্রশ্নকারী তখন অন্য এক সাহাবীকে (সম্ভবত হজরত আলীকে) এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। তিনি বললেন, আমি যদি কাউকে এমন করতে দেখি তবে তাকে কঠিন শাস্তির

www.eelm.weebly.com

উপযোগী মনে করবো। আবার আবু সালেহ বর্ণনা করেন, হজরত আলী এ সম্পর্কে বলেছেন, এক আয়াতে উভয়কে হালাল করা হয়েছে। অন্য আয়াতে করা হয়েছে হারাম। এখন আমি একে হালাল ও বলতে পারি না। হারামও না। আর আমি নিজে এরকম করতে পারি না। আমার বংশধরেরাও না। ইবনে আবী শায়বা, বায়হাকী। ইবনে মুনজির এবং বায়হাকী হজরত ইবনে মাসউদের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এরকম, স্বাধীনা রমণী ও ক্রীতদাসী — সকলের জন্য রয়েছে একই ধরনের নিষিদ্ধতা। সংখ্যাগত ব্যাপারটি অবশ্য ভিন্ন। স্বাধীনা রমণী চারজনের অধিক বিবাহ করা হারাম। কিন্তু ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে কোনো সংখ্যাসীমাবদ্ধতা নেই। হজরত আম্মার বিন ইয়াসির থেকে আবদুর রাজ্জাকও এরকম লিখেছেন। আমি বলি, হজরত ওসমান ও হজরত আলীর মন্তব্যে যে হালাল হারাম সমপর্কিত দোদুল্যমানতার কথা বর্ণিত হয়েছে, তা কিন্তু আয়াতের প্রতি সন্দিহানতা নয়। বরং আয়াতের প্রতি পুর্ন আস্থার কারণেই তাঁরা মনে করেছেন, সতর্কতার দাবী অনুসারেই হারামকে হালালাপেক্ষা অধিক গুরুত্বশীল স্বীকার করতে হবে। ইবনে আবদুল বার তাঁর ইসতিজকার পুস্তকে লিখেছেন আয়াস বিন আমের রসুল স. এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আমি গনিমত হিসাবে পেয়েছি দুই সহোদরা ক্রীতদাসী। একজন আমার সন্তান ধারণ করেছে। এখন আমি দ্বিতীয় জনকে যৌন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চাই। এটা কি আমার জন্য সঙ্গত হবে? রসুল স. বললেন, আগের জনকে মুক্তি দাও। তারপর দ্বিতীয় জনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করো। তিনি স. আরো বললেন, স্বাধীনা রমনী ও ক্রীতদাসীদের বিধান একই (সংখ্যাগত দিক থেকে নয়)। দুধ সম্পর্কীয়দের বিধানও একই।

দ্বিতীয় খন্ড শেষ

www.eelm.weebly.com

পঞ্চম পারা

সুরা নিসা ঃ আয়াত ২৪

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

وَالۡمُحۡصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ‌ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ‌ ۚ وَاُحِلَّ لَـكُمۡ مَّا وَرَآءَ ذٰ لِكُمۡ اَنۡ تَبۡتَغُوۡا بِاَمۡوَالِكُمۡ مُّحۡصِنِيۡنَ غَيۡرَ مُسٰفِحِيۡنَ‌ ؕ فَمَا اسۡتَمۡتَعۡتُمۡ بِهٖ مِنۡهُنَّ فَاٰ تُوۡهُنَّ اُجُوۡرَهُنَّ فَرِيۡضَةً‌ ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيۡمَا تَرٰضَيۡتُمۡ بِهٖ مِنۡۢ بَعۡدِ الۡفَرِيۡضَةِ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا

❒ এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ; তোমাদের জন্য ইহা আল্লাহের বিধান। উল্লেখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে অর্থ ব্যয়ে বিবাহ করিতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নহে। তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে তোমরা সম্ভোগ করিয়াছ তাহাদের নির্ধারিত মোহর অর্পণ করিবে। মোহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হইলে তাহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

সধবা নারীদেরকে এখানে 'মুহ্সানাত' বলা হয়েছে। এর অর্থ তারা হেফাজতপ্রাপ্তা। সধবা নারীদেরকে এ জন্যই হেফাজতপ্রাপ্তা বলা হয় যে— বিবাহ কর্ম তাদেরকে সুরক্ষিত করে। এ নারীদেরকে তখনই বিবাহ করা যাবে, যখন তারা বিধবা হবে অথবা তালাক লাভ করবে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন, এ আয়াত মোহাজির মেয়েদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা মুসলমান হয়েই বিধর্মী স্বামীদেরকে ছেড়ে হিজরত করেছিলেন। এমন হতো যে, অন্য কোনো মুসলমান তাঁদেরকে বিয়ে করতেন। তারপর দেখা যেতো, পূর্ব স্বামীও মুসলমান হয়েছেন। তারপর তাঁরাও হিজরত করেছেন। এই সমস্যাটিকে এড়াতেই এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী আগে হিজরত করে মুসলিম দেশে এসে গেলেও তিনি নতুন করে বিয়ে বসতে পারবেন না। কারণ দু'জনেই মুসলমান হওয়ায় তাদের বিবাহবন্ধন অটুট আছে— যদিও স্বামী দারুল হরবে (যে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈধ) এবং স্ত্রী দারুল ইসলামে আছেন। আর যদি এমন হয় যে, স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী রাজ্যে চলে এসেছেন আর স্বামী কাফের অবস্থায় দারুল হরবে আছে— এ রকম অবস্থায় বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। আর তখন হিজরতকারিণী নতুন করে বিয়ে বসতে পারবেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! যখন মুসলমান রমণীরা হিজরত করে তোমাদের কাছে চলে আসে, তখন তোমরা তাদের মুসলমান হওয়ার ব্যাপারটা পরীক্ষা করে নাও। আল্লাহ্ই তাদের প্রকৃত ইমান সম্পর্কে ভালো জানেন। অনন্তর যদি তাদেরকে তোমরা মুসলমান মনে করো, তবে তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফিরিয়ে দিও না। কেননা, ওই রমণীরা কাফেরদের জন্য হালাল নয়। কাফেরেরাও তাদের জন্য হালাল নয়। ওই রমণীদের বিয়ে করলে তোমরা অপরাধী হবে না।'

কিন্তু ইমামে আজম ও সাহেবাইন (ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ) এর মতে, মুসলিম নারী দারুল হরব থেকে ইসলামী রাজ্যে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দারুল হরবের স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কারণ, তারা পৃথক পৃথক দেশের অধিবাসী। আর দুই দেশের আইন কানুনও আলাদা। ইমামে আজম বলেন, এভাবে পৃথক হয়ে এলে মেয়েদেরকে ইদ্দত পালন করতে হবে না কিন্তু সাহেবাইন বলেন, ইদ্দত পালন জরুরী। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, এবং ইমাম আহমদ বলেন— মুসলমান হওয়ার পর তিনবার ঋতুস্রাব অন্তে বিচ্ছিন্নতা বলবৎ হয়। তবে শর্ত হলো যদি তার স্বামীসহবাস হয়ে থাকে। সহবাস না হয়ে থাকলে মুসলমান হওয়ার সাথে সাথেই পৃথক হয়ে যাবে। এই ইমামগণের নিকট রাজ্য পৃথক হওয়ার কারণে আলাদা কোনো নিয়ম নেই।

ক্রীতদাসীদের নিয়ম অন্যরকম। আতা বলেছেন, ক্রীতদাসীদের ব্যাপারে বিশেষ নিয়ম এই যে— যদি কারো কোনো ক্রীতদাসী তার নিজস্ব ক্রীতদাসের বিবাহাধীনে থাকে, তবে মালিক ইচ্ছা করলে তাদেরকে বিবাহবিচ্ছিন্ন করার হুকুম জারী করতে পারবে। কিন্তু সলফে সালেহীনের নিকট এ অভিমতটি সর্ববাদীসম্মতরূপে ভুল। এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ মতটি বর্ণনা করেছেন— মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি এবং নাসাঈ। তাঁদের বর্ণনাটি হচ্ছে—হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আওতাসের যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্যে ছিলো কতিপয় সধবা মহিলা। তাদেরকে সম্ভোগ করা ঠিক হবে কিনা জানতে চেয়ে আমরা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শরণাপন্ন হলাম। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। আল্লাহ্তায়ালা স্পষ্ট জানালেন, গণিমত হিসেবে প্রাপ্ত বন্দিনীদের সঙ্গে সহবাস তোমাদের জন্য বৈধ। এতে কোনো গোনাহ্ নেই।

তিবরানী হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এভাবে— এই আয়াত নাজিল হয়েছে হুনাইন যুদ্ধের সময়। যুদ্ধজয়ের পর আহলে কিতাবদের কতিপয় রমণী মুসলমানদের অধিকারাধীনা হয়। তারা ছিলো সধবা। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা তাদেরকে পেয়েছিলেন, তাঁরা তাদেরকে সম্ভোগ করতে

www.eelm.weebly.com

চাইলে তারা বলে উঠলো, আমাদের তো স্বামী আছে। একথা রসুল স. কে জানানো হলো। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, যুদ্ধবন্দিনীদের সঙ্গে তাদের মালিকেরা সহবাস করতে পারবে। তাদের স্বামী থাকলেও তারা বিবাহবিচ্যুতা বলে গণ্য হবে। স্বামী না থাকলেতো হবেই। তবে জরায়ু ভ্রূণমুক্ত থাকা অপরিহার্য। কারণ, আওতাসের দিন রসুল স. ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, গর্ভবতীদেরকে প্রসবের পূর্বে এবং যারা গর্ভবতী নয় তাদেরকে ঋতুবতী হওয়ার আগে বিবাহ কোরো না।

বন্দিনীদের মালিকেরা তাদের অধিকৃতাদেরকে অন্যত্র বিয়েও দিয়ে দিতে পারে। অধিকৃতা বলেই পারে (অধিকার অর্থ বন্দিনীর অস্তিত্বের উপর বন্দীকারীর সার্বিক অধিকার)। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ এরকমই বলেছেন। এই ইমামগণ বলেছেন, আওতাসের দিন ওই মহিলাদেরকে তাদের স্বামীসহ বন্দী করা হয়েছিলো। ইমামে আজম বলেন, কেবল বন্দিনী হলেই রমণীরা স্বামীচ্যুতা হয় না। স্বামীবিচ্ছিন্না হয় তখনই যখন একজন বন্দী হয়, অপরজন হয় না। এরকম হলে বন্দীত্বের কারণেই হবে। তবে বন্দিনী বা বন্দীর অবস্থান হতে হবে পৃথক দুই রাজ্যে। শুধু বন্দী হলেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না। ইমামে আজম এই মতই পোষণ করেন। হানাফীদের বক্তব্য এই যে, রাজ্য পৃথক হলে বিবাহ আর প্রতিষ্ঠিত থাকে না। আর বন্দিনীদের অধিকার লাভ করা মানে বন্দিনীদের অস্তিত্বের নির্ভেজাল মালিকানা লাভ করা। এরকম মালিকানা দ্বারা উপকার লাভ করা জরুরী নয়। কিন্তু নসের (কোরআন হাদিসের) উপস্থিতিতে এরকম অনুমাননির্ভরতা গ্রহণীয় নয়।

ইবনে হুমাম লিখেছেন, আওতাসের যুদ্ধে কোনো পুরুষ বন্দী হয়নি। বন্দী হয়েছিলো কেবল রমণীরা। তিরমিজির বর্ণনায় এর সমর্থন রয়েছে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আওতাসের যুদ্ধে আমরা কতিপয় মহিলাকে বন্দী করলাম। তাদের স্বামীরা ছিলো মুক্ত। এই পরিস্থিতিতেই মুসলমানেরা বন্দিনীদের সহবাসবিমুখতা সম্পর্কে রসুল স. কে জানিয়েছিলেন, আর তখনই নাজিল হয়েছিলো এই আয়াত।

আমি বলি, তিরমিজির বর্ণনায় এমন শব্দ নেই যাতে করে একথা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, মহিলারা তাদের স্বামী ছাড়াই বন্দী হয়েছিলো। এ জন্যেই ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, মহিলারা স্বামী ব্যতীত বন্দী হলে সাধারণ অর্থই গ্রহণীয় হবে। বিশেষ কোনো কারণ উল্লেখের প্রয়োজন হবে না। এরপর একথাটিও চিন্তা করতে হবে যে, এই আয়াতে 'অধিকারভুক্ত দাসী' বলা হয়েছে সেই সকল বন্দিনীকেও যারা সধবাও। কিন্তু পৃথক রাজ্যের কথা বলা হয়নি।

হানাফীগণ বলেন, আয়াতের সাধারণ অর্থের মধ্যে ঐকমত্য নেই। কেননা, সাধারণ অর্থে তো সকল রাজ্যই অন্তর্ভূত। যুদ্ধে বন্দী হওয়া, ক্রয়সূত্রে বা মীরাসের মাধ্যমে পাওয়া—সকল রাজ্যেই সম্ভব। আয়াতের উদ্দেশ্য যদিও

www.eelm.weebly.com

ব্যাপক, কিন্তু ক্রীতদাসী প্রাপ্তির সূত্রগুলো বিশেষভাবে চিহ্নিত। তাই সধবা বন্দিনীদেরকে আমরা বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছি। (যেমন ঐকমত্যানুসারে ক্রয়সূত্রে প্রাপ্ত সধবা নারীরাও বিশেষিত। এভাবেই আমরা বিবাহিতা বন্দিনীদেরকে বিশেষভাবে কিয়াস বা ধারণা করে নিয়েছি)।

আমি বলি, বিশেষভাবে চিহ্নিত করার ব্যাপারটা কিয়াস (ধারণা) নির্ভর হলেও তার সমর্থনে শরিয়তের দলিল থাকতে হবে। নস (কোরআন, হাদিস), ইজমা (ঐকমত্য) অথবা কিয়াস (নস ও ইজমা সমর্থিত অনুমান) — কিছু একটা তো থাকতেই হবে। ব্যক্তিগত অভিমতের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবই নয়। তাই ক্রয় করার বিষয়টি ছাড়া অন্য সূত্রের সধবা ক্রীতদাসীদেরকে আয়াতের ব্যাপকতার মধ্যে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ নেই।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায়, বিবাহিতা রমণী বিক্রি হওয়ার সাথে সাথে স্বামী বিচ্ছিন্না হয়ে পড়ে। বিক্রি হয়ে যাওয়াই তার জন্য তালাকপ্রাপ্তা হওয়া। ইবনে আবী শায়বা, ইবনে জারীর, আব্দ বিন হুমাইদ্।

আমি বলি, এই আয়াতের 'মুহসানাত' শব্দটির মাধ্যমে ওই সকল স্বাধীনা রমণীকে নির্দেশ করা হয়েছে, যাদের স্বামী আছে। তাদের ও স্বামীসম্পন্না বন্দিনীদের পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য তাদেরকে একসঙ্গে আলোচনায় আনা হয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ হবে, স্বাধীনা সধবারা তোমাদের জন্য হারাম। কিন্তু ওই সকল সধবা হারাম নয়, যারা যুদ্ধবন্দিনী ক্রীতদাসী। এমতাবস্থায় খরিদসূত্রে অথবা মীরাসের মাধ্যমে প্রাপ্ত ক্রীতদাসীদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, খরিদ করার আগে অথবা মীরাসের অন্তর্ভূতা হওয়ার আগে তারা 'মুহসানাত' ছিলো না (স্বাধীনা সধবা ছিলো না— ক্রীতদাসীই ছিলো)।

আল্লাহ্তায়ালাই এই বিধান দিচ্ছেন। যাদেরকে তিনি হারাম করেছেন তারা হারামই। আর যাদেরকে হালাল করেছেন, তারা হালাল। আর এটাও আল্লাহ্র বিধান যে, স্ত্রীদের সংখ্যা হতে পারবে সর্বোচ্চ চারজন। ইবনে জারীর কিতাবুল্লাহ্র ব্যাখ্যায় হজরত ওমর বিন খাত্তাবের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এরকম— তোমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে (সর্বাধিক) চারজন। ইবনে জারীহের বর্ণনাসূত্রে ইবনে মুনজির লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— এক ব্যক্তির জন্য চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

হারাম ঘোষিতা ছাড়া অন্যরা হালাল। আর সংখ্যার দিক থেকে চারজনে সীমাবদ্ধ রাখাও হালাল। যারা হালাল তাদেরকে বিবাহের পয়গাম পাঠানো যাবে। তারা সম্মত হলে মোহরানা নির্ধারণ করে বিবাহ করতে হবে। মোহরানা প্রদান করা ফরজ। মোহরানা প্রদান আর অবৈধ যৌনচরিতার্থতার জন্য অর্থ ব্যয় এক কথা নয়। পবিত্রতা রক্ষা করাই বিবাহের উদ্দেশ্য। নিছক যৌনপ্রয়োজন সিদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়।

www.eelm.weebly.com

মোহরানা ছাড়া বিবাহ বৈধ হবে না। রসুল স. অবশ্য এই নিয়মের উর্ধ্বে। যেমন, আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'এবং ওই মুমিন নারীদেরকেও (আপনার জন্য হালাল করেছি) যে বিনা বিনিময়ে (বিনা মোহরে) নিজেকে নবীর নিকট সম্প্রদান করে, যদি নবী তাদেরকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন। এ হুকুম কেবল আপনার জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়।'— এই আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় মোহর ব্যতীত বিবাহের অধিকার রয়েছে কেবল নবী করীম স. এর।

কিয়াস দ্বারা বুঝা যায়, মোহরানা ছাড়া বিবাহই হবে না। কিন্তু আমরা কিয়াসকে আয়াতের পশ্চাতে রেখে এসেছি। আল্লাহ্তায়ালা আরো এরশাদ করেছেন, 'তোমাদের জন্য কোনো গোনাহ্ নেই যদি তোমরা রমণীদেরকে স্পর্শ (সহবাস) করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও অথবা তাদের জন্য মোহরানা নির্ধারণ করা না হয়ে থাকে।' এই আয়াতের শেষ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানা গেলো, মোহরানা ছাড়াও বিয়ে হতে পারে। কিন্তু আয়াত উল্লেখ করেই আমরা বলতে চাই, বিবাহের জন্য মোহরানা জরুরী। বিবাহের উদ্দেশ্যও তাই। কিন্তু বিবাহের প্রাক্কালেই মোহরানা নির্ধারণ জরুরী নয়। এর উপরেই ঐকমত্য হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বিয়ে পড়ানোর সময় যদি মোহরানা নির্ধারণ করা না হয়ে থাকে, অথবা 'মোহরানা নির্ধারণ করা হবে না' এরকম বলা হয়ে থাকে — এমতাবস্থায় নির্জন মিলনের আগেই যদি স্বামী মৃত্যুবরণ করে তবে স্ত্রীর মোহরানা অবশ্যম্ভাবী হবে না। কিন্তু জমহুরের অভিমত হচ্ছে, এরকম অবস্থায় 'মোহরে মেছাল' ওয়াজিব হবে (বোন অথবা ফুফুর বিয়েতে যে মোহরানা ধরা হয়েছে তাকে মোহরে মেছাল বলে)। নির্জন মিলনের পর মারা গেলে যেমন হয় তেমনি এক্ষেত্রেও হবে। আমরা বলি, স্ত্রী হালাল হওয়া সম্পদ (মোহরানা) পরিশোধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই শরিয়তে মোহর নির্ধারণ করার কথা এসেছে। আয়াতের 'বি আমওয়ালিকুম' (অর্থব্যয়) শব্দটির উদ্দেশ্য এরকমই। অতএব, ইমাম শাফেয়ীর এই মন্তব্যটি ভুল যে 'মোহর উল্লেখ ছাড়া অথবা মোহর পরিশোধ করা হবে না— এই শর্তে বিবাহ সম্পাদিত হওয়ার পর নির্জন মিলনের আগেই মারা গেলে মোহরে মেছাল পরিশোধ করতে হবে না।' তাঁর মন্তব্যকে ঠিক মনে করলে 'বি আমওয়ালিকুম' শব্দটি অনর্থক হয়ে পড়বে।

আলকামার বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করা হলো, যদি মোহর উল্লেখ ব্যতীত বিয়ে করার পর সহবাস ব্যতীত কেউ মারা যায় তবে কী হবে? তিনি বললেন, মোহরে মেছাল ওয়াজিব হবে। এর কমও হবে না। বেশীও হবে না। আর বিধবার জন্য ইদ্দত পালন জরুরী হবে এবং সে মীরাসও পাবে। একথা শুনে হজরত মা'কাল বিন সানান আশজায়ী রা. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমাদের বংশের এক মহিলা ছিলেন বরওয়া বিনতে ওয়াশেক— তাঁর ব্যাপারেও রসুল স. এই সিদ্ধান্তই দিয়েছিলেন। একথা শুনে হজরত ইবনে মাসউদ সন্তুষ্ট হলেন। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, দারেমী, বায়হাকী। বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

একটি ধারণাঃ বিবাহের জন্য যদি মোহর অপরিহার্য হয়, তবে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দিলে মোহরানা পরিশোধ করাও অপরিহার্য হওয়া প্রয়োজন। অথচ ইমাম আহমদ ব্যতীত অন্য কেউ এরকম বলেননি। বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় মোহরে মেছালের অর্ধেক পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বক্তব্য জমহুরের বক্তব্যের অনুরূপ।

সমাধানঃ মুত্আ দিতে হবে (জামা, ওড়না এবং চাদর এই তিন বস্ত্রকে বলে মুত্আ)। মুত্আ অর্ধেক মোহরের স্থলবর্তী।

মাসআলাঃ ইমাম মালেক বলেছেন, মোহর দেয়া হবে না একথা বলে বিয়ে করলে বিয়েই হবে না। কেননা, বিয়ে হচ্ছে ক্রয় বিক্রয়ের মতো—যা স্বীকারোক্তি ও বিনিময়ের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। পণ্যমূল্য পরিশোধ ব্যতিরেকে যেমন বেচাকেনা হয় না, তেমনি মোহরানা ছাড়াও বিয়ে হয় না।

আমরা বলি, বিবাহ অবিকল বেচাকেনার মতো নয়, মোহর ওয়াজিব হওয়া শরিয়তের হুকুম (প্রকৃতপক্ষে, স্বীকারোক্তি ও পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ সম্পাদিত হয়ে থাকে, আর শরিয়ত এজন্য মোহরকে ওয়াজিব করে দিয়েছে)। কাজেই মোহরানা ধার্য করার শর্ত অনর্থকতায় পর্যবসিত হলেও বিবাহ বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু কেনাবেচার ব্যাপারটি অন্যরকম। পণ্যমূল্য নির্ধারণের উপরই ক্রয় বিক্রয়ের ভিত্তি। তাই পণ্যমূল্যের উল্লেখ না থাকলে ক্রয় বিক্রয় হবেই না।

জ্ঞাতব্যঃ এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মোহরানা হিসেবে অর্থ সম্পদ নির্ধারণ করা হোক। আর সম্পদ হতে হবে হালাল। জানা থাকা, নির্ধারিত থাকা এবং উপকার পাওয়ার জন্য অর্থ সম্পদই শরিয়তসম্মত মোহরানা। এজন্য কোরআন, হাদিস এবং এজমার দিক থেকে আকদে ইজারা (ভাড়া, চুক্তি ইত্যাদি) বৈধ। ইজারা পণ্যসামগ্রীর উপস্থিতি ব্যতিরেকেই সম্পাদিত হতে পারে। পরে প্রাপ্তব্য পণ্যসামগ্রী উপকারী হবে, না অপকারী হবে একথা জানা না থাকলেও মানুষের ব্যাপক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এরকম করা হয়েছে। যেমন বাড়ীভাড়ার ব্যাপার। বাড়ীতে বসবাস না করা পর্যন্ত বসবাসের সুবিধা অসুবিধা বাস্তবভাবে বুঝা সম্ভব নয়। তবুও বসবাসের আগেই বাড়ী ইজারা বা ভাড়া নির্ধারণ করা বৈধ হবে। শ্রমের আগেই শ্রমিকের সঙ্গে শ্রমমূল্য নির্ধারণ করা, ভ্রমণের আগেই যাত্রীভাড়া ও পরিবহনমূল্য নির্ধারণ করা, শস্য উৎপাদিত হওয়ার আগেই জমির ইজারা মূল্য নির্ণয় করা, গৃহে প্রবেশের পূর্বেই বাড়ী ভাড়া ঠিক করা— এ সমস্ত কিছুই বৈধ। বিবাহের অবস্থা ঠিক এরকমই। স্বামীর যদি মোহর দেয়ার মতো সম্পদ না থাকে তবে, সুনির্দিষ্ট কোনো উপকারী বস্তুকে মোহর নির্ধারণ করলেও বিবাহ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে— এটাও সম্পদ প্রাপ্তির একটি প্রকৃতি।

মাসআলাঃ যদি বিয়ের সময় এই শর্ত করে যে, স্বামী এক বৎসর স্ত্রীর খেদমত করবে এবং এই এক বৎসরের খেদমতই হবে তার মোহর। তবে এক বৎসরের খেদমতের মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে, একথা বলেছেন— ইমাম মোহাম্মদ। কারণ এই যে, এরকম সিদ্ধান্ত বিবাহের উদ্দেশ্য বিরোধী। স্বামী

www.eelm.weebly.com

স্ত্রীর খাদেম হতে পারে না। তাই সে খেদমত করতে অপারগ। আর যেহেতু মোহর নির্ধারণ করা হয়েছে এক বৎসরের খেদমত। তাই স্বামীকে মোহরানা হিসেবে এক বৎসরের খেদমতের সমমূল্য পরিশোধ করতে হবে।

ইমামে আজম ও ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন অন্যকথা। তাদের মতে, মোহরে মেছাল ওয়াজিব হবে। কেননা, খেদমত করা যেহেতু সম্ভব নয়, তাই খেদমতের প্রসঙ্গটি বাতিল হওয়াই সমীচীন। অতএব, এক্ষেত্রে মোহরে মেছালই পরিশুদ্ধ।

মাসআলাঃ যদি বিবাহের সময় এই শর্ত করে যে, একজন খাদেম এক বৎসর পর্যন্ত স্ত্রীর খেদমত করবে এবং এটাই হবে বিবাহের মোহরানা তবে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে। ওই খাদেমের শ্রমমূল্য পরিশোধ করতে হবে স্বামীকে। এটা ঐকমত্য। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, নির্ধারিত খাদেম খেদমত করতে অসম্মত হলে অন্য খাদেম নিয়োগ করা জরুরী হবে।

মাসআলাঃ যদি স্ত্রীর গৃহপালিত পশু চরানো, তার জমি চাষ করা, ফসল বোনা ইত্যাদিকে মোহর হিসেবে নির্ধারণ করা হয়, তবে তা জায়েয হবে না বলে কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে জায়েয। অবশ্য এ ধরণের খেদমত কেবল স্ত্রীরই খেদমত নয়— বরং স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলেই এ সমস্ত কাজ কর্ম দেখাশুনা করে থাকেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে রয়েছে হজরত মুসা এবং হজরত শুয়াইব আলাইহিমুস্সালামের ঘটনা। আমাদের শরিয়তে ওই ঘটনার কোনো বিরুদ্ধ নির্দেশ নেই। ইমাম আহমদ এবং ইবনে মাজা লিখেছেন, হজরত উতবা বিন মুনজির বর্ণনা করেন, আমি রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি স. ত্ব, সিন, মীম পাঠ করছিলেন। যখন হজরত মুসার বর্ণনায় পৌছলেন তখন বললেন, হজরত মুসা তাঁর লজ্জাস্থান পবিত্র রাখার জন্য এবং জীবিকা সংস্থানের জন্য হজরত শুয়াইবের নিকট জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি ওই সময় দলিল হিসেবে পেশ করা সম্ভব যখন এটা প্রমাণিত হবে যে, ওই বকরীগুলোর মালিক ছিলেন হজরত শুয়াইবের কন্যা (তাঁর স্ত্রী)। কিন্তু বিষয়টি সেরকম ছিলো না। তাঁর স্ত্রী নন, বরং বকরীগুলোর মালিক ছিলেন স্বয়ং হজরত শুয়াইব। তাই প্রশ্ন জাগে যে, বকরী চরানোকে মোহরানা নির্ধারণ করা কী করে সম্ভব?

মাসআলাঃ যদি কোরআনের কোনো সুরাকে শিক্ষা দেয়া মোহরানা নির্ধারণ করা হয় তবে তা বৈধ হবে। একথা বলেছেন ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী। এক বর্ণনায় এসেছে— ইমাম আহমদও এই অভিমত পোষণ করেন। ইমাম আজম এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, বৈধ হবে না, বরং মোহরে মেছাল ওয়াজিব হবে। প্রশ্ন হচ্ছে— হজ পালন, কোরআন শিক্ষাদান ইত্যাদি ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয কিনা। যদি জায়েয হয়, তবে কোরআন শিক্ষাকে মোহরানা নির্ধারণ করা যাবে। যদি না হয়, তবে যাবে না। ইমাম শাফেয়ীর ব্যাখ্যা দু'ভাবে করা যেতে পারে— ১. ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয। তাই কোরআন

www.eelm.weebly.com

শিক্ষা দেয়াকে মোহরানা নির্ধারণ করাও জায়েয। ২. অন্য ইবাদত নয়—এই কোরআন শিক্ষাকেই বিশেষভাবে মোহরানা নির্ধারণ করা জায়েয।

প্রথম মাসআলার সমর্থনে রয়েছে দু'টি হাদিস। প্রথম হাদিসের বর্ণনাকারী হজরত আবু সাঈদ খুদরী। হাদিসটি এই— কতিপয় সাহাবী একটি জনপদ অতিক্রম করছিলেন। তাঁদের পানাহারের প্রয়োজন হয়ে পড়লো। কিন্তু ওই জনপদবাসীরা তাঁদেরকে আহার্য দিতে সম্মত হলো না। হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটলো। তাদের সর্দারকে সাপ বা বিষাক্ত কিছু দংশন করলো। তখন তারা সাহাবীগণকে বললো, তোমরা কি এর ঔষধ জানো? তোমাদের মধ্যে মন্ত্র পড়তে পারে এমন কেউ আছে কি? সাহাবীগণ বললেন, তোমরা আমাদেরকে আহার্য দিতে সম্মত হওনি; তাই বিনিময় নির্ধারণ ব্যতীত আমরা কোনো মন্ত্র উচ্চারণ করবো না। তারা বিনিময় হিসেবে একপাল ছাগল দিতে সম্মত হলে হজরত আবু সাঈদ খুদরী সুরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিলেন। সর্দার নিরাময় লাভ করলো। জনপদবাসীরাও ছাগল দিয়ে দিলো। সাহাবীগণ বললেন, রসুল স. কে জিজ্ঞেস করা ব্যতিরেকে আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি না। যখন তাঁরা রসুল স.এর নিকট উপস্থিত হয়ে সবকিছু জানালেন, তখন তিনি স. মৃদু হেসে বললেন, তোমরা কীভাবে জানলে যে সুরা ফাতিহা মন্ত্র। বকরীগুলো গ্রহণ করো আর এতে আমাকেও অংশী করো।

দ্বিতীয় হাদিসের বর্ণনাকারী হচ্ছেন হজরত ইবনে আব্বাস। ঘটনাটি এই— কতিপয় সাহাবী একটি ঝর্ণার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে সাপ অথবা বিচ্ছু দংশন করেছিলো। একজন বললো, তোমাদের মধ্যে কি কোনো মন্ত্র জানা লোক আছে? সাহাবীগণের একজন সুরা ফাতিহা পড়লেন। দংশিত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে গেলো। বিনিময় হিসেবে তিনি লাভ করলেন কয়েকটি ছাগল। তাঁর সঙ্গীগণ এটাকে পছন্দ করলেন না। বললেন—তুমি কিতাবুল্লাহ্‌র মজুরী নিয়েছো। তাঁরা মদীনায় ফিরে এলে রসুল স. বললেন, কিতাবুল্লাহ্‌ইতো বিনিময় গ্রহণের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী। অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বললেন, তোমরা ঠিকই করেছো। এর একটি অংশ আমাকেও দিও। বর্ণিত দু'টি হাদিসই বোখারী ও মুসলিমে লিপিবদ্ধ রয়েছে। খারেজা বিন ছলতের চাচার বর্ণনা থেকে ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদ এরকম উদ্ধৃত করেছেন।

উপরোক্ত হাদিস দু'টির বিশ্লেষণার্থ এরকম হতে পারে যে, সাহাবীগণ যাদের কাছ থেকে ছাগল নিয়েছিলেন, তারা ছিলেন কাফের আর কাফেরদের তরফ হতে এরকম বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ। লক্ষ্যণীয় যে, মন্ত্রোচ্চারণ নিছক ইবাদত নয় এবং এর বিনিময় গ্রহণ করাও বৈধ (কিন্তু কোরআন শিক্ষাদান কেবলই ইবাদত)।

ইমাম শাফেয়ীর দ্বিতীয় দলিল হিসেবে পেশ করা হয়েছে হজরত সহল বিন সা'দ বর্ণিত নিম্নের হাদিসটি—যাতে বলা হয়েছে এক মহিলা রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রসুল, আমি আমাকে আপনার নিকট সম্প্রদান করলাম। রসুল স. কোনো কথা বললেন না। মহিলা

www.eelm.weebly.com

দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ ধরে। উপস্থিত এক সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রসুল ওকে আমার সংগে বিয়ে দিয়ে দিন, যেহেতু আপনার প্রয়োজন নেই। রসুল স. বললেন, তোমার মোহর দেয়ার মতো কী আছে? তিনি বললেন, আমার পরিধানের এই লুঙ্গিটি ব্যতীত আমার আর কিছুই নেই। রসুলপাক স. বললেন, খুঁজে দেখো। লোহার আংটিও যদি পাও। কিন্তু ওই সাহাবী কোনো কিছুই পেলেন না। তিনি স. বললেন, তোমার কি কোরআন মুখস্থ আছে? সাহাবী বললেন, হ্যাঁ। অমুক অমুক সুরা আমার মুখস্থ আছে। রসুলপাক স. বললেন, তোমার ওই মুখস্থ কোরআন শিক্ষাদানের পরিবর্তে আমি এই মহিলাকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম। অন্য বর্ণনায় এসেছে রসুল স. বললেন, ঠিক আছে। আমি এই মহিলাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলাম। তুমি তাকে কোরআন শিক্ষা দিও। বোখারী, মুসলিম।

এই হাদিস প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এটা ছিলো রসুল স. এরই বিশেষত্ব। তিনি যেমন নিজে মোহরানা ব্যতিরেকেই বিয়ে করতে পারতেন, তেমনি অন্যকেও বিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখতেন।

মাকহুল থেকে ইবনে জাওজী লিখেছেন, রসুল স. কোরআন শিক্ষার বিনিময়ে একজনকে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য কারো জন্য এরকম অনুমতি নেই। লাইসের বক্তব্য হতে তাহাবী লিখেছেন, রসুল স. ছাড়া অন্য কারো জন্য এরূপ করা বৈধ নয়। এ সম্পর্কে ইবনে জাওজী মন্তব্য করেছেন— ইসলামের প্রথমাবস্থায় দারিদ্রের কারণে এমনটি করা হয়েছিলো।

আমি বলি, ইবনে জাওজীর মতে এ হুকুমটি পরে রহিত হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রহিত হওয়া বিষয়টি কোনো ধারণাসম্ভূত বিষয় নয়। আর রসুল স.ও এই বিশেষ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ইমামে আজমের অভিমত প্রমাণ করার জন্য দু'টি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। ১.সাধারণতঃ ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়েয। ২. বিশেষতঃ শিক্ষাদান মোহর হতে পারে না। প্রথমটির প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েকটি হাদিস থেকে। যেমন, হজরত উবাদা বিন সামেত বর্ণনা করেন—আমি আহলে সুফ্ফার কতিপয় সদস্যকে লিখতে শিখিয়েছি এবং কোরআন পড়িয়েছি। তাঁদের মধ্যে একজন আমাকে একটি ধনুক উপহার দিলেন। আমি স্থির করলাম, ধনুকটি আমি জেহাদে ব্যবহার করবো। রসুল স. কে এ কথা জানাতেই তিনি বললেন, তুমি যদি আগুনের মালা গলায় পরতে চাও তবে ধনুকটি নিতে পারো। আহমদ, আবু দাউদ। এই হাদিসের একজন বর্ণনাকারীর নাম মুগীরা। ইবনে জাওজী তাকে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসংগে আর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত উবাই বিন কাব রা.। তিনি বলেছেন, আমি একজনকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছিলাম। তিনি আমাকে একটি ধনুক উপহার দিলেন। আমি রসুল স. কে একথা জানালাম। তিনি স. বললেন, তুমি যদি এটা নাও তবে যেনো আগুনের ধনুক নিলে। একথা শুনে আমি ধনুকটি ফিরিয়ে দিলাম। ইবনে জাওজী আর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন

www.eelm.weebly.com

হজরত আব্দুর রহমান বিন সহল আনসারী থেকে। তিনি বলেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি কোরআন পড়ো কিন্তু সীমা অতিক্রম কোরো না এবং এর নিকট থেকে দূরেও সরে যেওনা (সম্পূর্ণরূপে পাঠ পরিত্যাগ কোরো না) আর এর জন্য বিনিময় গ্রহণ কোরো না (কোরআন শিক্ষাদানকে উপার্জনের উপকরণ বানিয়ো না) অহংকারীও হয়ো না (বিদ্যার গর্ব কোরো না)। তিবরানী।

জ্ঞাতব্যঃ সীমা অতিক্রম করা সম্পর্কে নেহায়া রচয়িতা লিখেছেন, রসুল স. সচ্চরিত্র ও শিষ্টাচারের হুকুম দিয়েছেন। সকল কাজে সীমাসুষমা বজায় রাখাও ওই হুকুম সমূহের একটি। মধ্যমাবস্থা সর্বাপেক্ষা উত্তম। ন্যূনতা ও অতিরিক্ততা উভয় অবস্থাই মন্দ।

হজরত মিতরাফ বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, হজরত ওসমান বিন আস নিবেদন জানালেন, আমাকে আমার সম্প্রদায়ের ইমাম বানিয়ে দিন। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে। তবে দুর্বলতম ব্যক্তির দিকে খেয়াল রেখো এবং এমন মোয়াজ্জিন নিযুক্ত কোরো, যে বিনিময় আকাঙ্খী নয়। আহমদ। এ সমস্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ করা নিষেধ। অন্যান্য ইবাদতের মতো কোরআন শিক্ষার জন্যও বিনিময় নেয়া বৈধ নয়। শরিয়ত এর সম্পদগত মূল্যকে স্বীকার করেনি। আর মোহরানা সম্পূর্ণতঃই সম্পদনির্ভর। তাই কোরআন শিক্ষাকে মোহরানা নির্ধারণ করা নাজায়েয।

বায়যাবী লিখেছেন, অর্থব্যয়ে বিবাহ করতে চাওয়াকে বৈধ করা হয়েছে কেবল ওই সমস্ত নারীকে, যাদের ব্যাপারে নিষিদ্ধতা নেই। এই অর্থ ব্যয় করাই মোহরানা এবং শর্ত হচ্ছে অর্থ হালাল হতে হবে। আর মনে রাখতে হবে, অবৈধ যৌনচরিতার্থতার জন্য এই অর্থ ব্যয়কে বৈধ করা হয়নি। বায়যাবীর উদ্দেশ্য এই যে, নিষিদ্ধ ঘোষিত রমণীরা ছাড়া অন্যান্যদের হালাল হওয়ার প্রধান শর্তই হচ্ছে অবৈধ সম্ভোগের জন্য অর্থ ব্যয় না করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, অর্থ ব্যতীত মহিলাদের হালাল হওয়া সম্ভবই নয় এবং বিবাহকালে মোহরানা নির্ধারণ করতেই হবে।

আমি বলি, মোহর ব্যতীত বিয়ে করলে বিয়ে বিশুদ্ধ হবে, কিন্তু তাকে পরিশোধ করতে হবে মোহরে মেছাল। আর মূল্যহীন কোনো বস্তুকে মোহর নির্ধারণ করলে ওই মোহর বাতিল হয়ে যাবে এবং তদস্থলে ওয়াজিব হবে মোহরে মেছাল। এটাই ঐকমত্য। ইমাম শাফেয়ী কোরআন শিক্ষাদানকে মোহরানা নির্ধারণ করা জায়েয করেছেন এই কারণে যে, তিনি কোরআন শিক্ষা দানের বিনিময়মূল্যকে স্বীকার করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ঐকমত্যসম্ভূত মাসআলাটিই গ্রহণীয়।

মাসআলাঃ যদি কেউ কোনো ক্রীতদাসীকে মুক্তি দেয়ার সময় বলে, আমি এই মুক্তিদানকে মোহরানা করে তোমাকে বিয়ে করতে চাই; তবে ঐকমত্যানুসারে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে। ইমাম আহমদ বলেছেন, দু'জন সাক্ষীর সামনে এই শর্ত প্রকাশ করা হলে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে। উম্মত জননী হজরত সাফিয়া রা. এর

www.eelm.weebly.com

বিবাহের ঘটনাটি এই মতের পরিপোষক। অন্য এক বর্ণনায় ইমাম আহমদের বক্তব্য অবশ্য জমহুরের বক্তব্যের অনুকূলে এসেছে। জমহুরের বক্তব্য এই যে, এতে করে ক্রীতদাসী মুক্তি অবশ্যই পাবে, কিন্তু বিবাহ কবুল করা না করার ব্যাপারে সে স্বাধীনা থাকবে। যদি কবুল করে তবে সে মোহরে মেছালের অধিকারিণী হবে। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম সুফিয়ান সওরী জমহুরের সংগে একমত হননি। তাঁরা মুক্তিপ্রাপ্তা ক্রীতদাসীর বিবাহ কবুল করা না করার ব্যাপারে স্বাধীনতা দানের পক্ষপাতি নন। তাদের পক্ষে জননী সাফিয়ার বিবাহের ঘটনাটিতো রয়েছেই, তদুপরি রয়েছে উম্মত জননী হজরত জুয়াইরিয়া রা. এর বিবাহের বিষয়টি। ঘটনাটি এরকম—বনী মুস্তালিকের যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভূতা হয়ে এসেছিলেন হজরত জুয়াইরিয়া রা.। গণিমত বণ্টনক্রমে তিনি পড়েছিলেন ছাবেত বিন কায়েস রা. এবং তাঁর চাচাত ভাইয়ের ভাগে। হজরত ছাবেত তাঁকে মোকাতাব বলে ঘোষণা করলেন। (অর্থমূল্য পরিশোধ করে মুক্তি প্রাপ্তব্য ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীকে মোকাতাব বলে)। হজরত জুয়াইরিয়া রসুল স. কে একথা জানালেন। তিনি স. বললেন, এই শর্তে আমি তোমার মোকাতাবের অর্থ পরিশোধ করতে চাই যে, তুমি আমাকে বিবাহ করতে সম্মত হবে। জননী জুয়াইরিয়া বললেন, উত্তম। রসুল স. বললেন আমিও সম্মত আছি (বিবাহ করতে সম্মত আছি)। হজরত আয়েশা রা. থেকে এই বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন আহমদ ও আবু দাউদ।

আমরা বলি, এই বিবাহ মোহর ব্যতিরেকেই সম্পাদিত হয়েছিলো। এমতো ক্ষেত্রে মোহরে মেছাল ওয়াজিব। এই হাদিসটি মোহরানা ব্যতীত বিবাহ সম্পাদনের দলিল নয়। এ বিশেষ ব্যবস্থাটি ছিলো কেবল রসুল স. এর জন্যই। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'অন্যান্য মু'মিন ব্যতীত একে আপনার বৈশিষ্ট্য করা হয়েছে।' এরকম অবস্থায় ক্রীতদাসী যদি বিবাহে অসম্মত হয়, তবে তাকে শ্রমের মাধ্যমে মুক্তিপণের অর্থ পরিশোধ করে নিতে হবে। এরকম অভিমত পোষণ করেন ইমাম আজম, সাহেবাইন এবং ইমাম শাফেয়ী। ইমাম মালেক ও ইমাম জোফার বলেছেন— এরকম ক্ষেত্রে ক্রীতদাসীর জন্য মুক্তিপণ পরিশোধ করা ওয়াজিব নয়।

ইমাম আজম, সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ী তাঁদের বক্তব্যের কারণ উল্লেখ করেছেন এরকম—মনিব মুক্তিপণকে মোহরানা নির্ধারণ করেছে আর ক্রীতদাসী বিবাহে অসম্মত হয়েছে—তাই ক্রীতদাসীকে মুক্তিপণ দিতেই হবে। যদি মনিব বলে, মুক্তির শর্ত হচ্ছে এক বৎসর পর্যন্ত আমার খেদমত করতে হবে—একথা বলে মনিব যদি মারা যায় তবে ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসীকে মনিবের ওয়ারিশগণের খেদমত করতে হবে। একথা বলেছেন ইমাম আজম এবং ইমাম আবু ইউসুফ। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, খেদমত নয় বরং খেদমতের মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

www.eelm.weebly.com

ইমাম মালেক ও ইমাম জোফার তাঁদের অভিমতের প্রমাণ দিয়েছেন এরকমভাবে—মুক্তিপণকে যেহেতু মোহর হিসেবে স্বীকার করা হলো না, তাই মুক্তি হবে বিনিময়বিহীন। ক্রীতদাসী যেহেতু বিবাহকেই অস্বীকার করে বসেছে, তাই বিবাহের মোহরানারূপী মুক্তিপণ পরিশোধ করা আর তার জন্য জরুরী নয়। যেমন, সে বিবাহে সম্মত হলেও তাকে মুক্তিপণ পরিশোধ করতে হতো না। তাই স্বীকৃতি অথবা অস্বীকৃতি উভয় ক্ষেত্রে তার মুক্তি হবে বিনিময়বিহীন। এই বর্ণনাটি প্রাধান্য পেয়েছে বেশী।

মাসআলাঃ ঐকমত্যানুসারে মোহরানা নির্ধারণের উর্ধ্বতম কোনো সীমানির্দেশ নেই। পাত্র-পাত্রীর সম্মতি অনুসারে যতো বেশী সম্ভব মোহরানা নির্ধারণ করা যেতে পারে। মোহরানার ন্যূনতম সীমা সম্পর্কে অবশ্য মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, ন্যূনতম মোহরের বিশেষ কোনো সীমা নেই। যে বস্তুর বিক্রয়মূল্য রয়েছে তাকেই বিবাহের মোহর নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমন এই আয়াতেই বলা হয়েছে, অর্থ ব্যয়ে বিবাহ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো। এখানে মোহরের কম, বেশী বা বিশেষ কোনো সীমা নির্দেশ করা হয়নি। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক বলেছেন, শরিয়তে ন্যূনতম মোহরের পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে। ন্যূনতম মোহরের পরিমাণ ঠিক ততোটুকুই, যতোটুকু চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে। ইমাম আজমের মতে এর পরিমাণ হচ্ছে— এক দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) অথবা দশ দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা)। ইমাম মালেকের মতে, এক চতুর্থাংশ দিনার অথবা তিন দেরহাম। ন্যূনতম মোহরানা নির্ধারণ করা হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার এই নির্দেশে 'আমি এ সমস্ত হুকুম অবগত আছি যা আমি তাঁদের এবং তাঁদের পত্নীগণের জন্য ফরজ করেছি।' ফরজের অর্থ পরিমাণ নির্ধারণ করা। এই আয়াতের মাধ্যমে দু'টো বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১. শরিয়তে মোহরের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। যারা বলেন নির্ধারণ করা হয়নি, তাঁদের বক্তব্য এই আয়াতের বিরুদ্ধে চলে যায়। ২. মোহরের পরিমাণ নির্ধারণকারী স্বয়ং আল্লাহ্। এমতাবস্থায় মোহরানা যদি বান্দার ইচ্ছানির্ভর করা হয় তাহলে ফরজ কথাটি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে— এই আয়াতটি মোহর সম্বন্ধীয় নয় বরং এখানে মেয়েদের খোরপোষের কথা বলা হয়েছে। আয়াতের সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি এরকম— 'আমি এ সমস্ত হুকুম অবগত আছি যা আমি তাঁদের এবং তাঁদের পত্নীদের জন্য ও দাসীদের জন্য ফরজ করেছি।' এখন যদি এই আয়াতটিকে মোহরানা নির্ধারণের আয়াত হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তবে ক্রীতদাসীদের মোহর নির্ধারণ করাও জরুরী হয়ে পড়বে। অথচ এরকম কথা কেউ বলেন না।

ইমাম শাফেয়ী তাঁর মাসআলার সমর্থনে কতিপয় হাদিস উল্লেখ করেছেন। ১. হজরত সহল বিন সা'দ রা. বর্ণিত হাদিস। যেখানে রসুল পাক স. বলছেন, খুঁজে দেখো— লোহার একটি আংটিও যদি পাও। হাদিসটি বিশুদ্ধরূপে বর্ণিত হয়েছে। ২. হজরত আমের বিন রবিয়া বর্ণিত হাদিস— যেখানে বলা হয়েছে এক মহিলা

www.eelm.weebly.com

একজোড়া জুতার বিনিময়ে বিবাহে সম্মত হয়েছিলেন। রসুল স. বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্টচিত্ত? মহিলা বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বিবাহ অনুমোদন করলেন। তিরমিজি। এ হাদিসকে ইবনে জাওজী বলেছেন, বিশুদ্ধ নয়। এই সনদের একজন বর্ণনাকারীর নাম আছিম বিন উবায়দুল্লাহ্। ইয়াহিয়া বিন মুঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। আরো বলেছেন, তার বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা নেই। ইবনে হাব্বানের মন্তব্য এরকমই। ৩. হজরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণিত হাদিস। তিনি বলেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন— যদি কেউ মোহর হিসেবে কোনো রমণীকে হাত ভরে খাদ্য সামগ্রী দেয়, তবে স্ত্রী হিসেবে ওই মহিলা তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, মোহর হিসেবে কেউ যদি হাতের মুঠি ভরে আটা অথবা তরকারী কিংবা ছাতু দেয় তবে সে তার স্ত্রীকে হালাল বানিয়ে নেয়। দারা কুতনী। আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে ছাতু অথবা খেজুর।

উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের এক বর্ণনাকারী সালেহ্ বিন মুসলিম বিন রোমান সম্পর্কে দুর্বলতার অভিযোগ এনেছেন ইয়াহ্ইয়া ও রাজী। কোনো কোনো সনদে সালেহ্ বিন মুসলিমের স্থলে মুসা বিন মুসলিমের নাম এসেছে। তিনি ঠিক সুপরিচিত ছিলেন না। দারা কুতনীর বর্ণনায় রয়েছে আব্দুল্লাহ্ বিন মোয়ামেল, আবু জোবায়ের এবং হজরত জাবের। হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, আমরা এক লপ অথবা দুই লপের মাধ্যমে মেয়েদেরকে বিয়ে করতাম। ইমাম আহমদ বলেছেন— ইবনে মোয়ামেলের বর্ণনা মুনকার। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন দুর্বল। (অত্যধিক দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে মুনকার বলে)।

এ সম্পর্কিত আর একটি হাদিসের রাবী হচ্ছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী। তিনি বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন— তোমরা বিধবাদেরকে বিবাহ করো এবং আলায়েক আদায় করো। জানতে চাওয়া হলো, আলায়েক কী? তিনি স. বললেন, যার উপর উভয় পক্ষের অভিভাবক সম্মত হয়— যদিও তা হয় পিলু বৃক্ষের একটি লাঠি— দারা কুতনী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইসমাইল বিন আয়াশ থেকে। আলেমগণ বলেছেন, তিনি দুর্বল। ইবনে হাব্বান বলেছেন, তার দলিল গ্রহণীয় নয়। এই সনদের আর এক বর্ণনাকারী হচ্ছে আবু হারুন আবদি। তার আসল নাম আম্মারা বিন জুন। হাম্মাদ বিন জায়েদ বলেছেন, সে ছিলো মিথ্যুক। ইমাম আহমদ বলেছেন, সে কিছুই ছিলো না। শা'বা বলেছেন, যদি সে এসে আমার গলা কেটে ফেলে তবুও তা আমার পছন্দ হবে, কিন্তু আমি তার বর্ণনা করা হাদিস গ্রহণ করতে পারবো না। সুদ্দী বলেছেন, সে ছিলো মিথ্যুক এবং ধোকাবাজ।

দারা কুতনী ও বায়হাকী এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন মোহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন সালমানী থেকে। তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা হজরত ইবনে আব্বাস অথবা হজরত ইবনে ওমর থেকে। শেষ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন দারা কুতনী ও তিবরানী।

www.eelm.weebly.com

ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন বলেছেন, মোহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান কিছুই ছিলো না। ইবনে হাব্বান বলেছেন, তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে সন্দেহযুক্ত বর্ণনা করেছেন। বায়হাকীও শিথিল সনদে হজরত ওমর থেকে এ বিবরণটি দিয়েছেন। আবু দাউদ তাঁর মারাসীল গ্রন্থে মুরসাল হিসেবে আব্দুল মালেক বিন মুগীরা তায়েফীর মাধ্যমে— আব্দুর রহমান সালমানী থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আবদুল হক বলেছেন, এই মুরসাল হাদিসটি অন্যান্য দিক থেকে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। বায়হাকী ইয়াহ্ইয়া বিন আবদুর রহমান থেকে, তিনি তাঁর পিতা আবদুর রহমান থেকে বলেছেন— কেউ যদি এক দেরহামকেও মোহর নির্ধারণ করে, তবুও তার স্ত্রী তার জন্য হালাল হয়ে যাবে।

ইবনে শাহীনের বর্ণনায় রয়েছে— দুই দেরহাম অথবা তার চেয়ে অধিক মোহরের উপর বিবাহ বৈধ হবে।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসটি— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন— ভালো করে শোনো! মেয়েদের বিবাহ সম্পাদন করবে তাদের অভিভাবকেরা। তারা বিবাহ সম্পন্ন করবে কুফু (সমকক্ষতা) বজায় রেখে। আর লক্ষ্য রাখবে মোহর যেনো দশ দেরহাম থেকে কম না হয়। দারা কুতনী, বায়হাকী। ইবনে জাওজী বলেছেন বিভিন্ন পদ্ধতিতে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সবগুলো মিলিত হয়েছে বশীর বিন উবায়েদের সঙ্গে। ইমাম ইবনে হাম্বল তাকে আমলই দেননি। বলেছেন, সে মিথ্যুক। তার বর্ণনা যথাযথ নয়। দারা কুতনী বলেছেন, সে মিথ্যাচারী। কিন্তু ইবনে হাব্বান বলেছেন, এ বিষয়টি বর্ণনার দিক থেকে সে নির্ভরযোগ্যই ছিলো। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, বর্ণনাটি দুর্বল হলেও এর সাক্ষ্যদাতা শক্তিমান এবং বর্ণনাটির পোষকতা রয়েছে হজরত আলী থেকে। বলা হয়েছে, দশ দেরহামের কম চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না এবং দশ দেরহামের চেয়ে কম মোহরও হবে না। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন— হজরত আলী, হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর, হজরত আমের এবং হজরত ইব্রাহিম থেকে আমাদের কাছে এরকম বর্ণনা এসেছে— যাতে ন্যূনতম মোহরানা দশ দেরহাম নির্ধারিত রয়েছে। শরহে তাহাবীতে উদ্ধৃত হয়েছে— হজরত জাবেরের সূত্রানুযায়ী এটি ছিলো রসুল স. এরই নির্দেশনা। কিন্তু হজরত আলী বর্ণিত হাদিসের আর এক বর্ণনাকারী দাউদ ইজদী এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন শা'বী থেকে। ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন বলেছেন, দাউদের বর্ণনা ধর্তব্য নয়। ইবনে হাব্বান বলেছেন, দাউদ ছিলেন বক্তব্য প্রত্যাহারকারী। আর শা'বী হজরত আলী থেকে এরকম কথা শোনেননি। অন্যান্য সূত্রে এসেছে— গিয়াস বিন ইব্রাহিমের নাম। আহমদ, বোখারী, দারা কুতনী তাকে বলেছেন মাতরুক। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন মিথ্যুক এবং ইবনে হাব্বান বলেছেন বর্ণনাটি অযথার্থ।

হজরত আলীর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে— পাঁচ দেরহামের কম মোহর নেই। এই সনদের বর্ণনাকারীর নাম হাসান বিন দিনার। ইমাম আহমদ বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

তার বর্ণনা লিপিবদ্ধযোগ্য নয়। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, সে ছিলো অপদার্থ। আবু হাতেম বলেছেন, সে ছিলো মিথ্যানুসারী।

আমি বলি, এ সকল ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, দশ দেরহাম নির্ধারণকারী কোনো বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য নয়; বরং এর বিপরীতে হজরত সহল বিন সা'দের বর্ণনাই বিশুদ্ধ। আর হাদিস বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলেও কিতাবুল্লাহকে অতিক্রম করতে পারে না। কিতাবুল্লাহ্র ব্যাখ্যাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। যদি এরকম বলা হয় যে, শরিয়তের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মোহরের নিয়ম বর্ণিত হয়েছে, তাই মূল্যহীন কোনো কিছুকে মোহর বলে গণ্য করা হয়নি। যেমন গমের একটি দানা, রুটির একটি টুকরা— এ সমস্তের কোনো সম্মানজনক মূল্যমান নেই। তাই শরিয়তে ন্যূনতম নির্ধারণের নিয়ম থাকা প্রয়োজন। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলবো, এ দৃষ্টিভঙ্গী কিতাবুল্লাহ্র উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। তাই এই প্রকৃতির ধারণা পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। আল্লাহ্তায়ালাই ভালো জানেন।

এরশাদ হয়েছে, 'তোমরা যাদেরকে সম্ভোগ করেছো তাদের মোহরানা পরিশোধ করো।' কেউ কেউ বলেছেন, এই নির্দেশটি আকদে মুত্আ (সাময়িক বিবাহ চুক্তি) সম্পর্কিত। এই ধরণের বিবাহে সময়সীমাও নির্ধারিত থাকে। নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। তালাক দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু পুনঃবিবাহের জন্য স্ত্রীকে এক ঋতুস্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এই বিবাহের আর একটি প্রকৃতি এই যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেউ মারা গেলে কেউ কারো মীরাস পাবে না। অর্থাৎ আকদে মুত্আয় প্রকৃত অর্থে কেউ স্বামী বা স্ত্রী নয়। বরং এরূপ বিবাহ হারাম।

মুসান্নিফ গ্রন্থে আব্দুর রাজ্জাক ইবনে জারীহের বর্ণনা থেকে আতার বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস মুত্আকে (কিছু সম্পদের বিনিময়ে কয়েক দিনের জন্য বিবাহকে) হালাল মনে করতেন এবং মুত্আর সমর্থনে এই আয়াত পাঠ করতেন। তিনি আরো বলেছেন, হজরত উবাই ইবনে কা'বের ক্বেরাত ছিলো এ রকম— 'ইলা আজালিম মুসাম্মা' অর্থাৎ 'নির্দিষ্ট সময়'। তিনি বলতেন, আল্লাহ্ ওমরের প্রতি রহম করুন। মুত্আ হচ্ছে আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্র এক রহমত। তিনি যদি মুত্আ নিষিদ্ধ না করতেন তবে জেনা ব্যভিচারের প্রশ্নই উঠতো না। ইবনে আব্দুল বার বর্ণনা করেন, হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলো মুত্আ কি বিবাহ না জেনা? তিনি বললেন, বিবাহও নয় জেনাও নয়। পুনরায় বলা হলো, তাহলে কী? তিনি বললেন, এমনই যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন। জিজ্ঞেস করা হলো ইদ্দতের প্রয়োজন আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। পুনঃ প্রশ্ন করা হলো, মুত্আকারী নারী-পুরুষ কি একে অপরের ওয়ারিশ? তিনি বললেন, না।

মুত্আ হালাল হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে সাহাবীগণের এক জামাতের সাথে। তাহাবী এবং নাসাঈ লিখেছেন, হজরত আসমা বিনতে হজরত সিদ্দিকে আকবর বলেন, আমরা রসুল স. এর যুগে এরকম দেখেছি। মুসলিম লিখেছেন, হজরত

www.eelm.weebly.com

জাবের বলেন, আমরা রসুল স. এর সময়, হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের খেলাফতের প্রথম যুগে এরকম করেছি। হজরত ওমর তাঁর খেলাফতের শেষদিকে মুত্আ নিষিদ্ধ করে দেন। এরপর আমরা কেউ হুকুমের সীমা অতিক্রম করিনি। হজরত জাবের এবং হজরত সালমা বিন আকওয়া থেকে তাহাবী বর্ণনা করেছেন— রসুল স. সাহাবীগণের সামনে মুত্আর অনুমতি দিয়েছিলেন। বোখারী ও মুসলিমে হজরত ইবনে মাসউদের বক্তব্যে এসেছে— রসুল স. আমাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এরপর হজরত ইবনে মাসউদ এই আয়াত পাঠ করলেন— 'হে ইমানদারগণ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে সব বস্তু হালাল করেছেন.... ।'

এ সকল বর্ণনানুযায়ী মুত্আ জায়েয বলে মনে হয়। অবশ্য এই জায়েয হওয়া বহাল থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত যতোক্ষণ না মনসুখ বা রহিত হওয়ার দলিল না পাওয়া যায়। হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনানুযায়ী রহিত না হওয়াই প্রমাণিত হয়। আব্দুর রাজ্জাক লিখেছেন, হজরত মুয়াবিয়া রা. তায়েফে এক মহিলাকে মুত্আ করেছিলেন।

আখবারুল মদীনা গ্রন্থে স্বসূত্রে আমর বিন শায়বা লিখেছেন, হজরত সালমা বিন উমাইয়া এক মহিলাকে মুত্আ করলেন। এ সংবাদ হজরত ওমরের নিকট পৌছলে তিনি সালমাকে ধমক দিলেন। আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নিফ গ্রন্থে লিখেছেন— মা'বাদ বিন উমাইয়া মুত্আকে হালাল মনে করতেন। হাফেজ লিখেছেন, তাবেয়ীনদের এক জামাতও মুত্আ হালাল হওয়ার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইবনে জারীহ্, তাউস, আতা, হজরত ইবনে আব্বাসের ছাত্রগণ। ওই দলে আরও ছিলেন সাঈদ বিন জোবায়ের এবং মক্কার ফকিহ্গণ। এর উপর ভিত্তি করে হাকেম তাঁর উলুমুল হাদিস গ্রন্থে ইমাম আওজায়ীর এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন যে—আহলে হেজাজের (হেজাজবাসীদের) পাঁচটি বক্তব্য পরিত্যক্ত। এর মধ্যে পড়েছে মক্কাবাসীদের মুত্আ এবং মদিনাবাসীদের স্ত্রীর সঙ্গে পায়ুসঙ্গম হালাল হওয়ার প্রসঙ্গ দু'টি।

মাসআলাঃ মুত্আ নাজায়েজ ও হারাম হওয়ার উপর এজমা হয়েছে। এখন শিয়ারা ছাড়া অন্য কেউ তাকে হালাল মনে করে না। মুত্আ হারাম হয়েছে এ আয়াত দ্বারা 'আর যারা নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে, কিন্তু আপন স্ত্রীগণ ও ক্রীতদাসীগণ থেকে নয়। কেননা, এতে তাদের কোনো দোষ নেই। তবে এছাড়া যারা অন্যত্র কামলিপ্সা চরিতার্থ করতে চায় তারা সীমালঙ্ঘনকারী।' মুত্আকারী রমণীকে স্ত্রী বলা যায় না—ক্রীতদাসীও বলা যায় না। তাই তারা ওয়ারিশও হয় না। আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, স্ত্রী অথবা ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্যত্র গমনকারীরা সীমালঙ্ঘনকারী। যদি এই আয়াতের তাফসীর হজরত ইবনে আব্বাসের মতানুসারে করা হয়, তবে একথাও মানতে হবে যে, এ হুকুমটি পরবর্তীতে রহিত হয়েছে। (কিন্তু রহিত হওয়ার বিষয়টি সকলের নিকট স্পষ্ট হয়নি)। মুসলিম লিখেছেন, রবী বিন সুবরা বিন মা'বাদ জুহুনী বর্ণনা করেন—

www.eelm.weebly.com

আমার পিতা আমাকে বলেছেন, আমি রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি স. বললেন— হে মানুষেরা! আমি তোমাদিগকে মুত্আ করার অনুমতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহ্ এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত একে হারাম করে দিয়েছেন। কাজেই যদি তোমাদের কারও কাছে এ ধরনের রমণী থাকে তবে তাকে মুক্ত করে দাও এবং যা কিছু দিয়েছো তা ফেরৎ নিও না।

উল্লেখিত বর্ণনাকারীর বর্ণনা উদ্ধৃত করে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. আমাদেরকে মুত্আর অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই আমি এক আমেরীয়া রমণীর নিকট গেলাম। সে ছিলো যৌবনবতী, দীর্ঘ গ্রীবাধারিণী। আমি প্রস্তাব পেশ করলাম— সে বললো, তুমি আমাকে কী দিবে? আমি বললাম, চাদর। আমার সঙ্গে ছিলো আর একজন। সেও তার চাদর পেশ করলো। তার চাদর আমার চাদর থেকে উত্তম ছিলো। কিন্তু আমি ছিলাম তার চাইতে বেশী যুবক। রমণীটি আমার সঙ্গীর চাদর দেখে পছন্দ করলো, আর আমার চাদর পছন্দ না করলেও আমাকে পছন্দ করলো। বললো— তোমার চাদরই আমার জন্য যথেষ্ট। তুমিই আমার পছন্দ। আমি তার নিকট তিন রাত্রি অতিবাহিত করলাম। এরপর রসুল স. কে বলতে শুনলাম, যার কাছে মুত্আ রমণী আছে, সে যেনো তাকে ছেড়ে দেয়।

ইবনে মাজা বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ওমর ভাষণ দিলেন। ভাষণে বললেন, রসুল স. তিন দিন পর্যন্ত মুত্আর অনুমতি দিয়েছিলেন এবং পরে তা হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্র কসম এখন যদি আমি কাউকে মুত্আ করতে দেখি তবে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে ধ্বংস করে দেবো; যদি সে বিবাহিত হয়। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে— হজরত ওমর তাঁর ভাষণে বললেন, মানুষেরা মুত্আকে পছন্দ করবে কেনো? রসুল স. তো মুত্আকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। মুত্আকারী ব্যক্তিকে যদি আমার কাছে আনা হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি তাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলবো।

হজরত ইবনে ওমরকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন—মুত্আ হারাম করা হয়েছে। তাকে যখন বলা হলো, হজরত ইবনে আব্বাসতো এটাকে জায়েয বলেন; তখন তিনি বললেন— হজরত ওমরের যুগে এরকম কেউ বলেননি।

হজরত সালাম বিন আকওয়া বলেছেন, রসুল স. আওতাসের বৎসর তিন দিনের জন্য মুত্আর অনুমতি দিয়েছিলেন। পরে এটাকে নিষিদ্ধ করেছেন। মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় আরও এসেছে— হজরত সুবরা বিন মা'বাদ বলেন, মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে আমরা যখন মক্কায় প্রবেশ করলাম তখন মুত্আর অনুমতি পেয়েছিলাম। কিন্তু মক্কা থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার আগেই একে নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। হজরত জাবের থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাজেমী।

আমরা রসুল স. এর সঙ্গে তাবুকের যুদ্ধে গিয়েছিলাম। যখন শামদেশে পৌছলাম তখন কয়েকজন মহিলাকে দেখলাম। আমরা তাদের সঙ্গে মুত্আ করলাম। আমরা ধারণা করেছিলাম, তারা আমাদের উটে চড়ে ভ্রমণ করবে।

www.eelm.weebly.com

এরপর রসুল স. এলেন। মহিলাদেরকে দেখে বললেন, এরা কারা? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা এদের সঙ্গে মুত্আ করেছি। রসুল স. একথা শুনে রোষান্বিত হলেন। তাঁর স. পবিত্র গণ্ডদেশ লাল বর্ণ ধারণ করলো এবং মুখাবয়বের পবিত্র বর্ণও পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তৎক্ষণাৎ তিনি ভাষণ দিতে দণ্ডায়মান হয়ে গেলেন এবং আল্লাহ্তায়ালার স্তবস্তুতির পর মুত্আকে হারাম ঘোষণা করলেন। আমরাও ওই মহিলাদেরকে বিদায় করে দিলাম। এরপর আমরা আর কখনও এরূপ করিনি।

তাহাবী উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে তাবুক অভিযানে চললাম। ছানিয়াতুল বিদায় পৌঁছে তিনি শিবির স্থাপন করলেন। দেখলেন, একস্থানে প্রদীপ জ্বলছে। ভেসে আসছে নারীদের কান্না। নিকটে গিয়ে তিনি বললেন, কী হয়েছে? বলা হলো, এই রমণীদেরকে যারা মুত্আ করেছিলো, এখন তারা পৃথক হয়ে যাচ্ছে। রসুল স. বললেন তালাক, বিবাহ, ইদ্দত এবং মীরাস থেকে আল্লাহ্তায়ালা মুত্আকে হারাম করে দিয়েছেন। দারা কুতনীর বর্ণনায় এসেছে— আল্লাহ্তায়ালা তালাক, ইদ্দত ও মীরাস থেকে মুত্আকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

মোহাম্মদ হানাফিয়ার দুই পুত্র হাসান ও আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, মোহাম্মদ বিন আলী যখন শুনলেন হজরত ইবনে আব্বাস মুত্আ সম্পর্কে নম্র ভাবাপন্ন, তখন তিনি বললেন, তার একথাটি ছেড়ে দিও। কেননা, খায়বর যুদ্ধের সময় রসুল স. মুত্আ এবং পালিত গাধার গোশ্তকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে— ইবনে হানাফিয়া তাঁকে বলেছিলেন, হে ইবনে আব্বাস! তোমার চিন্তায় কিছুটা অপরিচ্ছন্নতা রয়েছে। বোখারী, মুসলিম।

ওরওয়া বিন জোবায়েরের মাধ্যমে মুসলিম আরও বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জোবায়ের মক্কায় বলেছিলেন, আল্লাহ্ কিছুসংখ্যক মানুষের অন্তরকে অন্ধ করে দিয়েছেন, যেমন—কারো কারো চক্ষু অন্ধ হয়। যারা এরকম, তারাই মুত্আকে জায়েজ বলে। তিনি ওই সময় হজরত ইবনে আব্বাসের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছিলেন। শেষ বয়সে হজরত ইবনে আব্বাসের চোখ নিষ্প্রভ হয়ে আসছিলো। তিনি হজরত জোবায়েরকে ডেকে বললেন, নিশ্চয়ই তুমি নির্বোধ। আল্লাহ্র কসম! রসুল স. এর যুগে মুত্আর প্রচলন ছিলো। হজরত ইবনে জোবায়ের বললেন— চিন্তা করে দেখো, তুমি এরকম করেছো কিনা। আল্লাহ্র কসম তুমি যদি এরকম করে থাকো তবে আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করে ফেলবো।

হজরত ইবনে আবী ওমর আনসারী বলেছেন, ইসলামের প্রথমাবস্থায় অপারগ ব্যক্তিদের জন্য মুত্আর অনুমতি ছিলো। যেমন —মৃত, রক্ত এবং শুকরের গোশ্ত। এরপর আল্লাহ্ দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিলেন এবং মুত্আ নিষিদ্ধ করলেন। বায়হাকী, জুহরীর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এরকম— পরকাল যাত্রার

www.eelm.weebly.com

আগে হজরত ইবনে আব্বাস মুত্আ হালাল হওয়া সম্পর্কিত অভিমতটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। আবু আওয়ানা তাঁর সহীহ্ পুস্তকে একথাই বলেছেন।

নাসেখ গ্রন্থে আবু দাউদ এবং আতার মাধ্যমে ইবনে মুনজির ও নুহাস বর্ণনা করেন— এই আয়াতটি রহিত করে দেয়া হয়েছে— 'হে রসুল স. (মানুষকে বলে দিন) যখন তোমরা স্ত্রীদিগকে তালাক দিতে চাও, তখন ইদ্দতপূর্ব তালাক প্রদান করো; আর তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ নিজেকে তিন ঋতু পর্যন্ত বিরত রাখবে। আর তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে যারা নিরাশ হয়েছে।'

বায়হাকী ও অন্যান্যরা হজরত ইবনে মাসউদের বক্তব্য এবং আবু দাউদ ও বায়হাকী হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন— মীরাস সম্পর্কিত আয়াত মুত্আকে রহিত করে দিয়েছে।

তিরমিজি হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যরূপে উল্লেখ করেছেন, মুত্আ ইসলামের প্রথমদিকে ছিলো। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তি বা গ্রামে গিয়ে প্রয়োজনীয় কর্ম নির্বাহে অসমর্থ হয়ে পড়তো, তখন সে যে কয়দিন সেখানে থাকতো সে কয়দিনের জন্য কোনো মহিলাকে মুত্আ করে নিতো। ওই মহিলা তার জিনিসপত্র হেফাজত করতো এবং প্রাত্যহিক কাজকর্ম সেরে দিতো। তারপর নাজিল হয় সুরা মু'মিনুনের এই আয়াত— 'তবে তাদের পত্নী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না হলে তারা তিরস্কৃত হবে না।'

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, এখন স্ত্রী ও ক্রীতদাসীরা ছাড়া অন্য সবাই হারাম।

আমি বলি, সম্ভবত হজরত ইবনে জোবায়ের এবং অন্যান্য আলেমগণের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার পর হজরত ইবনে আব্বাস তাঁর অভিমত থেকে সরে এসেছিলেন। সুতরাং মুত্আ রহিত হওয়া তাঁর মাধ্যমেও প্রমাণিত হলো। এক বর্ণনায় এসেছে—হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুত্আ ওই সময়ে বৈধ হবে যখন মুসাফির তার প্রাত্যহিক কর্ম সম্পাদনে অসহায় হয়ে পড়ে। সাঈদ বিন জোবায়েরের বক্তব্য উদ্ধৃত করে হাজেমী বলেছেন, ইবনে জোবায়ের বলেন, আমি হজরত ইবনে আব্বাসের নিকট নিবেদন করলাম, আপনার অভিমত তো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এ নিয়ে কবিরাও অনেক কবিতা রচনা করেছে— যেগুলোর বক্তব্য এরকম— যখন শায়েখ দীর্ঘদিন যাবত অবস্থান করতে থাকলেন, তখন আমি বললাম, হে আমার বন্ধু আপনি কি ইবনে আব্বাসের অভিমতটি পছন্দ করেন? আপনি কি চান চম্পক অঙ্গুলীধারিণী রমণী আপনার অবস্থানস্থলে প্রতীক্ষারতা থাকুক?

একথা শুনে হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, সোবহানাল্লাহ! আমিতো এরকম ফতোয়া দিইনি। মুত্আতো মৃত, রক্ত অথবা শুকরের গোশ্তের মতো, যা নিতান্ত অসমর্থ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও জন্য বৈধ নয়। এই বর্ণনাটি লিখেছেন, ইবনে মুনজির তাঁর তাফসীরে এবং বায়হাকী তাঁর সুনান গ্রন্থে। বর্ণনাটি এরকম— 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন (আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সকলে

www.eelm.weebly.com

তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী)। আল্লাহ্র কসম! আমি এরকম ফতোয়া দিইনি। আমার উদ্দেশ্য ওরকম নয়। নিতান্ত অসহায় ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্যদের জন্য মুত্আ হালাল হবে না।

ইবনে জারীহও তাঁর অভিমত প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। সহীহ্ পুস্তকে আবু আওয়ানা লিখেছেন, বসরা শহরে ইবনে জারীহ বলেছিলেন, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি মুত্আ হালালের ফতোয়া প্রত্যাহার করে নিলাম। অথচ তিনি ইতোপূর্বে মুত্আ জায়েযের পক্ষে আঠারোটি হাদিস বর্ণনা করেছিলেন।

একটি ধারণাঃ মুসলিমের বিভিন্ন বর্ণনায় মুত্আর হালাল হারাম প্রসঙ্গ এসেছে আওতাস যুদ্ধের প্রাক্কালে। অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. মক্কাবিজয়ের দিন মুত্আকে হারাম করে দিয়েছেন। বোখারী ও মুসলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে, মুত্আ হারাম হয়েছে খায়বর যুদ্ধের সময়। তাবুক যুদ্ধের সময়ে হারাম হওয়ার কথাও এসেছে অন্যত্র। এই বৈসাদৃশ্যের কারণ কী?

সমাধানঃ আওতাসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো মক্কাবিজয়ের বছরেই। বাকি রইলো খায়বর যুদ্ধের কথা। একথা জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, মুত্আর অনুমতি দেয়া হয়েছিলো দু'বার এবং দু'বারই অনুমতি রহিত করে দেয়া হয়েছে। এরপর চিরদিনের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। একথা বলেছেন ইবনে হুম্মাম। মুসলিম শরীফে মুত্আ অধ্যায়ের প্রথমে মুত্আর অনুমতিসূচক বর্ণনা রয়েছে। এরপরও রয়েছে রহিত হওয়া সম্পর্কিত বর্ণনা। এই রহিত হওয়া অর্থ কিয়ামত পর্যন্ত রহিত হওয়া।

রবী বিন সালমানের মাধ্যমে বাগবী বর্ণনা করেন, ইমাম শাফেয়ী বলেছেন— হালাল করার পর হারাম করা হয়েছে— মুত্আ ব্যতীত এরকম কোনো হুকুম আমার জানা নেই। হালাল করা হয়েছে দু'বার, হারামও করা হয়েছে দু'বার। এরপর হারাম করা হয়েছে চিরদিনের জন্য। কোনো কোনো আলেম বলেছেন মুত্আ রহিত করা হয়েছে তিনবার। কেউ কেউ বলেছেন, তিনবারের অধিক। তাবুক যুদ্ধের সময় নিষিদ্ধ করার বর্ণনা দ্বারা একথা বলা যাবে না যে, তাবুকের পূর্বে অনুমতি ছিলো। বরং এটাই সত্য যে, মুত্আ যে চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে গিয়েছে একথা তখনকার মুত্আকারীরা জানতেন না। তাই মুত্আর কথা শুনে রসুল স. কুপিত হয়েছিলেন। তাঁর পবিত্র চেহারার রঙ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিলো এবং তিনি ভাষণদানের মাধ্যমে মুত্আর নিষিদ্ধতা সম্পর্কে পুনঃ ঘোষণা দিয়েছিলেন। হাজেমী বর্ণনা করেন, স্বদেশে বা স্বস্থানে কখনোই মুত্আর অনুমোদন ছিলো না। সফরের অসহায়ত্বের সময় অনুমতি ছিলো এবং বিদায় হজের দিন থেকে চিরদিনের জন্য হারাম করা হয়েছে।

এই আয়াতকে অধিকাংশ তাফসীরকার মুত্আ বিষয়ক বলেননি। বরং বলেছেন, এখানে বিশুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে সহবাসের উপকার এবং আস্বাদের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, যেহেতু তোমরা তাদেরকে উপভোগ করো তাই তাদের মোহরানা পরিশোধ করে দাও। হাসান এবং মুজাহিদের বক্তব্য এরকমই। ইবনে

www.eelm.weebly.com

জারীহ, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— এই আয়াতটি বিবাহের মাধ্যমে উপকার প্রাপ্তি এবং মোহরানার হুকুম সম্পর্কিত আয়াত। এখানে বলা হয়েছে 'আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও।'

মাসআলাঃ উল্লেখিত তাফসীরের মাধ্যমে বুঝা যায়, সহবাস ব্যতীত মেয়েরা মোহরের অধিকারিণী হয় না। ইমাম মালেক তাই বলেছেন। কেবল বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে মেয়েরা সম্পূর্ণ মোহরের অধিকার লাভ করে না। অধিকার লাভ করে অর্ধেক মোহরের। সহবাসের এবং মৃত্যুর মাধ্যমে তারা মোহরানার পূর্ণ অধিকার পায়। কিন্তু জমহুরের অভিমত হচ্ছে, বিয়ে হয়ে গেলেই স্ত্রী পূর্ণ মোহরের অধিকারিণী হবে। কিন্তু সহবাস ব্যতীত তালাক দিলে তখনই কেবল অর্ধেক মোহরানা বাদ পড়ে যাবে। বলা হয়েছে— 'ইন তাবতাগু বি আমওয়ালিকুম— এখানে 'বি' বর্ণটির মাধ্যমে মিলিত হওয়ার অর্থ প্রকট হয়েছে। কাজেই, বিবাহের স্বীকারোক্তির সাথে সাথেই স্ত্রী সম্পূর্ণ মোহরানার অধিকার লাভ করবে। তখন সহবাসকে শর্ত করা হবে আয়াতের মর্মবিরুদ্ধ। এ আয়াতের মাধ্যমে আরও বুঝা যায় যে, উপকার লাভ এবং সহবাস করার সাথে সাথে মোহর ওয়াজিব হবে এবং তখন মোহরানা রহিত হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। কিন্তু একথা বলা যাবে না যে, বিয়ের পর সহবাস না হওয়া পর্যন্ত মোহর ওয়াজিব হবে না। এ ব্যাপারে আয়াতটি নিশ্চুপ। তাই ইমাম মালেকের দলিলটিও ভুল। আয়াত দু'টির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। আর যেহেতু কেবল বিবাহের স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই তারা সম্পূর্ণ মোহরানার অধিকারিণী হয়— তাই তাদের এমতো অধিকার রয়েছে যে, মোহর না পেলে তারা স্বামীকে সহবাসে বাধাদান করতে পারবে এবং তার অনুগমন থেকে বিরত থাকার অধিকারিণী হবে। মোহর হিসেবে যদি কোনো গোলামের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তবে সে গোলামকে স্বামী কখনও মুক্তি দিতে পারবে না। স্ত্রী পারবে। ওয়াল্লহু আ'লাম।

'তোমরা যাদেরকে সম্ভোগ করেছো, তাদের নির্ধারিত মোহর অর্পণ করবে'— এ কথার মাধ্যমে মোহরানা পরিশোধ করা ফরজ করে দেয়া হয়েছে। আয়াতে উল্লেখিত শব্দটি হচ্ছে 'ফারিদ্বাতান'। মোহর নির্ধারণের পর স্বামী-স্ত্রী যদি এ ব্যাপারে কোনো সমঝোতায় আসে, তবে তাতে দোষ নেই। যারা এই আয়াতটি মুত্আ সম্পর্কিত বলে মনে করেন, তারা সমঝোতার ব্যাখ্যা করেন এরকম— মুত্আর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও মুত্আকারিণী সময় বাড়াতে চাইলে পারবে। তেমনি মুত্আকারী পুরুষও নির্ধারিত বিনিময় অপেক্ষা অতিরিক্ত বিনিময় পরিশোধ করতে পারবে। তবে এ ব্যাপারে দু'জনে একমত হতে হবে। একমত না হলে দু'জনে পৃথক হয়ে যাবে। আর যারা বিশুদ্ধ বিবাহের আয়াত বলে এই আয়াতটিকে মনে করেন, তারা সমঝোতার ব্যাখ্যা করেছেন এরকম— মোহর নির্ধারণের পর যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দেয় অথবা সম্পূর্ণ

www.eelm.weebly.com

মোহর মাফ করে দেয় তবে তা বৈধ হবে। আবার স্বামীও যদি নির্ধারিত মোহরের অধিক মোহর পুনঃনির্ধারণ করে তবু তা জায়েয হবে।

মাসআলাঃ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতায় পুনঃনির্ধারিত (কম বা বেশী) মোহরানাই হবে প্রকৃত মোহরানা। স্ত্রী যেমন আগের নির্ধারণকৃত মোহরানার হকদার, তেমনি পুনঃনির্ধারিত মোহরানারও হকদার। দু'জনের সমঝোতায় মোহরানা পুনঃনির্ধারণে স্বামী একথা বলতে পারবে না যে, আগের মোহরানাই হলো আসল মোহরানা। পরে তো আমি অতিরিক্ত সংযোজন করেছি, পরের পরিমাণটুকুতো অনুদান—আমি ইচ্ছা করলে দিতে পারি নাও দিতে পারি।

ইমাম শাফেয়ী পরে নির্ধারিত মোহরকে আসল মোহর মনে করেন না। পরে স্ত্রী যদি তার মোহরানা কমিয়ে দেয় তবে তা স্বামীর প্রতি হেবা (দান) হবে। আর স্বামী যদি পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় তবে বাড়তি পরিমাণ বিবেচিত হবে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হেবা (দান)হিসেবে। দান গ্রহণকারী দানকৃত বস্তু অধিকারে না পেলে মালের মালিক হয় না। তাই মূল মোহরানার সংগে এর কোনো সংশ্রব নেই। অতিরিক্ত পাওনা পাওয়ার বিষয়টি আলাদাই রাখতে হবে। এই ব্যাখ্যাটি একদিক থেকে আমাদের হানাফী মাজহাবের অভিমতকে পোষকতা করেছে। তাই হানাফী অভিমতে বলা হয়েছে— সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একজন আর একজনকে দান করার সম্পর্ক নয়। আর এখানে প্রসঙ্গটি হচ্ছে মোহরানা বিষয়ক। দান অনুদানের প্রসঙ্গ এখানে টেনে আনার প্রয়োজন নেই।

ইমাম আহমদের মতে পরের অতিরিক্ত পরিমাণও মূল মোহরের অন্তর্ভুক্ত। তাই স্বামী যদি স্ত্রীসহবাস করে অথবা মারা যায় তবে পরে নির্ধারিত অতিরিক্ত পরিমাণ সহ মোহরানা পরিশোধ করতে হবে। আর সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে পরে অতিরিক্ত নির্ধারণসহ যে পরিমাণ দাঁড়ায় তার অর্ধেক পরিশোধ করতে হবে।

ইমাম আজম বলেছেন, সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে প্রথমে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক দিতে হবে। পরের অতিরিক্ত অংশের অর্ধেক দিতে হবে না। কেননা আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'আর যদি তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে থাকো আর যদি মোহর নির্ধারণ করে থাকো তবে ফরজ মোহরের অর্ধেক তাদেরকে দিতে হবে। এখানে অতিরিক্তের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

ইমাম মালেক বলেছেন, সহবাসের পর পরবর্তী নির্ধারণ সহই ওয়াজিব হবে। আর সহবাসের আগে তালাক দিলে আগের পরিমাণের সঙ্গে পরের অতিরিক্ত পরিমাণের অর্ধেক দিতে হবে। যদি সহবাসের আগেই স্বামী মারা যায়, আর পরের অতিরিক্ত অংশ স্ত্রীর অধিকারে না থাকে— তবে সে অতিরিক্ত অংশ আর পাবে না।

মাসআলাঃ আলেমদের ঐকমত্য এই যে, মোহরের হকদার নারীরা। তারা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারে। তারা যদি অর্ধেকের কম স্বামীকে হেবা করে

www.eelm.weebly.com

দেয়ার পর সহবাসের আগেই তালাকপ্রাপ্তা হয়, তবে তার স্বামী পরিশোধকৃত মোহরের অর্ধেক রেখে বাকী অংশ ফেরত নেয়ার দাবী করতে পারে। বোখারী ও মুসলিমে এরকম বর্ণনা এসেছে। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, যে পরিমাণ স্ত্রীর অধিকারে চলে গিয়েছে, তার অর্ধেক দাবী করতে পারে। স্ত্রী তার ক্ষমাকৃত অংশ দাবী করতে পারবে না।

আয়াত শেষে ঘোষণা করা হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়—এ কথার অর্থ, যে নির্দেশ তিনি জারী করলেন তার হেকমত সম্পর্কে তিনিই সম্যক পরিজ্ঞাত।

সুরা নিসাঃ আয়াত ২৫

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ
مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ
مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ
مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ
اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ
ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ۟

☐ তোমাদের মধ্যে কাহারো স্বাধীনা বিশ্বাসী নারী বিবাহের সামর্থ না থাকিলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত বিশ্বাসী যুবতী বিবাহ করিবে; আল্লাহ্ তোমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তোমরা এক অপরের সমান সুতরাং তাহাদিগকে বিবাহ করিবে তাহাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাহারা ব্যভিচারিণী অথবা উপপতি গ্রহণকারিণী না হইয়া সচ্চরিত্রা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের মোহর ন্যায়সংগতভাবে দিবে। বিবাহিতা হইবার পর যদি তাহারা ব্যভিচার করে তবে তাহাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীদের অর্ধেক; তোমাদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচারকে ভয় করে ইহা তাহাদের জন্য; ধৈর্যধারণ করা তোমাদের জন্য মংগল। আল্লাহ্ ক্ষমা-পরায়ণ, পরম দয়ালু।

www.eelm.weebly.com

'তাউলুন' শব্দটির অর্থ হচ্ছে— সম্পন্ন অবস্থা। এখানে অর্থ হবে সামর্থ্য। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে উচ্চ হওয়া। পুরো অর্থটা হবে এরকম— যে ব্যক্তি স্বাধীনা রমণীদের বিবাহ করার উচ্চ যোগ্যতা স্পর্শ করতে সমর্থ নয় (যার এমন সম্পদ নেই যার দ্বারা ওই উচ্চতায় আরোহন সম্ভব) — সে যেনো অন্যের মালিকানাধীন ক্রীতদাসীদেরকে বিবাহ করে।

স্বাধীনা রমণীরা দাসত্বের অভিশাপমুক্ত। তাই তাদেরকে বলা হয়েছে মুহ্সানাত্। আর নিজের ক্রীতদাসী তো ক্রীতদাসী হিসেবে রয়েছেই। এখানে বলা হয়েছে,স্বাধীনা নারী সম্ভব না হলে অন্য কোনো ক্রীতদাসীকে সে যেনো বিবাহ করে। ক্রীতদাসীকে হতে হবে মুসলমান। মুশরিক ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা বৈধ নয়। এই আয়াত দ্বারা ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ দু'টি নির্দেশ প্রমাণ করেছেন। ১.স্বাধীনা রমণীদেরকে বিয়ে করতে সমর্থদের জন্য ক্রীতদাসী বিবাহ করা হারাম। ২.আহলে কিতাব রমণীদের বিবাহ করা সাধারণতঃ হারাম। ক্রীতদাসী বিবাহ করার জন্যও রয়েছে দু'টি শর্ত— ১. স্বাধীনা রমণীদের বিবাহ করার যোগ্যতা না থাকা। ২. ক্রীতদাসীদের মুসলমান হওয়া।

হজরত জাবের এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এরকম বর্ণনা এসেছে। বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আবু জোবায়ের বলেছেন— কোনো স্বাধীন পুরুষ যেনো কোনো ক্রীতদাসীকে বিয়ে না করে। যে স্বাধীনা রমণীর মোহরানা পরিশোধ করতে সক্ষম, সে যেনো ক্রীতদাসী অভিমুখী না হয়। এই বর্ণনাটির সনদ বিশুদ্ধ।

ইবনে মুনজির হজরত ইবনে মাসউদের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এরকম— আল্লাহ্ ওই ব্যক্তির জন্য ক্রীতদাসীদেরকে বিবাহ করা হালাল করেছেন, যার স্বাধীনা রমণীদের মোহরানা পরিশোধ করার ক্ষমতা নেই এবং যার গোনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হানাফীগণ এই প্রসংগটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন কয়েক রকমভাবে। ১. আমরা উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে দলিল পেশ করার পক্ষপাতি নই এবং একথাও বলি না যে, শর্তযুক্ত কোনো কিছু না সূচক হবে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সত্য হচ্ছে কারণ সমতুল্য। যার সংগে কারণের সম্পর্ক তাও আবার অধিক উপকারী হওয়া জরুরী নয়। কারণ যার সাথে সংশ্লিষ্ট তার আবার অন্য কারণও থাকতে পারে। তাই হুকুমের সংগে শর্ত ও বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরী (তবে দেখতে হবে এতে যেনো কোনো নিষিদ্ধতা না থাকে)। শর্ত ও বৈশিষ্ট্য না থাকলে হুকুম না থাকা জরুরী নয়, বরং হুকুম না হওয়ার ব্যাপারে মৌনতা বাঞ্ছনীয়। শর্ত ও বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতিতে হুকুমের সংগে দ্বিতীয় কোনো কারণ যদি সংশ্লিষ্ট হয়, তবে উত্তম। অন্যথায় বুঝতে হবে হুকুম নেই। এই হুকুম না হওয়াই মূল নিষিদ্ধতা। কেননা, ঘটনাক্রমে শর্তসংলগ্নতার সঙ্গে হুকুমটি তার অবয়ব পেয়েছিলো। আসল হুকুমটি ছিলো নিষেধসূচক। আর এই নিষেধসূচতাকে অবশ্যপালনীয় শরিয়তও বলা যায় না। এখন আসল মাসআলাটির দিকে লক্ষ্য করুন। ক্রীতদাসী হোক অথবা

www.eelm.weebly.com

কাফের আহলে কিতাব হোক কিংবা স্বাধীনা রমণীদেরকে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখুক অথবা নাই রাখুক— সকল অবস্থায় বিবাহ জায়েয বলে প্রমাণ রয়েছে এই আয়াতে— 'তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন অথবা চার ....।'

এর অনুকূলে রয়েছে আর একটি আয়াত—'উহিল্লা লাকুম মা ওয়ারাআ জালিকুম।' (অর্থব্যয়ে বিবাহ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো)। কাজেই 'ফামিম্মা মালাকাত আইমানুকুম'— এই আয়াতের ব্যাখ্যায় অন্যকে বিবাহ করে কিতাবীয়াদের বিবাহকে হারাম করে দেয়া অথবা ক্রীতদাসীকে বিবাহ করার শর্ত হিসেবে স্বাধীনা রমণীকে বিবাহ করার যোগ্যতা না থাকা— এসব কথা বলা ঠিক নয়। ২. যারা প্রচলিত অভিমতের বিরুদ্ধে তাদের কথা হচ্ছে— হুকুমটি ঘটনাক্রমে না হয়ে স্পষ্ট শর্ত এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হতে হবে। স্বভাবগত এবং প্রচলনগত হওয়া চলবে না। পরিস্থিতিগত কারণে মানুষ স্বভাবতঃই উৎকৃষ্ট আকাঙ্খা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। স্বাধীনা রমণী বাদ দিয়ে ক্রীতদাসী বিবাহ করার ব্যাপারটি সেরকম। নিতান্ত অপারগতাবশতঃই মানুষ ক্রীতদাসীর পাণি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। নতুবা ক্রীতদাসীর মাধ্যমে বংশধারা প্রবহমান থাকুক— এরূপ কামনা হতে পারে কার? আর মুসলমান কখনো সঙ্গী বা সঙ্গিনী হিসেবে কাফেরকে পছন্দ করতে পারে না। মুসলমানদের এই স্বভাবজঃ বৈশিষ্ট্যের কারণে আল মুহ্সানাতের বৈশিষ্ট্য হিসেবে আল মু'মিনাত (ইমানদার নারী) কে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ কারণেই ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যদি আহলে কিতাবকে বিবাহ করার ক্ষমতা থাকে, তবে বাঁদীকে বিবাহ করা দুরস্ত নয়। আমরাও তাই বলি। আল মু'মিনাত নির্ধারণ করা হয়েছে ঘটনাক্রমে অথবা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশার্থে নয়, বরং এ কথা বলা হয়েছে উত্তম অবস্থা নির্ধারণার্থে। আলেমদের ঐকমত্য এরকমই। ৩. প্রকৃত জ্ঞানের বিরুদ্ধে হলেও নাজায়েয হওয়ার অর্থ যদি গ্রহণ করা হয় তবুও এরকম চিন্তা অপরিহার্য নয় যে, যা মোবাহ্ (বৈধ) নয়, তা সকল ক্ষেত্রে হারাম। বরং অনেক ক্ষেত্রে যা বৈধ নয় তা মাকরূহ্ বলে সাব্যস্ত হয়েছে। বেদায়া গ্রন্থে এ সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় রয়েছে, কিতাবীয়া ক্রীতদাসী অথবা স্বাধীনা নারী— সকলের সঙ্গে বিবাহ মাকরূহ্। কারণ, এতে করে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, আর এরকম বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ। রসুল স. এরশাদ করেছেন, তোমাদের মহব্বতকে শক্তিশালী করতে বৈবাহিক সম্বন্ধের তুল্য কিছু নেই। ইবনে মাজা। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'তোমরা ইহুদী ও নাসারাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না।' অন্য আয়াতে এসেছে— 'যাদের প্রতি আল্লাহ গজব নাজিল করেছেন তাদের সাথে হৃদ্যতা কোরো না।' রসুল স. আরও বলেছেন, রমণীদের চারটি গুণ তাদেরকে বিবাহাধীনে পাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি করে। সেগুলো হচ্ছে— সম্পদ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য্য ও ধর্মপরায়ণতা। তোমরা ধর্মপরায়ণা রমণীর পাণি গ্রহণ করার প্রয়াসী হয়ো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। হজরত জাবেরের মাধ্যমে বর্ণিত মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতিতে

www.eelm.weebly.com

হাদিসের শব্দগুলো এসেছে এরকম— 'ধর্মানুরাগ, বৈভব এবং রূপলালিত্যের কারণে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়। তোমরা অগ্রগণ্য করো ধর্মানুরাগকে। হজরত আবু সাঈদ থেকে হাকেম ও ইবনে হাব্বানও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজা, বায্যার এবং বায়হাকী হজরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর থেকেও এরকম লিখেছেন। ক্রীতদাসী বিবাহ মাকরুহ্ হওয়ার কারণ এই যে, এতে করে সন্তান-সন্ততিও দাসত্বচিহ্নিত হয়। আর দাসত্ব মৃত্যু সমতুল্য। রসুল স. এরশাদ করেন, আপন ঔরসকে নির্বাচন করো, কুফু বা সুসামঞ্জস্যতার ভিত্তিতে বিবাহ করো এবং করাও। আবু দাউদ, হাকেম ও বায়হাকী। বায়হাকী এই হাদিসকে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণ করেছেন এবং তিনি হজরত আয়েশা থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।এর পরে এরশাদ হয়েছে—'আল্লাহ্ তোমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তোমাদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হচ্ছে ইমান এবং নেক আমল। মূলতঃ তোমরা কিন্তু একই বংশোদ্ভূত। স্বাধীনা, ক্রীতদাসী— সবাই হজরত আদমের সন্তান-সন্ততি।

রসুল স. এরশাদ করেন, এটা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের নিকট থেকে মূর্খ যুগের অপরিচ্ছন্নতা এবং পিতা-পিতামহ নির্ভর দর্প-অহংকারকে দূর করে দিয়েছেন। মুমিন, মুত্তাকী অথবা কাফের অসৎ সবাই হজরত আদমের সন্তান। আর হজরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি ও আবু দাউদ। হজরত ওকবা বিন আমের হতে ইমাম আহমদ এবং বায়হাকী লিখেছেন, বংশগত কারণে তোমরা কেউ দোষী নও। তোমরা সকলে হজরত আদমের সন্তান। ধর্মপরায়ণতা এবং আল্লাহ্ভীতি ব্যতীত তোমরা কেউ কারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নও। কর্কশভাষ্য, গালাগালি ও কৃপণতা সম্পূর্ণতঃই দোষ। রসুল স. এর বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, ক্রীতদাসীর পাণি গ্রহণ করাকে যেনো কেউ মন্দ না ভাবে বরং তাদেরকে বিবাহ করতে যেনো আগ্রহী হয়।

ক্রীতদাসীদেরকে বিবাহ করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে —এই নির্দেশটির মধ্যে সব রকমের ক্রীতদাসীই অন্তর্ভুক্তা। সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনা, মুকাতিবা, মুদাব্বিরা অথবা উম্মে ওয়ালাদ (যে ক্রীতদাসীকে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করা হবে বলে চুক্তিবদ্ধা করা হয়েছে তাকে মুকাতিবা বলে। যে ক্রীতদাসীকে তার মালিক 'আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত'— এরকম ঘোষণা দিয়েছে তাকে মুদাব্বিরা বলে। আর উম্মে ওয়ালাদ বলে ওই ক্রীতদাসীকে যে তার মনিবের ঔরসজাত সন্তানের মা)। ইতোপূর্বে স্বাধীনা নারীদেরকে বিবাহ করতে অক্ষমদেরকে ক্রীতদাসী বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর এখন তাদেরকে বিবাহের পূর্বে তাদের মনিবদের অনুমতি গ্রহণ করা ওয়াজিব করে দেয়া হলো। আগের জায়েযকে 'মিম্মা মালাকাত আইমানুকুম' দ্বারা এবং এখনকার ওয়াজিবকে 'ফানকিহু' শব্দটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ক্রীতদাসদের বিবাহের ক্ষেত্রেও এরকম অনুমতি নিতে হবে। কোনো গোলামের বিবাহ তার মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে না। এই মাসআলাটি

www.eelm.weebly.com

ঐকমত্যসম্মত। রসুল স. এরশাদ করেন, যে ক্রীতদাস প্রভুর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে, সে ব্যভিচারী। হজরত জাবের থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন— আবু দাউদ ও তিরমিজি। তিরমিজি একে হাসান বলেছেন। সুনান গ্রন্থে হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেন, গোলাম যদি তার মালিকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে, তবে তা বাতিল হবে।

মাসআলাঃ ক্রীতদাস তার প্রভুর অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে, সে বিয়ে শুদ্ধ হওয়া না হওয়া নির্ভর করে তার প্রভুর ইচ্ছার উপর। এই মাসআলায় মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেকের এক বর্ণনায় এবং ইমাম আহমদের বক্তব্য উল্লেখিত হয়েছে এ রকম— বিয়ে হয়ে যাবে, কিন্তু তা নির্ভরশীল থাকবে প্রভুর অনুমোদনের উপর। কেননা, ক্রীতদাসের বিয়ের যোগ্যতা ছিলো এবং সেই যোগ্যতানুসারে সে বিয়ে করেছে। কিন্তু প্রভুর অনুমতি প্রয়োজন এজন্যই যে, তার সন্তুষ্টি ব্যতীত ক্রীতদাসী সহবাসের হক রহিত হয়ে যায়। আর ক্রীতদাসের ব্যাপারে রয়েছে মোহরানা পরিশোধের বিষয়টি, যা মালিকের অনুমোদন ব্যতিরেকে পরিশোধিত হতে পারে না। আয়াতে অবশ্য পূর্বানুমতির কথা আছে— প্রাক অনুমোদনের উল্লেখ নেই। তাই ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বিবাহই সংঘটিত হবে না। (বিয়ের পর মনিব অনুমোদন দিলেও বিয়ে ঠিক থাকবে না। বিয়ে হতে হবে আবার নতুন করে)। কেননা, রসুল স. এ ধরণের বিয়েকে বাতিল বলেছেন। আর এই আয়াতেও এরকম বলা আছে। তাই, অনুমোদন নিতে হবে পূর্বাহ্নে, পরে নয়।

বলা হয়েছে, ক্রীতদাসীদেরকে তাদের মোহর ন্যায়সঙ্গতভাবে দিবে। এই স্পষ্ট কথাটির ভিত্তিতেই ইমাম মালেক বলেছেন, মোহরানার অধিকার ক্রীতদাসীর (মনিবের নয়)। কিন্তু জমহুরের মত এই যে, ক্রীতদাসীর মোহর পাবে তার মনিব। এখানে বাঁদীর কোনো অধিকার নেই। বরং এই অধিকারের চিন্তাও সে করতে পারবে না। ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'বিইজনি আহলেহিন্না'—একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, মালিকের অনুমতিক্রমে তাদের মোহর দিয়ে দাও। এই অনুমতির ভিতরেই মোহরানার বিষয়টি উহ্য রয়েছে। তাই পরে একথার পুনোরুল্লেখ প্রয়োজন হয়নি।

অথবা এরকমও বলা যায় যে, ক্রীতদাসীকে দেয়া মানেই তার মনিবকে দেয়া। এ দু'টি ব্যাখ্যাই অবশ্য দুর্বল। মুহাক্কিক তাফতাজানী বলেছেন, এখানে মোহর ওয়াজিব করা এবং ক্রীতদাসীর গোপনাঙ্গের দ্বারা উপকার লাভ করার বিষয়টি অপরিহার্য করে দেয়াই উদ্দেশ্য। তাই প্রকৃত অর্থ হবে— মোহর ক্রীতদাসীরই প্রাপ্য। কিন্ত মনিব যেহেতু তার উপরে কর্তৃত্বশীল তাই মোহর শেষ পর্যন্ত তার অধিকারেই চলে যাবে। ব্যাপারটি এরকম— যেমন, কোনো মনিব তার ক্রীতদাসকে ব্যবসার কাজে লাগিয়েছেন। এমতাবস্থায় ক্রীতদাস পণ্য বিক্রয় ও তার মূল্য গ্রহণের অধিকার রাখে, তেমনি বিবাহের অনুমতিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসী তার মোহরের অধিকারিণী হতে পারে। চূড়ান্ত অধিকার কিন্তু মালিকের। এরকম হতে

www.eelm.weebly.com

পারে যে, মোহরানা বলতে এখানে খোরপোষের কথা বলা হয়েছে। আর খোরপোষের ব্যাপারে মনিবের অনুমতির প্রয়োজন নেই।

মোহরানা পরিশোধ করতে হবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। শরিয়তের নির্দেশানুসারে। অর্থাৎ মনিবের অনুমতিসহ। অনুমতি ব্যতিরেকে মোহরানা দেয়া নিষিদ্ধ।

ক্রীতদাসীদেরকে হতে হবে পবিত্রা। তারা ব্যভিচারিণী হতে পারবে না। গোপন প্রণয়িনী হতে পারবে না। এখানে পবিত্রা বুঝাতে 'মুহ্সনাত' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। 'মুসাফিহাত' শব্দটির আভিধানিক অর্থ একস্থানে স্থির না থাকা— এই শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে ব্যভিচারিণী বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ পবিত্রা রমণী তারাই যাদের মধ্যে ব্যভিচার এবং গোপন প্রণয়— দোষ দু'টি নেই। বিবাহের সঙ্গে 'মুহ্সনাত' শব্দটি উল্লেখ করার অর্থ এই যে, এই অবস্থাই উত্তম অবস্থা। অর্থাৎ পবিত্রা রমণীকে বিবাহ করাই উত্তম যদিও ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করাও বৈধ। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, তওবা না করা পর্যন্ত ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করা বৈধ নয়। চাই সে স্বাধীনা হোক অথবা ক্রীতদাসী। কেননা, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'ব্যভিচারী পুরুষ, ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিক নারী ছাড়া অন্যকে বিবাহ করে না। আর ব্যভিচারিণী নারীকে ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষ ভিন্ন অন্য কেউ বিবাহ করে না। মুসলমানদের জন্য এরকম বিবাহ হারাম করে দেয়া হয়েছে। ইমাম মালেক বলেছেন, ব্যভিচারিণীর সঙ্গে বিবাহ সাধারণতঃ মাকরুহ্ (যদি সে তওবা না করে)। কেননা, বিবাহের জন্য নারীকে পবিত্র হওয়া শর্ত করা হয়েছে। মোহর পরিশোধ করার শর্তও করা হয়েছে এ কারণে। নারীকে পবিত্র হতে হবে বিবাহের সময় এবং মোহরানাও পরিশোধ করতে হবে ওই একই সময়ে। অতএব, এক্ষেত্রে এরকম বলা যেতে পারে না যে, ঐকমত্যানুসারে মোহর প্রদানের জন্য রমণীদেরকে পবিত্র হতে হবে না।

বিবাহিতা হওয়ার পর ক্রীতদাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাদের শাস্তি হবে স্বাধীন বিবাহিতা ব্যভিচারিণীর অর্ধেক। স্বাধীনা বিবাহিতা রমণীর ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে— 'সঙ্গেসার' অর্থাৎ প্রস্তর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা। এই শাস্তির অর্ধেক হওয়া অসম্ভব।

মাসআলাঃ অবিবাহিত পুরুষ এবং অবিবাহিতা নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাদের শাস্তি হবে একশ দোর্‌রা। কেননা, আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন— 'ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণী প্রত্যেককে একশ দোর্‌রা লাগাও।' ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, একশ দোর্‌রার সাথে এক বৎসরের জন্য দেশান্তরী করা জরুরী। ইমাম মালেক বলেছেন, দেশান্তরীর শাস্তি কার্যকর হবে কেবল পুরুষের বেলায়, মেয়েদের বেলায় নয়। দেশান্তরীর দলিল সম্পর্কে হজরত উবাদা বিন সামেতের বর্ণনায় এসেছে— বিবাহিতা নারীর সঙ্গে জেনা করার শাস্তি একশ' দোর্‌রা এবং এক বৎসরের দেশান্তর। মুসলিম। হজরত জায়েদ বিন খালেদ বর্ণনা করেন, আমি নিজে রসুল স. কে অবিবাহিতা ব্যভিচারীর জন্য একশত দোর্‌রা

www.eelm.weebly.com

মারার এবং এক বৎসরের দেশান্তরীর হুকুম দিতে দেখেছি। ইমাম মালেক বলেন, হাদিসে 'আল বাকেরা' শব্দটি এসেছে। এই শব্দে মেয়েরা অন্তর্ভূতা হয় না। তাই মেয়েদের জন্য দেশান্তর নেই। কিন্তু এই দলিলটি দৃঢ় নয়। কারণ, 'বাকেরা' শব্দটি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। হাদিসের বর্ণনার মাধ্যমে বুঝা যায় রসুল স. মহিলাদের ব্যভিচারের শাস্তির কথাও বলেছেন। এরশাদ করেছেন, আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো, আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো। ব্যভিচারিণীর জন্য আল্লাহ্ উপায় করে দিয়েছেন। তাই 'বাকেরা' শব্দের মধ্যে মেয়েরা শামিল নয়— এ কথাটি ভুল। হাদিসের প্রথমেই এসেছে 'আল বিকরু বিল বিকরি' এবং প্রথম 'বিকর' অর্থ পুরুষ এবং দ্বিতীয় 'বিকর' অর্থ নারী। অন্য হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেন, বিকর থেকে বিবাহের অনুমতি নিয়ে নাও। এখানে বিকের শব্দের অর্থ কেবলই নারী। এছাড়া হজরত জায়েদ বিন খালেদের বর্ণনায় 'মান জানা' শব্দটি এসেছে, যার মধ্যে নারী পুরুষ উভয়েই শামিল।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, দেশান্তরীর হাদিসটি খবরে আহাদ (একক বর্ণিত)। কিতাবুল্লাহ্র হুকুমের সঙ্গে খবরে আহাদ সংযোজন করা শোভনীয় নয়। একশত দোর্‌রার কথা এসেছে কোরআনে আর দেশান্তরের কথাটি এসেছে হাদিস শরীফে। ইনশাআল্লাহ্ সুরায়ে নূরের তাফসীরে বিষয়টির বিশদ বর্ণনা করা হবে।

মাসআলাঃ চার ইমাম বলেছেন, ব্যভিচারে লিপ্ত বিবাহিত এবং অবিবাহিত ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর শাস্তি পঞ্চাশ দোর্‌রা। ক্রীতদাসীর শাস্তিতো নস (কোরআন) দ্বারা প্রমাণিত। এই প্রমাণ ক্রীতদাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দেশান্তরের কথা কোনো ইমাম বলেননি। কেবল ইমাম শাফেয়ীর এক বক্তব্যে এসেছে, বাঁদীকে (ক্রীতদাসীকে) ছয়মাসের জন্য দেশান্তর করতে হবে।

আবু সওরের বক্তব্য এই যে, বিবাহিতা বাঁদীকে পাথর মারতে হবে; কিন্তু এই আয়াত তার বক্তব্যকে রহিত করে দিয়েছে। আর প্রস্তর প্রক্ষেপের শাস্তি অর্ধেক করা সম্ভব নয়। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং হজরত সাঈদ বিন জোবায়েরের নিকট অবিবাহিতা বাঁদী ও অবিবাহিত গোলামের (ক্রীতদাসের) জন্য শরিয়তের আইন নেই। কেননা, আয়াতে শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে।এতে করে বুঝা যায় স্বাধীন না হলে কোনো শাস্তি নেই।

ইমাম আবু হানিফার মতে মাফহুমের (অভিমতের) শর্ত গ্রহণীয় নয়। অন্য তিন ইমাম মাফহুমের শর্তকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন। তাঁদের মতে এ আয়াতের সঙ্গে অভিমতের শর্তের কোনো বিরোধ নেই। এ আয়াত দ্বারা বরং সতর্ক করাই উদ্দেশ্য। বাঁদী এবং গোলাম যদি বিবাহিতও হয়, তবু তাদেরকে পাথর মারা যাবে না। তাদের শাস্তি হলো দোর্‌রা। তাও অর্ধেক অর্থাৎ পঞ্চাশ দোর্‌রা। স্বাধীনদের হুকুম এর বিপরীত। স্বাধীন বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি রজম (প্রস্তর নিক্ষেপণ)। এবং অবিবাহিত হলে দোর্‌রা। এই হুকুম রসুল স.এর বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। যদি কোনো বাঁদী প্রথমবারের মতো ব্যভিচারিণী হয়, তবে দোর্‌রা মারবে। কিন্তু তাকে অভিসম্পাত করবে না। দ্বিতীয়বার ব্যভিচারে লিপ্ত হলে

www.eelm.weebly.com

পুনরায় তাকে দোর্‌রা মারবে কিন্তু তাকে লাঞ্ছিত করবে না। তৃতীয়বার করলে দোর্‌রা মারার সাথে সাথে তাকে অপমানিতও করবে, মাথার চুলের পরিমাণ হলেও। হজরত আবু হোরায়রা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেন বোখারী ও মুসলিম। হজরত আলী বর্ণনা করেন, হে মানুষেরা! আপন বাঁদী এবং গোলামের উপর শরিয়তের শাস্তি প্রয়োগ করো— বিবাহিত অথবা অবিবাহিত। কেননা রসুল স. এর এক বাঁদী ব্যভিচার করলে তিনি স. আমাকে হুকুম দিয়েছিলেন—তাকে দোর্‌রা মারো। আমি দেখলাম বাঁদীটি গর্ভবতী এজন্য দোর্‌রা মারলাম না। রসুল স. কে একথা বলতেই তিনি বললেন, বেশ করেছো। মুসলিম।

হজরত আব্দুল্লাহ বিন আয়াশ বিন আবী রবিয়া বর্ণনা করেন, হজরত ওমর আমাকে ও কতিপয় কোরায়শী যুবককে হুকুম দিলেন— তোমরা রাজ্যের কিছু সংখ্যক বাঁদীকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে দোর্‌রা মারবে।

এরপর এরশাদ হয়েছে— 'এই শাস্তির নির্দেশ জারী করা হলো এই কারণে যে, তোমরা যেনো ভীত হও। ব্যভিচারমুখী হওয়া থেকে বিরত থাকো।' ব্যভিচার বহির্ভূত জীবন অত্যুত্তম। দুনিয়াতেও। আখেরাতেও। অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে এখানে 'জালিকা' শব্দটির দ্বারা বাঁদীকে বিবাহ করার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ব্যভিচারপ্রবণতা প্রবল হওয়ার আশংকা থাকলে বাঁদীকে বিবাহ করা জায়েয। কেননা, দুনিয়ার বিপর্যয় আখেরাতের বিপদকে ওয়াজিব করে। এরপর বলা হয়েছে ধৈর্যধারণের কথা অর্থাৎ বাঁদীকে বিবাহ করার ব্যাপারে যদি ধৈর্যধারণ করতে পারো তবে তাই শোভনীয় হবে— যাতে সন্তানদের গোলাম হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। রসুল স. বলেছেন, স্বাধীনা নারী কল্যাণময়ী আর বাঁদী বিধ্বংসের কারণ। এ হাদিস বর্ণনা করেন দায়লামী এবং ছা'লাবী হজরত আবু হোরায়রা থেকে। আমি বলি, বাঁদী বিধ্বংসী হওয়ার কারণ এই যে, তার গর্ভজাত সন্তানেরা তার মালিকের গোলাম হয়ে যাবে। আর এ দিকে প্রকৃত পিতার বুক থাকবে সন্তানশূন্য। আয়াত শেষের উল্লেখ এই যে, আল্লাহ্ গফুরুর রহিম অর্থাৎ তোমরা যদি বাঁদীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হও, তবু আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। তিনি পরম দয়ালু বলেই বাঁদীকে বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন। এই তাফসীর ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের ওই বক্তব্যের পোষকতা করছে যেখানে বলা হয়েছে, বাঁদীকে বিয়ে করা কেবল তাদের জন্য বৈধ যাদের ব্যভিচারলিপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত জাবেরও এরকম উক্তি করেছেন। তাউস এবং আমর ইবনে দিনারও এরকম বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, একথা ঠিক নয় যে, ব্যভিচারলিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকলে বাঁদীকে বিবাহ করা যাবে না। তবে হ্যাঁ, বিনা প্রয়োজনে বাঁদীকে বিয়ে করা মাকরুহ বা ক্ষতিকর।

জ্ঞাতব্যঃ ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, বাঁদীকে বিয়ে করার কয়েকটি শর্ত রয়েছে। প্রথম শর্ত হচ্ছে—স্বাধীনা রমণীর পাণিগ্রহণ করার যোগ্যতা যদি না থাকে। দ্বিতীয়তঃ ক্রীতদাসী স্ত্রীর সন্তানেরাও গোলাম হবে—

www.eelm.weebly.com

একথা জানা সত্ত্বেও উপায়ান্তর না থাকলে বাঁদীকে বিয়ে করা যাবে বটে, তবে এমতাবস্থায়ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু করা যাবে না। যেমন— একজনের মাধ্যমে প্রয়োজন মিটে গেলে একাধিকতায় আগ্রহী হওয়া যাবে না। ইমাম আবু হানিফা বলেন, বাঁদী বিবাহ সাধারণভাবে জায়েয করে দেয়া হয়েছে। বাঁদী মুসলমান অথবা আহলে কিতাব হোক। স্বাধীনভাবে বিবাহে সম্মত হওয়ার অধিকার তার থাকুক বা নাই থাকুক— সকল অবস্থায় জায়েয। কেবল প্রয়োজন পূরণ করাই নয়, প্রয়োজনাতিরিক্ত করাও জায়েয। তবে প্রয়োজনাতিরিক্ততা মাকরুহ্ (কিন্তু জায়েয)। কেননা, আগের আয়াতে বলা হয়েছে 'অর্থ ব্যয়ে বিবাহ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো।' আরও বলা হয়েছে 'ফানকিহ্ মা ত্বাবা লাকুম।'

এসবের মধ্যে পরিমাণ বা শর্ত উল্লেখ নেই। বাঁদী বিয়ে করলে তার সন্তান সন্ততিরাও গোলাম হবে (যদিও তাদের পিতা স্বাধীন) — এই কারণ দেখিয়ে স্বাধীন ব্যক্তির জন্য যদি বাঁদী বিবাহ নাজায়েয করে দেয়া হয়, তবে গোলামের জন্যও তো বাঁদী বিবাহ নাজায়েয হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বিধান এখানে অন্যরকম। গোলামের জন্য সর্বোচ্চ দু'জন বাঁদীকে বিবাহ করা জায়েয। তাহলে স্বাধীন ব্যক্তির জন্য বাঁদী বিবাহ তো আরও বেশী জায়েয হবে। স্বাধীনের জন্য সর্বোচ্চ চারটি বিবাহের অনুমতি রয়েছে। আর গোলামের জন্য রয়েছে দু'টি। প্রথম হুকুমটি এসেছে কোরআনে। দ্বিতীয়টি এসেছে হাদিসে। স্বাধীন ব্যক্তির চার স্ত্রী স্বাধীনা রমণীও হতে পারবে, বাঁদীও হতে পারবে। চারটি স্ত্রীই স্বাধীনা হতে হবে এমন কথা নেই। ইমাম মালেক বলেছেন, স্বাধীন ব্যক্তির জন্য চারটি বিবাহ বৈধ। স্বাধীনা অথবা বাঁদী কিংবা মিলিতভাবে চারজন স্ত্রী রাখাকে তিনি সমর্থন করেছেন।

মাসআলাঃ তিনজন ইমামের মতে স্বাধীন ব্যক্তির জন্য বাঁদী বিবাহ করা জায়েয নয়। শুধু ইমাম মালেক বলেছেন, স্ত্রী রাজী থাকলে বাঁদী বিবাহ করা জায়েয। রাজী না থাকলে জায়েয নয়— যদিও ওই ব্যক্তি বিবাহ করতে চায়। শুধু ইমাম মালেক বলেছেন, বিবাহ করতে চাইলে জায়েয। না চাইলে জায়েয নয়। ঐকমত্য এই যে, বাঁদীকে বিবাহ করা বৈধ। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেছেন, বাঁদী বিবাহ জায়েয। এ সম্পর্কে তাঁরা এই আয়াতটি উল্লেখ করেন 'স্বাধীনা বিশ্বাসী নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকিলে.....।' যার স্বাধীনা স্ত্রী রয়েছে সেতো সামর্থ্যবান, তাই তার জন্য বাঁদী বিবাহ দুরস্ত নয়। তার স্বাধীনা স্ত্রী রাজী থাকলেও না। ইমাম আজম এ রকম ব্যক্তির জন্য বাঁদী বিবাহ নাজায়েয হওয়ার পক্ষে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন— আসহাবে সুনান অর্থাৎ নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা সাঈদ বিন মানসুর থেকে বর্ণনা করেন— রসুল স. স্বাধীন ব্যক্তিদের জন্য বাঁদী বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন, বাঁদী (মুক্ত) স্বাধীন হলে বিবাহ হতে পারে— বায়হাকী ও তিবরানী হাসান বসরী পর্যন্ত

www.eelm.weebly.com

সনদকে মিলিয়ে বায়হাকী এবং তাবারী এই হাদিসটি লিখেছেন। আমেরে আহওয়াল এর বর্ণনাকে গরীব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে (যে বিশুদ্ধ হাদিসের বর্ণনাকারী মাত্র একজন তাকে গরীব বলে)। কিন্তু আমর বিন ওবায়েদও হাসান থেকে প্রসিদ্ধ সনদে এরকম বর্ণনা করেছেন। সাঈদ বিন মানসুরের হাদিসকে হাফেজ বলেছেন মোবহাম। (যে হাদিসের বর্ণনাকারীর সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না সে হাদিসকে মোবহাম বলে)। কেননা সাঈদ উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আলিয়ার বর্ণনা এবং ইবনে আলিয়া তাঁর নিজের এবং হাসান বসরীর মধ্যবর্তী বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি। শুধু এতোটুকুই বলেছেন, হাসান বসরী থেকে শুনেছেন এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আব্দুর রাজ্জাক এই হাদিসটি মুরসাল হিসেবে হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন (যে হাদিসের শেষ দিকের বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে এবং এই কারণে যে হাদিস সমাপ্ত হয়েছে কোনো তাবেয়ীর মাধ্যমে তাকে বলে মুরসাল)। ইবনে আবী শায়বাও মুরসাল হিসেবে এই বর্ণনাটি দিয়েছেন। আমাদের নিকট হাদিসটি মুরসাল হলেও দলিল হিসেবে গণ্য। ইমাম শাফেয়ীও একে মুরসাল বলেছেন এবং দলিল হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার উপযুক্ত গণ্য করেছেন। সাহাবীগণের বক্তব্য এই বর্ণনাটির পোষকতা করেছে।

ইবনে আবী শায়বা এবং বায়হাকী হজরত আলী থেকে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেন, স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও স্বাধীন ব্যক্তির জন্য বাঁদীকে বিবাহ করা শোভনীয় নয়। (যে হাদিসের বর্ণনাসূত্র সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মওকুফ বলা হয়)। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, স্ত্রী থাকলে বাঁদীকে বিবাহ করা যাবে না। হজরত ইবনে মাসউদের বক্তব্য এরকম। আবু জোবায়েরের মাধ্যমে আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন— হজরত জাবের বলেছেন, স্বাধীনা স্ত্রী থাকলে কেউ যেনো বাঁদীকে বিয়ে না করে। বায়হাকীর বর্ণনাটিও এরকম। তার বর্ণনার অতিরিক্ত কথাটুকু হচ্ছে, যে স্বাধীনা রমণীর মোহর দিতে সক্ষম সে যেনো বাঁদীকে বিয়ে না করে। এই হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ।

ইবনে আবী শায়বা হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এভাবে— বাঁদী স্ত্রী থাকলে আজাদকে বিবাহ করবে এবং আজাদ স্ত্রী থাকলে বাঁদীকে বিবাহ করবে না।এ প্রসঙ্গে হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে——রসুল স. বলেছেন, গোলামের তালাক দুইবার। শেষে বলেছেন ক্রীতদাসী স্ত্রী থাকলে স্বাধীনাকে বিয়ে করা যাবে। কিন্তু স্বাধীনা স্ত্রী থাকলে ক্রীতদাসীকে বিয়ে করা যাবে না।–বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী। এই সনদের রাবী মাজাহের বিন আসলাম দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত। ইমাম আবু হানিফা কিতাবুল্লাহ্‌কে হাদিসে আহাদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করাকে নাজায়েয বলেছেন। কিন্তু এই স্থানে বিষয়টি বিশেষভাবে নির্ধারণ করা জরুরী। কারণ, আয়াতে অর্থব্যয়ে বিবাহ করতে চাওয়া বৈধ করে দেয়া হয়েছে। হুকুমটি তাই সাধারণ অথচ হাদিসে স্বাধীনা স্ত্রীর

www.eelm.weebly.com

বর্তমানে বাঁদী বিবাহ্ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরকম করলে আর আয়াতের হুকুমটি সাধারণ থাকে না। এখানে আপত্তি দূর করণার্থে এরকম ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, হাদিসটি যদিও খবরে আহাদ (একক বর্ণিত) কিন্তু এর সমর্থনে রয়েছে এজমা। আর এজমা দ্বারা কোরআনের হুকুমকে সুনির্ধারিত করা জায়েয।

ইমাম শাফেয়ীর মতে গোলামের জন্য স্বাধীনা স্ত্রীর বর্তমানে বাঁদীকে বিবাহ করা জায়েয। কিন্তু ইমাম আজম ও অন্যান্য ইমামগণের মতে জায়েয নয়। কেননা, হাদিসে মুরসাল দ্বারা সাধারণ নিষিদ্ধতা এসেছে বিরুদ্ধবাদী ইমামগণের নিকট। জায়েয না হওয়ার সিদ্ধান্তটিও একটি সাধারণভাবে চিহ্নিত সিদ্ধান্ত। কাজেই ক্রীতদাসেরাও সাধারণ সিদ্ধান্তের বাইরে নয়। ওয়াল্লহু আ'লাম।

সুরা নিসাঃ আয়াত ২৬

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

❒ আল্লাহ্ কামনা করেন তোমাদের পূর্ববর্তীদের চরিত-কথা তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করিতে, উহার হিতাহিত নির্দেশ করিতে এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

পূর্ববর্তী উম্মতের রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে বিবরণ দান করার উদ্দেশ্য এই যে, যেনো এতে করে সত্যাসত্য স্পষ্ট হয়ে যায় এবং হেদায়েতের পথ হয় প্রশস্ততর।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অতীত শরিয়তের কোনো হুকুম যদি আমাদের শরিয়তে মনসুখ না হয়ে থাকে এবং সেই হুকুম যদি কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নত সমর্থিত হয়, তবে তার উপর আমল করা আমাদের জন্য ওয়াজিব হবে। এমতো ক্ষেত্রে ইহুদীদের বর্ণনা অবশ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, ইহুদীরা অবিশ্বস্ত ও অমাননীয়— যদিও হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম এবং হজরত কাব বিন আহবার ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম ছেড়ে মুসলমান হওয়ার পর যে সকল ইসরাইলী বর্ণনা করেছেন, সেগুলো গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ্তায়ালার আর একটি উদ্দেশ্য এই— তিনি মুসলমানদেরকে ক্ষমা করে দিতে চান, তওবার সুযোগ দিতে চান। আল্লাহ্ চান তোমরা এমন কাজ করো যার দ্বারা গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ সকলের নেক আমল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। তাঁর সকল হুকুমের মধ্যে রয়েছে হিকমত। কারণ, তিনিই প্রজ্ঞাময়।

www.eelm.weebly.com

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ○

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ○

❐ আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হইতে চাহেন, আর যাহারা কামনা-বাসনার অনুসারী তাহারা চাহে যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও।

❐ আল্লাহ্ তোমাদের ভার লঘু করিতে চাহেন; মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল।

আল্লাহ্ তোমাদেরকে নেক আমল এবং তওবার তৌফিক দিতে চান। বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্য একথাটির এখানে পুনরোল্লিখিত হয়েছে। যারা প্রবৃত্তিপূজক তারা অবাধ্য। প্রবৃত্তির অভিলাষ পূর্ণ করতে হবে শরিয়তসমর্থিত উপায়ে। শরিয়তের বিরোধিতা করে নয়। আলেমগণ বলেছেন, প্রবৃত্তিপূজক বলতে এখানে ব্যভিচারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রবৃত্তিপূজক অর্থ এখানে অগ্নিপূজক। কেননা, তারা মুহরিম (নিষিদ্ধ) মহিলাকে হালাল মনে করে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, প্রবৃত্তিপূজক হচ্ছে ইহুদীরা। কেননা, তাদের নিকট সহোদরা বোন, ভাতিজি, বোনঝি সব হালাল।

আল্লাহ্ এখানে প্রবৃত্তিপূজকদের দূরভিসন্ধির কথা জানিয়ে দিয়ে হেদায়েত করছেন, তারা চায় তোমরাও পাপের দিকে ঢলে পড়ো, তাদের মতো হারামকে হালাল মনে করো। হালালকে হারাম জানা জঘন্য অপরাধ।

আল্লাহ্ তোমাদের ভার লাঘব করতে চান। তাই তিনি তোমাদের জন্য সহজ শরিয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং অতীত সম্প্রদায়ের জন্য যেসব বস্তু হারাম ছিলো, তার মধ্যে থেকে কতিপয় বিষয় তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন।

মুজাহিদ থেকে ইবনে আবী শায়বা এবং ইবনে মুনজির বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ এই উম্মতের জন্য যে সকল সহজ পন্থা নির্ধারণ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে এই বিধানটি, বাঁদীর সাথে এবং ইহুদী ও খৃষ্টান মহিলার সাথে মুসলমানের বিবাহ হবে। তাফসীরে মাদারেকে রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনা এসেছে।

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে। তারা কামনা বাসনাকে যেমন বাধা দিতে পারে না, তেমনি আনুগত্যের কষ্টও সহ্য করতে পারে না। আর কিয়ামত যতোই নিকটবর্তী হচ্ছে ততোই তাদের দুর্বলতা বেড়েই চলেছে। আল্লাহ্ তাই এই উম্মতের উপর গুরুভার চাপিয়ে দেননি।

www.eelm.weebly.com

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

❐ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হইয়া ব্যবসায় করা বৈধ; এবং নিজদিগকে হত্যা করিও না; আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

এরশাদ হয়েছে— কেউ কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতে পারবে না। গ্রাস করতে পারবে না যেমন মুসলমানদের সম্পদ, তেমনি কাফেরদের সম্পদ। যারা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ নয়, সে সকল কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধের মাধ্যমে হস্তগত সম্পদ ভক্ষণ করা অবশ্য অবৈধ নয়।অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ নিষিদ্ধ বলেই শরিয়তে ছিনতাই, চুরি, খেয়ানত, সুদ এবং অবৈধ বেচাকেনাকে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

বৈধ সম্পদ উপার্জন এবং ভক্ষণের উপায় হচ্ছে ব্যবসা। কুফাবাসীদের ক্বেরাতে এসেছে 'তিজারাতান' শব্দটি। এই ক্বেরাতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অন্যান্য ক্বারীগণ পড়েছেন 'তিজারাতুন'।

ব্যবসা হতে হবে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। রসুল স. বলেছেন, বেচাকেনা সংঘটিত হয় উভয়ের রাজীখুশীর মাধ্যমে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা এবং ইবনে মুনজির। 'বায়' বা ক্রয়বিক্রয়ের অর্থ হলো পণ্য বিনিময়— তা বাক্য ব্যয়ের মাধ্যমে হোক অথবা বিনা বাক্য ব্যয়ে শুধু লেনদেনের মাধ্যমে। 'ইজারা' অর্থ হলো অর্থের বিনিময়ে ভাড়া করা। এছাড়াও একের জন্য অন্যের সম্পদ হালাল হওয়ার আরও উপায় রয়েছে যেমন——হেবা (দান), মীরাস ইত্যাদি। এতদসত্ত্বেও ব্যবসাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, সাধারণতঃ ব্যবসার মাধ্যমেই প্রাত্যহিক প্রয়োজন নির্বাহ করা সম্ভব। তাই ব্যবসাই সম্পদ অর্জন ও উপার্জনের সর্বাপেক্ষা পবিত্র অবলম্বন।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত আবু উমামা থেকে ইসপাহানী মারফু হাদিসে বর্ণনা করেন, উপার্জন তখনই পবিত্র হবে যখন ব্যবসা পরিচালিত হবে চারটি নীতিমালার ভিত্তিতে। ১. বেচাকেনার সময় অসততা না করা— অর্থাৎ ভালো ও মন্দ এক সঙ্গে না মিশানো। ২. বিক্রয়যোগ্য বস্তুর অতিপ্রশংসা না করা। ৩. বিক্রয়ের সময় ধোকাবাজি না করা। ৪. কেনাবেচার সময় কসম না খাওয়া। ইমাম আহমদ ও ইমাম হাকেম লিখেছেন, আব্দুর রহমান বিন শাবেল বর্ণনা করেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ব্যবসায়ীরাই ফাসেক ফাজের হয়ে থাকে (সাধারণতঃ)। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ্ কি বেচাকেনাকে হালাল করেন নি? তিনি স. বললেন, হালাল করবেন না কেনো? কিন্তু ব্যবসায়ীদের অভ্যাস,

www.eelm.weebly.com

বিক্রয়ের সময় তারা কসম খায় এবং গোনাহ্গার হয়ে যায়। আর কথা বলার সময় মিথ্যা কথা বলে থাকে। হজরত রেফায়া বিন রাফে থেকে হাকেম এরকম বর্ণনা করেছেন।

রসুল স. বলেছেন, ব্যবসায়ীদেরকে কিয়ামতের দিন গোনাহ্গারদের দলভুক্ত করে ওঠানো হবে, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে তারা ব্যতীত। তাঁরা পুণ্যবান, ক্রয় বিক্রয়ের সময় যাঁরা সত্য কথা বলেন। হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন হাকেম। হাকেম ও তিরমিজির আরো একটি বর্ণনায় রয়েছে— হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেন, রসুল স. বলেছেন— সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ীদের হাশর হবে আম্বিয়া, সিদ্দিক ও শহীদগণের সঙ্গে। তিরমিজি হাদিসটিকে বলেছেন হাসান। ইবনে মাজা এবং হাকেম হজরত ইবনে ওমর থেকে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেন, সত্যপন্থী ও আমানতদার মুসলমান ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথী হবে। হজরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া থেকে তিবরানী মারফু হিসাবে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র সাহায্য সৎকর্মশীল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে । ইসপাহানী মারফু হিসেবে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, সত্যবাদী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে। হজরত মুআজ বিন জাবাল থেকে ইসপাহানী আরো লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যবসায়ীর উপার্জন পবিত্র যারা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মিথ্যাশ্রয়ী হয় না, অঙ্গীকার করলে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না, আমানত রাখা হলে আমানত খেয়ানত করে না, ক্রয় করার সময় বিক্রেতার ক্ষতি করে না, বিক্রি করার সময় (অযথা) প্রশংসা করে না, ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করে না এবং পাওনা আদায় করার বেলায় অসৎ আচরণ করে না।

হজরত রাফে বিন খাদিজ বলেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সবচেয়ে পবিত্র উপার্জন কোন্‌টি? তিনি স. বললেন, স্বহস্তে উপার্জন এবং পবিত্র বিক্রয়। আহ্মদ। হজরত মেকদাম বিন মাদী করব রা. বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন—স্বহস্তে উপার্জন অপেক্ষা উত্তম কোনো আহার নেই। আল্লাহ্র নবী হজরত দাউদও স্বহস্তে উপার্জনলব্ধ আহার ভক্ষণ করতেন। বোখারী। জননী আয়েশা বলেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন— তোমাদের আহার্য বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র আহার ওইটি যা তোমরা স্বহস্তে উপার্জন করো। তোমাদের সন্তানদের উপার্জনও তোমাদের উপার্জন। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

এই আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, ব্যবসা ব্যতীত অন্য উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদ নিষিদ্ধ। যেমন—মোহর, দান খয়রাত, ঋণ ইত্যাদি। এসমস্ত উপায়ও শরিয়তসিদ্ধ। হানাফীগণ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন যে, স্বীকারোক্তির মজলিশে ইজাব ও কবুলের (প্রস্তাব ও সম্মতির) পর বেচা-কেনা করার ইচ্ছা রহিত হয়ে যায় না, যদি ক্রেতা-বিক্রেতা স্থানান্তরিত না হয়। ইমাম মালেকও এই মত পোষণ করেন। কারণ, এতে রয়েছে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি। তাই কথা বদল হবে না। কিন্তু পণ্য প্রদান ও পণ্যমূল্য লাভের অধিকার বলবৎ থাকবে। এই অধিকার বাতিল করার ক্ষমতা ক্রেতা বিক্রেতা কারোই নেই। ইমাম

www.eelm.weebly.com

শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইজাব ও কবুলের পরও স্থান ত্যাগের পূর্বে ক্রেতা-বিক্রেতা যে কোনো একজন স্বীকারোক্তি বাতিল করতে পারে বলে মনে করেন। কেননা, হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই একে অপরের বিরুদ্ধে বাতিল করার অধিকার রাখে যতোক্ষণ তারা পৃথক না হয়ে যায়। বোখারী, মুসলিম।

হজরত হাকিম বিন হাজাম বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের বাতিল করার অধিকার থাকবে যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃথক হয়ে না পড়ে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে এবং পণ্যবস্তুর দোষত্রুটি জানিয়ে দেয়, তবে উভয়েই বরকত লাভ করবে। আর মিথ্যা বললে এবং দোষ গোপন করলে বরকত বিনষ্ট হবে। বোখারী, মুসলিম। এ প্রসঙ্গে হানাফিগণ বলেন, কিতাবুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে হাদিসের উপর আমল করা জায়েয নয়। আর কিতাবুল্লাহ্‌র বর্ণনা হচ্ছে এরকম— ইজাব ও কবুলের পর কারো স্বীকারোক্তি ভঙ্গের অধিকার থাকে না। অর্থাৎ ইজাব পেশ করার পর তা কবুল করা না করা সম্পর্কে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই অধিকার রাখে। নতুবা বেচা-কেনায় চূড়ান্তভাবে সম্মত হওয়ার পর নতুন করে বিক্রয়ের পণ্য বেচা-কেনা হতে পারে না। হাদিসে বর্ণিত অধিকার হচ্ছে, স্বীকারোক্তিপূর্ব অধিকার। স্বীকারোক্তিপরবর্তী অধিকার নয়। হাদিস শরীফে পৃথক হওয়ার যে কথা এসেছে তা হচ্ছে, দরদাম নির্ধারণ সংক্রান্ত কথাবার্তার পার্থক্য হওয়া (শারীরিকভাবে পৃথক হয়ে যাওয়া নয়)। হেদায়া। ইবনে হুমাম লিখেছেন, পৃথক হওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে কথার মাধ্যমেই হয়। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন, আর আহলে কিতাবগণ তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ ও কিতাব আসার পর বিভক্ত হয়ে গেলো।

আমাদের নিকট বিশুদ্ধ ধারণা এই যে, মজলিশ থেকে পৃথক হওয়ার আগেই চূড়ান্ত বেচাকেনা ও বিক্রয়মূল্য অধিকার করার বৈধতা সম্পর্কে এই আয়াতে প্রমাণ এসেছে। কিন্তু রহিত করা বা বাতিল করার অধিকারের কথা এখানে বলা হয়নি। এজন্য উত্তম এই, যেমন বলেছেন ইমামে আজম— বেচাকেনার স্বীকারোক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরও পণ্য দর্শনের অধিকার এবং দোষ চিহ্নিত করার অধিকার অবশিষ্ট থাকবে। তেমনি মজলিশ থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বের মজলিশের অধিকারও স্বীকার করতে হবে যাতে বিশুদ্ধ হাদিসের উপর আমল করার ব্যাপারটি বাদ না পড়ে যায়। হানাফীগণ আরো বলেছেন, বেচাকেনার কাজে নিয়োজিত থাকা পর্যন্ত তাদেরকে ক্রেতা-বিক্রেতা বলা যাবে। আর স্বীকারোক্তি পূর্ণ হওয়ার পর ক্রেতা-বিক্রেতা বলা যাবে না—একথা ঠিক নয়। কেননা, দ্বিতীয় পক্ষ কবুল করার আগেই প্রথম পক্ষকে বলা হয় বিক্রেতা। তার ইজাবের পর ক্রেতা কবুল না করা পর্যন্ত তাদেরকে ক্রেতা-বিক্রেতা বলা যায় না। হ্যাঁ ইজাব ও কবুলের পর যখন স্বীকারোক্তি সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন বাকী থাকে কেবল লেনদেনের কাজ। স্বীকারোক্তি ও লেনদেন একই মজলিশের অন্তর্ভূত। কাজেই স্বীকারোক্তির মজলিশ বাকী থাকা মানে বেচাকেনাও অবশিষ্ট থাকা। এছাড়া বিভিন্ন হাদিসের

www.eelm.weebly.com

বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, পৃথক হওয়া অর্থ শারীরিকভাবে পৃথক হওয়া। এতে করে মজলিশ থেকে পৃথক হওয়াই বুঝা যায়। হজরত ইবনে ওমর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেন, যখন দু'জন (ক্রেতা-বিক্রেতা) বেচা-কেনায় লিপ্ত থাকে, তখন পৃথক না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকের অধিকার থাকবে (তারা ইচ্ছে করলে বেচাকেনা ঠিক রাখতে পারবে, ইচ্ছে করলে রহিত করতেও পারবে)। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বেচাকেনার পরও প্রত্যেকের রদবদলের অধিকার থাকবে যতোক্ষণ স্থানচ্যুত না হবে।

দ্বিতীয় বর্ণনায় আমর বিন শোয়াইবের দাদার বক্তব্য হিসেবে এসেছে— ক্রয় বিক্রয়কারী পৃথক হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অধিকার থাকবে (দেখার অধিকার ও দোষত্রুটি বের করার অধিকার ব্যতীত)। অতএব, যদি এরকম হয় তবে পৃথক হওয়ার পরও এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রহিত করার অধিকার থাকবে। কারও জন্য এরকম করা বৈধ নয় যে, কেনাবেচা বাতিল করার সন্দেহে আগেই পৃথক হয়ে যাবে। তিরমিজি, আবু দাউদ ও নাসাঈ।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, স্বীকারোক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর পারস্পরিক সম্মতি ব্যতীত পৃথক হয়ো না। আবু দাউদ।

হজরত জাবের বর্ণনা করেন, রসুল স. এক মজলিশে এক বিধর্মীর সঙ্গে কেনাবেচার পরও বেচাকেনা বাতিল করার অধিকার দিয়েছিলেন। তিরমিজি। এই হাদিসের ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা যায় বেচাকেনা সম্পন্ন হওয়ার পরও স্থান ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত বেচাকেনাকে নাকচ করা জায়েয। ওয়াল্লহু আ'লাম।

পুনঃ এরশাদ হচ্ছে, 'নিজদিগকে হত্যা করিও না।' সাবেত বিন জুহাক বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো বস্তু দ্বারা নিজকে নিজে হত্যা করলো কিয়ামতের দিন ওই বস্তু দ্বারা তাকে শাস্তি দেয়া হবে। ইমাম শাফেয়ীর মাধ্যমে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বাগবী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং সর্বক্ষণ সে সেখানে এই শাস্তিই পেতে থাকবে। আর যে কোনো লৌহ নির্মিত অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে দোজখেও তার ওই রকম সার্বক্ষণিক আত্মহনন চলতে থাকবে। সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনের সঙ্গে এই হাদিসটি আরও উল্লেখ করেছেন বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি এবং নাসাঈ। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, যে বিষপান করবে জাহান্নামের আগুনের মধ্যেও তার বিষপান চলতে থাকবে অব্যাহতভাবে। হজরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন—অতীত সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির হাতে ঘা হয়েছিলো, সে ওই ঘা এর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নিজ তরবারী দিয়ে হাতটি কেটে ফেললো। রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করলো। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে রক্তপাত থামলো না। আল্লাহ্তায়ালা বললেন,

www.eelm.weebly.com

আমার বান্দা জীবন দেয়ার জন্য তাড়াহুড়া করলো। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম। বাগবী।

আবু দাউদ ও ইবনে হাব্বান 'সহীহ্' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত আমর বিন আস এই আয়াত থেকে শীতাতংকের কারণে তায়াম্মুম জায়েয হওয়ার দলিল উপস্থাপন করেছেন। রসুল স. ও তাঁর এই দলিলকে অপছন্দ করেননি। হজরত আমর বিন আস বলেন, এক শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়ে গেলো। ওই সময় আমি জাতুস্সালাসিলের যুদ্ধে ছিলাম। আমার সন্দেহ হলো, এখন যদি আমি গোসল করি তবে হয়তো ঠাণ্ডায় মরেই যাবো। আমি তখন তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে নিলাম। একথা যখন রসুলপাক স. এর সামনে পেশ করা হলো, তখন তিনি স. বললেন, তুমি তাহলে জানাবাত অবস্থায় তোমার সাথীদেরকে নিয়ে নামাজ পড়েছো। আমি বললাম, হ্যাঁ। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কোরো না'। রসুলপাক স. আমার কথা শুনে হাসলেন। কোনো মন্তব্য করলেন না।

হাসান, হজরত ইকরামা, আতা ইবনে আবি রিবাহ্ এবং সুদ্দীর নিকটে এ আয়াতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— একে অপরকে হত্যা কোরো না। যেমন— অন্য এক আয়াতে এসেছে 'অতঃপর তোমরা এমন লোক যে একে অপরকে হত্যা করে'। শিরিকের পরে সবচেয়ে বড় গোনাহ্ হচ্ছে মুসলমান হয়ে মুসলমানকে হত্যা করা।

হজরত জারীর বর্ণনা করেন, রসুল স. আমাকে বললেন, আমি মানুষকে শুনিয়ে দিতে চাই, আমার পর তোমরা কাফের হয়ে যাবে না বটে, তবে একে অপরের মস্তক ছেদন করতে থাকবে। বোখারী।

জ্ঞাতব্যঃ কোনো কোনো আলেম এই আয়াতের অর্থ করেছেন এরকম— অন্যায় হারাম সম্পদ ভক্ষণ করতে গিয়ে তোমরা তোমাদের জীবনকে ধ্বংস করে দিও না। অন্যায় সম্পদ তার ভক্ষণকারীকে বরবাদ করে দেয় এবং দোজখে নিয়ে যায়। তারা সর্বক্ষণ সেখানেই থাকবে। অন্যায় মালই তার ধ্বংসের কারণ।

আসেম বিন বাহদেলা বর্ণনা করেন, মাসরুক সিফফিনে গিয়েছিলেন। তিনি উভয় বাহিনীর মধ্যবর্তী স্থলে দাঁড়িয়ে বললেন— হে মানুষেরা! মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং জবাব দাও যদি কোনো আহবানকারী তোমাদেরকে আকাশ থেকে আহবান করে, তাকে যদি তোমরা দেখতে পাও ও তার কথা শুনতে পাও—সে যদি বলে, যে কাজে তোমরা নিয়োজিত রয়েছো, আল্লাহ্ সে কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তবে কি সে কাজ থেকে তোমরা বিরত থাকবে? লোকেরা জবাব

www.eelm.weebly.com

দিলো, সোবহান আল্লাহ্। (নিশ্চয়ই বিরত থাকবো)। তখন মাসরুক বললেন, আল্লাহ্র কসম! জিবরাইল মোহাম্মদ স. এর নিকট এই ফরমান নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, 'তোমাদের পরস্পরকে হত্যা কোরো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ।' আমার ধারণা এখন আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে কাউকে কিছু বলতে শোনাপেক্ষা অবতীর্ণ এই আয়াতের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী (যার উপর ইমান আনা ওয়াজিব)।

'আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু' —দয়ালু বলেই তিনি তোমাদেরকে পুণ্য কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন— আল্লাহ্ বনী ইসরাইলদের তওবা কবুল হওয়ার শর্ত দিয়েছিলেন এরকম যে, তারা একে অপরকে হত্যা করবে। কিন্তু আল্লাহ্র বিশেষ রহমত যে, আল্লাহ্ এই উম্মতের তওবা কবুলের জন্য এরকম শর্ত আরোপ করেননি। বরং লজ্জিত হওয়া এবং এস্তেগফার করাকেই তওবা হিসেবে অনুমোদন দিয়েছেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৩০

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

❒ এবং যে কেহ সীমালংঘন করিয়া অন্যায়ভাবে উহা করিবে তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিব; ইহা আল্লাহের পক্ষে সহজসাধ্য।

অন্যের প্রতি জুলুম করা প্রকৃতপক্ষে নিজের উপরই জুলুম করা। অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করা এবং কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা শাস্তিকে অবধারিত করে— আল্লাহ্পাক তাই বলেছেন, আমি তাকে আগুনে পোড়াবো আর একাজ আমার জন্য অতি সহজ। অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করাকে কেউ হালাল মনে করলে তার দোজখের আযাব হবে সার্বক্ষণিক (কারণ, হারামকে হালাল মনে করার কারণে সে কাফের হয়েছে)। তাই কাফেরদের মতো তার শাস্তি হবে চিরস্থায়ী। আর যে আত্মসাৎ ও হত্যা করা সত্ত্বেও একাজকে হালাল মনে করে না, তার দোজখাযাব হবে বটে কিন্তু তা চিরস্থায়ী হবে না। (কারণ, সে গোনাহ্গার হলেও ইমানদার)। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাকে ইচ্ছে করলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

www.eelm.weebly.com

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ○

❑ তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে যাহা গুরুতর তাহা হইতে বিরত থাকিলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলি মোচন করিব এবং তোমাদিগকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করিব।

এরশাদ হয়েছে, বড় গোনাহ্ থেকে বিরত থাকলে ছোট গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। হজরত আলী বলেন, কবীরা (বড়) গোনাহ্ ওইগুলো যার শাস্তিরূপে নির্ধারিত হয়েছে দোজখ— যে কাজে রয়েছে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি এবং অভিসম্পাত ও অবধারিত শাস্তি। জুহাক বর্ণনা করেন, ওই সমস্ত পাপ কবীরা গোনাহ্ নামে অভিহিত, যে সমস্ত কাজের জন্য দুনিয়ায় অথবা আখেরাতে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে।

আমি বলি, কবীরা গোনাহ্র ধরণ তিনটি। এক আল্লাহ্র সাথে শরীক সাব্যস্ত করা। রসুল স. যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করাও শিরিকের অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের মিথ্যাচার ব্যাখ্যাসহ অথবা ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে করা হলেও শিরিক পদবাচ্য হবে। আর যদি ইসলামের বদনাম করার উদ্যোগ নেয়া হয় তবে তাকে নফসানিয়াত বা বেদাত বলা হবে, এরকম কাজও কুফর। দু'টি অবস্থার পার্থক্য এই যে, প্রথমাবস্থার কুফর হলো ইচ্ছাকৃত এবং পরের অবস্থার কুফর অনিচ্ছাকৃত। তাদের উদ্দেশ্য কুফরী না হলেও তাদের গতি কুফরীর দিকেই। যেমন রাফেজী, খারেজী, কদরিয়া— তারা নিজকে নিজেদের কর্মের সৃষ্টিকর্তা বলে জানে। আরও রয়েছে জুহনিয়া, মোতাজিলা ও মোজাস্সেমা। এরা মনে করে আল্লাহ্র শরীর ও অঙ্গ প্রতঙ্গ রয়েছে। এরা অন্তর্ভূত রয়েছে কুফরীর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ আকিদা ও দম্ভ প্রদর্শনের দিক থেকে তারা বেদাতী এবং নফস্ পোরস্ত (প্রবৃত্তিপূজক)। এর উপর ভিত্তি করেই হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ্ হলো আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা এবং আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় না করা এবং আল্লাহ্র রহ্মত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া।

আমি বলি, আল্লাহ্পাক বলেছেন তাঁর গোপন জিজ্ঞাসাবাদ থেকে যারা নির্ভয় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত এবং পথভ্রষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত কেউই আল্লাহ্র রহ্মত থেকে নিরাশ হবে না। আর আল্লাহ্র রহমত হতে নিরাশ হয় কেবল কাফেরেরাই।

জ্ঞাতব্যঃ আওসাত নামক গ্রন্থে বায্যার এবং তিবরানী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে লিখেছেন, রসুল স.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কবীরা গোনাহ্ কী? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র জাত ও সিফাতের শরীক করা। আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ্র গোপন ধরপাকড় থেকে ভাবনামুক্ত হয়ে যাওয়া।

---

www.eelm.weebly.com

কবীরা গোনাহের দ্বিতীয় ধরণটি হচ্ছে এই— এতে করে আল্লাহ্‌র বান্দাদের জীবন সম্পদ অথবা সম্মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইমাম সুফিয়ান সওরী বলেন, তোমাদের ও আল্লাহ্‌র বান্দাদের হক বিনষ্ট হওয়া কবীরা গোনাহ্। আল্লাহ্‌র হক বিনষ্ট করাও কবীরা গোনাহ্। আল্লাহ্ মহান, তাঁর রহমতের তুলনায় সকল কিছুই ক্ষুদ্র। তিনি সকল গোনাহ্ ক্ষমা করে দিতে পারেন। রসুল স. নিবেদন করেছেন, হে আমার আল্লাহ্! তোমার মাগফেরাত আমাদের গোনাহ্ থেকে অনেক বড়। আল্লাহ্ নিজে বলেছেন, আমার রহমত সবকিছু থেকে বড়।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন— আল্লাহ্‌র নিকট তিনটি দপ্তর থাকবে। প্রথম দপ্তরটিকে আল্লাহ্ উপেক্ষা করবেন অর্থাৎ আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে প্রথম দফতরভূতদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। দ্বিতীয় দফতরভূতদেরকে আল্লাহ্ অব্যাহতি দিবেন না আর তৃতীয় দফতরভূত যারা আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আর ক্ষমার অযোগ্য এই দফতরটি হবে শিরিকের। আর যাদেরকে উপেক্ষা করবেন তারা হচ্ছে— আল্লাহ্‌র হক বিনষ্টকারী, নামাজ ও রোজা ইত্যাদি হুকুম পরিত্যাগকারী। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। যাদেরকে আল্লাহ্ অব্যাহতি দিবেন না, তারা হচ্ছে বান্দার হক বিনষ্টকারী। বান্দার হক বিনষ্টকারীদেরকে আল্লাহ্ মাফ করবেন না (বান্দা যদি মাফ করে তবেতো ভালোই)। আহমদ, হাকেম।

হজরত সালমান এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিবরানীও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন বায্যার। হজরত আনাস বিন মালেক বলেন, রসুল স. বলেছেন কিয়ামতের দিন আরশের দিক থেকে এক আহবানকারী ঘোষণা দিবেন, হে উম্মতে মোহাম্মদী! নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিশ্বাসবান পুরুষ এবং বিশ্বাসবতী নারীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তোমরা একে অপরের হক ক্ষমা করে দাও এবং আল্লাহ্‌র রহমতবেষ্টিত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। বাগবী। হজরত আবু বকর বর্ণনা করেন, বিদায় হজের ভাষণে রসুল করীম স. ঘোষণা দিয়েছেন— তোমাদের একের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান অপরের জন্য হারাম। যেমন হারাম আজকের দিন। তোমাদের জন্য আজকের দিন, এই শহর, এই মাস হারাম হয়েছে। (অর্থাৎ কারও জানমাল এবং ইজ্জতের হক বিনষ্ট করা জায়েয নয়, যেমন জায়েয নয় হেরেম শরীফের মধ্যে কোনো গোনাহ্ করা)। বোখারী, মুসলিম। তিরমিজি এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আমর বিন আস থেকে। তিনি আরো বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

হজরত উসামা বর্ণনা করেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে একই বাহনে আরোহী হয়ে হজ করতে গেলাম। লোকেরা রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে বলতে লাগলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল ! আমি তওয়াফ করার আগেই সায়ী করে ফেলেছি। কেউ বলতে লাগলো আমি আগের কাজটি পরে, পরের কাজটি আগে করে ফেলেছি। রসুল স. বললেন, এতে কোনো গোনাহ্ নেই। গোনাহ্গারতো ওই ব্যক্তি, যে অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের সম্পদ নষ্ট করেছে।তারা গোনাহে

www.eelm.weebly.com

পড়ে থাকবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'যে সকল লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে কষ্ট দেয় তাদের উপর দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত পতিত হবে এবং আল্লাহ্ তাদের জন্য অপমানজনক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর যারা মুসলমান পুরুষ ও নারীকে দুঃখ দেয় তারা নিজেদের উপর অপবাদ এবং প্রকাশ্য গোনাহ্‌র বোঝা ওঠাবে।' এই আয়াতে দু'প্রকার কবীরা গোনাহ্‌র বর্ণনা রয়েছে। প্রথমে কুফর এবং পরে বান্দাদের উপর জুলুম করার কথা এসেছে।

ইতোপূর্বে বর্ণিত 'ইমানদারগণ তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কোরো না... পরস্পরকে হত্যা কোরো না'—এ সকল কথায় বুঝা যায় সম্পদহানি এবং প্রাণহানি উভয়টিই কবীরা গোনাহ্। বিশুদ্ধ হাদিস সমূহে কবীরা গোনাহ্ সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জুলুম এবং শিরিকের কথাই এসেছে।

হজরত আনাস এবং হজরত আমর বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কবীরা গোনাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, মিথ্যা কসম খাওয়া। মিথ্যা কসম খাওয়ার কথা হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমরের বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ করেছেন বোখারী। হজরত আনাসের বর্ণনায় মিথ্যা কসমের পরিবর্তে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কথা এসেছে। এ বর্ণনাটি লিখেছেন বোখারী ও মুসলিম।

হজরত আনাস থেকে ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন— কবীরা গোনাহ্ সাত প্রকার। উপরে বর্ণিত তিন প্রকার ব্যতীত অন্য চার প্রকার হচ্ছে— সাধ্বী রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া, এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, সুদ খাওয়া এবং জেহাদের ময়দান থেকে পশ্চাদপসরণ করা।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, নবী করীম স. বলেছেন— তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে দূরে থেকো। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো কী? তিনি স. বললেন— ১. আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. অন্যায়ভাবে হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. এতিমের মাল আত্মসাৎ করা, ৬. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন এবং সতী সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া — বোখারী, মুসলিম। ইবনে রাহ্‌বিয়ার বর্ণনায় পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং কাবা শরীফের মধ্যে গোনাহ্ করার কথাও এসেছে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসুল ! আল্লাহর নিকট সব চেয়ে বড় গোনাহ্ কোনটি? তিনি স. বললেন— কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। পুনঃ জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি স. বললেন— তোমার সন্তান তোমার একান্নবর্তী হবে এই ভয়ে যদি তুমি তাকে হত্যা করো। পুনঃ প্রশ্ন করা হলো—তারপর? তিনি স. বললেন—প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌পাক কোরআনের এ আয়াত নাজিল করেছেন— 'যারা আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে উপাস্য বলে স্বীকার করে না এবং

www.eelm.weebly.com

যাকে হত্যা করা আল্লাহ্তায়ালা হারাম করে দিয়েছেন আইনের বিধান ব্যতীত তাকে হত্যা করে না আর ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না।' বোখারী, মুসলিম।

প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা মানে প্রতিবেশীর হক বিনষ্ট করা। অন্য এক হাদিসে রসুলপাক স. বলেছেন—প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা অপেক্ষা অন্যস্থানের দশজন মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করা সহজ (অপেক্ষাকৃত কম অপরাধ)। হজরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আহমদ, তিবরানী এই হাদিসটিকে কবীর ও আওসাত পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বর্ণনা করেন—রসুল স. বলেছেন, কবীরা গোনাহ্র একটি হচ্ছে পিতামাতাকে গালি দেয়া। এক ব্যক্তি বললো, পিতামাতাকে গালি দেয়া হয় কিভাবে? রসুলপাক স. বললেন—অন্য কারও পিতাকে গালি দিলে সে ব্যক্তিও গালিদাতার পিতাকে গালি দেয়। অন্যের মাতাকে গালি দিলে সে ব্যক্তিও গালিদাতার মাতাকে গালি দেয়। বাগবী।

হজরত আবু বকর বর্ণনা করেন—রসুল স. বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে তিন প্রকার শ্রেষ্ঠ কবীরা গোনাহ্ সম্পর্কে অবহিত করবো না? সাহাবীগণ আরজ করলেন, নিশ্চয়ই। তিনি স. বললেন, কাউকে আল্লাহর সমান্তরাল ধারণা করা, পিতামাতার অনানুগত্য। তিনি স. হেলান দিয়েছিলেন, একথা বলে সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, ভালো করে শুনে নাও তৃতীয়টি হচ্ছে মিথ্যা বলা। মিথ্যা বলা, মিথ্যা বলা। রসুলপাক স. একথা কয়েকবার বললেন। আমরা চাইছিলাম তিনি যেনো নীরব হয়ে যান। কারণ, আমরা তাঁর কথা সম্পূর্ণই বুঝতে পেরেছি।

জ্ঞাতব্যঃ রসুলপাক স. মিথ্যা বলাকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন এ কারণে যে, মিথ্যা অনেক কবীরা গোনাহ্কে একত্রিত করে। আল্লাহ্র সঙ্গে শিরিক, মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা কসম, ব্যভিচারের অপবাদ, মিথ্যা দাবী, রসুল স. এর উপর মিথ্যারোপ— এগুলো সবই মিথ্যা বলার অন্তর্ভুক্ত। রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেনো জাহান্নামে তার ঠিকানা নির্বাচন করে নেয়। বোখারী, মুসলিম। গীবত ব্যভিচারের চেয়েও কঠিন। মারফু পদ্ধতিতে হজরত সাঈদ এবং হজরত জাবের থেকে বায়হাকী এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। চোগলখুরীও মিথ্যার আর একটি প্রকার। হজরত আবদুর রহমান বিন গানাম এবং হজরত আসমার মারফু বর্ণনা এই যে, ওই ব্যক্তি নিকৃষ্টতম যে চোগলখুরী করে বেড়ায়। আহমদ।

আর একটি মিথ্যাচার হচ্ছে ফাসেক ব্যক্তির প্রশংসা করা। হজরত আনাসের মারফু বর্ণনায় এসেছে— ফাসেকের প্রশংসা করা হলে আল্লাহ্তায়ালা রাগান্বিত হন এবং আল্লাহ্র আরশ কাঁপতে থাকে। বায়হাকী। লানতের অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে লানত করা আর এক প্রকার মিথ্যাচরণ। এমতাবস্থায়, লানত ফিরে আসে লানতকারীর উপরেই। তিরমিজি। তিরমিজি এই হাদিসটি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে আরও বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু দারদা বর্ণিত মারফু বর্ণনায় এসেছে— অপবাদ দেয়া এবং অকথ্যভাষায় গালি দেয়া, আর এক রকমের মিথ্যাচার। হজরত ইবনে মাসউদের মারফু বর্ণনায় এসেছে— ইমানদার ব্যক্তি অপবাদ দিতে পারে না, অভিশাপ দিতে পারে না, অকথ্যভাষায় গালি দিতে পারে না এবং নির্লজ্জ হতে পারে না। তিরমিজি।

কবীরা গোনাহ্ আরও রয়েছে। রসুল স. বলেছেন— যে ব্যক্তি জিহ্বা এবং দুই উরুর মধ্যবর্তী অঙ্গের জামিনদার হবে আমি হবো তার জান্নাতের জিম্মাদার। হজরত সহল বিন সা'দ থেকে এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন বোখারী। ইমাম মালেক ও বায়হাকী হজরত সাফওয়ান বিন সুলাইমের মাধ্যমে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন— রসুল স. কে জিজ্ঞেস করা হলো, মুমিন কি কাপুরুষ হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নিবেদন করা হলো, মুমিন কি কৃপণ হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। পুনঃ নিবেদন করা হলো, মুমিন কি মিথ্যুক হতে পারে? তিনি স. বললেন, না।

রসুল স. বলেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি— যদিও নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং মুসলমান হওয়ার দাবী করে। নিদর্শন তিনটি হচ্ছে—১. কথায় কথায় মিথ্যা বলা, ২. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং ৩. আমানত খেয়ানত করা। বোখারী, মুসলিম।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে— যার মধ্যে চারটি স্বভাব থাকবে সে মুনাফিক। যদি একটি স্বভাব থাকে তবে বুঝতে হবে তার একটি মুনাফিকি স্বভাব রয়েছে। মুনাফিকের ওই স্বভাব চারটি হচ্ছে— ১. আমানত খেয়ানত করা ২. মিথ্যা বলা ৩. প্রতিশ্রুতি ছিন্ন করা এবং ৪. অশ্লীল ভাষায় ঝগড়া করা।

তৃতীয় প্রকার কবীরা গোনাহ্ আল্লাহ্র হকের সঙ্গে। যেমন ব্যভিচার, মদ্যপান। ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমরকে শরাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি রসুল স.কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি স. বলেছেন, সবচেয়ে বড় গোনাহ্ হলো মদ্যপান। যে শরাবপানে অভ্যস্ত হয় সে নামাজও ছেড়ে দেয় এবং নেশার ঘোরে মা, ফুফী ও খালার উপরও চড়াও হয়। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে আবদুল্লাহ বিন হুমাইদ এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, নবী করীম স. বলেছেন— ইমান থাকা অবস্থায় কেউ ব্যভিচার করতে পারে না, চুরি করতে পারে না, মদ্যপান করতে পারে না। সম্পদ লুণ্ঠন ও সম্পদ আত্মসাৎ করতে পারে না। সাবধান! তোমরা এ সকল অপকর্ম থেকে বেঁচে থেকো। বোখারী, মুসলিম। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় অতিরিক্ত আরো রয়েছে, ইমান অবস্থায় কেউ হত্যা করতে পারে না।

www.eelm.weebly.com

বোখারী। আমি বলি সমকামও ব্যভিচারের মতো। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'তোমরা এমনই নির্লজ্জ কাজ করো যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে আর কেউ করেনি।'

চুরি অপেক্ষা রাহাজানি বড় অপরাধ। আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন, 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে যুদ্ধ করে'— এ আয়াত রাহাজানি সম্বন্ধে নাজিল হয়েছে। ওজনে কম দেয়াও চুরির অন্তর্ভূত। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন, 'মাপে কম দেয় যারা তাদের জন্য রয়েছে মহাসর্বনাশ।' খেয়ানত বড়ই অপবিত্র কাজ এবং খেয়ানত মুনাফিকির নিদর্শন।

কোনো গোনাহ্‌কে ছোট মনে করা এবং ছোট গোনাহের পরওয়া না করাও কবীরা গোনাহ্। কেননা, সগীরা (ছোট) গোনাহ্‌কে গুরুত্ব কম দিলে মাগফেরাত থেকে দূরে থাকবে। এরকম করা আল্লাহ্‌র হুকুমের প্রতি অবাধ্যতার প্রমাণ। এরকম আচরণ পরিশেষে কুফরীতে পৌঁছে দিতে পারে। ছোট বড় নির্বিশেষে সকল গোনাহ্‌কে বড় মনে করলে এবং আল্লাহ্‌র আযাবকে ভয় করলে মাগফেরাত লাভের যোগ্যতা অর্জন করা যায়। রসুল স. বলেছেন, গোনাহ্‌কে এমন মনে করবে যেনো মাথার উপরে পাহাড় স্থাপন করা হয়েছে। মুনাফিকেরা গোনাহ্‌কে মনে করে যেনো নাকের ডগায় মাছি বসেছে যা সহজেই উড়ে যায়।

হজরত আনাস বলেন, তোমরা এমন কিছু আমল করো যেনো চুলের চেয়েও চিকন বলে তোমাদের মনে হয়। কিন্তু রসুল স. এর সময় আমরা এসবকে ধ্বংসাত্মক অপরাধ বলে মনে করতাম। বিশুদ্ধ সনদে এ বর্ণনাটি করেছেন বোখারী হজরত আবু সাঈদ থেকে। আহ্‌মদও এরকম লিখেছেন।

যে মনে করবে কবীরা গোনাহ্ মাত্র সাতটি সে ভুল করবে। ছোট গোনাহে লিপ্ত থেকে কেউ যদি গোনাহ্‌কে গুরুত্বহীন মনে করে সেও কবীরা গোনাহে লিপ্ত রয়েছে বুঝতে হবে।

ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, সা'দ বিন জোবায়ের বলেন, এক ব্যক্তি হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলো, কবীরা গোনাহ্ কি সাতটি? তিনি জবাব দিলেন, প্রায় সাত শত। কিন্তু এস্তেগফার অর্থাৎ তওবা করলে কবীরা গোনাহ্ আর কবীরা থাকে না।আর গোনাহে নিমজ্জিত থাকলে সগীরাও আর সগীরা গোনাহ্ থাকে না– তার এ উদাসীনতা তখন কবীরা হয়ে যায়। তিনি আরো বললেন, যে আমলের মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয়, তাই— কবীরা গোনাহ্।এ ধরণের আমল যারা করে তাদের এস্তেগফার করা উচিৎ। কেননা, এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কাউকে আল্লাহ্‌পাক সব সময় দোজখে রাখবেন না। ওই ব্যক্তিরা অবশ্য ব্যতিক্রম যারা ইসলাম পরিত্যাগ করেছে অথবা ফরজ অস্বীকার করেছে কিংবা তকদীরকে অমান্য করেছে।

www.eelm.weebly.com

জ্ঞাতব্য ১ ঃ খেয়ানত, চুরি ও ওজনে কম দেয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর কবীরা গোনাহ্। তিরমিজি ও ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে রসুল স. এর বাণী উল্লেখ করেছেন এরকম— ওজর ব্যতীত দুই নামাজকে একত্রিত করে পড়া কবীরা গোনাহ্। হজরত ওমর, হজরত আবু মুসা এবং হজরত আবু কাতাদা থেকে ইবনে আবী শায়বাও এরকম বর্ণনা করেছেন।

আমি বলি, 'এস্তেগফার করলে কোনো গোনাহ্ থাকে না'— হজরত ইবনে আব্বাসের এ কথার অর্থ হচ্ছে, ওই সমস্ত গোনাহ্ যার সম্পর্ক কেবল আল্লাহ্র সঙ্গে। কিন্তু যে গোনাহের সম্পর্ক মানুষের অধিকারের সঙ্গে, সে গোনাহ্ শুধু এস্তেগফারের মাধ্যমে ক্ষমা করা হয় না। এমতোক্ষেত্রে এস্তেগফারও করতে হবে, সাথে সাথে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যার অধিকার নষ্ট করা হয়েছে তার সন্তুষ্টিও অর্জন করতে হবে।

জ্ঞাতব্য ২ ঃ কোনো কোনো আরেফ বলেছেন, এক সময় এমন স্তরে বান্দা উপনীত হয়, যখন গোনাহ্ তাঁর ক্ষতি করতে পারে না। এ কথার অর্থ এরকম নয় যে, গোনাহ্ করলে শরিয়তের শাস্তি তাদের প্রতি প্রযোজ্য হবে না। তাদের জন্য হারাম হালাল হয়ে যাবে— এরকম বিশ্বাস রাখা কুফরী ও কঠোর গোনাহ্। বরং ওই কথার উদ্দেশ্য এই যে, কলবের পবিত্রতা ও নফসের পরিশুদ্ধির পর কোনো কোনো আরেফ চৈতন্যময় অবস্থায় সর্বক্ষণ ফয়েজ লাভ করতে থাকে। তখন কোনো গোনাহ্ প্রকাশিত হতে পারে না। আবার কখনো এমন মনে হয় ছোটো বড় সকল গোনাহ্ই তাঁদের চোখে ভয়াবহ মনে হতে থাকে। গোনাহ্র চিন্তায় তখন তাঁরা এমন হয়ে যান যেনো তাদের জান, মাল, বাড়ি, ঘর, সন্তান সন্ততি সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এরকম লজ্জাবনত অবস্থায় তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয় তওবা-ই-রহমত যা তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হয়ে যায়। এ সকল মানুষের গোনাহ্কে আল্লাহ্পাক পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেন।

আরেফ রূমী, ফরজ নামাজের মধ্যেকার ওই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন যা সংঘটিত হয়েছিলো হজরত মুয়াবিয়া এবং শয়তানের মধ্যে। এর বিশুদ্ধ সনদ অবশ্য আমার জানা নেই। কিন্তু উপমা হিসেবে এই ঘটনাটিকে মেনে নেয়া যেতে পারে। একদিন শয়তান হজরত মুয়াবিয়াকে ফজরের নামাজের সময় জাগিয়ে দিলো। তিনি শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাজ তো মানুষকে ফরজ কর্তব্য থেকে উদাসীন করে দেয়া। কিন্তু তুমি এমন করলে কেনো? শয়তান বললো, আমার ভয় হচ্ছিলো, যদি আপনার নামাজ কাজা হয়ে যায় তবে আপনি এমন চিন্তিত, দুঃখিত ও লজ্জিত হবেন, যার জন্য ফরজ আদায় অপেক্ষাও আপনার মর্যাদা বেড়ে যাবে। তাই, আমি আপনাকে জাগিয়ে দিয়েছি। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহর কসম! যিনি আমার জীবনাধিকারী—যদি তোমরা গোনাহ্ না

www.eelm.weebly.com

করতে তবে আল্লাহ্ এমন মানুষ সৃষ্টি করতেন যারা গোনাহ্ করতো, তারপর ক্ষমাপ্রার্থনা করতো এবং আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। এই হাদিসটিও উপরোক্ত অবস্থার অনুকূল।

জ্ঞাতব্যঃ অন্তরের কাঠিন্যই সকল গোনাহের ভিত্তি। প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও অসৎ ধারণার উৎপত্তি হয় এখান থেকেই। এখান থেকেই শুরু হয় পাশবিক স্বভাব ও প্রবৃত্তিপূজার অপবিত্রতা। রসুল স. বলেন, মানুষের শরীরে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে। ওই মাংসপিণ্ডটি সুস্থ হলে সমস্ত শরীর সুস্থ হয়ে যায়। আর যদি অসুস্থ থাকে তবে সমস্ত শরীর অসুস্থ থাকে। জেনে রেখো, উহাই কলব (অন্তকরণ)। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, যখন সমস্ত মোকদ্দমা মীমাংসিত হবে তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে সঠিক অঙ্গীকার করেছিলেন, আমিও কিছু অঙ্গীকার করেছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর আমার কোনো বলপ্রয়োগ ছিলো না। কেবল এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছিলাম। তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। অতএব তোমরা আমাকে দোষারোপ কোরো না। বরং নিজেকে দোষারোপ কোরো।'

একাগ্রচিত্ততা (হুজুরী কলব্) অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পাপমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। নামাজের পবিত্রতাও হুজুরী কলবের উপর নির্ভরশীল। আর তরিকার প্রকৃত মোর্শেদের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার পথে অগ্রসর হওয়ার সাধনায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত হুজুরী কলব হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই তোমরা কামেলে মোকাম্মেল পীর মোর্শেদের তরিকাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। তাঁদের সাহচর্য অর্জন করো। এরকম করলে তোমরা কখনো হতভাগ্য হবে না। তাঁদের বন্ধুরা কখনো অকৃতকার্য হয় না।

'লঘুতর পাপগুলো মোচন করবো'— একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক আমাদের সগীরা (ছোট) গোনাহ্ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন। যেমন অবৈধ স্পর্শ, চুম্বন ইত্যাদি। রসুল স. বলেছেন, চোখ, হাত ও পা–ও ব্যভিচার করে। শেষ পর্যন্ত লজ্জাস্থান ব্যভিচারকে বাস্তবায়ন করে। অথবা করে না। ইনশাআল্লাহ্ নামাজ, রোজা ছোট পাপগুলোকে দূর করে দিবে। নিশ্চয়ই পুণ্যকর্ম পাপকে বিদূরিত করে। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, নামাজের মধ্যবর্তী সময়ের এবং জুমআর নামাজ দুই জুমআর মধ্যবর্তী সময়ের পাপ সমূহ মিটিয়ে দেয়। তবে শর্ত হচ্ছে কবীরা গোনাহ্ থেকে বিরত থাকতে হবে। মুসলিম।

'সম্মানজনক স্থানে দাখিল করবো'—একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, আমি তোমাদেরকে কল্যাণের সঙ্গে সম্মানজনক স্থানে অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

www.eelm.weebly.com

মুজাহিদ বর্ণনা করেন, হজরত উম্মে সালমা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! পুরুষেরা জেহাদ করে, আমরা করতে পারি না। তাদের মীরাস দ্বিগুণ। আমরা যদি পুরুষ হতাম তবে আমরাও জেহাদে অংশগ্রহণ করতে পারতাম এবং দ্বিগুণ মীরাস পেতাম। এই কথার প্রেক্ষিতে নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়। তিরমিজি, হাকেম, বোখারী, মুসলিম। অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, যখন মীরাস সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হলো, 'একজন পুরুষের জন্য দুইজন মহিলার সমান অংশ রয়েছে'—তখন মহিলারা বললেন, পুরুষেরা শক্তিমান। আমরা দুর্বল। আমাদের প্রয়োজন বেশী। অথচ তাদের উপার্জনের ক্ষমতা অধিক। তাই মীরাসের অধিকার আমাদেরই বেশী হওয়া প্রয়োজন। এ সকল মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিচের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। হজরত কাতাদা ও সুদ্দী বর্ণনা করেন, 'যখন একজন পুরুষের জন্য দুইজন মহিলার সমান অংশ রয়েছে'—এই আয়াত নাজিল হলো, তখন পুরুষেরা বললেন, মীরাসের নিয়মে যদি আখেরাতেও আমরা মেয়েদের পুণ্য অপেক্ষা দ্বিগুণ পুণ্য পেতাম। এরকম কথাবার্তা চলার সময় নিচের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৩২

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ○

❐ যদ্দারা আল্লাহ্ তোমাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন তোমরা তাহার লালসা করিও না। পুরুষ যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহের অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়। তাঁর নির্ধারণই চূড়ান্ত। তিনি একজনকে অপরজনের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তাঁর এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া উচিৎ। আল্লাহ্তায়ালার দেয়া মর্যাদার সমকক্ষতা অর্জন করার লালসা পরিত্যাজ্য। বরং প্রত্যেকের উচিত এই যে, আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনকে উদ্দেশ্য করবে। পুণ্য অর্জনের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা করে যাবে।

পুরুষদের আমল যেমন নির্ধারিত। তেমনি নারীদের আমলও। পুরুষদের জন্য জেহাদ, গণিমত, দ্বিগুণ মীরাস, ব্যবসায়িক সফলতা—আল্লাহ্তায়ালাই নির্বাচন

www.eelm.weebly.com

করেছেন। নারীদের আমলও তেমনি সুনির্ধারিত—স্বামীর অনুসরণ, সন্তান প্রতিপালন, সতীত্ব রক্ষা এগুলো হচ্ছে নারীর দায়িত্ব। তাদের জন্য রয়েছে মোহরানা, খোরপোশ, মীরাস। এছাড়াও রয়েছে নামাজ, রোজা, দান—ইত্যকার আরো অনেক পুণ্য কর্মের সুযোগ। আমল ও কর্মক্ষেত্র কিছুটা ভিন্ন হলেও পুরুষ রমণী উভয়েই আখেরাতে তাদের পুণ্যকর্মের বিনিময় লাভ করবে। সুতরাং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য নিবেদন জানাও। তাঁর রহ্‌মতের ভাণ্ডার অফুরন্ত। তিনি একটি পুণ্যকে দশগুণ থেকে সাত'শ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। আবার কখনো দান করেন অপরিমেয়, অনির্ণেয়। তাঁর দান দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি কাউকে বেশী দিলে তার প্রতি হিংসা করা বৈধ নয়।

....

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিরমিজি লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। তিনি প্রার্থনা মঞ্জুর করলে তুমি অনুগ্রহমণ্ডিত হবে। জনৈক সাহাবী থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহর কাছে তাঁর ফজল প্রার্থনা করো। আল্লাহ্ পছন্দ করলে ফজলের অধিকারী হতে পারবে। আর প্রশস্ততার অপেক্ষা করা অতি উত্তম ইবাদত। হজরত আনাস থেকে ইমাম আহমদ লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন কোনো মুসলমান আল্লাহ্‌র নিকট তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করে তখন জান্নাত বলে, হে আল্লাহ! তার অভিলাষ পূর্ণ করো। আবার যখন কোনো মুসলমান তিনবার দোজখ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করে, তখন দোজখ বলে, হে আল্লাহ! তার প্রার্থনা পূর্ণ করে দাও। হজরত সাঈদ বিন জোবায়েরের উক্তি ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম উদ্ধৃত করেছেন এরকম— দোয়া পার্থিব কোনো ব্যাপার (পার্থিব বিষয় প্রার্থনা করা হলেও) নয়। দোয়া হচ্ছে ইবাদত।

আল্লাহ্‌তায়ালা সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। কে কী এবং কাকে কী মর্যাদা দিতে হবে— সকল কিছু সম্পর্কে তিনি জানেন। মর্যাদা, যোগ্যতা ও বিনিময় প্রদানের হকিকত তিনি ব্যতীত অন্য কারো জানার কথা নয়।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৩৩

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

❑ পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী করিয়াছি এবং যাহাদের সহিত তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তাহাদিগকে তাহাদের অংশ দিবে। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ের দ্রষ্টা।

---

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্তায়ালা পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত প্রতিটি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং অধিকার প্রত্যার্পণে ধর্মনিষ্ঠ হওয়া বাঞ্ছণীয়।

জ্ঞাতব্যঃ আবু দাউদ নাসেখ পুস্তকে দাউদ বিন হোসাইনের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এ রকম— আমি উম্মে সা'দ বিনতে রবীকে কোরআন শেখাতাম। তিনি শিশুকালে এতিম হয়েছিলেন এবং প্রতিপালিতা হয়েছিলেন হজরত আবু বকরের নিকট। আমি তাঁর সামনে 'যাহাদের সঙ্গে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ' আয়াত পাঠ করলাম তখন তিনি বললেন, এ রকম নয়। বরং পাঠ করতে হবে এভাবে— 'ওয়াল্লাজিনা আক্বাদাত আইমানুকুম।' এই আয়াত নাজিল হয়েছে হজরত আবু বকরের ছেলে হজরত আবদুর রহমান সম্পর্কে। যখন আবদুর রহমান মুসলমান হতে অস্বীকার করলো, তখন হজরত আবু বকর কসম খেয়ে তাঁকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করে দিলেন। কিন্তু পরে তিনি মুসলমান হয়ে গেলে আল্লাহ্ হুকুম করলেন, তাকে মীরাস দিয়ে দাও। আমি বলি, এই আয়াত দ্বারা প্রভুর সম্পত্তিতে দাসের উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হয় না। আবু মালেকের উক্তি আবদ বিন হুমাইদ এবং ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন এরকম— জাহেলী যুগে কোনো কোনো মানুষ আপন গোত্র ছেড়ে দিয়ে অন্য দলে মিশে যেতো। দলের লোকেরা বলতো, তুমি আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। কল্যাণ অকল্যাণ, হত্যা, রক্তপণ (দিয়ত) সকল বিষয়ে তুমি আমাদের ভ্রাতৃত্বের অংশীদার। ওই ব্যক্তির নিকট থেকেও তারা এরকম অংগীকার গ্রহণ করতো। কিন্তু বাস্তবে এ অংগীকারের প্রতিফলন পড়তো খুব কমই। প্রয়োজনের সময় সাহায্যার্থী হলে ওই ব্যক্তি যেমন এগিয়ে আসতে গড়িমসি করতো, তেমনি ওই ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হলে দলের কেউ কেউ এগিয়ে গেলেও সবাই যেতো না। আর এ সমস্ত সাহায্যে আন্তরিকতা প্রায়শই থাকতো না। ইসলামের আবির্ভাবের পর এই ধরনের অঙ্গীকারের মধ্যে অসঙ্গতি দেখতে পেয়ে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো রসুল স. সকাশে। আরজ করা হলো, মূর্খতার যুগের কৃত অংগীকার সম্পর্কে হুকুম কী? এমতাবস্থায় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। নির্দেশ আসে, অংগীকার পূর্ণ করতে হবে। আবদ বিন হুমাইদ এবং ইবনে আবী হাতেম অন্য আর এক সূত্রে আবু মালেকের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন এরকম— তারা এক গোত্র অন্য গোত্রের সঙ্গে অংগীকারাবদ্ধ হতো। এক দল অপর দলকে সকল কাজকর্ম ও পরামর্শে অংশগ্রহণ করতে বলতো। হজরত ইবনে ওমর থেকে আবদ বিন হুমাইদ ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেন, রসুল স. মক্কাবিজয়ের দিন বলেছেন, জাহেলিয়াতের সময়কার অঙ্গীকার পূর্ণ করো। ইসলাম এই অংগীকারকে অধিকতর শক্তিশালী করেছে। কিন্তু এখন আর ওরকম অংগীকার কোরো না। আহমদ ও মুসলিম হজরত জোবায়ের বিন মোতয়েম থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, ইসলামে পারস্পরিক কসম জায়েয নেই। কিন্তু ইসলামপূর্ব সময়ের অংগীকারকে ইসলাম অধিকতর মজবুত করেছে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবদ বিন হুমাইদ মারফু পদ্ধতিতে বর্ণনা করেন, মূর্খতার যুগের অংগীকারকে

www.eelm.weebly.com

ইসলাম সুদৃঢ় করেছে। জুহরীর বর্ণনা থেকে আবদুর রাজ্জাক এবং আবদ বিন হুমাইদ লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইসলামে পারস্পরিক কসম করা নাজায়েয।

ইমাম আবু হানিফার অভিমত এই যে, যাবিল ফুরুজ (কোরআনে উল্লেখিত উত্তরাধিকারী) আসাবা (যাবিল ফুরুজের পরের অংশীদার) এবং যাবিল আরহাম (রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়) যদি না থাকে তবে সবচেয়ে উপরের স্তরের মাওলাল মাওয়ালাতকে অংশ দিতে হবে। (মৃত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত বন্ধুকে মাওলাল মাওয়ালাত বলে)। যাবিল ফুরুজ অথবা যাবিল আরহাম অথবা আসাবা থাকলে মাওলাল মাওয়ালাত কিছুই পাবে না। এটা ঐকমত্য।

জমহুরের মন্তব্য এই যে, মূর্খতার যুগে মাওলাল মাওয়ালাতকে অংশীদার করার নিয়ম ছিলো। ইসলামের প্রথম দিকেও পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ দেয়ার হুকুম ছিলো। কিন্তু যখন আল্লাহ্র কিতাবে রক্ত সম্পর্কিত স্বজনদের মধ্যে 'বিভিন্নজন বিভিন্নজনের চেয়ে উত্তম'—এই আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন মাওলাল মাওয়ালাতদের অংশীদারিত্ব রহিত হয়ে গেলো। অন্য অংশীদারদের কেউই যদি না থাকে তবুও তাদেরকে কিছু দেয়া যাবে না। সমস্ত সম্পদ তখন জমা দিতে হবে বায়তুল মালে।

জমহুরের বক্তব্যের ব্যাপারে এই আপত্তিটি উত্থাপিত হতে পারে যে, এক আয়াত যখন অন্য আয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়—যদি একটি আমল করতে গেলে অন্যটির বিরুদ্ধাচরণ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে, তখনই কেবল মানসুখ (রহিত) হওয়ার কথা উঠতে পারে। তখন এক আয়াত হয় রহিতকারী, অন্যটি হয় রহিত। কিন্তু এখানে সে রকম ঘটেনি। এখানে যা বলা হয়েছে তা হলো, প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের অংশ দেয়ার পর যদি উদ্বৃত্ত থাকে অথবা প্রকৃত উত্তরাধিকারী যদি আদৌ না থাকে, তখনই কেবল মাওলাল মাওয়ালাত অংশীদার হবে। সুতরাং এখানে দ্বন্দ্ব কোথায় যে রহিত হওয়া না হওয়ার কথা ভাবতে হবে?

আমাদের নিকট বিশুদ্ধ ধারণা এই যে, মাওলাল মাওয়ালাত প্রকৃত পক্ষে ওয়ারিশই নয়। এ আয়াতই তাদের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করেছে। অন্য অংশীদারেরা যদি কেউই না থাকে তবুও মাওলাল মাওয়ালাত কোনো অংশ পাবে না। কারণ আয়াতের শেষ দিকে বলা হচ্ছে, কিন্তু এই মাত্র যে, 'তোমরা আপন বন্ধুদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।' (তবে তোমরা মরার পর তারা শরয়ী অসিয়ত অনুযায়ী কিছু পেয়ে যাবে)। এই বাক্যটি এখানে স্পষ্ট প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, অসিয়ত করলে তারা কিছু পাবে, অসিয়ত না করলে পাবে না।

ইমামে আজম বলেছেন, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় উপস্থিত হলে মাওলাল মাওয়ালাত কিছুই পাবে না। আমরাও একথা বলি। কিন্তু রক্ত সম্পর্কীয় কেউ না থাকলে মাওলাল মাওয়ালাতের অংশ বাকী থাকবে। প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকাকালে তার সম্পত্তির মালিক ছিলো এবং সকল প্রকার ব্যয় করার অধিকার তার ছিলো। (সে বন্ধুদেরকে দিতে পারতো এবং দেয়ার অঙ্গীকারও করেছিলো)। বায়তুল মালে জমা দেয়ার প্রশ্ন আসে নিতান্ত অপারগ

www.eelm.weebly.com

অবস্থায়। আর বায়তুল মাল নিজে কোনো ওয়ারিশ নয়। বায়তুল মালের দান গ্রহীতা অনির্দিষ্ট ও অপরিচিত হয়ে থাকে। অপরিচিতরা উত্তরাধিকারী হয় না। (অতঃপর বংশীয় আসাবা ওয়ারিশ ও আত্মীয় না থাকলে মাওলাল মাওয়ালাতেরাই বায়তুল মাল অপেক্ষা অধিক হকদার। কেননা, মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় তার সাথে সম্পত্তি দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলো। এই অঙ্গীকার অবশ্য অন্যান্য হকদারের হক বিনষ্ট করতে পারে না। অঙ্গীকার অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। বায়তুল মালের কোনো হক নেই)।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। এই আয়াতে আত্মীয়কে মীরাস না দেয়ার প্রতি ভয় দেখানো হয়েছে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৩৪

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ
اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۭ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللّٰهُ ۭ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلِيًّا كَبِيْرًا ○

❑ পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাহাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং পুরুষ তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা, এবং যাহা লোক চক্ষুর অন্তরালে আল্লাহের হিফাজতে উহারা তাহার হিফাজত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাহাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাহাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাহাদিগকে প্রহার কর। যদি তাহারা তোমাদের অনুগতা হয় তবে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করিও না। আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ।

পুরুষগণ রমণীদের অভিভাবক। হজরত হাসানের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, এক মহিলা রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার স্বামী আমাকে চড় মেরেছে। রসুল স. বললেন, প্রতিশোধ নাও। তৎক্ষণাৎ এই আয়াত অবতীর্ণ হলো। মহিলার আর প্রতিশোধ নেয়া হলো না। এই বর্ণনাটি ইবনে আবী শায়বা তাঁর মুসান্নিফ গ্রন্থে এবং আবু দাউদ তাঁর মারাসিলের মধ্যে লিখেছেন। হজরত হাসান থেকে ইবনে জারীরও এ রকম লিখেছেন।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু ছা'লাবীয়ে ওয়াহেদী এবং বাগবী বর্ণনা করেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত রবী ও তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে। সা'দ ছিলেন নুকাবাহ্ দলভুক্ত। রবীর স্ত্রী ছিলেন হাবীবা বিনতে জায়েদ বিন আবী জুহাইর। মুকাতিলও এই নাম লিখেছেন। বাগবী লিখেছেন, সা'দের স্ত্রী ছিলেন মোহাম্মদ বিন মোসলেমার কন্যা। ঘটনাটি এই— সা'দের স্ত্রী সা'দের হুকুমের বিরুদ্ধে কিছু বলেছিলেন। সা'দ তখন রেগে গিয়ে তাঁকে চপেটাঘাত করেছিলেন। তখন তাঁর শ্বশুর তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে রসুল স. সকাশে হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্, আমার এ কন্যাকে আমি সা'দের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি। সে আমার মেয়েকে চড় মেরেছে। রসুল স. বললেন, তোমার মেয়েরও প্রতিশোধ গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। সহসা তিনি বলে উঠলেন, এখন যাও। হজরত জিবরাইল এসেছেন। ইতোমধ্যে হজরত জিবরাইল এই আয়াত নিয়ে আবির্ভূত হলেন। রসুল স. বললেন, আমি এক রকম চাইলাম। আর আল্লাহ্তায়ালা মঞ্জুর করলেন আর এক রকম। আল্লাহ্র ইচ্ছাই উত্তম। এরপর রসুল স. রমণীদের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রহিত করে দিলেন।

হজরত আলী থেকে ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন, এক আনসার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে রসুল স. এর দরবারে হাজির হলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! উনি আমাকে মেরেছেন। আমার চেহারায় দাগ পড়ে গিয়েছে। রসুল স. বললেন, তার এই অধিকার নেই। এমন সময় আল্লাহ্তায়ালা এই আয়াত নাজিল করলেন। স্ত্রীকে আদব শিক্ষা দেয়ার অধিকার রয়েছে স্বামীদের। পুরুষদের অভিভাবক হওয়ার যোগ্যতা হিসাবে এখানে দু'টি যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে— ১. দান করা ২. উপার্জন করা।

আল্লাহ্তায়ালা পুরুষকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এটাই পুরুষের অভিভাবক হওয়ার প্রথম কারণ। আল্লাহ্ পুরুষকে অধিকতর জ্ঞান দিয়েছেন, তাই তারা উত্তম ব্যবস্থাপক। শারীরিক শক্তিমত্তা ও অন্যান্য যোগ্যতাও তাদের অধিক। মেয়েরা এদিক থেকে পিছিয়ে। নবুয়ত, ধর্মীয় ও পার্থিব নেতৃত্ব, রাজ্য পরিচালনা, সুবিচার, সুসিদ্ধান্ত, সাক্ষ্যদান, জেহাদ, জুম'আ, ঈদ, নামাজের জামাত, খোতবা, অধিক মীরাস, বিবাহের কর্তৃত্ব, অধিক স্ত্রী লাভের অধিকার, তালাকের অধিকার, রমজানের নিরবচ্ছিন্ন রোজা, নিরবচ্ছিন্ন নামাজ—এরকম অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে পুরুষদের। এ সমস্ত কিছু লক্ষ্য করেই রসুল স. বলেছেন, আমি যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা দিতে বলতাম তবে হুকুম দিতাম, মেয়েরা যেনো তাদের স্বামীদেরকে সেজদা করে। আহ্মদ হজরত মুআজ থেকে এবং তিনি হজরত আয়েশা থেকে এ বর্ণনাটি করেছেন। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন তিরমিজি হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং আবু দাউদ হজরত কায়েস বিন সা'দ থেকে।

পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্বের আর একটি কারণ হচ্ছে, তারা তাদের সম্পদ স্ত্রীদের জন্য খরচ করে। মোহরানা পরিশোধ করে। খোরপোশ ও অন্যান্য খরচ দেয়।

পুণ্যবতী রমণীরা আল্লাহতায়ালার প্রতি অনুগতা। পুরুষদের অনুপস্থিতিতে তারা আল্লাহ্র সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয়সমূহ সংরক্ষণ করে। 'কানেতাতুন' শব্দের

www.eelm.weebly.com

মাধ্যমে তাঁদের এই গুণ বিবৃত হয়েছে। তাঁরা স্বামীকেও মান্য করে। স্বামীর সম্পদ ও গোপন কথার হেফাজত করে এবং নিজের চরিত্র ও মর্যাদা রক্ষা করে চলে। তাদের হেফাজতের যোগ্যতা ও সুযোগ দিয়েছেন আল্লাহ্পাক। তিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই পুরুষকে দিয়েছেন মোহরানা, খোরপোশ, তত্ত্বাবধান ইত্যাদির হুকুম। এর মাধ্যমে তিনি মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন। একারণেই মেয়েদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন তারা যেনো স্বামীদের সম্পদ, গোপন যা কিছু এবং আপন কর্তৃত্বের হেফাজত করে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন— সবচেয়ে উত্তম স্ত্রী সে, যে আনন্দিত হয় যদি তুমি তার দিকে তাকাও। তুমি নির্দেশ দিলে সে নির্দেশ মান্য করে। আর অনুপস্থিতিতে আপন সম্পদ-সম্মানের হেফাজত করে। এরপর রসুল স. এই আয়াত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। বোখারী। ইবনে জারীরের বর্ণনায় আপন সম্পদ ও সম্মানের পরিবর্তে তোমার সম্পদ ও আপন সম্মান এর উল্লেখ এসেছে। 'সুনানে নাসাঈতে' নাসাঈ, মুসতাদরাক পুস্তকে হাকেম এবং 'শো'বুল ইমান' পুস্তকে বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসুল! সর্বাপেক্ষা উত্তম রমণী কে? তিনি স. বললেন, যাকে দেখে তার স্বামী প্রফুল্ল হয়। যে তার স্বামীকে মান্য করে এবং আপন সম্পদে ও স্বভাবে এমন কিছু না করে যাতে স্বামী অসন্তুষ্ট হয়। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, তারা আপন ইজ্জত ও স্বামীর সম্পদের হেফাজত করে। আল্লামা সুয়ুতি লিখেছেন, অধিকাংশ সিলসিলায় এই কথাগুলোই এসেছে। হজরত আবু উমামা থেকে ইবনে মাজাও এরকম বর্ণনা করেছেন। তৈয়বী লিখেছেন, আপন সম্পদ অর্থ স্বামীর সম্পদই। মেয়েরাই তাদের স্বামীর সম্পদ খরচ করে, তাই স্বামীর সম্পদকেই তাদের আপন সম্পদ বলা হয়েছে।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, নির্ধারিত মাসের রোজা রাখবে, আপন গোপনীয়তা বজায় রাখবে এবং স্বামীকে মেনে চলবে, সে যে দরোজা দিয়ে খুশী জান্নাতে প্রবেশ করবে। হুলিয়া পুস্তকে আবু নাঈম এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

হজরত উম্মে সালমার মারফু বিবরণ এই যে, যদি মেয়েরা তাদের স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে পৃথিবী পরিত্যাগ করে তবে বেহেশতবাসিনী হবে। তিরমিজি।

স্ত্রীর অবাধ্যতার আশংকা দেখা দিলে তাকে সদুপদেশ দিতে হবে। আশংকা করা বা ভয় করা বলতে এখানে 'খউফুন' শব্দটি এসেছে। 'কামুস' অভিধানে এই শব্দটির একটি অর্থ এসেছে— জানা। এই আয়াতের উদ্দেশ্যও তাই। অর্থাৎ তোমরা যদি এরকম জানতে পারো যে স্ত্রী অবাধ্য, তবে তাদেরকে উত্তম উপদেশ দিবে। অবাধ্যতার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত শাস্তি দেয়া যাবে না। আমি বলি, অবাধ্যতার আশংকা দেখা দিলে সদুপদেশ দানই যথেষ্ট। অবাধ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত শাস্তিদান বৈধ নয়। 'সদুপদেশ দাও' অর্থ আল্লাহর

www.eelm.weebly.com

আযাবের ভয় প্রদর্শন করো। এতে কাজ না হলে শয্যা পৃথক করো— তাও না হলে প্রহারও করতে পারো। এরকম করো এই উদ্দেশ্যে যেনো তারা সংশোধিত হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে আবী শায়বা এবং বায়হাকী হজরত ওমরের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এরকম, ইমানের পর সর্বোচ্চ নেয়ামত হচ্ছে— সচ্চরিত্র স্বামীকে মহব্বতকারিণী চরিত্রবতী ও সন্তানবতী পত্নী। আর কুফরীর পর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্তু হচ্ছে— কর্কশভাষিণী ও অসচ্চরিত্রা স্ত্রী। হজরত ওমর আরো বলেছেন, মেয়েরা তিন ধরনের। ১. পবিত্রা, বিনম্রা, সতী ও স্বামী অন্তপ্রাণা, অধিক সন্তানবতী। তারা বিপদে স্বামীর সহযোগিনী হয়। তারা অধিক পার্থিব উন্নতির জন্য লালায়িত হয় না। এরকম রমণী নিতান্তই অল্প। ২. কেবল সন্তানধারণ ছাড়া যাদের অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য গুণ নেই। ৩. তৃতীয় প্রকার মেয়েরা হচ্ছে ঘৃণিত। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তার গলায় এদেরকে ঝুলিয়ে দেন। আবার আল্লাহর ইচ্ছাতেই এদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। নতুবা তারা গলদেশে কণ্ঠহারের মতো স্থায়ী হয়ে যাবে।

শয্যাবর্জন অর্থ শয়নের স্থান পৃথক করে দেয়া। অথবা নিজের লেপে বা চাদরের নিচে স্ত্রীকে আসতে না দেয়া। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শয্যা বর্জন অর্থ সহবাস বর্জন। অথবা অন্য দিকে মুখ করে শুয়ে থাকা। এই ব্যাখ্যাটিই অধিকতর সুস্পষ্ট।

শয্যাবর্জন সত্ত্বেও যদি স্ত্রী সংযত ও সংশোধিত না হয়, তবে প্রহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাফসীরকারগণ 'প্রহার' এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এমনভাবে প্রহার করতে হবে যেনো দাগ না হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে লঘু প্রহার কোরো। অতিরিক্ত মেরো না। এর কারণ হিসেবে হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণিত হাদিসটির উল্লেখ করা যায়— যেখানে বলা হয়েছে, বিদায় হজের ভাষণে রসুল স. বলেছেন, নারীদের অধিকার বিষয়ে আল্লাহ্কে ভয় করো। তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্র আমানতের উপর অর্থাৎ আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে গ্রহণ করেছো। আল্লাহ্র হুকুমে তাদের লজ্জাস্থান তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তাদের উপর তোমাদের হক এই যে, তারা তোমাদের শয়নকক্ষে এমন কাউকে প্রবেশাধিকার দিবে না যাতে তোমরা অসন্তুষ্ট হও। তারা এমন করলে তাদেরকে এরকম প্রহার কোরো যেনো চামড়া না উঠে যায়। এরকম করার অধিকার তোমাদের রয়েছে।

আমি বলি, কোরআনের অকাট্য আয়াতকে খবরে আহাদ (একক বর্ণিত হাদিস) দ্বারা শর্তযুক্ত করা উচিত নয়। কোরআনের সরল ও স্পষ্ট নির্দেশই এক্ষেত্রে পালনীয়। অবাধ্যতার আলামত ও কর্কশ স্বভাব দেখতে পেলে ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করবে, ভালো উপদেশ দিবে। এতে করে সে যদি সংযত হয় এবং অসুন্দর স্বভাব পরিত্যাগ করে তবে তো ভালোই। সংযত না হলে প্রথম

www.eelm.weebly.com

শাস্তি হচ্ছে শয্যাবর্জন। শয্যাবর্জনে কাজ না হলে অপরাধ অনুসারে মারবে। কখনো কম। কখনো বেশী। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেনো দাগ না পড়ে অথবা কোনো অঙ্গ যেনো বিকৃত না হয়। কঠিন শাস্তি দিবে তখন, যখন দেখতে পাও তারা ব্যভিচারপ্রবণা, ফরজ নামাজ ও রোজা পরিত্যাগকারিণী, সহবাসের পর এবং ঋতুস্রাব শেষে গোসলে অনভ্যস্তা। এরকম ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রহার করবে এবং বন্দিনী করে রাখবে যেনো তারা উল্লেখিত মন্দ স্বভাবগুলো পরিত্যাগ করে।

আয়াতের শেষ পাদে উপদেশ দেয়া হয়েছে, যদি তারা তোমাদের আনুগত্যে প্রথম থেকেই অটল থাকে অথবা কৃত অপরাধ থেকে প্রত্যাবর্তনকারিনী হয় তবে তাদেরকে আর কিছু বোলো না। অতীতের প্রসঙ্গ টেনে অযথা তাদেরকে উত্যক্ত কোরো না। কারণ, পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন পাপহীনতার মতোই।

আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ। তাই সাবধান হও। দুর্বলের প্রতি অত্যাচার কোরো না। তোমরা তোমাদের অধীনস্তাদের প্রতি যে রকম ক্ষমতা রাখো, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র ক্ষমতা তদপেক্ষা অনেক বেশী। আল্লাহ্ সর্বাধিক ক্ষমতাশালী হওয়া সত্ত্বেও দ্যাখো, তোমাদেরকে কেমন ক্ষমা করে দেন। তোমরাও অধীনাদের অপরাধ ক্ষমা করে দাও।

হজরত আবদুল্লাহ বিন জামআ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসীর মতো দোররা না মারে। এরকম আচরণ নিতান্তই অসঙ্গত যে, তোমরা সকালে যাদেরকে দোররা মারবে, রাতে তাদেরকেই সম্ভোগের জন্য প্রস্তুত করবে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত মুয়াবিয়া বিন কুশায়রী বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের প্রতি আমাদের পত্নীদের কী কী অধিকার রয়েছে? তিনি স. বললেন, সময়মতো তাদের আহারের প্রয়োজন মেটানো, উপযুক্ত পরিধেয় প্রদান করা, তাদেরকে গালি না দেয়া, মুখমণ্ডলে আঘাত না করা এবং ঘরের বাইরে একা যেতে না দেয়া। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

হজরত আয়াস বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র দাসীদেরকে মেরো না। হজরত ওমর নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! মেয়েরা স্বামীদের অবাধ্য হয়েছে। এরপর রসুল স. প্রহারের অনুমতি দিলেন। ওদিকে তাঁর স. পবিত্রা পত্নীদের ঘরে অনেক মহিলা সমবেত হলেন এবং তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ পেশ করলেন। রসুল স. বললেন, মোহাম্মদ স. এর স্ত্রীদের নিকট অগণিত মহিলা সমবেত হয়ে স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করছে। তারা উত্তম নয় যারা স্ত্রীদের কষ্ট দেয় এবং তাদেরকে অভিযোগের সুযোগ করে দেয়। আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারেমী।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিই উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীগণের নিকট তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম। তিরমিজি, দারেমী। ইবনে মাজা এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

www.eelm.weebly.com

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ○

☐ তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করিলে তোমরা তাহার পরিবার হইতে একজন ও উহার পরিবার হইতে একজন সালিস নিযুক্ত করিবে; তাহারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাহিলে আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।

আয়াতের শুরুতে 'খিফতুম' শব্দটির মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে হাকিম বা বিচারককে। 'শিকাক্ব' শব্দের অর্থ শত্রুতা, মতবিরুদ্ধতা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতবিরুদ্ধতা দেখা দিলে যখন একথা স্পষ্ট বুঝা যায় না যে, তাদের মধ্যে কে সঠিক, কে ভুল—তখনকার করণীয় সম্পর্কে এখানে নির্দেশনা এসেছে। তাফসীরকার বলেছেন— এখানে সম্বোধন করা হয়েছে, অভিভাবককে (হাকিমকে নয়)। বলা হয়েছে, এমতোক্ষেত্রে পুরুষের পক্ষের একজন এবং স্ত্রীর পক্ষের একজন সালিস নিযুক্ত করো। সালিসেরা তাদের আত্মীয় হলেই ভালো। কারণ, আত্মীয়রাই তাদের অবস্থা অন্যের চেয়ে অধিক ওয়াকিফহাল। সালিস আত্মীয় না হলেও ক্ষতি নেই। সালিসের প্রাথমিক কাজ হলো বিবদমান দুই পক্ষকে মিলিয়ে দেয়া। যদি স্বামীর আগ্রহ দেখে তবে সালিস তাকে বলবে, যা কিছুই ঘটে থাকুক না কেনো সব ভুলে গিয়ে সে যেনো তার স্ত্রীকে রেখে দেয়। আর ঘর করা সম্ভব নয় মনে করলে, উত্তম আচরণের মাধ্যমে যেনো সম্পর্ক পরিত্যাগ করে। স্ত্রীর অবাধ্যতার প্রমাণ পেলে সালিস তাকে সদুপদেশ দিবে যেনো সে তার স্বামীকে মান্য করে সংসারে স্থিতা হয়। আর সংসার করা তার পক্ষে নিতান্তই সম্ভব না হলে যেনো খোলা তালাক নিয়ে নীরবে সরে যায়। সন্ধি অথবা বিচ্ছেদ, যাই হোক না কেনো তা যেন হয় উত্তম ও কলহহীন অবস্থায়।

বাগবী ইমাম শাফেয়ীর মাধ্যমে হজরত উবাদা থেকে বর্ণনা করেন, হজরত আলীর খেদমতে এক পুরুষ ও এক রমণী উপস্থিত হলো। তাদের সঙ্গে তাদের অভিভাবকেরাও ছিলো। হজরত আলী নির্দেশ দিলেন, উভয় পক্ষের একজন করে সালিস নির্ধারণ করো। নির্দেশ পালিত হলো। তিনি উভয় সালিসকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের কাজ এই যে, তোমরা প্রথমে দু'জনের মনোভাব জেনে নাও। তাদের মধ্যে সমঝোতা করে দিতে পারলে করো। আর তা সম্ভব না হলে তাদেরকে পৃথক করে দাও। রমণীটি বললো আমার লাভ ক্ষতি যাই হোক আমি চাই আল্লাহ্র কিতাবের ফয়সালা। পুরুষটি বললো, পৃথক হওয়ার প্রশ্নই আসে

www.eelm.weebly.com

না। (বাকী কাজ সালিসদের)। হজরত আলী বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি ভুল বলেছো (ওই সময় পর্যন্ত সালিস হবে না) যতোক্ষণ না তুমি তোমার স্ত্রীর অনুরূপ কথা বলবে।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, আমাকে এবং হজরত মুয়াবিয়াকে সালিস করে (এক স্থানে) পাঠিয়ে দেয়া হলো এবং আমাদেরকে বলে দেয়া হলো, মিলমিশ করে দেয়া উত্তম মনে করলে তাই করে দিবে। আর বিচ্ছিন্নতা উত্তম মনে করলে বিচ্ছিন্নই করে দিবে। হজরত ওসমানের খেলাফতের সময় এরকম ঘটেছিলো।

ইমাম মালেকের মতে, পুরুষ পক্ষের সালিসের তালাকের সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা আছে। পুরুষ এতে রাজী না হলে স্ত্রীর সালিসের খোলা করার অধিকার আছে। (অর্থের বিনিময়ে স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে খোলা বলে)। স্ত্রী রাজী না হলে তার সম্পদ থেকে খোলার অর্থ পরিশোধ করে দিবে। তার সালিসের এরকম অধিকারও আছে। হজরত আলী পৃথক করে দেয়া অথবা মিলিয়ে দেয়া এই দু'রকম অধিকারই সালিসদেরকে দিয়েছিলেন। কিন্তু পৃথক না করাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন অধিক।

জমহুরের রীতি এই যে, সালিসগণ নিজে থেকে কিছুই করতে পারবে না যতোক্ষণ না পুরুষ তালাকের অথবা নারী খোলার সিদ্ধান্ত না দেয়। সালিসদের কর্তব্য হলো সমঝোতার চেষ্টা করা, কল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং অকল্যাণ থেকে বিরত রাখা। তারা দু'জনের একজনও যদি বিরুদ্ধবাদিতায় অটল থাকে, তবে সালিসদ্বয় হাকিমকে নিজেদের সমঝোতার প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানাবে। হাকিম তখন স্বামীকে উত্তম আচরণের সঙ্গে বিধান অনুযায়ী স্ত্রীকে রাখার অথবা তালাক দেয়ার ব্যাপারে হুকুম দেবে। মহিলাকে বাধ্য করবে সে যেনো তার অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে অথবা খোলা করে নেয় এবং খোলার বিনিময় পরিশোধ করে। হজরত আলীর সিদ্ধান্তে একথা পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তিনি স্বামীকে বললেন, যতোক্ষণ না সে তার স্ত্রীর মতো কথা বলবে ততোক্ষণ তার কথা হবে ভুল। এতে করে বুঝা যায় যে, তালাকের জন্য স্বামীর রাজী থাকা শর্ত। সালিসেরা নিজেদের পক্ষ থেকে তালাক অথবা খোলার সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না। সালিসদের সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার নেই।

সালিসদ্বয় যদি বিশুদ্ধ নিয়তে ফয়সালার জন্য চেষ্টা চালায় তবে আল্লাহ্তায়ালা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন। সেই মীমাংসা মিলনের আকারেও হতে পারে। আবার বিচ্ছিন্নতার আকারেও হতে পারে। এরকম হতে পারবে তখনই যখন 'ইউরিদা' সর্বনামটি সালিসদের সঙ্গে এবং 'বায়নাহুম' সর্বনামটি স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কিত হবে। কিন্তু উভয় সর্বনাম যদি সালিসের প্রতি প্রযোজ্য হয় তবে অর্থ হবে এরকম—যখন সালিসদ্বয় স্বজনপ্রীতির বশবর্তী না হয়ে অত্যাচারিতকে

www.eelm.weebly.com

সাহায্য করার নিয়তে অগ্রসর হবে, তখন আল্লাহ উভয়ের ভাবনাকে এক করে দিবেন এবং তাতে করে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে। উল্লিখিত সর্বনাম দু'টি যদি স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয় অর্থাৎ দু'জনেই যদি উত্তম সিদ্ধান্তের আকাংখা করে অথবা যদি একথায় একমত হয় যে, আমাদের জন্য যা শোভনীয় তাই যেন হয়— তখন আল্লাহ্পাক তাদের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন এবং এমন মীমাংসার তৌফিক দিবেন যা দু'জনের জন্যই হবে কল্যাণজনক। এই আয়াতে এরকম নির্দেশনা রয়েছে যে, যে কাজ বিশুদ্ধ নিয়তে করা হয়, আল্লাহ্তায়ালা তার শুভপরিণাম দান করেন।

নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা অন্তরের নিয়ত ও আমলের পরিণাম সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। তিনি জানেন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কে অন্যায়ের উপরে আছে। অন্যায় অবলম্বন যে করবে, তিনি তাকে শাস্তি দিতে সক্ষম।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৩৬

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ

❏ তোমরা আল্লাহের ইবাদত করিবে ও কোনকিছুকে তাঁহার শরীক করিবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। যে দাম্ভিক, আত্ম-গরবী, তাহাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন না।

এরশাদ হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো। জুহরী লিখেছেন, 'উবুদিয়াত' অর্থ অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা প্রকাশ করা। এই অর্থ 'দাসত্ব' অপেক্ষা অধিকতর যথার্থ। ইবাদত অর্থ তাই কেবলই দাসত্ব নয়—ইবাদত হচ্ছে অপরিসীম অক্ষমতাবোধ ও বিনয়। মানুষ মানুষের গোলামী বা দাসত্ব করতে পারে। কিন্তু মানুষ কস্মিনকালেও মানুষের ইবাদত করতে পারে না। ইবাদত পাওয়ার অধিকার কেবল তিনিই যিনি মহামর্যাদাশীল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।

আরো এরশাদ হয়েছে— কোনো কিছুকে তাঁর সঙ্গে শরীক কোরো না। কোনো কিছু বুঝাতে 'শাইয়ান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির শেষে

www.eelm.weebly.com

তানবীন (দুই জবর) তুচ্ছতাব্যঞ্জক। আল্লাহ্‌র সীমাহীন মহিমার তুলনায় সৃষ্টি নগন্যাতিনগন্য (অতএব, সৃষ্ট কোনো কিছুকে তাঁর ইবাদতে অংশী নির্ধারণ কোরো না)। এই হুকুমের মাধ্যমে গোপন প্রকাশ্য সকল প্রকার শিরিক নিষিদ্ধ হয়েছে।

ইবাদত দুই প্রকার। ১. বেএখতেয়ারী বা বাধ্যতাবদ্ধ ইবাদত। সকল সৃষ্টি তাঁর হুকুমের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর হুকুম ও বিধানবিচ্যুত কোনো সৃষ্টি থাকা সম্ভব নয়। ২. এখতেয়ারী— ইচ্ছাধীন ইবাদত। এই আয়াতে এ দ্বিতীয় প্রকার ইবাদতের হুকুম দেয়া হয়েছে। ইবাদতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ নিষেধ মান্য করে চলা।

সুফিয়ানে কেরামের মতে, ইবাদতের অর্থ এরকম,যেনো গোসলদাতার অধীনে মরদেহ।আল্লাহ্‌র হুকুম আহকামের আমলের ক্ষেত্রে নিজেদের ইচ্ছাকে মনে করতে হবে মৃতবৎ। তাঁর প্রতিটি নির্দেশ মেনে নিবে সন্তুষ্টচিত্তে। আল্লাহ্‌তায়ালার প্রকৃত ইবাদতকারীর দৃষ্টিতে এখতেয়ারী ইবাদতও বেএখতেয়ারী ইবাদতের মতো। শরিয়তের হুকুম পালনে অনীহার চিন্তা কিছুতেই তাঁদের মাথায় আসে না।

আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুল স. কোনো সিদ্ধান্ত দেন, তখন ইমানদার নারী-পুরুষের কোনো নিজস্ব ইচ্ছা থাকে না। হজরত মুআজ বিন জাবাল বলেছেন, একদিন আমি রসুল স. এর সঙ্গে একই উটনীতে আরোহন করেছিলাম। তিনি স. বললেন, মুআজ। তুমি কি জানো, বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহর প্রতি বান্দার অধিকার কী? আমি বললাম, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র অধিকার এই— তারা কেবল আল্লাহ্‌রই ইবাদত করবে। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার অধিকার হচ্ছে— যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, তাকে তিনি আযাব দিবেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি কি এই কথা মানুষকে জানিয়ে দেবো? তিনি স. বললেন, না। একথা জানলে মানুষেরা এই কথার প্রতি নির্ভর করে বসে থাকবে (আমল করবে না)। বাগবী। সহীহাইনেও এই হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে। সুফীগণের মধ্যে আযাব না দেয়া অর্থ মহব্বতের কষ্ট না দেয়া। অর্থাৎ শিরিকমুক্ত মানুষকে তিনি দুঃখ দিবেন না।

এরপর এরশাদ হচ্ছে, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। হজরত মুআজ বলেন, আমাকে রসুল স. দশটি কথা দ্বারা নসিহত করলেন। তার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক কোরো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ো না, যদিও তারা স্ত্রী ও সম্পত্তি পরিত্যাগ করতে বলে। আহ্‌মদ।

নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে—এ প্রসঙ্গে হজরত সালমান বিন আমের থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, দরিদ্রকে দান করা কেবলই দান, আর দরিদ্র আত্মীয়কে দান করলে দানও হবে এবং সেলায়ে রেহেমীও হবে (দ্বিগুণ পুণ্য হবে)। আহমদ, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান, হাকেম,

www.eelm.weebly.com

তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে খুজাইমা। এই হাদিসকে তিরমিজি বলেছেন হাসান এবং ইবনে খুজাইমা বলেছেন সহীহ্।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনদের ভরণ পোষণ করা বিত্তশালীদের জন্য ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ বলেছেন, লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, আল্লাহর রাস্তায় কী খরচ করবে? আপনি বলে দিন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু। রসুল স. বলেছেন, উত্তম দান হচ্ছে ওই দান যা বিত্তবানেরা (তাদের প্রয়োজন পূরণ করার পর) দান করে, যে দান শুরু হয় তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভূতদের থেকে। বর্ণনা করেছেন হাকেম ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী এবং হাকেম থেকে মুসলিম।

আত্মীয়-স্বজন উপার্জনে অক্ষম হলে তাদেরকে দান করা ওয়াজিব। যেমন— পঙ্গু, অন্ধ অথবা অসহায় কোনো মহিলা। পিতা-মাতাকে দান করার নিয়ম এরকম নয়। তারা অক্ষম না হলেও তাদেরকে দিতে হবে। অনাহারক্লিষ্ট আত্মীয়-স্বজনকে দান না করা ইহ্সান বিরোধী।

এতিম ও মিসকীন অর্থাৎ পিতৃহীন ও অভাবগ্রস্তদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। তাদেরকে জাকাত দেয়া ওয়াজিব। জাকাত ছাড়াও দান করা মোস্তাহাব। হজরত সহল বিন সাঈদ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আমি এবং এতিমের প্রতিপালনকারী (এতিম আত্মীয় হোক কিংবা অনাত্মীয়) বেহেশতে এরকম অবস্থায় থাকবো।— একথা বলে তিনি স. তাঁর তর্জনী এবং মধ্যমা অঙ্গুলি একত্র করে দেখালেন। দুই আঙ্গুলের মধ্যে ছিলো অতি সামান্য ব্যবধান। বোখারী।

হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি এতিমের মাথায় আদর করে হাত বুলাবে, তার স্পর্শিত প্রতিটি চুলের জন্য দশটি করে পুণ্য লেখা হবে। যে তার তত্ত্বাবধানাধীন এতিম বালক বালিকার সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে সে বেহেশতে আমার সঙ্গে থাকবে এরকম— তিনি দু'টি আঙ্গুল (তর্জনী ও মধ্যমা) একত্রিত করে দেখালেন। বাগবী।

ভালো ব্যবহার করতে হবে নিকট প্রতিবেশীদের সঙ্গে। দূর-প্রতিবেশীর সঙ্গেও। 'কুরবা' বা নিকট বলতে বুঝানো হয়েছে ঘরের নিকটে যাদের ঘর তাদেরকে। বংশসূত্রে নিকটে কিংবা ধর্মের দিক থেকে নিকটে যারা তারাও এই হুকুমের অন্তর্ভূত।

দূর-প্রতিবেশী হচ্ছে তারা, যাদের বসবাস একটু দূরে। ঘরের সঙ্গে ঘর নয়, তবে একই রাস্তায় বা একই মহল্লায় যারা থাকে। অনাত্মীয় এবং অমুসলিমরাও এই হুকুমের আওতাধীন।

হজরত জাবের বলেছেন, প্রতিবেশী তিন প্রকার। প্রথম প্রকার যারা, তাদের রয়েছে তিন রকম অধিকার। ১. প্রতিবেশীর অধিকার ২. আত্মীয়তার অধিকার এবং ৩. ধর্মীয় অধিকার। দ্বিতীয় প্রকার প্রতিবেশীর রয়েছে দু'টি অধিকার। প্রতিবেশী হওয়ার অধিকার এবং মুসলমান হওয়ার অধিকার। তৃতীয় প্রকার

www.eelm.weebly.com

প্রতিবেশীর অধিকার একটি— তা হচ্ছে, কেবলই প্রতিবেশী হওয়ার অধিকার। তারা অনাত্মীয় ও অমুসলিম কিন্তু প্রতিবেশী। প্রথম প্রকার প্রতিবেশীর তিনটি, দ্বিতীয় প্রকার প্রতিবেশীর দুইটি এবং তৃতীয় প্রকার প্রতিবেশীর একটি অধিকার রয়েছে। হাসান বিন সুফিয়ান ও বায্যার। কিতাবুস সাওয়াবে আবু শায়েখ, হুলিয়ায় আবু নাঈম এবং কামেলে ইবনে আদ্দী এরকম বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে। কিন্তু দু'টি হাদিসই দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত।

হজরত আয়েশা বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার দুই প্রতিবেশীর মধ্যে কার গৃহে হাদিয়া পাঠাবো (দু'জনের মধ্যে কে বেশী হকদার)। রসুল স. বললেন, যার গৃহের দরোজা তোমার অধিকতর নিকটে। বোখারী।

হজরত আবু জর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যখন তরকারী রান্না করবে তখন পানি বেশী করে দিও যাতে ঝোল বেশী হয়। এভাবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখো। মুসলিম।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, জিবরাইল আমাকে প্রতিবেশীর বিষয়ে উপদেশ দিতেন। তখন মনে হতো তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করবেন। বোখারী।

সঙ্গী-সাথী ও পথচারীরাও উত্তম আচরণ লাভের অধিকার রাখে। ইবনে জারীহ্ এবং ইবনে জায়েদ বলেছেন, যারা তোমাদের উপকারের জন্য তোমাদের সঙ্গে থাকে তারাই চলার পথের সাথী। একথার মধ্যে ভাই, বন্ধু, ওস্তাদ, শাগরিদ সকলেই রয়েছেন। হজরত আলী, আবদুল্লাহ এবং ইব্রাহিম নাখয়ী 'ওয়াস্সাহিবি বিল জামবি'(সঙ্গী) শব্দের অর্থ করেছেন স্ত্রী যার সঙ্গ সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ।

পথচারী অর্থ মুসাফির। অধিকাংশ আলেম বলেছেন, মেহ্মান। হজরত আবু শুরাইহ্ খাজায়ী বলেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতে আস্থাবান সে যেনো প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে, একান্ত বিনয়ের সঙ্গে অতিথির সম্মান রক্ষা করে এবং উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে। বাগবী।

হজরত আবু শুরাইহ্ কা'বী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাসী সে যেনো অন্ততঃ একদিন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করে। অতিথির অবস্থানের অধিকারসীমা তিন দিন। এরপর হবে দান। অতিথির জন্য এরকম উচিত নয় যে, সে অতিথিপরায়ণতার সুযোগ নিবে। আমন্ত্রকের গৃহে তিন দিনের অধিক অবস্থান করার অর্থ তাকে কষ্ট দেয়া যা মেহমানের পক্ষে জায়েয নয়। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসে প্রত্যয়ী সে যেনো মেহমানের প্রতি বিনম্র হয়, প্রতিবেশীকে দুঃখ না দেয় এবং মানুষের সঙ্গে সদালাপ করে অথবা মৌন থাকে। বোখারী, মুসলিম।

দাস-দাসীদের প্রতিও উত্তম আচরণ করতে হবে। আমি বলি, চতুষ্পদ জন্তুও এই হুকুমের অধীন। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন— রসুল স. বলেছেন, প্রভুর প্রতি দাস-দাসীদের পানাহার ও পরিচ্ছদের অধিকার রয়েছে। প্রভু যেনো

www.eelm.weebly.com

তাদের প্রতি তাদের সাধ্যাতীত কাজের হুকুম না দেয়। মুসলিম। হজরত আবু জর আরো বর্ণনা করেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তারা (বাঁদী-গোলাম) তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা যা খাবে, অধীনস্থ ভাই-বোনদেরকেও তাই খাওয়াবে এবং যা পরিধান করবে তাদেরকে তাই পরিধান করতে দেবে। সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ তাদেরকে দিও না। যদি দাও তবে নিজেও তার সাহায্যকারী হয়ো। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন কোনো খাদেম আগুনের তাপে উত্তাপিত হয়ে আহার্য প্রস্তুত করে নিয়ে আসবে তখন তাকেও পাশে বসিয়ে একত্রে আহার কোরো। আহার্যের পরিমাণ কম হলেও তাকে অন্ততঃ দুই এক লোকমা দিও। মুসলিম।

হজরত আবু মাসউদ আনসারী বলেন, একদিন আমি আমার গোলামকে প্রহার করেছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে আওয়াজ শুনলাম, আবু মাসউদ! তুমি তার উপর যতোখানি ক্ষমতাবান তার চেয়ে আল্লাহ্ অনেক বেশী ক্ষমতাবান তোমার উপর। আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, রসুল পাক স. স্বয়ং উপস্থিত। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমি তাকে মুক্তি দিলাম। তিনি স. বললেন, তুমি এমন না করলে আগুন তোমার কাছে পৌঁছতোই। অথবা বললেন, আগুন স্পর্শ করেই ফেলেছিলো। মুসলিম।

হজরত উম্মে সালমা বলেন, রসুল স. অন্তিম শয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেছেন, নামাজ এবং ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের প্রতি খেয়াল রেখো। শো'বুল ইমানে এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন বায়হাকী। হজরত আলী থেকে আহমদ ও আবু দাউদও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত জাবের বলেন, রসুল স. বলেছেন, তিনটি স্বভাব যার থাকবে, আল্লাহ্ তার মৃত্যু সহজ করে দিবেন এবং তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। দুর্বলের প্রতি সদয় ব্যবহার, পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণ এবং দাস-দাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার। তিরমিজি।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বলেন, এক ব্যক্তি রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো, আমরা খাদেমদেরকে কতোবার ক্ষমা করবো? তিনি স. নিশ্চুপ রইলেন। ওই ব্যক্তি পুনরায় প্রশ্ন করলো। এবারও তিনি নিশ্চুপ। তৃতীয়বারের মতো প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, প্রতিদিন সত্তর বার। তিরমিজি।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর এবং হজরত সহল বিন হানজালা থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, পথিমধ্যে রসুল স. একটি জীর্ণ-শীর্ণ উট দেখলেন যার পেটের সঙ্গে পিঠ লেপটে আছে। তিনি স. বললেন, এই নির্বাক পশুর ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কোরো। বাহনের উপযুক্ত অবস্থায় আরোহণ কোরো। ছেড়ে দেয়ার অবস্থায় পৌঁছলে ছেড়ে দিও (আরোহণ কোরো না)।

হজরত আবু হোরায়রা বলেন, রসুল স. বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না যে, মন্দ মানুষ কারা? 'মন্দ মানুষ তারাই যারা একা একা খায়, গোলামকে দোররা মারে এবং কাউকে কিছু না দেয়। রজীন।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু সাঈদ বলেন, রসুল স. বলেছেন, খাদেমকে প্রহার করার প্রাক্কালে মানুষ যেনো আল্লাহ্কে স্মরণ করে নেয়। যেনো চিন্তা করে দেখে তিনি কী রকম পরাক্রম ও শক্তিমত্তার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বান্দাদের শত অপরাধ ক্ষমা করে দেন। কাজেই তোমরা ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের প্রহার করা থেকে হাত গুটিয়ে নাও। তিরমিজি।

দাম্ভিক ও আত্মগরবীদেরকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন না। 'মোখতাল' শব্দের অর্থ দাম্ভিক— যে তার আত্মীয়, প্রতিবেশী ও সঙ্গীসাথীদেরকে উপেক্ষা করে ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। আর 'ফাখুর' শব্দের অর্থ ওই সকল আত্ম-গৌরব প্রকাশক যারা আপন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে মগ্ন। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, এক লোক দু'টি চাদর পরিধান করে হেলে দুলে পথ অতিক্রম করছিলো। আল্লাহ্ তাকে মৃত্তিকাপ্রোথিত করলেন। সে কিয়ামত পর্যন্ত মৃত্তিকা-নিমজ্জিত হতেই থাকবে। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকার প্রদর্শনার্থে পরিধেয় বস্ত্র মাটি পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে পথ চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার দিকে সুদৃষ্টি দিবেন না। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আয়ায বিন হেমার আশজায়ী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে এই মর্মে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন যে, তোমরা যেনো পরস্পর নম্র আচরণে ব্রতী হও। পরস্পর বিনয়াবনত হও। বাহাদুরী প্রদর্শন কোরো না। বাড়াবাড়ি কোরো না। মুসলিম।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বলেন, রসুল স. বলেছেন, হে ইসলামী দল! আল্লাহ্কে ভয় করো। এতে কোনো ভুল নেই যে, জান্নাতের বাতাস অনুভব করতে পারবে হাজার বছর সময়ের দূরত্ব থেকে। কিন্তু পিতা-মাতার সঙ্গে অসৎ আচরণকারী তা পাবে না। আর পাবে না আত্মীয়তা ছিন্নকারী, বৃদ্ধ ব্যভিচারী এবং ওই দর্পপ্রকাশক যে তার পরিধেয় মাটি পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে চলে। গৌরব কেবল আল্লাহ্র জন্যই। আওসাত পুস্তকে এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন তিবরানী।

সূরা নিসা ঃ আয়াত ৩৭

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

❑ যাহারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা গোপন করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন না। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

যারা কৃপণ এবং অন্যকেও কৃপণ হতে বলে তারা আল্লাহ্তায়ালার প্রিয়পাত্র নয়। ইমাম বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে জায়েদের বক্তব্যানুসারে কতিপয় ইহুদী সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তারা হচ্ছে কারামদা ইবনে জায়েদ, হুয়াই ইবনে আখতাব, রেফায়া ইবনে জায়েদ, ইবনে তাবুত, উসামা ইবনে হাবিব, নাফে ইবনে আবী নাফে এবং বুহরা

www.eelm.weebly.com

ইবনে আমর। এই ইহুদীরা এক আনসার সাহাবীর বাড়ীতে যাওয়া আসা করতো এবং বলতো, তুমি তোমার সম্পত্তি ব্যয় কোরো না। আমাদের আশংকা— এরকম করলে তুমি দরিদ্র হয়ে যাবে। তখন তোমাকে কেউ দেখবে না। এই বর্ণনাটি ইবনে ইসহাক এবং ইবনে জারীর বিশুদ্ধ সনদের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই আয়াতে কৃপণতা বলতে অর্থ ব্যয়ে কৃপণতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হজরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের বলেন, এখানে কার্পণ্য অর্থ এলেম গোপন করা। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আতিয়া আওফীর মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, এ আয়াতে ওই সকল লোকের কথা বলা হয়েছে যারা তওরাতে লিপিবদ্ধ রসুলপাক স. এর বৈশিষ্ট্যাবলী গোপন করতো এবং অন্যকে গোপন রাখার পরামর্শ দিতো। এই জ্ঞানকে গোপন করার চেয়ে অধিক বখিলি (কৃপণতা) আর কী হতে পারে? এই বর্ণনাটি দুর্বল। কারণ, আতিয়া আওফী দুর্বল হিসাবে চিহ্নিত।

আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন (বৈভব অথবা জ্ঞান) তা গোপন করার ফলে তারা অকৃতজ্ঞ হয়েছে। এই অকৃতজ্ঞতা অস্বীকৃতিতুল্য। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন না। আর তার জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে চরম লাঞ্ছনা। অপমানজনক শাস্তি। তারা আল্লাহর নেয়ামতকে অপমান করেছে বলেই তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এই অপমানকর আযাব।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, দানশীল ব্যক্তি নৈকট্য লাভ করবে আল্লাহ্র, জান্নাতের এবং মানুষের। জাহান্নাম তার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। বখিল দূরে থাকবে আল্লাহ্র, বেহেশতের এবং মানুষের। সে হবে দোজখের নিকটবর্তী। আর কৃপণ আবেদ অপেক্ষা মূর্খ দাতা আল্লাহ্তায়ালার নিকট অধিকতর প্রিয়। তিরমিজি।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর মারফু বর্ণনায় এসেছে, ইমানদারদের মধ্যে কৃপণতা ও চরিত্রহীনতা—এই মন্দ স্বভাব দু'টো কখনো একত্রিত হবে না। তিরমিজি।

হজরত আবু বকর বলেছেন, প্রতারক, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, কৃপণ এবং দানের পর খোঁটা দানকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। তিরমিজি।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৩৮

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ○

❒ এবং যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্য তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও শেষদিনে বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন না; এবং শয়তান কাহারও সংগী হইলে সে সংগী কত মন্দ!

---

www.eelm.weebly.com

লোক দেখানো দান দূষণীয়। লোক দেখানোর প্রবৃত্তিকে বলা হয় রিয়া। রিয়াকারীর দানের উদ্দেশ্য থাকে 'দানবীর' সুখ্যাতি লাভ করা। অথচ আল্লাহ্‌র সন্তোষ সাধনই হওয়া উচিত ছিলো একমাত্র উদ্দেশ্য। কারণ তিনিই জীবন, সম্পদ ও দান করার সুযোগ করে দিয়েছেন। কৃপণকে যেমন আল্লাহ্ ভালোবাসেন না তেমনি ভালোবাসেন না রিয়াকার দানকারীকেও। কার্পণ্য, বাহুল্য ব্যয়, লোক দেখানো ব্যয়—এ সব আল্লাহর নিতান্ত অপছন্দনীয়। এ সকল অপকর্মের জন্য শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। আর লোক দেখানো ব্যয় এক ধরনের শিরিক— গোপন শিরিক (শিরকে খফি)। লোক দেখানো প্রবৃত্তি অবিশ্বাসপ্রসূত বলেই এখানে বলা হয়েছে, 'এবং আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে না।'

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন, আমি শিরিক থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী (আমার শরীক ধারণা করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন)। শিরিকমিশ্রিত আমলকে আমি বাতিল করবো। অন্য বর্ণনায় এসেছে, শিরিকমিশ্রিত আমলের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হবেন এবং তার আমল হবে তার জন্যই যার জন্য সে আমল করেছে। মুসলিম।

হজরত মুআজের মারফু বর্ণনায় এসেছে, যৎসামান্য রিয়াও শিরিক। ইমাম সুদ্দী বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে মুনাফিকদের সম্পর্কে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মক্কার মুশরিক যারা রসুল স. এর প্রতি শত্রুতার্থে অর্থ ব্যয় করতো, তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

শয়তান অত্যন্ত মন্দ সঙ্গী। যে তার বন্ধুত্বকে প্রশ্রয় দিয়েছে সে জঘন্য কাজ করেছে। শেষ বাক্যের মাধ্যমে শয়তানের সাথে হৃদ্যতা স্থাপন থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে শয়তানানুগত্য। ইঙ্গিতার্থ এই যে, বখিলি, রিয়া ও অন্যান্য অপকর্ম শয়তানের নৈকট্য ও সংসর্গের কারণেই হয়ে থাকে। সুতরাং শয়তানের সঙ্গী হয়ে দোজখযাত্রা সম্পর্কে সাবধান।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৩৯

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ۝

❒ তাহারা আল্লাহ্ ও শেষদিনে বিশ্বাস করিলে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিলে তাহাদের কী ক্ষতি হইত? আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালভাবে জানেন।

যারা আল্লাহ্‌কে এবং কিয়ামত দিবসকে বিশ্বাস করে তাদের জন্য ক্ষতিকর বলে কিছু নেই। তারা কৃতজ্ঞ ও অনুগত বলেই আল্লাহ্‌র দেয়া সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত নয়। দান কখনো আর্থিক ক্ষতি নয়। কখনোই নয়।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই বিশ্বাসীদের জীবনের ব্রত। দানের বিনিময় হিসেবে রয়েছে দশ থেকে সাত'শ গুণ পুণ্যপ্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি। আর আবশ্যিক দান তো নিতান্তই লঘু। জমানো সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত, পশুর জাকাত— এ সমস্ত তো বৎসরে একবার মাত্র ওয়াজিব হয়। জাকাতকে তো ক্ষতি বলে ভাবাই যায় না। বরং আল্লাহ্‌তায়ালা দয়া করে দানের হুকুমের মাধ্যমে আমাদেরকে পুণ্য লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি ভালো করেই জানেন, কারা এই সুযোগ গ্রহণ করে সৌভাগ্যশালী হবে আর কারা হবে না। শেষ কথাটি মূলতঃ কাফেরদের প্রতি হুঁশিয়ারী। বলা হয়েছে, তিনি তাদেরকে ভালোভাবে জানেন– তাই শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় তাদের নেই।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৪০

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ○

❒ আল্লাহ্ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ পুণ্যকার্য হইলেও আল্লাহ্ উহাকে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ্ তাঁহার নিকট হইতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।

অণু পরিমাণ বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'মিছকাল' শব্দটি। মিছকাল শব্দ এসেছে 'ছাকলুন' শব্দ থেকে। এর অর্থ ক্ষুদ্র পিপিলীকা অথবা পরিষ্কার রৌদ্রে রাখা ধানের উড়ন্ত ধূলিকণা যার কোনো ওজন হয় না, যা বিন্দু (জাররা) বৎ। এরকম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জুলুম করা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। তাই কাফেরদের জন্য যে আযাব প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে জুলুম নয়। বরং তাদেরকে শাস্তিদানই প্রকৃত ইনসাফ (ন্যায়বিচার)। তাদেরকে শাস্তি না দেয়াই বরং জুলুম। কেননা তারা আল্লাহ্‌তায়ালার এককত্ব ও ইবাদত বিমুখ হয়েছিলো। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীর অধিকার পূরণে ছিলো উদাসীন। সুতরাং, তাদেরকে আযাব না দেয়া ন্যায়ানুগতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আযাব হচ্ছে কাফেরদের অধিকার। আর জুলুম হচ্ছে অধিকার বিনষ্ট করার নাম। আল্লাহ্ কখনো জুলুম করেন না। বিন্দুপরিমাণও না। আর জুলুম করেন না বলেই তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক আযাব। জুলুমের আর এক অর্থ হচ্ছে, কোনো বস্তুকে যথাস্থান থেকে অপসারণ করে অযথার্থ স্থানে স্থাপন করা। অনর্থক নাজায়েয কাজ করা। কিন্তু আল্লাহ্‌র কোনো কাজই অযথার্থ ও অবৈধ নয়। তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা ও প্রভু। অন্যায় ছাড়াও যদি তিনি তাঁর সকল সৃষ্টিকে আযাব দেন, তবু তা জুলুম হবে না। অতএব, আল্লাহ্‌তায়ালার শানে কোনো কাজই জুলুম হবে না। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাঁর কোনো

www.eelm.weebly.com

কাজ জুলুম। বরং উদ্দেশ্য এই যে, অন্যের কাজ জুলুম হতে পারে—কিন্তু আল্লাহ্র কাজ জুলুম হওয়া সম্ভবই নয়। মূল কথা এই যে, আল্লাহ্পাক কারো ইবাদতের সওয়াব কম করবেন না, গোনাহের শাস্তিও বেশী দিবেন না। হজরত আনাস থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীদের পুণ্যের বিনিময় কম করা হবে না। পৃথিবীতে তাদের রিজিক বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং আখেরাতে দেয়া হবে উত্তম বিনিময়। অবিশ্বাসীরা তাদের সৎ কর্মের জন্য পৃথিবীতে পাবে রিজিক। কিন্তু আখেরাতে কিছুই পাবে না। আহমদ, মুসলিম।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেন, মুমিন যখন দোজখ থেকে পরিত্রাণ পাবে, তখন দোজখে প্রবিষ্ট তার অন্য ভাইদের জন্য তুমুল ঝগড়া শুরু করবে আল্লাহ্র সঙ্গে। ওরকম বাদানুবাদ তোমরাও কখনো নিজেদের হকের ব্যাপারে করো না। মুমিন বলবে, তারা আমাদের ভাই। তারা আমাদের সঙ্গে নামাজ পড়েছে, রোজা রেখেছে, হজ করেছে। আল্লাহ বলবেন, যাও, যাকে চিনতে পারো দোজখ থেকে বের করে নিয়ে এসো। মুমিন তখন মুখাবয়ব দেখে তার ভাইদের চিনে নেবে। কারণ মুখমণ্ডল অগ্নিদগ্ধ হবে না। তাদের কারো পা অর্ধেক, কারো টাখনু পর্যন্ত আগুনে ঝলসানো থাকবে। সে তার ভাইদেরকে আগুন থেকে বের করে নিয়ে আসবে এবং বলবে, হে আমার আল্লাহ্! তুমি যাদের বের করে আনতে বলেছো তাদেরকে বের করে এনেছি। আল্লাহ্ বলবেন, আবার যাও এবং যাদের অন্তরে দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পরিমাণ ইমান আছে, তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো। (মুমিন হুকুম তামিল করবে)। এমন কি এরকম হুকুমও হবে যে, যাদের অন্তরে কণা পরিমাণ ইমান আছে তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো। মুমিন হুকুম তামিল করবে।

বর্ণনাকারী বলেন, এই বক্তব্যের প্রতি যে দ্বিধান্বিত সে যেনো ওই আয়াতটি পড়ে, যেখানে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণ জুলুম করবেন না। কেউ যদি একটি পুণ্য করে তবে আল্লাহ্ সেটিকে দ্বিগুণ করে দেন। তদুপরি তিনি নিজের পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার দান করেন।' মুমিন আরজ করবে, আল্লাহ! তুমি যাদেরকে বের করে আনতে নির্দেশ দিয়েছো, তাদেরকে বের করে এনেছি। এখন দোজখে এমন আর কেউই নেই যাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ আছে। আল্লাহ বলবেন, ফেরেশতারা সুপারিশ করেছে। মুমিনরাও সুপারিশ করেছে। এখন বাকী রয়েছেন রহমানুর রহিম। রসুল স. বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ দোজখ থেকে এক মুষ্টি ভরে অথবা দুই মুষ্টি ভরে এমন লোকদের বের করে আনবেন যারা কোনোদিন কোনো পুণ্যকর্ম করেনি এবং যারা জ্বলে পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছিলো। তাদেরকে এনে তাদের উপর আল্লাহ্পাক ঢেলে দিবেন আবে হায়াত (চিরস্থায়ী জীবনদানকারী পানি)। সেই সলিলে স্নাত হওয়ার পর তাদের অবস্থা হবে এমন— যেনো বৃষ্টির পানিতে ধোয়া শস্যদানা। মোতির মতো চকমক করতে থাকবে তাদের অবয়ব। তাদের স্কন্ধে অংকিত থাকবে 'আল্লাহর মুক্তিকৃত।' (অর্থাৎ তাদের নিজেদের কোনো পুণ্যকর্ম নেই)। তাদেরকে আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, জান্নাতে প্রবেশ করো। যা চাও তাই পাবে। যে বস্তুর প্রতি

www.eelm.weebly.com

দৃষ্টিপাত করবে তাই পাবে। তারা আরজ করবে, হে আমাদের আল্লাহ্! আমাদেরকে এমন কিছু দিন যা পৃথিবীর কাউকে দেননি। আল্লাহ বলবেন, এর চেয়ে বড় নেয়ামত আমার কাছে রয়েছে। তারা বলবে, কী সেই নেয়ামত। আল্লাহ বলবেন, আমার সন্তুষ্টি। আর কখনো আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না। বোখারী ও মুসলিমের সনদ থেকে এই বর্ণনাটি করেছেন বাগবী। হজরত আবু সাঈদের বর্ণনায় একথা নেই যে, এই বক্তব্যের প্রতি যারা দ্বিধান্বিত তারা যেনো এই আয়াতটি পড়ে।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেন, (কিয়ামতের দিন) আমার উম্মতের একজনকে আল্লাহ্তায়ালা সকল মানুষের সামনে উপস্থিত করবেন। তার গোনাহের আমলনামার দপ্তর হবে নিরানব্বইটি। প্রতিটি দপ্তর হবে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত লম্বা। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি এই লিখিত কোনো কিছুকে অস্বীকার করো? এরকম মনে করো কি যে আমার লেখকদ্বয় (আমল লেখক ফেরেশতা) তোমার অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে? অথবা তোমার এমন কোনো পুণ্য যা লিপিবদ্ধ হয়নি। বান্দা হতবাক হয়ে যাবে। এরপর জবাব দিবে, না। আল্লাহপাক্ বলবেন, আমার কাছে তোমার কেবল একটি পুণ্য জমা আছে। আজ তোমার উপর জুলুম করা হবে না। এরপর ছোট্ট একটুকরা কাগজ বের করা হবে যাতে লেখা থাকবে— 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়া আশহাদুআন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু। আল্লাহ্পাক বলবেন, ওজনের সময় লক্ষ্য রেখো। বান্দা বলবে, হে আমার প্রভু এই ছোট্ট কাগজ বিশাল দপ্তরগুলোর তুলনায় যে কিছুই নয়। আল্লাহ্ বলবেন, তোমার অধিকার নষ্ট করা হবে না। এরপর গোনাহের দপ্তরগুলো মিজানের এক পাল্লায় রেখে অপর পাল্লায় রাখা হবে ছোট্ট কাগজটি। ছোট্ট কাগজটির পাল্লাই ভারী হয়ে যাবে। রসুল স. বলেন, আল্লাহ্র নামের সামনে সমস্ত কিছুই ওজনহীন। ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, হাকেম। হাকেম এই হাদিসকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

কোনো কোনো আলেম বলেন, আয়াতটির উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্তায়ালা কারো অধিকার অবশিষ্ট রাখবেন না। ক্ষুদ্রাতিতমক্ষুদ্র পাপ ও পুণ্যের প্রতিফল দান করবেন। কিন্তু কিছু গোনাহ তিনি বাদ দিয়ে দিবেন (এটা তাঁর অনুগ্রহ)।

অণুপরিমাণ পুণ্যকর্মকেও তিনি দ্বিগুণ করেন—একথার অর্থ অনেক গুণ করেন যার সীমানা উল্লেখ করা হয়নি।

হজরত আবু হোরায়রা কসম খেয়ে বলেছেন, আমি নিজে রসুল স.কে বলতে শুনেছি—এ কথা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্ একটি পুণ্যকে হাজার হাজার পুণ্যে পরিণত করে দিবেন। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শায়বা।

তদুপরি তিনি মহাপুরস্কার প্রদান করবেন—আয়াতের শেষাংশে এরকম ঘোষণা দেয়া হয়েছে। 'আজরান আজিমা' অর্থ অপরিমেয় মহাপুরস্কার। সেই মহাপুরস্কারের পরিমাণ নির্ণয় করে এরকম সাধ্য কারো নেই।

বাগবী হজরত আবু হোরায়রার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন এরকম, স্বয়ং আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। কেউ এর পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবে না।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, কিয়ামতের সময় আল্লাহ্তায়ালা পূর্বাপর সকলকে একত্র করবেন। একজন আহবায়ক তখন ডেকে বলবে, সাবধান! সাবধান! সবাই এবার অধিকার প্রাপ্তির জন্য এগিয়ে আসছে। এ ঘোষণা শুনে মানুষ খুশী হবে। পিতা, সন্তান, ভাই—প্রত্যেকে তাদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে পেয়ে যাবে। সে অধিকার যতো ক্ষুদ্রই হোক না কেনো। আত্মীয়তার অধিকার সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে, 'যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন তাদের মধ্যকার পারস্পরিক আত্মীয়তা থাকবে না।' তখন প্রতিটি ব্যক্তিকে ডাকা হবে। বলা হবে, সে যেনো তার অধিকার আদায় করে নেয়। দাবীদার বলবে, হে আমার প্রতিপালক! এখন তো তারা পৃথিবীবাসী নয়— এখন আমাদের হক তারা আদায় করবে কিভাবে? আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে হুকুম করবেন, হক বিনষ্টকারীদের আমলনামা থেকে দাবীদারদের হক পরিশোধ করে দাও। এভাবে হক আদায় করতে গিয়ে কারো কারো বিন্দু পরিমাণ পুণ্য অবশিষ্ট থেকে যাবে। ফেরেশতারা বলবেন, হে আমাদের প্রভু! এই ব্যক্তির বিন্দু পরিমাণ পুণ্য অবশিষ্ট রয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, আমার বান্দারা কিছু গোনাহ্ তো করবেই। আমি আমার রহমতে তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবো। এই আয়াতটিই এই অবস্থার প্রমাণ। যারা নিতান্ত হতভাগা তাদের সম্পর্কে ফেরেশতারা বলবে, হে আমাদের উপাস্য—হকদারদের হক পরিশোধ করতে গিয়ে এই লোকের সকল পুণ্য শেষ। অথচ এখনো অনেক হকদার রয়েছে। আল্লাহ্ বলবেন, দাবীদারদের গোনাহ্ ওর আমলনামায় সংস্থাপন করো। তাই করা হবে। তখন তার জন্য জারী হবে দোজখের পরওয়ানা (অথবা হুকুম হবে, তাকে প্রহার করতে করতে দোজখে নিয়ে যাও)। বাগবী, ইবনে মোবারক, আবু নাঈম, ইবনে আবী হাতেম।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৪১

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ○

❐ যখন প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকে উহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব তখন কী অবস্থা হইবে?

তখন কাফেরদের কি অবস্থা হবে তা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। কারণ এ কথা তো স্পষ্টতঃই জানা গেলো যে, আল্লাহ্ কারো প্রতি জুলুম করেন না। করবেন না। অত্যাচারী ব্যক্তির হক তিনি অত্যাচারীর নিকট থেকে আদায় করে দেবেন। তখন কেমন অবস্থা হবে কাফেরদের? তারা তো আল্লাহ্র হক আদায় করেইনি। বান্দার হকও বিনষ্ট করেছে।

এরশাদ হয়েছে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্তায়ালা পূর্ববর্তী নবীগণকে তাঁদের উম্মতের বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে হাজির করবেন। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ উম্মতের ভালো মন্দ, সত্য-মিথ্যার সাক্ষ্য পেশ করবেন। এরপর সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হবেন শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

www.eelm.weebly.com

সাল্লাম। তিনি ইসলামী উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য পেশ করবেন। যারা তাঁকে দেখেছে আর যারা দেখেনি সকলের সম্বন্ধেই তিনি সাক্ষ্যদান করবেন।

ইবনুল মোবারক হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এরকম—প্রতিদিন সকালে ও বিকালে রসুল স. এর সম্মুখে তাঁর উম্মতকে হাজির করা হবে। তিনি বিশেষ বিশেষ আলামত ও আমল দেখে তাদেরকে আপন উম্মত বলে চিনতে পারবেন। তাই তিনি সহজেই তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারবেন।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, তিনি (ইবনে মাসউদ) বলেছেন, রসুল স. আমাকে বললেন, কোরআনের কিছু অংশ আমাকে পাঠ করে শোনাও। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসুল! কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে আপনার প্রতি আর আমি আপনার সম্মুখে পাঠ করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। পাঠ করো। হুকুম মোতাবেক আমি এই আয়াতটি পাঠ করলাম। তিনি শুনলেন। তারপর বললেন, থামো। আমি দেখলাম, তাঁর পবিত্র চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু নির্গত হচ্ছে।

অনেকে বলেছেন, এই আয়াতের 'হা উলায়ি' শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে অন্যান্য নবী ও রসুলগণকে। তাঁরা তাঁদের উম্মতদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন। আর রসুল স. হবেন সকল নবী রসুলগণের সাক্ষী। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'হা উলায়ি' বলতে বুঝানো হয়েছে এই উম্মতের মুমিনদেরকে। এই উম্মতের মুমিনেরা নবীদের মতো সাক্ষ্য দান করবেন। তাঁরা সত্য সাক্ষ্য পেশ করবেন। আর তাঁদের (মুমিনদের) সততার সাক্ষ্য দেবেন স্বয়ং রসুল স.।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৪২

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ○

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং রসূলের অবাধ্য হইয়াছে তাহারা সেদিন কামনা করিবে যদি তাহারা মাটির সহিত মিশিয়া যাইত! এবং তাহারা আল্লাহ্ হইতে কোন কথাই গোপন করিতে পারিবে না।

কিয়ামতের দিন ভয়াবহ অবস্থা হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের (কাফেরদের) এবং রসুল স. এর বিরুদ্ধাচরণকারীদের। ভয়ে, আক্ষেপে, লজ্জায় তারা এরকম কামনা করবে, হায় এই মুহূর্তে যদি মাটি ফেটে যেতো আর আমরা মৃত্তিকাভ্যন্তরে আত্মগোপন করতে পারতাম। এ রকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত কাতাদা এবং হজরত আবু ওবাদা। কালাবী লিখেছেন, কিয়ামতের দিন বন্য এবং গৃহপালিত সকল চতুষ্পদ জন্তু ও পাখিকে আল্লাহ্পাক মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন। ওই সময় কাফেরেরাও চাইবে, হায় তারা যদি আজ পশুপাখিদের মতো মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারতো।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু তাদের কামনা হবে নিষ্ফল। আত্মগোপন করার কোনো সুযোগই তারা পাবে না। আতা বলেছেন, তাদের কামনা হবে এই যে, যদি আজ তারা মাটিতে মিশে যেতে পারতো। আর রসুল স. এর যে বৈশিষ্ট্যাবলীর উল্লেখ ছিলো তওরাতে সেগুলো যদি গোপন না করতো। জমহুরের মতে, অর্থ হবে এরকম—তারা তাদের কোনো কথা আল্লাহ্‌র কাছে গোপন করতে পারবে না। কারণ, তাদের হাত পা তখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করবে।

হজরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হজরত ইবনে আব্বাসের নিকট আরজ করলো, কোরআনের কতিপয় আয়াত সম্পর্কে আমার সংশয় রয়েছে। মনে হয় আয়াতগুলো পরস্পরবিরোধী। তিনি বললেন, বলো সেগুলো কী কী? ওই ব্যক্তি বললো, যেমন বলা হয়েছে— 'ওই দিন কেউ কাউকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না।' অন্যত্র বলা হয়েছে, 'সম্মুখীন হয়ে বিভিন্নজন বিভিন্নজনের নিকট প্রশ্ন করতে থাকবে।' আবার এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'ওয়ালা ইয়াকতুমুনাল্লাহা হাদিসা' (আল্লাহ্ থেকে কোনো কথাই গোপন রাখতে পারবে না)। আর এক স্থানে বলা হয়েছে, তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মুশরিক ছিলাম না।' এ কথায় কাফেরেরা তাদের উদ্দেশ্যকে গোপন রাখার চেষ্টা করবে বলা হয়েছে। (এগুলো পরস্পরবিরোধী নয় কি?) হজরত ইবনে আব্বাস বললেন (প্রকৃতপক্ষে আয়াতগুলো পরস্পরবিরোধী নয়। ব্যাপারটা এ রকম) যখন মুশরিক ও কাফেরেরা দেখবে মুসলমানদেরকে ক্ষমা করা হচ্ছে আর মুশরিকদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করা হচ্ছে না, তখনই তারা ক্ষমা পাবার ইচ্ছায় বলবে 'আল্লাহ্‌র কসম আমরা মুশরিক ছিলাম না।' আল্লাহ্ তখন তাদের মুখ মোহরাঙ্কিত করে দিবেন। তারা বাকরুদ্ধ হবে। তাদের হাত, পা ও অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সে সময় তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে থাকবে। এভাবে তাদের অপরাধ প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাদের গোপন করার অভিলাষ চরিতার্থ হবে না। তাই বলা হয়েছে, তারা আল্লাহ্ থেকে কোনো কথাই গোপন রাখতে পারবে না।' (সুতরাং পরস্পরবিরুদ্ধতার অবকাশ এখানে কোথায়)? ওই ব্যক্তি আর একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলো। বললো, এক আয়াতে আগে আকাশ এবং পরে পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'তোমরা কি এমন আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করছো যিনি দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।' এখানে বুঝা যাচ্ছে, পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে আকাশেরও আগে। জবাবে হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, আল্লাহ্ দুই দিনে জমিন সৃষ্টি করেছেন, তারপর দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন আসমান। আবার দুই দিনে বিন্যস্ত করেছেন জমিনকে। আয়াতগুলোর সম্মিলিত অর্থ এরকমই (তাই সংশয়ের অবকাশ কোথায়)। ওই ব্যক্তি আর একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে বললো, একস্থানে বলা হয়েছে 'কানাল্লহু গফুরার রহিমা'—এখানে 'কানা' শব্দটি সংযোগ করায় অর্থ হয়েছে এরকম, 'আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু ছিলেন।' এ কথায় বুঝা যায়, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু ছিলেন। তার মানে এখন আর ক্ষমাশীল

www.eelm.weebly.com

ও পরম দয়ালু নন। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, এখানে 'কানা' অতীতকাল বোধক নয়, অবশ্যই নয়। তাঁর ক্ষমাশীলতা ও দয়ার্দ্রতার চিরন্তন অবস্থাই (অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত) এখানে প্রকাশিত হয়েছে। শেষে তিনি বললেন, কোরআন মজীদে সংশয় থাকা অনুচিত। কারণ, সমস্ত কিছুই অবতীর্ণ হয়েছে মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। বোখারী।

প্রকাশ্যতঃ বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে হাসান বলেছেন—এ সকল আয়াতে বিভিন্ন সময় ও স্থানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন একস্থানে তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'অনুচ্চ আওয়াজ ব্যতীত তারা কিছু শুনবে না।' দ্বিতীয়স্থানে তারা মিথ্যা কথা বলবে। বলবে, 'আমরা মুশরিক ছিলাম না।' আরেক জায়গায় বলবে, 'আমরা মন্দ আমল করিনি।' আর একস্থানে বলা হয়েছে, 'তারা নিশ্চুপ থাকবে।' অন্য আর এক স্থানের অবস্থা এরকম যে, তারা পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তনের অভিলাষ ব্যক্ত করবে। সবশেষে তাদেরকে করা হবে বাকরুদ্ধ। তখন তাদের হাত পা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তাই বলা হয়েছে, তারা আল্লাহ থেকে কোনো কথা গোপন করতে পারবে না।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৪৩

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝

❑ হে বিশ্বাসীগণ! মদ্য-পানোম্মত্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইওনা, যতক্ষণ না তোমরা যাহা বল তাহা বুঝিতে পার, এবং যদি তোমরা পথবাহী না হও তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচস্থান হইতে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির চেষ্টা করিবে এবং উহা মুখ ও হাতে বুলাইবে। আল্লাহ্ পাপমোচনকারী, ক্ষমাশীল।

---

www.eelm.weebly.com

হজরত আলীর বক্তব্য আবু দাউদ, হাকেম এবং তিরমিজি উল্লেখ করেছেন এরকম—আবদুর রহমান ইবনে আউফ আমাদের জন্য আহার্য প্রস্তুত করে আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করলেন। খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে আমরা শরাবও পান করলাম। তখন অবশ্য মদ্যপান হারাম ছিলো না। আমরা নেশাচ্ছন্ন হলাম। নামাজের সময় হলো। সকলে আমাকে সামনে ঠেলে দিলেন (ইমাম বানালেন)। আমি পড়তে শুরু করলাম কুল ইয়া আইউহাল কাফিরুন— আ'বুদু মা তা'বুদুন', 'লা' আ'বুদু মা তা'বুদুন' পড়ার কথা। কিন্তু আমি 'লা' শব্দটি বাদ দিয়েই পড়লাম। তখন এই আয়াত নাজিল হলো। তিরমিজি বলেছেন হাদিসটি হাসান। বলা হলো, 'তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের নিকটে যেয়ো না। তোমরা যা পাঠ করো তার মর্ম সম্যক উপলব্ধ না হলে নামাজে দাঁড়িও না। এতে করে বুঝা যায়, নেশার প্রভাব প্রবল হলে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। স্বাভাবিকতার কাছাকাছি অল্প নেশা অবস্থায় নিষিদ্ধ নয়।

প্রশ্নঃ যারা নেশায় বেহুঁশ তাদেরকে সম্বোধন করা নিরর্থক। অথচ আল্লাহ্ তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'মদ্যপানোন্মত্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না।'—এরকম সম্বোধনের কারণ কী?

উত্তরঃ সম্বোধন করা হয়েছে স্বাভাবিক সময়ে। যখন তারা স্বাভাবিক ছিলেন, তখনই তাদের অস্বাভাবিক অবস্থার উল্লেখ করে তাদের প্রতি পানোন্মত্ত অবস্থার কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, (নামাজ তো ফরজ এবং নামাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় রয়েছে তাই) নামাজের সময় তোমরা নেশার নিকটে যেয়ো না। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীগণ নামাজের সময় শরাব পান থেকে বিরত থাকতেন (অন্য সময় পান করতেন)। পরবর্তী সময়ে শরাব পান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

জুহাক বিন মাজাহিম বলেছেন, এখানে নেশা বলতে ঘুমের নেশাকে বুঝানো হয়েছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অথবা নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নামাজ পড়তে বারণ করা হয়েছে। হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, ঘুম পেলে ঘুমিয়ে নিও। কারণ, ঘুমের ঘোরে নামাজ পাঠকালে হয়তো এরকম অবস্থা হবে যে, তুমি ক্ষমাপ্রার্থনা করতে যেয়ে নিজেকে গালি দিচ্ছো। বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা। এই আয়াতে প্রকৃতপক্ষে এই কথাটির গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে যে, নামাজ পড়তে হবে হুজুরী কলবের (একাগ্রচিত্ততার) সঙ্গে। অর্থাৎ— এমনভাবে যেনো কোরআন পাঠ করা হয়, যাতে আয়াতের অর্থ উপলব্ধিতে জাগ্রত থাকে এবং অন্যমনস্কতা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

হজরত আসলাহ বলেন, আমি রসুল স. এর খেদমত করতাম। তাঁর জন্য উটের আসন প্রস্তুত করে রাখতাম। একদিন রসুল স. আমাকে বললেন, আসলাহ। উটের আসন প্রস্তুত করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি এখন জুনুব (অপবিত্র)। আমি গোসল করতে পারিনি এজন্যে যে, এই শীতে গোসল করলে আমি হয় মারা পড়বো অথবা নির্ঘাত কঠিন অসুখে পড়বো। এরপর

www.eelm.weebly.com

হজরত জিবরাইল তায়াম্মুমের আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। রসুল স. আমাকে তায়াম্মুমের নিয়ম শিখিয়ে দিলেন। একবার মাটিতে হস্ত স্থাপন করে মুখমণ্ডল মুছলেন এবং পরের বার পুনরায় মাটিতে হাত রেখে উভয় হাত কুনুই পর্যন্ত মুছে ফেললেন। আমিও এভাবে তায়াম্মুম করলাম। তারপর উটের উপরে আসন বিছিয়ে দিলাম। তিবরানী, ইবনে মারদুবিয়া ফারইয়াবী, ইবনে মুনজির। হজরত আলী থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে ওই সকল মুসাফিরদের উদ্দেশ্যে যাঁরা সফর অবস্থায় জুনুব হয়েছিলেন। তখন তায়াম্মুম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তাঁদেরকে।

তায়াম্মুম সম্পর্কিত প্রথম নির্দেশটি উল্লেখিত হয়েছে সুরা মায়িদায়। ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে আমরা এ বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা করবো। গোসল ফরজ হয়েছে— এমন ব্যক্তি ঠান্ডা পানিতে গোসল করলে যদি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার অথবা কঠিন রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে ব্যক্তির উপর তায়াম্মুমের নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।

'জানাবাতের অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না'—আয়াতে এরকম নির্দেশও জারী করা হয়েছে। (অপবিত্র অবস্থায় গোসল না করলেও মসজিদের ভেতর দিয়ে যাওয়া যাবে)। জুনুব বলে ওই ব্যক্তিকে যার জানাবাত অর্থাৎ গোসল ফরজ হয়েছে। এরকমাবস্থায় স্ত্রী পুরুষের হুকুম একই। কামুস অভিধানে লেখা হয়েছে, জানাবাত অর্থ বীর্য। হানাফিদের অভিধানসম্মত বক্তব্য এই যে, জানাবাত অর্থ কামোত্তেজনাজাত বীর্যস্খলন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বীর্যপাত হোক বা না হোক স্ত্রীসহবাস করলেই গোসল ফরজ হবে। হাফেজ ইবনে হাজার ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য উল্লেখ করে বলেছেন, জানাবাতের প্রকৃত অর্থ সহবাস। বীর্যপাত ঘটুক অথবা না ঘটুক। জানাবাতের আসল আভিধানিক অর্থ হলো দূর হওয়া। তাই যারা জুনুব তারা অপবিত্র হওয়ার কারণে পবিত্র মানুষদের থেকে দূরবর্তী। দাউদ জাহেরী বলেছেন, জানাবাতের অর্থ বীর্য নির্গত হওয়া। তাই তাঁর মতে সহবাস করলেও গোসল ফরজ হবে না, যতোক্ষণ না বীর্যস্খলন ঘটে। তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে হজরত উবাই ইবনে কাব বর্ণিত হাদিসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। হজরত উবাই বিন কাব আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল স.! ওই ব্যক্তির উপর কী হুকুম যে বীর্যপাত ব্যতিরেকে স্ত্রীসহবাস করেছে? রসুল পাক স. বললেন, যতোটুকু অংশ স্ত্রী অংগ স্পর্শ করেছে তা ধুয়ে নিও (অর্থাৎ সহবাসের সময় পুরুষাঙ্গের যতোটুকু ব্যবহৃত হয়েছে তা ধুয়ে ফেলো) তারপর ওজু করে নামাজ পড়ে নিও। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, রসুল স. একজন আনসারকে ডাকলেন। অতিদ্রুত তিনি রসুল স. এর সামনে হাজির হলেন। তার মাথা থেকে পানি পড়ছিলো। রসুলপাক স. বললেন, সম্ভবতঃ আমি তোমাকে বিব্রত করেছি। আনসারী বললেন, জি হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, যদি তোমাকে দ্রুত কিছু করতে হয় (অর্থাৎ বীর্যপাতের আগেই যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রয়োজনের কারণে পৃথক হয়ে

www.eelm.weebly.com

যেতে হয়) অথবা (লজ্জাস্থান) শুকিয়ে যায় তবে তোমার জন্য ওজুই যথেষ্ট (গোসল ফরজ নয়)। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমে এর সঙ্গে অতিরিক্ত যে কথাটুকু রয়েছে তা হচ্ছে, রসুল স. বলেন, পানি (অর্থাৎ গোসল) শুধু পানির (বীর্যপাতের) কারণে হয়।

মাসআলাঃ চার ইমাম ও সাধারণ জমহুর আহলে ইসলাম একথায় একমত হয়েছেন যে, সহবাস করলেই গোসল ফরজ হবে, বীর্যপাত হোক অথবা না হোক। জানাবাতের অর্থ যদি সহবাস ধরা হয়, তবে (যেমন ইমাম শাফেয়ী বলেন) এই আয়াত দ্বারা কেবল সহবাসের গোসল ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। আর জানাবাতের অর্থ যদি বীর্যস্খলনসহ সহবাস ধরা হয় তবে প্রতিটি সহবাসই এই অর্থের আওতায় পড়বে। সে সহবাস হাকিকাতান (প্রকৃত) হোক অথবা হুকুমী। হুকুমীর উদ্দেশ্য এই যে, বীর্যস্খলন না হলেও সহবাসতো বীর্যস্খলনেরই কারণ। তাই কখনো কখনো এরকম হতে পারে যে, বীর্যপাত হয়েছে তবে তা স্পষ্ট অনুভূতিতে আসেনি। তাই, সহবাসকে বীর্যপাতসহ সহবাসই ধরতে হবে। যেমন, নিদ্রাচ্ছন্ন হলে ওজু ভংগ হবে বলা হয়েছে— যদিও শুধু ঘুমের কারণে ওজু ভংগ হয় না। কিন্তু ঘুম এমন অচেতন অবস্থা যে, ঘুমন্ত অবস্থায় বায়ু নির্গত হলেও তা জানার উপায় থাকে না। তাই ধরে নেয়া হয়, হয়তো ওই অবস্থায় বায়ু নির্গত হয়েছে। অতএব এক্ষেত্রে অবস্থাটা হবে হুকমী এবং হুকমী অবস্থানুযায়ী নিদ্রাচ্ছন্ন হলেই ওজু ভংগ হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

রসুল স. বলেছেন, শায়িত অবস্থায় চোখ বন্ধ হয়ে গেলে শারীরিক বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা। হজরত আলী বর্ণিত কয়েকটি হাদিস এবং এজমা দ্বারা দারা কুতনী প্রমাণ করেছেন যে, শুধু সহবাস দ্বারাই গোসল ওয়াজিব হয়। হজরত আবু হোরায়রা বলেন, রসুল স. বলেছেন, যখন পুরুষ স্ত্রীর চারটি শাখায় উপগত হয় এবং তাকে রমণমুখর করে তোলে তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। বোখারী, মুসলিম। হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, যখন পুরুষ চারটি শাখায় বসে যায় এবং লজ্জাস্থানদ্বয় একত্রিত হয় তখনই গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। আমি রসুল স. এর সঙ্গে এরকম করেছি। অতঃপর দু'জনেই গোসল করেছি। দাউদ জাহেরী যে দলিল সমূহকে গ্রহণ করেছেন, সেগুলো রহিত হয়ে গিয়েছে। ইমাম আহমদ এবং সুনান গ্রন্থের লেখকগণ হজরত সহল বিন সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত উবাই বিন কাব বর্ণনা করেন, আনসারীগণ বলতেন, 'ইন্নামাল মাউ মিনাল মায়ে' (তাই বীর্যপাতহীন সহবাসের পর ওজু করে নেয়াই যথেষ্ট)। এই অনুমতি ছিলো ইসলামের শুরুতে। পরে আমাদেরকে গোসল করার হুকুম দেয়া হয়েছে। এই বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন ইবনে খুজাইমা এবং ইবনে হাব্বান। ইসমাইল বলেছেন, এই হাদিসটি বোখারীর শর্তানুসারে বিশুদ্ধ। ইবনে হারুন এবং দারা কুতনী বলেছেন— জুহরী এই হাদিসটি হজরত সহল বিন সাদ থেকে সরাসরি শোনেননি (মাঝখানে রয়েছে আরও কয়েকজন বর্ণনাকারী)। ইবনে হাজার লিখেছেন, আবু দাউদের সনদে

www.eelm.weebly.com

রয়েছে 'ইনকেতা' (যে হাদিসের সনদে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে)। আমর বিন হরবের বর্ণনায় রয়েছে, ইবনে শিহাব (জুহরী) বলেছেন আমার নিকট এমন ব্যক্তি বর্ণনা করেছে, যে আমার নিকট খুব পছন্দনীয়। ওই পছন্দনীয় ব্যক্তিটি হজরত সহলের বক্তব্য আমাকে শুনিয়েছেন। (জুহরী ওই ব্যক্তির নামোল্লেখ করেননি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে ওই ব্যক্তি ছিলেন সিকাহ্) তাঁর মাধ্যমেই হজরত সহল সূত্রে হজরত উবাই বিন কাবের বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। এই আলোচনাটির সামঞ্জস্যহীনতা প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, আবু দাউদের সনদ সহীহ্। সিকাহ্ (ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন বর্ণনাকারী) যদি বলেন তিনি কোনো বর্ণনাকারীকে পছন্দ করেন তবে তার বর্ণনাকে বিশুদ্ধ বলে মেনে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু এ কথা দ্বারা বিষয়টি মেনে নেয়া অপরিহার্য নয় যে, ইমাম আহমদ এবং ইবনে মাজা'র সনদ মুনকাতে। জুহরী কোনো একজন সিকাহ্ থেকে হজরত সহলের বক্তব্য শুনেছেন আবার তাঁর নিকট থেকে সরাসরিও শুনেছেন।

মাসআলাঃ ওলামাদের ঐকমত্য এই যে, মনিস্খলন অথবা বীর্যপাত উভয় অবস্থায় গোসল ওয়াজিব। কিন্তু ইমামে আজম, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদের মতে স্খলন হতে হবে দ্রুতবেগে। ইমাম ইউসুফের মতে দ্রুতবেগে হতেই হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কেবল মনি নির্গত হওয়াই গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ। এই নির্গত হওয়া কামাস্বাদনের সঙ্গে হতে পারে অথবা কামাস্বাদন ব্যতিরেকেও হতে পারে। ধীরেও হতে পারে। দ্রুতবেগেও হতে পারে। কেননা, রসুল স. এর নিকট মজি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, এতে করে ওজু ভেঙে যায় এবং মনি স্খলিত হলে গোসল ওয়াজিব হয়। (উত্তেজিত হলে যে তরল পদার্থ ধীরে ধীরে বের হতে থাকে তাকে বলে মজি। আর প্রবল বেগে যে স্খলন হয় তাকে বলে মনি)। তাহাবী।

একটি সন্দেহঃ প্রথমেই হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে যে, 'বীর্যপাতহীন সহবাসের পর ওজু করে নেয়াই যথেষ্ট।' এ হাদিসে দ্রুত বেগে অথবা কামোদ্দীপনার সঙ্গে এরকম কোনো শর্ত নেই। পরের হাদিসে হজরত উম্মে সালমার বর্ণনায় এসেছে, উম্মে সুলাইম রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল ফরজ হবে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। যদি (জাগ্রত হওয়ার পর) পানি দেখে। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিসে পানি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সাধারণ অর্থে। এখানে দ্রুত বেগে অথবা কামাস্বাদনের সঙ্গে— এরকম নির্দিষ্ট কোনো কথা নেই।

জবাবঃ দু'টি হাদিসের মধ্যে 'আল মাউ' শব্দটিতে লামে আহদি হয়েছে (এমন আলিফ ও লাম যার মাধ্যমে শর্ত বলবৎ করা হয়)। আর এই শর্তটিই হলো ওই পানি যা দ্রুতবেগে এবং কামোত্তেজনার সঙ্গে বের হয়। ইমাম শাফেয়ী আলিফ লাম কে জিনসি অর্থাৎ জাতিগত বলেছেন। তাঁর বক্তব্যটি অধিক শক্তিশালী।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ ঘুম থেকে জেগে যদি তরল পানি নজরে আসে তবে স্বপ্নদোষ হোক অথবা না হোক, এই পানি মজি হোক অথবা বীর্য হোক— এমতাবস্থায় গোসল ওয়াজিব হবে। নিদ্রা হচ্ছে অচৈতন্যাবস্থা। এ অবস্থায় স্বপ্নদোষের অবস্থা বুঝা যেতেও পারে। নাও যেতে পারে। খাদ্যবস্তুর খারাবী বা অপবিত্রতা থেকে শুক্রপাতের সৃষ্টি। তাই স্বপ্নদোষ হোক কিংবা নাই হোক, তরল পানি চোখে পড়লেই গোসল ওয়াজিব হবে।

হজরত আয়েশা থেকে তিরমিজি লিখেছেন, রসুল স. কে জিজ্ঞেস করা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে তার কাপড় ভেজা অনুভব করে, কিন্তু তার স্বপ্নদোষ হয়েছে কিনা তা স্মরণ করতে পারে না, তখন সে কী করবে। তিনি স. বললেন, গোসল করবে। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, স্বপ্নে যদি দেখে তার স্বপ্নদোষ হয়েছে কিন্তু জেগে দেখে তার কাপড় ভেজা নয় তখন কী করবে? তিনি স. বললেন, গোসল করতে হবে না। এই হাদিসের সনদ এসেছে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর, উবায়দুল্লাহ্ বিন ওমর এবং কাসেম বিন মোহাম্মদ থেকে। তিরমিজি বর্ণিত এই হাদিসের শব্দগুলোকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ।

'যদি তোমরা পথবাহী না হও'— এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, যদি তোমরা মুসাফির না হও তবে, গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় নামাজের সমীপবর্তী হয়ো না। তবে, মুসাফির অবস্থায় যদি পানি না পাও অথবা পানি ব্যবহার করতে অসমর্থ হও, তবে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়তে পারবে। ইতোপূর্বে বর্ণিত শানে নজুলে এ বিষয়টির বাস্তব সমর্থন রয়েছে। মুসাফির অবস্থায় পানি সহজলভ্য না হওয়াই স্বাভাবিক। তাই মুসাফিরকে এই সুযোগটুকু দেয়া হয়েছে। তায়াম্মুম অপবিত্রতাকে স্থায়ীভাবে দূর করতে পারে না। প্রয়োজন বশতঃ কেবল অপবিত্রতা থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেয়। জমহুর আলেমদের বক্তব্য এরকমই। কিন্তু দাউদ জাহেরী বলেছেন, তায়াম্মুম অপবিত্রতাকে সম্পূর্ণ বিদূরিত করে। হানাফিদের অধিকাংশ কিতাবে এসেছে— তায়াম্মুম অপবিত্রতাকে পুরোপুরি অপসারিত করে— —দাউদ জাহেরীর একথা ঠিকই, কিন্তু এ অবস্থা বলবৎ থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত, যতোক্ষণ পানি পাওয়া সম্ভব হবে না। পানি পেলে তায়াম্মুমের পবিত্রতা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আমাদের নিকট বিশুদ্ধ ধারণা এই যে, তায়াম্মুম অপবিত্রতাকে অপসারণ করে না। তাই পানি পেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়। মাটি সাময়িকভাবে পবিত্রতাকে বলবৎ রাখে। অপবিত্রতাকে গোপন করে ফেলে। পানি পেলে আবার ওই গোপন অপবিত্রতাই পুনঃপ্রকাশিত হয়। নতুন করে কোনো অপবিত্রতার সৃষ্টি হয় না।

দাউদ জাহেরীর বক্তব্যের দলিল ওই হাদিসটি— যেখানে বলা হয়েছে রসুল স. বলেন, পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম হচ্ছে মুসলমানের ওজু— দশ বৎসর পর্যন্ত পানি পাওয়া না গেলেও। এ হাদিস আসহাবে সুনানে আবু জর থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তিরমিজি একে বিশুদ্ধ বলেছেন। অন্য একটি হাদিসে এসেছে— রসুল

www.eelm.weebly.com

স. বলেন, আমার উম্মতের জন্য সমস্ত পৃথিবীকে মসজিদ করা হয়েছে এবং সকল স্থানের মাটিকেই পবিত্র করে দেয়া হয়েছে। মুসলিম, ইবনে খুজাইমা।

আমরা বলি, বর্ণিত হাদিস দু'টির মাধ্যমে বুঝা যায়, তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায় বটে কিন্তু স্থায়ী পবিত্রতা অর্জন করা যায় না। পানি পাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত ইমরান বিন হোসাইন বর্ণিত হাদিসে এসেছে— পানি না পাওয়া অবস্থায় রসুলপাক স. অপবিত্র ব্যক্তিকে তায়াম্মুম করার হুকুম দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, পানি পেলেই গোসল করে নিতে হবে। তায়াম্মুমের মাধ্যমে সম্পূর্ণ পবিত্রতা অর্জিত হলে তিনি স. এরকম নির্দেশ দিতেন না।

জ্ঞাতব্যঃ উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং হজরত সাঈদ বিন জোবায়েরের তাফসীর অনুযায়ী করা হয়েছে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত 'আস্‌সালাত' শব্দটির অর্থ নামাজ নয়, নামাজের স্থান অর্থাৎ মসজিদ। তাই প্রকৃত নির্দেশটি হচ্ছে এই যে— জানাবাতের অবস্থায় তোমরা মসজিদের নিকটে (অভ্যন্তরে) যেয়ো না। মসজিদের অভ্যন্তরে অপবিত্র হলে বাইরে বেরিয়ে এসো। কিন্তু সেখানে অবস্থান কোরো না।

হজরত জায়েদ বিন আবি হাবীব থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, কতিপয় আনসারীদের ঘরের দরোজা ছিলো মসজিদমুখী। যখন তাদের কারো গোসল ফরজ হতো এবং ঘরে পানি না থাকতো তখন তাঁরা পেরেশান হয়ে যেতেন। যেহেতু মসজিদের মধ্য দিয়ে গমন করা ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর ছিলো না। এই পরিস্থিতিতে হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, জুহাক, হাসান বসরী, ইকরামা, নাখয়ী এবং জুহ্‌রীর অভিমত হচ্ছে— গোসল ফরজ হয়েছে এমন ব্যক্তি মসজিদের ভেতর দিয়ে গমনাগমন করতে পারবে যদি এছাড়া অন্য পথ না থাকে। এই তাফসীরের প্রেক্ষিতে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অপবিত্র ব্যক্তির জন্য সকল সময় মসজিদের ভিতর দিয়ে গমনাগমন বৈধ। হাসান বসরীও এরকম বলেছেন। কারণ, বিশেষ পরিস্থিতিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হলেও আয়াতের নির্দেশটি সাধারণ। তাই অন্য পথ থাকুক বা না থাকুক সকল সময় মসজিদের মধ্য দিয়ে অপবিত্র অবস্থায় গমনাগমন বৈধ।

আমাদের মত হচ্ছে, মসজিদের ভেতর দিয়ে অপবিত্র ব্যক্তির চলাচল বৈধ নয়। এখানে আরও একটি সমস্যার উদ্ভব হতে পারে— যেমন 'আস্‌সালাত' শব্দটির অর্থ যদি সালাতের স্থান হয়, তবে ঘরের যে স্থানে নামাজ পড়া হয় সে স্থানেও তো চলাচল নিষিদ্ধ হওয়া দরকার। কিন্তু এখানে মাসআলাটি মসজিদ সম্পর্কিত, গৃহ সম্পর্কিত নয়— একথাটা মনে রাখতে হবে। তবে ইতোপূর্বে নেশাগ্রস্তাবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না— বাক্যটির সালাত শব্দটির অর্থ সালাতই(সালাতের স্থান নয়)। এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য।

মাসআলাঃ মসজিদের মধ্যে অপবিত্রাবস্থায় অবস্থান করা নাজায়েয। এই অভিমত হানাফিদের। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ীও এরকম বলেছেন।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু ইমাম আহমদ বলেছেন জায়েয। প্রথম তিন ইমামের অভিমতের দলিল এই হাদিসটি— রসুল স. বলেছেন, তাদের গৃহের প্রবেশপথ মসজিদের বিপরীত দিকে করে দাও। আমি ঋতুবতীদেরকে এবং জানাবাত অবস্থার লোকদেরকে (মসজিদে অবস্থান করা এবং প্রবেশ করা) জায়েয করিনি। ইবনে মাজা, আবু দাউদ এবং বোখারী কর্তৃক এই হাদিসটি উদ্ধৃত হয়েছে তারিখ গ্রন্থে। তিবরানী উল্লেখ করেছেন, জাসারা বিনতে দুজাজার মাধ্যমে হজরত আয়েশা থেকে। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, এই হাদিসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন জাসারার মাধ্যমে উম্মে সালমা থেকে। আবু জারয়া প্রথম বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। খাত্তাবী বলেছেন, বর্ণনাটি দুর্বল। তাঁর মন্তব্য হচ্ছে— এই সনদের এক বর্ণনাকারী আখলাত বিন খলিফা আমেরী অখ্যাত। ইবনে রেফায়া বলেছেন, বর্ণনাটি বর্জনীয়। আমরা বলি, ইবনে রেফায়ার বক্তব্য গ্রহণীয় নয়। কারণ, হাদিসের ইমামদের মধ্যে কেউই তাঁকে বর্জনীয় বলেননি। তাঁর সম্পর্কে ইমাম আহমদ বলেছেন, আমি তাঁর মধ্যে খারাপ কিছু দেখিনি। ইবনে খুজাইমা বলেছেন বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। ইবনে কাত্তান বলেছেন হাসান। সুতরাং, আখলাতকে কেউ জানুক বা না জানুক তিনি অখ্যাত পদবাচ্য হয়ে যেতে পারেন না।

এই হাদিসটির অবস্থান ইমাম আহমদের মতের বিপরীতে। জমহুরের অনুকূলে। ইমাম শাফেয়ীরও বিরুদ্ধে (যিনি জানাবাতের অবস্থায় মসজিদের ভিতর দিয়ে যাতায়াতকে বৈধ বলেছেন)। কিন্তু এখানে আয়াতের বর্ণনাভঙ্গিই প্রমাণ করেছে যে জানাবাতের অবস্থায় মসজিদের অভ্যন্তরে চলাচল নিষিদ্ধ।

মাসআলাঃ অপবিত্রাবস্থায় কাবা শরীফের তাওয়াফ বৈধ নয়। কেননা, তাওয়াফের স্থান মসজিদের সীমানাভূত। গোসল ফরজ হয়েছে এমন ব্যক্তির জন্য কোরআন পাঠ করাও জমহুর ওলামাদের অভিমতানুসারে নাজায়েয। ইমাম মালেকের মতে শয়তানের নিকট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েকটি আয়াত পাঠ করা জায়েয। দাউদের নিকট জানাবাত অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত নাজায়েয নয়। আমরা বলি, রসুল স. বলেছেন, ঋতুবতী নারী এবং জুনুবী পুরুষ এবং নারী যেনো কোরআন পাঠ না করে। ইতোপূর্বে সুরা বাকারার তাফসীরে যথাস্থানে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সামনের দিকে 'একে কেউ স্পর্শ করতে পারে না পবিত্রাবস্থা ব্যতীত' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিষয়টি পুনঃ আলোচিত হবে।

একটি সন্দেহঃ ওজুবিহীন ব্যক্তি কোরআন স্পর্শ করতে পারবে না কিন্তু তেলাওয়াত করতে পারবে—কারণ কী?

সন্দেহের অপনোদনঃ ওজুবিহীনতার প্রভাব পড়ে শরীরে, মুখের অভ্যন্তরে নয়। আবার জানাবাতের (অপবিত্রতার) প্রভাব শরীরে যেমন পড়ে, তেমনি পড়ে মুখগহবরেও। এ ছাড়া ওজুহীনতা ও জানাবাতের গোসল ফরজ হওয়ার অবস্থায় আরো পার্থক্য রয়েছে যেমন— বেওজু অবস্থা একটি সাধারণ অবস্থা, দীর্ঘক্ষণ এ অবস্থায় থাকা অশোভনীয় নয়। কিন্তু জানাবাত অবস্থা একটি বিশেষ অবস্থা যা

www.eelm.weebly.com

দীর্ঘ হওয়া নিতান্ত অশোভনীয় ব্যাপার। বেওজু অবস্থায় কোরআন পাঠ নিষিদ্ধ করা হলে গুরুতর সমস্যা দেখা দিতো। জানাবাত অবস্থায় কোরআন পাঠ নিষিদ্ধ হওয়ায় সেরকম সমস্যা দেখা দেয় না (কারণ, সকলেরই জানাবাত অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ততা থাকে)। বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, জানাবাত ব্যতীত অন্য কোনো অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত করতে রসুল স. নিষেধ করেননি। আহমদ, আসহাবে সুনান, ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাব্বান, ইবনে জারুদ, বায়হাকী, তিরমিজি, ইবনে সুকুন, আব্দুল হক, বাগবী। তিরমিজি ও বায়হাকী এই হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সহিহাইনে রয়েছে, রসুল স. ওজুর আগে সুরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করেছেন। 'যে পর্যন্ত না গোসল করবে'— কথাটির অর্থ হবে এরকম, মুসাফির ও মাজুর (অসমর্থ) ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের জন্য গোসল না করে নামাজ পড়া বৈধ নয়। মুসাফির ও মাজুরেরাই কেবল জানাবাত অবস্থায় তায়াম্মুম করে নামাজ সম্পাদন করতে পারবে।

আরেকটি সন্দেহঃ জানাবাতের গোসল একই সঙ্গে কীভাবে নামাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এবং নামাজ পাঠ না করার শেষ সীমা নির্ধারিত হতে পারে? কারণ, গোসল করার সঙ্গে সঙ্গেই তো জানাবাত (অপবিত্রতা) দূর হয়ে যায়।

সন্দেহের অপনোদনঃ 'হাত্তা' শব্দটির প্রতিক্রিয়া স্থান ও কালের প্রথম থেকে শেষাংশ পর্যন্ত থাকে। যেমন, গতরাতে আমি সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েছি। একথার অর্থ হচ্ছে— রাতের শেষ অংশের পর সকালের যে সীমা শুরু হয়েছে ওই পর্যন্ত ঘুমিয়েছি। এক্ষেত্রেও তেমনি অর্থ হবে এরকম যে, জানাবাতের অবস্থায় নামাজের যে নিষিদ্ধতা ছিলো জানাবাতের শেষ অংশে এসে তা গোসল পর্যন্ত পৌঁছেছে। এরপর গোসল করে নিলে নামাজ পাঠ বৈধ হবে।

অন্য একটি সন্দেহঃ 'হাত্তা তাগতাসিল' বললে কী লাভ? জানাবাত অবস্থায় নামাজ পড়াতো নিষিদ্ধই। জানাবাত বা অপবিত্রতা দূর হয়ে গেলেতো নামাজ পড়তে পারবেই।

সন্দেহের অপনোদনঃ এখানে উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, গোসল দ্বারা অপবিত্রতা দূর হয়ে যায়। গোসলের বিস্তারিত বিবরণ সামনে সুরা মায়িদার তাফসীরে আসবে ইনশাল্লাহুতায়ালা।

তায়াম্মুমের অনুমতি কেবল মুসাফির এবং পীড়িত লোকদের জন্য। এটা ঐকমত্য। (মুসাফির পানি পায় না এবং পীড়িত ব্যক্তি পানি ব্যবহার করতে পারে না। জমহুর ওলামাদের নিকট এ অবস্থার ব্যাপারে কোনো আলাদা অভিমত নেই। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কোনো বস্তি বা গ্রামবাসীর পানি যদি শেষ হয়ে যায় তবে তারা তায়াম্মুম করে নামাজ পড়তে পারবে। পানি পেলে নামাজ দোহ্‌রাতে হবে (ওজু করে পুনরায় নামাজ পড়তে হবে)। কেননা, তায়াম্মুমের সাধারণ অনুমতি শুধু মুসাফির ও পীড়িত লোকদের জন্য।

www.eelm.weebly.com

আমাদের মত এই— মুসাফির এবং পীড়িতদের জন্য পরে পানি পাওয়া গেলেও যেমন একই নামাজ দু'বার পড়া ওয়াজিব নয় তেমনি সুস্থ ও মুকিম (গৃহবাসী) ব্যক্তিরাও পানি না পাওয়ার কারণে একবার নামাজ পড়ে নিলে একই নামাজ পুনরায় পড়বে না (পরে পানি পাওয়া গেলেও না)। রাবাজা নামক স্থানে হজরত আবু জর বসবাস করতেন। সেখানে বছরে কিছুদিন পানি পাওয়া যেতো না। তিনি রসুল পাক স. কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি স. বলেছিলেন, তোমার জন্য মাটিই যথেষ্ট। দশ বৎসর পর্যন্ত যদি পানি না পাও— তবুও। অন্য বর্ণনায় এসেছে— পাক মাটি দ্বারাই মুসলমানদের ওজু হবে, যদিও দশ বৎসর অতিবাহিত হয় (এবং পানি পাওয়া না যায়)। আসহাবে সুনান। আবু দাউদ এ বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

যদি, আবেরে সাবিলিন শব্দটির উদ্দেশ্য মুসাফির হয় তবে, দু'বার 'আলা সাফারিন' বলার কারণ এই যে, অসুস্থ এবং মুসাফিরের হুকুম একই। পানি না পাওয়া এবং পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়া— উভয় ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। 'আর তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি শৌচস্থান থেকে আগমন করে'— ওই সময় গ্রাম দেশের লোকজন সাধারণতঃ শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য নিচু এলাকায় গমনাগমন করতো। তাই আয়াতে 'গাইত' বলা হয়েছে। যার মর্ম হচ্ছে— মলমূত্র ত্যাগে মানুষ ওজুহীন হয়।

মাসআলাঃ শৌচস্থান থেকে এলে—এ কথায় বুঝা যায়, পায়খানা অথবা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে ওজু নষ্ট হয়ে যায়। অস্বাভাবিক কিছু বের হলে ওজু নষ্ট হয় না। যেমন—কীট, রক্ত ইত্যাদি। ইমাম মালেক বলেছেন, যদি কেবল অসাধারণ বস্তু উভয় রাস্তা দিয়ে বের হয় তবে ওজু নষ্ট হবে না।

মাসআলাঃ জমহুরের নিকট অসাধারণ বস্তু বের হলেও ওজু নষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম মালেকের একটি বক্তব্যেও এ রকম রয়েছে। হজরত আয়েশা বর্ণিত একটি হাদিসেও ইস্তেহাজা সম্পর্কে এ রকম প্রমাণ এসেছে। যেমন রসুল স. হজরত ফাতেমা বিনতে জাহাশ কে বললেন, ইস্তেহাজার রক্ত দেখলে প্রতি ওয়াক্তে রক্ত ধুয়ে নিবে এবং নামাজের জন্য নতুন করে ওজু করবে। বোখারী, মুসলিম। ঋতুস্রাবের সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পর যে রক্তক্ষরণ হতে থাকে, তাকে ইস্তেহাজা বলে। ইমাম শাফেয়ী এ আয়াত থেকে মাসআলা উদ্ধার করেছেন যে— বমি, রক্ত ইত্যাদি বের হলে ওজু নষ্ট হবে না। ইমাম আহমদ বলেছেন, উভয় রাস্তা ব্যতীত রক্ত, বমি ইত্যাদি অল্প পরিমাণে বের হলে ওজু যাবে না। এ দু' ইমামের বক্তব্য থেকে সঠিক মাসআলা নির্ধারণ করা যায় না। তাই ইমামে আজম বলেছেন, অপবিত্র বস্তু যে স্থান দিয়ে যে পরিমাণই বের হোক না কেনো— ওজু নষ্ট হয়ে যাবে। রক্ত যদি প্রবহমান না হয়, তবে তা অপবিত্র হিসেবে গণ্য নয়। আর অল্প বমি এবং কফ থুথুর অন্তর্ভূত। তাই এসব বের হলে ওজু নষ্ট হবে না।

www.eelm.weebly.com

এই মত হচ্ছে আমাদের মাজহাবের। কিন্তু প্রস্রাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে যা কিছু বের হবে তা অপবিত্রই হবে। কম বেশী যে পরিমাণই বের হোক না কেনো, ওজু নষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ শরীরের যে কোনো স্থান থেকে হোক অপবিত্র কোনো কিছু বের হলেই ওজু চলে যাবে।

যদি বলা হয়, অপবিত্র বস্তু নির্গত হলেই ওজু চলে যাবে— কথাটা জ্ঞানের অনুকূল হতে পারে না। এ কথাটা ঠিক নয়। কারণ জ্ঞানতো একথাই বলে যে, অপবিত্রতা পবিত্রতাকে দূর করে দেয়।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেন— একবার রসুল স. এর বমি হলো, তখন তিনি ওজু করলেন। দামেস্কের মসজিদে হজরত সাওবানের সম্মুখে আমি এ হাদিসটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আবু দারদা সত্য বলেছেন। আমি তখন রসুল স. এর ওজুতে সাহায্য করেছিলাম। আহ্মদ এ হাদিসের সনদ বিবৃত করেছেন এভাবে— হোসাইন, মোয়াল্লেম, ইয়াহ্ইয়া বিন কাসির, আওজায়ী, ইয়াইশ বিন ওলিদ মাখজুমি মা'দান, আবু দারদা। এ হাদিস সম্পর্কে মতবিরোধকারীদের মন্তব্য এই যে, সিলসিলাটি মুজ্তারিব (মুজতারিব বলে ওই হাদিসকে যে হাদিসের বর্ণনাকারীগণ আগের জন পরে এবং পরের জন আগে উল্লেখিত হয়েছেন)। দ্বিতীয় হাদিসের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কেও মতবিরোধ রয়েছে, যেখানে সনদ উল্লেখ রয়েছে এরকম— মোয়াম্মার, ইয়াহ্ইয়া বিন কাসির, ইয়াইশ, খালেদ বিন মা'দান, আবু দারদা। এ বর্ণনাবিভ্রান্তি সম্পর্কে বলা যায় যে, সকল বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি প্রখর ছিলো না। আসরাম বলেছেন, আমি ইমাম আহমদকে বললাম, লোকে বলে এ হাদিসটি মুজতারিব। তিনি বললেন, হোসাইন বিন মোয়াম্মেলতো এলোমেলো বর্ণনা করেননি। তিনি নিজে বলেছেন হাদিসটি হাসান এবং সহীহ্।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন— রসুল স. বলেছেন, নামাজরত অবস্থায় যদি কারো বমি হয়, তবে সে যেনো নামাজ ছেড়ে দিয়ে ওজু করে নেয়। তারপর পুনরায় নামাজ পড়ে নেয় (আগে যতোটুকু পড়া হয়েছিলো তার পরেরটুকু পড়ে নেয়)। তবে শর্ত হচ্ছে, ইত্যবসরে সে যেনো কোনো কথা না বলে। দারা কুতনী এই হাদিসকে ইসমাইল বিন আয়াশ থেকে মুত্তাসিল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (যে হাদিসের ধারাবাহিকতা এবং বর্ণনাকারীদের উল্লেখ পূর্ণ ও যথাযথ, সে হাদিসকে বলে মুত্তাসিল)। এই সনদের এক বর্ণনাকারীর নাম আব্দুল্লাহ্ বিন আবী মালিকা। তিনি হজরত আয়েশা থেকে এ হাদিসটি শুনেছেন। দারা কুতনী লিখেছেন ইবনে জুরাইজ থেকে। হাদিসের হাফেজগণ এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন মুরসাল হিসেবে (যে হাদিসের শেষের দিকের রাবির উল্লেখ নেই এবং তাবেয়ী পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে যার বর্ণনাক্রম, তাকে বলে মুরসাল)। ইসমাইল বিন আয়াশের বর্ণনাটিই কেবল মুত্তাসিল। আবু হাতেম রাজী ইসমাইলকে বলেছেন অনর্থক। আমরা বলি, ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন ইসমাইলকে সিকাহ্ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর

www.eelm.weebly.com

সিকাহ্ বর্ণনায় অতিরিক্ত কিছু থাকলেও তা গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। হাদিস বিশেষজ্ঞের নিয়মানুসারে সতর্কতাবশতঃ এ হাদিসটিকে অবশ্য মুরসাল হিসেবে অগ্রগণ্য করে দেয়া হয়েছে। মুরসাল আমাদের নিকট দলিল হিসেবে গ্রহণীয়। এ বিষয়ে রয়েছে আরও অনেক হাদিস। পরিসর বৃদ্ধির আশংকায় আমরা আর সেগুলোকে উল্লেখ করতে চাই না।

ইমাম আহমদ এ ব্যাপারে তার কম ও বেশীর পার্থক্য সম্পর্কে হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত মারফু হাদিসটি পেশ করেছেন— যাতে বলা হয়েছে দু' এক ফোঁটা রক্ত বের হলে ওজু জরুরী নয় তবে প্রবহমান রক্তের একটি ফোঁটাও ওজু বিনষ্ট করে দেবে।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসুল স. ফোঁড়ার রক্তের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। এ দু'টি হাদিসই বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী। প্রথমটির সনদভুক্ত এক বর্ণনাকারীর নাম মোহাম্মদ বিন ফজল বিন আতিয়া। তাকে ইমাম আহ্মদ এবং ইয়াহ্ইয়া বিন হাব্বান মিথ্যুক বলেছেন। দ্বিতীয়টির বর্ণনাকারী আতিয়া 'আন' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর ঊর্দ্ধতন বর্ণনাকারীর নামোল্লেখ না করেই বিবরণটি পেশ করেছেন। তাই এই বর্ণনাটি হয়েছে মুদাল্লাস প্রকৃতির।

ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী তাঁদের অভিমতের দলিল হিসেবে পেশ করেছেন হজরত আনাস বর্ণিত হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. শিংগা লাগিয়েছেন এবং নতুন ওজু না করেই নামাজ পড়েছেন। শুধু শিংগা লাগানোর স্থানকে ধুয়ে নিয়েছেন এবং অতিরিক্ত কিছু করেননি। দারা কুতনী, বায়হাকী।

এই সনদের এক বর্ণনাকারী সালেহ্ বিন মুকাতিল দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ইমাম নববী তাকে দুর্বল বর্ণনাকারীদের তালিকাভুক্ত করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার ইবনে আরাবীর বর্ণনা থেকে লিখেছেন—দারা কুতনী বলেছেন, এই হাদিসটি বিশুদ্ধ। কিন্তু এটা বাস্তবতাবিরোধী— কেননা, বর্ণনাকারী হিসেবে সালেহ্ ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন না।

হজরত সাওবান বর্ণনা করেন, রসুল স. বমি করার পর ওজুর পানি চেয়ে নিয়ে ওজু করলেন। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল ! বমিতে কি ওজু ফরজ হয়ে যায়? তিনি স. বললেন, যদি ফরজ হতো তবে তুমি এর প্রমাণ দেখতে পেতে কোরআনে। দারা কুতনী। এই হাদিসের সনদভুক্ত ওতবা বিন আসকান মাতরুকুল হাদিস। বায়হাকী লিখেছেন, হাদিসটি বানানো।

আয়াতে উল্লেখিত 'আও লামাসতুমুন নিসাআ' এর শাব্দিক অর্থ যদি রমণীকে স্পর্শ করে থাকে। প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, যদি নারী সম্ভোগ করে। হজরত আলী, হজরত আয়েশা, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু মুসা আশআরী, হাসান, মুজাহিদ এবং কাতাদার বক্তব্য এরকমই। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম সুফিয়ান সওরীও এরূপ বলেছেন। তবে এখানে ধরে নিতে হবে কেবল সহবাস বা সম্ভোগ নয়— বীর্যপাতসহ সহবাস। নতুবা প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রমাণিত হবে না।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ওমর বিন খাত্তাব এবং শায়বীর বক্তব্য এই যে, এখানে স্পর্শ শব্দটি হতে প্রকৃত স্পর্শই বুঝতে হবে। অর্থাৎ বাইরের চামড়ার সাথে চামড়া লেগে যাওয়া (স্পর্শ হওয়া)। তাই তাঁরা বলেছেন মেয়েদেরকে স্পর্শ করলে ওজু নষ্ট হয়ে যায়। যদি এ স্পর্শ হয় নগ্ন (বস্ত্রের আবরণহীন)।

এ আয়াতের তাফসীরে হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এখানে স্পর্শ অর্থ সহবাস ব্যতীত অন্য যে কোনো অঙ্গের স্পর্শ। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বায়হাকী বলেছেন, চুম্বনও এক ধরণের স্পর্শ এবং এর দ্বারা ওজু জরুরী হয়। হজরত ইবনে ওমর থেকে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চুমু খেয়েছে অথবা হাত দ্বারা স্পর্শ করেছে তাকে ওজু করতে হবে। ইমাম আহ্মদ, জুহ্রী ও আওজায়ীও এরকম বলেছেন। এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীরও বক্তব্য এসেছে এরকম। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইসহাকের অন্য একটি বর্ণনায় ইমাম আহ্মদের বক্তব্য হিসেবে এসেছে, কামভাবের সঙ্গে কামাতুরা রমণীকে স্পর্শ করলে ওজু নষ্ট হয়ে যায়। কামানুভূতির সঙ্গে না করলে নষ্ট হয় না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হাতের ভিতরের অংশ দ্বারা স্পর্শ করলে ওজু ভঙ্গ হবে— হাতের বাইরের অংশের স্পর্শ লাগলে ভঙ্গ হবে না। তিনি এ বিষয়টিকে তুলনা করেছেন পুরুষাঙ্গ স্পর্শ সম্পর্কিত মাসআলাটির সঙ্গে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, কারও হাত তার লজ্জাস্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তাকে ওজু করতে হবে। আলেমগণ লিখেছেন, এ বিধানটি প্রযোজ্য হবে তখন যখন হাতের ভিতরের অংশ দিয়ে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা হবে।

হজরত ওমর বলেছেন, চুম্বনও একপ্রকার স্পর্শ— এরপর ওজু করবে। হজরত ওসমান বলেছেন, স্পর্শ কেবল হাত দ্বারাই হয়।

আমরা বলি, হাতের নিম্নাংশ দিয়ে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার হাদিসটি বিশুদ্ধ নয়। তাই আমরা একে গ্রহণ করিনি। তাই ইমামে আজম এ আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— যদি তোমরা অপবিত্র হও (তোমাদের বীর্যস্খলিত হয়) অসুস্থ হও, ভ্রমণরত থাকো, প্রস্রাব পায়খানার কারণে ওজুহীন হয়ে যাও অথবা বীর্যপাত ব্যতীত সহবাস করে থাকো, তবে তায়াম্মুম করতে পারো।

ইমাম শাফেয়ী ব্যাখ্যা করেছেন এরকম— যদি তোমরা অপবিত্র হও (সহবাস করে থাকো), রোগগ্রস্ত হও, সফরে থাকো, প্রস্রাব পায়খানার কারণে ওজুচ্যুত হও অথবা নারীস্পর্শের কারণে ওজুবিহীন হয়ে যাও, তবে তায়াম্মুম করে নিতে পারো। স্মর্তব্য যে, হাকিকী (প্রকৃত) এবং মাজাজী (রূপক) অর্থ একত্রিত হয় না। অর্থাৎ একই বর্ণনাধীন বিষয়াবলীর কিছু অংশ হাকিকী এবং কিছু অংশ মাজাজী— এ রকম হতে পারে না। তাই আয়াতের এ প্রলম্বিত বাক্যটির প্রথমে যেহেতু অসুস্থতা ও অপবিত্রতার উল্লেখ এসেছে, তাই শেষের স্পর্শ কথাটির দ্বারা সহবাস অর্থটিই ধরতে হবে (মাজাজী অর্থ কেবল স্পর্শ ধরলে চলবে না)।

www.eelm.weebly.com

হজরত ওমর 'লামাস' (স্পর্শ) শব্দটিকে কেবলই স্পর্শ মনে করেন। তাই তাঁর মতে অপবিত্রাবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয নয়। হজরত আম্মারের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত অবস্থায় তিনি তাঁর এই মতটি বিবৃত করেছিলেন।

ইবনে জাওজী বর্ণনা করেন, হজরত মুআজ বিন জাবাল রসুলপাক স. এর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল ! এক লোক এক মহিলার সাথে সহবাস ছাড়া অন্য সকল কাজই করেছে, তার সম্পর্কে হুকুম কী? রসুলপাক স. বললেন, ভালোভাবে ওজু করে নিয়ে নামাজ পড়তে পারবে। ইবনে জাওজী বলেছেন, এ হাদিসের মাধ্যমে বুঝা যায়, মেয়েদেরকে স্পর্শ করলে ওজু চলে যায়। কিন্তু ইবনে জাওজীর এ দলিলটি যথাযথ নয়। কারণ, প্রশ্নকারীর একথা জানার উদ্দেশ্য ছিলো না যে, এমতোক্ষেত্রে ওজু যাবে কি যাবে না। তার উদ্দেশ্য ছিলো স্ত্রী নয় এরকম মহিলার সঙ্গে সহবাস ব্যতীত অন্য যে সব অপকর্ম হয়েছে, শরিয়তে সে সবের শাস্তি কী? রসুল স. এর সমাধান স্বরূপ বলেছেন— উত্তমরূপে ওজু করে নিয়ে নামাজ পড়লেই তার গোনাহের কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিসে এসেছে— কোনো মুসলমান যখন ওজু করার সময় মুখ ধৌত করে তখন তার চেহারার সমস্ত গোনাহ্‌ ধুয়ে যায়। হজরত ওসমানের মারফু বর্ণনা এই যে, রসুল স. বলেছেন— যে ব্যক্তি আমার ওজুর মতো ওজু করে একাগ্রচিত্ততার সঙ্গে দু'রাকাত নামাজ পড়বে তার অতীতের সমস্ত গোনাহ্‌ মাফ করে দেয়া হবে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে— এক ব্যক্তি রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো, হে রসুল! আমি শরিয়তের শাস্তি পাবার মতো গোনাহ্‌ করেছি। আমার উপর শাস্তি আ'রাপ করুন। রসুল স. তার গোনাহ্‌র কথা জানতে চাইলেন না। ইত্যবসরে নামাজের সময় হয়ে এলো। তখন সে রসুল স. এর সঙ্গে নামাজ পড়লো। বোখারী ও মুসলিম।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসুল স. এর খেদমতে নিবেদন করলো— ইয়া রসুলাল্লাহ্‌! মদীনার শেষপ্রান্তে আমি এক মহিলাকে পেয়েছিলাম। সহবাস ছাড়া আমি তার সঙ্গে অন্য সবকিছুই করেছি। এ বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথাটি এসেছে যে, রসুল স. তখন আয়াত পাঠ করলেন 'আর নামাজের পাবন্দি করুন দিবসের দু' প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে। নিঃসন্দেহে সৎকর্মসমূহ মন্দকর্ম সমূহকে মুছে ফেলে।' আমরা হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসটি এখানে দলিল হিসেবে পেশ করছি। তিনি বলেছেন, রসুল স. রাতে নামাজ পড়তেন এবং আমি তাঁর সামনে মৃতবৎ পড়ে থাকতাম। সেজদার সময় এলে তিনি আমাকে হাত দিয়ে ধাক্কা দিতেন। আমি পা গুটিয়ে নিতাম। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, ওই সময় গৃহ থাকতো আলোহীন। বোখারী, মুসলিম। হজরত আয়েশা বলেছেন, এক রাতে আমি রসুল স. কে শয্যায় পেলাম না। আমি শয্যা হাতড়াতে লাগলাম। এমন সময় আমার হাত লাগলো তাঁর পায়ে। ওই সময় তিনি

www.eelm.weebly.com

সেজদারত অবস্থায় বলছিলেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার শাস্তি থেকে পরিত্রাণ চাই। তোমার সন্তোষ চাই। তোমার আযাব থেকে বাঁচবার জন্য তোমারই নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমি তোমার যথার্থ প্রশংসা করতে অসমর্থ। তুমি তো তেমনই যেমন তুমি নিজে তোমার প্রশংসা করেছো। বোখারী। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আয়েশা বলেন—আমি তাঁর পবিত্র কেশে হাত রাখলাম, বুঝতে চেষ্টা করলাম তিনি গোসল করেছেন কিনা।

হাফেজ বলেছেন, প্রকাশ থাকে যে বর্ণনা দু'টি পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. ইতেকাফে ছিলেন। ওই সময় আমি তাঁর চুল আঁচড়িয়ে দিতাম। বোখারী। রসুলেপাক স. এর ইতেকাফ অবশ্যই ওজুবিহীন ছিলো না।

হজরত আয়েশা, হজরত মায়মুনা এবং হজরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেন, তাঁরা পর্দার এপাশ ওপাশ থেকে রসুল স. এর সঙ্গে এক পাত্র থেকে পানি উঠিয়ে গোসল করতেন।

আমি বলি, গোসলের পূর্বক্ষণে ওজু করা সুন্নত। তারপর, গোসলের পানি উঠাবার সময় নিশ্চয় রসুল স. এর হাত তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের হাতের সঙ্গে লেগেছে।

হজরত কাতাদা বর্ণনা করেন, হজরত জয়নাবের কন্যাকে অর্থাৎ রসুল স. এর নাতনীকে পিঠে উঠিয়ে নিয়ে তিনি স. নামাজ পড়তেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আয়েশা বলেন, আমি ঋতুবতী ছিলাম। তখন রসুল স. তাঁর মস্তক মোবারক আমার উরুতে রেখে কোরআন তেলাওয়াত করেছিলেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আয়েশা আরো বলেন, আমার কোলেই রসুল স. মাথা রেখে ইন্তেকাল করেছেন। নিশ্চয় তিনি তখন ওজু অবস্থাতেই ছিলেন। এই হাদিসের উপর ভিত্তি করেই ইমাম শাফেয়ী এবং তার সঙ্গীরা বলেছেন, মেয়েদেরকে স্পর্শ করলে তখনই কেবল ওজু ভঙ্গ হবে যখন কামভাবের সঙ্গে স্পর্শ করা হবে। তাঁদের এ বক্তব্যের বিরুদ্ধেও দলিল রয়েছে। যেমন, হজরত আয়েশা বলেছেন, রসুল স. তাঁর পত্নীদেরকে চুমু খেতেন এবং পরক্ষণেই নামাজে চলে যেতেন। নতুন করে ওজু করতেন না। বায্যার, তিরমিজি এবং ইবনে মাজাও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। বায্যার বলেছেন, হাদিসটি হাসান। হাদিসটির সনদ এরকম—ওয়াকি', আমাশ, হাবিব বিন আবী সাবেত, ওরওয়া, হজরত আয়েশা। বোখারী বর্ণিত এই হাদিসকে দুর্বল বলে মনে করলে ভুল হবে। তাঁর ধারণানুযায়ী ওরওয়া থেকে হাবিব শোনেননি—এ রকম সন্দেহ করা ঠিক নয়। কারণ, এ সনদের সকল বর্ণনাকারীই সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য)।

www.eelm.weebly.com

হজরত আয়েশা থেকে আহমদ ও ইবনে মাজা বলেছেন, রসুল স. ওজু করার পর চুম্বন করেছেন। এরপর নতুন করে ওজু না করেই নামাজ পড়েছেন। হাদিসের সনদ এরকম— হাজ্জাজ, আমর বিন শোয়াইব, জয়নব সাহামিয়া, হজরত আয়েশা। কেউ কেউ বলেছেন, জয়নব অপরিচিতা। আমি বলি, জয়নব অপরিচিতা হলেও তাঁর বর্ণনা গ্রহণীয়। কারণ, তিনি ছিলেন দ্বিতীয় কুরুণের সময়ের (৮০ হিজরী পর্যন্ত প্রথম কুরুণ এবং ৮০ থেকে ১২০ হিজরী পর্যন্ত দ্বিতীয় কুরুণ)। দ্বিতীয় কুরুণের অখ্যাত বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। এ সনদের বর্ণনাকারী হাজ্জাজ যদিও মাজরুহ (বিতর্কাহত) তবুও আওজায়ী তাঁর মাধ্যমে হজরত আমর বিন শোয়াইবের বর্ণনা পেশ করেছেন। এরকমই বলেছেন দারা কুতনী। আওজায়ী ছিলেন সিকাহ্। দারা কুতনী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান সওরীর মাধ্যমে। এ সনদে ইব্রাহিমে তামীমের মাধ্যমে হজরত আয়েশার বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। তিরমিজি লিখেছেন, হজরত আয়েশা থেকে ইব্রাহিম শুনেছেন এরকম প্রমাণ নেই। আর এ ধরনের হাদিস মারফু অথবা সহীহ্ কোনোটিতেই পড়ে না।

আমি বলি, ইব্রাহিম ছিলেন সম্মানিত তাবেয়ী। তাঁর পক্ষে হজরত আয়েশার কথা শোনা সম্ভব। এরকম সম্ভাবনাই যথেষ্ট। শুনতে পাওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ না পেলেও চলবে। তাঁর বর্ণনা বিশুদ্ধ না হলে হাদিসটি হবে মুরসাল। আর আমাদের নিকট মুরসাল গ্রহণীয়। এখন আসা যাক তিরমিজির মন্তব্য প্রসঙ্গে। তাঁর মন্তব্যানুযায়ী এ রকম হাদিস রসুল স. থেকে সাব্যস্ত হয়নি। তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই যে, এরকম কোনো হাদিস মারফু অথবা সহীহ্ হিসেবে সাব্যস্ত নেই। কিন্তু অন্যভাবে সাব্যস্ত আছে এবং এর বর্ণনাকারীরাও সিকাহ্।

প্রশ্নঃ যদি এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা যায় যে, ইব্রাহিমের কোনো বর্ণনার উদ্ধৃতি আবু রউফ এবং আতিয়া বিন হারেস ব্যতীত অন্য কেউ দেননি। আর আবু রউফের বর্ণনাকারী কেবল সুফিয়ান সওরী ও আবু হানিফা। এ দু'জনের মধ্যে আবার মতানৈক্যও ছিলো। সওরী বর্ণনা করেছেন হজরত আয়েশা থেকে, আবু হানিফা বর্ণনা করেছেন হজরত হাফসা থেকে। আর এ দু'জনের বর্ণনাকারী কেবলই ইব্রাহিম। আবার তাঁদের কথা ইব্রাহিমের শোনার নিশ্চিত প্রমাণও নেই। (এ সমস্ত সমস্যার সমাধান কী)?

উত্তরঃ আমরা বলি, বর্ণিত চারজন ইমামই সিকাহ্। তবে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, ইব্রাহিম মুরসাল হিসাবে হাদিস দু'টি বর্ণনা করেছেন। একটি করেছেন হজরত আয়েশা থেকে অপরটি হজরত হাফসা থেকে। প্রথমটি পৌঁছেছে সওরী পর্যন্ত। দ্বিতীয়টি আবু হানিফা পর্যন্ত। ফকিহ্দের নিকট এরকম হওয়াতে কোনো দোষ নেই। এছাড়া সওরীর দ্বিতীয় বর্ণনা মুত্তাসিল। কেননা, ইব্রাহিমে তাইয়েমী তাঁর পিতার মাধ্যমে হজরত আয়েশার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

যদি এরকম সন্দেহ করা হয় যে, হাদিসের শব্দগুলো এরকম নয়। যেমন হজরত ওসমান বিন শায়বা বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, রসুল স. রোজা অবস্থায়

www.eelm.weebly.com

স্ত্রীদেরকে চুম্বন করতেন। অন্যান্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি স. চুম্বনের পর নতুন করে ওজু করতেন না। আমরা এ ধরণের সন্দেহকে প্রশ্রয় দেয়ার পক্ষপাতী নই। কারণ, বর্ণনাভিন্নতা সত্বেও সকল বর্ণনাকারীই এখানে সিকাহ্। তাই তাঁদের সকল বর্ণনাকেই সহীহ্ বলে মেনে নিতে হবে। কারণ, ঘটনাস্থল ও সময় হয়তো পৃথক। অথবা কেউ কেউ হয়তো ঘটনার অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন। তাই কোনো বর্ণনায় রয়েছে, তিনি রোজা অবস্থায় চুম্বন করতেন, অতঃপর ওজু করতেন না। আর কোনোখানে কেবল রোজা অবস্থায় চুম্বনের কথা বলা আছে। অন্য কোথাও শুধু ওজু না করার কথাটাই বলা আছে। তাই দেখা যায়, এককভাবে কোনো পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা নেই। এ ধরনের আংশিক বর্ণনা জায়েয। একথা বলেছেন বোখারী।

হাফেজ ইবনে হাজার বর্ণনা করেন, ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আমাদের কাছে সাঈদ বিন বানানার মাধ্যমে মোহাম্মদ বিন ওমর এবং আতা বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. চুমু খেলে ওজু করতেন না। ইমাম শাফেয়ী বলেন, সাঈদ সম্পর্কে আমার ভালো জানা নেই। যদি তিনি সিকাহ্ হন তবে এ হাদিসটি দলিল হিসেবে গৃহীত হবে। হাফেজ বলেন, বায়হাকী দশটি পদ্ধতিতে এ হাদিস উদ্ধৃত করেছেন এবং শেষে সবগুলোকেই দুর্বল হিসেবে গণ্য করেছেন।

আমি বলি, পদ্ধতিগত দুর্বলতা থাকলেও এ ধরনের বর্ণনা হাসান প্রকৃতির। আর এসবের বর্ণনাকারীগণ সকলেই সিকাহ্। তাঁরা কেউই মিথ্যাবাদী ছিলেন না। হজরত আবু উমামা বলেন, আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্। নামাজের জন্য ওজু করার পর কেউ কি তার স্ত্রীর চুম্বন গ্রহণ করতে পারে? এভাবে আনন্দকে গ্রহণ করলে কি তার ওজু ভেঙে যাবে? তিনি স. বললেন, না। এ সিলসিলার বর্ণনাকারী রোকন বিন আবদুল্লাহ্কে দারা কুতনী মাতরুক বলেছেন। (হাদিসের ব্যাপারে নয়, জাগতিক কোনো ব্যাপারে যার মিথ্যাবাদীতার প্রমাণ রয়েছে তাকে বলে মাতরুক)। এ প্রসঙ্গের সকল হাদিসের বর্ণনাকারীগণ যেহেতু সকলেই বিশ্বাসভাজন, তাই একথা নিশ্চিত যে, রসুল স. চুম্বনের পর নতুন ওজু করতেন না। তাই একথা বলতে আর কোনো বাধা নেই যে, মেয়েদেরকে স্পর্শ করলে ওজু ভঙ্গ হয় না। যদি হতো তবে কোনো না কোনো বর্ণনায় একথা এসেই যেতো। বিশেষ করে মুমিনদের মাতাগণের কেউ না কেউ এরকম বিবরণ দিতেন। রসুল স. তাঁদের সঙ্গে একান্তে মিশেছিলেন। হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, মা আয়েশা বলেন, এমন কোনো দিন অতিবাহিত হতো না, যেদিন তিনি স. আমাদেরকে চুম্বন না করতেন। এ সমস্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এ আয়াতের 'লামাস' শব্দটির প্রকৃত অর্থ সহবাস, স্পর্শ নয়। যদি স্পর্শ হতো তবে বর্ণনাটি হতো আরো দীর্ঘ। তখন বিশেষভাবে এ প্রসঙ্গটির বিবরণ দিতে হতো। কিন্তু এখানে শৌচস্থান থেকে আসার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করার পর পর এসেছে স্পর্শ (সহবাস) করার কথা। আয়াতের বক্তব্য এই যে, তায়াম্মুম ওজুর স্থলাভিষিক্ত। ওজু বিনষ্টকারী বিষয়াবলীর সংখ্যা নির্ণয় করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কেননা, অন্যত্র ওজু বিনষ্টকারী অনেক বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। যেমন, নিদ্রা, অচৈতন্য,

www.eelm.weebly.com

উম্মাদ হওয়া, প্রস্রাবের পথ অথবা গুহ্যদ্বার দিয়ে কোনো কিছু বেরিয়ে যাওয়া, অট্টহাসি, উটের গোশত ভক্ষণ, লজ্জাস্থান স্পর্শ করা ইত্যাদি।

চিৎ হয়ে কিংবা বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমালে, বেহুঁশ হয়ে গেলে কিংবা পাগল হয়ে গেলে সাধারণতঃ ওজু ভঙ্গ হয়ে যায়। এটা ঐকমত্য। রসুল স. এর হাদিসে প্রস্রাব পায়খানা থেকে পৃথক হলে এবং ঘুম ভেঙে গেলে— এরকম কথা এসেছে। এ হাদিসের বর্ণনাকারী হজরত সাফওয়ান বিন আস্সাল। ইবনে খুজাইমা এবং তিরমিজি হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম মালেকের মতে নামাজের রুকু অথবা সেজদারত অবস্থায় ঘুমালে ওজু থাকবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যে কোনো অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ নিদ্রামগ্ন থাকলে ওজু চলে যাবে। ইমাম আহমদও এরকম মত পোষণ করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নামাজের যে কোনো অবস্থায় ঘুমালে ওজু যাবে না যদি হেলান না দিয়ে থাকে। কেননা হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সেজদায় ঘুমালে নতুন করে ওজু করতে হবে না। যতোক্ষণ চিৎ হয়ে না ঘুমাবে ততোক্ষণ ওজু ঠিক থাকবে। চিৎ হয়ে ঘুমালে শরীরের গ্রন্থি শিথিল হয়ে যায়। আবদুল্লাহ বিন আহমদ।

আবু দাউদ এবং তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, বসে বসে ঘুমালে ওজু নষ্ট হয় না। বায়হাকীর বর্ণনায় বলা হয়েছে, বসে বসে অথবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমালে ওজু ওয়াজিব হবে না। এ সকল বর্ণনার অন্তর্ভূত এক বর্ণনাকারী ইয়াজিদ বিন খালেদ দালানীকে কোনো কোনো ইমাম দুর্বল বলেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে জাহাবীর সিদ্ধান্তটিই প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ। তিনি বলেছেন, ইয়াজিদ ছিলেন হাসানুল হাদিস। তাঁর চরিত্রে কোনো অসততা ছিলো না।

অচৈতন্য অথবা উম্মাদ অবস্থা নিদ্রা অপেক্ষা কঠিন। তাই এ ব্যাপারে আলেমগণের কোনো মতানৈক্য নেই। যে কোনো অবস্থায় এবং যতো কম সময়ের জন্যই হোক না কেনো, বেহুঁশ অথবা পাগল হলেই ওজু নষ্ট হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফার মত হচ্ছে, নামাজে অট্টহাসি হাসলে ওজু চলে যাবে। রসুল স. বলেছেন, নামাজে যে অট্টহাসি হাসবে তাকে নতুন করে ওজু করে নিতে হবে। হজরত ইবনে ওমর থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন ইবনে আদী। এ হাদিসের আংশিক অনুসরণ করেছেন, মুসলিম। ইবনে আদীর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে মতোবিরোধ রয়েছে। নিশ্চয়ই ইবনে আদী ছিলেন সিকাহ্ মুদাল্লাস্। কোনো সিকাহ্ বর্ণনাকারী যদি 'হাদ্দাসানা' (আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করেন) বলে হাদিস বর্ণনা করেন, তবে তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে। এ হাদিসের বর্ণনাভঙ্গী সেরকমই। তাই হাদিসটিও গ্রহণীয়।

এক অন্ধ ব্যক্তি সম্পর্কিত ঘটনায় রসুল স. বলেছিলেন, যে নামাজের মধ্যে সশব্দে হাসে, তাকে নতুন করে ওজু করে নিয়ে নামাজের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। মা'বাদ খাজায়ী থেকে এ হাদিস উদ্ধৃত করেছেন, দারা কুতনী। বিশুদ্ধ মত এই যে, মা'বাদ ছিলেন মহিলা সাহাবী উম্মে মা'বাদের ছেলে। ইমাম আবু হানিফাও এ

www.eelm.weebly.com

হাদিসের একজন বর্ণনাকারী। ইবনে জাওজী বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা এ হাদিসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ করেছেন। দারা কুতনী এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন জনৈক আনসারী সাহাবী থেকে। এই বর্ণনাসূত্রভূত খালেদ বিন আবদুল্লাহ ওয়াসেতি সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য এই যে, আমরা জানি না তাঁর সম্পর্কে কেউ আপত্তি উত্থাপন করেছেন কিনা। সঠিক কথা হচ্ছে, হাদিসটি মুরসাল। আর মুরসাল আমাদের নিকট দলিল। যারা সশব্দে হাসাকে ওজুভঙ্গের কারণ মনে করেন না, কেবল নামাজভঙ্গের কারণ বলে জানেন, তাঁরা বর্ণনা করেন হজরত জাবের বর্ণিত ওই মারফু হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে, সশব্দ হাসি নামাজ বিনষ্ট করে, কিন্তু ওজু বিনষ্ট করে না। আমরা বলি, এখানে উল্লেখিত হাসি হবে সাধারণ হাসি, যে হাসিতে উচ্চ আওয়াজ থাকে না। এভাবে বর্ণিত হাদিস দু'টির সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা সম্ভব। আর একটি কথা হচ্ছে, এ হাদিসের বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, তিনি ছিলেন বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। ইমাম আহমদ বলেছেন, তিনি ছিলেন অপদার্থ। তার তেমন প্রসিদ্ধিও ছিলো না।

মাসআলাঃ ইমাম আহমদের মতে উটের গোশত খেলে ওজু ভঙ্গ হয়ে যায়। কেননা রসুল স. বলেছেন, উটের গোশত খেলে ওজু করে নিও। হজরত বারা থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আসহাবে সুনান (আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা এই গ্রন্থকারত্রয়কে আসহাবে সুনান বলে)। হাদিস বিশারদগণ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ বলেছেন। হজরত জাবের থেকে মুসলিম এবং হজরত উসাঈদ বিন হুদাইর ও জিল ইজ্জাত থেকে আহমদও এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাসের মারফু বর্ণনা এই যে, শরীরের ভিতর থেকে কোনো কিছু বেরিয়ে গেলে ওজু ওয়াজিব হয়। কিন্তু বাইরে থেকে কোনো কিছু ভিতরে প্রবেশ করলে ওজু যায় না। দারা কুতনী ও বায়হাকী এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের বর্ণনাসূত্রটি দুর্বল ও বর্জনীয়।

মাসআলাঃ ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদের অভিমত— লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওজু ভেঙে যায়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হাতের ভেতরের অংশ অথবা হাতের তালু দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওজু ভেঙে যাবে। হাতের উপরের অংশ অথবা হাতের পিঠ দ্বারা স্পর্শ করলে ওজু ভাঙবে না। রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আপন লজ্জাস্থান স্পর্শ করে ফেলে, সে যেনো নতুন ওজু করা ছাড়া নামাজ না পড়ে। হজরত বুসরা থেকে ওরওয়ার মাধ্যমে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিন ইমাম (মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ) এবং চার আসহাবে সুনান (আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা) ও অন্যান্য আলেমবৃন্দ। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হাদিসটি মুনকাতে (বিপর্যস্ত ধারাবাহিকতাসম্পন্ন)। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, হাদিসটি মুত্তাসিল (যথাসূত্রসম্পন্ন)। মারওয়ানের মাধ্যমে হজরত বুসরা

www.eelm.weebly.com

থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ওরওয়া। এরপর ওরওয়া নিজেই হজরত বুসরা থেকে সরাসরি হাদিসটি শুনেছেন। এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারীদের নাম সহীহাইনে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আহমদ, তিরমিজি, ইয়াহ্ইয়া ও দারা কুতনী হাদিসটিকে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বলেছেন ইমাম বোখারী। এ প্রসঙ্গে হজরত জায়েদ বিন খালেদ থেকে তিরমিজি এবং আহমদ আর একটি মারফু বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে সে যেনো ওজু করে নেয়। হজরত আমর বিন শোয়াইবের দাদা থেকে তিরমিজি, আহমদ, বায়হাকীও এরকম বিবরণ দিয়েছেন। তিরমিজির বর্ণনাটিকে বোখারীও বিশুদ্ধ বলেছেন।

এই অধ্যায়ের আর একটি হাদিস লিখেছেন হজরত আবু আইয়ুব থেকে ইবনে মাজা ও হাকেম। তাঁরা হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং হজরত উম্মে সালমা থেকে এ রকম বিবরণ দিয়েছেন। আর বায়হাকী বর্ণনা দিয়েছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। কিন্তু এ সমস্তের বর্ণনাসূত্র শিথিল। এ বিষয়ে হজরত আলী বিন তোলাক্ব থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তিবরানী এবং বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। হজরত নোমান, হজরত আনাস, হজরত উবাই বিন কাব এবং হজরত মুয়াবিয়া বিন জুন্দুব থেকে এ রকম আরো বর্ণনা করেছেন ইবনে মানদাহ্ এবং হজরত আরওী বিনতে আনাস থেকে তিরমিজি।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর দলিল হিসাবে পেশ করেছেন হজরত তোলাক্ব বিন আলী বর্ণিত হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. এর নিকট নিবেদন করা হলো, ইয়া রসুলাল্লাহ্! যদি কেউ তার নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, তবে কি তাকে ওজু করতে হবে? তিনি স. বললেন, ওটা তো তার শরীরেরই একটি অংশ (তবে স্পর্শ করলে ওজু যাবে কেনো)। আসহাবে সুনান এবং ইমাম আহমদও এ হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং এ হাদিসকে বিশুদ্ধ বলেছেন— আমর বিন আলী ফ্লাল্লাস, ইবনে মাদেনি, ইবনে হাব্বান, তিবরানী এবং ইবনে হাজম। কিন্তু একে শিথিল বলেছেন ইমাম শাফেয়ী, আবু জুরয়া, আবী হাতেম, দারা কুতনী ও বায়হাকী।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসটির বর্ণনাসূত্র মোট পাঁচটি। এর মধ্যে চারটি দুর্বল। বাকী একটির বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তিনি হচ্ছেন কায়েস বিন তোলাক্ব যিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু এ সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। ইমামে আজম বলেছেন দুর্বল এবং বাজলী বলেছেন মজবুত। উভয় বর্ণনার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন ইয়াহ্ইয়া। তাই যে সকল আলেম কায়েসকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, তাঁদের নিকট হাদিসটি সহীহ্। যাঁরা এরকম বলেননি তাঁদের নিকট বিশুদ্ধ নয়। আমাদের মতে হাদিসটি হাসান প্রকৃতির। কিন্তু বুসরা বর্ণিত হাদিসটি অধিকতর শক্তিশালী।

www.eelm.weebly.com

পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে ওজু না যাওয়ার হাদিসগুলো হজরত আবু উমামা, হজরত আসমা বিনতে মালেক এবং হজরত আয়েশা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এগুলোর বর্ণনাসূত্র দুর্বল। ইবনে হাব্বান দাবী করেছেন— তোলাক্ব বর্ণিত হাদিস রহিত হয়েছে। কেননা, ষষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণকারী হজরত আবু হোরায়রাও পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে ওজু যাওয়ার কথা বলেছেন। আর তোলাক্ব রসুল স. এর নিকট হাজির হয়েছিলেন হিজরত পূর্ব সময়ে অথবা মসজিদে নববী নির্মাণের প্রাক্কালে। দারা কুতনী।

আমি বলি, দারা কুতনীর এ বর্ণনাসূত্রও অশক্ত। হজরত তোলাক্ব মসজিদে নববী নির্মাণের প্রাক্কালে উপস্থিত হওয়ার কথা জানা গেলেও একথা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় না যে, হজরত আবু হোরায়রার ইসলাম গ্রহণের পর আর কখনো তিনি রসুল স. এর সমীপবর্তী হননি। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিসটি যেহেতু নিজেই অশক্ত সূত্রপরম্পরাযুক্ত, তাই হজরত তোলাক্ব বর্ণিত হাদিসটিকে রহিত বলা যায় না।

'যদি পানি না পাও'—আয়াতে বর্ণিত একথার অর্থ হচ্ছে— যদি পানি ব্যবহার করতে সক্ষম না হও। পানি ব্যবহার না করতে পারার কারণ হতে পারে অনেক। যেমন, যদি পানি আদৌ না থাকে। যদি পানি থাকে এক মাইল দুই মাইল দূরে। দূরের পানি আনার ক্ষমতা থাকলেও যদি দলছুট হবার সম্ভাবনা থাকে। কূপে পানি আছে কিন্তু পানি ওঠানোর ব্যবস্থা যদি না থাকে। পানি আনতে গেলে হিংস্র জন্তু, বিষাক্ত সাপ অথবা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ভয় যদি থাকে। পানি আছে কিন্তু তার পরিমাণ এত অল্প যে ওজু করলে পান করার পানি শেষ হয়ে যেতে পারে, যার কারণে পিপাসার কষ্ট অথবা পীড়িত হবার আশংকা দেখা দিতে পারে। অথবা শারীরিক অক্ষমতা ও দুর্বলতা অবশ্যম্ভাবী হয়। ধ্বংস ও অঙ্গহানি হওয়ার ভয় যদি থাকে তবে পানি কাছে কিংবা দূরে থাক, তায়াম্মুম করে নিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হওয়া অথবা অঙ্গহানির আশংকাস্থলেই তায়াম্মুম জায়েয (কেবল রোগবৃদ্ধির আশংকায় জায়েয নয়)।

মুজাহিদ থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, এক আনসারী পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন। উঠে বসে ওজু করার সামর্থ্য তাঁর ছিলো না। তাঁর এমন কোনো সাহায্যকারীও ছিলো না, যে তাঁকে ওজু করিয়ে দেবে। রসুল স. এর দরবারে তাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো। তখন আল্লাহ্তায়ালা 'যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হও'— এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন। ইব্রাহিম নাখয়ীর মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেন, কতিপয় যুদ্ধাহত সাহাবী জখমযন্ত্রণার কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। ওই সময় তাঁরা জুনুবও (গোসল ফরজ হওয়ার অবস্থা) হয়ে গেলেন। তাঁদের দূরবস্থার কথা রসুল স. কে জানানো হলে আল্লাহ্তায়ালা এই আয়াতটি নাজিল করলেন।

হজরত আমর বিন আস বলেন, জাতুস্ সালাসিলের যুদ্ধের এক প্রচণ্ড শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হলো। আমি চিন্তা করলাম, এই ভয়ানক ঠাণ্ডায় গোসল করলে নির্ঘাত মারা পড়বো। আমি আর গোসল করলাম না। তায়াম্মুম করলাম

www.eelm.weebly.com

এবং নামাজ পড়ালাম। এই ঘটনাটি পরে রসুল স. কে জানানো হলো। তিনি স. বললেন, আমর! তুমি তাহলে জানাবাত অবস্থাতেই নামাজ পড়িয়েছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ আমার স্মরণে ছিলো, 'তোমরা আত্মহত্যা কোরো না।' রসুল স. হাসলেন। আমাকে আর কিছু বললেন না। বোখারী, আবু দাউদ, হাকেম।

হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, তিনি ওয়াকে'উজ্‌জরফ থেকে রওয়ানা দিয়ে মারবাদু নায়াম নামক স্থানে পৌঁছলে আসরের সময় হয়ে গেলো। তিনি মাটি দ্বারা মুখমণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত দুই হাত মোসেহ্ করে নিয়ে তায়াম্মুম সমাপন করলেন এবং নামাজ পড়ে নিলেন। যখন তিনি মদীনায় পৌঁছলেন তখনও সূর্যাস্ত হয়নি। কিন্তু তিনি আসর নামাজের পুনরাবৃত্তি করলেন না। শাফেয়ী। এই হাদিসটি ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইবনে ইসহাক বলেছেন, জরফ ছিলো মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে। আর মারবাদ ও মদীনার দূরত্ব ছিলো এক মাইল। বায়হাকী বলেছেন, সফর অবস্থায় ইবনে ওমর দুই এক মাইল দূরে পানি থাকলে পানির জন্য ব্যস্ত না হয়ে তায়াম্মুম করে নিতেন। আমি বলি, দলছুট হওয়ার আশংকাতেই তিনি এরকম করতেন। ডানে কিংবা বাঁয়ে দূরে পানি থাকলে অর্থাৎ সামনের দিকে পানি না থাকলেই কেবল তিনি এ রকম করতেন।

মাসআলাঃ ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মুসাফির ওজুর পানি না পেলে সাথীদের কাছে পানির অনুসন্ধান করবে। যদি খোলা প্রান্তরে থাকো, কোনো দিকের কোনো সাড়া শব্দ না পাওয়া গেলেও চতুর্দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। সামনে উঁচু দেয়াল বা টিলা থাকলে ডানে বাঁয়ে তাকাবে। কেননা, আয়াতে বলা হয়েছে, 'যদি পানি না পাও।'— এ কথার অর্থ যদি অনুসন্ধান করে পানি না পাও। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, সঙ্গীদের নিকট পানি চাওয়ার কথা এখানে বলা হয়নি। নিজের কাছে পানি না থাকলেই তার প্রতি 'যদি পানি না পাও' কথাটি প্রযোজ্য হবে।

কামুস অভিধানানুযায়ী তায়াম্মুম শব্দের অর্থ সংকল্প করা। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, তায়াম্মুমের জন্য নিয়ত ফরজ। ওজু ও গোসলের নিয়তকে তিনি ফরজ বলেননি। ইমাম জোফার বলেছেন, ওজু ও গোসলের মতো তায়াম্মুমের নিয়তও ওয়াজিব নয়। এই আয়াতটিই ইমাম জোফারের অভিমতবিরোধী। অন্য ইমামত্রয়ের অভিমত এই যে, তায়াম্মুমের মতো ওজু ও গোসলের নিয়তও ওয়াজিব। সুরা মায়িদায় এই অনুষঙ্গটি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হবে ইন্‌শাআল্লাহুতায়ালা।

তায়াম্মুম করতে হবে মাটি দিয়ে। বালি, চুনাপাথর কিংবা সাধারণ যে কোনো পাথর মাটিরই গোত্রভূত। জুযাজ বলেন, বিষয়টির প্রকৃত অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই। আমি বলি, একারণেই বায়যাবী, শাফেয়ী মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও কেবল মাটিকেই তায়াম্মুমযোগ্য মনে করেননি। বাগবী

www.eelm.weebly.com

বর্ণনা করেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— 'সয়িদান' অর্থ মাটি-ই। কামুসে রয়েছে, সয়িদান অর্থ মাটি, জমির মাটি, বালি। দারা কুতনী।

হেদায়া গ্রন্থে রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস 'সয়িদান তইয়েবান'—এর তাফসীর করেছেন, (ওই মাটি) যার মধ্যে সবুজ বৃক্ষ অংকুরিত হয়। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, আমার নিকট এরকম বিবরণ পৌঁছেনি। কিন্তু বায়হাকী এবং ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যের অনুসরণে বলেছেন, পবিত্র মাটি অর্থ ক্ষেতের মাটি অর্থাৎ যে জমিতে ফসল ফলানো যায় সেই জমির মাটি। ইবনে মারদুবিয়া তাঁর তাফসীরে হজরত ইবনে আব্বাসের এই হাদিসটি মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। 'পবিত্র' শব্দটির মাধ্যমে একথাই বুঝা যায় যে, শস্যক্ষেত্রের মৃত্তিকা এবং অন্য সকল স্থানের মৃত্তিকা।

আমি বলি, শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। কামুস প্রণেতা লিখেছেন, তৎসত্ত্বেও এখানে সয়িদা অর্থ সকল প্রকার মাটি। কারণ, সুরা মায়িদায় আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহর ইচ্ছা নয় যে, তিনি তোমাদের প্রতি কোনো অসুবিধা চাপিয়ে দেন।' কেবল ক্ষেতের মাটি হলে ব্যাপারটা হতো খুবই কঠিন। তখন কৃষিকাজের উপযুক্ত নয় এমন লবণাক্ত বা অনুর্বর জমিতে, পাথুরে প্রান্তরে, পাহাড়ী এলাকার বসবাসে তায়াম্মুম করা কঠিন হয়ে পড়তো। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিস দৃষ্টে বুঝা যায়, সয়িদা অর্থ জমিরই মাটি।

রসুল স. বলেছেন, অন্যান্য নবী অপেক্ষা আমাকে ছয়টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। ১. কলেমায়ে জামেয়া (সমন্বিত বাণীবৈভব) ২. শত্রুদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। ৩. গণিমতের মাল হালাল করে দেয়া হয়েছে। ৪. সারা পৃথিবীকে আমার জন্য মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। ৫. আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমস্ত সৃষ্টির জন্য ৬. নবুয়তের প্রবাহ বন্ধ করা হয়েছে আমারই মাধ্যমে। মুসলিম, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ থেকে তিবরানী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, অন্যদেরকে দেয়া হয়নি এ রকম পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে আমাকে। এই হাদিসে কলেমায়ে জামেয়া এবং নবুয়ত সমাপ্তির উল্লেখ নেই। বাকী চারটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে এ কথাটি— উম্মতের জন্য আমার সুপারিশ সুসংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে।

হজরত আবু উমামা থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনাপরম্পরায় বায়হাকী লিখেছেন, আমাকে চারটি বিশেষত্বের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়েছে। ১. সমস্ত পৃথিবী আমার ও আমার উম্মতের জন্য পবিত্র ও মসজিদ করে দেয়া হয়েছে। এখন নামাজের সময় জায়নামাজ না পেলে মাটিতেই নামাজ পড়তে পারবে। ২. আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সকল মানুষের জন্য। ৩. গণিমতের মাল আমার জন্যই হালাল করা হয়েছে। ৪. দুই মাসের দূরত্বে থাকলেও শত্রুরা আমার ভয়ে ভীত হয়।

www.eelm.weebly.com

হজরত আমর বিন শোয়াইবের বর্ণনায় রয়েছে, যেখানে নামাজের সময় হবে সেখানেই তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে নিতে পারবে।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে— পাঁচটি এমন বিষয় আমাকে দেয়া হয়েছে, যা ইতোপূর্বের কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। পাঁচটির একটি হচ্ছে, সমস্ত পৃথিবীর মাটি আমার জন্য পবিত্র করে দেয়া হয়েছে, যার জন্য সকল স্থানের মাটিই আমার জন্য মসজিদ তুল্য।

ইবনে জারুদ এবং ইবনে মুনজির হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন সমস্ত মাটি আমার জন্য পবিত্র। সকল স্থানের মাটিই মসজিদ। এ প্রসঙ্গের হাদিসগুলো থেকে বুঝা যায়, মাটি তার সমস্ত অংশসহ পবিত্র। আর আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, সকল স্থানের মাটিই মসজিদ। কেননা, 'আল আরদ্ব' শব্দটির মধ্যে আলিফ লামে জিনসী (জাতিগত আলিফ) হয়েছে। বিশেষ করে হজরত আবু উমামার হাদিস এ বিষয়টির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মাটি বা মাটি জাতীয় সব কিছু দিয়ে তায়াম্মুম করা যাবে। পাথর ও বালি ইত্যাদিও মাটির সমগোত্রীয়। ইমাম মালেকের মতে খড়ি এবং গাছ দ্বারাও তায়াম্মুম জায়েয। তবে শর্ত হচ্ছে খড়ি অথবা গাছ লেগে থাকতে হবে মাটির সঙ্গে। বৃক্ষ বড় হয় মাটির রস শোষণ করে, সুতরাং মাটির অংশ রয়েছে তার শরীরে। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, তায়াম্মুম বৈধ কেবল মাটি ও বালি দ্বারা। আর ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ অভিমত প্রকাশ করেছেন, তায়াম্মুম কেবল মাটি দ্বারাই করা যায়।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ তাঁদের অভিমতের সমর্থনে হজরত হোজায়ফা বর্ণিত হাদিসটি এনেছেন, যাতে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমাকে তিনটি বিষয়ে বিশেষিত করে মানুষের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। ১. আমাদের নামাজের কাতারগুলোকে ফেরেশতাদের কাতারের মতো সুশৃঙ্খল করা হয়েছে। ২. সমস্ত পৃথিবীকে আমাদের জন্য মসজিদ করে দেয়া হয়েছে। ৩. মাটিকে করা হয়েছে পবিত্র যখন আমরা পানি না পাই। মুসলিম।

হজরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্র করে দেয়া হয়েছে। বর্ণিত হাদিস দু'টিতে কেবল মাটির কথাই উল্লেখিত হয়েছে। তাই মাটিই তায়াম্মুমের একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা সেরকম নয়। এখানে বিশেষ অর্থ ও সাধারণ অর্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার কোনো কারণ আসলে নেই। কেবল মাটির কথা উল্লেখ করা হলেও সাধারণ অর্থে মাটি জাতীয় সকল পদার্থ এর অন্তর্ভূত হবে। কারণ, এখানে মাটি জাতীয় অন্যান্য পদার্থ সমূহকে নাজায়েয ঘোষণা দেয়া হয়নি বরং নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। অন্য হাদিসে ভূমিজাত অন্যান্য বস্তুর কথা স্পষ্ট করেই বলে দেয়া হয়েছে। এই হাদিস দু'টিতে কেবল মাটির উল্লেখ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা উত্তম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদিস থেকে ইমাম আবু ইউসুফ দলিল পেশ করেছেন। বর্ণিত হয়েছে, বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা আরজ

www.eelm.weebly.com

করলেন, হে আল্লাহর রসুল! কোনো কোনো সময় পাহাড়ী এলাকায় আমাদেরকে তিন চার মাস ধরে অবস্থান করতে হয়। তখন কখনো কখনো আমাদের গোসল ফরজ হয়। স্ত্রীরা ঋতুবর্তী হয়। সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আমরা সেখানে পানির সংকটে পড়ে যাই। রসুল স. বললেন, সেখানকার ভূমিকে ব্যবহার কোরো। একথা বলেই তিনি তাঁর হাত রাখলেন মাটিতে এবং মুখমণ্ডল মুছলেন। আবার মাটিতে হাত রাখলেন। তারপর হাত উঠিয়ে দু' হাত কনুই পর্যন্ত মুছে ফেললেন। ইবনে জাওজী এই হাদিস উদ্ধৃত করে বলেছেন, হাদিসটি অশুদ্ধ। কেননা, এই হাদিসের এক বর্ণনাকারী মোছান্না বিন সবাহ্কে ইমাম আহমদ ও রাজী বলেছেন, অপদার্থ। নাসাঈ বলেছেন, পরিত্যক্ত হাদিস।

'তইয়েবান' শব্দটির অর্থ পবিত্র। এখানে এ শব্দটির দ্বারা ফসলের জমিনের মাটি বুঝানো হয়নি। কেননা, ওলামাদের ঐকমত্য এই যে, সয়িদান অর্থাৎ মাটি পবিত্র হওয়া জরুরী। এখন যদি এই মাটিকে কেবল ফসল জন্মানোর উপযুক্ত মাটি বলে মনে করা হয় তবে প্রকৃত ও রূপক উভয় প্রকার অর্থ একই সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়। এরকম করা বৈধ নয়। কারণ, কোরআন ও ঐকমত্য অনুযায়ী পবিত্রতার শর্তটিই জরুরী। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মাটি অপবিত্র হওয়ার পর শুকিয়ে গেলে তার উপর নামাজ পড়া যাবে। কিন্তু ওই স্থানের মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা যাবে না। কেননা, মাটি পবিত্র হওয়ার শর্ত কোরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর এই পবিত্রতার অর্থ হচ্ছে আগাগোড়া পবিত্র। বাকী তিন ইমামও এ রকম মাটিতে নামাজ পড়া নাজায়েয বলেননি। হাদিস শরীফের মাধ্যমে জানা যায়, মাটি তরল অপবিত্রতা শোষণ করার পর শুকিয়ে গেলে পবিত্র পদবাচ্য হয়। কিন্তু এই হাদিস তেমন প্রসিদ্ধ নয়। আমাদের নিকট এ সম্পর্কিত একটি হাদিস পৌঁছেছে হজরত হামজা বিন আবদুল্লাহ্‌র বর্ণনা থেকে— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. এর জামানায় কুকুর মসজিদের ভিতরে চলাফেরা করতো এবং প্রস্রাব করতো। কিন্তু কেউ অপবিত্র স্থান পানি দ্বারা ধৌত করতেন না। বোখারী। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন— আবু দাউদ, ইসমাইল, আবু নাঈম এবং বায়হাকী।

'উহা মুখ ও হাতে বুলাইবে'—এরকম সরাসরি নির্দেশের কারণে ঐকমত্যানুসারে বলা হয়েছে, সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল মোসেহ্ করা ফরজ। কনুই সহ দু' হাত পর্যন্ত মোসেহ্ করাও ফরজ। কনুই থেকে আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত অঙ্গের নাম হাত। জুহরী বলেছেন, বগল পর্যন্ত মোসেহ্ করা ওয়াজিব। সাহাবীগণের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এই বিষয়টির সম্যক ব্যাখ্যা দেয়ার আগে তাঁরা বগল ও কাঁধ পর্যন্ত মোসেহ্ করতেন। হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেন, রসুল স. সেনাবাহিনীতে শেষ রাতের দিকে পৌঁছলেন। সঙ্গে ছিলেন হজরত আয়েশা রা.। তাঁর ইয়ামানি হার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। সকলে হার অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তখন তাঁদের নিকট পানি ছিলো না। ওই সময়েই আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র মাটি দিয়ে পবিত্র হওয়ার নির্দেশ অবতীর্ণ করলেন।

www.eelm.weebly.com

মুসলমানেরা উঠে দাঁড়ালেন। মাটিতে হাত স্থাপন করলেন এমনভাবে যাতে মাটি লাগলো না। তারপর হাতের ভেতরের (তালুর) অংশ দ্বারা বগল এবং কাঁধ পর্যন্ত মোসেহ্ করলেন। আহমদের মাধ্যমে ইবনে জাওজী এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, আমরা কাঁধ পর্যন্ত মোসেহ্ করেছি। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, আমরা রসুল স. এর মাধ্যমে কাঁধ পর্যন্ত মোসেহ করেছি। কিন্তু রসুল স. এর শিক্ষা এবং জমহুরের ঐকমত্যে প্রমাণিত হয়েছে— এখানে হাত অর্থ সম্পূর্ণ হাত নয়। বরং হাত বলতে এখানে ততোটুকু বুঝানো হয়েছে যতোটুকু ওজুর সময় ধৌত করতে হয়।

হজরত আম্মার বর্ণনা করেন, তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমিও সকলের সঙ্গে ছিলাম। রসুল স. আমাদেরকে হুকুম করলেন। আমরা একবার হাত মাটিতে স্থাপন করে উঠিয়ে নিয়ে মুখমণ্ডল মোসেহ্ করলাম। দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত রেখে উঠিয়ে নিয়ে দু' হাত কনুই পর্যন্ত মুছলাম। বায্যার।

হাফেজ ইবনে হাজারও নির্দোষসূত্রে এরকম বর্ণনা করেছেন। এরকম বর্ণনা আরো করেছেন আবু দাউদ হজরত আম্মার থেকে। তাঁর বিবরণেও 'কনুই পর্যন্ত' উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত কাতাদার বর্ণনায় আছে, আমার নিকট এক মুহাদ্দিস বলেছেন— যিনি উদ্ধৃত করেছেন শায়বী থেকে হজরত কাতাদা ওই মুহাদ্দিসের নাম বলেননি। কিন্তু তাঁর বর্ণনাভঙ্গিতে বুঝা যায় তিনি ওই মুহাদ্দিসকে সিকাহ্ মনে করেন।

আয়াতটি নাজিল হওয়ার ব্যাপারে হজরত আসলাহ্র হাদিসটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে— যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, রসুল স. আমাকে তায়াম্মুম করা শিখিয়েছেন এভাবে— একথা বলে একবার মুখমণ্ডল মোসেহ্ করলেন। পরের বার মোসেহ্ করলেন কনুইসহ দু' হাত। কিন্তু এই বর্ণনাসূত্রের এক বর্ণনাকারী রবী বিন বদর ছিলেন বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। এতদসত্ত্বেও হজরত আম্মারের হাদিসে যেহেতু একই কথা এসেছে, তাই উভয় হাদিসের ব্যাখ্যা মূলত সমগুরুত্বসম্পন্ন বলে গ্রহণ করা যায়।

মাসআলাঃ উপরোক্ত বিবরণাদির ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কনুই পর্যন্ত হাত বুলিয়ে নেয়া ওয়াজিব। এই অভিমতের সাহায্যার্থে রয়েছে হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসটি— যেখানে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি রসুল স. সকাশে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে। আমি তাই (পবিত্র হওয়ার জন্য) মাটিতে গড়াগড়ি করেছি। রসুল স. বললেন, তায়াম্মুম এরকম—একবার মাটিতে হাত রেখে মুখমণ্ডল মুছতে হবে, আর একবার মাটিতে হাত দিয়ে মুছে ফেলতে হবে কনুই পর্যন্ত দুই হাত। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. একবার মাটিতে হাত রেখে তাঁর পবিত্র মুখাবয়ব মুছলেন। পরের বার একই নিয়মে মাটিতে হাত স্থাপন করে মুছে ফেললেন কনুই পর্যন্ত দু' হাত। হাকেম বলেছেন হাদিসটি সহীহ্। দারা কুতনী বলেছেন, এই

www.eelm.weebly.com

সূত্রভূত সকল বর্ণনাকারীই সিকাহ্। বোখারী ও মুসলিম এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেননি।

হজরত ইবনে সামুহ বর্ণনা করেন, একদিন আমি রসুল স. এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তখন প্রস্রাব করছিলেন। আমি সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি স. সালামের জবাব দিলেন না। প্রস্রাব সমাপন করে তিনি সামনের একটি দেয়ালে তাঁর লাঠি দিয়ে আঁচড় দিলেন। তারপর দুই হাত দেয়ালে রেখে উঠিয়ে নিয়ে মুখমণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত দু' হাত মুছে নিলেন। শাফেয়ী, নাসাঈ। নাসাঈ বলেছেন, হাদিসটি হাসান। এই বর্ণনাসূত্রের আবু আসমা এবং আবু খারেজ সম্পর্কে ইবনে জাওজী সন্দেহ করেছেন। আর এক বর্ণনাকারী আবু হুয়াইরিস সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার দুর্বলতার অনুযোগ করেছেন। কিন্তু বর্ণিত তিনজন সম্পর্কে কেউই মিথ্যাবাদিতার অভিযোগ তোলেননি। কাজেই হাদিসটি উন্নীত হয়েছে হাসান পর্যায়ে। সহীহাইনে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে— রসুল স. তাঁর পবিত্র চেহারা এবং উভয় হাত মোসেহ্ করেছেন।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আবী আওফাকে তায়াম্মুম প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, রসুল স. আম্মারকে এরকম করতে নির্দেশ করেছেন— উভয় হাত মাটিতে স্থাপন করবে, তারপর হাত ঝেড়ে নিবে, তারপর মুছে ফেলবে মুখ ও দুই হাত। দ্বিতীয় বর্ণনায় হাতের বদলে কনুই বলা হয়েছে। ইবনে মাজা। জাহাবী এই সনদের কোনো বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ না করলেও একথা নিশ্চিন্ততার সঙ্গে বলেছেন যে, বোখারীর শায়েখ ওসমান বিন আবী শায়বা নিশ্চিতরূপে সত্যবাদী ছিলেন। এ কারণেই প্রমাণিত হয় যে, হাদিসটি হাসান (উত্তম)। এই অনুচ্ছেদের কতিপয় হাদিস অবশ্য দুর্বল। আবু দাউদ কর্তৃক হজরত ইবনে আসমা এবং হজরত ইবনে ওমরের হাদিস এসে পৌঁছেছে মোহাম্মদ বিন সাবেত পর্যন্ত। আর মোহাম্মদ বিন সাবেত দুর্বল রূপে চিহ্নিত। দারা কুতনী, বায়হাকী এবং হাকেম বর্ণিত হজরত ইবনে ওমর এবং হজরত আয়েশার হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তায়াম্মুম দু'বার হাত স্থাপনের দ্বারা সমাপ্ত হয়। প্রথমবার মাটিতে হাত রেখে চেহারা মুছতে হবে। দ্বিতীয়বার মুছতে হবে কনুই পর্যন্ত দু' হাত। হজরত ওমর বর্ণিত হাদিসের এক বর্ণনাকারী আলী বিন জুবিয়ানকে কাত্তান এবং ইবনে মুঈন দুর্বল বলেছেন। হাকেম বলেছেন সত্যবাদী। এক বর্ণনাসূত্রের সোলায়মান বিন দাউদকে বলা হয়েছে মাতরুকুল হাদিস। হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসের বর্ণনাকারী হারিশ বিন হারিছকে আবু হাতেম বলেছেন, হাদিস অস্বীকারকারী।

হজরত ওমরের এক বর্ণনায় এসেছে, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে তায়াম্মুম করেছি। দেখেছি, তিনি তাঁর হাত পবিত্র মাটিতে রাখলেন, হাত ঝাড়লেন, তারপর মুখমণ্ডল মুছে নিলেন। দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত রেখে মুছে নিলেন কনুই পর্যন্ত দু' হাত। দারা কুতনী। এই বর্ণনাসূত্রটির সোলায়মান বিন আরকাম আবার মাতরুকুল হাদিস। এ সম্পর্কিত আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু উমামা থেকে যার সনদকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তিবরানী।

www.eelm.weebly.com

ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, তায়াম্মুমের জন্য শুধু একবার মাটিতে হস্তস্থাপন করাই যথেষ্ট। একবার মাটি স্পর্শ করেই মুখ ও হাত মুছে ফেলতে হবে। কেননা, হজরত আম্মার বর্ণনা করেন, আমি সেনাদলের সঙ্গে ছিলাম। আমার স্বপ্নদোষ হয়ে গেলো। আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। তারপর রসুল স. এর নিকট যেয়ে একথা বললে তিনি বললেন, তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট—তিনি হাত রাখলেন মাটিতে। তারপর হাত উঠিয়ে নিয়ে হাতে ফুঁ দিলেন। তারপর মুছে ফেললেন মুখ ও হাত—কনুই পর্যন্ত। হজরত আম্মারের দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, তায়াম্মুমকালে কেবল একবার মাটিতে হাত রেখে চেহারা এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মোসেহ্ করবে। এই হাদিস দু'টি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। সহীহাইনেও বিভিন্ন সূত্রে এ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমার জন্য এরকমই যথেষ্ট ছিলো—একথা বলে তিনি দু' হাত মাটিতে রাখলেন, হাতে ফুঁ দিলেন, তারপর চেহারা এবং দু' হাত কনুই পর্যন্ত মোসেহ্ করলেন। মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, তোমার জন্য এ রকম করাই যথেষ্ট ছিলো যে, তুমি উভয় হাত মাটিতে রেখে হাতে ফুঁ দিয়ে নিয়ে মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত দু' হাত মোসেহ্ করে নিবে।

আমি বলি, সহীহাইনের হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, হজরত আম্মার তখন পর্যন্ত জানতে পারেননি যে, জানাবাত অবস্থার জন্যও তায়াম্মুম করা যায়। তিনি মনে করেছিলেন তায়াম্মুম ওজুর স্থলাভিষিক্ত। তাই তিনি তায়াম্মুমের নিয়মকে যথেষ্ট মনে না করে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলেন। হাদিস বিশারদগণ বলেন, বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত হজরত আম্মারের হাদিস অধিকতর শক্তিমান। আমরা বলি, নিঃসন্দেহে বোখারী ও মুসলিমের হাদিস আমাদের কোনো একটি হাদিসের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী। কিন্তু আমাদের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা অনেক। সূত্রগত দুর্বলতা সত্ত্বেও সেগুলো বিশুদ্ধ পদবাচ্য। ওই সকল বর্ণনা এবং বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনার মধ্যে বিরোধাভাস বিদ্যমান। এখন আমাদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে ওগুলোর পারস্পরিক মর্যাদা কী? ইমাম আহমদ বর্ণিত হাদিসের ঘটনা ঘটেছিলো এই আয়াত নাজিলের পরে। কাজেই আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা এই হাদিস দ্বারা করা যায় না। এ ধরনের বিলম্বিত বর্ণনা জায়েয নয়। এই হাদিসের প্রকাশ্য অর্থ নিলে আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে যায়। আর এটা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, একক বর্ণনা দ্বারা কিতাবুল্লাহ্‌র হুকুম রহিত হয় না। তাই নিঃসন্দেহে কিতাবুল্লাহ্‌ই কায়েম থাকবে। আর রহিত হয়ে যাবে সহীহাইনের বর্ণনা। তাই অন্যান্য বর্ণনাগুলোই বরং গ্রহণীয়। কারণ, সেগুলো আয়াত নাজিলের সময়ের। সুতরাং, আয়াতের ব্যাখ্যা এই হাদিসগুলোর মাধ্যমে হওয়াই সমীচীন।

সহীহাইনের হাদিসের ব্যাখ্যা এভাবেও করা যায়, হাদিসের বর্ণনায় রয়েছে কনুই পর্যন্ত হাতের কথা। সম্পূর্ণ হাত নয়। মাটিতে হাত রাখার কথা বলে মাটিতে গড়াগড়ি যাওয়া নিষেধ করা হয়েছে। তায়াম্মুমের সম্পূর্ণ নিয়ম বর্ণনা করা

www.eelm.weebly.com

তখন উদ্দেশ্য ছিলো না। যেমন গোসল সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তোমার জন্য এরকমই যথেষ্ট যে, তুমি তিনবার মাথায় পানি ঢেলে দিবে। এর মধ্যে কুলি করা, নাকে পানি দেয়া এবং সমস্ত শরীর ধুয়ে ফেলার কথা বলা হয়নি। কেননা, রসুল স. এর উদ্দেশ্য ছিলো কেবল একথা জানানো যে, খোঁপা বাঁধা চুল খোলার দরকার নেই।

শেষ কথা হচ্ছে, হাদিসগুলোর মধ্যে যেহেতু পরস্পরবিরোধিতা দৃষ্ট হলো, তাই আমরা ওগুলোকে দলিল হিসাবে না টেনে বরং আমরা তায়াম্মুমকে ওজুর সঙ্গে তুলনা করলেই ভালো করবো। তাই শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে, কনুই পর্যন্ত মুছে ফেলার কথাটিই মেনে নেয়া (যেহেতু ওজুতে এরকমই করতে হয়)।

মাসআলাঃ নামাজের সময় চলে যাওয়ার আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করে নিয়ে নামাজ পড়া যাবে। যেমন, ঈদের নামাজ এবং জানাজার নামাজ। কিন্তু প্রতি দিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুমআর নামাজের সময় চলে যাবার সম্ভাবনা থাকলেও তায়াম্মুম করে নামাজ পড়া যাবে না।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, জানাজা অথবা ঈদের নামাজ ছুটে যাবার আশংকা থাকলেও তায়াম্মুম করা যাবে না। কারণ এগুলো ওয়াজিবই নয়। ঈদের নামাজ সুন্নত। আর জানাজার নামাজ ফরজে কেফায়া (কিছু লোক পড়লে সকলের পক্ষ থেকে নামাজ আদায় হয়ে যায়)। তাঁরা আরো বলেছেন, ওয়াক্তিয়া নামাজ এবং জুমআর নামাজ ছুটে যাবার ভয় থাকলে তায়াম্মুম করা যাবে। এমতোক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ীর মত হচ্ছে, পরে ওজু করে নামাজের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। ইমাম আহমদ বলেছেন, বর্ণিত চার অবস্থার কোনো অবস্থাতেই তায়াম্মুম করা যাবে না। কারণ, তায়াম্মুম করার শর্ত হচ্ছে পানি না পাওয়া। কিন্তু বর্ণিত অবস্থাগুলোর একটিতেও এরকম কিছু নেই।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, রসুল স. সালামের জবাব দেয়ার জন্যও তায়াম্মুম করে নিয়েছিলেন। (ইতোপূর্বে এই হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে)। অথচ ওজুহীন অবস্থাতেও সালামের জবাব দেয়া যায়। এ ঘটনার দ্বারা বুঝা যায় কেবল ওয়াজিব আদায়ের জন্য নয়, বরং সাধারণভাবে সকল অবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ।

মাসআলাঃ আমাদের মাজহাবের মত হচ্ছে, তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ার পর ওই ওয়াক্তের মধ্যেই যদি পানি পাওয়া যায়, তবুও নামাজ পুনঃ পড়া ওয়াজিব হবে না। কিন্তু আতা, তাউস, মাকহুল, ইবনে সিরীণ এবং জুহরী বলেছেন, পুনঃ পাঠ করা ওয়াজিব হবে। আমাদের পক্ষের দলিল হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত ওই হাদিস— যেখানে বলা হয়েছে, দু' ব্যক্তি ভ্রমণরত ছিলেন। নামাজের সময় হলো। তাঁদের সঙ্গে পানি ছিলো না। তাঁরা দু'জনেই তায়াম্মুম করে নামাজ পড়লেন। এরপর পানি পেলেন। তখন একজন ওজু করে নিয়ে নামাজ পড়লেন। আর একজন পড়লেন না। পরে যখন উভয়ে রসুলেপাক স. এর কাছে এই ঘটনা বললেন, তখন তিনি যে ব্যক্তি নামাজ পরে পড়েননি তাঁকে বললেন, তুমি সুন্নত অনুযায়ী আমল করেছো। তোমার নামাজ পূর্ণ হয়েছে। আর নামাজ

www.eelm.weebly.com

পুনঃপাঠকারীকে বললেন, তুমি দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। আবু দাউদ, নাসাঈ, হাকেম, দারেমী।

মাসআলাঃ যদি শরীরের কোনো কোনো অঙ্গ জখম হয় এবং কোনো কোনো অঙ্গ ভালো থাকে, তবে জখম অংশের জন্য তায়াম্মুম করে নিতে হবে। ভালো অংশ ধুয়ে নিলেই চলবে। এ কথা বলেছেন ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক বলেছেন, যদি আহত অঙ্গের অধিকাংশ ভালো থাকে, তবে সে অংশ ভালো করে ধুয়ে নিয়ে জখম অংশটুকুর উপরে মোসেহ্ করতে হবে। তায়াম্মুম করা যাবে না। আর অধিকাংশ অঙ্গই যদি আহত হয় তবে তায়াম্মুম করে নিবে। পানি দিয়ে তখন কিছুই ধুয়ে নিতে হবে না।

আমরা বলি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিছু অংশ ভালো এবং কিছু অংশ জখম— এ রকম অবস্থায় সে কিন্তু পুরাপুরি অসুস্থ নয়। কাজেই ধৌত করার হুকুম বাদ দেয়া যাবে না। কিন্তু অন্য দিকে সে কিন্তু পুরাপুরি রোগীই। কারণ, সমস্ত শরীরে পানি ব্যবহার করার অবস্থা তার নেই। কাজেই তার জন্য তায়াম্মুম বৈধ হবে। এ মতের সমর্থনে রয়েছে হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে, আমি এক সফরে ছিলাম। আমাদের এক সাথী মাথায় পাথরের আঘাত পেয়েছিলেন। আঘাতের জখম ছিলো তাঁর মাথায়। এমতাবস্থায় তাঁর স্বপ্নদোষ হয়ে গেলো। তিনি সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কী বলো? আমার জন্য তায়াম্মুম বৈধ হবে কি? সাথীরা বললেন, আমাদের ধারণায় বৈধ হবে না। কেননা, তুমি পানি ব্যবহার করতে অসমর্থ নও। তিনি গোসল করলেন এবং গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। রসুল স. এই সংবাদ পেয়ে বললেন, তোমরাই তাকে মেরে ফেলেছো। তোমরা যা জানোনা সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে নিলে না কেনো? তার জন্য তো তায়াম্মুমই যথেষ্ট ছিলো। অথবা জখমের উপর পট্টি বেঁধে শরীরের বাকী অংশ সে ধৌত করে নিয়ে পট্টির উপর মোসেহ্ করতে পারতো। দারা কুতনী, ইবনে জাওজী।

মাসআলাঃ একবার তায়াম্মুম করে নিলে পবিত্রতা ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত যতো ইচ্ছা নামাজ পড়তে পারবে। প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন নতুন তায়াম্মুমের প্রয়োজন নেই। তবে পানি পেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহ্মদের অভিমত হচ্ছে, প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য পৃথক পৃথক তায়াম্মুম করে নিতে হবে। আমাদের দলিল হচ্ছে, রসুল স. বলেছেন, পবিত্র মাটি মুসলমানের ওজু, যদিও দশ বৎসর পর্যন্ত পানি না পাওয়া যায়। হজরত আবু জর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

ইমাম শাফেয়ী তাঁর মতের সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি—যাতে বলা হয়েছে, এক তায়াম্মুম দ্বারা এক ওয়াক্তের অধিক নামাজ না পড়াই সুন্নত। দারা কুতনী, বায়হাকী। রাফেয়ী বলেন, যখন এ বক্তব্যে

www.eelm.weebly.com

'মিনাস্ সুন্নাতে' উল্লেখ রয়েছে, তখন এর অর্থ রসুল স. এর সুন্নতই হবে। কাজেই হাদিসটি মারফু প্রকৃতির। এ প্রসঙ্গে হজরত আলী থেকে ইবনে শায়বা বর্ণিত হাদিসে এসেছে, হজরত আমর বিন আ'স প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য পৃথক তায়াম্মুম করতেন এবং এরকম করার নির্দেশ দিতেন— কাতাদা থেকে এরকম বর্ণনা এনেছেন দারা কুতনী। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজের জন্য নতুন করে তায়াম্মুম করে নিতেন।

আমরা বলি, এ সকল বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদিসের সনদভূত আবু ইয়াহহিয়া এবং হাসান বিন আম্মারাহ্‌কে মাতরুক বলেছেন ইবনে জাওজী। হাসান বলেছেন, তারা অত্যধিক দুর্বল। হজরত আলীর বর্ণনাসূত্রের অন্তর্ভুক্ত হাজ্জাজ বিন আরতাতকে মাতরুক আখ্যা দিয়েছেন ইবনে মাহদী ও কাত্তান। তাদের বর্ণনা দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না —এরকম মন্তব্য করেছেন আহমদ ও দারা কুতনী। ইবনে মুঈন এবং নাসাঈ বলেছেন, তারা বর্ণনাকারী হিসেবে শক্তিশালী নয়। হজরত আমর বিন আস কর্তৃক বর্ণিত আসারটির বর্ণনাসূত্রটি একারণে বিপর্যস্ত যে, তার সঙ্গে কাতাদার রয়েছে অনেক ব্যবধান। আর হজরত ইবনে ওমর থেকে আসারটির বর্ণনাসূত্রের আমের আহওয়াল সম্পর্কে হাদিস বিশেষজ্ঞগণের মন্তব্য রয়েছে বিভিন্ন রকম। তাকে ইমাম আহমদ বলেছেন দুর্বল। আবু হাতেম ও মুসলিম বলেছেন বলিষ্ঠ। শেষ কথা এই যে, এ সকল বর্ণনা মারফু হাদিসের সঙ্গে তুলনীয়ই নয়। তাই আমরা প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন করে তায়াম্মুম করাকে মোস্তাহাব বলে থাকি। হজরত ইবনে আব্বাস যে সুন্নতের কথা বলেছেন, তা মোস্তাহাব অর্থেই। সুন্নতে রসুলুল্লাহ বা ওয়াজিব অর্থে নয়।

মাসআলাঃ যদি পানি অথবা পাক মাটি কোনটাই না পাওয়া যায়, তবে ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে— নামাজ পড়বে না। তবে পরে এর কাজা অবশ্যই আদায় করতে হবে। ইমাম মালেকের অভিমত হচ্ছে নামাজ ছেড়ে দেবে, আর পরে কাজাও আদায় করতে হবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ওই অবস্থাতেই নামাজ পড়ে নেবে। পরে পানি পেলে দ্বিতীয়বার নামাজ পড়া ওয়াজিব হবে। ইমাম আহমদ বলেছেন, এই অবস্থাতে নামাজ পড়বে, পরে পড়া ওয়াজিব হবে না। আমাদের (হানাফিদের) দলিল এই যে, আয়াতে বলা হয়েছে জানাবাতের অবস্থায় নামাজের নিকটে যেয়ো না। এখানে অপবিত্রাবস্থায় নামাজ পড়তে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে গোসল পর্যন্ত, যদি পানি পাওয়া যায়। না পেলে তায়াম্মুম করতে হবে। গোসলও করতে পারে না অথবা তায়াম্মুমও করতে পারে না, যদি এরকম অবস্থা হয় তবুও নিষিদ্ধতা বলবৎ থাকবে। কাজেই নামাজ পড়বে না। যদি কেউ বলে মুসাফির এই নিষিদ্ধতার বাইরে, তখন আমরা বলবো, তায়াম্মুমকারী মুসাফির অবশ্যই এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে। এরকম না হলে তায়াম্মুম ছাড়াই মুসাফিরের জন্য নামাজ পড়া জায়েয

www.eelm.weebly.com

হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী যুক্তি দিয়েছেন, এ রকম মুসাফির সম্পূর্ণতঃই এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে। তাই তাদের জন্য তায়াম্মুম ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে, আর তায়াম্মুম ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হিসেবে এসেছে পবিত্র মাটি। মাটি পেলে তায়াম্মুম করবে, না পেলে তায়াম্মুমের হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। (তাই তিনি তায়াম্মুম ব্যতিরেকে নামাজ পড়ে নেয়ার কথা বলেছেন)। কিন্তু আমরা আমাদের দলিল হিসাবে ওই হাদিসটি তুলে ধরেছি যেখানে বলা হয়েছে—রসুল স. বলেন, আল্লাহ্ পবিত্রতা ব্যতীত কোনো নামাজ কবুল করবেন না। তিরমিজি।

কেউ যদি বলে এই হাদিসের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করতে সক্ষম, পবিত্রতা ব্যতীত আল্লাহ্ তারই নামাজ কবুল করবেন না—তবে আমরা বলবো, এতে করে অপব্যাখ্যা করা হবে। হাদিসের স্পষ্ট অর্থ অপেক্ষা অনুমানকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

আমাদের দ্বিতীয় দলিল ওই হাদিসটি, যার বর্ণনা এরকম—হজরত আম্মার বিন ইয়াসার হজরত ওমরকে বলেছিলেন, আপনার কি ওই ঘটনার কথা মনে আছে—আপনি ও আমি সফরে ছিলাম। তখন আমাদের দু'জনেরই গোসল ফরজ হয়ে গিয়েছিলো। আমি তখন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে শরীরে মাটি লাগিয়ে নিলাম এবং নামাজ পড়লাম। আপনি পড়লেন না। পরে রসুল স. এর নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি বলেছিলেন, আমার জন্য ওইটাই ছিলো যথেষ্ট। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিসে দেখা যায়, রসুল স. হজরত ওমরকে পরে পরিত্যক্ত নামাজ পাঠ করার কথা বলেননি।

ইমাম শাফেয়ী তাঁর অভিমতের সমর্থনে হজরত আয়েশার হাদিস পেশ করেছেন। হজরত আয়েশা হজরত আসমার গলার হার ধার নিয়েছিলেন। ওই হার সফরের সময় হারিয়ে গেলো। হার অনুসন্ধানের জন্য রসুল স. কতিপয় সাহাবীকে নিযুক্ত করলেন। ইত্যবসরে নামাজের সময় হলো। তখন সাহাবীগণ ওজু ছাড়াই নামাজ পড়ে নিলেন। কারণ, তাঁরা তখন পানি পাননি। পরে রসুল স. এর নিকট হাজির হয়ে তাঁরা এই ঘটনাটি বললেন। ওই সময় অবতীর্ণ হলো তায়াম্মুমের আয়াত। উসাইদ বিন হুদাইর হজরত আয়েশাকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আপনি সমস্যায় পড়লে এরকম কখনো হবে না যে, আল্লাহ আপনাকে তাঁর সমাধান না দিবেন এবং মুসলমানদেরকে এর বরকত না দিবেন। বোখারী, মুসলিম।

দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. উঠে দাঁড়ালেন। সকাল হয়ে গেলো। তবু পানি পাওয়া গেলো না। অতঃপর তায়াম্মুমের আয়াত নাজিল হলো। সবাই তায়াম্মুম করলেন। রসুল স. এর নকীব হজরত উসাইদ বিন হুদাইর বললেন, হে আবু বকরের বংশধর এটাই আপনাদের প্রথম বরকত নয়। হজরত আয়েশা বলেন, আমার বাহন উটটি উঠে পড়তেই তার নিচে হারানো হারটি পাওয়া গেলো। এই হাদিস সম্পর্কে আমরা বলি যে, এতে আমাদেরই মতের সমর্থন

www.eelm.weebly.com

রয়েছে। কেননা এর মধ্যে এ কথার উল্লেখ নেই যে, রসুল স. ওজু ছাড়া নামাজ পড়েছেন। এরকম করেছিলেন সাহাবীগণ। তিনি করেননি। আর এ ব্যাপারে রসুল স. এর স্বতন্ত্র কোনো বক্তব্যও নেই। ওজু ছাড়া নামাজ যদি জায়েযই হতো, তবে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সকলে তায়াম্মুম করতেন না।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ওজু ছাড়াই নামাজ ওয়াজিব ছিলো। পরে পুনরাবৃত্তি করা ওয়াজিব হবে এ রকম চিন্তা রীতিবিরুদ্ধ। কারণ, সুনির্দিষ্ট ওয়াক্ত না হলে ওয়াজিব তো হতে পারেই না। এবার ইমাম মালেকের অভিমতটি পর্যালোচনা করা যাক। তিনি বলেছেন, নামাজ পড়বে না। পরে কাজা আদায়ও করতে হবে না। কারণ, ব্যক্তি এখানে দোষী নয়, তাই কাজা আদায় করাও তার জন্য ওয়াজিব নয়। এই অভিমতটি ভুল। কেননা রসুল স. বলেছেন, যে নামাজ বাদ পড়ে যায় তার কাজা আদায় করে নিও। এখানে কার দোষে কেনো নামাজ বাদ পড়লো। সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা হয়নি। নিদ্রিত ব্যক্তির ব্যাপারটিও সেরকম। ঘুমের কারণে নামাজের ওয়াক্ত চলে গেলে সে দোষী হবে না। কিন্তু ঘুম ভাঙার পর তাকে কাজা আদায় করতেই হবে।

আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী। তায়াম্মুমের নির্দেশ প্রদানকারী। তিনি তোমাদের প্রতি অত্যুচ্চ অনুগ্রহ দান করেছেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। তাই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে নেশাসক্ত অবস্থায় এবং জানাবাত অবস্থায় নামাজ পড়ার কারণে যে ত্রুটি তোমাদের হয়েছে, তা তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। ওয়াল্লহু আ'লাম।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৪৪, ৪৫

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ
أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۝ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝

❒ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল? তাহারা ভ্রান্ত পথ ক্রয় করে, এবং তোমরাও পথভ্রষ্ট হও ইহাই তাহারা চাহে।

❒ আল্লাহ তোমাদের শত্রুদিগকে ভালভাবে জানেন। অভিভাবকত্বে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং সাহায্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক লিখেছেন, রেফায়া বিন জায়েদ বিন তাবুত ছিল ইহুদীদের এক বড় সর্দার। সে রসুল স. এর মুখোমুখী হলে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলতো, হে মোহাম্মদ! আপনি কিছুক্ষণ আমার

www.eelm.weebly.com

দিকে আপনার শ্রুতি নিবদ্ধ করুন, যেনো আমি আপনাকে জ্ঞানদান করতে পারি। এরপর সে ইসলামের দোষ বর্ণনা করতো। এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই। আয়াতে সাধারণভাবে সকল ইহুদীকে সম্বোধন করা হয়েছে। সম্বোধনের মাধ্যম হচ্ছে তাদের সর্দার।

এরশাদ হয়েছে, হে শ্রোতা! আপনি কি লক্ষ্য করেননি ওই সকল লোককে যাদেরকে দেয়া হয়েছে কিতাবের কিছু অংশ। ওই সকল লোক বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে মদীনার ইহুদীদেরকে। 'নছিবান' এর তানভিন (দু' জবর) তাদের নিকৃষ্টতাকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আল কিতাব বলে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তওরাতকে। তওরাতের কিছু অংশ অর্থ আক্ষরিক অংশ। অভ্যন্তরীণ অংশ অর্থাৎ তওরাতে বিশ্বাস এবং তওরাত বুঝবার ক্ষমতা তাদেরকে দেয়া হয়নি। তাদের ভাগ্যে জুটেছিলো কেবল তওরাতের মৌখিক আবৃত্তি। তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রষ্টতাকে আহরণ করে নিয়েছে। প্রথমে তাদের বিশ্বাস ছিলো আখেরী জামানায় প্রেরিত হবেন অক্ষরের অমুখাপেক্ষী (উম্মী) নবী। সেই নবীর অসিলায় তারা বিজয়ের জন্য প্রার্থনাও করে আসছিলো। কিন্তু সেই নবী যখন তাদের সম্মুখে এলেন, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো। বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করলো। অবিশ্বাসকে মান্য করলো। আর তারা এই অভিপ্রায়ও অন্তরে পোষণ করতে লাগলো যে, মুসলমানেরাও যেনো তাদের মতো পথহারা হয়ে যায়। 'আলাম তারা' বলে রসুল স. কে প্রশ্নাকারে সম্বোধন করা হয়েছে। এই মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, হে নবী এবং নবীর উম্মতেরা তোমরাতো দেখতেই পাচ্ছো এবং এ বিষয়েও সম্যক অবগত আছো যে, ইহুদীরা তোমাদের প্রতি কিরূপ শত্রুতাপরায়ণ। এ কথা তারা ভালোভাবেই জানে, তোমরাই সত্যানুসারী। কিন্তু তারা তোমাদেরকে মানে না। তারা তোমাদেরকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। সুতরাং তোমরা কখনোই তাদেরকে তোমাদের কল্যাণকামী মনে কোরো না।

আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক। কর্মবিধায়ক। তিনি তাদের সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। আর আল্লাহ্র সাহায্য রয়েছে তোমাদের সঙ্গে। তোমাদের জন্য সাহায্যকারী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। অভিভাবক হিসাবেও যথেষ্ট। কাজেই তোমরা অভিভাবক এবং সাহায্যকারী হিসেবে তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হও। অন্য কাউকে কর্মবিধায়ক বানিয়ো না। অন্যত্র সাহায্যপ্রার্থীও হয়ো না।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৪৬

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا

وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّيْنِ ؕ

وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ

وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

www.eelm.weebly.com

❒ ইহুদীদের মধ্যে কতক লোক কথাগুলির অর্থ বিকৃত করে এবং বলে, 'শ্রবণ করিলাম ও অমান্য করিলাম এবং শোন না শোনার মত;' আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করিয়া এবং দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া বলে, 'রায়িনা'। কিন্তু তাহারা যদি বলিত 'শ্রবণ করিলাম ও মান্য করিলাম এবং শ্রবণ কর ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর' তবে উহা তাহাদের জন্য ভাল ও সংগত হইত। কিন্তু তাহাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। তাহাদের অল্পসংখ্যকই বিশ্বাস করে।

ইহুদীদের কিছু লোক তওরাতের শব্দগুলোকে স্থানচ্যুত করে দেয়। 'আল কালেমা' অর্থ কথা অথবা কথাগুলো। যারা এর অর্থ কথাগুলো (বহুবচন) বলে থাকেন তাদের মত হচ্ছে— এ শব্দটির পূর্বে আরও বিভিন্ন শব্দ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ তারা বিভিন্ন শব্দ অথবা বিভিন্ন কথা স্থানচ্যুত করে ফেলেছে। আল্লামা তাফতাজানী 'আলকালাম' শব্দটিকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, যারা শব্দটিকে বহুবচন বলেন না তাদের বক্তব্য হচ্ছে শব্দটি অভিধানসম্মত নয়। আর যারা বহুবচন বলেন, তাদের কথা হচ্ছে অভিধানসম্মত না হলেও এর অর্থগত দিকটি বহুবচনই হবে। সুতরাং, প্রকৃত অর্থ হবে এরকম, পবিত্র তওরাতে আল্লাহ্ যে শব্দাবলী অবতীর্ণ করেছেন, ইহুদীরা সেগুলোকে স্থানচ্যুত করে ফেলেছে। রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনা সমূহকে তারা তওরাত থেকে সরিয়ে ফেলেছে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেন, তওরাতে হজরত মোহাম্মদ স. এর পবিত্র আকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা ছিলো এরকম— — তাঁর আঁখি যুগল সুরমাশোভিত এবং প্রশস্ত, পবিত্র কেশ একই সঙ্গে সরল ও বঙ্কিম এবং চিত্তাকর্ষক। রসুল স. মদীনায় এলে তাঁকে দেখে ইহুদী আলেমেরা হিংসার আগুনে জ্বলতে শুরু করলো। তারা তখন তওরাতের বর্ণনা পরিবর্তন করে ফেললো। বললো, আমরা এরকম আকৃতি বিশিষ্ট নবীর প্রমাণ পাইনি। সেই প্রতিশ্রুত নবী হবেন দীর্ঘদেহ বিশিষ্ট, নীল চোখ এবং অবিন্যস্ত চুলের অধিকারী। তারা তাদের অধীনস্তদেরকে বললো, ইনি সেই নবী নন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছিলো তাদের উপার্জনের সম্পর্ক। তারা আশংকিত হলো এই ভেবে যে, সাধারণ ইহুদীরা যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে তাদের উপার্জন বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এহেন প্রতারণাকে আশ্রয় করলো তারা। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, ইহুদীরা রসুল স. এর কাছে কিছু প্রশ্ন করতো। তিনি যথা উত্তর দিতেন। উত্তর শুনে মনে হতো তারা বুঝি সন্তুষ্ট হয়েছে এবং রসুল স. এর কথা মেনে নিয়েছে। কিন্তু পৃথক হওয়ার পর তারা রসুল স. এর কথাকে বিকৃত করে ফেলতো। আয়াতে সেদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা শুধু তওরাতের বাণীবৈভবকেই বিকৃত করতো না, রসুল স. এর কথামৃতকেও পরিবর্তন করে ফেলতো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর কথার প্রবৃত্তিপ্রসূত ব্যাখ্যা— যে রকম ব্যাখ্যা করে থাকে এই উম্মতের বেদাতী সম্প্রদায় কোরআনের তাফসীরের নামে। কথা পরিবর্তনের আর একটি

www.eelm.weebly.com

উপায় অবলম্বন করতো তারা, তা হচ্ছে— দ্ব্যর্থবোধক বাক্যাবলীর ব্যবহার। যে সকল বাক্যের প্রশংসা ও অপ্রশংসা, সম্মান ও অসম্মান দু'রকমের ব্যাখ্যাই করা যায়। প্রকাশ্যে প্রশংসা এবং অন্তরালে অপবাদ—এই ছিলো তাদের রীতি। তারা বলতো আমরা শুনলাম, কিন্তু মানলাম না। এতে করে বুঝা যায়, তারা রসুল স. এর কথাকে বিকৃত করতো। তারা তাদের সঙ্গী-সাথীদেরকে বলতো, আমরা মোহাম্মদের কথা শুনেছি, কিন্তু মানি নাই। 'সামীয়না' শব্দের অর্থ শুনলাম। এরকম সংক্ষিপ্ত স্বীকৃতির দু'রকম অর্থ হতে পারে—১. শুনলাম (মান্য করলাম) ২. শুনলাম (কিন্তু মান্য করলাম না)। প্রথম অর্থটি ছিলো তাদের মৌখিক এবং দ্বিতীয়টি ছিলো আন্তরিক।

'শোনো, না শোনার মত'—এ কথার ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেছেন, ইহুদীরা রসুল স. কে বলতো শোনো, অন্তরে বলতো তিনি যেনো না শুনতে পান। তারা অন্তরে অন্তরে বদ-দোয়া করতো রসুল স. যেনো বধির হয়ে যান এবং মরে যান। না শোনার মতো শোনো— এ কথাটিরও বিভিন্ন রকম অর্থ হয়। একথায় সম্মান ও বদ-দোয়া উভয়টিই বুঝায়। এই অর্থে সম্মান বুঝা যায় যে, মন্দ কথা যেনো না শোনো। যেমন এরকম বলা হয়, অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তিকে খুব শুনিয়েছে (মন্দ কথা বলেছে অথবা গালি দিয়েছে)— এরকম কথা না শোনার মতো করে শোনা। আর বদ-দোয়া হবে এই অর্থে যে, শোনার ক্ষমতা যেনো তোমার অপসৃত হয়। যেনো তুমি বধির হয়ে যাও অথবা মরে যাও ইত্যাদি। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, আমাদের কথা শোনো। আমরা বদ-দোয়া করছি, আমরা এমন কথা শোনাবো না, যার দ্বারা তোমরা খুশী হয়ে যেতে পারো। আর এক রকম অর্থ হতে পারে এ রকম—আমাদের কথা তোমরা না শোনার মত করেই শোনো, কারণ তোমাদের কান এ রকম শুনতে পছন্দ করে না।

আর একটি শব্দ তারা ব্যবহার করতো 'রায়িনা'— এ শব্দটিও বহু অর্থবোধক। আরবী ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন এবং আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন। ইবরানী এবং সুরিয়ানী ভাষায় এই শব্দটি একটি গালি। ইহুদীরা একে অপরকে এই শব্দের মাধ্যমে গালি দিতো। এই শব্দটির মাধ্যমে রসুল স.কে অপমান করা এবং তাঁর ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। এ শব্দটি তারা উচ্চারণ করতো জিহ্বা কুঞ্চিত করে অর্থাৎ মুখ বিকৃত করে, সত্যমিথ্যা মিশ্রিত করে, প্রকাশ্য মর্যাদার সঙ্গে অপ্রকাশ্য অমর্যাদাকে মিশিয়ে। তারা মনে করতো রসুল স. যদি সত্যিই নবী হতেন, তবে তাদের এই দ্ব্যর্থবোধক বাক্যাবলী ব্যবহারের উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করতে পারতেন। আল্লাহ্ বলেছেন, কতোইনা উত্তম হতো, যদি তারা অমন অপআচরণ ছেড়ে দিয়ে এ রকম বলতো, আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম এবং আরও বলতো আমাদের কথা শোনো এবং আমাদের দিকে অনুগ্রহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করো।

একটি ধারণাঃ এই আয়াতে 'অভিসম্পাত' কথাটি উল্লেখ করে বেঈমান ইহুদীদের আকৃতি পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতের বর্ণনা থেকে

www.eelm.weebly.com

এর সমর্থন পাওয়া যায়। বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম এই আয়াত শুনে তাঁর গৃহাভিমুখে যাচ্ছিলেন। কিন্তু গৃহে না গিয়ে পুনরায় তিনি রসুল পাক স. এর সকাশে হাজির হলেন। ভয়ে ভয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসুল ! আমার ভয় হচ্ছিলো গাধায় পরিবর্তিত হওয়ার আগে হয়তো আমি আপনার খেদমতে হাজির হতে পারবো না—এই বলে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। হজরত কাব আহবার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে—হজরত ওমরের জামানায় তিনি এই আয়াত শোনার সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেলেন এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, এই আয়াতের অভিসম্পাতের শাস্তি যেনো আমার উপর পতিত না হয়। সকল ইহুদী এখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি, আর আল্লাহ্র অভিসম্পাতও বাস্তবায়িত হয়নি— এর কারণ কী?

ধারণার অপনোদনঃ অভিসম্পাতের এই শাস্তি অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিয়ামতের পূর্বে ইহুদীদের আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আয়াতে উল্লেখিত এই শাস্তির শর্ত ছিলো যে, ইহুদীর মধ্যে কেউ যদি ইমান গ্রহণ না করে, তবেই কেবল অভিসম্পাত কার্যকর হবে। কেউ কেউ ইমান গ্রহণ করলে শাস্তি বলবৎ হবে না। তাদের কারণে ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর আর আযাব আসবে না। এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, এখানে দু'টি আযাবের যে কোনো একটি আপতিত হওয়ার ভয় দেখানো হয়েছে। আকৃতি পরিবর্তনের অভিসম্পাত এবং শুধুই অভিসম্পাত (লানত)। আকৃতি পরিবর্তন না হলেও সাধারণ অভিসম্পাত অবশ্যই পতিত হবে।

আমরা বলি, কাফের ইহুদীদের আকৃতি পরিবর্তিত হবে কিয়ামতের দিন। হজরত মুয়াজ বিন জাবাল থেকে ইবনে আসাকের এবং খতিব লিখেছেন, রসুল স. 'যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন তোমরা দলে দলে সমবেত হবে'— এই আয়াত পাঠ করলেন এবং বললেন, আমার উম্মত কিয়ামতের সময় দশ রকম আকার ধারণ করবে। একদল পাবে বানরের আকৃতি, আরেক দল পাবে শুকরের আকৃতি। একদল পাবে কুকুরের— আরেক দল পাবে গাধার আকৃতি। কিন্তু তারা ছিলো সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। তাই তাদের প্রতি বর্ষিত হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার অভিসম্পাত। আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্যবিহীন ছেড়ে দিয়েছেন এবং দূরে সরিয়ে দিয়েছেন হেদায়েত থেকে।

ইহুদীদের অল্প কয়েকজন ছাড়া অন্য সকলে অবিশ্বাসে অনড় থাকবে। তাই আয়াতের শেষ দিকে আল্লাহ্তায়ালা উল্লেখ করেছেন 'তাদের অল্পসংখ্যকই বিশ্বাস করে।' এই অল্পসংখ্যকদের মধ্যে রয়েছেন হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম এবং তাঁর কতিপয় সঙ্গী। আল্লামা তাফতাজানী বলেছেন, এই অল্পসংখ্যক (ইল্লা কালিলান) ছাড়া বাকি সকলকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত দিয়েছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে ইসহাক লিখেছেন, আবদুল্লাহ্ সুরীয়া, কাব বিন উসাইদ এবং তাদের মতো আরও কয়েকজন ইহুদী আলেমকে রসুল স.

www.eelm.weebly.com

বলেছিলেন— তোমরা তো ভাল করেই জানো, আমি যা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছি তা সম্পূর্ণরূপে সত্য। তারা বলেছিলো, মোহাম্মদ! আমরা এ রকম কিছু জানি না, আমাদের কিতাবে এ রকম কিছু নেই। আমাদের কিতাবে যে নবীর কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে, তুমি সে নবী নও। তাদের এহেন মিথ্যাচারিতার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৪৭

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝

❑ তোমাদের যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তোমরা তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, তোমাদিগকে এমনভাবে পথভ্রষ্ট করার পূর্বে যখন তোমরা আর কখনও বিশ্বাস করিবে না; অথবা শনিবার-অমান্যকারীদিগকে যেরূপ অভিসম্পাত করিয়াছিলাম সেইরূপ তোমাদিগকে অভিসম্পাত করিবার পূর্বে। আল্লাহের আদেশ কার্যকরী হইয়াই থাকে।

এরশাদ হয়েছে, হে আহলে কিতাব! তোমরা কোরআনকে মেনে নাও যা আমি অবতীর্ণ করেছি মোহাম্মদ এর উপর। এই কিতাব তোমাদের উপর অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থক এবং স্বীকৃতিদাতা। আর কখনো তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না— এরকম অবস্থা আসার আগেই বিশ্বাস স্থাপন করো। এই হেদায়েতটির শাব্দিক অর্থ এরকম—তোমাদের মুখগুলো যখন আমি উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেবো, ওরকম অবস্থা আসার আগেই বিশ্বাস স্থাপন করো। 'উজুহান' শব্দটিতে তানবীন সংযোজিত হয়েছে সম্বন্ধ পদের কারণে। এখানে মুখ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেয়া বা চেহারা পরিবর্তনের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে—চিহ্ন মিটিয়ে দেয়া। অর্থাৎ নাক, চোখ, মুখ ও সম্মানকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। আলেমগণ বলেছেন, 'নারুদ্দুহা আলা আদবারিহা'— এর অর্থ মুখের উপর গাধার মতো পশম সৃষ্টি করে দেবো, যেমন বানরের মুখ চুল বিশিষ্ট হয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, ইতোপূর্বে আমি তোমাদের চেহারাকে উটের মুজে'র মতো করে দিয়েছি। কাতাদা এবং জুহাক বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে—দৃষ্টিহীন করে দেয়া। চেহারা অর্থ এখানে চোখ। মুজাহিদ বলেছেন, আকৃতি পরিবর্তন হওয়ার অর্থ হচ্ছে ভ্রষ্টতায় নিপতিত হওয়া, অন্তর্বিকৃতি ঘটে যাওয়া এবং দৃষ্টিবিভ্রম হওয়া। এই অর্থ করা হলে ইমান গ্রহণের পূর্বে ইহুদীরা শুদ্ধ পথেই ছিলো বলে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ইবনে জায়েদ

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, চেহারা পরিবর্তন হওয়ার অর্থ হচ্ছে আমরা তাদেরকে মদীনা থেকে নিশ্চিহ্ন করবো। যেখান থেকে তারা এসেছিলো তাদেরকে সেদিকেই তাড়িয়ে দেবো। এরকমই হয়েছে। বনী নাজিরকে নির্বাসিত করা হয়েছে শামদেশে, আজরায়াতে এবং আরিহায়। অথবা এই আয়াতে ওই অভিসম্পাতের ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে অভিসম্পাত আল্লাহতায়ালা দিয়েছিলেন হজরত দাউদ ও হজরত ঈসার মাধ্যমে। হজরত দাউদের সময় শনিবার ছিলো বিশ্রাম দিবস। ওই দিন মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিলো। ওই নিষেধাজ্ঞা ইহুদীরা অমান্য করেছিলো— তাই তাদের প্রতি নেমে এসেছিলো আকৃতি পরিবর্তনের আযাব।

জ্ঞাতব্যঃ শামদেশের কিছুসংখ্যক বনী ইসরাইল সমুদ্রতীরে বসবাস করতো। মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতো তারা। শনিবার ছিলো তাদের বিশেষ ইবাদতের দিন। নির্দেশ ছিলো, ওই দিন তারা কোনো পার্থিব কাজে লিপ্ত হতে পারবে না। কিন্তু শনিবারেই অত্যধিক মৎস্য সমাগম হতো। সপ্তাহের অন্য ছয়দিন তেমন হতো না। এটা ছিলো তাদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার পরীক্ষা। শেষ পর্যন্ত তারা সংযম প্রদর্শন করতে পারলো না। লোভের বশবর্তী হলো। কৌশল অবলম্বন করলো তারা। তীরভূমিতে বড় বড় পুকুর খনন করলো। জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানিতে ভরে যেতো পুকুরগুলো। সেই সঙ্গে মাছও এসে জমা হতো পুকুরগুলোতে। শনিবার তারা মৎস্য শিকার করতো না বটে— কিন্তু রবিবারে তারা সেগুলোকে ধরে ফেলতো। নবী এবং দ্বীনদার আলেমগণ তাদেরকে এমতো কৌশলানুসারী হতে বারণ করলেন। কিন্তু তারা মানলো না। দুনিয়াদার আলেমেরা তাদের এই অপকর্মকে সমর্থন করে বসলো। কেউ কেউ তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলো, কিন্তু তাদেরকে নিষেধ করলো না এবং তাদের কাজে শরীকও হলো না। শেষ পর্যন্ত সত্যানুসারীরা ছাড়া অন্য সকলের (অপকর্মকারী এবং তাদের সরব ও নীরব সমর্থনকারীদের) উপর নেমে এলে আযাব। আকৃতি পরিবর্তন হয়ে গেলো তাদের। সকলেই পরিণত হলো বানরে।

আল্লাহ্র হুকুম অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়। কেউ একে বাধা দিতে পারে না। হজরত আবু আইয়ুব আনছারী থেকে ইবনে আবী হাতেম এবং তিবরানী লিখেছেন— এক ব্যক্তি রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্র পাপাসক্ত। কিছুতেই সে পাপ থেকে নিবৃত্ত হয় না। রসুল স. বললেন, সে কি ধর্মের কাজ করে? লোকটি বললেন, সে নামাজ পড়ে এবং আল্লাহর এককত্বকে স্বীকার করে। রসুল স. বললেন, তার দ্বীন ক্রয় করো। তাকে বলো, সে যেনো তার দ্বীন তোমাকে দান করে দেয়। অর্থাৎ তাকে বলো সে যেনো তার ধর্মাচরণ— নামাজ, তৌহিদ ইত্যাদি— তোমার কাছে বিক্রয় করে দেয় যদি এতে সে অস্বীকৃত হয় তবে এটাই প্রমাণিত হবে যে, দুনিয়া অপেক্ষা দ্বীনই তার কাছে প্রিয়)। লোকটি রসুল স. এর নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু তার ভ্রাতুষ্পুত্র তার কথায় সম্মত হলো না। তখন ওই ব্যক্তি পুনরায় রসুল পাক স. এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। আমি দেখলাম দ্বীনের ব্যাপারে সে অত্যন্ত লোভী। এর পর অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ○

❐ আল্লাহ্ তাঁহার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; এবং যে কেহ আল্লাহের শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।

আল্লাহ্তায়ালা ওয়াজিবুল ওজুদ (অবশ্যম্ভাবী-অস্তিত্ব)। তিনি আজালী (শাশ্বত), আবাদী (চিরবিদ্যমান) এবং লা ফানী (অবিনাশী)। তিনি ছাড়া উপাস্য কেউ নেই। সুতরাং কেউ যদি তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো কিছুকে সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করায়, তবে সে শিরিক করলো। মৃত্যু পর্যন্ত সে যদি এই শিরিকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে আল্লাহ্ তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। জীবদ্দশায় এই শিরিক থেকে যদি সে প্রত্যাবর্তন করে, তবে আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এটাই ওলামাদের ঐকমত্য।

পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী এমন, যেনো সে কখনও পাপ করেইনি। আল্লাহ্পাক বলেছেন 'হে মোহাম্মদ স.! আপনি কাফেরদেরকে বলে দিন, যদি তারা অবিশ্বাস থেকে বিরত থাকে তবে তাদের অতীত অবিশ্বাস ও পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।' সে পাপ ছোট হোক বা বড় হোক, ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায়। পাপী (মুশরিক নয়) তওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে তাকে ক্ষমা করা না করা আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। এ কথার মাধ্যমে মারজিয়া নামক পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অভিমত ভুল প্রমাণিত হলো। তাদের অসৎ বিশ্বাস ছিলো এই যে, বিশ্বাসীদের সকল গোনাহ্ ক্ষমা করা আবশ্যিক। তারা বলে, ইমান থাকলে গোনাহ্ কোনো ক্ষতি করতে পারে না। যেমন শিরিক থাকলে পুণ্য কর্ম দ্বারা কোনো লাভ হয় না। এ সম্পর্কে আর এক পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় মোতাজিলাদের অভিমত হচ্ছে, ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য তওবা করতেই হবে—এ রকম কথা এ আয়াতে বলা হয়নি। তাই, তওবাকারীর ক্ষমাপ্রাপ্তির সুযোগ এখানে নেই। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, মুশরিক এবং পাপী ইমানদারদের পার্থক্য নির্দেশ করা এই আয়াতের উদ্দেশ্য। বিনা তওবায় মারা গেলে মুশরিকদেরকে ক্ষমা করা হবে না, কিন্তু পাপী ইমানদারের ক্ষমা আল্লাহ্র ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

খারেজীদের অভিমত আরও ভয়াবহ। তারা বলে কোনো পাপীরই ক্ষমা হবে না। শিরিক হোক বা অন্য যে কোনো প্রকারের গোনাহ্ হোক। সকল গোনাহ্র জন্যই নির্ধারিত রয়েছে সার্বক্ষণিক দোজখ (গোনাহ্র ক্ষমা হবেই না)। কিন্তু এই আয়াতের ব্যাখ্যা তাদের অভিমতের প্রতিকূল। আবু ইয়া'লী, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আদী বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে হজরত ইবনে ওমরের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এ রকম— প্রথম দিকে আমরা কবীরা গোনাহকারীদেরকে ক্ষমাপ্রার্থনা (ইস্তেগফার) করতে নিষেধ করতাম। পরে আমরা এ থেকে বিরত হলাম রসুল স. এর নিকট

www.eelm.weebly.com

থেকে এই আয়াতের তেলাওয়াত শুনে। রসুল স. বলেছেন, আমি আমার উম্মতের কবীরা গোনাহকারীদের জন্য শাফায়াত প্রার্থনাকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করে নিয়েছি। আভ্যন্তরীণ কামনা বাসনা মুক্ত হওয়ার জন্য তাদের পক্ষে আমি দোয়া করি এবং দোয়া কবুল হওয়ার আশাও করি।

কালাবীর মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওয়াহশী বিন হারব এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে। ওয়াহশী হজরত হামজাহকে শহীদ করে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ক্রীতদাস। মুক্তির অঙ্গীকার পেয়ে তিনি হজরত হামজাহকে শহীদ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মক্কাবিজয়ের পর চরম অনুশোচনায় পড়ে গেলেন তিনি এবং তার সঙ্গী সাথীরা। তাঁরা নবীপাক স. কে লিখে জানালেন, আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। আমরা মুসলমান হতে চাই। কিন্তু কী লাভ হবে মুসলমান হয়ে? কারণ, আপনার মক্কা অবস্থানকালে আমরা আপনাকে তেলাওয়াত করতে শুনেছি 'এবং যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোনো উপাসককে ডাকবে না (কেবল তারাই মুক্তি পাবে)।' এখন আমাদের উপায় কী? আমরা তো এতোদিন গায়ের আল্লাহ্‌র ইবাদত করেছি। অন্যায়ভাবে হত্যা করেছি এবং ব্যভিচারী হয়েছি। তখন অবতীর্ণ হলো— 'কিন্তু যারা তওবা করে এবং পুণ্য কর্ম করে।' রসুল স. আগের আয়াত এবং এই আয়াতটি লিখে ওয়াহশী এবং তাঁর সাথীদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা পুনরায় রসুল স. কে লিখলেন, এই শর্ত বড়ই কঠিন। আমরা তো কোনো পুণ্য কর্ম করিনি। তাই আমরা ভীতসন্ত্রস্ত। অতঃপর, অবতীর্ণ হলো এই আয়াতটি— 'আল্লাহ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন।' এই আয়াতটিও রসুলপাক স. লিখে তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা জানালেন, এই আয়াতে তো ক্ষমা লাভ আল্লাহর ইচ্ছাধীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের ভয় হয় আমরা হয়তো তাদের অন্তর্ভূক্ত হবো না, যাদেরকে আল্লাহতায়ালা ক্ষমা করতে ইচ্ছে করবেন। এরপর নাজিল হলো এই আয়াত— 'হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর সীমাতিক্রম করেছো......... আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না।' রসুলপাক স. এই আয়াতও পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা তখন সকলেই রসুল স. এর নিকটে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। রসুল স. বললেন, এবার বলো তুমি কীভাবে হামজাকে হত্যা করেছো। ওয়াহশী হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ বিবরণ দিলেন। তিনি স. বললেন, তোমার অকল্যাণ হোক। তুমি আমার সামনে আর এসো না। ওয়াহশী তখন চলে গেলেন শামদেশে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। এ রকম সন্দেহ উত্থাপিত হতে পারে যে, নিশ্চিত ক্ষমাপ্রাপ্তির এই আয়াতটির মাধ্যমে 'যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন'— ওই আয়াতটি রহিত হয়ে গিয়েছে। আর এতে করে মারজিয়াদের অভিমতই সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। কারণ তাদের বক্তব্য হচ্ছে, মুমিনদের জন্য মাগফিরাত (ক্ষমা প্রদান) ওয়াজিব। এই সন্দেহের প্রেক্ষিতে আমরা বলবো, কথিত আয়াতটি রহিত হয়নি। কারণ, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই সংঘটিত হতে পারে না। কাজেই 'হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর সীমাতিক্রম করেছো'—এই আয়াত দ্বারা কেবল এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ কেবল হজরত ওয়াহশী এবং তাঁর সাথীদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে ওমরের উক্তি বাগবী এবং আবু মোয়লাজ এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, যখন 'হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর সীমাতিক্রম করেছো......'—এই আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে শিরিকের বিষয়ে জানতে চাইলেন। রসুলপাক স. নিরুত্তর রইলেন। ওই ব্যক্তি বার বার একই প্রশ্ন করতে লাগলো। তখন নাজিল হলো এই আয়াতটি।

মুতরাফ বিন আবদুল্লাহ্ বিন শাখিরের মাধ্যমে বাগবী হজরত ইবনে ওমরের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এ রকম— রসুল স. এর জামানায় কবীরা গোনাহ্কারী কেউ মৃত্যুবরণ করলে আমরা তাকে দোজখী বলতাম। তখন এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে। আয়াত নাজিলের পর আমরা আর ওইরূপ অসৎ উক্তি করতাম না। বাগবী আরও লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, এ আয়াত কোরআনের সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ আয়াত।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত জাবের থেকে আবু ইয়া'লী, ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন— যে বান্দা শিরিকবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাকে ক্ষমা করা হবে। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাকে আযাব ছাড়াই মাগফিরাত (ক্ষমা) করবেন। আর যদি ইচ্ছে করেন, তবে তাকে শাস্তি দিবেন (শাস্তির মেয়াদ শেষে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)। আয়াতে এ কথাই স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিরিককারীকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করবেন না, কিন্তু শিরিক ব্যতীত অন্যান্য পাপে লিপ্তদেরকে ইচ্ছে করলে ক্ষমা করবেন। হজরত আনাস থেকে আবু ইয়া'লী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন—যাকে আল্লাহ্ সওয়াব প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন, সে নিশ্চয়ই সওয়াব লাভ করবে। কিন্তু যাকে আযাবের ভয় দেখিয়েছেন তাকে তিনি আযাব দিতেও পারেন, নাও পারেন। হজরত সালমান থেকে তিবরানী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ এক প্রকার গোনাহ্ ক্ষমা করবেন না। আর এক প্রকার গোনাহের প্রতিফল না দিয়ে ছাড়বেন না। অন্য আর প্রকারের গোনাহ্ তিনি ক্ষমা করে দিবেন। ক্ষমাহীন গোনাহ্ হচ্ছে শিরিক । যে গোনাহ্র প্রতিফল তিনি অবশ্যই দিবেন তা হচ্ছে, বান্দার হক নষ্ট করার গোনাহ্। আর আল্লাহ্পাক ক্ষমা করবেন তাদেরকে, যারা আল্লাহ্র হক নষ্ট করার কাজে লিপ্ত ছিলো।

যে আল্লাহ্র সঙ্গে শিরিক করে সে মহাপাপী। সে অবশ্যই মিথ্যাচারী, যে আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বের এবং বৈশিষ্ট্যাবলীর সমকক্ষ হিসেবে কোনো কিছুকে নির্ধারণ করে নেয়। নিঃসন্দেহে শিরিক হচ্ছে জুলুম। শিরিকের তুলনায় অন্যান্য যে কোনো গোনাহ্ নিতান্তই নগন্য। শিরিক বৃহত্তম পাপ—এ কথাই এই আয়াতের শেষ শব্দ 'আজিমা'র মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

হজরত জাবের বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন— দু'টি বিষয় অবশ্যম্ভাবী করে দেয়। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! অবশ্যম্ভাবী বস্তু দু'টো কী? তিনি স. বললেন, যে শিরিক না করে মরবে সে জান্নাতে যাবে আর যে শিরিক করে মরবে সে যাবে দোজখে। মুসলিম।

হজরত আবু জর গিফারী বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি ছিলেন শ্বেতবস্ত্র পরিহিত এবং নিদ্রিত। আমি ফিরে এলাম। পরের বার যখন গেলাম, দেখলাম তিনি জাগ্রত। এরশাদ করলেন, আল্লাহ্র

www.eelm.weebly.com

কোনো বান্দা যদি এ কথা বলে— আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং এই বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে সে জান্নাতে যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল ! যদি সে ব্যভিচার করে অথবা চুরি করে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে। আমি পুনরায় বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল ! যদি সে ব্যভিচারী ও চোর হয়? তিনি স. বললেন, যদিও সে ব্যভিচারী ও চোর হয়। আমি আবারও বললাম, হে আল্লাহর রসুল ! যদি সে ব্যভিচারী ও অপহারক হয়—তবু কি সে জান্নাতী? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আবু জরের নাসিকা ধূলি ধূসরিত হলেও (আবু জর পছন্দ না করলেও)। বোখারী, মুসলিম। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হজরত ইবনে আবী হাতেম, ইকরামা, আবু মালেক, মুজাহিদ প্রমুখের বর্ণনা থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, ইহুদীরা তাদের শিশুদেরকে সাথে নিয়ে নামাজ পড়তো, কোরবানীও করতো এবং দাবী করতো আমাদের কোনো গোনাহ্ এবং ভুলত্রুটি নেই। আমাদের দ্বারা কোনো পাপ হয় না। তারা শিশুদের মতো নিজেদেরকেও নিষ্পাপ মনে করতো। তাদের এ মনোভঙ্গীকে নির্দেশ করে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৪৯

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ○

❐ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা নিজদিগকে পবিত্র মনে করে? না, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। এবং তাহাদের উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হইবে না।

ইহুদীরা পবিত্রতার গৌরব করতে অভ্যস্ত। আয়াতে প্রশ্নাকারে এই বিস্ময়টি প্রকাশ করা হয়েছে। অন্য সকলের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই তাদের এই অনর্থক এবং মূর্খজনোচিত দাবীর উদ্দেশ্য। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা তো ওই ব্যক্তি লাভ করবে আল্লাহ যাকে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র করবেন। এ হচ্ছে তাঁর নিছক অনুগ্রহ ও দান।

কালাবীর বক্তব্যসূত্রে বাগবী এবং ছা'লাবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বাহরী বিন আমর, নোমান বিন আওফা, মারহাব বিন জায়েদ প্রমুখ ইহুদীদের উদ্দেশ্যে। তারা তাদের শিশুদেরকে নিয়ে একবার রসুলপাক স. এর দরবারে উপস্থিত হলো। বললো, হে মোহাম্মদ। এ শিশুদের কি কোনো গোনাহ্ আছে? তিনি স. বললেন, না। তারা বললো, আমরা তো এদের মতোই। আমরা দিনে গোনাহ্ করলে রাতে তা মুছে ফেলা হয়, আর রাতে গোনাহ্ করলে দিনে সেগুলোর ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। তাদের এই অপবাক্যের প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে এ আয়াত।

www.eelm.weebly.com

হাসান, জুহাক এবং কাতাদা বর্ণনা করেছেন ইহুদীরা বলতো, আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র এবং প্রিয়পাত্র। খৃষ্টানেরা বলতো, ইহুদী এবং খৃষ্টান ছাড়া আর কেউ বেহেশতে যাবে না। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে এ আয়াত।

আমি বলি, নির্দিষ্ট একটি প্রেক্ষিতকে অবলম্বন করে এই আয়াত নাজিল হলেও এর অর্থ সাধারণ ও ব্যাপক। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আহলে কিতাবগণ (ইহুদী ও খৃষ্টান) নিজেদেরকে নিষ্পাপ বলে থাকে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তারেক বিন শিহাব উল্লেখ করেছেন, ইহুদীদের কোনো কোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি সকালে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এমন ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হতো যার দ্বারা তাদের জীবন ও সম্পদহানীর আশংকা থাকতো। ধর্মপ্রাণ লোকেরা ওই দুষ্ট লোকদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের অনর্থক প্রশংসা বর্ণনায় লিপ্ত হতো। বলতো আল্লাহর কসম তুমি এরকম, তুমি ওরকম ইত্যাদি। এরপর তারা যখন গৃহে ফিরে আসতো, তখন ধার্মিকতা বলে তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না। এ রকম বলার পর হজরত ইবনে মাসউদ এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

মাসআলাঃ নবী রসুল ব্যতীত অন্য কাউকে নিষ্পাপ (মাসুম) মনে করা জায়েয নয়। কেননা, জ্ঞানছাড়া কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। আল্লাহ্‌পাক বলেন, কোনো বিষয়ে না জেনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোরো না। তবে, মুমিনদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা রাখবে। উত্তম ধারণা রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে বটে, কিন্তু কাউকে নিষ্পাপ বলার অধিকার দেয়া হয়নি। নিজেদেরকে এবং সাথীদেরকে নিষ্পাপ মনে করা একটি অহংকারজাত ধারণা। শরিয়তে এরকম করা নিষিদ্ধ। কারণ, এ সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত হতে পারে না যে, আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকে কে কতোটুকু অনুগ্রহ লাভ করেছে। তাই বলা হয়েছে, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। তিনিই পবিত্র করার ক্ষমতাধারী। তিনি মানুষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, ওহী এবং এলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্ যদি কারোর পবিত্রতার সংবাদ দান করেন তবে তা ব্যক্ত করা যেতে পারে। তবে শর্ত হলো, কোনো অবস্থাতেই তা অহংকারপ্রকাশক হতে পারবে না। আত্ম-অহমিকা একটি বৃহৎ কুপ্রবৃত্তি। তাই, রসুল স. তাঁর আপন বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে যে সব বিবরণ দিয়েছেন সেগুলোর শেষে বলেছেন, ইহা গৌরব প্রকাশার্থে নয়। যেমন, তিনি স. বলেছেন, আমি আদম সন্তানদের নেতা—এ কথা গৌরবপ্রকাশক নয়। এ সম্পর্কিত হাদিস সমূহ ইতোপূর্বে সুরা বাকারার তাফসীরব্যপদেশে বর্ণিত হয়েছে। হিংসাসক্ত মুনাফিকেরা রসুল স. সম্পর্কে বলতো তিনি সুষম বণ্টনকারী নন। তিনি স. বলতেন, আল্লাহ্‌র কসম আমার চেয়ে অধিক ইনসাফকারী তোমরা আর কাউকে পাবে না। এই হাদিস হজরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন তিবরানী এবং হাকেম। হজরত আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে— হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর মধ্যম বয়সী বেহেশতবাসীদের সর্দার হবেন এবং যুবক বেহেশতিদের সর্দার হবেন

www.eelm.weebly.com

ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন। আর জান্নাতিনীদের নেত্রী হবেন হজরত ফাতেমা। আওলিয়ায়ে কেরামও এলহামের মাধ্যমে এ ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন। যেমন হজরত গাউসুল আজম বলেছেন, অলি আল্লাহ্গণের স্কন্ধদেশে স্থাপন করা হয়েছে আমার চরণ।

এরপর বলা হয়েছে, তাদের উপর সামান্য জুলুমও করা হবে না। এর অর্থ হচ্ছে— পবিত্রতা অর্জনের সাধনায় লিপ্ত ব্যক্তিরা তাদের উপযুক্ত বিনিময় লাভ করবে। তাদের প্রতিদান কখনও কম করা হবে না। যে পবিত্রতা লাভের উপযুক্ত, আল্লাহ্ তাকে পবিত্র করবেন। যে উপযুক্ত নয় তাকে করবেন না। আর একটি অর্থ এই যে, যারা দর্পবশতঃ পবিত্রতার দাবী উত্থাপন করে তাদের অপরাধানুসারে শাস্তি নির্ধারণ করা হবে। অপরাধ কমবেশী করে তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।

'ফাতিলা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ সূঁচের অগ্রভাগ। কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ খেজুর দানার অর্ধাংশ। অর্থাৎ সূঁচের অগ্রভাগতুল্য অথবা খেজুর দানার অর্ধাংশতুল্য কোনো জুলুমও আল্লাহ্ কর্তৃক সংঘটিত হয় না। হতে পারে না।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫০

انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۚ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

❑ দেখ! তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা উদ্ভাবন করে; এবং প্রকাশ্য পাপ হিসাবে ইহাই যথেষ্ট।

এরশাদ হয়েছে— হে নবী! আপনি দেখুন ইহুদীরা কিরূপ মিথ্যা উদ্ভাবনকারী! তারা নিজদেরকে আল্লাহ্র পুত্র এবং প্রিয়পাত্র বলছে। দাবী করছে, তাদের দিনের পাপ রাতে এবং রাতের পাপ দিনে ক্ষমা করে দেয়া হয়। তাদের এই মহাপাপ সুস্পষ্ট এবং সর্বসমক্ষে প্রকাশিত।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, উহুদ যুদ্ধের পর ইহুদীদের নেতা কাব ইবনে আশরাফ তার সত্তরজন অনুসারী নিয়ে মক্কায় গিয়ে কোরায়েশদের সঙ্গে মিলিত হলো। সে কোরায়েশদেরকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে অনুপ্রাণিত করলো। ইতোপূর্বে রসুল স. এর সঙ্গে কৃত তাদের অঙ্গীকারকে তারা ভঙ্গ করলো। কাব সরাসরি কথা বললো আবু সুফিয়ানের সঙ্গে এবং অন্য কোরায়েশদের সঙ্গে কথোপকথন শুরু করলো তার সঙ্গীরা। মক্কাবাসীরা বললো, তোমরা আহলে কিতাব। মোহাম্মদও আহলে কিতাব। তবে তার বিরুদ্ধে তোমরা চক্রান্ত করছো কেনো? যদি তোমরা আমাদের সাথে মিলিত হয়ে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাও, তবে বিশ্বাসভাজনতার প্রমাণ দাও। তোমরা যে আমাদের আস্থাভাজন হবে তার প্রমাণ স্বরূপ আমাদের প্রতিমাগুলোকে সেজদা করো। কাব তাদের কথামতো প্রতিমাগুলোকে প্রণতি জানালো। তারপর বললো, তোমাদের অন্তরতো প্রশান্ত

www.eelm.weebly.com

হলো, এখন আমাদের মনের প্রশান্তির জন্য এই কাজটি করা হোক। তোমাদের তিরিশজন এবং আমাদের তিরিশজন মিলে কাবা গৃহে দাঁড়িয়ে এই মর্মে শপথ উচ্চারণ করুক যে, আমরা একত্র হয়ে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। কোরায়েশরা সম্মত হলো। অনুষ্ঠিত হলো তাদের অসৎ শপথের পাপানুষ্ঠান।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫১

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ○

❑ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল; 'তাহারা জিব্‌ত ও তাগুতে বিশ্বাস করে; তাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের সম্বন্ধে বলে যে, ইহাদেরই পথ বিশ্বাসীদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর।'

আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয়তম নবীকে জানাচ্ছেন, দেখুন তাদের অবস্থা। তাদেরকে আসমানী কিতাব দেয়া হয়েছে অথচ তারা আজ প্রণতিপাত জানাচ্ছে জিব্‌ত ও তাগুত মূর্তিদ্বয়কে। তারা এখন সম্পূর্ণতঃই শয়তানের অনুরাগী।

দালায়েল গ্রন্থে বায়হাকী এবং হজরত ইবনে আব্বাস প্রমুখের মাধ্যমে তিবরানী লিখেছেন, জিব্‌ত ও তাগুতের অর্থ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইকরামা হতে বর্ণিত হয়েছে, জিব্‌ত ও তাগুত হচ্ছে কোরায়েশদের দু'টি পূজনীয় প্রতিমা। ইকরামার বর্ণনায় আরও রয়েছে, হাবশী ভাষায় জিব্‌ত অর্থ শয়তান। আমি বলি, শয়তানের নামেই সম্ভবতঃ ওই প্রতিমার নাম রাখা হয়েছিলো। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বাতিল উপাস্যদেরকে জিব্‌ত ও তাগুত বলা হয়। কিন্তু তাগুত ও জিব্‌ত দু'টি পৃথক শব্দ এবং এর মাধ্যমে শব্দ দু'টিকে পৃথকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে করে বুঝা যায়, দু'টি শব্দের অর্থ একীভূত হবে না। শব্দ যেহেতু দু'টি । তাই অর্থও হবে দু'রকম।

গ্রন্থকার নিশ্চিতির সঙ্গে বলছেন, জিব্‌ত শব্দটির আসল অর্থ জাবাত। জাবাত ওই ব্যক্তিকে বলা হয় যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। তাগুত শব্দটি নিঃসৃত হয়েছে তুগইয়ান হতে। তুগইয়ান অর্থ অবিশ্বাস এবং সীমালজ্ঘন। কামুস ও সিহাহ্। এ কারণেই ইহুদী হুয়াই বিন আখতাবকে জিব্‌ত এবং কাব বিন আশরাফকে তাগুত বলা হয়। জুহাক, ওমর, শায়বী এবং মুজাহিদ বলেছেন, জিব্‌ত অর্থ যাদু এবং তাগুত অর্থ শয়তান। মোহাম্মদ বিন সিরীন বলেছেন, জিব্‌ত মানে গণক এবং তাগুত মানে যাদুকর। সাঈদ বিন জোবায়ের এবং আবুল আলিয়া বলেছেন, জিব্‌ত অর্থ যাদুকর এবং তাগুত অর্থ গুণিন। হজরত কাবিসা থেকে স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইয়াফত পাখির চলাচল এবং তুরক পাথর ছুঁড়ে মারাকে অশুভ ধারণা করা জিব্‌ত। এগুলোতে কোনো কল্যাণ নেই।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, জিব্‌তের প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে মূর্তি যা অবশ্যই কল্যাণরহিত এবং তাগুত অর্থ হচ্ছে মূর্তিকে আশ্রয়কারী শয়তান, যে মূর্তির অভ্যন্তর থেকে কথা বলে মানুষকে প্রতারিত করে। মূর্তিপূজারীরা মূর্তির অন্তরালবর্তী শয়তানের কথাকেই মূর্তির কথা বলে মনে করে। হজরত আবু তোফায়েল থেকে বায়হাকী লিখেছেন, মক্কাবিজয়ের দিন রসুল স. হজরত খালেদ বিন ওলিদকে উজ্জা নামক প্রতিমাটিকে ধ্বংস করতে পাঠালেন। হজরত খালেদ প্রতিমাসংলগ্ন বাবুল বৃক্ষটি কেটে ফেললেন এবং ফিরে এসে রসুল স. কে এই সংবাদ দিলেন। রসুল স. বললেন, তুমি কি কিছু দেখেছো? হজরত খালেদ বললেন, না। রসুল স. বললেন, তুমি তো উজ্জাকে ধ্বংস করতে পারোনি। হজরত খালেদ পুনরায় রওনা হলেন। দূর থেকে তাকে দেখে উজ্জা পূজারীরা পাহাড়ের দিকে চলে গেলো। তারা বলতে বলতে যাচ্ছিলো, উজ্জা তোমাকে অন্ধ করে দেবে। তুমি লাঞ্ছনার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবে। এমন সময় হজরত খালেদের সামনে আবির্ভূত হলো এক কালো নগ্ন এলোকেশী মহিলা। সে তার মাথায়, মুখে মাটি মাখতে লাগলো। হজরত খালেদ অসি উত্তোলন করে বললেন, আমি তোমাকে অস্বীকার করছি। তোমার তথাকথিত পবিত্রতাকে অমান্য করছি। আমি দেখছি, আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। অতঃপর তিনি কালো মহিলাটিকে দ্বিখণ্ডিত করলেন এবং ফিরে এসে রসুল স. কে এই সংবাদ দিলেন। হ্যাঁ, এই সেই উজ্জা। এবার থেকে তোমাদের রাজ্যে তার পূজা বন্ধ হয়ে গেলো। এ রকম বলা হয়েছে সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম আহমদ এবং ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, যখন কাব বিন আশরাফ মক্কায় পৌঁছলো, তখন কোরায়েশরা তাকে বললো— দেখো! মোহাম্মদ দাবী করছে তারা আমাদের চেয়ে উত্তম। অথচ আমরা হজের মোতওয়াল্লী, কাবার তত্ত্বাবধায়ক। আমরা হাজীদেরকে পানি পান করাই। কাব বললো, তাদের কথা ঠিক নয়। তোমরাই তাদের চেয়ে উত্তম। অতঃপর অবতীর্ণ হলো— 'ইন্না শানি য়াকা হুয়াল আবতার।'

কাব বিন আশরাফের বর্ণিত মিথ্যা ভাষণের দিকে ইঙ্গিত করে এই আয়াতে তাই বলা হয়েছে—দেখ, কী ঘৃণ্য তাদের মনোভাব। তারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারিদেরকে বলে, তোমরাই সঠিক পথে রয়েছো। তোমরাই বিশ্বাসীদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মোহাম্মদ বিন ইসহাক লিখেছেন, রসুল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কোরায়েশ, বনী গাতফান এবং বনী কুরায়জা একত্রিত হলো। এর সঙ্গে যোগ দিলো বনী নাজির গোত্রের হুয়াই বিন আখতাব, সালাম বিন আবিল হাকীক, আবু রাফে, রবী বিন আবিল হাকীক, আবু আম্মারা এবং হাওদা বিন কায়েস। যখন এরা সবাই কোরায়েশদের নিকট পৌঁছলো তখন কোরায়েশেরা বললো, এরা ইহুদী সমাজের আলেম। তোমরা এদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো, কার ধর্ম উত্তম। আমাদের না মোহাম্মদের। কোরায়েশরা প্রশ্ন করলো। ইহুদী আলেমেরা জবাব দিলো, তাদের ধর্মাপেক্ষা তোমাদের ধর্মই

www.eelm.weebly.com

উত্তম। মোহাম্মদ এবং তার সঙ্গীরা নয়, তোমরাই সঠিক পথে আছো। এরপর আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন এই আয়াত 'মুলকান আজিমা' পর্যন্ত।

বাগবী লিখেছেন, আবু সুফিয়ান যখন বর্ণিত প্রশ্ন উত্থাপন করলো তখন ক'াব বললো, তোমাদের ধর্মের পরিচয় দাও। আবু সুফিয়ান বললো, আমরা হাজীদের আতিথেয়তার জন্য উঁচু পিঠ বিশিষ্ট উষ্ট্রী জবাই করি। তাদেরকে পানি পান করাই এবং অতিথিদের অন্যান্য ব্যবস্থাপনাও নিশ্চিত করি। আরও অনেক কাজ করি আমরা। যেমন— বন্দীদেরকে মুক্ত করি, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখি, আমাদের প্রতিপালকের এই গৃহ আবাদ রাখি এবং এর তাওয়াফ করে থাকি। আর আমরা হারামের অধিবাসী। মোহাম্মদতো বাপ-দাদাদের ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে। আত্মীয়তার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলেছে এবং এ হেরেম ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমাদের ধর্ম পুরাতন আর মোহাম্মদের ধর্ম নতুন। আবু সুফিয়ানের কথা শুনে কাব বললো, আল্লাহ্র কসম! তোমরা মোহাম্মদের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ পথানুসারী।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫২

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ○

❐ ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ যাহাকে অভিসম্পাত করেন তুমি কখনও তাহার কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

এরশাদ হয়েছে, ওই সমস্ত লোকের উপরেই আল্লাহ্র অভিসম্পাত (লানত)। আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয়তম নবীকে লক্ষ্য করে বলছেন, দুনিয়া অথবা আখেরাত কোনোখানেই আপনি তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী দেখতে পাবেন না। যুদ্ধলিপ্ত হলে তারা যেমন সাহায্য পাবে না, তেমনি আখেরাতে শাফায়াতের মাধ্যমেও কেউ তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। ইহুদী এবং মক্কার মুশরিকদের অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে এই আয়াতে। এটাই তাদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার অভিসম্পাত নেমে আসার কারণ।

কৃপণতা, হিংসা অত্যন্ত মন্দ স্বভাব। পরবর্তী আয়াতে ইহুদীদের এসমস্ত মন্দ স্বভাবকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫৩

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ○

❐ তবে কি তাহাদের রাজ-শক্তিতে কোন অংশ আছে! সেক্ষেত্রেও তো তাহারা কাহাকেও এক কপর্দকও দিবে না।

ইহুদীদের ধারণা ছিলো, তারা অতিসত্ত্বর রাজত্বের অধিকারী হয়ে যাবে। এই আয়াতের মাধ্যমে তাদের সে ধারণাকে ধূলিসাৎ করে দেয়া হয়েছে। রসুল স. এর

www.eelm.weebly.com

মদীনায় আগমনের পর রাজত্বের অভিলাষ তাদের অন্তর্হিত হয়ে গেলো। তারা আতংকিত হলো এই ভেবে যে, রাজত্ব তো অনেক দূরের কথা এখন যেটুকু সামাজিক নেতৃত্ব রয়েছে সেটুকুই রক্ষা করা দায় হয়ে গেলো। এরকম অসৎ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা রসুল স. এর বিরোধীতায় অনড় অবস্থান গ্রহণ করলো। তারা নেতৃত্বাকাঙ্খী কিন্তু যোগ্যতারহিত। নেতাকে হতে হয় উদার, দানশীল। কিন্তু তারা কৃপণতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আল্লাহ্পাক তাই বলেছেন, তারা কীভাবে নেতৃত্ব, কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারে— যারা অভাবগ্রস্তকে এক কানাকড়িও দিতে সম্মত হয় না। এরকম সংকীর্ণচিত্তদেরকে আল্লাহ্ কেনো রাজ্যাধিকারী করবেন? এখনই তারা এরকম কৃপণ। রাজ্য পেলে তো আরও কৃপণ হয়ে যাবে।

হজরত ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে হজরত ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, ইহুদীরা বলতে শুরু করলো, এই তো হলো মোহাম্মদ। যার রয়েছে নয়টি স্ত্রী। কোনো রাজা বাদশাও তো তার চেয়ে অধিক আরামে আয়েশে থাকে না। তাদের এই হিংসাচ্ছন্নতাকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫৪

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ۝

❑ অথবা আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যাহা দিয়াছেন সে জন্য কি তাহারা তাহাদিগকে ঈর্ষা করে? ইব্রাহীমের বংশধরকেও তো কিতাব ও হিকমত প্রদান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বিশাল রাজ্য দান করিয়াছিলাম।

হজরত রসুলুল্লাহ্ স. এর প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ দেখে ইহুদীরা হিংসানলে দগ্ধিভূত হতে শুরু করলো। ইহুদীরা সকলেই ছিলো হিংসুক। এখানে 'আন্ নাস' (মানুষ) শব্দটির মাধ্যমে রসুল স. এর কথা বলা হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান এবং তাদের অনুসারী একটি দলের বক্তব্য হচ্ছে—ইহুদীদের হিংসার কারণ রসুল স. এর পবিত্র জীবন সঙ্গিনীগণ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'আন্ নাস' শব্দটির দ্বারা রসুল স. এর সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কাতাদা বলেছেন, 'আন্নাস' শব্দের অর্থ হবে সমগ্র আরববাসী। আল্লাহ্পাক আরবদের মাঝে নবী পাঠিয়েছেন, তাদেরকে সম্মানিত করেছেন, এই ছিলো ইহুদীদের হিংসার মূল কারণ। কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'আন্নাস' হচ্ছে ওই সকল মানুষ যারা রসুল স. এর নবুওয়াতকে মেনে নিয়ে পথপ্রাপ্ত হয়েছে এবং পূর্ণত্ব লাভ করেছে। এ ধরনের সকল মানুষই তাদের হিংসার কারণ। ইহুদীরা দেখতে পেলো নবুওয়াত, কিতাব, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, যুদ্ধবিজয়, পৃথিবীর সম্মান, পবিত্র স্ত্রী, আকাঙ্খিত হালাল বস্তু, প্রতিশ্রুত নবী—সকল কিছুই তাদের গোত্র

www.eelm.weebly.com

এবং সমাজের বাইরে। এ সমস্ত দেখে হিংসাগ্নিতে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো তারা।

আল্লাহ্তায়ালা জানাচ্ছেন, তিনি হজরত ইব্রাহিমের বংশধরকেও কিতাব ও এলেম দান করেছিলেন। দিয়েছিলেন বিশাল রাজত্বের অধিকার। 'আলে ইবরাহিম' (ইব্রাহিমের বংশধর) বলতে এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে মোহাম্মদ স. এর সম্মানিত পূর্ব পুরুষ হজরত ইসমাইল আ., হজরত ইসহাক আ., হজরত ইয়াকুব আ. এবং বনী ইসরাইলের নবীগণকে। 'আল কিতাব' শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে তওরাত, ইঞ্জিল ও যবুর শরীফকে। 'আল হিকমাতা' দ্বারা ইঙ্গিত হয়েছে এলমে লাদুন্নিকে—যে জ্ঞান তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো কিতাব ব্যতিরেকেই। রাজত্বের অধিকার বলে বুঝানো হয়েছে হজরত ইউসুফ, হজরত দাউদ এবং হজরত সুলায়মানের সাম্রাজ্যকে। এ সমস্ত বিবরণ দিয়ে আল্লাহ্ ইহুদীদেরকে যে কথা জানিয়ে দিতে চেয়েছেন তা হচ্ছে— মোহাম্মদ স. এর সম্মানিত পূর্বপুরুষগণকে আল্লাহ্ যে বিশাল রাজত্বের অধিকার দিয়েছিলেন, প্রিয়তম নবী মোহাম্মদ স. কে তিনি তদপেক্ষা উত্তম সাম্রাজ্য তো দিতেই পারেন। হজরত সুলায়মানের পত্নী সংখ্যা ছিলো এক হাজার। বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন তিনশত এবং সাতশত ছিলেন বৈধ ক্রীতদাসী। হজরত দাউদের স্ত্রী ছিলেন একশত। আর মোহাম্মদ স. এর পত্নী মাত্র নয়জন।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ইহুদীরা নিশ্চুপ হয়ে গেলো। তখন থেকে তারা রসুল স. এর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তাঁকে প্রদত্ত অন্যান্য নেয়ামতের উপমা দেয়া ছেড়ে ছিলো (রসুল স. কে দোষারোপ করার সুযোগ আর তাদের রইলো না)।

এই বিষয়টির আর একটি ব্যাখ্যা এ রকম হতে পারে যে—হজরত ইব্রাহিমের বংশধরকে আমি নবুওয়াত, হেকমত ও রাজত্বদান করেছি। তাঁদের শত্রুরা ছিলো অধিকতর শক্তিধর। নমরূদ, ফেরাউন, কারুন, হামান সকলেই তাঁদেরকে হিংসা করতো। কিন্তু হিংসাকারীদের হিংসা হজরত ইব্রাহিমের বংশধরদের কোনোই ক্ষতি করতে পারে নি। ঠিক তেমনি তোমাদের হিংসাও মোহাম্মদ স. এবং তাঁর সহচরদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫৫

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ○

❒ অতঃপর তাহাদের কতক উহাতে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং কতক উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল; দগ্ধ করার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট।

কতিপয় ইহুদী বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো—এ কথার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম এবং তাঁর সঙ্গীগণকে। তাঁরা ইহুদী ধর্মমত ছেড়ে দিয়েছেন। আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন ইসলাম। এ বাক্যটির এ রকমও

www.eelm.weebly.com

অর্থ হওয়া সম্ভব যে, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্পাক ইব্রাহিমের বংশধরকে যে নবুওয়াত, হেকমত ও রাজত্বদানের কথা উল্লেখ করেছেন, কতিপয় ইহুদী সে সত্য ভাষণটিকে স্বীকার করে নিয়েছে।

এরপরে বলা হয়েছে 'ওয়ামীনহুম মান সাদ্দা আনহু'—অর্থ তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ইমাম সুদ্দী লিখেছেন, 'বিহি' এবং 'আনহু' সর্বনামদ্বয় হজরত ইব্রাহিমের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ কিছু লোক হজরত ইব্রাহিমের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো। এবং কিছু লোক হজরত ইব্রাহিমের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো এবং কিছু লোক করেনি। প্রাসঙ্গিক ঘটনাটি এই—একবার হজরত ইব্রাহিম তাঁর জমিতে শস্য বপণ করলেন। অন্যান্য লোকেরাও শস্য বপন করলো। সকলের ফসল ধ্বংস হয়ে গেলো। কেবল হজরত ইব্রাহিমের জমিতে অতিরিক্ত ফলন হলো। সহায়হীন লোকেরা তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হলো। হজরত ইব্রাহিম বললেন, আমি শস্য দান করবো তাদেরকে, যারা আমার নবুওয়াতকে মান্য করবে। একথা শুনে কিছু লোক ইমান আনলো। তিনি তাঁদেরকে ফসল দিলেন। যারা ইমান আনলো না, তিনি তাদেরকে কিছুই দিলেন না। এই প্রেক্ষিতের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ হবে এই—হজরত ইব্রাহিমের প্রতি অবিশ্বাসীরা যেমন ইমান না আনায় কোনো ক্ষতি হয়নি, তেমনি হে প্রিয়তম নবী! হতভাগ্য ইহুদীদের অস্বীকৃতি আপনার সুমহান কর্মকাণ্ডকে তেমনি নিস্তেজ করতে পারবে না। তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নামের লেলিহান শাস্তি। সুতরাং দুনিয়াতে শাস্তি বিলম্বিত হলে অসুবিধার কিছু নেই।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫৬

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ○

❒ যাহারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবই; যখনই তাহাদের চর্ম দগ্ধ হইবে তখনই উহার স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করিব, যাহাতে তাহারা শাস্তি ভোগ করে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

যারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত। এই আয়াতের বিবরণ পূর্ববর্তী আয়াতটির ব্যাখ্যার সহায়তা করেছে। বলা হয়েছে, যখন তাদের গায়ের চামড়া দগ্ধ হবে তখন নতুন চামড়া সৃষ্টি করে দেয়া হবে। যেমন আরববাসীগণ বলে থাকে, আমি আংটিকে বালিতে (কানের অলংকার বিশেষ) পরিবর্তিত করেছি। অবিশ্বাসীদের দোজখাযাব হবে

www.eelm.weebly.com

সেরকমই। দগ্ধীভূত চামড়ার স্থলে সৃষ্টি করে দেয়া হবে নতুন চামড়া যাতে করে তারা পুনঃ পুনঃ আযাব ভোগ করতে পারে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাদের চামড়া কাগজের ন্যায় শাদা করে দেয়া হবে। বাগবী। হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে আবী হাতেমও এরকম তাফসীর করেছেন। হজরত ইবনে ওমর থেকে তিবরানী, ইবনে মারদুবিয়া এবং ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন— হজরত ওমরের সামনে এই আয়াত পাঠ করা হলো। হজরত মুয়াজ বললেন, আমি এই আয়াতের ব্যাখ্যা জানি। ব্যাখ্যাটি এই— এক ঘণ্টার মধ্যে একশতবার তাদের চামড়া পরিবর্তন করে দেয়া হবে। হজরত ওমর তখন বললেন, আমি রসুল স. এর নিকট এরূপই শুনেছি। দ্বিতীয় বর্ণনায় হজরত মুয়াজের স্থলে হজরত উবাই এর সঙ্গে এই আয়াতটির ব্যাখ্যা সূত্রবদ্ধ হয়েছে। আবু নাঈমের হুলিয়ায় এবং ইবনে মারদুবিয়ার অন্য একটি সূত্রে বলা হয়েছে— এক ঘণ্টায় একশত বিশবার চামড়া পরিবর্তিত হবে। বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে—— চামড়াগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং তদস্থলে দেয়া হবে নতুন চামড়া। এরকম করা হবে এক ঘণ্টায় ছয় হাজার বার। হাসান বসরীর বক্তব্যানুসারে বায়হাকী আরও বলেছেন, এক ঘন্টায় সত্তর হাজার বার চামড়া পরিবর্তিত হবে। প্রতিবারের জন্যই জারী হবে নতুন নতুন হুকুম। সেই হুকুমানুযায়ী পুনঃ পুনঃ চামড়া পরিবর্তিত হবে।

হজরত হোজায়ফার উক্তি অনুসারে ইবনে আবিদ্‌দুনিয়া লিখেছেন, জাহান্নামের আগুনের ভিতরে থাকবে হিংস্র প্রাণীকূল, আগুনের কুকুর, আগুনের কাঁটা এবং আগুনের তরবারী। কাফেরদের শরীরের জোড়া কেটে কেটে হিংস্র প্রাণী ও কুকুরের সামনে রাখা হবে। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলার সাথে সাথে তৈরী হয়ে যাবে নতুন নতুন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আমি বলি, আগের অঙ্গের বদলে তৈরী হবে নতুন অঙ্গ এবং আগের চামড়ার স্থলে স্থাপন করা হবে নতুন চামড়া। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, দ্বিতীয় বারের চামড়া প্রথম বারের মতো হবে না (প্রতিবারে পুরোনো চামড়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থলে নতুন নতুন চামড়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুনঃ স্থাপিত হবে)। প্রকৃতপক্ষে, শাস্তি অনুভব করবে নফস। প্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শাস্তি অনুভব করার উপকরণ বা মাধ্যম। আবদুল আজিজ বিন ইয়াহ্‌ইয়া বলেছেন, আল্লাহ্ দোজখীদেরকে এমন চামড়ার পোশাক পরিধান করাবেন, যার যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত শরীরে। যন্ত্রণা ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। চামড়া পুড়ে গেলে তদস্থলে আসবে নতুন চামড়া। এভাবেই ঘটতে থাকবে শাস্তির পুনরাবৃত্তি। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'পাজামার কোনো ব্যথা হবে না বরং ব্যথা পৌঁছে যাবে সমস্ত শরীরে।' বিরতিহীন শাস্তি দানের জন্য এই ব্যবস্থা। নফসকে শায়েস্তা করার জন্যই এ আয়োজন।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দ্রুতগামী অশ্বের তিনদিন ছুটে চলার পথের সমান হবে কাফেরদের দুই স্কন্ধের দূরত্ব। বোখারী, মুসলিম। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, কাফেরদের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মতো বিশাল এবং তাদের চামড়া পুরু হবে তিনদিনের পথের সমান। মুসলিম। ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে—কিয়ামতের দিন কাফেরদের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের চেয়ে বড়। তাদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করা হবে। তিরমিজি এবং বায়হাকীর বিবরণে রয়েছে— পাহাড়ের মতো বিশাল হবে কাফেরদের উরু। জাহান্নামী কাফেরদের উপবেশনের স্থান হবে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী স্থানের সমপরিমাণ। বিয়াল্লিশ গজ পুরু চামড়া হবে তাদের। আহমদ, তিরমিজি, হাকেম এবং বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে—কাফেরদের চামড়া হবে সত্তর গজ চওড়া। বাহু হবে জাবালে নূর পর্বতের মতো এবং উরুদেশ হবে ওয়ারাকান পাহাড়ের সমান।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন দোজখীদের শরীর হবে বিশাল। তাদের কানের লতি থেকে স্কন্ধদেশের দূরত্ব হবে সাত বছরের পথ সমতুল্য। চামড়া হবে সত্তর গজ মোটা এবং দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান। হজরত ইবনে ওমর থেকে মারফু পদ্ধতিতে— তিরমিজি, বায়হাকী এবং হান্নাদ উল্লেখ করেছেন, তাদের মুখাবয়ব হবে দুই ফারসাখ (তিন মাইলে এক ফারসাখ হয়)। এক এবং দুই ফারসাখের কথা তিরমিজির বর্ণনাতেও এসেছে। হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যের অনুসৃতিতে আহমদ এবং হাকেম বলেছেন, অনেক দোজখীদের কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত দূরত্ব হবে চল্লিশ বছরের পথের সমান। তার মধ্যে প্রবহমান থাকবে রক্তের নহর। বর্ণনাকারীকে জিজ্ঞেস করা হলো, রক্তের নহর মানে কি রক্তের সমুদ্র? তিনি উত্তর দিলেন, না। সমুদ্র নয়, উপত্যকা।

'আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' এ কথার অর্থ — আল্লাহ্ পরম পরাক্রমশালী। তিনি যা চান তাই হয়। হতে বাধ্য। তার ইচ্ছাকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারোরই নেই। আর তিনি প্রজ্ঞাময়ও। উপযুক্ত শাস্তি প্রদান তাঁর প্রজ্ঞাময়তার নিদর্শন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫৭

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

www.eelm.weebly.com

❑ যাহারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তাহাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে, সেখানে তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গী থাকিবে এবং তাহাদিগকে চির স্নিগ্ধ ছায়ায় দাখিল করিব।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হাকেম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতীদের পত্নীরা ঋতুস্রাব, মলমূত্র, নাকের সর্দি এবং থুথু থেকে পবিত্র থাকবে। মুজাহিদের উক্তি হান্নাদ উপস্থাপন করেছেন এভাবে— তারা ঋতুস্রাব, মলমূত্র, নাকের পানি, থুথু -কফ, গর্ভধারণ এবং বীর্য থেকে পবিত্র হবে। আতার বর্ণনায়ও এ সকল কথা বলা হয়েছে।

চিরস্নিগ্ধ সুপ্রসারিত ছায়ায় থাকবে বেহেশতবাসীরা। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন— জান্নাতের একটি গাছের ছায়া একশ' বছর ভ্রমণ করেও শেষ করা যাবে না। যদি তোমরা এর প্রমাণ চাও তবে এ আয়াতটি পাঠ করো— 'এবং সুবিস্তৃত ছায়া থাকবে।' বোখারী, মুসলিম।

হজরত রবী বিন আনাস থেকে ইবনে আবী হাতেম এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ওই ছায়া হবে আরশের ছায়া যা কখনও অপসৃত হবে না।

আয়াতের শেষ শব্দ দু'টি হচ্ছে 'জিল্লান জালীলা'— এর অর্থ ছায়াঘন প্রশান্তি অথবা প্রশান্ত ছায়া কিংবা চিরস্নিগ্ধ ছায়া। 'জালীলা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষণরূপে। আরবী ভাষায় এধরনের ব্যবহার সুপ্রচুর। যেমন —শামসুন শামেসুন (প্রজ্জ্বলিত সূর্য), লাইলুন লাঈলুন (তমাসাচ্ছন্ন রাত্রি), ইয়াওমুন আইওয়ামুন (সুদীর্ঘ দিবস)। চিরস্নিগ্ধ কথাটির মাধ্যমে এ রকম ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জান্নাতের নেয়ামত হবে অনির্বচনীয় ও অন্তহীন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে কালাবী এবং আবু সালেহের সূত্রপরম্পরায় ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মক্কাবিজয়ের পর রসুল স. হজরত ওসমান বিন তালহাকে তলব করলেন। হজরত ওসমান উপস্থিত হলে তিনি স. বললেন, চাবি দাও। হজরত ওসমান কাবা গৃহের চাবি নিয়ে হাজির হলেন। রসুল স. চাবি নেয়ার জন্য তাঁর পবিত্র হস্ত প্রসারিত করলে হজরত আব্বাস দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক। হাজীদেরকে পানি পান করানো এবং এই চাবি রক্ষকের দায়িত্ব আমার উপরে অর্পণ করুন। হজরত ওসমান তখন হাত টেনে নিলেন। রসুল স. পুনরায় বললেন, দাও। তিনি চাবি দিলেন। রসুল স. চাবি দিয়ে কাবা গৃহের দরোজা খুললেন। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করার পর বের হয়ে এসে তাওয়াফ করলেন। তারপর হজরত ওসমান বিন তালহাকেই চাবি দিয়ে দিলেন। তারপর পাঠ করলেন নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ○

❒ আমানত উহার মালিককে প্রত্যর্পণ করিতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করিবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার করিবে। আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে উপদেশ দেন তাহা কত উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা।

সানিদ তাঁর তাফসীরে হাজ্জাজ বিন জারিহের মাধ্যমে মুজাহিদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন এভাবে— এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্য ছিলেন হজরত ওসমান বিন তালহা।

মক্কাবিজয়ের দিন হজরত ওসমানের নিকট থেকে চাবি নিয়ে কাবা শরীফের মধ্যে প্রবেশ করলেন রসুল স.। কিছুক্ষণ পর তিনি এই আয়াত পাঠ করতে করতে বেরিয়ে এলেন। হজরত ওমর বলেছেন, আল্লাহ্র রসুলের জন্য আমার মাতাপিতা উৎসর্গীকৃত হোক। এই আয়াত আমি আগে কখনও রসুল স.কে পাঠ করতে শুনিনি। এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কাবা শরীফের ভিতরে। সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবও এ রকম বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বিবরণের অতিরিক্ত সংযোজনটুকু হচ্ছে এই— রসুল স. বললেন, হে তালহার বংশধরেরা! তোমরা এই চাবির স্থায়ী সংরক্ষক। কাফের ছাড়া অন্য কেউ তোমাদেরকে এ বিষয়ে উত্যক্ত করবে না।

ইব্রাহিম বিন মোহাম্মদ আবদারীর শিক্ষকবৃন্দ থেকে ইবনে সা'দ লিখেছেন, হজরত ওসমান বিন তালহা বলেছেন, হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে রসুল স. আমাকে ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানালেন। আমি বললাম আশ্চর্য! তুমি স্ব-সম্প্রদায়ের আচরণীয় ধর্ম ছেড়ে দিয়ে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছো। আবার এ রকমও কামনা করছো যে, আমি তোমার পদাংক অনুসরণ করি। হজরত ওসমান বিন তালহা আরও বলেছেন, সোমবার এবং বৃহস্পতিবার আমরা বায়তুল্লাহ শরীফের দরোজা খুলে দিতাম। তখন মানুষ তাতে প্রবেশ করবার সুযোগ পেতো। হিজরতের পূর্বে একবার মহানবী স. তাঁর কতিপয় সহচরসহ বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশের উদ্দেশ্যে এলেন। ওসমান তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তিনি রসুল স.কে কাবাগৃহে প্রবেশ-প্রচেষ্টায় বাধ সাধলেন এবং বিরক্তি প্রদর্শন করলেন। মহানবী স. গভীর ধৈর্য ও গাম্ভীর্য সহকারে ওসমানের অপআচরণকে সহ্য করে নিলেন। বললেন, হে ওসমান! এমন এক সময় আসবে যখন তুমি এ বায়তুল্লাহর চাবি দেখতে পাবে আমার হাতে। তখন যাকে ইচ্ছে এ চাবি অর্পণ করার অধিকার থাকবে আমারই। ওসমান বললেন, তাই যদি হয় তবে তো সেদিন কোরায়েশেরা চরম লাঞ্ছনার শিকার হবে। রসুল স. বললেন, না। তা নয়।

www.eelm.weebly.com

বরং তখনই কোরায়েশেরা হবে প্রকৃত অর্থে মুক্ত, যথাসম্মানে সম্মানিত । এ কথা বলতে বলতে তিনি কাবা গৃহে প্রবেশ করলেন। ওসমান বলেছেন, আমি বিষয়টি গভীরভাবে ভাবতে শুরু করলাম। তখন আমার অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হলো যে, তিনি স. যা বলেছেন তা অবশ্যই ঘটবে। সেই মুহূর্তেই আমি মুসলমান হওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হলাম। কিন্তু আমার সম্প্রদায়ের মনোভাব ছিলো প্রতিকূল। তারা আমার কথা শুনে আমাকে চরমভাবে ভর্ৎসনা করলো। তাই আমি আমার সংকল্প বাস্তবায়ন করতে পারলাম না। মক্কাবিজয়ের পর রসুল স. আমার নিকট চাবি চাইলে আমি চাবি পেশ করলাম। আমাকে ফিরে যেতে দেখে তিনি আমাকে ডাকলেন। বললেন, এই চাবি গ্রহণ করো সর্বক্ষণের জন্য। যে নিতান্ত জালেম, সে ব্যতীত অন্য কেউ তোমার নিকট থেকে এই চাবি ছিনিয়ে নিতে পারবে না। ওসমান। তোমাদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন করেছেন। কাজেই এই ঘরের মাধ্যমে যা কিছু উপার্জিত হয় তা তোমরা বিধি অনুসারে ভক্ষণ কোরো। আমি চলে যাচ্ছিলাম। তিনি স. পুনরায় ডেকে বললেন, আমার কথা কি ঠিক হয়েছে যা তোমাকে বলেছিলাম? আমার তখন সেই কথাটিই মনে পড়ে গেলো, যা তিনি স. আমাকে হিজরতের পূর্বে বলেছিলেন। আমি বললাম, নিশ্চয়ই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্‌রই রসুল।

হজরত জোবায়ের বিন মুতয়েম থেকে ফাকেহানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ওসমানকে চাবি দিয়ে বললেন, গোপনে রেখো। জুহুরী বলেছেন, এই নির্দেশের পর ওসমান চাবি গোপন করে রাখতেন। আমি বলি, প্রায় প্রত্যেকেই চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনে আগ্রহী ছিলেন। তাই রসুল স. এ রকম নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আব্বাস এ রকম প্রস্তাব রেখেছিলেন। ইবনে আবেদ এবং আজরুকী লিখেছেন, রসুল স. এর নিকট হজরত আলী নিবেদন করলেন, কাবার রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাজীদের পানি পান করার দায়িত্ব আমার হাতে অর্পণ করুন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে। রসুল স. ওসমানকে ডেকে বললেন, হে তালহা তনয়! এ চাবির প্রতি রয়েছে তোমার সার্বক্ষণিক অধিকার। যে এই চাবি ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করবে, সে জালেম।

জুহুরীর বর্ণনাসূত্রে আবদুর রাজ্জাক এবং তিবরানী লিখেছেন, কাবাগৃহে প্রবেশ করলে হজরত আলী রসুল স. কে বললেন, আমাদের উপরেই অর্পিত হয়েছে নবুয়তের খেদমত, হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব এবং কাবা শরীফের রক্ষণাবেক্ষণ। আমাদের চেয়ে অধিক ভাগ্যবান আর কেউ নেই। রসুল স. হজরত আলীর এ কথা পছন্দ করলেন না। তিনি হজরত ওসমানকে ডেকে চাবি দিয়ে বললেন, লুকিয়ে রেখো।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. মক্কাবিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন ওসমান কাবার দরোজা বন্ধ করে ছাদে উঠে গেলেন। তিনি স. চাবি তলব করলেন। তখন বলা হলো, চাবি রয়েছে ওসমানের নিকট। সে চাবি দিতে চায় না। বলে, আমি যদি নিশ্চিত হতাম যে তিনি আল্লাহ্‌র রসুল, তবে চাবি দিতে অস্বীকৃত হতাম না। হজরত আলী ওসমানের ঘাড় মুড়ে দিয়ে চাবি নিয়ে নিলেন এবং কাবাঘরের দরোজা খুলে দিলেন। রসুল স. ভিতরে গিয়ে দুই রাকাত নামাজ

www.eelm.weebly.com

পড়লেন। যখন বেরিয়ে এলেন তখন হজরত আব্বাস চাবি সংরক্ষণ ও হাজীদের পানি পান করার দায়িত্ব কামনা করলেন। এর অব্যবহিত পরেই অবতীর্ণ হলো এই আয়াতটি। রসুল স. হজরত আলীকে নির্দেশ দিলেন, চাবি ওসমানকে দাও। আর তার সঙ্গে জোর জবরদস্তি করার অপরাধ স্বীকার করো। হজরত আলী হুকুম তামিল করলেন। ওসমান বললেন, তুমি আমার উপর জুলুম করেছো। এখন আবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছো। হজরত আলী বললেন, তোমার শানে আল্লাহ্পাক আয়াত অবতীর্ণ করছেন। রসুল স. সদ্য অবতীর্ণ আয়াতটি পাঠ করলেন। হজরত ওসমান বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল। এ ঘটনার পর স্থায়ীভাবে চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব পেলেন তিনি। এই চাবি তিনি মৃত্যুর সময় তাঁর ভাই শায়েবাকে দিয়েছিলেন। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত কাবার চাবি সংরক্ষণ করতে থাকবেন তাঁরই বংশধরেরা।

জ্ঞাতব্য ১ ঃ বনী তালহাকে চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান উপলক্ষে এই বিশেষ আয়াতটি বিশেষভাবে অবতীর্ণ হলেও এই আয়াতের হুকুমটি সাধারণ ও ব্যাপক। আমানতদানকারীকে তাঁর আমানত ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. ঘোষণা করেছেন, যার আমানতদারী নেই, তার ইমান নেই। যার ওয়াদা ঠিক নেই, তাঁর ধর্ম নেই। বায়হাকী। হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমরের মারফু বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. মুনাফিকির এই আলামতটিও উল্লেখ করেছেন যে, তার নিকট আমানত রাখা হলে সে আত্মসাৎ করবে। বোখারী, মুসলিম।

জ্ঞাতব্য ২ ঃ হজরত জায়েদ বিন সাবেত বলেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, সর্বপ্রথম উঠানো হবে মানুষের আমানত। সবশেষে নামাজ। তখন অনেক নামাজী হবে কল্যাণবিবর্জিত (যাদের নামাজ ছিলো প্রদর্শনপ্রবণ)।

হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্য হিসেবে ইবনে জারীর লিখেছেন, ধনী দরিদ্র কাউকেই এই কাজগুলো থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। মায়মুনা বিন মোহরানের বক্তব্যানুসরণে বায়হাকী লিখেছেন, বিত্তশালী সম্বলহীন সকলকেই এই কাজগুলো করতে হবে। ১. আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখতে হবে, আত্মীয়রা পুণ্যবান হলেও, পাপী হলেও। ২. সকলের আমানত প্রত্যর্পণ করতে হবে। উত্তমদেরও, অধমদেরও। ৩. সকলের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার প্রতিপালন করতে হবে। পুণ্যশীলদের সঙ্গেও, অপুণ্যশীলদের সঙ্গেও। হজরত ইবনে মাসউদের উক্তিরূপে আবদুর রাজ্জাক, ইবনে আবী শায়বা, আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম এবং বায়হাকী লিখেছেন, আল্লাহ্র পথে শাহাদৎ বরণ করা আমানত খেয়ানত করার পাপ ছাড়া সকল পাপকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। হাশরের সমাবেশে শহীদদেরকেও হুকুম দেয়া হবে আমানতদারের আমানত ফিরিয়ে দাও। শহীদ আরজ করবে, এখন তো আমরা পৃথিবী ছেড়ে চলে এসেছি। এখন কীভাবে আমানত প্রত্যার্পণ করবো। তখন হুকুম হবে, একে হাবিয়া দোজখে নিক্ষেপ করো। নির্দেশ পালন করা হবে। দোজখের অগ্নিগহ্বরে আসলরূপে আর্বিভূত হবে তার আমানত। সে তখন ওই আমানতের বোঝা ওঠাতে চেষ্টা করবে। যখন সে

www.eelm.weebly.com

আমানতের বোঝা উঠিয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ নিবে, তখনই আমানত তার হাত ফসকে পড়ে যাবে জমিনে। সেও পুনঃপতিত হবে অগ্নিগহবরে।

বর্ণনাকারী রজিন বলেন, হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনা শুনে নিয়ে আমি গেলাম হজরত বারা বিন আজিবের নিকট। বললাম, আপনি কি জানেন আপনার ভাই ইবনে মাসউদ এ রকম বলেছেন। হজরত বারা বললেন, তিনি ঠিকই বলেছেন। আল্লাহ্তায়ালাও এ সম্পর্কে বলেছেন, 'আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন।'

সকল ক্ষেত্রেই জড়িত রয়েছে আমানতের বিষয়টি। নামাজ, ফরজ গোসল, কথা, পরিমাপ, ধর্মাচরণ—সকল ক্ষেত্রেই আমানতদারীর ব্যাপারটি আচরণীয়। তবে সবচেয়ে কঠিন আমানত হচ্ছে সম্পদের আমানত।

জ্ঞাতব্য ৩ ঃ আমানতের সম্পর্ক সম্পূর্ণতঃই সম্পদ বিষয়ক নয়। মানুষের অধিকার আদায় করাও আমানতদারী। হকদারদের উপযুক্ত হক আদায় করতে হবে। আয়াতের শানে নুজুলে সে কথাটিই প্রমাণিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সুফিয়ানে কেরামের বিবরণ এই যে, সৃষ্টির অস্তিত্ব ও গুণাবলী আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আমানত। আল্লাহ্ প্রদত্ত আমানত ব্যতিরেকে সৃষ্টিতো কেবলই শূন্যতা। তাই সৃষ্টির উচিত আমানত প্রদানকারীকে সম্মান করা, আমানতের সুসংরক্ষণ নিশ্চিত করা এবং নিজেকে আমানতের মালিক না মনে করা। আল্লাহ্তে সমর্পিতপ্রাণ হওয়া অর্থ— আল্লাহর আমানত প্রত্যর্পণ করা। ধরা যাক, কোনো পরাক্রান্ত সম্রাট কোনো ঝাড়ুদারকে পুরস্কৃত করলো এবং তাঁকে পরিধান করতে দিলো বহুমূল্যবান পরিচ্ছদ। এমতাবস্থায় ঝাড়ুদার যদি জ্ঞানী হয়, তবে নিশ্চয় স্মরণে রাখবে যে, এই গৌরব ও অনুগ্রহ আমাকে আমানত হিসেবে দান করা হয়েছে। মূলতঃ আমি ঝাড়ুদার। আর যদি সে অজ্ঞ হয়, তবে আমানদারকে ভুলে যাবে। তখন আমানত সুসংরক্ষণের চিন্তাও তার মাথায় থাকবে না। আর তখনই সে চিহ্নিত হবে আমানত খেয়ানতকারী অবিশ্বাসীরূপে।

সুফীগণের আত্মিক অবস্থা কখনো কখনো এ রকম হয় যে, শূন্যতা এবং অস্তিত্বহীনতাই যেনো তাদের প্রকৃত অবস্থা। নিজেকে তখন মনে হয়, এ অস্তিত্ব যেনো নিরস্তিত্ব, অসততা ও বিনষ্টির সমন্বয়। এ অবস্থার নাম ফানা। এরপর অবস্থা এমন স্থানে এসে দাঁড়ায় যখন তার অস্তিত্বের অনুভূতি এবং পূর্ণত্বের ধারণা বিলীন হয়ে যায়। এ রকম অবস্থার নাম ফানা উল ফানা। এভাবে কেউ কেউ কখনো শুহুদীর অবস্থায় পৌঁছে যান (তওহীদের প্রকৃত স্তরে পৌঁছলে যখন অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে সৃষ্টির অবস্থাবলী প্রতিভাসিত হতে থাকে, তখন তাকে বলে শুহুদী)। তখন তিনি নিজ অস্তিত্ব অবলোকন করেন, কিন্তু দেখেন— এই অস্তিত্ব

www.eelm.weebly.com

এবং অস্তিত্বগত সকল বৈশিষ্ট্যসমূহে আমার নিজস্বতা বলে কিছু নেই। আল্লাহ্ই অনুগ্রহ করে এই আমানত দান করেছেন। আল্লাহ্র জাত (অস্তিত্ব) ও সিফাতের (গুণাবলীর) আলোয় এবার আমাকে আলোকিত করা হয়েছে। আর এই আলোকরঞ্জিত হওয়ার কারণে এবার এসেছে স্থায়িত্ব, ধ্বংসহীনতা। এই অবস্থার নাম বাকা বা বাকাবিল্লাহ। (বাকা বিল্লাহ্য় উপনীত উচ্চ স্তরের সুফীগণ আল্লাহ্র ইসিম, সিফাত, শান, ইতেবারাতের এবং পবিত্রতার এমন জ্ঞান লাভ করেন যা অবর্ণনীয়, যে জ্ঞানের দিকে ইঙ্গিত করাও দুরূহ। প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ কোনো বর্ণনা সে জ্ঞানকে ধারণ করতে অপারগ। ধারণাতীত ও অনুভবাতীত এই স্তরকেই বলে বাকা বিল্লাহ)। হাদিসে কুদসীতে এই অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে আমি হয়ে যাই তার শ্রুতি যদ্দারা সে শোনে, আমি হয়ে যাই তার দৃষ্টি যদ্দারা সে অবলোকন করে....।

সুফিয়ানে কেরামের দৃষ্টিতে এই ফানা বাকায় উপনীত হওয়াই প্রকৃত আমানতদারী। এ রকম অবস্থায় নফস পবিত্র করার কৃতিত্বের ধারণাও সুফীর স্মরণপথ থেকে অপসৃত হয়ে যায়। তখন তিনি স্পষ্টতই দেখেন, নিজের বলতে কেবল শূন্যতাই সম্বল। আর এই শূন্যতার অন্ধকারেই পূর্ণত্ববোধ অপসৃত হয়েছে। এরপর যে কামালিয়াত ও মর্যাদা লাভ হয় তা আল্লাহ্তায়ালারই নিছক অনুগ্রহ। তখন সুফী তাঁর প্রতি এই সুপ্রতুল অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করতে আদিষ্ট হন। প্রকৃত পূর্ণত্ব প্রদানকারী দয়াল দাতার দিকে আহবান জানান তিনি। মানুষের নিকট তিনি তখন প্রকৃত আমানতদারীর আদর্শ প্রচারে ব্রতী হন। সকল স্তবস্তুতি কেবলই আল্লাহ্র। আল হামদুলিল্লাহ্।

এই আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে পূর্বে উল্লেখিত ওই আয়াতের সঙ্গে যেখানে বলা হয়েছে— 'তুমি কি তাদেরকে দেখো নাই যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে, না আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন' (আয়াত ৪৯)। ওই আয়াত এবং এই আয়াতের মর্মকথা এই যে, আত্মশুদ্ধির পূর্বে তোমাদের কামালিয়ত বলে কিছু নেই। আর আত্মশুদ্ধির স্তরে কেবল আল্লাহ্ই পৌঁছে দিতে পারেন। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তার প্রতি নিক্ষেপ করেন নূরের একটি ঝলক অথবা নূরসমুদ্রের একটি ঢেউ যার কারণে সে পবিত্র হয়ে যায়। আল্লাহ্ তোমাদেরকে আমানত প্রত্যর্পণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই যে পূর্ণত্ব ও সম্মান তোমাদেরকে আমানতস্বরূপ দেয়া হয়েছে, তা তাঁরই নিকট প্রত্যর্পণ করো। পবিত্রতা অর্জনকে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি বা কৌশললব্ধ মনে কোরো না। কৃতজ্ঞ হও। তাঁরই স্তবস্তুতি বর্ণনা করো যিনি তোমাদেরকে দয়া করে পবিত্র করেছেন।

কোনো কোনো পীর মাশায়েখ তাঁদের আপন ফযীলত প্রকাশ করে থাকেন, যা বাহ্যতঃ অহমিকাজাত বলে মনে হয়। যারা মূর্খ তারা এ কারণে তাঁদেরকে

www.eelm.weebly.com

দোষারোপ করার সুযোগ করে নেয়। কিন্তু তারা এ কথা বুঝতে পারে না যে, তাঁরা তাঁদের মহত্ব ও কামালিয়তকে আমানতস্বরূপ রক্ষাণাবেক্ষণে রত এবং তাঁরাই প্রকৃত আমানত প্রত্যর্পণকারী। আল্লাহর নেয়ামত প্রকাশ করাই তাঁদের ওই সকল কথার উদ্দেশ্য। বিভিন্ন হিকমত ও পরিস্থিতির কারণেই তাঁরা তাঁদেরকে প্রদত্ত মহিমা সমূহের কথা প্রকাশ করে থাকেন। ওয়াল্লহু আ'লাম।

এরপর আল্লাহ্পাক নির্দেশ দিচ্ছেন— 'তোমরা বিচার কার্যে ন্যায়ানুগতাকে আশ্রয় কোরো'। ইনসাফের সঙ্গে সিদ্ধান্ত দান করাও আমানতের আর একটি শাখা। ন্যায়বিচার না করা আমানত খেয়ানতের নামান্তর। এভাবে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল এবং উলিল আমর (যারা নির্দেশ জারী করার যোগ্যতাধারী) গণের নির্দেশ অমান্য করাও আর এক ধরনের আমানতের খেয়ানত করা। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

হজরত আবু জর গিফারী বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে প্রশাসক নিযুক্ত করুন। রসুল স. বললেন, তুমি তো দেখি দুর্বলচিত্ততার পরিচয় দিচ্ছো। শাসনাধিকার একটি আমানত। কিয়ামতের দিন শাসকেরা অপমানিত হবে। তবে হাঁ, যারা শাসনাচরণে সততানির্ভর, তারা অপমানিত হবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হে আবু জর! আমি তোমাকে দুর্বল দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমার জন্য ওই কথা পছন্দ করবো না, যা নিজের জন্য আমি পছন্দ না করি। দুই প্রকৃতির মানুষের শাসনভার নিতে যেয়ো না এবং এতিমের সম্পদের মোতোয়াল্লি হয়ো না। মুসলিম।

আয়াত শেষে এরশাদ হয়েছে, ভেবে দেখো তোমাদেরকে আমানতদারী এবং ইনসাফের যে নির্দেশ দেয়া হলো তা কতোই না সুন্দর, উৎকৃষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা। তোমাদের চিন্তা, আচরণ, কথা, কাজ—সব কিছুই তাঁর শ্রুতি ও পর্যবেক্ষণের আওতাভূত।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আসের মারফু বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, ন্যায়বিচারকারী কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ রহমানের দক্ষিণ হস্তের দিকে নূরের মিম্বরে থাকবে এবং আল্লাহর উভয় হস্তই দক্ষিণ হস্ত। তারা হবে ওই সকল লোক যারা স্বসম্প্রদায়ের শাসন ন্যায়ানুগতার সঙ্গে সম্পাদন করে থাকেন। মুসলিম।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা প্রকাশ করেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রীতিভাজন এবং নৈকট্যভাজন হবে ন্যায়বিচারকেরা এবং ন্যায়বিচারবিরোধীরা হবে সর্বাধিক দূরবর্তী এবং সর্বাপেক্ষা শাস্তিযোগ্য। দ্বিতীয় বর্ণনায় কেবল সর্বাধিক দূরবর্তীতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিরমিজি এই হাদিসটিকে বলেছেন হাসান এবং গরীব (দুষ্প্রাপ্য)।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. প্রশ্ন করলেন কিয়ামতের দিন কে প্রথমে আল্লাহ্তায়ালার রহমতের ছায়া লাভ করবে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও

www.eelm.weebly.com

তাঁর রসুলই উত্তমরূপে অবগত। রসুল স. বললেন, ওই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়ার দিকে অধিক অগ্রগামী থাকবে যে যথাপ্রাপ্য গ্রহণ করে এবং তা প্রদানও করে। আর ন্যায়বিচারপ্রার্থীদেরকে যে দান করে ন্যায়বিচার। মানুষের ব্যাপারে সে ওই সিদ্ধান্তই নির্বাচন করে, যা পছন্দ করে নিজের বেলাতেও। আহমদ। বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে এ রকমই মারফু বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৫৯

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

❐ হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আল্লাহের আনুগত্য কর; রসুল এবং তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাহাদের আনুগত্য কর; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে সে বিষয়ে আল্লাহ্ ও রসুলের স্মরণ লও। ইহা ভালো ও ব্যাখ্যায় প্রকৃষ্টতর।

বোখারী, মুসলিম এবং আসহাবে সুনান (ইবনে মাজা, নাসাঈ, আবু দাউদ প্রমুখ) হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হুজাফা সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়েছিলো। রসুল স. তাঁকে একটি সেনাবাহিনীর সঙ্গে কোনো এক স্থানে প্রেরণ করেছিলেন। ইমাম সুদ্দীর বর্ণনাসূত্রে ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, রসুল স. হজরত খালেদ বিন ওলিদকে এক সেনাদলের সঙ্গে প্রেরণ করলেন। তিনি ছিলেন সেনাধ্যক্ষ। দলমধ্যে হজরত আম্মার বিন ইয়াসারও ছিলেন। সেনাদল আক্রমণের লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হলো। সকালে সেনাদল যখন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছলো, তখন দেখা গেলো সকলেই পালিয়ে গিয়েছে। মাত্র এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওই ব্যক্তি হজরত আম্মারের নিকট এসে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। কলেমায়ে শাহাদাৎ পাঠ করলেন। হজরত আম্মার বললেন, দাঁড়াও তুমি মুসলমান হওয়ার উপকার লাভ করবে। হজরত খালেদ পুনঃআক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন হজরত আম্মার বললেন, এই লোকটিকে কিছু বলবেন না। সে মুসলমান হয়েছে। সে এখন আমার আশ্রয়াধীন। হজরত খালেদ নতুন মুসলমানকে কিছু বললেন না বটে, তবে হজরত আম্মারের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। সেনাদল মদীনায় ফিরে এলে বিষয়টি রসুল স. এর সামনে উপস্থাপন করা হলো। তিনি স. হজরত

www.eelm.weebly.com

আম্মারের আশ্রয়দানকে বলবৎ রাখলেন। কিন্তু নসিহত করলেন যেনো, ভবিষ্যতে নেতার অগোচরে এ রকম কিছু করা না হয়। দু'জনের মধ্যে তখনো কথা কাটাকাটি হচ্ছিলো। রসুল স. বললেন— খালেদ। আম্মারকে গালি দিও না। যে আম্মারকে গালি দিবে আল্লাহ্ তাকে মন্দ বলবেন। যে আম্মারের প্রতি বিদ্বেষাপন্ন হবে আল্লাহ্ তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবেন। যে আম্মারকে অভিসম্পাত করবে তাকে অভিসম্পাত করবেন আল্লাহ্। হজরত খালেদ তৎক্ষণাত হজরত আম্মারের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। হজরত আম্মার প্রসন্ন হলেন। অতঃপর অবতীর্ণ হলো এই আয়াতটি।

হজরত আবু হোরায়রার বক্তব্যানুসারে আবু শায়বা প্রমুখ লিখেছেন 'উলিল আমর' অর্থ প্রশাসক। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে সেনাধিপতি। বস্তুতঃ 'উলিল আমর' বলতে বাদশাহ, বিচারক, প্রশাসক, সেনাপতি সকলকেই বুঝায়।

হজরত আলী বলেছেন, নেতা এবং বিচারকের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশানুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং আমানতকে আদায় করা। যখন তাঁরা এ রকম করবেন, তখন জনতার কর্তব্য হচ্ছে— তাদের কথা শোনা এবং মান্য করা। হজরত হোজায়ফা বর্ণনা করেন— রসুল স. বলেছেন, যারা আমার পরে আসবেন তাদেরকে মান্য করো অর্থাৎ হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরকে মান্য করো। তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যে আমার অনুসরণ করলো সে আল্লাহ্রই অনুসরণ করলো। যে আমার অবাধ্য সে আল্লাহ্রও অবাধ্য। যে শাসকের অনুসরণ করলো সে আমারই অনুসরণ করলো। আর যে শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করলো সে যেনো আমারই বিরুদ্ধাচরণকারী। বোখারী, মুসলিম।

হজরত উবাদা বিন সামেত বলেছেন, আমরা রসুল স. এর নিকট এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি যে, আমরা তাঁর হুকুম শুনবো এবং মেনে নিবো। কঠিন, সহজ, খুশী-অখুশী সকলাবস্থায়। হাকিমের হুকুমও আমরা অমান্য করবো না। যেখানেই আমরা থাকবো সেখানেই সত্যপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হবো আমরা। সত্য কথা বলবো এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধবাদী কাউকে ভয় করবো না। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, নেতার হুকুম মান্য করো। নেতা যদি হাবশী গোলামও হয়, তবুও তার নির্দেশ সূর্যের আলোর মতোই স্বীকার্য। হজরত আবু উমামা বলেছেন, বিদায় হজের ভাষণে আমি রসুল স.কে নির্দেশ করতে শুনেছি, আল্লাহকে ভয় করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সম্পাদন করবে, রমজান মাসে রোজা রাখবে, সম্পদের জাকাত দিবে এবং নেতা কোনো হুকুম দিলে পালন করবে। এ রকম করলে আল্লাহ্র অনুগ্রহে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। তিরমিজি।

স্বামী স্ত্রীকে, মুনিব গোলামকে এবং পিতা সন্তানকে হুকুম দিয়ে থাকেন। এরা সকলেই 'উলিল আমর।'

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর বর্ণনা করেন, আমি রসুল স.কে নির্দেশ করতে শুনেছি— জেনে রেখো তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক, অধীনস্থদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম বা নেতা জনগণের রক্ষক। জনতা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পরিবারের কর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তার অধীনস্থ পরিবার পরিজন সম্পর্কে। নারীরা তাদের স্বামীদের, পরিবারের সদস্য ও সন্তান-সন্ততিদের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী। তাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। দাস-দাসীরা তাদের প্রভুর সম্পদের সংরক্ষক। জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তাদেরকেও। সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষণাবেক্ষণকারী। অধীনস্থদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে তোমরা সকলে জিজ্ঞাসিত হবেই। বোখারী, মুসলিম।

জ্ঞাতব্যঃ উলিল আমরের ব্যাখ্যায় হজরত ইকরামা বলেছেন, হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর উলিল আমর ছিলেন। কালাবী বলেছেন, উলিল আমর অর্থ হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ। ইকরামাকে জিজ্ঞেস করা হলো, ক্রীতদাসীর সদ্যপ্রসূত সন্তান সম্পর্কে হুকুম কী? তিনি বললেন, সন্তান স্বাধীন। প্রশ্নকারীরা বললেন, আপনার কথার দলিল কী? তিনি বললেন, কোরআনে রয়েছে 'আতিউল্লাহা ওয়াআতি উর রসুলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম।' হজরত ওমর, যিনি উলিল আমর ছিলেন তিনি বলেছেন—বাঁদী যদি অপরিণত শিশুও প্রসব করে, তবুও শিশুটি প্রসবের পর স্বাধীন বলে গণ্য হবে। হজরত ইমরান বিন হোসাইন বলেছেন, হজরত ওমর কাউকে কোনো স্থানের প্রশাসক নিযুক্ত করলে তার ফরমাননামায় লিখে দিতেন—যদি তিনি ইনসাফ করেন তবে জনতা তাঁর হুকুম মানবে। হজরত ওমর আরও বলেছেন, উত্তমরূপে অবগত হও— হাকিমের হুকুম মানতে হবে, যদিও নাক কাটা কোনো হাবশী গোলামও তোমাদের হাকিম নিযুক্ত হন। যদি তিনি প্রহার করেন, আঘাত দেন, তবে ধৈর্যধারণ করবে। আর যদি তিনি ধর্মের অবমাননামূলক কোনো নির্দেশ দেন তবে তোমরা বলে দিও— আমরা জীবন দিবো কিন্তু ধর্মাবমাননা সহ্য করবো না। উলিল আমরের প্রশস্ততর ব্যাখ্যার অন্তর্ভূত রয়েছেন ফুকাহা এবং ওলামা মাশায়েখ। এঁরাই নবীগণের প্রকৃত প্রতিনিধি। আল্লাহ এবং আল্লাহ্র রসুলের নির্দেশাদি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এঁদের উপরেই বর্তেছে। হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যানুসরণে ইবনে জারীর, হাকেম প্রমুখ বলেছেন, ফকীহ এবং দ্বীনদার ব্যক্তিগণই উলিল আমর। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে— উলিল আমর হচ্ছেন আলেমগণ। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী শায়বা এবং হাকেম কর্তৃক এ রকম বর্ণনা এসেছে। আবুল আলিয়া এবং মুজাহিদও এ রকম বলেছেন। আল্লাহ্তায়ালা নির্দেশ করেছেন— 'আর যদি তারা বিষয়টিকে রসুলের এবং তাদের দলের বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের উপর সমর্পণ করতো, তবে সঠিক তথ্যানুসন্ধানকারীরা সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারতো।

রসুল স. বলেছেন, ওলামাগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা। রসুল স. সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, সকল মানুষ

www.eelm.weebly.com

তোমাদের অনুসরণ করবে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাসআলা জানবার জন্য মানুষেরা ছুটে আসবে তোমাদের কাছে। হজরত আবু সাঈদ খুদরীর মাধ্যমে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

মাসআলাঃ শরিয়তবিরোধী না হলে হাকিমের আনুগত্য করা ওয়াজিব। এই আয়াত দৃষ্টে এ কথাই প্রমাণিত হয়। কেননা, প্রকৃত হুকুমদাতা আল্লাহ্। তিনি ইনসাফ রক্ষার হুকুম দিয়েছেন। পরে বলেছেন, হাকিমের অনুসরণ করতে। এতে করে বুঝা যায়— শাসক যতক্ষণ ইনসাফের উপরে কায়েম থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে মান্য করা জরুরী হবে। আয়াতে আরো বলা হয়েছে, কোনো বিষয়ে মতভেদ ঘটলে বিষয়টি আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসুলের প্রতি ন্যস্ত কোরো।

আলেমগণ বলেছেন, উলিল আমর (নির্দেশ দানের অধিকারী) শব্দটিই এ কথা প্রমাণ করে যে, প্রশাসক যে বিষয়ে নির্দেশ দানের অধিকারপ্রাপ্ত কেবল সেই বিষয়েই তাঁর অনুসরণ ওয়াজিব। যে বিষয়ে তাঁর অধিকার নেই, সে সকল বিষয়ের আনুগত্য ওয়াজিব নয় (বরং কোনো কোনো সময় এ রকম করা হারাম হবে)। শাসক যদি কাউকে বলে, অমুক ব্যক্তিকে এক হাজার টাকা (তোমার নিজের) দাও। তবে এ রকম হুকুম মানা ওয়াজিব নয়। (কেননা শাসকের এ রকম নির্দেশ দানের অধিকার নেই)।

মাসআলাঃ বিচারক যদি সিদ্ধান্ত দেয়, অমুক ব্যক্তিকে সঙ্গেসার করো (পাথর মারো) অথবা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করো কিংবা তার হাত কেটে ফেলো, তবে এই নির্দেশ যাকে দেয়া হবে সে নিঃসন্দেহে নির্দেশ পালন করতে পারে। কিন্তু এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম মোহাম্মদ এই অভিমত থেকে পরবর্তীতে সরে গিয়ে বলেছিলেন, কোন দলিলের ভিত্তিতে এমতো নির্দেশ দেয়া হয়েছে—এ কথা স্পষ্ট না বুঝা পর্যন্ত হুকুম তামিল করা বৈধ হবে না। মাশায়েখগণ এই অভিমতটি পছন্দ করেছেন। কারণ, পরবর্তী জামানার অনেক কাযীর স্বভাব পরিবর্তিত হয়েছে।

ইমাম আবুল মনসুর মাতুরিদি বলেছেন, কাযী যদি মুত্তাকী এবং আলেম হন, তবে তাঁর হুকুম তামিল করা ওয়াজিব। কারণ, এক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত হওয়ার কোনো কারণ আর অবশিষ্ট নেই। আর মুত্তাকী হওয়া সত্ত্বেও যদি তিনি বিজ্ঞ না হন, তবে কোন দলিলের উপর সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে, তা জেনে নিতে হবে। যদি কাযী তাঁর সিদ্ধান্তের অনুকূলে উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেন, তবে তাঁর নির্দেশ পালন করবে। অন্যথায় করবে না। যদি কাযী আলেম ও ফাসেক (মুত্তাকী বা ধর্মভীরু নয়) হয়, তবে উপযুক্ত দলিল সহযোগে ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত তার কথা মানা যাবে না। হেদায়া।

হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যানুসরণে বোখারী লিখেছেন, এই আয়াত আবদুল্লাহ্ বিন হুজাফা বিন কায়েস সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ্‌কে রসুল স. একটি সেনাদলের সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। দাউদী বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ রকম— সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে রসুল স. হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হুজাফাকে কোনো এক স্থানে পাঠিয়েছিলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে

www.eelm.weebly.com

তিনি তাঁর বাহিনীকে অগ্নি প্রজ্বলন করতে নির্দেশ দিলেন। সৈন্যদের আচরণে রুষ্ট হয়েছিলেন তিনি। তাই হুকুম দিলেন, সবাই এই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করো। মতানৈক্য দেখা দিলো বাহিনীতে। কেউ কেউ নির্দেশ প্রতিপালন করাই বাঞ্ছনীয় ভাবলো। আর কেউ কেউ নির্দেশ পালনে অস্বীকৃত হলো। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই আয়াতে বলা হয়েছে, অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে তবে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের স্মরণ লও। মুজাহিদও এ রকম বলেছেন। আলেমগণের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়, তবে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র হুকুমের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। 'শাই-ইন' শব্দটির অর্থ হচ্ছে নেতার নির্দেশ। নেতার নির্দেশ সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি হলে কেউ কেউ বলেছেন, নির্দেশ প্রতিপালন করা ওয়াজিব হবে। আর কেউ কেউ বলেছেন, নাজায়েয হবে। এমতো ক্ষেত্রে আল্লাহ্র এবং আল্লাহ্র রসুলের শরণাপন্ন হতে হবে। অর্থাৎ বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে আল্লাহ্র কিতাবের আলোকে এবং রসুল স. এর সুন্নাহ্র আদর্শে। যদি কোরআন ও সুন্নাহ্য় (হাদিসে) 'বিষয়টির স্পষ্ট সিদ্ধান্ত উদ্ধার করা সম্ভব না হয়, তবে গ্রহণ করতে হবে এজমা ও কিয়াসের আশ্রয়। কোরআন ও হাদিসের অনুকূল এজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে বিষয়টি শরিয়তসম্মত প্রমাণিত হলে হুকুম মান্য করবে। অন্যথায় করবে না।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, আমিরের (নেতার) হুকুম শোনা এবং মানা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। মনঃপুত হলেও। না হলেও— যদি হুকুম আল্লাহ্র বাধ্যতাবিরোধী না হয়। আল্লাহ্র আনুগত্যবিরোধী নির্দেশ মান্য করা জায়েয নয়। বোখারী, মুসলিম। হজরত আলী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, পাপ কাজের অনুসরণ দুরস্ত নয়। অনুসরণ কেবল পুণ্যকর্মের জন্যই। বোখারী, মুসলিম। হজরত ইমরান বিন হোসাইন এবং হজরত হাকিম বিন আমর গাফফারী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, স্রষ্টার অবাধ্যদের আনুগত্য জায়েয নয়। আহমদ, হাকেম। হাকেম হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।

মুসলিম বিন আবদুল মালেক বিন মারওয়ান একবার আবু হাজেমকে বললেন, তোমরা কি উলিল আমরি মিনকুম সম্পর্কিত আয়াত জানার পরও মানুষকে আমাদের অনুসরণ করতে বলবে না? আবু হাজেম বলেন, হুকুমটির অব্যবহিত পরেই বলা হয়েছে— মতভেদ ঘটলে বিষয়টিকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের প্রতি ন্যস্ত করতে হবে। এতে করে বুঝা যায়, অন্ধ অনুসরণ নিষিদ্ধ। মাদারেক।

মাসআলাঃ শাসকের হুকুম বলবৎ করার দায়িত্ব যদি বিচারকের উপরে ন্যস্ত করা হয়, তবে বিচারককে তা বলবৎ করতেই হবে— যদি তা কোরআন বিরোধী না হয়। কোরআন বিরোধী হলে বরং অমান্য করা ওয়াজিব। যেমন, দাবীদারের কসম ও প্রমাণ স্বরূপ যদি এক সাক্ষ্যের উপর খুনের রায় দেয়ার কথা বলা হয়,

www.eelm.weebly.com

তবে তা বাতিল করতে হবে। কেননা, আল্লাহ্‌তায়ালার স্পষ্ট হুকুম রয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে দুই জন পুরুষ সাক্ষী গ্রহণ করবে।'

মশহুর হাদিসের বিরুদ্ধেও রায় দেয়া চলবে না (যে হাদিস দু'য়ের অধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন তাকে মশহুর হাদিস বলে)। যেমন, তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে যদি কেউ বিবাহ করার পর সহবাস ব্যতিরেকেই ছেড়ে দেয়, তবে পূর্ব স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে—এ রকম রায় দেয়া যাবে না। কারণ, এক্ষেত্রে সহবাস শর্ত ছিলো। হজরত রেফায়ার স্ত্রী সম্পর্কে হজরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন. তোমার বিবাহ তার সঙ্গে দুরস্ত হবে না যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তোমার সঙ্গে সহবাস না করবে (এ সম্পর্কিত আলোচনা সুরা বাকারার তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে)।

এজমাবিরোধী (ঐকমত্যবিরোধী) রায়ও অগ্রহণীয়। যেমন, পশু জবাই করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ্ বলা ছেড়ে দিলে ওই পশু হালাল হবে বলে সাহাবীগণের ঐকমত্য রয়েছে। সুতরাং এর বিরুদ্ধে রায় দেয়া যাবে না। হেদায়া।

মাসআলাঃ মুজতাহিদের (মাসআলা উদ্ধারকারীর) অভিমত কোরআন ও হাদিসবিরুদ্ধ হলে পরিত্যাজ্য হবে। এমতাবস্থায় ইজতিহাদি রায় পরিত্যাগ করা জরুরী। বিশুদ্ধ সূত্রে বায়হাকী মাদখাল পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন, আবদুল্লাহ্ বিন মোবারক বর্ণনা করেছেন, আমি নিজে শুনেছি— ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আমার অভিমতবিরোধী হাদিস পেলে অবশ্যই আপন অভিমত ছেড়ে আমি হাদিসকেই বরণ করে নেবো। রওয়াজাতুল ওলামা গ্রন্থে রয়েছে, ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আমার অভিমত রসুল স. কিংবা তাঁর সাহাবীগণের বিপরীত হলে পরিত্যাগ কোরো। ইমাম আজম আরো বলেছেন, বিশুদ্ধ প্রমাণিত হাদিসই আমার মাজহাব।

আয়াতের শেষ দিকে বলা হয়েছে, 'ইহা ভালো এবং ব্যাখ্যায় প্রকৃষ্টতর।' এর অর্থ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসুলের অনুকূলে সমর্পিত হয়ে সিদ্ধান্ত করা অতি উত্তম। প্রকৃষ্টতর এই পদ্ধতিই ইমানদারদের আচরণীয় পদ্ধতি। শুভ পরিণাম নির্ভর করে এমতো পদ্ধতির উপরেই।

শায়বীর মাধ্যমে ইবনে জারীর লিখেছেন, এক ইহুদী ও এক মুনাফিকের মধ্যে কোনো এক বিষয়ে বাদানুবাদের সৃষ্টি হলো। ইহুদী বিষয়টি রসুল স. এর দরবারে পেশ করতে চাইলো। কারণ, কাফের হলেও তার এই বিশ্বাস ছিলো যে, রসুল স. অবশ্যই ন্যায়বিচার করবেন। কিন্তু মুনাফিক এতে রাজী ছিলো না। কারণ, সে জানতো রসুল স. কখনোই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিবেন না। সে চাইলো ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যেই মিটমাট করে নিতে। এ রকম করা হলে বরং ঘুষ দিয়ে ইহুদীকে বশে রাখা সম্ভব হবে। সে তখন ইহুদীকে নিয়ে এক গণকের কাছে গেলো। গণক ছিলো জুহুনিয়া গোত্রের। ফয়সালার জন্য তারা বিষয়টি পেশ করলো সেই গণকের কাছে।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ছা'লাবী, হজরত আবুল আসওয়াদ থেকে ইবনে আবী হাতেম মুরসাল হিসেবে এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে কালাবী ও আবু সালেহের মাধ্যমে বাগবী উল্লেখ করেছেন, ইহুদীটির নাম ছিলো বাশার। জনৈক মুনাফিকের সঙ্গে তার বচসা হলো। ইহুদী বললো, চলো তাহলে মোহাম্মদের নিকট গিয়ে বিষয়টির নিস্পত্তি করি। মুনাফিক বললো, না বরং চলো কাব ইবনে আশরাফের (মুনাফিকদের নেতা) কাছে যাই। মনে হয় ইহুদীর দাবীই সত্য ছিলো। তাই সে রসুল স. এর মীমাংসা মেনে নিতে চেয়েছিলো। কারণ, সে অবিশ্বাসী হলেও এ কথা ভালো করেই জানতো যে, রসুল স. কখনোই ছলচাতুরীকে প্রশ্রয় দিবেন না। ন্যায়বিচারই তাঁর স্বভাব। ইহুদী কিছুতেই মুনাফিকের প্রস্তাবে সম্মত হলো না। শেষ পর্যন্ত রসুল স. এর নিকট বিষয়টি উত্থাপিত হলে সিদ্ধান্ত গেলো ইহুদীর পক্ষে। মুনাফিক এ রায়ে সন্তুষ্ট হতে পারলো না। সে ইহুদীকে বললো, চলো এবার ওমরের নিকট যাই। তার ধারণা ছিলো, হজরত ওমর যেহেতু কাফেরদের প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন, তাই তার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই কাফেরের বিরুদ্ধেই যাবে। ইহুদী ও মুনাফিক তখন হজরত ওমরের নিকটে গিয়ে ঘটনাটি খুলে বললো। ইহুদী এ কথাও বললো যে, বিষয়টি সম্পর্কে রসুল স. সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, কিন্তু আমার প্রতিপক্ষ এতে সন্তুষ্ট নয়। হজরত ওমর বললেন, তাই নাকি? মুনাফিক বললো, হ্যাঁ। হজরত ওমর বললেন, একটু অপেক্ষা করো— আসছি। তিনি ঘরে গিয়ে একটু পরে খোলা তলোয়ার নিয়ে এলেন। তারপর মুনাফিককে হত্যা করে বললেন, যে ব্যক্তি মোহাম্মদ স. এর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নয়, এ রকম শাস্তিই তার জন্য উপযুক্ত। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬০

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ
قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا
بِهٖ ۗ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ۝

❑ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা দাবী করে যে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে তাহারা বিশ্বাস করে, অথচ তাহারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হইতে চায়—যদিও উহা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এবং শয়তান তাহাদিগকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করিতে চায়।

---

www.eelm.weebly.com

এই আয়াতে আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে মুনাফিকদের অবস্থা জানিয়ে দিয়েছেন। মুনাফিকদের মৌখিক দাবী হচ্ছে, তারা রসুল স. এর প্রতি এবং পূর্ববর্তী রসুলদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব সমূহকে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাদের আচরণ কিরকম দেখুন, তারা বিচার মীমাংসার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার বিধানবিরোধী সিদ্ধান্ত চায়। শরণাপন্ন হতে চায় তাগুতের। 'তাগুত' বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে কাব ইবনে আশরাফকে অথবা জুহুনিয়া গোত্রের সেই গণককে। 'তাগুত' শব্দটি এসেছে 'তুগিয়ান' থেকে। এর অর্থ সীমালংঘন। তাগুত বলে শয়তানকেও নির্দেশ করা যায়। কাব বিন আশরাফ এবং ওই গণকটিও শয়তান। অথবা শয়তানী স্বভাবসম্পন্ন। তাদের নিকট মীমাংসা চাওয়ার প্রকৃত অর্থ শয়তানের কাছেই মীমাংসা চাওয়া।

হজরত ওমর কিন্তু তাগুত নন। কিছুতেই নন। তাই তিনি রসুল স. এর মীমাংসায় সন্তুষ্ট না হওয়াতে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। খাঁটি মুমিনের আচরণ এ রকমই। তাঁর সম্পর্কে হজরত জিবরাইল বলেছেন, ওমর হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী। তাই তিনি ফারুক নামে ভূষিত হয়েছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, আবু বুরদা আসলামী নামে এক গণক ছিলো। সে ইহুদীদের পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করে দিতো। ইহুদীদের দেখাদেখি কতিপয় মুসলমানও তার কাছে যাওয়া আসা শুরু করলো। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

ইকরামা অথবা সাঈদের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্য ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন এ রকম—হাল্লাস বিন সামেত, মোতাব বিন কুশাইর, রাফে বিন জায়েদ এবং বাশার নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতো। স্বসম্প্রদায়ের কিছু লোকের সঙ্গে তাদের বিবাদ দেখা দিলো। মুসলমানেরা বললেন চলো, রসুল স. এর নিকটে গিয়ে বিবাদ মীমাংসা করি। কিন্তু তারা বললো, তার চেয়ে চলো ওই গণকের কাছেই যাই। তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে।

সুদ্দীর মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, ইহুদী থেকে মুসলমান হওয়া লোকদের কিছু সংখ্যক ছিলেন খাঁটি মুসলমান এবং কিছু সংখ্যক ছিলো মুনাফিক। মূর্খতার যুগে বনী নাজির ও বনী কুরায়জা সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে নিয়ম ছিলো, কুরায়জাদের কেউ নাজিরদের কাউকে হত্যা করলে তারা কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) নিতো। অথবা দিয়ত (রক্তপণ) হিসেবে গ্রহণ করতো শত ওসক খেজুর কিংবা খোরমা। আর নাজিরদের কেউ কুরায়জার কাউকে হত্যা করলে রক্তপণ হিসাবে ষাট ওসক খোরমা বা খেজুর দিতে হতো। কিসাস হতো না। বনী নাজির সম্প্রদায় ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শক্তিশালী। বনী কুরায়জারা ছিলো সংখ্যালঘু ও দুর্বল। খাজরাজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে তারা ছিলো সন্ধিবদ্ধ। আর বনী নাজিরেরা ছিলো আউস গোত্রের মিত্র। রসুল স. এর মদীনা আগমনের পর নাজির সম্প্রদায়ের একজন কুরায়জাদের একজনকে হত্যা করলো। বিচার সালিস শুরু হলো। বনী নাজির বললো, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম হলো, আমাদের কেউ তোমাদেরকে হত্যা করলে তোমরা কিসাস গ্রহণ করতে পারবে না। রক্তপণ হিসাবে কেবল পাবে ষাট ওসক খেজুর। আর তোমরা হত্যা করলে আমরা কিসাসও গ্রহণ করতে পারি অথবা রক্তপণ হিসাবে একশত ওসক খেজুর দাবী

www.eelm.weebly.com

করতে পারি। সুতরাং প্রচলিত নিয়মানুসারে এখন আমরা রক্তপণের ষাট ওসক দিতে রাজী। তখন কুরায়জার মিত্র খাজরাজ সম্প্রদায় বললো, এতো ছিলো মূর্খতার সময়ের নিয়ম। তোমরা ছিলে সংখ্যাগুরু। তাই এ রকম অন্যায় নিয়ম জারী রাখতে পেরেছিলে। কিন্তু এখন সে নিয়ম চলবে না। এখন আমরা মুসলমান। বনী কুরায়জারও কেউ কেউ মুসলমান। আমরা মুসলমানেরা ভাই ভাই। এখন আমরা সংখ্যায় ও শক্তিতে তোমাদের সমকক্ষ। তাই এখন তোমরা আর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারো না। উভয় পক্ষের কতিপয় মুনাফিক বললো, আবু বুরদা আসলামী গণকের নিকটে চলো, সে-ই এ বিষয়ে মীমাংসা করে দিবে। উভয় পক্ষের মুসলমানেরা বললেন, না। বরং রসুল স. এর দরবারে চলো। মুনাফিকেরা তাদের মতেই স্থির রইলো। অতঃপর আল্লাহ্ কিসাস সম্পর্কিত আয়াত ও এই আয়াতটি নাজিল করলেন।

আয়াতে মুনাফিকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, তোমাদেরকে তো তাগুতের শরণাপন্ন হতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। ইমানের দাবীদার হলে অবশ্যই তাগুতের বিরুদ্ধাচরণকারী হতে হবে। ইহুদী গণক ও শয়তানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে। সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করতে হবে অবিশ্বাসকে। অবিশ্বাসীকে। অন্যত্র আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, 'ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে নির্বাচন কোরো না।'

রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায়, তাদের কথায় আস্থা রাখে এবং ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয় অথবা তার সঙ্গে পায়ুসঙ্গম করে, সে ওই নির্দেশাদি থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে— যা অবতীর্ণ হয়েছে মোহাম্মদ স. এর উপর। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরায় এ বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন আহমদ ও আসহাবে সুনান।

হজরত ওয়াসেলা থেকে শিথিল সূত্রে তিবরানী লিখেছেন, যে গণকের কাছে সমাধান জানতে চাইবে— চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার তওবা কবুল হবে না। আর তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে কাফের হয়ে যাবে।

শয়তান, মানুষ ও জ্বীন উভয় সম্প্রদায়েই আছে। এ সকল শয়তানের উদ্দেশ্য, মুসলমানদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করা। সর্বক্ষণ ওই শয়তানেরা বিভ্রান্তিতে লিপ্ত করাবার অপপ্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬১

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ○

❒ তাহাদিগকে যখন বলা হয় আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার দিকে এবং রসূলের দিকে আইস, তখন মুনাফিকদিগকে তুমি তোমার নিকট হইতে মুখ একেবারে ফিরাইয়া লইতে দেখিবে।

---

www.eelm.weebly.com

যখন মুনাফিকদেরকে বলা হয়, যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন এবং রসুল স. যা নির্দেশ করেন তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতদৃষ্টে বুঝা যায়, আল্লাহ্র নির্দেশাদি অবতীর্ণ না হলে কোনো কোনো ব্যাপারে রসুল স. ইজতেহাদ করতেন। তাঁর পবিত্র ইজতেহাদও এক ধরনের ওহী (ওহীয়ে খফি বা গোপন প্রত্যাদেশ)। তাই এখানে আল্লাহ্র কথা এবং রসুলের কথা পৃথকভাবে উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তাঁর দিকে এবং রসুলের দিকে।

ন্যায়বিচারকে মুনাফিকেরা ভয় পায়। তাই তারা রসুল স.কে এড়িয়ে চলতে চায়। ভাবে, অন্য কারো নিকট মীমাংসা প্রার্থী হলে ফয়সালাকারীকে ঘুষ দিয়ে অপমীমাংসা করানো সম্ভব। এটাই অসৎস্বার্থ বজায় রাখার পদ্ধতি।

আয়াতের শেষ শব্দটি হচ্ছে 'সুদুদা'। জাওহারী লিখেছেন, এর অর্থ বিমুখ হওয়া, বিরত থাকা। শব্দটি সকর্মক, অকর্মক—উভয় ক্রিয়া হিসেবেই ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন বলা হয়েছে, 'ফাছাদ্দা হুম আনিস্ সাবিল'—তাকে রাস্তা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে, বাধা দিয়েছে।

বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমর যখন ওই মুনাফিককে হত্যা করলেন, তখন তার উত্তরাধিকারীরা রক্তপণের দাবী নিয়ে হাজির হলো রসুল স. সকাশে। তারা কসম খেয়ে বললো, নিহত লোকটি রসুল স. এর সিদ্ধান্তকে অমান্য করেনি। এ রকম অসৎ উদ্দেশ্যে সে হজরত ওমরের কাছে যায়নি। বরং তার উদ্দেশ্য ছিলো যেনো হজরত ওমর উত্তম আচরণের মাধ্যমে বাদী বিবাদীদেরকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়ে দেন। তাদের এ রকম কৌশলমূলক কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬২

فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَٰنًا وَتَوْفِيقًا ○

❐ তাহাদের কৃতকর্মের জন্য যখন তাহাদের কোন মুসিবত হইবে তখন তাহাদের কী অবস্থা হইবে? অতঃপর তাহারা আল্লাহের নামে শপথ করিয়া তোমার নিকট আসিয়া বলিবে 'আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাহি নাই।'

---

www.eelm.weebly.com

আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'কাইফা' শব্দটি একটি বিস্ময়বোধক প্রশ্নবাণ। অর্থ হচ্ছে, কী বিস্ময়ের ব্যাপার! রসুল স. কে সরাসরি অমান্য করার পরও তারা অবলীলায় কীভাবে কসম খাচ্ছে। এমতো মিথ্যা শপথ তারা উচ্চারণ করে কী করে? কী ঘৃণ্য আচরণ নিহত মুনাফিকের উত্তরাধিকারীদের। হজরত ওমরের মতো সত্য প্রেমিকের প্রতি তারা কী জঘন্য অপবাদ আরোপ করতে উদ্যত হয়েছে। কী নির্দ্বিধায় মিথ্যার পর মিথ্যা সাজিয়ে তারা বলে যাচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো, হজরত ওমরের মাধ্যমে শত্রুতার পরিবর্তে যেনো পারস্পারিক সম্প্রতি স্থাপিত হয়ে যায়। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস রসুল স. ই আমাদের সংশোধনের জন্য যথেষ্ট। তাই আমরা হজরত ওমরের নিকট এই উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম যেনো রসুল স. এর সিদ্ধান্তের অনুসরণেই তিনি আমাদেরকে মিলিয়ে দেন। ভবিষ্যতে বিশৃংখলার অবকাশ যেনো আর না থাকে। কল্যাণ ও প্রীতি ছাড়া আমরা অন্য কিছুই চাই না।

মুনাফিকদের কসম খাওয়ার ব্যাপারটা ভবিষ্যতকালবোধক ধরে নিলে অর্থ হবে এ রকম— যখন তাদের উপর (আখেরাতে) আযাব নেমে আসবে, তখন তারা এ রকম মিথ্যা কসম কেমন করে খাবে? আখেরাত হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার চিরতরে পৃথক হওয়ার স্থান। সুতরাং তাদের এই অপপ্রচেষ্টা বিস্ময়কর নয় কি?

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬৩

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ○

❒ ইহারাই তাহারা যাহাদের অন্তরে কী আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর, তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও এবং তাহাদিগকে তাহাদের মর্ম স্পর্শ করে এমন কথা বল।

এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা এ সকল মুনাফিককে ভালো করেই চেনেন। তারা যতোই কসম করুক, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে দোজখ। অতএব হে প্রিয়তম নবী! আপনি শান্ত থাকুন। তাদেরকে উপেক্ষা করুন। তাদের কোনো নিবেদনকে আপনি গ্রহণীয় বিবেচনা করবেন না। বরং তাদেরকে মর্মস্পর্শী উপদেশ দিন, যেনো তারা কপটতা পরিহার করে খাঁটি মুসলমান হয়ে যায়। আপনি রসুল। তাই মানুষের অন্তর বিগলিত হয় এমন হৃদয়স্পর্শী নির্দেশনা প্রদানই আপনার জন্য শোভনীয়।

www.eelm.weebly.com

হাসান বসরী বলেছেন, 'ক্বওলাম বালিগা' অর্থ— এ রকম বলুন, তোমরা অন্তরের অপবিত্রতা সহই মারা যাবে। আয়াতের শেষ শব্দদ্বয় 'ক্বওলাম বালিগা' (মর্মস্পর্শী কথা) সম্পর্কে অন্যান্য আলেমগণ বলেন, এর অর্থ হবে আল্লাহ্‌র আযাবের ভীতিপ্রদর্শনসূচক কথা বলা।

আল্লামা জামাখশারী তাঁর তাফসীরে কাশ্‌শাফে লিখেছেন, 'ফী আনফুসিহিম' শব্দের সঙ্গে 'ক্বওলাম বালিগা' অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অর্থাৎ এমন কথা বলো যা (শ্রুতির মাধ্যমে অথবা শ্রুতি ব্যতিরেকেই) অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছে যায়।

বায়যাবী কাশ্‌শাফ রচয়িতার বক্তব্যকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'বালিগা' হচ্ছে 'ক্বওলান' এর বিশেষণ। সুতরাং ক্বওলান এর পরে স্পষ্ট বিশেষণ ব্যবহার হওয়ায় ক্বওলান এর আগে বিশেষ্য ব্যবহারের সুযোগ নেই। বায়যাবীর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এ রকম বলা যায় যে, 'ফী আনফুসিহিম' এর পূর্বে 'ক্বওলাম বালিগা' শব্দটি উহ্য আছে। সেই উহ্য কথাটিই তাফসীরে এনে বসানো হয়েছে।

আয়াতের আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুনাফিকদেরকে শাস্তি না দিয়ে নসিহত করার কথা বলার কারণ— মুনাফিকেরা প্রকাশ্যতঃ মুসলমানদের অন্তর্ভূত। তাই তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখলে কাফেরেরা দেখতে পাবে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য। এতে করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রভাব পড়বে কাফেরদের উপরেও। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে মুনাফিকদের শাস্তি বিধান করার নির্দেশ দেননি। বরং বিনম্র উপদেশ দিতে বলেছেন। এ রকম একক উপদেশ অধিকতর কার্যকর হয়ে থাকে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬৪

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○

❑ রসূল এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছি যে আল্লাহের নির্দেশ অনুসারে তাহার আনুগত্য করা হইবে। যখন তাহারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে তখন তাহারা তোমার নিকট আসিলে ও আল্লাহের ক্ষমা প্রার্থনা করিলে এবং রসূলও তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহিলে তাহারা আল্লাহ্‌কে ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ালু রূপে পাইত।

এরশাদ হয়েছে— হে নবী! আপনি তাদেরকে রসুল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে দিন। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌র হুকুমে যেনো তাঁদের (নবীদের) আনুগত্য করা হয়। 'বিইজনি' অর্থ হুকুম। 'বিইজনিল্লাহ্‌' অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে নবীকে মান্য করবে। তাঁর হুকুম

www.eelm.weebly.com

অনুযায়ী জীবন গঠন করবে। সকল ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তকেই শিরোধার্য করবে। যে এ রকম করবে না, সে হত্যার উপযোগী হবে। কারণ, রসুলের মীমাংসা না মানার অর্থ হচ্ছে রেসালতের অবমাননা করা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কেই অবমাননা করা। কারণ, রসুল নির্বাচন করেন আল্লাহ্তায়ালাই।

'আর যখন তারা নিজেদের নফসের উপর জুলুম করে' (অভ্যন্তরীণ অপরিচ্ছন্নতার কারণে অন্যের মীমাংসামুখী হয়), তখন তাদের কর্তব্য হবে তওবা করা। তখন তওবার উদ্দেশ্যে যদি তারা আপনার শরণাপন্ন হয়, খাঁটি নিয়তে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর সেই সঙ্গে রসুলও যদি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, তবে তারা দেখবে, আল্লাহ্ তায়ালা কতোইনা ক্ষমাপরায়ণ, কতোইনা দয়ালু। অপরাধীদের ক্ষমাপ্রার্থনার সঙ্গে তাদের জন্য রসুলের ক্ষমাপ্রার্থনার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, রসুলের অত্যুচ্চ মর্যাদাকে সুপ্রমাণিত করা।

ক্ষমাপ্রার্থনা করলে সকল অপরাধেরই ক্ষমা আছে। অপরাধ যতো বড় হোক না কেনো, অপরাধের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে। ক্ষমাপ্রার্থনাকারীকে আল্লাহ্পাক বিমুখ করেন না। কারণ, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬৫

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○

❐ কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তাহারা বিশ্বাস করিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তাহাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাহাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে উহা মানিয়া লয়।

সিহাহ্ সিত্তায় (বোখারী, মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিজি, নাসাঈ, এবং সুনানে ইবনে মাজায়) লিপিবদ্ধ রয়েছে, হেরার কোনো এক পাহাড়ী নালা থেকে জমিতে পানি দেয়ার ব্যাপারে হজরত জোবায়ের বিন আওয়াম এবং জনৈক আনসারীর মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। রসুল স. এর দরবারে তাঁরা বিচার প্রার্থী হলেন। রসুল স. বললেন, জোবায়ের তুমি প্রথমে তোমার বাগানে পানি দেয়ার পর আনসারীর বাগানের দিকে পানি ছেড়ে দিও। আনসারী এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারলো না। বললেন, জোবায়ের আপনার ফুফাতো ভাই। সেজন্যেই

www.eelm.weebly.com

আপনি এ রকম সিদ্ধান্ত দিলেন। এ কথা শুনে রসুল স. এর পবিত্র মুখমণ্ডলের বর্ণ পরিবর্তিত হলো। তিনি স. বললেন, জোবায়ের! তুমি নালার পানি দিয়ে বাগানের জমি ভেজাবার পর নালা বন্ধ করে দিও যেনো পানি বাগানের প্রাচীর পর্যন্ত ওঠে। তারপর পানি ছেড়ে দিও। রসুল স. এর প্রথম সিদ্ধান্তটি এ রকম ছিলো, যাতে করে হজরত জোবায়েরের যেনো অধিক অসুবিধা না হয়, আবার আনসারীও যেনো সুবিধা লাভ করে। আনসারী যখন এই সিদ্ধান্তে অপ্রসন্ন হলো, তখন তিনি স. দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে হজরত জোবায়েরের পূর্ণ অধিকার বলবৎ করে দিলেন। হজরত জোবায়ের বলেছেন, যতোটুকু জানা যায়, তাতে এই ঘটনা সম্পর্কেই এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

কবীর গ্রন্থে তিবরানী এবং মসনদ গ্রন্থে হুমায়দী হজরত উম্মে সালমা থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তির সঙ্গে হজরত জোবায়েরের বিবাদ দেখা দিয়েছিলো। বিষয়টি উপস্থাপিত হলো রসুল স. এর দরবারে। তিনি স. সিদ্ধান্ত দিলেন হজরত জোবায়েরের পক্ষে। তখন ওই লোকটি বললো, রসুল স. এর ফুফাতো ভাই হওয়ার কারণে এ রকম সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

বাগবী লিখেছেন, এক আনসারীর সঙ্গে হজরত জোবায়েরের বিবাদ দেখা দিলো। আনসারীর নাম ছিলো হাতেব বিন আবী বালতা। হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব থেকে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো হজরত জোবায়ের এবং হাতেব বিন বালতাকে উপলক্ষ করে। পানিসিঞ্চন সম্পর্কে দু'জনের বচসা দেখা দিয়েছিলো। রসুল স. তাঁর ফয়সালা ঘোষণা করে বলেছিলেন, প্রথমে উঁচু জমিতে পানি দিতে হবে। তারপর নিচু জমিতে।

আমি বলি, এই ঘটনার সঙ্গে হাতেব বিন আবী বালতা জড়িত নন। কারণ, তিনি আনসারী ছিলেন না। ছিলেন মুহাজির। বদর যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই ঘটনার সঙ্গে যে আনসারী জড়িত ছিলো, সে ছিলো প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক। আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের সঙ্গে বংশগত সম্পর্ক থাকার কারণে তাকে আনসারী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

বাগবী বলেছেন, বিষয়টি মীমাংসার পর উভয়ে চলে যাওয়ার সময় হজরত মেকদাদের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। হজরত মেকদাদ জিজ্ঞেস করলেন, কার পক্ষে ফয়সালা হলো? আনসারী মুখ বাঁকিয়ে বললো, তাঁর ফুফাতো ভাইয়ের পক্ষে। হজরত মেকদাদের কাছে উপস্থিত ছিলো এক ইহুদী। সে আনসারীর অবজ্ঞা প্রদর্শন দেখে বললো, আল্লাহ্ একে ধ্বংস করুন। এরা কেমন লোক। এরা রেসালাত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, অথচ রসুলের নির্দেশ উপেক্ষা করে। আল্লাহ্র কসম! বনী ইসরাইলেরা হজরত মুসার সময় গোনাহ্ করেছিলো। হজরত মুসা নির্দেশ দিয়েছিলেন— তওবা স্বরূপ তারা একে অপরকে হত্যা করবে। বনী ইসরাইল তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করেছিলো। নবীর নির্দেশ মানতে গিয়ে তাদের সত্তর হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তবু তাঁরা নবীর ফয়সালায় সন্দেহ করেননি। হজরত সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস এ কথা শুনে বললেন, আল্লাহ্র কসম! মোহাম্মদ স. যদি আমাকে আত্মহত্যা করতে নির্দেশ দেন তবে সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেকে হত্যা করবো।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ ও শায়বীর বক্তব্য এই যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মুনাফিক বাশার এবং জনৈক ইহুদীকে লক্ষ্য করে। তারা কোনো এক বিষয়ে রসুল স. এর নিকট বিচারপ্রার্থী হয়েছিলো। রায় ঘোষিত হয়েছিলো ইহুদীর পক্ষে। তারপর তারা হজরত ওমরের নিকট পুনঃবিচার প্রার্থী হলে হজরত ওমর মুনাফিক বাশারকে হত্যা করেছিলেন। ইতোপূর্বে এই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতের বর্ণনা দৃষ্টে মনে হয়, ওই দুইজনের সম্পর্কেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

আয়াতের 'লা' শব্দটিকে না সূচক ধরে নিলে অর্থ হবে এ রকম—ঘটনাটি এমন নয় যেমন ওই মিথ্যা ইমানের দাবীদার করেছিলো। ইমানের স্বীকৃতি দেয়ার পরও সে আপনার ফয়সালায় সন্তুষ্ট হচ্ছিলো না। কসম আপনার প্রতিপালকের! বিবাদ বিসম্বাদের বিচারের ব্যাপারে আপনার প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল না হওয়া পর্যন্ত তারা ইমানদার নয়। এ রকমও হতে পারে যে, 'ফালা ওয়া রব্বিকা'—র মধ্যে 'লা' শব্দটি অতিরিক্ত কসমের তাগিদে এসেছে। অর্থাৎ আপনার আল্লাহ্‌র কসম, এ ব্যাপারটি নিশ্চিত যে, ওই ব্যক্তি ইমানদার হতে পারবে না যতোক্ষণ না সে পারস্পরিক মতবিরোধপূর্ণ ব্যাপারগুলো সমাধানকল্পে আপনাকে বিচারক নির্ণয় না করে। 'শাজার' শব্দটির অর্থ বৃক্ষ। কিন্তু এখানে অর্থ হবে মতভেদ। বৃক্ষের শাখা প্রশাখা যেমন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে, মতভেদও তেমনি বিভিন্ন গতি ও অবস্থাসম্পন্ন।

'হারাজান' শব্দটির অর্থ সন্দেহ। এ কথা বলেছেন মুজাহিদ। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইমানের দাবীদারেরা অবশ্যই আপনাকে দ্বিধাহীনতার সঙ্গে মেনে নিবে। আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তারা কোনো দ্বিধা-সন্দেহকে প্রশ্রয় দিবে না। আপনাকে এবং আপনার সিদ্ধান্তকে মান্য করবে সর্বান্তকরণে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬৬

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اَشَدَّ تَثْبِيْتًا ○

❒ যদি তাহাদিগকে আদেশ দিতাম যে তোমরা নিহত হও অথবা আপন গৃহ ত্যাগ কর তবে তাহাদের অল্প সংখ্যকই ইহা করিত। যাহা করিতে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারা তাহা করিলে তাহাদের ভাল হইত এবং চিত্তস্থিরতায় তাহারা দৃঢ়তর হইত।

বাইরে বিশ্বাসী—অন্তরে অবিশ্বাসী, যারা এ রকম তাদেরকে বলা হয় মুনাফিক। আর রসুল স. এর সাহাবা তাঁরাই যাঁরা অন্তরে বাইরে পূর্ণ বিশ্বাসী। মুনাফিক ও সাহাবীগণের বাহ্যিক সাদৃশ্য ছিলো। পার্থক্য ছিলো অন্তরে। এই

www.eelm.weebly.com

আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মুনাফিকদেরকে। সাহাবীগণকে নয়। সাহাবীগণতো আল্লাহ্তায়ালার আনুগত্য করার জন্য সদা উন্মুখ। আল্লাহ্ তাদের প্রশংসায় অন্যত্র বলেছেন, 'তোমরাই উত্তম উম্মত যাদের অভ্যুদয় ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে।' আর এক স্থানে বলেছেন, 'তারা সৎকাজে পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী।' রসুল স. বলেছেন, উত্তম সময় আমার সময়। অন্য হাদিসে এসেছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাকে এবং আমার সহচরবৃন্দকে মনোনীত করে নিয়েছেন।

এই আয়াতে যদি সাহাবীরা সম্বোধিত হতেন তবে তাঁরা হজরত মুসার ওই উম্মতদের মতোই প্রমাণিত হতেন যাঁরা হজরত মুসার নির্দেশে তওবা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করেছিলেন। নির্দেশ পালন করতে দ্বিধান্বিত হবেন, এ রকম বিশ্বাসহীনতা সাহাবীগণের চরিত্রে সম্পূর্ণতঃই অনুপস্থিত।

জ্ঞাতব্যঃ সম্মানিত গ্রন্থকার র. এই কালামের উদ্দেশ্য বুঝতে অসমর্থ হয়েছেন মনে হয়। 'যদি তাহাদেরকে আদেশ দিতাম'—বলে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তারা যদি মুনাফিক হয় তবে এ কথা কেনো বলা হলো 'অল্প সংখ্যকই ইহা করিত?' এ কথার অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, মুনাফিকেরা নিহত হওয়ার এবং গৃহচ্যুত হওয়ার হুকুম অধিকাংশই প্রত্যাখ্যান করবে বটে কিন্তু কিছুসংখ্যক পালন করবে। অথচ সকল মুনাফিকদেরই হুকুম অমান্য করার কথা। আর যারা হুকুম পালন করবেন তাঁরা তো মুমিন। মুনাফিক নন। সুতরাং কীভাবে বলা যেতে পারে যে, আয়াতটির সম্বোধনস্থল কেবল মুনাফিকেরা। আর আয়াতে সম্বোধিতদের সকলকে সাহাবী তো বলা যেতে পারেই না। কারণ, তাঁরা সকলেই হুকুম মানবেন। কেউ মানবেন, কেউ মানবেন না— এ রকম নয়। কারণ, তারা খাঁটি ইমানদার। ইমানদারেরা হুকুম প্রত্যাখ্যানকারী হতেই পারেন না। এ সমস্ত চিন্তা করে সম্মানিত গ্রন্থকার স্থিরনিশ্চিত হতে পারেন নি যে, আয়াতের সম্বোধিতরা কারা? সাহাবীরা না মুনাফিকেরা। এই মন্তব্যের দৃষ্টিতে বুঝা যায়, এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে সকল মুসলমানকে। খাঁটি মুসলমান এবং মুনাফিক সকলকে। কারণ, দৃশ্যতঃ সকলেই মুসলমান। এ রকম ধারণা রাখাই উত্তম। তাহলেই বরং আয়াতের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। কারণ, পরক্ষণেই বলা হয়েছে, 'অল্প সংখ্যকই উহা করিত।' অর্থাৎ প্রকৃত মুমিনরাই হুকুম তামিল করতো। বাইরে বাইরে মুসলমানরূপে দৃষ্ট হলেও মুনাফিকেরা কিছুতেই নির্দেশ পালন করতো না। ইসলামের দাবীদার তো খাঁটি ও কপট সকলেই। এই আয়াতের মাধ্যমে তাদের মধ্যে অর্থাৎ খাঁটি ও অখাঁটির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। ওয়াল্লহু আ'লাম।

তাই আয়াতে মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, হে প্রিয়তম রসুল! যারা আপনার সিদ্ধান্তকে প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতে পারেনি, তাদেরকে যদি আমি নিহত হতে এবং গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে বলি, তবে তারা তা করতে গড়িমসি করবে।

www.eelm.weebly.com

'নিহত হও'—অর্থ আত্মহত্যা করো। বনী ইসরাইলেরা বাছুর পূজার মাধ্যমে হজরত মুসার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলো, তোমাদের অপরাধও সেরকমই। তোমরাও অন্যকে মীমাংসাকারী মেনে নিয়ে রসুলবিমুখ হয়েছো। তাদের উপর এ রকমই হুকুম দেয়া হয়েছিলো 'নিহত হও' (পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করো)।

'আপন গৃহ ত্যাগ করো'—অর্থ আপন জনপদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হও। বনী ইসরাইলদেরকে মিসর পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছিলো। বর্ণিত হুকুম দু'টি সম্পর্কে এ রকম ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, রসুলবিমুখতার কারণে বনী ইসরাইলদেরকে যেমন নিহত হওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছিলো এবং তাদের পরিত্রাণের নিশ্চিতির জন্য যেমন জন্মভূমি পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো— সে রকম নির্দেশ যদি মুসলমান বলে পরিচিতদেরকে দেয়া হয়, তবে মুনাফিকেরা এই হুকুম তামিল করবে না। কিন্তু সাহাবীরা করবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। তিনি ভালো করেই জানেন কে অনুগত। কে নয়।

সুদ্দীর বর্ণনা থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, এ আয়াতটি 'অল্প সংখ্যকই ইহা করিত'.... পর্যন্ত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবী সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস এবং এক ইহুদীর মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়ে গেলো। ইহুদী গর্ব ভরে বলতে শুরু করলো, আল্লাহ্ আমাদের জন্য আত্মহত্যা ওয়াজিব করলে আমরা অবশ্যই তা করতাম। হজরত সাবেত বললেন, আল্লাহ্র কসম। এ রকম নির্দেশ আমাদের প্রতি ফরজ করা হলে আমরাও তা করতাম। এর পর অবতীর্ণ হলো আয়াতের অবশিষ্ট অংশটুকু। এরশাদ হলো, বর্ণিত হুকুম দু'টো অত্যন্ত কঠিন হলেও যারা এ দু'টোকে কার্যকর করতো তারা নিশ্চিতরূপে লাভ করতো চিরঅক্ষয় ইমান ও প্রভূত কল্যাণ।

হাসান এবং মুকাতিল বর্ণনা করেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত ওমর, হজরত আম্মার বিন ইয়াসার, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ এবং আরো কতিপয় সাহাবা বললেন, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ আমাদেরকে এ রকম হুকুম দিলে আমরা অবশ্যই প্রসন্নচিত্তে তা পালন করতাম। কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ্। আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে আমাদেরকে ওই কঠিন বিপদ থেকে মুক্ত রেখেছেন। রসুল স. যখন সাহাবীগণের এ সকল মন্তব্য জানতে পারলেন তখন বললেন, আমার উম্মতের কারো কারো ইমান মৃত্তিকাস্থিত পাহাড়াপেক্ষাও অধিকতর মজবুতভাবে অন্তরে প্রোথিত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬৭, ৬৮

وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۝ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝

❒ এবং তখন আমি আমার নিকট হইতে তাহাদিগকে নিশ্চয়ই মহাপুরস্কার প্রদান করিতাম;

❒ এবং তাহাদিগকে নিশ্চয় সরল পথে পরিচালিত করিতাম।

---

www.eelm.weebly.com

অনুগ্রহসিক্ত এরশাদ হয়েছে, হুকুম প্রতিপালনের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। সেই সঙ্গে রয়েছে সরল সহজ পথ প্রদানের অঙ্গীকার, যে পথে রয়েছে প্রভূত মর্যাদা ও আল্লাহতায়ালার কাংখিত সামীপ্য।

নির্ভুল সূত্রপরম্পরায় আবু নাঈমের মাধ্যমে তিবরানী লিখেছেন, জননী আয়েশা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, হে রসুল! আপনি আমার নিকট জীবন, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। এখানে আপনার রূপচ্ছটা দেখে মোহিত হয়ে থাকি। কিন্তু ভাবতে পারি না পরবর্তীতে কী হবে। আপনি তো চলে যাবেন আপনার ভ্রাতৃবৃন্দ অন্যান্য নবী রসুলদের কাছে। আপনাকে পেয়ে ধন্য হবে সর্বোত্তম জান্নাত। আমরা থাকবো নিম্নস্তরে। আমরা তখন আপনার দর্শনবঞ্চিত হবো। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে হজরত জিবরাইল নিয়ে এলেন নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৬৯

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ○

☐ কেহ আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করিলে আল্লাহ্ যাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন সে তাহাদের সঙ্গী হইবেঃ যেমন, নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ! এবং তাহারা কত উত্তম সঙ্গী।

যাঁরা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের অনুগত, ফরজ নির্দেশসমূহ ও সুন্নতসমূহ যাঁরা মেনে চলেন, তাঁরা আল্লাহ্র অনুগ্রহভাজনদের সঙ্গ লাভে ধন্য হবেন। নবী, শহীদ ও অন্যান্য পুণ্যবানগণ আল্লাহ্র অনুগ্রহভাজন। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাসূত্রে তিবরানী এ রকম বলেছেন।

ইবনে আবী হাতেম হজরত মাসরুকের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, সাহাবীগণ রসুল স.কে বললেন, পৃথিবীতে আমরা সামান্য সময়ও আপনার নিকট থেকে পৃথক থাকতে পারি না। পরজগতে আপনি হবেন অত্যুচ্চ স্থানের অধিকারী। আমরা তখন কী করে দর্শন পাবো আপনার?

ইবনে জারীর, হজরত রবীর বক্তব্যানুসরণে বলেছেন, সাহাবীগণ বলেন, আমরা জানি ইমানের জগতে রসুল স. এর মর্যাদা সর্বাধিক। কিন্তু তাঁকে যারা বিশ্বাস করেছে, তাঁর অনুসরণ করেছে, তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। কিন্তু তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাক্ষাত ঘটবে কেমন করে (তাঁরা যেহেতু পৃথক পৃথক অবস্থানে থাকবেন)। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করলেন এই আয়াত। বললেন, বেহেশতবাসীরা বেহেশতের বাগানে সম্মিলিত হয়ে

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা প্রকাশ করবেন। উপরের স্তরের জান্নাতীগণ সকলেই নেমে আসবেন ওই বাগানে।

মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ লিখেছেন, হজরত রবীয়া বিন কাব আসলামী বলেছেন, আমি রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত হতাম। অজু ও ইস্তেঞ্জার পানির ব্যবস্থা করতাম আমি। তিনি স. একদিন বললেন, কিছু চাও। আমি নিবেদন করলাম, জান্নাতে আমি যেনো আপনার সঙ্গে থাকতে পারি। তিনি স. বললেন, আর কী চাও? আমি বললাম, ব্যস। এতোটুকুই। তিনি স. বললেন, তাহলে সেজদার সংখ্যা বাড়াতে থাকো। অর্থাৎ অধিক নামাজ পড়ো, যাতে করে তোমার নিবেদন বাস্তবায়নে সুপারিশ করতে পারি আমি।

হজরত ইকরামা বর্ণনা করেন, এক যুবক রসুল স. এর দরবারে হাজির হয়ে বললো, হে আল্লাহর রসুল, আপনার পবিত্র অবয়ব তো এখানে অহরহ দেখছি, কিন্তু কিয়ামতের দিন কী অবস্থা হবে? আপনি তো তখন থাকবেন অত্যন্ত উচ্চ অবস্থানে। ওই সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো। রসুল স. যুবকটিকে বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ্ তুমি জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকবে।

ইবনে জারীর মুরসাল হিসেবে হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের, হজরত মাসরুক, হজরত রবী, হজরত কাতাদা এবং সুদ্দী থেকে এই হাদিসটির বিবরণ দিয়েছেন।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. এর মুক্ত ক্রীতদাস হজরত সাওবান সম্পর্কে। রসুল স. কে তিনি অত্যধিক ভালোবাসতেন। রসুলবিরহ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একদিন রসুল স. দেখলেন, সাওবান বিষণ্ন ও চিন্তান্বিত। তিনি স. বললেন, তুমি বিমর্ষ কেনো? হজরত সাওবান বললেন, আমার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আপনার বিরহ অসহনীয়। আখেরাতে আপনি আপনার নবী ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে অবস্থান করবেন অনেক উঁচু বেহেশতে। তখনকার বিরহভাবনাই আমাকে বিমর্ষ করেছে। তখন তো দেখতে পাবো না আপনাকে। হজরত সাওবানের এমতো কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াতটি।

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর প্রীতিভাজনদের শ্রেণীবিন্যাস দেখিয়েছেন। তাঁরা হবেন চার শ্রেণীর। এতে দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অভিলাষ জাগ্রত করা হয়েছে। ওই তিন শ্রেণীর যে কোনোটিতে শামিল হওয়ার প্রচ্ছন্ন উৎসাহ দেয়া হয়েছে। শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে এভাবে—

১. নবী ও রসুল। তাঁরা প্রীতিভাজনদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান। তাঁরা আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলীর তাজাল্লীর অন্তরালবিহীন। নৈকট্যভাজন। তাঁরা বিনা মাধ্যমে জাতি নূরে রঞ্জিত। এ রকম জাতি তাজাল্লি সমৃদ্ধ পূর্ণত্বের নাম হচ্ছে কামালিয়তে নবুয়ত। আল্লাহ্তায়ালার জাতের ফয়েজ তাঁরা সরাসরি লাভ করে থাকেন। আর মাধ্যম হন ওই সকল মানুষের যাঁরা পূর্ণতার অনুসারী। কামেল ইনসানেরা (পূর্ণ মানুষেরা) এই নবী

www.eelm.weebly.com

রসুলগণের মাধ্যমে নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে আল্লাহ্তালার নৈকট্যের স্তরসমূহ অতিক্রম করে চলেন। আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ নির্বাচিত এই নবী, রসুলগণই আল্লাহ্র আহবান মানুষের নিকট পৌঁছে দেন এবং মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনকে করে তোলেন অর্থবহ।

২. সত্যবাদীগণ। এঁরা নবীর প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল অবস্থার পূর্ণ অনুসারী। তাঁরা অনুসারী হিসেবে কামালিয়তে নবুয়তের নূরে নিমজ্জিত। তাই নবীর পূর্ণ প্রতিনিধি।

৩. শহীদগণ। তাঁরা আল্লাহ্র পথে জেহাদরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই অনবদ্য কোরবানীর বিনিময় স্বরূপ তাঁরা জাতি নূরের এক বিশেষ পূর্ণত্ব অর্জন করে থাকেন।

৪. সৎকর্মপরায়ণ (সলিহীন)। এই পুণ্যবানেরা অন্যায় ও আবিলতা থেকে নফসকে (প্রবৃত্তিকে) পবিত্র রাখেন। তাঁদের অন্তর সদা জাগ্রত থাকে আল্লাহ্র স্মরণালোকে। সৃষ্টির প্রতি তাঁরা আন্তরিকভাবে আকর্ষণচ্যুত। তাঁদের শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পাপমুক্ত। ফানা ও বাকা লাভের পর তাঁরাও লাভ করেন জাতি তাজাল্লির ছায়া প্রতিচ্ছায়া। এঁদেরকেই বলা হয় অলিআল্লাহ্ বা আউলিয়া। আল্লাহ্তায়ালার নূরসমুদ্রে নিমজ্জিত হলে ফানা সংঘটিত হয়। তখন সৃষ্টজগতের অনুভূতি অবলুপ্ত হয়। আর বাকা হচ্ছে ওই অবস্থা — আল্লাহ্ পাকের ইসম (নাম), সিফাত (গুণাবলী), শান (মর্যাদা) এবং ইতেবারাত (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুমান) এবং পবিত্রতা সমূহের জ্ঞানলাভের পর এমন স্থানে উপনীত হওয়া যা বর্ণনায়, ইঙ্গিতে প্রকাশ করা যায় না। এই অবস্থা অনুভবযোগ্য নয়। এ রকম আত্মিক পরিণতির নামই বাকা বা বাকা বিল্লাহ্।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ্র অনুমোদন না থাকলে নবীগণ কাউকে হেদায়েত করতে পারেন না। প্রকৃত হাদী হচ্ছেন আল্লাহ্তায়ালা। মানুষ তাদের নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে নবীর মাধ্যমে ফয়েজ লাভ করে থাকেন এবং অবশেষে সফলতায় উপনীত হন।

নবীগণ মাধ্যমবিহীন তাজাল্লীয়ে জাতির অধিকারী। সিদ্দীক (সত্যবাদী) গণ নবীগণের মাধ্যমে তাজাল্লিয়ে জাতির নূরে স্থায়ীভাবে নিমজ্জিত। শহীদগণ লাভ করেছেন তাজাল্লীয়ে জাতির এক বিশেষ পূর্ণত্ব (অবশ্যই নবীর মাধ্যমে)। জাতি তাজাল্লীর সার্বক্ষণিক ফয়েজ তাঁরা পান না। কিন্তু জাতি তাজাল্লীর বিশেষ এক নূরে তাঁরা প্রোজ্জ্বল। আর আউলিয়া সম্প্রদায় নিমজ্জিত থাকেন সিফাতে তাজ্জাল্লীর নূরে। আর কখনো কখনো জাতি তাজাল্লীর ছায়া নয় বরং প্রতিচ্ছায়া পড়ে তাঁদের উপর। এখানেও নবীর মাধ্যম অপরিহার্য।

আল্লাহ্পাক এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, তিনি বেহেশতে ইমানদারদেরকে দীদার দানে ধন্য করবেন। তবে সেখানে দীদার লাভের স্তরগত পার্থক্য থাকবে। কারো দীদার লাভ হবে অধিক। কারো অল্প।

www.eelm.weebly.com

সিদ্দীকিয়াতের (সত্যবাদীতার) মাকামে (স্তরে) নবীগণও রয়েছেন। নবীগণ সিদ্দীক এবং নবী। আর যাঁরা নবী নন কেবলই সিদ্দীক— তাঁরা নবীদের মতোই পূর্ণত্বসম্পন্ন—কিন্তু তাঁদের অর্জনের অসিলা বা মাধ্যম হচ্ছেন নবী। সলিহীন (পুণ্যবান) গণ কেবলই সলেহীন। কিন্তু নবীগণ ও সিদ্দীকগণও সলেহীন (পুণ্যবান)। নবী হচ্ছেন নবী, সিদ্দীক ও সলেহ (পুণ্যবান)। সিদ্দীকগণ হচ্ছেন সিদ্দীক ও সলেহীন। আর সলেহীন হচ্ছেন শুধুই সলেহীন।

আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইব্রাহিম সম্পর্কে বলেছেন, 'নিশ্চয় তিনি সত্যবাদী নবী।' হজরত ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন, 'তিনি নেতা। তিনি সাধু এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভূত।' হজরত ঈসা সম্পর্কে জানিয়েছেন, 'তিনি দোলনায় অবস্থানকালে পরিণত বয়সীদের মতো কথা বলবেন। তিনি পুণ্যবানদের একজন।'

আমার পীর ও মোর্শেদ ইমাম মাযহারে শহীদ জানে জাঁনা যখন শহীদ হলেন, তখন আমি তাঁর মৃত্যুদিবস নিয়ে চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ আমার অন্তরে উদ্ভাসিত হলো এই আয়াতটি— 'ফা উলায়িকা মাআল্লাজিনা আনআমাল্লহু......' আমি তখন হিসেব বের করতে সক্ষম হলাম। মৃত্যুর বছর ১১৯৫ হিজরী নির্ধারণ করা গেলো। ওয়াল হামদুলিল্লাহ্।

আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে, 'ওয়া হাসুনা উলায়িকা রফিক্বা।'—এর অর্থ তাঁরাই (উপরোক্ত চার শ্রেণীর মানুষেরাই) উত্তম সঙ্গী। 'রফিক্বা' শব্দটি পার্থক্যজ্ঞাপক বিশেষ্য অথবা অবস্থাজ্ঞাপক বিশেষ্য। এই শব্দটি একবচন ও বহুবচন— সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৭০

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ○

❑ ইহা আল্লাহের অনুগ্রহ। জ্ঞানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও পুণ্যবানেরা আল্লাহ্তায়ালার প্রিয়জন। কেবল আল্লাহ্র নিছক অনুগ্রহেই তাঁদের সঙ্গী হতে পারা যায়। তাঁদের সঙ্গী হওয়া মানে তাঁদের দলভুক্ত হওয়া। তাঁদের সকলের সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালা মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। আর মহব্বত বা প্রেম-ভালোবাসা এমনই বিষয় যার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কেবল আল্লাহ্তায়ালাই সম্যক জ্ঞাত। দুই কাঁধের আমল লেখক ফেরেশতারা এর কোনো কিছুই জানতে পারে না।

হজরত আনাস বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আরজ করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! এক লোক এক সম্প্রদায়কে ভালোবাসে। কিন্তু সে ওই সম্প্রদায়ের নিকটে পৌঁছতে সক্ষম নয়। দূর থেকেই সে তাদেরকে ভালোবাসে। রসুল স. বললেন, ওই ব্যক্তি (প্রকৃত অর্থে) তাদেরই সঙ্গী যাদেরকে সে ভালোবাসে। আহমদ, বোখারী, মুসলিম।

বোখারী ও মুসলিমে এই হাদিসটি হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কিয়ামত সংঘটিত হবে কখন। রসুল স. বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো। আমি বললাম, অন্য কিছুতো নেই। কিন্তু আমি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলকে ভালোবাসি। রসুল স. বললেন, তবে তুমি তাঁদেরই সঙ্গী যাদেরকে তুমি ভালোবাসো। বর্ণনাকারী হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. এর এই পবিত্র বাণী শুনে মুসলমানদেরকে ইসলাম আগমনের পর আর কখনো এতো আনন্দিত হতে দেখা যায়নি। বোখারী, মুসলিম।

এ রকমও হতে পারে যে, এখানে আল্লাহ্তায়ালা যে অনুগ্রহের কথা বলেছেন—তা অনুগ্রহভাজন বান্দাদের মর্যাদার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ অনুগ্রহভাজন বান্দাগণের নিকট থেকে ফয়েজ লাভ করাই আল্লাহ্র অনুগ্রহ। নিজস্ব সাধনার মাধ্যমে এই অনুগ্রহ অর্জনের যোগ্য হওয়া যায় না।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আমল দুরস্ত রাখো। কিন্তু মনে রেখো, নাজাত (পরিত্রাণ) কখনোই আমল নির্ভর নয়। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনিও কি? তিনি স.বললেন, আমিতো তাঁর রহমতবেষ্টিত। বোখারী, মুসলিম।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًا ۝ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ۝ وَلَئِنْ أَصَٰبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌ يَٰلَيْتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

❒ হে বিশ্বাসীগণ! সতর্কতা অবলম্বন কর; অতঃপর হয় দলে দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হও অথবা এক সঙ্গে অগ্রসর হও।

❒ তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে গড়িমসি করিবেই। তোমাদের কোন মুসিবত হইলে সে বলিবে, 'তাহাদের সহিত না থাকায় আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন।'

❒ আর তোমাদের প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহ হইলে, যেন তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই এমনভাবে বলিবেই, 'হায়! যদি তাহার সহিত থাকিতাম তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করিতাম।'

www.eelm.weebly.com

এরশাদ হয়েছে, (জেহাদের জন্য) সতর্ক হও অর্থাৎ অস্ত্রসজ্জিত হও। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে অথবা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হও।

বিভিন্ন দল অর্থ ছোট ছোট সেনাদল। এ রকম বলেছেন মুজাহিদ। আর হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— দশ কিংবা দশের অধিক সৈন্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল।

অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ জারী করার পর বলা হয়েছে, দেখবে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই নির্দেশ প্রতিপালনে গড়িমসি শুরু করেছে। এ রকম তারা করবেই। কারণ, তারা ইমানদার নয়। মুনাফিক। তারা কেবল নিজেরা গড়িমসি করেই ক্ষান্ত হবে না, অন্যদেরকেও জেহাদে গমন করতে নিরুৎসাহিত করবে। যেমন উহুদ যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ্ বিন উবাই কিছু লোককে যুদ্ধে যেতে বাধা দিয়েছিলো। মুনাফিকেরা এ রকমই করে। তারা সাগ্রহে যুদ্ধের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে। যদি দেখে মুসলমান বাহিনী বিপদগ্রস্ত হয়েছে, তবে বলে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ রয়েছে আমাদের প্রতি। তাই আমরা মুসলমানদের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পেরেছি। নতুবা মুসলমানদের মতো আমরাও বিপদগ্রস্ত হতাম।

ফলাফল বিপরীত হলে তারা আক্ষেপ করতে থাকে। বলে, হায়! আমরা যদি তাদের সঙ্গে থাকতাম তবে কতোইনা উত্তম হতো। সাথে থাকলে যুদ্ধবিজয়ের গৌরব আমরাও পেতাম। আর সেই সঙ্গে পেতাম গণিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)। তাদের এ সকল কথায় পরিষ্কার বুঝা যায়, তোমাদের প্রতি তাদের কোনো মহব্বত বা ভালোবাসা বলে কিছু নেই। তাদের ভালোবাসা কেবল বিজয় ও সম্পদের প্রতি। তারা হিংসুক। তোমাদের সফলতা তাদের অন্তরে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। আর তোমাদের বিপদগ্রস্ততা তাদেরকে আনন্দিত করে। এই হচ্ছে মুনাফিকদের পরিচয়। হে ইমানদারগণ, তাদেরকে ভালো করে চিনে নাও।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৭৪

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

❑ সুতরাং, যাহারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তাহারা আল্লাহের পথে সংগ্রাম করুক, এবং কেহ আল্লাহের পথে সংগ্রাম করিলে সে নিহত হউক অথবা বিজয়ী হউক তাহাকে মহা পুরস্কার দান করিব।

জেহাদ আল্লাহ্র হুকুম। তাই পূর্বের আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রসজ্জিত হও। তারপর আল্লাহ্র পথে জেহাদে অবতীর্ণ হও। মুনাফিকদেরকে আমলে এনো না। তারা যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে করতে দাও। তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধযাত্রা করা। সুতরাং অগ্রসর হও।

www.eelm.weebly.com

এই আয়াতে বলা হলো, 'যাহারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে'—এ কথার লক্ষ্য হচ্ছেন ওই সকল বিশুদ্ধচিত্ত মানুষ, যাঁরা আখেরাতের কল্যাণ লাভের আশায় তাঁদের পার্থিব জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এ কথার মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে মুনাফিকদেরকে। সুতরাং অর্থ হবে এ রকম— তোমরা যারা আখেরাতকে ছেড়ে দুনিয়াকে ভালোবেসে ফেলেছো তাদের কর্তব্য হবে বিশুদ্ধ বিশ্বাস অবলম্বন করা। নেফাক (অপবিত্রতা) পরিত্যাগ করতে হবে। জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এ রকম না করলে পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীতে লাভ হবে কেবলই গ্লানি। কেবলই আক্ষেপ।

এরশাদ হয়েছে, জেহাদে নিহত হওয়া অথবা বিজয়ী হওয়া উভয় অবস্থাই কল্যাণকর। নিহত হলে লাভ হবে শাহাদাতের বিরল সৌভাগ্য। আর বিজয়ী হলে লাভ হবে সম্মান ও সম্পদ। কিন্তু এ সকল কিছু মূল লাভ নয়। আখেরাতের সওয়াব লাভই হচ্ছে মূল সফলতা। এই সওয়াব শহীদও পাবেন। গাজী (বিজয়ী)ও পাবেন। বিজয়ীদের সম্মান ও সম্পদ আখেরাতের সওয়াব লাভের প্রতিবন্ধক হবে না। কারণ, জেহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুন্নত করাই ছিলো মুজাহিদদের উদ্দেশ্য।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ইমান এবং রসুলের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় (পার্থিব লাভালাভ যদি তার উদ্দেশ্য না থাকে), আল্লাহ্ তাকে তাঁর আপন জিম্মায় নিয়ে নেন। এরপর আল্লাহ্ তাঁকে সওয়াব ও গণিমতের মালসহ বিজয়ীর বেশে স্বগৃহে প্রবেশ করাবেন অথবা (শাহাদাতের মাধ্যমে) তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার দ্বিতীয় বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদলিপ্তরা বিরতিহীন রোজা পালনকারী, সারারাত ইবাদত সম্পাদনকারী এবং বিনয়াবনত কোরআন পাঠকারীর মতো। মুজাহিদেরা এ রকম অবস্থায় থাকবে গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত। আল্লাহ্ তাদেরকে সওয়াব ও গণিমতসহ গৃহগমনের সুযোগ দিবেন অথবা শাহাদাতের মাধ্যমে জান্নাতে দাখিল করাবেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৭৫

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

❑ তোমাদের কী হইল যে তোমরা সংগ্রাম করিবে না আল্লাহের পথে এবং অসহায় নর-নারী এবং শিশুগণের জন্য? যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ যাহার অধিবাসী জালিম উহা হইতে আমাদিগকে অন্যত্র লইয়া যাও;

www.eelm.weebly.com

তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের সহায় কর।'

জেহাদে উদ্বুদ্ধ করতে এই আয়াতে উপস্থাপিত হয়েছে এক অনন্য বাকভঙ্গি। বলা হয়েছে, ওই শোন, নিপীড়িত নারী-পুরুষ ও শিশুদের আহাজারী! তোমরা তো ইমানদার। অত্যাচারিত মানবতাকে উদ্ধার করা তোমাদের ইমানী কর্তব্য নয় কি? তবে কেনো তাদের মুক্তির জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ শুরু করবে না? কী হলো তোমাদের? এখানে প্রশ্নাকারে জেহাদ বিমুখতাকে অস্বীকার করা হয়েছে।

রসুল স. মদীনায় হিজরত করেছিলেন। মুসলমানদের অনেকেই মদীনায় এসে নিরাপদে বসবাস করছিলেন। কিন্তু মক্কায় আটকে পড়েছিলেন বেশ কিছু মুসলমান নারী, পুরুষ ও শিশু। মুশরিকদের দ্বারা অত্যাচারে জর্জরিত হচ্ছিলেন তাঁরা। তাঁদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌পাক মদীনায় বসবাসরত মুসলমানদেরকে রসুল স. এর মাধ্যমে এই আয়াতে জেহাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

'ফি সাবিলিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র পথে। সকল পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু দুর্বল মুসলমানদেরকে উদ্ধার করা শ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম— তাই এখানে বিশেষ করে 'ফি সাবিলিল্লাহ্' উল্লেখিত হয়েছে।

মক্কায় আটকে পড়া মুসলমানেরা প্রার্থনা করে চলেছে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদের অধিবাসীরা অত্যাচারী। তারা আমাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। আমাদের ত্রাণ করো। অন্যত্র আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করে দাও। আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দাও অভিভাবক এবং সাহায্যকারী, যারা আমাদেরকে মুশরিকদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করবেন।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি ও আমার মা ওই অত্যাচারিতদের মধ্যে ছিলাম। বোখারী।

আল্লাহ্‌তায়ালা মজলুমদের প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। মক্কাবিজয়ের পর রসুল স. মক্কার শাসক হিসাবে নিযুক্তি দিয়েছিলেন হজরত ইতাব বিন উমাইদকে। তিনি ছিলেন অত্যাচারিতের সাহায্যকারী এবং ন্যায়পরায়ণ।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৭৬

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

❐ যাহারা বিশ্বাসী তাহারা আল্লাহের পথে সংগ্রাম করে এবং যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাহারা তাগুতের পথে সংগ্রাম করে; সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর; শয়তানের কৌশল দুর্বল।

www.eelm.weebly.com

যারা ইমানদার তারা জেহাদ করেন আল্লাহ্‌র পথে। এই পথেই তারা আল্লাহ্ পর্যন্ত উপনীত হন। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) — তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। এই পথ তাদেরকে নিক্ষেপ করে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে।

এখানে নির্দেশ হচ্ছে, তোমরা শয়তানের সঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। অবিশ্বাসীরাই শয়তানের সঙ্গী। শয়তান তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা ঢেলে দেয়। সত্যের বিরুদ্ধবাদী হতে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু তার এই কুমন্ত্রণা দানের প্রচেষ্টা নিতান্তই দুর্বল। আঘাত হানলে সহজেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বদর যুদ্ধের সময় সে কাফেরদেরকে বলেছিলো, অগ্রসর হও। আমি তোমাদের পিছনে রয়েছি। তোমাদের উপর জয়লাভ করার সাধ্য কারো নেই। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে সে যখন মুসলমানদের সাহায্যকারী হিসেবে ফেরেশতাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি দেখলো, তখন ভয়ে পালিয়ে গেলো। যেতে যেতে বললো, তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। হে অবিশ্বাসীর দল! আমি যা দেখি তোমরা তা দেখতে পাও না। আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি। তাঁর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে নাসাঈ এবং হাকেম লিখেছেন, রসুল স. মক্কায় ইসলাম প্রচার শুরু করলে এক এক করে এগিয়ে এলেন অনেকেই। মুশরিকেরা তাদের উপর নির্যাতন শুরু করলো। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং কতিপয় সাহাবী বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমরা যখন মুশরিক ছিলাম তখন সম্মানিত ছিলাম। মুসলমান হওয়ার পর লাঞ্ছিত হচ্ছি। রসুল স. বললেন, আমাকে বলা হয়েছে অত্যাচারী কাফেরদেরকে ক্ষমা করে দিতে। সুতরাং তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেয়ো না। হিজরতের পর যখন রসুল স. এবং মুহাজির সাহাবীরা মদীনায় বসবাস করছিলেন, তখন আল্লাহ্‌পাক মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু মুসলিম জনতা জেহাদে উজ্জীবিত হচ্ছিলেন না। এক ধরনের স্থবিরতা যেনো পেয়ে বসেছিলো তাঁদেরকে। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৭৭

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ
اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا
إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ
وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ○

❒ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সম্বরণ কর, সালাত কায়েম কর এবং জাকাত দাও।' অতঃপর

www.eelm.weebly.com

যখন তাহাদিগকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল তখন তাহাদের একদল মানুষকে ভয় করিতেছিল আল্লাহ্‌কে ভয় করার মতো অথবা তদপেক্ষা অধিক, এবং বলিতে লাগিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলে? আমাদিগকে কিছু দিনের অবকাশ দাও না?' বল, 'পার্থিব ভোগ সামান্য! এবং যে সাবধানী তাহার জন্য পরকালই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হইবে না।'

এখানে বিস্ময়াবিষ্ট প্রশ্নের আকারে বলা হয়েছে, হে প্রিয়তম নবী! আপনি কি লক্ষ্য করছেন না, এক সময় তারা যুদ্ধ করতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো, তখন তাদেরকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। তাদের সেই আকাংখিত যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হলো এখন। অথচ তারা উদ্দীপনারহিত, ভীত। কেনো?

'হস্ত সম্বরণ করো'— অর্থ হাত গুটিয়ে বসে থাকো। যুদ্ধ করো না। বাগবীর মাধ্যমে কালাবী লিখেছেন, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ, জুহ্‌রী, হজরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ কান্দি, হজরত কুদামা বিন মাজউন জাহমী, হজরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস ও আরো কতিপয় সাহাবী মক্কার মুশরিকদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিলেন। তাঁরা রসুল স. এর নিকট নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল, অংশবাদীরা আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিন। রসুল স. বললেন, হাত গুটিয়ে বসে থাকো। এখনো আমাকে যুদ্ধ করতে বলা হয়নি।

নামাজ পড়ো এবং জাকাত দাও—এই হুকুমটিও জেহাদ। প্রাথমিক এবং প্রধান জেহাদ। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ অপেক্ষা এই যুদ্ধই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। প্রথমে এই যুদ্ধে রত হতে হবে। বিজয়ী হয়ে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হবে। আত্মসংশোধনের পর অন্যের সংশোধনের কথা আসে। তাই মক্কায় অবস্থানকালে আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্যই নামাজ ও জাকাত প্রতিপালনের হুকুম দেয়া হয়েছিলো। প্রবৃত্তিকে বশীভূত করার এই যুদ্ধ ফরজে আইন (ব্যক্তিগত ফরজ)। আর কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফরজে কেফায়া। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে সংশোধন করা, অপরাধ মুক্ত করা।

জেহাদের অনুমতি দেয়া হলো মদীনায় হিজরতের পর। কিন্তু কী আশ্চর্য! যারা যুদ্ধের জন্য ব্যাকুল ছিলো, তারা কেমন আগ্রহরহিত, ভীত, চিন্তিত। ভয় তো করতে হবে আল্লাহ্‌কে। কিন্তু তারা এখন অবিশ্বাসীদের ভয়ে ভীত। যেমন ভয় করতে হয় আল্লাহ্‌কে, সে রকম অথবা তারও বেশী ভয় করছে তারা অংশীবাদীদেরকে। বিষয়টি বিস্ময়কর নয় কি!

যে ভয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে, তা প্রকৃত অর্থে ভয় নয়। কারণ, আল্লাহ্‌র চেয়ে আল্লাহ্‌র বান্দাকে অধিক ভয় করা কুফরী। এ রকম ভয় সাহাবীগণের ছিলোই না। কারণ তাঁরা ছিলেন বিশুদ্ধ মুমিন। এখানে ভয় অর্থ এক ধরনের অনুদ্দীপনা, জড়তা। আয়াতে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এ জন্যই। ইমানদারেরা

www.eelm.weebly.com

হবে আড়ষ্টতামুক্ত, অথচ তাঁদেরকে মনে হচ্ছে কী রকম ভীতসন্ত্রস্তদের মতো আড়ষ্ট, উজ্জীবনহীন। আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ এ রকমই।

খারেজীদের অভিমত এর বিপরীত। তারা সব সময় প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। তারা বলে, কবীরা গোনাহকারী কাফের। আর আল্লাহ্র চেয়ে বান্দাকে অধিক ভয় করা কুফরী। তারা এ সম্পর্কে এ রকম যুক্তির অবতারণা করে যে, জ্ঞানীরা সাপের গর্তে হাত প্রবেশ করায় না। যদি প্রবেশ করায় তবে বুঝতে হবে, হয় সে উম্মাদ, অজ্ঞ কিংবা তার বিশ্বাস নেই যে, গর্তের মধ্যে সাপ আছে। কবীরা গোনাহকারীদের অবস্থা এ রকমই। আযাবের আয়াতের প্রতি বিশ্বাস থাকলে তারা কখনোই গোনাহ্ করতো না।

আমাদের ব্যাখ্যায় খারেজীদের দলিল বাতিল প্রমাণিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্তরে সাপ দংশন করবে না—এ রকম দৃঢ় বিশ্বাসও থাকতে পারে। এছাড়া অমনোযোগিতা, ভুল (গোনাহ নয়) — এ রকম মানবিক প্রভাবও তাঁদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে। সুতরাং নির্দেশ প্রতিপালনে বিলম্বিত সাড়া দিলে ইমানদার কখনো কাফের হয়ে যায় না। যদি যেতো তবে ব্যাপারটা আর আশ্চর্যজনক থাকতো না। কারণ, কাফেরদের কুফরী কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। বরং ইমানদারদের অনুৎসাহই বিস্ময়ের কারণ। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গিতে এই সুরটিই কিঞ্চিত নেপথ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

আল্লাহ্তায়ালা এর পর ওই সকল সাহাবীর মনের অবস্থাকে প্রকাশ করে দিয়ে বলেছেন, তাদের কামনা এ রকম— যুদ্ধ বিলম্বিত হোক। আমরা অবকাশ প্রার্থী। কেনো যে সহসা জেহাদের বিধান বলবৎ করা হলো। আমরা তো চাইছিলাম নিরুপদ্রব জীবন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁদের এই অসুন্দর চিন্তাকে খণ্ডন করে স্নেহসিক্ত আহবানের মাধ্যমে বৃহত্তর সাফল্যের দিকে পথনির্দেশ করে জানিয়ে দিচ্ছেন, হে প্রিয়তম নবী! আপনি জানিয়ে দিন, পার্থিব জীবন অস্থায়ী। এই অনিশ্চয়তায় ভোগবিলাসের আর অবকাশ কোথায়? অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে এই পার্থিবতা। আয়ুর পরিসর কিঞ্চিত প্রসারিত হলেও কী লাভ—মৃত্যুই যখন সকলের অনড় পরিণতি। সুতরাং সাবধান হও। পরকালকেই উত্তম জ্ঞান করো। আলস্য পরিত্যাগ করো। অস্ত্রসজ্জিত হও। যুদ্ধযাত্রা করো। তোমাদের উপর জেহাদ ফরজ করার উদ্দেশ্য তোমাদেরকে পুণ্যপ্লাবিত করে দেয়া, চিরস্থায়ী জীবনের সফলতা দান করা। আরো অবগত হও হে বিশ্বাসীরা! তোমাদের উপর যৎসামান্য জুলুমও করা হবে না। তোমাদের পুণ্যসম্ভার ন্যূনতর করা হবে না। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীর যে আয়ু নির্ধারণ করা হয়েছে তাও কম করা হবে না। সুতরাং একথা মনে কোরো না যে, জেহাদে গেলেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে। আর না গেলেই নির্ধারিত মৃত্যু ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।

মুনাফিকেরা বলাবলি করছিলো, তারা (সাহাবীগণ) যদি আমাদের মতো যুদ্ধযাত্রা থেকে ফিরে আসতো— তবে, মারা পড়তো না (শহীদ হতো না)। তাদের এহেন মূর্খজনোচিত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ○

❑ তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই, এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করিলেও। যদি তাহাদের কোন কল্যাণ হয় তবে তাহারা বলে, 'ইহা আল্লাহের নিকট হইতে;' আর যদি তাহাদের কোন অকল্যাণ হয় তবে তাহারা বলে, 'ইহা তোমার নিকট হইতে।' বল, 'সব কিছুই আল্লাহের নিকট হইতে।' এই সম্প্রদায়ের হইল কী যে ইহারা একেবারেই কোন কথা বোঝে না।

মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যুকে রোধ করা কিংবা প্রতিহত করা কারো পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। আয়াতে বলা হয়েছে, মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের অবস্থান বেছে নাও। সুদৃঢ় দুর্গ বুঝাতে এখানে উল্লেখিত হয়েছে 'বুরুজীল মুশাইয়াদাহ' শব্দটি। হজরত কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ মজবুত অট্টালিকা। হজরত ইকরামা বলেছেন, চুনাপাথর নির্মিত অট্টালিকা।

পূর্ববর্তী আয়াতের 'আমাদেরকে কিছু দিন অবকাশ দাও'—এর পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে জবাব স্বরূপ বলা হয়েছে, 'মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই—'। সতর্ক করা হয়েছে এই বলে যে, যুদ্ধ করলেই মৃত্যু আসে না। তকদীরের অনড় লিখন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়েই মৃত্যু এসে পড়ে। যুদ্ধ করলেও। না করলেও।

রসুল স. এর মদীনায় আগমনের পর ইহুদীরা ও মুনাফিকেরা হিংসায় জ্বলতে লাগলো। তারা রসুল স. কে লক্ষ্য করে বলতো, এই লোক ও তার সহচরদের কারণেই আমাদের এহেন দুর্দশা। আমাদের ফল ও ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। ভালো কিছু হলে তারা বলে, এ রকম হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার দয়ায়। অর্থাৎ আমাদের যোগ্যতার কারণেই আল্লাহ্ আমাদেরকে অধিক সম্পদ ও রিজিক দান করেছেন। যখন তাদের পার্থিব ক্ষতি হয় তখন আবার বলে, এসব হচ্ছে তোমার (রসুল স. এর) কারণে। তোমরা হতভাগ্য তাই তোমরাই আমাদের ক্ষতিগ্রস্ততার কারণ। —ইহুদীদের এ রকম ঘৃণ্য মনোভাব ও কথোপকথনের পরিচিতি দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীকে নির্দেশ করছেন, বলুন, 'সবকিছু আল্লাহের নিকট হতে।' অর্থাৎ

www.eelm.weebly.com

ভালো মন্দ সবই আল্লাহ্তায়ালার নির্ধারণ। তিনিই অবতীর্ণ করেন কল্যাণ ও অকল্যাণ। একজনের অপরাধের জন্য অন্যজনকে শাস্তি দেয়া তাঁর বিধান নয়।

আয়াতের শেষ দিকে সত্যবিমুখ ইহুদী ও মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, ওরা একেবারেই বুঝে না। সত্য কথা শুনতেই চায় না। আয়াতের শেষ শব্দটি হচ্ছে 'হাদিসান'—এর অর্থ কথা। এখানে অর্থ হবে আল্লাহ্র কথা (কোরআন)। কোরআনের প্রতি মনোনিবেশ করলে সহজেই প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হতো তাদের সামনে। 'হাদিসান' শব্দটির অর্থ কেবল কথা ধরা হলে অর্থ হবে এ রকম—ইহুদী ও মুনাফিকেরা চতুষ্পদ পশুর মতো। তাই কথা বুঝে না। যদি মানুষ হতো তবে কথা শুনতো এবং বুঝতো।

সূরা নিসা ঃ আয়াত ৭৯

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ۚ

وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝

❐ কল্যাণ যাহা তোমার হয় তাহা আল্লাহের নিকট হইতে এবং অকল্যাণ যাহা তোমার হয় তাহা তোমার নিজের কারণে এবং তোমাকে মানুষের জন্য রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছি; সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

এরশাদ হয়েছে, ভালো যা কিছু তোমরা লাভ করে থাকো তা সমস্তই আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ। এ আয়াতে প্রচ্ছন্নভাবে সকল মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ তার সততা ও সৎকর্মশীলতার জন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারে না। মানুষ যদি সম্পূর্ণতঃই পাপমুক্ত হয়, সারাক্ষণ সৎ আমলে ব্যাপৃত থাকে, তাদের সৎকর্ম যদি আল্লাহ্পাক কর্তৃক অনুমোদিতও হয়, তবু তারা গৌরব প্রকাশ করতে পারবে না। প্রতিদান লাভের দাবীদারও হবে না। কারণ তাদের অস্তিত্ব, অস্তিত্বজ যোগ্যতা, সৎকর্মের আগ্রহ, আমল সম্পাদনের শক্তি ও সাহায্য সবই লাভ হয়েছে আল্লাহতায়ালার নিকট থেকে। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার নিছক অনুগ্রহ। ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্ভব নয়। কারণ, তিনি তওফিক না দিলে ইবাদত তো সম্ভবই ছিলো না। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশই যখন সম্ভব নয়, তখন ইবাদতের বিনিময় লাভের দাবীও অযৌক্তিক। নিজস্ব যোগ্যতা থাকলেই কেবল দাবীর প্রসঙ্গটি ওঠে। কিন্তু এখানে সে রকম কিছু নেই। রয়েছে শুধু দিকহীন, চিহ্নহীন, সীমানাহীন অনুগ্রহ। কেবলই অনুগ্রহ। এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই অনুগ্রহ দান করতে তিনি বাধ্য নন। কারণ বাধ্যগত হওয়া থেকে তিনি পবিত্র।

www.eelm.weebly.com

অকল্যাণও অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্র দিক থেকে। কিন্তু অকল্যাণ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সৃষ্টি করে মানুষ। এ সমস্ত হচ্ছে মানুষের গোনাহের শাস্তি। প্রত্যেকে তার নিজ পাপের জন্যই শাস্তির উপযোগী হবে। একে অন্যের পাপের জন্য দায়ী হবে না। মানুষ যখন অবিশ্বাসকে নির্বাচন করে তখন আখেরাতের অনন্ত শাস্তির উপযোগী হয়ে যায়। দুনিয়াতেও সে অন্তহীন শাস্তির নিদর্শন প্রকাশিত হতে পারে। বিশ্বাসীদের প্রতিও পৃথিবীতে বিপদ মুসিবত নেমে আসে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা শাস্তি মনে হলেও তাদেরকে শাস্তি দান আল্লাহ্র উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশোধন। পাপের ক্ষতিপূরণ। আখেরাতের অধিকতর মর্যাদা লাভের সুযোগ। জননী আয়েশা বলেন, রসুল স. বলেছেন, মুসলমানদের প্রতি আপতিত বিপদ গোনাহের কাফফারা (ক্ষতিপূরণ)। পায়ে কাঁটা ফুটলেও গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, যে সকল দুঃখকষ্ট, রোগব্যাধি মুসলমানদের প্রতি আপতিত হয়— এমন কি পায়ে কাঁটাও যদি ফোটে তবুও তা পাপের ক্ষতিপূরণ। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেন, হোঁচট খাওয়া অথবা এর চেয়েও কম কষ্ট যা কিছু এসে থাকে—তা গোনাহের কাফফারা। আর আল্লাহ্ অধিকাংশ গোনাহ তো বিপদ কষ্ট ব্যতিরেকেই ক্ষমা করে দেন। তিরমিজি।

পূর্ববর্তী আয়াতে কল্যাণ অকল্যাণ সম্পর্কিত ইহুদীদের বিকৃত ধারণাকে সংশোধন করা হয়েছে এই আয়াতে। দেয়া হয়েছে কল্যাণ অকল্যাণের যথাযথ ধারণা।

এরশাদ হয়েছে, 'আমি আপনাকে মানুষের জন্য রসুল হিসেবে প্রেরণ করেছি। আপনিই মহাবিশ্বের রহমত'। অবিশ্বাসী ইহুদী ও মুনাফিকদের কথা অসঙ্গত। তারা তাদের অপপ্রবৃত্তির কারণে রহমতবঞ্চিত। তাই তারা আযাবগ্রস্ত হবে। আখেরাতেও। দুনিয়াতেও। রসুল স. এর আনুগত্যহীনতার কারণেই তারা আজ দুর্দশাগ্রস্ত। হে প্রিয়তম নবী! মনস্তাপের কোনো কারণ নেই। আল্লাহ্ নিজেই আপনার সততার সাক্ষ্যদাতা। সাহায্যকারী। তিনি মোজেজা দানের মাধ্যমে আপনার রেসালতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিয়ামতের দিন কাফেরদের বচসাপ্রবণতার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ই আপনার পক্ষে সাক্ষ্য পেশ করবেন। কাফেরেরা তখন নির্বাক হয়ে যাবে। আযাবগ্রস্ত হবে তারা। তখন প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল কিছু হবে তাঁর সরাসরি হুকুমের অধীন। তিনিই তখন তাঁর অসীম জ্ঞানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অন্য সাক্ষীর প্রয়োজন হবে না।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, 'যে আমার অনুসরণ করলো, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্রই অনুসরণ করলো। যে আমাকে ভালোবাসলো, সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্কেই ভালোবাসলো।' এই পবিত্র নির্দেশনা শুনে কোনো কোনো

www.eelm.weebly.com

অবিশ্বাসী বলতে শুরু করলো, ইনি তো চাচ্ছেন, খৃষ্টানেরা যেমন হজরত ঈসাকে প্রতিপালক বানিয়ে নিয়েছে, তেমনি আমরাও যেনো তাকে প্রতিপালক বলে বিশ্বাস করি। তাদের এই অপবিত্র কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮০

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝

❒ কেহ রসূলের আনুগত্য করিলে সে তো আল্লাহেরই আনুগত্য করিল এবং কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে তোমাকে তাহাদের উপর প্রহরীরূপে প্রেরণ করি নাই।

কেউ যদি রসুলের আনুগত্য স্বীকার করে তবে বুঝতে হবে, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্যকেই শিরোধার্য করেছে। রসুল তো হচ্ছেন বাণীবাহক। আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ প্রচার করাই তাঁর কাজ। আর সেই নির্দেশদাতা স্বয়ং আল্লাহ্। সুতরাং রসুলের কথা আল্লাহ্‌রই কথা এবং রসুলকে মান্য করা আল্লাহ্‌কেই মান্য করা। এ'তে আর দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

এরশাদ হয়েছে, হে প্রিয়তম নবী! যারা আপনাকে অস্বীকারকারী তাদেরকে কোনোই পরওয়া করবেন না। আমি ওই সকল অবিশ্বাসীর পাহারাদার হিসেবে আপনাকে নিযুক্ত করিনি। আপনি কেবল সংবাদ প্রচার করতে থাকুন। মানুষের স্বীকৃতি অস্বীকৃতির হিসেব তো গ্রহণ করবো আমিই। সুতরাং আমিই তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণকারী। তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দানকারী।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮১

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۖ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ۗ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

❒ তাহারা বলে, 'আনুগত্য করি'; অতঃপর যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায় তখন রাত্রে তাহাদের একদল তাহারা যাহা বলে তাহার বিপরীত পরামর্শ করে; তাহারা যাহা রাত্রে পরামর্শ করে আল্লাহ্ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন; সুতরাং তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং আল্লাহের প্রতি ভরসা কর; কর্ম-বিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

---

www.eelm.weebly.com

এরশাদ হয়েছে, হে নবী! আপনি যখন ওই সকল মুনাফিকের সামনে নির্দেশনা উপস্থাপন করেন, তখন তারা বলে, আমরা অনুগত। আনুগত্য করাই আমাদের কাজ। তারপর যখন তারা আপনার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন তাদের একটি দল রাত্রিবেলা একত্রিত হয়ে আপনার বিরুদ্ধে শলাপরামর্শ করে।

হজরত কাতাদা এবং কালাবী বর্ণনা করেন, আয়াতে উল্লেখিত 'বাইয়াতা' শব্দটির অর্থ পরিবর্তন করা। ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ আখ্ফাশ বলেছেন, 'বাইয়াতা' অর্থ কোনো কিছু নির্ধারণ করা বা সম্পন্ন করা। যেমন আরববাসীগণ বলে থাকেন 'বাইয়েতা ফুলানুন'—অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি রাত্রিযাপন সম্পন্ন করেছে। 'বাইয়াতা' শব্দের আরেকটি অর্থ ভিত্তিপ্রস্তরের উপর গৃহনির্মাণ করা। কবিরা যেমন কিছু শব্দ সমন্বয়ে বাণী নির্মাণ করে। যেমন কোনো গৃহস্বামী কাঠ, লোহা, ইট ইত্যাদি একত্র করে গৃহনির্মাণ করে। মুনাফিকেরাও তেমনি শলাপরামর্শের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের ষড়যন্ত্রকে। হজরত আবু উবাইদা কুতাইবি বলেছেন, 'বাইয়াতা' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'বাইয়ুতাত' থেকে। এর অর্থ রাত্রি অতিবাহিত করা। এর মাধ্যমে তাদের রাতের ষড়যন্ত্রমূলক পরামর্শকে বুঝানো হয়েছে— যা তাদের দিনের অঙ্গীকারবিরুদ্ধ।

আল্লাহ্তায়ালা তাদের রাতের এই পরামর্শকে আমল লেখক ফেরেশতাদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করে রাখছেন, যাতে আখেরাতে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া যায়। লিপিবদ্ধ করার অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, তাদের রাত্রিকালীন ষড়যন্ত্রের কথা লিখিত আকারে ওহীর মাধ্যমে রসুল স. কে জানিয়ে দিচ্ছেন এবং নির্দেশনা দিচ্ছেন, হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন। তাদের কোনো পরওয়া করবেন না। রাগ করবেন না। তাদের নামও প্রকাশ করবেন না। দৃষ্টি কেবল নিবদ্ধ রাখুন আল্লাহ্র দিকে। সকল ব্যাপারে আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করুন। তাঁর প্রতি নির্ভরশীলদের জন্য তিনিই যথেষ্ট। তিনিই আপনার পক্ষ থেকে অবিশ্বাসীদের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮২

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

❒ তবে কি তাহারা কোরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? ইহা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও হইত তবে তাহারা উহাতে অনেক অসংগতি পাইত।

এরশাদ হয়েছে, ওই সকল কপটেরা কোরআন অনুধাবন করে না কেনো? কোরআনে রয়েছে কতো বিস্ময়কর ও অলৌকিক বিষয়বস্তু—তারা সেগুলো গবেষণা ও অনুশীলন করে না কেনো? অনুধাবন করতে চেষ্টা করলে তারা সহজেই দেখতে পেতো কোরআনের এই অনন্যসাধারণ বাণীসমাহার মানবরচিত হতেই পারে না। এই বাণী নিশ্চিত আল্লাহ্র বাণী। অনুধাবনস্পৃহা থাকলে তারা সহজেই অন্তরের অপরিচ্ছন্নতাকে ঝেড়ে ফেলে পৌঁছে যেতে পারতো বিশ্বাসের বাগানে।

www.eelm.weebly.com

'তবে কি তাহারা কোরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না'—এ কথায় বুঝা যায়, কোরআন অনুধাবনের চেষ্টা করে (গবেষণা বা কিয়াস করে) শরিয়তের মাসআলা উদ্ধার করা জায়েয।

কোরআন যে আল্লাহ্‌র কালাম—এ কথা নিশ্চিত। কোরআন মানুষের কালাম নয়। অবশ্যই নয়। যদি হতো তবে এতে অনেক রকম অসংগতি পরিদৃষ্ট হতো। বর্ণনাবৈষম্য থাকতো, দেখা দিতো অর্থগত ত্রুটিবিচ্যুতি, প্রকাশভঙ্গিতে থাকতো সামঞ্জস্যশীলতার অভাব। অনাবশ্যক কাঠিন্য কিংবা অনভিপ্রেত সারল্যের দোষে দুষ্ট হতো বিধানাবলী। ফলে কোনো কোনো নির্দেশ প্রতিপালন করা হতো অসম্ভব। আবার কোনো নির্দেশ হতো প্রশ্নপ্রতিরোধের সম্মুখীন। মানুষের কালাম হলে এ রকম বিভিন্নমুখী অসংগতি দেখা দিতোই। কারণ, মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। আর তা সুস্থিরও নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কোরআনের কিছু কিছু আয়াত পরবর্তীতে মনসুখ (রহিত) হয়েছে। এটা কি এক ধরনের অসংগতি নয়? উত্তরে বলা যায়, কখনোই নয়। কারণ, রহিত নির্দেশটি ছিলো এক বিশেষ সময়ের জন্য। মেয়াদ শেষে তাই সেটিকে রহিত করা হয়েছে। এসেছে সময়োপযোগী নতুন বিধান। এটা বরং সুসংগতিরই দৃষ্টান্ত। অসংগতির নয়।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন। তাঁরা কখনো জয় লাভ করতেন। কখনো হতেন পরাজিত। মুনাফিকেরা মুসলিম বাহিনীর জয়পরাজয় সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করতো। পরাজয়ের সংবাদ পেলে তারা ফলাও করে তা প্রচার করতো। উদ্দেশ্য — ইমানদারেরা যেনো দুর্বলচিত্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, কতিপয় দুর্বলচিত্ত মুসলমান সেনাদলের খারাপ বা ভালো সংবাদ মুনাফিকদের নিকট থেকে জানতে পেলে অথবা রসুল স. এর নিকট থেকে শুনলে— তা ব্যাপকভাবে প্রচার করে বেড়াতো। ফলে শত্রুপক্ষ লাভবান হতো। তারা এ রকম সংবাদ শুনে পরিবর্তন করতো তাদের রণকৌশল। নতুন রূপে সেনাবিন্যাস করে আত্মরক্ষার উপায় বের করতো তারা। অবস্থা যখন এ রকম তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮৩

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ○

❑ যখন শান্তি অথবা শংকার কোন সংবাদ তাহাদের নিকট আসে তখন তাহারা উহা প্রচার করিয়া থাকে। যদি তাহারা উহা রসুল কিংবা তাহাদের মধ্যে

www.eelm.weebly.com

যাহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাহাদের গোচরে আনিত তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা তথ্য অনুসন্ধান করে তাহারা উহার যথার্থতা নির্ণয় করিতে পারিত। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিত তবে তোমাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলে শয়তানের অনুসরণ করিত।

মুসলিম সেনাবাহিনীর জয় পরাজয়ের সংবাদ মুনাফিকেরা প্রচার করে বেড়াতো। তাদের দেখাদেখি দুর্বলচিত্ত কিছু মুসলমানেরাও এ রকম করতো। এ রকম অজ্ঞজনোচিত কাজ মুসলমানদের স্বার্থবিরুদ্ধ। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির উপর এ রকম সংবাদ মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে। মুনাফিকদের এ রকম আচরণ বিস্ময়কর কিছু নয়। কারণ, তারা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে কাফের। কিন্তু মুসলমানদের এ রকম দুর্বলচিত্ততা শোভনীয় নয়। তাই এরশাদ হয়েছে, তাদের উচিত ছিলো, যে সংবাদই কানে আসুক না কেনো প্রথমে তা রসুল স. এর দরবারে পেশ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশের অপেক্ষা করা। তাঁর স. ক্ষমতাধর (উলিল আমর) সহচরবৃন্দের নিকটেও তাঁরা এ ব্যাপারে নির্দেশনা লাভ করতে পারতেন। তাঁরা সংবাদ বিশ্লেষণ করে পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে কর্তব্যনির্দেশ করতে সক্ষম। সংবাদ গোপন রাখা অথবা প্রচার করা— কোনটি কখন উত্তম সে সম্পর্কে তাঁরা সম্যক অবগত। সুতরাং মুসলমানদের উচিত ছিলো অপরিণামদর্শিতা ও অবিমৃশ্যকারীতাকে বর্জন করা। সুবিজ্ঞ নির্দেশনার অপেক্ষা করা।

আয়াতে রসুল স. সহ ক্ষমতাধর (উলিল আমর) সাহাবীগণের মর্যাদাও বিবৃত হয়েছে। উলিল আমর বলতে এখানে হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান এবং হজরত আলী—এই চারজন সম্মানিত ও জ্ঞানী সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে। পর্যবেক্ষণের ও সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার ছিলো তাঁদের। রসুল স. স্বয়ং তাঁদের অভিমতের মূল্য দিতেন। অধিকাংশ বিষয়ে তাঁদেরকেই নেতা নির্ধারণ করতেন। তাঁদেরকে অনুসরণের নির্দেশও দিয়েছিলেন রসুল স। বলেছিলেন, পৃথিবীতে আমার দু'জন প্রতিনিধি হবে আবু বকর ও ওমর। তিরমিজি। হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, তোমরা ওই দু'জনকে অনুসরণ কোরো, যারা আমার পরে খলিফা হবে। তারা হচ্ছে আবু বকর ও ওমর। তিরমিজি।

আয়াতে উল্লেখিত 'আল্লাজিনা ইয়াসতামবিতুনাহু' বাক্যাংশটির অর্থ তত্ত্বানুসন্ধানীগণ। এঁরা হচ্ছেন রসুল স. এবং তাঁর জ্ঞানী সহচরবৃন্দ। তাঁরা ছিলেন এলেম ও মারেফতে সিদ্ধ পুরুষ। 'ইস্তিমবাত' অর্থ উদ্ধার করা। যেমন 'ইস্তেমবাতাল মাআ' অর্থ পানি বের করা। তাঁরা সমস্যাসংকুলতা থেকে এভাবেই যথাকর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে পারতেন। আয়াতে তাই সাধারণ মুসলমানদেরকে তাঁদের শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শেষে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়া বর্ষিত হয়েছে তোমাদের প্রতি। তিনি রসুল প্রেরণ করেছেন। কোরআন অবতীর্ণ করেছেন।

www.eelm.weebly.com

এসবের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি ফজল ও রহমত যদি বর্ষিত না হতো তবে তোমরা হতে নিরাপত্তারহিত এবং অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেই হয়ে যেতো শয়তানের অনুসারী। (কিন্তু বিশেষ অনুকম্পায় আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন)। এই অল্পসংখ্যক সাহাবীদের মধ্যে রয়েছেন হজরত জায়েদ বিন আমর বিন নুফাইম এবং ওয়ারকা বিন নওফেল। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানে জ্ঞানী। ছিলেন আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহভাজন। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগেই আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে শয়তানের অনুসরণ থেকে নিরাপদ রেখেছিলেন। কিন্তু এখন অবস্থা ভিন্ন। স্বয়ং রসুল তোমাদের সামনে উপস্থিত। তদুপরি কোরআন অবতীর্ণ হয়ে চলেছে। তাই বয়ে চলেছে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ার বিরতিহীন প্রস্রবণ। অতএব নির্দেশ প্রতিপালন করো। শরণ গ্রহণ করো রসুলের এবং তাঁর প্রাজ্ঞ সহচরবৃন্দের।

হজরত ওমর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো, রসুল স. তাঁর পবিত্রা পত্নীগণকে পরিত্যাগ করেছেন। দেখলাম সবাই উদ্বিগ্ন, ব্যথিত। পেরেশান হয়ে কেউ কেউ পাথর দ্বারা মাটি খুঁড়ে চলেছে। তখন অবতীর্ণ হলো, 'ওয়া ইজা জাআহুম আমরুম মিনাল আমনি আবিল খওফ।' মসজিদে অবস্থান নিয়েছিলেন রসুল স.। আমি মসজিদে প্রবেশ করে বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা করলাম। গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে ঘটনাটির সত্যাসত্য নির্ণয় করে মসজিদের দরোজায় দাঁড়িয়ে (অস্থিরচিত্ত লোকদেরকে লক্ষ্য করে) বললাম, রসুল স. তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দেননি। (তত্ত্বানুসন্ধানের এ এক অনন্য উদাহরণ)। ওয়াল্লহু আ'লাম।

যুদ্ধকালে দুর্বলচিত্ত মুসলমানদের অসংলগ্ন আচরণ এবং তাদের কর্তব্যসচেতনতা সম্পর্কে এতোক্ষণ আলোচনা করা হলো। এবার আসছে রসুল স. এর প্রতি জেহাদের নির্দেশ। এরশাদ হচ্ছে—

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮৪

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ○

❑ সুতরাং আল্লাহের পথে সংগ্রাম কর; তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হইবে এবং বিশ্বাসীগণকে উদ্বুদ্ধ কর, হয়তো আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শক্তি সংযত করিবেন। আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তি দানে কঠোরতর।

হে নবী! আপনি আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ করুন। কেউ আপনার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করুক অথবা না করুক। আপনি আপনার ব্যক্তিগত কর্তব্য সম্পাদনে দণ্ডায়মান হোন। অন্যকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা আপনার কর্তব্য। বাধ্য করা

www.eelm.weebly.com

নয়। আপনি রসুল। আপনি কারো মুখাপেক্ষী নন। মানুষের অসহযোগিতা কিংবা বিরুদ্ধাচরণ আপনার রেসালতে কোনো পরিবর্তন আনতে অসমর্থ।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত খালেদ বিন মাদানের বর্ণনা থেকে ইবনে সা'দ লিখেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, আমাকে রসুল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে সকল মানুষের জন্য। মানুষেরা না মানলে কেবল আরববাসীদের জন্য। আরবেরা না মানলে পারস্যবাসীদের জন্য। তারা না মানলে বনী হাশেমের জন্য। তারাও যদি না মানে, তবে আমার রেসালাত কেবল আমার নিজের জন্য।

বাগবী লিখেছেন, উহুদ যুদ্ধের পর রসুল স.আবু সুফিয়ানের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন, পরের বছর জিলকদ মাসে ছোট বদরে কাফের ও মুসলমানেরা পুনরায় যুদ্ধ করবে। (মদীনা থেকে আট মাইল দূরের এক বাজারের নাম ছোট বদর)। জিলকদ মাস যখন এলো, তখন রসুল স. মুসলমানদেরকে যুদ্ধযাত্রার আহবান জানালেন। উহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের স্মৃতি তখনও তাজা। তাই অনেকেই সাড়া দিচ্ছিলেন না। তখন এই আয়াত নাজিল হলো। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীরও এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

এরশাদ হয়েছে, বিশ্বাসীগণকে উদ্বুদ্ধ করুন। সম্ভবতঃ শীঘ্রই আল্লাহ্তায়ালা শত্রুপক্ষকে শক্তিহীন করে দিবেন। রসুল স. মাত্র সত্তর জনকে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। শত্রুপক্ষ যুদ্ধের ময়দানে এলো না। আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে সংযত করেছিলেন। মুসলিম বাহিনী নিরাপদে ফিরে এলো মদীনায়। সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে ইতোপূর্বে এই ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ চলে গিয়েছে।

'আল্লাহ্তায়ালা শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তি দানে কঠোর'—এ কথা বলে যুদ্ধে অনীহ, ভীত মুসলমানদেরকে শাসানো হয়েছে। ইতোপূর্বে বলা হয়েছিলো, 'কেউ আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ করলে সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী হোক আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দান করবো।' (আয়াত ৭৪)। এখন বলা হচ্ছে, জেহাদ না করলে মনে রেখো, আল্লাহ্ই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। সুতরাং তাকেই কেবল ভয় করা উচিত। আর শাস্তিদানেও তিনি কঠোরতম। তবে কাফেরদের ভয়ে জেহাদ বিমুখ হচ্ছো কেনো? আয়াতের এই শেষ বাক্যে ভর্ৎসনা করা হয়েছে যুদ্ধভীত মুসলমানদেরকে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮৫

مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ○

❒ কেহ কোন ভালো কাজের সুপারিশ করিলে উহাতে তাহার অংশ থাকিবে; এবং কেহ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করিলে উহাতেও তাহার অংশ থাকিবে। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে নজর রাখেন।

---

www.eelm.weebly.com

এই আয়াতে আলোচিত হয়েছে সুপারিশ প্রসঙ্গটি। সুপারিশ হচ্ছে কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা ও নিবেদন। সুপারিশকারী তার চেষ্টা ও নিবেদনের জন্য সওয়াব লাভ করবে। মুজাহিদ বলেছেন, সুপারিশকারীর সুপারিশ গৃহীত না হলেও সে সওয়াব পাবে। হজরত হাসান থেকে ইবনে আবী হাতেমও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেন, রসুল স. এর নিকট কেউ কিছু চাইলে তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলতেন, সুপারিশ করো। সওয়াব পাবে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নবীর মাধ্যমে যা ইচ্ছা প্রচার করেন। বোখারী, মুসলিম। রসুল স. আরো জানিয়েছেন, কল্যাণের পথ প্রদর্শনকারী কল্যাণকর্ম সম্পাদনকারীদের মতোই। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন বায্যার। তিবরানী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত সহল বিন সা'দ থেকে।

জ্ঞাতব্যঃ মুসলমানদের জন্য দোয়া করাও শাফায়াতে হাসানা (উত্তম সুপারিশ) হিসেবে গণ্য। হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অসাক্ষাতে দোয়া করতে থাকে তখন ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকেন, হে আল্লাহ্ এমনই করে দাও। তার (প্রার্থনাকারীর) জন্যও এমনই হোক।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সন্ধির প্রচেষ্টাও শাফায়াতে হাসানা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মানুষের সঙ্গে উত্তম কথা বলাও শাফায়াতে হাসানা। এর জন্যও সওয়াব পাওয়া যাবে।

মন্দকাজের জন্য সুপারিশ করলে গোনাহ্ হবে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, চোগলখোরী করাও মন্দ সুপারিশ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পরচর্চা করা ও মন্দ আচরণও মন্দ শাফায়তের মধ্যে গণ্য।

এরশাদ হয়েছে, মন্দ সুপারিশও মন্দ কাজের অংশবিশেষ। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কোনো মুমিনকে হত্যার ব্যাপারে যে আংশিক বাক্য দ্বারাও সমর্থন করবে কিয়ামতের দিন তার দুই চোখে লেখা থাকবে, 'এই লোক আল্লাহ্তায়ালার রহমত থেকে বঞ্চিত'। ইবনে মাজা।

আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে, 'ওয়া কানাল্লহু আ'লা কুল্লি শাইইম মুক্বিতা।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মুক্বিতা' অর্থ ক্ষমতাবান। মূল শব্দটি হচ্ছে 'কূতুন'। 'কূতুন' অর্থ খাদ্য যার মাধ্যমে শরীরে শক্তি সৃষ্টি হয়। মুজাহিদ বলেছেন, মুক্বিতা অর্থ শাহেদ (হাজির নাজির)। কাতাদা বলেছেন, পর্যবেক্ষণ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, প্রাণীদের খাদ্য প্রদানকারীকেও বলা হয়

www.eelm.weebly.com

মুক্বিতা। সুতরাং শেষ বাক্যটির প্রকৃত অর্থ হবে এ রকম— রিজিক প্রদান ও শক্তিমত্তায় তিনি সদাবিদ্যমান পর্যবেক্ষণকারী (সুতরাং সৎ সুপারিশ করো)।

সূরা নিসা ঃ আয়াত ৮৬

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ○

❑ তোমাদিগকে যখন অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও উহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করিবে অথবা উহারই অনুরূপ করিবে; আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

এই আয়াতে নির্দেশনা এসেছে সালাম ও সালামের প্রত্যুত্তর প্রদান প্রসঙ্গে। বলা হয়েছে, অভিবাদনের প্রত্যুত্তর হবে সমপর্যায়ের অথবা তদপেক্ষা উত্তম। আরববাসীরা অভিবাদন বিনিময় করতো এভাবে— 'হাইয়্যাল্লাহ্' (আল্লাহ্ তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন)। অভিবাদন বিনিময়ের জন্য এ রকম আরো কিছু বাক্যের প্রচলন ছিলো। ইসলাম অভিবাদনের নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দিয়েছে। কুশল বিনিময়ের জন্য প্রচলন করা হয়েছে সালামের।

হজরত ইমরান বিন হোসাইন বলেন, মূর্খতার যুগে আমরা বলতাম, আনআলাল্লাহু বিকা আইনা (আল্লাহ্ তোমার আঁখিযুগল শীতল করুন)। কখনো বলতাম, আনআলা সাবাহান (তোমার জন্য সুপ্রভাত)। ইসলাম আগমনের পর আমাদেরকে এ রকম করতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে সালাম প্রচলনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবু দাউদ।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদম কে তাঁর (জন্য নির্ধারিত) আকৃতিতে সৃষ্টি করলেন। তাঁর দৈর্ঘ্য ছিলো ষাট গজ। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে নির্দেশ করলেন, যাও। ফেরেশতাদের ওই দলটির নিকট গিয়ে তাদেরকে সালাম করো এবং শোনো, তারা কী জবাব দেয়। তোমার সালাম এবং তাদের প্রত্যুত্তর হবে তোমার এবং তোমার বংশধরদের কুশলবিনিময়ের নিয়ম। হজরত আদম ফেরেশতাদের নিকটে গিয়ে বললেন, আসসালামু আলাইকুম। ফেরেশতারা বললেন, আস্সালামু আলাইকা ওয়া রহ্মাতুল্লাহ। বোখারী, মুসলিম।

সালামের প্রত্যুত্তরে সালামের সঙ্গে রহমত ও বরকতের উল্লেখ করা মোস্তাহাব। অর্থাৎ এ রকম বলতে হবে 'ওয়া আলাইকুমুস্সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ্ ওয়াবারাকাতুহ্। এ রকম বাড়িয়ে বললে সওয়াবও বাড়বে।

হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আস্সালামু আলাইকুম।' তিনি স. বললেন, 'ওয়া

www.eelm.weebly.com

আলাইকুমুস সালাম।' লোকটি চলে গেলে রসুল স. বললেন, এর জন্য লেখা হলো দশটি পুণ্য। কিছুক্ষণ পর আরেকজন উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্।' রসুল স.ও একইভাবে তাঁর সালামের জবাব দিলেন। তারপর লোকটি বসলে বললেন, এর জন্য লেখা হলো বিশটি পুণ্য। কিছুক্ষণ পর অন্য আর একজন এসে বললেন, 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।' রসুল স. ওভাবেই প্রত্যুত্তর দিলেন। লোকটি বসলে বললেন, এর জন্য লেখা হলো তিরিশটি নেকী। তিরমিজি, আবু দাউদ। হজরত মুআজ বিন আনাসের বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে—চতুর্থ ব্যক্তি হাজির হয়ে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহ্। রসুল স. প্রত্যুত্তরে এ রকমই বললেন। তারপর মন্তব্য করলেন, এ লোকের আমলনামায় চল্লিশটি পুণ্য লিপিবদ্ধ হলো।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পরিপূর্ণ সালাম হলো—'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্ (তোমার প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক)। এই বাক্যটির সঙ্গে অতিরিক্ত সংযোজন নেই। বর্ণিত হয়েছে, এক লোক একবার হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে সাক্ষাত করে এই বাক্যটির অতিরিক্ত কিছু বললেন। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, 'ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।' তারপর বললেন, সালাম বারাকাতুহু পর্যন্তই। বাগবী।

হজরত সালমান ফারসী থেকে আহমদ, তিবরানী, ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন, এক ব্যক্তি রসুল স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।' রসুল স. বললেন, 'ওয়া আলাইকাস্‌সালাম।' ওই ব্যক্তি বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনি আমার অংশ কমিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, 'তোমরাও উহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করবে। অথবা উহারই অনুরূপ করবে।' তিনি স. বললেন, তুমি কোনো কিছু অবশিষ্ট রাখোনি। তাই তুমি যা বলেছো— তাই ফিরিয়ে দিয়েছি। এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেউ যদি 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলে, তবে জবাবে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' (তোমার উপরও) বলা যাবে। এই নিয়মটি অবশ্য প্রকাশ্যতঃ এই আয়াতের নির্দেশনার খেলাফ। বলা হয়েছে সালামের জবাব সমপর্যায়ের বাক্য অথবা তদপেক্ষা উত্তম বাক্যের মাধ্যমে হতে হবে। বর্ণিত হাদিসটি কিন্তু আয়াতের মর্মের অনুকূল। এতে করে বুঝা যায়, অবিকল বাক্য নয়, মূল উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে, এ রকম তুলনীয় বাক্যের মাধ্যমে সালামের প্রত্যুত্তর দেয়া যাবে। এমতো ক্ষেত্রে 'আলাইকাস্ সালাম' এর প্রকৃত অর্থ হবে 'যে পুণ্য ও সুন্দর বাক্যের মাধ্যমে তুমি সালাম করেছো ওই রকম সালাম তোমার প্রতিও বর্ষিত হোক।'

মাসআলাঃ সালামের উত্তর দেয়া ফরজে কেফায়া। দলের মধ্য থেকে একজন জবাব দিলেই চলবে। আরাজিয়া। হজরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একটি দল

www.eelm.weebly.com

উপবিষ্ট আরেকটি দলের পাশ দিয়ে যাবার সময় একজন সালাম করবে। অন্যদলের একজন জবাব দিবে। এ রকম করাই যথেষ্ট (সমস্বরে সকলেই সালাম বলতে থাকা শোভনীয় নয়)। বাগবী, বায়হাকী। এই হাদিসটি আবু দাউদও বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট মারফু হিসেবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত হাসান বিন আলী। তিনি ছিলেন আবু দাউদের শায়েখ।

উপবিষ্ট দলের কোনো লোককে যদি কেউ নাম ধরে সালাম দেয়, তবে ওই লোককেই সালামের জবাব দিতে হবে। এ রকম করা ওয়াজিব। অন্য লোক জবাব দিলে জবাব দেয়া হয়েছে ধরা যাবে না।

কোনো দলকে লক্ষ্য করে সালাম দেয়ার পর ওই দলের বাইরের কোনো লোক জবাব দিলে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না।

মাসআলাঃ প্রথমে সালাম করা সুন্নত। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইমান ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যতোক্ষণ তোমরা একে অপরকে ভালো না বাসবে ততোক্ষণ ইমানদারও হতে পারবে না। আমি কী তোমাদেরকে ওই কথাটি জানিয়ে দেবো না, যা করলে তোমরা ভালোবাসতে পারবে। কথাটি হচ্ছে এই—অভিবাদন বিনিময় অব্যাহত রাখো। মুসলিম।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, প্রথম সালাম দানকারী অহংকার থেকে পবিত্র হয়ে যায়। বায়হাকী। হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষের মধ্যে ওই ব্যক্তিই আল্লাহ্তায়ালার অধিকতর নৈকট্যভাজন যে প্রথমে সালাম করে। আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বর্ণনা করেন, এক লোক রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইসলামের সর্বোত্তম আদর্শটি কী? রসুল স. বললেন, আহার করানো এবং পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে অভিবাদন করা। বোখারী, মুসলিম।

মাসআলাঃ বাহনের আরোহী পদব্রজে চলাচলকারীকে, পদব্রজে গমনকারী উপবিষ্টকে এবং স্বল্প সংখ্যকেরা অধিক সংখ্যকদেরকে সালাম করবে। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণিত এ সম্পর্কিত হাদিসটি লিপিবদ্ধ রয়েছে বোখারী ও মুসলিমে। বোখারীতে অতিরিক্ত রয়েছে এ কথাটি —কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে অভিবাদন করবে।

মাসআলাঃ শিশু ও মহিলাদেরকেও সালাম করা যায়। যেহেতু হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. বালকদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দিয়েছেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত জারীরের বর্ণনায় রয়েছে— রসুল স. মহিলাদের পাশ দিয়ে গমনকালে তাদেরকে সালাম দিয়েছেন। আহমদ।

ফতোয়ায়ে গারায়েবে বর্ণিত হয়েছে, অপরিচিতা যুবতী এবং শিশুদেরকে সালাম করা মাকরূহ। তারা সালাম দিলে উত্তর দেয়া ওয়াজিব নয়। আমি বলি, এই হুকুমটি তখনকার, যখন বিশৃংখলা সৃষ্টির আশংকা ছিলো।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ গৃহস্বামী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের সময় গৃহবাসীদেরকে সালাম বলবে। হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, হে বৎস! তুমি স্বগৃহে প্রবেশকালে সকলকে সালাম বলবে। এ রকম করলে তোমার ঘরের লোকজনদের জন্য বরকত হবে। তিরমিজি।

মাসআলাঃ শূন্য গৃহে প্রবেশকালে বলতে হবে, 'আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সলেহীন' (আল্লাহ্‌র পুণ্যবান দাসদের প্রতি সালাম)। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, 'যখন ঘরে প্রবেশ করবে তখন সালাম কোরো।' তাফসীরকারদের মধ্যে একটি দল এই আয়াতের 'বুয়ুতান' শব্দটির অর্থ করেছেন শূন্যগৃহ। আর 'আনফুসিহিম' অর্থ করেছেন 'তুমি' (যাকে নির্দেশ করা হয়েছে তার সত্তা)। ওয়াল্লহু আ'লাম।

মাসআলাঃ আগে অভিবাদন। তারপর কথোপকথন। অর্থাৎ আগে সালাম পরে কালাম। এ রকম করা সুন্নত। হজরত জাবের বর্ণিত মারফু হাদিসে এসেছে, 'আস্‌সালামু ক্বলাল কালাম।' তিরমিজি।

মাসআলাঃ যতোবার সামনাসামনি হবে ততোবার সালাম করা সুন্নত। সালাম বিনিময় শেষে বৃক্ষ অথবা দেয়ালের আড়ালের পর পুনরায় মুখোমুখি হলে পুনঃঅভিবাদন করবে। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, ভ্রাতৃবৃন্দের সাক্ষাত পেলেই সালাম কোরো। সালামের পর গাছ বা দেয়ালের আড়াল শেষে পুনঃসাক্ষাত ঘটলে পুনরায় সালাম কোরো। আবু দাউদ।

মাসআলাঃ বিদায় বেলায় সালাম করা সুন্নত। হজরত কাতাদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, গৃহে প্রবেশকালে গৃহবাসীদেরকে সালাম বলবে। গৃহনিষ্ক্রান্তকালেও সালাম বলবে। মুরসাল পদ্ধতিতে এই বর্ণনাটি শো'বুল ঈমানে লিপিবদ্ধ করেছেন বায়হাকী। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কোনো জনসমাবেশে পৌঁছলে সালাম বলবে। বসতে ইচ্ছে হলে বসবে। প্রত্যাবর্তনের সময়েও সালাম বলবে। প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালাম অপেক্ষা অধিকতর জরুরী নয় (অর্থাৎ দুই সালামই সমগুরুত্বসম্পন্ন)। তিরমিজি, আবু দাউদ।

মাসআলাঃ যদি কেউ কারো সালাম পৌঁছায় তবে যাকে সালাম পৌঁছানো হয়েছে সে বলবে, 'আলাইকা ওয়া আলাইহিস্ সালাম।' অর্থ তোমার প্রতি এবং তার প্রতি (যে সালাম বলেছে) শান্তি বর্ষিত হোক। গালেব তাঁর পিতা ও পিতামহের মাধ্যমে বর্ণনা করেন, আমাকে আমার পিতা বললেন, রসুল স. এর নিকটে যেয়ে আমার সালাম বোলো। আমি রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম পৌঁছালাম। তিনি স. বললেন, তোমার প্রতি এবং তোমার পিতার প্রতি সালাম। আবু দাউদ।

মাসআলাঃ কাফেরদেরকে প্রথমে সালাম দেয়া জায়েয নয়। রসুল স. বলেছেন, ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে প্রথমে সালাম করবে না। রাস্তায় ইহুদী কিংবা খৃষ্টানের সাক্ষাত পেলে এমনভাবে পথ চলো যেনো তারা রাস্তার একপাশ দিয়ে

www.eelm.weebly.com

চলে যেতে বাধ্য হয়। মুসলিম। কোনো দলে মুসলমান, মূর্তিপূজক, ইহুদী মিলিতভাবে থাকলে দলকে লক্ষ্য করে সালাম দিও। এ প্রসঙ্গে হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন বোখারী ও মুসলিম। বলা হয়েছে, দলকে উদ্দেশ্য করে সালাম বললেও নিয়ত রাখতে হবে কেবল মুসলমানদেরকে সালাম দেয়া হচ্ছে।

মাসআলাঃ জিম্মি কাফেরদের সালামের জবাব দেয়াতে দোষ নেই। জবাবে শুধু 'ওয়া আলাইকা' বলবে। এর বেশী নয়। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, যখন তোমাকে কোনো আহলে কিতাব সালাম দিবে তখন জবাবে বলবে, 'ওয়া আলাইকুম'।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে যে কেউ (ইহুদী, নাসারা, অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজক) সালাম বলুক তার জবাব দিতে হবে। কেননা আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'ইজা হুইয়িতুম বি তাহিয়্যাতিন' (তোমাদিগকে যখন অভিবাদন করা হয়.....)। ইবনে আবী শাইবা, বোখারী।

মাসআলাঃ নামাজ ও খোতবা পাঠকালে সালামের জবাব দেয়া যাবে না। এ রকম করলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। উচ্চস্বরে কোরআন তেলাওয়াতের সময়, হাদিস লিপিবদ্ধ করার সময়, ধর্মীয় আলোচনার সময় এবং আজান-ইকামতের সময় সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে জায়েয।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ের হিসাব গ্রহণকারী।' মুজাহিদ বলেছেন, হিসাব গ্রহণকারী অর্থ হেফাজতকারী। আল্লাহ্ বান্দাদের হক প্রতিপালিত হলো কিনা সে বিষয়ে হিসাব গ্রহণ করবেন।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। যেমন— ১. পীড়িতের সেবা শুশ্রূষা করা। ২. মৃতের জানাজা ও দাফন কাফনে উপস্থিত থাকা। ৩. নিমন্ত্রণ রক্ষা করা অথবা আহবানে সাড়া দেয়া। ৪. সাক্ষাতে সালাম করা। ৫. হাঁচি শুনলে দোয়া করা অর্থাৎ হাঁচি দাতা আলহামদু লিল্লাহ বললে ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলা। ৬. উপস্থিত অনুপস্থিত সকলের জন্য কল্যাণ কামনা করা। নাসাঈ। এই হাদিসটি হজরত আলী থেকে তিরমিজি ও দারেমী বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার ছয় নম্বরে কল্যাণকামনার কথা বলা নেই। তদস্থলে রয়েছে, নিজের জন্য যা পছন্দ অন্যের জন্য তাই পছন্দ করা। উভয় বর্ণনার মূল মর্ম একই।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা রাস্তায় উপবেশন কোরো না। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্। এ রকম না করলে আমাদের চলে না। প্রয়োজনীয় কথা-বার্তা, লেন-দেন আমাদেরকে রাস্তায় বসেই সমাধা করতে হয়। রসুল স. বললেন, যদি তোমরা নিরুপায় হও তবে রাস্তার হক আদায় কোরো। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! রাস্তার হক কী রকম? রসুল স. বললেন, দৃষ্টি সংযত রাখা, পথে পতিত কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা, অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দেয়া, সৎকর্মের পরামর্শ দেয়া এবং অসৎকর্মের প্রতিবন্ধক হওয়া। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে,

www.eelm.weebly.com

পথানুসন্ধানীকে পথের সন্ধান দেয়া। আবু দাউদ। হজরত ওমরের বর্ণনায় এসেছে, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা, পথহারাকে পথের দিশা দেয়া। আবু দাউদ।

মাসআলাঃ সালামের পূর্ণতা হলো মুসাফাহা (করমর্দন) এবং মুয়ানাকা (আলিঙ্গন)। হজরত আবু উমামা থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, মুসাফাহা হচ্ছে সালামের পূর্ণতা।

হজরত আবু জর বলেছেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে মিলিত হলে তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করতেনই। একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি বাড়ী ছিলাম না। বাড়ী এসে যখনই সংবাদ জানলাম তখনই ছুটে গেলাম রসুল স. এর খেদমতে। তিনি একটি আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর আলিঙ্গন ছিলো অনবদ্য, অনন্য। আবু দাউদ।

শা'বী বর্ণনা করেন, একবার সফর থেকে ফিরে হজরত আবু জাফর ইবনে আবু তালেবের সঙ্গে দেখা হতেই রসুল স. তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং দুই চোখের মাঝখানে (কপালে) চুম্বন করলেন। আবু দাউদ। শো'বুল ইমানে এই হাদিসটি মুরসাল হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছেন বায়হাকী। শরহে সুন্নায় বিইয়াদীর বর্ণনাসূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে মিলিতভাবে— সেখানে বলা হয়েছে, হজরত আবু জাফর বলেন, রসুল স. আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন এবং আমাকে আলিঙ্গন করেছেন।

হজরত আতা খোরাসানী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা পরস্পর করমর্দন করো এবং ঈর্ষা দূর করো। উপঢৌকন বিনিময় করো। এতে করে বন্ধুত্ব দৃঢ় হবে এবং শত্রুতা দূর হবে। মুরসাল রূপে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মালেক।

হজরত বারা বিন আজিব বর্ণনা করেন, যখন দু'জন মুসলমান মুসাফাহা করে তখন তাদের গোনাহ্ ঝরে যায়। বায়হাকী।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮৭

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ۝

❐ আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনি তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন একত্র করিবেনই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী?

আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা অন্য কারো নেই। পূর্ববর্তী আয়াতে 'সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী' বলে বান্দাদের হক প্রতিপালনের ব্যাপারে যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছিলো— এই আয়াতের শুরুতে সেই সতর্ক সংকেতকেই

www.eelm.weebly.com

জোরদার করে বলা হয়েছে, 'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু।' অর্থাৎ স্মরণে রেখো আল্লাহ্ যেমন সকল কিছুর হিসাব গ্রহণ করবেন, তেমনি তিনি ব্যতীত উপাস্যও কেউ নেই। তিনি কিয়ামতের দিন সবাইকে কবর থেকে তুলে হাশরের ময়দানে একত্র করবেন। 'কিয়াম' এবং 'কিয়ামত' শব্দ দুটির অর্থ একই। যেমন 'তলব' ও 'তলবাতুন'—এই দুটি শব্দের অর্থ এক। অর্থাৎ হিসাবের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। কিয়ামতের একত্রিকরণের সংবাদটিতে সন্দেহের অবকাশই নেই।

শেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে? এই বাকভঙ্গিটি হচ্ছে প্রশ্নবোধক অস্বীকৃতি। অর্থাৎ আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কেউই নেই। সুতরাং তিনি যখন কিয়ামতের ভয়াবহতার সংবাদ দিচ্ছেন, তখন তা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত।

বোখারী ও অন্যান্যরা হজরত জায়েদ বিন সাবেতের বর্ণনা থেকে লিখেছেন, রসুল স. মুশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উহুদ প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হলেন। কিছু দূর তাঁর সঙ্গ নিয়ে মুনাফিকেরা ফিরে গেলো মদীনায়। তাদের ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলেন সাহাবীরা। একদল বললেন, এই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। অন্যদল বললেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করাই উচিত। এমতাবস্থায় অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮৮

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ۭ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝

❑ তোমাদের হইল কী যে তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুই দল হইয়া গেলে, যখন আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিয়াছেন আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিতে চাও? এবং আল্লাহ্ কাহাকেও পথভ্রষ্ট করিলে তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না।

সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে এরশাদ হচ্ছে, তোমরা বাদানুবাদ করছো কেনো? এখানে দলাদলি করার কোনো কারণই তো নেই। বিষয়টিকে আল্লাহ্তায়ালার নিকট সোপর্দ করলেই তো পারো। অপেক্ষা করো তাঁর হুকুমের। তাঁর প্রতিই পূর্ণ আস্থাশীল হও। যে নির্দেশ তিনি তাঁর রসুলের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেন, তাই প্রতিপালন করে যাও।

হজরত সাদ বিন মুআজ থেকে সাঈদ বিন মানসুর এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, একদিন রসুল স. ভাষণ দিলেন। সে ভাষণে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমাকে দুঃখ দেয় এবং তার ঘরে এমন লোকদেরকে একত্র করে যারা আমাকে কষ্ট দেয়—আমার সহায়তার্থে তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য প্রস্তুত

www.eelm.weebly.com

আছো কে? সা'দ বিন মুআজ বললেন, ওই লোক যদি আওস গোত্রের হয় তবে তাকে আমরা হত্যা করবো। আর যদি সে খাজরাজ গোত্রের হয় তবে আপনি তার সম্পর্কে যা হুকুম দিবেন আমি তাই পালন করবো। একথা শুনে সা'দ বিন উবাদা দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, সা'দ বিন মুআজ! এটা রসুল স. এর অনুসরণ নয়। কেননা, তোমরা অবগত। আর ওই লোক অজ্ঞ। এবার দাঁড়িয়ে গেলেন উসাইদ বিন হুদাইর। বললেন, হে ইবনে উবাদা! তুমি মুনাফিক। মুনাফিকদের সঙ্গেই তোমার হৃদ্যতা। এ রকম বাদানুবাদ দেখে হজরত মোহাম্মদ বিন মুসলিমা বললেন, সবাই চুপ করো। রসুল স. স্বয়ং উপস্থিত। তিনি যা নির্দেশ করবেন, আমরা তাই নির্বিবাদে প্রতিপালন করবো। অতঃপর অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত জায়েদ বিন আসলাম থেকে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, রসুল স. তাঁর ভাষণে বললেন, ওই সকল লোক সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কী যারা রসুলের সহচরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং রসুলের পবিত্র স্ত্রীগণ সম্পর্কে অপবাদ ছড়ায়, অথচ আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং তাঁদের পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন। এরপর রসুল স. ওই আয়াত পাঠ করলেন, যাতে বিশ্বাসীদের জননী হজরত আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াতটি।

হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, কতিপয় আরববাসী রসুল স. এর খেদমতে মদীনায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়লো। পীড়া নিয়েই তারা বের হয়ে গেলো মদীনা থেকে। পথিমধ্যে কিছু সংখ্যক সাহাবীর সঙ্গে দেখা হলো তাদের। তাঁরা মদীনা থেকে চলে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলেন। প্রত্যাবর্তনকারীরা বললো, মদীনার মহামারী প্রভাব বিস্তার করেছে আমাদের উপর। তাই আমরা পীড়াগ্রস্ত। সাহাবীগণ বললেন, তোমরা তাহলে রসুল স. এর অনুসরণ করোনি। তিনি তো হিজরতের পর থেকে মদীনাতেই বসবাস করে চলেছেন। আর তোমরা তাঁর অনুসারী হয়ে ফিরে যাচ্ছো। ওই লোকগুলোকে কেন্দ্র করে সাহাবীগণের মধ্যে সৃষ্টি হলো দু'টি দল। একদল বললেন, এরা মুনাফিক। আর এক দল বললেন, মুনাফিক নয়। এই বাদানুবাদের প্রেক্ষিতেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণনাটির সূত্রে রয়েছে ক্রটিবিচ্যুতি। বর্ণনাকারীর নাম এখানে বাদ পড়েছে। তাই এ বর্ণনাটি গ্রহণীয় নয়।

মুজাহিদের মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, কিছু লোক মদীনায় এসে মুসলমান হলো। তারপর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেলো। রসুল স. এর নিকটে তারা ব্যবসার মালমাত্তা সংগ্রহের জন্য মক্কায় যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলো। অনুমতি পেয়ে মক্কায় গিয়ে বসবাস করতে লাগলো তারা। তাদের সম্পর্কে সাহাবীগণ বিভিন্ন মন্তব্য করতে লাগলেন। কেউ কেউ বললেন, তারা ছিলো মুনাফিক। কেউ কেউ বললেন— না, মুমিন।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কতিপয় কোরায়েশ মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। তারপর তারা এজন্য লজ্জিত হলো এবং বিরুদ্ধবাদীদের দলে ভিড়ে মদীনা থেকে চলে গেলো। দূর থেকে রসুল স. কে তারা এই মর্মে চিঠি লিখলো যে, আমরা আমাদের আগের বিশ্বাসেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। মদীনায় আমরা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলাম। স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের আকাংখা হয়ে উঠেছিলো প্রবল। তাই আমরা চলে এসেছি। এর কিছুদিন পর তারা বাণিজ্য ব্যাপদেশে শামদেশে গেলো। সাহাবীগণ এই সংবাদ পেলেন। কেউ কেউ বললেন, চলো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। তাদেরকে ধরে নিয়ে আসি। কারণ তারা ধর্মত্যাগী। আবার কেউ বললেন, তারা তো আমাদের ধর্মমতেই রয়েছে। স্বধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও কেনো? এই কথোপকথনের প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে পূর্ববৎ অবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। কারণ, তাদের কৃতকর্ম ছিলো এই অবস্থার অনুকূল। তারা পূর্ব বিশ্বাসকেই পছন্দ করেছে এবং (রসুলের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করে) কাফের মুলুকে বসতি গড়েছে। আল্লাহ্ তাই তাদের ভ্রষ্টতাকেই তাদের চোখে শোভনীয় করে দিয়েছেন। তোমরা কি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করতে চাও অথবা তোমরা কি তাদেরকে পথপ্রাপ্ত বলতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ্ই পথভ্রষ্ট করেছেন?

এই আয়াত দ্বারা ওই দলিলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বান্দাদের অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বজ ক্রিয়াকলাপের স্রষ্টা আল্লাহ্ই। বান্দা কর্তা আর আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টিকর্তা।

অবশেষে তাঁর প্রিয় নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা জানিয়ে দিচ্ছেন, আল্লাহ্পাক যাকে পথভ্রষ্টতায় প্রতিষ্ঠিত করে দেন, তার হেদায়েতের পথ তোমরা কখনোই পাবে না।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৮৯

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ
حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ
وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

❒ তাহারা যেরূপ সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তোমরাও সেই রূপ সত্য প্রত্যাখান কর এবং তোমরা তাহাদের সমান হও ইহাই তাহারা কামনা করে। সুতরাং আল্লাহের পথে গৃহত্যাগ না করা পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে না; যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তাহাদিগকে যেখানে পাইবে গ্রেফতার করিবে এবং হত্যা করিবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধু ও সহায়রূপে গ্রহণ করিবে না;

মুমিনদেরকে কাফেরদের অভিপ্রায় সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে এই আয়াতে। বলা হচ্ছে, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা চায় তোমরাও সত্যপ্রত্যাখ্যান করো

www.eelm.weebly.com

এবং তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের মতো হয়ে যাও। অতএব সাবধান। তাদের সঙ্গে হার্দিক সম্পর্ক স্থাপন কোরো না। তারা যতোক্ষণ না আল্লাহ্‌র পথে গৃহত্যাগ (হিজরত) করবে, ততোক্ষণ তাদেরকে বিশ্বাস কোরো না।

হজরত ইকরামা বলেন, হিজরত তিন ধরনের— ১. ওই হিজরত যা মক্কার সাহাবীগণ করেছিলেন। ২. মুজাহিদগণের হিজরত যারা রসুল স. এর সঙ্গী হয়ে কেবল পুণ্য অর্জনের ইচ্ছায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ করেছেন। ৩. ওই হিজরত যা আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াবলী পরিত্যাগ করাকে বুঝায়।

এরশাদ হচ্ছে, যারা হিজরত বিমুখ অথবা হিজরত থেকে ফিরে যায় তাদেরকে বন্দী করো এবং হত্যা করো। পুনরায় বলা হচ্ছে, তাদেরকে তোমাদের বন্ধু নির্বাচন কোরো না। মনে কোরো না, তারা তোমাদের সহায়।

শেষ বাক্যটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধের সময়েও কাফেরদের সহায়তা গ্রহণ করা বৈধ নয়। জুহুরী বর্ণনা করেছেন, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ বিন উবাই তার সাথীদেরকে নিয়ে যখন উহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে গেলো তখন সাহাবীগণের কেউ কেউ বললেন, ইহুদীদের সঙ্গে আমরা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। এখন তাদের সহায়তা গ্রহণ করা প্রয়োজন। রসুল স. বললেন, তারা জঘন্য। তাদের সহায়তার প্রয়োজন আমাদের নেই।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৯০

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝

❐ কিন্তু তাহাদিগকে নহে যাহারা এমন এক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হয় যাহাদের সহিত তোমরা অংগীকারাবদ্ধ, অথবা যাহারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আগমন করে যখন তাহাদের মন তোমাদের সহিত অথবা তাহাদের সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহে না। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তাহাদিগকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন ও তাহারা নিশ্চয় তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত। সুতরাং তাহারা যদি তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া যায়, তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন না।

পূর্ববর্তী আয়াতে হুকুম দেয়া হয়েছিলো, কাফেরদেরকে বন্দী ও হত্যা করতে হবে। এই আয়াতে বলা হলো, সকল কাফেরের সঙ্গে এ রকম আচরণ কোরো না। যারা তোমাদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ তাদেরকে বন্দী করা অথবা হত্যা করা যাবে না।

www.eelm.weebly.com

একটি প্রশ্নঃ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিলো, কাফেরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কোরো না। এখানে আবার সন্ধির কথা বলা হলো কেনো? সন্ধি মানে তো বন্ধুত্বই।

উত্তরঃ বন্ধু নির্বাচন কোরো না অর্থ যে সকল কাফের তোমাদের শত্রু তাদেরকে বন্ধু ভেবো না। তারা কতলের উপযোগী। কারণ, তারা তোমাদেরকে কতল করতে চায়। তাই তাদেরকে কখনো প্রিয়ভাজন ভেবো না। আন্তরিক দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে তাদেরকে হত্যা করতে দ্বিধা কোরো না।

বাগবী লিখেছেন, সন্ধিবদ্ধ গোত্র হচ্ছে বনী আসলাম গোত্র। ঘটনাটি এ রকম— হেলাল বিন আওয়ামির আসলামী মক্কা বিজয়ের পূর্বে রসুল স. এর সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ ছিলো যে, সে এবং তার গোত্র রসুল স. অথবা তাঁর শত্রুপক্ষ কাউকেই সমর্থন করবে না। আর বিধর্মীদের কেউ যদি হেলালের আশ্রয় যাচনা করে, তবে তাকেও হেলালের গোত্রের লোকেদের মতো নিরাপত্তা দিতে হবে (বন্দী বা হত্যা করা যাবে না)। মুজাহিদ থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেম।

হজরত সুরাকা বিন মালেক থেকে হাসানের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন, (সুরাকা বলেন) বদর ও উহুদ যুদ্ধের পর মুসলমানদের বিজয় দেখে আশে পাশের অনেক লোক মুসলমান হয়ে গেলো। তখন আমি জানতে পারলাম, রসুল স. খালেদ বিন ওলিদকে আমার সম্প্রদায় বনী মাদলাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠাচ্ছেন। আমি তৎক্ষণাৎ রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন জানালাম, সংবাদ পেলাম আপনি খালেদকে আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করতে চাচ্ছেন। আমি আপনার নিকট এই মর্মে শান্তি প্রস্তাব করছি যে, আপনি আমার সম্প্রদায়কে নিরুপদ্রব রাখুন। যদি কখনো মক্কাবাসী আপনার স্বজনেরা মুসলমান হয়ে যায় তবে তারাও মুসলমান হয়ে যাবে। আর যদি তারা মুসলমান না হয় তবুও আমার সম্প্রদায় আপনার বিরুদ্ধবাদী হবে না। আপনার শত্রুপক্ষকে সহায়তাও করবে না। রসুল স. তখন হজরত খালেদের হাত ধরে বললেন, তাদের নিকট যাও। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। হজরত খালেদ বনী মাদলাজের নিকটে গিয়ে এই মর্মে সন্ধি করলেন যে, তারা রসুল স. এর শত্রুপক্ষকে সাহায্য করতে পারবে না। আর কোরায়েশেরা যদি মুসলমান হয়ে যায় তবে তারাও মুসলমান হয়ে যাবে। ওই সময় অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াতটি। এই চুক্তির কারণে কেউ যদি বনী মাদলাজ গোত্রে গিয়ে আশ্রয় নিতো তবে সেও তাদের মতো নিরাপত্তা লাভ করতো।

হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যানুসরণে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে সুরাকা বিন মালেক মাদলাজী হেলাল বিন উয়াইমির আসলামী এবং বনী খুজাইমা বিন আমের বিন আবদে মানাফ সম্বন্ধে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে জুহাক লিখেছেন, এই আয়াতের লক্ষ্যও ছিলো মুসলমানদের

www.eelm.weebly.com

সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ বনী বকর বিন জায়েদ মানাত। মুকাতিল বলেছেন, সন্ধিবদ্ধ গোত্রটি ছিলো বনী খাজাআহ্।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছে তাদেরকেও বন্দী অথবা হত্যা করা যাবে না। কারণ, তারা তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেনি। এখানে বলা হচ্ছে, মুনাফিকেরাও বন্দী ও হত্যার হুকুমের আওতায় পড়বে না। কারণ, তারাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেনি। এই নির্দেশটি প্রযোজ্য হবে মদীনার সন্ধিবদ্ধ ইহুদীদের ক্ষেত্রেও।

এরশাদ হয়েছে, এ ধরনের ভীত ও হতোদ্যম মুনাফিক ও কাফেরেরা তোমাদের উপর চড়াও হতে পারতো যদি আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের ভয় তাদের অন্তরে স্থাপন না করতেন। আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমতা দিলে তারা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতো। এখন তারা যখন এ রকম করে না, সুতরাং তোমরাও এ রকম কোরো না। তাদেরকে বন্দী এবং হত্যা করার হুকুমটি এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ অবৈধ ঘোষণা করেছেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৯১

سَتَجِدُونَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ
كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ
السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكُمْ
جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

❒ তোমরা অপর কতক লোক পাইবে যাহারা তোমাদের সহিত ও তাহাদের সম্প্রদায়ের সহিত শান্তি চাহিবে। যখনই তাহাদিগকে ফিতনার দিকে ফিরাইয়া লওয়া হয় তখনই এই ব্যাপারে তাহারা তাহাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায়। যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া না যায়, তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে এবং তাহাদের হস্ত সংবরণ না করে তবে তাহাদিগকে যেখানেই পাইবে গ্রেফতার করিবে ও হত্যা করিবে এবং তোমাদিগকে ইহাদেরই বিরুদ্ধাচরণের স্পষ্ট অনুমতি দিয়াছি।

এরশাদ হচ্ছে, তোমরা দেখতে পাবে এক ধরনের মুনাফিক তোমাদের নিকট থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে চায়, আবার স্বসম্প্রদায়কেও সন্তুষ্ট রাখতে চায়। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু সালেহ্‌র মাধ্যমে কালাবী বর্ণনা করেছেন, ওই মুনাফিকেরা ছিলো বনী আসাদ ও বনী গাতফান গোত্রের। তারা মদীনায় এসে বসবাস করছিলো। তারা লোক দেখানোর জন্য মুখে কলেমা পড়েছিলো। অন্তরে

www.eelm.weebly.com

অন্তরে তারা ছিলো কাফের। তাদের গোত্রের লোকেরা যখন তাদেরকে বলতো, তোমরা মুসলমান হলে কেনো? তারা তখন বলতো, আমরা বানর ও বিচ্ছুর ইমান গ্রহণ করেছি (বানর ও বিচ্ছুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি)। আর সাহাবীগণের সাক্ষাতে তারা বলতো, আমরা তোমাদের ধর্মেই আছি। এভাবে তারা উভয় পক্ষকে খুশী রাখতে চেষ্টা করতো। এদের স্বভাব এ রকম— যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিলে তারা আসলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এরশাদ হয়েছে, তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত না থাকে, যদি তোমাদের নিকট সন্ধি ও শান্তির আবেদন পেশ না করে তবে তাদেরকে যেখানে পাও, ধরো এবং হত্যা করো। এ রকম লোকদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে মোকাবিলা করার স্পষ্ট অনুমতি দিয়েছি। কারণ, তাদের শত্রুতা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। নিশ্চিতরূপে জানা হয়েছে যে, তারা প্রকৃতই কাফের এবং শত্রুতালিপ্ত।

বাগবী লিখেছেন, আয়াশ বিন রবীয়া মাখজুমী ছিলেন আবু জেহেলের ভাই। রসুল স. এর হিজরতের আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মনে হলো, তাইতো ব্যাপারটা তো পরিবারের সবাই জেনে যাবে (সবাই তখন নির্মম অত্যাচার চালাবে)। তিনি তখন দ্রুত মক্কা ত্যাগ করলেন। চলে গেলেন মদীনায়। সেখানকার এক পাহাড়ী গহবরে আত্মগোপন করলেন। আয়াশ উধাও হওয়ার পর তাঁর মা হয়ে পড়লো প্রায় উন্মাদিনী। সে তার দুই ছেলে আবু জেহেল এবং হারেস বিন হিশামকে বললো, আয়াশকে এনে দাও। আল্লাহ্‌র কসম তোমরা আয়াশকে না আনা পর্যন্ত আমি ঘরে যাবো না। পানাহারও করবো না। মায়ের কসম শুনে দুই ভাই বের হলো আয়াশের সন্ধানে। হারেস বিন জায়েদ বিন আবী আনিসাও সঙ্গী হলো তাদের। খুঁজতে খুঁজতে তারা হাজির হলো সেই পাহাড়ী গর্তের কাছে। বললো, নিচে নেমে এসো। তোমার চলে আসার সংবাদ শুনে মা কসম খেয়েছে, তোমাকে তার কাছে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত মা ঘরে ঢুকবে না। পানাহারও করবে না। আমরাও কসম খাচ্ছি, আমরা তোমার ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করবো না। তুমি যে ধর্মে ইচ্ছা করবে সেই ধর্মেই থাকতে পারবে। মা শোকাচ্ছন্না। বেহুঁশ। তার উপর কসম খেয়ে বসে আছে। সুতরাং চলো আমাদের সঙ্গে। মায়ের দুরবস্থার কথা শুনে আয়াশ নরম হয়ে গেলো। সে গিরিগহবর থেকে নিচে নেমে এলো। সাথে সাথে ভাইয়েরা তাকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেললো। প্রত্যেকে একশ' করে চাবুক মারলো। তারপর তাকে হাজির করে দিলো মায়ের সামনে। মা বললো, আল্লাহ্‌র কসম— ইসলাম ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে বাঁধনমুক্ত করবো না। আয়াশকে ফেলে রাখা হলো প্রখর রৌদ্রে। বন্দী আয়াশ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ওই কথাই উচ্চারণ করলো যা ছিলো তার মায়ের ইচ্ছা। তখন বাঁধনমুক্ত করে দেয়া হলো আয়াশকে। হারেশ বিন জায়েদ এই ঘটনা দেখে বলে উঠলো, সামান্য কষ্টও সহ্য করতে পারলে না। ইমান পরিত্যাগ করলে। আল্লাহর কসম! তুমি যে মত গ্রহণ করেছিলে তা যদি সত্য হয় তবে তো তুমি সত্যকেই পরিত্যাগ করলে। তুমি যে পথভ্রষ্ট সেই

www.eelm.weebly.com

পথভ্রষ্টই রয়ে গেলে। আয়াশ এ কথা শুনে রেগে গেলো। বললো, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি যদি তোমাকে কখনো একা পাই তবে হত্যা না করে ছাড়বো না।

কিছু দিন পর আয়াশ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং চলে গেলেন মদীনায়। এর কিছু দিন পর হারেস বিন জায়েদও মুসলমান হয়ে গেলেন এবং মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় রসুল স. এর নিকটে হাজির হলেন। আয়াশ এ কথা জানতেন না। একদিন তিনি কোবার বাইরের দিকে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে দেখা হলো হারেসের সঙ্গে। আয়াশ আর কালবিলম্ব না করে হারেসকে হত্যা করলেন। লোকেরা বললেন, তুমি করেছো কী? হারেস তো এখন মুসলমান। আয়াশ রসুল স. এর সকাশে উপস্থিত হয়ে জানালেন, হারেস যে মুসলমান হয়েছে এ কথা আমার জানা ছিলো না। আমি তাকে কাফের ভেবেই খুন করেছি।

ইবনে জারীর হজরত ইকরামার উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, হারেস বিন জায়েদ আবু জেহেলের সঙ্গী হয়ে আয়াশের উপর অত্যাচার করেছিলো। পরে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। আয়াশ এ কথা জানতেন না। তাই হাতের কাছে পেয়েই তাঁকে খুন করেছিলেন। খুন করার পর আয়াশ রসুল স.এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৯২

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۗ فَاِنْ كَانَ مِنْ
قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۖ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

❐ কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করা কোন বিশ্বাসীর জন্য সংগত নহে, তবে ভুলবশতঃ করিলে উহা স্বতন্ত্র; এবং কেহ কোন বিশ্বাসীকে ভুলবশতঃ হত্যা করিলে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা এবং তাহার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তাহারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং বিশ্বাসী হয় তবে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাহার সহিত তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তাহার

www.eelm.weebly.com

পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যে সংগতিহীন সে একাধিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করিবে। তওবার জন্য ইহা আল্লাহের ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীকে হত্যা করতে পারবে না। এ রকম করা হারাম। এ রকম বর্ণনা করেছেন মুজাহিদ ও সুদ্দী। এ রকম আরো বর্ণনা করেছেন ইবনে ইসাহাক, আবু ইয়া'লী, হারেস বিন আবী উসামা, আবু মুসলিম কাহী এবং কাসেম বিন মোহাম্মদ। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সাঈদ বিন জোবায়েরের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনাটিও একই রকম।

আয়াতের বক্তব্য এই যে, এক মুমিনকে হত্যা করা অন্য মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। এ কাজে রয়েছে বিশ্বাসের অনড় অন্তরায়। এ কাজ যারা করে তারা অবিশ্বাসীদের মতো। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী রসুল স. এর এই নির্দেশটি বর্ণনা করেছেন যে, ইমান থাকা অবস্থায় কেউ কোনো মুমিনকে খুন করতে পারে না।

সিহাহ্ গ্রন্থে রয়েছে, সাধারণভাবে পৃথকীকরণ সম্ভব নয়, এ রকম বিষয়াবলী প্রকাশের বাকভঙ্গিতে আরবীতে 'কানা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'কানাল ইনসানা কুফুরা' (বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ), 'কানাল ইনসানু কৃতুরা (বস্তুত মানুষ বড়ই সংকীর্ণচিত্ত)। আমি বলি, সিহাহ্'র বর্ণনানুসরণে এ কথাও বলা যায় যে, এক বস্তু অন্য বস্তু থেকে যখন অধিকাংশ সময় পৃথক থাকে অর্থাৎ সাধারণতঃ একত্র হয় না (বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে একত্র হয়) —এমতাবস্থায় 'মা কানা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন 'মা কানাল্লহু লি ইউআয্যিবাহুম ওয়া আংতা ফিহিম' (আল্লাহ এমন নন যে, আপনি তাদের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন)। এই বিধানটি সাধারণ। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও ঘটেছে। যেমন, উহুদ যুদ্ধের সময় রসুল স. উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও মুসলমান বাহিনীর উপর নেমে এসেছিলো বিপদ। পর্যুদস্ত হয়েছিলেন মুসলমানেরা। কিন্তু এ রকম ঘটনা সকল ক্ষেত্রে কিংবা সাধারণতঃ ঘটেনি। এই আয়াতেও তেমনি সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করা কোনো বিশ্বাসীর জন্য সংগত নহে।' এবং বাক্যটির শুরুতে 'মা কানা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'মা কানা লাকুম আং তু-জু রসুলাল্লাহি ওয়ালা আং তানকিহু আজওয়াজাহু মিম বায়াদিহ্।' 'তোমাদের জন্য রসুল স. কে কষ্ট দেয়া সংগত নয় এবং তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীদেরকে বিবাহ করাও সংগত নয়।' এ কথার উদ্দেশ্য এই যে— এমন কাজ তোমরা কোরো না। 'সংগত নয়' অর্থ জায়েয নয়। অর্থাৎ হারাম।

কিন্তু ভুলক্রমে এ রকম হত্যাকাণ্ড ঘটে যেতেও পারে। হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত হতে পারে। অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে। ইচ্ছাকৃত হত্যা হচ্ছে কতলে আমাদ এবং অনিচ্ছাকৃত হত্যা হচ্ছে কতলে খাতা। ইচ্ছাকৃত হত্যা সম্পর্কে বিভিন্নমুখী বর্ণনা, কিসাসের হুকুম, প্রকারভেদ ইত্যাদি বিষয়ে সুরা বাকারার আয়াত 'কুতিবা আলাইকুমুল ক্বিসাস....' এর তাফসীরে ইতোপূর্বে বলা হয়েছে। এখানে কেবল অনিচ্ছাকৃত হত্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব

www.eelm.weebly.com

হবে কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক বলেছেন, কাফফারা ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ওয়াজিব। ইমাম আহমদ থেকে ওয়াজিব এবং ওয়াজিব নয়— দু'রকম বর্ণনাই এসেছে।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ভুলবশতঃ হত্যার কারণে যদি কাফফারা ওয়াজিব হয়, তবে ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে তো আরো বেশী ওয়াজিব হওয়া প্রয়োজন। হজরত ওয়াসেল বিন আসকা' বর্ণনা করেন, আমাদের এক সাথী হত্যাকাণ্ড ঘটনোর কারণে দোজখী হয়েছিলো। তার সম্পর্কে আমরা রসুল স. এর নিকট বিধান জিজ্ঞেস করলাম। তিনি স. বললেন, তাকে বলো, সে যেনো একটি গোলাম আজাদ করে দেয়। গোলামের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুক্ত হওয়ার কারণে তারও প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মুক্ত হয়ে যাবে। রাফেঈ। এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, দোজখমুক্তির জন্য ইচ্ছাকৃত হত্যার কাফফারা ওয়াজিব। এ জন্য একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিতে হবে। আমরা বলি, এই হাদিসটি আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান এবং হাকেমও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওই বর্ণনায় কেবল এ কথাটিই আছে যে, আমাদের সাথী দোজখী হয়ে গিয়েছে। (কিসাস, দিয়ত অথবা দোজখবাসের অবস্থা সম্পর্কে সেখানে ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি)।

নস্ (কোরআন, হাদিস) দ্বারা বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। ভুলবশতঃ হত্যা করলে যেহেতু কাফফারা ওয়াজিব তাই ইচ্ছাকৃত হত্যার কাফফারাও ওয়াজিব—এ কথাটি গ্রহণীয় নয়। কারণ, ইচ্ছাকৃত হত্যা কবীরা গোনাহ্। এজন্য কাফফারাকেই যথেষ্ট মনে করা হলে ইচ্ছাকৃত হত্যার সুযোগ অবারিত করা হবে। ভুলক্রমে হত্যার সঙ্গে তাহলে আর পার্থক্য রইলো কোথায়? দোজখবাস তো পরের ব্যাপার। আর গোলাম আজাদ করা একই সঙ্গে ইবাদত ও শাস্তি।

আমাদের নিকট পার্থক্যটি ইয়ামিনে গামুস এবং ইয়ামিনে মোনাক্বাদার মতো। জেনে শুনে কসম খেয়ে ভুল সাক্ষ্য দেয়াকে ইয়ামিনে গামুস এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কসম খাওয়াকে ইয়ামিনে মোনাক্বাদা বলে। প্রথমটির কাফফারা নেই। দ্বিতীয়টির আছে। ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে ভুলক্রমে হত্যার মতোই কাফফারা দিতে হবে। শিবহে আমাদ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যা সম্পর্কে ওলামাগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যা ওই হত্যাকে বলে— যা এমন অস্ত্র দ্বারা করা হয় যা হত্যার জন্য বানানো হয়নি (যেমন বড় পাথর অথবা বড় কাঠ)। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদও এ রকম বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এমন বস্তু দ্বারা হত্যাকাণ্ড ঘটানো যার দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যু সংঘটিত হয় না। তাই দুই একবার চাবুক মারলেই যদি মৃত্যু সংঘটিত হয় তবে তা ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হবে। আর ছোট চাবুক দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রহারের ফলে মৃত্যু সংঘটিত হলে তা ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে বিবেচিত হবে। এ কথা বলেছেন ইমাম শাফেয়ী। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা এবং সাহেবাইনের মতে, এ রকম হত্যা হবে ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ। বড় পাথর বা বড় তক্তার দ্বারা হত্যা করা হলে তা হবে ইমাম আজমের মতে

www.eelm.weebly.com

ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ এবং অন্য ইমামদের মতে ইচ্ছাকৃত হত্যা। পাহাড় থেকে ফেলে দেয়ার ফলে মরে গেলে ইমাম হানিফার মতে কিসাস হবে না।

জ্ঞাতব্যঃ ইচ্ছাকৃত হত্যার কাফফারা না হওয়ার দলিল ওই হাদিসটি, যা হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে আবী শায়বা, বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি এই—রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশসমূহ মান্য করেছে, সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে জাকাত দিয়েছে এবং মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেনি, সে জান্নাতে যাবে। পাঁচটি বিষয়ের কাফফারা নেই। ১. অন্যায়ভাবে হত্যা করা। ২. মুসলমানকে অপবাদ দেয়া। ৩. যুদ্ধপ্রান্তর থেকে পলায়ন। ৪. অর্থ আত্মসাতের জন্য মিথ্যা শপথ।

ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ হত্যা, ইচ্ছাকৃত হত্যা অপেক্ষা নিম্নস্তরের। শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করাটা ইচ্ছাকৃতই হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। ইমাম আবু হানিফা দলিল হিসেবে এই হাদিসটি পেশ করেছেন— রসুল স. বলেছেন, দোররা এবং লাঠি দ্বারা হত্যা করা হচ্ছে ভুলক্রমে হত্যা সদৃশ। সত্ত্বরই বর্ণনা আসছে যে, চাবুক এবং লাঠির মধ্যে ছোট বড় সব ধরনের হত্যাকেই শামিল করা যায়। জমহুর বলেন, লাঠি বলতে ছোট লাঠিই বুঝতে হবে। বড় বাঁশ বা বৃক্ষকে লাঠি বলা যায় না।

দ্বিতীয় প্রকার হত্যা হচ্ছে ভুলবশতঃ হত্যা— শিকার মনে করে হত্যা করলে, পরে দেখা গেলো শিকার নয়, মানুষ অথবা যুদ্ধে কাফের মনে করে হত্যা করার পর জানা গেলো নিহত ব্যক্তি কাফের নয় —মুসলমান।

তৃতীয় প্রকার হচ্ছে, ঘটনাক্রমে অনিচ্ছাকৃত হত্যা। তীর নিক্ষেপের ফলে দেখা গেলো কেউ অতর্কিতে তীরবিদ্ধ হয়ে মরেছে। এ রকম হত্যা ভ্রমবশতঃ হত্যা। যেমন, কোনো ব্যক্তি ঘুমজড়িত অবস্থায় পাশ ফিরতে যেয়ে অন্য কোনো মুসলমানের উপর পড়ে গেলো এবং এর ফলে তার মৃত্যু হলো।

চতুর্থ প্রকার হচ্ছে, কারণিক হত্যা। যেমন কোনো ব্যক্তি তার আপন এলাকার বাইরে একটি কূপ খনন করলো—ওই কূপে পড়ে কেউ মারা গেলো। অথবা কেউ জমিতে কোনো পাথর রাখলো, সেই পাথরে হোঁচট খেয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করলো। এ ধরনের হত্যা হচ্ছে কারণিক হত্যা।

এই প্রকারে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে হুকুম এই যে, জ্ঞানবানদের জন্য দিয়ত (রক্তপণ) ওয়াজিব হবে। এটা ঐকমত্য। এমতোক্ষেত্রে কিসাস (খুনের বদলে খুন) হবে না। রক্তপণ না দিলে অন্যায় হবে। দিলে গোনাহ্গার হবে না। এ ব্যাপারেও সকলে একমত হয়েছেন যে, এমতোক্ষেত্রে হত্যাকারীর উপর কাফফারাও ওয়াজিব হবে এবং সে মীরাস (উত্তরাধিকার) থেকে বঞ্চিত হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, সে উত্তরাধিকারবঞ্চিত হবে না। কারণ, সে যা করেছে তা প্রকৃত হত্যাকাণ্ড নয়— ইচ্ছাকৃতভাবে যেহেতু হত্যা করা হয়নি। এ ব্যাপারে কূপ খননকারী অথবা পাথরস্থাপনকারী সরাসরি জড়িত নয়। জমহুর বলেন, উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেনো হত্যাকাণ্ড তো সংঘটিত হয়েছেই। আর

www.eelm.weebly.com

শরিয়তও এটাকে হত্যাকাণ্ড বলে সাব্যস্ত করেছে। সে কারণেই তো দিয়ত ওয়াজিব করা হয়েছে। আর এ ব্যাপারে কারো মতদ্বৈততাও নেই। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এমতোক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হবে। দিয়ত হবে না। কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে সর্বাবস্থায়। গোনাহ্ মাফের জন্যই কাফফারাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। আর শায়িত ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে যেয়ে যদি কারো উপরে পড়ে গেলে তার মৃত্যু হয় তবে সে অপরাধী হবে কেনো?

রসুল স. বলেছেন, তিন প্রকার ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে— অর্থাৎ তাদের গোনাহ্ লেখা হবে না, তার মধ্যে এক ব্যক্তি হচ্ছে ঘুমন্ত ব্যক্তি— জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত যার কোনো গোনাহ্ নেই। কিন্তু অন্যের জমিতে কূপ খনন করে রাখলে সে কূপে পড়ে যদি কোনো মুমিন মারা যায়, তবে কূপ খননকারীকে কাফফারা দিতেই হবে। জুলুম বা ছিনতাই করার সময় (কূপে পড়ে) মারা গেলে অবশ্য কাফফারা দিতে হবে না।

দিয়ত হচ্ছে হত্যার বিনিময়। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে হত্যাকারী যে ধনসম্পদ বা অনুরূপ ক্ষতিপূরণ দেয়, তাকে বলে দিয়ত। বলা হয়েছে, 'অতঃপর তার কাফফারা স্বরূপ একজন মুসলমান ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিতে হবে।'

মাসআলাঃ এক বর্ণনায় ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য হিসেবে এসেছে, শিবহে আমাদ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যার কাফফারা ওয়াজিব নয়। কেফায়া শরহে হেদায়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, জুরজানী বলেন, আমাদের আলেমগণ বলেছেন, 'শিবহে আমাদের' জন্য কাফফারা ওয়াজিব নয়। আমি বলি, এই অভিমতটিই অধিকতর সঙ্গত যে, হত্যার জন্য নির্ধারিত অস্ত্রের মাধ্যমে হত্যা সংঘটিত না হওয়ায় 'শিবহে আমাদের' জন্য কিসাস হয় না। কিন্তু হত্যার গোনাহ্ থেকে নিষ্কৃতি নেই। কেননা, গোনাহ্র সম্পর্ক নিয়ত বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে। অস্ত্রের সঙ্গে নয়। অস্ত্রের প্রকারভেদ এখানে ধর্তব্য নয়। এমনকি ঘুষি মেরে কাউকে মেরে ফেললেও হত্যার কবীরা গোনাহ্ই হবে। এ রকম হত্যা তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা অপেক্ষা গুরুতর। দেখুন, কিসাস কার্যকর হয় তরবারী দ্বারা। দণ্ডিত ব্যক্তির মৃত্যু সহজ করার জন্যই এই ব্যবস্থা। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা সকল কাজ সম্পাদনের সুন্দর নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা (কিসাস বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও) সুন্দর নিয়মে কতল কোরো। কষ্ট দিয়ে কতল কোরো না। জবেহ্ কালেও সুন্দর নিয়মে জবাই কোরো। ছুরি শানিত করে নিও। কতলের প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে মেরো না। শাদ্দাদ বিন আওসের হাদিস থেকে এ রকম বর্ণনা এনেছেন আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরিমিজি, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা।

কাফফারা হিসেবে একটি গোলাম আজাদ করা ওয়াজিব। আজাদ করাকে আয়াতে 'হুর' বলা হয়েছে। ভালো এবং শ্রেষ্ঠ বস্তুকে হুর বলা হয়। কামুস অভিধানে রয়েছে, উত্তম বস্তুকে হুর বলা হয়। মুক্তিদানকে হুর বলার কারণ এই যে, এতে রয়েছে সৌজন্য ও কল্যাণ। 'রক্বাবাতুন' অর্থ গর্দান। আসল অর্থ জীবন। যেমন মাথা (নেয়া) অর্থ জীবন।

www.eelm.weebly.com

গোলাম বা বাঁদী পূর্ণ মালিকানাধীনে থাকলে তাকে মুক্তি দেয়া যাবে। বাঁদী গর্ভবতী থাকলে তার গর্ভস্থিত শিশুও মুক্ত হয়ে যাবে। কতলের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করে দেয়া বৈধ নয়। আর তাকে বিক্রয় করাও জায়েয নয়। রসুল স. বলেছেন, শিশুর মাকে শিশুই আজাদ করে দিয়েছে।

এভাবে মুদাব্বার গোলামকে (যে দাসকে তার মালিক 'আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত' এ কথা বলেছে তাকে মুদাব্বার গোলাম বলে) মুক্ত করাও বৈধ নয়। ইমাম আবু হানিফা এ কথা বলেছেন। কেননা, মনিবের মৃত্যুর পর তার মুক্তির ঘোষণা তো রয়েছেই। ইমাম শাফেয়ীর মতে মুদাব্বার গোলামকে কাফফারা হিসেবে মুক্ত করে দেয়া জায়েয। মুকাতিব দাসকেও মুক্ত করা জায়েয, যদি সে তার মালিককে কিছুই পরিশোধ করে না থাকে (মুকাতিব বলে ওই দাসকে যাকে বলা হয়েছে, তুমি এতো টাকা পরিশোধ করতে পারলে মুক্ত)। ইমাম আবু হানিফার মতে, মুকাতিব আজাদ করা জায়েয। কেননা, দাস ও প্রভু সম্মত হলে চুক্তি রহিত করা যায়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মুকাতিব মুক্ত করা নাজায়েয, যদি গোলাম কিছু অংশও পরিশোধ করে থাকে। মুকাতিব আজাদ করা অধিকাংশের মতে নাজায়েয—যদি মুকাতিব তার কিছু অংশ পরিশোধ করে থাকে।

পাগল, বোবা, কালা ও অন্ধকে আজাদ করা জায়েয নয়। উভয় হাত অথবা উভয় পা কাটা অথবা একদিকের এক হাত কাটা ও অন্য দিকের এক পা কাটা—এ রকম গোলামও আজাদ করা বৈধ নয়। এ ধরনের মানুষ মৃততুল্য। চোখে কম দেখে, ধবল কুষ্ঠের রুগী অথবা রাতকানা যদি হয়, তবে আজাদ করা জায়েয হবে। কেননা, এধরনের মানুষ সম্পূর্ণ সক্ষম না হলেও পুরাপুরি অক্ষম নয়।

জন্মগতভাবে পুরুষত্বহীন অথবা পরে নির্বীর্যকরণ করা হয়েছে— এমন গোলামকেও আজাদ করা সিদ্ধ। কেননা, তারা পৌরুষহীন হলেও শ্রম দিতে সক্ষম এবং তাদের নিকট থেকে শ্রম নেয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো, বংশবিস্তার নয়। এভাবে বাঁদী আজাদ করাও জায়েয, যদি সে কর্মসক্ষমা হয় (সহবাসসক্ষমা না হলেও)।

মাসআলাঃ হত্যাকারীকে হতে হবে জ্ঞানবান, প্রাপ্তবয়স্ক এবং মুসলমান। কেননা, কাফফারা হচ্ছে ইবাদত। ইমাম শাফেয়ী কাফফারাকে দিয়ত তুল্য মনে করেছেন। দিয়ত আদায়ের ক্ষেত্রে বালেগা, জ্ঞানবান ও মুসলমান হওয়ার শর্ত নেই। তাই তিনি কাফফারার বেলাতেও এ সকল শর্তের উল্লেখ করেননি।

মাসআলাঃ ইমাম শাফেয়ীর অভিমত এই যে, কাফফারার জন্য স্বেচ্ছায় আজাদ করতে হবে। তাই কাফফারার উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ যদি তার আপন পিতাকে ক্রয় করে, তবে জায়েয হবে না (কেননা, পিতা তো ক্রয় করার সাথে সাথেই ক্রেতার ইচ্ছা ছাড়াই আপনাআপনি আজাদ হয়ে যায়)। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে, পিতা কিংবা নিকটতম কোনো আত্মীয় (যারা ক্রয় করার সাথে সাথেই আপনাআপনি মুক্ত হয়ে যায়) —তাদেরকে কাফফারার উদ্দেশ্যে খরিদ করলেই যথেষ্ট হবে। কেননা, এক্ষেত্রে নিয়ত করা ওয়াজিব। এখানে ক্রয় মুক্তির কারণ এবং ক্রয়ের বিষয়টি ক্রেতার ইচ্ছাধীন। তাই ক্রয় করার সময়

www.eelm.weebly.com

কাফফারার নিয়ত করা জরুরী। তাই যদি কারো পিতা জায়েদ নামক কারো গোলাম হয় এবং জায়েদ আমর নামের কাউকে সেই পিতাকে দান হিসেবে দিয়ে দেয় অথবা অসিয়তের মাধ্যমে পিতার মালিকানা লাভ হয়, তবে হত্যার কাফফারা হিসেবে সেই দান বা অসিয়ত জায়েয হবে না। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জায়েয হবে। কিন্তু পিতা পুত্রকে অথবা পুত্র পিতাকে মীরাস হিসেবে পেলে (অথবা আজাদ হয়ে গেলে) এই আজাদী বা মুক্তি কতলের কাফফারা হিসেবে যথেষ্ট হবে না (কাফফারার নিয়ত করে থাকলেও) —এটা ঐকমত্য।

আয়াতে 'মু'মিনা' শব্দটি এসেছে, তাই ঐকমত্যানুসারে কাফফারার জন্য যাকে মুক্তি দিতে হবে তাকে হতে হবে মুসলমান ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী। (কসমের কাফফারা, জেহারের কাফফারা এবং রোজার কাফফারার জন্য মুসলমান হওয়ার শর্ত নেই)। মুসলমান হওয়ার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট, যেনো শরিয়তসম্মতভাবে সে মুসলমান বলে গণ্য হয়। যেমন, কোনো মুসলমান পিতা অথবা মাতা নিজের ছোট শিশুকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়—এ রকম করা জায়েয। কারণ, শিশুকে শরিয়তে তার পিতামাতার অনুগামী হিসেবে ধরে নেয়া হয়। মাতা পিতার মধ্যে যে কোনো একজন মুসলমান হলেও ওই শিশুকে মুসলমান ধরা হবে। ইবনে মুনজির, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন যে, এখানে 'মু'মিনা' অর্থ ওই গোলাম বা বাঁদী যার ইমানের অনুভূতি রয়েছে এবং যে নামাজ রোজা করে থাকে। কিন্তু কোরআনের যে স্থানে ক্রীতদাসের সঙ্গে মু'মিনার শর্তটি নেই, সেখানে সদ্যজাত শিশু কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকও জায়েয। কাতাদা থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন আবদুর রাজ্জাক। ক্বারী হজরত উবাই বিন কাবের ক্বেরাত অনুযায়ী অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক জায়েয নয়।

দিয়ত অর্থ রক্তের বিনিময়। এই বিষয়টিও দাসমুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। কামুস অভিধানে দিয়ত শব্দটি লিখিত হয়েছে 'দাল' অক্ষরে জের সহযোগে। দিয়ত বা রক্তপণ পরিশোধ করতে হবে হত্যাকারীকে। আয়াতে কেবল দিয়ত প্রদানের হুকুম দেয়া হয়েছে। কিন্তু কার বা কাদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে, সে কথা বলা হয়নি। এ বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে হাদিস শরীফে।

মাসআলাঃ দিয়ত হত্যাকারীর আসাবা ও উত্তরাধিকারীদের উপর ওয়াজিব। প্রতিটি উত্তরাধিকারীকে যতোটুকু দিতে হবে ততোটুকু—এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হত্যাকারীকে কিছুই দিতে হবে না।

আকেল (জ্ঞানসম্পন্ন) ব্যক্তির উপর দিয়ত ওয়াজিব হওয়ার কথা কোরআনে উল্লেখিত হয়নি, কিন্তু বিষয়টি প্রসিদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং এর উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাদিসটি যদিও খবরে আহাদ (এককভাবে বর্ণিত) — তবুও তা ঐকমত্যপুষ্ট হওয়ার কারণে কোরআনের বিধানের মতো অকাট্য। কেননা, জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির উপর দিয়ত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি অবধারিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন— বনী হুজাইল গোত্রের দুই রমণী সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিলো। একজন পাথর নিক্ষেপ করলো অন্যজনের

www.eelm.weebly.com

প্রতি, যে ছিলো গর্ভবতী। পাথরের আঘাতে সে এবং তার গর্ভস্থ শিশু দু'জনেই মৃত্যুবরণ করলো। এ প্রসঙ্গে রসুলপাক স. নির্দেশ দিলেন, শিশুর দিয়ত হিসেবে একটি গোলাম অথবা বাঁদী মুক্ত করে দিতে হবে। আর নিহত রমণীর দিয়ত পরিশোধ করবে হত্যাকারীর জ্ঞানসম্পন্ন আত্মীয়েরা। অন্য সূত্রের বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. বলেছেন, নিহত রমণীর দিয়ত পরিশোধ করবে তার ওয়ারিশেরা। এবং গর্ভস্থ শিশুর জন্য একটি ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী মুক্ত করে দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী থেকে বায়হাকী উদ্ধৃত করেছেন—আমরা আলেমগণের ঐকমত্যসূত্রে জেনেছি যে, স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তি কর্তৃক ভুলক্রমে নিহত হলে দিয়তের পরিমাণ হবে একশত উট। আর এই দিয়ত পরিশোধ করতে হবে হন্তারকের জ্ঞানসম্পন্ন নিকটজনদেরকে। ঐকমত্যসূত্রে এ কথাও এসেছে যে, দিয়ত পরিশোধ করতে হবে তিন বছরের মধ্যে। প্রতি বছরে পরিশোধ্য এক তৃতীয়াংশ।

লেহিয়া সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেন—সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব বলেছেন, তিন কিস্তিতে তিন বছরে দিয়ত পরিশোধ করা সুন্নত। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এই নিয়মটি ঐকমত্যসমর্থিত। তিরমিজি ও ইবনে মুনজিরও এ কথা বলেছেন। শা'বী সূত্রে মুনকাতে' হিসেবে ইবনে আবী শাইবা, আবদুর রাজ্জাক এবং বায়হাকীও বলেছেন (ধারাবাহিকতাছিন্ন বর্ণনাকে বলে হাদিসে মুনকাতে') — হজরত ওমর সম্পূর্ণ দিয়তের জন্য তিন বছর, অর্ধেকের জন্য দুই বছর এবং অর্ধেকের চেয়ে কমের জন্য এক বছর সময় নির্ধারণ করেছেন। হজরত আলীও বলেছেন এ কথা। তাঁর উক্তি মুনকাতে' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে বায়হাকী এবং ইয়াজিদ বিন আবী হাবীব কর্তৃক।

মাসআলাঃ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কিছু সম্পদ দানের মাধ্যমে যদি সন্ধি হয়ে যায় অথবা নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা যদি ক্ষমা করে দেয়, তবে কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) মাফ হয়ে যাবে। এমতোক্ষেত্রে সম্পদ পরিশোধ করতে হবে হত্যাকারীকে। তার জ্ঞানসম্পন্ন নিকটজনদেরকে নয়। হত্যাকারী সম্পদ দিতে স্বীকৃত হলেও জ্ঞানসম্পন্নরা দায়মুক্ত হয়ে যাবে। ক্রীতদাস নিহত অথবা হত্যাকারী যেই হোক না কেনো, হত্যাকারীকেই দিয়ত পরিশোধ করতে হবে। পরিশোধের দায় জ্ঞানসম্পন্ন নিকটজনদের উপর বর্তাবে না।

হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে দারা কুতনী এবং তিবরানী বর্ণনা করেছেন—রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, জ্ঞানসম্পন্নদের উপর ওয়াজিব করে দিও না। অর্থাৎ স্বীকারোক্তিকারীর স্বীকৃত দিয়ত জ্ঞানসম্পন্ন উত্তরাধিকারীদের উপরে চাপিয়ে দিও না। এই হাদিসটির সনদ অত্যধিক দুর্বল। এর মধ্যে মোহাম্মদ বিন সাঈদ নামক বর্ণনাকারী ছিলো মিথ্যুক এবং হারিস বিন নাবহান ছিলো হাদিস অস্বীকারকারী। হজরত ওমর থেকে মাওকুফ রূপে দারা কুতনী এবং বায়হাকী উদ্ধৃত করেছেন—গোলাম নিজে নিহত হলে বা কাউকে হত্যা করলে এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস রহিত হয়ে গেলে সন্ধির মাধ্যমে কিংবা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে দিয়ত অবশ্যপরিশোধ্য হয়ে থাকলে সেই দিয়ত জ্ঞানসম্পন্ন

www.eelm.weebly.com

নিকটাত্মীয়েরা পরিশোধ করবে না। হাদিসটির সনদ মুনকাতে'। এর এক বর্ণনাকারী আবদুল মালেক বিন হোসাইন দুর্বল। বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে সমঝোতা অথবা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে গোলাম অপরাধী সাব্যস্ত হলে তার জ্ঞানসম্পন্ন নিকটাত্মীয়েরা দিয়ত পরিশোধ করবে না। মুয়াত্তা গ্রন্থে জুহরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. এর সুন্নত এবং সাহাবীগণের সুন্নতের মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সকল অবস্থায় হন্তারকের বুদ্ধিসম্পন্ন নিকটজনেরা দিয়ত পরিশোধের দায় বহন করবে না। বায়হাকী আবু জেনাদের মাধ্যমে বলেছেন, মদীনার ফকিহ্গণও এই অভিমতের প্রবক্তা।

মাসআলাঃ ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, জ্ঞানসম্পন্ন নিকটজন অর্থ হত্যাকারীর গোত্রের লোকজন এবং আসাবা (কোরআন ও হাদিসের বিধানানুসারে সম্পদবণ্টনের পর অতিরিক্ত অংশ যারা পায় তাদেরকে বলে 'আসাবা')। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গোত্রনেতৃত্ব না থাকলে নিকটতম আত্মীয়রা হবে জ্ঞানসম্পন্ন নিকটজন এবং কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে গোলামকে যে মুক্ত করেছে সে-ই হবে তার জ্ঞানসম্পন্ন নিকটজন আর 'মাওলাল মাওয়ালাত' এর ক্ষেত্রে বুদ্ধিসম্পন্ন নিকটজন হবে সেই ব্যক্তি, যে অঙ্গীকারাবদ্ধ (যারা এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, আমাদের দু'জনের জান ও মাল এক)।

মাসআলাঃ জ্ঞানসম্পন্ন একজন নিকটজনের উপর প্রতি বছর চার দেরহামের অধিক কিস্তি নেয়া যাবে না। ইমাম আবু হানিফা এ রকম বলেছেন। অপর একটি বর্ণনায় প্রতি বছরের স্থলে এসেছে তিন বছরের কথা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, একজনের উপর অর্ধ দিনারের বেশী ধার্য করা যাবে না।

মাসআলাঃ নিহত ব্যক্তির জ্ঞানসম্পন্ন নিকটজন না থাকলে দিয়ত জমা করে দিতে হবে বায়তুল মালে। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, হত্যাকারীর জ্ঞানসম্পন্ন নিকটজন না থাকলে দিয়ত পরিশোধ করতে হবে বায়তুল মাল থেকে। মুফাসসিরগণ এই মাসআলাটির সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হননি।

দিয়তের পরিমাণঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাতুল্য হত্যার ক্ষেত্রে পরিশোধ্য দিয়ত হবে কঠিন। আর কোনো কারণে কিসাস রহিত হয়ে গেলে ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রেও কঠিন দিয়ত পরিশোধ করতে হবে। রসুল পাক স. বলেছেন, ইচ্ছাকৃত হত্যাতুল্য হত্যা এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়ত কঠিন। আর কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) প্রযোজ্য হবে কেবল ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে। ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো হত্যার ক্ষেত্রে নয়। ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো হত্যার ব্যাপারটা এ রকম—হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে শয়তানের খপ্পরে পড়ে গেলো এবং হয়তো তখন বিক্ষিপ্তভাবে কারো প্রতি পাথর নিক্ষেপ করলো—এ ধরনের অপরিকল্পিত হত্যা, যাতে কোনো অস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি। আহমদ।

ভুলবশতঃ হত্যার দিয়ত হবে লঘু। কঠিন দিয়ত পরিশোধ করতে হবে উটের মাধ্যমে (সোনা রূপার মাধ্যমে নয়)। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, কঠিন দিয়তের পরিমাণ হচ্ছে একশত উট—যা পূরণ করতে হবে

www.eelm.weebly.com

এভাবে—বিনতে মাখাজ পঁচিশটি, বিনতে লাবুন পঁচিশটি, হিক্কা পঁচিশটি এবং জায্আ পঁচিশটি (এক বছর অতিক্রম করে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে এ রকম উটনীকে বলে বিনতে মাখাজ। বিনতে লাবুন বলে ওই উটনীকে যা দ্বিতীয় বছর অতিক্রম করে তৃতীয় বছরে পড়েছে। চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উটনীর ও উটের নাম হিক্কা। আর জায্আ হলো ওই উট বা উটনী যা পঞ্চম বছরে পড়েছে)।

ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ীর মতে একশ' উট পূরণ করতে হবে তিরিশটি জায্আ, তিরিশটি হিক্কা এবং চল্লিশটি ছানিয়া দ্বারা (গর্ভবতী উটনীকে বলে ছানিয়া)।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল পাক স. বলেন, শুনে নাও। কতলে শিবহে আমাদ (চাবুক অথবা লাঠির মাধ্যমে হত্যা) এর দিয়ত হবে একশত উট। তার মধ্যে চল্লিশটিকে হতে হবে গর্ভবতী। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ। ইবনে হাব্বান বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে তিরমিজি এবং ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সোপর্দ করতে হবে। তারা যদি ইচ্ছা করে তবে তারা তাকে হত্যা করবে অথবা হত্যা না করে দিয়ত গ্রহণ করবে। দিয়তের একশত উটের মধ্যে থাকতে হবে তিরিশটি হিক্কা, তিরিশটি জায্আ এবং অবশিষ্ট চল্লিশটি গর্ভবতী উটনী, যার নাম ছানিয়া। হজরত উবাদা বিন সামেত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. বলেন, শুনে রাখো, কঠিন দিয়তের পরিমাণ হচ্ছে একশত উট, যার মধ্যে চল্লিশটিকে হতে হবে গর্ভবতী। দারা কুতনী ও বায়হাকী। হাদিসটি ধারাবাহিকতাছিন্ন (মুনকাতে)।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. এর এরশাদ হচ্ছে, মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যার দিয়ত একশত উট। কিন্তু উটনীর পেটে বাচ্চা আছে কিনা সে সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করা যায় না। আবার এমনও হতে পারে যে, যে কোনো সময় উটনী তার বাচ্চা প্রসব করতে পারে। এভাবে প্রসব যদি হয়েই যায় তবে উটের সংখ্যা একশত ছাড়িয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফার এ কথাটি অবশ্য বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ, যা শরিয়ত কর্তৃক গৃহীত হওয়ার উপায় নেই। বরং গর্ভবতী উটনী সম্পর্কে এ কথা বলা যেতে পারে যে, এখানে গর্ভবতী উটনী অর্থ ওই উটনী যা গর্ভ ধারণের উপযোগী। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফার মতে লঘু দিয়ত হবে এ রকম—বিশটি জায্আ, বিশটি হিক্কা, বিশটি বিনতে লাবুন, বিশটি বিনতে মাখাজ এবং বিশটি ইবনে মাখাজ। ইমাম আহমদের মতও এ রকম। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের মত হচ্ছে—ইবনে মাখাজের স্থলে হবে ইবনে লাবুন। ইমাম আবু হানিফার দলিল ওই হাদিসটি যা হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন আহমদ, বায্যার, দারা কুতনী, বায়হাকী এবং আসহাবে সুনান। হাদিসটি এই—রসুল পাক স. ভুলক্রমে হত্যার দিয়ত নির্ধারণ করেছেন এ

www.eelm.weebly.com

রকম—বিনতে মাখাজ বিশটি, বিনতে লাবুন বিশটি, হিক্কা বিশটি, জায্আ বিশটি এবং ইবনে মাখাজ বিশটি। হাদিসটির সূত্রপ্রবাহ এ রকম—হাজ্জাজ বিন আরতাদ—জায়েদ বিন জোবায়ের—হাশফ বিন মালেক—আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ। ইমাম শাফেয়ী দলিল পেশ করেছেন দারা কুতনী বর্ণিত ওই হাদিস থেকে, যার বর্ণনাকারী আবু উবায়দা— তিনি বলেছেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেন, ভুলক্রমে হত্যার দিয়ত একশ' উট, যার পাঁচটি অংশ এ রকম—বিশটি করে হিক্কা, জায্আ, বিনতে মাখাজ, বিনতে লাবুন এবং ইবনে লাবুন। দারা কুতনী হাদিসটিকে উত্তমসনদবিশিষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন, এর বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। আরো বলেছেন, পূর্বে বর্ণিত হাদিসের হাশফ বিন মালেক বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। তাই তার বর্ণনা আলেমগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তার বর্ণনা হজরত আবু উবায়দার বর্ণনার বিরুদ্ধে। হজরত আবু উবায়দার বর্ণনাই সঠিক। যেহেতু তিনি তাঁর পিতার উক্তির অবিকল উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর সূত্রপ্রবাহ নেমে এসেছে বিশুদ্ধভাবে। আর এই মাসআলায় হজরত আবু উবায়দাই হাশফ বিন মালেকের চেয়ে অধিক ওয়াকিফহাল। রসুলপাক স. এর সিদ্ধান্ত জানার পর কেউ তাঁর বিরুদ্ধে বলতে পারে না। অথচ হাশফ তাই করেছে। তাছাড়া হাশফ তেমন প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীও নয়। পরবর্তী বর্ণনাকারী জায়েদ বিন জোবায়ের—তার পরের বর্ণনাকারী হাজ্জাজ বিন আরতাদ—এই হাজ্জাজ বিন আরতাদ ছিলো মুদাল্লাস (মুদাল্লাস শব্দটি তাদলিস কৃদন্ত পদ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মালের দোষক্রটি গোপন করা। আবার কেউ বলেছেন, শব্দটির উৎস 'দালসুন' —যার অর্থ ভীষণ অন্ধকার। মোটকথা, বর্ণনাকারী এখানে তার ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি। এই অস্পষ্টতার কারণে বর্ণনাটিকে বলা হয়েছে মুদাল্লাস)। হাজ্জাজের বর্ণনা থেকে পরবর্তীরা বিভিন্নভাবে বর্ণনাটিতে বিকৃতি ঘটিয়েছেন।

ইবনে জাওজী লিখেছেন, দারা কুতনী বলেছেন, হজরত আবু উবায়দা তাঁর পিতার নিকট থেকে কোনো হাদিস শোনেননি। অথচ বর্ণনা করেছেন পিতার সূত্রে; সুতরাং বর্ণনাটি দ্বন্দ্বদীর্ণ। হাদিস বিশারদগণের শর্ত এই যে, প্রত্যেক বর্ণনাকারীর নিকট থেকে কমপক্ষে দু'জনকে হাদিস শুনতে হবে এবং বলতে হবে। নতুবা তা প্রামাণ্য বলে গৃহীত হবে না। কিন্তু হজরত আবু উবায়দার বর্ণনার ক্ষেত্রে এই শর্তটি পালিত হয়নি।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, এখানে বায়হাকী দারা কুতনীকে আক্রমণ করে বলেছেন, দারা কুতনী তাঁর ধারণার শিকার। হাফেজ ইবনে হাজার আরো লিখেছেন, আমি সুফিয়ান সওরীর 'জামিয়া' গ্রন্থে হাদিসটিকে তিনভাবে বর্ণিত হতে দেখেছি। ১. মানসুর—ইব্রাহিম— হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ। ২. আবু ইসহাক—আলকামা— হজরত ইবনে মাসউদ। ৩. আবদুর রহমান বিন ইয়াজিদ বিন হারুন—সুলায়মান তামিমি— আবু মুজলাজ—হজরত আবদুল্লাহ্

www.eelm.weebly.com

ইবনে মাসউদ (ধারাবাহিক সূত্রে)। বর্ণিত তিনটি প্রশাখাতেই ইবনে মাখাজের উল্লেখ রয়েছে।

মাসআলাঃ নগদ পরিশোধ্য দিয়তের পরিমাণ হাজার দিনার তোলাই অথবা বারো হাজার দিরহাম। ইমাম আহমদের মতে দশ হাজার দিরহাম। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আসল দিয়ত হলো উট। উট দিতে না পারলে দিতে হবে যে কোনো একটি— ১. হাজার দিনার তোলাই অথবা বারো হাজার দিরহাম। ২. উটের মূল্যমান যা হয়— মুদ্রা কিংবা হাজার দিনার অথবা বারো হাজার দিরহাম।

হাজার দিনার তোলাই এর প্রমাণ রয়েছে আবু বকর বিন মোহাম্মদ বিন আমর বিন হাজমের হাদিসে। ওই হাদিসটি আমরা বর্ণনা করবো সামনের দিকে গিয়ে। রৌপ্যমুদ্রা দ্বারা দিয়ত পরিশোধের প্রমাণ রয়েছে হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায়। তিনি বলেছেন, রসুল স. দিয়ত নির্ধারণ করেছেন বারো হাজার রৌপ্য মুদ্রা। হজরত ইকরামার মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আসহাবে সুনান (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা)। কিন্তু ইকরামার নিচের দিকের এবং আমর বিন দিনারের উপর দিকের বর্ণনাকারীদের মধ্যে মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। আমর বিন দিনারের বর্ণনা থেকে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন মোহাম্মদ বিন মোসলেমা তায়েফী। আবার হজরত ইকরামা থেকে সুফিয়ান বিন উয়াইনা বর্ণনা করেছেন মুরসাল পদ্ধতিতে। আবদুর রাজ্জাক এ রকম বলেছেন। ইবনে আবী হাতেম তাঁর পিতার বক্তব্য হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন যে, একে মুরসাল বলাই অধিকতর বিশুদ্ধ। ইবনে হাজম লিখেছেন, সুফিয়ান বিন উয়াইনার প্রখ্যাত ছাত্রগণ একে মুরসাল বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, রসুল স. এর যুগে দিরহামের ওজন ছিলো ছয় রতি। হজরত ওমরের জামানায় হয়ে গিয়েছিলো সাত রতি। তাই ছয় রতি হিসেবে বারো হাজার এবং সাত রতি হিসেবে প্রায় দশ হাজার। ইমাম শাফেয়ীর দ্বিতীয় বক্তব্যটি এই কারণে হয়েছে যে, আমর বিন শোয়াইবের হাদিসে এসেছে, বস্তিবাসীদের উপর রসুল স. দিয়তের মুদ্রামূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। উটের মূল্য মহার্ঘ হলে তিনি স. মুদ্রামূল্য বাড়িয়ে দিতেন এবং কম হলে দিতেন কমিয়ে। ইমাম শাফেয়ী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম ও ইবনে জুরাইজের বর্ণনা থেকে এবং আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন মোহাম্মদ বিন রাশেদ সূত্রে সুলায়মান বিন মুসার মাধ্যমে আমর বিন শোয়াইব থেকে।

মাসআলাঃ জমহুরের নিকট উপরোল্লিখিত তিনটি নিয়মেই দিয়ত পরিশোধ করা যাবে (উট, দিনার, দিরহাম)। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ এবং ইমাম আহমদ বলেন, দিতে হবে দুইশত গাভী অথবা দুই হাজার ছাগল কিংবা দুইশত জোড়া কাপড়। কেননা, হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে আতা বর্ণনা করেছেন—রসুলুল্লাহ্ স. উটওয়ালাদের জন্য একশত উট, গাভীওয়ালাদের

www.eelm.weebly.com

জন্য দুইশত গাভী, বকরীওয়ালাদের জন্য দুই হাজার বকরী এবং বস্ত্রব্যবসায়ীদের জন্য দুইশত জোড়া কাপড় দিয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আবু দাউদ।

স্বসূত্রে ইবনে জাওজী এই হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন। হাদিসটি নিঃসন্দিগ্ধ। আবু দাউদ তাঁর 'মারাসিল' গ্রন্থে এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন আতা থেকে। হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্‌র নাম সেখানে নেই।

মাসআলাঃ জখম সম্পর্কে আবু বকর বিন মোহাম্মদ বিন আমর বিন হিশাম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে-রসুলুল্লাহ্ স. ইয়ামানবাসীদের নিকট প্রেরিত ফরমানে নির্দেশ করেছেন, যদি কেউ কোনো মু'মিনকে হত্যা করে তবে তাকে বন্দী ক'রে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশের নিকট কিসাসের জন্য পাঠিয়ে দিবে। ওয়ারিশেরা দিয়ত নিতে সম্মত হলে দিয়ত পরিশোধ করতে হবে। পুরুষকে রমণীর বিনিময়ে হত্যা করা যাবে। হত্যার দিয়ত একশত উট। স্বর্ণব্যবসায়ীদের জন্য এক হাজার দিনার (তোলাই)। নাক যদি সম্পূর্ণ কেটে ফেলে তবে পরিশোধ করতে হবে পূর্ণ দিয়ত (এক শত উট) দাঁত উঠিয়ে ফেললে দিয়ত দিতে হবে। ঠোঁট কেটে ফেললেও দিয়ত দিতে হবে। দিয়ত দিতে হবে অণ্ডকোষ কেটে ফেললে বা অকেজো করে দিলে, পুরুষাঙ্গ কেটে ফেললে অথবা অকেজো করে ফেললে, পিঠ ভেঙে দিলে, কোমর ভেঙে ফেললে, চোখ নষ্ট করলে এবং দুই হাত কেটে ফেললেও। দিয়তের পরিমাণ একশত উট। এক হাত কেটে ফেললে পঞ্চাশটি। দুই পা কেটে ফেললে একশ'টি এবং এক পা কেটে ফেললে পঞ্চাশটি। মস্তকে আঘাত করলে পূর্ণ দিয়তের এক তৃতীয়াংশ। উদরাভ্যন্তর পর্যন্ত জখম পৌঁছে গেলেও তাই। অস্থি স্থানচ্যুত করলে পনেরোটি, হাত বা পায়ের কোনো আঙুল কেটে ফেললে দশটি এবং দাঁত ভেঙে ফেললে পাঁচটি উট দিতে হবে। নাসাঈ, দারেমী। মালেকের বর্ণনায় এর সঙ্গে আরো বলা হয়েছে, চোখ ফুটো করে ফেললে পঞ্চাশ উট এবং হাড়ের জোড়া খুলে ফেললে পাঁচ উট। হাদিসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। আবু দাউদ তাঁর মারাসিলের মধ্যে বলেছেন, হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ নয়। হাকেম ইবনে হাব্বান এবং বায়হাকী বলেছেন, বিশুদ্ধ। আহমদ বলেছেন, আমি ধারণা করি হাদিসটি বিশুদ্ধ। ইমামগণের একটি দল এই হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলে মেনে নেননি। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ স. এর লিখিত ফরমান হওয়ায় এটি বিশুদ্ধ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। রসুল স. এর ওই চিঠিটি ছিলো প্রসিদ্ধ, তাই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ বলে মান্য করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ফরমানটি যে রসুল স. এর সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আলেমগণ হাদিসটিকে গ্রহণ করেননি। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, ফরমানটি সুবিখ্যাত, আলেমগণ তা ভালো করেই জানেন। বহুবিদিত হওয়ার কারণে এখানে সনদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে গৌণ। এ রকম সর্বজনবিদিত হাদিস সনদ ব্যতিরেকেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। হাকেম লিখেছেন, ওমর বিন আবদুল আজিজ এবং ইমামগণের যুগে জুহুরী হাদিসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করেছেন। সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব থেকে স্বসূত্রে আবদুর

www.eelm.weebly.com

রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, আঘাত যদি উদরের অভ্যন্তরে পৌঁছে যায়, তবে হজরত আবু বকরের সিদ্ধান্ত মতে দুই তৃতীয়াংশ দিয়ত দিতে হবে। ইবনে আবী শায়বা থেকেও এ রকম বর্ণিত হয়েছে। দারা কুতনী মওকুফ হিসেবে হজরত জায়েদ বিন সাবেতের উক্তি উল্লেখ করেছেন এ রকম—প্রহারের ফলে অস্থি স্থানচ্যুত হলে দশটি উট দিতে হবে। আবদুর রাজ্জাক এবং বায়হাকী। বায়হাকীর নিকট হাদিসটি মারফু। ইবনে আবী শায়বা, বায়হাকী এবং ইবনে আবু ইসহাক সূত্রে মাকহুল বর্ণনা করেছেন—রসুল স. অস্থি স্থানচ্যুত করার দিয়ত নির্ধারণ করেছেন পাঁচটি উট। এর চেয়ে কম আঘাত হলে পরিশোধ্য দিয়তের পরিমাণ সম্পর্কে তিনি স. কিছু বলেননি। হাসানের বর্ণনা থেকে আবদুর রাজ্জাক লিখেছেন, অস্থি স্থানচ্যুতির চেয়ে কম আঘাতের দিয়ত সম্পর্কে রসুল স. কোনো সিদ্ধান্ত দান করেননি। আবু জেনাদ এবং ইসহাক বিন আবী তালহা থেকে মুরসাল রূপে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী, জুহরী এবং রবীয়া। রসুল স. হাত ও পায়ের আঙ্গুলকে সমান্তরাল মূল্য দিয়েছেন এবং বলেছেন, দাঁত ভাঙা এবং হাত ও পায়ের আঙ্গুল কেটে ফেলার অপরাধ সমান। হাদিসটি পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও বায্যার। ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন সংক্ষিপ্তরূপে। ইবনে হাব্বানও এ রকম করেছেন। বোখারীতে বলা হয়েছে, দাঁত ও আঙ্গুল এক বরাবর।

আমর বিন শোয়ায়েবের বর্ণনা থেকে আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা বলেছেন, আঙ্গুল ও দাঁত এক বরাবর। প্রতি আঙ্গুলের জন্য দশ উট এবং প্রতি দাঁতের জন্য পাঁচ উট। হাজ্জাজের যুগের এক বৃদ্ধ ব্যক্তির বর্ণনাসূত্রে ইবনে আবী শায়বা বলেছেন, হজরত ওমরের যুগে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির মাথায় পাথর মেরেছিলো। সেই পাথরের আঘাতে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো তার শ্রুতি, স্মৃতি, বাকক্ষমতা এবং পুরুষত্ব। হজরত ওমর তার ক্ষেত্রে চারগুণ দিয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

মাসআলাঃ মহিলাকে হত্যা অথবা জখম করলে দিয়ত হবে অর্ধেক। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা কম। শেষে তিনি অর্ধেক দিয়তের কথাটি মেনে নিয়েছিলেন। মোহাম্মদ বিন হাসানের বর্ণনা থেকে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু হানিফা, হাম্মাদ ও ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, হজরত আলী বলেন, নারীহত্যার ক্ষেত্রে দিয়ত হবে অর্ধেক। জিয়াদ প্রমুখের মাধ্যমে শা'বীর উক্তি হিসেবে সাঈদ বিন মানসুর বলেছেন, হজরত আলী বলেন, রমণীদের জখমের দিয়ত পুরুষদের জখমের দিয়তের অর্ধেক— দিয়ত যে পরিমাণই হোক না কেনো।

বাগবী বলেছেন, হজরত জায়েদ বিন সাবেতের বক্তব্য এই যে, পুরুষ ও রমণীর আঘাতের দিয়ত এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সমান। এর বেশী হলে মহিলার জন্য দিয়ত হবে পুরুষের অর্ধেক। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, দাঁত এবং

www.eelm.weebly.com

হাড় ভেঙে ফেললে পুরুষ ও রমণীর দিয়ত হবে একই রকম। কিন্তু হজরত আলী এ ক্ষেত্রেও মহিলার দিয়ত পুরুষের অর্ধেকের কম নির্ধারণ করেছেন।

ইব্রাহিম থেকে মুগীরার মাধ্যমে হিশামের বর্ণনাসূত্রে সাঈদ বিন মানসুর তাঁর পিতা থেকে বলেছেন, হজরত ওমর বলেন, হাত ও পায়ের আঙ্গুল এক বরাবর। দাঁত ভাঙার ক্ষেত্রে পুরুষ ও রমণীর দিয়ত এক সমান। হাড় ভেঙে গেলেও তাই। এগুলো ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে নারীর দিয়ত পুরুষের দিয়তের অর্ধেক। হজরত জাবের—সুফিয়ান সূত্রে বায়হাকী বলেছেন, শোরাইহ্ বলেন, আমাকে হজরত ওমর এ রকমই লিখে পাঠিয়েছিলেন।

ইসমাঈল বিন আয়াশ— জুরাইজ— আমর বিন শোয়াইব সূত্রে নাসাঈ লিখেছেন, এক তৃতীয়াংশ দিয়ত পর্যন্ত নারী পুরুষ সকলেই সমান। ইমাম মালেক অভিমত গ্রহণ করেছেন হজরত জায়েদ বিন সাবেত, হজরত ওমর এবং হজরত ইবনে মাসউদের। তিনি বলেছেন, এটাই সুন্নত। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আমিও এটিকে সুন্নত মনে করতাম। কিন্তু সিদ্ধান্তটি যে সুন্নত সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ নই। পরে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ইমাম মালেক কর্তৃক এটিকে সুন্নত বলার কারণ এই যে, সুন্নতটি ছিলো মদীনাবাসীদের—এ কথা জানার পর আমি সন্দেহমুক্ত হয়েছি। হজরত আলীর অভিমত সম্পর্কে শা'বী বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু জমহুর এটাকেই গ্রহণ করেছেন। কেননা, রমণীরা পুরুষ অপেক্ষা অপূর্ণ। পুণ্যার্জনের ক্ষেত্রেও তারা পুরুষ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ।

ঐকমত্যসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীর দিয়ত পুরুষের দিয়তের চেয়ে কম। অর্থাৎ অর্ধেক। জখমের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। এক তৃতীয়াংশ বা এর চেয়ে বেশীর সঙ্গে বিষয়টিকে কিয়াসের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

মাসআলাঃ ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, গোলাম ও বাঁদীর দিয়ত হবে তাদের মূল্যানুসারে। ইমাম আজম এবং ইমাম মোহাম্মদও এ রকম বলেন। কিন্তু তার সঙ্গে তারা যে অতিরিক্ত কথাটি বলেন সেটি হচ্ছে—যদি গোলামের মূল্য দশ হাজার দিরহাম অথবা তার চেয়ে বেশী এবং বাঁদীর মূল্য পাঁচ হাজার অথবা তার চেয়ে অধিক হয়, তবে তাদের প্রত্যেকের মূল্য থেকে দশ দিরহাম কম করে দেবে। এভাবে গোলাম জখম হলে তার দিয়ত হবে তার মূল্য অনুপাতে। আর স্বাধীন ব্যক্তি আঘাত পেলে দিতে হবে পূর্ণ দিয়ত। হজরত ওমর এবং হজরত আলীর ফরমান বায়হাকী উদ্ধৃত করেছেন এভাবে—মুক্ত ক্রীতদাসও স্বাধীন ব্যক্তির মতো। অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তি ও মুক্ত ক্রীতদাসের দিয়ত সমান। হাদিসটি বিপর্যস্ত সূত্রসম্পন্ন।

ইবনে শায়বা বক্তব্য পেশ করেছেন হজরত আলীর এবং বিশুদ্ধ সূত্রে শাফেয়ী জুহরীর এই উক্তিটি উপস্থাপন করেছেন যে, আঘাতপ্রাপ্ত গোলামের দিয়ত পরিশোধ করতে হবে তার মূল্যানুসারে— যেমন, আঘাতপ্রাপ্ত স্বাধীন ব্যক্তির দিয়ত পরিশোধ করতে হয় দিয়তের নিয়মানুসারে।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আজমের বক্তব্যের দলিল এই যে, আল্লাহপাক বলেছেন, 'এবং তার উত্তরাধিকারীদেরকে দিয়ত (রক্তপণ) দিতে হবে।' এই নির্দেশের মধ্যে আজাদ ও গোলাম দু'জনেই শামিল। তাই গোলাম হত্যা করলে কাফফারা ওয়াজিব হয়। অতএব, ক্রীতদাসকে ভুলক্রমে হত্যা করলে কিসাসের পরিবর্তে দিয়ত পরিশোধ করা জরুরী হয়। তাই ক্রীতদাসের দিয়ত কখনো আজাদের দিয়তের সমান অথবা বেশী হয় না। কেননা, ক্রীতদাসের মানবত্ব অপূর্ণ। একদিক থেকে লক্ষ্য করলে তারা সামগ্রীতুল্য। অন্য দিক থেকে লক্ষ্য করলে তারা মানুষ। লক্ষ্যণীয় যে, স্বাধীনা রমণীর দিয়তও স্বাধীন পুরুষের চেয়ে কম। কিন্তু কেউ যদি বিশ হাজার দিনার মূল্যের কোনো ক্রীতদাসকে লুণ্ঠনের মাধ্যমে অধিকার করে বসে এবং ওই লুণ্ঠনকারীর অধিকারে থাকাবস্থায় যদি সে মারা যায় তবে তার পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে, লুণ্ঠনের জরিমানা দিতে হবে মালের দ্বারা (জানের দ্বারা নয়)।

মাসআলাঃ গোলাম যদি কাউকে ভুলক্রমে হত্যা অথবা জখম করে, তবে তার মনিবের নিকট বলতে হবে— সে যেনো তার গোলামের অপরাধের বিনিময় নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদেরকে জরিমানা হিসেবে দিয়ে দেয়। গোলামের অপরাধ স্খলনের দায়িত্ব তারই। কিন্তু যদি সে জরিমানা দিতে অসম্মত হয়, তবে জরিমানা আদায়ের জন্য বন্দী করতে হবে গোলামকে অথবা তার মনিবকে। শাফেয়ী বলেছেন, গোলামের জরিমানা দিতে হবে গোলামকেই। তবে তার মনিব যদি জরিমানা পরিশোধ করে, তবে তা উত্তম। গোলাম মুক্ত করার পর দিয়ত পরিশোধ করার জন্য কাকে বন্দী করতে হবে সে সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী বলেন, গোলামকে বন্দী করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গোলামের অপরাধ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর যদি মনিব সেই গোলামকে আজাদ করে দেয়, তবুও মনিবকেই বিনিময় পরিশোধ করতে হবে। আর যদি গোলামের অপরাধ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পূর্বেই তাকে মুক্তি দেয়, তবে মনিবের উপর জরিমানা অপরিহার্য হবে অথবা দিতে হবে ক্রীতদাসের মূল্য। এ দুটোর মধ্যে যেটি কম সেটিই পরিশোধ করতে হবে মনিবকে।

রক্তপণ বা দিয়ত দিতে হবে নিহত ব্যক্তির পরিজনবর্গ বা উত্তরাধিকারীদেরকে। উত্তরাধিকারীরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের মতো রক্তপণলব্ধ সম্পদও ব্যয় করবে। প্রথমে ব্যয় করবে তার কাফন দাফনের জন্য। তারপর পরিশোধ করবে তার ঋণ। এরপর যা থাকে, তার এক তৃতীয়াংশ থেকে পূর্ণ করবে অসিয়ত (স্মর্তব্য যে, অসিয়ত এক তৃতীয়াংশের কম হলে তাই পূর্ণ করতে হবে। এক তৃতীয়াংশের বেশী হলে উত্তরাধিকারীরা ইচ্ছা করলে তাও পূর্ণ করতে পারে)। এরপর বাকি অংশ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

নিহত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে হত্যাকারীকে সদকা করে দেয়— অর্থাৎ মাফ করে দেয়, তবে হত্যাকারীকে আর রক্তপণ দিতে হবে না। তার উত্তরাধিকারীরা যদি মাফ করে দেয়, তবুও রক্তপণ দিতে হবে না। এই মাফ করে দেয়ার কথা আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে—'ইল্লা আইয়াস্‌সাদ্দাকূ (যদি না তারা সদকা

www.eelm.weebly.com

করে)।' এখানে সদকা করার অর্থ ক্ষমা করা। এ রকম শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য এই যে, এতে করে যেনো ক্ষমা করে দেয়ার উৎসাহ জাগ্রত হয় এবং ক্ষমার ফযীলত প্রকাশ পায়। কারণ, ক্ষমা এক প্রকার সদকা (দান)। কাজেই ক্ষমা করে দেয়াই উত্তম। রসুল স. এরশাদ করেন, সদকার মধ্যেই সকল কল্যাণ। হজরত জাবের থেকে বোখারী এবং হজরত হোজায়ফা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন— যে ব্যক্তি সদকাকে মালের ময়লা মনে করে এবং সদকা গ্রহণ করতে রাজী হয় না, সেই ব্যক্তিকে দান করার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

নিহত ব্যক্তি যদি শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং ইমানদার হয় তবে একটি ইমানদার ক্রীতদাস মুক্ত করে দিতে হবে, রক্তপণ দিতে হবে না। এখানে শত্রুপক্ষের অর্থ কাফের শাসিত রাজ্যের মুসলমান অধিবাসী । যেমন, কোনো মুসলমান যদি মুসলমান শাসিত রাজ্যে হিজরত না করে কাফেরদের রাজ্যে থেকে যায়, অথবা হিজরত করলেও পুনরায় কাফেরের রাজ্যে ফিরে যায় এবং ইসলাম ত্যাগ না করে সেখানেই বসবাস করতে থাকে—এ রকম মুসলমানকে যদি কোনো মুসলমান ভুলবশতঃ হত্যা করে ফেলে তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। দিয়ত ওয়াজিব হবে না। কারণ, দিয়তের হুকুম মুসলমান শাসিত রাজ্যের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য। মুসলিম রাষ্ট্রে দিয়তকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে এজন্যই যে, নিহত ব্যক্তিকে নিরাপত্তা প্রদান করা তাদের অপরিহার্য দায়িত্বভূত, যা তারা প্রতিপালন করেনি। কিন্তু শত্রুরাষ্ট্রে (দারুল হরবে) এ রকম নিরাপত্তা লাভের তো প্রশ্নই ওঠে না।

হজরত জারীর বিন আবদুল্লাহিল বাজালী থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন— রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, যারা মুশরিকদের সাথে (রাজ্যে) বসবাস করে, আমরা তাদের দায় থেকে মুক্ত।

নিহত ব্যক্তি যদি মুসলমান হয় এবং মুসলমান শাসিত অঞ্চলে বসবাস করে অথচ তার বংশধরেরা যদি কাফের হয় এবং কাফের রাজ্যে বসবাস করে—যাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধবিগ্রহ চলতে থাকে (হজরত হারেস বিন জায়েদের অবস্থা ছিলো এ রকম) — এমতাবস্থায় উক্ত মুসলমানের কাফের বংশধরকে হত্যা করলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মুক্ত করে দিতে হবে একজন মুসলমান ক্রীতদাসকে। দিয়ত ওয়াজিব হবে না। কেননা, ওই কাফের সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলমানদের সন্ধি ছিলো না। আরেকটি কারণ এই যে, মুসলমান ও অমুসলমান পরস্পরবিরোধী বিশ্বাসধারী বলে এক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের বিধানও বলবৎ করা যাবে না।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে আবী শায়বা, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম, তিবরানী এবং বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত ও হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত বর্ণনায় রয়েছে— হজরত ইবনে আব্বাস এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, কোনো কোনো লোক মুসলমান হয়ে যেতো। তারপর ফিরে গিয়ে বসবাস করতো নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনের সঙ্গে। ওই সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হলে

www.eelm.weebly.com

অজ্ঞতাবশতঃ তাদের কেউ কেউ নিহত হতো। এ রকম হত্যার জন্য একজন মুসলমান গোলামকে মুক্ত করে দিতে হতো— এটাই ছিলো তাদের জন্য কাফফারা। আর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ সম্প্রদায়ের কেউ নিহত হলে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে পরিশোধ করতে হতো দিয়ত এবং মুক্ত করে দিতে হতো একজন মুসলমান গোলাম।

নিহত ব্যক্তি যদি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোনো সম্প্রদায়ের হয় তবে দিয়ত ওয়াজিব। এক্ষেত্রে দিয়ত প্রদান করার দু'টি প্রকার রয়েছে। একটি হচ্ছে—নিহত ব্যক্তি জিম্মি (মুসলিমশাসিত দেশে বসবাসকারী কাফের) অথবা এমন কাফের যাদের সঙ্গে অঙ্গীকার (সন্ধি) করা হয়েছে। আরেকটি হচ্ছে—নিহত ব্যক্তি মুসলমান এবং তার উত্তরাধিকারীরাও মুসলমান। এই দু'টি ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র দিয়ত দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই দু'টি প্রকারের আওতায় না পড়লে দিয়ত জমা করে দিতে হবে বায়তুল মালে।

মাদারেক রচয়িতা লিখেছেন, এই আয়াতটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, জিম্মির দিয়ত মুসলমানদের দিয়তের মতোই। আমি বলি, তার প্রমাণ এ আয়াতে নেই। এখানে বলা হয়েছে কেবল দিয়তের কথা। আর বিশুদ্ধ হাদিসের মাধ্যমে এসেছে দিয়তের বিভিন্ন রূপ। পুরুষ, নারী এবং আজাদ ও গোলামের দিয়ত সম্পর্কে যে সকল মতবিরোধ রয়েছে, সেগুলোকে আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং এ রকম হওয়া সম্ভব যে, মুসলমান ও কাফেরের দিয়তের প্রসঙ্গটিও মতানৈক্যমণ্ডিত।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফার অভিমতানুসারে মুসলমান এবং কাফেরের দিয়ত একই রকম। ইমাম মালেকের মতে সকল প্রকার কাফেরের দিয়ত মুসলমানের অর্ধেক অর্থাৎ ছয় হাজার দিরহাম। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ইহুদী ও নাসারাদের দিয়ত চার হাজার দিরহাম। আর অগ্নিপূজক ও মূর্তিপূজকদের দিয়ত আটশত দিরহাম। ইমাম আহমদ বলেছেন, ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে মুসলমান ও কাফের— উভয়ের বেলায় দিয়ত দিতে হবে সমপরিমাণ। আর ভুলক্রমে সংঘটিত হত্যার ক্ষেত্রে অগ্নিপূজক ও মূর্তিপূজকদের দিয়ত আটশত দিরহাম। ইহুদী ও নাসারাদের ক্ষেত্রে তাঁর দু'টি অভিমতের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি ইমাম মালেকের, অন্যটি ইমাম শাফেয়ীর অনুরূপ। ইমাম মালেক ওই হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন যার বর্ণনাকারী আমর বিন শোয়াইব এবং তাঁর পিতা। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে দু'ভাবে। একটিতে রয়েছে—রসুল স. বলেন, কাফেরের দিয়ত মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক। দ্বিতীয়টিতে রয়েছে— রসুল স. বলেন, ইহুদী ও নাসারাদের দিয়ত মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক।

ইমাম শাফেয়ী ইহুদী ও নাসারাদের দিয়ত সম্পর্কে বলেছেন, এই হাদিসটির উপর ভিত্তি করে আমর বিন শোয়াইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর যুগে দিয়তের পরিমাণ ছিলো একশত দিনার অথবা আট হাজার দিরহাম। আর ইহুদী ও নাসারাদের দিয়ত ছিলো এর অর্ধেক। হজরত ওমরের খেলাফতের পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়মই বলবৎ ছিলো। তিনি খলিফা

www.eelm.weebly.com

হওয়ার পর এক ভাষণে বললেন, উট মহার্ঘ হয়েছে। এরপর তিনি নগদ দিয়তের পরিমাণ নির্ধারণ করলেন এক হাজার দিনার তোলাই অথবা বারো হাজার দিরহাম। গো-পালকদের জন্য নির্ধারণ করলেন দুইশত গাভী এবং বকরীওয়ালাদের জন্য দুই হাজার বকরী। আর বস্ত্রব্যবসায়ীদের জন্য দুইশত জোড়া কাপড়। কিন্তু তিনি জিম্মিদের দিয়ত বৃদ্ধি করেননি। আবু দাউদ। ইমাম শাফেয়ী ফুজাইল বিন আয়াজের নিয়মে সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন এভাবে—হজরত ওমর ইহুদী ও নাসারাদের দিয়ত চার হাজার দিরহাম এবং অগ্নিপূজকদের দিয়ত আটশত দিরহাম নির্ধারণ করেছেন। স্বসূত্রে দারাকুতনীও সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব থেকে এ রকম বলেছেন।

ইমাম শাফেয়ীর নিয়মে বায়হাকী যে বর্ণনা করেছেন তার দ্বারা বুঝা যায় যে, সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব বলেছেন, সন্ধিচুক্তির দিয়তের কথা। হজরত ওসমান সন্ধিবদ্ধদের জন্য দিয়ত নির্ধারণ করেছেন চার হাজার দিরহাম। বায়হাকী এবং দারা কুতনী হজরত ওমরের এই সিদ্ধান্তটি উদ্ধৃত করেছেন যে, অগ্নিপূজারিণীর দিয়ত চারশত দিরহাম। হজরত উকবা বিন আমের থেকে ইবনে হাজম লিখেছেন—রসুল স. বলেন, অগ্নিপূজকদের দিয়ত আটশত দিরহাম। শিথিল সূত্রের এই হাদিসটির বর্ণনাকারী তাহাবী, ইবনে আদী এবং বায়হাকী। বর্ণনাকারী ইবনে লাহবিয়ার কারণেই হাদিসটি শিথিল পদবাচ্য হয়েছে। হজরত উকবা বিন আমের বলেছেন, হজরত ওসমানের খেলাফতের সময় এক ব্যক্তি একটি শিকারী কুকুরকে হত্যা করেছিলো, যার মূল্য ছিলো আটশত দিরহাম। নজীরবিহীন এই ঘটনায় হজরত ওসমান আটশত দিরহামই পরিশোধ করতে হত্যাকারীকে বাধ্য করেছিলেন। এভাবে অগ্নিপূজকের মূল্য হয়ে গিয়েছে কুকুরের মূল্যের সমান।

জুহরীর বর্ণনা থেকে বায়হাকী লিখেছেন— হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদও অগ্নিপূজকের দিয়ত আটশত দিরহাম বলেছেন। হজরত ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, জিম্মির দিয়ত মুসলমানের দিয়তের সমান। 'আওসাত' পুস্তকে এই হাদিসটি বিবৃত করেছেন তিবরানী। হেদায়ার বর্ণনাটি এ রকম—সন্ধিবদ্ধদের প্রত্যেকের দিয়ত এক হাজার দিনার। হেদায়া প্রণেতা লিখেছেন—হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের সিদ্ধান্তও এ রকম। আমি বলি, তিবরানী বর্ণিত হাদিস দারা কুতনীও উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তিনি এ কথাও বলেছেন যে, (হজরত ইবনে ওমরের ছাত্র) নাফে থেকে আবু বকর কোরায়শী নাহদি এবং আবদুল্লাহ্ বিন মালেক ব্যতীত অন্য কেউ হাদিস বর্ণনা করেননি। আর নাহদি ছিলো পরিত্যক্ত। দারা কুতনী বলেছেন, বর্ণনাটি বাতিল এবং ভিত্তিহীন। ইবনে হাব্বানও এ রকম বলেছেন।

হজরত উসামা বিন জায়েদ থেকে দারা কুতনী বলেছেন, রসুল স. সন্ধিবদ্ধদের দিয়ত নির্ধারণ করেছিলেন মুসলমানদের দিয়তের সমপরিমাণ। দারা কুতনী বলেছেন, এই সনদের ওসমান বিন আবদুর রহমান ওক্কাসী পরিত্যক্ত। হজরত

www.eelm.weebly.com

ইবনে আব্বাস থেকে দারা কুতনী লিখেছেন—রসুল স. বনী আমের গোত্রের দুই ব্যক্তির দিয়ত করে দিয়েছিলেন মুসলমানদের দিয়তের সমপরিমাণ। এই হাদিসের এক বর্ণনাকারী আবু বকর আইয়াজ বলেছেন, ওই ব্যক্তিদ্বয় ছিলো সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। দারা কুতনী বলেছেন, এই সনদের এক বর্ণনাকারী আবু সাঈদ বিন মারজুবান ছিলো বাচাল। ইয়াহ্‌ইয়া বলেছেন, সে কিছুই ছিলো না। কালাস বলেছেন, পরিত্যক্ত। এবার আসা যাক হজরত ওমরের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে। আবদুর রাজ্জাক — রেবা—ওবায়দুল্লাহ্—হামিদ—হজরত আনাস থেকে এসেছে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক ব্যক্তির দ্বারা জনৈক ইহুদী নিহত হয়েছিলো। হজরত ওমর তার দিয়ত নির্ধারণ করেছিলেন বারো হাজার দিরহাম। এই সূত্রপরম্পরার বর্ণনাকারী রেবা জঈফ।

আবু জাফর বিন আবদুল্লাহ্ বিন হাকিমের বর্ণনাসূত্রে তাহাবী ও হাকেম লিখেছেন, রেফায়া বিন শামুয়েল ইহুদী নিহত হয়েছিলো শামদেশে। হজরত ওমর তার দিয়ত নির্ধারণ করেছিলেন এক হাজার দিনার। ইমাম আবু হানিফার এই দলিলটিকে ইমাম আহমদও দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। অন্যান্যদের উপস্থাপিত ইচ্ছাকৃত হত্যা সম্পর্কিত হাদিসকে এখানে ধারণা করা হয়েছে ভুলক্রমে হত্যার দলিল হিসেবে।

'এবং এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়'—এ কথার অর্থ ঋণ পরিশোধের পর হত্যাকারীর নিকট যদি ক্রীতদাস ক্রয় করার মতো অর্থ থাকে তবে সে একটি ক্রীতদাস ক্রয় করে মুক্ত করে দেবে।

'এবং যে সঙ্গতিহীন সে একটানা দুই মাস রোজা রাখবে'— এ কথার অর্থ যার ক্রীতদাস ক্রয়ের ক্ষমতা নেই তার জন্য ওয়াজিব হবে একাধারে দুই মাস রোজা রাখা। কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়া যদি তার এই রোজা দুই মাসের চেয়ে একদিন কম হয় অথবা ভুলে রোজার নিয়ত না করে কিংবা অন্য কোনো রোজার নিয়ত করে নেয়, তবে তাকে আবার নতুন করে দুই মাস লাগাতার রোজা রাখতে হবে। এটা ঐকমত্য। মহিলাদের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের কারণে যদি রোজা রাখার বিরাম দিতে হয়, তবে শুরু থেকে আবার তাকে রোজা রাখতে হবে না। এটাও ঐকমত্য। আর যদি অসুস্থতা কিংবা সফরের কারণে রোজা ভঙ্গ হয়, তবে জমহুরের মতে শুরু থেকে রোজা রাখতে হবে। কিন্তু এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর মত হচ্ছে, প্রথম থেকে আবার রোজা রাখা জরুরী নয়। ইবনে আবী হাতেমের মাধ্যমে মুজাহিদের অভিমতও এ রকম বলা হয়েছে। রোজা রাখতে অসমর্থ হলে অন্য কাউকে আহার করানো যথেষ্ট নয়। ইমাম আজম এবং ইমাম মালেক এ রকম বলেছেন। বিশুদ্ধ সূত্রে প্রাপ্ত ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এ রকম। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর অন্য সূত্রে বর্ণিত অভিমত এবং ইমাম আহমদের সিদ্ধান্ত এই যে, জেহারের মতো এক্ষেত্রেও অন্য কাউকে আহার করালেই যথেষ্ট হবে (স্ত্রীর কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করাকে বলে জেহার)। মুজাহিদের অভিমতও এ রকম—বলেছেন ইবনে আবী হাতেম। আমরা বলি, অকারণে

www.eelm.weebly.com

বিষয়টি জেহারের সঙ্গে তুলনা করা সঙ্গত নয়। কারণ, আয়াতে বর্ণিত হুকুমটি ওয়াজিব। আর নসের বিপরীতে সমষ্টিভূত কারণ ছাড়া কিয়াস গ্রহণীয় নয়।

'তওবার জন্য ইহা আল্লাহ্র ব্যবস্থা' —এখানে 'তাওবাতান' হুকুমটি দেয়া হয়েছে এ জন্য যে, তওবার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে আল্লাহ্পাকের মেহেরবানী। তাই বিধানানুসারে এমন একনিষ্ঠ রোজা পালন করতে হবে যাতে তওবা গৃহীত হয়—এটাই আল্লাহ্পাকের ব্যবস্থা।

'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'—আল্লাহ্পাক জানেন হত্যাকারীর প্রকৃত অবস্থা। আর তার জন্য যে কল্যাণ নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে, সে সম্পর্কেও তিনি সবিশেষ অবহিত। বাগবী লিখেছেন, মুকাইয়েস বিন দুবাবা কান্দী এবং তার ভাই হিশাম মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন মুকাইয়েস বনী নাজ্জার গোত্রের নিকট হিশামের লাশ দেখতে পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রসুল স. এর শরণাপন্ন হলেন। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে ফেহরী নামক এক ব্যক্তির মাধ্যমে বনী নাজ্জারকে বলে পাঠালেন, তোমরা হিশামের হত্যাকারীকে চিনতে পারলে মুকাইয়েসের কাছে সমর্পণ করো, যেনো সে তার ভাইয়ের কিসাস গ্রহণ করতে পারে। আর হত্যাকারীকে না চিনতে পারলে হিশামের দিয়ত আদায় করো। ফেহরী রসুল স. এর নির্দেশনামা যথারীতি পৌঁছে দিলেন। বনী নাজ্জার উত্তরে জানালো, আল্লাহ্র রসুলের নির্দেশানুসারে আমরা বলছি, হিশামের হত্যাকারীকে আমরা চিনি না। তবে আমরা দিয়ত আদায় করতে প্রস্তুত। এই বলে তারা মুকাইয়েসকে একশত উট দিয়ে দিলো। মুকাইয়েস এবং ফেহরী একশত উট নিয়ে ফিরে চললো। পথিমধ্যে মুকাইয়েস পড়ে গেলো শয়তানের খপ্পরে। সে মনে করলো, এভাবে দিয়ত গ্রহণ করা তো বড়ই অপমানের কথা। বরং ফেহরীকে হত্যা করে ভ্রাতৃহত্যার কিসাস গ্রহণ করাই উত্তম। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত হিসেবে একশত উট তো রইলোই। এ রকম শয়তানী চিন্তা মাথায় নিয়ে সে অপ্রস্তুত ফেহরীর মাথায় সাজোরে একটি পাথর ছুঁড়ে মারলো। এভাবে ফেহরীকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে সে পালিয়ে গেলো মক্কায়। হয়ে গেলো ধর্মত্যাগী। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৯৩

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ○

❑ কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করিলে তাহার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হইবে এবং আল্লাহ্ তাহার প্রতি রুষ্ট হইবেন, তাহাকে অভিসম্পাত করিবেন, এবং তাহার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখিবেন।

www.eelm.weebly.com

ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; কারণ, সে জেনে শুনে একজন ইমানদারকে হত্যা করেছে অথবা তার হত্যাকে হালাল মনে করেছে। যেমন, মুকাইয়েস হত্যা করেছিলো ফেহরীকে।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ভারী পাথর দ্বারা হত্যা করলে ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো হত্যা হবে। বাগবী বলেছেন, ফেহরীকেও পাথর দ্বারা হত্যা করা হয়েছিলো এবং সেটি ছিলো ইচ্ছাকৃত হত্যা। এই আয়াত নাজিল হয়েছে সে কারণেই। তাই ইমাম আবু হানিফার অভিমতটি ভুল (কারণ, তিনি পাথর দ্বারা হত্যাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ হত্যা বলেছেন)। জুরজানীর বর্ণনানুসারে এর উত্তরে বলা হয়েছে, ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো হত্যাও ইচ্ছাকৃত হত্যার সমতুল্য। তাই এই হত্যার ক্ষেত্রেও কাফফারা নেই। পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস হয়ে থাকে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব নয়। এই আয়াতে তাই এ ব্যাপারে জাহান্নামের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ বাগবী লিখেছেন, মুকাইয়েস এমন পাপিষ্ঠ যে, রসুল স. তাকে মক্কাবিজয়ের দিনে ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার অন্তর্ভূত করেননি। তাকে সেদিন হত্যা করা হয়েছিলো। কেননা, সে প্রতারণার মাধ্যমে ফেহরীকে হত্যা করেছিলো এবং হয়ে গিয়েছিলো মুরতাদ।

ইবনে জারীহ্ এর মাধ্যমে ইবনে জারীর হজরত ইকরামার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এভাবে—এক আনসারী মুকাইয়েসের ভাইকে হত্যা করেছিলো। রসুল স. তাকে তার ভাইয়ের দিয়ত দিয়েছিলেন। সেই দিয়ত সে গ্রহণও করেছিলো। এর কিছুদিন পর সে ভাইয়ের হত্যাকারীকে আক্রমণ করলো এবং তাকে হত্যা করে ফেললো। রসুল স. তখন ঘোষণা দিলেন, আমি তাকে আশ্রয় দেবো না। হেরেমের অভ্যন্তরেও না এবং হেরেমের বাইরেও না (যেখানে পাও, তাকে হত্যা করে ফেলো)। শেষে মক্কাবিজয়ের দিন তাকে হত্যা করা হয়েছিলো।

ইবনে জারীহ্ বলেছেন, তার সম্পর্কেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণনাটি প্রকাশ্যতঃ মুরসাল। কিন্তু আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে—হজরত ইকরামা বলেন, আমি এই বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে (আমি তার নাম উচ্চারণ করি অথবা না করি)। এমতাবস্থায় বর্ণনাটি মুত্তাসিল। বর্ণনাটির উদ্দেশ্য এই যে, মুকাইয়েসের ভাই হিশামের হত্যাকারী কে তা জানা ছিলো না এবং হত্যাকাণ্ডটিও ইচ্ছাকৃত ছিলো না। হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিলো ভুলবশতঃ। তাই রসুল স. দিয়তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাগবীর বর্ণনা থেকে এ কথাও জানা যায় যে, হত্যাকারীকে সনাক্ত করা না গেলে তার উত্তরাধিকারীরা দিয়ত পরিশোধ করবে। এই মাসআলাটি বিস্তারিতভাবে ইতোপূর্বে যথাস্থানে বর্ণনা করা হয়েছে।

কোনো বিশ্বাসীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী জাহান্নামী। কেননা, সে ইমান বা বিশ্বাসকে ঘৃণা করে অথবা হত্যাকাণ্ডকে বৈধ মনে করে। তাই সে কাফের (অবিশ্বাসী)। আর অবিশ্বাসের শাস্তি হচ্ছে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। এমনও বলা যেতে পারে যে, তার জাহান্নামে প্রবেশ করাকে বুঝাতে যে 'খুলুদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে সুদীর্ঘ সময় জাহান্নামে অবস্থান করবে। শিথিল সূত্রপরম্পরায় হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—রসুল

www.eelm.weebly.com

স. এই আয়াত পাঠের পর বলেছেন, আল্লাহ্ যদি তাদেরকে শাস্তি দেন (তবে তাদের শাস্তি হবে সার্বক্ষণিক জাহান্নাম)।

'সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন'— এ প্রসঙ্গে বোখারী ও মুসলিম হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করেছেন এ রকম— ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করলে তার তওবা কবুল হবে না। বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে—হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো বিশ্বাসীর হন্তারকদের জন্য কোনো তওবা নেই। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'এবং যারা আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন তাকে শরিয়তসম্মত কারণ ব্যতীত হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যে ব্যক্তি এমন করবে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে লাঞ্ছিত হতে থাকবে অনন্তকাল, কিন্তু যারা তওবা করে'—এই আয়াত উল্লেখ করে হজরত ইবনে আব্বাসকে বলা হলো, এখানে যে হত্যাকারীর তওবা কবুল করার কথা বলা হয়েছে? হজরত ইবনে আব্বাস তখন বললেন, এই আয়াতের প্রেক্ষাপটটি ছিলো মূর্খতার যুগের। তখন কতিপয় মুশরিক ছিলো হত্যা ও ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী। তারা রসুল স. সকাশে নিবেদন করলো, আপনার আহবান উত্তম। তবে আপনি কি এ কথার নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, আমাদের ইতোপূর্বের পাপ কর্মগুলোর ক্ষতিপূরণ হওয়া সম্ভব? তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াতটি। আর আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য মুসলমানেরা। তারা ইসলামকে মেনেছে। ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করেছে। এর পরেও যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করে—তবে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম এবং তার তওবা কবুল হবে না।

হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যাবিরোধী। তিনি বলেছেন, বিশ্বাসী ব্যক্তি কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করলে জাহান্নামই হবে তার স্থায়ী আবাস, যদি আল্লাহ্পাক এ রকম ইচ্ছা করেন। কিন্তু আল্লাহ্পাক তো এ রকম ইচ্ছাই করেন। কিন্তু আল্লাহ্পাক অবশেষে অনুগ্রহ করবেন এবং তাঁরা ইমানদার হওয়ার কারণে চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবেন। সাঈদ বিন মানসুর এবং বায়হাকী সুনান গ্রন্থে লিখেছেন, এক ব্যক্তি হজরত ইবনে আব্বাসের কাছে নিবেদন করলেন, আমি আমার হাউজ পানি দ্বারা পূর্ণ করে আমার পশুপালের অপেক্ষা করছিলাম। ইত্যবসরে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ জেগে উঠে দেখলাম, এক ব্যক্তি দ্রুতগতিতে তার উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে আমার হাউজের কিনারা বন্ধ করে দিয়েছে। সে কারণে পানি উপচে পড়ছে। আমি তখন বাহ্য জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম এবং তরবারীর আঘাতে তাকে হত্যা করলাম। এখন আমার জন্য কী হুকুম? হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, তওবা করতে হবে।

সাঈদ বিন মানসুর বলেছেন, সুফিয়ান বিন উয়াইনা বর্ণনা করেছেন, আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, যে ইমানদার অন্য ইমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার তওবার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু কেউ যখন এ রকম করেই ফেলে, তখন তাঁরা বলেন, তুমি তওবা করো। হজরত ইবনে

www.eelm.weebly.com

আব্বাস এবং আলেমদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্পর্কে আমি বলি, ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধ দ্বিগুণ। একটি হচ্ছে বান্দার রক্তের অবমাননা এবং অন্যটি হচ্ছে আল্লাহ্র অধিকারের অপমান। আলেমগণ যখন বলেন, যেহেতু হত্যাকারীর জন্য তওবা নেই, তখন তার উদ্দেশ্য হবে এই যে, এক্ষেত্রে কিসাস গ্রহণ করা জরুরী হবে। বান্দার হক যদি নিজে অথবা তার উত্তরাধিকারীরা ক্ষমা না করে, তবে তাকে সে হক অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। হয় পৃথিবীতে। না হয় আখেরাতে। নস এর মাধ্যমে এই ব্যাখ্যা এ রকম করা হয়েছে—রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করলে যে কোনো পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন— ওই ব্যক্তির পাপ ব্যতীত যে শিরিকলিপ্তাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে অথবা কোনো বিশ্বাসীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে। হজরত আবু দারদা থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ। নাসাঈ এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন হজরত মুয়াবিয়া থেকে। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। হাদিসটির উদ্দেশ্য এই যে, এক্ষেত্রে কিসাস অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং হত্যাকারী মু'মিনের তওবা কবুল হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তার হক ক্ষমা করে দিবেন এবং হত্যাকারীকে আখেরাতে শাস্তি দিবেন না।

হজরত জায়েদ বিন সাবেত বলেছেন, যখন 'তওবা করলে এবং ইমান গ্রহণ করলে এই অপরাধ ক্ষমা হয়ে যাবে'—এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন আমরা এ রকম সহজ নির্দেশ অবলোকন করে বিস্মিত হয়ে গেলাম। এ রকম অবস্থায় অতিবাহিত হলো সাতটি মাস। এরপর সুরা নিসার এই কঠোর আয়াতটি অবতীর্ণ হলো এবং রহিত হয়ে গেলো পূর্বের সহজ আয়াতটি।

আলোচ্য আয়াত দৃষ্টে এ কথাই অনুমিত হয় যে, হত্যাকারীর তওবা গ্রহণীয় হবে না। এই আয়াতে ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তির বিবরণ দেয়া হয়েছে। তবে এই শাস্তি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন হন্তারক তওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করবে। তওবা করলে ক্ষমা তো হয়েই যায়—অর্থাৎ আল্লাহ্পাক তাঁর নিজের হক ক্ষমা করে দেন। বাকী থাকে কেবল বান্দার হক—যার জন্য হকদারকে প্রসন্ন করা অথবা শাস্তি ভোগ করা জরুরী।

এই আয়াত থেকে মোতাজিলা সম্প্রদায় এই অর্থ গ্রহণ করেছে যে, কবীরা গোনাহ্কারীরা চিরকাল দোজখে থাকবে। খারেজীরাও কবীরা গোনাহ্কারীকে কাফের বলেছে। আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত যে অর্থ গ্রহণ করেছেন, তা আমরা এতোক্ষণ ধরে আলোচনা করেছি। এ সম্পর্কে উম্মতের ঐকমত্য এই যে, তওবা ব্যতীত মৃত্যুমুখে পতিত হলেও যারা বিশ্বাসী তারা চিরদিন দোজখে থাকবে না। কারণ, কবীরা গোনাহ্ ইমানকে বিনষ্ট করতে পারে না। এই ঐকমত্য, কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত এবং সর্বজনবিদিত হাদিস দ্বারা সুসাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ পুণ্যকর্ম করবে সে তা দেখতে পাবে।' বিশ্বাস এবং কর্ম দু'টি পৃথক বস্তু। অতএব কর্মগত ত্রুটির কারণে শাস্তি অবধারিত হলেও সঠিক বিশ্বাসের বিনিময় পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। এই আয়াতের তাফসীর আমরা যথাস্থানে করেছি। আল্লাহ্পাক আরো এরশাদ করেন, 'হে বিশ্বাসীরা! তোমাদের জন্য কিসাস ফরজ করা হয়েছে নিহত ব্যক্তিদের ব্যাপারে।'

www.eelm.weebly.com

মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত এবং কিসাসের নির্দেশ দেয়া হয়েছে মুসলমানদেরকে হত্যার কারণেই। হাদিস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ব্যভিচারী অথবা অপহারক হলেও। বোখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত এই হাদিসের বর্ণনাকারী হজরত আবু জর। অন্য এক হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি শিরিকলিপ্ত না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে বেহেশতে যাবে। মুসলিম এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের থেকে। রসুল স. বলেন, আমার নিকট তোমরা এই শর্তে শপথ করো যে, তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্যকে শরীক করবে না, অপহরণ করবে না, ব্যভিচার করবে না, সন্তান হত্যা করবে না, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং পুণ্যকর্মে অবাধ্য হবে না—এ সকল অঙ্গীকার যে পূর্ণ করবে, আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আর যে এ সকল অপরাধের যে কোনো একটিতে লিপ্ত হবে এবং তার জন্য এই পৃথিবীতে শাস্তি পাবে, ওই শাস্তি হবে তার অপরাধের ক্ষতিপূরণ। আর পৃথিবীতে যদি ওই পাপের শাস্তি না হয়, তবে বিষয়টি হবে আল্লাহ্পাকের ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে মার্জনা করবেন অথবা শাস্তি দিবেন। বর্ণনাকারী বলেছেন, আমরা এ সব কথার উপর রসুল স. এর পবিত্র হস্তে বায়াত গ্রহণ করলাম। বোখারী, মুসলিম। হজরত উবাদা বিন সামেত হাদিসটির বর্ণনাকারী।

দ্রষ্টব্যঃ ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীদের সম্বন্ধে বর্ণিত হাদিসসমূহ হচ্ছে— ১. হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন—রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম রক্তপাতের মীমাংসা করা হবে। বোখারী, মুসলিম। ২. হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—এক ব্যক্তি নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? রসুল স. বললেন, আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, অথচ তিনিই তোমার একক স্রষ্টা। ওই ব্যক্তি পুনরায় প্রশ্ন করলো, তারপর কোনটি? তিনি স. বললেন, তোমার সন্তান তোমার অন্নে অংশগ্রহণ করবে—এই আশংকায় তাকে যদি তুমি হত্যা করো। বোখারী, মুসলিম। ৩. হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন—নবীপাক স. বলেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে দূরে থাকবে। তিনি স. অন্যায়ভাবে হত্যা করাকেও ওই সাতটি বিধ্বংসী বস্তুর অন্তর্গত করেছেন। বোখারী, মুসলিম। ৪. মারফু পদ্ধতিতে হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, মু'মিন যখন হত্যা করে তখন তার মধ্যে ইমান থাকে না। বোখারী। ৫. হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—রসুলপাক স. বলেছেন, আল্লাহ্পাকের নিকট একজন মুসলমানের হত্যার তুলনায় সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বের। তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত বারা বিন আজিব থেকে। ৬. হজরত বুরায়দা থেকে নাসাঈ বর্ণনা করেছেন—আল্লাহ্র নিকট বিশ্বাসীকে হত্যা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার চেয়েও গুরুতর। ৭. হজরত আবু সাঈদ এবং হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন—রসুল স. বলেন, যদি আকাশ ও পৃথিবীর সকল অধিবাসী কোনো মু'মিনের হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্পাক তাদের সবাইকে উপুড় করে দোজখে নিক্ষেপ করবেন।

www.eelm.weebly.com

তিরমিজি। ৮. হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বর্ণনা করেন—আমি দেখলাম রসুল স. কাবা শরীফ তাওয়াফ করছেন এবং বলছেন, হে কাবা! তুমি কতো পবিত্র। তোমার সুবাস কতো মনোমুগ্ধকর। তুমি উচ্চমর্যাদাশালী। মহাসম্মানিত! কিন্তু আমার জীবনাধিকারী ওই পবিত্র সত্তার শপথ। বিশ্বাসীর জীবন ও সম্পদ তোমাপেক্ষা অধিক সম্মানীয়। ইবনে মাজা। ৯. হজরত আবু দারদা বলেছেন— রসুল স. এরশাদ করেন, বিশ্বাসীরা ততোক্ষণ পর্যন্ত দোজখমুক্ত ও পুণ্যবান, যতোক্ষণ না তারা নিষিদ্ধ হত্যার অপরাধে অপরাধী হয়। হারাম হত্যার অপরাধে অপরাধীরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আবু দাউদ। ১০. হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন— যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে অর্ধেক কথা বলেও সহায়তা করবে, সে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হলে দেখা যাবে তার দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে লেখা রয়েছে, 'আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত'। ইবনে মাজা। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন তিবরানী এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইবনে জাওজী। আবু নাঈম তাঁর হুলিয়া পুস্তকে এ রকম বর্ণনা করেছেন হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে। আল্লাহ্পাকই অধিক অবহিত।

বোখারী, তিরমিজি এবং হাকেম হজরত ইকরামার মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন এভাবে—বনী সুলাইম গোত্রের এক লোক তার বকরীর পাল নিয়ে কয়েকজন সাহাবীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। সে সাহাবীগণকে সালাম করলো। তাঁরা বললেন, এ লোক আমাদের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আমাদেরকে সালাম করেছে (প্রকৃতপক্ষে সে মুসলমান নয়)। এই ধারণা করে সাহাবীগণ তাকে হত্যা করলেন এবং তার বকরীগুলো নিয়ে রসুলপাক স. সকাশে উপস্থিত হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা নিসা ঃ আয়াত ৯৪

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا
لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

❑ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন আল্লাহের পথে যাত্রা করিবে তখন পরীক্ষা করিয়া লইবে, এবং কেহ তোমাদিগকে সালাম করিলে ইহ-জীবনের সম্পদের আকাংখায় তাহাকে বলিও না, 'তুমি বিশ্বাসী নহ,' কারণ আল্লাহের নিকট অনায়াস লভ্য সম্পদ প্রচুর রহিয়াছে। তোমরা তো পূর্বে এইরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন; সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করিয়া লইবে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

---

www.eelm.weebly.com

এখানে বিশ্বাসীদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যুদ্ধ গমনকালে পরীক্ষা করে নিতে হবে কে শত্রু, কে বন্ধু। এ সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না।

যে নিহত ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি ছিলেন মুসলমান। হজরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন বাগবী ও কালাবী। ওই নিহত ব্যক্তির নাম মুরদাস বিন নাহিক। তিনি ছিলেন ফেদাকের অধিবাসী। তিনি মুসলমান ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো অমুসলমান। মুসলিম বাহিনীকে আসতে দেখে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা পালিয়ে গেলো। তিনি মুসলমান ছিলেন, তাই পালালেন না। হঠাৎ তাঁর ভয় হলো অগ্রসরমান বাহিনী কি রসুলপাক স. এর, না অন্য কারো—এ কথা ভেবে তিনি তাঁর বকরীগুলোকে পাহাড়ের আড়ালে একটি নিরাপদ স্থানে হাঁকিয়ে দিলেন। নিজেও উঠে পড়লেন এক পাহাড়ে। সেনাবাহিনী তকবীর উচ্চারণ করতে করতে এগিয়ে এলো। তাদের তকবীর স্পষ্টরূপে কর্নগোচর হতেই তিনি বুঝলেন, এই বাহিনী রসুলপাক স. এর সাহাবীগণের। তিনি তখন কলেমা শরীফ পড়তে পড়তে পাহাড় থেকে নেমে এলেন এবং সাহাবীবাহিনীকে সালাম বললেন। কিন্তু তাঁকে বিশ্বাস না করে তরবারীর আঘাতে তাঁকে হত্যা করলেন হজরত উসামা বিন জায়েদ। সেনাবাহিনী মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে রসুলপাক স. সকাশে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তিনি স. ঘটনাটি জানতে পেরেছিলেন আগেই। নিতান্ত দুঃখিত হয়ে তিনি বললেন, তোমরা তাকে হত্যা করেছো সম্পদের লোভে। তারপর তিনি পাঠ করলেন এই আয়াত। হজরত উসামা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য দোয়া করুন। রসুল স. পরপর তিনবার বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'—এর কী হবে (সে তো এই কলেমা পাঠ করেছিলো তা সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করেছো। এখন আমি কিভাবে দোয়া করতে পারি) হজরত উসামা বলেছেন, রসুল স.এর বার বার কলেমা শরীফ উচ্চারণ শুনে আমি মনে মনে আক্ষেপ করলাম, হায়! আমি যদি আগে ইসলাম গ্রহণ না করে এখন ইসলাম গ্রহণ করতাম, তবে অতীত পাপের জন্য অভিযুক্ত হতাম না। কেননা, ইসলাম পূর্ববর্তী পাপকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তিনবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার পর রসুল স. আমার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন, একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দাও। কালাবীর নিয়মে এই বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন ছা'লাবী।

হজরত আবু জুবিয়ানের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত উসামা বলেছেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সে অস্ত্রের ভয়ে কলেমা পড়েছিলো। রসুল স. বললেন, তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছো? (তবে কিভাবে বুঝলে তার ভীতি অস্ত্রসঞ্জাত না হৃদয়োৎসারিত)? হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ভিন্ন সূত্রে বায্যার বলেছেন, রসুল স. যোদ্ধাদের একটি দল প্রেরণ করলেন। ওই দলে ছিলেন হজরত মেকদাদ। যোদ্ধারা একটি কাফের অধ্যুষিত জনপদে পৌঁছলে তারা পালিয়ে জীবন বাঁচালো। কেবল এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। তাঁর নিকট

www.eelm.weebly.com

ছিলো অনেক সম্পদ। তিনি যোদ্ধাদেরকে দেখে উচ্চারণ করলেন, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই)। এ কথা শুনেও হজরত মেকদাদ তাঁকে হত্যা করলেন। যোদ্ধৃবৃন্দ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে রসুল স. হজরত মেকদাদকে বললেন, কিয়ামতের দিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' সম্পর্কে তুমি কী জবাব দেবে? অতঃপর আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আহমদ, তিবরানী, আবদুল্লাহ্ বিন হাজার আসলামীর বর্ণনা থেকে এবং ইবনে জারীর আবু ওমরার মাধ্যমে লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন— রসুলুল্লাহ্ স. এক মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে প্রেরণ করলেন আমাদেরকে। হজরত আবু কাতাদা এবং হজরত মুহলিম বিন খাসামা বিন কায়েস লাইলীও ছিলেন ওই বাহিনীতে। এক স্থানে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে সালাম করলেন আমের বিন আদ্বাতে আশজায়ী। হজরত মুহলিম তাঁকে আক্রমণ করলেন এবং হত্যা করে ফেললেন। তারপর আমরা যখন রসুল স. এর নিকট ফিরে গিয়ে এই ঘটনাটি বললাম, তখন আমাদের সম্পর্কে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো।

ইবনে মান্দা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—হজরত জুযআ বিন হদরজাম বলেছেন, আমার ভাই খাদ্দাদ রসুল স. সকাশে উপনীত হয়ে নিবেদন করেছিলো, আমি ইমানদার। কিন্তু লোকেরা তার কথা বিশ্বাস না করে তাকে হত্যা করেছিলো। আমি সেই দুঃসংবাদ শুনে রসুল স. এর নিকট ছুটে গেলাম। তিনি স. আমাকে আমার ভাইয়ের দিয়ত দান করলেন। আমার সেই নিহত ভ্রাতাকে উপলক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

সুদ্দীর নিয়মে ইবনে জারীর, কাতাদার মাধ্যমে আবদ এবং ইবনে লেহিয়ার সূত্রে ইবনে আবী হাতেম হজরত আবু জোবায়েরের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এ রকম—এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মারদাসকে লক্ষ্য করে। বর্ণনাটি ছা'লাবী কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসের সমর্থক।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন—রসুল স. হজরত মুহলিম বিন খাসামাকে একটি সেনাদলের সঙ্গে পাঠালেন। পথিমধ্যে তিনি সাক্ষাত পেলেন আমের বিন আদ্বাতের। আমের তাঁকে সালাম করলেন। মূর্খতার যুগে তাঁরা ছিলেন পরস্পর পরস্পরের শত্রু। তাই হজরত মুহলিম তীর নিক্ষেপ করে আমেরকে হত্যা করলেন। সংবাদটি পৌঁছে গেলো রসুল স. এর নিকট। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর হজরত মুহলিম রসুল স. এর নিকট মাগফেরাতের দোয়ার জন্য নিবেদন জানালেন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা না করুন। হজরত মুহলিম কাঁদতে কাঁদতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর কাঁদতে কাঁদতে মৃত্যুবরণ করলেন। যথারীতি দাফন করা হলো তাঁকে। কিন্তু মাটি

www.eelm.weebly.com

তার মরদেহ গ্রহণ করলো না। উগলে দিলো মাটির উপর। সাহাবীগণ রসুল স. কে ঘটনাটি জানালেন। তিনি স. বললেন, হে মৃত্তিকা! তুমি কি এমন লোককে গ্রহণ করবে না; যে তার সাথীর সঙ্গে অসদাচরণ করেছে? এই ঘটনাটির মাধ্যমে সদুপদেশ প্রদানই ছিলো আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা। অবশেষে মুহলিমের মরদেহে পাহাড়ের এক গুহায় রেখে তার উপর পাথর চাপিয়ে দেয়া হলো এবং তখনই অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

এরপর এরশাদ হয়েছে, 'কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে ইহজীবনের সম্পদের আকাংখায় তাকে এ কথা বোলো না যে, তুমি বিশ্বাসী নও।' কেননা আল্লাহ্র নিকট অনায়াস লভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে—গণিমতের সম্পদ লাভই যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য নয়। তাই কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্য গণিমত লাভ হতে পারে না। মু'মিনের রক্ত ও সম্পদ পবিত্র। সুতরাং কেউ যদি নিজেকে ইমানদার বলে ঘোষণা করে, তবে তাকে বিশ্বাস করতে হবে। তাকে এ কথা বলা যাবে না যে, তুমি বিশ্বাসী নও। আর সম্পদের মূল মালিক তো আল্লাহ্ই। তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে অসংখ্য গণিমত মওজুদ রেখেছেন। সম্পদ লাভ করতে চাইলে কারো ইমানের ঘোষণাকে অবিশ্বাস করতে হবে কেনো? আর তাকে হত্যাই বা করতে হবে কেনো? আখেরাতের সফলতাই বিশ্বাসীদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেখানকার অগণিত ও অক্ষয় সম্পদ এবং অগণন সওয়াব তিনি প্রস্তুত রেখেছেন মু'মিনের জন্যে।

এরপর এরশাদ হয়েছে, 'তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নেবে'—এখানে অদূর অতীতের প্রতি মনোনিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্তায়ালা। বলেছেন, কিছু কাল পূর্বে তোমরাও তো ছিলে বিশ্বাসবর্জিত। আল্লাহ্পাক তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে ইমান দান করেছেন। আর তোমরাও ইসলামের কলেমা পড়ে তোমাদের জীবন ও সম্পদকে নিরাপদ করেছো। তখন তো তোমাদেরকে এ কথা বলা হয়নি যে, তোমাদের ইমানের ঘোষণা কেবল মৌখিক—আন্তরিক নয়। অনুগ্রহ করার অর্থ এ রকম হতে পারে যে, হিজরতের পূর্বে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তোমরা কাফের সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবাস করতে। তখন কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমাই ছিলো তোমাদের রক্ষাকবচ। তারপর আল্লাহ্পাক দয়া করে হিজরতের সুযোগ দিয়েছেন। ফলে তোমরাও পেয়েছো পূর্ণ নিরাপত্তা। আল্লাহ্র অনুগ্রহ সম্পর্কে কাতাদা বলেছেন, নিকট অতীতে অবিশ্বাসীদের মতো তোমরাও ছিলে পথভ্রষ্ট। অতঃপর আল্লাহ্পাক তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার তৌফিক দিয়েছেন। এ সম্পর্কে হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, তাদের মতো তোমরাও প্রথমে

www.eelm.weebly.com

ইমানকে গোপন করেছিলে। তারপর আল্লাহ্তায়ালা দয়া করেছেন বলে তোমরা ইসলামকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছো।

অতএব হে বিশ্বাসীরা! তোমরা সতর্কতাকে অবলম্বন করো, পরীক্ষা করে দেখো হত্যার মাধ্যমে যে গণিমত তোমরা লাভ করতে চাও, তা আসলে হালাল না হারাম। এই আয়াতে পরীক্ষা করার কথা বলা হয়েছে দু'বার। প্রথমে বলা হয়েছে, পরীক্ষা না করে হত্যার ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নিও না— যদি দেখো, তার মধ্যে ফুটে উঠেছে ইসলামের চিহ্ন। পরের বার পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে এ জন্য যে, তাদের বাহ্যিক ইসলামের ঘোষণাকে খারাপ জেনে অনুমানকে প্রশ্রয় দিও না— যতোক্ষণ না তাদের মধ্যে দেখতে পাও অবিশ্বাসের স্পষ্ট আলামত।

শেষে বলা হয়েছে, 'ইন্নাল্লহা কানা বিমা তা'মালুনা খবীরা'—এ কথার অর্থ তোমরা যা করো, সে বিষয়ে আল্লাহ্পাক সবিশেষ অবহিত। অর্থাৎ তোমাদের আমল ও আমলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্পাকের রয়েছে নিশ্চিত অবহিতি। তাই তিনি বিনিময় দান করবেন তোমাদের নিয়ত ও আমল অনুসারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এই আয়াতের মাধ্যমে যে বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে তা হচ্ছে— ১. কেউ যদি বাধ্য হয়ে ইমানের ঘোষণা দেয়, তবু তার ইমানের ঘোষণাকে সঠিক বলে গ্রহণ করতে হবে। ২. কোনো মুজতাহিদ সৎ উদ্দেশ্যে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি ভুল করেন, তবে তিনি ক্ষমার্হ। ৩. মুজতাহিদকে অগ্রসর হতে হবে সতর্ক পরীক্ষা এবং গভীর চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে। এ রকম করা তাঁর জন্য ওয়াজিব। এতদসত্ত্বেও ভুল হয়ে গেলে সৎপ্রচেষ্টার কারণে তিনি সওয়াব লাভ করবেন। ৪. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ সম্পর্কে আহলে কিতাবদেরও এক রকম বিশ্বাস আছে। তারা যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ঘোষণা দেয়, তবে চট করে তাদেরকে এ কথা বলা যাবে না যে, তারা ইসলামের বিশ্বাস অনুযায়ী এই ঘোষণা দিলো কিনা। তাদের ক্ষেত্রে দ্রুত হত্যার সিদ্ধান্ত না নিয়ে সংযত হওয়াই সমীচীন। অবিশ্বাসের স্পষ্ট আলামত না পাওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করতে হবে। ৫. কোনো শহরে অথবা জনপদে ইসলামের বিশেষ চিহ্ন পরিদৃষ্ট হলে হত্যা এবং লুণ্ঠন থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব হবে। যেমন রসুল স. কোনো স্থানে প্রেরিত সেনাদলকে এই মর্মে নির্দেশ দিতেন যে, যদি সেখানে আজানের আওয়াজ শুনতে পাও, তবে আক্রমণোদ্যত হয়ো না। আজান শুনতে না পেলে আক্রমণ কোরো। বাগবী ও ইমাম শাফেয়ীর নিয়মে ইবনে ইসামের মাধ্যমে তার পিতা থেকে বর্ণিত হয়েছে, যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে রসুল স. সেনাদলকে বলতেন, যদি কোথাও মসজিদ দেখতে পাও অথবা আজান শুনতে পাও, তবে সেখানকার কাউকে হত্যা কোরো না। আল্লাহ্পাকই উত্তমরূপে অবহিত।

www.eelm.weebly.com

لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

❒ বিশ্বাসীদের মধ্যে যাহারা অক্ষম নহে অথচ ঘরে বসিয়া থাকে ও যাহারা আল্লাহের পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তাহারা সমান নহে। যাহারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে, যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের উপর, মর্যাদা দিয়াছেন; আল্লাহ্ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের উপর যাহারা জিহাদ করে তাহাদিগকে আল্লাহ্ মহা পুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন।

সাহাবী ইবনে উম্মে মকতুম ছিলেন দৃষ্টিহীন। একবার তিনি রসুল স. কে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমি সক্ষম হলে অবশ্যই জেহাদ করতাম। বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসাঈ হজরত জায়েদ বিন সাবেত থেকে— বোখারী হজরত বারা বিন আজিব থেকে—তিবরানী, হজরত জায়েদ বিন আরকাম থেকে— ইবনে হাব্বান ইবনে আসেম থেকে— এবং তিরমিজি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছে , রসুল স. হজরত জায়েদ বিন সাবেতের দ্বারা লিপিবদ্ধ করাচ্ছিলেন—'লা ইয়াসতাবিল কৃয়িদুনা মিনাল মু'মিনিনা ওয়াল মুজাহিদুনা ফি সাবিলিল্লাহ্।' ইতোমধ্যে উপস্থিত হলেন হজরত ইবনে উম্মে মকতুম। বললেন, আমি জেহাদ করতে সক্ষম হলে অবশ্যই জেহাদ করতাম। তিনি ছিলেন দৃষ্টিহীন। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. কে এ রকম বলেছিলেন হজরত ইবনে উম্মে মকতুম এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ। তাঁরা বলেছিলেন, আমরা তো চোখে দেখি না। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—'বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজের ধন-প্রাণ দ্বারা জেহাদ করে তারা সমান নয়।'

হজরত জায়েদ বিন সাবেত বলেছেন, এই আয়াত ওই সময় অবতীর্ণ হয়েছিলো যখন রসুল স. এর উরুদেশ ছিলো আমার উরুদেশের উপর। তখন আমি আমার উরুদেশে অনুভব করছিলাম ওহীর প্রচণ্ড ভার। মনে হচ্ছিলো আমার উরু বুঝি ফেটে যাবে। কিছুক্ষণ এই অবস্থা চললো। তারপর সমাপ্ত হলো এই আয়াতের অবতরণ।

www.eelm.weebly.com

কামুস অভিধানে রয়েছে 'দুররুন' এবং 'দ্বরারুন' অর্থ শোচনীয় অবস্থা অথবা খারাপ অবস্থা। যার দৃষ্টিশক্তি নেই তার অবস্থা তো খারাপই। এই খারাপ অবস্থা বুঝাতে আয়াতে উলিদ্দ্বরার (অক্ষম) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আমি বলি, এখানে 'উলিদ্দ্বরার' বলে সকল রকম অক্ষম ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন বোবা, খোঁড়া, শারীরিকভাবে অসুস্থ কিংবা দুর্বল অথবা দৃষ্টিহীন, সহায় সম্বলহীন ইত্যাদি। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে— যাঁরা চলচ্ছক্তিহীন, রোগগ্রস্ত, অন্ধ অথবা সম্পদহীন তাঁরা জেহাদ করতে সমর্থ নন। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যদি এ রকম থাকে যে, আমরা এ রকম অক্ষম না হলে অবশ্যই জেহাদে যাত্রা করতাম— তবে এ রকম বিশুদ্ধ নিয়তের কারণে তাঁরাও লাভ করবেন মুজাহিদের মর্যাদা। হজরত আনাস থেকে বোখারী এবং হজরত আনাস ও হজরত জাবের থেকে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে বললেন, মদীনায় এমন কিছু লোক রয়েছে যারা তোমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলো। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল, মদীনায় অবস্থান করা সত্ত্বেও? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। মদীনায় অবস্থান করা সত্ত্বেও। তারাতো এখানে আটকে ছিলো উপযুক্ত ওজরবশতঃ।

মুকসেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতে যারা বদর যুদ্ধে গমন করেছিলেন এবং যারা করেননি তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। যারা বদরে গিয়েছিলেন এবং যারা যাননি তাঁরা সমান নন। এখানে যারা ঘরে বসে থাকে তাদেরকে বলা হয়েছে আল ক্বায়িদুনা। এ কথার অর্থ যারা অক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও ঘরে বসে থাকে।

প্রশ্নঃ পূর্বের বাক্যে বলা হয়েছে যারা অক্ষম না হয়েও ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহ্র পথে ধন-প্রাণ দ্বারা জেহাদ করে তারা সমান নয়। পরের বাক্যে বলা হয়েছে, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপরে ধন-প্রাণ দ্বারা জেহাদকারীকে আল্লাহ্পাক মর্যাদা দিয়েছেন। দু'টি বাক্য একই বক্তব্যকে প্রকাশ করেছে। সুতরাং আগের বাক্যটি উল্লেখ না করলেও চলতো। তাই প্রশ্ন — এ রকম পুনরাবৃত্তি করা হলো কেনো?

উত্তরঃ আগের বাক্যে সংক্ষেপে বলে দেয়া হয়েছে যে, ওই দুই দল সমান নয়। পরের বাক্যে তার ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা হয়েছে, জেহাদকারী দল জেহাদ বিমুখদের চেয়ে মর্যাদাশালী। এ রকম বাকভঙ্গির উদ্দেশ্য হচ্ছে বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা— যাতে করে শ্রোতার স্মৃতিতে বক্তব্যটি গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়।

পুনঃ প্রশ্নঃ এ কথাতো সর্বজনবিদিত যে, যারা জেহাদ করে তারা জেহাদ বিমুখদের চেয়ে উত্তম। এতদ্সত্ত্বেও এখানে সে কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হলো কেনো?

উত্তরঃ বিশেষভাবে এ কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, জেহাদের প্রতি সকলকে উৎসাহিত করে তোলা। অধিকতর শুদ্ধ উত্তর এই যে, যুদ্ধ না করলেই বরং

www.eelm.weebly.com

ইবাদত বন্দেগী এবং মানুষের হক সঠিকভাবে প্রতিপালন করা যায়। কিন্তু যারা জেহাদ করে তারা এ রকম নির্বিঘ্ন ও প্রশান্ত ইবাদত করার সুযোগ পায় না—এ রকম চিন্তার কারণে কেউ হয়তো মনে করতে পারে, জেহাদ করার চেয়ে না করাই উত্তম। এই আয়াতে এ রকম অযথার্থ চিন্তাকে অপসারিত করা হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেন, যুদ্ধ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত মুজাহিদগণের অবস্থা ওই ব্যক্তিদের মতো, যারা বিরামহীনভাবে রোজা রাখে এবং সারা রাত নামাজ পড়ে। বোখারী, মুসলিম।

'আল্লাহ্ সকলকে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন'—এ কথার অর্থ যারা যুদ্ধে গমন করবে, অথবা অক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকবে, তাদের সকলকেই আল্লাহ্তায়ালা কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অর্থাৎ তারা ইমানের কারণে জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে।

এ কথাটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জেহাদ ফরজে কেফায়া। কতিপয় লোক এই ফরজ সম্পাদন করলে অন্য সকলে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। জেহাদ ফরজে আইন নয়। যদি হতো তবে জেহাদ বিমুখেরা পুণ্য লাভের অধিকারী হতো না। হতো শাস্তিযোগ্য।

আরো কিছু কথাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, কাফের সাম্রাজ্য যদি মুসলমানদের প্রতি আক্রমণপ্রবণ না হয় (শান্তিপ্রিয় হয়) তবুও খলিফা বা প্রতিনিধিকে প্রতি বছর যুদ্ধের আয়োজন করতে হবে। খলিফা বা প্রতিনিধির জন্য এটা ওয়াজিব। অন্যথায় জেহাদ অবলুপ্ত হয়ে যাবে। এ সকল জেহাদে খলিফা বা প্রতিনিধি নিজে অংশগ্রহণ করবে অথবা সেনাদল পাঠিয়ে দেবে। রসুল আকরম স. এবং খোলাফায়ে রাশেদীন কখনও জেহাদ পরিত্যাগ করেন নি।

একদল মুসলমান যুদ্ধোদ্যত হলে যদি আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয় এবং কাফেরদেরকে রুখে দেয়া হয়, তবে অবশিষ্ট মুসলমানেরা জেহাদের ফরজ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। এ সকল অবস্থায় মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকে ক্রীতদাস, স্বামীর নির্দেশ ব্যতীত স্ত্রী, ঋণপ্রদাতার অনুমোদন ব্যতীত ঋণী এবং পিতামাতার অনুমতি ছাড়া সন্তান জেহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, সকলেই যদি জেহাদ থেকে বিরত থাকে তবে সকলেই গোনাহ্গার হবে। কিন্তু যার প্রকৃত ওজর রয়েছে সে গোনাহ্গার হবে না।

আলেমগণের আরও ঐকমত্য এই যে, মুসলমানেরা তাদের শহরে ও জনপদে বসবাসকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এই দায়িত্বটি ওয়াজিব। যদি তারা দুর্বল হয়, তবে নিকটবর্তী মুসলমানেরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। যদি তাতেও যথেষ্ট না হয়, তবে তাদেরকে সাহায্য করবে তাদের নিকটবর্তীরা। না হলে তাদের নিকটবর্তীরা। এভাবে প্রয়োজনবশতঃ মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটাতে হবে।

মাসআলাঃ আলেমগণ এই বিষয়টিতে একমত হয়েছেন যে, সম্মুখসমরে উপস্থিত হওয়ার পর পশ্চাদাপসরণ নাজায়েয। তখন আপন সেনাদল থেকে এদিক ওদিক চলে যাওয়াও নাজায়েয। তবে শত্রুকে ধাওয়া করার জন্য অথবা

www.eelm.weebly.com

আপন দলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য যাওয়া আসা করা যাবে। শত্রুর সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণের চেয়ে অধিক হলে নিরাপদ পশ্চাদপসরণ জায়েয। কিন্তু এ রকম পরিস্থিতিতেও অটল থাকা উত্তম।

মাসআলাঃ জেহাদ বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধসরঞ্জাম তো থাকতেই হবে। তার সঙ্গে থাকতে হবে খাদ্য ও বাহন। ইমাম মালেক ছাড়া অন্য তিন ইমাম এ রকম বলেছেন। শুধু ইমাম মালেক বলেছেন, কেবল সমরসরঞ্জাম থাকলেই চলবে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, তারাই অক্ষম যাদের নিকট আহার্য ও বাহন নেই। আরও বলেছেন, যখন তারা আপনার নিকট বাহনপ্রার্থী হয় তখন আপনি বলে দিন আমার নিকট কিছুই নেই (এই আয়াতে বাহন থাকা জরুরী বলা হয়েছে)।

মাসআলাঃ ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য এই যে, অবিশ্বাসীদের দ্বারা কোনো মুসলমান জনপদ আক্রান্ত হলে ওই জনপদের সকল মুসলমানের উপর জেহাদ করা ফরজে আইন হয়ে যায়। (তখন জেহাদ ফরজে কেফায়া থাকে না)। স্বাধীন, ক্রীতদাস, বিত্তবান, বিত্তহীন— সকলের উপর তখন জেহাদ ফরজ হয়ে যায়। যেমন ফরজ নামাজ ও রোজা। দাসের উপর মনিবের, ঋণীর উপর ঋণদাতার এবং সন্তানের উপর তার পিতামাতার হক সম্পর্কে তখন পরোয়া করলে চলবে না। তখন মনিব, ঋণদাতা, এবং পিতামাতার নিষেধাজ্ঞা যথাক্রমে গোলাম, কর্জগ্রহীতা এবং সন্তানের উপর থাকবে না। ফরজ নামাজ, রোজা নিষেধ করার ক্ষমতা যেমন কারোর নেই, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তেমনি জেহাদে বাধা দেয়ার অধিকারও কারো নেই। ইমাম আবু হানিফা এ কথাও বলেছেন যে, ওই পরিস্থিতিতে স্বামীর নির্দেশের তোয়াক্কা না করে জেহাদে অংশগ্রহণ করাকে স্ত্রী অপরিহার্য কর্তব্য বলে জানবে। আক্রান্ত জনপদবাসীরা মোকাবেলায় যথেষ্ট হলে তো ভালোই, না হলে নিকটবর্তী মুসলমান জনপদের অধিবাসীরা অত্যাবশ্যক জ্ঞানে আক্রান্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এ রকম সঙ্গিন পরিস্থিতিতেও যারা অক্ষম তাদের উপর জেহাদ ফরজ নয়।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে, 'যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জেহাদ করে—তাদেরকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।' এই মহাপুরস্কার বা 'আজ্‌রি আজিম' অর্থ আল্লাহ্পাকের নৈকট্য এবং জান্নাতের উচ্চতর মর্যাদা।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৯৬

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً وَّكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

❒ ইহা তাঁহার নিকট হইতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

'দারাজাত' অর্থ মর্যাদা, 'মাগফেরাত' অর্থ ক্ষমা এবং 'রহমত' অর্থ দয়া। এই তিনটি বিষয় আল্লাহ্তায়ালার দান। যে গোনাহ থেকে মুক্ত তার জন্য রয়েছে

www.eelm.weebly.com

মর্যাদা। যে গোনাহগার তার জন্য রয়েছে ক্ষমা। আর দয়া বা রহমত উভয় দলের জন্য। আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, জেহাদে অংশগ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ্পাক মহাপুরস্কার স্বরূপ মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া এই তিনটি নেয়ামত দান করবেন।

পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জেহাদে উৎসাহ প্রদান। প্রথমে বলা হয়েছে, যারা জেহাদ করে এবং যারা করে না তারা সমান্তরাল নয়। তারপর বলা হয়েছে, যারা জীবন ও সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে, তারা জেহাদ বিমুখদের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। তারপর বলা হয়েছে, মুজাহিদদেরকে আল্লাহ্পাক মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এতটুকু বলেই পূর্ববর্তী আয়াত শেষ করা হয়েছে। পরের আয়াতে কেবল বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাকের দরবারে রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া যা মুজাহিদদের জন্য নির্ধারিত।

একটি প্রশ্নঃ প্রথমে বলা হয়েছে মর্যাদা দানের কথা। পরে বলা হয়েছে 'দারাজাত' অর্থাৎ বহুতর মর্যাদা (মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া) দানের কথা। তবে কি প্রথমে বর্ণিত মর্যাদা ও পরে বর্ণিত মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে?

উত্তরঃ না। পৃথকভাবে উল্লেখিত মর্যাদার মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। প্রথমে উক্ত হয়েছে জেহাদে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে জেহাদ পরিত্যাগকারী ব্যক্তির উপরে মর্যাদা দানের কথা। পরে বলা হয়েছে, যারা জেহাদ করে না সেই দলের উপরে মুজাহিদদের মর্যাদাশালী হওয়ার কথা। মুজাহিদগণ দলগতভাবে সমমর্যাদাশীল । এ রকম বলা যেতে পারে যে, এই সমমর্যাদার অর্থ পার্থিব মর্যাদা যার মধ্যে রয়েছে গণিমত, বিজয়, সাহায্য এবং রাজত্ব। এ সকল মর্যাদা আখেরাতের মর্যাদার তুলনায় নগণ্য। তাই প্রথমেই বলা হয়েছে, একক মর্যাদার কথা এবং পরে আখেরাতের মর্যাদা বুঝাতে 'দারাজাত' (বহুতর মর্যাদা) বলা হয়েছে। অথবা এ কথাও বলা যেতে পারে যে, 'দরজা' বা মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ্র নৈকট্যের সিঁড়ি এবং দারাজাত (মর্যাদাসমূহ) হচ্ছে জান্নাতের মর্যাদাসমূহ।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আল্লাহ্পাক অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে মর্যাদা দান করবেন। আর আপন প্রবৃত্তির (নফসের) বিরুদ্ধে যুদ্ধরতদেরকে দান করবেন মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া। রসুল স. এরশাদ করেছেন, ওই ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুজাহিদ, যে আল্লাহ্র অনুগত হয়ে আপন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ করে থাকে এবং পূর্ণ মুহাজির (হিজরতকারী) ওই ব্যক্তি যে ত্রুটি বিচ্যুতি এবং পাপ পরিত্যাগ করে। হজরত ফুজালা থেকে বায়হাকী এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর শো'বুল ঈমান গ্রন্থে।

এ রকমও বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত (আয়াত ৯৫) —এর প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, যারা শরিয়তসম্মত ওজরের কারণে অক্ষম তাঁরা পাবেন একটি স্তরের মর্যাদা। কারণ, তাঁদের অন্তরে রয়েছে জেহাদে গমনের বিশুদ্ধ সংকল্প। কিন্তু অক্ষমতা তাদেরকে জেহাদে শরীক হতে দেয়নি। আর মুজাহিদেরা অন্তরের বিশুদ্ধ সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গে জেহাদ কার্যকর করেছে। এই দুই দলকে আল্লাহ্পাক কল্যাণ প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। তাঁরা কেউই গোনাহ্গার নন। পরের বাক্যে বলা হয়েছে বিনা ওজরে যারা জেহাদে অনুপস্থিত থাকে তাদের

www.eelm.weebly.com

কথা। ইমান থাকার কারণে তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। কিন্তু তাদের চেয়ে অধিক মর্যাদাশালী হবে মুজাহিদেরা। এ রকম বর্ণনা করেছেন মুকাতিল।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুলুল্লাহ্ স. বলেন, আল্লাহ্ প্রভুপ্রতিপালক, ইসলাম সত্য ধর্ম এবং মোহাম্মদ স. সত্য নবী— যে ব্যক্তি এই আদর্শের উপর প্রসন্ন তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। এ কথা শুনে হজরত আবু সাঈদ খুদরী বিস্মিত হয়েছিলেন এবং এ কথা পুনর্বার শুনতে চেয়েছিলেন। রসুলুল্লাহ্ স. পুনরায় এ কথা উল্লেখ করেছিলেন। আরও বলেছিলেন, আল্লাহ্পাক বেহেশতবাসীদেরকে শতস্তরের মর্যাদা দান করবেন। পৃথিবী থেকে আকাশ যেমন উচ্চ তেমনি উন্নত হবে ওই মর্যাদা— একটি থেকে অন্যটি। হজরত আবু সাঈদ তখন বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল, ওই উচ্চতর মর্যাদাগুলো অর্জিত হবে কীভাবে? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র পথে জেহাদ, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে জেহাদ। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করেছে, যথানিয়মে নামাজ আদায় করেছে এবং রমজানের রোজা রেখেছে, আল্লাহ্পাক তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। সে আল্লাহ্র পথে জেহাদ করে থাকুক অথবা স্বগৃহে বসে থাকুক। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা কি মানুষকে এই সুসংবাদ জানাবো? তিনি স. বললেন, জান্নাতের রয়েছে এক শত স্তর। ওই স্তরগুলো আল্লাহ্র পথে জেহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ওই স্তরগুলোর দূরত্ব আসমান ও জমিনের দূরত্বের মতো। প্রার্থনাকালে তোমরা জান্নাতুল ফেরদাউস প্রার্থী হয়ো। এই জান্নাত প্রশস্ততম ও উচ্চতম। এর উপরে রয়েছে আল্লাহ্র আরশ। আর আরশ থেকে নেমে আসে স্বর্গের স্রোতস্বিনী।

সব শেষে বলা হয়েছে , 'ওয়াকানাল্লহু গফুরর্ রহিমা' (আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু)।

বাগবী লিখেছেন, কিছু সংখ্যক মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু হিজরত করেননি। তাদের মধ্যে কায়েস বিন ফাকা বিন মুগীরা এবং কায়েস বিন ওলিদ বিন মুগীরাও ছিলেন। বদর যুদ্ধের সময় তাঁরা মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন এবং নিহত হয়েছিলেন।

বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে রয়েছে, কতিপয় মুসলমান মুশরিক বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন। তাঁরা মুসলমান বাহিনীর তীর অথবা তলোয়ারের আঘাতে নিহত হয়েছিলেন। আমি বলি, মুশরিক বাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন—এ কথার দ্বারা বুঝা যায়, তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসেনি। ইবনে মান্দা ওই সকল লোকের নাম উল্লেখ করেছেন এভাবে—কায়েস বিন ওলিদ বিন মুগীরা, আবু কায়েস বিন ফাকা বিন মুগীরা, ওলিদ বিন উকবা বিন রবীয়া, আমর বিন উমাইয়া, সুফিয়ান এবং আলী বিন উমাইয়া বিন খালফ। ইবনে মান্দা এ কথা বলেছেন যে, এ সকল লোক মুশরিক বাহিনীর সঙ্গে বদর প্রান্তরে এসে দেখলো মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা

www.eelm.weebly.com

অনেক কম। তখন তারা সন্দেহে পতিত হলো এবং বলতে শুরু করলো, ধর্ম ওই লোকগুলোকে প্রতারণা করেছে। এই লোকগুলো যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো।

আমি বলি, তারা সন্দেহে পতিত হলো—এ কথায় বুঝা যায় তারা মুরতাদ বা কাফের হয়ে গেলো। কিন্তু কোরআনের বর্ণনায় তাদের কাফের হওয়ার প্রমাণ নেই। ইবনে আবী হাতেমও এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। তিনি ওই দলের তালিকার মধ্যে হারেস বিন রবীয়া বিন আসওয়াদ এবং আস বিন উতবা বিন হাজ্জাজের নামও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তিবরানী উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল পাক স. যখন হিজরত করলেন, তখন কতিপয় মুসলমান ভয় পেয়ে গেলো। তারা হিজরত করাকে ভালো মনে করলো না। ইবনে জারীর এবং ইবনে মুনজির কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কতিপয় মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু তারা তাদের ইমানকে প্রকাশ করেনি। বদর যুদ্ধের সময় মুশরিকেরা তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলো। ওই সকল লোকের মধ্যে কেউ কেউ তখন নিহত হয়েছিলেন। সাহাবীগণ বললেন, তাঁরা মুসলমান। মুশরিকেরা বলপূর্বক তাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছিলো। অতএব তাদের মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করা দরকার। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৯৭

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ○

❒ যাহারা নিজেদের উপর জুলুম করে, তাদের প্রাণ-গ্রহণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' তাহারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম;' তাহারা বলে, 'তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে বসবাস করিতে পারিতে আল্লাহের দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না?' ইহাদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর উহা কত মন্দ আবাস!

যারা সুযোগ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হিজরত করে না, তাদের মৃত্যুর সময়ের অবস্থা বিবৃত হয়েছে এই আয়াতে। এখানে 'তাওয়াফফা' শব্দটির অর্থ রূহ কবজ করা বা প্রাণ গ্রহণ করা। শব্দটির মাধ্যমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ— যে কোনো কালে জান কবজের কথা বুঝানো যেতে পারে। 'মালায়েকা' শব্দটির অর্থ ফেরেশতা। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, এখানে ফেরেশতা অর্থ মৃত্যুর ফেরেশতা বা 'মালাকুল মউত।' আল্লাহ্‌পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'আপনি বলে দিন, মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের জীবন সংহার করে থাকে, যে নিযুক্ত

www.eelm.weebly.com

রয়েছে তোমাদের জন্য।' আরবী ভাষার রীতি হচ্ছে— কখনো কখনো এক বচনকেও বহুবচন হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এখানে তেমনি 'মালায়েকা' অর্থ হবে ফেরেশতাগণ—মৃত্যুর ফেরেশতা ও তার সঙ্গীগণ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ ও নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে এ কথাও রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, বিশ্বাসীর মৃত্যুর সময় শাদা রেশমী বস্ত্র নিয়ে রহমতের ফেরেশতা এসে বলতে থাকেন, হে পবিত্র রূহ! বহির্গত হও। তুমি আল্লাহ্র প্রতি প্রসন্ন এবং আল্লাহ্ও তোমার প্রতি প্রসন্ন। চলো আল্লাহ্র রহমত ও শান্তির দিকে এবং ওই প্রভু-পালকের দিকে— যিনি তোমার প্রতি অপ্রসন্ন নন। অবিশ্বাসীর মৃত্যুর সময় আযাবের ফেরেশতা আসেন কদর্য বস্ত্র নিয়ে এবং বলতে থাকেন, হে অপবিত্র নফস, বের হয়ে এসো আল্লাহ্র আযাবের দিকে। তুমি আল্লাহ্র প্রতি অপ্রসন্ন এবং আল্লাহ্ও তোমার প্রতি রুষ্ট।

হজরত বারা বিন আজিব থেকে আহমদ বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে বলা হয়েছে, মুমিন বান্দা পৃথিবী পরিত্যাগের সময় সূর্যের মতো আলোকোজ্জ্বল শুভ্র অবয়ববিশিষ্ট ফেরেশতাকুল বেহেশতি কাফন এবং সৌরভ নিয়ে অবতরণ করেন এবং উপবেশন করেন তাঁর দৃষ্টিসীমার মধ্যে। এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁর শিয়রে এসে বলতে থাকেন, হে প্রশান্ত প্রবৃত্তির অধিকারী! চলো, আল্লাহ্র মার্জনা ও সন্তোষের দিকে। তখন মশক থেকে যেমন পানির প্রবাহ বেরিয়ে আসে তেমনি করে বেরিয়ে আসে তার রূহ। মৃত্যুর ফেরেশতা তখন তার সেই রূহ গ্রহণ করেন। উপবিষ্ট ফেরেশতাগণ এক মুহূর্ত দেরী না করে পবিত্র সে আত্মাকে কাফনে জড়িয়ে নিয়ে বেহেশতি সৌরভে সুরভিত করে প্রস্থান করেন। কাফের বান্দার মৃত্যু আসন্ন হলে তার কাছে আকাশ থেকে নেমে আসেন কালো মুখবিশিষ্ট ফেরেশতার দল। তাঁদের হাতে থাকে কদর্য বস্ত্রের টুকরা। ওই ব্যক্তির দৃষ্টিসীমার মধ্যে বসে যান তাঁরা। এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তার মাথার কাছে বসে বলতে থাকেন, আল্লাহ্র গজবের দিকে বের হয়ে এসো হে অপবিত্র আত্মা! অপবিত্র আত্মা তখন ভয়ে শরীরের অভ্যন্তরে লুকোবার চেষ্টা করে। কিন্তু মৃত্যুর ফেরেশতা লোহার কাঁটার মতো তাকে টেনে বের করে আনে। উপবিষ্ট কৃষ্ণকায় ফেরেশতারা তখন এক মুহূর্ত দেরী না করে অপবিত্র আত্মাকে কদর্য বস্ত্রে জড়িয়ে নিয়ে চলে যায়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজির লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর 'মদীনায় হিজরতকারী মুসলমানেরা তাঁদের মক্কায় অবস্থানরত আত্মীয়স্বজনদেরকে লিখে জানালেন, অতি শীঘ্র সকলে মদীনায় চলে এসো। মক্কায় অবস্থানের পরিণাম ভালো নয়। সংবাদ পেয়ে তাঁরা মদীনার পথে যাত্রা করলেন। কিন্তু মক্কার মুশরিকেরা তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়ালো এবং পুনরায় তাঁদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে গেলো। তখন অবতীর্ণ হলো, 'অতঃপর যখন তাদেরকে আল্লাহ্র পথে কোনো কষ্ট আপতিত হয় তখন তারা মানবপ্রদত্ত কষ্টকে মনে করে এ যেনো আল্লাহ্র আযাব।' মদীনার মুসলমানেরা এই আয়াত পুনরায় লিখে পাঠিয়ে দিলেন মক্কার মুসলমানদেরকে। তখন মক্কার মুসলমানেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, নিশ্চয়ই আমরা হিজরত করবো। যারা পশ্চাদ্ধাবন করবে তাদের সঙ্গে করবো যুদ্ধ। পুনরায় মদীনায় যাত্রা করলেন তাঁরা। পেছনে পেছনে

www.eelm.weebly.com

ছুটে এলো মুশরিকেরা। শুরু হলো যুদ্ধ। মুসলমানদের কেউ কেউ নিহত হলেন। অন্যরা চলে এলেন মদীনায়। অবতীর্ণ হলো, 'অতঃপর নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক এ রকম লোকদের জন্য যারা অবিশ্বাসে লিপ্ত থাকার পর বিশ্বাসী হয়ে হিজরত করেছে।'

হিজরতের হুকুম পালন করা ফরজ। এই ফরজ হুকুম না মেনে মুশরিকদের সাহচর্যে (মক্কায়) অবস্থান করা শক্ত পাপ। এ রকম আচরণ অবিশ্বাসকে সমর্থনদান তুল্য।

বাগবী লিখেছেন, হিজরতের নির্দেশ দানের পর হিজরত না করলে ইমান ও ইসলাম কবুল হবে না। মক্কাবিজয়ের পর এই হুকুমটি রহিত হয়ে গিয়েছে। রসুল স. বলেছেন, মক্কাবিজয়ের পর হিজরত করা জরুরী নয়। বিশুদ্ধ সূত্রে মোজাশী বিন মাসউদ থেকে এ বর্ণনাটি এনেছেন আহমদ ও আবু দাউদ। এই হাদিসটি জুহাকের বর্ণনাসূত্রে লিপিবদ্ধ করে ইবনে জারীর লিখেছেন, হিজরতের হুকুমটি রহিত হয়নি। পরাক্রান্ত কাফেরদের জনপদ থেকে অন্যত্র হিজরত করে যাওয়া আলেমগণের ঐকমত্যসূত্রে ফরজ। এই আয়াতের বক্তব্য এই যে, যে স্থানে মুসলমানেরা ইসলামী বিধিবিধান কার্যকর করতে অক্ষম তাদের জন্য সেই স্থান থেকে হিজরত করা ওয়াজিব। আর 'মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নেই'— এই হাদিস সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, মক্কাবিজয়ের পর যেহেতু মক্কায় ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত— তাই সেখান থেকে হিজরত করা আর ওয়াজিব নয়। কেউ বিজয়ের পর মক্কা পরিত্যাগ করলে তাকে মোহাজিরও বলা যাবে না। সে হিজরতের সওয়াবও লাভ করবে না। আর একটি কথা এই যে, হিজরতের নির্দেশ বলবৎ থাকার সময় যারা হিজরত করে নি তাদের ইমান ও ইসলাম যে আদৌ কবুল হবে না এ কথাটিও ঠিক নয়। তবে তারা গোনাহ্গার এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা যাবে না। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে 'আর যারা ইমান এনেছে অথচ হিজরত করেনি তাদের সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্বের সংশ্রব নেই, যে পর্যন্ত না তারা হিজরত করে। আর যদি তারা তোমাদের নিকট ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্যপ্রার্থী হয় তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের জন্য ওয়াজিব। কিন্তু তোমরা ওই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না— যাদের সঙ্গে তোমরা সন্ধির অঙ্গীকার করেছো'। অর্থাৎ যে সকল ইমানদার হিজরত করেনি তারা তোমাদের বন্ধু নয় যতোক্ষণ না তারা হিজরত করবে। তবে তারা সাহায্যপ্রার্থী হলে তোমাদেরকে অবশ্যই সাহায্য প্রদানে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তোমরা তোমাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না।

হিজরতবিমুখদের প্রাণহরণের সময় মৃত্যুর ফেরেশতারা শাসাবেন— বলো, কী অবস্থায় ছিলে তোমরা। হিজরতকারীদের সঙ্গে না হিজরতবিমুখ কাফেরদের সঙ্গে? তোমরাতো বন্ধুত্ব করেছো কাফেরদের সঙ্গেই (তাই হিজরত করোনি)।

ফরজ হিজরত পরিত্যাগকারীরা তখন বলবে, আমরা ছিলাম অসহায়। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমাদের ছিলো না। অবিশ্বাসের প্রতাপে আমরা আমাদের বিশ্বাস ও ধর্মকে প্রকাশ করতে পারিনি।

ফেরেশতাগণ বলবেন, তোমরা তো দেশত্যাগ করতে পারতে। চলে যেতে পারতে ইসলাম প্রভাবিত এলাকায়। আল্লাহ্র পৃথিবী কি এ রকম প্রশস্ত ছিলো না?

www.eelm.weebly.com

মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যাওয়ার ক্ষমতা তো তোমাদের ছিলোই। তোমরা সেখানে যেয়ে তোমাদের বিশ্বাস ও ধর্মকে রক্ষা করতে পারতে— যেমন আবিসিনিয়ার ও মদীনার হিজরতকারীগণ করেছেন।

হিজরত পরিত্যাগকারীদের সঙ্গে মৃত্যুর ফেরেশতাদের এই কথোপকথনের বিবরণ দানের পর আয়াত শেষে বলা হয়েছে, এদের আবাসস্থল জাহান্নাম। এ কথার মাধ্যমে হিজরত পরিত্যাগকারীরা যে চিরস্থায়ী জাহান্নামী সে কথা অবশ্য প্রমাণিত হয়নি। তবে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও তারা যে জাহান্নামী—এ কথা ঠিক। আর জাহান্নাম কতোই না মন্দ আবাস।

হজরত হোসাইন থেকে মুরসালরূপে ছা'লাবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ধর্মরক্ষার জন্য কেউ এক হাত দূরত্বের স্থানে হিজরত করলেও তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। জান্নাতে সে তাঁর সঙ্গী হিসাবে পাবে হজরত ইব্রাহিম আ. এবং আল্লাহ্র হাবিব হজরত মোহাম্মদ স. কে।

বোখারী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, মুসলমানদের উত্তম সম্পদ ওই সকল বকরী যেগুলো নিয়ে তাঁরা ফেতনা ফাসাদ থেকে ধর্মরক্ষার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যাবে।

হজরত আমর বিন আস থেকে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন— নিশ্চয়ই ইসলাম পূর্ব জীবনের সমস্ত পাপ মিটিয়ে দেয়। হিজরত মিটিয়ে দেয় হিজরত পূর্ব সময়ের পাপরাশি। আর হজ ধ্বংস করে দেয় হজপূর্ববর্তী সকল অপরাধকে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ৯৮, ৯৯

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۝

❒ তবে যে সব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারে না এবং কোন পথও পায় না,

❒ আল্লাহ্ হয়তো তাহাদের পাপ মোচন করিবেন কারণ আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

যারা অক্ষম তাদের উপর হিজরত ওয়াজিব নয়। আল্লাহ্পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'লা ইউকাল্লিফুল্লহু নাফসান ইল্লা উসআ'হা (আল্লাহ্ কাউকে সাধ্যাতীত নির্দেশ পালনে বাধ্য করেন না)। সুতরাং হিজরত তাদের প্রতি অত্যাবশ্যকীয় নয়— যারা বয়োবৃদ্ধ, কঠিন রোগে আক্রান্ত, চলচ্ছক্তিহীন, বাহনবিহীন অথবা এমন ব্যক্তি যে পরিবার পরিজনসহ হিজরত করার সামর্থ রাখে

www.eelm.weebly.com

না। অর্থাৎ যে একা হিজরত করলে তার পরিবার পরিজন হয়ে পড়ে অভিভাবকহীন। বিপদগ্রস্ত। আয়াতে উল্লেখিত 'অসহায় পুরুষ' বলতে এদেরকে বুঝানো হয়েছে। নারী ও শিশুরাও অক্ষমদের অন্তর্ভুক্ত। শিশুদের উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে, হিজরত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। অভিভাবকগণ যদি সামর্থ রাখে তবে শিশুদেরকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করবে। আর শিশুরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদেরকে নিজ উদ্যোগে হিজরত করতে হবে।

আয়াতে ক্রীতদাসদেরকে অক্ষমদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাই তাদের উপর হিজরত ওয়াজিব। মনিব তাদেরকে বাধা দিতে পারবে না। কারণ, হুকুমটি ফরজে আইন। এই ফরজ প্রতিপালনে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারে না।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক, হজরত ইউনুস বিন বুকাইর থেকে বর্ণনা করেছেন, তায়েফ অবরোধের সময় রসুল স. এর পক্ষ থেকে একজন আহ্বানকারী এই মর্মে আহবান জানিয়েছিলেন যে, যারা দূর্গ থেকে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে সম্মিলিত হবে— তারা মুক্ত। এই আহবান শুনে দশ জনের অধিক লোক দূর্গ থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। হাফেজ মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী শাফেয়ী তাঁর 'সাবিলির রাশাদ' পুস্তকে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন ঘোষণা দিয়েছিলেন— গোলামদের মধ্যে যারা আমাদের কাছে আসবে তারা আজাদ হয়ে যাবে। এই ঘোষণা শুনে কয়েকজন গোলাম দূর্গ থেকে বের হয়ে এলেন। রসুল স. তাঁদেরকে মুক্ত করে দিলেন। হজরত আবু বকরাও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। বোখারী ও মুসলিমে এই বর্ণনাটি উল্লেখিত হয়েছে হজরত ওসমান নাহদী থেকে। হজরত সা'দ বলেছেন, আবু ওসমান নাহদী ছিলেন আল্লাহ্‌র পথের প্রথম তীর নিক্ষেপকারী। তখনকার মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। আর ছিলেন হজরত আবু বকরাও। তিনি ছিলেন ওই দলের তেইশতম ব্যক্তি। তায়েফবাসীরা এই ঘটনায় খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলো। প্রচণ্ড রুষ্ট হয়েছিলো হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া ক্রীতদাসদের প্রতি। রসুল স. মুক্তিপ্রাপ্তদেরকে একজন একজন করে একেকজন সাহাবীর দায়িত্বে অর্পণ করলেন এবং এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যেনো তাদেরকে দেখাশুনা করে, তাদের বাহনে উঠিয়ে নেয় এবং কোরআন ও ধর্মীয় বিধিবিধান শিক্ষা দেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে মুক্তিপ্রাপ্তদের প্রাক্তন অধিকর্তা বনী সাকিফ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা তখন রসুল স. এর নিকট তাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া গোলামদেরকে ফেরত চেয়েছিলেন। রসুল স. বলেছিলেন, আল্লাহ্ তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং তাদেরকে আর অধিকারভূত করতে যেয়ো না। হারেস বিন কালাদাও ছিলেন ওই নিবেদনকারীদের মধ্যে একজন।

যারা হিজরত করতে অক্ষম, তারা যেহেতু উপায়হীন, পাথেয়বিহীন, পথ ও পথপ্রদর্শকহীন—তাই খুব সম্ভব আল্লাহ্ পাক তাদেরকে মার্জনা করবেন। পরের আয়াতে অক্ষমদেরকে নিশ্চিত ক্ষমা প্রদানের সুসংবাদ না দিয়ে বলা হয়েছে—

www.eelm.weebly.com

'হয়তো' অর্থাৎ 'খুব সম্ভব'। এই বাকভঙ্গিমার মাধ্যমে এ কথাটি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, হিজরতের গুরুত্ব যেনো অক্ষমেরাও অনুধাবন করতে সচেষ্ট থাকে। ধ্যান ও চিন্তা হিজরতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে তারাও যেনো সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে।

সবশেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। সুতরাং অক্ষমেরা ক্ষম্য।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যারা হিজরত করতে সমর্থ ছিলেন না তাঁদের মধ্যে আমার মা ও আমিও ছিলাম। আমাদের জন্য রসুল স. নামাজের পর দোয়া করতেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, তখন ইশার নামাজের শেষ রাকাতে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলার পর রসুল স. বলতেন, হে আল্লাহ্! তুমি আয়েশা বিন আবী রবিয়াকে মুক্ত করো, হে আল্লাহ্ ! তুমি ওলিদ বিন ওলিদকে নিষ্কৃতি দাও। হে আল্লাহ! সালমা বিন হিশামকে তুমি অব্যাহতি দান করো। হে আল্লাহ, বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অসহায় তাদেরকে পরিত্রাণ দাও। হে আল্লাহ মোজার গোত্রের প্রতি তুমি কঠোর হও (তাদের বিনাশ সাধন করো)।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১০০

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

❒ কেহ আল্লাহের পথে দেশ ত্যাগ করিলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করিবে এবং কেহ আল্লাহ্ ও রসূলের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী হইয়া বাহির হইলে এবং তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার পুরস্কারের ভার আল্লাহের উপর; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আলী বিন আবু তালহা বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, এখানে উল্লেখিত 'মুরাগামান' শব্দটির অর্থ হিজরতের স্থান। অথবা গন্তব্যস্থল। শব্দটি এসেছে 'রিগম' থেকে। 'রিগম' অর্থ মৃত্তিকা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'মুরাগামান' অর্থ এমন পথের সন্ধান লাভ যা আপন সম্প্রদায়ের নাসিকা ধূলিধূসরিত করে দেয়। অর্থাৎ দেশত্যাগের যে পথ স্বসম্প্রদায়ের মতবিরুদ্ধ। মুজাহিদ বলেছেন, মুরগামান অর্থ প্রবৃত্তিবিরুদ্ধ নির্দেশে স্থানান্তরে গমন। আবু উবাইদা বলেছেন, দেশান্তরে গমনের স্থান। অর্থাৎ এ কথা বুঝানো যে, আমি স্বদেশ ত্যাগ করেছি। কামুস অভিধানে রয়েছে মুরাগামান অর্থ পরিত্যাগ,

www.eelm.weebly.com

দূরগমন। 'মুরাগাম' অর্থ গন্তব্যভূমি, আশ্রয় গ্রহণের স্থান অথবা শরণ প্রার্থনার স্থান।

'ওয়াসায়্তা' অর্থ জীবনোপকরণের কিংবা উপার্জনের নিশ্চিন্ততা। অথবা প্রচারের জন্য বক্ষদেশের প্রশস্ততা।

এই আয়াতের প্রথমেই হিজরতকারীদের বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্যের শুভসমাচার দেয়া হয়েছে। বাগবী লিখেছেন, শুভসমাচারটি অবতীর্ণ হলে বনী লাইস নামক জনপদের এক অতিবৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তি বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি এখন আর দুর্বল নই। আমি হিজরত করতে সক্ষম। দেশত্যাগের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা আমার আয়ত্বে। মদীনা কিংবা মদীনা অপেক্ষা দূরবর্তী স্থানে গমনের জন্য আমার নিকটে রয়েছে প্রয়োজনীয় পাথেয়। আল্লাহ্পাক যদি ইচ্ছা করেন তবে আমি আজ রাতেই মক্কা ছেড়ে চলে যাবো।

ওই অতিবৃদ্ধ ব্যক্তির নাম জুনদা, বিন জুমরাহ্। তিনি তাঁর কথামতো ওই রাতেই মদীনার পথে যাত্রা করলেন। তানয়ীম নামক স্থানে পৌঁছে তিনি বুঝলেন, তাঁর মৃত্যুকাল সন্নিকটবর্তী। তিনি তখন আনন্দে দুই হাতে তালি বাজিয়ে বলে উঠলেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি এবং তোমার রসুলের জন্যই আমার এই প্রচেষ্টা। আমি তোমার সঙ্গে ওই অঙ্গীকারে আবদ্ধ, যে অঙ্গীকার করেছেন তোমার রসুল। এ কথা বলার অল্পক্ষণ পরেই তিনি পৃথিবী পরিত্যাগ করলেন। মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে গেলো মদীনায়। সাহাবীগণ বলাবলি করলেন, সে যদি মদীনায় পৌঁছুতে পারতো তবে তাঁর হিজরতের পূর্ণ পুণ্য লাভ হতো। মক্কার মুশরিকেরা তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে হাসাহাসি করতে শুরু করলো। বললো, হায়— তার মনের আশা আর পূরণ হলো না।

ইবনে আবী হাতেম ও আবু ইয়া'লী উত্তমসূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত জুমরাহ্ বিন জুনদুব হিজরতের উদ্দেশ্যে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। গৃহবাসীদেরকে বললেন, আমাকে একটি বাহনে বসিয়ে দাও। শিরিক প্রভাবিত এই স্থান থেকে আমাকে আমার রসুল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। গৃহবাসীগণ তাঁকে মদীনার দিকে নিয়ে চললেন। পথিমধ্যে তিনি ইন্তেকাল করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আয়াতের পরবর্তী অংশটি— 'কেউ আল্লাহ্ ও রসুলের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী হয়ে বের হলে এবং তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্র উপর; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'—এ কথার অর্থ হিজরতের স্থানে না পৌঁছুতে পারলেও ওই ব্যক্তি পুণ্য লাভ করবে। তাকে পুণ্য প্রদান আল্লাহ্পাক অত্যাবশ্যকীয় করে নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্পাকের প্রতি কোনো কিছুই অত্যাবশ্যকীয় নয়। তিনি অবশ্যই অত্যাবশ্যকতা থেকে পবিত্র। কিন্তু তিনি যে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাই তিনি তাঁর দয়া ও ক্ষমার কারণে ওই পুণ্যাভিসারীকে পুরস্কৃত করার দায়িত্ব নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের থেকে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, আবু জুমরাহ্ নামক এক অন্ধ ব্যক্তি মক্কায় বসবাস করতেন। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ

www.eelm.weebly.com

হলো তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে পড়েছে আমার উপর। আর এই নির্দেশ প্রতিপালনের ক্ষমতাও আমার রয়েছে। এই বলে তিনি হিজরতের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং অনতিবিলম্বে যাত্রা শুরু করলেন মদীনার দিকে। কিন্তু তানয়ীম নামক স্থানে পৌঁছে মৃত্যুবরণ করলেন তিনি। তখন আয়াতের পরবর্তী অংশটি অবতীর্ণ হলো। এই ঘটনাটি হজরত জোবায়ের থেকে ইবনে জারীর এবং হজরত ইকরামা থেকে কাতাদা, সুদ্দী এবং জুহাকও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্ণনাগুলোতে ওই হিজরতকারীর বিভিন্ন নাম বর্ণিত হয়েছে। কেউ বলেছেন, পথিমধ্যে মৃত্যুবরণকারী ওই বৃদ্ধ ব্যক্তির নাম জুমরাতা বিন আইস, কেউ বলেছেন আইস বিন জুমরাহ্‌। কেউ বলেছেন জুনদুব বিন জুমরায়ে জুনদায়ী। আবার কেউ বলেছেন, জুমারী। কারো নিকট তিনি ছিলেন বনী জুমরাহ্‌'র এক ব্যক্তি, কারো নিকট বনী খাজায়ার অন্তর্ভুক্ত, কারো নিকট বনী লাইস, কারো নিকট বনী কেনানা এবং কারো নিকট বনী বকর।

তব্‌কাত গ্রন্থে ইয়াজিদ বিন আবদুল্লাহ্‌ বিন কাসিদ থেকে ইবনে সা'দ লিখেছেন, জুনদাহ বিন জুমাইরা জামেরী দুমরী জুনদায়ী ছিলেন মক্কার অধিবাসী। তিনি তাঁর পুত্রদেরকে বললেন, আমাকে মক্কা থেকে বের করে নিয়ে চলো। পুত্রগণ বললেন, কোথায়? তিনি ইশারায় জানালেন, মদীনায়। পুত্রগণ তাঁকে নিয়ে চললেন। এজায়াতে বনী আম্মারায় পৌঁছলে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। এই উপলক্ষে অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। ইবনে মান্দা থেকে ইবনে আবী হাতেম এবং হিশাম বিন ওরওয়া থেকে বাওয়ার্দী বর্ণনা করেছেন, হজরত জোবায়ের বিন আওয়াম বলেছেন, খালিদ বিন হিশাম হিজরতের উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে একস্থানে তিনি সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ওই ঘটনাটিকে লক্ষ্য করে।

আমুবী তাঁর মাগাজী গ্রন্থে হজরত আবদুল মালেক বিন ওমায়ের সূত্রে লিখেছেন, রসুল পাক স.এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির সংবাদ শুনতে পেয়ে আকতাম বিন সাইফি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বাধা দিলো। কারণ, তিনি ছিলেন দুর্বল। আকতাম বললেন, তবে তোমরা আমার জন্য এমন লোক নিযুক্ত করে দাও, যে আমার কথা রসুলের নিকট এবং রসুলের কথা আমার নিকট পৌঁছে দেয়। তাঁর কথামতো তখন দৌতকর্মে নিযুক্ত করা হলো দুই ব্যক্তিকে। তাঁরা রসুল স. এর দরবারে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আকতাম বিন সাইফির দূত। আকতাম আপনার পরিচয় জানতে চেয়েছেন। আরো জানতে চেয়েছেন, আপনি কোন ধর্ম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। রসুল স. বললেন, আমি আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসুল। অতঃপর তিনি স. 'ইন্নাল্লহা ইয়া'মুরু বিল আদ্‌লি ওয়াল ইহ্‌সান (নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাক হুকুম দিয়েছেন অনুগ্রহ, ন্যায়বিচার.....)'— এই আয়াত শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। দূতদ্বয় ফিরে গিয়ে আকতামকে এ সকল কথা জানালো। আকতাম তখন সকলকে ডেকে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! রসুল মোহাম্মদ স. উত্তম

www.eelm.weebly.com

চরিত্র গঠনের নির্দেশ দিয়ে থাকেন এবং অসুন্দর কথা ও কর্ম থেকে নিবৃত্ত করেন। সুতরাং, তোমরা আর মাথা গুঁজে থেকো না (সবার আগে ইমান আনো—এমন যেনো না হয় যে, ইমানে অন্যেরা অগ্রবর্তী আর তোমরা অনুবর্তী)। এ কথা বলে আকতাম উষ্ট্রারোহী হয়ে মদীনার দিকে চললেন। কিন্তু পথিমধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি। তাঁর সম্পর্কে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণনাটি মুরসাল এবং এর সনদ অদৃঢ়।

আবু হাতেম তাঁর কিতাবুল মুয়াম্মারাইন নামক পুস্তকে দুইভাবে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আকতাম বিন সাইফির সম্পর্কে। লোকেরা বলেছিলো, তবে যে বলা হয় আয়াতটি নাজিল হয়েছে লাইসী সম্পর্কে? তিনি তখন বলেছিলেন, এই ঘটনাটি ছিলো লাইসীর এক বৎসর পূর্বের। আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দিক থেকে বিশিষ্ট এবং হুকুমের দিক থেকে সাধারণ।

জ্ঞাতব্যঃ আলেমগণ বলেন— হিজরত অর্থ জ্ঞানান্বেষণ, হজ ও জেহাদ অথবা বৈধ জীবনোপকরণের জন্য এমন শহরে যাত্রা যেখানে রয়েছে আল্লাহ্‌র আনুগত্য, এবং ধর্মীয় উন্নতির সুযোগ। সেই স্থানের উদ্দেশ্যে হিজরতকারী পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করলেও (গন্তব্যে পৌঁছেতে না পারলেও) আল্লাহ্‌র দায়িত্বভূত হয়ে যায়।

হজরত আলী থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, বনী নাজ্জারের কতিপয় ব্যক্তি রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমরা সফরের সময় কিভাবে নামাজ আদায় করবো? তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১০১

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ
إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا
مُبِينًا ۝

❑ এবং তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করিবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমাদের জন্য ফিত্না সৃষ্টি করিবে তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করিলে তোমাদের কোন দোষ নাই। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

কামুস অভিধানে রয়েছে 'জুনাহুন' অর্থ পাপ। আয়াতের সরল বক্তব্য হচ্ছে, সফরের সময় কাফেরদের আক্রমণের আশংকা থাকলে নামাজ সংক্ষিপ্ত বা কসর করায় দোষ নেই। কসর অর্থ চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ দুই রাকাতের মধ্যে

www.eelm.weebly.com

সম্পন্ন করা। ঐকমত্যসঞ্জাত অভিমত এই যে, তিন বা দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজের কসর হয় না। সুতরাং বুঝতে হবে আয়াতে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ দুই রাকাত বিশিষ্ট করে পড়তে বলা হয়েছে।

কতিপয় প্রতর্ক—১ঃ অনুমোদিত সফরের সময়সীমা কতদূর, ইতোপূর্বে এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা সুরা বাকারায় করা হয়েছে। ওই আলোচনাটি ছিলো সফরে রোজা রাখা না রাখা সম্পর্কে।

প্রতর্ক—২ঃ সফরে নামাজ কসর না করা কি বৈধ? ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং তাঁদের সুহৃদগণের নিকট কসর না করা বৈধ নয়। বাগবী লিখেছেন, এ রকম আমল করতেন হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত জাবের। হাসান বসরী, ওমর বিন আবদুল আজিজ এবং কাতাদাও এই অভিমতের অনুসারী। এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকও এ রকম বলেছেন। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম মালেকের প্রখ্যাত উক্তি এই যে, ভ্রমণাবস্থায় কসর না করে পূর্ণ নামাজ পড়া জায়েয। বাগবী লিখেছেন, এ রকম আমলে অভ্যস্ত ছিলেন হজরত ওসমান গণি এবং হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস। আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্য দৃষ্টে ইমাম শাফেয়ী কসর না করাকে জায়েয বলেছেন। কারণ এখানে বলা হয়েছে, 'সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোনো দোষ নাই'। যদি কসর না করা অবৈধ হতো তবে বক্তব্যটি হতো সরাসরি (সফরে পুরো নামাজ পোড়ো না—কসর কোরো—এ ধরনের)। হজরত আয়েশা বলেছেন, রসুল স. ভ্রমণের সময় কখনও কসর করতেন। আবার কখনো পুরো নামাজ পড়তেন। তেমনি কখনো রোজা রাখতেন, কখনো রোজা পরিত্যাগ করতেন। শাফেয়ী, ইবনে আবী শায়বা, বায্যার, দারা কুতনী। দারা কুতনী বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রসংবলিত। কিন্তু এই সূত্রসংশ্লিষ্ট মুগীরা বিন জিয়াদ সম্পর্কে (যিনি আতা বিন রিবাহ্ এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন) আপত্তি রয়েছে। ইমাম আহমদ তাঁকে দুর্বল বলেছেন এবং আবু জারআ তার বর্ণনাকে প্রামাণ্য বলে মনে করেননি। এই হাদিসটি আবার হজরত আতা থেকে ওমর বিন সা'দের মাধ্যমে ইবেন জাওজী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—যার সূত্রশৃংখলে মুগীরার নাম নেই। তাছাড়া মুগীরাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন ওয়াকি' এবং ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন।

আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আয়েশা বলেছেন, আমি রমজানে ওমরা করার সময় রসুল স. এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন রোজা রাখেননি, আমি রেখেছি। তিনি স. নামাজে কসর করেছিলেন, আমি করিনি। আমি তখন বলেছিলাম, আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা কোরবান। আপনি রোজা রাখলেন না, আমি রাখলাম। আপনি নামাজ সংক্ষেপ করলেন, আর আমি পড়লাম পুরো নামাজ। তিনি স. বললেন, আয়েশা তুমি উত্তম কর্ম করেছো। নাসাঈ, দারা কুতনী। দারা কুতনী বলেছেন, হাদিসটি উত্তম। বায়হাকী বলেছেন, বিশুদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আবার এই আপত্তিটি উত্থাপিত হয়েছে যে, আবদুর রহমান বিন

www.eelm.weebly.com

আসওয়াদ হজরত আয়েশার খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন অতি শৈশবে। আর তিনি তখন হজরত আয়েশা থেকে কোনো হাদিস শোনেননি। দারা কুতনী বলেছেন, তিনি হজরত আয়েশার খেদমতে উপনীত হয়েছিলেন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কাছাকাছি সময়ে। তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি সাহায্য গ্রহণ করেছেন বোখারীর ইতিহাস ইত্যাদির দ্বারা। তারপর বলেছেন, আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ এই হাদিসটি তাঁর পিতার মাধ্যমেও বর্ণনা করেছেন। এ রকম বলে দারা কুতনী হাদিসটির দু'রকম সূত্রের অবতারণা করেছেন। একটি বর্ণনা মুসনাদ, অপরটি মুরসাল। আল ইয়াসীর গ্রন্থে মুসনাদকে বলা হয়েছে বিশুদ্ধ এবং এলাল গ্রন্থে মুরসালকে করা হয়েছে সন্দেহযুক্ত। এখানে এই মর্মে আরেকটি আপত্তি রয়েছে যে, ঐতিহাসিকদের ঐকমত্যানুসারে রসুল স. কখনো রমজানে ওমরা করেননি। দারা কুতনীর এই বর্ণনা ছাড়া অন্য কোনো বর্ণনায় রমজানের ওমরার কথা আসেনি। আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত।

ইমাম আবু হানিফার দলিল হচ্ছে—ইয়া'লী বিন উমাইয়া বলেছেন, আমি হজরত ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, অবিশ্বাসীদের আক্রমণের আশংকা থাকলে সফরে নামাজ সংক্ষেপ করাতে দোষ নেই। তবে কি আক্রমণের আশংকা না থাকলে নামাজ সংক্ষেপ করা যাবে না? হজরত ওমর বললেন, আমিও রসুল স.কে এ রকম প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি স. বলেছিলেন, এটা হচ্ছে আল্লাহ্র সদকা। তোমরা এই সদকা (দান) গ্রহণ করো। মুসলিম।

যেখানে দানের মাধ্যমে কাউকে দানকৃত বস্তুর মালিক করা যায় না সেখানে সদকা অর্থ হবে রহিত করে দেয়া। এখানেও নামাজ সংক্ষেপ করার এই দানের মাধ্যমে কাউকে কোনো বস্তুর মালিক করা হয়নি। তাই এ কথা নিশ্চিত যে, এখানে দুই রাকাত নামাজকে রহিত করে দেয়াই হবে দানের উদ্দেশ্য। আর আল্লাহ্র দিক থেকে যে হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে, তা করা নাজায়েয অর্থাৎ কসর না করা নাজায়েয। লক্ষণীয় যে, দাবীদারেরা মাফ করে দিলে কিসাস রহিত হয়ে যায় (রহিত কিসাস পুনরায় কার্যকর করা যায় না)। আর বিত্তশালী দাতার অনুসরণ ওয়াজিব (তবে মহাশক্তিধর দাতা আল্লাহ্তায়ালার দান অবশ্যমান্য হবে না কেনো)!

বনী আবদুল্লাহ্ বিন কা'ব গোত্রভূত আনাস বিন মালেক একটি মাত্র হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর আর অন্য কোনো বর্ণনার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি বলেছেন, একবার রসুল স. এর সঙ্গীরা আমাদের উপর হামলা করলেন। আমি তৎক্ষণাৎ রসুল স. এর খেদমতে হাজির হলাম। দেখলাম, তিনি স. দ্বিপ্রহরের আহার সম্পন্ন করছেন। আমাকে দেখে বললেন, এসো আহার করো। বললাম, আমি রোজা রেখেছি। তিনি স. বললেন, কাছে এসো। আমি তোমাকে রোজা সম্পর্কে একটি কথা বলবো। আমি নিকটে গেলে তিনি স. বললেন, আল্লাহ্পাক মুসাফিরদের জন্য নামাজ ও রোজার অর্ধেক অংশ রহিত করে দিয়েছেন। তেমনি রহিত করে দিয়েছেন দুগ্ধদাত্রী ও গর্ভধারিণীদের রোজা। আনাস আরো বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

আক্ষেপ! আমি রসুল স. এর আহার্য্য ভক্ষণ করতে পারলাম না। ইবনে জাওজী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজির নিয়মে। ইমাম শাফেয়ী এই হাদিসটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—এখানে রোজা ও নামাজের কথা এক সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। সফরে মুসাফিরের রোজা ঐকমত্যসূত্রে জায়েয—ওয়াজিব নয় (কাজেই সফরের সময় নামাজ সংক্ষেপ করা জায়েয, ওয়াজিব নয়)।

'ওয়াদ্বিয়া' শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো রহিত করে দেয়া। এই একই শব্দ সফরের নামাজ ও রোজার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ সফরে রোজা রাখা না রাখা উভয়টিই বৈধ। সুতরাং রোজার ক্ষেত্রে এই শব্দটির রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হবে। আর নামাজের ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে হবে প্রকৃত অর্থ (ওয়াজিব)। কিন্তু প্রকৃত (হাকিকি) এবং রূপক (মাজাজী) একই বাক্যে একত্র করা রীতিবিরুদ্ধ। তাই হজরত ওমর বর্ণিত হাদিসে কেবল নামাজের কথাই উল্লেখিত হয়েছে এভাবে—রসুল স. আজ্ঞা করেন—সফরে নামাজ দুই রাকাত, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাজ দুই রাকাত এবং জুমআর নামাজ দুই রাকাত। নাসাঈ, ইবনে মাজা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্পাক তোমাদের নবীর উপর স্বগৃহে বসবাসের সময় চার রাকাত, ভ্রমণাবস্থায় দুই রাকাত এবং ভীতির সময় এক রাকাত নামাজ ফরজ করেছেন। মুসলিম।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বলেছেন, নামাজ প্রথমে দুই রাকাতই ফরজ করা হয়েছিলো। পরে ভ্রমণাবস্থায় ওই দুই রাকাতই নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে এবং গৃহবাসের সময় আরো দুই রাকাত সংযোজিত হয়েছে। বোখারী, মুসলিম।

জুহরী বলেছেন, আমি হজরত ওরওয়ার নিকট জিজ্ঞেস করলাম, মাতা আয়েশা সফরে পুরো নামাজ পড়তেন কেনো? তিনি বললেন, মাতা সাহেবা হজরত ওসমানের অভিমতের ভাবার্থ অনুযায়ী এ রকম করতেন। তাই বোখারীর বর্ণনায় তিনি এ কথা বলেছেন যে, প্রথমে নামাজ দুই রাকাত ফরজ করা হয়েছিলো। হিজরতের পরে গৃহবাসের সময় চার রাকাত করা হয়েছে। কিন্তু ভ্রমণাবস্থায় দুই রাকাতই নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে।

হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমি দেখেছি, রসুল স. পৃথিবী থেকে প্রস্থানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সফরের সময় দুই রাকাতের অধিক নামাজ পড়েননি। আমি হজরত ওমর এবং হজরত ওসমানকেও দুই রাকাতের বেশী পড়তে দেখিনি। স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, 'লাক্বদ কানালাকুম ফি রসুলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা (নিশ্চয়ই রসুলুল্লাহ স. এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ)। বোখারী।

সহিহাইনে (বোখারী ও মুসলিমে) হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমি রসুল স. এর সঙ্গে ছিলাম, তিনি সফরের সময় দুই রাকাতের বেশী নামাজ পড়তেন না। হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং হজরত ওসমানকেও আমি এ রকম করতে দেখেছি। সহিহাইনে আরো বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, মিনা প্রান্তরে রসুল স. দুই রাকাত নামাজ পড়েছেন। পরে হজরত আবু

www.eelm.weebly.com

বকর এবং হজরত ওমরও তাঁদের খেলাফতকালে এ রকম করেছেন। কিন্তু হজরত ওসমান তাঁর খেলাফতের প্রথম দিকে এ রকম করলেও পরে চার রাকাত নামাজ পড়েছেন।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ওসমান যখন মিনায় চার রাকাত নামাজ পড়লেন তখন জনতা আপত্তি উত্থাপণ করলো। তিনি বললেন, হে সমবেত জনতা! আমি এখন মক্কায় গৃহবাসী (মুসাফির নই)। আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো শহরে গৃহবাসী হয়, সে গৃহবাসীদের মতোই পুরো নামাজ পড়বে। লক্ষ্যণীয় যে, সফর অবস্থায় পুরো নামাজ পড়া যায় না। যদি যেতো তবে জনতা আপত্তি উত্থাপন করতো না এবং হজরত ওসমানও আপত্তির যথাউত্তর দিতেন না।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হজরত ওমর বিন খাত্তাবের বর্ণনায় রয়েছে, সফরের নামাজ দুই রাকাত—এ কথার অর্থ দুই রাকাত নামাজ পড়লে কোনো ক্ষতি নেই। বরং পুরো সওয়াবই পাওয়া যাবে। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, নামাজ আসলেই দুই রাকাত এবং সফরে পুরো নামাজ পড়া যাবেই না। যদি এ রকমই হতো তবে আয়াতে নির্দেশমূলক বক্তব্য থাকতো। 'সংক্ষিপ্ত করলে দোষ নেই'— এ রকম বলা হতো না। আয়াতের বক্তব্য সফরের নামাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। সুতরাং কোনো একক বর্ণিত হাদিস মারফু হওয়া সত্ত্বেও কোরআনের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল না হলে পরিত্যাজ্য হবে।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাটি তো ঐকমত্যসূত্রে পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। কেননা তিনি বলেছেন, ভীতির সময়ে নামাজ পড়তে হবে এক রাকাত (অথচ কোনো নামাজই এক রাকাত হয় না)। হজরত আয়েশার বর্ণনাটিও আমলে আনা যায় না। কারণ, তাঁর বর্ণনা এবং আমলের মধ্যে সামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয় না। তিনি সফরের সময় পুরো নামাজ পড়তেন এবং তিনি যে এর অনুমতিপ্রাপ্ত সে কথাও বলেছেন। তাই 'সফরের নামাজ প্রথম অবস্থায় রাখা হয়েছে'—তাঁর এ কথার অর্থ যে দুই রাকাত নামাজ পড়তে চায়, সে দুই রাকাতই পড়তে পারবে। পুরো নামাজ পড়ার কষ্ট আর তাকে করতে হবে না।

হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনাটি নেতিবাচক। আর জননী আয়েশার বর্ণনাটি ইতিবাচক (হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, দেখিনি এবং জননী আয়েশা বলেছেন, দেখেছি)। তাই জননী আয়েশার বর্ণনাটিকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, হজরত ইবনে ওমরের 'দুই রাকাতের অতিরিক্ত করেননি'— কথাটির প্রকৃত অর্থ অধিকাংশ সময় তিনি স. দুই রাকাতের অতিরিক্ত করেননি (কোনো কোনো সময় হয়তো করেছেন)। হজরত ইবনে ওমর শেষে এ কথাও বলেছেন যে, হজরত ওসমান তাঁর খেলাফতের প্রথম দিকে দুই রাকাতই পড়তেন। পরে পড়েছেন চার রাকাত। তাঁর ওই বর্ণনায় জনতার আপত্তির কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাই প্রমাণিত হয়েছে যে, সফরে দুই রাকাত অথবা চার রাকাত পড়া যাবে (দুই রাকাত ওয়াজিব হবে না)। তাঁর বর্ণনার শেষে

www.eelm.weebly.com

'নিশ্চয় রসুলুল্লাহ্ স. এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ'—এই আয়াতটির মাধ্যমেও কসর ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না বরং প্রমাণিত হয় যে, এ রকম করা উত্তম। এ কথাও বলা যায় যে, হজরত ওসমানের বিরুদ্ধে জনতা কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তিটি ছিলো উত্তমতা পরিত্যাগ করার কারণে (ওয়াজিব তরক করার কারণে নয়)। ইমাম আবু হানিফা এ ক্ষেত্রে একটি যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, কসরের নামাজের শেষ শোফা (দুই রাকাত নামাজকে একত্রে বলে শোফা) বাদ দিলে গোনাহ্গার হতে হবে না। তাই প্রমাণিত হয় যে, প্রথম শোফা ফরজ এবং শেষ শোফা নফল। রোজার অবস্থা কিন্তু এ রকম নয়। সফরের পরিত্যক্ত রোজার পরে কাযা আদায় করা ওয়াজিব। দরিদ্রের হজের অবস্থা আবার পৃথক প্রকৃতির। দরিদ্র ব্যক্তির উপর হজ যদিও ওয়াজিব নয়, কিন্তু সে যদি মিকাতের সীমানায় প্রবেশ করে, তবে তাঁর উপর হজ ফরজ হয়ে যাবে।

ইচ্ছা করা না করার বিষয়টি তো ওই সময় পালনীয় হয়, যখন দু'টি আমলের যে কোনো একটিকে সহজসাধ্য বলে গ্রহণ করার সুযোগ থাকে। যেমন মুসাফিরের রমজানের রোজা। মুসাফিরেরা রমজানের রোজা রাখতেও পারে। ছেড়েও দিতে পারে।

জুমআ এবং জোহরের নামাজের মধ্যেও মুসাফিরেরা সহজসাধ্য আমলটিকে বেছে নিতে পারবে। জুমআর নামাজ দুই রাকাত— কিন্তু জুমআর নামাজে কতিপয় অতিরিক্ত শর্ত রয়েছে, যা জোহরের নামাজে নেই। অতএব জোহর (কসর) অধিকতর অভিপ্রেত। উল্লেখ্য যে, সহজসাধ্যতার দিকে দৃষ্টি রাখাই সমীচীন।

ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যের জবাবঃ সফরে নামাজ সংক্ষেপ করা না করার অধিকার দেয়া হলে দুটি নির্দেশের কারণ হতো পৃথক পৃথক। সংক্ষিপ্ত আমলের জন্য কম এবং সম্পূর্ণ আমলের জন্য বেশী সওয়াবের কথা আসতো। দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে নামাজের ক্বেরাতের (কোরআন পাঠের) কথা বলা যেতে পারে। সেখানে সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ— উভয় প্রকার ক্বেরাতের অনুমতি রয়েছে। সংক্ষিপ্ত ক্বেরাতের সঙ্গেও নামাজ আদায় হয়ে যাবে। এতোটুকুই ফরজের সীমা। কিন্তু কেউ ইচ্ছা করলে নফল (অতিরিক্ত) হিসেবে নামাজে পুরো কোরআন শরীফও পাঠ করতে পারবে। কিন্তু প্রকৃতিগত দিক থেকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত উভয় ক্বেরাতই ক্বেরাত পদবাচ্য। ক্বেরাত হিসাবে তাদের প্রকার এক।

তবে কি বলা যাবে, মুসাফির পুরো নামাজ পড়লে বেশী সওয়াব পাবে আর সংক্ষেপ করলে সে রকম সওয়াব পাবে না (শুধু ফরজ আদায় হয়ে যাবে) — যেমন ঐকমত্যসূত্রে নামাজে দীর্ঘ ক্বেরাত দ্বারা অধিক সওয়াব লাভ হয়? জবাব এই—সুন্নতসম্মত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক ক্বেরাত পাঠ করা ইমামের জন্য মাকরূহ, যদি মোক্তাদিরা তা অপছন্দ করে। একা একা নামাজ পড়লে অবশ্য অধিক ক্বেরাতই উত্তম। আর মোক্তাদিরা আগ্রহী হলে ইমাম অধিক কোরআন পাঠ

www.eelm.weebly.com

করতে পারবে এবং এতে সওয়াবও বেশী হবে। কিন্তু ঐকমত্যোৎসারিত অভিমত এই যে, সফরের সময় সম্পূর্ণ নামাজ পড়ার চেয়ে কসর পড়া উত্তম। ইমাম শাফেয়ী অবশ্য বলেছেন, সফরে পুরো নামাজ পড়াই উত্তম। কিন্তু পরে তিনি ওই অভিমত পরিত্যাগ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী 'কসর করাতে দোষ নেই'—আয়াতের এই নির্দেশনাকে ইচ্ছাধীন মনে করে ভুল করেছেন। বিষয়টি আসলে সে রকম নয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে—মানুষের মনে ভয় ছিলো, হয়তো নামাজ সংক্ষেপ করলে গোনাহ্ হয়ে যেতে পারে। তাদের এই মনোভাবের প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা দানের উদ্দেশ্যে বক্তব্যের ধরনটি এখানে হয়েছে এ রকম। বলা হয়েছে, তোমাদের আশংকা অমূলক। প্রশান্তচিত্তে তোমরা সফরের সময়ে নামাজে কসর করো—এ রকম করাতে দোষ নেই। অন্য একটি আয়াতেও এ রকম বাকভঙ্গির মাধ্যমে মুসলমানদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের অপনোদন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহ্র স্মৃতি নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র হজ কিংবা ওমরা সম্পন্ন করে তার জন্য সাফা মারওয়া প্রদক্ষিণ করায় দোষ নেই।'

মূর্খতার যুগেও মানুষ সাফা ও মারওয়া প্রদক্ষিণ করতো। তখন ওই দুই পাহাড়ে ছিলো দু'টি প্রতিমা। ইসলাম প্রবর্তনের পর সাফা ও মারওয়া প্রদক্ষিণ ওয়াজিব করে দেয়া হলো। এই হুকুম প্রতিপালন করতে মানুষ যেনো দ্বিধান্বিত না হয় (যেনো একে মূর্খতার যুগের নিয়ম ভেবে না বসে) —তাই বলা হলো 'লা জুনাহা' (কোনো পাপ নেই)। শাফেয়ীগণের পক্ষ থেকে অবশ্য এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, আয়াতটিতো তাহলে এখানে অকারণে পরিত্যাগ করা হচ্ছে। আল্লাহ্পাকই প্রকৃত পরিজ্ঞাতা।

প্রতর্ক—৩ঃ এই আয়াতের নিদের্শনা সাধারণ ও ব্যাপক। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, অবৈধ সফরেও নামাজে কসর করতে হবে। অন্য ইমামত্রয় অবৈধ সফরে নামাজ কসর করাকে জায়েয বলেননি। কিন্তু তাঁদের নিকট এমন কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই, যাতে করে তাঁদের অভিমতকে আয়াতের সাধারণ নির্দেশনার প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানো যায়।

প্রতর্ক—৪ঃ মুসাফির যখন জনবসতি থেকে বের হয়ে যাবে তখন কসর করবে। এ ব্যাপারে চার ইমামই একমত। অবশ্য এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেক বলেছেন, জনপদ থেকে তিন মাইল দূরে যাওয়ার পর কসর করবে। এক বর্ণনায় এ রকমও এসেছে যে, হারেস বিন রবিয়া ভ্রমণের সময় তাঁর আপন শহরেই দুই রাকাত নামাজ পড়েছেন। তখন সেখানে হজরত আসওয়াদ এবং হজরত আবদুল্লাহ্সহ তাঁর অনেক ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। মুজাহিদের বর্ণনায় এসেছে, দিনে সফর শুরু করলে রাত না আসা পর্যন্ত কসর করবে না। আর রাতে সফর শুরু করলে দিন আসার আগে কসর করবে না।

ইবনে আবী শায়বা বলেছেন, হজরত আলী বসরা থেকে বহির্গমনের প্রাক্কালে জোহরে নামাজ চার রাকাত পড়েছেন। তারপর বলেছেন, আমরা যদি এই শহর

www.eelm.weebly.com

থেকে বের হয়ে যেতাম তবে দুই রাকাত পড়তাম। তিনি প্রত্যাবর্তনের সময় শহরে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত কসর পড়তেন। আর শহরে প্রবেশ করার পরেই পড়তেন পুরো নামাজ। এই বিষয়টিও ঐকমত্যাশ্রিত। বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী সফরের পথে গৃহ থেকে বের হয়ে গেলেই কসর পড়তেন। অথচ তখনও তাঁর গৃহ থাকতো দৃষ্টিসীমার মধ্যে। সফর থেকে ফিরে আসার পরও তিনি এ রকম করতেন। অর্থাৎ বাড়ী নজরে এলেও কসর করতেন তিনি। লোকেরা বলেছিলো, কুফা তো এসেই গিয়েছে। তিনি তখন বলেছিলেন, নগরাভ্যন্তরে তো এখনও প্রবেশ করিনি।

সওরীর বর্ণনা থেকে আবদুর রাজ্জাক ওফা বিন আয়াশ আসাদীর উক্তি উল্লেখ করেছেন এ রকম— ওফা বলেন, আমরা হজরত আলীর সঙ্গে কুফা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম। নামাজের সময় হলো। হজরত আলী নামাজে কসর করলেন। সফর থেকে ফিরে আসার পরও এ রকম করলেন তিনি। অথচ তাঁর মহল্লা পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো। তবুও তিনি সেখানে কসর করলেন। আমরা নিবেদন করলাম, আমরা কি চার রাকাত পড়বো না? তিনি বললেন, না— যতোক্ষণ না গৃহে প্রবেশ করবে।

প্রতর্ক—৫ঃ সফরের সময় কেউ যদি কোনো শহরে অথবা গ্রামে চার দিন অবস্থানের নিয়ত করে, তবে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মতে তাকে চার রাকাত নামাজ পড়তে হবে। আর ওই চার দিনের মধ্যে শহরে প্রবেশ করার দিন এবং নিষ্ক্রান্ত হওয়ার দিন অন্তর্ভুক্ত হবে না। ইমাম আহমদ বলেছেন, যে মুসাফির বিশ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার সময় পর্যন্ত কোথাও অবস্থান করবে, তাকে সেই স্থানে পুরো নামাজ পড়তে হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোনো শহরে পনেরো দিন থাকার নিয়ত করলে মুসাফির আর মুসাফির বলে গণ্য হবে না। সে হয়ে যাবে মুকিম। সেখানে তখন তাকে পুরো নামাজ পড়তে হবে। কিন্তু অরণ্যে, বন্ধুগৃহে কিংবা কোনো তাঁবুতে অবস্থানকে এই নিয়মের মধ্যে ধরা যাবে না।

হানাফিদের দলিল এই—বিদায় হজের সময় ৪ঠা জিলহজ রবিবার রসুলুল্লাহ্ স. মক্কায় পৌঁছুলেন। ৮ই জিলহজ বৃহস্পতিবার তিনি উপস্থিত হলেন মিনায়। এই দিনকে বলা হয় তারবীয়ার দিন (আরাফায় গমনের উদ্দেশ্যে এই দিন হাজীরা তাদের উটকে প্রচুর পানি পান করান, যেনো হজ সম্পাদন পর্যন্ত তারা পিপাসার্ত না হয়— তাই এই দিনের নাম ইয়াওমে তারবীয়া বা তারবীয়ার দিন)। ৯ই জিলহজ সূর্যোদয়ের পর তিনি স. আরাফায় উপস্থিত হলেন। সারাদিন আরাফা প্রান্তরে অবস্থান করে রাতেই ফিরে এলেন মুজদালিফায়। এরপর মিনায় অবস্থান করে হজের অবশিষ্ট বিধানসমূহ পালন করলেন এবং বিদায় তাওয়াফ করে ৪ঠা জিলহজ সকালে মক্কা থেকে মদীনাভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। এভাবে মক্কায় তিনি স. অবস্থান করলেন পূর্ণ দশটি রাত। (মক্কায় চার দিন এবং বাকী সময় মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায়)। এই দশ দিনই তিনি স. নামাজে কসর করেছেন। এই ঘটনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, কোথাও চার দিন অবস্থানের নিয়ত করলে কসর করা যাবে না। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ীর অভিমতটি পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু ইমাম আহমদের এ সম্পর্কীয় অভিমতটি পরিত্যক্ত

www.eelm.weebly.com

হয়নি। কারণ তিনি বলেছেন, বিশ ওয়াক্ত নামাজের বেশী সময় কোথাও অবস্থান করলে তাকে পুরো নামাজ পড়তে হবে। কিন্তু রসুল স. মক্কায় মোট বিশ রাকাত নামাজই আদায় করেছেন। এর বেশী করেননি।

ইমাম আবু হানিফা সাহাবীগণের আসারকেও দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাহাবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, ভ্রমণাবস্থায় তোমরা কোনো শহরে যদি পনেরো দিন অবস্থানের নিয়ত করো, তবে পুরো নামাজ পড়ো। আর যদি তোমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হও যে, সেখানে কতোদিন অবস্থান করতে হবে, তবে কসর পড়তে থাকো— এভাবে যতো সময়ই অতিবাহিত হোক না কেনো।

মুজাহিদ থেকে ইবনে আবী শাইবা লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর কোথাও পনেরো দিন থাকার দৃঢ় সংকল্প করলে পূর্ণ নামাজ পড়তেন। ইমাম মোহাম্মদ তাঁর কিতাবুল আসারে লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আমাদের নিকট মুসা বিন মুসলিম মুজাহিদের এই বক্তব্যটি উপস্থাপন করেছেন যে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, মুসাফির অবস্থায় যদি তোমাদের কোথাও পনেরো দিন অবস্থান করতে হয়, তবে সেখানে তোমাদেরকে পুরো নামাজ পড়তে হবে। আর কবে সেখান থেকে যেতে হবে— সে কথা জানা না থাকলে কসর পড়তে হবে।

মাসআলাঃ কোনো শহরে প্রবেশের পর সেখানে অবস্থানের নিয়ত না থাকলেও কার্যোপলক্ষ্যে যদি আজ কাল করতে করতে কয়েকটি বৎসরও অতিবাহিত হয়ে যায়, তবুও কসর পড়তে হবে। এটাই জমহুরের অভিমত। এক বর্ণনানুযায়ী ইমাম শাফেয়ীও এই অভিমত পোষণ করেন। (অন্য বর্ণনানুসারে চৌদ্দ দিন পর্যন্ত কসর করার পর পঞ্চদশ দিবসে পুরো নামাজ পড়তে হবে)। কিন্তু তাঁর অধিকতর দৃঢ় অভিমত এই যে, সতেরো দিন কসর করবে। তারপর পড়বে পুরো নামাজ। কেননা হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর সঙ্গে সফর অবস্থায় তিনি সতেরো দিন কসর পড়েছেন। আমরাও তাই সতেরো দিন পর্যন্ত কসর করি এবং সতেরো দিনের অধিক হলে পুরো নামাজ পড়ি। তিরমিজি এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। কিন্তু এই হাদিসে সতেরো দিন কসর করার নিয়ম প্রমাণিত হয় না। হয়তো ওই সফরে রসুল স.কে সতেরো দিন অবস্থান করতে হয়েছিলো, যা ছিলো তাঁর পরিকল্পনার বাইরে। অষ্টদশ দিবসে তিনি স. পুরো নামাজ পড়েছেন—এ কথা ওই হাদিসে বলা হয়নি। এতে করে বুঝা যায়, তিনি স. যদি আরও অধিক দিবস অতিবাহিত করতেন তবুও হয়তো কসরই করতেন। কারণ, কতোদিন সেখানে অবস্থান করতে হবে সে বিষয়ে তিনি হয়তো নিশ্চিত ছিলেন না।

হজরত জাবের থেকে আহমদ ও আবু দাউদ লিখেছেন, তবুক যুদ্ধের সময় তিনি স. সেখানে বিশ দিন অবস্থান করেছেন এবং কসর করেছেন। স্বসূত্রে আবদুর রাজ্জাক লিখেছেন, আজারবাইজান নামক স্থানে হজরত ইবনে ওমর ছয় মাস কাটিয়েছেন এবং ছয় মাসই কসর করেছেন। বায়হাকীও বিশুদ্ধসূত্রে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

www.eelm.weebly.com

স্বসূত্রে তিনিও লিখেছেন— হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমরা মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে ছয় মাস আজারবাইজানে ছিলাম। প্রচণ্ড তুষারপাত আমাদেরকে পথরুদ্ধ করেছিলো। ওই সময় আমরা নামাজে কসর করেছি। বর্ণনাটিতে এ কথাও এসেছে যে, ওই সময় হজরত ইবনে ওমরের সঙ্গী সাহাবীগণও কসর করেছিলেন।

আবদুর রাজ্জাক লিখেছেন, হাসান বলেছেন, আমরা হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরার সঙ্গে কয়েক বৎসর যাবৎ পারস্য রাজ্যে ছিলাম। তিনি ওই সময় দুই নামাজকে একত্রিত করতেন না এবং দুই রাকাতের অতিরিক্ত নামাজও পড়তেন না। আবদুর রাজ্জাক এ সম্পর্কিত আরও একটি বর্ণনা এনেছেন হজরত আনাস বিন মালেক থেকে— যেখানে বলা হয়েছে, আমরা আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের সঙ্গে শাম দেশে দুই মাস ছিলাম। সেখানে আমরা দুই রাকাত করে নামাজ পড়েছি।

মাসআলাঃ যে মাঝি বা মাল্লা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও আসবাবপত্রসহ জাহাজে সফর করতে থাকে এবং যে শ্রমিক সারাক্ষণ সফরে থাকে, তাদেরকে কসর করতে হবে। ইমাম আহমদ ছাড়া অন্য তিন ইমাম এ কথা বলেছেন। কেবল ইমাম আহমদই বলেছেন, তাদেরকে কসর করতে হবে না।

মাসআলাঃ যারা কোনো স্থানের স্থায়ী অধিবাসী নয় (প্রান্তরে তাঁবু খাটিয়ে বসবাস করে)— অনেকেই তাদেরকে গৃহবাসী আখ্যায়িত করতে চাননি। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনা এই যে, তারা মুকিম (গৃহবাসী)। কেননা এ রকম স্থানান্তর দ্বারা গৃহবাসের বিধানটি বাতিল হতে পারে না।

মাসআলাঃ জমহুর বলেন, মুসাফির মুকিম ইমামের নামাজের কোনো অংশে শামিল হলে তাকে পুরো চার রাকাতই পড়তে হবে। ইমাম মালেক বলেছেন, সে যদি এক রাকাত পায় তবে তাকে পুরো চার রাকাতই পড়তে হবে। অন্যথায় পড়তে হবে না। ইসাহাক বিন রাহ্ওয়াইহ্ বলেছেন, মুকিম ইমামের অনুসারী হলেও মুসাফির কসরই পড়বে। হজরত মুসা বিন সালমা থেকে ইমাম আহমদ বলেছেন, আমরা হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে মক্কায় ছিলাম। তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমরা তো আপনাদের সঙ্গে নামাজ পড়লে পুরো চার রাকাতই পড়ি। আর আপনাদের সঙ্গে না পড়লে পড়ি দুই রাকাত। তিনি বললেন, এটাই ছিলো রসুল স. এর রীতি।

মাসআলাঃ গৃহবাসের সময় নামাজ কাযা হলে সেই কাযা নামাজ সফরে আদায় করতে হবে পুরোপুরি। ইবনে মুনজির বলেছেন, এতে কেউ দ্বিমত পোষণ করেছেন বলে আমার জানা নাই। তবে এক বর্ণনায় হাসান ও মাজানীর বক্তব্যরূপে এসেছে, সফরে সেই নামাজ কসর রূপেই পড়তে হবে। সফরে কোনো নামাজ কাযা হলে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেকের নিকট গৃহবাসের সময় সেই নামাজ পড়তে হবে কসররূপেই। ইমাম শাফেয়ীও এ রকম বলেছেন। ইমাম আহমদ বলেছেন, আদায় করতে হবে পুরো নামাজ। আর এটাই ইমাম শাফেয়ীর বিশুদ্ধ অভিমত।

মাসআলাঃ ইমাম মুসাফির এবং মোক্তাদী মুকিম হলে ইমাম দুই রাকাত পড়বে এবং মুকিম তার নামাজ পুরো করবে। ঐকমত্যাগত সিদ্ধান্ত এটাই।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইমরান বিন হোসাইনের বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্ স. এর সঙ্গে একই বাহনে আরোহণ করে জেহাদ করেছি। মক্কাবিজয়ের সময়েও আমি তাঁর স. এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি স. মক্কায় তখন আট রাত অতিবাহিত করেছিলেন। ওই সময় আমরা দুই রাকাত পড়তে থাকি। এ রকম করতে দেখে রসুল স. বলেছিলেন, হে আহলে মক্কা, তোমরা চার রাকাত পড়ো। আর আমরা তো মুসাফির। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বিশুদ্ধসূত্রে।

'যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমাদের জন্য ফেত্না সৃষ্টি করবে'—এ কথার অর্থ, যদি তোমাদের ধারণা হয় নামাজ পাঠের সময় অবিশ্বাসীরা তোমাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হবে, অতর্কিত আক্রমণ করে তোমাদের মাল-মাত্তা লুণ্ঠন করবে। আয়াতের বর্ণনানুযায়ী দেখা যায় যে, কাফেরদের আক্রমণের আশংকাই নামাজ সংক্ষেপ হওয়ার কারণ। খারেজীরা তাই বলে, আক্রমণের ভয় না থাকলে নামাজ সংক্ষেপ করা যাবে না। কিন্তু আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, সে সময় শত্রুর আক্রমণের আশংকা লেগেই ছিলো। অধিকাংশ সফরেই এ রকম আক্রমণের আশংকা ছিলো। তাই আয়াতে এ রকম করে বলা হয়েছে। নতুবা আক্রমণের আশংকা নামাজ সংক্ষেপ হওয়ার প্রধান কারণ নয়। সফরই প্রধান কারণ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা তোমাদের ক্রীতদাসীকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য কোরো না, যদি তারা পবিত্রতা বজায় রাখতে চায়।' উল্লেখ্য যে, এখানে পবিত্রতা বজায় রাখতে চাওয়ার কথা বলা হয়েছে অধিকাংশ ক্রীতদাসীর দিকে লক্ষ্য করে। ক্রীতদাসী যদি মুসলমান হয় তবে তো সে ব্যভিচারের প্রতি আকৃষ্ট হবেই না, পবিত্রতা বজায় রাখার প্রতিই তার আগ্রহ থাকবে। অতএব পবিত্রতা রক্ষা করতে না চাইলে ক্রীতদাসীকে কি ব্যভিচারে বাধ্য করা যাবে?

নিরাপদ সফরে নামাজ সংক্ষেপ করা সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে। হাদিসগুলো একটি অপরটির পরিপূরক। যেমন ইতোপূর্বে ইয়া'লী বিন উমাইয়া কর্তৃক বর্ণিত হজরত ওমরের হাদিসে এ বিষয়ে বলা হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, রসুল স. মক্কা ও মদীনার মধ্যে নিরাপদ সফরে দুই রাকাত নামাজ পড়েছেন, যখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো ভয় অবশিষ্ট ছিলো না।

হজরত হারেসা বিন ওয়াহাব খাজায়ী বলেছেন, রসুল স. আমাদেরকে মিনায় দুই রাকাত নামাজ পড়িয়েছেন। ওই সময় আমরা ছিলাম পূর্ণ নিরাপদ। বোখারী, মুসলিম।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, 'ইন খিফতুম' যদি তোমরা শংকাগ্রস্ত হও এই শব্দটির সম্পর্ক ইতোপূর্বে বর্ণিত সালাতুল খওফ (ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজ) এর সঙ্গে যদিও ওই আয়াতটি বর্ণনার দিক থেকে দূরবর্তী, কিন্তু তা অর্থের দিক থেকে নিকটে। ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজের প্রধান কারণ শত্রুর ভয়—এ কথা ঐকমত্যাগত এবং ইতোপূর্বে আর কোথাও 'শত্রুর ভয়' শব্দটি উল্লেখিত হয়নি। বাগবী বলেছেন, হজরত আবু আইয়ুব আনসারী উল্লেখ করেন, এই আয়াতটি প্রথমে 'ফালাইসা আলাইকুম জুনাহুন, আনতাকসুরু মিনাস্‌সলাত'—এই পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক বৎসর পর সাহাবীগণ যখন ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজ

www.eelm.weebly.com

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন অবতীর্ণ হলো 'ইন খিফতুম আঁইইয়াফতিনা কুমুল্লাজিনা কাফারু ইন্নাল কাফিরিনা কানু লাকুম আদুওয়াম মুবিনা'—এর সঙ্গে পরবর্তী আয়াত (১০২) 'ওয়া ইজা কুনতা ফিহিম' (এবং হে নবী, আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন)। বাগবী বলেছেন, কোরআন মজীদে এ রকম আয়াত রয়েছে অনেক। আসল সংবাদটি দেয়া হয়েছে প্রথমে। পরে তা অন্য সংবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে— যা প্রকৃত তত্ত্ব থেকে পৃথক প্রকৃতির। যেমন সুরা ইউসুফে বলা হয়েছে, 'এখন তো সত্য প্রকাশ হয়ে পড়লো, আমি তার নিকট আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির কামনা করেছিলাম এবং নিশ্চয়ই তিনি সত্যবাদী। ইউসুফ বললেন, এ সকল আয়োজন এ জন্যে যেনো আজিজ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ কথা অবহিত হোন যে, আমি তাঁর কুলমর্যাদায় হস্তক্ষেপ করিনি।' এখানে প্রথমে আজিজের পত্নীর উক্তি এবং পরে হজরত ইউসুফের বক্তব্য রয়েছে।

ইবনে জারীর লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, বনী নাজ্জারের কতিপয় লোক রসুল স. এর নিকট নিবেদন করলো, আমরা দেশবিদেশে সফর করি। তাই জানতে চাই সফরে আমরা কিভাবে নামাজ পড়বো? তখন অবতীর্ণ হলো 'ওয়া ইজা দ্বরবতুম ফিল আরদ্বি ফালাইসা আলাইকুম জুনাহুন আংতাক্বসারু মিনাস্‌সলাত।' এর এক বৎসর পর রসুলুল্লাহ্ স. এক জেহাদে গমন করলেন। সেখানে জোহরের নামাজ পড়লেন তিনি। মুশরিকেরা বললো, মোহাম্মদ ও তাঁর সাথীদেরকে পিছনদিক থেকে আক্রমণ করা যায়, তবে তোমরা আক্রমণ করছো না কেনো? তাদের একজন বললো, পরবর্তী নামাজের সময় হোক (তখন আক্রমণ করবো)। ঠিক তখনই জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে 'ইনখিফ্‌তুম' থেকে এই আয়াতের শেষাংশ সহ পরবর্তী আয়াতের শেষাংশ (১০২) পর্যন্ত অবতীর্ণ হলো। আমি বলি, এই শানে নুজুল থেকে প্রতীয়মান হয়— 'ইনখিফ্‌তুম' (শত্রুর ভয়) সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে। সেখানে বলা হয়েছে, কাফেরদের পক্ষ থেকে বিপদের আশংকা করলে তোমরা নামাজের সময়েও সতর্কতা অবলম্বন করবে— জেহাদ পরিত্যাগ করবে না।

এই আয়াতের শেষ বক্তব্য হচ্ছে—'সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' ইমাম আহমদ, বায়হাকী এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু আয়াশ জরক্বী বলেছেন, আমি আসফান সফরে রসুল স. এর সঙ্গে একই বাহনের আরোহী ছিলাম। আমাদের সম্মুখে ছিলো মুশরিক বাহিনী, যার নেতৃত্বে ছিলো খালেদ বিন ওলিদ। রসুল স. আমাদের নিয়ে জোহরের নামাজ আদায় করলেন। মুশরিকেরা বলতে শুরু করলো, এইতো সুযোগ। আমরা তাদেরকে অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করার সুযোগ পাবো। সামনে রয়েছে আরেকটি নামাজ। এই নামাজ তাদের নিকট তাদের জীবন ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অধিক প্রিয় (তাই নামাজ পাঠের সময় আমরা আক্রমণ করবো)। তখন হজরত জিবরাইল জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে পরবর্তী আয়াত (১০২) নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। তাই নামাজের সময় রসুল স. আজ্ঞা করলেন, তোমরা অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় নামাজে দণ্ডায়মান হও। আমরা তাঁর আজ্ঞা যথাপ্রতিপালন করলাম। তাঁর পশ্চাতে দুই কাতারে দাঁড়িয়ে গেলাম আমরা। তিনি রুকু করলেন। আমরাও রুকু

www.eelm.weebly.com

করলাম। তিনি মস্তক উত্তোলন করলেন। আমরাও করলাম। কিন্তু তাঁর সেজদার সঙ্গে সেজদা করলেন প্রথম কাতারের মোক্তাদীরা। দ্বিতীয় কাতারের মোক্তাদীরা দাঁড়িয়ে থাকলেন। পরের রাকাতে রসুল স. এর সঙ্গে রুকুতে শামিল হলেন সকলেই। কিন্তু সেজদায় শামিল হলেন কেবল দ্বিতীয় কাতারের অনুসারীরা। তখন প্রথম কাতার এবং দ্বিতীয় কাতারের অনুসারীরা তাঁদের স্থান বদল করেছিলেন। অর্থাৎ দ্বিতীয় কাতারের নামাজীরা প্রথম কাতারের নামাজীদের স্থানে গিয়ে সেজদায় শামিল হয়েছিলেন। আর তখন প্রথম কাতারের নামাজীরা দ্বিতীয় কাতারের স্থানে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন শত্রুদের গতিবিধি। রসুল স. এর নামাজ দুই রাকাত হওয়ায় তিনি সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করেছিলেন। আর মোক্তাদীরা তাদের বাদ পড়ে যাওয়া রাকাত তাঁর স. সালামের পর আদায় করে নিয়েছিলেন। এভাবে ভীতিপ্রদ অবস্থায় রসুল স. নামাজ পড়েছিলেন দুইবার— একবার আসফানে, আরেকবার বনী সুলাইম গোত্রের ভূখণ্ডে। হজরত জাবের থেকে মুসলিম ভীতিপ্রদ পরিস্থিতিতে রসুল স. এর নামাজের এ রকমই বিবরণ দিয়েছেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১০২

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَ
لْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ
طَآئِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ
أَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ
فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى
مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضٰٓى أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ
إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ○

❒ এবং তুমি যখন তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিবে ও তাহাদের সঙ্গে সালাত কায়েম করিবে তখন তাহাদের একদল তোমার সহিত যেন দাঁড়ায় এবং তাহারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাহাদের সিজ্‌দা করা হইলে তাহারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যাহারা সালাতে শরীক হয় নাই তাহারা তোমার সহিত যেন সালাতে শরীক হয় এবং তাহারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও

www.eelm.weebly.com

আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাহাতে তাহারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রাখিয়া দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করিবে। আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন।

আয়াতের বর্ণনাদৃষ্টে বুঝা যায়— যুদ্ধপ্রান্তরে মুসলমান সেনাদলের সঙ্গে যদি রসুলপাক স. অবস্থান করেন, তবে ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজ বা সালাতে খওফ পড়তে হবে। পূর্ববর্তী আয়াতের শেষাংশের 'ইনখিফ্তুম' (শত্রুর ভয়) এর সঙ্গে এই আয়াতের সংযোগ রয়েছে। শত্রুর ভয় না থাকলে এবং সেনাদলের সঙ্গে রসুলপাক স. উপস্থিত না থাকলে ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজ জায়েয নয়— আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্য এ রকমই। তাই ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজ রসুল স. এর জন্যই নির্দিষ্ট ছিলো। অন্যদের জন্য এই নামাজ জায়েয নয়। কিন্তু জমহুরের বক্তব্য এই যে, রসুল স এর জামানার পরেও এই নামাজ পড়া হয়েছে। পরবর্তী খলিফাগণ এরূপ করেছেন, কারণ তাঁরা রসুল স. এর স্থলাভিষিক্ত। সকল সাধারণ বিধান রসুল স. কে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়। সুতরাং সম্বোধন রসুল স. কে করা হলেও সাধারণভাবে বিধানটি সকল উম্মতের জন্য প্রযোজ্য। রসুল স. এর পরে সকল খলিফাই সালাতে খওফ্ পাঠ করেছেন। আর তাঁরা এ ব্যাপারে কেউ কারোর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেননি। অতএব, বিষয়টি ঐকমত্যসঞ্জাত।

আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, কাবুলের যুদ্ধে হজরত আব্দুর রহমান বিন সামুরা তার সঙ্গী সৈন্যদেরকে নিয়ে সালাতে খওফ্ পাঠ করেছেন। আবু দাউদের বর্ণনায় এ কথাও এসেছে যে, সিফ্ফিন যুদ্ধের সময় হজরত আলীও তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে এই নামাজ পড়েছিলেন। রাফেঈ উল্লেখ করেছেন, লাইলাতুল হারীরে (জঙ্গে জামালে) হজরত আলী মাগরিবের নামাজ সালাতে খওফের নিয়মে পাঠ করেছেন।

ইমাম জাফরের বর্ণনাসূত্রে ইমাম জয়নাল আবেদীনের মাধ্যমে ইমাম হোসাইন থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী লাইলাতুল হারীরে মাগরিবের নামাজ সালাতে খওফের রীতি অনুযায়ী পাঠ করেছেন। আবুল আলিয়া থেকে বায়হাকী আরো বর্ণনা করেছেন, ইসপাহান যুদ্ধের সময় ভীতিপ্রদ নামাজ পড়েছেন। হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে বায়হাকীর এ বর্ণনাটিও এসেছে যে, অগ্নিপূজকদের সঙ্গে যুদ্ধে তিবরিস্তানে সেনাপতি হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ভীতিকালীন অবস্থার নামাজ পড়েছেন। ওই সময় তাঁর সঙ্গে হজরত হাসান বিন আলী, হজরত হোজায়ফা বিন ইয়ামান এবং হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আসও ছিলেন। আবু দাউদ ও নাসাঈ সা'লাবাহ্ বিন খাহ্বামের পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন—আমরা সাঈদ বিন আসের সঙ্গে ছিলাম, তিনি এক দল লোককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ কি রয়েছেন যিনি রসুল স. এর

www.eelm.weebly.com

সঙ্গে সালাতুল খওফে অংশ গ্রহণ করেছেন? হজরত হোজাইফা তখন বলেছিলেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে সালাতুল খওফ পাঠ করেছি। তিনি ওই নামাজে এক দলকে নিয়ে প্রথম রাকাত এবং অপর দলকে নিয়ে দ্বিতীয় রাকাত পাঠ করেছেন।

আয়াতে এরপর সালাতে খওফ পাঠের নিয়ম বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, নামাজের সময় সেনাবাহিনীকে দু'টি দলে বিভক্ত করতে হবে। এক দল প্রথমে রসুল স. এর সঙ্গে এক রাকাত নামাজ পড়বে, তখন অপর দল থাকবে সশস্ত্র ও সদাসতর্ক। পরের রাকাতে রসুল স. এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করবে অপর দলটি যারা প্রথম রাকাতের সময় পাহারারত ছিলো।

ইমাম মালেক বলেছেন, ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজে সশস্ত্র থাকা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ীও এ রকম বলেছেন, কিন্তু অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, ভীতির নামাজে অস্ত্রসজ্জিত থাকা মোস্তাহাব।

রসুল স. যখন তাঁর দুই রাকাত নামাজ শেষ করবেন, তখন সেনাবাহিনীর এক রাকাত করে নামাজ শেষ হবে। কারণ, একদল তাঁর সঙ্গে প্রথম রাকাতে এবং অপর দল দ্বিতীয় রাকাতে শরীক থাকবে অর্থাৎ প্রথম দল দ্বিতীয় দলকে সশস্ত্র প্রহরায় রেখে প্রথম রাকাত পড়বে। তারপর চলে যাবে দ্বিতীয় দলের অবস্থানে। দ্বিতীয় দল প্রথম দলের অবস্থানে এসে রসুল স. এর সঙ্গে পাঠ করবে দ্বিতীয় রাকাত, প্রথম দল তখন থাকবে পাহারায়। এভাবে রসুল স. এর দুই রাকাত নামাজ শেষ হলে প্রথম ও দ্বিতীয় দল তাদের বাদ পড়ে যাওয়া এক রাকাত নামাজ আদায় করে নিবে।

এরপর আয়াতে বলা হয়েছে, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা চায় তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক থাকো, আর ওই অসতর্ক মুহূর্তে তারা তোমাদের উপর একযোগে আক্রমণ করতে চায়।

রসুল স. এর ভীতির নামাজের পদ্ধতি ছিলো কয়েকটি ঃ

১. আবু আয়াশ জারক্বী এবং হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ বর্ণিত পদ্ধতিটি আসফানের যুদ্ধ প্রসঙ্গে ইতোপূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। ওই সময় শত্রুদের অবস্থান ছিলো মুসলমান বাহিনী এবং নিকটবর্তী জনপদের মাঝামাঝি।

২. বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত জাবের বলেছেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে 'জাতুর রেকা' নামক স্থানে পৌঁছুলাম। এক বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. তখন এক দলকে নিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়লেন, তারপর তাঁরা পেছনে চলে গেলেন, পেছনে পাহারারত দলটি এসে নামাজে যোগ দিলেন। তাদেরকে নিয়ে রসুল স. আরো দুই রাকাত নামাজ পড়লেন। এভাবে রসুল স. এর চার রাকাত নামাজ হলো এবং পিছনের দল দুইটির নামাজ হলো দুই রাকাত করে। হাদিসটির দু' রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। একটি এই—রসুল স. এক সালামে চার রাকাত নামাজ সমাপণ করেছেন। আর মুজাহিদ বাহিনী করেছে দুই রাকাত করে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে রসুল স. এক দলকে নিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়ে

www.eelm.weebly.com

সালাম ফিরিয়েছেন, তারপর অপর দলকে নিয়ে পুনরায় দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়েছেন।

হজরত জাবেরের বর্ণনার ব্যাখ্যায় এ রকমও এসেছে যে, বাতনে নাখলে রসুল স. জোহরের নামাজ ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজরূপে পড়িয়েছেন এভাবে—এক দলকে নিয়ে দুই রাকাত এবং অপর দলকে নিয়ে দুই রাকাত। ওই নামাজে তিনি দুই রাকাত পর পর সালাম ফিরিয়েছেন। শাফেয়ীর নিয়মে এ রকম বর্ণনা করেছেন বাগবী। মূল বর্ণনাকারীর নাম না জানলেও শাফেয়ী বর্ণনাটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন এবং বলেছেন, একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী আমাকে এ কথা বলেছেন, আবু আলিয়া অথবা অন্য কেউ।

দারা কুতনীর নিয়মে আম্বাসা— হাসান— হজরত জাবের— এই সূত্রে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ইবনে জাওজী। ইয়াহ্ইয়া বিন মুঈন বলেছেন, আম্বাসা অপদার্থ। নাসাঈ বলেছেন, পরিত্যক্ত এবং আবু হাকিম বলেছেন, সে হাদিস প্রস্তুতকারী।

হজরত আবু বকরা থেকে এই হাদিসটিই বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান, হাকেম এবং দারা কুতনী। আবু দাউদ ও ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় বলা হয়েছে ওই নামাজ ছিলো জোহরের নামাজ। দারা কুতনীর বর্ণনায় রয়েছে মাগরিবের নামাজ। ইবনে কাত্তান বলেছেন, বর্ণনাটি মুয়াল্লাল। কেননা, হজরত আবু বকরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সালাতুল খওফ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন বর্ণনাটি মুয়াল্লাল নয় বরং মুরসাল, যা গ্রহণযোগ্য।

৩. হজরত সালেহ বিন খাওয়াত থেকে শাইখাইন এমন এক ব্যক্তির বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যিনি জাতুর রেকা'র দিনে রসুল স. এর সালাতুল খওফে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভিন্নসূত্রে হজরত সালেহ বিন খাওয়াত থেকে বর্ণনা এনেছেন সহল বিন আবি হাসামাহ। ওই বর্ণনায় রয়েছে, একটি দল রসুল স. এর পশ্চাতে সারিবদ্ধ হলো। অপর দলটি দাঁড়িয়ে রইলো শত্রুর সম্মুখে। প্রথম দলকে নিয়ে রসুল স. পড়লেন এক রাকাত। তারপর রসুল স. স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন, আর মোক্তাদিরা পূর্ণ করলো তাদের দ্বিতীয় রাকাত। তারপর তারা শত্রুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তাদের অবস্থানে এলো দ্বিতীয় দলটি তখন তাদেরকে নিয়ে রসুল স. এর দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে বসে রইলেন। আর দ্বিতীয় দলটি পূর্ণ করলো তাদের দ্বিতীয় রাকাত। সবশেষে তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় দলকে নিয়ে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করলেন।

৪. হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. দাহ্নান ও আসফানের মধ্যবর্তীস্থানে শিবির স্থাপন করলেন। সামনে ছিলো মুশরিক বাহিনী। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, মুসলমানদের কাছে আসরের নামাজ তাদের মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততিদের চেয়ে অধিক প্রিয়। সুতরাং তারা যখন আসরের নামাজ পাঠ করবে, তখন আমরা পূর্ণশক্তি নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করবো। হজরত জিবরাইল তাদের এই আলোচনার

www.eelm.weebly.com

সংবাদ রসুল পাক স. কে জানিয়ে দিলেন এবং বললেন, নামাজ পাঠ করতে হবে এভাবে— সেনাবাহিনীকে দুই ভাগে ভাগ করে এক ভাগকে নিয়ে আপনি এক রাকাত নামাজ পড়বেন। তখন অপর ভাগটি সশস্ত্র প্রহরায় থাকবে। এক রাকাত শেষ করে তারা অপর দলটির স্থানে গিয়ে দাঁড়াবে। অপর দলটি তখন আপনার পশ্চাতে এসে আপনার সঙ্গে এক রাকাত নামাজ পড়বে। এভাবে আপনার নামাজ হবে দুই রাকাত এবং সেনা দলের নামাজ হবে এক রাকাত। বাগবী লিখেছেন, হজরত হুজাইফা থেকে রসুল স. এর ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজের এই নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। এই নিয়মে তিনি স. দুই রাকাত নামাজ পড়েছেন এবং তাঁর সঙ্গী সৈন্যরা পড়েছেন এক রাকাত করে। বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত যায়েদ বিন সাবেতের বর্ণনায় এসেছে, ওই সময় রসুল স. নামাজ পড়েছেন দুই রাকাত এবং তাঁর সহচরবৃন্দ পড়েছেন এক রাকাত। আলেমগণ ওই নামাজকে অত্যন্ত ভীতির নামাজ বলেছেন এবং ব্যাখ্যাস্বরূপ মন্তব্য করেছেন, ওই রকম অবস্থায় এক রাকাত নামাজই ফরজ।

৫. সালেম বিন ওমরের মাধ্যমে হজরত ওমর থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন— হজরত ওমর বলেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে নজদের দিকে পরিচালিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। শত্রুদের সম্মুখে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। নামাজের সময় হলো, রসুল স. আমাদের এক দলকে নিয়ে নামাজ শুরু করলেন, অপর দল তখন সশস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলো। তিনি স. এক রুকু ও দুই সেজদা করে এক রাকাত নামাজ শেষ করলেন। প্রথম দলটি এক রাকাত নামাজ শেষ করেই দ্বিতীয় দলের অবস্থানে সশস্ত্র প্রহরায় দাঁড়িয়ে গেলো। দ্বিতীয় দলটি এসে রসুল স. এর পশ্চাতে দাঁড়ালো, তিনি স. এক রুকু ও দুই সেজদা করে তাঁর স. দ্বিতীয় রাকাত শেষ করে সালাম ফিরালেন, তারপর মুক্তাদিরা তাদের বাদ পড়ে যাওয়া রাকাত এক রুকু ও দুই সেজদাসহ শেষ করলেন। হজরত নাফেও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার অতিরিক্ত কথাগুলো এ রকম— যদি এর চেয়েও অধিক ভয়সংকুল পরিস্থিতি দেখা দেয়, তবে চলমান অবস্থায়, বাহনে আরোহী অবস্থায় কেবলামুখী হয়ে, অথবা কেবলামুখী না হয়েও নামাজ পড়া যাবে। হজরত নাফে আরো বলেছেন, রসুল স. না বললে হজরত ওমর নিজে থেকে এ রকম বলতেন না।

ইমাম আবু হানিফা ভীতিকালিন অবস্থার নামাজে বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে শেষোক্ত পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন। অন্য নিয়মগুলোকে তিনি নাজায়েয বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন, দ্বিতীয় দল ইমামের সালাম ফিরানোর পর শত্রুর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। তখন প্রথম দল তাদের বাদ পড়ে যাওয়া রাকাত পূর্ণ করবে। তারপর দ্বিতীয় দল আদায় করবে তাদের বাদ পড়ে যাওয়া রাকাত। ইমাম মোহাম্মদ তাঁর কিতাবুল আসারে ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক হজরত ইবনে আব্বাসের এরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এ ধরনের বর্ণনাকে হাদিসে মাওকুফ বলে যা হাদিসে মারফুর মতোই।

www.eelm.weebly.com

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি (যে পদ্ধতিতে রসুল স. এর চার রাকাত এবং তাঁর অনুসারীদের দুই রাকাত নামাজ হয়) এ কারণে গ্রহণীয় নয় যে, এতে করে নফল নামাজ পাঠকারীর পিছনে ফরজ নামাজ পাঠকারীর এক্তেদা হয় (রসুল স. এর পরের দুই রাকাত নামাজ নফল, ফরজ নয়)। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, নফল নামাজ পাঠকারীর পিছনে ফরজ নামাজ হয় না।

তৃতীয় পদ্ধতিটিও গ্রহণীয় নয়। কারণ, ওই পদ্ধতিতে ইমামের পূর্বে মোক্তাদীদেরকে রুকু ও সেজদা করতে হয়, শরিয়তে এ রকম বিধানের অবকাশ নেই।

চতুর্থ পদ্ধতিটি ঐকমত্যসূত্রে পরিত্যক্ত। কারণ, এই নিয়মে মোক্তাদিদের নামাজ হয় মাত্র এক রাকাত। আর নামাজ কখনো এক রাকাত হয় না। ভয় কখনো নামাজের রাকাতের সংখ্যা কমাতে পারে না।

প্রথম নিয়মটি (যেখানে নিকটবর্তী জনপদ এবং মুসলমান বাহিনীর মধ্যে শত্রুসেনারা অন্তরায় হয়েছিলো) কোরআনের বক্তব্যের প্রতিকূল। কারণ, এই আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাদের একদল তোমার সঙ্গে যেনো দাঁড়ায়।' আরও বলা হয়েছে, 'আর অপর এক দল যারা সালাতে শরীক হয় নাই তারা তোমার সঙ্গে যেনো সালাতে শরীক হয়।' অথচ প্রথম নিয়মে দুই দল দুই কাতার হয়ে একই সঙ্গে নামাজে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে। নিয়মটি তাই কোরআনের বক্তব্যবিরোধী।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, ভীতির নামাজের সকল নিয়মই সঠিক (মতানৈক্য হয়েছে কেবল অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য প্রদান সম্পর্কে)। ইমাম আহমদ আবার এ কথাও বলেছেন যে, আমার জানা মতে এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে একটি হাদিস ব্যতীত অন্য কোনো হাদিস বিশুদ্ধ নয়। ইমাম শাফেয়ী বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে চারটি পদ্ধতিকে অগ্রগণ্য ভেবেছেন। ইমাম আহমদ অগ্রগণ্য মনে করেছেন তিনটিকে। যদি শত্রুর অবস্থান কেবলার দিকে হয়, তবে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ প্রথমোক্ত পদ্ধতিকে অগ্রগণ্য বলে মনে করেছেন। যদি অন্যদিকে হয় তবে তাঁরা অগ্রাধিকার দিয়েছেন দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে— যে পদ্ধতিতে রসুল স. নামাজ পড়েছিলেন বাতনে নাখলায়। এ রকম অবস্থায় তৃতীয় পদ্ধতিটিকেও তাঁরা প্রতিপালনীয় বলে মনে করেন— যে পদ্ধতিতে রসুল স. নামাজ পড়েছিলেন জাতুর রেকা নামক স্থানে। ইমাম আহমদের মতে এ রকম অবস্থায় তৃতীয় পদ্ধতিটিই অধিক অগ্রগণ্য। আলেমগণ বলেছেন, এই পদ্ধতিটিই কোরআন মজীদের বক্তব্যের অধিক অনুকূল এবং এই নিয়মের মধ্যে রয়েছে অধিকতর সতর্কতা ও নিরাপত্তা।

কোরআনের স্পষ্ট বক্তব্য এই যে, প্রথম দল ইমামের সঙ্গে এক রাকাত নামাজ পড়ে সশস্ত্র প্রহরারত দ্বিতীয় দলের অবস্থানে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল এসে ইমামের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে এক রাকাত নামাজ পড়বে। উভয় দলই পরে তাঁদের এক রাকাত নামাজ পূর্ণ করবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, এই যাওয়া আসার

www.eelm.weebly.com

মধ্যে নামাজবহির্ভূত কোনো কাজ (আমলে কাসির) যেনো না হয়। তবে জরুরী বা বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে এবং অত্যন্ত ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হলে পদবিক্ষেপরত অবস্থায় যে কোনো দিকে মুখ করে নামাজ পড়া যাবে। এ রকম অপারগ অবস্থায় কেবলামুখী না হলেও এবং নামাজবহির্ভূত কাজ করতে হলেও নামাজ হয়ে যাবে। রুকু ও সেজদা করার সুযোগ না পেলে ইশারায় রুকু সেজদা আদায় করতে হবে। রুকুর জন্য করতে হবে সাধারণ ইশারা এবং সেজদা করতে হবে ইশারা অপেক্ষা একটু বেশী মাথা ঝুঁকিয়ে। ইমাম আবু হানিফার মতে অতি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দু'টি নিয়মে নামাজ পড়া যাবে। দণ্ডায়মান অবস্থায় অথবা বাহনে আরোহী হয়ে। আর রুকু ও সেজদা করতে হবে ইশারায় (যেমন ইশারার কথা বলা হলো একটু আগে)। কিন্তু পদাতিক অবস্থায় যুদ্ধ চালানোর সময় নামাজ পড়া যাবে না। পূর্বের আয়াতে আমলে কাসির সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্যঃ হাফেজ ইবনে হাজার রসুল স. এর ভীতির নামাজের চৌদ্দটি নিয়ম লিখেছেন। ইবনে হাজমের জুযে মোফরাদ পুস্তকেও সেগুলোর বর্ণনা রয়েছে। কয়েকটি বর্ণনা মুসলিমেও রয়েছে। তবে বেশীর ভাগ বর্ণনা রয়েছে সুনানে আবু দাউদে। হাকেম লিখেছেন আটটি নিয়ম এবং ইবনে হাব্বান লিখেছেন নয়টি।

মাসআলাঃ ইমাম মালেক ব্যতীত জমহুরের মতে লোকালয়েও সালাতে খওফ সিদ্ধ। আসর নামাজে সালাতে খওফ জায়েয। প্রতিটি দল দু'রাকাত করে পড়বে। আর মাগরিবের নামাজের সময় প্রথম দল দু'রাকাত এবং দ্বিতীয় দল পড়বে এক রাকাত।

'সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ কামনা করে যেনো তোমরা তোমাদের অস্ত্রসস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও। যাহাতে তাহারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে।'— এ কথার মাধ্যমে নামাজে সশস্ত্র থাকার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সশস্ত্র ও সতর্ক না থাকলে অবিশ্বাসীরা তোমাদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসবে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে আবু সালেহের মাধ্যমে কালাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ স. বনী মুহারিব ও বনী আনমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। পথিমধ্যে সেনাদলসহ একস্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন তিনি স.। শত্রুপক্ষের কাউকে সেখানে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না। তাই রসুল স. যুদ্ধসজ্জা পরিত্যাগ করলেন এবং অস্ত্র রেখে দিলেন। তাঁর দেখাদেখি সকলেই এ রকম করলেন। এরপর তিনি স. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে পাহাড়ী এলাকা ছেড়ে নিম্নভূমির দিকে চলে গেলেন। সেনাবাহিনী রয়ে গেলো পাহাড়ের আড়ালে। তখন বৃষ্টি হচ্ছিলো। তিনি একটি বৃক্ষের নিচে উপবেশন করলেন। হঠাৎ সেখানে হাজির হলো মুজারিব গোত্রের গুআইরাস বিন হারেস। সে বললো, এখন যদি আমি তাকে হত্যা করতে না পারি তবে আল্লাহ যেনো আমাকে হত্যা করে। এ কথা বলে সে আরো এগিয়ে এলো এবং রসুল স.কে লক্ষ্য করে বললো, মোহাম্মদ!

www.eelm.weebly.com

এখন তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে কে? রসুল স. নির্বিকারচিত্তে বললেন, আল্লাহ্। তারপর দোয়া করলেন— হে আমার আল্লাহ্! তুমি যেভাবে ইচ্ছা আমাকে এই দুরাচারের হাত থেকে বাঁচাও। গুআইরাস তলোয়ার উত্তোলন করলো। অকস্মাৎ তার স্কন্ধদেশের মধ্যস্থলে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলো সে। তারপর প্রচণ্ড ব্যথার কারণে উপুড় হয়ে পড়ে গেলো। তলোয়ার খসে পড়লো তার হাত থেকে। রসুল স. তৎক্ষণাৎ তলোয়ার উঠিয়ে নিয়ে বললেন, এবার তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে কে? সে বললো, কেউ না। তিনি স. বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই আর মোহাম্মদ আল্লাহ্র বান্দা ও রসুল? যদি এরূপ সাক্ষ্য দিতে সম্মত হও, তবে আমি তোমার তলোয়ার তোমাকেই দিয়ে দেবো। সে বললো, না। তবে আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তোমার বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ করবো না এবং তোমার কোনো শত্রুকে সাহায্যও করবো না। রসুল স. তলোয়ারটি ফেরত দিয়ে দিলেন। গুআইরাস বললো, আল্লাহ্র কসম তুমি আমার চেয়ে উত্তম। তিনি স. বললেন, নিশ্চয় আমি এ রকম উত্তম আচরণ প্রদর্শনের অধিকারী। গুআইরাস তার দলের লোকদের নিকট উপস্থিত হলো। তাকে দেখে তার সাথীরা বললো, কী হয়েছে তোমার? তোমার উদ্দেশ্য সাধনে বাধা দিলো কে? সে বললো, আমি তো তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তলোয়ার উত্তোলন করেছিলাম। কিন্তু কে যেনো আমার ঘাড়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা সৃষ্টি করে দিলো। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আমি উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম।

এরপর অবতীর্ণ হলো পরবর্তী বাক্যটি 'যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাক, তবে তোমরা অস্ত্র রাখিয়া দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করিও।'—এখানে বৃষ্টিপাত, অসুস্থতা, ইত্যাদির কারণে যুদ্ধসজ্জা খুলে ফেলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এতে করে বুঝা যায়, ইতোপূর্বে প্রদত্ত সশস্ত্র থাকার নির্দেশটি ছিলো ওয়াজিব। ঐচ্ছিক নয়। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী এ রকম বলেছেন।

বৃষ্টির কারণে চামড়া নির্মিত জেরা (বর্ম) ভিজে ভারী হয়ে গেলে এবং অসুস্থতার কারণে ভারী অস্ত্র উত্তোলন কষ্টদায়ক মনে হলে অস্ত্রসজ্জা পরিত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হলেও পরক্ষণেই বলা হয়েছে, 'কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে।' এ কথার অর্থ এমন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করবে, অথবা এমন ব্যূহ রচনা করে তার মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করবে, যাতে করে শত্রুরা আকস্মিক আক্রমণের সুযোগ না পায়। আত্মরক্ষা করা ওয়াজিব। অনর্থক জীবন দান বৈধ নয়। জীবন, সম্পদ এবং আল্লাহ্র কলেমা সুরক্ষা করতে হবে। আল্লাহ্পাক তাঁর নবী ও রসুলগণকে এই মর্মে নির্দেশনাও দিয়েছেন যে, শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময়েও নিরাপদ এলাকার বাইরে যাওয়া যাবে না।

www.eelm.weebly.com

আয়াতের শেষ বাক্যটিতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন।'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্পাক কাফেরদের জন্য পৃথিবীতে নির্ধারণ করেছেন হত্যা, বন্দীত্ব এবং আখেরাতে দোজখ। পূর্ণ আয়াতটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, এখানে এই মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে—অবিশ্বাসীদের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্বাসীদের বিজয় ও সাফল্য। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার বিধান এই যে, আল্লাহ্পাক প্রদত্ত বিজয় ও সফলতা লাভ করতে হলে প্রচেষ্টা এবং সতর্কতাও প্রয়োজন। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে জারী রাখতে হবে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় ও সতর্কতা। আর এই সতর্ক অধ্যবসায় হতে হবে উপকরণের মাধ্যমে (যুদ্ধাস্ত্রের মাধ্যমে)।

কালাবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ফিরে এসে গুআইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার ঘটনাটি জানালেন এবং পাঠ করলেন, 'ইনকানা বিকুম আযাম্ মিম মাতারিন আও কুনতুম মারদ্বা' (যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাকো)। এ বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ সম্পর্কে। তিনি আহত হয়েছিলেন। আর এ কারণে তাঁকে যুদ্ধসজ্জা পরিত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১০৩

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ○

❒ যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করিবে তখন দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শুইয়া আল্লাহ্কে স্মরণ করিবে; যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করিবে, নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

দণ্ডায়মান অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায় এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্র জিকিরে রত থাকা। মাতা আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. সব সময় আল্লাহ্র স্মরণে মগ্ন থাকতেন। আবু দাউদ। উল্লেখ্য যে, কোরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফে উল্লেখিত সার্বক্ষণিক জিকিরের উদ্দেশ্য কলবী জিকির। মুখে সর্বক্ষণ জিকির করাতো সম্ভবই নয়।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমে বলা হয়েছে— তোমরা যখন সালাতুল খওফ থেকে অবসর গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহ্‌র জিকির করবে। অর্থাৎ তখন সুস্থাবস্থায় থাকলে নামাজ দাঁড়িয়ে পড়বে। পীড়িত বা আহত অবস্থায় থাকলে অথবা দাঁড়াতে অপারগ হলে নামাজ পাঠ করবে বসে কিংবা শুয়ে। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, ভয়সংকুল অবস্থায় নামাজের সময় হলে ক্ষমতা থাকলে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। অন্যথায় পড়বে বসে। তাও যদি না পারো তবে নামাজ আদায় করবে শায়িত অবস্থায়।

'যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করিবে'—এ কথার অর্থ ভয়াবহ পরিস্থিতি দূর হয়ে গেলে নামাজের সকল রোকন ও শর্তসহ পরিপূর্ণ নামাজ আদায় করবে। কারণ, নিরাপত্তার সময় এবং শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশংকার সময় এক নয়। যে সংক্ষিপ্তি ও অবকাশ ভীতির নামাজে দেয়া হয়েছিলো, নিরাপদ সময়ে সেই অবকাশ আর থাকবে না।

'নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য'—এ কথার অর্থ নির্ধারিত সময়ে নামাজ পাঠ অত্যাবশ্যক। অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থায় নামাজ পাঠ করতেই হবে। ইমাম শাফেয়ী যুদ্ধরত অবস্থাতেও দাঁড়িয়ে, বসে অথবা শুয়ে নামাজ পাঠ অত্যাবশ্যক বলেছেন। উদ্ধৃত বাক্যটির মাধ্যমে বায়যাবীও এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু সিদ্ধান্তটি ভুল। যদি এ রকমই হতো তবে পূর্বের আয়াতে এ কথার উল্লেখ থাকতো। স্মর্তব্য যে, এই আয়াতে নামাজের নির্ধারিত সময় সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে হাদিস শরীফে।

মাসআলাঃ ঐকমত্যসূত্রে এ কথা গৃহীত হয়েছে যে, দ্বিপ্রহরের পর সূর্য ঢলে পড়লে জোহরের নামাজের সময় শুরু হয়। এবং জোহরের ওয়াক্ত থাকে আসর পর্যন্ত। আর আসরের সময় থাকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কিন্তু সূর্যাস্তের পূর্বে যখন সূর্যকিরণ হরিদ্রাভ হয় তখন আসরের নামাজ পাঠ করা মাকরূহে তাহরীমী (হারামের নিকটবর্তী)। সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যাশ্রিত। ইমাম শাফেয়ীর মতে যখন কোনো বস্তুর ছায়া (মূল ছায়া বাদে) দ্বিগুণ হয়, সেই সময়ের মধ্যে আসরের নামাজ পাঠ করা উত্তম।

মাগরিবের নামাজ শুরু হয় সূর্যাস্তের পর। পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের সর্বশেষ চিহ্নটুকু মুছে গেলে শুরু হয় ইশার ওয়াক্ত। তখন থেকে শুরু করে সুবহে সাদেক পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত থাকে। ঐকমত্য এই যে, অর্ধরাত্র বিলম্ব করে ইশার নামাজ পাঠ না করা মোস্তাহাব। সুবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের নামাজের সময়।

জোহর ও মাগরিবের সর্বশেষ সময় নিয়ে আলেমগণের মধ্যে মতপৃথকতা রয়েছে। জমহুরের অভিমত হচ্ছে, যখন কোনো বস্তুর ছায়া মূল ছায়া বাদে ওই বস্তুটির দ্বিগুণ হয়ে যায়, তখন পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে। মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে সূর্যাস্তের শেষ আভা পরিদৃষ্ট হওয়া পর্যন্ত। ইমাম আবু হানিফা

www.eelm.weebly.com

বলেন, জোহরের সময় থাকে কোনো বস্তুর ছায়া মূল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর এক অভিমত অনুসারে মাগরিবের নামাজ পাঠ করতে হবে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরক্ষণেই, বিলম্ব করা যাবে না।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত ওই হাদিসে নামাজের সময় সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেন, কাবা শরীফের সন্নিকটে হজরত জিবরাইল ইমাম হয়ে দু'বার আমাকে নামাজ পড়িয়েছেন, প্রথমবার তিনি পড়িয়েছিলেন জোহরের নামাজ, যখন ছায়া ছিলো তস্‌মার মতো (চামড়ার লম্বা টুকরাকে বলে তস্‌মা)। এরপর তিনি আসরের নামাজ ওই সময় পড়িয়েছেন, যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া (মূল ছায়া বাদে) এক গুণ হয়ে গিয়েছিলো। এরপর তিনি মাগরিবের নামাজ পড়ালেন সূর্যাস্তের পরক্ষণেই, যখন রোজাদারেরা ইফতার করে। এরপর পশ্চিমাকাশের লাল রঙ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইশার নামাজ পড়ালেন। এরপর ফজরের নামাজ পড়ালেন সেহেরির সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর, যখন ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। দ্বিতীয় বার হজরত জিবরাইল জোহর পড়ালেন, প্রতিটি বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়ার সময়। আসর পড়ালেন ছায়া দ্বিগুণ হয়ে গেলে, মাগরিব পড়ালেন আগের সময়েই এবং ইশা পড়ালেন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর। আর ফজর পড়ালেন তখন, যখন হলুদ ফর্সা আলোয় উদ্‌ভাসিত হয়ে গেলো পৃথিবী। সবশেষে তিনি আমার সামনাসামনি হয়ে বললেন, প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ সীমানা এটাই। আপনার পূর্বের নবীগণ এই সময়সীমাকেই মান্য করেছেন। আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান। তিরমিজি এই হাদিসকে বলেছেন, উত্তম ও বিশুদ্ধ।

হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত। কিন্তু এ সূত্রের বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান বিন হারেসকে দুর্বল হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন আহমদ, নাসাঈ ও ইবনে মুঈন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবদুর রাজ্জাকও এ রকম বর্ণনা এনেছেন। তাঁর বর্ণনাকে উত্তম বলেছেন, ইবনে দাকিকুল ঈদ। আর একে বিশুদ্ধ বলেছেন, আবু বকর বিন আরাবী এবং ইবনে আব্দুল বার।

হজরত জিবরাইলের নামাজ পড়ানো সম্পর্কে আরো কতিপয় সাহাবীর বর্ণনা রয়েছে। হজরত জাবের বর্ণিত হাদিস হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসের মতোই, তবে তাঁর বর্ণনায় কেবল ইশার নামাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তখন রাতের অর্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়েছিলো। বোখারী লিখেছেন, নামাজের সময় সম্পর্কে হজরত জাবেরের বর্ণনাটি সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ।

হজরত বোরায়দার বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি রসুল স. এর নিকট নামাজের সময় সম্পর্কে জানতে চাইলে, তিনি স. বললেন, আমাদের সঙ্গে দু'দিন নামাজ পড়ো (প্রশ্নকারী তাই করলো)। প্রথম দিন রসুল স. জোহরের নামাজ হজরত বেলালের আজান ও একামত সহ পড়লেন সূর্য ঢলে পড়ার পরপর এবং সূর্যের প্রখরতা অটুট থাকতে থাকতেই হজরত বেলালকে আসরের আজান দিতে বললেন। তারপর হজরত বেলালের একামতসহ আদায় করলেন আসরের

www.eelm.weebly.com

নামাজ। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আদায় করলেন মাগরিব। ইশা পড়লেন পশ্চিমাকাশের সান্ধ্য আভা মুছে গেলে। আর ফজর পড়লেন সুবহে সাদেকে। দ্বিতীয় দিন তিনি স. জোহর পড়লেন সূর্য বেশ কিছুটা ঢলে পড়লে। আসর পড়লেন আগের দিনের চেয়ে কিছুটা বিলম্বে, যখন সূর্য উঁচু অবস্থানে ছিলো কিন্তু হারিয়ে ফেলেছিলো তার প্রখরতা। মাগরিব পড়লেন পশ্চিমাকাশের রক্তিম বর্ণ মুছে যাওয়ার কিছুটা পূর্বে। আর ইশা পড়লেন, রাতের তিন ভাগের একভাগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর। ফজর পড়লেন চতুর্দিক ফর্সা হয়ে গেলে। তারপর বললেন, নামাজের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনকারী ব্যক্তিটি কোথায়? লোকটি বলে উঠলো, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমি উপস্থিত। তিনি স. বললেন পরপর দু'দিন যেভাবে আমাকে নামাজ পাঠ করতে দেখলে, সেটাই প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সময়সীমা। মুসলিম।

হজরত আবু মুসার বর্ণনাটিও উপরোক্ত বর্ণনাটির মতো। তবে তাঁর বর্ণনায় মাগরিব নামাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি স. দ্বিতীয় দিন মাগরিব পড়েছেন সন্ধ্যার রঙ অদৃশ্য হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে। মুসলিম।

হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন— জোহর নামাজের সময়সীমা সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে আসরের পূর্ব পর্যন্ত। যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া ওই বস্তুটির সমপরিমাণ হয় (মূল ছায়া বাদে)। আর আসরের সময় থাকে সূর্যের রঙ হলুদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত। মাগরিবের সময় থাকে সূর্যাস্তের পর থেকে সন্ধ্যার রঙ অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত। ইশার সময় থাকে অর্ধ রাত্রি বা মধ্য রাত্রি পর্যন্ত। আর ফজরের সময় শুরু হয় সুবহে সাদেক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, মাগরিব শুরু হয় সূর্যাস্তের পরক্ষণেই। সন্ধ্যার সর্বশেষ রঙ মুছে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাগরিবের সময় থাকে। তারপর থেকে অর্ধরাত পর্যন্ত থাকে ইশার সময়। আর সুবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত হচ্ছে ফজরের সময়। তিরমিজি এই হাদিসটিকে মোহাম্মদ বিন ফুজাইল— আ'মাশ আবু ছালেহ— আবু হোরায়রা— এই সূত্রে বর্ণনা করছেন। বোখারী ভুলক্রমে বর্ণনাটি এনেছেন মারফু রূপে। এ সকল হাদিস অনুযায়ী জমহুরের অভিমত ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ীর বিরুদ্ধে এতটুকু এসেছে যে, মাগরিবের শেষ সময় লাল আভা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের সর্বশেষ সময় সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কোরআন মজীদের আয়াতও এ বিষয়ে জমহুরের অনুকূল। যেমন বলা হয়েছে 'যখন ধারণোদ্যত উত্তম অশ্বগুলো সন্ধ্যার সময় তাঁর (হজরত সুলায়মানের) সম্মুখে আনা হলো, তখন তিনি বললেন— এই সম্পদের মোহে আপন প্রতিপালকের স্মরণ (নামাজ) থেকে গাফেল হয়ে গেলাম; এমনকি সূর্য অন্তরালে চলে গেল।' এ ছাড়াও রসুল স. এরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বে সকালের নামাজ এক রাকাত পেলো, সে ফজরের নামাজ পেলো। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাজ এক রাকাত পেলো সেও আসরের নামাজ পেলো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম এ রকম বলেছেন।

www.eelm.weebly.com

ইশার শেষ সময় সম্পর্কে হাদিসের বক্তব্যসমূহে বৈসাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু মুসা আশআরী এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে— রসুলুল্লাহ স. রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ইশার নামাজ বিলম্ব করেছেন। আবার হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত বিলম্ব করার কথা। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. দুই তৃতীয়াংশ রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর ইশার নামাজ পড়েছেন। মাতা আয়েশা সিদ্দিকা বলেছেন, তিনি স. রাতের বেশীর ভাগ গত হওয়ার পর ইশার নামাজ পড়েছেন। বর্ণিত হাদিসগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে 'সীহাহ্' গ্রন্থে।

তাহাবী লিখেছেন, উল্লেখিত হাদিস সমূহের মাধ্যমে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত রাতই ইশার ওয়াক্ত। কিন্তু এক তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত উত্তম, অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত কম উত্তম এবং অর্ধরাত্রির পরের ফযীলত আরো কম। স্বসূত্রে তাহাবী নাফে বিন জোবায়েরের মাধ্যমে হজরত ওমর এবং হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে লিখেছেন, তাঁরা বলেছেন— ইশার নামাজ রাতের যে সময়ে ইচ্ছা পড়ো, কিন্তু উদাসীন হয়ো না। হজরত আবু কাতাদার বর্ণনাসূত্রে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেন, ঘুমের মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই (ঘুমের কারণে নামাজ কাযা হয়ে গেলে ক্ষতি নেই)। তবে পরবর্তী নামাজের সময় পর্যন্ত পূর্ববর্তী নামাজকে বিলম্বিত করা অনুচিত। এই হাদিস থেকেও বুঝা যায় যে, ইশার নামাজের সর্বশেষ সময় ফজরের সময়ের পূর্ব পর্যন্ত। যদিও এরূপ বিলম্ব অভিপ্রেত নয়। তাই আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, রাত শেষ হওয়ার কিছু আগে কোনো অবিশ্বাসী ইসলাম গ্রহণ করলে অথবা কোনো ঋতুবতী নারী ঋতুমুক্ত হলে কিংবা কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের প্রতি ইশার নামাজ ওয়াজিব হবে।

প্রকৃত কথা এই যে, হজরত জিবরাইলের নামাজ শিক্ষাদান সম্পর্কিত হাদিস এবং এক ব্যক্তির প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বাস্তব নামাজ শিক্ষাদান সম্পর্কিত হাদিসে নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্তের নির্দেশনা এসেছে। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মাগরিবের নামাজ ওয়াক্তের প্রথম দিকে না পড়ে শেষ দিকে পড়া মাকরূহ। কিন্তু এই মাকরূহ— মাকরূহে তাহরীমী নয়। কেননা রসুল স. এ রকম করেছেন। কিন্তু ইশার নামাজ কিঞ্চিত বিলম্বে পড়াই মোস্তাহাব— রসুল স. এর দ্বিতীয় দিবসের নামাজের বর্ণনায় এ রকমই এসেছে। সূর্যের রঙ হলুদাভ হয়ে গেলে আসর নামাজ পড়া মাকরূহে তাহরীমী হবে (রসুল স. এ রকম কখনও করেন নি)। এরূপ অতিবিলম্বে নামাজ পাঠ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং এ রকম আমলকে শয়তানের প্রভাবদুষ্ট বলা হয়েছে।

হজরত জিবরাইলের হাদিসে বলা হয়েছে, আসরের সময় হচ্ছে বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু এই হাদিসটি রহিত হয়েছে ওই হাদিসের মাধ্যমে যেখানে বলা হয়েছে, আসরের নামাজের সময় থাকে ততোক্ষণ পর্যন্ত— যতোক্ষণ সূর্যের আলো নিস্প্রভ না হয়। আর জোহরের নামাজ বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত— এ কথা বিশুদ্ধ কিংবা দুর্বল কোনো হাদিসেই আসেনি। তাই এই মাসআলাটিতে ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদের বক্তব্য ইমামে

www.eelm.weebly.com

আজমের বিপক্ষে এবং জমহুরের পক্ষে। কিন্তু ইমামে আজম তাঁর অভিমতের সমর্থনে হজরত বোরায়দার হাদিসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করে বলেছেন, দ্বিতীয় দিনে রসুলুল্লাহ স. এর নির্দেশ অনুসারে হজরত বেলাল একামত বলেছিলেন সূর্যের প্রখরতা কমে আসার পর। রসুল স. এ রকমও বলেছেন যে, প্রচণ্ড গরম অনুভূত হলে তাপ কিছুটা কমে আসার পর নামাজ পাঠ কোরো। কেননা, তপ্ত অবস্থা সৃষ্টি হয় দোজখের প্রশ্বাসের কারণে। ইমামে আজম আরো বলেছেন, বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়া পর্যন্ত মদীনার পরিবেশ থাকতো অত্যন্ত উত্তপ্ত। তাই উত্তাপ কমে আসার পর নামাজ পাঠ করতে বলা হয়েছে। আর এই হাদিস হজরত জিবরাইলের ইমামত সম্পর্কিত হাদিসকে রহিত করেছে। কেননা, হজরত জিবরাইল নামাজের নির্ধারিত সময় সম্পর্কে পরিচিতি দান করেছিলেন প্রথম দিকে আর উত্তাপ কমে আসার পর জোহর পাঠ করার কথা বলা হয়েছে পরবর্তীতে। সুতরাং বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের সময় থাকবে। কোরআন মজীদে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয়ই নামাজ মু'মিনদের উপর নির্ধারিত সময়ে ফরজ করা হয়েছে।' রসুল স. বলেছেন, পরবর্তী নামাজের সময় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববর্তী নামাজকে বিলম্বিত করতে পারো। এই নীতিমালা অনুসারে জোহরের নামাজ বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছে। আর হজরত জিবরাইল দ্বিতীয় দিবসে আসরের নামাজে ইমামতি করেছিলেন বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর। সুতরাং এটাই আসরের নামাজের ওয়াক্ত। ইমামে আজমের এই অভিমত্যানুসারে জোহর বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়ার পর পাঠ করাই সমীচীন। কিন্তু এই অভিমতটি তেমন সবল নয়। কারণ, হাদিসে উল্লেখিত উত্তাপ কমে আসার পর নামাজ পাঠের নির্দেশের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়ার পর জোহর পড়তে হবে। চরম উত্তপ্ত অবস্থা থেকে সূর্য হেলে পড়ার প্রাক্কালে আর বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়ার আগেই সে উত্তাপ কিছুটা কমে আসে। এরপর আবার উত্তাপ কিছুটা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই উত্তাপ কমে আসার পর নামাজপাঠ করার অর্থ হচ্ছে বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়ার আগেই জোহর পড়তে হবে। আল্লাহ্পাকই সমধিক জ্ঞাত।

মাসআলাঃ 'শাফাক' অর্থ রক্তিম রেখা অর্থাৎ যতোক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিমাকাশে রক্তিম আভা থাকে। একটি দুর্বল বর্ণনা অনুসারে ইমাম আবু হানিফার অভিমত এ রকমই। কিন্তু তাঁর প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, শাফাক অর্থ ওই শ্বেতাভ বর্ণ যা রক্তিম আভা অবসানের পর দৃষ্ট হয়। শাফাক অর্থ যেহেতু লাল ও শাদা দু'রকমই হয়, তাই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সন্দিগ্ধ সময়কে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। কেননা, নির্ধারিত ওয়াক্তের পরেও নামাজ পাঠ করা যায় (কাযা হলেও)। কিন্তু সময়ের পূর্বে নামাজ পাঠ কোনোক্রমেই সিদ্ধ নয়।

জমহুরের দলিল এই— রসুল স. বলেছেন, রক্তিম বর্ণ অপসৃত হলে ইশার নামাজ ওয়াজিব হয়ে যায়। গারায়েবে মালেক গ্রন্থে ইবনে আসাকের এই হাদিসটিকে দু'ভাবে বর্ণনা করেছেন। ১. আতিক বিন ইয়াকুব মালেক থেকে, তিনি নাফে থেকে এবং তিনি হজরত ইবনে ওমর থেকে মারফু পদ্ধতিতে। ২. মালেক থেকে আবু হোজায়ফা। প্রথমোক্ত সনদটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন ইবনে

www.eelm.weebly.com

আসাকের। বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি মাওকুফ (যার বর্ণনাসূত্র সাহাবা পর্যন্ত)। হাকেম তাঁর মাদখাল গ্রন্থে আবু হোজায়ফার বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন ওই মাওকুফ হাদিস সমূহের সঙ্গে— সমালোচকগণ যেগুলোকে মারফু মনে করেন। মারফু হিসেবে আরো বর্ণনা করেছেন ইবনে খুজাইমা, মোহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ওয়াসেতি থেকে, তিনি শো'বা থেকে, তিনি কাতাদা থেকে, তিনি আবু আইয়ুব থেকে এবং তিনি হজরত ইবনে ওমর থেকে। বর্ণনাটি এই— মাগরিবের সময় থাকে রক্তিমাভা পরিদৃষ্ট হওয়া পর্যন্ত। ইবনে খুজাইমা লিখেছেন, যদি এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধতার স্তরে উপনীত হয়, তবে অন্য কোনো বর্ণনার প্রয়োজন আর থাকে না। কিন্তু এ কথা কেবল বলেছেন মোহাম্মদ বিন ইয়াজিদ। তিনি বলেছেন, আসহাবে শো'বা হামরাতুশ শাফাকের স্থলে সাউরুশ্ শাফাক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, মোহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী। বায়হাকী এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত উবাদা বিন সামেত, হজরত শাদ্দাদ বিন আউস এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে। কিন্তু তাঁর বর্ণনার কোনো সূত্রই বিশুদ্ধ নয়। ওয়াল্লহু আ'লাম।

বাগবী লিখেছেন উহুদ যুদ্ধের পর মুশরিকবাহিনীর অধিনায়ক আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে যখন মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলো, তখন রসুল স. একটি দলকে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে বললেন। কিন্তু তাঁরা শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের কারণে অনুযোগ উত্থাপন করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১০৪

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

❐ শত্রুদলের সন্ধানে তোমরা কাতর হইও না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তাহারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহের নিকট তোমরা যাহা আশা কর উহারা তাহা আশা করে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

যুদ্ধরত উভয় দলই আঘাত প্রাপ্ত হয়। হয় কমবেশি বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত। তাই এখানে বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ্পাক এই মর্মে নির্দেশনা দান করেছেন যে, যুদ্ধযন্ত্রণা কেবল তোমরাই পাওনি, অবিশ্বাসীরাও পেয়েছে। সুতরাং দুর্বলতা প্রদর্শনের কোনো হেতু নেই। রসুলের নির্দেশে তাই অবিশ্বাসীদের পশ্চাদ্ধাবন করাই শ্রেয়। আর হে বিশ্বাসী সম্প্রদায়, তোমরা তো তাদের মতো নও। তোমাদের সম্মুখে রয়েছে আশা। আর অবিশ্বাসীদের সম্মুখে রয়েছে নৈরাশ্য। আল্লাহ্ দর্শন, বেহেশত লাভ, ইহ-পরকালের কল্যাণ তোমাদের কাম্য। কিন্তু

www.eelm.weebly.com

কাফেরদের এ সকল মহৎ অভিলাষ নেই। সুতরাং তোমরাই তো হবে জেহাদে অধিক অগ্রগামী এবং ধৈর্যশীল।

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। সর্বজ্ঞ বলেই তিনি তোমাদের নিয়ত ও আমল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আর প্রজ্ঞাময় বলেই এ কথাও তিনি উত্তমরূপে অবগত যে, তোমাদের প্রতি আরোপিত নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে অনন্ত রহস্য ও কল্যাণ।

বাগবী বলেছেন, আয়াতের বর্ণনাদৃষ্টে অনুমিত হয় যে, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো হামরাউল আসাদে (মদীনা থেকে আট মাইল দূরে এই নামের একটি বাজারে)। 'যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও'—এ কথার মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণিত হয়। কিন্তু বায়যাবী বলেছেন, আয়াতটির অবতরণ স্থল ছোট বদর। ঐতিহাসিকেরা বর্ণিত অভিমত দু'টির একটিকেও সমর্থন করেননি। তাঁদের মতে এ আয়াতটি বদর কিংবা উহুদ— কোথাও অবতীর্ণ হয়নি। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গিমাতেও এ রকম প্রমাণ নেই। বরং এ সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে সুরা আলে ইমরানের ওই আয়াতে— যেখানে বলা হয়েছে, 'যারা আহত হওয়ার পর আল্লাহ্র রসুলের আহবানে সাড়া দিয়েছে.....'। আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১০৫, ১০৬

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ۝ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

❒ তোমার প্রতি সত্য সহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যাহা জানাইয়াছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর, এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করিও না।

❒ এবং আল্লাহের ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

হজরত কাতাদা বিন নোমানের উক্তি হিসাবে তিরমিজি, হাকেম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, বনী উবাইরিকেরা ছিলেন তিন ভাই— বশর, বশীর ও মোবাশ্বের। বশীর ছিলো মুনাফিক। সে রসুল স. এর সাহাবীগণের বিরুদ্ধে শ্লেষপূর্ণ কবিতা রচনা করে প্রচার করতো এবং বলতো এই কবিতা রচিত হয়েছে অমুকের জন্য। মূর্খতা ও ইসলাম—উভয় যুগে সে ছিলো অনটনক্লিষ্ট। খেয়ে না খেয়ে দিন কাটতো তার। তখন মদীনাবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিলো খেজুর, খোরমা ও যব। আমার চাচা রেফায়া বিন জায়েদ একটি মাটির পাত্রে কিছু আটা রেখেছিলেন। ওই পাত্রে তিনি তাঁর যুদ্ধাস্ত্র ও জেরা (বর্ম)ও রেখেছিলেন। এক রাতে সেই পাত্রে রক্ষিত আটা ও যুদ্ধসরঞ্জামগুলো চুরি হয়ে গেলো। সকালে আমার চাচা আমাকে বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! কাল রাতে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম বলে বেঘোরে ঘুমিয়ে ছিলাম। সকালে উঠে দেখি, সিঁদ কেটে চোর আমার আটা ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে

www.eelm.weebly.com

গিয়েছে। আমরা তল্লাশি শুরু করলাম। লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে খবর পেলাম, বনী উবাইরিকের গৃহে আটা দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। আমি পিতৃব্যকে বললাম,মনে হয় ওই আটা আপনারই। আমরা দু'জন বনী উবাইরিকের গৃহে গমন করে তাকে আটা চুরির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই সে জানালো, আমার মনে হয় চুরি করেছে লবিদ বিন যুহাইল। লবিদ ছিলেন পুণ্যবান মুসলমান। তাঁকে চুরির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই তিনি তলোয়ার উত্তোলন করে বললেন, আমি যদি চুরি করে থাকি তবে আমার ঘর থেকে চুরির মাল বের করে নিয়ে এসো। নাহলে এই তলোয়ার দিয়েই আমি তোমাকে দ্বিখণ্ডিত করবো। তলোয়ার উত্তোলিত হয়েছিলো বনী উবাইরিকের উপরে। সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, আরে আরে করো কি! তলোয়ার নামাও। আমি তো তোমাকে চোর বলিনি। খেপছো কেনো? পিতৃব্য বললেন, বুঝতে পেরেছি বনী উবাইরিকই আসলে চোর। চলো, রসুল স. এর নিকটে গিয়ে আসল কথা খুলে বলি। তাই করলাম আমরা। রসুল স. কে জানালাম, আটা নয়—আমরা কেবল যুদ্ধসরঞ্জামগুলো ফেরত পেতে চাই। ওদিকে বনী উবাইরিকের লোকটি তার সুহৃদ আসির বিন ওরওয়ার কাছে গিয়ে জানালো যে, সে নির্দোষ। আশে পাশের লোকজনও সেখানে জমা হয়ে গেলো। তারপর সকলে মিলে এসে হাজির হলো রসুল স. এর দরবারে। তার পক্ষের লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের গোষ্ঠীর লোকের উপর কাতাদা বিন নোমান ও তার পিতৃব্য চুরির অপবাদ দিচ্ছে। অথচ তাদের কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। রসুল স. আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, দেখো। লোকেরা যাকে ভালো বলছে—তোমরা তাকেই বলছো চোর। এ কথা বলার অল্পক্ষণ পরেই অবতীর্ণ হলো এই আয়াত (ইন্না আনজালনা....আজিম পর্যন্ত)। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর বনী উবাইরিকের লোকটি তার অপরাধ স্বীকার করলো এবং যুদ্ধসরঞ্জামগুলো এনে হাজির করলো। রসুল স. সেগুলো আসল মালিককে প্রত্যর্পণ করলেন। ইত্যবসরে চোর বশীর পালিয়ে গিয়ে যোগ দিলো মুশরিকদের সঙ্গে। অতঃপর অবতীর্ণ হলো এই সুরার ১১৫ এবং ১১৬ নং আয়াত দু'টি। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ এবং এটি লিপিবদ্ধ রয়েছে মুসলিম শরীফে।

ইবনে সা'দ তাবকাত গ্রন্থে স্বসূত্রে মাহমুদ বিন লবিদের বর্ণনা থেকে লিখেছেন, কাতাদা বিন নোমানের পিতৃব্য রেফায়া বিন যায়েদের ঘরের পেছনের দিকে সিঁদ কেটে কিছু পরিমাণ আটা, জেরা এবং কতিপয় সামগ্রী চুরি করেছিলো বশীর বিন হাকেম। হজরত কাতাদা এই ঘটনাটি রসুল স.কে জানালেন। রসুল স. বশীরকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। অভিযোগ অস্বীকার করে বসলো বশীর। উল্টো বরং সে দোষ চাপিয়ে দিলো হজরত লবিদের উপর। অথচ তিনি ছিলেন সজ্জন ও শ্রদ্ধার্হ। তখন হজরত লবিদের সততা প্রমাণার্থে এই আয়াতটি (১০৫) অবতীর্ণ হয়। আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানতে পেরে বশীর ইসলাম পরিত্যাগ করে মক্কায় চলে গেলো। সেখানে সালাফা বিনতে সা'দের নিকটে সে রসুল স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপমূলক কবিতা প্রচার করতে লাগলো। কবি সাহাবী হাস্‌সান বিন সাবেত তখন তার বিদ্রূপাত্মক কবিতার জবাব কবিতার মাধ্যমেই দিয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিলো চতুর্থ হিজরীর রবিউস্‌ সানি মাসে। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এ বর্ণনাটি এনেছেন কালাবী। আবু সালেহের বর্ণনাটি ইবনে জারীরও উদ্ধৃত করেছেন এবং

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, আয়াতটি নাজিল হয়েছে এক আনসারী সম্পর্কে। তাঁর নাম ছিলো তুমা বিন উবাইরিক, সে ছিলো যুফার বিন হারেসের বংশোদ্ভূত। সে তার প্রতিবেশী হজরত কাতাদা বিন নোমানের ঘর থেকে আটা ও জেরা চুরি করেছিলো। আটা ভর্তি থলিটি ছিলো ফাটা। চুরির সময় সেই ফাটা দিয়ে আটা পড়ছিলো। তাই তার বাড়ি পর্যন্ত পড়ে গিয়েছিলো আটার দাগ। তুমা জেরাটি এক ইহুদীর নিকট জমা রেখেছিলো—তার নাম যায়েদুস্ সামিন। পরদিন সকালে আটার দাগ ধরে হজরত কাতাদা পৌঁছলেন তুমার বাড়িতে। বললেন, তুমি যে থলিটি নিয়ে এসেছো তার মধ্যে ছিলো আমার আটা ও জেরা। তুমা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বললো, আমি তোমার জেরা নেইনি। এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। হজরত কাতাদা বললেন, এই দেখো আমার বাড়ি থেকে তোমার বাড়ি পর্যন্ত আটার দাগ। দাগ দেখা সত্ত্বেও তুমা আবার আল্লাহ্র নামে কসম করলো। হজরত কাতাদা তাকে ছেড়ে দিলেন এবং আটার দাগ দেখে দেখে উপস্থিত হলেন ইহুদী যায়েদের বাড়িতে। ইহুদী বললো, তুমা বিন উবাইরিক আমাকে একটি জেরা দিয়েছে। এরপর তুমার সম্প্রদায়ের লোকেরা রসুল স. এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললো, আপনি আমাদের লোকের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন, যদি এমন না করেন,তবে আমাদের গোত্রের লোকেরা অপদস্থ হবে। রসুল স. তখন ওই ইহুদীকে শাস্তি দিতে মনস্থ করলেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তুমা ভুসি ভর্তি একটি থলিতে রক্ষিত জেরা— থলিটিসহ চুরি করে ইহুদী যায়েদের নিকট নিয়ে গিয়ে আমানত রাখলো। থলিটির নিচে ছিলো ফুটো, সারা পথ ওই ফুটো দিয়ে ভুসি পড়েছিলো। পর দিন ওই ভুসির চিহ্ন ধরে জেরার মালিক ইহুদী যায়েদের বাড়িতে উপস্থিত হলেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় হাজির হলেন রসুল স. এর দরবারে। রসুল স. চুরির অভিযোগে ওই ইহুদীর হাত কাটতে ইচ্ছা করলেন। মুকাতিলের বক্তব্য হিসেবে বাগবী বর্ণনা করেছেন, ইহুদী যায়েদের নিকট তুমা চুরি করা জেরাটি গচ্ছিত রেখেছিলো। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে সে অভিযোগ অস্বীকার করে বসে। তখন নাজিল হয় এই আয়াতটি।

আয়াতে বলা হয়েছে —তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করো। এখানে 'জানিয়েছেন' বুঝাতে আরাকা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে রুইয়াত থেকে যার অর্থ দেখা। রুইয়াত এর পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশের জন্য দু'টি কর্মপদের প্রয়োজন হয়। অথচ এখানে বাবে ইফয়ালের ইরায়াতুন ধাতুমূল থেকে 'আরাকা' ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে আসলে তিনটি কর্মপদের প্রয়োজন। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একটির। আর রুইয়াত অর্থ যে দর্শন— সেই দর্শন এখানে বুঝানো হয়নি। এখানে রুইয়াত বা দর্শনের উদ্দেশ্য হবে, মারেফাত বা পরিচিতি। অর্থ হবে এ রকম—আল্লাহ্ যা তোমার নিকট বর্ণনা করেছেন (প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেছেন) — সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত প্রদান করো। এখানে প্রথম কর্মপদটি কেবল বিদ্যমান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কর্মপদটি রয়েছে উহ্য।

আমি বলি, এখানে রুইয়াত অর্থ জানা বা জ্ঞাত হওয়া। এর পূর্বে সম্বন্ধবাচক পদ 'মা' সংযোজন করার উদ্দেশ্য হবে— ওই পূর্ণ বিষয়টি যার সঙ্গে এলেমের

www.eelm.weebly.com

(জ্ঞানের) সম্পর্ক রয়েছে। এখানে সম্বন্ধবাচকের দিকে প্রত্যাবর্তনের সর্বনামটি রয়েছে উহ্য। ওই উহ্য সর্বনামটি এখানে শব্দটির অর্থ প্রকাশ করবে। উহ্য সর্বনামটিই এখানে উহ্য কর্মপদ দু'টির স্থলাভিষিক্ত। তাই এখানে একাধিক কর্মপদ উল্লেখের প্রয়োজন হয়নি। অতঃএব আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য হবে এই— তুমিই তুমা, লবিদ এবং ইহুদী যায়েদের মধ্যে সংঘটিত মামলাটির বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দান করবে। সেই উদ্দেশ্যেই আমি কিতাবের এই আয়াত অবতীর্ণ করেছি।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা এ কথাটি স্পষ্ট হয়েছে যে, রসুল স. শুধু ধারণা অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। কিন্তু তিনি যে ইজতেহাদ (গবেষণা) করতেন না— সে কথার প্রমাণ এখানে নেই। বরং তিনি প্রতিটি সমস্যা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করতেন। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁর সেই সিদ্ধান্ত ভুল না বলা হলে তিনি বুঝতেন, সিদ্ধান্তটি সঠিক। অন্য মুজতাহিদগণের অবস্থা এ রকম নয়। অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ দ্বারা অন্য মুজতাহিদগণকে সাহায্য করা হয় না। তাই তাঁদের ইজতেহাদ নিশ্চিত বিশ্বাসের স্তরে উপনীত হতে পারে না। আমর বিন দিনার থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি হজরত ওমরকে বললেন, আল্লাহ্পাক যা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন আপনিতো সেই শিক্ষা অনুসারে মীমাংসা করেন। হজরত ওমর বললেন, খামোশ । এই মহান মর্যাদাতো কেবল ছিলো রসুল স. এর।

এ রকমও মনে করা যেতে পারে যে, এই আয়াতের নির্দেশটি ব্যাপক অর্থবোধক (কেবল রসুল স. জন্য নির্ধারিত নয়)। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, যখন খবরে আহাদ (একজন বর্ণনাকারীর বর্ণনা) অথবা কিয়াস (অনুরূপ বিধান) থেকে কোনো হুকুম মুজতাহিদগণের জ্ঞানের আওতায় আসে, তখন কোরআন, হাদিস ও এজমার মাধ্যমে ওই হুকুমের উপর আমল করা ওয়াজিব হবে। সে বিধান বিশুদ্ধ হলেও। ভুল হলেও। এ অবস্থা বলবৎ থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী দলিল পাওয়া যায়। চিন্তা ও বোধের চূড়ান্ত ব্যবহারের পরেও মুজতাহিদগণের এমতো বিশ্বাস অর্জিত হয় না যে, সিদ্ধান্তটি প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্র হুকুম। তবুও তাঁরা এতটুকু বুঝতে পারেন যে, এ ইজতেহাদ অবশ্য পালনীয়।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে ওয়াহাব বলেছেন, মালেক আমাকে জানিয়েছেন, মানুষের মধ্যে মীমাংসার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার প্রকার দু'টি। ১. ওই মীমাংসা যা কোরআন ও হাদিসে স্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ রকম নির্দেশ অকাট্য, বিশুদ্ধ এবং ওয়াজিব। ২. ওই নির্দেশ যা কোরআন ও হাদিসে সরাসরি হাঁ বা না হিসেবে লিপিবদ্ধ নেই। এ ধরনের বিধান বিদ্বান মুজতাহিদগণকে গভীর অভিনিবেশসহকারে বুঝে নিতে হয়। এই দুই প্রকারের বাইরে অন্য কোনো কিছুই গ্রহণীয় নয়।

শায়েখ আবু মনসুর বলেছেন আয়াতটির অর্থ হবে এ রকম—অবতীর্ণ প্রত্যাদেশটির মাধ্যমে আল্লাহ্পাক তোমাদের অন্তরে যে রকম উপলব্ধি দান করেছেন, সেই মোতাবেক মীমাংসা করো। শায়েখের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, রসুল স. এর জন্য যে ইজতেহাদ সিদ্ধ— তার প্রমাণ রয়েছে এই আয়াতে।

www.eelm.weebly.com

আয়াতটির শেষাংশে বলা হয়েছে—বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক কোরো না। 'তর্ক কোরো না' কথাটি যদি 'সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করছি' এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তবে এখানে অর্থ হবে, এ রকম অবতীর্ণ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমি বলে দিয়েছি যে, আমানত খেয়ানতকারী বা বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সাহায্যকারী হয়ো না। আর তর্ক করার সম্পর্ক যদি 'আল কিতাব' এ সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তবে অর্থ হবে এ রকম—আমি কিতাব অবতীর্ণ করেছি এবং এ নির্দেশও অবতীর্ণ করেছি যে, বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সহায়তাকারী হয়ো না। এখানে 'আল খয়িনিনা' শব্দটির উদ্দেশ্য বনী উবাইরিক এবং 'খসিমা' শব্দটির উদ্দেশ্য নিরপরাধ লবিদ বিন সহল অথবা ইহুদী যায়েদ বিন যামীন।

পরের আয়াতে (১০৬) নির্দেশ করা হয়েছে (তোমরা কাতাদা বিন নোমান সম্পর্কে যে কথা বলেছো তার জন্য) আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। হজরত কাতাদার এই ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত করেছেন তিরমিজি এবং হাকেম। বাগবী লিখেছেন, এখানে ক্ষমাপ্রার্থনার অর্থ ইহুদীকে শাস্তি প্রদানের যে ইচ্ছা পোষণ করা হয়েছিলো, তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। মুকাতিল বলেছেন, এখানে অর্থ হবে এ রকম— তোমার সাহায্যার্থে যা কিছু বলা হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও।

শেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ নিশ্চয়ই ক্ষমাপ্রার্থীগণকে আল্লাহ্‌পাক ক্ষমা করেন এবং তাদের প্রতি তিনি পরম দয়াবান।

সূরা নিসা ঃ আয়াত ১০৭, ১০৮

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِـيْمًا ۝ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَھُوَ مَعَھُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ۝

❑ যাহারা নিজদিগকে প্রতারিত করে তাহাদের পক্ষে কথা বলিও না, আল্লাহ্ বিশ্বাস ভঙ্গকারী পাপীকে ভালবাসেন না।

❑ তাহারা মানুষকে লজ্জা করে; কিন্তু আল্লাহ্‌কে লজ্জা করে না এবং রাত্রে যখন তাহারা তিনি যাহা পছন্দ করেন না এমন বিষয়ের পরামর্শ করে তখন তিনি তাহাদের সঙ্গেই থাকেন এবং তাহারা যাহা করে তাহা সর্বোতভাবে আল্লাহের জ্ঞানায়ত্ব।

এই আয়াতে (১০৭) আত্মপ্রতারকদের পক্ষে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্যকে যারা প্রতারণা করে, তারা আসলে নিজেকেই প্রতারণা করে। তাদেরকেই

www.eelm.weebly.com

আয়াতে বলা হয়েছে 'যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে'। ইবনে উবাইরিক এবং তার মতো লোকদেরকে এখানে আত্মপ্রতারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথবা এ রকমও বলা যেতে পারে যে, ইবনে উবাইরিক ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরাই এখানে আত্মপ্রতারক। কারণ, তারা ছিলো অন্যায়ের সমর্থক। ইবনে উবাইরিক সম্পর্কে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা রসুল স. এর নিকট সুপারিশ করেছিলো।

'আল্লাহ্ বিশ্বাসভঙ্গকারী পাপীকে ভালোবাসেন না'— এ কথার অর্থ যারা খেয়ানতের পাপে নিবিষ্টচিত্ত, আল্লাহ্পাক তাদেরকে ঘৃণা করেন। কারণ তারা মিথ্যাবাদী। তারা সত্যকে গোপন করে এবং নিরপরাধ লোকের উপর দোষ চাপিয়ে দেয়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে যদিও রসুল স. কে লক্ষ্য করে এ রকম বলা হয়েছে, 'তাদের পক্ষে কথা বোলো না'— কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নির্দেশটি তাঁর স. মাধ্যমে জানানো হয়েছে অন্য লোকদেরকে। কেননা আত্মপ্রতারকদের পক্ষে কথা বলা রসুল স. এর জন্য অসম্ভব। খেয়ানতের সমর্থক তিনি কস্মিনকালেও নন। নির্দেশনাটির বাকভঙ্গি ওই আয়াতের মতো যেখানে বলা হয়েছে, 'অতঃপর আপনি সন্দেহে নিপতিত হন যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি।' — এই আয়াতেও রসুল স. এর মাধ্যমে অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, রসুল স. এর পক্ষে কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া সম্ভবই নয়।

ইস্তেগফার অর্থ শরিয়তের হুকুম মানা এবং অনুসরণ করা। বাগবী লিখেছেন, নবী-রসুলগণের ইসতেগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনা তিন ধরনের। ১. নবুয়ত লাভের পূর্বের ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা। ২. আপন উম্মত এবং নিকট আত্মীয়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা। ৩. ওই সকল বৈধ কর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা— যা তাঁরা পরবর্তী সময়ে আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করেছেন।

পরের আয়াতে (১০৮) এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, মানুষকে নয়, লজ্জা করতে হবে আল্লাহ্কে। ইবনে উবাইরিক ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা মানুষের নিকট লজ্জিত ও অপমানিত হওয়ার আশংকায় সত্য গোপন করতে সচেষ্ট হয়েছিলো।

আত্মপ্রতারকেরা এ কথা জানেনা যে, প্রকারবিহীনরূপে আল্লাহ্পাক তাঁর সৃষ্টির সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাই তিনি সকলের অবস্থা সম্যক পরিজ্ঞাত। আত্মপ্রতারকেরা রাতে গোপনে একে অপরের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে। আল্লাহ্পাক তাদের সকল দূরভিসন্ধিরই খবর রাখেন। কারণ, সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্বে।

বাগবী লিখেছেন, তুমার সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে স্থির করেছিলো যে, রসুল স. কে বলতে হবে তুমা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ কথা বললে রসুল স. তুমার কথা বিশ্বাস করবেন এবং তার কসমকেও গ্রহণ করবেন। তখন তিনি স. ইহুদীর কথা আর শুনবেন না। আল্লাহ্পাক তুমার সম্প্রদায়ের এই দূরভিসন্ধিকে পছন্দ করেননি।

www.eelm.weebly.com

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ جَٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ○ وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ○

❑ দেখ তোমরাই ইহজীবনে তাহাদের পক্ষে কথা বলিতেছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহের সম্মুখে কে তাহাদের পক্ষে কথা বলিবে অথবা কে তাহাদের উকিল হইবে?

❑ কেহ কোন মন্দ কার্য করিয়া অথবা নিজের প্রতি জুলুম করিয়া পরে আল্লাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ্‌কে সে ক্ষমাশীল পরম দয়ালু পাইবে।

'তোমরা তাদের পক্ষে কথা বলছো'— এখানে তাদের পক্ষে অর্থ ইবনে উবাইরিক এবং তার মতো অসৎ লোকদের পক্ষে। পক্ষে কথা বলা বুঝাতে এখানে 'জিদালুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ তুমুল বাদানুবাদ। শব্দটি এসেছে 'জাদলুন' থেকে। 'জিদাল' এর আরেকটি অর্থ কঠোরতা ও বিভিন্ন যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়া। অথবা শব্দটি 'জাদ্‌লাতুন' থেকেও উৎপন্ন হয়ে থাকতে পারে। 'জাদ্‌লাতুন' অর্থ ওই মৃত্তিকা যেখানে একদল অন্যদলকে ধরাশায়ী করতে প্রয়াসী হয়।

কিয়ামতের দিন ইবনে উবাইরিক এবং তার মতো লোকদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালা কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন। তাই প্রশ্ন করা হয়েছে, তখন কে তাদের পক্ষে কথা বলবে? কে-ই বা সুপারিশ করবে তাদের পক্ষে? উকিলেরা তাদের মোয়াক্কেলের পক্ষে সুপারিশ ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, পাপ করার পর অথবা নিজের উপর জুলুম করার পর যে ব্যক্তি ক্ষমাপ্রার্থী হয়, সে আল্লাহ্‌পাককে পায় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে। পাপ বুঝাতে এখানে 'সু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'সু' অর্থ শিরিক ব্যতীত অন্য সকল পাপ। আর 'জুলুম' অর্থ 'শিরিক'। অথবা 'সু' সগীরা গোনাহ এবং জুলুম কবীরা গোনাহ। এখানে ইবনে উবাইরিক এবং তার মতো লোকদেরকে তওবা ও ইসতেগফারের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে রাহ্‌ওয়াইহ্‌ তাঁর মসনদে লিখেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, যখন 'আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কর্ম করবে সে তার প্রতিফল লাভ করবে এবং সে তার নিজের জন্য আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না'— এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন আমরা আতংকে পানাহার পরিত্যাগ

www.eelm.weebly.com

করলাম। অতঃপর অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত দু'টি। ক্ষমাপ্রার্থনাকারীরা আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে—এ রকম আশ্বাস প্রাপ্তির পর আমরা দুশ্চিন্তামুক্ত হলাম। বিভিন্ন পদ্ধতিতে হজরত আলীর মাধ্যমে হজরত আবু বকরের উক্তি বর্ণিত হয়েছে এ রকম— আমি স্বয়ং রসুল স. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো পাপ কর্ম করে ফেলে, সে যেনো তৎক্ষণাৎ উত্তমরূপে ওজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে যায় এবং কৃত পাপের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে। কেননা তিনি নিজেই বলেছেন, মন্দকর্ম ও জুলুমের পর যে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, সে আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুরূপে পাবে। ইবনে আবী হাতেম, ইবনুস সুন্নী, ইবনে মারদুবিয়া।

সূরা নিসা ঃ আয়াত ১১১, ১১২

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ○

❒ কেহ পাপ কার্য করিলে সে উহা নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

❒ কেহ কোন দোষ বা পাপ করিয়া পরে উহা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করিলে সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া ও ক্ষতি পাপিষ্ঠের উপরেই আপতিত হয়। স্বকৃত পাপের বোঝা কখনো অন্যেরা বহন করে না। আল্লাহ্পাক সর্বজ্ঞ, তাই তিনি সকলের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। আর তিনি প্রজ্ঞাময়—তাই প্রজ্ঞাপূর্ণ বিনিময় দান করবেন। পাপীকেও। পুন্যবানকেও।

যে ব্যক্তি ছোটো অথবা বড় গোনাহ ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃতভাবে করার পর নিরপরাধ কারো (লবিদ কিংবা ইহুদী যায়েদের মতো) উপর দোষ চাপিয়ে দেয়, সে তো চরম অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপের বোঝা আপন স্কন্ধে স্থাপন করে। সে অপবাদ ও পাপের গুরুভারবাহী।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত জায়েদ বিন আসলাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদিন হজরত ওমর দেখলেন, হজরত আবু বকর তাঁর আপন রসনা ধরে টানছেন। হজরত ওমর বললেন, হে রসুলুল্লাহ্র প্রিয় খলিফা! আপনি এমন করছেন কেনো? হজরত আবু বকর বললেন, এই জিহবা আমাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ শানিত রসনার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে (বাচালতা ও বাকপটুতার জন্য দেহের প্রতিটি প্রত্যঙ্গই দুঃখ পায়)।

www.eelm.weebly.com

সূরা নিসা ঃ আয়াত ১১৩

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۝

❒ তোমার প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তাহাদের এক দল তোমাকে পথভ্রষ্ট করিতে চাহিতই; কিন্তু তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও পথভ্রষ্ট করে না, এবং তোমার কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব এবং হিকমত অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তুমি যাহা জানিতে না তাহা তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, তোমার প্রতি আল্লাহের মহা অনুগ্রহ রহিয়াছে।

এরশাদ হয়েছে— হে রসুল, আপনার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহ (ফজল) এবং দয়া (রহমত)। তাই আপনি নিরাপদ। ইবনে উবাইরিকের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে আল্লাহ্পাক আপনাকে অবহিতি দান করেছেন। তাই আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহ ও দয়ার কারণেই এ রকম হয়েছে। ইবনে উবাইরিকের দল আপনাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলো। তারা মিথ্যা কথা বলে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছিলো ভুল মীমাংসার দিকে। আপনিও সরল বিশ্বাসে তাদেরকে সমর্থন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের অপচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। তারা নিজেরাই হয়েছে বিভ্রান্তির শিকার। আল্লাহ্পাক আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন আল কোরআন এবং হিকমত (প্রজ্ঞা)। আরও দান করেছেন ওই জ্ঞান যা ইতোপূর্বে আপনি জানতেন না। কাতাদা বলেছেন, এই জ্ঞান হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কিত বিবিধ জ্ঞান এবং হালাল ও হারাম বিষয়ক জ্ঞান।

সবশেষে বলা হয়েছে, তোমার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ। —এই মহা অনুগ্রহ হচ্ছে নবুয়ত ও রেসালত। এর চেয়ে উন্নততর অনুগ্রহ আর নেই।

সূরা নিসা ঃ আয়াত ১১৪

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ ۢ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

❒ তাহাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নাই, তবে কল্যাণ আছে যে দান খয়রাত, সৎকার্য ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়

www.eelm.weebly.com

তাহার পরামর্শে, আল্লাহের সন্তুষ্টি লাভের আকাংখায় কেহ উহা করিলে তাহাকে মহা পুরস্কার দিব।

গোপন পরামর্শ বুঝাতে এখানে 'নাজওয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কামুস অভিধানে বলা হয়েছে, 'নাজওয়া' অর্থ গোপন ভেদ। যেমন নাজাইতুহু অর্থ আমি তার সাথে গোপন কথা বলেছি। সিহাহ্ গ্রন্থে রয়েছে, নাজওয়াতুল আরদ্ব অর্থ টিলা। অর্থাৎ সকলের নিকট থেকে পৃথক হয়ে কোনো টিলায় আরোহন করে কথা বলা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, নাজওয়া অর্থ এমন কথা যাতে নিহিত রয়েছে, বক্তার নাজাত বা পরিত্রাণ। বাগবী লিখেছেন, নাজওয়া গোপন পরামর্শের নাম। কেউ আবার বলেছেন, নাজওয়া অর্থ ওই উদ্যোগ— যা কোনো দল প্রকাশ্যে অথবা গোপনে এককভাবে করে থাকে। এ ধরনের গোপন পরামর্শ বা উদ্যোগ অধিকাংশই কল্যাণহীন। এখানে 'তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শ'— অর্থ, ইবনে উবাইরিক গোষ্ঠীর গোপন পরামর্শ। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে ঘোষণাটি সাধারণ অর্থবোধক। অর্থাৎ কেবল উবাইরিক গোষ্ঠী নয়—সকল মানুষের গোপন শলাপরামর্শের কথাই এখানে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এ সকল পরামর্শের অধিকাংশই কল্যাণরহিত।

ওই সকল গোপন পরামর্শকারীরা অবশ্য এর ব্যতিক্রম— যারা সৎকর্মশীল, দানশীল এবং শান্তিকামী। গোপন পরামর্শকারী হিসেবে যদি উবাইরিক গোত্রকে ধরা হয়, তবে বুঝতে হবে যারা দানশীল তাঁরা উবাইরিক গোষ্ঠীর কেউ নয়। মুজাহিদের ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থ হবে, যারা দানশীল তারা কল্যাণহীন গোপনপরামর্শকারী জনতা থেকে পৃথক। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সকল গোপন পরামর্শকারীকে কল্যাণহীনরূপে চিহ্নিত করার পর দানশীলদেরকে এখানে পৃথক করে দেয়া হয়েছে।

একটি সন্দেহঃ 'আমার নিকট অনেক লোক এসেছে কিন্তু যায়েদ আসেনি'— এ রকম বললে এ কথা প্রমাণ হয় না যে, অনেক লোকের মধ্যে যায়েদও রয়েছে। তারপর তাকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। এমনও বলা যেতে পারে যে, যায়েদ অনেক লোকের অন্তর্ভুক্তই নয় —বরাবরই সে জনতা থেকে পৃথক।

উত্তরঃ এখানে আয়াতের অর্থ এ রকম— তাদের অধিকাংশের গোপন পরামর্শের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। কিন্তু যারা দান খয়রাত করার পরামর্শ দেয় তারা এর ব্যতিক্রম। এখানে 'তাদের' শব্দটির মধ্যে সকল পরামর্শদাতা অন্তর্ভুক্ত। এই অন্তর্ভুক্তির পর দানের পরামর্শ দানকারীদেরকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। গোপন পরামর্শ দানকারীদেরকে কর্তা হিসেবে গ্রহণ না করা হলেই কেবল এই উত্তরটি বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। নতুবা বাক্যটি হবে এ রকম— কোনো কল্যাণ নেই অধিক পরামর্শকারীদের মধ্যে, যাকে হুকুম করা হয় তাকে ব্যতীত। এ ধরনের কথা অতিরিক্ত ও নিরর্থক।

উল্লেখ্য এখানে 'ইল্লা' শব্দটির অর্থ 'ব্যতীত' নয় বরং অর্থ হবে বিশেষণমূলক। যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছে 'ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো

www.eelm.weebly.com

উপাস্য যদি হতো তবে সব ধ্বংস হয়ে যেতো (লাওকানা ফিহিমা আলেহাতুন ইল্লাল্লাহু লা ফাসাদাতা)। এখানে 'ইল্লা' শব্দটির অর্থ হবে 'অন্য কেউ'। দানশীলতার পর বলা হয়েছে সৎকর্মের কথা আও মারূফ। মারূফ অর্থ শরিয়ত সমর্থিত সৎকর্ম। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে দানখয়রাত অর্থ ফরজ জাকাত এবং মারূফ অর্থ ঋণ, নফল (অতিরিক্ত) সদকা এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা।

এ রকমও হতে পারে যে, মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশের সঙ্গে সৎকর্মের বিষয়টি সম্পৃক্ত। শান্তি স্থাপন বুঝাতে এখানে 'এসলাহ্' শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণভাবে সৎকর্ম সম্পাদন এবং বিশেষভাবে মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এখানে। বিষয় দু'টোর গুরুত্ব তুলে ধরাই এ রকম পৃথক উল্লেখের কারণ। অথবা এ রকমও বলা যায় যে, সংশোধন বা সন্ধির সকল দিক কল্যাণকর নয়—তবুও তা শরিয়ত সমর্থিত। যেমন মিথ্যা কথা বলা—যদিও উত্তম নয় তবুও সংশোধন বা সন্ধির মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যা বলা জায়েয। হজরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা বিন আবু মুয়ীত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তি মিথ্যুক নয় যে মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে— যে কোনো উত্তম কথা নিজের দিক থেকে বলে দেয়। অথবা কোনো উত্তম বাক্য সৃষ্টি করে অন্যের নিকট পৌঁছায়। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু দারদার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন— আমি কি তোমাদেরকে ওই কথা জানাবো না যা কিয়ামত দিবসে হবে নামাজ অপেক্ষাও অধিক মর্যাদামণ্ডিত। (হজরত আবু দারদা বলেন) আমরা নিবেদন করলাম, নিশ্চয়ই। বলুন ইয়া রসুলাল্লাহ্। তিনি স. বললেন, মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করো। পারস্পরিক বিবাদ পুণ্যকে অপসারিত করে। আবু দাউদ, তিরমিজি হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।

হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, তিনটি স্থানে মিথ্যা বলা জায়েয— আপন স্ত্রীকে প্রসন্ন করতে, যুদ্ধরত অবস্থায় এবং মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশ্যে।

দান-খয়রাত, সৎকার্য এবং শান্তি স্থাপন করতে হবে আল্লাহ্পাকের সন্তোষ সাধনার্থে। যে এ রকম করবে সে লাভ করবে মহাপুরস্কার। এ সকল কর্মের পরামর্শ যারা দেয় তারা কল্যাণহীন গোপন পরামর্শ দাতাদের মতো নয়। কারণ তারা সুনাম, সুখ্যাতি বা লোক দেখানোর জন্য আমল করেন না। হজরত ওমর থেকে বর্ণিত মারফু হাদিসে রয়েছে 'ইন্নামাল আ'মালু বিন নিয়াত' (সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভশীল)। বোখারী, মুসলিম।

আল্লাহ্পাক এখানে যে মহা পুরস্কারের শুভসংবাদ দিয়েছেন, তা পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থিত সকল সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। বোখারী ও মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু শোরাইহ্ থেকে আহমদ লিখেছেন, রসুল স. বলেন—— যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাসী সে যেনো উত্তম কথা বলে অথবা

www.eelm.weebly.com

নিশ্চুপ থাকে। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন, আল্লাহ্পাক ওই ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করুন যে কল্যাণজনক কথা বলে অথবা নীরব থাকে। এ **রকম ব্যক্তি ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত।**

পুণ্যবানদেরকে মহাপুরস্কারের শুভসমাচার দেয়ার পর আসছে পুণ্যবিবর্জিতদের শাস্তির কথা। এরশাদ হচ্ছে—

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১১৫

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝

❑ **কাহারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে তবে যে দিকে সে ফিরিয়া যায় সে দিকেই তাহাকে ফিরাইয়া দিব এবং জাহান্নামে তাহাকে দগ্ধ করিব, আর উহা কতো মন্দ আবাস!**

সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসুলের বিরুদ্ধাচরণের অর্থ অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে রসুলের নির্দেশ অবগত হওয়ার পর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ। নিশ্চিত ও অকাট্য অবহিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, যারা রসুল স. এর নির্দেশ সম্পর্কে জানে না অথবা নির্ভরযোগ্য নয় এমন কোনো অস্পষ্ট কিংবা শিথিল সূত্রে নির্দেশ অবগত হয়, তাদেরকে নির্দেশ লংঘনকারী বলা যাবে না। আবার সর্বাত্মক চেষ্টা করা সত্ত্বেও হাদিসের অর্থ বুঝতে গিয়ে যদি কারো 'ইজতেহাদী' (গবেষণালব্ধ) ভুল হয়ে যায় তবে তাকেও নির্দেশবিরোধী মনে করা যাবে না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে রসুলের বিরুদ্ধাচরণ অর্থ ধর্মত্যাগী হওয়া। তওহীদ ও নবুয়ত প্রকাশিত হওয়ার পর যে ধর্মবিমুখ হয় সে-ই প্রকৃতপক্ষে রসুলের বিরুদ্ধাচারী। যেমন ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে তুমা'র প্রসঙ্গটি।

বিশ্বাসীদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করার অর্থ ইমানদারগণের ঐকমত্যের বিরুদ্ধাচারী হওয়া। ঐকমত্যবিরোধী না হয়ে যদি কোনো কোনো মুসলমানের ধারণা ও কর্মধারার বিরোধী কেউ হয় তবে তা দূষণীয় নয়। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, একদল প্রকৃত বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে গেলেও অন্য কোনো বিশ্বাসীর দলভুক্ত হতে হবে। রসুল স. এরশাদ করেন, আমার সাহাবীগণ আকাশের নক্ষত্রতুল্য। তাঁদের যে কোনো একজনের অনুসরণ করলে তোমরা প্রকৃত গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারবে।

রসুলের বিরুদ্ধাচারী এবং বিশ্বাসীদের পথবিচ্যুত যারা, তাদের সম্পর্কে আয়াতে বলা হয়েছে— আল্লাহ্পাক তাদেরকে বাধা দিবেন না। তারা যেদিকে যেতে চায় সেদিকেই যেতে দিবেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ কথার

www.eelm.weebly.com

অর্থ তারা পৃথিবীতে যে যার প্রতি নির্ভরতা রাখবে, আখেরাতে আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে ওই সকল বস্তুর সঙ্গী করে দিবেন। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিবসে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করতে থাকবে— যারা পৃথিবীতে গায়ের আল্লাহ্‌র উপাসনা করেছো এখন তাদেরকেই অনুসরণ করো। এরপর তাদেরকে তাদের উপাস্যসহ নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে।

শেষে বলা হয়েছে, জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করবো, আর জাহান্নাম কতো মন্দ আবাস।

জ্ঞাতব্যঃ ইমাম মালেক লিখেছেন, ওমর বিন আব্দুল আজিজ বলেন, রসুল স. এর পৃথিবী পরিত্যাগের পর তাঁর খলিফাগণ কতিপয় তরিকা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ওই সকল পদ্ধতিকে মান্য করলে সত্যানুসরণ ও ধর্মপরায়ণতা শক্তিশালী হয়। খোলাফায়ে রাশেদীন প্রবর্তিত ওই সকল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলার অনুমতি কারো নেই। সিদ্ধান্তগুলোর পুনর্বিবেচনা-চিন্তা নিষিদ্ধ। ওই সকল সিদ্ধান্তকে যে মান্য করবে সে আল্লাহ্ কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। যে মান্য করবে না, সে হবে বিশ্বাসীদের পথ থেকে বিচ্যুত। তার এই বিচ্যুতির পরিণাম জাহান্নাম। আর জাহান্নাম অত্যন্ত নিকৃষ্ট অধিবাস।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে তু'মা বিন উবাইরিক সম্পর্কে। সে চুরি করেছিলো। চৌর্যকর্ম প্রমাণিত হলে হাত কাটা যাওয়ার ভয়ে সে ধর্মত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিলো মক্কায়। তার সম্পর্কে এই আয়াতে বলা হয়েছে 'যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।'

রসুলের বিরুদ্ধাচরণ আযাবকে অপরিহার্য করে। বিশ্বাসীদের ঐকমত্যের বিরোধিতাও শাস্তিকে ডেকে আনে। এ দু'টো অপরাধ যে করবে সে অবশ্যই শাস্তিযোগ্য। এর যে কোনো একটি করলেও শাস্তিযোগ্য। রসুলের বিরুদ্ধাচরণ যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি ঐকমত্যের বিরুদ্ধাচরণও নিষিদ্ধ। সুতরাং মেনে নিতে হবে যে, ঐকমত্যের অনুসরণ ওয়াজিব।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকী ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এই উম্মতকে ভুলের উপর একত্র করবেন না। যুথবদ্ধতার উপরে রয়েছে আল্লাহ্‌র হাত। যে যুথচ্যুত, সে দোজখী। আল্লাহ্‌পাকই অধিক জ্ঞাত।

বাগবী লিখেছেন, তু'মা বিন উবাইরিক মদীনা থেকে মক্কায় গিয়ে হাজ্জাজ বিন এলাজ নামক এক ব্যক্তির আশ্রয় লাভ করলো। সে আশ্রয়দাতার গৃহেই একদিন চুরি করে বসলো। সিঁদ কেটে চুরি করার সময় একটি পাথর গড়িয়ে এসে তাকে চাপা দিলো। সে আর নড়াচড়া করতে পারলো না। সকাল হলে লোকেরা সচক্ষে

www.eelm.weebly.com

দেখলো তার এই অপকীর্তি। কেউ কেউ তাকে হত্যা করতে চাইলো । কেউ কেউ বললো, সে তোমাদের আশ্রিত, সুতরাং ছেড়ে দাও। তাকে ছেড়ে দেয়া হলো বটে, কিন্তু বলা হলো সে যেনো মক্কা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায়। মক্কা পরিত্যাগের পর বনিকদের একটি কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া যাত্রা করলো সে। পথিমধ্যে একস্থানে কাফেলা যখন বিশ্রামরত তখন কাফেলার লোকদের মাল চুরি করলো। পলায়ণকালে আবার ধরা পড়লো সে। লোকেরা তখন সকলে তাকে সঙ্গেসার (প্রস্তর নিক্ষেপ) করে মেরে ফেললো। তার উপর এতো পাথর নিক্ষিপ্ত হলো যে, পাথরের নিচেই রচিত হলো তার সমাধি। এক বর্ণনায় এসেছে— সে চুরি করা একটি স্বর্ণমুদ্রার থলিসহ একস্থানে নৌকায় আরোহণ করেছিলো। সেখানেই ধরা পড়লো সে। লোকেরা তখন তাকে সমুদ্রে ফেলে দিলো। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, সে বনী সুলাইম জনপদে গিয়ে মূর্তিপূজকে পরিণত হলো। মৃত্যু পর্যন্তই সে ছিলো মূর্তিপূজক।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১১৬

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

❒ আল্লাহ্ তাঁহার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, ইহা ব্যতীত সব কিছু যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং কেহ আল্লাহের শরীক করিলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এক বৃদ্ধ বেদুঈন সম্পর্কে। তিনি রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে একদিন বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! অনেক পাপ কর্ম আমি করেছি কিন্তু আল্লাহ্কে যখন চিনেছি এবং তাঁকে বিশ্বাস করেছি তখন থেকে আমি শিরিক থেকে মুক্ত। ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নেই। এখন আমি বয়োবৃদ্ধ। মৃত্যুকাল সন্নিকটে। আমি লজ্জিত, তওবাকারী ও ক্ষমাপ্রার্থী–জানিনা আমার অদৃষ্টে কী রয়েছে। বৃদ্ধ বেদুঈনের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ছা'লাবী ও জুহাক এ রকম বলেছেন।

আয়াতে স্পষ্টরূপে বলে দেয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করে তাদেরকে তিনি ক্ষমা করেন না। কিন্তু শিরিক ছাড়া অন্য সকল পাপ ক্ষমার্হ। তিনি ইচ্ছে করলে এ সকল পাপ মার্জনা করেন— কখনো তওবার পর আবার কখনো তওবা ব্যতিরেকেই। তাই শেষে বলা হয়েছে আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক যে করে সে চরম পথভ্রষ্ট।

বাগবী লিখেছেন, নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে।

www.eelm.weebly.com

إِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ إِلَّآ إِنٰثًا ۚ وَإِنْ يَّدْعُوْنَ إِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ○ ۙ
لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ○

❒ তাঁহার পরিবর্তে তাহারা দেবীর পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে।

❒ আল্লাহ্ তাহাকে অভিসম্পাত করেন, এবং সে বলে,'আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করিবই।'

আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদত গ্রহণ করার অধিকার কারো নেই। ইবাদত করতে হবে কেবল আল্লাহ্র এবং প্রার্থী হতে হবে তাঁর নিকটেই। রসুল স. এরশাদ করেছেন, প্রার্থনাও ইবাদত। অতঃপর তিনি স. 'অক্বলা রব্বুকুমুদউনি আসতা জিব লাকুম' (এবং তোমাদের স্রষ্টা নির্দেশ করেন, তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো) —এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা।

উপাসনাকারীরা তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য উপাসনা করে থাকে। অবিশ্বাসীরা উপাসনা করে থাকে দেবদেবীর এবং বিদ্রোহী শয়তানের। দেবী বুঝাতে এখানে 'ইনাস্' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির অর্থ দেবী প্রতিমা। আরবের মুশরিকেরা তাদের উপাস্যদেরকে দেবী বলে জানতো এবং মানতো। মানাত, উজ্জা, লাত— এগুলো ছিলো তাদের দেবী। তারা মনে করতো মানাতের পুংলিঙ্গ মান্নান। লাত এর পুংলিঙ্গ আল্লাহ্ এবং উজ্জার পুংলিঙ্গ আয়াজ্জু। বিভিন্ন প্রতিমাকে তারা বলতো, অমুক গোত্রের দেবী। হজরত উবাই বিন কাব 'ইল্লা ইনসান' এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, প্রতিমাপূজকেরা মনে করে দেবী প্রতিমাগুলোই প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মুনজির, আব্দুল্লাহ্ বিন আহমদ প্রমুখ এ রকম বলেছেন।

এ রকমও হতে পারে যে, তাদের উপাস্যগুলোর মূল বা আসল বলে কিছু ছিলো না। ছিলো কেবল নাম— যা তারা পূজা করতো। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত কতকগুলো নাম ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত তারা করতো না।' তাদের পূজ্য নামগুলো ছিলো নারীর। তাই সেগুলোকে এখানে 'ইনাস্' বলা হয়েছে। এটাও একটি কারণ হতে পারে যে—তাদের উপাস্যগুলো ছিলো প্রাণহীন পাথর, পিতল, স্বর্ণ ইত্যাদি। তাদের ওই মাবুদগুলো নিষ্প্রাণ ছিলো বলেই তারা সেগুলোকে নারী মূর্তির সঙ্গে কল্পনা করে নিয়েছে। কামুস নামক অভিধান গ্রন্থে রয়েছে 'উনাস্' শব্দটি 'উনসা' শব্দের বহুবচন এবং 'ইনাস্' বলা হয় প্রাণহীন বস্তুকে। যেমন— গাছ, পাথর, ছোট বিড়াল। এ রকম অর্থ গ্রহণ করলে রূপক অর্থের প্রয়োজন আর হয় না। স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, দেবী পূজারীরা

www.eelm.weebly.com

প্রাণহীনতার উপাসক। ব্যকরণ গ্রন্থগুলোতে বলা হয়েছে, 'আলিফ' ও 'তা' এর সঙ্গে কোনো একবচনের বহুবচন এবং বহুবচন স্ত্রীলিঙ্গের নুন অচেতন বস্তুসমূহের আসল বা প্রকৃত অবস্থা। যেমন, বলা হয় 'সুফনুন জারিইয়াতুন, নাখলুন বাসিক্বতুন। এ সকল ক্ষেত্রে 'আলিফ' ও 'তা' এর মাধ্যমে স্বল্পজ্ঞানকে জ্ঞানহীনের সংজ্ঞাভূত করা হয়েছে।

হাসান ও কাতাদা 'ইল্লা ইনাসান' এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, স্ত্রীলিঙ্গ যেমন পুংলিঙ্গের তুলনায় নিকৃষ্ট তেমনি প্রাণহীনতা প্রাণের মোকাবেলায় গুরুত্বহীন। তাই এখানে প্রাণবিহীন অবস্থা নির্দেশ করতে স্ত্রীলিঙ্গবাচক 'ইনাস্' ব্যবহৃত হয়েছে। এই ব্যাখ্যায় 'ইনাসের' অর্থ রূপক হিসেবে গৃহীতব্য।

হজরত ইবনে আব্বাসের ক্বেরাত অনুসারে শব্দটির উচ্চারণ 'উস্নান'—শব্দটি 'আউসান' এর বহুবচন। আউসানের আরেকটি বহুবচনবোধক শব্দ হচ্ছে 'ওয়াসনুন'— যার অর্থ বিগ্রহ মন্দির। জুহাক বলেছেন, 'ইনাসুন' অর্থ ফেরেশতামণ্ডলী। কেননা অংশীবাদীরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে বিশ্বাস করতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'ওয়া জায়ালুল মালাইকাতা ল্লাজিনা হুম ইবাদুর রহ্‌মানি ইনাসা (আর তারা ফেরেশতাদেরকে নারী সাব্যস্ত করে রেখেছে—যারা আল্লাহ্‌র বান্দা)।

শয়তানের পূজা করার কথা বলা হয়েছে এই আয়াতে। প্রতিটি প্রতিমার উপরে ভর করে থাকে এক একটি শয়তান। তারা তাদের পূজারীদের এবং গণৎকারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে এবং তাদের সাথে কথাও বলে—ইতোপূর্বে আমরা এ কথা বলেছি। কেউ কেউ বলেছেন এখানে শয়তান অর্থ ইবলিস। ইবলিসই অংশীবাদীদেরকে প্রতিমাপূজার নির্দেশ দিয়ে থাকে। প্রতিমাপূজা প্রকৃতপক্ষে ইবলিসেরই পূজা ও অনুসরণ।

শয়তানকে এখানে বলা হয়েছে বিদ্রোহী। দ্রোহ বুঝাতে এখানে 'মারিদা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'মারিদা' এবং 'মারাদা' কল্যাণের সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত। মিম, র ও দাল সহযোগে গঠিত এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ চাকচিক্য। 'সারহুন মুমার্‌রাদুন' অর্থ পরিষ্কার ঝকমকে প্রাসাদ। 'আমরদু' অর্থ শশ্রু ও গুম্ফবিহীন বালক। কিন্তু এখানে 'মারিদ' অর্থ আল্লাহ্‌দ্রোহী, আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে বহিষ্কৃত।

পরের আয়াতে (১১৮) বলা হয়েছে— আল্লাহ্‌পাক শয়তানকে অভিসম্পাত করেন। অভিশপ্ত শয়তান বলে, আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করবো (তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো)। শয়তানের অধিকারভূত ওই মানুষেরা হবে জাহান্নামী। হাসান বলেছেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন হবে জাহান্নামী এবং একজন হবে জান্নাতী। আমি বলি, জাহান্নামীদের সম্পর্কে হাদিস শরীফে এ রকমই বলা হয়েছে। যে নির্দিষ্ট অংশ শয়তানের কবজায় চলে যাবে তারা চিরতরে হয়ে যাবে সৌভাগ্যশীলদের জামাত থেকে পৃথক।

www.eelm.weebly.com

শয়তান মানুষের চির শত্রু। সে হজরত আদমকে সেজদা করার নির্দেশ লঙ্ঘন করেছিলো। তখন থেকেই সে অভিসম্পাতগ্রস্ত। অভিসম্পাতলাভের সঙ্গে সঙ্গেই সে বলেছিলো, তোমার মর্যাদা ও পরাক্রমের শপথ! আদমের বংশধরেরা যতোক্ষণ জীবিত থাকবে, ততোক্ষণ আমি তাদেরকে পথচ্যুত করার চেষ্টা করতেই থাকবো। বিশুদ্ধ হাদিসে এ রকমই বর্ণনা এসেছে। নিম্নের আয়াতে রয়েছে এ কথার বিশদ বিবরণ।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১১৯

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ○

❑ এবং তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিবই; তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করিবই, আমি তাহাদিগকে নিশ্চয় নির্দেশ দিব এবং তাহারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করিবেই, এবং তাহাদিগকে নিশ্চয় নির্দেশ দিব এবং তাহারা আল্লাহের সৃষ্টি বিকৃত করিবেই। আল্লাহের পরিবর্তে কেহ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিলে সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়,

---

শয়তান বলে, আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবোই। তাদের অন্তরে সৃষ্টি করবো মিথ্যা বাসনার ধুম্রজাল। এখানে শয়তান পথভ্রষ্ট করবে বলেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পথভ্রষ্ট করা এবং হেদায়েত দান করার ক্ষমতা কেবল আল্লাহ্ই রাখেন। শয়তান পথভ্রষ্টতার উপকরণ, উপলক্ষ ও মাধ্যম মাত্র।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন— শয়তান কোনো কোনো লোককে প্রশ্ন করতে থাকে এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে। মানুষ বলে, আল্লাহ্। আল্লাহ্ই সকল কিছুর স্রষ্টা। এ রকম প্রশ্নত্তোরের এক পর্যায়ে এসে সে প্রশ্ন করে বসে, বলো আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করেছে? এমতাবস্থায় কর্তব্য হচ্ছে বিতর্কে ক্ষান্ত দেয়া এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করা। বোখারী, মুসলিম।

মিথ্যা বাসনার ধুম্রজাল হচ্ছে এ রকম—শয়তান বলে কিয়ামত হবে না, আযাব গজব বলে কিছু নেই, জীবনের পরমায়ু শেষ হতে এখনও অনেক দেরী, পাপী হলে কি হবে, আখেরাতের কল্যাণ তোমরাই লাভ করবে ইত্যাদি।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, শয়তান মানুষের শরীরে রক্ত চলাচলের মতো বিচরণশীল। বোখারী ও মুসলিম। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন— মানুষের উপর

www.eelm.weebly.com

শয়তানের প্রভাব রয়েছে। প্রভাব রয়েছে ফেরেশতাদেরও। শয়তানের প্রভাবে মানুষ অমঙ্গলের ভয়ে ভীত হয় এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর ফেরেশতাদের প্রভাব হচ্ছে শুভসান্ত্বনা প্রদান ও সত্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। যে ব্যক্তি ফেরেশতাদের এই শুভপ্রভাব লাভ করবে, সে জ্ঞাপন করবে আল্লাহ্পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আর যে শয়তানের প্ররোচনা অনুভব করতে পারবে, সে হবে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনাকারী। এর পর তিনি স. পাঠ করলেন 'শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভয় দেখায় এবং নির্দেশ দেয় অশ্লীলতার।' তিরমিজি এই হাদিসটিকে বলেছেন গরীব।

শয়তান আরো বলে, আমি মানুষকে এইমর্মে নির্দেশ দিবো, যেনো তারা তাদের পশুদের কান ছিদ্র করে। মূর্খতার যুগে এভাবে পশুদের কর্ণচ্ছেদন করা হতো। কর্ণচ্ছেদনকৃত পশুকে তারা তাদের দেবীর নামে ছেড়ে দিতো। তাদের রীতি ছিলো কোনো উষ্ট্রী দশবার প্রসব করলে তার কান চিরে দিয়ে দেবীর নামে ছেড়ে দিতো। সেই উষ্ট্রী তখন যত্রতত্র স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতো। উষ্ট্রী মরে গেলে পুরুষেরা তার গোশ্ত ভক্ষণ করতো, রমণীদের জন্য সেই গোশ্ত ভক্ষণ ছিলো নিষিদ্ধ। এই উষ্ট্রীকে বলা হতো বাহিরা।

শয়তান আরোও বলে 'তারা আল্লাহ্র সৃষ্টি বিকৃত করবেই।'— এ কথার অর্থ আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় প্রকার বিকৃতি সাধন করবে তারা।

জ্ঞাতব্যঃ রসুল স. বলেছেন, যারা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুঁই দ্বারা খোদাই করে, সুরমা কাজল অথবা নীল কালি দ্বারা আঁকে বিশেষ কোনো লিপি বা চিত্র, উপড়িয়ে ফেলে মস্তকের পক্ক কেশ— তাদেরকে আল্লাহ্পাক অভিসম্পাত দেন। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এ বর্ণনাটি এনেছেন, আহমদ বোখারী ও মুসলিম। হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেন ওই সকল লোকের উপর আল্লাহ্র লানত যারা পাকা চুল তুলে ফেলে, পরচুলা পরিধান করে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে দাগ দেয়। হজরত আয়েশা থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আল্লাহ্ লানত করে থাকেন ওই সকল ব্যক্তিকে যারা সুঁইয়ের দ্বারা অঙ্গ খোদাই করে ও করায়, কেশ উৎপাটন করে কেশ সংযোগ করে এবং করায়। হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমর জানোয়ারকে খাসী করতে নিষেধ করতেন। কারণ, এতে করে বংশধারা রহিত করা হয়। এ রকম ভাবে পশুর বংশপ্রবাহ রুদ্ধ করা অসিদ্ধ। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জানোয়ার খাসী করালে কোনো ক্ষতি হবে না। হেদায়া গ্রন্থে এ রকম বর্ণনা এসেছে আব্দুর রাজ্জাক এবং আবদ্ ইবনে হুমাইদ এবং হাসান থেকে। মোহাম্মদ বিন সিরিন ও হাসান থেকে ইবনে আবী শায়বা এবং ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় রয়েছে— হজরত ওমর পশুকে খাসী করতে নিষেধ করতেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মুনজির ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. জানোয়ারকে খাসী করতে নিষেধ করেছেন। এই বর্ণনার সঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে ইবনে আবী শায়বা অতিরিক্ত এ কথাটিও বলেছেন যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এই প্রসঙ্গটিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ইবনে জারীর ও

www.eelm.weebly.com

ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, এখানে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করার যে কথাটি বলা হয়েছে, তার অর্থ হবে আল্লাহ্‌র দ্বীনের বিকৃতি।

আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্টি বিকৃতির মধ্যে আরো রয়েছে ষাঁড়ের এক চোখ অন্ধ করে দেয়া, ক্রীতদাসকে নির্বীর্যকরণ শরীরে উলকি আঁকা ইত্যাদি। মুশরিকেরা এ রকম করতো। সৃষ্টি বিকৃতির আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, শরীরে চিত্রাংকন, বালু দ্বারা দাঁত ধারালো করা, বদলা রূপে হাত পা কান নাক ইত্যাদি কেটে ফেলা, সমকাম, নারী নির্যাতন, চন্দ্র, সূর্য, প্রস্তর বৃক্ষ, সমুদ্র ইত্যাদির পূজা এবং এমন কাজে শারীরিক শক্তি ক্ষয় যা কোনো প্রকার পরিপূর্ণতা সাধনে সক্ষম নয়। আরেকটি বিকৃতি হচ্ছে ফিৎরত অর্থাৎ ইসলামের বিকৃতি।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি মানব শিশু ফিৎরতের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। পরে তার জনক জননী তাকে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়। পশুকুলও প্রসব করে পরিপূর্ণ পশুশাবক। অথচ তোমরা তাদের নাক, কান কেটে দাও এবং নির্বীর্য করো। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন 'আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর ফিতরতের উপর মনুষ্য জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ্‌র সৃষ্টি পরিবর্তনযোগ্য নয়। এটাই হলো সরল সোজা ও মজবুত পথ'। বোখারী, মুসলিম।

এখানে পাঁচটি বাক্যের মাধ্যমে শয়তান তার নিজের কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছে। এই অপকর্মগুলো কেবল ইবলিসই করে না। তার অনুসারীরাও করে। তাই বিশেষভাবে এগুলোর জন্য কেবল ইবলিসই দায়ী নয়। তার মতো যারা তারা সকলেই দায়ী।

শিরিক হচ্ছে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্টতা। এই শিরিক সম্পর্কেই আল্লাহ্‌তায়ালা সতর্ক করে দিয়েছেন এভাবে— তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে ওই সকল বস্তুকে শরীক করছো যেগুলো নিষ্প্রাণ, উপকার কিংবা অপকার করতে অক্ষম। আবার তোমরা তাদের নাম রেখেছো রমণীদের নামের মতো। অথচ সেগুলোর প্রকৃত তত্ত্ব বলে কিছু নেই। শিরিক করলে অভিশপ্ত শয়তানের অনুসরণ করতে হয়, যে শয়তান নিজেই শিরিক ও গোমরাহীর মধ্যে আমস্তক নিমজ্জিত। কল্যাণ ও হেদায়েতের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। সে চির অভিশপ্ত। তার অনুসরণের মধ্যেও রয়েছে লানত এবং গোমরাহী। সে মানুষের নিকৃষ্টতম শত্রু।

শেষে বলা হয়েছে, শয়তানকে যে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার আনুগত্য এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য কখনই সম্মিলিত হতে পারে না। শিরিকমিশ্রিত ইবাদত কস্মিনকালেও আল্লাহ্‌র ইবাদত বলে গণ্য হবার নয়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেন, আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, আমি সকল শিরিক থেকে বেপরোয়া। যে ব্যক্তি তার আমলের মধ্যে আমার সঙ্গে অন্যকে শরীক করে, আমি তাকে এবং তার শরীককে পরিত্যাগ করি। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, আমি তাদের চেয়ে পৃথক। তাদের আমল ওই শরীকের জন্যই হবে, যার জন্য তারা ইবাদত করেছে। মুসলিম।

প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অর্থ শিরিকের কারণে তারা তাদের আসল সম্পদ— ইমান হারিয়ে ফেলবে এবং জান্নাতের বদলে প্রবিষ্ট হবে জাহান্নামে।

www.eelm.weebly.com

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۝ اُولٰٓئِكَ
مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ۝ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ
اَبَدًا ۖ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۖ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ۝

❒ সে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে, এবং শয়তান তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তাহা ছলনা মাত্র।

❒ ইহাদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, উহা হইতে তাহারা নিষ্কৃতির উপায় পাইবে না।

❒ এবং যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাহাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহের প্রতিশ্রুতি সত্য; কে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী?

শয়তান তার প্রকৃত অনুসারীদের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম প্রতিশ্রুতি দেয়— যেগুলো সে কখনোই পূর্ণ করতে পারবে না। এ রকমও হওয়া সম্ভব যে, কখনো কখনো সে নিজে মানুষের সম্মুখে এসে সফলতার লোভ দেখায়। বদর যুদ্ধের সময় সে এ রকম করেছিলো। মুশরিক বাহিনীকে বলেছিলো, আজ তোমাদের উপর কেউ সফল হতে পারবে না, আমি তোমাদের জিম্মাদার। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে আচরণ করলো এর বিপরীত। মুশরিক ও মুসলিম বাহিনী মুখোমুখি হওয়া মাত্র পলায়ন করলো এবং এ কথা বলতে বলতে গেলো যে, আমি আজ তোমাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারবো না। আমি আল্লাহ্র দিক থেকে এমন কিছু দেখেছি যা তোমরা দেখতে সমর্থ নও।

শয়তান তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। কামনা বাসনা সৃষ্টি করে দীর্ঘ আয়ুষ্কালের এবং অধিক সম্পদের।

শয়তানের অঙ্গীকার ছলনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সে অন্যায় কাজকে কল্যাণকর এবং ভালো কাজকে অকল্যাণকর হিসেবে প্রতিভাত করতে প্রয়াসী হয়। এ সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ হয়েছে 'শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায়। (বলে), যদি তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করো অথবা আত্মীয় স্বজনকে দান করো তবে দরিদ্র হয়ে যাবে'।

শয়তানের অনুসারীদের আশ্রয়স্থল হচ্ছে জাহান্নাম। সেখান থেকে কোনো দিনই তারা নিষ্কৃতি পাবে না। নিষ্কৃতির উপায় পাবে না— এ কথা বুঝাতে আয়াতে (১১২) 'মাহিসুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ পলায়ন বা পলায়নের

www.eelm.weebly.com

স্থান। কামুস অভিধানে লিপিবদ্ধ রয়েছে, 'হাসা আনহু,' ইয়াহিসু, হায়াসান, হাইসাতান ও মাহিসান— শব্দগুলোর ধাতুমূল 'হাইসুন'। 'হাইসাতান' ও 'মাহিসুনের' পরে যদি 'আন' আসে তবে অর্থ হবে প্রত্যাবর্তন করা। আর 'আন' না এলে অর্থ হবে সেলাই করা। যেমন হাসাআইনিয়াহ্ অর্থ দু'চোখ সেলাই করা হয়েছে অর্থাৎ ঘুম তার চক্ষুযুগলকে বন্ধ করে দিয়েছে। আয়াতে 'মাহিসা'র পূর্বে 'আনহা' শব্দটির উল্লেখ থাকলেও শব্দটি 'মাহিসা'র সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। কেননা 'মাহিসা' শব্দটি ধাতুগত অথবা স্থান কালগত— কোনোভাবেই কার্যকারিতা অগ্রগণ্য হতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের সর্বশেষটিতে বলা হয়েছে, যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে তাদেরকে শীঘ্রই প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে— যার পাদদেশে রয়েছে প্রবহমান নদী। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে? এই প্রশ্নটির মাধ্যমে সত্যবাদীতায় অন্যের অগ্রণী হওয়ার বিষয়টিকে সমূলে নিবারণ করা হয়েছে। করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যেনো, শয়তানের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির সমকক্ষতার ধারণা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, ইহুদী ও খৃষ্টানেরা বলতো, আমরা ছাড়া অন্য কেউ বেহেশতে যাবে না। আর মক্কার মুশরিকেরা বলতো, হাশর নশর বলে কিছু নেই। তাদের এমতো অপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত—

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১২৩

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

❒ তোমাদের খেয়াল খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল খুশী অনুসারে কাজ হইবে না, কেহ মন্দ কাজ করিলে তাহার প্রতিফল সে পাইবে, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহার জন্য সে কোনো অভিভাবক ও সহায় পাইবে না।

এখানে 'তোমাদের খেয়াল খুশী' কথাটির অর্থ মক্কার মুশরিকদের খেয়াল খুশী। আয়াতের বাচনভঙ্গি দৃষ্টে সে কথাই প্রমাণিত হয়। মুজাহিদও এ রকম বলেছেন। এখানে বলা হচ্ছে— হে মক্কাবাসী মুশরিক, তোমরা বলো পরকাল বলে কিছু নেই। কেউ কেউ বলো, তোমাদের উপাস্য প্রতিমাগুলো তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। আবার কেউ কেউ বলো, আমরা যদি দ্বিতীয়বার জীবিতও হই তবুও তোমাদের (বিশ্বাসীদের) চেয়ে উত্তম অবস্থায় থাকবো। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তোমাদের ধারণার অনুকূল নয়। আর হে আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান)!

www.eelm.weebly.com

তোমাদের খেয়াল খুশীজনিত ধারণাও ঠিক নয়। তোমরা বলো, তোমরা আল্লাহ্র পুত্র। এ রকমও বলো যে, ইহুদী ও খৃষ্টান ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আবার কেউ কেউ বলো, মাত্র কয়েকদিনের জন্য তোমাদেরকে নরকানল ভোগ করতে হবে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই, পরকালের পরিত্রাণ এবং পুণ্যপ্রাপ্তির সম্পর্ক ইমান ও পুণ্যকর্মের সঙ্গে। আর সেখানকার আযাবের সম্পর্ক অবিশ্বাস, বিকৃত বিশ্বাস এবং অসৎ কর্মের সঙ্গে। কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবেই এবং এ কথাও তোমরা জেনে রাখো যে, মন্দকর্মে জড়িত ব্যক্তিরা সেখানে কোনো অভিভাবক পাবে না। কারো পক্ষ থেকে কোনো সহায়তাও পাবে না।

আয়াতের শানে নুজুল মক্কার মুশরিক ও মদীনার আহলে কিতাবদের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হলেও এটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলেই এই আয়াতের লক্ষ্য। হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত সাঈদ বিন জোবায়েরের বক্তব্যরূপে বাগবীর বর্ণনায় এ রকমই বলা হয়েছে। শাস্তি পাবে তারাই যারা আল্লাহ্পাকের মার্জনা থেকে বঞ্চিত। শাস্তির ভয় প্রদর্শন সম্পর্কিত সকল আয়াতের এই একটিই শর্ত যে, আল্লাহ্ যদি ক্ষমা না করেন তবে আযাব হবে। সে আযাব পরকালেও হতে পারে। ইহকালেও।

হজরত উবাদা বিন সামেত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে —এক দল সাহাবী রসুল স. এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁদেরকে লক্ষ্য করে রসুল স. নির্দেশ করলেন, তোমরা আমার হাতে এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হও যে, তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, অপহরণ করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিবে না, এবং পুণ্যকর্মে অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে না। যে ব্যক্তি এ সকল অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করবে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আর যে ব্যক্তি এ সকল অপরাধের মধ্যস্থিত কোনো অপরাধ করে বসবে, সে জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পৃথিবীতে আযাব ভোগ করতে হবে। আর পৃথিবীতে আযাব না হলে বিষয়টি হয়ে পড়বে সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্পাকের উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছে করলে মার্জনা করবেন অথবা ইচ্ছে করলে আযাব দিবেন। হজরত উবাদা বিন সামেত বলেন, অতঃপর আমরা এ সব কথার উপর অঙ্গীকারাবদ্ধ (বায়াত) হলাম। বোখারী, মুসলিম।

কেউ কেউ বলেছেন, কেবল অবিশ্বাসীরাই এই আয়াতের লক্ষ্য। এই আয়াতের সঙ্গে বিশ্বাসীদের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা বিশ্বাসীদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী আল্লাহ্। তিনি ইচ্ছে করলে তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা তাঁর নির্দেশে ফেরেশতাবৃন্দ, নবী-রসুলগণ এবং আউলীয়ায়ে কেরাম বিশ্বাসীদের সুপারিশকারী হবেন। কিন্তু তাঁরা আল্লাহ্পাকের আযাব অপসারণ করতে পারবেন না। আর বিশ্বাসীরাও তাঁদেরকে কার্যনির্বাহী এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধে সাহায্যকারী মনে করেন না। অপর পক্ষে অবিশ্বাসীরা মনে করে তাদের পূজ্য প্রতিমা গুলোই

www.eelm.weebly.com

তাদের কার্যনির্বাহক। অবিশ্বাসীরা তাদেরকে তাদের সুহৃদ ও সাহায্যকারী বলে মনে করে। কিন্তু আখেরাতে তাদের কোনো কর্মনির্বাহক ও সাহায্যকারীর অস্তিত্ব থাকবে না।

কেবল অবিশ্বাসীরাই এই আয়াতের লক্ষ্য—এই অভিমতটি ভুল। নিম্নের আয়াত দ্বারা অভিমতটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। হজরত আবু বকর বলেছেন, আমি রসুল স. সকাশে উপস্থিত ছিলাম। তখন 'ফামাইয়াআ'মাল সুআম ইউজ জা বিহি (১২৪) আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। রসুল স. বললেন, হে আবু বকর, আমি কি একটি আয়াত পাঠ করে শুনানো যা এই মাত্র আমার উপর অবতীর্ণ হলো। আমি নিবেদন করলাম, শোনান, ইয়া রসুলাল্লাহ্! তিনি স. আয়াতটি পাঠ করলেন। তাঁর তেলাওয়াত শুনে আমার কোমরের ব্যথা দূর হয়ে গেলো। আমি কোমর সোজা করে বসলাম। আমি আগে কখনও এ রকম অনুভব করিনি। তিনি স. বললেন, আবু বকর তোমার কি হয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। আমরা কেউ কোনো মহৎ কর্ম সম্পাদন করিনি। আমাদের পাপের শাস্তিতো অবশ্যই হবে। তিনি স. বললেন, তুমি এবং তোমার বিশ্বাসী সঙ্গীরা পৃথিবীতেই পাপের শাস্তি লাভ করবে। তারপর আল্লাহ্র সকাশে উপস্থিত হবে পাপমুক্ত পবিত্র অবস্থায়। অন্য লোকদের পাপ জমা হতে থাকবে আর ওই পুঞ্জীভূত পাপের শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে আখেরাতে। বাগবী, তিরমিজি, আব্দুল্লাহ্ বিন হুমাইদ, ইবনে মুনজির। আহমদ, ইবনে হাব্বান এবং হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর বললেন, এই আয়াত প্রকাশিত হওয়ার পর পরিত্রাণ পাবে কে? রসুল স. বললেন, তুমি কি দুঃশ্চিন্তায় নিপতিত হও না? পীড়াগ্রস্ত হও না কিংবা তোমাদের উপর কি মুসিবত নেমে আসে না? আমি বললাম, অবশ্যই আসে। তিনি স. বললেন, এগুলোই তোমাদের পাপের শাস্তি। এ রকম বর্ণনা আরো এসেছে আহমদ, আবু ইয়া'লী, বায়হাকী এবং বোখারীর ইতিহাসের মাধ্যমে। হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে আবু সালেহ্ ও কালাবীর মাধ্যমে বাগবীর বর্ণনায় এসেছে— এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানেরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল, আপনি ব্যতীত আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে কোনো পাপ করেনি। রসুল স. বললেন, দুনিয়ার বিপদ মুসিবত এক ধরনের আযাব। (১) যে একটি পুণ্য কর্ম করবে, তার জন্য লেখা হবে দশটি নেকী। একটি পাপ করলে ওই দশটি নেকী থেকে একটি কমে যাবে। বাকী থাকবে নয়টি। ওই ব্যক্তির জন্য আক্ষেপ, যার পাপ পুণ্যাপেক্ষা বেশী। এখানে আক্ষেপ করা হয়েছে এজন্যে যে, একটি পুণ্য পরিণত হয় দশটিতে। কিন্তু একটি পাপ একটিই। এভাবে একটি নেকী দশটি গোনাহ্র মোকাবিলা করে। সুতরাং কেউ যদি এগারো, বারো কিংবা তেরোটিও গোনাহ করে থাকে, তবে দশের অধিক গোনাহ্গুলোর জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে এই পৃথিবীতেই। সুতরাং আক্ষেপ ওই ব্যক্তির জন্য যার পুণ্যকর্ম অপেক্ষা পাপকর্ম অধিক।

www.eelm.weebly.com

আখেরাতে নেকী ও বদি ওজন করা হবে। সেখানে প্রতিটি গোনাহ্র বিপরীতে একটি করে নেকী রহিত করে দেয়া হবে। এভাবে বদি অপেক্ষা যদি নেকী বেশী হয় তবে সে লাভ করবে সওয়াব ও জান্নাত। (২)

জ্ঞাতব্য ১ঃ হজরত মোহাম্মদ বিন মোনতাশার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— হজরত ওমর বলেছেন, 'কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তার জন্য সে কোনো অভিভাবক ও সহায় পাবে না'— এই আয়াত অবতীর্ণ হলে আমরা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। পানাহারে রুচি বিবর্জিত অবস্থায় আমাদের দিনাতিপাত হচ্ছিলো। তখন আমাদেরকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করলেন 'কেউ কোনো মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে— পরে আল্লাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্কে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুরূপে পাবে'।

জ্ঞাতব্য ২ ঃ ইবনে আবী শায়বা, আহমদ, বোখারী ও মুসলিম হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে লিখেছেন, বর্ণিত সাহাবীদ্বয় রসুল স. কে বলতে শুনেছেন, বিশ্বাসীদের প্রতি আপতিত দুঃখ, বিপদ ও দুশ্চিন্তা তাদের গোনাহের কাফফারা (ক্ষতিপূরণ)। বোখারী ও মুসলিমে উম্মতজননী হজরত আয়েশা থেকেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। হজরত বোরায়দা আসলামী থেকে ইবনে আবিদ্দুনিয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, মুসলমানের প্রতি আপতিত বিপদের জন্য, এমন কি তার পায়ে কাঁটা বিঁধলেও আল্লাহ্পাক তার বিনিময় প্রদান করেন। ওই অমোচনীয় বিপদের মাধ্যমে তার পাপ মার্জনা করা হয়। অথবা তাকে দান করা হয় কোনো মর্যাদা, যা ওই বিপদ ছাড়া অর্জন করা ছিলো অসম্ভব।

হজরত আবু ফাতেমা থেকে ইবনে সা'দ এবং বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. বলেন, যার অলৌকিক হস্তে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তার শপথ, তিনি তাঁর অপার করুণাস্বরূপ বিপদ আপতিত করেন তাঁর বান্দার উপর। বেহেশতে ওই বান্দা এমন মর্যাদায় উপনীত হবে যা ওই বিপদ ছাড়া লাভ করা ছিলো অসম্ভব। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বায়হাকীও এ রকম বলেছেন।

আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক 'কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল পাবে....'— এই আয়াতের শানে নুজুল বর্ণিত হয়েছে। এই আয়াতের আরেকটি শানে নুজুলের বর্ণনা এসেছে মাসরুক থেকে কাতাদা, জুহাক এবং সুদ্দীর মাধ্যমে মুরসালরূপে ইবনে জারীর কর্তৃক এবং হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যরূপে আউফী কর্তৃক। বর্ণনাটি এ রকম— 'তোমাদের খেয়াল খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল খুশী'— আয়াতটি নাজিল হয়েছে মুসলমান এবং খৃষ্টানদের একটি বিতর্ককে উপলক্ষ্য করে। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানেরা এক স্থানে বসে বিতর্ক করে যাচ্ছিলো। প্রত্যেকে দাবি করছিলো—আমরাই উত্তম। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা বলছিলো, আমাদের নবী এসেছে তোমাদের নবীর আগে আর আমাদের

www.eelm.weebly.com

কিতাবও অবতীর্ণ হয়েছে তোমাদের কিতাবের পূর্বে। সুতরাং আমরা তোমাদের আল্লাহ্‌র অধিক নৈকট্যের অধিকারী। মুসলমানেরা বললেন, আমাদের নবী হচ্ছেন খাতামুল আম্বিয়া (সর্বশেষ নবী) আর আমাদের কিতাব পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যায়নকারী। আমরা আমাদের কিতাবসহ পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে বিশ্বাস করি কিন্তু তোমরা আমাদের কিতাবকে বিশ্বাস করো না। সুতরাং আমরাই উত্তম। এই শানে নুজুল অনুযায়ী বিআমানিয়্যিকুম বলে বুঝানো হয়েছে বিশ্বাসীদেরকে এবং 'মাই ইয়া'মাল সুআন ইয়ুজজা বিহী (কেউ মন্দ কাজ করলে) বলে বুঝানো হয়েছে সকল ধর্মাবলম্বীকে।

মাসরুক থেকে ইবনে জারীর এবং হজরত আমাশ থেকে ইবনে জুহার বক্তব্য বাগবী উদ্ধৃত করেছেন এভাবে— যখন 'তোমাদের খেয়াল খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল খুশী অনুসারে...' আয়াতটি অবতীর্ণ হলো তখন কিতাবীরা বলতে শুরু করলো দেখো, আমরা ও তোমরা সমান্তরালে (উল্লেখিত হয়েছি)। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো-

সূরা নিসা ঃ আয়াত ১২৪

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ○

❐ পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেহ সৎকাজ করিলে ও বিশ্বাসী হইলে তাহারা জান্নাতে দাখিল হইবে এবং তাহাদের প্রতি অণুপরিমাণও জুলুম করা হইবে না।

পুণ্যবান বিশ্বাসী এবং পুণ্যবতী বিশ্বাসিনীরা বেহেশতে প্রবেশ করবে। এখানে 'মিনাস সলিহাত' অর্থ সৎকর্মসমূহের মধ্যে। অর্থাৎ পুণ্য কর্মসমূহের মধ্যে কিছুসংখ্যক পুণ্যকর্ম যারা সম্পাদন করবে তারাও বেহেশতে প্রবেশ করবে— যদি তারা মুমিন কিংবা মুমিনা হয়। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, মাই ইয়াআ'মাল মিছক্বলা যার্‌রতিন খইরই ইয়ারহ্ (যে ব্যক্তি পৃথিবীতে অণু পরিমাণ পুণ্যকর্ম করবে সে তা দেখতে পাবে)।

'মিন জাকারিন আউ উনছা' অর্থ— পুণ্যবান অথবা পুণ্যবতীদের মধ্যে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ কথার মাধ্যমে ওই মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, যারা তাদের কন্যা সন্তানকে হত্যা করতো এবং মনে করতো রমণীরা জন্তু-জানোয়ার সদৃশ— তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নেই এবং তারা পুণ্যকর্ম সম্পাদনের অযোগ্যা।

ওয়া হুয়া মু'মিন অর্থ বিশ্বাসী হলে —এ কথার উদ্দেশ্য পুণ্যকর্মের প্রতিদান ইমান বা বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। বিশ্বাসবিহীন পুণ্যকর্ম গ্রহণীয় নয়। অপরপক্ষে মন্দকর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়নি। যেমন

www.eelm.weebly.com

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 'কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে।' এ কথায় বুঝা যায় যে, মন্দকর্ম আল্লাহ্পাকের পছন্দনীয় নয়। তাই আল্লাহ্পাক মার্জনা না করলে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ সকল পাপীদের জন্য শাস্তি অপরিহার্য। তাই সাধারণভাবে সকলকে মন্দকর্মের প্রতিফল সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে কিন্তু এ রকম সাধারণ বিধান নেই। এক্ষেত্রে বিশ্বাসযুক্ত পুণ্যকর্ম গৃহীতব্য। বিশ্বাসবিহীন পুণ্যকর্ম আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় না বলে তা স্পষ্টতই শিরিক (অংশীবাদিতা)। এই শিরিকই সর্বোচ্চ পাপ।

একটি প্রশ্নঃ যদি অবিশ্বাসীদের কোনো কর্মই পুণ্য বলে বিবেচিত না হয়, তবে পুণ্যকর্মের সঙ্গে বিশ্বাসের শর্ত সংযোজনের অর্থ কী (যখন বিশ্বাসীদের পুণ্যকর্মই একমাত্র পুণ্যকর্ম)।

উত্তরঃ সৎকর্মের সঙ্গে বিশ্বাসের উল্লেখের মাধ্যমে এখানে এ কথাটিই স্পষ্ট করে নেয়া উদ্দেশ্য যে, ইমান বিহীন সৎকর্ম আল্লাহ্পাক গ্রহণ করেন না। সুতরাং অবিশ্বাসীরা যেনো তাদের পুণ্যকর্মকে (নিকটজনের সঙ্গে শিষ্ট আচরণ, সন্তানসন্ততির ভরণ-পোষণ, জনকল্যাণমূলক কর্মসমূহ ইত্যাদি) পরিত্রাণের উপায় ভেবে না বসে।

'ফা উলাইকা ইয়াদ্ খুলুন জান্নাহ্' অর্থ তারা (পুণ্যবাণ বিশ্বাসী ও পাপীরা) বেহেশতে প্রবেশ করবে। পাপী বিশ্বাসীরা পৃথিবীতে তওবা করে মৃত্যুবরণ করলে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তওবা না করে মরলেও বেহেশতে যাবে তারা। আল্লাহ্পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন। ক্ষমাপ্রাপ্তির পরই তারা বেহেশতে যাবে, পাপের শাস্তিভোগ না করে অথবা কিছুকাল শাস্তি ভোগ করার পর।

সবশেষে বলা হয়েছে 'ওয়ালা ইউয্লামুনা নাক্বিরা (তাদের প্রতি অণুপরিমাণও জুলুম করা হবে না)— এ কথার অর্থ অনুগতদের পুণ্য অণু পরিমাণও কম করা হবে না। স্পষ্ট করে উল্লেখ করা না হলেও এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট যে, মেহেরবান আল্লাহ্ পাপকর্মের শাস্তির ক্ষেত্রেও অণু পরিমাণ অতিরিক্ত করবেন না। আল্লাহ্পাকের ন্যায়পরায়ণতা নিখুঁত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'অণু পরিমাণ জুলুম করা হবে না'— এ কথা মন্দ কর্মের প্রতিফল প্রদানের ক্ষেত্রে (পূর্ববর্তী আয়াতে) উল্লেখ করা হয়নি এ কারণে যে, শিরিক সকল অবস্থাতেই ঘৃণ্য। বক্তব্যটির উদ্দেশ্য ছিলো কাফেরদেরকে সতর্ক করা। আর এই আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদেরকে পুণ্যকর্মে উৎসাহিত করা। তাই এখানে 'অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না' বক্তব্যটি সংযোজিত হয়েছে।

আমি বলি, 'অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না' কথাটির উদ্দেশ্য এই যে, ইবাদতকারীর ইবাদতের বিনিময় যেমন কম দেয়া হবে না, তেমনি পাপিষ্ঠদের প্রাপ্য শাস্তিও বিন্দু পরিমাণ অতিরিক্ত করা হবে না। আর আলোচ্য আয়াতে নেককার ও গোনাহ্গার— সকল বিশ্বাসীকে জান্নাত গমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। কেননা, বিশ্বাসবান পাপীরাও কোনো না কোনো পুণ্যকর্ম করে থাকে।

www.eelm.weebly.com

অন্ততপক্ষে তৌহিদের (আল্লাহ্‌র এককত্বের) সাক্ষ্যতো দিয়ে থাকেই। — আর এই সাক্ষ্যইতো ইমানের সর্বপ্রধান বিষয়। তাই পাপী পুণ্যবাণ নির্বিশেষে সকলের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে 'তাদের প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।' অর্থাৎ তাদের সওয়াব যেমন কম করা হবে না, তেমনি শাস্তিও বেশী করা হবে না। স্মর্তব্য যে, পূর্ববর্তী আয়াতে 'কেউ মন্দ কাজ করলে'— কথাটির মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পাপী বিশ্বাসীরা। দেখা যাচ্ছে, পাপী বিশ্বাসীরা মন্দ কর্মের ক্ষেত্রে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে এবং সৎকর্মের ক্ষেত্রে পুণ্যবাণ বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে আলোচ্য আয়াত দু'টো পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, পাপী বিশ্বাসীরা প্রথম দিকে (পাপের শাস্তি ভোগের প্রাক্কালে) অবিশ্বাসীদের সঙ্গে এবং শেষ দিকে (মার্জনা বা শাস্তি আস্বাদনের পর) নেককারগণের সঙ্গে থাকবে। 'অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না' এ কথাটি কেবল গোনাহ্‌গার মুসলমানের উপর প্রযোজ্য। অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে কেবল পাপপুণ্য কম না করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে। যারা প্রকৃত কাফের তারা এই সুসংবাদের বাইরে। তাদের সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'আযাবের উপর আযাব তাদের উপর বৃদ্ধি করে দেয়া হবে'।

একটি ধারণাঃ আল্লাহ্‌পাক সকল দোষত্রুটি থেকে পবিত্র। অথচ বলা হয়েছে, কাফেরদের আযাব বাড়িয়ে দেয়া হবে। এ রকম করাতো জুলুম— এই সমস্যাটির সমাধান তবে কী?

ধারণার অপনোদন ঃ অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার নাম জুলুম। আল্লাহ্‌পাক কখনই অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন না। সমগ্র সৃষ্টি তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধীন। সমগ্র সৃষ্টির তিনিই একক স্রষ্টা। সুতরাং তিনি যদি অপরাধ ছাড়াই সকলকে শাস্তি দেন, তবুও তাকে জুলুম বলা যাবে না (কারণ তিনি অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেননি)'।

একটি সন্দেহঃ আল্লাহ্‌র জন্য 'জুলুম' শব্দটি যখন প্রযোজ্যই নয়, তখন এই আয়াতে 'অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না' বলা হলো কেনো? অন্য স্থানে বলা হয়েছে 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বান্দাদের উপর জুলুম করবেন না'।—এ সকল ক্ষেত্রে তবে জুলুম না করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?

সমাধানঃ বর্ণিত বাক্যগুলো রূপক অর্থবোধক। বক্তব্যগুলোর উদ্দেশ্য এই যে —জুলুম বলতে যা বুঝা যায়, সে ধরনের আচরণ আল্লাহ্‌পাক তাঁর অনুগত দাসদের ক্ষেত্রে কিছুতেই করবেন না। অর্থাৎ মানুষ ও ফেরেশতামণ্ডলী কর্তৃক সম্পাদিত কোনো কর্মকে জুলুম বলে অভিহিত করা হলেও আল্লাহ্‌পাক তার বিশ্বাসী বান্দাদের সঙ্গে কস্মিনকালেও জুলুম করবেন না।

মাসরুক থেকে বাগবী লিখেছেন, 'তোমাদের খেয়াল খুশী ও কিতাবীদের খেয়ালখুশী অনুসারে...' আয়াতটি অবতীর্ণ হলে কিতাবীরা যখন বললো— তোমরা ও আমরা একবরাবর, তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। সেই সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নবর্ণিত আয়াতটি।

www.eelm.weebly.com

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ○

❑ তাহার অপেক্ষা দ্বীনে কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হইয়া আল্লাহের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? এবং আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

যে তার অন্তর বাহির সহ আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে, যে সৎকর্মপরায়ণ এবং একনিষ্ঠভাবে হজরত ইব্রাহিমের ধর্মমত অনুসরণ করে— ধর্মপরায়ণতার দিক থেকে তার চেয়ে কে অধিক উত্তম? — এখানে এমতো গুণবত্তার অধিকারী ব্যক্তির চেয়ে অন্য কেউ উত্তম নয়— সে কথা প্রশ্নাকারে অস্বীকার করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তিই আল্লাহ্পাকের নিকট সর্বোত্তম। এরাই প্রকৃত বিশ্বাসী। এঁদের ধ্যান জ্ঞান চিন্তা আল্লাহ্কেন্দ্রিক। এঁরা একাগ্রতা ও বিশুদ্ধচিত্ততার অধিকারী। পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারী। মন্দকর্ম পরিত্যাগকারী। আয়াতে বলা হয়েছে ওয়াহুয়া মুহ্সিন। —এর অর্থ এঁরা এহ্সানের অধিকারী। এহ্সান সম্পর্কে রসুল স. বলেছেন, এহ্সান (ইবাদতের সৌন্দর্য্য) এই যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত এমনভাবে কোরো যেনো আল্লাহ্কে দেখছো। যদি এভাবে দেখতে না পাও তবে (মনে রেখো) তিনিতো তোমাদেরকে দেখছেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ওমর। বোখারী, মুসলিম।

'ওয়াত্তাবায়া মিল্লাতা ইব্রাহীমা হানিফা'— এ কথার অর্থ একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে। স্মর্তব্য যে, সকল নবী ও রসুলগণের ধর্মাদর্শ মূলতঃ একই। স্বীয় সত্ত্বা ও শরীর আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করাই সকল নবী ও রসুলের ধর্মাদর্শ। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে হজরত ইব্রাহিমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, তিনি সর্বজনগ্রাহ্য, সকল ধর্মমতাবলম্বীদের নিকট মাননীয়। ইসলাম ধর্মের প্রধান নির্দেশসমূহ তাঁর ধর্মমতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। যেমন কাবামুখী হয়ে নামাজ পাঠ, কাবা শরীফের তাওয়াফ, হজ, কোরবানী, খৎনা, অতিথিপরায়ণতা ইত্যাদি। এ সকল উত্তম কর্মসমূহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহ্পাক কর্তৃক পরিক্ষীত হয়েছিলেন। আর সে পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণও হয়েছিলেন। তাই ইসলামী শরিয়তে তাঁর ধর্মাদর্শকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

হানিফ শব্দটির অর্থ সকল মিথ্যা মত ও পথ থেকে বিমুখ হয়ে সত্য পথের অনুসারী হওয়া। তাঁর পিতা, নিকটজন ও সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকেরা ছিলো প্রতিমাপূজক। তাই তিনি সকলকে পরিত্যাগ করে গ্রহণ করেছিলেন সিরাতুম মুসতাক্বিম— সরল সহজ পথ।

www.eelm.weebly.com

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ওয়াত্তাখজাল্লহু ইব্রাহীমা খলিলা (এবং আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন)। খুল্লাতুন শব্দটি গঠিত হয়েছে খলালুন থেকে। খিলাল অর্থ ওই বস্তু যা শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরায় প্রবেশ করে। খুল্লাতুন তাই গোপন ভালোবাসারূপে প্রবেশ করে হৃদয়ে এবং হয়ে যায় সত্তাসম্পৃক্ত। শব্দটি ওই দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নির্দেশ করে যারা সুগভীর অনুরাগরঞ্জিত— যারা একে অপরের প্রয়োজন পূর্ণ করেন, একে অন্যের সন্তোষ সাধনে থাকেন ব্যাপৃত।

জুজায বলেছেন, খলিল অর্থ অটুট ভালোবাসার অধিকারী। শব্দটি খালুন থেকেও উৎপন্ন হয়ে থাকতে পারে। খালুন অর্থ ওই পথ, যে পথের পথিক দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু। খালাত থেকেও খলিল শব্দটি উৎসারিত হয়ে থাকতে পারে। খালাত অর্থ সমস্বভাববিশিষ্ট দুই বন্ধু। সমস্বভাবসম্পন্ন বলেই তাদেরকে বলা হয় খলিল।

হজরত ইব্রাহিমকে খলিল বলার কারণ এই যে, তিনি ছিলেন সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী। সৃষ্টির সম্মুখে তিনি তাঁর প্রয়োজন পূরণের আবেদন পেশ করতেন না। বর্ণিত হয়েছে, নমরূদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলে হজরত জিবরাইল তাঁকে বলেছিলেন, আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন। তিনি তখন বলেছিলেন, আল্লাহ্‌পাক আমার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। সুতরাং প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন।

জ্ঞাতব্যঃ খলিল অর্থ যিনি দান করেন কিন্তু গ্রহণ করেন না। বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে লিখেছেন, রসুল স. একদিন হজরত জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্‌পাক হজরত ইব্রাহিমকে খলিল বানিয়েছেন— কারণ কী? হজরত জিবরাইল বললেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবকে আহার করানোর জন্য। ইবনে আবাজীর উক্তিরূপে ইবনে মুনজির কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার হজরত ইব্রাহিম হজরত আজরাইলকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার প্রভু প্রতিপালক আমাকে খলিল বলেছেন কেনো? হজরত আজরাইল বললেন, আপনি সৃষ্টিকে দিতে পছন্দ করেন— কিন্তু সৃষ্টি থেকে কিছু নিতে পছন্দ করেন না। হজরত আবু হোরায়রার এ রকম একটি উক্তিকে রসুল স. এর বাণী বলে উল্লেখ করেছেন দায়লামী। কিন্তু তাঁর সনদের শেষ দিকটি দুর্বলতাদুষ্ট। ইবনে বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক হজরত ইব্রাহিমের নিকট এই মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন, তুমিতো জানো আমি কেনো তোমাকে খলিল বলি। হজরত ইব্রাহিম বললেন, হে আমার প্রভু প্রতিপালক, আমি জানি না। আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমার হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলাম; তুমি দিতে ভালোবাসো। কিন্তু নিতে ভালোবাসো না।

একটি প্রশ্নঃ একটু আগেই বলা হয়েছে খিলাল অর্থ ওই বন্ধুদ্বয় যারা পরস্পরের প্রয়োজন পূরণ করে। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক তো সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তবে এ রকম বলার অর্থ কী?

www.eelm.weebly.com

উত্তরঃ সৃষ্টির সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক তাঁর নামের সঙ্গে নয়। বরং নামের প্রতিক্রিয়া বা কার্যকলাপের (আফআলের) সঙ্গে। যেমন রহমান ও রহীম আল্লাহ্‌পাকের দু'টি গুণবাচক নাম। উভয় নামের উৎস রহমত বা দয়া। তিনি দয়াদ্র। তিনি অপরকে দয়া করে থাকেন এবং অতিথিপরায়ণতার প্রতি আগ্রহান্বিত হন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌পাক মানুষের মতো চিত্ত বা অন্তর থেকে এবং অন্তরে সৃষ্ট দয়া বা করুণার প্রভাব থেকে পবিত্র। প্রভাবিত হওয়া অক্ষমতার চিহ্ন। আর আল্লাহ্‌পাক সকল অক্ষমতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তাই রহমান বা রহীম থেকে উৎসারিত করুণার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও তিনি যে সৃষ্টির মতো দয়াদ্রচিত্ত— তা কিন্তু নয়। কারণ, তিনি সকল আনুরূপ্য থেকে পবিত্র। তেমনি এখানে খিল্লাত বা খুল্লাত শব্দের অর্থ হিসেবে যে প্রয়োজন পূরণের কথা বলা হয়েছে, সেই প্রয়োজন অর্থ হজরত ইব্রাহিমের প্রয়োজন পূরণ যা বিশুদ্ধ ভালোবাসার প্রতিফল। ওই ভালোবাসা শুরু হয় আল্লাহ্‌র দিক থেকে। কিন্তু তা আল্লাহ্‌র প্রয়োজন হিসেবে নয়—কেবলই ভালোবাসা ও দয়া হিসেবে।

আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন— এ কথার মাধ্যমে হজরত ইব্রাহিমের অনুসরণকে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। কেননা, যিনি আল্লাহ্‌র খলিল তাঁর আনুগত্য যে অত্যাবশ্যক— এ কথা সুনিশ্চিত। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী র. বলেছেন, খলিল হচ্ছেন ওই সুহৃদ ও সহচর যাঁর নিকট প্রেম-ভালোবাসার রহস্য উন্মোচন করা হয়। আব্দুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম তাঁদের আপনাপন তাফসীরে হজরত জায়েদ বিন আসলামের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম নিষ্ঠুর ব্যক্তি ছিলো নমরূদ। লোকেরা অভাবে পড়ে তার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করতো। সে তখন প্রার্থীদেরকে জিজ্ঞেস করতো, তোমাদের প্রতিপালক কে? প্রার্থীরা বলতো, আপনি। এ রকম বললে সে খাদ্য দান করতো। একদিন হজরত ইব্রাহিম গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। নমরূদ বললো, তোমার প্রতিপালক কে? হজরত ইব্রাহিম বললেন, যার অধিকারে রয়েছে জীবন ও মৃত্যু। নমরূদ বললো, আমিও জীবন মৃত্যুর অধিকারী। (বন্দীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি আবার জীবন ভিক্ষাও দিতে পারি)। হজরত ইব্রাহিম বললেন, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ সূর্যের অভ্যুদয় ঘটান পূর্বাকাশে (তুমি যদি প্রতিপালক হও) তবে পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় ঘটাও। এ কথা শুনে নিরুত্তর হয়ে গেলো নমরূদ। কিন্তু সে হজরত ইব্রাহিমকে কোনো খাদ্যশস্য দিলো না। হজরত ইব্রাহিম গৃহাভিমুখী হলেন। ফেরার পথে একটি টিলার নিকট দিয়ে গমন কালে তিনি ভাবলেন, থলিতে করে এখান থেকে কিছু মাটি নেয়া দরকার। রাতে গৃহে পৌছলে বাড়ীর লোকেরা তাহলে ভর্তি থলি দেখলে সঙ্গে সঙ্গে নিরাশ হবে না (সকালে অবশ্য আসল কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে)। তিনি তখন সেখান থেকে কিছু বালি থলিতে ভরে নিয়ে বাড়ীতে এলেন। ঘরের এক কোণে থলি রেখে দিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। তারপর নিদ্রাভিভূত হলেন। তাঁর স্ত্রী থলিটি উঠিয়ে নিয়ে আহার্য প্রস্তুত করতে বসলেন। দেখলেন, খাদ্যশস্যে পরিপূর্ণ রয়েছে থলিটি। রান্না হওয়ার পর তিনি হজরত ইব্রাহিমকে ঘুম

www.eelm.weebly.com

থেকে জাগালেন এবং রান্না করা খাদ্য রাখলেন তাঁর সম্মুখে। হজরত ইব্রাহিম বিস্মিত হয়ে বললেন, রান্না হলো কেমন করে (ঘরেতো কিছু ছিলো না)। স্ত্রী বললেন, আপনিইতো থলি ভর্তি করে খাদ্যশস্য নিয়ে এসেছেন। হজরত ইব্রাহিম বুঝতে পারলেন, এ হচ্ছে আল্লাহ্পাকের অযাচিত দান। তিনি আল্লাহ্পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

আবু সালেহের বর্ণনা থেকে ইবনে আবী শায়বা লিখেছেন, হজরত ইব্রাহিম খাদ্যশস্য আনতে গেলেন, কিন্তু পেলেন না। প্রত্যাবর্তনের পথে একটি লাল টিলা থেকে কিছু বালি নিয়ে তিনি তাঁর থলি পূর্ণ করলেন। বাড়ী ফিরে এলে তাঁর পরিবারের লোকেরা বললেন, থলির মধ্যে কী? তিনি বললেন, লাল গম। তাঁর সহধর্মিনী থলি খুলে দেখলেন, এক আশ্চার্যজনক লাল গমে থলি পরিপূর্ণ। সেখান থেকে কিছু গম নিয়ে তিনি মাটিতে বপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই গম বীজ থেকে উৎপন্ন হলো গমের গাছ। আর সেই গাছে দেখা গেলো অনেক শীষ।

হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যরূপে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইব্রাহিম ছিলেন অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। তাঁর বসতবাটি ছিলো সিরিয়ায়। সেখান দিয়ে গমনকারী সকল পথিককে তিনি সাদরে আপ্যায়ণ করাতেন। একবার দেখা দিলো দুর্ভিক্ষ। অভুক্ত লোকেরা একে একে তাঁর নিকট সমবেত হতে শুরু করলো। তিনি তখন সকলের জন্য আহারের বন্দোবস্ত করলেন। মিসরে বাস করতেন তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর নিকট থেকে প্রতি ফসলের মৌসুমে খাদ্যশস্য আসতো। দুর্ভিক্ষের বছরেও তিনি তাঁর কয়েকজন ক্রীতদাসকে উটসহ ফসল আনতে পাঠালেন। মিসরীয় বন্ধু ক্রীতদাসদেরকে বললেন, (শস্যহানী হয়েছে তাই) এবার যদি হজরত ইব্রাহিম তাঁর নিজের প্রয়োজনের কথাও বলে পাঠাতেন, তবুও ক্ষমাপ্রার্থনা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় ছিলো না। সকলের মতো আমরাও এবার দুর্ভিক্ষগ্রস্ত। বিফল মনোরথ ক্রীতদাসেরা ফেরার পথে মরুভূমি অতিক্রম করতে করতে ভাবতে লাগলো, এভাবে শস্যশূন্য অবস্থায় প্রত্যাগমন লজ্জাজনক। বরং আমাদের উচিৎ, এখানকার কিছু মাটি দিয়ে থলিগুলো পূর্ণ করে নেয়া। যাতে প্রথম দর্শনে অপেক্ষমান জনতা হতাশ না হয়। মনে করে, আমাদের সকল উটই শস্যবাহী। ক্রীতদাসেরা তাই করলো। সকল থলি বালি ও মাটি দিয়ে পূর্ণ করে উটের পিঠে চাপিয়ে উপস্থিত হলো হজরত ইব্রাহিম সকাশে। তখন রাত্রি। হজরত ইব্রাহিমের স্ত্রী ছিলেন নিদ্রামগ্না। হজরত ইব্রাহিম ছিলেন জেগে। গৃহাঙ্গনের বাইরে অপেক্ষা করছিলো বুভুক্ষু জনতা। হজরত ইব্রাহিম ক্রীতদাসদের নিকট থেকে প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে দুঃখিত হলেন।

আর ওদিকে অপেক্ষমান জনতা মনে করলো আহারের আয়োজন হতে আর দেরী নেই। সকালে একটু দেরী করে নিদ্রাভঙ্গ হলো হজরত সারা'র। তিনি বললেন, কী আশ্চর্য ক্রীতদাসেরাতো এখনো এলো না। ক্রীতদাসেরা জবাব দিলো, এইতো আমরা সকলেই এসেছি। হজরত সারা বললেন, তোমরা কি কিছু আনোনি? ক্রীতদাসেরা বললো, এনেছি। হজরত সারা উট থেকে নামানো থলিগুলোর নিকটে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, থলিগুলো অত্যন্ত উন্নতমানের

www.eelm.weebly.com

আটায় পরিপূর্ণ। তিনি পরিচারকদেরকে রুটি তৈরীর নির্দেশ দিলেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হজরত ইব্রাহিম শয্যাগ্রহণ করেছিলেন। ইত্যবসরে তিনিও গাত্রোত্থান করলেন। আহার্যের গন্ধ পেয়ে তিনি বললেন, সারা ! আহারের আয়োজন হলো কীভাবে? হজরত সারা বললেন, আপনার মিসরবাসী বন্ধু আটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, না। এ রিজিক প্রেরণ করেছেন আমার খলিল (আল্লাহ্)। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক হজরত ইব্রাহিমকে খলিল বানিয়ে নিয়েছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ রসুলশ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর মর্যাদা ছিলো খলিলের মর্যাদারও উর্ধ্বে। তাঁর মাকাম বিশুদ্ধ প্রেমাস্পদত্বের (খালেস মাহবুবিয়াতের) মাকাম। তিনি স. ছিলেন আল্লাহ্পাকের মাহবুব (প্রিয়জন)। খলিলতো ছিলেনই। তিনি স. বলেছেন, আমি আমার প্রভুপ্রতিপালক ব্যতীত যদি অন্য কাউকে বন্ধু (খলিল) রূপে গ্রহণ করতাম তবে গ্রহণ করতাম আবু বকরকে। কিন্তু আবু বকর আমার ভ্রাতা ও সুহৃদ। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম। বোখারী ও মুসলিম অনুরূপ হাদিস উদ্ধৃত করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি বলেছেন, রসুল স.বলেন, শুনে রাখো তোমাদের সাথী (আমি) আল্লাহ্র খলিল।

হজরত জুনদুব বলেছেন, আমি স্বকর্ণে মৃত্যুর পূর্বে রসুল স. কে বলতে শুনেছি— আল্লাহ্ আমাকে করেছেন খলিল। যেমন হজরত ইব্রাহিমকে করেছিলেন। হাকেম। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের মতো আমিও আল্লাহ্র খলিল। আর কিয়ামত দিবসে আমি হবো আদম সন্তানদের সর্দার। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন, আছা আই ইয়াব্ আছাকা রব্বুকা মাক্বমাম মাহ্মুদা (অচিরেই আপনার প্রভুপ্রতিপালক আপনাকে মাকামে মাহ্মুদে অধিষ্ঠিত করবেন)।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন— রসুল স. বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম ছিলেন আল্লাহ্র খলিল। প্রকৃত অর্থেই খলিল ছিলেন তিনি। কিন্তু তোমরা শুনে রাখো, আমি আল্লাহ্র হাবিব (প্রিয়জন)। — এ বাক্যটি কোনো গৌরবপ্রকাশক বাক্য নয়। (কিয়ামত দিবসে) আমিই সর্বপ্রথম শাফায়াত করবো এবং আমার শাফায়াত মঞ্জুর করা হবে। এই উক্তিটিও কোনো দম্ভোক্তি নয়। আমি সর্বপ্রথম বেহেশতের শিকল ধরে নাড়া দেবো। আল্লাহ্পাক তখন আমার জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন বেহেশতের দরোজা। আমার সঙ্গে তখন থাকবে ফকির ও মু'মিনদের একটি দল। এ কথাও দর্পমুক্ত যে, কিয়ামতের দিন পূর্বাপর সকল মানুষের মধ্যে আমিই হবো সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত। হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যরূপে তিবরানী ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্পাক হজরত ইব্রাহিমকে করেছেন খলিল (বন্ধু)। হজরত মুসাকে করেছেন কলিম (কথোপকথনকারী)। আর মোহাম্মদ মোস্তফা স. কে দিয়েছেন দীদার (দর্শন)।

---

www.eelm.weebly.com

রসুল স. ছিলেন মাহবুবিয়াতের মাকামধারী— যে মাকাম খলিলগণের মাকাম অপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু তিনি স. চাইতেন যেনো তাঁর উম্মতের অনেকে খুল্লাতের মাকামে উন্নিত হয়। তাহলে খুল্লাতের কামালিয়াত (পূর্ণত্ব) তাঁর নিজস্ব কামালিয়তের অংশ হয়ে যাবে। কেননা এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, অনুসরণকারীর কামালিয়ত অনুসরণীয়ের কামালিয়তের অন্তর্ভূত। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্যানুসারে ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে এ কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, আউলিয়াগণের কারামত তাঁদের অনুসরণীয় পয়গম্বরের মোজেজা (মোজেজার প্রতিবিম্ব অথবা ধারাবাহিকতা)।

রসুলপাক স. এরশাদ করেছেন, উত্তম পদ্ধতি প্রচলনকারী ওই পদ্ধতির অনুসারীদের সমান পুণ্য অর্জন করবে। এতে করে অনুসরণকারীদের সওয়াবও হ্রাস করা হবে না। তিনি স. আরো বলেছেন, পুণ্যপদ্ধতি উদ্ভাবনকারী ওই পুণ্যপদ্ধতি সম্পাদনকারীর মতোই। এ কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উম্মতের আমল ও কামালিয়ত রসুল স. এরই অধিকারভূত। তিনি স. তাই তাঁর উম্মতের কামালিয়তের বিস্তার (প্রশস্ততা) কামনা করেছিলেন এভাবে— আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মোহাম্মাদিঁও ওয়াআলা আলি মোহাম্মদ কামা সল্লাইতা আলা ইব্‌রহিম ওয়া আলা আলি ইব্‌রহিম (হে আল্লাহ্ তুমি মোহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত বর্ষণ করো যেমন করেছো ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরদের উপর)। আল্লাহ্‌পাক রসুল স. এর এই আকাংখা পূর্ণ করেছেন। তাঁর মহাপ্রস্থানের এক হাজার বছর পর খুল্লাতের এই মাকাম তিনি দান করেছেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. কে। তাই হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. ও আল্লাহ্‌পাকের খলিল। এ খলিলের ফজিলত রসুল পাক স. এর পরে এভাবে (উম্মতের মধ্যে) কেউ লাভ করেন নি। সরাসরি ও নিখুঁত অনুসরণের কারণে তাঁর স. কোনো কোনো সম্মানিত সাহাবী এবং আহলে বাইতের সদস্যগণ খুল্লাতের মাকাম অতিক্রম করে মাহবুবিয়াতের মাকাম পর্যন্ত উপনীত হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলের মাধ্যমে এই মাকামে উপস্থিত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে— ইনকুংতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিয়্যুনি ইউহ্ বিবকুমুল্লহ্ (যদি তোমরা আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পেতে চাও তবে আমার অনুসারী হও; আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন)। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌পাক এভাবে কাউকে কাউকে বিশেষভাবে অনুগ্রহরঞ্জিত করে মর্যাদামন্ডিত করেছেন। আর আল্লাহ্‌পাক যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই তাঁর বিশেষ অনুকম্পা দানে ধন্য করেন।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের অবস্থা বৃষ্টিপাতের মতো। বুঝা যায়না যে (এই বৃষ্টিপাতের) প্রথম দিক উত্তম না শেষ দিক। অথবা তাদের দৃষ্টান্ত যেনো একটি বাগান— যে বাগানে প্রথম বৎসরে এক দলকে এবং দ্বিতীয় বৎসর অন্য দলকে ভোগদখলের অধিকার দেয়া হয়। এ রকম হওয়াও সম্ভব যে, প্রথম দল অপেক্ষা দ্বিতীয় দল অধিক রিজিক প্রাপ্তিতে আনন্দচিত্ত হবে। আবু জাফর বিন মোহাম্মদের বর্ণনা থেকে রজীন এই হাদিসটি এনেছেন।

এই মাসআলাটি সহীহ্ কাশ্‌ফ (বিশুদ্ধ অন্তর্দর্শন) দ্বারাও প্রমাণিত। সুতরাং কেউ যদি একে মান্য নাও করে তাতে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। আমরাতো ওই সকল লোকের উদ্দেশ্যে বলছি যারা উত্তম ও পথপাপ্ত। তাঁরাই প্রকৃত জ্ঞানী।

www.eelm.weebly.com

এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, কতিপয় স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন আলেম না বুঝতে পেরে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর দাবিকে অস্বীকার করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি (হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী) কোনো অসম্ভব প্রাপ্তির দাবি করেননি। অবিসংবাদিত বুজুর্গবৃন্দের প্রতি সুধারণা রাখাই সমীচীন। অন্তঃত পক্ষে নীরবতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

রসুল স. এর পৃথিবীবাসের সময় কেউ কেউ বলতো, এই কোরআন ওই দু'টি জনপদের মধ্যে বিত্তশালী জনপদের কারো উপর অবতীর্ণ করা হলো না কেনো? আল্লাহ্পাক তাদের কথার উত্তরে বলেছেন, মানুষেরা আল্লাহ্র রহমতকে নিজেরাই বণ্টন করেছে।(যাকে ইচ্ছা তাকেই পয়গম্বর বানিয়ে দিয়েছে)। কেউ কেউ বলতো, আমাদের মধ্য থেকে ওই ব্যক্তির উপর কেনো কোরআন নাজিল করা হলো (এমনটি কখনও হতে পারে না)। সেতো মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্পাক তার উত্তরে বলেছেন, সকলেই (এক সময়) জানতে পারবে, প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী কে।

সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই খুল্লাতের মাকাম অতিক্রম করে মাহবুবিয়াতের মাকামে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা হজরত ইব্রাহিম খলিলের চেয়ে অধিক মর্যাদাশালী নন। কারণ, সাহাবীগণের প্রাপ্তি ঘটেছে রসুল স. এর অনুসরণের মাধ্যমে। কিন্তু হজরত ইব্রাহিমের প্রাপ্তি মাধ্যম বিবর্জিত— সরাসরি। সুতরাং এ কথাটি স্মরণে রাখতে হবে যে, মাধ্যমসহ এবং মাধ্যম বিবর্জিত অবস্থার মধ্যে রয়েছে বিপুল ব্যবধান।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানীও খুল্লাতের মাকামে উপনীত হয়েছিলেন অনুসরণের মাধ্যমে। কিন্তু তিনি সেখানেই থেমে থাকেননি। মাহবুবিয়াতের মঞ্জিলের দিকে ছিলো তাঁর নিরন্তর অভিযাত্রা। এভাবে যথাঅনুসরণের মাধ্যমেই তিনি মাহবুবিয়াতের মাকাম লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আল্লাহ্পাক যাকে ইচ্ছা তাকেই তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ দানে মর্যাদায়িত করেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১২৬

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا ۝

❑ আসমান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহেরই, এবং সব কিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুই আল্লাহ্পাকের অধিকারভূত। এই বিশাল সৃষ্টির তিনিই একক অধীশ্বর ও স্রষ্টা। কিন্তু এখানে কেবল আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত বস্তুনিচয়ের মালিকানার কথা বলা হয়েছে। মানুষের দৃষ্টি সাধারণত স্থূল। দৃষ্টি গ্রাহ্যতার মধ্যেই তাদের চিন্তা আবদ্ধ থাকে। তাই এখানে দৃষ্টিসীমা বহির্ভূত সৃষ্টির উল্লেখ না করে বলা হয়েছে— আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্র। এই বাক্যটি পূর্ববর্তী আয়াতের 'তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম যে সৎকর্মশীলতার সঙ্গে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে'— কথাটির সঙ্গে অর্থগতভাবে সম্পৃক্ত। এভাবে বাক্যটির অর্থ হবে— সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং

www.eelm.weebly.com

অধীশ্বর যেহেতু আল্লাহ্, তাই সকলের জন্য এ দায়িত্বটি অপরিহার্য যে তারা আল্লাহ্মুখী হবে (আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করবে)। পূর্ববর্তী আয়াতের 'আল্লাহপাক্ ইব্রাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন' কথাটির সঙ্গেও এই আয়াতটি সম্মিলিত অর্থ প্রকাশ করতে পারে। এভাবে অর্থ হতে পারে— আল্লাহ্পাক যেমন হজরত ইব্রাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন, তেমনি তিনি ইচ্ছা করলে অন্যদেরকেও তাঁর বন্ধুত্ব দানে ধন্য করতে পারেন। সুতরাং সৃষ্টির জন্য তাঁর আনুগত্য অপরিহরণীয়। তিনিই সমকক্ষতাবিহীন একক অধিকর্তা। তিনিই সৃষ্টির সৎ ও অসৎ কর্মের একক বিনিময় প্রদাতা।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে— সবকিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। এই পরিবেষ্টন আমাদের ধারণাসঞ্জাত পরিবেষ্টনের মতো নয়। কারণ তাঁর সত্তা, গুণবত্তা এবং কার্যকলাপ ধারণাতীত। এখানে এ বাক্যটির প্রকৃত অর্থ এই যে, সকল সৃষ্টি তাঁর অধীন। সৃষ্টির অস্তিত্ব প্রকৃত অস্তিত্ব নয়। আল্লাহ্পাক অনুকম্পাবশতঃ সৃষ্টিকে সম্ভাব্য অস্তিত্ব দান করেছেন। অতএব করুণাময় আল্লাহ্তায়ালা ছাড়া অন্য দিকে মুখ ফিরানো (অন্য কিছুর নিকট আত্মসমর্পণ করা) বৈধ নয়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে পরিবেষ্টনের অর্থ জ্ঞান ও ক্ষমতার পরিবেষ্টন। সৃষ্টির সকল কিছু তাঁর জ্ঞানায়ত্ব ও ক্ষমতাভূত (যদিও এই জ্ঞানায়ত্ব ও ক্ষমতাভূত অবস্থাটি আমাদের জ্ঞানাতীত ও ধারণার অতীত)। কাজেই তিনিই সৃষ্টির কর্মকাণ্ডের বিনিময় প্রদান করবেন। উত্তম বিনিময় দান করবেন পুণ্য কর্মের জন্য। মন্দ কর্মের জন্য প্রদান করবেন মন্দ বিনিময়। ওয়াল্লহু আ'লাম।

মুসতাদরাক গ্রন্থে হাকেম লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মূর্খতার যুগে অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং রমণীদেরকে মীরাস (সম্পদের উত্তরাধিকার) দেয়া হতো না। ইসলামের আবির্ভাবের পর বিশ্বাসীরা রসুল স. এর নিকট নারী ও শিশুর মীরাস সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তখন আল্লাহ্পাক এরশাদ করলেন—

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১২৭

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ ۖ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِي يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ○

❑ এবং লোকে তোমার নিকট নারীদিগের বিষয় পরিষ্কারভাবে জানিতে চায়, বল, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাহাদের সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে জানাইতেছেন এবং পিতৃহীন নারী সম্পর্কে যাহাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না অথচ তোমরা

www.eelm.weebly.com

তাহাদিগকে বিবাহ করিতে চাহ ও অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে এবং পিতৃহীনদের প্রতি তোমাদের ন্যায় বিচার সম্পর্কে যাহা কিতাবে তোমাদিগকে শুনান হয় তাহাও পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেওয়া হয়। এবং যে কোনো সৎকাজ তোমরা কর আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবহিত।

ইসতিফতা অর্থ জানতে চাওয়া। সিহাহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে ইসতিফতা অর্থ ফতোয়া (অভিমত)। জটিল মাসআলার (সমস্যার) উত্তর।

ইবনে মুনজির কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, তখনকার মানুষেরা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকা এবং নারীকে সম্পদের উত্তরাধিকার দিতো না। এরপর যখন সুরা নিসার মাধ্যমে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হতে শুরু করলো, তখন অনেকের নিকটই বিষয়টি হয়ে পড়লো অত্যন্ত কঠিন। সকলে মিলে রসুল স. এর নিকটে নারী ও শিশুদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানতে চাইলেন। সে কথাই আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে এভাবে— ওয়া ইয়াসতাফতুনাকা ফিন্নিসাই (এবং লোকে তোমার নিকট নারীদের বিষয় পরিষ্কারভাবে জানতে চায়)। ইবনে জারীর ও আবদ্ বিন হুমাইদ মুজাহিদের উক্তিরূপে এ রকমই বর্ণনা করেছেন আবু সালেহের মাধ্যমে কালাবী বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে উম্মে কোহার মেয়েদের সম্পর্কে (ঘটনাটি এই সুরার প্রথম দিকে বর্ণিত হয়েছে)।

বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, জননী আয়েশা বলেছেন, এই আয়াতের লক্ষ্য ওই ব্যক্তি, যে ছিলো একটি এতিম বালিকার অভিভাবক। তার সম্পদের মধ্যে এতিম বালিকাটিরও অংশ ছিলো। বালিকাটির অন্যত্র বিবাহ হলে সম্পদ অন্যত্র চলে যাবে বলে সে বিবাহে বাধা প্রদান করে আসছিলো। বাগবীর বর্ণনায় এ কথাও এসেছে যে, এতিম বালিকাটি ছিলো কুৎসিতদর্শনা। তাই সে নিজে তাকে বিবাহ করতে রাজী ছিলো না। আবার সম্পদ অন্যত্র চলে যাবে বলে অন্যের সঙ্গে বিবাহেও সে ছিলো গররাজী। সে চাইছিলো বালিকাটির মৃত্যু হোক। তাহলে সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার ভয় আর থাকবে না। তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। অন্য একটি বর্ণনায় জননী আয়েশার উক্তিরূপে এসেছে, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ওই পিতৃহীনা রমণীকে লক্ষ্য করে, যে ছিলো এক ব্যক্তির প্রতিপালনাধীনা। মেয়েটি সুন্দর ছিলো না। সুন্দর হলে হয়তো লোকটি তাকে বিয়ে করতো। কিন্তু যথোপযুক্ত মোহর দিতো না।

জ্ঞাতব্যঃ আহকামুল কোরআন গ্রন্থে কাযী ইসমাইল লিখেছেন, আবদুল মালেক বিন মোহাম্মদ বিন হাজম বলেছেন, ওমরা বিনতে হাজম ছিলেন হজরত সা'দ বিন রবীর স্ত্রী। হজরত সা'দ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই ওমরা হয়ে পড়লেন বিধবা এবং তাঁর গর্ভজাত কন্যাটি হয়ে পড়লো এতিম। মেয়েটি তার পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারের দাবি নিয়ে রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। বোখারী এবং মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে— উম্মত জননী হজরত আয়েশা বলেছেন, 'মা ইউত্লা আলাইকুম

www.eelm.weebly.com

ফিল কিতাব' (আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন) — এ কথার মাধ্যমে ওই আয়াতের দিকে নির্দেশ করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে 'তোমরা যদি আশংকা করো যে পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে (আয়াত- ৩)।

'কুলিল্লাহু ইউফতিকুম ফিহিন্না'— এ কথার অর্থ (হে রসুল) আপনি বলে দিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন অর্থাৎ আল্লাহ্পাক তাঁর হুকুম বর্ণনা করছেন মেয়েদের সম্পর্কে আল্লাহ্র কিতাবে অর্থাৎ তিনি উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। এ রকম হতে পারে যে, এখানে 'মা ইউত্‌লা' উদ্দেশ্য এবং 'ফিল কিতাব' বিধেয়। এভাবে কথাটির অর্থ হবে— যে হুকুম তোমাদেরকে শোনানো হচ্ছে তা কিতাবের মধ্যে (লাওহে মাহ্ফুজে) সুরক্ষিত আছে। এখানে 'মা ইউত্‌লা' এর কর্মপদ হিসেবে একটি উহ্য ক্রিয়াও থাকা সম্ভব। যদি তাই হয় তবে উহ্য ক্রিয়া সহযোগে অর্থ হবে এ রকম— যে হুকুম শোনানো হচ্ছে তার বর্ণনাকারী আল্লাহ্।

'ফি ইয়াতামান নিসায়ি' অর্থ পিতৃহীনা নারী। এই পিতৃহীনা নারী সম্পর্কে নির্দেশ হচ্ছে— তাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান করো না। এখানে তাদের প্রাপ্য অর্থ মীরাস, মোহর ইত্যাদি। এরপর বলা হয়েছে, অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে চাও। এ কথার অর্থ তোমরা একবার তাদেরকে বিয়ে করতে চাও, আরেকবার পিছিয়ে যাও। এখানে প্রথম অর্থের মধ্যে (একবার বিয়ে করতে চাও) 'ফি' এবং দ্বিতীয় অর্থের মধ্যে (আরেকবার পিছিয়ে যাও) 'আন' শব্দ দু'টো উহ্য রয়েছে। ইবনে মুনজির বলেছেন, প্রথম অর্থটি করেছেন হাসান এবং দ্বিতীয়টি করেছেন ইবনে সিরিন। কিন্তু ইবনে আবী শায়বা বলেছেন দ্বিতীয়টি হাসানের।

অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে— এই অসহায় শিশুদেরকে মূর্খতার যুগে মীরাস দেয়া হতো না। অভিভাবকেরাই তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করতো। এতিম শিশু সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'এতিমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও।' আর এই আয়াতে দেয়া হচ্ছে পিতৃহীনদের প্রতি ন্যায়বিচারের নির্দেশ। অর্থাৎ বলা হচ্ছে, তাদেরকেও তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও।

শেষে বলা হচ্ছে, যে কোনো সৎকাজ তোমরা করো, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। এখানে 'যে কোনো সৎকাজ' অর্থ পিতৃহীন নারী ও পিতৃহীন শিশুদের জন্য যে কোনো কল্যাণজনক কর্ম। আল্লাহ্পাক সকল সৎকর্ম সম্পর্কেই সবিশেষ অবহিত এবং তিনি সেগুলোর যথাবিনিময় প্রদান করবেন।

জননী আয়েশা থেকে বোখারী, আবু দাউদ, হাকেম এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি লিখেছেন, জননী সাওদা হয়ে পড়েছিলেন বিগত যৌবনা। তিনি আশংকা করলেন, রসুল স. হয়তো তাঁকে পরিত্যাগ করবেন। এ কথা ভেবে তিনি রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল, আমি আপনার সঙ্গে রাত্রিযাপনের অধিকার আয়েশাকে দিয়ে দিলাম। তাঁর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

❐ কোন স্ত্রী যদি তাহার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে তবে তাহারা আপোষ নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে তাহাদের কোন দোষ নাই, এবং আপোষ-নিষ্পত্তিই শ্রেয়। মানুষ লোভ হেতু স্বভাবতঃ কৃপণ; এবং যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও ও সাবধান হও তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার খবর রাখেন।

দাম্পত্য জীবনে জটিলতা দেখা দিলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আপোষরফা করাতে কোনো দোষ নেই। এই আয়াতে যে জটিলতার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে— স্বামী যদি দুর্ব্যবহার করে অথবা উপেক্ষা করে— যেমন দাম্পত্য সম্পর্ক শিথিল হওয়া, কথাবার্তা কম হওয়া ইত্যাদি; এমতাবস্থায় সন্ধির উদ্দেশ্যে স্ত্রী যদি মোহরানার দাবি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ছেড়ে দেয়, অবশ্য পরিশোধ্য খোরপোষের দাবি শিথিল করে অথবা রাতের স্বামীসঙ্গের অধিকার (পালা) পরিত্যাগ করে, তবে তা অতি উত্তম। এ রকম অবস্থায় স্ত্রী স্বামীকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে কিছু সম্পদও প্রদান করতে পারে। বাগবী লিখেছেন, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে তোমার বয়স বেশী হয়ে গিয়েছে। এবার আমি কোনো যুবতী সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করতে চাই এবং বিবাহের পর তোমার চেয়ে তাকেই পালা বেশী করে দিতে চাই। এই সিদ্ধান্তে তুমি যদি প্রসন্ন হও, তবে আমার কাছে থাকতে পারো। আর যদি অপ্রসন্ন হও তবে চলে যেতে পারো। স্বামীর এই সিদ্ধান্তে যদি স্ত্রী সম্মত হয় তবে এটা হবে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অনুগ্রহ। এ রকম ক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীর উপর কোনো জুলুম করতে পারবে না। আর স্ত্রী সম্মত না হলে স্বামীকে তার হক পুরোপুরি আদায় করতে হবে (পালা কম কিংবা পরিত্যাগ করা যাবে না)। অন্যথায় স্বামী তার স্ত্রীকে শিষ্টাচারের সঙ্গে মুক্ত করে দিবে। স্বামী যদি এমতাবস্থায় স্ত্রীকে মুক্তি না দেয় এবং অপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর হক পুরাপুরি আদায় করে, তবে সেটা হবে স্ত্রীর প্রতি তার অনুগ্রহ। অর্থাৎ স্ত্রী তার হক ছেড়ে দিয়ে এক সঙ্গে থাকতে চাইলে সে হবে স্বামীর প্রতি অনুগ্রহকারিণী আর স্বামী তার হক ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীকে রাখতে চাইলে সে হবে স্ত্রীর প্রতি অনুগ্রহকারী। এভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা করা সৎকর্মপরায়ণতার নিদর্শন। আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'আপোষ নিষ্পত্তিই শ্রেয়।'

মুকাতিল বিন হাব্বান বলেছেন, বৃদ্ধা স্ত্রীর স্বামী কোনো যুবতী রমণীকে বিবাহের পর যদি প্রথম স্ত্রীকে বলে, এই শর্তে আমি তোমাকে কিছু সম্পদ প্রদান করবো যে, তুমি তোমার পালার অধিকার শিথিল করবে (কমিয়ে দেবে)। অর্থাৎ

www.eelm.weebly.com

তোমার পালা অধিকাংশ কিংবা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিবে আমার নতুন স্ত্রীর জন্য— এ কথায় বৃদ্ধা স্ত্রী যদি সম্মত হয় তবে তা অতি উত্তম। আর যদি সম্মত না হয়, তবে পালার ক্ষেত্রে স্বামীকে সমতা রক্ষা করে চলতেই হবে। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে হজরত আলী বলেছেন, যদি কোনো স্বামী তার কুরূপা অথবা যৌবনহীনা স্ত্রীকে সুনজরে না দেখে, স্ত্রীও যদি তার স্বামী থেকে পৃথক হতে না চায় এবং দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য স্ত্রী যদি তার স্বামীকে কিছু সম্পদ প্রদান করে, তবে ওই সম্পদ স্বামীর জন্য হালাল। সম্পদ না দিয়ে স্ত্রী যদি তার পালার অধিকার ছেড়ে দেয়, তবুও তা সিদ্ধ হবে।

'সুল্‌হা' অর্থ সন্ধি। 'বাইনাহুমা' অর্থ নিজেদের (স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে)। 'বাইনাহুমা সুল্‌হা' কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, দাম্পত্য বিষয়ক জটিলতার সংবাদ স্বামী স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উত্তম। জটিলতার নিরসনও নিজেরা করা ভালো। দাম্পত্য জীবনের গোপন কথা অন্য কেউ যেনো জানতে না পারে।

'ওয়াস্‌ সুল্‌হু খইর' অর্থ (এবং সকল অবস্থায় আপোষ নিস্পত্তিই শ্রেয়)। ঝগড়া বিবাদ কখনই উত্তম নয়। বিবাদ মিটানোর নিমিত্তে স্ত্রী যদি স্বামীকে কিছু সম্পদ দান করে তবে তাকে বাহ্যিক সাদৃশ্যের কারণে কেউ যেনো ঘুষ মনে না করে। এ রকম অপধারণার নিরসনার্থে এখানে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে 'আপোষ নিস্পত্তিই শ্রেয়'।

বিশেষভাবে স্বামী-স্ত্রীর সন্ধির উদ্দেশ্যে এই আয়াতটি নাজিল হলেও এর নির্দেশটি একটি সাধারণ নির্দেশ। তাই সকল প্রকার আপোষ নিস্পত্তি বা সন্ধি এই আয়াতের নির্দেশের আওতাভূত বলে মেনে নেয়া যেতে পারে।

সন্ধির প্রকারভেদঃ সন্ধি তিন প্রকার। ১.স্বীকারোক্তির সঙ্গে সন্ধি। ২. মৌনতাসহ সন্ধি। ৩. দাবি অস্বীকার করার সঙ্গে সন্ধি।

আলোচ্য আয়াতের সন্ধির হুকুমটি একটি সাধারণ হুকুম। তাই ইমাম শাফেয়ী ছাড়া অন্য ইমামগণ সকল প্রকার সন্ধিকে সিদ্ধ বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সন্ধির শেষোক্ত প্রকার দু'টি নাজায়েয। কেননা রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, মুসলমানদের মধ্যে সকল প্রকার সন্ধি জায়েয। কিন্তু ওই সন্ধি নাজায়েয যা হারামকে হালাল অথবা হালালকে হারাম করে দেয়। মুসলমানেরা সন্ধির শর্ত মান্য করতে বাধ্য। কিন্তু ওই শর্তকে মানতে তারা বাধ্য নয়, যা হালালকে হারাম করে দেয়। হাকেম। হাদিসটির ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির নিকট কিছু দাবি করে বসলো। দাবিটি মিথ্যা। এমতাবস্থায় দু'জনের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হলো। সন্ধির শর্তানুযায়ী দাবিদারের দাবি (আংশিক হলেও) প্রত্যর্পণ করতে হবে। এমতাবস্থায় দাবিদারের মিথ্যা দাবি সত্যে পরিণত হলো। আর যার উপর দাবি করা হয়েছে তাকেও আত্মসমর্পণ করতে হলো মিথ্যার নিকট। বিবাদ মেটানোর জন্য এভাবে মিথ্যা পরিণত হলো সত্যে এবং সত্য পরিণত হলো মিথ্যায়। আর দাবিদারকে (আংশিক বা সম্পূর্ণ) যে সম্পদ দেয়া হলো তা হলো এক ধরনের উৎকোচ। উৎকোচের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে বলে এই নিয়মে সম্পাদিত সন্ধি নাজায়েয।

www.eelm.weebly.com

ইমাম শাফেয়ী ব্যতীত অন্য ইমামত্রয় বলেছেন, বর্ণিত হাদিসটি আমাদের অভিমতের বিরুদ্ধে নয়। বরং আমাদের অভিমতটি প্রমাণিত হয়েছে এ হাদিসের মাধ্যমেই। কেননা রসুল স. বলেছেন, পূর্ব শর্ত ব্যতীত সকল সন্ধি জায়েয। যা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালালে পরিণত করে, তাতো সকল অবস্থায় নাজায়েয। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে— কোনো ব্যক্তি তার এক স্ত্রীর সঙ্গে এই শর্তে সন্ধি করলো যে, সে তার অপর স্ত্রীকে সম্ভোগ করবে না অথচ স্ত্রীর সপত্নীর সঙ্গে সহবাস হালাল। এ ধরনের সন্ধি বাতিল। আবার কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে স্ত্রী যদি তার স্বামীর সঙ্গে এ কথা বলে সন্ধি করে নেয় যে, আমি আমার সহবাসের পালা আমার সপত্নীকে দিলাম— তবে এ ধরনের সন্ধি ঐকমত্যানুসারে বিশুদ্ধ হবে। কেননা সন্ধির পূর্বে পালাবণ্টনের ক্ষেত্রে একজনকে অপরজন অপেক্ষা অগ্রাধিকার দান ছিলো হারাম। কিন্তু সন্ধি সম্পাদনের পর এ রকম অগ্রাধিকার দান হালাল। নীরবতা এবং অস্বীকৃতির পর কিছু দেয়া নেয়ার উপর সন্ধি করা জায়েয। কেননা এক্ষেত্রে দাবিদার তার ধারণা মোতাবেক আপন হক আদায় করবে এবং যার উপর দাবি প্রয়োগ করা হয়েছে সে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য কিছু দিতে সম্মত হবে। এ রকম করা জায়েয। জীবন রক্ষার জন্য সম্পদ প্রদান জায়েয। অত্যাচার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ঘুষ প্রদান করা মোবাহ্ (বৈধ)। দাবিদার তার অধিকার প্রমাণ করতে অক্ষম হলেও দাবিকৃত ব্যক্তি যদি জানে যে দাবিদারের দাবি সঠিক—তৎসত্ত্বেও তা স্বীকার না করে দাবির কিছু অংশ প্রদানের মাধ্যমে যদি সন্ধি স্থাপিত হয় তবে, দাবির বাকী অংশ রইলো আল্লাহ্‌র অধিকারে। মিথ্যা দাবির মাধ্যমে সংগৃহীত সম্পদ ভক্ষণ হালাল নয়। কারণ, জেনেশুনে কারো অধিকার আত্মসাত করা নাজায়েয। তবে যদি দাবি সম্পর্কিত মূল বিবাদকে এড়িয়ে কিছু লেনদেনের মাধ্যমে সন্ধি স্থাপন করতে উভয় পক্ষ সম্মত হয়ে যায় তবে তা জায়েয— ইমামত্রয় এ কথা বলেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন নাজায়েয।

মাসআলাঃ স্বীকারোক্তির দাবি উত্থাপনের পর সন্ধি স্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু সম্পদ দেয়া হলে তাকে বিক্রয় মনে করতে হবে (যদি সম্পদের দাবি হয়)। যে সম্পদের দাবি করা হয়েছে, সে সম্পদ দিতে স্বীকৃত হলে তার মূল্যকে বিক্রয় মূল্য বলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে শোফা'র নিয়ম প্রযোজ্য হবে। এমতাবস্থায় দোষত্রুটি অবলোকনের অধিকার, শর্তের অধিকার এবং দেখার অধিকার থাকবে। পণ্যবিনিময় যদি অজ্ঞাতসারে হয় তবে স্বীকারোক্তির সন্ধি বতিল হয়ে যাবে। কিন্তু দাবিকৃত সামগ্রী উপস্থিত না করলে স্বীকারোক্তির সন্ধি বাতিল হবে না। কেননা এক্ষেত্রে পণ্য পরিশোধের বিষয়টিতো রহিতই ছিলো। আদায় করা হয় নি। (রহিত বিষয়ের হক সম্পর্কে না জানা দূষণীয় নয় এবং তা বিবাদের কারণও হতে পারে না)। তবে এক্ষেত্রে যে দাবির মাল দিতে সম্মত হয়েছে, তার পণ্য পরিশোধের ক্ষমতা থাকতে হবে।

www.eelm.weebly.com

মালের দাবির বিনিময়ে যদি দাবিদারকে কিছু শ্রম দিতে হয় তবে তা হবে ইজারা বা ভাড়াতুল্য। এমতোক্ষেত্রে ইজারার মতো শ্রমদানের সময় নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক। এ রকম শর্তে সন্ধি স্থাপনের প্রাক্কালে দুই পক্ষের যে কোনো এক পক্ষ যদি মৃত্যুবরণ করে, তবে স্বীকারোক্তির সন্ধি বাতিল বলে গণ্য হবে।

মাসআলাঃ নীরবতা ও অস্বীকৃতিসূচক সন্ধির ক্ষেত্রে যার উপর দাবি প্রয়োগ করা হয়েছে সে কসম খাওয়া থেকে রক্ষা পাবে। (সন্ধি না হলে তাকে কসম করতে হতো। কেননা কসমের মাধ্যমে অস্বীকৃতি জানাতে হয়) এবং দাবিদারও তার প্রাপ্য পেয়ে যাবে। ঘরের দাবি উত্থাপিত হলে কিছু অর্থ দিয়ে যদি দাবিদারের সঙ্গে সন্ধি করে নেয়া হয়, তবে ওই ঘরের উপর শোফা বা প্রিএমসন ওয়াজিব নয়। কিন্তু দাবিদারকে ওই ঘর ফিরিয়ে দেয়া হলে শোফা ওয়াজিব।

মাসআলাঃ ঘরের দাবিদারকে ঘরের একাংশ দিয়ে সন্ধি করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। কেননা এমতো ক্ষেত্রে দাবিদার ঘরের যে অংশটুকু পাবে সেটা তার নিজের পুরো দাবির একটি অংশ। সুতরাং পুরো অংশের উপরই তার দাবি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তবে দাবিকৃত ব্যক্তি যদি এর সঙ্গে কিছু অর্থ দিতে সম্মত হয় অথবা দাবিদার যদি অবশিষ্ট অংশের দাবি থেকে বিরত থাকবে বলে ঘোষণা দেয়, তবে সন্ধি বিশুদ্ধ হবে। এমতাবস্থায় দাবিদারের কোনো প্রকার দাবি আর অবশিষ্ট থাকবে না।

মাসআলাঃ ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রেও সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে সন্ধি স্থাপন সিদ্ধ। কেননা এটাও মানুষের অধিকার সমূহের মধ্যে একটি অধিকার। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, অতঃপর যাকে প্রতিপক্ষের পক্ষ হতে কিছু মাফ করা হয়, তবে বাকীটুকু ন্যায়সঙ্গতভাবে যেনো তাগাদা করে এবং হত্যাকারী যেনো তা সৎভাবে তার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়।'

কোনো পুরুষ যদি কোনো মহিলাকে বিবাহ করেছে বলে দাবি করে এবং কিছু সম্পদ নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়, তবে তা জায়েয হবে। কেননা এটা হচ্ছে খোলা সদৃশ (মালের বিনিময়ে তালাক)।

কেউ যদি কারো উপর এমতো দাবি উত্থাপন করে বলে যে, তুমি আমার গোলাম। তখন দাবিকৃত ব্যক্তি যদি দাবিদারকে কিছু সম্পদ প্রদান করে সন্ধি স্থাপন করে, তবে তা সিদ্ধ হবে অথবা সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে সে স্বাধীন হয়ে যেতেও পারবে।

মাসআলাঃ যদি কেউ কারো উপর ঋণের দাবি করে বসে, তবে দাবিকৃত ব্যক্তি কিছু অর্থকড়ি দিয়ে সন্ধি করলে দাবি শুদ্ধ হবে। তখন ব্যাপারটি হবে এ রকম— যেনো দাবিদার তার পাওনার কিছু অংশ আদায় করে নিয়ে অবশিষ্ট অংশ ক্ষমা করে দিয়েছে। কেউ যদি উন্নতমানের এক হাজার মুদ্রার দাবিদার হয় এবং অনুন্নতমানের পাঁচ শত মুদ্রার বিনিময়ে সন্ধিবদ্ধ হতে সম্মত হয় তবে এ ধরনের সন্ধি নির্দোষ হবে। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে যে, দাবিদার তার উন্নতমানের অর্থের অধিকার পরিত্যাগ করেছে এবং মুদ্রার সংখ্যাও কম করে দিয়েছে। আবার মুদ্রা পরিশোধের জন্য অবকাশও দিয়েছে।

অচল হাজার মুদ্রার দাবির ক্ষেত্রে সচল পাঁচ শত মুদ্রা আদায়ের শর্তে সন্ধি সিদ্ধ নয়। নগদ বা বাকী যেভাবেই অর্থ পরিশোধ করা হোক না কেনো। কেননা পাওনা ছিলো অচল মুদ্রা এবং সন্ধি হয়েছে সচল মুদ্রা পরিশোধের উপর। সুতরাং

www.eelm.weebly.com

এক্ষেত্রে অচল হাজার মুদ্রার বিনিময়ে অচল হাজার মুদ্রাই পরিশোধ্য। তাই এক্ষেত্রে সচল পাঁচশত মুদ্রা দিলে তা হবে সুদ।

রূপার টাকার দাবি উত্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু স্বর্ণমুদ্রা পরিশোধের মাধ্যমে যদি সন্ধি হয়ে যায়, তবে তা হবে পণ্য বিক্রয়তুল্য। সুতরাং এক্ষেত্রে সন্ধিস্থল পরিত্যাগের পূর্বেই স্বর্ণমুদ্রাগুলো দাবিদারকে হস্তগত করতে হবে (যেমন নগদ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে)।

হজরত সাঈদ বিন মানসুর এবং হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব বলেছেন, মোহাম্মদ বিন মোসলেমার কন্যা রাফে বিন খাদীজের বিবাহবন্ধা ছিলেন। রাফে তাঁর স্ত্রীর কোনো কথাই পছন্দ করতেন না। কিন্তু অপছন্দের কোনো কারণও তাঁর জানা ছিলো না (যেমন স্ত্রী বৃদ্ধা বা অন্য কোনো দোষযুক্তা)। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলেন। স্ত্রী বললেন, আমাকে তালাক দিও না। আমার সহবাসের পালা তোমার ইচ্ছাধীন। তুমি যা ইচ্ছা তাই আমার জন্য নির্ধারণ করে দাও। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি। হাকেম হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের এই বর্ণনার পক্ষে কতিপয় সাক্ষী উপস্থাপন করেছেন, যার কারণে হাদিসটি হয়েছে মুত্তাসিলসনদবিশিষ্ট (সুসংবদ্ধ ধারাবাহিকতাসম্পন্ন হাদিসকে বলে মুত্তাসিল)।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওমরা সম্পর্কে। এ রকমও বর্ণনা এসেছে যে, খুয়াইলা বিনতে মোহাম্মদ বিন মুসলেমা এবং তার স্বামী আসআদ বিন রবীকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। অথবা হজরত রাফে বিন খাদীজ ছিলেন এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্য, যিনি মোহাম্মদ বিন মোসলেমার কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের সময় খুয়াইলা ছিলেন যুবতী। তার বয়স বেড়ে গেলে হজরত রাফে আরেকটি বিয়ে করলেন এবং প্রথম স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে দ্বিতীয় স্ত্রীকেই অগ্রাধিকার দিতে শুরু করলেন। খুয়াইলা তখন রসুল স. এর নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

হাকেমের বর্ণনায় রয়েছে, মাতা আয়েশা বলেছেন, ওয়াস্ সুলহু (আপোষ নিষ্পত্তি শ্রেয়) আয়াতটি নাজিল হয়েছে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে যার ছিলো এক স্ত্রী ও এক সন্তান। লোকটি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য একজনকে বিয়ে করতে চাইলো। স্ত্রী তার স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য বললো, তুমি শুধু আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাও, পালার দাবি আমি করবো না।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, এক লোকের স্ত্রী হয়ে পড়েছিলো বৃদ্ধা। কয়েকটি সন্তান সন্ততিও ছিলো তার। সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করতে চাইলো। স্ত্রী বললো, আমাকে তালাক দিও না, সন্তান সন্ততিদের সঙ্গে থাকতে দাও। ইচ্ছে করলে দুই মাস অন্তর আমার জন্য একটি পালা নির্ধারণ করে দিও। যদি ইচ্ছা না হয়, তবে তাও দিও না। লোকটি বললো, তোমার এই প্রস্তাবে আমি সম্মত। লোকটি রসুল স. এর দরবারে গিয়ে এ কথা জানালো। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে...' তখন ওই মহিলা বললো, এখন আমার খরচের অংশ পুনঃনির্ধারণ করো। ইতোপূর্বে মহিলাটি তার খরচের পালা ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছিলো এবং এ

www.eelm.weebly.com

কথাও বলেছিলো যে, আমাকে তালাক দিও না– ইচ্ছে করলে তুমি আমার কাছে নাও আসতে পারো। তার এই কথার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো 'লোভ হেতু স্বভাবতঃ কৃপণ'।

সিহাহ্ এবং কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'শুহ্হা' অর্থ লোভ, কৃপণতা। শব্দটির মাধ্যমে মানুষের স্বভাবজ লালসা ও কার্পণ্যের কথা বলা হয়েছে এবং এরপরে এই অসৎ স্বভাব অতিক্রম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই যেমন স্বামী তার স্ত্রীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবে না এবং তার অধিকার আদায়ে কার্পণ্য করবে না, তেমনি স্ত্রীর পক্ষেও তার স্বামীর অধিকার আদায় না করা হবে অসমীচীন।

আয়াতের প্রথমাংশে সন্ধির প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং শেষ অংশে স্বভাবগত একগুয়েমি থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 'এবং যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও ও সাবধান হও, তবে তোমরা যা করো আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।' 'ওয়া ইন তুহ্সিনু '(এবং যদি সৎকর্মপরায়ণ হও) এ কথার মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের প্রতি নম্র হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা যেনো পারস্পরিক অধিকারকে সম্মান জানাতে সচেষ্ট হয়— অপ্রিয় হলেও যেনো ন্যায়ানুগতাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে।

ওয়া তাত্তাকু অর্থ 'এবং সাবধান হও।' অর্থাৎ আল্লাহ্র ভয়ে সাবধান হও। অসদাচরণ, উপেক্ষা ইত্যাদি থেকে আল্লাহ্ভীতির কারণে সতর্ক হও।

সবশেষে বলা হয়েছে, তোমরা যা করো আল্লাহ্ তার খবর রাখেন। এ কথার অর্থ তোমাদের উত্তম ও অনুত্তম সকল কর্ম সম্পর্কে তিনি পরিজ্ঞাত। তাই তিনি তোমাদের কর্মের যথোপযুক্ত বিনিময় দান করবেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১২৯

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوٓا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ○

❐ এবং তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে কখনই পারিবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকিয়া পড়িও না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রাখিও না; যদি তোমরা নিজদিগকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে একাধিক স্ত্রীধারীদের জন্য। এখানে বলা হয়েছে, সকল স্ত্রীর ক্ষেত্রে সমান ব্যবহার অসম্ভব। তারপরেই বলা হয়েছে 'তবে তোমরা কোনো একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পোড়োনা ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখো না।' এ কথার মাধ্যমে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, খোরপোষ, কথাবার্তা,

www.eelm.weebly.com

সহবাসের পালাবণ্টন, —এ সকল ক্ষেত্রে সকল স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু একজন অপেক্ষা অন্যজনের প্রতি অধিক ভালোবাসা থাকলে দূষণীয় হবে না। কেননা ভালোবাসার প্রসঙ্গটি হৃদয়ঘটিত ব্যাপার, যা মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত। রসুল স. তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, হে আমার আল্লাহ্! আমার নিয়ন্ত্রণে যা কিছু রয়েছে তার মধ্যে আমি সমতা রক্ষা করেছি। কিন্তু আমার হৃদয় তোমারই অধিকারে। তাই হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে যদি আমি সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে অসমর্থ হই, তবে এর জন্য তুমি আমাকে অভিযুক্ত কোরো না। আহমদ, সিহাহ্ রচয়িতা চতুষ্টয়, ইবনে হাব্বান এবং হাকেম এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। আর মাতা আয়েশা সিদ্দিকা থেকে বর্ণনা করেছেন সুনান প্রণেতা চতুষ্টয় (আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা) এবং দারেমী।

একজনের দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ার অর্থ তার জন্য অতিরিক্ত পালা নির্ধারণ, অতিরিক্ত মেলামেশা কিংবা অধিক খোরপোষ প্রদান। অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রাখার অর্থ অপর স্ত্রীর খোরপোষ, আলাপচারিতা ও পালা সংক্রান্ত অধিকার ক্ষুণ্ন করা। আয়াতে এ রকম সাম্যবিহীনতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দুই স্ত্রীর অধিকারী ব্যক্তি একজনের প্রতি বিমুখ হয়ে অপর জনের প্রতি অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়লে সে কিয়ামত দিবসে উত্থিত হবে কোমর ভাঙা অবস্থায়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় এবং দারেমী।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন করো ও সাবধান হও তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এ কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সমতা রক্ষা সংক্রান্ত যে অনাচার সংঘটিত হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে অভিযুক্ত করবেন না— যদি তোমরা এখন থেকে সংশোধিত আচরণে অভ্যস্ত হও (আয়াতের এই নির্দেশকে মান্য করে চলো)। আল্লাহ্ পাক ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু। তাই তিনি তোমাদের অতীত পাপসমূহকে দয়া করে মার্জনা করবেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৩০

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ۝

❑ যদি তাহারা পরস্পর পৃথক হইয়া যায় তবে আল্লাহ্ তাঁহার প্রাচুর্য দ্বারা তাহাদের প্রত্যেককে অভাব মুক্ত করিবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

দাম্পত্যজটিলতার কারণে স্বামী স্ত্রীকে যদি পৃথক হয়ে যেতেই হয়, তবে এতে করে কারো জন্য দুশ্চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। এ রকম হলে আল্লাহ্পাক তাদের দু'জনকেই প্রাচুর্য দান করবেন। পরস্পরের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে নিরাপদ রাখবেন। অর্থাৎ স্ত্রীকে দ্বিতীয় স্বামী এবং পুরুষকে দ্বিতীয় স্ত্রী দান করবেন।

www.eelm.weebly.com

এভাবে পুনঃ পরিণয়ের মাধ্যমে তাদেরকে নিশ্চিন্ত করে দেয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে। শেষে বলা হয়েছে আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়— এ কথার অর্থ তাঁর রহমত অতি প্রশস্ত, সীমাহীন। আর তিনি হাকিম (প্রজ্ঞাময়)। তাই এ কথা নিশ্চিত যে, তাঁর প্রতিটি নির্দেশ ও কর্মকাণ্ড পরম প্রজ্ঞামণ্ডিত।

মাসআলাঃ কোরআন মজীদের আলোচ্য আয়াত এবং রসুল স. এর সুন্নত অনুসারে এ বিষয়টি সুসাব্যস্ত যে, স্ত্রীদের পালা বণ্টন ও খোরপোষ প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। যে এ রকম করবে না, সে আল্লাহ্পাকের অবাধ্য। কাযীর উপরও ওয়াজিব কর্তব্য হচ্ছে, যে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে— তার পক্ষে রায় দেয়া। তবে মনে রাখতে হবে, পালা বণ্টনে সমতা ওয়াজিব হলেও সহবাসে সমতা জরুরী নয়। কেননা রতিকর্মের ইচ্ছা একটি হৃদয়ঘটিত বিষয় যা মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।

যে ব্যক্তির একজন স্বাধীনা স্ত্রী এবং একজন ক্রীতদাসী থাকে তাকে দুই অনুপাত এক— এই নিয়মে পালা বণ্টন করতে হবে। সম্মানিত সাহাবীবৃন্দ থেকে এ রকমই বর্ণনা এসেছে।

হেদায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দিক এবং হজরত আলী এ রকম হুকুম দিয়েছেন। হজরত আলীর সিদ্ধান্তরূপে ইমাম আহমদও এই দলিলটি পেশ করেছেন। কিন্তু এই বর্ণনাটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন ইবনে হাজম। কারণ, এই বর্ণনাসূত্রভূত মানহাল বিন ওমর এবং ইবনে আবী লাইলা বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। ইবনে হাজমের এই মন্তব্যকে অবশ্য গ্রাহ্য করা হয়নি। কারণ, উল্লেখিত বর্ণনাকারীগণ প্রকৃতপক্ষে দুর্বল ছিলেন না। ছিলেন সিকাহ্ (বলিষ্ঠ) এবং হাফেজ।

নতুন স্ত্রী এবং পুরাতন স্ত্রীর পালা সম্পর্কিত অধিকার সমান। হাদিস শরিফেও এ রকম বলা হয়েছে । ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এ রকম। অন্য ইমামত্রয় বলেছেন, কুমারী অবস্থায় নতুন স্ত্রীকে বিবাহ করা হলে গৃহে আনার পর স্বামী তার কাছে একাদিক্রমে এক সপ্তাহ রাত্রিযাপন করবে। আর কুমারী অবস্থায় বিয়ে করা না হলে অতিবাহিত করবে একাধারে তিন রাত্রি। এভাবে এক সপ্তাহ্ বা তিন রাত নতুন স্ত্রীর সঙ্গে শয্যাগ্রহণের পর নতুন ও পুরাতন স্ত্রীর পালার অধিকার সমান হয়ে যাবে। তখন পুরাতন স্ত্রী সাত বা তিন দিনের পালা পরিশোধের দাবি তুলতে পারবে না।

আবু কালাবার বর্ণনায় রয়েছে— হজরত আনাস বলেছেন, দ্বিতীয় স্ত্রীকে কুমারী অবস্থায় বিয়ে করে ঘরে আনলে তার কাছে এক টানা সাত রাত থাকবে। আর বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা অবস্থায় বিয়ে করে আনলে তার কাছে থাকবে একটানা তিন রাত। এরপর উভয় স্ত্রীর পালা সমান সমান হয়ে যাবে। বর্ণনাটি উদ্ধৃতির পর আবু কালাবা বলেছেন, আমি ইচ্ছে করলে এ কথা বলতে পারি যে, হজরত আনাসের বর্ণনাটি রসুল স. এরই নির্দেশ। বোখারী, মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

সফরে বহির্গত হলে স্ত্রীদের পালার হক আর থাকে না। তখন যাকে ইচ্ছা তাকে নিয়ে সফরে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সফরসঙ্গিনীদের এই নির্বাচন লটারীর মাধ্যমে হওয়া মোস্তাহাব। লটারীতে যার নাম উঠবে তাকেই সঙ্গে নিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা এ রকম বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, স্ত্রী বা স্ত্রীদের সম্মতি ব্যতীত তাদের কোনো একজনকে ভ্রমণের সহযোগিণী করা সিদ্ধ নয়। ইমাম মালেক থেকে সিদ্ধ এবং সিদ্ধ নয়— দুই রকম অভিমতই এসেছে। যদি স্ত্রী বা স্ত্রীগণের সম্মতি ব্যতীত অথবা লটারী ছাড়া কোনো একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে অপর স্ত্রী বা স্ত্রীগণকে পরে তার বা তাদের প্রাপ্য পালা পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক এ রকম করাকে ওয়াজিব বলেননি। ইমাম শাফেয়ী তাঁর অভিমত প্রমাণার্থে মাতা আয়েশার ওই বর্ণনাটিকে উপস্থাপন করেছেন যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. সফরের প্রাক্কালে তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণের মধ্যে লটারী করতেন। লটারীতে যাঁর নাম উঠতো তাকেই সঙ্গে নিতেন। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, পত্নীগণের মন রক্ষার জন্য রসুল স. এ রকম করেছেন। এ রকম করা তাঁর জন্য ওয়াজিব ছিলো না। ছিলো ঐচ্ছিক। প্রকৃত কথা এই যে, সফরের সময় স্ত্রীগণের পালার অধিকার থাকে না। লক্ষ্যণীয় যে, পুরুষ ইচ্ছে করলে স্ত্রীকে সঙ্গে না নিয়ে একাই সফর করতে পারে। কাজেই সে স্ত্রীদের যে কোনো একজনকে সঙ্গে নিতে পারে। তবে ইমাম শাফেয়ীর স্বপক্ষে এ রকম বলা যেতে পারে যে, একা সফরে গেলে স্ত্রীদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া বা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় না। কিন্তু একজনকে নিলে অপরের মনে প্রতিক্রিয়া হওয়াই স্বাভাবিক।

কোনো স্ত্রী তার পালার অধিকার তার সপত্নীকে দিয়ে দিলে তার পালার অধিকার রহিত হয়ে যায়। জননী আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, জননী সাওদা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আমার পালা আয়েশাকে দিলাম। তিনি এ রকম বলেছিলেন বলে রসুল স. জননী আয়েশার প্রকোষ্ঠে পর পর দু'দিন শয্যাগ্রহণ করতেন। একদিন জননী আয়েশার পালার অধিকার পূরণার্থে এবং অন্যদিন জননী সাওদার পালার পরিবর্তে। বোখারী, মুসলিম।

সপত্নীকে প্রদত্ত পালার অধিকার পালা প্রদাত্রী পুনরায় ফিরিয়ে নিতে পারবে। কেননা পালার দিন এলেই কেবল পরিত্যক্ত পালা কার্যকর করা ওয়াজিব হয়। সুতরাং পালার দিন আসার পূর্বে পরিত্যাক্ত পালা ফিরিয়ে নিলে তা বিশুদ্ধ হবে। কারণ তখন পর্যন্ত পালার ওয়াজিব কার্যকারিতা শুরু হয়নি।

সোলায়মান বিন ইয়াসারের বর্ণনা থেকে বাগবী লিখেছেন, 'লা জুনাহা আলাই হিমা' (আয়াত ১২৮) আয়াতটি সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, স্ত্রী তার খোরপোষ অথবা পালার অধিকার পরিত্যাগের পর পুনরায় অধিকার ফিরিয়ে নিতে পারবে (যদি সে পুনরায় চায়)। এ রকম করা জায়েয।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ রোগগ্রস্তা হওয়ার কারণে স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত তার পালা রহিত করে দেয়া জায়েয নয়। স্ত্রী যদি সম্মতি প্রদান করে, তবে জায়েয। উম্মত জননী হজরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন, পরলোকগমণের কয়েকদিন আগে রসুলুল্লাহ্ স. মাঝে মাঝে বলেছিলেন, আমি আগামীকাল কার ঘরে থাকবো। তাঁর কথায় সকলে বুঝতে পারলেন, তিনি স. হজরত আয়েশার ঘরে থাকতে চান। এ কথা বুঝতে পেরে তাঁর অন্য সহধর্মিণীগণ বললেন, আপনি যার প্রকোষ্ঠে ইচ্ছা রাত্রিযাপন করতে পারেন (এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই)। পত্নীগণের অনুমতি প্রাপ্তির পর রসুল স. হজরত আয়েশার কামরায় অবস্থান গ্রহণ করলেন। কয়েকদিন পর সেখানেই সংঘটিত হলো তাঁর পবিত্র মহাতিরোধান।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৩১. ১৩২

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ○ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

❒ আস্‌মান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহেরই; তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে ও তোমাদিগকেও নির্দেশ দিয়াছি যে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে এবং তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করিলেও আস্‌মান ও জমিনে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহেরই এবং আল্লাহ্ অভাব মুক্ত, প্রশংসা-ভাজন।

❒ আস্‌মান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহেরই এবং কর্ম-বিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

আস্‌মান জমিনের সকল কিছুর মালিক আল্লাহ্। পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়। আকাশ ও পৃথিবীর অন্তর্ভূত বিশাল সৃষ্টির মালিকানা সেই প্রাচুর্যময়তারই একটি নিদর্শন। এই নিদর্শন উপস্থাপনের পর পূর্ববর্তী উম্মত এবং বর্তমান উম্মতকে আল্লাহ্‌কে ভয় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 'তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে'— এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে সকল আসমানী গ্রন্থ ও সহিফার (পুস্তিকার) কথা। 'তোমাদেরকেই নির্দেশ দিয়েছি' — এ কথার মধ্যে 'তোমাদেরকে' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর উম্মতকে। এভাবে পূর্বাপর সকল নবীর উম্মতকে একটি সাধারণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে— তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করবে (আনিত্তাকুল্লা)। এই ভয় করার অর্থ শিরিক (অংশীবাদিতা) থেকে মুক্ত থাকা।

www.eelm.weebly.com

'তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করলে'— এ কথার অর্থ কুফরী করলে। কুফরী অর্থ অস্বীকৃতি, অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা। এভাবে 'ওয়াইন তাকফুরু' কথাটির অর্থ হবে যদি তোমরা অবাধ্য হও অথবা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। এরপর বলা হয়েছে, (তবে জেনে রাখো) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কেবলই আল্লাহ্র। এই সত্য যদি তোমরা প্রত্যাখ্যান করো, তবে এতে আল্লাহ্র কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। তিনি যে ভাবে ইচ্ছা তোমাদেরকে শাস্তি প্রদানে সক্ষম। তাঁর আযাব থেকে রক্ষা করার সাধ্য কারো নেই। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, যদি তোমরা আল্লাহ্পাকের সার্বভৌম কর্তৃত্বের বিষয়টিকে অস্বীকার করো তবে জেনো, আল্লাহ্পাক সকল কিছু থেকে বেপরোয়া। আর তোমরা অস্বীকার করলেও আকাশ ও পৃথিবীর ফেরেশতামণ্ডলী তাঁর পূর্ণ অনুগত ও নিরন্তর উপাসনারত। এ রকম অর্থ হওয়াও সম্ভব যে, আল্লাহ্পাক সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী (বেনিয়াজ)। তোমাদের স্বীকৃতি ও ইবাদত তাঁর কোনো উপকারে আসে না। তেমনি তোমাদের অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতা তাঁর কোনো অপকার সাধনে সক্ষম নয়। উপকার ও অপকারের মুখাপেক্ষী তোমরাই। তিনি দয়া করে তোমাদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন সৎকর্মের নির্দেশ দিয়েছেন এবং অসৎকর্মসমূহকে নিষিদ্ধ করেছেন।

শেষে বলা হয়েছে, 'অকানাল্লহু গনিয়ান হামিদা' (আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসাভাজন)। অর্থাৎ তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। আর সকল প্রশংসার একক অধিকারী তিনিই। সৃষ্টি তাঁর প্রশংসা করুক কিংবা নাই করুক— সকল অবস্থায় তিনিই প্রকৃত প্রশংসাভাজন।

পরের আয়াতে (১৩২) পুনরায় বলা হয়েছে 'আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই। এবং কর্মবিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাকের সার্বভৌম কর্তৃত্বের বিষয়টি যে মেনে নিবে সে আল্লাহ্পাককেই তার কর্ম বিধায়করূপে যথেষ্ট মনে করবে এবং তাঁরই প্রতি নির্ভরশীল হবে।

কর্মবিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট— এ কথাটির সম্পর্ক সম্ভবত 'আল্লাহ্ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা তাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন' (১৩০) আয়াতটির সঙ্গে। অর্থাৎ কর্মবিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তাই তিনি তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা নারী পুরুষ সকলকে অভাবমুক্ত করেন। এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে, যারা বিশ্বাসী তারা যেনো তাদের সকল কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্পাককেই প্রকৃত কর্মবিধায়ক রূপে যথেষ্ট বলে মেনে নেন।

সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৩৩

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ۝

❐ হে মানুষ! তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে ও অপরকে আনিতে পারেন; আল্লাহ্ ইহা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

---

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্পাকের অতুল ও অপার ক্ষমতার নিদর্শন বিবৃত হয়েছে এই আয়াতে। 'আইয়্যুহান্নাস' বলে সকল মানুষকে লক্ষ্য করে আচরণে সংযত ও বিশ্বাসে সংহত করার নিমিত্তে বলা হয়েছে, তিনি ইচ্ছে করলে মুহূর্ত মধ্যে তোমরা বিনাশপ্রাপ্ত হবে। তোমাদের স্থলে আনা হবে নতুন কোনো সৃষ্টিকে। যারা তোমাদের মতো সত্য প্রত্যাখ্যানকারী হবে না, হবে বিনয়াবনত, পূর্ণ অনুগত। আল্লাহ্পাক এ রকম করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে সাঈদ বিন মানসুর, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হলে রসুল স. তাঁর পবিত্র হস্ত হজরত সালমান ফারসীর পৃষ্ঠদেশে রেখে বললেন, এই ব্যক্তিই ওই সম্প্রদায়ভূত (আয়াতে যাদেরকে মানুষের স্থলাভিষিক্ত করার কথা বলা হয়েছে)। এই হাদিসের প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হবে এ রকমই। যেমন অন্য একটি স্থানেও এরশাদ করা হয়েছে 'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আল্লাহ্ তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন।' বোখারী ও মুসলিমে রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আমরা রসুল স. এর সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন অবতীর্ণ হলো সুরা জুমআর এই আয়াতটি— 'আর (উপস্থিতগণ ব্যতীত) অন্যান্য লোকদের জন্যও যারা তাদের সাথে শামিল হবে কিন্তু এখনও শামিল হয়নি।' আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল, আয়াতে উল্লেখিত লোক কারা? রসুল স. তাঁর হস্ত মোবারক হজরত সালমান ফারসীর উপরে রেখে বললেন, ইমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রের মতো দূরত্বেও থাকে (পৃথিবীতে ইমান বলে যদি কিছু নাও থাকে) তবুও এই ব্যক্তির সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক ইমান অর্জন করতে সমর্থ হবে। (আকাশে যে সাতটি তারা একত্রে দৃষ্ট হয় সেগুলোর মধ্যেই রয়েছে সুরাইয়া নক্ষত্র)। তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. তেলাওয়াত করলেন 'আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন।' সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল, তাদের পরিচয় কী? তিনি স. তাঁর পবিত্র হাত হজরত সালমানের উরুদেশে স্থাপন করে বললেন, এই ব্যক্তি এবং তার সম্প্রদায়। ধর্ম যদি সুরাইয়া নক্ষত্র অপেক্ষা অধিক দূরবর্তী হয়, তবে কতিপয় পারস্যবাসী সেখান থেকে ইমান ছিনিয়ে আনবে।

জ্ঞাতব্যঃ শায়েখ মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, শায়েখ জালালউদ্দিন সুয়ুতী বলেছেন, এই হাদিসে ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর সহচরবৃন্দের কথা বলা হয়েছে। শায়েখ সালেহী কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, শায়েখ সুয়ুতীর বক্তব্যটিতে সন্দেহ মাত্র নেই। কেননা ইমাম আবু হানিফা ও তার সঙ্গীদের মতো পারস্যবাসীর অন্য কেউ প্রজ্ঞার পূর্ণত্ব পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। আর হজরত সালমান ফারসী ছিলেন ইমাম আবু হানিফার উর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ।

তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একবার রসুল স. এর সম্মুখে অনারব সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিলো। তখন রসুল স.

www.eelm.weebly.com

বলেছিলেন, আমি তাদের প্রতি (অথবা বলেছিলেন তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন জনের প্রতি) তোমাদের চেয়ে (অথবা বলেছেন তোমাদের কোনো কোনো লোকের চেয়ে) অধিক ভরসা রাখি।

আমি বলি, সম্ভবত বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে শায়েখ বাহাউদ্দিন নকশবন্দ র. এবং তাঁর মতো মা অরা উন্নাহারের অন্যান্য শায়েখগণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ওই শায়েখগণ পিতৃপুরুষের দিক থেকে অনারব না হলেও অধিবাসী হিসেবে ছিলেন অনারব। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন রসুল স. এবং সাহাবায়ে কেরামের বংশধর। তাঁরাই রসুল স. এর বিস্মৃত সুন্নতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরা কখনই বেদাতে সাইয়া অথবা বেদাতে হাসানাকে পছন্দ করেননি। এমনও হতে পারে যে, মা অরা উন্নাহারের মুহাদ্দেসীনে কেরাম এবং ফুকাহায়ে এজামের প্রতি ইশারা করা হয়েছে এ হাদিসে। যেমন ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ বোখারী প্রমুখ।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৩৪

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝

❒ কেহ ইহকালের পুরস্কার চাহিলে সে জানিয়া রাখুক যে আল্লাহের নিকট ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার রহিয়াছে। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

এই আয়াতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ কামনার দিকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। দুনিয়া ধ্বংসশীল। আর আখেরাত অবিনাশী। সুতরাং সামগ্রিক কল্যাণ লাভ করতে হলে উভয় জগতের প্রার্থী ও প্রয়াসী হতে হবে। বলতে হবে 'রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরতি হাসানাহ্' (হে আমার প্রভুপ্রতিপালক আমাদেরকে দান করো পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ)। বিশুদ্ধ নিয়তে যে জেহাদ করে সে দুনিয়ায় গণিমত পায় এবং আখেরাতের সওয়াবও লাভ করে। আখেরাতের বিনিময়ের তুলনায় পৃথিবীর প্রাপ্তি কিছুই নয়।

শেষে বলা হয়েছে 'অকানাল্লহু সামিয়াম বাসিরা'— এ কথার অর্থ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। তিনি মানুষের অন্তরের অভিপ্রায় সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। তাই তিনি নিয়ত অনুসারে প্রত্যেককে বিনিময় প্রদান করবেন। রসুল স. বলেছেন, দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো রমণীকে বিবাহ করার অভিপ্রায়ে যে হিজরত করে, তার হিজরত তারই কাম্যবস্তুর সঙ্গে। বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে।

ইবনে আবি হাতেম এবং সুদ্দী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার দু'জন লোক তাদের পারস্পরিক বিবাদ নিয়ে রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলো। তাদের একজন

www.eelm.weebly.com

ছিলো বিত্তশালী এবং অন্যজন ছিলো দরিদ্র। দরিদ্র ব্যক্তিটির দিকেই রসুল স. এর হৃদয়ে সহানুভূতি জাগ্রত হলো। তিনি স. ভাবলেন, কোনো দরিদ্র কোনো বিত্তবানের উপর জুলুমতো করতেই পারে না। এ রকম ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৩৫

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তোমরা সাক্ষ্য দিবে আল্লাহের উদ্দেশ্যে যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীনই হউক আল্লাহ্ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করিতে কামনার অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটাইয়া যাও তবে জানিয়া রাখ যে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার খবর রাখেন।

এই আয়াতে বিশ্বাসীগণকে ন্যায়বিচারে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকতে বলা হয়েছে। তাই বিচারকের প্রতি এই কর্তব্যটি ওয়াজিব যে, তিনি দাবিদার এবং দাবিকৃত ব্যক্তি উভয়ের সঙ্গে সমান আচরণ করবেন। একজনকে অপরজন অপেক্ষা অগ্রগণ্য মনে করবেন না। কারো দিকে অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়বেন না।

হজরত উম্মে সালমার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যে ব্যক্তি কাযী হবে সে যেনো বাদী বিবাদী উভয়ের উপবেশনের স্থান, ইশারা এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমতা রক্ষা করে। একজন অপেক্ষা অন্যজনের সঙ্গে যেনো অধিক আলাপচারিতা না করে। এ রকম বলেছেন ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহ ও দারা কুতনী।

এরপর বলা হয়েছে, তোমরা সাক্ষ্য দিও আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। এ কথার অর্থ আল্লাহ্র ওয়াস্তে সত্য সাক্ষ্য দিও। আত্মপ্রসাদ কিংবা অন্য কোনো কারণে নয়।

'নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়'— এ কথার অর্থ সত্য সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে যেয়ে কার পক্ষে গেলো না গেলো সে কথা ভাবা যাবে না। কারণ, সত্য গোপন করা মহাপাপ। তাই নিজের, পিতা-মাতার এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে গেলেও সত্যকে প্রকাশ করতেই হবে। এক্ষেত্রে

www.eelm.weebly.com

বিত্তবানদের বিত্তের প্রভাবে এবং বিত্তহীনদের অসহায়ত্বের সমবেদনায় সত্যকে গোপন করা যাবে না। সত্য সাক্ষ্যদাতার কর্তব্য হচ্ছে— সে ধনের প্রতাপকে যেমন অগ্রাহ্য করবে, তেমনি অস্বীকার করবে দরিদ্রের প্রতি সহমর্মিতার প্রভাবকে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকী প্রমুখ এ রকম বলেছেন।

'ফাল্লহু আউলা বিহিমা'— এ কথার অর্থ আল্লাহ্পাক উভয়ের (ধনী ও দরিদ্রের) যোগ্যতর অভিভাবক। তিনি ধনী ও দরিদ্র উভয়ের স্রষ্টা। উভয়কে সংশোধন করাই তাঁর উদ্দেশ্য। সত্য সাক্ষ্য যদি সংশোধনের প্রতিকূল হতো, তবে আল্লাহ্পাক সাক্ষ্য প্রদানের পদ্ধতির প্রচলন করতেন না। আল্লাহ্পাক চান, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধনী গরীব দু'জনেই পরিশুদ্ধ হোক। কারণ, তিনি দু'জনেরই স্রষ্টা, রিজিকদাতা। তাই সাক্ষীগণের প্রতি এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সকল অবস্থায় সত্য সাক্ষ্য প্রদান করবে।

একটি ধারণাঃ 'বিহিমা' শব্দটি দ্বিবচন বিশিষ্ট। সর্বনামটি ধনী ও দরিদ্র উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে সংযোজক অব্যয় হিসেবে 'ওয়াও' (এবং) এর উল্লেখ নেই। বরং এখানে রয়েছে 'আও'। ধনী ও দরিদ্র উভয়কে যখন এখানে একত্রিত করা হয়নি, তাই এখানে প্রয়োজন ছিলো একবচনসূচক সর্বনাম ব্যবহারের।

উত্তরঃ এখানে সর্বনামটি কেবল ধনী ও দরিদ্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় বরং এখানে সংশ্লিষ্ট রয়েছে ধনী সম্প্রদায় এবং দরিদ্র সম্প্রদায়। তাফতাজানী লিখেছেন, এখানে একবচনসূচক সর্বনামকে ছেড়ে দিয়ে দ্বিবচনসূচক সর্বনাম উল্লেখ করার কারণ এই যে, এখানে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে 'ফাল্লহু'। একবচন সূচক সর্বনাম ব্যবহৃত হলে এ রকম ধারণার সৃষ্টি হতো যে, সর্বনামটি বোধ হয় আল্লাহ্র সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। তাফতাজানীর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এ রকম আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, একবচনসূচক সর্বনাম ব্যবহৃত হলেই এখানে তা বিশেষভাবে প্রথমোক্ত শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে— এ কথা ঠিক নয়। (অনির্ধারিত কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে 'বিশেষভাবে' ধারণাটির সৃষ্টি হতে পারে না)। ইমাম রাজী লিখেছেন, উদ্ধৃত দু'টো বস্তুর যদি পারস্পরিক সংযোগ থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে একবচনসূচক কিংবা দ্বিবচনসূচক—দু'রকম সর্বনাম ব্যবহার করা সিদ্ধ হবে।

আমি বলি, এখানে দ্বিবচনসূচক সর্বনামটির সম্পর্ক ধনী ও দরিদ্রের সঙ্গে হবে না। বরং সম্পর্ক হবে ওই দু'জনের সঙ্গে যাদের পক্ষে এবং বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদাতা সাক্ষ্য প্রদান করে। যদিও এখানে প্রকাশ্যতঃ এ কথার উল্লেখ নেই। কিন্তু বক্তব্যের ক্রমধারা এখানে এ কথাই প্রমাণ করে যে, সাক্ষ্য প্রমাণের নিয়ম জারী করার মধ্যে রয়েছে উভয়ের (যে দাবি তুলেছে এবং যার উপর দাবি করা হয়েছে) কল্যাণ। সাক্ষ্য যার পক্ষে যাবে বিচারের রায়ও হবে তার অনুকূলে। আর যার বিরুদ্ধে যাবে সেও হয়ে যাবে 'হক্কুল ইবাদ' (বান্দার অধিকার) থেকে দায়মুক্ত। তাই বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্তায়ালা উভয়ের যোগ্যতর অভিভাবক'।

www.eelm.weebly.com

'শুহাদাআ লিল্লাহ্' (সাক্ষ্য দিও আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে)— কথাটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, তোমরা আল্লাহ্র এককত্ব, তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর পূর্ণত্ব, আসমানী কিতাব সমূহ, পয়গম্বরগণের সততা এবং সত্য নিদর্শনাবলীর সাক্ষী হয়ে যাও— সে সাক্ষ্য তোমাদের আপন সত্তা, পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে গেলেও। সত্য সাক্ষ্য দিতে গিয়ে যদি জীবন বিপন্ন হয়, সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায় কিংবা বিত্তহীন হয়ে পড়ার আশংকা থাকে, তবুও সত্য সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে পশ্চাদাপসরণ কোরো না। কারণ, বিশ্বাসীদের নিকট জীবন ও সম্পদ অপেক্ষা আল্লাহ্পাকের হুকুমের মূল্য অধিক।

'তোমরা ন্যায়বিচার করতে কামনার অনুগামী হয়ো না'—এ কথার অর্থ প্রবৃত্তির তাড়নায় তোমরা ন্যায় বিচারের মহান কর্তব্য প্রতিপালন থেকে বিমুখ হয়ো না। ইনসাফের উপরেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকো।

'যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও'— এ কথার অর্থ যদি তোমরা বক্র পথ অন্বেষণ করো অর্থাৎ সাক্ষীর প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাও এবং সত্য সাক্ষ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ কথার অর্থ— যদি তোমরা আপন সাক্ষ্যকে অন্যের উপর ন্যস্ত করে দাও অর্থাৎ সাক্ষ্য আদায় করাকে করে দাও অন্যের অধীন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এই নির্দেশটির লক্ষ্য হাকিম বা বিচারকগণ। তাদেরকে লক্ষ্য করে এখানে বলা হয়েছে, তোমরা যদি পক্ষ প্রতিপক্ষের যে কোনো একজনের অনুরক্ত হও— একদিকে ঝুঁকে পড়ো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে (জেনে রেখো) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের কর্মকাণ্ডের খবর রাখেন। সুতরাং অপকর্মের শাস্তি থেকে তোমাদের অব্যাহতি নেই।

সূরা নিসা : আয়াত ১৩৬

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহে, তাঁহার রসূলে, তিনি যে কিতাব তাঁহার রসূলের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে বিশ্বাস কর; এবং কেহ আল্লাহ্, তাঁহার ফেরেশতা, তাঁহার কিতাব, তাঁহার রসূল এবং পরকালকে প্রত্যাখ্যান করিলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।

---

www.eelm.weebly.com

আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে, হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করো। এই বিশ্বাসের প্রকৃত তত্ত্ব ও পূর্ণত্ব এই— ইমানদার ব্যক্তি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে এ কথা উত্তমরূপে অবগত হবে যে, আল্লাহ্পাকই প্রকৃত অস্তিত্ব, তিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তিনি চূড়ান্ত কল্যাণ এবং অকল্যাণের নিশ্চিতকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর মধ্যে প্রকৃত পূর্ণত্ব ও সৌন্দর্য্য নেই। সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু পূর্ণত্ব ও রূপ সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয়, তা আল্লাহ্পাকেরই অনুগ্রহসিক্ত অনুদান। বিশ্বাসের এই প্রকৃত পরিচিতি লাভের পর বিশ্বাসীদের ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা ও প্রকৃত আকৃষ্টি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে থাকে না। সত্তা তখন রঞ্জিত হয় আল্লাহ্তায়ালার অক্ষয় ভালোবাসায়। তাঁর আদেশ ও নিষেধকে মান্য করা তখন আর প্রয়াসনির্ভর থাকে না। আনুগত্যের বিষয়টি তখন হয়ে পড়ে স্বভাবনির্ভর। এই পর্যায়ে উন্নীত বিশ্বাসীরা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ অপেক্ষা পাপকর্ম সম্পাদনকে অধিক অপ্রিয় মনে করে থাকে।

বাগবী, আবুল আলীয়া এবং আলেমদের একটি দল বলেছেন, বিশ্বাসীদেরকে যে বিশ্বাসের প্রতি আহবান করা হয়েছে সেই আহবানের অর্থ এই — তোমরা প্রকৃত বিশ্বাসে সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হও। এই তাফসীরের মূল মর্মটি আমরা শুরুতেই সন্নিবেশিত করেছি (মূল কথাটি হচ্ছে— তোমরা যারা ইমানের অবয়বকে অবলম্বন করেছো তারা ইমানের প্রকৃত তত্ত্ব পর্যন্ত উপনীত হও)।

জুহাক লিখেছেন, এখানে 'হে বিশ্বাসীগণ' বলে ইহুদী ও খৃষ্টানদের ওই সকল লোককে আহবান করা হয়েছে, যারা হজরত মুসা এবং হজরত ঈসার প্রতি ইমান এনেছিলেন। এই ব্যাখ্যাসূত্রে আয়াতটির মর্ম দাঁড়াবে এ রকম—মুসা এবং ঈসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হে জনতা, তোমরা এবার মোহাম্মদকে এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কোরআনকে বিশ্বাস করো। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে হে বিশ্বাসীগণ বলে আহবান করা হয়েছে মুশরিক সম্প্রদায়কে। এই দৃষ্টিভঙ্গিসূত্রে আহবানের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম—লাত ও উজ্জার প্রতি আস্থা স্থাপনকারী হে মূঢ় জনতা! তোমরা এবার আল্লাহ্, মোহাম্মদ এবং কোরআনের প্রতি ইমান আনো। কেউ আবার বলেছেন, এখানের এই আহবান মুনাফিকদের প্রতি প্রযোজ্য। এ কথা মেনে নিলে আহবানের অর্থ হবে এ রকম—মুখে মুখে স্বীকৃতি প্রদানকারী হে কপট জনতা! তোমরা এবার আল্লাহ্, রসুল এবং কোরআনকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করো। এ সকল ব্যাখ্যা অবশ্য দুর্বলতাদুষ্ট। প্রকৃত কথা হচ্ছে, এখানে 'ইয়া আইওহাল্লাজিনা আ'মানু (হে বিশ্বাসীগণ!) বলে ইহুদী, খৃষ্টান মুশরিক কিংবা মুনাফিকদেরকে সম্বোধন করা হয়নি। কারণ বিশ্বাস অর্থ প্রকৃত বিশ্বাস— যার মূল সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে। সুতরাং বুঝতে হবে প্রকৃত বিশ্বাসের বলয়ভূত ব্যক্তিরাই এখানে সম্বোধিত হয়েছেন।

www.eelm.weebly.com

কালাবী সূত্রে বাগবী—আবু সালেহের বর্ণনারূপে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, (ছা'লাবীও হজরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তির বর্ণনাকারী), এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পটভূমিটি এই—হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম, হজরত আসাদ বিন কা'ব, হজরত উসাইদ বিন কা'ব, হজরত সা'লাবা বিন কয়িস, হজরত আব্দুল্লাহ বিন সালেমের ভাগিনেয় সালাম এবং ভ্রাতুষ্পুত্রি সালমা এবং হজরত ইয়ামিন বিন ইয়ামিন একবার রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমরা বিশ্বাস করেছি আপনাকে, আপনার উপর অবতীর্ণ কিতাবকে, হজরত মুসার তওরাতকে এবং হজরত উযায়েরকে। এছাড়া আমরা আর কোনো কিতাব এবং পয়গম্বরকে মানি না। ইহুদী সম্প্রদায় থেকে আগত এ সকল নতুন মুসলমানের বর্ণিত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

এখানে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে— আল্লাহ্‌কে, রসুল স. এর প্রতি ক্রমাগত অবতীর্ণ কোরআনকে এবং কোরআনের পূর্বে একবারে অবতীর্ণ (ক্রমাগতভাবে নয়) অন্য সকল কিতাবকে (তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর এবং অন্য সকল কিতাব ও সহিফা সমূহকে)। শেষে বলা হয়েছে, যে আল্লাহ্, ফেরেশতা, কিতাব, রসুল এবং পরকালকে অবিশ্বাস করবে, সে হবে চরম পথভ্রষ্ট। সুতরাং বিশ্বাসীদেরকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, রসুলে বিশ্বাস অর্থ সকল নবী রসুলে বিশ্বাস। এবং কিতাবে বিশ্বাস অর্থ সকল আসমানী কিতাব ও সহিফায় বিশ্বাস। এক বা একাধিক রসুল কিংবা কিতাবকে অবিশ্বাস করলে সকল রসুল ও কিতাবকে অবিশ্বাস করা হবে। আর সকল রসুল এবং সকল কিতাবকে অবিশ্বাস করা তো চরমতম পথভ্রষ্টতা।

আমি বলি, আল্লাহ্‌র সিফাতকে (গুণাবলীকে) অস্বীকার করাও চরম পথভ্রষ্টতা। যেমন মুতাজিলা সম্প্রদায় কোরআনকে আল্লাহ্‌র কথা বলে বিশ্বাস করে না এবং মানুষের কর্মকান্ডের স্রষ্টা যে আল্লাহ্‌তায়ালা সে কথা স্বীকার করে না। তারা এ রকমও অপমন্তব্য করে থাকে যে, আল্লাহ্ এমন কিছু অভিপ্রায় করে থাকেন, যেগুলো বাস্তবায়িত হয় না। এ সকল অপবিশ্বাসের মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌র গুণাবলী ও অবিসংবাদিত সৃজনক্ষমতাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে। কোনো কোনো বুজুর্গ বলেছেন, মুতাজিলারা মানুষকে তার আপন কর্মের স্রষ্টা বলে জানে। আর মানুষের স্রষ্টা হিসেবে মান্য করে আল্লাহ্‌কে। তারা মানুষের কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্‌কে মেনে নিতে সম্মত হলেও হতে পারে কিন্তু তারা আল্লাহ্‌কে হেদায়েতদানকারী হিসেবে কিছুতেই মানে না। মনে করে মানুষ নিজের চেষ্টায় হেদায়েত লাভ করে থাকে। এ যুগের সাধারণ জনতার বিশ্বাস তো মুতাজিলাদের চেয়েও নিকৃষ্ট। অধিকাংশ জনতার বিশ্বাস এখন এ রকম— পৃথিবীর বস্তুনিচয়ের প্রতিক্রিয়াতেই চূড়ান্ত উপকার অথবা অপকার সাধিত হয় (যেমন বিষই প্রকৃত মৃত্যুদাতা, তরইয়াব বা বিষ বিনষ্টকারী পদার্থই প্রকৃত

www.eelm.weebly.com

জীবনদাতা—রাজা বা প্রশাসকই প্রকৃত উদ্ধারকারী ইত্যাদি)। সুতরাং এই জামানায় অপবিশ্বাসের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হলে সূফীগণের তরিকা গ্রহণ করতেই হবে। তাঁদের যথানুসরণ করলে দৃষ্টির সামনে থেকে সরে যাবে উদাসীনতার যবনিকা এবং অর্জিত হবে প্রকৃত বিশ্বাস।

সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৩৭

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ○

❒ যাহারা বিশ্বাস করে ও পরে সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং আবার বিশ্বাস করে, আবার সত্য প্রত্যাখ্যান করে, অতঃপর তাহাদের সত্য-প্রত্যাখ্যান প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না, এবং তাহাদিগকে কোন পথও দেখাইবেন না।

কাতাদা বলেছেন, এ আয়াতের লক্ষ্য ইহুদীরা। তারা প্রথমে হজরত মুসার উপরে ইমান এনেছিলো। পরে তারা গো-বৎসের উপাসনা করে কাফের হয়ে যায়। এরপর তারা মোহাম্মদ স. সহ অন্য নবীদেরকেও অস্বীকার করে বসে। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে এই আয়াত ওই সকল আহলে কিতাবের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে যারা তাদের নিজ নিজ নবীকে বিশ্বাস করার পর পুনরায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে বসে। অর্থাৎ তাদের জন্য অবতীর্ণ কিতাবের নির্দেশ তারা পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়। এরপর শেষ রসুল মোহাম্মদ স. কে অস্বীকার করে তারা পৌঁছে যায় কুফরীর (সত্য প্রত্যাখ্যানের) চরম পর্যায়ে। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতে বলা হয়েছে ওই সকল ধর্মত্যাগীদের (মুরতাদদের) কথা যারা মুসলমান হওয়ার পর ধর্মত্যাগ করেছিলো। তাদের কেউ কেউ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। এরপর পুনরায় ধর্মত্যাগী হয়েছে। আয়াতে তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা পুনঃ পুনঃ ধর্ম গ্রহণ ও বর্জন করে আল্লাহ্পাক তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোনো পথও দেখাবেন না। হজরত আলী বলেছেন, এ রকম লোকদের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আল্লাহ্পাক এদেরকে ক্ষমা করবেন না বলে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু ঐকমত্যায়িত অভিমত এই যে, মৃত্যু পর্যন্ত তওবার তোরণ সতত উন্মুক্ত (যতোবার তওবা করতে চায় ততোবার তওবা গৃহীত হবে)। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়'— অর্থ তারা মৃত্যু পর্যন্ত অবিশ্বাসে অনড় থাকে।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ক্ষমাহীনতার ঘোষণাটি প্রযোজ্য হবে তাদের উপর, যারা ইমান থেকে বহু দূরে অবস্থানের কারণে চিরভ্রষ্ট। তাদের অন্তর জরাজীর্ণ, সত্য গ্রহণের অধিকার ও যোগ্যতারহিত। তাদের অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ। তাই তারা সত্যপথ দেখতে এবং সত্যমত বুঝতে অপারগ।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৩৮,১৩৯,১৪০

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ
اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ
لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ
بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ۖ
اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۙ

❒ মুনাফিকদিগকে শুভ সংবাদ দাও যে তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে!

❒ বিশ্বাসীগণের পরিবর্তে যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাহারা কি উহাদের নিকট শক্তি চায়? সমস্ত শক্তি তো আল্লাহেরই।

❒ কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, যখন তোমরা শুনিবে, আল্লাহের কোন আয়াত প্রত্যাখ্যাত হইতেছে এবং উহাকে বিদ্রূপ করা হইতেছে, তখন, যে-পর্যন্ত তাহারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হইবে তোমরা তাহাদের সহিত বসিও না, অন্যথায় তোমরাও উহাদের মত হইবে। মুনাফিক এবং সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী সকলকেই আল্লাহ্ জাহান্নামে একত্র করিবেন।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে মুনাফিকদের জন্য নির্ধারিত মর্মন্তুদ শাস্তির কথা বলা হয়েছে। শাস্তির সংবাদ অবশ্যই দুঃসংবাদ। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে মুনাফিকদেরকে শুভসংবাদ দাও। এই বাকভঙ্গিটি বিদ্রূপাত্মক। এ রকম বলেছেন জুজায। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যে সংবাদ শোনার পর মুখমণ্ডলে প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হয়, সেই সংবাদই প্রকৃত সংবাদ। সেই সংবাদ শুভ অশুভ দু'টোই হতে পারে। এখানে মুনাফিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে ওই সকল লোককে যারা সাহাবীগণের সামনে বলতো, আমরা ইমানদার এবং তাদের নেতাদের সঙ্গে মিলিত হলে বলতো, আমরা তো মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়ার জন্য ওরকম বলি। এভাবে তারা সবসময় সমাজে অনাসৃষ্টির চেষ্টায় থাকতো।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১৩৯) বলা হয়েছে, বিশ্বাসীদেরকে ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি চায়—শক্তি, সহযোগিতা, সম্মান? এখানে প্রশ্নাকারে মুনাফিকদের অভিলাষকে ব্যর্থ করে দিয়ে বলা হয়েছে 'সমস্ত শক্তি তো আল্লাহ্‌রই', প্রশ্নটির মাধ্যমে বিদ্রূপ এবং বিস্ময়ও প্রকাশ করা হয়ে থাকতে পারে।

'ফাইন্নাল ইজ্‌জাতা লিল্লাহি জামিয়া'—এ কথার অর্থ সমস্ত শক্তি (মর্যাদা) আল্লাহ্‌রই। তিনি সকল সম্মানের একক অধিকর্তা। আর তিনিই সম্মান দান করেছেন তাঁর প্রিয় রসুলকে এবং রসুলের অনুসারীগণকে।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের শেষটিতে বিশ্বাসীদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহ্‌র কোনো আয়াত প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং আয়াতকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন প্রত্যাখ্যানকারী ও বিদ্রূপকারীদের সঙ্গে তোমরা উপবেশন কোরো না, যদি না তারা প্রসঙ্গান্তর ঘটায়।

উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে উপবেশন করা নিষিদ্ধ নয়। প্রয়োজনবশতঃ তাদের কাছে যাওয়া আসা করা বা উপবেশন করা জায়েয। প্রয়োজন না পড়লে বসা মাকরূহ্‌। হাসান বলেছেন, কাফের ও মুনাফিকেরা ঠাট্টা বিদ্রূপ ছেড়ে দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করলেও তাদের সঙ্গে বসা নাজায়েয।

এই আয়াতটি মর্মের দিক দিয়ে সুরা আনআ'মের একটি আয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেখানে এরশাদ করা হয়েছে— 'আর যখন তুমি তাদেরকে আমার আয়াতের দোষান্বেষণ করতে দেখবে তখন তাদের নিকট থেকে দূরে থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা অন্য বিষয়ে আলোচনা শুরু করে'। জুহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কিয়ামতের দিন বেদাতী সম্প্রদায়গুলো এই আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

'অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হবে'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্‌র আয়াতের সঙ্গে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার সময় যদি তোমরা কাফের ও মুনাফিকদের সঙ্গে বসো, তবে তোমরা হবে তাদের মন্তব্যসমূহের নীরব সম্মতিদানকারী। এভাবে (ধীরে ধীরে) তোমরাও হয়ে যাবে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী অথবা মুনাফিক।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'মুনাফিক এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সকলকেই আল্লাহ্‌ জাহান্নামে একত্র করবেন'—এ কথার অর্থ পৃথিবীতে মুনাফিক, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী এবং তাদের ব্যঙ্গবিদ্রূপের প্রতি মৌন সমর্থনদানকারীরা যেমন বন্ধুত্ব সূত্রে একত্র ছিলো, তেমনি তাদেরকে চিরস্থায়ী আবাস প্রজ্বলিত নরকেও সম্মিলিত করে দেয়া হবে।

www.eelm.weebly.com

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۠

❑ যাহারা তোমাদের শুভাশুভের প্রতীক্ষায় থাকে তাহারা আল্লাহের অনুগ্রহে তোমাদের জয় হইলে বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' এবং ভাগ্য যদি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অনুকূল হয়, তাহারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে জয়ী ছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদিগকে বিশ্বাসীদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই?' আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করিবেন এবং আল্লাহ্ কখনই বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য কোন পথ রাখিবেন না।

মুনাফিকদের চরিত্রের একটি অন্ধকার দিক উন্মোচন করা হয়েছে এই আয়াতে। সুযোগ সন্ধানী মুনাফিকেরা মুসলমান ও কাফের বাহিনীর যুদ্ধের সময় অপেক্ষা করে দেখতে থাকে—মুসলমানদের জয় হলো না পরাজয় ঘটলো। মনেপ্রাণে তারা চাইতো মুসলমানদেরই পরাজয় ঘটুক। কিন্তু আল্লাহ্র অনুগ্রহে মুসলমানেরা জয়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা বলতে শুরু করতো, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? (আমরাই তো ছিলাম তোমাদের সাথী ও সমর্থক)। সুতরাং আমাদেরকেও গণিমতের অংশ দাও। কাফেরেরা জয়ী হলে তারা কাফেরদের নিকটে গিয়ে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে বিশ্বাসীদের হাত থেকে রক্ষা করি নি (আমরাইতো তোমাদেরকে মুসলমানদের গোপন সংবাদ প্রদান করে সাবধান করে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা মুসলমানের বিরুদ্ধে যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করে জয়লাভে সমর্থ হও)। এই আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে 'মোবাররাদ' বলেছেন, কাফেরদের প্রতি মুনাফিকদের বক্তব্য ছিলো এ রকম—তোমরাতো যুদ্ধ সম্পর্কে দোদুল্যচিত্ত ছিলে। আমরাই তো তোমাদেরকে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেছি। এভাবে তোমাদেরকে রক্ষা করেছি বিশ্বাসীদের হাত থেকে।

'আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন'—এ কথার অর্থ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক এই মর্মে সিদ্ধান্ত দান করবেন যে, বিশ্বাসীরা বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং মুনাফিকরা যাবে দোজখে।

www.eelm.weebly.com

বোখারী, মুসলিম ও হাকেম বর্ণিত একটি দীর্ঘ বর্ণনায় রয়েছে— হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, কিয়ামতের দিন একজন ঘোষক এই বলে ঘোষণা দিতে থাকবে, হে মানুষ! তোমরা আপন আপন উপাস্যের পশ্চাতে সমবেত হও। এই ঘোষণার পর প্রত্যেকে তাদের আপনাপন উপাস্যের পশ্চাতে সমবেত হবে। দাঁড়িয়ে থাকবে কেবল বিশ্বাসীরা। আল্লাহ্‌পাক তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে আছো (কার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছো তোমরা)? বিশ্বাসীরা বলবেন, আপনার জন্য। আল্লাহ্‌পাক তৎক্ষণাৎ যবনিকামুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। আল্লাহ্‌কে দেখা মাত্র প্রকৃত বিশ্বাসীরা পড়ে যাবে সেজদায়। আর যারা লোক দেখানোর জন্য কিংবা সুখ্যাতির জন্য ইবাদত করেছিলো, তারা সেজদা করতে পারবে না। তাদের পিঠ হয়ে যাবে কাঠের তক্তার মতো, যার কারণে তারা মস্তক অবনত করতে পারবে না। হাকেমের বর্ণনায় এ কথাটিও রয়েছে যে, তারা সামনের দিকে ঝুঁকে সেজদা করতে চাইবে, কিন্তু পড়ে যাবে পিছনের দিকে।

'এবং আল্লাহ্ কখনই বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য কোনো পথ রাখবেন না'—এ কথার অর্থ বিশ্বাসীদের উপর আধিপত্য বিস্তারের কোনো পন্থা আল্লাহ্‌পাক অবিশ্বাসীদেরকে দান করবেন না। হজরত আলী বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক আখেরাতে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদেরকে বিজয় দান করবেন না। ইবনে জারীর। এক বর্ণনাসূত্রে এসেছে হজরত ইবনে আব্বাসও এ রকম বলেছেন। কিন্তু হজরত ইকরামা এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, দলিল প্রমাণের দিক দিয়ে আল্লাহ্‌পাক কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবেন না। বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন ইবনে জারীর, আবদ বিন হুমাইদ এবং সুদ্দী। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ— সাহাবায়ে কেরামের উপর তাদের শত্রুরা কখনোই প্রবল হতে পারবে না। পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের উপর কাফেরদের আধিপত্য বিস্তারের যে ঘটনা পরিলক্ষিত হয়— তা সংঘটিত হতে পেরেছে কেবল মুসলমানদের বিশ্বাসগত দুর্বলতা ও অবাধ্যতার কারণে। এখানে আল্লাহ্‌পাক মুসলমানদের উপর কাফেরদেরকে প্রবল না করার যে অঙ্গীকার দান করেছেন সেই অঙ্গীকারের অর্থ হচ্ছে— আল্লাহ্‌পাক কখনোই প্রকৃত বিশ্বাসীদের উপর কাফেরদেরকে আধিপত্যবিস্তারের সুযোগ দিবেন না। দুর্বল ইমানদার এবং অবাধ্য মুসলমানদের জন্য এই অঙ্গীকার কার্যকর নয়।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'আলাল মু'মিনিনা সাবিলা।' 'সাবিলা' অর্থ পথ। এখানে পথ শব্দটি উল্লেখের মাধ্যমে বলা হয়েছে, কাফেরেরা এমন পথ পাবে না, যার মাধ্যমে তারা মুসলমানদের মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হয়।

এই আয়াতের দলিল উপস্থাপন করে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কোনো কাফের যদি মুসলমান গোলাম খরিদ করে, তবে তার খরিদসত্ব বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বেচাকেনা শুদ্ধ হবে। কেননা কাফের এখানে স্বীকারোক্তিকারী এবং মুসলমান গোলাম বিক্রয়পণ্য। কিন্তু এই আয়াতের

www.eelm.weebly.com

বর্ণনানুসারে কাফের ওই গোলামের মালিক হতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে কাফের তার ক্রয়কৃত গোলামকে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। এ আয়াত থেকে ইমাম আবু হানিফা এই দলিলটি উত্থাপন করেছেন যে, স্বামী ধর্মত্যাগী হলে মুসলমান স্ত্রীর সঙ্গে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। বিবাহ বাতিল হবে স্বামীর ধর্মত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৪২,১৪৩,১৪৪.১৪৫

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْٓا إِلَى الصَّلٰوةِ

قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا ۝ مُّذَبْذَبِيْنَ

بَيْنَ ذٰلِكَ لَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ

لَهٗ سَبِيْلًا ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ

دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۝

❒ মুনাফিকগণ আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করিতে চাহে; বস্তুতঃ তিনিই তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া থাকেন এবং যখন তাহারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য, এবং আল্লাহ্‌কে তাহারা অল্পই স্মরণ করে;

❒ দোটানায় দোদুল্যমান, না এদিকে না ওদিকে! এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না।

❒ হে বিশ্বাসীগণ! বিশ্বাসীগণের পরিবর্তে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি আল্লাহ্‌কে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?

❒ মুনাফিকগণ তো অগ্নির নিম্নতম স্তরে রহিবে এবং তাহাদের জন্য তুমি কখনও কোন সহায় পাইবে না।

মুনাফিকেরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রতারণা করতে চায়। কিন্তু তাদের প্রতারণার প্রতিফল তাদের দিকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়। এই প্রতারণার প্রকৃতি সম্পর্কে সুরা বাকারার প্রথম দিকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। সেখানে ব্যাখ্যাটি ভালোভাবে দেখে নেয়া যেতে পারে।

www.eelm.weebly.com

'তারা যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সঙ্গে দাঁড়ায়'— এ কথার অর্থ মুনাফিকেরা নামাজে দাঁড়ায় আলস্য ও অসন্তুষ্টি সহকারে। নামাজের বিনিময়ে সওয়াবের ইচ্ছা তারা রাখে না। যথানিয়মে নামাজ সম্পাদন না করলে অথবা নামাজ পরিত্যাগ করলে আল্লাহ্পাক যে শাস্তি দান করবেন— সে ভয়ও তারা করে না।

'কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্কে তারা অল্পই স্মরণ করে'— এ কথার অর্থ লোকে যেনো তাদেরকে নামাজী মনে করে সে কারণে তারা নামাজে দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ্র ইবাদত তাদের উদ্দেশ্য নয়। তাই তাদের নামাজে নিবিষ্টচিত্ততা নেই। আল্লাহ্ভীতিও নেই। তারা এ কথা জানে না এবং মানে না যে, আল্লাহ্র জিকিরবিহীন নামাজ নামাজই নয়।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আবু ইয়া'লী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের সামনে নামাজ উত্তমরূপে পাঠ করে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে যথানিয়মে পড়ে না, সে নামাজের মর্যাদাহানি করে। এই প্রকৃতির নামাজ দ্বারা ওই ব্যক্তি তার প্রতিপালককে অবমাননা করে।

'দোটানায় দোদুল্যমান, না এদিকে না ওদিকে'—এখানে বলা হয়েছে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোদুল্যমানতার কথা। দোদুল্যমানতা বুঝাতে এখানে 'মুজাব যাব' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যাকে দু'দিক থেকে ধাক্কা দেয়া হয়, ওই ব্যক্তিকে বলে মুজাব যাব। সে কোনো দিকেই স্থির হতে পারে না। ওই সকল লোকের সম্পর্কে তাই বলা হয়েছে, না এদিকে না ওদিকে। অর্থাৎ একবার বিশ্বাসের দিকে, আরেকবার অবিশ্বাসের দিকে। তারা পথভ্রষ্ট। তাদের পথপ্রাপ্তির আর কোনো আশাই নেই। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোনো পথ পাবে না।' এ প্রসঙ্গে অন্য একটি আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে, 'আর আল্লাহ্ যাকে নূর দান না করেন, তার জন্য কোনো নূর নেই।' হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, মুনাফিকদের উদাহরণ হচ্ছে ওই স্ত্রী ছাগলের মতো যে— তাকে ডাকতে থাকা দু'টি পুরুষ ছাগলের ডাকে একবার এর কাছে দৌড়ে যায়, আরেকবার দৌড়ে যায় ওর কাছে। মুসলিম।

মুনাফিকদের অসৎ স্বভাবসমূহের পরিচিতি দানের পর আল্লাহ্পাক বিশ্বাসীদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন এভাবে— হে বিশ্বাসীরা! বিশ্বাসীগণের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। যদি করো, তবে তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। এরপর বলা হয়েছে 'তোমরা কি আল্লাহ্কে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?'

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ্পাকের এই অমোঘ প্রশ্নের প্রসঙ্গে ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া হজরত ইবনে আব্বাসের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এ রকম— কোরআনের প্রতিটি আয়াত আল্লাহ্পাকের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

www.eelm.weebly.com

'মুনাফিকগণ তো অগ্নির নিম্নতর স্তরে থাকবে'—এখানে নিম্নতর স্তর বুঝাতে 'দারকিল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি দারকাতুন শব্দের বহুবচন। এর অর্থ স্তরসমূহ অথবা মঞ্জিলসমূহ। নিম্নস্তর বুঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর বিপরীতার্থক শব্দ 'দারাজাত'। 'দারাজাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয় উর্ধ্বস্তর বুঝানোর জন্য। এ রকম বলেছেন আল্লামা সুয়ূতী। ইবনে মোবারক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদ এ বাক্যটির তাফসীর সম্পর্কে বলেছেন, দোজখের নিম্নস্তরে থাকবে লোহার সিন্দুক। সেই সিন্দুকে মুনাফিকদেরকে বন্দী করে রাখা হবে। বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, ওই সিন্দুকের ভিতর মুনাফিকেরা বন্দী অবস্থায় থাকবে। আর ওই সিন্দুকের উপরে ও নিচে থাকবে জ্বলন্ত হুতাশন।

ইবনে ওয়াহাব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, দোজখে একটি কূপের মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। দোজখ সৃষ্টির প্রথম থেকেই ওই কূপের ভয়াবহ উত্তাপ থেকে দোজখ নিজেই আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করে। ওই কূপই দোজখের নিম্নতম স্তর। ওই নিম্নস্তরে মুনাফিকেরা অবস্থান করবে এ কারণে যে, তারা কাফেরদের চেয়েও বেশী অপবিত্র। অন্তরে তাদের অবিশ্বাসতো ছিলোই, তার উপরে তারা আল্লাহ্‌, রসুল, ইসলাম প্রসঙ্গে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করতো এবং মুসলমানদেরকে ধোকা দিতো। প্রকৃত কাফের হওয়া সত্ত্বেও তারা পৃথিবীতে হত্যা ও জিজিয়ার আওতামুক্ত থাকতে পেরেছিলো। কিন্তু আখেরাতে এ রকম সুযোগ নেই। কাফের হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীতে সুবিধা ভোগ করেছিলো বলেই তারা আখেরাতে হবে জাহান্নামের নিম্নতর স্তরের অধিবাসী। সবশেষে তাই এ মর্মে চূড়ান্ত ঘোষণা এসেছে যে, '(হে আমার প্রিয় রসুল), তাদের জন্য আপনি কখনও কোনো সহায় পাবেন না।

সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৪৬.১৪৭

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ○ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ○

❒ কিন্তু যাহারা তওবা করে, নিজদিগকে সংশোধন করে, আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহের উদ্দেশ্যে তাহাদের দ্বীনকে নির্মল করে তাহারা বিশ্বাসীদের সংগে থাকিবে এবং বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ্‌ মহা পুরস্কার দিবেন।

❒ তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও বিশ্বাস কর তবে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহের কী কাজ? আল্লাহ্‌ পুরস্কার দাতা, সর্বজ্ঞ।

প্রকৃত তওবাকারীদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। প্রকৃত তওবাকারী তারাই যারা নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মকে নির্মল করে নেয়। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দ্বীনকে

www.eelm.weebly.com

নির্মল করার অর্থ এখলাস অর্জন করা। এখলাস অর্জন করার অর্থ বিশুদ্ধ নিয়তে (উদ্দেশ্যে) আল্লাহ্‌র উপাসনা করা। ইবনে আসাকের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আবু ইদ্রিস বলেছেন, এখলাস অর্জিত হবে ওই সময়ে যখন কেবল আল্লাহ্‌র জন্য আমল করা হবে—মানুষের প্রশংসার জন্য নয়। ইমাম আহমদ ও ইবনে আবী শায়বার মাধ্যমে এসেছে— আবু সুমামা বলেছেন, হাওয়ারীগণ হজরত ঈসাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে রুহুল্লাহ! এখলাসের অধিকারী কে? তিনি বললেন, ওই ব্যক্তি মুখলিস (এখলাসের অধিকারী) যে কেবল আল্লাহ্‌র জন্য আমল করে এবং তার আমলের জন্য মানুষের প্রশংসাকে পছন্দ না করে। নাওয়াদিরুল উসুল গ্রন্থে হজরত যায়েদ বিন আরকাম থেকে হাকেম ও তিরমিজি লিখেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি এখলাসের সঙ্গে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। নিবেদন জানানো হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এখলাসের সঙ্গে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়ার অর্থ কী? রসুল স. বললেন, ওই কলেমা, যার পাঠকারী নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকে (এ রকম ব্যক্তি কর্তৃক পঠিত কলেমাই এখলাসের কলেমা)।

হজরত মুআজ বিন জাবালের বর্ণনায় এসেছে (হজরত মুআজ বলেন), রসুল স. যখন আমাকে ইয়েমেনের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন, তখন আমি নিবেদন জানালাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাকে কিছু নির্দেশনা দান করুন। তিনি স. বললেন, ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা কোরো। তাহলে অল্প আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। হাকেম, বায়হাকী।

ইবনে আবিদ্‌দুনিয়া 'আল এখলাস' গ্রন্থে এবং বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমানে লিখেছেন— হজরত সাওবান বলেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, মুখলিসদের জন্য শুভসমাচার। তারা হবে পথনির্দেশনার প্রদীপ। সেই প্রদীপের মাধ্যমে ফেৎনার অন্ধকার অপসৃত হবে।

'তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকবে'—এ কথার অর্থ তারা থাকবে জান্নাতের পথে অগ্রগামী বিশ্বাসীদের সঙ্গে। ফাররা বলেছেন, মাআল মু'মিনিন (বিশ্বাসীদের সঙ্গে) কথাটির অর্থ হবে মিনাল মু'মিনিন (বিশ্বাসীদের মধ্যে)।

'বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কার দিবেন'—কথাটির অর্থ বিশুদ্ধ বিশ্বাসীদেরকে তিনি মহাপুরস্কার দানে ধন্য করবেন। সেই মহাপুরস্কার হচ্ছে আল্লাহ্‌পাকের দীদার, সন্তোষ, নৈকট্য এবং জান্নাত।

শাস্তি দেয়া যে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় নয়, শেষ আয়াতটিতে (১৪৭) সে কথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে চাইলে হতে হবে কৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসী। প্রশ্নাকারে উল্লেখিত বাক্যটির মূল মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌পাক তাঁর শোকর গুজার ও বিশ্বাসী বান্দাকে শাস্তি দিবেন না। শাস্তি দিলে তাঁর ক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি হয় না, তেমনি শাস্তি না দিলে তাঁর প্রতাপ ক্ষুণ্ন হওয়ারও কোনো কারণ ঘটে না। সৃষ্টির মুখাপেক্ষী তিনি নন। শাস্তি দিলে তাঁর কোনো উপকার হবে এবং না দিলে ক্ষতি হবে— এ রকম ধারণা থেকেও

www.eelm.weebly.com

তিনি পবিত্র। তাঁর নির্ধারিত বিধান এই যে, সকল কিছুর পরিণামকে তিনি সবব বা কারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। এই বিধানানুসারে শাস্তিদানও কার্যকর হবে। শারীরিক নিয়মের ভারসাম্য নষ্ট হলে যেমন পীড়া সৃষ্টি হয়, তেমনি বিশ্বাসহীনতা এবং অকৃতজ্ঞতার কারণে হৃদয়ে জমাট বাঁধে নেফাক বা অপবিত্রতা— যা শাস্তিকে অবধারিত করে দেয়। বিশ্বাস এবং কৃতজ্ঞচিত্ততার মাধ্যমে কেবল সেই শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ সম্ভব।

বাগবী লিখেছেন, এখানে শব্দ ব্যবহারে অগ্রপশ্চাৎ ঘটেছে। 'ইনশাকারতুম ওয়া আমানতুম' (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো ও বিশ্বাস করো) এর স্থলে 'ইন আমান তুম ওয়া শাকারতুম' (বিশ্বাস করো ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো) বললে ধারাবাহিকতা রক্ষা হতো। আমি বলি, এ রকম মন্তব্যের কোনো প্রয়োজনই নেই। কেননা 'ওয়াও' বা 'এবং' ব্যবহৃত হয় শব্দসংযোজনের জন্য, ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নয়। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, এখানে ইমানের পূর্বে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে, মানুষ যেনো আল্লাহ্পাকের বিশাল অনুগ্রহরাজি অবলোকন করে প্রথমে কৃতজ্ঞ হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়। তারপর গভীরতর উপলব্ধির মাধ্যমে অনুগ্রহসম্ভারের মহান দাতা আল্লাহ্পাকের প্রতি ইমান আনে। আমি বলি, সম্ভবত এখানে শোকর বা কৃতজ্ঞতা অর্থ রূপক বিশ্বাস (ইমানে মাজাজী), যা রূপক অবিশ্বাসের বিপরীত। আর ইমান অর্থ প্রকৃত ইমান (ইমানে হাকিকি)। ইমানে মাজাজী আবার ইমানে হাকিকির প্রকাশ্য সৌন্দর্য্য। এই প্রকাশ্য সৌন্দর্যের পথ ধরে মানুষ অন্তর্নিহিত প্রকৃত বিশ্বাস পর্যন্ত উপনীত হয়। এ কারণেই এখানে শোকরকে ইমানের আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

শেষ বাক্যটি এই— 'ওয়া কানাল্লহু শাকিরান আ'লিমা।' এ কথার অর্থ আল্লাহ্পাক মানুষের কৃতজ্ঞতা গ্রহণকারী। আর তিনি সর্বজ্ঞও। তিনি ভালো করেই জানেন কে কৃতজ্ঞচিত্ত এবং কে নয়। মানুষের কৃতজ্ঞতার বিনিময় বা পুরস্কার দান করেন তিনি। গ্রহণ করেন অল্প এবং তার বিনিময় দান করেন অধিক। আর প্রকৃত ইমানদার কে— তাও তিনি ভালো করেই জানেন।

www.eelm.weebly.com

ষষ্ঠ পারা

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৪৮,১৪৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۞ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ○

❒ মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ ভালবাসেন না; তবে যাহার উপর জুলুম করা হইয়াছে তাহার কথা স্বতন্ত্র, এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❒ তোমরা সৎকর্ম প্রকাশ্যে করিলে অথবা গোপনে করিলে অথবা দোষ ক্ষমা করিলে আল্লাহ্ও দোষ মোচনকারী, শক্তিমান।

'জাহ্রা বিস্সুয়ি' কথাটির অর্থ মন্দ কথার প্রচারণা। এই আয়াতে মন্দ কথার প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্ মন্দ কথার প্রচারণা ভালোবাসেন না। সে প্রচারণা উচ্চ স্বরে হোক অথবা অনুচ্চস্বরে। তবে উচ্চ স্বরের প্রচারণা অনুচ্চস্বরের প্রচারণার চেয়ে অধিকতর অনভিপ্রেত। মজলুম (অত্যাচারিত) ব্যক্তি অবশ্য এর ব্যতিক্রম। মজলুমেরা জালেমের বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে প্রতিবাদ জানাতে পারে এবং তাদের জন্য বদদোয়াও করতে পারে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে মন্দ কথা অর্থ গালি দেয়া। কাউকে গালি দেয়া নিষেধ। কিন্তু মজলুম ব্যক্তি গালি দিতে পারবে। আল্লাহ্পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন 'এবং উৎপীড়িত হওয়ার পর যদি কেউ তার উৎপীড়নের সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে তবে তাতে কোনো দোষ নেই।'

হজরত আনাস এবং হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, একে অপরের প্রতি গালি বর্ষণকারী ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রথম গালিদাতাই দোষী, যতোক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় গালিদাতা তার প্রত্যুত্তরে সীমালংঘন না করে। মুসলিম।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে অতিথি সম্পর্কে। কোনো সম্প্রদায়ের নিকট আগত ব্যক্তির অতিথি সৎকার যদি

www.eelm.weebly.com

না করা হয় তবে অতিথি সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে পারবে তার প্রতি যেমন আচরণ করা হয়েছে।

কিতাবু জুহদ গ্রন্থে হান্নাদ লিখেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, মদীনার এক লোকের বাড়িতে একজন মেহমান এলো। কিন্তু গৃহকর্তা উত্তমরূপে মেহমানদারী করলো না। মেহমান তখন তার সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে তা মানুষের নিকট প্রচার করে দিলেন। তার ওই প্রচারণার সমর্থনে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

আবদুর রাজ্জাক, আবদ্ বিন হুমাইদ এবং ইবনে জারীর লিখেছেন, মুজাহিদ বলেছেন— এক লোক একটি মহল্লায় মেহমান হিসেবে হাজির হলো। মহল্লার লোকেরা মেহমানের পানাহারের ব্যবস্থা করলো না। মেহমান তাদের এই অনাদরের কথা জনসমক্ষে প্রচার করে দিলো। মহল্লার লোকেরা তখন তাকে পাকড়াও করলো। অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

হজরত উকবা বিন আমের বলেছেন, আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আমাদেরকে বিভিন্নস্থানে ধর্মপ্রচারে এবং ধর্মযুদ্ধে প্রেরণ করেন। তখন আমরা কখনো কখনো এমন জনপদে গিয়ে উপস্থিত হই, যারা অতিথি বৎসল নয়। তাদের প্রতি আমরা কেমন আচরণ করবো? রসুল স. বললেন, তোমরা কোথাও মেহমান হিসেবে উপস্থিত হলে সেখানকার লোকেরা যদি মেহমানদারী না করে তবে তোমরা মেহমানের হক (বলপূর্বক) আদায় করে নিবে। বোখারী ও মুসলিম।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াকানাল্লহু সামিয়ান আলিমা' (এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ) —এ কথার অর্থ তিনি সর্বশ্রোতা বলেই অত্যাচারিতের অভিযোগ ও অপপ্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং সর্বজ্ঞ বলেই তিনি অত্যাচারীর সকল কর্মকাণ্ডের সংবাদ উত্তমরূপে অবগত রয়েছেন। পরের আয়াতে সৎকর্ম বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে 'খইর' শব্দটি। শব্দটির অর্থ অনুসরণ, অনুগমন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে যদি তোমরা অত্যাচারীর অত্যাচারের কথা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে প্রচার করো কিংবা তাদের দোষ ক্ষমা করে দাও তবে (জেনে রেখো) আল্লাহ্ও দোষ মোচনকারী, শক্তিমান।

এখানে 'খইর' বা সৎকর্ম প্রকাশ্যে ও গোপনে করার অর্থ প্রকাশ্যে ও গোপনে দান খয়রাত করা— কোনো কোনো আলেম এ রকম অভিমতও ব্যক্ত করেছেন।

'দোষ ক্ষমা করলে'—এ কথার অর্থ অত্যাচারীর সঙ্গে শিষ্ট আচরণ করতে না পারলেও অত্যাচারের স্মৃতি অন্তর থেকে মুছে দিলে ও তাকে ক্ষম্য মনে করলে। বায়যাবী বলেছেন, 'দোষ ক্ষমা করলে'— এ রকম বলে অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। যারা এ রকম করবে তাদেরকে লক্ষ্য করে জানানো হচ্ছে— 'আল্লাহ্ও দোষ মোচনকারী, শক্তিমান'। এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং যখন খুশী তখন তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম। তৎসত্ত্বেও তিনি পাপীদেরকে ক্রমাগত ক্ষমা করতে থাকেন। তোমরাও আল্লাহ্পাকের ক্ষমাপ্রদর্শনের এই মহৎ গুণটি কর্মায়ত্ত করতে সচেষ্ট হও। যদি এ

www.eelm.weebly.com

রকম করো, তবে আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে তোমরা অনেক সওয়াব লাভ করবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে অত্যাচারের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। পরের আয়াতে উৎসাহিত করা হয়েছে ক্ষমা প্রদর্শনের উচ্চতর আদর্শকে অবলম্বন করতে। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন— রসুল স. এর নিকট প্রশ্ন করা হলো, পরিচারককে (খাদেমকে) কতোবার ক্ষমা করা যাবে? তিনি স. বললেন, প্রতিদিন সত্তরবার (অসংখ্যবার)। আবু দাউদ, তিরমিজি, আবুল ইয়া'লী।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৫০, ১৫১, ১৫২

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ○ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ○ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ○

❑ যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলদিগকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহে বিশ্বাস ও তাঁহার রসূলে বিশ্বাসের ব্যাপারে তারতম্য করিতে চাহে এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে প্রত্যাখ্যান করি,' এবং ইহাদের মধ্যবর্তী এক পথ অবলম্বন করিতে চাহে,

❑ প্রকৃত পক্ষে ইহারাই সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী, এবং সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদিগের জন্য লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি।

❑ যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণে বিশ্বাস করে এবং তাহাদের একের সহিত অপরের পার্থক্য করে না। উহাদিগকেই তিনি পুরস্কার দিবেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

উদ্ধৃত আয়াতগুলোর প্রথম দু'টি (১৫০, ১৫১) অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদীদের সম্পর্কে। বাগবী এ রকম বলেছেন। ইহুদীরা প্রথমে রসুল মোহাম্মদ স., কোরআন এবং রসুল ঈসা আ. এবং ইঞ্জিলকে অস্বীকার করলো। পরে সকল নবী

www.eelm.weebly.com

রসুলকে অস্বীকার করে বসলো। কারণ, তাঁরা ছিলেন একে অপরের সত্যায়নকারী। আল্লাহ্‌পাক সকল নবী ও রসুলকে বিশ্বাস করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের সকলকে নবী ও রসুল বলে স্বীকার করতে হবে। তাঁদের যে কোনো এক জনকে অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশকে অস্বীকার করা। এ অস্বীকৃতি মূলতঃ আল্লাহ্‌র প্রতি অস্বীকৃতি।

মুশরিকেরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানে না। ইহুদীরাও আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্যকারী। তারা হজরত মুসাকে তাদের নিজস্ব অপবিশ্বাসের নিরিখে মান্য করে। আর সরাসরি অমান্য করে হজরত ঈসা, হজরত মোহাম্মদ স. ও অন্য নবীগণকে। তওরাতের প্রতি তারা আংশিক বিশ্বাসী। আর সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী কোরআন ও ইঞ্জিলের প্রতি। তারা বলে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে প্রত্যাখ্যান করি। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে তারা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র পথ আবিষ্কার করতে চায়। যারা এ রকম করে তারা সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের)। কেননা ইমান ও কুফরের মধ্যবর্তী কোনো মত ও পথ নেই। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে যা রয়েছে তা হচ্ছে অপবিশ্বাস বা বিকৃত বিশ্বাস, যা অবিশ্বাসেরই নামান্তর। তাই এ কথা সন্দেহাতীত যে, এ রকম অপবিশ্বাসীরা কাফের।

নবী ও রসুলগণ ছিলেন সকলেই বিশ্বাসভাজন ও অনুসরণীয়। যুগের চাহিদা অনুসারে তাঁদের শরিয়তের শাখা-প্রশাখায় বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও তাঁরা ছিলেন মূলতঃ এক। তাঁদের মূল বিশ্বাসের বাইরে সত্য বলে কোনো কিছু নেই, যা আছে তা ভ্রষ্টতা। কেবলই ভ্রষ্টতা।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের শেষটিতে বলা হয়েছে প্রকৃত বিশ্বাসীদের কথা। যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলগণকে বিশ্বাস করে এবং তাঁদের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য করে না। (একজনকে মানবো অপরজনকে মানবো না— এ রকম বলে না)। এ রকম প্রকৃত বিশ্বাসীদেরকেই তিনি পুরস্কৃত করবেন। এখানে 'সাওফা' শব্দটির মাধ্যমে পুরস্কার প্রদানের দৃঢ় অঙ্গীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'উলায়িকা সাওফা ইউ'তিহিম উজুরাহুম' (তোমাদেরকে তিনি পুরস্কার দিবেন)। শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়াকানাল্লহু গফুরর রহিমা' (এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু)। এ কথার মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ্‌পাক বিশ্বাসীদেরকে ক্ষমা করবেন। তাঁদের পুণ্য অনেক গুণ বাড়িয়ে দেবেন। কারণ, তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

মোহাম্মদ বিন কাব কারাজী থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, কতিপয় ইহুদী রসুল স. এর দরবারে হাজির হয়ে বললো, হজরত মুসার উপর তওরাত নাজিল হয়েছিলো এক সঙ্গে (ধারাবাহিকভাবে নয়)। আপনিও তেমনি তওরাতের প্রস্তর ফলকগুলোর মতো এক সঙ্গে লিখিত কোরআন নিয়ে আসুন যাতে আমরা আপনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারি। বাগবী বলেছেন, প্রশ্নকারী ইহুদীরা ছিলো কাব বিন আশরাফ, ফাখাজ বিন আজুরা প্রমুখ। ইহুদীদের ওই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত ।

www.eelm.weebly.com

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا
مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ
ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ
وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا
لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ
مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ
الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۭ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا
عَظِيْمًا ۝

❒ কিতাবীগণ তোমাকে তাহাদের জন্য আসমান হইতে কিতাব অবতীর্ণ করিতে বলে; কিন্তু তাহারা মূসার নিকট ইহা অপেক্ষাও বড় দাবী করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, 'প্রকাশ্যে আমাদিগকে আল্লাহ্ দেখাও।' তাহাদের সীমালংঘনের জন্য তাহারা বজ্রাহত হইয়াছিল; অতঃপর স্পষ্ট প্রমাণ তাহাদের নিকট প্রকাশ হওয়ার পরও তাহারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল; ইহাও ক্ষমা করিয়াছিলাম, এবং মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলাম।

❒ তাহাদের অংগীকারের জন্য 'তূর' পর্বতকে তাহাদের ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম 'নত শিরে দ্বার প্রবেশ কর'। এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'শনিবারে সীমালংঘন করিও না'; এবং তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অংগীকার লইয়াছিলাম।

❒ এবং তাহারা অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহাদের অংগীকার ভঙ্গের জন্য, আল্লাহের আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য, নবীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য, এবং 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত' তাহাদের এই উক্তির জন্য; যদিও তাহাদের সত্য-প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্লাহ্ উহা মোহর করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের অল্পই বিশ্বাস করে।

www.eelm.weebly.com

❒ এবং তাহারা অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহাদের সত্য-প্রত্যাখ্যানের জন্য ও মরিয়মের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদের জন্য,

---

অবিমৃশ্য ইহুদীদের অসমীচীন আবদারের কারণে মনঃক্ষুণ্ন রসুল স. কে সান্ত্বনা প্রদানার্থে আল্লাহ্পাক এখানে এরশাদ করেছেন, (হে প্রিয় রসুল!) আপনি মূর্খ ও অবাধ্য ইহুদীদের অসুন্দর কথায় মনঃক্ষুণ্ন হবেন না, ইহুদীদের স্বভাব এ রকমই। এ অভ্যাস তাদের নতুন নয়। রসুল মুসাকে তারা এর চেয়েও বেশী জঘন্য আবদার জানিয়ে অপ্রস্তুত করেছিলো। তারা আপনাকে আসমান থেকে একই সঙ্গে সম্পূর্ণ কোরআন নাজিল করতে বলে। আর রসুল মুসাকে বলেছিলো প্রকাশ্যে আমাদেরকে আল্লাহ্ দেখাও। হজরত আবু উবাইদা বলেছেন, এ কথার অর্থ—বনী ইসরাইলেরা প্রকাশ্যে বলেছিলো, আল্লাহ্কে দেখিয়ে দাও। এ কথা বলেছিলো বনী ইসরাইলের ওই সত্তরজন নেতা যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে হজরত মুসা তুর পর্বতে গমন করেছিলেন। ওই নেতাদের আল্লাহ্কে দেখাতে চাওয়ার আবদারটি ছিলো একটি অসম্ভব আবদার। পৃথিবীতে আল্লাহ্ দর্শন সম্ভব নয়। কারণ, এটা আল্লাহ্পাকের বিধান ও হেকমতের পরিপন্থী। কিন্তু এ কথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ্র দর্শন কোনো দিনই ঘটবে না। মুতাজিলারা বলে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে দীদারে এলাহী অসম্ভব। তাদের ধারণা ঠিক নয়। প্রকৃত কথা এই যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্র দর্শন অসম্ভব হলেও আখেরাতে সম্ভব। সেখানে প্রকৃত বিশ্বাসীরা আল্লাহ্র দীদার লাভে ধন্য হবেন।

বনী ইসরাইলের নেতারা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে দেখতে চেয়ে অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ করেছিলো। বজ্রাঘাতের মাধ্যমে আল্লাহ্পাক তাদের এ জঘন্য অপরাধের শাস্তি দিয়েছিলেন। আকাশ থেকে আগত একটি বজ্রাগ্নির মাধ্যমে ভস্মীভূত হয়েছিলো তারা। স্পষ্ট প্রমাণ তাদের সম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা সংযত হয়নি। পুনরায় অবাধ্য হয়েছিলো। শুরু করেছিলো গো-বৎসের উপাসনা। পরে অবশ্য তারা তওবা করেছিলো। আর সে তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্পাক তাদেরকে ক্ষমাও করেছিলেন। তওবার শর্তটি ছিলো অত্যন্ত কঠিন। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তারা একে অপরকে হত্যা করবে। তারা তা করেছিলোও। এভাবে অনেকে নিহত হবার পর আল্লাহ্পাক তাদের তওবা কবুল করেছিলেন। তাদের সম্প্রদায়কে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেননি। এ তওবা ও ক্ষমার কথাটির মধ্যে এ ইঙ্গিতটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, রসুল স.এর যুগের ইহুদীরাও যেনো ওই ভয়াবহ ঘটনাটির কথা স্মরণ করে তওবা ও ক্ষমার পথে ধাবিত হয়।

'এবং মুসাকে স্পষ্ট প্রমাণ (সুলতানাম মুবিনা) প্রদান করেছিলাম'—এ কথার অর্থ তওবা কবুলের শর্ত হিসেবে প্রদত্ত হত্যাকাণ্ডের হুকুম (বনী ইসরাইলেরা যে হুকুমটি যথাযথভাবে প্রতিপালন করেছিলো)। অথবা এখানে 'সুলতানাম মুবিনা' অর্থ অন্য কোনো নতুন মোজেজা (যে মোজেজার বিবরণ সম্পর্কে এখানে পরিষ্কার করে কিছু বলা হয়নি)।

www.eelm.weebly.com

বনী ইসরাইলের সীমালংঘনের ঘটনা দুই একটি নয়। অনেক। তারা তওরাতকে মান্য করতে চায়নি। তখন আল্লাহ্পাক তুর পর্বতকে তাদের উর্ধ্বে স্থাপন করেছিলেন। পর্বত পতনের ভয়ে বাধ্য হয়ে তারা তওরাতকে মেনে নিয়েছিলো। এভাবে তারা আরো অনেক সীমালঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়েছে। আল্লাহ্পাক তাদেরকে একটি শহরে প্রবেশের হুকুম দিয়েছিলেন এভাবে— 'নত শিরে দ্বার প্রবেশ করো।' তারা তা করেনি। আরও বলেছিলেন, 'শনিবারে সীমালংঘন কোরো না।' কিন্তু তারা ওই নিষেধাজ্ঞাটিও অমান্য করেছিলো। শনিবারে সীমালংঘন কোরো না— কথাটি আল্লাহ্পাকের নির্দেশ হিসেবে হয়তো বনী ইসরাইলদেরকে বলেছিলেন, হজরত মুসা অথবা হজরত দাউদ। কারণ, হজরত মুসার সময় থেকেই বনী ইসরাইলদের সাপ্তাহিক বিশেষ ইবাদতের দিন ছিলো শনিবার। হজরত দাউদের সময়ও তারা শনিবারের নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে মৎস শিকার করেছিলো। সীমালংঘনের কারণে তখন তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো চেহারা পরিবর্তনের শাস্তি। তারা হয়ে গিয়েছিলো বানর। অথচ তারা ছিলো আল্লাহ্পাকের সঙ্গে অংগীকারাবদ্ধ। তারা এই মর্মে অংগীকার করেছিলো যে— আমরা আল্লাহ্পাকের নির্দেশ মান্য করবো, শনিবারে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করবো না ইত্যাদি।

ইহুদীরা অভিশপ্ত। তারা অভিশাপগ্রস্ত হয়েছে অংগীকার ভঙ্গের জন্য, আল্লাহ্র আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য। তাদের উক্তি ছিলো—'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত।' এখানে যে আয়াত প্রত্যাখ্যানের কথা বলা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে— তওরাত শরীফের ওই আয়াত যেগুলোতে রসুল মোহাম্মদ স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ রয়েছে। আয়াতিল্লাহ বা আল্লাহ্র আয়াত বলে এখানে কোরআন মজীদ ও ইঞ্জিল শরীফের আয়াতের কথাও বলা হয়ে থাকতে পারে। ইঞ্জিল ও কোরআনের আয়াতগুলোকেও ইহুদীরা প্রত্যাখ্যান করে থাকে। নবীহত্যাও তাদের অভিশাপগ্রস্ত হওয়ার আরেকটি মোক্ষম কারণ।

'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত'— কথাটির মাধ্যমে ইহুদীরা বুঝাতে চেয়েছে, আমরা জ্ঞানী। আমাদের হৃদয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ। নতুন কোনো জ্ঞান ধারণ করার স্থান সেখানে নেই। সুতরাং নতুন ধর্ম ইসলামের আহবান আমাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছুবে না। তাদের এই বক্তব্যটি ছিলো সত্য-প্রত্যাখ্যানের একটি চূড়ান্ত প্রকাশ। আল্লাহ্পাক তাই তাদের হৃদয়কে মোহর করে দিয়েছেন। এ কথার অর্থ — তাদের হৃদয়কে করেছেন প্রকৃত প্রজ্ঞা থেকে চিরবঞ্চিত। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ্পাক তাদেরকে সহায়তাবিহীন অবস্থায় পরিত্যাগ করেছেন, আল্লাহ্র আয়াতগুলোর প্রতি মনোনিবদ্ধ করার তৌফিক তাদেরকে দান করেননি। 'সুতরাং তাদের অল্পই বিশ্বাস করে' এ কথার অর্থ তাদের সম্প্রদায়ের অল্পসংখ্যক লোক ইমান আনবে। যেমন, ইমান এনেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম ও তাঁর কতিপয় সঙ্গী। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, তাদের বিশ্বাস অপূর্ণ, তারা

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো নবী এবং কোনো কোনো আসমানী কিতাবকে বিশ্বাস করে। সকল নবী এবং সকল কিতাবকে মান্য করে না, এ রকম অপূর্ণ বিশ্বাসকে বিশ্বাস বলে গ্রহণ করা যায় না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সাধারণভাবে সকল ইহুদী যে ইমান আনবে না—এখানে সে কথাই বলা হয়েছে (আরবী বাকভঙ্গি অনুসারে 'অল্পই বিশ্বাস করে' অর্থ বিশ্বাসই করে না)।

আলোচ্য আয়াতগুলোর শেষটিতে ইহুদীদের অভিশপ্ত হওয়ার কারণ হিসেবে সত্য-প্রত্যাখ্যানসহ আরও একটি জঘন্য অপরাধের কথা বলা হয়েছে। এখানে সত্য-প্রত্যাখ্যানের কথা পুনঃ উল্লেখের কারণ এই যে, এই আয়াতে প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি বিশেষভাবে হজরত মরিয়মের সঙ্গে সম্পর্কিত। অথবা পুনঃ পুনঃ তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে বলে এখানে পুনরায় সত্য প্রত্যাখ্যানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা প্রত্যাখ্যান করেছে হজরত মুসাকে, হজরত দাউদকে, হজরত সুলায়মানকে, হজরত ঈসাকে এবং সবশেষে হজরত মোহাম্মদ স. কে। হজরত মরিয়মের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ দিয়েছিলো তারা। তাঁকে বলেছিলো ব্যভিচারিণী (আল্লাহ্পাক রক্ষা করুন)।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৫৭, ১৫৮

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ○ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ○

❒ আর 'আমরা আল্লাহের রসূল মরিয়ম তনয় ঈসা মসীহ্কে হত্যা করিয়াছি' তাহাদের এই উক্তির জন্য। তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই ও ক্রুসবিদ্ধও করে নাই; কিন্তু তাহাদের এইরূপ মনে হইয়াছিল। যাহারা তাহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিল, তাহারা নিশ্চয় এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল, এবং এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাহাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। ইহা নিশ্চিত যে তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই।

❒ না, আল্লাহ্ তাহাকে তাঁহার নিকট তুলিয়া লইয়াছেন, এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ইহুদীরা হজরত ঈসাকে আল্লাহ্র রসুল বিশ্বাস করতো না। অথচ আয়াতে তাদের উক্তি হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে 'আমরা আল্লাহ্র রসুল মরিয়ম তনয় ঈসা

www.eelm.weebly.com

মসীহ্কে হত্যা করেছি।' এতে করে বুঝা যায়, তারা তাঁকে রসুল বলতো ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। এ রকমও হতে পারে যে, তারা হজরত ঈসাকে আল্লাহ্র রসুল না বলে অন্য কোনো মন্দ শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করতো। কিন্তু আল্লাহ্পাক এখানে তাদের উক্তিটি উদ্ধৃতি করলেও তাদের মন্দ সম্বোধনের পরিবর্তে হজরত ঈসাকে আল্লাহ্র রসুল বলে সম্মানিত করেছেন। এ রকম অর্থ করলে বুঝতে হবে, আল্লাহ্র রসূলের প্রতি মন্দ সম্বোধন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই অপরাধের কারণেই ইহুদীরা অভিশাপগ্রস্ত হয়েছে। অভিশপ্ত ওই ইহুদীদের ধৃষ্টতামূলক উক্তিটি উল্লেখ করার পরক্ষণেই আল্লাহ্পাক জানাচ্ছেন 'তারা তাঁকে হত্যা করেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করেনি; কিন্তু তাদের এ রকম মনে হয়েছিলো।' এক বর্ণনায় রয়েছে, প্রকৃত ঘটনা ছিলো এ রকম— একদল ইহুদী হজরত ঈসা এবং তাঁর পুত-পবিত্রা জননীকে গালি দিলো। তিনি তখন তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। তাঁর বদদোয়ার কারণে আল্লাহ্পাক গালিদাতাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করে দিলেন। এই ঘটনা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো ইহুদী সম্প্রদায়। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, হজরত ঈসাকে হত্যা করতে হবে। আল্লাহ্পাক তখন হজরত ঈসাকে জানালেন, তোমাকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হবে। সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

কতিপয় বর্ণনায় এসেছে—হজরত ঈসা তাঁর সহচরবৃন্দকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমার আকৃতি বিশিষ্ট হতে চাও, যাকে ইহুদীরা শূলে চড়াবে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একজন দাঁড়িয়ে বললেন, আমি চাই। আল্লাহ্পাক তখন তাঁর আকৃতি হজরত ঈসার মতো করে দিলেন। ওই ব্যক্তিকেই ইহুদীরা শূলে চড়িয়ে হত্যা করলো। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে নাসাঈ এ রকম বর্ণনা করছেন। বাগবী বলেছেন, আল্লাহ্পাক ওই ব্যক্তিকে হজরত ঈসার আকৃতি বিশিষ্ট করে দিলেন। আর ইহুদীরা তাকেই হজরত ঈসা মনে করে ক্রুশবিদ্ধ করলো।

আমরা সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে কালাবী কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছি যে—ইহুদীদের নেতা ইয়াহুদা হজরত ঈসাকে হত্যার জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলো। তার নাম ছিলো তাতিয়ানুস। সে হত্যার উদ্দেশ্যে যখন হজরত ঈসার গৃহে প্রবেশ করলো তৎক্ষণাৎ হজরত ঈসাকে উঠিয়ে নেয়া হলো আকাশে। আর তাতিয়ানুসের চেহারা হয়ে গেলো অবিকল হজরত ঈসার মতো। সে ঘর থেকে বের হয়ে এলে অপেক্ষমান ইহুদী জনতা তাকেই হজরত ঈসা মনে করে বন্দী করলো এবং শূলে চড়ালো। কেউ কেউ বলেছেন, ইহুদীরা হজরত ঈসাকে একটি ঘরে বন্দী করে রেখে দিলো এবং তার জন্য নিযুক্ত করলো এক পাহারাদার। ওই পাহারাদারের চেহারাকে আল্লাহ্ হজরত ঈসার মতো করে দিলেন। ইহুদীরা তাকে হজরত ঈসা ভেবে হত্যা করে ফেললো। আল্লাহ্পাকই সমধিক জ্ঞাত।

হজরত ঈসার ক্রুশবিদ্ধ হওয়া নিয়ে ইহুদীদের মধ্যেই দেখা দিলো চরম মতবিরোধ। কালাবী বলেছেন, ইহুদীরা বললো, আমরা ঈসাকে হত্যা করেছি।

www.eelm.weebly.com

খৃষ্টানেরা বললো, তাকে কতল করেছি আমরা। খৃষ্টানদের একটি দল এ কথাও বলে বসলো যে, ইহুদী বা খৃষ্টান কেউ তাঁকে হত্যা করতে পারেনি বরং আল্লাহ্ তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর আকাশে উত্তোলনের ঘটনাটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্পাক তাতিয়ানুসের মুখমণ্ডল কেবল হজরত ঈসার মতো করে দিয়েছিলেন। তার শরীরের আকার পরিবর্তন করেননি। ক্রুশবিদ্ধ করার পর এই বিষয়টি লক্ষ্য করে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়লো তারা। একদল বললো, ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে হজরত ঈসাকে। আরেকদল বললো, না, ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তিটি তাতিয়ানুস—ঈসা নয়। একদল বললো, দেখো! এইতো ঈসার মুখাকৃতি। আরেকদল বললো, কিন্তু শরীরতো তাতিয়ানুসের। সুদ্দী বলেছেন, যদি ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তিটি হজরত ঈসা হয়ে থাকেন, তবে আমাদের তাতিয়ানুস কোথায়? আর তাতিয়ানুসকে যদি ক্রুশবিদ্ধ করা হয় তবে ঈসা কোথায়?

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিলো'— এখানে 'তাঁর' সর্বনামটির উদ্দেশ্য হজরত ঈসা। হজরত ঈসা সম্পর্কে ইহুদীদের মতবিরোধ ছিলো এ রকম— কেউ বলতো ঈসা মিথ্যাচারী, আমরা তাকে হত্যা করে উপযুক্ত কাজ করেছি। আবার কেউ বলতো, আমরা জানিনা, ঈসা মিথ্যাবাদী না সত্যবাদী। এ ব্যাপারেও আমরা নিশ্চিত নই যে, তাকে আমরা প্রকৃতই হত্যা করতে পেরেছি কি না। কেউ কেউ আবার এ রকমও বলতো যে, আমাদের সঙ্গে ঈসার দেখা হয়েছে। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। তারা বলে বেড়াতো, হজরত ঈসার আকাশে আরোহণের বিষয়টি সঠিক।

সংশয়যুক্ত ইহুদীরা সর্বজনমান্য কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছিলো না। তাদের প্রতিটি মতামতই ছিলো অনুমান নির্ভর। আল্লাহ্পাক তাই বলেছেন, 'তাদের কোনো জ্ঞানই ছিলো না।' এ সম্পর্কে আয়াতে সঠিক সিদ্ধান্তটি দেয়া হয়েছে এভাবে —'এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।' এ কথাটি আল্লাহ্পাকের চূড়ান্ত রায় হতে পারে। আবার এটা ইহুদীদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হওয়াও সম্ভব। সংশয়াচ্ছন্নতার অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে খেতে তারা হয়তো অবশেষে এই সিদ্ধান্তের উপকূলে উপনীত হতে পেরেছিলো যে, হজরত ঈসা নিহত হননি— এ কথাটি নিশ্চিত। ফাররা বলেছেন, ক্রুশবিদ্ধ করার কাজটি যারা করেছিলো তারাই বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে, ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তিটি হজরত ঈসা।

হজরত ঈসাকে যে ইহুদীরা ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করতে পারেনি, সে কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে পরের আয়াতে (১৫৮)। আল্লাহ্পাকের এই অমোঘ ঘোষণাটির মাধ্যমে এ বিষয়ে আর সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ মাত্র নেই যে, আল্লাহ্পাক তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যারা বলবে তারা মিথ্যুক।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে 'ওয়াকানাল্লহু আযিযান হাকিমা' —এ কথার অর্থ এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। পরাক্রমশালী বলেই তিনি ইহুদীদেরকে যথাশাস্তি দান করতে পূর্ণ সক্ষম। আর তিনি প্রজ্ঞাময় তাই অভিসম্পাতের যোগ্য ইহুদীদেরকে অভিশাপগ্রস্ত করেছেন। হজরত ঈসার আকাশ আরোহণের বিষয়টিও তাঁর প্রজ্ঞাময়তার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৫৯

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۝

❑ কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে বিশ্বাস করিবেই, এবং কিয়ামতের দিন সে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

এক সময় ইহুদীরা ইমান আনবেই। ইমান আনবে হজরত ঈসার প্রতি, হজরত মোহাম্মদ স. এর প্রতি এবং আল্লাহ্র প্রতি (আল্লাহ্র হুকুমের প্রতি)। আল্লাহ্পাকের হুকুম এই যে— সকল নবী-রসুলের প্রতি ইমান আনতে হবে। রসুল ঈসার প্রতি ইমান আনলে ইমান আনতে হবে রসুল মোহাম্মদ স. সহ সকল নবীগণের প্রতি। রসুল মোহাম্মদ স. এর প্রতি ইমান আনলেও ইমান আনতে হবে হজরত ঈসা, হজরত মুসা সহ সকল পয়গম্বরের প্রতি। আয়াতে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবেই। আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, যারা বিশ্বাস করবে না। আলী বিন আবী তালহার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রত্যেক কিতাবীই (ইহুদী ও খৃষ্টান) মৃত্যুর প্রাক্কালে ইমান আনবে। বর্ণনাকারী বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, ইহুদীরা যদি অকস্মাৎ গৃহের ছাদ থেকে পতিত হয় (তখন কি তারা হজরত ঈসার রেসালাতকে স্বীকার করবে)? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বাতাসের মধ্যেই (মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বেই) সে হজরত ঈসার রেসালাতের স্বীকৃতি দেবে। পুনঃ প্রশ্ন করা হলো, যদি তার কণ্ঠ ছেদন করা হয়? তিনি বললেন, তখন জিহবায় সত্য কলেমা উচ্চারণ করবে। প্রকৃত কথা এই, ইহুদীরা প্রত্যেকেই মৃত্যুর সময় আল্লাহ্র এককত্ব এবং হজরত মোহাম্মদ স. ও হজরত ঈসার রেসালাতকে মেনে নিবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, প্রত্যেক কিতাবী কোনো না কোনো সময় নিশ্চয়ই ইমান গ্রহণ করবে। জীবদ্দশায় যদি গ্রহণ না করে, তবে মৃত্যুর সময় আযাব দেখে ইমানের স্বীকৃতি দিবে।

আমি বলি, সম্ভবতঃ এই বাক্যটির অর্থ এ রকম— প্রতিটি ইহুদী হজরত মুসা এবং তওরাতকে তো বিশ্বাস করেই। সুতরাং তারা তওরাতের নির্দেশে অবশেষে হজরত ঈসা, হজরত দাউদ, হজরত মোহাম্মদ স. এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিল, যবুর ও কোরআনকেও বিশ্বাস করে। কিন্তু তারা কেবল হিংসাবিদ্বেষের কারণেই ওই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে। তারা অপরিণামদর্শী। অবিমৃশ্য। সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী। তাই তওরাতকে মান্য করেও বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে

www.eelm.weebly.com

তওরাতের নির্দেশের। কিন্তু যখন উপায়ন্তর থাকবে না, দাঁড়াতে হবে মৃত্যুর মুখোমুখি, তখন আযাবের ফেরেশতাকে দেখে তাদের হুঁশ হবে। তখনই হবে তাদের হিংসাবিদ্বেষের চির অবসান। বুঝবে, রসুল মোহাম্মদ স. যা কিছু বলেছেন, তা সত্য। আয়াতে তাদের ওই অবস্থাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে— 'কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবেই।' ইহুদীরা যাতে সত্বর তওবা করে বিশ্বাসীদের দলভূত হয়ে যায়, সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে এই বাক-ভঙ্গিটি। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত্যুর প্রাক্কালে তোমরা তো ইমান আনবেই, কিন্তু ওই সময়ের ইমান গ্রহণীয় হবে না। কারণ, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তওবার দরোজা বন্ধ করে দেয়া হয়। এখন তওবার তোরণ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। সুতরাং এখনইতো তওবা করার প্রকৃষ্ট সময়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবে' অর্থ হজরত ঈসার মৃত্যুর পূর্বে হজরত ঈসাকে বিশ্বাস করবে। অর্থাৎ হজরত ঈসা যখন আকাশ থেকে পুনরায় নেমে আসবেন, তখন সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। তখন অবিশ্বাসী বলে আর কেউ থাকবে না। পৃথিবীবাসীরা সকলেই হয়ে যাবে ইসলামের অনুসারী। এই ব্যাখ্যাটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে। বোখারী ও মুসলিমে রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, যার অলৌকিক হস্তে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তার শপথ, অতি সত্বর মরিয়ম নন্দন তোমাদের মধ্যে হাকিম নির্বাচিত হয়ে অবতরণ করবেন। তিনি ক্রুশকে নিশ্চিহ্ন করবেন, শুকর নিধন করবেন এবং অবলুপ্ত করে দিবেন জিজিয়া। দেখা দিবে বিত্তের প্রাচুর্য। বিত্ত গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওই সময় একটি সেজদার গুরুত্ব হবে পৃথিবীর সকল সামগ্রী অপেক্ষা অধিক। হাদিসটি উদ্ধৃত করার পর হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, যদি তোমরা এ কথার প্রমাণ চাও, তবে পড় 'ওয়া ইম্মিন্ আহলিল কিতাবি ইল্লা লা ইয়ু'মিনান্না বিহী ক্বলা মাওতিহি' (কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবেই)। এক বর্ণনায় এসেছে— হজরত আবু হোরায়রা এই বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন তিনবার। হজরত ঈসার অবতরণকালিন ঘটনা প্রসঙ্গে হজরত আবু হোরায়রার মারফু বর্ণনায় এ কথাটিও এসেছে— হজরত ঈসার অবতরণের পর পৃথিবীতে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মাওকুফরূপে ইবনে জারীর এবং হাকেমও এ রকম বলেছেন। বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ আখ্যায়িত করে হাকেম আরও বলেছেন, কিতাবীদের মধ্যে তখন অবিশ্বাসী বলে কেউ থাকবে না।

আমি বলি, কিয়ামতের পূর্বে হজরত ঈসার অবতরণের পর পৃথিবীতে যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না সে কথাটি ঠিক এবং তা বিশুদ্ধ মারফু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু এই আয়াতে হজরত ঈসার স্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্বে ওই সময়ের ইহুদীরা তাঁকে বিশ্বাস করবে— এ কথাটি ঠিক নয়। হজরত আবু হোরায়রা তাঁর নিজস্ব ধারণা অনুসারে তখনকার ইহুদীদের ইমান আনার সঙ্গে এই আয়াতটিকে সম্পৃক্ত করেছেন। কোনো বিশুদ্ধ মারফু হাদিসে এ রকম উল্লেখ নেই। এখানে 'কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে' অর্থ সকল যুগের সকল কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে (কেবল হজরত ঈসার অবতরণের পরের কিতাবীদের প্রত্যেকে— এ রকম নয়)। হুকুমটি সাধারণ। আর যদি এটিকে বিশেষ মনে করা হয়, তবে

www.eelm.weebly.com

রসুল স. এর সময়ের ইহুদীদের প্রতি এ বাক্যটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং হজরত ঈসার মৃত্যুর পূর্বে তখনকার প্রতিটি কিতাবী ইমান আনবে— কথাটি ঠিক নয়। কিতাবীরা প্রত্যেকে তার নিজের মৃত্যুর পূর্বে বিশ্বাস করবে— এই ব্যাখ্যাটিই সঠিক। হজরত উবাই ইবনে কা'বের উচ্চারণরীতির (ক্বেরাতের) মাধ্যমেও এ কথাটি প্রমাণিত হয়। তিনি 'ক্বলা মাওতিহি' এর স্থলে পড়তেন 'ক্বলা মাওতিহিম।' এই 'হিম' সর্বনামটি সুস্পষ্টরূপে কিতাবীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত— হজরত ঈসার সঙ্গে নয়।

শেষে বলা হয়েছে, 'এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।' এ কথার অর্থ কিয়ামতের দিন হজরত ঈসা অথবা হজরত মোহাম্মদ স. তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন (কারণ ইহুদীরা এমন সময়ে ইমান এনেছিলো যখন ইমান আনার সময় আর ছিলো না অর্থাৎ তখন তওবার দরোজা হয়ে গিয়েছিলো রুদ্ধ)। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্পাক নিজেও তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। তাই অন্যত্র বলা হয়েছে— 'ওয়া কাফা বিল্লাহি শাহিদা' (আর আল্লাহ্ই সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে যথেষ্ট)। তখন নবী ও রসুলগণ তাঁদের আপনাপন উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবেন। আর রসুল স. সাক্ষী হবেন সকলের জন্য।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৬০, ১৬১, ১৬২

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ○ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوٰا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ النَّاسِ بِالْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ○ لَّٰكِنِ الرَّٰسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَوٰةَ ۚ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ أُولَٰٓئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ○

❒ ভাল ভাল যাহা ইহুদীদের জন্য বৈধ ছিল তাহা উহাদের জন্য অবৈধ করিয়াছি তাহাদের সীমালংঘনের জন্য এবং আল্লাহের পথে অনেককে বাধা দেওয়ার জন্য,

❒ এবং তাহাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও উহা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল; এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধনসম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাহাদের মধ্যে যাহারা সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি।

www.eelm.weebly.com

❑ কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা স্থিতপ্রাজ্ঞ তাহারা ও বিশ্বাসীগণ তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহাতেও বিশ্বাস করে এবং যাহারা সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে উহাদিগকেই মহাপুরস্কার দিব।

সীমালংঘন বুঝাতে এখানে 'জুলমিন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইহুদীদের সীমালংঘনের তালিকা দীর্ঘ। যেমন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, আল্লাহ্র নিদর্শনকে অস্বীকার করা, নবীদেরকে হত্যা করা, হজরত মরিয়মের উপর অপবাদ আরোপ করা, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত'— এ রকম দর্পপ্রকাশক বাক্য ব্যবহার করা, হজরত ঈসাকে হত্যার দাবী ইত্যাদি। তারা আল্লাহ্র পথে গমনকারীকেও বাধা দেয়। এ সকল কারণে আল্লাহ্পাক অনেক বৈধ বস্তু তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। বৈধ বস্তু অবৈধ করার ঘোষণা সুরা আনআমে দেয়া হয়েছে— 'ওয়া আলাল্লাজিনা হাদু হার্‌রামনা কুল্লা জি জুফরিন থেকে ওয়া ইন্না লা সদিকুন পর্যন্ত)। বৈধ বা পবিত্র বস্তু বুঝাতে এখানে 'তইয়েবাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'তইয়েবাত' বলে এখানে জান্নাতের পবিত্র নেয়ামত সমূহ বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। পৃথিবীর হালাল রিজিককে 'তইয়েবাত' বলা যায়। ইহুদীরা পৃথিবীর বৈধ ও পবিত্র রিজিক থেকেও বঞ্চিত। তারা সুদখোর। আর সুদকে আল্লাহ্পাক হারাম করে দিয়েছেন। রসুল স. এরশাদ করেন, যে গোশত হারাম রিজিক থেকে সৃষ্ট, দোজখই তার উপযুক্ত স্থান।

সুদ ভক্ষণ করার সাথে সাথে তারা আরেকটি জঘন্য হারাম কাজে অভ্যস্ত। সেটি হচ্ছে অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করা। এ সকল কারণে অবিশ্বাসী ইহুদীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

কিতাবীদের মধ্যে সকলেই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী নয়। তাদের মধ্যে একটি দল সর্বান্তঃকরণে ইমান ও ইসলামকে গ্রহণ করেছেন; যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীবৃন্দ। আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে এভাবে 'কিন্তু তাহাদের মধ্যে যারা স্থিত প্রাজ্ঞ'। বায়হাকী লিখেছেন, ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদী সম্প্রদায় থেকে আগত ইমানদার হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, হজরত উসাইদ বিন শা'বা এবং ছা'লাবা বিন শা'বা প্রমুখ সম্পর্কে। এই সকল ইমানদার এবং মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণকে মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন আল্লাহ্পাক। বলেছেন, তারা কোরআন এবং কোরআনের পূর্বে অবতীর্ণ সকল কিতাবকে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে।

সালাত কায়েম করা বা নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— আল মুক্বিমিনাস্ সলাহ্ (যারা সালাত কায়েম করে)। বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আয়েশা এবং হজরত আবান বিন ওসমান বলেছেন, কথাটি লিখতে হতো এভাবে—আল মুক্বিমুনাস্ সলাহ (যারা সালাত প্রতিষ্ঠাকারী)। সুরা মায়িদার মধ্যেও এ রকম ভুল রয়েছে। যেমন একস্থানে 'সাবেয়ুন' লেখা হয়েছে। অথচ শব্দটি লেখা উচিৎ ছিলো 'সাবেইন।' আরেকস্থানে লেখা হয়েছে 'হাজানি'— যার

www.eelm.weebly.com

শুদ্ধ লিখিতরূপ 'হাজাইনি।' হজরত ওসমান বলেছেন, কোরআনে এ রকম কিছু কিছু ভুল উচ্চারণের শব্দ লিপিবদ্ধ রয়েছে যেগুলোকে আরববাসীরা পাঠ করার সময় সঠিকভাবে উচ্চারণ করে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, আপনি শব্দগুলোকে শুদ্ধরূপে লেখার ব্যবস্থা করেননি কেনো? উত্তরে হজরত ওসমান বলেছিলেন, এভাবেই থাকতে দাও। এর মাধ্যমে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করা হয়নি। প্রকৃত কথা এই যে, এ রকম মন্তব্য অসমীচীন। ঐকমত্যসম্মত মত এই যে, কোরআনে যা কিছু লিপিবদ্ধ রয়েছে তা ঐকমত্যসম্মতভাবেই বিশুদ্ধ। অবশ্য সেগুলোর ব্যাখ্যার বিভিন্ন রূপ থাকতে পারে। কোরআন ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্নভাবে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন।

নামাজ প্রতিষ্ঠার পর বলা হয়েছে জাকাত দেয়ার কথা। শেষে বলা হয়েছে 'ওয়াল মু'মিনুনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখির' (এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী)। এখানে আল্লাহ্ ও পরকালের বিশ্বাসের কথা শেষে বলার কারণ এই যে—এ বিশ্বাস ইহুদীদের ছিলোই। তারা সকল নবী এবং সকল কিতাবকে বিশ্বাস করতো না এবং নামাজ ও জাকাত প্রতিষ্ঠায় ছিলো অনীহ। আয়াতগুলো ইহুদীদের বিশ্বাস সংশোধনের নিমিত্তেই অবতীর্ণ হয়েছে। তাই যে বিশ্বাসে তাদের ত্রুটি ছিলো সেগুলোকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে প্রথমে বলা হয়েছে রূপক ইমান এবং অবশ্যমান্য শরিয়তের কথা এবং শেষে বলে দেয়া হয়েছে প্রকৃত বা চূড়ান্ত ইমানের কথা (আল্লাহ্ ও পরকালের কথা)। এভাবে আলোচ্য আয়াতের শেষটিতে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস্য বিষয় এবং শরিয়ত প্রতিষ্ঠার কথা বলে এবং তাদেরকে মহাপুরস্কারদানের ঘোষণা দিয়ে অবাধ্য ইহুদীদেরকে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আদি বিন জায়েদ ইহুদী একবার বললো, আমাদের এ কথা জানা নেই যে, হজরত মুসার পর আল্লাহ্পাক কোনো ব্যক্তির উপর কিতাব অবতীর্ণ করবেন। তার কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৬৩

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ○

❑ তোমার নিকট 'ওহি' প্রেরণ করিয়াছি যেমন নূহ ও তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, ইব্রাহীম, ইস্‌মাইল, ইস্‌হাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণ, ঈসা, আয়ুব, ইউনুস, হারুণ এবং সুলায়মানের নিকট 'ওহি' প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং দাউদকে যবুর দিয়াছিলাম।

---

www.eelm.weebly.com

যে সকল নবী রসুলের উপর কিতাব ও সহিফা অবতীর্ণ হয়েছিলো তার মধ্যে এখানে সর্বপ্রথম নামোল্লেখ করা হয়েছে হজরত নূহের। বলা হয়েছে, তোমার নিকট প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি— যেমন নূহ এবং পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সর্বপ্রথম নবী হজরত আদম। কিন্তু এখানে তাঁর নামোল্লেখ না করে হজরত নূহের নামোল্লেখের কারণ এই যে–তিনি মহাপ্লাবনপরবর্তী মানবতার পিতা। মহাপ্লাবনের সময় তাঁর নৌকায় যারা ওঠেনি, তারা সকলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। রক্ষা পেয়েছিলেন কেবল তিনি ও তাঁর বংশধরেরা। আল্লাহ্পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'ওয়া জায়ালনা জুররিইয়াতাহু হুমুল বাক্বিন (তাঁর বংশকে কেবল আমি অবশিষ্ট রেখেছি)। আরো অনেক বিশেষত্ব ছিলো হজরত নূহের। যেমন— ১. তিনিই প্রথম শরিয়ত প্রবর্তনকারী নবী। ২. সর্বপ্রথম তিনি শিরিকের জন্য আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন। ৩. তাঁর আহবান প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাঁর উম্মতের প্রতি নেমে এসেছিলো প্রথম আযাব। ৪. তাঁর অপপ্রার্থনার কারণে তাঁর বিশ্বাসী বংশধর ব্যতীত পৃথিবীর সকল অধিবাসীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিলো। ৫. নবীগণের মধ্যে তিনিই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী হায়াত পেয়েছিলেন। তাঁর পৃথিবীর সাড়ে নয়শ' বছরের হায়াত ছিলো একটি অনন্য মোজেজা। এই দীর্ঘ হায়াতের মধ্যে তাঁর একটিও দাঁত পড়েনি, চুল শাদা হয়নি, শারীরিক শক্তিও ছিলো অটুট। সুদীর্ঘ জীবনে তাঁর সম্প্রদায় প্রদত্ত অনেক অত্যাচার তিনি সহ্য করেছিলেন।

এরপর প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নবীদের তালিকা দেয়া হয়েছে এ রকম—হজরত ইব্রাহিম, হজরত ইসমাইল, হজরত ইসহাক, হজরত ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণ, হজরত ঈসা, হজরত আইয়ুব, হজরত ইউনুস, হজরত হারুন, হজরত সুলায়মান এবং হজরত দাউদ। হজরত ইয়াকুবের বংশধর অর্থ তাঁর দ্বাদশ পুত্র। তাঁদের বংশে এসেছিলেন আরো অনেক নবী ও রসুল। এখানে বিশেষভাবে যে সকল নবীদের নামোল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই ছিলেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

সবশেষে বলা হয়েছে 'এবং দাউদকে যবুর দিয়েছিলাম, 'ওয়া আতাইনা দাউদা যাবুরা।' বাগবী লিখেছেন, যবুর শরীফে রয়েছে আল্লাহ্পাকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও অত্যুচ্চ মর্যাদার বিবরণ। হজরত দাউদ জনপদ থেকে দূরে অরণ্যের নিকটে দাঁড়িয়ে যবুর পাঠ করতেন। বনী ইসরাইলের আলেমগণ তখন তাঁর পশ্চাতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতো। তাঁদের পিছনে দাঁড়াতো সাধারণ জনতা এবং সাধারণ জনতার পশ্চাতে থাকতো জ্বিনেরা। পাহাড়ি পশুরাও সেখানে সমবেত হয়ে তেলাওয়াত শুনে বিমোহিত হয়ে যেতো। উপরে সমবেত হতো উড্ডন্ত পক্ষিকূল। হজরত আবু মুসা আশআরী বলেছেন, রসুল স. একবার আমাকে বললেন, আমি তোমার রাতের কোরআন তেলাওয়াত তোমার আগোচরে দাঁড়িয়ে শুনেছিলাম। তোমার কণ্ঠস্বর দাউদ নবীর কণ্ঠস্বরের মতো সুন্দর। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল ! এ কথা জানলে আমি অনেক সময় ধরে কোরআন তেলাওয়াত করতাম।

www.eelm.weebly.com

একবার হজরত ওমর তাঁকে বললেন, হে আবু মুসা! আমাদেরকে কিছু নসিহত করুন (কোরআন পাঠের মাধ্যমে)। হজরত আবু মুসা তখন কোরআন পাঠ করে শোনালেন।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৬৪

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۝

❑ অনেক রসূল প্রেরণ করিয়াছি যাহাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি এবং অনেক রসূল যাহাদের কথা তোমাকে বলি নাই। এবং মূসার সহিত আল্লাহ্ সাক্ষাত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন।

নবী রসুলের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ্পাক জানাননি। এই আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে এভাবে —'অনেক রসুল যাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলেছি এবং অনেক রসুল যাদের কথা তোমাকে বলিনি।' হজরত আবু জর বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সর্বপ্রথম পয়গম্বর কে? তিনি স. বললেন, হজরত আদম। আমি বললাম, তিনি তো নবী ছিলেন। তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্পাক তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন। আমি বললাম, রসুলের সংখ্যা কতো? তিনি স. বললেন, তিনশত দশের অধিক। হজরত আবু উমামা বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল, নবীগণের মোট সংখ্যা কতো? তিনি স. জবাবে বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তার মধ্যে তিনশত পনেরো জনের একটি বৃহৎ দল ছিলো রসুলের। আহমদ, ইবনে আবী হাতেম। শিথিল সূত্রে আবু ইয়া'লী, হাকেম এবং আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন— আল্লাহ্তায়ালা আট হাজার নবী প্রেরণ করেছেন। বনী ইসরাইলের মধ্যে চার হাজার এবং অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে চার হাজার।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে হাব্বান, হাকেম, ইবনে আসাকের, তিরমিজি, এবং আবদ বিন হুমাইদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু জর বলেছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কতোজন আম্বিয়া প্রেরিত হয়েছেন? রসুল স. বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্, তার মধ্যে রসুলের সংখ্যা কতো? তিনি স. বললেন তিনশত তেরো। তিনি স. পুনরায় বললেন, আদম, শীশ, নূহ, এবং খুনুখ ছিলেন অনারব। খুনুখ ইদ্রিস নবীর নাম। তিনিই সর্বপ্রথম কলম দ্বারা লিখেছেন। আরবদের নবী চার জন— হুদ, সালেহ্, শীশ, এবং তোমাদের নবী। বনী ইসরাইলের সর্বপ্রথম নবী হজরত মুসা এবং সর্বশেষ হজরত ঈসা। নবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রেরিত হয়েছিলেন হজরত আদম এবং সর্বশেষে প্রেরিত হয়েছেন তোমাদের এই নবী।

---

www.eelm.weebly.com

আয়াতের বর্ণনা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, নবীগণের প্রত্যেকের নাম জানা জরুরী নয়। যদি প্রত্যেকের নাম জানা ইমানের অন্তর্ভুক্ত হতো, তবে আল্লাহ্পাক সকলের নাম জানিয়ে দিতেন। সকল নবী যে আল্লাহ্র নবী এ রকম বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'এবং মুসার সঙ্গে আল্লাহ্ সরাসরি কথা বলেছেন'। সরাসরি কথোপকথনের এই মর্যাদা আল্লাহ্পাক হজরত মুসাকেই দান করেছিলেন। কিন্তু শেষ নবী মোহাম্মদ স. এর মর্যাদা সকল নবী রসুলের সম্মিলিত মর্যাদা অপেক্ষা অধিক। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'অতঃপর নিকটবর্তী হলো—তখন ধনুকের দুই জ্যা ব্যবধান ছিলো অথবা ব্যবধান ছিলো আরো কম। তখন আল্লাহ্ তাঁর আপন বান্দার প্রতি যা ওহী নাজিল করতে চেয়েছিলেন তা করলেন। তিনি যা দেখলেন, তাঁর হৃদয় তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেনি। তোমরা কি এ বিষয়ে সংশয়াচ্ছন্ন হবে যা তিনি দেখেছেন! নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আর একবার সিদরাতুল মুনতাহার নিকট দেখেছিলেন'।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৬৫

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

☐ সুসংবাদ-বাহী ও সাবধানকারী রসূল প্রেরণ করিয়াছি যাহাতে রসূল আসার পর আল্লাহের বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

রসুলগণকে আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে। তাঁরা মানুষকে পুণ্যকর্মের সুসংবাদ দেন এবং মন্দ কর্ম থেকে সাবধান করে থাকেন। রসুল প্রেরণ করার পর মানুষের অভিযোগ উত্থাপনের আর কোনো উপায় থাকে না। তাই কিয়ামতের দিন কারো এই আপত্তি গ্রহণীয় হবে না যে, আমাদের নিকট কোনো রসুল আসেননি। তাই আমরা সওয়াব ও আযাব সম্পর্কে কিছু জানি না।

হজরত মুগীরা থেকে বর্ণিত হয়েছে— হজরত সা'দ বিন উবাদা বলেছেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর নিকটে কাউকে দেখি তবে নিশ্চয়ই আমি তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করবো। তাঁর এই কথা রসুল স. এর নিকট পৌঁছলো। তিনি স. বললেন, তোমরা কি সা'দের লজ্জাবোধ দেখে বিস্মিত হচ্ছো! আল্লাহ্র কসম, আমার লজ্জাবোধ এর চেয়ে বেশী। আর আমার আল্লাহ্র লজ্জাবোধ আরো বেশী। তাই তিনি প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ পাপীদের অনুযোগ-অভিযোগ উত্থাপনের কোনো পথই খোলা রাখেননি। তাই

www.eelm.weebly.com

তিনি ভীতি প্রদর্শনকারী ও শুভসংবাদবাহী পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন। কেউ আত্মপ্রশংসায় মগ্ন হোক আল্লাহ্পাক তা চান না। তাই তিনি বেহেশত প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। বোখারী প্রমুখ।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী প্রেরণ ব্যতিরেকে আল্লাহ্পাক কাউকে শাস্তি দিবেন না। অন্যত্র এরশাদ করা হয়েছে, 'আর আমি কখনও শাস্তি প্রদান করবো না যতোক্ষণ না রসুল প্রেরণ করবো।' হানাফী মতাবলম্বী আলেমগণ বলেছেন, এই আয়াতে যে শাস্তি না প্রদান করার কথা বলা হয়েছে, সে শাস্তি হচ্ছে দুনিয়ার শাস্তি। অর্থাৎ নবীগণের প্রচারিত হেদায়েত যারা অস্বীকার করে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্পাক তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করেন। নবী রসুল না এলে মানুষ হালাল হারাম সম্পর্কে কোনো কিছুই অবগত হতে পারতো না। তাঁদের প্রচারিত শরিয়ত অস্বীকার করলে পৃথিবীতেই শাস্তি নেমে আসে। কিন্তু মূল তৌহিদ (আল্লাহ্র এককত্ব) সম্পর্কে মানুষ নবী রসুল ছাড়াই জ্ঞান লাভ করতে পারে। এই বিশাল সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুই এক আল্লাহ্র সৃজনশীলতাকে প্রমাণ করছে। সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা গবেষণা করলে আল্লাহ্পাক যে একক স্রষ্টা— সে কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ওয়াল্লহু আ'লাম।

জ্ঞাতব্যঃ 'আর আমি কখনও শাস্তি প্রদান করবো না যতক্ষণ না রসুল প্রেরণ করবো'—এই আয়াতের মাধ্যমে যে আযাবের কথা বলা হয়েছে, সে আযাব হবে আখেরাতে—এ কথাও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ তখন ওই পাপিষ্ঠদেরকে আযাব দেয়া হবে যাদের প্রতি রসুল প্রেরিত হয়েছিলো। তারা রসুলের মাধ্যমে আল্লাহ্পাকের আদেশ নিষেধ জ্ঞাত হবার পরও পাপকর্ম পরিত্যাগ করেনি বলেই সেখানে শাস্তির উপযুক্ত হবে। আল্লাহ্পাককে একক স্রষ্টা জানার প্রসঙ্গটি অবশ্য ভিন্ন। মানুষকে সাধারণভাবে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, সেই জ্ঞানের যথাচর্চা করলেই তওহীদ বা এককত্বের বিষয়টি আর অনবগত থাকে না।

শেষে বলা হয়েছে 'এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। এ কথার অর্থ তাঁর পরাক্রম অপ্রতিরোধ্য এবং তাঁর প্রজ্ঞা অতুলনীয়। তিনি তাঁর অবিভাজ্য প্রজ্ঞা বলে প্রত্যেক নবীকে প্রত্যাদেশ, মোজেজা এবং ফযীলত দান করেছেন এবং সকল সম্প্রদায়ের নিকট নবী প্রেরণ করেছেন।

ইবনে ইসহাক ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার ইহুদীদের এক দলকে উদ্দেশ্য করে রসুল স. বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমি আল্লাহ্র রসুল। ইহুদীরা বললো, আমরা জানি না। বাগবী লিখেছেন, মক্কার কয়েকজন জননেতা রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, হে মোহাম্মদ, আমরা ইহুদীদের নিকট জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার সম্পর্কে তাদের কিতাবে কোনো কিছু লেখা আছে কিনা? ইহুদীরা বলেছে, এ রকম কিছু তাদের কিতাবে লেখা নেই। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا
ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ○ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا
لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ○ اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ وَكَانَ
ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا
خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا
حَكِيْمًا ○

❐ তোমার প্রতি আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা তিনি জানিয়া শুনিয়া করিয়াছেন। আল্লাহ্ ইহার সাক্ষী এবং ফেরেশ্তাগণও সাক্ষী, এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

❐ যাহারা সত্য-প্রত্যাখ্যান করে ও আল্লাহের পথে বাধা দেয় তাহারা ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়াছে।

❐ যাহারা সত্য-প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও সীমালংঘন করিয়াছে আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে কোন পথও দেখাইবেন না,

❐ জাহান্নামের পথ ব্যতীত; সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে এবং ইহা আল্লাহের পক্ষে সহজ।

❐ হে মানব! রসূল তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্য আনিয়াছে; সুতরাং তোমরা বিশ্বাস কর, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে। এবং তোমরা সত্য-প্রত্যাখ্যান করিলেও আস্মান ও জমিনে যাহা আছে সব আল্লাহেরই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

ইহুদীরা সত্য গোপন করেছে। তওরাত শরীফে রসুল স. সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা অস্বীকার করেছে। সেই গোপন করা সত্যকে প্রকাশ করে দিয়ে আল্লাহ্পাক এখানে জানাচ্ছেন 'তোমার প্রতি আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তিনি জেনে শুনে করেছেন'—এ কথার অর্থ (হে প্রিয় রসুল), আপনার উপর যে

www.eelm.weebly.com

মহাগ্রন্থ কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, সেই কোরআনই আপনার নবুয়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর এই কোরআন তিনি অবতীর্ণ করেছেন জেনে শুনে। 'আনযালাহু বি ইলমিহি' অর্থ জেনে শুনে, বিশেষভাবে জেনে শুনে। এই বিশেষ জ্ঞান অর্থ মহাকালের (অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের) অদৃশ্য জ্ঞান। কে নবুয়ত লাভের উপযুক্ত, কার উপর কিতাব অবতীর্ণ করতে হবে— সে সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান এবং ওই জ্ঞান যার মাধ্যমে মানুষের জীবন যাপন, পানাহার ও বসবাসস্থলের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। ফেরেশতারাও আপনার নবুয়তের সাক্ষী, তারা আপনার সাহায্যকারীও। জেহাদের ময়দানে তারা আপনার সাহায্যের জন্য সমবেত হয়, যেমন বদর যুদ্ধে হয়েছিলো। আল্লাহ্পাকও আপনার সাক্ষী। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। 'অকাফা বিল্লাহি শাহিদা'— এ কথার অর্থ আপনার নবুয়তের পক্ষে কোরআন ও ফেরেশতাদের যে সাক্ষ্য আল্লাহ্পাক উপস্থাপন করেছেন সেই সাক্ষ্যই আপনার জন্য যথেষ্ট। অথবা কথাটির অর্থ হবে এ রকম— কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক সকল মানুষের বিচার করবেন তখন আপনার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণের কোনো প্রয়োজনই হবে না। বিচারক নিজেই যখন আপনার সাক্ষী, তখন অন্য সাক্ষীর প্রয়োজন কী?

এর পরে বলা হয়েছে, ইহুদীরা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (তওরাতের লিখিত রসুল স. পরিচিতি গোপনকারী)। অন্যদেরকেও তারা সত্য গ্রহণে বাধা দেয় (যেমন, তওরাতে রসুল স. সম্পর্কে কিছু লিখা নেই—একথা বলে মক্কার মুশরিকদেরকে তারা সত্য গ্রহণে বাধা দিয়েছে)। এভাবে তারা নিজেরাও ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে। পথচ্যুত করেছে অন্যদেরকেও।

পরে আয়াতে (১৬৮) ইহুদীদের সত্য-প্রত্যাখ্যান ও সীমালংঘনের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্পাক জানাচ্ছেন, তিনি কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোনো পথও দেখাবেন না। এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে 'জাহান্নামের পথ ব্যতীত'—এ কথার অর্থ, অবিশ্বাসী ইহুদীদেরকে তিনি ওই পথই দেখাবেন, যে পথ তার পথিকদেরকে নরকে প্রবেশ করায়। ওই নরকই তাদের চিরস্থায়ী আবাস। তাই ঘোষিত হয়েছে 'খলিদিনা ফিহা আবাদা' (সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে)।

জ্ঞাতব্যঃ 'খলিদিনা' শব্দটি অবস্থাবোধক বিশেষ্য। এর অর্থ চিরস্থায়ী বা অনন্তকাল। অবিশ্বাসীরা যে মুহূর্তে নরকে প্রবেশ করবে ওই মুহূর্তটি থেকে অনন্তকাল ধরে তারা বসবাস করবে নরকাগ্নিতে। তাদেরকে প্রদত্ত চিরস্থায়ী হওয়ার হুকুমটিও একটি চিরস্থায়ী হুকুম। সে হুকুমের কার্যকারিতাও থাকবে অনন্তকাল।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াকানা জালিকা আলাল্লাহি ইয়াসিরা' এ কথার অর্থ তাদেরকে নরকে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র পক্ষে অতি সহজ। উল্লেখ্য যে, অবিশ্বাসীরা যে কোনো সময় ইমান গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ইমান না এনে যদি

www.eelm.weebly.com

কেউ মৃত্যু পর্যন্ত অবিশ্বাসে অটল থাকে, তবে কেবল সেই হবে নরকের চিরস্থায়ী অধিবাসী। তার উপরেই কার্যকর হবে নরকবাসের এই চিরস্থায়ী নির্দেশটি।

আলোচ্য আয়াতগুলোর শেষটিতে এসে আল্লাহ্পাক মানুষকে সত্য পথের দিকে উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। বলেছেন, রসুলকে বিশ্বাস করো। তিনি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্যসহ আবির্ভূত হয়েছেন। যদি বিশ্বাসকে আশ্রয় করো তবে লাভ করবে অনন্ত কল্যাণ। যদি না করো তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্পাক কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুর একক অধিকর্তা। এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (ওয়াকানাল্লাহু আলিমান হাকিমা)। সর্বজ্ঞ বলেই তিনি বিশ্বাসীদের বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। আর তিনি প্রজ্ঞাময় (হাকিম)। তাই তিনি সত্য ও অসত্যকে কখনও একত্র করবেন না। ফলে তাদের পরিণামও এক রকম হবে না।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৭১

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۖ وَلَا تَقُولُوا۟ ثَلَٰثَةٌ ۚ ٱنتَهُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ سُبْحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ ۘ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا

❒ হে কিতাবীগণ, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না ও আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য বলিও। মরিয়ম তনয় ঈসা মসীহ্ আল্লাহের রসূল এবং তাঁহার বাণী যাহা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, ও তাঁহার আদেশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলে বিশ্বাস কর এবং বলিও না যে, 'আল্লাহ্ তিন!' নিবৃত্ত হও, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে। আল্লাহ্ তো একমাত্র ইলাহ্; তাঁহার সন্তান হইবে তিনি ইহার অনেক উর্ধ্বে। আস্‌মান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহেরই; কর্ম-বিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

'হে কিতাবীগণ' বলে এখানে ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করা হয়েছে— কোনো কোনো আলেম এ রকম বলেছেন। এখানে উভয় দলকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি কোরো না। 'গুলু' অর্থ বাড়াবাড়ি করা। ইহুদীরা ছিলো হজরত ঈসার বিরুদ্ধে। তারা হজরত ঈসার

www.eelm.weebly.com

পুতঃপবিত্রা মাতাকে ব্যভিচারিণী বলতো। তাঁর রেসালতের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করতো। এটা ছিলো তাদের চরম বাড়াবাড়ি। অপর পক্ষে, খৃষ্টানেরাও চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি করে ধর্মচ্যুত হয়েছে। হজরত ঈসাকে বলেছে— আল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্র পুত্র।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে খৃষ্টানদেরকে লক্ষ্য করে। তাদের মধ্যে ছিলো চারটি দল—১. ইয়াকুবীয়া, ২. মালাকায়ীয়া, ৩. নাসতুরীয়া এবং ৪. মারকুযীয়া। ইয়াকুবীয়া ও মালাকায়ীয়ারা বলতো ঈসাই আল্লাহ্। নাসতুরীয়ারা বলতো ঈসা আল্লাহ্র পুত্র। আর মারকুযীয়াদের বক্তব্য ছিলো— তিন আল্লাহ্র মধ্যে ঈসা তৃতীয়। বুলেস নামক এক ইহুদী তাদেরকে এই অপবিশ্বাসের শিক্ষা দিয়েছিলো। ইনশাআল্লাহ্! সুরা তওবার তাফসীরে এই প্রসঙ্গটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা আসবে।

'আল্লাহ্র সম্বন্ধে সত্য বলিও'—এ কথার অর্থ তাকে শিরিক মুক্তভাবে বিশ্বাস কোরো। স্বীকার করো যে, তিনি স্ত্রী ও পুত্র পরিগ্রহণ থেকে পবিত্র। তাঁকে শরীর বিশিষ্ট মনে কোরো না। পানাহারের মুখাপেক্ষী বলেও ভেবো না।

ইহুদী ও খৃষ্টান কারো কথাই ঠিক নয়। হজরত ঈসা আল্লাহ্র পুত্রও নন, তিনি মিথ্যাবাদীও নন। তিনি আল্লাহ্র রসুল এবং আল্লাহ্র বাণী (কালিমাতুল্লাহ্)। আর তিনি আল্লাহ্র আদেশ—আল্লাহ্র 'কুন'(হও) আদেশের প্রতিফল। 'হও' আদেশের মাধ্যমে তিনি পিতা ব্যতিরেকেই মানুষ হিসাবে সৃষ্ট হয়েছেন। জন্মলাভ করেছেন সাধ্বী জননীর উদর থেকে। তিনি মানুষ এবং রসুল। তাই তিনি কারো উপাস্য হতে পারেন না। তিনি আল্লাহ্র রূহ্। এখানে তাই বলা হয়েছে 'রূহুম মিনহু'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রূহ্ বা আত্মা। এরকম নয় যে হজরত ঈসা আল্লাহ্র নিজের রূহ্ অথবা আল্লাহ্র নিজের রূহের অংশ। সকল রূহের অধিকারী বা মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ্ই সকল রূহকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এখানে হজরত ঈসাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে 'রূহুম মিনহু' কথাটি বলা হয়েছে 'হও' আদেশের মাধ্যমে। হজরত ঈসার রূহ আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে সরাসরি স্থাপিত হয়েছিলো মাতৃগর্ভে। তাই এই সম্মানিত সম্বোধন।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, হজরত ঈসাকে রূহ বলার কারণ এই যে, তিনি মৃত মানুষকে অথবা মৃত হৃদয়কে জীবিত করে দিতেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে রূহ অর্থ ওই ফুৎকার যা হজরত জিবরাইল, হজরত মরিয়মের প্রতি নিবদ্ধ করেছিলেন। ওই ফুৎকারের ফলেই গর্ভবতী হয়েছিলেন হজরত মরিয়ম। তাই তাঁর উপাধি রূহুল্লাহ্।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে রূহ অর্থ আল্লাহ্র বিশেষ রহমত। তার উপরেই আল্লাহ্র বিশেষ রহমত বর্ষিত হয় যে বিশ্বাসী, নির্দেশ পালনে যত্নশীল। রূহ অর্থ প্রত্যাদেশ (ওহী) —এরকমও বলা যেতে পারে। হজরত মরিয়ম প্রত্যাদেশের মাধ্যমে শুভসমাচার পেয়েছিলেন এবং হজরত জিবরাইল প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই ফুৎকার করেছিলেন। হজরত ঈসার সৃষ্টি সেই ফুৎকারের পরিণাম। 'হও' আদেশটিও একটি প্রত্যাদেশ। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে রূহ অর্থ হজরত

www.eelm.weebly.com

জিবরাইলের সংযোগ 'আলক্বা'র উহ্য কর্তার সর্বনামের সঙ্গে। কর্তা ও ক্রিয়াপদের ব্যবধানের কারণে এ রকম অর্থ গ্রহণীয়। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক তাঁর বাণী (কলেমা) হজরত মরিয়মের দিকে প্রেরণ করলেন। আর আল্লাহ্র হুকুমে বিবি মরিয়মের নিকট সেই কলেমা পৌঁছে দিলেন হজরত জিবরাইল। আল্লাহ্পাক নির্দেশদাতা ও স্রষ্টা। এজন্য নির্দেশদান ও সৃজনের সম্পর্ক আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে। হজরত জিবরাইল সেই নির্দেশ বহনকারী অথবা নির্দেশ বহনের মাধ্যম। তাই নির্দেশবাহী হিসেবে নির্দেশের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত। তাই তিনি রূহুল্লাহ।

হজরত উবাদা বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন— যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে লা শরীক (অবিভাজ্য) জেনেছে, মোহাম্মদ স.কে আল্লাহ্র বান্দা ও রসুল বলে ঘোষণা করেছে, এ কথাও মেনে নিয়েছে যে হজরত ঈসা আল্লাহ্র বান্দা, রসুল এবং কলেমা, যা আল্লাহ্পাক বিবি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছেন—তিনি ছিলেন আল্লাহ্র দিক থেকে মনোনীত রূহ্ (এবং সে এ রকমও বিশ্বাস রাখে যে) বেহেশত ও দোজখ সত্য—তবে তাকে অবশেষে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে, তার আমল যে রকমই হোক না কেনো। বোখারী, মুসলিম। এরপর নির্দেশ করা হয়েছে— 'ফাআমিনু বিল্লাহি ওয়া রসুলিহি ওয়ালা তাক্বুলু ছালাছা।' এ কথার অর্থ তোমরা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করো, রসুলগণকে মান্য করো (যে রসুলগণের মধ্যে রয়েছেন হজরত ঈসাও) এবং 'আল্লাহ্ তিন জন' বলা থেকে বিরত হও।

খৃষ্টানদের বিশ্বাস—আল্লাহ্, বিবি মরিয়ম এবং হজরত ঈসা— তিনজনই আল্লাহ্। এ রকম বিশ্বাস করা এবং বলা স্পষ্টতঃই শিরিক। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক এ বিষয়ে হজরত ঈসাকে যে প্রশ্ন করবেন, প্রত্যাদেশের ভাষায় তা হচ্ছে— হে ঈসা! তুমি কি তাদেরকে বলেছিলে আল্লাহ্ সহ আমাকে ও আমার মাতাকে তোমরা উপাস্য হিসাবে স্বীকার করে নাও'।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, খৃষ্টানেরা কয়েকটি উপদলে বিভক্ত। তাদের ত্রিত্ববাদের (তিন আল্লাহ্র) ধারণাও বিভিন্ন রকমের। এক দলের বিশ্বাস হজরত ঈসাই আল্লাহ্—আল্লাহ্ই হজরত ঈসারূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। আরেক দল মনে করে— আল্লাহ্ পিতা, হজরত ঈসা পুত্র এবং হজরত জিবরাইল পবিত্র আত্মা (রূহুল কুদ্দুস)। আরেক দল বলে আল্লাহ্পাকের সত্তায় দু'টি গুণ ছিলো— এলেম এবং হায়াত (জ্ঞান ও জীবন)। তারপর জ্ঞান স্বস্থান থেকে নেমে এসে শক্তিশালী অবয়ব ধারণ করেছে—যার নাম ঈসা। আর হায়াত বা জীবন হয়েছে হজরত জিবরাইল—এ সকল অপবিশ্বাস থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্পাক। বলেছেন, যদি নিবৃত্ত হও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে।

এরপর দেয়া হয়েছে প্রকৃত বিশ্বাসের বিবরণ। বলা হয়েছে 'সুবহানাহু আঁইয়াকুনা লাহু ওয়ালাদ'— এ কথার অর্থ আল্লাহ্পাকই তো একমাত্র উপাস্য। তাঁর সন্তান রয়েছে—এ রকম ধারণা থেকে তিনি পূতঃপবিত্র। সন্তানধারীরা সকলেই মরণশীল এবং তুল্যমূল্য বিচারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আল্লাহ্ অক্ষয়, অব্যয়, তুলনারহিত—আনুরূপ্য থেকে পবিত্র।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। এটা তাদের জন্য একটি অত্যন্ত অনুচিত কর্ম। তারা আল্লাহ্কে গাল মন্দও করেছে, যা অনভিপ্রেত। তারা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এ কথা বলে যে—আল্লাহ্ আমাদেরকে যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমন করে পুনরায় আর সৃষ্টি করতে পারবেন না। অথচ দ্বিতীয় সৃষ্টির চেয়ে প্রথম সৃষ্টিই কঠিন। আর আমাকে গালমন্দ করার অর্থ এই যে—আদম সন্তান বলে, আল্লাহ্ সন্তান ধারণ করেছেন— অথচ আমি এক, অদ্বিতীয় এবং অমুখাপেক্ষী। আমার সমকক্ষ কেউ নেই। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে, আদম সন্তানের গালমন্দ করার অর্থ হচ্ছে এই—তারা বলে, আমার স্ত্রী সন্তান আছে। অথচ আমি পরিবার পরিজন থেকে পবিত্র। বোখারী।

এরপর বলা হয়েছে আল্লাহ্পাকের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারের কথা। বলা হয়েছে, 'আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই'। সবশেষে বলা হয়েছে 'অকাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা (কর্ম বিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট)। এ কথার অর্থ তিনিই আকাশ পৃথিবীসহ সকল সৃষ্টির শৃঙ্খলা রক্ষাকারী, তত্ত্বাবধায়ক, ব্যবস্থাপক এবং কর্মবিধায়ক। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন (পিতা তার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সন্তানের মুখাপেক্ষী হয়—সে রকম মুখাপেক্ষিতা থেকে তিনি পবিত্র)। ওয়াল্লহু আ'লাম।

বাগবী এবং ওয়াহেদী কালাবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একবার নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদল বললো, হে মোহাম্মদ! আপনারা আমাদের প্রভু ঈসাকে দোষারোপ করে থাকেন। রসুল স. বললেন, কীভাবে? প্রতিনিধিরা বললো, আপনি আমাদের প্রভু ঈসাকে বলেন আল্লাহ্র বান্দা ও রসুল। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র বান্দা হওয়ার মধ্যে লজ্জাজনক কিছু নেই (বরং এর মধ্যেই রয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান)। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৭২

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ

وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ○

❒ মসীহ্ আল্লাহের দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না, এবং ঘনিষ্ট ফেরেশতাগণও নহে; এবং কেহ তাহার দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করিলে এবং অহংকার করিলে তিনি তাহাদের সকলকে তাঁহার নিকট একত্র করিবেন।

আল্লাহ্র বান্দা বা দাস হওয়া কোনো লজ্জাজনক বিষয় নয়। বরং আল্লাহ্র দাসত্বই সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় বিষয়। দাসত্ব বা বন্দেগীর কারণেই আল্লাহ্র প্রিয় পাত্রগণ উচ্চ মর্যাদা লাভ করে থাকেন। আল্লাহ্পাক গুণগত পূর্ণত্বের (সিফাতে

www.eelm.weebly.com

কামালিয়তের) রঙে রঞ্জিত হতে গেলে আল্লাহ্‌র দাসত্ব ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই। যারা আল্লাহ্‌প্রেমিক, আল্লাহ্‌র দাসত্বই তাঁদের জীবনের মূল ব্রত। সুতরাং আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়া লজ্জার বিষয় নয়। আনন্দের বিষয়। তাই আয়াতে বলা হয়েছে ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্‌র দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণও নয়। একদল আলেম এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করতে চান যে, ফেরেশতারা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ, এখানে হজরত ঈসার পর নৈকট্যভাজন ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নস্তরের পর অপেক্ষাকৃত উর্ধ্বস্তরে উন্নিত হওয়াই সাধারণ নিয়ম। তাই সাধারণতঃ নিম্নমর্যাদাধারীর উল্লেখ করার পর তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাধারীর উল্লেখ করা হয়। ভাষার বিবরণরীতি এ রকমই। যেমন—এ বিষয়টিকে জায়েদ হেয় মনে করে না, ওই ব্যক্তিও হেয় মনে করে না যে— জায়েদের চেয়ে উত্তম। এ রকম বলা যায় না যে— ওই কথা বলতে জায়েদ লজ্জিত হয় না, লজ্জিত হয় না তার গোলামও। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, এই আয়াতের বিবরণভঙ্গিটি সে রকম নয়। বরং এখানে এই বিবরণভঙ্গিটির মাধ্যমে ওই দুই বাতিল সম্প্রদায়ের অপবিশ্বাসকে প্রতিহত করাই উদ্দেশ্য—যাদের মধ্যে একদল বলে, হজরত ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র এবং অন্যদল বলে, ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে বরং উর্ধ্বস্তরের উল্লেখের পর নিম্নস্তরের উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— যেমন বলা হয়, শ্রেষ্ঠ নেতারাও বিচারককে ভয় করে, প্রজাসাধারণতো করেই।

বায়যাবী লিখেছেন, নিম্ন থেকে উচ্চ—এ বর্ণনারীতিটি যদি মেনেও নেয়া যায়, তবে এখানে এ কথার অর্থ হবে— সকল ফেরেশতা নয়, কেবল ঘনিষ্ঠ ফেরেশতারা (আরশবাহী ফেরেশতারা) হজরত ঈসা থেকে উত্তম।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে আল্লাহ্‌র দাসত্বকে হেয় জ্ঞান না করার ক্ষেত্রে ফেরেশতারা যে শ্রেষ্ঠ, সে কথা ঠিক নয়। ফেরেশতারা তো দাসত্ব করতে বাধ্য এবং তাঁরা তা করেনও। তাঁরা তাঁদের ইবাদতের সওয়াবও লাভ করে থাকেন। কিন্তু মানুষ ইবাদত করে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে— আল্লাহ্‌র মহব্বতে ও ভয়ে। সুতরাং ফেরেশতা অপেক্ষা মানুষই শ্রেষ্ঠ।

আমরা মনে করি প্রকৃত কথা এই যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে ফেরেশতারা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। তবে মানুষের তুলনায় তাঁদের আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। ফেরেশতারা নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতে রত থাকতে পারেন। কিন্তু মানুষের সে সুযোগ নেই। মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী। অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষা করতে গিয়ে তাকে পানাহার করতে হয়। নিদ্রাভিভূত হতে হয়। প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে হয়। কর্মক্লান্ত হলে শ্রান্তি নিরসনের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করতে হয়। তার উপর রয়েছে স্ত্রীসঙ্গ, পরিবার-পরিজন প্রতিপালন। এতো কিছু করে ইবাদত সম্পাদন করতে হয় তাদেরকে। তাদের পৃথিবীর আয়ুও সংকীর্ণ। আর পৃথিবী মানুষের জন্য একমাত্র ইবাদতের স্থান। পক্ষান্তরে ফেরেশতারা ক্লান্তি শ্রান্তিহীন। রোগ শোক, ও

www.eelm.weebly.com

অন্যান্য বিপদের বালাই তাঁদের নেই। তাঁরা কেউ কারো পতি কিংবা পত্নী নন। তাঁরা অপবিত্রতামুক্ত, অধিক আয়ুর অধিকারী। তাঁদের ইবাদত নিরন্তর, নিরবচ্ছিন্ন, নিখুঁত। আর তাঁরা আল্লাহ্র দাসত্বকে হেয় জ্ঞান করেন না। তবে মানুষ আল্লাহ্র দাসত্বে হেয় জ্ঞান করবে কেনো? আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হজরত ঈসা-ই বা কেনো আল্লাহ্র দাস হওয়াকে লজ্জাজনক মনে করবেন।

খৃষ্টানেরা তাঁকে আল্লাহ্র দাস না বলে আল্লাহ্র পুত্র বলে। তাদের বিভ্রান্তির কারণ এই যে—হজরত ঈসা অলৌকিকভাবে পিতা ব্যতীত কেবল মাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি অন্ধকে দৃষ্টি দান করতেন, কুষ্ঠ রুগীকে নিরাময় করতেন, মৃতকে জীবিত করে দিতেন। কার ঘরে কোন সামগ্রী রয়েছে এবং কে কী পানাহার করে, তাও তিনি বলে দিতে পারতেন। এগুলো ছিলো তাঁর অনন্য মোজেজা, যা আল্লাহ্পাক নবী রসুলগণকে দান করে থাকেন। কিন্তু খৃষ্টানেরা মনে করতো, এ সকল তিনি সম্পাদন করতেন স্বশক্তিবলে। আল্লাহ্র দেয়া মোজেজা হিসেবে নয়। আয়াতে তাদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনার্থে আল্লাহ্পাক তাই জানিয়েছেন, সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়ে বিরতিহীন ইবাদত করা সত্ত্বেও ফেরেশতারা আল্লাহ্র দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করেন না। হজরত ঈসাও করেন না। কীভাবে করবেন? তিনি তো ভালো করেই জানেন— 'আল্লাহ্র দাস' পরিচয়ই সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়।

খৃষ্টানেরা হজরত ঈসার জন্য অনুচিত উচ্চ স্থান নির্ধারণ করেছিলো। তাই আয়াতে হজরত ঈসার পরে ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে করে বুঝা যায় ফেরেশতারাই হজরত ঈসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আগেই বলা হয়েছে ফেরেশতারা অংশত শ্রেষ্ঠ, সামগ্রিকভাবে নয়। হজরত মুসা এবং হজরত খিজিরের ঘটনার মধ্যে এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাঁদের দুই জনের মধ্যে সামগ্রিকভাবে হজরত মুসা এবং অংশত হজরত খিজির শ্রেষ্ঠ। লোকেরা হজরত মুসাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কেউ আছে কি? হজরত মুসা নিরুত্তর রইলেন। আল্লাহ্পাক তখন তাঁকে জানালেন, নিশ্চয়ই আছে। আমার বান্দা খিজির তোমার চেয়ে (অংশত) অধিক জ্ঞানী। হজরত খিজিরের সঙ্গে দেখা করার জন্য হজরত মুসা পথ চলতে শুরু করলেন। সফরসঙ্গীকে বললেন, 'আমি অনবরত চলতে থাকবো যতোক্ষণ না দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে পৌঁছবো'। দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছে তিনি হজরত খিজিরের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁকে বললেন, আমি এই কারণে আপনার সঙ্গ নিতে চাই যে, আপনাকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তা আপনি আমাকে শিক্ষা দিবেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, যারা হজরত ঈসার দাস হওয়াকে হেয় মনে করবে এবং অহংকার করবে তাদের সকলকে আল্লাহ্পাক (কিয়ামতের দিন) একত্র করবেন। এ কথার অর্থ কিয়ামতের দিন তিনি অহংকারী ও অপবিশ্বাসী খৃষ্টানদেরকে একত্র করে শাস্তি দান করবেন।

www.eelm.weebly.com

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ
مِّنْ فَضْلِهٖ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ
جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ۝ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَّيَهْدِيْهِمْ
اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝

❐ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে তিনি তাহাদিগকে পূর্ণ পুরস্কার দান করিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দিবেন; কিন্তু যাহারা হেয় জ্ঞান করে ও অহংকার করে তাহাদিগকে তিনি মর্মন্তুদ শাস্তি দান করিবেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের জন্য তাহারা কোন অভিভাবক ও সহায় পাইবে না।

❐ হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট প্রমাণ আসিয়াছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতিঃ অবতীর্ণ করিয়াছি।

❐ যাহারা আল্লাহে বিশ্বাস করে ও তাঁহাকে অবলম্বন করে তাহাদিগকে তিনি তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করিবেন, এবং তাহাদিগকে সরল পথে তাঁহার দিকে পরিচালিত করিবেন।

শুরুতেই বলা হয়েছে, যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তাদেরকে আল্লাহ্পাক পূর্ণ পুরস্কার দান করবেন। যেমন পুরস্কার দান করবেন হজরত ঈসাসহ তাঁর সকল প্রিয় বান্দাগণকে এবং ফেরেশতাগণকে। কারণ, তাঁরা আল্লাহ্র দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করেন না। বরং 'আল্লাহ্র দাস' পদবীটিই যে সর্বোচ্চ পদবী, সে কথা বিশ্বাস করেন।

'এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী দিবেন'—এখানে যে দানের কথা বলা হয়েছে তাতে ফেরেশতাদের কোনো অংশ নেই। আরো বেশী দান বা অত্যধিক দানের বিষয়টি কেবল মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহ্র প্রিয় দাস তাঁরাই অনুগ্রহের প্রাচুর্য লাভের যোগ্য। কারণ, তাঁরা আল্লাহ্পাক কর্তৃক প্রদত্ত ধর্ম প্রচার করে থাকেন। ফেরেশতারা ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব প্রাপ্ত নন। তাদের হিসাবকিতাব নেই। সওয়াব কিংবা আযাবও নেই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্পাকের প্রিয় বান্দাগণ তাঁদের ইবাদতের উপযুক্ত সওয়াব তো লাভ করবেনই। তদুপরি অত্যধিক অনুগ্রহ হিসেবে লাভ করবেন নৈকট্যের বিভিন্ন মর্যাদা এবং দীদারে এলাহি। শিথিল সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিবরানী প্রমুখ কর্তৃক এসেছে— দোজখের জন্য উপযুক্ত পাপী বান্দাদেরকে সুপারিশ করবেন পুণ্যবান বান্দাগণ। তাঁদেরকে প্রদত্ত সুপারিশ করার অধিকারটিও আল্লাহ্পাকের একটি অত্যধিক অনুগ্রহ।

এরপরে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাকের দাস হওয়াকে যারা হেয় জ্ঞান করবে এবং অহংকার করবে তাদেরকে তিনি মর্ম বিদারক শাস্তি দান করবেন। আল্লাহ্পাক হবেন তাদের প্রতি রুষ্ট। তাই তারা হয়ে পড়বে অভিভাবকহীন ও সহায়হীন। কারণ, আল্লাহ্পাক ব্যতীত অন্য কোনো অভিভাবক নেই। সহায়ও নেই। তাই বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের জন্য তারা কোনো অভিভাবক ও সহায় পাবে না'।

পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে 'তিনি তাদের সকলকে তাঁর নিকট একত্র করবেন'— বিনিময়দানের কথা সেখানে বলা হয়নি। বলা হয়েছে পরের আয়াতে (১৭৩)। একত্র করার পর আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণকে পুরস্কৃত করা হবে— আর শাস্তি প্রদান করা হবে তাদেরকে যারা আল্লাহ্র দাস হওয়াকে হীনকর্ম মনে করে। তাদের শাস্তি হবে দ্বিগুণ। একটি হবে আক্ষেপের শাস্তি। কারণ, তাদের সামনেই আল্লাহ্র বান্দাগণকে পুরস্কার দেয়া হবে এবং দান করা হবে অত্যধিক অনুগ্রহ। এই দৃশ্য দেখে আক্ষেপে জর্জরিত হতে থাকবে তারা। আরেকটি শাস্তি হচ্ছে অভিভাবক ও সহায়হীন অনন্ত দোজখবাস।

আমি বলি, আগের আয়াতে বলা হয়েছে 'মসীহ্ আল্লাহ্র দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণও নয়' —আর এই আয়াতে (১৭৩) বলা হয়েছে 'তিনি তাদেরকে পূর্ণ পুরস্কার দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন'। তেমনি যারা আল্লাহ্র দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে তাদের সকলকে একত্র করার কথা আগের আয়াতে বলে নিয়ে এই আয়াতে বলা হয়েছে তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি বিধানের কথা (এভাবে প্রসঙ্গটির পুনঃবিবরণ বিধৃত করা হয়েছে)।

'হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতিঃ অবতীর্ণ করেছি'—এখানে প্রমাণ (বুরহান) অর্থ রসুল স. কে প্রদত্ত মোজেজাসমূহ অথবা তাঁর পবিত্র অস্তিত্ব। এভাবে 'প্রমাণ এসেছে'— কথাটির অর্থ হবে রসুল স. এর অলৌকিক নিদর্শনসমূহ (মোজেজা) প্রকাশিত হয়েছে অথবা মোহাম্মদ স. কে তোমাদের নিকট রসুল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

'স্পষ্ট জ্যোতিঃ অবতীর্ণ করেছি'—এ কথাটির অর্থ কোরআন অবতীর্ণ করেছি।

'যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে ও তাঁকে অবলম্বন করে তাদেরকে তিনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন'—এখানে দয়া (রহমত) অর্থ জান্নাত এবং সওয়াব, যা তিনি ইমান ও আমলের বিনিময় হিসেবে দান করবেন। এই দানের

www.eelm.weebly.com

ব্যাপারে তিনি অঙ্গীকার করেছেন, যদিও তিনি দান করতে বাধ্য নন। কারণ আল্লাহ্পাক বাধ্যবাধকতা থেকে পবিত্র। মুতাজিলারা বলে থাকে, প্রতিটি পুণ্যকর্মের বিনিময় দান করা আল্লাহ্র উপর ওয়াজিব। কিন্তু তাদের কথা ঠিক নয়।

'অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন'—এখানে অনুগ্রহ বা ফজল অর্থ আল্লাহ্পাকের ওই অনুগ্রহ যা নির্ধারিত সওয়াবের চেয়ে অতিরিক্ত, উন্নত। যেমন, আল্লাহ্পাকের দীদার ও নৈকট্যের মাকামসমূহ।

'তাদেরকে সরল পথে তাঁর দিকে পরিচালিত করবেন' —এখানে 'তাঁর দিকে' অর্থ তাঁর উদাহরণরহিত (বেমেছাল) অস্তিত্বের (জাতের) দিকে। সরলপথ বা 'সিরাতিম মুসতাক্বিম' অর্থ পৃথিবীতে ইসলামের পথ, আধ্যাত্মিক সাধকবৃন্দের (সুফিয়ানে কেরামের) পথ। আর আখেরাতে জান্নাত, দীদার ও নৈকট্যের স্তরসমূহে উপনীত হওয়ার পথ।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় রয়েছে—হজরত ওমর একবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কালালার (সন্তানহীনের) উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধান কী? তাঁর এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নিসা ঃ আয়াত ১৭৬

يَسْتَفْتُونَكَ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَ
اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

❒ লোকে তোমার নিকট পরিষ্কারভাবে জানিতে চায়। বল, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদিগকে আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে জানাইতেছেন, কেহ মারা যাইলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তাহার এক ভগ্নি থাকে তবে তাহার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ, এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তাহার ভাই তাহার উত্তরাধিকারী হইবে, আর দুই ভগ্নি থাকিলে তাহাদের জন্য তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয় থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে এই আশংকায় আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরিষ্কারভাবে জানাইতেছেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

www.eelm.weebly.com

আবু জোবায়েরের মাধ্যমে নাসাঈ বর্ণনা করেছেন— হজরত জাবের বলেছেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। রসুল স. আমার নিকট আগমন করলেন। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি কি আমার বোনদের জন্য আমার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করবো? তিনি স. বললেন, এ রকম যদি করো তবে এটা হবে তাদের প্রতি অনুগ্রহ। আমি বললাম, যদি অধিক করি? তিনি স. বললেন, তবে তা হবে আরো অধিক অনুগ্রহ। এ কথা বলার পর তিনি চলে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, আমার মনে হয় তুমি এই অসুখে মরবে না। আল্লাহ্পাক তোমার এবং তোমার বোনদের সম্পর্কে নির্দেশ অবতীর্ণ করেছেন। তারা পাবে দুই তৃতীয়াংশ। হজরত জাবের আরো বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আমার সম্পর্কে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী লিখেছেন, এই সুরার প্রথম দিকে এ সম্পর্কে যে ঘটনা বিবৃত হয়েছে, হজরত জাবেরের এই ঘটনাটি তা থেকে পৃথক।

আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সহোদর ভাইবোনদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে। হজরত আবু বকরের বর্ণনাসূত্রে সুরার শুরুতে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সহোদর ভাইবোন না থাকলে বৈমাত্রেয় ভাইবোনেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। অভিমতটি ঐকমত্যসম্মত। আয়াতে বলা হয়েছে, 'কেউ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগ্নি থাকে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। আর দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই বোন দু'জনেই থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। এটা ঐকমত্য।

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির বোন একজন থাকলে সে পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক, দুই বা ততোধিক বোন থাকলে পাবে দুই তৃতীয়াংশ— বোনেরা এই অংশ পাবে তখনই যখন পরলোকগত ব্যক্তির অধঃস্তন সন্তান-সন্ততি না থাকবে। যেমন— পৌত্র, পৌত্রী, প্রপৌত্র, প্রপৌত্রী ইত্যাদি। এক বা একাধিক পৌত্র, একজন প্রপৌত্র অথবা কয়েকজন প্রপৌত্রী থাকলে মৃতব্যক্তির ভাই বোনেরা কিছুই পাবে না। এক বা একাধিক কন্যা, কন্যার দিকের কয়েকজন নাতনী অথবা কয়েকজন প্রপৌত্রী থাকলে ভাইবোনেরা হয়ে যাবে 'আসাবা' (যাবিল ফুরুজদের নির্ধারিত অংশ বণ্টনের পর অবশিষ্ট অংশ থেকে যারা মিরাস পায় তাদেরকে বলে আসাবা)। অর্থাৎ কন্যা, পৌত্রী, প্রপৌত্রী তাদের নির্ধারিত অংশ লাভ করার পর অতিরিক্ত অংশ হবে ভাইবোনদের। এমতোক্ষেত্রে ভাইদের আসাবা হওয়া সম্পর্কে হাদিস শরীফে নির্দেশ দান করা হয়েছে। রসুল স. বলেছেন, অংশীদারদের নির্ধারিত অংশ দিয়ে দাও। তারপর যা কিছু অতিরিক্ত থাকবে, তা হবে নিকটতম পুরুষের (ভাইয়ের)। এভাবে ভাই, এক বা একাধিক বোন—এক কন্যা অথবা কয়েকজন কন্যার উপস্থিতিতে আসাবা হবে। রসুল স. বলেছেন, ছেলেদের উপস্থিতিতে বোনদেরকে আসাবা করে দিতে হবে।

শারজীল কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি হজরত আবু মুসা এবং হজরত সুলায়মান বিন রবিয়াকে জিজ্ঞেস করলো, এক লোক তার এক কন্যা, কন্যার কন্যা এবং এক সহোদরা বোন রেখে মারা গিয়েছে। তারপর পরিত্যক্ত সম্পত্তি

www.eelm.weebly.com

বণ্টন হবে কীভাবে? তারা দু'জনেই জবাব দিলেন, অর্ধেক পাবে কন্যা এবং অবশিষ্ট অর্ধেক পাবে বোন (কন্যার কন্যা কিছুই পাবে না)। তাঁরা আরো বললেন, তুমি হজরত ইবনে মাসউদকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। তিনিও এ রকম বলবেন। লোকটি তখন হজরত ইবনে মাসউদের কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইলো। হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, তাদের সিদ্ধান্ত আমি সমর্থন করতে পারি না। আমি তোমাকে ওই কথাই বলবো, যে কথা বলেছেন রসুলুল্লাহ্ স. তা হচ্ছে—কন্যা পাবে অর্ধেক, কন্যার কন্যা পাবে এক ষষ্ঠাংশ—এভাবে তারা দু'জনে পাবে দুই তৃতীয়াংশ এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ পাবে বোন। বোখারী।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কন্যার বর্তমানে বোন হবে আসাবা, সে নির্ধারিত কোনো অংশ পাবে না। তিনি আরো বলেছেন, এই সিদ্ধান্তটি কোরআনে নেই। রসুল স. ও এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। সিদ্ধান্তটি সাহাবায়ে কেরামের সুন্নতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে এবং এর উপর ঐকমত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোরআনে কেবল বলা হয়েছে 'কেউ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তবে সে পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক।'

মাসআলাঃ একজন সহোদর ভাইয়ের উপস্থিতিতে বৈপিত্রেয় ভাইবোন কোনো অংশ পাবে না। কেননা হজরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, সহোদর ভাই একজন অন্য জনের ওয়ারিশ। বৈপিত্রেয় ভাই ওয়ারিশ হয় না। হারেসের মাধ্যমে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, ইবনে মাজা ও হাকেম। হারেস ছিলেন জয়ীফ। কিন্তু তিরমিজি বলেছেন, তিনি ছিলেন ফারায়েজের (উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিদ্যার) আলেম। তাঁর বর্ণনার উপর আমল করা যায়। অর্থাৎ এ ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছে।

মাসআলাঃ একজন সহোদর বোন থাকলে এক বা একাধিক বৈপিত্রেয় বোন পাবে এক ষষ্ঠাংশ—যাতে দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়ে যায়। এভাবে এক কন্যা এবং তার সঙ্গে এক বা একাধিক পৌত্রী থাকলে কন্যা পাবে অর্ধেক এবং পৌত্রী পাবে এক ষষ্ঠাংশ। কিন্তু দুই বোন থাকলে বৈপিত্রেয় বোনেরা কিছুই পাবে না। কেননা সহোদরা বোনেরা ওই সময় পাবে দুই তৃতীয়াংশ। তবে বৈপিত্রেয় বোনদের সঙ্গে তাদের কোনো ভাই থাকলে তাদের ভাইয়ের কারণে তারাও আসাবা হয়ে যাবে এবং 'পুরুষ দ্বিগুণ মহিলা একগুণ'—এ নিয়মে তাদেরকে বণ্টন করে দিতে হবে এক তৃতীয়াংশ।

মাসআলাঃ আলেমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, সহোদর ভাই না থাকলে তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে বৈপিত্রেয়রা। এই আয়াতের 'আখওয়াত' শব্দটির মধ্যে বোনদেরকেও ধরা হয়েছে (সহোদরা ও বৈপিত্রেয়া—সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত)। কিন্তু হাদিস শরীফের মাধ্যমে সহোদরকে বৈপিত্রেয়ের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে ওই হাদিস শরীফের মাধ্যমেই। এভাবে কোরআন ও হাদিসের মিলিত অর্থ গ্রহণ করতে হবে। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, বহুল প্রচারিত হাদিসের প্রেক্ষিতে আমরা বর্ণিত বিধানটি দিয়েছি—যদিও আয়াতে এর উল্লেখ নেই। সকল অবস্থায় এক বোন অর্ধেক এবং দুই বা

www.eelm.weebly.com

ততোধিক বোন হলে দুই তৃতীয়াংশ দিতে হবে। শুধু এক ভাই হলে সে হবে সম্পূর্ণ সম্পদের মালিক। আর তার সঙ্গে একাধিক ভাই বা বোন থাকলে সম্পদ বণ্টিত হবে 'পুরুষ দ্বিগুণ মহিলা একগুণ'— এই নিয়মে। পরলোকগত ব্যক্তির পুত্র অথবা প্রপৌত্র কিংবা প্রপৌত্রী অথবা পিতা কিংবা দাদা থাকলে বৈপিত্রেয় ভাইবোনেরা কিছুই পাবে না। মৃত ব্যক্তির এক বা একাধিক কন্যা বর্তমান থাকলে বৈপিত্রেয়দের উপর ওই বিধান প্রযোজ্য হবে, যে বিধান প্রযোজ্য হয় কন্যাদের বর্তমানে সহোদর ভাইয়ের প্রতি।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে 'তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এই আশংকায় আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন' —এ কথার অর্থ তোমাদেরকে যদি আপন ইচ্ছার উপর চলতে দেয়া হয়, তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ্পাক এ সম্পর্কে তাঁর বিধান সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিচ্ছেন, যাতে তোমরা আপন অভিমত ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্র বিধানকে মেনে নিয়ে পথপ্রাপ্ত হতে পারো। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের সম্মুখে স্পষ্টভাবে সত্য বিধান জানাচ্ছেন। কারণ তোমাদের পথভ্রষ্ট হওয়াকে তিনি পছন্দ করেন না। কুফার আলেমগণের অভিমত এই যে, এখানে 'লা' (না) শব্দটি উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য শব্দটি সহযোগে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবে এ রকম—আল্লাহ্পাক তাঁর বিধানাবলী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াল্লহু বিকুল্লি শাইয়িন আলিম'—এ কথার অর্থ বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। পরলোকগত ব্যক্তির এবং তার উত্তরাধিকারীদের জন্য কোন বিধানটি কল্যাণকর, তা তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন।

হজরত বারা বিন আজিব বলেছেন, সবশেষে অবতীর্ণ সুরা হচ্ছে সুরা বারাআত এবং সকলের শেষে অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে সুরা নিসার এই শেষ আয়াতটি। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সুদ সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সকলের শেষে এবং সর্বশেষ অবতীর্ণ সুরা হচ্ছে সুরা নসর (ইজা জা—আ নাসরুল্লহি ওয়াল ফাতহ্)। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতটি হচ্ছে 'ওয়াত্তাক্বু ইয়াওমান তুরজাউনা ফিহি ইলাল্লহ্ (ওই দিবসকে ভয় করো যে দিবসে তোমরা আল্লাহ্র সমীপে প্রত্যানীত হবে)। এ রকমও বলা হয়েছে যে, সুরা নসর অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. পৃথিবীর বুকে ছিলেন এক বৎসর। আর সুরা নসর অবতীর্ণ হওয়ার ছয় মাস পরে অবতীর্ণ হয়েছে সুরা বারাআত। এই সুরাই সর্বশেষ অবতীর্ণ সুরা। এরপর রসুল স. পৃথিবীতে ছিলেন মাত্র ছয় মাস। বিদায় হজের সময় পথিমধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য সুরার শেষ আয়াতটি। এই আয়াতটির নাম 'সাইফ' (গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ)। এরপর তিনি স. যখন আরাফাতের প্রান্তরে উপস্থিত হলেন তখন অবতীর্ণ হলো 'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দিনাকুম' (অদ্যকার এই দিবসে তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম)। এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলেন একাশি দিন। অতঃপর সুদ সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই সর্বশেষ প্রত্যাদেশটি অবতীর্ণ হওয়ার একুশ দিন পর মহাতিরোধান ঘটেছিলো তাঁর।

www.eelm.weebly.com

সুরা বারাআতের পর রসুল স. এর পৃথিবীর জীবন ছিলো ছয় মাস—বর্ণনাটি একটি ধারণাপ্রসূত বর্ণনা। নবম হিজরীতে রসুলুল্লাহ্ স. হজযাত্রীদের আমির নিযুক্ত করে হজরত আবু বকরকে মক্কায় প্রেরণের পর সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তিনি স. এই সুরার চল্লিশটি আয়াত শিক্ষা দিয়ে হজরত আলীকে হজ যাত্রীদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেনো এই আয়াতসমূহ সমবেত হজযাত্রীদের সম্মুখে পাঠ করা হয়। এ কথার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, সুরা বারাআত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. এর পৃথিবীর হায়াত ছিলো পনেরো মাস অথবা ষোলো মাস।

এ কথাটিও ঠিক নয় যে, রসুল স. সুরা নসর অবতীর্ণ হওয়ার পর এক বৎসর পৃথিবীতে ছিলেন। মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে সুরা নসর পাঠ করতে করতে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন রসুলুল্লাহ্ স.। আর মক্কা বিজিত হওয়ার তিরিশ মাস পর তিনি স. যাত্রা করেছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে।

হজরত ওমর বিন খাত্তাব বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরা বাকারা, সুরা আলে ইমরান এবং সুরা নিসা পাঠ করবে সে আল্লাহ্পাকের নিকট জ্ঞানী বলে বিবেচিত হবে।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۝

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অংগীকার পূর্ণ করিবে। যে সব জন্তুর কথা তোমাদিগকে বলা হইতেছে তাহা ব্যতীত চতুষ্পদ আন্আম তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল, তবে ইহ্রাম রত অবস্থায় শিকারকে বৈধ মনে করিবে না। আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা আদেশ করেন।

'আক্বদুন' অর্থ দৃঢ় প্রতিশ্রুতি, স্বীকারোক্তি, অঙ্গীকার। 'ওয়াফাআ' এবং 'ইফাআ' অর্থ—প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা। দু'টি বস্তু একত্র করার পর সে দু'টোকে পৃথক করা যখন কঠিন হয়ে পড়ে, তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় 'আক্বদুন' বা 'আক্বদ'। আয়াতে বলা হয়েছে, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এ কথার অর্থ—তোমরা আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছো তা অবশ্যই পূর্ণ করবে।

জুজায বলেছেন, সুদৃঢ় অঙ্গীকারের নাম 'আক্বদ'। এখানে 'আউফু বিল উক্বুদ' বলে সুদৃঢ় অঙ্গীকারকে পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। রূহের জগতে সকল রূহ আল্লাহ্পাককে প্রভুপ্রতিপালক হিসেবে স্বীকার করেছিলো। ওই স্বীকারোক্তিসহ

www.eelm.weebly.com

সকল স্বীকারোক্তি এখানে কথিত অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত। হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে স্বীকার করা, রসুল মোহাম্মদ স. এর রেসালতের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান, তাঁর স. বৈশিষ্ট্যাবলী প্রচার প্রসঙ্গে আহলে কিতাবদের কৃত অঙ্গীকার এবং মানুষের ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে আমানত রক্ষাসহ সকল প্রকার মৌখিক ও লিখিত স্বীকারোক্তিসমূহ পূর্ণ করতে হবে। শরিয়ত সকল প্রকার অঙ্গীকারকে পূর্ণ করা অপরিহার্য করে দিয়েছে। হাদিস শরীফে এসেছে— অঙ্গীকার ভঙ্গ করা মুনাফিকদের নিদর্শন। বোখারী ও মুসলিম।

জ্ঞাতব্যঃ উম্মত জননী হজরত আয়েশা বলেছেন, সকল সুরার শেষে নাজিল হয়েছে সুরা মায়িদা। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা যা কিছু হালাল পাও তাকে হালাল মনে করো এবং যা কিছু হারাম পাও তাকে হারাম করে দাও (অর্থাৎ এই সুরার কোনো হুকুম রহিত হয়নি)। আহমদ, নাসাঈ।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর বলেছেন, সুরা মায়িদা এবং সুরা আল ফাতাহ্ সকলের শেষে অবতীর্ণ হয়েছে। আহমদ, তিরমিজি ও হাকেম। বর্ণনাটিকে উত্তম বলেছেন তিরমিজি এবং বিশুদ্ধ বলেছেন হাকেম। হজরত আবু উবাদা থেকে মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী বর্ণনা করেছেন, মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে। তখন রসুল স. ছিলেন উষ্ট্রারোহী। প্রত্যাদেশের ভারে তাঁর উষ্ট্রীটি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। তাই তিনি স. তখন অবতরণ করেছিলেন।

ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রবী বিন আনাস এবং আতিয়া বিন কায়েস উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেন সকলের শেষে অবতীর্ণ হয়েছে সুরা মায়িদা। সুতরাং তোমরা এই সুরায় উল্লেখিত হালালকে হালাল হিসেবে মেনে নাও এবং হারামকে হারাম মনে করে পরিত্যাগ করো। নাসেখ গ্রন্থে আবু দাউদ এবং হাসানের মাধ্যমে ইবনে মুনজির বলেছেন, মায়িদার কোনো অংশ রহিত হয়নি। শা'বীর উক্তিরূপে আবু দাউদ লিখেছেন 'ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু লা তুহিল্লু শায়ায়িরাল্লহি ওয়ালাশ শাহ্রাল হারামা ওয়ালাল হাদ্ইয়া ওয়া লাল ক্বলায়িদা'— দ্বিতীয় আয়াতের এই অংশটি ব্যতীত অন্য কোনো অংশ রহিত হয়নি। আবদ্ বিন হুমাইদও এ রকম বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে হাকেমও এ ধরনের বর্ণনা এনেছেন। তিনি বলেছেন, আরো একটি আয়াতাংশ রহিত করে দেয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে 'ফাইন জাউকা .... ওয়া ওয়ারাদ্দি আনহুম।'

বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে লিখেছেন, মুকাতিল বিন হাব্বান বলেছেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে'—নির্দেশটির মধ্যে যে অঙ্গীকার পূরণের কথা বলা হয়েছে সেই অঙ্গীকার হচ্ছে—কোরআনের আদেশ ও নিষেধ মেনে নেয়া। মুমিন ও মুশরিকদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বা অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং ওই অঙ্গীকার সম্পন্ন করা যা মানুষ একে অপরের সঙ্গে করে থাকে।

এই আয়াত থেকে হানাফিগণ প্রমাণ পেশ করেন যে, ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতার ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব ও স্বীকৃতি) পূর্ণ হয়ে গেলে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা যাবে না। ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউই এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করার অধিকার রাখে না, যদি না তাতে কোনো শর্ত থাকে, যেমন— পণ্য দেখার শর্ত,

www.eelm.weebly.com

পণ্যের মধ্যে ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হলে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে—এ রকম শর্ত। ইমাম মালেকও এ রকম বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, দু'টি ক্ষেত্রে ক্রেতা বা বিক্রেতা তাদের ক্রয়বিক্রয়ের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারবে। একটি হচ্ছে — মালামালের বিবরণ ও বাস্তব অবস্থার মধ্যে যদি বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। আরেকটি হচ্ছে—কথা দেয়া নেয়ার পর ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যদি কেউ সে স্থান পরিত্যাগ করে। হজরত ইবনে ওমর এবং হজরত হাকিম বিন হাজম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, একজন অন্যজন থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয় বিক্রয়ের অঙ্গীকারনামা কার্যকর থাকে। অর্থাৎ স্বীকারোক্তির মজলিশ থেকে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ক্রয় বিক্রয় বাতিল হয় না। স্বীকারোক্তিও পূর্ণ হয় না।

'যে সব জন্তুর কথা তোমাদেরকে বলা হচ্ছে, সেগুলো ছাড়া চতুষ্পদ 'আন্আম' তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো'—এ কথার অর্থ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো বাদে অন্যগুলোর গোশত ভক্ষণ করা তোমাদের জন্য হালাল। এভাবে চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে হারাম ও হালাল— এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। ব্যাকরণ বিদগণের বক্তব্য হচ্ছে— এভাবে সাধারণ কোনো কিছুকে বিশেষ কোনো কিছুর সঙ্গে মিলিত করতে গেলে 'লাম' ব্যবহৃত হয়ে থাকে (বাহিমাতুল আনআম—এখানে বাহিমা ও আনআম কে মিলিত করা হয়েছে 'লাম' সহযোগে)। বায়যাবী ও কাশ্শাফ রচয়িতা বলেছেন, এ ধরনের সম্পর্ক রচিত হয় 'মিন' (মধ্যে) শব্দের মাধ্যমে। যেমন রূপার আংটি (আংটিসমূহের মধ্যে ওই আংটি যা রৌপ্য দ্বারা নির্মিত)। এখানেও তেমনি চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে ওই চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে বৈধ বলা হয়েছে যেগুলো হারাম নয়। এখানে বৈধ করা হলো— বলে ওই সকল চতুষ্পদ জন্তুকে হালাল করা হয়েছে, মূর্খতার যুগের মানুষ যেগুলোকে হারাম করে নিয়েছিলো। যেমন বাহীরা এবং সায়েবা (যে পশুর দুধ নিজেরা পান না করে প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা হয়, ওই পশুকে বলা হয় বাহীরা। আর যে পশু নিজের কাজে না লাগিয়ে দেব দেবীর জন্য ছেড়ে দেয়া হয়, তাকে বলে সায়েবা। কালাবী বলেছেন, এখানে 'বাহিমাতুল আনআম' বলে ওই চতুষ্পদ জন্তুকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো জঙ্গলে বাস করে এবং যেগুলো গৃহপালিত পশুদের মতো তৃণভোজী।

বাগবী লিখেছেন, আবু জুবিয়ানের মাধ্যমে এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বাহিমাতুল আনআম অর্থ হুলুআন (পশুর পেট থেকে প্রসব হওয়া বাচ্চা)। শা'বীও এ রকম বলেছেন। এই ব্যাখ্যানুযায়ী এ কথা বলা যায় যে— কোনো মাদী পশু জবাই করার পর তার পেটে শরীরের গঠন পুরোপুরি হয়েছে— এ রকম মৃত বাচ্চা যদি পাওয়া যায় তবে তা জবাই ছাড়াই ভক্ষণ করা হালাল। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদের অভিমতও এ রকম। ইমাম মালেক এই শর্তটিও জুড়ে দিয়েছেন যে, ওই বাচ্চার শরীরে যদি লোম থাকে। বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, মাতা পশুর জবাইকে তার উদরস্থ শাবকের জবাই ধরে নেয়া হবে। তবে শর্ত এই

www.eelm.weebly.com

যে, ওই শাবকের শরীরের গঠন পুরোপুরি হতে হবে এবং তার শরীরে পশম থাকতে হবে। সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবও এ রকম বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোনো অবস্থাতেই জবাঃ কৃত পশুর বাচ্চা জবাই করা ছাড়া ভক্ষণ করা যাবে না—তার শরীরে পশম থাকুক কিংবা নাই থাকুক। ইমাম শাফেয়ী এবং তাঁর সঙ্গীবৃন্দ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমরা নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা উটনী, গাভী এবং বকরী জবাই করে থাকি। ওগুলোর পেটে বাচ্চা থাকলে সেগুলো কি আমরা ফেলে দেবো না খেয়ে ফেলবো? তিনি স. বললেন, যদি ইচ্ছে হয় তবে খেতে পারো। তার মাতাকে জবাই করাই তাকে জবাই করা। নতুন জবাইয়ের প্রয়োজন নেই। আবু দাউদ, আহমদ।

হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, পশুমাতাকে জবাই করাই তার উদরস্থ শাবককে জবাই করা। আবু দাউদ, দারেমী। হজরত ইবনে ওমর থেকে দারা কুতনী লিখেছেন, জবাইকৃত পশুর পেটের বাচ্চা সম্পর্কে রসুল স. বলেছেন, তার মাকে জবাই করার অর্থ তাকে জবাই করা। তার শরীরে পশম থাক বা না থাক। হাদিসটিকে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন দারা কুতনী এবং বলেছেন, হাদিসের শেষ কথাটুকু হজরত ইবনে ওমরের।

ইমাম শাফেয়ী যুক্তি উপস্থাপন করেছেন এভাবে— পেটের বাচ্চা তার মায়ের অংশ। সে তার মায়ের সঙ্গে সম্মিলিত থাকে। কোনো কিছু দিয়ে কেটে আলাদা না করা পর্যন্ত তাকে পৃথক করা যায় না। মায়ের খাদ্য থেকেই সে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে এবং নিঃশ্বাস নিয়ে থাকে মায়ের নিঃশ্বাসের মাধ্যমে। সুতরাং তার মাকে জবাই করার অর্থ তাকেও জবাই করা। শিকার করার সময় যেমন শিকারকে আঘাত হানা হয়, তেমনি এক্ষেত্রেও তার মাকে আঘাত হানার অর্থ তাকেও আঘাত হানা। ইমাম আবু হানিফা যুক্তি দিয়েছেন, পেটের বাচ্চার রয়েছে স্বতন্ত্র জীবন। মাতার মৃত্যুর পরও তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আর সে স্বতন্ত্র রক্তসম্পন্ন প্রাণী। গোশতকে রক্ত থেকে পৃথক করাই জবাই করার উদ্দেশ্য। মাতা পশুকে জবাই করলে তার শরীর থেকেই কেবল রক্ত প্রবাহিত হয়— তার বাচ্চার শরীর থেকে রক্ত বের হয় না। বিষয়টি শিকার করার সঙ্গেও তুলনীয় হতে পারে না। কারণ, শিকারকে আঘাত করা হলে তার শরীর থেকে কিছু না কিছু রক্ত বের হয়। ওই রক্ত বের হওয়াকেই সম্পূর্ণ রক্ত বের হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। জবাইকৃত পশুর বাচ্চার শরীর থেকে একটুও রক্ত বের হয় না। সুতরাং মাতাকে জবাই করার ফলে ওই বাচ্চা মরে গেলে তা ভক্ষণ করা হারাম হবে। কারণ, কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে মৃত পশু হারাম। জবাইকৃত পশুর পেটের বাচ্চা জবাই ছাড়া ভক্ষণ করা যাবে বলে যে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে, সে হাদিস খবরে আহাদ (একক বর্ণিত)। আর খবরে আহাদ দ্বারা কোরআনের অকাট্য হুকুম অপসারিত করা যায় না। অতএব শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, জবাইকৃত পশুর পেটের বাচ্চাকে জবাই না করলে তার গোশত খাওয়া যাবে না।

www.eelm.weebly.com

'ইল্লা মা ইউত্‌লা আলাইকুম'—এ কথার অর্থ যে সব জন্তুর কথা তোমাদের বলা হচ্ছে সেগুলো ব্যতীত। পরবর্তী আয়াতে সেই সকল হারাম ঘোষিত পশুর বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে মৃত, শুকরের মাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, শ্বাসরুদ্ধ করে মারা পশু, উচ্চস্থান থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণকারী পশু এবং ওই পশু যার কিছু অংশ কোনো বন্য প্রাণী ভক্ষণ করেছে। এগুলোকে 'বাহিমাতুল আনআম' বলা হয়েছে। এর মধ্যে জবাইকৃত পশুর উদরস্থ শাবকের কথা আসে না। যে পশুগুলোকে হারাম করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে— স্বাভাবিকভাবে মৃত অথবা অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে মৃত্যুবরণকারী। আর আয়াতে সেগুলোর স্পষ্ট তালিকা দেয়া হয়েছে। সুতরাং হারাম ঘোষিত পশুগুলোর বিপরীতে যে সকল চতুষ্পদ জন্তু রয়েছে সেগুলোর মধ্যে জবাইকৃত পশুর উদরস্থ শাবক অন্তর্ভুক্ত নয়।

তবে 'এহ্‌রামরত অবস্থায় শিকারকে বৈধ মনে করবে না'—এ কথার অর্থ হজ বা ওমরার এহ্‌রাম পরিহিত অবস্থায় শিকার করা যাবে না। কাশ্‌শাফ প্রণেতা লিখেছেন, 'গইরা মুহিল্লিস্ সইদি' অর্থ— শিকার থেকে বিরত থাকা। তিনি এমনও বলেছেন, যখন শিকার নিষিদ্ধ— তখনও বিভিন্ন চতুষ্পদ জন্তু হালাল, যাতে তোমাদের জন্য বিষয়টি কঠিন না হয়। এরকম ব্যাখ্যা আপত্তিকর। কেননা চতুষ্পদ জন্তুটি হালাল হওয়ার বিষয়টি এহ্‌রামের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বরং চতুষ্পদ পশু সকল অবস্থায় হালাল। এহ্‌রামের অবস্থায় হোক অথবা এহ্‌রামের অবস্থায় না হোক। সে সকল চতুষ্পদ পশু গৃহপালিত হোক অথবা জংগলের হোক। এহ্‌রাম অবস্থায় কেবল জংগলের পশুপাখী শিকার করা নিষেধ বলা হয়েছে। অতএব প্রকৃত অর্থ হবে এই যে, বিভিন্নভাবে মৃত পশু ছাড়া হালাল ঘোষিত পশুসমূহ সকল অবস্থায় হালাল। হারাম কেবল এহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করা। এখানে 'মুহিল্লি' শব্দটিতে সম্মান প্রকাশের জন্য বহু বচনের 'সিগা' ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে আয়াতের প্রকৃত মর্ম হবে এ রকম— 'আমি তোমাদের জন্য বন্য চতুষ্পদ জন্তুকে বৈধ করেছি, কিন্তু এহ্‌রামের অবস্থায় শিকারকে বৈধ করিনি।'

শেষে বলা হয়েছে, 'ইন্নাল্লহা ইয়াহ্‌কুমু মা ইউরিদ।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা আদেশ করেন। অর্থাৎ তিনি যেগুলোকে হালাল করতে চান সেগুলোকে হালাল করে দেন এবং যেগুলোকে হারাম করতে চান সেগুলোকে করে দেন হারাম।

হজরত ইকরামা এবং সুদ্দী থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, হাকাম বিন হিন্দ বিকরী কয়েকটি উটের পিঠে খাদ্যশস্য চাপিয়ে মদীনায় এলো। খাদ্যশস্যগুলো বিক্রয়ের পর সে রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বায়াত গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলো। ফেরার সময় সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাচ্ছিলো। তখন রসুল স. উপস্থিত সাহাবীগণকে বললেন, এই লোকটি অবিশ্বাসের সঙ্গে এলো এবং প্রতারকদের মতো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে গেলো। এরপর সে ইয়ামামায় পৌঁছে

www.eelm.weebly.com

মুরতাদ (ধর্মচ্যুত) হয়ে গেলো। এভাবে রসুল স. এর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হলো। ইয়ামামা থেকে ওই লোকটি তার উটগুলোর উপর কিছু পণ্যসামগ্রী চাপিয়ে মক্কার দিকে রওনা হলো। এই সংবাদ মদীনায় এলে কতিপয় মুহাজির ও আনসার সাহাবী তার পণ্যবাহী বাণিজ্য বহরটি লুণ্ঠন করতে ইচ্ছা করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

বাগবী লিখেছেন, নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, হাতাম সম্পর্কে। তার আসল নাম ছিলো শোরাইহ্ বিন সরিয়ায়ে বিকরী। সে একবার মদীনায় এলো। উটের বহরগুলো একস্থানে রেখে সে একা উপস্থিত হলো রসুল স. এর দরবারে। বললো, আপনি মানুষকে কোন কথার দিকে আহবান করেন? রসুল স. বললেন, আমি মানুষকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' বাক্যটি স্বীকার করতে বলি। আরো বলি নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা এবং জাকাত দেয়ার কথা। সে বললো, উত্তম! কিন্তু আমার সঙ্গে কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রয়েছে, তাদের পরামর্শ ছাড়া আমি কিছু করতে পারবো না। তার এ কথা বলার পূর্বেই রসুল স. সাহাবীগণকে বলেছিলেন, তোমাদের নিকট একটু পরেই রবীয়া গোত্রের এক লোক এসে মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করবে। তাই হলো। শোরাইহ্ মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণের কথা বলে রসুল স. এর দরবার পরিত্যাগ করলো। তখন রসুল স. বললেন, সে এসেছিলো অবিশ্বাসী অন্তর নিয়ে। এখন আবার অঙ্গীকার ভঙ্গকারী হিসেবে পিঠ দেখিয়ে চলে গেলো। শোরাইহ্ মদীনা থেকে চলে যাওয়ার সময় মদীনাবাসীদের কিছু উট ভাগিয়ে নিয়ে গেলো। সাহাবীগণ পশ্চাদ্ধাবন করলেন। কিন্তু তাকে ধরা গেলো না। পরের বছর সে ইয়ামামা থেকে বনী বকরের হাজীদের সঙ্গে হজ করতে চললো। তখন তার সঙ্গে ছিলো অনেক উটের বাণিজ্য বহর। উটগুলোর গলায় সে পট্টি লাগিয়ে চিহ্ন করে দিয়েছিলো। কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! ওই প্রতারকটি হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। নির্দেশ দিন, আমরা তাকে বন্দী করে আনি। রসুল স. বললেন, সে তো কোরবানীর পশু হিসেবে উটগুলোর গলায় পট্টি লাগিয়ে চিহ্নিত করে দিয়েছে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্, আমরা তো মূর্খতার যুগে এ রকম করতাম। রসুল স. কিন্তু তাদেরকে আক্রমণ করার অনুমতি দিলেন না। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

ওয়াহেদী বলেছেন, ইয়ামামা থেকে হাতাম রসুল স. এর খেদমতে মদীনায় এসে উপস্থিত হলো। রসুল স. তাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন। কিন্তু সে ইসলাম কবুল করলো না। উপরোন্ত যাবার সময় মদীনাবাসীদের উট চুরি করে নিয়ে গেলো। পরে যখন তিনি স. কাজা ওমরা আদায়ের জন্য মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন পথিমধ্যে শুনলেন, ইয়ামামার হাজীরা 'লাব্বায়েক' ধ্বনি উচ্চারণ করছে। সাহাবীগণ বললেন, এটা হাতাম ও তার সাথীদের আওয়াজ। হাতাম মদীনা থেকে অপহৃত উটগুলোর গলায় পট্টি লাগিয়ে হজের সময় কোরবানীর উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলো। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ
وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟
عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ○

❑ হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহের নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশুর, গলায় পরান চিহ্ন বিশিষ্ট পশুর এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র-গৃহ-অভিমুখীদের পবিত্রতার অবমাননা করিবে না। যখন তোমরা ইহ্‌রাম মুক্ত হইবে তখন শিকার করিতে পার। তোমাদিগকে মস্‌জিদুল্ হারামে বাধা দেওয়ার জন্য কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সাহায্য করিবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করিবে না। আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ বলেছেন, শায়ায়িরিল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র নিদর্শন) অর্থ— 'মানাসেকে হজ' বা হজের নিয়মাবলী এবং মাওয়াক্বিফ কাবা শরীফের তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে 'সায়ি' এবং আরাফা, মুজদালিফা ও মিনায় কংকর নিক্ষেপ ইত্যাদি। হজের সময় করণীয় অন্য সকল কাজও শায়ের বা আল্লাহ্‌র নিদর্শনের অন্তর্ভূত। যেমন— এহ্‌রাম, তাওয়াফ, মস্তকমুণ্ডন, কোরবানী ইত্যাদি। এ সকল নিদর্শনকে সম্মানিত করার অর্থ হচ্ছে মুশরিকদেরকে অপদস্থ করা। এ কথা প্রমাণ করা যে, কোরবানীর পশু প্রেরণ মুসলমানদের কাজ আর মুশরিকদের কাজ হচ্ছে— হজে বাধা সৃষ্টি করা। এখানে আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে অবমাননা না করার নির্দেশ দিয়ে মুশরিকদের মতো লুণ্ঠনকর্মকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'শায়ায়ির' শব্দটি 'শায়রাতুন' শব্দটির বহুবচন। বিশেষ কোনো চিহ্ন বা নিদর্শনকে শায়রা বলা হয়ে থাকে। হজের নিয়ম পদ্ধতিকে তাই শায়েরে হজ বলা হয়। হজরত আবু উবাইদা বলেছেন, 'শায়ারিল্লাহ্' অর্থ কোরবানীর ওই সকল পশু যা হাজীগণ হজের সময় মক্কায় প্রেরণ করে থাকেন।

ইশয়ারে আলামতের আভিধানিক অর্থ উটের পৃষ্ঠদেশের সর্বোচ্চ অংশকে কোনো প্রকারে চিরে দেয়া, যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়। এই কর্মটিও একটি নিদর্শন (আলামত)। কোরবানী করাই যেহেতু উট প্রেরণ করার উদ্দেশ্য— তাই এভাবে উটের রক্ত প্রবাহিত করাকেও আশয়ারে মানাসেক বলা হয়ে থাকে।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ কোরবানীর পশু হিসেবে উটকে বিশেষ কোনো প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করাকে মাকরুহ্ বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। অন্য ইমামত্রয়ের নিকট এ রকম করা সুন্নত। সাহেবাঈন (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ) ও এ রকম বলেছেন। জমহুরের বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে এসেছে মাতা আয়েশা সিদ্দিকার হাদিসটি, যেখানে বলা হয়েছে, আমি নিজ হাতে রসুল স. এর কোরবানীর পশুদের জন্য কাপড়ের পট্টি বানিয়েছি। তিনি স. ওই পট্টিগুলোকে উটের গলায় পরিয়ে দিয়েছেন। এভাবে সেগুলোকে চিহ্নিত করে মক্কায় পাঠানো হয়েছে। কিন্তু উটগুলো রওয়ানা হওয়ার পূর্বে যে বিষয়গুলো হালাল ছিলো সেগুলো উটের যাত্রার কারণে নিষিদ্ধ হয়নি, অর্থাৎ উটের গলায় লাগানো পট্টিগুলোর কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়নি।

আতীয়ার বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, এহরাম অবস্থায় শিকার কোরো না। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে, যখন এহরাম খুলে ফেলবে তখন শিকার করতে পারবে। এ দু'টি নির্দেশের উদ্দেশ্য একই। এহরাম অবস্থায় শিকার থেকে বিরত থাকা হজের নিয়মাবলীর বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকার একটি অংশ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হেরেম শরীফে হত্যাকাণ্ড কোরো না।

'ওয়ালাশ্‌শাহ্‌রাল হারামা' এ কথার মাধ্যমে সম্মানিত মাসের অবমাননা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— নিষিদ্ধ মাস সমূহে যুদ্ধবিগ্রহ করাকে বৈধ মনে কোরো না। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এ কথার অর্থ নিষিদ্ধ ঘোষিত মাসগুলোকে পরিবর্তন কোরো না। মূর্খতার যুগে মুশরিকেরা তাদের ইচ্ছেমতো সম্মানিত মাস নির্ধারণ করতো। এই অপকর্মকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এখানে। রজব, জিলক্বদ, জিলহজ এবং মহররমকে ইসলামপূর্ব যুগে শাহরুল হারাম বা সম্মানিত মাস বলা হতো। এই মাসগুলোতে সর্বসাধারণকে নিরাপত্তা দেয়া হতো। লুণ্ঠন, যুদ্ধ ইত্যাদি নিষিদ্ধ থাকতো বলে, তখন লোকজন চলাফেরা করতো নির্বিঘ্নে। লুণ্ঠনকারীরা অনন্যোপায় হয়ে একবার তাদের নেতাদের নিকট আবেদন জানালো। এ বছর মহররম মাসকে আমাদের জন্য হালাল করা হোক। এর পরিবর্তে সম্মানিত ও নিরাপদ মাস (শাহরুল হারাম) ঘোষণা করা হোক সফর মাসকে। এভাবে তাদের নিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একেক বছর একেক নিয়মে সম্মানিত মাসের ঘোষণা আসতে শুরু করলো। এই পরিবর্তনকেই এখানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

'ওয়ালাল হাদ্‌ইয়া' অর্থ— কোরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশু। তখনকার যুগে কোরবানীর জন্য মক্কায় প্রেরণ করা হতো উট, গাই ও বকরী। বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'হাদী' অর্থ কোরবানীর পশু—উট, গাই অথবা বকরী। আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্‌র নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও নিদর্শন হিসেবে পুনরায় কোরবানীর পশুর কথা উল্লেখ করে তার অবমাননা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোরবানীর পশু একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। সেই গুরুত্বকে প্রকাশ করার জন্যই পুনরায় এর উল্লেখ এসেছে। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, পুনরায় উল্লেখের মাধ্যমে ওই সকল পশুর কথা বলা হয়েছে, যেগুলো লুণ্ঠনের মাধ্যমে আহরিত।

www.eelm.weebly.com

'ওয়ালাল ক্বলাইদা'— ক্বলাইদা শব্দটি 'ক্বলাদাতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ গলায় পরানো চিহ্নবিশিষ্ট পশু। মূর্খতার যুগে কোরবানীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত কোনো কোনো পশুর গলায় জুতা অথবা কোনো গাছের ডাল ঝুলিয়ে দেয়া হতো, যেনো এগুলো দেখে সকলেই বুঝে নিতে পারে যে, এগুলো কোরবানীর উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে চলেছে।

এখানে বলা হয়েছে 'আল ক্বলাইদা' এর অর্থ— গলায় পরানো চিহ্ন বিশিষ্ট পশু। এগুলোও হাদী'র অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ সম্মানের কারণে এখানে বিষয়টিকে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। আতা বলেছেন, ক্বলাদা বা গলায় পরানো চিহ্ন বলতে বুঝানো হয়েছে গলায় বিশেষ চিহ্ন ধারণকারী মানুষকে। কেননা, মূর্খতার যুগে যারা হেরেম শরীফ থেকে বের হতো তারা তাদের গলায় বৃক্ষের ছাল ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখতো। তারা এ রকম করতো এই কারণে যে, এগুলো দেখে কেউ যেনো তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ না হয়। মুতরাফ বিন শাখির এ রকমই অর্থ গ্রহণ করেছেন। বলেছেন, মক্কায় মুশরিকেরা তাদের গলায় বৃক্ষের ছাল ঝুলিয়ে রাখতো।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে কোরবানীর পশুগুলোকে অবমাননা না করার কথা বল্যাই উদ্দেশ্য ছিলো। কিন্তু বক্তব্যকে বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে গলায় পরানো চিহ্নের অবমাননা না করার কথা। অর্থাৎ গলায় পরানো চিহ্নবিশিষ্ট পশুর অবমাননা করা যাবে না। যেমন অন্য এক আয়াতে রমণীদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য সেখানে উদ্দেশ্য ছিলো রমণীদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দেয়া। কিন্তু নির্দেশকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য সেখানে সৌন্দর্য্য প্রকাশ করাকেও নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। হাদী ও ক্বলাদার অবমাননার অর্থ কোরবানীর উদ্দেশ্যে মক্কায় গমনকারী সকল পশুকে বাধা দান করা।

'ওয়ালা আম্মিনাল বাইতাল হারাম'—এ কথার মাধ্যমে বাইতুল্লাহ্ শরীফ অভিমুখে গমনকারী মানুষের অবমাননা নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ হজযাত্রীদেরকে হত্যা করা যাবে না এবং তাদের মালামাল লুণ্ঠনও করা যাবে না। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, তাদের মক্কাযাত্রার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভ। এখানে অনুগ্রহ (ফজল) অর্থ ব্যবসার মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈধ রিজিক এবং সন্তোষ অর্থ সওয়াব। এভাবে প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায় এ রকম—যারা বৈধ ব্যবসা এবং হজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাচ্ছে তাদেরকে অবমাননা কোরো না।

এখানে হজযাত্রীদের মধ্যে মুশরিক ও মু'মিন উভয় দলই অন্তর্ভূত। কারণ, ওই সময় মু'মিন মুশরিক সকলেই হজ করতো। রসুলুল্লাহ্ স. কাজা ওমরা আদায়ের জন্য মক্কায় যাচ্ছিলেন। হাতামও তখন তার চোরাই উটগুলোকে নিয়ে মক্কায় গমন করছিলো। তখনই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। তাই এর মধ্যে মু'মিন ও মুশরিক দুই দলই জড়িত রয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এই আয়াতের নির্দেশটি কেবল বিশ্বাসীদের প্রতি প্রযোজ্য। কারণ, অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'মুশরিকদেরকে তোমরা যেখানে পাও সেখানেই হত্যা করো।'

www.eelm.weebly.com

'যখন তোমরা এহরাম মুক্ত হবে তখন শিকার করতে পারো'—এই নির্দেশটির মাধ্যমে এহরাম মুক্ত অবস্থায় শিকারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আদেশ নয়। কেউ কেউ বলেছেন, পূর্বের আয়াতে এহরাম অবস্থায় শিকার করতে নিষেধ করা হয়েছিলো। এখানে সেই নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিয়ে শিকারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, এখানে নির্দেশটি একটি অনুমতি, যদিও এখানে ব্যবহৃত হয়েছে আদেশসূচক ক্রিয়ার সিগা। প্রথমে 'কোরো না' বলার পর যদি 'কোরো' বলা হয় তবে সেটি আদেশ না হয়ে অনুমতি হবে। অর্থাৎ 'কোরো' অর্থ হবে করতে পারো। এক স্থানে এরশাদ হয়েছে—'ফাইজা কুদ্বিয়াতুস্ সলাতু ফাংতাশিরু (যখন নামাজ শেষ হয়, তখন তোমরা বের হয়ে পড়ো)। এখানে বের হয়ে পড়ো অর্থ বের হয়ে যেতে পারো। এখানে অবশ্য অনুমতিজ্ঞাপক এই আদেশটি কোনো নিষেধের পরেও আসেনি। এ রকম দৃষ্টান্ত আরো রয়েছে। যেমন—'মা মানায়াকা আন তাস্জুদা ইজ আমার তুকা' (কে তোমাকে সিজদা করতে নিষেধ করলো যখন আমি তোমাকে আদেশ করলাম) — এখানে আমারতুকা (আদেশ করলাম) অর্থ উসুল বিশারদগণের নিকট ইজাব বা কবুল।

'তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে বাধা দেয়ার জন্য কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেনো কখনোই সীমালজ্ঘনে প্ররোচিত না করে।' বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত কাতাদা বলেছেন, এখানে প্ররোচিত না করে কথাটির অর্থ— উত্তেজিত না করে। ফাররা বলেছেন, এখানে 'ক্বওমুন' (কোনো সম্প্রদায়) অর্থ মক্কাবাসী। 'বিদ্বেষ' অর্থ মক্কাবাসীদের প্রতি বিদ্বেষ। ইতোপূর্বে মুসলমানেরা হজ করতে এসেও মক্কায় পৌঁছতে পারেন নি। হুদাইবিয়া প্রান্তরে মুশরিকদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো তাঁদেরকে। সে সময়ে সম্পাদিত চুক্তির একটি শর্তানুযায়ী মদীনায় ফিরে যেতে হয়েছিলো। সেই কারণে মুসলমানদের অন্তরে ছিলো ক্ষোভ ও বিদ্বেষ। সেই বিদ্বেষের কথাই উল্লেখ করে এখানে দেয়া হয়েছে বিদ্বেষের কারণে সীমালজ্ঘন না করার নির্দেশ। ইবনে জারীর লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হুদাইবিয়ার ঘটনার পর। এখানে সীমালজ্ঘন অর্থ যুদ্ধ-বিগ্রহ অথবা লুন্ঠন। হজরত যায়েদ বিন আসলাম থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, ইতোপূর্বে মুশরিকেরা রসুল স. এর হজযাত্রাকে বাধা প্রদান করেছিলো। রসুল স. তখন অবস্থান করছিলেন হুদাইবিয়ায়। ওই সময় পূর্বাঞ্চলের কিছু মুশরিক ওমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে যাচ্ছিলো। তাদেরকে দেখে সাহাবীগণ বললেন, মক্কার মুশরিকেরা যেমন আমাদেরকে বাধা দিয়েছে, তেমনি আমরা এই মুশরিক হজযাত্রীদেরকে বাধা দেবো, যাতে তারাও আমাদের মতো ওমরা করতে না পারে। তাঁদের এহেন মনোভাবের প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

সৎকর্ম ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে'। এখানে আলবির্ অর্থ আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতিপালন এবং তাক্ওয়া অর্থ আত্মসংযম।

www.eelm.weebly.com

'পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরের সাহায্য করবে না'—এখানে পাপ অর্থ নিষিদ্ধ কার্য সম্পাদন। আর 'উদ্উয়ান' অর্থ সীমালঙ্ঘন, জুলুম। অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করা। প্রতিশোধ স্পৃহাকে প্রশ্রয় দেয়া।

হজরত নাওয়াস বি সামআন আনসারী বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'বির' এবং 'ইসমুন' শব্দ দু'টোর অর্থ কী? তিনি স. বললেন, 'বির' অর্থ উত্তম চরিত্র এবং 'ইসমুন' অর্থ ওই খটকা যা তোমাদের মনে সৃষ্ট হয়। এবং যে খটকার কথা লোকে জানুক তা তোমাদের পছন্দ নয়। বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি।

হজরত আবু ছা'লাব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, ওই কথাকে বির্ বলে যে কথা শুনে তোমাদের হৃদয় প্রশান্ত হয় যদিও মুফতীর ফতওয়া ওই কথার বিরুদ্ধে যায়। আহমদ। আমি বলি, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে প্রশান্ত প্রবৃত্তির অধিকারীদেরকে। তারাই প্রশান্ত প্রবৃত্তির অধিকারী যাদের অন্তর মোতমাইন (প্রশান্ত)।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াত্তাকুল্লহা ইন্নাল্লহা শাদিদুল ইক্বব'—আল্লাহ্কে ভয় করো, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর (তাঁর শাস্তি অত্যন্ত ভয়ংকর)।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৩

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

❒ তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মড়া, রক্ত, শূকর মাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু আর গলা চাপিয়া মারা জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু; তবে যাহা তোমরা জবেহ দ্বারা পবিত্র করিয়াছ তাহা ব্যতীত, আর যাহা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় তাহা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এইসব পাপকার্য; আর সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণে

www.eelm.weebly.com

হতাশ হইয়াছে, সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাংগ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করিলাম। তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকিয়া ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হইলে তখন আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছিলো 'ইল্লা মা ইউত্লা আলাইকুম' (যে সব জন্তুর কথা তোমাদেরকে বলা হচ্ছে)—সেই হারাম ঘোষিত জন্তুগুলোর কথা এই আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে, তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মড়া। মড়া অর্থ স্বাভাবিকভাবে মৃত প্রাণী। কিতাবুস্ সাহাবা গ্রন্থে ইবনে মান্দা লিখেছেন, হজরত ইবনে হাইয়ান বিন আল জাবর বলেছেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তখন মৃত পশুর গোশত ভর্তি একটি পাত্রের নিচে আমি আগুন দিয়ে জ্বাল দিচ্ছিলাম। ওই সময় মড়া হারাম হওয়ার এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। আমি তৎক্ষণাৎ গোশতের হাড়িটি উল্টিয়ে দিলাম। বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। কারণ, এটাই হুকুম আহকাম সম্পর্কিত সর্বশেষ আয়াত। হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ সুরা আন'আমের মধ্যে মড়া হারাম করা হয়েছিলো। সুতরাং এ রকম কিছুতেই সম্ভব নয় যে, হারাম ঘোষণার পরেও সাহাবীগণের কেউ মৃত জন্তুর গোশত রান্না করবেন। বরং বলা যেতে পারে যে, হজরত ইবনে হাইয়ানের এই ঘটনাটি হিজরত পূর্ব সময়ের যখন সুরা আনআমের মাধ্যমে মড়া হারাম করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটির সঙ্গে ওই ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই।

'ওয়াদ্দামু' অর্থ রক্ত। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, ওয়াদ্দামু অর্থ প্রবাহিত রক্ত। মূর্খতার যুগে অনেকেই প্রবাহিত রক্ত পান করতো। এখানে সেই রক্ত পানকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

'ওয়া লাহ্মুল খিনজির' অর্থ শূকরের গোশত। শূকরের শরীরের সকল অংশই অপবিত্র। সকল অংশই হারাম। কিন্তু এখানে কেবল গোশত খাওয়া হারাম বলা হয়েছে এ কারণে যে, আহার্য বস্তুর মধ্যে গোশতের ভূমিকাই প্রধান।

'ওয়া মা উহিল্লালি গইরিল্লাহি বিহি'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু। মুশরিকেরা পশু জবাইয়ের সময় চিৎকার করে তাদের কল্পিত লাত ও উজ্জা দেবতার নাম উচ্চারণ করতো। আবু তোফায়েলের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলীকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, রসুল স. কি বিশেষ কোনো অসিয়ত অথবা গোপনীয় কোনো হুকুম রেখে গিয়েছেন? হজরত আলী বললেন, জনসাধারণের উপর প্রযোজ্য নয়— এ রকম কোনো হুকুম আমার উপরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে হ্যাঁ, আমার তলোয়ারের পৃষ্ঠদেশে একটি মূল্যবান লিপি রয়েছে। এ কথা বলে তিনি তলোয়ারের পৃষ্ঠদেশ দেখালেন। দেখা গেলো সেখানে লেখা রয়েছে—ওই লোকের উপর আল্লাহ্র লানত যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর জন্য জবেহ্ করে (জবেহ্ করার সময় আল্লাহ্ নামের সঙ্গে অন্যের নাম যুক্ত করে অথবা কেবল অন্যের নামে জবেহ্ করা)। আল্লাহ্র লানত ওই ব্যক্তির

www.eelm.weebly.com

উপর যে জমিনের চিহ্নরেখা সমূহ চুরি করে। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, চিহ্নসমূহ পরিবর্তন করে অর্থাৎ জমিনের বিভক্ত রেখা গুলোকে পরিবর্তন করে। ওই লোকের উপরও আল্লাহ্‌র লা'নত যে তার আপন পিতাকে লানত করে। ধর্মের মধ্যে নতুন কথা আবিষ্কারকারীর বিরুদ্ধে যে না দাঁড়ায়, তার উপরের আল্লাহ্‌র লানত। মুসলিম।

মাসআলাঃ জবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নামের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, এ রকম নাম উল্লেখ করা মাকরূহ্ — হারাম নয়। যেমন, জবেহের সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠের পর সাথে সাথে কেউ যদি বলে আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান (হে আল্লাহ্, তুমি অমুকের নিকট থেকে এই কোরবানী কবুল করো) — এ রকম বলা। বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ার পরক্ষণে মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ পড়লেও মাকরূহ্ হবে। কিন্তু মিলিয়ে পড়লে হবে হারাম। যেমন, বিস্‌মিল্লাহি ওয়া ইসমিফুলান, বিস্‌মিল্লাহি ওয়া মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্। এ রকম করলে আল্লাহ্‌র নামের সঙ্গে অন্যাকে শরীক করা হয়। তবে জবাইয়ের জন্য পশুকে শোয়ানোর পর বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠের পূর্বে গাইরুল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করাতে দোষ নেই। তেমনি জবেহ্ করার পর কোনো দোয়া অথবা অন্য কোনো বাক্য উচ্চারণ করলে মাকরূহ্ হবে না। এক বর্ণনায় এসেছে, জবেহ্ করার পর রসুল স. বলতেন, 'হে আল্লাহ্, তুমি একে মোহাম্মদ স. এর উম্মতের দিক থেকে কবুল করো— যারা তোমার এককত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে।

'ওয়াল মুনখনিক্বতু' অর্থ শ্বাসরুদ্ধ করে মারা জন্তু।

'ওয়াল মাউকুজাত' অর্থ আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী জন্তু। মূর্খতার যুগের লোকেরা লাঠি ও পাথর দ্বারা পশুকে আঘাত করে মেরে ফেলতো। তারপর তার গোশত খেতো।

'ওয়াল মুতারদ্দিয়াত' অর্থ পতনে মৃত জন্তু। অর্থাৎ উচ্চস্থান থেকে পড়ে গিয়ে কিংবা কূপে পড়ে গিয়ে যে পশু মারা যায়।

'ওয়ান্নাতিহাত' অর্থ শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু। পশুরা সংঘর্ষে লিপ্ত হলে একে অপরকে শিং দ্বারা আঘাত করে। সেই আঘাতে মরে যাওয়া পশুই হচ্ছে শৃংগাঘাতে মৃত পশু।

'ওয়ামা আকালাস্ সাবুউ ইল্লা মা জাক্কাইতুম' — এবং হিংস্র পশুকে খাওয়া জন্তু; তবে যা তোমরা জবেহ্ দ্বারা পবিত্র করেছো। এ কথায় বুঝা যায়, শিকারী জানোয়ার যদি শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে, আর ওই অবস্থায় পশুটি যদি মরে যায়, তবে তার গোশত ভক্ষণ করা যাবে না। তবে মৃত্যুর পূর্বে জবাই করে নিলে তার গোশত খাওয়া যাবে। এখানে জবেহ্ দ্বারা পবিত্র করার কথা বলা হয়েছে। পবিত্র করা বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'তায্‌কিয়াতুন' শব্দটি। সৃষ্টিগতভাবে সকল পশুর রক্ত অপবিত্র। এই অপবিত্রতা দূর করতে গেলে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে জবাই করতে হবে এবং জবাইও করতে হবে শরিয়ত নির্ধারিত নিয়মে—কণ্ঠনালী ও তার কিনারের দু'টি রগ কেটে রক্ত প্রবাহিত করে দিতে

www.eelm.weebly.com

হবে। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. নাওফেল বিন ওয়ারাকা খাজায়ীকে তাঁর উটের পিঠে উঠিয়ে নিয়ে মিনা প্রান্তরে উপস্থিত হলেন এবং সকল হাজীদের সম্মুখে ঘোষণা করলেন, জবেহ্ ও নহর করতে হবে কণ্ঠনালী এবং তার পার্শ্বস্থ রগগুলোর মধ্যে। দারা কুতনীর পদ্ধতিতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জাওজী।

মাসআলাঃ হিংস্র প্রাণী কর্তৃক আহত অথবা ভক্ষিত পশু তখনই হালাল হবে, যখন মরার পূর্বে সেটিকে জবাই করে নেয়া হবে। আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। যদি হিংস্র প্রাণী জখম করার কারণে শিকারের অবস্থা মৃতবৎ হয়ে যায়— তবে ওই অবস্থায় জবেহ্ করলেও সে শিকারের গোশত খাওয়া যাবে না। (মৃতবৎকে মৃতই ধরে নিতে হবে)। মুতারাদ্দিয়া, নাতিহা ও মাউকুজা — এগুলোর হুকুম একই। যদি আঘাত পাওয়ার কারণে জবেহ সদৃশ হয়— তবু ওগুলো খাওয়া হারাম হবে (মরার পূর্বে জবাই করে নিলেও)।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ইল্লা মা জাক্কাইতুম (জবেহ্ দ্বারা পবিত্র করেছো) —এই হুকুমটির সম্পর্ক কেবল হিংস্র প্রাণী কর্তৃক ভক্ষিত পশুর সঙ্গে। কেননা, ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হওয়ার পর নতুন কোনো প্রসঙ্গ এলে তা সর্বশেষ বিষয়টির সঙ্গেই সম্পর্কিত হয় — সকল বিষয়ের সঙ্গে নয়। এখানেও তাই জবেহ্ করার শর্তটি কেবল সর্বশেষে উল্লেখিত হিংস্র পশু ভক্ষিত জন্তুর সঙ্গে যুক্ত। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, প্রহারে, পতনে ও শৃংগাঘাতে মৃত জন্তুদের ব্যাপারে জবেহ করার অবকাশই নেই। বর্ণিত চার অবস্থার প্রাণী জীবিত থাকলেও তা জবেহ করলে হালাল হবে না। হালাল হবে কেবল ওই জন্তু যা হিংস্র পশু কর্তৃক ভক্ষিত হওয়ার পর জীবিত থাকে এবং জীবিত অবস্থায় সেটিকে জবাই করা হয়।

মাসআলাঃ জবেহ করার রগ চারটি — ১. হুলকুম (শ্বাসনালী), ২. মেরী (খাদ্যনালী) এবং দু'টি আদওয়াজ (রক্তনালী)। ইমাম মালেকের মতে চারটি রগ কাটাই জরুরী। ইমাম আহমদের একটি অভিমতও এ রকম। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কেবল শ্বাসনালী এবং খাদ্যনালী কাটলেই চলবে। ইমাম আহমদের দ্বিতীয় অভিমতটিও এ রকম। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যে কোনো তিনটি রগ কাটতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ প্রথমদিকে এ রকমই বলেছেন। পরে তিনি এই মত থেকে সরে গিয়ে বলেছেন — কাটতে হবে শ্বাসনালী, খাদ্যনালী এবং যে কোনো একটি রক্তনালী। এক বর্ণনায় ইমাম মোহাম্মদের অভিমত এ রকম ছিলো বলা হয়েছে। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে — চারটি রগেরই বেশীর ভাগ অংশ কাটতে হবে। আর এক বর্ণনায় তাঁর অভিমতকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে। সকল অবস্থায় ইমাম মোহাম্মদের মূল কথা হচ্ছে — চারটি রগ কাটাই জরুরী। চারটি রগের অধিকাংশ কর্তিত হলেও তাকে সম্পূর্ণ কর্তিত হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। ইমাম আবু ইউসুফের অভিমতের (শ্বাসনালী, খাদ্যনালী এবং যে কোনো একটি রক্তনালী) উদ্দেশ্য এই যে, রক্ত প্রবাহ যেনো নিশ্চিত হয়। তাই তিনি শ্বাসনালী, খাদ্যনালীসহ যে কোনো একটি রক্তনালী

www.eelm.weebly.com

কাটার কথা বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, অধিকাংশকেই সম্পূর্ণ ধরা হয়। কাজেই চারটির মধ্যে যে কোনো তিনটি কাটলেই সবগুলো রগ কাটা হয়েছে মনে করতে হবে। এ রকম করলেই আসল উদ্দেশ্য (রক্ত প্রবাহিত করা) পূর্ণ হয়ে যায়।

মাসআলাঃ রক্ত প্রবাহিত করা যায় এবং রগ সমূহ কাটা যায় — এ রকম যে কোনো অস্ত্র জবাইয়ের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। সে অস্ত্র লৌহ নির্মিত হতে পারে, আবার প্রস্তর নির্মিতও হতে পারে। কিংবা বংশ নির্মিতও হতে পারে। দাঁত নখ এবং শিং দ্বারাও জবাই করা যায়, কিন্তু শর্ত হচ্ছে — এগুলো শরীর সংলগ্ন হওয়া যাবে না। শরীর সংলগ্ন দাঁত, নখ ও শিং দ্বারা জবাই করা নাজায়েয। আরেকটি শর্ত হচ্ছে জবাইয়ের সকল অস্ত্রই ধারালো হতে হবে। ইমামে আজম বলেছেন, শরীর থেকে পৃথক দাঁত, নখ ও শিং দ্বারা জবাই করা মাকরূহ্। অন্য ইমামত্রয় বলেছেন, নাজায়েয — এগুলো দ্বারা জবাই করলেও জবাইকৃত পশু মৃত বলে গণ্য হবে — তাই তার গোশতও খাওয়া যাবে না। হেদায়া।

হজরত রাফে বিন খাদিজ বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! পশু জবাইয়ের জন্য আমাদের কাছে কোনো ছুরি নেই। আমরা কি বাঁশের ছিলকা দিয়ে জবাই করতে পারবো? তিনি স. বললেন, যে অস্ত্রের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করা যায় এবং জবাইয়ের সময় আল্লাহ্র নাম নেয়া হয়, সেই জবাইকৃত পশু হালাল। কিন্তু দাঁত ও নখকে জবাইয়ের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কেননা, দাঁত হচ্ছে হাড় এবং নখ হচ্ছে হাবশীদের ছুরি। বোখারী, মুসলিম। হজরত কাব বিন মালেক বলেছেন, আমার বকরীগুলো চারণ ভূমিতে চরে বেড়াচ্ছিলো। একটি বকরী ছিলো মৃত্যুপথ যাত্রী। আমার এক ক্রীতদাস একটি প্রস্তর খণ্ডকে ধারালো করে নিয়ে ওই বকরীটিকে জবাই করে ফেললো। আমি রসুল স. সকাশে গিয়ে ঘটনাটি জানালাম। রসুল স. বললেন, হালাল। বোখারী। হজরত আদী বিন হাতেম বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল, হঠাৎ শিকার মিলে গেলো। কাছে কোনো ছুরি নেই। এমতাবস্থায় পাথর অথবা লাঠিকে ধারালো করে নিয়ে ওই শিকারকে কি জবাই করতে পারবো? তিনি স. বললেন, রক্ত প্রবাহিত করে দাও -- যে অস্ত্র দ্বারাই হোক না কেনো। কিন্তু জবাই করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করবে। আবু দাউদ, নাসাঈ।

বনী হারেসার এক ব্যক্তির ঘটনা — আতা বিন ইয়াসার বর্ণনা করেছেন এভাবে — উহুদ পাহাড়ের উপরে তার কয়েকটি উষ্ট্রি চরে বেড়াচ্ছিলো। একটি উষ্ট্রি ছিলো মরণোন্মুখ। সে ইচ্ছে করলো, মরার আগেই উটনীটিকে জবাই করতে হবে। কিন্তু তার কাছে কোনো ছুরি ছিলো না। সে তখন একটি লাকড়িকে ধারালো করে নিয়ে উটনীটিকে নহর (জবাই) করলো। রক্ত প্রবাহিত হলো। রসুল স.কে এ কথা জানালে তিনি স. তাঁকে ওই উটনীর গোশত খাওয়ার অনুমতি দিলেন। আবু দাউদ, মালেক। অন্য বর্ণনায় লাকড়ির পরিবর্তে বলা হয়েছে

www.eelm.weebly.com

সাজ্জাজ (সাজ্জাজ উটের পিঠে বোঝা বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়)। ইমাম আবু হানিফা এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, রসুল স. সাধারণভাবে নহর করা পশুর গোশত খাওয়াকে হালাল বলেছেন এবং সাধারণভাবে এ কথাও বলেছেন যে, 'ইহ্‌রিক্বিদ্দাম বিমা শি'তা' (যেভাবে ইচ্ছে রক্ত প্রবাহিত করো) — এ কথায় বুঝা যায় নখ এবং দাঁতও জবাইয়ের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ। অন্য ইমামত্রয় ধরেছেন রসুল স. এর ওই উক্তিটি — 'লাইসা সিননু ওয়াজজুফরু' (দাঁত এবং নখ নয়)। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এ কথার অর্থ ওই দাঁত এবং নখ নয় যা শরীর সংলগ্ন। হাবশীরা হাতের নখ দিয়ে জবাই করতো। তাই রসুল স. বলেছেন, নখ হচ্ছে হাবশীদের ছুরি। তিনি স. দাঁতকে বলেছেন হাড়। সুতরাং দাঁত নয় — এ কথার অর্থ হবে ওই দাঁত যা শানিত নয়।

এটা ঐকমত্য যে, কোনো অবস্থাতেই শরীরলগ্ন দাঁত ও নখকে জবাইয়ের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এভাবে জবাই করলে জবাইকৃত পশু হয়ে যাবে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা পশুর মতো — যা হারাম।

মাসআলাঃ জবাই করার পূর্বে ছুরি ধার করে নেয়া মোস্তাহাব। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক প্রতিটি কাজকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই জবাইও করতে হবে সুন্দর ও সুচারুরূপে। ছুরি ধারালো করে নিতে হবে। যেনো জবাইয়ের পশু কষ্ট কম পায়। হজরত শাদ্দাদ বিন আউস থেকে মুসলিম এ রকম বর্ণনা করেছেন।

মাসআলাঃ উড়ন্ত পাখিকে তীরবিদ্ধ করার পর যদি পাখিটি মাটিতে পড়ে মারা যায়, তবে তা হালাল। শর্ত হচ্ছে মাটিতে বা সরাসরি সমভূমিতে পড়তে হবে। পানিতে, পাহাড়ে অথবা গাছের উপরে পড়ে মারা গেলে হালাল হবে না। তখন তা হবে এই আয়াতে বর্ণিত 'পতনে মৃত জন্তু' তুল্য — যা হারাম। তবে যদি তীরটি পাখির গলায় বা জবাই করার স্থানে লাগে তবে হালাল হবে — যেখানেই পড়ুক না কেনো। এ রকম তীরবিদ্ধ পাখি জবাইকৃত পাখি তুল্য যা হালাল।

'ওয়ামা জুবিহা আ'লান নুসুবি' — এ কথার অর্থ আর যা মূর্তিপূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, কাবা শরীফের আশে পাশে তিন শত সাতটি পাথর ছিলো। মুশরিকেরা সেগুলোকে সম্মান করতো এবং কোরবানীর পশুগুলোকে ওই সকল স্থানে বসিয়ে রাখতো। কেউ কেউ বলেছেন, তিন শত সাতটি পাথর নয়, বরং তিনশত সাতটি মূর্তি ছিলো সেখানে। কাতরাব বলেছেন, এই আয়াতের প্রথমাংশে বর্ণিত 'অমা উহিল্লালি গইরিল্লাহি বিহি (আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু) এবং আলোচ্য বাক্য (আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়) এর উদ্দেশ্য একই। আমি বলি, এ কথা দু'বার যখন উল্লেখ করা হয়েছে তখন মনে করতে হবে উদ্দেশ্য বা বক্তব্যও এখানে দু'রকম। সুতরাং এক্ষেত্রে মুজাহিদ ও কাতাদার বর্ণনাটি বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। তাঁরা বলেছেন, কাবা শরীফের আশে পাশে ছিলো তিন শত সাতটি পাথরের বেদী। মূর্খতার যুগের লোকেরা ওই বেদীগুলোর উপর ইবাদত মনে করে পশু বলি দিতো।

www.eelm.weebly.com

'ওয়া আন তাস্‌তাক্‌সিমু বিল আজলাম'—এ কথার অর্থ, এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা। আজলাম শব্দটি জালমুন শব্দের বহুবচন। এখানে যে জুয়ার তীরের কথা বলা হয়েছে সেই তীরগুলো বাইতুল্লাহ্‌র সেবকের নিকট রক্ষিত থাকতো। তীর ছিলো মোট সাতটি। তীরগুলোর কোনোটির গায়ে লেখা থাকতো 'হাঁ' কোনোটির গায়ে থাকতো 'না।' কেউ সফর, বিবাহ বিষয়ে কী করণীয় তা জানতে চাইলে হোবল নামক সবচেয়ে বড় প্রতিমাটির নিকট হাজির হতো। সেখানে তারা কাবার সেবককে একশত মুদ্রা উপঢৌকন দিতো। সেবক তার তুন থেকে একটি তীর টেনে বের করতো। সেই তীরের গায়ে 'হাঁ' লেখা দেখতে পেলে কল্যাণজনক মনে করে বিবাহ, সফর ইত্যাদি করতো। আর 'না' বিশিষ্ট তীর বের হয়ে এলে অকল্যাণ মনে করে অন্ততঃ এক বৎসরের মধ্যে তারা আর বিবাহ কিংবা সফরে অগ্রসর হতো না। বংশগত ভাগ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে কাউকে নির্বাচন করলে যদি দেখতো, 'হাঁ' লেখা তীর বের হয়েছে, তবে নির্বাচিত ব্যক্তিকে তারা খুব সম্মান করতো। আর 'না' লেখা তীর বের হয়ে এলে তারা মনোনীত ব্যক্তিকে বংশগত কেউ বলে মনেই করতো না। দিয়ত বা রক্তপণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য দেখা দিলেও তারা এভাবে জুয়ার তীর দ্বারা বিষয়টি নিস্পত্তি করতো। হাঁ সূচক হলে পুরোপুরি রক্তপণ দিতো। আর না সূচক হলে পুনরায় ভাগ্য পরীক্ষা করতো এবং তীরের গায়ে যা লেখা থাকতো, সেই মোতাবেক আমল করতো। এই আয়াতের মাধ্যমে জুয়ার তীরের এ রকম ভাগ্য পরীক্ষাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই অপকর্মটিসহ এতোক্ষণ ধরে বর্ণিত সকল অপকর্মগুলো পাপ।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, 'আজলাম' অর্থ কতোগুলো শাদা রঙের তীর— যেগুলোর মাধ্যমে মূর্খতার যুগের লোকেরা ভাগ্য পরীক্ষা করতো। মুজাহিদ বলেছেন, এ কথার অর্থ পারস্যবাসী এবং রোমবাসীদের গুটি, যদ্দারা তারা জুয়া খেলতো। সুফিয়ান বিন ওয়াকিয় বলেছেন, এ কথার অর্থ শতরঞ্জ খেলা। বত্রিশটি মোহর এবং চৌষট্টিটি গুটির মাধ্যমে শতরঞ্জ খেলা হয়। শায়বী প্রমূখ বলেছেন, আরববাসীদের আজলাম এবং অনারবদের গুটি একই নির্দেশের মধ্যে পড়ে।

আমি বলি, ভাগ্য পরীক্ষার জন্য যতোরকম উপকরণ ব্যবহৃত হয়, সে সকল উপকরণই আজলামের অর্ন্তভূক্ত। যেমন পাশা খেলা, ভাগ্য গণনা, বাজি ধরা। এ ধরনের সকল কিছুই ভাগ্য নির্ধারক তীরের মতোই।

হজরত আবুদ্‌ দারদা বলেছেন, রসুল স. বলেন, যে ব্যক্তি গণকের মাধ্যমে কিছু জানতে চায়, ভাগ্য গণনা করে অথবা সফর করার উত্তম সময় জানতে চায়— সেই ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন জান্নাতে দেখা যাবে না। কাবিসা থেকে এই বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন বাগবী। রসুল স. আরো বলেছেন, পাখির নাম, তিন বার তার আওয়াজ অথবা চলাচলের মাধ্যমে ভাগ্য গণনা করা এবং কোনো কাজের উত্তম সময় সম্পর্কে জানতে চাওয়া অথবা প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে হার জিৎ কিংবা কোনো কিছু করা না করার নির্দেশ জানা কুফুরীর (অবিশ্বাসের) অর্ন্তভূক্ত। বিশুদ্ধ সূত্রে এই বর্ণনাটি এনেছেন আবু দাউদ।

www.eelm.weebly.com

আল ইয়াওমা ইয়াইসাল্লাজিনা কাফারু মিন দিনিকুম ফালা তাখ্‌শাও হুম ওয়াখ শাওনি—এ কথার অর্থ আজ সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে, সুতরাং তাদেরকে ভয় কোরো না। শুধু আমাকে ভয় করো। এখানে আল ইয়াওমা বা আজ অর্থ আজকের দিন নয়। বরং এ কথার অর্থ হচ্ছে— এই মুহূর্ত থেকে চিরদিন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে আজ অর্থ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিন। আর এখানে কাফেরদের হতাশ হওয়ার অর্থ এখন থেকে অবিশ্বাসীরা ইসলামের উপরে বিজয় লাভ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ। তাদের আরেকটি চরম নৈরাশ্য এই যে, মুসলমানেরাও আর তাদের ধর্ম ত্যাগ করবে না।

'তাদেরকে ভয় কোরো না'—এ কথার অর্থ হে মুসলমানেরা তোমরা আর এই ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়ো না যে, অবিশ্বাসীরা তোমাদের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের ধর্মকে ধ্বংস করে দেবে।

'শুধু আমাকে ভয় করো' এ কথার অর্থ— আমি তোমাদেরকে সকল ভীতি থেকে নিরাপদ রেখেছি, সুতরাং অন্য সকলের ভয় পরিত্যাগ করো। কেবল ভয় করো আমাকে।

আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দিনাকুম (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম)। এখানে দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দেয়ার অর্থ সকল বিধিবিধানকে চূড়ান্ত করে দেয়া। যেমন — আকায়েদ, ফারায়েজ, ওয়াজিবাত, সুনান, মুসতাহিব্বাত, হালাল, হারাম, মাকরূহাত, মুফসিদাত, ইত্যাদি। মুফসিদাত্ বা বিনষ্টকারীর বিধানও বিভিন্নরূপে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। যেমন, রোজা বিনষ্টকারী, নামাজ বিনষ্টকারী, ক্রয়-বিক্রয় বিনষ্টকারী ইত্যাদি। নসের (কোরআন ও হাদিসের) সুস্পষ্ট বর্ণনার বাইরের বিষয়গুলোও ইজতেহাদের মাধ্যমে জেনে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে ধর্মের পূর্ণতা অর্থ রসুল স. এর চূড়ান্ত মর্যাদা লাভ। যে মর্যাদা পূর্বাপর কারো পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব নয়। তাঁর স.এই পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভের কারণে আল্লাহ্‌পাক তাঁর উম্মতের সকল পাপ মার্জনা করে দিয়েছেন। ক্ষমা করে দিবেন তাদের— ছোট-বড় সকল অপরাধ, রক্তপাত, জুলুম ইত্যাদি। কখনো শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করার পর, কখনো অনুতাপ জর্জরিত তওবার পর, আবার কখনো আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ ফজল বা অনুগ্রহের মাধ্যমে।

হজরত আব্বাস বিন মারদাস বর্ণনা করেছেন, আরাফার দিন বিকেলে রসুল স. তাঁর উম্মতের পাপ মার্জনার জন্য দোয়া করেছেন এবং তাঁর দোয়া গৃহীতও হয়েছে। দোয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌পাক তাঁকে জানিয়ে দিলেন, আমি পারস্পরিক জুলুমকে ক্ষমা করে দিয়েছি। অত্যাচারিত ব্যক্তির প্রতিশোধ আমি অত্যাচারীর নিকট থেকে অবশ্যই গ্রহণ করবো। রসুল স. নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক, আপনি যদি ইচ্ছে করেন তবে অত্যাচারিত ব্যক্তির অত্যাচারের বিনিময়ে তাকে জান্নাতের এক অংশ দিয়ে দিন এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা করে

www.eelm.weebly.com

দিন। কিন্তু তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হলো না। পর দিন সকালে মুজদালিফায় তিনি স. পুনরায় একই প্রার্থনা জানালেন। তখন তাঁর দোয়া কবুল করে নেয়া হলো। তিনি স. মৃদু হাসলেন। হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল, আমরা আপনাকে প্রফুল্লচিত্ত দেখছি। আপনার পবিত্র মুখে লেগে রয়েছে নির্মল হাসির চিহ্ন। অনুগ্রহপূর্বক এর কারণ বর্ণনা করুন। রসুল স. বললেন, আমার দোয়া কবুল হয়েছে বুঝতে পেরে ইবলিস তার মাথায় মাটি মাখতে মাখতে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছে। তার এই দিশেহারা অবস্থা দেখে আমি হেসে ফেলেছি। ইবনে মাজা, বায়হাকী।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতের পর হালাল, হারাম, ফারায়েজ, সুনান, হুদুদ এবং অন্য কোনো বিধি বিধান সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। যদি সন্দেহ করা হয় যে, হজরত ইবনে আব্বাস তো এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, এরপর অবতীর্ণ হয়েছে সুদের আয়াত। তবে আমি তার উত্তরে বলবো, যদি বর্ণনাটির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়েই যায়, তখন বুঝতে হবে, সুদ হারাম হওয়ার হুকুম যদিও এই আয়াতের আগে এসেছে কিন্তু তা অবতীর্ণ হয়েছে সুরা বাকারার শেষ আয়াতটি (২৭৫) অবতীর্ণ হওয়ার পর। হজরত জাবের কর্তৃক বিদায় হজ সম্পর্কিত বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, মূর্খতার যুগের সকল সুদকে রহিত করে দেয়া হলো এবং আমিই প্রথম আমার পিতৃব্য হজরত আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিবের সুদের দাবি পরিত্যাগ করলাম।

'দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম'— এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, কথাটির অর্থ আমি এখন তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম। এবার কোনো মুশরিক তোমাদের সঙ্গে হজ করেনি। তিনি এ রকমও অর্থ করেছেন যে, সকল বাতিল ধর্মের উপর তোমার সত্য ধর্মকে আমি বিজয়ী করে দিলাম এবং শত্রু থেকে চিরনিরাপত্তা দান করলাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বিদায় হজের সময় আরাফা প্রান্তরে জুমার দিন আসরের নামাজের পর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। রসুল স. ওই সময় তাঁর উষ্ট্রির উপরে উপবিষ্ট ছিলেন। ওহীর (প্রত্যাদেশের) ভারে উষ্ট্রিটি তখন মাটিতে বসে পড়েছিলো। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, একবার এক ইহুদী হজরত ওমরকে বললো, হে মুসলমানদের নেতা! আপনাদের কিতাবে চরম সুসংবাদ সম্পর্কিত একটি আয়াত রয়েছে। ওই আয়াতটি যদি আমাদের উপর অবতীর্ণ হতো, তবে আমরা অবতীর্ণ হওয়ার দিনটিকে ঈদ হিসেবে মান্য করতাম। হজরত ওমর বললেন, কোন আয়াত? ইহুদী বললো, 'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দিনাকুম।' হজরত ওমর বললেন, তোমরা জানো, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিনটি কোন দিন ছিলো এবং অবতীর্ণ হওয়ার স্থানটি ছিলো কোথায়? আরাফা প্রান্তরে জুমআর দিবসে উষ্ট্রারোহী অবস্থায় রসুলুল্লাহ্ স. এর উপর আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। হজরত ওমরের কথার মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওই দিবসটি ছিলো দু'টি খুশীর দিবস—একটি জুমআর দিবস এবং অন্যটি আরাফার দিবস।

www.eelm.weebly.com

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, অবতীর্ণ হওয়ার পর এই আয়াতের আবৃত্তি শুনে হজরত ওমর কেঁদে ফেললেন। রসুল স. বললেন, ওমর কাঁদছো কেনো? হজরত ওমর বললেন, হে প্রিয়তম রসুল! এই আয়াত আমাকে কাঁদিয়েছে। এতোদিন আমাদের দ্বীন ছিলো ক্রমঅগ্রসরমান উন্নতির দিকে। কিন্তু আজ পূর্ণতার ঘোষণা দেয়া হলো। তিনি স. বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। উল্লেখ্য যে, এই আয়াতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের সংবাদ। তাই হয়েছিলো। এই ঘটনার একাশি দিন পর এগারো হিজরীর বারোই রবিউল আউয়াল সোমবারে পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে পড়ার পর শেষতম নবী রসুল মোহাম্মদ স. যাত্রা করেছিলেন তাঁর পরম প্রভু প্রতিপালকের সান্নিধ্যে।

'আর আমি তোমাদের উপর পরিপূর্ণ করে দিলাম আমার নেয়ামত রাশি।' আল্লাহ্পাক প্রদত্ত এই নেয়ামতের পূর্ণতা দু'ধরনের — (১). দ্বীনের পূর্ণতা (২) হেদায়েতের পূর্ণতা। বক্তব্য হচ্ছে, দ্যাখো আমার পরিপূর্ণ নেয়ামতের নিদর্শন— তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ। মক্কা বিজয়ও সংঘটিত হয়েছে। বিদূরিত হয়েছে মূর্খতার যুগের তমাসাবৃত নিশীথ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সার্বজনীন শান্তি। এখন নীরবে নির্বিঘ্নে একাকী হজ সমাধা করতে পারে যে কোনো ব্যক্তি।

'আর তোমাদের জন্য মনোনীত করেছি দ্বীন ইসলাম', যা সকল ধর্মের উপর, মনোনীত একমাত্র ধর্ম।

আল্লামা বাগবী লিখেছেন, হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বলেছেন— আমি স্বয়ং রসুল স. কে বলতে শুনেছি, হজরত জিবরাইল আমার নিকট আল্লাহ্পাকের বার্তা পৌঁছিয়েছেন। ইসলাম একটি ধর্ম। আমি তা মনোনীত করেছি আমার নিজের জন্য। দানশীলতা ও উত্তম চরিত্র এই ধর্মের বিশেষত্ব। কাজেই যতোদিন এই ধর্মের বাহক থাকতে চাও, ততোদিন দানশীলতা ও উত্তম চরিত্রের দ্বারাই সম্মান বৃদ্ধি কোরো এই ধর্মের।

'অনন্তর যে ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে যাবে, পাপপ্রবণতা ব্যতীত।' এ আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে আলোচ্য নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর সাথে। মধ্যখানে এমন কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে যেগুলো নিষিদ্ধ বিষয় সমূহের থাকাই সঙ্গত। অর্থাৎ ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও পূর্ণতায় পর্যবসিত করা।

'মাখমাসাতুন' অর্থ শূন্য উদর। 'মুতাজানিফ' অর্থ আকৃষ্ট হওয়া। আয়াতের মর্ম হচ্ছে— যে ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে নিষিদ্ধ বস্তুগুলো ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। উপভোগের নিমিত্তে নয় বরং জীবন ধারণের তাগিদে। সীমাতিক্রম না করে যদি এমতাবস্থায় কেউ নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করে নেয়—

'তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্পাক ক্ষমাশীল করুণাময়।' এ কথার অর্থ— তিনি ক্ষমা করে দিবেন স্বীয় করুণা বশে। বিষয়টি আলোচিত হয়েছে সুরা বাকারায়।

হজরত আবু ওয়াকেদ লাইসি থেকে বাগবী লিখেছেন, এক লোক নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা কখনো কখনো এমন ভূখন্ডে গিয়ে উপস্থিত

www.eelm.weebly.com

হই, যেখানে পানাহারের কোনো ব্যবস্থা থাকে না। তখন কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলে আমাদের জন্য মৃত জন্তু হালাল হবে? তিনি স. বললেন, সকালে যদি তোমরা কোনো কিছু পান না করে থাকো, পর দিনও যদি কিছু পানাহারের ব্যবস্থা না করতে পারো এবং ভূমি খনন করেও যদি কোনো খাদ্যবস্তুর সন্ধান না পাও, তবে মৃত পশু ভক্ষণের অনুমতি পাবে। ওয়াল্লহু আলা'ম।

হজরত আবু রাফে থেকে তিবরানী, হাকেম ও বায়হাকী লিখেছেন, একবার হজরত জিবরাইল রসুল স. এর নিকট আগমন করে দরবারে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রসুল স. অনুমতি দিলেন, কিন্তু হজরত জিবরাইল দরবারে প্রবেশ করলেন না। রসুল স. তখন তাঁর পবিত্র শরীরে চাদর জড়িয়ে নিয়ে বাইরে গিয়ে দেখলেন, হজরত জিবরাইল দরজার পাশে দণ্ডায়মান। রসুল স. বললেন, আমি তো আপনাকে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছি। হজরত জিবরাইল বললেন, আমি তো ওই ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে জীবন্ত কোনো কিছুর প্রতিকৃতি অথবা সারমেয় থাকে। এ ঘটনার পর তিনি স. হজরত আবু রাফেকে নির্দেশ দিলেন মদীনার সকল কুকুর নিধন করো। একটিও যেনো অবশিষ্ট না থাকে। এমন সময় কিছুসংখ্যক লোক উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! এ ধরনের জন্তুগুলোর মধ্যে কোন কোন জন্তু আমাদের জন্য হালাল। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

❑ লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাহাদের জন্য কী কী বৈধ করা হইয়াছে? বল, সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে এবং শিকারী পশু-পক্ষী যাহাদিগকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়াছ যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, উহারা যাহা তোমাদের জন্য ধরে তাহা ভক্ষণ করিবে এবং ইহাতে আল্লাহের নাম লইবে এবং আল্লাহ্কে ভয় করিবে, আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইকরামা বলেছেন, রসুল স. যখন হজরত আবু রাফেকে কুকুর নিধনের নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি মদীনা শহরের সকল কুকুরকে হত্যা করতে করতে শহরের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলেন। হজরত আসেম বিন আদী, হজরত সা'দ বিন হাতাম, হজরত উয়াইমির বিন সায়েদা প্রমুখ

www.eelm.weebly.com

সাহাবী রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্ আমাদের জন্য কী কী হালাল করা হয়েছে? তখন অবতীর্ণ হয়েছে এ আয়াত। হজরত মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, রসুল স. যখন কুকুর নিধনের নির্দেশ দিলেন তখন লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! কোন ধরনের শিকারী কুকুর রাখা আমাদের জন্য হালাল? হজরত আদী বিন হাতেম থেকে শা'বীর মাধ্যমে ইবনে জারীর আরো লিখেছেন, এক ব্যক্তি রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, কুকুরের মাধ্যমে শিকার করা যাবে কি না? তিনি স. নিশ্চুপ রইলেন। তখন অবতীর্ণ হলো এ আয়াত।

হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের থেকে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, হজরত আদী বিন হাতেম তা'ঈ এবং হজরত জায়েদ বিন মুহাল তা'ঈ রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা কুকুর এবং বাজপাখি দ্বারা শিকার করে থাকি। আর জরীহ্ গোত্রের কুকুর নীল গাই ও হরিণ শিকার করে আনে। আল্লাহ্পাক আমাদের জন্য মৃত জন্তু ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন, এখন তাহলে আমাদের জন্য কোন ধরনের শিকার হালাল? এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এ আয়াত। এখানে এমতো প্রশ্ন উত্থাপনের উদ্দেশ্য এই কথা বলা যে, কুকুর দ্বারা আমরা কোন প্রকার উপকার লাভ করতে পারি এবং কুকুরের শিকার করা কোন প্রকার জন্তু খেতে পারি। এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই আয়াতের প্রথমে বলা হয়েছে, 'লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী কী বৈধ করা হয়েছে?' পরক্ষণেই বলা হয়েছে, 'বলো, সমস্ত ভালো জিনিস তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।' এ কথায় বুঝা যায়, পবিত্র বস্তুগুলোকেই আল্লাহ্পাক হালাল করে দিয়েছেন আর নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন অপবিত্র বস্তুগুলোকে।

'ওয়ামা আল্লামতুম মিনাল জাওয়ারিহি' (এবং শিকারী পশু-পক্ষী যাদেরকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছো)। এখানে 'আলজাওয়ারিহি' অর্থ শিকারী পশু অথবা পাখি। যেমন কুকুর, চিতা, বাজ, শুকরা (বাজী ধরার জন্য একপ্রকার শিকারী পাখি), শাহীন এবং শাদা বর্ণের শিকারী পাখি ইত্যাদি।

'জুরুহ্' অর্থ রোজগার করা। যেমন, 'ফুলানুন জারিহাতুন আহ্লাহু' অর্থ অমুক ব্যক্তি তার গৃহবাসীদের জন্য উপার্জন করে। মানুষ হাত-পায়ের মাধ্যমে কাজ করে উপার্জন করে তাই মানুষকে বলা হয় জাওয়ারীহ্। শিকারী পশু-পাখিরাও তেমনি তাদের মালিকের জন্য শিকার করে থাকে। তাই সেগুলোকেও এখানে জাওয়ারেহ্ বলা হয়েছে। অথবা জুরুহ্ অর্থ জখম করা। শিকারী প্রাণীরা শিকারকে জখম করে থাকে। তাই সেগুলোকে বলা হয়েছে জাওয়ারীহ্। শেষোক্ত ব্যাখ্যাটির দিকে লক্ষ্য করে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ এবং অধিকাংশ আলেম বলেছেন, শিকারকে জখম করা শিকারীর জন্য জরুরী। যদি কোনো শিকারী প্রাণী শিকারকে হত্যা না করে গলা চেপে ধরে মেরে ফেলে, তবে তা হবে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা জন্তুর মতো—যা ভক্ষণ করা হারাম। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, শিকারী কর্তৃক শিকারকে জখম করা জরুরী নয়। তাই তাঁর মতে জখম ছাড়াই যদি কোনো

www.eelm.weebly.com

শিকার শিকারীর আক্রমণে মারা যায়, তবে তা হালাল হবে। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, বর্ণিত ব্যাখ্যা দু'টোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যদি 'জুরুহ্' অর্থ উপার্জন ধরে নেয়া হয় অথবা এর অর্থ জখম করা ধরা হয়, তবে সকল অবস্থায় জখমের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী হবে। কেফায়া গ্রন্থে ফখরুল ইসলাম বায়যাবী উল্লেখ করেছেন, যদি 'না' সূচক নির্দেশের মধ্যে উপকার গ্রহণের ব্যাপারে মতোবিরোধ দৃষ্ট হয় এবং ঐকমত্য সম্ভব না হয়, তবে যে কোনো একটি অভিমতকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। আর যদি উপকার গ্রহণের ব্যাপারে কোনো মতোবিরোধ দৃষ্ট না হয়, তবে সবকিছুই গ্রহণ করা যাবে।

একটি সন্দেহঃ এখানে উপার্জন এবং জখম দু'টোকে সাধারণভাবে একাকার করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইমামে আজম এ রকম সাধারণ অর্থ গ্রহণের পক্ষপাতি নন কেনো?

সন্দেহের অপনোদনঃ সাধারণভাবে বহু অর্থ বিশিষ্ট শব্দ বক্তার উভয় প্রকার বক্তব্যকেই প্রকাশ করে যেনো শ্রোতাও নিশ্চিত বুঝতে পারে যে, দু'টো অর্থই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে দু'রকম অর্থ সম্পন্ন বাক্য বলা এবং শোনাকেই বহু অর্থ বিশিষ্ট বাক্য ধরে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু এখানে আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই যে, জাওয়ারীহ্ শব্দটির আসল অর্থ কোনটি। সুতরাং এখানে উপার্জন ও জখম দু'টো অর্থকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা কেবল এখানে সতর্কতার দিকটিকে গুরুত্ব দিয়েছি। বলেছি, জখম জরুরী। অর্থাৎ শিকার হালাল হওয়ার জন্য জবেহ্ অথবা নহর জরুরী হবে। কিন্তু যেখানে এ রকম করা সম্ভব হবে না, সেখানে কোনো অস্ত্র দ্বারা শিকারের শরীরের যে কোনো স্থানে জখম করতেই হবে। যদি শিকারী জানোয়ার তার শিকারের কোনো অঙ্গকে ছিঁড়ে ফেলার পর তার মৃত্যু হয়, তবে তা হালাল হবে—এক বর্ণনানুযায়ী ইমাম আবু হানিফার মত এ রকম। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে তাঁর অভিমত হচ্ছে, এ রকম অঙ্গহীন শিকার মৃত জন্তু তুল্য— যা হারাম। এখানে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু অঙ্গহানি করে রক্তপ্রবাহ করা ঠিক হয়নি। তাই এখানে অঙ্গহানিকেই প্রধান বিবেচ্য বিষয় ধরে নিয়ে মৃত জন্তুটিকে মনে করতে হবে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলা জন্তু। রসুল স. বলেছেন, অস্ত্র দ্বারা রক্ত প্রবাহ করা হলে এবং আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হলে জবাইকৃত পশু হালাল হবে।

তীর দ্বারা শিকার করার ক্ষেত্রে জখম হওয়া জরুরী। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। হজরত আদী বিন হাতেম বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি চেপটা তীর দ্বারা শিকার করি। তিনি স. বললেন, তীর যদি শিকারের শরীরে প্রবেশ করে এবং শিকারের শরীর কেটে যায় তবে সেটিকে খেতে পারবে। আর যদি তীরের চেপটা অংশের আঘাতে শিকারটি মরে যায় তবে সেটিকে খেতে পারবে না (তখন তা হবে প্রহারে মৃত জন্তু তুল্য—যা হারাম)। বোখারী, মুসলিম।

মাসআলাঃ সকল প্রকার শিকারী জানোয়ার দ্বারা শিকার করা সিদ্ধ। ইমাম আবু ইউসুফ বাঘ এবং বাঘের মতো হিংস্রপ্রাণীকে শিকারী বলে গণ্য করেননি।

www.eelm.weebly.com

কেউ কেউ চিলকেও শিকারী বলেন না। আর শুকর দ্বারা শিকার করা কোনোক্রমেই বৈধ নয়। কেননা, শুকর অস্তিত্বগতভাবে অপবিত্র। সুতরাং শুকরের মাধ্যমে কোনো প্রকার উপকার গ্রহণ করা যাবে না। এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

আমি বলি— বাঘ, হিংস্রপ্রাণী এবং চিলকে শিকারী গণ্য না করার কোনো কারণ নেই। এগুলোকেও শিকারের প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। যদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করে তবে এমনিতেই সেগুলো শিকারীর তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাবে। ইমাম আহমদ বলেছেন, ঘোর কালো কুকুরের শিকার হালাল নয়। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মুগাফফাল বলেছেন, রসুল স. বলেন, উম্মতের অন্য পশুর মতো কুকুর যদি একটি উম্মত না হতো, তবে আমি সেগুলোকে মেরে ফেলার ঢালাও নির্দেশ দিতাম। এখন থেকে এতোটুকুই বলি, তোমরা ঘোর কালো কুকুরকে হত্যা করে ফেলো। আবু দাউদ, তিরমজি, দারেমী। হজরত জাবের বলেছেন, রসুল স. আমাদেরকে কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর সেই নির্দেশটি স্থগিত করেছেন এবং বলেছেন— দুই জ্রতে বিশেষ চিহ্নবিশিষ্ট কালো কুকুরকে হত্যা করে ফেলো। নিশ্চয়ই ওগুলো শয়তান। কিন্তু আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির দিকে লক্ষ্য করে জমহুর বলেছেন, সকল প্রকার কুকুরের শিকার হালাল।

'মুকাল্লাবিন' অর্থ শিকারের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। যে ব্যক্তি কুকুরকে শিকার শিক্ষা দেয়, তাকে বলে মুকাল্লাব। শব্দটি এসেছে 'কালবুন' থেকে। কুকুর প্রভুভক্ত প্রাণী। তাই 'কালবুন' শব্দটি 'তাকলিবুন' ক্রিয়ামূল থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ কুকুরকে শিকার শিক্ষা দেয়া। পরবর্তীতে সকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশুর ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, সকল প্রকার হিংস্র প্রাণীই 'কালবুন।' তাই শব্দটি সকল হিংস্রপ্রাণীকে শিকার শিক্ষা দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে— প্রতিটি চিৎকার প্রবণ হিংস্র প্রাণীকে কালবুন বলা হয়।

উত্বা বিন আবু লাহাব রসুল স.কে গাল মন্দ করতো। রসুল স. তার জন্য বদদোয়া করলেন। হে আমার আল্লাহ্, তোমার কুকুরগুলোর মধ্য হতে যে কোনো একটি কুকুরকে (যে কোনো হিংস্র প্রাণীকে) তার উপর চড়াও করে দাও। উত্বা একবার সফরের উদ্দেশ্যে শাম দেশের দিকে যাত্রা করলো। মক্কা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েই সে তার সাথীদেরকে বললো, আমি মোহাম্মদের বদদোয়াকে ভয় করি (তোমরা আমাকে রক্ষা করার ব্যাপারে সতর্ক থেকো)। সাথীরা তাদের সকল অস্ত্র শস্ত্রসহ সব সময় উত্বাকে পাহারা দিতে শুরু করলো। কিন্তু তাদের সতর্ক প্রহরাতেও কোনো কাজ হলো না। একদিন হঠাৎ একটি বাঘ এসে উতবাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। হাকেম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে হজরত আবু আকরাবের মাধ্যমে এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন, এর সনদ বিশুদ্ধ।

'তুআল্লিমুনা হুন্না মিম্মা আল্লামাকুমুল্লহ্' — অর্থ যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এ কথায় বুঝা যায়, সকল জ্ঞানের মতো শিকার করার জ্ঞানও আল্লাহ্পাকই দিয়েছেন। সেই জ্ঞানানুযায়ী শিকারী জন্তুকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শিকারী জন্তুর উপরে থাকতে হবে তার মালিকের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ। মালিক বাধা

www.eelm.weebly.com

দিলে থেমে যাওয়া, ডাকলে ফিরে আসা, শিকারকে আটকে রাখা, শিকারকে নিজে ভক্ষণ না করা—এ সকল কিছু যাতে শিকারী জন্তু যথাযথভাবে মান্য করে, সেই বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। যে শিকারী জন্তু তার মালিকের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণকে যথানিয়মে মান্য করে চলে সেই শিকারীকেই সঠিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী বলে মনে করা যেতে পারে।

আল্লাহ্‌পাকই একমাত্র জ্ঞানদাতা। এলমে তাসাব্বুরি, এলমে তাসদিকি, এলমে বদহি, এলমে নজরি—এ সকল জ্ঞান তিনিই এল্‌কা করে থাকেন। চিন্তা ভাবনা জ্ঞানার্জনের মূল কারণ নয়। মূল কারণ হচ্ছে, এলকা হওয়া। ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোনো বিষয়ে চিন্তা ভাবনার পর আল্লাহ্ প্রদত্ত এলকার সাহায্য ছাড়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। জ্ঞানের স্তরান্তর ও ক্রমবিকাশ আল্লাহ্‌তায়ালার অদৃশ্য সাহায্যের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে চলে। তাই এ কথাটি অবশ্য মান্য যে, আল্লাহ্‌পাকই জ্ঞান দাতা।

কুকুরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার নিয়মপদ্ধতি আল্লাহ্‌পাক কোরআনে উল্লেখ করেননি। হাদিস শরীফের মাধ্যমেও এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়নি। বিষয়টি শরিয়তের জ্ঞানের মধ্যেও পড়ে না। কিন্তু এ কথাটি অবশ্য স্বীকার্য যে, আল্লাহ্‌পাকই সকল জ্ঞানের অধিকারী। তিনি না দিলে কোনো জ্ঞানই অর্জন করা সম্ভব নয়। সে জ্ঞান দর্শনের মাধ্যমেই হোক অথবা শ্রুতির মাধ্যমে হোক। পরীক্ষা নিরীক্ষা, অনুমান, উপমা, অনুসন্ধিৎসা, যুক্তিপ্রমাণ—এ সকল কিছু জ্ঞানের উপকরণ, কারণ অথবা মাধ্যম—প্রকৃত জ্ঞান নয়। চেতন, অবচেতন, অধিচেতন– যে কোনো অবস্থায় জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা হোক না কেনো, আল্লাহ্‌পাক দান না করা পর্যন্ত নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় না। মনীষা, অন্তর্দৃষ্টি, সজ্ঞা, আত্মবিনাশন— এ সকল কিছু জ্ঞানার্জনের মোক্ষম উপকরণ মাত্র, যেগুলোর মাধ্যমে অভিজ্ঞানের অসীম আকাশে উড়াল দেয়া যায় কিংবা ডুব দেয়া যায় প্রজ্ঞার অতলস্পর্শী জলধির অন্তর্তরঙ্গে। কিন্তু প্রাপ্তির নিশ্চিতি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। সত্তাগতভাবে সকল সৃষ্টি এক প্রকার সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী। এ জ্ঞান আল্লাহ্ই দিয়েছেন। এর সঙ্গে বিশেষ জ্ঞানও আল্লাহ্ই দিয়ে থাকেন।

'ফাকুলু মিম্মা আমসাকনা আলাইকুম' (তারা যা তোমাদের জন্য ধরে তা ভক্ষণ করবে) —এ কথার অর্থ তোমরা ওই শিকার ভক্ষণ করতে পারো, যাকে তোমাদের শিকারী পশু ধরেছে। কিন্তু নিজে ভক্ষণ করেনি। এই ব্যাখ্যাটি সংকলিত হয়েছে হজরত আদী বিন হাতেম থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এই মর্মে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, যদি তোমরা বিস্‌মিল্লাহ্ বলে তোমাদের শিকারী কুকুরকে ছাড়ার পর সে কোনো শিকারকে জীবিত পাকড়াও করে তবে তোমরা সেটিকে জবাই করে খেতে পারবে। যদি শিকারী কুকুর সেটিকে হত্যা করে নিজে কোনো অংশ ভক্ষণ না করে, তবে ওই শিকারকেও তোমরা খেতে পারবে। আর যদি কুকুর তার কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তবে তোমরা সেটিকে খেয়ো না। তখন বুঝতে হবে কুকুর নিজে খাওয়ার জন্য শিকারটিকে ধরেছে। বোখারী, মুসলিম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে— রসুল স. বলেন, কুকুর ও বাজপাখিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আল্লাহ্‌র নামে সেগুলোকে তোমরা শিকারের জন্য ছেড়েছো। তাই

www.eelm.weebly.com

তাদের পাকড়াও করা শিকার তোমরা ভক্ষণ করতে পারবে। হজরত আদী বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! যদি তারা শিকারকে হত্যা করে ফেলে। তিনি স. বললেন, হত্যা করে ফেললেও। তবে শর্ত হচ্ছে শিকারীর কোনো অংশ যেনো তারা না খায়। যদি খায় তবে তোমরা খেয়ো না। কারণ, ওই শিকার তারা নিজেদের জন্য ধরেছে। আবু দাউদ ও বায়হাকী এ বর্ণনাটি এনেছেন মোজলেদ থেকে। মোজলেদ বর্ণনা করেছেন শা'বী থেকে। বায়হাকী লিখেছেন, মোজলেদের বর্ণনায় রয়েছে কেবল বাজপাখির কথা। অন্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় রয়েছে কেবল কুকুরের কথা। বাজপাখির কথা সেগুলোতে নেই। হজরত আদী বর্ণিত হাদিসের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, শিকারী পশুপাখি যদি শিকার করা পশুর কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তবে ওই শিকার ভক্ষণ হালাল হবে না।

ইমাম আহমদও এই বক্তব্যটির সমর্থক। ইমাম শাফেয়ী সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। তার মধ্যে বিশুদ্ধতর বর্ণনাটি এই বক্তব্যটির অনুরূপ। বাগবী লিখেছেন— আতা, তাউস, শা'বী, সাওরী এবং ইবনে মোবারকও এ রকম বলেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এ রকম বর্ণিত হয়েছে। আলেমগণ লিখেছেন, শিকারী কুকুরকে পর পর তিনবার শিকারের জন্য ছাড়তে হবে। তিন বারই যদি সে শিকারকৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ না করে, তবে তাকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বলা যাবে। ওই কুকুর দ্বারা চতুর্থবার শিকার ধরে খাওয়া জায়েয হবে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, ইমামে আজম তৃতীয়বার ধৃত শিকার খাওয়াকেই জায়েয বলেছেন। ইমাম মালেক বলেছেন, শিকারী কুকুর যদি শিকারের গোশত খেয়েও ফেলে, তবুও তা হালাল। এক বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, ইমাম শাফেয়ীও এ রকম বলেছেন। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর, হজরত সালমান ফারসী এবং হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের অভিমতও এ রকম ছিলো। হজরত আমর বিন শোয়াইবের পিতামহের বর্ণনায় রয়েছে, আবু ছা'লাবা নামক এক ব্যক্তি রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর রয়েছে। সেটিকে দিয়ে আমি শিকার করাই। রসুল স. বললেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার খেতে পারো। আবু ছা'লাবা বললেন, জবাই করে, না, না জবাই করে? তিনি স. বললেন, যেভাবে খুশী। আবু ছা'লাবা বললেন, যদি কুকুর তার কিছু অংশ খেয়ে ফেলে? তিনি স. বললেন, তবুও। আবু দাউদ।

আমি বলি, বায়হাকী হাদিসটিকে মোয়াল্লাল বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং হজরত আদী বিন হাতেমের হাদিসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কেও একমত হয়েছেন। হজরত আদী এবং মোজলেদের বর্ণনা অনুসারে যে সকল শর্ত শিকারী জন্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত, সে সকল শর্তই প্রযোজ্য হবে শিকারী পাখিদের বেলায়। কোনো কোনো ফিকাহ্‌বিশারদগণের মাসআলা এ রকমই। ইমাম আবু হানিফার নিকট শিকারী জন্তু কর্তৃক শিকারের গোশত ভক্ষণ করা না করার প্রসঙ্গটি শিকারী পাখির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ, শিকারী পাখি আঘাত সহ্য করতে পারে না। কিন্তু হিংস্র চতুষ্পদ জন্তু আঘাত সহ্য করতে পারে। আবদ বিন হুমাইদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— যদি কুকুর তার শিকারকৃত প্রাণীর কিছু অংশ

www.eelm.weebly.com

খেয়ে ফেলে, তবে তোমরা ওই শিকার খেয়ো না। কিন্তু শুকরা পাখি যদি তার শিকারকৃত প্রাণীর কিছু অংশ খায়, তবে তার বাকী অংশ খাওয়া যাবে। কারণ এই যে, কুকুর আঘাত সহ্য করতে পারে। কিন্তু শুকরা পাখি পারে না।

এই সিদ্ধান্তটির মধ্যে এ রকম সন্দেহ অনুচিৎ যে, কোরআন ও হাদিসের বিপরীতে এটি একটি কিয়াসী দলিল যা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, কোরআনের মধ্যে এমন কোনো শব্দ নেই যদ্বারা শিকারী জন্তু কর্তৃক শিকারভূত জন্তুর গোশত খাওয়া নিষেধ বুঝা যায়। বরং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা যা তোমাদের জন্য ধরে তা ভক্ষণ করবে'। এখানে শিকারের কিছু অংশ না খাওয়ার কোনো উল্লেখই নেই। অবশ্য হাদিস শরীফের মাধ্যমে এ রকম শর্তের কথা বলা হয়েছে। আর মোজলেদের একক বর্ণনাটির মধ্যে এসেছে বাজ পাখির কথা— যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তা হাদিস ও কিয়াসের বিরুদ্ধে।

'ওয়াজকুরুস্ মাল্লহি আলাইহি' (এতে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে) —এ কথার অর্থ তোমরা যখন শিকারী জানোয়ারকে শিকারের জন্য ছাড়বে তখন বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে নেবে। অতএব কুকুর, বাজপাখি, ইত্যাদি শিকারের জন্য ছাড়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া জরুরী। ঠিক তেমনি তীর নিক্ষেপের সময়ও বিসমিল্লাহ্ পড়া জরুরী— যেমন জবাই করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া জরুরী। জবাইয়ের সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে হয় ছুরি বা যে কোনো ধারালো অস্ত্র ধরে। আর শিকারের সময় করতে হয় তীর বা শিকারী জন্তু ছেড়ে। এইভাবে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে হবে প্রতি জবাইয়ের এবং প্রতি শিকারের প্রাক্কালে। যদি কোনো ছাগলকে শোয়ানো অবস্থায় বিস্‌মিল্লাহ্ বলে জবাই করতে গিয়েও জবাই না করে, ওই বিস্‌মিল্লাহ্‌র মাধ্যমে যদি অন্য কোনো ছাগল জবাই করে, তবে তা নাজায়েয হবে। কিন্তু কোনো পাখিকে শিকারের উদ্দেশ্যে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে তীর ছুড়লে যদি ওই তীর বিদ্ধ হয়ে অন্য পাখি মারা যায় তবে তা হালাল হবে। যদি কোনো বকরীকে শুইয়ে একটি ছুরি হাতে নিয়ে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে জবাই করতে গিয়েও জবাই না করে হাতের ছুরি ফেলে দেয় এবং অন্য একটি ছুরি হাতে নিয়ে জবাই করে তবে তা হালাল হবে। যদি একটি তীর ছোঁড়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে, তারপর ওই তীর না ছুঁড়ে যদি অন্য একটি তীর ছোঁড়ে তবে দ্বিতীয় তীরবিদ্ধ শিকার হালাল হবে না। বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে হয় জবাই করার সময়। শিকারের ক্ষেত্রে এ রকম সম্ভব নয় বলে, শিকারী জন্তু ছাড়ার সময় অথবা তীর নিক্ষেপের সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়লেই যথেষ্ট হবে। এভাবে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে শিকারী জন্তু এবং তীর ছাড়ার পর যদি শিকার জীবিত অবস্থায় হাতে এসে পড়ে, তবে পুনরায় সেটিকে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে জবাই করা ওয়াজিব হবে। পুনঃ জবাই না করলে ওই শিকার হালাল হবে না। ধৃত শিকার মৃতপ্রায় হলেও জবাই করতে হবে। এ রকম অবস্থায় জবাই না করলে এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু হানিফার মত হচ্ছে— হালাল নয়। দ্বিতীয় বর্ণনানুসারে হালাল। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম শাফেয়ীও এ রকম বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, জবাই করা সম্ভব অথচ জবাইয়ের অস্ত্র হাতের কাছে না থাকার কারণে যদি জবাই না করতে পারে, তবে তা হালাল হবে না। আর যদি জবাই করা সময় না পাওয়া যায় তবে তা হালাল হবে। ইমাম আবু হানিফাও এ রকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন এর বিপরীত।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ শিকারী জন্তু অথবা তীর ছোঁড়ার সময় যদি স্বেচ্ছায় বিস্মিল্লাহ্ ছেড়ে দেয়, জবাই করার সময় ইচ্ছে করে বিস্মিল্লাহ্ পাঠ না করে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সঙ্গে যদি অপ্রশিক্ষিত কুকুর অথবা অগ্নিপূজকদের কুকুর কিংবা বিস্মিল্লাহ্ পাঠ ছাড়া ছেড়ে দেয়া কুকুর একত্রিত হয়, তবে ওই শিকার খাওয়া হালাল নয়। কারণ, শিকার হালাল হওয়ার জন্য আয়াতে যে শর্তগুলো এসেছে সেগুলো এক্ষেত্রে লংঘিত হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, 'ওয়ালা তাকুলু মিম্মা লাম ইয়াজকুরিস্মাল্লহ্' (যার উপর আল্লাহ্র নাম উল্লেখ করা হয়নি তাকে ভক্ষণ কোরো না)। হজরত আদী বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আমার কুকুর ছেড়ে দেই। তখন কখনো কখনো অন্যের কুকুর মিলিত হয়ে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রসুল স. বললেন, এভাবে শিকার করলে খেয়ো না। কেননা, তুমি তোমার কুকুর ছাড়ার সময় বিস্মিল্লাহ্ পড়েছো ঠিকই কিন্তু তুমি তো অন্যের কুকুরের বেলায় বিস্মিল্লাহ্ পড়োনি। বোখারী ও মুসলিম। হজরত আদী আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আমাকে বলেছেন, তুমি তোমার কুকুর ছাড়ার সময় আল্লাহ্র নাম নাও। এরপর তোমার কুকুর যদি কোনো শিকারকে জীবন্ত ধরে ফেলে, তবে তুমি সেটিকে জবাই করে খেতে পারবে। আর শিকারকে যদি এমনভাবে মৃত অবস্থায় পাও যে, কুকুর তার কোনো অংশ খায়নি— তবুও তুমি সেই শিকার খেতে পারবে।

জ্ঞাতব্যঃ হাদিস শরীফের মাধ্যমে এই নির্দেশগুলো এসেছে যে— শিকারী কুকুর তার শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেললে ওই শিকার তোমরা খেয়ো না। কেননা, বুঝতে হবে শিকারী জন্তু ওই শিকার ধরেছে তার নিজের জন্য। তোমাদের বিস্মিল্লাহ্ পড়ে ছেড়ে দেয়া কুকুরের সঙ্গে যদি অন্য কুকুর মিলিত হয়ে কোনো শিকারকে হত্যা করে, তবে সেই শিকার তোমরা খেয়ো না। কারণ, তোমরা এ কথা জানো না যে, কোন কুকুরটি হত্যাকারী। আর বিস্মিল্লাহ্ পড়ে তীর ছোঁড়ার পর তীরবিদ্ধ শিকার একদিন পর মৃত অবস্থায় হস্তগত হলে যদি তাতে তোমার তীরের চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোনো চিহ্ন নেই দেখতে পাও, তবে তা খেতে পারবে।

আর যদি তুমি শিকারকে পাও পানিতে ডুবন্ত অবস্থায়, তবে খেয়ো না। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু ছা'লাবা খাশানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা বিস্মিল্লাহ্ বলে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে যে শিকার হস্তগত করেছো, সেই শিকার খেতে পারবে। বিস্মিল্লাহ্ বলে প্রশিক্ষিত কুকুরের মাধ্যমে যে শিকার পাবে তাকেও খেতে পারবে। আর প্রশিক্ষিত কুকুরের মাধ্যমে জীবিত শিকার পেলেও তা জবাই করে খেতে পারবে। বোখারী, মুসলিম।

মাসআলাঃ জবাইয়ের সময় বিস্মিল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলে জবাইকৃত পশু হালাল হবে না—এ রকম বলেছেন, ইমাম আহমদ। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হালাল হবে। ইমাম মালেকও এ রকম বলেছেন। মালেকিয়া নামক গ্রন্থেও এ রকম বলা হয়েছে। ইমাম আহমদের একটি অভিমতও অনুরূপ। তাঁর দ্বিতীয় অভিমতটি এ রকম— জবাইয়ের সময় বিস্মিল্লাহ্ পড়তে ভুলে গেলে

www.eelm.weebly.com

হালাল হবে; কিন্তু শিকারী জন্তু ছাড়ার সময় এবং তীর নিক্ষেপের সময় ভুলে গেলে হবে হারাম। তাঁর তৃতীয় অভিমত হচ্ছে—তীর নিক্ষেপের সময় বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়ার কথা ভুলে গেলে শিকার হালাল হবে। কিন্তু কুকুর ও চিতা ছাড়ার সময় ভুলে গেলে হারাম হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সকল অবস্থায় বিস্‌মিল্লাহ্‌ পাঠের কথা ভুলে গেলে হালাল হবে। এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকের অভিমতও এ রকম। আবুল কাশেম মালেকীও এ রকম বলেছেন। যদি বিস্‌মিল্লাহ্‌ ইচ্ছাকৃতভাবে তরক করে অথবা পড়তে ভুলে গিয়ে থাকে—জবাইয়ের সময় হোক অথবা কুকুর ও তীর ছাড়ার সময়— কিন্তু কুকুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। প্রশিক্ষণদাতা মুসলমান হোক অথবা কিতাবী— যদি অপ্রশিক্ষিত কুকুর হয় কিংবা অগ্নিউপাসকের কুকুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে শিকার করে তবে সে শিকার হারাম হবে।

সাধারণ নিয়ম এই যে, বিস্‌মিল্লাহ্‌ না পড়লে জবাই বা শিকার হালাল হয় না। হজরত আয়েশার হাদিসে রয়েছে, কতিপয় লোক রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রসুলাল্লাহ্‌! কেউ কেউ আমাদের নিকট গোশত নিয়ে আসে। আমরা জানিনা যে, জবাই করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলা হয়েছিলো কিনা। তিনি স. বললেন, তোমরা বিস্‌মিল্লাহ পড়ে খেয়ে নিও। হজরত আয়েশা বলেছেন, মূর্খতার যুগ দেখছি এখনো যায় নি। বোখারী।

হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে রয়েছে, এক ব্যক্তি নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের কেউ কেউ জবাই করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলতে ভুলে যায়। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র নাম প্রত্যেক মুসলমানের মনে থাকে। দারা কুতনী।

হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কেউ যদি জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ্‌ পাঠ করতে ভুলে যায়, তবে পরে পাঠ করে নিবে এবং বিসমিল্লাহ্‌ বলে খেয়ে নিবে। দারা কুতনী। হজরত সলত্‌ বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, মুসলমানের জবাই হালাল। বিসমিল্লাহ্‌ বলুক কিংবা নাই বলুক। আবু দাউদ এই হাদিসটি তার মারাসিল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। বায়হাকী এ হাদিসটি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে লিখিতভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদিসটির সূত্র পরম্পরায় দুর্বলতা রয়েছে। বিশুদ্ধ কথা এই যে, হাদিসটি আসলে হজরত ইবনে আব্বাসের নিজস্ব মতামত।

বর্ণিত হাদিসগুলো পর্যালোচনান্তে বলা যেতে পারে যে, প্রথমোক্ত হাদিসে বিসমিল্লাহ্‌ পাঠের কথা বলাই হয়নি। দ্বিতীয় হাদিসের সূত্রসংযুক্ত মারওয়ান বিন সালেম সম্পর্কে ইমাম আহমদ বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। নাসাঈ এবং দারাকুতনীও তাকে পরিত্যক্ত বলেছেন। তৃতীয় হাদিসের এক বর্ণনাকারী মা'কাল অখ্যাত।

চতুর্থ বর্ণনাটি মুরসাল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদিসে ভুলে বিস্‌মিল্লাহ্‌ বাদ পড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। সুতরাং তা ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের সহায়ক নয়। চতুর্থ হাদিসে ভুলে বিসমিল্লাহ্‌ বাদ পড়ার জন্য হালাল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। হেদায়া প্রণেতা লিখেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ্‌ ছেড়ে দিলে হালাল হবে— এ

www.eelm.weebly.com

রকম কথা ঐকমত্যবিরোধী। আর ইমাম শাফেয়ীর পক্ষ থেকেও এ রকম বলা হয়নি। ভুলে বিসমিল্লাহ্ বাদ পড়ে গেলে হালাল হবে কিনা সে সম্পর্কে সলফে সালেহীনের মধ্যেই মতবিরোধ ছিলো। ভুলবশতঃ বাদ পড়ে গেলেও হারাম হবে— এ রকম বলেছেন হজরত ইবনে ওমর। আর হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আলী বলেছেন, হালাল হবে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ্ পরিত্যাগ করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এক্ষেত্রে ইজতেহাদের কোনো সুযোগ নেই। আর যদি বিচারক (কাযী) এ ধরনের জবাইকৃত পশু বিক্রয়কে জায়েয বলে, তবে তার অভিমত গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, এই অভিমত ঐকমত্যের বিরুদ্ধে।

মাসআলাঃ গৃহপালিত পশুকে জবাই করা জরুরী। জঙ্গলের উট, গাই ইত্যাদিকে জখম করে দিলেই চলবে। যে বকরী উদভ্রান্ত হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যায়, তাকেও জখম করে দিলে হালাল হবে। আর উদভ্রান্ত বকরী যদি জঙ্গলে না গিয়ে লোকালয়ে বিচরণ করে, তবে তাকে জবাই করা জরুরী হবে। অর্থাৎ আওতার বাইরে চলে গেলে জখম এবং আওতার মধ্যে থাকলে জবাই—এই নিয়মই সকলক্ষেত্রে প্রতিপালনীয়। তাই জঙ্গল থেকে ধরে আনার পর কোনো পশু গৃহপালিত পশুর মতো হয়ে গেলে সেটিকেও করতে হবে জবাই। কারণ তা আওতার মধ্যে চলে এসেছে। জমহুরের অভিমত হচ্ছে, কোনো চতুষ্পদ জন্তু কুয়ার মধ্যে পড়ে গেলে সেটিকে জবাই করা যদি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তবে জখম করে দেয়া যাবে। ইমাম মালেক বলেছেন, গৃহপালিত পশুকে নিয়মানুযায়ী জবাই করতে হবে অর্থাৎ তার খাদ্যনালী ও রক্তনালী কর্তন করতে হবে। এ রকম না করলে ওই পশু পালিয়ে গিয়ে অরণ্যবাসী হয়ে যেতে পারে। তখন তাকে ধরা বা জখম করাও সহজ হবে না।

হজরত রাফে বিন খাদিজের হাদিসটি আমাদের অভিমতের দলিল, যেখানে বলা হয়েছে আমরা গণিমতের মাল হিসেবে কয়েকটি উট পেলাম। ওগুলোর মধ্যে একটি জঙ্গলের দিকে দৌড়াতে শুরু করলো। তখন এক ব্যক্তি সেটিকে তীর মেরে থামিয়ে দিলো। রসুল স. বললেন, এ ধরনের উটের মধ্যে কিছু জংলী উটও থাকে। সুতরাং জংলী উটের মতই দূর থেকে সেগুলোকে জখম করা যাবে। বোখারী, মুসলিম। আবুল আশয়ার বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল, হলক এবং লুব্বা কর্তন ছাড়া কি অন্য উপায়ে জবাই করা যায় না? তিনি স. বললেন, উরুদেশে বল্লম বিদ্ধ করলেই যথেষ্ট হবে। আহমদ, সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়, দারেমী। আবু দাউদ বলেছেন, উপর থেকে নিচে পড়ে যাওয়া পশুকেও এভাবে বল্লম বিদ্ধ করা যাবে। তিরমিজি লিখেছেন, জরুরী কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে এ রকম করা যায়। মসনদে আবুল আশয়ারের মধ্যে হাফেজ আবু মুসা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— রসুল স. বলেন, যদি তোমরা তার রান, বাহু অথবা বগলে বল্লম বিদ্ধ করো এবং আল্লাহ্র নাম নাও তবে তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী বর্ণনা করেছেন, এক উট কুয়ার মধ্যে পড়ে গেলো। তখন তার বগলে বল্লম বিদ্ধ করে দেয়া হলো। হজরত ইবনে ওমরকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি খাওয়ার অনুমতি দিলেন।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ তীরবিদ্ধ শিকারের কোনো অঙ্গ যদি পৃথক হয়ে যায় তবে তা খাওয়া হালাল হবে। কিন্তু কর্তিত অংশটি খাওয়া যাবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মূল এবং কর্তিত উভয় অংশই খাওয়া হালাল— তীর বিদ্ধ হওয়ার কারণে শিকার যদি মরেও যায়। কেননা ওই শিকার আওতাভূত ছিলো না বলে দূর থেকে তাকে জখম করতে হয়েছে। শিকারটি যেহেতু হালাল তাই তার মূল এবং কর্তিত অংশ দু'টোই হালাল। কিন্তু আমাদের অভিমতটিই পুরোপুরি হাদিসসম্মত। রসুল স. বলেছেন, জীবিত পশু থেকে যে অংশ পৃথক হয়ে যায় তা মৃত বা মরা— যা হালাল নয়।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্‌কে ভয় করার কথা বলে তিনি যে সত্তর সকলের হিসাব গ্রহণ করবেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ওয়াত্তাকুল্লহা ইন্নাল্লহা সারিউল হিসাব (আল্লাহ্‌কে ভয় করো, আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর)।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৫

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۖ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

❒ আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস বৈধ করা হইল, যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ ও তোমাদের খাদ্য দ্রব্য তাহাদের জন্য বৈধ এবং বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল যদি তোমরা তাহাদের মোহর প্রদান কর বিবাহের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপ-পত্নী গ্রহণের জন্য নহে। কেহ ইমান প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার কর্ম নিষ্ফল হইবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

'তইয়েবাত' অর্থ পবিত্র। আয়াতের শুরুতেই উহিল্লা লাকুমুত তইয়েবাত বলে পবিত্র বা ভালো ভালো বস্তু হালাল হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এই ঘোষণা কার্যকর থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। কারণ দ্বীন এখন পূর্ণ। ইতোপূর্বে এ কথা বলাও হয়েছে (আয়াত-৩)। পূর্ণতার সঙ্গে সংযোজন বা বিয়োজনের কোনো সুযোগ নেই। তাই এখানে বলা হলো, আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভালো ভালো জিনিস

www.eelm.weebly.com

বৈধ করা হলো। এ কথার অর্থ এই বৈধতা আর কখনও রহিত হবে না। এখন কোরআন ও হাদিসের মাধ্যমে হালাল ও হারাম সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। এই সুস্পষ্ট বিধিবিধানের বাইরে যদি কিছু পড়ে তবে তার হুকুম সম্পর্কে কিয়াসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

জ্ঞাতব্যঃ প্রকৃত কথা এই যে, কোরআনের বক্তব্যই মূল বক্তব্য। আর হাদিস ওই বক্তব্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। এর বাইরে কোনো সমস্যা দেখা দিলে প্রথমে দেখতে হবে কোরআন ও হাদিসে এ সম্পর্কিত কোনো মূলনীতি বা কারণের উল্লেখ রয়েছে কিনা। যদি থাকে তবে সেই নীতিমালার আলোকেই নতুন সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করতে হবে। যদি কোরআন ও হাদিসে সে রকম কিছু না পাওয়া যায়, তবে মুজতাহিদ ইমামগণ কোরআন ও হাদিসের অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণার আলোকে অভিনিবেশী গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করবেন। অবশেষে সে সিদ্ধান্তটি তাঁরা দাঁড় করাবেন কোরআন ও হাদিসের মূল মর্মের অনুকূলে কিয়াসরূপে। এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা উসুলে ফিকাহের গ্রন্থগুলোতে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এখন থেকে কোরআন ও হাদিসের যেগুলোকে তইয়েবাত (পবিত্র) বলা হয়েছে সেগুলোই পবিত্র। আর যেগুলোকে 'খাবাসাত' (অপবিত্র) বলা হয়েছে সেগুলোই অপবিত্র। যেমন এহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম। কোরআনে এ কথাটি সুস্পষ্ট। কিন্তু হাদিস শরীফে বলা হয়েছে কিছু ব্যতিক্রমের কথা। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, এহরাম অবস্থায় হেরেমের অভ্যন্তরে পাঁচ প্রকার জন্তু কতল করলে কোনো গোনাহ্ হবে না। সেগুলো হচ্ছে, ইঁদুর, কাক, চিতা, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর। বোখারী, মুসলিম। হজরত আয়েশার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেন, পাঁচ প্রকার প্রাণী ফাসেক বা অপবিত্র অর্থাৎ কষ্টদায়ক। হেরেমের অভ্যন্তরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রে সেগুলোকে হত্যা করা যাবে। যেমন, সাপ, ইঁদুর, কাক, দংশনপ্রবণ কুকুর ও চিল।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, সাপের সঙ্গে আমাদের সর্বাত্মক যুদ্ধ। কখনও আমরা তার সঙ্গে সন্ধি করিনি। যে ব্যক্তি ভয়ে সর্প হত্যা পরিত্যাগ করে সে আমাদের অন্তর্ভূত নয়।

হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সাপ দেখলেই মেরে ফেলো। যারা সাপ মারতে ভয় পায় তারা আমাদের সঙ্গী নয় (আমার উম্মত নয়)। আবু দাউদ, নাসাঈ।

কিন্তু যে বিষয়গুলো নসের (কোরআন ও হাদিসের)। সুস্পষ্ট নির্দেশের আওতাভূত নয়, সেগুলোকে কিয়াসের মাধ্যমে বুঝে নিতে হবে। যেমন, নসের সুস্পষ্ট নির্দেশ বা নিষেধাজ্ঞা না থাকা সত্ত্বেও সাহাবীগণ মৃত পশুর ক্ষুরকে অপবিত্র জ্ঞান করেছেন। এ রকম বর্ণনা এসেছে নাখয়ীর পদ্ধতিতে ইবনে আবী শায়বার মাধ্যমে। এই বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতেই জমহুর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, মৃত ভক্ষণকারী পশু ও পাখি হারাম। সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই নীতিটি মেনে চলতে হবে।

www.eelm.weebly.com

অতএব কোনো পশু হত্যা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ পেলে বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা সেটিকে হারাম বা মাকরূহ বলবো। তিনজন ইমাম এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত নিধন নিষিদ্ধ পশুকে হারামই বলতে হবে, মাকরূহ নয়। হুদহুদ এবং ময়ূরের ব্যাপারেও এই নীতিটি কার্যকর।

মাসআলাঃ ফেঁড়ে চিরে খায় এমন প্রাণী মাকরূহ এ রকম বলেছেন— ইমাম মালেক। অন্য ইমামত্রয় বলেছেন হারাম। যেমন সিংহ, চিতা, বাঘ, কুকুর, বিড়াল, শেয়াল। যে সকল পাখি থাবা মারে, সেগুলোও ইমাম মালেকের নিকট মাকরূহ এবং অন্য তিন ইমামের নিকট হারাম। যেমন বাজ, শুকরা, চিল ইত্যাদি। ইমাম মালেক বলেছেন, কোরআনে এসেছে— 'কুল লাআজিদু ফিমা উহ্য়িয়া ইলাইয়া মুহাররামান আলা তইমিন ইয়াত আমহু' (আপনি বলে দিন আমার প্রতি যা খাদ্য প্রত্যাদেশ করা হয়েছে তাতে আমি এমন কিছু পাইনি যা বস্তু হিসেবে হারাম)। কাজেই কোরআনে যা হারাম বলা হয়নি তা হারাম হবে না, হবে মাকরূহ। এটাই ইমাম মালেকের প্রমাণ। আমরা বলি এই আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায়, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় যে সকল পশু-পাখি হারাম করা হয়েছিলো সেগুলো প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানানো হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে যে হারাম করা হয়নি, সে কথার প্রমাণ এই আয়াতে নেই। আয়াতের তাফসীর হিসেবে বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের মাধ্যমে হালাল হারাম সম্পর্কে অধিকতর ব্যাখ্যা আসাই স্বাভাবিক। সে সকল ব্যাখ্যাকে উম্মতগণ গ্রহণও করেছেন। যেমন হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. শিকারী দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী এবং নখর বিশিষ্ট থাবার অধিকারী পাখিকে খেতে নিষেধ করেছেন। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেন, শিকারী দাঁত বিশিষ্ট প্রাণী খাওয়া হারাম। মুসলিম। ইবনে আবদুল বার লিখেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে। আবদুল্লাহ্ বিন আহমদ জিয়াদাতে মসনদ গ্রন্থে হজরত আলী থেকে এই হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন। হজরত জাবেরের বর্ণনায় এ রকম রয়েছে যে, রসুল স. বিড়াল ও তার বিক্রয় মূল্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ, তিরমিজি।

মাসআলাঃ ইমাম আজমের নিকট উদ এবং শেয়াল হারাম। ইমাম মালেকের নিকট মাকরূহ। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের নিকট হালাল। এক বর্ণনায় এসেছে ইমাম আহমদের নিকট শৃগাল হালাল নয়। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, বর্ণিত প্রাণী দু'টো হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। বেফায়া গ্রন্থে রয়েছে, কথিত প্রাণী দু'টো বড় বড় দন্ত বিশিষ্ট হয়ে থাকে। বাঘের মতো তারা আক্রমণপ্রবণ। তাই এ দু'টোকে খাওয়া বৈধ নয়।

ইমাম শাফেয়ী লিখেছেন, হজরত জাবেরকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো উদ কি শিকাররূপে গণ্য? তিনি বললেন, হ্যাঁ। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, উদ কি খাওয়া যাবে? তিনি বললেন, যাবে। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, এ কথাটি আপনি

www.eelm.weebly.com

রসুল স. এর নিকট থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় (তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা) ও ইমাম শাফেয়ী এই বর্ণনাটি এনেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আবু দাউদ এ রকম বর্ণনা করেননি। বায়হাকীও করেননি। বোখারী ও তিরমিজি বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। এই সূত্রের এক বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বিন আবী আম্মারাকে মুয়াল্লাল বলেছেন ইবনে আবদুল বার। কিন্তু আবু জারআ এবং নাসাঈ তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে মেনেছেন। ইমাম শাফেয়ী এ রকমও বলেছেন যে, সাফা ও মারওয়ার মধ্যে উদের গোশত বেচাকেনা করা হয়। অন্য কোথাও হয় না। আবু দাউদের বর্ণনায় এ কথাটিও রয়েছে যে, হজরত জাবের বলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল, উদ কি শিকার? তিনি স. বললেন, হাঁ। যদি এহরামধারী ব্যক্তি উদ শিকার করে তবে তাকে দুম্বা কোরবানী দিতে হবে।

আমি বলি, উদ শিকার করলে দুম্বা কোরবানী করতে হবে— এ কথায় প্রমাণিত হয় না যে উদ হালাল। এহরাম পরিহিত ব্যক্তি— যার গোশত হারাম এ রকম প্রাণীকে বধ করলেও দুম্বা কোরবানী ওয়াজিব হবে। শিকার বলা হয় ওই সকল জন্তুকে যে সকল জন্তু অরণ্যবাসী। সেগুলো হালালও হতে পারে, আবার হারামও হতে পারে। ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, যে সকল প্রাণী হিংস্র সে সকল প্রাণী হারাম। ওই হাদিস উদ হালাল হওয়ার হাদিস অপেক্ষা অধিকতর বলিষ্ঠ। আর উদও একটি হিংস্র প্রাণী। হালাল ও হারামের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিদৃষ্ট হলে সতর্কতা প্রতিপালনার্থে হারামকেই অগ্রাধিকার দিতে হয়। কারণ এই যে, হারামের হুকুম বার বার রহিত হয় না। সুতরাং এখানে দ্বন্দ্ব নিরসনার্থে হারামকেই অগ্রগণ্য মনে করতে হবে।

খুজাইমা বিন জারীরের মাধ্যমে তিরমিজির বর্ণনায় এ রকম প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে 'উদ কি কেউ খায়?' বর্ণনাটি দুর্বল। কারণ এই বর্ণনাসূত্র সংযুক্ত বর্ণনাকারী আবদুল করিম বিন উমাইয়া ঐকমত্যসম্মতভাবে দুর্বল।

মাসআলাঃ মাটিতে বিচরণরত পোকা-মাকড় ইমাম মালেকের নিকট মাকরূহ। অন্য ইমামত্রয়ের নিকট হারাম। যেমন, মাক্কুরে (এক প্রকার বড় পোকা), ইঁদুর, গিরগিটি (সূর্যকিরণের মাধ্যমে যার রং পরিবর্তিত হয়) ইত্যাদি। ইমামত্রয় (আয়েম্মায়ে ছালাছা) দলিল গ্রহণ করেছেন হজরত উম্মে শারীকের হাদিস থেকে— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. গিরগিটিকে মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছেন এবং বলেছেন, এই অভিশপ্ত প্রাণীটি হজরত ইব্রাহিমের অগ্নিকুণ্ডবাসের সময় আগুনকে উসকে দেয়ার জন্য ফুঁ দিয়েছিলো। বোখারী, মুসলিম।

হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. গিরগিটিকে হত্যা করতে বলেছেন। আরো বলেছেন, গিরগিটি ফাসেক (দূষিত)। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই গিরগিটিকে মারতে পারবে তার জন্য রয়েছে একশত পুণ্য। দ্বিতীয় আঘাতে হত্যা করলে পুণ্য হবে এক শতের কম এবং তৃতীয় আঘাতে হত্যা করলে আরো কম। মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

ইঁদুরকেও নিধন করার নির্দেশ এসেছে এবং ইঁদুর যে দূষিত (ফাসেক) সে কথাও হাদিসে বিবৃত হয়েছে। তাই গিরগিটি ও ইঁদুরের মাপকাঠিতে বিচার করে মাটির মধ্যে গর্ত করে বাস করে— এ রকম সকল পোকা মাকড় হারাম করে দেয়া হয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী ধেড়ে ইঁদুরকে হালাল বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন হারাম। কারণ এগুলো হচ্ছে মৃত্তিকাবাসী পোকামাকড়। ঈসা বিন নুমাইলার পিতার মাধ্যমে আবু দাউদ লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমরের নিকট এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো, তিনি তৎক্ষণাৎ পাঠ করলেন এই আয়াত, 'কুল লা আজিদু ফিমা আওহা ইলা......। সেখানে উপস্থিত এক বৃদ্ধ বললেন, আমি রসুল স.কেও এ রকম বলতে শুনেছি। তিনি স. বলেছেন, জমিনের পোকা অপবিত্র। হজরত ইবনে ওমর বৃদ্ধের কথা শুনে বললেন, রসুল স. যখন এ কথা বলেছেন, তখন তা এ রকমই। বায়হাকী লিখেছেন, এই বর্ণনাটির সূত্র দুর্বল। আবার অন্য কোনো সূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত হয়নি।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গুইসাপ ও ঘুঁছ (এক প্রকার বড় ইঁদুর) হারাম। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেন হালাল। ইমাম আহমদ বলেছেন, গুই সাপ হালাল এবং ঘুঁছ সম্পর্কে রসুল স. থেকে হালাল ও হারাম দু'রকম বর্ণনাই রয়েছে। গুইসাপকে যারা হালাল বলেছেন, তাঁরা প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করেছেন হজরত ইবনে ওমরের হাদিসটিকে— যেখানে বলা হয়েছে রসুল স. বলেছেন, গুইসাপ খাই না কিন্তু একে হারামও বলি না। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত খালেদ বিন ওলিদ বলেছেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে জননী মায়মুনার প্রকোষ্ঠে উপস্থিত ছিলাম। উম্মত জননী হজরত মায়মুনা ছিলেন হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত খালেদ বিন ওলিদের খালা। জননী মায়মুনা গুইসাপের ভুনা করা গোশত রসুল স. এর সামনে উপস্থিত করলেন। রসুল স. হাত গুটিয়ে নিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল গুইসাপ কি হারাম? তিনি স. বললেন, না। কিন্তু প্রাণীটি তো এদেশে পাওয়াই যায় না। আর আমি একে পছন্দও করি না। হজরত খালেদ বলেছেন, এ কথা শুনার পর আমি গোশতের পাত্রটি আমার দিকে টেনে নিলাম এবং খেতে শুরু করলাম। তিনি স. নীরবে আমার খাওয়া দেখে যাচ্ছিলেন। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গুইসাপ মাটির পোকা মাকড়ের মধ্যে গণ্য। আর প্রকাশ্য নস দ্বারা মাটির সকল পোকা-মাকড় হারাম প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এর বিরুদ্ধে আমল করা যায় না। হেদায়া গ্রন্থে রয়েছে, যখন হজরত আয়েশা গুইসাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন রসুল স. তার গোশত খেতে নিষেধ করলেন। গ্রন্থকার বলেছেন, আমার তো হাদিসটি জানাও নেই।

জ্ঞাতব্যঃ বর্ণিত হাদিসটি রয়েছে মেশকাতে। যা খাওয়া হালাল এবং যা হালাল নয়— অধ্যায়ে আবদুর রহমান বিন শিলের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. গুইসাপের গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ।

---

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ মৃত টিড্ডি খাওয়া হালাল— যেভাবেই মরে থাকুক না কেনো। ইমাম মালেক বলেছেন, কেবল ওই টিড্ডি খাওয়া যাবে না, যা বাইরের কোনো কারণে মরে গিয়েছে। এ রকম টিড্ডি খাওয়া মাকরূহ। জমহুর দলিল পেশ করেছেন হজরত ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিস থেকে, যেখানে বলা হয়েছে রসুল স. এরশাদ করেন, আমাদের জন্য দু'টি মৃত ও রক্ত হালাল। একটি টিড্ডি এবং অপরটি মাছ। দুই প্রকার রক্তের মধ্যে একটি কলিজা এবং অপরটি পিত্ত। আবদুর রহমান বিন জায়েদ বিন আসলামের মাধ্যমে এই বর্ণনাটি এনেছেন শাফেয়ী, আহমদ, ইবনে মাজা, দারা কুতনী ও বায়হাকী। কিন্তু বর্ণনাকারী হিসেবে আবদুর রহমান বিন জায়েদ দুর্বল ও পরিত্যাজ্য। দারা কুতনী জায়েদ বিন আসলামের মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণনা করে বলেছেন, এ বক্তব্যটি হজরত ইবনে ওমরের। এ কথাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। আবু জুরাআ এবং আবু হাতেম ও একে মাওকুফ হিসেবে বিশুদ্ধ বলেছেন। খতিব বর্ণনা করেছেন এভাবে— মুসাওয়ার বিন সলত জায়েদ বিন আসলাম থেকে, তিনি আতা বিন ইয়াসার থেকে এবং তিনি হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। এই বর্ণনাসূত্রভূত মুসাওয়ারকে মিথ্যুক বলেছেন ইমাম আহমদ। আবার ইবনে হাব্বান বলেছেন, তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে মেনে নেয়া যায়।

মাসআলাঃ তিন ইমাম বলেছেন, গাধা ও খচ্চরের গোশত হারাম। ইমাম মালেক বলেছেন, মাকরূহ। হজরত আবু ছা'লাবার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম ঘোষণা করেছেন। বোখারী, মুসলিম। ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. হজরত আবদুর রহমান বিন আউফের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছেন— যে ব্যক্তি আমাকে রসুল বলে স্বীকার করে, সে যেনো জেনে রাখে গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম। হজরত জাবেরের বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত ভক্ষণের অনুমতি দিয়েছেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত জাবের থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে খাইবার যুদ্ধের সময় রসুল স. গৃহপালিত গাধা, খচ্চর, শিকারী দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী এবং পায়ের থাবা দিয়ে শিকার করে এ রকম পাখির গোশতকে হারাম ঘোষণা করেছেন। তিরমিজি এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদিসটি গরীব।

ইমাম আহমদ কর্তৃক আনীত বর্ণনাগুলোর মধ্যে রয়েছে— রসুল স. গৃহপালিত গাধা, শেয়াল, শিকারী দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী এবং নখর বিশিষ্ট থাবা বিস্তারকারী পাখির গোশতকে হারাম করে দিয়েছেন। হজরত জাবের বলেছেন, রসুল স. আমাদেরকে ঘোড়ার গোশত খেতে বলেছেন এবং গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। তিরমিজি, নাসাঈ। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, খায়বরের দিন রসুল স. প্রতিটি হিংস্র প্রাণী ও পালিত গাধার গোশত হারাম করে দিয়েছেন। আহমদ। হজরত বারা বিন আজিব বলেছেন, খায়বরের দিন আমাদের কাছে গাধার গোশত এলো। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করে রসুল স. এর আহবানকারী ঘোষণা করলেন, গোশতের হাঁড়িগুলো

www.eelm.weebly.com

উল্টিয়ে দাও। বোখারী, মুসলিম। হজরত আলী বলেছেন, খায়বরের বৎসর মুত্আ বিবাহ এবং পালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বোখারী, মুসলিম। এ রকম কথা আরো বলেছেন হজরত আবু সলিত, হজরত আনাস, হজরত ইবনে আব্বাস। হজরত সালমা বিন আকওয়া হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আবী আউফা। হজরত খালেদ বিন ওলিদ, হজরত আমর বিন শোয়াইবের দাদা, হজরত মেকদাম বিন মাদি করব এবং হজরত আমর বিন দিনার।

মাসআলাঃ জমহুরের নিকট ঘোড়ার গোশত হালাল। সাহেবাঈনও এ রকম বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক বলেছেন, মাকরূহ (তাহরিমী অথবা তানজিহী)। হেদায়া রচয়িতা বলেছেন, মাকরূহে তাহরিমী হওয়াই অধিকতর বিশুদ্ধ। জমহুরের দলিল হজরত জাবেরের ওই হাদিসটি— যেখানে ঘোড়ার গোশত ভক্ষণের অনুমতি রয়েছে। আরেকটি হাদিস তাঁরা উল্লেখ করেছেন হজরত আসমা থেকে। হজরত আসমা বলেছেন, আমরা রসুল স. এর জীবদ্দশায় মদীনায় একটি ঘোড়া জবাই করে খেয়েছি। বোখারী, মুসলিম। ইমাম আহমদের বর্ণনায় বলা হয়েছে, আমরা এবং রসুল স. এর গৃহবাসীগণ।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপণ করেছেন এই আয়াতকে—'তিনি অশ্ব, খচ্চর এবং গাধাকে বাহন ও সৌন্দর্যের বস্তুরূপে সৃষ্টি করেছেন।' এখানে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাকে আহার্য বস্তু রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে বলা হয়নি। বলা হয়েছে এগুলোর সৃষ্টির উদ্দেশ্য দু'টি— বাহন ও সৌন্দর্য। হজরত খালেদ বিন ওলিদের হাদিসের মাধ্যমেও বিষয়টি সুপ্রমাণিত, যেখানে বলা হয়েছে; রসুল স. বলেছেন, গৃহপালিত গাধা ও ঘোড়ার গোশত হারাম। ইমাম আহমদও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মুসা বিন হারূণ বলেছেন, এই সূত্র সংযুক্ত বর্ণনাকারী সালেহ্ বিন ইয়াহ্ইয়া এবং ইয়াহ্ইয়া বিন মিকদাম প্রসিদ্ধ নয়। কেবল পরোক্ষভাবে হজরত মিকদামের নামোল্লেখের কারণে হাদিসটির কিছুটা পরিচিতি ঘটেছে। নতুবা বর্ণনাটি সম্পূর্ণ অপ্রসিদ্ধ থেকে যেতো। দারা কুতনীও বর্ণনাটিকে দুর্বল বলেছেন।

ইবনে জাওজী লিখেছেন, খায়বর যুদ্ধের সময় রসুল স. ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত হারাম ঘোষণা করেছিলেন। ওয়াকেদী বলেছেন, হজরত খালেদ মুসলমান হয়েছিলেন খায়বর যুদ্ধের পর (সুতরাং হাদিসটি দুর্বলই বটে)।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নেউল বা বেজি মাকরূহ্।

মাসআলাঃ তিন ইমামের নিকট রাখম (মিসরী শকুন), বিগাছ (সাদা ও সবুজ রঙ মিশ্রিত এক প্রকার পাখি), আব্কা (দাঁড় কাক) এবং শকুন মাকরূহ। কারণ, এ সকল পাখি মড়া খায়। শস্য ক্ষেতের কাক খাওয়া যেতে পারে। আকআক (পাতিকাক) ও খাওয়া যায়। কেননা, তাদের খাদ্য মিশ্র প্রকৃতির (শস্যদানা ও মৃতের গোশত)। এরা মুরগীর মতো। ইমাম আবু ইউসুফ এদেরকে মাকরূহ বলেছেন। কারণ, এদের বেশীর ভাগ খাদ্যই মৃতের গোশত।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ নাপাক ক্ষুর বিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু ও নাপাক নখর বিশিষ্ট পাখির গোশত, ডিম ও দুধ হারাম— এ রকম বলেছেন ইমাম আহমদ। জবাইয়ের পূর্বে এগুলোকে কিছু দিন আটকে রাখতে হবে। পাখিকে তিন দিন, উটকে চল্লিশ দিন, গাভীকে তিরিশ দিন, বকরীকে সাত দিন এবং মুরগীকে তিন দিন আটকে রাখতে হবে। এক বর্ণনায় রয়েছে, সবগুলোকেই তিন দিন আটকে রাখতে হবে। তিনজন ইমামের নিকট ময়লা ভক্ষণকারী পশুর গোশত ও দুধে যদি দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়, তবে তা খাওয়া মাকরূহে তাহ্‌রীম হবে। ওগুলোকে ততদিন পর্যন্ত বন্দী করে রাখতে হবে, যতদিন না অপবিত্রতার দুর্গন্ধ দূর হয়। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. অপবিত্র ভক্ষণকারী পশুর গোশত এবং দুধ খেতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. নাপাকী ভক্ষণকারী বকরীর দুধ খেতে নিষেধ করেছেন। আহমদ।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আসের বর্ণনায় রয়েছে— রসুল স. নাপাক ক্ষুর বিশিষ্ট উটের গোশত খেতে, দুধ পান করতে এবং তার উপর আরোহণ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এগুলোকে চল্লিশ দিন আটকে রাখতে হবে এবং ঘাস দেয়া বন্ধ রাখতে হবে। বায়হাকী, দারা কুতনী। এ বর্ণনা সূত্রের অন্তর্ভূত ইসমাইল বিন ইব্রাহিম ছিলেন মোহাজির। ইসমাইল ও ইব্রাহিম দু'জনকেই দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন ইবনে জাওজী। আমর বিন শোয়াইবের দাদা থেকে আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. পালিত গাধা এবং নাপাকী ভক্ষণকারী পশুর গোশত খেতে এবং তার উপর আরোহী হতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে মাছ ব্যতীত অন্য কিছু হালাল নয়। ইমাম মালেক বলেছেন, সকল সামুদ্রিক প্রাণী হালাল— কাঁকড়া, সামুদ্রিক কুকুর, এমন কি সামুদ্রিক শুকরও। কিন্তু সামুদ্রিক শুকর ইমাম মালেকের নিকট মাকরূহ। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি এগুলোর হালাল হারামের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। ইমাম আহমদ বলেছেন, তিমি ও কুসেজ ব্যতীত ব্যাঙ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী হালাল। কিন্তু মাছ ব্যতীত অন্যগুলোকে জবাই করা জরুরী। ইমাম শাফেয়ীর অনুসারীদের মধ্যে এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের কারো কারো অভিমত ইমাম মালেকের অভিমতের মতো। আবার কারো কারো অভিমত ইমাম আবু হানিফার অনুকূল। কেউ কেউ বলেছেন, সমুদ্রের যে সকল প্রাণী স্থলভাগের প্রাণী বা পশুর আকৃতির মতো সেগুলো খাওয়া যাবে না। যেমন, সামুদ্রিক কুকুর, শুকর, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর ইত্যাদি। আর যেগুলোর আকৃতি স্থলভাগের প্রাণীর মতো নয়, সেগুলো খাওয়া যাবে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, ব্যাঙ, তিমি, সামুদ্রিক সর্প, বৃশ্চিক, কাঁকড়া, কুঁচো হারাম। বাকীগুলো হালাল। ইমাম মালেকের দলিল এই আয়াতটি— 'তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হয়েছে।' রসুল স. বলেছেন, সমুদ্রের প্রাণী পাক এবং সমুদ্রের মৃত প্রাণী জবাই করা ব্যতিরিকেই হালাল। এ

www.eelm.weebly.com

প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, বর্ণিত আয়াতটিতে 'সায়দুন' শব্দটির অর্থ শিকার করা। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে 'যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এহরাম অবস্থায় থাকো, ততক্ষণ তোমাদের জন্য স্থলজ প্রাণী শিকার করা হারাম।' উল্লেখ্য যে এখানে 'সায়েদুন' অর্থ শিকার করা। শিকারযোগ্য জন্তু মৃত হতে পারে না। কেননা যে ব্যক্তি এহরাম বাঁধেনি, সে যদি এহরামধারীর সাহায্য ব্যতীত স্থলভাগের কোনো হালাল প্রাণী শিকার করে, তবে তার গোশত খাওয়া এহরামধারীর পক্ষে হালাল হবে (তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এ রকম হতে পারে না যে, স্থলভাগের প্রাণীর গোশত, এহরামধারীদের জন্য সাধারণভাবে নাজায়েয)। আর হাদিস শরীফের 'সমুদ্রের মাছ জবাই করা ছাড়াই হালাল' —কথাটির অর্থ সমুদ্রের মাছ জবাই করা ছাড়াই হালাল। দারা কুতনী বর্ণিত হজরত জাবেরের আরেকটি হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সমুদ্রের প্রাণী এমন নয় যাকে আল্লাহ্পাক আদম সন্তানের জন্য পবিত্র করেননি। অর্থাৎ জবাই করা ব্যতীত হালাল করে দেননি। উল্লেখ্য যে, এ হাদিসে বর্ণিত প্রাণী হচ্ছে মাছ— সকল সামুদ্রিক প্রাণী নয়। কেননা অন্য একটি হাদিসে এসেছে, প্রতিটি নুন বনী আদমের জন্য জবিহা (জবাই তুল্য)। নুন এর একটি অর্থ মাছ। হাদিসের বর্ণানুসারে প্রতীয়মান হয় যে, সকল সামুদ্রিক প্রাণীকে জবাই বহির্ভূত করা হয়নি। আসল যে কথাটি বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে— মাছকে জবাই করার প্রয়োজন নেই।

হজরত জাবেরের বর্ণনার মাধ্যমে অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী হালাল হওয়ার কথা জানা যায়। তিনি বলেছেন, আমি জাইশুল খাবত নামক সমুদ্র উপকূলে এক সেনাদলের সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেনাপতি ছিলেন হজরত আবু উবাদা। আমরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু খাদ্যের কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। হঠাৎ আমরা পেলাম একটি বিশাল মৃত মৎস। মৎসটির নাম আম্বর। আমরা অর্ধ মাস ধরে ওই মৎসটি ভক্ষণ করেছি। হজরত আবু উবাদা মৎসটির বুকের একটি হাড় তোরণের মতো খাড়া করে ধরলেন। এক ব্যক্তি তার ভিতর দিয়ে উটে সওয়ার হয়ে অনায়াসে চলে গেলো। আমরা এই সংবাদটি রসুল স. এর নিকট প্রেরণ করলাম। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র দেয়া রিজিক। খাও। যদি অবশিষ্ট থাকে তবে আমার জন্য কিছু প্রেরণ করো। আমরা তখন ওই মৎসটির কিছু অংশ মদীনায় রসুল স. নিকট পাঠিয়ে দিলাম। তিনি স. তা ভক্ষণ করেছিলেন। বোখারী, মুসলিম। এ সম্পর্কে হানাফিগণ বলেছেন, আম্বর এক প্রকার বিশাল আকৃতির মৎস। আর মৃত মৎস ভক্ষণ হালাল। কিন্তু ব্যাঙ এবং তার মতো অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীগুলো অত্যন্ত অসুন্দর। তাই রুচি বিগর্হিত। স্বভাবগত অনীহাই ওগুলো ভক্ষণের প্রতিবন্ধক। কোরআন মজীদেও বলা হয়েছে 'তাদের জন্য অপবিত্র বস্তু হারাম করে দেয়া হয়েছে।' হজরত আবদুর রহমান বিন ওসমান কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রসুল স. এর সম্মুখে এক চিকিৎসক কিছু ঔষুধের বিবরণ দিলেন। ওগুলোর মধ্যে ব্যাঙও ছিলো। কিন্তু রসুল স. ব্যাঙকে হত্যা করতে নিষেধ করলেন। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, বায়হাকী। বায়হাকী লিখেছেন, ব্যাঙ নিষিদ্ধ হওয়ার বর্ণনাটি একটি শক্তিশালী বর্ণনা।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ পানির উপর ভেসে ওঠা মৃত মাছ ইমাম আবু হানিফার নিকট মাকরূহ। জমহুরের নিকট মাকরূহ নয়। জমহুর তাঁদের মতের স্বপক্ষে আম্বর মাছের ঘটনা সম্পর্কিত হজরত জাবেরের হাদিসটিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন-যেখানে বলা হয়েছে, মাছটি মৃত অবস্থায় সাগর তীরে পড়েছিলো। দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে ওই হাদিস— হুওয়াল হিল্লু মাইতাতু (ওই মৃত হালাল)। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, হজরত জাবেরের বর্ণনায় রয়েছে সমুদ্র তীরে একটি মাছ পড়ে ছিলো। সমুদ্রতরঙ্গ কর্তৃক তীরভূমিতে ঠেলে দেয়া এ রকম মৃত মাছ তো ঐকমত্যানুসারে হালাল। কিন্তু ওই মাছ হালাল হতে পারে না, যা তটভূমিতে আসার আগে সমুদ্রের মধ্যে কোনো রোগের কারণে মরে ভেসে উঠেছে। হানাফিগণ তাঁদের পক্ষে হজরত জাবেরের একটি বর্ণনা তুলে ধরেছেন— যেখানে বলা হয়েছে রসুল স. বলেন, ওই মাছ খেয়ো না যা মরে পানিতে ভেসে উঠে। ওই মাছ খাও সমুদ্র যাকে রেখে চলে যায়। এ কথার অর্থ জোয়ারের সময় সাগর স্রোতে যে মাছ বেলাভূমির দিকে ভেসে আসে কিন্তু ভাটার সময় তীরে আটকা পড়ে মরে থাকে সেই মাছ খেতে পারবে। আবু আহমদ জুবাইরীর নিয়মে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী। দারা কুতনী আরো বলেছেন, জুবাইরির পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতিতে হাদিসটি মারফু হিসেবে বর্ণিত হয়নি। বর্ণনাটিকে ওয়াকেদী, আবদুর রাজ্জাক, এবং মোয়াম্মেল প্রমুখও মারফু হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন। আরো উল্লেখ করেছেন আবু আইয়ুব সিজিসতানী, আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন জারীহ্, হাম্মাদ বিন সালমা, জুহাই প্রমুখ হজরত আবু জোবায়ের থেকে। বর্ণনাটি বিশুদ্ধ।

অন্য এক পদ্ধতিতে দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন সমুদ্র (জোয়ারের সময়) যে মাছ নিয়ে চলে যায় এবং যে মাছ বেলাভূমিতে ফেলে যায় ওই মাছ খাও। আর পানিতে মৃত অবস্থায় ভাসমান মাছকে খেয়ো না। দারা কুতনী লিখেছেন, হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে কেবল আবদুল আজিজ ওয়াহাবের সূত্রে। আর আবদুল আজিজ দুর্বল এবং তার দলিল গ্রহণযোগ্য হওয়ার উপযুক্ত নয়। ইমাম আহমদও তাকে দুর্বল বলেছেন এবং বর্ণনাটিকে অশুদ্ধ বলে চিহ্নিত করেছেন। নাসাঈও বলেছেন, গ্রহণীয় নয়।

ভিন্ন সূত্রে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, সমুদ্র যে মাছকে কিনারায় নিক্ষেপ করে রেখে যায় ওই মাছ খাও। আর যে মাছ সমুদ্রের অভ্যন্তরে মরে গিয়ে পানিতে ভাসতে থাকে ওই মাছ খেয়ো না। এই বর্ণনার সূত্রস্থ ইসমাইল বিন উমাইয়া পরিত্যাজ্য। আবু দাউদ লিখেছেন, হাদিসটি সুফিয়ান, আইয়ুব এবং হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন আবু জোবায়ের থেকে। কিন্তু তারা সকলে বর্ণনাটিকে হজরত জাবেরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। মারফু বলেননি।

মাসআলাঃ খরগোশ হালাল—অভিমতটি ঐকমত্যসঞ্জাত। হজরত আনাস বলেছেন, আমি মারউজ জাহ্‌রান নামক স্থানে একটি খরগোশ ধরলাম। খরগোশটি নিয়ে আমি উপস্থিত হলাম আবু তালহার নিকট। আবু তালহা সেটিকে জবাই করে রানের গোশত পাঠিয়ে দিলেন রসুল স. এর নিকট এবং তিনি স. গ্রহণও করলেন। বোখারী ও মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু মুসার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. মুরগীর গোশত খেয়েছেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত সাফিনা বলেছেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে ডাহুকের গোশত খেয়েছি। আবু দাউদ।

'ওয়া তোয়ামুল্লাজিনা উতুল কিতাবা হিল্লুল্লাকুম' (যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ) —এখানে 'তাদের খাদ্যদ্রব্য' অর্থ তাদের জবাই করা খাদ্যদ্রব্য। এখানে কিতাবীদের জবাই করা খাদ্য মুসলমানদের জন্য বৈধ বলে দেয়া হয়েছে। এই কিতাবী হচ্ছে ইহুদী, নাসারা ও সাবেয়ী। নক্ষত্রপূজারী একটি সম্প্রদায়ও এর অন্তর্ভুক্ত। যারা কোনো নবী প্রবর্তিত ধর্মের উপর এবং কোনো কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখে। এ বিশ্বাস বিবর্জিত তারকা পূজারীরা সাবেয়ী নয়। এখানে কিতাবী বা আহলে কিতাবের আরেকটি অর্থ ওই সকল কিতাবী যারা হরবী (অমুসলিমদের রাজ্যে বসবাসকারী), জিম্মি (মুসলিম দেশে বসবাসকারী), আজমী (অনারব) অথবা আরবীদের অধীনস্থ।

ইমাম আজম এ রকম বলেছেন। কিন্তু অন্য তিনজন ইমাম বলেছেন, অধিকৃত নাসারাদের জবাই করা পশুপাখির গোশত হালাল নয় (কারণ, তারা প্রকৃতপক্ষে মুশরিক)। ইবনে জাওজী লিখেছেন, আমাদের সিলসিলার দিকপালগণ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আরবের ঈসায়ীদের (নাসারাদের) জবীহা খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। ইবনে জাওজীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, বনী তাগলিবের ঈসায়ীদের জবীহা (জবাই করা পশু) খেয়ো না। তারা শরাব পান করা ব্যতীত অগ্রগামী নাসারাদের কাছ থেকে অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করেনি। ইমাম শাফেয়ীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, নাসারাদের জবীহা খাওয়া এবং তাদের মেয়েদেরকে বিবাহ করা মাকরূহ। ইব্রাহিম নাখয়ীর পদ্ধতিতে আবদুর রাজ্জাকও এ রকম বর্ণনা করেছেন। আমি বলি, এই বিষয়টি সম্পর্কে আমি কোনো মারফু হাদিস পাইনি। যদি কোনো মারফু হাদিস থাকেও তবে তা হবে খবরে আহাদ (এককবর্ণিত)। আর খবরে আহাদ কোরআনকে রহিত করতে পারে না।

বাগবী লিখেছেন, আয়াতের বক্তব্য এই যে, রসুল স. এর আবির্ভাবপূর্ব সময়ের সকল কিতাবীদের জবীহা ছিলো হালাল। কিন্তু তাঁর স. আবির্ভাবের পরেও যারা ঈসায়ী অথবা ইহুদী হয়ে আছে তাদের জবীহা হালাল নয়।

আমি বলি, মন্তব্যটি অতিরঞ্জিত। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, মোরতাদের (ধর্ম পরিত্যাগকারীর) জবীহা হালাল নয়। এ কথার অর্থ — যে মুসলমান ইসলাম ছেড়ে দিয়ে ইহুদী, ঈসায়ী, অগ্নি উপাসক অথবা মূর্তিপূজারী হয়ে গিয়েছে তাদের জবীহা খেয়ো না। কারণ, তাদের কোনো ধর্ম নেই। তারা আপন ধর্মেও সুস্থির নয়। তবে এক কিতাবী যদি অন্য কোনো কিতাবী সম্প্রদায়ের ধর্ম গ্রহণ করে তবে তাকেও কিতাবী ধরে নিতে হবে। তার অতীতের ধর্ম পরিচিতি তখন থাকবে না। কেফায়া রচয়িতা লিখেছেন, যদি কোনো ইহুদী অথবা ঈসায়ী অগ্নিপূজক হয়ে যায়, তবে তার জবীহা হালাল হবে না। কিন্তু যদি কোনো অগ্নিপূজারী ইহুদী কিংবা ঈসায়ী হয়ে যায়, তবে তার জবীহা এবং শিকার হালাল।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ কোনো ইহুদী হজরত উযায়েরের নামে এবং কোনো ঈসায়ী হজরত ঈসার নামে জবাই করলে সেই জবীহা হালাল হবে না। কেফায়া গ্রন্থে রয়েছে, আল্লাহ্র নামে জবাই করলেই কেবল কিতাবীদের জবীহা হালাল হবে। উযায়ের, মসীহ্ ইত্যাদির নামে জবাই করলেও হালাল হবে না। মুসলমানও যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করে, তবে সেই জবীহা হালাল নয়। কারণ, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'অমা উহিল্লাবিহি লিগইরিল্লাহ্।'

বাগবী লিখেছেন, এই মাসআলায় আলেমগণের মতবিরোধ রয়েছে। হজরত ইবনে ওমর বলেন, কিতাবীদের জবীহা হালাল নয়। কিন্তু অধিকাংশ আলেম একে হালাল বলার পক্ষপাতী। শা'বী, আতা খোরাসানী এবং মাকহুলের অভিমতও এ রকম। একবার শা'বীকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোনো ঈসায়ী যদি মসীহের নামে জবাই করে তবে কী হবে? শা'বী বললেন, হালাল হবে। কারণ, আল্লাহ্পাক ঈসায়ীদের জবীহাকে হালাল করে দিয়েছেন। আল্লাহ্পাকতো জানতেনই যে ঈসায়ীরা জবাইয়ের সময় কী বলে।

হাসান বসরী বলেছেন, যদি তোমরা শুনতে পাও কোনো ইহুদী অথবা ঈসায়ী আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো নাম উচ্চারণ করে জবাই করেছে, তবে তোমরা তা খেয়ো না। আর যদি সেখানে উপস্থিত না থাকো এবং স্বকর্ণে না শোনো তবে খেয়ে নাও। কারণ, আল্লাহ্পাক একে হালাল করে দিয়েছেন।

আমি বলি, আমাদের নিকট প্রথম অভিমতটি বিশুদ্ধ। যদি কোনো কিতাবী সম্পর্কে এ কথা নিশ্চিত জানা যায় যে, তারা আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্য কোনো নামে জবাই করতে অভ্যস্ত, তবে তাদের জবীহা খাওয়া যাবে না। আরবের ঈসায়ীদের জবীহা হালাল না হওয়ার এটাই কারণ। হজরত আলী বনী তাগলীবের ঈসায়ীদের সম্পর্কে এ কথা জানতেন যে, তারা জবাইয়ের সময় আল্লাহ্র নাম নেয় না অথবা গায়রুল্লাহ্র নামে তারা জবাই করে থাকে। তাই তিনি তাদের জবীহাকে খেতে নিষেধ করেছেন। অনারব ঈসায়ীদের সম্পর্কেও একই বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ অনারব কিতাবীরাও যদি আল্লাহ্র নাম না নিয়ে অথবা গায়রুল্লাহ্র নামে জবাই করে তবে তা খাওয়া যাবে না। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই, ওই সময়ের ঈসায়ীরা জবাই করতো না—আঘাত বা প্রহারের মাধ্যমে পশু বধ করতো (তাই তাদের জবীহা হারাম বলা হয়েছে)।

'ওয়া তোয়ামুকুম হিল্লুল্লাহুম'—এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ—এ কথার অর্থ মুসলমানদের জবীহা কিতাবীদের জন্য বৈধ।

একটি প্রশ্নঃ রসুলপাক স. প্রেরিত হয়েছেন সকল মানুষের জন্য। তবে কোনো কোনো মানুষের জন্য বৈধ আবার কোনো কোনো মানুষের জন্য অবৈধ এ রকম নির্দেশ দেয়ার কারণ কী? (নির্দেশের এই বিভিন্নতা আরোপ করা হয়েছে কেনো?)।

উত্তরঃ কোনো কোনো বস্তু সকলের জন্য হালাল। যেমন সমুদ্রের পানি। আবার কোনো বিষয় হালাল হওয়া শর্তসাপেক্ষ। যেমন, নামাজের জন্য ওজু শর্ত।

www.eelm.weebly.com

অথবা ইবাদতের জন্য আল্লাহ্ ও রসুলের উপর ইমান ও এখলাস (বিশুদ্ধ নিয়ত) শর্ত। সম্পদ হালাল হওয়ার জন্য তা নিজের হওয়া শর্ত অথবা তা ভোগ করতে গেলে মালিকের অনুমতি থাকা শর্ত। এখানে তাই 'তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ'—এ কথা বলে মুসলমানদের জবাইকৃত বস্তু খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে কাফেরদেরকে। এই জবীহা খাওয়ার জন্য আখেরাতে তাদেরকে আযাব ভোগ করতে হবে না। যেমন ওই সকল কাজ করার কারণে আযাব হবে না, যা সকল মানুষের জন্য বৈধ এবং যার জন্য ইমানের শর্ত নেই। অগ্নিউপাসকদের জবীহা মৃত পশু তুল্য যা সকলের জন্য হারাম। তাদের জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করলে কাফেরদেরও আযাব হবে। যেমন, ইমান গ্রহণ করা ফরজ এবং ইমান তরক করলে আযাব হয়। ইমানের সঙ্গে সম্পর্কিত ফরজ বিধানসমূহ পালন না করলেও আযাব হবে এবং যা কিছু হারাম করে দেয়া হয়েছে তা অস্বীকার করলেও শাস্তি পেতে হবে। যেমন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন '(তখন প্রশ্ন করা হবে) কোন জিনিস তোমাদেরকে দোজখে প্রবেশ করালো।' তারা বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না, দরিদ্রকে আহার করাতাম না। এখানে মুসলমানদের খাদ্যদ্রব্য কাফেরদের জন্য বৈধ এ কথা বলার আসল উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদের খাদ্যদ্রব্য কাফেরেরাও খেতে পারবে বটে, কিন্তু তারা মুসলমান মেয়েদেরকে বিয়ে করতে পারবে না (মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে কেবল মুসলমান— একটু পরেই সে কথা শুরু হবে)।

জুজায বলেছেন, এখানে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে বিশ্বাসীদেরকে। বলা হচ্ছে— 'তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ।' এ কথায় বুঝা যায় কিতাবীদের আহার করানো তোমাদের জন্য হালাল। বায়যাবী বলেছেন, এ কথার অর্থ কিতাবীদেরকে আহার করালে এবং তাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করলে তোমাদের কোনো গোনাহ্ হবে না। যদি মুসলমানদের খাদ্যদ্রব্য কিতাবীদের জন্য হালাল না হোতো তবে তাদের খাদ্যদ্রব্যও মুসলমানদের জন্য হালাল হোতো না। এতো কিছু ব্যাখ্যার পরেও এই ব্যাখ্যাটি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে—আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ কথা বলা, মুসলমানদের জবীহা খেতে হলে ইমান থাকা শর্ত নয় কিন্তু মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করতে হলে ইমানদার হতেই হবে।

'ওয়াল মুহসানাতু মিনাল মু'মিনাতি ওয়াল মুহ্সানাতু মিনাল্লাজিনা উতুল কিতাবা মিন ক্বব্লিকুম (এবং বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের সৎ চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো) — — খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তইয়েবাত (পবিত্র) এবং রমণীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে মুহ্সানাত (সচ্চরিত্রা) অর্থাৎ আল্লাহ্পাক বৈধ করেছেন পবিত্র খাদ্য সামগ্রীকে এবং বৈধ করেছেন সচ্চরিত্রা নারীকে। বাগবী লিখেছেন, 'আল মুহ্সানাত' শব্দটির অর্থ সম্পর্কে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। তবে অধিকাংশ আলেমের নিকট শব্দটির অর্থ স্বাধীনা নারী—ক্রীতদাসী নয়। তারা বিশ্বাসিনী হতে পারে অথবা হতে পারে কিতাবিনী। চরিত্রবতী কিংবা দুশ্চরিত্রা যাই হোক না

www.eelm.weebly.com

কেনো, আসল অর্থ হচ্ছে স্বাধীনা। মুজাহিদও এ রকম বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, কিতাবী ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা যাবে না। কেননা, আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'যারা তোমাদের অধিকৃত ক্রীতদাসীদের মধ্য থেকে এমন রমণীকে বিবাহ করে যে বিশ্বাসবতী'—এখানে ক্রীতদাসীদেরকে বিবাহ করতে গেলে তাকে বিশ্বাসবতী হতে হবে বলা হয়েছে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'মুহ্সানাত' অর্থ সতী-সাধ্বী ললনাকুল। তারা স্বাধীনা বিশ্বাসবতী হতে পারে, আবার ক্রীতদাসীও হতে পারে। তেমনি হতে পারে স্বাধীনা কিতাবিনী কিংবা ক্রীতদাসী। সুতরাং মুসলমান স্বাধীনা, ক্রীতদাসী অথবা কিতাবী স্বাধীনা ক্রীতদাসী যদি অসচ্চরিত্রা হয়, তবে তাদেরকে বিয়ে করা হারাম হবে। হাসান বসরী এ রকম বলেছেন। শা'বী বলেছেন, কিতাবী সচ্চরিত্রা নারী অর্থ— ব্যভিচার থেকে পবিত্র কিতাবিনী। এবং যারা জানাবাতের গোসল করে (বৈধ সহবাসের পর বা অন্য কোনো কারণে রেতঃপাত হওয়ার পর অপবিত্র হলে যারা গোসল করে নেয়)।

আমি বলি, বাগবীর বক্তব্যটি আয়াতের উদ্দেশ্যের পূর্ণ অনুকূল নয়। কারণ, আয়াতে মুসলমান ও কিতাবী উভয় সম্প্রদায়ের সচ্চরিত্রা রমণীদেরকে বিবাহ করা বৈধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ সচ্চরিত্রা ও স্বাধীনা রমণী বিবাহ করা বৈধ। এতে করে বুঝা যায়, ক্রীতদাসীদেরকে বিবাহ করা যাবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা এ কথা গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছেন, অসৎ স্বভাবা কিতাবী ক্রীতদাসীদেরকেও বিয়ে করা যাবে। কারণ, অন্যত্র এরশাদ হয়েছে— 'ওয়া উহিল্লালাকুম মা ওয়ারায়া জালিকুম' (আর ওই নারীগণ ব্যতীত অন্য নারীদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে)। অসৎস্বভাবা কিতাবী রমণীগণও এই অনুমতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারী'—এ কথায় অন্য নারীদেরকে যে বিবাহ করা যাবেই না— তা প্রমাণিত হয় না। তাই বায়যাবী লিখেছেন, এখানে বিশ্বাসী সচ্চরিত্রাদেরকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এ রকম করা উত্তম কিন্তু অন্যদেরকেও (অসচ্চরিত্রা, স্বাধীনা, বিশ্বাসিনী, কিতাবী, ক্রীতদাসী) বিবাহ করা যাবে। আল্লাহ্পাকই সমধিক জ্ঞাত। অর্থাৎ সাধারণভাবে এখানে এ কথাটিই বলে দেয়া হয়েছে, অমুসলিম দেশের কিতাবী নারীদেরকেও বিবাহ করা বৈধ। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, অমুসলিম কিতাবী রমণীকে বিবাহ করা বৈধ নয়। হজরত ইবনে ওমর কিতাবী রমণীদের সঙ্গে কোনোক্রমেই বিবাহবদ্ধ হওয়ার পক্ষপাতী নন— সে রমণী স্বাধীনা হোক অথবা বাঁদী। জিম্মি হোক অথবা হরবী। কারণ, কিতাবী মহিলারা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তা। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, 'ইহুদীরা উযায়েরকে এবং নাসারারা মসীহ্কে আল্লাহ্র পুত্র বলে থাকে।' যারা এ রকম বলে, তারা মুশরিক (অংশীবাদী)। আর অংশীবাদীদের সঙ্গে বিবাহ হারাম। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'যতোক্ষণ পর্যন্ত মুশরিক মহিলাগণ ইমান গ্রহণ না করে, তাদেরকে বিবাহ কোরো না।' হজরত ইবনে ওমর আরো বলেছেন, এখানে 'আল মুহ্সানাত' অর্থ সতী সাধ্বী মুসলিম রমণী। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি ভুল। কেননা,

www.eelm.weebly.com

এখানে স্পষ্ট করে তাদেরকে বিবাহ করার বৈধতা দেয়া হয়েছে। স্বাধীনা কিতাবী রমণীকে বিবাহ করা জায়েয—সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যসম্মত। মতোবিরোধ রয়েছে কেবল কিতাবী ক্রীতদাসীকে বিবাহ করার ব্যাপারে। সুরা নিসার তাফসীরে বিষয়টি বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে ঐকমত্যসম্মতরূপে কিতাবী রমণীদেরকে বিবাহ করা জায়েয হলেও মাকরূহ। এ রকম করা হলে অবিশ্বাসী নারীর সঙ্গে সর্বক্ষণ বসবাস করা ও তাকে ভালোবাসা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। সন্তান-সন্ততি হলে তাদের উপরও তার অবিশ্বাসী মায়ের চরিত্র প্রতিফলিত হয়। কারণ, মায়ের সঙ্গেই থাকে তাদের লালন পালনের প্রত্যক্ষ সংযোগ। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, হজরত হুজায়ফা, হজরত তালহা এবং হজরত কা'ব বিন মালেক কিতাবী রমণীর পাণি গ্রহণ করেছিলেন। হজরত ওমর এজন্য তাঁদের উপর রাগান্বিত হন। তখন তাঁরা বললেন, হে বিশ্বাসীদের অগ্রণী! আমরা তালাক দিয়ে দিচ্ছি। এ ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কিতাবী মহিলাদেরকে বিবাহ করা দুরস্ত নয়। কিন্তু দুরস্ত যদি নাই হবে তবে তালাক দেয়ার কথা উঠবে কেনো। অতএব বলতে হবে এ রকম— বিবাহ জায়েয কিন্তু মাকরূহ। আর মাকরূহ বলেই হজরত ওমর রাগান্বিত হয়েছিলেন। হজরত ওমর বলেছেন, মুসলমান পুরুষ ঈসায়ী মহিলাদেরকে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু ঈসায়ী পুরুষ মুসলমান রমণীকে বিয়ে করতে পারবে না।

সাবায়ী রমণীদেরকে বিবাহ করার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা এবং সাহেবাইনের মধ্যে মতোবিরোধ রয়েছে। ইমামে আজম বলেন, সাবায়ীরা যবুর কিতাবকে মান্য করে। তাই তারা কিতাবী। আর কিতাবীকে বিয়ে করা জায়েয। সাহেবাইনের বক্তব্য হচ্ছে— তারা তারকা পূজারী, তাই তারা মুশরিক। আর মুশরিক রমণীকে বিয়ে করা যায় না (যবুর কিতাবকে মান্য করলেও)। হেদায়া গ্রন্থে রয়েছে, ইমামে আজম এবং তাঁর দুই প্রধান ছাত্রের মতোবিরোধের কারণ— সাবায়ীদের সম্পর্কে তাদের ধারণার ভিন্নতা। হজরত ইব্রাহিম এবং হজরত শীশের সহীফার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মহিলাদেরকেও বিয়ে করা যাবে বলে ইমামে আজম মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

মাসআলাঃ মুসতাসফি গ্রন্থে বলা হয়েছে, মসীহ্‌কে যদি আল্লাহ্ না মনে করে তবে ঈসায়ী মহিলাদেরকে বিবাহ করা যাবে। আর যে মসীহ্‌কে ইলাহ্ বা উপাস্য বলে বিশ্বাস করে তাকে বিয়ে করা যাবে না। আল মাবসুত প্রণেতা শায়খুল ইসলাম বলেছেন, যদি কিতাবীরা মসীহ্ অথবা উযায়েরকে উপাস্য মনে করে, তবে তাদের জবীহা খাওয়া যাবে না এবং তাদের মহিলাদেরকে বিয়ে করা যাবে না (কারণ, তারা মুশরিক)। কোনো কোনো আলেম এই সিদ্ধান্তের উপরই ফতওয়া দিয়েছেন। কিন্তু কোরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কিতাবীদের জবীহা খাওয়া এবং তাদের মহিলাদেরকে বিবাহ করা জায়েয বলে মানতে হবে (মুসলিম জগতের শায়েখদের সর্বশেষ অভিমত এটাই)। ইবনে হুম্মাম শাইখুল ইসলামের অভিমত গ্রহণ করে লিখেছেন, প্রতিটি ঈসায়ীর জবীহা হালাল—তারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী হোক অথবা না হোক। কারণ, আলোচ্য আয়াতে কিতাবীদের জবীহাকে শর্তবিহীন হালাল করে দেয়া হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, আয়াতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, কিতাবী অর্থ ওই সকল কিতাবী যারা মুশরিক নয়। মুশরিক রমণীদেরকে বিবাহ করা আল্লাহ্‌পাকই নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। বলেছেন, 'ইমান গ্রহণ করা ব্যতীত তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ কোরো না।' আবার এখানে বলেছেন, 'তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো।' অতএব কিতাবীদের মধ্যে যারা শিরিক করে না তাদের মেয়েদের বিয়ে করা বৈধ, আর যারা শিরিক করে (হজরত ঈসা এবং হজরত উযায়েরকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে) তাদেরকে বিয়ে করা যাবে না। কারণ, তারা মুশরিক। জ্ঞানীদের অভিমত এই যে, প্রতিমা পূজারীর শিরিক এবং কিতাবীদের শিরিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উল্লেখ্য যে, ইহুদীদের একটি ক্ষুদ্র দল হজরত উযায়েরকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে থাকে। তেমনি ঈসায়ীদের একটি ক্ষুদ্র দল হজরত ঈসাকে ইবনুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র সন্তান বলে। এই দল দু'টোর এখন আর কোনো অস্তিত্ব নেই।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, আমাদের দেশের ইহুদীরা এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্‌কে হজরত উযায়েরের পিতা হওয়া থেকে পবিত্র মনে করে থাকে। তবে ঈসায়ীদের মধ্যে এমন কোনো লোক আমরা পাইনি যে, হজরত ঈসাকে আল্লাহ্‌র পুত্র মনে করে না। হজরত আলী বনী তাগলিবের খৃষ্টানদের জবীহা খেতে এবং তাদের নারীদেরকে বিবাহ করতে এ কারণেই নিষেধ করে দিয়েছেন।

ইজা আতাইতুমু হুন্না উজুরাহুন্না (যদি তোমরা তাদের মোহর প্রদান করো বিবাহের জন্য) —এ কথার মাধ্যমে বিবাহের মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে মোহর প্রদানের অর্থ বিবাহের জন্য মোহর জরুরী এবং নির্ধারিত মোহর পরিশোধ করতেই হবে। যেমন বলা হয়, লজ্জাস্থানকে হালাল করার জন্য বিবাহ করো। তেমনি এ রকম বলা যেতে পারে, বিবাহ করতে হলে মোহর অবশ্যই প্রদান করো।

সম্ভোগের জন্য নারীকে অর্থ প্রদান করার নামই মোহর নয়। কেউ কেউ ব্যভিচার করার জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে, আবার কেউ কেউ উপপত্নী বা রক্ষিতার জন্য অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু বিবাহ বৈধ এবং ব্যভিচার অবৈধ। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা তাদের মোহর প্রদান করো বিবাহের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নয়।'

শেষে বলা হয়েছে, 'কেউ ইমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'—এ কথার অর্থ ইমানই মূল সম্পদ। ইমান পরিত্যাগ করলে যত সৎ কর্মই করা হোক না কেনো, কোনো সৎকর্মই কবুল করা হবে না। আমল কবুল হওয়ার জন্য ইমান থাকা অপরিহার্য একটি শর্ত। আর পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অর্থ তার সকল পুণ্য বিনষ্ট হয়ে যাবে (যা পরকালের একমাত্র সম্বল)। এ রকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস।

www.eelm.weebly.com

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ
جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ
ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا
فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ
حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

❒ হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হইবে তখন তোমরা তোমাদের মুখ-মন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করিবে এবং তোমাদের মাথায় হাত বুলাইবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করিবে; যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হইবে। তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচস্থান হইতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রীর সহিত সংগত হও এবং পানি না পাও তবে বিশুদ্ধ মাটির চেষ্টা করিবে এবং উহা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাইবে; আল্লাহ্ তোমাদিগকে কষ্ট দিতে চাহেন না, বরং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র করিতে চাহেন ও তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিতে চাহেন, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

কাসেমের বর্ণনাসূত্রে বোখারী লিখেছেন, হজরত আয়েশা বলেছেন, আমি রসুল স.এর সঙ্গে মদীনায় আসছিলাম। পথিমধ্যে আমার গলার হার হারিয়ে গেলো। এ কথা জানতে পেরে রসুল স. কাফেলার যাত্রা স্থগিত করে দিলেন। লোকেরা হারানো হার অনুসন্ধান করতে লাগলো। তিনি স. আমার কোলে মাথা রেখে নিদ্রাভিভূত হলেন। এমন সময় আমার পিতা হজরত আবু বকর এসে আমাকে বললেন, তুমি একটি হারের জন্য পুরো কাফেলাকে থামিয়ে রেখেছো। একটু পরে রসুল স. জাগ্রত হলেন। ফজর নামাজের সময় হয়ে গেলো। কিন্তু ওজুর জন্য কোনো পানি পাওয়া গেলো না। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। হজরত উসাইদ বিন হুদ্বাইর বললেন, হে আবু বকর তনয়া! আপনাদের পরিবারের অসিলায় আল্লাহ্পাক মানুষকে বরকত দান করেছেন (এজন্য আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ)।

তাফসীরে মাযহারী/৪১৪

www.eelm.weebly.com

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মাতা আয়েশা সিদ্দিকার গলার হার হারিয়ে যাওয়ার কারণে। সুরা নিসার একটি আয়াতের তাফসীরে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে এই ঘটনাটিকেই উল্লেখ করা হয়েছিলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি ছিলো এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। যদি এমন না হতো তবে হজরত আবু বকর এ কথা বলতেন না যে, তুমি পুরো কাফেলাকে থামিয়ে দিয়েছো। ওজুর পানি না থাকার কথাও তাহলে আসতো না। আর হজরত উসাইদও হজরত আয়েশাকে কৃতজ্ঞতা জানাতেন না।

তিবরানীও হজরত আয়েশা থেকে এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে (এই ঘটনার কারণে) তায়াম্মুমের আয়াত নাজিল হলো এবং হজরত আবু বকর তাঁর কন্যা হজরত আয়েশাকে বললেন, নিঃসন্দেহে তুমি বরকতের অধিকারিণী।

'কুম তুম' অর্থ দন্ডায়মান হবে বা দণ্ডায়মান হওয়ার ইচ্ছা করবে। এখানে অর্থ হবে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে বা নামাজ পাঠের জন্য প্রস্তুত হবে। যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, ওয়া ইজা ক্বরাতাল কুরআনা ফাস্‌তাইজ বিল্লাহ্ (যখন তুমি কোরআন পাঠ করবে তখন আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে)। এখানে কোরআন পাঠ করা অর্থ কোরআন পাঠের ইচ্ছা করা। এভাবে 'কুনতুম ইলাস্‌সলাতি' বাক্যটির অর্থ হবে যখন তোমরা নামাজের জন্য প্রস্তুত হবে।

'ফাগছিলু উজুহাকুম' অর্থ মুখমণ্ডল ধৌত করবে। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দৃষ্টে বুঝা যায় যে, যে নামাজ পড়তে ইচ্ছে করবে তার জন্য ওজু করা ওয়াজিব। (যার ওজু নেই তার উপর ওজু ওয়াজিব এবং যার ওজু আছে তার জন্য পুনঃ ওজু মোস্তাহাব)। বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, মক্কাবিজয়ের দিন রসুল স. কয়েক ওয়াক্তের নামাজ এক ওজু দ্বারা পড়েছেন এবং চামড়ার মুজার উপর মসেহ করেছেন। এর পূর্বে তিনি স. প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন করে ওজু করে নিতেন। হজরত ওমর নিবেদন করলেন, আজ আল্লাহ্‌র রসুল এমন আমল করলেন যা ইতোপূর্বে করেননি। রসুল স. বললেন, ওমর আমি ইচ্ছাপূর্বক এ রকম করেছি। হজরত বুরাইদা থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম ও সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়।

'নামাজ পড়তে চাইলে ওজু করা ওয়াজিব'—প্রথম দিকে এই বিধানই কার্যকর ছিলো। পরে এই বিধান রহিত হয়ে যায়। পরে এই নিয়ম জারী হয়ে যায় যে, নামাজের প্রাক্কালে ওজু না থাকলে ওজু করা ওয়াজিব। আর ওজু থাকলে নতুন ওজু করা মোস্তাহাব। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হানযালার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. প্রত্যেক নামাজের জন্য ওজু করতেন। ওজু থাকুক কিংবা নাই থাকুক। যখন এই আমলটি রসুল স. এর উপর কঠিন হয়ে গেলো, তখন প্রতি নামাজের আগে শুধু মেসওয়াক করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাব্বান, হাকেম।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, ওজু থাকলেও নামাজের আগে ওজু করা মোস্তাহাব। কেউ বলেছেন সুন্নত। কারণ, হজরত আনাসের হাদিসে রয়েছে রসুল স. প্রত্যেক নামাজের জন্য তাজা ওজু করতেন। সুতরাং আলেমগণ এব্যাপারে একমত যে, ওজু থাকলেও প্রতি নামাজের আগে ওজু করা সুন্নত। কমপক্ষে মোস্তাহাব।

মোস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ রয়েছে হজরত ওমরের হাদিসে। সেখানে বলা হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র থাকা সত্ত্বেও ওজু করবে সে দশটি নেকী পাবে। শিথিল সূত্রসহযোগে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নাসাঈ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াতে নামাজের প্রাক্কালে ওজু করে নেয়ার কথা বলা হয়েছে— কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। (এ কথা বলা হয়নি যে, ওজু না থাকলে ওজু করবে, থাকলে করবে না)। কিন্তু নির্দেশটির প্রকৃত অর্থ হবে এ রকম—যদি বেওজু অবস্থায় থাকো তবে নামাজের পূর্বে ওজু করে নাও। হুকুমটি ওয়াজিব। সুতরাং এ কথা মানতে হবে যে, বেওজু অবস্থায় নামাজ পড়লে আল্লাহ্পাক তার নামাজ কবুল করবেন না। হাদিস শরীফে এ রকম বলা হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন— বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি।

হজরত জায়েদ বিন আসলাম বলেছেন, এ আয়াতটির অর্থ—নিদ্রার পর তোমরা যখন শয্যা ত্যাগ করে নামাজের জন্য উঠবে তখন ওজু করে নিবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রসুল স. কে এই সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপর ওই সময় ওজু ওয়াজিব যখন তোমরা নামাজ পাঠের ইচ্ছা করো, অন্য কোনো আমলের জন্য ওজু ওয়াজিব নয়। কেননা, আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে এই অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, নামাজ ব্যতীত অন্য আমলগুলো বেওজু অবস্থাতেও করা যাবে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমরা রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি স. প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পাদনের পর আমাদের নিকট এলেন। তাঁর সম্মুখে আহার্য বস্তু রাখা হলো এবং বলা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল, আপনি কি ওজু করবেন? তিনি স. বললেন, আমি নামাজ পড়তে চাই। এ কথা বলে তিনি ওজু করে নিলেন।

দ্রষ্টব্যঃ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব থেকেই ওজু ওয়াজিব ছিলো। যেমন বোখারীর বর্ণনা দৃষ্টে এ কথা বুঝা যায় যে, এখানে ওজুর প্রসঙ্গ এসেছে তায়াম্মুমের বিধান প্রবর্তন করার কারণে। মাতা আয়েশার গলার হার হারিয়ে যাওয়ার পর একস্থানে কাফেলা থেমে গিয়েছিলো। ইত্যবসরে নামাজের সময় হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ওজুর পানি ছিলো না। তাই রসুল স. সহ সকল সাহাবী পেরেশান হয়ে গিয়েছিলেন। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, সকল সাহাবী এ কথা জানতেন যে, নামাজ ফরজ হওয়ার পর থেকেই রসুল স. কখনো বেওজু অবস্থায় নামাজ পড়েননি। সাহাবীগণও পড়েননি। কারণ, ওজু ফরজ হওয়ার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছিলো নামাজ ফরজ হওয়ার সঙ্গেই। এই তথ্যের ভিত্তিতে এ কথা

www.eelm.weebly.com

সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এই ঘটনার পূর্বে কারো নামাজই ওজুবিহীন ছিলো না। এ কথাটি মেনে নিলে প্রমাণিত হবে যে, ওজু কেবল ফরজ নামাজের জন্য। আমি বলি, এখানে ওজুর উল্লেখ করা হয়েছে তায়াম্মুমের বিবরণ প্রসঙ্গে। আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত।

'ফাগসিলু উজুহাকুম'—এ কথার অর্থ মুখ-মণ্ডল ধৌত করো। ইমামত্রয়ের মতে মুখ-মণ্ডল ধৌত করতে হলে পানি পাওয়া শর্ত। ইমাম মালেক বলেছেন, পানি পাওয়া জরুরী। কিন্তু কোরআনে পানির কথা নেই। তাই ইমাম মালেকের কথাটি অপ্রমাণিত। ওয়াজহুন অর্থ চেহারা বা মুখমণ্ডল। শব্দটি এসেছে 'মাওজেহাত' থেকে। চেহারা বা মুখমণ্ডলের সীমা রেখা হচ্ছে কপালের চুল থেকে চিবুকের নিম্নরেখা পর্যন্ত এবং এক কান থেকে দ্বিতীয় কান পর্যন্ত। দাড়ি আবৃত অংশ যদি না ধোয়া হয় তবে ইমাম মালেক ব্যতীত অন্য তিন ইমামের মতে ওজু হবে না। ইমাম মালেকের মতে চোখের ভ্রূ থেকে গোঁফ দাড়ি পর্যন্ত পানি পৌঁছানো জরুরী। যদি দাড়ি পাতলা হয় এবং দাড়ির অভ্যন্তরে চামড়া দৃষ্টিতে আসে তবে চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো জরুরী। আর যদি দাড়ি ঘন হয়, চামড়া দেখা না যায় তবে চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো জরুরী নয়। যেমন মাথার চুলের উপর মসেহ্ করলে মাথা মসেহ্ হয়ে যায়। তাঁর এই বক্তব্যটি আলেমগণের ঐকমত্যের মাধ্যমে প্রমাণিত। দ্বিতীয় আমল হচ্ছে— রসুল স. এক আঁজলা পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিতেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী। তাঁর স. পবিত্র শ্মশ্রু ছিলো অত্যন্ত ঘন। কাযী আয়াজ এ রকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার সমর্থনে বহুসংখ্যক সাহাবীর বক্তব্য রয়েছে। সেগুলো বর্ণিত হয়েছে বিশুদ্ধ সূত্রসহযোগে।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর পবিত্র শ্মশ্রু ছিলো খুব ঘন। আমি বলি, ঘন শ্মশ্রুর গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো অসম্ভব। তাই চামড়া নয়, দাড়ির উপরের অংশ ধুয়ে নেয়া জমহুরের নিকট ওয়াজিব, যেমন মাথার চামড়ার বদলে চুলের উপর মসেহ করা ওয়াজিব। এক বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম আজমের অভিমতও এ রকম। জহিরীয়া গ্রন্থে এ রকমই ফতওয়া দেয়া হয়েছে। বাদায়ে গ্রন্থে অন্য একটি ফতওয়া ইমাম আজম থেকে সংকলিত হয়েছে। এক বর্ণনায় রয়েছে ইমামে আজম বলেন, এক চতুর্থাংশ দাড়ি মসেহ করা ওয়াজিব। আরেক বর্ণনায় এসেছে, এক তৃতীয়াংশ মসেহ করা ওয়াজিব। অন্য আর এক বর্ণনায় এসেছে, দাড়ি না ধোয়াই ওয়াজিব। ঐকমত্যানুসারে দাড়ির ভিতরের চামড়া ধৌত করার বিষয়টি রহিত হয়ে গিয়েছে। ঐকমত্যসূত্রে এ কথাও এসেছে যে, রসুল স. এক আঁজলা পানি দ্বারা তাঁর পবিত্র মুখ-মন্ডল ধৌত করে নিতেন। আর মসেহ করার বর্ণনায় এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, দাড়ির গোড়ার চামড়া ধোয়া ওয়াজিব নয়। চুলের উপর মসেহ করলেও যখন মস্তক মসেহ করা ধরা হয়, তখন দাড়ির ভিতরের চামড়া না ধোয়া হলেও মুখ-মণ্ডলের সঙ্গে দাড়িও ধোয়া হয়েছে ধরতে হবে। নতুবা শাখাগত আমলকে মূল আমল

www.eelm.weebly.com

অপেক্ষা অগ্রাধিকার দেয়া জরুরী হবে। আর হাদিস শরীফেও এ কথা পরিষ্কার বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, রসুল স. এক আঁজলা পানি দ্বারা তাঁর পবিত্র মুখ-মণ্ডল ধৌত করতেন। অতএব দাড়ির চামড়ার গোড়ায় পানি না পৌঁছলেও মুখমণ্ডল ধৌত করা হয়েছে ধরতে হবে। এই অভিমতের সমর্থনে যেমন ঐকমত্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে কিয়াস এবং হাদিস।

'ওয়া আইদিকুম ইলাল মারাফিক'—অর্থ হাত কনুই পর্যন্ত (ধৌত করবে)। হাত অঙ্গুলির অগ্রভাগ থেকে বগল পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু পরিষ্কার করে কনুই থেকে হাতের আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত অংশ ধৌত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইমাম চতুষ্টয় তাই কনুই পর্যন্ত ধৌত করা ওয়াজিব বলেছেন। জমহুরের বক্তব্যও এ রকম। কিন্তু ইমাম শা'বী এবং মোহাম্মদ বিন জারীরের মতে, কনুই ধৌত করা ওয়াজিব নয়। ইমাম জোফারও এ রকম বলেছেন। কেননা, 'ইলা' অর্থ পর্যন্ত। এই 'পর্যন্ত' অর্থ কনুই যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেই পর্যন্ত। এ রকম অর্থ করলে কনুই 'পর্যন্ত' কথাটির বাইরে থেকে যায়। যেমন, অন্যত্র এরশাদ করা হয়েছে, 'তোমরা রোজাকে রাত পর্যন্ত পূর্ণ করো।' এখানে রাতের কোনো অংশ নির্দেশের আওতায় আসেনি। রোজার সীমানা নির্দিষ্ট হয়েছে রাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। আর একটি কথা এই যে, আরবের প্রধান আলেমগণ বলেন 'ইলা' শব্দটি কেবল শেষ সীমা প্রকাশক। সীমাবহির্ভূতকে শেষ সীমানা অন্তর্ভূত করে না। এই ব্যাখ্যার আলোকে এখানে 'ইলাল মারাফিক্ব' অর্থ (কনুই পর্যন্ত) এবং কনুই সহ—দু'রকমই হতে পারে। অতএব, এর কোনো একটি অর্থকে অবশ্য গ্রহণীয় মনে করে অন্য অর্থটিকে অবশ্য বর্জনীয় মনে করা যাবে না।

আমি বলি, এখানে 'ইলা' অর্থ সহ। অর্থাৎ কনুই সহ। 'আল উম' গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ওজুর সময় হাত কনুই (সহ) ধৌত করতে হবে—এই মতের বিপক্ষে কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। অর্থাৎ এ প্রসঙ্গে সকলে একমত যে, কনুই (সহ) ধৌত করা ওয়াজিব। শা'বী, মোহাম্মদ বিন জারীর এবং ইমাম জোফারের ভিন্ন মত যদি কোনো বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হয়ও, তবুও তা হবে ঐকমত্যের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। ইমাম মালেক থেকেও এ কথা প্রমাণিত হয়নি যে, তিনি কনুই ধৌত করতে হবে না বলেছেন। শুধু আশহাব বলেছেন, পর্যন্ত ও সহ—দু'টো অর্থই সমশক্তিসম্পন্ন। আর এ বিষয়ের ঐকমত্যটি (কনুই সহ ধৌত করতে হবে) সনদবিহীনও নয়। এ ব্যাপারে রসুল স. এর আমলও প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান। উত্তম সনদ সহযোগে দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, হজরত ওসমান এতো অতিরিক্ত ধৌত করতেন না যাতে বাহুমূল পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। রসুল স. এর ওজু এ রকমই ছিলো। হজরত জাবের থেকে দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কনুইয়ের উপর পর্যন্ত পানি পৌঁছে দিতেন। এই বর্ণনাসূত্রটি অবশ্য দুর্বল। হজরত ওয়ায়েল বিন হাজর থেকে মারফু সূত্রে বায্যার ও তিবরানী বলেছেন, রসুল স. উভয় হস্ত কনুই যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেই পর্যন্ত ধৌত করতেন। হজরত ছা'লাবা বিন উবাদা তাঁর পিতা থেকে মারফু সূত্রে তাহাবী ও

www.eelm.weebly.com

তিবরানী লিখেছেন, রসুল স. কনুইয়ের উপর পর্যন্ত পানি পৌঁছে দিতেন। তিনি স. এবং সাহাবীগণের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি ওজুর সময় কনুই এবং পায়ের গ্রন্থি (টাখনু) পর্যন্ত না ধৌত করতেন। এই আমলের মধ্যেই কোরআনের আলোচ্য নির্দেশটির প্রমাণ রয়েছে। তাই তাফসীরকারগণ বলেছেন, 'ইলাল মারাফিক্ব' এবং 'ইলাল কা'বাইন' এর ইলা (পর্যন্ত) শব্দটির অর্থ হবে সহ (মাআ)। এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে আরো কয়েকটি আয়াতে। যেমন—১. 'ওয়া ইয়ানজিরকুম ক্বওয়াতান ইলা ক্বওয়াত' (এবং তোমাদেরকে শক্তির সাথে শক্তি বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে। ২. 'ওয়ালা তাকুলু আমওয়ালাহুম ইলা আমওয়ালিকুম' (এবং তোমরা তাদের সম্পদ তাদের সম্পদের সঙ্গে মিলিয়ে খেয়ো না)। ৩. 'মান আনসারি ইলাল্লহ' (কে এমন আছো যে আমাকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে সাহায্য করবে বা সঙ্গে থাকবে)।

'ওয়ামসাহু বিরুউসিকুম'—অর্থ মাথায় হাত বুলাবে বা মাথা মসেহ করবে। মাথা মসেহ করা ওয়াজিব (ফরজ)। তবে মস্তকের কতোটুকু অংশ মসেহ করতে হবে সে সম্পর্কে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, সম্পূর্ণ মস্তক মসেহ করা ওয়াজিব। কেননা, বলা হয়েছে মস্তক মসেহ করার কথা— কোনো অংশ বিশেষের উল্লেখ এখানে নেই। 'বিরুউসিকুম' শব্দটিতে 'বা' বর্ণটিও অতিরিক্ত হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। কাজেই সম্পূর্ণ মস্তক মসেহ করাই ওয়াজিব। যেমন মুখমন্ডল ধৌত করার অর্থ সম্পূর্ণ মুখমন্ডল ধৌত করা। তায়াম্মুমের সময়ও সম্পূর্ণ মুখমন্ডল মসেহ করা ফরজ। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জায়েদের বর্ণনায় রয়েছে—রসুল স. উভয় হস্ত দ্বারা মস্তক মসেহ করতেন। দুই হাত সম্মুখের দিক থেকে নিয়ে যেতেন পশ্চাতের দিকে পুনরায় পিছন থেকে নিয়ে আসতেন সামনে। তারপর দুই হাত স্থাপন করতেন গ্রীবাদেশে। সেখান থেকে হাত নিয়ে আসতেন ওই স্থানে— যেখান থেকে মসেহ শুরু করেছিলেন। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'বিরুউসিকুম' এর 'বা' অক্ষরটি প্রকৃত মিলিত অর্থে ব্যবহৃত। তাই এখানে প্রকৃত অর্থ ছেড়ে রূপক অর্থ গ্রহণ করার কারণ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর অর্থ হয় উপকরণগত বা কারণগত। মাফহুল বা কর্মকারক হয় না। তাই এখানে মস্তক মসেহ করার অর্থ সম্পূর্ণ মস্তক মসেহ করা হবে না। যেমন স্থানের সঙ্গে মিলিত করার অর্থে এমন বলা হয়—মারারতু বিস্সুক্ব (আমি বাজারে গিয়েছিলাম)। এখানে বাজার অর্থ বাজারের সম্পূর্ণ পরিসর নয়। তেমনি এই আয়াতেও মস্তক মসেহ অর্থ সম্পূর্ণ মস্তক মসেহ করা নয়। রসুল স. এর আমল থেকেও এ কথাটি প্রমাণিত। হজরত মুগিরা বিন শো'বা বলেছেন, রসুল স. ওজু করলেন। তখন মস্তকের সম্মুখভাগের উপর, পাগড়ীর উপর এবং মোজার (চামড়া নির্মিত) উপর মসেহ করলেন। মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

আতা থেকে মুরসালরূপে ইমাম শাফেয়ী লিখেছেন, রসুল স. ওজু করলেন এবং পাগড়ী উঠিয়ে মাথার সম্মুখভাগ মসেহ করলেন। এই মুরসাল বর্ণনাটির সমর্থনে আর একটি মুত্তাসিল বর্ণনাও রয়েছে, যে বর্ণনাটি আবু দাউদ লিখেছেন হজরত আনাস থেকে। তবে এই সূত্রভূত এক বর্ণনাকারী মা'কাল অপরিচিত।

সাঈদ বিন মানসুর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওসমানের নিকট একবার ওজুর নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি ওজু করে দেখালেন। মসেহ করলেন মস্তকের সামনের অংশে। এ বর্ণনাসূত্রভূত খালেদ বিন ইয়াজিদ বিন আবী মালেক ছিলো ভিন্ন প্রকৃতির লোক। হাফেজ ইবনে হাজারের বর্ণনায় রয়েছে, ইবনে মুনজির প্রমুখ লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর মাথার কিছু অংশ মসেহ করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। ইবনে হাজম এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাহলে সম্পূর্ণ মস্তক মসেহ করাকে মোস্তাহাব বলা যায়। কারণ, সম্পূর্ণ মস্তক মসেহ করার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

উপরে বর্ণিত আলোচনার মাধ্যমে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আয়াতে মাথা মসেহ করার নির্দেশটির অর্থ এ রকম নয় যে, সম্পূর্ণ মাথা মসেহ করতে হবে। কিন্তু মাথার কতোটুকু অংশ মসেহ করতে হবে সে কথাও স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তাই ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মাথার একটি অথবা তিনটি চুলের উপরে মসেহ করলেই চলবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নির্দেশটি ব্যাপক অর্থবোধক। হজরত মুগীরার হাদিসটিও ব্যাপকতার পোষকতা করেছে। তাই আমরা বলি, মস্তকের এক চতুর্থাংশ মসেহ করা ওয়াজিব। অবশ্য মস্তক অর্থ যদি মস্তকের নূন্যতম অংশ ধরা হয়, তবে দু'একটি চুল মসেহ করলেই চলবে। কেননা, এটা আসরে বদহী (যার জন্য সুনির্দিষ্ট দলিলের প্রয়োজন হয় না)। সম্পূর্ণ মুখমন্ডল ধৌত করলেই মস্তকের সম্মুখভাগের কিছু চুল মসেহ হয়েই যায়। কিন্তু এখানে মস্তক মসেহ করার কথা বলা হয়েছে পৃথকভাবে— (সুতরাং এক চতুর্থাংশ মসেহ ওয়াজিব বলাই শ্রেয়)।

'ওয়া আরজুলাকুম ইলাল কা'বাইন' (এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে)। ক্বারী নাফে, ইবনে আমের, কুসাই, ইয়াকুব এবং হাফস 'আরজুলাকুম' শব্দটিকে পড়েছেন 'আরজুলিকুম' (লাম অক্ষরটিকে যের সহযোগে)। এভাবে কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করার সঙ্গে গ্রন্থি (টাখনু) পর্যন্ত পা ধোয়ার সংযোগ সাধিত হয়েছে। কাজেই হাতের কনুই এবং পায়ের গ্রন্থি ধৌত করতে হবে। আর পায়ের গ্রন্থি ধৌত করার প্রসঙ্গটি যদি মাথা মসেহ করার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তবে বিষয়টি হয়ে পড়বে অনির্ধারিত। অর্থাৎ মাথা অর্থ যেমন সম্পূর্ণ মাথা নয়, পায়ের গ্রন্থি অর্থও তেমনি সম্পূর্ণ পা বা পায়ের গ্রন্থি বুঝা যাবে না।

অন্য ক্বারীগণ শব্দটিকে পড়েছেন 'আরজুলাকুম' (লাম অক্ষরটিকে যবর সহযোগে)। এ রকম উচ্চারণ করলেও হাতের কনুই ধৌত করার সঙ্গেই এর সংযোগ স্থাপন করেছেন তাঁরা। অন্য আয়াতেও এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন 'ইন্নি আখাফু আলাইকুম আযাবা ইয়াওমিন আলীম' (নিশ্চয়ই আমি তোমাদের

www.eelm.weebly.com

যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির দিনের আশংকা করি)। এখানে 'আলীম' শব্দটির 'লাম' অক্ষরটিতে রয়েছে 'যের।' এভাবে যন্ত্রনাদায়ক শব্দটির সরাসরি সংযোগ শাস্তির সঙ্গে হলেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'ইয়াওমিন' (দিন এর সঙ্গে)। এই আয়াতেও তেমনি 'রুউসিকুম' (মাথায়) এর পরে 'আরজুলাকুম' উচ্চারিত হলেও ধৌত করার ব্যাপারটি কনুই ধৌত করার সঙ্গে সম্পৃক্ত মনে করতে হবে।

একটি ধারণাঃ অধিকাংশ ব্যাকারণবিদ নৈকট্য বা সম্পৃক্তি স্থাপনের জন্য 'যের' হরকতের ব্যবহারকে অসিদ্ধ বলেছেন। যারা সিদ্ধ বলেছেন, তাদের রয়েছে দু'টি শর্ত—১. সংযোজক অব্যয় বা অক্ষর মাঝখানে থাকা যাবে না (কিন্তু এখানে সংযোজক অব্যয় 'ওয়াও' রয়েছে)। ২. দ্ব্যর্থবোধকতাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। কিন্তু এখানে 'লাম' অক্ষরে 'যের' হরকত যোগ করলে বিষয়টি হয়ে পড়ে সন্দেহযুক্ত। অর্থাৎ এ কথা নিশ্চিত হওয়া যায় না যে, 'আরজুলিকুম' শব্দটির সংযোগ 'রুউসাকুম' এর সঙ্গে না 'আইদিকুম' এর সঙ্গে (পায়ের গ্রন্থি কি মাথার মতো মসেহ করতে হবে, না কনুইয়ের মতো ধৌত করতে হবে)।

উত্তরঃ অধিকাংশ ব্যাকরণবিদ সম্পৃক্তিসূচক 'যের'কে অসিদ্ধ বলেছেন—এ কথা মেনে নেয়া যায় না। যের হরকতের এ রকম ব্যবহার কোরআন মজীদের অনেক আয়াতে রয়েছে। অলংকার শাস্ত্রবিদগণের বাক্যাবলীতেও এ রকম প্রমাণ রয়েছে অনেক। সুতরাং একে অস্বীকার করা হঠকারিতার নামান্তর। এখানে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, 'ইলাল কা'বাঈন (পা গ্রন্থি পর্যন্ত)। সুতরাং বিষয়টি আর সন্দেহ যুক্ত নয়। তবে এ কথা ঠিক— সংযোগকারী অব্যয় মাঝখানে না থাকলে মতপার্থক্যের অবকাশ থাকবে। কোনো কোনো আলেম তাই এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন। কেনন, সংযোগকারী অব্যয় সংযোজিত প্রসঙ্গগুলোকে দূরবর্তী করে দেয়। আবার সংযুক্তও করে। ইবনে মালেক এবং খালেদ আজহারী বলেছেন 'ওয়াও' (এবং) অব্যয়টির বিশেষত্ব রয়েছে এগারোটি— যার মধ্যে রয়েছে পার্শ্বস্থ বাক্যের প্রভাব, যা প্রতিষ্ঠিত থাকে সংযোজক 'ওয়াও' এর সঙ্গে।

আমি বলি, মাঝখানে 'ওয়াও' আসার পর নৈকট্যের প্রভাব বাকী থাকার যদি কোনো অতিরিক্ত দলিল না থাকে তবে পা ধৌত করা যে ওয়াজিব— সে কথা প্রমাণিত হয়। উপরে সে কথা বলাও হয়েছে। অর্থাৎ 'আরজুলিকুম' সম্পর্কিত 'আইদিকুম'—এর সঙ্গে। রুউসিকুমের সঙ্গে নয়। কারণ, ধৌত করতে হয় কনুই ও পায়ের গ্রন্থি। আর মসেহ করতে হয় মাথা। হাদিস শরীফসমূহে এ কথা বিবৃত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে সংঘটিত হয়েছে ঐকমত্যও। কাজেই সংযোজক অব্যয়ের উপস্থিতিতেও শাব্দিক নৈকট্যের চেয়ে প্রসঙ্গের নৈকট্যের প্রভাবই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আর একটি কথা এই যে, পায়ের গ্রন্থি অর্থ ওই দু'টি হাড় যেখানে মিলিত হয়েছে মূল পা এবং পায়ের পাতা। আর এ কথা কেউই বলেন না যে, পা মসেহ করার অর্থ— ওই দু'টি হাড় মসেহ করা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'আরজুলিকুম' এর সংযোগ যদি 'আইদিকুম' এর সঙ্গে হয়, তবে সংযোগ লিপিটি হবে এ রকম—'দ্বরাবৃতু জাইদান আও

www.eelm.weebly.com

আমরান ওয়া আকরামতু বাকরা'ওঁ ওয়া খালিদা' (আমি প্রহার করেছি জায়েদকে অথবা আমরকে এবং আমি সম্মান করেছি বকর এবং খালেদকে)। এখানে খালেদকে জায়েদের সঙ্গে সংযুক্ত করলে ভুল হবে। তবে এখানে খালেদের সঙ্গে সংযোগ ঘটতে পারে বকরের।

কেউ কেউ বলেছেন, যদি খবর সহযোগে 'আরজুলাকুম' পড়া হয় তবুও তা সংযুক্ত হবে 'রুউসিকুম'—এর সঙ্গে। রুউসিকুমই যবরের স্থান। অথবা এ রকমও বলা যায় যে, এখানে যের কে অপসারণ করে যবর বসানো হয়েছে। এ কথাটিও ভুল। কেননা, রীতিবিরুদ্ধ ও অকারণ সংযোজনকে বিশুদ্ধ বলা যায় না। কেউ আবার বলেছেন, আরজুলাকুম এর পূর্বে 'আমসাহু' (মসেহ করো) শব্দটি উহ্য রয়েছে। এ কথাটিও ঠিক নয়। কারণ, বিশেষ কোনো ক্রিয়ার রীতিবিরুদ্ধ পরিবর্তন বৈধ নয়। মূল উদ্দেশ্যের প্রতি যাতে সন্দেহ সৃষ্টি না হয়— সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে। কোনো কোনো আলেম 'ওয়া আরজুলাকুম' এর 'ওয়াও' এর অর্থ ধরে নিয়েছেন 'সঙ্গে'। কিন্তু এই ধারণাটিও ভুল। 'মাফউলেমায়াহু' (সংগতাজ্ঞাপক কর্ম) এর জন্য কেবল ক্রিয়াকে মিলিত করাই যথেষ্ট নয়—স্থান ও কালকেও মিলিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কালের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ধারণাটিও একটি অবাস্তব ব্যাপার। কেননা, সংযোজনরীতির মধ্যেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক)। আর মাথা ও পা নিশ্চয়ই এক সঙ্গে ধৌত বা মসেহ করা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই একটি আগে এবং অপরটি পরে হবে। অথবা এখানে সাধারণ ক্রিয়াই হবে উদ্দেশ্য। তখন আর সময়ের কথা উঠবে না। ধারাবাহিকতা ও ধারাবাহিকতাহীনতা কোনোটিই তখন ধর্তব্য বলে গণ্য হবে না। আর স্থানের সম্মিলন প্রসঙ্গে এ কথা বলতে হয় যে, একই স্থানে দু'টি মসেহ (মাথা ও পা) কারোর নিকটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

যদি উপরে বর্ণিত দুর্বল ব্যাখ্যাটিকে মেনে নিয়ে 'রুউসিকুম' এর সঙ্গে সংযোগ হয়েছে বলে মনে করা হয়, তবে ওই 'বা' (বিরুউসিকুম) শব্দটির প্রথমে সংযুক্ত থাকার কারণে 'রুউস' (মাথা) শব্দটির অর্থ হবে অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির মতো অনির্দিষ্ট। অর্থাৎ মাথার অর্থ হবে মাথার কিয়দংশ (সম্পূর্ণ মাথা নয়)। তাই অধিকাংশ ফকীহ্ মাথার কিছু অংশ মসেহ করতে হবে বলেছেন। কিন্তু 'আরজুলাকাম' শব্দটির অর্থ সে রকম অনির্দিষ্ট হবে না। অর্থাৎ 'আরজুলাকুম' (পা গ্রন্থি পর্যন্ত) অর্থ হবে সম্পূর্ণ পা। কিন্তু সম্পূর্ণ পা মসেহ করা ওয়াজিব—এ কথা কেউই বলেননি। ইমামীয়া সম্প্রদায়ের নিকট 'আরজুলাকুম' এর সংযোগ রয়েছে 'রুউসিকুম' এর সঙ্গে। তাই তারা ওজুর সময় পা ধৌত না করে মসেহ করে থাকে। নিঃসন্দেহে তাদের ব্যাখ্যা দুর্বল এবং ভুল।

হজরত আমর বিন আমবাসার ওজুর ফযীলত সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ হাদিস আমাদের অভিমতের প্রমাণ— যার শেষাংশে বলা হয়েছে, রসুল স. বললেন, দুই পা ধুয়ে নাও, যেমন আল্লাহ্পাক হুকুম দিয়েছেন। এই পা ধোয়ার কথাটি হাদিস শরীফে পুনঃপুনঃ উল্লেখিত হয়েছে। বর্ণনাকারীগণ সকলেই পা ধৌত করার কথাই

www.eelm.weebly.com

বলেছেন। পা মসেহ করার কথা কেউই বলেননি। পা ধৌত করার বিষয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাহাবীগণের ঐকমত্য। কেবল হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আনাসের বর্ণনায় পা মসেহ করার কথা রয়েছে। কিন্তু তাঁরাও অবশেষে পা ধৌত করার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। সাঈদ বিন মানসুর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী শব্দটিকে পড়তেন 'আরজুলিকুম।' হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, হজরত আলী এই উচ্চারণের প্রেক্ষিতে পা ধৌত করার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছেন। আবু আবদুর রহমান সালামীর বর্ণনায় রয়েছে, একবার হজরত ইমাম হাসান এবং হজরত ইমাম হোসাইন পাঠ করলেন 'ওয়া আরজুলিকুম।' তাদের পাঠ শুনে হজরত আলী বললেন, এই আয়াতে কিছু শব্দের অগ্র-পশ্চাৎ ঘটেছে। যেমন এখানে 'ওয়াআরজুলিকুম' হুকুমটি হবে 'রুউসিকুমের' পূর্বে, যদিও এখানে 'ওয়া আরজুলিকুম' এসেছে 'বিরুউসিকুম' এর পরে (অর্থাৎ ধৌত করতে হবে দুই হাত কনুই পর্যন্ত, দুই পা গ্রন্থি পর্যন্ত এবং মসেহ করতে হবে মস্তক)। ওই সময় হজরত আলী জনতার একটি বিবাদের মীমাংসা করে দিচ্ছিলেন। ইবনে জারীর। পা ধৌত করার বিষয়ে সকল সাহাবী একমত—আবদুর রহমান বিন আবি লাইলীর এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন সাঈদ বিন মানসুর। ইবনে আবী শায়বাও বলেছেন, রসুল স. এবং মুসলমানদের রীতি হিসেবে সুদূর অতীত থেকে পা ধৌত করার এই নিয়মটি চলে এসেছে।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, আতা বলেছেন, আমি কাউকেই পা মসেহ করার কথা বলিনি। তাহাবী এবং ইবনে হাজম দাবী করেছেন, প্রথমে মসেহ করার হুকুমই দেয়া হয়েছিলো। পরে তা রহিত হয়ে গিয়েছে। ইবনে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আনাস বলেছেন, কোরআনে প্রকাশ্যে মসেহের হুকুমই দেয়া হয়েছে এবং সুন্নত বা হাদিসে এসেছে পা ধৌত করার হুকুম। হজরত আনাস আরো বলেছেন, কোরআনে রয়েছে মসেহ করার প্রমাণ। কিন্তু রসুল স. পা ধৌত করতেন। আর রসুল স. এর এমন আমল করা ওই সময়ে সম্ভব, যখন আয়াতের উদ্দেশ্য হবে পা ধৌত করা অথবা মসেহ করার হুকুমটি রহিত হওয়া।

আমাদের অভিমতের সমর্থনে রয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর বর্ণিত হাদিসটি— যেখানে তিনি বলেছেন, এক সফরের সময় রসুল স. ছিলেন কিছুটা পশ্চাদবর্তী। তিনি স. যখন আমাদের নিকট পৌঁছলেন, তখন নামাজের সময় শুরু হয়েছিলো। আমরা ওজু করছিলাম। শেষে মসেহ করলাম পা। রসুল স. তখন উচ্চ স্বরে ঘোষণা করলেন, শুষ্ক পদসমূহের জন্য রয়েছে ওয়ায়েল দোজখ অথবা দোজখের শাস্তি। বোখারী, মুসলিম।

এক বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা কতিপয় লোককে ওজু করতে দেখে বললেন, ওজু পূর্ণ করো। আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, শুকনো পায়ের জন্য রয়েছে দোজখের আযাব। বোখারী, মুসলিম। এরূপ বক্তব্য এসেছে হজরত জাবের এবং মাতা আয়েশা সিদ্দিকার হাদিসেও।

www.eelm.weebly.com

যাঁরা পা মসেহ করার পক্ষপাতি তাঁরা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এই হাদিসটিকে—হজরত উয়াইস বিন আবী উয়াইস বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং দেখেছি রসুল স. ওজু করলেন এবং শেষে মসেহ করলেন তাঁর পবিত্র পাদুকার উপর। তারপর নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হলেন। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. জুতা এবং পায়ের উপর মসেহ করলেন।

আমরা বলি, বর্ণিত হাদিসের পবিত্র পাদুকা বা নালাইন ছিলো চামড়ার মোজার মতো— যা সম্পূর্ণ পা আবৃত করে থাকে। মোজার উপর যেমন মসেহ করা হয়ে থাকে ঠিক তেমনি, তিনি স. তাঁর পবিত্র পাদুকার উপর মসেহ করেছিলেন। ইয়া'লীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. ওজু করলেন এবং উভয় পায়ে মসেহ করলেন। বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ ইয়া'লী থেকে বর্ণনাটি এনেছেন হাইসাম। আর ইমাম আহম্মদ হাইসামকে তাদলীসকারী বলেছেন (পণ্য বিক্রয়ের সময় যে পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করে তাকে বলে তাদলীস)। সুতরাং বুঝতে হবে হাইসাল নিশ্চয়ই অন্য কোনো বর্ণনাকারীর নিকট শুনে তার কথা গোপন করে বলেছে— আমি ইয়া'লী থেকে শুনেছি। অথবা বর্ণনাটির প্রকৃত অর্থ হবে এ রকম—রসুল স. তাঁর পবিত্র পা মসেহ করেছেন ওই সময়, যখন তাঁর পবিত্র পদযুগল ছিলো মোজার ভিতরে এবং তিনি মোজার উপরেই মসেহ করেছিলেন। আর এই মসেহকেই পা মসেহ করেছেন বলা হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ মানুষ সাধারণ কথাবার্তায় এ রকম বলে থাকে, আমি যখনই আমিরের নিকটে যাই, তখনই তার পদচুম্বন করি— এ কথার অর্থ হয়— যদি তখন আমিরের পায়ে মোজা না থাকে তবে পদচুম্বন করি। আর যদি তিনি মোজা পরিহিত অবস্থায় থাকেন তখন চুম্বন করি তার মোজা। উভয় অবস্থাকে পদচুম্বন বলা যায়। কিন্তু মোজার উল্লেখ না থাকলে আমিরের পা মোজা আবৃত ছিলো এ কথা প্রমাণ করা যায় না। মোজা আবৃত পায়ের কথাটি প্রমাণ করা তখন দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে (উপরোক্ত হাদিসে বর্ণিত পা মসেহের কথাটিকে তেমনি মোজার উপরে মসেহ প্রমাণ করা দুঃসাধ্য)। এর উত্তরে এই বলা যেতে পারে যে, দু'টি আয়াত অথবা দু'টি উচ্চারণের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে উভয়টি আমল করার একটি পদ্ধতি বের করা ওয়াজিব। তন্মধ্যে একটি পদ্ধতি এই—বর্ণিত আমল দু'টোর সময় এবং অবস্থা পৃথক পৃথক করে দিতে হবে। দু'টো অবস্থার উল্লেখ করা তখন জরুরী হবে অন্যথায় নিশ্চয়ই কোনো কারণ প্রদর্শন করা জরুরী হবে। যেমন এই আয়াতটি—'ওয়ালা তাক্বরাবুহুন্না হাত্তা ইয়াত্হুরনা' (এবং তোমরা তোমাদের পত্নীদের নিকট ঋতুবতী অবস্থায় গমন কোরো না, যতোক্ষণ না তারা পবিত্র হয়)। এখানে পবিত্র হওয়া সম্পর্কে দু'টো উচ্চারণ রীতি (ক্বেরাত) রয়েছে। একটি হচ্ছে 'ইয়াত্হুরনা' এবং অন্যটি 'ইয়াত্তাহারনা।' প্রথম উচ্চারণ অনুসারে অর্থ হবে, যখন ঋতুর পুরো দশ দিন অতিবাহিত হবে এবং দশ দিনের পর যখন পবিত্র হয়ে যাবে। দ্বিতীয় উচ্চারণ অনুসারে অর্থ হবে— যখন দশ দিনের কম সময়ে ঋতুস্রাব শেষ হবে এবং তারা পবিত্র হবে। যদি এখানে এ

www.eelm.weebly.com

রকম বলা হয় যে, রসুল স. এর সময়ে চামড়ার মোজা ব্যবহারের প্রচলন ছিলো খুব কম, তবে আমরা বলবো পা মসেহ করার বর্ণনাটি গ্রহণ না করাই সমীচীন।

'ইলাল মারাফিক্ব ' অর্থ যেমন কনুই পর্যন্ত তেমনি 'ইলাল কা'বাঈন' অর্থ পায়ের গ্রন্থি পর্যন্ত। পায়ের গ্রন্থি অর্থ ওই গ্রন্থি যা পায়ের উভয় দিকে একটু করে উঁচু হয়ে থাকে। হাঁটুকে পায়ের গ্রন্থি বলা যায় না। আবার জুতার ফিতা বাঁধার স্থানকেও গ্রন্থি বলা হয় না। 'কা'বাঈন' শব্দটি দ্বিবচন বিশিষ্ট। এক বচন হচ্ছে কা'ব। এখানে পায়ের গ্রন্থি বুঝাতে দ্বিবচনসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, প্রতিটি পায়ের গ্রন্থিতে দু'টো হাড় দু'পাশে বেরিয়ে থাকে। তাই এখানে পায়ের গ্রন্থি বুঝাতে একবচন বা বহুবচন ব্যবহৃত হয়নি। ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিবচন।

মাসআলাঃ পুরোপুরি ওজু করে (পা ধৌত করা সহ) চামড়ার মোজা পরিধান করার পর ওজু ভেঙে গেলে, পুনঃ ওজু করার সময় সব শেষে পা ধোয়ার পরিবর্তে মোজার উপর মসেহ করলেই যথেষ্ট হবে। সফরে এবং গৃহবাসে এ রকম করা যাবে বলে জমহুর অভিমত প্রকাশ করেছেন। ইমাম মালেক বলেছেন, গৃহবাসী (মুকিম) অবস্থায় মোজার উপরে মসেহ করা যাবে না। মুসাফির অবস্থায় যাবে।

আবু বকর বিন দাউদ এবং ইমামীয়া গোত্রের নিকট মোজার উপর মসেহ সকল অবস্থায় নাজায়েয। কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন 'আরজুলাকুম' পড়া হলে সংযোগ হবে 'আইদিকুম' এর সঙ্গে এবং তখন পা ধোয়া হবে ওয়াজিব। আর 'আরজিলুকুম' পড়লে সংযোগ হবে 'রুউসিকুম' এর সঙ্গে এবং তখন পা মসেহ করা হবে ওয়াজিব— কিন্তু পা থাকতে হবে মোজার ভিতরে। কেননা, দু'টি উচ্চারণ (ক্বেরাত) রয়েছে দু'টি আয়াতের মতো। একটি ক্বেরাতের লক্ষ্য প্রকৃত এবং অন্যটির লক্ষ্য রূপক। প্রতিটি ক্বেরাতের তরতীব এবং শব্দের পরিমাণ অপর ক্বেরাতের তরতীব এবং শব্দের পরিমাণ থেকে পৃথক হবে। প্রথম ক্বেরাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে পা ধৌত করা এবং দ্বিতীয় ক্বেরাতের রূপক উদ্দেশ্য হবে পায়ের উপর মসেহ করা (মোজার উপর মসেহ করা)। যদি একটির তাফসীর এ রকম করা হয়, তবে মোজার উপরে মসেহ করার নির্দেশটি হবে প্রসিদ্ধ— যদ্দারা কোরআনের নির্দেশ রহিত হওয়া জায়েয হবে। হাফেজে হাদিসের একটি দল বলেছেন, মোজার উপর মসেহের নির্দেশটি বহুজনবিদিত। মোজার উপর মসেহ সম্পর্কে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা আশি জনেরও বেশী। তাদের মধ্যে আশারায়ে মোবাশারা (বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী)ও রয়েছেন। ইবনে আবী শায়বা প্রমুখ লিখেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, আমার নিকট সত্তরজন সাহাবী মোজার উপর মসেহ করার হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, দিবালোকের মতো স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমি মোজার উপর মসেহের সমর্থক হবো না। আবার তিনি এ কথাও বলেছেন, যে ব্যক্তি মোজার উপর মসেহকে জায়েয না বলে, তার সম্পর্কে আমি কুফরীর (অবিশ্বাসের) আশংকা করি। ইমাম আহমদ বলেছেন, আমার হৃদয়ে মোজার উপর মসেহ সম্পর্কে কোনো দ্বিধা নেই। এ সম্পর্কে সাহাবীগণের চল্লিশটি হাদিস

www.eelm.weebly.com

বর্ণিত হয়েছে। হাদিসগুলোর কোনো কোনোটি মারফু আবার কোনো কোনোটি মাওকুফ। ওই হাদিসগুলো থেকে দু'টো হাদিস বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। একটি এই—হজরত মুগীরা বিন শো'বা বর্ণনা করেছেন, আমি এক সফরে রসুল স. এর একান্ত সঙ্গী ছিলাম। এক স্থানে তিনি স. আমার নিকট পানির পাত্র চাইলেন। আমি পানিপূর্ণ একটি পাত্র এনে দিলাম। তিনি স. সেটি নিয়ে চলতে চলতে আমার চোখের আড়াল হয়ে গেলেন। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের পর পুনরায় ফিরে এলেন আমার কাছে। আমি পানির পাত্র থেকে পানি ঢেলে দিলাম। নামাজের পূর্বে যেভাবে ওজু করতে হয়, তিনি সেভাবে ওজু করলেন এবং শেষে পা না ধুয়ে মোজার উপর মসেহ করলেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত মুগীরার এই হাদিসটি কমপক্ষে ষাটটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে পঁয়তাল্লিশটি সূত্রে বর্ণনাকারী হিসেবে রয়েছেন ইবনে মান্দা।

দ্বিতীয় হাদিসটি এই— হজরত জারীর বর্ণনা করেছেন, আমি দেখেছি রসুল স. প্রস্রাব করার পর ওজু করেছেন এবং মোজার উপর মসেহ করেছেন। ইব্রাহিম বলেছেন, এ হাদিসটি ছিলো অত্যন্ত জনপ্রিয়। হজরত জারীর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সুরা মায়িদা অবতীর্ণ হওয়ার অনেক পরে। আলোচ্য আয়াতটির নির্দেশ দৃষ্টে এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, প্রথম দিকে তিনি স. অত্যাবশ্যকরূপে পা ধৌত করতেন। পরে (কখনো কখনো) মসেহ করতেন। পরবর্তীকালে এই অবস্থার কথাই বর্ণিত হয়েছে হজরত জারীরের হাদিসে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। ইবনে আবদুল বার মালেকী বর্ণনা করেছেন, কোনো ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদই মোজার উপর মসেহ জায়েয হওয়াকে অস্বীকার করেননি। অস্বীকৃতিসূচক বক্তব্য এসেছে কেবল ইমাম মালেকের পক্ষ থেকে। কিন্তু বিশুদ্ধ সূত্রে এ রকমও প্রমাণিত হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত তিনিও মোজার উপর মসেহকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

সাহাবীগণের মধ্যে এ রকম কেউ ছিলেন না যিনি মোজার উপর মসেহকে অস্বীকার করেছেন। অস্বীকৃতি এসেছে কেবল হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু হোরায়রা এবং জননী আয়েশা থেকে। কিন্তু পরে হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আবু হোরায়রা তাঁদের মত পরিবর্তন করেছিলেন। বিশুদ্ধ সূত্রে এ কথা এসেছে, তাঁরাও শেষে অন্যান্য সাহাবীর অভিমতকে গ্রহণ করেছিলেন। আর জননী আয়েশা সম্পর্কে মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে— একবার শোরাইহ্ বিন হানী মাতা আয়েশা সিদ্দিকাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ইবনে আবী তালেবকে জিজ্ঞেস করো। তিনি রসুল স. এর সঙ্গে অনেক সফর করেছেন। শোরাইহ্ তখন হজরত আলীর নিকটে গিয়ে এ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। হজরত আলী বললেন (মোজা মসেহের জন্য) রসুল স. মুসাফিরকে তিন দিন তিন রাত এবং মুকিমকে এক রাত এক দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান। জননী আয়েশা সিদ্দিকা থেকে দারা কুতনীও মোজার উপর মসেহ জায়েয হওয়া সম্পর্কিত বর্ণনা এনেছেন।

www.eelm.weebly.com

কেউ কেউ বলেছেন, হজরত আলী বলতেন, মোজার উপর মসেহ করা এবং আমার গাধার পিঠের উপর মসেহ করা একই কথা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, হজরত আয়েশা বলেন, মোজার উপর মসেহ করার চেয়ে পা কেটে ফেলাই আমার নিকট উত্তম—এ সকল কথা ভিত্তিহীন ও ভুল। হাদিসের হাফেজগণ এগুলোর যথা ব্যাখ্যাদান করেছেন।

মাসআলাঃ মুসাফির তিন দিন তিন রাত্রি এবং মুকিম এক দিন এক রাত্রি মোজার উপর মসেহ করতে পারবে। হজরত আবু বকরের বর্ণনায় রয়েছে, মুসাফির তিন দিন এবং মুকিম এক দিন মোজার উপর মসেহ করতে পারবে। তবে শর্ত হচ্ছে, মোজা পরিধান করতে হবে পবিত্রাবস্থায়। তিরমিজি, ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাব্বান, ইবনে জারুদ, শাফেয়ী, ইবনে আবী শায়বা, বায়হাকী, দারা কুতনী। বায়হাকী লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ীর নিকট অভিমতটি বিশুদ্ধ। ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত মুগীরার হাদিসটিতে এ কথাও রয়েছে যে, আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমি কি আপনার মোজা খুলে দেবো। তিনি স. বললেন, যেভাবে আছে, সেভাবেই থাকতে দাও। পবিত্র অবস্থায় আমি মোজা পরিধান করেছি। ইবনে জাওজী তাঁর আত্‌তাহ্‌কিক গ্রন্থে এ সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত আলী, হজরত সাফওয়ান বিন আস্‌সাল, হজরত ওমর বিন খাত্তাব। হজরত আমর বিন আবী উমাইয়া জামরী, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত খুজাইমা বিন সাবেত থেকে আমরা ওই হাদিসগুলো মিনারুল আহ্‌কাম গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছি। হাদিসগুলোতে মসেহের সময়সীমা সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে। ইমাম মালেক মুকিমকে মোজার উপর মসেহ করার অনুমতি দেননি। মুসাফিরকে দিয়েছেন। কিন্তু তাদের জন্য কোনো সময় নির্ধারণ করেননি। উপরোক্ত হাদিসগুলো তাঁর এই অভিমতের বিরুদ্ধে।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফার নিকট ওজুর মধ্যে তরতিব (ধারাবাহিকতা) এবং তাওয়ালী (দ্রুত অঙ্গ ধৌত করা) জরুরী নয়। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম মালেকের নিকট তরতিব ও তাওয়ালী দু'টোই শর্ত। ইমাম মালেক বলেছেন, তরতিব ও তাওয়ালী জরুরী। ইমাম শাফেয়ীর প্রথম দিককার বক্তব্যও এ রকম। আমরা আমাদের অভিমত প্রমাণার্থে এ কথা বলি যে, আয়াতে 'ওয়াও' (এবং) সহযোগে ওজুর অঙ্গগুলো ধৌত এবং মসেহ করার কথা বলা হয়েছে। এই 'ওয়াও' বা 'এবং' দ্বারা এক বা একাধিক বিষয়কে একত্র করা হয় মাত্র। এতে করে তরতিব বা তাওয়ালী কোনোটিই প্রমাণিত হয় না। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, এ বিষয়টি আমার নিকট লক্ষণীয় নয় যে, আমি কোন অঙ্গ থেকে ওজু শুরু করবো।

ইমামত্রয় হজরত উবাই বিন কা'ব এবং হজরত ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিস থেকে তাঁদের অভিমতের পক্ষে দলিল গ্রহণ করেছেন। ওই হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. ওজুর পানি চেয়ে নিয়ে ওজুর অঙ্গগুলো একবার করে ধৌত করলেন। তারপর বললেন, এভাবে ওজু করতে হয়। এভাবে ওজু না করলে আল্লাহ্‌পাক নামাজ কবুল করবেন না। এরপর তিনি স. দু'বার করে ওজুর অঙ্গগুলো ধৌত

www.eelm.weebly.com

করলেন এবং বললেন, এটাই আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের ওজু। যারা এ রকম করবে আল্লাহ্পাক তাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দিবেন। অতপরঃ তিনি স. তিনবার অঙ্গসমূহ ধৌত করলেন। দারা কুতনী। এ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. তরতিব ও তাওয়ালীর সঙ্গে ওজু করেছেন এবং বলেছেন, এ রকম ওজু না করলে আল্লাহ্পাক নামাজ কবুল করবেন না। অতএব তরতিব ও তাওয়ালী ফরজ। কিন্তু আমরা বলি, এভাবে আহরিত দলিল নির্ভুল নয়। কারণ—
১. হজরত উবাই বিন কা'ব বর্ণিত হাদিসের এক বর্ণনাকারী যায়েদ বিন আবীল জাওয়ারীকে অপদার্থ বলেছেন ইয়াহ্ইয়া। দুর্বল বলেছেন আবু জুরায়া। আরেক বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ্ বিন ওরওয়া সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া মন্তব্য করেছেন, সে কিছুই না। বোখারী বলেছেন, তার বর্ণনা পরিত্যাজ্য।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিসটির এক বর্ণনাকারী মুসাইয়্যেব বিন ওয়াজেহ্ ছিলেন বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। ২. তরতিব ও তাওয়ালী প্রমাণের জন্য যদি তার বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়, তবে আমরাও তার বিরুদ্ধে এ রকম দলিল উপস্থিত করে বলতে পারি যে, রসুল স. ডান দিক থেকে ওজু শুরু করেছেন, বাম দিক থেকে মেসওয়াক করেছেন অথবা করেননি, নাক ঝেড়েছেন অথবা ঝাড়েননি। এ রকম বিপরীত কার্যকলাপগুলোর মধ্যে নিশ্চয় যে কোনো একটি রীতিকে ওয়াজিব প্রমাণ করতে হবে—কিন্তু এ রকম করা কি সম্ভব? ৩. বর্ণিত হাদিসের উদ্দেশ্য আসলে এ কথা প্রমাণ করা যে, একবার করে অঙ্গ ধৌত করলেই ওজু হয়ে যাবে। এর চেয়ে কম করলে হবে না। এর চেয়ে কম যারা করবে, তাদের নামাজ আল্লাহ্পাক কবুল করবেন না।

হজরত আমর বিন আব্বাসের হাদিসের মাধ্যমেও তরতিব ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, রসুল স. বলেন, যে ব্যক্তি একটি পাত্রে ওজুর পানি নিয়ে কুলি করে ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিস্কার করে তার মুখ ও নাকের গোনাহ্ পানির সাথে ঝরে যায়। যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন গোনাহ্ ঝরে যায় তার দাড়ির সমপরিমাণ। উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিলে ঝরে যায় হাতের গোনাহ্সমূহ। মাথা মসেহ করলে মাথার চুলের পরিমাণ গোনাহ্ চলে যায়। আর পায়ের গ্রন্থি (টাখনু) পর্যন্ত ধৌত করলে ঝরে যায় পায়ের গোনাহ্। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় 'ফা' (অতঃপর) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তরতিবের জন্য।

আমরা বলি, গোনাহ্ মাফের সুসংবাদ প্রদান করাই ছিলো বর্ণিত হাদিসের প্রধান উদ্দেশ্য। তরতিব প্রমাণ করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। তরতিব না রক্ষা করা হলে ওজু হবে না বা মাগফেরাত হবে না এ রকম কোনো বক্তব্য হাদিসটিতে নেই।

'তাওয়ালী' জরুরী— এ কথা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে আরেকটি হাদিসের মাধ্যমে— যেখানে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি নামাজের জন্য ওজু করলো। তার পায়ের উপরের দিকে নখ পরিমাণ স্থান শুকনো রয়ে গেলো। রসুল স. তা দেখে বললেন, পুনরায় ওজু করো। ওই ব্যক্তি পুনরায় ওজু করলো। তারপর নামাজ

www.eelm.weebly.com

পাঠ করলো। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও আবু দাউদ হজরত আনাস থেকে এবং মুসলিম হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে। কিন্তু এখানে তাওয়ালী ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ আসলে নেই। কেননা, উত্তমরূপে ওজু করার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাদ পড়ে যাওয়া অংশটুকু পুনরায় ধৌত করা। এভাবে ওজু পূর্ণ হয়। সেই পূর্ণ করার কথাই বলা হয়েছে হাদিসে। তাওয়ালীর প্রমাণ তাহলে কোথায়?

ইমাম আহমদের বর্ণনায় রয়েছে এ রকম—হজরত ওমর বলেছেন, রসুল স. তাকে দ্বিতীয়বার ওজু করার নির্দেশ দিলেন। এই বর্ণনার সূত্রসংযুক্ত ইবনে লেহিয়া ছিলো বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর পবিত্র সহধর্মিণীগণের মধ্যে একজন বর্ণনা করেছেন, এক লোক নামাজ পড়ছিলো। তার পায়ের উপরে দেরহাম পরিমাণ অংশ ছিলো শুকনো। সেদিকে লক্ষ্য করে রসুল স. তাকে পুনরায় ওজু করার নির্দেশ দিলেন। এই হাদিসের সনদেও দুর্বলতা দৃষ্ট হয়। এ সূত্রের এক বর্ণনাকারী বাকীয়াহ্ ছিলো মুদাল্লাস। বলিষ্ঠ কোনো বর্ণনাকারীর সাহায্য ব্যতিরেকে তার বর্ণনাকে বিশুদ্ধ বলে গণ্য করা যায় না।

'তাওয়ালী' জরুরী না হওয়ার প্রমাণ রয়েছে জননী উম্মে মায়মুনা বর্ণিত ওই হাদিসে— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. গোসল করলেন। তারপর গোসলের স্থান থেকে সরে গিয়ে ধৌত করলেন পবিত্র পদযুগল। বোখারী।

হজরত নাফে থেকে ইমাম মালেক বর্ণনা করেছেন (বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ রয়েছে ইমাম শাফেয়ীর আল উম গ্রন্থে), মদীনার বাজারের এক স্থানে হজরত ইবনে ওমর ওজু করলেন। তখনো তাঁর পা মসেহ করা হয়নি। জানাযার কথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ লোকদের সঙ্গে গিয়ে উপস্থিত হলেন জানাযার স্থানে। তারপর মোজার উপর মসেহ করলেন। এক বর্ণনায় রয়েছে, অন্যান্য অঙ্গের ওজুর পানি শুকিয়ে যাওয়ার পর হজরত ইবনে ওমর একবার পা ধৌত করেছেন।

ইমাম আজমের মতে ওজুর নিয়ত জরুরী নয়। অন্য ইমামত্রয় বলেছেন জরুরী। তাঁদের কথা হচ্ছে ওজু ইবাদত। আর ইবাদতের জন্য নিয়ত শর্ত— এ কথাটি ঐকমত্যসম্মত। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, ওয়ামা উমিরু ইল্লা লিইয়া'বুদুল্লহা মুখলিসিনা লাহুদ্দিন (তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি— তাঁরা বিশুদ্ধতার সঙ্গে আল্লাহ্র ইবাদত করবে)। হাদিস শরীফে এসেছে, ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়াত' (নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়ত নির্ভর)। আমরা বলি, এখানে ওজু হবে দু'রকম। একটি হচ্ছে— ওজু ইবাদত। যার কারণে ওজুর মাধ্যমে গোনাহ্ মাফ হয়। এ রকম নিয়তে ওজু করলে নিয়ত জরুরী হবে কেননা ইবাদতের জন্য নিয়ত শর্ত। ওজুর আরেকটি ধরন হচ্ছে এ রকম—ওজু নামাজের চাবি—এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, নামাজের শর্তসমূহের মধ্যে ওজুও একটি শর্ত। আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়ত জরুরী নয়। নামাজের অন্যান্য শর্তের জন্য যেমন নিয়ত জরুরী নয়— তেমনি ওজুর জন্যও নিয়ত জরুরী নয়।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ জমহুরের অভিমত হচ্ছে—ওজুর জন্য বিসমিল্লাহ্ বলা, কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া শর্ত নয়। ইমাম আহমদের মতে বর্ণিত তিনটি কাজই ওজুর রোকন (স্তম্ভ) এবং তিনটিই জরুরী। কারণ, রসুল স. বলছেন, যে ব্যক্তি বিস্‌মিল্লাহ্ বলবে না, তার ওজু হবে না। ইমাম আহমদসহ হাদিস বিশারদগণের একটি দলও কাসীর বিন জায়েদের মাধ্যমে বর্ণনাটি এনেছেন। বর্ণনাসূত্রটি এ রকম—কাসীর বিন জায়েদ—রমীহ বিন আবদুর রহমান—আবদুর রহমান বিন হজরত আবু সাঈদ খুদরী। হজরত আবু সাঈদ খুদরী ছিলেন রমীহের পিতামহ। তিরমিজি প্রমুখ বর্ণনাটি এনেছেন সাঈদ বিন জায়েদের মাধ্যমে। বর্ণনাসূত্রটি এ রকম—সাঈদ বিন জায়েদ—আবদুর রহমান বিন হারমেলা—আবু সীফাল রেবাহ্—তার পিতা—তার পিতা। ইমাম আহমদ এবং সুনান রচয়িতাগণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা থেকে। এই বর্ণনাসূত্রটির মধ্যে ইয়াকুব বিন সালমাও রয়েছেন। দারা কুতনীর বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেন, যে ব্যক্তি ওজু করলো এবং বিসমিল্লাহ্ পড়লো, সে তার সম্পূর্ণ শরীরকে পবিত্র করে নিলো এবং যে বিসমিল্লাহ্ ছাড়া ওজু করলো সে পবিত্র করে নিলো তার ওজুর অঙ্গসমূহ।

হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে ওমর এবং হজরত আয়েশার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. যখন ওজুর জন্য উঠতেন, তখন ওজুর পূর্বেই বিসমিল্লাহ্ পড়তেন। তিরমিজি, ইবনে আবী শায়বা, ইবনে আদ্দি। হজরত খাসীফের বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তি রসুল স. এর সামনে বিসমিল্লাহ্ না পড়েই ওজু করে ফেললো। রসুল স. বললেন, তুমি পুনরায় ওজু করো। সে পুনরায় বিসমিল্লাহ্ না বলে ওজু করলো। তিনি স. বললেন, তুমি আবার ওজু করো। তৃতীয়বার সে বিসমিল্লাহ্ বলে ওজু করলো। রসুল স. বললেন, এবার তুমি সঠিক ওজু করেছো এবং কল্যাণ লাভ করেছো।

পর্যালোচনাঃ ওপরে বর্ণিত সব কয়টি হাদিসই দুর্বল। হজরত খাসীফ থেকে বর্ণিত হাদিস তো পুরোটাই বানানো এবং ভিত্তিহীন। আবু বকর আসরাম বলেছেন, আমি ইমাম আহমদকে বলতে শুনেছি, কোনো সূত্রেই বিসমিল্লাহ্ ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে কাসীর বিন জায়েদের হাদিসটিই দীর্ঘ। কিন্তু কাসীর দুর্বল। আবদুর রহমান বিন হারমেলাও দুর্বল। তার হাদিস প্রামাণ্য নয়— এ রকম বলেছেন আবী হাতেম। বোখারীর নিকটেও সে অবলিষ্ঠ। আবু সীফাল রেবাহ্—এরাও প্রসিদ্ধ নয়। আর রেবাহের পিতামহীর নাম-পরিচয় অজ্ঞাত। আবী হাতেম ও আবু জুরায়া এ রকম বলেছেন। ইয়াকুব বিন সালমা সম্পর্কে বোখারী লিখেছেন, ইয়াকুব—সালমা—হজরত আবু হোরায়রা—সূত্রটি অজ্ঞাত।

হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসের সূত্রভূত হারেসাও দুর্বল। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, ইবনে আদ্দির মাধ্যমে এ রকম একটি বর্ণনা এসেছে হজরত আলী থেকে। কিন্তু এই বর্ণনাটির সনদও সঠিক নয়। হজরত আনাস বর্ণিত হাদিসের বর্ণনাকারী আবদুল মালেক অত্যন্ত দুর্বল এবং হজরত ইবনে ওমর বর্ণিত

www.eelm.weebly.com

হদিসের বর্ণনাকারী আবু বকর দাহের পরিত্যক্ত। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদিসের বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া বিন হাশেমুস্‌শামশাদও পরিত্যক্ত। মুরসালরূপে হাদিসটি আবানের মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই হাদিটিও দুর্বল। সার কথা হচ্ছে বিস্‌মিল্লাহ্ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে বিশুদ্ধ কোনো হাদিসই নেই। এ সকল কারণে ইমাম আহমদ বলেছেন, যে বিসমিল্লাহ্ না পড়ে ওজু করে, তাকে আমি পুনরায় ওজু করতে বলি না। আমার বিশ্বাস, তার ওজু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ইমাম আহমদ এ কথা বলে জয়ীফ হাদিসের তুলনায় তাঁর কিয়াসকেই (অনুমানকেই) অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। লক্ষণীয় যে, উপর বর্ণিত দুর্বল হাদিসগুলো একে অপরের সাহায্যে কিছুটা হলেও শক্তি অর্জন করেছে— যদ্দারা কমপক্ষে এতোটুকু বুঝা যায় যে, নিশ্চয়ই এর কিছুটা ভিত্তি থাকা সম্ভব।

'বিসমিল্লাহ্ ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হজরত আবু হোরায়রার মারফু হাদিসটির ভাষ্য এ রকম—রসুল স. বলেছেন, যে কাজ বিসমিল্লাহ্ ব্যতীত আরম্ভ করা হয় না, সে কাজে কোনো বরকত থাকে না। আমরা বলি, এই হাদিসের মাধ্যমে বিসমিল্লাহ্ ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয় না। যদি হতো তবে প্রত্যেক কাজের শুরুতে হামদ্ (আল্লাহ্‌র প্রশংসাবাণী) উচ্চারণ করাও ওয়াজিব হতো। ওজুর পূর্বে তো ওয়াজিব হতোই। কেননা, হামদ্ সম্পর্কে এ রকম হাদিস রয়েছে।

এ সম্পর্কে হজরত আবু জাহীমের বিশুদ্ধ হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. জামাল কূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁকে সালাম দিলেন। কিন্তু তিনি স. তৎক্ষণাৎ সালামের জবাব দিলেন না। এগিয়ে গেলেন একটি প্রাচীরের নিকটে। প্রাচীর গাত্র স্পর্শ করে তায়াম্মুম করার পর ওই ব্যক্তির সালামের উত্তর দিলেন.। বোখারী, মুসলিম। হাদিসটির মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, সালামে রয়েছে আল্লাহ্‌র নাম। এবং রসুল স. পবিত্র হওয়ার পূর্বে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা সমীচীন মনে করেননি। যদি তাই হয়, তবে ওজুর পবিত্রতার পূর্বে বিসমিল্লাহ্ পড়া যেতে পারে কিরূপে? যদি এ কথা বলা যায়, হাদিস শরীফে ওজুর সময় বিসমিল্লাহ্ পড়ার কথা এসেছে। তবে তাকে ওয়াজিব না বলে মোস্তাহাব বলা সঙ্গত হবে। হাদিস শরীফে উল্লেখিত 'বিসমিল্লাহ্' না পড়লে ওজু হবে না' কথাটির অর্থ তখন হবে বিসমিল্লাহ ব্যতিরেকে ওজুর পূর্ণত্ব অর্জিত হবে না (ওজু যে হবেই না—এ রকম নয়)।

কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ রূপে জননী আয়েশা এবং হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে রয়েছে— রসুল স. বলেছেন, কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ওজুর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া গত্যন্তর নেই। অথবা বলেছেন, এগুলো ছাড়া ওজু পূর্ণ হয় না। হজরত আবু হোরায়রার এক বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. কুলি করতে ও নাকে পানি দিতে বলেছেন। এই বর্ণনা তিনটি লিপিবদ্ধ করেছেন দারা কুতনী। বর্ণনাগুলো সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য এই যে, হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসের সূত্রভূত সুলায়মান বিন মুসাকে পরিত্যক্ত বলে অভিহিত করেছেন বোখারী এবং নাসাঈ তাকে বলেছেন দুর্বল। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাসূত্রসংযুক্ত জাবের জু'ফীকে আইয়ুব সেজেস্তানী এবং জায়েদা মিথ্যুক বলেছেন। নাসাঈ বলেছেন, পরিত্যক্ত। হজরত আবু হোরায়রার হাদিসের বর্ণনাকারী হুদ্‌বাহ্ এবং দাউদ বিন মোজের উল্লেখ করেছেন যে, হাম্মাদের

www.eelm.weebly.com

মাধ্যমে আম্মার এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন মুরসালরূপে। ইবনে জাওজী বলেছেন, হুদ্‌বাহ্ ছিলেন নির্ভরযোগ্য। বোখারী ও মুসলিমে তাঁর বর্ণনা এসেছে। যদি তিনি এই মুরসাল বর্ণনাকে মারফু হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন, তবে বলতে হয়—নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর কিঞ্চিত অতিরিক্ততাও গ্রহণযোগ্য। অবশ্য মুরসাল বর্ণনাও দোষের কিছু নয়। মুরসালও প্রমাণ হিসেবে গণ্য।

নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব—এ কথার প্রমাণ হিসেবে হজরত আবু হোরায়রার একটি হাদিসে এসেছে—রসুল স. বলেছেন, যে ওজু করে সে যেনো নাকের ছিদ্রপথে পানি দেয় এবং নাক ঝাড়ে। মুসলিম। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, সে যেনো নাকে পানি দেয় এবং নাক ঝেড়ে ফেলে। বোখারী, মুসলিম। ইবনে জাওজী লিখেছেন, হজরত ওসমান বিন আফফান, হজরত সালমান বিন কায়েস এবং হজরত মিকদাম বিন মাদী করবের হাদিসেও এ রকম বলা হয়েছে। মারফুরূপে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আহমদ, আবু দাউদ, তায়লাসী এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দু'বার অথবা তিনবার খুব করে নাক ঝাড়ো। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ওজু করে সে যেনো নাক ঝাড়ে দু'বার অথবা তিনবার। হাদিসটি হাসান। আমরা বলি, বর্ণিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে নাসিকার অভ্যন্তরে পানি পৌঁছানো এবং নাসিকা প্রক্ষালনের যে নির্দেশ এসেছে তা ওয়াজিব নয়, মোস্তাহাব। নাকে পানি দেয়া ও নাক ঝাড়া যেহেতু এক সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই তা হবে সমগুরুত্বসম্পন্ন। আর এভাবে তা মোস্তাহাবই হবে। কেননা, নাক ঝাড়া ওয়াজিব এ কথা কেউই বলেন নি। আর দেখুন, হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ওজুর সময় নাক ঝাড়লে উত্তম, না ঝাড়লে ক্ষতি নেই। অতএব বিসমিল্লাহ্ বলা, নাকে পানি দেয়া এবং নাক ঝাড়া সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলোকে যদি বিশুদ্ধ বলে মেনে নেয়াও যায়, তবে সেগুলোকে ওয়াজিব হওয়ার দলিল বলা যাবে না, বলতে হবে মোস্তাহাব। ইমাম আবু হানিফা এ রকমই বলেছেন। কারণ, তাঁর মতে কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশের সঙ্গে হাদিস শরীফের নির্দেশাদিকে সমগুরুত্বপূর্ণ মনে করা বৈধ নয়। অত্যাবশ্যক হিসেবে অতিরিক্ত সংযোজন রহিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর এ কথা সর্ববাদিসম্মত যে, হাদিস কখনো কোরআনকে রহিত করতে পারে না। কোরআনে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে যে, ওজুর রোকন চারটি (হাত, মুখ ও পা ধৌত করা এবং মাথা মসেহ করা)। এই চারটি রোকন সম্পাদিত হলেই ওজু হয়ে যাবে এবং ওই ওজু দিয়ে নামাজও পড়া যাবে। এর সঙ্গে যদি হাদিসের নির্দেশগুলোকে ওয়াজিব হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তবে কোরআনের নির্দেশ (চারটি রোকন) রহিত হয়ে যাবে—যা অসম্ভব। হাদিসে আহাদের মাধ্যমে কখনো কোরআন রহিত হয় না। আল্লাহ্পাকই অধিক পরিজ্ঞাত।

দ্রষ্টব্যঃ ওজুর সুন্নতগুলো হচ্ছে — ১. নিয়ত ২. ওজুর প্রারম্ভে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা, ৩. কুলি করা, ৪. নাকে পানি দেয়া ৫. নাক ঝাড়া (নিয়তের পরে আমলগুলো করতে হবে তিনবার করে)। ৬. ধৌতযোগ্য অঙ্গগুলোকে তিনবার করে ধৌত করা ৭. একবার মাথা মসেহ করা ৮. তরতিব (ধারাবাহিকতা) এবং ৯. তাওয়ালী (আমলগুলো অবিচ্ছিন্নরূপে সম্পাদন করা)।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জায়েদের নিকট একবার নিবেদন করা হলো— রসুল স. কিভাবে ওজু করতেন তা আমাদেরকে জানিয়ে দিন। তিনি পানির পাত্র আনতে বললেন। পাত্র আনা হলো। প্রথমে তা থেকে পানি নিয়ে দুই হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধুয়ে ফেললেন। তারপর কুলি করলেন তিনবার এবং নাকে পানি দিলেন তিনবার তারপর তিনবার ধৌত করলেন মুখ-মণ্ডল। তারপর দুই কনুই পর্যন্ত দুই হাত। এরপর দুই হাতে মাথা মসেহ করলেন এভাবে—প্রথমে হাত নিয়ে গেলেন পিছনের দিকে তারপর পিছন থেকে সামনের দিকে। শেষে দুই পা ধৌত করলেন টাখনু পর্যন্ত এবং বললেন, রসুল স. এভাবে ওজু করতেন। বোখারী, মুসলিম। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে— অতঃপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং নাক পরিষ্কার করলেন তিনবার করে, তিন চউল পানি দ্বারা। হজরত আলীর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি কুলি করলেন তিনবার, নাকে পানি দিলেন তিনবার, মুখাবয়ব ধৌত করলেন তিনবার, কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করলেন তিনবার এবং মাথা মসেহ করলেন একবার। শেষে পায়ের গ্রন্থি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করে দাঁড়িয়ে পাত্রে রক্ষিত অবশিষ্ট পানি পান করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে রসুল স. এর ওজুর নিয়ম দেখিয়ে দেয়ার জন্যই এ রকম করেছি। তিরমিজি, নাসাঈ। দারা কুতনী লিখেছেন, এ রকম কোনো হাদিস পাওয়া যায়নি— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. নিয়ত, তরতিব এবং তাওয়ালীর মধ্য থেকে কোনো একটি আমল বাদ দিয়েছেন। অতএব এ তিনটি কাজ সুন্নত। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, তিনবার মাথা মসেহ করা সুন্নত।

হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জায়েদ, হজরত সালমা বিন আকওয়া, হজরত আনাস, হজরত মুয়াজ বিন জাবাল, হজরত বারা বিন আজীব, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর এবং হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে এসেছে— রসুল স. মাথা মসেহ করেছেন একবার। অতএব একবার মসেহ করাই সুন্নত, তিনবার নয়।

তিনবার মাথা মসেহ করার প্রমাণ হিসেবে বোখারী বর্ণিত হজরত ওসমানের একটি হাদিসকে উপস্থাপন করেছেন ইমাম আহমদ—যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. ওজু করতেন তিনবার করে। এই তিনবার ওজু করার অর্থ হচ্ছে—ওজুর অঙ্গসমূহ তিনবার ধৌত করা এবং তিনবার মাথা মসেহ করা। হজরত আলী থেকেও এ রকম একটি বর্ণনা রয়েছে। তিরমিজি।

আমরা বলি, এখানে তিনবার ওজু করার অর্থ ধৌতব্য অঙ্গগুলো তিনবার ধৌত করা। আবু দাউদ বলেছেন, হজরত ওসমান থেকে বর্ণিত সকল বিশুদ্ধ হাদিসে একবার মস্তক মসেহ করার কথা এসেছে। কিন্তু হজরত আলীর বর্ণনায় এসেছে— তিনি ওজু করলেন, মাথা এবং উভয় কান মসেহ করলেন তিনবার। এ কথার অর্থ তিনি হাত নিয়ে গেলেন মস্তকের পশ্চাতভাগে এবং অগ্রভাগে। এর জন্য তিনি একাধিকবার পানি ব্যবহার করেছেন—সে কথা প্রমাণিত হয়নি। পানি নিয়েছিলেন তিনি একবার তারপর কয়েকবার সামনে পিছনে করে মাথায় হাত বুলিয়েছেন। এভাবে মসেহ করলে একবারই মসেহ করেছেন বলা উচিত। তাছাড়া হজরত

www.eelm.weebly.com

আবদুল্লাহ্ বিন জায়েদের বর্ণনায় এসেছে, তিনি উভয় হাত নিয়ে গেলেন মস্তকের পশ্চাদ্দিকে, তারপর নিয়ে এলেন সামনের দিকে, পুনরায় পিছনের দিকে, সেখান থেকে আবার সামনের দিকে— যেখান থেকে মসেহ শুরু করেছিলেন (এভাবে মসেহ করাকে এক বারই মসেহ করা বলাই সমীচীন, তিনবার নয়)।

দুই কান মসেহ করাও সুন্নত। হজরত আবু উমামা বাহেলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তাঁর মস্তকের অংশ তিনি স. মসেহ করতেন একবার। আহমদ ও সুনান রচয়িতাগণ দু'বার মসেহ করার কথা বলেছেন। মারফুরূপে হজরত মিকদাম বিন মাদি করব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. ওজু করলেন এবং দুই হাতের তর্জনী কানে প্রবেশ করালেন। নাসাঈ এবং ইবনে মাজার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী ওজু করলেন এবং মাথা ও কান মসেহ করলেন তিনবার। শেষে বললেন, রসুল স. এর ওজু ছিলো এ রকম।

একটি প্রশ্নঃ অধিকাংশ হাদিসে কান মসেহের উল্লেখ নেই কেনো?

উত্তরঃ কান মসেহের বর্ণনা এসেছে হজরত আবু উমামা এবং হজরত আলীর হাদিসে। অন্যান্য হাদিসে কান মসেহের উল্লেখ নেই। কিন্তু তাতে করে কান মসেহ করা যাবে না—এ কথা প্রমাণিত হয় না। রসুল স. বলেছেন, কান মস্তকের অংশ। সে কারণেই হয়তো কান মসেহের কথা পৃথকভাবে উল্লেখিত হয় নি)।

হাতের আঙ্গুল দ্বারা দাড়ি খিলাল করা সুন্নত। হজরত ওসমান বলেছেন, রসুল স. (ওজুর সময়) তাঁর পবিত্র শ্মশ্রু খিলাল করতেন। তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে খুজাইমা, হাতেম, ইবনে হাব্বান। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনাতে দাড়ি খিলালের কথা এসেছে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা, দারা কুতনী এবং বায়হাকী। ইবনে সুকুন বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

মুখ-মন্ডল ধৌত করার সময় গণ্ডদেশ মর্দন করা সুন্নত। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. তাঁর পবিত্র গণ্ডদেশ কিছুক্ষণ মর্দন করতেন। ইবনে মাজা ও দারা কুতনী বলেছেন, হাদিসটি হাসান। ইবনে সুকুন বলেছেন বিশুদ্ধ।

বিসমিল্লাহ্র সঙ্গে ওজু করা মোস্তাহাব। ইতোপূর্বে উল্লেখিত এ সম্পর্কিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে এ রকমই প্রমাণিত হয়। ডান দিক থেকে ওজু শুরু করা মোস্তাহাব। কিন্তু এই আমলটি সুন্নত হওয়াই সমীচীন। কেননা, রসুল স. সব সময় এ রকম করতেন। কিন্তু এ আমলটিকে কেউ সুন্নত বলেননি। কারণ, এটা ছিলো তাঁর পবিত্র অভ্যাস। ইবাদত নয়। জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. সাধারণতঃ ওজু করা, জুতা পরিধান করা, চিরুণী করা ইত্যাদি কাজকে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। বোখারী, মুসলিম। তিনি স. এ কথা বলেছেন যে, যদি ওজু করতে চাও তবে দক্ষিণ অঙ্গ থেকে শুরু কোরো। আহমদ, আবু দাউদ।

ওজু শেষে এই দোয়া পাঠ করা মোস্তাহাব—আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু। আল্লাহুম্মাজ আলনি মিনাত্তাওয়াবিনা ওয়াজ আলনি মিনাল মুতাহ্হিরিন (আমি

www.eelm.weebly.com

সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ স. তার বান্দা ও রসুল। হে আল্লাহ্—আমাকে তওবাকারী, এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো)। হজরত ওমর থেকে হজরত উকবা বিন আমেরের মাধ্যমে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি ওজুর পরে বর্ণিত দোয়াটি পাঠ করবে তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে বেহেশতের সকল দরোজা। সে যে কোনো একটি দরজা দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। অন্য একটি সূত্রে তিরমিজির বর্ণনাতেও অতিরিক্ত বাক্যটি (আল্লাহুম্মাজ আলনি....) রয়েছে। ওজুর পরে এই দোয়াটিও পাঠ করা যায়—সুব্হানাকা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আংতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা (হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি—তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তোমারই নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং প্রত্যাবর্তন করি তোমার দিকেই)। এরপর দুই রাকাত তাহ্ইয়াতুল ওজুর নামাজ পড়া যায়। ইবনে মাজা এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে নাসাঈ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি ওজু করলো এবং সুব্হানাকা শেষ পর্যন্ত পড়লো—তার ওই আমলকে লিপিবদ্ধ করে একটি ঝুলিতে রেখে মুখ বন্ধ করে রাখা হবে। কিয়ামত পর্যন্ত ওই থলির বন্ধ মুখ আর খোলা হবে না। নাসাঈ এই হাদিসকে মাওকুফ হিসেবে বিশুদ্ধ এবং মারফু হিসেবে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু মাওকুফ ও মারফু একই প্রকৃতির।

মাসআলাঃ মেসওয়াক করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। মাওকুফরূপে হজরত আনাস থেকে বোখারী লিখেছেন, তোমরা অত্যধিক মেসওয়াক করবে। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে—হজরত আয়েশা বলেছেন, রসুল স. ঘরে এলে প্রথমে মেসওয়াক করতেন। হজরত উম্মে সালমা থেকে তিবরানী ও বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, জিবরাইল সব সময় আমাকে মেসওয়াক করতে বলেন। আমার ভয় হলো (মেসওয়াক করতে করতে) হয়তো আমার দাঁতই পড়ে যাবে। হাদিস গ্রন্থগুলোতে এ রকম হাদিস রয়েছে অনেক—যেগুলোর বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন হজরত সহল বিন সা'দ, হজরত আবু উমামা, হজরত জোবায়ের বিন মুতয়েম, হজরত আবু তোফায়েল, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত মোত্তালিব, হজরত আয়েশা এবং হজরত আনাস। শয্যাত্যাগের পর মেসওয়াক করা অত্যন্ত জরুরী। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. যখনই শয্যা ত্যাগ করতেন তখনই মেসওয়াক করতেন।

প্রতি নামাজের পূর্বে মেসওয়াক করা মোস্তাহাব। রসুল স. এরশাদ করেছেন, উম্মতের কষ্ট না হলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাজের সময় মেসওয়াক করতে বলতাম। মুসলিম, আবু দাউদ। জননী আয়েশার মারফু বর্ণনায় রয়েছে, মেসওয়াকসহ নামাজ, মেসওয়াকবিহীন নামাজের চেয়ে সত্তরগুণ অধিক উত্তম। আহমদ, ইবনে খুজাইমা, হাকেম। মেসওয়াক ওজুর সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা হজরত ওসমান, হজরত আলী এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন জায়েদের মাধ্যমে ওজু সম্পর্কিত অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সেগুলোতে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়ার কথা বলা হলেও মেসওয়াক করার কথা বলা হয়নি।

www.eelm.weebly.com

ওয়া ইন কুনতুম জুনুবান ফাত্তাহ্হারু—এ কথার অর্থ, যদি তোমরা অপবিত্র (জুনুব) থাকো তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে (স্ত্রী সম্ভোগ অথবা অন্য কোনো কারণে যার রেতঃপাত হয়, তাকে বলে জুনুব বা অপবিত্র)। জানাবাত বা অপবিত্রতার ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে সুরা নিসার আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও বলা হয়েছে 'বিশেষভাবে পবিত্র হবে'—এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করা ওয়াজিব। কুলি করা ও নাকে পানি দেয়াও ওয়াজিব। বিশেষভাবে পবিত্র হওয়ার নির্দেশ দেয়ার কারণেই মুখগহবর ও নাসিকার অভ্যন্তর ধৌত করাকে আমরা সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করার অঙ্গীভূত করে নিয়েছি। কিন্তু ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী ওজুর মতো গোসলের মধ্যেও কুলি করা ও নাকে পানি দেয়াকে সুন্নত বলেছেন।

উম্মত জননী উম্মে সালমা বর্ণনা করেছেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি শক্ত করে চুল বেঁধেছি, এখন ফরজ গোসল করলে চুল খুলতে হবে কি? তিনি স. বললেন না, মাথার উপর তিনবার পানি ঢেলে দাও। সেই পানি শরীরের সকলস্থানে উত্তমরূপে পৌঁছিয়ে দাও। তাহলেই পবিত্র হয়ে যাবে। আমরা বলি, জননী উম্মে সালমার প্রশ্নটি ছিলো মাথা ধৌত করা সম্পর্কে। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, বেনীবদ্ধ অথবা খোঁপাবদ্ধ কেশ উন্মুক্ত করতে হবে কিনা। রসুল স. উত্তরে বলেছেন, না। এখানে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়ার কথা তো উল্লেখই করা হয়নি।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমরা রসুল স. সকাশে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় সুরভিত পরিচ্ছদাবৃত এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ইসলাম কী? রসুল স. বললেন, নামাজ কায়েম করা, জাকাত দেয়া, রমজান শরীফের রোজা রাখা, হজ করা এবং জানাবতের (অপবিত্রতা) গোসল করা। লোকটি বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। আবদ্ বিন হুমাইদের বর্ণনায় রয়েছে ওহাব যমারী বলেছেন, যবুর শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে—যে ব্যক্তি জানাবতের গোসল করলো, নিশ্চয় সে ব্যক্তি আমার বান্দা। আর যে করলো না, সে আমার নিশ্চিত শত্রু।

মাসআলাঃ পুরুষ ও নারী উভয়কেই চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে হবে। এ রকম করা ওয়াজিব। দাড়ির গোড়ায় পানি পৌঁছানোও জরুরী। ওজুর সঙ্গে তুলনা করে ইমাম শাফেয়ীর এক বর্ণনায় এসেছে, দাড়ির গোড়ায় পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়। আমরা বলি, ওজু ও ফরজ গোসল এক কথা নয়। গোসলের জন্য বিশেষভাবে পবিত্র হওয়ার নির্দেশ এসেছে। ওজুর জন্য এ রকম নির্দেশনা দেয়া হয়নি।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, শরীরের চামড়া ভালোভাবে পরিষ্কার করবে। হজরত আলী বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স. কে বলতে শুনেছি জানাবাতের গোসলের সময় বিন্দু পরিমাণ জায়গা শুকনো থাকলেও তাকে দোজখে প্রবেশ করানো হবে। হজরত আলী আরো বলেছেন, এ কারণেই আমি আমার চুলের সঙ্গে শত্রুতা করেছি (তিনি মস্তক মুন্ডন করতেন)। আবু দাউদ ও ইবনে মাজা বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বিশুদ্ধ বলাই ঠিক। মারফু বলা ঠিক নয়। আমরা বলি, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে বলেই হাদিসটি মারফু। কারণ, যিনি সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য বা বলিষ্ঠ) তাঁর অতিরঞ্জনও গ্রহণীয়। সুতরাং এই মাওকুফ বর্ণনাটি মারফু হিসেবে গ্রহণ করাই সমীচীন। কেননা, এখানে এসেছে দোজখের আযাবের কথা। প্রত্যাদেশ ছাড়া আযাবের কথা বলা যায় না। সাহাবীগণও এ রকম বলতেন না। অতএব, বুঝতে হবে এখানে দোজখের শাস্তির কথাটি রসুল স. এর। কারণ রসুলের উপরেই প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়, সাহাবীগণের উপরে হয় না। অতএব সাহাবীর মুখে উচ্চারিত হলেও কথাটি মূলতঃ রসুল স. এর। এভাবে বর্ণনাটি তাঁর স. সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে বলেই হাদিসটি মারফু বলাই সঙ্গত।

হজরত আবু আইয়ুব আনসারীর মারফু বর্ণনায় রয়েছে, জানাবত হচ্ছে আমানত (গোসলের মাধ্যমেই এই আমানতের দায়ভার থেকে মুক্ত হতে হবে)। প্রতিটি চুলের গোড়ায় জানাবাত বা অপবিত্রতা থাকে। ইবনে মাজা এই বর্ণনাটিকে দুর্বল বলেছেন। বোখারী ও মুসলিমে জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. হাতের আঙ্গুলে পানি নিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। জননী আয়েশা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, আমার বোন (হজরত আসমা) ঋতু পরবর্তী গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রসুল স. বললেন, খুব ভালো করে মর্দন করবে, যাতে করে প্রতিটি পশমের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। মুসলিম। হজরত আবু জর গিফারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, পানি পেলে ভালো করে ত্বক মর্দন করবে। আহমদ।

মাসআলাঃ জমহুরের নিকট শরীর মর্দন করা ওয়াজিব নয়। ইমাম মালেকের নিকট ওয়াজিব। জমহুরের দলিল এই—আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'হাত্তা তাগ্তাসিলু।' 'ইগতিসাল' অর্থ ধৌত করা বা পানি প্রবাহিত করে দেয়া। এর মধ্যে শরীর মর্দনের কথা নেই। তাছাড়া হজরত জোবায়ের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, অতঃপর আমি আঁজলা ভরে পানি মাথার উপর ঢালতাম। এরপর সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করে দিতাম। বোখারী, মুসলিম। গোসল সম্পর্কিত কোনো হাদিসেই এ রকম কিছু উল্লেখ করা হয়নি যার মাধ্যমে শরীর মর্দন ওয়াজিব বুঝা যায়।

মাসআলাঃ মেয়েদের খোঁপা এবং বেনীবদ্ধ চুল ধৌত করা ওয়াজিব নয়। বুদ্ধি বলে, স্ত্রী-পুরুষ সকলের জন্য বেনী, জটা ইত্যাদি ধৌত করা ওয়াজিব হওয়া উচিৎ। কেননা, গোসলের মধ্যে বিশেষভাবে পবিত্র হওয়ার নির্দেশ এসেছে। আর এই নির্দেশ স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু শরিয়তের বিধান নস্ নির্ভর, বুদ্ধি নির্ভর নয়। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে জননী উম্মে সালমার হাদিসে বলা হয়েছে—চুলের বেনী খুলতে হবে না। হজরত উবায়েদ বিন উমায়ের বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত আয়শা জানতে পারলেন, হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর মেয়েদেরকে বলেন, গোসলের সময় চুলের খোঁপা ও বেনী খুলে ফেলতে হবে। এ কথা শুনে হজরত আয়শা বললেন, তিনি মেয়েদেরকে মস্তক মুণ্ডনের নির্দেশ দেন না কেনো। আমি এবং রসুল স. একটি পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তখন তিনবার মাথার উপরে পানি ঢালতাম। এর বেশী কিছু করতাম না।

www.eelm.weebly.com

পুরুষদের জট ধৌত করার হুকুম রহিত হয়নি। হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি চুলের নিচে জানাবাত বা অপবিত্রতা থাকে। তাই তোমরা কেশ ধৌত করো এবং ত্বক পরিষ্কার করো। আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, বায়হাকী। বর্ণনাটি দুর্বল। কারণ এই হাদিসের সূত্রভূত বর্ণনাকারী হারেস বিন দাহীয়া অত্যন্ত দুর্বল। দারা কুতনী বলেছেন, কেবল মালেক বিন দিনার থেকে মুরসালরূপে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। এভাবে সাঈদ বিন মানসুর ইউনুস থেকে, তিনি হাসান থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। ইবনে জাওজী বলেছেন, হাদিসটি মাওকুফ। এটি হজরত আবু হোরায়রার নিজস্ব বচন। তাই সকল অবস্থায় হাদিসটি হবে বিশুদ্ধ মুরসাল অথবা বিশুদ্ধ মাওকুফ । মুত্তাসিল সনদ বিশিষ্ট বর্ণনা মারফু নয় কিন্তু মনে রাখতে হবে মুরসাল বর্ণনাও দলিল রূপে গণ্য।

দ্রষ্টব্যঃ গোসলের মধ্যে নিয়ত করা এবং গোসলের নিয়মশৃংখলা রক্ষা করা সুন্নত। প্রথমে ওজু করতে হবে (পা ধৌত করা বাদে), গোসল শেষে একটু সরে গিয়ে পা ধুয়ে নিতে হবে। এ রকম করা সুন্নত। ওজুর মতো গোসলের নিয়ত করা সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। গোসলের নিয়মশৃংখলা প্রমাণিত হয়েছে রসুল স. এর সার্বক্ষণিক আমল থেকে। অন্য কাজগুলো সুন্নত প্রমাণিত হয়েছে জননী মায়মুনার হাদিস থেকে। জননী বলেছেন, আমি রসুল স.-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি স. ফরজ গোসল করলেন। প্রথমে পাত্রটি বাম হাত দিয়ে একটু কাত করে ডান হাতে পানি নিলেন। সেই পানি দিয়ে দুই হাত ধৌত করলেন। তারপর মাথায় পানি ঢাললেন তিনবার। এরপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিলেন। শেষে স্থান পরিবর্তন করে দুই পা ধৌত করলেন। বোখারী, মুসলিম। জননী আয়েশা বলেছেন, ফরজ গোসলের সময় রসুল স. প্রথমে হাত ধুয়ে নিতেন। তারপর নামাজের পূর্বে যেভাবে ওজু করা হয় সেভাবে ওজু করতেন কিন্তু পা ধৌত করতেন না। এরপর আঙ্গুলে পানি নিয়ে চুলের গোড়ায় খিলাল করতেন। এরপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিতেন। বোখারী, মুসলিম।

জ্ঞাতব্যঃ শরীরের কোথাও যদি অপবিত্রতা (নাজাসাতে হাকিকি) লেগে থাকে তবে তা দূর করা ওয়াজিব। তাই এই কাজটিকে গোসলের সুন্নতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি। যেমন, ওজুর সুন্নতের মধ্যে শৌচকর্মের (এস্তেঞ্জার) উল্লেখ করা হয় না। আর তিন বার সমস্ত শরীর ধৌত করার দলিল আমাদের জানা নেই।

'ওয়া ইনকুনতুম মারদ্বা আওআ'লা সাফারিন আওজায়া আহাদুন মিনকুম মিনাল গয়িতি আওলামাস্ তুমুন্ নিসায়া ফালাম্ তাজিদু মাআন ফা তাইইয়াম্মামু সায়িদান তৈয়েবান ফানসাহু বি উজু হিকুম ওয়া আইদিকুম মিনহু'—এ কথার অর্থ তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আগমণ করে, অথবা তোমরা স্ত্রীর সঙ্গে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে বিশুদ্ধ মাটির চেষ্টা করিও এবং তা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে।— এখানে শেষের 'মিনহু' শব্দটি বাদে অবশিষ্ট নির্দেশটি সুরা নিসায় বর্ণনা করা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে। বাগবী লিখেছেন, মিনহু শব্দটির মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় মসেহ করতে হবে মাটি দ্বারা। আমি বলি, বাগবীর বক্তব্য তখনই গ্রহণীয় হবে, যখন 'মিনহু' শব্দটি ভিন্ন অর্থবোধক হবে। ইমাম আবু ইউসুফ তাই বলেছেন, মাটি জাতীয় সকল বস্তু দ্বারা ওই সময় তায়াম্মুম বিশুদ্ধ হবে, যখন সেই বস্তুর উপরে মাটি থাকবে (মাটি না থাকলে তায়াম্মুম বিশুদ্ধ হবে না)।

এ সম্পর্কে ইমাম মোহাম্মদের দু'টি অভিমত রয়েছে— মাটি হওয়া জরুরী অথবা মাটি জাতীয় হওয়াই যথেষ্ট—তার উপর মাটি থাকুক অথবা না থাকুক। আমরা বলি, এখানে 'মিন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রারম্ভিকা হিসেবে। আংশিক অথবা বর্ণনামূলক যদি হতো তবে তা হতো রূপক অর্থবোধক, যা ধাবিত হতো ধারাবাহিকতার দিকে। আল্লামা তাফ্তাজানী শাফেয়ী লিখেছেন, কোনো কোনো শাফেয়ী ফিকাহ্বিদ বলেছেন, 'মিন' ব্যবহৃত হয়েছে আংশিক অর্থের জন্য, যাতে করে বহু অর্থবোধক অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে না হয়। অর্থাৎ আংশিক অর্থ বুঝানো হলে সেটাই হবে তার আসল কারণ। আর শুরু করাকে আসল কারণ মনে করা হলে, তা প্রকৃত কারণের অন্তর্ভুক্ত হবে। এবং নিয়মানুযায়ী যতদূর সম্ভব বহুঅর্থবোধক হওয়ার দিকে না যাওয়াই সমীচীন। কিন্তু শাফেয়ীগণের বর্ণিত ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, অভিধান বিশারদগণের ঐকমত্য এই যে, শুরু শেষ বুঝানোর জন্যই এখানে মিন দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে।

আমি বলি, এখানে আংশিক অর্থ গ্রহণযোগ্য হতেই পারে না। আংশিক বুঝাতে গেলে মিন এর পরিবর্তে আংশিক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করাই হতো সঙ্গত। কিন্তু এ স্থানে এমনটি হওয়া সম্ভব নয়। অতএব বাক্যটির উদ্দেশ্য হবে— মুখমণ্ডলে এবং হস্তদ্বয়ে হাত বুলিয়ে নাও। এই হাত বুলিয়ে নেয়ার অর্থই মসেহ করা। এর অতিরিক্ত কোনো অর্থ করা অনাবশ্যক। যদি মিনকে এব্তেদা বা শুরু বলা হয় তবে অর্থ হবে এ রকম—পবিত্র মাটি দ্বারা মসেহ শুরু করো অর্থাৎ মাটি স্পর্শ করে অথবা মাটির উপরে হাত রেখে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়কে মসেহ করে নাও। এই অর্থটিই স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন।

যদি বলা হয়, কাশ্শাফ রচয়িতা বলেছেন, মানুষ মনে করে 'মিন' প্রকৃত পক্ষে ইব্তেদায়ে গায়েত বা প্রান্তসীমার জন্য এসেছে। যেমন, মাসাহ্তু বি রাসি মিনাদ্দুহ্নি (আমি আমার মাথা প্রান্তসীমা পর্যন্ত তৈল দ্বারা মসেহ করেছি। অথবা 'মিনাল মায়ি' (পানি দ্বারা) অথবা 'মিনাত্তুরাবি' (মাটি দ্বারা)। —এ গুলোর দ্বারা আরববাসীরা আংশিক অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ বুঝে না। এর উত্তরে আমরা বলি, বর্ণিত দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যে আংশিক উদ্দেশ্য বুঝা যায় বুদ্ধিগতভাবে। কিন্তু 'মিন'—এর অর্থ এ রকম নয়। লক্ষণীয় যে, মাথার উপর হাত বুলিয়ে তেল, পানি বা মাটি দ্বারা মসেহ শুরু করা যাবে। কিন্তু বর্ণিত বাক্যগুলো দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয় না যে— তেল, পানি, মাটি হাতে লাগিয়ে নেয়া হয়েছে, না হাতে লাগানোই ছিলো। কিন্তু যদি বলা হয়, আমি আমার মাথা পাথর দ্বারা মসেহ করেছি তবে এর

www.eelm.weebly.com

দ্বারা সুনির্দিষ্ট অবস্থাটি প্রকাশ পাবে। আংশিক অর্থ বুঝা যাবে না। সুতরাং এখানে 'মিন' শব্দটি বসেছে শেষ সীমা বুঝানোর জন্যেই। এবং এ কথাও স্পষ্ট হবে যে, পাথর দ্বারা তায়াম্মুম বৈধ যদিও তার উপর মাটি না থাকে। আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত।

'মা ইউরিদুল্লহু লি ইয়াজ্য়ালা আলাইকুম মিন হারজ'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না। অর্থাৎ ওজু, গোসল ও তায়াম্মুমের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না।

'ওয়া ইউরিদু লিইউত্বহ্হিরাকুম'—এ কথার অর্থ বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান। হজরত আমর বিন আম্বাসা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমরা রসুল স. এর পবিত্র বাণীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, ওজুর সময় কুলি করলে এবং নাকে পানি দিলে, মুখ ও নাকের গোনাহ্ পানির সঙ্গে ধুয়ে চলে যায়। বাগবী লিখেছেন, হজরত ওসমান ওজুর সময় তিনবার করে অঙ্গ ধৌত করার পর বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার ওজুর মতো ওজু করবে তার মুখ, হাত ও পা থেকে পাপ অপসৃত হবে।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়ালি ইউতিম্মা নি'মাতাহু আলাইকুম লায়াল্লাকুম তাশকুরুন'—এ কথার অর্থ, এবং তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।' এই শুভসংবাদটির মাধ্যমে আল্লাহ্পাকের এ অভিলাষ প্রকাশিত হয়েছে যে—আল্লাহ্পাক তোমাদের জন্য এমন বিধান নির্ধারণ করে দিতে চান যা পালন করলে তোমরা শরীরের অপবিত্রতা এবং পাপের পংকিলতা থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। এবং মেরাজ তুল্য নামাজের চাবি তোমাদের হস্তগত হবে। কারণ, বেহেশতের চাবি যেমন নামাজ তেমনি নামাজের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা (ওজু, গোসল, তায়াম্মুম)। রসুল স. এরশাদ করেছেন, পূর্ণ অনুগ্রহ লাভকারী জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। হজরত মুয়াজ বিন জাবাল থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, ইবনে আবী শায়বা এবং তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে রয়েছে, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মুখমণ্ডল ও হাত-পা হবে ওজুর কারণে সমুজ্জ্বল। যারা সেই সমুজ্জ্বলতাকে দীর্ঘ করতে চায় তারা যেনো পূর্ণরূপে ওজু করে। বোখারী।

'লিইয়াজয়ালা', 'লিইউত্ব'হ্হিরা' এবং 'লিইউতিম্মা' শব্দত্রয়ের আদ্যক্ষর 'লাম' অতিরিক্ত। লামের পরে একটি 'আন' শব্দ উহ্য থাকার কারণে শব্দগুলো 'জবর' যুক্ত হয়েছে। 'ইয়ুরিদু' ক্রিয়ার কর্মপদ হিসেবে শব্দ তিনটি ধাতুগত অর্থ প্রদান করেছে। ব্যাকরণবিদ ইবনে হাজিবের সূত্রানুসারে কাযী বায়যাবী বলেছেন, এখানে 'আন' উহ্য হবে না। কিন্তু তাঁর ধারণাটি ভুল। ইমাম রাযী এবং আল্লামা জামাখশরী 'আন' শব্দটির উহ্য হওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছেন— 'লাম' অক্ষরটির অতিরিক্ত সংযোজন সত্ত্বেও।

www.eelm.weebly.com

কাযী বায়যাবী বলেছেন, আয়াতে বর্ণিত দু'টি ইয়ুরিদু ক্রিয়ার কর্মপদই উহ্য। আর লাম অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে কারণ হিসেবে। এই ধারণানুসারে তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এ রকম—আল্লাহ্পাক চান না যে, পবিত্রতার বিধানের কারণে তোমরা বিব্রত হও। বরং তিনি তোমাদেরকে এ উদ্দেশ্যেই পবিত্রতার বিধান দিতে ইচ্ছে করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করবেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন। ব্যাখ্যাটি এ কারণে অসংগত যে, প্রথমে বিধান দেয়া হলো। অথচ কারণ দর্শানো হলো না। পরে আবার বিধান দানের অভিলাষ প্রকাশের সঙ্গে কারণ দর্শানো হলো। কিন্তু বিধান দানের সঙ্গে কারণ দর্শানোই হতো সুসংগত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৭

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

❒ তোমাদের প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহ স্মরণ কর। এবং তোমরা যখন বলিয়াছিলে, 'শ্রবণ করিলাম ও মান্য করিলাম' তখন তিনি তোমাদিগকে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিয়াছিলেন উহাও স্মরণ কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর; অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

এখানে 'মিসাক্ব' অর্থ ওই অঙ্গীকার যা রসুল স. তাঁর সাহাবীগণের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। অঙ্গীকার নামাটি ছিলো এ রকম—সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আমরা আনুগত্যে অটল থাকবো, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করবো না। হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, আকাবা প্রান্তরে গভীর রাতে আনসারদের নিকট থেকে রসুল স. যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, সে অঙ্গীকারের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। অথবা এখানে ওই অঙ্গীকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা সংঘটিত হয়েছিলো হোদায়বিয়ায়। সে অঙ্গীকারের কথা কোরআন মজীদেও বিবৃত হয়েছে (সুরা ফাতাহে)।

মুজাহিদ ও মুকাতিলের নিকট এখানে ওই 'মিসাক্ব' বা অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে, যা আল্লাহ্পাক সকল আদম সন্তানকে হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করে গ্রহণ করেছিলেন। সেই অঙ্গীকারনামাটি ছিলো এ রকম—আমরা শ্রবণ করলাম এবং মান্য করলাম।

এরপর বলা হয়েছে, 'ওয়াত্তাকুল্লহ্ (আল্লাহকে ভয় করো)। এ কথার অর্থ আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা বিস্মৃত হওয়া থেকে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা থেকে আল্লাহ্র ভয়ে বিরত হও।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে, 'ইন্নাল্লহা আলিমুম বিজাতিস্‌সুদুর' (অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত)। —এ কথার অর্থ তোমাদের হৃদয়ে যে সকল ভালো কিংবা মন্দ ধারণার উদ্ভব হয়, সে সকল কিছুই আল্লাহ্‌পাকের অসীম জ্ঞানের আওতাভূত। তিনি সে সকল সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। আয়াতের প্রথমে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বিস্মরণ এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের মতো প্রকাশ্য অপকর্ম সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে এবং পরে অপ্রকাশ্য ও অসৎ হৃদয়ানুভূতি সম্পর্কেও সাবধান করে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বাসী ও পুণ্যবানদের জন্য উত্তম বিনিময় দানের শুভসংবাদ এবং অবিশ্বাসী ও পাপিষ্ঠদের জন্য শাস্তিদানের কথা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক যেহেতু মানুষের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল কিছুই জানেন, তাই নিশ্চয়ই তিনি পুণ্য কর্মের যথাবিনিময় এবং অপকর্মের যথাশাস্তি নিশ্চিত করবেন।

সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৮

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۭ اِعْدِلُوْا ۣ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

❑ হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহের উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকিবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনও সুবিচার না করায় প্ররোচিত না করে, সুবিচার করিবে, ইহা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার খবর রাখেন।

সত্য সাক্ষ্য দিতে হবে। বিশ্বাসীদের লক্ষ্য করে এই আয়াতের শুরুতেই এই নির্দেশটি দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দানে অবিচল থাকতে হবে। বিদ্বেষবশতঃ কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচার না করার প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। সুবিচার নিশ্চিত করতে হবে। কারণ সুবিচার আত্মসংযমের (তাকওয়ার) নিকটতর। শেষে বলা হয়েছে 'এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে; তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা জানেন'।

'কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেনো কখনও সুবিচার না করায় প্ররোচিত না করে'— এ কথাটির অর্থ, তোমাদের শত্রু অবিশ্বাসীদের প্রতি বিদ্বেষের কারণে তোমরা যেনো ন্যায়চ্যুত না হও। যেনো তাদের প্রতি এমন আচরণ না করো যা তোমাদের জন্য অবৈধ। যেমন, নিহত অবিশ্বাসীদের নাক, কান কেটে ফেলা। অবিশ্বাসিনীদেরকে হত্যা করা। সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত তাদেরকে ব্যভিচারিণী হিসেবে অভিযুক্ত করা, তাদের সঙ্গে কৃত সন্ধির শর্ত লংঘন করা ইত্যাদি।

www.eelm.weebly.com

ই'দিলু অর্থ সুবিচার করবে। বিদ্বেষবশতঃ সুবিচার না করা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দানের পরেও বলা হয়েছে 'ই'দিলু' (সুবিচার করবে)। সুবিচারকে অত্যধিক গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্যই এসেছে এই পুনঃনির্দেশ।

'হুয়া আক্বরাবু লিত্তাক্বওয়া' অর্থ এটা (সুবিচার) আত্মসংযমের (তাকওয়ার) নিকটতম। 'তাকওয়া' অর্থ আল্লাহ্ অপ্রসন্ন হোন এমন চিন্তা ও কর্ম থেকে প্রবৃত্তিকেও বাঁচিয়ে রাখা। মুক্ত থাকা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ থেকে। এটাই আত্মসংযম। আর এই আত্মসংযম ন্যায়ানুগতা বা সুবিচারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে। সুবিচারের মাধ্যমেই মানুষের পারস্পরিক অধিকার নিশ্চিত হয়। আর পারস্পরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার এই নিশ্চিতি আত্মসংযমেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। তাই সুবিচারকে তাকওয়ার নিকটতম বলা হয়েছে।

'ওয়াত্তাকুল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্কে ভয় করবে। তাঁর অতুলনীয় ও অসীম পরাক্রম ও শক্তিমত্তার কথা স্মরণ করে শংকিত চিত্তে প্রতিপালন করবে তাঁর আদেশ এবং নিষেধ।

'ইন্নাল্লহা খবিরুম্ বিমা তা'মালুন' অর্থ তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তার সংবাদ রাখেন। এই ব্যাক্যটির মাধ্যমে পূন্যবানকে দেয়া হয়েছে পুণ্যপ্রাপ্তির সুসংবাদ এবং পুণ্যরহিতদেরকে দেখানো হয়েছে শাস্তির ভয়। পুনঃ পুনঃ এ রকম বলা হয়েছে সুবিচারকে নিশ্চিত করার জন্য। সুবিচারকারীকে উৎসাহ দান এবং অবিচারকারীদেরকে সংযত হওয়ার জন্য।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৯, ১০

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

☐ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরষ্কার আছে।

☐ যাহারা সত্য-প্রত্যাখ্যান করে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির অধিবাসী।

আলোচ্য আয়াত দু'টোতে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পরিণাম সম্পর্কে জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ্তায়ালার প্রতিশ্রুতি এই যে—তারা লাভ করবে ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার। আর যারা অবিশ্বাসী, সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী এবং যারা আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারা হবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির অধিবাসী। ওই অগ্নিবাস থেকে তারা কখনোই পৃথক হবে না। আল্লাহ্পাকের পবিত্র বাণীবিন্যাসের রীতি এই যে, পাশাপাশি শাস্তি স্বস্তির কথা উল্লেখ করা হয়। আলোচ্য আয়াত দু'টোতেও তেমনি করা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে। পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে বিশ্বাসীদের উত্তম বিনিময় লাভের কথা এবং অবিশ্বাসীদের নিকৃষ্ট প্রতিফলের কথা। ক্ষমা ও পুরস্কার (জান্নাত) পাবে বিশ্বাসী ও পুণ্যবানেরা এবং অনন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করবে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী এবং আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন— মুজাহিদ, ইকরামা, কালাবী এবং ইবনে বাশ্‌শার বলেছেন, রসুলুল্লহ্ স. হজরত মুনজির বিন ওমর সায়াদীকে তিরিশজন মুহাজির ও আনসার সাহাবীর সঙ্গে বনী আমেরের জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করলেন। তাঁরা সকলে পথ চলতে চলতে বনী আমের জনপদে একটি পানির ঝরনার নিকটে উপস্থিত হলেন। স্থানটির নাম ছিলো বীরে মাউনা। সেখানে বনী আমের বিন তোফায়েলের সঙ্গে তাঁদেরকে মোকাবিলা করতে হলো। কুচক্রী বনী আমেরেরা ধর্মপ্রচারক সাহাবীগণকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। যুদ্ধ হলো। যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন হজরত মুনজির এবং তাঁর সঙ্গীগণ। তিনজন সাহাবী হারানো উট খুঁজতে গিয়ে দল ছুট হয়ে পড়েছিলেন। ওই তিনজনের একজন ছিলেন হজরত আমর বিন উমাইয়া দ্বামেরী। সাহাবীত্রয় দেখলেন, আকাশে কয়েকটি পাখি উড়ছে। তাদের চক্ষু থেকে ঝরে পড়ছে রক্তের ফোটা। এক সাহাবী বললেন, নিশ্চয় আমাদের সাথীদেরকে হত্যা করা হয়েছে। এ কথা বলে তাঁরা তিনজন দ্রুত রওনা হলেন মূল দলের দিকে। পথিমধ্যে সশস্ত্র শত্রুদলের একজন তাঁদের গতিরোধ করে দাঁড়ালো। শুরু হলো আঘাত। প্রত্যাঘাত। সাহাবীদের একজন গুরুতর আহত হয়ে পড়লেন। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে একটি অলৌকিক নিদর্শন দেখে বলে উঠলেন, আল্লাহ্ আকবর। আল্লাহ্‌র কসম, আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। অন্য সাহাবীদ্বয় সেখান থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বনী সুলাইম গোত্রের দু'জন লোককে শত্রু মনে করে হত্যা করে ফেললেন তাঁরা। বনী সুলাইম ছিলো বনী আমেরেরই একটি শাখা। তাই তাদেরকে বনী আমেরের লোক মনে করেই সাহাবীদ্বয় হত্যা করে ফেলেছিলেন। কিন্তু বনী সুলাইম রসুল স. এর সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলো। তাই তারা রক্তপণের (দিয়তের) দাবি নিয়ে উপস্থিত হলো রসুল স. এর দরবারে। কিন্তু তখন রসুল স.এর নিকটে রক্তপণ পরিশোধের মতো অর্থ বা উপকরণ ছিলো না। তাই তিনি স. হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত তালহা এবং হজরত আবদুর রহমান বিন আউফকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন বনী নাজিরের কা'ব বিন আশরাফ ইহুদীর নিকটে। রক্তপণ পরিশোধের কিছু উপকরণ সংগ্রহ করাই ছিলো তাঁর স. এর উদ্দেশ্য। রসুল স. এর সঙ্গে ইহুদীরা এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলো যে, মদীনার ইহুদী এবং মুসলমান কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না এবং প্রয়োজন দেখা দিলে রক্তপণ পরিশোধের জন্য ইহুদীরা সাহায্য করবে। রসুল স. এর আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ইহুদীরা বললো, হে আবুল কাশেম, আপনার প্রয়োজনের কথা বলে ভালোই করেছেন। উপবেশন করুন। আগে আমাদের সঙ্গে কিছু আহার করুন। তারপর

www.eelm.weebly.com

আপনি যা চাইবেন, তাই দেয়া হবে। রসুল স. উপবেশন করলেন। ইহুদীরা আড়ালে গিয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলো—এটাই সুযোগ, এ রকম সুযোগ আর আসবে না। এখন যদি কেউ গৃহের ছাদের উপর থেকে একটি বড় পাথর তার উপর ফেলে দিতে পারো তবে চিরদিনের জন্য আমরা নিরাপদ।

আমর বিন জাহাশ বললো, আমি পারবো। এ কথা বলে সে তৎক্ষণাৎ ছাদে উঠতে শুরু করলো। কিন্তু অদৃশ্য থেকে নিরস্ত করা হলো তাকে। ইতোমধ্যে হজরত জিবরাইল রসুল স. কে ইহুদীদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। রসুল স. সেখান থেকে উঠে এলেন। হজরত আলীকে বললেন, তুমি স্থান ত্যাগ কোরো না। ইহুদীরা এলে বোলো, আমি বাড়ীতে চলে গিয়েছি। হজরত আলী সেখানেই বসে রইলেন। অন্য সাথীদেরকে নিয়ে রসুল স. ফিরে এলেন স্বগৃহে। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিতে চাহিয়াছিল, তখন আল্লাহ্ তাহাদের হাত সংযত করিয়াছিলেন; এবং আল্লাহ্কে ভয় কর আর আল্লাহেরই প্রতি বিশ্বাসীগণ নির্ভর করুক।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে উপরে যে বর্ণনা রয়েছে সেই বর্ণনাটি মোহাম্মদ বিন ইসহাক, ইবনে আমর এবং ইবনে সা'দও উল্লেখ করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে যে, সালাম বিন মুশকাম ইহুদী অন্য ইহুদীদেরকে রসুল স.কে হত্যার চক্রান্ত করতে নিষেধ করেছিলো এবং বলেছিলো তোমরা এ রকম করলে এ কথা অবশ্যই প্রমাণ হয়ে যাবে যে, আমরা সন্ধিভঙ্গকারী। আমরা তো মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ। সুতরাং এমন কোরো না। ইবনে জারীর, ইকরামা, ইয়াযিদ বিন যিয়াদ, আবদুল্লাহ বিন আবু বকর, আসেম বিন ওমর বিন কাতাদা, মুজাহিদ, আবদুল্লাহ্ বিন কাসীর এবং আবু মালেকের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. তখন হজরত আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে চলে এলেন। আল হাদিস। এই বর্ণনায় হজরত মুনজির এবং তার সঙ্গীগণের শহীদ হওয়ার বিবরণ নেই।

www.eelm.weebly.com

আবু নাঈম তাঁর দালায়েলুন নবুয়ত গ্রন্থে হাসান বসরীর নিয়মে হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, বনী মহারেবের এক লোকের নাম ছিলো গুয়াইরিস বিন হারেস। সে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বললো, আমি এখনই গিয়ে মোহাম্মদকে হত্যা করবো। এই বলে সে রসুল স .এর সামনে এলো। রসুল স. তখন উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন। পাশেই রক্ষিত ছিলো তাঁর তরবারী। গুয়াইরিস বললো, আমি আপনার তরবারীটি একটু দেখতে চাই। রসুল স. বললেন, দেখো। সে তরবারীটি হাতে নিয়ে কোষমুক্ত করলো। দেখতে লাগলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তারপর বললো, আমার হাতে উন্মুক্ত তরবারী। আপনার কি একটুও ভয় করছে না? তিনি স. বললেন, না। সে বললো, তলোয়ার তো আমার হাতে। রসুল স. বললেন, তোমার হাত থেকে আল্লাহ্পাক আমাকে রক্ষা করবেন। এ কথা শুনে গুয়াইরিস খোলা তলোয়ারটি কোষবদ্ধ করে রসুল স.কে ফিরিয়ে দিলো। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

এক বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. ওই সময় বনী গাতফানদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম আউফীর নিয়মে লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসেবে হজরত ইবনে আব্বাস লিখেছেন, কতিপয় ইহুদী একবার রসুল স. এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে আহারের আমন্ত্রণ জানালো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো আমন্ত্রণের নামে ডেকে এনে তারা রসুল স.কে হত্যা করে ফেলবে। আল্লাহ্পাক তাঁর রসুলকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে ইহুদীদের চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিতি দান করলেন। রসুল স. আর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন না। নিমন্ত্রিত সাহাবীগণও নিমন্ত্রণগমন থেকে বিরত রইলেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত জাবের থেকেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। কিন্তু সে বর্ণনায় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথা নেই।

বায়হাকী তাঁর দালায়েল গ্রন্থে হজরত কাতাদা থেকে লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই আরব গোত্র সম্পর্কে যারা প্রতারণা করে রসুল স.কে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলো। এক বেদুইনকে প্রেরণ করেছিলো তারা। বেদুইনটি রসুলে পাক স. এর নিকটে যখন পৌঁছলো তখন তিনি স. ছিলেন শায়িত অবস্থায়। বেদুইন বললো, এখন আমার আক্রমণ থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? রসুল স. বললেন, আল্লাহ্! এ কথা শোনার সাথে সাথে তার হাত থেকে তলোয়ারটি পড়ে গেলো। এতদ্সত্ত্বেও রসুল স. তাকে শাস্তি দেননি।

এই আয়াতে রসুল স. এর হত্যাকারীদেরকে আল্লাহ্পাকই যে প্রতিহত করেছিলেন, সে কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ তাদের হাত সংযত করেছিলেন।' বিশ্বাসীগণকে সম্বোধন করে তাঁদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্পাকের এই অপার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করতে বলেছেন আল্লাহ্পাক। অবশেষে বলেছেন, ভয় করো, আর আল্লাহ্রই প্রতি বিশ্বাসীগণ নির্ভর করুক।' এ কথার অর্থ বিশ্বাসীগণের উচিত তারা যেনো পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীল হয়। কারণ, তিনিই কল্যাণদাতা। এবং তিনিই অকল্যাণ থেকে প্রকৃত রক্ষাকর্তা।

www.eelm.weebly.com

لَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا
وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ
بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ
سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ فَمَنْ كَفَرَ
بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

❐ আল্লাহ্ বনি ইসরাইলের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের মধ্য হইতে দ্বাদশ নেতা নিযুক্ত করিয়াছিলেন আর বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা যদি সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও, আমার রসুলগণকে বিশ্বাস কর ও উহাদিগকে সম্মান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে তোমাদের দোষ অবশ্যই মোচন করিব এবং নিশ্চয় তোমাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; ইহার পরও কেহ সত্য প্রত্যাখ্যান করিলে সে সরল পথ হারাইবে।

ফেরাউন এবং তার বাহিনীর সলিল সমাধির পর আল্লাহ্পাক তওরাত কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন। ওই সময় বনী ইসরাইলেরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলো। সেই অঙ্গীকারের কথাই এই আয়াতের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরে।

বারোটি গোত্রে বিভক্ত ছিলো বনী ইসরাইলেরা। সেই বারোটি গোত্রের বারো জন নেতা নিযুক্ত করেছিলেন আল্লাহ্পাক। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো, তারা তাদের আপনাপন গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহ্পাকের নির্দেশ মান্য করে চলতে বলবে। রসুল মুসার আনুগত্যে অটল থাকার নির্দেশ দিবে, কল্যাণকর্মে উদ্বুদ্ধ করবে এবং মন্দকর্ম থেকে আত্মরক্ষা করতে উৎসাহিত করবে।

আয়াতে বলা হয়েছে, সে দ্বাদশ নেতাকে আল্লাহ্পাক বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি (অক্বালাল্লহু ইন্নি মায়াকুম)'। এ কথার অর্থ যতোক্ষণ তোমরা আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার মান্য করে চলবে, ততোক্ষণ আল্লাহ্পাক থাকবেন তোমাদের সঙ্গে। সৃষ্টি একে অপরের সঙ্গে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে থাকা সে রকম নয়। এই সঙ্গে থাকার প্রকৃত প্রকৃতি অবর্ণনীয়। আল্লাহ্পাক অতুলনীয় অবিভাজ্য ও উদাহরণরহিত। তাঁর সঙ্গে থাকার বিষয়টিও তেমনি অতুলনীয় যা— অবোধ্য, জ্ঞানাতীত। তবে তাঁর সঙ্গে থাকার

www.eelm.weebly.com

পরিণাম এবং প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিগ্রাহ্য, অনুভব্য এবং বোধ্য। আল্লাহ্‌পাক সঙ্গে থাকার পরিণাম এই যে—শরিয়তের আদেশ ও নিষেধ মান্য করা সহজ হয়, বক্ষ সম্প্রসারিত হয়, হৃদয় ও প্রবৃত্তি হয় প্রশান্ত।

এরপর শুরু হয়েছে নতুন বাক্য। কারণ, বাক্যের শুরুতে রয়েছে লামে এবতেদায়ী (প্রারম্ভিকা প্রকাশক লাম)। বাক্যটি শুরু হয়েছে এভাবে—লাইন আক্বমতুমুস সলাহ্ (যদি নামাজ প্রতিষ্ঠা করো...)। এই বাক্যটির শেষাংশে বলা হয়েছে 'তবে তোমাদের দোষ অবশ্যই মোচন করবো।' যে নির্দেশগুলো পালন করলে আল্লাহ্‌পাক অবশ্যই দোষ মোচন করবেন বলেছেন, সেগুলো হচ্ছে— সালাত প্রতিষ্ঠা, জাকাত প্রদান, রসুলগণের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মান প্রদর্শন এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ (কর্জে হাসানা) প্রদান। এই নির্দেশগুলো যথাপ্রতিপালনের মধ্যেই রয়েছে পাপমোচন ও মুক্তি। নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত প্রদান তো করতেই হবে। তার সঙ্গে থাকতে হবে সকল নবী রসুলদের প্রতি নিষ্কলুষ আস্থা। তাঁদের সকলকেই দিতে হবে যথাবিহিত সম্মান। পূর্বাপর নবী রসুলগণের কাউকে মান্য করবে, কাউকে করবে না, কাউকে জানাবে সম্মান আবার কারোর প্রতি প্রদর্শন করবে অসম্মান—এ রকম কিছুতেই করা যাবে না। কারণ পাপমোচনের পথ এটা নয়।

ওয়া আক্বরদ্বতুমুল্লহা ক্বরদ্বান হাসানা (আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ প্রদান করো)। আল্লাহ্‌কে ঋণ প্রদান করার অর্থ কল্যাণের পথে অর্থ ব্যয় করা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে সকল প্রকার পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা। অথবা অর্থ হবে এ রকম— আল্লাহ্‌কে প্রসন্ন করার উদ্দেশ্যে অভাবগ্রস্তদেরকে দান করা। গ্রহীতাকে অনুগ্রহ করা হোলো—এ রকম অহংবোধ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। লোক দেখানো মনোভাব থেকেও মুক্ত থাকতে হবে। নতুবা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দানের উদ্দেশ্য হবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

পাপমোচনের পর সুগম হবে জান্নাতের পথযাত্রা। জান্নাত লাভ হবে নিশ্চিত। আল্লাহ্‌পাক তাই জানাচ্ছেন, 'ওয়া লাউদ্‌খিলান্নাকুম জান্নাতিন্ তাজরি মিন্ তাহ্‌তিহাল আন্‌হার (এবং নিশ্চয় তোমাদেরকে দাখিল করবো জান্নাতে, যার পাদদেশে রয়েছে প্রবহমান স্রোতস্বতী)।'

শেষে বলা হয়েছে, 'ফামান কাফারা বা'দা জালিকা মিনকুম ফাক্বদ্ দ্বল্লা সাওয়া আস্‌সাবিল' (এর পরও কেউ সত্য প্রত্যাখ্যান করলে সে সরল পথ হারাবে)। আল্লাহ্‌পাক তাঁর রসুলের মাধ্যমে ক্রমাগত সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্দেশ করে চলেছেন। সুতরাং পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীতে আত্মরক্ষা যারা করতে চায়, লাভ করতে চায় সফলতা, তাদেরকে তো বিশ্বাস ও সৎ কর্মের পথে আসতেই হবে। অন্যথায় পথচ্যুতি অনিবার্য। সত্য প্রত্যাখ্যান করলে তাই শাশ্বত সরলপথটি (সাওয়া আস্ সাবিল) হারাতেই হবে— যে পথ পাপ মুক্তির, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির এবং জান্নাতের।

www.eelm.weebly.com

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

❑ তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছি ও তাহাদের হৃদয় কঠিন করিয়াছি; তাহারা শব্দগুলির আসল অর্থ বিকৃত করে এবং তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল উহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে; তুমি সর্বদা উহাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাঘাতকতা করিতে দেখিতে পাইবে। সুতরাং উহাদিগকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর; আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

অঙ্গীকারভঙ্গের অপরাধ একটি গুরুতর অপরাধ। এই গুরুত্বকে প্রকাশ করার জন্য এখানে 'মা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে, 'তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য তাদেরকে অভিসম্পাত করেছি।' আতা বলেছেন, অভিসম্পাত (লানত) অর্থ আল্লাহ্পাকের রহমত থেকে বিচ্ছিন্ন বা বহিষ্কার করা। হাসান এবং মুকাতিল বলেছেন, অভিসম্পাত অর্থ আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, জিজিয়া নির্ধারণ করা। আয়াতটির প্রকৃত উদ্দেশ্য এ রকম—খৃষ্টানেরা মোহাম্মদ স. কে রসুল বলে স্বীকার করেনি এবং ইহুদীরা অস্বীকার করেছে হজরত ঈসাকে, হজরত মোহাম্মদ স কে এবং অন্য নবীগণকে। তারা আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আল্লাহ্পাকের আনুগত্য থেকে। তাই আমি তাদেরকে অভিসম্পাত করেছি।

'তাদের হৃদয় কঠিন করেছি।' 'ক্বাসিয়াহ্' অর্থ কঠিন। শব্দটি এসেছে 'ক্বিস্ওয়াতুন্' থেকে। যার অর্থ হৃদয়ের কাঠিন্য। যেমন বলা হয়— 'হাজারুন ক্বাসিয়াতুন' (কঠিন প্রস্তর)। সিহাহ্ গ্রন্থে এ রকম বলা হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ক্বাসিয়াহ্ অর্থ শুষ্কতা, চরম শুষ্কতা। কোনো কোনো ক্বারী শব্দটিকে পড়েছেন 'ক্বাসিয়াতান। বাগবী লিখেছেন, শব্দ দু'টো সমার্থক। বায়যাবী লিখেছেন, ক্বাসিয়াহ্ অথবা ক্বাসিয়াতান থেকে মোবালেগার সিগা হয়েছে অথবা এর অর্থ খারাপ। যেমন, দিরহামুন ক্বাসিউন (অচল মুদ্রা)। আমি বলি, যেভাবেই বলা হোক না কেনো শব্দটির অর্থ হবে কঠিন বা কাঠিন্য। অচল মুদ্রার মধ্যে শুষ্কতা ও কাঠিন্য দু'টোই থাকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে হৃদয় কঠিন করার অর্থ— হৃদয়ে বিশুদ্ধ বিশ্বাস থাকবে না, থাকবে অচল বা ময়লা মুদ্রার মতো অবিশ্বাস (কুফর) ও অপবিত্রতা (নেফাক)।

www.eelm.weebly.com

'তারা শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করে'—এ কথার অর্থ তারা আল্লাহ্‌র কালামের বিকৃত অর্থ করে। তাহরিফ অর্থ বিকৃত করা বা স্থানচ্যুত করা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এর অর্থ রসুল স. এর গুণাবলীকে পরিবর্তন করা। কেউ কেউ বলেছেন, ভুল ধারণার সৃষ্টি করা, শব্দের যথা অর্থ না করা।

'এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিলো তার এক অংশ ভুলে গিয়েছে' —এখানে ভুলে যাওয়ার অর্থ পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ তওরাত শরীফে হজরত মোহাম্মদ স. এর আনুগত্যের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, বনী ইসরাইলেরা তা পরিত্যাগ করেছে। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, বনী ইসরাইল তাদেরকে প্রদত্ত সদুপদেশ পরিত্যাগ করেছে। ইতোপূর্বে তারা হজরত মুসার আনুগত্যও পরিত্যাগ করেছিলো। এখন পরিত্যাগ করছে রসুল স. এর আনুগত্য।

প্রথমে বলা হয়েছে, অর্থবিকৃতি (তাহ্‌রিফ) এর কথা। পরে উল্লেখ করা হয়েছে বিস্মৃতি (নেসিয়ান) বা পরিত্যাগের কথা। বিস্মৃতি অপেক্ষা বিকৃতি গুরুতর। তাই বিকৃতির বিষয়ে ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের সিগা এবং এর উল্লেখ এসেছে প্রথমে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে বিকৃতি ও বিস্মৃতির সম্মিলিত অর্থ হবে এ রকম—অর্থ বিকৃতির অপরাধে তারা যা স্মরণে রেখেছিলো তাও ভুলে গিয়েছে। জুহ্‌দ পুস্তকে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি ধারণা করি, মানুষ পাপ করলে জানা বিষয়ও ভুলে যায়, এ কথা বলে তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন।

'তুমি সর্বদা তাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখতে পাবে।'—এখানে 'খয়েনাহ্‌' অর্থ বিশ্বাসঘাতকতা। শব্দটি 'ফায়েলাহ্‌' এর ওজনে ধাতুগত অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, কাযেবাহ্‌—কিয্‌বুন-এর এবং লায়েনাহ্‌—লা'নুন এর অর্থ প্রকাশক। অথবা এ ধরনের শব্দগুলো কর্তার ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এগুলোর বিশেষ্য উহ্য। যেমন, বিশ্বাসঘাতক (খেয়ানতকারী) দল। অথবা বিশ্বাসঘাতকতার স্বভাব কিংবা বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্যকলাপ। এমনও বলা যায় যে, খয়েনাহ্‌ এর মধ্যে 'হা' অব্যয়টি আধিক্য প্রকাশক। তাই অর্থ হবে চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

'খাইনাতিম্‌ মিনহুম'—এখানে 'মিনহুমের' 'হুম' (তাদের) সর্বনামটি সকল বনী ইসরাইলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ অতীতের এবং বর্তমানের অধিকাংশ বনী ইসরাইল বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতকতা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। তাদের পূর্ব পুরুষেরা যেমন তাদের নবীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তেমনি বর্তমানের ইহুদীরাও বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর সঙ্গে। সন্ধিশর্ত ভঙ্গ করেছে তারা। সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করেছে মুশরিকদের দিকে। রসুল স. কে হত্যার পরিকল্পনাও তারা করেছে—যাদুর মাধ্যমে, বিষ পান করানোর মাধ্যমে, এ অপপ্রচেষ্টায় তারা নিরন্তর।

'ইল্লা ক্বলিলাম্‌ মিন্‌হুম' অর্থ তাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত। এ কথার অর্থ—তাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দল সত্যের প্রতি সমর্পিতপ্রাণ। তাঁরা হজরত মুসার অনুগত ছিলেন। হজরত ঈসাকেও মান্য করেছিলেন তাঁদের একটি দল। শেষ নবী

www.eelm.weebly.com

রসুল স.কেও বনী ইসরাইলের কতিপয় ব্যক্তি মান্য করেছেন। তাঁর প্রতি ইমান এনেছেন। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, এই অল্পসংখ্যক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁরাই, যাঁরা 'তাদের হৃদয় কঠিন করেছি'—এই অভিশাপ থেকে মুক্ত। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি ভুল। কারণ 'তাদের হৃদয় কঠিন করেছি'—এ কথা বলা হয়েছে তাদেরকে লক্ষ্য করে যারা অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। আয়াতে এ কথাটি সুস্পষ্ট।

'সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো'—এ কথার অর্থ, হে আমার প্রিয় রসুল! ইহুদীরা অবিমৃশ্য ও অর্বাচীন। সুতরাং আপনি তাদেরকে মার্জনা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তারা ক্রমাগত আপনাকে কষ্ট দিয়ে চলেছে, আপনাকে হত্যার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে—তবুও আপনি তাদেরকে মার্জনা করুন (কারণ আপনি মহান)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে এ রকম—যদি তারা তওবা (প্রত্যাবর্তন) করে এবং ইমান আনে অথবা সন্ধি করতে সম্মত হয় এবং জিজিয়া প্রদান করতে চায়, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কেউ কেউ বলেছেন, জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ করার মাধ্যমে ক্ষমা অথবা উপেক্ষা করার এই নির্দেশটিকে রহিত করে দেয়া হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে, 'ইন্নাল্লহা ইউহিব্বুল মুহ্সিনিন' (আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন)। এ কথার মাধ্যমে অপরাধীকে ক্ষমা করার জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে। এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিশ্বাসঘাতক অবিশ্বাসীকেও মার্জনা করা উত্তম।

সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ১৪

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصٰرٰٓى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِۦ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝

❑ যাহারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান' তাহাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল তাহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি তাহাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রাখিয়াছি; তাহারা যাহা করিত আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহা জানাইয়া দিবেন।

খৃষ্টানেরা নিজেরাই নিজেদেরকে খৃষ্টান বা নাসারা নামে অভিহিত করেছে। আয়াতের শুরুতে তাই বলা হয়েছে, যারা বলে 'আমরা খৃষ্টান' তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম—এ কথার অর্থ, আমি ইনজিল শরীফ এবং হজরত ঈসার মাধ্যমে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। ইঞ্জিল তওরাতকে প্রত্যয়ন করেছে এবং এই শুভসমাচার দিয়েছে যে, হজরত ঈসার পরে মোহাম্মদ নামে একজন রসুল আসবেন। সেই নবীকে তোমরা অবশ্যই মান্য করবে।

www.eelm.weebly.com

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. এর সমসাময়িক খৃষ্টানদের সম্পর্কে। এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে, হে খৃষ্টান সম্প্রদায়, তোমাদের মতো তোমাদের পূর্ব পুরুষেরাও নিজেদেরকে খৃষ্টান বা নাসারা বলতো (দাবি করতো আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী)। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ রকম ছিলোও। আমি তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। তোমরা তাদেরকে মান্য করার দাবি করে থাকো। তাই তোমরাও আমার এই অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত।

'কিন্তু তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিলো, তার এক অংশ ভুলে গিয়েছে'—এ কথার অর্থ, ইঞ্জিলের মাধ্যমে এই উপদেশ দেয়া হয়েছিলো যে, মোহাম্মদ স. আর্বিভূত হলে (তোমরা অথবা তোমাদের অধঃস্তনেরা) তাঁকে বিশ্বাস করবে। কিন্তু তোমরা তা করোনি। বরং তাঁর আর্বিভাবের পূর্বেই তোমরা হয়ে পড়েছো বিভক্ত। কেউ হয়েছো মাল্‌কানীয়াহ্ কেউ নিস্‌তুরিয়াহ্, আবার কেউ হয়েছো ইয়াকুবিয়াহ্। কেউ বলছো— আল্লাহ্ তিনজন, কেউ বলছো— মসীহ্ হচ্ছেন আল্লাহ্‌র পুত্র। আবার কেউ বলছো মসীহ্ই আল্লাহ্। 'সুতরাং আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি'— কাতাদা বলেছেন, এখানে 'তাদের মধ্যে' অর্থ ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে। কিন্তু রবী বিন আনাস বলেছেন, এ কথার অর্থ—খৃষ্টানদেরই বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে। ইহুদী ও খৃষ্টানেরা ছিলো পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। খৃষ্টানদের দল উপদলগুলোর মধ্যেও ছিলো চরম হিংসাবিদ্বেষ। আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌পাকই তাদের মধ্যে এই শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগ্রত রেখেছেন। কারণ, তারা সম্প্রীতিকামী নয়—বিদ্বেষদুষ্ট।

'তারা যা করতো আল্লাহ্ তাদেরকে তা জানিয়ে দিবেন'— এখানে 'তারা যা করতো' তা হচ্ছে অবিশ্বাসপ্রসূত পাপ, আসমানী কিতাবের অবমাননা ইত্যাদি। এই সকল অপকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে কিয়ামতের দিন জানিয়ে দিবেন। তখন তাদের উপর শাস্তি আরোপ করে বলবেন, পৃথিবীতে তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট, তোমাদের কার্যকলাপ ছিলো অত্যন্ত গর্হিত। আল্লাহ্‌পাকই সমধিক জ্ঞাত।

ইকরামার মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, একবার কতিপয় ইহুদী রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে রজম, সঙ্গেসার (প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড) সম্পর্কে জানতে চাইলো। রসুল স. বললেন, তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী কে? (তাকে উপস্থিত করো)। ইহুদীরা ইবনে সুরীয়াকে দেখিয়ে দিলো। রসুল স. আল্লাহ্‌র শপথ করে বললেন, যিনি হজরত মুসার উপর তওরাত অবতীর্ণ করেছেন, তুর পর্বতকে মাথার উপর উত্তোলন করে বনী ইসরাইলের নিকট থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, সেই আল্লাহ্‌পাকের শপথ। রজমের শাস্তির কথা রয়েছে তোমাদের কিতাবেই। ইবনে সুরীয়া বললো, হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের মধ্যে যখন ব্যভিচারের ব্যাপক প্রচলন শুরু হলো, তখন সঙ্গেসার করা হয়ে পড়লো অত্যন্ত কঠিন। তখন আমরা ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করলাম একশত দোর্‌রা এবং মস্তক মুণ্ডন। এই কথোপকথনের পর অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرٗا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖۚ قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ ۝ يَهۡدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِهِۦ وَيَهۡدِيهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ۝

❑ হে কিতাবীগণ! আমার রসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তোমরা কিতাবের যাহা গোপন করিতে সে উহার অনেক তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক উপেক্ষা করিয়া থাকে। আল্লাহের নিকট হইতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে।

❑ যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করিতে চাহে ইহা দ্বারা তিনি তাহাদিগকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া যান এবং উহাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

এখানে 'ইয়া আহ্‌লাল কিতাব' (হে কিতাবীগণ) বলে ইহুদী ও খৃষ্টান দু'দলকেই সম্বোধন করা হয়েছে। দ্বিতীয় শব্দটি এখানে একবচন। শব্দটি বহুবচনের অর্থেও ব্যবহৃত হয় (যেমন মানুষ অর্থ মনুষ্য জাতি)। তাই ইহুদী ও খৃষ্টানদের কিতাব পৃথক পৃথক হলেও একবচনবোধক কিতাব এর মাধ্যমে বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। ইয়া আহ্‌লাল কিতাবের অর্থ হয়েছে, হে আহলে কিতাব (হে কিতাবীগণ)।

'আমার রসুল তোমাদের নিকট এসেছে'—এ কথার অর্থ, শেষ নবী মোহাম্মদ স. তোমাদের সামনে উপস্থিত। তিনি আল্লাহ্‌পাকের সত্য রসুল।

'তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে সে তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করে'—এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, তোমরা তওরাত ও ইঞ্জিলের অনেক নির্দেশ গোপন করেছো। আমার রসুল সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু প্রকাশ করে দিচ্ছেন। যেমন— রজমের আয়াত, তওরাতে উল্লেখিত রসুল মোহাম্মদ স. এর প্রশংসাসূচক বিবরণ, ইঞ্জিলে বিবৃত শেষ রসুলের আগমনের শুভসমাচার ইত্যাদি।

'এবং অনেক উপেক্ষা করে থাকে'—এ কথার অর্থ, আমার রসুল তোমাদের অনেক অপরাধ মার্জনা করে দেন, উপেক্ষা করেন।

শেষে বলা হয়েছে, 'কৃদজায়াকুম মিনাল্লাহি নুরুঁউ ওয়া কিতাবুম্ মুবিন' (আল্লাহ্‌র নিকট হতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে)। এখানে জ্যোতি (নূর) অর্থ, রসুল মোহাম্মদ স. এর পবিত্র অস্তিত্ব অথবা ইসলাম।

www.eelm.weebly.com

এবং 'কিতাব' অর্থ কোরআন মজীদ। 'নূর' অর্থ এখানে কোরআন মজীদও হতে পারে। এভাবে আয়াতের মর্ম এ রকম হতে পারে যে, আলো যেমন অন্ধকারকে দূর করে তেমনি রসুল স. এবং কোরআন মজীদ এই দুই আলোর মাধ্যমে অবিশ্বাসের অন্ধকার দূরীভূত হয়।

এর পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে 'যারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ চায়'— এর দ্বারা 'তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন।' এখানে 'এর দ্বারা' অর্থ রসুল স. এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ এই কিতাব দ্বারা। এখানে 'বিহি' সর্বনামটি এক বচন হলেও এর অর্থ দ্বিবচনবোধক। রসুল স. এবং কোরআনের অনুসরণ মূলতঃ একই। তাই এ রকম একবচনবোধক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে 'শান্তির পথ' (সুবুলুস্ সালাম) অর্থ নিরাপত্তার পথ অর্থাৎ যে পথের পথিকেরা আল্লাহ্‌র আযাব থেকে নিরাপদ, সেই পথ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আল্লাহ্‌পাকের একটি মহাপবিত্র নাম হচ্ছে 'আস্‌সালাম'। সেই সালাম বা শান্তির পথেই আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে পরিচালিত করেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তোষ প্রার্থীদেরকে কিতাবের মাধ্যমে পথনির্দেশনা দেন। এভাবেই তাদেরকে পরিচালিত করেন শান্তির পথে।

'এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান'—এ কথার অর্থ, আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে যথানির্দেশনার মাধ্যমে অবিশ্বাসী অন্ধকার থেকে মুক্ত করেন এবং পরিচালিত করেন বিশ্বাসী আলোর দিকে।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়া ইয়াহ্‌দি বিহিম ইলা সিরাতিম্ মুসতাক্বিম'—এ কথার অর্থ, এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। এই সরল পথ (সিরাতল মুস্‌তাক্বিম) অর্থ ইসলামের পথ।

সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ১৭

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

❒ যাহারা বলে, 'মরিয়ম-তনয় মসীহ্‌ই আল্লাহ্', তাহারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেই। বল, আল্লাহ্ মরিয়ম-তনয় মসীহ্, তাহার মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে যদি ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাকে বাধা দিবার শক্তি কাহার আছে! আস্‌মান ও জমিনের এবং ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহেরই। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয় সর্বশক্তিমান।

www.eelm.weebly.com

খৃষ্টানদের ইয়াকুবিয়া সম্প্রদায় মনে করতো, হজরত ঈসা নিজেই আল্লাহ্। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ রকম বিশ্বাস ইয়াকুবিয়ারা মনে মনে করতো, মুখে প্রকাশ করতো না। প্রকাশ্যে তারা ছিলো তৌহিদের দাবিদার। আল্লাহ্পাক এখানে তাদের অন্তর্নিহিত অপবিশ্বাসটি প্রকাশ করে দিয়েছেন। আয়াতের শুরুতেই জানিয়ে দিয়েছেন, তারা মরিয়ম তনয় হজরত ঈসাকে (মনে মনে) আল্লাহ্ বলে। সুতরাং তারা নিশ্চিত সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের)।

এরপর রসুল স.কে লক্ষ্য করে আল্লাহ্পাক এক জবাবহীন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এভাবে— 'হে রসুল, আপনি বলুন আল্লাহ্পাক যদি হজরত ঈসা, তাঁর মাতা এবং পৃথিবীর সকলকে ধ্বংস করতে চান, তবে এই অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে কে?' এই প্রশ্নটির মাধ্যমে এ কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অন্য সকলের মতো হজরত ঈসা এবং তাঁর জননী সম্ভাব্য জগতের (দায়রায়ে এমকানের) অন্তর্ভূত। আর সম্ভাব্য জগৎ ধ্বংসশীল। 'ওয়াজিবুল ওজুদ' (অনিবার্য অস্তিত্ব) আল্লাহ্পাকই কেবল শাশ্বত, চিরন্তন। তাঁর ক্ষমতা অপার। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। তাঁর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এমন কেউই নেই। থাকতেও পারে না।

এরপর বলা হয়েছে. 'আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।'—এখানে 'তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন (ইয়াখ্লুকু মা ইয়াশাউ)' কথাটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে আল্লাহ্পাকের অপ্রতিদ্বন্দ্বি ইচ্ছাশক্তিকে। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনি সৃষ্টি করেন। নির্ধারিত কোনো বিধান তিনি মানতে বাধ্য নন। কারণ বিধান তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর সৃষ্টিলীলা বিচিত্র, বিস্ময়কর। বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম ঘটে বৃক্ষের। কিন্তু আল্লাহ্পাক এই বিশাল গগনমণ্ডল ও ধরিত্রীমণ্ডলকে কোনো বীজ বা বৃক্ষ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। মানব সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে ব্যতিক্রমী বিধানও প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে— পিতা-মাতার মিলনের মাধ্যমে মানব শিশুর সৃষ্টি হয়। কিন্তু তিনি হজরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে— পিতা-মাতা ছাড়াই। আবার সাধারণ বিধানানুসারে মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হয় নারীর উদর থেকে। তাঁর প্রদত্ত এই সাধারণ বিধানকেও তিনি ভেঙেছেন এভাবে— হজরত হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন হজরত আদমের বক্ষের অস্থি থেকে। তেমনি তিনি কেবল মাতা থেকে সৃষ্টি করেছেন হজরত ঈসাকে। এ সকল কিছু হচ্ছে তাঁর নিরঙ্কুশ ও চিরমুক্ত অভিপ্রায়ের নিদর্শন। 'ইয়াখলুকু মা ইয়াশাউ' (তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন) কথাটি সেই নিরঙ্কুশ ও সমকক্ষতাহীন অভিপ্রায়ের প্রমাণ।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াল্লহু আলা কুল্লি শাইয়িন কৃদির' (আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান) — এ কথাটি চিরসত্য। সুতরাং সৃষ্টির বৃত্তবাসী যারা তারা কীভাবে স্রষ্টার মতো হয়? সৃষ্টি মুখাপেক্ষী। আর তিনি অমুখাপেক্ষী। অতএব এ কথা নিশ্চিত যে, যারা হজরত ঈসাকে আল্লাহ্ বলে, তারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদ বিন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার ইহুদী নোমান বিন হুয়াই, বাহ্‌রী বিন আমর এবং শায বিন আদ্দী রসুল পাক স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করলে রসুল স. সেগুলোর যথা-উত্তর দিলেন এবং তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন ও তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় দেখালেন। তারা বললো, হে মোহাম্মদ! আপনি আমাদেরকে কিসের ভয় দেখান? আমরা তো আল্লাহ্‌র ও তার পুত্রের প্রিয় পাত্র (সুতরাং তিনি আমাদেরকে শাস্তি দিবেন কেনো)। এরপর অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ১৮

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؗ وَاِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

❑ ইহুদী ও খৃষ্টানগণ বলে, 'আমরা আল্লাহের পুত্র ও তাঁহার প্রিয়। বল, 'তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদিগকে শাস্তি দেন? না, তোমরা মানুষ তাহাদেরই মতো যাহাদিগকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন।' যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন; আসমান ও জমিনের এবং ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহেরই আর প্রত্যাবর্তন তাঁহারই দিকে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়'—ইহুদী ও খৃষ্টানদের এ কথার অর্থ, তারা মনে করতো—আল্লাহ্ আমাদের প্রতি পিতার মতো দয়ার্দ্র এবং আমরা তাঁর সন্তানের মতো স্নেহাস্পদ। তাই কোনো মাধ্যম ব্যতিরেকেই আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কধারী।

ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, ইহুদীরা দেখেছিলো, তওরাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, 'হে আমার আহ্‌বারের সন্তানগণ,' (ইহুদী আলেমদেরকে বলা হয় আহ্‌বার)। তারা এই 'আহ্‌বার' শব্দটিকে মনে করতো 'ইব্‌কার' (কুমারী নারী)। এই ধারণায় তারা নিজেদেরকে মনে করতো—আল্লাহ্ আমাদেরকে কুমারী রমণীর সন্তান করেছেন। তাই আমাদের প্রকৃত পিতা হবে আল্লাহ্। এ কথা তারা প্রকাশ্যে বলে বেড়াতো। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, তাদের 'আবনাউল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র পুত্র) কথাটির অর্থ ছিলো, আমরা আল্লাহ্‌র পয়গম্বরের সন্তান (সুতরাং আমাদের উপর আযাব কিভাবে হবে)। কেউ কেউ বলেছেন, তারা হজরত উযায়ের এবং হজরত ঈসাকে বলতো আল্লাহ্‌র সন্তান এবং নিজেরা ছিলো হজরত

www.eelm.weebly.com

উযায়ের এবং হজরত ঈসার বংশধর হওয়ার দাবিদার। এই সূত্রে তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তান হিসেবে দাবি করতো। 'তবে কেনো তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দেন'—এ কথার অর্থ পিতা কখনো পুত্রকে শাস্তি দেন না। কিন্তু তোমাদেরকে অতীতেও শাস্তি দেয়া হয়েছিলো। এখনো দেয়া হচ্ছে। এর পরেও তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তান বলো কীভাবে? হত্যা, বন্দী, অপমান, লাঞ্ছনা, আকৃতি পরিবর্তন—ইত্যাকার অনেক শাস্তি আরোপিত হয়েছে তোমাদের উপর। তাছাড়া তোমরা নিজেরাই স্বীকার করো, আখেরাতে কিছুদিনের জন্য তোমাদেরকে দোজখের শাস্তি ভোগ করতে হবে। (পিতা কি কখনো সন্তানকে এতো শাস্তি দেয়)।

'না, তোমরা মানুষ তাদেরই মতো, যাদেরকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন'—এ কথার অর্থ অন্যান্য সৃষ্টির মতো তোমরাও সৃষ্ট। আর আল্লাহ্‌তায়ালার বিধান সকলের জন্য এক। পুণ্যবানেরা উত্তম বিনিময় লাভ করবে এবং অবাধ্যরা পাবে শাস্তি— তোমরাও এই সাধারণ বিধানের অন্তর্ভূত (তোমাদের জন্য কোনো স্বতন্ত্র বিধান নেই)।

'যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্‌পাকের অভিপ্রায় চিরমুক্ত, চিরস্বাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। ক্ষমা করতে কিংবা শাস্তি দিতে তিনি বাধ্য নন (বাধ্য বাধকতা থেকে তিনি চিরমুক্ত)।

'আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই'— এ কথার অর্থ, আল্লাহ্‌পাকই নিখিল সৃষ্টির একক অধিকর্তা। সমগ্র সৃষ্টি তাঁর অধীন। তিনি সৃষ্টির জনক নন—প্রভূপ্রতিপালক।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়া ইলাইহিল মাসির'— এ কথার অর্থ 'আর প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে।'—এ কথার মাধ্যমে পুণ্যবানদেরকে দেয়া হয়েছে সওয়াবের অঙ্গীকার এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে প্রদর্শন করা হয়েছে আযাবের ভয়। অর্থাৎ পুণ্যবান, পাপী সকলকেই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তাদের কর্ম অনুযায়ী ফল প্রদান করবেন।

মোহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. ইহুদীদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন। কিন্ত তারা সাড়া দিলো না। তখন হজরত মুআজ বিন জাবাল এবং হজরত সা'দ বিন উবাদা বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ্‌র শপথ তোমরা ভালো করেই জানো যে, মোহাম্মদ মোস্তফা স. আল্লাহ্‌র রসুল। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে তোমরাই এ কথা আমাদেরকে বলেছো এবং তাঁর সম্পর্কে অনেক প্রশংসাও করেছো। এ কথা শুনে ইহুদী রাফে বিন হারমেলা এবং ওহাব বিন ইয়াহুদা বললো, না। আমরা এ রকম বলিনি। হজরত মুসার পরে আল্লাহ্‌পাক কাউকে রসুল হিসেবে প্রেরণ করেননি। কোনো কিতাবও অবতীর্ন করেননি। ইহুদীদের এই অপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

www.eelm.weebly.com

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ عَلَىٰ فَتۡرَةٖ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٖ وَلَا نَذِيرٖۖ فَقَدۡ جَآءَكُم بَشِيرٞ وَنَذِيرٞۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ

❒ হে কিতাবীগণ! রসূল প্রেরণে বিরতির পর আমার রসুল তোমাদের নিকট আসিয়াছে; সে তোমাদের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতেছে যাহাতে তোমরা বলিতে না পার, 'কোন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আমাদের নিকট আসে নাই, এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আসিয়াছে। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

দীর্ঘ বিরতির পর রসুল প্রেরণ করা হয়েছে। এ আয়াতে কিতাবীদেরকে লক্ষ্য করে এই শুভসমাচারটি দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বর এসেই পড়েছেন। তিনি স. তোমাদের নিকট স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে চলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মাদর্শ ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান, প্রকাশ করে চলেছেন হেদায়েতের নিদর্শনসমূহ যাতে করে তোমরা কিয়ামতের দিন এ অভিযোগটি উত্থাপন করতে না পারো, 'আমাদের নিকট কোনো শুভসমাচার প্রদাতা এবং সতর্ককারী আসেনি।'

শেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'—এ কথার অর্থ একের পর এক রসুল প্রেরণ তাঁর অপার ক্ষমতার নিদর্শন। তাই দীর্ঘ বিরতির পর তিনি হজরত মুসার পরে হজরত ঈসা এবং হজরত ঈসার পরে হজরত মোহাম্মদ স. কে রসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

রসুল মুসার পনেরো শত অথবা সতেরো শত বৎসর পর প্রেরিত হয়েছেন রসুল ঈসা। এর মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন এক হাজার নবী। ইবনে সা'দ, জুকায়ের বিন বিকার এবং ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় রয়েছে, কালাবী বলেছেন হজরত মুসা বিন ইমরান এবং হজরত ঈসার জননী মরিয়ম বিনতে ইমরানের মধ্যে ব্যবধান ছিলো এক হাজার সাত শত বছরের। তাঁদের বংশধারাও এক ছিলো না। হাকেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসা এবং হজরত ঈসার মধ্যে ব্যবধান ছিলো এক হাজার পাঁচ'শ বছরের। হজরত আ'মাসের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত মুসা এবং হজরত ঈসার মধ্যবর্তীতে এক হাজার নবী এসেছিলেন। কিন্তু হজরত ঈসার পরে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. পর্যন্ত কোনো নবী প্রেরিত হননি। হজরত কাতাদার মাধ্যমে ইবনে আসাকের এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদ স. প্রেরিত হয়েছেন হজরত ঈসার ছয়'শ বছর পর। কিন্তু মোয়াম্মারের পদ্ধতিতে আব্দুর রাজ্জাক, আবদ বিন হুমাইদ এবং ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত কাতাদা বলেছেন—হজরত ঈসা এবং হজরত মোহাম্মদ স.এর মধ্যে ছিলো পাঁচ'শ ষাট বছরের ব্যবধান। এর মধ্যে কোনো নবী আগমন করেননি।

আলোচ্য আয়াতে 'রসুল প্রেরণে বিরতির পর আমার রসুল তোমাদের নিকট এসেছে'— এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ্পাকের বিপুল অনুগ্রহের কথা বিবৃত হয়েছে। কারণ, রসুল প্রেরণ আল্লাহ্পাকের রহমত। রসুলগণের প্রতি অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্পাকের প্রত্যাদেশ। সেই প্রত্যাদেশ দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত ছিলো। শেষ নবী মোহাম্মদ স. কে প্রেরণের মাধ্যমে পুনরায় খুলে দেয়া হয়েছে সেই রহমতের বেহেশতি প্রস্রবণ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, আমি পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে রসুল ঈসার সর্বাপেক্ষা নিকটে। সকল নবী ও রসুল ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁদের সকলের ধর্মাদর্শ এক। বিধিবিধান (শরিয়ত) ভিন্ন। আর রসুল ঈসা ও আমার মধ্যে অন্য কোনো নবী আগমন করেননি। বোখারী, মুসলিম।

সূরা মায়িদা : আয়াত ২০

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ
أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ

☐ স্মরণ কর, মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহের অনুগ্রহ স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের মধ্য হইতে নবী করিয়াছিলেন ও তোমাদিগকে রাজ্যাধিপতি করিয়াছিলেন এবং বিশ্বজগতে কাহাকেও যাহা তিনি দেন নাই তাহা তোমাদিগকে দিয়াছিলেন।'

এখন থেকে আলোচনা শুরু হয়েছে হজরত মুসা ও তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে। বলা হয়েছে, হজরত মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো—তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে নবী করেছিলেন।' —এ কথার অর্থ, আল্লাহ্পাক তোমাদের মধ্যেই প্রেরণ করেছেন সবচেয়ে বেশী নবী ও রসুল। অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহ্পাক এতো নবী প্রেরণ করেননি। এই নবী প্রেরণ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্পাকের বিপুল অনুগ্রহের প্রমাণ।

'তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করে দিলেন'— এ কথার অর্থ, ফেরাউনের সলিল সমাধির পর বনী ইসরাইলের মধ্যে অনেকেই হয়েছিলেন রাজা। সেই রাজাদের রাজত্ব অবলুপ্ত হয়ে গেলো তখনই, যখন তারা হজরত ইয়াহ্ইয়াকে হত্যা করলো

www.eelm.weebly.com

এবং হজরত ঈসাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে রাজা অর্থ ওই ব্যক্তি যার রয়েছে বহুসংখ্যক পরিচারক ও পরিচারিকা। হজরত কাতাদা বলেছেন, সর্বপ্রথম বনী ইসরাইলেরাই খেদমতের জন্য পরিচারক ও পরিচারিকা নিয়োগ করে। তাদের পূর্বে এই প্রথাটি ছিলো না। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বনী ইসরাইলের মধ্যে কেউ স্ত্রী পরিচারক ও বাহনের অধিকারী হলে তাকে বলা হতো রাজা। এই মারফু হাদিসের সহায়করূপে হজরত জায়েদ বিন আসলামের মুরসাল বর্ণনায় এসেছে, আব্দুর রহমান হাবালী বলেছেন, আমার সম্মুখে এক ব্যক্তি হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আসকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি ফকির ও মুহাজির নই? হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বললেন, তোমার কি স্ত্রী রয়েছে যার সঙ্গে তুমি বসবাস করো। সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তো তুমি বিত্তশালী। সে বললো, আমারতো একটি পরিচারকও রয়েছে। হজরত ইবনে আমর বললেন, তবে তো তুমি রাজা।

সুদ্দী বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো'—এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, তোমরা ছিলে কিব্তীদের ক্রীতদাস। আল্লাহ্পাক সেই অভিশাপ থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করেছেন। সেই বিশেষ অনুগ্রহের কথা তোমরা স্মরণ করো। জুহাক বলেছেন, বনী ইসরাইলদের বসতবাটি ছিলো বড় ও প্রশস্ত। কেউ কেউ বসতবাটির ভিতর দিয়েই প্রবাহিত করে দিতো প্রবহমান নহর। এ রকম নহরবিশিষ্ট বসতবাটির অধিকারীদেরকে বলা হতো রাজা।

শেষে বলা হয়েছে, 'বিশ্বজগতে অন্যকে যা তিনি দেননি, তা তোমাদেরকে দিয়েছিলেন'— এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, বিপুলসংখ্যক নবী আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে দিয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে বিশ্বাসীরা পেয়েছে আল্লাহ্পাকের নৈকট্য ও পৃথিবীর সম্মান। দেখেছে অনেক অলৌকিক নিদর্শন। যেমন, সমুদ্রের বুক চিরে সৃষ্ট পথ, ফেরাউনের সলিল সমাধি ইত্যাদি। এ রকম নিয়ামত আল্লাহ্পাক অন্য কোনো সম্প্রদায়কে দেননি।

সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ২১

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ○

❑ 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করিও না, করিলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।'

হজরত মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিলেন, আল্লাহ্পাক তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্ধারণ করেছেন, সেই পবিত্র ভূমিতে (আরদ্বাল মুকাদ্দাসা) প্রবেশ

www.eelm.weebly.com

করো। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে পবিত্র ভূমির অর্থ তুর পর্বত ও তার সন্নিহিত ভূখণ্ড। জুহাক বলেছেন, এর অর্থ ইলিয়া এবং বাইতুল মাকদিস। ইকরামা ও সুদ্দী বলেছেন, আরীহা। কালাবীর মতে দামেস্ক, ফিলিস্তিন এবং জর্দানের কিছু অংশ। কাতাদার অভিমত হচ্ছে— এখানে পবিত্র ভূমি অর্থ সম্পূর্ণ শাম দেশ (সিরিয়া)। হজরত কা'ব বর্ণনা করেছেন, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব তওরাতে দেখেছি— পৃথিবীতে শাম আল্লাহ্‌পাকের ধনভাণ্ডার। আর শামের অধিবাসীরা অন্যান্য মানুষের তুলনায় ধনভাণ্ডার তুল্য। এ স্থানটিকে পবিত্রভূমি বলা হয়েছে এ কারণে যে, বহু সংখ্যক নবী এবং তাঁদের অনুসারীরা এই এলাকার অধিবাসী ছিলেন।

'যে পবিত্র ভূমি আল্লাহ্‌পাক নির্ধারণ করেছেন'—এ কথার অর্থ, যে পবিত্র ভূমিতে আল্লাহ্‌পাক তোমাদের বসবাস ফরজ করে দিয়েছেন। এ রকম বলেছেন কাতাদা ও সুদ্দী। তাঁদের মতে নামাজ, রোজা যেমন ফরজ, বনী ইসরাইলের জন্য তেমনি ওই স্থানে বসবাস করা ফরজ।

'পশ্চাদপসরণ কোরো না, করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে'— কোনো কোনো আলেম এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক লাওহে মাহফুজে এ কথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যে, আরদ্বাল মুকাদ্দাসা (পবিত্র ভূমি) তোমাদের বাসস্থান— এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে এখানে একটি শর্ত উহ্য রয়েছে বলে মেনে নিতে হবে। তখন অর্থ হবে এ রকম— তোমরা যদি বিশ্বাসী ও অনুগত হও তবে লাওহে মাহফুজে এ পবিত্র ভূমিকে আল্লাহ্‌পাক তোমাদের জন্য বাসস্থান নির্ধারণ করে দিবেন। এখানে বিশ্বাস এবং আনুগত্যের শর্তটি উহ্য রয়েছে মনে করতে হবে। কারণ, বিশ্বাস ও আনুগত্যের শর্তটি প্রতিপালিত না হওয়ার কারণে পরবর্তীতে আল্লাহ্‌পাক এই ভূখণ্ডটিকে বনী ইসরাইলের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। বলেছেন, 'ক্বলা ফাই'ন্নাহা মুহার্‌রমাতুন আলাইহিম আরবায়িনা সানাতা (আল্লাহ্ বললেন, তবে এটা চল্লিশ বছর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ রইলো। —আয়াত ২৬)।

আলোচ্য আয়াত এবং ২৬ নং আয়াতটির সামঞ্জস্য বিধান— বিশ্বাস ও আনুগত্যের উহ্য শর্তটির মাধ্যমে করা সম্ভব। অর্থাৎ কথাটি এভাবে বুঝে নিতে হবে যে, এই আয়াতে লাকুম (তোমাদের জন্য) বলে বুঝানো হয়েছে পুণ্যবান বনী ইসরাইলকে। আর ২৬ নং আয়াতে আলাইহিম (তাহাদের জন্য) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে অবাধ্য বনী ইসরাইলকে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত এ পবিত্র ভূমির বসবাস পুণ্যবানদের জন্য ফরজ এবং অবাধ্যদের জন্য হারাম। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, বনী ইসরাইলের জন্য ওই ভূখণ্ডটি চল্লিশ বছরের জন্য ছিলো নিষিদ্ধ। তারপর আল্লাহ্‌পাক তাদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন ওই পবিত্র ভূখণ্ডটিকে।

www.eelm.weebly.com

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, এখানে 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্পাক ওই পবিত্র ভূমি তোমাদেরকে দান করেছেন। তাই ওই দান অবশ্যই তোমাদের হস্তগত হবে।

কালাবী বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম যখন লেবাননের পর্বতশীর্ষে আরোহন করলেন, তখন আল্লাহ্পাক তাঁকে বললেন, দূরে দৃষ্টিপাত করো। যতোদূর তোমার দৃষ্টি প্রসারিত হবে ততদূরই 'আরদ্বাল মুকাদ্দাসা' (পবিত্র ভূমি)। ওই ভূমির অধিকারী হবে তোমার পরবর্তী বংশধর।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্পাক হজরত মুসার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলেন— তোমাকে এবং তোমার সম্প্রদায়কে পবিত্র ভূমির অধিকার দেয়া হবে। ওই পবিত্র ভূমি অর্থ সিরিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। পূর্বে সেখানে বসবাস করতো অত্যাচারী কেনানীরা। ফেরাউনের সলিল সমাধির পর মিসরে গিয়ে পুনঃবসবাস করতে লাগলো বনী ইসরাইলেরা। তখন আল্লাহ্পাক এ আয়াতের নির্দেশটি অবতীর্ণ করলেন। এখানে শাম দেশের পবিত্র ভূমি আরীহায় গমনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তখন আরীহায় ছিলো এক হাজার বসতি। প্রতি বসতিতে ছিলো এক হাজার উদ্যান। আমি বলি, এখানে এক হাজার অর্থ অনেক। ঠিক গুণে গুণে এক হাজার নয়। আল্লাহ্পাকের নির্দেশটি ছিলো এ ধরনের— হে আমার রসুল মুসা! তুমি এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য আমি সিরিয়ার পবিত্র ভূমিকে বাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট করেছি। সুতরাং তোমরা সকলে সেখানে যাও এবং সেখানকার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, আমি তোমাদেরকেই বিজয় দান করবো। তোমার সম্প্রদায়ের বারোটি গোত্রের জন্য নির্ধারণ করো বারোজন নেতা। তারাই হবে তাদের আপন আপন গোত্রের তত্ত্বাবধায়ক, পর্যবেক্ষক ও ব্যবস্থাপক। তারাই দেখবে, তাদের গোত্রভূতরা আল্লাহ্পাকের নির্দেশের যথাপ্রতিপালন করে চলেছে কিনা। এরপর হজরত মুসা বারোটি গোত্রের জন্য নিযুক্ত করলেন বারো জন নেতা। এরপর সকলকে নিয়ে চললেন আরীহার দিকে। শহরের উপকণ্ঠে স্থাপন করলেন সমরশিবির। বারোজন নেতাকে পাঠালেন শত্রুর গতিবিধি জেনে আসার জন্য। দ্বাদশ নেতা বাইতুল মাকদিসের অদূরে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলেন। আমালিকা সম্প্রদায়ের লোকটি ছিলো সুবিশাল শরীরবিশিষ্ট। দেহের উচ্চতা তিন হাজার তিনশত তেত্রিশ হাত। সে পানি পান করতো উড়ন্ত মেঘমালা থেকে। আর সমুদ্রের গভীর তলদেশ থেকে মাছ ধরে নিয়ে সূর্যালোকে সিদ্ধ করে খেতো। এক বর্ণনায় রয়েছে, প্লাবনে পাহাড় নিমজ্জিত হলে পানি পৌঁছতো তার উরুদেশ পর্যন্ত। নাম তার উজ। মাতার নাম অনুক। অনুক ছিলো হজরত আদমের কন্যা। তার উপবেশনের জন্য প্রয়োজন হতো এক জরীব জমীনের (হিন্দুস্তানের হিসেবে ষাটগজ এবং ইংরেজদের হিসেবে পঞ্চাশ গজ জমি মাপার শিকলকে বলা হয় জরীব)। তিন হাজার বছর বেঁচে ছিলো উজ। শেষে হজরত মুসার মাধ্যমে

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌পাক তাকে ধ্বংস করে দেন। ঘটনাটি ছিলো এ রকম— সে হজরত মুসার সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীকে দাবিয়ে দিতে পারে, এ রকম এক বিশাল পাথর উত্তোলন করলো। এমন সময় আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশে একটি হুদহুদ পাখি তার ঠোঁট দিয়ে পাথরের মাঝখানে সৃষ্টি করে দিলো একটি সুড়ঙ্গ। ওই পাথর শেষে গিয়ে পড়লো তার নিজের উপরেই। সুড়ঙ্গ পথে প্রবিষ্ট হলো তার মস্তক। সে আর অগ্রসর হতে পারলো না, মাটিতে পড়ে গেলো। তখন হজরত মুসা তাকে হত্যা করলেন। এই উজেরই মুখোমুখি হলো দ্বাদশ নেতা। উজের মাথায় তখন ছিলো বিশাল লাকড়ির বোঝা। সে দ্বাদশ নেতাকে ধরে তার কোমরের সঙ্গে বেঁধে নিলো তারপর বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীর সামনে নেতাদেরকে দাঁড় করিয়ে বললো, দেখো! এই লোকগুলো আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে। আমি এদেরকে পদতলে পিষ্ট করবো। স্ত্রী বললো, না। এদেরকে ছেড়ে দাও। এরা যা কিছু দেখলো, তা তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট গিয়ে জানাবে। স্ত্রীর কথা শুনে উজ তাদেরকে ছেড়ে দিলো। এক বর্ণনায় রয়েছে। উজ দ্বাদশ নেতাকে তার আস্তিনে ভরে নিয়ে তাদের বাদশাহ্‌র নিকট উপস্থিত হলো। বাদশাহ্ দ্বাদশ নেতাকে দেখলো। বললো, তোমরা যা কিছু দেখেছো তা তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে জানাও। দ্বাদশ নেতা দেখলো, দুর্ধর্ষ আমালিকাদের সকল কিছুই বিশালাকৃতির। তাদের আঙ্গুরের খোসা উঠাতেও লাগে পাঁচ জন মানুষ। আনারের খোসাও এত বড় যে, অনায়াসে সেখানে পাঁচটি মানুষ ঢুকে যেতে পারে। আমি বলি, উজ বিন উনুক সম্পর্কিত বাগবীর বর্ণনাটি অতিরঞ্জিত, সুস্থ জ্ঞান এ সকল বিবরণকে গ্রহণ করে না। হাদিস বিশেষজ্ঞগণ এই অলিক ঘটনাকে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা কেবল এতোটুকু স্বীকার করেছেন যে, আমালিকা সম্প্রদারের লোকেরা ছিলো বিশাল বপুধারী এবং শক্তিশালী। আর তাদের মধ্যে উজ ছিলো অপেক্ষাকৃত অধিক বৃহৎ আকৃতি বিশিষ্ট ও শক্তিমান।

ভীত ও বিস্মিত দ্বাদশ নেতা ফিরে এসে হজরত মুসার নিকটে সব কিছু খুলে বললো। হজরত মুসা বললেন, এ সকল কথা কাউকে জানিও না, সেনাপতিদেরকেও নয়। নতুবা সকলে হতোদ্যম হয়ে পড়বে। এই দ্বাদশ নেতার মধ্যে দু'জন মাত্র হজরত মুসার নির্দেশ মান্য করলেন। বাকী দশ জন তাদের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সকলের নিকট ভয়ংকরদর্শন আমালিকাদের কথা জানিয়ে দিলো। একান্ত অনুগত ওই দু'জন ছিলেন ইউশা বিন নুন বিন আফ্‌রাহিম বিন ইউসুফ এবং কালেব বিন উকান্না। ইউশা ছিলেন হজরত মুসার একান্ত অনুচর। তেইশ নং আয়াতে 'তাদের মধ্যে দু'জন'—এ কথা বলে এ দু'জনের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কালেব ছিলেন হজরত মুসার বোন মরিয়ম বিন ইমরানের স্বামী এবং ছিলেন ইয়াহুদার বংশধর।

আমালিকাদের বিবরণ শুনে বনী ইসরাইলেরা বিলাপ শুরু করে দিলো। বললো, মনে হয় আর আমরা বাঁচবো না। মিসরেই শেষে আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কেনো যে আমরা এখানে এলাম। মনে হয় মৃত্যু এসেই গিয়েছে।

www.eelm.weebly.com

হায়! আমাদের পরিবার পরিজন ও সহায় সম্পদ এখনই হয়তো হয়ে যাবে আমালিকাদের গণিমত। কেউ কেউ বললো, এসো, অন্য কাউকে আমরা আমাদের নেতা নির্বাচন করি এবং হজরত মুসাকে পরিত্যাগ করে এখান থেকে চলে যাই।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ২২, ২৩, ২৪, ২৫

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ۝ قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝

❑ তাহারা বলিল, 'হে মূসা! সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় রহিয়াছে এবং তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশ করিবই না; তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া গেলে আমরা প্রবেশ করিব।'

❑ যাহারা ভয় করিতেছিল তাহাদের মধ্যে দুইজন, যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারা বলিল, 'তোমরা প্রবেশ দ্বারে তাহাদের মুকাবিলা কর, প্রবেশ করিলেই তোমরা জয়ী হইবে আর তোমরা বিশ্বাসী হইলে আল্লাহের উপরই নির্ভর কর।'

❑ তাহারা বলিল, ' হে মূসা! তাহারা যতদিন সেখানে থাকিবে ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করিবই না; সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব।'

❑ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অপর কাহারও উপর আমার আধিপত্য নাই, সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দাও।'

এখানে 'দুর্দান্ত সম্প্রদায়' অর্থ আমালিকা সম্প্রদায়। বনী ইসরাইল তাদেরকেই 'ক্বওমান জাব্বারিন' (দুর্দান্ত সম্প্রদায়) বলেছে। যে জোর করে অন্যকে নিজের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করে তাকে বলে জাবের এবং জাব্বার। বাগবী লিখেছেন,

www.eelm.weebly.com

জাব্বার বলে তাকে— যে অজেয়, অপ্রতিরোধ্য। যেমন বলা হয়, 'নাখলাতুন জব্বারাতুন' (ওই দীর্ঘ খর্জুর বৃক্ষ যা আওতা বহির্ভূত)। আমি বলি, তারা দুর্দান্ত ছিলো শারীরিক শক্তির কারণে। অথবা বিপুল সৈন্য, সম্পদ এবং অস্ত্র সম্ভারের কারণে। বাগবী আরো লিখেছেন, আমালিকারা ছিলো আদ সম্প্রদায়ের অধঃস্তন পুরুষ। আদ, সামুদ ইত্যাদি সম্প্রদায়কে বলা হতো 'বায়েদা' (ধ্বংস প্রাপ্ত)। তাদের অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।

বনী ইসরাইলেরা বললো, আমালিকারা বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা ওই শহরে প্রবেশ করবোই না। তারা বের হয়ে যাওয়ার পর আমরা প্রবেশ করবো সেখানে। এ কথা বলে তারা মিশরে ফিরে যেতে মনস্থ করলো। হজরত মুসা এবং হজরত হারুণ সেজদাবনত হলেন। ইউশা এবং কালেব ক্ষোভে দুঃখে নিজেদের পরিধেয় ছিঁড়তে শুরু করলেন। তাদের সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে। 'তাদের মধ্যে দুইজন— যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন।' কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, আয়াতে উল্লেখিত 'দুইজন'— ইউশা এবং কালেব ছিলেন না। ওই দুই জন ছিলেন আমালিকা সম্প্রদায়ের। তাঁরা হজরত মুসার ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন। এই ব্যাখ্যাসূত্রে আয়াতের অর্থ হবে এ রকম— 'ওই সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তি, যাদেরকে বনী ইসরাইল ভয় করছিলো, তারা বললো.......'। হজরত সাঈদ বিন জোবায়েরের ক্বেরাতে এই অর্থটি পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি আয়াতের 'ইয়াখাফুনা' শব্দটিকে পড়েছেন 'ইউখাফুন'। ইবনে জারীর এ রকম বলেছেন হজরত সাঈদ বিন জোবায়েরের থেকে এবং হাকেম বলেছেন— হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। ওই দু'জন সম্পর্কে আয়াতে বলা হয়েছে, 'যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন' (আন্আমাল্লাহু আলাইহিমা)। তাঁরা বললেন, 'তোমরা প্রবেশ দ্বারে তাদের মোকাবিলা করো; প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে আর তোমরা বিশ্বাসী হলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করো'। এ কথার অর্থ— তোমরা অতর্কিতে তাদের উপর চড়াও হও। এবং তাদেরকে বন্দী করো— যাতে তারা জঙ্গলের বা প্রান্তরের দিকে পালিয়ে যেতে না পারে। যদি তোমরা হঠাৎ এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো, তবে তোমরাই জয়ী হবে। কারণ, তাদের শহরের পরিসর সংকীর্ণ। তাই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি তাদের হবে না। তারা শারীরিক শক্তিমত্তার অধিকারী হলেও অন্তরের দিক থেকে শক্তিশালী নয়। আর আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকেই বিজয়দানের অঙ্গীকার করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে বিশ্বাস করো। বাগবী লিখেছেন, বনী ইসরাইলেরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত ওই দু'জনকে প্রস্তরনিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করতে চাইলো। তারা রোষান্বিত হয়ে বললো, হে মুসা, তারা যতোদিন সেখানে থাকবে ততোদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করবোই না; সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে থাকবো (আয়াত ২৪)।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, বনী ইসরাইলেরা এ কথা বলেছিলো, ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে। আল্লাহ্ এবং তার রসুলের প্রতি তারা মোটেও অনুগত ছিলো না। আমি বলি, কথাটি ভুল। কারণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি ভর্ৎসনা কুফরীকে (অবিশ্বাসকে) অবধারিত করে। কিন্তু তারা কাফের ছিলো না। কাফের হলে তারা হজরত মুসার সঙ্গে থাকতে পারতো না। মান্না ও সালওয়া তাদের প্রতি অবতীর্ণ হতো না। মেঘমালার ছায়া, প্রস্তর নিঃসৃত পানির প্রস্রবণ—এগুলোও তারা লাভ করতো না। সুতরাং এখানে তাদের বক্তব্যের অর্থ হবে এ রকম—আপনি অগ্রসর হোন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্পাক আপনাকে সাহায্য করবেন। আমরা বরং এখানেই অপেক্ষা করি।

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলেছেন, এ রকম একটি দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছেন হজরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ। আমি যদি সে রকম সুযোগ পেতাম, তবে তা হতো আমার নিকট পৃথিবীর সকল বস্তু অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। রসুল স. একবার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহবান জানালেন। আহবান শোনা মাত্র হজরত মিকদাদ দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, আমরা হজরত মুসার সম্প্রদায়ের মতো নই— যারা বলেছিলো, আপনি এবং আপনার আল্লাহ্ যুদ্ধ করুন। আমরা আমাদের রসুল স. এর দক্ষিণে, বামে, অগ্রে ও পশ্চাতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবো। তাঁর এ কথা শুনে রসুল স. অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁর পবিত্র মুখাবয়বে ফুটে উঠলো খুশীর ঝলক।

ভীত ও দ্বিধান্বিত বনী ইসরাইলের কথা শুনে এবং ইউশা ও কালেবকে হত্যা করার পরিকল্পনা জানতে পেরে হজরত মুসা রোষতপ্ত হয়ে উঠলেন। প্রার্থনা করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অপর কারো উপর আমার আধিপত্য নেই; সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দাও' (আয়াত ২৫)। —এখানে 'অপর কারোর উপর আমার আধিপত্য নেই' অর্থ কারো অবাধ্যতা দূর করার ক্ষমতা আমার নেই। 'আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত'—এ কথার অর্থ এই নয় যে, আমি ও আমার ভ্রাতা হারুণ ছাড়া অন্য কেউ বিশ্বাসী নয়। কারণ, ইউশা এবং কালেবসহ একটি ক্ষুদ্র দল ছিলো হজরত মুসার পূর্ণ অনুগত। হজরত মুসা রোষতপ্ত ছিলেন বলে অধিকাংশ ভীত বনী ইসরাইলের প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেছিলেন, 'আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দাও।' অতএব প্রকৃত অর্থ হবে এ রকম— হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাদের এবং অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিন। অর্থাৎ যারা অনুগত তাদেরকে দান করুন সওয়াব এবং যারা অবাধ্য তাদের প্রতি আপতিত করুন আযাব। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে— আমাদেরকে অবাধ্যদের সংসর্গ থেকে পৃথক করে দিন।

www.eelm.weebly.com

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيۡهِمۡ اَرۡبَعِيۡنَ سَنَةً ۚ يَتِيۡهُوۡنَ فِى الۡاَرۡضِ ؕ فَلَا تَاۡسَ عَلَى الۡقَوۡمِ الۡفٰسِقِيۡنَ ۝

❒ আল্লাহ্ বলিলেন, 'তবে ইহা চল্লিশ বৎসর তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ রহিল; তাহারা পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে; সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না।'

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন তাতে তোমরা প্রবেশ করো।' নির্দেশটি ছিলো হজরত মুসার। তাঁর নির্দেশের অবমাননার কারণে এই আয়াতে বলা হলো, তবে এটা চল্লিশ বৎসর তাদের জন্য নিষিদ্ধ রইলো'—এ কথার অর্থ, বনী ইসরাইলকে চল্লিশ বছরের জন্য ওই শহরের বসবাস থেকে বঞ্চিত করা হলো। চল্লিশ বছর পর বনী ইসরাইলেরা যখন হজরত মুসার নির্দেশ সর্বান্তঃকরণে মেনে নিলো, তখন হজরত মুসা তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আরীহা বিজয় সম্পন্ন করলেন। হজরত ইউশা হলেন প্রধান সেনাপতি। আমালিকাদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করার পর হজরত মুসা তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরীহায় বসবাস করতে শুরু করলেন। সেখানেই সাঙ্গ হলো তাঁর পৃথিবীর জীবন। কেউ জানে না তাঁর পবিত্র সমাধি কোথায়। বাগবী লিখেছেন, বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে এ কথাটি প্রমাণিত যে, হজরত মুসা-ই হত্যা করেছিলেন উজ বিন উনুককে। অভিমতটি ঐকমত্যসঞ্জাত। আমি বলি, এই ঘটনাটি সুরা বাকারার একষট্টি নম্বর আয়াতের তাফসীরে বিবৃত হয়েছে। হজরত মুসার নির্দেশের অবমাননার কারণে বনী ইসরাইলকে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো তীহ্ প্রান্তরে। সেখানে তাদের সঙ্গে হজরত মুসাও ছিলেন। চল্লিশ বছরের বন্দীত্ব শেষে বিজিত হয়েছিলো আরীহা।

'তারা পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে'— এ কথার অর্থ, তাদের প্রান্তরের বন্দী জীবন হবে সার্বক্ষণিক। তারা কখনো তাদের জন্য নির্দিষ্ট পবিত্র ভূমি আরীহায় প্রবেশ করতে পারবে না। উদভ্রান্ত হয়ে তারা যেদিকেই গমন করুক না কেনো— তীহ্ প্রান্তরের মধ্যেই নির্ধারিত থাকবে তাদের গমনাগমন। তাই হয়েছিলো। তারা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে পারেনি। প্রবেশ করতে পেরেছিলো তাদের পরবর্তী বংশধরেরা। চল্লিশ বৎসরে মৃত্যুবরণ করার পর তাদের সন্তানেরা হজরত ইউশা ইবনে নুনকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হলো। হজরত মুসা এবং হজরত হারুন ইন্তেকাল করলেন ওই তীহ্ প্রান্তরেই। তাঁদের মহাপ্রয়ানের পর হজরত ইউশা নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন প্রতিশ্রুত পবিত্র ভূমিতে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, ঘটনাটি ছিলো এ রকম—হজরত মুসা পৃথিবী পরিত্যাগ করলেন। অতিক্রান্ত হলো চল্লিশটি বছর। আল্লাহ্‌পাক হজরত ইউশাকে নবুয়ত দান করলেন। তিনি বনী ইসরাইলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহ্‌পাক আমাদেরকে আমালিকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ পালন করতেই হবে। বনী ইসরাইলের নতুন প্রজন্ম আল্লাহ্‌র নির্দেশকে সর্বান্তঃকরণে মান্য করলেন এবং জেহাদের বায়াত গ্রহণ করলেন। হজরত ইউশার নেতৃত্বে সকলে এগিয়ে চললেন আরীহার দিকে। তাঁদের সঙ্গে ছিলো তাবুত (ওই অলৌকিক সিন্দুক যার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সুরা বাকারার ২৪৮ নং আয়াতের তাফসীরে)। বনী ইসরাইল বাহিনী আরীহা অবরোধ করলেন। অবরুদ্ধ অবস্থায় কেটে গেলো ছয়টি মাস। সপ্তম মাসের শুরুতেই শিংগায় ফুৎকার দেয়া হলো। আল্লাহু আকবর বলে বীর বিক্রমে বনী ইসরাইল বাহিনী ঢুকে পড়লো শহরের অভ্যন্তরে। শুরু হলো আমালিকা নিধন পর্ব। পরাজিত হলো দুর্ধর্ষ আমালিকা সম্প্রদায়। যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো জুম্মার দিন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ হলো। পরদিন শনিবার পুনরায় শুরু হলো যুদ্ধ। হজরত ইউশা আগের দিন সূর্যকে সংযত করার নিমিত্তে বলেছিলেন, 'হে আমার আল্লাহ্! আপনি সূর্যকে আমার প্রতি ফিরিয়ে দিন। তারপর সূর্যকে বললেন, তুমি যেমন আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ পালন করছো, আমিও তেমনি নিয়মিত নির্দেশ পালন করে থাকি। তুমি বিলম্বে অস্ত গেলে আমি আল্লাহ্‌র শত্রুদের নিধন পর্ব সমাপ্ত করতে পারতাম। পরদিন আল্লাহ্‌পাক সূর্যের অস্তগমন একঘণ্টা বিলম্বিত করে দিলেন। সেই সুযোগে হজরত ইউশা আমালিকা নিধন পর্ব সমাপ্ত করলেন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইউশা শামদেশের সকল রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এভাবে যুদ্ধ করতে করতে তিনি একত্রিশ জন রাজাকে হত্যা করলেন এবং সম্পূর্ণ শাম সাম্রাজ্য অধিকার করলেন। প্রশাসক নিযুক্ত করলেন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে। তারপর যুদ্ধলব্ধ গণিমতের সকল সম্পদ উম্মুক্ত প্রান্তরে একত্র করলেন। কিন্তু সবিস্ময়ে দেখলেন, আকাশ থেকে কোনো আগুন নেমে এলো না (পূর্ববর্তী নবীগণের সময়ের নিয়ম ছিলো—গণিমত কেউ ভোগ করতে পারবে না, উন্মুক্ত প্রান্তরে স্তূপিকৃত করে রাখতে হবে গণিমতের সকল সম্পদকে। তখন আকাশ থেকে আগুন এসে সকল সম্পদকে ভস্মিভূত করে দেবে। এটাই ছিলো জেহাদ ও কোরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন)। আগুন নেমে না আসায় হজরত ইউশা পেরেশান হয়ে পড়লেন। বললেন, আল্লাহ্‌পাকই জানেন কী অপরাধ আমরা করেছি। আল্লাহ্‌পাক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন—এক ব্যক্তি গণিমতের মাল চুরি করেছে। বনী ইসরাইলদেরকে নির্দেশ দাও, তারা যেনো নতুন করে তোমার কাছে বায়াত গ্রহণ করে। তিনি বায়াত গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। সকলেই বায়াত গ্রহণ করলেন। এক ব্যক্তি শুধু বায়াত গ্রহণ করতে পারলো না। সে হস্ত প্রসারিত করলো বটে, কিন্তু তার হাত আপনাআপনি ফিরে এলো। হজরত ইউশা বললেন, তোমার কাছে কী আছে বের করো। লোকটি নিয়ে এলো একটি

www.eelm.weebly.com

মনিমুক্তা শোভিত স্বর্ণনির্মিত গাভীর মস্তক। হজরত ইউশা সেটিকে গণিমতের মালের স্তূপে রেখে দিলেন। চোরটিকেও রেখে দিলেন মালের সঙ্গে। একটু পরেই আকাশ থেকে অগ্নির লেলিহান শিখা নেমে এসে ওই লোকটিসহ সকল গণিমতের মাল ভস্মিভূত করে দিয়ে গেলো। এর কিছুদিন পর হজরত ইউশা পরবর্তী পৃথিবীর দিকে যাত্রা করলেন।

ইফরাইম পাহাড়ের এক গুহায় তাঁকে সমাহিত করা হলো। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো এক শত ছাব্বিশ বছর। হজরত মুসার মহাঅন্তর্ধানের পর তিনি ছাব্বিশ বছর ধরে বনী ইসরাইলদেরকে পরিচালনা করেছিলেন।

'সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ কোরো না'— এ কথা বলে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুল হজরত মুসাকে এই মর্মে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন যে, অবাধ্যরা শাস্তির উপযুক্ত। তীহ্ প্রান্তরে তাদেরকে চল্লিশ বছর ধরে আটকে রাখা হলো। এ শাস্তি তাদের প্রাপ্য। সুতরাং হে আমার প্রিয় রসুল! অবাধ্যরা শাস্তি পেয়েছে বলে আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না।

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে ছয় ফরসখ (তিন মাইলে এক ফরসখ—এই হিসেবে তিনশত চব্বিশ বর্গমাইল) এলাকার মধ্যে চল্লিশ বছর ধরে বনী ইসরাইলদেরকে বন্দী করে রেখেছিলেন আল্লাহ্পাক। তীহ্ প্রান্তরের ওই নির্ধারিত সীমানার মধ্যে চলাফেরা করতে বাধ্য হতো বনী ইসরাইলেরা। সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো চেষ্টাই তাদের ফলপ্রসূ হতো না। অন্যত্র গমনের উদ্দেশ্যে কেউ সকালে পথ চলতে শুরু করলেও বিকেল বেলা সেখানেই এসে পৌঁছুতো যেখান থেকে তার যাত্রারম্ভ হয়েছিলো। আবু শায়েখ তাঁর আল উজমা গ্রন্থে ইবনে জারীর ও ওহাব বিন মোনাববাহ্ সূত্রে এ রকমই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের বর্ণনায় ছয় ফরসখের কথাটি নেই।

বাগবী আরো লিখেছেন, বনী ইসরাইলের ছিলো ছয় লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে— হজরত মুসা এবং হজরত হারুন ওই সেনাদলের সঙ্গে ছিলেন না। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, তাঁরাও বনী ইসরাইলের সঙ্গে তীহ্ প্রান্তরে বসবাস করতেন। তাঁদের জন্য ওই বসবাস শাস্তিমূলক ছিলো না। ছিলো আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ। শাস্তি ছিলো শুধু অবাধ্য বনী ইসরাইলের জন্য। এতদসত্ত্বেও বাধ্য অবাধ্য নির্বিশেষে সকলেই সেখানে পেতো মেঘপুঞ্জের ছায়া— যা বিস্তৃত হতো ছয় ফরসখ সীমানা জুড়ে। হজরত রবী বিন আনাস থেকে ইবনে জারীর এ রকম বর্ণনা করেছেন। রাতে সেখানে প্রকাশিত হতো আলোর একটি স্তম্ভ— যার ফলে আলোকিত হয়ে পড়তো পুরো এলাকা। খাদ্য হিসেবে নিয়মিত অবতীর্ণ হতো মান্না ও সালওয়া। আর পানির প্রয়োজন মিটতো ওই অলৌকিক প্রস্তর খণ্ডটি থেকে— হজরত মুসার যষ্টির আঘাতে যা থেকে নির্গত হতো বারোটি গোত্রের জন্য বারোটি স্বচ্ছ তোয়প্রবাহ।

এক সময় তীহ্ প্রান্তরের বন্দী জীবনের অবসান ঘটলো। পুনঃনির্দেশ এলো— ওই জনপদের দিকে এগিয়ে চলো। হজরত মুসা তাঁর পুরো বাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। সুসম্পন্ন করলেন আরীহা বিজয়। নির্দেশ দিলেন শহরের প্রবেশ দ্বার দিয়ে অবনত মস্তকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে শহরাভ্যন্তরে প্রবেশ করো।

www.eelm.weebly.com

হজরত হারুনের মহাপ্রয়ানঃ সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে প্রত্যাদেশ করলেন— 'আমি হারুনকে মৃত্যু দান করতে চাই। তুমি তাঁকে অমুক পাহাড়ে নিয়ে এসো। হজরত মুসা নির্দেশানুসারে হজরত হারুনকে নিয়ে নির্ধারিত পাহাড়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন, একটি বিস্ময়কর বৃক্ষ ও প্রাসাদ। প্রাসাদের অভ্যন্তরে রয়েছে একটি সুন্দর সিংহাসন। মনোরম ফরাশ বিছানো সেই সিংহাসন থেকে ছড়িয়ে পড়ছে অপার্থিব সুবাস। হজরত হারুন সিংহাসনটিকে খুবই পছন্দ করলেন। বললেন, মুসা! আমি এই সিংহাসনে শয়ন করতে চাই। হজরত মুসা বললেন, বেশতো, শয়ন করুন। হজরত হারুন বললেন, গৃহকর্তা যদি অপ্রসন্ন হোন। হজরত মুসা বললেন, আমি গৃহকর্তাকে বুঝিয়ে বলবো। হজরত হারুন বললেন, আপনিও আমার পাশে শয়ন করুন। গৃহকর্তা যদি অপ্রসন্ন হোন তবে আমাদের দু'জনের প্রতিই অপ্রসন্ন হবেন (আমরা তখন সম্মিলিতভাবে জবাবদিহি করতে পারবো)। নবী ভ্রাতৃদ্বয় সিংহাসনে শয়ন করলেন। শয়ন করার সঙ্গে সঙ্গে হজরত হারুন বুঝলেন, তিনি এবার মৃত্যুর মুখোমুখি। বললেন, মুসা! আমার চোখ দু'টো বন্ধ করে দিন। এ কথা বলার পরক্ষণেই ইন্তেকাল করলেন হজরত হারুন। আর বৃক্ষ, প্রাসাদ এবং সিংহাসনসহ হজরত হারুন উঠে গেলেন আকাশে। নিঃসঙ্গ হজরত মুসা ভ্রাতৃবিরহে ভারাক্রান্ত হয়ে ফিরে এলেন আপন সম্প্রদায়ের নিকট। তাঁকে একাকী দেখে বনী ইসরাইলেরা বললো, আমরা হজরত হারুনকে অত্যধিক ভালোবাসি। তাই হজরত মুসা তাঁকে হত্যা করে একা ফিরে এসেছেন। হজরত মুসা বললেন, হে অবুঝ হতভাগ্যের দল! হারুন তো আমার সহোদর ভ্রাতা। তোমরা কি মনে করো আমি ভ্রাতৃ হন্তারক? এ কথার জবাব না দিয়ে লোকেরা একই কথা বার বার বলতে লাগলো। হজরত মুসা দুই রাকাত নামাজ পড়লেন এবং আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মুহূর্তেই প্রকাশিত হলো প্রার্থনার ফল। নেমে এলো সেই অলৌকিক সিংহাসন। লোকেরা বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখলো, আকাশে ভাসমান সিংহাসনে শায়িত রয়েছেন হজরত হারুন। এ দৃশ্য দেখে তারা হজরত মুসার প্রতি আরোপিত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলো।

হজরত আলী বিন আবু তালেব বলেছেন, একটি পাহাড়ে আরোহণ করলেন মুসা ও হারুন। সেখানে হজরত হারুন পরলোকগমন করলেন। বনী ইসরাইলেরা হজরত মুসাকে বললো, তুমিই হারুনকে হত্যা করেছো। তখন আল্লাহ্পাকের নির্দেশে ফেরেশতারা হারুনের পবিত্র মরদেহ বনী ইসরাইলের নিকট নিয়ে এলেন এবং তাঁর মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করলেন। বনী ইসরাইলেরা তখন হজরত হারুনের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হলো এবং হজরত মুসাকে নির্দোষ বলে মেনে নিলো। ফেরেশতারা তখন হজরত হারুনের জানাযা আদায় করলেন এবং একস্থানে সমাধিস্থ করলেন। তাঁর সমাধি কোথায় তা 'রখম' ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। কিন্তু আল্লাহ্পাক রখমকে মুক ও বধির করে দিয়েছেন (এক প্রকার গাধার নাম রখম)।

www.eelm.weebly.com

হজরত আমর বিন মায়মুনা বলেছেন, তীহ্ প্রান্তরেই বসবাস করতেন হজরত মুসা ও হজরত হারুন। তাঁরা দু'জনে একদিন একটি পাহাড়ের গুহায় উপস্থিত হলেন। সেখানে ইন্তেকাল করলেন হজরত হারুন। হজরত মুসা তাঁকে সমাহিত করে ফিরে এলেন। বনী ইসরাইলেরা বললো, আমরা হারুনকে ভালোবাসি। তাই বিদ্বেষবশতঃ আপনি তাঁকে হত্যা করেছেন। বনী ইসরাইলেরা অবশ্য হজরত হারুনকে খুবই ভালোবাসতো। হজরত মুসা আল্লাহ্পাকের দরবারে জানালেন বিনম্র প্রার্থনা। আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশ করলেন—বনী ইসরাইলদেরকে হারুনের কবরের নিকট নিয়ে যাও। হজরত মুসা সকলকে নিয়ে হজরত হারুনের কবরের পাশে পৌছলেন। হজরত হারুনকে নাম ধরে ডাকলেন তিনি। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে মস্তক আন্দোলিত করে কবর থেকে বেরিয়ে এলেন হজরত হারুন। হজরত মুসা জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি আপনাকে হত্যা করেছি? হজরত হারুন বললেন, না। স্বাভাবিক নিয়মেই ইন্তেকাল হয়েছে আমার। হজরত মুসা বললেন, ঠিক আছে, আপনি এবার প্রস্থান করুন। হজরত হারুন সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন কবরের আড়ালে। স্বগৃহে ফিরে এলো বনী ইসরাইলেরা।

হজরত মুসার মহাঅন্তর্ধানঃ ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত মুসা মৃত্যুকে পছন্দ করতেন না। আল্লাহ্পাক চাইলেন হজরত মুসা যেনো মৃত্যুকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন। তিনি তাই ইউশা ইবনে নুনকে নবী নির্ধারণ করলেন। তিনি সকাল বিকাল হজরত মুসার নিকট গমন করতেন। হজরত মুসা একদিন বললেন, হে আল্লাহ্র নবী, আল্লাহ্পাক কি আপনার নিকট কোনো নতুন পয়গাম প্রেরণ করেছেন? হজরত ইউশা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল, আমিতো দীর্ঘদিন ধরে আপনার পবিত্র সংসর্গে রয়েছি। আমি কখনোই নতুন প্রত্যাদেশ এসেছে কিনা সে সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি। আপনি সব সময় আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ প্রচার করেছেন। এ কথা শুনে হজরত মুসা জীবনের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে পড়লেন। মৃত্যুর প্রতি তাঁর আসক্তি গেলো বেড়ে।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতা একদিন হজরত মুসার নিকটে এসে বললেন, আপনার প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দিন। হজরত মুসা তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর ফেরেশতা হজরত আজরাইলকে সজোরে চপেটাঘাত করলেন। এর ফলে তাঁর একটি চক্ষু বিনষ্ট হয়ে গেলো। তিনি আল্লাহ্পাকের দরবারে গিয়ে বললেন, হে আমার আল্লাহ্! আপনি আমাকে আপনার এমন এক দাসের নিকট পাঠিয়েছেন— যে মরতে চায় না। আপনার সেই রোষান্বিত প্রেমিক আমার দৃষ্টিশক্তিকে বিনষ্ট করেছেন। আল্লাহ্পাক হজরত আজরাইলের চোখ ভালো করে দিয়ে বললেন, তুমি পুনরায় তার নিকট গমন করো। তাকে বলো, পৃথিবীর জীবনই যদি আপনার পছন্দ হয়, তবে আপনার হাত কোনো গাভীর পৃষ্ঠদেশে রাখুন। আপনার হাত ওই গাভীর যতোগুলো পশম স্পর্শ করবে, ততো বৎসর আপনাকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে দেয়া হবে। হজরত আজরাইল আল্লাহ্র এই পয়গাম পৌঁছে দিলেন হজরত মুসার নিকটে। তিনি

www.eelm.weebly.com

বললেন, ঠিক আছে তা না হয় করলাম। তারপর? হজরত আজরাইল বললেন, তারপর তো মৃত্যুবরণ করতেই হবে। হজরত মুসা বললেন, তাহলে আর বিলম্ব করে কী লাভ। তিনি প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! আমাকে পবিত্র ভূমির (আরদ্বাল মুকাদ্দাসের) অতি সন্নিকটে পৌঁছে দিন। রসুলপাক স. বলেছেন, সেখানে উপস্থিত হলে আমি তোমাদেরকে ওই লাল টিলার সন্নিকটে রাস্তার পাশে হজরত মুসার সমাধি দেখিয়ে দিতে পারবো। বোখারী, মুসলিম।

ওহাবের বর্ণনায় রয়েছে, একবার হজরত মুসা কোনো এক কাজের উদ্দেশ্যে পথ চলছিলেন। পথ চলতে চলতে একস্থানে দেখলেন, ফেরেশতাদের একটি দল একটি কবর খনন করে চলেছে। তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। এতো সুন্দর কবর তিনি আর কখনো দেখেননি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র ফেরেশতাবৃন্দ! এই কবর কার জন্য খনন করা হয়েছে? ফেরেশতারা বললেন, আল্লাহ্‌র এমন এক বান্দার জন্য যিনি আল্লাহ্‌র নিকট অত্যধিক সম্মানার্হ। হজরত মুসা বললেন, সত্যি তাই। এতো অপরূপ শয়নকক্ষ আমি আর কখনও দেখিনি। ফেরেশতারা বললেন, হে কলিমুল্লাহ্! এই শয়নকক্ষটি কি আপনার মনে ধরেছে? হজরত মুসা বললেন, হ্যাঁ। ফেরেশতাগণ বললেন, তবে এখানে শয়ন করুন এবং আপনার প্রতিপালকের দিকে মনোনিবদ্ধ করুন। হজরত মুসা নির্দ্বিধায় শুয়ে পড়লেন কবরে। পরিপূর্ণরূপে মনোনিবেশ করলেন আল্লাহ্‌র প্রতি। ধীরে ধীরে তাঁর নিঃশ্বাস হয়ে এলো শ্লথ। আল্লাহ্‌পাক তাঁর মহান প্রেমিকের প্রাণ হরণ করলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। ওই সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো এক শত বিশ বছর।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ২৭

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

❑ আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাহাদিগকে যথাযথভাবে শোনাও যখন তাহারা উভয়ে কোরবানী করিয়াছিল তখন এক জনের কোরবানী কবুল হইল এবং অন্য জনের কবুল হইল না। তাহাদের একজন বলিল, 'আমি তোমাকে হত্যা করিবই।' অপরজন বলিল, 'আল্লাহ্ সংযমীদিগের কোরবানী কবুল করেন,

---

হজরত আদমের দুই পুত্র কাবিল ও হাবিলের বৃত্তান্ত উপস্থিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। কাবিল ও হাবিল দু'জনেই আল্লাহ্‌পাকের সন্তোষ সাধনার্থে তাদের কোরবানী পেশ করেছিলো। কিন্তু হাবিলের কোরবানী কবুল

www.eelm.weebly.com

হয়েছিলো। কাবিলের হয়নি। এ সম্পর্কে আলেমগণ উল্লেখ করেছেন—হজরত হাওয়া প্রতি প্রসবে একটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম দিতেন। এভাবে বিশ বারে চল্লিশ জন সন্তান প্রসব করেছিলেন তিনি। বিশটি পুত্র এবং বিশটি কন্যা, প্রথম প্রসবে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন কাবিল এবং আকলিমা। দ্বিতীয় প্রসবে হাবিল ও লিমুজা। সর্বশেষ প্রসবে ছিলেন আবুল মুগীছ ও উম্মুল মুগীছ। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আদম পৃথিবীতে থাকতেই তাঁর অধঃস্তন বংশধরদের সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছিলো চল্লিশ হাজারে। বিভিন্ন ইসরাইলী আলেমের মাধ্যমে মোহাম্মদ বিন ইসহাক লিখেছেন, কাবিল ও তার সহজন্মের বোন আকলিমার জন্ম হয়েছিলো হজরত আদম ও হজরত হাওয়ার বেহেশতবাসের সময়। তাই তখন হজরত হাওয়াকে ঋতুস্রাব, গর্ভধারণের বিড়ম্বনা, প্রসব বেদনা — কোনো কিছুই ভোগ করতে হয়নি। এ সকল কষ্ট তিনি প্রথমে পেয়েছিলেন হাবিল ও তার সহজন্মের বোন লিমুজার পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পৃথিবীতে অবতরণের একশ' বছর পর হজরত আদম ও হজরত হাওয়া সম্ভোগ সুখ আস্বাদন করেছিলেন এবং বেহেশতে নয়, পৃথিবীতেই তাঁরা হয়েছিলেন সন্তান সন্ততির পিতা ও মাতা। কাবিল ও আকলিমা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন পৃথিবীতেই। এর দু'বছর পর ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন জোড়া জন্মের হাবিল ও তার বোন। কালাবী।

হজরত আদমের সন্তানেরা যখন যৌবনপ্রাপ্ত হলেন, তখন এক জন্মের পুত্রের সঙ্গে অন্য জন্মের কন্যার বিবাহ দেয়া হলো। তৎকালে আল্লাহ্পাকের বিধান ছিলো হজরত আদমের পুত্রেরা নিজের জোড়া জন্মের বোন ব্যতীত অন্য যে কোনো জোড়ার বোনকে বিবাহ করতে পারবে। কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি করলো কাবিল। সে হয়ে উঠলো আল্লাহ্পাকের বিধান বিরোধী। হজরত আদম স্থির করলেন তিনি হাবিলের সঙ্গে কাবিলের জোড়া বোন আকলিমাকে এবং কাবিলের সঙ্গে হাবিলের জোড়া বোন লিমুজাকে বিবাহ দিবেন। হাবিল পিতার প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কিন্তু কাবিল হলো না। তার জোড়া বোন আকলিমা ছিলো পরমাসুন্দরী। তাই সে তার সহজন্মের বোনটিকে ছাড়তে অস্বীকার করলো। বললো, আমরা দু'জন জান্নাতে জন্মগ্রহণ করেছি। হাবিল ও তার জোড়া বোন জন্মগ্রহণ করেছে পৃথিবীতে। হজরত আদম বললেন, তোমার জোড়া বোন তোমার জন্য বৈধ নয়। এটাই আল্লাহ্তায়ালার বিধান। কাবিল বললো, না, এটা আল্লাহ্পাকের বিধান নয়। এটা আপনার ব্যক্তিগত অভিমত। হজরত আদম বললেন, ঠিক আছে। তবে তোমরা দু'জনেই কোরবানী করো। যার কোরবানী গৃহীত হবে, সেই লাভ করবে আকলিমাকে। তখন কোরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন ছিলো এই— কোরবানীর বস্তু পাহাড়ে বা প্রান্তরে রেখে দিলে, আকাশ থেকে শাদা আগুন নেমে এসে ভস্মীভূত করে দিতো কোরবানীকে। এটাই ছিলো কোরবানী কবুল হওয়ার প্রমাণ। আগুন নেমে না এলে বুঝা যেতো কোরবানী কবুল করা হয়নি।

www.eelm.weebly.com

একটি পাহাড়ে কোরবানী নিয়ে উপস্থিত হলেন কাবিল ও হাবিল। কৃষিকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করতো কাবিল। তাই সে উপস্থিত করলো তার জমির ফসল। মনে মনে ভাবলো, কোরবানী কবুল হোক বা না হোক আমার কোনো পরোয়া নেই। হাবিলের সঙ্গে আকলিমার বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেবো না। হাবিলের পেশা ছিলো পশুপালন। তিনি তার পশুপালের মধ্য থেকে একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দুম্বা পেশ করলেন কোরবানী হিসেবে। মনে মনে নিয়ত করলেন—এই কোরবানী কেবল আল্লাহ্পাকের সন্তোষ সাধনার্থে নিবেদিত। হজরত আদম দোয়া করলেন। একটু পরেই আকাশ থেকে নেমে এলো শাদা আগুন। সে আগুনে ভস্মীভূত হলো হাবিলের বিশুদ্ধ নিয়ত সংবলিত কোরবানী। অসৎ উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত কাবিলের কোরবানীতে সে আগুন স্পর্শই করলো না। এ রকম স্পষ্ট নিদর্শন দেখেও কাবিলের জ্ঞানোদয় ঘটলো না। সে রাগে ফুঁসতে লাগলো। তার সব রাগ গিয়ে পড়লো হাবিলের উপর। সিদ্ধান্ত নিলো— যে করেই হোক হাবিলকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকলো সে। কাঙ্ক্ষিত সুযোগ এসে পড়লো অল্প কিছুদিন পরেই। হজরত আদম হজ সম্পাদনের জন্য পবিত্র মক্কাভিমুখে যাত্রা করলেন। পিতাবিহীন হাবিলকে একা পেয়ে তখন কাবিল বললো, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করবো। হাবিল বললো, কেনো? কাবিল বললো, আল্লাহ্পাক তোমার কোরবানী কুবল করেছেন। তুমি আমার সুন্দরী জোড়া বোনকে বিয়ে করলে লোকে বলবে তুমি আমার চেয়ে উত্তম। আর তোমার সন্তান সন্ততিরাও এ নিয়ে গৌরব বোধ করবে। হাবিল বললেন, এতে আমার অপরাধ কোথায়? আল্লাহ্পাকতো সংযমীদের (মুত্তাকীদের) কোরবানী কবুল করে থাকেন। হাবিলের এই কথার মধ্যে এই উপদেশটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, ইবাদত হতে হবে বিশুদ্ধ সংকল্প সংবলিত। আর যারা মুত্তাকী তারাই অন্তরে বিশুদ্ধ সংকল্প (নিয়ত) ধারণ করতে সক্ষম। বিদ্বেষ কলুষিত হৃদয়ের অধিকারীরা এই বিশুদ্ধতা আস্বাদনে অপারগ। 'ইন্নামা ইয়াতাক্বাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাক্বিন (আল্লাহ্ সংযমীদের কোরবানী কবুল করেন) —আলোচ্য আয়াতের এই শেষ বাক্যটির ব্যাখ্যা রূপে ইবনে আবী শায়বা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জুহাক বলেছেন, এখানে মুক্তাকী অর্থ ওই সকল লোক, যারা শিরিক থেকে মুক্ত।

আমি বলি, কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে—ওই ব্যক্তিরই কোরবানী গৃহীত হবে, যে অধিকতর সত্যাধিষ্ঠিত। যে সত্যাশ্রিত নয় তার কোরবানী গৃহীত হয় না। মুসা বিন আইনের নিকট এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এখানে মুত্তাক্বিন অর্থ ওই সকল লোক, যারা হালালকে আশ্রয় করে হারামের আশংকা থেকে মুক্ত হয়। ইবনে আবীদ্দুনিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, তাকওয়া (সংযম) সংবলিত ক্ষুদ্র আমলও ক্ষুদ্র নয়। যে আমল গৃহীত হয় তাকে কীভাবে ক্ষুদ্র বলা যেতে পারে? ইবনে আবীদ্দুনিয়ার বর্ণনায় আরও রয়েছে, ওমর বিন আবদুল আজিজ এক ব্যক্তিকে লিখলেন, আমি তোমাকে তাকওয়া অবলম্বনের জন্য সদুপদেশ দান করছি। তাকওয়া ছাড়া কোনো আমল গৃহীত হয় না। সেই ব্যক্তির উপরেই রহমত বর্ষিত হয়, যে তাকওয়ার অধিকারী। আর প্রতিদান লাভ হবে কেবল তাকওয়ারই।

www.eelm.weebly.com

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু দারদা বলেছেন, আমি যদি জানতে পারতাম আমার একটি নামাজ আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয়েছে, তবে আমি এই সংবাদটিকে পৃথিবী ও পৃথিবীর সকল বৈভবাপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে করতাম। কেননা, আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ কেবল তাকওয়ার অধিকারীদের আমলই কবুল করে থাকেন। ইয়াহ্‌ইয়া থেকে তাঁর পুত্র হিসামের মাধ্যমে ইবনে আসাকের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার এক যাঞ্চাকারী হজরত ইবনে ওমরের নিকট উপস্থিত হলো। তিনি তাঁর পুত্রকে বললেন, প্রার্থীকে একটি দিরহাম দাও। হজরত ইবনে ওমরের পুত্র তাই করলেন। তারপর পিতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ভিক্ষুকটি আপনার দিরহাম গ্রহণ করেছে। হজরত ইবনে ওমর বললেন, আমি যদি জানতাম আল্লাহ্‌পাক আমার একটি সেজদা অথবা আমার এক দিরহাম সদকা কবুল করেছেন, তবে মৃত্যুই হতো আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। হে বৎস! তুমি কি জানো, আল্লাহ্‌পাক কার আমল কবুল করে থাকেন। তিনি কেবল গ্রহণ করেন তাকওয়া অবলম্বনকারীদের আমল। ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় আরও রয়েছে— হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি যদি জানতাম আমার কোনো একটি আমল আল্লাহ্‌পাক কবুল করেছেন, তবে এ সংবাদটি আমার নিকট হতো পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণের চেয়ে অধিকতর প্রিয়। মৃত্যুর সময় সন্নিকটবর্তী হলে হজরত আমের বিন আবদুল্লাহ্ কাঁদতে শুরু করলেন। লোকেরা বললো, কাঁদছেন কেনো? আপনি তো অনেক ইবাদত বন্দেগী করেছেন। তিনি বললেন, আমি জানি আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌পাক কেবল মুত্তাকীদের (সাবধানীদের) আমল কবুল করে থাকেন (আমি জানি না আমার আমল তাকওয়ার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে কিনা। আমার রোদন সেই অনিশ্চিতির কারণেই)।

সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ২৮

لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

❒ 'আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুলিলেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলিব না; আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালককে ভয় করি।'

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম, কাবিলের চেয়ে হাবিলই ছিলেন অধিক শক্তিশালী। কিন্তু তিনি কেবল আল্লাহ্‌র ভয়ে নিজেকে সংযত করে রেখেছিলেন। বলেছিলেন, আমাকে হত্যার জন্য তুমি হস্ত উত্তোলন করলেও, আমি তোমাকে হত্যার জন্য হস্ত উত্থাপন করবো না; আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালককে ভয় করি। হাবিলের এ রকম বলার প্রকৃত কারণ এই যে, ওই সময় প্রতিবাদ ছিলো অসিদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

মুজাহিদ বলেছেন, ওই জামানার বিধান ছিলো—হত্যাকারীকে প্রতিহত করা যাবে না। নিজেকে কেবলই ধৈর্য ধারণকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। এ রকমও হতে পারে যে, হয়তো প্রতিবাদ সিদ্ধ ছিলো, কিন্তু ধৈর্য অবলম্বনই ছিলো শ্রেয়। আর হাবিল শ্রেয়তর পন্থাটিকেই অবলম্বন করেছিলেন।

রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আল্লাহ্র জন্য প্রাণপাতকারী হয়ো—হন্তারক হয়ো না। ইবনে সা'দের এই বর্ণনাটি এসেছে হজরত আবদুল্লাহ্ বর্ণিত হাদিস থেকে। আমাদের শরিয়তেও এ রকম আমল সিদ্ধ। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান এ রকম করেছিলেন। ইবনে সা'দের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আমি অবরুদ্ধ ওসমানের নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই (যেরূপ নির্দেশ করবেন আমি সেরূপই করবো)। মহান খলিফা বললেন, প্রিয় আবু হোরায়রা! তুমি কি অবরোধকারী সকল মানুষকে হত্যা করতে চাও? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, একজনকে হত্যা করলে সকল মানুষকে হত্যা করা হয়।

আবদুর রাজ্জাক ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, হাসান বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, হজরত আদমের দুই পুত্রের বর্ণনা এখানে এ কারণে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যেনো ভালো মন্দ বিচার করে কাবিলের মতো মন্দ কর্মের অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকো এবং অনুসারী হও হাবিলের মতো উত্তম আমলের।

লক্ষণীয় যে, হাবিল এখানে এ রকম কথা বলেন নি যে, তোমাকে আমি হত্যা করবো না। বলেছেন, তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলবো না। এ কথায় প্রমাণিত হয়েছে, মন্দ কর্মের প্রতি তাঁর আন্তরিক অসন্তোষ। তাই তিনি যে হস্ত উত্তোলনের মাধ্যমে হত্যা সংঘটিত হয়, সেই হস্ত উত্তোলনকেই পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন। বলেছেন, হত্যা তো দূরের কথা, হত্যার জন্য হাত পর্যন্ত আমি উত্তোলন করবো না।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ২৯, ৩০

إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ فَتَكُونَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ ○ فَطَوَّعَتۡ لَهُۥ نَفۡسُهُۥ قَتۡلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ○

❒ 'তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং অগ্নিবাসী হও ইহাই আমি চাহি এবং ইহা জালিমদিগের কর্মফল।'

❒ অতঃপর তাহার চিত্ত ভ্রাতৃহত্যায় তাহাকে উত্তেজিত করিল এবং সে তাহাকে হত্যা করিল; ফলে, সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

---

www.eelm.weebly.com

কাবিলকে লক্ষ্য করে হাবিল এখানে বলছেন, ঠিক আছে, তুমি তোমার জিঘাংসা চরিতার্থ করো। আর এভাবে তোমার নিজের ও আমার পাপের ভার আপন স্কন্ধে স্থাপন করো এবং চিরস্থায়ী অগ্নিবাসী হও—এটাই আমার কাম্য। মুজাহিদ থেকে আয়াতের এ রকম অর্থ বর্ণনা করেছেন ইবনে নাজীহ্।

'এটাই জালেমদের কর্মফল'—এ কথার মাধ্যমে কিয়ামত দিবসে অত্যাচারীদের শোচনীয় পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেদিন অত্যাচারীর পুণ্যসমূহ অত্যাচারিতকে দেয়া হবে। যদি তার পুণ্য না থাকে তবে অত্যাচারিতের পাপগুলো চাপিয়ে দেয়া হবে অত্যাচারীর উপর। শেষে অত্যাচারীকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে।

রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তি হবে সবচেয়ে গরীব, যে দুনিয়া থেকে নামাজ, রোজা, জাকাত, ইত্যাদির সঙ্গে নিয়ে আসবে অনেক পাপ, যেমন—— সে হয়তো কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে দিয়েছে অপবাদ কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, অন্যায়ভাবে কাউকে প্রহার করেছে অথবা কাউকে হত্যা করেছে। তখন তার পুণ্যসমূহ দিয়ে দেয়া হবে তাদেরকে, যাদের প্রতি সে জুলুম করেছে। এভাবে তার সকল পুণ্য শেষ হয়ে যাবে। এরপরেও পাপের ক্ষতিপূরণ না হলে অত্যাচারিতের পাপগুলো চাপিয়ে দেয়া হবে তার উপর এবং শেষে তাকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে। মুসলিম।

একটি সন্দেহঃ বিশ্বাসীদের জন্য এ রকম বৈধ নয় যে, তারা আপন ভ্রাতাকে পাপী হতে বলবে। তাহলে হাবিল কি করে বললেন, আমি চাই তুমি তোমার ও আমার পাপের বোঝা বহন করো।

সন্দেহের অপনোদনঃ হাবিলের বক্তব্যের উদ্দেশ্য এ রকম নয়। তিনি তো কখনোই চাননি যে কাবিল তাকে হত্যা করুক এবং পাপী হয়ে থাক। কিন্তু যখন তিনি নিশ্চিত হলেন, কাবিল তাকে হত্যা করবেই তখন তিনি হত্যার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে কাবিলকে এভাবে সতর্ক করে দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, এভাবে বললে হয়তো আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে কাবিল পাপ পথ থেকে ফিরে আসবে। পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে, উত্তেজিত কাবিল ভ্রাতৃহত্যার পথেই অগ্রসর হলো। সে তার জিঘাংসা চরিতার্থও করলো। এভাবেই সে হয়ে গেলো ক্ষতিগ্রস্তদের দলভূত। 'ফা তুওয়াত লাহু নাফসুহু কৃতলা আখিহ্' অর্থ অতঃপর তার চিত্ত ভ্রাতৃহত্যায় তাকে উত্তেজিত করলো। এখানে 'লাহু' শব্দটির মাধ্যমে হত্যার উত্তেজনাকে অধিকতর অনড়রূপে প্রদর্শন করা হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে—হাফিজ্তু লিজায়েদিন মালাহু (আমি জায়েদের মালের সংরক্ষণ নিশ্চিত করেছি)। কাবিল যখন বুঝলো হাবিল তাকে প্রতিহত করবে না, তখন সে আরো অধিক উত্তোজিত হয়ে পড়লো। সে ভাবলো, হাবিল তো তাকে বরং হত্যার আহবান জানালো। উদ্বুদ্ধ করলো। সিহাহ্ গ্রন্থে রয়েছে, 'তাওয়াত' অর্থ উদ্বুদ্ধকরণ। মানুষ এ রকম উদ্বুদ্ধ হয়েই সাধারণতঃ ঝুঁকিপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করে।

কাবিল হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ হলো বটে, কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না—— হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হবে কীভাবে। হত্যার ধারণা ইতোপূর্বে তো কেউ কখনো করেনি। ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, শয়তান তখন তার রূপ পরিবর্তন করে কাবিলের সামনে একটি পাখিকে ধরে পাথরের উপরে রেখে অন্য একটি পাথর

www.eelm.weebly.com

দিয়ে আঘাত হানলো। এভাবে পাখিটির মস্তক পিষ্ট হলো। সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গ হলো পাখিটির জীবন। কাবিল বুঝলো, এভাবেই হত্যাকাণ্ড ঘটাতে হয়। সে হাবিলকে ঠিক এভাবেই হত্যা করলো। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, কাবিলের কথামত হাবিল নিজেই পাথরের উপরে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছিলেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, হাবিল একস্থানে নিদ্রিত ছিলেন। তখন কাবিল প্রস্তরাঘাতে তাঁর মস্তক চূর্ণ করে ফেললো।

পৃথিবীতে সংঘটিত হলো প্রথম ভ্রাতৃহত্যা। মৃত্যুকালে হাবিলের বয়স হয়েছিলো বিশ বছর। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কাবিল হাবিলকে কোহে নূর পর্বতের পাদদেশে হত্যা করেছিলো (সম্ভবতঃ পাহাড়টির নাম কোহে সওর—কোহে নূর নয়। আল্লাহ্পাকই ভালো জানেন)। কেউ কেউ বলেছেন, হেরা পর্বতের আশেপাশে নিহত হয়েছিলেন হাবিল। নিহত হওয়ার পর তাঁর পবিত্র মরদেহ খোলা আকাশের নিচে পড়ে রইলো। কাবিল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না, ভাইয়ের লাশ নিয়ে এখন সে কী করবে। ওদিকে মানুষের প্রথম মরদেহ ভক্ষণ করতে এগিয়ে আসতে চাইছে হিংস্র প্রাণীকূল। উপায়ান্তর না দেখে ভাইয়ের লাশ ঘাড়ে নিয়ে কাবিল উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পথ চলতে শুরু করলো। এভাবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ালো সে। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে, এভাবে কাবিল ঘুরে বেড়ালো এক বছর ধরে। পশু পাখিরা তার অনুসরণ করতে লাগলো। তারা ভাবলো কাবিল সরে গেলেই হাবিলের লাশ ভক্ষণের সুযোগ পাওয়া যাবে। একদিন কাবিল দেখলো তার সামনে দু'টি কাক প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। কাবিলকে শিক্ষাদানের জন্য আল্লাহ্পাকই কাক দু'টো পাঠিয়ে দিলেন। যুদ্ধরত কাক দু'টির একটি অপরটিকে এক সময় হত্যা করে ফেললো। তারপর তার ঠোঁট দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করলো সে। এভাবে গর্ত করে মৃত কাকটিকে সেই গর্তে শুইয়ে দিলো হন্তারক কাকটি। তারপর মাটি দিয়ে ঢেকে দিলো তার মরদেহ। নিম্নের আয়াতে এই ঘটনাটির বিবরণ রয়েছে।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৩১

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ قَالَ يٰوَيْلَتٰۤى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ۝

❒ অতঃপর আল্লাহ্ এক কাক পাঠাইলেন, যে তাহার ভ্রাতার শবদেহ কিভাবে গোপণ করা যায় ইহা দেখাইবার জন্য মাটি খনন করিতে লাগিল। সে বলিল, 'হায়! আমি কি এই কাকের মতও হইতে পারিলাম না যাহাতে আমার ভ্রাতার শবদেহ গোপণ করিতে পারি?' অতঃপর সে অনুতপ্ত হইল।

---

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্ প্রেরিত কাকটিকে মাটি খুঁড়তে দেখে বোধোদয় হলো কাবিলের। সে বললো, আমি তো কাকের মতোও (বুদ্ধিমান) নই। 'আরাদাত' শব্দটির অর্থ ইচ্ছা করা হলেও এখানে শব্দটির অর্থ হবে শিক্ষা দেয়া। কাকটি ইঙ্গিতে লাশ দাফন করার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছিলো। হাবিলের লাশকে দাফন করে লাশ দাফনের নিয়ম দেখিয়ে দেয়নি। এখানে 'সাওয়াতা' শব্দটির অর্থ কুৎসিৎদর্শন। মৃতদেহ বুঝাতে এখানে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ মৃতদেহ দেখতে অসুন্দর। কাক এখানে কাবিলের পথপ্রদর্শক। ঘটনাটির মাধ্যমে এই কথাটিই ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কাবিল কাক অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কারণ কাবিল হন্তারক। হন্তারকেরা মানুষ হলেও প্রাণীকূলের চেয়ে নিকৃষ্ট।

কাবিল বুঝলো, সে সত্যিই নিকৃষ্ট। তাই আক্ষেপ করে বললো, হায়! আমি কি তবে এই কাকের মতোও নই। যাতে আমার ভাইয়ের শবদেহ গোপন করতে পারি। এ কথাটি তার একটি বিস্ময়বোধক প্রশ্ন। এভাবে আত্মবিশ্লেষণ করতে গিয়ে পাপবোধ জাগ্রত হলো তার। অতঃপর সে অনুতপ্ত হলো।

কেউ কেউ বলেছেন, এক বৎসর ধরে ভাইয়ের লাশ পিঠে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অনুতাপ এসেছিলো কাবিলের। কেউ আবার বলেছেন, ভাইয়ের লাশ দাফনের পর সে অনুতাপ জর্জরিত হয়েছিলো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হত্যার পর পরই সে অনুতপ্ত হয়েছিলো। অনুতাপ জর্জরিত কাবিল বুঝতে পেরেছিলো আমি পাপী। ভ্রাতৃহন্তারক। আমি পিতা-মাতাকেও অপ্রসন্ন করেছি। হায়! আমার তো আর পাপস্খলনের উপায়ও নেই।

মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ্ বিন হানতাবের বর্ণনায় রয়েছে, কাবিল যখন হাবিলকে হত্যা করলো, তখন পৃথিবী প্রকম্পিত হলো। পৃথিবীর মাটি হলো প্রথম রক্ত রঞ্জিত। পৃথিবী সেই তাজা রক্ত নিঃশেষে পান করে নিলো (মাটিতে রক্তের চিহ্ন আর রইলো না)। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ হলো তোমার ভাই কোথায়? কাবিল উত্তর দিলো, আমি জানি না। পুনঃ আওয়াজ হলো, মাটি তার রক্ত শোষণ করে নিয়েছে। কাবিল বললো, কই, কোথাও তো রক্তের চিহ্ন নেই। এরপর থেকে নিঃশেষে রক্তপানকে আল্লাহ্পাক পৃথিবীর জন্য নিষিদ্ধ করলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, ভ্রাতৃহত্যার পর কাবিলের শরীর হয়ে গেলো ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের। হজরত আদম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হাবিল কোথায়? সে বললো, আমি তার সংরক্ষক নই। হজরত আদম বললেন, এ রকম বলছো কেনো? নিশ্চয়ই তুমি তাকে হত্যা করেছো। তাই তোমার শরীর হয়েছে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের। হজরত আদম কাবিলের প্রতি অপ্রসন্ন হলেন। পুত্রশোকে জর্জরিত হলেন তিনি। এক বৎসরের মধ্যে তিনি আর কখনও হাসেন নি।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে জুহাকের মাধ্যমে মুকাতিল বিন সুলায়মান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, কাবিলের ভ্রাতৃ হত্যার সময় হজরত আদম ছিলেন মক্কায়। হাবিলের শাহাদতের পর কোনো কোনো বৃক্ষ হয়ে পড়লো কণ্টাকীর্ণ। আহার্য বস্তু হয়ে পড়লো স্বাদহীন। ফলবান বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়তে লাগলো ফলের সম্ভার। পানির স্বাদ হলো লবণাক্ত। পৃথিবীর অনেক ভূখণ্ড হয়ে পড়লো বালুকাময়। তাঁর শাহাদতের পূর্বে কোনো বৃক্ষই কণ্টকযুক্ত ছিলো না। কোনো আহার্য বিনষ্ট হতো

www.eelm.weebly.com

না, ফলন্ত বৃক্ষ থেকে ফল ঝরে পড়তো না। পানি ছিলো না লবণাক্ত। মাটি ছিলো না বালুকাময়। এ সকল পরিবর্তন দেখে হজরত আদম আপন মনে বললেন, নিশ্চয়ই পৃথিবীতে কোনো অঘটন ঘটেছে। তিনি হিন্দুস্তান অভিমুখে ফিরে চললেন। গৃহে উপস্থিত হয়ে জানতে পারলেন, কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছে। পুত্রবিরহে কাতর হয়ে তিনি একটি কবিতা (শোকগাথা) আবৃত্তি করলেন। ওই কবিতাটি পৃথিবীর প্রথম কবিতা। কবিতাটির মর্ম ছিলো এ রকম—পৃথিবীবাসীরা তাদের রূপ পরিবর্তন করেছে। দেখো না— পৃথিবী কেমন ধূসর, অসুন্দর। আহার্য হয়ে পড়েছে স্বাদহীন, পরিবর্তিত হয়েছে নিসর্গের রঙ। সুন্দর যা কিছু তা হয়ে পড়েছে ক্ষণজন্মা। মায়মুনা বিন মোহরানের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে বলে হজরত আদম কবিতা রচনা করেছেন, সে মিথ্যুক। মোহাম্মদ স. যেমন কাব্য রচয়িতা ছিলেন না, তেমনি হজরত আদমসহ কোনো নবী রসুল কাব্য রচনা করেননি। তবে তিনি পুত্রবিরহে কাতর হয়ে কিছু শোকবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। যার ভাষা ছিলো সুরইয়ানী। পরবর্তী সময়ে তিনি হজরত শীশকে বলেছিলেন, হে প্রিয় বৎস! আমার অসিয়ত শ্রবণ করো। আর আমার এ শোকবাণীকে স্মরণে রেখো। এই শোকবাণী যেনো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রচারিত হয়। আর সকলে যেনো এ উচ্চারণের মাধ্যমে হাবিলের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে পারে। এরপর থেকেই ওই শোকবাণী প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রচারিত হয়ে আসছে। ইয়ারেব বিন কাহাতান ছিলেন সুরইয়ানী ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত। তিনিই প্রথম আরবী বর্ণমালা লিপিবদ্ধ করেন। প্রখ্যাত কবি ছিলেন তিনি। হজরত আদমের শোকবাণীকে কিঞ্চিত রূপান্তরের মাধ্যমে তিনিই কাব্যরূপ দিয়েছেন। সেই কাব্যরূপের দু'টি পংক্তির মর্ম এ রকম—

'কী কারণে আমি তার জন্য অশ্রুপাত করতে কার্পণ্য করবো? প্রিয় হাবিল এখন মৃত্তিকার অন্তরালে। আমিতো সারা জীবন ধরে তার বিচ্ছেদকাতরতাকেই মনে করবো আমার সন্তাপ ও সান্ত্বনা।

হাবিলের শাহাদাতের পর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হলো। হজরত আদমের বয়স তখন একশত তিরিশ। তিনি পুনরায় এক পবিত্র পুত্র সন্তানের পিতা হলেন। মাতা হাওয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন হজরত শীশ। তিনি হাবিলের স্থলাভিষিক্ত হলেন বলে তাঁর অপর নাম হেবাতুল্লাহ্। আল্লাহ্পাক তাঁকে রাত ও দিনের সময় পরিমাপের জ্ঞান দান করলেন। ঘণ্টার হিসেব ধরে তিনি আল্লাহ্পাকের ইবাদত করতে শুরু করলেন। আল্লাহ্পাক তাঁর উপর পঞ্চাশটি সহিফা অবতীর্ণ করেছিলেন। তিনিই ছিলেন হজরত আদম পরবর্তী নবী।

কাবিলের উপর নেমে এলো অভিশাপ। তাকে বলে দেয়া হলো— যাও! বিভ্রান্তের মতো যত্রতত্র বিচরণ করো। কোথাও তুমি শান্তি লাভ করতে পারবে না। কাবিল তখন তার সহজন্মের বোনকে নিয়ে ইয়ামেনের এডেন নামক অঞ্চলে চলে গেলেন। সেখানে ইবলিস তার সুহৃদ সেজে তাকে বললো, হাবিল ছিলো অগ্নিউপাসক। তাই আগুন সদয় হয়ে আকাশ থেকে নেমে এসে তার কোরবানীকে ভস্মীভূত করে ফেলেছিলো। তুমিও অগ্নিপূজার প্রচলন করো। তাহলে আগুনের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে তোমার এবং তোমার বংশধরের একচ্ছত্র অধিকার।

www.eelm.weebly.com

ইবলিসের পরামর্শকে সৎ পরামর্শ হিসেবে গ্রহণ করলো কাবিল। অচিরেই অগ্নিমন্দির প্রতিষ্ঠা করে সর্বপ্রথম সে উপাসনা করলো আগুনের। তার সন্তানেরা তৈরী করলো বিভিন্ন খেলাধুলার উপকরণ ও সঙ্গীতযন্ত্র। যেমন— মুরলী, বাঁশী, ঢোল, তানপুরা ইত্যাদি। তারা সকলে খেলাধুলা, মদ্যপান, ব্যভিচার, অগ্নিউপাসনা— এসবের মধ্যেই ডুবে গেলো। পরবর্তী সময়ে হজরত নূহের মহাপ্লাবনের মাধ্যমে কাবিলের সকল বংশধরকে সলিল সমাধি দেয়া হয়েছিলো। প্লাবনপরবর্তী পৃথিবীতে রয়ে গিয়েছিলো কেবল হজরত শীশের বংশধরেরা।

হজরত ইবনে মাসউদের হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, অন্যায়ভাবে হত্যাকারীর পাপের একাংশ হজরত আদমের প্রথম পুত্র কাবিলের স্কন্ধে আপতিত হয়। কারণ, কাবিলই প্রথম হন্তারক। বোখারী।

বায়হাকী তাঁর শো'বুল ঈমানে হজরত ইবনে ওমর থেকে লিখেছেন, দোজখ থেকে শাস্তির অর্ধাংশ ভোগ করবে হজরত আদমের জ্যেষ্ঠ সন্তান কাবিল (সকল দোজখীর অর্ধেক আযাব ভোগ করবে সে)। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আসাকের লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় এক বৎসর অতিবাহিত করবে, সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্পাকের সম্মুখে কাবিলের পাপের বোঝা বহন করবে। দোজখে প্রবেশ করার আগে সে আর কাবিল থেকে পৃথক হতে পারবে না। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে সে হবে কাবিলের সাথী। কিন্তু দোজখে তার অবস্থান হবে কাবিলের অবস্থান থেকে পৃথক। কারণ, কাবিলের শাস্তি হবে সুকঠিন ও সুদীর্ঘ।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৩২

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

❐ এই কারণেই বনি ইসরাইলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করিল, আর কেহ কাহারও প্রাণ রক্ষা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল। তাহাদের নিকট তো আমার রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ আনিয়াছিল, কিন্তু ইহার পরও তাহাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমালংঘনকারীই রহিয়া গেল।

---

www.eelm.weebly.com

নরহত্যা এবং ধ্বংসাত্মক কার্য — এই দুই অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো কারণে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে— তবে সে হবে দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যাকারীর মতো। আর কেউ যদি কারো প্রাণ রক্ষা করে তবে সে হবে পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণরক্ষাকারীর মতো। বনী ইসরাইলের প্রতি এই বিধানটি আল্লাহ্পাক এখানে জানিয়ে দিয়েছেন। কেবল বনী ইসরাইলদেরকে লক্ষ্য করে বলা হলেও বিধানটি কিন্তু চিরন্তন। পূর্বাপর সকল উম্মতের জন্য বিধানটি অবশ্য পালনীয়। হত্যা করা যাবে কেবল ওই ব্যক্তিকে যে নরহত্যা করেছে, লুণ্ঠন করেছে এবং বিবাহিত জীবনে ব্যভিচার করেছে। ধ্বংসাত্মক কার্য বলতে এখানে অবশ্য বুঝানো হয়েছে কাফেরদের সৃষ্ট বিভিন্ন অশান্তি ও বিশৃংখলাকে।

বাগবী লিখেছেন, বিভিন্নজন বিভিন্নরূপে এই আয়াতটির অর্থ করেছেন। ইকরামার বর্ণনায় রয়েছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে ব্যক্তি নবী অথবা তার খলিফার যুগে নরহত্যা করে, সে যেনো সকল মানুষকেই হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি নবী অথবা তাঁর প্রতিনিধিকে সাহায্য করে, সে যেনো রক্ষা করে সকল মানুষের জীবন। মুজাহিদ বলেছেন, অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যাকারী ব্যক্তি এমনভাবে দোজখে প্রবেশ করবে, যেমনভাবে দোজখে প্রবেশ করে সকল মানুষের হত্যাকারী। আর যে ব্যক্তি একজন মানুষকে হত্যা করা থেকে রক্ষা করে, সে যেনো সকল মানুষকে হত্যা থেকে রক্ষা করে। হজরত কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্পাক এই আয়াতে একজন মানুষকে হত্যা করার পাপ যে কতো ভয়াবহ এবং হত্যা না করার মর্যাদা যে কতো অধিক তা প্রকাশ করেছেন। আয়াতের মূল বক্তব্য এই যে, যদি কেউ একজন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করাকে হালাল মনে করে, তবে সে সকল মানুষকে হত্যাকারীর মতো গোনাহ্গার হবে।

'আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেনো দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো'—এ কথার অর্থ, যে ব্যক্তি কোনো একজনকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে অথবা কাউকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করবে। যেমন, অন্যায়ভাবে নরহত্যা থেকে কাউকে বিরত রাখবে কিংবা অগ্নিকাণ্ড থেকে, দেয়াল চাপা পড়া থেকে কাউকে বাঁচাবে, সে হবে সকল মানুষের জীবন রক্ষাকারীর মতো মহাপুণ্যের অধিকারী। হাসান বলেছেন, একজনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে তার উপর ওইরূপ কিসাস ওয়াজিব হবে যেমন কিসাস ওয়াজিব হয় সকল মানুষকে হত্যা করলে। আর কেউ যদি কিসাস ওয়াজিব হয়েছে— এ রকম ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়, কিসাস (খুনের বদলা) না নেয় তবে সে যেনো সকল মানুষের জীবন রক্ষা করলো।

উপরোক্ত বিবরণগুলোর মূল মর্ম এই যে, জীবন সংহার কতো ভয়াবহ এবং জীবন রক্ষা কতো মর্যাদামণ্ডিত তা সকলে জেনে নাও এবং সৃষ্টির জীবন রক্ষার ব্যাপারে সদাসচেষ্ট হও।

www.eelm.weebly.com

জ্ঞাতব্যঃ আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর এবং ইবনে মুনজির কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াতটি সুরা নিসার ওই আয়াতের মতো— যেখানে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি কোনো বিশ্বাসীকে ইচ্ছাপূর্বক বধ করবে, তার প্রতিফল হবে জাহান্নাম, তার অগ্নিবাস হবে চিরস্থায়ী। তার প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত। জাহান্নামের ভয়ংকর আযাবের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাদেরই জন্য— —অর্থাৎ সকল মানুষকে হত্যা করলে যে আযাব হবে, একজনকে হত্যা করলেও সে রকম আযাবই ভোগ করতে হবে।

হজরত বারা বিন আজিবের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সারা পৃথিবী ধ্বংস করাও একজন মানুষকে হত্যা করার চেয়ে আল্লাহ্পাকের নিকট কম অন্যায়। হাসান সূত্রে এই বর্ণনাটি এনেছেন ইবনে মাজা। বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, যদি আকাশ ও পৃথিবীর সকল অধিবাসী একযোগে একজন মুমিনের হত্যাকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্পাক তাদের সকলকে দোজখে প্রবেশ করাবেন। বায়হাকীর অন্য একটি বর্ণনায় 'হত্যাকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করে'— এর স্থলে 'অন্যায়ভাবে রক্ত প্রবাহিত করে' কথাটি এসেছে। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, ইবনে মাজার হাদিসের অনুরূপ। হজরত বোরায়দা থেকে নাসাঈ লিখেছেন, আল্লাহ্র নিকট ইমানদারের হত্যা সারা পৃথিবী ধ্বংস করার চেয়েও বড় অপরাধ।

ইবনে মাজা লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর বলেছেন, আমি একবার দেখলাম রসুল স. কাবা শরীফ তাওয়াফ করছেন এবং বলছেন, হে কাবা! তুমি কত পবিত্র, কত সুবাসিত। তোমার সম্মান কতো উচ্চ, মর্যাদা কতো সীমাহীন। কিন্তু আমার জীবনাধিকারী ওই পবিত্র সত্তার শপথ করে আমি বলি, মুমিনের সম্পদ, রক্ত ও মর্যাদা তোমার মর্যাদা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সোলায়মান বিন আলী বলেছেন, আমি হাসান বসরীকে এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেছিলাম, হে আবু সাঈদ, এই আয়াতটি কি আমাদের জন্যও প্রযোজ্য না কেবল বনী ইসরাইলদের জন্য? তিনি বললেন, নিশ্চয় আমাদের জন্যও। কসম ওই অবিভাজ্য সত্তার, আল্লাহ্পাকের নিকট আমাদের রক্ত অপেক্ষা বনী ইসরাইলের রক্ত অধিক সম্মানার্হ নয়।

'তাদের নিকট তো আমার রসুলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিলো, এর পরেও তাদের অনেকে পৃথিবীতে সীমালংঘনকারীই রয়ে গেলো।'—এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, বনী ইসরাইলেরা আমার প্রেরিত পুরুষদেরকে দেখেছে। তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণ (মোজেজা)। এতদসত্ত্বেও তাদের অনেকে সীমালংঘনের উপরে অনড় রইলো। সীমালংঘন বুঝাতে এখানে 'ইসরাফ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দসহযোগে শেষে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'দুনিয়ায় সীমালংঘনকারীই রয়ে গেলো' (ফিল আরদ্বি লা মুসরিফুন)।

www.eelm.weebly.com

إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُّقَتَّلُوْٓا أَوْ يُصَلَّبُوْٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

❑ যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে তাহাদের শাস্তি এই যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হইবে অথবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে। দুনিয়ায় ইহাই তাহাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাহাদের জন্য মহা শাস্তি রহিয়াছে।

আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অর্থ আল্লাহ্র বান্দাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পথই নিরাপত্তার পথ। যাঁরা রসুলের স্থলাভিষিক্ত অথবা পুণ্যবান প্রশাসক—তাঁরাই রসুলের প্রতিনিধি। তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করাও আল্লাহ্পাকের বিরুদ্ধাচরণ সমতুল্য। এখানে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ। আল্লাহ্পাকের হুকুমেই মানুষের জীবন ও সম্পদকে সম্মানার্হ করে দেয়া হয়েছে। তাই মানুষের জীবন এবং সম্পদ লুণ্ঠন হারাম। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে যুদ্ধ অর্থ সশস্ত্র যুদ্ধ নয়, রাহাজানি। কামুস অভিধানে রয়েছে, এখানে যুদ্ধের আসল অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন। বায়যাবীর বক্তব্যানুযায়ী এখানে সশস্ত্র যুদ্ধের কথা বলা না হলেও কামুস গ্রন্থের ভাষ্যানুসারে সকল প্রকার বিরুদ্ধাচরণকেই এখানে যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

'দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে'—এ কথার অর্থ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। বিশৃঙ্খলা বুঝাতে এখানে 'ফাসাদান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিভিন্নরূপ বর্ণনা রয়েছে। যায়েদ বিন আবী হাবিবের মাধ্যমে ইবনে জারীর লিখেছেন, আবদুল মালেক বিন মারওয়ানকে আরীজা নামক স্থানে হজরত আনাসের নিকট প্রেরণ করা হলো। তিনি হজরত আনাসের নিকট এই আয়াত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। হজরত আনাস তখন লিখিতভাবে জানালেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উরায়নার অধিবাসীদের সম্পর্কে। তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে রসুল স. এর রাখালদেরকে হত্যা করেছিলো এবং তাদের উটগুলো নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। হজরত জারীর থেকে ইবনে জারীর এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবদুর

www.eelm.weebly.com

রাজ্জাক এ রকম বর্ণনা করেছেন। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের থেকে বাগবীও এ রকম বলেছেন। বোখারী প্রমুখ হজরত আনাস থেকে লিখেছেন, উকাল গোত্রের কিছু লোক রসুল স. এর দরবারে হাজির হয়ে মুসলমান হয়ে গেলো। মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিলো না। তাই রসুল স. নির্দেশ দিলেন, তোমরা মদীনার বাইরে যেখানে সদকার উট রাখা হয়েছে, সেখানে গিয়ে থাকো এবং উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করো। তারা নির্দেশ পালন করলো এবং সুস্থ হয়ে উঠলো। তারপর হঠাৎ একদিন তারা ধর্মত্যাগী হয়ে রাখালদেরকে হত্যা করে তাদের উটগুলো নিয়ে পালিয়ে গেলো। রসুল স. তাদেরকে ধরে আনবার জন্য একটি ক্ষুদ্র দল পাঠালেন। তারা ধর্মত্যাগীদেরকে বন্দী করে নিয়ে এলো। রসুল স. তাদের হাত পা কেটে দিলেন এবং সুরমাদণ্ড তপ্ত করে তাদের চোখ অন্ধ করে দিলেন। তারা চিৎকার করে পানি প্রার্থনা করলো। কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হলো না। এ অবস্থাতেই তারা মৃত্যুবরণ করলো। আবু কালাবা বলেছেন, তারা যুদ্ধ করেছিলো, সম্পদও লুট করেছিলো। পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছিলো বিশৃঙ্খলা। তাদের এই অপকর্মকেই এই আয়াতে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলা হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ খারাবেতী তাঁর মাকারিমুল আখলাক্ব গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উরায়না গোত্রের কিছু লোক রসুল স. এর নিকটে এসে মুসলমান হয়ে গেলো। মদীনার আবহাওয়া তাদের সহ্য হচ্ছিলো না। তাদের হাত পা শুকিয়ে যেতে লাগলো। চেহারা হয়ে গেলো হলদে এবং দেখা দিলো উদরস্ফীতি। রসুল স. তাদেরকে সদকার উটের পালের সঙ্গে চারণভূমিতে থাকতে বললেন এবং উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করার নির্দেশ দিলেন। তারা নির্দেশ প্রতিপালন করলো। এভাবে রোগমুক্ত হয়ে শারীরিক সুস্থতা লাভ করলো তারা। তারপর হঠাৎ একদিন রসুল স. এর রাখালদেরকে হত্যা করে উটের পাল নিয়ে পলায়ন করলো এবং মোরতাদ হয়ে গেলো। হজরত জিবরাইল রসুল স.কে এ কথা জানালেন এবং পরামর্শ দিলেন— তাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য লোক পাঠিয়ে দিন। রসুল স. তৎক্ষণাৎ কয়েকজনকে নির্দেশ দিলেন যাও, ধর্মত্যাগীদেরকে বন্দী করে আনো। হজরত জিবরাইল বললেন, এই দোয়া পাঠ করুন— হে আল্লাহ্, আকাশ তোমারই আকাশ এবং পৃথিবী তোমারই পৃথিবী। আর পূর্ব পশ্চিম সকল দিক তোমারই। হে আল্লাহ্, পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ করে দাও, তাদেরকে এনে দাও আমার আওতায়। রসুল স. দোয়াটি পাঠ করলেন। পলায়নপর ধর্মত্যাগীরা ধরা পড়ে গেলো। পশ্চাতে প্রেরিত বাহিনী তাদেরকে বন্দী করে আনলেন রসুল স. এর দরবারে। তখন অবতীর্ণ হলো 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে..... ।' হজরত জিবরাইল রসুল স.কে বললেন, এদের মধ্যে যে লোক হত্যা ও লুণ্ঠন করেছে তাকে শুলে চড়িয়ে দিন। যে হত্যা করেছে তাকে হত্যা করুন। আর যে কেবল সম্পদ লুণ্ঠন করেছে তার হাত পা কেটে দিন—একদিকের হাত-পা নয়, একটি ডানদিকের ও অপরটি বাম দিকের।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যদি কারো ক্রীতদাস পলায়ন করে অথবা পশু কিংবা মানুষ হারিয়ে যায়, তবে সে যেনো এই দোয়াটি পাঠ করে এবং কোনো কিছুতে দোয়াটি লিখে পাক পবিত্র স্থানে পুঁতে রাখে। এ রকম করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্পাক পালিয়ে যাওয়া ও হারিয়ে যাওয়া মানুষ কিংবা পশু তাকে ফিরিয়ে দেবেন।

উরায়না গোত্রের লোকদের শাস্তি সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতের মধ্যে বর্ণিত শাস্তি রহিত হয়ে গিয়েছে। শাস্তিস্বরূপ কারো নাক কান কেটে ফেলা জায়েয নয়। কেউ কেউ বলেছেন, চক্ষু অন্ধ করে দেয়া এবং নাক কান কাটা জায়েয না হলেও অন্য শাস্তিগুলো এখনও কার্যকর। কিন্তু এ কথা ওই সময়ে কার্যকর হবে, যখন বিচারক বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করে আয়াতের নির্দেশের পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম হবেন। হজরত কাতাদা লিখেছেন, এই আয়াতে বর্ণিত শাস্তি শরিয়তের শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার আগের। আবু জিনাদ বলেছেন, রসুল স. এই আয়াতের নির্দেশানুযায়ী শাস্তি কার্যকর করেছেন এবং 'মুসলা' (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্তন) নিষিদ্ধ করেছেন। এরপর থেকে আর কখনও কারো মুসলা করা হয়নি। হজরত কাতাদা বলেছেন, আমরা সংবাদ পেয়েছি, এর পর থেকে রসুল স. সদকার জন্য উৎসাহ দান করতে লাগলেন এবং মুসলা করতে নিষেধ করলেন। হজরত আনাস থেকে সুলায়মান তাইমী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ওই ধর্মত্যাগীদেরকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন এ কারণে যে, তারা রাখালদেরকে হত্যার পূর্বে তাদের চোখ উপড়ে ফেলেছিলো। লাইস বিন সা'দ বলেছেন, এই আয়াতের নির্দেশানুযায়ী রসুল স. শাস্তি কার্যকর করেছিলেন। এটা ছিলো অপরের জন্য শিক্ষা। শিক্ষাটি এ রকম— আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্য— করে তাদেরকে এভাবে শাস্তি দিতে হবে; কিন্তু মুসলা করা যাবে না।

জুহাক বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কিতাবীদের একটি গোত্র সম্পর্কে। তারা রসুল স. এর সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলো। তারপর সন্ধি ভঙ্গ করে তারা পৃথিবীতে শুরু করেছিলো ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড।

কালাবী লিখেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, বেলাল বিন উয়াইমির গোত্র সম্পর্কে। ওই গোত্রের আবু বারাজা আসলামীর সঙ্গে রসুল স. এর এই মর্মে সন্ধি ছিলো যে, তারা রসুল পাক স.কে যেমন সাহায্য করবে না, তেমনি সাহায্য করবে না তাঁর শত্রুদেরকেও। আর ওই গোত্রের কোনো লোক যদি রসুল স. এর নিকটে আসে, তবে তাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। তাদেরকে আক্রমণ করা হবে না, প্রতিশোধও গ্রহণ করা হবে না। একবার কেনানা গোত্রের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণের মানসে মদীনার দিকে যাত্রা শুরু করলো। পথিমধ্যে তাদের সাক্ষাৎ ঘটলো আসলামী উপগোত্রের কিছু লোকের সঙ্গে। উপগোত্রটি ছিলো হেলাল বিন উয়াইমির গোত্রভূত। হেলাল তখন ছিলো অনুপস্থিত। সেই সুযোগে বনী আসলামের লোকেরা মদীনাযাত্রী কেনানীদের উপর আক্রমণ করে বসলো। সম্পদ লুণ্ঠন করলো এবং তাদেরকে হত্যা করে ফেললো। এ সংবাদসহ আয়াতটি নিয়ে হজরত জিবরাইল উপস্থিত হলেন রসুল স. এর দরবারে।

www.eelm.weebly.com

দ্রষ্টব্যঃ আলেমদের ঐকমত্য এই যে, এই আয়াতের মুহারিবিন এবং মুফসিদিন অর্থ রাহাজানি ও ডাকাতি। মুসলমান অথবা জিম্মী (কাফের) সকলেই এই বিধানের অন্তর্ভূত। এ অভিমতটিও ঐকমত্যসম্মত— কেউ যদি শহরের বাইরে গিয়ে কাউকে ভয় দেখানোর জন্য অস্ত্র উত্তোলন করে তবে সে হবে মুহারীব (আল্লাহ্ ও তার রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী)। তার উপর এই আয়াতের বিধান কার্যকর করা যাবে।

শহরের অভ্যন্তরে অথবা হেরা ও কুফা— এই দু'টি জনপদের মধ্যবর্তী স্থানে কেউ যদি রাতে অথবা দিনে লুটতরাজ চালায় তবে তার শাস্তি কী হবে— সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেছেন। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন— এ ধরনের রাহাজানিও মুহারিব পদবাচ্য। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, লুণ্ঠনকারীর উপর এই বিধান প্রযোজ্য হবে তখন, যখন লুণ্ঠনকর্ম সংঘটিত হবে শহর থেকে দূরবর্তী এমনস্থানে যেখানে কোনো সাহায্যকারীর উপস্থিতি সম্ভব নয়। বাগবী লিখেছেন, শহরের অভ্যন্তরে লুণ্ঠনকারীর উপরও এই আয়াতের বিধান প্রয়োগ করা যাবে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আওজায়ী এবং লাইস বিন সা'দও এ রকম বলেছেন। ইবনে হুমাম লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ীর মাজহাবেও এই অভিমতটি গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর ওয়াজিজুল মাসায়েল গ্রন্থে রয়েছে— যে ব্যক্তি শহরের মধ্যে জোর পূর্বক কারো সম্পদ ছিনিয়ে নিবে, সে অবশ্যই লুণ্ঠনকারী। ইমাম মোহাম্মদের ছয়টি গ্রন্থের কোনো একটিতে রয়েছে— ইমামে আজম বলেছেন, শহর ও লুণ্ঠনস্থানের দূরত্ব হতে হবে সফরের দূরত্বের সমপরিমাণ। এ রকম দূরবর্তী স্থানে যে রাহাজানি করবে, তাকে শাস্তিদান করা ওয়াজিব। কারণ, সেখানে কোনো সাহায্যকারী পৌঁছুতে পারে না। বনেজঙ্গলে লুট পাট কারীরা অধিকতর অপরাধী। এ সম্পর্কে ইমাম মালেকের দু'টি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। একটিতে বলা হয়েছে, জনবসতি থেকে এক মাইল দূরত্বের লুণ্ঠনকর্মের কথা। অপরটিতে বলা হয়েছে তিন মাইল। আরো বলা হয়েছে, লুণ্ঠনের সময় আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো প্রকার সাহায্য পাবার সম্ভাবনা যেখানে না থাকে।

ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল এই মাসআলা প্রসঙ্গে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ হাম্বলীগণের অভিমত এই—রাহাজানির স্থান হতে হবে এমন স্থানে, যেখানে কোনো প্রকার সাহায্য পাবার সম্ভাবনা নেই। ইমাম আবু ইউসুফের এক বর্ণনায় এসেছে—নগরাভ্যন্তরে দিবাভাগে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলে, তা হবে লুণ্ঠনকর্ম। আর কাষ্ঠ খণ্ড, পাথর ইত্যাদি দ্বারা আক্রমণ করলে তাকে রাহাজানি বলা যাবে না। তবে এভাবে রাতে আক্রমণ করলে তা হবে রাহাজানি। কেননা দিনে সাহায্যকারী পৌঁছার সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু সাহায্যকারী পৌঁছার পূর্বে লুণ্ঠনকারীরা তাদের কার্যসিদ্ধ করে ফেলতে পারে। তাই দিবসের সশস্ত্র আক্রমণ লুটতরাজ হিসেবে গণ্য। রাতের অবস্থা অন্য রকম। তখন অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই আক্রমণকারীরা তাদের কার্যসিদ্ধ করতে পারে। কারণ, রাতের সাহায্য সুলভ্য

www.eelm.weebly.com

নয়। তাই রাতের আক্রমণ সশস্ত্র না হলেও তা লুণ্ঠনকর্ম হিসেবে গণ্য। তাহাবী ব্যাখ্যাতা বলেছেন, ফতোয়া দান করতে হবে ইমাম আবু ইউসুফের বক্তব্যানুসারে। হেদায়া রচয়িতা বলেছেন, ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য কিয়াসের অনুরূপ। কেননা, জোরপূর্বক সম্পদ ছিনিয়ে নেয়াকেই রাহাজানি, লুণ্ঠন বা লুটতরাজ বলে (যদিও তা নগরমধ্যে সংঘটিত হয়)। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার অভিমতটি বিবেচনা সুলভ। কারণ, তিনি বিবেচনায় এনেছেন— সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনাকে। নগরে অথবা নগরের সন্নিকটে সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত। তাই তিনি নগর থেকে দূরবর্তী স্থানকে নগরের সমান্তরাল করেননি। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, এই আয়াতে বর্ণিত শাস্তির বিধান রাহাজানির পারিভাষিক অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা। শহরের মানুষ থাকে সংঘবদ্ধ ও সুসজ্জিত। সুতরাং অতর্কিত আক্রমণ সাধারণতঃ নগর সীমানার বাইরেই সংঘটিত হয়ে থাকে। আর এই বাইরের স্থানটি সফরের (তিন দিনের) দূরত্বে হওয়াও জরুরী নয়। কোরআন ও হাদিসে এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট দূরত্বের কথা বলা হয়নি। উরায়নাবাসীরা যে উটের বাথানে হত্যা ও লুণ্ঠন করেছিলো, তা ছিলো মদীনার নিকটেই, তিন দিনের দূরত্বে নয়।

মাসআলাঃ লুণ্ঠনকারী বা ডাকাত একজন হোক বা একাধিক—তাদেরকে শক্তিশালী হতেই হবে। শক্তি হতে হবে এ রকম— তারা যাত্রীদলের পিছন থেকে আক্রমণ করে লুণ্ঠিত মালামাল নিয়ে পলায়ন করতে যেনো সক্ষম হয়। আর যদি আক্রমণকারীর শক্তিমত্তা প্রদর্শনার্থে যাত্রীদের কিছুসংখ্যক লোকের উপর হামলা করে, তবে ব্যাপারটিকে তখন রাহাজানি বলা যাবে না। রাহাজানির অর্থ লুণ্ঠন। শুধুই আক্রমণ নয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। আয়াতেও এ কথা বলা হয়েছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষমতা না থাকলে ধ্বংসাত্মক কর্মসম্পাদন করা সম্ভবই নয়।

'তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।'— এখানে চার প্রকার শাস্তির বিবরণ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, বিদ্রোহী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে এই চার প্রকার শাস্তির যে কোনো একটি শাস্তি দেয়া যাবে। বিষয়টি বিজ্ঞ ইমামের সিদ্ধান্তাধীন। আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ এ রকমই। এখানে 'আও' শব্দটির মাধ্যমে আল্লাহ্পাক বিচারকদেরকে শাস্তি নির্বাচনের অধিকার দিয়েছেন। তাঁরা এই চার প্রকার শাস্তির মধ্যে যে শাস্তিটিকে উপযুক্ত মনে করবেন, তা কার্যকর করতে পারবেন। এ রকম বলেছেন সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব, আতা, দাউদ, হাসান বসরী, জুহাক, নাখয়ী, মুজাহিদ এবং আবু সওর। ইমাম মালেক বলেছেন, বিচারক বা প্রশাসক ইজতেহাদের (গভীর বিশ্লেষণের) মাধ্যমে শাস্তি নির্বাচন করবেন। বিদ্রোহী যদি শক্তিশালী ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ হয়, তবে তাকে হত্যা করে ফেলবে। যদি রাজনীতিই তার বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য হয়, তবে তাকে করতে হবে ক্রুশবিদ্ধ। সে যদি বলশালী না হয় এবং ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করার মনোবৃত্তি তার না থাকে, তবে

www.eelm.weebly.com

তার হাত ও পা কেটে দিতে হবে (কাটতে হবে ডান হাত ও বাম পা)। নির্বাসন সম্পর্কে ইমাম মালেক বলেছেন, বিদ্রোহী যদি যুদ্ধংদেহী না হয়, তবে তাকে দেশান্তর করতে হবে। দেশান্তরী অবস্থাতেও তাকে বন্দী করে রাখতে হবে। সেখানেও তাকে মুক্ত রাখা যাবে না। মোহাম্মদ বিন জোবায়েরও এ রকম বলেছেন। ইমাম মালেকের নিকট আরেকটি শর্ত এই যে, লুণ্ঠিত সামগ্রী নেসাব পরিমাণ হতে হবে। তবে লুণ্ঠনকারীদের বণ্টিত অংশ নেসাব পরিমাণ হওয়া জরুরী নয়। ইমামে আজম, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম আওজায়ীর মতে আয়াতের উল্লেখিত 'আও' শব্দটি লুণ্ঠনকারীদের বিভিন্ন অবস্থাকে প্রকাশ করেছে (অপরাধের প্রকৃতি অনুসারে তাদের জন্য শাস্তি নির্বাচন করা হয়েছে)। যদি ডাকাতেরা ভয় দেখায়, হুমকি দেয়, সম্পদ না নেয়, হত্যাকাণ্ড না ঘটায়— তবে তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিতে হবে। এ বহিষ্কার করার অর্থ তাদেরকে বন্দী করে রাখতে হবে— যতোক্ষণ না তারা তওবা করে। এই শাস্তি আরোপিত হলে তার মন্দ প্রভাব থেকে দেশের সমগ্র ভূখণ্ড মুক্ত হয়ে যাবে।

মাকহুলের বর্ণনায় এসেছে, সর্ব প্রথম হজরত ওমর একদল ডাকাতকে জেলখানায় বন্দী করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে ওই সময় পর্যন্ত বন্দী করে রাখবো, যতোক্ষণ না তোমরা তওবা করো। তোমাদেরকে অন্য কোনো শহরেও আমি পাঠাবো না। এ রকম করলে তোমরা অন্য শহরের বাসিন্দাদেরকেও কষ্ট দেবে। মোহাম্মদ বিন জোবায়ের বলেছেন, এক বস্তির ডাকাতকে অন্য বস্তির জেলখানায় বন্দী করে রাখতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে একই সঙ্গে প্রকৃত ও রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হয়। তাই অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, বিচারক সময় বেঁধে দিয়ে বন্দীকে বিভিন্ন বস্তির জেলখানায় ক্রমাগত স্থানান্তরের নির্দেশ দিবে, যেনো সে কোথাও স্থায়ী হতে না পারে।

ভয় দেখিয়ে মুসলমান অথবা জিম্মির (জিজিয়া পরিশোধকারী কাফেরের) সম্পদ ছিনতাই করলে এবং হত্যাকাণ্ড না ঘটালে যদি দেখা যায় লুণ্ঠিত দ্রব্য বণ্টনের পর প্রত্যেক ডাকাতের অংশে লুণ্ঠনের নেসাব পরিমাণ সামগ্রী রয়েছে, তবে ডাকাতদের হাত পা কেটে দেয়া যাবে (ইমাম আজমের মতে লুণ্ঠনের নেসাব দশ দিরহাম। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে এক চতুর্থাংশ দিনার অথবা তিন দিরহাম)। যদি ডাকাতেরা সম্পদ লুণ্ঠন না করে কেবল হত্যাকাণ্ড ঘটায়, তবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ক্ষমা করে দিলেও ওই ডাকাতকে হত্যা করতে হবে। এটাই শরিয়তের বিধান।

যদি একজন সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং হত্যাকাণ্ড ঘটায়— তার দলের অন্য কেউ যদি তার কাজে অংশ গ্রহণ না করে তবুও সকলকে শরিয়তসম্মত শাস্তি দিতে হবে। ইমামে আজম এ রকম বলেছেন। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের বক্তব্যও অনুরূপ। হত্যাকারী ও লুণ্ঠনকারী ডাকাতের সঙ্গীরাও সমঅপরাধী। কারণ তারা, সকলেই এক ও অভিন্ন উদ্দেশ্যধারী। তাই তাদের সকলকে একে একে শাস্তি দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অপরাধীর সহযোগীদেরকে কেবল বন্দী করে দেশান্তর করতে হবে।

www.eelm.weebly.com

যদি ডাকাতেরা একই সঙ্গে হত্যা ও লুণ্ঠন করে— তবে ইমামে আজম ও ইমাম আবু ইউসুফের অভিমত হচ্ছে, এক্ষেত্রে হাকিম তার যথেচ্ছ অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। প্রথমে হাত পা কর্তন, তারপর হত্যা, তারপর ক্রুশবিদ্ধ করা অথবা শুধু হত্যা কিংবা শুধু ক্রুশবিদ্ধ। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন, এক্ষেত্রে অঙ্গপ্রতঙ্গ কর্তন করা যাবে না। শুধু হত্যা করবে এবং শূলদণ্ড দিবে। আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্য এ রকমই। আয়াতে একটি শাস্তির সঙ্গে অপর শাস্তি যুক্ত হয়েছে 'অথবা' শব্দের মাধ্যমে। সুতরাং একই অপরাধের দু'রকম শাস্তি দেয়া যায় না। হত্যাকাণ্ড একটি বৃহৎ অপরাধ। সুতরাং বৃহৎ অপরাধের শাস্তির মধ্যেই ক্ষুদ্র অপরাধের শাস্তি অন্তর্ভূত রয়েছে বুঝতে হবে। যেমন চুরির শাস্তি হস্তকর্তন এবং ব্যভিচারের শাস্তি রজম। এ দু'টো অপরাধ একত্রিত হলে— সঙ্গেসারের (প্রস্তর নিক্ষেপের) মাধ্যমে কার্যকর করতে হবে কেবল রজম। চুরির শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন তখন আর থাকবে না।

ইমামে আজমের বক্তব্যের ব্যাখ্যা এ রকম— অপরাধ কঠিন হলে শাস্তিও হবে কঠিন। কারণ, হত্যা ও ছিনতাই দু'টো অপরাধই গুরুতর। তাই এ দু'টো অপরাধে অপরাধীদেরকে দিতে হবে কঠিন শাস্তি। বড় ধরনের চুরি বা ছিনতাইয়ের শাস্তি হাত ও পা কর্তন মূলত একটিই শাস্তি। আর ছোট ধরনের চুরির ক্ষেত্রে হাত কাটা একটি শাস্তি এবং পা কাটা আরেকটি শাস্তি। অপরাধ যদি এক ধরনের হয় তবে শাস্তিও হবে একধরনের। একধরনের শাস্তির মধ্যে অন্য ধরনের শাস্তি প্রবিষ্ট হতে পারে না।

ইমাম আবু ইউসুফের মতে হত্যা ও লুণ্ঠনের অপরাধীকে হত্যা, ক্রুশবিদ্ধ— দু'টোই করতে হবে। কেননা, কোরআনে দু'টো শাস্তির কথাই বলা হয়েছে। এ রকম গুরুত্ব সহকারে শাস্তি দেয়া হলে মানুষ সদুপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। ইমামে আজম বলেছেন, আসল শাস্তি তো হত্যা। এর পরে শূলদণ্ড দেয়া হলে শাস্তির গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যাবে, ফলে জনগণেরা নসিহত লাভের সুযোগ পাবে অধিক। সুতরাং বিষয়টি হবে বিচারকের ইচ্ছাধীন (তিনি হত্যার নির্দেশ দিবেন অথবা শূলিতে চড়াবেন)। ইমাম শাফেয়ী আরও বলেছেন, শূলিতে চড়াতে হবে হত্যা করার পর। আর একটি বর্ণনায় তাঁর অভিমত এসেছে এ রকম— অপরাধীকে জীবিত অবস্থায় শূলদণ্ড দিতে হবে। তারপর তীর ও বল্লমের আঘাতে তাকে মেরে ফেলতে হবে।

ইমামে আজমের বক্তব্যও দু'ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর একটি অভিমতকে গ্রহণ করেছেন তাহাবী— যেখানে বলা হয়েছে মুসলা (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্তন) করা যাবে না। তাঁর দ্বিতীয় অভিমতটিকে গ্রহণ করেছেন কারখী। এই অভিমতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। কেননা, এতে রয়েছে হত্যা অথবা শূলিতে চড়ানোর কথা। আর 'আও' (অথবা) শব্দটি দু'টো শাস্তির একত্র হওয়ার অন্তরায়।

www.eelm.weebly.com

ইমামে আজম বলেছেন, লাশ ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় তিন দিনের অধিক রাখা যাবে না। তিন দিনের বেশী রাখলে লাশ পঁচতে শুরু করবে এবং মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়ে তুলবে। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, লাশ আপনাআপনি পঁচে গলে না পড়ে যাওয়া পর্যন্ত ক্রুশবিদ্ধ অবস্থাতেই রাখতে হবে— যাতে করে জনসাধারণ শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। আমরা বলি, সর্ব সমক্ষে ক্রুশবিদ্ধ করলেই নসিহতের প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং ক্রুশবিদ্ধ অবস্থা দীর্ঘায়িত করার কোনো কারণ নেই।

জমহুর আলেম আয়াতের তাফসীর গ্রহণ করেছেন ইমাম শাফেয়ী এবং হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাসূত্রে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ডাকাত সর্দারেরা যদি হত্যা ও লুণ্ঠন দু'টোই করে, তবে তাদেরকে হত্যা ও শূলদণ্ড দু'টোই দেবে। শুধু হত্যা করলে তাদেরকে কেবল হত্যা করবে, শূলে চড়াবে না। আর হত্যা না করে কেবল মাল লুট করলে তার যেকোনো একটি হাত ও একটি পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবে। আর পথচারীকে শুধু ভয় দেখালে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে।

মোহাম্মদ বিন সা'দ আউফির নিয়মে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বিদ্রোহীরা যদি যুদ্ধ করে ও হত্যাকাণ্ড ঘটায়, তবে তাদেরকে বন্দী করে হত্যা করতে হবে। তারা যদি এর সঙ্গে সম্পদ লুণ্ঠনও করে, তবে তাদেরকে শূলিতেও চড়াতে হবে। হত্যা না করে শুধু লুণ্ঠন করলে বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলতে হবে তার যে কোনো একটি হাত ও পা। আর যুদ্ধোদ্যত হলে এবং মুসাফিরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করলে তাদেরকে দিতে হবে দেশান্তর।

আবু সালেহের মাধ্যমে কালাবীর নিয়মে ইমাম মোহাম্মদ এবং ইমাম আবু ইউসুফ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. আবু বুরদা হেলাল বিন উয়াইমির আসলামীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করেছিলেন। চুক্তি সম্পাদনের কিছু দিন পর মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকার কিছু লোক মুসলমান হওয়ার ইচ্ছায় মদীনার দিকে যাত্রা শুরু করলো। পথিমধ্যে আবু বুরদার সাথীরা তাদের মালমাত্তা লুণ্ঠন করলো এবং তাদেরকে হত্যাও করলো। অতঃপর হজরত জিবরাইলের মাধ্যমে এই আয়াতের শাস্তির বিধানগুলো অবতীর্ণ হয়েছে— যে ব্যক্তি হত্যা ও লুণ্ঠন করেছে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করবে, যে ব্যক্তি কেবল হত্যা করেছে তাকে হত্যা করে ফেলবে আর যে কেবল লুণ্ঠন করেছে তার যে কোনো একটি হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করবে। আর সে যদি বন্দী হওয়ার পূর্বে মুসলমান হয়ে যায়, তবে তার ইসলাম পূর্ব জীবনের সমস্ত পাপ মার্জনা করা হবে। আতিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে ব্যক্তি পথচারীদেরকে কেবল ভীতি প্রদর্শন করে, তার শাস্তি দেশান্তর। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাঁর তাফসীরে বর্ণনাগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন।

অপরাধের তারতম্য অনুসারে শরিয়তে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। হাকিমকে এ রকম কোনো অধিকার দেয়া হয়নি যে, তিনি ইচ্ছে মতো শাস্তি নির্বাচন করবেন। এ রকম অধিকার দেয়া হলে লঘু অপরাধের জন্য গুরুদণ্ড

www.eelm.weebly.com

এবং গুরু অপরাধের জন্য লঘু শাস্তির অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে। তাই হাকিমকে শরিয়ত সমর্থিত শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। এখানেও তাকে কোরআনের নির্দেশানুযায়ী হত্যার পরিবর্তে হত্যা, সম্পদ লুণ্ঠনের পরিবর্তে হস্তপদ কর্তন এবং উভয় অপরাধে অপরাধী হলে হত্যার পর ক্রুশবিদ্ধও করতে হবে। ইমাম আবু হানিফার শেষ অভিমতটিতে বলা হয়েছে, হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করতে হবে, শূলে চড়ানো যাবে না—তিনি এ রকম বলেছেন কেবল উরায়নাবাসীদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। তারা উটের রাখালদেরকে হত্যা করেছিলো এবং তাদের উটগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো; কিন্তু রসুল স. তাদেরকে ক্রুশবিদ্ধ করেননি (অন্যথায় বুদ্ধি তো এ কথাই বলে যে—ক্রুশবিদ্ধ করাই ছিলো সমীচীন)।

মাসআলাঃ ডাকাতেরা যদি হত্যা ও লুণ্ঠন— কোনো কিছু না করে কেবল আহত করে থাকে, তবে তাদের আঘাতের বদলা (কিসাস) নিতে হবে। আর যদি জখমের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তবে তাদের সম্পদ থেকে ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা আদায় করতে হবে। আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিই এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সে ইচ্ছে করলে বদলা কিংবা জরিমানা নিতে পারবে— আবার ক্ষমাও করে দিতে পারবে। হেদায়া প্রণেতা লিখেছেন, শরিয়তে এ ধরনের অপরাধের কোনো শাস্তি নির্ধারণ করা হয়নি। এ ধরনের অপরাধ বান্দার হক বিনষ্টের অন্তর্ভুক্ত। তাই আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার হক আদায়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী। হেদায়া প্রণেতার এ বক্তব্যটি অবশ্য গ্রহণীয় নয় যে, শরিয়তে এ ধরনের কোনো শাস্তি নির্ধারণ করা হয়নি। কারণ, এখানে রয়েছে হুমকি, ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি। যার জন্য শরিয়ত দেশান্তরের শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

মাসআলাঃ ডাকাতদল যদি সম্পদ লুণ্ঠন ও আঘাত দু'টোই করে, তবে লুণ্ঠনের কারণে তার হাত পা কাটতে হবে, আঘাতের জন্য পৃথক শাস্তি দেয়া যাবে না। কেননা, শরীর বান্দার নিজের অধিকারে এবং সম্পদের অধিকার আল্লাহ্‌র। তাই শরিয়তসম্মত শাস্তি নির্ধারণের পর বান্দার পক্ষ থেকে আর কোনো অধিকার থাকে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, উভয় অধিকার পৃথক পৃথকরূপে কার্যকর থাকবে। আল্লাহ্‌র অধিকার নষ্ট করার কারণে শাস্তি দেয়া সত্ত্বেও বান্দার অধিকার নষ্ট করার অপরাধের শাস্তি দেয়া যাবে। অর্থাৎ আহত ব্যক্তি বদলা (কিসাস) নিতে পারবে।

ইমামে আজম ও ইমাম শাফেয়ীর এই মতবিরোধ হবে ওই অবস্থায় যখন হত্যার অপরাধে ডাকাতদেরকে হত্যা করা হবে অথবা সম্পদ লুণ্ঠনের কারণে তাদের হাত পা কাটা হবে এবং লুণ্ঠিত সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাবে অথবা অপরাধীরাই সম্পদ বিনষ্ট করে ফেলবে। এমতাবস্থায় লুণ্ঠিত সম্পদের জন্য কোনো জরিমানা সাব্যস্ত করা যাবে না। ইমামে আজম এ রকমই বলেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেন, অপরাধীদেরকে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া অথবা বিনষ্ট করে ফেলা মালের জরিমানা দিতে হবে। অবশ্য আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, লুণ্ঠিত মাল যদি বিনষ্ট না হয়, তবে তা ফেরৎ দিতে হবে। চুরি সম্পর্কিত অধ্যায়ে এই মতবিরোধের বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্‌তায়ালা।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ ডাকাতদের দলে যদি কোনো মহিলা থাকে যে হত্যা করেছে এবং সম্পদ লুট করেছে, তাকেও হত্যা করতে হবে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ এ রকমই বলেছেন। এই শাস্তি কার্যকর হবে শরিয়ত সম্মতভাবে (নিহত ব্যক্তির অভিভাবকেরা তাকে ক্ষমা করে দিতে পারবে না)। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ওই মহিলাকে হত্যার বদলে হত্যা করা যাবে। ছিনতাই করা মালের জরিমানাও আদায় করা যাবে (কিন্তু নিহত ব্যক্তির অভিভাবকেরা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারবে)।

মাসআলাঃ ডাকাত দলে শিশু অথবা উন্মাদ থাকলে তাদেরকে কোনো শাস্তি দেয়া যাবে না। তিন ইমাম এ রকম বলেছেন। ইমামে আজম এবং ইমাম জোফারের মতে অন্য লোকদের উপর থেকে শরিয়তের শাস্তি (হদ) রহিত হয়ে যাবে (বাকী থাকবে কেবল কিসাসের হক)। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, যদি কেবল সুস্থ মস্তিষ্ক লোকেরা অপরাধ করে (হত্যা ও লুণ্ঠনে যদি শিশু ও উন্মাদেরা অংশগ্রহণ না করে থাকে) তবে শিশু ও উন্মাদ বাদে অন্য লোকদের উপর হদ জারী করে দিবে। আর যদি শিশু ও পাগলেরাও অপরাধ সংঘটনে শরিক থাকে, তবে সকলের উপর থেকে হদ রহিত হয়ে যাবে, বাকী থাকবে কেবল কিসাস। এই মতবিরোধ দেখা দিবে তখনই, যখন ডাকাতের দলে থাকবে তাদের মুহ্‌রিম (যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ) আত্মীয়স্বজন।

ইমামে আজমের দলিল এই যে—অপরাধ একটিই, যা সবার উপর প্রযোজ্য হবে (যদি অপরাধী একজন এবং তার সহযোগী অন্য সকলে হয়)। এমতোক্ষেত্রে সবাইকে অপরাধী বলে সন্দেহ করা জরুরী হয়। আর সন্দেহের অবস্থায় হদ জারী হতে পারে না। জমহুর বলেছেন, সন্দেহকে অধিক গুরুত্ব দিলে হদের (শরিয়তসম্মত শাস্তির) অবকাশ আর থাকবে না।

মাসআলাঃ যদি কোনো দলের সদস্য একে অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করে, তবে হদ ওয়াজিব হবে না। কারণ, দলের সকলেই নিরাপত্তার দিক থেকে একই অধিকারভূত। যেমন, এক বাড়ীর দু'জন সদস্যের মধ্যে একে অপরের সম্পদ লুণ্ঠন করলে হদ জারী করা যায় না। তবে হদ ওয়াজিব না হলেও কিসাস ও সম্পদ বিনিময় ওয়াজিব হবে।

আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য সম্পাদনকারীদের শাস্তির বিবরণ দানের পর, আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে— দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। সুতরাং মনে রাখতে হবে দুনিয়ার শাস্তিই তাদের শেষ শাস্তি নয়, আখেরাতেও তাদের জন্য রাখা হয়েছে কঠোর শাস্তি।

www.eelm.weebly.com

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

❐ তবে, তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসিবার পূর্বে যাহারা তওবা করিবে তাহাদের জন্য নহে। সুতরাং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বাগবী লিখেছেন, যে সকল আলেম মনে করেন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কাফেরদের সম্পর্কে, তাঁদের মতে এর অর্থ হবে 'মুজরিম' (হত্যাকারী, ছিনতাইকারী) কাফেরেরা গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে যদি শিরিক থেকে প্রত্যাবর্তন করে মুসলমান হয়ে যায়, তবে তাদের উপর হদ জারী করা যাবে না এবং কাফের অবস্থায় তারা খুন, ছিনতাই যা কিছু করে থাকুক না কেনো— তারজন্য তাদেরকে অভিযুক্ত করা যাবে না।

আমি বলি, এই নিয়মেই কোনো 'হরবী' (অমুসলিম দেশের কাফের) বন্দী হওয়ার পর যদি শিরিক থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তবে মুসলমান হওয়ার পর তার বিগত অপরাধের ব্যাপারে তাকে অভিযুক্ত করা যাবে না। অন্যান্য আয়াতেও এই বিষয়টির প্রমাণ রয়েছে। তেমনি মুসলমান অথবা জিম্মি (মুসলিম দেশের কাফের) যদি ডাকাতি অথবা ছিনতাই করার পর গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তওবা করে নেয়, তবে তার উপরেও হদ জারী হবে না। তবে আল্লাহ্র বান্দার হক সম্পর্কে সে অভিযুক্ত হবে। কারো কারো মতে তাও হবে না। তওবার পর বিগত অপরাধের অভিযোগ আর থাকে না। তবে তওবাকারী ছিনতাইকারীর নিকট যদি ছিনতাইয়ের মাল বিদ্যমান থাকে, তবে তা ফেরৎ দিয়ে দিতে হবে।

এক বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলীর খাদেম হারেসা বিন বদর পালিয়ে গিয়ে ডাকাত হয়ে গেলো। সে খুন করলো। লুণ্ঠনও করলো। কিছু দিন পর গ্রেফতার হওয়ার আগেই সে তওবা করে নিজে নিজেই হজরত আলীর দরবারে উপস্থিত হলো। হজরত আলী তার নিকট থেকে কোনো কৈফিয়ত চান নি। শা'বী থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা, আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে আবীদ্দুনিয়া, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম। ইবনে আবী শায়বা এবং আবদ বিন হুমাইদ আশয়াসের মাধ্যমে হজরত আবু মুসা থেকেও এ রকম বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাসূত্রে আশয়াস ও হজরত আবু মুসার মধ্যে একজন অপরিচিত ব্যক্তি রয়েছেন।

জমহুরের নিকট হক্কুল ইবাদ (বান্দার হক) রহিত হয় না। তাই খুন এবং ছিনতাইয়ের পর গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করলেও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা কিসাস (বদলা) অথবা ক্ষমা করার অধিকার রাখবে। আর ছিনতাইয়ের মাল

www.eelm.weebly.com

মওজুদ থাকুক অথবা বিনষ্ট হয়ে যাক কিংবা ডাকাতেরা নষ্ট করে দিয়ে থাকুক বা ব্যয় করে থাকুক—সকল অবস্থায় পরিশোধ করতে হবে (মওজুদ থাকলে ঐকমত্যানুসারে ফেরৎ দিতে হবে এবং বিনষ্ট হয়ে থাকলে দিতে হবে জরিমানা)।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হদ ওয়াজিব এবং সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র হক। আল্লাহ্র হকই অগ্রগন্য। তাই আল্লাহ্র হক প্রতিষ্ঠা করলে বান্দার হক রহিত হয়ে যায়। সে কারণেই কিসাস ও জরিমানা রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু পৃথক আয়াতে তওবার কথা বলা হয়েছে বলে তওবার পর হদ ওয়াজিব থাকবে না। তাই বান্দার হকও রহিত হয়ে যাবে। বাকি থাকবে কেবল জরিমানা। অন্য আয়াতেও এর প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং এই আয়াতের হুকুমটি রহিত হওয়ার প্রমাণ যখন নেই, তখন এই হুকুমটি কার্যকর থাকবে। প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ্তায়ালাই অবগত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৩৫

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর, তাহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁহার পথে সংগ্রাম কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

'ওয়াব্তাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা' (নৈকট্যলাভের উপায় অন্বেষণ করো) — কথাটির অর্থ, আল্লাহ্পাকের নৈকট্য অন্বেষণ করো। হজরত হুজায়ফা থেকে হাকেম এ রকম বলেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ফারইয়ানি, আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেমও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

আমি বলি, এখানে নৈকট্য অর্থ সত্তাগত (জাতী) নৈকট্য— যা বাহ্যিক নৈকট্যের অনেক উর্ধ্বে। কামুস অভিধানে বলা হয়েছে, শব্দটির অর্থ শাহী নৈকট্য, মর্যাদা, অবস্থান ইত্যাদি। 'ওয়াসিল'—এর প্রকৃত অর্থ আগ্রহান্বিত হওয়া। সীহাহ্ গ্রন্থে রয়েছে 'ওয়াসিলা'(সিন সহযোগে) উৎসারিত হয়েছে বিশেষভাবে 'ওয়সিলা'(ছোয়াদ সহযোগে) থেকে। 'ওয়াসিলা' অর্থ আগ্রহের সঙ্গে কোনো গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছানো। আর (ছোয়াদ সহযোগে) ওয়াসিলা অর্থ মিলিত হওয়া। প্রথম অর্থটিতে রয়েছে ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের অনুপ্রবেশ।

হাদিস শরীফে এসেছে, নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালার নিকট ওয়াসিলার একটি স্তর রয়েছে। ওই স্তরের উর্ধ্বে আর কোনো স্তর নেই। তোমরা আল্লাহ্তায়ালার নিকট এই বলে প্রার্থনা করো; হে আমার আল্লাহ্, আমাদেরকে ওই উচ্চ স্তর দান করো। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে ইমাম আহমদ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা মুয়াজ্জিনের উচ্চারণের অনুরূপ কথায় আজানের জবাব দিবে এবং আজান শেষে আমার উপর দরুদ পাঠ করবে। যে ব্যক্তি একবার আমার উপর রহমতের দোয়া করবে, আল্লাহ্পাক তাঁর উপর দশ বার রহমত বর্ষণ করবেন। অতঃপর যে আমার নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহ্পাকের নিকট প্রার্থনা জানাবে, তার জন্য আমার শাফায়াতের দরোজা উন্মুক্ত হবে।

একটি সন্দেহঃ হাদিস সমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্পাকের নৈকট্য অন্বেষণের একটি বিশেষ স্তর রয়েছে। ওই স্তরটি সর্বোচ্চ। নস (কোরআন ও হাদিস) এবং উম্মতের ঐকমত্যের মাধ্যমে এ কথাটিও সুসাব্যস্ত যে, ওই সর্বোচ্চ স্তরটি কেবল রসুল স. এর জন্য সুনির্দিষ্ট। যদি তাই হয়, তবে এ আয়াতের মাধ্যমে অন্যদেরকে নৈকট্য অন্বেষণের নির্দেশ দেয়া হলো কেনো? তবে কি বুঝতে হবে অন্যরাও ওই সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম?

সন্দেহের অপনোদনঃ আমি বলি, রসুল স. এর জন্য ওই সর্বোচ্চ নৈকট্যের স্তর অন্য কারো মাধ্যম ব্যতিরেকেই বিশেষভাবে নির্ধারিত। কিন্তু তাঁর উম্মতের আওলিয়া, কামেল ব্যক্তিরাও তাঁর স. এর মাধ্যমে ওই স্তরে পৌঁছুতে সক্ষম। রসুল স. এর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত ওই স্তরে তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীরা পৌঁছতে পারবেন না—এ রকম কথা কোথাও বলা হয়নি। হাদিস শরীফে কেবল বলা হয়েছে, ওই স্তরের উপর রসুল স. এর মাধ্যমবিবর্জিত সুনির্দিষ্ট অধিকারের কথা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী র. এর মকতুবাত শরীফ পাঠ করতে হবে। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, ওয়াসিলা বা নৈকট্য অন্বেষণের নির্দেশটি একটি সাধারণ নির্দেশ। নৈকট্যের পথ পরিক্রমার প্রতিটি স্তরই ওয়াসিলা। ওই স্তরগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরটির অধিকার কেবল রসুল স. এর। অন্য সকল ওয়সিলা ওই সর্বোচ্চ ওয়সিলা অপেক্ষা নিম্নমানের। আল্লাহ্পাক সমধিক জ্ঞাত।

দ্রষ্টব্যঃ জুহুরী তাঁর সীহাহ্ গ্রন্থে লিখেছেন, অন্বেষণের আগ্রহ ও প্রেম ওয়াসিলার অভিলাষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, প্রেমভালোবাসা ছাড়া নৈকট্যের সুউচ্চ শিখরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। এ কথার সমর্থন রয়েছে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী কাদ্দাসা সিররুহুর বক্তব্যে। তিনি বলেছেন, 'সায়ের' বা আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণের পথে অকল্পনীয় নৈকট্যের সর্বোচ্চ স্তর রয়েছে। ওই স্তরের উর্ধ্বে আর কোনো স্তর নেই। ওই স্তর সম্পর্কে রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাকের সঙ্গে আমার একটি বিশিষ্ট সময় রয়েছে। ওই সময় আমার সঙ্গে কোনো নৈকট্যধারী ফেরেশতা কিংবা নবী রসুল অংশগ্রহণ করেন না (আমি সেখানে এককভাবে ফয়েজ আহরণকারী)। এই সায়েরটি কেবল মহব্বতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। (কেবল প্রেমমহব্বতের মাধ্যমেই ওই উচ্চ শিখরে আরোহণ করা যায়)। ওই প্রেম ভালোবাসা সুন্নতের একনিষ্ঠ অনুসরণের প্রতিফল। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, কুল ইন্‌কুনতুম তুহিব্বুনাল্লহা

www.eelm.weebly.com

ফাত্তাবিয়ুনি ইউহ্বিব্ কুমুল্লাহ্ (আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্র ভালোবাসা পেতে চাও তবে আমার অনুসারী হও, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন)। রসুল স. এর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুসরণের মাধ্যমে ওই অমূল্য প্রেম আল্লাহ্পাকের দয়াতেই কেবল অর্জন করা যায়।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়া জাহিদু ফি সাবিলিল্লাহিলা আল্লাকুম তুফলিহুন'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্র পথে আল্লাহ্র শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো, সে শত্রু নফস, শয়তান অথবা কাফের যেই হোক না কেন। আল্লাহ্পাকের সন্তোষ অর্জনার্থে তাঁর সকল শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হও। যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারো। অর্থাৎ এখলাসের (বিশুদ্ধতার) সঙ্গে আল্লাহ্পাকের ইবাদত করে পূর্ণ তাকওয়া এবং ওয়াসিলা অন্বেষণের মাধ্যমে সফলতার শিখর স্পর্শ করে ধন্য হতে পারো।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে কিয়ামতের দিন শাস্তি হইতে মুক্তির জন্য পণস্বরূপ দুনিয়ায় যাহা কিছু আছে যদি তাহাদের তাহার সমস্ত থাকে এবং তাহার সহিত সমপরিমাণ আরও থাকে তবুও তাহাদের নিকট হইতে তাহা গৃহীত হইবে না এবং তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

❒ তাহারা অগ্নি হইতে বাহির হইতে চাহিবে; কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইবার নহে এবং তাহাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রহিয়াছে।

যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) তারা আল্লাহ্পাকের অভিসম্পাতগ্রস্ত ও চিরবঞ্চিত। তাই আখেরাতে তাদের কঠোর আযাব হবে। কোনো কিছুর বিনিময়েও সেই আযাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। যদি ধরে নেয়া যায়— তাদের সন্তান সন্ততি, ধন-সম্পদ এবং প্রিয় বস্তুসমূহ সেদিন তাদের অধিকারে থাকে এবং সেগুলোকে যদি সেখানে দ্বিগুণ করে দেয়া হয়— আর কাফেরেরা যদি সে সকল কিছুর বিনিময়ে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করে, তবু তাদের বিনিময় গৃহীত হবে না। কারণ, আখেরাত আমলের স্থান নয়, আমলের প্রতিফল লাভের স্থান। তাই শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়া লাহুম আযাবুন আলিম'

www.eelm.weebly.com

(এবং তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে)। এ কথার মাধ্যমে পরিষ্কার বুঝা যায়, আখেরাতে কাফেরদের শাস্তি কোনো কিছুর বিনিময়ে রহিত তো হবেই না, লঘু শাস্তির সুযোগও তারা সেখানে পাবে না। বরং তাদের শাস্তি হবে কল্পনাতীতরূপে কঠিন।

হজরত আনাসের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কম শাস্তিপ্রাপ্ত দোজখীকে আল্লাহ্‌পাক বলবেন, যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর অধিকারী হতে, তবে শাস্তি থেকে অব্যাহতির জন্য তুমি কি ওই সমূদয় বস্তু দিয়ে দিতে? দোজখী বলবে, নিশ্চয়ই। আল্লাহ্‌পাক বলবেন, তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে তখন আমি তোমার নিকট থেকে ছোট্ট একটি কথা আশা করেছিলাম। কথাটি এই —আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু তুমি পৃথিবীতে পদার্পণের পর সেই শিরিকেই আমস্তক নিমজ্জিত ছিলে। বোখারী, মুসলিম।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে, সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা নরকাগ্নি থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে, কিন্তু পারবে না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তারা দোজখ থেকে বের হতে উদ্যত হলে তাদেরকে দোজখের দিকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। এ কথার অর্থ তারা পরিত্রাণের প্রার্থনা জানাবে। বলবে, রব্বানা আখরিজনা' মিনহা (হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দোজখ থেকে বের করে দিন)। এই আয়াতে তাদের প্রার্থনার অনড় জবাব দেয়া হয়েছে এভাবে—ওয়া মাহুম বিখরিজিনা মিন হা (কিন্তু তারা তা থেকে বের হবার নয়)। পরক্ষণেই স্পষ্টরূপে বলে দেয়া হয়েছে— তাদের নরকমুক্তি কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। দোজখই তাদের চিরকালিন আবাস। তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি (ওয়া লাহুম আযাবুম মুক্বিম)। আলোচ্য আয়াত দু'টোর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হচ্ছে এই— কোনো কিছুর বিনিময়ে কাফেরদের দোজখমুক্তি যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব তাদের শাস্তি লঘু হওয়া এবং আযাব চিরস্থায়ী না হওয়া।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৩৮

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

❑ পুরুষ কিংবা নারী চুরি করিলে তাহাদের হস্তচ্ছেদন কর; ইহা উহাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহের নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

পুরুষ কিংবা নারী— যে কেউ চুরি করুক না কেনো, তার হস্ত কর্তন করতে হবে—এটাই চুরির শাস্তি। এ শাস্তি আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড বিধান। দণ্ড বিধানের অধিকার তাঁর। কারণ, তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অতুলনীয় পরাক্রমের অধিকারী ও প্রজ্ঞাময়।

www.eelm.weebly.com

কোরআনের অধিকাংশ বিধানে রমণীদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি। পুরুষদের উপর প্রদত্ত বিধানে স্বাভাবিকভাবে রমণীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে চুরির দণ্ডাদেশ দানের সময় এবং অন্য আয়াতে ব্যভিচারের দণ্ডাদেশ উল্লেখের প্রাক্কালে নারী ও পুরুষের কথা স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হয়েছে। এখানে পুরুষের উল্লেখ এসেছে নারীর আগে। কারণ, চুরি করতে গেলে প্রয়োজন হয় কৌশল ও সাহসের—যা নারীর তুলনায় পুরুষের মধ্যে থাকে অধিক। আর ব্যভিচারের দণ্ডাদেশ বর্ণনার সময় নারীর উল্লেখ এসেছে পুরুষের আগে। কারণ, পুরুষ অপেক্ষা নারীর কামপ্রবৃত্তি অধিক।

চুরির শাস্তি হস্ত কর্তন। কারণ, হাতই চুরির প্রধান অঙ্গ। ব্যভিচারের শাস্তির বেলায় কিন্তু ব্যভিচারের প্রধান অঙ্গ কর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়নি। কারণ, তা বংশ বিস্তারেরও অঙ্গ।

কাঁধ থেকে হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত পুরো অঙ্গটিকেই বলা হয় হাত। খারেজীরা তাই বলে, চুরির শাস্তি স্বরূপ কাঁধ পর্যন্ত পুরো হাতই কেটে ফেলতে হবে। কিন্তু ইসলামের শুরু থেকে সকল উম্মত এই আমলটি করে চলেছেন যে—চুরি করলে হাত কাটতে হবে কব্জি পর্যন্ত। এই অভিমতটি ঐকমত্যাগত। ঐকমত্যটি এতোই প্রসিদ্ধ যে, এর জন্য কোনো দলিল উপস্থাপনের প্রয়োজনই নেই। কারণ, সকল উম্মত কখনো কোনো ভুলের উপর একমত হতে পারে না। তাছাড়া বিশেষভাবে কতিপয় হাদিসেও চুরির শাস্তি হিসেবে কব্জি পর্যন্ত কেটে ফেলার কথা এসেছে।

হজরত সাফওয়ানের চাদর চুরির ব্যাপারে দারা কুতনী একটি বর্ণনা এনেছেন— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. চোরের কব্জি পর্যন্ত হাত কাটার হুকুম দিয়েছিলেন। এই হাদিসের এক বর্ণনাকারী আযরীকে অবশ্য দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে। কামেল গ্রন্থে ইবনে আদী এই হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে। এই বর্ণনাসূত্রসংযুক্ত আবদুর রহমান বিন সালমা সম্পর্কে ইবনে কাত্তান মন্তব্য করেছেন আমি জানি না তিনি দুর্বল না অপরিচিত।

রেজা বিন হায়াতের মাধ্যমে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এক ব্যক্তির হাত কব্জি পর্যন্ত কেটে দিয়েছিলেন। বর্ণনাটি মুরসাল। ইবনে আবী শায়বা এ কথাটিও লিখেছেন যে, হজরত ওমর এবং হজরত আলী চোরের কব্জি পর্যন্ত হাত কেটে দিয়েছিলেন।

কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, হাত বলতে কব্জি পর্যন্ত হাত এবং কাঁধ পর্যন্ত হাত—দু'টোই বুঝায়। তবে কব্জি পর্যন্ত হাতকেই প্রকৃত পক্ষে হাত বলে। যদিও সম্পূর্ণ হাতকেও হাত বলা হয়। সুতরাং হাত বলতে কব্জি পর্যন্ত হাত এই অর্থটি গ্রহণ করা উচিত। এর অধিক হওয়ার ব্যাপারটি সন্দেহপূর্ণ।

হজরত ইবনে মাসউদ 'আইদিহিমা'—এর পরিবর্তে পড়তেন 'আইমানিহিমা।' সুতরাং আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, 'আইদি' অর্থ ডান হাত। আর হজরত ইবনে মাসউদের ক্বেরাতটিই বিখ্যাত এবং আয়াতের সম্পর্ক হুকুমের সঙ্গে। ঘটনাও এখানে এক। সুতরাং হুকুমের সঙ্গে যদি আয়াতের সম্পর্ক হয় এবং প্রকৃত ঘটনাও এ রকম হয়, তবে মশহুর হাদিসে আলোচিত সীমারেখা দ্বারা সীমিত করা সিদ্ধ। এটা কোনো সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নয়। কেননা, এখানে সংক্ষিপ্ত বলে কিছু নেই।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. এবং তাঁর সাহাবীগণ চোরের ডান হাত কেটে দিতেন। যদি আয়াতের মর্ম সাধারণ হতো তবে রসুল স. ও সাহাবীগণ নিশ্চয়ই ডান হাত কাটতেন না। কাটতেন বাম হাত। আর সেটাই ছিলো সহজতর বিধান। কারণ, ডান হাতই বাম হাতের চেয়ে বেশী কাজে লাগে। কিন্তু রসুল স. এ রকম করেননি। তিনি স. কেটেছিলেন ডান হাত। আর সাহাবীগণও ছিলেন তাঁর যথার্থ অনুসারী।

চুরি (সরাক্বাহ্) বলে ওই অপকর্মকে যা সংরক্ষিত স্থান থেকে চুপিসারে নিয়ে নেয়া হয়। কামুস গ্রন্থে রয়েছে—সরাক্বা মিনহু শাইয়া ওয়াসতারাক্বহু (গোপনে সুরক্ষিত স্থানে গিয়ে সেখান থেকে অন্যের মাল নিয়ে আসা)। অর্থাৎ গোপনে সুরক্ষিত স্থান থেকে অন্য কারো সম্পদ নিয়ে আসার নাম চুরি। তাই চুরির জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো জরুরী।

১. সম্পদ হতে হবে কোনো ব্যক্তির বা দলের মালিকানার অধীন। যে গোপনে ওই সম্পদ চুরি করে নিয়ে যাবে, ওই সম্পদের মধ্যে তার (চোরের) কোনো স্বত্ব থাকা যাবে না, স্বত্ব আছে এ রকম সন্দেহও থাকা যাবে না।

২. সম্পদ সংরক্ষিত অবস্থায় থাকতে হবে। সংরক্ষণের ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকা চলবে না।

ইমাম আবু হানিফার নিকট কোনো একটি বস্তু হেফাজতে থাকলে অন্য সকল বস্তু হেফাজতে আছে বলে ধরে নেয়া যাবে। কিন্তু অন্য তিন ইমামের নিকট বিভিন্ন প্রকার সম্পদের বিভিন্নভাবে হেফাজত করতে হবে। সম্পদগুলো আলাদাভাবে চিনতে পারলেই হলো। যেমন, ঘোড়ার আস্তাবল অথবা বকরির ঘর হতে মনিমুক্তা চুরি হলে ইমাম আজমের মতে চোরের হাত কাটা যাবে। অন্য তিন ইমামের মতে যাবে না। আস্তাবল এবং বকরি রাখার স্থান নির্মিত হয় ঘোড়া ও বকরির জন্যই, মনিমুক্তার জন্য নয়। গৃহ নির্মিত হয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্তেই। গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য এটাই। যেমন অর্থশালা, ব্যাংক ভবন ইত্যাদি। কখনো আবার কেবল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষিত হয়। যেমন, কোনো লোক রাস্তা অথবা মসজিদে নিজের মাল সামান রেখে তার উপর নজর রাখতে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে কেবল দেখাশুনার মাধ্যমে সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

হজরত সাফওয়ান একবার মসজিদে শায়িত ছিলেন। এক লোক তখন তার মস্তকের নিচে রক্ষিত চাদর চুরি করে নিয়ে গেলো। রসুল স. ওই চোরের হাত কেটে দিয়েছিলেন। ইমাম মালেক এ ঘটনাটি তাঁর মুয়াত্তা'য় লিপিবদ্ধ করেছেন। আহমদ, হাকেম, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাও এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তানকীহ্ রচয়িতা লিখেছেন, এই হাদিসটি বিভিন্নরূপে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর বক্তব্যেও রয়েছে বিভিন্নরূপ। সেগুলোর কোনো কোনো সূত্র সুদৃঢ় এবং কোনো কোনো সূত্র দুর্বল (কিন্তু ঐকমত্যানুযায়ী হাদিসটি বিশুদ্ধরূপে বিবেচিত)।

www.eelm.weebly.com

দিবাভাগে চুরির প্রথম ও শেষ অবস্থা গোপন থাকা জরুরী। আর রাতের চুরির প্রথম অবস্থা গোপন থাকাই যথেষ্ট। যেমন, চোর হয়তো দেয়ালে সিঁদ কাটতে শুরু করলো। এ কাজ তাকে করতে হবে গোপনে। পরে সে জেগে ওঠা গৃহকর্তার নিকট থেকে বলপূর্বক মালমাত্রা নিয়ে উধাও হয়ে যেতে পারে। চোর যা চুরি করবে, তার উপর তার সার্বিক কিংবা আংশিক মালিকানা যেনো না থাকে এবং সম্পদ যেনো থাকে সংরক্ষিত অবস্থায়। এই শর্ত দু'টো মারফু হাদিস থেকে সংকলিত হয়েছে। হজরত আয়েশা থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন শাফেয়ী, তিরমিজি, হাকেম এবং বায়হাকী। বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। রসুল স. বলেছেন, যতোদূর সম্ভব মুসলমানদের উপর হদ (শরিয়তসম্মত শাস্তি) অপসারণের চেষ্টা করো। শাস্তি থেকে অব্যাহতির কোনো উপায় বের করতে পারলে তাকে ক্ষমা করে দাও। শাস্তিদানের ক্ষেত্রে বিচারকের ভুল অপেক্ষা ক্ষমা করে দেয়ার ভুল উত্তম (বিচারকের আওতায় আসার পূর্বেই ক্ষমা করে দাও)।

উত্তমসূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত ইবনে মাজার মারফু হাদিসে রয়েছে— রসুল স. বলেছেন, শাস্তি রহিত করার কোনো উপায় বের করতে পারলে তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর থেকে শাস্তি রহিত করো। হজরত আলীর মারফু বর্ণনায় রয়েছে, হুদুদ (শাস্তি) রহিত করে দাও, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়ার পর বিচারক শাস্তি রহিত করতে পারবে না, শাস্তিকে লঘুও করতে পারবে না। উত্তম সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, দারা কুতনী ও বায়হাকী।

শিথিল সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আদী বর্ণিত মারফু বর্ণনায় রয়েছে— সন্দেহ দেখা দিলে হুদুদকে রহিত করে দাও এবং মানুষের ভুলকে ক্ষমা করে দাও। হাদিসটির প্রথমাংশ ওমর বিন আবদুল আজিজের মাধ্যমে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন, আবু মুসলিম কাহী এবং ইবনে সামানী। আর মাওকুফ হিসাবে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন মোসাদ্দাদ। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সন্দেহ দেখা দিলে হুদুদকে রহিত করা যাবে।

চুরির শর্তসমূহ সম্পর্কে এতোক্ষণ ধরে আমরা আলোচনা করলাম। এবার বর্ণনা করা হচ্ছে— চুরি সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল।

মাসআলাঃ যারা লুটপাট ও রাহাজানি করে তাদের হাত কাটা যাবে না। কারণ, এরা প্রকাশ্যে সম্পদ লুণ্ঠন করে, গোপনে চুরি করে না। খেয়ানতকারী বা আমানত অস্বীকারকারীদের হাত কাটা যাবে না। কারণ তারা চোর নয়। তাদেরকে সম্পদের মালিক স্বেচ্ছায় তাদের সম্পদ আমানত হিসেবে অর্পণ করে। আমানত গ্রহণকারী আমানত দাতার সম্পদের সংরক্ষক। কিন্তু চোর গৃহকর্তার সম্পদের সংরক্ষক নয়। হজরত জাবেরের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ছিনতাইকারীদের উপর হস্তকর্তনের শাস্তি নেই। কিন্তু তারা আমাদের দলভূত নয় (ছিনতাইকারীরা আমি ও আমার সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত নয়)। আবু দাউদ। হজরত জাবেরের দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে— রসুল স. বলেছেন, ছিনতাইকারীদের উপর হস্তকর্তনের শাস্তি নেই। আমানত আত্মসাতকারী, প্রতারক ও কৌশলে

www.eelm.weebly.com

সম্পদ হস্তগতকারীর উপরেও নেই। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও দারেমী। তিরমিজি হাদিসটিকে বলেছেন উত্তম ও বিশুদ্ধ। এই হাদিসের সমর্থনে হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে ইবনে মাজাও একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত আনাস থেকে জুহুরীর পদ্ধতিতে আওসাত গ্রন্থে তিবরানীও এ রকম হাদিস এনেছেন। এ রকম আরো বর্ণনা করেছেন আল এলাল গ্রন্থে ইবনে জাওজী, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

ইমাম আহমদ বলেছেন, ঋণ গ্রহণ করার পর অস্বীকার করলে তার হাত কাটা ওয়াজিব। জননী আয়েশার হাদিসে এসেছে, মাখজুমী গোত্রের এক মহিলা মানুষের নিকট থেকে কিছু জিনিসপত্র কর্জ হিসেবে গ্রহণ করে কর্জকে অস্বীকার করলো। রসুল স. তার হাত কেটে ফেলার হুকুম দিলেন। তখন ওই মহিলার আপনজনেরা হজরত উসামা বিন জায়েদের নিকটে সাহায্যপ্রার্থী হলো। হজরত উসামা সুপারিশের উদ্দেশ্যে রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলেন। তিনি স. বললেন, উসামা! আমি চাই তোমরা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত হদের ব্যাপারে যেনো কিছু না বলো। এরপর তিনি স. বহির্বাটিতে গমন করলেন এবং সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাদের পূর্ব যুগের লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। প্রভাবশালী ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো। যার অলৌকিক হস্তে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তার শপথ! যদি মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করে, তবে আমি তার হাতও কেটে দিবো। এ কথা বলে তিনি স. মাখজুমী মহিলার হাত কেটে দিলেন। মুসলিম।

হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, মাখজুমী সম্প্রদায়ের এক রমণী এক লোকের নিকট থেকে ঋণ স্বরূপ কিছু সামগ্রী গ্রহণ করার পর ঋণ পরিশোধ করতে অসম্মত হলো। রসুল স. তার হস্তকর্তনের নির্দেশ দিলেন।

এই হাদিস সম্পর্কে জমহুর বলেছেন, ওই মাখজুমী মহিলা ঋণ অস্বীকারের কারণে ছিলো কুখ্যাত। হজরত আয়েশার হাদিসে তাই ঋণ অস্বীকারের কথাটি উল্লেখিত হয়েছে। কারণ, তার ঋণ অস্বীকারের বিষয়টিই ছিলো সুবিদিত। একবার সে চুরিও করলো। সেই অপরাধেই তার হাত কেটে নেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রসুল স. তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, অতীত যুগের লোকেরা ধ্বংস হয়েছিলো এ কারণে যে, চুরি করলেও তারা প্রভাবশালী লোককে ছেড়ে দিতো এবং দুর্বল ব্যক্তির হস্ত কর্তন করতো। এই ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ওই মাখজুমী মহিলা চুরিও করতো। নতুবা কেবল ঋণ অস্বীকারের কথা বলা হতো, চুরির কথা উঠতো না। তাছাড়া রসুল স. তাঁর ভাষণে বলেছিলেন— ফাতেমা চুরি করলেও আমি তার হাত কেটে দিতাম। তাঁর এ কথায় পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ওই মহিলাটি চুরিও করতো। চুরি না করলে উপস্থিত লোকেরা নিশ্চয়ই বলে উঠতেন, ইয়া রসুলাল্লাহ, মহিলাটি তো চুরি করেনি। সে অস্বীকার করেছে ঋণ। অথচ আপনি তার উপর চুরির শাস্তি আরোপ করছেন। লক্ষ্যণীয় যে, হজরত আয়েশার হাদিসে মাখজুমী মহিলাটির ঋণ অস্বীকারের সাধারণ দুর্নামটির কথা

www.eelm.weebly.com

বলা হয়েছে। বিশেষভাবে প্রমাণিত কোনো ঘটনার কথা তিনি বলেননি। যতো দুর্নামই থাক, সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত কারো প্রতি কি শাস্তি আরোপ করা যায়? সুতরাং এ কথাটি মেনে নিতে হবে যে, মহিলাটি চুরি করেছিলো এবং তা প্রমাণিতও হয়েছিলো। তাই রসুল স. তার হস্তকর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হাদিসটিকে প্রকাশ্যতঃ মেনে নিলে হজরত জাবের বর্ণিত ওই হাদিসটিকেও গ্রহণ করতে হবে— যেখানে বলা হয়েছে, আমানত খেয়ানতকারীর হাত কাটা যায় না। হজরত জাবেরের হাদিসটিকেই উম্মতেরা গ্রহণ করেছেন। অতএব জননী আয়েশার হাদিসটি রহিত বলে ধরে নিতে হবে।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, কাফন চোরের হাত কাটা যাবে না। কারণ, কাফনের কোনো ওয়ারিশ নেই। আর কাফন সুসংরক্ষিতও নয়। কাফন দাফনের পর ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত পূর্ণ করে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি কোরআনের বিধানানুসারে বণ্টন করতে হয়। কিন্তু কাফন বণ্টন করা যায় না। কারণ, উত্তরাধিকারীরা কাফনের মালিক নয়। মৃত ব্যক্তিও কাফনের মালিক হতে পারে না। মৃতদেহের মালিক হওয়ার কোনো যোগ্যতাই নেই। আর কবরও সম্পদ সংরক্ষণের স্থান নয়। এ রকম অরক্ষিত স্থান থেকে কিছু নিয়ে আসা চুরি হিসেবে গণ্য নয়। কবরস্থানে মানুষ সচরাচর চলাচল করে না। কবরের জন্য তালাচাবি, পাহারাদার কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয় না। সুতরাং সেখান থেকে কেউ কিছু নিয়ে এলে তাকে চোর সাব্যস্ত করে হাত কেটে ফেলা হবে কেনো?

ইমাম মালেক, ইমান শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, কাফন চোরের হস্তকর্তন করা যাবে। কেননা, রসুল স. বলেছেন, যে কাফন চুরি করবে আমি তার হাত কেটে দিবো। বায়হাকী। হাদিসটি পরিত্যক্ত। হজরত বারা বিন আজিব হাদিসটির বর্ণনাকারী। বায়হাকী লিখেছেন, এই হাদিসের সূত্রভূত এক বর্ণনাকারী অপরিচিত। বোখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, হাইশামের বর্ণনায় রয়েছে, সহল বলেছেন— আমার সামনে হজরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের এক কাফন চোরের হাত কেটে দিয়েছিলেন। কিন্তু সহল বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। আতা বলেছেন, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলি। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের বর্ণনায় রয়েছে, হাসান বসরী ও ইবনে সিরিন বলেছেন, কাফন চোরের হাত কাটা যাবে। মুয়াবিয়া বিন ফারদাহ্ও বলেছেন, কাফন চোরের হাত কাটা যাবে। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদিসগুলোর কোনোটিই মারফু পর্যায়ে উন্নীত হয়নি।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইব্রাহিম নাখয়ী এবং শায়বী বলেছেন, বায়তুল মাল থেকে কেউ কিছু চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে। ইমাম মালেকও বলেছেন, যাবে।

আমরা বলি, বায়তুল মালের মালিক সাধারণ জনগণ। চোরও ওই সাধারণ জনতার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বায়তুল মালে তারও কিছু না কিছু অংশ রয়েছে। ইবনে

www.eelm.weebly.com

আবী শায়বার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ওমর বলেছেন, বায়তুল মালে চোরেরও কিছু অধিকার রয়েছে (সুতরাং তাকে হস্তকর্তনের শাস্তি দেয়া যাবে না)। বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, যে ব্যক্তি বায়তুল মাল থেকে চুরি করবে, তার হাত কাটার নির্দেশ জারী করা যাবে না। ইবনে মাজার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জাকাত আদায়কারী এক গোলামকে গণিমতের সম্পদ থেকে চুরির অভিযোগে রসুল স. নিকট উপস্থিত করা হলো। তিনি স. তার হাত কাটতে বলেন নি। বলেছেন, আল্লাহ্র এক মাল অন্য মালকে চুরি করে নিয়েছে। এক ব্যক্তি বায়তুল মাল থেকে কিছু অপহরণ করলো। হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত ইবনে মাসউদ তখন বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কারণ এমন কেউ নেই, বায়তুল মালের মধ্যে যার অংশ নেই।

মাসআলাঃ এক শরীক অন্য শরীকের সুসংরক্ষিত সম্পদ অপহরণ করলে তার হাত কাটা যাবে না।

মাসআলাঃ এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে কিছু ঋণ প্রদান করলো। তারপর ঋণদাতা যদি ঋণ গ্রহণকারীর সম্পদ থেকে প্রদত্ত ঋণের সমপরিমাণ চুরি করে নেয়, তবে তার হাত কাটা যাবে না। কেননা, সে শুধু নিজের অধিকারটুকু আদায় করে নিয়েছে। যদি প্রদত্ত ঋণ অপেক্ষা অতিরিক্ত চুরি করে, তবুও তার হাত কাটা যাবে না। কারণ, চুরি করা সম্পদে রয়েছে ঋণদাতা ও গ্রহিতার সম্মিলিত মালিকানা।

মাসআলাঃ মাতা-পিতা এবং তাঁদের উপরের স্তরের মূল ও শাখা প্রশাখার লোকেরা যদি তাদের অধঃস্তন সন্তান-সন্ততির সম্পদ চুরি করে, তবে তাদের হাত কাটা যাবে না। রসুল স. বলেছেন, তোমাদের অস্তিত্ব ও সম্পদ— সবই পিতার (পিতৃপুরুষদের) অধিকারভূত। ঠিক তেমনি, সন্তান যদি তার মাতা-পিতা এবং ঊর্ধ্বস্তরের এবং তাদের ঊর্ধ্বতনদের কারো সম্পদ চুরি করে, তবে ইমামত্রয়ের মতে, তার হাত কাটা যাবে না। কেবল ইমাম মালেক বলেছেন, যাবে।

মুহ্‌রিম আত্মীয় (যাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ), যেমন ভাই-বোন অথবা চাচার সম্পদ চুরি করলে তিন ইমামের মতে তার হাত কাটা যাবে। কেবল ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যাবে না। কেননা, মুহ্‌রিম আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত সম্পদের নিরাপত্তার ব্যাপারটি থাকে অপূর্ণ। মুহ্‌রিমেরা একে অপরের গৃহে প্রবেশের অধিকার রাখে। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'তোমাদের নিজেদের জন্য কোনো অপরাধ নেই, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগ্নীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতুলদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে— যার চাবি রয়েছে তোমাদের হাতে কিংবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে।' এই আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, মুহ্‌রিমেরা একে অপরের গৃহে প্রবেশ করতে পারবে এবং তাদের ঘরে পানাহারও

www.eelm.weebly.com

করতে পারবে। পারবে না—এ রকম দলিল প্রমাণ হাজির করা হলেও বৈধতার অবকাশ থাকবেই। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'আংতা ওয়া মালুকা লিআবীকা' (তুমি ও তোমার সম্পদ, তোমার পিতার)।

একটি সন্দেহঃ উল্লেখিত আয়াতের ভাষ্যানুসারে প্রতীয়মান হয় যে, বিনা অনুমতিতে বন্ধুগৃহে পানাহার সিদ্ধ। সুতরাং বন্ধু গৃহ থেকে কিছু চুরি করলে নিশ্চয় হাত কাটা যাবে না।

সন্দেহের অপনোদনঃ বন্ধুগৃহে পানাহার করলে সে বন্ধুই থাকে। বরং এ রকম করলে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা প্রগাঢ় হয়। কিন্তু বন্ধুর সম্পদ চুরি করলে বন্ধুত্ব আর অটুট থাকে না। বন্ধু হয়ে যায় তখন শত্রু। তাই বন্ধুগৃহে চুরি করলে চোরের হাত কাটা ওয়াজিব হবে।

মাসআলাঃ যদি কেউ তার মুহ্‌রিম আত্মীয়ের ঘরে রক্ষিত অন্য কারো সম্পদ চুরি করে, তবে তার হাত কাটা যাবে না। কিন্তু অন্য কারো ঘরে রক্ষিত মুহ্‌রিম আত্মীয়ের মাল চুরি করলে ইমাম আবু হানিফার মতে হাত কেটে দিতে হবে। কারণ প্রথম অবস্থায় সম্পদের নিরাপত্তা ছিলো অপূর্ণ (মুহ্‌রিমের ঘরে তার প্রবেশাধিকার ছিলো)। দ্বিতীয় অবস্থায় সম্পদ ছিলো সুরক্ষিত (সেখানে তার প্রবেশাধিকার ছিলো না)। সুতরাং প্রথম অবস্থায় হাত কাটা যাবে না, দ্বিতীয় অবস্থায় যাবে।

মাসআলাঃ স্বামীর ঘর থেকে স্ত্রী, স্ত্রীর ঘর থেকে স্বামী অথবা তাদের সম্মিলিত বসবাসের গৃহ থেকে যদি কেউ কারো সম্পদ চুরি করে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে হাত কাটা যাবে না। ইমাম আহমদও এ রকম বলেছেন। ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও অনুরূপ। ইমাম মালেক বলেছেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বসবাস করে এ রকম কোনো ঘর থেকে অপরিচিত কোনো ব্যক্তির মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। কিন্তু যদি স্বামী স্ত্রীর ঘর থেকে এবং স্ত্রী স্বামীর ঘর থেকে অপরিচিত কোনো ব্যক্তির মাল চুরি করে, তবে তার হাত কাটা যাবে। ইমাম শাফেয়ীর প্রকৃত অভিমতও এ রকম। এক বর্ণনানুসারে, ইমাম আহমদও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, স্বামী যদি স্ত্রীর ঘর থেকে কিছু চুরি করে তবে তার হাত কাটা যাবে। কিন্তু স্ত্রী স্বামীর ঘর থেকে চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। কেননা, রসুল স. আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাকে বলেছিলেন, তুমি কি তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হবে—এ রকম সম্পদ আবু সুফিয়ানের নিকট থেকে নিয়েছো?

ইমামে আজমের দলিল এই—এতে করে বুঝা যায় স্ত্রীর ঘরে স্বামী এবং স্বামীর ঘরে স্ত্রী অনুমতি ছাড়াই যাওয়া আসা করতে পারে। কাজেই, এখানে সুরক্ষার ব্যাপারটি অপূর্ণ।

ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা'য় লিখেছেন, হজরত ওমরের নিকট এক ক্রীতদাসকে ধরে আনা হলো— যে তার প্রভুপত্নীর আয়না চুরি করেছে। হজরত

www.eelm.weebly.com

ওমর বললেন, এর উপর কোনো শাস্তি নেই। তোমাদেরই খাদেম তোমাদের মাল চুরি করেছে। এই বর্ণনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হলো যে, স্বামীর ক্রীতদাসের হাত কাটা যাবে না। সুতরাং স্বামীর হাত কর্তিত হবে কীভাবে?

মাসআলাঃ যদি ক্রীতদাস তার প্রভুর অথবা প্রভুপত্নীর কিংবা উভয়ের সম্পদ অপহরণ করে, তবে তার হাত কাটা যাবে না। কেননা, প্রভু ও প্রভুপত্নীর ঘরে তার প্রবেশাধিকার রয়েছে।

গৃহকর্তার অতিথি তার গৃহে অবস্থানের সময় চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। কেননা, গৃহকর্তার গৃহে তার রয়েছে স্বাগত প্রবেশাধিকার।

সাধারণজনের প্রবেশাধিকার যেখানে, সেখানে চুরি সংঘটিত হলে চোরের হাত কাটা যাবে না। যেমন, দিনের বেলা কোলাহল মুখর বাজারের দোকান। এ রকম দোকানে ক্রেতা বা ক্রেতারূপী মানুষের রয়েছে অবাধ প্রবেশাধিকার।

মাসআলাঃ যদি চোর নেসাব পরিমাণ মাল চুরি করে, তারপর যদি তা খরিদ করে অথবা মালিক তাকে তা দান করে দেয় কিংবা মীরাস স্বরূপ তা চোরের মালিকাধীনে এসে যায় এবং এ সকল কিছু যদি কাযীর নিকট মোকাদ্দমা পেশের পূর্বে হয়ে থাকে অথবা মোকাদ্দমা পেশের পর এবং রায় প্রদানের পূর্বে অথবা রায়ের পরও যদি হয়—সকল অবস্থায় ইমামে আজম এবং ইমাম মোহাম্মদের মতে, তার হাত কাটা যাবে না। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, যাবে। কেননা, চুরি সকল অবস্থায় পূর্ণ ও প্রমাণিত। এতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই।

এছাড়া হজরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া বলেছেন, আমি মসজিদে চোখ বুঁজে শুয়ে ছিলাম। চোর এসে আমার মাথার নিচ থেকে চাদর বের করে নিয়ে যেতে শুরু করলো। আমি তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে ফেললাম। তারপর রসুল স. এর নিকটে গিয়ে বললাম, এই লোক আমার কাপড় চুরি করেছে। রসুল স. চোরের হাত কাটতে নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমিতো এ রকম চাইনি। আমি চাদরটি তাকে দান করলাম। রসুল স. বললেন, আমার কাছে আসার আগে কেনো এমন করোনি। ইমাম মালেক, আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও নাসাঈ। কেবল নাসাঈর বর্ণনায় অতিরিক্ত এই কথাটি রয়েছে যে, অতঃপর রসুল স. তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্‌ বিন আমর বিন আস থেকে আবু দাউদ লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার পূর্বে তোমরা একে অপরের অপরাধ ক্ষমা করে দিও। যখন আমার নিকট কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধীকে উপস্থিত করা হয়, তখন তার উপর হদ জারী করা আমার উপর হয়ে যায় ওয়াজিব।

হানাফীগণের পক্ষ থেকে ইবনে হুম্মাম বলেছেন, হজরত সাফওয়ানের হাদিসের সূত্রসংযুক্ত একজন বর্ণনাকারী দুর্বল। ইতোপূর্বে সে কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হাকেম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত সাফওয়ান বলেন, আমি এ চাদর তাকে দিয়ে দিয়েছি। চাদরের মূল্য তার উপর ঋণস্বরূপ ছেড়ে দিয়েছি। কোনো কোনো বর্ণনায় আবার এ কথাগুলো আসেনি। এতোটুকু এসেছে যে,

www.eelm.weebly.com

হজরত সাফওয়ান বলেন, আমি এ রকম চাই না যে, তিরিশ দিরহামের জন্য একজন আরববাসীর হস্ত কর্তিত হোক। সকল অবস্থায় হাদিসের শেষ বর্ণনাগুলো এ রকম এলোমেলো পরিদৃষ্ট হয়। এ রকম এলোমেলো কথা অকাট্য প্রমাণ হওয়ার অন্তরায়। এটা এক ধরনের দুর্বলতা। শাস্তি কার্যকর করার পূর্বে চোরকে চুরি করা মালের মালিক বানিয়ে দিলে শাস্তি আরোপের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়। আর সন্দিগ্ধাবস্থায় হদ ওয়াজিব হয় না।

দ্রষ্টব্যঃ চোরের হাত কাটার পূর্বে দেখতে হবে চুরির মাল নেসাব পরিমাণ কিনা। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্যানুসারে নেসাবের ব্যাপারটি জরুরী। কিন্তু খারেজী, দাউদ জাহেরী, ইবনে নবত্ এবং শাফেয়ীর নিকট নেসাব জরুরী নয়। হাসান বসরীও এ রকম বলেছেন। কেননা, আয়াতে নেসাবের কথা বলা হয়নি। তাছাড়া হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, চোরের উপর আল্লাহ্‌র লানত। রশি অথবা ডিম চুরি করলেও হাত কেটে দিতে হবে। বোখারী, মুসলিম।

• আমরা বলি, আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, যদিও আয়াতে নেসাবের কথা বলা হয়নি, তবু নেসাব না থাকাকে নিষেধও করা হয়নি। অন্য শর্তগুলোর উল্লেখও আয়াতে নেই। তবু সেগুলোকে সকলে গ্রহণ করেছেন। যেমন, চুরি করা সম্পদে চোরের কোনো প্রকার মালিকানা না থাকা, সম্পদ অরক্ষিত অবস্থায় না থাকা, ইত্যাদি। খারেজীদের বক্তব্যকে গ্রহণ করা যাবে না। আর ঐকমত্য ছেড়ে দিয়ে দাউদ জাহেরী এবং হাসান বসরীর বক্তব্যও গ্রহণ করা সমীচীন নয়।

মাসআলাঃ একদল চোর চুরির মাল নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়ার পর, যদি দেখা যায় তাদের একক অংশে নেসাব পূর্ণ হচ্ছে না, তবে কারো হাত কাটা যাবে না। এ রকম বলেছেন, ইমামে আজম ও ইমাম শাফেয়ী। তাঁদের মতে প্রত্যেকের অংশে নেসাব পরিমাণ মাল থাকা জরুরী। কিন্তু ইমাম আহমদ বলেছেন, জরুরী নয়। সুতরাং প্রত্যেকেরই হাত কাটা যাবে। হজরত আবু হোরায়রার হাদিস থেকে এ রকম অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। ইমাম মালেক বলেছেন, চুরির মাল যদি এক নেসাব পরিমাণ হয় এবং একজন লোক যদি তা চুরি করে এবং তা স্থানান্তরিত করার সময় যদি পরস্পরের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে, তবে সকলের হাত কাটা যাবে। এ রকম না হলে কারো হাত কাটা যাবে না, যতোক্ষণ না প্রত্যেকের অংশ নেসাব পরিমাণ হয়।

মাসআলাঃ ইমাম আজমের মতে চুরির নেসাব দশ দেরহাম অথবা এক দিনার কিংবা তার মূল্যমানের সমান। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মতে, চুরির নেসাব দিনারের এক চতুর্থাংশ অথবা তিন দেরহাম অথবা ওই সম্পদ, যার মূল্য এ দু'টোর যে কোনো একটির সমান। ইমাম শাফেয়ীর মতে, এক দিনারের এক চতুর্থাংশ অথবা তার মূল্যমানের সমান। জননী আয়েশার মারফু হাদিসে রয়েছে, চুরির মাল দিনারের এক চতুর্থাংশ অথবা এর অধিক হলে হাত কাটা যাবে। ভিন্নসূত্রের বর্ণনায় রয়েছে, হাত কাটা যাবে না। কিন্তু নেসাব দিনারের চার ভাগের এক ভাগই হবে। বোখারী, মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

এক বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. এর যুগে ঢালের চেয়ে কম মূল্যের কোনো সামগ্রী চুরি হলে হাত কাটা হতো না। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, হাত কাটা যাবে না। কিন্তু এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ অথবা এর চেয়ে বেশী মূল্যের বস্তু চুরি হলে হাত কাটা যাবে।

মসনদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আয়েশার হাদিসে এসেছে, দিনারের চার ভাগের এক ভাগ মূল্যের সামগ্রী চুরি করলে হাত কাটো। এর চেয়ে কম মূল্যের হলে কেটো না। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. একবার ঢালের সমপরিমাণ মূল্যের সামগ্রী চুরির অপরাধে এক চোরের হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (অর্থাৎ তিন দেরহাম মূল্যের চুরির জন্য হাত কেটে দিয়েছিলেন)। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা'য় উমরা বিনতে আবদুর রহমান সূত্রে লিখেছেন, হজরত ওসমানের খেলাফতের সময় এক প্রকার ফল চোরকে ধরে নিয়ে আসা হলো। হজরত ওসমান ফলের মূল্য নিরুপণ করার নির্দেশ দিলেন। ফলের মূল্য নির্ধারিত হলো তিন দেরহাম। তখন হজরত ওসমান চোরের হাত কেটে দিলেন।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হদ রহিত হওয়ার জন্য কোনো না কোনো অসিলা থাকা জরুরী (সামান্য সন্দেহ দেখা দিলেও হদ রহিত হয়ে যায়)। চুরির নেসাব অধিক ধরাই যুক্তিযুক্ত। আর ঢালের মূল্য তিন দেরহাম অপেক্ষা অধিক। হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে মুজাহিদের মাধ্যমে আইমান থেকে লিখেছেন, রসুল স. এর সময়ে চুরির মাল ঢালের চেয়ে কম মূল্যের হলে হাত কাটা হতো না। ওই সময় ঢালের মূল্য ছিলো এক দিনার এবং দশ অথবা বারো দেরহাম।

হজরত আমর বিন শোয়াইব থেকে আহমদ, শাফেয়ী ও ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর জামানায় ঢালের মূল্য ছিলো দশ দেরহাম। ইবনে আবী শায়বা তাঁর মুসান্নিফ গ্রন্থে সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের মাধ্যমে মোজায়েনা গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, চুরি করা সামগ্রী যদি ঢালের মূল্যের সমান হয়, তবে চোরের হাত কেটে দেবে। আর ঢালের মূল্য দশ দেরহাম। দারা কুতনী, আহমদ, সালেম বিন কুতাইবাহ্, জোফার বিন হুজাইল। হাজ্জাজ বিন আরতাদ, আমর বিন শোয়াইব—তিনি শোয়াইব থেকে—তিনি তাঁর দাদার সূত্রে—তিনি তাঁর পিতামহের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রসুল স. বলেছেন, দশ দেরহাম মূল্যের চেয়ে কম মূল্যের সামগ্রী চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না। আবদুর রাজ্জাক, তিবরানী এবং কাশেম বিন মোহাম্মদের মাওকুফ বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেছেন, এক দিনার অথবা দশ দেরহামের চেয়ে কম মূল্যের মাল চুরি করলে হাত কাটার হুকুম নেই। হাদিসটির ধারাবাহিকতা অবশ্য পূর্ণরূপে রক্ষিত হয়নি। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে কাসেম বিন মোহাম্মদের হাদিস শ্রবণের বিষয়টি প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং হাদিসটি মুনকাতে।

www.eelm.weebly.com

প্রকৃত কথা এই যে, যে হাদিস থেকে জমহুর দলিল পেশ করেছেন, তা সম্পূর্ণতই বিশুদ্ধ। আর তাঁদের সময় অতি সতর্কতার সঙ্গে মাসআলা চয়ন করা হতো। জমহুর যে হাদিসগুলোকে গ্রহণ করেননি, সেগুলো দুর্বল। আমর বিন শোয়াইবের হাদিসের বর্ণনাকারী ইবনে ইসহাক, সালেম, জোফার এবং হাজ্জাজ বিন আরতাদ—সকলেই বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। তাঁদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর যুগে ঢালের মূল্য ছিলো দশ দেরহাম। এ কথাটি ছিলো তাঁদের নিজস্ব ধারণা। প্রকৃত কথা হচ্ছে—তখন ঢালের মূল্য কখনও ছিলো তিন দেরহাম, কখনও দশ দেরহাম আবার কখনও দশ দেরহামের চেয়ে বেশী। গুণগত তারতম্যের কারণে ঢালের মূল্যের তারতম্য ঘটতো। এ রকম না হলে রসুল স. এর যুগে ঢালের মূল্যের চেয়ে কম মূল্যের বস্তু চুরি হলে চোরের হাত কাটা হতো না—কথাটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হতো। দিনারের এক চতুর্থাংশ হলে হাত কাটা যাবে কিংবা যাবে না—এ বর্ণনার বিপক্ষে দশ দেরহামের কম হলে চোরের হাত কাটা যাবে না—এ রকম বর্ণনাও রয়েছে। কিন্তু বর্ণনাটি মারফু নয়। তাই এটিকে মারফু হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। বিরোধ পরিদৃষ্ট হলে মাওকুফ বর্ণনাকে দলিল হিসেবে পেশ করা যায় না। এটাই ঐকমত্যসম্মত মাসআলা।

এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, হাদিস শরীফে রয়েছে, এক চতুর্থাংশ দিনার এবং এর চেয়ে অধিক মূল্যের সামগ্রী চুরি করলে হাত কাটা যাবে। তারপর তিনি কেমন করে বলেন যে, দশ দেরহাম এবং ততোধিক মূল্যের সামগ্রী চুরি করলে হাত কাটা যাবে, এর কম হলে যাবে না।

ইমাম মোহাম্মদ মুজাহিদের মাধ্যমে হজরত আইমান থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত আইমান ছিলেন হজরত উমামা বিন জায়েদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মুজাহিদের জন্মের পূর্বে হজরত আইমান হুনাইনের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর নিকট থেকে মুজাহিদ হাদিস বর্ণনা করতে পারেন না। মুজাহিদ ছিলেন তাবেয়ী। আর তিনি রসুল স. এর যুগ তো দূরের কথা, তাঁর খলিফার যুগও পাননি।

আমি বলি, হজরত আইমানের মাতা রসুল স. কে কোলে বসিয়ে পানাহার করিয়েছেন। তিনি ছিলেন রসুল স. এর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁর পুত্র কোনো খলিফার যুগেও জন্মগ্রহণ করেন নি—তা কেমন করে হতে পারে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আইমান নামে দু'জন তাবেয়ী ছিলেন। একজন ইবনে জোবায়ের (জোবায়েরের পুত্র)। অন্যজন ছিলেন ইবনে আবী আমরের মুক্ত করা ক্রীতদাস। ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে হাব্বান তাঁদের দু'জনকে একই ব্যক্তি মনে করেছেন। মোট কথা এই যে, তাঁর মাধ্যমে বর্ণিত হাদিস জননী আয়েশা এবং হজরত ইবনে ওমরের বিপরীতে গ্রহণীয় নয়।

মাসআলাঃ যে দেশে যে বস্তু মূল্যহীন, সে বস্তু গ্রহণ করাকে চুরি বলা যায় না। তাই ইমাম আজম বলেছেন, এ সকল বস্তু নিলে হাত কাটা যাবে না। যেমন—– লাকড়ি, শুকনা ঘাস, বাঁশ, মাছ, পাখি, অরণ্যের পশু, চুনাপাথর, ইত্যাদি। যে সকল আহার্য দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। যেমন রান্না করা তরকারী, দুধ, সুপক্ক ফল, পাকা খেজুর ইত্যাদি। অন্য তিন ইমাম বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

বর্ণিত বস্তুগুলো সংরক্ষিত অবস্থা থেকে চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে। কেননা, আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাপকাত্মক। সুতরাং এ ধরনের বস্তুও চুরির বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আজম বলেছেন, আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাপকাত্মক হলেও এক্ষেত্রে আলেমগণের ঐকমত্যের বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য। যেমন, নেসাবের চেয়ে কম পরিমাণকে চুরি গণ্য করা যাবে না। কাজেই মূল্যহীন অথবা প্রায় মূল্যহীন বস্তু চুরি করলেও তা চুরি হিসেবে গণ্য হবে না। এই অভিমতটির পোষকতা রয়েছে জননী আয়েশার হাদিসে। তিনি বলেছেন, রসুল স. এর জামানায় তুচ্ছ বস্তু চুরি করলে চোরের হাত কাটা হতো না। হাদিসটি হজরত আয়েশা থেকে হিশাম বিন ওরওয়ার মাধ্যমে আবদুর রহমান বিন সুলায়মান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং এই সূত্রে ইবনে আবী শায়বা তাঁর মুসান্নিফ গ্রন্থে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। মুরসাল সূত্রে ওরওয়া থেকে হিশাম বিন ওরওয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন ওয়াকী। আবদুর রাজ্জাকের মুসান্নিফে উল্লেখিত সূত্রটি এ রকম— ইবনে জারীহ্— হিশাম—ইসহাক বিন রাহ্ওয়াইহ্—ঈসা বিন ইউনুস হিশাম। ইবনে আদ্দির কামেল গ্রন্থে বর্ণিত সূত্রটি হচ্ছে, আবদুল্লাহ বিন কাবীছাহ্ ফাজারী— হিশাম বিন ওরওয়া–হজরত আয়েশা। ইবনে আদ্দি আবদুল্লাহ বিন কাবীছাহ্ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেননি। তিনি শুধু এতোটুকু বলেছেন, তাঁকে কেউ অনুসরণ করেননি। কিন্তু পূর্ব যুগের মনীষীরা তাঁর সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, এই নির্দেশটি সুসাব্যস্ত যে, মুরসাল হাদিস দলিল হওয়ার উপযুক্ত। ইবনে আবী শায়বা একে মাওসুল (মিলিত) রূপে বর্ণনা করেছেন। স্বসূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন— আবদুল্লাহ্ বিন ইয়াসার বলেছেন, ওমর বিন আবদুল আজিজের দরবারে এক মুরগী চোরকে হাজির করা হলো। তিনি চোরের হাত কাটতে উদ্যত হলেন। তখন সালমা বিন আবদুর রহমান বলছেন, হজরত ওসমান জিন্নুরাইন বলেছেন, পাখি চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। এই সূত্রভূত এক বর্ণনাকারীর নাম জাফর জো'ফী।

ইয়াযিদ বিন হাফসা—জুহাইর বিন মোহ্ম্মদ—আবদুর রহমান বিন মাহদী সূত্রে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, ওমর বিন আবদুল আজিজের দরবারে এক ব্যক্তিকে হাজির করা হলো। সে কয়েকটি পাখি চুরি করেছিলো। ওমর বিন আবদুল আজিজ সায়েব বিন ইয়াযিদের নিকট এ সম্পর্কে ফতোওয়া জানতে চাইলেন। সায়েব বললেন, পাখি চুরি করার অপরাধে হাত কাটা যাবে—এ কথা কখনও আমি শুনিনি। হজরত ওমর বিন আবদুল আজিজ তখন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছেড়ে দিলেন।

আবু দাউদ তাঁর মারাসীল পুস্তকে জারীর বিন হাযেমের মাধ্যমে হাসান বসরী থেকে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আহার্য চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। শায়েখ আবদুল হকও এ হাদিস উল্লেখ করেছেন এবং তিনি মুরসাল হওয়া ব্যতীত হাদিসটির অন্য কোনো ত্রুটি বর্ণনা করেননি। কিন্তু মুরসাল আমাদের নিকট দলিল হিসেবে গণ্য।

www.eelm.weebly.com

হজরত রাফে বিন খাদিজের হাদিসে রয়েছে— রসুল স. বলেছেন, ফল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। সুফিয়ান বিন উয়ায়না থেকে তিরমিজি, লাইস বিন সা'দ, নাসাঈ, ইবনে মাজা এবং লাইস ও সুফিয়ান উভয়ে ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ থেকে, তিনি মুহম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন হাব্বান থেকে, তিনি তাঁর চাচা ওয়াসেয় ইবনে হাব্বান থেকে— বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। যদি কোনো বর্ণনা মুনকাতে এবং মাউসুল হওয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তবে সেটিকে মাউসুল করে দেয়াই উত্তম। কেননা, মাউসুলের মধ্যে অতিরিক্ত গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং সিকাহ্ বর্ণনাকারীদের নিকট তা গ্রহণীয়।

তাহাবী লিখেছেন, হাদিসটিকে সকল উম্মত গ্রহণ করেছেন। আলেমগণ লিখেছেন, এই হাদিসের 'ছামারাত' শব্দটির অর্থ ওই ফল যা বৃক্ষসংযুক্ত থাকে। অরক্ষিত অবস্থায় ওই ফল কেউ গ্রহণ করলে তার হাত কাটা যাবে না। আমর বিন শোয়াইব তাঁর পিতামহ হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি স. বললেন, বৃক্ষের ফল ছিঁড়ে কেউ যদি খেয়ে ফেলে (ঝুলির মধ্যে করে নিয়ে না যায়) তবে তার হাত কাটা যাবে না। কিন্তু ওই ফল পেড়ে কেউ যদি অন্যত্র নিয়ে যায়, তবে তাকে দিতে হবে দ্বিগুণ জরিমানা। বৃক্ষ থেকে পাড়া ফল কোথাও শুকাতে দিলে সেখান থেকে যদি কেউ ফল চুরি করে, তবে ওই চুরি করা ফল যদি ঢালের মূল্যের সমান হয়, তবে তার হাত কাটা যাবে। আবু দাউদ এই হাদিসটি লিখেছেন— ইবনে ওজলান, ওলিদ বিন কাসীর, ওবায়দুল্লাহ্ বিন আখনাস এবং মোহাম্মদ বিন ইসহাকের মাধ্যমে এবং এই চারজন বর্ণনা করেছেন আমর বিন শোয়াইবের মাধ্যমে। ইমাম নাসাঈ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এই সূত্রে, ওহাব—আমর বিন হারেস—হিশাম বিন সায়াদ—আমর বিন শোয়াইব। হাদিসটিতে বলা হয়েছে, কাবিলায়ে মুজাইনার এক ব্যক্তি রসুল স. এর নিকট ওই সকল বকরি চুরি সম্পর্কে বিধান জানতে চাইলেন, যেগুলো রাতে গৃহে ফিরে আসতো না, চারণভূমিতেই থেকে যেতো। রসুল স. বললেন, ওখান থেকে চুরি করলে দ্বিগুণ মূল্য দিতে হবে এবং চোরকে প্রহার করতে হবে এমনভাবে যাতে তা অন্যের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে যায়। আর গৃহস্থের বসতবাটী থেকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে, তার মূল্য হতে হবে ঢালের মূল্যের সমান্তরাল।

একবার সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ওই সকল ফল সম্পর্কে কী হুকুম, যা ঘরে রাখা হয়েছে। তিনি স. বললেন, যদি ফল কেউ খেয়ে ফেলে, পুটলী বেঁধে না নিয়ে যায় তবে তার উপর কোনো জরিমানা ও শাস্তি নেই। আর কেউ যদি ওই ফল বেঁধে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যায়, তবে তাকে দিতে হবে দ্বিগুণ মূল্য। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে তাকে মারপিটও করতে হবে। আর ফল শুকাবার স্থান থেকে ফল অপহরণ করলে তার উপর হাত কাটার শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। আহমদ, নাসাঈ।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, বৃক্ষসংলগ্ন ফল ছিড়ে নিয়ে গেলে কী হুকুম? তিনি স. বললেন, গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে নিলে হাত কাটার শাস্তি নেই। কিন্তু ফল শুকাবার স্থান থেকে ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ ফল চুরি করলে হাত কাটা যাবে। ঢালের মূল্যের চেয়ে কম হলে দিতে হবে দ্বিগুণ জরিমানা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে পেতে হবে প্রহার। হাকেমও এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আমাদের ইমাম ইসহাক বিন রাহ্ওয়াইহ্‌র অভিমত এই যে, আমর বিন শোয়াইবের হাদিস বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য হোন, তবে তাকে গ্রহণ করতেই হবে। যেমন আইয়ুব, নাফে, ইবনে ওমর, ইবনে আবী শায়বা এই হাদিসকে সংযুক্ত করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমরের সঙ্গে। অর্থাৎ হাদিসটিকে তারা মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর বলেছেন, ফল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না— যদি না তা ফল শুকানোর স্থান থেকে অপহরণ করা হয়।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, সুসংরক্ষিত স্থানের ফল চুরি করলে হাত কাটা ওয়াজিব হবে। বর্ণিত হাদিসটি তাঁদের অভিমতের অনুকূল। হজরত ওসমানের হাদিসেও তাঁদের অভিমতের পোষকতা রয়েছে, যে হাদিসটি ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা'য় লিপিবদ্ধ করেছেন। হাদিসটি এই— হজরত ওসমানের খেলাফতের সময় একজনের কিছু ফল চুরি হলো। হজরত ওসমান ফলের মূল্য নির্ধারণের নির্দেশ দিলেন। মূল্য নিরুপিত হলো তিন দিরহাম এবং সিদ্ধান্ত হলো, এক দিনার অথবা বারো দিরহাম চুরি করলে চোরের হাত কেটে দিতে হবে। ইমাম মালেক ফল বলতে ওই সাধারণ ফলকে বুঝিয়েছেন, যা মানুষ ভক্ষণ করে থাকে। হানাফীগণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনাটির জবাব দান করেছেন। যেমন— ১. বর্ণিত হাদিসটির বক্তব্য কোরআনের আয়াতের প্রতিকূল। তাই এ হাদিসের উপরে আমল করা যাবে না। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'তারা তোমাদের প্রতি যতোটুকু সীমাতিক্রম করেছে তোমরাও ততোদূর করো।' কিন্তু বর্ণিত হাদিসে ফল ও চারণভূমির বকরি চোরের দ্বিগুণ জরিমানার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এই হাদিসের উপর আমল না করাই ওয়াজিব। ২. বর্ণিত হাদিস দু'টোর মধ্যে রয়েছে মতবিরোধ। এক হাদিসে এসেছে— ফল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। এটি একটি সাধারণ হুকুম। তাই ফল শুকানোর স্থান থেকে নিলে অথবা বাগানে পড়ে থাকা ফল নিলে হাত কাটা না যাওয়াই উচিত। কিন্তু অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, সংরক্ষিত স্থান থেকে এবং ফল শুকানোর স্থান থেকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে— ভেজা ফল চুরি করলে হাত কাটার শাস্তি নেই, কিন্তু শুকনো ফল চুরি করলে হাত কাটা ওয়াজিব। অথবা হাত না কাটাকে কাটার উপর অগ্রাধিকার দিতে হয় (শুষ্ক ও ভেজা কোনো প্রকার ফল চুরির জন্য হাত কাটা ওয়াজিব করে দেয়া যাবে না)। এ রকম করলে আবার হুদুদকে রহিত করে দেয়া হবে। যে খাদ্য চুরির জন্য হাত কাটা যাবে না বলা হয়েছে, তা হচ্ছে ওই খাদ্য— যা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

www.eelm.weebly.com

কেননা, আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, গম এবং শুষ্ক ফল চুরি হাত কাটাকে ওয়াজিব করে। এই নিয়মে চিনি চুরি করলেও হাত কাটা যাবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় ফল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। কারণ, এ ধরনের চুরি সাধারণতঃ জীবন রক্ষার জন্য করা হয়।

রসুল স. বলেছেন, ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হয়ে চুরি করলে হাত কাটার হুকুম নেই। হজরত ওমর বলেছেন, দুর্ভিক্ষের সময় হাত কাটা যাবে না (তখন মানুষ চুরি করে জীবন বাঁচানোর জন্য)।

মাসআলাঃ প্রথম চুরির শাস্তিস্বরূপ ডান হাত কাটার পর যদি কেউ দ্বিতীয়বার চুরি করে অথবা কোনো কারণে কারো প্রথমে ডান হাত কাটা থাকে তবে দ্বিতীয় চুরির জন্য চোরের বাম পা কাটা যাবে। এটা ঐকমত্য। বাম পা কাটার হুকুম কিন্তু এ আয়াতে নেই। আয়াতে কেবল বলা হয়েছে হাত কাটার কথা। হজরত ইবনে মাসউদের ক্বেরাত অনুসারে কাটতে হবে ডান হাত। প্রথম চুরির শাস্তি হিসেবে ডান হাত কাটা পড়লে দ্বিতীয় চুরির শাস্তি হিসেবে তাহলে কোন হাত কাটতে হবে? এ সম্পর্কে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত এই যে, এক্ষেত্রে হাত নয়, কাটতে হবে চোরের বাম পা।

আগে থেকেই যদি চোরের ডান হাত ও বাম পা কাটা হয়ে থাকে অথবা দুই বার চুরির কারণে প্রথমবার ডান হাত এবং দ্বিতীয়বার বাম পা কাটা থাকে তবে এই ব্যক্তি তৃতীয়বার চুরি করলে হাত কিংবা পা কাটার শাস্তি তাকে দেয়াই যাবে না। তাকে বন্দী করতে হবে জেলখানায়। ইমাম আজম এবং ইমাম আহমদ এ রকম বলেছেন।

ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, দ্বিতীয়বার চুরি করলে বাম পা, তৃতীয়বার চুরি করলে বাম হাত এবং চতুর্থবার চুরি করলে ডান পা কেটে দিতে হবে। পঞ্চমবার চুরি করলে তাকে জেলখানায় বন্দী করতে হবে। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদ এ রকম অভিমত পোষণ করেছেন।

আতা, হজরত আমর বিন আস, ওমর বিন আবদুল আজিজ এবং হজরত ওসমান বলেছেন, পঞ্চমবার চুরি করলে চোরকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী তাদের অভিমত প্রমাণার্থে হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্র হাদিসটিকে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে— রসুল স. এর দরবারে এক চোরকে উপস্থিত করা হলো। তিনি স. তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। কিছু দিন পর সে আবার চুরি করলো। রসুল স. তখন তার দ্বিতীয় হাতটি কাটার নির্দেশ দিলেন। আবারও সে চুরি করলো। তখন রসুল স. কেটে দিতে বললেন তার দ্বিতীয় পা। পঞ্চমবার চুরি করার পর রসুল স. তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। দারা কুতনী। এই হাদিসের বর্ণনাসূত্রসংযুক্ত মোহাম্মদ বিন ইয়াযিদ বিন সেনান দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত।

আবু দাউদ ও নাসাঈর বর্ণনায় রয়েছে, এক চোরকে রসুল স. সকাশে উপস্থিত করা হলো। তিনি স. বললেন, ওকে হত্যা করো। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! সেতো চুরি করেছে। রসুল স. বললেন, হাত কেটে

www.eelm.weebly.com

দাও। নির্দেশ মোতাবেক তার হাত কাটা হলো। দ্বিতীয়বার চুরির অপরাধে পুনরায় তাকে উপস্থিত করা হলো রসুল স. এর নিকটে। তিনি স. বললেন, তাকে হত্যা করো। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, সেতো চুরি করেছে। তখন রসুল স. বললেন, তার বাম পা কর্তন করো। লোকটি তৃতীয়বারও চুরি করলো। তাকে ধরে এনে রসুল স. এর সামনে হাজির করা হলে তিনি স. বললেন, তাকে হত্যা করে ফেলো। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল, সেতো চুরি করেছে। রসুল স. বললেন, তার দ্বিতীয় হাতটি কর্তন করো। যথারীতি নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। চতুর্থবারও সে চুরি করে ধরা পড়লো। রসুল স. এর দরবারে তাকে হাজিরও করা হলো। তিনি স. বললেন, তাকে হত্যা করো। সাহাবীগণ বললেন, সেতো চোর। তিনি স. বললেন, দ্বিতীয় পা কেটে দাও। তাই করা হলো। পঞ্চমবারও তাকে চুরির অভিযোগে হাজির করা হলো রসুল স. এর দরবারে। তিনি স. নির্দেশ দিলেন, হত্যা করো। হজরত জাবের শেষে বর্ণনা করেছেন, আমরা তাকে উটের আস্তাবলে নিয়ে গেলাম এবং তাকে সেখানে চিৎ করে শুইয়ে হত্যা করলাম। তারপর তার লাশ টেনে নিয়ে একটি কুপে ফেলে দিলাম এবং তার উপর চাপা দিলাম পাথর। এই হাদিসের বর্ণনাকারী মুসআব বিন সাবেতকে ইমাম নাসাঈ বলেছেন দুর্বল।

চোরকে হত্যা করা সম্পর্কিত একটি হাদিস হারেস বিন হাতেব জাহাবীর মাধ্যমে নাসাঈ এবং আবদুল্লাহ্ বিন জায়েদের মাধ্যমে হাকেম বর্ণনা করেছেন। আবু নাঈম তাঁর হুলিয়া নামক পুস্তকে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইবনে আবদুল বার লিখেছেন, চোরকে হত্যা করার হাদিসটি মুনকার —যার কোনো মূল্য নেই। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হাদিসটি রহিত হয়ে গিয়েছে। আর এ বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। ইবনে আবদুল বার আরও বলেছেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজরত ওসমান এবং ওমর বিন আবদুল আজিজ সম্পর্কে আবু মোসায়াবের বর্ণনাটি ভুল। কারণ, বর্ণনাটির কোনো মূল্য নেই। আর বর্ণনাটি ঐকমত্যবিরোধীও।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে— রসুল স. বলেছেন, কেউ চুরি করলে তার হাত কেটে দাও। পুনরায় চুরি করলে জোড়া পর্যন্ত পা কেটে দাও। আবার চুরি করলে কেটে দাও দ্বিতীয় হাত। পুনরায় চুরি করলে কেটে দাও তার দ্বিতীয় পা। দারা কুতনী। এই সূত্রভূত বর্ণনাকারী ওয়াকেদীকে অসত্যভাষী আখ্যা দিয়েছেন ইমাম আহমদ। ইমাম শাফেয়ী এই হাদিসটি ভিন্ন সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং আসমা বিন মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন তিবরানী ও বায়হাকী। কিন্তু সূত্রটি শিথিল। দারা কুতনীর বর্ণনায় রয়েছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমার সম্মুখেই হজরত ওমর বিন খাত্তাব একে একে চোরের হাত, পা এবং অন্য হাত কেটে দিয়েছেন। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা'য় আবদুর রহমান বিন কাসেমের মাধ্যমে, কাসেম থেকে বর্ণনা করেছেন, ইয়ামেনের এক হাত ও এক পা কাটা এক লোক হজরত আবু

www.eelm.weebly.com

বকরের নিকট এসে বললো, ইয়ামেনের প্রশাসক আমার উপর জুলুম করেছে। লোকটি রাত্রি জেগে নামাজ পড়তো। হজরত আবু বকর বললেন, তোমার পিতার শপথ! তোমার রাত তো চুরির রাত নয়, ইবাদতের রাত। কিছুদিন পর হজরত আবু বকরের স্ত্রীর গলার হার হারিয়ে গেলো। সকলে হার অনুসন্ধান করতে শুরু করলো। ইয়ামেনের লোকটিও হারের খোঁজ করতে লাগলো এবং দোয়া করলো, হে আল্লাহ্! যে লোক এই পুণ্যবান ঘরে রাতে চুরি করেছে তাকে বন্দী করে দেয়ার দায়িত্ব তোমার উপরেই অর্পণ করলাম। খুঁজতে খুঁজতে অলংকারটি পাওয়া গেলো স্বর্ণকারের কাছে। স্বর্ণকার বললো, ওই হাত কাটা লোকটির কাছ থেকেই সে অলংকারটি পেয়েছে। তখন হজরত আবু বকর লোকটির বাম হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ প্রতিপালিতও হলো। হজরত আবু বকর বললেন, লোকটির দোয়া তার চুরির চেয়ে তাকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এ বর্ণনাসূত্রের এক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে। বর্ণনাটি এনেছেন আবদুর রাজ্জাক।

ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান তাঁর মুয়াত্তায় লিখেছেন, জুহুরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আয়েশা বলেছেন, যে ব্যক্তি হজরত আবু বকরের সহধর্মিনীর অলংকার চুরি করেছিলো, তার ডান হাত ছিলো কর্তিত। তাই হজরত আবু বকর তার বাম পা কেটে দিয়েছিলেন। ইমাম মোহাম্মদ আরো বলেছেন, এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম জুহুরী অন্যদের চেয়ে অধিক ওয়াকিফহাল ছিলেন।

আমাদের দলিল ওই হাদিসটি— যা ইমাম মোহাম্মদ কিতাবুল আসারে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা আমরের মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ বিন সালমা থেকে উল্লেখ করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, কেউ যদি চুরি করে তবে আমি তার ডান হাত কেটে দেবো। দ্বিতীয়বার চুরি করলে কাটবো বাম পা। এরপর চুরি করলে আমি তাকে জেলখানায় বন্দী করে রাখবো যাতে সে সৎকর্মশীল হওয়ার সুযোগ পায়। আল্লাহ্পাকের দরবারে আমি এই ভেবে লজ্জিত যে, আমি তাকে এমন অবস্থায় ফেলবো, যাতে করে তার নিকট পানাহার শৌচকর্ম এবং চলাফেরা করার মতো কোনো অঙ্গ থাকবে না।

আবদুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নিফে লিখেছেন, হজরত জাবের থেকে মুয়াম্মারের মাধ্যমে শায়বী বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী প্রথম চুরির জন্য এক হাত এবং দ্বিতীয় চুরির জন্য এক পা কাটতেন। তৃতীয়বার চুরি করলে তাকে বন্দী করতেন জেলখানায় এবং বলতেন, এ ব্যাপারে আমি আল্লাহ্কে লজ্জা করি (হাদিসের শেষ পর্যন্ত)।

ইবনে আবী শায়বা মুসান্নিফ গ্রন্থে হজরত আলীর আমল এবং নির্দেশ ইমাম জয়নাল আবেদীন, ইমাম জাফর, হাতেম বিন ইসমাইল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন সালমা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত আলীর দরবারে এক চোরকে ধরে আনা হলো। তিনি তার হাত কেটে দিলেন। পুনরায় তাকে চুরির অপরাধে ধরে আনা হলে তখন তিনি কেটে দিলেন তার পা। তৃতীয়বারও তাকে চুরির অপরাধে পাকড়াও করে আনা হলো। তখন তিনি

www.eelm.weebly.com

বললেন, আমি কি তার দ্বিতীয় হাতটিও কেটে দেব? তবে সে শৌচকর্ম সমাধা করবে কীভাবে। পানাহারই বা করবে কেমন করে। দ্বিতীয় পা যদি কেটে দেই তবে সে কিসের উপর ভর করে চলবে। আমি আল্লাহ্পাকের নিকট লজ্জিত— এ কথা বলে তিনি চোরকে কিছু প্রহার করলেন এবং জেলখানায় পাঠিয়ে দিলেন।

তানকীহে আবদুল হাদীর মধ্যে রয়েছে, আবু সাঈদ মাকবারী বলেছেন, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। হজরত আলীর দরবারে ওই লোকটিকে উপস্থিত করা হলো। তার এক হাত ও এক পা ছিলো কাটা। এরপরেও সে চুরি করেছিলো। হজরত আলী উপস্থিত সাহাবীগণকে বললেন, এর বিষয়ে আপনাদের অভিমত কী? তাঁরা বললেন, হাত কেটে দিন। হজরত আলী বললেন, তবে তো আমি তাকে হত্যাই করলাম। এ রকম করলে সে পানাহার করবে কীভাবে? নামাজের জন্য ওজু করবে কোন অঙ্গ দিয়ে। ফরজ গোসলই বা করবে কীভাবে। কীভাবে মেটাবে অন্যান্য প্রয়োজন। এ কথা বলে হজরত আলী তাকে কিছু দিনের জন্য জেলে পাঠালেন। কিছু দিন পর সেখান থেকে তাকে বের করে এনে পুনরায় সাহাবীগণের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন। তাঁরা আগের মতই হাত কাটার পরামর্শ দিলেন। হজরত আলীও উচ্চারণ করলেন আগের কথাগুলো। এরপর তাকে কঠোর শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিলেন।

আবদুর রহমান বিন আমের—সিমাক বিন হারব—আবুল আহ্ওয়াস—আবু সাঈদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আবদুর রহমান বলেছেন, হজরত ওমর বিন খাত্তাবের দরবারে এক লোককে উপস্থিত করা হলো যার এক হাত এবং এক পা ছিলো কাটা। সে পুনরায় চুরি করেছিলো। হজরত ওমর তার পা কাটার নির্দেশ দিলেন। সেখানে উপস্থিত হজরত আলী বললেন, আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন, 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে......।' আপনি তো চুরির দায়ে ইতোপূর্বে তার এক হাত ও এক পা কেটে দিয়েছেন, এখন অপর পাটি কেটে ফেললে সে তো হয়ে যাবে সম্পূর্ণরূপে চলচ্ছক্তিরহিত। আপনি বরং তাকে অন্য শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিতে পরেন। এ কথা শুনে হজরত ওমর চোরটিকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিলেন। বায়হাকী।

ইবনে আবী শায়বা তাঁর মুসান্নিফে সিমাক বিন হারব সূত্রে লিখেছেন, হজরত ওমর ওই চোর সম্পর্কে সাহাবীগণের পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা সকলে তখন হজরত আলীর অভিমতটিকে সমর্থন জানালেন।

মাকহুলের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ওমর বলেছেন, কেউ চুরি করলে তার হাত কেটে দাও। আবার চুরি করলে কেটে দাও পা। এরপরও যদি সে চুরি করে তবে তার দ্বিতীয় হাতটি আর কেটো না। কারণ, ওই হাত দিয়ে সে পানাহার করবে এবং শৌচকর্ম সমাধান করবে। কিন্তু ওই চোরকে মুসলমানদের বসতি থেকে দূরে কোথাও বন্দী করে রাখো (যাতে মুসলমানদের মধ্যে সে কোনো বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে না পারে)।

www.eelm.weebly.com

ইবনে শায়বা বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসও তাঁর বক্তব্যে হজরত আলীর অভিমতকে সমর্থন করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হজরত আলীর সিদ্ধান্তের উপরেই ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে। এবং হজরত ওমরও তাঁর কথা মেনে নিয়েছেন।

এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী যে প্রমাণ পেশ করেছেন তার কোনো ভিত্তি নেই। অথবা বর্ণনাটি রহিত হয়ে গিয়েছে। সাহাবীগণ যদি জানতেন, হজরত আলী রসুল স. এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁরা হজরত আলীকে সমর্থন করতেন না। আর হজরত আলীও এমন বলতেন না যে, আল্লাহ্‌র নিকট আমি লজ্জাবোধ করি। কেননা, আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন—আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে শৈথিল্য যেনো না হয়।

হজরত আলীর নির্দেশানুসারে এ রকম মাসআলাও এসেছে যে, যে ব্যক্তির বাম হাত অথবা বাম হাতের আঙ্গুল কিংবা বাম পা কাটা অথবা শুষ্ক, সে প্রথমবার চুরি করলে তার বাম হাতই কাটতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এটাই হবে হত্যাতুল্য শাস্তি। কাজেই, তার উপর আর হত্যার শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। আল্লাহ্‌পাকই অধিক পরিজ্ঞাত।

মাসআলাঃ হস্ত কর্তনের পর দাগ লাগিয়ে দিতে হবে, যাতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত না হয়। ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ীর মতে দাগ দেয়া মোস্তাহাব। হাকেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এর দরবারে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো, সে চাদর চুরি করেছিলো। রসুল স. বললেন, আমার মনে হয় সে চুরি করেনি। চোর বললো, কেনো নয় (নিশ্চয়ই আমি চুরি করেছি)। রসুল স. নির্দেশ করলেন ওকে নিয়ে যাও এবং হাত কেটে দাও। তারপর দাগ লাগিয়ে দাও, তারপর আমার কাছে নিয়ে এসো। নির্দেশের যথাপ্রতিপালনের পর পুনরায় তাকে উপস্থিত করা হলো রসুল স. এর দরবারে। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করো। লোকটি বললো, আমি আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করছি। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌পাক তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন, তিনি তোমার তওবা কবুল করেছেন এবং তোমার উপর অবতীর্ণ করেছেন রহমত। হাকেম বলেছেন, মুসলিমের শর্তানুসারে হাদিসটি বিশুদ্ধ। আবু দাউদ তাঁর মারাসীল পুস্তকে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। কাশেম বিন সালাম বলেছেন, হাদিসটি গরীব। দারা কুতনী বলেছেন মাওকুফ। তাঁর বর্ণনায় এ কথাটিও রয়েছে—হজরত আলী তার হাত জোড়া থেকে কেটে দিয়েছিলেন। তারপর দাগ দিয়েছিলেন।

মাসআলাঃ ইমাম আজম, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে— চোর একবার চুরির কথা স্বীকার করলেই তার হাত কাটা ওয়াজিব হবে। কিন্তু ইমাম আহমদ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইবনে আবী লায়লা, জোফার এবং ইবনে শুবরামার অভিমত হচ্ছে— চোর দু'বার চুরির স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত তার হাত কাটা যাবে না। ইমাম আবু ইউসুফ

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, দু'বার স্বীকৃতি দিতে হবে দু'টি মজলিশে। তিনি দলিল পেশ করেছেন— — হজরত আবু উমাইয়া মাখজুমীর বর্ণনা থেকে। একটু আগেই বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বললেন, আমার মনে হয় তুমি চুরি করোনি। চোর বললো, কেনো নয় (নিশ্চয়ই আমি চুরি করেছি)। রসুল স. 'আমার মনে হয় তুমি চুরি করোনি'—এ কথা দুই অথবা তিনবার বললেন। চোরও বার বার একই কথা উচ্চারণ করলো। তখন তিনি স. হাত কাটার হুকুম দিলেন। লক্ষ্যণীয় যে, তিনি স. হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছেন পুনঃপুনঃ স্বীকৃতি দানের পর। পুনঃপুনঃ স্বীকৃতি দানের পূর্বে তিনি হস্ত কর্তনের হুকুম দেননি।

স্বসূত্রে তাহাবী লিখেছেন, হজরত আলীর সামনে এক ব্যক্তি দুইবার তার চুরি করার কথা স্বীকার করলো। তিনি বললেন, তুমি নিজেই তোমার বিরুদ্ধে দু'বার সাক্ষ্য দিয়েছো। এ কথা বলে তিনি হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এবং কর্তিত হাত ঝুলিয়ে দিতে বললেন তার গলায়।

চুরি ও ব্যভিচারঃ ব্যভিচারের ক্ষেত্রে ব্যভিচারীর একাধিক স্বীকৃতি জরুরী। একাধিক স্বীকৃতি স্বাক্ষীদের স্থলাভিষিক্ত করে দেয়া হয়েছে। তবে কি ব্যভিচারের সঙ্গে তুলনা করে চুরির ক্ষেত্রেও একাধিক স্বীকৃতিকে জরুরী বলা হয়েছে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, আবু উমাইয়া মাখজুমীর বর্ণনা সম্পর্কে খাত্তাবী লিখেছেন, তাঁর বর্ণনা সূত্রে কিছু অতিরিক্ত কথা রয়েছে। খাত্তাবী এ কথাও বলেছেন যে, বর্ণনাসূত্রে অপরিচিত কোনো বর্ণনাকারী থাকলে তা দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না এবং ওই বর্ণনানুযায়ী আমল করা ওয়াজিব নয়। ব্যভিচার ও চুরি তো দু'টি পৃথক অপরাধ। ব্যভিচারের জন্য সাক্ষীদের সংখ্যা একটি জরুরী বিষয়। কারণ, সেখানে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। সম্ভবতঃ সাক্ষ্যদাতা মিথ্যা বললে অপরাধী যদি নিজেই তার অপরাধের স্বীকৃতি দেয়, তবে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। (এ রকম ধারণাও করা যায় না যে, চোর একবার মিথ্যা বলবে, পরক্ষণেই তা স্বীকার করে নেবে)।

ব্যভিচারের ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তির সংখ্যাধিক্য জরুরী এ জন্যে যে, কোরআন একে জরুরী করে দিয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে কিয়াসের কোনো সুযোগ নেই। ব্যভিচারকে মিথ্যার শাস্তি এবং কিসাসের সঙ্গে তুলনা করা যায় না (মিথ্যার শাস্তি এবং কিসাসের ক্ষেত্রে স্বীকৃতির সংখ্যাধিক্য যেমন জরুরী নয়, তেমনি চুরির ক্ষেত্রেও জরুরী নয়)। ইমাম আজমের অভিমতের প্রমাণ রয়েছে হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. শুধু একবার স্বীকারোক্তি শুনে চোরের হাত কেটে দিয়েছেন এবং হাত কাটার পর দাগ দিয়েছেন।

'যাযাআম বিমা কাসাবা নাকালাম মিনাল্লাহ্'—এ কথার অর্থ, এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত আদর্শদণ্ড। বাক্যটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি কঠোর সাবধানবাণী। 'যাযাআ' এবং 'নাকালাম' এখানে যথাক্রমে হেতু নির্দেশক কর্ম এবং সাধারণ কর্মকারক। বাগবী শব্দ দু'টোকে কর্তৃকারক বিশেষ্য

www.eelm.weebly.com

অর্থে প্রকাশ করেছেন। 'ফাকৃতাউ' (হস্তচ্ছেদন) এখানে অবস্থাজ্ঞাপক বিশেষণ। মাদারেক রচয়িতা 'যাযাআন' (বিনিময়) এর সর্বনামকে হেতু নির্দেশক কর্ম এবং 'নাকালান' (আদর্শ দণ্ড) এর স্থলবর্তী করে দিয়েছেন।

কামুস গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'নাকালা' ও 'তানকিলা' অর্থ এমন কাজ যা অন্যের জন্য আদর্শ বা দৃষ্টান্ত হয়। আল্লামা তাফতাজানী লিখেছেন, এখানে 'নাকালান' শব্দটিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, হস্তচ্ছেদন যেনো এমন দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়, যাতে করে অপরাধী নিজে ও অন্যেরা এধরনের কাজ থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়। আমি বলি, নিশ্চয়তার ভিত্তি হিসেবে এটাই উপযুক্ত যে— 'কৃতকর্মের ফল' এবং 'হস্তচ্ছেদন' কে হেতুনির্দেশক কর্ম বলা যাবে। আর 'আদর্শ দণ্ড'কে করে দিতে হবে 'কৃতকর্মের ফল' এর কারণ। কোনো কোনো বিশ্লেষণকারী বলেছেন, পৃথকভাবে 'আদর্শ দণ্ড' এবং 'কৃতকর্মের ফল' উল্লেখ করে উভয়টিকে হস্তচ্ছেদনের কারণ করা হয়েছে। 'কৃতকর্মের ফল' শব্দটি বান্দার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং 'আদর্শদণ্ড' সম্পৃক্ত আল্লাহ্র সঙ্গে। এ দু'টোর সম্মিলিত কারণ হচ্ছে হস্তচ্ছেদন।

মাসআলাঃ ইমামে আজম বলেছেন, হস্তচ্ছেদন করলে চুরি করা মালের ক্ষতিপূরণ রহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ চুরি করা মাল তার মালিককে ফেরৎ দেয়া তখন তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না (যদি ওই মাল নষ্ট হয়ে যায় অথবা নষ্ট করে দেয়া হয়)। অন্য তিন ইমাম বলেছেন, হাত কাটা হলেও চোরাই মালের জরিমানা রহিত হবে না। হস্তচ্ছেদন ও জরিমানা দু'টোই এক সঙ্গে কার্যকর করতে হবে। চুরির মাল যদি চোরের নিকট মওজুদ থাকে (নষ্ট না হয়) তবে তা মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে—হাত কাটার আগে হোক বা পরে। এই অভিমতটি ঐকমত্যসম্মত। কিন্তু চোরাই মাল নষ্ট হয়ে গেলে অথবা খরচ করে ফেললেও তিন ইমামের মতে জরিমানা দিতে হবে।

চুরিকৃত সম্পদের দণ্ডস্বরূপ—হস্তকর্তনের পর চুরিকৃত সম্পদ ফেরৎ দেয়া হলো মালিককে। সে সম্পদ পুনরায় চুরি করলো চোর। এ চুরির প্রতিবিধানে পুনরায় চোরের হাত কাটা যাবে না। ইমাম আবু হানিফা এ রকম বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, প্রথম চুরির দণ্ড বিধানের পর ওই সম্পদের সংরক্ষণযোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। অন্য ইমামত্রয়ের মতে হস্তকর্তন করতে হবে। কারণ, সম্পদের সংরক্ষণযোগ্যতা রহিত হয়নি।

ইমাম আবু হানিফার দলিলসমূহঃ

১. আলোচ্য আয়াতে শাস্তির স্থলে 'জাযা' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। শাস্তির স্থলে জাযার উল্লেখ করা হয় তখনই, যখন আল্লাহ্পাকের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়; এবং তার প্রতিবিধানে শাস্তি নির্ধারিত হয়। অনুরূপ আল্লাহ্র অধিকারে হস্তক্ষেপ করার পরিণামে 'নাকাল' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। তাহলে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে নিছক আল্লাহ্র অধিকারের ক্ষেত্রে। তাই হাত

www.eelm.weebly.com

কাটাও আল্লাহ্র অধিকারভূত। আল্লাহ্র অধিকারে অপরাধ তখনই বিযুক্ত হয়, যখন অপরাধক্ষেত্র সত্তাগতভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ থাকে। যেমন সত্তাগত হারামের কারণে মদ্য নিষিদ্ধ। জাযা অর্থ পুরোপুরি বা যথেষ্ট। চুরির প্রতিবিধানে জাযা অর্থ উল্লেখ হওয়ায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, শাস্তি পুরোপুরি দেয়া হয়েছে। আর শাস্তির পূর্ণত্ব তখনই অর্জিত হয়েছে যখন চুরিকৃত বস্তু সত্তাগতরূপে হারাম বা নিষিদ্ধ। চুরিকৃত বস্তু যদি সত্তাগত হারাম হয়, তাহলে আইন প্রয়োগের পর সে বস্তুর সংরক্ষণযোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। যেমন, চুরিকৃত মদ্য ও শুকর বিনষ্ট হওয়ার পর তার বিনিময়ে জরিমানা বিধিবদ্ধ হয় না।

২. যদি হস্ত কর্তনের পর জরিমানা বিধিবদ্ধ করা হয়, তবে জরিমানা আদায় করার পর চুরিকৃত বস্তু চোরের অধিকারে আসে। পুনরায় চুরি করলে তো সে নিজের সম্পদই চুরি করেছে। তবে হাত কাটার প্রশ্ন উঠবে কেনো?

৩. হজরত আবদুর রহমান বিন আউফের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ডান হাত কাটার পর চোরের উপর সম্পদগত ক্ষতিপূরণ (মালি জরিমানা) নেই। দারা কুতনী। নাসাঈর বর্ণনাটি এ রকম— চোরের উপর হদ প্রয়োগ করলে তাকে আর অন্য শাস্তি দিতে হবে না। বায্যারের বর্ণনায় রয়েছে, শাস্তি কার্যকর করার পর চোর তার চোরাই মালের জন্য দায়ী হবে না। এই বর্ণনাটি এনেছেন সাঈদ বিন ইব্রাহিম তাঁর ভাই মাসওয়ার বিন ইব্রাহিম বিন আবদুর রহমান বিন আওফ থেকে—তিনি তাঁর পিতামহ হজরত আবদুর রহমান বিন আউফের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন। দারা কুতনী বলেছেন, সাঈদ বিন ইব্রাহিম অপরিচিত এবং মাসওয়ার হজরত আবদুর রহমান বিন আউফের কোনো বর্ণনা উল্লেখ করেননি। পদ্ধতিগত দিক থেকে বর্ণনাটি প্রামাণ্য নয়। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, সাঈদ বিন ইব্রাহিম জুহরী ছিলেন মদীনার কাযী। বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য।

শাফেয়ীগণ হানাফীগণের দলিলের জবাব দিয়েছেন এভাবেঃ

১. জাযা হচ্ছে পূর্ণ শাস্তির দাবিদার। পূর্ণ অপরাধ হলো— আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক যুগপৎ বিনষ্ট করা। আমরা এ-ও মেনে নিতে পারি যে, হস্ত কর্তন নিছক আল্লাহ্র হক। এর থেকে অপরাধের ক্ষেত্র সত্তাগতভাবে হারাম হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয় না। নিশ্চিত হয় না জরিমানাও। হস্ত কর্তন শরিয়তের বিধান। চোর শরিয়ত লংঘন করাতে তার উপর প্রযোজ্য হয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হস্ত কর্তনের বিধান। কারণ, চোর এমন সম্পদে হস্তক্ষেপ করেছে যাতে সংরক্ষিত রয়েছে অন্যের অধিকার। যেমন এহ্রামধারী ব্যক্তি কারো অধিকারভুক্ত জন্তু শিকার করলে সেই জন্তুর জরিমানা তো দিতেই হবে, উপরোক্ত কোরবানীও অবধারিত হবে তার উপর। আমরাও অপরাধের ক্ষেত্র নিষিদ্ধ মেনে নিয়েছি। কিন্তু এ নিষিদ্ধতা সত্তাগত নয় —বিধানগত। যদি সত্তাগত হতো তবে হস্ত কর্তনের পর চুরিকৃত সম্পদ ফেরত দিতে হতো না। সম্পদ যদি বর্তমান থাকে তাহলে এ

www.eelm.weebly.com

সম্পদ মালিকের জন্য হালাল হবে না। কাজেই অপরাধের ক্ষেত্র সত্তাগত নয় বরং বিধানগত। আবার সত্তাগত নিষিদ্ধতা মেনে নিলে হাত কাটার পর মওজুদ সম্পদ মালিক ফেরত নিতে পারবে না। এ সম্পদ তার জন্য হালাল হবে না। যেহেতু সম্পদ চুরির প্রতিবিধানে কাটা হয়েছে চোরের হাত তাহলে মালিক তার সম্পদ ফেরত নিবে কিভাবে? আর যদি চুরিকৃত সম্পদ মদ্য বা মৃতের মতো সত্তাগত হারাম ধরে নেয়া যায় তাহলে মদ্য বা মৃত বস্তু চুরির প্রতি বিধানে যেমন ওয়াজিব হবে না হস্ত কর্তন, তেমনি কোনো সম্পদের চুরিতেও কাটা যাবে না চোরের হাত। এতে প্রমাণিত হয় যে, চুরিকৃত সম্পদ সত্তাগতরূপে হারাম নয়

চুরিকৃত সম্পদ সত্তাগত হারাম নয় । আপত্তিকর দিকটি হচ্ছে এ রকম—যদি দুই অথবা তিন ধরনের হারাম মিশ্রিত হয়, যেমন—রমজান মাসের রোজা অবস্থায় কোনো জিম্মির কৃতদাস মদ্য পান করেছে অথবা রোজা অবস্থায় অপরের দাসীর সাথে ব্যভিচার করেছে। একে তো রোজা, তদুপরি অন্যের দাসী, পরিশেষে, ব্যভিচারের অপরাধ; তাও আবার জিম্মির দাসী। এক্ষেত্রে প্রতিবিধান কী হবে?

শাফেয়ীদের পক্ষ থেকে হানাফিগণের দ্বিতীয় দলিলের জবাব দেয়া যেতে পারে এভাবে—চুরিকৃত বস্তুর জরিমানা আদায়ের পর ওই বস্তুর মালিক হয়ে যায় চোর। তা কেমন করে হয়? কারণ সম্পদ বিনষ্ট করলে বা করালে প্রশ্ন আসে জরিমানার। তখন তো সম্পদ বর্তমানই থাকে না। সেখানে মালিকানা আবার কিসের?

হানাফিগণের তৃতীয় দলিলের জবাব দেয়া যায় এভাবে—তাদের পেশকৃত দলিল দুর্বল। যদি বিশুদ্ধ হিসেবে মেনেও নেয়া যায়, তবে কোরআনের আয়াত 'ফা'তাদু আলাইহি বিমিসলি মা'তাদা আলাইকুম' (তোমরা তাদের প্রতি তেমনিই সীমা অতিক্রম করো, যেমন সীমা অতিক্রম করেছে তারা) এর প্রতিকূলে দাঁড়ায় আলোচ্য হাদিসগুলো। উপরোক্ত শাফেয়ীগণ জরিমানার অপরিহার্যতার সমর্থনে পেশ করেন এই হাদিসটি— রসুল স. এরশাদ করেন— চোরের উপর দায়িত্ব হলো সে যা হস্তগত করেছে তা প্রত্যার্পণ করা। প্রয়োজনে ক্রয় করে দিবে। আহমদ, বিশুদ্ধ সনদসহ সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়, হাকেম।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াল্লহু আযিযুন হাকিম'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তাঁর হুকুমের মোকাবিলা করার সাধ্য কারো নেই। আর তাঁর প্রতিটি হুকুম হেকমতময়।

আহমদ, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বলেছেন, রসুল স. এর জমানায় এক মহিলা চুরি করলো। তার ডান হাত কেটে দেয়া হলো। মহিলাটি তখন নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার তওবা কবুল হবে কি? রসুল স. বললেন, অদ্যকার তওবা দ্বারা তুমি এমনভাবে পাপমুক্ত হয়ে যাবে যেমন ছিলে জন্মগ্রহণের দিন। এরপর অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

❒ কিন্তু সীমালংঘন করার পর কেহ তওবা করিলে ও নিজেকে সংশোধন করিলে আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্ষমাপরবশ হইবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❒ তুমি কি জান না যে, আসমান ও জমিনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহেরই; যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

তওবা অর্থ কৃত পাপের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করা এবং ভবিষ্যতে পাপ না করার অঙ্গীকার করা। নিজেকে সংশোধন করার অর্থ আপন আমলকে বিশুদ্ধ করে নেয়া। তওবার আরেক অর্থ ফিরে আসা (পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করা)। তওবার পর 'আলা' শব্দ এলে এবং আল্লাহ্র সঙ্গে তওবার সম্পর্ক করা হলে এর অর্থ হবে তওবা কবুল হওয়া। যেমন 'ইয়াতুবু আলাইহি'। যতো পাপই করা হোক না কেনো খাঁটি তওবা করলে এবং নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ্পাক তার প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিবেন। পরকালে তাকে শাস্তি দিবেন না। সে কথাই আয়াতে পরিষ্কার রূপে বলে দেয়া হয়েছে।

তওবা করলে কি পৃথিবীর শাস্তি রহিত হয়ে যায়? এর উত্তরে ইমাম আহমদ বলেছেন, তওবা করলে সকল প্রকার পার্থিব শাস্তি (হদ্দে শরয়ী) রহিত হয়ে যায়। তিনি তাঁর অভিমতের সমর্থনে কোরআনের এমন একটি আয়াত দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, যেখানে তওবা কবুল হওয়ার কোনো শর্ত উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া অন্য একটি আয়াতে রয়েছে 'এবং তোমাদের মধ্যে যে দু'জন, অর্থাৎ নারী ও পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান করো। অতঃপর যদি তারা তওবা করে এবং তাদের কর্মধারাকে পরিবর্তন করে, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও।' রসুল স. এরশাদ করেছেন, পাপ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির মতো। এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর অভিমত এই যে, তওবা করার পর এক বৎসর অতিবাহিত হলে হদ বা শাস্তি রহিত হয়ে যায়। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেকের অভিমত হচ্ছে, তওবা করলেও পৃথিবীর শাস্তি রহিত হবে না। এক বর্ণনানুযায়ী ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের অভিমতও এ রকম। তবে রাহাজানির শাস্তি এর ব্যতিক্রম অর্থাৎ তওবা করলে রাহাজানির শাস্তি রহিত হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতে এ রকমই বলা হয়েছে। ইমাম আহমদের প্রথমোক্ত দলিল দু'টি সম্পর্কে হানাফি ও মালেকীগণের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই আয়াত দ্বারা শাস্তি রহিত হওয়া বুঝা যায় না। উল্লেখ্য যে হজরত মায়েযা

www.eelm.weebly.com

এবং গামেদীয়া ব্যভিচারের কথা স্বীকার করেছিলেন। তওবাও করেছিলেন। এর পরেও তাঁদেরকে সঙ্গেসার (প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা) করা হয়েছিলো।

মাসআলাঃ বিচারকের নিকট মামলা দায়ের করার পূর্বে চোর যদি তার চুরির মাল মালিককে ফিরিয়ে দেয় তবে তার হাত কাটা যাবে না। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, এ রকম করলেও তার হাত কাটা যাবে। মামলা দায়েরের পূর্বে হাত কাটা যাবে না— এ কথা বলার কারণ এই যে, চুরি হওয়া মালের দাবি পেশ করা জরুরী। তার এই দাবি পেশ করতে হবে বিচারকের নিকট। সুতরাং তাঁর নিকট দাবি পেশের পূর্বেই যদি মালিককে তার মাল ফেরৎ দেয়া হয়, তবে দাবি পেশ করার কোনো অবকাশ থাকে না। তবে মামলার মাধ্যমে দাবি পেশের পর, সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করার পর এবং বিচারকের রায় ঘোষণা দেয়ার পর চুরির মাল ফেরৎ দেয়া হলে চোরের হাত কাটা জরুরী হবে। রায় ঘোষণার পূর্বে এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশের পর মাল ফেরৎ দিলেও চোরের হাত কাটা যাবে। কেননা, সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে বিচারকের নিকট ততক্ষণে চুরি প্রমাণিত হয়েছে এবং এর আগে দাবিও পেশ করা হয়েছে।

মাসআলাঃ চোরের হস্তচ্ছেদন করলে আখেরাতে কি তার গোনাহ্ মাফ হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে মুজাহিদ বলেছেন, হ্যাঁ। আখেরাতে তার গোনাহ্ থাকবে না। হজরত উবাদা বিন সামেত বলেছেন রসুল স. একদিন কতিপয় সাহাবীর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ তিনি সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমার হাতে এই মর্মে বায়াত গ্রহণ করো—তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং পুণ্য কর্মে অবাধ্য হবে না। যে ব্যক্তি এ সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করবে সে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লাভ করবে মহাপুরস্কার। আর যে ব্যক্তি এ সকল পাপের কোনো একটিতে লিপ্ত হবে, তাকে শাস্তি দেয়া হবে পৃথিবীতে। ওই শাস্তি হবে তার পাপের কাফফারা (ক্ষতিপূরণ)। আর যে ব্যক্তি এ সকল অপরাধের কোনো একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্তায়ালা তা গোপন করে রাখবেন (যে কারণে তার শাস্তি হবে না)— এ রকম অবস্থা আল্লাহপাকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচছা করলে তাকে মার্জনা করবেন অথবা শাস্তি দিবেন। বোখারী, মুসিলম। বাগবী লিখেছেন, বিশুদ্ধ কথা এই যে, হস্তকর্তন হচ্ছে অপরাধের শাস্তিস্বরূপ শরিয়তের বিধান। শাস্তি আরোপ করা হলেও তওবা করতে হবে। এ কথার প্রমাণ রয়েছে হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে— যেখানে বলা হয়েছে, হাত কাটা এবং দাগ দেয়ার পর রসুল স. এক লোককে বলেছিলেন, আল্লাহর নিকট তওবা করো। ওই লোক বলেছিলো আমি আল্লাহ্র নিকট তওবা করছি। তখন রসুল স. বলেছিলেন, আল্লাহ্পাক তোমার তওবা কবুল করে নিয়েছেন।

তওবা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে ক্ষমা ও রহমত প্রাপ্তি নিশ্চিত। সে কথাই আয়াত শেষে বলা হয়েছে এভাবে, 'আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (ইন্নাল্লহা গফুরুর রহিম)।

আল্লাহ্পাকই সমস্ত সৃষ্টির একক অধিকর্তা। সে কথা পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে এভাবে, 'তুমি কি জানো না যে আসমান ও জমিনের সার্বভৌমত্ব

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন'। কবীরা, সগীরা— সকল গোনাহ্‌র শাস্তি দেয়া ন্যায়সংগত। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক অনুগ্রহ করে সে সকল গোনাহ্ ক্ষমা করে দিতে পারেন। গোনাহর জন্য তওবা করা হোক অথবা নাই হোক।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াল্লহু আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদির'— এ কথার অর্থ, 'এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান'। তিনি যেমন শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে ক্ষমতাবান, তেমনি ক্ষমতাবান ক্ষমা করে দেয়ার ব্যাপারেও। কিন্তু কোনোটিই করতে বাধ্য নন তিনি।

এই আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে, শাস্তিদানের কথা, তারপর বলা হয়েছে ক্ষমা করার কথা। এ রকম বলার কারন এই যে, অপরাধীরা শাস্তির উপযুক্ত হয়— ক্ষমার পূর্বে। আরেকটি কারণ এই, আল্লাহ্‌পাকের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে শাস্তি দানের ক্ষেত্রেই। ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রকাশ ততটা প্রকট নয়। শাস্তিপ্রাপ্তদের দিক থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কিন্তু যাদেরকে ক্ষমা করা হয় তাদের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কোনো অবকাশই নেই। শাস্তি দিতে গেলে শাস্তিদাতাকে হতে হবে ক্ষমতাশালী। কিন্তু ক্ষমা করতে গেলে তেমন পরাক্রমের প্রয়োজন পড়ে না।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ
قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ ۛ سَمَّٰعُونَ
لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ
بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ
فَٱحْذَرُوا۟ ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ
أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا
خِزْىٌ ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

❑ হে রসুল! যাহারা মুখে বলে, 'বিশ্বাস করিয়াছি', কিন্তু অন্তরে বিশ্বাসী নহে ও যাহারা ইহুদী হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানে তৎপর তাহাদের আচরণ যেনো তোমাকে দুঃখ না দেয়। উহারা মিথ্যা শ্রবনে অত্যন্ত

www.eelm.weebly.com

আগ্রহশীল, যে সম্প্রদায় তোমার নিকট আসে নাই উহারা তাহাদের জন্য কান পাতিয়া থাকে। শব্দগুলি যথাযথ বিন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তাহারা সেগুলির অর্থ বিকৃত করে; তাহারা বলে, 'এই প্রকার বিকৃত বিধান দিলে গ্রহণ করিও এবং উহা বিকৃত না হইলে বর্জন করিও।' এবং আল্লাহ্ যাহার পথচ্যুতি চাহেন তাহার জন্য আল্লাহের নিকট তোমার কিছুই করিবার নাই। তাহাদেরই হৃদয়কে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করিতে চাহেন না, তাহাদের জন্য আছে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও পরকালে মহা শাস্তি।

হজরত বারা বিন আজিব থেকে আহমদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, এক ইহুদীকে তাদের নেতারা ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে চাবুক মেরেছিলো। সে মুখে কালিমাখা অবস্থায় রসুল স. এর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি স. তাকে বললেন, তোমাদের কিতাবে কি ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে এভাবে প্রহার করার কথা বলা আছে? সে বললো, হ্যাঁ। রসুল স. তখন এক ইহুদী আলেমকে ডেকে বললেন, আমি তোমাকে ওই আল্লাহ্র কসম দিচ্ছি, যিনি মুসার উপর তওরাত অবতীর্ণ করেছেন। বলো, তোমাদের কিতাবে কি প্রহার করাই ব্যভিচারের শাস্তি? ইহুদী আলেম বললো, না। আল্লাহ্র কসম না দিলে আমি আপনার নিকট সত্য কথা স্বীকার করতাম না। তওরাতে বলা হয়েছে, ব্যভিচারের শাস্তি সঙ্গেসার (প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে মেরে ফেলা)। কিন্তু আমাদের প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে যখন ব্যাপকভাবে ব্যভিচার শুরু হলো, তখন আমরা তাদের প্রতি আর শাস্তি আরোপ করতে পারতাম না। শাস্তি প্রয়োগ করতাম কেবল দুর্বল লোকদের উপর। এ রকম করা ঠিক হচ্ছে না ভেবে, একদিন আমরা সকলে মিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, ধনী-দরিদ্র সকলের উপরে একই বিধান হওয়াই সমীচীন। সুতরাং আমাদেরকে এমন একটি বিধান উদ্ভাবন করতে হবে— যা আমরা বিত্তশালী, বিত্তহীন নির্বিশেষে সকলের উপর প্রয়োগ করতে পারি। তখন সকলে মিলে আমরা ঠিক করলাম, এখন থেকে ব্যভিচারের শাস্তি প্রহার করা ও মুখে কালি মাখানো। এ কথা শুনে রসুল স. বললেন, হে আমার আল্লাহ্, এ সকল লোক তোমার বিধানকে মিটিয়ে দিয়েছে। আমি তোমার বিধানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবো। এরপর তিনি স. ওই ব্যভিচারী ইহুদীকে সঙ্গেসার করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মোতাবেক প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াতের 'ইয়া আইয়্যুহার রসুলু' থেকে 'হুমুজ জলিমুন' (৪৫ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

বাগবী লিখেছেন, খায়বরের প্রভাবশালী ইহুদীদের মধ্যে একজন বিবাহিত পুরুষ এবং একজন বিবাহিত নারী ব্যভিচার করেছিলো। সেখানকার ইহুদী নেতারা তাদের উপর ব্যভিচারের শাস্তি (সঙ্গেসার করা) প্রয়োগ করা সমীচীন মনে করলো না। তারা মদীনার বনী কুরায়জার ইহুদীদের নিকট বলে পাঠালো, তোমরা মোহাম্মদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাস করো— বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার করলে তাদের শাস্তি কী হবে? তিনি চাবুক মারার কথা বললে তার কথা মেনে নিও, কিন্তু সঙ্গেসারের কথা বললে মেনো না। এ প্রস্তাব শুনে বনী কুরাইজা ও

www.eelm.weebly.com

বনী নাজিরের লোকেরা বলে পাঠালো, আল্লাহ্‌র কসম, তিনি তো এমন সিদ্ধান্ত দিবেন, যা তোমাদের পছন্দ হবে না। এরপর কা'ব বিন আশরাফ, সাঈদ বিন আমর, মালেক বিন যইফ এবং লুবাবা বিন আবিল হাকিক ইহুদী রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, মোহাম্মদ! বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার করলে তার শাস্তি কি হবে বলুন? তিনি স. বললেন, তোমরা কী আমার সিদ্ধান্ত পছন্দ করবে? তারা বললো, হ্যাঁ। তৎক্ষণাৎ সঙ্গেসারের আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন হজরত জিবরাইল। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার করলে তাদের শাস্তি হবে সঙ্গেসার। ইহুদীরা শুনলো, কিন্তু এই বিধানকে গ্রহণ করলো না। হজরত জিবরাইল রসুল স. কে ইবনে সুরিয়া নামক এক ইহুদী আলেমের কথা জানালেন। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ইহুদীদের বলুন, তারা কি ইবনে সুরিয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সম্মত? রসুল স. বললেন, তোমরা কি শাদা বর্ণের ওই যুবককে চেনো, যার এখনো দাড়ি গোঁফ উঠেনি। যে ফদকের অধিবাসী। তার এক চোখ অন্ধ। নাম ইবনে সুরিয়া। ইহুদীরা বললো, হ্যাঁ, তাকে আমরা ভালো করেই চিনি। তিনি স. বললেন, তার সম্পর্কে তোমাদের ধারনা কি? ইহুদীরা বললো, বর্তমানে ইহুদীদের যতো আলেম রয়েছেন, তাদের মধ্যে ইবনে সুরিয়াই শ্রেষ্ঠ। রসুল স. বললেন, তোমরা কী এ ব্যাপারে ইবনে সুরিয়ার সাক্ষ্য মানতে সম্মত আছো? ইহুদীরা বললো, হাঁ। রসুল স. বললেন, তবে তোমরা তাকে ডেকে আনো। তারা ইবনে সুরিয়াকে ডেকে আনলো। রসুল স. তাকে বললেন, তুমিই কি ইবনে সুরিয়া? সে বললো, লোকেরা এ রকমই বলে থাকে। রসুল স. বললেন, আমি তোমাকে ওই আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, যিনি মুসার উপর তওরাত অবতীর্ণ করেছেন, তোমাদেরকে মিসরের বন্দী জীবন থেকে উদ্ধার করেছেন, সমুদ্রবক্ষে সৃষ্টি করেছেন পথ, সলিল সমাধি দিয়েছেন ফেরাউনকে, তীহ্ প্রান্তরে তোমাদেরকে দিয়েছেন মেঘমালার ছায়া— এবার বলো, আল্লাহ্‌পাক কি তোমাদের কিতাবে বিবাহিত পুরুষ ও নারীর ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে সঙ্গেসারকে বিধিবদ্ধ করে দেননি? ইবনে সুরিয়া বললো, হ্যাঁ, দিয়েছেন। শপথ ওই পবিত্র সত্তার, যার কথা আপনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন— তওরাত যদি লিপিবদ্ধরূপে না থাকতো এবং মিথ্যা বলে পার পাবার উপায় যদি আমার থাকতো, তবে নিশ্চয়ই আমি এ কথা স্বীকার করতাম না। হে মোহাম্মদ! এবার আপনি বলুন, আপনার কিতাবে বিবাহিত পুরুষ ও নারীর ব্যভিচারের শাস্তি কী? রসুল স. বললেন, চারজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যদি এ রকম সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, তাঁরা কোনো পরপুরুষ ও পরস্ত্রীকে এভাবে দেখেছেন— যেনো অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে সুরমাদানীর মধ্যে সুরমাদণ্ড, তবে তাদেরকে সঙ্গেসার করা ওয়াজিব হবে। ইবনে সুরিয়া বললো, হজরত মুসার প্রতি যিনি তওরাত অবতীর্ণ করেছেন, সেই আল্লাহ্‌র শপথ! তওরাত শরীফেও এ রকম বলা হয়েছে। রসুল স. বললেন, তবে তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পরিত্যাগ করেছো কেনো? ইবনে সুরিয়া বললো, বিত্তশালী লোকের প্রভাবে আমরা এ রকম করেছি।

www.eelm.weebly.com

আমরা বিত্তশালী ব্যভিচারীকে ছেড়ে দিতাম। আর সঙ্গেসার কার্যকর করতাম দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের উপর । এই সুযোগে বিত্তশালীরা ব্যাপকভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়লো। আমাদের বাদশাহ্র পিতৃব্যপুত্রও ব্যভিচার করেছিলো। কিন্তু তার উপরেও সঙ্গেসার কার্যকর করা হয়নি। তখন এক দরিদ্র ব্যভিচারীকে শাস্তি দেয়ার উদ্যোগ নিতেই তার গোত্রের লোকেরা প্রতিবাদী হয়ে উঠলো। তারা বলে বসলো, বাদশাহর পিতৃব্যপুত্রকে সঙ্গেসার না করা পর্যন্ত আমরা আমাদের লোককে সঙ্গেসার করতে দেবো না। অবস্থা বেগতিক দেখে আলেমগণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করলো— এখন থেকে এমন কোনো লঘু শাস্তি প্রচলন করা প্রয়োজন যা ধনী গরীব নির্বিশেষে সকলের উপর কার্যকর করা যায়। তারা অবশেষে শাস্তি নির্ধারণ করলো এ রকম— ব্যভিচারীকে চাবুকের মাধ্যমে প্রহার করতে হবে এবং তার মুখে লাগিয়ে দিতে হবে কালি। এই ঘটনার পর রসুল স. সঙ্গেসারের হুকুম দিলেন। মসজিদের দরজার পাশেই সঙ্গেসার কার্যকর করা হলো। তিনি স. বললেন, হে আমার আল্লাহ্! এ সকল লোক তোমার বিধান মিটিয়ে দিয়েছিলো। আমিই তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলাম। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, একবার কতিপয় ইহুদী রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, আমাদের এক পুরুষ ও মহিলা জেনা করেছে। তাদেরকে কী শাস্তি দিতে হবে? তিনি স. বললেন, এ সম্পর্কে তোমাদের কিতাবে কী বিধান রয়েছে? ইহুদীরা বললো, তাদেরকে অপদস্থ করতে হবে এবং চাবুক দিয়ে প্রহার করতে হবে। সেখানে উপস্থিত হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম বলে উঠলেন, তোমরা মিথ্যা বলেছো। তওরাতে রয়েছে, তাদেরকে সঙ্গেসার করতে হবে। লোকেরা তৎক্ষণাৎ তওরাত আনলো এবং তাদের মধ্যে একজন তওরাত খুলে পাঠ করতে শুরু করলো। যখন রজমের (সঙ্গেসারের) আয়াত এলো, তখন সে ওই আয়াতের উপর হাত রেখে তারপর থেকে পড়ে যেতে লাগলো। হজরত আবদুল্লাহ বললেন, যে আয়াত হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছো, সেই আয়াত পড়ো। পাঠকারী তার হাত উঠিয়ে নিতেই দেখা গেলো, সেখানে স্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে রজমের বিধান। বাধ্য হয়ে ইহুদীরা তখন রসুল স. কে সত্যবাদী বলে মেনে নিলো। রসুল স. তখন তাদের ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে পাথর মেরে হত্যা করতে নির্দেশ দিলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেছেন, আমি দেখলাম, প্রস্তরনিক্ষেপের সময় ব্যভিচারী পুরুষটি ব্যভিচারিণীটিকে প্রস্তরবর্ষণ থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছে।

ইমাম আহমদ তাঁর মসনদে লিখেছেন, হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ বলেছেন, ফদকের এক লোক ব্যভিচার করলো। ফদকবাসীরা মদীনার ইহুদীদেরকে লিখে জানালো— তোমরা মোহাম্মদের নিকট ব্যভিচারের শাস্তি কি তা জেনে নাও। যদি তিনি চাবুক মারার নির্দেশ দেন তবে মেনে নিও আর সঙ্গেসারের নির্দেশ দিলে মেনো না। ইহুদীরা এই মাসআলাটি রসুল স. এর

www.eelm.weebly.com

নিকট থেকে জেনে নিয়েছিলো। ইতোপূর্বে আহমদের ও মুসলিমের বর্ণনাতেও এই ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। রসুল স. তাদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, তাদেরকে সঙ্গেসার করতে হবে। তাঁর নির্দেশ কার্যকর করাও হয়েছিলো। এরপর অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। বায়হাকী তাঁর দালায়েল পুস্তকে হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কিসাস সম্পর্কে। ঘটনাটি ছিলো এই— বনী নাজিরেরা ছিলো বনী কুরায়জার চেয়ে অধিক সম্মানিত। বনী কুরায়জার লোকেরা একদিন রসুল স. কে বললো, আমরা এবং বনী নাজির একই পিতার সন্তান। আমাদের ধর্ম একটি। আমাদের নবীও একজন। কিন্তু বনী নাজিরেরা আমাদের কোনো লোককে হত্যা করলে কিসাস (বদলা) নিতে দেয় না। তারা রক্তপণ হিসেবে কেবল সত্তর ওয়াসক খেজুর দেয়। আর যদি আমরা তাদের লোককে হত্যা করি, তবে তারা আমাদের লোকের উপর কিসাস নেয় (তাকে হত্যা করে) এবং আমাদের নিকট থেকে আদায় করে দ্বিগুণ রক্তপণ (একশত বিশ ওয়াসক খেজুর)। তাদের মহিলাকে হত্যা করা হলে তারা আমাদের পুরুষকে হত্যা করে। একজন পুরুষকে হত্যা করলে, তারা হত্যা করে আমাদের দু'জন পুরুষকে। ক্রীতদাসকে হত্যা করলে তারা আমাদের স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করে। তাদের কোনো লোককে প্রহার করলে তারা আমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করে দ্বিগুণ বিনিময়। আপনি এখন তাদের এবং আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

আহমদ ও আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদীদের দু'টি গোত্র সম্পর্কে। মূর্খতার যুগে তাদের এক দল ছিলো অপর দল অপেক্ষা প্রবল। তাদের মধ্যে চুক্তি ছিলো এ রকম বিজয়ী দল যদি পরাস্ত দলের কোনো লোককে হত্যা করে, তবে তাকে রক্তপণ (দিয়ত) হিসেবে দিতে হবে পঞ্চাশ ওয়াসক খেজুর। আর পরাস্ত দলের কেউ যদি বিজয়ী দলের কাউকে হত্যা করে, তবে সে দিয়ত হিসেবে দিবে একশত ওয়াসক খেজুর। রসুল স. এর মদীনায় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তাদের মধ্যে এই চুক্তি অনুসারে আমলও করা হতো। রসুল স. এর মদীনায় আগমণের পর পরাস্ত দলের একজন বিজয়ী দলের এক ব্যক্তিকে মেরে ফেললো। রক্তপণ হিসেবে বিজয়ী দল চেয়ে বসলো একশত ওয়াসক খেজুর। পরাস্ত দলের লোকেরা বললো এ অবিচার আমরা মেনে নেবো কেনো? আমাদের দুই গোত্রের বংশ এক। আমাদের দেশ এক। ধর্ম এক। এতদসত্ত্বেও আমাদের দুই গোত্রের দিয়তের ব্যাপারে এ রকম বৈসাদৃশ্য থাকবে কেনো? আমরা এতদিন এই অনাচার মেনে নিয়েছিলাম জুলুমের ভয়ে। এখন মদীনায় এসেছেন মোহাম্মদ। সুতরাং এখন থেকে আমরা এ অনিয়ম মানবো না। এ নিয়ে দুই গোত্রের মধ্যে শুরু হলো প্রচণ্ড বিতণ্ডা। দু'দলই হয়ে উঠলো যুদ্ধংদেহী। শেষ পর্যন্ত দু'টো গোত্রই বিষয়টি ফয়সালার জন্য রসুল স.

www.eelm.weebly.com

এর শরণাপন্ন হতে সম্মত হলো। তারা কিছুসংখ্যক লোককে (মুনাফিককে) রসুল স. এর দরবারে পাঠালো এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আগাম বুঝতে চেষ্টা করবে, রসুল স. এ ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত দিতে চান। তখন অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। ওই মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যারা মুখে বলে বিশ্বাস করেছি, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাসী নয়'।

আরো বলা হয়েছে, 'যারা ইহুদী হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যানে তৎপর তাদের আচরণ যেনো তোমাকে দুঃখ না দেয়।' এ কথার অর্থ, হে রসুল! ওই সকল ইহুদী মুনাফিকদের আচরণে আপনার দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই, তারা বিশ্বাসবিচ্যুত হয়ে ইহুদী হয়েছে এবং তারা সত্য প্রত্যাখ্যানে সদা তৎপর।

এরপর বলা হয়েছে 'তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল'— এ কথার অর্থ ইহুদী আলেমেরা মিথ্যা শ্রবণে অভ্যস্ত। মিথ্যাচারিতাই তাদের আমলের ভিত্তি। তারা আপনার কথা এ উদ্দেশ্যেই শোনে, যেনো আপনার কথাকে তারা বিকৃত করে আপনার উপর অপবাদ দিতে পারে।

'যে সম্প্রদায় তোমার নিকট আসে নাই, তারা তাদের জন্য কান পেতে থাকে'— এ কথার অর্থ খায়বরবাসী ইহুদীরা আপনার নিকট আসে নাই, কিন্তু মদীনার বনী কুরায়জারা তাদের গুপ্তচর হিসেবে আপনার কথা শোনে ও আপনার গতিবিধি লক্ষ্য করে।

'শব্দগুলো যথাযথ বিন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তারা সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে'— এ কথার অর্থ তওরাতে উল্লেখিত রজম, কিসাস ইত্যাদি বিধানকে তারা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে। আল্লাহ্পাকের বাণী সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত। তবু তারা শব্দ বদলের মাধ্যমে অথবা অর্থ বিকৃতির মাধ্যমে অবতীর্ণ বিধানাবলীর রূপান্তর (তাহরীফ) ঘটায়।

এরপর বলা হয়েছে 'তারা বলে, এই বিকৃত বিধান দিলে গ্রহণ কোরো এবং তা বিকৃত না হলে বর্জন কোরো'— এ কথার অর্থ ইহুদীরা বলে, মোহাম্মদ স. যদি আমাদের মনমতো মীমাংসা না করে, তবে তোমরা তা গ্রহণ কোরো না।

'আল্লাহ্ যার পথচ্যুতি চান, তার জন্য আল্লাহ্র নিকট তোমার কিছু করার নেই— এ কথার অর্থ হে রসুল! আল্লাহ্পাক যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্য আপনি কিছুই করতে পারবেন না। আপনাকে এমন ক্ষমতা দেয়া হয়নি যে, আপনি আল্লাহ্র অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যকে অবদমন করতে পারেন।

মোতাজিলারা বলে, আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয় নয়। কিন্তু এ বাক্যটি তাদের অভিমতের বিরুদ্ধে। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয়।

'তাদেরই হৃদয়কে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করতে চান না'— এ কথার অর্থ, আল্লাহ্পাক ইহুদী মুনাফিকদের অন্তরকে কুফরী থেকে পবিত্র করতে চান না। মোতাজিলারা বলে, আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় ইমান, কুফরী নয়। কিন্তু এ বাক্যটি তাদের বিরুদ্ধে একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মোতাজিলারা হুকুম ও ইচ্ছার মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। তারা বলে, আল্লাহ্পাক ইমানের নির্দেশ দিয়েছেন, কুফরীর নির্দেশ দেননি। কিন্তু তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধে মানুষ কুফরী ও গোনাহ্ করে থাকে।

www.eelm.weebly.com

এ পৃথিবীতে এভাবে অবিশ্বাসীরা হয়ে ওঠে বিরুদ্ধাচারী। কিন্তু আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়, তারা ঈমান গ্রহণ করুক। সুতরাং নির্দেশ ও অভিপ্রায় এক নয়। বরং পৃথক। আশায়েরাগণ বলেছেন, পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্র নির্দেশ লংঘন করতে পারে। বরং করেই চলেছে। কিন্তু আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় ভালো ও মন্দ উভয়কে বেষ্টন করে রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়ের বাইরে ভালো কিংবা মন্দ কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্পাক যদি চান কারো কল্যাণ হোক, তবে সে অকল্যাণের পথে যেতেই পারে না। আর যদি চান কারো অকল্যাণ হোক, তবে তার পক্ষেও কল্যাণের পথে আসা সম্ভব নয়। আলোচ্য বাক্যটিকে আল্লাহ্পাকের সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপরিবর্তনীয় অভিপ্রায়ের কথাই বলা হয়েছে। যে অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কারো কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই (নবী রসুলগণেরও নেই)। সুতরাং প্রমাণিত হলো, নির্দেশ ও অভিপ্রায়— পৃথক দু'টি বিষয়।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'তাদের জন্য রয়েছে ইহকালে লাঞ্ছনা ও পরকালে মহা শাস্তি'— এ কথার অর্থ ইহকালে তাদেরকে কখনও নিহত হতে হবে, কখনও হতে হবে বন্দী। আবার কখনও জিজিয়া প্রদানে বাধ্য হয়ে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এতদ্সত্ত্বেও মুসলমানদের ভয়ে থাকতে হবে সদাশংকিত। আর তাদের পরকালের মহাশাস্তি হচ্ছে দোজখের অনন্ত আযাব। ওই চিরস্থায়ী শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে ইহুদীদের জন্য, মুনাফিকদের জন্য— অর্থাৎ উভয়ের জন্য।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪২, ৪৩

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْــًٔا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞

❒ তাহারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত; তাহারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাহাদের বিচার-নিষ্পত্তি করিও অথবা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিও; তুমি যদি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর তবে তাহারা তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, আর যদি বিচার-নিষ্পত্তি কর তবে ন্যায় বিচার করিও; আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

www.eelm.weebly.com

❒ তাহারা তোমার উপর কিরূপে বিচারভার ন্যস্ত করিবে যখন তাহাদের নিকট রহিয়াছে তওরাত— যাহাতে আল্লাহের আদেশ আছে? ইহার পরও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় এবং উহারা বিশ্বাসী নহে।

ইহুদী মুনাফিকেরা মিথ্যা শ্রবণে (গুপ্তচরবৃত্তিতে) আগ্রহী এবং হারাম ভক্ষণে অভ্যস্ত। 'সুহ্‌তা' অর্থ হারাম রিজিক। শব্দটির প্রকাশ্য অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'ফাই সহিতাকুম বিআযাব'— এ কথার অর্থ লিইউহ্‌লিকাকুম (তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য)। আখফাশ বলেছেন, সকল অবৈধ উপার্জনকে বলা হয় সুহ্‌তা।

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কা'ব ইবনে আশরাফ এবং তার মতো অন্য ইহুদী প্রশাসক সম্পর্কে। ওই সকল প্রশাসক ঘুষ গ্রহণ করে ঘুষ দাতার পক্ষে মামলার রায় দিতো। ঘুষ দাতা মিথ্যা কথা বললেও তা গ্রহণ করতো, অন্য পক্ষের প্রতি দৃকপাত মাত্র করতো না।

হাসান, কাতাদা, মুকাতিল এবং জুহাক বলেছেন, সুহ্‌তা ওই উৎকোচের নাম যা বিচার মীমাংসার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। হাসান বলেছেন, মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য বিচারককে যে উৎকোচ দেয়া হয় তাকেই বলে সুহ্‌তা। তবে জুলুম থেকে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে যদি হাকিমকে উৎকোচ দেয়া হয়, তাতে কোনো দোষ হবে না। আত্মরক্ষার জন্য উৎকোচ দিলে উৎকোচদাতার কোনো পাপ হবে না। কিন্তু উৎকোচ গ্রহণকারী সকল অবস্থায় গোনাহ্‌গার হবে।

আমি বলি, এ রকম হবে তখনই যখন দাবিদার সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। দাবিদার যদি এ রকম আশংকা করে যে, ঘুষ না দিলে হাকিম আমার হক ফিরিয়ে দিবে না এবং বিরোধী পক্ষের অত্যাচার থেকেও আত্মরক্ষা করা যাবে না, তবে ওই অবস্থায় উৎকোচ প্রদান তার জন্য বৈধ হবে। কিন্তু কোনো অবস্থায় হাকিম উৎকোচ নিতে পারবে না। তার জন্য সকল অবস্থায় উৎকোচ নাজায়েয।

হজরত ইবনে সা'দ বলেছেন, কেউ যদি কারো হক প্রতিষ্ঠার জন্যে অথবা জুলুম ঠেকানোর জন্য হাকিমের নিকট সুপারিশ করে ও কিছু দেয় এবং হাকিম তা গ্রহণ করে, তবে তা তার জন্য হারাম হবে। লোকেরা বললো, হে আবু আবদুর রহমান, আমরা ধারণা করি, নাজায়েয ফয়সালার জন্য কিছু গ্রহণ করার নাম ঘুষ (জায়েয ফয়সালার জন্য কিছু নেয়া ঘুষ নয়)। তিনি বললেন, নাজায়েয ফয়সালার জন্য ঘুষ গ্রহণ করাতো কুফরী। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন, সেই মোতাবেক যারা নির্দেশ প্রদান করবে না, তারাই কাফের'। মাসরুক বলেছেন, আমি হজরত ওমরের নিকট নিবেদন করলাম, অবৈধ সিদ্ধান্ত দানের জন্য ঘুষ নিলে কী হবে? তিনি বললেন, কুফরী হবে। ঘুষ ওই বস্তু, যা কোনো বাদশাহ্‌র পরিচিত জন প্রয়োজন ও বিপদ উদ্ধারের নিমিত্তে বাদশাহ্‌কে উপহার হিসেবে দেয় (উপহার না দিলে যদি তার কার্যোদ্ধার না হয়, তবে ওই প্রদত্ত উপহারই হবে ঘুষ)।

www.eelm.weebly.com

হজরত ওমর বলেছেন, দু'টি উপায়ে মানুষ ঘুষ খেয়ে থাকে। একটি হচ্ছে, অবৈধ সিদ্ধান্তদানের জন্য ঘুষ এবং অপরটি হচ্ছে ব্যভিচারে ব্যবহৃতা রমণীর বিনিময় মূল্য।

লাইসের বর্ণনায় রয়েছে, একবার বাদী-বিবাদী হজরত ওমরের সম্মুখে হাজির হলো। হজরত ওমর তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। তারা পুনরায় উপস্থিত হলো। তিনি পুনরায় তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। তারা তৃতীয়বার আগমন করলে তিনি তাদের ফয়সালা করে দিলেন। এমন করলেন কেনো— এ কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, প্রথমবার অনুভব করলাম আমার অন্তর বাদী-বিবাদীর একজনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। দ্বিতীয়বারও দেখলাম, আমি নিরপেক্ষ অবস্থায় নেই। তাই প্রথম ও দ্বিতীয়বার আমি বিচার মীমাংসা করা সমীচীন মনে করিনি। তৃতীয়বার আমি ছিলাম পক্ষপাতিত্বের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই তখন তাদের সুবিচার নিশ্চিত করেছি।

রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, বিচার মীমাংসার ক্ষেত্রে উৎকোচ দাতা ও প্রদাতা উভয়ের উপরে আল্লাহ্র অভিসম্পাত। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ,তিরমিজি ও হাকেম। মারফুরূপে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে। শিথিলসূত্রে মারফুরূপে হজরত সাওবান থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র লানত ঘুষ দাতা ও গ্রহিতা— উভয়ের উপর এবং ঘুষ আদান-প্রদানের ব্যাপারে যে প্রচেষ্টা চালায় তার উপর।

দ্রষ্টব্য একঃ ইবনে হুমাম লিখেছেন, ঘুষ হতে পারে কয়েক প্রকারের। ১. ঘুষ দিয়ে কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করা। এ রকম কাযী, কাযী নয় (ঘুষ দিয়ে কাযী হওয়া জায়েয নয়, এমন কাযীকে কাযীরূপে মান্য করা যাবে না।)। ২. ঘুষ নিয়ে কাযী যে মামলার মীমাংসা করবে সে মামলা গ্রহণযোগ্য নয়—সঠিক রায় দেয়া হলেও। কারণ, ঘুষ না নিয়েই সঠিক রায় দেয়া ছিলো কাযীর অবশ্যকর্তব্য। সুতরাং এক্ষেত্রে ঘুষ দেয়া নেয়া দু'টোই নাজায়েয। ৩. যদি ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার জন্য অথবা ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাদী বিবাদী ছাড়া অন্য কেউ হাকিমকে ঘুষ দিয়ে সুপারিশের মাধ্যমে ন্যায় বিচারকে নিশ্চিত করে। তবে সুপারিশকারীর জন্য ঘুষ প্রদান জায়েয। কিন্তু হাকিমের জন্য ঘুষ গ্রহণ করা হারাম। তবে হাকিম এ ব্যাপারে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে তার শ্রমের মূল্য হিসেবে কিছু নিতে পারবে। ওই অতিরিক্ত পারিশ্রমিক ঘুষ নয়। জানমালের নিরাপত্তার জন্য বাদী-বিবাদীর কেউ হাকিমকে কিছু দান করলে তা তাদের জন্য জায়েয হবে। কিন্তু হাকিমের জন্য ওই দান হারাম।

দ্রষ্টব্য দুইঃ মুহিত গ্রন্থে রয়েছে, ঘুষ কয়েক রকমের। ১. মহব্বত বৃদ্ধির জন্য কেউ কাউকে কিছু দিলে তা ঘুষ নয়, হাদিয়া। এ রকম হাদিয়া প্রদান জায়েয। আমি বলি, রসুল স. এ সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা একে অপরকে হাদিয়া দাও। এতে করে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা প্রগাঢ় হবে। ২. ভীত হয়ে কেউ কাউকে কিছু দান করলে অথবা হাকিমের জুলুম থেকে জানমাল রক্ষার জন্য

www.eelm.weebly.com

হাকিমকে কিছু দিলে দানকারীর জন্য তা জায়েয হবে, কিন্তু গ্রহণকারীর জন্য হালাল হবে না। ৩. যদি কেউ হাকিমের নিকট সুপারিশ করে তার কার্যসিদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য হাকিমকে কিছু দেয় তবেতো হবে নাজায়েয। এ রকম দেয়া-নেয়া হারাম। বৈধ কাজের জন্য কিছু দিয়ে সুপারিশ করে হাকিমের নিকট থেকে যদি কেউ তার কার্য সিদ্ধি করে তবে তার জন্য তা জায়েয হবে। কিন্তু গ্রহণকারীর জন্য তা জায়েয হবে কিনা, সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন জায়েয হবে, কেউ বলেছেন হবে না। এ গ্রহণ বৈধ হওয়ার স্বরূপ এই যে— মধ্যস্থতাকারী সময়সীমা নির্ধারণ করে কেবল তার সময় ও পরিশ্রমের বিনিময় গ্রহণ করবে এবং তা থেকে হাকিমকে কিছু দান করবে (আগে থেকে কোনো বিনিময় নির্দিষ্ট করবে না)। এমতোক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী তার নিজের পক্ষ থেকে হাকিমকে কিছু দিলে হাকিমের জন্য তা গ্রহণ করা মাকরূহ হবে না। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন মাকরূহ হবে। এক বর্ণনানুসারে হজরত ইবনে মাসউদের অভিমত অনুরূপ।

এরপর বলা হয়েছে, 'তারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি কোরো অথবা তাদেরকে উপেক্ষা কোরো; তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা করো তবে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না'—এ কথার অর্থ, অবিশ্বাসীরা যদি আপনার নিকট কোনো মামলা মোকদ্দমা নিয়ে হাজির হয়, তবে হে আমার প্রিয় রসুল! বিষয়টি সম্পূর্ণতই আপনার অভিপ্রায়ভূত করে দেয়া হলো। আপনি ইচ্ছা করলে তাদের মামলা নিষ্পত্তি করে দিতে পারেন। ইচ্ছা করলে নির্লিপ্তও থাকতে পারেন। নির্লিপ্ত থাকলে মনে করবেন না যে, তারা আপনার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে।

বাগবী লিখেছেন, জিম্মি কাফের (যারা জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করেছে) তাদের নিজেদের ভিতরে কোনো দ্বন্দ্ব সমস্যা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে মুসলমান হাকিমের শরণাপন্ন হলে হাকিম তাদের বিচার নিষ্পত্তি করতে পারেন কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, বিষয়টি হবে হাকিমের ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে তিনি বিচার নিষ্পত্তি করতে পারেন, নাও করতে পারেন। কারণ, সুরা মায়িদার কোনো নির্দেশ রহিত হয়নি। মুসলমান হাকিমের এখনও এই অধিকার রয়েছে যে, তিনি আহ্লে কিতাব ও অন্যান্য বিধর্মীদের মামলা মোকদ্দমা ইচ্ছে হলে নিষ্পত্তি করবেন। ইচ্ছে না হলে করবেন না। কিন্তু নিষ্পত্তি যদি করতে চান, তবে তা করবেন ইসলামের বিধান অনুসারে। এ রকম বলেছেন নাখয়ী, শা'বী, আতা এবং কাতাদা। কেউ কেউ বলেছেন, বিধর্মীরা কোনো বিচার সালিশ নিয়ে এলে তা নিষ্পত্তি করে দেয়া ওয়াজিব। কারণ, সুরা মায়িদার এই আয়াত রহিত হয়েছে ওই আয়াতের মাধ্যমে, যেখানে বলা হয়েছে— ওয়া আনিহ্কুম বাইনাহুম বিমা আনযালাল্লহু (এবং তাদের মধ্যে হুকুম করুন আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে)। এ রকম বলেছেন হজরত ইকরামা ও মুজাহিদ। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এই অভিমত

www.eelm.weebly.com

পোষণকারী। তিনি বলেছেন, সুরা মায়িদার দু'টি আয়াত ব্যতীত অন্য কোনো আয়াত রহিত হয়নি। 'লা তাহিল্লু শায়ায়িরিল্লাহ্'— এই আয়াতটি রহিত হয়েছে 'উক্বুতুলুল মুশরিকিনা কাফ্ফাহ্' আয়াত দ্বারা এবং 'ফাইন জায়ুকা ফাহ্কুম বাইনাহুম আও, আয়্‌রিদ্ব আনহুম'— আয়াতটি রহিত হয়েছে 'ওয়া আনিহ্কুম বাইনাহুম বিমা আনযালাল্লহ্' দ্বারা।

বায়যাবী লিখেছেন, দু'জন কিতাবী (কাফের) তাদের বিবাদ মেটানোর জন্য মুসলমান হাকিমের নিকটে এলে তা নিষ্পত্তি করে দেয়া হাকিমের উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ীও এ রকম বলেছেন। কিন্তু বাদী বিবাদীর একজন যদি জিম্মি হয়, তবে তা নিষ্পত্তি করে দেয়া ওয়াজিব। কারণ, মুসলমানেরা জিজিয়া গ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করতে অংগীকারাবদ্ধ। আলোচ্য আয়াতটির বিধানের মধ্যে জিজিয়া অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, সকল অবস্থায় বিচার নিষ্পত্তি করা ওয়াজিব।

আমি বলি, জিম্মি কিংবা হরবী— যে কোনো বিধর্মী বাদী-বিবাদী মুসলমান হাকিমের আদালতে মামলা মোকদ্দমা নিয়ে হাজির হলে ন্যায়ানুগতার সঙ্গে তা নিষ্পত্তি করে দেয়া হাকিমের উপর ওয়াজিব। কারণ, বাদশাহ্ কর্তৃক হাকিম নিযুক্ত করা হয়েছে বিচারাচারের জন্যই। সুতরাং মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকল বাদী-বিবাদীর বিচার নিষ্পত্তি করে দেয়া সকল অবস্থায় হাকিমের উপর ওয়াজিব। মুসলমান তো সর্বাবস্থায় মুসলমানই। আর জিম্মিরাও মুসলমানের অধীনে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। যার উপর দাবি করা হয়েছে সে যদি হরবী (বিধর্মী দেশের কাফের) হয়, তবে সে যেহেতু ইসলামী শরিয়তের বিধানের আওতাভূত নয়— তাই তার বিচার নিষ্পত্তি করা মুসলমান হাকিমের উপর ওয়াজিব নয়। বাদী-বিবাদী দু'জনেই যদি হরবী হয়, অথবা একজন হরবী একজন জিম্মি— এ রকম হয় এবং বাদী বিবাদী দু'জনে গ্রাম নেতা (হাকিম নয়), কোনো মুসলমানের নিকট বিচার নিষ্পত্তির আবেদন নিয়ে হাজির হয়, তবে ওই মুসলমানের উপর বিচার নিষ্পত্তি করে দেয়া ওয়াজিব নয়।

শেষে বলা হয়েছে, 'আর যদি বিচার নিষ্পত্তি করো, তবে ন্যায়বিচার কোরো; আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। এ কথার মাধ্যমে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক ন্যায়বিচারকদেরকে ভালোবাসেন। রসুল স. বলেছেন, ন্যায়বিচারকেরা (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্পাকের সান্নিধ্যে নূরের মিম্বরে উপবিষ্ট থাকবে। মুসলিম। হজরত ওমর বিন খাত্তাবের হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাকের নিকট ন্যায় বিচারক ও সচ্চরিত্ররা সবচেয়ে বেশী মর্যাদাশীল হবে। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে মূর্খ হাকিম এবং অসচ্চরিত্র অত্যাচারীরা। শো'বুল ইমান।

পরের আয়াতে (৪৩) এ মর্মে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, হে প্রিয় রসুল! ইহুদীরা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করবে কিভাবে? তারা তো আপনাকে রসুল বলে স্বীকারই করে না। আর তারা যে বিষয়ে নিষ্পত্তি করতে চায়, তার

www.eelm.weebly.com

স্পষ্ট বিধান রয়েছে তাদের কিতাবেই। সে বিধান সম্পর্কে তারা উত্তমরূপে অবগত (তওরাতের বিধান হচ্ছে, বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তি সঙ্গেসার)। কিন্তু সে বিধান তারা মানতে চায় না। তারা চায় তাদের মনগড়া সহজ কোনো বিধান।

শেষে বলা হয়েছে, 'এর পরেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা বিশ্বাসী নয়'। —এ কথার অর্থ তারা সত্য থেকে পশ্চাদপসরণকারী, অবিশ্বাসী। আল্লাহ্পাকের কোনো কিতাবের উপরেই তাদের বিশ্বাস নেই। যদি থাকতো তবে তাদের নিজেদের কিতাবের (তওরাতের) উপরে তারা আমল করতো। আর এ রকম করলে স্বাভাবিকভাবেই তারা তওরাতের প্রত্যয়নকারী কোরআনকেও মেনে নিতো। তারা এ রকম করে না। তাই তারা সত্যবিমুখ, অবিশ্বাসী।

সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪৪

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ○

❒ তওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম; উহাতে ছিল পথ-নির্দেশ ও আলো; নবীগণ যাহারা আল্লাহের অনুগত ছিল তাহারা ইহুদীদিগকে তদনুসারে বিধান দিত, রব্বানীগণ ও পণ্ডিতগণও বিধান দিত, কারণ তাহাদিগকে আল্লাহের কিতাবের রক্ষক করা হইয়াছিল এবং তাহারা ছিল উহার সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করিও না। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না তাহারাই সত্য- প্রত্যাখ্যানকারী।

সকল আসমানী কিতাবের মতো তওরাতও ছিলো পথনির্দেশ (হেদায়েত) এবং আলো (নূর)। আয়াতের শুরুতে এ কথাই বলে দেয়া হয়েছে। ইহুদীদের অন্তর যদি কঠিন না হতো, তবে তওরাতের মাধ্যমে তারা আলোকিত হতে পারতো। লাভ করতে পারতো পথের দিশা।

www.eelm.weebly.com

'নবীগণ যারা আল্লাহ্‌র অনুগত ছিলো, তারা ইহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিতো'- এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে হজরত মুসা পরবর্তী সকল সুবিচারক নবীগণের কথা। শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ স.ও তাঁদের অন্তর্ভূত। হজরত মুসা যেমন ব্যভিচারের জন্য রজমের নির্দেশ দিতেন, শেষ নবী মোহাম্মদ স.ও তেমনি নির্দেশ দেন। হাসান এবং সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'নাবিয়্যুন' (নবীগণ) অর্থ রসুল মোহাম্মদ স. । সম্মানিত দলপতির ক্ষেত্রে এ রকম বহুবচনসূচক শব্দ ব্যবহার আরবী ভাষার একটি প্রচলিত রীতি। সেই রীতির প্রয়োগ ঘটেছে এখানে। অন্যত্রও এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, 'ইন্না ইব্রাহিমা কানা উম্মাতান কৃনিতা'। এ আয়াতে উম্মত বলা হয়েছে হজরত ইব্রাহিমকে। রসুল স. এর বিধান দানের কথাই এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। তাই নবীগণ বলতে তিনিই এককভাবে অভিহিত হয়ে থাকতে পারেন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে নবীগণ বলতে বুঝানো হয়েছে হজরত মুসার পরের এবং হজরত ঈসার আগের নবীবৃন্দকে। কেননা একটু পরেই (৪৬ আয়াতে) উত্তর সাধকরূপে হজরত ঈসাকে প্রেরণের কথা বলা হয়েছে। সবশেষে প্রেরিত নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স.। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, অতীত নবীগণের শরিয়তের যে সকল হুকুম রহিত হয়নি, সেগুলোর উপর আমল করা আমাদের জন্য ওয়াজিব। রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে আমি ঈসার সর্বাপেক্ষা নিকটে। নবীগণ বৈপিত্রেয় ভ্রাতা। তাঁদের দ্বীন (পিতা) এক। কিন্তু শরিয়ত(মাতা) অনেক। বোখারী, মুসলিম।

'আল্লাজিনা আসলামু লিল্লাজিনা হাদু'— এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র পূর্ণ অনুগত নবীগণ ইহুদীদেরকে তওরাত অনুসারে বিধান দিতেন। 'পথ-নির্দেশ ও আলো'— তওরাতের এই বিশেষণের সঙ্গে রয়েছে এ বিধান দানের সংযোগ। এভাবে মূল বক্তব্যবিষয় হবে এই— তওরাতের পথ-নির্দেশ ও আলো এবং তদানুসারে প্রদত্ত নবীগণের বিধান ওই সকল লোকের জন্য, যারা কুফরী থেকে তওবা করে বিশ্বাসকে অবলম্বন করেছে। ইহুদীদের বিচার নিষ্পত্তি নবীগণ করেছেন তওরাতের বিধানের আলোকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির শেষের 'লিল্লাজিনা' (লিল্লাজিনা হাদু) এর 'লাম' অক্ষরটির অর্থ হবে 'আ'লা' বা উপরে। যেমন, 'ওয়া ইন আসা'তুম ফালাহা' (যদি তোমরা গোনাহ্ করো তবে তা তোমাদেরই জন্য)— এখানে 'ফালাহা' শব্দটির অর্থ হবে 'ফা আলাইহা।' অর্থাৎ যদি তোমরা গোনাহ্ করো তবে তা তোমাদের নফসের উপরেই বর্তাবে। অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে, উলায়িকা লাহুমুল্লা'নাতু। এখানে 'লাহুম' অর্থ হবে 'আলাইহিম' (তাদের উপর)। বাক্যটির পুরো অর্থ হবে, 'তাদের উপরেই হবে লা'নত (অভিশাপ)'। আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের প্রকৃত অর্থ হবে এ রকম — নবীগণ তওরাতের মাধ্যমে অবিশ্বাসী ইহুদীদের বিরুদ্ধে বিধান দান করতেন। কারণ তওরাতের নির্দেশ এই যে, যখন কোনো নবী তওরাত অনুসারে বিধানদাতারূপে আবির্ভূত হোন, তখন তোমরা তাকে অবশ্যই মেনে নিবে এবং তার সাহায্যকারী হবে। বায়যাবী লিখেছেন, 'লিল্লাজিনা হাদু' কথাটির মাধ্যমে ওই সকল নবীগণকে নির্দেশ করা হয়েছে, যারা তওরাতের অনুকূল বিধানদাতারূপে হজরত মুসার পর আবির্ভূত হয়েছেন। এই নির্দেশের

www.eelm.weebly.com

মধ্যে হজরত ঈসা এবং হজরত মোহাম্মদ স. পড়বেন না। কারণ, তাঁরা তওরাতের বিধানের অধীনে ছিলেন না। ছিলেন তওরাতের প্রত্যয়নকারী এবং স্বতন্ত্র কিতাবের অধিকারী। এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'লিকুল্লি জায়ালনা মিনকুম শিরআতাঁও ওয়া মিনহাজা' (আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও পথ দিয়েছি)। এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, হজরত ঈসা আ. এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স.তওরাত অনুসারে বিধান দিতে আদিষ্ট ছিলেন না। বায়যাবীর এ বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অতীত নবীগণের শরিয়ত আমাদের জন্য দলিল নয়।

আমরা বলি, 'লিকুল্লি জায়ালনা মিনকুম শিরআতাঁও ওয়া মিনহাজা'— এই আয়াতের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, তওরাতের সকল নির্দেশ রহিত করে দেয়া হয়েছে। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, তওরাতের অধিকাংশ হুকুম আহকামকে রহিত করা হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন এবং হাদিস দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে একথা প্রমাণিত না হবে যে, অমুক হুকুমটি রহিত, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই হুকুম আমাদের জন্য আমল করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন, 'অনুসরণের মধ্যেই তাদের জন্য রয়েছে হেদায়েত'।

'রব্বানীগণ ও পণ্ডিতগণও বিধান দিতো'— কারণ, তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিলো এবং তারা ছিলো তার সাক্ষী'— এখানে রব্বানীগণ অর্থ সুফী সাধকগণ। অর্থাৎ তৎকালীন পীর মাশায়েখগণ। তাঁরা তাঁদের মুরিদদের চরিত্র সংশোধনের নিমিত্তে এবং হৃদয়কে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে তওরাতের নির্দেশ অনুসারে বিধান দান করতেন।

আহবার অর্থ আলেম বা পণ্ডিত। আহবার শব্দটির একবচন হচ্ছে 'হাবর' বা 'হিবর'। হিবর বলা হয় পণ্ডিতদেরকে। অর্থাৎ যারা প্রাজ্ঞ— তাদেরকে। কেউ কেউ বলেছেন, হিবর অর্থ জামাল বা সৌন্দর্য। হাদিস শরীফে এসেছে, দোযখ থেকে এক ব্যক্তি এমন অবস্থায় নিষ্ক্রান্ত হবে, যখন সে হয়ে পড়বে সৌন্দর্য (জামাল) বিহীন।

তাহ্‌বীর অর্থ তাহ্‌সীন বা সুন্দর। প্রকৃত আলেমগণ উত্তম চরিত্রের এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত হোন বলে তাঁদেরকে বলা হয় আহ্‌বার। রব্বানী ও আহবারগণ ছিলেন আল্লাহ্‌র কিতাবের (তওরাতের) রক্ষক। তাঁদেরকে তওরাত গ্রন্থের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তওরাতানুসারে আমল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। তওরাতের শব্দ পরিবর্তন কিংবা অর্থ বিকৃতির নির্দেশ দেয়া হয়নি। 'ওয়াকানু আলাইহি শুহাদায়া'— অর্থ তাঁরা ছিলেন তার (তওরাতের) সাক্ষী। অর্থাৎ সুফী সাধক ও আলেমগণ তওরাতের বিধান সম্পর্কে সত্য সাক্ষ্য পেশ করতেন। পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করতেন তওরাতের বিধান।

'ফালা তাখ্‌শাউন্নাস'— এ কথার অর্থ, সুতরাং মানুষকে ভয় কোরো না। অর্থাৎ হে প্রিয় রসুল! আপনার বিচারের রায় যদি প্রভাবশালী লোকদের বিরুদ্ধেও যায় তবুও আপনি কাউকে ভয় করবেন না।

'ওয়াখশাওনি' অর্থ, আমাকেই ভয় করো। ইবনে আসাকের, হাকেম এবং তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যদি মানুষ মানুষকে ভয় করে তবে যাকে ভয় করা হয়েছে— তাকেই ভীত মানুষের উপর প্রবল করে

www.eelm.weebly.com

দেয়া হয়। আল্লাহ্ ব্যতীত যে অন্য কাউকে ভয় করে, আল্লাহ্পাক তাকে মানুষের মুখাপেক্ষী করে দেন। আর যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপর নির্ভর করে না, আল্লাহ্পাক তাকে মানুষের মুখাপেক্ষী করেন না।

'ওয়ালা তাশতারু বিআইয়্যাতি ছামানান ক্বলিলা' (এবং আমার আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রয় কোরো না) — এ কথার অর্থ, পার্থিব সুবিধার জন্য আল্লাহ্র বিধান থেকে সরে যেয়ো না। উৎকোচ ইত্যাদি গ্রহণ কোরো না। এ কথাটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, তওরাতের যে সকল বিধান রহিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তার উপর আমল করা এই উম্মতের জন্য জরুরী।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।' – এ কথার অর্থ, যারা আল্লাহ্তায়ালার বিধানকে অস্বীকার করে এবং তাঁর বিধানানুসারে যারা অন্যকে চলতে নির্দেশ দেয় না, তারাই কাফের। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে কাফের অর্থ হবে ফাসেক। কেউ কেউ বলেছেন, সত্যবিমুখ। হজরত ইবনে আব্বাস এবং তাউস বলেছেন, তারা ওই পর্যায়ের কাফের নয়, যারা ধর্ম থেকে পরিপূর্ণরূপে বহিষ্কৃত। আল্লাহ্, রসুল এবং কিতাবকে অস্বীকার করলে প্রকৃত কাফের হয়। এখানে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বলে ওই রকম কাফেরের কথা বলা হয়নি। তাই এখানে কাফের অর্থ হবে ফাসেক (পাপিষ্ঠ)।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ
الْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ وَّمُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

❒ তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম যে, প্রাণের বদল প্রাণ, চোখের বদল চোখ, নাকের বদল নাক, কানের বদল কান, দাঁতের বদল দাঁত এবং জখমের বদল অনুরূপ জখম। অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহারই

www.eelm.weebly.com

পাপ মোচন হইবে। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না তাহারাই সীমালংঘনকারী।

❑ মরিয়ম-তনয় ঈসাকে তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থকরূপে উহাদের উত্তর-সাধক করিয়াছিলাম এবং তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থকরূপে এবং সাবধানকারীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাহাকে ইঞ্জিল দিয়াছিলাম; উহাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো।

কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে, ইহুদীদের জন্য তওরাতের বিধান ছিলো এ রকম— প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম।

খুনের বদলে খুন— এই বিধান আমাদের শরিয়তেও বহমান। সুরা বাকারার 'আল হুররু বিল হুররি' আয়াতের তাফসীরে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হত্যাকারী স্বাধীন, ক্রীতদাস, পুরুষ, নারী, মুসলমান, জিম্মি— যেই হোক না কেনো তাকে হত্যা করতে হবে।

কিসাস শব্দের অর্থ সাদৃশ্য বা আনুরূপ্য। এর প্রকৃত অর্থ, কেউ কারো ক্ষতি করলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তির নিকট থেকে সমপরিমাণ বদলা নিতে পারবে। অতিরিক্ত বদলা নিতে পারবে না। যেমন, যদি কেউ কারো কব্জি পর্যন্ত হাত কেটে দেয়, তবে ওই ব্যক্তি হস্ত কর্তনকারীর হাতও কব্জি পর্যন্ত কেটে দিতে পারবে। মাথা, নাক, কান, দাঁত কেটে ফেললে বা তুলে ফেললে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিসাধনকারীর উপর সমপরিমাণ বদলা নিতে পারবে। যদি কাউকে প্রহার করলে তার চোখ বেরিয়ে যায়, তবে তার কিসাস নেয়া সম্ভব হবে না। কেননা, প্রহারকারীকে প্রহার করতে শুরু করলে তার চোখ বেরিয়ে নাও আসতে পারে। কিন্তু যদি চোখ স্বস্থানে স্থির থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টিহীন হয়ে যায়, তবে তার বদলা নেয়া ওয়াজিব হবে। কেননা, এখানে অনুরূপ বদলা নেয়া সম্ভব। এমতোক্ষেত্রে আয়নাকে উত্তপ্ত করে রাখতে হবে প্রহারকারীর চোখের উপর। এভাবে চোখের উপর অতি উত্তপ্ত আয়না রাখলে তার দৃষ্টিশক্তি অন্তর্হিত হবে। সাহাবীগণের মাধ্যমে এ রকমই বর্ণনা চলে এসেছে। কেফায়া গ্রন্থে রয়েছে, এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছিলো হজরত ওসমানের যুগে। তিনি উপস্থিত সাহাবীগণের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ বিনিময় করলেন। কিন্তু কেউ সদুত্তর দিতে সক্ষম হলেন না। এমন সময় হজরত আলী এলেন। সব শুনে তিনি বর্ণিত নিয়মে বদলা নেয়ার কথা বললেন। সকলেই তাঁর কথা মেনে নিলেন। কেউ তখন তাঁর বিরুদ্ধাচারী হননি বলে সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যসম্মত। হজরত ওসমান ওইরূপ বিধানই কার্যকর করেছিলেন। দাঁত ও হাড় উঠিয়ে ফেলার বদলা নেয়া যায় না।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, জখমের বদলা ওই সময় নেয়া যাবে, যখন জখম ছড়িয়ে পড়বে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, জখম বেশী হওয়া বা শুকিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করা যাবে না। তাৎক্ষণিকভাবে বদলা নেয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। হানাফিগণ হজরত জাবের বর্ণিত হাদিসকে

www.eelm.weebly.com

তাঁদের অভিমতের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তিকে আহত করা হয়েছিলো— সে তাৎক্ষণিক কিসাসের আবেদন জানালো। কিন্তু রসুল স. জখম নিরাময় হওয়া পর্যন্ত কিসাস নিতে নিষেধ করেছিলেন। দারা কুতনী।

মাসআলাঃ যদি অর্ধেক হাত কেটে দেয়া হয় এবং ভিতরের খালি স্থান পর্যন্ত জখম পৌঁছে যায় এবং জখম ভালো হয়ে পুরো হাত জোড়া লেগে যায়, তবে কিসাস নেয়া যাবে না। কেননা, এমতোক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ বিনিময় গ্রহণ করার সুযোগ নেই। বিনিময় নিলে অপরাধীর হাতের হাড় অকেজো হয়ে যেতে পারে। এমনকি এতে করে তার মৃত্যুর সম্ভাবনাও রয়েছে। তাই, বদলা বা বিনিময় নেয়া যাবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যদি বাহুমূল থেকে কেটে ফেলে দেয়া হয় তবে, কিসাস হিসেবে ওই ব্যক্তির কনুই পর্যন্ত হাত কেটে নিতে হবে। আর যদি কব্জি ও কনুইয়ের মাঝখানে কেটে দেয়া হয়, তবে হাত কেটে নিতে হবে পিছনের দিক থেকে। অন্যান্য অঙ্গ কর্তন করলেও এভাবে কিসাস গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ সমপরিমাণ অথবা কাছাকাছি অংশ থেকে কেটে দিতে হবে।

মাসআলাঃ জিহ্বা এবং লজ্জাস্থান কাটলে ইমাম আবু হানিফার মতে কিসাস নেয়া যাবে না। কারণ, এ দু'টো অঙ্গের কর্তনের পরিমাণ বা সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে লজ্জাস্থানের অগ্রভাগ কেটে নিলে তার কিসাস গ্রহণ করা যাবে। কেননা, এক্ষত্রে কর্তনের সীমানা সুচিহ্নিত। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, জিহ্বা এবং লজ্জাস্থান যদি মূল থেকে কেটে নেয়া হয় তবে তার বদলা নেয়া যাবে। কারণ, এক্ষেত্রে সীমানা নির্ধারণের সমস্যা নেই। সম্পূর্ণ ওষ্ঠ মূল থেকে কেটে ফেললে বিনিময় নেয়া যাবে। কারণ, এখানেও পরিমাণ নির্ধারণ অসম্ভব নয়। তবে সম্পূর্ণ ঠোঁট কাটা না হলে বিনিময় নেয়া যাবে না। কারণ, অনুরূপ অবিকল বিনিময় হওয়া সম্ভব নয়।

মাসআলাঃ অক্ষম ও খুঁত বিশিষ্ট হাতের বিনিময়ে সুস্থ সবল হাত, ডান হাতের পরিবর্তে বাম হাত অথবা বাম হাতের পরিবর্তে ডান হাত কাটা যাবে না। এ অভিমতটি ঐকমত্যোৎসারিত।

মাসআলাঃ প্রহৃত ব্যক্তির চোখ যদি স্বস্থানে থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টিহীন হয়ে যায়, অথবা হাত নষ্ট হয়ে যায় বা বাকশক্তি রহিত হয়ে যায় এবং পুরুষাঙ্গ অকেজো হয়ে যায় অথবা প্রহারকারী যদি তার অতিরিক্ত আঙ্গুল কেটে নেয়, তবে জমহুরের নিকট ন্যায়বিচারকের মাধ্যমে এর মীমাংসা করে দিতে হবে। ইমাম আহমদের নিকট সুস্থ অঙ্গের এক তৃতীয়াংশ দিয়ত আদায় করে দিতে হবে। কেননা, আমর বিন শোয়াইবের পিতামহ হজরত আবদুল্লাহ্‌র বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. এক তৃতীয়াংশ দিয়ত পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, যখন চোখ যথাস্থানে থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টিহীন হয়েছিলো, আর যখন নষ্ট হাত কেটে দেয়া হয়েছিলো এবং বিনষ্ট চোখ উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো। নাসাঈর পদ্ধতিতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী। হজরত ইবনে আব্বাসের মাওকুফ হাদিসে রয়েছে, বিনষ্ট হাতের জন্য এক তৃতীয়াংশ দিয়ত দিতে হবে আর চোখ যথাস্থানে থেকেও দৃষ্টিহীন হলে দিয়ত দিতে হবে এক তৃতীয়াংশ।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ যদি কারো সুস্থ সবল হাত কাটা হয় এবং যে হাত কেটেছে তার হাত বিনষ্ট অথবা কম আঙ্গুল বিশিষ্ট থাকে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে যার হাত কাটা হয়েছে সে ইচ্ছে করলে হস্ত কর্তনকারীর বিনষ্ট হাতকে কেটে দেবে অথবা পুরোপুরি সম্পদগত ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে পূর্ণ শারীরিক বিনিময় গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কাজেই হয়তো নিজের হাতের চেয়ে কম শারীরিক বিনিময় নিতে হবে অথবা নিতে হবে আর্থিক বিনিময় (মালী জরিমানা)। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মালী বিনিময় নেয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

মাসআলাঃ যদি মাথার খুলির উভয় পাশে এমন আঘাত লাগে যাতে করে মাথার উপরের সম্পূর্ণ অংশ জখম হয়ে যায় তবে এর বদলা স্বরূপ প্রহারকারীর (মাথা বড় হওয়ার কারণে) খুলির উভয় পাশে আঘাত করলে যদি সেই আঘাত মাথার উপরে পর্যন্ত না পৌঁছায়, তবে প্রহৃত ব্যক্তি ইচ্ছে করলে প্রহারকারীর মাথার উপরে আঘাত করে জখম করে দিতে পারবে। ডান বা বাম যেদিক থেকে খুশী সেদিক থেকেই তার মস্তকের উপরিভাগে আঘাত করা যাবে। অথবা প্রহৃত ব্যক্তি ইচ্ছে করলে এ রকম বদলা না নিয়ে প্রহারকারীর নিকট থেকে মালী জরিমানা গ্রহণ করতে পারে।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, দাঁত তুলে ফেললেও শারীরিক বিনিময় গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, দাঁত তুলে ফেলার শারীরিক বিনিময় নেই। কেননা, এ রকম বিনিময়ের অবিকল সাদৃশ্য হওয়া সম্ভব নয়।

আমরা বলি, যদি দাঁতের সামান্য অংশ উঠিয়ে ফেলে, তবে অবিকল সাদৃশ্য হওয়া সম্ভব। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. দাঁতের বিনিময় নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নাসাঈ। হজরত আনাসের বর্ণনায় আরও এসেছে হজরত আনাস বিন মালেকের ফুফী রবী এক আনসারী মেয়ের দাঁত ভেঙে ফেললেন। ওই আনসার অভিযোগ নিয়ে রসুল স. দরবারে উপস্থিত হলে রসুল স. বিনিময় গ্রহণ করার হুকুম দিয়েছিলেন। এই নির্দেশের কথা শুনে হজরত আনাস বিন মালেকের পিতৃব্য হজরত আনাস বিন নজর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! দাঁত উপড়ানোর নির্দেশ থেকে তাকে রক্ষা করুন। রসুল স. বললেন, আনাস! বিনিময় আল্লাহ্র ফরজ বিধান। এ কথা শুনে তিনি মালী বিনিময়ের নির্দেশকে মেনে নিলেন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্র এমন কতিপয় বান্দা রয়েছে, তারা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে কসম খেয়ে বসলে আল্লাহ্ পাক তা পূর্ণ করে দেন। বোখারী, মুসলিম।

মাসআলাঃ প্রাণহরণের চেয়ে কম অপরাধের মধ্যে শিবহে আমাদ নেই (ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো হত্যাকে কতল শিবহে আমাদ বলে)। প্রহার যদি ইচ্ছাকৃত হয় অথবা ভুলক্রমে হত্যা করে ফেলে, তবে তা হবে ইচ্ছাকৃত হত্যার মতোই।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, প্রাণ নাশ করার চেয়ে কম অত্যাচারের ক্ষেত্রে স্ত্রী, পুরুষ, স্বাধীন, ক্রীতদাস এবং সমপর্যায়ের দু'জন ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে কিসাস জারী করা যাবে না। অন্য তিন ইমাম বলেছেন, সকল অবস্থায় বিনিময় নেয়া যাবে। তবে মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের হাত কেটে ফেললে কিসাস হবে না। কেননা মুসলমানদের রীতি এই যে, স্বাধীনের নিকট থেকে দাসের কিসাস হতে পারে না। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'আল হুররু বিল হুররি' (স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন)। এই আয়াত সাধারণ অর্থের দিক থেকে ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে। ইমাম আবু হানিফার অভিমতের প্রমাণ এই যে, শরীরে অবস্থান সম্পদের মতোই। অর্থাৎ সম্পদের মাধ্যমে এর ক্ষতিপূরণ করে নিতে হবে। কিন্তু শরীরের মূল্যও সুনির্ধারিত। তাই প্রাণনাশের বিষয়টি পৃথক প্রকৃতির। রূহের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলে জীবনাবসান ঘটে। কাজেই এর মধ্যে কোনো পার্থক্য চলে না।

মাসআলাঃ মুসলমান এবং জিম্মির মধ্যে দৈহিক বদলা (কিসাস) কার্যকর করা যাবে। কেননা, মুসলমান ও জিম্মি নিরাপত্তাপ্রাপ্তির দিক থেকে সমপর্যায়ের। এ রকম বলেছেন ইমাম আজম। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, মুসলমান যদি কোনো অমুসলমানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করে, তবে কিসাস হবে না। তাঁরা আরও বলেছেন, মুসলমান কাফেরকে হত্যা করে ফেললেও কিসাস হবে না। সুরা বাকারার তাফসীরে এই মাসআলাটির বিবরণ দেয়া হয়েছে।

'অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তার পাপ মোচন হবে।' —এ কথার অর্থ বদলা গ্রহণের অধিকার লাভ করা সত্ত্বেও কেউ যদি তা পরিত্যাগ করে এবং অপরাধীকে মাফ করে দেয়, তবে তাতে তার পাপ মোচন হবে। হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস, হাসান বসরী, শা'বী এবং কাতাদা এ রকম বলেছেন। এক আনসারী বর্ণনা করেছেন,এ বাক্যটি সম্পর্কে রসুল স. বলেছেন এখানে ওই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যার দাঁত ফেলে দেয়া হয়েছে, হাত অথবা অন্য কোনো অঙ্গ কেটে নেয়া হয়েছে কিংবা অন্য কোনো ভাবে আঘাত করা হয়েছে— এতদসত্ত্বেও যদি সে অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে এর সমপরিমাণ পাপ আল্লাহ্পাক তার আমলনামা থেকে মুছে ফেলবেন। যদি ওই ব্যক্তি তার এক চতুর্থাংশ দিয়ত ক্ষমা করে দেয়, তবে তার পাপও মার্জনা করা হবে এক চতুর্থাংশ। যদি এক তৃতীয়াংশ দিয়ত ক্ষমা করে দেয়, তবে তার পাপও ক্ষমা করা হবে এক তৃতীয়াংশ। আর যদি সে তার সম্পূর্ণ দিয়ত ক্ষমা করে দেয়, তবে তার সম্পূর্ণ গোনাহ্ই মাফ করে দেয়া হবে। ইবনে মারদুবিয়া।

তিবরানী তাঁর কবীর পুস্তকে উত্তমসূত্রে হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার শরীরে প্রাপ্ত আঘাতের বিনিময় ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ্পাক তার সমপরিমাণ গোনাহ্ রহিত করে দেবেন। হজরত সানজুরা থেকে তিবরানী ও বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েও ধৈর্য ধারণ করে এবং দিয়ত দেয়া হলে কৃতজ্ঞচিত্ত হয় এবং

www.eelm.weebly.com

জুলুমকারীকে ক্ষমা করে দেয় অথবা নিজে জুলুম করলে আল্লাহ্তায়ালার মার্জনা অন্বেষণকারী হয়, তাকে আখেরাতে আল্লাহ্পাকের আযাব থেকে নিরাপদ রাখা হবে এবং এগুলো হবে তার জন্য হাদিয়া স্বরূপ।

তিরমিজি ও ইবনে মাজার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু দারদা বলেছেন, আমি নিজে রসুল স.কে বলতে শুনেছি—শারীরিক আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি আঘাতকারীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে আল্লাহ্পাক তার একটি মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন এবং মুছে দিবেন তার পাপকে।

আমাদের শায়েখ ও ইমাম মীর্জা মাযহারে শহীদ জাঁনে জানা র. কে আঘাত করা হয়েছিলো এবং ওই আঘাতেই তিনি পৃথিবী পরিত্যাগ করেছিলেন। আহত শায়েখকে দিল্লির আমির নবাব নজফ খান বলে পাঠালেন, আমি আপনার আঘাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। শায়েখ বললেন, আঘাতকারীর সঙ্গে বিরোধ কোরো না। আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'তার পাপ মোচন হবে'—এখানে 'তার' সর্বনামটি অপরাধীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা দৃষ্টে এ কথাটিই প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণের হকদার ব্যক্তি যদি অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে ওই ক্ষমা হবে অপরাধীর পাপের ক্ষতিপূরণ। আখেরাতে এ অপরাধের জন্য তাকে আর অভিযুক্ত হতে হবে না। এখন রইলো অত্যাচারিত ব্যক্তির ক্ষমা করার সওয়াব প্রসঙ্গ। এই সওয়াব দান করবেন আল্লাহ্পাক। তাই এরশাদ হয়েছে, 'অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয় তার বিনিময় রয়েছে আল্লাহ্র অধিকারে' (ফামান উফিইয়া ওয়া আসলাহা ফাআজরুহু আলাল্লহ্)। বাগবী লিখেছেন, এই তাফসীর করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। মুজাহিদ, ইব্রাহিম, এবং জায়েদ বিন আসলামের বর্ণনাও অনুরূপ।

বাক্যটির আরেকটি তাফসীর বর্ণিত হয়েছে এ রকম—যদি কেউ স্বেচ্ছায় বিনিময় দিয়ে দেয় অর্থাৎ শরিয়তসম্মত কিসাস স্বউদ্যোগে পরিশোধ করে, তবে সেটাই হবে তার গোনাহের কাফফারা। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'হে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জীবনের নিরাপত্তা' (ফিল কিসাসে হায়াতুঁ ইয়া উলিল আলবাব)।

শেষে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই সীমালংঘনকারী।'—এ কথার অর্থ কিসাস ইত্যাদি প্রসঙ্গে আল্লাহ্পাক যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন— তদনুসারে যারা বিচার নিষ্পত্তি করবে না, তারাই জালেম (সীমালংঘনকারী)। অর্থাৎ যারা হুকুমকে গোপন করবে এবং আল্লাহ্র হুকুম পালন করা থেকে বিরত থাকবে, সীমালংঘনকারী তারাই।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে, 'মরিয়ম তনয় ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থকরূপে তাদের উত্তর সাধক করেছিলাম এবং তার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থক হিসেবে এবং সাবধানকারীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে ইঞ্জিল দিয়েছিলাম; তাতে ছিলো পথের নির্দেশ ও আলো।' এখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা সাবধানী (তাকওয়ার অধিকারী) তাদের জন্যই আসমানী কিতাব ইঞ্জিল পথের নির্দেশ ও আলো।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪৭

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

❑ ইঞ্জিল অনুসারিগণ যেন আল্লাহ্ উহাতে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না তাহারা সত্যত্যাগী।

এখানে বলা হয়েছে, ইঞ্জিল অনুসারিগণ যেনো ইঞ্জিলের নির্দেশানুসারে বিধান দেয়; আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারা সত্যত্যাগী (ফাসেক)।

একটি সন্দেহঃ কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর ইঞ্জিল রহিত হয়েছে অথচ এই আয়াতে আদেশ দেয়া হয়েছে, ইঞ্জিল অনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারা সত্যত্যাগী—এর কারণ কী?

সন্দেহভঞ্জনঃ ইঞ্জিলের সকল নির্দেশ রহিত করা হয়নি। যে সকল নির্দেশ রহিত হয়েছে, সেগুলোর স্থলে কোরআনে নতুন নির্দেশ এসেছে। এখন যদি রহিত নির্দেশের উপর কেউ আমল করে, তবে তাতে করে ইঞ্জিলেরই বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। কারণ, আল্লাহ্পাকই নির্দেশ অবতীর্ণ করেন এবং তারপর নির্দেশ রহিত করেন। সুতরাং রহিত নির্দেশ অনুযায়ী আমল করলে তা চলে যাবে ইঞ্জিলেরও মূল উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে। ইঞ্জিল অনুসারীরা ছিলেন হজরত ঈসার উম্মত। তাঁরা রসুল মোহাম্মদ স. এর আবির্ভাবের পূর্বেই গত হয়েছেন। রসুল মোহাম্মদ স. এর আবির্ভাবের পরে তাঁদেরকে হতে হবে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এরই উম্মত (অর্থাৎ রসুল স. এর আগমনের পর তাঁর উম্মতেরাও অন্য সকল আসমানী কিতাবের মতো ইঞ্জিলকে মান্য করেন। কিন্তু ইঞ্জিলের রহিত নির্দেশ অনুসারে আমল করেন না। ইঞ্জিলেরও নির্দেশ এই যে, রহিত হুকুমের উপর আমল করা যাবে না। সুতরাং রহিত হওয়ার পরেও যারা রহিত নির্দেশের অনুগামী হবে, তারা ইঞ্জিলেরও বিরোধী)।

এখানে ফাসেক বলা হয়েছে তাদেরকে, যারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেয় না। এখানে ফাসেক অর্থ কাফের (অবিশ্বাসী, ইমান বহির্ভূত)। কারণ তারা আল্লাহ্র নির্দেশের অবমাননা করে।

www.eelm.weebly.com

وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ
عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ
شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ
اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

❒ তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে তুমি তাহাদের বিচার-নিষ্পত্তি করিও এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তদ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহা করেন নাই। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর, আল্লাহের দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।

'তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে'—এখানে প্রথমে উল্লেখিত কিতাব অর্থ কোরআন মজীদ এবং পরে উল্লেখিত কিতাব অর্থ কোরআনের পূর্বে অবতীর্ণ সকল আসমানী কিতাব। 'মুহাইমিনান' শব্দটির অর্থ সাক্ষী—এ কথা বলেছেন মুজাহিদ, কাতাদা, সুদ্দী এবং কাসাই। হজরত ইকরামা বলেছেন শব্দটির অর্থ, বর্ণনাকারী। হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের এবং হজরত আবু উবাদা বলেছেন এর অর্থ, সংরক্ষক। হাসান বসরী বলেছেন বিশ্বাসী। সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব এবং জুহাক বলেছেন, বিচারক। খলিল বলেছেন, সংক্ষণকারী। এ সকল শব্দ প্রায় সমার্থক। মূল উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল কিতাবকে কোরআন মজীদ সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়, সে সকল কিতাব আল্লাহ্র কিতাব। নিশ্চয়ই আল্লাহ্রই কিতাব। ইবনে জারীহ্ বলেছেন কোরআন মজীদ পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সংরক্ষক। আহলে কিতাবগণ যা কিছু বর্ণনা করে, সেগুলোর বিবরণ যদি কোরআন মজীদে থাকে, তবে

www.eelm.weebly.com

সেগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে। কোরআনে সেগুলোর সমর্থন না থাকলে সেগুলোকে গ্রহণ করা যাবে না। অর্থাৎ কোরআন যেগুলোকে প্রত্যয়ন করবে, সেগুলোই সত্য এবং যেগুলোকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করবে সেগুলো মিথ্যা। আর যে বিষয়ে কোরআন নিশ্চুপ থাকবে, সে বিষয়ে তোমাদেরকেও থাকতে হবে নিশ্চুপ। সেগুলোকে সত্য মিথ্যা কিছুই বলা যাবে না।

'মুহাইমিন' শব্দটি মূলে ছিলো 'মুয়াইমিন'। যার অর্থ আমানতদার বা সংরক্ষক। মুয়াইমিনের 'হামযা' অক্ষরটির স্থলে 'হা' বসিয়ে শব্দটিকে করা হয়েছে মুহাইমিন।

'সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে তুমি তাদের বিচার মীমাংসা কোরো এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কোরো না'।—এ কথার অর্থ, হে প্রিয় রসুল! আপনার উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, সেই কিতাবই সর্বশেষ কিতাব। সে কিতাব (কোরআন) কখনও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের বিধানের অনুকূল। কখনও পূর্ববর্তী বিধানের রহিতকারী। সুতরাং আপনি সর্বশেষ কিতাবের বিধানানুযায়ী বিচার নিষ্পত্তি করুন। অন্য কোনো দিকে দৃকপাত করবেন না। জনতার (প্রধানত ইহুদীদের) খেয়াল-খুশীকে প্রশ্রয় দেবেন না।

'লিকুল্লি জায়ালনা মিনকুম শিরআতাঁও ওয়া মিনহাজা'— এ কথার অর্থ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। এখানে 'শিরআতা' বা আইন অর্থ শরিয়তের আইন এবং মিনহাজা অর্থ পথ বা ধর্মপথ। 'মিনহাজা' শব্দটি এসেছে নাহাজুন থেকে। নাহাজার অর্থ উন্মুক্ত। বায়যাবী এই আয়াতকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করে বলেছেন, আমরা বিগত কোনো শরিয়তের হুকুম মানতে বাধ্য নই। এর উত্তরে আমরা বলি, যদি আমাদের কোরআন ও হাদিসে পূর্বের কোনো আসমানী কিতাবের হুকুম থেকে থাকে যা রহিত হয়নি, তবে আমরা সেই বিধান মানতে বাধ্য। কারণ, ওই বিধান আমাদেরই শরিয়তের অন্তর্ভূত। এতে করে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য অবতীর্ণ বিশেষ বিধান বিশেষভাবে তাদের জন্যই নয়, কিয়ামত পর্যন্ত সাধারণভাবে সকলের জন্য। সুতরাং পূর্বের সকল হুকুমকে বাতিল বলা জ্ঞান বর্হিভূত বিষয় এবং তা বিভিন্ন বিশুদ্ধ বর্ণনার প্রতিকূল। তবে বিভিন্ন নবীর শরিয়তে বিভিন্ন প্রকার বিধান অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সেগুলো মূল বিষয় নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মতভিন্নতা রয়েছে শাখাগত বিধানের মধ্যে।

'ইচ্ছে করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তদ্দারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি তা করেন নি।'— এ কথার অর্থ, আল্লাহ্পাক ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে এক উম্মত করে দিতে পারতেন। আর সে রকম করলে তাঁর বিধান হতো অপরিবর্তনশীল।

www.eelm.weebly.com

কোনো বিধানই রহিত হতো না। নতুন নতুন বিধানের প্রবর্তনাও ঘটতো না। কিন্তু আল্লাহ্পাক এ রকম করেননি। একের পর এক পৃথক পৃথক উম্মত হিসেবে তোমাদেরকে পৃথিবীতে এনেছেন। এ রকম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমাদেরকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করে নেয়া— যাতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, তোমাদের মধ্যে কারা আল্লাহ্পাকের বিধানকে মান্য করে চলে এবং কারা পিতৃপুরুষদের অন্ধ বিশ্বাসে অনড় থাকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ— আল্লাহ্পাক যদি চাইতেন, তবে সকল মানুষকে বল প্রয়োগপূর্বক ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিতেন। কিন্তু তোমাদেরকে যাচাই করাই তাঁর আসল উদ্দেশ্য। তাই তিনি তোমাদের উপর বল প্রয়োগ করেননি।

'সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা করো; আল্লাহ্র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন।'—এ কথার অর্থ হিংসা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে তোমরা সৎকর্মের প্রতি ধাবিত হও। আল্লাহ্র অবশ্যপালনীয় বিধানকে মেনে নিয়ে পুণ্যের পথে অগ্রগামী হতে চেষ্টা করো যাতে— অধিকতর পুণ্যলাভ নিশ্চিত হয়। রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো উত্তম পন্থা প্রবর্তন করবে, সে ওই উত্তম পন্থার জন্য সওয়াব লাভ করবে। আর ওই উত্তম পন্থা যারা অবলম্বন করে পুণ্য কর্মে ব্রতী হবে, তাদের সকলের সওয়াবের পরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে তাকে, অনুসারিগণের সওয়াবও কম করা হবে না।

'আল্লাহ্র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন'—এ কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই মর্মে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হে মানুষ! তোমাদেরকে আল্লাহ্র নিকট সমবেত হতেই হবে। সুতরাং তাঁর স্বস্তি ও শাস্তির প্রসঙ্গটি বিস্মৃত হয়ো না। তিনি আখেরাতে পুণ্যবানদেরকে সওয়াব দান করবেন এবং অবাধ্যদেরকে শাস্তি দিবেন।

'অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।' —এ কথার অর্থ কিয়ামত দিবসে তিনি সত্যানুসারী এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে চিরদিনের জন্য পৃথক করে দিবেন। অনুগতদেরকে দান করবেন পুরস্কার এবং তিরস্কার করবেন অবাধ্যদেরকে। তখন সকলে বুঝতে পারবে, কে সত্যাশ্রয়ী এবং কে মিথ্যানুসারী।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কা'ব বিন আশরাফ, আবদুল্লাহ বিন সুরিয়া এবং শাছ বিন কায়েস নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে ঠিক করলো, চলো মোহাম্মদের নিকট যাই। সম্ভবতঃ আমরা বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে তার ধর্ম থেকে বিরত রাখতে পারবো। রসুল স. এর দরবারে তারা উপস্থিত হয়ে বললো, হে মোহাম্মদ! আপনি তো জানেন আমরা ইহুদীদের আলেম ও নেতা। আমরা যদি আপনার অনুসারী হই তবে সকলেই আপনার অনুসারী হবে। বিরোধিতা করার কেউ থাকবে না। এখন আমরা আপনার কাছে এসেছি

www.eelm.weebly.com

একটি মোকদ্দমা নিয়ে। আপনি যদি এই মোকদ্দমায় আমাদের পক্ষে রায় দেন, তবে আমরা আপনার ধর্মে বিশ্বাস করবো। রসুল স. তাদের এই অপ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪৯

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۚ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ۝

❒ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুযায়ী তাহাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর, তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ না কর এবং তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাহাতে আল্লাহ্ যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহার কিছু হইতে তোমাকে বিচ্যুত না করে। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ যে, তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিতে চাহেন এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী।

এই আয়াতেও আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে কোরআনের বিধানানুযায়ী বিচার-নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন এবং ইহুদীদের খেয়াল-খুশীকে প্রশ্রয় দিতে নিষেধ করেছেন। আর এ মর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ইহুদীরা যেনো আপনাকে সত্য ধর্ম থেকে অপসারণের প্রচেষ্টায় কিছুতেই সফল না হয়। মূল বক্তব্য এই যে, হে রসুল! আপনি সদা সতর্ক থাকুন। ইহুদীরা আপনার দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সদা তৎপর। তাই আল্লাহ্পাক আপনাকে তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতত সাবধান থাকার উপদেশ দিচ্ছেন।

এরপর বলা হয়েছে, যদি তারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে হে প্রিয় রসুল! আপনি জেনে রাখুন তাদের কোনো কোনো পাপের জন্য আল্লাহ্পাক তাদেরকে ইহজগতে শাস্তি দিতে চান। পাপে পাপে তারা আমস্তক নিমজ্জিত। সেই সকল পাপের মধ্যে এখানে কোনো কোনো পাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কোনো কোনো পাপ অর্থ রসুল স. প্রতি অবতীর্ণ কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। নিশ্চয়ই এই অপরাধটি অত্যন্ত গুরু।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়া ইন্না কাছিরুম মিনান্নাসি লাফাসিকুন'—এ কথার অর্থ, মানুষের মধ্যে বিশেষ করে ইহুদীদের মধ্যে অধিকাংশই ফাসেক (অবাধ্য)। তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই অহংকারী ও অবিশ্বাসে সীমালংঘনকারী।

www.eelm.weebly.com

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

❑ তবে কি তাহারা প্রাক-ইসলামী যুগের বিচার-ব্যবস্থা কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?

কোনো কোনো বর্ণনাকারী লিখেছেন, বনী কুরায়জা ও বনী নাজিরের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। তারাই রসুল স. এর নিকট আবেদন করেছিলো, তিনি স. যেনো ইসলাম পূর্ব যুগের প্রচলিত রীতি অনুসারে বিচার নিষ্পত্তি করে দেন। ওই মূর্খতার যুগের রীতি ছিলো, প্রভাবশালী ও দুর্বল গোত্রের মধ্যে কিসাসের ব্যাপারে সমতা রক্ষা না করা, তওরাতে উল্লেখিত ব্যভিচারের শাস্তিকে লঘু করে দেয়া ইত্যাদি। ইহুদীদের ওই সকল মূর্খজনোচিত কর্মকাণ্ডের দিকে লক্ষ্য করে আয়াতের প্রথমে প্রশ্ন করা হয়েছে 'তবে কি তারা প্রাক ইসলামী যুগের বিচার ব্যবস্থাকে কামনা করে? এভাবে প্রশ্নের মাধ্যমে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, মূর্খতার যুগের রীতির অনুরাগী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হে রসুল! আপনি নিশ্চয়ই এ রকম করবেন না।

এরপর বলা হয়েছে, 'নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর'—এ কথার অর্থ প্রকৃত বিশ্বাসীরাই পরিণামফল সম্পর্কে সচেতন তাই তাঁরা চিন্তাভাবনা করে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে, আল্লাহ্পাকের চেয়ে উত্তম এবং নিখুঁত নির্দেশ দানকারী আর কেউ হতে পারে না। মানুষের জ্ঞান অপূর্ণ এবং আল্লাহ্পাকের জ্ঞান পূর্ণ। মানুষের মধ্যে রয়েছে লোভ, ক্রোধ, হিংসা এবং পক্ষপাতিত্ব। দেশীয় প্রথা, বংশ, ভাষা, বর্ণ গৌরব ইত্যাকার অনেক প্রভাবে মানুষ প্রভাবান্বিত। কিন্তু আল্লাহ্পাক সকল প্রকার প্রভাব ও পক্ষপাতিত্ব থেকে চিরমুক্ত। তাই তাঁর প্রদত্ত বিধানের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানগর্ভ রহস্য ও নিশ্চিত ন্যায়পরায়ণতা। তাই তাঁর নির্দেশ অবশ্য মাননীয়।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। এরপর সে ভাবলো, আমরা বনী কুরায়জা এবং বনী নাজিরের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। এমন তো হতে পারে যে, মুসলমানেরা পরাস্ত হবে, আর ইহুদীরা হবে বিজয়ী। তখন তো আত্মরক্ষা হয়ে পড়বে অসম্ভব। এ রকম শয়তানী চিন্তার কারণে সে ইসলাম পরিত্যাগ করলো। হজরত উবাদা বিন সামেত বললেন, আমি বনী কুরায়জা ও বনী নাজিরের সন্ধির ব্যাপারে আল্লাহ্পাকের সমীপে তোমাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছি। এখন আমার সাহায্যকারী আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল। আর আমার সাথে রয়েছে মুসলমানদের জামাত। তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— 'ইয়া আইয়্যুহাল লাজিনা আমানু ইন্নামা ওয়ালিউকুমুল্লহ্ (হে বিশ্বাসীগণ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের বন্ধু) থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত (আয়াত ৫৫)।

www.eelm.weebly.com

ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত উবাদা বিন সামেত বলেছেন, বনু কায়নুকার সঙ্গে ইহুদীদের যুদ্ধ শুরু হলো। ইহুদীদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ ছিলো আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল। তাই সে ইহুদীদের পক্ষ নিলো। ইহুদীদের সঙ্গে হজরত উবাদা বিন সামেতেরও সন্ধি ছিলো। কিন্তু তিনি রসুল স. এর পক্ষে গেলেন এবং বললেন, আমি ইহুদীদের সঙ্গে সন্ধির বন্ধন ছিন্ন করলাম। ইহুদীদের পক্ষ যারা নিয়েছে, আল্লাহ এবং রসুলের সম্মুখে আমি তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছি। হজরত উবাদা ছিলেন বনী খাজরাজের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সম্পর্কে এবং মুনাফিক আবদুল্লাহ্ বিন উবাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৫১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

❒ হে বিশ্বসীগণ! ইহুদী ও খৃস্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে সে তাহাদেরই একজন হইবে।আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

এই আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।' এ কথার অর্থ, তোমাদের প্রতি শত্রুতা করার দিক থেকে তারা একই মত ও পথের অনুসারী। এরপর বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুত্বকে গ্রহণ করলে সে হবে তাদেরই একজন।' এ কথার অর্থ, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বন্ধু হিসেবে ইহুদীদের পক্ষ নিয়েছে। সুতরাং সেও তাদের মতো কাফের এবং মুনাফিক। রসুল স. তখন বললেন, আবুল হাব্বাব! ইহুদীদের বন্ধুত্ব থেকে তোমরা যা অতিরিক্ত লাভ করবে, তা তোমাদের জন্য রইলো। উবাদা এর মধ্যে নেই। আবদুল্লাহ বিন উবাই বললো, তবে তাই হোক।

'সে হবে তাদেরই একজন' কথাটির রূপক অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ ইহুদী খৃষ্টানদের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব রাখবে, সে হবে ফাসেক-কাফেরের মতো। সে হবে তাদেরই একজন—এ রকম বলে নিষেধাজ্ঞাটিকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তোলা হয়েছে। এখানে এ কথাই বলা উদ্দেশ্য যে, কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানদের বন্ধুত্ব অভিপ্রেত নয়। রসুল স. বলেছেন, যে মুসলমান মুশরিকদের সঙ্গে থাকে আমি তার জিম্মাদার নই (যুদ্ধের সময় কোনো মুসলমান সৈন্য হয় তো তাকে কাফের মনে করে হত্যা করে ফেলবে)। নির্ভরযোগ্যসূত্রে হজরত খালেদ বিন ওলিদ থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী। তিরমিজি, নাসায়ী ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন হজরত জারীর বিন আবদুল্লাহ থেকে।

www.eelm.weebly.com

জ্ঞাতব্যঃ কাযী আয়াযের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ওমর ইয়েমেনের প্রশাসক হজরত আবু মুসা আশআরীকে একবার নির্দেশ দিলেন, আপনি যা কিছু লেনদেন করেছেন, তা লিখিতভাবে উপস্থিত করুন। হজরত আবু মুসার সচিব ছিলো একজন খৃষ্টান। সে নিখুঁতভাবে আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করলো। হজরত ওমর বিস্মিত হয়ে বললেন, এ লোকের স্মৃতিশক্তিতো অত্যন্ত প্রখর। আমার কোনো চিঠি যখন তোমার কাছে যায় তখন তুমি কি একে মসজিদের ভিতরেই চিঠি পড়তে দাও। হজরত আবু মুসা বললেন, সে তো মসজিদে প্রবেশ করবে না। হজরত ওমর বললেন, কেনো? সে কি অপবিত্র? তিনি বললেন, সে খৃষ্টান। হজরত আবু মুসা বলেছেন, আমার এই কথা শুনে হজরত ওমর আমাকে বকুনি দিলেন এবং আমার উরুদেশে প্রহার করলেন। বললেন, একে বের করে দাও। তারপর পাঠ করলেন এই আয়াতটি। ইবনে আবী হাতেম, বায়হাকী।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'ইন্নাল্লহা লাইয়াহ্দিল ক্বওমাজ্ জ্বলিমিন' (আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না)। —এ কথার অর্থ, ওই সকল লোককে আল্লাহপাক হেদায়েত করেন না, যারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ক'রে নিজেদের উপর জুলুম ক'রে এবং মুসলমানদের উপর জুলুম ক'রে তাদের শত্রুদের সাহায্যকারী হয়।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৫২, ৫৩

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ۝

❐ এবং যাহাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি রহিয়াছে তুমি তাহাদিগকে সত্বর তাহাদের সহিত মিলিত হইতে দেখিবে এই বলিয়া যে, 'আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিবে।' হয়তো আল্লাহ্ বিজয়, অথবা তাঁহার নিকট হইতে এমন কিছু দিবেন যাহাতে তাহারা তাহাদের অন্তরে যাহা গোপন রাখিয়াছিল তজ্জন্য অনুতপ্ত হইবে।

www.eelm.weebly.com

❒ এবং বিশ্বাসীগণ বলিবে, ইহারাই কি তাহারা যাহারা আল্লাহের নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করিয়াছিল যে, তাহারা তোমাদের সঙ্গেই আছে? তাহাদের কার্য নিষ্ফল হইয়াছে; ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল ও তার সঙ্গী সাথীদের সম্পর্কে আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে, তাদের অন্তঃকরণে রয়েছে ব্যাধি।হে রসুল! আপনি দেখবেন তারা সত্বর গিয়ে ইহুদীদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে এবং বলছে, আমাদের আশংকা হয়, হয়তো আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুনাফিকদের এ কথার অর্থ, অন্তরের ব্যাধির কারণে তারা এ রকম আশংকা করতে শুরু করেছিলো, রসুল স. হয়তো শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদেরও মনে হতে লাগলো, আমাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব হয় তো শেষ পর্যন্ত থাকবে না। তখন হয়তো আবার ইহুদীদের মুখাপেক্ষী হতে হবে। হয়তো দুর্ভিক্ষ এসে যাবে। তখন ইহুদীরা সাহায্য সহযোগিতা করতে অস্বীকার করবে। মু'মিনদের ভাগ্য বিপর্যয়ের আশংকাটি ছিলো এ রকম।

ইবনে জারীর এবং ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হজরত উবাদা বিন সামেত রসুল স.এর নিকট নিবেদন করলেন, ইহুদীদের অনেকের সঙ্গেই আমার হৃদ্যতা রয়েছে। কিন্তু আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলাম এবং ওই সকল প্রাক্তন বন্ধুদেরকে অস্বীকার করলাম। আমি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বললো, আমার ভয় হয়, ভবিষ্যতে হয়তো এ রকম পরিস্থিতি থাকবে না। হয়তো এক সময় আমাদেরকে তাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে। সুতরাং সতীর্থ ইহুদীদের সঙ্গে আমি সন্ধি ও বন্ধুত্ব ছিন্ন করতে পারবো না। রসুল স.বললেন, আবুল হাব্বাব (হে বন্ধুর পিতা) ইহুদীদের বন্ধুত্ব নিয়ে তুমি থাকো। উবাদা এর মধ্যে নেই। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বললো, ঠিক আছে আমি তাই মেনে নিলাম।

'হয়তো আল্লাহ্ বিজয়, অথবা তাঁর নিকট থেকে এমন কিছু দিবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিলো তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে।' — এখানে যে বিজয় দানের কথা বলা হয়েছে সেই বিজয় হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ বিজয়। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ্পাক মুসলমানদের সেই পরিপূর্ণ বিজয় দান করেছিলেন। কাতাদা এবং মুকাতিল বলেছেন, এ কথার মাধ্যমে রসুল স.কে নির্বিবাদে মেনে নেয়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, দেয়া হয়েছে বিজয়ের অঙ্গীকার। সুতরাং তাঁকে মেনে না নিলে ভবিষ্যতে অনুতাপ ও আক্ষেপ ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। কালাবী ও সুদ্দী বলেছেন, এখানে বিজয় অর্থ মক্কা বিজয়। জুহাক বলেছেন, খায়বর, ফদক এবং অন্যান্য ইহুদী জনপদ বিজয়।

'তাঁর নিকট থেকে এমন কিছু দিবেন'— এ কথার অর্থ, আল্লাহ্পাক মুনাফিকদের গোপন চক্রান্তকে প্রকাশ করে দিবেন। তাদেরকে অপদস্থ করা হবে। বনী কুরায়জাকে হত্যা করা হবে এবং বনী নাজিরকে করা হবে বহিষ্কার। এভাবে আরব ভূখণ্ড থেকে ইহুদীদের মূলোৎপাটন করা হবে।

www.eelm.weebly.com

'তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিলো তার জন্য অনুতপ্ত হবে।'—এ কথার অর্থ তখন মুসলমানদের পরিপূর্ণ বিজয় দেখে তাদের অন্তরের ব্যাধি, কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ইত্যাদি সম্পর্কে তারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

এর পরের আয়াতে (আয়াত ৫৩) বলা হয়েছে, 'তখন বিশ্বাসীরা বলবে, এরাই কি তারা, যারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিলো যে, তারা তোমাদের সঙ্গেই আছে।' এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ বিজয়ের পর মুনাফিকদের আচরণ যখন সুস্পষ্ট হয়ে পড়লো তখন মুসলমানেরা বিস্মিত হয়ে বললেন, এরা কি সেই সকল লোক যারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় শপথ করেছিলো। দৃঢ় শপথ বুঝতে এখানে 'যাহ্‌দা আইমন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'ইন্নাহুম লামায়াকুম'—অর্থ আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। মুনাফিকেরা কসম খেয়ে এ রকম বলতো। কিন্তু বাস্তবে তাদের আচরণ ছিলো এর বিপরীত। তাই পরিপূর্ণ বিজয়ের পর মুসলমানেরা তাদের স্বরূপ বুঝতে পেরে বিস্মিত হয়ে বলবে, এরাই তো সেই লোক, যারা দৃঢ়ভাবে শপথ করে বলতো, 'আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি।' তারা আরও বলতো তোমাদেরকে যদি বহিষ্কার করা হয়, তবে আমরাও তোমাদের সাথে থাকবো। আর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করবো। মুনাফিকেরা মুখে এ রকম বলবে বটে, কিন্তু বাস্তবে করবে এর বিপরীত। তাই ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পর মুসলমানেরা বিস্মিত অথবা আনন্দিত হয়ে উপরোক্ত কথাগুলো বলবে।

'তাদের কার্য নিষ্ফল হয়েছে; ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।' এই বাক্যটি মুনাফিকদের আচরণ দৃষ্টে বিস্মিত ও আনন্দিত মুসলমানদের হতে পারে, যা তাঁরা বলবেন ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পর। আবার কথাটি আল্লাহ্‌পাকেরও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে মুনাফিকদের সম্পর্কে এটাই আল্লাহ্‌পাকের চূড়ান্ত ঘোষণা যে, তাদের কার্য নিষ্ফল এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৫৪

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ
يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ
ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ○

❐ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ দ্বীন হইতে ফিরিয়া গেলে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন ও যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে; তাহারা বিশ্বাসীদিগের প্রতি কোমল ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের

www.eelm.weebly.com

প্রতি কঠোর হইবে; তাহারা আল্লাহের পথে জিহাদ করিবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করিবে না; ইহা আল্লাহের অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

'তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে'—এ কথার মাধ্যমে বুঝা যায়, আল্লাহ্পাক সবকিছু জানেন, তাই রসুল স. এর মহাতিরোধানের পর যারা ইসলাম পরিত্যাগ করবে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এখানে এ রকম বলেছেন। হাসান বসরী থেকে এ রকম বর্ণিত হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্পাক জানতেন যে, ভবিষ্যতে কিছু লোক ধর্মত্যাগ করবে। এই আয়াতের মাধ্যমে তিনি সে কথাই জানিয়েছেন। পরবর্তীতে রসুল স. এর মহাঅন্তর্ধানের পর সাধারণ আরববাসী নতুন মুসলমানেরা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেলো। ইসলামে অনড় রইল কেবল মক্কাবাসী, মদীনাবাসী এবং বাহরাইনের অধিবাসীগণ (কবিলায়ে আবদুল কায়েস)। মুরতাদেরা বললো, আমরা নামাজ পড়বো, কিন্তু জাকাত দিবো না। কেউ আমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর তখন সাহাবীগণকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন। সাহাবীগণ বললেন, হে বিশ্বাসীগণের নেতা! তাদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করুন। ধীরে ধীরে তারা ধর্মজ্ঞান লাভ করবে, তখন আর তারা জাকাত দিতে অস্বীকৃত হবে না। হজরত আবু বকর বলেন, আল্লাহ্পাক যে নির্দেশগুলোকে অবশ্য পালনীয় করেছেন আমি সেগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের বিধানানুযায়ী প্রাপ্য একটি রশি দিতে অস্বীকার করলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। তিনি ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। তাদের অনেকে হলো নিহত ও আহত। শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হয়ে তারা জাকাত প্রদান করতে স্বীকৃত হলো। হজরত কাতাদা বলেছেন, আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলাম, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর এবং তাঁর সঙ্গীগণ সম্পর্কে। অর্থাৎ এখানে 'ইয়াতিহিম' শব্দটির 'হিম' বা 'হুম' একটি অতিরিক্ত সংযোজন— সম্ভবতঃ হজরত কাতাদা এমনই বলেছেন (বি ক্বওমিন ইউহিব্বুহুম ওয়া ইউহিব্বুনাহু)। এ রকম বর্ণনা করেছেন আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, আবু শায়েখ, বায়হাকী ও ইবনে আসাকের।

কেবল হজরত আবু বকরের যুগেই ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। যুদ্ধের সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন এককভাবে। সাহাবীগণ ধর্মত্যাগীদের সম্পর্কে বিনম্র আচরণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা পরে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, হজরত আবু বকরের সিদ্ধান্তই সঠিক। তাঁরা তখন হজরত আবু বকরের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

হজরত আবু মুসা আশআরী বলেছেন, আমি রসুল স. এর নিকট এই আয়াত পাঠ করলাম এবং জানতে চাইলাম তারা কোন সম্প্রদায়, যাদেরকে আল্লাহ্পাক ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহ্পাককে ভালোবাসবে। রসুল স. বললেন, তারা ইয়েমেনের অধিবাসী বনী কুনদা—বনী কুনদার মধ্যে কবিলায়ে সুকুন—কবিলায়ে সুকুনের মধ্যে কবিলায়ে নজিব গোত্রের লোক।

www.eelm.weebly.com

কাশেম বিন মোহমারা বলেছেন, আমি একবার হজরত ওমরের খেদমতে হাজির হতেই তিনি আমাকে মারহাবা বলে স্বাগত জানালেন। তারপর পাঠ করলেন এ আয়াত। পাঠ শেষে আমার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করে তিনবার বললেন, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, এই আয়াতে তোমাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে —'আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তারাও আল্লাহ্‌পাককে ভালোবাসেন।' বোখারী। আমি বলি, হজরত আবু বকরের সেনাবাহিনী ইয়েমেনবাসীদের সহায়তায় ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো। কাজেই এ সম্পর্কে বর্ণিত দু'টো ঘটনাই সঠিক।

'আল্লাহ্‌ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালোবাসবে'—এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌পাক মুসলমানদের মধ্য থেকেই একটি দলকে ভালোবাসবেন, তারা হবে আল্লাহ্‌পাকের বন্ধু। কিন্তু আল্লাহ্‌পাকের ওই প্রিয় দল কোনটি — সে সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, ওই দলটি হচ্ছে হজরত আলী এবং তাঁর সঙ্গী সাথীরা। হাসান, জুহাক ও কাতাদা বলেছেন, হজরত আবু বকর ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা। তাঁরা জাকাত প্রদানে অস্বীকৃত ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছিলেন। ঘটনাটি ছিলো এ রকম—রসুল স.এর মহাঅন্তর্ধানের পর মক্কা মদীনা এবং বাহরাইনের কবিলায়ে আবদে কায়েসের অধিবাসীরা ছাড়া অন্যান্য নতুন মুসলমানেরা মুরতাদ হয়ে গেলো। তারা বলে বসলো আমরা জাকাত দিতে পারবো না। প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্ধান্ত নিলেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম এই সিদ্ধান্তে সায় দিতে পারলেন না। হজরত ওমর বললেন, এ সকল লোক কলেমা পাঠ করেছে। সুতরাং আপনি কীরূপে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চান? রসুল স. বলেছেন, আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে ওই সময় পর্যন্ত জেহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে —যতোক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্‌' বলে। যে এই কলেমা পাঠ করবে তার জীবন ও সম্পদ নিরাপদ। তার অন্তরের হিসাব গ্রহণ করবেন আল্লাহ্‌ই। হজরত আবু বকর বললেন, নামাজ ও জাকাত— দু'টোই ফরজ। আল্লাহ্‌পাকের এই ফরজ হুকুমের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার বিরুদ্ধে জেহাদ করবো। নামাজ যেমন দৈহিক ইবাদত, তেমনি জাকাত হচ্ছে সম্পদগত ইবাদত। আল্লাহ্‌র শপথ! রসুল স.কে যারা জাকাত হিসেবে বকরির বাচ্চা দিয়েছে, তারা যদি এখন তা দিতে অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।

হজরত আনাস বলেছেন, জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে প্রথম দিকে সাহাবীগণ অসম্মত ছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন, জাকাত অস্বীকারকারীরাও তো আহলে কেবলা (কাবামুখী হয়ে নামাজ পাঠকারী)। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসমীচীন। কিন্তু যখন হজরত আবু বকর তরবারী নিয়ে একাই যুদ্ধ করতে চললেন, তখন সাহাবীগণ আর তাঁর অনুসরণ না করে পারলেন না।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, প্রথম দিকে আমরা হজরত আবু বকরের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছিলাম না। কিন্তু পরে আমরা প্রকৃত বিষয়টি বুঝতে পেরেছি এবং হজরত আবু বকরের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছি। আবু বকর বিন আয়াশ বলেছেন, আমি হজরত আবু হাফস্‌কে বলতে শুনেছি—নবী রসুলগণের পর হজরত আবু বকরের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই। রসুল স.এর মহাতিরোধানের পর তিনি মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর স. মহাযাত্রার আগেই তিনটি গোত্র মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো। ১. বনী মুযহাজের সর্দার ছিলো জুলহেমার আবহেলা বিন কা'ব আনাসী। তার উপাধি ছিলো আসওয়াদ। সে ছিলো যাদুকর ও গণক। ইয়েমেনে সে নবুয়ত দাবি করলো এবং ইয়েমেনের একটি শহর অধিকার করে নিলো। রসুল স. সেখানকার প্রশাসক হজরত মুয়াজ বিন জাবালকে লিখে জানালেন, মানুষকে ধর্মে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবার নির্দেশ দাও। আসওয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করো। হজরত মুয়াজ বিন জাবাল তাই করলেন। তাঁর নির্দেশে ফিরোজ দায়লামী অতর্কিতে আসওয়াদের গৃহে প্রবেশ করে তাকে শায়িত অবস্থাতেই হত্যা করলেন। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, মদীনায় শেষ যাত্রার জন্য অপেক্ষারত রসুল স. তখন বলে উঠলেন, গত রাতে আসওয়াদকে হত্যা করা হয়েছে। তাকে হত্যা করেছে এক পবিত্র ব্যক্তিত্ব। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র প্রিয় রসুল! সেই ব্যক্তির পরিচয় কী? রসুল স. বললেন, ফিরোজ। ফিরোজ সফল হয়েছে। পর দিন রসুল স. পাড়ি দিলেন পরজগতে। মদীনায় আসওয়াদের হত্যার সংবাদ এলো রবিউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে। তখন হজরত উসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী এগিয়ে চলেছে যুদ্ধের দিকে। তিনিও বিজয়ী হয়ে ফিরে এলেন মদীনায়।

২. রসুল স. এর পৃথিবীবাসের সময়েই দশম হিজরী সনের শেষ ভাগে বনী হুনাইফার সর্দার মুসায়লামা কায্‌যাব নবুয়তের দাবী করে বসলো। সে ধারণা করতো, মোহাম্মদ স. এর সঙ্গে আমাকেও নবুয়ত দান করা হয়েছে। সে রসুল স. এর নিকট দু'জন দূতের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করলো। সেই পত্রে লিখা ছিলো— অর্ধেক পৃথিবী আমার এবং অর্ধেক আপনার। রসুল স. দূতদ্বয়কে বললেন, যদি দূত হত্যা সমীচীন হতো তবে এক্ষুণি আমি তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দিতাম। অতঃপর রসুল স. পত্রের উত্তরে লিখলেন—রসুল মোহাম্মদের নিকট থেকে মুসায়লামা কায্‌যাবের প্রতি। আম্মাবাদ, সমস্ত পৃথিবী আল্লাহ্‌র। তিনি তাঁর বান্দাগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকেই এর অধিকারী করে দেন এবং পরহেজগারদের জন্যই রয়েছে উত্তম বিনিময়। এর কিছুদিন পরে রসুল স, পীড়িত হয়ে পড়লেন এবং এক মহাপবিত্র ক্ষণে লাভ করলেন মাশুক মিলন। এরপর হজরত আবু বকর মুসায়লামার বিরুদ্ধে হজরত খালেদ বিন ওলিদের নেতৃত্বে প্রেরণ করলেন এক বিশাল বাহিনী। যুদ্ধ শুরু হলো। ওই যুদ্ধে হজরত ওয়াহ্‌শী বল্লমের আঘাতে মুসায়লামাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ওহুদ যুদ্ধের সময় শহীদশ্রেষ্ঠ হজরত হামযাকে শহীদ করে

www.eelm.weebly.com

দিয়েছিলেন। মুসায়লামাকে হত্যার পর তিনি বললেন, আমি মুসলমান হওয়ার আগে শহীদ করে দিয়েছিলাম সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে। আর মুসলমান হওয়ার পরে আজ হত্যা করলাম সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে।

৩. বনী আসাদের সর্দার ছিলো তুলায়হা বিন খুয়াইলিদ। নবুয়তের দাবিদারদের মধ্যে সে ছিলো সর্বশেষ ব্যক্তি। সে ধর্মত্যাগী হয়ে রসুল স.এর মহাপ্রস্থানের আগেই নবুয়তের দাবি করে বসলো। রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর হজরত আবু বকর হজরত খালেদ বিন ওলিদের নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন এক মুজাহিদ বাহিনী। হজরত খালেদের বিরুদ্ধে টিকতে না পেরে সে শামদেশে চলে গেলো। কিছুদিন সেখানে বসবাসের পর সে পুনরায় ফিরে এলো ইসলামের চির সুবাসিত কাননে। তাঁর এই ইসলাম গ্রহণ ছিলো বিশুদ্ধ ও একনিষ্ঠ।

রসুল স. এর পরজগত গমনের পর হজরত আবু বকরের খেলাফতের সময় অনেক লোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো। মুরতাদেরা ছিলো সাতটি গোত্রভূত —১. বনী ফাযারাহ্ ২. বনী গাতফান ৩. বনী সুলাইম ৪. বনী ইয়ারবু ৫. খানদানে বনী তামীমের কিছু অংশ (মুসায়লামা কাযযাবের স্ত্রীও ছিলো এই দলে)। ৬. বনী কুনদাহ্ এবং ৭. বনী বকর বিন ওয়ায়েল। হজরত আবু বকর ওই সাতটি গোত্রকেই পূর্ণরূপে পরাস্ত করে সত্য ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মাতা আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর পরকাল গমনের সঙ্গে সঙ্গে আরববাসীদের অনেকে মুরতাদ হয়ে গেলো। আমার পিতার স্কন্ধে আপতিত হলো চরম মুসিবত। ওই মুসিবত কোনো পাহাড়ের উপর পতিত হলে নিশ্চয় সেই পাহাড়ের চূড়া ভেঙে পড়তো।

হজরত ওমরের খেলাফতের সময় জাবালা বিন আয়হাম গোত্রের গাসসান মুরতাদ হয়ে গেলো। সে এক দরিদ্র ব্যক্তিকে প্রহার করেছিলো। হজরত ওমর এর বদলা নেয়ার নির্দেশ দিলেন। গাসসানের আভিজাত্যবোধে এই নির্দেশ চরম আঘাত করলো। ক্ষোভে দুঃখে সে ইসলাম পরিত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলো এবং চলে গেলো শামদেশে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহতায়ালার বন্ধু অর্থ আশয়ারী গোত্রের লোকেরা। হজরত আয়াস বিন গানাম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো তখন রসুল স. হজরত আবু মুসা আশয়ারীর দিকে ইশারা করে বললেন, এই ব্যক্তির গোত্রভূতরাই এই আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্পাকের প্রিয়জন। ইবনে জারীর, তিবরানী ও হাকেম। আশয়ারী গোত্রের লোকেরা ছিলেন ইয়েমেনের অধিবাসী।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের নিকট এক অধিবাসী এসেছে। তারা বড়ই কোমল চিত্ত। ইমান তো ইয়েমেনীদেরই অধিকারে। হিকমতেরও অধিকারী তারা। বোখারী, মুসলিম। কালাবী বলেছেন তাঁরা ছিলেন ইয়েমেনের বিভিন্ন গোত্রের লোক—কবিলায়ে নাখয়ার দুই হাজার,

www.eelm.weebly.com

বনী কুনদাহ এবং বাহলীয়ার পাঁচ হাজার এবং অন্যান্য গোত্রের তিন হাজার। তাঁরা সকলেই হজরত ওমরের খেলাফতের সময় অতিগুরুত্বপূর্ণ কাদসীয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে, 'আজিল্লাতিন আলাল মু'মিনিনা আয়িয্যাতিন আলাল কাফিরিন' (তারা বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি কঠোর হবে)—এখানে 'আজিল্লাতিন' শব্দটি 'জালিলুন' শব্দটির বহুবচন। অতীতকালবোধক হলে 'জাল্লা,' বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালবোধক হলে 'ইয়াজিল্লু' হবে। শব্দটি উৎসারিত হয়েছে 'জিল্লাতুন,' 'জুলালাতুন,' 'জালালাতুন' এবং 'মাজাল্লাতুন' থেকে। 'জাল্লা' অর্থ অপদস্থ হওয়া, সহজ হয়ে যাওয়া। কামুস। 'জাল্লাত' যদি নিজের দিক থেকে নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে হয়, তবে তা প্রশংসনীয়। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'ওয়াখফিদ্ব লাহুমা জানাহাজ্ জুল্লি মিনার রহমাত' (এবং তাদের সম্মুখে করুণভাবে বিনয়ের সাথে নত থাকবে)। অর্থাৎ মাতা পিতার জন্য নম্রতা ও বিনয়ের হস্ত প্রসারিত করে দাও। অন্য কারো দিক থেকে যদি জিল্লত হয়, তবে তা হবে আযাব। যেমন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'তারহাক্বুহুম জিল্লাহ্ দ্বুরিবাত আলাইহিমুজ জিল্লাতু ওয়াল মাসকানাতু' (এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করবে, আর স্থায়ী হবে তাদের উপর লাঞ্ছনা বা অপমান)। জিল্লতের পরে এসেছে ইয্যাত শব্দটি (আইয্যাতিন আলাল কাফিরিন)। ইয্যাত অর্থ বিজয়ী। আযিযুন ওই ব্যক্তি যে বিজয়ী, অপরাজিত। 'ইয্যাত' যদি অযথার্থ বা মিথ্যা হয়, তবে তা হবে অপ্রশংসনীয়। যেমন আল্লাহপাক বলেছেন, 'বালিল্লাজিনা কাফারু ফি ইয্যাতিঁউ ওয়া শিক্বাক্ব' (বরং ওই কাফেরেরা বিদ্বেষী ও তারা (সত্যের) বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে)। কখনও রূপক অর্থে ইয্যাত শব্দটি লজ্জা, হিংসা, অহংকার ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহ্পাক বলেন, 'আখাজাত হুমুল ইয্যাতু বিল ইছমি ফা হাসবুহু জাহান্নাম' (যখন তাকে বলা হয় আল্লাহ্কে ভয় করো, তখন তার অহংবোধ তাকে পাপপ্রবণ করে তোলে, জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট)। যদি ইয্যাত আল্লাহ্র দিক থেকে হয়, তবে তা হবে নেয়মত ও পূর্ণতা। যেমন আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'ওয়ালিল্লাহিল ইয্যাতু ওয়ালির রসুলিহি ওয়ালিল মু'মিনিন' (আর প্রকৃত সম্মান আল্লাহ্র জন্যে এবং তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীদের জন্যে)। অন্যত্র এসেছে, 'মানকানা ইউরিদিল ইয্যাতা ফা লিল্লাজিল ইয্যাতু জামিয়া' (কেউ সম্মান চাইলে সে জেনে রাখুক, সকল সম্মান আল্লাহ্র)। রসুল পাক স. বলেছেন, ইয্যাত আল্লাহ্র দিক থেকে না হলে তা হবে জিল্লত বা লাঞ্ছনা।

বায়যাবী লিখেছেন, 'অজিল্লাতুন' 'জালিলুন'—এর বহুবচন, জালুলুন এর বহুবচন নয়। 'জালুলুন'—এর বহুবচন 'জুলুল।' কিন্তু কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'জালিলুন'—এর বহুবচন জিলাল, আজাল্লা এবং আজিল্লা। জুলুলুন এর বহুবচন জুলুলু এবং আজিল্লাতুন। অতএব আজিল্লাতুন— জালিলুন এবং জুলুলুন শব্দ দু'টোর বহুবচন।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, যদি আজিল্লাতুনকে জুলুলুন—এর বহুবচন ধরা হয় তবে তার অর্থ হবে সহজ, সরল, কাঠিন্যের বিপরীত। শব্দ দু'টি সমার্থক। প্রকৃত অর্থ হবে এ রকম— নম্র, বিনয়ী, শান্ত, দয়ালু এবং একে অপরের অনুরাগী। কিয়াস এবং আভিধানিক ধারণা এই যে, আলাল মু'মিনিন (বিশ্বাসীদের প্রতি) এর পরিবর্তে লিল্ মু'মিনিন বলা যেতো। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আ'লা। কেননা, এর পরে আল কাফিরিনের সঙ্গেও আ'লা এসেছে (আজিল্লাতিন আলাল মু'মিনিনা আ ইয্‌যাতিন আলাল কাফিরিন)। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে, আল মু'মিনিনের সঙ্গে আ'লা উল্লেখ করা হলে অর্থ হবে অন্যান্য মু'মিনদের তুলনায় তারা উচ্চ মর্যাদাধারী। তবুও এই মুমিনেরা (এখানে উল্লেখিত বিশ্বাসীরা) অন্যান্য বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, জিল্লত শব্দটি নিজেই রহমত এবং দয়া প্রকাশক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আ'লা। তাই আজিল্লাতের পরেও আ'লা উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা এমনও বলা যায় যে, 'আজিল্লাতুন' শব্দটি 'আয়িযযাতুন' শব্দের পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা 'আজিল্লাতুন' অর্থ সম্মানবিবর্জিত।

'আয়িযযাতিন আলাল কাফিরিন' অর্থ— সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি কঠোর। অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে তারা হবে শক্তিশালী, কঠোর। এ সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'আশিদ্দাউ আলাল কুফফার রুহামা-উ বাইনাহুম (কিন্তু তাঁরা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে কোমল)।

'তাঁরা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না'— এ কথার অর্থ, তারা আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করতে যেয়ে নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, কাফেরদের দোষারোপকে উপেক্ষা করে তারা জেহাদে অবতীর্ণ হবে। মুনাফিকদের অবস্থা এর বিপরীত। তারা মুসলমান সৈন্যদের সাথে থাকে গণিমতের লোভে অথবা তাদের অন্তরের অবস্থা প্রকাশ হয়ে যায় কিনা সেই ভয়ে। তাদের ইহুদী বন্ধুরা তাদেরকে দোষারোপ করে কিনা সে ভয়ও তাদের সঙ্গে লেগে থাকে সারাক্ষণ (আয়াতে উল্লেখিত বিশেষ মর্যাদার বিশ্বাসীদের এ রকম নিন্দা মন্দের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র থাকে না)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই আয়াতে আল্লাহ পাকের যে প্রিয় বান্দাদের কথা বলা হয়েছে, তাদের দুটি বিশেষ গুণ হচ্ছে এই—১. তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং ২. ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিন্দুকের নিন্দাকে গ্রাহ্য করবে না।

হজরত উবাদা বিন সামেত বলেছেন, আমরা রসুল স. এর নিকট একথার উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি যে, আমরা তাঁর নির্দেশ শুনবো, মানবো, জেহাদ করবো, হক কথা বলবো এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে গ্রাহ্য করবো না। বোখারী, মুসলিম।

'এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন'—আল্লাহ্ প্রদত্ত এই বিশেষ অনুগ্রহের বদৌলতেই তাঁর প্রিয়পাত্রগণ আল্লাহ্‌পাকের ভালোবাসা লাভ করেন এবং হন বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল, কাফেরদের প্রতি কঠোর, করেন

www.eelm.weebly.com

জেহাদ আল্লাহ্‌র পথে এবং গ্রাহ্য করেন না নিন্দুকের নিন্দা, অধিক সংখ্যক লোক মুরতাদ হয়ে গেলেও মুসলমানদের সংখ্যাল্পতার জন্য তারা দোষারোপকারীর কোনো দোষকে আমলেই আনেন না।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াল্লহু ওয়াসিউন আলীম'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় (অতি প্রশস্ত), প্রজ্ঞাময়। সম্মানিত সুফী সাধকগণ বলেন, আল্লাহ্‌পাকের এই প্রাচুর্য বা প্রশস্ততা অতুলনীয়। সৃষ্টির বিশাল পরিসর জুড়ে তাঁর সিফাতের (গুণাবলীর) প্রতিচ্ছবি পতিত হয়। তাঁর প্রশস্ত হওয়ার অর্থ, তাঁর ফজল (অনুগ্রহ) এবং কুদরাত (ক্ষমতা) প্রশস্ত হয়। তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। তাই তিনি তাঁর অপার ক্ষমতা কোথায় কখন কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, সে সম্পর্কে সম্যক অবগত (ক্ষমতা যদিও তাঁর অসীম, তবুও তিনি তা প্রয়োগ করেন হেকমতের সঙ্গে, অযথার্থরূপে নয়)।

সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৫৫

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ○

❑ তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁহার রসুল ও বিশ্বাসীগণ যাহারা বিনত হইয়া সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয়।

ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'হে বিশ্বাসীগণ, ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না' (আয়াত ৫১) এবং 'এমন এক সম্প্রদায়কে আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন' (আয়াত ৫৪) তে বন্ধুত্ব কার সঙ্গে করতে হবে তার বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। আর এখানে আরো স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে 'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীগণ।' সুতরাং মুসলমানদের বন্ধু তিনজন—আল্লাহ্, রসুল এবং বিশ্বাসীগণ। কিন্তু এখানে ব্যবহৃত হয়েছে একবচনের সিগা—বহুবচনের নয়। অর্থাৎ আউলিয়া না বলে বলা হয়েছে ওলি। এ রকম এক বচন ব্যবহারের কারণ এই যে, প্রকৃত পক্ষে বন্ধু তো একজনই। অর্থাৎ প্রকৃত বন্ধু কেবলই আল্লাহ্—রসুল ও বিশ্বাসীগণের বন্ধুত্ব তো আল্লাহ্‌র কারণেই হয়ে থাকে।

'যারা বিনত হয়ে সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয়' (আল্লাজিনা ইউক্বিমুনাস্ সলাতা ওয়া ইউতূনায্ যাকাহ্)। এখানে বিশ্বাসীগণের দু'টি প্রধান গুণের কথা বলা হয়েছে। সে দুটো গুণ হচ্ছে বিনয়াবনত সালাত প্রতিষ্ঠা ও জাকাত আদায়। বিনয়াবনত সালাত অর্থ, বিশ্বাসীরা নামাজ পাঠ করে রুকুর সঙ্গে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো তাদের নামাজ রুকুবিহীন নয়। তাই সবশেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াহুম রক্বিউন'—এ অর্থ বিনত হওয়া। জুহরী লিখেছেন, রুকু অর্থ নম্রতা ও বিনয়।

www.eelm.weebly.com

এ রকমও বলা যেতে পারে যে, তারা যেমন নামাজে রুকু করে, তেমনি জাকাতও প্রদান করে রুকু অবস্থায়। তিবরানী তার আল আওসাত গ্রন্থে এক অপরিচিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে হজরত আম্মার বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বিন আবু তালেব একবার নফল নামাজে রুকু অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় হাজির হলো এক যাঞ্চাকারী। তিনি রুকু অবস্থাতেই তাঁর হাতের আংটি খুলে ওই যাঞ্চাকারীকে দিলেন। তখন অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। তিবরানীর এই হাদিসটি অপরিচিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হলেও এর সমর্থনে অন্যান্য সাক্ষ্যও রয়েছে। আবদুর রাজ্জাক বিন আবদুল ওয়াহাব বিন মুজাহিদ তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আলী বিন আবু তালেবের শানে। ইবনে মারদুবিয়ার ভিন্ন সূত্রে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত আলীকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। মুজাহিদের মাধ্যমে ইবনে জারীর এবং সালমা বিন ফুহাইলের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেমও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু জর থেকে ছা'লাবীও এ রকম বলেছেন। এছাড়া হাকেম তাঁর উলুমুল হাদিস গ্রন্থে হজরত আলীর উক্তিরূপে এ রকমই বর্ণনা করেছেন। এ সকল বিবরণ একটি অপরটির সমার্থক।

এ সকল বিবরণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নামাজ পাঠরত অবস্থায় আমলে কালীল (গৌণ কর্ম) করলে নামাজ ফাসেদ (নষ্ট) হয় না। এ অভিমতটি ঐকমত্যাগত। এ সকল বিবরণ থেকে আরও একটি বিষয়ও প্রতীয়মান হয় যে, নফল সদকাকেও জাকাত বলা যায়। আয়াতটি বিশেষভাবে হজরত আলীর শানে অবতীর্ণ হলেও এর বিধান সাধারণ। অর্থাৎ যারা হজরত আলীর অনুকূল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, তাঁরাও এই আয়াতে উল্লেখিত শুভ সংবাদের অন্তর্ভুক্ত। তাই এখানে বহুবচনের সিগা ব্যবহৃত হয়েছে।

দান করার ঘটনাটি ঘটেছিলো রুকু অবস্থায়। তাই বিশেষ করে রুকুর কথাটি এসেছে। নতুবা আয়াতের অর্থ হতো এ রকম— কোনো প্রার্থী উপস্থিত হলে তাঁরা যে অবস্থায় থাকেন, সে অবস্থায় দান করেন, বিলম্ব করেন না—রুকুতে, কিয়ামে, উপবিষ্ট অবস্থায়, অথবা দ্বীন-দুনিয়ার যে কোনো কাজে রত থাকুন না কেনো, প্রার্থীর প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ পূরণ করে। রুকু এখানে ওই সকল অবস্থার প্রতীক।

বায়যাবী লিখেছেন, যদিও আয়াতটি এককভাবে হজরত আলীর শানে অবতীর্ণ হয়েছে, তবুও এখানে বহু বচনের সিগা ব্যবহার করে অন্যদেরকেও এমতো পুণ্যকর্মে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। অর্থাৎ অন্যেরাও যেনো হজরত আলীর মতো এই বিশেষ পুণ্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

আমি বলি, হজরত আলী এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলেও এখানে ইন্নামা শব্দটি ব্যবহারের কারণে অন্যেরাও অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। এই অন্যেরা হচ্ছেন বিশ্বাসীগণ। ইহুদী , খৃষ্টান ও অনান্য অবিশ্বাসীরা

www.eelm.weebly.com

নয়। যেমন, অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসুল' (এবং মোহাম্মদ রসুল ব্যতীত কিছু নন)। এখানে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে অন্যান্য রসুলগণও রয়েছেন।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এসেছে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত উবাদা বিন সামেত এবং মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল সম্পর্কে। যখন হজরত উবাদা ইহুদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিন্ন করে বললেন, আমি আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল এবং মুসলমানদের বন্ধু —তখন অবতীর্ণ হলো চুয়ান্ন এবং পঞ্চান্ন নং আয়াত দু'টি। আলোচ্য আয়াতে 'বিশ্বাসীগণ' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত উবাদা এবং অন্যান্য সাহাবীগণকে।

বাগবী আরো লিখেছেন, একবার হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের সম্প্রদায় (বনী নাজির ও বনী কুরায়জা) আমাদেরকে পরিত্যাগ করেছে। তারা শপথ করে বলেছে, তারা আমাদের সঙ্গে ওঠা বসা করবে না, কোনো প্রকার সম্পর্কও রাখবে না। তখন অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। এরপর হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম বলেছিলেন, আমরা আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং বিশ্বাসীগণের প্রতি বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট। হজরত জুআইবির বর্ণনা করেন, এই আয়াতে 'বিশ্বাসীগণ' বলে ওই সকল বিশ্বাসীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা একে অন্যের বন্ধু।

আবু জাফর বিন মোহাম্মদ বিন আলী বাকের বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, সকল বিশ্বাসী সম্পর্কে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো তবে যে লোকেরা বলে, এই আয়াত কেবল হজরত আলীর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। আবু জাফর জবাব দিলেন, তিনিও তো বিশ্বাসীদের দলভূত। আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম। আবু নাঈম তাঁর হুলিয়া পুস্তকে এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

হজরত ইকরামা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকরের শানে। বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী সম্পর্কে যে বর্ণনাগুলো এসেছে, সেগুলো বাদ দিয়ে অন্য বর্ণনাগুলোর আলোকে এখানে 'রকিউন' এর উদ্দেশ্য হবে— দিবসে ও নিশীথে নফল নামাজ পাঠকারীগণ।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৫৬

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

❒ কেহ আল্লাহ্, তাঁহার রসুল এবং বিশ্বাসীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে আল্লাহের দলই তো বিজয়ী হইবে।

যারা আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে এই আয়াতে বলা হয়েছে— 'হিযবুল্লাহ্' (আল্লাহ্র দল)। আরোও বলা হয়েছে

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'বিশ্বাসীগণ' অর্থ মোহাজির ও আনসার সম্প্রদায়। অর্থাৎ আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং মোহাজির ও আনসারদেরকে যারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাঁরাই আল্লাহ্‌র দল।

'হিযবুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র দল) কথাটির মধ্যে রয়েছে আউলিয়া সম্প্রদায়ের সম্মান, উচ্চ মর্যাদা ও বিশেষ অনুগ্রহ প্রদানের কথা। কারণ তাঁরাই আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীদের প্রকৃত প্রেমিক। এর বিপরীতে যারা আল্লাহ, তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীগণকে পরিত্যাগ করে অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তারা নিশ্চয়ই শয়তানের দল।

কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'হিয্‌বুন' অর্থ অযিফা, দল, যুদ্ধাস্ত্র, দিক এবং কোনো ব্যক্তির ওই সঙ্গী— যে তার স্মরণপটে সদা উদ্ভাসিত থাকে। আমি বলি, এখানে শেষ অর্থটিই গ্রহণীয়। বায়যাবী লিখেছেন, যে সকল মানুষ কোনো আপতিত বিপদকে প্রতিহত করার জন্য একত্রিত হয় তারাই হিযবুন। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'হাজাবাহুল আমরু'—অর্থ, তার উপর মুসিবত আপতিত হয়েছে।

রাফেজীরা বলে, খেলাফতের হক ছিলো কেবল হজরত আলীর। তাদের বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে এই আয়াতটিকে তারা উপস্থাপন করে থাকে। এখানে ওলী (বন্ধু) অর্থ তত্ত্বাবধানকারী ও ব্যবস্থাকারী — মোতাওয়াল্লী।

আল্লাহ্‌পাক তাঁর নিজের এবং তাঁর রসুলের জন্য এ রকম বন্ধুত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এভাবেই তিনি হজরত আলীকেও মুসলমানদের ওলী (অভিভাবক) করে দিয়েছেন এবং 'ইন্নামা' শব্দটিকে সীমারেখা হিসেবে উল্লেখ করেছেন (যাতে মুসলমানদের ওলী হিসেবে আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং হজরত আলী স্বীকৃত হন। অন্য কারো জন্য এ সম্মানিত বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়নি। কেননা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের ওলী হওয়া ব্যাপকার্থক (সকল মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত)। সুতরাং হজরত আলীর বেলায়েতও ব্যাপকভিত্তিক হবে। তাই হজরত আলীই হবেন ইমাম — তিনি ব্যতীত অন্য কারো খলিফা হওয়ার অধিকার নেই। বিষয়টি প্রমাণার্থে রাফেজীরা হজরত বারা ইবনে আজিব এবং হজরত জায়েদ বিন আরকামের হাদিস উল্লেখ করেছে—যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. গাদিরে খুম নামক কূপের নিকট থামলেন এবং হজরত আলীর হাত ধরে বললেন, তোমরা কি জানো না— আমি স্বয়ং বিশ্বাসীদের বন্ধু। তাদের সত্তার উপরে তাদের নিজেদের অধিকার অপেক্ষা আমার অধিকার বেশী। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি ঠিকই বলেছেন। রসুল স. তখন প্রার্থনা করলেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি যাদের মাওলা (অভিভাবক) হবো, আলীও হবে তাদের মাওলা। হে আল্লাহ্! আলীকে যারা ভালোবাসবে আপনি তাদেরকেও ভালোবাসুন। আর আলীর সঙ্গে যারা শত্রুতা করবে আপনি তাদেরকেও শত্রু গণ্য করুন। এই ঘটনার পর হজরত আলীর সঙ্গে হজরত ওমরের সাক্ষাত ঘটলো। হজরত ওমর বললেন, হে ইবনে আবু তালেব, তুমি ধন্য। তুমি প্রতিদিন প্রতিক্ষণে প্রতিটি বিশ্বাসী নারী-পুরুষের মাওলা (বন্ধু) হয়ে গিয়েছো। আহমদ। হাদিসটি সর্বজনবিদিত হয়েছে। প্রতি যুগে ক্রমাগত বর্ণিত হয়ে চলেছে। অন্ততপক্ষে তিরিশ জন সাহাবী থেকে মুহাদ্দিসগণের একটি দল সিহাহ্ সিত্তাহ্ এবং সুনান গ্রন্থসমূহে স্বসূত্রে উল্লেখ করেছেন। হজরত

www.eelm.weebly.com

আলী বিন আবু তালেব, হজরত বুরায়দা বিন হাসিব, হজরত আবু আইয়ুব, হজরত আমর বিন মাররাহ্, হজরত আবু হোরায়রা, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আম্মার বিন বুরায়দা, হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস, হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর, হজরত আনাস বিন মালেক, হজরত জারীর বিন মালেক বিন হুয়াইরিস, হজরত আবু সাঈদ খুদরী, হজরত তালহা, হজরত আবু তোফায়েল, হজরত হুজায়ফা বিন উসাইদ এবং আরো অনেক সাহাবীর মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। হাদিসগুলোতে বলা হয়েছে, আলী যার অভিভাবক, তাদের উপর আলীর হক প্রাণের চেয়েও বেশী।

গাদিরে খুমের হাদিস স্পষ্টরূপে হজরত আলীর খেলাফতকে প্রমাণ করেছে। হজরত ইমরান বিন হোসাইনের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আলী আমা হতে, আমি আলী হতে। আলী প্রতিটি মুমিনের ওলী। তিরমিজি, ইবনে আবী শায়বা। বর্ণিত হাদিস দু'টো এই আয়াতের চেয়ে অধিক বিশদরূপে হজরত আলীর খেলাফতকে প্রমাণ করেছে। আর এই আয়াতের শানে নুজুল যদি হজরত আলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় তবে বুঝতে হবে, সকল বিশ্বাসীকে হজরত আলীর বন্ধুত্ব গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর হাদিস দু'টোতে বিশেষ করে বিবরণ দেয়া হয়েছে তাঁর বেলায়েতের (অন্য কেউ এর অন্তর্ভুক্ত নন)।

আমরা বলি, এই আয়াত এবং বর্ণিত হাদিস দু'টোর মাধ্যমে হজরত আলী ব্যতীত অন্য খলিফাগণের খেলাফত নিষিদ্ধ মনে করলে ভুল হবে। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, ওলী শব্দটি এসেছে 'ওয়ালইউন' থেকে। এটি একটি গুণবাচক বিশেষ্য (ওলী অর্থ প্রিয়জন, বন্ধু, সাহায্যকারী)। সিহাহ্ পুস্তকে জাওহারী লিখেছেন, 'বেলাউন' এবং 'তাওয়ালীউন' অর্থ দুই অথবা দু'য়ের অধিক বন্ধুর মধ্যে প্রতিবন্ধকহীন সম্পর্ক। রূপক হিসেবে এই সম্পর্ক বা নৈকট্য বিভিন্ন প্রকার। যেমন, স্থানের নৈকট্য, বংশীয় নৈকট্য, ধর্মীয় নৈকট্য, বন্ধুত্বের নৈকট্য, সহযোগিতার নৈকট্য, বিশ্বাসগত নৈকট্য এবং প্রভুর নৈকট্য। এর অর্থ কর্মনির্বাহী অথবা ব্যবস্থাপকও হতে পারে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, মাওলা অর্থ মালিক, গোলাম, আযাদকারী এবং যাকে আযাদ করা হয়েছে, সাথী, নৈকট্যভাজন— যেমন, পিতৃব্যপুত্র, ভাগিনেয়, প্রতিবেশী, অঙ্গীকারাবদ্ধ, অতিথি, অভিজাত, প্রতিপালক, বন্ধু, সাহায্যকারী, নেয়ামত প্রদানকারী, নেয়ামতপ্রাপ্ত, প্রিয়ভাজন, অনুগামী, সতীর্থ। কোরআন মজীদে এই শব্দগুলো এসেছে আল্লাহ্র সঙ্গে বান্দার ভালোবাসা ও নৈকট্যের সম্পর্ক বুঝাতে। এ সম্পর্ককে বেলায়েতও বলা হয়ে থাকে। ওলী বা বন্ধু শব্দটি বান্দার উপরেও প্রয়োগ করা যায়। যেমন, বলা হয়, ওয়ালীউল্লাহ্। আল্লাহ্র ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'আল্লাহু ওয়ালীউল্লাজিনা আমানু' (আল্লাহ্ ইমানদারদের ওলী)। মাওলা শব্দটিও কোরআন মজীদে আল্লাহ্র সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির' (তিনি কতই না উত্তম কর্মনির্বাহক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী)। হজরত জিবরাইল এবং পুণ্যবান মুমিনদের সঙ্গেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কোরআন মজীদে। যেমন, 'ইন্নাল্লহা হুয়া মাওলাহু ওয়াজিব্‌রিলু ওয়া সালিহুল মু'মিনিন' (নিশ্চয়ই আল্লাহ্, জিবরাইল এবং পুণ্যবান বিশ্বাসীগণের সহায়)। প্রকৃত

www.eelm.weebly.com

কথা এই যে, এই আয়াত এবং গাদিরে খুম সম্পর্কিত হাদিসগুলো হজরত আলীর খেলাফতকে সুনির্দিষ্টরূপে প্রমাণ করেনি এবং অন্য খলিফাগণের খেলাফতকেও অস্বীকার করেনি। তবে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে হজরত আলীর ভালোবাসার উপযুক্ত হওয়া এবং হাদিসসমূহের মাধ্যমে হজরত আলীর ভালোবাসা অপরিহার্য হওয়া এবং তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ হারাম হওয়া নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হারাম হওয়া।

আবু নাঈম মাদায়েনী বর্ণনা করেছেন, যখন হাসান মুসান্না বিন ইমাম হাসান মুজতবার নিকট 'মান কুনতা মাওলা হু' এই হাদিস সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো তখন তিনি বললেন, হাদিসটি যদি হজরত আলীর খেলাফত সম্পর্কিত হতো, তবে আল্লাহ্‌র শপথ! রসুল স. নিশ্চয় সে কথা পরিষ্কার করে বলে দিতেন। কারণ, তিনিই স. ছিলেন সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট বক্তা। গাদিরে খুমের নিকট প্রদত্ত রসুল স. এর ওই ভাষণের কারণ ছিলো এই—রসুল স. হজরত আলীকে সেনাপতি নিযুক্ত করে একটি বাহিনীকে পাঠিয়েছিলেন ইয়েমেনে। তিনি ওই যুদ্ধে প্রাপ্ত গণিমতের এক পঞ্চমাংশ (খুমুস) হিসেবে একটি ক্রীতদাসী গ্রহণ করেছিলেন। এই নিয়ে কেউ কেউ রসুল স. এর নিকট অনুযোগ উত্থাপন করলো। অনুযোগকারীদের প্রতি রসুল স. হলেন অপ্রসন্ন। বললেন, তোমরা তার সম্পর্কে কী বলতে চাও, যে আল্লাহ্ ও তার রসুলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলও তাকে ভালোবাসেন। এরপর তিনি উপরোক্ত ভাষণ দিলেন— যাতে করে সকল মুসলমানের হৃদয়ে হজরত আলীর মহব্বত বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং তাঁর সম্পর্কে সকল অনুযোগপ্রবণতা্র অবসান ঘটে। ওই ভাষণে তিনি স. বলেছেন 'আলাস্‌তুম তায়ালামুনা আন্নি আওলা বিকুল্লি মু'মিনিন' (তোমরা কি জানো না যে, আমি সকল বিশ্বাসী থেকে উত্তম)। এ কথার দ্বারা মুসলমানদেরকে সতর্ক করাই ছিলো রসুল স. এর উদ্দেশ্য। তিনি স. ওই ভাষণে বলতে চেয়েছেন, আলীকে ভালোবাসো—এটা আমার নির্দেশ। এ নির্দেশ পালন করা তোমাদের জন্য ওয়াজিব। ভাষণ শেষে তিনি স. হজরত আলীর জন্যে এ মর্মে দোয়াও করেছিলেন।

কোরআন মজীদে দু'ভাবে রাফেজীদের অভিমতের বিরুদ্ধে প্রমাণ এসেছে—

১. রাফেজীদের মতবাদের ভিত্তি তাকিয়া'র উপর। কিন্তু তারা বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি কঠোর হবে; তারা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না।—এই আয়াতের (আয়াত ৫৪) মাধ্যমে এখানে প্রশংসা করা হয়েছে ওই সকল মানুষের যারা বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল, কাফেরদের প্রতি কঠোর; তারা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করে না। হজরত আলীও ছিলেন উপরোক্ত গুণবিশিষ্ট। তিনি তাঁর পূর্বসূরী খলিফাত্রয়ের নিকট বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। তেইশ বছর ধরে তাঁদের সঙ্গে নামাজ পড়েছিলেন এবং জেহাদও করেছিলেন। তিনি হজরত ওমরের সঙ্গে তাঁর আপন কন্যাকে বিবাহ দিয়েছিলেন। নিশ্চয় এ সকল কিছু করতে গিয়ে তিনি নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করেননি। হজরত

www.eelm.weebly.com

আলীর কর্মকাণ্ডগুলোও ছিলো প্রকাশ্য। তিনি কি নিন্দুক এবং প্রতাপশালীদের ভয়ে উল্লেখিত পুণ্যকর্মসমূহ তাকিয়া হিসেবে সম্পাদন করেছিলেন? যদি তিনি তা করতেন, তবে তিনি নিশ্চয় এই আয়াতের অন্তর্ভূত হতেন না। অতএব প্রমাণিত হলো যে, রাফেজীদের মতবাদ একটি বাতিল মতবাদ।

২. 'ফাইন্না হিয্‌বাল্লহি হুমুল গলিবুন' (আল্লাহ্‌র দলই তো বিজয়ী হবে)। এ কথার অর্থ কেবল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতই নাজাতপ্রাপ্ত হবে। রাফেজী অথবা অন্য কোনো বেদাতী দল নাজাতপ্রাপ্ত হবে না। কারণ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতই সর্বযুগে বিজয়ীর আসনে অধিষ্ঠিত। এ রকম প্রাবল্য রাফেজী কিংবা অন্য বেদাতী দলগুলোর নেই। তারা কোনো যুগে বিজয়ীর মতো প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠা পায়নি। বরং তারা হজরত আলীকে মনে করেছে কাপুরুষ। তাই তারা বলে তাঁর পূর্ববর্তী তিন খলিফার ভয়ে তিনি সত্য প্রকাশ করেননি। পরবর্তী ইমামগণও ভয়ে ভয়ে ছিলেন। তাঁরা তাঁদের সাথীদেরকে সংগোপনে ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন এবং সে শিক্ষাকে গোপনই রাখতে বলেছেন। তারা নাকি বলতেন, দেখো দেয়ালেরও কান আছে। খুব গোপনে কার্যোদ্ধার করতে হবে ইত্যাদি। তারা বলে, ইমাম বাকের এবং ইমাম জাফর সাদেক নাকি তাদের সঙ্গীদেরকে এ রকম বলতেন। এগুলো নাকি তাদের গোপন গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধও রয়েছে। এই বেদাতীদের আর একটি অপবিশ্বাস এই যে, ইমাম মাহদী নাকি সামেরাহ্‌ ভূখণ্ডের নিচে হাজার বছর ধরে আত্মগোপন করে আছেন। আল্লাহ্‌পাকই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রেফাআ বিন যায়েদ বিন তাবুত এবং সুয়াইব বিন হারেস প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু অন্তরে তারা ছিলো কাফের। মুসলমানেরা সে কথা বুঝতে না পেরে ওই দু'জনকে সুহৃদ ভাবতে শুরু করলো। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা : আয়াত ৫৭

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে যাহারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাহাদিগকে ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

এই আয়াতে ইহুদী ও কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, তারা ধর্ম নিয়ে হাসিঠাট্টা করে এবং ধর্মকে মনে করে ক্রীড়াকৌতুকের বিষয়। তাই তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যাবে না। করতে

www.eelm.weebly.com

হবে শত্রুতা। এখানে 'হুযুওয়ান' অর্থ হাসি-তামাশা এবং 'লায়িবান' অর্থ ক্রীড়াকৌতুক। আর 'আলকুফফার' অর্থ মুশরিক। হজরত ইবনে মাসউদের 'ওয়ামিনাল্লাজিনা আশরাকু' (এবং তাদের মধ্যে যারা শিরিক করে)। সুতরাং কুফফার অর্থ মুশরিকই হবে। অথবা মুশরিক এবং আহলে কিতাবসহ সকল অবিশ্বাসীকে সাধারণভাবে এখানে বলা হয়েছে আলকুফফার। আহলে কিতাবদেরকে প্রথমে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে পুনরায় সাধারণভাবে মুশরিকসহ সকল অবিশ্বাসীদের সঙ্গে তাদেরকেও বলা হয়েছে আলকুফফার। অর্থাৎ ইহুদী, কাফের, মুশরিক যেই হোক না কেনো, সকল অবিশ্বাসীদেরকেই শত্রু জ্ঞান করতে হবে। বন্ধু মনে করা যাবে না।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াত্তাকুল্লহা ইন কুনতুম মু'মিনিন'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্কে ভয় করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। রক্ষা পেতে সচেষ্ট হও আল্লাহ্পাকের নির্দেশ লংঘন করা থেকে (অবিশ্বাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা থেকে)।

কালাবী বলেছেন, রসুল স.এর মুয়াজ্জিন নামাজের জন্য আজান দিলে সাহাবীগণ সমবেত হয়ে নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হতেন। ইহুদীরা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতো না বরং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপহাস করতো। তখন অবতীর্ণ হলো নিচের আয়াতটি।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৫৮

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ۝

❒ তোমরা যখন সালাতের জন্য আহবান কর তখন তাহারা উহাকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে— ইহা এই হেতু যে, তাহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদের বোধশক্তি নাই।

নামাজের জন্য আজান দেয়াকে ইহুদী খৃষ্টানেরা মনে করতো হাসি-তামাশা ও খেলাধূলার বস্তু। সুদ্দীর মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, মুয়াজ্জিন যখন আজানে উচ্চারণ করতেন 'আশ-হাদুআন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লহ্,' তখন মদীনার এক খৃষ্টান বলতো, আল্লাহ্ ওই মিথ্যুককে জ্বালিয়ে দিক। এক রাতে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে একই শয্যায় শায়িত ছিলো। ওই সময় তার পরিচারক রান্নাবান্নার জন্য আগুন নিয়ে এলো। হঠাৎ দমকা বাতাসে ওই আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ উড়ে গিয়ে পড়লো খৃষ্টান দম্পতির উপর। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেলো।

www.eelm.weebly.com

এক বর্ণনায় এসেছে, আজান শুনলে কাফেরেরা হিংসায় জ্বলে যেতো। একবার তারা রসুল স. এর নিকটে এসে বললো, মোহাম্মদ! আপনি এমন এক বেদাত কাজ শুরু করেছেন যা কোনো নবী রসুল করেননি। এর মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকলে আগের নবীগণ অবশ্যই করতেন। এই যে পাঁঠার মতো চিৎকার—এগুলো আপনি শিখেছেন কোত্থেকে? আজানের আওয়াজ অত্যন্ত কর্কশ এবং এর কথাগুলোও অসুন্দর। তাদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— 'ওয়ামান আহসানু ক্বওলাম্ মিমমান্ দাআ' ইলাল্লহি ওয়াআমিলা সলিহা' (এর চেয়ে উত্তম কথা আর কি হতে পারে— যে আল্লাহ্র দিকে আহবান জানায় এবং নিজেও পুণ্যকর্ম করে) — এই আয়াতটি এবং তার সঙ্গে আলোচ্য আয়াতটি।

শেষে বলা হয়েছে, 'এটা এ কারণে যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই'—এ কথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসীদের কোনো ধর্মজ্ঞান থাকে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, তারা বিভিন্ন বিষয়ে সদাসতর্ক এবং সর্বদা জ্ঞানচর্চায় রত। কিন্তু এই আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায়, ইন্দ্রিয়নির্ভর বিষয়ে যতোই চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করা হোক না কেনো, মূল জ্ঞান তাদের কখনই অর্জিত হয় না। দার্শনিকেরা চিন্তা গবেষণাকে জ্ঞানার্জনের জরুরী মাধ্যম বলে মনে করে। কিন্তু আল্লাহ্পাকের বিধান এবং নিয়ম এই যে, বিশুদ্ধ অন্তরে যে জ্ঞানার্জনের জন্য ফিকির করে (অনুসন্ধিৎসু হয়), আল্লাহ্পাক তাকে কাঙ্খিত জ্ঞান দান করেন। বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্পাকের মাশীয়াত বা ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

ইবনে জারীর লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার কতিপয় ইহুদী রসুল স. এর দরবারে হাজির হলো। তাদের মধ্যে ছিলো আবু ইয়াসার বিন আখতাব, রাফে' বিন আবু রাফে' এবং আরি বিন আমর। তারা রসুল স.কে বললো, কোন নবীর উপরে আপনার ইমান রয়েছে? তিনি স. বললেন, আমি বিশ্বাস রাখি আল্লাহ্র উপর এবং যা কিছু ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের বংশধরের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে— সে সকলের উপর। আরও বিশ্বাস রাখি মুসা, ঈসা ও অন্য নবীদেরকে যা দান করা হয়েছে— সে সকলের উপর। আমি তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্দেশ করি না (কেউ সত্য, কেউ সত্য নয়— এ রকম মনে করি না)। আমরা আল্লাহ্পাকের অনুগত। ইহুদীরা হজরত ঈসার নাম শুনে নাক সিটকালো। বললো, আমরা না ঈসাকে মান্য করি, না বিশ্বাস করি তাদেরকে, যারা ঈসাকে নবী বলে মানে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইহুদীরা তখন বললো, আল্লাহ্র কসম, দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে তোমাদের মতো হতভাগ্য আর কেউ নেই। তোমাদের চেয়ে খারাপ ধর্ম আর কারো আছে বলেও আমাদের জানা নেই।

www.eelm.weebly.com

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا
وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَٰسِقُونَ ○ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ
مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ
مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّٰغُوتَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ
عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ○ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُوا۟ بِٱلْكُفْرِ
وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا۟ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْتُمُونَ ○ وَتَرَىٰ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ
مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ○ لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ
وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ○

❑ বল, 'হে কিতাবীগণ! আমরা আল্লাহে ও আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করি, ইহা ব্যতীত অন্য কোন কারণে তোমরা আমাদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন নহ; এবং তোমাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।'

❑ বল, 'আমি কি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দিব যাহা আল্লাহের নিকট আছে? যাহাকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করিয়াছেন, যাহার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাহাদিগের কতককে তিনি বানর ও কতককে শুকর করিয়াছেন এবং যাহারা তাগুতের ইবাদত করে মর্যাদায় তাহারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হইতে সর্বাধিক বিচ্যুত।'

❑ তাহারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি' কিন্তু তাহারা অবিশ্বাস সহ আসে এবং উহা লইয়াই বাহির হইয়া যায়। তাহারা যাহা গোপন করে আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।

❑ তাহাদের অনেককেই তুমি পাপে, সীমা লংঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর দেখিবে; তাহারা যাহা করে নিশ্চয় তাহা নিকৃষ্ট।

www.eelm.weebly.com

❑ রব্বানীগণ ও পণ্ডিতগণ কেন তাহাদিগকে পাপ কথা বলিতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না? ইহারা যাহা করে নিশ্চয় তাহাও নিকৃষ্ট।

প্রথমেই নির্দেশ এসেছে, হে প্রিয় রসুল! আপনি তাদেরকে বলে দিন, হে কিতাবীগণ! তোমরা তো কেবল এ কারণেই আমাদেরকে শত্রু ভেবে বসে আছো। —আমরা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ কোরআন এবং পূর্বে অবতীর্ণ সকল আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করি। এখানে 'নাকৃমাতুন' শব্দটির অর্থ মন্দ, মন্দের বিনিময়ে মন্দ, 'তানক্বিমুনা মিন্না' অর্থ তোমরা আমাদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন। 'মিন্না' অর্থ আমাদের প্রতি বা আমাদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে, 'ওয়া আন্না আকছারাকুম ফাসিকূন'—এ কথার অর্থ এবং তোমাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। এ কথাটিকে আগের বাক্যটির সঙ্গে মিলিত অর্থ করলে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই অবিশ্বাসী (সত্যত্যাগী)। কারণ, তোমরা আসমানী কিতাবসমূহকে অস্বীকার করো। আর আমরা সকল আসমানী কিতাবের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসী। তোমরা উত্তম কথাকে মনে করো মন্দ আর মন্দ কথাকে মন্দ মনে করো না। পরের বাক্যটির 'ওয়াও' (এবং) কে পূর্ববর্তী বাক্যের 'তানক্বিমুনা' এর সঙ্গে মেলালে এ রকমই অর্থ দাঁড়ায়। আর এই 'ওয়াও'কে পূর্ববর্তী বাক্যের 'আমান্না' (বিশ্বাস করি) এর সঙ্গে মেলালে অর্থ দাঁড়াবে— তোমরা আমাদের প্রতি এ কারণেই বিরুদ্ধভাবাপন্ন যে, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে, আমরা বিশ্বাসী, আমাদের বিশ্বাস তোমাদের বিশ্বাসের বিপরীত (গ্রন্থকার এখানে বিভিন্নভাবে আলোচ্য বাক্যটির তরকিব ও তরতিব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেগুলোতে খুব বেশী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। তাই আমরা সেগুলোকে প্রলম্বিত করতে চাইনি—উপস্থাপন করেছি সংক্ষেপে)। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে 'ওয়াও' (এবং) এর অন্তর্নিহিত অর্থ হবে 'সহ'। এভাবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— তোমরা আমাদের বিশ্বাসকে মন্দ জেনে আমাদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়েছো, তৎসহ তোমরা অধিকাংশই কাফের।'

একটি সন্দেহঃ অধিকাংশ ব্যাকরণ শাস্ত্রজ্ঞদের নিকট মাফউলে মাআহু বা সঙ্গতাজ্ঞাপক কর্ম পদের জন্য সাথী থাকা জরুরী। তাই এই আয়াতের 'ওয়াও' এর অর্থ 'সঙ্গে' (মাআ) নয়। আখফাশ প্রমুখ ব্যাকরণজ্ঞদের নিকট অবশ্য নিকটতম অবস্থান থাকাই যথেষ্ট। তাই এই বাক্যে সঙ্গতাজ্ঞাপক অর্থ এসেছে।

সন্দেহের অপনোদনঃ জমহুরের নিকট সঙ্গতাজ্ঞাপক কর্ম হওয়ার জন্য নিশ্চিতরূপে সাথী হওয়া শর্ত। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে এ রকম হওয়া জরুরী নয়। সুতরাং সাথী হওয়ার শর্তটি সকল সঙ্গতাজ্ঞাপক কর্মে অভিপ্রেত নয়। আলোচ্য বাক্যটি 'যেরে'র হালতেও হতে পারে। যদি হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— আমরা বিশ্বাস রাখি আল্লাহ্‌র প্রতি। আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহের প্রতি এবং তোমরা যে অধিকাংশই কাফের—সে কথার প্রতি, তাই তোমরা আমাদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন।

www.eelm.weebly.com

এ রকম হতে পারে যে, এখানে খবর বা বিধেয় উহ্য রয়েছে। যদি এ কথাকে মানা হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে এ রকম—একথা তোমরা ভালো করেই জানো যে, তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই অবাধ্য (সত্যত্যাগী)। কিন্তু তোমরা কেবল বিত্তলিপ্সা ও নেতৃত্বাকাংখার কারণে আমাদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন।

'কারণ' ধরে নিয়েও শব্দটির অর্থ করা যায়। এ রকম করলে অর্থ দাঁড়াবে—অন্য কোনো কারণে তোমরা আমাদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন নও, বিরুদ্ধভাবাপন্ন কেবল এই কারণে যে, আমরা ইমানদার এবং তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই কাফের।

পরের আয়াতে (আয়াত ৬০) বলা হয়েছে, হে রসুল! আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দিবো—যা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে।

'মাছুবাতান' এবং 'উকুবাতুন' শব্দ দু'টির অর্থ আমলের বিনিময়। প্রথমোক্ত শব্দটি ব্যবহৃত হয় উত্তম বিনিময় হিসেবে পুরস্কার দানের ক্ষেত্রে। শেষোক্ত শব্দটি ব্যবহৃত হয় নিকৃষ্ট বিনিময় হিসেবে শাস্তি দানের ক্ষেত্রে। কিন্তু এখানে 'মাছুবাতুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম বুঝাতে। এ রকম করা হয়েছে উপহাস হিসেবে। যেমন, অন্য আয়াতে রয়েছে—'বাশ্‌শিরহুম বিআযাবিন আ'লীম' (তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন)। শাস্তির সংবাদ নিশ্চয়ই সুসংবাদ নয়—দুঃসংবাদ। কিন্তু সেখানে 'বাশারাত' বা সুসংবাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিদ্রুপার্থে।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের প্রতি ইমান নিশ্চয় কোনো নিকৃষ্ট কর্ম নয়। অথচ ইহুদীরা বলেছিলো, আমরা দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে তোমাদের মতো হতভাগ্য আর কাউকে দেখিনি। তোমাদের চেয়েও খারাপ ধর্ম আর কারো আছে বলেও আমাদের জানা নেই। তাদের এই গর্হিত উক্তিকে রহিত করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। সেই সূত্রেই বলা হয়েছে 'এরচেয়ে নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দিবো' (তোমরা তো মনে করো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান একটি নিকৃষ্ট কর্ম (কিন্তু তোমরা যা ধারণা করো তার চেয়েও নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ আমি তোমাদেরকে দিবো যা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে)। অন্য আয়াতেও এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, 'আও নাব্বিউকুম বিশার্‌রিম্‌মিন্ জালিকুমুন্নার' (আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ দিবো এর চেয়ে নিকৃষ্ট পরিণামের, জাহান্নামের)।

এরপর বলা হয়েছে 'যাকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের কতিপয়কে তিনি বানর, এবং কতিপয়কে শুকর করেছেন এবং যারা তাগুতের ইবাদত করে, মর্যাদায় তারাই নিকৃষ্ট এবং সরলপথ থেকে সর্বাধিক বিচ্যুত।'-এখানে অতীতকালের সিগা হিসেবে 'আবাদা' (ইবাদত করেছে)। শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ কথার অর্থ, অতীতে তারা তাগুতের পূজা করেছে আর সে কারণেই হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার অভিসম্পাতগ্রস্ত। 'আত্‌তাগুত' অর্থ বাছুর। তারা বাছুর পূজা করেছিলো। বাছুরের পূজা ছিলো প্রকৃতপক্ষে শয়তানের পূজা। বাছুর

www.eelm.weebly.com

ও শয়তান দু'টোই তাগুত বা মিথ্যা উপাস্য। অথবা তাগুত বলে কেবল শয়তানকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়েই তারা গো-শাবকের উপাসনা করেছিলো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, তাগুত অর্থ এখানে গণক। গণকদের পরামর্শেই তারা অগ্রসর হয়েছিলো মহাপাপের দিকে (শিরিকের দিকে)। তারা ছিলো অবাধ্য। তাই আল্লাহ্পাক তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। কাউকে করেছেন বানর এবং কাউকে করেছেন শুকর। তাগুতের উপাসনাকারীরাই সর্ব নিকৃষ্ট এবং সরল পথ থেকে সবচেয়ে দূরে।

পরের আয়াতে (আয়াত ৬১) মুনাফিকদের প্রকৃতি সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়েছে। তারা মুসলমানদের সামনে বলে 'আমরা বিশ্বাস করি।' কিন্তু তাদের অন্তরে থাকে অবিশ্বাস অর্থাৎ অন্তরের অবিশ্বাস সহই তারা মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করে।

পরে বলা হয়েছে, 'তারা যা গোপন করে আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত'— এ কথার মাধ্যমে মুনাফিকদেরকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে, মুনাফিকদের অন্তর্নিহিত অবিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ্পাক উত্তমরূপে অবগত। সুতরাং মুনাফিকদের পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। দুনিয়ায় তাদের জন্য রয়েছে চরম লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

এর পরের আয়াতে (আয়াত ৬২) বলা হয়েছে 'হে প্রিয় রসুল! আপনি দেখবেন মুনাফিকেরা পাপে, সীমালংঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে সদা তৎপর।' এখানে 'ইছম' শব্দটির অর্থ পাপ। 'উদওয়ান' অর্থ জুলুম বা সীমালংঘন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'ইছম' অর্থ তওরাতের বিভিন্ন বিধানকে গোপন করা এবং উদ্ওয়ান অর্থ তওরাতের মধ্যে নতুন ও মনগড়া কোনো কিছু সংযোজন করা। অবৈধ ভক্ষণের কথা এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, ইহুদী মুনাফিকেরা সুদ ভক্ষণ করতো। অর্থাৎ ইহুদী মুনাফিকদের চরম অপরাধগুলো ছিলো এই—তারা রসুল স. এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অগ্রসরমান জনতাকে বাধা দিতো, তওরাতের বিধান পরিবর্তন করতো এবং আল্লাহ্র নির্দেশ লংঘন করতো (সুদ ভক্ষণ করতো)।

শেষে বলা হয়েছে, 'তারা যা করে নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট।'—এ কথার মাধ্যমে পাপাচারী মুনাফিকদেরকে সুচিহ্নিত করা হয়েছে।

পরের আয়াতে (আয়াত ৬৩) বলা হয়েছে ইহুদীদের ধর্মনেতা ও আলেমগণের প্রকৃতি সম্পর্কে। তারা ইহুদীদেরকে পাপ কথা বলতে নিষেধ করে না, অবৈধ ভক্ষণেও বাধা দেয় না। এখানে মাশায়েখ ও আলেমদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। তাদের অবশ্য কর্তব্য ছিলো, তারা নিজেরা অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকবে এবং মানুষের পাপ কর্মের প্রতিবন্ধক হবে। কিন্তু তারা করেছে এর বিপরীত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন এখানে 'রব্বানিউন' (রব্বনীগণ) অর্থ খৃষ্টান আলেমগণ এবং 'আহ্বার' (পণ্ডিতগণ) অর্থ ইহুদী আলেমগণ।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে, 'তারা যা করে নিশ্চয় তা-ও নিকৃষ্ট।' এখানে পূর্বের আয়াতের মতো 'ইয়া'মালুনা' না বলে 'ইয়াসনাউনা' উল্লেখ করা হয়েছে বক্তব্যকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য। সানাআ অর্থ মাশাক্ব। মাশাক্ব অর্থ হচ্ছে পারদর্শী হয়ে ওঠার পর কোনো কাজ করা (পাপকর্ম ইহুদীদের স্বভাব বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। তাই 'ইয়াসনাউনা' বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদেরকে)।

মাদারেক রচয়িতা লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোরআন মজীদের এই আয়াতটি অত্যন্ত কঠিন। এখানে পাপাচারীকে যারা প্রতিহত করে না, তাদেরকেও পাপাচারীদের মতোই শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে। বরং পাপাচারীদের চেয়ে যারা পাপ কাজে বাধা দান করে না, তাদের প্রতি প্রদত্ত হুঁশিয়ারীটিই এখানে অধিকতর শক্তিশালী।

বায়যাবী লিখেছেন, সৎকর্ম পরিত্যাগ করা, পাপকর্ম করার চেয়েও অধিক মন্দ। কারণ, পাপকর্ম প্রবৃত্তির আস্বাদ্য। কিন্তু সৎকর্ম পরিত্যাগের মধ্যে কোনো প্রকার আস্বাদন নেই। সুতরাং সৎকর্ম পরিত্যাগ করাই অধিকতর দূষণীয়।

সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৬৪

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ۭ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاۗءُ ۭ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۭ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۗءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۭ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

❒ ইহুদীগণ বলে, 'আল্লাহ্ ব্যয়কুণ্ঠ'; উহারাই ব্যয়কুণ্ঠ এবং উহারা যাহা বলে তজ্জন্য উহারা অভিশপ্ত, আল্লাহের উভয় হস্তই মুক্ত; যে-ভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করিবেই; তাহাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করিয়াছি। যতবার তাহারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে ততবার আল্লাহ্ উহা নির্বাপিত করেন এবং তাহারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করিয়া বেড়ায়; আল্লাহ্ ধ্বংসাত্মক কার্যে-লিপ্তদিগকে ভালবাসেন না।

---

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস, ইকরামা, জুহাক এবং কাতাদা বলেছেন, ইহুদীরা ছিলো সম্পদশালী। কিন্তু যখন থেকে তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের অবাধ্যতা শুরু করলো, তখন থেকে কমতে শুরু করলো তাদের বিত্তবৈভব। ক্রমাগত অভাবগ্রস্ত হতে থাকলো তারা এবং বলতে শুরু করলো, আল্লাহ্ ব্যয়কুণ্ঠ বা কৃপণ। বনু কাইনুকার নেতা ফাখাজ বিন আজুরা বলতে লাগলো, আল্লাহ্ রিজিক দেয়া থেকে তাঁর হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। আবু শায়েখ ইবনে হাব্বান তাঁর তাফসীরে হজরত ইবনে আব্বাসের এই বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিবরানীর বর্ণনায় রয়েছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বান্নাশ বিন কায়েস ইহুদী বললো, হে মোহাম্মদ! তোমার আল্লাহ্ বখিল। কিছু দিতে চায় না। তখন অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, ফাখাজ এবং বান্নাশের কথার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অন্য ইহুদীরা এ রকম না বললেও তারা ছিলো ফাখাজ ও বান্নাশের এই উক্তির নীরব সমর্থক। তাই আয়াতে 'ইহুদীরা বলে'—এ রকম বলা হয়েছে। এভাবে সকল ইহুদীদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

'মাগলুলাত' অর্থ ব্যয়কুণ্ঠ বা হাত বন্ধ হওয়া। হাত বন্ধ ও খোলা অর্থ, কৃপণতা ও দানশীলতা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়ালা তাজআ'ল ইয়াদাকা মাগলুলাতান ইলা উনুক্বিকা ওয়ালা তাবসুত্হা কুল্লালবাস্ত্' (নিজের হাতকে কৃপণতাবশতঃ কাঁধের দিকে সংকুচিত করে রেখো না এবং সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করে দিও না।

এরপর বলা হয়েছে, 'গুল্লাত আইদিহিম ওয়া লুয়ীনু বিমা ক্বালু (তারা যা বলে তার জন্য তারা অভিশপ্ত—এ কথার অর্থ, 'আল্লাহ্ ব্যয়কুণ্ঠ'— এই অপবচনটির কারণে তাদের উপর নেমে এসেছে আল্লাহ্র অভিসম্পাত। এ রকমও অর্থ হতে পারে— যেহেতু তারা বলেছে আল্লাহ্র হাত বন্ধ, তাই অভিসম্পাত হিসেবে তাদের হাতও বন্ধ হয়ে যাক। তারা হয়ে যাক দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্ত। হাত বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ প্রকৃতপক্ষেই হাত বন্ধ হয়ে যাওয়া—এ রকমও হতে পারে। অর্থাৎ পৃথিবীতে যেনো তাদের হাত শৃংখলাবদ্ধ হয় অথবা দোজখে তাদেরকে যেনো লাগানো হয় হাত কড়া।

'না, আল্লাহ্র উভয় হস্তই মুক্ত'—শ্রবণ ও দর্শনের মতো দানশীলতাও আল্লাহ্র পাকের একটি গুণ। তাঁর উভয় হস্ত মুক্ত অর্থ, তিনি দানশীল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্পাক আনুরূপ্য থেকে পবিত্র। তাই তাঁর উভয় হস্তকে মানুষের হাতের মতো মনে করা যাবে না। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইমামগণ বলেছেন, এখানে আল্লাহ্পাকের দানশীলতার বিবরণটি যেভাবে এসেছে, সেভাবে আমাদেরকে বিশ্বাস রাখতে হবে। কিন্তু এর সঙ্গে অন্য কিছুকে তুলনীয় মনে করা যাবে না। কারণ, আল্লাহপাকের সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলী—সবকিছুই তুলনা রহিত।

www.eelm.weebly.com

হজরত আমর বিন আমবাসা বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, রহমানের (আল্লাহর) উভয় হস্তই দক্ষিণ হস্ত। কিয়ামতের দিন কিছুসংখ্যক লোকের বিশেষ মর্যাদা দেখে নবী ও শহীদগণ ওই মর্যাদা লাভের জন্য লোভাতুর হয়ে পড়বেন। তাঁদের মুখমণ্ডলের নূর চমকাতে থাকবে চাঁদের মতো। এ কথা শুনে সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তারা কারা? রসুল স. বললেন, তারা ওই দল যারা আপন অবস্থান পরিত্যাগ করে একত্রে আল্লাহপাকের স্মরণে মগ্ন হয়। তারা পছন্দ করে পবিত্র আহার্য এবং পবিত্র কালাম। উত্তম সূত্রে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী।

জ্ঞাতব্যঃ এই বিশেষ দলটি হচ্ছে অন্তর্জগতকে পবিত্র করার জন্য একত্রিত খানকাবাসী সুফী সাধকদের দল এবং ধর্মীয় শিক্ষকদের ছাত্রগণ। গ্রন্থকার।

প্রথম যুগের আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহ্‌র হস্ত অর্থ অপার ক্ষমতা বলে কোনো কিছুকে অধিকার করা। এভাবে তারা কথাটির রূপক অর্থ গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, মুক্তহস্ত অর্থ অসীম দাতা— যার দানের সীমা পরিসীমা নেই। 'উভয় হস্ত মুক্ত' বলে এখানে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, পরিপূর্ণরূপেই তিনি দানশীল, কৃপণ নন। তিনিই পরিপূর্ণ দানশীল যিনি দুই হাতে তাঁর সম্পদ বিতরণ করেন। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে তিনি দানশীল। তাঁর উন্মুক্ত দুই হাতের একটি দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত, আরেকটি সম্পৃক্ত আখেরাতের সঙ্গে। এমনও বলা যায়— তাঁর উভয় হস্ত মুক্ত, একটির সম্পর্ক অবকাশ দানের সঙ্গে এবং অপরটির সম্পর্ক মর্যাদা প্রদানের সঙ্গে। 'যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন' —এ কথার অর্থ হেকমত অনুসারে কখনও কখনও তিনি মানুষের উপার্জনে দান করেন প্রশস্ততা, কখনও সংকীর্ণতা। এখানে এমতো অপধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, মানুষের উপার্জন সংকুচিত হলে তাঁর দানও সংকুচিত হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌পাকের ভাণ্ডার তো অফুরন্ত। তবে তিনি রিজিক প্রদানে সংকীর্ণতা করবেন কেনো? এই অপধারণা নিরসনের জন্যই বলা হয়েছে —'যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন'।

'তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করবেই'—এ কথার অর্থ, হে প্রিয় রসুল! আপনার উপর যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে তা ইহুদীদের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেবে— যেমন, উত্তম ও শক্তিশালী আহার্য নিরোগ ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যবান করে কিন্তু বাড়িয়ে দেয় রোগগ্রস্ত ব্যক্তির রোগ। তেমনি কোরআন মজীদ তাদের অন্তরের রোগ ও মিথ্যা বিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেবে। তারা ক্রমাগত হতে থাকবে অধিকতর ধর্মদ্রোহী ও অবিশ্বাসী। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কোনো আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীরা অস্বীকার করতো। এভাবে নতুন নতুন অবতীর্ণ আয়াত তাদেরকে অধিকতর অবাধ্য ও অবিশ্বাসী করে তুলতো। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কোরআনের কোনো আয়াত অবতীর্ণ হলে

www.eelm.weebly.com

তারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতো। এভাবেই তাদের ক্রমঅগ্রসরমাণ অভিযাত্রা চলতো দ্রোহ ও বিশ্বাসহীনতার দিকে।

'তাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করেছি।' হাসান ও মুজাহিদ বলেছেন,

এখানে 'তাদের মধ্যে' (বাইনাহুম) অর্থ ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে। অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে অথবা ইহুদীদের বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে। আল্লাহ্পাক তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত গোত্রদ্বন্দ্ব প্রসূত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছেন।

'যতবার তারা যুদ্ধের অগ্নিপ্রজ্বলিত করে, ততবার আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করেন'—এ সম্পর্কে হাসান বলেছেন, যখন ইহুদীরা রসুল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা বিশৃংখলা সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়, তখনই আল্লাহ্পাক তাদের নিজেদের মধ্যে গোত্রদ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ প্রবল করে দেন। এভাবে তাদের উদ্দেশ্য বানচাল করে দিয়ে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে সাহায্য করেন।

কাতাদা বলেছেন, এখানে ইহুদীদের পূর্বাপর সকল যুদ্ধ ও বিশৃংখলাকে অকার্যকর করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। যখনই তারা তওরাতের হুকুমের বিরুদ্ধে গিয়েছে তখনই অন্য সম্প্রদায়কে তাদের উপর চড়াও করে দেয়া হয়েছে। অতীতে এভাবে বখতে নসরের মাধ্যমে তাদেরকে যেমন পর্যুদস্ত করা হয়েছে, তেমনি বর্তমানে মুসলমানদেরকে প্রবল করে দেয়া হয়েছে তাদের উপর। তাই তারা ক্রমাগত হয়ে চলেছে অপদস্থ। অকৃতকার্য।

'তারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায়'—এ কথার অর্থ তারা সব সময় যুদ্ধ ও ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টির অপচেষ্টায় থাকে। এখানে 'ইয়াসআওনা' শব্দটির অর্থ 'ইয়াতলুবুনা' ও হতে পারে। এ রকম হলে অর্থ হবে, তারা বিশৃংখলা ও কুফরী সৃষ্টিতে সতত উদ্যোগী। তারা ইসলামকে ধ্বংসের অপচেষ্টায় লিপ্ত এবং তাদের কিতাব থেকে রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কিত বিবরণসমূহ অপসারণ করতে সদা সচেষ্ট।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াল্লহু লা ইউহিব্বুল মুফ্সিদিন'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্পাক ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্তদেরকে ভালোবাসেন না। তাই তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করে থাকেন।

জ্ঞাতব্যঃ রসুল স. এরশাদ করেছেন, রসুল মুসার উম্মতেরা একাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে সত্তরটি দল জাহান্নামী এবং একটি দল জান্নাতী। রসুল ঈসার উম্মতেরা বিভক্ত হয়েছে বায়াত্তরটি দলে। তার মধ্যে একাত্তরটি জাহান্নামী এবং একটি জান্নাতী। আর আমার উম্মতেরা বিভক্ত হবে তিয়াত্তরটি দলে। বাহাত্তরটি হবে জাহান্নামী এবং একটি জান্নাতী। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! জান্নাতী দল কোনটি? তিনি স. বললেন, আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে দলে (আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত)।

---

www.eelm.weebly.com

হজরত আনাস থেকে ইয়াকুব বিন যায়েদ বিন আসলামের পদ্ধতিতে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ইয়াকুব বিন যায়েদ বলেছেন, হজরত আলী বিন আবু তালেব উপরোক্ত মারফু হাদিসটি বর্ণনা করার সময় সুরা মায়িদার পঁয়ষট্টি ও ছেষট্টি সংখ্যক আয়াত পাঠ করে বলতেন, ওই জান্নাতী দলের অন্তর্ভুক্ত হবে তারা, যারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকবে।

রসুল স. বলেছেন, এ রকম অবস্থা হবে তখন, যখন এলেম উঠে যেতে থাকবে। হজরত জিয়াদ বিন লবিদ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এলেম কবে থেকে উঠে যেতে থাকবে। আমরাতো কোরআন পাঠ করি। আমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও আমরা কোরআন শিক্ষা দিবো। তারাও তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষা দিবে। তারা শিক্ষা দিবে পরবর্তীদেরকে। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে কোরআনের শিক্ষা। রসুল স. বললেন, ইবনে লবিদ! মদীনাবাসীদের মধ্যে আমি তো তোমাকে জ্ঞানী বলে জানি। ইহুদী ও নাসারা কি তওরাত, ইঞ্জিল পাঠ করে না? কিন্তু তওরাত ও ইঞ্জিলের নির্দেশনার মাধ্যমে তারা কি কোনো উপকার গ্রহণ করতে পারে? হজরত জোবায়ের বিন ইয়াসার থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর। হাদিসের শেষাংশে বলা হয়েছে, এরপর তিনি স. পাঠ করলেন, 'ওয়ালাউ আন্নাহুম আক্বমুত্ তাওরাতা ওয়াল ইনজিলা....মিন তাহ্‌তি আরজুলিহিম' (আয়াত ৬৬)।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৬৫, ৬৬

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاۤءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ○

❐ কিতাবীগণ যদি বিশ্বাস করিত ও ভয় করিত তাহা হইলে তাহাদের দোষ অপনোদন করিতাম এবং তাহাদিগকে সুখদ কাননে দাখিল করিতাম।

❐ তাহারা যদি তওরাত, ইঞ্জিল ও যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিত তাহা হইলে তাহারা সকল দিক দিয়া প্রাচুর্য লাভ করিত। তাহাদের মধ্যে এক দল রহিয়াছে যাহারা মধ্যপন্থী, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ যাহা করে তাহা নিকৃষ্ট।

আলোচ্য আয়াত দুইটির প্রথমটিতে বলা হয়েছে, 'কিতাবীগণ যদি বিশ্বাস করতো ও ভয় করতো, তাহলে তাদের দোষ অপনোদন করতাম'—এ কথার অর্থ যদি ইহুদী ও খৃষ্টানেরা ইসলাম গ্রহণ করতো তবে আল্লাহ্‌পাক তাদের অতীতের

www.eelm.weebly.com

সকল পাপ মার্জনা করতেন। ইসলাম পশ্চাতের সকল অপরাধ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। হজরত আমর বিন আস বলেছেন, আমি রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! হস্ত প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে হাত রেখে অঙ্গীকারাবদ্ধ (বায়াত) হবো। রসুল স. তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তিনি স. বললেন, হে আমর! এমন করলে কেনো? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি একটি শর্ত করতে চাই। রসুল স. বললেন, বলো। আমি নিবেদন করলাম, আমাকে যেনো ক্ষমা করে দেয়া হয়। তিনি স, বললেন, আমর! তুমি কি জানো না ইসলাম অতীতের সকল পাপ অপসারিত করে, হিজরত দূর করে হিজরত পূর্ব সকল গোনাহ্ এবং হজ মুছে ফেলে হজের আগের সকল অপরাধ। মুসলিম।

এরপর বলা হয়েছে, 'এবং সুখদ কাননে দাখিল করতাম'—এ কথায় বুঝা যায় সুখদ কাননে অর্থাৎ বেহেশতে প্রবেশ করতে গেলে মনে প্রাণে ইসলামকে গ্রহণ করা (ইমান আনা) জরুরী। তাই সুখদ কাননে প্রবেশ করার শর্ত হিসেবে পূর্ববর্তী বাক্যটিতে ইসলাম গ্রহণ করার (ইমান আনার কথা বলা হয়েছে)। রসুল স. বলেছেন, যার অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তার শপথ! যে সকল ইহুদী ও নাসারা আমার রেসালতে এবং আমার প্রতি অবতীর্ণ বিষয়াবলীতে বিশ্বাস স্থাপন না করে জীবন লীলা সাঙ্গ করবে, নিশ্চয়ই তারা প্রবিষ্ট হবে নরকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা যদি তওরাত ইঞ্জিল ও যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকতো, তাহলে তারা সকল দিক দিয়ে প্রাচুর্য লাভ করতো।'—এ কথার অর্থ ইহুদী ও খৃষ্টানেরা যদি তাদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও ইঞ্জিলের নির্দেশানুযায়ী চলতো, আল্লাহ্‌র আয়াত গোপন না করতো অর্থাৎ তওরাতে উল্লেখিত রসুল স. এর প্রতি ইমান গ্রহণের নির্দেশ এবং তাঁর গুণাবলী সমূহকে গোপন না করে প্রচার করতে সচেষ্ট হতো— সেই সঙ্গে সকল আসমানী কিতাবকে বিশ্বাস করতো, তবে তারা হতো সকল দিক দিয়ে প্রাচুর্যের অধিকারী। 'লা আকালু মিন ফাওক্বিহিম ওয়া মিন তাহ্‌তি আরজুলিহিম'—কথাটির অর্থ সকল দিক দিয়ে।ফাররা বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ হবে রিজিকের মধ্যে সীমাহীন প্রশস্ততা। আরববাসীগণ বলে থাকেন, অমুক ব্যক্তি আপাদমস্তক নিমজ্জিত রয়েছে (............)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এ কথাটির অর্থ, তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতো এবং মৃত্তিকা হয়ে যেতো শস্য শ্যামল। যেমন, অন্য এক আয়াতে এসেছে, 'ওয়ালাও আন্না আহলাল কুরা আমানু ওয়াত্তাক্বাও লা ফাতাহ্‌না আলাইহিম বারাকাতিম মিনাস্‌সামায়ি ওয়াল আরদ্বি' (যদি জনপদবাসীরা ইমান গ্রহণ করতো, তবে আমি নভোঃমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে তাদের জন্য বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম)। প্রকৃত কথা এই যে, তাদের রিজিকের সংকীর্ণতা আল্লাহ্‌পাকের কৃপণতার কারণে নয়, তাদের অবিশ্বাস ও পাপের কারণে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে, 'তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা মধ্যপন্থী; কিন্তু তাদের অধিকাংশ যা করে তা নিকৃষ্ট।'-এখানে মধ্যপন্থী অর্থ সত্য পন্থী, সৎপথের অনুরাগী— যারা সীমা লংঘন করে না। তাঁরা হচ্ছেন হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম এবং তাঁর সঙ্গী সাথীরা। কিন্তু তাঁরা নগণ্য সংখ্যক। অধিকাংশ কিতাবীরা নিকৃষ্ট। তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অবাধ্যতা করেই চলেছে। পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করে চলেছে তওরাতের বিধানাবলীর। শত্রুতা পোষণ করে চলেছে আল্লাহ্র হাবীব আখেরী রসুল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর সঙ্গে। হাসান বসরীর মাধ্যমে আবু শায়েখ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাক যখন আমাকে রেসালত দান করলেন, তখন আমি শংকিত হলাম এই ভেবে যে, মানুষ নিশ্চয় আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন করবে। তখন আল্লাহ্পাক আমাকে হুঁশিয়ার করে দিলেন এই বলে যে, হে প্রিয় রসুল! প্রেরিত প্রত্যাদেশ প্রচার করুন, অন্যথায় আমি আপনাকে অভিযুক্ত করবো। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৬৭

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

❐ হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রচার কর; যদি না কর তবে তো তুমি তাঁহার বার্তা প্রচার করিলে না। আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন। আল্লাহ্ সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

মাসরুকের বর্ণনায় রয়েছে, জননী আয়শা বলেছেন, যে-ব্যক্তি বলবে, রসুল স. তাঁর প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশের কিছু অংশ গোপন করেছেন, সে হবে মিথ্যাবাদী। কারণ আল্লাহ্পাক স্পষ্ট বলেছেন, 'হে রসুল! আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন।' কোনো কোনো আলেম বলেছেন। এই আয়াতের মাধ্যমে রসুল স.কে প্রচার করতে বলা হয়েছে রজম ও কিসাসের বিধানসমূহ যা ইহুদীরা গোপন করতে চেয়েছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে জননী জয়নাব বিনতে জাহাশ এবং রসুল স. এর পবিত্র পরিণয় সম্পর্কে। আবার কেউ বলেছেন, জেহাদের নির্দেশ প্রচার সম্পর্কে অবতীর্ণ এই আয়াতটি ছিলো এ রকম— যুদ্ধের নির্দেশ শুনার সঙ্গে সঙ্গে মুনাফিকেরা হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। তাদের সম্পর্কে অন্যত্র

www.eelm.weebly.com

উল্লেখিত হয়েছে, 'অতঃপর যখন কোনো স্পষ্ট বিষয়ে সুরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে জেহাদেরও উল্লেখ থাকে, যখন যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, তারা আপনার দিকে এমনভাবে তাকাবে যেমনভাবে তাকায় কোনো মৃত্যু পথযাত্রী।' জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন রসুল স, দেখলেন, কেউ কেউ বিষয়টি পছন্দ করতে পারছে না। তখন তিনিও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তখনই। ইবনে আবি হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, মুজাহিদ বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'হে রসুল, আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন। তখন রসুল স. নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভু প্রতিপালক! আমি কেমন করে অগ্রসর হবো, আমি একা আর সকলে অনুপ্রেরণাহীন। তখন অবতীর্ণ হলো আয়াতের অবশিষ্টাংশ।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া এবং ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় রয়েছে হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, গাদিরে খুম কূপের নিকট হজরত আলী ইবনে আবু তালেবের শানে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. এর যুগে আমরা এই আয়াতটি পাঠ করতাম এভাবে—'ইয়া আইয়ুহার রসুলু বালিগ মা উনযিলা ইলাইকা মির‌রব্বিক। ইন্না আলিয়ান মাওলাল মু'মিনিনা ওয়া ইল্লাম তাফ্‌য়াল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতাহু ওয়াল্লহু ইয়া'ছিমুকা মিনান্‌নাস।' (হে রসুল! আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন। নিশ্চয় আলী বিশ্বাসীদের অভিভাবক। যদি আপনি এরূপ না করেন তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না। আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন)। এই বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো গাদিরে খুম নামক কূপের নিকটে। কিন্তু এই বক্তব্যটি জ্ঞান এবং বিভিন্ন বর্ণনা বিরুদ্ধ। এই সুরার বর্ণনা ধারার মাধ্যমেও বুঝা যায় যে, গাদিরে খুমের নিকট এই আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। হজরত আয়েশা থেকে বিশুদ্ধসূত্রে বোখারীর বর্ণনায় জননী আয়েশা থেকে তিরমিজি ও হাকেমের বর্ণনায় এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে— এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে খন্দক যুদ্ধের দিন। আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, গাদিরে খুমের ঘটনাটি ঘটেছিলো রসুল স. কর্তৃক ধর্মের প্রচার সমাপ্ত হওয়ার পর। তখন কোরআনের এমন কোনো আয়াত ছিলো না যা প্রচার করা হয়নি। গাদিরে খুমে আগমনের আগেই বিদায় হজে অবতীর্ণ হয়েছিলো কোরআনের সর্বশেষ আয়াতটি—'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দিনাকুম ওয়া আত্‌মামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রদ্বিতু লাকুমুল ইসলামা দিনা' —আজ তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সমাপ্ত করলাম (কোরআনের অবতরণ সমাপ্ত ঘোষণা করলাম) এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম। এরপর ধর্ম প্রচারের নির্দেশ কিভাবে আসতে পারে? তখন তো আরব ভূখণ্ডে বিধর্মী বলে কেউ

www.eelm.weebly.com

ছিলো না। তাছাড়া আলোচ্য আয়াতের এই বাক্যটির অর্থই বা কি হবে—'আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।' আর এই আয়াতে পূর্বে ও পরে রয়েছে ইহুদী ও নাসারাদের বিবরণ। এই সুরার ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করতে চেয়েছিলো, তখন আল্লাহ্ তাদের হাত সংযত করেছিলেন।' পরবর্তী আয়াতেও (আয়াত ৬৮) বলা হয়েছে, 'বলো হে কিতাবীগণ, তওরাত, ইঞ্জিল ও যা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোনো ভিত্তি নেই।'—এ সকল আয়াতের বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াতে রজম ও কিসাসের বিধান প্রচার করার কথা বলা হয়েছে। হাসানের মাধ্যমে ইবনে হাব্বান এ রকমই বলেছেন।

এরপর বলা হয়েছে 'যদি না করো তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না।' —এ কথার অর্থ হে রসুল! আপনি যদি কোনো একটি নির্দেশ প্রচার করলেন না। আল্লাহ্ পাকের বিধানের একাংশ গোপন রাখলে অন্য অংশটিও হয়ে পড়ে অর্থহীন। যেমন, নামাজের রোকনসমূহের কোনো একটি বাদ পড়লে সম্পূর্ণ নামাজ বাতিল হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্তায়ালার একটি বিধান প্রচার না করলে অন্যগুলোর প্রচারও হয়ে পড়ে নিরর্থক। কারণ এতে করে প্রচার না করার বিধানটির প্রতি মানুষ ইমান আনবে না, আল্লাহ্তায়ালার আয়াত বলে মানবে না। এভাবে আনীত আংশিক ইমান ইমানই নয়। যেমন ইহুদীরা বলতো আমরা কোনো কোনো অংশকে বিশ্বাস করি এবং কোনো কোনো অংশকে অস্বীকার করি। ইহুদীদের এ রকম বিশ্বাসকে কোরআনে অবিশ্বাস বলা হয়েছে। তাছাড়া মনে রাখতে হবে, একটি আয়াত গোপন রাখার অপরাধ সকল আয়াত গোপন রাখার অপরাধের মতো। যেমন, এক ব্যক্তিকে হত্যা সম্পর্কে আল্লাহ্পাক বলেছেন 'যেনো সে সকল মানুষকে হত্যা করে ফেলতো।'

'আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন।'—এ কথার অর্থ, হে আমার রসুল! সত্য ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে আপনি ভীত হবেন না। যদিও আপনি একা 'কিন্তু তারা আপনাকে হত্যা করতে পারবে না। এই তাফসীরের মধ্যে এ রকম সন্দেহ করা যায় না যে, আল্লাহ্পাকের হেফাজতের অঙ্গীকার দানের পরেও উহুদ যুদ্ধে রসুল স. এর পবিত্র মস্তক রক্তে রঞ্জিত হয়েছিলো কেনো? কেনোই বা ভেঙ্গে গিয়েছিলো তাঁর পবিত্র দন্ত? কেনো তাঁকে দেয়া হয়েছিলো অন্যান্য আপদ বিপদ? এ রকম সন্দেহ নিরসনার্থে বলা যেতে পারে যে, এই আয়াতে হত্যা থেকে নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার দেয়া হয়েছে। সকল দুঃখ বিপদের হেফাজতের ওয়াদা করা হয়নি। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. এর পবিত্র মস্তক রক্তে রঞ্জিত হওয়ার পরে। কেননা, সুরা মায়িদা অবতীর্ণ হয়েছে সকলের শেষে। জননী আয়েশা থেকে তিরমিজি ও হাকেম বর্ণনা করেছেন,

www.eelm.weebly.com

রাত্রিকালে রসুল স.কে পাহারায় রাখা হতো। এরপর আলোচ্য বাক্যটি অবতীর্ণ হলে তিনি প্রহরীদের কে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেন এবং তাঁবুর বাইরে এসে বললেন, হে জনতা! তোমরা নিশ্চিন্ত মনে চলে যাও আল্লাহ্পাক আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন। রসুল স. রাতে আপন শয্যায় শায়িত ছিলেন। ওই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, মাতা সাহেবা আয়েশা বলেছেন, রসুল স. আপন নিরাপত্তার জন্য রাতে জেগে থাকতেন। মদীনায় আগমনের পর তিনি স. একদিন বললেন, আমার সঙ্গীদের মধ্যে কেউ যদি আজ রাতে আমাকে পাহারা দিতো, তবে অতি উত্তম হতো। এমন সময় অস্ত্রের আওয়াজ শোনা গেলো। রসুল স. বললেন, কে? জবাব এলো আমি সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস, পাহারা দিতে এসেছি। এ কথা শুনে রসুল স. শয্যা গ্রহণ করলেন। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিবরানী লিখেছেন, রসুল স. এর পাহারায় তাঁর পিতৃব্য হজরত আব্বাসও ছিলেন। যখন অবতীর্ণ হলো 'আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন,' তখন থেকে তিনি পাহারা দেয়া ছেড়ে দিলেন। হজরত আসমা বিন মালেক হাতামা থেকে তিবরানী লিখেছেন, আমরা রাতে রসুল স. কে পাহারা দিতাম। অতঃপর 'আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন' অবতীর্ণ হলে তিনি স. আমাদের পাহারা দেয়া বন্ধ করে দিলেন।

ইবনে হাব্বান তাঁর সহিহ্ গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে লিখেছেন — সফরের সময় আমরা রসুল স. এর সঙ্গে একই বাহনে আরোহন করতাম। কোথাও থেমে গেলে আমরা রসুল স. এর জন্য ছেড়ে দিতাম সেখানকার সর্ববৃহৎ বৃক্ষতল। ওই বৃক্ষের ছায়ায় তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। একদিন তিনি একটি বৃক্ষে তরবারি ঝুলিয়ে শয়ন করলেন। হঠাৎ এক লোক এসে তরবারীটি হাতে নিয়ে বললো, মোহাম্মদ! বলো, আমার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবে কে? রসুল স. বললেন আল্লাহ্। তারপর বললেন, তরবারি রেখে দাও। লোকটি তৎক্ষণাৎ তরবারি রেখে দিলো। তখন অবতীর্ণ হলো 'আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন।'

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা থেকে মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজীও এ রকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় যে কথাটি অতিরিক্ত রয়েছে তা হচ্ছে— গ্রাম্য লোকটির হাত কাঁপতে শুরু করলো। তার হাত থেকে তরবারীটি পড়ে গেলো এবং সে তার মাথা বৃক্ষের সঙ্গে ঠুকতে লাগলো। তার মাথা হয়ে গেল রক্তাক্ত। তখন আল্লাহ্পাক নাজিল করলেন এই আয়াত।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে ইবনে আবি হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন, রসুল স. বনী আনমারের যুদ্ধের সময় জাতুররেকা নামক স্থানে একটি উঁচু বৃক্ষের নিচে তাঁর বাহন থেকে অবতরণ করলেন। সেখানে তিনি স. একটি কুয়ার মধ্যে পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন। অনতিদূরে ছিলো শত্রুপক্ষের কয়েকজন লোক। তাদের মধ্যে একজন ছিলো বনী নাজ্জার জনপদের। তার নাম ওয়ারেস। সে বললো, আমি মোহাম্মদকে হত্যা করবো। তার সঙ্গের লোকেরা

www.eelm.weebly.com

বললো, কেমন করে? সে বললো, আমি তাঁর নিকট গিয়ে বলবো, আপনার তরবারিটা একটু দিন, আমি দেখি। তিনি তরবারীটা দিলেই আমি তাঁকে খুন করে ফেলবো। এ কথা বলেই সে রসুল স. এর নিকটে এলো। বললো, মোহাম্মদ আপনার তরবারীটা একটু দিন, আমি দেখি। রসুল স. তরবারীটি দিলেন, কিন্তু তার হাত কাঁপতে শুরু করলো। তিনি স. বললেন, তোমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি সন্দিহান। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। এ ঘটনাটি বোখারীও লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনায় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথাটি নেই।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আরও একটি বিস্ময়কর কারণ বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি এই—মক্কাবাসের সময় রসুল স. এর সঙ্গে কোনো না কোনো দেহ রক্ষী থাকতো। তাঁর চাচা আবু তালেব প্রতিদিন তাঁর নিরাপত্তার জন্য হাশেমী বংশের কোনো একজনকে দেহরক্ষী নিযুক্ত করতেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও তিনি দেহরক্ষী নিয়োগ করতে চাইলেন। তখন রসুল স. বললেন, প্রিয় পিতৃব্য! আল্লাহ্পাক নিজেই আমাকে জ্বিন ও মানুষ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন। এই বর্ণনাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। কিন্তু বর্ণনাটি প্রকাশ্য প্রমাণের প্রতিকূল।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেন না।' এ কথার অর্থ, সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা সৎ পথে চলতে অনিচ্ছুক। সত্য ধর্ম ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা সদা সচেষ্ট। তাই আল্লাহ্পাক তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. যখন ইহুদীদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালেন, তখন তারা এ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুরু করলো। বললো, আমরা তো অনেক আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। পরিহাস ছলে তারা এ কথাও বলতে শুরু করলো— নাসারাগণ ঈসাকে যেমন হান্নান বানিয়ে নিয়েছে, তেমনি করে আমরাও তোমাদেরকে হান্নান বানাতে চাই (এখানে হান্নান অর্থ রফিক বা বন্ধু, প্রিয় পাত্র, দয়ালু)। রসুল স. তাদের বিদ্রূপবানে জর্জরিত হয়ে মৌনতা অবলম্বন করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত এবং পরবর্তী আয়াত (আয়াত ৬৮)।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রাফে, সালাম এবং মালেক বিনআলজয়ীফ ইহুদী বললো, মোহাম্মদ আপনি তো ইব্রাহিম ও তাঁর ধর্মের প্রতি আমাদেরকে আহবান জানাচ্ছেন। বলছেন, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়াবলীর উপর আপনি বিশ্বাস রাখেন। রসুল স. বললেন, হ্যাঁ আমি এ রকমই বলি। কিন্তু তোমরা ধর্মের মধ্যে নতুন কথা সংযোজন করেছো। যে সকল বিষয় মানুষের নিকট প্রকাশ করতে বলা হয়েছে তোমরা সে সকল বিষয়কে গোপন করেছো। তারা বললো, যা আমরা পেয়েছি, তাই প্রচার করি। আর এ কথা নিশ্চিত যে, আমরাই রয়েছি বিশুদ্ধ হেদায়েতের উপর। তাদের এ রকম অপবক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ○

❑ বল 'হে কিতাবীগণ! তওরাত, ইঞ্জিল ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তোমরা তাহা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তি নাই।' তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করিবেই। সুতরাং তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না।

এখানে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মমত ভিত্তিহীন। তারা ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে তখনই যখন তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের মূল নীতিকে বিশ্বাস করবে এবং তাতে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে তওরাত ও ইঞ্জিলের কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে, তওরাত ও ইঞ্জিলের নির্দেশ মানলে সকল আসমানী কিতাব এবং সকল রসুলকে মান্য করা হয়। দ্বিতীয় কারণ এই যে, তওরাত ও ইঞ্জিল মেনে নিলে মোহাম্মদ স. এবং কোরআনকেও মেনে নিতে হয় এবং প্রকাশ্যে প্রচার করতে হয় তওরাতে উল্লেখিত হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর গুণাবলী। তৃতীয় কারণ হচ্ছে তওরাত ও ইঞ্জিলের ওই সকল বিধান পালন করতে হবে, যা কোরআনের মাধ্যমে রহিত হয়নি। এই আয়াত দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে,পূর্ববর্তী শরিয়তের অরহিত বিধানগুলোর উপর আমল করা ওয়াজিব। আর এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, তওরাত ও ইঞ্জিলের যে বিধান কোরআন কর্তৃক রহিত হয়েছে সেই রহিতকারী বিধানের উপর আমল করাই পূর্ববর্তী শরিয়তের উপর আমল করা। কারণ পূর্বাপর সকল বিধান আল্লাহ্‌র।

তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করবেই। সুতরাং সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ কোরো না।'—এ কথার অর্থ হে রসুল আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা তা ক্রমাগত অস্বীকার করে চলেছে। তাদের এই অস্বীকৃতি যত বৃদ্ধি পাবে, ততই বেড়ে যাবে তাদের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস সুতরাং হে আমার প্রিয় রসুল! সত্য-প্রত্যাখ্যানই যাদের একমাত্র ব্রত,তাদের জন্য দয়া প্রদর্শন এবং দুঃখ প্রকাশ করার কিছু নেই।

www.eelm.weebly.com

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا
جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ
وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا
وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

❒ বিশ্বাসীগণ, ইহুদীগণ, সাবেয়ী ও খৃষ্টানগণের মধ্যে কেহ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করিলে এবং সৎকার্য করিলে তাহার কোন ভয় নাই এবং সে দুঃখিতও হইবে না।

❒ বনি ইসরাইলের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম ও তাহাদের নিকট রসুল প্রেরণ করিয়াছিলাম। যখনই কোন রসুল তাহাদের নিকট এমন কিছু আনে যাহা তাহাদের মনঃপূত নয় তখনই তাহারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে ও কতককে হত্যা করে।

❒ তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের কোন শাস্তি হইবে না; ফলে, তাহারা অন্ধ ও বধির হইয়াছিল। তাহারা যাহা করে আল্লাহ তাহার দ্রষ্টা।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমান, ইহুদী, সাবেয়ী ও খৃষ্টান যে কোনো মতবাদের লোক তাদের বিশ্বাস ও কর্মকে সংশোধন করে নিতে পারবে। যদি তারা সংশোধিত হয়, তবে কিয়ামতে তাদেরকে ভীত ও দুঃখিত হতে হবে না। ইমান বা বিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে— আল্লাহ্পাকের একত্বে এবং পরকালে বিশ্বাস। আর এই অক্ষয় বিশ্বাসের কথা যে নবী বা রসুল প্রচার করেন সেই নবী রসুলের প্রতি বিশ্বাস। আর সৎ কর্ম অর্থ আল্লাহ্পাকের বিধানসম্মত বা শরিয়তসম্মত সৎকর্ম। এখানে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে সাবেয়ী সম্প্রদায়ের কথাও বলা হয়েছে। সাবেয়ীরা ফেরেশতাদের ইবাদত করে। কেবলার বিপরীত মুখ হয়ে নামাজ পাঠ করে এবং হজরত দাউদের জবুর কেতাব তেলওয়াত করে। সুরা বাকারার তাফসীরে এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'বনী ইসরাইলের নিকট থেকে অঙ্গীকার

www.eelm.weebly.com

গ্রহণ করেছিলাম ও তাদের নিকট রসুল প্রেরণ করেছিলাম। —এ কথার অর্থ আমি তওরাতে এই নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তওরাতে বিশ্বাস করো এবং এর নির্দেশানুযায়ী আমল করো এবং সকল নবীদের প্রতি, বিশেষ করে শেষ নবী মোহাম্মদ স. এর প্রতি ইমান আনো। এটাই ছিলো বনী ইসরাইল থেকে গৃহিত অঙ্গীকার।

'যখনই কোনো রসুল তাদের নিকট এমন কিছু আনে যা তাদের মনঃপূত নয়, তখনি তারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে ও কতককে হত্যা করে।'—এ কথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, বনী ইসরাইলেরা অঙ্গীকার ভঙ্গকারী, তওরাতের বিরুদ্ধাচারী, প্রবৃত্তির অনুগামী। তাই যখন কোনো নবী এসে তাদেরকে তওরাতের বিধানানুযায়ী চলার সদুপদেশ দেয়, তখনই তারা তাঁদের বিরোধিতা করে। কোনো কোনো নবীকে তারা বলে মিথ্যাবাদী এবং কোনো কোনো নবীকে করে হত্যা। আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, নবী হত্যার প্রবণতা তাদের বরাবরই ছিলো, আছে এবং থাকবে। তাই এখানে অতীতকালের পরিবর্তে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের সিগা (মুজারে) ব্যবহার করা হয়েছে। 'কতককে হত্যা করে'—কথাটির অর্থ হবে তারা রসুল স. এর সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাঁর খাদ্যে বিষ মেশায়, তাঁর উপর যাদু করে। এভাবে তারা রসুল স.কে হত্যা করতে চায়।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা মনে করেছিলো যে, তাদের কোনো শাস্তি হবে না; ফলে, তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিলো।'—এখানে বলা হয়েছে বনী ইসরাইলেরা স্থির নিশ্চিত ছিলো যে, নবীদেরকে মিথ্যাবাদী বললে এবং তাঁদেরকে হত্যা করলে তারা বিপদগ্রস্ত হবে না। এই চিন্তাতেই তারা ছিলো অন্ধ ও বধির সদৃশ। সত্যকে তারা চাক্ষুস করতে পারতো না, শুনতে সমর্থ হতো না সত্যের আহ্বান।

'অতঃপর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছিলেন'—এ কথার অর্থ চরম পাপাচারী হওয়া সত্ত্বেও এক সময় তারা অনুতপ্ত হলো। তওবা করলো। আল্লাহ্পাকের মেহেরবানী অসীম। তাই তিনি তাদেরকে ক্ষমা করলেন। অর্থাৎ অনুতপ্ত বনী ইসরাইলেরা যখন তওবা করে হজরত ঈসার উপর ইমান আনলো, তখন তিনি তাদের তওবা কবুল করলেন।

'পুনরায় তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হয়েছিলো।' তারা যা করে আল্লাহ্ তার দ্রষ্টা'—এখানে পুনরায় তাদের অনেকের অন্ধ ও বধির হওয়ার অর্থ পুনরায় তারা অস্বীকার করে বসলো শেষ নবী মোহাম্মদ স.কে। তাদের এসকল অপকর্ম সম্পর্কে আল্লাহপাক উত্তমরূপে অবগত। সুতরাং তিনি তাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার শাস্তি দিবেনই।

www.eelm.weebly.com

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ
يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ
حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝ لَقَدْ
كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَ
اِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝
اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

❒ যাহারা বলে 'আল্লাহ্ই মরিয়ম তনয় মসীহ্' তাহারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেই; অথচ মসীহ্ বলিয়াছিল, ' হে বনি ইসরাইল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহের ইবাদত কর।' কেহ আল্লাহের শরীক করিলে আল্লাহ্ তাহার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করিবেন ও তাহার আবাস অগ্নি; সীমালংঘনকারীদিগের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

❒ যাহারা বলে 'আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন,' তাহারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেই—যদিও এক ইলাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তাহারা যাহা বলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হইবেই।

❒ তবে কি তাহারা আল্লাহের দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে না ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না? আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

যারা হজরত ঈসাকে আল্লাহ্ বলে তারা প্রকৃত অর্থেই কাফের। হজরত ঈসা তাদেরকে এ রকম বলার নির্দেশ দেননি। তিনি বলেছিলেন, তোমাদের মতো আমিও আল্লাহ্র বান্দা আর আল্লাহ্ই আমাদের সকলের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করো।

কেউ আল্লাহ্র শরীক করলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন ও তার আবাস অগ্নি।—এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, যারা মুশরিক, তাদেরজন্য জান্নাত হারাম। কারণ, জান্নাত পবিত্র স্থান। আর মুশরিকেরা অপবিত্র। তারা গায়রুল্লাহ্কে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করে। কখনও আল্লাহ্পাকের বিশেষ গুণ ও বিশেষ কার্যের মধ্যে অন্যকে শরীক করে। অথচ আল্লাহ্পাক সত্তাগত, গুণগত এবং কার্যগত (জাত, সিফাত ও আফআল) —সকল দিক থেকেই অংশীবিহীন,

www.eelm.weebly.com

সমকক্ষতাহীন ও অবিভাজ্য। কেউ হয়তো বলতে পারে আল্লাহ্‌পাকের অনেক গুণতো মানুষের মধ্যেও রয়েছে। যেমন মানুষও বিচারক (হাকিম), জ্ঞানী (আলীম), শ্রোতা (সামী), দ্রষ্টা (বাসির) ইত্যাদি। এ সকল গুণ তো আল্লাহ্‌র । তবে কি এ সকল গুণে মানুষের অংশ রয়েছে। আল্লাহ্‌পাক রক্ষা করুন। এ রকম বিশ্বাসইতো শিরিক যা মানুষের জন্য হারাম করা হয়েছে। শব্দগত মিল থাকলেও স্রষ্টা ও সৃষ্টির গুণ কখনও এক নয়। সৃষ্টির কোনো গুণই স্রষ্টার গুণের অংশ নয়। প্রতিবিম্ব অপসারিত হলেও মূল বস্তুর কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। সৃষ্টির গুণ সীমানাভূত। অথচ আল্লাহ্‌তায়ালার গুণ ধারণাতীত। সৃষ্টি দৃষ্টান্তযুক্ত। আর তিনি দৃষ্টান্তবিহীন (বেমেসাল)। অন্যত্র এই বিশ্বাসটি স্পষ্ট বিবৃত হয়েছে এভাবে— 'লাইসা কা মিসলিহি শাইউন' (তিনি সকল আনুরূপ্য থেকে পবিত্র)। তাই সৃষ্টির কাউকে বা কোনো কিছুকে তাঁর অনুরূপ, সমকক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী ও শরীক মনে করা যাবে না।

জান্নাত কেবল ইমানদার ও মুত্তাকীদের জন্য মুশরিকদের জন্য নয়। আল্লাহ্‌পাক যদি ইচ্ছা করেন তবে তিনি বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন, কিন্তু তিনি তা করবেন না। কোরআন মজীদে বিভিন্নভাবে সে কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন কোনো কিছুর বিনিময়েও অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদেরকে ক্ষমা করা হবে না। এখানেও স্পষ্টরূপে বলে দেয়া হয়েছে 'তাদের আবাস অগ্নি'।

'সীমালংঘনকারীদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই'—সীমালংঘনকারী বুঝাতে এখানে 'জ্বলিমিন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা সীমালংঘনকারী তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। 'নাসের' অর্থ সাহায্যকারী। এর বহুবচন হচ্ছে আনসার (সাহায্যকারীরা)। এখানে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে উপহাসার্থে। কেননা, ওই সীমালংঘনকারীরা ধারণা করতো আমাদের রয়েছে অগণিত সাহায্যকারী। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ কথাটিতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, একজন সাহায্যকারী থাকলেও তার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট হবে না, প্রয়োজন পড়বে অসংখ্য সাহায্যকারীর। কিন্তু সেই সাহায্যকারীর দলও তারা পাবে না।

এখানে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে কেউ আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করলে' কথাটি আল্লাহ্‌পাকেরও হতে পারে। হজরত ঈসারও হতে পারে। হজরত ঈসা আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশ হিসেবে এ কথা উচ্চারণ করেছেন। এ কথার মাধ্যমে তিনি খৃষ্টানদের অপবিশ্বাসকে নিজেই রহিত করে দিয়েছেন। সুতরাং সত্যানুসারীগণ কখনই তিনি (হজরত ঈসা) যা বলেছেন, তার বিরুদ্ধবিশ্বাসী হতে পারে না।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (আয়াত ৭৩) বলা হয়েছে, তিন আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের কথা। বলা হয়েছে, তারা নিশ্চিতরূপে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। খৃষ্টানদের মারকুসীয়া ও নাসতুরীরা সম্প্রদায় বিশ্বাস করতো, আল্লাহ্, হজরত ঈসা ও হজরত জিবরাইল। তাদের বিশ্বাস ছিলো সত্তাগত দিক থেকে উচ্চ মর্যাদাধারী আল্লাহ্, জ্ঞানের দিক থেকে হজরত ঈসা এবং হায়াতের দিক থেকে হজরত জিবরাইল শ্রেষ্ঠ। কেউ কেউ বলতো— আল্লাহ্ হচ্ছেন পিতা, হজরত ঈসা পুত্র এবং হজরত মরিয়ম হচ্ছেন স্ত্রী— এই তিন আল্লাহ্ই উপাস্য। (আল্লাহ্পাক রক্ষা করুন)। তাদের এই অপবিশ্বাসের প্রমাণ রয়েছে অন্য একটি আয়াতে—'আআনতা কুলতা লিন্নাসিত্ তাখিজুনি ওয়া উম্মিইয়া ইলাহাইনি মিন্ দুনিল্লাহ্' (যখন আল্লাহ্ বলবেন, হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তুমি কি মানুষকে এ কথা বলেছিলে যে, আল্লাহ্কে ছেড়ে আমার ও আমার মাতার উপাসনা করো)? এরপর বলা হয়েছে, 'ওয়ামা মিন ইলাহিন ইল্লা ইলাহুউঁ ওয়হিদ' (যদিও এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই)। — এখানে 'মিন ইলাহিন' এর মধ্যে 'মিন' অতিরিক্ত সংযোজন যা সাধারণ অর্থবোধক এবং বিধেয় হবে উহ্য অর্থাৎ মুমকিনাত বা সম্ভাব্য জগতে আল্লাহ্পাকের অস্তিত্ব ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ্পাক সৃষ্টিকে দয়া করে অস্তিত্ব দান করেছেন। সুতরাং তিনিই একমাত্র উপাস্য। তাঁর সত্তা, গুণাবলী এবং কার্যাবলীতে সৃষ্টির কোনো অংশ নেই।

এরপর বলা হয়েছে, 'তারা যা বলে তা থেকে নিবৃত্ত না হলে তাদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবেই।'—এ কথার অর্থ 'আল্লাহ্ তিনজন' এ রকম শিরিক সম্পন্নবাক্য থেকে তারা যদি বিরত না হয়, এক আল্লাহ্কে উপাস্য সাব্যস্ত না করে শিরিক সহই যদি পৃথিবী পরিত্যাগ করে, তবে তাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবেই হবে। এখানে মিনহুম শব্দটি বর্ণনামূলক অথবা অংশবোধক। মিনহুম (তাদের মধ্যে) অর্থ ওই সকল সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে (আল্লাজিনা কাফারু মিনহুম)। 'হুম' কে এখানে সর্বনাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি, কিন্তু বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে বুঝা যায় শব্দটির সর্বনাম হিসেবে ব্যবহারের কথা। পূর্বের বাক্যেও 'হুম' ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে সম্পূর্ণ আয়াতে দুবার কাফের সাব্যস্ত করা হয়েছে। এভাবে এ কথাটি পরিষ্কার হয়েছে যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে যারা মৃত্যু পর্যন্ত সত্যপ্রত্যাখ্যানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের জন্যই রয়েছে নিশ্চিত মর্মন্তুদ শাস্তি। (মৃত্যুর পূর্বেই যারা তওবা করবে তাদের জন্য নয়)।

এর পরের আয়াতে (আয়াত ৭৪) প্রশ্নাকারে জানানো হয়েছে তাঁর দয়ার্দ্র আহবান— আল্লাহ্পাক ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তাই তাঁর পক্ষ থেকে দয়া করে স্নেহসিক্ত আহবানটি জানানো হয়েছে এভাবে—'তবে কি তারা আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না?'

www.eelm.weebly.com

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝

❐ মরিয়ম-তনয় মসীহ্ তো কেবল একজন রসূল; তাহার পূর্বে বহু রসূল গত হইয়াছে এবং তাহার মাতা সত্যনিষ্ঠা ছিল। তাহারা উভয়ে খাদ্যাহার করিত। দেখ, উহাদের জন্য আয়াত কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি; আরও দেখ, উহারা কিভাবে সত্য বিমুখ হয়!

হজরত ঈসা আল্লাহ্র রসুল (প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ)। তাই তিনি ছিলেন রেসালতের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। উপাস্য হওয়ার কোনো বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ছিলো না। তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো কেবল মাতার মাধ্যমে। আরো অনেক অলৌকিকত্ব দেয়া হয়েছিলো তাঁকে কিন্তু সেগুলোর কোনোটিও উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা নয়।

'তাঁর পূর্বে বহু রসুল গত হয়েছে'-এ কথার অর্থ সকল রসুলগণের মতো তিনিও একজন রসুল। সকল রসুল যেমন জীবন মৃত্যু, পানাহার ও অন্যান্য মানবিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ছিলেন। হজরত ঈসাও ছিলেন তেমনি। তাঁকে দেয়া হয়েছিলো কতিপয় অলৌকিক নিদর্শন—তিনি কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করতেন, জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান করতেন এবং মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। আল্লাহ্ প্রদত্ত এ রকম অলৌকিকত্ব অন্য রসুলদেরকেও দেয়া হয়েছিলো। যেমন, হজরত মুসার লাঠিকে সর্পে পরিণত করা মৃতকে জীবিত করার চেয়েও অধিক বিস্ময়কর (মৃত ব্যক্তিতো এক সময় জীবিত ছিলো কিন্তু লাঠি কখনই জীবিত ছিলো না)। হজরত ঈসাকে সৃষ্টি করা হয়েছে পিতা ব্যতিরেকে। নিঃসন্দেহে এটি একটি বিস্ময়কর নিদর্শন। কিন্তু হজরত আদমের সৃষ্টি এর চেয়ে অধিক বিস্ময়কর। তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো কেবল পিতা ব্যতিরেকে নয়, মাতা ব্যতিরেকেও।

'এবং তাঁর মাতা সত্যনিষ্ঠা ছিলো।'— এ কথার অর্থ তিনিও অন্য রমণীদের মতো একজন রমণী। কিন্তু সত্যের প্রতি তাঁর ছিলো অবিচল নিষ্ঠা। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র বিধান মান্যকারিণী এবং নবী রসুলগণকে সত্য বলে মান্যকারিণী।

'তারা উভয়ে খাদ্যাহার করতো'— এ কথার অর্থ অন্য মানব ও মানবীদের মতো হজরত ঈসা এবং তাঁর পবিত্রা জননী পানাহার করতেন। এই আয়াতে প্রথম দিকে হজরত ঈসা এবং হজরত মরিয়মের কামালাত ফযীলতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, ওই ফযীলত ও কামালতগুলো উপাস্য হওয়ার কোনো যোগ্যতা নয়। আর এ রকম ফযীলত তিনি অন্য নবী

www.eelm.weebly.com

রসুলদেরকেও দান করেছিলেন। বিস্ময়কর ফযীলত লাভ করা সত্ত্বেও তাঁরা যে কিছুতেই উপাস্য নন, সে কথাই পরক্ষণে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে—তাঁরা দু'জনেই খাদ্যাহার করতেন। এ কথার অর্থ যারা পানাহারের মুখাপেক্ষী, তাঁরা কখনও স্রষ্টা নন, সৃষ্টি। আর সৃষ্টি কখনই উপাস্য হতে পারে না।

'দেখো, তাদের জন্য আয়াত কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি; আরও দেখো, তারা কিভাবে সত্য বিমুখ হয়'—হজরত ঈসা সৃষ্টির বৃত্তের (দায়রায়ে এমকানের) অন্তর্ভুক্ত। অন্য নবী রসুলদের মতো তিনিও অলৌকিক নিদর্শনের অধিকারী। তৎসত্ত্বেও তিনি পানাহার বিশ্রাম ও দিবারাত্রির বিবর্তনের অধীন। সকল সৃষ্টির মতো তিনি তাঁর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য আল্লাহ্পাকের মুখাপেক্ষী। কিন্তু মূর্খ খৃষ্টান সম্প্রদায়কে এ সকল বিশদ বিবরণ জানানোর পরেও তারা হজরত ঈসাকে সৃষ্টির বৃত্ত বহির্ভূত মনে করে নিয়েছে। স্থির করে নিয়েছে উপাস্য বলে।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৭৬, ৭৭

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝

❒ বল 'তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর যাহার তোমাদিগের ক্ষতি বা উপকার করার কোন ক্ষমতা নাই? আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

❒ বল, 'হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না; এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হইয়াছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে এবং সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না।'

শুরুতেই বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ব্যতীত কারো কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা নেই। সুতরাং ইবাদত করতে হবে কেবল তাঁর, অন্য কারো নয়। এ কথার অর্থ, হজরত ঈসা তো আল্লাহ্র রসুল। আল্লাহ্ নন। তাঁর বিশেষত্বসমূহ আল্লাহ্পাকই তাঁকে দিয়েছেন। ওই বিশেষত্বের কারণেই তিনি আল্লাহ্র রসুল এবং অনেক নিদর্শনের অধিকারী। কিন্তু তিনি কাউকে সওয়াব ও আযাব দেয়ার ক্ষমতা রাখেন না। পৃথিবীতে শারীরিক সুস্থতা এবং রিজিকের প্রশস্ততা যেমন তিনি দিতে পারেন না, তেমনি পরবর্তী পৃথিবীতে দিতে পারেন না জান্নাত অথবা জাহান্নাম। এ কথাটি এখানে প্রশ্নাকারে বলা হয়েছে এভাবে 'বলো, তোমরা কি

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত করো, তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা মাত্র যার নেই?' এখানে 'মা' অর্থ মাত্র। আভিধানিক নিয়মে শব্দটি ব্যবহৃত হয় জ্ঞানহীন বস্তুর ক্ষেত্রে। জ্ঞানসম্পন্ন সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহার করে জ্ঞানবান হজরত ঈসাকে সৃষ্টি হিসেবে অন্যান্য চেতনাহীন সৃষ্টির সমতুল করে দেয়া হয়েছে। অন্য সৃষ্টি হিসেবে তিনিও যে আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টি, সে কথা বুঝাতেই এমন করা হয়েছে। অর্থাৎ হজরত ঈসা জ্ঞানবান হলেও তাঁর জ্ঞান অনাদি ও অনন্ত নয়। সুতরাং তিনি উপাস্য হবেন কিভাবে? আরেকটি বিষয় অনুধাবনীয় যে, এখানে উপকারের আগে ক্ষতির উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার কোনো ক্ষমতা নেই।' এ রকম বলার কারণ এই যে, উপকার প্রাপ্তি অপেক্ষা ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার বিষয়টিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে 'ক্ষতি'র উল্লেখ করা হয়েছে 'উপকারের' পূর্বে।

শেষে বলা হয়েছে 'ওয়াল্লহু হুয়াস্ সামিউল আলিম' (আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ)।'—এ কথার অর্থ আল্লাহ্পাক সকলের সব কথা শোনেন এবং সকলের সবকিছু জানেন। তাই তিনি বিশ্বাসানুযায়ী নির্ধারণ করবেন পুরস্কার ও তিরস্কার। এখানে হজরত ঈসার উপাসনাকারীদেরকে একথাটিও বলা উদ্দেশ্য যে, হজরত ঈসা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞও নন। সুতরাং উপাসনা করতে হবে আল্লাহ্র। হজরত ঈসার নয়।

পরের আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে 'দ্বীন সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি কোরো না'— অর্থাৎ হজরত ঈসা আ. আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রসুল— এ বিশুদ্ধ বিশ্বাসটিকে আশ্রয় করো। বিশ্বাসের এই সীমা অতিক্রম কোরো না। ইহুদীরা ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ি করেছে। খৃষ্টানেরাও। তারা উপাস্য বানিয়েছে হজরত ঈসাকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'হে কিতাবীগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে কেবল খৃষ্টানদেরকে।

'গইরাল হাক্বি' অর্থ অন্যায়রূপে। বাড়াবাড়ি নিশ্চয় অন্যায়। তাই এখানে এ রকম শব্দ ব্যবহার ঘটেছে। বলা হয়েছে বাড়াবাড়ি কোরো না (অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি কোরো না)। অথবা গইরাল হাক্বি সাধারণ কর্মকারক নয় বরং অবস্থান জ্ঞাপক। দ্বীনাকুম (দ্বীন সম্বন্ধে) সহযোগে অবস্থাবোধক বিশেষ্য হবে। তখন অর্থ হবে এ রকম— বাতিল ধর্মের প্রতি বাড়াবাড়ি কোরো না। অর্থাৎ বাতিল ধর্মের প্রতি অটল থেকো না।

এরপর বলা হয়েছে 'এবং যে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কোরো না'— এ কথার অর্থ তোমরা তোমাদের ওই সকল পূর্ব পুরুষের অনুসরণ কোরো না, যারা শেষ নবী মোহাম্মদ স. এর আগমনের পূর্বেই ধর্মভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে— (অর্থাৎ অনেক লোক তাদের বেদাত ও গোমরাহীর অনুসরণ করেছে)। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে— এ কথার অর্থ তারা রসুল স. এর আর্বিভাবের আগেই সরল পথ থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

❒ বনি ইসরাইলের মধ্যে যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা দাউদ ও মরিয়ম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল-ইহা এই হেতু যে, তাহারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী।

বনী ইসরাইলের মধ্যে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিলো তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন হজরত দাউদ ও হজরত ঈসা। কারণ, তারা ছিলো অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী— আলোচ্য আয়াতে এ কথাটি জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

হরজত দাউদ অভিশাপ দিয়েছিলেন আইলার আধবাসীদেরকে। শনিবার দিন তাদেরকে মাছ ধরতে নিষেধ করা হয়েছিলো। কারণ, ওই দিনটি ছিলো সাপ্তাহিক বিশেষ ইবাদতের দিন। কিন্তু তারা ওই নিষেধাজ্ঞা লংঘন করেছিলো। তখন হজরত দাউদ বলেছিলেন, ইয়া ইলাহী! তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করুন এবং তাদেরকে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত করে দিন। আল্লাহ্পাক তখন তাদেরকে বানরে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন।

হজরত ঈসা অভিশাপ দিয়েছিলেন আসহাবে মায়িদাকে। মায়িদা অর্থ খাদ্যাধার। হজরত ঈসা তাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য অবতরণ করিয়েছিলেন এবং তাদেরকে ওই খাদ্য জমা করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তারা তা অমান্য করেছিলো। খাদ্য জমা করে রেখেছিলো। তখন হজরত ঈসা তাদের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! তাদেরকে অভিশাপগ্রস্ত করুন, তাদেরকে করুন অন্যদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ। আল্লাহ্পাক ওই অপপ্রার্থনা কবুল করে নিয়েছিলেন। অবাধ্যদেরকে পরিণত করেছিলেন শুকরে। তাদের সংখ্যা ছিলো পাঁচ হাজার।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৭৯

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

❒ তাহারা যে সব গর্হিত কার্য করিত উহা হইতে তাহারা একে অন্যকে বারণ করিত না। তাহারা যাহা করিত নিশ্চয় তাহা নিকৃষ্ট।

গর্হিত কর্মে বাধা প্রদান না করা অন্যায়। এই অন্যায়ে নিমজ্জিত ছিলো অবাধ্য বনী ইসরাইলেরা। সে কথাই বলে দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

হজরত আবু বকর বলেছেন, আমি রসুল পাক স. কে বলতে শুনেছি, তিনি স. বলেছেন, জালেমকে জুলুম করতে দেখে তার হাত না ধরে ফেললে অনতিবিলম্বে আল্লাহ্পাক সকলকে শাস্তি দিবেন। এ রকম বর্ণনা করেছেন সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়। তিরমিজি এই হাদিসটিকে উত্তম ও বিশুদ্ধ বলেছেন। বিশুদ্ধ বলেছেন

www.eelm.weebly.com

ইবনে হাব্বানও। নাসাঈর বর্ণনায় রয়েছে, যদি মন্দ কাজ সংঘটিত হতে দেখেও অন্যায়কারীকে বাধা না দেয়া হয়। আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, যে জাতির মধ্যে পাপাচার অনুষ্ঠিত হয় এবং সাধ্য থাকা সত্ত্বেও যদি ওই জাতি তা দূর করার চেষ্টা না করে, তবে অতিসত্ত্বর তাদের সবাইকে আল্লাহ্পাক শাস্তি প্রদান করবেন।

'তারা একে অন্যকে বারণ করতো না'—কথাটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, তারা মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতো না। বরং মন্দের উপরেই অনড় থাকতো। যেমন বলা হয়েছে, 'তানহা আনিল আমরি' (অমুক ব্যক্তিকে অমুক কাজে বাধা দেয়া হয়েছে)।

'তারা যা করতো নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট'—এ কথার অর্থ পাপ কর্মে বাধা সৃষ্টি না করা অত্যন্ত নিকৃষ্ট কর্ম। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেছেন, রসুল স, বলেন বনী ইসরাইলেরা যখন পাপাচারে লিপ্ত হলো, তখন তাদের আলেম সম্প্রদায় তাদেরকে এ রকম করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু তারা ক্ষান্ত হলো না। আলেমেরাও তাদের মজলিশে বসতে শুরু করলো। পানাহার, মদ্য পান সবই চলতে লাগলো তাদের সঙ্গে। এভাবে অসৎসঙ্গের প্রভাবে আলেমদের অন্তরও হয়ে পড়লো কলুষিত। পাপকর্মের এমতো সীমালংঘনের কারণে হজরত দাউদ এবং হজরত ঈসা তাদেরকে অভিশাপ দিলেন। সেই অভিশাপের ফলে তাদের কেউ হলো বানর, কেউ হলো শুকর। এরপর রসুল স. বললেন, আমার জীবন যার হাতে— সেই পবিত্র সত্তার শপথ, তোমরা অবশ্যই সৎকাজে আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। এবং ধরে ফেলবে অত্যাচারীর দু'হাত। সত্যের উপর সম্মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় তোমাদের একে অপরের হৃদয়কে সম্মিলিত করে দেয়া হবে (সকলের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হবে) এবং আল্লাহ্পাক বনী ইসরাইলকে যেমন অভিসম্পাত দিয়েছেন, তোমাদের উপরও তেমিন অভিসম্পাত দিবেন। তিরমিজি, আবু দাউদ।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৮০, ৮১

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ۝ وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِىِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

❒ তাহাদের অনেককে তুমি সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিতে দেখিবে! কত নিকৃষ্ট তাহাদের কৃতকর্ম— যে কারণে আল্লাহ তাহাদের উপর ক্রোধান্বিত হইয়াছেন তাহাদের শাস্তিভোগ স্থায়ী হইবে।

www.eelm.weebly.com

❒ তাহারা আল্লাহে নবীতে ও তাহার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাসী হইলে উহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না, কিন্তু তাহাদের অনেকে সত্যত্যাগী।

মদীনার ইহুদী কা'ব বিন আশরাফ এবং তার সঙ্গীরা মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলো। তারা মক্কায় গিয়ে সেখানকার মুশরিকদেরকে রসুল স. এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতো। যুদ্ধ করতে বলতো মুসলমানদের বিরুদ্ধে। সেদিকে ইঙ্গিত করে আয়াতে বলা হয়েছে 'তাদের অনেককে তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে'। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং হাসান বলেছেন এখানে 'মিনহুম' (তাদের মধ্যে) সর্বনামটি ব্যবহৃত হয়েছে মুনাফিকদের জন্য। কেননা, তারাই ছিলো ইহুদীদের বন্ধু।

শেষে বলা হয়েছে, 'কতো নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম— যে কারণে আল্লাহ্ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। 'তাদের শাস্তিভোগ স্থায়ী হবে'— এখানে আল্লাহ্র ক্রোধান্বিত হওয়ার অর্থ ইহুদীদের উপর আযাবগজব অবশ্যম্ভাবী হওয়া। তাদের ওই আযাব হবে চিরস্থায়ী।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা আল্লাহ্তে নবীতে ও তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাসী হলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না'—এ কথার অর্থ ইহুদী ও মুনাফিক আল্লাহকে, তাঁর রসুল স.কে এবং কোরআনকে যদি বিশ্বাস করতো, তবে তারা মক্কার অংশীবাদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতো না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে যুদ্ধংদেহী করে তুলতো না। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, মুনাফিকেরা যদি ইমানদার হতো তবে ইহুদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতো না। কেননা, আল্লাহ্র দুশমনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ইমান বিরোধী কাজ।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'কিন্তু তাদের অনেকে সত্যত্যাগী।'—এ কথার অর্থ অধিকাংশ ইহুদী ও মুনাফিক দূরাচার, অবাধ্য।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৮২

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ

بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ○

❒ অবশ্য বিশ্বাসীদের প্রতি শত্রুতা মানুষের মধ্যে ইহুদী ও অংশীবাদীদিগকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখিবে এবং যাহারা বলে 'আমরা খৃষ্টান' মানুষের মধ্যে তাহাদিগকেই তুমি বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখিবে, কারণ তাহাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগী আছে, আর তাহারা অহংকারও করে না।

www.eelm.weebly.com

ইহুদী ও মুশরিকেরাই বিশ্বাসীদের প্রধান শত্রু। রসুল স. বলেছেন, মুসলমানদেরকে একা পেয়ে ইহুদীদের মনে হতো, একে হত্যা করি। হজরত উবাই থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু শায়েখ ও ইবনে মারদুবিয়া। এখানে মুশরিক অর্থ আরবের মুশরিক। তারা ছিলো সম্পূর্ণতই প্রবৃত্তির দাস এবং তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসারী। সত্যের সঙ্গে তাদের কোনো প্রকার সম্পর্কই ছিলো না। তাদের শত্রুতা ছিলো সার্বক্ষণিক। এই আয়াতের শুরুতে প্রতিহিংসাপরায়ণ ইহুদীদেরকে এবং প্রবৃত্তিপরায়ণ মুশরিকদেরকে মুসলমানদের সর্বাধিক উগ্র শত্রুরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে 'যারা বলে 'আমরা খৃষ্টান' মানুষের মধ্যে তাদেরকেই তুমি বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখবে'-বাগবী লিখেছেন, সকল খৃষ্টানকে এখানে 'বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধু' বলা হয়নি। কারণ, তারাও ছিলো ইহুদীদের মতো চরম মুসলমান বিদ্বেষী। এখানে যে খৃষ্টানদেরকে বিশ্বাসীদের নিকটবন্ধু বলা হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী এবং তাঁর সাথীগণ।

হজরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের থেকে নাসাঈ, ইবনে আবী হাতেম এবং তিবরানী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সম্রাট নাজ্জাশী ও তাঁর অনুগামীদের সম্পর্কে। ইবনে আবী হাতেম প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে— মুজাহিদ বলেছেন, এ আয়াতে ওই সকল খৃষ্টানদেরকে বিশ্বাসীদের বন্ধু বলা হয়েছে, যারা হজরত জাফরের সঙ্গে আবিসিনিয়া থেকে এসেছিলেন। আতাও এ রকম বলেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, এখানে সকল ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকেই ইমানদারদের নিকটতর বন্ধু বলা হয়েছে। খৃষ্টানেরা ছিলো ইহুদীদের তুলনায় কিছুটা কোমল স্বভাবসম্পন্ন। আর তারা মুশরিকদের তেমন সাহায্য-সহযোগিতাও করতো না। ইহুদীরাই ছিলো মুশরিকদের আসল বন্ধু ও প্রধান সাহায্যকারী।

আমি বলি, খৃষ্টানদের কোনো নির্দিষ্ট দলকে এখানে মুসলমানদের নিকটতর বন্ধু বলা হয়নি। ইহুদীদের মধ্যেও তো কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যেমন হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম, হজরত কা'ব বিন আহবার প্রমুখ। খৃষ্টান ধর্ম থেকে আসা মুসলমানদের চেয়ে তাঁদের মর্যাদা কোনো দিক থেকেই কম ছিলো না। সুতরাং তাদেরকে বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধু না বলে কেবল খৃষ্টানদেরকে এরূপ বলা যুক্তিসম্মত নয়। প্রকৃত কথা এই যে, এখানে ওই খৃষ্টানদেরকে নিকটতর বন্ধু বলা হয়েছে, যারা রসুল স. এর আবির্ভাবের পূর্বে হজরত ঈসা প্রবর্তিত ধর্মে মনে প্রাণে বিশ্বাসী ছিলেন। সম্রাট নাজ্জাশী এবং তার সঙ্গীসাথীরাও ছিলেন সে রকম সত্যানুসারী খৃষ্টান। মুসলমানদের বন্ধু বলা হয়েছে তাদেরকেই। যারা হজরত ঈসাকে আল্লাহ্র পুত্র বলে 'আল্লাহ্ তিনজন— এ রকম মতবাদে বিশ্বাস করে, তাদেরকে এই আয়াতে বিশ্বাসীদের বন্ধু বলা হয়নি। খৃষ্টানদের এ রকম দল উপদল অবিশ্বাসী ইহুদীদের মতোই প্রবৃত্তিপূজক এবং পাথরের মতো কঠিন অন্তঃকরণ বিশিষ্ট। যেমন নাজরানের খৃষ্টান সম্প্রদায়। যারা খাঁটি খৃষ্টান ছিলেন তাঁরা প্রতিশ্রুত পয়গম্বরের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁরা জানতেন সেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বরের নাম আহমদ। জ্ঞানী ছিলেন তাঁরা। ছিলেন পুণ্যবান

www.eelm.weebly.com

এবং পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী। হজরত ঈসার ধর্মে তাঁরা ছিলেন একনিষ্ঠ। তাই তাঁদের অন্তরে ছিলো সত্যের সতত উদ্ভাস।

'কারণ তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী আছে'—এ কথার অর্থ খৃষ্টানদের মধ্যে অনেক আলেম ও মাশায়েখ রয়েছেন। বাগবী লিখেছেন, রুমী ভাষায় 'ক্বিস' এবং ক্বিস্‌সিসীন অর্থ আলেম। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, খৃষ্টানদের নেতৃস্থানীয় আলেমদেরকে বলা হয় ক্বিস্‌সিসীন। শব্দটির অর্থ (কোনো কিছু) অন্বেষণকারী। সিহাহ্ গ্রন্থে রয়েছে ক্বিসসিসীন অর্থ নাসারাদের আলেম, আবেদ ও সরদার। এবং ক্বিস অর্থ রাতে কোনো বস্তু তালাশ করা। ওলামা ও মাশায়েখ রাতেই জ্ঞানান্বেষণ করতেন। ইবাদতে রত থাকতেন। এখানে রুহ্‌বান (সংসার বিরাগী) শব্দটি রাহেব শব্দের বহুবচন। খানকাবাসী একাগ্রচিত্ত সাধকদেরকে রুহ্‌বান বা সংসার বিরাগী বলা হয়।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'তারা অহংকার করে না'—এ কথার অর্থ সত্যের দিকে আহ্‌বান করা হলে তারা ইহুদীদের মতো জঘন্য আচরণ করে না।

হজরত কাতাদা বলেছেন, কিছুসংখ্যক আহলে কিতাব বিশুদ্ধ ঈসায়ী শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রসুল পাক স.এর আবির্ভাবের পর তারা তাঁকে বিশ্বাস করে মুসলমান হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌পাক এই আয়াতে তাদের প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, 'জালিকা বিআন্না মিনহুম ক্বিসসিসিনা ও রুহ্‌বানা' (তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী আছে)।

আমি বলি, হজরত কাতাদা ওই সকল খৃষ্টানদের কথা বলেছেন, যাঁরা রসুল স. এর আবির্ভাবের পূর্বে সত্য ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁর স. আবির্ভাবের পরে ইমান গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে রসুল স. বলেছেন তিন প্রকার ব্যক্তির জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। তাদের মধ্যে এক প্রকার হচ্ছে ওই সকল কিতাবী, যারা তাদের নবীর উপর ইমান এনেছিলো, পরে ইমান এনেছে মোহাম্মদ স. এর উপর। বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, কোরায়েশ নেতারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলো, মুসলমানদেরকে বিভিন্ন প্রকার দুঃখ কষ্ট দিয়ে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা মুসলমানদেরকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দিতে লাগলো। ক্রমাগত চালিয়ে যেতে লাগলো শারীরিক নির্যাতন। আল্লাহ্‌পাক কাউকে কাউকে এই অসহনীয় নির্যাতন থেকে রক্ষা করলেন। রসুল স. কে নিরাপদে রাখলেন তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবের মাধ্যমে। নির্যাতন যখন চরমে পৌঁছলো, তখন রসুল স. অত্যাচারিত মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় চলে যেতে বললেন। কেননা তখন পর্যন্ত জেহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি। রসুল স. বললেন, আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ পুণ্যবান। সে কারো প্রতি জুলুম করে না। তার কাছে গেলে কেউ জুলুম করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা সেখানে চলে যাও। আল্লাহ্‌পাক সুদিন দিলে ফিরে আসতে পারবে। আবিসিনিয়ার বাদশাহ্‌কে বলা হতো

www.eelm.weebly.com

নাজ্জাশী। যেমন রোমের বাদশাহ্‌কে বলা হতো কায়সার এবং ইরানের বাদশাহ্‌কে বলা হতো কাসরা. আবিসিনিয়ার নাজ্জাশীর প্রকৃত নাম ছিলো আসহামা। আবিসিনিয়ার ভাষায় নাজ্জাশী অর্থ দাতা। রসুল স. এর নির্দেশে ইসলামের প্রথম হিজরতকারী দল আবিসিনিয়ার পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ওই দলে ছিলেন হজরত ওসমান গণি এবং তাঁর সহধর্মিনী রসুল তনয়া হজরত রোকেয়া, হজরত জোবায়ের বিন আওয়াম, হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হজরত আবু হুজায়ফা বিন উত্‌বা এবং তাঁর স্ত্রী হজরত সাহ্‌লী বিনতে সুহাইল বিন আমর, হজরত মুসআব বিন উমায়ের, হজরত আবু সালমা বিন আবদুল আসাদ এবং তাঁর স্ত্রী হজরত উম্মে সালমা বিনতে উমাইয়া, হজরত ওসমান বিন মাজউন, হজরত আমর বিন রবীয়াহ্‌ এবং তাঁর স্ত্রী হজরত লাইলী বিনতে আবী হাইসুমা, হজরত হাতেব বিন আমর এবং হজরত সহ্‌ল বিন বায়দা— এই পনেরো জন। রসুল স. এর নবুয়ত প্রাপ্তির পঞ্চম বৎসরে সংঘটিত হয়েছিলো এই হিজরত। হিজরতকারী দলটি সমুদ্রের তীরে পৌছে অর্ধদিনার দিয়ে একটি নৌকা ভাড়া করে নিয়ে আবিসিনিয়ায় পৌছে ছিলেন।

কিছু দিন পর সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন হজরত জাফর বিন আবু তালেব। এরপর ধীরে ধীরে অন্য মুসলমানেরাও আবিসিনিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। মহিলা ও শিশু ছাড়াই তাঁদের সংখ্যা পৌছলো বিরাশিতে।

কোরায়েশ নেতারা যখন জানতে পারলো দেশত্যাগী মুসলমানেরা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে আবিসিনিয়ায়, তখন তারা আবিসিনিয়ায় পাঠালো আমর বিন আসকে। আবিসিনিয়ার বাদশাহ্‌ ও সভাসদদের জন্য কিছু উপঢৌকনও পাঠানো হলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো বাদশাহ্‌কে উপঢৌকন প্রদানের মাধ্যমে প্রসন্ন করে দেশত্যাগী মুসলমানদেরকে তারা মক্কায় ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু তারা সফল হলো না। আল্লাহ্‌পাক মুসলমানদেরকে হেফাজত করলেন। সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। আমর বিন আস ও তার সঙ্গীদের অকৃতকার্য হয়ে প্রত্যাবর্তনের পর নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে সসম্মানে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। এর কিছু দিন পর রসুল স. মদীনায় হিজরত করলেন। ষষ্ঠ হিজরীতে তিনি স. হজরত আমর বিন উমাইয়ার মাধ্যমে নাজ্জাশীর নিকট একটি বরকতময় পত্র প্রেরণ করলেন। পত্রে লিপিবদ্ধ ছিলো— উম্মে হাবিবা সম্মত হলে তাকে আমার সঙ্গে বিবাহবন্ধ করে দাও এবং মুহাজির মুসলমানদেরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও।

হজরত উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান তাঁর স্বামীর সঙ্গে হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর স্বামীবিয়োগ ঘটে। রসুল স. তাই তাঁকে শুভবিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছিলেন।

রসুল স. এর নির্দেশানুসারে নাজ্জাশী তাঁর ক্রীতদাসী আবরাহাকে চারশত দিনার দিয়ে এবং রসুল স. এর প্রস্তাব নিয়ে হজরত উম্মে হাবিবার নিকট প্রেরণ করলেন। এ পবিত্র প্রস্তাব পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন হজরত উম্মে

www.eelm.weebly.com

হাবিবা। আনন্দের আতিশয্যে তিনি আবরাহাকে খুলে দিলেন তাঁর হাতের কংকন এবং হজরত খালেদ বিন সাঈদ বিন আসকে নিযুক্ত করলেন বিবাহের উকিল। তিনি চারশত দিনার মোহরানা নির্ধারণ করে শুভবিবাহ সম্পন্ন করলেন। বিবাহের মোহর পরিশোধ করে দিলেন নাজ্জাশী। মোহরানার স্বর্ণ মুদ্রাগুলো আবরাহা পৌঁছে দিলেন হজরত উম্মে হাবিবাকে। তিনি মোহরানার স্বর্ণ মুদ্রাগুলো থেকে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা আবরাহাকে উপহার দিতে চাইলেন। আবরাহা বললেন, বাদশাহ্ আমাকে কোনো উপহার গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।। আমিই তো বাদশার রাজকোষের পরিচালিকা। আমি রসুল মোহাম্মদ স.কে বিশ্বাস করি। আমার একটি বিনীত নিবেদন এই যে, যখন আপনি মদীনায় পৌঁছবেন, তখন প্রিয় রসুলকে আমার সালাম পৌঁছে দিবেন। জননী উম্মে হাবিবা বললেন, এটিতো অত্যন্ত শুভসংবাদ । বাদশাহ তাঁর সহধর্মিনীদেরকে নির্দেশ দিলেন, হাতের কাছে যে সকল সুগন্ধি দ্রব্য পাও (উদ, আম্বর ইত্যাদি) সে সকল সুগন্ধি দ্রব্য পাঠিয়ে দাও। জননী উম্মে হাবিবা বলেছেন, আমরা আবিসিনিয়া থেকে যখন মদীনায় যাত্রা করলাম, তখন রসুল স. অবস্থান করছিলেন খায়বরে। কেউ কেউ খায়বরে চলে গেলেন। কিন্তু আমি থেকে গেলাম মদীনায়। রসুল স. খায়বর থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে পরস্পর মিলিত হলাম আমরা। তিনি স. আমার নিকট নাজ্জাশীর খবরাখবর জিজ্ঞেস করলেন। আমি সব বললাম এবং সেই সঙ্গে পৌঁছে দিলাম আবরাহার সালাম। তিনি স. সালামের জবাব দান করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো—আসাল্লহু আঁই ইয়াজ্আলা বাইনাকুম ওয়া বাইনাল্লাজিনা আদাইতুম মিনহুম মুআদ্দাতান (অচিরেই আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিবেন, যারা ছিলো তোমাদের শত্রু)।

হজরত উম্মে হাবিবাকে বিবাহ করার কথা শুনে তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান প্রসন্ন হলেন। বললেন, মোহাম্মদ অভিজাত এবং সাহসী পুরুষ। তাঁর মধ্যে কোনো দোষ নেই।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের নেতা হজরত জাফরের সঙ্গে নাজ্জাশী তাঁর পুত্র আরহা বিন আসহামা বিনিল জরকে মদীনায় পাঠালেন। তাঁর সঙ্গে ছিলো ষাট সদস্যবিশিষ্ট একটি আবিসিনিয় দল। নাজ্জাশী তাঁর পুত্রের মাধ্যমে একটি অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করেছিলেন— যাতে লেখা ছিলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি সত্য রসুল। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাসমূহে আপনার পবিত্র প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমি আপনার প্রতিনিধি ও পিতৃব্যপুত্র হজরত আবু জাফরের মাধ্যমে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি এবং বিশ্বসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র একত্বকে স্বীকার করে নিয়েছি। আপনার পবিত্র সংসর্গে আমি আমার প্রিয় পুত্রকে প্রেরণ করলাম। যদি আদেশ হয়, তবে আমি নিজেও উপস্থিত হবো। আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ্।

হজরত আবু জাফরের কাফেলার সঙ্গে নাজ্জাশীপুত্র রওয়ানা হলো মদীনায়। কিন্তু সমুদ্রযাত্রার সময় তাঁর নৌকা নিমজ্জিত হলো অথৈ সাগরে। সকলেই উদ্ধার

www.eelm.weebly.com

পেলো। নাজ্জাশী পুত্রকে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না। হজরত আবু জাফরের সঙ্গে পশমী বস্ত্র পরিহিত তাঁর সত্তরজন সঙ্গী উপস্থিত হলেন রসুল স. এর পবিত্র দরবারে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আবিসিনিয়ার বাটজন এবং শামের আটজন। রসুল স. তাঁদেরকে সম্পূর্ণ সুরা ইয়াসিন পাঠ করে শুনালেন। কোরআনের মর্মস্পর্শী পাঠ শুনে কেঁদে ফেললেন নতুন অতিথিরা। তাঁরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং বললেন, এই পবিত্র বাণী সম্ভার তো ওই বাণীবৈভবের মতো যা অবতীর্ণ হয়েছিলো হজরত ঈসার উপর। এরপর অবতীর্ণ হলো 'এবং যারা বলে আমরা খৃষ্টান, মানুষের মধ্যে তাদেরকে তুমি বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধু বলে দেখবে'— এই আয়াতে ওই খৃষ্টানদের কথা বলা হয়েছে, যারা নাজ্জাশীর নির্দেশে আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় এসেছিলেন। তাঁরা ছিলেন সত্তর জন।

মুকাতিল এবং কালাবী বলেছেন, তাঁরা ছিলেন চল্লিশজন—বত্রিশজন আবিসিনিয় এবং আটজন শামী। আতা বলেছেন, আশিজন ছিলেন তাঁরা— নাজরানের বনী হারেসা গোত্রের চল্লিশ জন, আবিসিনিয়ার বত্রিশ জন এবং শাম বা রোমের আটজন। ইবনে আবী শায়রা, ইবনে আবী হাতেম এবং ওয়াহেদী, ইবনে শিহাবের সূত্রে সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব, আবু বকর বিন আবদুর রহমান এবং ওরওয়া বিন জোবায়েরের মুরসাল বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, রসুল স. হজরত আমর বিন উমাইয়া দ্বমেরীকে একটি পত্রসহ নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করলেন। হজরত আমর যথাসময়ে নাজ্জাশীর নিকট পৌঁছে দিলেন সেই পবিত্র পত্র। নাজ্জাশী সেই পত্র পাঠ করে ওলামা ও মাশায়েখগণকে দরবারে তলব করলেন। হজরত জাফরকেও তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ নিয়ে এলেন দরবারে। হজরত আবু জাফর সুরা মরিয়ম পাঠ করে শোনালেন। পবিত্র কোরআন শ্রবণ করে সকলেই ইমান গ্রহণ করলো। তাঁদের নয়ন থেকে নির্গত হলো অশ্রুর ধারা। তাঁদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে—'এবং যারা বলে আমরা খৃষ্টান.........সুতরাং তুমি আমাদিগকে সাক্ষ্যবহদিগের তালিকাভুক্ত করো' (৮৩ আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ বিন জোবায়ের বলেছেন, নাজ্জাশী ফাল্লাস নামক তাঁর এক পুণ্যবান দরবারীকে একটি দলসহ প্রেরণ করলেন রসুল স. এর খেদমতে। রসুল স. তাঁদেরকে সুরা ইয়াসিন পাঠ করে শুনালেন। পবিত্র বাণীর আবৃত্তি শ্রবণ করে তাঁরা সকলে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁদেরকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে এ আয়াত।

নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের বলেছেন,, নাজ্জাশী এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

তৃতীয় খণ্ড শেষ

www.eelm.weebly.com

সপ্তম পারা

সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৮৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ

❑ রসূলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যখন তাহারা শ্রবণ করে তখন তাহারা যে-সত্য উপলব্ধি করে তাহার জন্য তুমি তাহাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখিবে। তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করিয়াছি; সুতরাং তুমি আমাদিগকে সাক্ষ্য-বহদিগের তালিকাভুক্ত কর।

হজরত সাঈদ বিন যোবায়ের রা. থেকে ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী তাঁর এক প্রবীণ সভাসদ ফাল্লাসের নেতৃত্বে একটি দল রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। রসুল পাক স. তাঁদেরকে সুরা ইয়াসিন পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। আল্লাহ্পাকের পবিত্র বাণীর হৃদয়হারক আবৃত্তি শুনে কেঁদে ফেলেছিলেন ফাল্লাস ও তাঁর সঙ্গীরা। এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাঁদেরকে লক্ষ্য করেই।

হজরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের রা. থেকে নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, নাজ্জাশী এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে লক্ষ্য করে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তিবরানীও এ রকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনা কিছুটা বিস্তৃত।

আমি বলি, কেবল নাজ্জাশী অথবা নাজ্জাশীর দল সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে— এ রকম বলা ঠিক নয়। কারণ, বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা দলকে উপলক্ষ করে আয়াত অবতীর্ণ হলেও আয়াতের উদ্দেশ্য থাকে ব্যাপক। তাই সাধারণভাবে আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্র পাক-পবিত্র বাণী শুনে যারা ক্রন্দন করে তাদের সকলকেই এই আয়াতের উপলক্ষ মনে করা যেতে পারে।

www.eelm.weebly.com

পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়া আন্নাহুম লা ইয়াসতাক্‌বিরূন (আর তারা অহংকারও করে না)। এ আয়াতেও ওই নিরহংকার ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'রসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শ্রবণ করে', তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে, তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে।'

অশ্রুবিগলিত হওয়ার কথা উল্লেখ করে এখানে বলা হয়েছে—ওই অশ্রুপাতকারীদের অন্তরে রয়েছে সত্যের প্রতি অনাবিল আকুতি, নম্রতা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় ও ভালোবাসা।

ফয়েজ অর্থ কোনো পাত্র পরিপূর্ণ হওয়ার পর তা উপচে পড়া। তাদের চোখের অশ্রু উপচে পড়েছিলো— এ কথা বুঝাতেই এখানে 'তাফিদু' (অশ্রুবিগলিত) বলা হয়েছে। এভাবে এ কথাটি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পবিত্র কোরআনের সুললিত আবৃত্তি শুনে তাঁরা অঝোর ধারায় অশ্রুপাত করেছিলেন।

'মিম্মা আ'রাফু মিনাল হাক্ব' — এ কথার অর্থ তারা যে সত্য উপলব্ধি করে। 'মিম্মা আ'রাফু'— এর প্রকৃত রূপ হচ্ছে— 'মিন মা আ'রাফু'। — এখানে 'মিন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সূচনা বা কারণ প্রকাশার্থে। অর্থাৎ সত্য জেনেছে বলে অথবা সত্য জানার কারণে তারা কেঁদেছিলো। 'মা' শব্দটি এখানে সংযোজক অব্যয়। এর পরে 'মিনাল হাক্ব'— এর 'মিন'— শব্দটি হচ্ছে বায়ানিয়াহ্ বা বর্ণনামূলক। অর্থাৎ তারা যে সত্যের বিবরণ বা পরিচিতি লাভ করেছিলো, তার কারণেই তাদের চক্ষু থেকে নির্গত হয়েছিলো অশ্রু। এ রকমও হতে পারে যে, 'মিনাল হাক্ব'— এর 'মিন' আংশিক অর্থ প্রকাশক (তাবইজিয়াহ্)। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— তারা সত্যকে অংশতঃ উপলব্ধি করেছিলো বলে কেঁদেছিলো। সুতরাং অনুমান করে নাও যে, সত্যের পূর্ণ উপলব্ধি লাভ করলে তাদের অবস্থা হতো কিরূপ?

আতা খোরাসানীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'তারা শ্রবণ করে' বলে বুঝানো হয়েছে নাজ্জাশী ও তাঁর দরবারিগণকে। সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে ইসলামের প্রথম হিজরতকারী দলের নেতা 'কাফ, হা, ইয়া, আইন, সোয়াদ' (সুরা মারইয়াম) পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। ওই পাঠ যতক্ষণ চলেছিলো ততক্ষণ নীরবে অশ্রুপাত করে যাচ্ছিলেন নাজ্জাশী ও তাঁর সভাসদবৃন্দ। তারপর তাঁরা বলেছিলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যবাহীদের তালিকাভুক্ত করো।' এ কথার অর্থ, হে আমাদের আল্লাহ্! তুমি তোমার রসুল মোহাম্মদ স. এর প্রতি যে বাণী অবতীর্ণ করেছো, আমরা তার উপর ইমান এনেছি। সুতরাং আমাদেরকেও বিশ্বাসীদের তালিকাভুক্ত করো। এভাবে তাঁরা সর্বশেষ রসুল ও সর্বশেষ কিতাব সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাসকে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের বাক্যের প্রথমে তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন 'রব্বানা' (হে আমাদের প্রতিপালক)। এ কথাতেই প্রমাণিত হয় যে— তাঁদের বিশ্বাস ছিলো বিশুদ্ধ, মুনাফিকদের মতো মৌখিক নয়। যারা কপট, তারা কখনো আল্লাহ্‌পাককে এ রকম সরাসরি সম্বোধন করতে পারে না।

www.eelm.weebly.com

'আশ্শাহিদীন' অর্থ সাক্ষ্যবহনকারীগণ। 'সাক্ষ্য-বহগণের তালিকাভুক্ত করো'— — এ কথা বলে তাঁরা রসুল স. এর ওই সকল উম্মতের অন্তর্ভূত হতে চেয়েছেন, যাঁরা কিয়ামতের দিন অন্য সকল নবী-রসুলের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। বলবেন, এ কথা সত্য যে— সকল নবী তাঁদের উম্মতকে সত্যের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। উম্মতে মোহাম্মদীর কিয়ামত দিবসের সাক্ষ্য প্রদানের এই বিরল সম্মানের কথা তাঁরা জানতে পেরেছিলেন তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিল শরীফের মাধ্যমে। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, এখানে শাহিদীন অর্থ রসুল মোহাম্মদ স. এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কোরআনকে সত্য বলে সাক্ষ্য প্রদান। এই ব্যাখ্যাটির মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা ছিলেন খাঁটি ইমানদার। মুনাফিকদের মতো কপটচারী নন। 'শাহাদাত' অর্থই হচ্ছে অন্তর থেকে উৎসারিত স্বতঃস্ফুর্ত স্বীকৃতি। এখানে আল্লাহ্পাকই তাঁর পবিত্র বাণীর মধ্যে তাঁদের সাক্ষ্যদানের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ্পাক নিজেই মুনাফিকদেরকে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন— যদিও তারা মৌখিক ইমান প্রকাশ করেছে। যেমন, ওয়াল্লহু ইয়াশহাদু ইন্নাল মুনাফিক্বীনা লাকাজিবুন (আল্লাহ্ নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই মুনাফিকেরা মিথ্যাবাদী)। কিন্তু এখানে আল্লাহ্পাক নিজেই নাজ্জাশী, তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ এবং তাঁদের মতো সত্যকে উপলব্ধিকারী ও কোরআন মজীদের আবৃত্তি শুনে অশ্রুপাতকারীদের বাক্য উদ্ধৃত করেছেন এভাবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্য-বহদিগের তালিকাভুক্ত করো।'

সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৮৪

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ○

❒ 'আমরা যখন প্রত্যাশা করি যে, আল্লাহ্ আমাদিগকে সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত করুন তখন আল্লাহে ও আমাদের নিকট আগত সত্যে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কী কারণ থাকিতে পারে?'

আল ক্বওমুস সলিহীন (সৎকর্মপরায়ণগণ) অর্থ ইমানদার মুসলমান। অন্য আয়াতে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'ওয়া লাক্বদ্ কাতাব্না ফিজ্ জাবুরি মিম্ বা'দিজ্ জিক্রি আন্নাল আরদ্ব ইয়ারিছুহা ইবাদিয়াস্ সলিহূন' (আমি উপদেশ দানের পর যবুর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ দাসগণ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী)। এখানেও 'ইবাদিয়াস্ সলিহূন' (সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ) অর্থ ইমানদার বান্দাগণ।

এখানে নাত্মায়ু (আমরা প্রত্যাশা করি)— এর সম্পর্ক রয়েছে নু'মিনু (আমরা বিশ্বাস করি)— এর সঙ্গে। নু'মিনু— এর পূর্বে রয়েছে না বোধক শব্দ 'লা'।

www.eelm.weebly.com

সুতরাং অর্থ হবে এ রকম— কেনো আমরা ইমান আনবো না এবং তা প্রত্যাশা করবো না। এ রকমও হতে পারে যে 'লা' এর সংযোগ কেবলই 'নু'মিনু' শব্দটির সঙ্গে। যদি তাই হয় তবে অর্থ হবে এ রকম— কী কারণ থাকতে পারে যে, আমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর সত্যবাণীর উপর বিশ্বাসই করবো না, অথচ সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রত্যাশা করবো। বিশ্বাসই যদি না থাকে তবে প্রত্যাশা তো থাকতেই পারে না। এ রকমও অর্থ হওয়া সম্ভব যে— এখানে নু'মিনু (আমরা বিশ্বাস করি) এর সর্বনাম দ্বারা নাত্মায়ু (আমরা প্রত্যাশা করি) এর অবস্থা বুঝানো হয়েছে। এভাবে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে—এ রকম অবস্থায় কী কারণে আমরা ইমান আনবো না, যখন সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রত্যাশা আমাদের অন্তরে বিদ্যমান। এ রকমও উদ্দেশ্য হতে পারে যে— আমরা আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহের প্রত্যাশী। এই প্রত্যাশা পূর্ণ করতে হলে ইমান আনতে হবে। সুতরাং আমাদের যখন ইমান আছে, তখন প্রত্যাশিত বস্তু না পাওয়ার কোনো কারণই নেই।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত নাজ্জাশীর প্রতিনিধি দলের বক্তব্যটি ইহুদীদের একটি প্রশ্নের প্রতিপ্রশ্ন। ইহুদীরা তাদেরকে লজ্জা দিয়ে বলেছিলো, তোমরা আবার ইমান আনলে কেনো? তাদের ওই প্রশ্নের বিপরীতে নাজ্জাশীর দল যে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, সেই প্রশ্নটিই আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামে দীক্ষিত নাজ্জাশীর প্রতিনিধিদল যখন আবিসিনিয়ায় ফিরে গেলেন, তখন তাঁরা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত কথাগুলো বলেছিলেন। যদি এ রকম ব্যাখ্যা মেনে নেয়া হয়, তবে আলোচ্য আয়াতটি আর পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকবে না। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের শুরুতে হরফে 'আতফ' (সংযোজক অব্যয়) হিসেবে রয়েছে 'ওয়া' (এবং)। সুতরাং বিষয়টির আরো কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নতুবা এখানে সংযোজক অব্যয়টি অর্থগত দিক দিয়ে বিলুপ্ত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, হয়তো এখানে কিছু কথা অনুক্ত রয়েছে।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৮৫, ৮৬

فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِیْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِیْمِ ۝

❑ এবং তাহাদের এই কথার জন্য আল্লাহ্ তাহাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করিয়াছেন জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে। ইহা সৎকর্মপরায়ণদিগের পুরস্কার।

www.eelm.weebly.com

❒ যাহারা সত্য-প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও আমার আয়াতকে অগ্রাহ্য করিয়াছে তাহারাই অগ্নিবাসী।

পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত বিশুদ্ধ বিশ্বাস সম্বলিত বক্তব্যটি যাদের, তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্পাক এখানে জানিয়ে দিচ্ছেন— এবং তাদের এই কথার জন্য আল্লাহ্ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আল্লাহ্পাকের কালাম শুনে তাঁরা অশ্রুপাত করেছিলেন। ওই অঝোর অশ্রুপাত ছিলো বিশুদ্ধ বিশ্বাসের প্রকাশ। তাঁদের ওই হৃদয়োৎসারিত রোদন এবং বিশ্বাসের অকুণ্ঠ ঘোষণার কারণে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে। কথার মাধ্যমে মানুষ তার বিশ্বাসকে প্রকাশ করে। যেমন বলা হয় যে, এটাই অমুক ব্যক্তির অভিমত। অর্থাৎ তিনি এই অভিমতে বিশ্বাসী। সুতরাং, কোরআন শ্রবণ করে অশ্রুপাতকারীরা বিশ্বাস প্রকাশার্থে যে অভিমতটি প্রকাশ করেছেন, তার জন্য পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে সেই জান্নাত দান করবেন যার পাদদেশে রয়েছে নদী। আর সেই জান্নাতই হবে তাঁদের চিরকালীন আবাস।

এরপর বলা হয়েছে, ওয়া জালিকা জাজাউল মুহ্সিনীন (এটা সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার)। এ কথার অর্থ— যে সকল সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে (হুজুরী কলবে) ভয় ও আশা বুকে নিয়ে আল্লাহ্পাকের ইবাদত করবে, তাদের জন্যই রয়েছে আল্লাহ্পাকের চিরস্থায়ী পুরস্কার— জান্নাত। রসুল স. এরশাদ করেছেন, ইহ্সান (ইবাদতের পূর্ণ সৌন্দর্য) এই—তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে এভাবে যেনো তোমরা তাঁকে দেখছো, এ রকম না হলে (বিশ্বাস রাখো যে) তিনি তো তোমাদেরকে দেখছেন।

পবিত্র কোরআনের একটি সাধারণ বাকরীতি এই যে, তিরস্কারের পরে পুরস্কার অথবা পুরস্কারের পরে তিরস্কারের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। এখানেও তেমনি প্রদত্ত পুরস্কারের আলোচনা শেষে পরের আয়াতে (আয়াত ৮৬) বলা হয়েছে অবিশ্বাসীদের চিরস্থায়ী অগ্নিবাসের কথা। বলা হয়েছে, 'যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমার আয়াতকে অগ্রাহ্য করেছে তারাই অগ্নিবাসী'।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! গোশত ভক্ষণ করলে আমার প্রচণ্ড কামপ্রবণতা জেগে ওঠে। তাই আমি আমার নিজের উপরে গোশত হারাম করে নিয়েছি। তাঁর এ কথার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো—

www.eelm.weebly.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

❑ হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে-সব বস্তু বৈধ করিয়াছেন সেই সমুদয়কে তোমরা অবৈধ করিও না এবং সীমালংঘন করিও না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না।

❑ আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে বৈধ ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়াছেন তাহা হইতে ভক্ষণ কর এবং ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যাঁহার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।

উৎকৃষ্ট ও বৈধ বস্তুসমূহকে এখানে বলা হয়েছে তৈয়্যেবাত। আয়াতের ধারাক্রমানুসারে এখানে একটি বিশেষ সৌন্দর্য প্রতিভাত হয়েছে। প্রথমে নাসারাদের প্রশংসা করা হয়েছে। তাদের বৈরাগ্যকেও প্রশংসনীয় বলা হয়েছে। প্রবৃত্তিপরায়ণতাকে দূর করার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। তারপরে দেয়া হয়েছে হালাল হারামের যথাসংরক্ষণের নির্দেশনা। বলা হয়েছে, ওই সকল বস্তুকে তোমরা অবৈধ কোরো না। এরপর বলা হয়েছে, 'ওয়ালা তা'তাদু— ইন্নাল্লহা লা ইউহিব্বুল মু'তাদীন'—এ কথার অর্থ, 'এবং সীমালংঘন কোরো না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে ভালোবাসেন না।' — কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে, তোমরা হালালের সীমানা অতিক্রম করে হারামের সীমানায় প্রবেশ কোরো না। হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বানিও না। জটিলতা পরিহার করো— সহজ-সরল পথে অগ্রসর হও। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে— বৈধ ও পবিত্র বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপচয়কে প্রশ্রয় দিও না।

ইবনে জারীর সূত্রে আউফী বলেছেন, হজরত ওসমান ইবনে মাজউন এবং কতিপয় সাহাবী একবার ঠিক করলেন, তাঁরা স্ত্রী সম্ভোগ করবেন না, গোশত ভক্ষণ করবেন না এবং নির্বীর্য হবেন এই উদ্দেশ্যে, যাতে কুপ্রবৃত্তির মূলোৎপাটন হয় এবং ইবাদত বন্দেগী হয় অধিকতর একনিষ্ঠ। তাঁদের এমতো সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইবনে জারীর এ রকম আরেকটি বিশ্বস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইকরামা, আবু কেলাবা, মুজাহিদ, আবু মালেক নাখয়ী এবং সুদ্দীর সূত্রে। সুদ্দীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, ওই সাহাবীগণের সংখ্যা ছিলো দশজন। হজরত ওসমান বিন মাজউন এবং হজরত আলী বিন আবু তালেবও ছিলেন ওই দলে। ইকরামার বর্ণনায় রয়েছে, তাঁদের সংখ্যা ছিলো সাত জন।

www.eelm.weebly.com

ওই সাত জনের মধ্যে ছিলেন হজরত ইবনে মাজউন, হজরত আলী, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ এবং হজরত হোযায়ফার মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস হজরত সালেম। মুজাহিদের বর্ণনায় কেবল হজরত ইবনে মাজউন এবং হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আসের কথা এসেছে।

ইবনে আসাকেরের ইতিহাস গ্রন্থে সুদ্দী সূত্রে কালাবী ও আবু সালেহের মাধ্যমে এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সাহাবীগণের একটি দলকে লক্ষ্য করে। ওই দলে ছিলেন হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ওসমান ইবনে মাজউন, হজরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ এবং হজরত হোযায়ফার আযাদ করা গোলাম হজরত সালেম। তাঁরা সকলে এইমর্মে একমত হয়েছিলেন যে, তাঁরা স্ত্রী সংগম করবেন না, পুরুষাংগ কর্তন করবেন, গোশত ভক্ষণ করবেন না, মসলাযুক্ত আহার্য গ্রহণ করবেন না, পরিধান করবেন কম্বলের পোশাক এবং অভ্যস্ত হবেন অল্পাহারে। জীবনযাপন করবেন জনবিচ্ছিন্ন ও সংসারত্যাগী সাধুদের মতো। তীর্থযাত্রীদের মতো।

প্রথিতযশা তাফসীরকারগণের বিবরণ থেকে বাগবী উল্লেখ করেছেন, একদিন রসুলপাক স. তাঁর বক্তৃতায় কিয়ামত সম্পর্কে বললেন। কিয়ামতের ভয়াবহ বর্ণনা শুনে শ্রোতৃবৃন্দ ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। ক্রন্দন করতে শুরু করলেন সকলে। বক্তৃতা শেষ হলে হজরত ওসমান বিন মাজউনের গৃহে সমবেত হলেন দশ জন সাহাবী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন— হজরত ওসমান বিন মাজউন জাহামী, হজরত আবু বকর সিদ্দিক, হজরত আলী ইবনে আবী তালেব, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর, হজরত আবু জর গিফারী, হজরত আবু হোযায়ফার মুক্ত দাস হজরত সালেম। সেখানে হজরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ, হজরত সালমান ফারসী এবং হজরত মা'কাল বিন মাকরানের মধ্যে এ মর্মে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো যে— তাঁরা দুনিয়া পরিত্যাগ করবেন, চটের পোশাক পরিধান করবেন, গোপনাংগ কেটে ফেলবেন, প্রতিদিন রোজা রাখবেন, রাতে শয্যা গ্রহণ করবেন না— সারারাত নামাজ পড়বেন, গোশত ও চর্বি খাবেন না, স্ত্রীগমন করবেন না, সুগন্ধি ব্যবহার করবেন না। জীবনযাপন করবেন তীর্থযাত্রীদের মতো। অথবা যাযাবরের মতো। এই সংবাদ জানতে পেরে রসুল স. উপস্থিত হলেন হজরত ওসমান ইবনে মাজউনের বাড়ীতে। কিন্তু সেখানে তাঁকে পেলেন না। দেখলেন, তাঁর স্ত্রী খাওলা উম্মে হাকিম বিনতে আবী উমাইয়া সুসজ্জিতা ও সুবাসিতা। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্বামী সম্পর্কে যা কিছু শুনলাম তা কি সত্য? খাওলা স্বামীর গোপন শপথের কথা জানাতে চাচ্ছিলেন না। আবার অসত্যভাষণও ছিলো তাঁর অপছন্দনীয়। তাই তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ওসমান যদি এ সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলে থাকেন

www.eelm.weebly.com

তবে ঠিকই বলেছেন। এ কথা শুনে রসুল স. ফিরে এলেন স্বগৃহে। হজরত ইবনে মাজউন বাড়ীতে এসেই শুনতে পেলেন রসুল স. এর শুভাগমনের কথা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. সকাশে। রসুল স. বললেন, আমি শুনতে পেলাম, তোমরা এই এই কথাগুলো বলেছো। হজরত ইবনে মাজউন বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি যথার্থই শুনেছেন। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। রসুলুল্লাহ্ বললেন, আমার উপর এ রকম কোনো কঠোর নির্দেশ নেই। পুনরায় বললেন, তোমাদের উপর তোমাদের জীবনের হক রয়েছে। সুতরাং কখনও রোজা রাখো। কখনো ভঙ্গ করো। রাতে উপাসনা করো, আবার নিদ্রাভিভূতও হও। আমি (রাতের শেষাংশে) উঠি (এবং নামাজ পড়ি) এবং (রাতের কিছু অংশে) ঘুমাই। কখনও রোজা রাখি আবার কখনও ভঙ্গ করি। আমি গোশত ভক্ষণ করি। মসলা মিশানো আহার্য গ্রহণ করি এবং স্ত্রীগমনও করি। আমার এই আদর্শকে যে অবজ্ঞা করবে, সে আমার অনুসারী নয়। এরপর জনতাকে একত্রিত করে তিনি একটি সারগর্ভ বক্তৃতা উপস্থাপন করলেন। বললেন, আমি জানি না কী কারণে একদল লোক স্ত্রী সম্ভোগ, উৎকৃষ্ট আহার্য গ্রহণ, সুগন্ধি ব্যবহার, নিদ্রা এবং পার্থিব প্রয়োজনকে হারাম ঘোষণা করেছে। আমি তোমাদেরকে সন্যাসব্রত অবলম্বন করতে বলিনি। এ রকমও বলিনি যে, আমার ধর্মাদর্শে গোশত আহার এবং স্ত্রী-ব্যবহার নিষিদ্ধ। খানকাবন্দী হওয়ার কোনো নির্দেশও আমি তোমাদেরকে দেইনি। আমার উম্মতের রোজা যাযাবর জীবনের মতো এবং জেহাদ বৈরাগ্যের মতো। আল্লাহ্র উপাসনা করো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক কোরো না। হজ করো। ওমরা করো। নামাজ প্রতিষ্ঠা করো। জাকাত প্রদান করো। রমজান মাসের রোজা রাখো এবং চলা ফেরা করো সাধারণ মানুষের মতো। এ রকম করলে তোমাদের আমল যথাযথ হবে। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা কাঠিন্যকে প্রশ্রয় দেয়ার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর কঠোরতা আরোপ করেছিলো। তাই আল্লাহ্পাক তাদের দায়িত্বকে কঠোর করে দিয়েছিলেন। খৃষ্টানদের গির্জা এবং ইহুদীদের উপাসনালয়ে যারা বসবাস করে, তারা সুচিহ্নিত। তাদের কাছে রয়েছে মানদা (চিহ্ন সমূহ)। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করেছেন আলোচ্য আয়াতটি।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত সা'দ ইবনে মাসউদ বলেছেন, একবার হজরত ওসমান ইবনে মাজউন রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমাকে খাসী হওয়ার অনুমতি দিন। তিনি স. বললেন, যে ব্যক্তি খাসী করে এবং যে করায় সে আমার দলভুক্ত নয়। কামপ্রবৃত্তি দমনার্থে আমার উম্মতের জন্য রোজার বিধান দেয়া হয়েছে। হজরত ওসমান বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তবে আমাকে অসংসারী হওয়ার অনুমতি দিন। তিনি স. বললেন,

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ করাই আমার উম্মতের সংসারাসক্তিহীনতা। কতিপয় সাহাবী তখন বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয় রসুল! অনুমতি দান করুন— আমরা বৈরাগ্যকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করি। তিনি স. বললেন, মসজিদে বসে নামাজের প্রতীক্ষায় থাকাই আমার উম্মতের জন্য বৈরাগ্য।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আনাস বলেছেন, একবার তিনজন সাহাবী উম্মত জননী হজরত আয়েশা সিদ্দিকার নিকটে উপস্থিত হয়ে রসুল করীম স. এর ইবাদত বন্দেগী সম্পর্কে জানতে চাইলেন। জননীর নিকট থেকে যথা বিবরণ শুনে তাঁদের মনে হলো রসুল স. এর ইবাদতের পরিমাণ তো নিতান্তই অল্প। তাই তাঁরা বললেন, আমরা তো কিছুতেই রসুল স. এর মতো নই। তিনি নিষ্পাপ। পূর্বাপর সকল বিচ্যুতি থেকে মুক্ত। সুতরাং আমাদেরকে আরো অধিক ইবাদত করতে হবে। একজন সাহাবী বললেন, আমি তো সমস্ত রাত নামাজ পড়েই কাটাবো। দ্বিতীয়জন বললেন, আমি কোনো দিন রোজা ভঙ্গ করবো না। তৃতীয়জন বললেন, আমি জীবনে কখনো বিবাহ শাদী করবো না। ইত্যবসরে সেখানে উপস্থিত হয়ে রসুল স. বললেন, আমি তোমাদের কথা শুনেছি। এখন আমার কথা শোনো— আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করি। কিন্তু আমি কোনো দিন রোজা রাখি। কোনো দিন রাখি না। রাতে নামাজ পড়ি। আবার নিদ্রাও যাই। আর আমি বিবাহিতও (এগুলোই আমার আদর্শ)। যে ব্যক্তি আমার আদর্শকে অবমাননা করবে সে আমার দলের নয়।

আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আনাস বলেছেন, তোমরা নিজেদের প্রতি কঠোর হয়ো না। যদি হও, তবে আল্লাহ্‌ পাক তোমাদের প্রতি কঠোর হবেন। যারা কাঠিন্য পছন্দ করে, আল্লাহ্‌পাক তাদের উপর কাঠিন্যই চাপিয়ে দেন। খৃষ্টান ও ইহুদীদের উপাসনালয়ে বসবাসকারীদের রয়েছে এক প্রকার বিশেষ চিহ্ন (মানদা)। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— বৈরাগ্য প্রথাটি তাদের নিজস্ব আবিষ্কার, আমি তাদের জন্য বৈরাগ্যকে অত্যাবশ্যক করিনি।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, জননী আয়েশা বলেছেন, একবার রসুল স. একটি কাজ করলেন এবং সকলকে সেই কাজ করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু কেউ কেউ সেই কাজ থেকে বিরত থাকাই উত্তম মনে করলেন। এ কথা রসুল স. এর গোচরীভূত হলে তিনি স. জনতাকে একত্র করে একটি ভাষণ দিলেন। প্রথমে বর্ণনা করলেন আল্লাহ্‌পাকের স্তব-স্তুতি। তারপর বললেন, তারা কেনো ওই কাজ থেকে বিরত থাকতে চায় যা আমি নিজে করি। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাদের অপেক্ষা আল্লাহ্‌পাককে অধিক চিনি। তাঁকে তাদের চেয়ে বেশী ভয়ও করি।

www.eelm.weebly.com

হজরত জায়েদ বিন আসলাম থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার এক মেহ্মান উপস্থিত হলেন হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার গৃহে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে মেহমানের যথাআপ্যায়ণের নির্দেশ দিলেন। রসুল স. এর দরবারে গিয়েছিলেন তিনি। ঘরে ফিরতে তাঁর অনেক রাত হয়ে গেলো। দেখলেন, মেহ্মানকে তখনও আহার করানো হয়নি। তিনি রাগান্বিত হয়ে স্ত্রীকে বললেন, তুমি এখনও আমার মেহ্মানকে পানাহার করাওনি, আমার জন্য এই আহার্য হারাম। স্ত্রী বললেন, তবে আমার জন্যও হারাম। মেহ্মান বললেন, তাহলে আমার জন্যেও হারাম। উপায়ান্তর না দেখে হজরত আব্দুল্লাহ্ তাঁর বক্তব্য পরিহার করলেন এবং খাবারের উপর হাত দিয়ে বললেন, এসো বিস্মিল্লাহ্ বলে খাওয়া শুরু করি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে সব বস্তু বৈধ করেছেন, সে সকলকে তোমরা অবৈধ কোরো না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে ভালোবাসেন না' (আয়াত ৮৭)।

পরের আয়াতে সরাসরি এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে বৈধ ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে ভক্ষণ করো এবং ভয় করো আল্লাহ্কে, যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।'

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মোবারক বলেছেন, ওই জীবিকা বৈধ (হালাল) যা শরিয়তের বিধানানুযায়ী উপার্জন করা হয় এবং ওই জীবিকা উৎকৃষ্ট (তৈয়্যেব) যা শরীরকে পুষ্ট করে। যা পুষ্টিকর নয়, তা আহার করা মাকরূহ। তবে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা মাকরূহ নয়। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দৃষ্টে এ কথা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, সকল খাদ্য বৈধ নয়। তেমনি সকল খাদ্য উৎকৃষ্টও নয়।

মোতাজিলারা বলে, হারাম রিজিককে রিজিক বলা যাবে না। কিন্তু তাদের বক্তব্যটি ভুল। কারণ, হারাম যদি না থাকে তবে 'হালাল' শব্দটিও হয়ে পড়বে অনর্থক। আয়াতে হালাল খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ এসেছে। —এ কথার অর্থ হারাম খাদ্যও রয়েছে। আর সেই হারাম পরিত্যাজ্য। আর গ্রাহ্য কেবল হালাল।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'এবং ভয় করো আল্লাহ্কে, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।' 'ওয়াত্তাকুল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্কে ভয় করো। এই আল্লাহ্র ভয়ই খাঁটি ইমানের বৈশিষ্ট্য। হৃদয়ে আল্লাহ্র ভয় না থাকলে আল্লাহ্পাকের নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার যথাপ্রতিপালন সম্ভব নয় ।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে জননী আয়েশা বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. শিরনী ও মধু খেতে ভালোবাসতেন। বোখারী।

আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর প্রিয় আহার্য ছিলো রুটির সরিদ এবং কলিজার সরিদ।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পানাহারের পর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌পাকের শোকর করে, সে ধৈর্যশীল রোজাদারের মতো। তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারেমী।

বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে সকল বস্তু বৈধ করেছেন সে সকলকে তোমরা অবৈধ কোরো না' —তখন ওই সকল সাহাবী (যাঁরা স্ত্রীবর্জন, গৃহবর্জন, উৎকৃষ্ট খাদ্যবর্জন ইত্যাদির শপথ করেছিলেন) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তবে আমরা যে সকল শপথ করেছি সেগুলোর কী হবে? তাঁদের এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৮৯

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۚ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

❒ তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে দায়ী করিবেন না, কিন্তু যে-সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদিগকে দায়ী করিবেন। অতঃপর ইহার প্রায়শ্চিত্ত দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান, যাহা তোমরা তোমাদের পরিজনদিগকে খাইতে দাও, অথবা তাহাদিগকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাস মুক্তি, এবং যাহার সামর্থ নাই তাহার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করিলে ইহাই তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত, তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করিও। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

শপথের প্রকৃতি এবং শপথ ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে, নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্‌পাক মানুষকে দায়ী করবেন না, দায়ী করবেন সুদৃঢ় শপথের জন্য, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় এবং যদি ওই শপথ করা হয় আল্লাহ্‌র নামে। এ ধরনের শপথ পূর্ণ করতেই হবে। তাই

www.eelm.weebly.com

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, ইয়া আইয়্যুহাল্ লাজিনা আমানু আওফূ বিল উকুদ (হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ করো)।

জ্ঞাতব্যঃ আবু শায়েখ এবং আব্দ বিন হুমাইদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, যদি কসমের দ্বারা হালালকে হারাম বানানো হয় তবে তা হবে নিরর্থক কসম (কসমে লাগবী)। এ রকম কসম ভঙ্গ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে (কাফফারা দিতে হবে)। কিন্তু পরকালে এর জন্য কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ওই সকল কসমের জন্য, যে সকল কসম করা হয় সুদৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে।

ইতোপূর্বে সুরা বাকারার তাফসীরে শপথ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানেও এ সম্পর্কে কিছু মাসআলা উল্লেখ করা হলো।

মাসআলাঃ চার মাজহাবের ইমাম এবং জমহুর বলেছেন, শপথের বাক্য উচ্চারিত হওয়া অত্যাবশ্যক। উচ্চারণ মুখে মুখে হোক অথবা মনে মনে। শপথ হতে হবে আল্লাহ্‌র নামের সঙ্গে অথবা এমন শব্দাবলীর সঙ্গে যা আল্লাহ্‌পাকের সত্তাবাচক নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন— যাঁর হাতে আমার জীবন সেই সত্তার কসম, তাঁর কসম যিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, শপথ তাঁর যিনি অন্তরের বিবর্তনকারী, আকাশ ও পৃথিবীর প্রভুর শপথ ইত্যাদি।

কোনো কোনো হানাফী আলেম বলেছেন, কেবল আল্লাহ্‌পাকের গুণবাচক নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং যা আল্লাহ্‌র জন্যই নির্ধারিত সেই নামের কসম করলে কসম হয়ে যাবে। কিন্তু যে গুণ আল্লাহ্ এবং মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত, সেই গুণবাচক নাম নিয়ে শপথবাণী উচ্চারণ করলে শপথটি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে নিয়ত (সংকল্প), অবস্থা, কারণ এবং নিদর্শনের উপর । অর্থাৎ যেগুলোর উপর শপথ নির্ভরশীল সেগুলোর স্পষ্ট প্রমাণ না পেলে শপথ হবে না। যেমন, হালিম (ধৈর্য্যশীল), আলীম (জ্ঞানী), কাদের (ক্ষমতাশীল), ওয়াকিল (নির্ভরস্থল)। এ সকল বিশেষণ মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং এ সকল গুণের সঙ্গে সম্পৃক্ত শপথ, শপথ হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁর পরিচিতির জন্য যে সকল গুণের কসম করেছেন, সে সকল গুণের কসম খেলে কসম হয়ে যাবে। যেমন, আল্লাহ্‌র ইজ্জত, জালাল, আজমত ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণতঃ আল্লাহ্‌পাকের যে সকল গুণের কসম করা হয় না, সে সকল গুণের কসম করলে তা কসম বলে বিবেচিত হবে না। যেমন, আল্লাহ্‌র এলেম, ইরাদা ইত্যাদি।

ইরাকের শায়েখগণ বলেছেন, জাতি সিফাতের (সত্তাগত গুণাবলীর) কসম খেলে কসম হয়ে যাবে। কিন্তু সিফাতের ফেল বা ক্রিয়ার কসম খেলে কসম হবে না। শায়েখবৃন্দের অভিমত হচ্ছে— যে সকল গুণের বিপরীত কিছু আল্লাহ্‌পাকের

www.eelm.weebly.com

জন্য অসম্ভব সে সকল গুণই সত্তাগত গুণ (জাতি সিফাত)। যেমন, কুদরত, জালাল, আজমত এ সকলের বিপরীত হচ্ছে অক্ষমতা, অপমান, অবহেলা। এ সকল দোষ থেকে আল্লাহ্‌পাক সম্পূর্ণ পবিত্র। আর যে সকল গুণের বিপরীত গুণ আল্লাহ্‌পাকের মধ্যে রয়েছে সে সকল গুণের কসম করা যাবে না। যেমন, রহমত-গজব, সন্তোষ-অসন্তোষ, জীবিকা প্রশস্তকারী-অপ্রশস্তকারী ইত্যাদি।

মাসআলাঃ তিন ইমাম বলেছেন, কোরআন পাকের কসম খেলে শুদ্ধ হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হবে না—কারণ, এ রকম কসম খাওয়ার প্রচলন নেই (সম্ভবত ইমাম আবু হানিফার যুগে কোরআন পাকের কসম খাওয়া ছিলো অপ্রচল)। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, এখন ব্যাপকভাবে কোরআনের কসম খাওয়া হয়। তাই বলতে হয়, কোরআনের কসম খাওয়া শুদ্ধ। মাসহাফ বা সহিফার (আকাশী পুস্তিকার) কসমও কোরআন পাকের কসমের মতো। কেননা মাসহাফ দ্বারা কোরআনকে বুঝানো হয়ে থাকে— যা কাগজ নয়। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, কসমের মাসআলায় সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈগণের উক্তি উল্লেখ পূর্বক সকল ইমাম এইমর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কোরআনের কসম ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে। এর বিপরীত অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়।

পবিত্র কোরআনের নামে মিথ্যা কসম খেলে কী পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সে সম্পর্কে ফিকাহ্‌ শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মতে কাফফারা দিতে হবে একটি। ইমাম আহমদ থেকে দু'টি অভিমতের বর্ণনা এসেছে। একটি হচ্ছে— কাফফারা দিতে হবে একটিই। অন্যটি হচ্ছে—কোরআনের প্রতিটি আয়াতের জন্য এক একটি কাফফারা দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যদি কেউ আল্লাহ্‌র হকের কসম খায় তবে তার কসম শুদ্ধ হবে না। ইমামত্রয় বলেছেন, হবে।

যদি কেউ লাউমরুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র আয়ুর শপথ) এবং লাআয়মুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র জীবনের শপথ) বলে, তবে ইমাম আজমের (ইমাম আবু হানিফার) মতে কসম শুদ্ধ হবে— কসমের নিয়ত করা হোক অথবা নাই করা হোক। ইমাম আহমদের একটি অভিমত এ রকম। ইমাম শাফেয়ীর কোনো কোনো অনুসারী বলেছেন, নিয়ত না করা হলে বর্ণিত শব্দগুলো দ্বারা কসম শুদ্ধ হবে না। ইমাম আহমদের অপর অভিমতটি এ রকম।

মাসআলা ঃ যদি কা'বা শরীফ অথবা নবীর কসম খায়, তবে তা শুদ্ধ হবে না। সেই কসম ভাঙলে কাফফারাও ওয়াজিব হবে না— ইমামত্রয় এ রকম বলেছেন। এক বর্ণনায় এসেছে— ইমাম আহমদ বলেছেন, কোরআন ও নবীর কসম খেলে শুদ্ধ হবে। আমাদের পক্ষে রয়েছে রসুল স. এর ওই হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে— কসম যদি খেতেই হয়, তবে আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ো, নতুবা বিরত থেকো। বোখারী ও মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম খায়, সে অবশ্যই শিরিক করে। হজরত ইবনে মাসউদের একটি মাওকুফ বর্ণনায় রয়েছে— আমার নিকট আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কসম খাওয়া, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো সত্য বস্তুর কসম খাওয়া থেকে উত্তম। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, এই অভিমতটি গ্রহণীয় হবে তখন, যখন কেউ রসুলপাক স. এর নামে প্রতিজ্ঞা করবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞাকারী যদি এ রকম বলে— যদি আমি এই কাজ করি তবে যেনো রসুল স. এবং কাবা আমার প্রতি বিরূপ হয়। অথবা যদি বলে— আমি যেনো কাফের, ইহুদী কিংবা খৃষ্টান হই। এ রকম প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা হিসেবেই গণ্য। কেননা প্রতিজ্ঞাকারী এখানে নিজেই কাফের হওয়ার শর্ত সংযোজন করেছে। এ রকম অবস্থায় তাকে অবশ্যই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রতিজ্ঞার শব্দ বা শর্ত উল্লেখ না করলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা শুদ্ধ হবে। যেমন— কেউ কোনো হালাল বস্তু তার নিজের উপর হারাম করে নেয়ার প্রতিজ্ঞা করলো। ইমাম শাফেয়ী অবশ্য বলেছেন, হালাল বস্তুকে হারাম করার প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা নয়। আমাদের দলিল হচ্ছে— রসুল স. তাঁর এক ক্রীতদাসী হজরত মারিয়াকে এবং মধুপান করাকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন। তাই কোরআনপাকে এরশাদ হয়েছে, 'ইয়া আইয়্যুহান্ নাবীয়্যু লিমা তুহার্‌রিমু মা আহাল্লাল্লহু লাকা ক্বদ ফারাদ্বল্লহু লাকুম তাহিল্লাতা আইমানিকুম'।

বোখারী ও মুসলিম গ্রন্থে এ রকম বর্ণনা রয়েছে। এই আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সুরা তাহ্রীমের তাফসীরে আসবে ইন্‌শা আল্লাহু তা'য়ালা।'

মাসআলাঃ 'যদি আমি এরূপ করে থাকি তবে আমি ইহুদী হবো অথবা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবো'— এ রকম প্রতিজ্ঞা ইয়ামিনে গুমুস (অতীতের জানিত ঘটনা সম্পর্কে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করা)। যদি প্রতিজ্ঞাকারী অতীতে কথিত কাজটি করেও থাকে, তবুও ইমাম আজমের মতে সে কাফের হবে না। কেননা তার প্রতিজ্ঞা অতীত সম্পৃক্ত। যদি প্রতিজ্ঞাটি ভবিষ্যৎকাল সম্পৃক্ত হয় তবে সে কাফের হবে। যেমন, সে বললো— 'আমি যদি (ভবিষ্যতে) এ রকম কাজ করি তবে কাফের হয়ে যাবো।' কিন্তু কোনো কোনো ফকিহ্ বলেছেন, এমতোক্ষেত্রে অতীতকাল সম্পৃক্ত প্রতিজ্ঞা দ্বারাও সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, কুফরী হওয়ার ব্যাপারটি সে নিজেই নিজের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, প্রকৃত কথা এই যে, এ রকম প্রতিজ্ঞাকারী যদি তার বক্তব্যকে কেবলই প্রতিজ্ঞা বলে মনে করে, তবে সে কাফের হবে না। কিন্তু যদি সে বুঝে শুনে প্রতিজ্ঞাবাক্যটি উল্লেখ করে, তবে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, জেনে শুনে সে কুফরীকে পছন্দ করেছে। সুতরাং সে অবশ্যই কাফের হবে।

www.eelm.weebly.com

হজরত বুরায়দা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যদি কেউ বলে— আমি ইসলাম থেকে পৃথক হয়ে থাকবো— তার কথা মিথ্যা হলে তো মিথ্যাই। কিন্তু যদি সে মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে ইসলাম বহির্ভূত মনে করে (যদি তার বক্তব্যকে সে সত্য বলে বিশ্বাস করে) তবে সে আর কখনও ইসলামে ফিরে আসবে না। আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, আল্লাহ্‌পাকের নাম বা গুণের উল্লেখ করে অতীতকালবোধক বাক্য দ্বারা শপথ করলে শপথ হয়ে যাবে। যেমন— –'কৃসামতু বিল্লাহ্' (আমি আল্লাহ্‌র কসম করেছি) অথবা 'হালাফতু বিল্লাহ্' (আমি আল্লাহ্‌র নামে হলফ করেছি), কিংবা 'শাহিদ্‌তু বিল্লাহ্' (আমি আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য দিয়েছি) বা 'আজামতু বিল্লাহ্' (আমি আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় সংকল্প করেছি)। বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালবোধক বাক্য দ্বারা প্রতিজ্ঞা করলেও প্রতিজ্ঞা হয়ে যাবে— এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। কারণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালবোধক শব্দের মধ্যে বর্তমানই প্রত্যক্ষ এবং ভবিষ্যৎ অপ্রত্যক্ষ। আর ভবিষ্যৎকাল বুঝাতে কিছু কারণেরও আবশ্যক হয়। যেমন, শিন অথবা সাওফা ইত্যাদি। এ ধরনের শপথের দৃষ্টান্ত হচ্ছে—'উকৃসিমু বিল্লাহ' (আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি অথবা করবো), 'আহ্‌লিফু বিল্লাহ্' (আমি আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করছি অথবা করবো), আশহাদু বিল্লাহ্ (আমি আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি অথবা দিবো), 'ওয়া আজিমু বিল্লাহ্' (আমি আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় সংকল্প করছি অথবা করবো)।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, নিয়ত ব্যতীত শপথ হবে না। কেননা, মোজারের সিগায় (বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালবোধক শব্দরূপে) ভবিষ্যৎ কালই সম্ভাব্য। এ রকম শব্দের মাধ্যমে ভবিষ্যতের প্রতিজ্ঞাই বুঝা যায়। অর্থাৎ এ রকম অবস্থায় 'উকৃসিমু' অর্থ হবে আমি শপথ করবো, 'আশহাদু' অর্থ হবে, আমি সাক্ষ্য দেবো ইত্যাদি।

মাসআলাঃ যদি কেউ তার শপথে আল্লাহ্‌পাকের নাম বা গুণের উল্লেখ না করে কেবল বলে— আমি শপথ করছি, আমি প্রতিজ্ঞা করছি—তবে তার শপথ গ্রহণীয় হবে, সে নিয়ত করুক কিংবা নাই করুক। এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। এভাবে শপথ উচ্চারণ করার পর কেউ যদি বলে 'আমার তো শপথের নিয়ত ছিলো না'— তবে তার বক্তব্য গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহ্‌পাকের দরবারে সে অভিযুক্ত না হলেও আদালতে তাকে অভিযুক্ত করা যাবে। আদালত তার 'আমি শপথ করছি'— এ রকম বাক্যকে শপথ বলে ধরে নেবে। অবশ্য যদি সে ধর্মপরায়ণ ও সত্যবাদী হয় এবং তার ধর্মভীতির সম্পর্ক হয় কেবল আল্লাহ্‌র সঙ্গে (যিনি অন্তর্যামী)।

ইমাম জোফারের একটি অভিমত এবং ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের অভিমত অনুযায়ী কেউ যদি আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করার উদ্দেশ্যে কেবল বলে

www.eelm.weebly.com

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি' তবে তার প্রতিজ্ঞা হয়ে যাবে। যদি আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করার উদ্দেশ্য তার না থাকে তবে তার প্রতিজ্ঞা হবে না। কেননা তার ওই বাক্যটি শরিয়তবহির্ভূত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্তও হতে পারে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন,'আমি প্রতিজ্ঞা করছি'—এ রকম কথা বললেই প্রতিজ্ঞা হয় না। প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য থাকলেও হয় না। না থাকলেও হয় না।

আমরা বলি, আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করাই শরিয়তের বিধান। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে প্রতিজ্ঞা করা নিষিদ্ধ। তাই নিয়ত যদি শরিয়তসম্মত হয় তবে প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থও করতে হবে শরিয়তসম্মতভাবে। হাদিস শরীফেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক ব্যক্তি তার স্বপ্নবৃত্তান্ত রসুলপাক স. সকাশে বর্ণনা করলেন। সেখানে উপস্থিত হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অনুমতি দিলে আমি তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে চাই। তিনি স. অনুমতি দিলেন। হজরত আবু বকর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার পর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি কি সঠিক ব্যাখ্যা করতে পেরেছি? তিনি স. বললেন, ব্যাখ্যার কিছু অংশ সঠিক এবং কিছু অংশ ভুল। হজরত আবু বকর বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি কসম খাচ্ছি, আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার ভুল ব্যাখ্যাটি ধরিয়ে দিন। রসুল স. বললেন, এভাবে কসম খেয়ো না। ইমাম আহমদের বর্ণনায় বর্ণিত হাদিসটির বিবরণ এসেছে এ রকম। কিন্তু বোখারী ও মুসলিমে উল্লেখিত হয়েছে— হজরত আবু বকর বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আপনি অবশ্যই আমাকে ভুল ব্যাখ্যাগুলো জানিয়ে বাধিত করবেন। তখন রসুল স. বললেন, কসম খেয়ো না। আল্লাহ্‌পাকই সমধিক জ্ঞাত।

আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, 'ফা কাফ্‌ফারাতুহু'। শব্দটির অর্থ কাফফারা, ক্ষতিপূরণ, প্রতিকার অথবা প্রায়শ্চিত্ত। দৃঢ়তার সঙ্গে জ্ঞাতসারে কৃত শপথকে বলে ইয়ামিনে গমুস। এ রকম শপথভঙ্গ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত করলে বা কাফফারা দিলে শপথ ভঙ্গের পাপ মুছে যায়।

এর পরের আয়াতে দেয়া হয়েছে প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম ও নির্দেশনা। বলা হয়েছে, 'ইত্‌আ'মু আ'শারাতি মাসা কিনা'— এ কথার অর্থ, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্যদান করবে। দরিদ্র বা মিসকিনকে খাদ্যদান অর্থ খাদ্যের উপর তাদের কর্তৃত্ব বা মালিকানা প্রদান অথবা দানকৃত খাদ্যবস্তু ভক্ষণের অনুমতি প্রদান। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, প্রদত্ত খাদ্যবস্তুর মালিকানা প্রদান না করে, অর্থাৎ খাদ্যবস্তু বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি না দিয়ে যদি দশজন দরিদ্রকে সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা পেট পুরে খাইয়ে দেয়া হয়, তবু তা জায়েয হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের কেউ কম খেলো বা বেশী খেলো— তা ধরা যাবে না। কেবল দেখতে হবে, তারা সকলে পেট পুরে খেলো কিনা। হাসান বিন জিয়াদ সূত্রে ইমাম কারখী এ রকম বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

মিসকিনদেরকে আহার্য বস্তুর মালিক করে দিতে হবে, যেনো তারা ইচ্ছে করলে তা নিয়ে যেতে পারে অথবা কিছু অংশ খেয়ে বাকী অংশ নিয়ে যেতে পারে। জাকাত, সদকা ও ফিতরা গ্রহিতাদেরকে প্রদত্ত সম্পদের মালিকানা দিতে হয়। তাই এ ক্ষেত্রেও মিসকিনদেরকে আহার্য বস্তুর পূর্ণ কর্তৃত্ব দেয়া প্রয়োজন। এতে করে মিসকিনেরা ওই আহার্য বস্তু দ্বারা যথেষ্ট সুফল লাভ করার সুযোগ পাবে (কিছু খেতে পারবে, কিছু নিয়ে যেতে পারবে)। শুধু খাওয়ার অনুমতি দিলে যথেচ্ছ সুফল লাভ করার আর সুযোগ থাকে না।

আমরা বলি, কোরআন মজীদে বলা হয়েছে 'আতুজ্জাকাহ্।' এখানে আতা অর্থ প্রদান করা। সদ্কা ও ফিতিরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'আদা' শব্দটি। এর অর্থ আদায় করা। কিন্তু এই আয়াতে বলা হয়েছে 'ইত্আ'ম'। এর অর্থ খাদ্য প্রদান নয়— খাদ্যের উপর আহারের কর্তৃত্ব প্রদান। অর্থাৎ আহার করানোই ইত্আম শব্দের প্রকৃত অর্থ।

একটি প্রশ্নঃ যদি ইত্আম শব্দটির অর্থ আহার করানো হয় তবে খাদ্য প্রদান (যে খাদ্য দরিদ্ররা নিয়ে যেতে পারবে) নাজায়েয হওয়াই সমীচীন। কিন্তু খাওয়ার অনুমতি প্রদান তো এক ধরনের মালিকানা প্রদান। যদি তাই হয় তবে অনুমতি প্রদান ও মালিকানা প্রদান সম্মিলিত হয়ে যায়। তাহলে পৃথকভাবে আহার করানোর বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হবে কেনো?

উত্তরঃ আমরা বলি, মালিকানা প্রদানের মধ্যে আহারের অনুমতি ও দানের ক্ষমতা দু'টোই রয়েছে। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, কোরআনের মাধ্যমে এখানে মালিকানার বৈধতা এসেছে। এই বৈধতাটুকু বুঝতে পারাই আসল কথা। এই বৈধতা বাস্তবতার প্রতিকূল নয়। যেমন— কোরআন মজীদে বলা হয়েছে, পিতামাতা 'উহ্' বলে, এ রকম আচরণ সন্তানেরা করতে পারবে না। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই রয়েছে অনেক কথা— যেমন সন্তানেরা তাদের পিতামাতাকে প্রহার করতে পারবে না, গালি দিতে পারবে না ইত্যাদি। তেমনি এখানে খাদ্যদানের মধ্যেও রয়েছে খাদ্যের মালিকানা প্রদান ও খাদ্যাহারের অনুমতি প্রদানের কথা। এখানে খাদ্যের প্রয়োজন মিটানোই আসল উদ্দেশ্য। সুতরাং আহারের প্রয়োজনকে এখানে বড় করে দেখা সবদিক দিয়ে উত্তম।

আবদ্ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, 'দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্যদান'— সম্পর্কে হজরত আলী বিন আবী তালেব বলেছেন, দরিদ্রদেরকে সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা খাওয়াবে রুটি-গোশত, রুটি-জয়তুনের তেল, রুটি-ঘি, রুটি-খেজুর— যাই হোক না কেনো।

মাসআলাঃ দশজন দরিদ্রের মধ্যে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ধরা যাবে না। কারণ, এ ধরনের শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের মতো পরিপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ করতে সক্ষম নয়।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ প্রায়শ্চিত্তের খাদ্য হিসেবে গমের রুটি না দিয়ে অন্য রুটি দিলে তার সঙ্গে তরকারী থাকা একান্ত প্রয়োজন— যাতে দরিদ্ররা তৃপ্তির সঙ্গে পেট পুরে খেতে পারে। গমের রুটি দেয়া হলে তরকারী দেয়ার শর্তটি আর থাকে না। কারণ, যিনি খাদ্যদান করছেন তিনি নিজেও সাধারণতঃ তরকারী ছাড়া গমের রুটি খেয়ে থাকেন।

মাসআলাঃ ইমাম আজমের মতে একজন মিস্‌কিনকে দশ দিন ধরে খাদ্যদান করা জায়েয। কিন্তু একই দিনে একজনকে দশবার খাদ্য প্রদান জায়েয নয়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এর দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, একদিনে একজনকে দশবার খাদ্য খাওয়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু একদিনে একজনকে দশজনের খাদ্য দেয়া জায়েয। কেননা, একজন একদিনে দশজনের খাদ্যের মালিক হতে পারে। কিন্তু দশজনের খাদ্য কেউ একদিনে খেতে পারে না (একদিনে কারো দশবার খাবারের প্রয়োজনও হয় না)। তাই ইমাম আজম বলেছেন, একদিনে দশজনের খাদ্য একজনকে দিলে জায়েয হবে না।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হচ্ছে— দশ মিসকিনের খাদ্য এক মিসকিনকে খাওয়ানো জায়েয। কিন্তু দেয়া জায়েয নয় (একসঙ্গে, দশবারে কিংবা দশদিনে দেয়া জায়েয নয়)। কেননা আয়াতে বলা রয়েছে, দশজনের কথা। সুতরাং একজন যদি দশ দিন ধরে প্রতিদিন খাদ্য গ্রহণ করে তবে ওই মিসকিনকে দশ মিসকিন বলা যায় না (সে তো প্রকৃতপক্ষে একজনই)।

ইমাম আজম বলেছেন, এখানে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে— খাদ্যের প্রয়োজন মেটানো। আর প্রতিদিনই নতুন করে আহারের প্রয়োজন হয়। সুতরাং একজনকে প্রতিদিন আহার দিলে প্রতিদিন একজন একজন করে ধরতে হবে— এভাবে পূর্ণ হবে দশ মিসকিনের সংখ্যা। প্রতিদিন নতুন নতুন প্রয়োজন দেখা দেয়ায় একজনকে প্রতিদিন নতুন নতুন মিসকিন ধরতে হবে। আর যেহেতু একদিনে একজনের দশবার খাদ্যের প্রয়োজন হয় না, তাই একদিনে একজনকে দশজনের খাদ্য প্রদান করলে তাকে ধরতে হবে একজনই— দশজন নয়।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আয়াতে বলা হয়েছে দশজনের কথা। সুতরাং দশজনের সংখ্যা পূরণ করতে হবে। খাদ্য দিতে হবে দশজনকেই— একজনকে নয়।

মাসআলাঃ ইরাকী আলেমগণের অভিমত হচ্ছে— প্রতি মিসকিনকে দিতে হবে দুই মুদ (প্রায় দুই সের) আটা। অর্থাৎ আটার পরিমাণ হতে হবে অর্ধ সা। ইমাম বাগবী বলেছেন, হজরত ওমর এবং হজরত আলী থেকে এ রকমই বর্ণনা এসেছে।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গম দেয়া হলে দিতে হবে অর্ধ সা (চৌদ্দ ছটাক) এবং যব বা খেজুর দিলে দিতে হবে পূর্ণ এক সা। শা'বী, নাখয়ী, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, মুজাহিদ এবং হাকাম এ রকম বলেছেন। ইমাম মালেকের মতে মুদ্ হচ্ছে বাগদাদী দুই রতল। ইমাম আহমদ বলেছেন, গম অথবা গমের আটা হলে দিতে হবে এক মুদ্। যব অথবা খেজুর দিলে দিতে হবে দুই মুদ্ এবং গমের রুটি দিলে দিতে হবে দুই রতল।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মুদ্ হচ্ছে রসুল স. এর যুগের মুদ্ যার পরিমাণ এক সমস্ত তিন ভাগের এক রতল। এবং খাদ্য বস্তু হতে হবে শহরবাসীদের প্রধান খাদ্যের মতো। রুটি ও আটা দেয়া ঠিক হবে না। প্রচলিত আহার্য দেয়াই সমীচীন। বাগবী লিখেছেন, হজরত জায়েদ বিন সাবেত, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত ইবনে ওমর, হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব, কাসেম, সুলায়মান বিন ইয়াসার, আতা এবং হাসানও এ রকম বলেছেন।

অন্য সকল কাফফারার মতো শপথভঙ্গের কাফফারা প্রসঙ্গেও সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং ইমামগণের মধ্যে মতপৃথকতা রয়েছে। ইমাম আজমের মতে কাফফারা দিতে হবে দিরহাম ও দিনারের (রৌপ্যমুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রার) মুদ্রামানে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে। অন্য আলেমগণ বলেছেন, এভাবে কাফফারা দেয়া জায়েয নয়।

ইমাম কারখীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ওমর বলেছেন, খেজুর ও যব দেয়া উচিত এক সা এবং গম আধা সা। স্বসূত্রে কারখী আরো বর্ণনা করেছেন যে, হজরত আলী বলেছেন, শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ হবে আধা সা গম। মুজাহিদের উক্তিরূপে কারখী এ কথাও বলেছেন যে, কোরআনের উল্লেখিত কাফফারার পরিমাণ হচ্ছে মিসকিন প্রতি অর্ধ সা গম।

আত্তাহ্কীক গ্রন্থে ইবনে জাওজী উল্লেখ করেছেন, হজরত সুলায়মান বিন ইয়াসার বলেছেন, আমি আয়াতের নির্দেশের মধ্যে (তআমু মাসাকিনা) পেয়েছি— কাফফারা দিতে হবে এক মুদ্। অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত কথা হিসেবে এসেছে— এই পরিমাণই যথেষ্ট হতো (এই পরিমাণ কাফফারা আদায় করাকে যথেষ্ট মনে করা হতো)।

কাফফারার মাসআলার বিবরণ প্রসঙ্গে হজরত আবু সালমার বর্ণনায় এসেছে— হজরত সুলায়মান বিন সাখর (সালমা বিন সাখর) একবার রমজান মাসে তাঁর স্ত্রীকে জেহার করলেন। অর্থাৎ বললেন, তুমি রমজান মাসে আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশ তুল্য। কিন্তু রমজান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর পরই তিনি স্ত্রীগমন করলেন। পরদিন রসুল স. এর দরবারে গিয়ে তিনি এই ঘটনাটি জানালেন। রসুল স. বললেন, একটি ক্রীতদাসী কিনে মুক্ত করে দাও। হজরত

www.eelm.weebly.com

সালমা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! বাঁদী আজাদ করা তো আমার পক্ষে কঠিন। তিনি স. বললেন, তবে একাধারে দু'মাস রোজা রাখো। হজরত সালমা বললেন, আমি এ রকম করতেও অক্ষম। রসুল স. বললেন, তবে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাও। তিনি বললেন, এ কাজটিও আমার সামর্থ্যের বাইরে। তখন রসুল স. হজরত ওরওয়া বিন আসরকে নির্দেশ দিলেন, সালমাকে এক ফুরক (খেজুর) দিয়ে দাও। তারপর সালমাকে বললেন, এই খেজুর দিয়ে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাও। তিরমিজি। (পনেরো/ষোলো সা আহার্য বস্তুর সংকুলান হয় এমন পাত্রকে বলে ফুরক)।

তিরমিজির মতো আবু দাউদ, ইবনে মাজা এবং দারেমীও হজরত সালমা বিন সাখরের হাদিস বর্ণনা করেছেন—যেগুলোতে বলা হয়েছে, হজরত সালমা বলেছিলেন, আমি রমণীর মধ্যে ওই বস্তু পাই যা অন্য কেউ পায় না।

ইমাম শাফেয়ী এবং অন্যান্য ফিকাহ্‌ শাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন, কাফফারা স্বরূপ প্রতি মিসকিনকে এক চতুর্থাংশ সা খাদ্যবস্তু দেয়াই যথেষ্ট। এর সমর্থনে তাঁরা হজরত সালমা সম্পর্কিত হাদিসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। আর ইমাম আবু হানিফা দলিল হিসেবে পেশ করেছেন হজরত আউস বিন সামেত থেকে তিবরানী বর্ণিত হাদিসটিকে—যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছিলেন, ষাটজন মিসকিনকে তিরিশ সা খাদ্যবস্তু দিয়ে দাও। হজরত আউস বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার কাছে তো ওই পরিমাণ আহার্য বস্তু নেই। আপনি যদি সাহায্য করেন, তবেই আমি ওই পরিমাণ খাদ্য দিতে পারবো। রসুল স. তখন তাঁকে দিলেন পনেরো সা। অন্য এক সাহাবীও তাঁকে সাহায্য করলেন। এভাবে তিরিশ সা হয়ে গেলো। আমি বলি, সম্ভবতঃ ওই পনেরো সা ছিলো গম। আবু দাউদ ও ইবনে ইসহাক বর্ণিত হজরত মুয়াম্মার বিন আবদুল্লাহ্‌ বিন হানযালা এবং হজরত ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ্‌ বিন সালামের হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি তাকে এক ফুরক খুরমা দান করবো। হজরত আউস বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্‌! আমি এক ফুরক দান করবো। তিনি স. বললেন, উত্তম। বর্ণনাকারী বলেছেন, এক ফুরকের পরিমাণ ষাট সা এবং এক মাকতালের পরিমাণ তিরিশ সা। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, শেষোক্ত উক্তিটি অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা এক মাকতালের পরিমাণ যদি ষাট সা হতো তবে দ্বিতীয়বার সাহায্য প্রার্থনার আর প্রয়োজনই দেখা দিতো না।

হজরত আবু সালমা বিন আবদুর রহমান সম্পর্কিত হাদিস থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, এক ফুরক অর্থ পনেরো সা ওজনের একটি আটি, গাঁইট বা বোঝা। হজরত সালমা বিন সাখরের ঘটনা সম্পর্কে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বললেন, ষাটজন দরিদ্রকে এক ওসাক খুরমা দিয়ে দাও। হজরত সালমা বললেন, যিনি আপনাকে রসুল রূপে প্রেরণ করেছেন সেই পবিত্র সত্তার

www.eelm.weebly.com

শপথ! আমি দুই রাত ধরে অভুক্ত। আমার ঘরে কোনো খাবার নেই। রসুল স. বললেন, তুমি বনি জুরাইকের জাকাত আদায়কারী কর্মচারীর কাছে যাও। সে তোমাকে কিছু দিবে। যা দিবে তা থেকে এক ওসাক খেজুর ষাটজন মিসকিনকে দিয়ে দাও। অবশিষ্ট যা থাকবে তা তোমার এবং তোমার পরিবারের। আবু দাউদ, আহমদ।

মাসআলাঃ শিশুদেরকে আহার করানো এবং খাদ্যদান দু'টোই জায়েয। শিশুদের পক্ষ থেকে তাদের খাদ্য গ্রহণ করবে তাদের অভিভাবকেরা। যে শিশু এখনো খেতে শিখেনি, তাকেও কাফফারার খাদ্য দেয়া যাবে। ইমাম আজম, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেকের মতে এ রকম খাদ্যদান সিদ্ধ। ইমাম আহমদের মতে অসিদ্ধ।

মাসআলাঃ ইমাম আজমের মতে জিম্মিকে (আশ্রিত বিধর্মীকে) খাদ্য দান সিদ্ধ। কেননা কোরআনে কেবল বলা হয়েছে দরিদ্রকে খাদ্য দানের কথা। দরিদ্রকে যে ইমানদার হতেই হবে— এ রকম বলা হয়নি। তাছাড়া অন্য আয়াতে এসেছে 'লা ইয়ানহাকুমুল্লহু আনিল্লাজিনা লাম ইউক্বাতিলুকুম ফিদ্দিন' (যে বিধর্মী তোমাদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয় না তার সঙ্গে পার্থিব বিষয়ে উত্তম আচরণ করা থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিরত রাখেন না)। জমহুরের মতে বিধর্মীকে কাফফারার খাদ্যদান অসিদ্ধ। কারণ, তাদেরকে জাকাত দেয়া বৈধ নয়। বিধর্মীরা জাকাতের ব্যয়ের খাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যসম্মত। তাই জাকাত প্রদানের খাতের মধ্যে কাফফারা প্রদানকেও সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এ রকম কিয়াস অসমীচীন নয়।

আয়াতে বলা হয়েছে, মধ্যম ধরনের খাদ্য দানের কথা। বলা হয়েছে 'মধ্যম ধরনের খাদ্যদান, যা তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনদের খেতে দাও।' এ সম্পর্কে বাগবী বলেছেন, পরিবার পরিজনেরা যে রকম উত্তম উত্তম আহার্য ভক্ষণ করে, সে রকম উত্তম আহার্য দিতে হবে মিসকিনদেরকে।

আমি বলি, যে খাদ্য উন্নত ধরনের নয় আবার নিম্নমানেরও নয়— সেই আহার্য বস্তুই মধ্যম ধরনের আহার্য বস্তু। ধনী ব্যক্তিদের কর্তব্য হচ্ছে, তাদের পরিবার পরিজনদের জন্য যেমন উত্তম সুস্বাদু আহার প্রস্তুত করা হয় তেমনি উন্নত মানের আহার্য দিতে হবে মিসকিনকে। এখানে আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি ইমাম আবু হানিফার 'খাদ্যদান অর্থ আহারের অনুমতিদান' এই উক্তিটিকে প্রমাণ করেছে। অর্থাৎ দরিদ্রদেরকে খাদ্যের মালিকানা প্রদান অথবা আহারে অনুমতি প্রদান দু'টোই সিদ্ধ।

'মধ্যম ধরনের খাদ্য প্রদান' সম্পর্কে আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মধ্যম ধরনের খাদ্য কেমন তা নির্ধারিত হয় আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে— অভাব ও

www.eelm.weebly.com

সচ্ছলতার নিরিখে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, অধিক জাঁকজমকপূর্ণও নয়— আবার নিকৃষ্ট মানেরও নয়।

'অথবা তাদেরকে বস্ত্র দাও'—বস্ত্রও দিতে হবে মধ্যম মানের। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের অভিমত এই— এতটুকু কাপড় দিতে হবে, যা পরিধান করে নামাজপাঠ করলে নামাজ শুদ্ধ হয়। ইমাম মোহাম্মদও এ রকম বলেছেন, পুরুষকে দিতে হবে পাজামা, লুঙ্গি অথবা কোর্তা। আর মেয়েদেরকে দিতে হবে দু'টি কাপড়— লম্বা কোরতা ও উড়না।

ইমাম আজম এবং ইমাম আবু ইউসুফের অভিমত হচ্ছে— কমপক্ষে এমন কাপড় দিতে হবে যা দিয়ে শরীরের বেশীর ভাগ অংশ আবৃত করা যায়। তাই কেবল পাজামা দেয়াই যথেষ্ট নয়, যদিও পাজামা পরে নামাজ পড়লেও নামাজ হয়ে যাবে। আর শুধু পাজামা পরিহিত ব্যক্তিকে বিবস্ত্র বলার প্রচলন রয়েছে। তাই দিতে হবে পূর্ণ পোশাক। আবার মহিলাদেরকে একটি লম্বা কোরতা দিলেই যথেষ্ট হবে। ওড়না দিতে হবে না, যদিও ওড়না ছাড়া মহিলাদের নামাজ শুদ্ধ হয় না। কেননা লম্বা কোরতা পরিহিতা মহিলাকে সাধারণত বিবস্ত্রা বলা হয় না।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত হোযায়ফা বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! 'আও কিসওয়াতুহুম'(বস্ত্রদান) কথাটির অর্থ কি? তিনি স. বললেন, আবা (লম্বা ঢিলাঢালা জামা)। জননী আয়েশা থেকে তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক মিসকিনকে দিতে হবে লম্বা ঢিলাঢালা জামা।

ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হচ্ছে, এখানে কিসওয়াতুহুম এর উদ্দেশ্য, কমপক্ষে এতটুকু কাপড় যা পোশাক পদবাচ্য। সুতরাং পাগড়ি বা পাজামা অথবা সাধারণ কোনো জামা— যে কোনো একটি দিলেই বস্ত্রদান শুদ্ধ হবে। টুপি প্রদান সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীদের দু'রকম অভিমত এসেছে। পাঁচজন দরিদ্রকে খাদ্যদান এবং পাঁচজনকে বস্ত্রদান— এভাবেও কাফফারা পরিশোধ করা যাবে। বলেছেন ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ। আর ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক বলেছেন, এভাবে কাফফারা দেয়া যাবে না।

এরপর বলা হয়েছে 'কিংবা একজন দাস মুক্তি'। —এখানে 'রক্বাবাতিন' শব্দটির অর্থ গ্রীবাদেশ। অথবা গ্রীবার অধিকারী বা অধিকারিণী। সুতরাং এখানে দাসমুক্তি অর্থ হবে ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী মুক্ত করা।

ইমাম আজমের অভিমত হচ্ছে শপথ ও 'জেহার' এর ক্ষতিপূরণরূপে কাফের ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসীও মুক্ত করে দেয়া সিদ্ধ। কেননা কোরআনে রয়েছে 'রক্বাবাতিন' শব্দটি—যা মুসলমান ও কাফের ক্রীতদাস এবং ক্রীতদাসী উভয়কেই বুঝায়।

www.eelm.weebly.com

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হচ্ছে— মুক্তি দিতে হবে বিশ্বাসী ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসীকে, বিধর্মীকে নয়। কোরআন মজীদের অন্য আয়াতে হত্যার ক্ষতিপূরণরূপে বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এই আয়াতের আলোকে এখানেও বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনী দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেয়ার কথা বলা হলো (যদিও এখানে বিশ্বাসী বা বিধর্মীর কথা স্পষ্টরূপে বলা হয়নি)। আমরা বলি, কোরআন মজীদের নির্দেশনাগুলো যে রকম রয়েছে, সে রকম করেই ব্যাখ্যা করা উচিত। একটি নির্দেশকে অন্য নির্দেশের সঙ্গে তুলনীয় ভাবা অনাবশ্যক।

মাসআলাঃ এখানে তিন প্রকার কাফফারার কথা বলা হয়েছে। একটির সঙ্গে অপরটির সংযোগ করা হয়েছে 'আও' (অথবা, কিংবা) শব্দের মাধ্যমে। সুতরাং এ কথাটি পরিষ্কার যে, বর্ণিত তিনটি নিয়মের যে কোনো এক নিয়মে শপথ ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করা ওয়াজিব হবে। যিনি প্রায়শ্চিত্ত করবেন, তিনিই নির্ধারণ করবেন, তিনি কোন্ নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হলে হজরত হোযায়ফা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা কি যে কোনো একটি নিয়ম নির্ধারণ করে নিতে পারবো?। তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। এ বিষয়ে তোমাদেরকে অধিকার দেয়া হয়েছে। তোমরা ইচ্ছে করলে দরিদ্রকে আহার করাতে পারবে, অথবা বস্ত্র দান করতে পারবে কিংবা দাস-দাসী মুক্ত করে দিতে পারবে। অসমর্থ হলে একাধারে রোজা রাখবে তিন দিন।

'এবং যার সামর্থ্য নাই, তার জন্য তিনদিন সিয়াম পালন'— এ কথার অর্থ সকল শপথভঙ্গকারী বর্ণিত তিনটি প্রায়শ্চিত্তের একটিও যদি পালন করতে সক্ষম না হয়, তবে তাকে কাফফারারূপে তিনদিন রোজা রাখতে হবে। অসমর্থ ওই ব্যক্তি যার পারিবারিক ব্যয়বহন ও ঋণ পরিশোধের পর এ রকম কোনো সম্পদ অবশিষ্ট থাকে না— যার মাধ্যমে খাদ্যদান, বস্ত্রদান অথবা দাস-দাসী মুক্তি সম্ভব। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের পর যদি কাফফারার তিনটি নিয়মের যে কোনো একটি নিয়ম পালন করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়, তবে তাকে অসমর্থ বলা যাবে না। হজরত হাসান এবং হজরত সাঈদ বিন যোবায়ের এ রকম বলেছেন।

আবু শায়েখের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, যার নিকট পঞ্চাশ দিরহাম রয়েছে— সে সমর্থ। তার উপর কাফফারা অবধারিত। পঞ্চাশ দিরহামের কম থাকলে তাকে অসমর্থ গণ্য করা যাবে। তার শপথভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে— একটানা তিনদিন রোজা পালন। আবু শায়েখ কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, বিশ দিরহামের অধিকারী ব্যক্তিকে সমর্থ বলা যাবে। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দরিদ্রকে খাদ্যদান তার জন্য ওয়াজিব।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ ক্রীতদাসের জন্য রোজা পালনই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। কেননা তার নিজের বলে কিছু থাকে না। সুতরাং খাদ্যদান, বস্ত্র প্রদান অথবা দাসমুক্তি তার দ্বারা সম্ভবই নয়। আবার তার মনিব তার পক্ষে ক্ষতিপূরণ দিলেও তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। মাকাতিব এবং মুসতাসআ প্রকৃতির ক্রীতদাস, ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি প্রযোজ্য (মাকাতিব বলে ওই ক্রীতদাসকে যার সঙ্গে তার প্রভু এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ যে,— তুমি আমাকে এত টাকা দিলে মুক্তি পাবে। আর মুসতাসআ ওই ক্রীতদাস—যাকে সম্মিলিতভাবে ক্রয় করেছে দু'জন ব্যক্তি। একজন মালিক যদি তাকে মুক্ত করে দেয়, তবে সে অপর মালিককে অর্থ প্রদান করে মুক্ত হয়ে যেতে পারে)।

মাসআলাঃ কাফফারার রোজা পালনকারী ক্রীতদাস তিন দিবস পূর্ণ হওয়ার এক ঘন্টা আগেও যদি মুক্তি পায় এবং প্রায়শ্চিত্ত করার মতো সম্পদও যদি তার হস্তগত হয়, তবে তাকে অন্নদান, বস্ত্রদান অথবা দাসমুক্তির মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

মাসআলাঃ আমাদের নিকট কাফফারা আদায় করার ইচ্ছা করার সময়েই সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত (শপথভঙ্গের সময় সম্পদশালী থাকুক বা না থাকুক)। তাই সম্পদ না থাকার কারণে কেউ রোজা পালনকালে সম্পদের মালিক হয়ে গেলে তাকে বর্ণিত তিনটি নিয়মের যে কোনো এক নিয়মে (অন্নদান, বস্ত্রদান, দাসমুক্তি) কাফফারা আদায় করতে হবে। ওজু না থাকলে যেমন তায়াম্মুম করতে হয়, আবার তায়াম্মুম অবস্থায় পানি পেলে যেমন ওজু ভঙ্গ হয়ে যায়— এ ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি । সম্পদ না থাকায় তিন দিনের রোজা পালন এবং রোজা পালনকালে সম্পদের অধিকারী হলে কাফফারা প্রদান (অন্নদান অথবা বস্ত্রদান কিংবা দাসমুক্তি)। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, শপথভঙ্গের সময় সম্পদের মালিক হওয়া প্রয়োজন।

মাসআলাঃ ইমাম মালেক বলেছেন, ধারাবাহিকভাবে তিনদিন রোজা রাখার প্রয়োজন নেই। ক্রমচ্ছিন্ন রোজা রাখলেও কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। কারণ, এই আয়াতে ধারাবাহিকতার কথা উল্লেখিত হয়নি। কেবল বলা হয়েছে 'ছালাছাতা আইআম' (তিনদিন রোজা পালন)। তবে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, একাধারে তিন দিন রোজা রাখা মোস্তাহাব। ইমাম শাফেয়ীর একটি অভিমত হচ্ছে, ধারাবাহিক রোজা রাখা মোস্তাহাব— ওয়াজিব নয়।

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, ধারাবাহিক রোজা পালন ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ীর অপর অভিমতটি হচ্ছে এই—যেহেতু হত্যা ও জেহারের কাফফারারূপে কোরআন মজীদের অন্যত্র ধারাবাহিক রোজা পালনের কথা এসেছে, তাই এখানে শপথভঙ্গের কাফফারার রোজাও ধারাবাহিক হওয়া উচিত।

www.eelm.weebly.com

ইমাম শাফেয়ীর অধিকতর গ্রহণযোগ্য বক্তব্যটির প্রমাণ এই যে— শপথভঙ্গের কাফফারার দু'টি পদ্ধতিকে সামনে রাখতে হবে। একটি হচ্ছে হত্যা ও জেহারের পদ্ধতি। এ সকল ক্ষেত্রে কোরআন মজীদে ধারাবাহিক রোজার কথা এসেছে। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে সওমে তামাত্তু (ধারাবাহিকতাহীন রোজা)। এই পদ্ধতিটি হজের মধ্যে দমে জবরের (জোরপূর্বক ক্ষতিপূরণের) মতো। আমরা তাই আলোচ্য আয়াতে কোরআনের বক্তব্যকে যথাস্থানে রাখার পক্ষপাতি। তাই আমরা ক্রমসহ এবং ক্রমবিচ্ছিন্ন— দু'টোর একটিকেও ওয়াজিব বলিনি।

ইমাম আজম তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ দিয়েছেন, হজরত ইবনে মাসউদের কেরাতের মাধ্যমে। তাঁর কেরাতে উচ্চারিত হয়েছে— 'ছালাছাতু আইয়াম।' এর পরে উল্লেখিত হয়েছে 'মুতাতাবিয়াত্' শব্দটি। তাঁর কেরাত সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এ রকম সুবিদিত অবস্থা সুনির্দিষ্ট করা সিদ্ধ। এমতোক্ষেত্রে নির্দেশনার গুরুত্বটিই মুখ্য, কারণ এখানে মুখ্য নয়।

মাসআলাঃ বিধর্মীর শপথ কখনো শপথ নয়। সুতরাং তার উপর শপথভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত অত্যাবশ্যক নয়। বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমামত্রয় বলেছেন, বিধর্মীর প্রতিজ্ঞাও প্রতিজ্ঞা পদবাচ্য। সুতরাং প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করলে তাকেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আমাদের দলিল হচ্ছে— বিধর্মীরা প্রতিজ্ঞা করার যোগ্যতারহিত। কারণ, প্রতিজ্ঞা সম্পাদিত হয় আল্লাহ্পাকের নামের সম্মানের কারণে। কিন্তু বিধর্মীদের কাছে আল্লাহ্র নামের কোনো গুরুত্বই নেই (আল্লাহ্র নামে প্রতিজ্ঞা করছি— এ রকম কথা তারা বলে না)। তবে এ রকম বলা যেতে পারে যে, বিধর্মী কোনো বিধান বা আইন অস্বীকার করলে তাকে প্রতিজ্ঞা করতে বলতে হবে। এটাই আলেমগণের সম্মিলিত অভিমত বা ঐকমত্য।

দ্বিতীয় দলিল এই যে, শপথভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত এক ধরনের ইবাদত। কিন্তু বিধর্মীরা ইবাদতেরও যোগ্যতারহিত। আমি বলি, এই দলিলের মাধ্যমে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, কোনো বিধর্মী শপথ করার পর যদি মুসলমান হয় এবং তারপর যদি শপথভঙ্গ করে; তবে তার উপরে কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা, সে শপথভঙ্গ করেছে মুসলমান হওয়ার পর এবং প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদনের যোগ্যতাও সে অর্জন করেছে। আল্লাহ্পাকই অধিক পরিজ্ঞাত।

এরপর বলা হয়েছে 'তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত'— এ কথার মাধ্যমে বুঝা যায়, শুধু শপথ করলেই কাফফারা ওয়াজিব হয় না— কাফফারা ওয়াজিব হয় শপথভঙ্গ করলে। এটাই আলেমগণের অভিমত।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আহমদ এবং ইমাম শাফেয়ী এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, শপথ ভঙ্গের পূর্বেই কাফফারা আদায় করা জায়েয। ইমাম মালেকের একটি অভিমতও এ রকম। কেননা, এখানে কাফফারার সম্পর্ক করা হয়েছে শপথের সঙ্গে, শপথ ভঙ্গের সঙ্গে নয়। তাই শপথ ভঙ্গের পূর্বেই কৃত শপথের কাফফারা পরিশোধ করা সিদ্ধ। কেননা এখানে শপথই কাফফারার কারণ। যেমন, নেসাব পরিমাণ সম্পদ জমা হয়ে যাওয়া জাকাত ওয়াজিব হওয়ার একটি কারণ। কিন্তু শর্ত হচ্ছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে এক বৎসর। কিন্তু এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি কেউ জাকাত দিয়ে দেয় তবে তা জায়েয হবে। আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই— যদি কেউ কাউকে আহত করে, তবে আঘাতকারী ব্যক্তি আহত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই তার রক্তপণ পরিশোধ করতে পারবে। এ রকম পরিশোধ সিদ্ধ। এভাবে প্রমাণিত হয় যে, শপথ ভঙ্গের আগেই কৃত শপথের সম্পদগত ক্ষতিপূরণ অথবা রোজা পালন দু'টোই জায়েয। ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ এবং ইমাম শাফেয়ীর পূর্বতন অভিমত এ রকম। ইমাম শাফেয়ীর পরবর্তী সময়ের অভিমত হচ্ছে, শপথভঙ্গের আগে কৃত শপথের সম্পদগত ক্ষতিপূরণ প্রদান সিদ্ধ, কিন্তু রোজাপালন সিদ্ধ নয়। কেননা রোজা শারীরিক ইবাদত। আর শারীরিক ইবাদত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আদায় করা যায় না। যেমন, নামাজ ও রোজা নির্দিষ্ট ওয়াক্ত ও মাস ছাড়া প্রতিপালিত হতে পারে না। আর নামাজ, রোজা হচ্ছে শারীরিক ইবাদত— সম্পদগত ইবাদত নয়।

ইমাম আজম বলেছেন, শপথভঙ্গের পূর্বে সম্পদগত, শারীরিক— কোনো রকম কাফফারা আদায় করা সিদ্ধ নয়। তাঁর মতে কেবল শপথ কাফফারার কারণ নয়, কাফফারার কারণ হচ্ছে শপথভঙ্গ। সুতরাং, শপথভঙ্গের পূর্বে কাফফারা আদায় করা জায়েয নয়। কাফফারার বিধান দেয়া হয়েছে পাপ অপসারণ ও ক্ষমার জন্য। পাপ হয় কসম ভঙ্গ করলে। সুতরাং কসম ভঙ্গের পূর্বে নয়, আর্থিক অথবা শারীরিক কাফফারা ওয়াজিব হবে শপথভঙ্গের পর। তাই শপথভঙ্গের পূর্বে কাফফারা দেয়া জায়েয নয়।

এবার আসা যাক কাফফারা সংক্রান্ত নিয়ম কানুনের আলোচনায়। কসম খাওয়া হয় ভঙ্গ করার জন্য নয়, কাফফারা প্রদানের জন্যও নয়— বরং পুণ্য অর্জনের জন্য। কসম করাকে শরিয়ত ওয়াজিব করে দেয়নি। কোনো বস্তু লাভের জন্য কসম খাওয়া হলে, কাংক্ষিত বস্তু যদি হস্তগত না হয় তবে তাকে কসম ভঙ্গ কিভাবে বলা যেতে পারে? এমতো অবস্থাকে তো কসম ভঙ্গ করা হয়েছে বলা যায় না। ভঙ্গ করার জন্য কসম করা নিষিদ্ধ। এতদসত্ত্বেও যদি কসম ভঙ্গ হয়েই যায়, তবে তার জন্য কাফফারা ওয়াজিব। এ রকমও বলা যায় না যে, কেবল কারণ নয়— শর্তের সঙ্গেও রয়েছে কাফফারার সম্বন্ধ। যেমন, রোজার ফিত্‌রা সদকা ওয়াজিব হওয়ার একটি শর্ত। যদি শপথকে কাফফারার কারণ মেনে নেয়া হয়,

www.eelm.weebly.com

তবুও শপথভঙ্গের শর্ত না পাওয়া পর্যন্ত কাফফারা ওয়াজিব হবে না। সুতরাং শপথভঙ্গের পূর্বে কাফফারা দিলে তা আদায় হবে না। কোনো কিছু ওয়াজিব না হওয়া পর্যন্ত তা প্রতিপালনের চিন্তাই তো করা যায় না। জাকাত এবং ফিতরাও ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে আদায় করা যায় না। সুতরাং সকল ক্ষেত্রে ওয়াজিব হওয়ার শর্তটি অবশ্য প্রতিপালনীয়। অতএব, কোরআনের নির্দেশই এখানে রূপান্তরহীনভাবে বহাল রাখা সমীচীন। কিয়াস বা অনুমানগত ব্যাখ্যাকে এক্ষেত্রে প্রশ্রয় না দেয়াই উচিত।

জাকাত সম্পর্কে হজরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই জাকাত দেয়া যাবে কিনা? তিনি স. বললেন, যাবে। আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারেমী। সদকা ফিতর সম্পর্কে বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. সদকা ফিতরকে ওয়াজিব বলে উল্লেখ করেছেন। ওই হাদিসে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেকে ঈদের দুই একদিন আগেই ফিতরা দিয়ে দিতেন। রসুল স. তখন থেকেই এর অনুমতি দিয়েছিলেন। ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করা সাধারণতঃ জ্ঞানবহির্ভূত কাজ। তাই সাহাবীগণ এ ব্যাপারে রসুল স. এর নিকট থেকে বিধান জেনে নিয়েছিলেন। নিজেদের জ্ঞানে তাঁরা কিছু করেননি। ইমাম ইবনে হুম্মাম বলেছেন, আমার নিকট এটাই সঠিক যে, কসমই কাফফারার কারণ। কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে কসম ভঙ্গ করা। উসুলে ফিকাহের মধ্যে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ইমামে আজমের মতে 'যদি তুমি ঘরে প্রবেশ করো, তবে তালাক'—এ রকম বললে বুঝতে হবে ঘর তালাকের কারণ। কিন্তু শর্ত হচ্ছে ঘরে প্রবেশ করা। সুতরাং এখানে তালাকের প্রতিবন্ধক হচ্ছে ঘরে প্রবেশ করা, কেবল ঘর নয় (তেমনি শপথ কাফফারার কারণ, কিন্তু শর্ত হচ্ছে শপথভঙ্গ)। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বর্ণিত বাক্যটি তালাকের কারণ হবে তখনই, যখন নির্দেশিত রমণীটি ঘরে প্রবেশ করবে। ঘরে প্রবেশ করলেই দূর হবে তালাকের প্রতিবন্ধকতা। তাকে এ রকম কথা বলা হয়েছিলো ঘরে প্রবেশ থেকে বিরত রাখার জন্য। এখানেও তেমনি আল্লাহ্র নামে কসম খাওয়াটাই কসম পূর্ণ হওয়ার কারণ। কিন্তু কসম পূর্ণ না করে ভঙ্গ করা হলে তখনই ওই কসম কাফফারার কারণ হয়ে যায়। সুতরাং কসম ভঙ্গের পূর্বে কাফফারা আদায় করা, কারণ পাওয়ার পূর্বে কাফফারা আদায়ের মতো। জাকাত কিন্তু এ রকম নয়। জাকাতের মূল কারণ হচ্ছে সম্পদ। আর ফিতরার কারণ হচ্ছে ব্যক্তি ও ব্যক্তির প্রকৃতি।

কসম ভঙ্গের পূর্বে কাফফারা প্রদান সিদ্ধ— এই অভিমতের পক্ষে নিম্নলিখিত বর্ণনাগুলো উপস্থাপন করা হলো—

www.eelm.weebly.com

হজরত আউফ বিন মালেকের পিতা বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার এক চাচাতো ভাইয়ের নিকট আমি কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে যাই। কিন্তু সে আমাকে কিছুই দেয় না। আত্মীয়সুলভ আচরণও করে না। অথচ তার প্রয়োজনের সময় সে আমার কাছে চাইতে আসে। তাই আমি কসম করেছি, সে যদি আর কখনো চাইতে আসে তবে আমি তাকে কিছুই দিবো না। স্বজনসুলভ আচরণও করবো না। এখন হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাকে সৎপরামর্শ দিন যা আমার জন্য কল্যাণকর। যদি বলেন, তবে আমি কাফফারা দিতে পারি। নাসাঈ, ইবনে মাজা। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার পিতৃব্যপুত্র আমার নিকট প্রার্থী হয়। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি— তাকে আমি কিছুই দিবো না, তার সঙ্গে আপনজনসুলভ ব্যবহারও করবো না। রসুল স. বললেন, তুমি কৃত প্রতিজ্ঞার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দাও।

হজরত আবু মুসা আশআরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যদি কোনো কথার উপর কসম খাওয়ার পর তদপেক্ষা উত্তম কিছু পাই, তবে ইনশা আল্লাহ্ কৃত কসমের কাফফারা দিয়ে ওই পুণ্য কর্মের দিকে ধাবিত হবো। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যদি তুমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার পর তদপেক্ষা কোনো উত্তম কর্মের সন্ধান পাও, তবে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করে উত্তম কর্মটির দিকে ধাবিত হয়ো। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি উত্তম কর্মটি করবে এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিবে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যদি কেউ কোনো কিছুর জন্য অঙ্গীকার করে; তারপর তার চেয়ে অধিক সুন্দর কিছু দেখতে পায়, তবে অঙ্গীকার ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ দিয়ে অধিকতর সুন্দর কর্মটির দিকে অগ্রসর হবে। মুসলিম।

উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র নামে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করার পূর্বে কাফফারা প্রদান সিদ্ধ। কিন্তু প্রকৃত বিষয় এরূপ নয়। কারণ, বর্ণিত হাদিসগুলোতে কাফফারা উল্লেখের পূর্বে 'ওয়াও' (এবং) শব্দটি রয়েছে। আর 'এবং' শব্দটি ধারাবাহিকতাকে প্রমাণ করে না। অর্থাৎ শপথ করো এবং কাফফারা দাও কথাটির অর্থ এ রকম নয় যে, শপথের পর পর কাফফারা দাও। অতএব, শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফফারা দেয়া সিদ্ধ— বর্ণিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় না।

একটি প্রশ্নঃ কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে ছুম্মা (অতঃপর) শব্দটি। এই শব্দটি ধারাবাহিকতাকে প্রকাশ করে। যেমন হজরত আব্দুর রহমান বিন সামুরা থেকে আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. বলেছেন, অতঃপর নিজের কসমের কাফফারা দিয়ে দেবে, তারপর অধিকতর উত্তম কাজটির দিকে অগ্রসর হবে। মুসতাদরাক গ্রন্থে জননী আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. শপথ করলে তা

www.eelm.weebly.com

ভঙ্গ করতেন না। যখন আল্লাহ্তায়ালা শপথের প্রায়শ্চিত্তের বিধান অবতীর্ণ করলেন তখন তিনি স. বললেন, এরপর থেকে আমি যদি শপথ করি (এরপর যদি উত্তম কোনো কাজ দেখি), তবে প্রথমে শপথের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবো, তারপর ওই কর্মটি করবো— যা উত্তম।

উত্তরঃ আবু দাউদের বর্ণনাটি বিরল প্রকৃতির। বোখারী এবং মুসলিমও হজরত আব্দুর রহমান বিন সামুরার বর্ণনা এনেছেন, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসতাদ্রাক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, জননী আয়েশার বর্ণনাটিও দুর্লভ প্রকৃতির। বোখারীর বর্ণনায় 'ছুম্মা' শব্দটি নেই। রয়েছে 'ওয়াও' (এবং) শব্দটি। যে সকল হাদিসে 'ছুম্মা' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে সেগুলো বোখারী, মুসলিম, সুনান ও মসনদ গ্রন্থাবলীর বর্ণনা থেকে ভিন্ন। এ সকল নির্ভরযোগ্য হাদিসগ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হাদিসগুলোর বিপরীত বর্ণনাগুলো বিরল ও অকার্যকর। তাই সেগুলো গ্রহণীয় নয়।

'ওয়াহ্ফাজু আইমানাকুম'— কথাটির অর্থ তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা কোরো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ কথার অর্থ তোমরা কথায় কথায় কসম খেয়ো না। কথাটির সঠিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্পাক বাক্যটির মাধ্যমে শপথভঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন এবং শপথ পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর সমর্থনে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, 'ইয়া আইয়্যুহাল লাজিনা আ'মানু আউফু বিল উকূদ' (হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা যথাযথভাবে অঙ্গীকার পূর্ণ করো)।

শপথের নির্দেশনাঃ পুণ্যকর্মে শপথ করলে তা পূর্ণ করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু শপথ ভঙ্গের পরে না আগে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে— সে সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আজম এবং ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে— শপথভঙ্গ করা যখন এই আয়াতের নির্দেশের বিরুদ্ধে, তাই (ইচ্ছাকৃতভাবে) শপথভঙ্গ করে কাফফারা দেয়া জায়েয নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, শপথবিরুদ্ধ কাজ না করাই উত্তম। কিন্তু কেউ যদি শপথ ভেঙ্গেই ফেলে, তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। এ সম্পর্কে ইমাম মালেকের দু'টি অভিমত এসেছে। একটি ইমাম আবু হানিফার অনুকূল। অপরটি ইমাম শাফেয়ীর। কেউ বৈধ বিষয়ের উপর শপথ করলে (যা না করা— করা থেকে উত্তম) — এ রকম শপথের হুকুমও উপরের হুকুমের ন্যায়।

কেউ যদি কোনো পাপকর্ম করবে বলে কসম খায়, তবে সেই কসম ভঙ্গ করে কাফফারা দেয়া ওয়াজিব। কেননা কসম ভঙ্গের পাপ কাফফারার মাধ্যমে বিদূরিত হয়ে যায়। কিন্তু এ রকম কসমকারী যদি পাপকর্ম করেই ফেলে (যে কর্মের জন্য সে কসম করেছে) — তবে তার পাপ মুক্তির আর কোনো উপায় নেই।

যদি কেউ মোস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করে, তবে কৃত প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলে ক্ষতিপূরণ দান করা উত্তম। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'লা তাজআলুল্লহা উরদ্বাতাললি আইমানিকুম' (তোমরা তোমাদের শপথ সমূহকে সৎকর্মের প্রতিবন্ধক কোরো না)।

www.eelm.weebly.com

হজরত ওমর বিন খাত্তাব বলেছেন, আমি কাউকে কিছু দেবো না— এ রকম প্রতিজ্ঞা করতাম এবং (কাফফারাস্বরূপ) দশ জন দরিদ্রকে এক সা করে খেজুর অথবা অর্ধ সা করে গম দিয়ে দিতাম।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দিক শপথ করে কখনো ভঙ্গ করতেন না। পরে যখন শপথ ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কিত এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্প্রদত্ত বিধান গ্রহণ করি। এখন আমি কোনো বিষয়ে শপথ করার পর তদপেক্ষা উত্তম কিছু পেলে সেটাই গ্রহণ করি। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা, আব্দুর রাজ্জাক, বোখারী এবং ইবনে মারদুবিয়া।

মানতঃ যদি কেউ এ রকম শর্ত আরোপ করে মানত করে যে, অমুক বিষয় বাস্তবায়িত হলে আমি মানত পূর্ণ করবো, তবে ওই মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। যেমন— কেউ যদি বলে, যদি আমার অসুখ ভালো হয়ে যায় তবে আমি একটি রোজা রাখবো। এক্ষেত্রে অসুখ ভালো হলে তার উপর একটি রোজা ওয়াজিব হবে। বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নেই— এ রকম বিষয় বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই যদি কেউ মানত করে, তবুও তা পূর্ণ হলে মানত আদায় করা ওয়াজিব হবে। যেমন— কেউ বলে, আমি যদি এই কাজ করি তবে আমার উপর হজ অত্যাবশ্যক। এমতাবস্থায়ও তার উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেলে মানত পূরণ করা ওয়াজিব হবে।

বিশুদ্ধতার সঙ্গে বর্ণিত ইমাম আজমের আরেকটি অভিমত এই যে, এমতাবস্থায় মানত পূরণ না করে কাফফারা আদায় করলেই যথেষ্ট হবে। ইমাম মোহাম্মদ এবং ইমাম আহমদও এ রকম বলেছেন। এ রকম অবস্থায় মানত অথবা কাফফারা— যে কোনো একটি পূরণ করা যাবে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে— ইমাম আহমদ বলেন, এমতক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক হবে কেবল কাফফারা। ইমাম শাফেয়ীর অভিমত শেষোক্ত অভিমত দু'টির মতো। ইমাম মালেক বলেছেন, সম্পদ বিতরণের মানত করলে এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করা ওয়াজিব হবে। সম্পদ দানের নিয়ত না করলে পূরণ করতে হবে কেবল মানত। কেননা হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত আবু লুবাবা রসুল স. কে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার তওবার মধ্যে এ কথাটিও ছিলো যে, আমার সম্প্রদায়ের বস্তি থেকে যে সকল পাপ প্রকাশিত হয়েছে, আমি সেগুলোকে পরিত্যাগ করবো এবং আমার সমস্ত সম্পদ থেকে দূরে থাকবো এবং সকল সম্পদ বিতরণ করে দেবো। রসুল স. বললেন, তোমার সম্পূর্ণ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দরিদ্রদেরকে বণ্টন করে দিলেই যথেষ্ট হবে।

মানতের স্থলে কাফফারা প্রদান সিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত হজরত উকবা বিন আমেরের হাদিসটিও সুস্পষ্ট যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেন, মানতের কাফফারা এবং কসমের কাফফারা একই রকম। মুসলিম।

হজরত ইমরান বিন হোসাইন বর্ণনা করেছেন, ক্রোধান্বিত অবস্থার মানত মানত নয়। এ রকম মানতের কাফফারা কসমের কাফফারার মতো। আহমদ, নাসাঈ।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ পূরণ করা অসম্ভব— এ রকম মানত করলে কসমের কাফফারার মতো কাফফারা দিয়ে দায়মুক্ত হতে হবে। যেমন কেউ বললো, আমার এই উদ্দেশ্য পূরণ হলে আমি পায়ে হেঁটে হজ করবো অথবা সব সময় রোজা রাখবো ইত্যাদি। মানত পূরণ করতে গেলে যদি পাপ কর্মে লিপ্ত হতে হয় তবুও কাফফারা দিলে দায়মুক্ত হওয়া যাবে। যেমন— আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কথাবার্তা বা সম্পর্ক ছিন্ন করার মানত বা রমজান মাসে রোজা না রাখার মানত ইত্যাদি।

মানত করার অর্থ— কোনো বিষয় পালন করা নিজের উপর অত্যাবশ্যক করে নেয়া এবং এর বিপরীত কিছু করা নিজের উপর হারাম করে নেয়া। কোনো কিছুকে নিজের উপর হারাম করে নিলেই কসম হয়ে যায়। আরবী ভাষায় মানত বুঝাতে আল্লাহ্ শব্দের উপর 'লাম' অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়। যেমন— লিল্লাহি আ'লাইয়া সওমুন (আল্লাহ্র কসম আমার উপর রোজা রাখা অত্যাবশ্যক)। এখানে লিল্লাহ্ শব্দটির প্রথমে সংযোজিত 'লাম' অক্ষরটি কসমের অর্থ প্রকাশক। আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে— 'লা আমরুকা।' এখানেও 'লা' কসমের অর্থ প্রকাশক। জননী আয়েশার হাদিসে রয়েছে পাপকর্ম সম্পর্কিত মানত, মানতই নয়। এর কাফফারা কসমের কাফফারার মতো। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ। নাসাঈ তাঁর স্বরচিত গ্রন্থে হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যার মানত সুনির্দিষ্ট নয়, তার কাফফারা কসমের কাফফারার মতো। গোনাহ্ হয়— এ রকম কাজের মানত যদি কেউ করে, তবে তার কাফফারাও কসমের কাফফারার মতো। শক্তি সামর্থ্যের বাইরে এ রকম মানতকারীর কাফফারাও কসমের কাফফারা তুল্য। সাধ্যের অনুকূল করলেও পূরণ করা জরুরী। আবু দাউদ, ইবনে মাজা। কোনো কোনো আলেম এ সম্পর্কে প্রদত্ত হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের উক্তিটিকে সমর্থন করেছেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, হজরত উকবা বিন আমেরের বোন একবার মানত করে বসলেন— নগ্ন পদে এবং নগ্ন মস্তকে তিনি পদব্রজে হজ যাত্রা করবেন। হজরত উকবা রসুল স. এর নিকটে এর সমাধান জানতে চাইলে তিনি স. বললেন, তাকে মস্তক আবৃত করে এবং কোনো বাহনে আরোহন করে হজে রওয়ানা হতে বলো এবং তিন দিন রোজা রাখতে বলো। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় এবং দারেমী।

মাসআলাঃ কসম করার সময় যদি কেউ 'ইন্শাআল্লাহ্' বলে তবে তার কসম হবে না। এ রকম অবস্থায় কসমের বিপরীত কিছু করলে, সে কসম ভঙ্গ করেছে বলা যাবে না (কেননা তার কসমই হয়নি)। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, 'ইনশাআল্লাহ্' উচ্চারণ করে কসম করলে কসম হবে না। সুনান প্রণেতা চতুষ্টয়, দারেমী। তিরমিজি বলেছেন, একদল আলেমের নিকট এ বর্ণনাটি, হজরত ইবনে ওমরের নিজস্ব বক্তব্য।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে, 'এভাবে আল্লাহ্, তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেনো তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো'। এ কথার মাধ্যমে এই আয়াতে বর্ণিত শপথ সম্পর্কীয় অবশ্যপালনীয় কর্তব্য সমূহের বিশদ বিবরণ দানের মাধ্যমে দায়মুক্ত হওয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেনো তোমরা প্রদত্ত নির্দেশ সমূহ যথাপ্রতিপালনের মাধ্যমে আল্লাহ্পাকের সন্তোষ এবং নৈকট্যলাভ করে তাঁর একনিষ্ঠ কৃতজ্ঞভাজন হতে সক্ষম হও।

সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৯০, ৯১,৯২,৯৩

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۝ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اَحْسَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

❒ হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর—যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

❒ শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহের স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চাহে! তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না?

❒ তোমরা আল্লাহের আনুগত্য কর ও রসূলের আনুগত্য কর এবং সতর্ক হও; যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তবে জানিয়া রাখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রসূলের কর্তব্য।

www.eelm.weebly.com

❑ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের কোন পাপ নাই, যদি তাহারা সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় সাবধান হয় এবং সৎকর্ম করে। এবং আল্লাহ্ সৎকর্ম-পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা, ভাগ্যনির্ণায়ক তীর ইত্যাদি সম্পর্কে সুরা বাকারার তাফসীরে ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে এখানেও দেয়া হয়েছে স্পষ্ট নির্দেশনা।

জ্ঞাতব্য ঃ তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, একবার হজরত ওমর বিন খাত্তাব দোয়া করলেন, হে আমাদের আল্লাহ্! মদ সম্পর্কে আমাদের প্রতি একটি শান্তিদায়ক বিধান অবতীর্ণ করুন। তখন সুরা বাকারার মাধ্যমে রসুল স. এর প্রতি অবতীর্ণ হলো, 'ইয়াসআলুনাকা আ'নিল খমরি ওয়াল মাইসিরি কুল ফিহিমা ইছমুন কাবিরু 'ওয়া মানাফিউ' লিন্নাস' (লোকে আপনাকে মদ, জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, এ দু'টোর মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকার)। হজরত ওমর পুনরায় দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ্! শরাব সম্পর্কে আমাদের উপর কিছু প্রশান্তিপ্রদায়ক নির্দেশ অবতীর্ণ করুন। তখন অবতীর্ণ হলো সুরা নিসার এই আয়াত— 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু লা তাক্বরাবুস্ সলাতা ওয়া আংতুম সুকারা' (হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা মদমত্ত অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না)। রসুল স. হজরত ওমরকে ডেকে এই আয়াত শোনালেন। হজরত ওমর পুনরায় প্রার্থনা জানালেন হে আল্লাহ্! মদ সম্বন্ধে আমাদের জন্য সুস্পষ্ট কিছু অবতীর্ণ করুন। তখন অবতীর্ণ হলো সুরা মায়িদার এই আলোচ্য আয়াতটি (আয়াত ৯১)। হজরত ওমর তখন বললেন, আমি বিরত থাকবো, আমি বিরত থাকবো (মদ এবং জুয়া থেকে)।

হজরত আব্দুর রহমান ইবনে হারেস বর্ণনা করেছেন, আমি হজরত ওসমান ইবনে আফফানকে বলতে শুনেছি, তোমরা মদ্যপান থেকে বিরত থাকো। কেননা মদ্যপান সকল পাপের উৎস। শোনো অতীত কালের একটি ঘটনা—এক ইবাদতপ্রিয় লোকের প্রতি আকৃষ্ট হলো এক চরিত্রহীনা রমণী। একদিন রমণীটি তার ক্রীতদাসীকে আবেদ লোকটির নিকট প্রেরণ করলো। ক্রীতদাসী আবেদকে বললো, আমি আপনাকে সাক্ষ্যদান করার জন্য ডাকতে এসেছি। সরলমনা লোকটি বললো, তবে চলো। এই বলে সে ক্রীতদাসীটির সঙ্গে চলতে চলতে একটি গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হলো। ক্রীতদাসীর সঙ্গে সে গৃহের দুই তিনটি দরজা অতিক্রম করলো। প্রতিটি দরজা অতিক্রমের পর ক্রীতদাসীটি দরজার কপাট অর্গলবদ্ধ করে দিচ্ছিলো। এভাবে কয়েকটি দরজা অতিক্রম করার পর সে উপস্থিত হলো এক গৌরবর্ণের রমণীর সামনে। রমণীর পাশে ছিলো একটি শিশু এবং একটি মদপূর্ণ পাত্র। রমণীটি বললো, আমি আসলে আপনাকে সাক্ষ্য দানের

www.eelm.weebly.com

জন্য ডাকিনি। এখন আপনাকে করতে হবে তিনটি কাজের যে কোনো একটি— আমার সঙ্গে রতিকর্ম করুন অথবা মদ্যপান করুন কিংবা এই শিশুটিকে হত্যা করুন। লোকটি বললো, বুঝেছি এখন তো আমার নিষ্ক্রান্ত হওয়ার জন্য কোনো পথ খোলা নেই। তবে আমাকে কেবল মদ্যপান করতে দাও (তারপর নিষ্কৃতি দাও)। রমণীটি পাত্র এগিয়ে দিলো। লোকটি অন্য দু'টো ভয়াবহ পাপ থেকে নিষ্কৃতির জন্য মদ গলাধঃকরণ করলো। রমণীটি বললো একটু অপেক্ষা করো। লোকটি একটু পরেই মদের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠলো এবং মত্ত অবস্থায় মিলিত হলো রমণীটির সঙ্গে এবং তারপর শিশুটিকেও হত্যা করে ফেললো। সুতরাং তোমরা সর্বদা শরাব থেকে দূরে থেকো। আল্লাহ্র ভালোবাসা এবং শরাব কখনও একত্র হতে পারে না। একটি থাকলে অন্যটি থাকবে না। নাসাঈ।

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর যুগে মদ্যপায়ীদেরকে হাত, জুতা এবং লাঠি দ্বারা প্রহার করা হতো, রসুল স. এর মহাঅন্তর্ধানের পর তাই ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর শরাব পানকারীর শাস্তি নির্ধারণ করেছিলেন চল্লিশটি বেত্রাঘাত। মদ্যপদের জন্য এই শাস্তিটি তখন থেকে চলে এসেছে।

হজরত আবু বকরের পরকাল যাত্রার পর পরবর্তী খলিফা হজরত ওমরও মদ্যপদেরকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতেন। একদিন এক সাহাবীকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ধরে আনা হলো। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম হিজরতকারীদের একজন। হজরত ওমর তাঁকেও বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিলেন। তখন ওই মুহাজির সাহাবী বললেন, হে বিশ্বাসীগণের অগ্রণী! আপনি আমাকে কিভাবে বেত্রাঘাত করতে পারেন। আপনার আমার ফয়সালা আল্লাহ্র কিতাবের ভিত্তিতে হওয়াই সমীচীন। হজরত ওমর বললেন, বেত্রাঘাত করা যাবে না, এ কথা কোরআনের কোন্ আয়াতে রয়েছে। মুহাজির সাহাবী তখন পাঠ করলেন, 'লাইসা আলাল্লাজিনা আমানু ওয়া আ'মিলুস্ সলিহতি জুনাহু ফিমা তয়ীমু ইজা মাত্তাকু ওয়া আমানু (পুণ্যবান ব্যক্তি ইমানদার। তাকওয়া ও ইমান আনার পর সে যা কিছু ভক্ষণ করুক না কেনো, কোনো গোনাহ্ হবে না।) — আমি এই আয়াতে বিশ্বাসী। আমি রসুল স. এর সঙ্গে বদর, উহুদ, খন্দক এবং অন্যান্য জেহাদে অংশগ্রহণ করেছি। হজরত ওমর উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা এঁর কথার জবাব দিচ্ছোনা কেনো? হজরত ইবনে আব্বাস বলে উঠলেন, মদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে সকল ইমানদারেরা পৃথিবী পরিত্যাগ করেছেন, তাদের কথা বলা হয়েছে এই আয়াতে। কিন্তু পরবর্তীদেরকে মেনে চলতে হবে এই আয়াতের নির্দেশ 'হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা এগুলো বর্জন করো' ৯০,৯১,৯২, এবং ৯৩ আয়াত পর্যন্ত।

www.eelm.weebly.com

এই আয়াতগুলোতে মদ্যপানকে স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হজরত ওমর বললেন, তবে এখন জনতার অভিপ্রায় কী? হজরত আলী বলে উঠলেন, এঁকে আশি বেত্রাঘাত করতে হবে। কারণ ইনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহ্পাকের আয়াতের অপব্যাখ্যা করেছেন। যারা আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (অপব্যাখ্যা করে), তাদের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত। হজরত ওমর তখন তাঁকে আশিটি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিলেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু শায়েখ, ইবনে মারদুবিয়া ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

'আনসাব' অর্থ মূর্তিপূজা। 'আজলাম' অর্থ ভাগ্য নির্ণায়ক তীর। 'রিজ্সুন' অর্থ ঘৃণ্য বা অপবিত্র, রুচিশীল লোকেরা যা ঘৃণা করে। 'মিন আমালিশ্শাইত্বান' অর্থ শয়তানের কাজ। 'ফাজ্ তানিবুহু' অর্থ সুতরাং তোমরা এসব বর্জন করো। লায়াল্লাকুম তুফলিহুন অর্থ যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। বর্ণিত বাক্যাংশগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্পাক সুন্দর ও স্পষ্টরূপে মদ ও জুয়াকে নিষিদ্ধ করেছেন। বাক্যটির শুরুতে ব্যবহার করেছেন 'ইন্নামা' শব্দটি, যার অর্থ 'নিশ্চয়'। অর্থাৎ মূর্তিপূজা, জুয়া, মদ ও জুয়া খেলার তীর সুনিশ্চিতরূপে হারাম। মদ এবং জুয়াকে এখানে ঘৃণ্য বস্তু ও শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। সুতরাং, বর্ণিত হারাম বস্তুগুলো থেকে বিশ্বাসীদেরকে বিরত থাকতেই হবে। তবেই আসবে সফলতা। তাই আয়াতটির শেষে বলা হয়েছে 'যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'

পরের আয়াতে (আয়াত ৯১) বলা হয়েছে, শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়'—এ কথার মধ্যে রয়েছে ওই ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত, যে ঘটনায় জনৈক আনসারী সাহাবী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হজরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস নামক অপর এক সাহাবীর মস্তক উটের পাঁজরের হাড়ের আঘাতে জখম করে দিয়েছিলেন। ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরে।

হজরত কাতাদা বলেছেন, কেউ কেউ তাদের সম্পদ ও পরিবার পরিজনকে বাজি ধরতো। তারপর বাজিতে হেরে গেলে বিজয়ী ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ হতো এবং তাকে শত্রু মনে করতো। এই আয়াতে আলোচিত হয়েছে মদ ও জুয়ার ক্ষতিকর দিকটির কথা— যাতে করে বিশ্বাসীরা এ দু'টো অপকর্ম সম্পর্কে অধিকতর সতর্ক হতে পারে।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, মদ্যপানকারী মূর্তিপূজারীর ন্যায়। বায্যার কর্তৃক হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনে মাজার বর্ণনায় শরাবে অভ্যস্থদের কথা বলা হয়েছে। হারেসের বর্ণনায় রয়েছে, শরাব পানকারী লাত ও উজ্জা পূজকের মতো।

www.eelm.weebly.com

'ওয়া ইয়াসুদ্দাকুম আন জিকরিল্লাহি ওয়া আনিস্ সালাত' (এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়)। এর অর্থ শরাব ও জুয়ার নেশায় আচ্ছন্ন করে শয়তান মানুষকে আল্লাহ্‌র কথা ভুলিয়ে দেয় এবং নামাজ বিনষ্ট করে। হজরত আব্দুর রহমান বিন্ আউফের মেহমানের ঘটনা এরূপই ঘটেছিলো। আমন্ত্রিত অতিথি এবং আমন্ত্রক, সকলে মদ্যপান করেছিলেন— এ অবস্থায় নামাজের সময় হলে, একজন ইমাম হলেন এবং সকলে তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ইমাম পড়তে শুরু করলেন— 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূনা আ'বুদু মা তা'বুদুন'—এর অর্থ দাঁড়ায় আপনি বলুন, হে অবিশ্বাসীরা! তোমরা যার ইবাদত করো আমিও তার ইবাদত করি। (আল্লাহ্‌পাক রক্ষা করুন)। এভাবে আয়াতের অর্থ হয়ে গেলো সম্পূর্ণ বিপরীত। ঘটনাটি সুরা বাকারায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের নামাজে বাধা সৃষ্টি করতে চায়— এরূপ বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাজই ধর্মের প্রধান নিদর্শন ও ভিত্তি। তাই নামাজ থেকে বিরত রাখার অর্থ ইমান থেকে বিরত রাখা। আর বিশ্বাসী অবিশ্বাসীর মধ্যে প্রকাশ্য পার্থক্য নামাজই। কোরআন মজীদের এক স্থানে নামাজকে ইমান শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে—'ওয়ামা কানাল্লাহু লিইয়ুদ্বিয়া ইমানাকুম' {আল্লাহ্ এ রকম নন যে তোমাদের ইমানকে (মদ হারাম হওয়ার পূর্বের নামাজকে) বিনষ্ট করবেন}।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি এবং ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, নামাজ ইমানদার ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী। আবদুল্লাহ্ ইবনে বুরাইদার সূত্রে ইমাম আহমদ হাদিসটি সংকলন করেছেন। হাদিসটিতে রয়েছে—যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করলো সে কাফের। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, একবার রসুলুল্লাহ্ স. বললেন সুচারুরূপে নামাজ সম্পাদনকারীর নামাজ কিয়ামতের দিন নূর, সাক্ষী এবং পরিত্রাণের উপলক্ষ হবে। আর যে ব্যক্তি যথানিয়মে নামাজ সম্পন্ন করবে না, কিয়ামতের দিন তার জন্য কোনো নূর ও পরিত্রাণের কোনো উপলক্ষ থাকবে না। ওই ভয়াবহ দিবসে সে হবে কারূন, ফেরাউন, হামান এবং উবাই বিন খালফের সঙ্গী।

'ফাহাল আনতুম মুনতাহুন' অর্থ— তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না? অর্থাৎ মদ, জুয়া এবং সকল প্রকার নিষিদ্ধ বস্তু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমরা কি আল্লাহ্‌পাক ও তার রসুলের একনিষ্ঠ আনুগত্যকে জীবনের আসল উদ্দেশ্য করে নিবে না? এর পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে—'ওয়া আতিউল্লহা ওয়া আতিউর রসুলা (তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো ও আল্লাহ্‌র রসুলের আনুগত্য করো।) — এ কথার অর্থ তোমরা শরাব ও জুয়া সহ সকল প্রকার নিষিদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিধানের অনুসারী হও।

www.eelm.weebly.com

'ওয়াহ্জার' অর্থ— এবং সতর্ক হও। তারপর বলা হয়েছে—'ফাইন্ তাওয়াল্লাইতুম ফা'লামু আন্নামা আলা রসুলিনাল বালাগুল মুবীন'— এ কথার অর্থ— যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখো স্পষ্ট প্রচারই আমার রসুলের কর্তব্য। অর্থাৎ সত্যের সুষ্ঠু প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমি আমার রসুলকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি। এখন তাঁকে মান্য করা বা অমান্য করা তোমাদের ব্যাপার। তবে এ কথাটি মনে রেখো যে, আমার রসুলকে অমান্য করলে তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে তোমাদের।

হজরত ইবনে ওমরের হাদিসে রয়েছে রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি গোনাহ্র বস্তু হারাম। সুতরাং যে নেশাচ্ছন্ন হবে, সে হবে আল্লাহ্পাকের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত; এবং কিয়ামতের দিন তাকে পান করানো হবে 'তৈয়েনাতুল খাবাল'। তোমরা কি জানো, তৈয়েনাতুল্ খাবাল কী? বস্তুটি হচ্ছে দোজখীদের শরীর নির্গত স্বেদ। বাগবী। হজরত ইবনে ওমর আরো বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মদ্যপান করবে এবং তওবা ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ্পাক তাকে আখেরাতের শরাব (বেহেশতী পানীয়) থেকে বঞ্চিত করবেন। বাগবী। হজরত ইবনে ওমর আরো বর্ণনা করেছেন, আমি সংকেত দিচ্ছি রসুলপাক স. বলেছেন, শরাবের উপর রয়েছে আল্লাহপাকের অভিশাপ। অভিশাপ রয়েছে শরাবীর উপর, যে শরাব পান করায় তার উপর, ক্রেতা-বিক্রেতার উপর, পরিচর্যাকারী, প্রস্তুতকারী বাহকের উপর, যার জন্য বহন করা হয় তার উপর এবং মূল্য ভক্ষণকারীর উপর। ইবনে মাজা, এবং আবু দাউদও এ রকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় 'মূল্য ভক্ষণকারীর উপর' কথাটি নেই। হজরত আনাস বিন মালেক থেকেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। আরো বর্ণনা এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি ও ইবনে মাজার মাধ্যমে এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাকেমের মাধ্যমে। হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় রয়েছে— রসুল স. বলেন, যে ব্যক্তি মদ্যপান করবে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হবে না। এরপর যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ্পাক তার তওবা কবুল করবেন। পুনরায় মদ্যপান করলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ গ্রাহ্য হবে না। এরপর তওবা করলে তওবা কবুল হবে। তৃতীয় বার এরূপ করলেও তার তওবা কবুল হবে। তবে চতুর্থবার করলে তওবা কবুল হবে না। কিয়ামতের দিন তাকে পান করানো হবে নহরে খাবালের দুর্গন্ধযুক্ত পানি। তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা এবং দারেমী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে।

হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর থেকে দারেমী বর্ণনা করেছেন, ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে তার পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, জুয়া খেলে এবং সর্বদা মদ্যপান করে।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে মহাবিশ্বের রহমত ও হেদায়েতরূপে। আমার **প্রভুপালক** আমাকে বিগ্রহের উপাসনা, ক্রুশ এবং মূর্খতার যুগের সকল অপসংস্কারকে উচ্ছেদ করার হুকুম দিয়েছেন। আমার প্রাণপ্রিয় **প্রভুপালক** শপথ করে বলেছেন, যে ব্যক্তি এক চুমুক শরাব পান করবে, আমি তাকে আরো অধিক পান করাবো। আর যে ব্যক্তি আমার ভয়ে শরাব পরিত্যাগ করবে, আমি তাকে পান করাবো কাওসারের পানি। আহমদ।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ— সর্বদা মদ্যপানকারী ও পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং অশ্লীল কর্মের সহায়ক। আহমদ, নাসাঈ।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, বেহেশত হারাম তিন ব্যক্তির জন্য— সর্বদা শরাব পানকারী, রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং যাদুর উপর আস্থা স্থাপনকারী। আহমদ।

সুরা বাকারার তাফসীরে ইমাম আহমদ সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলপাক স. যখন মদীনায় আগমন করেছিলেন, তখন মদীনাবাসীগণ ছিলো মদ্যপানে অভ্যস্থ। ওই হাদিসের শেষাংশে রয়েছে— এর পর তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ হলো— 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু ইন্নামাল খমরু ওয়াল মাইসিরু... ফাহাল আন্তুম মুন্তাহুন' পর্যন্ত (আয়াত ৯০-৯১)। এই নির্দেশ শুনে সাহাবীগণ উচ্চারণ করলেন, হে আমাদের প্রভু! আমরা এ সকল নিষিদ্ধ বস্তু থেকে অবশ্যই নিবৃত্ত হবো। কিন্তু এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে যে সকল মদ্যপায়ী এবং জুয়ার মাধ্যমে উপার্জিত হারাম ভক্ষণকারী বিশ্বাসী পৃথিবী পরিত্যাগ করেছেন, তাঁদের উপায় কী হবে? তাঁদের এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— লাইসা আলাল্লাজিনা আমানু থেকে ওয়াল্লহু ইয়ুহিব্বুল মুহসিনীন্ পর্যন্ত। (আয়াত ৯৩)।

নাসাঈ ও বায়হাকীর বর্ননায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— আনসারগণের দু'টি গোত্রের অনাসৃষ্টির প্রেক্ষিতে মদ হারাম করা হয়েছে। একদিন তাঁরা মদ্যপ অবস্থায় নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি শুরু করে দিলেন। নেশা কেটে যাওয়ার পর চেহারা, মস্তক ও শ্মশ্রুর বিধ্বস্ত অবস্থা লক্ষ্য করে তাঁরা বলতে শুরু করলেন, আমারই ভাই আমার এ অবস্থা করেছে। মদমত্ত না হলে সে একাজ কিছুতেই করতো না। তাদের ওই বিধ্বস্ত অবস্থাকে উপলক্ষ করে— ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু ইন্নামাল্ খমরু ওয়াল মাইসিরু— আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন তাঁরা বললেন শরাব তাহলে অপবিত্র। কিন্তু আমাদের ওই সকল সঙ্গীদের অবস্থা কী হবে, যারা ইতোপূর্বে সংঘটিত উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তখন

www.eelm.weebly.com

অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের সর্বশেষটি (৯৩)। আল্লাহ্পাক সুস্পষ্টরূপে জানালেন, 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তার জন্য তাদের কোনো পাপ নেই।' আরো জানালেন, 'ইজা মাত্তাক্বাও (যদি তারা সাবধান হয়), ওয়া আমানু (ও বিশ্বাস করে) ওয়া আমিলুস্ সলিহাত (এবং সৎ কর্ম করে)।' এরপর জানালেন, ছুম্মাত্তাক্বাও (অতঃপর মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার পর উভয়টি থেকে সাবধান হয়), ওয়া আমানু (এবং মদ জুয়া উভয়টি হারাম হওয়াকে মেনে নেয়), ছুম্মাত্তাক্বাও (তারপর— সকল প্রকার নিষেধাজ্ঞা থেকে পুনরায় বিরত থাকে), ওয়া আহ্সানু (এবং সৎকর্ম করে)। এখানে ওয়া আহ্সানু অর্থ নন্দিত কর্মকাণ্ড। অর্থাৎ ওই সুচারু ও সুন্দর উপাসনা যা সম্পাদন কালে তাদের প্রভুপ্রতিপালকের দর্শন অথবা বিদ্যমানতা অনুভূত হয়। সর্বশেষে বলা হয়েছে— 'ওয়াল্লহু ইয়ুহিব্বুল মুহ্সিনীন'। এ কথার অর্থ— এবং আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণগণকে ভালোবাসেন'

জ্ঞাতব্যঃ বোখারী ও অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, একবার হজরত জিব্রাইল রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসুলাল্লাহ্! ইহ্সান (উপাসনার সৌন্দর্য) কী? তিনি স. বললেন, আপনতম প্রভুর উপাসনা এমনভাবে সম্পন্ন করা যেনো আল্লাহ্পাক দৃশ্যমান হন। এ রকম সম্ভব না হলে অন্ততঃপক্ষে এতোটুকু বিশ্বাস রাখা যে, তিনি তো সর্বদ্রষ্টা। গ্রন্থকার এ হাদিসটির উপর আয়াতটির তাফসীর শেষ করেছেন।

ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর সহচরবৃন্দ সমভিব্যাহারে হুদায়বিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নোক্ত আয়াতটি।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৯৪

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَىْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের হাত ও বর্শা দ্বারা যাহা শিকার করা যায় সে বিষয়ে আল্লাহ্ অবশ্য তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন— যাহাতে আল্লাহ্ অবগত হন কে তাঁহাকে না দেখিয়াও ভয় করে। সুতরাং ইহার পর কেহ সীমালংঘন করিলে তাহার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

---

www.eelm.weebly.com

এখানে বলা হয়েছে, হাত ও বর্শা দ্বারা যা শিকার করা হয় সে বিষয়ে আল্লাহ্ পরীক্ষা করবেন। এই পরীক্ষা জীবন বা সম্পদ উৎসর্গ করার মতো বৃহৎ কোনো পরীক্ষা নয়। শাইয়িম মিনাস্ সইদি (যা অথবা যা কিছু শিকার) বলে সে কথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। শাই শব্দটির সঙ্গে তানভিন (দুই যের) ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরীক্ষা করার কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, হাত ও বর্শা দ্বারা যা শিকার করা যায়, সে বিষয়ে আল্লাহ্ অবশ্য তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। এ পরীক্ষা নিশ্চয় জীবন কিংবা সম্পদ উৎসর্গ করার মতো চরম গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। এ রকম বলা হয়েছে এজন্য যে, সাহাবীগণ যখন ওমরার ইহ্‌রাম পরিহিত অবস্থায় ছিলেন, তখন অনেক বন্যজন্তু তাঁদের শিবিরে ঢুকে পড়েছিলো। সেগুলোকে হাত দিয়ে ধরা যেতো অথবা সহজেই বর্শাবিদ্ধ করা যেতো। কিন্তু তাঁরা তো ছিলেন তখন ইহ্‌রাম অবস্থায়।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মুকাতিল বিন হাব্বান বলেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হুদায়বিয়ায় শিবির স্থাপনকারী ওমরাযাত্রী সাহাবীগণ সম্পর্কে। তাঁদের ওই শিবিরে অনেক বন্য শিকার এবং পাখি আসা যাওয়া শুরু করেছিলো। ইতোপূর্বে আর কখনও এ রকম দেখা যায়নি। সাহাবীগণ ছিলেন ইহ্‌রামের পোশাক পরিহিত অবস্থায় আর ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ করে তাঁদেরকে পরীক্ষা করেছিলেন আল্লাহ্‌পাক।

'লিইয়া'লামাল্লহু মাঁইইয়াখাফুহু বিল গইবি' অর্থ— যাতে আল্লাহ্ অবহিত হন, কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে। এখানে লিইয়া'লামা (অবহিত হন) এর সম্পর্ক রয়েছে ইয়াব্‌লুআ (পরীক্ষা করবেন) কথাটির সঙ্গে। কেননা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা আল্লাহ্‌কে না দেখে ভয় করে এবং যারা করে না, তাদেরকে পৃথক করে দেয়া। এমতাবস্থায় 'অবহিত হন' কথাটির অর্থ হবে—প্রকাশ করেন বা বাস্তবায়িত করেন। অর্থাৎ ভীত হওয়া না হওয়ার বিষয়টি বাস্তবায়িত হওয়ার পর তিনি তা ওইরূপ জানবেন, যেরূপ জানতেন পূর্বেও। আল্লাহ্‌পাক আদি-অন্তের জ্ঞানসম্পন্ন। তাই সকল ঘটিতব্য বিষয় তিনি সংঘটিত হওয়ার পূর্বেও জানেন। পরেও জানেন। পূর্বে জানেন এজমালী হিসেবে এবং পরে জানেন তাফসিলী হিসেবে। অর্থাৎ প্রথমে সমষ্টিগত হিসেবে এবং পরে বাস্তবে বিস্তৃতরূপে। এভাবেই তাঁর চিরন্তন ও পরিপূর্ণ জ্ঞান পূর্বাপর সকল জানিত বিষয়কে পরিবৃত করে রয়েছে। তাঁর জ্ঞান চিরবিদ্যমান ও চিরস্থায়ী। কিন্তু কোনো ঘটনাকে প্রকাশ পেতে গেলে তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন হয়। বাস্তবায়নপূর্ব অবস্থার সঙ্গে সওয়াব বা আযাবের কোনো সম্পর্ক নেই। সওয়াব বা আযাব প্রবর্তিত হয় স্থূল বা বাস্তব জগতে, ঘটনার প্রকাশ হওয়ার পর। এখানে সেই প্রকাশিত ঘটনার সঙ্গেই সম্পৃক্ত হবে পরীক্ষা ও অবহিতির বিষয়টি। অর্থাৎ এজমালী হিসেবে আল্লাহ্‌পাক যা আগে থেকেই জানেন, তাই এখানে জেনে নিবেন বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে।

www.eelm.weebly.com

'কে তাঁকে না দেখেও ভয় পায়' (মাঁইইয়াখাফুহু বিল গইব)। দু'টো অর্থ হতে পারে এ কথাটির। একটি হচ্ছে— কে না দেখে আল্লাহ্‌কে ভয় করে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে— শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার আগেই কে আল্লাহ্‌কে ভয় করে। আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের উপরে অত্যন্ত দয়ালু। তিনি চান, তাঁর প্রতি আস্থাস্থাপনকারীরা তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকুক। তাই তিনি পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দিচ্ছেন ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ হওয়ার আজ্ঞা। শেষে এ কথা আরো সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়েছেন— ফামানি' তাদা বা'দা জালিকা ফালাহু আজাবুন আ'লীম। এ কথার অর্থ, সুতরাং এরপর কেউ সীমালংঘন করলে তারজন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। অর্থাৎ ইহ্‌রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ শিকার থেকে যে বিরত থাকতে পারবে না সে ওই সকল বিষয় থেকে নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে পারবে— যেগুলোর প্রতি প্রবৃত্তি অধিকতর আকৃষ্ট।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, উপরে আলোচিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আবুল ইয়াসার নামক এক ব্যক্তি ইহ্‌রামের পোশাক পরিহিত থাকা সত্ত্বেও একটি বন্য গর্দভকে আক্রমণ করে হত্যা করে ফেললো। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৯৫

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ۝

❑ হে বিশ্বাসীগণ! ইহ্‌রামে থাকাকালে তোমরা শিকার জন্তু বধ করিও না; তোমাদের মধ্যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে উহা বধ করিলে যাহা বধ করিল তাহার বিনিময় হইতেছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যাহার ফয়সালা করিবে তোমাদের মধ্যে দুইজন ন্যায়বান লোক—কাবাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে। অথবা উহার বিনিময় হইবে দরিদ্রকে অন্নদান করা কিংবা সমপরিমাণ সিয়াম পালন করা,

www.eelm.weebly.com

যাহাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যাহা গত হইয়াছে আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন; কেহ উহা পুনরায় করিলে আল্লাহ্ তাহার শাস্তি দিবেন; এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।

এখানে ইহরাম অবস্থায় ওই সকল বন্য জন্তুকে বধ করতে নিষেধ করা হয়েছে— যেগুলো বন্য এবং হত্যাযোগ্য নয়। সেগুলোর গোশত খাওয়া যাক অথবা না যাক। কামুস অভিধানের বিবরণ এ রকম। ইমাম আবু হানিফা সঈদ বা শিকারের পরিচয় দিয়েছেন এভাবেই। কিন্তু তিনি ওই সকল প্রাণীকে এ নিষেধাজ্ঞা থেকে পৃথক করেছেন যেগুলো বিষাক্ত, হিংস্র এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর। যেমন সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, চিল, কাক এবং আক্রমণপ্রবণ পাখি। কুকুর অথবা পাগলা কুকুরকে হত্যা করা যাবে। কারণ, কুকুর স্বভাবগত দিক থেকে বন্য জন্তুদের দলভুক্ত। কুকুর প্রতিপালন করা এবং তাকে পোষ মানানো কিছুটা হলেও বিপজ্জনক। শিক্ষিত কুকুর অবশ্য শিকারী, শিকার নয়। কেউ কেউ আবার বলেছেন, কুকুর স্বভাবগতভাবে বন্য নয়। তাই কুকুরকে শিকার বলা যায় না। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, একবার রসুল স. কে জিজ্ঞেস করা হলো, মুহ্রিম (ইহ্রামধারী) কোন ধরনের পশু হত্যা করতে পারে? তিনি স. বললেন, বৃশ্চিক, মুষিক, কাক, চিল এবং কুকুর হত্যা করলে কোনো গোনাহ্ হবে না। বোখারী ও মুসলিমে জননী আয়েশার বর্ণনায় পাঁচটি পশুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে জাওজী বলেছেন, হাদিসে উল্লেখিত 'কালব্' শব্দটির অর্থ হিংস্র পশু-পাখি। সাধারণভাবে হিংস্র প্রাণীকে কালোব বলা হয়ে থাকে। রসুলপাক স. উৎবা বিন আবী লাহাব সম্পর্কে অপপ্রার্থনা করেছিলেন এভাবে— আয় আল্লাহ্! আপনার কুকুরের মধ্য থেকে যে কোনো কুকুরকে (যে কোনো হিংস্র প্রাণীকে) তার উপর চড়াও করে দিন। বলা বাহুল্য, তাঁর এ প্রার্থনা কবুল হয়েছিলো এবং উৎবাকে বাঘে ছিঁড়ে খেয়েছিলো। আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন, 'মিনাল জাওয়ারিহি মুকাল্লিবিন্' (হিংস্র জন্তুদের মধ্য হতে আক্রমণকারী)।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, শব্দগত দিক থেকে 'কালব্' থেকে হিংস্র পশু মেনে নেয়া হলেও শব্দটির প্রসিদ্ধ অর্থ কুকুর। হাদিস শরীফে যে পাঁচটি হিংস্র জন্তুর কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে প্রচলিত অর্থে ধরাই উত্তম। সুতরাং এ কথাটি মেনে নিতে হয় যে, কাল্ব অর্থ কুকুর— সকল হিংস্র জন্তু নয়।

জননী আয়েশার মাধ্যমে আবু আওয়াসাহ ছয়টি হিংস্র পশুর কথা উল্লেখ করেছেন। এ রকম বর্ণনা রয়েছে বোখারী শরীফেও। হজরত আবু সাঈদ থেকে আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, মুহ্রিম ব্যক্তি সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, আক্রমণপ্রবণ কুকুর, চিল এবং হিংস্র পশু-পাখি হত্যা করতে পারে। কিন্তু

www.eelm.weebly.com

কাক হত্যা করতে পারে না। কাক তাড়ানোর জন্য কেবল ইট, পাথর নিক্ষেপ করতে পারে। তিরমিজিও এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় হিংস্র পশু-পাখি কথাটি নেই। হাসান বলেছেন, এখানে ওই কাকদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে— যেগুলো প্রান্তরবাসী।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে খুজাইমা এবং ইবনে মুনজির যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাতে রয়েছে সাতটি পশুর কথা। তার মধ্যে পাঁচটি প্রসিদ্ধ এবং তার সঙ্গে বাড়ানো হয়েছে আরো দু'টি— বাঘ ও চিতা। আবার ইবনে খুজাইমা বলেছেন, হাদিসে উল্লেখিত 'কালবী আক্বোর' অর্থ বাঘ ও চিতা। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের মুরসাল বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. বলেছেন, মুহ্‌রিম সাপ ও বাঘ হত্যা করতে পারবে। বর্ণনাটি সংকলন করেছেন ইবনে আবী শায়বা, সাঈদ বিন মনসুর এবং আবু দাউদ। জননী আয়েশা থেকে মুসলিমের বর্ণনায় চারটি পশুর উল্লেখ রয়েছে। প্রসিদ্ধ পাঁচটি পশুর মধ্যে সেখানে বিচ্ছুর কথা নেই।

একটি প্রশ্নঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোরআনের কোনো বিধানকে কোনো হাদিসে আহাদ দ্বারা সীমাবদ্ধ করা সিদ্ধ নয়। (কেননা কোরআনের হুকুম সাধারণ, উন্মুক্ত ও ব্যাপকার্থক। তাই ইমাম আবু হানিফা একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা ওই ব্যাপকতাকে সুনির্দিষ্ট করে নেয়াকে সিদ্ধ বলে স্বীকার করেননি)। অথচ এখানে সঈদ (শিকার) শব্দটি একক বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে নেয়া হলো কেনো?

উত্তরঃ বর্ণিত হাদিসটিকে সকল আলেম বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করেছেন। একক বর্ণিত হলেও হাদিসটির মর্যাদা প্রসিদ্ধ হাদিসের মতো। সুতরাং এ রকম ব্যাপক বিদিত হাদিসের মাধ্যমে কোরআনের উদ্দেশ্যকে সুনির্ধারিত করা সিদ্ধ। এ রকমও হতে পারে যে, সাহাবীগণের ঐকমত্যানুসারে মুহ্‌রিম কোনো কোনো প্রাণীকে হত্যা করতে পারে। কোরআন মজীদে উল্লেখিত সঈদ বা শিকার বধ করার বিধানটি একটি সাধারণ বিধান। এর মধ্যে বিশেষভাবে যেগুলো এর ব্যতিক্রম, সেগুলোই কেবল হাদিস শরীফের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, যে সকল পশুর গোশত খাওয়া হালাল, মুহ্‌রিম সেগুলোকে হত্যা করতে পারবে না। আর যেগুলোর গোশত খাওয়া হালাল নয় সেগুলো হত্যা করতে পারবে। সেগুলোর ক্ষেত্রে শুধু গোশত খাওয়া হারাম, কিন্তু বধ করা হারাম নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো কোনো পশুর হুকুম এ রকম যে, সেগুলোকে হত্যা করা যায়, কিন্তু সেগুলোর গোশত ভক্ষণ করা যায় না। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কিছু শিকারী হিংস্র পাখি এবং বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ। যে পাখিরা শিকারী নয় আবার হিংস্র প্রাণীর মধ্যেও পড়ে না, এ রকম কিছু কিছু পাখির গোশত খাওয়াও হারাম। যেমন— চিল, কাক ইত্যাদি। বিষয়টি

www.eelm.weebly.com

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের পর আমরা এ কথা বুঝতে পারলাম যে, যেগুলোর গোশত হারাম সেগুলোকে হত্যা করা বৈধ। এ কারণটিকেই কিয়াসী নিয়মে হাদিসের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

আমি বলি, গোশত হারাম হলেই যে পশুকে হত্যা করা বৈধ— এ রকম মনে করা ভুল। হারাম হওয়া না হওয়ার উপরে মুহ্‌রিমের শিকার করা জায়েয অথবা নাজায়েয হতে পারে না। এ রকম কিয়াস জায়েয নয়।

আমার নিকট 'বাদায়ে' গ্রন্থের রচয়িতার অভিমতটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন— যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল নয় ওই সকল প্রাণীর মধ্যে যেগুলো হিংস্র এবং আক্রমণপ্রবণ, মুহ্‌রিম কেবল সেগুলোকেই হত্যা করতে পারবে। যেমন, কাক, চিল— এ সকল প্রাণীর গোশত হারাম। কিন্তু এগুলো হিংস্র নয় বলে মুহ্‌রিম এগুলোকে হত্যা করতে পারবে না। হত্যা করতে পারবে কেবল হিংস্র পাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদিকে। অতএব, প্রাণীবধ বৈধ হওয়ার কারণ হিংস্রতা— গোশত হালাল হওয়া না হওয়া এখানে প্রধান কারণ নয়। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু ইউসুফও এ রকম অভিমত পোষণ করেছেন। ফতওয়ায়ে কাযীখানেও এ রকম বলা হয়েছে।

হিংস্র ও ক্ষতিকর প্রাণী কয়েক রকমের—

১. শরীরের মধ্যে বিষ প্রবেশ করায়— এ রকম প্রাণী। যেমন, বিচ্ছু এবং বিচ্ছুর মতো অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণী।

২. এমন প্রাণী যেগুলো দংশন করে এবং জখম করে। যেমন, ইঁদুর, বেজি ইত্যাদি।

৩. থাবা বিস্তার করে ছোঁ মারে। যেমন, বাজপাখি, শকুন, এক ধরনের হিংস্র চিল ও কাক ইত্যাদি।

৪. এমন প্রাণী— যা উন্মত্ত ও বন্য, যা দংশনপ্রবণ এবং মানুষ দেখলেই যা আক্রমণোদ্যত হয়। যেমন, উন্মত্ত কুকুর। পোষা কুকুরের মধ্যেও এক ধরনের উন্মত্ততা বিদ্যমান। এই শ্রেণীর মধ্যে সকল হিংস্র জন্তু অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে গৃহপালিত পশু বলা যায় না। এগুলো গরু, মহিষ, ঘোড়া ইত্যাদির মতো গৃহপালিত নয়। কিন্তু বন্য গরু, মহিষ, ঘোড়া ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর অন্তর্ভুক্ত।

মাসআলাঃ মুহ্‌রিম শিকারযোগ্য প্রাণীর প্রতি ইঙ্গিতও করতে পারবে না। মুহ্‌রিমের ইঙ্গিত পেয়ে কোনো গায়ের মুহ্‌রিম (যে ইহরাম পরিহিত নয়) যদি কোনো প্রাণী শিকার করে, তবে মুহ্‌রিমও ওই হত্যাকর্মের অঙ্গীভূত হয়ে

www.eelm.weebly.com

পড়বেন। মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়ালে থাকা শিকার নিরাপদ। মুহ্‌রিম ওই শিকারকে দেখলেও কথায়, কাজে বা ইশারায় সেই শিকারকে দেখিয়ে দিতে পারবে না। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, সকল সাহাবী ইহ্‌রাম পরিহিত ছিলেন। কেবল হজরত আবু কাতাদা ছিলেন ইহরামমুক্ত অবস্থায়। ওই সময় হজরত আবু কাতাদা হঠাৎ একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে সেটিকে বধ করলেন। তারপর সেটিকে জবাই করে রান্নার পর সকলে মিলে গাধাটির গোশত ভক্ষণ করলেন। এই হাদিসের শেষে বলা হয়েছে, সকলে উপস্থিত হলেন রসুল স. সকাশে। তিনি স. বললেন, তোমরা কেউ কি আবু কাতাদাকে (কথায় বা ইঙ্গিতে) শিকার দেখিয়ে দিয়েছিলে। সাহাবীগণ বললেন, না। তিনি স. বললেন, তবে তোমরাও গোশত খেতে পারবে।

এখানে দেখা যাচ্ছে রসুল স. মুহ্‌রিমের জন্য ওই শিকারের গোশত খাওয়াকে জায়েয করে দিয়েছেন, যার প্রতি তারা শিকারীকে কোনো ইশারা ইঙ্গিত দেননি।

মাসআলাঃ পাখির ডিমের হুকুমও শিকারের মতো। দাউদ জাহেরী বলেছেন, ডিম ভেঙে ফেললে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু একটু পরেই একটি হাদিস এবং সে সম্পর্কে সাহাবীগণের অভিমতের আলোচনায় আমরা প্রমাণ পাবো যে, ডিম ভাঙলেও মুহ্‌রিমকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

মাসআলাঃ মুহ্‌রিম কর্তৃক শিকারকৃত ও জবেহ্‌কৃত প্রাণী মৃতজীব তুল্য। ওই শিকারের গোশত খাওয়া মুহ্‌রিম, গায়ের মুহ্‌রিম উভয়ের জন্য হারাম। সওরী, জমহুর। আবু ছাওর এবং কতিপয় আলেম অবশ্য ওই প্রাণীর গোশত খাওয়াকে জায়েয বলেছেন। তাঁদের মতে ব্যাপারটি এ রকম— যেমন কোনো চোর কোনো পশু চুরি করে এনে জবাই করলো। ইমাম শাফেয়ীর উক্তিও এ রকম। আমরা বলি, মুহ্‌রিমের জন্য জবাই করা গোনাহ্‌। সুতরাং, তার জবাই ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে জবাই করার মতো। সুতরাং তার জবাই গাইরুল্লাহ্‌র নামে জবাইতুল্য। চুরি করা পশু জবাই করার ব্যাপারটি এ রকম নয়। চোর যদি চুরির পশু জবাই করে, তবে তার জবাইয়ের মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই। কিন্তু ওই জবাইকৃত পশুর মধ্যে অন্যের অধিকার রয়েছে। তাই জবাইয়ের মধ্যে কোনো দোষ না থাকলেও অন্যের অধিকার বিনষ্টের কারণে তাকে ক্ষতিপূরণ অবশ্যই দিতে হবে। আর ক্ষতিপূরণ দিলেই কেবল অন্যের হক পূরণ করা সম্ভব।

মাসআলাঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তির কথায়, আচরণে অথবা কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ইশারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কোনো গায়ের মুহ্‌রিম ব্যক্তি যদি কোনো শিকার করে, তবে ওই শিকারের গোশত মুহ্‌রিম খেতে পারবে না। কিন্তু গায়ের মুহ্‌রিম খেতে পারবে। জমহুরের অভিমতও এ রকম— ওই শিকারের গোশত মুহ্‌রিমের জন্য হারাম, কিন্তু গায়ের মুহ্‌রিমের জন্য হালাল। এ সম্পর্কে একটু আগেই হজরত আবু কাতাদার হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে, 'ওয়া মান কৃতালাহু মিনকুম মুতাআম্‌মিদান'— এ কথার অর্থ, 'তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে উহা বধ করলে'। এ বর্ণনাভঙ্গিটির দিকে লক্ষ্য করে হজরত সাঈদ বিন যোবায়ের, দাউদ, আবু ছাওর, আবু মুনজির এবং শাফেয়ী বলেছেন, ভুলবশতঃ বা বাধ্য হয়ে কিংবা অন্য কোনো কারণে মুহ্‌রিম অবস্থায় যদি কেউ শিকার করে তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ (কাফফারা) ওয়াজিব হবে না (যে কাফফারার কথা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে)। কারণ, মুহ্‌রিম এখানে 'ইচ্ছাকৃতভাবে' হত্যা করেনি। ইমাম আহমদও এ রকম বলেছেন।

মুজাহিদ এবং হাসানও 'ইচ্ছাকৃতভাবে'— কথাটির উপরে জোর দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, ক্ষতিপূরণ ওই সময় ওয়াজিব হবে, যখন মুহ্‌রিম ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাণী বধ করবে। সুতরাং তার প্রাণী বধ ইচ্ছাকৃত না হওয়া সত্ত্বেও যদি সে ক্ষতিপূরণ দেয়, তবুও তার পাপস্খলন হবে না। এ রকম ব্যক্তির সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌পাকের উপর নির্ভরশীল (আল্লাহ্‌পাক তাকে এর জন্য শাস্তিও দিতে পারেন অথবা ক্ষমাও করতে পারেন)।

জমহুর ওলামা এবং চার ইমামের বক্তব্য হচ্ছে— আলোচ্য আয়াতের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ সর্বাবস্থায় ওয়াজিব প্রাণীবধ ইচ্ছাকৃত হোক অথবা অনিচ্ছাকৃত। জেনে শুনে হত্যা করুক অথবা ভুলবশতঃ। ইহ্‌রাম পরিহিত অবস্থায় শিকারযোগ্য প্রাণী বধ করা হারাম— এ জ্ঞান তার থাকুক অথবা না থাকুক।

ইমাম জুহ্‌রী বলেছেন, ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর উপর ক্ষতিপূরণ বাধ্যতামূলক— এ কথা এই আয়াত দ্বারাই স্বীকৃত। আর ভুলবশতঃ হত্যাকারীর উপরেও ক্ষতিপূরণ অত্যাবশ্যক। এ কথাটি প্রমাণিত হয়েছে হাদিস শরীফের মাধ্যমে। এর বিপরীত প্রমাণ হানাফীদের নিকট গ্রহণীয় নয়। অর্থাৎ আয়াতে যেহেতু ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষতিপূরণের বিবরণ রয়েছে, সুতরাং অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রাণী হত্যা করলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না— হানাফীগণ এ রকম মতকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন না। এ রকম ধারণার চেয়ে হাদিস শরীফের বিবরণ অধিকতর শক্তিশালী। আর ঐকমত্যের মাধ্যমেও এ কথা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত— সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ অত্যাবশ্যক।

হজরত জাবের থেকে ইবনে জাওজী বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. এর নিকট বিজ্জু (উদ্) হত্যা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি স. বললেন, এই প্রাণীটিও শিকারযোগ্য প্রাণী। কোনো মুহ্‌রিম যদি প্রাণীটিকে হত্যা করে, তবে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তার উপর ওয়াজিব হবে ভেড়া কিংবা দুম্বা কোরবানী করা। বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন তিরমিজি। দমে বদলকে (প্রাণী বধের বদলা বা ক্ষতিপূরণস্বরূপ কোরবানী করাকে) যাঁরা সাধারণ হুকুম বলেছেন, তাঁদের নিকটেও এ রকম হত্যাকাণ্ড পুনঃপুন ঘটানো নিষিদ্ধ। কারণ, পরবর্তী আয়াতের শেষদিকে বলা হয়েছে 'কেউ উহা পুনরায় করিলে, আল্লাহ্ তার শাস্তি দিবেন'।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ মুহ্‌রিম যদি হাত দিয়ে অথবা অন্য কোনো অঙ্গের ইশারায় কোনো শিকারীকে শিকার দেখিয়ে দেয়, আর শিকারী যদি ওই প্রাণীটিকে হত্যা করে, তবে ওই মুহ্‌রিমের উপর ক্ষতিপূরণ অত্যাবশ্যক হবে। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদও এ রকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক বলেছেন, ওই মুহ্‌রিমের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না, কিন্তু সে গোনাহ্‌গার হবে। যেমন, কেউ যদি কোনো রোজাদার ব্যক্তিকে মুখের কথায় বা ইশারায় কোনো বেগানা রমণীকে দেখিয়ে দেয়, আর রোজাদার ব্যক্তি যদি ওই মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পাপকর্মে লিপ্ত হয় তবে ওই ইশারাকারী ব্যক্তির উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। সে যদি রোজাদার হয়, তবে তার রোজাও ভঙ্গ হবে না। কিন্তু পাপ পথ প্রদর্শনের জন্য সে গোনাহ্‌গার অবশ্যই হবে। সুতরাং শিকার দেখিয়ে দেয়া অথবা তার প্রতি ইশারা করা অর্থ হত্যা করা নয়। আর যে হত্যাকারী নয়, তাকে হত্যার ক্ষতিপূরণও দিতে হবে না।

আমরা বলি, মুখে শিকার করার কথা বলা হত্যা করার মতোই। রসুল স.ও ইশারাকে হত্যার সমান্তরাল বলে উল্লেখ করেছেন। হজরত আবু কাতাদা বর্ণিত হাদিসে এ রকম বলা হয়েছে। আরেকটি কথা হচ্ছে এই, যে মুহ্‌রিম হত্যার কথা বললো, তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না হলেও বলে দেয়ার পাপ তার উপর থেকেই যাবে। কেননা ঐকমত্যানুসারে এ রকম বলা নিষিদ্ধ। আর সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, ক্ষতিপূরণ দিলে হত্যার পাপ দূরীভূত হয়। হত্যার কথা বলা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ (যদিও বাহ্যিক অবস্থা এর বিপরীত)।

একটি প্রশ্নঃ মুখে বা ইশারায় হত্যা করতে বলা যদি হত্যা সমতুল্য হয়, তবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত না হওয়া সত্ত্বেও তার উপর ক্ষতিপূরণ কি ওয়াজিব হয় না?

উত্তরঃ বলা এবং ইশারা করা হত্যার কারণ বা উৎস। যেমন, তীর নিক্ষেপ করাও হত্যার কারণ। কিন্তু কেবল তীর নিক্ষেপ করলেই ক্ষতিপূরণ অত্যাবশ্যক হয় না— অত্যাবশ্যক হয় তখনই যখন তীর বিদ্ধ হয়ে কোনো প্রাণী মারা যায়। এভাবে তীরবিদ্ধ হয়ে মারা না যাওয়া পর্যন্ত তীর নিক্ষেপকে আবার হত্যার কারণও বলা যায় না। সুতরাং মুখে বা হাতের ইশারাকে তখনই হত্যার সমান্তরাল বলা যেতে পারবে, যখন হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হবে।

'যাহা বধ করিল তাহার বিনিময় হইতেছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু'— এ কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওয়াজিব হবে ওই রকমই একটি পশু, যে রকম পশুকে মুহ্‌রিম হত্যা করেছে।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, যে পশুকে হত্যা করা হয়েছে সেই পশুটির তুল্য একটি পশুকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোরবানী করা উচিত। অর্থাৎ আকৃতি ও প্রকৃতির দিক থেকে দু'টি পশুর সমতুল্য হওয়াই উচিত। কিন্তু

www.eelm.weebly.com

ঐকমত্যাগত অভিমত এই যে, বধকৃত পশু এবং ক্ষতিপূরণের (কোরবানীর) পশুকে অবিকল এক রকম হতে হবে— এ রকম কথা আয়াতে বলা হয়নি। বলা হয়েছে রূপক সাদৃশ্যের (মিছলে মা'নুবীর) কথা। অর্থাৎ কোরবানীর পশুটিকে হতে হবে শিকার করা পশুটির মূল্যমানের সমান।

মেসাল (অনুরূপ) শব্দটি দু'রকম অর্থে ব্যবহৃত হয়— সমআকৃতির অথবা সমমূল্যের। এখানে 'সমমূল্যের' অর্থটি গ্রহণীয়। এ ব্যাপারে সকল আলেম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে— যে শিকারটি বধ করা হয়— তা আকৃতিগত দিক থেকে উট, গাভী, মহিষ, ছাগল, ভেড়া কোনোটির সঙ্গেই তুল্য নয়। শিকার হিসেবে বধ করা হয়েছে হয়তো চড়ুই, ফড়িং ইত্যাদি। আর সেগুলো নিশ্চয় আকৃতিগত দিক থেকে উট, গাভী ইত্যাদির সঙ্গে তুলনীয় নয়। সুতরাং এখানে মেসাল শব্দটির প্রকৃত অর্থ এবং পরোক্ষ অর্থের সংমিশ্রণও সম্ভব নয়। হানাফিগণের মতে এ রকম সংমিশ্রণ অসিদ্ধ। অতএব, 'সমমূল্যের' অর্থটিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'যদি তোমার উপর কেউ বাড়াবাড়ি করে তবে সেরকম এবং যতটুকু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে ততটুকু বদলা তুমি নিতে পারবে।' এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে— কোনো বস্তু নষ্ট করা হলে আকৃতিগত দিক থেকে অবিকল অনুরূপ বস্তু যদি পাওয়া না যায়, তবে মূল্যের দিক থেকে অনুরূপ বস্তুর সন্ধান করতে হবে। একই জাতের পশুর মধ্যেও আবার বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই মূল্যগত আনুরূপ্যই গ্রহণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আরো বলা যেতে পারে— যেমন, উট এবং উটপাখি। এ দু'টোর মধ্যে মিল ততটুকু যে— দু'টোরই গলা এবং পা লম্বা। তবুও এ দু'টোর মধ্যে আকৃতিগত আনুরূপ্য রয়েছে, এ কথা বলা যায় না। যেমন, কবুতর শিকার করলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ছাগল কোরবানী দিতে হবে। এ দু'টোর মধ্যেও আকৃতি বা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য নেই। অতএব, এ কথাটি মেনে নিতে হবে যে, বধকৃত পশু এবং কোরবানীর পশুর আকৃতিগত আনুরূপ্য থাক অথবা নাই থাক— মূল্যগত আনুরূপ্য থাকলেই চলবে।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, এখানে 'অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু' অর্থ ছাগল, ভেড়া, গাভী, মহিষ এবং উট। এগুলোও সৃষ্টিগত দিক থেকে (প্রাণী হিসেবে) শিকারকৃত পশুর তুল্য। রসুল স. বলেছেন, উদ শিকার করলে কোরবানী দিতে হবে একটি ছাগল। হজরত আবদুল্লাহ্ থেকে হাকেম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে। এই হাদিসটি আবার ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান এবং আসহাবে সুনান বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের থেকে। হাকেম তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, উদ একটি শিকারযোগ্য প্রাণী। মুহ্‌রিম ব্যক্তি এই উদ শিকার করলে তাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোরবানী করতে হবে একটি ভেড়া অথবা দুম্বা। হাকেম আরো বলেছেন, বর্ণনাটি অধিকতর বিশুদ্ধ। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে এবং ইমাম শাফেয়ী

www.eelm.weebly.com

বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন এভাবে- হজরত ওমর সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, মুহ্রিম ব্যক্তি একটি উদ শিকার করলে একটি ভেড়া এবং একটি হরিণ শিকার করলে একটি ছাগল কোরবানী করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদ সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, ইহরামের বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় বন্য ইঁদুর বধ করলে কোরবানী করতে হবে পুরুষ কিংবা স্ত্রী ছাগল অথবা ছাগলের পুরুষ বাচ্চা। বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হেরেম শরীফের কবুতর হত্যা করলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোরবানী করতে হবে একটি বকরি। দু'টো ডিম ভাঙলে কাফফারা দিতে হবে এক দিরহাম। উটপাখি শিকার করলে একটি উট, নীল গাভীকে হত্যা করলে একটি পালিত গাভী অথবা মহিষ এবং বন্য গাধা বধ করলে একটি গাভী কোরবানী দিতে হবে।

মালেকী ও শাফেয়ীগণের একটি দলিল হচ্ছে— আল্লাহ্পাক এখানে বলেছেন 'মিনান্ নাআম'। এখানে নাআমের উদ্দেশ্য হচ্ছে উট, গাভী অথবা বকরী। এগুলো কেবল উদাহরণ মাত্র। এ সকল পশুর মূল্যের কথা এখানে বলা হয়নি। (অতএব, মেসাল বা অনুরূপ অর্থ এখানে মূল্যের অনুরূপ হতে পারে না)।

মালেকী ও শাফেয়ীগণের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হানাফীগণ বলেছেন, রসুল স. এবং সাহাবীগণের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এখানে 'অনুরূপ' শব্দটির অর্থ হবে মূল্যের অনুরূপ। এখানে 'কৃতালা মিনান্ নাআম' (উহা বধ করিলে) এ কথা বলে বুঝানো হয়েছে বধিত পশু যদি চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে হয়, তবে অনুরূপ জন্তুর মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ করা ওয়াজিব। হজরত আবু উবাদা বলেছেন, 'নাআম' বলতে যেমন গৃহপালিত পশু বুঝায়, তেমনি বন্য জন্তুও বুঝায়। কামুস অভিধান রচয়িতাও এ রকম বলেছেন।

হানাফীগণের বর্ণিত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এমতো আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, বধিত শিকার পশু বা পাখি যাই হোক না কেনো, সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব। সুতরাং, কেবল চতুষ্পদ জন্তুকে বধ করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে— এ রকম বললে তা হবে আয়াতের মূল বক্তব্যের বিপরীত। আমি বলি, এখানে 'মিনান্ নাআম' (অনুরূপ জন্তু) — এ রকম উদাহরণের অর্থ ওই সকল চতুষ্পদ জন্তু, যেগুলো গৃহপালিত এবং যেগুলোর মূল্য নির্ধারণ করা যায়। বধিত জন্তুর সঙ্গে ক্ষতিপূরণের জন্তুর অন্যান্য সামঞ্জস্য থাকা জরুরী কিছু নয়। অতএব মুহ্রিম ব্যক্তি কোনো প্রাণী বধ করলে তাকে বধিত জন্তুর সমমূল্যের অথবা ততোধিক মূল্যের পশু ক্ষতিপূরণরূপে কোরবানী করতে হবে।

বন্য গাধা, নীল গরু এবং ওই সকল শিকার যেগুলোর মূল্য ছাগলের চেয়ে বেশী, সেগুলোর কোনো একটিকে হত্যা করলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ কোরবানী করতে হবে একটি গৃহপালিত গাভী। ছাগলের চেয়ে বেশী কিন্তু গরুর চেয়ে কম— এ

www.eelm.weebly.com

রকম মূল্যের প্রাণী বধ করলে খুব বড় অথবা খুব ছোট নয়— এ রকম গরু কোরবানী করতে হবে। কিন্তু ওই গরুর মূল্য কিছুতেই শিকারের মূল্য থেকে কম হওয়া যাবে না। যদি শিকারের মূল্য গরুর চেয়ে বেশী হয়, তবে উট কোরবানী করা উচিত, যদিও শিকারের মূল্য গাভীর চেয়ে বেশী হয় এবং উটের সমান না হয়। উটের চেয়েও বেশী মূল্যের শিকারের ক্ষেত্রে কোরবানী করতে হবে একটি উট এবং একটি ছাগল অথবা একটি গরু এবং একটি ছাগল কিংবা একটি গরু ও একটি উট, অথবা দু'টি উট বা দু'টি গরু, অথবা দু'টি ছাগল। মোটকথা সবসময় শিকারের মূল্য বিবেচনা করে কোরবানী করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই কোরবানীর পশুর মূল্য শিকারের মূল্যের চেয়ে কম হওয়া চলবে না।

শিকারের মূল্য ছাগলের মূল্যের সমান হলেও কোরবানীযোগ্য অর্থাৎ নাক, কান, চোখ, হাত, পা ও লেজ— সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ, এ রকম শিকারের ক্ষেত্রে কোরবানী করতে হবে এমন ছাগল যা কোরবানীর উপযুক্ত।

শিকারের মূল্য ছাগলের মূল্যের চেয়ে কম হলে (যেমন উদ, বন্য ইঁদুর, হরিণ, গিরগিটি, গুইসাপ, শিয়াল ইত্যাদি) কোরবানী দিতে হবে শিকারের মূল্যানুসারে যে কোনো বয়সের ছাগল। এক্ষেত্রেও কোরবানীর ছাগলের মূল্য শিকারের মূল্য অপেক্ষা কম হতে পারবে না।

কবুতর অথবা কবুতরের চেয়ে কম মানের শিকারের বিনিময়ে কোরবানী করতে হবে একটি ছাগল। আর ছাগলটিকে হতে হবে কোরবানীর উপযুক্ত (বয়স ও সুস্থতার দিক থেকে ত্রুটিমুক্ত)। উক্তিটি আমাদের নিকট ফতোয়া হিসেবে গ্রহণীয়। জমহুর আলেমগণের মাসআলাও এ রকম। তাঁরা বলেছেন, কাফফারার কোরবানীর পশু এমন শর্তযুক্ত নয় যে, তা কোরবানীযোগ্য হতেই হবে। কিন্তু ইমাম আজমের নিকট দমে বদলের (কাফফারা বা ক্ষতিপূরণের) কোরবানী এমন হওয়া উচিত, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোরবানীর যোগ্য। তাই উদ, গিরগিটি— এ রকম প্রাণী বধ করা হলে কোরবানীর উপযুক্ত কোনো পশু কোরবানী করতে হবে।

ইমাম মালেক বলেছেন, শিকার ছোটবড় নিখুঁত ত্রুটিপূণ— যাই হোক না কেনো, তার বিনিময়ে দিতে হবে শরিয়তসম্মত কোরবানী। অর্থাৎ বয়স ও সুস্থতার দিক থেকে কোরবানীটিকে হতে হবে শরিয়তসম্মত। ইমাম আজম ও ইমাম মালেকের বক্তব্যের প্রমাণ হচ্ছে— 'হাদী' শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, এর অর্থ হাদীয়ে কামেল। অর্থাৎ শরিয়ত যে কোরবানীকে কোরবানীর উপযুক্ত মনে করেছে সেরকম পূর্ণ ও নিখুঁত কোরবানী। তাই হাদীয়ে তামাত্তু (তামাত্তু হাজীদের কোরবানী) কে হতে হয় শরিয়তসিদ্ধ কোরবানী— যা দেয়া হয় হজের সকল ত্রুটির কাফফারা স্বরূপ।

www.eelm.weebly.com

আমাদের জমহুরের দলিল এই যে, সাহাবায়ে কেরাম ছাগলের ছোট বাচ্চাকে কোরবানী করা ওয়াজিব বলেছেন (অথচ ছাগলের ছোট বাচ্চা কোরবানী করা শরিয়তসিদ্ধ নয়)। আবার আয়াতে উল্লেখিত হাদী এ রকম সাধারণ অর্থবোধক নয়, যাকে পূর্ণ কোরবানী বলে নির্ধারণ করা যায়— যেমন হাদীয়ে তামাত্তু ও অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। বরং এখানে হাদী (কোরবানী) শব্দটির উদ্দেশ্য ওই হাদী যা চতুষ্পদ জন্তুর মেসাল (অনুরূপ) হতে পারে। তাই আকৃতিগত দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোরবানীও জায়েয হবে— ইমাম শাফেয়ী যে রকম বলেছেন। অথবা মূল্যের দিক দিয়ে সমমানের কোরবানীও সিদ্ধ হবে— যে রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। সেক্ষেত্রে পশুকে কোরবানীযোগ্য হতেই হবে এমন বলার কারণ নেই।

আলোচ্য আয়াতটির যে ব্যাখ্যা আমি করেছি, তা কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের উক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন, খরগোশের পরিবর্তে কোরবানী করতে হবে ভেড়া। কেননা, ভেড়া ও খরগোশ সমমূল্যমানবিশিষ্ট। উট ও গরুর জন্য নিম্নতম ক্ষতিপূরণ হচ্ছে ছাগল কোরবানী করা এবং ছাগল বা ছাগলের বাচ্চার মূল্য কবুতরের মূল্যের কাছাকাছি। গরু ও উটের মূল্য কবুতরের মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু কবুতরের তুলনায় ছাগলের মূল্য উটের মূল্যের মতো অত্যধিক নয়। তাই কবুতরের পরিবর্তে ছাগল কোরবানীর কথা বলা হয়েছে।

এবার আসা যাক শিকার ও তার ক্ষতিপূরণের কোরবানীর পশুর শারীরিক সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে। শারীরিক দিক দিয়ে বধিত পশুর মতো কোরবানী হওয়া আবশ্যক— এ রকম কথার কোনো দলিল নেই। আতা খোরাসানী সূত্রে বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত জায়েদ বিন সাবেত, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত মুয়াবিয়া বলেছেন, উট পাখি বধ করলে মুহ্‌রিমকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোরবানী করতে হবে একটি উট। ইমাম মালেকের বর্ণনায় রয়েছে, আবু উবায়দা বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেছেন, আমার পিতার লিখিত অভিমত এ রকমই। ইমাম মালেক আরো বলেছেন, আমি এ কথা সবসময়েই শুনে এসেছি যে, উট পাখি নিধনের কাফফারা হচ্ছে উট। এখানে এ কথাটিও স্পষ্ট যে, শারীরিক সাদৃশ্যের কারণেই এ রকম ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে— মূল্যগত সাদৃশ্যের কারণে নয়। উট পাখির যেমন দীর্ঘ গলদেশ এবং দীর্ঘ পা রয়েছে, তেমনি রয়েছে উটের। কিন্তু এমতো উক্তি অশক্ত। আর এ রকম ধারণা অকাট্যও নয়, তাই একে গ্রহণ করা যায় না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এ রকম অভিমত হাদিস শাস্ত্রজ্ঞদের নিকট প্রমাণিত নয়। কিয়াসও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় না যে, উট পাখি ও উট সমতুল। এ রকমও হতে পারে যে, কোনো কোনো সময় হয়তো উট পাখির মূল্য উটের মূল্যের সমতুল হতো।

www.eelm.weebly.com

সাহাবীগণ হয়তো ওই সময়েই উট পাখির পরিবর্তে উট কোরবানীর কথা বলেছেন। আর পরবর্তী যুগের মানুষ এ রকম ঘটনাকে মনে করে নিয়েছে— শারীরিক সাদৃশ্যের কারণে উট পাখি শিকার করলে উট কোরবানী দিতে হবে। পরবর্তীতে তাবেয়ীদের যুগে এই ধারণাটি হয়ে গিয়েছিলো সুপ্রসিদ্ধ। তাই ইমাম মালেক বলেছেন, আমি সবসময় শুনে এসেছি উট পাখির পরিবর্তে কোরবানী করতে হবে উট।

একটি প্রশ্নঃ বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইকরামা বলেছেন, এক লোক হজরত ইবনে আব্বাসের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি ইহ্রামের পরিচ্ছদ পরিহিত অবস্থায় একটি খরগোশ হত্যা করেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, খরগোশের যেমন চারটি পা তেমনি ছাগলের পা চারটি। খরগোশ জাবর কাটে, ছাগলের বাচ্চাও জাবর কাটে। সুতরাং বধিত খরগোশের বিনিময় হিসেবে ছাগলের বাচ্চা কোরবানী করো। বর্ণনাটির মাধ্যমে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ইবনে আব্বাস এখানে আকৃতিগত আনুরূপ্যকেই বিবেচ্য বলে মেনেছেন।

ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আতা বলেছেন, এক লোক একটি কবুতর ও দু'টি কবুতরের বাচ্চাকে ঘরে আটকে রেখে আরাফা ও মিনায় গমন করেছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে দেখলেন, তিনটি কবুতরই মরে গিয়েছে। লোকটি তখন হজরত ইবনে ওমরের দরবারে হাজির হয়ে ঘটনাটি জানালেন। হজরত ইবনে ওমর বললেন, তোমাকে অতি অবশ্যই তিনটি ছাগল কোরবানী করতে হবে। সেখানে উপস্থিত এক ব্যক্তিও সিদ্ধান্তটিকে সমর্থন করলেন (কেননা এ আয়াতেই বলা হয়েছে— বধিত শিকার এবং তার ক্ষতিপূরণরূপী কোরবানীর পশুর আনুরূপ্য সম্পর্কে ফয়সালা করবেন দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক)। ইমাম সওরী, ইবনে আবী শায়বা, শাফেয়ী এবং বায়হাকী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, কবুতরের বিনিময়ে ছাগল— এ রকম সিদ্ধান্ত দানের ক্ষেত্রে মূল্যের প্রসঙ্গটি বিবেচিত হয়নি। নতুবা একটি কবুতর এবং দু'টি কবুতরের বাচ্চার জন্য একটি ছাগল কোরবানী করাই যথেষ্ট ছিলো। বরং এর চেয়ে বেশী কবুতরের জন্য একটি ছাগলই ছিলো যথেষ্ট।

আমি বলি, কতিপয় প্রসিদ্ধ সাহাবীর মাধ্যমে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, বধিত পশু ও কোরবানীর পশু তুলিত হবে আকৃতিগত দিক থেকে, মূল্যের দিক থেকে নয়। কিন্তু কোরআনের আয়াত নিশ্চয় সকল ক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রগণ্য। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফা জাযাউম মিছ্লু মা ক্বতালা মিনান্ নায়াম' (যা বধ করলো, তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু)। আর এ কথাটিও ঠিক নয় যে, শারীরিক দিক দিয়ে উট পাখি উটের অনুরূপ বা কবুতরের অনুরূপ

www.eelm.weebly.com

ছাগল। শরীর, আকার কোনো দিক দিয়েই বর্ণিত পশুগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। দূরবর্তী সাদৃশ্য যা কিছু রয়েছে, সেগুলোও সাদৃশ্য হওয়ার অযোগ্য। আর ওগুলোর মধ্যে শব্দগত সাদৃশ্যও নেই। প্রাণী হিসেবে সাদৃশ্যের কথা যদি বলা হয়, তবে এ রকম সাদৃশ্য তো সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যেই বিদ্যমান।

তারপর বলা হয়েছে, 'ইয়াহ্‌কুমুবিহি জাওয়া আদ্‌লিম্‌ মিন্‌কুম' (যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক)। — এ কথার অর্থ, মুহ্‌রিম অবস্থায় বধিত প্রাণীর ক্ষতিপূরণের কোরবানীর পশু কী রকম হবে, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। অধিকাংশ হানাফিগণের অভিমত এই যে, এক্ষেত্রে আনুরূপ্য যাচাইয়ের জন্য একজনের সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। বিভিন্ন হাদিসে সাহাবীগণের একক সিদ্ধান্তদানের কথাও এসেছে। অবশ্য দু'জনের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অতি উত্তম। এ রকম সিদ্ধান্ত অধিকতর নিরাপত্তাপ্রদায়ক।

ইমাম শাফেয়ী এবং জমহুরের সিদ্ধান্ত এই যে— এক্ষেত্রে যৌথ সিদ্ধান্ত অত্যাবশ্যক। এর উপরেই ফতোয়া হওয়া উচিত। আয়াতে এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সাহাবীগণের কার্যকলাপেও এ রকম প্রমাণ রয়েছে অনেক।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত মায়মুন বিন মেহরান বর্ণনা করেছেন, একবার এক গ্রাম্য লোক হজরত আবু বকর সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি ইহ্‌রাম অবস্থায় প্রাণী বধ করেছি। এখন ক্ষতিপূরণ দিবো কিভাবে? হজরত আবু বকর তখন হজরত উবাই বিন কা'বকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী বলেন? গ্রাম্য লোকটি বললো, আপনি আল্লাহ্‌র রসুলের স্থলাভিষিক্ত। তাই আমি আপনার কাছে বিধান জানতে এসেছি। অথচ আপনি অন্যকে জিজ্ঞেস করছেন। হজরত আবু বকর বললেন, তুমি কি জানো না, আল্লাহ্‌ পাক আজ্ঞা করেছেন, 'যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক'? এই আজ্ঞা পালনের নিমিত্তেই আমি আমার সাথীর সঙ্গে মতবিনিময় করছি। আমাদের যৌথ সিদ্ধান্ত অনুসারেই আমি তোমাকে নির্দেশ দান করবো।

হজরত আবু বকর মাজানী বর্ণনা করেছেন, এক মুহ্‌রিম একটি হরিণকে তাড়া করলো এবং অন্য মুহ্‌রিম সেটিকে হত্যা করলো। তারপর তারা দু'জনে উপস্থিত হলো হজরত ওমর সকাশে। হজরত ওমর তখন হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফের অভিমত জানতে চাইলেন। হজরত আব্দুর রহমান বললেন, আমার বিবেচনায় ক্ষতিপূরণস্বরূপ কোরবানী করতে হবে একটি ছাগল। হজরত ওমর বললেন, আমার বিবেচনাও তাই। তারপর আগন্তুকদ্বয়কে বললেন, তোমাদেরকে ছাগল কোরবানী করতে হবে। প্রত্যাবর্তনকালে আগন্তুকদ্বয়ের একজন অপরজনকে বললো, আমিরুল মু'মিনীন (হজরত ওমর) বিষয়টি জানতেন না। তাই তিনি তাঁর সঙ্গীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। হজরত ওমর এ কথা শুনে

www.eelm.weebly.com

ফেললেন। বললেন, দাঁড়াও। তোমাকে বেত্রাঘাত করা হবে। ইহ্রাম অবস্থায় প্রাণী বধ করেছো, আবার শরিয়তের বিধান সম্পর্কেও তুমি বেখবর। অথচ আল্লাহ্পাক নির্দেশ করেছেন 'যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক'। এখানে দেখা যাচ্ছে, হজরত ওমর এক্ষেত্রে এককভাবে সিদ্ধান্ত দান করেননি। সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যৌথভাবে।

মোহাম্মদ বিন সিরিনের মাধ্যমে ইমাম মালেক উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তি ইহ্রাম অবস্থায় হরিণ শিকারের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে হজরত ওমরের নিকট জিজ্ঞেস করলেন। হজরত ওমর তখন হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফকে বললেন, আসুন, আমরা দু'জনে মিলে বিষয়টির সমাধান দেই। এ কথা বলে তাঁরা দু'জনে তাঁদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত জানালেন—কোরবানী দিতে হবে ছাগল। প্রশ্নকারী লোকটি বললো, আমাদের আমিরুল মু'মিনীন, এমন এক ব্যক্তি, যিনি হরিণ শিকারের ফয়সালা নিজে নিজে করতে পারেন না— অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। হজরত ওমর এ কথা শুনে বললেন, তুমি কি সুরা মায়িদা পাঠ করো? লোকটি জবাব দিলো, না। হজরত ওমর বললেন, 'সুরা মায়িদা পাঠ করি'— এ কথা বললে আমি এখনই তোমাকে প্রহার করতাম। তুমি কি জানো না আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক'।

মাসআলাঃ যারা ইহ্রাম অবস্থায় হত্যাকৃত পশুর সঙ্গে ক্ষতিপূরণের পশুর শারীরিক সাদৃশ্য হওয়ার পক্ষে, তাঁদের ব্যাখ্যায় স্ববিরোধিতা রয়েছে। ইমাম মালেক বলেছেন, প্রত্যেক যুগে দু'জন ন্যায়বান মুসলমান ক্ষতিপূরণের স্বরূপ সম্পর্কে নিত্যনতুন সিদ্ধান্ত দান করবেন (যদিও তাদের ফয়সালা সাহাবায়ে কেরামের সিদ্ধান্তের বিপরীত হয়। কেননা, যুগ বদলের সাথে সাথে ক্ষতিপূরণের স্বরূপও পরিবর্তিত হয়)।

অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে, সলফে সালেহীন যদি কোনো বিষয়ে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়ে থাকেন তবে তা মেনে নেয়া ওয়াজিব। কোনো যুগেই তার বিপরীত বিধান দেয়া যাবে না। আর কোনো বিষয়ে যদি তাঁদের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না থাকে, তবে পরবর্তী জামানার দু'জন পুণ্যবান মুসলমান নতুন করে ফয়সালা করতে পারবেন। মাসআলাটি যদি ইজতেহাদ (গবেষণামূলক) হয়, তবে এমতোক্ষেত্রে মতপৃথকতার সুযোগ রয়েছে।

ইমাম সুফিয়ান সওরী বলেছেন, যে মাসআলায় ইমামগণের মতদ্বৈধতা রয়েছে, সে বিষয়ে প্রত্যেক যুগে দু'জন পুণ্যবান মুসলমানের ফয়সালাই প্রযোজ্য হবে— যদিও তা সলফে সালেহীনের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী এ ধরনের মন্তব্যের প্রতিকূল বধিত পশু এবং ক্ষতিপূরণের পশুর মধ্যে

www.eelm.weebly.com

শারীরিক আনুরূপ্যই যদি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়, তবে নতুন নতুন ফয়সালার সুযোগ আর কিভাবে থাকে? (পশুর শারীরিক সাদৃশ্য তো সকল যুগে একই রকম।

এবার আসা যাক 'সলফে সালেহীনের সিদ্ধান্তকে মান্য করা আমাদের জন্য ওয়াজিব'—মন্তব্যটি সম্পর্কে। এই মন্তব্যটিকে মান্য করলে কোরআনের বিধানই তো রহিত হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, দু'জন ন্যায়বানের সিদ্ধান্ত দেয়ার কথা। এ দু'জন নিশ্চয়ই যুগে যুগে বদল হতে থাকবেন। কোনো যুগের দু'জন ন্যায়বানকে তো আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। সুতরাং, কোনো এক যুগের সিদ্ধান্ত যদি অবশ্যপালনীয় হতো, তবে রসুল স. নিজেই তো সকল অথবা অধিকাংশ বধিত শিকার সম্পর্কে কোরআনের মাধ্যমে ফয়সালা করে দিয়ে যেতেন— দু'জন ন্যায়বানের সিদ্ধান্ত তাহলে প্রয়োজনই পড়তো না। অতএব, এ কথাটি স্পষ্ট যে, এমতোক্ষেত্রে সলফে সালেহীনের সিদ্ধান্ত পরবর্তীদের জন্য দলিল নয়। বরং প্রতি যুগে দু'জন ন্যায়বান পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ফয়সালা করার অধিকার রাখেন। আর এভাবে শেষ পর্যন্ত এ কথাটি প্রমাণিত হয় যে, বধকৃত পশু এবং ক্ষতিপূরণের পশুর আনুরূপ্য বিবেচনা করতে হবে মূল্যমানের ভিত্তিতে— আকারের ভিত্তিতে নয়। এই মূল্যমান নির্ধারণের জন্যই প্রতি যুগে প্রতি ঘটনায় দু'জন ন্যায়বানের সিদ্ধান্তদানের প্রয়োজন পড়ে। সর্ববাদীসম্মতরূপে এ কথাটিও সত্য যে, স্থান ও কালের তারতম্য ঘটলে মূল্যমানের তারতম্যও ঘটতে বাধ্য। তাই পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে ফয়সালার জন্য দু'জন পুণ্যবানের শরণাপন্ন হওয়া অপরিহার্য।

'হাদ্ইয়াম্ বালিগাল কা'বাতি'— অর্থ কাবাতে প্রেরিতব্য কোরবানীরূপে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'হাদ্ইয়ান' (প্রেরিতব্য কোরবানী) — কথাটি প্রমাণ করে যে, কাবায় প্রেরিত হয় কোরবানীর পশু, পশুর মূল্য নয়। সুতরাং, বধকৃত শিকারের সঙ্গে ক্ষতিপূরণের পশুর আকৃতিগত সাদৃশ্যই বিচার্য। কিন্তু বিষয়টি আমরা ইতোপূর্বে বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, বধিত শিকার আর ক্ষতিপূরণের পশুর আনুরূপ্য নির্ণিত হওয়া উচিত মূল্যমানের ভিত্তিতে। এ সম্পর্কে ইমাম আজমের বক্তব্য হচ্ছে, যথামূল্য দিয়েই কাবায় প্রেরিত কোরবানী ক্রয় করতে হয়। সুতরাং মূল্যমানই বিচার্য।

একটি প্রশ্ন ঃ ইমাম আজমের বিশ্লেষণে, 'অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু'— কথাটিকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। যদি হতো, তবে আকৃতিগত সাদৃশ্যই প্রাধান্যলাভ করতো। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁর বিশ্লেষণে তিনি কথাটিকে উল্লেখ করেননি কেনো?

উত্তরঃ কথাটি ঠিক নয়। প্রকৃত কথা হচ্ছে, এখানে দেখতে হবে, ইমাম আজম 'অনুরূপ' শব্দটির নিরিখ নির্ণয় করেছেন কিভাবে। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, 'অনুরূপ জন্তু' অর্থ বধিত শিকারের মূল্যমানের অনুরূপ জন্তু। যদি বলা হয়, 'অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু'— কথাটিকে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন, তবে তো বলতে

www.eelm.weebly.com

হয় ইমাম শাফেয়ীও এড়িয়ে গিয়েছেন 'যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক' কথাটিকে। ওই দু'জন ন্যায়বান লোক প্রেরিত কোরবানী সম্পর্কে মীমাংসা করবেন প্রথমে। আর তাদের মীমাংসার মাপকাঠিটি হবে মূল্যমানের আনুরূপ্য। তাঁদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ক্রয় করতে হবে 'প্রেরিতব্য কোরবানী'। সুতরাং, ওই পশুর আকৃতিগত সাদৃশ্য ক্রয়ের পূর্বে বিচার্য হয় কিভাবে? অতএব আমাদেরকে এ কথাটি মেনে নিতে হবে যে, দুই ইমামের মতপার্থক্য ঘটেছে 'অনুরূপ' কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে। (আকৃতিগত আনুরূপ্যের কথা বলেছেন ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আবু হানিফা বলেছেন মূলগত আনুরূপ্যের কথা)।

মাসআলাঃ কোরবানীর পশু মক্কার বাইরে থেকে কিনে পাঠাতে হবে, না মক্কার কোনো বাজার থেকে ক্রয় করলে চলবে, সে সম্পর্কে ইমামগণের মতভিন্নতা রয়েছে। 'প্রেরিতব্য' শব্দটির প্রকাশ্য অর্থের দিকে লক্ষ্য করে ইমাম মালেক বলেছেন, মক্কার বাইরে থেকে পশু ক্রয় করে মক্কায় প্রেরণ করা ওয়াজিব। কিন্তু জমহুর বলেছেন, মক্কার বাইরে থেকে প্রেরিতব্য পশু ক্রয় করে প্রেরণ করা বাধ্যতামূলক নয়। 'কাবায় প্রেরিতব্য' কথাটির উদ্দেশ্য এই যে, কোরবানী করতে হবে হেরেম শরীফে— হেরেম শরীফের বাইরে নয়। কোরবানীর পশু মক্কার বাইরে থেকে ক্রয় করতেই হবে— এ রকম কথা এখানে বলা হয়নি। এই অভিমতের উপরেই আলেমগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদায় হজের ঘটনায় এসেছে, রসুলুল্লাহ্ স. মক্কায় প্রবেশ করে উপস্থিত জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বললেন, যারা কোরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে এসেছে, তারা হজ পূর্ণ না করে ইহ্রামমুক্ত হয়ো না। আর যারা কোরবানীর পশু সঙ্গে আনোনি তারা তাওয়াফ ও সায়ী করে চুল কেটে ইহ্রামমুক্ত হও। হজের সময় এলে পুনরায় ইহ্রাম বেঁধে হজ কোরো। তারপর কোরবানী করে ইহ্রামমুক্ত হয়ে যেও। কোরবানীর পশু না পেলে রোজা রেখো। এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, কোনো কোনো সাহাবী বাইরে থেকে কোরবানীর পশু সঙ্গে আনেননি তাঁরা কোরবানীর পশু ক্রয় করেছিলেন মক্কা থেকে। আর যারা কোরবানীর পশু পাননি তারা রোজা রেখেছিলেন। এই হাদিসে রসুল স. মক্কা থেকে ক্রয় করা পশুকেও বলেছেন হাদয়ি (কোরবানী অথবা প্রেরিতব্য কোরবানী)। কোরআন মজীদেও এ রকম বলা হয়েছে। যেমন— 'ফামাস তাইসারা মিনাল হাদয়ি।' এই নির্দেশনাটি তামাত্তু হজ সম্পর্কিত। তামাত্তু হজ সম্পাদনকারীরা কোরবানীর পশু ক্রয় করেন মক্কা থেকেই। কিন্তু বর্ণিত আয়াতে তাদের পশুকেও কোরবানী বা প্রেরিতব্য কোরবানী (হাদয়ি) বলা হয়েছে। অতএব 'কোরবানীর পশু মক্কার বাইরে থেকে নিয়ে আসা ওয়াজিব'— ইমাম মালেকের এই অভিমতটি অযৌক্তিক। বরং বাইরে থেকে আনা কোরবানীর পশু একটি অহেতুক বিড়ম্বনার কারণ। বিড়ম্বনার কারণ এ জন্য যে, হজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করার সাথে সাথে সেগুলোর দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াতে হয় মক্কায়, মিনায়, আরাফায় এবং মোজদালিফায়।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ জমহুর বলেছেন, কোরবানীর গোশত মক্কার দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা ওয়াজিব। কেননা, কোরবানী করতে হয় হেরেম শরীফ এলাকায়। তাই হেরেমবাসী মিস্‌কিনদেরকে কোরবানীর গোশত দান করা অত্যাবশ্যক। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোরবানীর গোশত হেরেমের ভিতরে বাইরে সকল স্থানের দরিদ্রদেরকে দেয়া যাবে। কারণ আয়াতে হেরেমের অভ্যন্তরে জবাই করার কথা বলা হয়েছে, বন্টন করার কথা বলা হয়নি। সুতরাং হেরেম এলাকার বাইরে জবাই করা যাবে না। কিন্তু বণ্টন করা যাবে। গোশত বণ্টনের বিষয়টি এমনই এক ইবাদত— যা বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বিবেচনা করে দেখতে হবে, কিভাবে গোশত বন্টন করলে দরিদ্র জনসাধারণ অধিকতর উপকৃত হয়।

'আওকাফ্‌ফরাতুন ত্বয়ামু মাসাকিন'— এ কথার অর্থ, 'অথবা তার বিনিময় হবে দরিদ্রকে অন্নদান করা'। এ সম্পর্কে ইমাম শা'বী ও নাখয়ী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের নিয়মটি পালন করতে হবে এভাবে— কোরবানী করতে হবে। কোরবানীর পশু না পেলে দরিদ্রদেরকে অন্নদান করতে হবে। অন্নদান সম্ভব না হলে রাখতে হবে রোজা। কিন্তু আমরা বলি, বর্ণিত তিনটি নিয়ম সংযোজিত হয়েছে দু'টি 'আও' (অথবা, কিংবা) শব্দের মাধ্যমে। সুতরাং ক্ষতিপূরণদানের নিয়মটি হবে এ রকম— প্রাণী বধকারী মুহ্‌রিম ইচ্ছে করলে কোরবানী করতে পারবে অথবা দরিদ্রকে অন্নদান করতে পারবে কিংবা রাখতে পারবে রোজা। এভাবে যে কোনো একটি নিয়মে ক্ষতিপূরণ আদায়ের অধিকার রয়েছে তার।

জ্ঞাতব্যঃ ইহ্‌রাম পরিহিত অবস্থায় শিকার করার অপরাধটিকে লঘু করার নিমিত্তে আল্লাহ্‌পাক অপরাধীকে তিন নিয়মের যে কোনো এক নিয়মে ক্ষতিপূরণ প্রদানের স্বাধীনতা দিয়েছেন। যেমন স্বাধীনতা দিয়েছেন শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ আদায়ের বেলায়। এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ইহ্‌রাম অবস্থায় প্রাণী বধকারীকে এ রকম স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। আয়াতে উল্লেখিত ক্ষতিপূরণের পশু নির্ধারণকারী দু'জন ন্যায়বান লোকের উপরেই ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্তটি নির্ভরশীল। ওই পুণ্যবানদ্বয় যৌথভাবে ক্ষতিপূরণের তিনটি নিয়মের যে কোনো একটিকে সাব্যস্ত করে দিবেন। — আলোচ্য আয়াতে অবশ্য এ অভিমতটির প্রমাণ নেই। আয়াতে কেবল বলা হয়েছে, ওই দু'জন ন্যায়বান কেবল বধকৃত শিকারের অনুরূপ কোরবানীর পশুর মূল্যমান নির্ধারণ করে দিবেন। মূল্যমান সম্পর্কিত তাঁদের ওই সিদ্ধান্ত জেনে নেয়ার পর অপরাধী তিনটি নিয়মের যে কোনো একটি নিয়মে ক্ষতিপূরণ করতে পারবে। ওই নির্ধারিত অর্থে সে তখন পশু ক্রয় করে কাবায় প্রেরণ করতে পারবে অথবা খাদ্য ক্রয় করে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতে

www.eelm.weebly.com

পারবে কিংবা উল্লেখ পরিমাণ রোজা রাখতে পারবে। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের অধিকার ওই ন্যায়বানদ্বয়ের নেই। এই অধিকার তো কেবল আল্লাহ্‌র। প্রকৃত বিচারক তিনি। তিনি অপরাধীকে তিনটি নিয়মের একটিকে নির্ধারণ করার অধিকার দিয়ে তার কষ্ট কিছুটা লাঘব করেছেন। এটা তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ।

মাসআলাঃ ঐকমত্যগত সিদ্ধান্ত এই যে, ক্ষতিপূরণের অন্নদান হতে হবে বধিত শিকারের মূল্যমানের ভিত্তিতে। যদি কোরবানীর জন্য 'অনুরূপ' পশু না পাওয়া যায়, তবে বধিত শিকারের মূল্য ধার্য করে সেই অর্থে খাদ্য ক্রয় করে দরিদ্রদেরকে আহার করাতে হবে। কিন্তু 'অনুরূপ' পশু পাওয়া গেলে পশু কোরবানীই করতে হবে। ওই সময় মূল্য ধার্য করার অবকাশ থাকবে না। কারণ, ওই পরিস্থিতিতে শিকারের মূল্য ধর্তব্য হবে না— শিকারের অনুরূপ পশুই ধর্তব্য হবে। অন্নদান তো পশু কোরবানীর বিকল্প। — এ রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন জমহুর আলেমগণ। তাঁদের এই অভিমতের প্রেক্ষিতে কবুতর বধের জন্য যদি ক্ষতিপূরণরূপে অন্নদান করতে হয়— তবে অন্নদান করতে হবে ছাগলের মূল্যের। কবুতরের মূল্যের নয়। কারণ, কবুতর বধের কাফ্‌ফারা হচ্ছে ছাগল কোরবানী করা। তাই ছাগল কোরবানী সম্ভব না হলে ছাগলের মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্য ক্রয় করে দরিদ্রদেরকে দান করতে হবে। এভাবেই 'অনুরূপ' কথাটি বাস্তবায়ন করতে হবে।

ইমাম আজম বলেছেন, এ রকম অবস্থায় অন্নদান করতে হবে বধিত প্রাণীর মূল্যের ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে 'অনুরূপ' কথাটি বিচার্য হবে না। 'অনুরূপ' কথাটি আসবে কোরবানীর বেলায়। আর অন্নদানের ক্ষতিপূরণ হবে বধিত প্রাণীর মূল্যের ভিত্তিতে— সরাসরি। কারণ, ক্ষতিপূরণ ওই বস্তুরই দিতে হয়— যা বিনষ্ট করা হয়েছে। অন্নদানের বেলায় তাই এই নিয়মটিই পালনীয়। মূল্যের আনুরূপ্যের ভিত্তিতে কোরবানী নির্বাচন করা হলে কোরবানীর মূল্য অতিরিক্ত হয়েও যেতে পারে। এতদসত্ত্বেও কোরবানীর পশু পুরোপুরি কোরবানী করতে হয়। কারণ, কোনো পশু আংশিকভাবে কোরবানী করা সম্ভব নয়। কিন্তু অন্নদানের ব্যাপারটি ভিন্ন। অন্নদানের মূল্য ধরতে হবে বধিত পশুর মূল্যের সমান। বধিত পশুর অনুরূপ কোরবানীর পশুর মূল্যের সমান নয়। অতএব অন্নদানের ক্ষেত্রে কবুতরের মূল্যই ধর্তব্য। ছাগলের নয়।

বধকৃত পশুর অবিকল অনুরূপ পশু কোরবানী ওয়াজিব— এই অভিমতটি ভুল। লক্ষ্যণীয় যে, কবুতর বধের পরিবর্তে উট কোরবানী দিলেও তা সিদ্ধ হবে। যদি অবিকল অনুরূপ পশু কোরবানী করা ওয়াজিব হতো, তবে ছাগলের পরিবর্তে ছাগল ছাড়া অন্য কোনো কিছু কোরবানী করা যেতো না। অবিকল

www.eelm.weebly.com

অনুরূপ কথাটিকে ওয়াজিব মনে করলে শা'বী এবং নাখয়ী কথিত ক্ষতিপূরণের নিয়মটিকে মেনে নিতে হয়। যেমন তাঁরা বলেছেন, প্রথমতঃ উদ্যোগ নিতে হবে কোরবানীর। বধিত পশুর অবিকল অনুরূপ পশু না পাওয়া গেলে অন্নদানের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তবে পালন করতে হবে রোজা। কিন্তু আমাদের মাজহাবের অভিমতানুযায়ী এ নিয়মটি ওয়াজিব নয়। আমরা বলি, এক্ষেত্রে অপরাধী স্বাধীনভাবে কোরবানী, অন্নদান, রোজা— এই তিনটির যে কোনো একটিকে বেছে নিতে পারবে। সুতরাং, এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের নিয়ম একটি না পারলে আর একটি, আর একটি না পারলে অন্য আর একটি— এ রকম নয়। বরং নিয়ম হচ্ছে তিনটির যে কোনো একটি। কারণ, এক প্রকারের শাস্তি অন্য প্রকারের শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

একটি প্রশ্নঃ এক প্রকারের শাস্তি যদি অন্য প্রকারের শাস্তির মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়, তবে এই আয়াতে দরিদ্রদের সংখ্যা অনুপাতে রোজা রাখা ওয়াজিব করা হয়েছে কেনো?

উত্তরঃ এখানে আল্লাহ্পাকের এরশাদ সুস্পষ্ট। আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে— 'আও আদলু জালিকা সিয়ামা' (কিংবা সমপরিমাণ সিয়াম পালন করা)। এ সম্পর্কে ইমাম ফাররা বলেছেন, অবিকল সমপ্রকৃতি বুঝাতে গেলে 'ইদলু' শব্দটি ব্যবহৃত হয় (প্রথম অক্ষর আইন এর নিচে দিতে হয় যের)। আর অবিকল সমপ্রকৃতির নয়, এ রকম আনুরূপ্য বোঝাতে গেলে ব্যবহৃত হয় 'আদলু' (প্রথম অক্ষর আইন এর উপরে দিতে হয় যবর। আলোচ্য আয়াতে এই বানানটিই ব্যবহৃত হয়েছে)।

মাসআলাঃ অন্নদানের পরিমাণ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, পরিমাণ হতে হবে এক মুদ (আনুমানিক এক সের)। তিনি আরো বলেছেন— রোজা, জেহার এবং শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ এ রকমই।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, প্রতি মিস্কিনকে দিতে হবে অর্ধ সা (আনুমানিক দুই সের) গম এবং খোরমা। যব দিতে হবে এক সা (আনুমানিক চার সের)। ইমাম আবু হানিফার নিকট সদ্কায়ে ফিতিরের পরিমাণও এ রকম। তাঁর মতে সকল প্রকার কাফ্ফারার জন্য এই পরিমাণ খাদ্যদান করা ওয়াজিব। উত্তম নিয়ম হচ্ছে— শহর এলাকায় যে খাদ্য অধিক প্রচলিত, প্রতি মিস্কিনকে সেই খাদ্যের আধা সা দিতে হবে। কেননা, ঐকমত্যাগত অভিমতানুসারে সকল অপরাধের অন্নদান সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এ রকম। তাই হজের ইহ্রাম পরিহিত অবস্থায় বিশেষ ওজর বশতঃ কেউ যদি তার মস্তকমুণ্ডন করে তবে তাকেও এই পরিমাণ খাদ্যদান করতে হবে। সুরা বাকারার তাফসীরে এ সম্পর্কে যে হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে— তাতে বলা হয়েছে, রসুল স. হজরত কা'বকে ইহ্রাম

www.eelm.weebly.com

অবস্থায় মস্তক মুণ্ডনের ক্ষতিপূরণস্বরূপ এক ফুরক খাদ্য ছয়জন দরিদ্রের মধ্যে ভাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং, শিকারের অন্নদান সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণকে ফিতরার সঙ্গে তুলনীয় না করে বর্ণিত হাদিসের মস্তকমুণ্ডনের ক্ষতিপূরণের সঙ্গে তুলনা করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা, ফিতরা কোনো প্রায়শ্চিত্ত নয়। কিন্তু মস্তকমুণ্ডনের ক্ষতিপূরণ অপরাধের কারণে সাব্যস্ত করা হয়। তাই এদিক থেকে অক্ষম অবস্থায় মস্তকমুণ্ডন এবং মুহ্‌রিম অবস্থায় প্রাণী বধের মধ্যে মিল রয়েছে— যদিও অপরাধ দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু দু'টো অপরাধই অপরাধ।

জমহুরের মতে কোরবানীর গোশত যেমন কেবল হেরেম শরীফ এলাকার দরিদ্র জনতার প্রাপ্য, তেমনি অন্নদানের অন্নও তাদেরই প্রাপ্য। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এ রকম কোনো শর্ত করা ঠিক নয়। কোরবানীর গোশত এবং অন্নদানের গোশত হেরেমের অন্তর্গত বহির্গত সকল এলাকার দরিদ্র জনতার প্রাপ্য।

মাসআলাঃ বধিত শিকারের মূল্য যদি একজন দরিদ্রের খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়, তবে পরিমাণ পূর্ণ করার প্রয়োজন নেই। যা হয় তাই দিয়ে দিতে হবে। অথবা যদি এ রকম হয়— শিকারের মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্য বণ্টনের পর কিছু খাদ্য উদ্বৃত্ত হলো— যা একজনের খাদ্যের পরিমাণ নয়। এমতোক্ষেত্রেও নিজের পক্ষ থেকে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি ওই উদ্বৃত্ত খাদ্যদানের পরিবর্তে কেউ রোজা রাখতে চায়, তবে তাকে একটি রোজাই রাখতে হবে। কারণ, রোজার কোনো অংশ হয় না। এ বিষয়ে সকলে একমত। আর যদি সে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কোরবানীই করে তবে সে যে কোনো বয়সের পশু কোরবানী করতে পারবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের মতে তাকে কোরবানী করতে হবে এমন ছাগল যা শরিয়তের দৃষ্টিতে কোরবানীযোগ্য। অর্থাৎ কোরবানীর ছাগলটিকে হতে হবে নিখুঁত অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট, নির্ধারিত বয়সের ইত্যাদি। যে কোনো বয়সের ছাগল কোরবানী দিলে তা যথেষ্ট হবে না।

এরপর বলা হয়েছে 'লিইয়াজুক্বা ওয়াবালা আমরিহি'— কথাটির অর্থ, যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। এখানে 'ওয়াবালা' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কৃতকর্মের বোঝা, কৃতকর্মের মন্দ পরিণতি। শাব্দিক অর্থ— ভারী খাদ্য (ওয়াবিলুন)। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে 'আখজানাহু আখজাউঁ ওয়াবিলা'। এখানে ওয়াবিলা শব্দটির অর্থ কঠিন, ভারী।

'আফাল্লহু আম্মা সালাফা ওয়ামান আদা ফা ইয়ানতাক্বিমুল্লহু মিনহু'— এ কথার অর্থ 'যা গত হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেছেন; কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ্ তার শাস্তি দিবেন।' অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কেউ ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার

www.eelm.weebly.com

করে থাকলে সেই অপরাধ আল্লাহ্পাক ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্পাক তার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। বরং অপরাধের যথাশাস্তি দান করবেন।

হজরত ইবনে আব্বাসের নিয়ম ছিলো— কোনো মুহ্‌রিম শিকার করার পর তাঁর নিকট এ ব্যাপারে বিধান জানতে চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন এ রকম ঘটনা কি এই প্রথম, না আগেও করেছো? লোকটি যদি বলতো, এটিই তার প্রথম অপরাধ, তখন তিনি তাকে কোরবানী, অন্নদান অথবা রোজা— যে কোনো একটি নিয়মে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে বলতেন। আর লোকটি যদি বলতো আগেও আমার দ্বারা এ রকম অপরাধ হয়েছে, তখন তিনি পড়ে শোনাতেন 'যা গত হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেছেন; কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ্ তার শাস্তি দিবেন।' এভাবে আয়াত আবৃত্তির পর তিনি লোকটির পিঠে ও বুকে সজোরে আঘাত করতেন এবং বলতেন, আল্লাহ্ এর প্রতিশোধ নিবেন। বাগবী।

আমি বলি, এই আয়াতের তাফসীর এ রকম হওয়াই সমীচীন— যা কিছু অতীতে ঘটে গিয়েছে, আল্লাহ্পাক তা মার্জনা করেছেন। যে ব্যক্তি ক্ষতিপূরণরূপে কোরবানী, অন্নদান অথবা রোজা রেখেছে, আল্লাহ্পাক তাকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু এরপরেও যে একই অপরাধে অপরাধী, আল্লাহ্পাক তাকে শাস্তি দান করবেন। সে যদি যথাক্ষতিপূরণ আদায় না করে, তবে আল্লাহ্পাক তাকে যথাশাস্তি দান করবেন।

সবশেষে বলা হয়েছে, ওয়াল্লহু আযিযুন জুনতিক্বম— এ কথার অর্থ 'এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী' অর্থাৎ অবাধ্যতার উপর যে অটল থাকে— মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্তায়ালা তাকে শাস্তি দান করবেনই।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৯৬

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

❐ তোমাদের প্রতি সমুদ্রের শিকার ও উহা ভক্ষণ বৈধ করা হইয়াছে তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য এবং তোমরা যতক্ষণ ইহ্‌রামে থাকিবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ। ভয় কর আল্লাহ্‌কে যাহার নিকট তোমাদিগকে একত্র করা হইবে।

---

www.eelm.weebly.com

এখানে 'ত্বোয়ামুহু' এর 'হু' সর্বনামটির সম্পর্ক 'সঈদু' এর সঙ্গে। এ রকম হলে অর্থ হবে, শিকারকৃত বস্তু থেকে প্রস্তুত আহার্য। সর্বনামটির সম্পর্ক 'আলবাহার' এর (সমুদ্রের) সঙ্গেও হতে পারে। যদি তাই হয় তবে অর্থ হবে, সমুদ্র থেকে অর্জিত আহার্য। এই আয়াতে ইহ্রাম পরিহিত অবস্থায় জলযানে ভ্রমণকারী হজযাত্রীদের জন্য সমুদ্রের শিকার ভক্ষণ বৈধ করে দেয়া হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত আনাসের বর্ণনায় রয়েছে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত আবু বকর সিদ্দিক বলেছেন 'সঈদুল বাহর' অর্থ ওই সকল ভক্ষণযোগ্য প্রাণী যেগুলো সমুদ্রে বাস করে। আর 'ত্বোয়াম' অর্থ ওই সকল ভক্ষণযোগ্য প্রাণী যেগুলোকে সমুদ্র তার তটভূমিতে নিক্ষেপ করে।

হজরত হারেস বিন নওফেলের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ওসমান ও হজরত আলী ছিলেন ইহ্রাম পরিহিত অবস্থায়। তাঁদের সম্মুখে কিছু শিকারের গোশত উপস্থিত করা হলো। হজরত ওসমান ওই গোশত খেলেন। কিন্তু হজরত আলী খেলেন না। হজরত ওসমান বললেন, আল্লাহ্র কসম আমরা এ শিকারকে স্বহস্তে হত্যা করিনি। কাউকে হত্যা করতেও বলিনি। ইশারা ইঙ্গিতও করিনি। হজরত আলী বললেন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'ওয়া হুররিমা আ'লাইকুম সঈদুল বাহরি মা দুমতুম হারামা' (এবং তোমরা যতক্ষণ ইহ্রামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ)। হজরত হাসান বর্ণনা করেছেন, যা মুহ্রিমের জন্য শিকার করা হয়নি— যা কোনো গায়ের মুহ্রিম অন্য কোনো গায়ের মুহ্রিমের জন্য শিকার করেছে, তার গোশত খাওয়াকে হালাল মনে করতেন হজরত ওমর, কিন্তু হজরত আলী মনে করতেন মাক্রূহ। ইবনে আবী শায়বা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'সঈদুল বাহর' অর্থ ওই সকল প্রাণী যেগুলো স্থলভাগে বেঁচে থাকে না। আর ত্বোয়ামুল বাহর অর্থ সামুদ্রিক খাদ্য।

ইমাম মালেক এই আয়াতের ভিত্তিতেই বলেছেন, সকল সামুদ্রিক প্রাণী ভক্ষণ সিদ্ধ। এ সম্পর্কিত মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরে।

হজরত ওমর বলেছেন, 'সঈদুল বাহর' বলা হয় ওই সকল প্রাণীকে যেগুলো সমুদ্র থেকে শিকার করা হয়। আর ত্বোয়ামুল বাহর বলা হয় সমুদ্র কর্তৃক তীরভূমিতে নিক্ষেপিত প্রাণীকে। হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, যে সকল মৃত প্রাণী সমুদ্রতরঙ্গ কর্তৃক বেলাভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়— সে সকল প্রাণীকে বলে ত্বোয়ামুল বাহর। হজরত সাঈদ বিন যোবায়ের, হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব, হজরত ইকরামা, হজরত কাতাদা, ইমাম নাখয়ী এবং ইমাম মুজাহিদ উল্লেখ করেছেন, সঈদুল বাহর অর্থ সদ্য ধৃত তাজা সামুদ্রিক মৎস্য। আর ত্বোয়ামুল বাহর হচ্ছে ওই সকল সামুদ্রিক মৎস্য, যেগুলোতে লবণ মাখানো হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

'মাতায়াল্লাকুম ওয়ালিস্ সাইয়ারাহ্'— অর্থ তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য। এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, সামুদ্রিক মৎস্যকুল স্থানীয় অধিবাসী এবং পর্যটক উভয়ের জন্য হালাল। স্থানীয় অধিবাসীরা সদ্য ধৃত তাজা মৎস্য ভক্ষণ করে। আর পর্যটকেরা সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে ভ্রমণ পথের আহার্য হিসাবে সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

'ওয়া হুররিমা আ'লাইকুম সঈদুল বার্রি মা দুমতুম হুরুমা'— এ কথার অর্থ তোমরা যতক্ষণ ইহ্রামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই বাক্যটির মাধ্যমে স্থলভাগের শিকারের গোশত মুহ্রিমের জন্য সাধারণভাবে হারাম করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ গায়ের মুহ্রিম কর্তৃক বধকৃত শিকার এবং মুহ্রিম যে শিকার বধ করতে গায়ের মুহ্রিমকে বলেনি, ইশারা ইঙ্গিত করেনি বা কোনোরূপ সাহায্য সহযোগিতা করেনি এবং যা কোনো মুহ্রিমের ভক্ষণের জন্য শিকার করেনি— এ ধরনের সকল শিকারের গোশত মুহ্রিমের জন্য হারাম। হজরত ইবনে আব্বাসও এ রকম বলেছেন। তাউস এবং সুফিয়ান সওরীও এ রকম অভিমত পোষণ করেন। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে অবস্থান নিলেন। হজরত সাআব বিন জুসামাহ্ ইয়াশি তাঁর সম্মুখে বন্য গর্দভের গোশত হাদিয়া পেশ করলেন, রসুল স. সে গোশত ফেরত দিলেন। হজরত সাআবের মুখমণ্ডলে দেখা দিল প্রত্যাখ্যানজনিত লজ্জার ছাপ। সেদিকে লক্ষ্য করে তিনি স. বললেন, এর মধ্যে অন্য কোনো কারণ নেই। কিন্তু আমি যে ইহ্রাম বেঁধেছি। বোখারী, মুসলিম। নাসাঈর বর্ণনায় রয়েছে অতিরিক্ত এ কথাটি— আমি এ শিকারের গোশত খাবো না। হজরত ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে হজরত সাঈদের বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথাটি রয়েছে— আমি ইহ্রাম না বাঁধলে এ গোশত ভক্ষণ করতাম। এ সম্পর্কে বোখারী বলেছেন, ওই বন্য গর্দভটি জীবিত ছিলো। আর জীবিত পশু ভক্ষণ করা মুহ্রিমের জন্য অসিদ্ধ। বর্ণনাকারীগণও এক্ষেত্রে ইমাম মালেকের উক্তি সমর্থন করেছেন। কিন্তু তাঁদের মন্তব্যগুলো ঠিক নয়। কেননা মুসনাদ গ্রন্থে মুসা, মোহাম্মদ বিন আমর বিন আলকামা এবং জুহ্রী থেকে স্বসূত্রে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর নিকট তখন বন্য গর্দভের গোশতই পাঠানো হয়েছিলো (জীবিত গাধা পাঠানো হয়নি)। জুহ্রী থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হাদিয়াস্বরূপ দেয়া হয়েছিলো বন্য গর্দভের রান। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, দেয়া হয়েছিল বন্য গর্দভের নিতম্ব যা থেকে টপ টপ করে রক্ত পড়ছিলো। মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় নিতম্বের স্থলে রানের কথা এসেছে। তাঁর তৃতীয় বর্ণনাটি হজরত সাঈদ থেকে দু'রকমভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। একটিতে এসেছে—বন্য গর্দভ। অন্যটিতে এসেছে— বন্য গর্দভের পাঁজর। এ সম্পর্কে বর্ণনাবৈষম্য যতই থাক না কেনো, আসল কথা হচ্ছে রসুল স. ওই হাদিয়া গ্রহণ করেননি।

www.eelm.weebly.com

আমর বিন উমাইয়া সূত্রে ওহাব এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন ছিলেন জুহফায়, ওই সময় তাঁর নিকট বন্য গর্দভের নিতম্ব উপস্থিত করা হয়েছিলো। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা ওই গোশত ভক্ষণ করেছিলেন। বর্ণনাটি উত্তমসূত্রসম্বলিত।

যতদূর জানা যায় উপরে বর্ণিত ঘটনা দু'টো এক নয়। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনাটি ছিলো আবওয়া অথবা ওয়াদ্দানের এবং ওহাব বর্ণিত ঘটনাটি ছিলো জুহ্ফার। জুহ্ফা থেকে আবওয়ার দূরত্ব তেরো মাইল এবং ওয়াদ্দানের দূরত্ব আট মাইল। এ সম্পর্কে হজরত আলী থেকেও একটি বর্ণনা এসেছে। হজরত আলী বলেছিলেন, তোমরা কি জানো রসুল স. এর সম্মুখে কোনো একটি শিকারের অঙ্গ বা অংশ হাদিয়া হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছিলো এবং তিনি তা গ্রহণ না করে বলেছিলেন, আমি ইহ্রাম অবস্থায় আছি। হজরত আলী এ কথা বলেছিলেন 'আশজা' গোত্রের এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে এবং তিনি কসমও দিয়েছিলেন। ওই ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, হাঁ (আমি জানি)। আবু দাউদ , তাহাবি এবং মুসলিমও এ রকম হাদিস সংকলন করেছেন। কিন্তু করনে আওয়ালের (প্রথম উত্তম যুগের) পরের মুসলমানেরা এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছেছিলেন যে, গায়ের মুহ্রিম নিজের জন্য যা শিকার করে, সেই শিকারের গোশত ভক্ষণ মুহ্রিমের জন্য হালাল। বিশ্বস্তসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. স্বয়ং এ রকম শিকারের গোশত ভক্ষণ করেছেন এবং সাহাবীদেরকেও ভক্ষণের অনুমতি দিয়েছেন। হজরত আবু কাতাদার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, (এই শিকারের) উদ্বৃত্ত গোশত তোমরা খেয়ে ফেলো। অন্যান্য বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. নিজেও ওই গোশত খেয়েছেন। হজরত সাআব বিন জুসামাহ্র অন্যান্য বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, রসুল স. নিজেও ওই গোশতের কিছু অংশ খেয়েছিলেন।

মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত মুয়াজ বিন আবদুর রহমান বিন ওসমান তাইমীর পিতা (আবদুর রহমান) বর্ণনা করেছেন, আমি ইহ্রাম অবস্থায় হজরত তালহা বিন আবদুল্লাহ্র সঙ্গে ছিলাম। তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। তখন তাঁর নিকট হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করা হলো একটি শিকার করা পাখির গোশত। আমরা কেউ কেউ ওই গোশত খেলাম। আবার কেউ কেউ বিরত রইলাম। হজরত তালহা জাগ্রত হয়ে ভক্ষণকারীদেরকেই সমর্থন করলেন এবং বললেন, আমি রসুল স. এর সফর সঙ্গী হয়ে শিকারের গোশত খেয়েছি।

আমর বিন সালমা জমিরি বাহজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. মক্কা গমনের উদ্দেশ্যে ইহ্রামের উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। যখন হজরত রওয়াহার বাসভবনের সম্মুখে উপস্থিত হলেন, তখন দেখলেন জবাই করা একটি বন্য গর্দভ পড়ে আছে। তিনি স. বললেন এটিকে এভাবেই থাকতে দাও। সম্ভবতঃ এর শিকারী এখনই এসে পড়বে। একটু পরেই সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত বাহজি। তিনি গর্দভটি

www.eelm.weebly.com

শিকার করেছিলেন। হজরত বাহজি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে এটাকে বন্টন করে দিতে পারেন। রসুল স. হজরত আবু বকরকে বণ্টনের নির্দেশ দিলেন। হজরত আবু বকর কাফেলার লোকদের মধ্যে বন্য গর্দভটির গোশত বণ্টন করে দিলেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মালেক এবং সুনান রচয়িতাগণ। ইবনে খুজাইমা বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। এ পর্যন্ত আলোচিত বিষয়বস্তু দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সঈদ শব্দের অর্থ শিকার করা।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গায়ের মুহ্‌রিম কর্তৃক শিকার করা পশুর গোশত খাওয়া সকলের জন্যই জায়েয। এমনকি যে মুহ্‌রিমের জন্য শিকার করা হয়েছে, তার জন্যও খাওয়া জায়েয। ইমাম মালেক বলেছেন, মুহ্‌রিমের জন্য যদি গায়ের মুহ্‌রিম শিকার করে তবে ওই শিকারের গোশত খাওয়া কারো জন্য হালাল নয়, এমনকি গায়ের মুহ্‌রিমও ওই গোশত খেতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন, ইহ্‌রাম বাঁধার আগে অথবা পরে যে কোনো অবস্থায় মুহ্‌রিমের জন্য গায়ের মুহ্‌রিমের শিকারের গোশত মুহ্‌রিমের জন্যও ভক্ষণ করা জায়েয নয়। অবশ্য গায়ের মুহ্‌রিম ওই শিকারের গোশত খেতে পারবে। আর ওই মুহ্‌রিমও খেতে পারবে যার উদ্দেশ্যে শিকার করা হয়নি। ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত ওসমানের কথায়ও এর প্রমাণ রয়েছে।

ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের বলেছেন, তখন গ্রীষ্মকাল। আমি মাকামুল আরজে ইহ্‌রাম অবস্থায় হজরত ওসমানকে দেখলাম। তাঁর মুখমণ্ডল চাদর দ্বারা আবৃত ছিলো। কিছুক্ষণ পর তাঁর সামনে শিকারের গোশত হাজির করা হলো। তিনি তাঁর সাথীদেরকে বললেন, খাও। সাথীরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি খাবেন না? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মতো নয়। আমার জন্য শিকার করা হয়েছে (তাই আমার জন্য এই গোশত হালাল নয়)।

এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. গায়ের মুহ্‌রিমের শিকার করা গোশত খেয়েছেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, খাননি। বরং ফেরত দিয়েছেন। ইমামত্রয় এই বিপরীতমুখী বর্ণনাগুলো সামঞ্জস্যসাধন করেছেন এভাবে— রসুল স. ওই গোশত খেয়েছিলেন— যা গায়ের মুহ্‌রিম নিজের জন্য শিকার করেছিলেন। আর ওই গোশত খাননি— যা রসুল স. অথবা অন্য কোনো মুহ্‌রিমের জন্য শিকার করা হয়েছিলো।

আমি বলি, কোনো হাদিসেই এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পরিলক্ষিত হয় না। আমার ধারণায় বিপরীতমুখী বর্ণনাগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করার উত্তম পথ হচ্ছে এ কথা বলা— গায়ের মুহ্‌রিম যদি তার নিজের জন্য শিকার করে, তবে

www.eelm.weebly.com

ওই শিকারের গোশত খাওয়া মুহ্‌রিম, গায়ের মুহ্‌রিম উভয়ের জন্য জায়েয। কিন্তু না খাওয়াই উত্তম। তাই রসুল স. জায়েয হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন খেয়ে এবং উত্তম বা মোস্তাহাবের প্রমাণ দিয়েছেন না খেয়ে।

একটি প্রশ্নঃ পরস্পরবিরোধী হাদিস পরিদৃষ্ট হলে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিতে হয়। আর কিয়াসের নিয়ম হচ্ছে, অসিদ্ধ হওয়ার বিধানকেই প্রাধান্য দিতে হবে। কিন্তু এখানে এই নিয়মটি মানা হলো না কেনো?

উত্তর ঃ আমরা বলি, কথাটি সত্য। কিন্তু আমি এক্ষেত্রে এই নিয়মটি অনুসরণ করিনি এ জন্য যে, বিষয়টি যেনো ঐকমত্যবিরোধী না হয়। কেননা, কোনো কোনো শিকার ভক্ষণ করা আলেমগণের ঐকমত্যানুযায়ী হালাল। আবার মুহ্‌রিমের জন্য শিকার করা পশুর গোশত তিন ইমামের নিকট হারাম।

হজরত জাবেরের বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. বলেছেন, স্থলভাগের শিকারের গোশত তোমাদের জন্য হালাল— যখন তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকো, নিজেরা শিকার না করো এবং তোমাদের জন্য শিকার করা না হয়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে খুজাইমা এবং আহমদ।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, এককবর্ণিত (খবরে আহাদ) পরস্পর বিরোধী হাদিসের মধ্যেই কেবল প্রাধান্য প্রদানের অবকাশ রয়েছে। এ সকল বর্ণনায় দেখা যায়, মুহ্‌রিম তার নিজের জন্য শিকার করলে অথবা তার জন্য কোনো গায়ের মুহ্‌রিম শিকার করলে— ওই শিকারের গোশত মুহ্‌রিমের জন্য হারাম। কিন্তু গায়ের মুহ্‌রিম তার নিজের জন্য অথবা অন্য কোনো মুহ্‌রিমের জন্য কিংবা অন্য কোনো গায়ের মুহ্‌রিমের জন্য শিকারের গোশত খাওয়া যাবে কিনা— এ সকল প্রশ্নের উত্তর কোনো হাদিসের বিবরণে নেই। সুতরাং এ সকল কথা হাদিসের বাইরে থেকে জেনে নিতে হয়।

আমরা বলি, উপরে বর্ণিত আমর বিন সাওবী আমরের বর্ণনাটি দলিল হওয়ার উপযুক্ত নয়। ইমাম আহমদের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত জাবেরের সূত্রপ্রবাহসংযুক্ত একজন বর্ণনাকারী সাধারণ আনসার। তিরমিজির বর্ণনায় এবং অন্যান্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, হাদিসের সূত্রটি এ রকম, আমর-মতলব— হজরত জাবের। ইমাম আহমদের এক বর্ণনায় রয়েছে, আমরের হাদিসের বর্ণনাকারীর মধ্যে রয়েছে এক অপরিচিত আনসারী। তিরমিজির বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, আমরের বর্ণনাকারী মতলব। আর এই মতলব যে হজরত জাবের থেকে হাদিস শুনেছেন, তার কোনো প্রমাণ নেই। তদুপরি আমর বিন আবী আমর ছিলো মতলবের মুক্ত করা ক্রীতদাস (সে নির্ভরযোগ্যও ছিলো না)। ইয়াহ্‌ইয়া বিন মুঈন

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, হাদিসটি দলিল হওয়ার অযোগ্য। ইয়াহ্ইয়া এবং আবু দাউদ দু'জনেরই স্পষ্ট উক্তি হচ্ছে হাদিসটি শক্তিশালী নয়। ইমাম আহমদ অবশ্য বলেছেন, এর মধ্যে খারাপ কিছু নেই। এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, উল্লেখিত দলিলটি ধারণাপ্রসূত দলিল। এ রকম ধারণাপ্রসূত দলিল সিদ্ধ নয়।

হজরত আবু কাতাদা বর্ণিত হাদিসটিও এই বিধানটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উপস্থিত করা হয়— যদি গায়ের মুহ্‌রিম মুহ্‌রিমের জন্য শিকার করে তবে তার গোশত খাওয়া জায়েয নয়। হজরত আবু কাতাদা বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়া প্রান্তরে আমি রসুল স. এর সফরসঙ্গী ছিলাম। আমার সাথীরা ছিলেন ইহ্‌রাম অবস্থায়। কিন্তু আমি ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলাম না। ওই সময় আমি একটি বন্য গর্দভ শিকার করে রসুল স. এর নিকটে এসে বললাম, আমি ইহ্‌রাম বাঁধিনি। আমি রসুলুল্লাহ্ স. এর জন্য শিকার করেছি। রসুল স. তখন গায়ের মুহ্‌রিম সাহাবীগণকে ওই গোশত খাওয়ার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তিনি স. নিজে খেলেন না। কারণ শিকারটি করা হয়েছিলো তাঁর জন্য। হাদিসটি সংকলন করেছেন ইসহাক ইবনে খুজাইমা এবং দারা কুতনী। এই দলিল প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে— ইবনে খুজাইমা, আবু বকর নিশাপুরী এবং দারা কুতনী সম্মিলিতভাবে এ কথা বলেছেন যে, মোয়াম্মারের বর্ণনায় এই কথাটি অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে— 'আমি আপনার জন্য এটি শিকার করেছি' এবং 'রসুল স. নিজে ওই গোশত খাননি।' এই কথাগুলো মোয়াম্মার ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। সম্ভবতঃ অতিরিক্ত কথা দু'টো তাঁর নিজস্ব ধারণা। ইমাম জাহাবী উল্লেখ করেছেন, মোয়াম্মার বিন রাশেদ হাদিস লিপিবদ্ধকালে কিছু কিছু নিজস্ব ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন।

আমি বলি, বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত সকল বর্ণনার ভিত্তিতে এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে— রসুল স. ওই শিকারের গোশত খেয়েছিলেন। ইমাম মালেকের বিরুদ্ধে মোয়াম্মারের বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, রসুল স. সাহাবীগণকে ওই গোশত ভক্ষণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য, সাহাবীগণও ওই গোশত খেয়েছিলেন। অতএব এ কথাটি প্রমাণিত হলো যে, মুহ্‌রিমের জন্য শিকার করা পশুর গোশত সকলের জন্য হালাল। অথচ ইমাম মালেক বলেছেন হারাম।

আয়াতের সর্বশেষ অংশে বলা হয়েছে, 'ওয়াত্তাকুল্লহাল্লাজি ইলাইহি তুহ্‌শারুন'— এ কথার অর্থ, ভয় করো আল্লাহ্‌কে যার নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।

www.eelm.weebly.com

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ؕ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝ اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ؕ

❑ আল্লাহ্ পবিত্র কাবা গৃহ, পবিত্র মাস, কুরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশু ও গলায় মাল্য পরিহিত পশুকে মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন; ইহা এই হেতু যে, তোমরা যেন জানিতে পার যাহা কিছু আসমান ও জমিনে আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

❑ জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তিদানে যেমন কঠোর তেমনি তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

চতুষ্কোণ বিশিষ্ট বলেই কাবা শরীফকে কাবা বলা হয়। আরবীতে অবশ্য চতুষ্কোণ বিশিষ্ট সকল গৃহকেই কাবা বলে। কিন্তু মুকাতিল বলেছেন, অন্য সকল গৃহ থেকে পৃথক প্রকৃতির বলেই কাবাগৃহের নাম কাবা।

কেউ কেউ বলেছেন, অন্য সকল গৃহ থেকে উচ্চ হওয়ার কারণেই আল্লাহ্র ঘরের নাম হয়েছে কাবা। কাবা'র শাব্দিক অর্থ উঁচু হয়ে ওঠা। পায়ের গ্রন্থিকে (টাখনুকে) কাআব বলা হয়। কারণ তা দু'দিকে উঁচু হয়ে ঠেলে উঠেছে। বালিকা যখন যুবতী হতে শুরু করে তখন তার বক্ষদেশ উঁচু হয়ে ওঠে। তখন তাকে বলা হয় 'তাকাআবাত্'।

আলোচ্য আয়াতে কাবা শরীফকে বলা হয়েছে 'আল বায়তুল হারাম'— যার অর্থ মহাসম্মানিত। এ কথা বলে কাবা শরীফের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আকাশ পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকেই আল্লাহ্ তায়ালা কাবাকে সম্মান দান করেছেন।

ক্বিয়ামাল্লিন্নাস্ অর্থ 'মানুষের দ্বীন দুনিয়ার শান্তি কেন্দ্র।' কাবা শরীফ যে শান্তি কেন্দ্র বা শান্তিধাম— সে কথা সর্বজনবিদিত। এখানে হজ করা হয়। পালন করা হয় হজের বিভিন্ন বিধান। দর্শিত হয় বিভিন্ন নিদর্শন। বিশ্বশান্তির এই একক কেন্দ্রে লুণ্ঠন, হত্যা ও সকল অপকর্ম নিষিদ্ধ। এখানে সকল মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ।

www.eelm.weebly.com

'ওয়াশ্‌শাহ্‌রাল হারাম' অর্থ পবিত্র মাস। পবিত্র মাসও শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। এখানে পবিত্র মাস বলে বুঝানো হয়েছে ওই চারটি মাস কে, যে সময় লুণ্ঠন, রক্তপাত ও যুদ্ধ নিষিদ্ধ। মাসগুলো হচ্ছে রজব, জিলক্বদ, জিলহজ্জ এবং মহররম। আরববাসীরা ওই চারমাস যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত থাকে। তাই ওই চারমাসে মানুষের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা।

'ওয়াল হাদ্‌ইয়া ওয়াল ক্বলাইদা' অর্থ কোরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশু এবং গলায় মাল্য পরিহিত পশু। কোরবানীর পশু এবং গলায় মালা পরিহিত পশুকেও আল্লাহ্‌পাক জানিয়েছেন নিরাপত্তার প্রতীক বলে। 'ক্বলাইদা' বা গলায় মালা পরা পশু সম্পর্কে এই সুরার প্রথম দিকে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'জালিকা লি তা'লামু আন্নাল্লহা ইয়া'লামু মাফিস্‌ সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ্বি ওয়া আন্নাল্লহা বিকুল্লি শাইইন আ'লীম।' এ কথার অর্থ, এটা এ কারণে যে, তোমরা যেনো জানতে পারো— যা কিছু আসমানে ও জমিনে আছে, আল্লাহ্‌ তা জানেন এবং আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

জুজায বলেছেন, এখানে জালিকা (এটা) শব্দটির মাধ্যমে ওই সকল অদৃশ্য বিষয় ও ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেগুলোর কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে এই সুরায়। যেমন 'ইহুদীদের মধ্যে যারা অসত্য শ্রবণে তৎপর', 'তোমার নিকটে আসে না, এমন এক ভিন্নদলের পক্ষে', 'যারা কান পেতে থাকে।' (অথবা তাদের কিতাব পরিবর্তনের কথাও জানানো হয়েছে, 'জালিকা' শব্দটির মাধ্যমে) আল্লাহ্‌পাক বিধান দাতা। আসমান জমিনের সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতায়। তাই তিনি ভবিষ্যতের ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখার জন্যই মানুষকে অনুগ্রহ করে বিভিন্ন বিধিবিধান দিয়েছেন। এখানে তাই বলা হয়েছে— আল্লাহ্‌পাক যে আসমান ও জমিনের সকল কিছু জানেন— এ কথাটি যেনো তোমরা ভালোভাবে বুঝে নিতে পারো। যেনো জেনে নিতে পারো যে, তিনি সর্বজ্ঞ। বিশেষভাবে এ কথা জানানোর পর পরের আয়াতে আল্লাহ্‌পাক শাস্তি ও ক্ষমার কথা সাধারণভাবে ঘোষণা করেছেন।

বলেছেন, 'জেনে রাখো যে, আল্লাহ্‌ শাস্তি দানে যেমন কঠোর, তেমনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (আয়াত ৯৮)। এ কথার মধ্যে রয়েছে যুগপৎ শাস্তির হুমকি এবং সওয়াবের অঙ্গীকার। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌পাকের বিধানের বিরোধিতা করবে এবং বিরোধিতায় অনড় থাকবে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর বিধানের আনুগত্য যে করবে, বিরত থাকবে নিষেধাজ্ঞা থেকে, তার জন্য রয়েছে পুণ্য।

হাসান থেকে আবু শায়েখ বর্ণনা করেন, জীবন সায়াহ্নে হজরত আবু বকর বলেছিলেন, আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র বাণীতে রয়েছে কখনো কোমলতার সঙ্গে

www.eelm.weebly.com

কঠোরতা। আবার কখনো কঠোরতার সঙ্গে কোমলতা। এ রকম বর্ণনারীতির মাধ্যমে প্রকৃত বিশ্বাসীদের হৃদয়ে ভয় ও আশার সঞ্চার করাই হচ্ছে আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়। নৈরাশ্য নিষিদ্ধ। তাই ভয় প্রদর্শনের পরক্ষণেই রয়েছে আশার কথা। আল্লাহ্পাক বিশ্বাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কখনো বিনষ্ট করেন না।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৯৯

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

❑ প্রচার করাই কেবল রসূলের কর্তব্য। তোমরা যাহা প্রকাশ কর ও গোপন রাখ আল্লাহ্ তাহা জানেন।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, সত্যধর্মের প্রচারই আল্লাহ্র রসুলের প্রধান দায়িত্ব। তিনি স. সে দায়িত্ব পালন করেছেন। সুতরাং, সত্যধর্ম গ্রহণের পথে আর কোনো প্রতিবন্ধক রইলো না। এখন যা প্রয়োজন তা হচ্ছে নির্বিবাদ আনুগত্য। এ কথাটি বুঝাতে যেয়েই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে 'প্রচার করাই কেবল রসুলের কর্তব্য।'

এরপর বলা হয়েছে 'ওয়াল্লহু ইয়ালামু মা তুব্দুনা ওয়ামা কুনতুম তাকতুমুন' (তোমরা যা প্রকাশ করো ও গোপন করো আল্লাহ্ তা জানেন) — এ কথার অর্থ আল্লাহ্পাক তোমাদের প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড এবং গোপন অভিপ্রায় (নিয়ত) সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। অতএব তোমরা সত্যনিষ্ঠ হও। বিশুদ্ধচিত্ত হও।

তারগীব গ্রন্থে ইসপাহানীর বর্ণনায় এবং হজরত জাবের থেকে ওয়াহেদির বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. শরাব হারাম হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এ কথা শুনে জনৈক আরববাসী বললো, আমি তো শরাবেরই ব্যবসা করি। এ ব্যবসা করে আমি অনেক উপার্জন করেছি। আমি যদি এই ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করি তবে কি আমি পরকালে কোনো উপকার লাভ করতে পারবো? রসুল স. বললেন, আল্লাহ্পাক কেবল পবিত্র উপার্জন গ্রহণ করেন। তখন রসুল স. এর বক্তব্যের সমর্থনে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

জ্ঞাতব্যঃ ইয়াকুব ইস্কান্দারী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, ওমর বিন আব্দুল আজিজের নিকট তাঁর অধীনস্থ এক প্রশাসক একটি পত্রে লিখলেন— সরকারী কর আদায়ের অবস্থা নাজুক। ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ উত্তরে লিখলেন, আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'ভালো এবং মন্দ কখনোই সমান নয়— যদিও প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে।' সুতরাং উত্তম কর্ম এবং আত্মশুদ্ধির পথে ধাবিত হও। অতীত পাপাচারের কথা স্মরণে এলে পাঠ করো 'ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্।'

www.eelm.weebly.com

قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۟

❐ বল, 'মন্দ ও ভাল এক নহে যদিও প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধ-শক্তি-সম্পন্নেরা! আল্লাহ্‌কে ভয় কর— যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।'

'মন্দ ও ভালো এক নয়'— এ কথার অর্থ আল্লাহ্‌পাকের নিকট ভালো ও মন্দ এক বরাবর নয়। তিনি মন্দ মানুষ ও মন্দ আমলকে অপছন্দ করেন। আর পছন্দ করেন উত্তম মানুষ ও উত্তম আমলকে। উদ্ধৃত বাক্যটির মাধ্যমে উত্তম আমল এবং হালাল উপার্জনের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সম্পদের প্রাচুর্য প্রবৃত্তির বিবেচনায় মনমুগ্ধকর হলেও, আল্লাহ্‌পাকের নিকট অগ্রহণীয়। বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পাদিত যৎকিঞ্চিত আমল অবিশুদ্ধ উদ্দেশ্যসম্বলিত অধিক আমল অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ্‌র পথে হালাল উপায়ে অর্জিত অল্প সম্পদ ব্যয় হারাম পথে অর্জিত অধিক ব্যয় অপেক্ষা শ্রেয়।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, বৈধ পথে উপার্জিত একটি খোরমা দান করলেও আল্লাহ্‌পাক তা কবুল করেন। ওই দান তিনি গ্রহণ করেন দক্ষিণ হস্তে এবং তা আরও বৃদ্ধি করে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করিয়ে দেন। যেমন তোমরা ছাগ শিশুকে সম্মুখে পরিচালিত করো। ওই দানকৃত খোরমাটিকে তিনি করে দেন পাহাড়ের মতো বিশাল। অল্প সংখ্যক বিশুদ্ধচিত্ত পুণ্যবান পৃথিবীপূর্ণ মন্দ মানুষ অপেক্ষা উত্তম। বোখারী, মুসলিম।

হজরত সহল বিন সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক লোক রসুল স. এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি স. তাঁর পাশে উপবিষ্ট এক সাহাবীকে বললেন, গমনকারী লোকটি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? জনৈক সাহাবী বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! ওই লোকটি অভিজাত। সে কোথাও বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে সে প্রস্তাব সহজেই কবুল করা হবে। কারো জন্য সুপারিশ করলে তা গৃহিত হবে। এ কথা শুনে রসুল স. কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন। একটু পরে আরেকটি লোক সে পথ দিয়ে যেতে শুরু করলো। রসুল স. তাঁর পাশের সাহাবীকে পুনরায় বললেন, এই লোকটি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! লোকটি দরিদ্র মুসলমান। তার বিবাহের প্রস্তাব কোথাও কবুল হবে না এবং কারো জন্য সুপারিশ

www.eelm.weebly.com

করলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। তার কথা কেউ মনোযোগ দিয়ে শুনবেও না। রসুল স. বললেন এই লোকটি পৃথিবীপূর্ণ মানুষের চেয়ে উত্তম। বোখারী, মুসলিম।

'ফাত্তাকুল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্কে ভয় করো। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র নিকট উত্তম হতে চেষ্টা করো। হালাল পথে উপার্জিত সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে সচেষ্ট হও। সে সম্পদের পরিমাণ অল্প হলেও ক্ষতি নেই।

বাগবী বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্কে ভয় করো' কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে, হজ যাত্রীদের জীবন ও সম্পদের কোনো ক্ষতি কোরো না, যদিও তারা মুশরিক হয় (মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুশরিকেরাও হজ প্রতিপালন করতো)। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এ সুরার প্রথম দিকে। উল্লেখ্য যে, বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে লক্ষ্য করে 'আল্লাহ্কে ভয় করো' নির্দেশটি এসেছে। বলা হয়েছে, 'সুতরাং হে বোধ-শক্তি-সম্পন্নেরা! আল্লাহ্কে ভয় করো— যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।' অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো (আল্লাহ্র ভয়ে সাবধান হও বা তাকওয়া অবলম্বন করো), তবেই কেবল তোমরা সফলতার আশা করতে পারো। কোরআন মজীদের যে সকল স্থানে 'লাআ'ল্লা' শব্দটি এসেছে সে সকল স্থানে সৃষ্ট আশা আকাঙ্খা আল্লাহ্পাকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় না, সম্পৃক্ত হয় বান্দার সঙ্গে। সুতরাং এখানে এ কথাটির অর্থ হবে এ রকম— এমতো আশা নিয়ে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো যাতে তোমরা সাফল্য আশা করতে পারো। আমি বলি, আয়াতটির এমতো অর্থ করাই উত্তম।

হজরত আলী থেকে আহমদ, তিরিমিজি, হাকেম এবং হজরত আবু হোরায়রা, হজরত আবু উমামা বাহেলী এবং হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, যখন 'ওয়া লিল্লাাহি আ'লান্নাসি হিজ্জুল বাইত' আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! প্রতি বছর কি হজ ফরজ? রসুল স. নিশ্চুপ রইলেন। সাহাবীগণ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, হে আমাদের প্রিয় রসুল! প্রতি বছর কি হজ করতে হবে? রসুল স. বললেন, না। যদি আমি এখন হ্যাঁ বলতাম, তবে প্রতি বছরই হজ ফরজ হয়ে যেতো। অন্য বর্ণনায় এসেছে রসুল স. তখন বললেন, তোমরা কি মনে করেছো, আমি হ্যাঁ বলবো? যদি হ্যাঁ বলতাম, তবে প্রতি বছর হজ ফরজ হয়ে যেতো। আর তোমাদের পক্ষে প্রতি বছর হজ করা সম্ভব হতো না। সুতরাং যে বিষয় সম্পর্কে আমি নিশ্চুপ থাকি, সে বিষয়ে প্রশ্ন কোরো না। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মত তাদের নবীকে অধিক প্রশ্ন করতো বলেই ধ্বংস হয়েছে। তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে— আমি যা নির্দেশ করি তা প্রতিপালন করা। আর যা নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাকা। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

□ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করিও না যাহা প্রকাশিত হইলে তোমরা দুঃখিত হইবে। কোরআন অবতরণের কালে তোমরা যদি সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো তবে উহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইবে, আল্লাহ্ সে সব বিষয়ের প্রশ্ন ক্ষমা করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

অনাবশ্যক প্রশ্নের কারণে জটিলতা সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ রসুলের উপস্থিতিতে উম্মতের দায়িত্ব হচ্ছে নির্দেশনার প্রতীক্ষা করা। তিনি যা করতে বলবেন, তা করা। যা নিষেধ করবেন, তা থেকে বিরত থাকা। রসুল তো নির্দেশনা দান করবেনই। এটা যখন তাঁর কর্তব্যকর্মের অন্তর্ভূত তখন তাঁকে প্রশ্ন করে বিব্রত করা হবে কেনো? আলোচ্য আয়াতে এই অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নপ্রবণতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন কোরো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে।'

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত উক্কাশা বিন মুহ্সিন হজ সম্পর্কে রসুল স. কে প্রশ্ন করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন, মুসলমানদেরকে প্রতি বছর হজ করতে হবে কিনা। ইবনে জারীর হাদিসটির বর্ণনাকারী। হজ প্রতি বছর ফরজ কিনা তা তো রসুল স. আপনা থেকেই বলবেন। অথবা বলবেন না— আমলের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন। সুতরাং এ বিষয়ে প্রশ্ন নিরর্থক। ধর্মের পথ সোজা সরল। জটিলতার প্রশ্রয় ধর্মীয় বিধানে নেই। সুতরাং অযথার্থ প্রশ্নজাত জটিলতাকে পরিহার করতে হবে। আলোচ্য আয়াতে এই কথাটিই বলে দেয়া হয়েছে।

'যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে'— কথাটির অর্থ, তোমাদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে যদি উত্থাপিত বিষয়টি ফরজ করে দেয়া হয়, তবে তোমরা মনঃক্ষুণ্ন হবে। কারণ, কঠিন নির্দেশ তোমাদের পক্ষে পালন করা অসম্ভব (তাহলে কঠিন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করছো কেনো? কেনো জানতে চাচ্ছো— প্রতি বছর হজ ফরজ কিনা)।

'কোরআন অবতরণের কালে তোমরা যদি সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো, তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে'— এ কথার মাধ্যমে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, হে বিশ্বাসীরা। তোমরা আর কখনো এ রকম অযথার্থ প্রশ্নের

www.eelm.weebly.com

অবতারণা কোরো না। তোমাদের জন্যই ক্রমাগত অবতরণ হয়ে চলেছে কোরআনের নির্ভুল বাণী নির্দেশনা। প্রশ্নপ্রবণতার অপরিচ্ছন্নতা এনে সেই স্বচ্ছ ও নিরবচ্ছিন্ন বাণীপ্রবাহকে আবিল করে তুলো না। যদি তোলো তবে তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে কঠিন বিধান যা তোমাদের জন্য হবে কষ্টকর। সুতরাং সাবধান! এমন প্রশ্ন তোমরা করেছো যার উত্তরে ছোট একটি শব্দ হ্যাঁ বললেই বিধানটি হয়ে যাবে তোমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং এ রকম প্রশ্ন থেকে বিরত থাকাই সমীচীন।

মাসআলাঃ সংখ্যা নির্দেশ করা না হলে বুঝতে হবে নির্দেশটি একবারই পালনীয়। বারংবার নয়। এটাই হানাফিগণের অভিমত। রসুল স. বলেছেন, 'লাও কুলতু নাআম ওয়াআজাবাত' (যদি আমি হ্যাঁ বলতাম তবে ওয়াজিব হয়ে যেতো)। অর্থাৎ প্রতি বছর হজ তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যেতো। আর হুকুমটি হতো তখন সংখ্যা নির্দেশ সম্বলিত ও বিস্তারিত।

'ইন তুবদালাকুম তাসুকুম'— কথাটির উদ্দেশ্য, হজ ফরজ (জীবনে একবারই ফরজ)। সাহাবীগণের প্রশ্নের কারণেই রসুল স.কে উত্তর দিতে হয়েছিলো। তখন যদি তিনি স. কেবল 'হ্যাঁ' বলতেন তবে 'হজ ফরজ' আয়াতটি রহিত হয়ে যেতো। তদস্থলে আসতো নতুন কঠিন আয়াত। আগের সাধারণ নির্দেশনার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হতো বিশেষ নির্দেশনা। প্রশ্নের পূর্বেই বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ দেয়াই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু তা যখন করা হয়নি, তখন নিশ্চুপ থাকাই ছিলো সমীচীন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, নতুন বিধান অবতীর্ণ না হলে পুরাতন বিধান রহিত হয় না। কিন্তু নতুন বিষয়ের আলোচনা— বিধান অবতীর্ণ হওয়া না হওয়ার প্রতি নির্ভরশীল নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে— সংক্ষিপ্ত, বিপজ্জনক অথবা গোপন বিষয়ে প্রশ্ন করাতে কোনো দোষ নেই। এ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করা সম্পর্কে এই আয়াতে কোনো নিষেধাজ্ঞা আসেনি।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, রুগ্ন ব্যক্তির নিরাময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা উচিত। সুতরাং বুঝতে হবে ওই সকল বিষয়ে প্রশ্ন করা অনুচিত যেগুলো সম্পর্কে শরিয়তে স্পষ্ট করে হ্যাঁ বা না বলা হয়নি। এ সকল বিষয়ে অহেতুক প্রশ্ন করা হলে এর পরিণামে নতুন হুকুম অবতীর্ণ হয়ে যাবে। যেমন প্রতি বছর হজ ফরজ কিনা— এই প্রশ্নটি। হজরত মুসা তাঁর উম্মতকে গাভী জবাইয়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিনা প্রশ্নে এই নির্দেশটি প্রতিপালিত হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু বনী ইসরাইলেরা একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো। আর কেবল তাদের প্রশ্নের কারণেই সরল হুকুম অপসারণ করে তদস্থলে এসে যাচ্ছিলো কঠিন, কঠিনতর হুকুম।

www.eelm.weebly.com

'আফাল্লহু আনহা'— কথাটির অর্থ, আল্লাহ্ সে সব বিষয়ের প্রশ্ন ক্ষমা করেছেন। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে— তোমরা হজ সম্পর্কে যা জিজ্ঞেস করেছো— আল্লাহ্পাক তা দয়া করে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আর যেনো কখনো এমন ঘটনা না ঘটে।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াল্লহু গফূরুন্ হালিম।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক বড়ই ক্ষমাশীল ও সহনশীল। তাই তিনি বিশ্বাসীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করেন (ক্ষমা করে দেন) এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেলেও শাস্তি আরোপ করেন না।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১০২

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ

❒ তোমাদের পূর্বেও তো এসব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করিয়াছিল; অতঃপর তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করে।

'ক্বদ সাআলাহা ক্বওমুম্ মিন ক্বব্লিকুম'—অর্থ , তোমাদের পূর্বেও তো এ সব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করেছিলো। এই প্রসঙ্গটি একটু পরেও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তার আগে এটুকু জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, ইবনে জারীর এবং ইবনে মুনজির বলেছেন, হজরত উবাই বিন কা'ব এই আয়াতটিকে পড়তেন এভাবে—'ক্বদ্ সাআলাহা ক্বওমুন বাইয়েনাত লাহুম ফাস্বাহু বিহা কাফিরীন।'

জ্ঞাতব্যঃ হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. রোষান্বিত হয়ে ঘরের বাইরে এলেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল ছিলো রক্তাভ। তিনি স. মিম্বরে আরোহণ করলেন। এক লোক দণ্ডায়মান হয়ে প্রশ্ন করলো, আমার পিতা ও পিতামহ এখন কোথায়? তিনি স. বললেন, দোজখে। আর এক লোক দাঁড়িয়ে বললো, আমার পিতা কে? তিনি স. তার পিতার নাম বলে দিলেন। হজরত ওমর রসুল স. এর রোষতপ্ত অবস্থা লক্ষ্য করে প্রমাদ গুণলেন। তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা আল্লাহ্কে প্রভুপালক হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে, মোহাম্মদ স. কে রসুল হিসেবে এবং কোরআনকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পেয়ে প্রসন্ন। হে আমদের প্রিয় রসুল! আমাদের জীবন থেকে মূর্খতার অমানিশা অপসৃত হয়েছে। আমরা এখন ইসলামের অক্ষয় আলোয় আলোকিত। আমাদের অপরাধ মার্জনা করা হোক। আল্লাহ্পাক অবশ্যই জানেন, আমাদের পিতা মাতারা এখন কোথায় (আমরা তাদের মর্মবিদারক পরিণতি সম্পর্কে আর জানতে আগ্রহী নই)। হজরত ওমরের এহেন সমর্পণস্নাত বক্তব্য শুনে রসুল স. এর রোষ প্রশমিত

www.eelm.weebly.com

হলো। তখন অবতীর্ণ হলো—'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু লা তাস্আলু আন আশ্ইয়াআ' (আয়াত ১০১)।

'সাআলাহা' শব্দটির 'হা' (এ সব) সর্বনাম পূর্বের আয়াতের 'আশ্আইয়া' (বিষয় সম্পর্কে) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত (অর্থাৎ ওই সব বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিলো)। এখানে 'আন' শব্দটি উহ্য রয়েছে ধরতে হবে। অথবা 'হা' সর্বনামটি এখানে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। 'সে সব বিষয়ে প্রশ্ন কোরো না' (লা তাসআল) পূর্ববর্তী আয়াতের বাক্যাংশটি এর প্রমাণ। যদি তাই হয়, তবে এখানে 'আন' শব্দটি উহ্য আছে— এ রকম বলার প্রয়োজন পড়বে না।

ইমাম বায়যাবী বলেছেন, 'মিন ক্বলিকুম' এর সম্পর্ক রয়েছে 'সাআলাহা' এর সঙ্গে। তিনি একে 'ক্বওমুন' এর বিশেষণ বলেননি। কেননা, 'জরফ জামান' (কালাধিকরণ কারক) কখনো বিশেষণ, বিশেষ্য কিংবা বিধেয় হতে পারে না। কিন্তু এ রকম দলিল প্রমাণ আপত্তিকর। 'জরফ' এর সম্পর্ক এমন বিষয়ের সঙ্গে করা উচিত যন্মধ্যে ওই বিষয়টি অনির্দিষ্ট। যেমন, 'আল হিলালু ইয়াওমাল জুমুআতে' (জুমআ দিবসের চন্দ্র)। এখানে জুমআর দিবস নির্দিষ্ট নয়। তাই এই দৃষ্টান্তটিতে নির্দিষ্টতাকে প্রকাশ করার জন্য জুমআর দিবসের সম্পর্ক চন্দ্রের দিকে করা হয়েছে।

বনী ইসরাইলকে গাভী জবাইয়ের নির্দেশ দেয়া হলে তারা গাভীর বয়স, রঙ, আকার ইত্যাদি সম্পর্কে অনাবশ্যক প্রশ্নের অবতারণা করেছিলো। সামুদ সম্প্রদায়ও প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলো হজরত সালেহ্ আ. এর অলৌকিক উষ্ট্রী সম্পর্কে। হজরত ঈসার সম্প্রদায় কুটিল প্রশ্ন তুলেছিলো তাঁর আকাশারোহণ প্রসঙ্গে। হজরত মুসার পরবর্তী নবী সম্পর্কে বনী ইসরাইলেরা বলেছিলো, আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করে দেয়া হোক— যার নেতৃত্বে জালুতের বিরুদ্ধে আমরা জেহাদ করতে পারি।

'ছুম্মা আসবাহূ বিহা কাফিরীন'— অর্থ, অতঃপর তারা উহা প্রত্যাখ্যান করে (কাফের হয়ে যায়)। এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, ওই কূট প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ নির্দেশ প্রশ্নকারীরা প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই তারা কাফের (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী)।

হজরত আবু ছা'লাবা খাশানী বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা কতিপয় ফরজ নির্ধারণ করেছেন। তোমরা প্রশ্নের অবতারণা করে সেগুলোকে অতিক্রম করতে প্রয়াসী হয়ো না। আর আল্লাহ্পাক কতিপয় বিষয়কে নিষিদ্ধ করেছেন। সেগুলোর বিপরীত কিছু করে অন্তরায় সৃষ্টি কোরো না। যে সীমানা তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছেন সে চিহ্নরেখাকে লংঘন কোরো না। কিছু বিষয় তিনি রেখেছেন গোপন— সেই নিভৃতিকে প্রশ্নবিদ্ধ কোরো না।

www.eelm.weebly.com

হজরত কাতাদাসূত্রে বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, কিছু লোক অনাবশ্যক বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলো। রসুল স. রুষ্ট হলেন। প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হলো তাঁর। মিম্বরে আরোহণ করে রোষতাপিত স্বরে তিনি স. বললেন, আজ তোমাদের সকল প্রশ্নের জবাব দেবো আমি (বলো কে কি বলতে চাও)। আমি অস্থির হয়ে ডানে বামে তাকাতে শুরু করলাম। দেখলাম, উপস্থিত জনতা লজ্জাবনত হয়ে পরিধেয় বস্ত্রে মুখমণ্ডল আবৃত করে কাঁদছে। এক লোক তার বংশপরিচয় বদলে ফেলেছিলো। সে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! বলুন আমার পিতা কে? রসুল স. বললেন, হুজাফা। হজরত ওমর দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা আল্লাহ্কে প্রভুরূপে, ইসলামকে ধর্মরূপে এবং মোহাম্মদ স.কে রসুলরূপে পেয়ে প্রশান্তচিত্ত। সকল বিশৃঙ্খলা থেকে আমরা পরিত্রাণপ্রার্থী। রসুল স. বললেন, ভালো মন্দ উভয় দিক থেকে আমি আজকের মতো দিন পাইনি। আমার দৃষ্টিপথে বেহেশত ও দোজখ উন্মোচিত করা হয়েছিলো। সামনের দেয়ালে আমি দেখেছি বেহেশত দোজখের উদ্ভাস। হজরত কাতাদার বর্ণনায় এসেছে— তখন অবতীর্ণ হলো, 'হে বিশ্বাসীরা! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন কোরো না' (আয়াত ১০১)।

জুহুরীর মাধ্যমে ইউনুস বর্ণনা করেছেন, হজরত ওবায়দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বলেছেন, আব্দুল্লাহ্ বিন হুজায়ফার মা তার ছেলে আব্দুল্লাহ্কে বললো, তোমার মতো মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী কোনো সন্তানের কথা আমি শুনিনি। তোমার কি সন্দেহ হয়, মূর্খতার যুগের অনেক মহিলার মতো তোমার মাতাও অশ্লীল চরিত্রের অধিকারিণী? এভাবে তিনি সর্বসমক্ষে তার সন্তানকে তিরস্কার করতে শুরু করলেন। আব্দুল্লাহ্ বললেন, আল্লাহ্র কসম! তুমি যদি কোনো হাবশী গোলামের সঙ্গেও আমার পিতৃসম্পর্ক স্থাপন করে দিতে চাও, তবুও আমি তা মেনে নেবো।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর তখন বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা মূর্খতার অন্ধকার থেকে সদ্যমুক্ত। আমাদেরকে দয়া করে ক্ষমার্হ মনে করা হোক। এ কথা শুনে রসুল স. প্রশমিত হলেন।

বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কয়েকজন লোক বিদ্রূপবশতঃ রসুল স. কে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো। একজন বললো, আমার পিতা কে? আরেকজন বললো, আমার হারানো উট এখন কোথায়? তখন অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, বর্ণিত দু'টি ঘটনাই এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত হতে পারে। তবে এ সম্পর্কিত সকল বর্ণনাপেক্ষা হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, যদি হজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার কারণে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়ে থাকে তাহলে আয়াতের বর্ণনা-ভঙ্গির সঙ্গে তা অধিকতর ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত হবে। আর পিতামাতা সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হওয়ার কথা মেনে নিলে অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— তোমরা এরূপ বিষয়ে প্রশ্ন করা থেকে বিরত হও— যার উত্তর পেলে তোমরাই লজ্জিত ও অপদস্থ হবে (সঠিক জন্মসূত্র জানিয়ে দিলে গোপন কোনো তথ্য প্রকাশিত হয়ে তোমাদেরই মনোকষ্ট বাড়িয়ে দিবে)।

মুজাহিদ বলেছেন, লোকেরা রসুল স. এর নিকট বহিরা, সায়েবা, ওসিলা এবং হাম্ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো। তাদের জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১০৩, ১০৪

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ۝

❒ বহিরা, সায়েবা, ওসিলা ও হাম্ আল্লাহ্ স্থির করেন নাই; কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ আল্লাহের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাহাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না।

❒ যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার দিকে ও রসূলের দিকে আইস, তাহারা বলে, 'আমরা আমাদিগের পূর্ব-পুরুষকে যাহাতে পাইয়াছি তাহাই আমাদিগের জন্য যথেষ্ট।' কী! যদিও তাহাদিগের পূর্ব পুরুষগণ কিছুই জানিত না ও সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না, তথাপি?

বহিরা, সায়েরা, ওসিলা এবং হামকে আল্লাহ্ পাক স্থির করেন নি— এ কথার অর্থ এগুলোকে আল্লাহ্পাক শরিয়তসম্মত করেননি, এগুলো আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদিত নয় এবং এগুলো আল্লাহ্পাকের নির্দেশনার অন্তর্ভুক্তও নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে উট পাঁচবার প্রসব করেছে সে উটের কর্ণ ছেদন করে স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দেয়া হতো। বোঝাবহনের কাজে কিংবা আরোহণের কাজে তাকে ব্যবহার করা হতো না। পশম কাটা হতো না, কোনো

www.eelm.weebly.com

কূপের পানি পান করতে বাধা দেয়া হতো না, সকল চারণক্ষেত্রে ছিলো তার অবাধ বিচরণ। ষষ্ঠ প্রসবের শাবক যদি পুরুষ হতো তবে ওই উষ্ট্রী শাবককে জবাই করে মুশরিক নারী পুরুষেরা ভক্ষণ করতো। আর মাদী শাবক প্রসব করলে সেই শাবকটিরও কান চিরে ছেড়ে দেয়া হতো। এ রকম উষ্ট্রীকে বলা হতো বহিরা।

হজরত আবু উবায়দা বর্ণনা করেছেন, মান্নত করে ছেড়ে দেয়া উটকে বলা হতো সায়েবা। রোগ মুক্তির জন্য এবং প্রবাসী নিকটজনের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য মান্নতকারী তাদের অভিলাষ পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ রকম উট ছেড়ে দিতো। সকল চারণভূমি এবং সকল পানি পান করার স্থান ছিলো এদের জন্য অবারিত। কেউ এগুলোর উপর আরোহণ করতো না। পুরুষ ও মাদী উভয় প্রকার উট সায়েবা হতে পারতো।

কোনো কোনো অভিধানবিশারদ উল্লেখ করেছেন, বারোটি প্রসবের পর ত্রয়োদশ প্রসবে মাদী বাচ্চা জন্ম নিলে কর্ণ ছেদন করে তাকে তার মায়ের সঙ্গে মুক্ত করে দেয়া হতো। মায়ের মতো তারও থাকতো অবাধ স্বাধীনতা। এ ধরনের মা উটকে সায়েবা এবং তার শাবককে বহিরা বলা হতো।

হজরত আলকামা বলেছেন, ক্রীতদাসকে যখন সকল বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়, তার উপর আর কর্তৃত্বের অধিকার প্রয়োগ করা হয় না, তেমনি ছিলো বহিরা ও সায়েবা প্রকৃতির পশুকুল। ওগুলোর অবস্থা ছিলো রক্তের বদলা ও উত্তরাধিকারের বিপরীত। রসুল স. বলেছেন, কর্তৃত্বের অধিকার ওই ব্যক্তির যে মুক্ত করেছে। সায়েবা অর্থ মুক্তকৃত যেমন, ঈশাতুর্‌রদ্বিয়াহ্— এখানে রদ্বিয়াহ্ ব্যবহৃত হয়েছে মার্‌দ্বিয়াহ্ অর্থে। অর্থাৎ পছন্দনীয় বা পছন্দকৃত।

সাত বার পুরুষ শাবক প্রসবকারী ছাগলকে জবাই করে মুশরিক নারী-পুরুষেরা ভক্ষণ করতো। কিন্তু সাতবার মাদী শাবক প্রসবকারী ছাগলকে তারা ছেড়ে দিতো। সপ্তম প্রসবের সময় পুরুষ ও মাদী দু'টো শাবক প্রসব করলে বাচ্চা দু'টোকেও তারা ছেড়ে দিতো। বলতো, এ দু'টো জোড়া বেঁধেছে। ওই জোড়া বাঁধা ছাগল শাবক দু'টোর মা ছাগলকে তারা বলতো 'ওসিলা'। তারা আরো বলতো, ওই মা ছাগলের দুধ পান করা মহিলাদের জন্য হারাম। আর ওই জোড়া বাঁধা ছাগল দু'টোর যে কোনো একটি মারা গেলে মুশরিক নারী পুরুষ সকলে সেটিকে ভক্ষণ করতে পারতো।

কোনো পুরুষ উটের প্রজনন দ্বারা দশটি উট শাবকের জন্ম হলে অংশীবাদিরা সেটিকে বলতো, এর পৃষ্ঠদেশ মুক্ত (বাহন ও বোঝা বহন থেকে)। এরপর থেকে ওই উটের পিঠে কেউ চড়তো না। তার পিঠে কোনো বোঝাও চাপাতো না। সকল পানি পানের স্থান এবং সকল চারণভূমি তার জন্য ছিলো বাধা বন্ধনহীন। এ ধরনের উটকে বলা হতো হাম। হামের মৃত্যু হলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুশরিক উটটির গোশত ভক্ষণ করতে পারতো।

www.eelm.weebly.com

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, ওই সকল উষ্ট্রীকে বহিরা বলা হতো যেগুলোর দুধ থাকতো তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর জন্য সংরক্ষিত। ওগুলোকে কেউ দোহন করতো না। আর তাদের দেব-দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত পুরুষ উটকে বলা হতো সায়েবা। সেগুলোর পিঠে কেউ চড়তো না। ওসিলা ছিলো ওই উষ্ট্রী যেগুলো প্রথম প্রসবে পুরুষ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রসবে মাদী শাবক প্রসব করতো। এ ধরনের উষ্ট্রীকে অংশীবাদিরা তাদের দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করতো। ওগুলোরই নাম ছিলো ওসিলা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত জোড়া শাবক প্রসবকারী এবং সেগুলো থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ শাবকের জন্ম হলে ওই প্রথম মা উষ্ট্রীকে তারা প্রতীমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতো। ওই উষ্ট্রীর দ্বারা কোনো বোঝা বহনের কাজ করানো হতো না। এগুলোর নাম ছিলো হাম্।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি আমর বিন আমের খাজায়ীকে দোজখের মধ্যে নিজের নাড়ি ভুঁড়ি টানা হেঁচড়া করতে দেখেছি। সে-ই ছিলো সর্বপ্রথম সায়েবা পদ্ধতির প্রবর্তক।

মোহাম্মদ বিন ইসহাকের মাধ্যমে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. আকসাম বিন জাওন খাজায়ীকে বলেছিলেন, আকসাম! আমি আমর বিন লুহাই বিন কুমআ বিন খান্দাফকে দোজখে নিজের নাড়িভুঁড়ি ছিড়তে দেখেছি। তুমি দেখতে অবিকল আমরের মতো এবং আমর তোমার মতো। আমরই সর্বপ্রথম হজরত ইসমাঈলের ধর্মাদর্শকে বিকৃত করেছিলো। উটকে চিহ্নিত করে ছেড়ে দেয়ার নিয়ম সেই আবিষ্কার করেছে। বহিরা, সায়েবা, ওসিলা এবং হামের অপপ্রবর্তনা তারই। আমি দেখলাম, তার নাড়িভুঁড়ির দুর্গন্ধে অন্য দোজখীরাও কষ্ট পাচ্ছে। আকসাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার চেহারা আমরের মতো— এজন্যে কি আমার কোনো ক্ষতি হবে? রসুল স. বললেন, না। তুমি ইমানদার এবং সে কাফের।

'কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না।'— এ কথার অর্থ অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে। অর্থাৎ তারা বলে, আল্লাহ্‌পাকই আমাদেরকে বহিরা, সায়েবা ইত্যাদি করতে বলেছেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ। তারা জানে না কি কারণে হালাল এবং হারাম বিধান প্রবর্তিত হয়। তারা তো ছিলো মূর্খ সাধকের অনুসারী। সত্যের উপলব্ধি তাদের নেই। তাদের অধিকাংশ এ রকম হলেও কিছুসংখ্যক ছিলো বোধসম্পন্ন। তৎসত্ত্বেও তারা তাদের অপবিশ্বাসের বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারেনি। নেতৃত্বাকাংখা এবং পিতৃপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ তাদেরকে সত্যানুসারী হতে দেয়নি— আয়াতে 'তাদের অধিকাংশ' কথাটির মাধ্যমে মূর্খ মুশরিক জনতার উপলব্ধিহীনতাকে প্রকাশ্যতঃ চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই সহজেই বুঝা যায়, তাদের নেতা পর্যায়ের লোকেরা উপলব্ধিহীন ছিলো না, যদিও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী হিসেবে নেতা জনতা সকলেই ছিলো সমান।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে, 'যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রসুলের দিকে এসো, তখন তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে যাতে পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কী! যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানতো না ও সৎপথ প্রাপ্তও ছিলো না, তথাপি?' এখানে দেয়া হয়েছে কাফেরদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। বলা হয়েছে, পথভ্রষ্ট পিতা— পিতামহদের অন্ধ অনুসরণ ছাড়া কাফেরদের নিকট আর কোনো দলিল নেই। আর এদিকে ঘোষিত হচ্ছে দয়ার্দ্র আহবান— কোরআনের দিকে ও আল্লাহ্‌র রসুলের দিকে এসো। কী বিস্ময়! এখনো কী তারা তাদের অজ্ঞ, অবিশ্বাসী পূর্বপুরুষদের অন্ধ আনুগত্যকেই আশ্রয় করে থাকবে?

এখানে 'আও' (অথবা) শব্দটি একই সঙ্গে বিজ্ঞপ্তিপ্রকাশক ও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। শব্দটি এভাবে প্রয়োগ করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, এরপরও কি বাপ দাদাদের মূর্খতা ও বিভ্রান্তির অনুসরণ করা বৈধ হবে? এ রকম প্রশ্নের মাধ্যমে এ কথাটিই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সকল যুগে, সর্বাবস্থায় পথপ্রাপ্ত জ্ঞানীগণই অনুসরণীয়। পথভ্রষ্ট মূর্খরা নয়।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১০৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! আত্মরক্ষা করাই তোমাদিগের কর্তব্য; তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমাদিগের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহের দিকেই তোমাদিগের সকলের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমরা যাহা করিতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।

হজরত আফরাহের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ওমর থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, যারা নতুন মুসলমান হতেন তাঁরা তাঁদের পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য নিকটজনকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাতেন। ইসলামের আহবান শুনে তারা জবাব দিতো, আমাদের জন্য আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রদর্শিত পথই যথেষ্ট। নতুন মুসলমানেরা এ কথা শুনে মনোক্ষুণ্ন হতেন। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতটি। আল্লাহ্‌তায়ালা ওই মনোক্ষুণ্ন মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে এখানে জানাচ্ছেন, হে বিশ্বাসীরা! আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য। এ কথার অর্থ— তোমরা নিজেদেরকেই সংশোধন করো। আত্মরক্ষা করো অবিশ্বাস থেকে। তারপর জানাচ্ছেন, যদি তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও— তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে

www.eelm.weebly.com

তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কোনো কোনো আলেম এ প্রসঙ্গে বলেছেন, মুসলমানেরা তাঁদের নিকটজনের সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে আক্ষেপ করতেন। তাঁরা মনে প্রাণে চাইতেন তাঁদের স্বজনেরাও সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করুক। ওই সময় অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। আহমদ ও তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে—হজরত আবু আমের আশআরী বলেছেন, আমি রসুল স.কে এই আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। বলেছিলাম 'মান দ্বাল্লা' (যে পথভ্রষ্ট হয়েছে) কথাটির অর্থ কী? তিনি স. বলেছিলেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী (পথভ্রষ্ট)। এ আয়াতে বলা হয়েছে, যারা পথভ্রষ্ট তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা সত্যের উপর সুদৃঢ় থাকো।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং মুজাহিদ বলেছেন, 'মান দ্বাল্লা' অর্থ ইহুদী ও খৃষ্টান। অতএব, হে মুসলিম বৃন্দ! যদি তোমরা সত্য ধর্মে সুদৃঢ় হও, তবে ইহুদী, খৃষ্টানেরা তোমাদের কোনো অপকার করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা তাদের নিকট থেকে জিজিয়া (কর) আদায় করো এবং তাদেরকে ছেড়ে দাও।

কোনো কোনো আলেমের বর্ণনায় এসেছে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে যারা ইসলাম গ্রহণ করতেন, তাঁদের আত্মীয়-স্বজনেরা বলতেন, তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে নির্বোধ ভেবেছো। এ রকম অপকথন শুনে তাঁরা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হতেন। মনে মনে চাইতেন, অজ্ঞ অবিশ্বাসীদের যদি বোধোদয় হতো। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

'আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য'—এ কথার অর্থ এ নয় যে, সৎ কর্মের আদেশ এবং অসৎ কর্মের নিষেধের দায়িত্ব পরিত্যাগ করতে হবে। বন্ধ রাখতে হবে সত্য ধর্মের প্রচার। সৎ কর্মের আদেশ এবং অসৎকর্মের নিষেধের কথা 'ইহতাদা' (যদি তোমরা সৎ পথে পরিচালিত হও) কথাটিতেই রয়েছে।

হজরত আবু বকর বলেছেন, হে মানুষ! তোমরা এ আয়াতটি পাঠ করো, কিন্তু এর অর্থ বুঝতে ভুল করো। আমি স্বয়ং রসুল স. কে বলতে শুনেছি, যদি মানুষ মন্দ কর্ম থেকে নিজে সংশোধিত না হয় (অথবা অন্যকে সংশোধনের চেষ্টা না করে) তবে এ রকমও হতে পারে যে, আল্লাহ্পাক সৎ অসৎ নির্বিশেষে সকলকেই শাস্তি দান করবেন। ইবনে মাজা, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, যদি মানুষ অনাচার দেখেও অনাচারীকে প্রতিহত করতে সচেষ্ট না হয়, তবে আল্লাহ্পাকের শাস্তি সকলের উপর নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, প্রতিহত করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ যদি অত্যাচারীকে বাধা না দেয়, তবে আল্লাহ্তায়ালা তাদের সকলকে শাস্তি দিবেন। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, যদি কোনো সমাজের সংখ্যালঘুরা

www.eelm.weebly.com

পাপ কর্মে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাদেরকে নিবৃত্ত করতে উদ্যোগী না হয়, তবে সর্বসাধারণের উপর নেমে আসতে পারে আল্লাহ্‌র আযাব। তৃতীয় বর্ণনায় এসেছে, মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশনা দাও এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে প্রয়াসী হও। যদি এমন না করো তবে আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে খারাপ লোকদের অধীন করে দিবেন এবং খারাপ মানুষেরা তোমাদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তিতে নিক্ষেপ করবে। তখন তোমাদের পুণ্যবানদের প্রার্থনাও গৃহীত হবে না।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা সৎ কর্মের নির্দেশনা দাও এবং অসৎ কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে বলো, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের কথা মান্য করে। যখন মানুষ তোমাদের এই শুভ প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করবে, তখন তোমরা নিজেরা সংশোধিত হও। কোরআন মজীদের কিছু কিছু ঘটনা বাস্তবায়িত হয়েছে। কিছু কিছু ঘটেছে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে। কিছু কিছু ঘটতে চলেছে নিকট ভবিষ্যতে, আবার কিছু কিছু ঘটবে দূর ভবিষ্যতে। যেমন —শেষ জামানায় এবং কিয়ামতের দিন। সুতরাং তোমরা পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি কোরো না। একে অপরকে আক্রমণ কোরো না। তোমরা উত্তম কর্মের নির্দেশ দিতে থাকো। আর নিষেধ করতে থাকো অনুত্তম কর্মের। এর পরেও যদি মানুষ সীমালংঘন করে তোমাদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে পড়ে, তোমাদেরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তবে তোমরা কেবল আত্মসংশোধন কর্মে ব্রতী হয়ো। ওই সময়ের সঙ্গে রয়েছে আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক। ওই পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই আয়াতে বলা হয়েছে— আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য। বায়হাকীর শো'বুল ইমানে আবুল আলিয়া সূত্রে এবং ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখের বর্ণনায় রয়েছে— উল্লিখিত বর্ণনাটিকে সকলে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের বর্ণনা বলে অভিহিত করেছেন।

তিরমিজি ও ইবনে মাজার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু ছা'লাবা খাশানী বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি রসুল স.এর নিকটে এই আয়াতের মর্মার্থ জানতে চেয়েছিলাম। তিনি স. বলেছিলেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য এ রকম নয় যে, তোমরা সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্বকে বন্ধ করে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে। বরং এই আয়াতের নির্দেশনা হচ্ছে— তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিতে থাকো এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত করতে থাকো এবং নিজেও বিরত থাকো। কিন্তু যখন দেখবে মানুষ কুপ্রবৃত্তির ক্রীতদাস, স্বেচ্ছাচারিতার অনুগামী, দ্বীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দানকারী এবং যখন দেখবে মানুষ তাদের অসৎ চিন্তাকে সঠিক মনে করে, তোমাকেও তাদের চিন্তানুসারী হতে বাধ্য করে—তখন কেবল আত্মসংশোধন কর্মে ব্যাপৃত থেকো, সর্বসাধারণের সংশোধন চিন্তা পরিত্যাগ কোরো। প্রকৃত কথা এই যে, সামনে

www.eelm.weebly.com

রয়েছে চরম দুঃসময়। হাতের মুঠোয় আগুন রাখা যেমন কঠিন, তখন ধৈর্য রক্ষা করাও হবে তেমনি কঠিন। ওই সময়ের একজনের পুণ্যকর্ম হবে পঞ্চাশ জনের পুণ্য কর্মের সমান। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তখন তাহলে একজনের পুণ্য কর্ম হবে তখনকার পঞ্চাশ জনের পুণ্য কর্মের সমান? তিনি স. বললেন, না। তোমাদের পঞ্চাশজনের সমান।

কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, বেদাতী সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। ইমাম আবু জাফর রাজী বলেছেন, হজরত সাফওয়ান বিন মাহ্‌রাজের সামনে এক বেদাতী যুবক অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে শুরু করলো। হজরত সাফওয়ান বললেন, আমি তোমাকে মহান আল্লাহ্‌র এক বিশেষ নির্দেশনার কথা বলি শোনো, আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয়জনদের উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেছেন 'হে বিশ্বাসীরা! আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য; তোমরা যদি শুভ পথে পরিচালিত হও তবে যে পথচ্যুত হয়েছে সে তোমাদের কোনো অপকার করতে পারবে না।

'আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। তারপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।' — এ কথার অর্থ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বিনিময় দেয়া হবে। একের অপরাধে অন্যকে অভিযুক্ত করা হবে না। পথচ্যুত এবং পথপ্রাপ্ত উভয়ের জন্য রয়েছে এখানে শাস্তি ও শান্তির অঙ্গীকার।

বাগবীর বর্ণনায় এবং বোখারী, আবু দাউদ ও তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তামীমদারী এবং আদী বিন বদর ছিলো খৃষ্টান। তাদের সঙ্গে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন হজরত আমর বিন আসের মুক্ত করা ক্রীতদাস বুদাইল। তিনি ছিলেন মুসলমান। সিরিয়ায় পৌঁছে বুদাইল পীড়িত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন, মৃত্যু অতি সন্নিকটে। তিনি তখন তাঁর নিজের পণ্যসামগ্রীর একটি তালিকা প্রস্তুত করে তাঁর মালমাত্তার সঙ্গে রেখে দিলেন। সাথীদ্বয়কে তালিকার কথা জানালেন না। শুধু অসিয়ত করলেন, তোমরা আমার মালমাত্তাগুলো আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিও। অল্পক্ষণের মধ্যে মৃত্যু বরণ করলেন তিনি। সাথীদ্বয় খোঁজাখুঁজি করে তাঁর মালপত্রের মধ্যে পেলো একটি তিনশত মিশকাল ওজনের রৌপ্যনির্মিত পাত্র। তারা কৌটাটি আত্মসাৎ করলো। ব্যবসা শেষ করে মদীনায় ফিরে এসে তারা বুদাইলের বাড়ীতে তাঁর জিনিসপত্রগুলো পৌঁছে দিলো। বুদাইলের স্ত্রী ওই জিনিসপত্রের মধ্যে পেলেন একটি তালিকা। তিনি তামীম ও আদীকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার স্বামী কি তার কোনো জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করেছে? তারা বললো, না। বুদাইলের স্ত্রী পুনরায় বললেন, তিনি কি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন? তাঁর চিকিৎসার জন্য তোমাদেরকে কি কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে? তারা বললো, না। বুদাইলের স্ত্রী বললেন, আমি

www.eelm.weebly.com

আমার স্বামীর পণ্যসামগ্রীর মধ্যে একটি লিখিত তালিকা পেয়েছি। তালিকার সকল সামগ্রী এখানে রয়েছে। কিন্তু তালিকায় লিপিবদ্ধ ওই রৌপ্যপাত্রটি আমি পাচ্ছি না, যা ছিলো স্বর্ণখচিত। ওজন ছিলো তিনশত মিশকাল। তারা বললো, এ কথা আমাদের জানা নেই। সে বলেছিলো তার জিনিসপত্রগুলো যেনো আমরা বাড়ীতে পৌছে দেই। আমরা তাই জিনিসপত্রগুলো পৌছে দিলাম। কিন্তু রূপার পাত্রটির কথা আমরা জানি না। এ ঘটনা সম্পর্কে রসুল স. এর নিকট অভিযোগ উত্থাপন করা হলে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১০৬

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي
الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ
شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ○

❑ হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগের কাহারও যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন অসিয়ত করার সময় তোমাদিগের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে; তোমরা সফরে থাকিলে এবং তোমাদিগের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে তোমাদিগের ছাড়া অন্য লোকদিগের মধ্য হইতে দুইজন সাক্ষী মনোনীত করিবে। তোমাদিগের সন্দেহ হইলে সালাতের পর তাহাদিগকে অপেক্ষমান রাখিবে। অতঃপর তাহারা আল্লাহের নামে শপথ করিয়া বলিবে, 'আমরা উহার বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করিব না যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহের সাক্ষ্য গোপন করিব না, করিলে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

মৃত্যু পথযাত্রীদের অসিয়ত সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে, অন্তিম যাত্রার সময় কেউ অসিয়ত করতে চাইলে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী নিযুক্ত করতে হবে। 'শাহাদাতু বাইনিকুম' (তোমাদের মধ্য থেকে) এখানে উদ্দেশ্য (মুবতাদা)। আর 'ইছনান' হচ্ছে বিধেয়। ইছনান (দু'জন) শব্দটির পূর্বে শাহাদাত (সাক্ষ্যপ্রমাণ) শব্দটি উহ্য রয়েছে। অসিয়ত সম্পর্কীয় এই

www.eelm.weebly.com

নির্দেশনাটি শব্দগত দিক থেকে বিজ্ঞপ্তিসূচক (জুমলায়ে খবরিয়াহ্)। আর অর্থগত দিক থেকে নির্দেশসূচক। বক্তব্য বিষয় এই যে, অসিয়তের সময় দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।

এ রকমও হতে পারে যে, এখানে 'ইছনান' শব্দটি শাহাদাত এর কর্তা (ফায়েল)। শাহাদাত এখানে উদ্দেশ্য এবং এর প্রথমে বিধেয়টি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যু পথ যাত্রী ব্যক্তি যে বিষয়ে অসিয়ত করতে চায়, তার উপর দু'জনকে সাক্ষী হতে হবে। শাহাদাত অর্থ সাক্ষী নির্বাচন। দু'জন লোককে ডেকে নিয়ে তাদের সম্মুখে মুমূর্ষু ব্যক্তি কিছু বলতে পারে। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দৃষ্টে এরকমই বুঝা যায়। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, 'ওয়াল ইয়াশহাদ আজাবাহুমা তইফাতুম মিনাল মু'মিনীন'(মুমিনদের একটি দল যেনো তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে)।

সাক্ষী হিসেবে দু'জন লোককে নির্বাচন করার বিষয়টি ঐচ্ছিক, আবশ্যিক নয়। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, অসিয়ত করার সময় একজন সাক্ষীর উপস্থিতিই যথেষ্ট।

'ইজা হাদ্বারা' (যখন উপস্থিত হয়) কথাটি শাহাদাত এর জরফে জামান (কালাধিকরণ কারক)। অর্থাৎ যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। এখানে বক্তব্য বিষয় হচ্ছে, মৃত্যুর সময় অসিয়তকে গুরুত্বহীন মনে করে পরিত্যাগ করা যাবে না। মৃত্যুর সময়ই অসিয়তের প্রকৃষ্ট সময়।

'জাওয়া আদলিম্ মিনকুম' অর্থ— তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক। অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ মুসলমান। ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টিকে এখানে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

এরপরে বলা হয়েছে, সফররত অবস্থায় মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে অমুসলমানদের মধ্যেও দু'জন সাক্ষী নির্বাচন করা যাবে। তখন ওই সাক্ষীদ্বয়কে অসী (যাকে অসিয়ত করা হয়েছে) বানিয়ে সম্পদ দিয়ে দেয়া যাবে। অসীদ্বয় মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে প্রদত্ত সম্পদ পৌঁছিয়ে দেবে। এমতোক্ষেত্রে অসীদ্বয় বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে। সম্পদ আত্মসাৎ করতে পারে। অথবা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে সন্দেহও করতে পারে। তাই এর পর বলা হয়েছে, 'তোমাদের সন্দেহ হলে নামাজের পর তাদেরকে অপেক্ষমান রাখবে।' এখানে 'মিমবা'দিস্ সলাত' (নামাজের পর) অর্থ আসরের নামাজের পর। কেননা আসরের পর অধিক লোক সমাগম হয়। ওই সময় দায়িত্ব আদান প্রদানের নিমিত্তে দিবস ও রজনীর ফেরেশতাবৃন্দও একত্র হয়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে নামাজের পর অর্থ—যে কোনো ওয়াক্তের নামাজের পর।

www.eelm.weebly.com

যাদের প্রতি সন্দেহ করা হয়েছে তারা নামাজের পর সমবেত জনতার উপস্থিতিতে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, আমরা এই শপথের বিনিময়ে কোনো মূল্য গ্রহণ করবো না, যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য গোপন করবো না, করলে আমরা হবো পাপীষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত। উত্তরাধিকারীরা সন্দেহ করলেই কেবল অসীদ্বয় জনসমক্ষে এ রকম শপথ বাক্য উচ্চারণ করবে। উত্তরাধিকারীরা সন্দেহ না করলে এ রকম শপথের কোনো প্রয়োজনই নেই। এ রকম শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন কাযী বা বিচারক।

'এর বিনিময়ে কোনো মূল্য গ্রহণ করবো না'—একথার অর্থ, আমরা লোভে পড়ে মিথ্যা শপথ করবো না। আর 'যদি সে আত্মীয়ও হয়'—এ কথার অর্থ অসী মৃত ব্যক্তির নিকটজন হওয়া সত্ত্বেও যদি তাকে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ সন্দেহ করে বসে, তবুও তাকে শপথ করাতে হবে। সন্দেহের ক্ষেত্রে পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে একই বিধান প্রযোজ্য।

'শাহাদাতাল্লহ' অর্থ ওই সাক্ষ্য যা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্‌পাক। সাক্ষ্য অর্থ সত্য সাক্ষ্য। নিজের বিরুদ্ধে গেলেও সত্যকে সত্যরূপে প্রকাশ করতে হবে।

'শাহাদাতাল্লহ ইন্না ইজাল্ লামিনাল আছিমিন' অর্থ 'আমরা আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য গোপন করবো না, করলে আমরা হবো পাপীষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত।'

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. আসরের নামাজ শেষে তামীম ও আদীকে ডেকে মিম্বারের কাছে নিয়ে এসে শপথ করালেন এভাবে—বলো, ওই আল্লাহ্‌র শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, আমরা বুদাইলের প্রদত্ত সামগ্রী আত্মসাৎ করিনি। এভাবে শপথ করানোর পর রসুল স. তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। দীর্ঘ দিন পর আত্মসাৎকৃত একটি পাত্র তাদের কাছে পাওয়া গিয়েছিলো।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে, হজরত সাঈদ বিন যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, কথিত পাত্রটি পাওয়া গিয়েছিলো মক্কায়। যাদের কাছে পাওয়া গিয়েছিলো তারা বলেছিলো, পাত্রটি আমরা ক্রয় করেছি তামীম ও আদীর কাছ থেকে। সংবাদটি বনী সাহমের নিকট পৌঁছানো হলো। সে তখন তামীম ও আদীর কাছে গেলো। তামীম ও আদী বললো, আমরা পাত্রটি ক্রয় করেছিলাম বুদাইলের নিকট থেকে। বনী সাহম বললো, তোমরা তো আগেই বলেছিলে যে, বুদাইল কোনো কিছু বিক্রয় করেনি। তখন তারা বললো, বুদাইল যে বিক্রয় করেনি তার কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। আমরা তাই কথাটিকে গোপন করাই উত্তম মনে করেছিলাম। এ কথা শুনে বনী সাহম মহানবী স. এর দরবারে বিষয়টি উত্থাপন করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰۤى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَاۤ ۖ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

❐ যদি ইহা প্রকাশ পায় যে, তাহারা দুইজন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে তবে যাহাদের স্বার্থহানি ঘটিয়াছে তাহাদিগের মধ্য হইতে নিকটতম দুইজন তাহাদিগের স্থলবর্তী হইবে এবং আল্লাহের নামে শপথ করিয়া বলিবে, 'আমাদিগের সাক্ষ্য অবশ্যই তাহাদিগের হইতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করি নাই, করিলে আমরা জালিমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

এখানে বলা হয়েছে, পরে যদি জানা যায় অসীদ্বয় প্রকৃতপক্ষে আত্মসাৎকারী এবং আত্মসাতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার নিমিত্তে তারা মিথ্যা কসম করেছে, তবে পাল্টা কসমের ব্যবস্থা করতে হবে। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাতে হবে দু'জনকে। অর্থাৎ যে সকল উত্তরাধিকারীর স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য থেকে নিকটতম দু'জনকে মিথ্যা শপথকারীদের স্থলবর্তী করতে হবে। পাল্টা সাক্ষ্য হিসেবে তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে 'তাদের চেয়ে আমাদের সাক্ষ্যই অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করিনি, করলে আমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'

উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দু'জন পাল্টা সাক্ষী দাঁড় করাতে হবে এজন্য যে, তারা দাবিদার। আর শরিয়তও তাদের দাবি মেনে নিয়েছে। সুতরাং তাদেরকেই শপথ করে বলতে হবে যে, অসীদ্বয়ের কৃত শপথ মিথ্যা। যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, সেই ঘটনায় দাবিদার ছিলো দু'জন। তাই আয়াতে 'নিকটতম দু'জন' এ রকম বলা হয়েছে। দাবিদার যদি একজন হয়, তবে একজনের সাক্ষীই যথেষ্ট। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু'য়ের অধিক দাবিদার থাকাও সম্ভব। তখন তাদের পক্ষ থেকে দু'জনকে নির্বাচন করতে হবে। তারাই শপথ করে বলবে যে, অসীদ্বয়ের কৃত শপথ মিথ্যা। শপথকারীদ্বয়কে হতে হবে আত্মীয়তার দিক থেকে নিকটতম। নিকটতম বুঝাতে এখানে 'আওলাইয়ান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, হুমাল আওলাইয়ান (তাদের মধ্য থেকে নিকটতম দু'জন)।

আলোচ্য আয়াতের নির্দেশানুসারে বলতে হয়, হারিয়ে যাওয়া পাত্রটি ক্রয় করার মিথ্যা দাবিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য দাবিদারদের দু'জন আল্লাহ্র নামে শপথ করবে এভাবে—ওই অসীদ্বয়ের শপথের চেয়ে আমাদের শপথ অধিক

www.eelm.weebly.com

গ্রহণযোগ্য। আর শপথের ক্ষেত্রে আমরা সীমালংঘনকারীও নই। যদি আমরা সত্যবিচ্যুত হই, তবে আমরা অবশ্যই হয়ে যাবো মিথ্যাচারী। এখানে শাহাদাত অর্থ শপথ। অপর এক আয়াতে এসেছে 'ফা শাহাদাতু আহাদিহিম আর বাউ' শাহাদাতিম বিল্লাহি ইন্নাহু লামিনাস্ সদিক্বীন' (তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এ রকম হবে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে বার বার শপথ করে বলবে, সে অবশ্যই সত্যবাদী)।

বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর বুদাইল সাহামীর নিকটাত্মীয়ের মধ্যে দু'জন শপথ করার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হলো। তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আমর বিন আস এবং তাঁর সঙ্গে একজন বা দু'জন দাঁড়িয়ে কসম খেলেন। বাগবী লিখেছেন, শপথকারীর নাম ছিলো মতলব বিন ওয়াদায়াহ্ সাহামী। তিনি কসম করেছিলেন আসরের নামাজের পর। পূর্বাহ্নে তার বিরুদ্ধবাদী দুই শপথকারী সম্ভবত এই মর্মে কসম খেয়েছিলো যে, কথিত পাত্রটি বিক্রয় করার কথা আমাদের জানা নেই। এ প্রসঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি একটি হাদিস সংকলন করেছেন। কিন্তু হাদিস বিশারদগণ সেটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তামীমে দারী উল্লেখ করেছেন, আদী বিন বাদা এবং আমি ছিলাম খৃষ্টান। বাণিজ্য ব্যপদেশে আমরা সিরিয়ায় গমনাগমন করতাম। একবার আমাদের সঙ্গে বনী সাহমের এক মুক্ত ক্রীতদাস কিছু পণ্য সামগ্রী নিয়ে সিরিয়ায় গেলো। তার নাম ছিলো বুদাইল বিন আবী মারিয়াম। সেখানে গিয়ে সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো। অসুস্থতা বেড়েই চললো তার। সে বুঝলো, অন্তিম যাত্রার সময় সমুপস্থিত। আমাদেরকে সে এই মর্মে অসিয়ত করলো, তোমরা আমার সম্পদগুলো আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিও। এ কথা বলে সে ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে। আমরা দেখলাম, তার সম্পদের মধ্যে রয়েছে একটি রূপার পাত্র। পাত্রটি এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করে আমরা দু'জন সমানভাগে ভাগ করে নিলাম। বাকী সম্পদগুলো পৌঁছে দিলাম তার বাড়ীতে। ওগুলোর মধ্যে ছিলো তার সম্পদের একটি লিখিত তালিকা। তালিকাটি দেখে তার স্ত্রী বললো, সব ঠিকই আছে। কিন্তু রূপার পাত্রটি তো নেই। আমরা বললাম, আমরা যা পেয়েছি সবই দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু পরে যখন আমি মুসলমান হলাম তখন পাপবোধ জাগ্রত হলো আমার। আমি বুদাইলের স্ত্রীর কাছে গিয়ে প্রকৃত ঘটনা জানালাম এবং পাত্র বিক্রয়ের পাঁচশত দিরহামও তাকে দিয়ে দিলাম। আরো বললাম, আর পাঁচশত দিরহাম রয়েছে আমার সঙ্গীর কাছে। লোকেরা তখন আমার সেই বাণিজ্যসঙ্গীকে নিয়ে রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলো। রসুল স. তার বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষী পেলেন না। তাই তিনি আদীকে কসম করতে বললেন। আদী কসম করলো। তখন অবতীর্ণ হলো ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু শাহাদাতু বাইনাকুম.......বা'দা আইমানিহিম পর্যন্ত (১০৬ থেকে ১০৮ আয়াত পর্যন্ত)।

www.eelm.weebly.com

আদীর মিথ্যা কসমের বিরুদ্ধে তখন হজরত আমর বিন আস এবং আর একজন সত্য কসম উচ্চারণ করলেন। এই সত্য কসমের প্রেক্ষিতে আদীর নিকট থেকে আদায় করা হলো পাঁচশত দিরহাম।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১০৮

ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ اَوْ يَخَافُوْۤا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۠

❑ এই পদ্ধতিতেই অধিকতর সম্ভাবনা আছে লোকের যথাযথ সাক্ষ্যদানের অথবা শপথের পর আবার তাহাদিগকে শপথ করান হইবে এই ভয়ের। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং শ্রবণ কর; আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

এই আয়াতে জানানো হয়েছে, এভাবে মিথ্যা শপথের বিরুদ্ধে সত্য শপথ করানোর বিধান হয়তো মিথ্যা কসমকারীদেরকে ভীত করবে। সুতরাং এভাবে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকায় মিথ্যাবাদীরা হয়তো অনন্যোপায় হয়ে সত্য ঘটনা প্রকাশ করে ফেলবে। এখানেও শাহাদাত অর্থ সত্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে যে অসিয়ত করে গিয়েছেন তা যথাযথরূপে বর্ণনা করা। 'আলা ওয়াজহিহা'—কথাটির মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির অসিয়ত হুবহু বর্ণনা করার কথাটি বলে দেয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে ওয়াত্তাকুল্লহ্ (আল্লাহ্‌কে ভয় করো)। কথাটির সংযোগ রয়েছে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে। উহ্য বাক্যটি হচ্ছে—আল্লাহ্‌র নির্দেশের অনুসরণ করো। এভাবে পূর্ণ বাক্যটি হবে এ রকম, আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশানুসারী হও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো।

'ওয়াস্‌মায়ু' অর্থ— এবং শ্রবণ করো। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে হুকুম দিয়েছেন তা আন্তরিকতার সঙ্গে শ্রবণ করো।

শেষে বলা হয়েছে ওয়াল্লহু লা ইয়াহ্‌দিল ক্বওমাল ফাসিক্বীন (আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না)। একথার অর্থ 'আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং শোন'—এ নির্দেশটি যদি তোমরা না মানো, তবে তোমরা হয়ে যাবে আল্লাহ্‌র আনুগত্যচ্যুত। এভাবে যারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সীমানা থেকে বের হয়ে যায়, আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না। পৃথিবীতে কোনো দলিল প্রমাণ যেমন তাদেরকে সত্যপথ প্রদর্শন করতে পারবে না, তেমনি পরকালেও তারা হারিয়ে ফেলবে জান্নাতের পথ।

www.eelm.weebly.com

আয়াতের শানে নুজুলের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছি। এভাবে ব্যাখ্যা করলে আয়াতের কোনো বাক্যকে মানসুখ (রহিত) বলার প্রয়োজন হবে না। কেননা উত্তরাধিকারীদের দাবি যদি অসী প্রত্যাখ্যান করে বসে, তবে তার বিরুদ্ধে সত্য শপথের প্রবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। অসী যদি মৃত ব্যক্তির নিকট থেকে কোনো সম্পদ ক্রয় করেছে বলে দাবি করে, আর উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীরা যদি তা স্বীকার না করে, তবে উত্তরাধিকারীদেরকেই প্রথমে শপথ করাতে হবে। এটাই আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য অভিমত। কেননা সুরা মায়িদার কোনো আয়াত রহিত হয়নি।

হাসান, দাউদ জাহেরী, এবং ইকরামা এই আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করেছেন এরকম—মৃত্যুর পূর্বে কেউ যদি অসিয়ত করে যেতে চায়, তবে সে দু'জন লোককে সাক্ষী নির্ধারণ করবে। যেনো তারা যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে, তার পক্ষে বিচারকের সামনে গিয়ে সাক্ষী দিতে পারে।

'আমরা তার বিনিময়ে কোনো মূল্য গ্রহণ করবো না, যদি সে আত্মীয়ও হয়'—পূর্ববর্তী আয়াতের (১০৭) এই বাক্যটিই এর প্রমাণ। অর্থাৎ সাক্ষী বলবে, যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে সে যদিও আমার নিকটজন, তথাপি আমি কোনো লোভের বশবর্তী হয়ে অতিরিক্ত সম্পদের অসিয়তের সাক্ষ্য দিবো না। এ অবস্থায় 'তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক'— পূর্ববর্তী আয়াতের (১০৬) এই বাক্যটির অর্থ হবে—দু'জন সাক্ষী মৃত্যুপথযাত্রী অসিয়তকারীর বংশ থেকেও হতে পারবে, আবার অন্য গোত্র থেকেও হতে পারবে।

মাসআলাঃ মুসলমানের বিরুদ্ধে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। মাসআলাটি সর্বজনসমর্থিত। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকার—এমন কি হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু মুসা আশআরী, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, ইব্রাহিম নাখয়ী, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, মুজাহিদ এবং উবাইদা এই আয়াতের 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্য থেকে) শব্দটির অর্থ করেছেন—মুসলমানদের মধ্য থেকে এবং 'মিন গইরিকুম'(অন্য লোকদের মধ্য থেকে) শব্দটির অর্থ করেছেন—বিধর্মীদের মধ্য থেকে। তাঁদের ব্যাখ্যানুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের বিষয়ে কাফেরদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। আবার ইব্রাহিম নাখয়ী এবং অন্যান্য আলেমগণ 'মিন গইরিকুম' শব্দ সংবলিত আয়াতকে (১০৬) রহিত বলেছেন। তাঁরা আরো বলেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানের জন্য কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ছিলো। পরে নির্দেশটি রহিত হয়েছে। এখন আর মুসলমান সম্পর্কে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যান্য আলেমের অভিমত হচ্ছে আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্যানুসারে মুসলমান সাক্ষী না পাওয়া গেলে কাফেরকে সাক্ষী বানানো সিদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

কাযী শোরাইহ্ বলেছেন, ভ্রমণকালে মুসলমান সাক্ষী না পাওয়া গেলে কাফেরকে সাক্ষী বানানো যাবে। কিন্তু বিধানটি কেবল অসিয়তের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। অন্য কোনো ক্ষেত্রে মুসলমানের জন্য কাফেরের সাক্ষ্য সিদ্ধ নয়।

ইমাম শা'বী বর্ণনা করেছেন, দাকুকা নামক স্থানে এক ব্যক্তির মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলো। সে তখন অসিয়ত করতে চাইলো। কিন্তু অসী হিসেবে কোনো মুসলমানকে পেলো না। অগত্যা সে দু'জন আহলে কিতাবকে সাক্ষী বানালো। তার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে সাক্ষী দু'জন উপস্থিত হলো কুফায়। সেখানে তারা হজরত আবু মুসা আশআরীর দরবারে উপস্থিত হয়ে মৃত ব্যক্তির সম্পদ হস্তান্তর করলো। হজরত আবু মুসা আশআরী বললেন, রসুলুল্লাহ্ স. এর মহাতিরোধানের পর এ রকম ঘটনা আর ঘটেনি। এরপর তিনি অসী দু'জনকে শপথ করালেন এবং তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী নির্দেশ কার্যকর করলেন।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতকে যদি মুহকাম (সুস্পষ্ট) আয়াত বলে মেনে নেয়া হয়, আর যদি কোনো কারণবশতঃ অমুসলিমের শপথে মিথ্যাচার রয়েছে বলে সন্দেহ হয়, তবে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের নিকট থেকে এইমর্মে শপথ গ্রহণ করাতে হবে যে, এই অমুসলিম লোক দু'টি অসত্য সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১০৯

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ۖ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

❑ স্মরণ কর, যে-দিন আল্লাহ্ রসূলদিগকে একত্র করিবেন এবং জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তোমরা কি সাড়া পাইয়াছিলে?' তাহারা বলিবে, 'আমাদিগের তো কোন জ্ঞান নাই; তুমিই তো অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত।'

'যে দিন আল্লাহ্ রসুলদেরকে একত্র করবেন'— কথাটির সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না' কথাটির সঙ্গে। এভাবে এখানে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— যে দিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ নবীদেরকে একত্র করবেন, সেদিন তিনি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে জান্নাতের পথ দেখাবেন না। অথবা পূর্বের আয়াতের 'ওয়াত্তাকুল্লহ্' (আল্লাহ্কে ভয় করো) কথাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে 'যে দিন আল্লাহ্ রসুলদেরকে একত্র করবেন' কথাটি। যদি তাই হয় তবে অর্থ দাঁড়াবে এ রকম — ওই কিয়ামত দিবসকে ভয় করো, যে দিবসে আল্লাহ্ একত্র করবেন রসুলগণকে। কিংবা এর সম্পর্ক রয়েছে

www.eelm.weebly.com

'ওয়াস্‌মায়ু' (এবং শ্রবণ করো) এর সঙ্গে। এভাবে অর্থ হবে—শ্রবণ করো কিয়ামতের দিবসের সংবাদ— যে দিবসে আল্লাহ্ রসুলদেরকে একত্র করবেন।

'এবং জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা কি সাড়া পেয়েছিলে?' এ কথার অর্থ—আল্লাহ্‌পাক তাঁর রসুলগণকে সেদিন মৃদু তিরস্কার করে এ রকম প্রশ্ন করবেন। ওই সকল রসুলগণের অবাধ্য উম্মতদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্‌পাক এ রকম বলবেন। এ রকম প্রশ্ন উল্লেখ করা হয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন—'মৃত্তিকায় জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছে?' এ রকম প্রশ্ন করা হবে মৃত্তিকা প্রোথিত কন্যা সন্তানকে অভিযুক্ত করার জন্য নয়। হত্যাকারীই এখানে অভিযোগের লক্ষ্য। তেমনি 'তোমরা কি সাড়া পেয়েছিলে' প্রশ্নটির মাধ্যমে রসুলগণের অবাধ্য উম্মতের প্রতি বর্ষিত হবে আল্লাহ্‌পাকের প্রবল ক্রোধ। ওই ক্রোধদীর্ণ ভয়াবহ দিবসে আল্লাহ্‌পাকের প্রিয় রসুলগণও হতবিহ্বল হয়ে পড়বেন। আল্লাহ্‌পাকের জালাল (রোষ) দর্শনে তাই তাঁরা তখন বলে উঠবেন, 'আমাদেরতো কোনো জ্ঞান নেই।'

হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান, মুজাহিদ এবং সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা দর্শনে আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী রসুলগণও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বেন। আল্লাহ্‌পাকের রোষতপ্ত প্রশ্নের জবাবে তাই তাঁরা তখন বলবেন, আমাদেরতো কোনো জ্ঞান নেই। তারপর যখন তাঁদের চৈতন্যোদয় হবে, তখন তাঁরা তাঁদের আপন আপন উম্মত সম্পর্কে যথাসাক্ষ্য প্রদান করবেন।

ইবনে জুরাইজ বলেছেন, 'আমাদেরতো কোনো জ্ঞান নেই' কথাটির অর্থ—রসুলগণ তখন বলবেন, আমরা জানিনা, আমাদের পৃথিবী পরিত্যাগের পর আমাদের উম্মতের কী পরিণাম হয়েছিলো। তাদের অন্তরের লালিত ধারণা এবং প্রদত্ত ধর্মাদর্শের কতটুকু ক্ষতি বৃদ্ধি তারা করেছে— সে সম্পর্কে আমরা সত্যিই কিছু জানি না।

শেষে বলা হয়েছে —'ইন্নাকা আংতা আল্লামুল গুয়ুব' (তুমিই তো অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত)। এ কথার অর্থ— হে আমাদের আল্লাহ্! আমরা যে সকল বিষয়ে জ্ঞান রাখিনা, সে সকল বিষয়ও আপনার জ্ঞানের অধীন। আমরাতো কেবল ততটুকুই জানি, যতটুকু আপনি আমাদেরকে জানতে দিয়েছেন।

ক্বারী আবু বকর এবং ক্বারী হামযা পবিত্র কোরআনের সকল স্থানের 'গুয়ুব' শব্দটি পড়েছেন, গিয়ুব (গইন অক্ষরের নিচে যের সহযোগে)। অন্য ক্বারীগণ 'গইন' অক্ষরে পেশ সহযোগে পড়েছেন 'গুয়ুব' (যেমন এখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে)।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন (কিয়ামতের দিন) হাউজে কাওসারের সন্নিকটে কিছু লোক আসতে চেষ্টা করবে। আমিও তাদেরকে চিন্‌তে পারবো। আমার পিছন দিক থেকে তাদেরকে রুখে দেয়া হবে।

www.eelm.weebly.com

তখন বলা হবে, আপনার জানা নেই, এ সকল লোক আপনার তিরোধানের পরে ধর্মাদর্শের মধ্যে কি কি নতুন প্রথা উদ্ভাবন করেছিলো। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও অন্যান্য ইমামগণ।

অন্য একটি আয়াত আলোচ্য আয়াতটির সমপ্রকৃতির। ওই আয়াতে হজরত ঈসার বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— 'যতোদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততোদিন ছিলাম আমি তাদের প্রত্যক্ষদর্শী। তারপর যখন আপনি আমাকে আপনার সন্নিধানে নিয়ে এলেন, তখন থেকে আপনিই তো তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়ক।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই'—কথাটির অর্থ, তুমি যতোটুকু দিয়েছো ততোটুকুই আমাদের জ্ঞান। আর সে জ্ঞান তোমার মহাজ্ঞানের তুলনায় জ্ঞানহীনতারই নামান্তর। তাই প্রকৃত অর্থে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটির অর্থ— তোমার অপরিসীম জ্ঞানের তুলনায় আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানকে জ্ঞানই বলা যায় না। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— এ বিষয়টি প্রকাশ করা যে, যে সকল বিষয়ে তুমি অধিক জ্ঞাত সে সকল বিষয়ে আমাদেরকে প্রশ্ন করার মধ্যে কী অপার রহস্য নিহিত রয়েছে—আমরা তা জানি না।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১০

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَىٰةَ وَالْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَٰتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

❑ আল্লাহ্ বলিবেন, 'হে মরিয়ম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ করঃ পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত

www.eelm.weebly.com

কথা বলিতে; তোমাকে কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়াছিলাম; তুমি কর্দম দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করিতে এবং উহাতে ফুৎকার দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্রমে উহা পাখী হইয়া যাইত; জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করিতে এবং আমার অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করিতে; আমি তোমা হইতে বনী-ইস্রাইলকে নিবৃত্ত রাখিয়াছিলাম। তুমি যখন তাহাদিগের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আনিয়াছিলে তখন তহাদিগের মধ্যে যাহারা সত্য-প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, 'ইহা তো স্পষ্ট যাদু!'

এই আয়াতের 'আল্লাহ্ বলবেন' কথাটির সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'তোমরা কি সাড়া পেয়েছিলে?' কথাটির সঙ্গে। অবাধ্য উম্মতদেরকে তিরস্কারের উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি প্রেরিত নবী রসুলদেরকে আল্লাহ্পাক কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করবেন 'তোমরা কি সাড়া পেয়েছিলে?' ওই অবাধ্যদের কেউ কেউ তাদের আপনাপন নবী রসুলদের মাধ্যমে প্রকাশিত মোজেজাসমূহকে অস্বীকার করেছিলো। কেউ কেউ বলেছিলো, ওগুলো তো যাদু। আবার কেউ কেউ মোজেজা দর্শনে অতি অভিভূত হয়ে নবী রসুলগণকে উপাস্য ভেবে নিয়েছিলো। আল্লাহ্পাক তাই ওই অলৌকিক নিদর্শনসমূহের উল্লেখ করে কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদেরকে তিরস্কার করবেন। আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে হজরত ঈসার প্রতি প্রদত্ত অলৌকিক নিদর্শনসমূহের কথা।

আয়াতের বক্তব্য শুরু হয়েছে এভাবে—আল্লাহ্ বলবেন, হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ করোঃ পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম। অনুগ্রহ বুঝাতে এখানে 'নি' মাতি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি এক বচন। কিন্তু এর অর্থ হবে বহু বচনের। অর্থাৎ এখানে অনুগ্রহ অর্থ হবে অনুগ্রহরাজি।

'তোমার জননী' অর্থ হজরত ঈসার মাতা হজরত মরিয়ম। আল্লাহ্পাক তাঁকে পবিত্র করেছেন এবং রমণীকুলের মধ্যে অনন্যসাধারণ মর্যাদা দান করেছেন। হাসান বলেছেন, এখানে 'অনুগ্রহ স্মরণ করো' কথাটির অর্থ অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। 'পবিত্র আত্মা' (রুহুল কুদুস্) অর্থ হজরত জিবরাইল।

'এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে।'— এ কথার অর্থ যখন তুমি দুগ্ধপোষ্য শিশু, তখনও তুমি পূর্ণ ও পরিণত মানুষের মতো বিজ্ঞজনোচিত কথা বলেছো। কেউ কেউ বলেছেন, পরিণত বয়সে পৌঁছার আগেই আল্লাহ্পাক হজরত ঈসাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। আকাশারোহনের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো তেত্রিশ বছর। তাই পরিণত বয়স হবে তখনই যখন তিনি পুনরায় আকাশ থেকে নেমে আসবেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ঈসাকে আল্লাহ্‌পাক তিরিশ বছর বয়সে রেসালাতের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিরিশ মাস যাবৎ তিনি এই মহান দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তারপর আল্লাহ্‌পাক তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন।

কোনো কোনো বিজ্ঞজন এমতো উক্তি করেছেন যে, এই আয়াত দ্বারা দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে (মধ্যম বয়সে) হজরত ঈসার কথা যে হুবহু এক রকম তা প্রমাণিত হয় না। বরং বলা যেতে পারে, ওই দুই অবস্থায় কথার মধ্যে রয়েছে গভীর সম্পর্ক। তাই ওই দুই বয়সের এক রকম কথার উল্লেখ করে এ কথা বলা যেতে পারে না যে, তাঁর পরিণত বয়সের কথা হবে আকাশ থেকে নেমে আসার পর।

'তোমাকে কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম।' এ কথাটির সম্পর্ক রয়েছে 'পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিশালী করেছিলাম' কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ হজরত জিবরাইলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাক দিয়েছিলেন কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষা।

এরপর উল্লেখিত হয়েছে হজরত ঈসার প্রতি প্রদত্ত আরো কয়েকটি অলৌকিক নিদর্শনের কথা। যেমন 'তুমি কর্দম দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখি সদৃশ আকৃতি গঠন করতে এবং ওতে ফুৎকার দিতে, ফলে আমার নির্দেশক্রমে তা জীবিত পাখি হয়ে যেতো; জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার নির্দেশক্রমে নিরাময় করতে এবং আমার নির্দেশক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করতে।'

'আমি তোমা হতে বনী ইসরাইলকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম।' এ কথার অর্থ তোমার অলৌকিক নিদর্শনসমূহ দর্শনে হিংসার অনলে দগ্ধীভূত যে সকল ইহুদী তোমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলো, তাদের জিঘাংসা ও হিংসানল থেকে আমি তোমাকে নিরাপদ রেখেছিলাম। তাদেরকে নিরাশায় নিমজ্জিত করে আমি তোমাকে উঠিয়ে নিয়েছিলাম আকাশে।

সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা নবী রসুলগণের সুস্পষ্ট নিদর্শন (মোজেজা) অস্বীকার করে থাকে। কেউ কেউ অবজ্ঞা ভরে বলে, এটা তো স্পষ্ট যাদু। অভিশপ্ত ইহুদীরাও হজরত ঈসার অলৌকিক নিদর্শনসমূহকে মূল্যহীন মনে করেছিলো। সে কথাই আয়াতের শেষে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— 'তুমি যখন তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে, তখন তাদের মধ্যে যারা সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী তারা বলেছিলো, এটা তো স্পষ্ট যাদু!'

'ইল্লা সিহ্‌রুম্‌ মুবিন' অর্থ—এটা তো স্পষ্ট যাদু। ক্বারী হামজা ও ক্বারী কাসায়ী সুরা হুদ এবং সুরা সফে উল্লেখিত 'ইল্লা সিহ্‌রুন' শব্দটিকে পড়েছেন 'ইল্লা সাহিরুন'। আলোচ্য আয়াতে 'সিহ্‌রুন' বা 'সাহিরুন' এর সম্পর্ক হজরত ঈসার সঙ্গে। আর সুরা হুদের 'সিহ্‌রুন' বা যাদুর সম্পর্ক রয়েছে রসুল পাক স. এর সঙ্গে।

www.eelm.weebly.com

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১১

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ○

❐ আরও স্মরণ কর, আমি যখন 'হাওয়ারী' দিগকে এই প্রেরণা দিয়াছিলাম যে, 'তোমরা আমার প্রতি ও আমার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর,' তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা বিশ্বাস করিলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে আমরা আত্মসমর্পণকারী।'

পূর্ববর্তী আয়াতের মতো এই আয়াতেও হজরত ঈসার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে—আমি যখন হাওয়ারীদেরকে এ অনুপ্রেরণা দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি এবং আমার রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। এখানে 'ওয়া ইজ আওহাইতু ইলাল্ হাওয়ারিইন' (হাওয়ারীদেরকে এই অনুপ্রেরণা দিয়েছিলাম) কথাটির সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'ইজ কাফাফ্তু' এর সঙ্গে অর্থাৎ 'তুমি যখন তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে' কথাটির সঙ্গে। এখানে 'আওহা' (ওহী) শব্দটির অর্থ অন্তরে স্থাপিত প্রেরণা বা অনুপ্রেরণা। এ রকম বলেছেন আবদ বিন হুমাইদ, হজরত কাতাদা থেকে এবং আবু শায়েখ, সুদ্দী থেকে। অন্যান্য আলেম বলেছেন, এখানে ওহী অর্থ হজরত ঈসার প্রতি প্রেরিত মৌখিক নির্দেশ।

'আন আমিনু বি ওয়া বিরসুলি'—কথাটির অর্থ তোমরা আমার প্রতি ও আমার রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে হাওয়ারীগণ (হজরত ঈসার সহচরবৃন্দ) বলেছিলেন, 'ওয়াশ্হাদ্ বি আন্নানা মুসলিমুন।' কথাটির অর্থ— আমরা বিশ্বাস করলাম এবং তুমি সাক্ষী থাকো যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১২

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ۗ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

❐ স্মরণ কর, 'হাওয়ারী'গণ বলিয়াছিল, 'হে মরিয়ম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আমাদিগের জন্য আস্‌মান হইতে খাদ্য-পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করিতে সক্ষম?' সে বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।'

www.eelm.weebly.com

'ইজ ক্বলাল হাওয়ারিইয়ুনা ইয়া ঈসাব্‌না মারইয়ামা হাল ইয়াস্‌তাতীয়ু রব্বুকা'— এ কথার অর্থ হাওয়ারীগণ বলেছিলো, হে মরিয়ম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি সক্ষম? অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক কি আমাদের নিবেদন বাস্তবায়ন করতে সক্ষম? 'ইস্‌তাতায়াত' অর্থ এখানে মেনে নেয়া অথবা নিবেদনানুসারে কার্য সম্পাদন করা। যেমন 'ইস্‌তিজাব' শব্দটি ব্যবহৃত হয় আজাবা অর্থে। তাই 'ফাস্‌তাজাবা লাহুম' অর্থ আল্লাহ্ কবুল করে নিয়েছেন। ইবনে আবী হাতেম আমের—শা'বী সূত্রে উল্লেখ করেছেন, হজরত আলী 'হাল ইয়াস্‌তাতিয়ু রব্বুকা' পাঠ করার পর বলেছেন, এর অর্থ হবে 'হাল ইউতিয়ু রব্বুকা।' আছার গ্রন্থে এসেছে— 'মান আতায়াল্লহা আতায়াহু'— কথাটির অর্থ, যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে আল্লাহ্ তার আবেদন মঞ্জুর করে নেন। ক্বারী কাসায়ীর ক্বেরাতে এসেছে 'হাল তাস্‌তাতিয়ু রব্বুকা।' সম্বোধনটি করা হয়েছে হজরত ঈসাকে। অর্থাৎ এখানে বক্তব্য হচ্ছে— হে ঈসা, আপনার প্রভুর কাছে এই আবেদন জানাবেন আপনার জন্য এ রকম আবেদন জানাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই এবং আপনার প্রভু আপনার আবেদন গ্রহণ করবেন। হজরত আলী, হজরত আয়েশা, হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ এই উচ্চারণরীতিটিকেই গ্রহণ করেছেন। হাকেম এবং হজরত মুআজ ইবনে জাবালও এই ক্বেরাতের সমর্থক। এই উচ্চারণরীতি অনুসারে 'ইয়াস্‌তাতিয়ু' অর্থ হয় 'ইয়াতিয়ু।'

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন, হাওয়ারীগণ আল্লাহ্‌তায়ালার মহান মর্যাদা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাই 'আল্লাহ্‌পাক কি সক্ষম' কথাটির মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহ্‌র সক্ষমতা এবং হজরত ঈসার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেননি— এ রকম বলেছেন ইবনে আবী শায়বা, আবু শায়েখ প্রমুখ।

হজরত আয়েশার ক্বেরাতে এসেছে—'তাস্‌তাতিয়ু রব্বাকা।' তিনি ইয়াস্‌তাতিয়ু' রব্বুকা পড়েননি। অর্থাৎ তাঁর ক্বেরাত অনুসারে অর্থ হয়— হজরত ঈসা কি তাঁর প্রভুর নিকট (আকাশ থেকে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণের) আবেদন জানাতে সক্ষম? তিনি (হজরত আয়েশা) ইয়াস্‌তাতিউ' রব্বুকা উচ্চারণটিকে ভুল বলেছেন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ স্থানে 'ইস্‌তাতায়াত' (সক্ষমতা) এর উদ্দেশ্য হতে পারে—হিকমত ও অভিপ্রায় এর মাধ্যমে সামর্থহীনতার সন্দেহ করা হয়নি। কারণ, আল্লাহ্‌তায়ালার অপার ক্ষমতার উপর হাওয়ারীগণের কোনো সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু তারা এ কথা জানতো না যে, আল্লাহ্‌পাকের হিকমত ও অভিপ্রায় তাদের এহেন আবেদনের অনুকূল কি না। অর্থাৎ আসমান থেকে খাদ্য-পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র ইচ্ছার অনুকূল কিনা। যেমন— কোনো ব্যক্তি তার সাথীকে বললো, আপনি কি এখন আমার সঙ্গে বাজারে যেতে পারেন? এ রকম কথার মধ্যে বাজারে যাওয়ার শক্তি তার আছে কিনা সে রকম সন্দেহ প্রকাশ পায় না।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে হাওয়ারীগণের প্রকাশ্য বক্তব্য থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, তাদের বিশ্বাস ছিলো প্রাথমিক পর্যায়ের। তাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে মারেফাতের লেশ মাত্র ছিলো না। তারা সবেমাত্র মূর্খতা ও অবিশ্বাসের যবনিকা অতিক্রম করেছিলো। তাই হজরত ঈসা তাদের এ রকম অশিষ্ট উক্তিতে বিব্রতবোধ করেছিলেন। বলেছিলেন—'ইত্তাকুল্লহা ইনকুনতুম মু'মিনিন (আল্লাহ্‌কে ভয় করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও)।

'মায়িদা' অর্থ খাদ্যপরিপূর্ণ বা খাদ্যসজ্জিত পাত্র। শব্দটি এসেছে 'মাদা' ইয়ামিদু' থেকে। 'মাইদুন' অর্থ পরিবেশন করা। খাঞ্চার মাধ্যমে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। তাই খাঞ্চাকে বলা হয় মায়িদা। যেমন বলা হয়— নদী প্রবাহিত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নদী নয়, প্রবাহিত হয় পানি। তবু প্রবাহিত হওয়ার সম্পর্ক করা হয় নদীর সঙ্গে।

কুফাবাসীগণ বলে থাকেন, মায়িদা অর্থ আন্দোলিত হওয়া বা নড়াচড়া করা। বসরাবাসীরা বলেন, ভক্ষণকারীরা আহারের সময় খাঞ্চা নাড়াচাড়া করেন। তাই এ অবস্থাকে বলা হয় 'মায়ি দাতুন।'

'কালাত্তাকুল্লহ' অর্থ— আল্লাহ্‌কে ভয় করো। হাওয়ারীদেরকে লক্ষ্য করে হজরত ঈসা এ রকম বলেছিলেন। তাঁর এ রকম বলার উদ্দেশ্য ছিলো, মোজেজা (অলৌকিক নিদর্শন) দেখতে চাওয়া নিষিদ্ধ। অতীত উম্মতেরা এভাবে মোজেজা দেখতে চেয়ে তাদের নবীদেরকে বিব্রত করেছিলো। যার ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো তারা। হজরত ঈসা তাই আল্লাহ্‌র ভয় প্রদর্শন করে হাওয়ারীদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

'ইন কুনতুম মু'মিনীন' অর্থ, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। বিশ্বাসীদের জন্য মোজেজা দেখতে চাওয়া অসিদ্ধ। হজরত ঈসার এ রকম বলার উদ্দেশ্য ছিলো এ কথাটি জানিয়ে দেয়া যে, হে হাওয়ারীগণ! আল্লাহ্‌পাকের অপার ক্ষমতার (কুদরতের) প্রতি এবং আমার রেসালাতের প্রতি যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেই থাকো, তবে মোজেজা দেখতে চাও কেনো? সন্দেহের ক্ষেত্রেই তো কেবল প্রমাণের প্রয়োজন হয়। তোমরা বলো তোমরা বিশ্বাসী। তবে সন্দেহকে প্রশ্রয় দিয়ে প্রমাণ হিসেবে মোজেজা দর্শনের দিকে ধাবিত হচ্ছো কেনো? হজরত ঈসার এমতো উক্তির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে—যদি তোমরা ইমানের দাবীতে সত্য হও (বিশ্বাসী হও) 'তবে খাদ্যপরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করতে সক্ষম?'—এ ধরনের অযথার্থ প্রশ্ন থেকে বিরত হও।

নাওয়াদিরুল উসুল গ্রন্থে ইবনে আবী হাতেম, হাকেম, তিরমিজি—আল উ'জমা গ্রন্থে আবুশ শায়েখ এবং আল ফায়লানীয়াত গ্রন্থে আবু বকর শাফেয়ী, হজরত সালমান ফারসী থেকে বর্ণনা করেছেন, হাওয়ারীদের আসমানী খাঞ্চার আবেদনে হজরত ঈসা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি তখন তাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাতেই কৃতজ্ঞ থাকো।

www.eelm.weebly.com

আকাশ থেকে খাঞ্চা অবতীর্ণ করার কথা বোলো না। এ রকম অলৌকিক খাঞ্চা অবতীর্ণ হলে তা হবে একটি বিরল নিদর্শন। আর ওই পবিত্র নিদর্শনের প্রতি তোমরা যথাযথ কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে না। সামুদ সম্প্রদায় তাদের নবীর নিকট এ রকম নিদর্শন দেখতে চেয়েছিলো। সে কারণেই তারা ধ্বংস হয়েছিলো। ওই নিদর্শন দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিলো। সে পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

হাওয়ারীরা হজরত ঈসার সতর্ক সংকেত সত্ত্বেও নিরস্ত হলো না। অনভিপ্রেত আবদারের উপরেই অনড় রইলো তারা। রসুলের কথার উপরে কথা বলা অন্যায়, বেআদবী। তবু—

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১৩

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

❐ তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা চাই যে, উহা হইতে কিছু খাইব ও আমাদিগের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করিবে। আর আমরা জানিতে চাহি যে, তুমি আমাদিগকে সত্য বলিয়াছ এবং আমরা উহার সাক্ষী থাকিতে চাহি।'

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হয়। চিত্তপ্রশান্তি ঘটে। সে কথাই আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত হাওয়ারীদের কথায় প্রকাশ পেয়েছে। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ঈসা তখন খাঞ্চার আবেদনকারীদেরকে বলেছিলেন, তিরিশটি রোজা রাখো। তারপর তোমাদের আবেদন আল্লাহ্পাক গ্রহণ করবেন। হাওয়ারীরা তাই করলো। তারপর দোয়ার মাধ্যমে লাভ করলো আসমানী খাঞ্চা। তারপর বললো, হে রসুল ঈসা! এ ব্যাপারে আমাদের প্রতীতি জন্মেছে যে, তিরিশটি রোজা রেখে প্রার্থনা জানালে আল্লাহ্পাক সে প্রার্থনা গ্রহণ করেন।

আয়াতের শেষ দিকে বলা হয়েছে, 'ওয়া নাকুনা আলাইহা মিনাশ্ শাহেদীন'—এ কথার অর্থ, আমরা এর সাক্ষী থাকতে চাই। অর্থাৎ অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস তো আমাদের ছিলোই। আসমানী খাঞ্চা লাভের পর আল্লাহ্র এককত্ব, কুদরত এবং আপনার নবুয়তের প্রতি এবার আমাদের প্রত্যক্ষ বিশ্বাসও অর্জিত হলো। কথাটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, যখন আমরা বনী ইসরাইল জনতার নিকট গমন করবো, তখন তাদের সম্মুখে আমাদের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারবো।

বলা বাহুল্য, হাওয়ারীগণের প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো হজরত ঈসার নেতৃত্বে। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ঈসা গোসল শেষে কম্বল পরিধান করে নামাজ পড়ে অবনত মস্তকে চক্ষু নিমীলিত অবস্থায় রোদন করছিলেন এবং প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন—

www.eelm.weebly.com

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

❒ মরিয়ম-তনয় ঈসা বলিল,- 'হে আল্লাহ্, আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের জন্য আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর; ইহা আমাদিগের ও আমাদিগের সকলের জন্য হইবে আনন্দোৎসব স্বরূপ ও তোমার নিকট হইতে নিদর্শন। এবং আমাদিগকে জীবিকা দান কর; আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকা দাতা।'

এখানে হজরত ঈসার প্রার্থনা শুরু হয়েছে 'আল্লাহুম্মা রব্বানা' বলে। 'আল্লাহুম্মা' অর্থ হে আল্লাহ্! এ কথার মাধ্যমে স্বীকার করা হয়েছে আল্লাহ্পাকের গুণরাজিকে। আর রব্বানা অর্থ—হে আমাদের প্রভুপালক! এই সম্বোধনটির মাধ্যমে প্রার্থনা গ্রহণের আবেদন বা আহবান জানানো হয়েছে আল্লাহ্পাকের প্রতি। 'আল্লাহুম্মা' এবং 'রব্বানা' সম্বোধনদ্বয়ের মধ্যে এ রকম পার্থক্য নিরুপণ করেছেন আল্লামা তাফ্তাজানী।

'আনযিল আ'লাইনা মাইদাতাম মিনাস্-সামায়ী'—কথাটির অর্থ, আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করো। এরপর বলা হয়েছে, এটা হবে—আমাদের ও আমাদের সকলের জন্য আনন্দোৎসব স্বরূপ ও তোমার নিকট থেকে নিদর্শন। সুদ্দী বলেছেন, এ কথার অর্থ—এ ঘটনাটি হবে আমাদের যুগের এবং আগামী প্রজন্মের আনন্দের দিন। আনন্দোৎসব বুঝাতে এখানে 'ঈদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ঈদকে খুশির দিন বলা হয় এ কারণে যে, ওই দিন মানুষ সকল বিষণ্ণতা পরিহার করে আনন্দমগ্ন হয়।

এক বর্ণনায় এসেছে, কথিত দিবসটি ছিলো রবিবার। খ্রীষ্টানেরা তাই রবিবারকে সাপ্তাহিক উৎসবের দিন নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, ঈদ অর্থ আঈদাহ্। অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দলিল বা প্রমাণ।

'আমাদের ও আমাদের সকলের জন্য'— এখানে 'আমাদের' অর্থ হজরত ঈসা'র সমসময়ের মানুষ এবং 'আমাদের সকলের' অর্থ ভবিষ্যতের খ্রীষ্টানগণ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উদ্ধৃত উক্তিটির অর্থ—আকাশ থেকে নেমে আসা ওই অলৌকিক খাঞ্চাটি যেনো এখনকার এবং আগামী পৃথিবীর সকল খ্রীষ্টানকে পরিতৃপ্ত করে। এভাবে বিষয়টি যেনো হয় সকল খ্রীষ্টান জনতার জন্য আনন্দোৎসব স্বরূপ।

www.eelm.weebly.com

'ওয়া আয়াতাম মিনকা'—অর্থ, তোমার নিকট থেকে নিদর্শন। অর্থাৎ এমন এক প্রমাণ যার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় আল্লাহ্পাকের অপার ক্ষমতা এবং হজরত ঈসার নবুয়ত।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'এবং আমাদেরকে জীবিকা দান করো, আর তুমিইতো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।' এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে—

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১৫

قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝

❐ আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমিই তোমাদিগের নিকট উহা প্রেরণ করিব: কিন্তু ইহার পর তোমাদিগের মধ্যে কেহ সত্যপ্রত্যাখ্যান করিলে তাহাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্ব জগতের অপর কাহাকেও দিব না।'

'ইন্নি মুনাজ্জিলুহা আ'লাইকুম'—অর্থ, আমিই তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করবো। আধিক্য ও ধারাবাহিক ক্রিয়া বুঝাতে 'মুনাজ্জিলুম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করবো এবং ধারাবাহিকভাবে কয়েকবার আমি খাঞ্চা অবতীর্ণ করবো।

এরপর বলা হয়েছে, 'কিন্তু এরপর আমি তোমাদের মধ্যে কেউ সত্য প্রত্যাখ্যান করলে তাকে এমন শাস্তি দিবো, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দিবো না।' শাস্তিদান বুঝাতে এখানে 'আযাবান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর মাধ্যমে শাস্তির একটি বিশেষ রূপ বা পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যে শাস্তি পরবর্তীতে আর কাউকে দেয়া হবে না। তাই হয়েছে। খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়ার পর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে আল্লাহ্পাক তাদেরকে শুকর ও বানরে পরিণত করে দিয়েছেন। এ রকম ভয়াবহ শাস্তি পরবর্তীতে আর কাউকে দেয়া হয়নি।

ইতোপূর্বে হজরত সালমান ফারসী বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। ওই হাদিসের শেষাংশে বলা হয়েছে—হজরত ঈসা দোয়া করলেন। একটু পরে আকাশ থেকে নেমে এলো একটি লাল রঙের খাঞ্চা। খাঞ্চাটি ছিলো পর্দাবৃত। ধীরে ধীরে খাঞ্চাটি এসে পড়লো মাটিতে। খাঞ্চা পতনের এই দৃশ্যটি দেখে হজরত ঈসা কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন, হে আমার আল্লাহ্! আমাকে কৃতজ্ঞচিত্তদের অন্তর্ভূত করো। আর এই নেয়ামতকে আমাদের জন্য রহমতে পরিণত করে দাও। একে শাস্তির উপকরণ বানিও না। বনী ইসরাইল জনতা বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো অলৌকিক খাঞ্চাটির দিকে। খাঞ্চা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে অপার্থিব সুবাস, যে সুবাসের সঙ্গে তারা কস্মিনকালেও পরিচিত ছিলো না। হজরত ঈসা বললেন, তোমাদের মধ্যে যে সর্বাধিক পুণ্যবান সে দণ্ডায়মান হও

www.eelm.weebly.com

এবং বিস্‌মিল্লাহ্ বলে খাঞ্চার আবরণ উন্মোচন করো। হাওয়ারীদের নেতা শামাউন সেফার বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এই বিশেষ কর্মের জন্য আপনিই অধিক উপযুক্ত। হজরত ঈসা দণ্ডায়মান হলেন। ওজু করলেন। দীর্ঘ সময় ধরে নামাজ পাঠ করলেন। অনেক রোদন করলেন। তারপর বিস্‌মিল্লাহ্ বলে খাঞ্চার আবরণ উন্মোচন করলেন এবং বললেন বিস্‌মিল্লাহি—খইরুর রজেক্বীন। সকলে সবিস্ময়ে দেখলো, খাঞ্চায় রয়েছে আঁশ ও কাঁটাবিহীন একটি ভাজা মাছ। মাছটি থেকে তেল চুঁয়ে পড়ছে। আর তার মস্তকের দিকে রয়েছে কিছু লবণ। লেজের দিকে কিছু সিরকা। চারপাশে রয়েছে বহু বর্ণের ব্যঞ্জন— সেগুলোতে কোনো সুবাস ছিলো না। মাছটির পাশে আরও রয়েছে পাঁচটি রুটি। একটি রুটির উপরে রয়েছে জয়তুন। দ্বিতীয়টির উপরে রয়েছে মধু। তৃতীয়টির উপরে ঘি, চতুর্থটির উপরে পনির এবং পঞ্চমটির উপরে রয়েছে এক টুকরো গোশত। শামাউন বললো, হে রুহুল্লাহ্! এ খাদ্য কি ইহকালের না পরকালের? হজরত ঈসা বললেন, এ আহার্য পৃথিবীর আহার্যের মতো নয়। আবার পরকালের খাদ্যের সঙ্গেও এর মিল নেই। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌পাকের অপার ক্ষমতার এক বিরল নিদর্শন। তোমাদের প্রার্থনার ফল হিসেবে আগত এ আহার্য তোমরা ভক্ষণ করো। আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। আর তাঁর অপার ক্ষমতা বলে এই আহার্যের মধ্যে তিনি প্রাচুর্য দান করবেন। হাওয়ারীগণ বললেন, হে রুহুল্লাহ্! আপনিই প্রথম শুরু করুন। হজরত ঈসা বললেন, এই আহার্য ভক্ষণ থেকে আমি আল্লাহ্‌পাক সকাশে পরিত্রাণ প্রার্থনা করি। এই খাদ্য চেয়েছিলে তোমরা। তাই তোমরাই এই খাদ্য ভক্ষণ করো। এ কথা শুনে হাওয়ারীগণ ভীত হলেন (কেউই আহার্য স্পর্শ করলেন না)। হজরত ঈসা তখন দরিদ্র, ক্ষুধার্ত, অসুস্থ, বিকলাঙ্গ এবং কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তদেরকে ডাকলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ প্রদত্ত এই আহার্য ভক্ষণ করো। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কিন্তু অন্যদের জন্য বিপজ্জনক। নিমন্ত্রিত জনতা পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভক্ষণ করলো আসমানী আহার্য। এক হাজার তিনশজন নিরন্ন নারী পুরুষ উদরপূর্তি করে ভক্ষণ করার পর দেখা গেলো— ভাজা মাছটি পূর্বের অবস্থাতেই রয়েছে। এরপর অলৌকিক খাঞ্চাটি উঠে গেলো আকাশে। এভাবে এক সময় জনতার দৃষ্টি থেকে সংগুপ্ত হয়ে গেলো অলৌকিক নিদর্শনটি।

অদৃশ্য থেকে ঘোষিত হলো— যে সকল অসুস্থ ও বিকলাঙ্গ মানুষ অলৌকিক আহার্য ভক্ষণ করেছে তারা হয়ে গিয়েছে নিরোগ। যে নিরন্ন নারী পুরুষ এই অলৌকিক খাদ্য খেয়েছে তারা হয়ে গিয়েছে বিত্তবান। যারা খায়নি তারা হয়েছে লজ্জিত। চল্লিশ দিন পর্যন্ত চাশতের নামাজের সময় অবতীর্ণ হতে লাগলো অলৌকিক খাঞ্চা। খাঞ্চা অবতীর্ণ হলে ধনী দরিদ্র, ছোট-বড়, পুরুষ-মহিলা সকলে সেখানে একত্র হতো। সকলেই আহার করতো খাঞ্চাটি থেকে। আহার শেষে সকলের চোখের সামনেই খাঞ্চাটি অদৃশ্য হয়ে যেতো আকাশে। এ রকমও বলা হয়েছে যে, সামুদ সম্প্রদায়ের উষ্ট্রীর মতো একদিন পর একদিন খাঞ্চাটি অবতীর্ণ হতো। আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় রসুল হজরত ঈসাকে প্রত্যাদেশ করলেন—আমি

www.eelm.weebly.com

আমার খাঞ্চার খাদ্য কেবল দরিদ্রদের জন্য নির্ধারণ করলাম। বিত্তশালীদের কোনো অংশ এতে নেই। হজরত ঈসা আল্লাহ্পাকের এই প্রত্যাদেশ জনসমক্ষে প্রচার করলেন। বিত্তশালীরা চিন্তিত হলো। তারা হয়ে গেলো সন্দেহবাদী। অন্য লোকের মধ্যেও তারা সন্দেহ সৃষ্টি করে চললো। বলে বেড়াতে লাগলো, ভালো করে দেখে নিও, খাঞ্চাটি কি সত্যিই আকাশ থেকে অবতীর্ণ হচ্ছে? (আকাশ থেকেই যদি অবতীর্ণ হয়, তবে আর ধনী দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্যের কথা ওঠে কেনো)। আল্লাহ্পাক পুনঃপ্রত্যাদেশ করলেন—আমি খাঞ্চা অবতীর্ণ করার পর যারা কুফরী (বিশ্বাসঘাতকতা) করবে আমি তাদেরকে এমন শাস্তি দিবো—যা পৃথিবীতে অন্য কাউকে কখনো দিবো না। (সুতরাং যারা ইতোমধ্যে কুফরী করেছে তারা হয়ে গিয়েছে শাস্তির উপযুক্ত)।

হজরত ঈসা বললেন, হে আমার আল্লাহ্! যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও (শাস্তি দেয়ার একক অধিকারী তো তুমিই), কিন্তু তারা তো তোমার বান্দা, আর যদি তাদেরকে তুমি মার্জনা করো, তবে নিঃসন্দেহে তুমিই তো অতুলনীয় ক্ষমাপরায়ণ। (তুমি মার্জনা করতে পারো এবং ক্ষমাপ্রার্থনা পদ্ধতিও তোমার জানা)। বিশ্বাসঘাতক তিনশত তেত্রিশজন ইহুদীর আকৃতি পরিবর্তন করে দিলেন আল্লাহ্পাক। রাতে তারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে শয্যা গ্রহণ করেছিলো। সকালে দেখলো, তারা আর মানুষ নয়, শুকর। ওই শুকরগুলো অন্য শুকরের মতো পচা নালা নর্দমায় দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য অন্বেষণ করতে শুরু করলো। এই ভীতিপ্রদ দৃশ্য দেখে বনী ইসরাইল জনতা হজরত ঈসার দরবারে উপস্থিত হয়ে কাঁদতে শুরু করলো। শুকরাকৃতির লোকগুলোও কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চারপাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। হজরত ঈসা তাদের নাম ধরে ডাকলে তারা মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারায় সাড়া দিতো। কথা বলার শক্তি তাদের ছিলো না। মাত্র তিন দিন পরেই মারা গেলো তারা।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আম্মার বিন ইয়াসার থেকে খালাস বিন আমর উল্লেখ করেছেন—রসুল স. বলেছেন, আকাশ থেকে অবতীর্ণ খাঞ্চাটিতে ছিলো গোশ্ত ও রুটি। বনী ইসরাইলকে বলা হয়েছিলো যতোদিন পর্যন্ত তোমরা এই আহার্য নিয়ে লুকিয়ে না রাখবে অথবা আত্মসাৎ না করবে, ততোদিন পর্যন্ত খাঞ্চাটি তোমাদের কাছে থাকবে। কিন্তু চঞ্চলমতি জনতা প্রথম দিনেই খাঞ্চা থেকে খাদ্য নিয়ে লুকিয়ে রাখতে শুরু করলো। কেউ করলো আত্মসাৎ। ফলে তারা কেউ হলো শুকর। কেউ হলো বানর।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ঈসা বনী ইসরাইলদেরকে বলেছিলেন, তোমরা তিরিশ দিন রোজা রাখো। তারপর আল্লাহ্পাকের কাছে যা খুশী চাও। আল্লাহ্পাক তোমাদের যাঞ্চা পূরণ করবেন। নির্দেশ মোতাবেক তারা সকলেই রোজা রাখলো। তারপর বললো, আমরা কারো কাজ করে দিলে সে আমাদেরকে খাদ্য দেয়। আমরা আল্লাহ্র কাজ করেছি। সুতরাং আল্লাহ্র কাছে আমরা খাবার চাই। এ কথা বলে তারা আল্লাহ্পাকের কাছে আকাশী খাঞ্চার

www.eelm.weebly.com

আবেদন জানালো। তাদের আবেদন মঞ্জুর করা হলো। ফেরেশ্তারা নিয়ে এলেন বিস্ময়কর একটি খাঞ্চা। খাঞ্চায় ছিলো সাতটি রুটি এবং সাতটি ভাজা মাছ। লোকেরা ওই খাঞ্চা থেকে ইচ্ছেমতো খেলো। তারপরও খাঞ্চার খাদ্য নিঃশেষ হলো না।

হজরত কা'ব আহ্বার বলেছেন, খাদ্যাধারটি অবতীর্ণ হয়েছিলো আকাশ ও মাটির মধ্যবর্তী স্থানে। সেখান থেকে ফেরেশ্তারা খাদ্যাধারটি নিয়ে এসেছিলো পৃথিবীতে। গোশত ছাড়া অন্য সকল খাদ্য বস্তু ছিলো তার মধ্যে।

হজরত কাতাদা বলেছেন, খাঞ্চায় ছিলো বেহেশ্তী ফল। আতিয়া আওফি বলেছেন, আকাশ থেকে নেমে এসেছিলো একটি মাছ, ওই মাছটিতে ছিলো সকল প্রকার খাদ্য বস্তুর আস্বাদ। কালাবী বলেছেন, ওই পাত্রটিতে ছিলো চালের রুটি। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে উল্লেখ করেছেন, আকাশী খাঞ্চাটিতে ছিলো রুটি ও গোশত ছাড়া অন্য সকল খাদ্য বস্তু। হজরত ওহাব বিন মুনাব্বাহ বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা যবের কয়েকটি ছোট রুটি এবং মৎস্য অবতীর্ণ করেছিলেন। কিছু লোক খেয়ে চলে যেতো। পরবর্তীরা এসে খেতে শুরু করতো। এভাবে ক্রমাগত অনেক লোক এসে খেয়ে যাওয়ার পরও খাদ্য ভাণ্ডার ছিলো অনিঃশেষ।

কালাবী এবং মুকাতিল বলেছেন, আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করেছিলেন রুটি, মাছ এবং কলিজা। এক হাজারেরও বেশী লোক সেই খাদ্য খেয়েছিলো। তারা স্বগৃহে ফিরে গিয়ে গৃহবাসীদেরকে এই অলৌকিক খাদ্য গ্রহণের কথা জানালো। কথা শুনে হেসে ফেললো তাদের নিকটজনেরা। বললো, তোমাদেরকে তো যাদু করা হয়েছে। এই অপার্থিব ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হলো দু'টো দল। যাদের প্রতি আল্লাহ্পাক সুপ্রসন্ন ছিলেন তারাই কেবল ছিলো বিশ্বাসে সুদৃঢ়। আর যারা কুফরী করলো, তারা পেলো শুকরের আকার। ওই রূপান্তরিত লোকগুলোর মধ্যে মহিলা ও শিশু কেউ ছিলো না। তারা সকলেই ছিলো পুরুষ। শুকরাকৃতি নিয়ে তারা বেঁচে ছিলো মাত্র তিনদিন। এর মধ্যে তারা পানাহার করতে পারেনি। হজরত কাতাদার উক্তিরূপে এসেছে, বনী ইসরাইল জনতা যেখানে যেখানে অবস্থান করতো সেখানেই মান্না ও সালওয়ার মতো অবতীর্ণ হতো আকাশী খাঞ্চা।

মুজাহিদ ও হাসান বলেছেন, শেষ পর্যন্ত প্রার্থিত খাঞ্চা অবতীর্ণ হয়নি। খাঞ্চার অবমাননা করলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে—এ রকম হুঁশিয়ারী শুনেই খাঞ্চাপ্রার্থীরা অবশেষে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলো। বলেছিলো, হে আমাদের আল্লাহ্! খাঞ্চা আমরা চাইনা। তাদের এ কথার পর খাঞ্চা আর অবতীর্ণ হয়নি। কিন্তু আয়াতে উল্লেখিত 'ইন্নি মুনাজ্জিলুহা' (নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করবো) কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, খাঞ্চা অবতীর্ণ হয়েছিলো। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, 'ইন্নি মুনাজ্জিলুহা' বাক্যটির অর্থ হবে এ রকম— এই সতর্কীকরণের পরেও যদি তোমরা খাঞ্চার আবেদন জানাতে থাকো, তবে আল্লাহ্পাক অবশ্যই খাঞ্চা অবতীর্ণ করবেন। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, শেষ পর্যন্ত প্রার্থিত খাঞ্চা অবতীর্ণ হয়েছিলো। 'আমিই খাঞ্চা প্রেরণ করবো'—আল্লাহ্পাক নিজেই এ কথা

www.eelm.weebly.com

জানিয়েছেন। সুতরাং খাঞ্চা অবতীর্ণ হয়নি—এ রকম বলা যায় না। এছাড়া খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়ার স্বপক্ষে রসুলুল্লাহ্ স. এর বহুসংখ্যক হাদিস বিদ্যমান। আর এ সম্পর্কে রয়েছে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈগণের অসংখ্য উক্তি। অতএব, বিষয়টি সর্বজনবিদিত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১৬

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ أَنْ أَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

❒ আল্লাহ্ যখন বলিবেন, 'হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহ্ রূপে গ্রহণ কর?' সে বলিবে, 'তুমিই মহিমান্বিত! যাহা বলার অধিকার আমার নাই তাহা বলা আমার পক্ষে শোভন নহে। যদি আমি তাহা বলিতাম, তবে তুমি তো তাহা জানিতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছ, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নহি; তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত।

'ইজ্ ক্বলাল্লহ' অর্থ —আল্লাহ্ বলেছিলেন অথবা বলবেন। 'ক্বলা' অতীতকাল বোধক। ইজ্ শব্দটিও অতীতকাল বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্পাকের প্রশ্নটি উচ্চারিত হয়েছিলো হজরত ঈসার আকাশারোহনের পর। কিন্তু তাফসীরবিদগণের অভিমত হচ্ছে— এখানে 'ইজ্ ক্বলাল্লহ' অর্থ আল্লাহ্পাক (কিয়ামতের দিন) বলবেন। অবিশ্বাসীদেরকে সতর্ক ও তিরস্কার করার জন্য এ রকম প্রকাশভঙ্গির ব্যবহার ঘটেছে। অন্য দু'টি আয়াতেও এমতো প্রকাশভঙ্গির দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, ১. 'ইয়াওমা ইয়াজ্মাউল্লহুর রুসুলা ফা ইয়াক্বুলু' (স্মরণ করো, যেদিন আল্লাহ্ রসুলদেরকে একত্রিত করবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন)। আয়াত ১০৯। ২, 'হাজা ইয়াওমুঁই ইয়ানফাউস্ সদিক্বীনা সিদ্ক্বুহুম।' সুতরাং এখানে 'ক্বলা' অর্থ হবে কিয়ামতের দিন বলবেন। এখন অবশিষ্ট রইল 'ইজ' শব্দটির অতীতকালসূচক ব্যবহারের প্রসঙ্গটি। এ সম্পর্কে বলতে হয় যে, ভবিষ্যতের সুনিশ্চিত ঘটনার ক্ষেত্রে এ রকম অতীতকাল বোধক শব্দ ব্যবহার সিদ্ধ। এ রকম শব্দ ব্যবহার ঘটলে বুঝে নিতে হবে যে, ভবিষ্যতে যা ঘটবে (কিয়ামত) তা যেনো ঘটেই গিয়েছে। 'ওয়ালাও তারা ইজ্ ফাজাউ'—এই আয়াতেও এভাবে ইজ্ শব্দটির ব্যবহার ঘটেছে।

www.eelm.weebly.com

'ইয়া ঈসাব্না মারইয়ামা আংতা কুলতা লিন্নাস' অর্থ— হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে। 'আংতা' অর্থ তুমি এবং কুলতা অর্থ তুমি বলেছিলে। 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করো' কথাটিকে হজরত ঈসার সঙ্গে সুদৃঢ় করার জন্যই এখানে আংতা শব্দটিকে বসানো হয়েছে কুলতা শব্দটির আগে। আমার ও আমার জননীর উপাসনা করো—এ রকম কথা হজরত ঈসার পক্ষে কস্মিনকালেও বলা সম্ভব নয়। কারণ, তিনি অবশ্যই জানতেন, আল্লাহ্‌পাক জন্মদান ও আনুরূপ্য থেকে পবিত্র। তাই এ রকম শক্তিশালী প্রশ্নের মাধ্যমে বক্তব্যটিকে হজরত ঈসার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে। হজরত ঈসা এবং তাঁর ধর্মপরায়ণা জননী অবশ্যই সৃষ্টির বৃত্তভূত। তাই এখানে বলা হয়েছে— আল্লাহ্ ব্যতীত। অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহ্ নন—গায়ের আল্লাহ্।

'মিন দুনিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত। অনধিক বুঝাতে 'দুনা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। শব্দটির ব্যবহারের মাধ্যমে এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে—অপরের উপাসনা করার সঙ্গে আল্লাহ্‌র উপাসনা করার অর্থ আদৌও আল্লাহ্‌র উপাসনা না করা। অর্থাৎ ওই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপাসক নয়, যে তার উপাসনায় আল্লাহ্‌পাকের সঙ্গে হজরত ঈসা ও হজরত মরিয়মকে উপাস্য বানায়। আরেকটি অর্থ এ রকম হতে পারে যে—তোমরা আমার ও আমার মায়ের এমন উপাসনা করো, যা আল্লাহ্‌র উপাসনার চেয়ে নিম্নমানের। এ রকম অর্থ করার কারণ এই যে—খ্রীষ্টানেরা হজরত ঈসা ও হজরত মরিয়মকে আল্লাহ্‌পাকের সমান্তরাল কোনো উপাস্য বলে মনে করতো না। তারা মনে করতো হজরত ঈসা ও তাঁর জননী একমাত্র উপাস্য আল্লাহ্‌তায়ালার মাধ্যম। তাই তাঁদের উপাসনা করার অর্থ আল্লাহ্‌রই উপাসনা করা।

'তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকেও আমার জননীকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করো?'—কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌পাকের এ রকম রোষতপ্ত প্রশ্ন শুনে হজরত ঈসা শিউরে উঠবেন। প্রকম্পিত হবে তাঁর শরীরের গ্রন্থিসমূহ। তাঁর দেহের প্রতিটি পশমের গোড়া থেকে বের হবে রক্ত কণা। এ রকম বলেছেন আবু রওক।

হজরত ঈসা তখন বলবেন, তুমিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই, তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম, তবে তুমিতো তা জানতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নই; তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত।' 'সুবহানাকা' অর্থ তুমিই মহিমান্বিত, পবিত্র। অর্থাৎ— হে আমার মহা মহিমান্বিত পরম পবিত্র প্রভুপালক! আমি তোমার মহিমা ও পবিত্রতার স্বীকৃতি দান করছি। এ কথাও ঘোষণা করছি যে, তুমি সকল প্রকার শিরিক থেকে মুক্ত, পবিত্র। সুতরাং কোনো প্রকার শিরিক প্রকাশক বাক্য আমার পক্ষে বলা অসম্ভব।

www.eelm.weebly.com

'তা'লামু মাফি নাফসি ওয়ালা আ'লামু মাফি নাফসিকা' (আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছো, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নই)। এখানে প্রথমে উল্লেখিত 'নাফসি' শব্দটির মাধ্যমে হজরত ঈসার সত্তাকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর শেষে 'ফি নাফসিকা' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্পাকের জাত বা সত্তাকে। শব্দের সমান্তরাল ব্যবহারের নিয়মে এখানে এ রকম করা হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে, 'ইন্নাকা আংতা আল্লামুল গুয়ুব' (তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত)। গুয়ুব শব্দটিকে কেউ কেউ পড়েছেন গিয়ুব। 'গইন' অক্ষরটিকে 'যের' না 'পেশ' সহযোগে পড়তে হবে, সে সম্পর্কে কোরআন পাঠকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১৭

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

❒ 'তুমি আমাকে যে আদেশ করিয়াছ তাহা ব্যতীত তাহাদিগকে আমি কিছুই বলি নাই; তাহা এইঃ 'তোমরা আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহের ইবাদত কর;' এবং যতদিন আমি তাহাদিগের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাহাদিগের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলিয়া লইলে তখন তুমিই তো ছিলে তাহাদিগের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ব বিষয়ে সাক্ষী।'

আগের আয়াতে আল্লাহ্তায়ালার প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত ঈসা যে উত্তর দিতে শুরু করেছিলেন, সেই উত্তরের ধারাবাহিকতা চলে এসেছে এই আয়াতেও। এখানে হজরত ঈসার বক্তব্যে আল্লাহ্পাকই যে প্রকৃত নির্দেশদাতা সে কথাটি স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। নির্দেশ দান প্রসঙ্গটিকে তিনি নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেননি। অর্থাৎ তিনি এ কথা বলেন নি যে 'তুমি আমাকে যে আদেশ করেছো আমি তাদেরকে সেরূপই আদেশ করেছি।' বরং তিনি বলেছেন, 'তুমি আমাকে যা আদেশ করেছো তা ব্যতীত তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি।' এই বক্তব্যটিতে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ্পাকই প্রকৃত আদেশদাতা। আর অন্য সকল রসুলের মতো তিনি সে কথা তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রচার করেছেন (বলেছেন)।

'আনি'বুদুল্লহা রব্বি ওয়া রব্বাকুম' অর্থ— তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র ইবাদত করো। এ কথার মাধ্যমে হজরত ঈসা বনী ইসরাইলদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আমি স্রষ্টা ও প্রভুপালক নই। বরং

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্তায়ালাই আমার ও তোমাদের স্রষ্টা ও প্রভুপালক। সুতরাং তোমরা সেই প্রভুপালক আল্লাহ্র ইবাদত করো।

হজরত ঈসা এখানে আরো বলেছেন, 'এবং যতোদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততোদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক'— এখানে 'তুলে নিলে' কথাটি বুঝাতে 'তাওয়াফফিয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির প্রকৃত অর্থ— কোনো কিছুকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ে নেয়া। এই নিয়ে নেয়ার শ্রেণী বিভাজনের মধ্যে মৃত্যুও একটি শ্রেণী। আল্লাহ্পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্ই পরিপূর্ণরূপে জীবনকে হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং কারো জীবনকে হরণ করেন তাদের নিদ্রার সময় (আল্লহু ইয়াতাওয়াফফাল আং ফুসা হিনা মাউতিহা ওয়াল্লাতি লাম তামুত ফি মানামিহা) এখানে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়—কেবল মৃত্যুর সময় নয়, নিদ্রার সময়েও আল্লাহ্পাক মানুষের প্রাণ হরণ করে থাকেন (প্রাণ হরণ করা বা নিয়ে নেয়া বুঝাতে এখানেও তাওয়াফফা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে)।

'তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক'— হজরত ঈসার এ কথাটির অর্থ, হে আমার পরম প্রভুপালক! আমাকে তো তুমি তোমার সকাশে তুলে নিয়েছো। তারপর আমার সম্প্রদায়ের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধান করেছো তুমি। তাদের মধ্যে তুমি যাদেরকে মিথ্যাচারিতা থেকে বাঁচাতে চেয়েছো তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে, নবীগণের মাধ্যমে এবং আসমানী কিতাবের মাধ্যমে হেদায়েত দান করেছো।

আয়াতে উল্লেখিত হজরত ঈসার শেষ কথাটি এই—এবং তুমিই সর্ব বিষয়ে সাক্ষী। কথাটির মাধ্যমে এই সত্য স্বীকৃতিটিই দেয়া হয়েছে যে—আল্লাহ্পাক সকল কিছুর দ্রষ্টা। অতীতের, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১৮

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

❑ 'তুমি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তবে তাহারা তো তোমারই দাস, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

এই আয়াতটিও হজরত ঈসার বক্তব্যের ধারাবাহিকতা। হজরত ঈসা এখানে বলছেন—'ইন তুয়াজ্জিব্হুম ফাইন্নাহুম ইবাদুক' (তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারাতো তোমারই দাস)। অর্থাৎ— হে আমার আল্লাহ্! তুমি তো সকলের সর্বময় অধীশ্বর। সুতরাং, তুমি তোমার মালিকানায় যথেচ্ছ অধিকার প্রয়োগ করতে পারো। এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপনের কোনো অবকাশই নেই। যারা

www.eelm.weebly.com

অবাধ্য হয়েছে, তাদেরকে তো তুমিই সৃষ্টি করেছো। তারা তোমার প্রতি বিমুখ হয়েছে, তবুও তুমি তাদেরকে পালন করেছো এবং পৃথিবীতে দান করেছো অজস্র নেয়ামত। অতএব তোমার অকৃতজ্ঞ দাসদেরকে যদি তুমি শাস্তি প্রদান করো তবে তা সম্পূর্ণতই ন্যায়সংগত হবে।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু জর গিফারী বলেছেন, আমি একবার রসুল স.কে বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। আমি আপনার রাতের নামাজে আপনাকে এই আয়াতটি বারংবার পাঠ করতে শুনেছি। আপনি এতবার এই আয়াতটি পড়েছেন যে, এ রকম অন্য কেউ করলে আমরা তার উপর বিরক্ত হয়ে যেতাম। রসুল স. বললেন, (এই আয়াত আবৃত্তির মাধ্যমে) আমি আমার উম্মতের জন্য দোয়া করেছি। আমি বললাম, কী জবাব পেয়েছেন? তিনি স. বললেন, আমি যে জবাব পেয়েছি, তা জানলে অনেক মানুষ নামাজ পরিত্যাগ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল, আমি এই সংবাদটি কি মানুষের মধ্যে প্রচার করবো না? তিনি স. বললেন, করো। হজরত ওমর এ কথা শুনে বললেন, হে আল্লাহ্র প্রিয় রসুল! এই শুভসংবাদটি জানানো হলে মানুষ ইবাদত ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্পাকের রহমতের উপর ভরসা করে বসে থাকবে। রসুল স. তখন গমনোদ্যত আমাকে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে ফিরিয়ে আনলেন এবং এই আয়াতটিই পুনরায় আবৃত্তি করলেন। মুসলিম। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বিন আস থেকে ইমাম নাসাঈও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

'আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করো তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'— হজরত ঈসার এ কথাটির অর্থ, হে আমার আল্লাহ্! নিঃসন্দেহে তুমি পরম পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিমত্তার অধিকারী। ক্ষমা ও শাস্তি—দু'টোই তোমার ক্ষমতাধীন। ক্ষমা করতে তুমি অপারগ অথবা বাধ্য নও। তুমি যদি শাস্তি দাও, তবে তা হবে তোমার প্রকৃত ন্যায় বিচার। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা হবে তোমার নিতান্ত মেহেরবানী।

একটি সন্দেহঃ এখানে শাস্তি ও ক্ষমা—উভয় ক্ষেত্রে শর্তসূচক 'ইন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—এ রকম শব্দ ব্যবহারের কারণে ক্ষমা ও শাস্তি দু'টোই হয়েছে সমসম্ভাবনাময়। অথচ কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, অংশীবাদীরা কস্মিনকালেও ক্ষমার্হ নয়। তবে এখানে এ রকম সম্ভাবনার কথা বলা হলো কেনো?

www.eelm.weebly.com

সন্দেহভঞ্জনঃ আল্লাহ্‌পাক মুশরিকদেরকেও ইচ্ছে করলে ক্ষমা করতে পারেন। এ রকম ক্ষমতা তাঁর অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু তিনি স্বয়ং ঘোষণা করেছেন যে, অংশীবাদীদেরকে তিনি ক্ষমা করবেন না। সুতরাং তাদের ক্ষমাপ্রাপ্তি অসম্ভব। আল্লাহ্‌পাকের ঘোষণার কারণেই তাদের ক্ষমাপ্রাপ্তির সম্ভাবনাটি অসম্ভবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এতে করে তাঁর ক্ষমা প্রদানের ক্ষমতা খর্ব হয়নি। আর এখানে ক্ষমা করার কথা বলার পর এ রকম বলা হয়নি যে—তুমি রহমানুর রহীম। বলা হয়েছে 'তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' (ইন্নাকা আংতাল আজিজুল হাকিম)। আজিজ ও হাকিম (পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়) —আল্লাহ্‌পাকের এই দু'টি নাম উল্লেখের মধ্যে এই ইংগিতটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌পাকের পরাক্রম ও প্রজ্ঞার প্রতি সমর্পিত হওয়া উচিত।

হজরত ইবনে মাসউদ আলোচ্য আয়াতটি পড়তেন এভাবে—'ইন তাগফির্‌লাহুম ফা ইন্নাহুম ইবাদুকা ওয়া ইন তুয়াজ্জিব্‌হুম ফা ইন্নাকা আংতাল আজিজুল হাকিম।' তিনি বলেছেন, রসুল স. আজিজুল হাকিম—এর সঙ্গে তুয়াজ্জিব্‌ পড়েছেন—তাগ্‌ফির পড়েন নি। তাই কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াতের শব্দ ব্যবহারে কিছু অগ্র-পশ্চাৎ ঘটেছে। (অর্থাৎ তাগ্‌ফির থেকে ইবাদুকা এবং তুয়াজ্জিব্‌ থেকে আজিজুল হাকিম পর্যন্ত অর্থগত সামঞ্জস্য বিদ্যমান)। এই সামঞ্জস্যানুসারে আয়াতের অর্থ হবে এ রকম—তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, তাই তুমি ইচ্ছে করলে শাস্তি দিতে পারো এবং তারাতো তোমার দাস, তাই তুমি তাদেরকে মার্জনাও করতে পারো। আমি বলি, প্রসিদ্ধ ক্বেরাতটিই অর্থগত দিক থেকে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হজরত আবদুল্লাহ্‌ বিন আমর বিন আস বলেছেন, রসুলুল্লাহ্‌ স. কোরআন মজীদে উল্লেখিত হজরত ইব্রাহিমের এই দোয়াটি পাঠ করলেন—রব্বি ইন্নাহুন্না আফআলনা কাছিরম্‌ মিনান্নাসি ফামান তাবিয়ানি ফা ইন্নাহূ মিন্নি ওয়ামান আ'সানি ফাইন্নাকা গফুরুর রাহীম। তারপর তিনি স. আলোচ্য আয়াতটি বারবার আবৃত্তি করে প্রার্থনা জানালেন— হে আমার প্রভুপালক! আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দাও। আমার উম্মতকে মার্জনা করো। প্রার্থনার সঙ্গে তাঁর পবিত্র দু'চোখ থেকে ঝরে পড়তে লাগলো অশ্রুর ধারা। আল্লাহ্‌পাক সকল কিছু সম্যক পরিজ্ঞাত। তৎসত্ত্বেও তিনি হজরত জিবরাইলকে নির্দেশ দিলেন, আমার প্রিয় রসুলের নিকটে গিয়ে জিজ্ঞেস করো—আপনার এমতো অশ্রু বর্ষণের কারণ কী? হজরত জিবরাইল নির্দেশ পালন করলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে রসুল স. ওই কথাই

www.eelm.weebly.com

জানালেন যা তিনি তাঁর প্রার্থনায় নিবেদন করছিলেন আল্লাহ্পাকের নিকট। হজরত জিবরাইল রসুল স. এর জবাব শুনে আল্লাহ্পাককে জানালেন। আল্লাহ্পাক পুনঃ নির্দেশ দিলেন, হে জিবরাইল! তুমি পুনরায় আমার রসুলের নিকট গমন করো এবং বলো, আমি তাঁর উম্মতের বিষয়ে তাঁকে প্রসন্ন করবো—অপ্রসন্ন করবো না।

সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১৯, ১২০

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ؕ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

❒ আল্লাহ্ বলিবেন, 'এই সেই দিন যেদিন সত্যবাদিগণ তাহাদিগের সত্যতার জন্য উপকৃত হইবে; তাহাদের জন্য আছে জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তাহারা সেখানে চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাহাতে সন্তুষ্ট; ইহা মহা সফলতা।'

❒ আস্‌মান ও জমিন এবং উহাদিগের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহেরই এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

উপরের আয়াতে উদ্ধৃত হজরত ঈসার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক যা বললেন সে কথাই উল্লেখিত হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে, কালাল্লহু হাজা ইয়াওমু ইয়ানফাউ'স্ সদিক্বীনা সিদ্‌ক্বুহুম (আল্লাহ্ বলবেন, এই সেই দিন যেদিন সত্যবাদিগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে)। এ রকম বক্তব্যের মাধ্যমে প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে যে, হজরত ঈসা যা কিছু বলেছেন— তা সবই সত্য। এভাবে কিয়ামতের দিন হজরত ঈসার সত্যতা প্রমাণিত করে তাঁর অবাধ্য উম্মতদেরকে অধিকতর অপদস্থ করা হবে। যেহেতু তারা মিথ্যাচারী, তাই 'সত্যবাদিরাই উপকৃত হবে'— এ রকম ঘোষণাই তাদের তিরস্কারের জন্য যথেষ্ট।

পূর্বের আয়াত দৃষ্টে প্রকাশ্যতঃ এ রকম প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ঈসা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য আল্লাহ্পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এই ধারণা অপনোদনের জন্যই এখানে পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে যে, সত্যবাদিরাই সেদিন উপকৃত হবে (মিথ্যাবাদিরা ক্ষমা ও উপকার পাবে না)। এ রকমও অর্থ হওয়া সম্ভব যে, হজরত ঈসার উক্তিতে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি ভয়ের যে চিহ্ন ফুটে

www.eelm.weebly.com

উঠেছিলো, তা দূর করার জন্যই এখানে এভাবে বলা হয়েছে যে, 'সত্যবাদিগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে' (অতএব যারা সত্যাশ্রয়ী তাদের ভীত ও চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই)। পৃথিবীতে বিশ্বাসে, কথায় এবং আচরণে যে সত্যনিষ্ঠ, পরকালে তার সেই সত্যনিষ্ঠাই তাকে উপকৃত করবে। আর যে পৃথিবীতে মিথ্যামগ্ন ছিলো, সে-ও সেদিন সত্যকে স্বীকার করবে এবং বলবে— 'লামনাকু মিনাল মুসাল্লিনা ওয়া লামনাকু নুত্ই'মুল মাসাকিনা' (আমরা নামাজ পাঠ করতাম না এবং দরিদ্রদেরকে খাদ্য দিতাম না)। শয়তানও তখন এই স্বীকৃতি দেবে—'ইন্নাল্লহা ওয়াআ'দাকুম ওয়াআ'দাল হাক্কি ওয়া ওয়াআদ্তুকুম' (নিশ্চয় আল্লাহ্র অঙ্গীকার সত্য, আর আমি যে অঙ্গীকার করেছি....)। অথবা সে সেদিন এ রকমও বলবে—'ওয়াল্লহু রব্বুনা মাকুন্না মুশরিকীন' (তারা বলবে, আল্লাহ্ই আমাদের প্রভুপালক, আমরা মুশরিক নই)। শয়তানের অনুসারীরা সেদিন এ রকম সত্য মিথ্যা অনেক কিছুই বলবে বটে, কিন্তু এতে করে তারা কোনো উপকারই লাভ করতে পারবে না। সেদিন তাদের মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং সাক্ষ্য নেয়া হবে তাদের হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে। এভাবে অবিশ্বাসীদেরকে সেদিন অপদস্থ করা হবে চূড়ান্তভাবে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'সদিক্বীন'(সত্যবাদিগণ) অর্থ নবী রসুলগণ। কালাবী বলেছেন—বিশ্বাসী বান্দাগণ। আতা বলেছেন, 'ইয়াওমা ইয়ান্ফাউ' কথাটির উদ্দেশ্য পৃথিবীর দিবস সকল—পরকালের দিন নয়। কারণ, পরকাল তো বিনিময় প্রদানের স্থান —আমলের স্থান নয়।

পরের বাক্যে সত্যবাদিরা কিভাবে উপকৃত হবে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার পাদদেশে রয়েছে প্রবহমান নদী, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।

এরপর বলা হয়েছে, 'রদ্বিআল্লাহু আ'নহুম ওয়া রদু আন্হু' (আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট)। তাসাওউফ পন্থীগণ বলেছেন, প্রেম ভালোবাসা যে আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দা — দু'দিক থেকেই হয়, এই কথাটি তার প্রমাণ। কিন্তু সাধারণ তাফসীরকারগণ কথাটির অর্থ করেছেন এ রকম—আল্লাহ্পাক সত্যবাদিদের নিষ্ঠা ও শ্রমকে পছন্দ করবেন। এটাই আল্লাহ্পাকের প্রসন্নতা। আর আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে সওয়াব ও জান্নাত পেয়ে সত্যাশ্রয়ীরা প্রফুল্ল হবেন। এটাই তাঁদের সন্তুষ্টি। অর্থাৎ এক পক্ষ থেকে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) থাকবে পরিপূর্ণ বিনিময় এবং অপর পক্ষ থেকে (বান্দার পক্ষ থেকে) থাকবে পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা।

শেষ কথাটি এই — 'জালিকাল ফাউজুল আ'জিম' (ইহা মহা সফলতা)। এই পরিপূর্ণ বিনিময়কে মহা সফলতা বলা হয়েছে এ কারণে যে, সে সফলতা হবে চিরন্তন। পৃথিবীর সফলতা ক্ষয়িষ্ণু ও অস্থায়ী।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষ আয়াতটিই সুরা মায়িদার সর্বশেষ আয়াত। এই আয়াতে বলা হয়েছে, 'আসমান ও জমিন এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে তার

www.eelm.weebly.com

সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহ্‌র এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।' এখানে 'তাদের মধ্যে' অর্থ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে। কথাটি বুঝাতে এখানে বলা হয়েছে 'মা ফিহিন্না।' 'মা' ব্যবহৃত হয় অচেতন সৃষ্টিকুলের সঙ্গে এবং 'মান' ব্যবহৃত হয় বিবেকবান বা সচেতন সৃষ্টিকুলের ক্ষেত্রে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিবেকবানকে বিবেকহীনের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। কিন্তু এখানে মা ফিহিন্না (তাদের মধ্যে) কথাটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বিবেকবান, বিবেকহীন সকল সৃষ্টিকে। এর কারণ হচ্ছে—যারা বিবেকবান তারাও সৃষ্টি হিসেবে বিবেকহীনদের তুল্য। তারা বিবেক ও জ্ঞানের অধিকারী হলেও সে জ্ঞান ক্রটি বিচ্যুতি ও অপূর্ণতার ঊর্ধ্বে নয়! সকল ক্রটি-বিচ্যুতি ও অপূর্ণতার ঊর্ধ্বে কেবল সেই চিরন্তন পবিত্র সত্তা।

সচেতন অচেতন সকল সৃষ্টি যে সৃষ্টি হিসেবে সমতুল—অন্য আয়াতে সে কথা বলা হয়েছে এভাবে, 'ইন্নাকা মাইয়েতুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়েতুন' (তারাও মৃত, তুমিও মৃত)। অর্থাৎ তোমরা সকলেই সত্তাগত দিক থেকে অস্তিত্বহীন। প্রকাশ্যতঃ তোমাদের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হলেও তোমরা সকলে অনস্তিত্বনির্ভর (তোমাদের প্রকাশ্য এ অস্তিত্ব দয়া করে দান করেছেন মহা মহিম আল্লাহ্‌তায়ালা)। এই মূল জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ইঙ্গিত প্রদানার্থেই এখানে 'মান'—এর পরিবর্তে বসেছে 'মা' (মাফিহিন্না)। এ রকম প্রকাশভঙ্গির আরো একটি কারণ এই হতে পারে যে, কেবল জ্ঞানসম্পন্নদের জন্য 'মান' ব্যবহৃত হলেও জ্ঞানসম্পন্ন ও জ্ঞানহীন সকলের জন্য 'মা' ব্যবহার সিদ্ধ। আর এখানে যেহেতু সমগ্র সৃষ্টির উল্লেখ করা হয়েছে, তাই চেতন অচেতন নির্বিশেষে সকলের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে 'মা' শব্দটি।

'ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বদীর' অর্থ—এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। অর্থাৎ সৃষ্টিকে রক্ষা করা অথবা ধ্বংস করা সকল কিছুই তাঁর পবিত্র অভিপ্রায়ের উপর নির্ভরশীল। কারণ তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۚ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

☐ প্রশংসা আল্লাহেরই যিনি আস্‌মান ও জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন, আর সৃষ্টি করিয়াছেন অন্ধকার ও আলো। এতদ্‌সত্ত্বেও সত্য প্রত্যাখ্যানকারিগণ তাহাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।

'আলহামদুলিল্লাহ্' অর্থ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। কথাটির মধ্যে এই শিক্ষা রয়েছে যে, সকল অবস্থায় কেবল আল্লাহ্‌ই প্রশংসার্হ। এই শিক্ষাটিও এখানে

www.eelm.weebly.com

অনুক্ত রয়েছে যে, সৃষ্টির প্রশংসার মুখাপেক্ষী তিনি নন। সৃষ্টি তাঁর প্রশংসা করুক অথবা নাই করুক—সকল অবস্থায় তিনি সামগ্রিক প্রশংসার অধিকারী।

'আল্লাজি খলাকাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' (যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন) —এর অর্থ পূর্ব দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ এবং পৃথিবী। এর মধ্যে এই ইঙ্গিতটিও রয়েছে যে—সকল প্রশংসা যে আল্লাহ্‌র, তার জন্য প্রমাণ স্বরূপ আকাশ ও পৃথিবীর সৃজনের নিদর্শনটিই যথেষ্ট। এর অধিক প্রমাণ প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন। সকল সৃষ্টির মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, স্বাভাবিক দৃষ্টিপাতের মধ্যেই এ দু'টো সৃষ্টি সতত দৃশ্যমান। আর এ দু'টোর মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য অজস্র রহস্য ও উপদেশ। এর মধ্যেই রয়েছে দিবস ও রাত্রির নিয়মিত বিবর্তন। সুতরাং যারা বিচক্ষণ, তাঁরা সহজেই বুঝতে পারেন, এই বিশাল সৃষ্টি যখন দৃশ্যমান—তখন এর স্রষ্টা অবশ্যই বিদ্যমান। কোনো কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি বলে থাকে, আকাশ চিরন্তন, চিরস্থায়ী। আল্লাহ্‌পাক আকাশকে সৃষ্টি করেছেন সময় সৃষ্টির পূর্বে। কিন্তু তাদের কথা ঠিক নয়। অন্য সকল সৃষ্টির মতো আকাশও কিয়ামতের মহাপ্রলয়ের সময় ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ সৃষ্টি হাদেস (বিনাশী) —ক্বদীম (চিরন্তন) নয়।

'সামাওয়াত' অর্থ আকাশসমূহ। 'আরদ্ব' অর্থ পৃথিবী। এখানে আকাশকে বহু বচনে এবং পৃথিবীকে এক বচনে প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ আকাশের আকৃতি ও প্রকৃতি এক রকম নয়। আকাশের রয়েছে বহুবিধ বিভঙ্গ ও আকার। এ কারণে আকাশের সংখ্যা একাধিক। কিন্তু পৃথিবীর মৃত্তিকা বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট হলেও এর মূল উপাদান একটি এবং আকারও একটি।

হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, এটি হচ্ছে তওরাত শরীফের সর্ব প্রথম আয়াত এবং সর্ব শেষ আয়াত হচ্ছে—'ক্বুলিল হামদু লিল্লাহিল্লাজি লাম ইয়াত্তাখিজ ওয়ালাদা' (বল, প্রশংসা আল্লাহ্‌র —যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি)।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁর সৃষ্টির সূচনা ও আলোচনা করেছেন তাঁরই প্রশংসাবর্ণন দ্বারা। বলেছেন—'আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি খলাক্বস্ সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন) এবং মানুষের পরিণতি ও পরিসমাপ্তির আলোচনাও আল্লাহ্‌পাক করেছেন তাঁর প্রশংসা সহযোগে। বলেছেন, 'ওয়া ক্বুদ্বিয়া বাইনা হুম বিল্‌হাক্বি ওয়া ক্বিলাল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।'

'ওয়া জাআ'লাজ্ জুলুমাতি ওয়ান্ নূর' অর্থ সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'জায়ালা' অর্থ খলাক্বা (সৃষ্টি করা)। বায়যাবী বলেছেন, 'জায়ালা' ও 'খলাক্বা' শব্দ দু'টির মধ্যে অর্থগত পার্থক্য রয়েছে। 'খলাক্বা' অর্থ পরিমাপসম্ভূত সৃষ্টি করা। আর 'জায়ালা' শব্দটির অর্থে রয়েছে অপরের প্রতি নির্ভরতার ইঙ্গিত। অর্থাৎ এক বস্তুকে অন্য বস্তুর অংগীভূত করে দেয়া এবং এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুর সৃষ্টি করা বা এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করা। যেমন, 'জায়ালাল খাতামা মিন্ ফিদ্‌দ্বাত (রৌপ্য দ্বারা নির্মিত আংটি)। আরেকটি

www.eelm.weebly.com

দৃষ্টান্ত—'জায়ালান্ নুরা জুল্মাতান' (আলো রূপান্তরিত হলো অন্ধকারে)। প্রকৃত কথা এই যে, 'জায়ালা' শব্দটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে দু'টি পরস্পরবিরোধী বস্তুর উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। তাই এখানে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দানের কথা বুঝাতে গিয়ে 'জায়ালা' শব্দটি ব্যবহারের পর বলা হয়েছে অন্ধকার ও আলোর কথা। এতে করে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, অন্ধকার ও আলোর স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই। এই ব্যাখ্যাটির দ্বারা সানুবিয়া সম্প্রদায়ের অযথার্থ ধারণাটিকেও অপনোদন করা যায় (তারা বলে নূর সরাসরি উত্তম এবং জুলমাত সরাসরি অনুত্তম)। অর্থাৎ ভালো কাজ করার শক্তিকে বলে নূর এবং খারাপ কাজ করার স্পৃহাকে বলে জুলমাত। আর নূর ও জুলমাত দু'টোই সত্তাগত দিক থেকে স্বতন্ত্র এবং দু'টোই তাদের আপনাপন সত্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

আমি বলি, অন্ধকার মূলতঃ অস্তিত্বহীনতানির্ভর। সুতরাং অস্তিত্বহীনতার সঙ্গে 'জায়ালা' শব্দটির সম্পর্ক হতে পারে না। কিন্তু এ আয়াতে যে জুলমাত বা অন্ধকারের কথা বলা হয়েছে, সেই অন্ধকার অস্তিত্বহীন নয়। বরং অন্ধকারের আগমন ও নির্গমন ঘটে সৃষ্টির সীমানাতেই। তাই আলো ও অন্ধকার—এ দু'টোর একটিও আপন অস্তিত্বে অস্তিত্বশীল নয়। এ পৃথিবীতে অন্ধকারাচ্ছন্ন অস্তিত্বের সংখ্যাই বেশী। অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন পদার্থের সংখ্যাই অধিক। তাই জুলমাত বা অন্ধকারকে প্রকাশ করা হয়েছে বহুবচনে। অপর দিকে আলোকিত অস্তিত্বের সংখ্যা নিতান্তই কম— তাই নূর শব্দটিকে প্রকাশ করা হয়েছে এক বচনে। নূরের সঙ্গে জুলমাতের সম্পর্ক এককের সঙ্গে একাধিকত্বের সম্পর্কের মতো।

হজরত হাসান বসরী বলেছেন, এখানে জুলমাত অর্থ কুফর বা অবিশ্বাস এবং নূর অর্থ ইমান বা বিশ্বাস। তাই জুলমাতকে প্রকাশ করা হয়েছে বহুবচনে। কারণ, অবিশ্বাসের পথ একাধিক। কিন্তু ইমানের পথ (সিরাত্বল মুস্তাক্বিম) কেবল একটি। তাই নূর শব্দকে এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে একবচনে।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, একদিন রসুল স. আমাদের সামনে মাটিতে একটি সরলরেখা অংকন করলেন এবং বললেন, এটাই আল্লাহ্‌র পথ। এরপর তিনি স. ওই সরল রেখাটির ডানে বাঁয়ে আরো অনেক রেখা আঁকলেন এবং বললেন, এ সকল পথের প্রতিটিতে রয়েছে শয়তানের দল যারা মানুষকে নিজেদের দিকে ডাকছে। এরপর তিনি স. এই আয়াত পাঠ করলেন—'ইন্না হাজা সিরাতিম্ মুসতাকিমা ফাত্তাবিউ'হু ওয়ালা তাত্তাবিউস্ সুবুলা ফা তাফার্‌রক্বা বিকুম আ'ন সাবিলিহি' (নিশ্চয় আমার এ পথই সরল পথ। অতএব তোমরা এর অনুসরণ করো, অন্য পথের অনুসন্ধান কোরো না—যদি করো, তবে তোমরা এ পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে)। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, নাসাঈ ও দারেমী।

www.eelm.weebly.com

অন্ধকার অস্তিত্বশীল থাকে আলো আগমনের পূর্বে। তাই এই আয়াতে প্রথমে অন্ধকার এবং পরে আলোর উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন অন্ধকারে। তারপর তার উপর নিক্ষেপ করেছেন নূর। সেই নূরের কিছু অংশ যে পেয়েছে, সে লাভ করেছে হেদায়েত। আর যার উপর সেই নূরের সম্পাত ঘটেনি, সে হয়েছে পথভ্রষ্ট। তাই আমি বলি, আল্লাহ্‌পাকের অসীম জ্ঞানানুযায়ী (অদৃষ্ট লিপিবদ্ধ করার পর) কলমের কালি শুকিয়ে গিয়েছে। আহমদ, তিরমিজি।

'ছুম্মাল্লাজিনা কাফারু বিরব্বিহিম ইয়া'দিলুন' অর্থ—এতদসত্ত্বেও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়। বাক্যটির সংযোগ রয়েছে আয়াতের প্রথমে উল্লেখিত 'আলহামদুলিল্লাহ্' কথাটির সঙ্গে। এই সংযোগের কারণে ইয়া'দিলুন (সমকক্ষ দাঁড় করায়) কথাটির উদ্দেশ্য হবে—এই বিশ্বচরাচর আল্লাহ্‌পাকই সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সকল বান্দাকে তিনিই দিয়েছেন অজস্র নেয়ামত। কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা এই নেয়ামতের অবমাননা করে (আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে এই নেয়ামত দানের মধ্যে অংশীদার বানায়)। আলোচ্য বাক্যটির সংযোগ 'খলাক্ব' (সৃষ্টি করেছেন) কথাটির সঙ্গেও হওয়া সম্ভব। যদি তাই হয়, তবে অর্থ হবে এ রকম—আল্লাহ্‌তায়ালাই এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। এই সৃজনকর্মে অন্য কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। এতদসত্ত্বেও কাফেরেরা তাঁর কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌তায়ালার সমকক্ষ মনে করে— যে মূলতঃ সৃজনক্ষমতাহীন। 'ছুম্মা' শব্দটির মাধ্যমে এখানে প্রসংগান্তর ঘটানো হয়নি। বরং প্রকাশ করা হয়েছে বিস্ময়। বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে—আল্লাহ্‌পাকের অসংখ্য অনুগ্রহ সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌পাকের সঙ্গে শিরিক করে। তাদের এ বিবেকবর্জিত ও গর্হিত অপকর্মটি অপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের ব্যাপার আর কী হতে পারে?

'বিরব্বিহিম' (তাদের প্রতিপালকের) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে 'কাফারু' (সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের) এর সঙ্গে। 'সমকক্ষ দাঁড় করায়' কথাটির সঙ্গেও এর নেপথ্য যোগসূত্র রয়েছে। এই যোগসূত্রের কারণে বাক্যটির অর্থ হবে এ রকম— তারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে এবং তাঁর সঙ্গে করে অত্যন্ত অনুচিত আচরণ। এমতাবস্থায় 'ইয়া'দিলুন' (সমকক্ষ দাঁড় করায়) কথাটির অর্থ হবে— তারা আল্লাহ্‌র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথবা 'বিরব্বিহিম' এর সম্পর্ক সরাসরি 'ইয়া'দিলুনের' সঙ্গে। এ রকম হলে অর্থ হবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের পূজনীয় প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করে।

www.eelm.weebly.com

নজর বিন শুমায়েল বলেছেন, এখানে 'ইয়া'দিলুন' শব্দটি উৎসারিত হয়েছে 'উ'দুল' থেকে— যার অর্থ ফিরে যাওয়া অথবা মুখ ফিরিয়ে নেয়া। তিনি আরো লিখেছেন, 'বিরব্বিহিম' এর মধ্যে 'বা' শব্দটির অর্থ হবে 'আ'ন' (থেকে)। অর্থাৎ তারা আপন প্রভুপালকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ২, ৩

هُوَالَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا ۭ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ۝ وَهُوَاللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ۭ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ۝

❒ তিনিই তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর এক কাল নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং আর একটি নির্ধারিত কাল আছে যাহা তিনিই জ্ঞাত, এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর।

❒ আস্‌মান ও জমিনে তিনিই আল্লাহ্, তোমাদিগের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যাহা কর তাহাও তিনি অবগত আছেন।

'হুওয়াল্লাজি খলাক্বাকুম মিন ত্বীন' অর্থ তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন। এখানে 'কুম' শব্দটির পূর্বে 'আবুন' (পিতা) শব্দটি অনুক্ত রয়েছে। এই অনুক্ত শব্দটিসহ বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— তিনিই তোমাদের পিতা (হজরত আদম) কে মৃত্তিকা থেকে সৃজন করেছেন।

ইমাম সুদ্দী বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত জিব্‌রাইলকে বললেন, পৃথিবী থেকে কিছু মাটি নিয়ে এসো। নির্দেশ প্রতিপালনের জন্য হজরত জিব্‌রাইল পৃথিবীতে নেমে এলে মাটি বললো, আমার অঙ্গহানি থেকে আমি আল্লাহ্‌র পরিত্রাণ চাই। একথা শুনে হজরত জিব্‌রাইল আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে ফিরে গিয়ে বললেন, হে মৃত্তিকাধিকারী প্রভু! মৃত্তিকা তো তার অংশ কম হওয়ার বিপদ থেকে তোমার পরিত্রাণ প্রার্থনা করেছে (তাই আমি শূন্য হাতে ফিরে এসেছি)। আল্লাহ্‌পাক তখন হজরত মিকাইলকে মাটি আনতে নির্দেশ দিলেন। মাটি পুনরায় তাঁর হস্তক্ষেপ থেকে আল্লাহ্‌তায়ালার শরণ প্রার্থনা করলো। হজরত মিকাইলও ফিরে গেলেন শূন্য হাতে। শেষে আল্লাহ্‌তায়ালা মৃত্যুর ফেরেশতা হজরত আজরাইলকে মাটি আনার নির্দেশ দিলেন। মাটি পুনরায় আল্লাহ্‌তায়ালার পরিত্রাণ কামনা করলো। হজরত আজরাইল তখন বললেন, আমি আল্লাহ্‌র অনানুগত্য থেকে পরিত্রাণ চাই। এ কথা বলে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে লাল, কালো,

www.eelm.weebly.com

শাদা— বিভিন্ন বর্ণের ও প্রকৃতির মাটি একত্র করে নিয়ে গেলেন আল্লাহ্পাকের পবিত্র দরবারে। সেই সম্মিলিত মাটি থেকে আল্লাহ্পাক সৃষ্টি করলেন হজরত আদমের শরীর। তাই তাঁর বংশধরেরা কেউ লাল, কেউ শাদা, কেউ কালো— আবার কেউ উগ্র, কেউ নম্র। আল্লাহ্তায়ালা তখন হজরত আজরাইলকে বললেন, জিব্রাইল ও মিকাইল দু'জনেই পৃথিবীর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেছে, তুমি করোনি। সুতরাং এ মাটি থেকে যে সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করা হবে তাদের প্রাণ (হরণের ক্ষমতা) দিবো আমি তোমার নিয়ন্ত্রণে।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমের শরীরকে আকৃতি দান করলেন নরম মাটির মাধ্যমে। তারপর কিছুকাল সেই মৃত্তিকামূর্তিকে ফেলে রাখলেন। মাটি শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেলো। এভাবে দীর্ঘদিন রাখার পর মূর্তিটি হয়ে গেলো মৃত্তিকানির্মিত পাত্রের ভাঙা অংশের মতো। তাতে আঘাত করলে তা থেকে নির্গত হতে শুরু করলো ঠন্ ঠন্ আওয়াজ। এরপর আল্লাহ্পাক তার নিজের পক্ষ থেকে রূহ্ সম্পাত করলেন মৃত্তিকা মূর্তিটিতে। ইমাম বাগবী এ রকম বলেছেন।

হজরত আবু মুসা বলেছেন, আমি রসুল স. থেকে শুনেছি— তিনি স. বলেছেন, আল্লাহ্পাক পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে হজরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মাটির বর্ণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষেরা কেউ লোহিতাভ, কেউ শ্বেতাভ, কেউ কৃষ্ণকায়। আবার কেউ নম্র, কেউ দুর্বিনীত। কেউ চরিত্রহীন। কেউ চরিত্রবান। আহমদ, তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রার একটি মারফু বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমকে জাবিয়্যাহ্ প্রকৃতির মাটি দ্বারা নির্মাণ করেছেন এবং সেই মাটিকে বেহেশতের পানির সঙ্গে মিশিয়ে খামির তৈরী করেছেন। (আমি বলি, জাবিয়্যাহ্ শব্দটির প্রকৃত অর্থ আমার জানা নেই। সম্ভবতঃ জাবিয়্যাহ্ ওই নিম্নভূমির মাটি যেখানে পানি জমে থাকে এবং যা কর্দমাক্ত। মনে হয় শব্দটির মাধ্যমে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, কর্দমাক্ত আঠালো মাটিকে জান্নাতের পানির সঙ্গে মিশিয়ে হজরত আদমের শরীরকে মসৃণ বানানো হলো)। হাসানের মাধ্যমে বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন, হাকেম এবং ইবনে আদী।

'ছুম্মা কদ্বা আজালা' কথাটির অর্থ অতঃপর এক সময়সীমা নির্দিষ্ট করেছেন অর্থাৎ হজরত আদমের নির্মাণ পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্পাকের নির্দেশে ফেরেশতারা তাঁর পৃথিবীর আয়ু কতদিন হবে তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির মূল উপকরণকে মাতৃগর্ভে চল্লিশদিন পর্যন্ত নুতফার (অপবিত্র পানির) আকারে রাখা হয়। তারপরে চল্লিশ দিন রাখা হয় রক্তপিণ্ডের আকারে। এর পরের চল্লিশদিন রাখা হয় গোশতের টুকরার উপরে। তারপর আল্লাহ্পাক

www.eelm.weebly.com

চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে এক ফেরেশতা প্রদান করেন। ওই ফেরেশতা গর্ভস্থিত শিশুর উত্তম ও অনুত্তম কর্ম, আয়ুষ্কাল, রিজিক এবং সে পুণ্যবান হবে না পাপিষ্ঠ— তা লিপিবদ্ধ করেন। অবশেষে তার মধ্যে প্রক্ষেপ করা হয় রূহ্ বা আত্মাকে। সুতরাং, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, সেই পবিত্র সত্তার শপথ— তোমাদের কতিপয় লোক পুণ্যকর্ম করতে করতে চলে যাবে জান্নাতের অতি নিকটে। এমন কি জান্নাত ও তার মধ্যে ব্যবধান থাকবে মাত্র অর্ধ হাত। তখন অদৃষ্ট তার উপর প্রবল হবে। সে হয়ে পড়বে পাপের প্রতি নিবিষ্টচিত্ত। ফলে সে চলে যাবে দোজখে। আবার কতিপয় লোক সারা জীবন ধরে ক্রমাগত পাপ করতে করতে পৌঁছে যাবে দোজখের এক হাত দূরত্বে। এমন সময় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যলিপি প্রবল হয়ে যাবে তার উপর। সে তখন বেহেশ্তবাসীদের মতো আমল শুরু করবে। অবশেষে চলে যাবে বেহেশতে। বোখারী, মুসলিম।

'ওয়া আজালুম্ মুসাম্মা ই'নদাহূ'— (এবং আর একটি নির্ধারিত কাল রয়েছে যা তিনিই জ্ঞাত)। এ কথার অর্থ— সময়ের পরিমাপ ও নির্ধারণ আল্লাহ্পাকের চিরন্তন জ্ঞানে বিদ্যমান। সে জ্ঞান পরিবর্তনশীলতা থেকে পবিত্র। আল্লাহ্পাক ব্যতীত সেখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপের অবকাশ নেই।

'আজালুন' শব্দটির শেষ অক্ষরে যে তানভীন রয়েছে— তা আল্লাহ্পাকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশক। তাই বাক্যটিকে 'এবং' বা 'অতঃপর'— এ রকম সংযোগসূচক শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়নি। বলা হয়েছে 'যা তিনিই জ্ঞাত'। তাছাড়া আজালুন এর বিশেষণ হিসেবে মুসাম্মা শব্দটির উল্লেখ তো রয়েছেই। তাই ই'নদাহূ (তাঁর সামনে) শব্দটিকে অগ্রে উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়েনি।

হাসান, কাতাদা এবং জুহাক, বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের প্রথমে উল্লেখিত 'আজালা' (নির্দিষ্ট কাল) শব্দটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়সীমা। আর পরে উল্লেখিত 'আজালুন' (নির্ধারিত কাল) শব্দটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়সীমা। হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যে এ কথার প্রমাণ রয়েছে। তিনি বলেছেন, দু'টি সময়সীমা রয়েছে প্রতিটি মানুষের। একটি জন্ম থেকে মৃত্যু এবং অপরটি মৃত্যু থেকে হাশর। যে মানুষ পুণ্যবান, পরহেজগার এবং রক্তের সম্পর্ক সংরক্ষণকারী হয়, তার মৃত্যোত্তর জীবন থেকে কিছু আয়ু নিয়ে বাড়িয়ে দেয়া হয় তার পৃথিবীর বয়স। আর যে মানুষ দুঃশ্চরিত্র ও রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী— তার পার্থিব জীবনের হায়াত কমিয়ে বাড়িয়ে দেয়া হয় তার কবরের জীবনের পরিসর।

মুজাহিদ এবং সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে প্রথম আজালা অর্থ পার্থিব জীবনের পরিসর। আর দ্বিতীয় আজালুনের অর্থ পারলৌকিক জীবনের ব্যাপ্তি। হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে আতিয়া বর্ণনা করেছেন এখানে প্রথমে উল্লেখিত আজালা'র অর্থ নিদ্রাভিভূত অবস্থা — যখন আল্লাহ্পাক প্রাণকে হরণ

www.eelm.weebly.com

করেন এবং তা ফিরিয়ে দেন জাগরণের প্রাক্কালে। আর পরের আজালুনের অর্থ মৃত্যুলগ্ন (যখন সাঙ্গ হয় পার্থিব জীবন)।

'ছুম্মা আন্‌তুম তামতারুন' (এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ করো)। এখানে তামতারুন শব্দটি এসেছে মিরইয়াতুন্ থেকে। মিরইয়াতুন্ অর্থ সন্দেহ। মিরাউন থেকে তান্‌তারুন শব্দটি সংকলিত হয়েছে— এ রকমও বলা যেতে পারে। মিরাআ অর্থ বচসা বা বিবাদ। এইভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবে— তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার সিদ্ধান্ত, অদৃষ্ট রীতি অথবা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছো বা বিতণ্ডা সৃষ্টি করছো।

ছুম্মা শব্দটি প্রয়োগ করা হয় বিস্ময় প্রকাশের ক্ষেত্রে। শব্দটি প্রয়োগ করে এখানে এই মর্মে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে— আশ্চর্য! সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরেও তোমরা বচসায় লিপ্ত হয়েছো। তোমাদের সকল নিয়মানুবর্তিতার স্রষ্টা আল্লাহ্। তিনিই তোমাদের আয়ু নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নির্ণয় করে দিয়েছেন মৃত্যুর সুনির্দিষ্টকাল। মৃত্যুর পর তিনিই পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন। এই পুনরুজ্জীবন ও পুনরুত্থানে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। কোনো কিছুই তাঁর নির্দেশ ও জ্ঞানের আওতাবহির্ভূত নয়।

হজরত আয়েশার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ছয় প্রকার মানুষের উপর রয়েছে আল্লাহ্‌র, আমার এবং সকল পয়গম্বরের অভিশাপ— ১. যে আল্লাহ্‌র কিতাবের শব্দগত অথবা অর্থগত বিকৃতি ঘটায়। ২. যে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অদৃষ্টে অপ্রত্যয়ী। ৩. যে আল্লাহ্ কর্তৃক অপমানিত ব্যক্তিকে সম্মান করে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক মর্যাদামণ্ডিত ব্যক্তিকে করে অপমান। ৪. আল্লাহ্ যাকে হারাম করেছেন তাকে যে মনে করে হালাল। ৫. আল্লাহ্ যাকে হালাল করেছেন তাকে যে মনে করে হারাম এবং ৬. যে আমার প্রদর্শিত পথকে পরিত্যাগ করে। বায়হাকী।

আমি বলি, আল্লাহ্‌র কিতাবের বিকৃতি ঘটিয়েছে রাফেজীরা। তারা বলে কোরআন তিরিশ পারা নয়— চল্লিশ পারা। তারা আরো বলে, হজরত ওসমান পবিত্র কোরআনের ওই পারাগুলো বাদ দিয়েছেন। তারা এই অপবিত্র ধারণাটিও পোষণ করে যে— সুরা আহযাব ছিলো সুরা বাকারার মতই সুদীর্ঘ। রাফেজীদের মতো খারেজীরাও পথভ্রষ্ট। তারা রসুল স. এর পবিত্র বংশধরদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করে। আর একটি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় হচ্ছে মোতাজিলা—তকদিরের উপর তাদের কোনো আস্থা নেই। এই আয়াতে 'তোমরা সন্দেহ করো' বলে তাদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ কর্তৃক হারাম ঘোষিত বস্তুকে হালাল মনে করে মারজিয়াহ্ নামক পথচ্যুত সম্প্রদায়টি। তারা আরো মনে করে মানুষ পুণ্য অথবা পাপ করতে সম্পূর্ণতঃই বাধ্য। আর অত্যাচারী রাজন্যবর্গ বল প্রয়োগপূর্বক হালালকে হারাম ঘোষণা করে এবং রসুলের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করে বেদাতী ও ফাসেকের দল।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতের (আয়াত ৩) শুরুতে বলা হয়েছে, ওয়া হুয়াল্লহু ফিস্‌সামাওয়াতি ওয়া ফিল আরদ্ব (আসমান ও জমিতে তিনিই আল্লাহ্)। বলা বাহুল্য, এখানে 'হুয়া' (তিনি) শব্দটি আল্লাহ্‌তায়ালার সর্বনাম যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণবত্তা সম্পর্কে পূর্বের আয়াতদ্বয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এভাবে আল্লাহ্‌পাককে নামবাচক বিশেষ্য ধরা হলে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবে আসমান ও জমিতে আল্লাহ্‌ই কেবল উপাসনার যোগ্য প্রভুপালক। আর আল্লাহ্‌কে গুণবাচক বিশেষ্য ধরা হলে অর্থ হবে— আল্লাহ্‌ই আকাশ ও পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ্ (এই নামেই তাঁর প্রসিদ্ধি এবং এই নামেই তাঁকে স্মরণ করা হয়)। ফিস্‌সামাওয়াতি ওয়াফিল আরদ্ব (আকাশ ও পৃথিবীতে)। এ কথার মাধ্যমে প্রকাশ্যতঃ স্থান নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ফলে প্রকাশ্য অর্থ দাঁড়াচ্ছে এ রকম— আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবী উভয় স্থানে বিদ্যমান। এ রকম অর্থ করলে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে যে, আকাশ ও পৃথিবী কি আল্লাহ্‌পাকের অধিষ্ঠান স্থল? প্রশ্নের উত্তর হবে, অবশ্যই নয় (কারণ আকাশ ও পৃথিবী সীমানাভূত সৃষ্টি, আর আল্লাহ্ সীমানার কলংক থেকে পবিত্র)। অতএব, এখানে অর্থ হবে রূপক বা পরোক্ষ। ধারণা করতে হবে, আকাশ, পৃথিবী ও অন্য সকল সৃষ্টি আল্লাহ্‌তায়ালার গুণরাজি ও সৃজনশীলতার নিদর্শন, প্রতীক বা প্রতিবিম্ব। এই বিশাল বিশ্বপ্রপঞ্চ আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি ইশারা, নির্দেশিকা বা প্রমাণ। এগুলোর কোনোটিই তাঁর অধিষ্ঠানস্থল বা আবাসস্থল নয়। কারণ, তিনি স্থানাতীত, কালাতীত, সীমানাতীত। বায়যাবী বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিশৈলী ও রহস্যরাজি সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত। সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর এই জ্ঞানের ধারণাতীত সম্পৃক্তির কারণে রূপক অর্থে বলা হয়— তিনি আকাশ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান। 'ইয়া'লামু সিররাকুম ওয়া জাহ্‌রাকুম' অর্থ তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তিনি জানেন। আর ওয়া ইয়ালামু মা তাকসিবুন অর্থ— তোমরা যা করো তা-ও তিনি অবগত। আয়াত শেষের আলোচ্য কথা দু'টোর মাধ্যমে এ কথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার অতুলনীয় মহাজ্ঞানের আওতাবর্হিভূত কিছু নেই। সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ব। তোমাদের অন্তর বাহির ও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ক্রিয়াকলাপ তাঁর নিকট সুবিদিত। তোমাদের হৃদয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে যে সকল শুভ ও অশুভ কর্ম তোমরা করো তিনি যথাসময়ে সেগুলোর যথাবিনিময় প্রদান করবেন। এর অন্যথা হওয়া অসম্ভব। কারণ, তাঁর জ্ঞানের ধারণাতীত পরিবেষ্টন অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে সতত বিদ্যমান (সুতরাং সমর্পণই শ্রেয়)।

www.eelm.weebly.com

وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ فَقَدْ
كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ
نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي
مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۝

❒ তাহাদিগের প্রতিপালকের এমন কোন নিদর্শন তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হয় না যাহা হইতে তাহারা মুখ না ফিরায়।

❒ সত্য যখন তাহাদিগের নিকট আসিয়াছে তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহার যাথার্থ্য তাহারা অবহিত হইবে।

❒ তাহারা কি দেখে না যে, তাহাদিগের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি; তাহাদিগকে দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেমনটি তোমাদিগকেও করি নাই এবং তাহাদিগের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম আর তাহাদিগের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করিয়াছিলাম; অতঃপর তাহাদিগের পাপের দরুন তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি এবং তাহাদিগের পরে নতুন মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছি।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে এরশাদ হয়েছে, তাদের প্রতিপালকের এমন কোনো নিদর্শন তাদের কাছে উপস্থিত হয় না যা থেকে তারা বিমুখ না হয়। এখানে আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বুঝতে বলা হয়েছে 'মিন আয়াতি রব্বি'। 'মিন' (মধ্যে) অব্যয়টি এখানে অতিরিক্ত। শব্দটি সাধারণ অর্থ প্রকাশক। তাই এখানে আল্লাহ্‌র নিদর্শন বা আয়াতের অর্থ হবে নবী রসুলগণের মাধ্যমে প্রকাশিত মোজেজাসমূহ যেমন চন্দ্রের দ্বিধাবিভক্তি, প্রস্তরের বাক স্ফূরণ ইত্যাদি। কিন্তু আতা বলেছেন, এখানে আয়াত অর্থ হবে কোরআনের আয়াত। তাঁর মতে 'মিন আয়াতি' কথাটির 'মিন' এখানে আংশিক অর্থ প্রকাশক রূপে প্রয়োগিত হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

দ্বিতীয়টিতে এরশাদ হয়েছে— সত্য যখন তাদের কাছে এসেছে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। এখানে 'হাক্বি' (সত্য) অর্থ হবে কোরআনুল করিম অথবা রসূলুল্লাহ্ স. এর পবিত্র অস্তিত্ব। বাক্যটির শুরুতে উল্লেখিত 'ফাক্বদ' শব্দটির 'ফা' এখানে তাফরি' বা অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত। তাই এখানে আনুষঙ্গিক ব্যাখ্যাটি হবে এ রকম— যখন তারা অন্য মোজেজাগুলোকে অস্বীকার করেছে, তখন অংশতঃ অস্বীকার করেছে কোরআনকেও। কারণ, কোরআনও একটি মোজেজা। হেতু নির্দেশক হিসেবে এখানে 'ফা' শব্দটি প্রয়োগিত হয়েছে বলা যেতে পারে। যদি তাই হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— অনন্য শব্দ সম্ভার ও অতুলনীয় মর্মবৈভবের কারণে মহাগ্রন্থ কোরআন মহাকালের এক মহান মোজেজা হওয়া সত্ত্বেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা একে অমান্য করেছে। অমান্য করেছে আল্লাহ্তায়ালার মহান রসুলকেও— যার পবিত্র উপস্থিতিই এক বিস্ময়কর মোজেজা। এই অনিন্দ্যসুন্দর রসুল নির্বাচিত হয়েছেন মানব সম্প্রদায় থেকেই। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দৃষ্টির সম্মুখেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। সকলেই দেখেছে, তিনি উম্মি (অক্ষরের অমুখাপেক্ষী)। পৃথিবীর অস্থায়ী বিদ্যার সীমাবদ্ধতা ও কলংক থেকে তিনি মুক্ত বলে তাঁর পবিত্র কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞানের কী অবাধ নির্ঝরিণী। পূর্বের আকাশী গ্রন্থগুলোতেও লিপিবদ্ধ রয়েছে এই সুমহান রসুলের বৈশিষ্ট্যসমূহ। এছাড়া তাঁর অনন্য জ্ঞানের স্বীকৃতি দিয়ে ধন্য হয়েছেন খ্যাতনামা ইহুদী ও খৃষ্টান পণ্ডিত ও মাশায়েখ। এতদসত্ত্বেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের অস্বীকৃতিতেই অনড়। সুতরাং তারা অন্য মোজেজাগুলোকে যে অস্বীকার করবে তা আর বিচিত্র কী?

এরপর বলা হয়েছে— যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তার যাথার্থ্য তারা অবহিত হবে। এ কথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের ঠাট্টা বিদ্রূপের মন্দ প্রতিফলের সম্মুখীন অবশ্যই হবে। পৃথিবীতে ইসলামের ক্রমবিকাশের যুগে যখন তারা ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হতে থাকবে, তখন। অথবা তখন, যখন নেমে আসবে কিয়ামতের বিভীষিকা ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের শেষটির প্রথমেই বলা হয়েছে— 'আলাম ইয়ারাউ কাম আহলাকনা মিন ক্বলিহিম মিন ক্বারনিন।' এ কথার অর্থ— তারা কি দেখে না যে, তাদের পূর্বে কতো মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি। এখানে 'কাম' শব্দটি বিজ্ঞপ্তিমূলক বা আধিক্যসূচক। আর 'মিন ক্বলিহিম' এর 'মিন' (মধ্যে) শব্দটি এখানে অতিরিক্ত। 'ক্বারনিন' শব্দটির অর্থ যুগ বা সমসাময়িক। শব্দটির বহুবচন 'ক্বুরুন।' রসুল স. বলেছেন, 'খইরুল ক্বুরুনি ক্বরনি।' এর অর্থ— সকল দলের মধ্যে আমার সমসাময়িক দলই উত্তম। অথবা সকল যুগের মধ্যে আমার যুগই

www.eelm.weebly.com

উৎকৃষ্ট। যুগের সময়সীমা সম্পর্কে অনেক রকম অভিমত রয়েছে। যেমন দশ, বিশ, তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, একশ, অথবা একশ বিশ বৎসর। তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হচ্ছে ক্বরুন অর্থ শতাব্দী (একশ বছর)। রসুল স. হজরত আবদুল্লাহ্ বিন বাশার মাযানীকে বলেছিলেন, তুমি এক ক্বরুন জীবিত থাকবে। তাঁর বয়স হয়েছিলো একশ বছর। যদি এই আয়াতের 'ক্বরুনিন' অর্থ যুগ ধরা হয়, তবে যুগকে ধ্বংস করার অর্থ দাঁড়াবে যুগের মানুষকে ধ্বংস বা বিনাশ করা।

এরপর বলা হয়েছে, 'তাদেরকে দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমনটি তোমাদেরকেও করিনি। এ কথার অর্থ— আমি তাদেরকে পৃথিবীতে দিয়েছিলাম শক্তি, সামর্থ্য, খ্যাতি, সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা। অজস্র পার্থিব নেয়ামতের মধ্যে আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করে রেখেছিলাম। নেয়ামতের সেই বিপুলতা আমি তোমাদেরকে (রসুলুল্লাহ্ স. এর উম্মতকে) দেইনি। এ সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস উদ্ধৃত বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে দিয়েছিলাম বয়সের দীর্ঘ পরিসর। সে রকম দীর্ঘ আয়ু আমি তোমাদেরকে দেইনি। ওই দীর্ঘ জীবন বিশিষ্ট সম্প্রদায়গুলো হচ্ছে— হজরত নুহের সম্প্রদায়, আদ, সামুদ সম্প্রদায় ইত্যাদি। এই বাক্যটিতে উদ্ধৃত 'লাকুম' শব্দটি সম্বোধনসূচক। কিন্তু এর পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে গায়েরে জমির (অনুপস্থিত সর্বনামসমূহ)। যেমন, 'ক্বলাহুম' 'ইয়াতিহিম' 'আলাম ইয়ারাউ' ইত্যাদি। সুতরাং এখানে অনুপস্থিত বা ভবিষ্যতের সকল মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে বলা যেতে পারে। বরং এ রকম বলাই উত্তম। কিন্তু বসরার আলেমগণ বলেছেন, সম্বোধনটি করা হয়েছে ওই সময়ের মক্কার অধিবাসীদের প্রতি। তাঁদের মধ্যে রসুল স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দও রয়েছেন। কিন্তু তাঁরা তো সেখানে উপস্থিতই ছিলেন। তাই বলা যেতে পারে, সম্বোধনটি করা হয়েছে সকল অনাগত (অনুপস্থিত) মানবতাকে লক্ষ্য করে।

এরপর বলা হয়েছে, ওয়া আরসালনাস্ সামাআ আলাইহিম মিদ্‌রারা (এবং আমি তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম)। আস্‌সামাআ— মর্ম হবে মুষলধারে বৃষ্টি। আর মিদরারা শব্দটি এসেছে দাররুন থেকে। দাররুন অর্থ দুধ। আরববাসীদের নিকট দুধ সর্বাপেক্ষা শক্তিবর্ধক পানীয়। তাই অধিক উপকারী ও উত্তম কিছু বুঝাতে গেলে দাররুন শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এখানে মিদরারুন শব্দটির অর্থ হবে অধিক উপকার প্রদায়ক বস্তু— যা প্রয়োজনের সময় কাজে লাগে। হজরত ইবনে আব্বাস এর অর্থ করেছেন— উপর্যুপরি, ধারাবাহিক।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে, ওয়া জাআলনাল আনহারা তাজরী মিন তাহ্তিহিম (আর তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম)। এ কথার অর্থ— তাদের বসতবাটির নিম্নদেশে আমি প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম স্রোতস্বিনী। তাই সেখানে জন্মেছিলো অনেক ফলবান বৃক্ষ। ফলে তাদের সাংসারিক জীবন ছিলো অত্যন্ত সুখের।

এরপর বলা হয়েছে, ফা আহ্লাকনাহুম বিজুনুবিহীম (অতঃপর তাদের পাপের দরুণ তাদেরকে বিনাশ করেছি)। এ কথার অর্থ— তাদের নিকট যখন নবী প্রেরণ করা হলো, তখন তারা সেই প্রেরিত পুরুষগণকে অমান্য করলো। আর সেই অবাধ্যাচরণের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। সে সময় তাদের পার্থিব বৈভব, শক্তিমত্তা এবং নির্বিকার জীবনযাত্রা তাদেরকে সে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারেনি। সেই অবাধ্য সম্প্রদায়গুলোর মতো শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর সম্প্রদায়ও রেসালাতের প্রতি অবজ্ঞা করে চলেছে। এখন যদি আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুলের অপমানের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করতে চান, তবে তাদের পার্থিব বৈভব ও প্রতাপ তাদেরকে কী করে রক্ষা করতে পারবে?

শেষে বলা হয়েছে 'ওয়াআনশা'না মিম্ বা'দিহীম কর্নান আখারীন' (এবং তাদের পরে নতুন মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি)। এই বাক্যটির মাধ্যমে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী মক্কাবাসীদেরকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে, ইতোপূর্বে প্রেরিত নবী রসুলদের প্রতি যে সকল সম্প্রদায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলো। তাদের ওই অবাধ্যাচরণের কারণে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে নতুন মানব সম্প্রদায়কে। সুতরাং হে অবিবেচক মক্কাবাসী এখনও সময় আছে তোমরা আমার প্রেরিত রসুলের প্রতি প্রত্যয়ী হও, অন্যথায় পূর্বের অবাধ্য উম্মতদের মতো তোমরাও বিনাশপ্রাপ্ত হবে। আর তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে নতুন মানবগোষ্ঠী।

কালাবী ও মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, ইহুদী নজর বিন হারেছ, আবদুল্লাহ্ বিন আবী উমাইয়া এবং নওফেল বিন খুয়াইলিদ একবার বললো, হে মোহাম্মদ! আমরা কখনই তোমার প্রতি আস্থা স্থাপন করব না— যতক্ষণ না তুমি আমাদের চোখের সামনে একটি আসমানী কিতাব আনবে, যার সঙ্গে থাকবে চারজন ফেরেশতা এবং তারা এই মর্মে সাক্ষ্য দিতে থাকবে যে, এটি আল্লাহ্র কিতাব— আল্লাহ্ই এই কিতাব প্রেরণ করেছেন। ফেরেশ্তারা আরও সাক্ষ্য দেবে যে, মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল। ইহুদীদের এই জঘন্য উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۗ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ۝ وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ۝ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

❒ যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও অবতারণ করিতাম আর তাহারা যদি উহা হস্তদ্বারা স্পর্শও করিত তবু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিগণ বলিত 'ইহা স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।'

❒ তাহারা বলে, 'তাহার নিকট কোন ফেরেশ্‌তা কেন প্রেরিত হয় না?' যদি আমি ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করিতাম তাহা হইলে তাহাদের কর্মের চূড়ান্ত ফয়সালাই তো হইয়া যাইত আর তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না।

❒ যদি তাহাকে ফেরেশ্‌তা করিতাম তবে তাহাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করিতাম আর তাহাদিগকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলিতাম যেরূপ বিভ্রমে তাহারা এখন রহিয়াছে।

❒ তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হইয়াছে; পরিণামে, তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছিল তাহা বিদ্রূপকারীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটিতে যে কথা বলা হয়েছে, তার মর্ম হচ্ছে, হে প্রিয় রসুল! ইহুদীদের আচরণ অত্যন্ত জঘন্য। তাদের নিকট আকাশ থেকে কাগজে লিখিত কোনো গ্রন্থ পাঠানো হলেও তারা তা গ্রহণ করবে না। নিজ হাতে তারা সেই গ্রন্থ স্পর্শ করলেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলবে এটা প্রকাশ্য যাদু ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আল্লাহ্‌পাক মহাজ্ঞানী। সকল কিছুই তাঁর মহাজ্ঞানের অধীন। তাই তিনি একথা ভালো করেই জানেন যে, আপনার প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী ইহুদীরা সত্যপ্রত্যাখ্যানে চির অনড়। কস্মিনকালেও তারা ইমান গ্রহণ করবে না।

www.eelm.weebly.com

দ্বিতীয়টির বক্তব্য এ রকম— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, আপনার নিকট কোনো ফেরেশ্তা প্রেরিত হয় না কেনো? তাদের প্রশ্নটি অত্যন্ত ঘৃণ্য। তাই হে প্রিয়তম রসুল! আপনি জেনে রাখুন যে, আমি যদি ফেরেশ্তা প্রেরণ করি তবে তো তাদের কর্মের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে। বেঁচে থাকার অবকাশ আর তারা পাবে না। এখানে কর্মের চূড়ান্ত মীমাংসার অর্থ—তাদের পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি হওয়া। পূর্বের উম্মতদের মধ্যে যারা এ রকম মোজেজা দর্শনের জন্য জিদ ধরেছিলো, তাদেরকে মোজেজা দেখানো হয়েছিলো বটে, কিন্তু এ ধৃষ্টতার জন্য তাদেরকে নিশ্চিহ্নও করে দেওয়া হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে কর্মের চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়ার অর্থ কিয়ামত সংঘটিত হওয়া। জুহাক বলেছেন, ফেরেশ্তারা তাদের আসল আকৃতি নিয়ে কাফেরদের সামনে এলে তারা ভয়ের চোটে সকলেই মৃত্যুবরণ করতো। এটাই 'তাদের কর্মের চূড়ান্ত মীমাংসা' হয়ে যাওয়ার অর্থ। 'আর তাদেরকে কোনো অবকাশ দেওয়া হতোনা'— কথাটির অর্থ, অতর্কিতে তাদের উপর নেমে আসত আযাব। ফলে তারা হয়ে যেতো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আত্মরক্ষার উপায় অন্বেষণের কোনো সুযোগই আর তারা পেতো না।

তৃতীয়টিতে বলা হয়েছে, 'যদি তাকে ফেরেশ্তা করতাম তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম।' এ কথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আবদার অনুযায়ী আমি যদি কিতাব ও রসুল সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কোনো ফেরেশ্তাকে পাঠাতাম তবে তাকেও দান করতাম মানবাকৃতি। কাফেরদের আবদার ছিলো দু'ধরনের। কখনও তারা বলতো, 'লাওলা উন্যিলা ইলাইহি মালাকুন ফাইয়াকুনু মা'আহু নাজিরা।' আবার কখনও বলতো 'লাওশা'আ রব্বানা লাআনযালা মালাইকা।' আলোচ্য আয়াতে 'তাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম' বাক্যটির মাধ্যমে তাদের ওই দুই আবদারের সম্মিলিত জবাব দেয়া হয়েছে। এখানে 'লাওজাআলনাহু রাজুলা' (যদি তাকে ফেরেশ্তা করতাম) কথাটির অর্থ— আমি তাকে পুরুষের আকৃতি দিয়ে পাঠাতাম। উল্লেখ্য যে, হজরত জিবরাইল কখনো কখনো প্রখ্যাত সাহাবী হজরত দাহীআ কালবীর আকৃতি ধরে রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হতেন। এর কারণ হচ্ছে প্রকৃত আকারে ফেরেশ্তা দর্শন মানুষের শক্তি বহির্ভূত। নবী ও রসুলগণ সাধারণ মানুষের মতো নন। তাই তাঁরা কখনও কখনও ফেরেশ্তাদেরকে তাঁদের আসলরূপে দেখেছেন। আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, নবী রসুলগণ স্রষ্টা ও সৃষ্টি—উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কধারী। স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে তারা সকল প্রকার ফয়েজ আহরণ করেন। আর তা সৃষ্টির মধ্যে বিতরণ করেন সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে। এভাবে উভয়দিকের যোগসূত্র না থাকলে তাঁদের দ্বারা ফয়েজ আহরণ ও বিতরণের কাজটি কিছুতেই সম্ভব হতো না। নবী ও ফেরেশ্তা উভয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক

www.eelm.weebly.com

রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার কোনো এক গুণের (সিফাতের) সঙ্গে। ওই গুণটিই তাঁদের মাব্দায়ে তা'ইয়ুন (উৎপত্তিস্থল)। আর অন্যদের উৎপত্তিস্থল ওই গুণের প্রতিবিম্ব অথবা ছায়া প্রতিচ্ছায়া থেকে। সুতরাং মানুষের নিকট আল্লাহ্র বাণী পৌঁছাতে গেলে মানুষের নবীকে মানুষই হতে হয়। ফেরেশ্তার দ্বারা এই কাজটি হয় না। এই বাণী বহনের কাজে যদি ফেরেশ্তাকে নিযুক্ত করা হতো, তবে তাদেরকেও হতে হতো মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট। এ রকম না করলে মানুষ ওই ফেরেশ্তাদের পরিচয় লাভ করতে পারত না। বুঝতে পারতো না, তারা মানব সম্প্রদায়ভূত না অন্য কোনো সম্প্রদায় হতে আগত। এ রকম অপরিচিতি উপকার আদান-প্রদানের প্রতিবন্ধক। তাই মানুষের নবী হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হয়েছে মানুষকে, ফেরেশ্তাকে নয়।

নবী রসুলগণের আহ্বানের একটি মূল বিষয় হচ্ছে— অদৃশ্যের প্রতি ইমান আনতে হবে। এই অদৃশ্য বিষয়ের মধ্যে ফেরেশ্তারাও রয়েছেন। সুতরাং তাঁরা নবী রসুলদের মতো দৃশ্যমান হলে তাদেরকে আর অদৃশ্য বলা যায় না। আর যদি তাঁরা দৃশ্যমান হন তবে তাদেরকে নবী রসুলের মতো অর্থাৎ মানুষের মতো আকার গ্রহণ করতে হবে। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'যদি তাকে ফেরেশ্তা করতাম তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম।' আর এ রকম করলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হতো আরও অধিক বিভ্রান্ত। মানুষের আকার বিশিষ্ট হওয়ার কারণে তারা ওই ফেরেশ্তাকে মানুষই মনে করতো এবং এখন যেমন তারা নবুয়ত ও রেসালাতকে অস্বীকার করে চলেছে, তখনও তেমনি অস্বীকৃতিকে আঁকড়ে ধরে থাকতো। তাই পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে, 'আর তাদেরকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন রয়েছে।'

জ্ঞাতব্যঃ নবী ও ফেরেশ্তাগণ সূর্যের দিকে তেরছা অবস্থায় স্থাপিত দর্পণ সদৃশ। তেরছা অবস্থায় স্থাপিত আয়নায় যেমন সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে ওই প্রতিফলনের মাধ্যমে যেমন কোনো অন্ধকার স্থান আলোকিত হয় তেমনি নবুয়তের আয়নায় আল্লাহ্তায়ালার জালাল ও জামাল প্রতিফলিত হয়ে আলোকিত করে বিশ্বাসী মানুষের হৃদয়। সূর্যের আলো আয়নায় বিম্বিত হয় সরাসরি। তাই বলা হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালার কোনো না কোনো গুণ বা সিফাত নবী ও ফেরেশ্তাগণের উৎপত্তিস্থল। আর অন্ধকার স্থান আলোকিত হয় ওই আয়নার প্রতিবিম্ব সন্নিপাতের কারণে। সেকারণেই বলা হয়েছে নবী রসুল ভিন্ন অন্যদের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে আল্লাহ্পাকের কোনো না কোনো গুণের ছায়া বা প্রতিচ্ছায়া (মূল গুণ নয়)।

অবিশ্বাসীরা রসুল স. কে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। তিনি স. এতে করে মনোক্ষুণ্ন হতেন। তাই সান্ত্বনা প্রদানার্থে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে যে কথা জানিয়েছেন— সে কথাই উদ্ধৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের শেষটিতে। বলা হয়েছে, 'তোমার পূর্বেও অনেক রসুলকেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছে;

www.eelm.weebly.com

পরিণামে, তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিলো তা বিদ্রূপকারীদের পরিবেষ্টন করেছে।' এই আয়াতে উল্লেখিত হাক্বা শব্দটির অর্থ জুহাক করেছেন— পরিবেষ্টন করা। কামুস গ্রন্থেও এ রকম অর্থ রয়েছে। কিন্তু রবি বিন আনাস এবং আতা বলেছেন, শব্দটির অর্থ— ধারাবাহিকতা।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১১

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

▢ বল, 'পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদিগের পরিণাম কী হইয়াছিল!'

আলোচ্য আয়াতে পৃথিবীতে পরিভ্রমণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পরক্ষণেই বলা হয়েছে 'অতপর দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণতি কী হয়েছিলো!' প্রথমেই বলা হয়েছে, পরিভ্রমণ করো। তারপর বলা হয়েছে, দেখো (অতঃপর দেখো)। ফা (কাইফা) শব্দটি পরিণতি প্রকাশক। ফা এর পরে বর্ণিত বিষয় এর পূর্বে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে যতিহীনভাবে সম্মিলিত হয়। অথচ এখানে ছুম্মা (অতঃপর— শব্দটি পূর্বের ও পরের বর্ণনার সঙ্গে ব্যবধানসূচক (অর্থাৎ অতঃপর এর পরের বিষয় পূর্বের বিষয়ের কিছুকাল পরে বাস্তবায়িত হয়)। সুতরাং এখানে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে যে, পৃথিবী পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যাচারীদের পরিণাম দৃশ্যমান হওয়া প্রয়োজন, না কিছুকাল পরে? নির্দেশনার এই যতি ও যতিহীনতার সঙ্কট নিরসনের উপায় কী?

সঙ্কট নিরসনঃ উত্থাপিত সঙ্কট নিরসনার্থে বলা যেতে পারে যে— ভ্রমণ (সায়ের) কোনো তাৎক্ষণিক বিষয় নয়। ভ্রমণের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময় ও সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমণ। ভ্রমণের শুরু ও সমাপ্তির মধ্যে রয়েছে সময়ের বিস্তৃত পরিসর। মিথ্যাশ্রয়ীদের পরিণাম অত্যন্ত মন্দ। তাদের বিনাশপ্রাপ্ত বিরান জনপদে গমনের সঙ্গে সঙ্গে তা দৃশ্যমান হয়। আর ওই নিদারুণ পরিণতি থেকে উপদেশ গ্রহণের ব্যাপারটি ঘটে ভ্রমণের শেষে। তাই এখানে প্রথম অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবহার করা হয়েছে ফা (কাইফা)। আর দ্বিতীয় অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবহৃত হয়েছে 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটি।

বায়যাবী লিখেছেন— এখানে ভ্রমণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের জন্য। তাই আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে এ রকম, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ভ্রমণ করা মোবাহ্ (বৈধ), আর বিনাশপ্রাপ্ত অবাধ্যদের পরিণতি পর্যবেক্ষণ ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক)। অর্থাৎ বাণিজ্য অথবা অন্য কোনো কারণে কোথাও

www.eelm.weebly.com

ভ্রমণে গেলে অবাধ্যদের বিনাশপ্রাপ্ত জনপদের নিদর্শন দেখা অবশ্য কর্তব্য। মাদারেক রচয়িতাও এ রকম লিখেছেন। তিনি এর সঙ্গে অতিরিক্ত যে কথাটি লিখেছেন তা হচ্ছে, ভ্রমণের নির্দেশটি ঐচ্ছিক এবং অবাধ্যদের ধ্বংসের নিদর্শন দেখার নির্দেশটি ওয়াজিব। আর ছুম্মা (অতঃপর) শব্দটি উল্লেখের মাধ্যমে ঐচ্ছিক ও অত্যাবশ্যক নির্দেশ দু'টির মধ্যে ব্যবধান ঘটানো হয়েছে।

আমি বলি, বায়যাবী ও মাদারেক রচয়িতার উক্তির ভিত্তি হচ্ছে— ফা (দেখো) নির্দেশটি কারণ সূচক। অর্থাৎ ভ্রমণ হচ্ছে দর্শনের কারণ। ভ্রমণের পর শুরু হয় দর্শনের কাজ। সুতরাং ভ্রমণ করা হলে দর্শনও ঘটবে— দর্শনের উদ্দেশ্য থাক অথবা না থাক। কিন্তু এখানে কাফেরদের চরম পরিণতি দর্শনই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। আর ভ্রমণ যেহেতু সেই দর্শনের কারণ বা মাধ্যম, তাই প্রথমে ভ্রমণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারপর বিবৃত করা হয়েছে মূল উদ্দেশ্যটি (দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিলো)। কারণ ও উদ্দেশ্য দু'টি পৃথক বিষয়। তাই এখানে ছুম্মা (অতঃপর) শব্দটি ব্যবহার করে নির্দেশ দু'টো একত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। সঙ্কটের প্রশ্নটি এখানে অবান্তর। সুতরাং নিরসনের চিন্তাটি নিষ্প্রয়োজন।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১২, ১৩

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ قُلْ لِّلّٰهِ ۗ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

❑ বল, 'আসমান ও জমিনে যাহা আছে তাহা কাহার?' বল, 'আল্লাহেরই'; দয়া করা তিনি তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদিগকে অবশ্যই একত্র করিবেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাহারা নিজেই নিজদিগের ক্ষতি করিয়াছে তাহারা বিশ্বাস করিবে না।

❑ রাত্রি ও দিবসে যাহা কিছু থাকে তাহা তাঁহারই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ্‌পাক নির্দেশ করছেন, হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি সকলকে জিজ্ঞেস করুন, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কার? এই ' মা' শব্দটি সাধারণ অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ এখানে মানুষ, জ্বিন, ফেরেশ্‌তা ও অন্য

www.eelm.weebly.com

সকল চেতন ও অচেতন সৃষ্টিকে সম্বোধন করে উদ্ধৃত প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটির একমাত্র জবাব— আল্লাহ্। তাই পরক্ষণেই বলে দেয়া হয়েছে বলুন, আল্লাহ্। অর্থাৎ এ সুবিশাল সৃষ্টির একক স্রষ্টা যে আল্লাহ্ তা অস্বীকার করার উপায় কারো নেই। অতএব হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি এই অনড় প্রশ্নটির জবাবটিও সকলকে জানিয়ে দিন। বলুন, আল্লাহ্।

রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ্পাক মানুষ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন একটি পুস্তক লিপিবদ্ধ করে আরশের উপরে রাখলেন। ওই পুস্তকে লেখা হলো এ কথা দৃঢ় সত্য যে, আমার রহমত আমার গজব অপেক্ষা অধিকতর প্রবল। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমার রহমত আমার গজব অপেক্ষা অগ্রগামী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বাগবী।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় আরো এসেছে রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্পাকের নিকটে রয়েছে একশত রহমত। তাঁর মধ্যে একটি রহমত বণ্টন করে দেয়া হয়েছে মানুষ, জ্বিন, চতুষ্পদ জন্তু, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির মধ্যে। তাই তারা পরস্পরের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে এবং পরস্পরকে ভালোবাসে। বন্য পশুকুলও এ কারণে ভালোবাসে তাদের শাবককে। অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমত আল্লাহ্পাক তাঁর কাছে জমা রেখেছেন। পুনরুত্থানের দিন ওই রহমত দেয়া হবে তাঁর প্রকৃত বান্দাদেরকে। মুসলিম।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসে সংখ্যাগত দিক দিয়ে একশত রহমতের কথা বলা হয়নি। অধিক ও অপেক্ষাকৃত কম অধিকের দৃষ্টান্তস্বরূপ নিরানব্বই, এক— এ রকম বলা হয়েছে। এ রকম বিবরণভঙ্গির মাধ্যমে এ কথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সৃষ্টিকুল যে রহমতপ্রাপ্ত হয়েছে তা বিনাশী। আর আল্লাহ্পাকের কাছে যা রয়েছে তা অবিনাশী। রহমত আল্লাহ্তায়ালার একটি গুণ। তাঁর সত্তা ও অন্য সকল গুণের মতো এই গুণটিও চিরস্থায়ী। ওই রহমতের ক্ষুদ্রাতিতমক্ষুদ্র এক প্রতিবিম্ব সৃষ্টিকুলের হৃদয়ে পতিত হলে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা।

হজরত ওমর বিন খাত্তাবের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. এর দরবারে বন্দী হিসেবে উপস্থিত করা হলো কয়েকজন অরণ্যবাসীকে। তাদের মধ্যে ছিলো এক রমণী। তার বক্ষদেশ ছিলো দুধে পরিপূর্ণ। সে হঠাৎ একটি শিশুকে দেখতে পেয়ে ছুটে গেলো তার দিকে। শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে নিলো সে এবং পরম যত্নে তাকে দুধ পান করালো। রসুল স. বললেন, দেখো, এই শিশুর মাতাটি তার সন্তানকে কি কখনও আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? আমরা বললাম, কস্মিনকালেও নয়। তিনি স. তখন বললেন, এই রমণীটির সন্তান বাৎসল্য অপেক্ষা আল্লাহ্পাক তাঁর দাসদের উপর অনেক বেশী দয়ার্দ্র।

পৃথিবীতে প্রদত্ত আল্লাহ্পাকের রহমত বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। যেমন শারীরিক সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য, বিত্তবৈভব ও সন্তান সন্ততির প্রাচুর্য, শান্তিপ্রদ সমাজ, রাষ্ট্রীয় সম্মান ইত্যাদি। পৃথিবীতে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলে

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্পাকের এ সকল রহমত লাভ করে। কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত ও রহমত সম্পৃক্ত কেবল আল্লাহ্র এককত্বে বিশ্বাস, নবী-রসুল, আসমানী কিতাব, আখেরাত সম্পর্কীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জ্ঞান, মৃত্যু, মৃত্যোত্তর জীবন, পুনরুত্থান ইত্যাদির সঙ্গে। এর পরিণামে রয়েছে জান্নাত এবং আল্লাহ্পাকের দীদার। এই প্রকৃতির রহমত পেয়ে থাকেন কেবল বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীরা। এই রহমতই যে প্রকৃত রহমত, বর্ণিত হাদিসে সে কথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। আয়াতের পরবর্তী বাক্যেও বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে এভাবে—'কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই একত্র করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। বাক্যটির শেষে বলা হয়েছে, ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ্। এখানে 'ইলা' শব্দটির অর্থ হবে ফি (মধ্যে)। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ্পাক কবরের জগতে কিয়ামত পর্যন্ত সকলকে একত্র রাখবেন। তারপর তোমাদেরকে তোমাদের কবর থেকে পৃথক পৃথকভাবে পুনরুত্থিত করবেন এবং গ্রহণ করবেন তোমাদের পৃথিবীর কার্যকাণ্ডের হিসাব। তারপর তার যথাবিনিময় দেয়া হবে।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত রহমত অর্থ আখেরাতের রহমত। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা জোরালো কণ্ঠে পরকাল, কিয়ামত এবং পুনরুত্থান (হাশর) কে অস্বীকার করতো। তাই পূর্বের আয়াতে তাদের খারাপ পরিণতির কথা বিবৃত করার পর এই আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ্পাক তাঁর অসীম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এই প্রশ্নটির মাধ্যমে— আসমান ও জমিনে যা আছে তা কার? এরপর বলেছেন, দয়া করা তিনি তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। অর্থাৎ পরকালে বিশ্বাসীদেরকে দয়া করা তিনি তাঁর দায়িত্ব বলে নিজে নিজেই নির্ধারণ করে নিয়েছেন।

এখানে 'লা ইয়াজমাআ'ন্নাকুম' শব্দটির শুরুতে ব্যবহৃত 'লাম' অক্ষরটিকে বলা হয় গুরুত্ব সঞ্চারক 'লাম' (লামে তাকীদ)। বিষয়বস্তুকে অধিকতর গুরুত্ববহ ও সুনিশ্চিত করে তুলবার জন্য এই লাম অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানেও এই অক্ষরটি ব্যবহারের মাধ্যমে কিয়ামত দিবসের পুনরুত্থানের প্রসঙ্গটিকে নিঃসন্দিগ্ধ করা হয়েছে। শেষে স্পষ্টতঃ বলেও দেয়া হয়েছে— লা রইবা ফি (এতে কোনোই সন্দেহ নেই)।

আর রহমত একটি ব্যাপকার্থক শব্দ। ইহকালে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলেই আল্লাহ্পাকের এই রহমত বা দয়া পেয়ে থাকে। সুতরাং এ থেকে কেউ এ রকম ধারণা করতে পারে যে, আখেরাতেও বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলে আল্লাহ্পাকের রহমত পেয়ে যাবে। কিন্তু ধারণাটি যে সম্পূর্ণতঃই ভুল, সে কথা শেষ বাক্যটিতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। আখেরাতে কাফেরেরা অবশ্যই বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই বলা হয়েছে— 'আল্লাজিনা খসিরু আংফুসাহুম ফাহুম লা ইউমিনুন' (যারা নিজেই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা বিশ্বাস করবে না)। এ কথার অর্থ—

www.eelm.weebly.com

তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরিক করার জন্য নিজেই নিজেদের ক্ষতি করেছে। নষ্ট করে দিয়েছে আখেরাতে আল্লাহ্‌র রহমত প্রাপ্তির যোগ্যতাকে। তাই পৃথিবীতে তারা যে রহমত লাভ করছিলো, সে রহমত লাভের যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলবে। সে যোগ্যতা হচ্ছে প্রশান্ত স্বভাব ও পরিশুদ্ধ জ্ঞান।

ফাহুম লা ইউ'মিনুন (তারা বিশ্বাস করবে না)। বাক্যটির প্রথমে 'ফা' অক্ষরটির স্থাপনের মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, যারা চির অবিশ্বাসী তারা কস্মিনকালেও ইমান আনবে না। পরিপূর্ণ ও অসীম জ্ঞানের কারণে আল্লাহ্‌পাক এ কথা সুস্পষ্টরূপে অবগত। তাই তিনি বলেছেন, তারা বিশ্বাস করবে না।

'আল্লাজিনা খসিরু' (যারা নিজেই নিজেদের ক্ষতি করেছে) — এ কথাটির পূর্বে 'ওয়াও আতেফাহ্' বা সংযোজক অব্যয় (এবং) উল্লেখ থাকলে পূর্বের বাক্য 'লা রইবা ফি' (কোনোই সন্দেহ নেই) এর সঙ্গে সংযোগ ঘটতো। কিন্তু এ রকম সংযোজন ঘটালে আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার সুযোগ থাকতো যে, কিয়ামত যদি সন্দেহাতীত কোনো বিষয় হয় তবে অবিশ্বাসীরা এ ব্যাপারে সন্দেহ করবে কেনো? এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, কিয়ামত নয়— কিয়ামতের উপর ইমান না থাকাই কাফেরদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, 'আল্লাজিনা' শব্দটি এখানে একটি অনুক্ত ও মন্দ ক্রিয়ার কর্ম।

হজরত আবু উমামা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌পাকের রহমত সর্বসাধারণের জন্য। কিন্তু কাফেরেরা ইমানবিহীন হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বলে সেই রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পালিয়ে বেড়ায়— যেমন উদ্ভ্রান্ত উট পালিয়ে বেড়ায় তার মালিকের নিকট থেকে। বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী ও হাকেম।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'ওয়ালাহু মা সাকানা ফিল্লাইলি ওয়ান নাহার' (রাত্রি ও দিবসে যা কিছু থাকে তা তাঁরই)। এখানে উল্লেখিত সাকানা শব্দটি গঠিত হয়েছে সুকনা থেকে। শব্দটির পরে সাধারণতঃ আসে স্থানবাচক কোনো কথা। যেমন— ফিল বাইত, ফিল মাসজিদ ইত্যাদি। কিন্তু এখানে স্থানের পরিবর্তে উল্লেখ করা হয়েছে সময়কে। রাত্রি ও দিবসকে। প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা বুঝানোর জন্যই এ রকম বলা হয়েছে। অর্থাৎ সময়কে এখানে করা হয়েছে স্থানের স্থলাভিষিক্ত। উদ্দেশ্য এ কথাটি বলা যে, স্থানের মতো সময়ও শান্তিপ্রদায়ক হতে পারে। অন্য আয়াতেও এ দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'সাকান্‌তুম ফি মাসাকিনাল্লাজিনা জলামু আনফুসাহুম', — এখানে ফি-এর পরে স্থানের উল্লেখ এসেছে।

'মা সাকানা ফিল্‌লাইলি ওয়ান্নাহার'— এই বাক্যাংশটির মা দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে ওই সকল বস্তুকে যেগুলোর উপর দিবস রজনী আবর্তিত হয়। সুকুনুন

www.eelm.weebly.com

থেকে সাকানা শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে— এ রকমও বলা যেতে পারে। যদি তাই হয় তবে আলোচ্য বক্তব্যটির উদ্দেশ্য হবে, সকল কিছু আল্লাহ্র জন্য যিনি দিবস যামিনীর বিবর্তনের মধ্যে সে সকলকে শান্ত রাখেন অথবা আন্দোলিত করেন। কিন্তু এখানে আন্দোলিত হওয়ার কথা একারণেই প্রচ্ছন্ন রাখা হয়েছে যে, আন্দোলন বা অস্থিরতা শান্তি বা প্রশান্তির পরিপন্থী। কোনো কোনো সময় একটি বিষয়ের উল্লেখের মাধ্যমে দু'টি উদ্দেশ্য সাধন করা হয়ে থাকে। যেমন— 'সারাবিলু তাক্বিকুমুল হার্‌রা' (ওই পোশাক যা তাপ ও শৈত্য থেকে রক্ষা করে)।

শেষে বলা হয়েছে 'ওয়াহুয়াস সামিউল আলীম' (এবং তিনিই সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞ)। কথাটির মধ্যে রয়েছে অবিশ্বাসীদের শাস্তির সংবাদ। সংবাদটি এই— আল্লাহ্পাক সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তাই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ধারণা, বক্তব্য ও আচরণ— কোনো কিছুই তাঁর নিকট গোপন নয়। সুতরাং শাস্তি থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নেই।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১৪, ১৫

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

❑ বল, 'আমি কি আস্‌মান ও জমিনের স্রষ্টা' আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিব? তিনিই জীবিকা দান করেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ জীবিকা দান করে না,' এবং বল, 'আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আত্মসমর্পণকারীদিগের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই,' আমাকে আরও আদেশ করা হইয়াছে 'তুমি অংশীবাদিগণের অন্তর্ভুক্ত হইও না।'

❑ বল, 'আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তবে আমি ভয় করি যে, মহাদিনের শাস্তি আমার উপর আপতিত হইবে;

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— 'কুল আগাইরাল্লহি আত্তাখিজু ওয়ালিইয়্যা' (বলুন, আমি কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবো)। কথাটি একটি অস্বীকৃতিমূলক জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ প্রশ্নটির মাধ্যমে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাস্য হওয়াকে নিবারণ করা হয়েছে। অভিভাবক অর্থ এখানে— উপাস্য। সাধারণ অভিভাবকত্ব নয়। তাই পরক্ষণেই বলা হয়েছে— 'ফাতিরিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' (যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা)। সেই

www.eelm.weebly.com

স্রষ্টা—যিনি চিরবিদ্যমান। 'ফাতির' শব্দটি এখানে ইজাফাতে মা' নুবীয়্যা। অর্থগত সম্বন্ধ নির্দেশক। ফাতির কর্তা এবং আসমান ও জমিন হচ্ছে কর্ম। তাই বাক্যটির অর্থ হবে—আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াহুয়া ইউত্‌ই'মু ওয়ালা ইউত্‌আ'মু' (তিনিই জীবিকা দান করেন কিন্তু তাঁকে কেউ জীবিকা দান করে না। এখানে 'তোআ'ম' অর্থ জীবিকা বা জীবনোপকরণ। (খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু)। অন্য সকল প্রয়োজনের মধ্যে খাদ্য বস্তুর প্রয়োজনই সর্বাধিক। তাই এখানে রিজিক না বলে বলা হয়েছে তোআ'ম।

কতিপয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী রসুল স.কে প্রচলিত ধর্মমত গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলো। তাদের সেই অসৎ পরামর্শের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী বাক্যটি— 'কুল ইন্নি উমিরতু আন আকুনা আউয়ালা মান আসলামা' (এবং বলুন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যেনো আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই) এ কথার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, সকল মানুষের মধ্যে রসুল স. ই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

এরপরের বাক্যটি এ রকম—'ওয়ালা তাকুনান্না মিনাল মুশরিকীন'— এ কথার অর্থ, (আমাকে এ রকমও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে) 'তুমি অংশীবাদিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। 'কি্লা' শব্দটি এখানে উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য শব্দটিসহ বাক্যটির প্রকৃত অর্থ হবে—কস্মিনকালেও তুমি অংশীবাদিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (কি্লা লা তাকুনান্না মিনাল মুশরিকিন)।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষটিতে বলা হয়েছে— 'বলো, আমি যদি আমার প্রভুপালকের অবাধ্যতা করি তবে আমি ভয় করি যে, মহাদিনের শাস্তি আমার উপর আপতিত হবে।' এখানে মহাদিন অর্থ কিয়ামতের দিন। আয়াতটির বক্তব্য বিষয় হচ্ছে— আমি ওই মহাদিবসের কথা স্মরণ করে ভীত ও চিন্তিত। এটা নিশ্চিত যে, আমি যদি আমার প্রভুর অবাধ্য হই, অন্য কোনো কিছুকে উপাস্য নির্ধারণ করি— তবে ওই ভয়াবহ দিবসে আল্লাহ্‌পাক নিশ্চয়ই শাস্তি দান করবেন। এভাবে আয়াতটির মাধ্যমে কাফেরদের কিয়ামতের প্রতি অবিশ্বাসকে মিথ্যা প্রমাণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই ইঙ্গিতটি দেয়া হয়েছে যে, অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার কারণে তোমরা শাস্তির উপযোগী হয়েছো। তাই তোমাদের জন্য শাস্তি অবধারিত। এখানে 'আজাবা ইয়াওমিন' (মহাদিনের শাস্তি) কথাটি 'আখাফু' (আমি ভয় করি) এর কর্ম। 'আখাফু' শব্দটি 'ইন্‌আ'সাইতু রব্বি' (যদি আমার প্রভুপালকের অবাধ্যতা করি) কথাটির শর্তপূরক নয়। এখানে শর্তপূরক কথাটি রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ শর্তপূরক রীতিতে ব্যবহৃত হলেও কথাটি মূলতঃ শর্তপূরক নয়। সুতরাং অনুক্ত বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

www.eelm.weebly.com

مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ○ وَاِنْ
يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

❒ 'সেই দিন যাহাকে উহা হইতে রক্ষা করা হইবে তাহার প্রতি তিনি তো দয়া করিবেন এবং ইহাই স্পষ্ট সফলতা।'

❒ আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দান করিলে তিনি ব্যতীত উহা মোচনকারী আর কেহ নাই; আর তিনি তোমার কল্যাণ করিলে তবে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

❒ তিনি আপন দাসদিগের উপর পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞাতা।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— 'মাই ইউস্‌রাফ আ'নহু ইয়াওমাইজিন ফাক্বদ্ রহিমাহু' (সেই দিন যাকে উহা হতে রক্ষা করা হবে তার প্রতি তিনি তো দয়া করবেন)। এ কথার অর্থ, সেই ভয়াবহ পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা পাবে কেবল সে-ই— যার প্রতি বর্ষিত হবে আল্লাহ্‌পাকের রহমত। অতএব যার উপর থেকে আযাব সরিয়ে দেয়া হবে তার প্রতি আল্লাহ্‌র হক আদায় করা অত্যাবশ্যক হবে না কেনো? এখানে ইয়াওমা ইজিন' শব্দটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'জবরে'র উপর।

ক্বারী আসেম এবং ক্বারী ইয়াকুব 'ইউস্‌রাফ' শব্দটিকে পড়েছেন 'ইউস্‌রিফ।' এ রকম পড়লে আযাব হবে কর্ম এবং মনে করতে হবে এর কর্তা আল্লাহ্ শব্দটি এখানে অনুক্ত রয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ ক্বেরাত হচ্ছে ইউস্‌রাফ— যার ফায়েল বা কর্তা হচ্ছে আযাব।

'ওয়া জালিকাল ফাউযুল মুবীন' (এটা স্পষ্ট সফলতা)। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, ফাউযুল অর্থ মুক্তি, সফলতা, ধ্বংস। কিন্তু এখানে ধ্বংস অর্থটি কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, তা বাক্যের পূর্বাপর বর্ণনার পরিপন্থী। আবার এর অর্থ যে পরিত্রাণ— সে কথাও বলা যায় না। কেননা আযাব সরে যাওয়ার অর্থই মুক্তি। তাই এখানে শব্দটির অর্থ মুক্তি করা হলে তা হবে পুনরুক্তির দোষে দুষ্ট। সুতরাং এখানে ফাউযুন শব্দটির অর্থ হবে সফলতা। এ রকম অর্থের মাধ্যমে এ কথাটিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শাস্তি অপসারিত হলেই জান্নাতে প্রবেশ হয়ে পড়ে অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ এ রকম কিছুতেই হতে পারে না যে— কারো উপর থেকে শাস্তি অপসারণ করা হলো, অথচ সে বেহেশতে প্রবেশ করলো না। এই ব্যাখ্যাটির দ্বারা মোতাজিলাদের মতবাদটিও ভুল প্রমাণিত হলো। তারা বলে

www.eelm.weebly.com

থাকে, শাস্তি অপসারণ এবং বেহেশতে অনুপ্রবেশের মধ্যে আরেকটি স্তর বা অধ্যায় রয়েছে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া ই'ইয়াম সাস্কাল্লহু বিদুর্‌রীন ফালা কাশিফালাহু ইল্লাহুয়া' (আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দান করলে— তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই)। এখানে 'দুররুন' শব্দটির অর্থ কঠিন দারিদ্র, পীড়া অথবা শাস্তি। আর 'ফালা কাশিফা' কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে— ওই কঠিন ক্লেশ মোচন করার ক্ষমতা কারো হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত ক্লেশ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ দূর করতে সক্ষম নয়। যদি এ রকম না হতো, তবে আল্লাহ্‌পাক যে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী, সে কথা প্রমাণিত হতো না। কারণ নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাক সকল দোষত্রুটি, দুর্বলতা ও অপারগতা থেকে পবিত্র।

এরপর বলা হয়েছে 'ওয়া ইঁইয়্যাম সাস্কা বিখইরিন ফাহুয়া আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বদির' (আর তিনি তোমার কল্যাণ করলে তবে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান)। এ কথার অর্থ বিত্তবৈভব, শারীরিক সুস্থতা ইত্যাকার সকল কল্যাণ আল্লাহ্‌তায়ালার আয়ত্তে। তিনিই সকল কল্যাণকে অবশিষ্ট রাখেন, প্রতিষ্ঠিত করেন অথবা দূর করে দেন। তিনি যদি কাউকে কোনো কল্যাণ দান করেন, তবে তা অপসারণ করার ক্ষমতা অন্য কারো নেই।

স্বসূত্রে বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পারস্যরাজ কেস্‌রা উপঢৌকন হিসেবে রসুল স.কে একটি খচ্চর প্রেরণ করলেন। তিনি স. খচ্চরটির লাগাম ধরে তার উপর আরোহণ করলেন। আমাকেও বসিয়ে নিলেন তাঁর পশ্চাতে। এভাবে কিছু পথ অতিক্রম করার পর তিনি স. বললেন, বৎস! আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রসুল! আজ্ঞা প্রতিপালনে আমি প্রস্তুত। তিনি স. বললেন, তুমি যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ প্রতিপালন কোরো, আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করবেন। এ রকম যথাআনুগত্য তোমাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন করবে। সুখের সময় আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়ো না। তাহলে দুঃখের সময়ে আল্লাহ্ তোমাকেও বিস্মৃত হবেন না। বিপদে তিনিই ত্রাতা। যদি কিছু চাইতে হয়, তবে তাঁর নিকটেই চেয়ো। সাহায্যের প্রয়োজন পড়লে তাঁর সকাশেই সাহায্যপ্রার্থী হয়ো। আল্লাহ্‌র নির্ধারণ অনুসারেই সকল কিছু সংঘটিত হয়। তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সকল সৃষ্টি সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলেও তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না। তেমনি পৃথিবীর সকলে মিলে চেষ্টা চালালেও তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তা আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তবিরোধী হয়। অতএব তুমি সংকটে পতিত হলে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ধৈর্য ধারণ কোরো এবং পুণ্য কর্মে নিয়োজিত থেকো। পুণ্যকর্ম সম্পাদনে সক্ষম না হলেও ধৈর্যচ্যুত হয়ো না। অপছন্দনীয় পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ বড়ই উত্তম। এ কথাটিও জেনে রেখো যে, ধৈর্যের পরে আসে সাহায্য। সংকীর্ণতার পরে আসে প্রশস্ততা এবং সহজতা আসে কাঠিন্যের পরে। আহমদ ও তিরমিজি হাদিসটিকে উত্তম ও বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। তিরমিজির বিবরণটি সংক্ষিপ্ত। সেখানে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ধৈর্য ধারণ কোরো, পুণ্যকর্মে নিয়োজিত থেকো— এ ধরনের কথাগুলো নেই।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের শেষটিতে বলা হয়েছে— 'ওয়াহুয়াল কৃাহিরু ফাওক্বা ই'বাদিহি ওয়াহুয়াল হাকিমুল খবির' (তিনি আপন দাসদের উপর পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞাতা)। 'কৃাহিরু' অর্থ পরাক্রমশালী, সকল কিছু যার পরাক্রমের নিকটে অবদমিত। কুদরত ও কৃহর অর্থগত দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও কুদরত অপেক্ষা কৃহর অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। কুদরতের মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীকে বিরোধিতা থেকে বিরত রাখা হয়। আর কৃহরের মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে পর্যুদস্ত করার অর্থটি প্রকাশ পায়।

'ফাউকা ইবাহিদি' অর্থ আপন দাসদের উপর। এটি হচ্ছে দ্বিতীয় বিধেয়। প্রথম বিধেয়টি ছিলো আল ক্বাহির। এখানে 'ফাওক্বা' অপেক্ষা ক্বাহির অধিকতর পরাক্রম প্রকাশক হওয়াই সমীচীন।

'ওয়াহুয়াল হাকিমুল খবির' অর্থ—তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞাতা। মহাকুশলী তিনি। তাঁর নির্দেশের হেকমত বা কৌশল সম্পর্কে তিনিই অধিক জ্ঞাত। তিনি খবির বা জ্ঞাতা। সকল সংবাদ তাঁর মহাজ্ঞানের অধীন। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুও তাঁর নিকট গোপন নয়।

কালাবীর বর্ণনায় রয়েছে, কতিপয় মক্কাবাসী মহানবী স. সকাশে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে মোহাম্মদ! তোমার রসুল হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে, এমন লোক কোথায়? আমরা তো সে রকম কাউকে খুঁজে পেলাম না। আমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি, তারা বলেছে, তাদের গ্রন্থে তোমার রেসালাত সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের এমতো ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১৯, ২০

قُلْ اَیُّ شَیْءٍ اَکْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِیْدٌ بَیْنِیْ وَبَیْنَکُمْ وَاُوْحِیَ اِلَیَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَکُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ اَئِنَّکُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰی قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِکُوْنَ ○ اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْکِتٰبَ یَعْرِفُوْنَهٗ کَمَا یَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ اَلَّذِیْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ○

❑ বল, 'সাক্ষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ কী?' বল, 'আল্লাহ্ আমার ও তোমাদিগের মধ্যে সাক্ষী এবং এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে যেন তোমাদিগকে এবং যাহার নিকট ইহা পৌঁছিবে তাহাদিগকে এতদ্বারা আমি সতর্ক করি; তোমরা কি

www.eelm.weebly.com

এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহের সহিত অন্য ইলাহ্ও আছে?' বল, 'আমি সে সাক্ষ্য দেই না;' বল, 'তিনি একক ইলাহ্ এবং তোমরা যে শরীক কর তাহা হইতে আমি নির্লিপ্ত।'

❒ যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহাকে সেইরূপ চিনে যেরূপ চিনে তাহাদিগের সন্তানগণকে; যাহারা নিজেরাই নিজদিগের ক্ষতি করিয়াছে। তাহারা বিশ্বাস করিবে না।

এরশাদ হয়েছে — 'কুল আইয়্যু শায়্যিন আক্বারু শাহাদাহ্' (বলো সাক্ষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ কী?)। প্রতিটি অস্তিত্বশীল বস্তুকে বলা হয় 'শাই'। সুরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে 'শাই' অর্থ বস্তু। আকবর অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্ব। কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে— কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য আল্লাহ্র সাক্ষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? প্রশ্নটি করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জনতাকে। এর উত্তরের অপেক্ষা না করে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে পরক্ষণেই এই নির্দেশটি প্রদান করেছেন— 'কুলিল্লাহু শাহীদুন বাইনি ওয়া বাইনাকুম' (বলো আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী)। এখানে আল্লাহ্ই উদ্দেশ্য এবং বিশেষ কারণবশতঃ এখানে বিধেয়টি লুপ্ত হয়েছে। আর কুলিল্লাহ্র পরে উল্লেখিত শাহীদুন বিধেয়টির আগে 'হুয়া' একটি অনুক্ত উদ্দেশ্য হিসেবে বিদ্যমান। অথবা উদ্দেশ্য আল্লাহ্ এবং বিধেয় শাহীদুন। আর সম্পূর্ণ বাক্যটিই কুল শব্দটির মাফউল বা কর্ম। এখানে আল্লাহ্ যখন সাক্ষী, তখন তিনি নিজেই বড়ো সাক্ষী।

এ রকমও হতে পারে যে, এখানে 'শাই' শব্দটির অর্থ মাশহুদ (যে সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে) এবং শাহাদাত অর্থ সাক্ষ্য দেয়া। যদি তাই হয় তবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— আমার রেসালাত সঠিক কি না সে সম্পর্কে সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ্। আর আল্লাহ্পাক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাক্ষী কে? সেই আল্লাহ্ই যখন মোজেজার মাধ্যমে আমার রেসালাতের সাক্ষ্য দিচ্ছেন তখন আমার রেসালাত নিশ্চয়ই সত্য। এই ব্যাখ্যাটির জন্য বৃথা কোনো আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই। এখানে আল্লাহ্র সাক্ষ্য অর্থ ওই মোজেজা সমূহ যা তিনি তাঁর প্রিয় রসুলকে প্রদান করেছেন। আর ওই মোজেজাসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেজা হচ্ছে মহা-গ্রন্থ আল কোরআন। তাই পরক্ষণে বলা হয়েছে— ওয়া উহিয়্যা ইলাইয়্যা হাজাল কুরআনু লিউনজিরাকুমবিহি ওয়ামান বালাগা (এবং এই কোরআন আমার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে যেনো তোমাদেরকে— যার নিকট এটা পৌঁছুবে— তাদেরকে এর দ্বারা আমি সতর্ক করি)। এর অর্থ— হে প্রিয় রসুল! আপনি বলুন, হে অর্বাচীন জনতা! তোমরা যদি আল্লাহ্র এককত্বে এবং আমার রেসালাতে বিশ্বাস স্থাপন না করো, তবে আমি এই কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করতে থাকবো। এখানে 'কুম' শব্দটির মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে মক্কাবাসীদেরকে। মানবালাগা (সতর্ক করি) কথাটি কুম শব্দটির সঙ্গে

www.eelm.weebly.com

সম্পর্কিত। এভাবে কথা দু'টির সম্মিলিত সম্বোধনকৃতরা হবে ওই সকল মানুষ ও জ্বিন, যারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলো অথবা যারা পৃথিবীতে আগমন করবে কিয়ামত পর্যন্ত।

নবী ও রসুলগণের আবশ্যিক কর্তব্য হচ্ছে অনুগতদেরকে সুসংবাদ প্রদান এবং অবাধ্যদেরকে সতর্ককরণ। কিন্তু এখানে কেবল সতর্ককরণ কথাটিই উল্লেখ করা হয়েছে। এ রকম করা হয়েছে প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষিতের কারণে। এ রকমও হতে পারে যে, সতর্ককরণ বা ভয় প্রদর্শন ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে অধিকতর ফলদায়ক। ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে কেউ উপকৃত না হলে সুসংবাদের মাধ্যমে তার উপকার লাভের সম্ভাবনা বৃথা। কারণ এ কথা সর্ববাদীসম্মত যে, ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া উপকারপ্রাপ্তি অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত পেলেও তা অন্যের নিকটে পৌঁছে দাও। বনী ইসরাইলদের বিবরণসমূহও প্রচার করতে পারো। এতে সংকীর্ণতার কোনো কারণ নেই (যদি তা হাদিস শরীফের অনুকূল হয়)। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার সঙ্গে মিথ্যা সংযোগ করে, সে যেনো তার আশ্রয় নির্বাচন করে নরকে। বোখারী, মুসলিম। হাদিসে উল্লেখিত বনী ইসরাইলদের বিবরণ অর্থ ওই সকল বনী ইসরাইলদের বিবরণ, যারা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বলা বাহুল্য যে মিথ্যাবাদী বনী ইসরাইলদের বিবরণের কোনোই মূল্য নেই।

হজরত সামুরা বিন জুনদুব এবং হজরত মুগিরা বিন শো'বা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনেশুনে আমার কথা হিসেবে কোনো মিথ্যা কথা বর্ণনা করে— সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী। মুসলিম।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, আল্লাহ্পাক তাঁর ওই বান্দার মস্তক চিরসবুজ করে দিবেন, বিশেষ সম্মানে ভূষিত করবেন — যে আমার কথা শুনে স্মৃতিবদ্ধ করলো, অনুধাবন করলো এবং অন্যের নিকট প্রচার করলো। এমনও হতে পারে, যে পৌঁছায়, তার চেয়ে যার নিকট পৌঁছানো হয়, সে-ই অধিকতর বিচক্ষণ।

তিনটি বিষয়ে বিশ্বাসীদের অন্তরে সঙ্কীর্ণতা থাকা অনুচিত। ১. একনিষ্ঠতার সঙ্গে আল্লাহ্পাকের উপাসনা করা। ২.মানুষের কল্যাণাকাঙ্খী হওয়া। ৩. বিশ্বাসীদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ থাকা। এ কথাটি সন্দেহাতীত যে, তাদের আহবান পরে আগমনকারীদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম বায়হাকী। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা এবং দারেমী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত জায়েদ বিন সাবেত থেকে। কিন্তু তিরমিজি ও আবু দাউদের বর্ণনায় 'তিনটি বিষয়ে বিশ্বাসীদের অন্তরে সঙ্কীর্ণতা থাকা অনুচিত'— কথাটি নেই।

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী বলেছেন, যার কাছে কোরআন মজীদ পৌঁছেছে, সে যেনো রসুল স. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে এবং তাঁর নিকট থেকে কোরআন শুনেছে।

এরপর পুনরায় অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন করা হয়েছে এইভাবে— 'আইন্নাকুম লা তাশ্হাদুনা আন্না মাআল্লাহি আলিহাতান উখ্রা' (তোমরা কি এই সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য উপাস্যও আছে?)। এ কথার অর্থ, হে মক্কাবাসী, তোমাদের সম্মুখে জ্ঞান ও কোরআন (আক্লি ও নক্লি) প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এতদসত্ত্বেও তোমরা বিবেকবর্জিত, মূঢ়। তাই তোমরা এখনও ধারণা করে চলেছো যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকা সম্ভব। কেনো? আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, মক্কাবাসীরা আল্লাহ্র এককত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য চেয়েছিলো। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— আল্লাহ্পাক স্বয়ং তাঁর এককত্বের সাক্ষী। তাঁর এককত্বের বিষয়টি সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তদুপরি অবতীর্ণ করা হয়েছে কোরআন— যা একটি প্রত্যক্ষগোচর মোজেজা। এই সাক্ষ্যটি একটি সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য। অথচ হে মক্কাবাসী, এই অনন্য মোজেজা প্রত্যক্ষগোচর করার পরেও তোমরা আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে শিরিক করতে চাও। কেনো? —এভাবে বিস্ময়বোধক প্রশ্ন প্রক্ষেপণের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের প্রশ্ন ও অপবিত্র ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

আমি বলি, সম্ভবত মক্কাবাসীরা তৌহিদী নয়, রেসালাতের সাক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছিলো। কেননা রেসালাতের সাক্ষ্যের জন্য তৌহিদের সাক্ষ্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু তৌহিদের সাক্ষ্যের জন্য রেসালাতের সাক্ষ্য অত্যাবশ্যক নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'কুল লা আশ্হাদু' (বল, আমি সেই সাক্ষ্য দেই না)। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! সাক্ষ্য সন্ধানী মক্কার জনতাকে জানিয়ে দিন উপাস্য নির্ধারণ সম্পর্কে তোমাদের দোদুল্যচিত্ততা ও শিরিকদুষ্টতাকে আমি সমর্থন করি না। আমি কিছুতেই তোমাদের বিকৃত বিশ্বাসের স্বপক্ষ নই।

এরপর এরশাদ হয়েছে— 'কুল ইন্নামা হুয়া ইলাহুঁউ ওয়াহিদুঁউ ওয়া ইন্নানী বারিউম মিম্মা তুশরিকুন' (বলো তিনি একক উপাস্য এবং তোমরা যে শরীক করো তা থেকে তিনি নির্লিপ্ত)। এ কথার অর্থ— উপাস্য হিসেবে, স্রষ্টা হিসেবে, চিরন্তন সত্তা হিসেবে, জীবনপোকরণ প্রদাতা হিসেবে, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে, সকল গুণে গুণান্বিত হিসেবে, পূর্ণতা ও পবিত্রতার অধীশ্বর হিসেবে তিনি একক। তাঁর এই অতুলনীয় এককত্বে ও বৈশিষ্ট্যে অন্য কেউই অংশীদার নয়। অন্য কারো আকৃতি, প্রকৃতি, সম্পৃক্তি থেকে তিনি পবিত্র। অন্যের শারীরিক, আত্মিক, স্থানগত, সংখ্যাগত, ধারণাগত অংশগ্রহণ থেকে তিনি মুক্ত। আমার এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে যে, আল্লাহ্পাকের সত্তা তো অতি অবশ্যই অতুলনীয় এককত্বমণ্ডিত। অথচ এখানে বলা হয়েছে ইলাহুউ ওয়াহিদ (তিনি একক আল্লাহ্)। এ রকম বলার কারণ কী? এখানে কেবল 'ইলাহুন' বললেই তো চলতো। এ রকম প্রশ্নের উত্তর রয়েছে

www.eelm.weebly.com

আমার ব্যাখ্যাটির মধ্যেই। ইলাহুন অর্থ উপাস্য। এখানে কেবল ইলাহুন উল্লেখিত হলে এ রকম অপধারণার অবকাশ থাকতো যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যও তাহলে রয়েছে। তাই ওয়াহিদ শব্দটি ইলাহ শব্দটির সঙ্গে সংযুক্ত করে (ইলাহুঁউ ওয়াহিদ বলে) ওই অপধারণার সম্ভাবনাটির মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এভাবে এ কথাটি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে যে— আল্লাহ্পাকই প্রকৃত অস্তিত্ব। তাঁর অস্তিত্বে, গুণাবলীতে এবং কার্যাবলীতে অন্য কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই। থাকা সম্ভবও নয়।

এ রকমও হতে পারে যে, এখানে ইন্নামা শব্দটি সীমিত অর্থবোধক শব্দ নয়। বরং এর মধ্যে শব্দটি 'মা মাউসুলা' (সম্পর্কযুক্ত বিশেষ্য পদ)। আর 'হুয়া' (তিনি) সর্বনামটি এখানে ওই বিশেষ্য পদের স্থলাভিষিক্ত। এভাবে 'ইন্নামা হুয়া ইলাহুঁউ ওয়াহিদ'—শব্দগুলো অবিচ্ছেদ্য। এভাবে বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— যিনি উপাস্য তিনি এক। তিনিই কেবল চিরন্তন ও সকল গুণাবলীর অধিকারী। সত্তায়, গুণে, কার্যে তাঁর অংশীদার কেউ নয়। তিনিই অংশীবিহীন, অতুলনীয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপাস্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ্তায়ালার অংশীদারিত্বের ব্যাপারে যে সকল কথা বলে যাচ্ছো, সে সকল কথা আমি বলি না। আমি সাক্ষ্য প্রদান করি আল্লাহ্পাকের নিরঙ্কুশ এককত্বের।

শেষে বলা হয়েছে —'ওয়া ইন্নানি বারিউম মিম্মা তুশরিকুন' (এবং তোমরা যে শরীক করো তা থেকে আমি নির্লিপ্ত। এখানে 'মিম্মা' শব্দটির 'মা' যদি 'মা মাউসুলা' (সম্পর্কযুক্ত বিশেষ্য পদ) হয় তবে আলোচ্য কথাটির অর্থ হবে— তোমরা যে প্রতিমাগুলোকে উপাস্য নির্ধারণ করে আল্লাহ্পাকের সঙ্গে শিরিক করে চলেছো, সেগুলো থেকে আমি বিমুখ। আর 'মিম্মা' শব্দটির 'মা'—'মায়ে মাসদারিয়াহ্' হলে মা তাশকুরুন কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে শিরিক করো। তাই আমি তোমাদের প্রতি অপ্রসন্ন, নির্লিপ্ত।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষটিতে বলা হয়েছে— 'আল্লাজিনা আতাইনাহুমুল কিতাব'। এ কথার অর্থ, যাদেরকে আমি আসমানী কিতাব দিয়েছি। অর্থাৎ তাওরাত ও ইনজিল দিয়েছি। 'ইয়ারিফুনাহু'—অর্থ, তারা রসুল মোহাম্মদ স.কে চেনে। তারা তওরাত ও ইঞ্জিল পাঠ করে। ওই কিতাবসমূহে রসুল স. এর অবয়ব সম্পর্কিত বর্ণনা, বৈশিষ্ট্যাবলী ও স্বভাবচরিত্রের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা সেগুলো পাঠ করে। তাই রসুল স. কে চিনতে তাদের এতটুকুও অসুবিধে হয় না। তাদের রসুল পরিচিতির দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে এভাবে— 'কামা ইয়ারিফুনা আব্নাআহুম (যে রূপ চেনে তাদের সন্তানদেরকে)।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাজিনা খসিরু আনফুসাহুম ফাহুম লা ইউ'মিনুন' (যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা বিশ্বাস করবে না)। এ কথার অর্থ, তারা বিদ্বেষবশতঃ তওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত রসুল স, সম্পর্কিত বিবরণাদি গোপন করেছে। এভাবে প্রতারণা, আত্মম্ভরিতা, অবাধ্যতা, ও আত্মঅত্যাচারের মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। তাই তারা রসুল স. এর রেসালাতকে যে

www.eelm.weebly.com

বিশ্বাস করবে না— এ কথা নিশ্চিত। আল্লাহ্তায়ালা আদি অন্তের জ্ঞান সম্ভূত। তাই তিনি ভালো করেই জানেন যে, প্রতারক ইহুদীরা কখনোই ইমান আনবে না। সে কথাই শেষ বাক্যে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— তারা বিশ্বাস করবে না।

মক্কাবাসীরা বলেছিলো, হে মোহাম্মদ! তোমার নবুয়তের পক্ষে কি কোনো সাক্ষী আছে? আমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা বলেছে, তাদের কিতাবে তোমার সম্পর্কে কোনো আলোচনাই নেই। মক্কাবাসীদের এই অপমন্তব্যটির জবাব দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বলা হয়েছে— যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। অর্থাৎ ওই মিথ্যাবাদী ইহুদীরা মিথ্যা কথা বলে নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এভাবে তারা হয়েছে চিরবঞ্চিত। ইমান আনলে যে জান্নাত তাদের জন্য নির্ধারণ করা হতো, সেই জান্নাতকে তারা চিরকালের জন্য হারিয়েছে। চিরকালীন ঠিকানা হিসেবে তারা বেছে নিয়েছে জলন্ত হুতাশন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে ইবনে মাজা এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেকের জন্য দু'টি স্থান নির্ধারিত রয়েছে। একটি বেহেশ্তে। অপরটি দোজখে। সুতরাং যে মৃত্যুর পর দোজখে যায়, তার বেহেশতের উত্তরাধিকারী হয় বেহেশ্তীরা। তাই অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'উলাইকা হুমুল ওয়ারিসুন।' (তাহারাই সেগুলোর উত্তরাধিকারী)।

বাগবী বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক বিশ্বাসীদেরকে দান করবেন জাহান্নামীদের জান্নাত এবং জাহান্নামীদেরকে দান করবেন বিশ্বাসীদের জাহান্নাম। এটাই হচ্ছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চরম ব্যর্থতা।

আমি বলি, আলোচ্য বাক্যটি এভাবে বিবৃত করাই ছিলো সঙ্গত— যারা বিশ্বাস করবে না, তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করবে। কিন্তু এখানে কথাটি বলা হয়েছে বিপরীতভাবে—যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা বিশ্বাস করবে না। ক্ষতি ও ধ্বংসকে অধিকতর গুরুত্বদানের জন্য এখানে এ রকম বিপরীতধর্মী প্রকাশভঙ্গিকে বেছে নেয়া হয়েছে।

সূরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ২১

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

❒ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে অথবা তাঁহার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? জালিমগণ সফলকাম হয় না।

---

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতে অস্বীকৃতিসূচক জিজ্ঞাসার মাধ্যমে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে অথবা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে, তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কেউ নয়। তারা মনগড়া ধর্ম প্রবর্তন করেছে। অথচ আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে কোনো প্রত্যাদেশ করেননি। আবার যা প্রত্যাদেশ করেছেন, সে প্রত্যাদিষ্ট বিষয়কে তারা করেছে অস্বীকার। অর্থাৎ তাদের জন্য অবতীর্ণ কোরআনকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। অবতীর্ণ কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার নিরঙ্কুশ এককত্বের প্রমাণ। আরো রয়েছে তাঁর প্রিয় রসুলের রেসালাতের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। এতদ্সত্ত্বেও তারা এই অলৌকিক নিদর্শনকে করেছে প্রত্যাখ্যান। সুতরাং তাদের চেয়ে অধিক জালেম আর কে? এই বক্তব্যটিই এখানে অস্বীকৃতিসূচক জিজ্ঞাসার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে— 'ওয়ামান আজলামু মিম্মা নিফ্তারা আ'লাল্লাহি কাজিবান আও কাজ্জাবা বিআয়াতিহি' (যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে অথবা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে অধিক জালেম আর কে?)। কথাটির উদ্দেশ্য এ রকমও হতে পারে যে, ওই অবিশ্বাসীদের চেয়ে অধিক অবিবেচক আর কে হতে পারে—যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে। অথবা এ রকম কথা বলে যা আল্লাহ্তায়ালার জন্য অত্যন্ত অশোভন, অসুন্দর। এভাবে তারা বিভিন্নরূপে আল্লাহ্তায়ালার অংশী সাব্যস্ত করে। কেউ তাঁর বান্দা ও রসুলকে বলে আল্লাহ্র পুত্র। আবার কেউ আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশকারী মনে করে উপাসনা করে পাথরের। অথবা আল্লাহ্র নিদর্শনকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এখানে 'আও' (অথবা) না বলে 'ওয়াও' (এবং) উল্লেখ করলে বক্তব্যটি হতো অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা কেবল মক্কাবাসীরাই ছিলো এই আয়াতের লক্ষ্য বিন্দু। আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করা এবং তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করা — এ দু'টো অপরাধই তাদের মধ্যে ছিলো সমভাবে বিদ্যমান। কিন্তু এ দু'টো অপরাধকে 'এবং' (ওয়াও) দ্বারা সংযোজন করা হয়নি। 'এবং' এর স্থলে বসানো হয়েছে 'অথবা' (আও)। এ রকম বাকভঙ্গির মাধ্যমে এ কথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বর্ণিত অপরাধ দু'টোর যে কোনো একটিকে যে গ্রহণ করবে, সেই হবে অত্যাচারী। অথচ মক্কাবাসীরা দু'টো অপরাধেই অপরাধী। অবলীলাক্রমে তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলে। আর তাঁর নিদর্শনকেও প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং তারা যে প্রকৃতই অত্যাচারী— সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই।

এখানে 'আও' শব্দটি উল্লেখ করার আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলা এবং আল্লাহ্র নিদর্শনকে অস্বীকার করা— অপরাধ দু'টো পরস্পরবিরোধী। সুতরাং ও দু'টো একত্র হওয়া অনুচিত। কিন্তু কাফেরদের নির্বুদ্ধিতা তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, বিপরীতধর্মী দু'টো গুরুতর অপরাধকে একত্র করার ব্যাপারে তারা ছিলো নির্দ্বিধ। আল্লাহ্ সম্পর্কে তারা মিথ্যা রটনা করতো। বিনা প্রত্যাদেশে ও বিনা বিবেচনায় তারা বলে যেতো, আল্লাহ্

www.eelm.weebly.com

অমুক কাজকে হালাল করেছেন এবং অমুক কাজকে করেছেন হারাম। কখনও আবার বলতো, আল্লাহ্তায়ালার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি রয়েছে। আবার বলতো, আল্লাহ্পাক কিয়ামতের দিন আমাদের পূজনীয় প্রতিমাগুলোর সুপারিশ গ্রহণ করবেন। তারা এ কথাও জানে যে, ধর্মাদর্শ প্রচারিত হয় নবী রসুলের মাধ্যমে। আবার প্রেরিত রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে এবং তাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত মোজেজাসমূহকে তারা করে অস্বীকার। বলে, মানুষ আবার কখনো রসুল হয় নাকি। রসুল তো হওয়া উচিত ফেরেশতাদের। তাদের এহেন বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায়— মানুষ কখনো রসুল হতে পারে না। রসুল হওয়া সম্ভব— আবার মানুষ কখনো রসুল হতে পারে না, এ রকম অসংলগ্ন ও পরস্পরবিরোধী কথা তারা অবলীলাক্রমে বলে যায়। সুতরাং তাদের চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে?

শেষে বলা হয়েছে —'ইন্নাহু লা ইউফলিহুজ্ জলিমীন'। এ কথার অর্থ, অত্যাচারীরা সফলকাম হয় না।

সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অসংলগ্ন ও অশোভন আচরণ সম্পর্কে জনৈক কবি বলেছেন—ওই সম্প্রদায়ের জন্য আক্ষেপ, যারা বিনা প্রমাণে বিগ্রহবন্দনা করে অথচ প্রেরিত পুরুষদেরকে বলে, তোমরা প্রমাণ নিয়ে এসো।

সুরা আন্আ'মঃ আয়াত ২২, ২৩, ২৪

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ
كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا
مُشْرِكِينَ ۝ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

❒ স্মরণ কর, যেদিন তাহাদিগের সকলকে একত্র করিব, অতঃপর অংশীবাদীদিগকে বলিব 'যাহাদিগকে তোমরা আমার শরীক মনে করিতে তাহারা আজ কোথায়?'

❒ অতঃপর তাহাদিগের ইহা ভিন্ন বলিবার অন্য কোন অজুহাত থাকিবে না যে, 'আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহের শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।'

❒ দেখ, তাহারা নিজেরাই নিজদিগকে কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে-মিথ্যা তাহারা রটনা করিত উহা কিভাবে তাহাদিগের জন্য নিষ্ফল হইল।

'ওয়া ইয়াওমা নাহ্শুরুহুম জামিয়া'—অর্থ, যেদিন তাদের সকলকে একত্র করবো। অর্থাৎ যেদিন আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে এবং তাদের পূজিত প্রতিমাগুলোকে একত্র করবো। এখানে ইয়াওমা (যেদিন) শব্দটি মাফউলেফিহি। এর ক্রিয়া এখানে অনুক্ত রয়েছে। অনুক্ত ক্রিয়াটিসহ বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ

www.eelm.weebly.com

রকম—স্মরণ করো, যেদিন সকলকে একত্র করবো। নির্দিষ্ট কোনো ক্রিয়ার উল্লেখ এখানে না থাকার কারণ এ রকমও হতে পারে যে, কিয়ামতের দিবসে সকল গুরুতর পাপ ও ভয়ংকর বিপদসমূহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে সকলের। নির্দিষ্ট কোনো ক্রিয়ার উল্লেখ থাকলে সেদিনের সামগ্রিক ভয়াবহতা দৃষ্টিগোচর হবে না। দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে কেবল উল্লেখিত বিষয়টির দিকে। অথবা আল্লাহ্তায়ালার বক্তব্যটি হবে এখানে এ রকম— কিয়ামত দিবসে যখন আমি সকলকে একত্রিত করবো, তখন এমন ভয়ংকর দৃশ্যাবলী দৃষ্টিগোচর হবে, যা বর্ণনাযোগ্য নয়। সূর্য হবে সন্নিকটবর্তী। স্বেদসমুদ্রে নিমজ্জিত হবে মানুষ। আরো অনেক কিছু হবে— যা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেমন বিশুদ্ধ হাদিসে এ রকম অনেক কিছু বর্ণিত হয়েছে।

ছুম্মা নাকুলু লিল্লাজিনা আশরাকু। অর্থাৎ তখন (তিরস্কার করার জন্য) আমি মুশরিকদেরকে বলবো। এখানে 'নাকুলু' শব্দটির সম্পর্ক ঘটেছে 'নাহ্শুরু' শব্দটির সঙ্গে। ছুম্মা (অতঃপর) শব্দটি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, মানুষ হাশর প্রান্তরে হিসাব নিকাশের অপেক্ষায় দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান থাকবে। রসুল স. বলেছেন, ওই দিন তোমাদের কি অবস্থা হবে, যে দিন আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে দাঁড় করিয়ে রাখবেন— যেমন তীরাধারের মধ্যে রাখা হয় তীর। ওই সময় তোমাদের দিকে আল্লাহ্পাক ভ্রুক্ষেপ করবেন না। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ। বায়হাকী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে।

রসুল স. আরো বলেছেন, কিয়ামতের দিন ঘোর অন্ধকারের মধ্যে নির্বাক অবস্থায় তোমাদেরকে এক হাজার বছর ধরে আটকে রাখা হবে। তখন সকলে থাকবে বাকরুদ্ধ। বায়হাকী শরীফে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর থেকে।

এরপর বলা হয়েছে, 'আইনা শুরাকাউকুমুল্লাজিনা কুনতুম তাজ্‌উ'মুন' (যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে তারা আজ কোথায়?)। এ কথার অর্থ— যিনি প্রকৃত উপাস্য, তাঁর সঙ্গেই তোমরা শরীক করেছো। আর ওই শরীকগুলোকেই তোমরা আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের পক্ষে সুপারিশকারী স্থির করে নিয়েছো। হে অবাধ্য, হে পাপিষ্ঠ! বলো, আজ তোমাদের মিথ্যা উপাস্যগুলো কোথায়?

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষটিতে (২৩) বলা হয়েছে— 'ছুম্মা লামতাকুন ফিত্নাতুহুম ইল্লা আন ক্বালু ওয়াল্লহি রব্বিনা মাকুন্না মুশরিকীন' (অতঃপর তাদের এছাড়া বলবার অন্য কোনো অজুহাত থাকবে না যে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না)। এখানে 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটি উল্লেখ থাকার কারণে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতের দিন দীর্ঘ সময় ধরে দ্বিধাসংশয়ে থাকার পর অবিশ্বাসীরা এ রকম বলবে। এখানে ফিত্না শব্দটির অর্থ কুফর বা অবিশ্বাস, অথবা দ্বিধাসংশয়।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত কাতাদা ফিৎনা শব্দটির অর্থ করেছেন—অজুহাত। অর্থাৎ অজুহাতই তাদের জন্য ফিৎনা বা অশান্তি। ওই অজুহাতকেই তারা তখন পরিত্রাণের উপায় বলে ধারণা করবে। কিন্তু তাদের ধারণা হবে নিষ্ফল। যেমন 'ফিৎনা তুজ্ জাহাবী' একটি আরবী প্রবচন। এর অর্থ, আমি স্বর্ণ থেকে খাদকে পৃথক করে দিয়েছি। এ রকমও হতে পারে যে, ওই অজুহাতটি হবে তাদের জবাব। তাদের ওই জবাব যেহেতু মিথ্যা, তাই সেটাকে এখানে ফিৎনা বলা হয়েছে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফিৎনা অর্থ তাজারবাহ (অভিজ্ঞতা)। জুজায বলেছেন, শব্দটি এখানে সমবেদনাসুলভ অর্থ প্রকাশক। বিপদ উপস্থিত হলে কোনো কোনো প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের উপর অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়। বলে, তোমার জন্যই আজ আমার এই দুর্দশা। দেবদেবীর প্রতি প্রণয়াসক্ত অবিশ্বাসীরাও তেমনি কিয়ামতের ভয়ঙ্কর বিপদ দেখে তাদের পূজিত দেবদেবীর উপর রাগান্বিত হয়ে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত কথাগুলো বলবে।

আমি বলি, শুধু দেবদেবী নয়—সেদিন তারা তাদের নেতৃবৃন্দের উপরেও প্রকাশ করবে চরম ঘৃণা। তারপর নিরুপায় হয়ে বলবে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।

এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়লা ইয়াকতুমুনাল্লাহা হাদিসা' (আল্লাহ্ থেকে তারা কোনো কথা গোপন করবে না)। আর এখানে বলা হচ্ছে— 'ওয়াল্লহি রব্বিনা মাকুন্না মুশরিকিন' (আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না)। এই বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে বোখারী শরীফের বর্ণনা অনুসারে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিবসে অবিশ্বাসীরা দেখবে, আল্লাহ্‌পাক বিশ্বাসীদের অপরাধ ক্ষমা করে দিচ্ছেন। কিন্তু মুশরিকদেরকে ক্ষমা করছেন না। তখন তারা ক্ষমাপ্রাপ্তির আশায় তাদের মুশরিক হওয়াকে অস্বীকার করবে। বলবে, আমরা তো মুশরিক ছিলাম না। তখন আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে বাকরুদ্ধ করে দিবেন। তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য তখন দিতে থাকবে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি। মনে মনে তারা এই আক্ষেপ করতে থাকবে যে, হায়! আমরা যদি মাটি হতাম (মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারতাম)। এ রকম উপায়বিহীন অবস্থায় তারা আর কোনো কিছুই গোপন রাখতে পারবে না। হজরত ইবনে আব্বাস প্রদত্ত এই ব্যাখ্যাটির মূল কথা হচ্ছে, প্রাথমিক অবস্থায় তারা তাদের অংশীবাদীতাকে অস্বীকার করে বসবে। এরপর বাকরুদ্ধ হলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সাক্ষ্যের পর তারা আর কিছুই গোপন করতে পারবে না।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে—'উনজুর কাইফা কাজাবু আলা আংফুসিহিম ওয়া দ্বল্লা আনহুম মাকানু ইয়াফতারুন' (দেখো, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তারা রটনা করতো তা কিভাবে তাদের জন্য নিষ্ফল হলো)। এ কথার অর্থ, পৃথিবীতে অবিশ্বাসীরা নিজেরাই হারাম হালাল নির্ধারিত করে বলতো, এই নির্ধারণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়েছে। আরও

www.eelm.weebly.com

বলতো, আল্লাহ্পাকের দরবারে আমাদের পূজনীয় দেবদেবীরাই আমাদের পক্ষের সুপারিশকারী। কিয়ামতের দিন আবার তাদের স্বরচিত এই মিথ্যাচারকেই তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তখনকার অবস্থাই বিবৃত হয়েছে এভাবে— দেখো, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে কিরূপ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আরও দেখো, তাদের রচিত মিথ্যা আজ কিভাবে তাদের জন্য নিষ্ফল হলো।

কালাবী বর্ণনা করেছেন, একবার আবু সুফিয়ান বিন হারব, আবু জেহেল বিন হিশাম, ওলিদ বিন মুগীরা, নজর বিন হারেস, উতবা বিন রবিআ, শাইবা বিন রবিআ, উমাইয়া বিন খালফ্, উবাই বিন খল্ফ এবং হারেস বিন আমের একত্র হয়ে রসুল স. এর পবিত্র কোরআন পাঠ শুনতে লাগলো, তারা নজরকে বললো, আবু কুতায়লা! মোহাম্মদ কি বলছে? নজর বললো আমি জানি না। জিহ্বা সঞ্চালন করছে মাত্র। আর পুরনো জামানার লোকদের সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলছে, যে সকল কথা আমি তোমাদেরকে মাঝে মাঝে শুনিয়ে থাকি। উল্লেখ্য যে, নজর অতীত সম্প্রদায়ের কাহিনী মাঝে মাঝে বর্ণনা করতো। আবু সুফিয়ান বললো, মনে হয় সে কিছু কিছু সত্য কথাও বলছে। আবু জেহেল বললো, কখনোই নয়। এ রকম কথা তুমি বোলো না। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এ রকম বলার চেয়ে আমাদের জন্য মৃত্যুই শ্রেয়। তাদের এ রকম কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ২৫

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۗ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۗ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

❑ তাহাদিগের মধ্যে কতক তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে, কিন্তু আমি তাহাদিগের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে; তাহাদিগকে বধির করিয়াছি, এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিলেও তাহারা উহাতে বিশ্বাস করিবে না; এমন কি তাহারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারিগণ বলে 'ইহা তো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে।'

'ওয়ামিনহুম মাঁই ইয়াস্তামিউ' ইলাইকা' (তাদের মধ্যে কতক তোমার দিকে কান পেতে রাখে)। —এ কথার অর্থ, হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি যখন কোরআন আবৃত্তি করতে থাকেন, তখন তারা তা কান পেতে শোনে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে—'ওয়াজায়ালনা আ'লা কুলুবিহিম আকিন্নাতান আই ইয়াফকুহুহু' (কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেনো তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে)। এখানে 'আকিন্নাতুন' শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে 'কিনান'। আকিন্নাতুন অর্থ আবরণ, পর্দা বা অন্তরায়। এই শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে এখানে বলা হয়েছে, আমি ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তরে আবরণ সৃষ্টি করে দিয়েছি এজন্য যে, তারা যেনো কোরআনের মর্ম উপলব্ধি করতে না পারে।

এরপর বলা হয়েছে—'ওয়াফি আজানিহি ওয়াক্বরা' (তাদেরকে বধির করেছি)। তারপর উল্লেখ করা হয়েছে—ওয়া ইঁয়ারাও কুল্লা আয়াতিল্লা ইউ'মিনুবিহা (এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তারা ওতে বিশ্বাস করবে না)। এখানে আয়াত বা নিদর্শন অর্থ মোজেজাসমূহ। আল্লাহ্‌পাক তাদের চোখ ও অন্তরে অন্তরায় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ওই অন্তরায়ের কারণে তারা রসুল স. এর সঙ্গে শত্রুতা করে চলেছে। এভাবে ক্রমাগত শত্রুতার কারণে তাদের অবস্থা এমতোপর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা হয়ে পড়েছে বিবেচনাহীন ও বিবেকহীন। তারা আর সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলে বুঝতে পারে না। তাই বলা হয়েছে, তারা ওতে বিশ্বাস করবে না।

শেষে বলা হয়েছে—'হাত্তা ইজাজাউকা ইউজাদিলুনাকা ইয়াকুলুল্লাজিনা কাফারু ইন্‌হাজা ইল্লা আসাত্বিরুল আউওয়ালিন' (এমনকি তারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বলে, এটাতো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়)। এখানে হাত্তা শব্দটি সংযোজক অব্যয়। এর সংযোগ রয়েছে আগের বাক্যের লা ইউ'মিনুনা (তারা ওতে বিশ্বাস করবে না) কথাটির সঙ্গে। আর 'ইজা' শব্দটি ক্রিয়ার আধার, শর্তের অর্থপ্রকাশক। এই শর্তের প্রতিফলন ঘটেছে 'ইউজাদিলুনাকা' (আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়) এর ব্যাখ্যারূপে 'তখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বলে' কথাটিতে। এ রকমও বলা যেতে পারে যে 'জা-উ' (তারা যখন আসে) ক্রিয়ার কর্তা থেকে ইউজাদিলুনাকা (আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়)) হচ্ছে অবস্থা বা হাল যার শর্তপ্রকাশক প্রতিফলন ঘটেছে ইয়াকুলু (সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ বলে) কথাটিতে। এভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অবিশ্বাস ও সত্য প্রত্যাখ্যানের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে তারা। তাই তারা কোরআনকে বলছে সেকালের উপকথা। কারণ বিতর্ক করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। সত্যানুসন্ধান নয়।

এ রকম হওয়াও সম্ভব যে, 'হাত্তা' শব্দটি এখানে হরফে যর বা অব্যয় এবং ইজা অব্যয়টি এখানে লা ইউ'মিনুনা (ওতে বিশ্বাস করবে না) কথাটির সঙ্গে সম্পর্কিত। কেননা, প্রখ্যাত ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ সিবওয়াইহ্ এর নিকটে 'ইজা' শব্দটির শর্ত হওয়াই অধিকতর শুদ্ধ। এমতাবস্থায় ইউজাদিলুনাকা (আপনার সাথে

www.eelm.weebly.com

বিতর্কে লিপ্ত হয়) কথাটি হচ্ছে তাদের অবস্থা এবং ইয়াক্বুলু (বলে) হচ্ছে তার ব্যাখ্যা। অর্থাৎ তারা আপনার সঙ্গে বাদানুবাদ করে, আপনাকে অবিশ্বাসী বলে।

কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'সতর' অর্থ ছত্র বা সারি— যেমন, সারিবদ্ধ বৃক্ষ, ছন্দ বদ্ধ রচনা, সারিবদ্ধ গ্রন্থ ইত্যাদি। শব্দটির বহুবচন হচ্ছে সুতুর এবং আস্‌তার। এর বহুবচনের বহুবচন হচ্ছে আসাতীর। আসাতীরুল আহাদিস অর্থ বাজে কথা বা সৌন্দর্যহীন বচন। বায়যাবী বলেছেন, আসাতীর অর্থ আবাতীল (অনর্থক বা বাস্তব বিবর্জিত কথা)।

আমি বলি, আসাতীর এর প্রকৃত অর্থ মিথ্যা কথা বা বাজে কথা হওয়াই সমীচীন। অতীত কাহিনীগুলো অতিরঞ্জিত, বাহুল্যদুষ্ট। ওই সকল উপকথায় সঠিক তথ্য সন্নিবেশিত নেই। কাহিনী রচয়িতারা সেগুলোর যথাসংরক্ষণে যত্নবান ছিলো না। তাই সেগুলোতে ধারাবাহিকতারও বালাই নেই। কিন্তু শুধুমাত্র আসাতীর শব্দটিই বহুল ব্যবহারের কারণে মিথ্যা কথা, উপকথা এবং কল্প কথার অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ আসাতীর শব্দটির অর্থগত দিক দিয়ে আবাতীলের (মিথ্যার) সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

সুরা আন্‌আ'মঃ আয়াত ২৬

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

❒ তাহারা অন্যকে উহা শ্রবণে বিরত রাখে এবং নিজেরাও উহা হইতে দূরে থাকে, আর তাহারা নিজেরাই শুধু নিজদিগকে ধ্বংস করে, অথচ তাহারা উপলব্ধি করে না।

'ওয়াহুম ইয়ান হাওনা আ'নহু ওয়া ইয়ান আওনা আ'নহু' অর্থ— তারা অন্যকে উহা শ্রবণে বিরত রাখে এবং নিজেরাও উহা থেকে দূরে থাকে। মোহাম্মদ বিন হানাফিয়া এবং কাতাদাও উদ্ধৃত বাক্যটির অনুরূপ অনুবাদ করেছেন। তাঁরা আরো বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কার অবিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে। তারা রসুল স. এর আনুগত্য এবং পবিত্র কোরআনের অনুসরণ থেকে বিরত থাকতো এবং অন্য লোকদেরকেও বিরত থাকতে বলতো। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. এর পিতৃব্য আবু তালেবকে লক্ষ্য করে। তিনি রসুল স.কে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতেন। কিন্তু তিনি স. যে ধর্মাদর্শ ও মহাগ্রন্থ নিয়ে এসেছিলেন, তা মানতেন না। এভাবে

www.eelm.weebly.com

সত্য গ্রহণে বিরত থাকতেন তিনি। হাকেম ও অন্যান্য আলেমও এ রকম বলেছেন। এমতাবস্থায় এখানে উল্লেখিত 'তারা' সর্বনামটির লক্ষ্য আবু তালেব ও তার বন্ধুবর্গ।

সাঈদ বিন আবী হেলালের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. এর পিতৃব্যপুত্রদেরকে লক্ষ্য করে। তারা ছিলো দশজন। প্রকাশ্যতঃ তারা ছিলো রসুল স. এর ঘনিষ্ঠজন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিলো ঘোর বিরোধী। অন্যের আক্রমণ থেকে রসুল স.কে রক্ষা করতো। কিন্তু রসুল স. এর ধর্মাদর্শ তারা মানতো না।

বাগবী লিখেছেন, কয়েকজন নেতৃস্থানীয় অংশীবাদী আবু তালেব সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, মোহাম্মদকে আমাদের হাওয়ালা করে দিন। আর তার পরিবর্তে আমাদের নিকট থেকে কতিপয় সুদর্শন যুবককে গ্রহণ করুন। আবু তালেব বললেন, তোমাদের প্রস্তাব ন্যায়ানুগ নয়। এ কথা তোমরা কীভাবে বলো যে, আমি আমার সন্তানকে তোমাদের অধীন করে দিবো। তোমরা তাকে হত্যা করবে। আর তোমাদের সন্তানদেরকে আমি সযত্নে প্রতিপালন করবো!

এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাঁর প্রিয় পিতৃব্য আবু তালেবকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। আবু তালেব বললেন, যদি কুরায়েশ জনতার নিকট আমার লজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকতো, তবে আমি (ইসলাম গ্রহণ করে) তোমার আঁখিযুগলকে শীতল করে দিতাম। তবে জেনে রেখো, যতদিন আমি জীবিত থাকবো, ততদিন পর্যন্ত আমি তোমার শত্রুদেরকে আক্রমণ থেকে বিরত রাখবো।

রসুল স. এর আহবানের প্রেক্ষিতে একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন আবু তালেব, যার মর্মার্থ এ রকম— আমাকে সমাহিত করার পূর্ব পর্যন্ত তোমার শত্রুরা তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না। তুমি প্রকাশ্যে তোমার আহ্বানকর্ম চালিয়ে যাও। এ কাজে বাধা দেয়ার শক্তি কারো নেই। তুমি আপন কাজে প্রসন্নচিত্ত থাকো। জুড়িয়ে যাক তোমার নেত্রযুগল। তুমি আমাকে সঠিক আহ্বান জানিয়েছো। আমি জানি তুমি আমার কল্যাণাকাঙ্খী। তুমি সত্যবাদী, আমানতদার। তুমি যে ধর্মের দিকে আমাকে ডাক দিয়েছো, সে ধর্মটি সকল ধর্মের সেরা। কিন্তু আমার রয়েছে তিরস্কারের আশংকা। নিকটজনের নিকট থেকে তিরস্কৃত হওয়ার ভয় যদি আমার না থাকতো তবে তুমি দেখতে আমি কত সহজে ইসলামকে কবুল করেছি।

শেষে বলা হয়েছে— ওয়া ইঁইয়ুহ্ লিকুনা ইল্লা আনফুসাহুম ওয়ামা ইয়াশউ'রুন (আর তারা নিজেরাই শুধু নিজেদেরকে ধ্বংস করে, অথচ তারা উপলব্ধি করে না)। এ কথার অর্থ বিদ্বেষ ও শত্রুতা করে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করে চলেছে। এতে করে রসুল স. মোটেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না। অথচ এই ক্রমাগত ক্ষতি সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি মাত্র নেই।

www.eelm.weebly.com

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

❒ তুমি যদি দেখিতে পাইতে যখন তাহাদিগকে অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করান হইবে এবং তাহারা বলিবে 'হায়! যদি আমাদিগের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনকে মিথ্যা বলিতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।

❒ না, পূর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত তাহা এখন তাহাদিগের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইলেও যাহা করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল পুনরায় তাহারা তাহাই করিত এবং তাহারাই মিথ্যাবাদী।

আখেরাতে যখন অবিশ্বাসীদেরকে দোজখের আগুনের পাশে দাঁড় করানো হবে তখনকার অবস্থা বিবৃত হয়েছে এই আয়াতে। নরকাগ্নিকে প্রবেশ করানোর পূর্ব মুহূর্তে দোজখের পাশে দণ্ডায়মান কাফেরদের তখনকার অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। সে কথাটিই বলা হয়েছে এভাবে—ওয়ালাওতারা ইজাত্তকি্ফু আলান্নার (তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে আগুনের পাশে দাঁড় করানো হবে)। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে ওই দোজখীদের তখনকার চরম আক্ষেপপূর্ণ কথাটি। বলা হয়েছে— ফাক্বালু ইয়ালাইতানা নুরাদ্দু ওয়ালা নুকাজ্জিবা বিআইয়াতি রব্বিনা ওয়ানা কুনা মিনাল মু'মিনীন। (এবং তারা বলবে, হায়! যদি আমাদের পুনঃপ্রত্যাবর্তন ঘটতো, তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে মিথ্যা বলতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম)।

পরবর্তী আয়াতে (২৮) দোজখীদের চরম আক্ষেপপূর্ণ কথাটির প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে—বাল্‌বাদালাহুম মাকানু তুখ্‌ফুনা মিন ক্বাব্‌লু (না, পূর্বে তারা যা গোপন করতো তা এখন তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে)। এ কথাটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, দোজখের আগুন দেখার সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস চিরতরে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। নিশ্চিত নরকাগ্নি দর্শনে তারা সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হবে সেদিন। এখানে মিন ক্বাবলু কথাটির উদ্দেশ্য দুনিয়া এবং মাকানুইউখ্‌ফুন কথাটির উদ্দেশ্য রসুল স. এর ওই সকল বৈশিষ্ট্য— যা ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা

www.eelm.weebly.com

ভালোভাবে জানতো। এই জ্ঞানের কারণে তারা তাদের সন্তানদেরকে যে রকম চিনে সেরকম স্পষ্টভাবে চিনে রসুল স.কে। কিন্তু এই জ্ঞানকে তারা গোপন করতো। মিন্‌ক্বাবলু কথাটির উদ্দেশ্য এখানে হতে পারে আখেরাতের ওই সময়, যে সময়ে অবিশ্বাসীরা তাদের অবিশ্বাসকে গোপন করতে চেষ্টা করবে এবং বলবে— ওয়াল্লাহি রব্বিনা মাকুন্না মুশরিকিন।

নজর বিন শুমাইল বলেছেন, এখানে 'বাদালাহুম' কথাটির অর্থ হবে বাদাআনহুম— অর্থাৎ ওই সকল কথা যা তারা গোপন করতে চেষ্টা করতো। সেই গোপনতা সেদিন প্রকাশ হয়ে পড়বে। মুবাররাদ মাকানু ইউখ্‌ফুনা কথাটিকে উদ্দেশ্য বলেছেন এবং বাদালাহুম কথাটিকে বলেছেন বিধেয়।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়ালাও রুদ্দু লা আ'দু লিমানুহু আ'নহু ওয়াইন্নাহুম লাকাজিবুন (এবং তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো পুনরায় তারা তাই করতো এবং তারাই মিথ্যাবাদী)। এ কথার অর্থ— যারা অবিশ্বাসী হয়ে পৃথিবী পরিত্যাগ করেছে (মৃত্যুবরণ করেছে), তারা চির অবিশ্বাসী। পৃথিবীতে তাদেরকে পুনঃপ্রেরণ করা হলেও পূর্ব জীবনের মতো তারা আল্লাহ্‌পাকের অবাধ্য হবে। চিরভ্রষ্ট তারা। তাদের সত্তার সূচনায় রয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার 'আল্‌মুদিল্লু' (পথভ্রষ্টকারী) নামের প্রতিফলন। সুতরাং পৃথিবীতে পুনরায় প্রেরণ করলে 'আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'— কাফেরদের এ রকম কথা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ জানা ও মানা কখনও এক কথা নয়। যেমন, এখন ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা রসুল স. এর গুণাবলী সম্পর্কে ভালোভাবে জানে। তাঁকে চেনে এমনভাবে, যেমনভাবে তারা চেনে তাদের আপন সন্তানকে। তারা তাদের কিতাবে রসুল স. সম্পর্কিত বিবরণাদি পাঠ করেছে, শুনেছে, জেনেছে এবং এখন স্বচক্ষে তাঁকে দেখতে পাচ্ছে— অথচ ইমান গ্রহণ করছে না। অতএব এটা নিশ্চিত যে, নরকের ওই কিনার থেকে পুনরায় পৃথিবীতে নামালেও তারা ইমান আনবে না।

তিবরানী প্রণীত আওসাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি— কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌পাক হজরত আদমের নিকট তাঁর অবাধ্য বংশধরগণের দোজখে নিক্ষেপের তিনটি কারণ বর্ণনা করবেন। আল্লাহ্‌তায়ালা বলবেন, হে আদম! আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে রহমত থেকে দূরে রেখেছিলাম। কারণ আমি এ কথা বলে দিয়েছিলাম যে, মিথ্যাচার ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার প্রতি রয়েছে আমার চরম ঘৃণা। যদি আমি এ রকম না বলতাম, তবে আজ তোমার সকল সন্তান সন্ততির উপর আমি রহমত বর্ষণ করতাম। কাউকে দোজখে নিক্ষেপ করতাম না। কিন্তু আমার ওই নির্দেশ লঙ্ঘিত

www.eelm.weebly.com

হয়েছে। অতএব, যারা আমার প্রেরিত নবী রসুলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং আমার অবাধ্য হয়েছে, সে সকল মানুষ ও জ্বিন দ্বারা আমি আজ নরক পরিপূর্ণ করবো। হে আদম! আমি যাদেরকে বিশেষভাবে জানবো— তারা পৃথিবীতে বারবার গেলেও বারবার লঙ্ঘন করতে থাকবে আমার নির্দেশ, কেবল তাদেরকেই আমি চিরদিনের জন্য নিক্ষেপ করবো দোজখে। যারা এ রকম নয়, তাদের জন্য আজ কোনো শাস্তি নেই। হে আদম! আমি তোমাকে আমার ও তোমার সন্তানদের মধ্যস্থতাকারী নির্ধারণ করলাম। তোমার সন্তানদের পাপ পুণ্য আজ ওজন করা হবে। তুমি দেখতে থাকো—কার পুণ্যের পাল্লা ভারী আর কার ভারী পাপের পাল্লা। পাপাপেক্ষা পুণ্যের পাল্লা অনুপরিমাণ ভারী যার হবে, তাকেও আমি আজ জান্নাতে প্রবেশ করাবো। জেনে রেখো, আমি কেবল দোজখে প্রবেশ করাবো তাদেরকেই— যারা জালেম (অত্যাচারী)।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ২৯, ৩০

وَقَالُوْٓا اِنْ هِیَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝ وَلَوْ تَرٰٓی اِذْ وُقِفُوْا عَلٰی رَبِّهِمْ ۚ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوْا بَلٰی وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

❒ তাহারা বলে 'আমাদিগের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিতও হইব না।'

❒ তুমি যদি দেখিতে পাইতে তাহাদিগকে যখন তাহাদিগের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করান হইবে এবং তিনি বলিবেন ইহা কি প্রকৃত সত্য নহে?' তাহারা বলিবে 'আমাদিগের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই সত্য,' তিনি বলিবেন, 'তবে তোমরা যে সত্য প্রত্যাখ্যান করিতে তজ্জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ কর।'

'ওয়া ক্বালু ইন্‌হিয়্যা ইল্লা হায়াতুনাদ্ দুন্‌ইয়া' কথাটির অর্থ— তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আর 'ওয়ামা নাহ্‌নু বি মাব্‌উ'ছিন' অর্থ— এবং আমরা পুনরুত্থিতও হবো না। এখানে 'হিয়্যা' শব্দটি সর্বনাম— যা হায়াত (জীবন) শব্দটির সঙ্গে সম্পর্কিত। দুন্‌ইয়া শব্দটি আদ্‌না শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ। মূল শব্দটি হচ্ছে দানউন। শব্দটির শাব্দিক অর্থ ক্বুরব (নৈকট্য)। আর 'ক্বালু' (তারা বলে) শব্দটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের লাআ'দু (তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও) কথাটির সঙ্গে। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— পৃথিবীতে তাদেরকে

www.eelm.weebly.com

বাধ্যতামূলকভাবে প্রেরণ করা হলেও তারা আগের মতই নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত থাকবে এবং মিথ্যা বলবে। 'ক্বালু' শব্দটির সংযোগ আগের আয়াতের 'লাকাজিবুন' (তারাই মিথ্যাবাদী) কথাটির সঙ্গে হওয়াও সম্ভব। যদি তাই হয় তবে অর্থ দাঁড়াবে— অবিশ্বাসীদের বক্তব্যটি মিথ্যা এবং তারা এই মিথ্যা কথাটি বলেছিলো পৃথিবীতে। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, এখানকার 'ক্বালু' শব্দটির সংযোগ রয়েছে পূর্বের আয়াতের 'নুহু' (নিষেধ করা হয়েছে) কথাটির সঙ্গে। এ রকম হলে অর্থ দাঁড়াবে— পুনরায় তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠানো হলে তারা ওই কাজগুলোই করবে, যেগুলো নিষিদ্ধ। এ রকমও হতে পারে যে, আলোচ্য বাক্যটিতে নেতিবাচক পৃথক বাক্যে বক্তব্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে কাফেরেরা যে সকল অপবিত্র উক্তি করেছিলো, আল্লাহ্তায়ালা এখানে হুবহু সে কথাগুলোই উদ্ধৃত করেছেন। বলেছেন— তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন; এছাড়া অন্য কোনো জীবন নেই (আমরা পুনরুত্থিতও হবো না)। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষটিতে (৩০) এরশাদ হয়েছে— 'ওয়ালাও তারা ইজ্ উকিফু আ'লা রব্বিহিম (তুমি যদি দেখতে পেতে তাদেরকে যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে)। এ কথার অর্থ, হে আমার প্রিয় রসুল! যখন অবাধ্যদেরকে জবাবদিহির জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে দাঁড় করানো হবে, তখন ওই দৃশ্যটি আপনার নিকট হবে আশ্চর্যজনক। এখানে আল্লাহ্র দরবারে দাঁড় করানো হবে কথাটির অর্থ— তখন তাদেরকে অপদস্থ করার জন্য প্রস্তুত করা হবে। 'আলা রব্বিহিম' কথাটির অর্থ এখানে— তাদের বিষয়টি ফয়সালার জন্য তাদেরকে অভিযুক্ত হিসেবে আল্লাহ্র সমীপে উপনীত করা হবে। এ রকমও হতে পারে যে ওই সময় অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্কে প্রকৃত প্রভু হিসেবে চিনতে পারবে।

ক্বলা আলাইসা হাজা বিল হাক্ব (তিনি বলবেন, এটা কি প্রকৃত সত্য নয়?)। এ কথার অর্থ, আল্লাহ্তায়ালা অথবা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে নরকের প্রহরীরা তখন বলবে, এটা কি প্রকৃত সত্য নয়? আলোচ্য বাক্যটি যেনো একটি অনুক্ত প্রশ্নের বিপরীতে আরেকটি উত্তরসুলভ প্রশ্ন। ওই গোপন প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্পাক এখানে এরশাদ করছেন— তিনি বলবেন, এটা কি প্রকৃত সত্য নয়? অর্থাৎ এই সমাধি থেকে পুনরুত্থান, পাপপুণ্যের হিসাব, আমলনামা, শাস্তির আয়োজন— এগুলো কি প্রকৃত সত্য নয়? এই প্রশ্নটি তাদেরকে করা হবে, তাদেরকে জ্ঞানদান কিংবা উত্তম কোনো উদ্দেশ্যে নয়। তাদেরকে লজ্জিত ও অপদস্থ করাই হবে এ রকম প্রশ্নবান নিক্ষেপের উদ্দেশ্য।

উপরে উদ্ধৃত আল্লাহ্পাকের অমোঘ প্রশ্নটির জবাবে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তখন বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই সত্য ('ক্বালু বালা ওয়া রব্বিনা')। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেদিন বাধ্য হয়ে এ রকম সত্য সাক্ষ্য দান

www.eelm.weebly.com

করবে। কারণ বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ সেদিন তাদের নিকট হয়ে পড়বে প্রত্যক্ষ। স্বচক্ষে সত্য দর্শনকে তারা সেদিন অস্বীকার করার উপায় খুঁজে পাবে না। শিরিক ও কুফরীর সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত রূপে তারা সেদিন নিজেদেরকে প্রকাশ করতে চাইবে। আর তাদের স্বীকারোক্তিকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্য আল্লাহ্র নামে শপথ করবে তারা। বলবে— আমাদের প্রতিপালকের শপথ নিশ্চয়ই সত্য। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্পাকের সঙ্গে কাফেরদের এই কথোপকথন হবে কিয়ামত দিবসে একটি বিশেষ স্থানে। এ রকম আরো অনেক স্থানে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হবে তারা। সে সকল স্থানে কখনো সত্য বলে, আবার কখনো মিথ্যা বলে পরিত্রাণ পেতে চাইবে কাফেরেরা।

শেষে এরশাদ হয়েছে— 'ক্বলা ফাজুক্বুল আজাবা বিমা কুনতুম তাক্ফুরুন' (তিনি বলবেন, তবে তোমরা যে সত্য প্রত্যাখ্যান করতে সে জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ করো)। এখানে 'বিমা' শব্দটির শুরুতে যে 'বা' অক্ষরটি রয়েছে, সেই অক্ষরটি কোনো না কোনো কারণ নির্দেশক। অথবা এর দ্বারা এক বিষয়ের পরিবর্তে অন্য কোনো বিষয়কে নির্দেশ করা হয়েছে।

সূরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ৩১, ৩২

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا
يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ
مَا يَزِرُونَ ○ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ
لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

❒ যাহারা আল্লাহের সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এমন কি অকস্মাৎ তাহাদিগের নিকট যখন কিয়ামত উপস্থিত হইবে তখন তাহারা বলিবে 'হায়! ইহাকে আমরা যে অবহেলা করিয়াছি তজ্জন্য আক্ষেপ।' তাহারা তাহাদিগের পৃষ্ঠে নিজদিগের পাপ বহন করিবে, দেখ তাহারা যাহা বহন করিবে তাহা অতি নিকৃষ্ট।

❒ পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বই আর কিছুই নয় এবং যাহারা সাবধানতা অবলম্বন করে তাহাদিগের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি অনুধাবন কর না?

'ক্বদ্ খসিরাল্লাজিনা কাজ্জাবু বিলিক্বাইল্লা' কথাটির অর্থ— যারা আল্লাহ্র সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখানে 'লিক্বা ইল্লা' মর্ম পুনরুত্থান। এই পুনরুত্থানের মাধ্যমেই আল্লাহ্র সম্মুখীন হতে হবে।

www.eelm.weebly.com

বাক্যটির মর্মার্থ এই যে, অবিশ্বাসীরা কিয়ামত, পুনরুত্থান, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিশ্বাস করে না। তাই তারা ক্ষতিগ্রস্ত, অকৃতকার্য। আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে অস্বীকার করার কারণে তাই তাদেরকে চিরশান্তিময় জান্নাত থেকে বঞ্চিত করা হবে। তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে চরম যন্ত্রণাদায়ক চিরকালীন শাস্তি।

মোতাজিলারাও আল্লাহ্তায়ালার দীদার (আল্লাহ্ দর্শন), মাগফিরাত (ক্ষমা) এবং শাফায়াত (সুপারিশ) কে অস্বীকার করে। তাই তারাও দীদার, মাগফিরাত এবং শাফায়াত থেকে হবে চিরবঞ্চিত। সুতরাং তারাও ক্ষতিগ্রস্তদের দলভূত। হাদিসে কুদসীর বর্ণনায় রয়েছে আমি আমার বান্দার ধারণার অনুকূল। বোখারী, মুসলিম।

বিশুদ্ধসূত্রে ওয়াছেলাহ্র মাধ্যমে তিবরানী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— ইব্রাহিম সায়েগ বলেছেন, দীদারে ইলাহীর পরিবর্তে যদি আমাকে অর্ধেক জান্নাতের অধিকার দেয়া হয়, তবু তা আমার মনঃপুত হবে না। এ কথা বলার পর তিনি পাঠ করলেন—'কাল্লা ইন্নাহুম আঁর্ রব্বিহিম ইয়াওমাইজন লামাহ্জুবুনা ছুম্মা ইন্নাহুম লাসালুল জাহিমু ছুম্মা ইউক্বালু হাজাল্লাজি কুনতুম বিহি তুকাজ্জিবুন' (কখনই নয়, আজ তারা অবশ্যই তাদের প্রতিপালকের অন্তরালভূত। অতঃপর তারা অবশ্যই নরকে প্রবিষ্ট হবে। অনন্তর বলা হবে, এটা হচ্ছে তোমাদের মিথ্যা মগ্নতার প্রতিফল)। এরপর তিনি বললেন, এখানে 'হাজা' শব্দটিতে রয়েছে দীদারের ইঙ্গিত। হাজা অর্থাৎ 'বির্ রুইয়াত'— এখানে 'বিহি' শব্দটির মাধ্যমেও আল্লাহ্দর্শনকে নির্দেশ করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'হাত্তা ইজা জায়াত্ হুমুস্ সায়াত।' এ কথার অর্থ, এমন কি অকস্মাৎ তাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হবে। বায়যাবী বলেছেন, এখানে 'হাত্তা' শব্দটির সম্পর্ক রয়েছে 'কাজ্জাবু' (মিথ্যা বলেছে) কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ যে সকল লোক জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মিথ্যা বলেছে, তারাই হবে হতাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত। খসিরু শব্দটির সঙ্গে হাত্তা শব্দটির কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা অবিশ্বাসীদের হতাশা অন্তহীন। এছাড়া এখানে এ রকম সন্দেহও সৃষ্টি হতে পারে যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যাচারিতারও তো অবসান ঘটে। যদি তাই হয়, তবে তা কিয়ামত পর্যন্ত উপনীত হবে কেনো? (আর সাআত শব্দটির উদ্দেশ্য এখানে কিয়ামত)। উত্থাপিত সন্দেহের নিরসনের নিমিত্তে আমি বলি, সাআত্ শব্দটির উদ্দেশ্য এখানে— মৃত্যুলগ্ন। কেননা মৃত্যুই মুমূর্ষু ব্যক্তির কিয়ামত। যে মৃত্যুবরণ করলো, তার কিয়ামত শুরু হয়ে গেলো। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন, একবার কয়েকজন গ্রাম্য অশিক্ষিত লোক রসুল স. এর নিকটে এসে কিয়ামতের বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে শুরু করলো। রসুল স. তাদের দলের সবচেয়ে কম বয়সী লোকটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এই কিশোরটি যদি পরিণত আয়ুসম্পন্ন হয়, তবে এর বার্ধক্য আসার পূর্বেই

www.eelm.weebly.com

তোমাদের কিয়ামত এসে যাবে। সুতরাং সাআত শব্দটির অর্থ যদি কিয়ামত ধরা হয়, তবে তা দূষণীয় হবে না। কেননা মৃত্যুই হচ্ছে কিয়ামতের প্রারম্ভিকা, পদধ্বনি বা যাত্রারম্ভ। মৃত্যুর আগমন অর্থই কিয়ামতের আগমন। মৃত্যুকে কিয়ামত বলার আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, মৃত্যুর পর কিয়ামতের আগমন হবে দ্রুততর। তাই মৃত্যুলগ্নকেই কিয়ামত বলা হয়েছে।

'আস্সাআত্' অর্থ 'মৃত্যু' হলে 'হাত্তা' শব্দটির সংযোগ 'খসিরু' শব্দটির সঙ্গেও হতে পারে। কেননা খুস্রান অর্থ আসল পুঁজি বিনষ্ট হওয়া। মৃত্যুলগ্নে অবিশ্বাসীদের আসল জীবন শেষ হয়ে যায়। শুরু হয় অনন্ত জীবনের অনিশ্চিত যাত্রা।

বাগ্তাতান্ অর্থ অকস্মাৎ। শব্দটি অবস্থা প্রকাশক। অথবা সাধারণ কর্ম। কেননা অকস্মাৎ আগমন— আগমনেরই একটি প্রকাশ।

'ক্বালু ইয়া হাস্রাতানা আ'লা মা ফার্রাত্বনা ফিহা' অর্থ— তখন তারা বলবে, 'হায়! একে আমরা যে অবহেলা করেছি সে জন্যে আক্ষেপ।' এখানে 'ফিহা' শব্দটির 'হা' সর্বনামটি পার্থিব জীবনের দিকে প্রত্যাবর্তিত। আর অবহেলা করার অর্থ পুণ্যকর্মে অবহেলা করা। তাদেরকে তখন এ কথা জানানো হয়েছিলো যে, কিয়ামত সুনিশ্চিত। সেই সত্যজ্ঞানের কথা স্মরণ করে তারা কিয়ামতের দিবসে বলবে, আমরা তো এ কথা শুনেছি অথচ হায়! এই কিয়ামতকে আমরা তখন অবহেলা করেছি। কিয়ামতের উপর আমরা তখন ইমান আনিনি।

'ওয়াহুম ইয়াহ্মিলুনা আওযারাহুম আ'লা জুহুরিহিম আলা সাআ মা ইয়াজিরুন' কথাটির অর্থ— তারা তাদের পৃষ্ঠদেশে তাদের নিজেদের পাপ বহন করবে, দেখো, তারা যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট।

উমরা বিন কায়েস মালায়ীর বর্ণনাসূত্রে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, বিশ্বাসী বান্দা কবরে পুনর্জীবিত হওয়ার পর তার সম্মুখে উপস্থিত হবে তার পুণ্যকর্মের একটি সুন্দর, পবিত্র ও সুবাসিত আকৃতি। আকৃতিটি বলবে, আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? বিশ্বাসী ব্যক্তিটি বলবে, না। তবে তুমি অতিসুন্দর, সুবাসিত এবং পবিত্র। আকৃতিটি বলবে, আমি পৃথিবীতেও এ রকম ছিলাম। আমি আপনার পুণ্যকর্ম। দীর্ঘদিন ধরে আমি আপনার উপর আরোহণ করেছিলাম। আজ আপনি আমার উপর আরোহণ করুন। এরপর বর্ণনাকারী পাঠ করলেন— 'ইয়াওমা নাহ্শুরুল মুত্তাক্বিনা ইলার্রহমানি ওয়াফ্দা' (সেদিন মুত্তাকীগণকে রহমানের (আল্লাহ্র) নিকটে দূত হিসেবে উপস্থিত করবেন)। অবিশ্বাসীদের পাপসমূহও তখন তাদের সম্মুখে হাজির হবে অত্যন্ত কুৎসিত আকারে। কুৎসিত আকারটি তাকে বলবে, তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছো? অবিশ্বাসীরা বলবে, না। তবে তুমি অত্যন্ত কুৎসিতদর্শন ও দুর্গন্ধময়। আকারটি বলবে, আমি পৃথিবীতেও এ রকম ছিলাম। আমি তোমার অসৎকর্ম। পৃথিবীতে দীর্ঘদিন ধরে তুমি আমার

www.eelm.weebly.com

উপরে আরোহী ছিলে। আজ তোমার উপরে আরোহী হবো আমি। এরপর বর্ণনাকারী পাঠ করলেন— ওয়াহুম ইয়াহ্মিলুনা আওযারাহুম আ'লা জুহুরিহিম (তারা তাদের পৃষ্ঠদেশে নিজেদের পাপ বহন করবে)।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. ভাষণদানের জন্য দণ্ডায়মান হলেন। বললেন, গনিমতের সম্পদ অপহরণ করা একটি মারাত্মক অপরাধ। এরপর তিনি স. যারা চতুষ্পদ জন্তু, সোনা, রূপা ইত্যাদির জাকাত দেয় না, তাদেরকে ভয় প্রদর্শনের নিমিত্তে বললেন, সাবধান! কিয়ামতের দিন আমি যেনো তোমাদেরকে চিৎকাররত উট ঘাড়ে নিয়ে আমার সামনে আসতে না দেখি। এমতাবস্থায় যেনো বলতে না শুনি, ইয়া রসুলাল্লহ! আমাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা করুন। তখন এ রকম করে কেউ বললে আমি বলবো, এখন আল্লাহ্তায়ালার সম্মুখে আমার করণীয় কিছু নেই। আমি তো পৃথিবীতে তোমাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলাম। হাদিসটি দীর্ঘ। এর মধ্যে ক্ষুধার্ত ঘোড়া এবং ছাগলের সামনে খাদ্য আনা হলে ওই ঘোড়া ও ছাগলের কি অবস্থা হবে, সোনা, রূপার জাকাত না দিলে কি অবস্থা হবে— ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে। বোখারী, মুসলিম। আবু ইয়ালী এবং বায্যার এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিব্রানীর মারফু বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো গৃহ বা সম্পদ অধিকার করে, কিয়ামতের দিন ওই অতিরিক্ত ঘর বা সম্পদ ঘাড়ে নিতে তাকে বাধ্য হতে হবে।

জননী আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিমের মারফু বর্ণনায় এসেছে, যে লোক কণিষ্ঠাঙ্গুলী পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে দখলে রাখবে, কিয়ামতের দিন তাকে পরিয়ে দেয়া হবে পৃথিবীর সাতটি স্তরের মালা। এ বিষয়ে হজরত হাকাম বিন হারেস এবং হজরত আনাস থেকে তিবরানী কর্তৃক আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আবার তিবরানী ও আহমদ কর্তৃক হজরত ইয়ালী বিন মুর্রাহ্ এবং হজরত আবু মালেক আশ্য়ারী থেকেও এ রকম বর্ণনা এসেছে।

এরপর পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে — 'ওয়ামাল হায়াতুত্ দুন্ইয়া ইল্লা লাইবুঁ ওয়া লাহ্উন' (পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বই আর কিছুই নয়)। এখানে লাইবুঁ শব্দটির অর্থ উপকারবিহীন এবং উদ্দেশ্যহীন কর্ম। আর লাহ্উন শব্দটির অর্থ ওই অনর্থক কাজ যা উপকারপ্রদায়ক কাজের অন্তরায়। বাক্যটির মর্মার্থ এ রকম—আল্লাহ্পাকের সন্তোষলাভের উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল পার্থিব সুখ শান্তির জন্য যে কর্ম করা হয় তা ক্রীড়া-কৌতুকতুল্য। কারণ এই পার্থিবতা অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং পৃথিবীর মোহ অনন্ত জীবনের সাফল্যের অন্তরায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়লাদ্দারুল আখিরাতু খইরুল্লিল্লাজিনা ইয়াত্তাকুন' (এবং যারা সাবধানতা অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়)।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'যারা সাবধানতা অবলম্বন করে' কথাটির অর্থ— যারা শিরিক ও পাপ থেকে মুক্ত থাকে। দারুল আখিরাত অর্থ পরকালের আবাস। পরকালের আবাস অবশ্যই শ্রেয়। এই চির নিরাপদ আবাসের নাম জান্নাত। সেখানকার উপকার ও আস্বাদ পার্থিব উপকার ও আস্বাদ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয়। ওই চিরস্থায়ী কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে কেবল মুত্তাকীদের (সাবধানীদের) জন্য। পক্ষান্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট পৃথিবীই সর্বোত্তম স্থান। তাই তারা পৃথিবীর মোহে আমস্তক নিমজ্জিত। এদের কার্যকলাপ মুত্তাকীগণের কার্যকলাপের বিপরীত। তাই তাদের কার্যকলাপকে ক্রীড়া-কৌতুকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আরও একটি বিষয় এখানে প্রমাণিত হয়েছে যে, যাদের আমল মুত্তাকীগণের আমলের অনুরূপ নয়— তাদের কার্যকলাপ ক্রীড়া ও কৌতুকের মতো।

শেষে বলা হয়েছে— 'আফালা তা'ক্বিলুন' (তোমরা কি অনুধাবন করো না?)। এ কথার অর্থ— তোমরা কি এতটুকুও বুঝোনা যে, দুনিয়ার কার্যকলাপ উত্তম না আখিরাতের। কেনো তোমরা এ কথাটি বুঝতে পারো না যে, পৃথিবী বিনাশশীল, আর আখিরাত চিরস্থায়ী। কেনো অনুধাবন করতে পারো না— যে সকল কথা ও কাজ চিরস্থায়ী কল্যাণের প্রতিবন্ধক, সেগুলো অতি অবশ্যই পরিত্যাজ্য?

হজরত আলী থেকে তিরমিজি এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন, একবার অবিশ্বাসী আবু জেহেল রসুল স.কে বললো, তোমার কথাকে আমি মিথ্যা বলি না। মিথ্যা বলি ওই কথাগুলোকে (কোরআনের আয়াতকে), যেগুলো তুমি আবৃত্তি করে থাকো। তার এমতো ধৃষ্টতাপূর্ণ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৩৩, ৩৪

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّٰلِمِينَ بِآيَٰتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ○ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِي الْمُرْسَلِينَ ○

❑ অবশ্য জানি যে, তাহারা যাহা বলে তাহা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়; কিন্তু তাহারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমালংঘনকারীগণ আল্লাহের আয়াতকেই অস্বীকার করে।

❑ তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিল কিন্তু তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল

www.eelm.weebly.com

যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাহাদিগের নিকট আসিয়াছে। আল্লাহের আদেশ কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না, প্রেরিত পুরুষদিগের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট আসিয়াছে।

'ক্বদ না'লামু ইন্নাহু লা ইয়াহ্‌জুনুকাল্লাজী ইয়াক্কুলুনা ফাইন্নাহুম লা ইউকাজ্জিবুনাকা ওয়ালাকিন্নাজ্‌ জলিমীনা বিআয়াতিল্লাহি ইয়াজহাদুন' (অবশ্য জানি যে, তারা যা বলে তা তোমাকে নিশ্চয়ই কষ্ট দেয়; কিন্তু তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমালংঘনকারীগণ আল্লাহ্‌র আয়াতকেই অস্বীকার করে)। এখানে ক্বদ (অবশ্য) শব্দটি ক্রিয়াকে অধিকতর শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এ রকম বলেছেন প্রখ্যাত তাফসীরবিদ ইমাম বায়যাবী। যেমন— ওয়ালা কিন্নাহু ক্বদ ইয়ামলিকুল মালা নাইলুহু (প্রাপক অবশ্যই তার প্রাপ্য সম্পদ পেয়ে থাকে)। এখানে 'ইন্নাহু' শব্দটিতে ব্যবহৃত 'হু' সর্বনামটি একটি অভিজাত সর্বনাম। এ রকম সর্বনাম মহামর্যাদামণ্ডিত ব্যক্তিত্বের পূর্বোল্লেখ ব্যতিরেকেই সরাসরি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, একবার আখনাশ বিন শারীক আবু জেহেল বিন হিশামকে একান্তে পেয়ে বললো, হে আবুল হাকাম! এখানে তো কেবল তুমি আর আমি। এবার তবে বলো, মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্‌ সত্যানুসারী, না মিথ্যাচারী? আবু জেহেল বললো, আল্লাহ্‌র শপথ। মোহাম্মদ নিঃসন্দেহে সত্যাশ্রয়ী। কিন্তু কুসাইয়ের সন্তানদের কাছে রয়েছে নেতৃত্বের পতাকা, হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব, কাবা গৃহের অভিভাবকত্ব ও পঞ্চায়েত। এর সঙ্গে নবুয়তের সম্মানও যদি যুক্ত হয় তবে কুরায়েশদের জন্য আর রইলো কি (নবুয়তের বিরোধিতা করি আমি এ কারণেই)। আবু জেহেলের এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— কিন্তু তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমালংঘনকারীগণ আল্লাহ্‌র আয়াতকেই অস্বীকার করে।

হজরত নাহিয়াহ্‌ বিন কা'ব বর্ণনা করেছেন, আবু জেহেল রসুল স.কে বলেছিলো, আমি তোমাকে সন্দেহ করি না, মিথ্যাবাদীও বলি না। কিন্তু যে কথা তুমি প্রকাশ করছো সেটাকে আমি মিথ্যা বলি।

'জলিমীন' অর্থ সীমালংঘনকারীগণ। বলা বাহুল্য যে, রসুল স.কে অস্বীকার করার জন্যই আবু জেহেলকে ও তার অনুসারীদেরকে বলা হয়েছে সীমালংঘনকারী। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, অনাচার ও অবাধ্যতা ছিলো তাদের অভ্যাস। তাই তারা রসুল স.কে অস্বীকার করেছিলো। ওই অস্বীকৃতির মধ্যে ছিলো মিথ্যাচারীতাও। তারা রসুল স.কে মিথ্যাবাদী না বললেও তাঁর নবুয়তকে মিথ্যা মনে করে। আর নবুয়তকে মিথ্যা বলার অর্থ যিনি নবুয়ত দান করেছেন তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে, ওয়া লাক্বদ কুজ্জিবাত রসুলুম মিন ক্ববলিক (তোমার পূর্বেও অনেক রসুলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিলো)। এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলকে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। এই মর্মে প্রচ্ছন্ন নির্দেশনা দিয়েছেন যে, হে আমার প্রিয় রসুল! অবিশ্বাসীদের অস্বীকৃতি কোনো নতুন বিষয় নয়, পূর্বের নবী রসুলগণকেও তাঁদের সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসীরা প্রত্যাখ্যান করেছিলো। সুতরাং আপনি মনঃক্ষুণ্ণ ও নিরুৎসাহিত হবেন না।

ওয়ালাক্বদ কুজ্জিবাত কথাটির দ্বারা 'তারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না' এ রকম বলা হয়নি। বরং কথাটির মাধ্যমে এটাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, রসুলকে মিথ্যাবাদী বলা অর্থ আল্লাহ্কে মিথ্যাবাদী বলা, কেননা রসুল নির্বাচন করেন স্বয়ং আল্লাহ্। রসুল স. নিজেও বলেছেন, যে আমাকে কষ্ট দিলো, সে (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ্কে কষ্ট দিলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফাসাবারু আ'লা মা কুজ্জিবু ওয়া উজু হাত্তা আতাহুম নাস্‌রুনা' (কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলো, যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের নিকট এসেছে)। এ কথার অর্থ, পূর্ববর্তী নবীগণকে অবিশ্বাসীরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সত্ত্বেও তাঁরা যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন, আপনিও তদ্রূপ ধৈর্যধারণ করুন। ধৈর্যধারণের পরিণামে আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় ও বিধানানুসারে তাঁদের নিকট যেমন সাহায্য এসেছিলো, তেমনি আপনার নিকটেও আল্লাহ্র সাহায্য আসবে।

এর পরের কথাটি হচ্ছে— 'ওয়ালা মুবাদ্দিলা লি কালিমাতিল্লাহ্' (আল্লাহ্র আদেশ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না)। এখানে 'কালিমাতিল্লাহ্' কথাটির অর্থ নবীগণকে প্রদত্ত আল্লাহ্পাকের সাহায্যের অঙ্গীকার। অন্য আয়াতেও এ রকম বলা হয়েছে। যেমন ১. ওয়ালা ক্বদ সাবাক্বত কালিমাতুনা লি ইবাদিনাল মুরসালিনা ইন্নাহুম লাহুমুল মানসুরুন (আমার দাস রসুলদের প্রতি পূর্বাহ্নে অঙ্গীকার করা হয়েছে যে আমি তাদের সাহায্য করবো)। ২. ইন্না লানানসুরু রসুলানা (আমিই রসুলদেরকে সাহায্য করে থাকি)। ৩. ওয়া ইন্না জুনাদানা লাহুমুল গলিবুন (আমার সৈন্যরাই বিজয়ী)।

কালিমাতুল্লাহ্ কথাটির অর্থ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও হতে পারে। যদি তাই হয় তবে বাক্যটির অর্থ হবে এ রকম— অযথা বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার মধ্যে কিংবা চাঞ্চল্য প্রকাশ করার মধ্যে কোনো উপকার নেই। ধৈর্য ধারণই শোভনীয়। সময় মতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে আল্লাহ্পাকের সাহায্য অবশ্যই অবতীর্ণ হবে। আর আল্লাহ্পাকের সেই বিধান কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়া লাক্বদ জাআকা মিন্নাবাইল মুরসালিন' (প্রেরিত পুরুষদের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট এসেছে)। প্রখ্যাত ব্যাকরণজ্ঞ আখফাশ বলেছেন, এখানে 'মিন' শব্দটি মিন-এ জায়েদাহ্ (অতিরিক্ত মিন)। আবার বিশিষ্ট ব্যাকরণজ্ঞ সিবওয়াইহ্ এর মতে ইতিবাচক বাক্যে অতিরিক্ত 'মিন' এর ব্যবহার বৈধ নয়। তাই তিনি বলেছেন, এখানে ব্যবহৃত 'মিন' শব্দটি মিন-এ তাবয়িজিয়াহ্ (বিশেষ অংশকে সনাক্তকারী মিন)। এভাবে বাক্যটির অর্থ হবে এ রকম— পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কোনো কোনো সংবাদ আপনার নিকটে পৌঁছেছে, যা আপনার সান্ত্বনার জন্য যথেষ্ট।

রসুল স. তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অত্যন্ত লালায়িত ছিলেন। অথচ মূঢ় ও অবিমৃশ্য জনতা বার বার সত্য প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে তাঁকে দুঃখ দিয়েই চলেছিলো। তারা প্রায়শই মোজেজা (অলৌকিক নিদর্শন) দেখতে চাইতো। রসুল স.ও আন্তরিকভাবে চাইতেন— কাংখিত মোজেজা প্রকাশিত হোক, যাতে করে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ইমান আনার ক্ষেত্রে আর কোনো অজুহাত সৃষ্টি করতে না পারে। এমতাবস্থায় অবতীর্ণ হলো—

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৩৫

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ○

❒ যদি তাহাদিগের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয় তবে পারিলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ কর এবং তাহাদিগের নিকট কোন নিদর্শন আন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদিগের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্র করিতেন। সুতরাং তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

'ওয়া ইন কানা কাবুরা আ'লাইকা ই'রাদুহুম ফা ইনিস তাতা'তা আন ইয়াবতাগিয়া নাফাক্বান ফিল আরদ্বি আওসুল্লামান ফিস্‌সামায়ি ফা তা'তিইয়াহুম বিআয়াতিন' (যদি তাদের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয় তবে পারলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ করো এবং তাদের নিকট কোনো নিদর্শন অন্বেষণ করো)। এখানে তাদের উপেক্ষা (ই'রাদ্ব) অর্থ অবিশ্বাসীদের নবুয়ত ও কোরআনের প্রতি উপেক্ষা। নাফাক্বান অর্থ সুড়ঙ্গ। শব্দটি এখানে ফিল আরদ্ব

www.eelm.weebly.com

(ভূমি) এর বিশেষণ। অর্থাৎ বক্তব্য বিষয় হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি যদি ভূগর্ভে কোনো প্রবেশপথ সৃষ্টি করতে পারেন এবং ওই পথে প্রবেশ করে সেখান থেকে অবিশ্বাসীদের প্রস্তাবানুসারে কোনো মোজেজা আনতে সক্ষম হন। 'সুল্লামান ফিস্সামায়ি' শব্দটির অর্থ আকাশের ছাদে আরোহণের সিঁড়ি। অর্থাৎ হে রসুল! আপনি যদি আকাশারোহণযোগ্য কোনো সিঁড়ি নির্মাণ করতে পারেন এবং সেই সিঁড়ি বেয়ে আকাশে উঠে সেখান থেকে কোনো মোজেজা নিয়ে আসতে পারেন। এভাবে পূর্ণ বাক্যটির মর্মার্থ হবে— হে আমার প্রিয় রসুল, আপনিতো আপনার পক্ষ থেকে কোনো মোজেজা প্রকাশ করতে পারবেন না। ভূগর্ভে নামলেও না, আকাশে উঠলেও না। সুতরাং কেনো আপনি অবিশ্বাসীদের জন্য এতো চিন্তাযুক্ত? তাদের উপেক্ষাকে সহ্য করুন। ধৈর্য ধারণ করুন।

এরপর বলা হয়েছে, ওয়ালাও শাআল্লাহু লা জামায়াহুম আ'লাল হুদা (আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্র করতেন)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক সকল কিছুর স্রষ্টা। বান্দার ইচ্ছাও আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীন। কিন্তু এই অবিশ্বাসীদেরকে (যারা আপনাকে ও কোরআনকে উপেক্ষা করে) আল্লাহ্পাক পথপ্রদর্শন করতে চান না। আর পথ প্রদর্শন কেবল আল্লাহ্ই করতে পারেন। আপনি হেদায়েতদানের মালিক নন— মাধ্যম মাত্র। অতএব আপনি বিচলিত হবেন না। ধৈর্য ধারণ করুন।

শেষে বলা হয়েছে, ফালা তা কুনান্না মিনাল জাহিলিন (সুতরাং তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না)। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল, যারা মূর্খ, তারাই আপাতঃঅসাফল্যে বিচলিত হয়। আপনি তো রসুল। সুতরাং আপনি চঞ্চলতাকে প্রশ্রয় দিবেন কেনো। এ রকমও অর্থ হতে পারে— হেদায়েত যে সম্পূর্ণতই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়নির্ভর, এ কথা যারা জানে না, আপনি তাদের মতো অজ্ঞ হবেন কেনো। আপনি তো আমার রসুল।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

❒ যাহারা শ্রবণ করে শুধু তাহারাই ডাকে সাড়া দেয় আর মৃতকে আল্লাহ্ পুনর্জীবিত করিবেন; অতঃপর তাঁহার দিকেই তাহারা প্রত্যানীত হইবে।

www.eelm.weebly.com

❒ তাহারা বলে, 'তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' বল, 'নিদর্শন অবতারণ করিতে আল্লাহ্ সক্ষম, কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই জানে না।'

'ইন্নামা ইয়াস্তাজিবুল্লাজিনা ইয়াসমাউ'ন' (যারা শ্রবণ করে শুধু তারাই ডাকে সাড়া দেয়)। কথাটির অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনার আহ্বান তো ওই সকল লোকই শুনবে (গ্রহণ করবে), যাদেরকে আল্লাহ্পাক প্রকৃত শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়েছেন। এখানে শ্রবণ করার অর্থ শোনা ও উপলব্ধি করা। শোনার পরেই আসে উপলব্ধি ও মান্যতা। তাই বলা হয়েছে যারা শ্রবণ করে, তারাই ডাকে সাড়া দেয়।

'ওয়াল মাউতা ইয়াব্য়াছুহুমুল্লহু ছুম্মা ইলাইহি তুরজাউন' (আর মৃতকে আল্লাহ্ পুনর্জীবিত করবেন; অতঃপর তাঁর দিকেই তারা প্রত্যানীত হবে)। এ কথার অর্থ— অবিশ্বাসীরা শুনবে কীভাবে? তাদের অন্তর তো মৃত। আল্লাহ্পাক তাদের কান, চোখ ও মন আচ্ছাদিত করেছেন। তাই সত্যের আহবান, সত্যদর্শন এবং সত্য উপলব্ধি তাদের ভাগ্যে ঘটে না। তারা বুঝতে পারে না, কোনটা সত্য— কোনটা মিথ্যা। তাই তারা মৃততুল্য। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক তাদেরকে পুনর্জীবিত করবেন। কেবল তখনই তারা হবে সত্যের মুখোমুখি। কিন্তু তখন তো ভুল শোধরানোর সময় নয়। প্রতিফল লাভের সময়। তাই তখন তাদেরকে দেয়া হবে চরমতম শাস্তি। আলোচ্য বাক্যটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে— বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলকে আল্লাহ্তায়ালা কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত করবেন। তাঁর দিকেই সকলের অবশেষ প্রত্যাগমন। সেখানে বিশ্বাসীরা হবে পুরস্কৃত এবং অবিশ্বাসীরা লাঞ্ছিত।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া ক্বালু লাওলা নুয্যিলা আ'লাইহি আয়াতুম মির রব্বিহি' (তারা বলে, তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেনো?)। এ কথার অর্থ— অবিশ্বাসী কুরায়েশ নেতারা বলে, আল্লাহ্র নিকট থেকে মোহাম্মদের উপর কোনো মোজেজা অবতীর্ণ হয় না কেনো? উল্লেখ্য যে, অনেক অলৌকিক নিদর্শন রসুল স. এর মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছিলো। কিন্তু চিরঅবিশ্বাসীরা চাচ্ছিলো, তাদের ইচ্ছামতো আরো অধিক নিদর্শন। তাই বলেছিলো, তার নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেনো?

এরপর বলা হয়েছে— কুল ইন্নাল্লহা ক্বাদিরুন আলা আইঁইউনায্যিলা আয়াতান (বলো, 'নিদর্শন অবতারণ করতে আল্লাহ্ সক্ষম')। এখানে 'নিদর্শন অবতারণ করতে আল্লাহ্ সক্ষম' কথাটির অর্থ— অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়, এমন মোজেজা আল্লাহ্পাক অবশ্যই অবতীর্ণ করতে সক্ষম। যেমন বনী ইসরাইলের মাথার উপর তুলে ধরা হয়েছিলো তুর পর্বত। পর্বতের নিচে পিষ্ট হওয়ার ভয়ে অবাধ্য বনী ইসরাইলেরা তখন বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলো। অথবা ওইরূপ নিদর্শন, যা অস্বীকার করলে ধ্বংস অপরিহার্য।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়ালাকিন্না আকছারুহুম লা ইয়া'লামুন' (কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক কাংখিত অনাকাংখিত, সকল মোজেজা অবতারণ করতে পূর্ণ সক্ষম। মোজেজার মাধ্যমে তিনি তো কাফেরদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতেও সক্ষম। কিন্তু নির্বোধেরা এ কথা জানে না।

সূরা আন্আ'ম : আয়াত ৩৮, ৩৯

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِي الظُّلُمٰتِ ۗ مَنْ يَّشَإِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ۗ وَمَنْ يَّشَأْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

❒ ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নাই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়ে না যাহা তোমাদিগের মত এক একটি উম্মত নয়। কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিতে ত্রুটি করি নাই; অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাহারা সকলে একত্র হইবে।

❒ যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে তাহারা বধির ও মূক, অন্ধকারে রহিয়াছে; যাহাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ বিপথগামী করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি সরল পথে স্থাপন করেন!

'ওয়ামা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদ্বি ওয়ালা ত্বাইরিয়াত্বিরু বি জানাহাইহি ইল্লা উমামুন আমছালুকুম' (ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোনো পাখি ওড়ে না যা তোমাদের মতো এক একটি উম্মত নয়)। এ কথার অর্থ— ভূ-পৃষ্ঠের সকল বিচরণশীল প্রাণী ও ডানার সাহায্যে উড়ন্ত সকল পাখি তোমাদের মতোই সৃষ্ট এবং যুথবদ্ধ। মানুষের চলমানতাকে অধিক গতিশীল অর্থ প্রদানের নিমিত্তে কখনো কখনো ওই চলাকে বলা হয় উড়ে চলা। কিন্তু এখানে ডানাবিশিষ্ট উড়ন্ত পাখির কথাই বলা হয়েছে। তাই শব্দ ব্যবহার ঘটেছে এ রকম— ইয়াতিরু ফি জানাহাইহি। আলোচ্য বাক্যটির বক্তব্যবিষয়টি এ রকম— হে মানুষ! অন্য সকল সৃষ্টিও তোমাদের মতো। জন্ম মৃত্যু—সুস্থতা অসুস্থতা —আহার বিহার—বংশবিস্তার, সকল দিক দিয়ে তারা তোমাদের মতো। আল্লাহ্পাকের পরিচিতি লাভের যোগ্যতা কেবল দেয়া হয়েছে তোমাদেরকে। তাই

www.eelm.weebly.com

তোমরা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষার সকল নিয়ম কানুনে তোমরাও অন্যান্য সৃষ্টির সমান্তরাল। মা ফার্‌রাতনা ফিল কিতাবি মিনশাইয়িন (কিতাবে কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি)। এখানে 'মিন শাইয়িন' বাক্যাংশটির 'মিন' শব্দটি অতিরিক্ত এবং 'শাইয়িন' শব্দটি এখানে মাফউলে মুতলাক (সাধারণ কর্ম পদ) — মাফউলে বিহি (সহ কর্মপদ) নয়। কারণ 'ফার্‌রাতা' শব্দটির পরে 'বা' অক্ষর ব্যতীত মাফউলে বিহি হয় না।

এখানে 'আল কিতাব' অর্থ লাওহে মাহফুজ। আল্লাহ্‌পাক আদি অন্তের প্রকাশ্য ও গোপন সকল কিছুই জানেন। তাই সকল কিছুর বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন লাওহে মাহফুজে। সুতরাং জড় অজড় সকল সৃষ্টির বিবরণ রয়েছে সেখানে। 'আল কিতাব' অর্থ এখানে কোরআন মজীদও হতে পারে। যদি তাই হয় তবে 'মিন শাইয়িন' (সকল কিছু) কথাটির অর্থ হবে ধর্মীয় বিধানাবলী। আর তখন বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— আমি কিতাবে (কোরআন মজীদে) সকল প্রকার ধর্মীয় বিধান বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্তরূপে লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি।

'ছুম্মা ইলা রব্বিহিম ইউহ্‌শারুন' (অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তারা সকলে একত্র হবে)। এখানে 'হুম' (তাদের) সর্বনামটির সংযোগ রয়েছে 'একত্র হবে' কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ আগের বাক্যে উল্লেখিত ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল প্রাণী, ডানা বিশিষ্ট উড়ন্ত পাখি— সকলকে সেদিন কিয়ামতের দিন একত্র করা হবে। অবশ্য হজরত ইবনে আব্বাস এবং জুহাক বলেছেন, মৃত্যুই অন্যান্য সৃষ্টির হাশর (কিয়ামতের দিন তারা পুনরুত্থিত হবে না)। কিন্তু ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর এবং বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, কিয়ামতের দিন সকল প্রাণী, পাখি ও কীটপতঙ্গকে পুনরুত্থিত করে সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে। এমন কি সেদিন অত্যাচারিত শিংবিহীন ছাগলকেও শিংবিশিষ্ট ছাগলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে। তারপর তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে—তোমরা মাটি হয়ে যাও। তখন অবিশ্বাসীরা আক্ষেপ করে বলতে থাকবে হায়! আমরা যদি এখন মাটি হয়ে যেতাম (তবে চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতাম)।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তাদের প্রাপ্য অধিকার দিয়ে দেয়া হবে। এমন কি যে নিরীহ ছাগল শিংবিশিষ্ট ছাগলের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিলো, সেও সেদিন বদলা নিতে পারবে।

তিবরানী তার আওসাত পুস্তকে লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে সর্বপ্রথম উত্থাপিত হবে একটি শিং বিশিষ্ট ছাগল এবং একটি শিংবিহীন ছাগলের মোকদ্দমা। হজরত আবু জর গিফারী থেকেও এ রকম আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন আহমদ, বায্‌যার এবং তিবরানী। হজরত ইবনে ওমর থেকে হাকেমও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে, ওয়াল্লাজিনা কাজ্জাবু বি আয়াতিনা সুম্মুন ওয়া বুকমুন ফি জুলমাত (যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে তারা বধির ও মূক, অন্ধকারে রয়েছে)। এ কথার অর্থ— যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তারা শ্রবণেন্দ্রিয় থাকা সত্ত্বেও বধির (সত্যের আওয়াজ তারা শুনতে পায় না) এবং মুখ থাকা সত্ত্বেও বাকহীন (সত্য-সাক্ষ্য তাদের মুখে উচ্চারিত হয় না)। তারা রয়েছে অন্ধকারে। সে অন্ধকার অবিশ্বাসের, মূর্খতার, অবাধ্যতার এবং পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের।

হেদায়েত সম্পূর্ণতই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়নির্ভর। তিনি চির স্বাধীন, চির মুক্ত। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। আয়াতের শেষাংশে এ কথাটিই বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— 'মাঁইয়্যাশাইল্লাহু ইউদ্বলিল্হু ওয়া মাঁইয়্যাশা' ইয়াজ্‌য়াল্হু আ'লা সিরাতিম্ মুসতাক্বিম' (যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি সরল পথে স্থাপন করেন)।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৪০, ৪১

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ○

❐ বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখ যে, আল্লাহের শাস্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হইলে অথবা তোমাদিগের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হইলে তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও?'

❐ 'না, শুধু তাঁহাকেই ডাকিবে? ইচ্ছা করিলে তিনি তোমাদিগের দুঃখ দূর করিবেন এবং যাহাকে তোমরা তাঁহার শরীক করিতে তাহা তোমরা বিস্মৃত হইবে।

'কুল আরাআইতাকুম'— এ কথার অর্থ, হে আমার রসুল আপনি বলুন। তোমরা ভেবে দেখো— কথাটির মধ্যে রয়েছে বিস্ময়াবিষ্ট প্রশ্নবোধক হামযা (হামযায়ে ইস্তেফহাম)। এখানে 'কাফ' অক্ষরটি সম্বোধনসূচক। এর দ্বারা রআইতা (ভেবে দেখো) কথাটির কর্তাকে নির্দেশ করা হয়েছে। আরবী অভিধানানুযায়ী 'কাফ' অক্ষরটি সম্পর্কে কিছু বলা নেই। অর্থাৎ অক্ষরটি কর্তাও নয় কর্মও নয়। এখানে বরং 'রআইতা' শব্দটির দু'টি কর্মই অনুক্ত। আয়াতের বাকভঙ্গিতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে।

www.eelm.weebly.com

ফাররা বলেছেন, আরববাসীরা 'আরাআইতুকা' (তুমি কি দেখেছো) কথাটির অর্থ করে— আমাদেরকে বলো। তাফতাজানী বলেছেন, 'আরাআইতা' শব্দটির মাধ্যমে জ্ঞানের দেখা, না চোখের দেখা বুঝানো হয়— সেটাই প্রথমে নিশ্চিত করতে হবে। এখানে কিন্তু শব্দটির দ্বারা 'অনুসন্ধান করে দেখো'— এ রকম বুঝানো হয়েছে। কেননা চোখের দেখা জ্ঞানার্জনের উপলক্ষ এবং জ্ঞান সংবাদ দানের উৎস বা কারণ। এখানে কারণকে কারণ বিষয়কের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

'ইন আতাকুম আজাবুল্লহি আওআতাত্ কুমুস্সায়াতু আগইরল্লাহি তাদ্উ'ন ইনকুন্তুম সদিক্বীন' (আল্লাহ্র শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?)। এ কথার অর্থ— হে মূর্খ অবিশ্বাসীরা! বিগত যুগের অবিশ্বাসীদের উপর যেভাবে আযাব নেমে এসেছিলো, সেভাবে যদি এখন তোমাদের উপর আযাব আপতিত হয়, কিংবা এই মুহূর্তে যদি ভয়াবহ কিয়ামত সংঘটিত হয়, তবে কি তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আশ্রয়ার্থী হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কি তোমরা তোমাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোকে পরিত্রাণদাতা বা পরিত্রাণদাত্রী হিসেবে আহবান জানাবে? এই প্রশ্নটির অস্বীকৃতি জ্ঞাপক প্রশ্ন পরবর্তী আয়াতে (৪১) প্রতিধ্বনিত হয়েছে এভাবে—

'বাল ইয়্যাহু তাদ্উ'ন' (না, শুধু তাকেই ডাকবে?)। এরপর বলা হয়েছে— 'ফা ইয়াকশিফু মা তাদ্উ'না ইলাইহি ইন্শায়া' (ইচ্ছে করলেই তিনি তোমাদের দুঃখ দূর করবেন)। এ কথার অর্থ, দুনিয়ায় যে বিপদ থেকে তোমরা পরিত্রাণ প্রার্থী, সেই বিপদকে তিনি ইচ্ছে করলে দূর করে দিতে পারেন। আবার ইচ্ছে করলে পরকালের আযাব দূর করবেন না। সকল বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী তিনি।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়া তানসাওনা মা তুশ্রিকুন' (এবং যাকে তোমরা তাঁর শরীক করতে, তা তোমরা বিস্মৃত হবে)। এ কথার অর্থ বিপদগ্রস্ত হলে তোমরা তোমাদের প্রতিমাগুলোকে ভুলে যাবে। এখানে ভুলে যাবে অর্থ ত্যাগ করবে। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্পাক সকল বিপদের একমাত্র পরিত্রাতা— এ কথা জন্মগতভাবে সকল মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল। তাই চরম মুসিবতের সময় অংশীবাদীরাও এক আল্লাহ্র শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়।

www.eelm.weebly.com

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ○ فَلَوْلَاۤ اِذْ جَاۤءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ○ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

❑ তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করিয়াছি; অতঃপর তাহাদিগকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ দারিদ্র্য দ্বারা পীড়িত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা বিনীত হয়।

❑ আমার শাস্তি যখন তাহাদিগের উপর আপতিত হইল তখন তাহারা কেন বিনীত হইল না? অধিকন্তু তাহাদিগের হৃদয় কঠিন হইয়াছিল এবং তাহারা যাহা করিতেছিল শয়তান তাহা তাহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল।

❑ তাহাদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারা যখন তাহা বিস্মৃত হইল তখন তাহাদিগের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম; অবশেষে, তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইল যখন তাহারা তাহাতে মত্ত হইল তখন অকস্মাৎ তাহাদিগকে ধরিলাম; ফলে, তখনি তাহারা নিরাশ হইল।

❑ অতঃপর সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হইল এবং প্রশংসা আল্লাহেরই যিনি বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— 'ওয়া লাক্বদ আরসালনা ইলা উমামিম্ মিন ক্বলিকা ফা আখাজনাহুম বিল্ বা'সায়ি ওয়াদ্বদ্‌দাররায়ি লায়াল্লাহুম ইয়াতাদ্বার্‌রাউন' (তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রসুল প্রেরণ করেছি; অতঃপর তাদেরকে অর্থ সংকট ও দুঃখ-দারিদ্র্য দ্বারা পীড়িত করেছি, যাতে তারা বিনীত হয়)। এখানে 'মিন ক্বলিকা' কথাটির 'মিন' শব্দটি অতিরিক্ত (মিন এ জায়েদা)। 'বা'সায়ি' শব্দটির অর্থ সংকট (বিত্তসংকট)। দ্বররায়ি অর্থ দুঃখ-দারিদ্র্য। আর 'তাদ্বার্‌রাউন' অর্থ পীড়ন। আয়াতটির বক্তব্য বিষয় হচ্ছে— হে আমার রসুল! শুনুন, ওই সকল জাতির কথা— যাদের নিকট আমি রসুল প্রেরণ করেছিলাম, তারা ছিলো উন্নাসিক। তাই আমি তাদেরকে অর্থসংকটে এবং দুঃখদারিদ্রে নিপতিত করেছিলাম এই উদ্দেশ্যে যে, তারা যেনো বিনয়াবনত হয়।

www.eelm.weebly.com

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফালাওলা ইজ্ জাআহুম বা'সুনা তাদ্বার্‌রাউ' (আমার শাস্তি যখন তাদের উপর আপতিত হলো তখন তারা কেনো বিনীত হলো না?)। এ কথার অর্থ আমার শাস্তি তাদের উপর পতিত হওয়া সত্ত্বেও ওই উন্নাসিকেরা বিনয়াবনত হলো না কেনো? তওবা করলো না কেনো? এখানে না বোধক শব্দ 'লা' ব্যবহারের কারণে এই অর্থটিই প্রকাশ পেয়েছে যে, বিনয়নম্র হওয়ার কারণ সামনে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অবাধ্যরা সংযত হলো না কেনো? কেনো সাড়া দিলো না সত্যের আহ্বানে? এমতো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে— 'ওয়ালাকিন ক্বাসাত ক্বুলুবুহুম' (অধিকন্তু তাদের হৃদয় হয়ে গিয়েছিলো কঠিন)।

এরপর বলা হয়েছে ওয়া জাইয়্যানা লাহুমুয্‌শাইতানু মা কানু ইয়া'মালুন (এবং তারা যা করছিলো শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিলো)। এ কথার উদ্দেশ্য— দুঃখ বিপদে পতিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের বোধোদয় হয়নি। শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো বলে তারা তাদের আচরণকেই উত্তম মনে করছিলো। এটাই হচ্ছে তাদের তওবা না করার কারণ। অর্থাৎ তাদের কঠিন অন্তর এবং শয়তানের প্রতারণা ও প্রভাবেই তারা তওবার পথে অগ্রসর হতে পারেনি।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফালাম্মা নাসু মা জুক্কিরু বিহি' (তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিলো তারা যখন তা বিস্মৃত হলো)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকে তাদেরকে যে বিধান দেয়া হয়েছিলো, সেই বিধানসমূহ যখন তারা মানলো না, তখন তাদের উপর নেমে এলো অর্থ সংকট ও দুঃখ বিপদ। তবুও তারা সজাগ হলো না।

এরপর বলা হয়েছে ফাতাহ্‌না আ'লাইহিম আব্‌ওয়াবা কুল্লি শাইয়িন (তখন তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মোচন করে দিলাম)। এ কথার অর্থ—বিপদগ্রস্ত হওয়ার পর তওবা করলো না বলে অন্যভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা শুরু করলাম। উন্মোচন করে দিলাম সকল নেয়ামতের দরজা। এটা হচ্ছে তাদের প্রতি প্রদত্ত সাময়িক অবকাশ।

হজরত উকবা বিন আমেরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যখন কেউ পাপকর্মের উপর অনড় অবস্থান গ্রহণ করে, তখন তাকে পৃথিবীতে দেয়া হয় তার পছন্দনীয় বস্তুসমূহ। এর অর্থ, তাকে দেয়া হয়েছে কিছুদিনের অবকাশ। এরপর রসুল স. পাঠ করলেন— 'ফালাম্মা নাসু মা জুক্কিরু বিহি ফাতাহ্‌না আলাইহিম আব্‌ওয়াবা কুল্লি শাইয়িন।'

এরপর বলা হয়েছে— 'হাত্তা ইজা ফারিহু বিমা উতু আখাজ্‌না হুম বাগ্‌তাতান ফা ইজাহুম মুব্‌লিসুন' (অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হলো, যখন তারা তাতে মত্ত

www.eelm.weebly.com

হলো, তখন অকস্মাৎ তাদেরকে ধরলাম; ফলে, তখনই তারা নিরাশ হলো)। এ কথার অর্থ— সাময়িক সুযোগরূপে অজস্র নেয়ামত পেয়ে ওই ভোগোম্মত্ত জনতা যখন উল্লসিত, তখন হঠাৎ এক সময় আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখনই তাদের উপর নেমে এলো নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকার।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের শেষটিতে বলা হয়েছে, 'ফাক্কুতিয়া' দাবিরুল ক্বওমিল্লাজিনা জলামু' (অতঃপর সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হলো)। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'দাবির' অর্থ মূল অংশ বা শিকড়। এই শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে— ওই অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সকলকেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। তাদের বংশধারাও হয়েছিলো সমূলে উৎপাটিত। এখানে 'তাদের মূলোচ্ছেদ করা হলো'— এ রকম না বলে বলা হয়েছে 'সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হলো'। এতে করে বুঝা যায় যে, তাদের মূলোচ্ছেদের মূল কারণ হচ্ছে সীমালংঘন বা জুলুম। তারা ছিলো আত্মঅত্যাচারী। ওই আত্মনিপীড়নই হয়েছিলো তাদের মূলোচ্ছেদের কারণ। আল্লাহ্‌পাক তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি। যথাবিনিময় দিয়েছেন মাত্র।

শেষে বলা হয়েছে 'ওয়ালহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন' (এবং প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক)। এ কথার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা একটি প্রশংসনীয় কাজ। কারণ, এতে করে বিশ্বাসী ও সৎ মানুষেরা সীমালংঘনকারীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পান। তাদের ভ্রান্ত ধারণা এবং অশান্তি উদ্রেককারী কর্ম থেকে পৃথিবী পবিত্র হয়। নিরবচ্ছিন্ন পাপাচরণ আল্লাহ্‌তায়ালার শাস্তিকে অবধারিত করে। তাই ওই পাপিষ্ঠদেরকে ধ্বংস করে শান্তিকামী পৃথিবীবাসীকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে পরিত্রাণ দেয়া হয়। এখানে আল্লাহ্ অভিহিত হয়েছেন 'বিশ্বজগতের প্রতিপালক' রূপে। এতে করে বুঝা যায়, অত্যাচারীদেরকে ধ্বংস করা বিশ্বজগত প্রতিপালনের একটি অত্যাবশ্যক দায়িত্ব। সংক্রামক ব্যাধির সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেতে হলে ব্যাধির মূলোৎপাটন যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনি বিশ্বমানবতাকে রক্ষা করতে হলে অত্যাচারীর মূলোৎপাটনও অনিবার্য। আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে এ দায়িত্বটি সম্পর্কেও সচেতন করা হয়েছে যে, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা অত্যাবশ্যক। কারণ তিনিই অত্যাচারীকে ধ্বংস করে দিয়ে নিশ্চিত করেন মানবতার স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা।

পরবর্তী আয়াতে, বিবরণ দেয়া হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিমত্তার এবং অতুলনীয় এককত্বের। বলা হয়েছে—

www.eelm.weebly.com

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَٰرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ
غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ۝ قُلْ
أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۝

❒ বল, 'তোমরা আমাকে বল, আল্লাহ্ যদি তোমাদিগের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কাড়িয়া লন এবং তোমাদিগের হৃদয় মোহর করিয়া দেন তবে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ আছে যে তোমাদিগকে এইগুলি ফিরাইয়া দিবে?' দেখ, কিরূপে আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি; এতদ্‌সত্ত্বেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়।

❒ বল, 'তোমরা আমাকে বল, আল্লাহের শাস্তি অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যে তোমাদিগের উপর আপতিত হইলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় ব্যতীত আর কে ধ্বংস হইবে?'

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— কুল আরায়াইতুম ইন আখজাল্লহু সাময়াকুম ওয়া আব্‌ছরাকুম ওয়াখতামা আ'লা কুলু বি কুম মান ইলাহুন গইরুল্লহি ইয়াতিকুম বিহি। কথাটির অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি বলুন, হে মুশরিকের দল! তোমরা আমাকে বলো— আল্লাহ্‌পাক যদি তোমাদের শ্রুতি ও দৃষ্টি কেড়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর করে দেন, তবে আল্লাহ্ ছাড়া কোন্ উপাস্য রয়েছে, যে তোমাদেরকে এগুলো ফিরিয়ে দিবে? এই প্রশ্নটি এখানে ইসতেফ্‌হামে তাকরীরী (স্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন)। এ রকম প্রশ্নের মাধ্যমে এখানে এ কথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, হে অংশীবাদী সম্প্রদায়, তোমরা তো এ কথা ভালো করেই জানো যে— শ্রুতি, দৃষ্টি এবং বোধসম্পন্ন হৃদয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ দিতে সক্ষম নয়। এখানে হৃদয় মোহর করার অর্থ হৃদয়ের সংবেদনশীলতা ও বোধকে অকেজো করে দেয়া।

এরপর বলা হয়েছে— 'উনজুর কাইফা নুসর্‌রিফুল্ আয়াতি ছুম্মাহুম ইয়াস্‌দিফুন' (দেখো, কিরূপে আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি; এতদ্‌সত্ত্বেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়)। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি দেখুন, আমি প্রকাশ্য প্রমাণ পঞ্জিসমূহ বিভিন্ন পন্থায় প্রকাশ করি। এরপরেও তারা বিমুখ হয়।

কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'আয়াত' শব্দের অর্থ দলিল প্রমাণকে বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করা। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'আয়াত' শব্দটির উদ্দেশ্য— আমি আমার অবিভাজ্য এককত্বের প্রমাণাদি কেমন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। বায়যাবী নুসররিফুল আয়াতি কথাটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে— আমি বারংবার প্রমাণসমূহ প্রকাশ করেছি। কখনো প্রকাশ করেছি জ্ঞানগত প্রমাণ। কখনো

www.eelm.weebly.com

দিয়েছি অনুপ্রেরণা। কখনো প্রদর্শন করেছি ভয়। আবার কখনো বিগত সম্প্রদায়সমূহের কাহিনী বর্ণনা করে করেছি সতর্ক। দিয়েছি উপদেশ।

এখানে ছুম্মাহুম (এতদ্‌সত্ত্বেও তারা) —কথাটির 'ছুম্মা' (এতদ্‌সত্ত্বেও) শব্দটি সময়ের ব্যবধান বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়নি। ব্যবধান বুঝানো হয়েছে প্রকাশ্য প্রমাণসমূহ এবং অংশীবাদীদের সত্য বিমুখতার মধ্যে। অর্থাৎ এদিকে প্রকাশ্য প্রমাণসমূহ বিদ্যমান—এতদ্‌সত্ত্বেও অংশীবাদীরা সত্য থেকে দূরে সরে যায় (মুখ ফিরিয়ে নেয়)।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে— কুল আরায়াইতাকুম ইন আতা কুম আজাবুল্লাহি বাগতাতান আও জাহ্‌রাতান হাল ইউহ্‌লাকু ইল্লাল কওমুজ্‌ জলিমুন। এ কথার অর্থ— হে রসুল! আপনি বলুন, হে অংশীবাদীরা! তোমরা আমাকে জানাও, সহসা অথবা প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র শাস্তি তোমাদের উপর নেমে এলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় ছাড়া আর কে ধ্বংস হবে? এখানে 'বাগতাতান' শব্দটির অর্থ পূর্ব সংকেত ব্যতীত বা অকস্মাৎ। আর 'জাহারাতান' শব্দটির অর্থ প্রকাশ্য— আগে থেকেই যার নিদর্শন পরিস্ফুট হয়েছে।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং হাসান বলেছেন, বাগতাতান এবং জাহারাতান শব্দ দু'টোর অর্থ দিবসে অথবা নিশিথে। 'হাল ইউহ্‌লাক' কথাটি এখানে নেতিবাচক উত্তর সম্বলিত প্রশ্ন (ইস্‌তেফ্‌হামে ইনকারী) প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেউ ধ্বংস হবে না। আর এখানে 'জলিমুন' শব্দটির অর্থ, ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী— যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৪৮, ৪৯, ৫০

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۖ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ○

❒ রসুলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি; কেহ বিশ্বাস করিলে ও নিজকে সংশোধন করিলে তাহার কোন ভয় নাই এবং সে দুঃখিতও হইবে না।

www.eelm.weebly.com

❐ যাহারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা বলিয়াছে সত্য ত্যাগের জন্য তাহাদিগের উপর শাস্তি আপতিত হইবে।

❐ বল, 'আমি তোমাদিগকে ইহা বলি না যে আমার নিকট আল্লাহের ধনভাণ্ডার আছে, অদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি অবগত নহি, এবং তোমাদিগকে ইহাও বলি না যে আমি ফেরেশ্‌তা, আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হয় আমি শুধু তাহারই অনুসরণ করি'; বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান?' তোমরা কি অনুধাবন কর না?

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— রসুলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি। এ কথার অর্থ— আমি আমার রসুলগণকে প্রেরণ করি ইমানদারদের নিকট জান্নাতের সুসংবাদদানের জন্য এবং কাফেরদের নিকট জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনের জন্য। সুতরাং কাফেরেরা যে রকম চায়, সে রকম অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করা তাঁদের কাজ নয়। আর তাঁরা আল্লাহ্ যাকে চান না তাকে হেদায়েত করার ক্ষমতাও রাখেন না। রসুল হতে গেলে যে সকল গুণ অত্যাবশ্যক বলে কাফেরেরা মনে করে, রসুলগণ সে সকল গুণে গুণান্বিত নন। কাফেরেরা চায়— রসুলকে ফেরেশ্‌তা হতে হবে, পানাহার থেকে মুক্ত থাকতে হবে, আধিভৌতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু তারা জানে না, রসুলগণ এ রকম কোনো কিছু নন। সুসংবাদ প্রদান করা এবং সতর্ক করাই তাঁদের প্রধান দায়িত্ব।

পরের বাক্যে বলা হয়েছে— কেউ বিশ্বাস করলে ও নিজকে সংশোধন করলে তার কোনো ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না। এ কথার অর্থ— রসুলের ডাকে যারা সাড়া দিয়েছে, ইমান এনেছে এবং অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে নিজেকে সংশোধন করেছে, তাদের জন্য শাস্তির আশংকা নেই। আর তারা পুণ্য থেকে বঞ্চিত হবে না বলে দুঃখিতও হবে না।

দ্বিতীয় আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— যারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা বলেছে, সত্যত্যাগের জন্য তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে। অর্থাৎ কাফেরেরা সত্যচ্যুত। আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে মিথ্যা বলেছে তারা। তাদের এই সত্যবিচ্যুতির কারণেই তাদের উপর নেমে আসবে আযাব।

শেষ আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— হে রসুল! আপনি বলুন, হে অবিশ্বাসীরা আমি তোমাদেরকে এ কথা বলিনা যে আমার নিকটে আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার (রিজিকের ভাণ্ডার) আছে। অদৃশ্য সম্বন্ধে আমি অবগত সে কথাও আমি বলি না। আদি অন্তের পরিপূর্ণ জ্ঞান আমাকে জানানো হয় নি। আর এটাও আমার বক্তব্য বিষয় নয় যে— আমি ফেরেশ্‌তা। ফেরেশ্‌তারা পানাহার, বিবাহ ইত্যাদি প্রয়োজন থেকে মুক্ত। আমি তো সে রকম নই। আমি কেবল সত্যধর্ম প্রচার করি।

www.eelm.weebly.com

আনুগত্য করি কেবল আল্লাহ্র। অনুসরণও করি কেবল তাঁর, তাঁর প্রত্যাদেশের। তাই আমার দাবি কেবল একটিই— আমি রসুল। এ দাবি অযৌক্তিক নয়। অসম্ভবও নয়। ইতোপূর্বে প্রেরিত নবী-রসুলগণও এ রকমই ছিলেন।

অংশীবাদীরা মনে করতো মানুষ কখনও নবী বা রসুল হতে পারে না। রসুল হতে পারে কেবল ফেরেশ্তা অথবা অতিমানবিক কোনো অস্তিত্ব। আলোচ্য আয়াতে তাদের এই অযথার্থ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। বাগবী বলেছেন, জ্ঞানান্ধ অংশীবাদীরা মোজেজা দেখতে চেয়েছিলো। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি ওই অবিশ্বাসী জনতাকে বলে দিন— আমি এ কথা বলি না যে, আমি আল্লাহ্র ধনভাণ্ডারের অধিকারী। এই সাফা পর্বতকে সোনার পাহাড়ে পরিণত করবো এবং তোমাদের চাহিদা মতো তোমাদেরকে দান করবো— এ রকম কথা আমি কখনোই বলি না। এ রকম দাবিও আমি করি না যে, অদৃশ্য বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান আমার রয়েছে। আর প্রত্যাদেশ ছাড়া আমি অতীত ভবিষ্যতের কোনো কথা তোমাদেরকে বলতে পারবো না। আমি ফেরেশ্তাও নই। তাই ফেরেশ্তা হওয়ার দাবিও আমি জানাই নি। ফেরেশ্তারা আহার বিহার, প্রাকৃতিক প্রয়োজন এবং দাম্পত্য প্রয়োজন থেকে মুক্ত। কিন্তু আমি তো প্রত্যাদিষ্ট মানুষ— রসুল। আমার দায়িত্ব কেবল প্রত্যাদেশানুসরণ।

পরের কথাটি হচ্ছে— বলুন হে আমার রসুল! অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? এ কথার অর্থ— অবিশ্বাসীরা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য রেখা প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তাই তারা অনস্বীকার্য বিষয়কে অস্বীকার করে। আর বিশ্বাস করে অবিশ্বাস্য বিষয়সমূহকে। ইমানদারগণ এর বিপরীত। তারা চক্ষুষ্মান। তাই সত্য মিথ্যার বিভাজন চিহ্নটি তাদের নিকট সুস্পষ্ট। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা রসুলকে, তাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত মোজেজাসমূহকে এবং অবতারিত কোরআনকে সত্য বলে মেনে নেয়। অন্ধ অবিশ্বাসীরা বিগ্রহবন্দনা করে। মনে করে বিগ্রহগুলো তাদের পক্ষে আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশ করবে। এ কথাও তারা বলে থাকে যে— ফেরেশ্তারা আল্লাহ্তায়ালার কন্যা। এ সকল জঘন্য বিশ্বাস ও আচরণ থেকে বিশ্বাসীরা সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ তারা সত্য দৃষ্টিসম্পন্ন—চক্ষুষ্মান।

শেষ কথাটি এই— আফালা তাতাফাক্কারুন (তোমরা কি অনুধাবন করো না?)। এ কথার অর্থ— যদি তোমরা অনুধাবন করতে সচেষ্ট হও যে, সত্য ও মিথ্যা কখনও সমান নয়। সত্য গ্রহণীয়। মিথ্যা বর্জনীয়— তবে অবশ্যই তোমরা সৎপথ প্রাপ্ত হবে। অতএব কেনো তোমরা বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা করো না।

www.eelm.weebly.com

وَاَنۡذِرۡ بِهِ الَّذِيۡنَ يَخَافُوۡنَ اَنۡ يُّحۡشَرُوۡۤا اِلٰى رَبِّهِمۡ لَيۡسَ لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ وَلِىٌّ وَّلَا شَفِيۡعٌ لَّعَلَّهُمۡ يَتَّقُوۡنَ ○

❒ যাহারা ভয় করে যে, তাহাদিগকে তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হইবে এমন অবস্থায় যে তিনি ব্যতীত তাহাদিগের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকিবে না। তুমি তাহাদিগকে ইহা দ্বারা সতর্ক কর; হয়ত তাহারা সাবধান হইবে।

ওয়া আনজির বিহিল্লাজিনা ইয়াখাফুনা আঁই ইউহ্শারু ইলা রব্বিহিম (যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হবে)। এখানে 'আল্লাজিনা' শব্দটির পরে এসেছে 'ইয়াখাফুনা আঁইইউহ্শারু'। এতে করে বুঝা যায় যারা পুনরুত্থানের বিষয়টিতে সন্দিহান— আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। বায়যাবী লিখেছেন, 'আল্লাজিনা' (যারা) শব্দটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— ওই সকল বিশ্বাসী, যাদের আমল কিছুটা শিথিল। অথবা পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাস করে— এ রকম বিশ্বাসী অথবা দোদুল্যচিত্ত অবিশ্বাসী কিংবা খ্রীষ্টান। অথবা পুনরুত্থান বিষয়ে সন্দেহবাদী দল। মোটকথা পুনরুত্থান দিবসে যারা অদৌ বিশ্বাসী নয়— তারা এই আল্লাজিনা (যারা) শব্দটির অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা শেষোক্ত দলটিকে সতর্ক করা নিরর্থক।

বায়যাবী প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি ভুল। এখানে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী, বিকৃত বিশ্বাসী— সকলকেই সতর্ক করা হয়েছে। এখানকার নির্দেশনা একটি সাধারণ নির্দেশনা। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— উহিয়্যা ইলাইয়্যা হাজাল কোরআনু লিউনজিরাকুম বিহি ওয়ামান বালাগা (এই কোরআন আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে প্রত্যাদেশরূপে, যাতে করে আমি এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এই কোরআনের আহবান পৌঁছেছে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে পারি)। এই আয়াতটিতে কেবল আমল সম্পর্কে উদাসীন বিশ্বাসীদেরকে ভয় দেখানোর কথা নেই। এখানে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে আপামর জনসাধারণকে। তবে এ কথা ঠিক যে, যথার্থ বিশ্বাসী এবং যথাযথ আমলকারীদের জন্যই ভীতিপ্রদর্শন অধিক ফলদায়ক। এরূপ একনিষ্ঠ বিশ্বাসীদেরকে ভীতিপ্রদর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে— তারা যেনো কোনক্রমেই সাধনার পথে ঔদাসীন্যকে প্রশ্রয় না দেয়। লক্ষণীয় যে, রসুল স. এর যুগে প্রতিটি বিশ্বাসী সুদৃঢ় আমলে অভ্যস্থ ছিলেন। আলস্যের উপস্থিতি তাঁদের আমলে ছিলোই না। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের 'আল্লাজিনা' শব্দটির লক্ষ্য নিখিল জনতা। এখানকার নির্দেশনাটি হচ্ছে— সকলেই যেনো তাদের

www.eelm.weebly.com

প্রতিপালকের সম্মুখীন হওয়ার জন্য নির্ধারিত পুনরুত্থান দিবসের কথা স্মরণ করে ভীত সন্ত্রস্ত হয়। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে নির্দিষ্ট করে পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে ভীত ব্যক্তিদেরকে এ কারণেই উল্লেখ করা হয়েছে যে— এই ভীতিপ্রদর্শন কেবল তাদেরই জন্য সর্বাধিক উপকারী। যেমন, 'হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন' কথাটিতে কেবল মুত্তাকিদের কথা বিশেষভাবে এ কারণেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোরআনের হেদায়েত দ্বারা তারাই সর্বাধিক উপকৃত হয়— যদিও কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সকল মানুষের হেদায়েতের নিমিত্তে।

এরপর বলা হয়েছে— লাইসা লাহুম মিন্দুনিহি ওয়ালিউঁ ওয়ালা শাফিউন (এমন অবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না)। এ কথাটি পূর্ববর্তী বাক্যের ধারাবাহিকতা। এ অবস্থায় বাক্যটির পূর্বাপর বক্তব্যের সম্মিলিত অর্থ হবে এ রকম— হে আমার রসুল! কোরআন দ্বারা হাশর দিবসের পুনরুত্থান অস্বীকারকারীকে এভাবে ভয় প্রদর্শন করুন— সেদিন আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো অভিভাবক থাকবে না। কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না। সুতরাং হে জনতা! তোমরা অন্য কারো ইবাদত কোরো না এবং অন্য কারো সাহায্যপ্রার্থী হয়ো না। এখানে অন্যের সুপারিশ বা শাফায়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু অন্য আয়াতে আল্লাহ্তায়ালার অনুমতি সাপেক্ষে অন্যের শাফায়াতের প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ্তায়ালার অনুমতিক্রমে সেদিন কেবল রসুল স. নন, তাঁর উম্মতের অনেকে সুপারিশ করতে পারবেন। শাফায়াত আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাতের একটি অকাট্য বিশ্বাস। এ সম্পর্কে এই জামাতের বক্তব্য হচ্ছে— আল্লাহ্তায়ালা ছাড়া সুপারিশ করার অধিকার কারো নেই। কিন্তু তিনি যাদেরকে অনুমতি দান করবেন, তাঁরাও শাফায়াত করতে পারবেন। আর তাঁদের শাফায়াত তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালারই শাফায়াত। কারণ তিনিই দিয়েছেন শাফায়াতের অধিকার। এখানে যে শাফায়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে, সেই শাফায়াত হচ্ছে তাঁর অনুমোদনহীন শাফায়াত। এ রকম শাফায়াতকারী সেদিন কেউই হবে না।

শেষে বলা হয়েছে— লায়াল্লাহুম ইয়াত্তাকুন (হয়তো তারা সাবধান হবে)। এখানে 'লায়াল্লা' শব্দটির অর্থ হয়তো অথবা সম্ভবত। কথাটির মর্ম হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি জনতাকে এ কোরআনের মাধ্যমে সতর্ক করতে থাকুন। সম্ভবতঃ এতে করে তারা সাবধান হবে।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আহমদ, তিবরানী ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এক স্থানে হজরত খাব্বাব, হজরত সুহাইব, হজরত বেলাল এবং হজরত আম্মারকে নিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কুরায়েশ সেখানে এসে বললো, মোহাম্মদ! তুমি এ সকল ছন্নছাড়া লোকদেরকে তোমার দরবারে নিযুক্ত করেছো অথচ অর্থ ও আভিজাত্যের দিক থেকে আমরাই অগ্রগামী। তুমিও তো অভিজাত। তবু তুমি এদেরকে তাড়িয়ে দিচ্ছো না কেনো?

www.eelm.weebly.com

এদেরকে তাড়িয়ে দিলে আমরা তোমার সঙ্গে বসতে পারতাম। কুরায়েশ নেতৃবৃন্দের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে 'ওয়াআনজিরবিহি' থেকে 'সাবিলুল মুজরিমিন' (৫১ থেকে ৫৫ আয়াত) পর্যন্ত।

ইবনে হাব্বান ও হাকেমের বর্ণনায় রয়েছে— হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, আমি এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদসহ ছয় জনকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। আমাদেরকে রসুল স. এর সঙ্গে উপবিষ্ট দেখে একবার কুরায়েশ নেতারা বললো, এই অনভিজাত লোকগুলোকে বের করে দাও। তাহলে আমরা তোমার কাছে বসতে পারবো। এদের সঙ্গে বসতে আমাদের লজ্জা হয়। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

মুসলিম শরীফে রয়েছে— হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, একবার আমরা ছয়জন রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। দু'জনের নাম আমি ভুলে গিয়েছি। বাকী চারজন হচ্ছি— আমি, ইবনে মাসউদ, হুজাইল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি এবং বেলাল। কুরায়েশ নেতারা সেখানে এসে আমাকে লক্ষ্য করে বললো, ওকে তাড়িয়ে দাও। নাহলে আমাদের আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হবে। রসুল স. চিন্তান্বিত হলেন। আল্লাহ্পাকের নির্দেশনার অপেক্ষায় অতিবাহিত হলো কিছু সময়। এরপর অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ৫২

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ○

❑ যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না। তাহাদিগের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদিগের নয় যে, তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবে; করিলে তুমি সীমালংঘনকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে তাদেরকে তুমি বিতাড়িত কোরো না— এ কথার অর্থ, হে আমার রসুল! ওই সকল লোককে আপনি আপনার দরবার থেকে তাড়িয়ে দিবেন না, যারা বিশেষভাবে সকালে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে ইবাদত করে এবং জিকির করে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ডাকে অর্থ— দোয়া

www.eelm.weebly.com

করে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌কে ডাকার উদ্দেশ্য ফজর ও আসর নামাজ পাঠ করা। আরেক বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ডাকার অর্থ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাঠ করা। এ রকম অর্থ করার কারণ এই যে— একবার কিছু সম্পদশালী মুসলমান রসুল স.কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! নামাজের সময় দরিদ্রদেরকে আমাদের পশ্চাতের সারিতে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিন। অথবা আমাদের নামাজ শেষ হওয়ার পর তাদেরকে নামাজ পড়তে বলুন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

'ইউরিদুনা ওয়াজহাহু' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে। অর্থাৎ যারা বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহ্‌তায়ালার ইবাদত করে। এই বিশুদ্ধতাই সকল আমলের ভিত্তি। তাই এখানে এরশাদ হয়েছে— হে আল্লাহ্‌র রসুল! কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভার্থে (বিশুদ্ধ অন্তরে) যারা ইবাদতে মগ্ন হয়, আপনি তাদেরকে তাড়াবেন না।

জ্ঞাতব্যঃ অলংকারশাস্ত্রের একটি সর্বসম্মত নিয়ম হচ্ছে, জাবেতাহ্। ইমাম আবদুল কাহের তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়টির বিবরণ দিয়েছেন। বিষয়টি 'মাতুল' নামক গ্রন্থের রচয়িতাও সংকলন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, নির্দেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত বৈশিষ্ট্যই ওই নির্দেশদানের কারণ। যেমন— তোমার সত্যবাদী বন্ধু জায়েদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করো। এখানে সুন্দর আচরণের নির্দেশের কারণ হচ্ছে বন্ধু জায়েদের সত্যবাদীতা। এই নিয়মটির দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থকার রহ. বলেছেন—— এখানে যাদেরকে তাড়িয়ে দিতে নিষেধ করা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে তাদের বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করা হয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে— তারা বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহ্‌তায়ালার ইবাদত করে। যারা এ রকম করে, তারা সম্মানের পাত্র। তাই তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া সমীচীন নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'মা আলাইকা মিন হিসাবিহিম মিন শাইনইউঁ ওয়ামা মিন হিসাবিকা আ'লাইহিম মিন শাইইন ফা তাত্‌রুদাহুম' (তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোনো কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে)। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! মুশরিকদের কথায় আপনার একান্ত অনুচর ওই সকল দরিদ্র মুসলমানকে বিতাড়ন করা বৈধ হতো— যদি তারা আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হতো। অথবা আপনি হতেন তাদের ক্ষতির কারণ। কিন্তু এখানে ব্যাপারটি সে রকম নয়। তারা আপনার সংস্পর্শে থাকলে সকলেরই লাভ। তারা আপনার সংসর্গের বরকতে অনেক পুণ্য অর্জন করতে পারবে এবং তাদের রসুল হিসেবে আপনিও তাদের পুণ্যের সমান পুণ্যের অধিকারী হবেন। আপনি বরং আপনার সংসর্গ লাভের সুযোগ দিয়ে তাদেরকে পরিপূর্ণরূপে সত্যানুসারী করুন। সঠিক দিকনির্দেশনা দিন।

www.eelm.weebly.com

এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, আলোচ্য বাক্যটিতে— দরিদ্র মুসলমানদেরকে যারা তাড়িয়ে দিতে বলেছিলেন, তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে— তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব আপনার নয় এবং আপনার কোনো কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয়। সুতরাং আপনি আপনার একান্ত অনুগতদেরকে আপনার দরবার থেকে বহিষ্কার করবেন না।

শেষে বলা হয়েছে ফাতাকুনা মিনাজ্ জলিমীন। এ কথার অর্থ— আপনি ওই সকল দরিদ্র মুসলমানকে বিতাড়িত করলে জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আপনি রসুল। তাই আপনি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হতেই পারেন না। অতএব এমতো অশোভন কর্ম আপনি করবেন না।

সূরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ৫৩

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ○

❐ এইভাবে তাহাদিগের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা বলে, 'আমাদিগের মধ্যে কি ইহাদিগের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিলেন?' আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদিগের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নহেন?

'ওয়া কাজালিকা ফাতান্না বা'দ্বাহুম বিবা'দ্বিন' (এভাবে তাদের একদলকে অন্যদল দ্বারা পরীক্ষা করেছি)। এখানে 'কাজালিকা' শব্দের 'কাফ' অক্ষরটি একটি অতিরিক্ত সংযোজন। অন্য একটি আয়াতেও এ রকম 'কাফ' সংযোজনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন লাইসা কা মিসলিহি শাইউন— এখানেও 'কাফ' অক্ষরটি অতিরিক্ত অক্ষর হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে। আলোচ্য বাক্যের 'জালিকা শব্দের মাধ্যমে কুরায়েশ নেতাদের পথভ্রষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং 'ফাতান্না' শব্দটি এখানে সাধারণ কর্ম (মাফউলে মতলক)। 'বা'দ্বাহুম (এক দলকে) শব্দটির উদ্দেশ্য কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ। আর 'বিবা'দ্বিন' (অন্য দল) শব্দটির উদ্দেশ্য দরিদ্র মুসলমানগণ— যাদের উপস্থিতি কুরায়েশ নেতৃবৃন্দের উস্মার কারণ হয়েছিলো।

আল্লামা তাফতাজানী বলেছেন, এখানে 'কাজালিকা ফাতান্না' এবং অন্য সকল স্থানে ব্যবহৃত 'কাজালিকা' শব্দটি সাদৃশ্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সাদৃশ্য বুঝানোটা এখানে আসল উদ্দেশ্য নয়। অথবা আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ এ রকমও হতে পারে যে, কুরায়েশ নেতাদেরকে যেমন আমি পরীক্ষা করেছি, তেমনি পরীক্ষা করেছিলাম হজরত নূহের সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে। এভাবে এ সকল নেতাদেরকে আমি পথভ্রষ্ট করেছি। হজরত নূহের সময়ের নেতাদের বক্তব্য অন্য আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— অবিশ্বাসীরা (হজরত নূহকে) বললো, আমরা তো দেখছি তুমি আমাদের মতোই মানুষ। আরো দেখছি, একদল অবিবেচক লোক তোমার অনুসারী হয়েছে— যারা আমাদের মধ্যে অধম। হজরত নূহ্

www.eelm.weebly.com

জবাবে বলেছিলেন— মাআনা লি তারিদিল্লাজিনা আমানু (যারা বিশ্বাসী তাদেরকে আমি বিতাড়িত করতে পারি না)। আলোচ্য বাক্যটির মধ্যে কুরায়েশ নেতাদেরকে হজরত নূহের সম্প্রদায়ের নেতাদের সমান্তরাল করা হয়েছে। এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে— সকল যুগের গর্বিত নেতাদের দৃষ্টান্ত একই রকম। পথভ্রষ্টরা সকল যুগে একইভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে।

আল্লামা বায়যাবী বলেছেন, এখানে 'জালিকা' শব্দটির মাধ্যমে পার্থিব পরীক্ষার দিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে এবং 'ফাতান্না' শব্দটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে ধর্মীয় পরীক্ষার। এভাবে বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— বিভিন্নভাবে আমি মানুষকে পরীক্ষা করি। কাউকে করি দরিদ্র। কাউকে বিত্তশালী। এভাবে ধর্মীয় বিষয়েও আমি একদলকে দিয়ে আরেকদলকে পরীক্ষা করে থাকি। এক্ষেত্রে আমি দরিদ্র বিশ্বাসীদেরকে বিত্তশালী অবিশ্বাসীদের উপরে প্রাধান্য দান করেছি। আর এই প্রাধান্য দানই হয়ে দাঁড়িয়েছে কুরায়েশ নেতৃবৃন্দের পথভ্রষ্টতার কারণ।

এরপর বলা হয়েছে— লিইয়াকুলু আ হাউলায়ি মান্নাল্লহু আলাইহিম মিম বাইনিনা (যেনো তারা বলে 'আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন?)। এখানে 'তারা বলে' অর্থ— ওই বিত্তশালী নেতারা বলে। আর 'এদের প্রতিই অর্থ দরিদ্র মুসলিমবৃন্দের প্রতি। আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন'— অর্থ (আমাদেরকে বাদ দিয়ে) এদেরকেই কি আল্লাহ্তায়ালা ইমান ও হেদায়েত দান করলেন? এখানকার এই প্রশ্নটি একটি নেতিবাচক জবাব বিশিষ্ট প্রশ্ন (ইস্তিফ্হামে ইনকারী)। অর্থাৎ বিত্তশালী নেতারা এমতো প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে বলতে চেয়েছিলো যে— উত্তম কর্মে দরিদ্ররা অগ্রগামী হবে কেনো? ইসলাম যদি সত্যধর্মই হতো, তবে আমাদের মতো সম্পদশালীদেরকে দরিদ্ররা অতিক্রম করে কিভাবে? (সুতরাং ইসলাম সত্যধর্ম নয়)। এ রকম মনোভাবের কারণেই আল্লাহ্তায়ালার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলো কুরায়েশ নেতারা।

শেষে বলা হয়েছে— আলাইসাল্লহু বিআ'লামা বিশ্শাকিরীন (আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন?)। এ কথার অর্থ— যারা কৃতজ্ঞভাজন হতে চায়, আল্লাহ্পাক তাদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ ও যোগ্যতা দান করেন। আর যারা চায় না, তাদেরকে তিনি ইমানের মতো অমূল্য সম্পদ দান করেন না। ওই বিপরীতমুখী দু'টি দল সম্পর্কে আল্লাহ্পাক কি সবিশেষ অবহিত নন? এই ব্যাখ্যাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ইমান গ্রহণের যোগ্যতা পূর্ব নির্ধারিত। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী রহ. বলেছেন, বিশ্বাসের সম্পর্ক আল্লাহ্তায়ালার 'আলহাদী' নামের সঙ্গে। আর অবিশ্বাসের সম্পর্ক তাঁর 'আলমুদিল্লু' নামের সঙ্গে। 'আলহাদী' অর্থ পথপ্রদর্শনকারী এবং 'আলমুদিল্লু' অর্থ পথভ্রষ্টকারী। সুতরাং হেদায়েত ও দ্বালালাত আল্লাহ্পাকের দু'টি বিশেষ গুণ। যে ব্যক্তি হেদায়েতের বৃত্তভূত সেই কেবল লাভ করে হেদায়েত। আর যে দ্বালালাতের সীমানাভূত সে হয় পথভ্রষ্ট। সুতরাং যার জন্য যে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে, তার জন্য ওই সীমানা অতিক্রম দুঃসাধ্য।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য বাক্যটির উদ্দেশ্য এ রকমও হতে পারে যে— অবিশ্বাসীরা ভাবতো দরিদ্ররা রসুল স. এর সংসর্গধন্য হবে কেনো? আমরা নেতৃত্বের পদে আসীন এবং বিত্তশালী। সুতরাং আমরাই আল্লাহ্‌র রসুলের সান্নিধ্যে উপবেশন করার যোগ্যতাধারী। আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের এই ধারণাকে প্রতিহত করার নিমিত্তে বলেছেন— আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন? এ কথার অর্থ, আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন, কে কৃতজ্ঞ এবং কে কৃতজ্ঞ নয়। দরিদ্র মুসলমানেরা কৃতজ্ঞ। অবিশ্বাসী নেতারা অকৃতজ্ঞ। আর অকৃতজ্ঞরা রসুল সান্নিধ্য লাভের অনুপযুক্ত।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত সালমান ফারসী এবং হজরত খাব্বাব বিন আরত্ বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের কয়েকজনকে লক্ষ্য করে। আকরা বিন হাবেস তামীমী, উয়াইনিয়াহ্ বিন হাসান ফাজারী এবং আরো কয়েকজন নতুন মুসলমান রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলো সেখানে বসে রয়েছেন বেলাল, সুহায়েব, আম্মার, খাব্বাব এবং আরো কয়েকজন দরিদ্র ও নিরীহ মুসলমান। আগন্তুকেরা তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলো ঘৃণার সঙ্গে। বললো, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনি যদি উচ্চ মর্যাদাসহ সভাপতির পদমর্যাদা লাভ করতে চান তবে এই অধমদেরকে আপনার দরবার থেকে তাড়িয়ে দিন। এদেরকে তাড়িয়ে দিলে আমরা আপনার নিকট উপবেশন করবো এবং আপনার নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করবো। ওই দরিদ্র মুসলমানেরা ছিলেন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত। ঘামে ভেজা সেই পরিচ্ছদ থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছিলো। রসুল স. তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন— এরা ইমানদার। কোনো ইমানদারকে আমি বিতাড়ন করতে পারি না। তারা বললো, তবে আমাদের জন্য পৃথক একটি স্থান নির্ধারণ করুন— যাতে আরববাসীরা আমাদেরকে অভিজাত বলে চিনে নিতে পারে। এ রকম সাধারণ দরবারে তুচ্ছ মানুষদের সঙ্গে বসতে আমরা লজ্জা করি। অতি উত্তম হয় যদি আমরা এলে আপনি এদেরকে চলে যেতে বলেন। আমরা চলে গেলে আপনি এদেরকে পুনরায় আপনার কাছে এনে বসাতেও পারেন। রসুল স. বললেন, হাঁ এটা হতে পারে। তারা বললো, আমাদেরকে এ কথাটি একটি ছোট্ট চিরকুটে লিখে দিন। রসুল স. কাগজ আনতে বললেন এবং হজরত আলীকে কাছে ডাকলেন। বর্ণনাকারী বলেছেন, আমরা তখন এক কোনায় বসেছিলাম। তখনো চিরকুট লেখা শুরু হয়নি। এমন সময় হজরত জিবরাইল নিয়ে এলেন এই আয়াত (ওয়ালা তাত্‌রুদিল্লাজিনা থেকে বিশ্‌শাকিরিন পর্যন্ত)। রসুল স. তখন আনীত কাগজটি ফেলে দিলেন। আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি নিকটে গেলে তিনি পাঠ করলেন— সালামুন আলাইকুম কাতাবা রব্বাকুম আ'লা নাফ্‌সিহির্‌রহমা (আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনাদের প্রতিপালক করুণা বর্ষণ করা তাঁর নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন)। এরপর থেকে আমরা রসুল স. এর একান্ত সান্নিধ্যে উপবেশন করতাম। তিনি যখন ইচ্ছা করতেন তখন আমাদের

www.eelm.weebly.com

নিকট থেকে অন্যত্র চলে যেতেন। আমাদেরকে চলে যেতে বলতেন না। এরপর অবতীর্ণ হলো—ওয়াস্‌বির নাফ্‌সাকা মায়াল্লাজিনা ইয়াদ্‌উ'না রব্বাহুম বিলগাদাতি ওয়াল আ'শিয়্যি ইউরিদুনা ওয়াজ্‌হাহু (আপনি ওই লোকদের সঙ্গে নিজেকে আবদ্ধ রাখুন যারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য কামনায় প্রাতে ও সায়াহ্নে তাদের প্রতিপালককে ডাকে)। এরপর থেকে নেতৃস্থানীয় কেউ এলেও রসুল স. আমাদেরকে সঙ্গে নিয়েই বসে থাকতেন। আমরা তাঁর এতো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতাম যে, তাঁর হাঁটুর সঙ্গে আমাদের হাঁটু লেগে থাকতো। তাঁর উঠার সময় হলে আমরা উঠতাম। তিনি যখন চলে যেতেন, আমরাও তখন সেখান থেকে চলে আসতাম। রসুল স. বলেছেন, আমি আল্লাহ্‌পাকের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এ কারণে যে অন্তিম সময় পর্যন্ত আমি আমার উম্মতের সঙ্গে যুথবদ্ধভাবে বসে থাকবো। জীবনে ও মৃত্যুতে আমি তোমাদের সঙ্গী।

কালাবীর বর্ণনায় রয়েছে, আকরা, উয়াইনা এবং অন্যান্য বিত্তশালীরা একবার রসুল স. এর নিকট আবেদন জানালো, আপনি ওদের জন্য একদিন এবং আমাদের জন্য একদিন নির্ধারণ করুন। তিনি স. বললেন, আমি এরূপ করতে পারি না। তারা বললো, ঠিক আছে। মজলিশ একই হোক কিন্তু আপনি আমাদের দিকে মুখ করে বসবেন এবং তাদেরকে রাখবেন আপনার পশ্চাতে। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হজরত খাব্বাব এবং হজরত সালমান থেকে বাগবী যে বর্ণনাটি এনেছেন, সেই বর্ণনাটি ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং আরো অনেকে কেবল হজরত খাব্বাব থেকে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটিতে অতিরিক্ত এ কথাটি রয়েছে যে— তারপর আল্লাহ্‌তায়ালা আকরা এবং তার সাথী সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। বলেছেন— ওয়া কাজালিকা ফাতান্না বা'দুহুম বিবা'দ্বিন (এভাবেই আমি এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করেছি)। শায়েখ ইবনে কাসির লিখেছেন, বর্ণনাটি দুর্বল। কেননা আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। আর আকরা ও উয়াইনা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হিজরতের অনেক পরে— মদীনায়।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমি কয়েকজন মুহাজিরের সঙ্গে বসেছিলাম। তাঁরা সকলেই ছিলেন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত। মাঝে মাঝে তাঁরা একে অপরের প্রায় বিবস্ত্র অবস্থা অবলোকন করছিলেন। একজন কোরআন মজীদ পাঠ করতে শুরু করলেন। আমরা মনোযোগের সঙ্গে তা শ্রবণ করছিলাম। এমন সময় রসুল স. আমাদের নিকটে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে কোরআন পাঠকারী নীরব হয়ে গেলেন। রসুল স. আমাদেরকে সালাম দিলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি করছিলে? আমি বললাম, আমরা আল্লাহ্‌র কালাম শুনছিলাম। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র শোকর। তিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছেন, যাদের সঙ্গে উপবেশনের জন্য আমাকেও হুকুম দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি আমাদের সঙ্গে বসে পড়লেন। আমরাও তখন গোল হয়ে তাঁর মুখোমুখি বসলাম। আমার মনে হলো, তিনি স. আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে

www.eelm.weebly.com

চিনতে পারেননি। এরপর তিনি স. বললেন, হে নিঃস্ব মুহাজিরের দল! শুভ সমাচার শ্রবণ করো। কিয়ামত দিবসে তোমরা হবে পরিপূর্ণ নূরের অধিকারী। ধনীদের অর্ধ দিবস পূর্বে তোমরা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। ওই অর্ধ দিবস অর্থ পাঁচ শত বৎসর।

হজরত ইকরামা থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, একবার উতবা বিন রবীয়া, শাইবা বিন রবীয়া, মুতইম বিন আদী এবং হারেস বিন নওফেল-মান্নাফ গোত্রের কতিপয় নেতার সঙ্গে রসুল স. এর পিতৃব্য আবু তালেবের কাছে গিয়ে বললো, যদি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র ওই সকল ক্রীতদাসকে তাঁর সাহচর্যচ্যুত করে, তবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাবে আমাদের অন্তরে এবং আমাদের দৃষ্টিতে সে হবে অধিক অনুসরণীয়। তাঁর আনুগত্যের প্রতি ধাবিত হওয়া তখন আমাদের পক্ষে হবে অধিকতর সহজ। আবু তালেব তাদের কথা রসুল স.কে জানালে হজরত ওমর বিন খাত্তাব বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি এ রকম করে দেখতে পারেন। আমরাও দেখবো, এতে তাদের উদ্দেশ্য কী। তখন অবতীর্ণ হয়েছে— ওয়া আনজির বিহিল্লাজিনা থেকে বিশ্শাকিরিন (৫১ থেকে ৫৩ আয়াত) পর্যন্ত।

কুরায়েশ নেতারা রসুল স. এর পবিত্র দরবার থেকে যাদেরকে দূর করে দিতে চাইতো, তাঁরা হচ্ছেন— হজরত বেলাল, হজরত আম্মার বিন ইয়াসার, হজরত আবু হুযায়ফার মুক্ত করা ক্রীতদাস হজরত সালেম, হজরত উসাইদের মুক্ত করা দাস হজরত সাবিহ্ এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ। এছাড়াও তাঁদের মধ্যে ছিলেন হজরত মিকদাদ বিন আবদুল্লাহ্, হজরত আক্বদ বিন আবদুল্লাহ্ হাজখালী এবং আরো অনেকে। এঁদের প্রসঙ্গে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত ওমর রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং পূর্বে প্রদত্ত তাঁর পরামর্শের ব্যাপারে অনুযোগ উত্থাপন করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ৫৪, ৫৫

وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَٰتِنَا فَقُلْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۝

❑ যাহারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে তাহারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাহাদিগকে তুমি বলিও 'তোমাদিগের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক,' তোমাদিগের প্রতিপালক দয়া করা তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

www.eelm.weebly.com

তোমাদিগের মধ্যে কেহ অজ্ঞানতা বশতঃ যদি মন্দ কার্য করে অতঃপর তওবা করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❒ এইভাবে আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি যাহাতে অপরাধীদের পথ প্রকাশিত হয়।

ওয়া ইজাজায়াকাল্লাজিনা ইউ'মিনুনা বিআয়াতিনা ফাক্বুল সালামুন আ'লাইকুম (যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে তারা যখন তোমার নিকটে আসে তখন তাদেরকে তুমি বোলো 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক')। হজরত ইকরামা বলেছেন, ওই সকল লোককে উপলক্ষ করে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, যারা রসুল স. এর পবিত্র দরবার থেকে নিঃস্ব মুসলমানদেরকে বের করে দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না। রসুল স, তাঁদেরকে দেখলে সালাম প্রদান করতেন।

আতা খোরাসানী বলেছেন, যাঁদের প্রসঙ্গে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত বেলাল, হজরত সালেম, হজরত আবু উবাইদা, হজরত মাস্আব বিন উমাইর, হজরত হামযা, হজরত জাফর, হজরত ওসমান বিন মাজউন, হজরত আম্মার বিন ইয়াসার, হজরত আরকাম বিন আরকাম এবং হজরত আবু সালমা বিন আবদুল আসাদ। রদ্বিআল্লাহু আনহুম।

হজরত মাহান থেকে ফারইয়ানী এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার কয়েকজন লোক রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, আমরা অনেক বড় বড় পাপ করেছি। রসুল স. নিঃশ্চুপ রইলেন। তখন অবতীর্ণ হলো— যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে, তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদেরকে তুমি বোলো 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক,' তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। এই আয়াতে আল্লাহ্পাক তাঁর রসুলকে এই মর্মে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি ওই সকল অনুতাপ জর্জরিত মানুষকে অগ্রে সালাম প্রদান করুন। অথবা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সালাম পৌছে দিন। ফাক্বুল সালামুন আলাইকুম (বলুন, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক) কথাটির মধ্যে শুধু শান্তির সুসংবাদ দেয়া হয়নি। পরক্ষণেই এই শুভ সমাচারটিও জানিয়ে দিতে বলা হয়েছে যে— আল্লাহ্পাক অনুগ্রহ করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— আন্নাহু মান আ'মিলা মিনকুম সুআম বিজাহালাতিন ছুম্মা তাবা মিম্বা'দিহি ওয়া আস্লাহা ফাআন্নাহু গফুরুর্রহীম (তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞানতা বশতঃ যদি মন্দ কাজ করে অতঃপর তওবা করে এবং সংশোধন করে, তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু)। এখানে 'আন্নাহু' শব্দের হু (কেউ) সর্বনামটি একটি অনড় সর্বনাম (যা এদিক ওদিক হবার নয়)। আর সম্পূর্ণ বাক্যটিই এখানে 'আর রহ্মাত' কথাটি থেকে উৎসারিত হয়েছে। অথবা 'বা' অক্ষরটি এখানে প্রচ্ছন্ন।

www.eelm.weebly.com

'বিজাহালাতিন' (মন্দ কাজ) শব্দটি এখানে 'আ'মিলা' শব্দটির অবস্থা প্রকাশক। আর কর্মপদ এখানে প্রচ্ছন্ন। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— পাপকর্মের ক্ষতিকর পরিণাম যে ধ্বংস, এ কথা না জেনে যদি কেউ পাপ করে। অথবা 'জাহালাতিন' শব্দটির অর্থ মুতাজাহিলান। অর্থাৎ অজ্ঞতাবশতঃ যদি কেউ পাপ করে বসে। বাক্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় যারা মূর্খতার দিকে ধাবিত হয়েছে, জমা করেছে রাশি রাশি পাপ— এতদ্‌সত্ত্বেও যদি সে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়, পুনঃ পাপ পথে যাবে না এ রকম সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে এবং নিজের আচরণকে সংশোধিত করে— তবে আল্লাহ্ তার প্রতি প্রদর্শন করবেন ক্ষমা ও দয়া। এখানে এ কথাটিই প্রমাণিত হয়েছে যে, পাপ মার্জনার কারণ হচ্ছে তওবা (সলজ্জিত প্রত্যাবর্তন)। পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— ওয়া কাজালিকা নুফাস্‌সিলুল আয়াতি (এভাবে আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি)। এ কথার অর্থ— যেমন করে আমি এই সুরার আয়াত সমূহের বিবরণ দিয়েছি, তেমন করে বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ দিয়েছি কোরআনের অন্যান্য আয়াতসমূহে। এ রকমও হতে পারে যে— এখানে আয়াত অর্থ সত্যের প্রমাণসমূহ যা অস্বীকৃত জনতার সম্মুখে বর্ণনা করা হয়।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়ালি তাস্‌তাবিনা সাবিলুল মুজরিমীন (যাতে অপরাধীদের পথ প্রকাশিত হয়)। অর্থাৎ পাপিষ্ঠরা যেনো সঠিক পথের সন্ধান পায়। এখানে রয়েছে একটি অলিখিত বাক্য। ওই বাক্যটিসহ উদ্ধৃত বক্তব্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— সঠিক পথকে স্পষ্ট করে তুলতেই আমি আমার আয়াত সমূহ বর্ণনা করি এবং এভাবে পাপীদের সামনে সত্যপথ প্রকাশিত হয়ে যায়।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৫৬, ৫৭

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ۝

❑ বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে আহবান কর তাহাদিগের ইবাদত করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে'; বল, 'আমি তোমাদিগের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না; করিলে আমি বিপথগামী হইব এবং সৎপথপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত থাকিব না।'

www.eelm.weebly.com

❐ বল, 'আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভরশীল; অথচ তোমরা উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, তোমরা যাহা সত্বর চাহিতেছ তাহা আমার নিকট নাই; কর্তৃত্ব তো আল্লাহেরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদিগের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।'

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— কুল ইন্নি নুহিতু আন আ'বুদাল্লাজিনা তাদ্উ'না মিন্দুনিল্লাহ্ (বলো, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান করো তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে')। এ কথার অর্থ— হে রসুল! আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপাসনা করো— যা অযৌক্তিক ও প্রমাণহীন। আর আমি এক আল্লাহ্র উপাসনা করি। আমার পক্ষে রয়েছে কোরআন ও জ্ঞানের সন্দেহাতীত প্রমাণ ও যুক্তি। তাই আমাকে তোমাদের উপাস্যসমূহের উপাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এরপর এরশাদ হয়েছে— 'কুললা আত্তাবিউ' আহ্ওয়াআকুম ক্বদ্ দ্বলালতু ইজাঁও ওয়ামা আনা মিনাল মুহ্তাদিন' (বলো, 'আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না; করলে আমি বিপথগামী হবো এবং সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না')। এই বাক্যটির মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের আশা-আকাংখাকে দূর করে দেয়া হয়েছে। স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা পুরোপুরি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুগত। তোমাদের ধারণা যুক্তিহীন, ভিত্তিহীন। তোমরা তোমাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসারী। আর এ রকম যুক্তিপ্রমাণহীন মতবাদের আনুগত্য নিষিদ্ধ। তোমরা সম্পূর্ণতই ভ্রষ্ট, বিনষ্ট। তাই তোমাদের অনুসরণ আমি করতে পারি না। করলে আমিও হয়ে যাবো তোমাদের মতো বিপথগামী এবং হয়ে পড়বো সৎপথপ্রাপ্তদের পথ থেকে বিচ্যুত।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— কুল ইন্নি আ'লা বাইয়্যিনাতিম মির্রব্বি (বলো, আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভরশীল)। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বলুন! আমি তো আমার প্রভুপ্রতিপালক প্রদত্ত সুস্পষ্ট প্রমাণ লাভ করেছি। আর ওই প্রমাণের উপরেই আমি সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণ অর্থ এখানে প্রতিপালকের বা আল্লাহ্র পরিচিতিও হতে পারে। অর্থাৎ আমি পেয়েছি ওই জ্ঞান ও প্রমাণ যে— আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।

আগের আয়াতে বলা হয়েছিলো— তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ আমি করি না। আর এখানে বলা হয়েছে ওই কথা— যার অনুসরণ অত্যাবশ্যক। সেটি হচ্ছে— স্পষ্ট প্রমাণ বা পরিচিতি।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়া কাজ্জাবতুমবিহি (তোমরা যাকে প্রত্যাখ্যান করেছো)। এখানে 'যাকে' (বিহি) শব্দটি আগের বাক্যের স্পষ্ট প্রমাণ (বাইয়্যেনাত) এর সর্বনাম। সর্বনামটির শব্দরূপ স্ত্রী লিঙ্গ হলেও এর অর্থ পুং লিঙ্গের। অর্থাৎ শব্দটি স্পষ্ট প্রমাণ অথবা প্রতিপালকের সঙ্গে সম্পর্কিত। এভাবে অর্থ হবে তোমরা আমার প্রভুপ্রতিপালককে মিথ্যা বলো, তাঁর উপাসনার ক্ষেত্রে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করো।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— মাই'ন্দি মা তাস্তা'জিলুনা বিহি (তোমরা যা সত্বর চাইছো তা আমার নিকটে নেই)। এখানে তোমরা যা চাইছো অর্থ তোমরা যে শাস্তি কামনা করছো। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যে শাস্তি কামনা করে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য আয়াতে। যেমন—'তোমার কাছে যা এসেছে তা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের প্রতি আকাশ থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো। অথবা অবতীর্ণ করো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'

'তোমরা যা চাইছো (মা তাজ্তা'জিলুনাবিহি) কথাটির উদ্দেশ্য কিয়ামতও হতে পারে। যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছে—'তারা যে বিষয়ে ব্যতিব্যস্ত হচ্ছে, তা তাদের সামনে উপস্থিত হলেও তারা ইমান আনবে না।'

এরপর বলা হয়েছে— ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ্ (কর্তৃত্বও আল্লাহ্রই)। এ কথার অর্থ সর্ববিষয়ে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহ্র। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি অবতীর্ণ করবেন, না শাস্তি বিলম্বিত করবেন— সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন।

শেষে বলা হয়েছে, ইয়াক্কুস্সুল হাক্কা ওয়াহুয়া খইরুল ফাসিলীন (তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং মীমাংসাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ)। এখানে 'ইয়াক্কুস্সু' শব্দটির অর্থ বর্ণনা করা, বলা বা ব্যাখ্যা করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ সত্যের বর্ণনা দান করেন এবং তিনিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

সূরা আন্আ'ম : আয়াত ৫৮, ৫৯, ৬০

قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِىَ الْاَمْرُ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ
اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝ وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِى
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ
وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝ وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ
مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰۤى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ
ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

❐ বল, 'তোমরা যাহা সত্বর চাহিতেছ তাহা যদি আমার নিকট থাকিত তবে আমার ও তোমাদিগের মধ্যেকার ব্যাপারে তো ফয়সালাই হইয়া যাইত, এবং আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদিগের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।'

www.eelm.weebly.com

❐ অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানে না। জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে তাহা তিনিই অবগত; তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না; মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।

❐ তিনিই রাত্রিকালে তোমাদিগের সুষুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে তোমরা যাহা কর তাহা তিনি জানেন; অতঃপর দিবসে তোমাদিগকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন যাহাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁহার দিকেই তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন; অনন্তর তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে তিনি অবহিত করিবেন।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে, কুল্‌লাউ আন্না ই'ন্‌দিমা তাস্‌তাযিলুনা বিহি লাকুদিইয়াল আমরু বাইনি ওয়া বায়না কুম (বলো, তোমরা যা সত্বর চাইছো তা যদি আমার নিকট থাকতো তবে আমার ও তোমাদের মধ্যেকার ব্যাপারে তো ফয়সালাই হয়ে যেতো)। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বলে দিন, হে মূর্খ জনতা, তোমরা যে আযাব অথবা কিয়ামত কামনা করছো, তার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র। যদি এ বিষয়ে আমার কর্তৃত্ব থাকতো, তবে আমার ইচ্ছায় এখনই শাস্তি অবতীর্ণ হতো। আর এতে করে তোমাদের ও আমার মধ্যের বচসা এখনই মিটে যেতো। আর আমার ইচ্ছায় যদি কিয়ামত সংঘটিত হতো, তবে সত্য মিথ্যার মীমাংসাও হয়ে যেতো এখনই। তোমাদের ও আমার পারস্পরিক বাদানুবাদের যে ফয়সালা কিয়ামতের দিন হবার কথা তাও হয়ে যেতো এই মুহূর্তে। উল্লেখ্য যে, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পারস্পরিক বিতণ্ডার মীমাংসা হবে কিয়ামতের দিন। অন্য এক আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে। যেমন— —'তারপর তাঁর দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। তারপর যে বিষয়ে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ ছিলো সে বিষয়ে ফয়সালা করা হবে।'

আলোচ্য বাক্যটিতে পারস্পরিক বচসার মীমাংসার কথা সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে। কিন্তু এ কথা বলা হয়নি যে, কোন দলের উপর সেদিন আযাব আপতিত হবে। বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে পরের বাক্যে এভাবে— ওয়াল্লহু আ'লামু বিজ্‌জলিমীন (এবং আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত)। অর্থাৎ তিনি ভালো করেই জানেন যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই শাস্তির উপযুক্ত এবং তাদেরকেই তিনি সেদিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দান করবেন। পরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— ওয়া ই'ন্‌দাহু মাফাতিহুল গইব (অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই নিকটে রয়েছে)। এখানে 'ইন্‌দা' শব্দটি প্রথমেই ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আয়ত্তেই রয়েছে অদৃশ্যের কুঞ্জি। অন্য কারো অধিকার এতে নেই। 'মাফাতিহু' শব্দটি বহুবচন। এর অর্থ কুঞ্জিসমূহ। এর এক বচন হচ্ছে মিফ্‌তাহুন

www.eelm.weebly.com

(কুঞ্জি)। কুঞ্জি বা চাবি হচ্ছে অর্গলবদ্ধ কোনো কিছুকে উন্মুক্ত করে দেয়ার যন্ত্র বা অস্ত্র। অদৃশ্যের কুঞ্জি (মিফতাহুল গইব) অর্থ— ওই জ্ঞান যা জানিত বস্তুর ঊর্ধ্বে, যার মাধ্যমে বাস্তব জগৎ তার রূপ পরিগ্রহ করে। ওই অদৃশ্যের কুঞ্জির একক অধিকার কেবল তাঁর। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকই ওই অদৃশ্য জ্ঞান দ্বারা সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। সুতরাং অদৃশ্যের কুঞ্জি তিনি ছাড়া অন্য কারো নিকটে নেই।

ওই বিষয়সমূহই গায়েব বা অদৃশ্য যা এখন পর্যন্ত অস্তিত্বশীল হয়নি। যেমন, কিয়ামত, কখন বৃষ্টি হবে না হবে, আগামীকাল মানুষ কি করবে, কোথায় থাকবে অর্থাৎ সে বেঁচে থাকবে না মৃত্যুবরণ করবে ইত্যাদি।

ওই বিষয়সমূহকেও গায়েব বা অদৃশ্য বলা যায়, যা বাস্তব জগতে অস্তিত্বশীল– কিন্তু আল্লাহ্পাক সে সম্পর্কে কাউকে জ্ঞান দান করেননি। যেমন মাতৃগর্ভের শিশু। কেউ জানেনা সে শিশু পুত্র না কন্যা। এখানে আলোচিত অদৃশ্যের কুঞ্জির মধ্যে এই দুই ধরনের অদৃশ্য জ্ঞানের কথাই রয়েছে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পাঁচটি বিষয় মাফাতিহুল গইব বা অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। সেই পাঁচটি বিষয় হচ্ছে— ১. কেউ জানেনা মাতৃউদরে কি রয়েছে— ছেলে না মেয়ে। ২. আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না যে, আগামীকাল তার কি অবস্থা হবে। ৩. বৃষ্টিপাত কখন হবে— সে কথাও আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। ৪. কোন ব্যক্তি কোন স্থানে সমাহিত হবে সে কথাও আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জানা নেই। ৫. কেবল আল্লাহ্ই জানেন, কখন অনুষ্ঠিত হবে কিয়ামত। অন্য কারো এই জ্ঞান নেই। আহমদ ও বোখারীও এ রকম বর্ণনা এনেছেন।

বোখারী ও মুসলিমে রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, হজরত জিব্রাইলের এক প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রসুল স. জানিয়েছেন, পাঁচ বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। ওই পাঁচটি বিষয়ের একটি হচ্ছে কিয়ামত। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন— ইন্নাল্লহা ই'নদাহু ইলমুস্সায়াতি ওয়া ইউনায্যিলু গইছা (নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কিয়ামতের সময় সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত এবং তিনিই মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন)।

আমি বলি, অদৃশ্য জ্ঞান বর্ণিত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ওই পাঁচ বিষয় ছাড়াও আরো অনেক অজানিত বিষয় রয়েছে। সেগুলোও গায়েবের (অদৃশ্যের) অন্তর্ভূত।

জুহাক বলেছেন, অদৃশ্যের কুঞ্জি অর্থ পৃথিবীর কুঞ্জি এবং আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার জ্ঞান। আতা বলেছেন, অদৃশ্যের কুঞ্জি হচ্ছে ওই সকল সওয়াব ও আযাব— যা তোমাদের নিকট গোপন রাখা হয়েছে। অদৃশ্যের কুঞ্জি সম্পর্কে

www.eelm.weebly.com

আরো অনেক উক্তি রয়েছে। যেমন— মৃত্যু কখন হবে, কোন শিশু হবে পুণ্যবান এবং কোন শিশু হবে পাপিষ্ঠ, কোন অবস্থায় নেমে আসবে মানুষের জীবনের যবনিকা ইত্যাদি। এই আলোচনাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, অদৃশ্যের কুঞ্জি সম্পর্কে আমার প্রদত্ত ব্যাখ্যা নির্বিরোধ।

এরপর বলা হয়েছে— লা ইয়া'লামুহা ইল্লাহুয়া (তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না)। গায়েবের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র জন্যই সুনির্ধারিত। সে কথাটিই এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তিনিই সৃষ্টির সময় তাদের বিলম্বিত অথবা অবিলম্বিত আগমন ও নির্গমনের বিষয়ে উত্তমরূপে অবগত। সকল রহস্য (হেকমত) সম্পর্কে কেবল তিনিই জানেন। তবে তিনি যদি এ সকল বিষয়ে কাউকে কিঞ্চিত জ্ঞান দান করেন— তবে তা করতেও তিনি সক্ষম। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে এ কথাটিও জানা যায় যে, অস্তিত্বশীল হওয়ার পূর্ব থেকেই তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়া ইয়া'লামু মাফিল বার্‌রি ওয়াল বাহ্‌রি (জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত)। এ কথার অর্থ স্থলভাগের সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে তিনি যেমন উত্তমরূপে অবগত, তেমনি অবগত সমুদ্র গর্ভের সকল জড় অজড় প্রাণী ও বৃক্ষরাজি সম্পর্কে।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়ামা তাস্‌কুতু মিউ ওয়ারক্বাতিন ইল্লা ইয়া'লামুহা (তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না)। এখানে 'মা' শব্দটি নেতিবাচক অর্থ প্রকাশক। এবং 'মিন' নিমজ্জন বা ইস্তেগ্‌রাক অর্থ প্রকাশকল্পে ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে স্পষ্ট বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে— প্রতিটি সৃষ্টির ক্ষুদ্রাতিতমক্ষুদ্র অংশ সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত। আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— সকল বৃক্ষের সকল পাতার সংখ্যা এবং বৃক্ষশাখালগ্ন ও বৃন্তচ্যুত সকল পত্রিকার অবস্থা ও স্বরূপ সম্পর্কেও আল্লাহ্‌পাক ভালো করে জানেন।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়ালা হাব্‌বাতিন ফি জুলুমাতিল আরদ্বি ওয়ালা রত্‌বিউঁ ওয়ালা ইয়াবিসিন ইল্লা ফি কিতাবিম্ মুবিন (মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্য কণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'রতাব্' অর্থ পানি এবং 'ইয়াবিস্' অর্থ মরুভূমি। আতা বলেছেন, এখানে 'রতাব্' অর্থ নামিদামি বা প্রসিদ্ধ এবং 'ইয়াবিস্' অর্থ জমাট পদার্থ। কেউ কেউ বলেছেন, বর্ণিত শব্দ দু'টোর অর্থ জীবন ও মৃত্যু। 'ওয়ালা হাব্বাতিন', 'ওয়ালা রত্ত্বিন' এবং 'ওয়ালা ইয়াবিসিন' শব্দত্রয়ের সংযোগ রয়েছে 'ওয়ারক্বাতিন' এর সঙ্গে। অর্থাৎ এ সকল কিছুই তাঁর অসীম জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। তিনি পত্রপতন, অঙ্কুরোদগম, সরস, শুষ্ক— সব কিছু সম্পর্কে জানেন। এমতাবস্থায় 'কিতাবুম্ মুবিন' কথাটির অর্থ হবে— আল্লাহ্‌তায়ালার অসীম অদৃশ্য জ্ঞান। আর 'ইল্লা ফি কিতাবিম্ মুবিন' (যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই) কথাটির অর্থ হবে— যা লাওহে মাহফুজে নেই।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'তিনিই রাত্রিকালে সুষুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে তোমরা যা করো তা তিনি জানেন; অতঃপর দিবসে তোমাদেরকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন, যাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়'। এখানে 'তাওয়াফ্ফা' শব্দটির অর্থ— কোনো কিছুকে পূর্ণরূপে অধিকার করে নেয়া (আয়ত্তে আনা)। রূপক অর্থে শব্দটির উদ্দেশ্য হয় মৃত্যু। কিন্তু এখানে অর্থ করা হয়েছে— নিদ্রা। কেননা নিদ্রাও মৃত্যুর একটি ধরন। 'জারহ্তুম' শব্দটির অর্থ— হাত পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গ দ্বারা কোনো কাজ করা। এখানে তাই বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্পাক কর্মমুখরতার জন্য দিবসকে এবং নিদ্রায় নিমজ্জিত হওয়ার জন্য রাত্রিকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই মানুষের পৃথিবীর জীবন এভাবেই বিবর্তিত হয়। কিন্তু সময়বিবর্তনের এই নিয়মটিকে অলংঘনীয় মনে করাও ভুল। অর্থাৎ এ রকম বলা যাবে না যে, কেউ রাতে কাজই করতে পারবে না এবং দিনে ঘুমাতেও পারবে না। এখানে আলোচ্য বাক্যটির শব্দ ব্যবহারে কিছু অগ্রপশ্চাৎ ঘটেছে। বক্তব্যটির বিবরণভঙ্গি হতে পারতো এ রকম—'হুওয়াল্লাজি ইয়াতাওয়াফ্ফাকুম বিল্লাইলি ছুম্মা ইয়াবয়াছাকুম বিন্নাহারী ওয়া ইয়া'লামু মা জারাহ্তুম।

'যাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়'— কথাটির অর্থ যাতে মানুষের পৃথিবীর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। অবশ্য মাতৃগর্ভে অবস্থানের সময়েই মানুষের মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়। বরং মৃত্যুর সময় নির্ধারিত হয় মাতৃগর্ভে আসার আগেই।

এরপর বলা হয়েছে—'অতঃপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার ফয়সালার দিকে মৃত্যুর পর সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

শেষে বলা হয়েছে—'অনন্তর তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে তিনি অবহিত করবেন।' এ কথার অর্থ— কিয়ামতের দিন হিসাব গ্রহণের সময় তোমাদের সকলকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানানো হবে এবং পুণ্য ও পাপের যথাবিনিময় প্রদান করা হবে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে (৫৯) আল্লাহ্তায়ালার অদৃশ্য জ্ঞানের একচ্ছত্র অধিকার সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর পরের আয়াতে (৬০) বিবৃত হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার অতুলনীয় শক্তিমত্তা সম্পর্কে। নিদ্রা ও জাগরণের বিষয়টি উল্লেখ করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, নিদ্রা মৃত্যুতুল্য। নিদ্রা থেকে মানুষকে যেমন জাগ্রত করা হয়, ঠিক তেমনি সকলকে পুনরুত্থিত করা হবে মৃত্যু থেকে। ওই পুনরুত্থান ঘটবে কিয়ামতের পর।

www.eelm.weebly.com

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ○

❒ তিনিই স্বীয় দাসদিগের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদিগের রক্ষক প্রেরণ করেন; অবশেষে যখন তোমাদিগের কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা তাহার মৃত্যু ঘটায় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

এরশাদ হয়েছে— ওয়াহুয়াল ক্বহিরু ফাওক্বা ই'বাদিহি (তিনিই আপন দাসদের উপর পরাক্রমশালী)। এখানে পরাক্রম (ফাওক্বিয়াত) অর্থ প্রাধান্য বিস্তারণ বা শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন। আর 'ক্বহিরু' অর্থ ওই বিজয় যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়া ইউরসিলু আ'লাইকুম হাফাজাতা হাত্তা ইজা জায়া আহাদাকুমুল মাউতু তাওয়াফ্‌ফাত্‌হু রুসুলুনা ওয়াহুম লা ইউফার্‌রিতুন (এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন; অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিতরা তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোনো ত্রুটি করে না)। এখানে 'হাফাজাতা' অর্থ মানুষের আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশ্‌তা বা আমলনামার রক্ষক। এই আমলনামা কিয়ামতের দিন বিচারের সময় উপস্থাপন করা হবে। 'হাত্তা' শব্দটির মাধ্যমে এখানে আমলনামা সংরক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ববহ করে তোলা হয়েছে। অথবা এই সংরক্ষণকে করা হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাক্রমের একটি নিদর্শন।

ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'রুসুলুনা' (প্রেরিতরা) অর্থ মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা হজরত আজরাইল ও তাঁর সহযোগী ফেরেশ্‌তাবৃন্দ। নাখয়ীর মাধ্যমে আবু শায়েখও এ রকম বর্ণনা এনেছেন।

আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ূতীর বর্ণনায় রয়েছে, ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ্ বলেছেন, যে ফেরেশ্‌তা সব সময় মানুষের কাছে থাকে, পৃথিবীর আয়ু শেষে সেই ফেরেশ্‌তাই রূহ্ কবজ করে মৃত্যুর ফেরেশ্‌তার অধিকারে দিয়ে দেয়। সুতরাং আমল লেখক ফেরেশ্‌তাও মৃত্যুর ফেরেশ্‌তার অধীনস্থ। মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা হজরত আজরাইল রাজস্ব আদায়কারীর মতো। অধীনস্থ কর্মচারী যেমন রাজস্ব আদায় করে তার কাছে দিয়ে দেয়, তেমনি অধীনস্থ ফেরেশ্‌তারাও মানুষের প্রাণ হরণ করে হজরত আজরাইলের হাতে সোপর্দ করে।

www.eelm.weebly.com

ইবনে হাব্বান এবং আবু শায়েখের বর্ণনায় রয়েছে, রবী বিন আনাসের নিকটে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, হজরত আজরাইল কি একাই সকল মানুষের রূহ্ কবজ করেন? তিনি বললেন, রূহ্ কবজের দায়িত্ব তাঁরই। কিন্তু তাঁর এই দায়িত্বের সহযোগী রয়েছেন অনেক। তাঁর এক পা পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে আরেক পা পশ্চিমপ্রান্তে। পুনঃ জিজ্ঞেস করা হলো, ইমানদারদের রূহ্ কোথায় রাখা হয়? তিনি বললেন, সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহার নিকটে।

আল্লামা কুরতুবী বলেছেন— এই আয়াত তিনটির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। আয়াত তিনটি হচ্ছে— ১. তাওয়াফ্‌ফাত্‌হু রুসুলুনা (আমার দূতগণ তার মৃত্যুদান করে)। ২. ইয়া তাওয়াফাকুম মালাকুল মাওতুল্লাজি উক্‌কিলা বিকুম (মৃত্যুর জন্য নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণহরণ করে)। ৩. আল্লাহু ইয়া তাওয়াফ্‌ফাল আনফুসা (আল্লাহ্‌পাকই সকলের মৃত্যুদান করেন)।

উদ্ধৃত আয়াত তিনটির প্রথমটিতে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিতদের মাধ্যমে রূহ্ কবজ করার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে হজরত আজরাইল কর্তৃক জান কবজের কথা এবং তৃতীয় আয়াতে প্রাণহরণের সম্পর্ক করেছেন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর নিজের সঙ্গে। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিতরা হজরত আজরাইলের রূহ্ কবজ করার কাজের সহযোগী। মূল দায়িত্ব হজরত আজরাইলের। তাঁর সহযোগীরা কেবল মৃত্যুযন্ত্রণা সৃষ্টির মাধ্যমে হজরত আজরাইলের কাজে সাহায্য করে থাকে। রূহ্ কবজ করেন হজরত আজরাইল নিজে। আর প্রাণহরণের নির্দেশদাতা স্বয়ং আল্লাহ্— সে কথাই বিবৃত হয়েছে তৃতীয় আয়াতটিতে।

কুরতুবী এমনও বর্ণনা করেছেন, যা হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— মৃত্যু আসন্ন এ রকম ব্যক্তির নিকট আগমন করেন চারজন ফেরেশ্‌তা। একজন দক্ষিণ পা, একজন বাম পা, একজন দক্ষিণ হস্ত অপর জন বাম হস্ত টেনে বের করেন তার প্রাণ। বর্ণনা করেছেন আবু হামেদ।

কালাবীর বিবৃতি— মৃত্যুদূত প্রাণহরণ করে সমর্পণ করেন শাস্তি অথবা শান্তি দূতের নিকট। জুয়াইবির তদীয় তাফসীরে উল্লেখ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে মুষ্টিবদ্ধ হস্তে ধৃত বস্তুর মতো পৃথিবীর সমগ্র বস্তু হজরত আজরাইলের অধীন। তিনি স্বহস্তে সংহার করেন যাবতীয় প্রাণ। তবে শান্তি ও শাস্তির ফেরেশতামণ্ডলী সহযোগী থাকে তাঁর কর্মে। পবিত্রাত্মা কবজ করে সমর্পণ করেন শান্তির ফেরেশতাকে আর অপবিত্র-আত্মা কবজ করে দিয়ে দেন শাস্তির ফেরেশতাকে। ইবনে মুসান্না হামাসীর বর্ণনা করেন, ইবনে আবীদ্ দুন্‌ইয়া ও আবু শায়েখ এ রকম বলেছেন। হজরত বারা বিন আজীবের বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসে সে বর্ণনার পোষকতা লক্ষ্য করা যায়।

www.eelm.weebly.com

রসুল পাক স. বলেছেন, মৃত্যু নিকটবর্তী হলে বিশ্বাসী বান্দার পৃথিবীসম্পৃক্তি অপসারিত হতে থাকে। নিকটতর হতে থাকে আখেরাত। ওই সময় সূর্যালোকের মতো উজ্জ্বল অবয়ব বিশিষ্ট এক ফেরেশ্তা নেমে আসে তার কাছে। ওই ফেরেশ্তার কাছে থাকে জান্নাতের কাফন ও সুবাস। মুমূর্ষু ব্যক্তির একটু দূরে অবস্থান গ্রহণ করে সে। ইত্যবসরে মৃত্যুর ফেরেশ্তা এসে মুমূর্ষু ব্যক্তিটির শিয়রে উপবেশন করে এবং বলে— হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমা ও সন্তোষের প্রতি এসো। মুমূর্ষু ব্যক্তির রূহ্ সে ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়। উপুড় করা মশক থেকে নির্গত পানির মতো দ্রুত বের হয়ে আসে সেই পবিত্র আত্মা। ফেরেশ্তারা তখন ওই পবিত্র আত্মাকে বেহেশ্তি কাফনে এবং বেহেশ্তি সুবাসে আচ্ছাদিত করে ফেলে।

রসুল পাক স. আরো বলেছেন, অবিশ্বাসী বান্দার মৃত্যুর সময় তার নিকট উপস্থিত হয় অত্যন্ত কুৎসিতদর্শন এক ফেরেশ্তা। ওই ফেরেশ্তা তাকে ধমক দিতে থাকে এবং তার দিকে দৃষ্টিপাত করে রোষতপ্ত চোখে। একটু দূরে বসে যায় সে। ইত্যবসরে মৃত্যুর ফেরেশ্তা এসে তার শিয়রে বসে যায় এবং তার রূহ্ কবজ করে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেয় ওই কুৎসিতদর্শন ফেরেশ্তাটির হাতে।

জুহায়ের বিন মোহাম্মদের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুলপাক স. কে একবার প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! মৃত্যুর ফেরেশ্তা তো একজন। অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে একই সঙ্গে অনেক লোক মৃত্যুবরণ করছে (একই সঙ্গে সকলের প্রাণ তিনি হরণ করেন কি করে?)। রসুল স. বললেন, মৃত্যুর ফেরেশ্তার সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী একটি খাদ্যের থালার মতো। তাই কেউই তার দৃষ্টির আড়াল নয়।

ইবনে আবীদ্ দুন্ইয়া এবং আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, আশআস বিন আসলাম বলেছেন, হজরত আজরাইলের সামনে ও পিছনে দু'টি করে মোট চারটি চোখ রয়েছে। তাঁকে একবার হজরত ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করলেন, এক লোক পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে আর এক লোক পশ্চিম প্রান্তে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিপদাপন্নরা অথবা চলেছে বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহ— এমতাবস্থায় একই সঙ্গে কি করে আপনি এতো লোকের প্রাণহরণ করেন? হজরত আজরাইল বললেন, আমি সকলের আত্মাকে আল্লাহ্র হুকুমের দিকে ডাকি। এই ডাক শুনে সকলের আত্মা এসে পড়ে আমার হাতের মুঠোয়।

আশআস বিন আসলাম আরো বলেছেন, মালাকুল মউতের সামনে সম্পূর্ণ পৃথিবী একটি খাদ্যের থালার মতো। সেখান থেকে যখন যাকে ইচ্ছা তিনি তুলে নিতে পারেন।

www.eelm.weebly.com

এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত ইয়াকুবের এক প্রশ্নের উত্তরে হজরত আজরাইল বলেছিলেন, আল্লাহ্পাক পৃথিবীকে এনে দিয়েছেন আমার আওতায়। আপনার সামনে রক্ষিত খাদ্যের বাসন থেকে আপনি যেমন ইচ্ছামত খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন, তেমনি আমিও সময়মতো পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষের রূহ্ কবজ করতে পারি।

আবু শায়েখ এবং আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশ্তার সম্মুখে পৃথিবী একটি আহারের বাসনের ন্যায়। তিনি তাই যে কোনো স্থানে এবং সময়ে একাধিক ব্যক্তির রূহ্ কবজ করতে পারেন। জুহ্দ্ পুস্তকেও মুজাহিদের এই উক্তিটি রয়েছে।

আমি বলি, রসুল স. এর পবিত্র বাণী এবং তাঁর সহচরবৃন্দের মূল্যবান বর্ণনাসমূহের মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, সকল সচেতন সৃষ্টির সঙ্গে যেমন সূর্যালোকের সম্পর্ক একই রকম, তেমনি পৃথিবী এবং পৃথিবীর প্রতিটি অণুপরমাণুর সঙ্গে সম্পর্ক হজরত আজরাইলের। তাই একজনের মৃত্যুর কারণে অন্য কারো মৃত্যু বিলম্বিত হয় না। এক মৃত্যু অন্য মৃত্যুর প্রতিবন্ধক নয়। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ— সকল প্রান্তে তাই দেখা যায় অনেক লোক একই সঙ্গে মৃত্যুবরণ করছে।

পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাঁর কোনো কোনো অলিকেও এ রকম ক্ষমতা দান করেছেন। ওই অলি আল্লাহ্গণ একই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে শারীরিক আকৃতি নিয়ে প্রকাশিত হতে পারেন। আল্লাহ্তায়ালা হজরত আজরাইলের অনেক সহযোগীও দিয়েছেন। তারা হজরত আজরাইলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো। তারা তাঁকে মৃত্যু ঘটানোর কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে থাকেন। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলের মৃত্যুর প্রাক্কালে একদল ফেরেশতা বেহেশতের অথবা দোজখের কাফন নিয়ে উপস্থিত হয়। তারা হজরত আজরাইলের কবজকৃত রূহ্ নিয়ে উঠে যায় আকাশে। এই আয়াতে 'রুসুলুন' বলে ওই ফেরেশ্তাদেরকে বুঝানো হয়ে থাকবে। অথবা এখানে 'রুসুলুন' অর্থ হজরত আজরাইলের সাধারণ সহযোগীবৃন্দ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে রুসুলুন শব্দটি বহুবচন। কিন্তু শব্দটি কেবল হজরত আজরাইলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ওয়াহুম লা ইউফার্‌রিতুন (তারা কোনো ত্রুটি করে না)— কথাটির অর্থ, হজরত আজরাইলের সহযোগীরা কখনো কর্তব্য পালনে অবহেলা করে না। মৃত্যুর নির্ধারিত সময়ের কিঞ্চিত পূর্বাপরও তাদের দ্বারা সংঘটিত হয় না। আর আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত রূহ্ কবজ করার ক্ষমতাও তারা রাখে না।

www.eelm.weebly.com

তিবরানী, ইবনে মাজা এবং আবু নাঈমের বর্ণনাসূত্রে এসেছে, হজরত হারেস বিন খাজরাজ বলেছেন, একবার রসুল স. এক আনসারীর শিয়রে হজরত আজরাইলকে দেখতে পেয়ে বললেন, হে মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা! আমার এই একান্ত অনুচরের সঙ্গে শিষ্ট আচরণ করুন। হজরত আজরাইল বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি প্রফুল্লচিত্ত থাকুন। শীতল রাখুন আপনার চক্ষুদ্বয়কে। জেনে রাখুন, আমি বিশ্বাসী লোকদের সঙ্গে কোমল আচরণ করি। আরো জেনে রাখুন হে রহমতের নবী! কোনো ব্যক্তির জীবন হরণের সময় তার পরিবার পরিজনেরা যখন চিৎকার করে বিলাপ করতে থাকে, তখন আমি মৃত ব্যক্তির রূহ্‌ হাতে নিয়ে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলি, হে রোদনার্ত স্বজনেরা! আল্লাহ্‌র শপথ আমি তোমাদের এই প্রিয়জনের উপর কোনো অন্যায় আচরণ করিনি। তোমাদের প্রতিও আমি কোনো জুলুম করিনি । আর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরেও আমি এ কাজ করিনি। এ আমার স্বসিদ্ধান্ত নয় (আল্লাহ্‌ই সিদ্ধান্তদাতা)। এখন যদি তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার ফয়সালায় প্রসন্ন থাকো, তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় লাভ করবে। আর যদি অপ্রসন্ন হও, তবে তোমরা হয়ে যাবে পাপী এবং পাপের প্রতিফলও নিশ্চয় পাবে। আমি তো এভাবে বারংবার তোমাদের কাছে আসতেই থাকবো। অতএব তোমরা ভীত হও, সতর্ক হও। তাঁবুর মধ্যে, দূর দেশে, গুহায়— যে স্থানেই তোমরা থাকো না কেনো, সকলের নিকট আমার আগমন সুনিশ্চিত। এ কথার অর্থ— তোমরা যাযাবর হও, গৃহবাসী হও, পর্বতবাসী হও— বিশ্বাসী হও, অথবা হও অবিশ্বাসী— তাতে কিছু আসে যায় না। তোমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। তাই মৃত্যুদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত আমার আগমনও নিশ্চিত। আমি তোমাদের ছোট বড় সকলকে চিনি। তোমরা তোমাদেরকে যতটুকু চেনো, তার চেয়েও আমি বেশী চিনি তোমাদেরকে। আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্‌তায়ালার অনুমতি ব্যতীত আমি কোনো মশার প্রাণও হরণ করি না। আল্লাহ্‌পাকই প্রাণ হরণের নির্দেশ দাতা। এ রকম আলোচনা ইবনে আবীদ্‌ দুন্‌ইয়া, আবু শায়েখ এবং হাসানও করেছেন।

হজরত জাফর বিন মোহাম্মদ বলেছেন, হজরত আজরাইল নামাজের সময় (মসজিদের মধ্যে) খোঁজ খবর নিতে থাকেন। মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে অভ্যস্থ থাকে, তবে হজরত আজরাইল তার কাছে উপস্থিত হয়ে শয়তানকে তাড়িয়ে দেন এবং ওই মুমূর্ষু ব্যক্তিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্‌' কলেমার তালকিন দিতে থাকেন।

www.eelm.weebly.com

ثُمَّ رُدُّوۡۤا اِلَى اللّٰهِ مَوۡلٰهُمُ الۡحَـقِّ‌ ؕ اَلَا لَـهُ الۡحُكۡمُ وَهُوَ اَسۡرَعُ الۡحٰسِبِيۡنَ‏

❑ অতঃপর তাহাদিগের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তাহারা প্রত্যানীত হয়। দেখ, কর্তৃত্ব তো তাঁহারই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর।

এরশাদ হয়েছে— 'ছুম্মা রুদ্দু ইলাল্লহি মাওলা হুমুল হাক্ব' (অতঃপর তাদের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তারা প্রত্যানীত হয়)। এখানে 'মাওলা' শব্দটির অর্থ প্রকৃত প্রভু বা প্রতিপালক। 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটি এখানে এ কথা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ্র দিকেই সকলকে ফিরে যেতে হবে। আর আল্লাহ্র দিকে ফিরে যেতে হবে অর্থ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র দরবারে হিসাব প্রদানের জন্য উপস্থিত হতে হবে। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, মৃত্যুর পর রহমত অথবা আযাবের ফেরেশ্‌তা মৃত ব্যক্তির আত্মাকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

হজরত বারা বিন আজীব থেকে একটি দীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসী বান্দার রূহ্ ফেরেশ্‌তারা উপরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। এভাবে উর্দ্ধযাত্রার সময় বিভিন্ন ফেরেশ্‌তার দল জিজ্ঞেস করতে থাকে, এ পবিত্র আত্মা কার? আত্মা বহনকারী ফেরেশ্‌তার তখন ওই ব্যক্তির পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট পরিচিতি উল্লেখ করে বলে, এই আত্মা অমুকের পুত্র অমুকের। এভাবে ওই আত্মাকে পৃথিবী থেকে আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়। তার জন্য আকাশের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। আকাশের নৈকট্যধারী ফেরেশ্‌তারা তখন পবিত্র আত্মা বহনকারী ফেরেশ্‌তাদের সঙ্গী হয়ে পরবর্তী আকাশ পর্যন্ত গমন করেন। এভাবে সাতটি আকাশ অতিক্রম করার পর আল্লাহ্তায়ালা ঘোষণা করেন, আমার এই বান্দার পুণ্য কর্মসমূহ ইল্লিয়্যিনে 'লিপিবদ্ধ' করে রাখো এবং তাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে দাও। রসুল স. আরো বলেছেন, অবিশ্বাসী বান্দার আত্মাকেও ফেরেশ্‌তারা উপরের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। বিভিন্ন ফেরেশ্‌তার দল তখন জিজ্ঞেস করে, এ অপবিত্র আত্মা কার? আত্মা বহনকারী ফেরেশ্‌তারা ওই ব্যক্তির পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ নাম নিয়ে বলে, এই আত্মা ওমুকের পুত্র ওমুকের। এভাবে আত্মা বহনকারী ফেরেশ্‌তার দল পৌঁছে যায় প্রথম আকাশে। প্রথম আকাশের প্রহরী ফেরেশ্‌তাদেরকে তারা আকাশের দরজা খুলে দিতে বলে। কিন্তু আকাশের দরজা তার জন্য খোলা হয় না। এরপর রসুল স. পাঠ করলেন— লা তুফাত্তাহু লাহুম আব্ওয়াবাস্ সামায়ি (তাদের জন্য আকাশের দরজা কখনোই উন্মুক্ত করা হবে না)। এরপর তিনি স. বললেন— আল্লাহ্পাক তখন বলবেন, সপ্তস্তর মৃত্তিকার নিচে 'সিজ্জিনে' তার নাম লিপিবদ্ধ করো। এই অমোঘ ঘোষণার পর ওই অপবিত্র আত্মাকে দূরে নিক্ষেপ করা হয়। এরপর রসুল স. উচ্চারণ

www.eelm.weebly.com

করলেন— ওয়া মাঁই ইউশ্‌রিক বিল্লাহি ফাকান্নামা খর্‌রা মিনাস্‌ সামায়ি ফাতাখাত্তাফাহুত্‌ তইরু আও তাহ্‌ই বিহির্‌ রিহু ফি মাকানিন সাহীক্ব (যে আল্লাহ্‌র শরীক করে, সে যেনো আকাশ থেকে পড়লো। অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো। অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো)।

শেষে বলা হয়েছে— 'আলা লাহুল হুক্‌মু ওয়া হুয়া আস্‌রাউ'ল হাসিবীন' (দেখো, কর্তৃত্ব তো তাঁরই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর)। বাক্যটির অর্থ— এ কথা সন্দেহাতীতরূপে সত্য যে, নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহ্‌র। আর তিনি হিসাব গ্রহণে অতুলনীয়রূপে তৎপর। অর্থাৎ একজনের হিসাব গ্রহণ কালে অন্য জনের হিসাব গ্রহণ বিলম্বিত হবে না। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, পৃথিবীর অর্ধ দিবস সময়ের মধ্যে আমি সকল সৃষ্টির হিসাব সম্পন্ন করবো।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৬৩, ৬৪

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ
اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ
كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ○

❒ বল, 'কে তোমাদিগকে ত্রাণ করে যখন তোমরা স্থলভাগের ও সমুদ্রের বিপদে কাতরভাবে এবং গোপনে তাঁহার নিকট অনুনয় কর, "আমাদিগকে ইহা হইতে ত্রাণ করিলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।"

❒ বল, 'আল্লাহ্‌ই তোমাদিগকে উহা হইতে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট হইতে ত্রাণ করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা তাঁহার শরীক কর।'

এরশাদ হয়েছে— 'কুল মাঁই ইউনাজ্জিকুম মিন জুলুমাতিল বার্‌রি ওয়াল বাহ্‌রি' (বলো, কে তোমাদেরকে ত্রাণ করে যখন তোমরা স্থলভাগের ও সমুদ্রের বিপদে পতিত হও)। এখানে 'জুলুমাত' (অন্ধকার) শব্দটির অর্থ করা হয়েছে বিপদ। বিপদ অন্ধকার সদৃশ। মানুষ স্থলভাগে ও সমুদ্র ভ্রমণকালে বিভিন্ন বিপদে পতিত হয়। কখনো পথ হারিয়ে ফেলে। কখনো তুফান, বজ্রপাত ইত্যাদির কারণে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। তখন সাহায্যের জন্য সকলে বিশুদ্ধ অন্তরে কেবল

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকে। কেননা অংশীবাদীরাও জানে, প্রতিমা বা দেবতা দ্বারা মানুষের কোনো উপকার বা ক্ষতি সাধিত হয় না।

এরপর বলা হয়েছে—তাদ্‌উ'নাহূ তাদ্বর্‌রুআ'ও ওয়া খুফ্‌ইয়াতান (কাতরভাবে এবং গোপনে তাঁর নিকট অনুনয় করে)। এখানে 'তাদ্বর্‌রুআন' শব্দটির অর্থ অনুনয় করা বা বিনীতভাবে প্রার্থনা করা। 'তাদ্বর্‌রুআন' (অনুনয়) এবং 'খিফাতান' (গোপন) —দু'টো শব্দই মূল ধাতু। কিন্তু শব্দ দু'টো কর্তৃকারকের অর্থবহ। উল্লেখ্য যে, গোপনে দোয়া করা এবং জিকির করা সুন্নত। রসুল স, বলেছেন, তোমরা কোনো বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না (আল্লাহ্‌তায়ালা বধিরও নন কিংবা অনুপস্থিতও নন যে, তোমরা তাকে উচ্চস্বরে ডাকতে থাকবে। বরং তিনি সকল সময়ে ও স্থানে সমভাবে উপস্থিত। তাঁর ওই অতুলনীয় বিদ্যমানতার কারণে তিনি অনুচ্চস্বরের ও অন্তরের প্রার্থনাও শ্রবণ করেন)। আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ এই যে— বিনয় ও বিশুদ্ধতার সঙ্গে ইবাদত করলে সে ইবাদতে রিয়ার (গর্বের) সম্ভাবনা থাকে না।

শেষে বলা হয়েছে— লা ইন আনজানা মিনহাজিহি লানা কুনান্না মিনাশ্‌শাকিরীন (আমাদেরকে এই বিপদ থেকে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো)। এখানে হাজিহি (এ) অর্থ— এই ঘোর অন্ধকার সদৃশ বিপদ থেকে। আলোচ্য বাক্যটি বিপদগ্রস্তদের একটি প্রার্থনার উদ্ধৃতি। প্রার্থনাটিতে বলা হয়েছে— এই বিপদ থেকে যদি আমরা পরিত্রাণ পাই, তবে মহাপরিত্রাতা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিয়ম হচ্ছে— যিনি ত্রাণকর্তা তাঁর অনুগ্রহকে স্বীকার করা এবং ওই অনুগ্রহের হক আদায় করা। অর্থাৎ অনুগ্রহদাতার সন্তোষের পথে চলা।

পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— কুলিল্লাহু ইউনাজ্জিকুম মিনহা ওয়ামিন কুল্লি কার্‌বিন ছুম্মা আনতুম তুশরিকুন (বলো, আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে ওই বিপদ থেকে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে ত্রাণ করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা তাঁর শরীক করো)। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি বলে দিন, কেবল আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে ওই বিপদের ঘোর অন্ধকার থেকে এবং সকল প্রকার দুঃশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করেন। এর পরেও তোমরা তাঁর সঙ্গে শরীক করো। তোমরা ভালো করেই জানো যে— প্রতিমা বা দেব দেবী নয়, একমাত্র আল্লাহ্‌ই সকল বিপদের একমাত্র উদ্ধারকারী। তবুও তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করো। প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হও। এভাবে ধাবিত হও শিরিকের পথে। এখানে তুশরিকুন শব্দটি আগের বাক্যের শাকেরীন শব্দের বিপরীত। অর্থাৎ শরীক করা ও কৃতজ্ঞ হওয়া পরস্পর বিরোধী দু'টি বিষয়। 'ছুম্মা আনতুম' কথাটির মাধ্যমে ওই বিষয় দু'টোকে পৃথকীকরণ করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۗ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ○ وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۗ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ○ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۡ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

❒ বল, 'তোমাদিগের উর্ধ্বদেশ অথবা তলদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিতে, তোমাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিতে এবং এক দলকে অপর দলের নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাইতে তিনিই সক্ষম।' দেখ, কিরূপ বিভিন্ন প্রকারে আয়াত বিবৃত করি যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে।

❒ তোমার সম্প্রদায় তো উহাকে মিথ্যা বলিয়াছে অথচ উহা সত্য। বল, 'আমি তোমাদিগের কার্যনির্বাহক নহি।'

❒ প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রহিয়াছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হইবে।

কুল হুয়াল ক্বাদিরু আ'লা আঁইয়াব্‌য়াছা আ'লাইকুম আ'জাবাম্ মিন্ ফাওক্বিকুম আওমিন তাহ্‌তি আরজুলিকুম (বলো, তোমাদের উর্ধ্বদেশ অথবা তলদেশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে সক্ষম)। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, আল্লাহ্‌পাকই আকাশ থেকে এবং মৃত্তিকাভ্যন্তর থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে সক্ষম। যেমন তিনি আকাশী শাস্তি দিয়েছিলেন হজরত নূহের সম্প্রদায়কে অঝোর বৃষ্টি ও তুফানের মাধ্যমে। আদ্ সম্প্রদায় এবং হজরত লুতের সম্প্রদায়কেও দিয়েছিলেন অগ্নিপাত ও প্রস্তরপাতের শাস্তি। আর কাবাগৃহ ধ্বংসের নিমিত্তে অগ্রসরমান হস্তি বাহিনীকে আবাবিল পাখির কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে করে দিয়েছিলেন ভূতলশায়ী। আর তিনি মৃত্তিকার তলদেশ থেকেও শাস্তি আনয়ন করেছিলেন। তাই মাটি ফেটে প্রবল জলস্রোত নির্গত হয়ে ডুবিয়ে দিয়েছিলো হজরত নূহের সম্প্রদায়কে। অবাধ্য ফেরআউনও লাভ করেছিলো সলিল সমাধি। আর কারুণকে প্রোথিত করা হয়েছিলো মৃত্তিকায়।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ বলেছেন, এখানে উর্ধ্বদেশের শাস্তি অর্থ— নিষ্ঠুর সম্রাটের অত্যাচার। আর তলদেশের শাস্তির অর্থ হচ্ছে অবাধ্য ও

www.eelm.weebly.com

দুষ্ট ক্রীতদাস। জুহাক বলেছেন, এখানে ঊর্ধ্বদেশ ও তলদেশের শাস্তি অর্থ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শাস্তি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ঊর্ধ্বদেশের শাস্তি হচ্ছে অতি বৃষ্টি এবং তলদেশের শাস্তি হচ্ছে অজন্মা বা খরা।

আও ইয়ালবিসাকুম শিইয়্যাআঁও ওয়া ইউজিক্বা বা'দ্বাকুম বা'সা বা'দ্বিন (অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং এক দলকে অপর দলের নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাতে তিনিই সক্ষম)। এখানে 'ইয়ালবিসা' শব্দটির অর্থ মিলিয়ে দেয়া। 'শিইয়্যাআন' অর্থ পরস্পরবিরোধী চিন্তা ভাবনা ও রুচিসম্পন্ন বিভিন্ন দল। বা'সা অর্থ আযাব, যুদ্ধের ভয়াবহতা। কামুস। আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে তোমরা পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহ্পাক এটা করতে সক্ষম।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, যখন এই আয়াতের (৬৫) 'কুল হুওয়াল ক্বাদিরু' থেকে 'ফাওক্বাকুম' পর্যন্ত অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. বললেন, 'আউজু বিওয়াজহিকাল কারীম'। তখন অবতীর্ণ হলো— 'আও ইয়ালবিসাকুম' থেকে 'বা'সা বা'দ্বিন' পর্যন্ত। রসুল স. তখন বললেন, (প্রথমোক্ত আজাব থেকে) এটা অনেক সহজ ও সহনীয়। বোখারী প্রমুখ।

দ্রষ্টব্যঃ শেষোক্ত অংশ (এক দলকে অপর দলের নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাতে তিনিই সক্ষম) বাক্যটির বাস্তবায়ন শুরু হয় পঁয়ত্রিশ হিজরী সালে। ওই সময়ে মুসলমানদের মধ্যে উষ্ট্রের যুদ্ধ (জংগে জামাল) এবং সিফ্ফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ওই সকল যুদ্ধে মুসলমানদের হাত রঞ্জিত হয় মুসলমানের রক্তে।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. এর সফরসঙ্গী ছিলাম। বনী মুআবিয়ার মসজিদের পাশ দিয়ে গমন করছিলাম আমরা। রসুল স. থামলেন। মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামাজ পাঠ করলেন। আমিও দু'রাকাত নামাজ পড়লাম। নামাজের পর রসুল স. দীর্ঘক্ষণ ধরে দোয়া করলেন। তারপর বললেন, আমি আমার প্রভু প্রতিপালকের নিকট তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা জানালাম। প্রথমটি হচ্ছে, আমার উম্মতকে যেনো হজরত নূহের উম্মতের মতো পানিতে ডুবিয়ে মারা না হয়। আল্লাহ্পাক আমার এই দোয়া কবুল করেছেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে— আমার উম্মত যেনো দুর্ভিক্ষগ্রস্ত না হয়। আল্লাহ্পাক আমার এই দোয়াটিও কবুল করেছেন। তৃতীয়টি হচ্ছে— আমার উম্মতেরা যেনো নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হয়— আল্লাহ্পাক আমার এই প্রার্থনাটিকে কবুল করেন নি। বাগবী।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আবদুর রহমান আনসারী বর্ণনা করেছিলেন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন, রসুল স. এক মসজিদে বসে তিনটি বিষয়ে দোয়া করেছেন— যার দু'টি কবুল হয়েছে, একটি

www.eelm.weebly.com

হয়নি। প্রথম দোয়াটি ছিলো— ইসলামের কোনো শত্রুকে যেনো আমার উম্মতের উপরে বিজয়ী করা না হয়। দ্বিতীয় দোয়াটি ছিলো— আমার উম্মত যেনো কখনো ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষকবলিত না হয়। এই দোয়া দু'টি কবুল হয়েছে। তৃতীয়টি কবুল হয়নি। তৃতীয়টি ছিলো— আমার উম্মত যেনো গৃহযুদ্ধে লিপ্ত না হয়। বোখারী।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত জায়েদ বিন আসলাম বলেছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. আমাদেরকে বললেন, আমার তিরোধানের পর তোমরা ইসলাম পরিত্যাগ করে অবিশ্বাসী হয়ো না। তোমরা তো তখন একজন অন্যজনের উপর তরবারীর আঘাত করতে থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রসুল (এ রকম সাক্ষী প্রদানের পরেও কি আমরা অবিশ্বাসকে গ্রহণ করবো?)। একজন সাহাবী বলে উঠলেন, আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করবো— এ রকম কখনো হতে পারে না। আমরা তো মুসলমান। তখন অবতীর্ণ হলো— 'উনজুর কাইফা নুসার্‌রিফুল আয়াতি লায়াল্লহুম ইয়াফ্‌ক্বহুন' (দেখো, কিরূপ বিভিন্ন প্রকারে আয়াত বিবৃত করি যাতে তারা অনুধাবন করে)।

পরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'ওয়াকাজ্‌জাবা বিহি ক্বাওমুকা ওয়া হুয়াল হাক্‌ক্বু ক্বুল লাস্‌তু আ'লাইকুম বিওয়াকিল' (তোমার সম্প্রদায় তো একে মিথ্যা বলেছে অথচ এটা সত্য। বলো, আমি তোমাদের কার্যনির্বাহক নই)। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা বলেছে। অথচ তা চিরন্তন সত্য। আপনি তাদেরকে এ কথা বলুন যে, আমি (রসুল) তোমাদেরকে জোর করে হেদায়েত দান করবো বা অস্বীকার করার কারণে তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবো— এ রকম দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়নি। কারণ প্রকৃত কার্যনির্বাহক আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং। আমি নই।

এর পরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'লিকুল্লি নাবাইম্ মুস্‌তাক্বার্‌রুন- ওয়াসাওফা তা'লামুন' (প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রয়েছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হবে)। এ কথার অর্থ—'অবিশ্বাসীদের জন্য আযাব অবধারিত', এ সংবাদটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত সময় রয়েছে। ওই সময়ের কখনো অগ্র-পশ্চাৎ ঘটবে না। অতএব হে অবিশ্বাসীরা! সত্বর তোমরা জানতে পারবে যে, প্রদত্ত সংবাদটি অবিসংবাদীতরূপে সত্য। আযাব তোমাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে। হয় পৃথিবীতে। না হয় আখেরাতে।

www.eelm.weebly.com

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي
حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

❐ তুমি যখন দেখ, তাহারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরিয়া পড়িবে যে পর্যন্ত না তাহারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের সহিত বসিবে না।

মুশরিকদের মজলিশে বসতে নিষেধ করা হয়েছে এই আয়াতে। ওই সময় মক্কার মুশরিকেরা তাদের মজলিশে বসে কোরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলতো। ত্রুটি নির্দেশ করতো বিভিন্ন আয়াতের। কোরআনকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন কথা বলে মেতে উঠতো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও হাসি-তামাশায়। তাই আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে ওই সকল মজলিশ পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন—'তুমি যখন দেখো তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন, তখন তুমি দূরে সরে পড়বে যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়'। আয়াতটি কিন্তু কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিত্যাগের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়নি এবং জেহাদের আয়াত দ্বারা এই আয়াতটি রহিতও হয়নি। এখানে কেবল এই নির্দেশনাটি দেয়া হয়েছে যে, মুশরিকদের বিদ্রূপপ্রবণ এবং সমালোচনামুখর অধিবেশন পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ তাদের মজলিশ প্রকৃতপক্ষে শয়তানের মজলিশ। আর শয়তানের মজলিশে বসা নিঃসন্দেহে একটি গর্হিত কর্ম। রসুলুল্লাহ্ স. এবং বিশ্বাসীদের জন্য তাই ওরকম অধিবেশনে উপবেশন করা শোভনীয় নয়।

শয়তানের অধিবেশন থেকে দূরে থাকা অত্যাবশ্যক। তাই পরক্ষণে এরশাদ হয়েছে—'এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবে না।' এখানে 'জলিমীন' শব্দটির মাধ্যমে অংশীবাদীদেরকে সীমালংঘনকারী বা জালেমরূপে অভিহিত করা হয়েছে।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা তাহলে কাবাগৃহের চত্বরে কিভাবে উপবেশন করবো? কাবাগৃহের তাওয়াফ্ইবা করবো কিভাবে? মুশরিকেরা তো অধিকাংশ সময় সেখানেই মজলিশ বসায়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে—

www.eelm.weebly.com

সাহাবীগণ তখন বললেন, আমরা যদি তাদের মিথ্যাচারের প্রতিবাদ না করি তবে তো আমরা পাপী হয়ে যাবো। তাঁদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৬৯, ৭০

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ۝ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا
شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا
كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

❐ উহাদিগের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদিগের নহে যাহারা সাবধানতা অবলম্বন করে; তবে উপদেশ দেওয়া তাহাদিগের কর্তব্য যাহাতে উহারাও সাবধান হয়।

❐ যাহারা তাহাদিগের দ্বীনকে ক্রীড়াকৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাহাদিগকে প্রতারিত করে তুমি তাহাদিগের সঙ্গ বর্জন কর এবং ইহা দ্বারা তাহাদিগকে উপদেশ দাও; যাহাতে কেহ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ্ ব্যতীত তাহার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকিবে না এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তাহা গৃহীত হইবে না; ইহারাই কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হইবে; সত্য প্রত্যাখ্যান হেতু ইহাদিগের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

ওয়ামা আ'লাল্লাজিনা ইয়াত্তাকুনা মিন হিসাবিহিম মিন শাইইন (ওদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যারা সাবধানতা অবলম্বন করে)। এখানে 'মিনহিসাবিহিম' কথাটির 'মিন' শব্দটি মিন এ তাবইজ (আংশিক অর্থ প্রকাশক)। আর 'মিনশাইইন' এর 'মিন' হচ্ছে মিন এ জায়েদ (অতিরিক্ত 'মিন')। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— কিয়ামতের দিন যখন অবিশ্বাসীদের অপকর্মের হিসাব নেয়া হবে, তখন বিশ্বাসীদেরকে এ প্রসঙ্গে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। অর্থাৎ যারা মুত্তাকী (সাবধানী) তারা অবিশ্বাসীদের কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী নয়।

www.eelm.weebly.com

'ওয়ালাকিন জিকরা' (তবে উপদেশ দেয়া তাদের কর্তব্য)— কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— তবে বিশ্বাসীদের উচিত তারা যেনো মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকার জন্য অংশীবাদীদেরকে সামর্থানুযায়ী উপদেশ দেয়। এ রকম উপদেশকে তারা হয়তো কখনো গ্রহণ করতেও পারে। তাই শেষে বলা হয়েছে— লায়াল্লাহুম ইয়াত্তাকুন (যাতে তারাও সাবধান হয়)। এই 'সাবধান হয়' কথাটি ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'সাবধানতা অবলম্বন করে' কথাটির সঙ্গেও সম্পৃক্ত করা সম্ভব। যদি তাই হয় তবে অর্থ হবে এ রকম— বিশ্বাসীরা যেনো অবিশ্বাসীদেরকে সদুপদেশ দান করা নিজেদের কর্তব্য বলে বিবেচনা করে এবং নিজেরাও সাবধান হয় (অবিশ্বাসীদের মজলিশে বসা থেকে বিরত থাকে)।

এর পরের আয়াতে এরশাদ হয়েছে— 'ওয়া জারিল্লাজিনাত্তাখাজু দিনাহুম লায়িবাঁও ওয়া লাহ্ওয়া (যারা তাদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করে)। এ কথার অর্থ—অবিশ্বাসীদের আচরণীয় ধর্ম ক্রীড়া-কৌতুকপূর্ণ। প্রতিমা পূজা, বাহিরা ও সায়বা (দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয়া পশু) — এগুলো তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাদের এই স্বকপোলকল্পিত ধর্মের দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাত— কোনো স্থানে তারা উপকৃত হবে না। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, সদ্য অবতীর্ণ সত্য ধর্ম ইসলামকে এবং ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধানকে তারা ক্রীড়া-কৌতুক বলে মনে করে। সত্যের প্রতি অবলীলাক্রমে বর্ষণ করে বিদ্রূপবান।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য উৎসবের দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কেবল মুসলমানেরা ছাড়া অন্যেরা ওই দিনগুলোকে ক্রীড়া-কৌতুকে পরিণত করেছে। কিন্তু মুসলমানেরা উৎসবের দিনকে ইবাদতের দিন হিসেবেই বহাল রেখেছে। যেমন— ঈদ, জুমআ, তাকবীর, কোরবানী, সদকায়ে ফিতর, খুতবা ইত্যাদি।

'জারিল্লাজিনা' কথাটির মাধ্যমে এখানে জানানো হয়েছে যে, মুশরিকদের কথা ও কার্যাবলীর দিকে ভ্রূক্ষেপই করা চলবে না। অথবা 'জার' শব্দটির উদ্দেশ্য এখানে ধমক দেয়া কিংবা ভয় দেখানো। যেমন, অন্য আয়াতে এসেছে— জারনি ওয়ামান খালাক্তু ওয়াহিদা (আমাকে ছেড়ে দাও)।

কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— মুশরিকদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ো না, তাদের অপআচরণের প্রভাব থেকে নিজেকে বিরত রাখো। এ অর্থটি গ্রহণ করলে মেনে নিতে হবে যে, জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আলোচ্য আয়াতটি রহিত হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

ওয়া গর্‌রাত হুমুল হায়াতুদ্ দুন্‌ইয়া(পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে) — কথাটির অর্থ, তারা নিমগ্ন হয়েছে পার্থিব জীবনের প্রতারণায়। তাই পুনরুত্থান দিবসের কথা বিস্মৃত হয়েছে তারা।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়া জাক্‌কির বিহি আন্ তুব্‌সালা নাফ্‌সুম বিমা কাসাবাত-লাইসা লাহা মিন্‌দুনিল্লাহি ওয়ালিইঁউ ওয়ালা শাফিউ'ন (এই কোরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকো; যাতে পরিণামে কেউ নিজ কৃত কর্মের জন্য ফাঁদে না পড়ে, যখন আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না)। এখানে 'তুব্‌সালা' শব্দটির পূর্বে 'লা' (না) শব্দটি উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য শব্দটিসহ অর্থ করা হয়েছে এ রকম— 'ফাঁদে না পড়ে'। 'বাসাল' শব্দের অর্থ বন্ধ করে রাখা বা ঠেকিয়ে রাখা। কামুস গ্রন্থে রয়েছে— শব্দটির অর্থ সাহায্যকারী বন্ধু, যিনি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আযাবকে প্রতিহত করতে পারেন। 'শাফিউন' অর্থ সুপারিশকারী, যিনি সুপারিশ করে আযাব থেকে রক্ষা করেন।

এরপর বলা হয়েছে ওয়া ইন তা'দিলহকুল্লা আ'দ্‌লিল্‌লা ইউখাজু মিন্‌হা (এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা গৃহীত হবে না)। এ কথার অর্থ— কিয়ামতের দিন দুনিয়ার সকল সম্পদ দিয়ে দিলেও আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। এখানে 'আ'দল' শব্দটি ধাতুগত অর্থ প্রকাশ করেছে। তাই 'লা ইউখাজু' শব্দটির সর্বনাম তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে পারে না। কিন্তু অন্য আয়াতে 'আ'দলুন' শব্দটি কর্তৃকারকের অর্থপ্রকাশক হয়েছে। যেমন—'লা ইউখাজু মিনহা আ'দলুন'। তাই 'লা ইউখাজু' শব্দটির সম্পর্ক সেদিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। 'আদলুন' অর্থ ফিদ্‌ইয়া বা বিনিময়। বিনিময় সবসময় সমমানের হয় বলে এখানে বিনিময়কে আ'দল বলা হয়েছে। এখানে 'কুল্লা আ'দলিন' অর্থ 'বিনিময়ে সব কিছু দিয়ে দিলেও'। এরপর বলা হয়েছে— উলাইকাল্লাজিনা উব্‌সিলু বিমা কাসাবু লাহুম শারাবুম্ মিন্ হামিমিউঁ ওয়া আ'জাবুন আলিমুম বিমা কানু ইয়াকফুরুন (এরাই কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে; সত্য-প্রত্যাখ্যান হেতু এদের জন্য রয়েছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি)। এখানে উলাইকা (এরাই) শব্দটির মাধ্যমে ওই সকল লোকের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুকে পরিণত করেছিলো। উব্‌সিলু অর্থ তাদেরকে ধ্বংস করা হবে। অর্থাৎ তাদেরকে আযাবের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। হামিমীন অর্থ চূড়ান্ত পর্যায়ের উত্তপ্ত সলিল (অত্যুষ্ণ পানীয়)। আর আ'জাবুন আ'লীম কথাটির অর্থ অগ্নি ও অন্যান্য শাস্তি। এখানে 'বিমা কানু' শব্দটির 'বা' অক্ষরটি একটি কারণ নির্দেশক অব্যয়। অথবা 'বিমা কানু' একটি পৃথক বাক্য। কিংবা কথাটি 'উলাইকা' শব্দটির দ্বিতীয় বিধেয়।

www.eelm.weebly.com

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا
بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ
لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ
وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ؕ وَهُوَ الَّذِىْٓ
اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

❐ বল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকিব যাহা আমাদিগের কোন উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে না? আল্লাহ্ আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইব যাহাকে শয়তান দুনিয়ার পথ ভুলাইয়া হয়রান করিয়াছে; যদিও তাহার সহচরগণ তাহাকে ঠিক পথে আহবান করিয়া বলে আমাদিগের নিকট আইস।" বল, 'আল্লাহের পথই পথ এবং আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।

❐ এবং সালাত কায়েম করিতে ও তাঁহাকে ভয় করিতেও, এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।'

কুল আনাদ্‌উ' মিনদুনিল্লাহি মালা ইয়ানফাউ'না ওয়ালা ইয়াদুররুনা ওয়া নুরাদ্‌দু আ'লা আ'ক্বাবিনা ব'াদা ইজহাদানাল্লহ্ (বলো, আল্লাহ্ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকবো যা আমাদের কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না? আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের পর)। কথাটির অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, তোমাদের মতো আমরাও কি প্রতিমাপূজারী হবো? কেনো হবো? পূজা পেলেও তো প্রতিমাগুলো তার উপাসকদের কোনো উপকার করতে পারে না। আর পূজা না পেলে করতে পারে না কোনো অপকার। আল্লাহ্‌পাক দয়া করে আমাদেরকে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন। দিয়েছেন সত্য ধর্ম ইসলাম। এর পরেও হে মূর্তি পূজকেরা তোমরা কি এমতো আশা করো যে, আমরা অবিশ্বাসের ডাকে সাড়া দেবো?

www.eelm.weebly.com

এরপরে বলা হয়েছে— কাল্লাজিস্ তাহ্ওয়াত্হুশ্ শাইয়া তিনু ফিল আরদ্বি হাইরানালাহু আস্হাবুঁই ইয়াদ্উ নাহু ইলাল হুদা'তিনা (আমরা কি সেই ব্যক্তির মতো পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবো যাকে শয়তান দুনিয়ার পথ ভুলিয়ে হয়রান করেছে; যদিও তার সহচরগণ তাকে ঠিক পথে আহবান করে বলে 'আমাদের নিকটে এসো')। এখানে 'হাওয়া' শব্দটির অর্থ যাওয়া। 'ইসতাহ্ওয়াতুহু' অর্থ— তাকে নিয়ে যেতে চাওয়া, নিয়ে যাওয়া। কাল্লাজিনা শব্দটির 'কাফ' অক্ষরটি এখানে যবর বিশিষ্ট। এটাকে কর্মকারক বলা যেতে পারে। অথবা 'নুরাদ্দু' শব্দটির সর্বনামের প্রকৃতি এখানে বুঝানো হয়েছে। এভাবে প্রথম অবস্থায় বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— আমরা কি পুনরায় অংশীবাদীতার দিকে ফিরে যাবো, যেভাবে ফিরে গিয়েছে ওই সকল লোক— যাদেরকে শয়তান পথ ভুলিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থ হবে— আমরা কি শিরিকের দিকেই ফিরে যাবো তাদের সাথে সাদৃশ্য রক্ষার্থে— যাদেরকে শয়তান ভুলিয়ে দিয়েছে সঠিক পথের দিশা।

শায়াতিন শব্দটির অর্থ অবাধ্য জ্বিন এবং আল আরদ্বি শব্দটির অর্থ মরুভূমি বা জনশূন্য প্রান্তর। এভাবে অর্থ হবে— শয়তান তাদেরকে সঠিক পথ থেকে ভুলিয়ে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছে। হাইরানা শব্দটি ইস্তাহ্ওয়াত্হু শব্দের কর্মপদী সর্বনামের অবস্থাজ্ঞাপক। অর্থাৎ তারা হয়রান পেরেশান হয়ে ঘুরতে থাকে, বুঝতে পারে না— কোথায় যাবে, কি করবে। 'আলহুদা' শব্দটি এখানে মূল ধাতু এবং কর্ম কারকের অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ সোজা পথ। ইয়াদ্উ'নাহু এর ব্যাখ্যা ই'তিনা। ইয়াদ্উ'না শব্দটির বক্তব্য প্রকাশক। অর্থাৎ তার সহচরগণ তাকে ডাকছে। বলছে, আমাদের কাছে এসো। অথচ সে তাদের ডাক শুনলো না এবং তাদের কাছেও এলো না।

যে ব্যক্তি ইসলামের পথ থেকে সরে যায়, মুসলমানেরা তাকে ইসলামের পথে উদাত্ত আহ্বান জানালেও যে ওই আহ্বানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না— আল্লাহ্তায়ালা তার তুলনা করেছেন ওই সকল লোকের সঙ্গে, যাদেরকে শয়তান গভীর অরণ্যে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। তার সাথীরা তাকে ডাকছে। কিন্তু সে শুনছে না।

'আনাদ্উ' প্রশ্নটি একটি না সূচক উত্তরসম্বলিত প্রশ্ন (ইসতেফ্হামে ইনকারী)। অর্থাৎ আমরা এখন এরূপ করবো না এবং উপমিতি সূচক পূর্ণ বাক্যটি পূর্বোক্ত 'নুরাদ্দু' শব্দের সর্বনামের অবস্থাজ্ঞাপক।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— ক্বুল ইন্না হুদাইয়াল্লহি হুয়াল হুদা ওয়া উমিরনা লিনুসলিমা লিরব্বিল আ'লামীন। কথাটির অর্থ হে আমার রসুল! আপনি বলুন, 'আল্লাহ্র পথই পথ এবং আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট হয়েছি।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— ওয়াআন আকিমুস্ সালাতা ওয়াত্তাকুহু (এবং আদিষ্ট হয়েছি সালাত কায়েম করতে এবং তাঁকে ভয় করতেও)। আগের আয়াতে 'লিনুস্ লিমা' শব্দটির 'লাম' অক্ষরটি ছিলো অতিরিক্ত। অথবা 'বা' অক্ষরের অর্থ প্রকাশক হিসেবে সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'লাম' অক্ষরটি। আর আলোচ্য আয়াতের 'আন' শব্দটি লুপ্ত সুনির্দিষ্ট। তাই ক্রিয়া এখানে মূল ধাতু হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা লিমুসলিমা শব্দের 'লাম' অক্ষরটি তা' লিলিয়াহ্ (কারণ প্রকাশক) এবং উমিরনা (আদিষ্ট হয়েছি) শব্দটির কর্ম এখানে উহ্য রয়েছে। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— আমাদেরকে দেয়া হয়েছে রসুলের অনুসরণের আদেশ, যেনো আমরা সকলে মহান প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রকৃত দাস হয়ে যাই (সালাত কায়েম করি এবং তাঁকে ভয় করি)। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র আনুগত্য ও নৈকট্য, রসুলুল্লাহ্ স. এর আনুগত্য ও নৈকট্যের উপর নির্ভরশীল।

সবশেষে বলা হয়েছে— ওয়া হুয়াল্লাজি ইলাইহি তুহ্শারুন। কথাটির অর্থ—— এবং তাঁরই নিকটে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ্তায়ালার সকাশে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে চূড়ান্ত বিচারের জন্য সকলকে একত্র করা হবে।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ৭৩

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۬ؕ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

☐ তিনিই যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; যখন তিনি বলেন 'হও' তখনই হইয়া যায়; তাঁহার কথাই সত্য; যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁহারই; অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত; আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।

---

www.eelm.weebly.com

এরশাদ হয়েছে— ওয়া হুওয়াল্লাজি খলাক্বাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা বিল হাক্কি (তিনিই যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)। এখানে বিল হাক্কি শব্দটির অর্থ যথাকুশলতার সঙ্গে বা যথাবিধি। অথবা এর অর্থ বাস্তবরূপ দেয়া। কিংবা 'বা' অক্ষরটির অর্থ এখানে 'লাম'। অর্থাৎ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য (তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী)।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়া ইয়াওমা ইয়াকুলু কুন্ ফাইয়াকুন্ (যখন তিনি বলেন 'হও' তখনই হয়ে যায়)। এ কথার অর্থ— কিয়ামতের দিন তিনি মৃতদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, উঠে দাঁড়াও। তখন সকলে পুনর্জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে। কথাটি নিঃসন্দিগ্ধ। তাই পরক্ষণেই বলা হয়েছে— ক্বাওলুহুল হাক্ব (তাঁর কথাই সত্য)।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়ালাহুল মুলকু ইয়াওমা ইউনফাখু ফিস্সুরি (যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁরই)। আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র বাণী সত্য। অন্য আয়াতেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। যেমন— (কিয়ামতের দিন তিনি বলবেন) 'আজকের দিনের কর্তৃত্ব কার? একমাত্র আল্লাহ্রই কর্তৃত্ব— যিনি বিজয়ী'। আলোচ্য বাক্যটিতে উল্লেখিত 'সুর' শব্দটির অর্থ শিংগা। একবার এক বেদুইন রসুল স. এর নিকটে শিংগা সম্পর্কে জানতে চাইলো। তিনি স. বললেন, শিংগা ওটাই যাতে ফুৎকার দেয়া হবে। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস থেকে ইবনে মুবারক তাঁর জুহুদ নামক গ্রন্থে এবং বায়হাকী তাঁর আলবা'ছ নামক গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। নাসাঈও হাদিসটি সংকলন করেছেন। ইবনে হাব্বানও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদিসটি বিশুদ্ধ। আবু দাউদও হাদিসটির বর্ণনাকারী। তিনি বলেছেন, হাদিসটি হাসান।

আবু শায়েখ ইবনে হাব্বান কিতাবুল আজামাহ্ নামক গ্রন্থে ওহাব বিন মুনাব্বাহ্র মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ শিংগা সৃষ্টি করেছেন স্বচ্ছ কাঁচের মতো উজ্জ্বল শাদা মোতি দ্বারা। তারপর আরশকে নির্দেশ দিয়েছেন— হে আরশ, শিংগাকে ধারণ করো। আরশ তখন শিংগাকে ধারণ করলো। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, 'হয়ে যাও'। তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি হলেন হজরত ইস্রাফিল। হজরত ইস্রাফিলকে নির্দেশ দিলেন, শিংগাটি গ্রহণ করো। হজরত ইস্রাফিল শিংগা গ্রহণ করলেন। আল্লাহ্পাক যতগুলো জীবন সৃষ্টি করেছেন ততগুলো ছিদ্র রয়েছে ওই শিংগায়। দু'টি রূহের জন্য একটি ছিদ্র রয়েছে— এমন কখনো নয়। শিংগার মধ্যস্থলে রয়েছে আকাশ পৃথিবীর গোলকের মতো এক বিশাল গহ্বর। ওই গহ্বরে মুখ লাগিয়ে রয়েছেন হজরত ইস্রাফিল। আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইস্রাফিলকে বললেন,

www.eelm.weebly.com

শিংগায় ফুঁ দেয়ার দায়িত্ব আমি তোমাকেই দিলাম। সেই থেকে হজরত ইসরাফিল আরশের সম্মুখভাগে বসে ডান পা আরশের নিচে প্রবেশ করিয়ে বাম পা সামনে বাড়িয়ে রেখেছেন এবং নিষ্পলক নেত্রে আল্লাহ্পাকের নির্দেশের জন্য প্রহর গুণে চলেছেন।

হজরত জায়েদ বিন আরকাম থেকে উত্তম সূত্রে আহমদ ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আমরা কিভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করবো। আল্লাহ্পাকের নির্দেশের অপেক্ষায় শিংগাওয়ালা যে শিংগা মুখে নিয়ে মস্তক ঝুঁকিয়ে উৎকর্ণ হয়ে আল্লাহ্পাকের নির্দেশের জন্য অপেক্ষমান। এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম সন্ত্রস্ত হলেন। তিনি স. বললেন, তোমরা এই কালামটি পড়তে থাকো— হাসবুনাল্লহু ওয়ানি'মাল ওয়াকিল (আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের উত্তম রক্ষক)। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। মুসতাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন হাকেম, আলব'াছ গ্রন্থে বায়হাকী এবং আওসাত গ্রন্থে তিবরানী। এক বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. তখন তাঁর সহচরবৃন্দকে এই দোয়াটি পাঠ করতে বলেছিলেন— হাসবুনাল্লহু ওয়ানি'মাল ওয়াকিল আ'লাল্লাহি তাওয়াক্কালনা। এ রকম হাদিস হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিরমিজি, হাকেম এবং বায়হাকীও বর্ণনা করেছেন। আর আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের থেকে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বায্যার এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতি প্রত্যূষে দু'জন ফেরেশতাকে শিংগার কাছে পাহারারত রাখা হয়। শিংগায় ফুঁক দানের নির্দেশ কখন আসে, সেই অপেক্ষায় তাঁরা থাকেন।

ইবনে মাজা ও বায্যাবের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দু'জন শিংগা ফুঁৎকারীর হাতে রয়েছে দু'টি শিংগা। দু'জনেই তাঁরা ফুঁৎকারের নির্দেশ শ্রবণের জন্য সতত উৎকর্ণ।

হজরত ইবনে ওমর থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন রসুল স. বলেছেন, শিংগায় ফুঁৎকার দানের দায়িত্ব বহনকারী দুই ফেরেশতা দুই আকাশে অবস্থান গ্রহণ করেছে। তাদের একজনের মাথা পূর্বপ্রান্তে এবং পা পশ্চিম প্রান্তে। অন্যজনের মাথা পশ্চিম প্রান্তে এবং পা পূর্বপ্রান্তে। তারা দু'জনে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে ফুঁৎকারের নির্দেশের জন্য প্রতীক্ষমান । এ সকল বর্ণনাদৃষ্টে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, দু'জন ফেরেশ্তা রয়েছেন শিংগা ফুৎকারের দায়িত্বে। আর তাদের প্রত্যেকের হাতে রয়েছে একটি করে শিংগা।

www.eelm.weebly.com

হজরত কা'ব আহ্বার থেকে উত্তমসূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, শিংগায় ফুঁক দানের দায়িত্ব বহনকারী ফেরেশতা এক পায়ের হাঁটু মুড়ে অপর পা খাড়া রেখে পিঠ ঝুঁকিয়ে শিংগা মুখে নিয়ে নির্দেশের অপেক্ষায় সদা প্রস্তুত রয়েছে। তাকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন হজরত ইস্রাফিলের ডানা সংকুচিত হয়ে আসবে, তখনই দিতে হবে ফুঁৎকার।

জননী আয়েশা থেকেও এ রকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে এ রকম বলতে শুনেছি। শায়েখ ইবনে হাজার বলেছেন, এই হাদিসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শিংগা ফুঁৎকারের দায়িত্বে রয়েছেন অন্য ফেরেশ্তারা— হজরত ইস্রাফিল নন। অথচ ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসমূহে দৃষ্ট হয়েছে যে, হজরত ইস্রাফিলই শিংগা ফুঁৎকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাই পরস্পরবিরোধী বিবরণ সমূহের সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলা হয়েছে— ওই শিংগাধারী ফেরেশতাদ্বয় যখন হজরত ইস্রাফিলের দু'টি ডানা সংকুচিত হতে দেখবেন, তখনই প্রথমবারের মতো ফুঁৎকার দিবেন তাদের শিংগায়। ওই ফুঁৎকার শুনে সকল মানুষ তাদের কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে। এরপর দ্বিতীয়বারের মতো শিংগায় ফুঁৎকার দিবেন হজরত ইস্রাফিল।

আবু শায়েখ ইবনে হাব্বান তাঁর 'আজামাহ্' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু বকর হাজালী বলেছেন, শিংগায় ফুঁৎকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতার এক পা রয়েছে পৃথিবীতে। সে হাঁটু গেড়ে হজরত ইস্রাফিলের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। তার সৃষ্টির পর সে কখনও চোখের পলক ফেলেনি। সে কেবল এই অপেক্ষায় রয়েছে যে কখন শিংগায় ফুঁৎকারের নিদর্শন প্রকাশিত হবে (কখন হজরত ইস্রাফিলের ডানা সংকুচিত হতে শুরু করবে)।

সবশেষে বলা হয়েছে— আ'লীমুল গইবি ওয়াশ্শাহাদাতি ওয়াহুয়াল হাকিমুল খবীর (অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সব কিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত; আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত)। এখানে গইব শব্দটির অর্থ অস্তিত্বপূর্ব অবস্থা (যা এখনো অবয়ব ধারণ করেনি)। শাহাদাতুন অর্থ প্রত্যক্ষগোচর সৃষ্টি— যা অস্তিত্বশীল। আল্লাহ্পাক দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল কিছুর স্রষ্টা। সকল সৃষ্টি তাঁর সম্মুখে সদা বিদ্যমান। আকাশ ও পৃথিবীর কোনো অণু-পরমাণুও তাঁর নিকট গোপন নয়। তিনি প্রজ্ঞাময় এবং বিজ্ঞানময় (সবিশেষ অবহিত)। অস্তিত্বশীল ও অস্তিত্বহীনতার সকল রহস্য তাঁর জ্ঞানায়ত্ব। তাই তিনি কিয়ামত, হিসাব, শাস্তি, বিনিময়— সৃষ্টিকুলের সামগ্রিক অবস্থা উত্তমরূপে অবগত।

www.eelm.weebly.com

وَاِذْقَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً اِنِّيْۤ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

❑ স্মরণ কর, ইব্‌রাহিম তাহার পিতা আযরকে বলিয়াছিল, 'আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ্‌ রূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি।'

ওয়া ইজক্বলা ইব্‌রাহীমু লিআবিহি আযারা আতাত্তাখিজু আসনামান আলিহাতান (স্মরণ করো, ইব্রাহিম তাঁর পিতা আযরকে বলেছিলো, 'আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করেন?)। আযর শব্দটি আরবী নয়। কেউ কেউ বলেছেন আরবী। আযর শব্দের অর্থ শক্তি। আর ওয়াযার শব্দটির অর্থ ভার বা ওজন। এ ওয়াযার থেকেই এসেছে আযর।

প্রকৃত কথা এই যে, আযর হজরত ইব্রাহিমের পিতা ছিলেন না— ছিলেন পিতৃব্য। আরব দেশে পিতৃব্যকেও পিতা বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে তাই হজরত ইব্রাহিমের চাচা আযরকে তাঁর পিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। অন্য আয়াতেও এরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— না'বুদু ইলাহাকা ওয়াইলাহা আবাইকা ইব্‌রহিমা ওয়া ইসমাইলা ওয়া ইস্‌হাক্বা ইলাহাও ওয়াহিদা (আমরা ইবাদত করি আপনার প্রতিপালকের এবং আপনার পিতৃপুরুষগণ— ইব্রাহিম, ইস্‌মাইল ও ইস্‌হাকের প্রতিপালকের)।

আযরের আসল নাম ছিলো নাখোর। সে প্রথমে তার পিতৃপুরুষের ধর্মানুসারে আল্লাহ্‌র এককত্বে বিশ্বাসী ছিলো। পরে সম্রাট নমরুদের সভাসদ হওয়ার কারণে লোভ লালসায় পড়ে মুশরিক হয়ে গিয়েছিলো। ইমাম রাযী বলেছেন, আযর হজরত ইব্রাহিমের চাচা ছিলো— বাপ নয়। তাঁর পূর্বের এক দল আলেমও এ রকম অভিমত পোষণ করেন।

আল্লামা জুরকানী 'শারহে মাওয়াহীব' গ্রন্থে লিখেছেন, শিহাব হাইসামী স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে— তওরাত ও ইঞ্জিল বিশেষজ্ঞগণ এবং সকল ঐতিহাসিক বলেছেন, আযর ছিলো হজরত ইব্রাহিমের চাচা।

আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ূতী লিখেছেন, আমার নিকট সূত্রপরম্পরায় এ কথাটি পৌঁছেছে যে, হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইবনে জারীর এবং সুদ্দী বলেছেন, আযর হজরত ইব্রাহিমের পিতা নয়। তাঁর পিতার নাম মারেখ। সুয়ূতী

www.eelm.weebly.com

এ কথাও লিখেছেন যে, ইবনে মুনজিরের তাফসীরে উল্লেখিত একটি আসারে (সাহাবীগণের উক্তি) আমি এ কথাটি পেয়েছি যে— আযর ছিলো হজরত ইব্রাহিমের চাচা।

কামুস গ্রন্থে রয়েছে, আযর ছিলো হজরত ইব্রাহিমের চাচা। তাঁর পিতার নাম ছিলো তারিখ্ অথবা তারিহ্। অথবা দু'টোই। এই আয়াতের ব্যাখ্যা থেকেও প্রমাণিত হয় যে আযর হজরত ইব্রাহিমের পিতা নন। সুরা বাকারায়ও এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন— 'ওয়ালা তাসআল আ'ন আস্হাবিল জাহীম' এই আয়াতের তাফসীর সূত্রে আমি সেখানে উল্লেখ করেছি যে—বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমাকে বনী আদমের উত্তম সময়গুলোর মধ্যে একটি উত্তম সময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাই আমি শেষ পর্যন্ত সেই যুগে এসেছি, যে যুগ ছিলো আল্লাহ্র জ্ঞানে। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর সকল উর্ধ্বতন পিতৃ-পুরুষ আল্লাহ্র নিরঙ্কুশ এককত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা কেউই মুশরিক ছিলেন না। কিন্তু আযর ছিলো মুশরিক। তাই সে হজরত ইব্রাহিমের চাচাই হবে— পিতা নয়। আল্লামা সুয়ূতী হজরত আদম থেকে রসুলুল্লাহ্ স. পর্যন্ত সকল নবী রসুলের পিতৃ-পুরুষদেরকে মুসলমান প্রমাণ করার জন্য কয়েকটি পুস্তিকাও লিখেছেন।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক, জুহাক এবং কালাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিমের পিতার ছিলো দু'টি নাম, আযর ও তারিখ— যেমন হজরত ইয়াকুবের আরেকটি নাম ছিলো ইস্রাইল। মুকাতিল এবং ইবনে হাব্বান বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের পিতার নাম ছিলো তারিখ। আর তার উপাধি ছিলো আযর। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিন হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর পিতা আযরের সাক্ষাৎ ঘটবে। বিমর্ষ আযরের চেহারায় তখন ফুটে উঠবে দোজখীদের চিহ্ন। হজরত ইব্রাহিম বলবেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার অবাধ্য হবেন না? আযর বলবে, আজ আমি তোমার বিরোধিতা করবো না। হজরত ইব্রাহিম তখন প্রার্থনা জানাবেন— হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! আপনি তো আমার সঙ্গে এই মর্মে অঙ্গীকার করেছেন যে, পুনরুত্থান দিবসে আপনি আমাকে অপমান করবেন না। আমার পিতা দুর্দশাগ্রস্ত। আমার জন্য এর চেয়ে অধিক অপমানজনক অবস্থা আর কী হতে পারে? আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। এরপর আল্লাহ্তায়ালা হুকুম করবেন, হে ইব্রাহিম! নিচের দিকে তাকাও। হজরত ইব্রাহিম নিচের দিকে তাকিয়ে দেখবেন কর্দমাক্ত একটি পুরুষ উদের মতো প্রাণীকে পা ধরে নরকে নিক্ষেপ করা হলো। আল্লাহ্পাকই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত। এই বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে আযর ছিলো হজরত ইব্রাহিমের পিতা।

www.eelm.weebly.com

সুলায়মান তায়মী বলেছেন, আযর অর্থ বক্র বা বাঁকা। এটি একটি অপছন্দনীয় শব্দ। এর ফারসী অর্থ হচ্ছে পায়ের গ্রন্থি।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব এবং মুজাহিদ বলেছেন, আযর একটি প্রতিমার নাম। ওই প্রতিমার পূজারীদেরকে বলা হতো আযর। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, আযর ছিলো আসলে আবদে আযর (আযরের ক্রীতদাস)। পরে আবদ শব্দটি লুপ্ত হয়েছে। প্রচলিত হয়েছে আযর নামটি। আযর প্রতিমার নাম ছিলো— কথাটি মেনে নিলে এখানে একটি সর্বনামবিশিষ্ট ক্রিয়া উহ্য রয়েছে বলে মেনে নিতে হয়। তখন আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— (তুমি কি আযরের পূজা করো) তুমি কি তাকে প্রভু মনে করো? তখন এ কথাই বলা উদ্দেশ্য হবে যে, হজরত ইব্রাহিমের পিতা কেবল আযর নামক প্রতিমার উপাসনা করতেন না, অন্যান্য প্রতিমাও ছিলো তাঁর উপাস্য। তাই এখানে 'তাত্তাখিজু' শব্দের পরে 'আস্নামান আলীহাতান' কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিমাপূজকেরা সন্দেহাতীতরূপে পথভ্রষ্ট। তাই হজরত ইব্রাহিমের উক্তিরূপে আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে— 'ইন্নি আরাকা ওয়া ক্বাওমাকা ফি দ্বলালিম মুবিন'। কথাটির অর্থ— আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৭৫

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۝

❑ এইভাবে ইব্‌রাহিমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাই যাহাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত হয়।

'ওয়া কাজালিকা নুরী ইব্‌রাহীমা মালাকুতাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি' (আমি ইব্রাহিমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাই)। এখানে নুরী শব্দটি অতীতকালবোধক। অর্থাৎ আল্লাহ্ এখানে বলছেন, আমি ইব্রাহিমকে আকাশ ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখিয়েছি। কিন্তু এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমানকালের সিগা (শব্দ প্রকরণ)।

কামুস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, মালাকুত অর্থ প্রাবল্য ও পরাক্রম। শব্দটি এসেছে মালাকুন থেকে। শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয় সুবিশাল সাম্রাজ্যের কথা। জাওহারী পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে, মালাকুত কেবল আল্লাহ্‌তায়ালার সাম্রাজ্যকে বলা হয়। কেননা প্রকৃত অর্থে তাঁর সাম্রাজ্যই সুবিশাল। এই সাম্রাজ্যের সম্পর্ক প্রধানতঃ আকাশমণ্ডলীর সঙ্গে। কারণ আকাশমণ্ডলী পৃথিবীর চেয়ে অনেক অনেক

www.eelm.weebly.com

বড়। আর আকাশমণ্ডলীও পৃথিবীতে কেবল আল্লাহ্তায়ালারই একচ্ছত্র অধিকার। মুজাহিদ এবং সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'মালাকুতাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি' কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত আল্লাহ্পাকের অপার ক্ষমতা ও প্রশাসনের নিদর্শনসমূহ।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ঘটনাটি ছিলো এ রকম— হজরত ইব্রাহিমকে একটি পাথরের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছিলো। আর তখন উঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো সকল পর্দা। এভাবে তাঁকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছিলো সকল আকাশ, পৃথিবীর নিম্নতম স্তর এবং আরশে মোয়াল্লা। এমন কি তিনি তাঁর জন্য নির্ধারিত বেহেশ্তও দেখে নিয়েছিলেন। অন্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে— 'ওয়া আতাইনাহু আজ্‌রাহু ফিদ্‌দুন্‌ইয়া' (আমি ইব্রাহিমকে এই পৃথিবীতেই তার বেহেশতের স্থান দেখিয়ে দিয়েছি)।

হজরত সালমান ফারসী বলেছেন, কেউ কেউ বলেন, হজরত আলী বলেছেন, চোখের সামনে থেকে পরদা উঠিয়ে নেয়ার পর হজরত ইব্রাহিম দেখলেন, এক স্থানে এক পুরুষ এবং নারী ব্যভিচারে রত। তিনি তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। তারা ধ্বংস হয়ে গেলো। আরেক স্থানেও তিনি এ রকম ব্যভিচারের ঘটনা দেখলেন। তাদের জন্যও তিনি বদদোয়া করলেন। তারাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। আরেকটি স্থানে তিনি একই ঘটনা দেখে বদ্‌দোয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতেই আল্লাহ্তায়ালা বললেন, হে ইব্রাহিম! তুমি এমন প্রার্থনাকারী যার প্রার্থনা কবুল করা হয়। কিন্তু তুমি আমার বান্দাদের জন্য এভাবে বদদোয়া কোরো না। পাপী বান্দাদের সঙ্গে আমার তিন প্রকারের সম্পর্ক রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে— পাপ করার পর যদি সে তওবা করে, তবে আমি তার তওবা কবুল করি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে— সে পাপী হলেও আমি তার বংশে এমন সন্তান সৃষ্টি করি, যে হয় আমার একনিষ্ঠ দাস। তৃতীয়টি হচ্ছে— শেষ বিচারের সময় পাপী অবস্থায় উপস্থিত আমার বান্দাকে আমি ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে দেই। অন্য বর্ণনায় রয়েছে— সে যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

হজরত কাতাদা বলেছেন, 'মালাকুতাস্‌সামাওয়াতি' অর্থ চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র। আর মালাকুতুল আরদ্ব অর্থ পর্বত, সমুদ্র, বৃক্ষরাজি।

শেষাংশে বলা হয়েছে— ওয়ালিইয়াকুনা মিনাল মু'ক্বিনিন (যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়)। এখানে ইয়াক্বীন শব্দটির অর্থ বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের সম্পর্ক রয়েছে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই অনুক্ত ক্রিয়া সহযোগে সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— আমি হজরত ইব্রাহিমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষগোচর করিয়ে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত

www.eelm.weebly.com

করিয়েছি। এভাবে তাঁর জ্ঞানগত বিশ্বাসকে (ইয়াক্বীনকে) আমি করেছি প্রত্যক্ষ বিশ্বাস (আইনুল ইয়াক্বীন)। এভাবেই সে হয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসের (হক্কুল ইয়াকিনের) অধিকারী। নিশ্চিত বিশ্বাসীদের দলভুক্ত আমি করেছি তাঁকে এভাবেই।

সুরা আন্‌আ'মঃ আয়াত ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ۝ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ۝ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

❒ অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাহাকে আচ্ছন্ন করিল তখন সে নক্ষত্র দেখিয়া বলিল, ইহাই আমার প্রতিপালক, অতঃপর যখন উহা অস্তমিত হইল তখন সে বলিল, 'যাহা অস্তমিত হয় তাহা আমি পছন্দ করি না।'

❒ অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হইতে দেখিল তখন সে বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালক;' যখন ইহাও অস্তমিত হইল তখন সে বলিল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করিলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

❒ অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হইতে দেখিল, তখন সে বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালক, ইহা সর্ববৃহৎ,; যখন ইহা অস্তমিত হইল তখন সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাহাকে আল্লাহের শরীক কর তাহা হইতে আমি নির্লিপ্ত।

❒ 'আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি অংশীবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

---

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতচতুষ্টয়ের প্রথমেই বলা হয়েছে— অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো, তখন সে নক্ষত্র দেখে বললো, 'এটাই আমার প্রতিপালক'। এ কথার অর্থ রাত্রি সমাগমের পর হজরত ইব্রাহিম আকাশে দেখলেন ধ্রুবতারা বা শুকতারা। সেই তারার দিকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, এটাই আমার প্রতিপালক। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিমা পূজার সাথে সাথে নক্ষত্রেরও পূজা করতো। তারকাপূজারীদের বিশ্বাস ছিলো সকল কাজের নিয়ন্ত্রণ আকাশের তারাগুলোই করে থাকে। তাদেরকে এই ভ্রষ্ট বিশ্বাস থেকে উদ্ধারের জন্য হজরত ইব্রাহিম দলিল প্রমাণ দিতে শুরু করলেন এভাবে। আকাশের নক্ষত্রের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বললেন, এটাই আমার প্রতিপালক? (তোমাদের কি মনে হয়)। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে 'হাজা' (এটাই) শব্দটির পূর্বে একটি প্রশ্নবোধক 'হামযা' অনুক্ত রয়েছে। ওই অনুক্ত হামযা সহযোগে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— এটাই কি আমার প্রভু? এ রকম প্রশ্নের অর্থ হয়— এ রকম হওয়া তো অসম্ভব। নক্ষত্রপূজকদেরকে একই সঙ্গে সচকিত ও সত্যানুসন্ধানী করে তুলবার জন্য তিনি এ রকম বাকভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'এটাই আমার প্রতিপালক'— কথাটির সরাসরি অর্থ গ্রহণ করাই উত্তম। কথাটির অতিরিক্ত ব্যাখ্যা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কেননা হজরত ইব্রাহিম 'এটাই আমার প্রতিপালক'— এ কথা যখন বলেছিলেন তখন তিনি ছিলেন আল্লাহ্পাকের এককত্বের তত্ত্বানুসন্ধানকারী এক দুর্বার পথিক। গন্তব্য তখনো দূর। অতএব পথযাত্রাকালে এ রকম মন্তব্য কোনো দূষণীয় ব্যাপার নয়। বাগবী বলেছেন, তখন হজরত ইব্রাহিম ছিলেন বালক। যে বয়সে শরিয়তের নির্দেশ প্রবর্তিত হয়, সেই বয়সে তখনো তিনি পৌঁছান নি। তাই উদ্ধৃত উক্তিটির জন্য তাঁকে তৌহিদ বিরোধী মনে করা যেতে পারেই না। বায়যাবী লিখেছেন, তিনি ছিলেন তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক এক কিশোর মাত্র।

শরহে যুলাসাতুস্ সায়ের গ্রন্থে আল্লামা আবু বকর লিখেছেন, নক্ষত্র চন্দ্র ইত্যাদি থেকে আল্লাহ্তায়ালার নিদর্শন অনুসন্ধান করার সময় হজরত ইব্রাহিমের বয়স ছিলো পনের মাস। এ সকল উক্তি অবশ্য ভুল। বরং শুরুতেই যে ব্যাকরণগত ব্যাখ্যাটি দেয়া হয়েছে— সেটাই অধিকতর শুদ্ধ। এ কথা ভুললে চলবে না যে, সকল নবী রসুল সকল সময়ের জন্য তৌহিদপন্থী (এক আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসী)। কোনো একটি মুহূর্তের জন্যও তাঁরা অংশীবাদী হতে পারেন না। কেমন করে পারবেন? তাঁরা যে নিষ্পাপ। আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে দিয়েছেন পাপবিমুক্ত ও পবিত্র অস্তিত্ব। তাই অপ্রাপ্তবয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্ক— সকল অবস্থায় তাঁরা সত্যাধিষ্ঠিত।

www.eelm.weebly.com

কাযী আয়ায তাঁর শিফা গ্রন্থে লিখেছেন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— ওয়ালাক্বাদ আতাইনা ইব্রাহীমা রুশ্দাহু মিনক্বলু (আমি শিশুকালেই ইব্রাহিমকে হেদায়েত দান করেছি)। মুজাহিদ এবং অন্যান্য আলেম তাই এ রকমই বলেছেন।

ইবনে আতা বলেছেন, তাঁর সৃষ্টির পূর্বেই তাঁকে রসুল হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিলো। এক বর্ণনায় এসেছে, জন্মগ্রহণের পর হজরত ইব্রাহিমের নিকট এক ফেরেশ্তা এসে বললো, হৃদয় দিয়ে আল্লাহ্কে চিনে নিন এবং মুখে তা প্রকাশ করুন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, আমি তো এ রকমই করেছি। 'ঠিক আছে আমি এরূপ করবো'— এ রকম কথা তিনি বলেননি। বলেছেন, আমি তো এ রকমই করেছি। এটাই ছিলো তাঁর জন্মপূর্ব অবস্থার রুশদ বা হেদায়েত।

আগের আয়াতে বলা হয়েছে— এভাবে ইব্রাহিমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাই, যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আলোচ্য আয়াত সেই পরিচালন-ব্যবস্থা দর্শনের একটি অধ্যায়— এ অধ্যায়ান্তর ক্রমাগত পরিণত হয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসে (৭৬ আয়াত থেকে ৭৯ আয়াত পর্যন্ত দেয়া হয়েছে জ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন পথযাত্রা, অধ্যায়ান্তর এবং পরিণতি বিষয়ক বিবরণ)। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য এক সময় অস্তমিত হয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে যে এগুলো কখনো প্রতিপালক নয়— প্রতিপালকের পরিচিতির পথে এগুলো এক একটি নিদর্শন মাত্র। এভাবে আলোচ্য আয়াতচতুষ্টয়ের মাধ্যমে হজরত ইব্রাহিমের সৃষ্টিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবায়িত হয়েছে 'এভাবে ইব্রাহিমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাই'— কথাটি। এই ব্যাখ্যাটি মেনে নিলে বলতে হয়— পৃথিবীতে পদার্পণের পর প্রথমবারের মতো তিনি যখন তারকা দর্শন করলেন, 'এটাই আমার প্রভু'—কথাটি তখনকার। আর তখনই শুরু হয়েছিলো তাঁর 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা' দর্শনের অধ্যায়। এই ব্যাখ্যাটির ভিত্তিতে বর্ণনাকারীগণ একটি ঘটনা বিবৃত করেছেন। ঘটনাটি এ রকম—

নমরূদ বিন কিনয়ান ছিলো ইরাকের সম্রাট। সে-ই ছিলো সর্বপ্রথম রাজমুকুট পরিধানকারী। প্রজা সাধারণকে সে নির্দেশ দিয়েছিলো— তার (নমরুদের) পূজা করতে হবে। তার দরবারে ছিলো কয়েকজন গণক ও জ্যোতির্বিদ। তারা গণনা করে বললো, রাজন! এ বছর আপনার রাজ্যে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হবে। বড় হয়ে সে-ই আপনার ধর্মাদর্শের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। তার মাধ্যমেই ধ্বংস হবেন আপনি এবং নিশ্চিহ্ন হবে আপনার সাধের সাম্রাজ্য।

এক বর্ণনায় এসেছে, পূর্ববর্তী কিতাবে হজরত ইব্রাহিমের মাধ্যমে ইরাক রাজ্যের ধ্বংস হওয়ার কথা লিপিবদ্ধ ছিলো। গণকেরা সে কথাই জানিয়েছিলো নমরুদকে।

www.eelm.weebly.com

আল্লামা সুদ্দী লিখেছেন, একবার নমরুদ স্বপ্নে দেখলো— আকাশে উদ্ভাসিত হয়েছে একটি তারকা। তারকাটির আলো চন্দ্র-সূর্যের আলোর মতো। এই ভয়ানক স্বপ্ন দেখে নমরুদ ভয় পেয়ে গেলো। সে গণকদেরকে ডেকে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলো। স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারীরা বললো, এ বছরই জন্ম নেবে ওই শিশুটি, যে হবে আপনার, রাজপরিবারের এবং সাম্রাজ্যের পতনের কারণ। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নমরুদ রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা করে দিলো— এ বছর যতো শিশু ভূমিষ্ঠ হবে তাদের সকলকে হত্যা করতে হবে। আর এখন থেকে বৎসর শেষ হওয়া পর্যন্ত কোনো দম্পতি সঙ্গম করতে পারবে না। নারী ও পুরুষেরা থাকবে পৃথক পৃথক স্থানে। এ ঘোষণার পর প্রতি দশজনের জন্য একজন করে পাহারাদার নিযুক্ত করলো নমরুদ। নমরুদের ওই ঘোষণাটিতে এ কথাও বলা ছিলো যে, ঋতুবতী রমণীরা কেবল তাদের স্বামীদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। ঋতুমুক্ত অবস্থায় পারবে না। এ রকম বলার কারণ এই ছিলো যে, নমরুদের সাম্রাজ্যের লোকেরা কখনো ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে রতিকর্ম করতো না। এতকিছু সাবধানতা অবলম্বন করার পরও আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় কার্যকর হলো। কারণ অকৃতকার্যতা তাঁর অভিপ্রায় বাস্তবায়নের অন্তরায় নয়। নমরুদের কঠোর ঘোষণা ও পাহারা সত্ত্বেও একদিন হজরত ইব্রাহিমের পিতা তাঁর মাতার সঙ্গে পবিত্রাবস্থায় মিলিত হলেন। তার ফলে মাতৃগর্ভে আগমন করলেন হজরত ইব্রাহিম।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক লিখেছেন, নমরুদ প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলার কাছে একজন করে পাহারাদার নিযুক্ত করেছিলো। হজরত ইব্রাহিমের জননী ছিলেন অল্পবয়সিনী। আর গর্ভধানের কোনো চিহ্নও তাঁর শরীরে ছিলো না। তাই তাঁর নিকট কোনো পাহারাদার রাখা হয়নি।

সুদ্দী লিখেছেন, ভীত সন্ত্রস্ত নমরুদ সকল পুরুষকে রেখে দিলো সেনা নিবাসে। এভাবে সে নারী ও পুরুষকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেললো। সে নিজেও অবস্থান গ্রহণ করলো ওই সেনা নিবাসে। একদিন এক বিশেষ কাজে রাজধানীতে লোক পাঠানোর প্রয়োজন পড়লো তার। বিশ্বাসী লোক হিসেবে আযরকেই একাজের জন্য নির্বাচন করলো সে। তাকে ডেকে বললো, একটি বিশেষ কাজে রাজধানীতে পাঠাতে হচ্ছে তোমাকে। তোমার উপর আমি আস্থা রাখি। তুমি নিশ্চয় বিশ্বাসভঙ্গ করবে না। তবু তোমাকে আমি কসম দিয়ে বলছি, কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে এসো। স্ত্রীর নিকট যেয়ো না। আযর বললো, স্ত্রীর নিকট গমন করার চেয়ে আপনার প্রসন্নতাই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। নমরুদের নির্দেশ মতো আযর রাজধানী শহরে গিয়ে উপস্থিত হলো। নির্দেশিত কাজ সম্পন্ন করার পর সে ভাবলো স্ত্রীকে এক নজর দেখে এলে দোষের তো কিছু নেই। এ কথা ভেবে সে স্বগৃহে গিয়ে উপস্থিত হলো। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করতে পারলো না। মিলিত হলো পত্নীর সঙ্গে। ওই মিলনের ফলে মাতৃউদরে এলেন হজরত ইব্রাহিম।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যেদিন হজরত ইব্রাহিম মাতৃউদরে আগমন করলেন, ওই দিনই গণকেরা নমরুদকে বললো সেই শিশুটি আজ মাতৃউদরে এসেছে। নমরুদ নির্দেশ দিলো সকল শিশু সন্তানকে হত্যা করা হোক। এদিকে হজরত ইব্রাহিম জননীর প্রসবকাল নিকটবর্তী হলো। প্রসববেদনা শুরু হতেই তিনি লোকালয় থেকে চলে গেলেন এক অরণ্যে— যেনো তাঁর সন্তান প্রসবের কথা কেউ জানতে না পারে। অরণ্যের তৃণশয্যার উপরে ভূমিষ্ঠ হলেন হজরত ইব্রাহিম। সেখানেই তাঁকে রেখে স্বগৃহে ফিরে এলেন ইব্রাহিম জননী। স্বামীকে বললেন, সদ্যজাত শিশুটি ওই অরণ্যের অমুক স্থানে তৃণশয্যায় শায়িত রয়েছে। পুত্রদর্শনের জন্য ব্যাকুল পিতা সেখানে গিয়ে পবিত্র শিশুটি দেখে বিমোহিত হয়ে পড়লো। সেখানে একটি সুড়ঙ্গ খনন করে শিশু ইব্রাহিমকে লুকিয়ে রাখলো সে। সুড়ঙ্গ মুখে চাপা দিয়ে রাখলো একটি পাথর। এরপর থেকে লোক চক্ষুর অগোচরে ইব্রাহিম জননী নিয়মিত যাতায়াত করতে লাগলেন সেখানে। এভাবে তিনি প্রতিদিন শিশুকে দুধ পান করিয়ে আসতেন।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, প্রসববেদনা অনুভব করার সাথে সাথে হজরত ইব্রাহিমের জননী ওই রাতেই গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। আশ্রয় নিলেন অনতিদূরের একটি পাহাড়ের গুহায়। ওই পর্বত গহ্বরেই ভূমিষ্ঠ হলেন নবী ইব্রাহিম। শিশু সন্তানকে সেখানে রেখে গৃহে ফিরে এলেন নবী ইব্রাহিমের মাতা। এরপর থেকে নিয়মিত গোপনে সেখানে গিয়ে তিনি শিশুকে দুধ পান করিয়ে আসতেন। প্রায়শঃই তিনি দেখতেন, শিশু ইব্রাহিম তাঁর নিজের হাতের আঙ্গুল চুষে পানাহারের প্রয়োজন মেটাচ্ছেন। হজরত আবু রওক বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিমের মাতা একদিন ভাবলেন, দেখি তো শিশুর আঙ্গুলে কী রয়েছে। তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন একটি আঙ্গুল থেকে বের হচ্ছে পানি এবং দ্বিতীয় আঙ্গুল থেকে বের হচ্ছে মধু। আর তৃতীয় আঙ্গুল থেকে দুধ, চতুর্থ আঙ্গুল থেকে খেজুর এবং পঞ্চম আঙ্গুল থেকে বের হয়ে আসছে ঘি।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আযর তাঁর স্ত্রীকে বললো, কী সন্তান হয়েছে তোমার। ছেলে না মেয়ে? তিনি বললেন, ছেলে। কিন্তু ছেলেটি মৃত। এ কথা শুনে আযর নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। ওদিকে নবী ইব্রাহিম অস্বাভাবিকরূপে দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকলেন। অন্য শিশু এক মাসে যতটুকু বড় হয়, তিনি একদিনে ততটুকু বাড়তে থাকলেন। অন্য শিশু এক বছরে যতখানি বাড়ে, তিনি এক মাসে বেড়ে উঠলেন ততখানি। এভাবে ওই পর্বত গহবরে তিনি কাটালেন পনেরটি মাস। একদিন জননীকে বললেন, আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চলো। তখন সাঁঝ অতিক্রান্ত হয়েছে। চরাচর জুড়ে নেমে এসেছে রাত্রির নিকষ আঁধার। জননী তাঁর পবিত্র সন্তানকে গুহার বাইরে নিয়ে এলেন। আঁধারঘেরা নিসর্গের প্রতি প্রথম

www.eelm.weebly.com

দৃষ্টিপাত করলেন হজরত ইব্রাহিম। ভাবলেন, আমার সেই প্রভু প্রতিপালক কোথায়, যিনি আমাকে পানাহার করিয়ে বড় করে তুলেছেন? তিনিই তো আমার উপাস্য। হঠাৎ আকাশের দিকে চোখ পড়তেই দেখলেন, একটি অতি উজ্জ্বল তারকা বিশাল আকাশে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, তবে কি এটি আমার প্রভু? এক সময় তারকা অদৃশ্য হয়ে গেলো। তিনি বললেন, আমি তো তাকে চাইনা যার সদাবিদ্যমানতা নেই। এরপর আকাশে দেখা দিলো আলো ভরা গোল চাঁদ। তিনি বললেন, তবে এটাই কি আমার প্রতিপালক! নিষ্পলক নেত্রে তিনি তাকিয়ে রইলেন সুউজ্জ্বল চন্দ্রটির দিকে। কিন্তু নিশাবসানে সে চাঁদ অন্তর্হিত হলো। অন্ধকার ভেদ করে দেখা দিলো ভোরের সূর্য। তিনি সবিস্ময়ে বললেন, তবে এটাই কি! দিনান্তে সেই প্রখর সূর্যও ডুবে গেলো চরাচর থেকে। হজরত ইব্রাহিম বুঝলেন, এ সকলের তাহলে সদাবিদ্যমানতা নেই। অর্থাৎ এগুলোর প্রতিপালক হওয়ার যোগ্যতাই নেই। মাতার সঙ্গে তিনি ফিরে এলেন স্বগৃহে। দেখলেন, পিতা ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা অক্ষয়, অব্যয়, সদাবিদ্যমান এক আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যের উপাসনায় রত। তিনি অপ্রসন্ন হলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। পিতাকে শুধু বললেন, আমার জননী বলেছেন, আপনিই আমার পিতা। আমি এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে গুহাভ্যন্তরে বেড়ে উঠেছি। পবিত্র পুত্রদর্শনে পিতা অত্যন্ত আনন্দিত হলো। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইব্রাহিম পর্বতের গুহায় ছিলেন দশ বছর। অপর বর্ণনায় এসেছে সাত বছর। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে সতেরো বছর।

আমি বলি, উপরের বর্ণনাগুলো সত্য বলে ধরে নিলেও হজরত ইব্রাহিমের মাতা-পিতা যে কাফের ছিলেন, সে কথা প্রমাণিত হয় না। তবে বর্ণনাগুলোতে হজরত ইব্রাহিমের পিতারূপে আযরের নাম এসেছে। আর আযর যে কাফের ছিলো তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে পবিত্র কোরআনে এবং হাদিস শরীফে। কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর মধ্যে আযরের নাম প্রসঙ্গে কোনো কোনো বর্ণনাকারী সন্দেহ পোষণ করেছেন। মূল বর্ণনায় কেবল বলা হয়েছে 'হজরত ইব্রাহিমের পিতা'। সেগুলোতে স্পষ্ট করে 'আযর' শব্দটির উল্লেখ নেই। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, যখন গুহার মধ্যে হজরত ইব্রাহিম বড় হয়ে গেলেন, তখন তাঁর মাকে জিজ্ঞেস করলেন— আমার প্রতিপালক কে? মা বললেন, আমি। হজরত ইব্রাহিম পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রতিপালক কে? মা জবাব দিলেন, তোমার পিতা। হজরত ইব্রাহিম বললেন, আমার পিতার প্রতিপালক কে? মা উত্তর দিলেন, নমরুদ। হজরত ইব্রাহিম বললেন, নমরুদের প্রতিপালক কে? মা বললেন, চুপ করো, বাবা চুপ করো। হজরত ইব্রাহিম নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। ইব্রাহিমজননী গৃহে ফিরে গিয়ে স্বামীর কাছে বললেন, আমার মনে হয় তোমার ছেলেই নমরুদের সাম্রাজ্যে বিপ্লব ঘটাবে। এরপর তিনি হজরত ইব্রাহিমের উত্থাপিত প্রশ্নগুলো শোনালেন। সব শুনে, পিতা উপস্থিত হলেন হজরত ইব্রাহিমের গুহাবাসে। হজরত ইব্রাহিম বললেন, হে আমার জনক, আমার পালনকর্তা কে?

www.eelm.weebly.com

পিতা বললেন, তোমার জননী। হজরত ইব্রাহিম বললেন, আমার জননীর পালনকর্তা কে? পিতা বললেন, আমি। হজরত ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পালনকর্তা কে? তিনি বললেন, নমরুদ। হজরত ইব্রাহিম প্রশ্ন করে বসলেন, নমরুদের পালনকর্তা কে? এ কথা শুনে পিতা তাকে চপেটাঘাত করলেন এবং বললেন, চুপ। তারপর যখন রাতের আঁধার নেমে এলো তখন হজরত ইব্রাহিম গুহামুখে এসে বাইরের দিকে তাকালেন। দেখলেন আকাশে একটি তারা জ্বলজ্বল করছে। আপন মনে তিনি বললেন, এটাই কি তবে আমার পালনকর্তা? এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইব্রাহিম একদিন তাঁর মাতা-পিতাকে বললেন, আমাকে এখান থেকে অন্যত্র নিয়ে চলো। জনক-জননী তখন তাঁকে গুহা থেকে বের করে নিয়ে এলেন। তখন রাত। হজরত ইব্রাহিম একস্থানে দেখলেন কিছু উট, ছাগল এবং ঘোড়া। পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী? পিতা বললেন, এগুলো উট, ঘোড়া এবং ছাগল। হজরত ইব্রাহিম বললেন, নিশ্চয়ই এদের কোনো স্রষ্টা ও পালনকর্তা রয়েছেন। এরপর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন শুকতারা অথবা ধ্রুবতারা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। রাতটি ছিলো কৃষ্ণপক্ষের শেষ দিকের একটি রাত। তাই তিনি প্রথম রাতে দেখেছিলেন শুকতারা এবং শেষ রাতে দেখেছিলেন চন্দ্র। আলোচ্য আয়াতেও তাই বলা হয়েছে প্রথমে নক্ষত্র পরে চন্দ্র ও শেষে সূর্যোদয়ের কথা।— এই বর্ণনাটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ইব্রাহিমের জনক জননী ছিলেন কাফের। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না যে, কাফের অবস্থাতেই তাদের মৃত্যু ঘটেছিলো। যাহোক, এ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো বিভিন্ন রকম। সূত্রগুলোও শিথিল। অপর দিকে বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত হাদিসে এর বিপরীত বর্ণনা রয়েছে। যেমন এক হাদিসে বলা হয়েছে, হজরত আদম থেকে রসুলুল্লাহ্ স. এর পিতা-মাতা পর্যন্ত সকল ঊর্ধ্বতন এবং অধঃস্তন মাতা-পিতা সকলেই ছিলেন ইমানদার। রসুলুল্লাহ্ স. পবিত্র পুরুষের পৃষ্ঠদেশ থেকে পবিত্র মাতার গর্ভে ক্রমান্বয়ে স্থানান্তরিত হয়ে আসছিলেন। তাই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ওয়া তাক্বাল্লুবুকা ফিস্ সাজিদীন (আর আমি তোমাকে সেজদাকারীদের মাধ্যমে পরিক্রমণ ঘটিয়েছি)। আর আরববাসীরা পিতৃব্যকেও পিতা নামে ডেকে থাকে। তাই এ রকমও হতে পারে যে, হজরত ইব্রাহিমের দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় তাঁর পিতা তারিখ ইন্তেকাল করেছিলেন। তারপর থেকে তাঁর প্রতিপালনের ভার অর্পিত হয় তাঁর চাচা আযরের উপর। তাই লালন-পালনকারী হিসেবে আযরকে আলোচ্য আয়াতে হজরত ইব্রাহিমের পিতা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্পাকই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

এরপর বলা হয়েছে— ফালাম্মা আফালা ক্বলা লা উহিব্বুল আফিলিন (অতঃপর যখন ওই নক্ষত্র অস্তমিত হলো তখন সে বললো, 'যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না)'। এ কথার অর্থ— যা ক্ষয় হয়, লয় হয়, অস্তমিত হয় তার উপাসনা করতে আমি সম্মত নই। আমি তো উপাসনা করবো তাঁর, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীলতা থেকে পবিত্র।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'ফালাম্মা রাআল ক্বমারা বাযিগান ক্বলা হাজা রব্বি' (অতঃপর সে যখন চন্দ্রকে উদিত হতে দেখলো, তখন সে বললো, 'এটাই আমার প্রতিপালক')। এ কথার অর্থ চন্দ্রকে নক্ষত্রাপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল দেখতে পেয়ে হজরত ইব্রাহিম বললেন, এটাই আমার প্রতিপালক। তিনি ছিলেন পূর্ণ সচেতন জ্ঞানানুসন্ধানী। তাই নক্ষত্রের অস্তমিতিকে তিনি গ্রহণ করলেন তৌহিদের পথের একটি প্রমাণ হিসেবে। এর অতিরিক্ত দলিল ছিলো নিষ্প্রয়োজন। তবু তিনি অংশীবাদীদের নিকট অধিকতর প্রমাণ স্থাপনের জন্য প্রমাণের পরিধিকে প্রশস্ততর করেছিলেন। তাই প্রমাণ হিসেবে নক্ষত্রের পর চন্দ্র এবং তারপর সূর্যের প্রমাণকে গ্রহণ করেছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে— ফালাম্মা আফালা ক্বলা লাইল্লাম ইয়াহ্দিনি রব্বি লা আকুনান্না মিনাল ক্বওমিদ্ দ্বল্লীন (যখন এটা অস্তমিত হলো তখন সে বললো, 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎ পথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবো')। এ কথার অর্থ— চন্দ্রও যখন ডুবে গেলো, তখন হজরত ইব্রাহিম নতুন নিদর্শনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, আমার প্রতিপালক যদি আমাকে সরল পথের সন্ধান দান না করেন, তবে নিশ্চয়ই আমি হয়ে পড়বো দিশাহীন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হেদায়েত প্রাপ্তির অমূল্য নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তিনি এ কথা বলেছিলেন। যেমন রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য না এলে আমি হেদায়েত প্রাপ্ত হতাম না। না দান করতে শিখতাম, না পড়তে পারতাম নামাজ। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে হজরত ইব্রাহিম তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে সত্যপথের দিকে আহবান জানিয়েছেন। এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, নক্ষত্রের মতো চন্দ্রও কখনো উপাস্য হতে পারে না। কারণ, নক্ষত্রের মতোন চন্দ্রও অস্তমিত হয়, পরিবর্তিত হয়। এগুলোর কোনোটিই চিরন্তন নয়। তাই যে এগুলোকে প্রতিপালক মনে করবে সে অবশ্যই হয়ে যাবে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত। উদয় ও অস্ত দু'টো অবস্থাই অচিরন্তনতার নিদর্শন। কিন্তু উদয়ের চেয়ে অস্তের মধ্যে ক্ষয়ের নিদর্শনটি অধিকতর প্রকট হয়ে ওঠে। তাই হজরত ইব্রাহিম এখানে নক্ষত্র ও চন্দ্রের অস্তমিত হওয়াকে উপাস্য না হওয়ার নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এর পরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— ফালাম্মা রায়াশ্ শামসা বাযিগাতান ক্বলা হাজা রব্বি হাজা আকবার (অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখলো তখন সে বললো, 'এটা আমার প্রতিপালক, এটা সর্ব বৃহৎ।') এখানে 'সর্ব বৃহৎ' অর্থ নক্ষত্র ও চন্দ্র অপেক্ষা বৃহৎ। আরবী ভাষায় শামস্ (সূর্য) শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। আর হাজা (এটা) নির্দেশক বিশেষ্যটি পুংলিঙ্গ। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে সূর্যের দিকে। কেননা হাজা শব্দটির বিধেয় 'রব' (প্রতিপালক) শব্দটি পুংলিঙ্গ। যে

www.eelm.weebly.com

নির্দেশক বিশেষ্য নির্দেশিত বস্তু এবং বিধেয় এর মধ্যবর্তী স্থানে হয়, তার মধ্যে নির্দেশিত বস্তুর স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ হওয়া কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, হাজা শব্দটির মাধ্যমে সূর্যের উদিত হওয়াকে অথবা সূর্যের প্রখরতাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

আমি বলি, শামস্ শব্দটি কেবল শ্রুতিগত দিক থেকে স্ত্রী লিঙ্গ। যেহেতু এর তাস্গীর রূপ শামসিয়াতুন। উল্লেখ্য যে, হজরত ইব্রাহিমের মাতৃভাষা আরবী ছিলো না। তাঁর ভাষায় সূর্য ছিলো পুংলিঙ্গ। তাই আয়াত আরবী হলেও আয়াতের বক্তব্যে হজরত ইব্রাহিমের বাকভঙ্গিকেই বলবৎ রাখা হয়েছে। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে পুংলিঙ্গ বাচক 'হাজা' শব্দটি।

সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট গায়রুল্লাহ্র উপাসনার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত করে তোলার জন্যই হজরত ইব্রাহিম বলেছেন, হাজা আকবার (এটাই সর্ব বৃহৎ)। অর্থাৎ সর্ববৃহৎ সূর্যও যখন অস্তমিত হয় এবং তা উপাসনার অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তখন চন্দ্র, নক্ষত্র এবং অন্যান্য সৃষ্টবস্তুনিচয় উপাস্য হওয়ার অযোগ্য। পরের বাক্যে সে কথাটিই বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে—

ফালাম্মা আফালাত্ ক্বলা ইয়া ক্বওমি ইন্নি বারিউম্ মিম্মা তুশ্রিকুন (যখন এটাও অস্তমিত হলো, তখন সে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্র শরীক করো তা থেকে আমি নির্লিপ্ত')। এ কথার অর্থ— দেখো হে আমার সম্প্রদায়, সূর্যও অস্তমিত হয়। সুতরাং নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য আলোকজ্জ্বল ও বৃহৎ হলেও প্রতিপালক হওয়ার উপযুক্ত নয়। এগুলোর অবস্থা সতত বিবর্তনশীল। এগুলোর সব কয়টিই এক ও অবিভাজ্য পরিবর্তনকারী স্রষ্টার মুখাপেক্ষী। তিনি এগুলোকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত করছেন। এই বৃহৎ নিদর্শনগুলোর অবস্থা যদি এ রকমই হয়, তবে স্বহস্তনির্মিত প্রতিমাগুলো তো উপাস্য হওয়ার আরো অধিক অনুপযুক্ত। এভাবে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে এক ও অবিনশ্বর আল্লাহ্কে উপাস্য প্রমাণ করার পর হজরত ইব্রাহিম তাঁর সম্প্রদায়ের লোককে লক্ষ্য করে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্র শরীক করো— তা থেকে আমি নির্লিপ্ত। এ কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক জনতার সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে আল্লাহ্পাকের এককত্ব প্রমাণের জন্যই তিনি নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যকে ক্রমান্বয়ে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করে যাচ্ছিলেন। এভাবে শেষ সিদ্ধান্তটি তিনি জানিয়ে দিয়েছেন আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে। এভাবে মুশরিক জনতাকে নিরুত্তর করে দেয়াই ছিলো তাঁর আসল উদ্দেশ্য। এরপর আরো পরিষ্কার করে তিনি তৌহিদের যে শ্বাশ্বত বাক্যটি উচ্চারণ করেছেন— তা উদ্ধৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (৭৯)।

www.eelm.weebly.com

বলা হয়েছে— ইন্নি ওয়াজ্জাহাতু ওয়াজ্হিয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা হানিফাঁও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকিন (আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই)। এখানে 'যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন' কথাটির মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীসহ সকল সৃষ্টি সর্ববিষয়ে এক আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী। সৃষ্টি সম্ভাব্যের বৃত্তভূত। আর তিনি অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব (ওয়াজিবুল ওজুদ)। তিনিই সৃষ্টির অনস্তিত্বকে অস্তিত্বশীল করেছেন। আমি সেই অবিভাজ্য ও চিরন্তন প্রভুপ্রতিপালকের দিকে মনোনিবদ্ধ করলাম। কারণ আমি অংশীবাদী নই। আমি বিশ্বাসী।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৮০

وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّیْ فِی اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ؕ وَلَاۤ اَخَافُ مَا
تُشْرِكُوْنَ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ یَّشَآءَ رَبِّیْ شَیْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّیْ كُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۟

❒ তাহার সম্প্রদায় তাহার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইল। সে বলিল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করিলে তোমরা যাহাকে তাঁহার শরীক কর তাহাকে আমি ভয় করি না, সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, তবে কি তোমরা অবধান করিবে না?

'ওয়া হাজ্জাহু ক্বওমুহু' (তার সম্প্রদায় তার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হলো)। এ কথার অর্থ—আল্লাহ্‌পাকের একক উপাস্য হওয়ার বিষয়টি সুপ্রমাণিত হওয়ার পর পরাজিত অংশীবাদীরা হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে বচসায় লিপ্ত হলো। তারা চিৎকার করে বলতে শুরু করলো, আমাদের উপাস্য প্রতিমাগুলোকে ভয় করো। নতুবা তাদের রোষে পতিত হবে। নমরুদকেও ভয় করো। তা না করলে সে তোমাকে হত্যা করবে। অথবা জ্বালিয়ে দিবে।

এরপর বলা হয়েছে— হজরত ইব্রাহিম বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। কথাটির অর্থ, জ্ঞানগত দলিল প্রমাণ পাওয়ার পরেও তোমরা অহেতুক আমার সঙ্গে বিবাদ করছো কেনো। আমার আল্লাহ্ই তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। আমার বয়স কম। আর অক্ষরের মুখাপেক্ষীও আমাকে করা হয়নি। তোমাদের দৃষ্টিতে অক্ষরজ্ঞান বিবর্জিত হলেও এ কথা পরিষ্কাররূপে জেনে নাও যে, আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং আমাকে সরাসরি পথপ্রদর্শন করেছেন। দেখিয়েছেন প্রকৃত পথ এবং দিয়েছেন অকাট্য প্রমাণ।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর শরীক করো তাকে আমি ভয় করি না। কথাটির অর্থ— সম্ভাব্যের বৃত্তের (দায়রায়ে এমকানের) কোনো কিছুই আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ব্যতীত কারো উপকার বা অপকার করতে পারে না। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র সৃষ্টি— স্রষ্টা নয়। ভূচতুষ্টয়ও (আগুন, পানি, মাটি বাতাস) আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টবস্তু। সম্রাট নমরুদও তেমনি আল্লাহ্পাকের সৃষ্টি। সুতরাং সচেতন অচেতন কোনো সৃষ্টিই উপাস্য হতে পারে না। আমি তাই কাউকে ভয় পাই না। তোমাদের দেব-দেবীদেরকেও না। কারণ সৃষ্টি হিসেবে আমরা সকলেই সমতুল। বরং কোনো কোনো সৃষ্টি তো আমাপেক্ষাও অধিক অক্ষম। যেমন, তোমাদের প্রতিমাগুলো, উদ্ভিদসমূহ এবং সকল জড় পদার্থ।

এক বর্ণনায় এসেছে— যখন হজরত ইব্রাহিম পর্বত গুহা থেকে বের হয়ে এলেন, তখন মুশরিক জনতা তাঁর প্রতি তত আগ্রহী ছিলো না। আযর মূর্তি নির্মাণ করতো এবং তা বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করতো। একদিন তিনি হজরত ইব্রাহিমকে, কয়েকটি মূর্তি বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করতে বললেন। হজরত ইব্রাহিম মূর্তিগুলো নিয়ে বাজারে গিয়ে চিৎকার করে বলতে শুরু করলেন, আমার নিকট থেকে কেউ কি এমন কোনো জিনিস ক্রয় করতে চাও— যা ক্ষতিকারক, উপকার করার কোনো ক্ষমতা যাদের একেবারেই নেই। এ রকম বলার ফলে কেউ আর মূর্তি ক্রয় করলো না। শেষ বেলায় তিনি মূর্তিগুলোকে একটি পুকুরের পানিতে উপুড় করে ধরে মূর্তিপূজকদের শুনিয়ে বলতে থাকলেন, নাও। এবার পানি পান করো।

'আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করলে'— কথাটির অর্থ আমার প্রতিপালক যদি আমাকে বিপদে ফেলতে ইচ্ছে করেন তবে কেবল আমার উপর আপতিত হবে বিপদ। সে বিপদ তিনি যে কোনো মাধ্যমে আমার উপর অবতীর্ণ করতে পারেন। আর তিনি যদি আমাকে নির্বিপদ রাখতে চান তবে তোমাদের উপাস্যগুলোর কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টির এমতোক্ষমতা নেই যে তারা আমার কেশাগ্র স্পর্শ করে।

এরপর বলা হয়েছে—'সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ব।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার অসীম ও অননুভব্য জ্ঞান সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। কথাটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, কেবল তাঁর ইচ্ছায় এবং সৃষ্টির মধ্যে তাঁর প্রতিফলিত ইচ্ছার মাধ্যমে সৃষ্টিকূলের পক্ষ থেকে উপকার অথবা অপকার সাধিত হয়। আর সৃষ্টির অনস্তিত্ব, অস্তিত্ব এবং সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাঁর অসীম জ্ঞানের আওতাভূত, সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানের অধীন।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'আফালা তাতাজাক্কারুন' (তবে কি তোমরা অবধান করবে না?) এ কথার অর্থ— তিনিই পরিপূর্ণ ও চিরঅক্ষয় সত্তা। তিনি অপরিমেয় ক্ষমতার অধিকারী এবং চিরবিজয়ী। আর সৃষ্টির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অক্ষমতা। আর তোমাদের পূজ্য প্রতিমাগুলো তো সম্পূর্ণতই জড় বস্তু। ইচ্ছা অথবা শক্তি কোনো কিছুই সেগুলোর নেই। এই চিরসত্য কথাটি কি তোমরা অনুধাবন করবে না?

সূরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৮১, ৮২

وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ۚ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ۝

❐ তোমরা যাহাকে আল্লাহের শরীক কর আমি তাহাকে কিরূপে ভয় করিব? যে বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে কোন সনদ দেন নাই তাহাকে আল্লাহের শরীক করিতে তোমরা ভয় কর না; সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল দুই দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী।'

❐ যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং তাহাদিগের বিশ্বাসকে সীমালংঘন দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাহাদিগেরই জন্য, তাহারাই সৎপথ প্রাপ্ত।

প্রথমেই বলা হয়েছে—'তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরীক করো আমি তাকে কিরূপে ভয় করবো?' এ কথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম বললেন, হে অংশীবাদী জনতা, তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালার অংশী বানিয়ে নিয়েছ তাদেরকে আমি ভয় করি কিরূপে? আমি তো জানি আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায় ব্যতিরেকে অন্য কেউ বা কোনো কিছু আমার কোনো অপকার করার ক্ষমতা রাখে না। এর পরেও কি তোমাদের মতো আমি গায়ের আল্লাহ্‌কে ভয় করবো? কেনো করবো?

এরপর বলা হয়েছে— 'যে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে কোনো সনদ দেননি তাকে আল্লাহ্‌র শরীক করতে তোমরা ভয় করো না।' এ কথার অর্থ— কী বিস্ময়ের ব্যাপার! তোমরা চির স্বাধীন, চির অমুখাপেক্ষী প্রভুপ্রতিপালকের সঙ্গে চির পরাধীন ও চিরমুখাপেক্ষী সৃষ্টিকে শরীক করছো— যার পক্ষে তোমাদের নিকটে জ্ঞানগত অথবা বিশ্বাসগত কোনো প্রমাণ নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও

www.eelm.weebly.com

তোমরা কী অবোধ, কী মূর্খ, কী অপবিত্র। তোমরা তাকে ভয় করছো না। ভয় তো করা উচিত তোমাদের। কারণ তোমরা অংশীবাদী। আর আমি তো নির্ভয়। কারণ আমি এক আল্লাহ্য় একনিষ্ঠ বিশ্বাসী।

শেষে বলা হয়েছে—'সুতরাং যদি তোমরা জানো তবে বলো দু'দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী?' এ কথার অর্থ— তৌহিদপন্থিদের বিশ্বাস, বুদ্ধি ও কর্ম আল্লাহ্পাকের নির্দেশের পূর্ণ অনুকূল। পক্ষান্তরে অংশীবাদীদের বিশ্বাস, বুদ্ধি ও কর্ম অশুদ্ধ, অপবিত্র, প্রমাণহীন। সুতরাং বিশ্বাসীরাই নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। অবিশ্বাসীরা নয়। কথাটির মাধ্যমে অংশীবাদীদেরকে একত্ববাদী হওয়ার প্রতি প্রচ্ছন্ন উৎসাহ দেয়া হয়েছে। যেনো বলা হয়েছে— হে অংশীবাদীর দল, চির নিরাপত্তা যদি চাও, তবে এসো তৌহিদের পথে। এখানে 'ইনকুনতুম তা'লামুন' (যদি তোমরা জানো) অর্থ— হে অংশীবাদী সম্প্রদায়! তোমরা যদি জানো যে, একমাত্র আল্লাহ্কেই ভয় করা উচিত অন্য কাউকে নয়, তবে শিরিককে পরিত্যাগ করে তৌহিদকে গ্রহণ করো। অথবা কথাটির অর্থ হবে এ রকম— যদি তোমরা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং জ্ঞানী হও, তবে আমার এ প্রশ্নটির যথা উত্তর প্রদান করো— দুই দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী?

পরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে—'যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাসকে সীমালংঘন দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য, তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।'

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো—তখন মুসলমানেরা চরমভাবে মুষড়ে পড়লেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে নিজের নফসের উপর জুলুম করেনি, বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও সীমালংঘন করেনি। অতএব আমাদের মুক্তির উপায় কী? রসুল স. বললেন, জুলুম অর্থ শিরিক। আপন পুত্রকে প্রদত্ত হজরত লোকমানের ওই উপদেশ কি তোমরা শোনোনি— হে বৎস! তুমি আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক কোরো না। কেননা শিরিক একটি জঘন্য অপরাধ। বোখারী।

হজরত ইব্রাহিম অংশীবাদীদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভের অধিকারী কে? অংশীবাদীরা কোনো জবাব দিলো না। তখন তিনি নিজেই উচ্চারণ করলেন— 'আল্লাজিনা আমানু' (যারা বিশ্বাস করেছে)। উক্তিটি হজরত ইব্রাহিমের হতে পারে— যা আল্লাহ্পাক এখানে সংকলিত করেছেন। অথবা কথাটি আল্লাহ্পাকের নিজের কথাও হতে পারে।

www.eelm.weebly.com

বকর বিন সাওদার মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এক আক্রমণকারী অতর্কিতে আক্রমণ করে এক মুসলমানকে হত্যা করলো। দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে সে হত্যা করলো আরেক মুসলমানকে। তৃতীয়বার হত্যা করলো আরেকজনকে। তারপর সে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হলো। বললো, এ অবস্থায় মুসলমান হলে আমার কি কোনো উপকার হবে? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। লোকটি মুসলমান হয়ে গেলো। এরপর সে পুনরায় একে একে তিনজন মুসলমানকে হত্যা করে বসলো। কেউ কেউ মনে করেন, ওই লোকটিকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৮৩

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

☐ এবং ইহা আমার যুক্তি যাহা ইব্রাহিমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়; যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নত করি; তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী।

হজরত ইব্রাহিম সম্পর্কে এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করা হয়েছে, এই আয়াতটিও সেই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের বক্তব্য দ্বারা স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, হজরত ইব্রাহিম নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যকে প্রতিপালক বলেছিলেন, আবার অস্তমিত হতে দেখে সেগুলোর প্রতিপালক হওয়াকে অস্বীকারও করেছিলেন। এটা তাঁর চিন্তা ভাবনা বা 'তাফাক্কুর' ছিলো না। কারণ পবিত্রাত্মাগণের চিন্তা-প্রসূত কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। বরং তিনি এ রকম করেছিলেন তাঁর সম্প্রদায়কে সচেতন করার জন্য। আয়াতেও তাই বলা হয়েছে——'এবং এটা আমার যুক্তি যা ইব্রাহিমকে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের মোকাবিলায়।'

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, এখানে উল্লেখিত 'যুক্তি' হচ্ছে ওই যুক্তি যা হজরত ইব্রাহিম নমরুদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। সুরা বাকারার আলোচনায় নমরুদের সঙ্গে হজরত ইব্রাহিমের বিতর্কের বিষয়টি সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি ঠিক নয়। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই অধিকতর শুদ্ধ।

এখানে 'হুজ্জাতুনা' শব্দটির অর্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত যুক্তি বা দলিল। এখানে বলা হয়েছে ওই যুক্তি আল্লাহ্পাকই হজরত ইব্রাহিমকে দিয়েছিলেন।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে—'যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি।'— কথাটির অর্থ আমি যাকে ইচ্ছা করি তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেই। অর্থাৎ জ্ঞান ও হেকমতের উচ্চস্তর প্রদান করে তাকে মর্যাদামণ্ডিত করি।

শেষে বলা হয়েছে— 'ইন্না রব্বাকা হাকিমুন আ'লীম' (তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী)। এ কথার অর্থ নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক কুশলী (হাকিম)। তাই তিনি কাউকে করেন উচ্চ এবং কাউকে অধম। এগুলো তাঁর হেকমতের নিদর্শন। আর এগুলো সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে অবগত। কারণ প্রকৃত অর্থে তিনিই জ্ঞানী।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن
ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ
نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۝ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ۝
وَإِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ۝ وَمِنْ
ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَٰهُمْ وَهَدَيْنَٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

❑ এবং তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইস্‌হাক ও ইয়াকুব ও ইহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম; পূর্বে নূহকেও সৎ পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারুণকেও; আর এইভাবেই সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি।

❑ এবং জাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম। ইহারা সকলে সজ্জনদিগের অন্তর্ভুক্ত;

❑ আরও সৎ পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম ইস্‌মাইল, আল-ঈসায়া, ইউনুস, ও লূতকে; এবং প্রত্যেককে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম।

❑ এবং ইহাদিগের পিতৃ-পুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।

---

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতচতুষ্টয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'এবং আমি তাকে দিয়েছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব ও তাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম।'— এ কথার অর্থ, আমি ইব্রাহিমকে দিয়েছিলাম পুত্র ইসহাককে এবং প্রপৌত্র ইয়াকুবকে। আর তাদেরকে দিয়েছিলাম হেদায়েত।

এরপর বলা হয়েছে—'পূর্বে নূহকেও সৎ পথে পরিচালিত করেছিলাম।' হজরত ইব্রাহিমের পূর্বপুরুষ ছিলেন হজরত নূহ। সেই হজরত নূহের হেদায়েত দানের কথা আলোচ্য বাক্যটিতে উল্লেখিত হয়েছে। বাক্যটির মাধ্যমে বুঝা যায়, কোনো ব্যক্তির পূর্বপুরুষ এবং উত্তর পুরুষের আভিজাত্য ও কৃতিত্বও ওই ব্যক্তিকে প্রদত্ত অনুগ্রহের একটি নিদর্শন। এখানেও তাই হজরত ইব্রাহিমকে প্রদত্ত অনুগ্রহ হিসেবে তাঁর পূর্বপুরুষ হজরত নূহ এবং উত্তর পুরুষ হজরত ইসহাক ও হজরত ইয়াকুবের হেদায়েত প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

আমি বলি, উপরোক্ত ব্যাখ্যাটির আলোকে সহজেই অনুমিত হয় যে, রসুলুল্লাহ স. এর পূর্বপুরুষগণের কেউই অবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি স. তো আল্লাহ্পাকের সর্বাপেক্ষা প্রিয়ভাজন। আর প্রেমের চাহিদা হচ্ছে— প্রিয়জনের আভিজাত্যকে পরিপূর্ণ ও নিষ্কলুষ রাখা।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারুণকেও।' এ কথার অর্থ— আমি নূহ্ অথবা ইব্রাহিমের বংশের মধ্যে সৎ পথে পরিচালিত করেছি দাউদ বিন আল ইয়াসা, সুলায়মান বিন দাউদ, আইয়ুব বিন আমুস্ বিন রাজাখ বিন রউম বিন ইস বিন ইসহাক বিন ইব্রাহিম এবং ইউসুফ বিন ইয়াকুব, বিন ইসহাক, মুসা বিন ইমরান বিন ইয়াসমার, বিন কাহিত, বিন লাবী, বিন ইয়াকুব এবং হজরত মুসার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হারুণকে। উল্লেখ্য যে, হজরত হারুণ ছিলেন হজরত মুসার এক বছরের বড়।

এখানে 'মিন জুর্রিইয়াতিহী' (বংশধরের মধ্যে) — কথাটির 'হা' (তার) সর্বনামটি হজরত ইব্রাহিমের স্থলাভিষিক্ত। কারণ এতক্ষণ ধরে হজরত ইব্রাহিমের প্রসঙ্গেই আলোচনা হয়ে চলেছে। কেউ কেউ বলেছেন, সর্বনামটি এখানে হজরত নূহের স্থলাভিষিক্ত। কেননা হজরত ইব্রাহিমের পূর্বে হজরত নূহ্ এর প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে। আর তৎসন্নিহিত আয়াতগুলোতে উল্লেখিত হয়েছে হজরত ইউনুস ও হজরত লুতের নাম। তাঁরা ছিলেন হজরত নূহ এর বংশধর। হজরত ইব্রাহিমের নয়। সুতরাং এখানে 'তাঁর বংশধর' অর্থ হবে হজরত নূহ্ এর বংশধর। এটাই সমধিক স্পষ্ট।

শেষে বলা হয়েছে—'আর এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি।' এ কথার অর্থ, হজরত নুহ্ এবং হজরত ইব্রাহিমের বংশধরগণ ছিলেন পুণ্যবান। আমি তাই তাদের মর্যাদা সমুন্নত করেছি। এভাবেই সকল সৎপরায়ণদেরকে আমি পুরস্কার দিয়ে থাকি।

www.eelm.weebly.com

হজরত ওমর থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত জিব্‌রাইলের এক প্রশ্নের উত্তরে রসুল স. বলেছিলেন ইহ্‌সান (ইবাদতের সৌন্দর্য সচেতনতা) হচ্ছে এই— তুমি তোমার প্রভুপ্রতিপালকের এমন একাগ্র উপাসনা করবে, যেন তুমি তাকে দেখছো। এমন যদি না হয় তবে বিশ্বাস রেখো যে, তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন। বোখারী, মুসলিম।

দ্বিতীয় আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে—'এবং জাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, মূসা এবং ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম।' এ কথার অর্থ— আমি আরও সৎ পথে পরিচালিত করেছিলাম জাকারিয়া বিন আজম, ইয়াহ্‌ইয়া বিন জাকারিয়া, ঈসা বিন মরিয়ম বিনতে ইমরান এবং ইলিয়াস বিন মাতা বিন ফুখাস বিন আইজার বিন হারুণকে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইদ্রিস এবং হজরত ইলিয়াস ছিলেন একই ব্যক্তি— যেমন ইয়াকুব এবং ইসরাইল একই ব্যক্তির নাম। কিন্তু আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি এ কথাটিকে প্রমাণ করে না। হজরত ইদ্রিস হজরত নূহের বংশভূত ছিলেন না। ছিলেন হজরত নূহের পিতামহের বংশধারার সাথে যুক্ত। হজরত নূহের পিতার নাম লামাক। লামাকের পিতা মাতুশালাখ। মাতুশালাখের পিতা ছিলেন খুনুখ এবং খুনুখের পিতা ছিলেন হজরত ইদ্রিস। হজরত আদমের উত্তর পুরুষের মধ্যে হজরত ইদ্রিসই ছিলেন প্রথম রসুল। কলম দিয়ে লিখার প্রথা তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'কুল্লুম্ মিনাস্‌সলেহীন' (তারা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত)। এ কথার অর্থ— উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল পাপ থেকে মুক্ত। নিষ্পাপ। নিষিদ্ধ বিষয় থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে আদিষ্ট বিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে সলেহ্ বা সজ্জন বলা যায় না। নিষিদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে যৎসামান্য সম্পৃক্তিও নিষ্পাপ বা সলেহ্ হওয়ার প্রতিবন্ধক। অবশ্য সাধারণভাবে সৎকর্মপরায়ণদেরকেও সলেহ্ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তারা সলেহ্ বা সজ্জন নন। তবে বৃহৎ পাপ থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারীরা যৎসামান্য ক্ষুদ্র পাপে পাপী হলেও সজ্জন নামে অভিহিত হতে পারেন। রূপক অর্থে তাদেরকে সজ্জন বলাতে দোষের কিছু নেই। এ কথাটিও সত্য যে, বিশুদ্ধ অন্তরে তওবাকারীরাও পুণ্যবান বা সলেহ্ হয়ে যান। এ ধরনের সলজ্জিত ও সানুতপ্ত প্রত্যাবর্তনকারীরাও নিষ্পাপ। কিন্তু নবী রসুলগণের নিষ্পাপত্ব প্রকৃত, পূর্ণ এবং পরিণত।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে—'আরও সৎ পথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাইল, আল' ঈসায়া, ইউনুস ও লুতকে। এ কথার অর্থ— আমি রসুল মোহাম্মদ স. এর পূর্ব-পুরুষ ইসমাইল বিন ইব্রাহিমকে, আল'ঈসায়া বিন উখতুব বিন আজুরকে, ইউনুস বিন মাতাকে এবং ইব্রাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র লুত বিন হারানকেও সৎপথে চালিত করেছিলাম।

www.eelm.weebly.com

ইয়াসা নামটি অনারব। তাই এ নামের পূর্বে আলীফ লাম সহযোগে 'আল' শব্দটি বসানো হয়েছে। যেমন, ইয়াজিদ। শব্দটির পূর্বে 'আল' বসিয়ে বলা হয় আল ইয়াজিদ। জনৈক কবি বলেছেন— আমি ওলিদ ইবনে আল ইয়াজিদকে বরকতময় পেয়েছি— খেলাফতের দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন সুদৃঢ়।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং' প্রত্যেককে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।' এ কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, সকল নবী রসুল তাঁদের আপন আপন সময়ে সকল মানুষ, জ্বিন এবং ফেরেশ্তাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে—'এবং এদের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম, তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং সরলপথে পরিচালিত করেছিলাম।' এখানে 'ওয়ামিন আবায়িহিম' (এদের পিতৃ পুরুষ) কথাটি পূর্ববর্তী আয়াতের 'এরা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত, এবং প্রত্যেককে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম'— কথা দু'টোর সঙ্গে সম্পৃক্ত। অথবা সম্পৃক্ত 'তার (হজরত নূহ্ এর) বংশধর' কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ 'ওয়ামিন আবায়িহিম' কথাটির মিন (মধ্যে) শব্দটি এখানে আংশিক অর্থ প্রকাশক। কেননা হজরত নূহের বংশধরগণ সকলেই নবী কিংবা রসুল ছিলেন না। এবং সকলে সৎপথে পরিচালিতও হননি।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৮৮, ৮৯, ৯০

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ۭ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ۝

❒ ইহা আল্লাহের পথ, স্বীয় দাসদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন; তাহারা যদি শিরক করিত তবে তাহাদিগের কৃতকর্ম নিষ্ফল হইত।

www.eelm.weebly.com

❒ ইহাদিগকেই কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়ত প্রদান করিয়াছি, অতঃপর যদি ইহারা এইগুলিকে প্রত্যাখ্যানও করে তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এইগুলির ভার অর্পণ করিয়াছি যাহারা এইগুলি প্রত্যাখ্যান করিবে না।

❒ ইহাদিগকেই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন, সুতরাং তুমি তাহাদিগের পথের অনুসরণ কর; বল, 'ইহার জন্য আমি তোমাদিগের নিকট পারিশ্রমিক চাহি না, ইহা তো শুধু বিশ্ব-জগতের জন্য উপদেশ।'

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'এটা আল্লাহ্র পথ, স্বীয় দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এর দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন'। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালাই নবী রসুলগণকে সরাসরি হেদায়েত দান করে থাকেন। তাঁরাই হচ্ছেন 'যাকে ইচ্ছা তিনি এর দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন'— কথাটির লক্ষ্যস্থল।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা যদি শিরিক করতো তবে তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হতো'। এ কথার অর্থ— শিরিক সকল কৃতকর্মকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করে দেয়। শিরিক (অংশীবাদীতা) এমনই জঘন্য পাপ যে এ মহাপাপ থেকে নিজের কৃতকর্মকে রক্ষা করা কারো জন্য কখনই সম্ভব নয়। নবী, রসুলগণ এ মহাপাপ থেকে চিরমুক্ত। তাঁদের দ্বারা শিরিক সংঘটিত হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। কিন্তু শিরিকের ভয়াবহতা বুঝানোর জন্যই এখানে এভাবে বলা হয়েছে যে, ওই সকল হেদায়েতপ্রাপ্ত আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় বান্দাগণের মধ্যেও যদি কেউ শিরিক করে— তবুও তার সকল কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। অতএব অন্যদের জন্য শিরিকমুক্ত থাকা যে অপরিহার্য—তা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'এদেরকেই কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়ত প্রদান করেছি।' এ কথার অর্থ— আমি আমার প্রিয় নবী রসুলদেরকে দিয়েছি কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়ত। এখানে আল কিতাব শব্দটি জাতিবাচক নাম পদ বা ইসমে জিন্স। এই নাম পদের ব্যবহারের মাধ্যমে নবী ও রসুলদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করার বিষয়টিকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর সঙ্গে তাঁদেরকে কর্তৃত্ব এবং নবুয়তদানের কথাও বলে দেয়া হয়েছে। কর্তৃত্ব বুঝাতে 'হুকুম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে— যার অর্থ কর্তৃত্ব বা সাম্রাজ্য। এভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আমি তাদেরকে সাম্রাজ্যাধিকারী বানিয়েছি এই জন্য যেনো মানুষেরা তাদের আনুগত্যকে স্বীকার করে। অথবা 'হুকুম' অর্থ এখানে হেকমত বা জ্ঞান। কিংবা সকল বিষয়ে সত্য সিদ্ধান্তদানের যোগ্যতা।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে—'অতঃপর যদি এরা এগুলোকে প্রত্যাখ্যানও করে তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এগুলোর ভার অর্পণ করেছি যারা এগুলো প্রত্যাখ্যান করবে না।' এ কথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা যদি আমার প্রদত্ত কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়ত অস্বীকার করে, তবে আমার তাতে কোনো ক্ষতি নেই। বরং আমি এই অনুগ্রহ বহনের গুরুদায়িত্ব অন্য এক সম্প্রদায়ের উপর অর্পণ করেছি। ওই সৌভাগ্যমণ্ডিত সম্প্রদায় হচ্ছে মদীনাবাসীরা। তারা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করে না। তারা প্রদত্ত অনুগ্রহকে এবং আমাকে বিশ্বাস করে। বিশ্বাসানুযায়ী আমলও করে। হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'কৃওমান' (এক সম্প্রদায়) অর্থ মদীনাবাসীগণ। উল্লেখ্য যে, এখানে প্রত্যক্ষভাবে মদীনাবাসীদেরকে চিহ্নিত করা হলেও 'এক সম্প্রদায়' কথাটির মধ্যে পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন অন্যান্য সাহাবীসহ পরবর্তী যুগের সকল মুসলমান। আবু রেজা আত্তারদী বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— পৃথিবীবাসী যদি কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়তকে অস্বীকার করে, তবে আমি নির্ধারণ করে রেখেছি যে, এ সমস্তের ভার অর্পণ করবো আসমানের ফেরেশ্তাদের উপর। তারা এগুলো প্রত্যাখ্যান করবে না।

তৃতীয় আয়াতে (৯০) বলা হয়েছে—'এদেরকেই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং— তুমি তাদের পথের অনুসন্ধান করো।' এ কথার অর্থ— এই নবী রসুলদেরকেই আল্লাহ্তায়ালা সৎপথে পরিচালিত করেছেন। দিয়েছেন তৌহিদ, দ্বীন এবং নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসম্বলিত শরিয়ত। এই দানের মাধ্যমেই তিনি তাদেরকে সঠিক পথে চালিয়েছেন। সুতরাং হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি এদের পথ অনুসরণ করুন। কথাটির মাধ্যমে মুশরিকদের ধর্মপথের প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে চরম ঘৃণা। কারণ তারা তাদের পথভ্রষ্ট পিতৃপুরুষের অন্ধ অনুসারী। নবী রসুলদের অনুসারী নয়। মনে রাখতে হবে যে, পূর্ববর্তী নবী রসুলের অনুসরণ করার অর্থ এখানে তাঁদেরকে এবং তাঁদের ধর্মমতকে সত্য বলে স্বীকার করা। তাঁদের শরিয়তের বিধানের অনুসরণ করা নয়। রসুল স. শ্রেষ্ঠতম রসুল। তাঁর শরিয়তই সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং তাঁর পক্ষে পূর্ববর্তী নবী রসুলের শরিয়তের অনুসরণ কিছুতেই শোভনীয় নয়। আর তাঁর উম্মতের জন্যও এ রকম অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়। প্রকৃত কথা এই যে, রসুল স.কে এখানে এ কথাটি বলে দেয়া হয়েছে যে, হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার পূর্বসুরীরা যেমন সৎপথে চলতেন আপনিও তেমনি সৎপথে চলুন। তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো শরিয়ত। আপনাকেও তেমনি দেয়া হয়েছে। তারা যেমন তাদেরকে প্রদত্ত শরিয়তানুযায়ী চলতেন, আপনিও তেমনি আপনাকে প্রদত্ত শরিয়তানুযায়ী চলুন।

www.eelm.weebly.com

আল্লামা বায়যাবী উল্লেখ করেছেন, 'হুদাহুম' (তাদের সৎপথ) কথাটির অর্থ— — আল্লাহ্‌র এককত্বে বিশ্বাস এবং ওই সকল মূল বিধান যা পালন করতে সকল রসুল সাধারণভাবে নির্দেশপ্রাপ্ত। শরিয়তের শাখা প্রশাখাগত কোনো বিধানের কথা এর মধ্যে পড়ে না। কারণ শাখাগত বিধানে তাঁদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। অর্থাৎ এখানে মূল বিষয়ে সকল নবী ও রসুল সম্মিলিত। আর শাখা-প্রশাখাগত বিধানের অনুসরণ অসম্ভবও। তাই এ রকম কথা কিছুতেই বলা যাবে না যে, এখানে রসুল স.কে পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়তের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে বা তিনি বিগত যুগের এক বা একাধিক শরিয়তের অনুসারী ছিলেন।

আমি বলি, নবী রসুলগণ আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ পালনের জন্য আদিষ্ট ছিলেন। তাই তাঁদের পূর্বসুরীদের শরিয়তের অরহিত বিধান মান্য করা ছিলো তাদের জন্য অত্যাবশ্যক। আর এটাও তাদের জন্য অত্যাবশ্যক যে, তাঁরা রহিত বিধানের স্থলাভিষিক্ত নতুনতর বিধান মান্য করে চলবেন। এখানে 'ইক্বতিদাহ্' (অনুসরণ) শব্দটির 'হা' হচ্ছে সাক্‌তাহ্ (তাজবীদের নিয়ম বিশেষ)। 'হা' শব্দটি এখানে সর্বনাম নয়।

শেষে বলা হয়েছে—'এর জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না, এটা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জনতাকে জানিয়ে দিন— আমার এ কোরআন ও ধর্মপ্রচারের জন্য আমি তোমাদের নিকট বিনিময় প্রত্যাশী নই। আমার পূর্বসুরীগণও তাঁদের উম্মতের নিকট বিনিময় প্রত্যাশী ছিলেন না। বিনিময় প্রত্যাশা তাদের জন্য যেমন নিষিদ্ধ ছিলো তেমনি আমার জন্যও নিষিদ্ধ। আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, কোরআন হাদিস এবং ফিকাহ্ শিক্ষাদান করে বিনিময় প্রার্থনা করা অসিদ্ধ। বিষয়টি বিনিময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো কিছু নয়। এটি হচ্ছে উপদেশ। জ্বিন ও ইনসানের জন্য কল্যাণময় উপদেশ।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে মুরসালরূপে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার মালিক ইবনে জয়িফ নামক এক ইহুদী বিতর্কের উদ্দেশ্যে রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হলো। গায়ে পড়ে ঝগড়া শুরু করে দিলো সে। রসুল স. বললেন— যিনি মুসার উপর তওরাত অবতীর্ণ করেছেন সেই আল্লাহ্‌র শপথ! বলো, তুমি কি তওরাতের মধ্যে এ কথাটি লিপিবদ্ধ দেখতে পাওনি— মোটা আলেমকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। ইহুদী মালেক ছিলো মোটা। তাই সে এ কথা শুনে রেগে গেলো। বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ কোনো মানুষের প্রতি কোনো হুকুম অবতীর্ণ করেননি। তার সাথীরা এ কথা শুনে বললো, কী বলছো তুমি? তবে কি আল্লাহ্ মুসার উপরেও কোনো কিছু অবতীর্ণ করেন নি? তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ○

❐ তাহারা আল্লাহের যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে নাই যখন তাহারা বলে 'আল্লাহ্ মানুষের নিকট কিছুই অবতারণ করেন নাই'; বল, তবে মুসার আনীত কিতাব যাহা মানুষের জন্য আলো ও পথ-নির্দেশ ছিলো, যাহা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়া কিছু প্রকাশ কর ও যাহার অনেকাংশ গোপন রাখ এবং যাহা তোমাদিগের পিতৃ-পুরুষগণ ও তোমরা জানিতে না যাহা দ্বারা তাহাও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল উহা কে অবতারণ করিয়াছিলো? বল, 'আল্লাহ্ই'; অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদিগের নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হইতে দাও।

মালেক বিন জয়িফ ছিলো ইহুদীদের ধর্মীয় নেতা। কিন্তু সে যখন বললো, 'আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোনো হুকুম অবতীর্ণ করেন নি'— তখন ইহুদীরা তাকে নেতৃপথ থেকে অপসারণ করলো। এ রকম লিখেছেন বাগবী।

সুদ্দী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদীদের ধর্মীয় নেতা ফাখাস বিন আজুরাকে লক্ষ্য করে। 'আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোনো কিছু অবতীর্ণ করেননি'— ফাখাসই এ রকম বলেছিলো। সুরা নিসা'র আলোচনায় এ সম্পর্কিত হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু তালহা এবং হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইহুদীরা বলেছিলো, হে মোহাম্মদ! আল্লাহ্ কি তোমার উপর কোনো কিতাব অবতীর্ণ করেছেন? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তারা বললো, আল্লাহ্র কসম, আসমান থেকে কখনও কোনো কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। তাদের এই অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— তারা আল্লাহ্র যথাযথ মর্যাদা

www.eelm.weebly.com

দান করে নাই যখন তারা বলে 'আল্লাহ্ মানুষের নিকট কিছুই অবতারণ করেননি।' এ কথার অর্থ— মানুষের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্পাকের নেয়ামত ও রহমত সম্পর্কে ইহুদীরা আদৌ অবহিত নয়। অজ্ঞ তারা। তাই আল্লাহ্পাকের দানের যথামর্যাদা দান করতে পারেনি। তারা রসুল প্রেরণের বিষয়টিকে সরাসরি অস্বীকার করলো। অথচ নবুয়ত ও রেসালাতই মানুষকে প্রদত্ত আল্লাহ্তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ।

এরপর বলা হয়েছে—'বলো, তবে মুসার আনীত কিতাব যা মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশ ছিলো, যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ করো ও যার অনেকাংশ গোপন রাখো।' এ কথার অর্থ— তোমাদের নবী হজরত মুসার কিতাবও তো ছিলো মানুষের জন্য নূর ও হেদায়েত। তোমরা ওই নূর ও হেদায়েত বিভিন্নরূপে বিভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ করে রেখেছো। কিন্তু ওই কিতাবের কিছু অংশ তোমরা প্রকাশ করো, অধিকাংশই করো না। এখানে 'বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ' করার অর্থ বিভিন্ন কাগজের টুকরায় তওরাতের আয়াত লিপিবদ্ধ করা। ইহুদীরা যে কাগজের টুকরোগুলোতে তওরাত লিপিবদ্ধ করতো, সেগুলোর অধিকাংশই গোপনে রেখে দিতো। আর কিছু অংশ প্রকাশ্যে প্রচার করতো। তাদের ওই গোপন কাগজগুলোতে ছিলো হজরত ঈসা আ. এবং হজরত মোহাম্মদ স. এর প্রশংসা, তাঁদের আগমনের সুসংবাদ, তাঁদের নিদর্শনসমূহ, রজমের আয়াত ইত্যাদি। আলোচ্য বাক্যটিতে এই অত্যন্ত জঘন্য ও নিন্দনীয় কর্ম সম্পর্কে ইহুদীদেরকে শাসানো হয়েছে। প্রকারান্তরে বলে দেয়া হয়েছে, ইহুদীরা নিশ্চিত কুপ্রবৃত্তিতাড়িত। এরপর বলা হয়েছে—'এবং যা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা জানতে না তাও শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো।' অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেছেন, এই বাক্যটি দ্বারা ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে লক্ষ্য করে এখানে বলে দেয়া হয়েছে— তোমাদের প্রতি অবতারিত তওরাতে এমন অনেক বিষয় নেই যা কোরআনে রয়েছে। আল্লাহ্পাকই দয়া করে তাঁর শেষ রসুলের মাধ্যমে সে সকল জ্ঞান তোমাদেরকে জানাচ্ছেন। এ অনন্য সুযোগ তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের ছিলো না। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, ধর্মীয় বিষয়ের যে সকল বিষয় ও পরিভাষা সহজবোধ্য ছিলো না, সে সকল বিষয়কে রসুল স. এর মাধ্যমে তোমাদের নিকট সহজবোধ্য করা হয়েছে। অন্য আয়াতেও এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'ইন্না হাজাল ক্বোরআনু ইয়াকুস্সো

www.eelm.weebly.com

আ'লা বনী ইসরাইলা আকছারাল্লাজি হুম ফিহি ইয়াখতালিফুন' (নিশ্চয়ই এই কোরআন বনী ইসরাইলদের মতবিরোধের বিষয়ে যথার্থ বর্ণনা প্রদান করছে)।

'তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা জানতে না, কথাটির অর্থ রসুল স. এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে যে দুর্লভ জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো, সেই জ্ঞানকে তারা নষ্ট করে ফেলেছে (গ্রহণ করেনি)।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে। অর্থাৎ বলা হয়েছে— হে বিশ্বাসীরা! ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তোমরা ছিলে মূর্খ। তোমাদের পিতৃ-পুরুষরাও ছিলো অজ্ঞ।

রসুল স. এর মাধ্যমেই আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে যথার্থ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছেন। এই মহান অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এভাবে— যা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা জানতে না।

এরপর বলা হয়েছে— কুলিল্লাহ্ (বলো, আল্লাহ্) এ কথাটির সংযোগ রয়েছে 'মান আন্যালাল কিতাব' (বলো, আল্লাহ্ই কিতাব নাজিল করেন) কথাটির সঙ্গে অর্থাৎ তওরাত ও কোরআনকে অবতীর্ণ করেছেন কে— এই প্রশ্নটি উত্থাপনের পর ইহুদীরা নিশ্চুপ হয়ে গেলো। তখন আল্লাহ্পাক নির্দেশ দিলেন— 'কুলিল্লাহ্ (বলুন আল্লাহ্)। অর্থাৎ অন্যান্য আসমানী কিতাবের মতো তওরাত ও কোরআন অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ্পাক স্বয়ং।

শেষে বলা হয়েছে— 'ছুম্মা জারহুম ফি খওদ্বিহিম ইয়াল্আবুন' (অতঃপর তাদেরকে তাদের নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হতে দাও)। এ কথার অর্থ— ইহুদীদের অসত্য আলোচনা নিরর্থক ও ক্রীড়া কৌতুক সদৃশ। অতএব হে আমার প্রিয় রসুল! ইহুদীদেরকে নিরর্থকতার মধ্যেই নিমজ্জিত থাকতে দিন। তাদের পথপ্রদর্শনের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হবেন না। এখানে 'ফি খওদ্বিহিম' (নিরর্থক আলোচনা) কথাটির সংযোগ ঘটেছে 'জারহুম' (মগ্ন হতে দাও) কথাটির সঙ্গে এবং 'ইয়াল্আ'বুন' (আলোচনারূপ খেলা) কথাটি এখানে কর্মবাচক সর্বনাম। অর্থাৎ 'হুম' (তাদেরকে) শব্দ থেকে অথবা খওদ্বিহিম শব্দের সর্বনাম (হিম) থেকে অবস্থা প্রকাশক হয়েছে। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে— 'ফি খওদ্বিহিম' এর সংযোগ এখানে 'ইয়াল্আ'বুন' এর সঙ্গে। 'খওদুন' শব্দটির অর্থ ইহুদীদের নিরর্থক আলোচনা বা বিভ্রান্ত ধারণা।

www.eelm.weebly.com

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝

❐ এই কিতাব কল্যাণময় করিয়া অবতারণ করিয়াছি যাহা উহার পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যাহা দ্বারা তুমি মক্কা ও উহার পার্শ্ববর্তী লোকদিগকে সতর্ক কর; যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে তাহারা উহাতে বিশ্বাস করে এবং তাহারা তাহাদিগের সালাতের হেফাজত করে।

'ওয়া হাজা কিতাবুন আনযালনাহু মুবারাকুম্ মুসাদ্দিকুল্লাজিনা বাইনা ইয়াদাইহি' (এই কিতাব কল্যাণময় করে অবতারণ করেছি যা এর পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক)। এ কথার অর্থ— এই কিতাব কোরআন একটি কল্যাণকর গ্রন্থ। এই কল্যাণকর গ্রন্থ ইতোপূর্বে অবতীর্ণ তওরাতকে সত্য বলে স্বীকার করে। এখানে 'মুবারক' শব্দটির অর্থ কল্যাণকর। আর 'পূর্বেকার কিতাব' কথাটির অর্থ তওরাত।

'ওয়ালি তুনজিরা উম্মালক্কুরা ওয়া মান হাওলাহা' (এবং যদ্বারা আপনি মক্কা ও মক্কার পার্শ্ববর্তী লোকদেরকে সতর্ক করে থাকেন)। এখানে 'ওয়ালি তুনজিরা' (যেনো আপনি সতর্ক করেন) কথাটির সংযোগ রয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। আগের বাক্যের 'কল্যাণময় করে অবতারণ করেছি' কথাটির মধ্যে এই ধারণাটি বিদ্যমান। এভাবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! ওই কল্যাণময় গ্রন্থটি এজন্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে যাতে মক্কা ও মক্কার পার্শ্ববর্তী লোকেরা উপকৃত হয় এবং এর দ্বারা আপনি তাদেরকে সতর্ক করেন। এভাবে 'উম্মুল ক্কুরা' শব্দটির অর্থ মক্কা বা মক্কাবাসী। 'মান হাওলাহা' কথাটির অর্থ মক্কার চতুষ্পার্শ্ব বা মক্কার চতুষ্পার্শ্বের অধিবাসী। মক্কা থেকেই সমস্ত পৃথিবী সম্প্রসারিত হয়েছে। তাই মক্কাকে বলা হয় 'উম্মুল ক্কুরা' বা ধরণীর নাভীমূল। কথাটির এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, মক্কাই পৃথিবীবাসীদের কেবলা এবং পবিত্র হজ পালনের স্থান। এভাবে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে উম্ শব্দটির অর্থ হবে মূল বা উৎস। আর শেষোক্ত ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে উম্ শব্দের অর্থ হবে মামুম বা অধিষ্ঠান। শেষে বলা হয়েছে—'যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা ওতে বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের নামাজের হেফাজত করে।' এ কথার অর্থ— পরকাল বিশ্বাসীরাই রসুল এবং রসুল

www.eelm.weebly.com

কর্তৃক আনীত কিতাবে বিশ্বাসী। এমতোবিশ্বাসের কারণে তারা তাদের নামাজের হেফাজত করে। পরকালে বিশ্বাস করলে স্বভাবতই হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত হয়। ফলে প্রতীতি জন্মায় রসুলের প্রতি, কোরআনের প্রতি এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার প্রতি। তাই তারা আল্লাহ্‌পাকের প্রধান নির্দেশ নামাজের যথাসংরক্ষণে ব্রতী হয়। এখানে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশসমূহের মধ্যে কেবল নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ নামাজই ইসলামের প্রধান স্তম্ভ। আলোচ্য বাক্যটির মাধমে প্রচ্ছন্নভাবে এ কথাটিও বলে দেয়া হয়েছে যে, ইহুদীরা রসুল মোহাম্মদ স. কে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না কোরআনকেও। তেমনি তওরাতের প্রতিও তাদের বিশ্বাস নেই। যদি থাকতো তবে তারা শেষ রসুল ও শেষ মহাগ্রন্থ কোরআনকেও বিশ্বাস করতো। কেননা কোরআন, তওরাত এবং কিয়ামতের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। এগুলোর যে কোনো একটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে অন্য দু'টি আপনাআপনি বিশ্বাসের বলয়ভূত হয়ে যায়।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৯৩

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۝

❒ যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে 'আমার নিকট প্রত্যাদেশ হয়,' যদিও তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না এবং যে বলে 'আল্লাহ্ যাহা অবতারণ করিয়াছেন আমিও উহার অনুরূপ অবতারণ করিব,' তাহার চেয়ে বড় জালিম আর কে? যদি তুমি দেখিতে পাইতে যখন জালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় রহিবে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়াইয়া বলিবে 'তোমাদিগের প্রাণ বাহির কর; তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অন্যায় বলিতে ও তাঁহার নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে, সেজন্য আজ তোমাদিগকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হইবে।'

ওই ব্যক্তি জালেম যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে। যেমন মালিক বিন জয়িফ বলে, আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কিছু অবতীর্ণ করেন নি। আমর বিন লুহাই এবং তার অনুসারীরা বলে, আল্লাহ্ সায়েবা এবং হাম কে হারাম করে দিয়েছেন এবং কোনো কোনো উটের উপর আরোহণ করা নিষিদ্ধ করেছেন। আর ওই পশুর

www.eelm.weebly.com

জীবিত বাচ্চা পুরুষদের জন্য হালাল কিন্তু রমণীদের জন্য হারাম। বাচ্চা মৃত হলে সকলের জন্য হালাল। এ সকল ধর্মদ্রোহীদেরকে লক্ষ্য করে এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে— 'যে আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে।'

এরপর বলা হয়েছে—'কিংবা বলে, আমার নিকট প্রত্যাদেশ হয়, যদিও তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না।' বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, এই বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে মিথ্যাবাদী মুসায়লামা সম্পর্কে। সে ছিলো গণক। কিছু কিছু ছন্দময় বাক্য গঠন করে সে বলতো— এগুলো প্রত্যাদেশ। এগুলো আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়। তাই আমি নবী।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইকরামা বলেছেন, মিথ্যুক মুসায়লামা রসুল স. এর দরবারে দু'জন দূত প্রেরণ করলো। রসুল স. তাদেরকে বললেন, তোমরা কি মুসায়লামাকে নবী বলে স্বীকার করো? দূতদ্বয় বললো, হাঁ। তিনি স. বললেন,দূত হত্যার নিয়ম থাকলে আমি এখনই তোমাদের মস্তক ছেদন করতাম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, একদিন আমি শায়িত অবস্থায় তন্দ্রার ঘোরে দেখলাম— আমাকে দেয়া হয়েছে পৃথিবীর ভাণ্ডারের চাবি। আর দু'হাতে পরানো হয়েছে দু'টো সোনার কাঁকন। কাঁকন দু'টোকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারলাম না। প্রত্যাদেশ হলো— কাঁকন দু'টো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দাও। আমি ফুঁ দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেলো কাঁকন দু'টো। আমি বুঝলাম, কাঁকন দু'টোর অর্থ— মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার ইয়ামিনবাসী আসওয়াদ আনাসী এবং ইয়ামামাবাসী মুসায়লামা কাজ্জাব।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং যে বলে 'আল্লাহ্ যা অবতারণ করেছেন আমিও তার অনুরূপ অবতারণ করবো,' তার চেয়ে বড় জালেম আর কে? বাগবী বলেছেন, এই বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে আবদুল্লাহ্ বিন আবী সারাহ্ সম্পর্কে। আবদুল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণ করলে রসুল স. তাকে কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করার কাজে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু সে বিশ্বাসভাজন ছিলো না। রসুল স. যখন বলতেন 'সামিয়াম বাসিরান'। সে লিখতো— আলীমান হাকিমান। আবার রসুল স. বলতেন, 'আলীমান হাকিমান, 'সে তখন লিখতো—'গফুরার রহীমান।' একদিন অবতীর্ণ হলো—'ওয়ালাক্বদ্ খলাক্বনাল ইনসানা মিন সুলালাতিম মিন্‌তিন' (আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে)। রসুল স. সদ্য অবতীর্ণ আয়াতটি লিখতে নির্দেশ দিলেন। মানব সৃষ্টি সম্পর্কিত এই আয়াতটি খুবই ভালো লাগলো আবদুল্লাহ্র। সে হঠাৎ বলে উঠলো—'ফা তাবারাকাল্লহু আহ্সানাল খলিক্বিন' (আল্লাহ্পাক কতোইনা সুন্দর স্রষ্টা)। রসুল স. বললেন, এ বাক্যটিও লিপিবদ্ধ করো। এই আয়াতটিও সদ্য অবতীর্ণ। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ্ ভাবলো— আশ্চর্য! আমার উপরেও তাহলে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়। এ রকম

www.eelm.weebly.com

চিন্তার ফলে সে হয়ে গেলো ধর্মত্যাগী। মিশে গেলো মুশরিকদের দলে। হজরত ইকরামা, ইবনে জারীর এবং সুদ্দীও এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। যথাস্থানে এর বিবরণ দেয়া হবে।

বাগবী উল্লেখ করেছেন, মক্কা বিজয়ের পূর্বে রসুল স. যখন মাররুজ জাহ্‌রান নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন, তখন অনুতপ্ত আবদুল্লাহ্ এসে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলেন। হাফেজ ফাত্‌হুদ্দীন ইবনে সাইয়্যেদিন্নাস তাঁর রচিত রসুল স. এর জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী সারাহের জন্য সুপারিশ করেছিলেন হজরত ওসমান। রসুল স. হজরত ওসমানের সুপারিশ কবুল করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী সারাহ ছিলেন খাঁটী ইমানদার। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আর কেউ কোনো সন্দেহ করেননি। শেষে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন সেজদারত অবস্থায়।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে, তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য বাক্যটি। 'আমিও এর অনুরূপ অবতারণ করবো'— কথাটি আল্লাহ্ সম্পর্কে উপহাস বৈ কিছু নয়। আর আলোচ্য বাক্যটি ওই উপহাসেরই প্রত্যুত্তর।

আমি বলি, আলোচ্য বাক্যটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে নজর বিন হারেসের প্রতি। সে সুরা 'আন্‌নাযিয়াত গরক্বান' কে উপলক্ষ করে একটি শ্লেষপূর্ণ বাক্য রচনা করেছিলো। ওই বাক্যটির অর্থ ছিলো— শপথ আটা ভক্ষণকারী, খামীর প্রস্তুতকারী এবং রুটি নির্মাতার।

এরপর বলা হয়েছে—'যদি আপনি দেখতে পেতেন যখন জালেমগণ মৃত্যুযন্ত্রণায় পতিত হবে।' এখানে বলা হয়েছে, হে আমার রসুল! যদি আপনি দেখতে পেতেন। অর্থাৎ এখানে রসুল স. কে সম্বোধন করে জালেমদের মৃত্যুযন্ত্রণার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে রয়েছে একটি উহ্য কর্ম। 'আজ্‌জ্বলিমুনা' (জালেমগণ) শব্দটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে ইহুদী ও ভণ্ড নবীদেরকে। তারা আল্লাহ্‌তায়ালার কালামকে উপহাস করতো। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে জ্বলিমুন অর্থ ইহুদী ও ভণ্ড নবীসহ সকল কাফের। 'দেখতে পেতে' কথাটি এখানে শর্তসূচক অর্থাৎ কথাটির মাধ্যমে এখানে বলে দেয়া হয়েছে, হে আমার রসুল! যদি আপনি জালেমদের মৃত্যু যন্ত্রণার স্বরূপ দর্শন করতেন, তবে ভীত সন্ত্রস্ত দৃশ্যই দেখতেন। 'গামারাত' শব্দটির অর্থ কষ্ট বা যন্ত্রণা। শব্দটি বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত। কামুস গ্রন্থে রয়েছে—'গামারাতুশ্‌শাই' অর্থ-- কোনো বস্তুর কঠিন বা কষ্টদায়ক অবস্থা। শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ— আবৃত করা বা ঢেকে নেয়া। গামারাহুল মাউ এবং ইগ্‌তামারাহুল মাউ অর্থ— একে পানি ঢেকে নিয়েছে বা নিমজ্জিত করেছে। চরম সংকটময় মুহূর্তকে বুঝাতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কারণ তখন মানুষ সবদিক দিয়ে বিপদাচ্ছাদিত হয়।

www.eelm.weebly.com

সিহাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, 'গামারা' শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ— কোনো বস্তুর প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। এ কারণে অধিক পানিকে 'গামারা' বলা হয়। কারণ তা সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করে দেয়। সিহাহ্ রচয়িতার ব্যাখ্যানুসারে এখানে 'গামারাত' শব্দটির মর্ম হবে— নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। মৃত্যু জীবনের চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দেয় বলেই এখানে মৃত্যুযন্ত্রণাকে বলা হয়েছে 'গামারাত্'।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং ফেরেশ্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের করো।' এ কথার অর্থ— মৃত্যুর প্রাক্কালে ঋণের টাকা আদায়কারীর মতো অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে ফেরেশ্তারা বলবে, মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে চাইলে এক্ষণে জীবন বের করো।

শেষে বলা হয়েছে—'তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে এবং তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, সেজন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে।' এভাবে আল্লাহ্ সম্বন্ধে কাফেরদের মিথ্যা কথাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে অবমাননাকর শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে। তাদের মিথ্যাকথাগুলো ছিলো এ রকম— আল্লাহ্তায়ালার সন্তান রয়েছে, আল্লাহ্পাক মানুষের নিকট কোনো কিছু অবতীর্ণ করেননি ইত্যাদি। আর আল্লাহ্র নিদর্শন সম্বন্ধে কাফেরদের ঔদ্ধত্যগুলো হচ্ছে— মিথ্যা নবুয়তের দাবি, 'আমিও এর অনুরূপ অবতারণ করবো' (আমার কাছেও প্রত্যাদেশ আসে) ইত্যাদি।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইকরামা বলেছেন— নজর বিন হারেস একবার বললো, লাত ও উজ্জা প্রতিমাদ্বয় আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ৯৪

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

❐ তোমরা আমার নিকট নিঃসংগ অবস্থায় আসিয়াছ যেমন প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম; তোমাদিগকে যাহা দিয়াছিলাম তাহা তোমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছ, তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিতে সেই সুপারিশকারিগণকেও তোমাদিগের সহিত দেখিতেছি না; তোমাদিগের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য ছিন্ন হইয়াছে এবং তোমরা যাহা ধারণা করিয়াছিলে তাহাও নিষ্ফল হইয়াছে।

---

www.eelm.weebly.com

কিয়ামতের দিনে অবিশ্বাসীদের দুরবস্থার কথা বিবৃত হয়েছে এই আয়াতে। সেদিন তারা নিতান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় জবাবদিহির জন্য হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব কেউ তখন পাশে থাকবে না। সঙ্গে থাকবে না পৃথিবীর কোনো সম্পদ। সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না ওই দেব-দেবীরাও, যাদের পূজা তারা করতো। সেদিনের নিঃসঙ্গ অবস্থা বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ফুরদু' শব্দটি। শব্দটি 'ফরদুন' শব্দের বহুবচন।

আয়াতে বলা হয়েছে—'তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছো, যেমন তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছিলাম। এ কথার অর্থ হে কাফের সম্প্রদায়! পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তোমরা যেরূপ বস্ত্রহীন ও খতনাবিহীন ছিলে— ঠিক সেভাবে আজ তোমরা উপস্থিত হয়েছো বিচারের ময়দানে।

এরপর বলা হয়েছে—'তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা তোমরা পশ্চাতে ফেলে এসেছো'; এ কথার অর্থ— পৃথিবীতে আমি তোমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছিলাম। দিয়েছিলাম সম্পদ, সম্মান, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন— অনেক কিছু। কিন্তু আজ দেখো, তোমাদের আর কোনো কিছুই নেই। তোমরা এখন নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ। বাক্যটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে,— তোমরা এখন তোমাদের জন্মের সময়ের মতো বস্ত্রহীন, বৈভবহীন। পৃথিবীর জীবনে তোমরা ছিলে আখেরাত সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। সেখানে তোমাদের বয়স, বুদ্ধি এবং সম্পদ দ্বারা এমন কোনো পুণ্যকর্ম সম্পাদন করোনি, যা আখেরাতে সঙ্গে নিয়ে আসা যায়। তোমরা তাই এখন রিক্ত, শূন্য, নিঃসম্বল।

অতঃপর বলা হয়েছে—'তোমরা যাদেরকে শরীক করতে সেই সুপারিশকারিদেরকে তোমাদের সঙ্গে দেখছি না; তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য ছিন্ন হয়েছে এবং তোমরা যা ধারণা করেছিলে তা-ও নিষ্ফল হয়েছে।' এখানে 'মা বাইনাকুম' (তোমাদের মধ্যকার) শব্দটিকে ক্বারী নাফে, ক্বারী হাফস্ এবং ক্বারী কাসাঈ পড়তেন 'মা বাইনাকাম'। 'তাক্বাত্তায়া মা বাইনাকুম' অর্থ— তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য বিচ্ছিন্ন হয়েছে। 'বাইনা' শব্দটি এখানে ধাতু মূল— যার অর্থ ছিন্ন করা, আবার সংযোগ করা। অর্থাৎ শব্দটি বিপরীত অর্থবোধক, আবার শব্দটি বিশেষ্য এবং আধারও। অর্থাৎ দু'ভাবে শব্দটি ব্যবহার করা যায়। কামুস গ্রন্থে এ রকম বলা হয়েছে। 'মা কুনতুম তাযউ'মুন' কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে— তোমরা ধারণা করতে, দেবতারা তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে। আরো ধারণা করতে, পরকাল বলতে কিছু নেই। আজ দেখো, তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

www.eelm.weebly.com

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ○

❑ আল্লাহ্ই শস্য-বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন, তিনিই প্রাণহীন হইতে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্ত হইতে প্রাণহীনকে নির্গত করেন; এই তো আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরিয়া যাইবে?

প্রথমেই বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ই শস্য-বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাকই গুচ্ছ থেকে বীজ, খর্জুর বৃক্ষ থেকে গুচ্ছ উৎপাদন করেন। বলেছেন হাসান, কাতাদা ও সুদ্দী। জুজায বলেছেন, এখানে শুষ্ক শস্যবীজ এবং শুকনো আঁটি থেকে সবুজ বৃক্ষ সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে ওই ফাটল বা ভ্রূণের কথা বলা হয়েছে— যা গমের বীজ এবং খেজুরের আঁটির মধ্যে থাকে। আল্লাহ্পাকই ওই ভ্রূণের স্রষ্টা। জুহাক বলেছেন, ফালেক অর্থ স্রষ্টা। এখানে 'হাব্বুন' শব্দটির অর্থ খাদ্যের শস্যবীজ, যেমন— গম, চাউল, বুট ইত্যাদি। 'হাব্বুন' শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে 'হাব্বাতুন'। আর 'নাওয়া' (আঁটি) শব্দটিও বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে 'নাওয়াতুন।' শব্দটির অর্থ— ফলমূলের আঁটি বা বীজ, যা মানুষের মূল আহার্য বস্তু নয়। যেমন— খেজুর, আঙ্গুর, আনার ইত্যাদির আঁটি।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইউখরিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিত' (তিনিই প্রাণহীন থেকে জীবন্তকে নির্গত করেন)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাকই মৃত-তুল্য বীর্য ও আঁটি থেকে সৃষ্টি করেন প্রাণবন্ত প্রাণী ও জীবন্ত উদ্ভিদ।

তারপর বলা হয়েছে—'ওয়া মুখরিজুল মাইয়্যিতি মিনাল হাই' (প্রাণহীনকে জীবন্ত থেকে নির্গত করেন)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালাই জীবন্ত প্রাণী ও সবুজ বৃক্ষ থেকে সৃষ্টি করেন মৃত-তুল্য বীর্য ও শুষ্ক শস্যবীজ। এখানে 'নির্গত করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 'মুখরিজু' শব্দটি। শব্দটি রূপান্তরিত কর্তৃকারক।

শেষে বলা হয়েছে—'জালিকুমুল্লহ্ ফাআননা তু'ফাকুন' (এই তো আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে)। এ কথার অর্থ— এই তো তোমাদের স্রষ্টা আল্লাহ্। এই তো তাঁর সৃষ্টির নিদর্শন। জীবন ও মৃত্যু সম্পূর্ণতঃই তাঁর অধিকারে। যে অক্ষম সে তো ইবাদতের অযোগ্য। সে প্রভাবিত, কিন্তু অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারকারী নয় । সুতরাং বুঝে নাও, তিনিই একমাত্র উপাস্য। জীবন ও মৃত্যু ঘটানোর এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাই তাঁর উপাস্য হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং হে আল্লাহ্র উদাসীন দাস সকল! তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে কোন দিকে যেতে চাও?

www.eelm.weebly.com

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ○

❑ তিনি উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করিয়াছেন; এইসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত।

'ফালিক্বুল ইসবাহ্' অর্থ— তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান। 'ইসবাহ্হুন' শব্দটি মূল ধাতু। এর অর্থ— প্রত্যুষের মধ্যে প্রবেশ করা। পরোক্ষভাবে এখানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে উষা। বলা হয়েছে, রাতের অন্ধকার ভেদ করে আল্লাহ্পাকই উষার উন্মেষ ঘটান। উল্লেখ্য যে, উষার উন্মেষ ঘটে ওই অন্ধকার থেকে, যে অন্ধকার উষাকাল সংলগ্ন।

'ওয়া জায়ালাল্ লাইলা সাকানা' অর্থ— তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্পাকের বাণী সত্য। তাই দেখা যায়, মানুষ সহ অধিকাংশ পশু-পাখি দিবসের কর্মমুখরতার পর রাতে নিদ্রাভিভূত হয়ে তাদের শ্রান্তি ও ক্লান্তি অপসারণ করে। রাত তাই সকল কর্মের শ্রান্তিহারক। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, দিনে সৃষ্টিকুলের সঙ্গে ব্যাপক মেলা মেশার ফলে আল্লাহ্র জিকির থেকে ঘটে এক ধরনের বিস্মরণ। সেই বিস্মরণের ক্লান্তি অন্তরাত্মাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কিন্তু রাত এলে পার্থিব সম্পৃক্তি হয়ে পড়ে শিথিল। তাই তখন নীরবে নিভৃতে আল্লাহ্তায়ালার প্রেমে বিভোর হয়ে বিস্মৃতিজনিত ক্লান্তি থেকে আত্মাকে মুক্তি দেয়া যায়। এই মুক্তির মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত বিশ্রাম।

'ওয়াশ্ শামসা ওয়াল ক্বমারা হুসবানা' অর্থ— এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন। এখানে 'হুসবানা' শব্দটি শব্দমূল বা ধাতু। এর অতীত কাল বোধক রূপ হচ্ছে হাসাবা। এর অর্থ হিসাব করা বা গণনা করা। 'হিসবানুন' শব্দটিও একটি মূল শব্দ। শব্দটির অতীতকালবোধক রূপ হচ্ছে হাসিবা। শব্দটির অর্থ গণনা করা বা অনুমান করা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'হুসবান' শব্দটি 'হিসাবুন' শব্দটির বহু বচন। এখানে এই শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে যে, সময়ের বিবর্তনকে চিহ্নিত করার জন্য, অর্থাৎ দিন-রাত্রি, মাস-বছরের হিসাব রাখার জন্য আল্লাহ্পাক চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন।

শেষে বলা হয়েছে—'জালিকা তাক্বদিরুল আজিজিল আ'লীম'। এ কথার অর্থ— এ সকল পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। আল্লাহ্পাকই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রকে দান করেছেন যথাযথ বিন্যাস। আর এগুলোর আকৃতি, প্রকৃতি, সংখ্যা— সকল কিছু সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে অবগত। আর সকল কিছুই তাঁর অপার পরাক্রমের অধীন।

www.eelm.weebly.com

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

❐ তিনিই তোমাদিগের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তদ্দ্বারা স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

এখানে বিশেষভাবে নক্ষত্র সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন— যেনো তদ্দ্বারা তোমরা স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ পাও। নিশীথের ঘোর অন্ধকার স্থলভাগ ও সমুদ্রকে সমভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে। পথিক ও নাবিক উভয়েই তখন হয়ে পড়ে দিশাহীন। আল্লাহ্‌পাকই সকল পথহারাদের প্রকৃত দিশারী। তাই তিনি রাতের আকাশে প্রোজ্জ্বল করে তোলেন নক্ষত্রকে— যেনো ওই নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে নিশীথের সকল পথিক ও নাবিক সহজেই খুঁজে পেতে পারে সঠিক পথের দিশা।

শেষে বলা হয়েছে—'ক্বদ্ ফাস্‌সালনাল আয়াতি লিক্বওমিই ইয়া'লামুন' (জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছেন)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন তাঁর এককত্বের অসংখ্য নিদর্শন। বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম, জীবন-মৃত্যুর উৎসারণ, উষার উন্মেষ, রাত্রি-দিন, চন্দ্র-সূর্য এবং নক্ষত্র— এ সকল কিছুই হচ্ছে তাঁর অপার, অতুলনীয়, অবিভাজ্য পরাক্রম ও জ্ঞানের নিদর্শন। যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরাই কেবল পাঠ করতে পারেন এই বিশদ নিদর্শনের অধ্যায়। জ্ঞানী, মূর্খ নির্বিশেষে সকলের সম্মুখে সদা উন্মোচিত রয়েছে আল্লাহ্‌পাকের অস্তিত্ব ও গুণাবলীর অসংখ্য প্রমাণ। কিন্তু এ সকল প্রমাণ থেকে উপকৃত হতে পারেন কেবল জ্ঞানীরা। মূর্খেরা নয়।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৯৮

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ○

❐ তিনিই তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে; অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

www.eelm.weebly.com

'তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন'— কথাটির অর্থ, আল্লাহ্পাক সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আদি পিতা হজরত আদম থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফামুস্তাক্বাররুঁ ওয়া মুস্তাওদাউ'ন' (এবং তোমাদের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান রয়েছে)। এখানে 'মুস্তাক্বাররুন' (স্থায়ী বাসস্থান) শব্দটি কর্তৃকারক। অথবা মাজদারে মীমী (মিম বিশিষ্ট মূল ধাতু)। কিংবা ইসমে জরফ (আধারাধিকরণ)। এভাবে কথাটির অর্থ হবে— তোমাদের মধ্য থেকে কারো কারো জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান নির্ধারণ করেছেন। অথবা— তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান নির্ধারিত রয়েছে। কিংবা— তোমাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে অবস্থানের স্থান।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'মুস্তাক্বাররুন' অর্থ মাতৃউদরে অবস্থানের সময় এবং 'মুস্তাওদাউন' (অস্থায়ী বাসস্থান) অর্থ— কবর জীবনের শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়। অর্থাৎ 'মুস্তাক্বাররুন' অর্থ মাতৃগর্ভ 'মুস্তাওদাউন' অর্থ কবর।

হজরত সাঈদ বিন যোবায়ের বলেছেন,'মুস্তাক্বাররুন' অর্থ মায়ের গর্ভ এবং 'মুস্তাওদাউন' অর্থ পিতার পৃষ্ঠ।

হজরত উবাইয়ের অভিমত এর বিপরীত। মুজাহিদ বলেছেন, মুস্তাক্বাররুন অর্থ পৃথিবী এবং মুস্তাওদাউন অর্থ কবর। অন্য আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে— ওয়া লাকুম ফিল আরদ্বি মুস্তাক্বাররুন (এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান রয়েছে)।

হাসান বসরী বলেছেন, 'মুস্তাক্বাররুন' অর্থ কবর এবং 'মুস্তাওদাউন' অর্থ পৃথিবী।

আমি বলি, 'মুস্তাক্বাররুন' (স্থায়ী আবাস) অর্থ জান্নাত এবং জাহান্নাম। আর 'মুস্তাওদাউন' অর্থ অন্য সকল অবস্থান। সে অবস্থানগুলো মাতৃউদর হতে পারে, পিতার পৃষ্ঠদেশ হতে পারে, পৃথিবীর বিভিন্ন বাসস্থান অথবা কবরের জীবনও হতে পারে।

শেষে বলা হয়েছে—'অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছেন'। আগের আয়াতে নক্ষত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পর বলা হয়েছিলো 'লি কওমিঁ ইয়্যালামুন', (জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য)। আর এখানে বলা হচ্ছে— 'লি ক্বওমিঁ ইয়্যাফক্বহুন' (অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য)। বিবরণভঙ্গির এ রকম পার্থক্যের কারণ হচ্ছে, নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু মানুষের সৃষ্টি রহস্য দৃশ্য গোচর কোনো বিষয় নয়— অনুধাবনের বিষয়।

www.eelm.weebly.com

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

❑ তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা তিনি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্‌গম করেন; অনন্তর উহা হইতে সবুজ পাতা উদ্‌গত করেন। পরে উহা হইতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্য-দানা উৎপাদন করেন, এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি হইতে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করেন আর আঙ্গুরের উদ্যান সৃষ্টি করেন এবং জয়তুন ও দাড়িম্বও; ইহারা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও; যখন উহা ফলবান হয় এবং ফলগুলি পরিপক্ক হয়। তখন উহাদিগের দিকে লক্ষ্য কর; বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য উহাতে অবশ্য নিদর্শন রহিয়াছে।

বৃক্ষের সৃষ্টি রহস্যের একটি দিকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। এখানে বলা হয়েছে—'তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তার দ্বারা তিনি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্‌গম করেন; অনন্তর তা থেকে সবুজ পাতা উদগত হয়, পরে তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্য দানা উৎপাদন করেন।' সকল পবিত্রতা আল্লাহ্‌র। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, একই বৃষ্টিপাতের ফলে সকল উদ্ভিদের জন্ম হয়। কিন্তু সেগুলোর স্বাদ এক রকম নয়। একেক গাছের ফল এক এক রকম স্বাদবিশিষ্ট।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করেন।' এখানে খেজুরের কাঁদি বুঝাতে 'ক্বিন্‌ওয়ানুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'ক্বনুউন'। ক্বনুউন অর্থ কাঁদি বা গুচ্ছ। 'দানিয়াতুন' অর্থ— পরিপক্ক খেজুরের ঝুলন্ত কাঁদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর আঙ্গুরের উদ্যান সৃষ্টি করেন।' এখানে 'সৃষ্টি করেন' কথাটির সংযোগ রয়েছে আয়াতের প্রথমে বর্ণিত 'সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্‌গম করেন' — কথাটির সঙ্গে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে—'এবং জয়তুন ও দাড়িম্বও; এরা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও।' এখানে 'আজ্‌জাইতুনা' 'ওয়ার্‌ রুম্‌মানা' (জয়তুন ও দাড়িম্ব) কথাটির পূর্বে 'শাজারুন' (বৃক্ষ) কথাটি অনুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, জয়তুন এবং দাড়িম্ব (ডালিম) ফলগুলো দেখতে এক রকম নয়। এগুলোর আকার ও বর্ণ পৃথক। তাই এখানে বলা হয়েছে—'একে অন্যের সদৃশ ও বিসদৃশও।' অর্থাৎ আকৃতি, প্রকৃতি, বর্ণ এবং স্বাদের দিক থেকে জয়তুন এবং ডালিম কখনো এক রকম আবার কখনো বিভিন্ন রকম।

এরপর বলা হয়েছে—'যখন তা ফলবান হয় এবং ফলগুলো পরিপক্ক হয়, তখন সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করো'। এ কথার অর্থ হে মানুষ! তোমরা জ্ঞানচক্ষুসহ ফলবান বৃক্ষের প্রতি এবং সুপক্ক ফলের সমারোহের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। দেখো ফল ও ফসলের উন্মেষকালে সেগুলো কতোই না ক্ষুদ্র আকার নিয়ে পরিণতির দিকে যাত্রা শুরু করে। এরপর পরিবর্তিত হতে থাকে সেগুলোর আকার, প্রকার এবং আস্বাদ। এই রহস্যময় পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং বিবর্তনের প্রতি তোমরা জ্ঞান ও অভিনিবেশসহ দৃষ্টিপাত করো।

শেষে বলা হয়েছে— 'ইন্না ফি জালিকুম লাআয়াতিল্‌লি ক্বওমিই ইউ'মিনুন।' এ কথার অর্থ— বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্য নিদর্শন রয়েছে। অর্থাৎ বৃক্ষের জন্ম, ফুল, ফল ও ফসলের এই সুনিয়ন্ত্রিত বিবর্তন মহাশক্তিধর, বিজ্ঞানময় মহান আল্লাহ্‌তায়ালার এককত্বের একটি অবাক নিদর্শন। এই সৃজনশীলতায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অতুলনীয়। যারা বিশ্বাসী এবং জ্ঞানী, তারাই কেবল এসকল নিদর্শন থেকে আল্লাহ্‌তায়ালার এককত্বের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ আহরণ করে।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১০০

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

❑ তাহারা জিনকে আল্লাহের শরীক করে, অথচ তিনিই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহারা অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহের প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে; তিনি মহিমান্বিত! এবং উহারা যাহা বলে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।

মহা নিসর্গে ছড়িয়ে রয়েছে আল্লাহ্‌পাকের এককত্বের অসংখ্য নিদর্শন। সেই সকল নিদর্শনের উল্লেখ করে অবিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার করে দেয়াই ছিলো আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়। তাই আগের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্‌র এককত্বের পক্ষে অনেক দলিল প্রমাণ উপস্থাপনের পর এই আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে

www.eelm.weebly.com

অংশীবাদীদের অপবিশ্বাস ও অপআচরণের বিবরণ। অংশীবাদীদের প্রতি ঘৃণা এবং অংশীবাদীদেরকে সতর্ক করার জন্যই এখানে বলা হয়েছে 'তারা জ্বিনকে আল্লাহ্‌র শরীক করে, অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে'। এখানে জ্বিন অর্থ ফেরেশতা। কারণ জ্বিনের মতো ফেরেশতারাও দৃষ্টিবহির্ভূত সৃষ্টি। মক্কার মুশরিকেরা আল্লাহ্‌তায়ালার কন্যা ভেবে ফেরেশতাদেরকে পূজা করতো। জ্বিন শব্দটির অর্থ এখানে শয়তানও হতে পারে। শয়তানের অনুপ্রেরণাতেই অংশীবাদীরা দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করে। অতএব মূলতঃ শয়তানকেই তারা আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে শরীক বানায়। শয়তান কখনও কখনও তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর উপর ভর করে থাকে। তাই বলা যেতে পারে, প্রতিমা পূজার সাথে সাথে তারা শয়তানেরও পূজা করে। এ রকমও হতে পারে যে, মুশরিকেরা আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভালো কাজের স্রষ্টা এবং শয়তানকে মন্দ কাজের স্রষ্টা মনে করে। এই ধারণাটি স্পষ্টতঃই শিরিক। কারণ সৃষ্টিকরণের ক্ষমতা আল্লাহ্‌তায়ালা ছাড়া আর কারো নেই। মুশরিকেরা এই চিরন্তন সত্য সম্পর্কে অনবগত। তারা এ কথা মানে না যে, জ্বিন, ফেরেশতা, মানুষ সহ এই বিশাল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং। মুশরিকেরা মিথ্যাবাদী। তারা বিভিন্ন আকারে ও প্রকারে আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিকে অংশী বানায়। যেমন ইহুদীরা বলে, হজরত উযায়ের আল্লাহ্‌তায়ালার পুত্র। খৃষ্টানেরা বলে, আল্লাহ্‌র পুত্র হচ্ছে হজরত ঈসা। আর প্রতিমা পূজকেরা বলে, ফেরেশতারা আল্লাহ্‌তায়ালার কন্যা। অথচ তাদের পক্ষে জ্ঞানগত এবং বিশ্বাসগত কোনো দলিল নেই। আল্লাহ্‌পাক সকল অংশীবাদীতা থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে—

'সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আ'ম্মা ইয়াসিফুন' (তিনি মহিমান্বিত! এবং তারা যা বলে তিনি তাঁর ঊর্ধ্বে)।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১০১, ১০২

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ○

❒ তিনি আস্‌মান ও জমিনের স্রষ্টা, তাঁহার সন্তান হইবে কিরূপে? তাঁহার তো কোন ভার্যা নাই; তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।

www.eelm.weebly.com

❒ এই তো আল্লাহ্, তোমাদিগের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁহার ইবাদত কর; তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক!

প্রথমে বলা হয়েছে—'বাদিউ'স্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব।' এ কথার অর্থ তিনি আসমান জমিনের স্রষ্টা। আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ্তায়ালার এক অতুলনীয় ও অপূর্ব সৃষ্টি। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'বাদিউ' শব্দটির অর্থ— মুব্দাউন। অর্থাৎ পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকেই আল্লাহ্পাক সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ ও মহাপৃথিবী। এভাবে আল্লাহ্পাক রেখেছেন তাঁর অতুলনীয় সৃজনশীলতার স্বাক্ষর। অনস্তিত্বকে এভাবেই তিনি পরিয়েছেন অস্তিত্বের পরিচ্ছদ।

এরপর বলা হয়েছে—'তাঁর সন্তান হবে কিরূপে? তাঁর তো কোনো ভার্যা নেই; তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত।' আল্লাহ্ পাক যে স্ত্রী গ্রহণ ও সন্তান ধারণ থেকে পবিত্র এবং বিশাল সৃষ্টির একক স্রষ্টা যে তিনিই, তার কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—

১.আল্লাহ্তায়ালার সত্তা চিরন্তন ও অবিনাশী। তিনিই সকল সৃষ্টির একক স্রষ্টা। সৃষ্টি তার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষার্থে এবং সকল প্রয়োজন পূরণার্থে আল্লাহ্তায়ালার মুখাপেক্ষী। কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাই স্ত্রী ও সন্তানের প্রয়োজন থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র।

২. আল্লাহ্পাকই সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শরীর বা অবয়বের স্রষ্টা। পিতৃত্ব শরীরের একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং তিনি কিভাবে আকার বা দেহের অধীন হবেন? তিনি তো আকারাতীত।

৩. নারী পুরুষের সম্মিলনের মাধ্যমে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আর নারী পুরুষ সমশ্রেণীভুক্ত। অর্থাৎ উভয়ে মনুষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তো কোনো গোত্র, সম্প্রদায় অথবা শ্রেণীভুক্ত নন। তিনি এ সকলের একক স্রষ্টা। তিনি অতুল। সৃষ্টি অস্থায়ী, আর তিনি চিরস্থায়ী। সুতরাং তিনি সৃষ্টির মতো স্ত্রী গ্রহণ ও সন্তান ধারণ করবেন কিরূপে?

৪. সৃষ্টি হিসাবে সন্তান পিতার সমতুল। কিন্তু কোনো সৃষ্টিই আল্লাহ্তায়ালার সমতুল এবং সমকক্ষ নয়। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টির পিতা হবেন কিভাবে?

৫. আল্লাহ্তায়ালা সর্বজ্ঞ। প্রকাশ্য ও গোপন সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ব। কিন্তু সৃষ্টি এ রকম অসীম ও অপরিমেয় জ্ঞানের অধিকারী হতেই পারে না। সুতরাং সৃষ্টি তাঁর সন্তান হবে কিভাবে?

www.eelm.weebly.com

৬. পরের আয়াতে (১০২) বলা হয়েছে—'এই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই; তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করো।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ যেহেতু তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ছাড়া উপাস্য যখন আর কেউ নেই এবং তিনিই যখন সকল কিছুর একক স্রষ্টা, তখন তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো। এই নির্দেশনাটির মাধ্যমে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, যিনি সৃজন ও প্রতিপালন করেন, তিনিই কেবল উপাস্য হবার যোগ্য। উপাসনার যোগ্যতা অন্য কারো নেই। তাই নির্দেশ এসেছে, সুতরাং তাঁকে একক স্রষ্টা ও প্রভু প্রতিপালক হিসাবে মেনে নাও এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করো।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইইয়িন্ ওয়াকিল।' এ কথার অর্থ তিনি সকল কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। অর্থাৎ সৃষ্টির তত্ত্বাবধায়ন, শৃঙ্খলা রক্ষা ও পরিচালনা আল্লাহ্তায়ালারই দায়িত্বভূত। সুতরাং সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হও এবং তাঁরই উপাসনা করো। তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করবেন এবং তোমাদের পুণ্য কর্মের যথা বিনিময় দান করবেন।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১০৩

لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ○

❐ তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁহার অধিগত এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।

তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন কথাটির অর্থ, তিনি সৃষ্টির দৃষ্টিগাহ্য নন। ইবনে আবী হাতেম এবং শিথিল সূত্রে হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, জ্বিন, মানুষ, শয়তান এবং ফেরেশ্তাসহ সকল সৃষ্টি সারা জীবন ধরে যদি আল্লাহ্তায়ালাকে চাক্ষুষ করতে চায়, তবু তাঁকে দেখতে পাবে না।

এই আয়াতের মাধ্যমে মোতাজিলারা প্রমাণ করতে চায় যে, আল্লাহ্তায়ালার দর্শন অসম্ভব। কিন্তু আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হচ্ছে— পৃথিবীতে আল্লাহ্-দর্শন অসম্ভব। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, পরকালে বেহেশতবাসীরা আল্লাহ্তায়ালার দর্শন লাভে ধন্য হবেন। আর এই আয়াত মোতাজিলাদের অভিমতকে প্রমাণ করে না। কারণ, 'লা তুদ্রিকু' (দেখতে পাবে না বা অধিগম্য নন) কথাটি বর্তমান কালবোধক। ভবিষ্যতকালের জন্য এ রকম শব্দরূপ পরোক্ষ অর্থে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যত তো এক কথা নয়। তাই এ কথাটি মেনে নিতে হবে যে, এখানে (পৃথিবীতে) আল্লাহ্র দীদার সম্ভব নয়।

www.eelm.weebly.com

অভিমতটি ঐকমত্যোৎসারিত। পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দীদার সম্ভব— এ রকম কথা কেউই বলেননি। পৃথিবীতে অনেক কিছুই অসম্ভব, কিন্তু আখেরাতে তা সম্ভব। পৃথিবীর অসম্ভাব্য বিষয়ের মধ্যে আখেরাতকে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন নয়। এ রকম অর্থ করলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এবং পৃথিবী ও আখেরাতের মধ্যে আর কোনো ব্যবধান থাকে না। এ রকম একার্থকতা অসিদ্ধ।

'আলআবসার' শব্দরূপটি বহুবচন। তাই শুধু দর্শন এখানে উদ্দেশ্য নয়— উদ্দেশ্য হচ্ছে সমষ্টিগত দর্শন। শব্দটির প্রথমে উল্লেখিত আলিফ লাম (আল)কে যদি আহাদী (লামে আহাদী) বলা হয়, তবে দর্শনের উদ্দেশ্য হবে পৃথিবীর দর্শন। তাই অর্থ হবে— পৃথিবীর কোনো চোখ আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে না। কিন্তু এখানে পরকালে বেহেশতের মধ্যে ইমানদারদের চোখও দেখতে পারবে না— এ কথাটি কি প্রমাণিত হয়? আলিফ লামকে ইস্‌তেগরাকি (নিমজ্জক) বলাও যায় না, কারণ আয়াতের বক্তব্যভঙ্গি নেতিবাচক। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— তিনি সকল দৃষ্টির অধিগম্য নন। কথাটির অর্থ এ রকম নয় যে— তিনি কোনো দৃষ্টিরই অধিগম্য নন। অর্থাৎ বেহেশতেও বেহেশতবাসীদেরকে দর্শনদানে ধন্য করবেন না।

'হুলিয়া' পুস্তকে আবু নাইমের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. এই আয়াত পাঠ করলেন—'রব্বি আরেনি আন্‌যুরু ইলাইকা' (হে আমার প্রতিপালক, দেখা দাও— আমি তোমাকে দেখবো)। এরপর বললেন, আল্লাহ্‌পাক হজরত মুসাকে এরশাদ করেছেন, 'হে মুসা! আমাকে যে জীবিত অবস্থায় দেখবে, সে মরে যাবে। আমাকে দেখলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে প্রস্তর ও অন্যান্য পদার্থনিচয়। বৃক্ষরাজিও ফেটে চৌচির হয়ে যাবে আমাকে দেখলে। শাখা-প্রশাখাগুলো হয়ে যাবে বিক্ষিপ্ত, বিধ্বস্ত। বেহেশতবাসের সময় কেবল বেহেশতবাসীরা আমাকে দেখতে সক্ষম হবে। তাদের দৃষ্টিশক্তি সেখানে নিষ্প্রভ হবে না এবং তাদের অবয়ব হবে সেখানে অবিনাশী।'

'ইদরাক' শব্দটির অর্থ আকার ও তত্ত্বসহ দেখতে পাওয়া। শব্দটির সঙ্গে 'রুইয়াত' (দর্শন) শব্দটির যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। রুইয়াত অর্থ শুধুই দর্শন। আর ইদরাক অর্থ একই সঙ্গে দেখা ও পাওয়া অর্থাৎ দৃষ্টি দ্বারা বেষ্টন করে নেয়া। অথবা পরিপূর্ণরূপে দর্শিত বস্তুর সম্মুখবর্তী হওয়া। কিংবা দর্শিত বস্তুকে পরিপূর্ণরূপে দৃষ্টিসীমার মধ্যে পাওয়া। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— 'ফালাম্মা তারাআল জামআ'নি ক্বলা আসহাবু মুসা ইন্না লামুদ্‌রাকুনা ক্বলা কাল্লা' (দু'টি দল একে অপরকে দেখলো। মুসার সাথীরা বললো, নিশ্চয় তারা আমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। মুসা বললেন, কখনো নয়)। এই আয়াতে হজরত মুসার দল এবং ফেরাউন দলের পারস্পরিক দর্শন প্রমাণিত হয়েছে —কিন্তু 'ইদরাক' (পরিপূর্ণরূপে পাওয়া বা আধিকার করা) প্রমাণিত হয়নি।

www.eelm.weebly.com

'রুইয়াত' (কেবল দর্শন) এবং 'ইদরাক' (দৃষ্টি বেষ্টনীর মধ্যে পাওয়া)— দু'টো শব্দের অর্থ যদি এক বলে মেনে নেয়াও যায়, তবুও এতে করে আল্লাহ্ দর্শন কশ্মিনকালেও সম্ভব নয়— কথাটি প্রমাণিত হয় না। এখানে বলা হয়েছে— তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন। কিন্তু তাঁর দর্শন কোনোদিনও সম্ভব নয়— এ রকম কথা এখানে নেই।

এরপর বলা হয়েছে—'ওয়া হুয়া ইউদ্‌রিকুল আব্‌সার' (কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত)। এ কথার অর্থ— তাঁর অতুলনীয় দৃষ্টি ও জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টিকে বেষ্টন করে রয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে—'ওয়া হুয়াল্ লাতিফুল খবির' (এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত)। কামুস রচয়িতা বলেছেন, 'লাতিফ্' অর্থ— আপন দাসদেরকে কল্যাণ দানকারী, উপকার প্রদাতা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয়জনদের প্রতি দয়াবান। কামুস রচয়িতা আরো বলেছেন, 'লাতিফুন' অর্থ— গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানী। সিহাহ্ গ্রন্থে রয়েছে, 'লাতিফ' ওই সত্তা— যা অননুভব্য। সিহাহ্ প্রণেতার ব্যাখ্যানুসারে আলোচ্য আয়াতটির মর্মার্থ যথানিয়মে সংকুচিত ও সম্প্রসারিত হবে। এভাবে আয়াতটির অর্থ হবে— সৃষ্টি তাঁকে দৃষ্টির সীমানাভূত করতে পারবে না। কারণ তিনি অনুভূতির অতীত। কিন্তু তিনি সৃষ্টির দৃষ্টিকে অধিকার করতে সক্ষম। কেননা বিষয়টি তাঁর জ্ঞানায়ত্ত।

সুরা আন্‌আ'মঃ আয়াত ১০৪

قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۝

❒ তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্য আসিয়াছে; সুতরাং কেহ উহা দেখিলে উহা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হইবে, আর কেহ না দেখিলে তাহাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমি তোমাদিগের তত্ত্বাবধায়ক নহি।

স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপনের পর মধ্যবর্তী কোনো অবস্থান আর থাকে না। যে স্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করে, সে-ই উপকৃত হয়। আর যে না দেখে সে হয় ক্ষতিগ্রস্ত। স্পষ্ট প্রমাণকে যে কাজে লাগায়, তারই সত্যদর্শন ঘটে এবং সে-ই ইমান আনয়ন করে। এভাবে সে নিজেরই উপকার করে। আর যে জ্ঞানান্ধ এবং সত্য অনুধাবন থেকে বিমুখ, সে করে আত্মহনন। তার খারাপ পরিণতি চাপিয়ে

www.eelm.weebly.com

দেয়া কোনো ব্যাপার নয়। বরং এ হচ্ছে তার স্বোপার্জিত পরিণতি। আলোচ্য আয়াতে এ কথাগুলোই জানিয়ে দেয়া হয়েছে এভাবে—'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্য এসেছে; সুতরাং কেউ তা দেখলে তার দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে, আর কেউ না দেখলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

শেষে বলা হয়েছে 'ওয়ামা আনা আ'লাইকুম বিহাফিজ' (আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই)। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি বলে দিন, হে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী জনতা, আমি তোমাদের কৃতকর্মের সংরক্ষক নই। পাপের শাস্তি এবং পুণ্যের পুরস্কার প্রদানকারীও আমি নই। আমি তো কেবল শুভসমাচারপ্রদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী। তোমাদের আমাদের সকলের কৃতকর্মের সংরক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্। রসুল স. এর মাধ্যমে পৃথিবীবাসীদেরকে এ কথাই জানিয়ে দিতে দয়ার্দ্র অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেছেন যে— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত। এই প্রমাণের মাধ্যমে সত্যপথ দর্শন অথবা অদর্শন এখন তোমাদের সিদ্ধান্তভূত বিষয়। পুরস্কার ও তিরস্কারের পথ এখন নির্বাচন করবে তোমরাই। আমি কারো পুরস্কার ও তিরস্কার প্রদাতা নই। আমার দায়িত্ব তো কেবল আল্লাহ্তায়ালার অসন্তোষ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা এবং তাঁর সন্তোষের সুসংবাদ প্রদান করা।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১০৫

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

❒ এইভাবে নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি; ফলে, অবিশ্বাসীগণ বলে 'তুমি ইহা পূর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন করিয়া বলিতেছ।' কিন্তু আমি তো সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।

'ওয়া কাজালিকা নুসাররিফুল আয়াতি' (এভাবে নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি)। এখানে 'সারফুন' শব্দটির অর্থ— কোনো বস্তুকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করা। এ রকম রূপান্তরিত বিবৃতির উদ্দেশ্য থাকে সম্বোধিত ব্যক্তির নিকট বক্তব্যকে সহজবোধ্য করে তোলা। এই পারিভাষিক রূপান্তরের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে—'বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি।'

কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'সারফুল হাদিস' অর্থ— বক্তব্যকে কিছুটা সম্প্রসারণ করা এবং সৌন্দর্যায়িত করা। মুদ্রা সম্পর্কিত পরিভাষা (সারফু ফিদ্দারাহিমা) থেকে

www.eelm.weebly.com

শব্দটি সংগৃহীত হয়েছে— যার অর্থ, কোনো মুদ্রার মূল্য অন্য কোনো মুদ্রাপেক্ষা অধিক হওয়া। 'সারফুল কালাম' শব্দটির অর্থও 'সারফুল হাদিস' শব্দের অর্থের মতো। 'লাহু আলাইহি সারফুন' কথাটির অর্থ— একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়া। অর্থাৎ প্রাধান্যপ্রাপ্ত বস্তুটি যেনো প্রাধান্যহীন বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হয়।

এরপর বলা হয়েছে— ফলে, অবিশ্বাসীগণ বলে, 'তুমি পূর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন করে এ কথা বলছো।' এ কথার অর্থ— বিভিন্ন প্রকারের নিদর্শনাবলী বিবৃত করার কারণে ধর্মপ্রচারের কাজ সুসংগতরূপ ধারণ করেছে। তাই অবিশ্বাসীরা বলে, তুমি তো পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব অধ্যয়ন করে এ রকম কথা বলছো। 'ওয়ালি ইয়াকুলু' (ফলে অবিশ্বাসীরা বলে)— কথাটির সূত্র এখানে অনুক্ত রয়েছে। আর এখানকার 'লাম' অক্ষরটি পরিণতি প্রকাশক। এ পরিণতিটি হচ্ছে—'তুমি পূর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন করে বলছো'।

'দারাসতাল কিতাবা' অর্থ পূর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন করে। 'দরস' অর্থ অধ্যয়ন।

হজরত ইবনে আব্বাস এই আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন— এখানে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে লক্ষ্য করে জানাচ্ছেন, হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি যখন মক্কাবাসীর সামনে কোরআন পাঠ করবেন, তখন তারা বলবে— ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, যে ভাবেই হোক না কেনো এ কথাগুলো তুমি কোনো না কোনো স্থান হতে শিখে এসেছো। মক্কায় ছিলো দু'জন পারস্যবাসী ক্রীতদাস। ইঞ্জিল শরীফের বিশেষজ্ঞ ছিলো তারা। মক্কাবাসীরা ধারণা করতো রসুল স. ওই দু'জনের নিকট থেকে আসমানী কিতাবের জ্ঞান আহরণ এবং পুনঃপ্রচার করে চলেছেন মাত্র।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়ালি নুবাইয়্যিন্নাহু লিক্বওমিঁ ইয়্যালামুন' (কিন্তু আমি তো সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য)। এ কথার অর্থ— যদিও সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা উপকৃত হয় কেবল জ্ঞানীরা। কারণ তারা কোরআনের মর্ম অনুধাবন করে এবং এর নির্দেশনাকে মান্য করে চলে। তাই মনে হয় কোরআন যেনো কেবল জ্ঞানীদের জন্যই অবতীর্ণ করা হয়েছে।

বাইয়্যিন্নাহু শব্দটির 'হু' সর্বনামটি এখানে কোরআনের দিকে প্রত্যাবর্তিত। সুতরাং এখানে সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করার অর্থ কোরআনের আয়াত বিবৃত করা। অতএব সর্বনামটি কোরআনের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হওয়াই সমীচীন।

www.eelm.weebly.com

প্রকৃত কথা এই যে— এখানে বিভিন্ন প্রকারে ও সুস্পষ্টভাবে বিবৃত কোরআনের মধ্যে রয়েছে তিনটি বিষয়— ১. পরিপূর্ণরূপে কোরআনের প্রচার। ২. ওই ব্যক্তি হতভাগ্য যে কোরআনকে বলে মানুষের শেখানো বাণী। ৩. ওই ব্যক্তির ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে কোরআনের বাণী শোনে এবং মান্য করে।

সূরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১০৬, ১০৭

اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝

❒ তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হয় তুমি তাহারই অনুসরণ কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; এবং অংশীবাদীদিগের হইতে দূরে থাক।

❒ আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা শির্ক করিত না এবং তোমাকে তাহাদিগের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করি নাই; আর তুমি তাহাদিগের অভিভাবকও নহ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় তুমি তার অনুসরণ করো, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি আপনার প্রতি অবতীর্ণ কোরআনের অনুসরণ করুন। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই (লা ইলাহা ইল্লা হুয়া)। এটাই আপনার প্রতিপালকের (রবের) পক্ষ থেকে আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কোরআনের মূল কথা।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং অংশীবাদীদের থেকে দূরে থাকো' এ কথার অর্থ অংশীবাদীরা চির ভ্রষ্ট। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না, তাদের ধারণার প্রতি মনোযোগী হবেন না এবং তাদের সঙ্গে বচসা বিতণ্ডায় লিপ্ত হবেন না।

পরের আয়াতে (১০৭) বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তারা শিরিক করতো না।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করলে মুশরিকদেরকে শিরিক থেকে মুক্ত করতে পারেন। কারণ তিনি অপার ক্ষমতাধর। কিন্তু তিনি কাউকে ইমান গ্রহণে বাধ্য করেন না। অবাধ্যদের জন্য রয়েছে সুনির্ধারিত গন্তব্য। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে— আমি জ্বিন ও ইনসান দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসী— সকলেই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়াধীন। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়ই পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। মোতাজিলারা বলে, অবিশ্বাস বা কুফর আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়বহির্ভূত বিষয়। কিন্তু তাদের কথা ঠিক নয়। কারণ কেউ বা কোনো কিছু আল্লাহ্পাকের অতুলনীয় ও অপার অভিপ্রায়ের বহির্ভূত হতেই পারে না।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং তোমাকে তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করিনি'। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি অবিশ্বাসীদের কৃতকর্মের প্রহরী বা রক্ষক নন। তাদের পাপাচারের জন্য আপনাকে কখনো অভিযুক্ত করা হবে না। আতা বলেছেন, এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অবাধ্যদের এমতোরক্ষক নিযুক্ত হননি যে, আল্লাহ্র আযাব থেকে আপনি তাদেরকে রক্ষা করবেন। আপনি তো আমার রসুল— প্রচারক, বাণীবাহক, শিক্ষক।

শেষে বলা হয়েছে— 'আর তুমি তাদের অভিভাবকও নও' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কখনো অবাধ্যদের অভিভাবক নন। সুতরাং আপনি তাদের জন্য দুঃশ্চিন্তিত হবেন কেনো? আপনি তো আমার রসুল।

হজরত মুয়াম্মার ও হজরত কাতাদা থেকে সূত্রপরম্পরায় ইবনে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, কখনো কখনো নব্য মুসলমানেরা কাফেরদেরকে গালাগালি করতো। প্রত্যুত্তরে তারাও গালি দিতো মুসলমানদেরকে। এই গালাগালি বন্ধ করার নিমিত্তেই অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১০৮

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

❒ আল্লাহ্কে ছাড়িয়া যাহাদিগকে তাহারা ডাকে তাহাদিগকে তোমরা গালি দিও না, কেননা, তাহারা সীমালংঘন করিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্কেও গালি দিবে; এইভাবে, প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাহাদিগের কার্যকলাপ সুশোভন করিয়াছি; অতঃপর তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট তাহাদিগের প্রত্যাবর্তন; অনন্তর তিনি তাহাদিগকে তাহাদিগের কৃতকার্য সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

---

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, যখন এই আয়াত— 'ইন্নাকুম ওয়ামা তা'বুদুনা মিন্দুনিল্লাহি হাসবু জাহান্নাম' (নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের উপাসনা করো— সকলে জাহান্নামের ইন্ধন) অবতীর্ণ হলো, তখন মুশরিকেরা বললো, হে মোহাম্মদ! আমাদের প্রভু প্রতিমাগুলোর দোষ বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকো। নইলে আমরাও তোমার প্রভুর দোষ বর্ণনা করবো। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াতটি। আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে—'আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা, তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্কেও গালি দিবে।'

আল্লামা সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, মৃত্যুর প্রাক্কালে আবু তালেবের নিকট উপস্থিত হলো কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ। বললো, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের সঙ্গে বিবাদ করতে নিষেধ করে দিন। ভাবতে লজ্জা হয়, আপনার মৃত্যুর পর আমরা যদি মোহাম্মদকে হত্যা করি তবে লোকে বলবে— তার চাচাই তাকে নিরাপদে রাখতো। এখন চাচা নেই বলে কাপুরুষেরা তাকে হত্যা করেছে। ওই নেতাদের দলে ছিলো আবু সুফিয়ান, আবু জেহেল, নজর বিন হারেস, উমাইয়া বিন খাল্ফ, উবাই বিন খাল্ফ, উকবা বিন আবী মুয়ীত, আমর ইবনে আস এবং আসওয়াদ বিন আবুল বুখতারী। তারা আরো বললো, আপনি আমাদের প্রিয় নেতা। কিন্তু মোহাম্মদ আমাদেরকে ও আমাদের পূজনীয় প্রতিমাগুলোকে কষ্ট দিচ্ছে। যদি আপনি পছন্দ করেন, তবে মোহাম্মদকে এ কাজ থেকে বিরত রাখুন। সে যেনো আমাদের দেবদেবীর বিরুদ্ধে কিছু না বলে। আমরাও তার আল্লাহ্ সম্পর্কে কিছু বলবো না।

আবু তালেব রসুল স. কে ডেকে বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের ইচ্ছা— তুমি আমাদের ও আমাদের প্রভুদের সম্পর্কে আপত্তিকর কিছু বলবে না। আমরাও তোমার প্রভু সম্পর্কে কোনো অন্যায় মন্তব্য করবো না। আর এরা তো ন্যায্য কথাই বলছে। সুতরাং প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র আমার! তুমি এদের কথা মেনে নাও। রসুল স. বললেন, তোমরা শুধু আমার একটি কথা মেনে নাও। মানলে তোমরা লাভ করবে সমগ্র আরবের কর্তৃত্ব। অনারবেরাও হয়ে যাবে তোমাদের নেতৃত্বের অধীন। আবু জেহেল বললো, তোমার পিতার কসম! এরূপ একটি কথা কেনো— দশটি কথা মানতে আমরা রাজী। রসুল স. বললেন, তোমরা কেবল বলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'। কিন্তু কুরায়েশ নেতারা এই পবিত্র কলেমা উচ্চারণ করতে অস্বীকৃত হলো এবং তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলো সেখান থেকে। আবু তালেব বললেন, বৎস! তুমি এছাড়া অন্য কথা বলো— যা তারা মানতে পারে। রসুল স. বললেন, আমার এক হাতে সূর্য এনে দিলেও আমি এ কথা বলা থেকে বিরত

www.eelm.weebly.com

থাকবো না। কুরায়েশ নেতারা নতুন করে প্রস্তাব দিলো, তুমি আমাদের প্রতিমাগুলোকে গালমন্দ করা থেকে বিরত থাকো। না হলে আমরা তোমাকে ও তোমার নির্দেশদাতাকে গালি দিবো। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে, তাদেরকে তোমরা গালি দিও না, কেননা, তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্‌কেও গালি দিবে।

এই আয়াতে প্রকাশ্যতঃ অংশীবাদীদের দেবদেবীদেরকে মন্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এ রকম নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে গালমন্দ থেকে রক্ষা করার জন্য। কারণ অজ্ঞ ও অবাধ্যরা এতে করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে গালাগাল করবে। আয়াতের বর্ণনাদৃষ্টে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, চূড়ান্ত পর্যায়ের অবাধ্যদেরকে পরিত্যাগ করা অত্যাবশ্যক। তাদেরকে কিছু না বলাই উত্তম। সত্য মিথ্যার ন্যূনতমবোধও তাদের নেই।

এরপর বলা হয়েছে—'এভাবে' প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি।' এ কথার অর্থ অবাধ্যদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসুলকে গালি দেয়া একটি অত্যুত্তম কর্ম। অন্যান্য পথভ্রষ্ট দলও তাদের মত ও পথকে সুন্দর মনে করে। আমিই তাদেরকে তাদের অপকর্মগুলো তাদের চোখে সুশোভন করে দিয়েছি।

এখানে সম্প্রদায় বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে 'উম্মত' শব্দটি। মানবতা বহু মত ও পথে বিভক্ত। প্রতিটি দলই তাদের বিশ্বাস ও কর্মকে সুন্দর বলে জানে। আল্লাহ্‌পাক যাকে ভালো কাজের সুযোগ দান করেন— তার চোখে পুণ্যকর্মই সুশোভন। আর যাকে পুণ্য পথে চলবার সুযোগ দেননি তার চোখে অসৎ কর্মই সুশোভন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, পথ প্রদর্শন এবং পথভ্রষ্টতা— দু'টোই আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাধীন।

এই আয়াত দ্বারা এ কথাটিও প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জন্য যা উপকারী তা প্রদান করতে আল্লাহ্‌তায়ালা বাধ্য নন। তাই ইমান ও সৎকর্ম সকলের জন্য উপকারী হলেও সকলের চোখে ইমান ও সৎকর্মকে সুশোভন করেননি। তাই বিশ্বাসীরা বিশ্বাস ও পুণ্যকর্মকে এবং অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাস ও মন্দ কর্মকে পছন্দ করে।

শেষে বলা হয়েছে— অতঃপর, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন; অনন্তর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে অবহিত করবেন। এ কথার অর্থ— অবশেষে সকলকে আল্লাহ্‌পাকের দরবারে উপস্থিত হতে হবে। তখন সকলের কৃতকর্মকে সামনে আনা হবে। নিশ্চিত করা হবে যথা পুরস্কার এবং যথাশাস্তি।

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী থেকে ইবনে জারীর এবং বাগবী বর্ণনা করেছেন, (কালাবী সূত্রেও বাগবী এ রকম লিখেছেন)— একবার কুরায়েশ নেতারা রসুল স.কে উদ্দেশ্য করে বললো, হে মোহাম্মদ! তুমি বলে থাকো মুসার হাতে ছিলো একটি লাঠি। ওই লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করলে তা থেকে বেরিয়ে আসতো বারোটি পানির প্রস্রবণ। আরো বললো, ঈসা মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। এ কথাও তুমি বলে থাকো যে, সালেহ্ তার সম্প্রদায়ের জন্য পাথরের মধ্য থেকে একটি উট বের করে দিয়েছিলেন। তুমিও এ রকম একটি মোজেজা দেখাও। যদি দেখাতে পারো তবে আমরা তোমাকে সত্য বলে মেনে নেবো। রসুল স. বললেন, কী মোজেজা দেখতে চাও তোমরা? কুরায়েশেরা বললো, এই সাফা পাহাড়টিকে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে সোনার পাহাড়ে পরিণত করে দাও। বাগবীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, অবিশ্বাসীরা তখন এ কথাও বলেছিলো, আমাদের মৃত পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তিকে জীবিত করে দেখাও— যেনো আমরা তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে পারি যে, তুমি যা বলছো তা সত্য। অথবা ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে এসো— যেনো তারা তোমার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়।

ইবনে জারীর ও বাগবী কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. তখন বললেন, তোমাদের আবেদন যদি আমি বাস্তবায়ন করি, তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা সমস্বরে বললো, আল্লাহ্র কসম! তুমি যদি এ রকম করতে পারো, তবে আমরা সকলেই তোমার অনুসারী হয়ে যাবো। সাহাবীগণও বললেন, তাদের আবেদন পূর্ণ করা হোক। তাহলে তারাও ইসলাম গ্রহণ করবে। রসুল স. দোয়া করার জন্য দণ্ডায়মান হলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো সাফা পাহাড়কে সোনার পাহাড়ে পরিণত করার জন্য তিনি আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা জানাবেন। অকস্মাৎ সেখানে আবির্ভূত হলেন হজরত জিব্রাইল। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল!। আপনি প্রার্থনা করলে সাফা পাহাড় সোনার পাহাড় হয়ে যাবে। কিন্তু এরপরেও আবেদনকারী জনতা যদি ইমান না আনে, তবে তাদের প্রতি আপতিত হবে আল্লাহ্র গজব। সুতরাং আপনি ক্ষান্ত হন। তাদের আবেদনে সাড়া দেবেন না। এতে করে যারা প্রকৃতই সত্যান্বেষী তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য তওবা করবে। আর যারা তা নয়— তারা পূর্ববৎ অবিশ্বাসে নিমগ্ন থাকবে। রসুল স. বললেন, আমি চাই তাদেরকে ইমান গ্রহণের সুযোগ দেয়া হোক— যাতে করে তারা আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা পায়। সুতরাং যারা তওবা করতে চায় তারা যেনো তওবার পথে এগিয়ে আসে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَاۤ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

❑ তাহারা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করিয়া বলে, তাহাদিগের নিকট যদি কোন নিদর্শন আসিত তবে অবশ্যই তাহারা উহাতে বিশ্বাস করিত; বল, 'নিদর্শন তো আল্লাহের এখতিয়ারভুক্ত'; তাহাদিগের নিকট নিদর্শন আসিলেও তাহারা যে বিশ্বাস করিবে না ইহা কিভাবে তোমাদিগের বোধগম্য করান যাইবে?

❑ তাহারা যেমন প্রথমবারে উহাতে বিশ্বাস করে নাই তেমনি আমিও তাহাদিগের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদিগের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দিব।

মোজেজা বা অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায় নির্ভর। তাই আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে— তারা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের নিকট যদি কোনো নিদর্শন আসতো, তবে অবশ্যই তারা তাতে বিশ্বাস করতো; বলো, নিদর্শন তো আল্লাহ্‌র এখতিয়ারভুক্ত। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে অবিশ্বাসীরা বলে, নিদর্শন বা মোজেজা প্রত্যক্ষ করতে পারলে আমরা বিশ্বাসী হয়ে যাবো। হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তাদেরকে সুস্পষ্টরূপে এ কথা জানিয়ে দিন যে, নিদর্শন সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছানির্ভর। আমি কোনো নিদর্শনের অধিকারী নই। এরপর বলা হয়েছে— তাদের নিকট নিদর্শন এলেও তারা যে বিশ্বাস করবে না, এটা কিভাবে তোমাদের বোধগম্য করানো যাবে। এখানে 'মা ইউশ্‌ই'রিকুম (তারা বুঝবে না) কথাটির 'মা' নেতিবাচক অর্থপ্রকাশক অথবা 'মা' শব্দটি এখানে একটি অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। আলোচ্য বাক্যে কারণের কারণকে অস্বীকার করার মাধ্যমে কারণকে অস্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ ইমান এখানে কারণ। এবং মোজেজা হচ্ছে কারণের কারণ। আর কারণের কারণ (মোজেজা বা নিদর্শনকে) অস্বীকার করার মাধ্যমে মূল কারণকে (ইমানকে) অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, নিদর্শন দেখলেও তারা ইমান আনবে না। এখানে অংশীবাদী ও বিশ্বাসী উভয় দলকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে— (হে বিশ্বাসী ও অংশীবাদীরা) তোমরা জানো না, নিদর্শন দেখতে

www.eelm.weebly.com

পেলেও অবিশ্বাসীরা ইমান আনবে না। কারণ তারা চিরভ্রষ্ট। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অসীম ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের কারণে নিদর্শন প্রত্যাশীর বিশ্বাস বিমুখতাকে আগে থেকেই জানেন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'লা ইউ'মিনুন' (বিশ্বাস করবে না) —কথাটির 'লাম' এখানে লামে যায়েদ (অতিরিক্ত লাম)। যেমন— অন্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'হারামুন আ'লা ক্বারইয়াতিন্ আহ্লাকনাহা আন্নাহুম লা ইয়ারজিউ'ন'। এখানেও অতিরিক্ত লামের ব্যবহার ঘটেছে। সুতরাং এখানে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াতে পারে এ রকম— তোমাদের কি এ কথা জানা আছে যে, নিদর্শন প্রদর্শনের পর তারা ইমান আনবে?

কোনো কোনো আলেমের মতে, এখানে আন্নাহা (নিশ্চয়ই তা) শব্দটির অর্থ হবে লাআ'ল্লাহা (সম্ভবতঃ তা)। এভাবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— তোমরা কি জানো, নিদর্শন প্রকাশের পর অংশীবাদীরা কোন পথে চলবে? সম্ভবতঃ তারা ইমানের পথে আসবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'লা ইউ'মিনুন' কথাটির পরে 'আওইউ'মিনুন' কথাটি উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য কথাটিসহ বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— তোমরা এ কথা জানো না যে, নিদর্শন প্রদর্শনের পর তারা ইমান আনবে কিংবা আনবে না।

পরের আয়াতে (১১০) বলা হয়েছে—'তারা যেমন প্রথমবারে ওতে বিশ্বাস করেনি, তেমনি আমিও তাদের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে দিবো।' এ কথার অর্থ— এ কথা নিশ্চিত যে, কাংক্ষিত নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও অংশীবাদীরা বিশ্বাসী হবে না। ইতোপূর্বেও তারা এ রকম বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। তারা আমার রসুলকে চন্দ্রদ্বিখণ্ডিত করতে বলেছিলো। ওই নিদর্শনও তাদেরকে দেখানো হয়েছিলো। এ রকম আরো অনেক নিদর্শন দেখানো সত্ত্বেও তারা বিশ্বাসের পথে আসেনি। সুতরাং এ কথা সন্দেহাতীত যে, নিদর্শনের পরে নিদর্শন প্রদর্শিত হলেও তারা ইমান আনবে না। তাই আমি তাদের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে তাদের স্বরচিত অবাধ্যতার পরিসরে উদ্ভ্রান্তের মতো বিচরণ করার সাময়িক সুযোগ দান করবো। তাদেরকে কখনো সত্যপথে পরিচালিত করবো না।

www.eelm.weebly.com

www.eelm.weebly.com

অষ্টম পারা

সুরা আন্‌আম ঃ আয়াত ১১১

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ

❒ আল্লাহ্ তাহাদিগের নিকট ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করিলেও এবং মৃতেরা তাহাদিগের সহিত কথা বলিলেও এবং সকল বস্তুকে তাহাদিগের সম্মুখে হাজির করিলেও যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন তাহারা বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

মানুষের মূল সম্পদ ইমান। আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা ব্যতিরেকে এ ইমান কেউ লাভ করতে পারে না। অসংখ্য অলৌকিক নিদর্শন দেখলেও না। আলোচ্য আয়াতে সে কথাটিই বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— 'আল্লাহ্ তাদের নিকট ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করলেও এবং মৃতেরা তাদের সঙ্গে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সম্মুখে হাজির করলেও যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন তারা বিশ্বাস করবে না।' এখানে মৃতেরা কথা বলার অর্থ — যদি মৃত ব্যক্তিরা পুনর্জীবিত হয়ে রেসালাতের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে। অর্থাৎ মৃতেরা যদি জীবিত হয়ে বলে, 'মোহাম্মদ স. আল্লাহ্‌র রসুল'— তবুও অবিশ্বাসীরা ইমান আনবে না।

'ক্বুবুলাম মা কানু লিইউ'মিনু' অর্থ— তবু তারা ইমান আনবে না। অর্থাৎ এ চির অবিশ্বাসীদের নিকট যদি ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করা হয়, মৃত ব্যক্তিরা পুনর্জীবিত হয়ে যদি বলে 'মোহাম্মদ সত্য নবী' এবং যদি সকল বস্তু তাদের নিকট উপস্থিত করা হয়, তবুও তারা ইমান আনবে না (যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন)। এখানে ক্বুবুলাম শব্দটি একটি মূল শব্দ। এর অর্থ সামনে আসা। শব্দটি 'ক্বিবিলান', 'ক্বিবিলুন' অর্থ 'ক্বিবিলাতুন' এর বহুবচন, যার অর্থ হচ্ছে— দল। অথবা শব্দটি একটি রূপান্তরিত সাদৃশ্যপূর্ণ বিশেষণবাচক শব্দ (সিফাতে মুশাব্বাহ্)। এর অর্থ

www.eelm.weebly.com

কাফীল (দায়বদ্ধতা)। অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ এবং জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে অবিশ্বাসীদেরকে ইমান গ্রহণের যে আহ্বান জানানো হয়েছে সেই আহ্বানের দায়িত্ব বা দায়।

'তবুও তারা বিশ্বাস করবে না'— কথাটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের চিরভ্রষ্ট হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আত্মার জগতে (আলমে আরওয়াহ্তে) নির্ধারিত হয়েছে। তাদের উৎপত্তিস্থলের সম্পর্ক রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার 'আলমুদিল্লু' (পথভ্রষ্টকারী) নামের সঙ্গে। তাই চিরভ্রষ্টরা কখনো ইমান আনবে না।

'ইল্লা আঁইয়াশা আল্লাহ্' কথাটির অর্থ— যদি না আল্লাহ্ অন্যরকম ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ আত্মার জগতে যদি কারো ইমানদার হওয়ার বিষয়টি সুসাব্যস্ত হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র অভিপ্রায় যদি কারো অনুকূল হয়, তবে সে-ই কেবল ইমানদার হতে পারবে। এ রকম না হলে কস্মিনকালেও ইমান পাওয়া যাবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়া লাকিন্না আক্ছারাহুম ইয়াজহালুন' (কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ)। অংশীবাদীরা সকলেই মূর্খ। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে— 'অধিকাংশ অজ্ঞ'। এ রকম বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, অংশীবাদীরা অধিকাংশই জানে না যে, অজস্র অলৌকিক নিদর্শনের মাধ্যমে ইমান লাভ করা যায় না। বিশেষ করে এই বিষয়টি সম্পর্কে তাদের অধিকাংশের কোনো জ্ঞান নেই বলেই এখানে বলা হয়েছে— কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ। তাই তারা বার বার মোজেজা বা অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চায়। এখানে 'হুম' (তাদের) সর্বনামটি মুসলমানদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবে এ রকম— চির অংশীবাদীরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। হাজার মোজেজা দেখলেও না। এ কথাটি অধিকাংশ মুসলমানের অজানা। তাই তারা এমতোকামনা করে যে— কাংখিত মোজেজা প্রকাশিত হলে অংশীবাদীরা সত্যধর্মকে বিশ্বাস করবে।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১১২, ১১৩

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۭ وَلَوْ شَاۗءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ○ وَلِتَصْغٰۤى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ○

❑ এইরূপে মানব ও জিনের মধ্যে শয়তানকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাহাদিগের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে;

www.eelm.weebly.com

যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা ইহা করিত না; সুতরাং তুমি তাহাদিগকে ও তাহাদিগের মিথ্যা রচনাকে বর্জন কর।

❒ এবং তাহারা এই উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের মন যেন উহার প্রতি অনুরাগী হয় এবং উহাতে যেন তাহারা পরিতুষ্ট হয় আর তাহারা যাহা করে তাহাতে যেন তাহারা লিপ্ত থাকিতে পারে।

আল্লাহ্তায়ালার অবাধ্য মানুষ ও জ্বিনেরা শয়তান। এই শয়তানেরা সকল নবী রসুলের শত্রু। আর এই শত্রুতা আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত। এখানে তাই বলা হয়েছে— এরূপে মানব ও জ্বিনের মধ্যে শয়তানকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি। বাক্যটির মাধ্যমে মোতাজিলাদের অভিমত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তারা বলে, বান্দা নিজেই তার কর্মের স্রষ্টা। কিন্তু আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্তায়ালাই সকল কিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তিনি অবাধ্য মানুষ ও জ্বিনের শত্রুতারও স্রষ্টা।

হজরত কাতাদা, মুজাহিদ এবং হাসান বলেছেন, মানুষও শয়তান হয়। সীমালংঘনকারী এবং অবাধ্যরাই শয়তান।

আমি বলি, মানুষ ও জ্বিনের মতো অন্য সৃষ্টিও শয়তান হয়। যেমন হজরত জাবেরের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. আমাদেরকে কুকুর নিধনের নির্দেশ দিলেন। এরপর নিষেধাজ্ঞাটি উঠিয়ে নিয়ে কেবল কপালে ঘন কালো দুই ফোঁটা বিশিষ্ট কুকুরকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। বললেন, নিঃসন্দেহে এগুলো শয়তান। মুসলিম।

শয়তান মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করে। তাই আয়াতে বলা হয়েছে— প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্রতারিত করে। আলেমগণ বলেছেন, শয়তান যখন সরাসরি প্রতারণা করতে অক্ষম হয় তখন সে অবাধ্য মানুষকে প্ররোচিত করে। শয়তানের প্রতিনিধি হিসেবে তখন ওই শয়তান প্রভাবিত মানুষ বিশ্বাসী মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করে। হজরত আবু জর বলেছেন, রসুল স. আমাকে আজ্ঞা করেছেন, শয়তান মানুষ ও জ্বিনের প্ররোচনা থেকে আল্লাহ্পাকের কাছে পরিত্রাণ প্রার্থনা কোরো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হয়! তিনি স. বললেন হ্যাঁ। আর মানুষ শয়তান, জ্বিন শয়তান অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিকর।

মালেক বিন দীনার বলেছেন, জ্বিন শয়তানের চেয়ে মানুষ শয়তান অধিকতর নির্মম এবং পাষণ্ড। আল্লাহ্পাকের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থী হলে জ্বিন শয়তান দূরে সরে যায়, কিন্তু মানুষ শয়তান প্রকাশ্যে পাপের পথে টানতে থাকে।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইকরামা, জুহাক, সুদ্দী এবং কালাবী বলেছেন, ওই শয়তানকে মানুষ শয়তান বলা হয়, যে মানুষের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আর ইবলিসের সার্বক্ষণিক সঙ্গীকে বলা হয় জ্বিন শয়তান। মানুষ কখনো শয়তান হয় না। ইবলিস তার বাহিনীকে দু'টি ভাগে ভাগ করে রেখেছে। একভাগকে নিযুক্ত করা হয়েছে জ্বিনদেরকে প্রতারণা দানের জন্য এবং অন্য দলটিকে নিযুক্ত করা হয়েছে মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য। শয়তানের ওই দু'টি দলই নবী রসুলগণের শত্রু। ওই দু'দল শয়তানের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক মেলামেশা। তারা একে অন্যকে বলে— আমরা এভাবে বিশ্বাসীদেরকে ধোকা দিয়ে থাকি। তোমরাও এভাবে ধোকা দিতে থাকো। এই বিষয়টিকেই আলোচ্য বাক্যে উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে— প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে। এখানে 'যুখরুফাল ক্বওলি গুরুরা' অর্থ— চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচনা দান।

এরপর বলা হয়েছে— যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তবে তারা এ রকম করতো না। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ যদি চাইতেন, শয়তান নবী রসুলদের সঙ্গে শত্রুতা করবে না তবে নিশ্চয়ই শয়তান এ রকম করতে পারতো না। কারণ কোনো কিছুই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়বিরুদ্ধ হতে পারে না। মোতাজিলারা বলে, আল্লাহ্পাক কেবল উত্তম কর্মের স্রষ্টা। আর অনুত্তম কর্মের স্রষ্টা বান্দা নিজে। তাদের অভিমত সত্য নয়। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্পাকই একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্রষ্টা। ভালো ও মন্দ উভয় কর্মের। সকল কর্মের।

শেষে বলা হয়েছে, 'ফাজারহুম ওয়ামা ইয়াফতারুন' (সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা রচনাকে বর্জন করো)। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি আপনাকে প্রদত্ত অংশীবাদীদের অপবাদকে উপেক্ষা করুন। তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করবেন না। আল্লাহ্তায়ালাই আপনার সহায়। তিনিই আপনার শত্রুদেরকে যথাসময়ে যথাশাস্তি প্রদান করবেন।

পরের আয়াতে (১১৩) বলা হয়েছে— 'এবং তারা এ উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মন যেনো তার প্রতি অনুরাগী হয় এবং তাতে যেনো তারা পরিতুষ্ট হয়। আর তারা যা করে তাতে যেনো তারা লিপ্ত থাকতে পারে।' এ কথার অর্থ— শয়তানের প্ররোচনাদানের উদ্দেশ্য এই যে, পরকাল-অবিশ্বাসীদের অন্তর যেনো শয়তানের প্রতি স্থায়ীভাবে আকৃষ্ট হয় এবং অবিশ্বাসের মধ্যেই যেনো তারা লাভ করে স্থায়ী পরিতুষ্টি। আর আমৃত্যু তারা যেনো অবিশ্বাসমগ্ন হয়ে থাকতে পারে।

অংশীবাদী কুরায়েশেরা বলতো, হে মোহাম্মদ! তোমার ও আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য দূর করার জন্য তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে নিযুক্ত করো। তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ○ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ○ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○

❒ বল, 'তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে সালিস মানিব?— যদিও তিনিই তোমাদিগের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন!' যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা জানে যে উহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্যসহ অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তুমি সন্দিহানদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

❒ সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ এবং তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করিবার কেহ নাই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❒ যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহের পথ হইতে বিচ্যুত করিবে; তাহারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; আর তাহারা শুধু মিথ্যাই বলে।

❒ তাঁহার পথ ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয় তোমার প্রতিপালক সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

'আফা গইরল্লহি আব্‌তাগি হাকামাউ ওয়া হুয়াল্লাজি আনযালা ইলাইকুমুল কিতাবা মুফাস্‌সালা।' এখানে 'আফা গইরা' শব্দটির 'ফা' অক্ষরটি একটি সংযোজক অব্যয়। সংযোগযোগ্য কথাটি এখানে অনুক্ত রয়েছে। ওই অনুক্ত কথা সহযোগে আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— আমি কি তোমাদের প্রস্তাব মেনে নেবো এবং তোমাদের ও আমার মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে মীমাংসাকারী নিযুক্ত করবো, যিনি সিদ্ধান্ত দান করবেন, আমাদের মধ্যে কে সত্য এবং কে মিথ্যা ? অথচ আল্লাহ্‌পাক আমাদের উপর কোরআন অবতীর্ণ করেছেন,

www.eelm.weebly.com

যে কোরআন একটি জাগ্রত নিদর্শন— পূর্ববর্তী আকাশী গ্রন্থগুলোর মতো অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ প্রদায়ক। এতে সত্য ও মিথ্যাকে সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং এখন সন্দেহের অবকাশ আর কোথায়?

আলোচ্য বক্তব্যটিকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্য 'হাকামা' (নিখুঁত মীমাংসাকারী) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে যে ন্যায়বিচারক, তার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় 'হাকামা'। আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে পরিষ্কাররূপে এ কথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে— পবিত্র কোরআনের অলৌকিক, নির্ভুল, বিস্ময়কর এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যার পরে অন্য কোনো মোজেজার প্রয়োজন নেই। অন্য কোনো মীমাংসাকারী নির্ধারণের অবকাশও নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াল্লাজিনা আতাইনা হুমুল কিতাবা ইয়া'লামুনা আন্নাহু মুনায্‌যালুম মির্‌রব্বিকা বিলহাক্ব' (যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে)। এ কথার অর্থ — ইহুদীরা ভালোভাবে জানে যে, মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সমাগত। কোরআন সত্য। তারা তওরাত অধ্যয়ন করতো। আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র বাণীর বাকভঙ্গি, প্রকৃতি ও মহিমা সম্পর্কে ছিলো ওয়াকিফহাল। তাই কোরআন মজীদের আয়াত শুনলে তারা সহজেই বুঝতে পারতো যে, এই কোরআনও আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র বাণী। আরো বুঝতে পারতো, এই কোরআন যার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তিনি অক্ষরের অমুখাপেক্ষি (উম্মী)। আসমানী কিতাবের বিষয়ে অভিজ্ঞ, এ রকম কোনো বিদ্বান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর কোনো সংযোগও নেই। সুতরাং কোরআন যে মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সমাগত এবং সত্যসহ অবতীর্ণ, এ কথা ইহুদীরা খুব ভালো করেই জানে।

শেষে বলা হয়েছে— সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। এখানে আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় রসুলের মাধ্যমে আপামর জনসাধারনকে এ কথাটিই জানিয়ে দিতে চেয়েছেন যে— হে আমার প্রিয় রসুল! যারা কোরআনের পবিত্র বাণী শ্রবণ করে, তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করুন — তারা যেনো সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত না হয়। যেনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক অবতীর্ণ এই মহাগ্রন্থকে সত্য বলে মেনে নেয়।

পরের আয়াতে (১১৫) বলা হয়েছে — 'ওয়া তাম্মাত কালিমাতু রব্বিকা সিদ্‌ক্বাঁও ওয়াআদ্‌লান' (সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ)। এ কথার অর্থ — আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী সম্পূর্ণ সত্য ও সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। অর্থাৎ কোরআনের আদেশ ও নিষেধ সমূহের ভিত্তি পূর্ণ ও পরিণত

www.eelm.weebly.com

সত্য এবং ন্যায়ের উপর। এ রকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত কাতাদা এবং মুকাতিল। সিদ্‌ক্বাও ওয়া আ'দ্‌লা (সত্য ও ন্যায়)— দু'টো শব্দের শেষেই ব্যতিক্রমধর্মী অথবা অবস্থাপ্রকাশক 'যবর' রয়েছে। অথবা এর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে সত্য ও ন্যায়ের ব্যতিক্রমী চিরবিদ্যমানতার কথা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকের বাণী সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে চিরন্তন।

এরপর বলা হয়েছে, 'লা মুবাদ্‌দিলা লিকালিমাতিহি'(তাঁর বাক্য পরিবর্তনকারী কেউ নেই)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাকের বাণী অপরিবর্তনীয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাঁর চিরস্থায়ী সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই। এমন কেউই নেই, যে তাঁর নির্দেশকে রদবদল করতে পারে। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে— রসুল মোহাম্মদ স. এর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। তাই আর কোনো আসমানী কিতাবও অবতীর্ণ হবে না। কোরআন মজীদই সর্বশেষ প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ। তাই এই গ্রন্থের নির্দেশ ও নিষেধাবলী আর কখনো পরিবর্তিত হবে না।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াহুয়াস্‌সামিউ'ল আ'লীম।' এ কথার অর্থ— তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। আর সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ বলেই তিনি সকলের প্রকাশ্য ও গোপন চিন্তা, কথা ও আচরণ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। তাই অবাধ্যদের নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায়ই নেই।

পরের আয়াতে (১১৬) বলা হয়েছে— যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামতো চলো তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। এখানে 'দুনিয়ার অধিকাংশ লোক' অর্থ অবিশ্বাসীদের দল। কেননা অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের চেয়ে সংখ্যাগুরু। আলোচ্য বাক্যের নির্দেশনাটি এ রকম— হে আমার রসুল! দেখুন পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অবাধ্য, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, অবিশ্বাসী। তারা সম্পূর্নরূপে সত্যচ্যুত। তাই তাদের কথায় কর্ণপাত মাত্র করবেন না। কেনো করবেন? আপনি তো আমার রসুল। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে সত্য ধর্মের প্রচার। আর তারা চায় আপনাকে আল্লাহ্‌তায়ালার পথ থেকে বা ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত করতে।

শেষে বলা হয়েছে— তারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; আর তারা শুধু মিথ্যাই বলে। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাকের বিধানের পরোয়া না করে বৈধা-বৈধ সম্পর্কে তারা তাদের অনুমানকে অনুসরণীয় করে নিয়েছে। যেমন, মৃত ভক্ষনকে মনে করেছে বৈধ, বাহিরাকে (কল্পিত দেবদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পশুকে) মনে করছে অবৈধ ইত্যাদি। তাদের এ সকল অপবিশ্বাসের পক্ষে বিশ্বাসগত বা জ্ঞানগত কোনো দলিল প্রমাণই তাদের নেই। তাই তাদের আচরণীয় ধর্মমত মিথ্যা। তাই তারা যা বলে তা সর্বৈব মিথ্যা।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের শেষটিতে (১১৭) আল্লাহ্‌পাক স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই সত্যানুসারী ও মিথ্যাশ্রয়ীদেরকে উত্তমরূপে জানেন।

আবু দাউদ ও তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার কয়েকজন লোক রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমরা নিজ হাতে পশু জবাই করলে তার গোশত খেতে পারবো, অথচ আল্লাহ্‌পাক যাকে মেরে ফেলবেন সেই মৃত পশুর গোশত খেতে পারবো না— কারণ কী? তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত ।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১১৮, ১১৯, ১২০

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ○ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ○ وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ○

❑ তোমরা তাঁহার নিদর্শনে বিশ্বাসী হইলে যাহাতে আল্লাহের নাম লওয়া হইয়াছে তাহা আহার কর;

❑ তোমাদিগের হইয়াছে কি যে যাহাতে আল্লাহের নাম লওয়া হইয়াছে তোমরা তাহা আহার করিবে না? —যদিও তোমরা নিরুপায় না হইলে যাহা তোমাদিগের জন্য নিষিদ্ধ তাহা তিনি বিশদভাবেই তোমাদিগের নিকট বিবৃত করিয়াছেন। অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিজদিগের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে; তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদিগের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

❑ তোমরা প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর; যাহারা পাপ করে তাহাদিগকে তাহাদিগের পাপের সমুচিত শাস্তি দেওয়া হইবে।

আগের আয়াতে (১১৬) অবিশ্বাসীদের কথামত চলতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানেও তেমনি তাদের আরেকটি ধারণার অনুসরণ নিষিদ্ধ হয়েছে। রসুল স. কে প্রশ্নকারী অবিশ্বাসীরা মৃত পশুর গোশতকে হালাল এবং জবাইকৃত পশুর গোশতকে হারাম মনে করতো। আলোচ্য আয়াতে তাদের বিকৃত ধারণার

www.eelm.weebly.com

অনুসরণের বিরুদ্ধে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— 'তোমরা তাঁর নিদর্শনে বিশ্বাসী হলে যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে তা আহার করো।' এ কথার অর্থ তোমরা যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করো, তিনি যাকে হালাল বলেছেন তাকে হালাল এবং যাকে হারাম বলেছেন তাকে হারাম বলে মানো। তোমাদের প্রতি এই নির্দেশ জারী করা হলো যে— আল্লাহ্‌র নামে যা জবাই করা হয়েছে তা আহার করো। কারণ তা হালাল। আয়াতটি শুরু হয়েছে এভাবে — ফা কুলু মিম্মা জুকিরাস্‌মুল্লহি আলাইহি...... । আয়াতের শুরুতে ব্যবহৃত 'ফা' অক্ষরটি এখানে কারণ প্রকাশক।

পরের আয়াতে (১১৯) বলা হয়েছে — 'ওয়া মালাকুম আল্লা তাকুলু মিম্মা জুকিরাস্‌মুল্লহি আলাইহি' (তোমাদের হয়েছে কি যে যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে তোমরা তা আহার করবে না?)। এখানে বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত 'মা' শব্দটি প্রশ্নবোধক। শব্দটি এখানে উদ্দেশ্য এবং 'লাকুম' শব্দটি এর বিধেয়। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কুল লা আজিদু ফিমা উহিয়্যা মুহার্‌রামা' (বলো, আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, তাতে আমি হারাম কিছু পাইনি)।

এরপর বলা হয়েছে— ইল্লা মাদ্বতুরির্‌তুম ইলাইহি। এ কথার অর্থ— যদিও তোমরা নিরুপায় না হলে যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন। এখানে 'মা' শব্দটি সময় নির্দেশক। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ ওই সকল বস্তুর স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন যেগুলো সকল সময়ের জন্য ভক্ষন করা হারাম। কেবল অনন্যোপায় অবস্থায়— যখন জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে, তখন জীবন রক্ষার জন্য হারাম বস্তু ভক্ষন করা যেতে পারে। হারাম তখনো হারামই থাকে। কিন্তু জীবন রক্ষার অত্যাবশ্যক তাগিদে তখন হারাম ভক্ষন করলে গোনাহ্ হবে না।

একটি প্রশ্নঃ এখানে বলা হয়েছে, 'যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে তোমরা তা আহার করবে না কেনো'— এ রকম বলার পর পরক্ষণেই আবার কেনো বলা হলো, 'যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তা তিনি বিশদভাবে তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন।' এভাবে একই নির্দেশের পুনারাবৃত্তি করা হলো কেনো?

উত্তরঃ অনন্যোপায় অবস্থায় হারাম ভক্ষণ সিদ্ধ, যদিও তখনও হারামের হুকুমটি থাকে অনড়। হালালের হুকুম কিন্তু এ রকম নয়। হালাল কোনো অবস্থায় কখনোই অসিদ্ধ ও নিষিদ্ধ নয়। আর আলোচ্য আয়াতে হালালের এই বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাই বর্ণনাভঙ্গিটি হয়েছে এ রকম।

শেষে বলা হয়েছে— 'অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে; তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক ওই সকল লোককে ভালোভাবে চিনেন, যারা অজ্ঞ ও খেয়াল-খুশীর অনুসারী। আর অজ্ঞানতা ও খেয়াল-খুশীর অনুসরণের কারণে যারা সত্য ছেড়ে মিথ্যার প্রতি অর্থাৎ হালাল ছেড়ে হারামের প্রতি ধাবিত হয়।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১২০) বলা হয়েছে— তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন করো। এ কথার অর্থ — তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার পাপাচার পরিত্যাগ করো। প্রকাশ্য পাপের সম্পর্ক কান, নাক, চোখ, জিহ্বা, হাত, পা ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে। আর দর্প, হিংসা, লোভ ইত্যাদি গোপন পাপের সম্পর্ক হৃদয় ও অসৎ প্রবৃত্তির সঙ্গে।

কালাবী এবং অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেছেন, এখানে ব্যবহৃত 'ইছমুন' শব্দটির মাধ্যমে ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে প্রকাশ্য পাপ অর্থ— যাদের সঙ্গে পরিণয় নিষিদ্ধ, তাদেরকে বিবাহ করা এবং গোপন পাপ অর্থ অবৈধ যৌনাচার।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে প্রকাশ্য পাপ বলে বুঝানো হয়েছে উলঙ্গ হয়ে কাবা ঘর তাওয়াফ করাকে। আর গোপন পাপ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে ব্যভিচারকে।

এক বর্ণনায় এসেছে, কালাবী বলেছেন, দিনে বিবস্ত্র হয়ে পুরুষদের কাবা ঘর তাওয়াফ হচ্ছে প্রকাশ্য পাপ। আর গোপন পাপ হচ্ছে রাতে মহিলাদের বিবস্ত্র হয়ে কাবা ঘর তাওয়াফ করা।

এরপর বলা হয়েছে— যারা পাপ করে তাদেরকে তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে। এ কথার অর্থ— পাপের শাস্তি অবধারিত। পৃথিবীতে। অথবা পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী উভয় স্থানে।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১২১

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيٰطِينَ لَيُوحُونَ

إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۝

❒ যাহাতে আল্লাহের নাম লওয়া হয় নাই তাহা আহার করিও না; উহা অবশ্যই পাপ; শয়তান তাহার বন্ধুদিগকে তোমাদিগের সহিত বিবাদ করিতে প্ররোচনা দেয়; যদি তোমরা তাহাদিগের কথামত চল তবে তোমরা অবশ্যই অংশীবাদী হইবে।

শুরুতেই বলা হয়েছে— যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়নি তা আহার কোরো না। এই নির্দেশটির মাধ্যমে ইমাম আহমদ প্রমাণ করেন যে, ভুলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে পশু জবাই করলে ওই পশুর গোশত ভক্ষণ হারাম। দাউদ জাহেরী, আবু সওর, শা'বী এবং মোহাম্মদ ইবনে সিরীনও এ রকম বলেছেন।

www.eelm.weebly.com

ইমাম মালেক বলেছেন, ভুলে আল্লাহ্র নাম না নিয়ে পশু জবাই করার বিষয়টি আলোচ্য আয়াতের নির্দেশভূত নয়। এ অভিমতের পক্ষে তিনি হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস উপস্থাপন করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে— রসুল স.কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে কেউ যদি জবাই করার সময় আল্লাহ্র নাম নিতে ভুলে যায়, তবে ওই জবাইকৃত পশু সম্পর্কে হুকুম কী? রসুল স. বললেন, আল্লাহ্র নাম প্রতিটি মুসলমানের মনে রয়েছে (সে নাম মুখে উচ্চারিত হোক বা না হোক)। হাদিসটি বর্ণনা করছেন দারা কুতনী।

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, মুসলমান যদি জবাই করার সময় আল্লাহ্র নাম নিতে ভুলে যায়, তবে পরে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে নেবে। তারপর খাবে। দারা কুতনী। উল্লেখ্য যে, দারা কুতনী বর্ণিত এই দু'টি হাদিসই দুর্বল। আর হজরত আবু হোরায়রার হাদিসের সূত্রপ্রবাহভূত এক বর্ণনাকারীর নাম মারওয়ান বিন সালেম। ইমাম আহমদ বলেছেন, মারওয়ান বিন সালেম নির্ভরযোগ্য নয়। নাসাঈ ও দারা কুতনীও তাকে পরিত্যক্ত বলেছেন। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের সূত্রপ্রবাহভূত এক বর্ণনাকারী মা'কালও অপরিচিত।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এক্ষেত্রে ইমাম মালেকের অনুরূপ। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার নিয়ম হচ্ছে— এককভাবে বর্ণিত কোনো হাদিস দ্বারা কোরআনের কোনো প্রমাণকে সুনির্দিষ্ট করা ঠিক নয় (তাই হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিস দ্বারা আলোচ্য আয়াতের সাধারণ অর্থকে সুনির্দিষ্ট করা যাবে না)। এদিকে হেদায়া প্রণেতা হানাফিদের নিয়মকে শক্তিশালী করার জন্য উল্লেখ করেছেন, যদি আলোচ্য নির্দেশটির সাধারণ অর্থ করা হয়, তবে যে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে ভুলে গেলো, তাকে একটি অস্বাভাবিক এবং কষ্টকর অবস্থায় পড়তে হবে। এই অস্বাভাবিকতাকে দূর করা প্রয়োজন। কারণ মানুষ স্বভাবতঃই ভুল করে। তাই আয়াতে প্রকাশ্য অর্থের উপর অনড় অবস্থান গ্রহণ করলে কলহ বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম যুগের মুসলমানেরা বিষয়টি নির্বিবাদে মেনে নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ থাকলে সেই মতভেদের প্রবহমানতা এখনও পরিদৃষ্ট হতো। হেদায়া প্রণেতার এই ব্যাখ্যাটি অবশ্য দুর্বল।

ইমাম শাফেয়ীর মতে 'মালামইউজ্ কারিস্‌মুল্লহি আলাইহি' (যার উপর আল্লাহ্র নাম নেয়া হয়নি)। কথাটির অর্থ— মৃত এবং ওই জবাইকৃত পশু গইরুল্লাহ্র নামে জবাই করা হয়েছে। পূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

'ওয়া ইন্নাহু লাফিস্‌কুন' অর্থ— এটা অবশ্যই পাপ। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে পাপ হবে তখনই, যখন জবাইকালে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নাম উল্লেখ করা হবে। যেমন এই সুরার শেষ দিকে এসেছে— আও ফিসক্বান উহিল্লা লিগইরিল্লহি বিহি (আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করার কারণে ওই পশু অবৈধ)।

www.eelm.weebly.com

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে জবাই করলেও হালাল হবে। জননী আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার কিছু লোক জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! শিরিকের যুগ অতিক্রম করেছে (সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছে) —এ রকম কেউ কেউ আমাদের নিকট গোশত নিয়ে আসে। কিন্তু আমরা জানি না জবাইকালে তারা বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলেছিলো কি না (আমরা কি ওই গোশত খেতে পারবো?)। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্‌র নাম নাও। তারপর খাও। বোখারী। এই হাদিসের ব্যাখ্যাসুত্রে বাগবী বলেছেন, বিস্‌মিল্লাহ্‌ না পড়ে জবাই করা পশু যদি হারাম হতো, 'তবে বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়া হয়েছে কি না'— এ রকম সন্দেহই ছিলো ওই হারাম প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। আর রসুল স. ও সরাসরি বলে দিতেন— এ রকম গোশত ভক্ষণ হারাম। কিন্তু তিনি তা বলেন নি। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, জবাইকালে মুখে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হালাল হওয়ার কোনো শর্ত নয়। এ ছাড়া ইমাম আবু দাউদের মারাসিল গ্রন্থে মিল্লাতের একটি মুরসাল হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মুসলমানের জবাই করা পশু হালাল— আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হোক অথবা না হোক।

হানাফিগণ বলেন, মিল্লাতের হাদিসে উল্লেখিত আল্লাহ্‌র নাম না নেয়ার অর্থ হবে— আল্লাহ্‌র নাম নিতে ভুলে যাওয়া। জননী আয়েশার হাদিসটিও আমাদের এই ধারণার বিপরীত নয়। বরং আমাদের অভিমত তাঁর হাদিসের সাহায্যপুষ্ট। কেননা প্রশ্নকারী নিশ্চিত জানতেন যে— জবাইকারী মুসলমান। তার সন্দেহ কেবল এই যে, জবাইয়ের সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে কি না। এতে করে প্রমাণিত হয়, সাহাবীগণ মনে করতেন জবাইয়ের সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়া জবাইকৃত পশুর গোশত হালাল হওয়ার একটি শর্ত। আর 'আল্লাহ্‌র নাম নাও। তারপর খাও'— রসুল স. এর এই কথাটি ছিলো মুসলমানদের প্রকাশ্য অবস্থার প্রেক্ষিতে। প্রকাশ্যতঃ কোনো মুসলমান ইচ্ছাকৃতভাবে জবাইকালে আল্লাহ্‌র নাম নেয়াকে পরিত্যাগ করে না। তাই মুসলমানদের বাজার থেকে ক্রয়কৃত গোশত ভক্ষণ করা হালাল। কারণ বাহ্যিকভাবে এটাই বুঝা যায় যে, মুসলমানদের বাজারের গোশত নিশ্চয় কোনো মুসলমানই জবাই করে থাকবে— যদিও বিধর্মীদের দ্বারা জবাইয়ের সম্ভাবনাও রয়েছে।

এবার আসা যাক ইমাম শাফেয়ীর অভিমতে। তাঁর দলিলে এই আয়াতটি— 'মালাম ইউজ্‌ কারিস্‌মুল্লহি আ'লাইহি' অর্থাৎ জবাইয়ের সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়নি — কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত প্রাণী এবং ওই সকল জবাইকৃত পশু— যা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা হয়েছে। বিষয়টি সাধারণ অবস্থার বিপরীত। ইতোপূর্বে জবাই এবং শিকারের আলোচনা পর্বে এ কথাও প্রমাণ করা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে যে, জবাইয়ের সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়া একান্ত প্রয়োজন। সুরা মায়িদার তাফসীরে জবাই বিষয়ক অনেক মাসআলা বর্ণিত হয়েছে। প্রয়োজনবশতঃ সেগুলো দেখে নেয়া যেতে পারে।

শারহুল মুকাদ্দামতুল মালিকিয়াহ্ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, আবুল কাশেম সূত্রে এসেছে, ইমাম মালেকের নিকট জবাইকালে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র নাম না নেয়া পশুর গোশত খাওয়াও হালাল। কিন্তু ইমাম মালেকের মুদাওয়ানা নামক ফেকাহ্ গ্রন্থে এ রকম অনুমতি দেয়া হয়নি এবং এটাই ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ অভিমত। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় বিস্‌মিল্লাহ্ পরিত্যক্ত হলে জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া যাবে না।

ইবনুল হারেস এবং ইবনুল বাশীর বলেছেন, জবাইকালে বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করা না করা সম্পর্কে কিছু কিছু মতভেদ পরিদৃষ্ট হলেও এ বিষয়টিতে সবাই একমত যে— যে ব্যক্তি জবাইয়ের সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলতে বার বার ভুলে যায় এবং বিস্‌মিল্লাহ্ বলার পরোয়া না করে, তার জবাই করা পশুর গোশত খাওয়া হারাম। কারণ ওই ব্যক্তি মুতাহাওয়ান। মুতাহাওয়ান বলে ওই ব্যক্তিকে— যে জবাইয়ের সময় বারংবার বিস্‌মিল্লাহ্ বলতে ভুলে যায়। আল্লাহ্‌তায়ালাই অধিক অবগত।

তিবরানী ও অন্যান্য আলেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন পারস্যবাসীরা মক্কার কুরায়েশদের নিকট এই মর্মে বার্তা প্রেরণ করলো যে— তোমরা মোহাম্মদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হও। তাকে জিজ্ঞেস করো, ছুরি দ্বারা তোমরা যা জবাই করো তাতো হালাল বুঝলাম। কিন্তু যা মৃত (আল্লাহ্ যার মৃত্যু ঘটিয়েছেন)— তাকে তোমরা হারাম বলো কেনো? (তোমাদের হত্যা কি আল্লাহ্‌র হত্যার চেয়ে উত্তম?)। আবু দাউদ ও হাকেমও এ রকম বর্ণনা এনেছেন। কিন্তু তাদের বর্ণনায় বিতর্কটি পারস্যবাসীদের ছিলো না, ছিলো মক্কার কুরায়েশদের। যাহোক, অবিশ্বাসীদের এমতো বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অবশিষ্টাংশ অবতীর্ণ হলো এভাবে— শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সঙ্গে বিতর্ক করতে প্ররোচনা দেয়; যদি তোমরা তাদের কথা মতো চলো তবে তোমরা অবশ্যই অংশীবাদী হবে। এ কথার অর্থ— অংশীবাদীরা তোমাদেরকে বিতর্কে লিপ্ত করতে চায়। করতে চায় তাদের বিশ্বাস ও কর্মের অনুসারী। কিন্তু জেনে রেখো, তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো, তবে নিঃসন্দেহে তোমরাও হয়ে যাবে অংশীবাদী।

এখানে ব্যবহৃত 'শায়াতীন' শব্দটির উদ্দেশ্য— পারস্যের ওই সকল শয়তান প্রকৃতির মানুষ। অথবা শয়তান জ্বিন। 'ওহী' শব্দটির অর্থ এখানে প্ররোচিত করা বা কুমন্ত্রণা দেয়া। 'আউলিয়া' শব্দটির উদ্দেশ্য— মক্কার অংশীবাদীরা। অথবা সাধারণভাবে সকল অবিশ্বাসীরা। আর 'ইতায়াত' শব্দটির উদ্দেশ্য— হারামকে হালাল মনে করা।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য যে, মুশরিক বা অংশীবাদী হওয়ার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালার আনুগত্য এবং ধর্মীয় বিধান পরিত্যাগ করে অন্যের কথামতো চলা। যে এ রকম করে, সে নিঃসন্দেহে মুশরিক। কেননা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের আনুগত্য শিরিক। জুজায বলেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ কর্তৃক ঘোষিত হারামকে হালাল অথবা হালালকে হারাম যে বলে, সে অংশীবাদী। আমি বলি, এক্ষেত্রে শর্ত এই যে, এই হালাল ও হারাম প্রমাণিত হতে হবে কোরআন মজীদের আয়াতের মাধ্যমে।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১২২

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

❑ যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাহাকে আমি পরে জীবিত করিয়াছি এবং যাহাকে মানুষের মধ্যে চলিবার জন্য আলোক দিয়াছি সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রহিয়াছে এবং সেই স্থান হইতে বাহির হইবার নহে? এইরূপে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের দৃষ্টিতে তাহাদিগের কৃতকর্ম শোভন করিয়া রাখা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতটি একটি রূপক উদাহরণ (ইসতেআরায়ে তামসিলিয়াহ্)। এখানে 'মৃত' শব্দটি দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে অবিশ্বাসীদেরকে। কারণ তাদের অন্তর মৃত। সত্যের স্পর্শ থেকে উদাসীনতার কারণে তাদের এই আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে। মৃত ব্যক্তি যেমন উপকারী ও অনুপকারী বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না, তেমনি অবিশ্বাসীরাও সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে অনুভূতিহীন। আর এখানে জীবিত করার অর্থ ইমানের নূর দ্বারা অন্তরকে জীবিত করে দেয়া। নূর অর্থ ইমানদার ব্যক্তির ওই জন্মগত জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি, যার দ্বারা সে সত্য ও মিথ্যাকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। এ নূর তার স্বভাব বা ফিৎরতের নূর। এই নূর পরিশুদ্ধ জ্ঞান, প্রশান্ত প্রবৃত্তি এবং আল্লাহ্তায়ালার বিধিবিধানের অনুকূল।

'মাছালা' শব্দটির অর্থ— মতো, ন্যায় বা অনুরূপ। শব্দটির মাধ্যমে এখানে এই দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে যে, বিশ্বাসী কখনও অবিশ্বাসীর মতো নয়। বিশ্বাসীরা আল্লাহ্ প্রদত্ত আলোর ধারক আর অবিশ্বাসীরা ভ্রষ্টতার অন্ধকারে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। একজনকে পথ প্রদর্শন করছে আল্লাহ্প্রদত্ত জ্ঞান ও শরিয়ত। আর অন্যজনকে পথভ্রষ্ট করেছে অবিবেচনা ও শরিয়তবিমুখতা। একজনের অন্তঃকরণ জীবন্ত। আর অন্যজনের অন্তঃকরণ মৃত।

www.eelm.weebly.com

আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ওমর এবং আবু জেহেলকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। জুহাকের মাধ্যমে ইবনে জারীরও এ রকম বলেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য হজরত হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব এবং আবু জেহেল। ঘটনাটি ছিলো এ রকম— একবার রসুল স. কাবা প্রাঙ্গণে সেজদাবনত হলেন। ওই সময় আবু জেহেল তাঁর উপর নিক্ষেপ করলো উটের নাড়ি-ভূঁড়ি। হজরত হামযা গিয়েছিলেন শিকারে। ঘরে ফিরেই তিনি আবু জেহেলের এই অপকর্মের সংবাদ পেলেন। হাতে ছিলো তাঁর ধনুক। ওই ধনুক হাতে নিয়েই ক্রোধান্বিত পদক্ষেপে অতি দ্রুত তিনি উপস্থিত হলেন আবু জেহেলের বাড়ীতে। হজরত হামযাকে রোষতপ্ত দেখে আবু জেহেল চরম বিনয়ের সঙ্গে বলতে শুরু করলো— আবু ইয়া'লী! তুমিতো জানোই মোহাম্মদ কি সব কথা শুরু করেছে। সে আমাদের প্রতিমাগুলোকে যখন তখন গালি দেয়। আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে মন্দ বলে। কতই না অজ্ঞ সে। হজরত হামযা বললেন, এর চেয়ে অধিক মূর্খ ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ্র উপাসনা ছেড়ে পাথরের উপাসনা করে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি— আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, মোহাম্মদ আল্লাহ্র দাস ও রসুল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি। হজরত ইকরামা এবং কালাবী বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আম্মার বিন ইয়াসার এবং আবু জেহেলকে কেন্দ্র করে। তাদের মধ্যকার ঘটনাটি ঘটেছিলো হজরত হামযার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে। ওই ঘটনার পরপরই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত জায়েদ বিন আসলাম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত ওমর এবং আবু জেহেলকে কেন্দ্র করে। হাসান বসরী এবং আবু সিনানও এরকম বলেছেন।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার তিনটি ঘটনার মধ্যে সাধারণ ঐক্যমত্য এই যে, এখানে 'যে অন্ধকারে রয়েছে' কথাটির লক্ষ্য আবু জেহেল। মতভেদ রয়েছে কেবল 'যাকে আমি জীবিত করেছি' কথাটি সম্পর্কে। কথাটি হজরত ওমর, হজরত হামযা অথবা হজরত আম্মারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অবশ্য তাঁদের ইসলাম গ্রহণের সময়ের মধ্যে খুব বেশী ব্যবধান ছিলো না। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর ওই সময়েই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং তাঁদের তিনজনই 'যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলবার জন্য আলো দিয়েছি'— কথাটির লক্ষ্যস্থল হতে পারেন। আয়াতে আবু জেহেলের এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে—

www.eelm.weebly.com

মুসলমানেরা যেহেতু তাদের পিতৃ-পুরুষ এবং পিতৃ-পুরুষের আচরণীয় ধর্মের বিরোধিতা করে, তাই তারাই মুসলমানদের চেয়ে উত্তম। কিন্তু আয়াতে উত্তম অনুত্তমের আলোচনা বা প্রতিতুলনা নেই। বরং এখানে সরাসরি বলে দেয়া হয়েছে মৃত ও জীবিত যেমন সমান নয়, তেমনি অবিশ্বাসীরা কখনো বিশ্বাসীদের মতো নয়। আয়াতে কেবল বিশ্বাসীদের পূর্ণতা ও বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করা হয়েছে। আর সম্পূর্নরূপে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে অবিশ্বাস ও অবিশ্বাসীকে।

শেষে বলা হয়েছে— এরূপে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দৃষ্টিতে তাদের কৃত-কর্ম শোভন করে রাখা হয়েছে। এ কথার অর্থ— আবু জেহেল ও তার অনুসারীরা ভ্রষ্টতাকেই পছন্দ করেছে। প্রত্যাখ্যান করেছে সত্যকে। তাই মিথ্যাই তাদের চোখে সুন্দর। আমিও তাই মিথ্যাকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দিলাম।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১২৩

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ۚ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

❒ এইরূপে প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদিগকে প্রধান করিয়াছি যেন তাহারা সেখানে চক্রান্ত করে; কিন্তু তাহারা শুধু তাহাদিগের নিজদিগের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না।

মানুষের সমাজ পরিচালিত হয় সমাজনেতাদের দ্বারা। জনতার পক্ষে নেতাদের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা কঠিন। আর আল্লাহ্‌তায়ালার নিয়ম হচ্ছে, সাধারণ জনতাই নবী রসুলগণের একনিষ্ঠ অনুসারী যেনো হয়। তাই দেখা যায় নবী রসুলের আহ্বানে সাধারণ জনতা সাড়া দিচ্ছে। আর সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা হয়ে যাচ্ছে প্রতিপক্ষ। অবিশ্বাস ও অবিশ্বাসীদের পরিণতি যে ধ্বংস ও ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু নয়, সে কথাটিই জানিয়ে দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। অপরাধী জনতার চেয়ে অপরাধী নেতারাই বড় অপরাধী। তাই আয়াতে তাদের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— এরূপে প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদেরকে প্রধান করেছি যেনো তারা সেখানে চক্রান্ত করে। এ কথার অর্থ— তখন যেমন কুরায়েশ নেতারা সত্যধর্ম ইসলামের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, রসুল স. এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম চক্রান্ত করে চলেছে— তেমনই অবস্থা ছিলো আগের যুগের সমাজ নেতাদের। তারাও তাদের জনপদে প্রেরিত নবী-রসুলদের বিরুদ্ধে এ রকম চক্রান্ত ও প্রতারণা করতো। অপরাধীদের নেতাদেরকে এভাবে আমি আবকাশ দিয়ে থাকি— যেনো তারা অধিকতর পাপাচারী হয় এবং আরও হয় অধিক

www.eelm.weebly.com

শাস্তির উপযোগী। এখানে ব্যবহৃত 'জায়ালনা' শব্দটির অর্থ যদি 'করেছি' অথবা 'বানিয়ে দিয়েছি' ধরা হয়, তবে এর কর্ম হবে দু'টি। একটি হচ্ছে— ফি ক্বারইয়াতিন (জনপদে) এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে— মুজ্‌রিমিহা (অপরাধীদের)। আর মুজ্‌রিমিহা শব্দটি বসবে 'আকাবিরা (প্রধানগণ) শব্দটির স্থলে। অথবা 'আকাবিরা' হবে দ্বিতীয় কর্ম এবং প্রথম কর্ম হবে 'মুজরিমিহা'। কিংবা 'আকাবিরা মুজ্‌রিমিহা' সম্মিলিতরূপে হবে একটি কর্ম। আর যদি 'জায়ালনা' অর্থ 'আমি করেছি' অথবা 'আমি শক্তি দিয়েছি' হয়, তবে মিলিতাবস্থায় 'আকাবিরা মুজ্‌রিমিহা' হবে তার কর্ম। 'সিগাহ ইস্‌মেতাফজীল' সম্বন্ধবাচক হলে এবং সম্বোধিত বিষয় বহুবচন হলে সম্বন্ধবাচক শব্দটি একবচন বা বহুবচন— যে কোনো এক প্রকারে ব্যবহার করা সিদ্ধ। আলোচ্য আয়াতে 'আকাবিরা' শব্দটি এসেছে বহুবচনরূপে।

এখানে মকর শব্দটির অর্থ— প্রতারণা বা চক্রান্ত। কামুস গ্রন্থে এ রকম বলা হয়েছে। আর সিহাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, বাধাদানের মাধ্যমে কাউকে তার মূল উদ্দেশ্য থেকে ফিরিয়ে দেয়া অথবা ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালানো।

কুরায়েশদের চক্রান্ত ছিলো এ রকম— তারা মক্কায় প্রবেশের সময় সব কয়টি পথে লোক বসিয়ে রাখতো। তাদের কাজ ছিলো, দূরের কেউ রসুল স. এর সঙ্গে দেখা করতে এলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া। 'মোহাম্মদ তো গণক', 'সে তো যাদুকর ছাড়া অন্য কিছু নয়'— এ সকল কথা বলে আগন্তুকদের মন বিষিয়ে দেয়া।

চক্রান্তের পরিণাম চক্রান্তকারীর উপরই আবর্তিত হয়। সুতরাং প্রকৃত অর্থে চক্রান্তকারীরা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে থাকে। আলোচ্য আয়াতের শেষে সে কথাটিই জানিয়ে দেয়া হয়েছে এভাবে— কিন্তু তারা শুধু তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না।

হজরত কাতাদা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, আবু জেহেল একবার বললো— প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ দু'টি ঘোড়ার মতো আবদে মান্নাফের সন্তানেরা আমার সঙ্গে আভিজাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলেছে। রসুল স. এর বংশের লোকেরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশার্থে বললেন, আমাদের মধ্যে রয়েছে একজন রসুল— যার প্রতি অবতীর্ণ হয় প্রত্যাদেশ। আবু জেহেল বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো তাকে মানবো না। কস্মিনকালেও তার অনুগত হবো না। তার মতো প্রত্যাদেশ যদি আমার উপরও অবতীর্ণ হয়, কেবল তখনই হয়তো তাকে মেনে নিতে পারি।

এক বর্ণনায় এসেছে, ওলিদ ইবনে মুগীরা একবার বললো, নবুয়ত যদি প্রকৃতই কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় হয়, তবে নবুয়ত লাভের অধিকার তোমার চেয়ে আমারই বেশী। আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, বিত্তশালী। ওলিদের এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

وَاِذَا جَآءَتۡهُمۡ اٰيَةٌ قَالُوۡا لَنۡ نُّؤۡمِنَ حَتّٰى نُؤۡتٰى مِثۡلَ مَاۤ اُوۡتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ؔ اَللّٰهُ اَعۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيۡبُ الَّذِيۡنَ اَجۡرَمُوۡا صَغَارٌ عِنۡدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا كَانُوۡا يَمۡكُرُوۡنَ ۝

❑ যখন তাহাদিগের নিকট কোন নিদর্শন আসে তাহারা তখন বলে 'আল্লাহের রসূলগণকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল আমাদিগকে তাহা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনও বিশ্বাস করিব না। আল্লাহ্ রিসালতের ভার কাহার উপর অর্পন করিবেন তাহা তিনিই ভাল জানেন। যাহারা অপরাধ করিয়াছে চক্রান্তের জন্য আল্লাহের নিকট হইতে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি তাহাদিগের উপর আপতিত হইবে।

নবী ও রসুলগণ আল্লাহ্তায়ালার নিজস্ব নির্বাচনের ফল। বংশ, সম্পদ, বয়স, চেষ্টা সাধনা— কোনো কিছুই নবুয়ত লাভের যোগ্যতা নয়। আর আল্লাহ্তায়ালাই ভালো করে জানেন, তিনি রেসালতের ভার কার উপর অর্পন করবেন, এ বিষয়ে মন্তব্য করবার অধিকার কারো নেই। তাই আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে— যখন তাদের নিকট কোনো নিদর্শন আসে, তখন তারা বলে, আল্লাহ্র রসুলগণকে যা দেয়া হয়েছিলো, আমাদেরকে তা না দেয়া পর্যন্ত আমরা কখনো বিশ্বাস করবো না। আল্লাহ্ রেসালতের ভার কার উপর অর্পন করবেন তা তিনিই ভালো জানেন।

হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফে সানি র. লিখেছেন, আল্লাহ্পাকের সত্তা ও গুণাবলীর সরাসরি প্রতিবিম্ব হচ্ছে নবী ও রসুলগণের আদি সূচনা বা উৎপত্তিস্থল। আর যারা নবী ও রসুল নয় তাদের আদি সূচনা বা উৎপত্তিস্থল হচ্ছে আল্লাহ্পাকের নাম ও গুণাবলীর প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া। তাই নবী ও রসুলগণের উপর আল্লাহ্পাকের সত্তার তাজাল্লী বা বিকাশ প্রতিবিম্বিত হয় প্রত্যক্ষভাবে আর অন্যদের প্রতি প্রতিবিম্বিত হয় পরোক্ষভাবে। প্রত্যক্ষ প্রতিবিম্বনের মধ্যে ফেরেশ্তাকুলও রয়েছেন। সুতরাং তারাও নবী রসুলগণের মতো নিষ্পাপ। তাঁদের উৎসস্থল বা সূচনা যদিও এক, তবুও তাঁর দিক রয়েছে দু'টি। একটি অপ্রকাশ্য এবং অন্যটি প্রকাশ্য। অপ্রকাশ্য দিকটি বিশেষভাবে ফেরেশ্তাদের জন্য নির্দিষ্ট। তাই তাঁরা অদৃশ্য। আর নবী রসুলগণ প্রকাশ্য দিকটির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত বলে তাঁদের প্রধান কর্মক্ষেত্র এই পৃথিবী বা প্রকাশ্য জগৎ।

www.eelm.weebly.com

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নৈকট্যের (বেলায়েতের) দিক থেকে ফেরেশ্‌তাকুলই শ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁরা নবী রসুল অপেক্ষা আল্লাহ্‌তায়ালার অধিকতর নৈকট্যভাজন। আর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নবুয়তের দিক থেকে। নবুয়তই আল্লাহ্‌পাক প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ। আল্লাহ্‌পাকের সত্তার সরাসরি তাজাল্লী, বিকাশ বা বিচ্ছুরণ নবী রসুলগণের উপরেই প্রতিভাসিত হয়। তাই তাঁরা ফেরেশ্‌তাগণের চেয়ে আল্লাহ্‌পাকের অধিকতর প্রিয়ভাজন।

প্রেমিক তাঁর প্রিয়জন নির্ধারণ করেন প্রেমের নিরিখে। বাহ্যিক কোনো যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়। প্রকৃত প্রেম প্রত্যক্ষ। আর যোগ্যতা বা কারণ একটি পরোক্ষ বিষয়। প্রেম ভালোবাসার স্রষ্টা আল্লাহ্‌তায়ালা এ কথা ভালো করেই জানেন। তাই তিনি সকল কারণ ও যোগ্যতার দিকে দৃকপাতমাত্র না করে আপন সিদ্ধান্তে তাঁর একান্ত প্রিয়জনদের উপর অর্পণ করেন রেসালতের অনন্যসাধারণ দায়িত্ব। আলোচ্য আয়াতে এ কথাটি স্পষ্টরূপে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর বান্দাদের অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর অন্তরকে সর্বাধিক পবিত্র, প্রেমময় এবং আনুগত্যপূর্ণ দেখলেন। তাই তিনি তাঁকে গ্রহণ করলেন সর্বাপেক্ষা আপন হিসেবে। পুনর্বার দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ্‌পাক দেখলেন, রসুল স. এর সাথীদের অন্তর্দেশ অন্য মানুষের অন্তর্দেশ থেকে উত্তম। তাই তাঁদেরকে নির্বাচন করলেন রসুল স. এর সহচর হিসেবে। তাঁরা ধর্মের জন্য যুদ্ধ করেছেন। তাই তাঁরা যা উত্তম মনে করেন, তা আল্লাহ্‌র নিকটে উত্তম। আর তাঁরা যা অনুত্তম মনে করেন, তা অনুত্তম আল্লাহ্‌র নিকটেও।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে— যারা অপরাধ করেছে, চক্রান্তের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট থেকে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে। এখানে 'সাগারুন্' শব্দটির অর্থ অপমান বা লাঞ্ছনা। 'ইন্দাল্লহ্ কথাটির মর্ম— কিয়ামতের দিন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ইন্দাল্লহ্' কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে— 'মিন ইনদিল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) অর্থাৎ দুনিয়ায় ও আখেরাতে (তাদের উপর আপতিত হবে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি)। 'আ'জাবুন শাদীদ্' অর্থ কঠোর শাস্তি। এই কঠোর শাস্তি পৃথিবী ও আখেরাত উভয় স্থানে হবে। যেমন অবিশ্বাসীরা পৃথিবীতে নিহত হয়েছে। হয়েছে বন্দী। বদর যুদ্ধের দিনেও তারা হয়েছিলো চরম লাঞ্ছনার শিকার। আর পরকালে তাদের জন্য নরক তো অবধারিত। এখানে 'বিমাকানু' শব্দটির 'বা' হচ্ছে কারণ নির্দেশক। এভাবে অর্থ দাঁড়ায় এ রকম— পাপাচারের কারণে, অথবা সত্যের প্রতিপক্ষ হওয়ার কারনে পরকালে তারা প্রবেশ করবে নরকাগ্নিতে।

www.eelm.weebly.com

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

❒ আল্লাহ্ কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে চাহিলে তিনি তাহার হৃদয় ইসলামের জন্য প্রশস্ত করিয়া দেন এবং কাহাকেও বিপথগামী করিতে চাহিলে তিনি তাহার হৃদয় অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া দেন; তাহার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহনের মতই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যাহারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তাহাদিগকে এইরূপে লাঞ্ছিত করেন।

আল্লাহ্ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন— এই আয়াত অবতীর্ণ হলে রসুল স. কে 'শরহে সদর' (বক্ষ সম্প্রসারণ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্পাক ইমানদারদের অন্তরে এক প্রকার নূর নিক্ষেপ করেন— ফলে তাদের অন্তর্জগত হয়ে যায় প্রসারিত, বিস্তৃত (ওই অবস্থাকেই বলা হয় শরহে সদর)।

আমি বলি, কথাটির অর্থ— মারেফাতে হক (সত্যের পরিচিতি) লাভের জন্য অন্তর উন্মোচিত হওয়া। ওই উন্মোচিত হৃদয়ই প্রকৃত ইমানকে ধারণ করে।

একবার সাহাবীগণ রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! শরহে সদরের নিদর্শন কী? তিনি স. বললেন, চিরস্থায়ী আবাসের প্রতি আকর্ষণ, পৃথিবী বিমুখতা, মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুতি— এগুলোই হচ্ছে শরহে সদরের নিদর্শন। হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিসটি হাকেম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে এবং বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মুরসালরূপে ফারইয়ানী বর্ণনা করেছেন আবু জাফর থেকে। ইবনে জারীর এবং আবদ বিন হুমাইদও হাদিসটির বর্ণনাকারী।

সুফী সম্প্রদায়ের মতে প্রবৃত্তির বিনাশ সাধিত হলে শরহে সদর হয়। তখন অপপ্রবৃত্তির (নফ্সানিয়াতের) কোনো চিহ্নই আর পরিদৃষ্ট হয় না। আধ্যাত্মিক পথিকগণ যখন বেলায়েতে কোব্রায় (নবীগণের নৈকট্যের বৃত্তে) উপনীত হন, তখনই অর্জিত হয় প্রকৃত ইমান।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— এবং কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন; তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহনের মতোই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

প্রখ্যাত ব্যাকরণজ্ঞ সিবওয়াইহ্ বলেছেন, এখানে ব্যবহৃত 'হারাজ' শব্দটির 'র' অক্ষরের উপর যবর দিয়ে পড়তে হবে। এটি একটি মূল শব্দ। অর্থগত দিক থেকে শব্দটি কর্তৃবাচক এবং এটি গুণবাচক শব্দরূপ। শব্দটি রূপান্তরযোগ্য ও বিশেষণাত্মক। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবে এ রকম— আল্লাহ্পাক অবিশ্বাসীদের হৃদয় অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন। তাই ওই সঙ্কুচিত ও রুদ্ধ হৃদয়ে ইসলামের আলো প্রবেশ করে না। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে কালাবী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র কথা শুনলে ওই সকল লোকের হৃদয় আরো বেশী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। আর দেব-দেবীর পূজা অর্চনার কথা শুনলে তাদের হৃদয়ের অর্গল খুলে যায়।

হজরত ওমর একবার এই আয়াত পাঠ করে বনী কেনানা নামক আরব গোত্রের এক লোককে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, 'হারাজাতুন' শব্দটির অর্থ কী? লোকটি বললো, আমাদের ভাষায় শব্দটির অর্থ দুর্গম অরণ্যের এমন বৃক্ষ— যেখানে গৃহপালিত বা বুনো কোনো পশু পৌঁছতে পারে না। হজরত ওমর বললেন, কপটদের (মুনাফিকদের) অন্তরও তদ্রূপ। উত্তম কোনো কিছু তাদের বদ্ধ অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না।

মুনাফিকদের জন্য ইসলামের অনুসরণ দুঃসাধ্য। এ দৃষ্টান্তটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহনের মতোই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এ কথার অর্থ— সশরীরে আকাশে উঠে যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব মুনাফিকদের হৃদয়ে ইমান প্রবেশ করা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য দৃষ্টান্তটির অর্থ— ইমান যেনো মুনাফিকদের নিকট আকাশে উধাও হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার। আকাশারোহণ যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব ওই উধাও ইমানকে খুঁজে পাওয়া।

শেষে বলা হয়েছে— যারা বিশ্বাস করে না, আল্লাহ্ তাদেরকে এভাবে লাঞ্ছিত করেন। এ কথার অর্থ, মুনাফিকদের হৃদয় এভাবে অবরুদ্ধ করে দিয়ে আল্লাহ্পাক তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন। এখানে ব্যবহৃত 'রিজসুন' শব্দটির অর্থ, পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী— উভয় স্থানের লাঞ্ছনা বা শাস্তি। কালাবী বলেছেন, যাতে কল্যাণের লেশমাত্র নেই তাকেই বলে— রিজসুন। জুজায বলেছেন, এর অর্থ গোনাহ্ বা পাপ। মুজাহিদ বলেছেন, শয়তান। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— এর অর্থ শয়তানকে বিজয়ী করে দেয়া। এখানে আ'লাইহিম (তাদের

www.eelm.weebly.com

উপর) না বলে বলা হয়েছে 'আলাল্লাজিনা লা ইউ'মিনুন (যারা বিশ্বাস করে না)। এতে করে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বাস না করা বা ইমান না আনাই তাদের লাঞ্ছনার কারণ।

আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে মোতাজিলাদের বিশ্বাস ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তারা বলে, আল্লাহ্ কেবল উত্তম কর্মের স্রষ্টা, মন্দ কর্মের নয়। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে— তিনিই ভালো ও মন্দ উভয় কর্মের একক স্রষ্টা (সৃষ্টি আল্লাহ্র আর অর্জন বান্দার)।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১২৬

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ۝

❑ ইহাই তোমার প্রতিপালক-নির্দেশিত সরল পথ। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে তাহাদিগের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি।

সরল পথ ব্যতিরেকে নির্ভুল গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আর এ রকম সরল সোজা পথ মানুষ কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টি নির্মাণ করতে পারে না। যে আল্লাহ্ মানুষের বক্ষ সম্প্রসারণ ও সংকোচন করেন, যিনি সকল দোষত্রুটি ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে পবিত্র— সেই আল্লাহ্ই কেবল সরল পথের নির্দেশনা দিতে সক্ষম। সে কথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে— এটাই তোমার প্রতিপালক নির্দেশিত সরল পথ। 'সিরত্বল মুসতাক্বিম' অর্থ সরল পথ। এই পথ বিজ্ঞানময় এবং আল্লাহ্তায়ালার নির্ধারিত নিয়মের অনুকূল। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কোরআন মজীদ কর্তৃক উপস্থাপিত এবং মোহাম্মদ মোস্তফা স. কর্তৃক অনুসৃত পথই হচ্ছে সরল পথ। এক কথায় এই পথের নাম ইসলাম। এখানে ব্যবহৃত মুসতাক্বিমা শব্দটি বর্তমান অবস্থাবোধক। পূর্বোক্ত তাফসীরের ভিত্তিতে শব্দটির অর্থ হবে ন্যায়ানুগতা, সাম্য। আর শেষোক্ত তাফসীরের ভিত্তিতে অর্থ হবে সরল, সোজা— যেখানে বক্রতা নেই।

এরপর বলা হয়েছে— যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছি। এখানে ক্বওমী ইয়্যাজ্জাক্কারুণ (যারা উপদেশ গ্রহণ করে)— কথাটির উদ্দেশ্য আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। কেননা কোরআন মজীদের আয়াত দ্বারা এই দলই সর্বাধিক উপকার লাভ করেছে। এই পথপ্রাপ্ত দলের বিশ্বাস হচ্ছে—: আল্লাহ্পাকই সর্বশক্তিমান। সকল দিক দিয়েই তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অতুলনীয় এবং সমকক্ষহীন। আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্ত অনুসারে সমগ্র বিশ্বের সকল ভালো ও মন্দ সংঘটিত হয়ে চলেছে। তিনি সকলের সকল প্রকাশ্য ও গোপন সম্পর্কেও সম্যক অবগত। তাঁর সকল কর্ম প্রজ্ঞামণ্ডিত। তিনি ন্যায়বিচারক। তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপনের অধিকার কারো নেই।

www.eelm.weebly.com

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

❒ তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে শান্তির আলয় এবং তাহারা যাহা করিত তজ্জন্য তিনিই তাহাদিগের অভিভাবক।

'লাহুম দারুস্ সালামি ই'নদা রব্বিহিম' (তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে শান্তির আলয়)। এখানে 'দারুস্সালাম' অর্থ শান্তির আলয় বা জান্নাত। জান্নাত সকল অশান্তিময়তা থেকে মুক্ত। অথবা দারুস্সালাম অর্থ ওই গৃহ, যেখানে জান্নাতিদের শান্তিময় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্তায়ালার এক নাম সালামুন। হতে পারে ওই নামে কোনো গৃহের নাম দারুস্সালাম। আর যে গৃহ আল্লাহ্তায়ালার নামাঙ্কিত, সেই গৃহ যে অত্যুচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন— তা বলাই বাহুল্য।

ই'নদা রব্বিহিম কথাটির অর্থ আল্লাহ্তায়ালার নিকটে, জিম্মাদারীতে বা দায়িত্বে। আল্লাহ্তায়ালার দায়িত্বে বিদ্যমান ওই গৃহের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না।

ওয়া হুয়া ওয়ালিয়্যুহুম বিমা কানু ইয়া'মালুন (এবং তারা যা করতো তার জন্য তিনিই তাদের অভিভাবক)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে (বিশ্বাসীদেরকে) ভালোবাসেন। তিনিই বিশ্বাসীদের ওলি (প্রেমিক বা অভিভাবক)। ওলি অর্থ সকল বিষয়ের অভিভাবক হওয়াও সম্ভব। অর্থাৎ অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ্পাক বিশ্বাসীদেরকে পৃথিবীতে বক্ষ সম্প্রসারণ করেন। ইমান দান করেন। বিশুদ্ধ করেন। কবরে মুনকির ও নকীর নামক ফেরেশ্তাদ্বয়ের প্রশ্নের সামনে তৌহিদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর পরকালেও তিনি তাদেরকে দান করবেন পরিপূর্ণ সওয়াব, নৈকট্য এবং রহমত।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১২৮, ১২৯

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

www.eelm.weebly.com

❐ যেদিন তিনি তাহাদিগের সকলকে একত্র করিবেন এবং বলিবেন 'হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা অনেক লোককে তোমাদিগের অনুগামী করিয়াছিলে', এবং মানব সমাজের মধ্যে তাহাদিগের বন্ধুগণ বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের মধ্যে কতক অপরের দ্বারা লাভবান হইয়াছি এবং তুমি আমাদিগের জন্য যে সময় নির্ধারিত করিয়াছিলে এখন আমরা উহাতে উপনীত হইয়াছি' সেদিন আল্লাহ্ বলিবেন, 'অগ্নিই তোমাদিগের বাসস্থান, তোমরা সেথায় স্থায়ী হইবে', যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।

❐ এইরূপে উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য জালিমদিগের একদলকে অন্য দলের উপর প্রবল করিয়া থাকি।

প্রথমেই বলা হয়েছে— যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন এবং বলবেন, হে জ্বিন সম্প্রদায়! তোমরা অনেক লোককে তোমাদের অনুগামী করেছিলে। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক কিয়ামতের দিন যখন সকল সৃষ্টিকে একত্র করবেন, তখন জ্বিন সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলবেন, হে জ্বিন সম্প্রদায়! তোমরা মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলে। এভাবে অনেক লোককে তোমরা তোমাদের অনুগামী করে নিয়েছিলে।

এরপর বলা হয়েছে— এবং মানব সমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছি এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলে, এখন আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে উপকৃত হওয়ার অর্থ— জ্বিনদের নিকট থেকে কোনো কোনো মানুষ যাদু ও গণনা শিক্ষা করে। ওই যাদু ও গণনার কারণে জ্বিনেরা তাদের কোনো কোনো প্রয়োজন পূরণ করে। এভাবে জ্বিনেরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে। জ্বিনদের মাধ্যমে ওই প্রবৃত্তিজাত প্রাপ্তিকে এখানে বলা হয়েছে উপকৃত হওয়া। এ রকম আরো কিছু কিছু উপকার প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, বিজন মরুপ্রান্তরে চলমান কোনো পথিক যদি বলে— আউ'জু বিসাইয়্যিদি হাজাল ওয়াদি মিন সুফাহায়া কৃওমিহি (আমি জ্বিন সম্প্রদায়ের ক্ষতি থেকে এই প্রান্তরের জ্বিন সর্দারের কাছে পরিত্রাণ প্রার্থী— তবে সে সমস্ত রাত জ্বিনের ক্ষতি থেকে পরিত্রান লাভ করে। মানুষের দ্বারা জ্বিনেরাও উপকৃত হয়। এ রকম উপকারের দৃষ্টান্ত হচ্ছে— কোনো কোনো মানুষ জ্বিনের উপাসনা করে, পথভ্রষ্টতা ও পাপাচারের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করে ইত্যাদি।

www.eelm.weebly.com

'আজালানা' শব্দটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে কিয়ামত দিবসকে। অর্থাৎ ওই দিবসে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে জ্বিনেরা এ রকম বলবে যে— তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলে, এখন আমরা তাতে উপনীত হয়েছি।

শেষে বলা হয়েছে— সেদিন আল্লাহ্ বলবেন, অগ্নিই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা সেখানে স্থায়ী হবে, যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। এখানে 'যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন'— কথাটির অর্থ হতে পারে বিভিন্ন রকম। যেমন—

১. আল্লাহ্র ইচ্ছায় ওই সময়টুকুর সুযোগ— যে সময়টুকু লাভ হবে দোজখে প্রবেশের পূর্বে।

২. আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছানুসারে প্রাপ্য ওই অবকাশটুকু, যে অবকাশের পর দোজখীদেরকে স্থানান্তরিত করা হবে জামহারীর দিকে (স্থায়ী অগ্নিবাসের দিকে)।

৩. 'ইল্লা' অর্থ ব্যতীত। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক চাইলে সার্বক্ষণিক দোজখীরাও কিছু কিছু আনুসাঙ্গিক আযাব থেকে মুক্ত থাকবে।

৪. হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইল্লা মাশাআল্লাহ্ (যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন) —কথাটির মাধ্যমে ওই সকল দোজখীদেরকে পৃথক করা হয়েছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্পাক আগের থেকেই জানেন যে, এরা পাপিষ্ঠ হলেও অনুপরিমান ইমানের অধিকারী। দোজখ এদের চিরস্থায়ী আবাস নয়। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা অন্য রকম ইচ্ছা করবেন। অর্থাৎ দোজখের সাময়িক শাস্তিদানের পর তাদেরকে দোজখ থেকে বহিষ্কৃত করবেন। এখানে মাশায়া (যদি ইচ্ছা করেন) শব্দটির 'মা' অর্থ 'মান' (যে ব্যক্তি)।

সবশেষে বলা হয়েছে— 'ইন্না রব্বাকা হাকিমুন আ'লীম' (তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তাঁর বন্ধু ও শত্রুদের সঙ্গে যে আচরণ করবেন তা হবে অবশ্যই প্রজ্ঞামণ্ডিত এবং তিনি সকলের সকল খবর জানেন। এ কথাও জানেন যে, কার অন্তরে রয়েছে বিশ্বাস এবং কার অন্তরে অবিশ্বাস।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে আব্বাসের উপরে বর্ণিত উক্তিটির মর্মার্থ সম্ভবতঃ এই যে— যাদের কাছে কোনো নবী ও রসুলের আহবান পৌঁছেনি, অথচ

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্তায়ালা জানেন যে সত্যের আমন্ত্রণ পেলে তারা সাড়া দিতো — তাদেরকেই আল্লাহ্পাক কোনো এক সময় দোজখ থেকে নিষ্কৃতিদান করবেন। আর যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্পাকের জানা রয়েছে যে — সত্যের ডাক শুনলেও তারা সাড়া দিতো না, তাদের জন্য আল্লাহ্তায়ালা নির্ধারণ করবেন চিরস্থায়ী অগ্নিবাস।

পরের আয়াতে (১২৯) বলা হয়েছে, এরূপে তাদের কৃতকর্মের জন্য জালেমদের একদলকে অন্য দলের উপর প্রবল করে থাকি। এ কথার অর্থ— আমি অবিশ্বাসী জ্বিন ও মানুষকে আমার সাহায্য থেকে সম্পর্কচ্যুত করে দিয়েছি। দিয়েছি তাদেরকে পারস্পরিক উপকৃত হওয়ার সুযোগ। তাই তারা একদল— অন্যদলের উপর প্রবল হয়। উপকৃত হয় একে অন্যের নিকট থেকে। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব।

এখানে নুওয়াল্লি (পারস্পরিক বন্ধুত্ব বা প্রাবল্য) শব্দটির অর্থ আলেমগণ বিভিন্নভাবে করেছেন। যেমন —

১. আমি তাদেরকে একে অপরের বন্ধু বানিয়ে দেই।

২. এক বিশ্বাসী অন্য বিশ্বাসীর কল্যাণকামী। তারা ভালো কাজে একে অপরকে সহযোগীতা করে থাকে। তেমনি অবিশ্বাসীরা মন্দ কর্মে সমমতি সম্পন্ন এবং তারা মন্দ কর্মে একে অপরের সহযোগী হয়।

৩. হজরত মুয়াম্মারের বর্ণনা থেকে কাতাদা বলেছেন, এখানে একদলকে অন্য দলের উপর প্রবল করার অর্থ— দোজখীদের এক দলকে অন্য দলের অগ্রগামী করা (এক জনের পশ্চাতে একজন— এভাবে দোজখে প্রবেশ করানো)।

নুওয়াল্লি শব্দটি এসেছে মোওয়ালাত থেকে— যার অর্থ একজনের পর একজন চলা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'মোওয়ালাত' শব্দটির অর্থ হস্তান্তর করা বা ন্যস্ত করা। এভাবে 'এক দলকে অন্য দলের উপর প্রবল করে থাকি'— কথাটির অর্থ দাঁড়াবে, আমি কখনো অবিশ্বাসী মানুষকে অবিশ্বাসী জ্বিনের হাতে এবং কখনো অবিশ্বাসী জ্বিনকে অবিশ্বাসী মানুষের হাতে ন্যস্ত করি।

হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে আবু সালেহ্ সূত্রে কালাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আলোচ্য আয়াতটির তাফসীর হবে এ রকম— যখন আল্লাহ্পাক কোনো সম্প্রদায়ের মঙ্গল চান, তখন উত্তম ব্যক্তিবর্গকে তাদের পরিচালক নির্ধারণ করেন। আর যখন কোনো সম্প্রদায়ের অমঙ্গল চান, তখন খারাপ লোকদেরকে বানিয়ে দেন তাদের পরিচালক। এই ব্যাখ্যানুসারে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এ

www.eelm.weebly.com

রকম— আমি এক অত্যাচারী দলকে অন্য অত্যাচারী দলের উপর প্রবল করে দেই এবং এভাবে একদলের দ্বারা অন্য দলকে পর্যুদস্ত করি। এক বর্ণনায় এসেছে, যে জালেমকে সাহায্য করে, আল্লাহ্পাক তার উপর জালেমকে প্রবল করে দেন।

এই ব্যাখ্যাটির সপক্ষে হজরত আলীর একটি উক্তিও উপস্থাপন করা যায়। হজরত সা'সা বিন সুহান থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, ইবনে মুলযমের তরবারীর আঘাতে আহত হজরত আলী যখন শাহাদাতের দ্বারপ্রান্তে, তখন জনতা আবেদন জানালো— হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাদের জন্য পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করে দিন। হজরত আলী বললেন, যদি আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের কল্যাণ চান, তবে পুণ্যবান পরিচালককে তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিবেন। আল্লাহ্পাক আমাদের মঙ্গল চেয়েছিলেন বলেই হজরত আবু বকর কে আমাদের পরিচালক নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, জালেমদের দ্বারাই আল্লাহ্পাক মানুষকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। তারপর শাস্তি দান করেন জালেমদেরকে।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১৩০, ১৩১

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَ
يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ
الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝ ذٰلِكَ اَنْ
لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ۝

❐ আমি উহাদিগকে বলিব, 'হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদিগের মধ্য হইতে কি রসূলগণ তোমাদিগের নিকট আসে নাই যাহারা আমার নিদর্শন তোমাদিগের নিকট বিবৃত করিত এবং তোমাদিগকে এই দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করিত?' উহারা বলিবে 'আমরা আমাদিগের অপরাধ স্বীকার করিলাম।' বস্তুতঃ পার্থিব জীবন উহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল, আর উহারা যে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ছিল ইহাও উহারা স্বীকার করিবে,

❐ ইহা এই হেতু যে, অধিবাসীবৃন্দ যখন অনবহিত তখন কোন জনপদকে উহাদের অন্যায় আচরণের জন্য ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নয়।

এ বিষয়টি ঐকমত্যসম্মত যে, মানুষের পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্য থেকে নবী ও রসুল নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু জ্বিনদের পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে

www.eelm.weebly.com

তাদের মধ্য থেকে নবী ও রসুল প্রেরণ করা হয়েছিলো কিনা— সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। জুহাক বলেছেন, অবশ্যই জ্বিনদের মধ্যে নবী ও রসুল প্রেরণ করা হয়েছিলো। উপরে উদ্ধৃত আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে তিনি বলেছেন, দ্যাখো, আল্লাহ্পাক স্বয়ং এখানে বলেছেন—'ইয়া মা'শারাল জিন্নি ওয়াল ইনসি আলাম ইয়া'তিকুম রসুলুম মিনকুম' (আমি তাদেরকে বলবো, হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য থেকে কি রসুলগণ তোমাদের নিকট আসেনি)।

কালাবী বলেছেন, শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর মহা আবির্ভাবের পূর্বে মানুষের জন্য মানুষকে এবং জ্বিনদের জন্য জ্বিনকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হতো। আর শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স.ই মানুষ ও জ্বিন উভয় সম্প্রদায়ের রসুল হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন।

মুজাহিদ বলেছেন, আগের যুগে মানুষের জন্য ছিলো মানুষ নবী। আর জ্বিনদের জন্য ছিলো কেবল ভয় প্রদর্শনকারী। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— ওয়ালাও ইলা ক্বওমিহি মুনজিরিন (আর যদি তার কওমের প্রতি কোন ভীতিপ্রদর্শনকারী থাকে)। এখানে 'ভীতি প্রদর্শনকারী' কথাটির অর্থ— নবী বা রসুলের প্রতিনিধি। সমসাময়িক নবী-রসুলগণের প্রতিনিধি বা দূত হিসেবে কোনো কোনো জ্বিন তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ভয়প্রদর্শনকারীরূপে নিযুক্ত হতেন। তাঁরা নবী রসুলগণের পক্ষ থেকে সত্যধর্মের বাণী প্রচার করতেন। আল্লাহ্র ভয় প্রদর্শন করতেন। তাঁরা নবী ছিলেন না। ছিলেন নবীর প্রতিনিধি বা দূত। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্য থেকে) কথাটির অর্থ হবে— কেবল মানুষের মধ্য থেকে। অর্থাৎ নবী কেবল মানুষের মধ্য থেকেই হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে—'ইউখরিজু মিনহুমাল্ লু'লু ওয়াল মারজান' (সেখান থেকে উত্তোলিত হয় লু'লু এবং মারজান প্রস্তর)। এখানে হুমা (সে দু'টি থেকে) সর্বনামটি দ্বিবচন। কিন্তু এর উদ্দেশ্য একটি। অর্থাৎ লবনাক্ত সমুদ্র থেকে মোতি এবং লু'লু (মূল্যবান পাথর বিশেষ) বের করেন। অন্য এক আয়াতে রয়েছে—'ওয়া জাআলাল ক্বমারা ফিহিন্না..... (আর সেগুলোতে আমি চন্দ্রকে করে দিয়েছি ....)। এখানকার 'হিন্না' (সেগুলোতে) শব্দটি বহুবচন হলেও এর উদ্দেশ্য বা অর্থ একবচন। কেননা চাঁদ তো একটি আকাশেই আছে।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে এ কথাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ ও জ্বিন— সকলের পথ প্রদর্শনের জন্য নবী ও রসুল পাঠানো হয়েছিলো। ওই নবী-রসুলগণ অধিকাংশই ছিলেন মানুষ। আবার কেউ কেউ ছিলেন জ্বিন।

www.eelm.weebly.com

মানুষের জন্য মানুষ নবী এবং জ্বিনদের জন্য জ্বিন নবী তখন সত্যধর্ম প্রচার করতেন। এক আয়াতে বলা হয়েছে— যদি পৃথিবীতে ফেরেশতাদের জনপদ থাকতো, তবে আকাশ থেকে তাদের জন্য কোনো ফেরেশতাকে (রসুল করে) পাঠানো হতো। এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, জ্বিনদের হেদায়েতের জন্য জ্বিনকেই রসুল করে পাঠানো হয়েছিলো। কারণ রসুল এবং রসুলের অনুসারীদের মধ্যে সম্প্রদায়গত এবং স্বভাবগত সম্পর্ক থাকতেই হয়। তাছাড়া মানুষের মতো জ্বিনেরাও বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টি। তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে হজরত আদমের পূর্বে। আর বিবেকবান বলেই তাদের প্রতি আল্লাহ্পাকের আদেশ ও নিষেধ প্রযোজ্য। সুতরাং মানুষ নবী সৃষ্টির পূর্বে তাদের হেদায়েতের জন্য নিশ্চয় তাদের মধ্য থেকে কোনো কোনো জ্বিনকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হতো। এক আয়াতে বলা হয়েছে— আমি জ্বিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করবো। এতে করে বুঝা যায়, মানুষের মতো জ্বিনদের জন্য রসুল প্রেরণের প্রচলন ছিলো। নতুবা তাদের শাস্তির কথা উঠতো না। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে— রসুল প্রেরণ ব্যতিরেকে আমি কাউকে শাস্তি প্রদান করি না।

হিন্দুস্তানে হিন্দু জ্বিনেরা অবতার বলে পরিচিত। পৌরাণিক পুস্তকগুলোতে দেখা যায়, ধর্মপ্রচারকরূপে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বেও কেউ কেউ আবির্ভূত হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁরাই ছিলেন ভারতবাসীদের কথিত পরমাত্মা কর্তৃক প্রেরিত অবতার। আর তারা ছিলেন জ্বিন। জ্বিনদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যেই তাঁদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিলো। মানুষেরাও হয়তো তাঁদের মাধ্যমে কিছু উপকার লাভ করেছিলো। আর সেগুলোকে ভিত্তি করেই দেখা দিয়েছিলো শতসহস্র বিকৃতি ও বিচ্যুতি। আর সে কারণেই হয়তো আল্লাহ্পাক পরবর্তী সময়ে জ্বিনদের নবী হওয়ার প্রথাটি বিলুপ্ত করে দিয়েছেন।

নবী রসুলগণের দায়িত্ব ছিলো— আল্লাহ্পাকের নিদর্শন প্রদর্শন এবং মানুষকে সতর্ককরণ। তাই এরপর বলা হয়েছে— যারা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বিবৃত করতো এবং তোমাদেরকে এই দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করতো।

এখানে 'এই দিন' অর্থ কিয়ামতের দিন। কিয়ামতের দিন সত্যকথা বলা ছাড়া অবিশ্বাসীদের আর কোনো উপায় থাকবে না। তাই এখানে বলা হয়েছে— তারা বলবে 'আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম।' এ কথার অর্থ— অবিশ্বাসীরা তখন বলবে, আজ এই কিয়ামতের দিন সত্যসাক্ষ্য দেয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। তাই স্ববিরোধী হলেও স্বীকার করছি, আমরা অপরাধী। যথাসময়ে নবী ও রসুলগণ আমাদেরকে সত্যধর্মের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে আহবান আমরা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। মুকাতিল বলেছেন, কিয়ামতের দিন বাকরুদ্ধ অবিশ্বাসীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এ রকম সাক্ষ্যদান করবে।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— বস্তুতঃ পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিলো, আর তারা যে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ছিলো তাও তারা স্বীকার করবে না। এ কথার অর্থ —তারা হয়ে পড়েছিলো পৃথিবীর প্রতি অতিরিক্ত মোহগ্রস্ত। সেখানে সত্য ও মিথ্যার প্রসঙ্গ ছিলো তাদের নিকট গুরুত্বহীন। পার্থিব জীবন যে প্রতারক— সে কথা তারা বুঝতে পারেনি। নবী ও রসুলগণ সে কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের নির্দেশনাকেও তারা সেখানে আমল দেয়নি।

পরের আয়াতে (১৩১) বলা হয়েছে— এটা এই হেতু যে, অধিবাসীবৃন্দ যখন অনবহিত তখন কোনো জনপদকে তার অন্যায় আচরণের জন্য ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নয়। এই আয়াতের শুরুতে ব্যবহৃত 'জালিকা' (এটা) শব্দটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে রসুল প্রেরণের প্রতি। এর পরের শব্দ 'আন' (যে) এখানে ধাতুগত অর্থে ব্যবহৃত। অথবা আন এখানে সহজ অবস্থা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অভিজাত সর্বনাম রূপ এখানে উহ্য। 'মুহ্লিকুল ক্বোরা' কথাটির অর্থ— জনপদ ধ্বংস কারী। আর 'গফিলুন' শব্দটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— যাদেরকে নবী প্রেরণপূর্বক সতর্ক করা হয়নি। 'বি জুলমিন' শব্দটি বর্তমান অবস্থা প্রকাশক। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক অত্যাচার করে কোনো জনপদকে ধ্বংস করে দেন না। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, কোনো জনপদকে আল্লাহ্পাক ততক্ষণ পর্যন্ত অত্যাচার করে ধ্বংস করে দেন না, যতক্ষণ না তাদের প্রতি প্রেরিত হয় নবী ও রসুল।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১৩২,১৩৩,১৩৪,১৩৫

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَرَبُّكَ

الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ

كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۝ اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ

بِمُعْجِزِيْنَ ۝ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ

مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

❐ প্রত্যেকে যাহা করে তদনুসারে তাহার স্থান রহিয়াছে এবং উহারা যাহা করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নহেন।

www.eelm.weebly.com

❒ তোমার প্রতিপালক অভাব মুক্ত, দয়াশীল। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে এবং তোমাদিগের পরে যাহাকে ইচ্ছা তোমাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন,— যেমন তোমাদিগকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

❒ তোমাদিগের নিকট যাহা ঘোষণা করা হইতেছে উহা বাস্তবায়িত হইবেই; তোমরা তাহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

❒ বল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাহা করিতেছ করিতে থাক, আমিও আমার কাজ করিতেছি। তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে, কাহার পরিণাম মঙ্গলময় এবং জালিমগণ কখনও সফলকাম হইবে না।'

প্রথমেই বলা হয়েছে— ওয়া লিকুল্লি দারাজাতুম্ মিম্মা আ'মিলু (প্রত্যেকে যা করে তদানুসারে তার স্থান রয়েছে)। এ কথার অর্থ— প্রত্যেকের অবস্থান ও মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার আমলের ভিত্তিতে। তাই কেউ কেউ হয় বিশেষ ও অশেষ পুণ্য ও মর্যাদার অধিকারী। হয় আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যভাজন। আবার কেউ কেউ হয় আল্লাহ্পাকের রহমত থেকে চিরবঞ্চিত ও কঠোর শাস্তির উপযোগী। আল্লাহ্তায়ালা সকলের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। তাই পরক্ষণেই বলা হয়েছে— 'ওয়ামা রব্বুকা বিগফিলিন আম্মা ইয়া'মালুন' (এবং তারা যা করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন)।

পরের আয়াতে (১৩৩) বলা হয়েছে—'ওয়া রব্বুকাল গনিয়্যু জুর্রহমাতি' (তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা তাঁর দাসদের উপর আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত শরিয়তের ভার অর্পণ করেছেন। এই দায়িত্ব অর্পণ করার মধ্যে তাঁর অভাব মোচন অথবা উপকার প্রাপ্তির কোনো উদ্দেশ্য নেই। কারণ তিনি গনি (অভাবমুক্ত)। আর তিনি দয়াশীলও। তাই তিনি দয়া করে তাঁর প্রিয় রসুলগণের মাধ্যমে আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত শরিয়তের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এই দায়িত্ব দানের উদ্দেশ্য— মানুষ ও জ্বিন যেনো এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে উপকৃত হয়, পূর্ণতা লাভ করে। পাপ করার সঙ্গে সঙ্গে শাস্তিদান না করা তাঁর দয়াশীলতার একটি অনন্য নিদর্শন। পাপিষ্ঠদেরকে তিনি অবকাশ দান করেন। দেন তওবা ও সংশোধনের সুযোগ।

এরপর বলা হয়েছে—'তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অপসারণ করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন— যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন। এ কথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! আল্লাহ্পাক ইচ্ছে করলে তোমাদের পাপাচারের কারণে

www.eelm.weebly.com

তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। আর তোমরা ধ্বংস হয়ে গেলে আল্লাহ্‌তায়ালার কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে পবিত্র, মুক্ত। আবার ইচ্ছে করলে আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে সরিয়ে তদস্থলে অন্য কাউকেও প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। এখানে অন্য কাউকেও অর্থ— যে বা যারা অনুগত, তাদেরকে। আর আল্লাহ্‌তায়ালা এ রকম করেছেনও। যেমন— ইতোপূর্বে তো তোমাদের অস্তিত্বই ছিলো না। অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ থেকে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালাই সৃষ্টি করেছেন। আর দ্যাখো, এখনও তিনি তোমাদেরকে সংশোধনের অবকাশ দিয়েই চলেছেন। দয়া করে এখনও টিকিয়ে রেখেছেন তোমাদের অস্তিত্ব।

এর পরের আয়াতে (১৩৪) বলা হয়েছে—'তোমাদের নিকট যা ঘোষণা করা হচ্ছে তা বাস্তবায়িত হবেই; তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।' এ কথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! কিয়ামত, হাশর, হিসাব, সওয়াব, আযাব ইত্যাদি সম্পর্কে আমার রসুল তোমাদের নিকট যে কথাগুলো বলে চলেছেন, সেগুলো সংঘটিত হবেই। এগুলো ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা তোমাদের নেই। সুতরাং তোমরা যেখানেই থাকোনা কেনো, তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন— যদি না তোমরা সংশোধিত হও।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের শেষটিতে (১৩৫) বলা হয়েছে— বলো, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যা করছো করতে থাকো, আমিও আমার কাজ করছি।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! ঠিক আছে। আমার কথার প্রতি তোমরা যখন কর্ণপাত মাত্র করছো না, তখন তোমরা তোমাদের ভ্রষ্টতার উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকো। এখানে 'মাকানাতিকুম' কথাটির অর্থ— যা করছো করতে থাকো। 'মাকানাতুন' এখানে শব্দমূল। কথাটির অর্থ— কোনো কিছুর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হওয়া। অর্থাৎ যতটুকু শক্তি ও সামর্থ্য আছে ততটুকু করা। অথবা কথাটি এখানে ইসমে জরফ (অধিকরণার্থক বিশেষ্য)। অর্থাৎ এর দ্বারা পরোক্ষ অবস্থা বুঝানো হয়েছে। কাউকে তার স্বঅবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকার আদেশ করলে বলা হয়— 'আ'লা মাকানাতিকুম' (স্বস্থানে অটল থাকো)। অর্থাৎ যে অবস্থায় আছো, সে অবস্থায় থেকে আপন কর্ম করে যাও (যা করছো করতে থাকো)। এ কথা বলে এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। যেনো বলা হয়েছে— ঠিক আছে হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর দল! তোমরা যখন সত্যকে গ্রহণ করবেই না, তখন সত্য প্রত্যাখ্যান ও সত্যের প্রতি শত্রুতার নীতিতেই অটল থাকো (কিন্তু জেনে রেখো, এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ)।

'ইন্নি আ'মিলুন' কথাটির অর্থ— আমিও আমার কাজ করে যাচ্ছি। আমি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট রসুল। তাই আমার কাজ ধর্মনিষ্ঠ হওয়া। সত্যের উপর অনড় থাকা। আর আমি এ কাজই করে চলেছি।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে—'তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কার পরিণাম মঙ্গলময় এবং জালেমগণ কখনো সফলকাম হবে না।' এ কথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর দল! সে দিন বেশী দূরে নয়, যে দিন আমাদের সকলকে আপনাপন কর্মের জবাবদিহির জন্য শেষ বিচারের ময়দানে হাজির হতে হবে। তখন তোমরা নিশ্চয় দেখতে পাবে, কে সফল এবং কে অসফল। আর এ কথাটিও জেনে রেখো যে, যারা আত্মঅত্যাচারী— অভাবমুক্ত ও দয়াশীল আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যের উপাসনায় মগ্ন, তারা কখনই সফলতার মুখ দেখবে না।

বাগবী বলেছেন, অংশীবাদীদের নিয়ম ছিলো এ রকম— তারা তাদের ক্ষেত ও বাগানের ফসল ও ফল, গৃহপালিত পশুর শাবক এবং অন্যান্য সম্পদের একাংশ আল্লাহ্র জন্য এবং অপরাংশ তাদের দেবদেবীর জন্য জমা রাখতো। আল্লাহ্র অংশ থেকে ব্যয় করতো অতিথি ও দরিদ্রদের জন্য। আর চাকর বাকরদের জন্য খরচ করতো দেব-দেবীর অংশ থেকে। আল্লাহ্র অংশ থেকে কিছু অংশ দেব-দেবীদের অংশের সঙ্গে মিশে গেলে তারা তার পরোয়া করতো না। কিন্তু দেব-দেবীর অংশ থেকে আল্লাহ্র অংশে কিছু অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আলাদা করে ফেলতো। বলতো, আল্লাহ্ তো সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত। কিন্তু দেব-দেবীরা অনেক প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী। আরো অনেক অদ্ভুত নিয়ম ছিলো তাদের। যেমন— আল্লাহ্র অংশের কোনো সামগ্রী বিনষ্ট হলে অথবা কম হয়ে গেলে, সেদিকে তারা ভ্রূক্ষেপই করতো না। কিন্তু দেব-দেবীর অংশের কোনো কিছু নষ্ট হয়ে গেলে অথবা কম হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর ক্ষতিপূরণ করে দিতো। তাদের এসকল বিচার-বিবেচনাহীন কর্মকাণ্ডকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াতগুলো।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১৩৬

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ
وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ
لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

❒ আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে তাহারা আল্লাহের জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজদিগের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'ইহা আল্লাহের জন্য এবং ইহা আমাদিগের দেবতাদিগের জন্য।' যাহা তাহাদিগের

www.eelm.weebly.com

দেবতাদিগের অংশ তাহা আল্লাহের কাছে পৌঁছায় না এবং যাহা আল্লাহের অংশ তাহা তাহাদিগের দেবতাদিগের কাছে পৌঁছায়; তাহারা যাহা মীমাংসা করে তাহা নিকৃষ্ট!

অংশীবাদীরা তাদের স্বধারণার অনুগামী। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশের তোয়াক্কা তারা করেই না। তাই আয়াতের শুরুতেই তাদের অপআচরণের বিবরণ দেয়া হয়েছে এভাবে— আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্য থেকে তারা আল্লাহ্র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহ্র জন্য এবং এটা আমাদের দেবতাদের জন্য।

পরের বিবরণটি এ রকম— যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহ্র কাছে পৌঁছায় না এবং যা আল্লাহ্র অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায়; তারা যা মীমাংসা করে তা নিকৃষ্ট! এ কথার অর্থ— অংশীবাদীরা আল্লাহ্র অংশে ঘাটতি দেখা দিলে দেব-দেবীদের অংশ থেকে তা পূরণের চেষ্টা করে না। অথচ দেব-দেবীর অংশে টান পড়লে আল্লাহ্র অংশ থেকে তা পূরণ করে দেয়। এ রকম সিদ্ধান্ত নিশ্চয় অত্যন্ত জঘন্য ও নিকৃষ্ট। আল্লাহ্পাকই সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। শস্য ও গবাদি পশুও তিনি সৃষ্টি করেছেন। অথচ নির্বোধ অংশীবাদীরা তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোকে মহান ও একক স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে অংশী (শরীক) নির্ধারণ করেছে। শুধু তাই নয়, নিষ্প্রাণ প্রতিমাগুলোকে অধিকতর গুরুত্ব দানও করেছে। তাই সেগুলোর অংশের ঘাটতি তারা পূরণ করে আল্লাহ্র অংশ থেকে। অথচ আল্লাহ্র অংশের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা মাত্র করে না। প্রতিমার অংশ থেকে তো করেই না।

কাতাদা বলেছেন, অভাব-অনটন দেখা দিলে মুশরিকেরা আল্লাহ্র অংশের খাদ্যবস্তু ভক্ষণ করতো। কিন্তু তাদের দেব-দেবীদের অংশের খাদ্য স্পর্শ করতো না। (কতই না ঘৃণ্য তাদের নির্ধারণ এবং মীমাংসা)।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১৩৭

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۝

❒ এইরূপে তাহাদিগের দেবতাগণ বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করিয়াছে তাহাদিগের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাহাদিগের ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদিগের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য; আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহারা ইহা করিত না। সুতরাং তাহাদিগকে তাহাদের মিথ্যা লইয়া থাকিতে দাও।

---

www.eelm.weebly.com

আগের আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা এই আয়াতেও প্রবহমান। আগের আয়াতে বলা হয়েছিলো, আল্লাহ্ এবং দেব-দেবীগুলোর মধ্যে শস্য ও গবাদি পশুর অংশীবাদী রীতির কথা। ওই অপবিত্র রীতিটি ছিলো তাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত শোভন। আর আলোচ্য আয়াতে তাদের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাও যে শোভন— সেকথা বলা হয়েছে। আয়াতের বক্তব্য শুরু হয়েছে এভাবে—'এরূপে তাদের দেবতাগণ বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করেছে তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য।' আগের আয়াতের যোগসূত্র রক্ষার জন্য এই আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে— এরূপে (ওয়া কাজালিকা)। এখানে সন্তান হত্যা অর্থ শিশু সন্তানকে জীবিত কবর দেয়া। অথবা দেবতার নামে উপহার বা উপঢৌকন প্রদান করা। এই নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ কর্মটিও তাদের দৃষ্টিতে ছিলো শোভন। আয়াতে বলা হয়েছে— তাদের দেবতারাই তাদের অনেকের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করেছে। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'শুরাকায়ুহুম' (দেবতাগণ) অর্থ— শয়তান। অর্থাৎ শয়তানই তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণাদানের মাধ্যমে এ ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলো যে, শিশু সন্তানকে জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে না ফেললে তোমরা অভাব অনটনে পড়ে যাবে। এখানে শয়তানকে 'শুরাকা' বলার কারণ এই যে— অংশীবাদীরা আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতিরেকেই শয়তানের কুমন্ত্রণাকে অত্যাবশ্যক আদেশ হিসেবে শিরোধার্য করে নিয়েছে। শয়তানই তাদের আসল দেবতা।

কালাবী বলেছেন, এখানে 'শুরাকা' অর্থ দেব-দেবীদের সেবক বা প্রতিনিধি— যারা অংশীবাদীদেরকে সন্তান হত্যায় উদ্বুদ্ধ করতো। তাদের অনুপ্রেরণাতেই অংশীবাদীরা মানত করতো এভাবে — এ রকম সন্তান হলে আমরা দেব-দেবীদের নামে উৎসর্গ করবো (মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করবো)। দেব-দেবীদের সন্তুষ্টিই ছিলো অংশীবাদীদের মূল উদ্দেশ্য। তাই এ রকম নির্মম হত্যাকাণ্ডও ছিলো তাদের চোখে সুন্দর। এখানে 'লিইউরদুহুম' (শোভন করেছে) কথাটির অর্থ— সন্তান হত্যাকে শোভন করেছে তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য। আর 'ওয়া লিইয়ালবিসু আ'লাইহিম দিনুহুম' অর্থ— এবং তাদের সম্বন্ধে তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। এ কথার অর্থ— হজরত ইসমাইলের যে ধর্মাদর্শের উপর তারা ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলো, সেই ধর্ম সম্বন্ধে তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য (তাদের দেবতারা তাদের অনেকের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করেছে)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'দিনুহুম' (ধর্ম সম্বন্ধে) কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে দ্বীন ইসলামকে। অথবা এখানে 'দিনুহুম' কথাটির উদ্দেশ্য ওই দ্বীন বা আল্লাহ্তায়ালার এককত্ব (তৌহিদ) নির্ভর ধর্ম— যাকে মান্য করা অংশীবাদীদের জন্য ছিলো অত্যাবশ্যক।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'লিইউরদু' এবং 'লিইয়ালবিসু' শব্দ দু'টিতে ব্যবহৃত 'লাম' অক্ষরটি কারণ সূচক। আর যদি অংশীবাদীদের কাজের মূল কর্তা শয়তানকে ধরা হয় এবং দেবমন্দিরের সেবকদেরকে ধরা হয় সর্বনাম, তবে এখানে 'লাম' অক্ষরটি হবে কর্মের পরিণতি প্রকাশক।

এরপর বলা হয়েছে— আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা এ রকম করতো না। সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যা নিয়ে থাকতে দাও। এ কথার অর্থ, চিরঅবিশ্বাসী ও চির হতভাগ্য অংশীবাদীদের হেদায়েত আল্লাহ্তায়ালার কাম্য নয়। একগুঁয়েমী ও হঠকারিতার কারণে হেদায়েত লাভের যোগ্যতাকে তারা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে ফেলেছে। তাই সকল কিছুর উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্পাক তাদেরকে জোর করে হেদায়েত দান করবেন না। সুতরাং হে আমার প্রিয় রসুল! বৃথা আক্ষেপ করবেন না। তাদেরকে তাদের মিথ্যা ধারণা ও কর্ম নিয়েই জীবনপাত করতে দিন।

সূরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১৩৮

وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

❐ তাহারা তাহাদিগের ধারণা অনুসারে বলে 'এই সব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ; আমরা যাহাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত কেহ এই সব আহার করিতে পারিবে না,' এবং কতক গবাদি পশু রহিয়াছে যাহাদিগের পৃষ্ঠে আরোহণ করা নিষিদ্ধ এবং কতক পশু আছে যাহাদিগকে জবাই করিবার সময় তাহারা আল্লাহের নাম লয় না। এই সমস্তই তাহারা বলে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে; তাহাদিগের এই মিথ্যা রচনার প্রতিফল তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে দিবেন।

'ওয়াক্বালু হাজিহি' অর্থ— তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে। 'আনআ'মুঁ ওয়া হারছুন হিজরুন' অর্থ— এইসব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র হারাম। 'হিজরুন' (নিষিদ্ধ) এখানে শব্দমূল। একবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ— সকল ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে আন্আ'ম (পশু) শব্দটির উদ্দেশ্য— ওই সকল পশু, যেগুলোকে মুশরিকেরা তাদের দেব-দেবীদের নামে উৎসর্গ করে। ওই সকল পশুকে তারা বলে— বাহিরা, সায়েবা, ওসিলা এবং হাম।

www.eelm.weebly.com

'লা ইয়াত্‌আ'মুহা ইল্লা মান্ নাশায়ু বিযা'মিহিম' অর্থ— আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ছাড়া অন্য কেউ এসব আহার করতে পারবে না। অর্থাৎ মহিলারা এসকল পশুর গোশত খেতে পারবে না। খেতে পারবে কেবল পুরুষ এবং দেবদেবীর সেবকেরা। এখানে 'বিযা'মিহিম' কথাটির উদ্দেশ্য— বিনা প্রমাণে মুশরিকেরা এ রকম হালাল ও হারাম নির্ধারণ করে। আল্লাহ্‌র নির্দেশের তোয়াক্কা করে না।

'ওয়া আ'নআমুন হুর্‌রিমাত জুহূরুহা' অর্থ— এবং কতক গবাদি পশু রয়েছে যেগুলোর পিঠে আরোহণ করা নিষিদ্ধ। ওই পশুগুলো হচ্ছে বাহিরা, সায়েবা এবং হাম।

'ওয়া আ'নআমুল্‌লা ইয়াজকুরুনাস্‌মাল্লহি আ'লাইহা অর্থ— এবং কতক পশু রয়েছে যেগুলোকে জবাই করার সময় তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না। অর্থাৎ ওই সকল উৎসর্গীকৃত পশু জবাই করার সময় মুশরিকেরা তাদের দেব দেবীদের নাম নিয়ে জবাই করে। আল্লাহ্‌র নাম নেয় না। আবু ওয়ায়েল বলেছেন, এখানে আল্লাহ্‌র নাম নেয় না অর্থ— আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পুণ্যকর্ম করে না। কেননা অংশীবাদীতায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও যে কোনো শুভ কাজ শুরুর পূর্বে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা ছিলো তখনকার একটি সাধারণ প্রথা। সুতরাং এখানে আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ হবে এ রকম— তারা ওই পশুর উপর আরোহণ করে হজে গমন করে না। অথবা অন্য কোনো পুণ্যকর্মের প্রতি ধাবিত হয় না।

'ইফ্‌তিরাআন আ'লাইহি' অর্থ— এ সমস্তই তারা বলে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনার উদ্দেশ্যে। এখানে 'ইফ্‌তারা আন' (অপবাদ) শব্দটি কর্মকারক। অথবা অবস্থাজ্ঞাপক। এখানে 'আ'লাইহি' (তার উপর) শব্দটির যোগসূত্র রয়েছে আলোচ্য আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'ক্বলু' (তারা বলে) শব্দটির সঙ্গে। অথবা এর সম্পর্ক রয়েছে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— তারা এ রকম বলে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনার অভিপ্রায়ে। কিংবা 'ইফ্‌তারা আন' শব্দটি এখানে 'মাফউলে লাহু' (কারণবাচক কর্ম) — যার কারণ হচ্ছে ক্বওল বা উক্তি। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনার কারণে এ রকম বলে।

শেষে বলা হয়েছে— 'সাইয়াজ্‌যিহিম বিমা কানু ইয়াফ্‌তারুন' (তাদের এই মিথ্যা রটনার প্রতিফল তিনি অবশ্যই তাদেরকে দিবেন)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে অথবা তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা রটনার প্রতিফল (শাস্তি) সত্বর তিনি তাদেরকে অবশ্যই দিবেন।

www.eelm.weebly.com

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ
وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ
عَلِيمٌ ۝ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا
رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

❐ তাহারা আরও বলে 'এই সব গবাদি পশুর গর্ভে যাহা আছে তাহা আমাদিগের পুরুষদিগের জন্য নির্দিষ্ট এবং ইহা আমাদিগের স্ত্রীদিগের জন্য অবৈধ, আর উহা যদি মৃত হয় তবে নারী-পুরুষ সকলে উহাতে অংশীদার, তাহাদিগের এইরূপ বলিবার প্রতিফল তিনি তাহাদিগকে দিবেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

❐ যাহারা নির্বুদ্ধিতার দরুণ ও অজ্ঞানতাবশতঃ নিজদিগের সন্তানদিগকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করিবার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তাহারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা অবশ্যই বিপথগামী হইয়াছে এবং তাহারা সৎপথ প্রাপ্তও ছিল না।

হারাম হালাল নির্ধারণের অধিকার যে কেবল আল্লাহ্‌র— অংশীবাদীরা সে কথা মানে না। তারা নিজেরাই ইচ্ছামত হালাল ও হারাম নির্ধারণ করে নেয়। তাদের এ রকম দলিল প্রমাণহীন নির্ধারণের আর একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে। বলা হয়েছে— 'ওয়া ক্বালু মা ফি বুতুনি হাজিহিল আনআ'মি খলিসাতুল্ লিজুকুরিনা ওয়া মুহার্‌রমুন আ'লা আযওয়াজিনা ওয়া ইঁয়্যাকুম্ মাইতাতান ফাহুম ফিহি শুরাকাউ' (তারা আরো বলে 'এই সব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং এটা আমাদের স্ত্রীদিগের জন্য অবৈধ, আর তা যদি মৃত হয় তবে নারী পুরুষ সকলে তাতে অংশীদার)। এখানে 'এই সব গবাদি পশুর গর্ভে' অর্থ— বাহিরা ও সায়েবার গর্ভে। দেব-দেবীদের জন্য নিবেদিত এসকল পশুর গর্ভের জীবিত বাচ্চার গোশত কেবল পুরুষেরা খেতে পারবে— আর বাচ্চা মৃত হলে তার গোশত খেতে পারবে নারী পুরুষ সকলেই— এটাই ছিলো অংশীবাদীদের নিজস্ব তৈরী বিধান। জীবিত শাবক বিশেষভাবে পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে খলিফাতুন শব্দটি। এর শেষ অক্ষর 'তা' একটি গুরুত্বপ্রকাশক অক্ষর। অথবা মুবালিগাহ্ (আধিক্য প্রকাশক)।

www.eelm.weebly.com

ক্বারী কাসায়ী বলেছেন, 'খলিসুন' এবং 'খলিসাতুন' শব্দ দু'টো সমার্থক। অর্থাৎ 'তা' অক্ষরটি এখানে তাকিদ বা মুবালিগা কোনোটাই নয়। ব্যাকরণজ্ঞ ফাররা বলেছেন, 'তা' অক্ষরটি এখানে স্ত্রীলিঙ্গকে নির্দেশ করেছে। কেননা 'আনআম' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। এখানে তাই পেটের বাচ্চাকেও স্ত্রীলিঙ্গ ধরতে হবে। কেউ কেউ বলেছেন, 'মা ফি বুতুনিহা' (গর্ভে যা আছে) কথাটি 'খলিসাতুন' শব্দটির মাধ্যমে এখানে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অর্থাৎ বাহিরা ও সায়েবার গর্ভজাত জীবিত মাদী শাবক পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট বা হালাল (খলিসাতুন)।

শেষে বলা হয়েছে— 'তাদের এ রকম কথার প্রতিফল তিনি তাদেরকে দিবেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ'। এ কথার অর্থ— অংশীবাদীরা এই যে স্বরচিত হালাল হারামের সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালাকে সম্পৃক্ত করেছে (বলেছে, এই হালাল হারামের বিধান আল্লাহ্ই দিয়েছেন)— এর জন্য শাস্তি তাদেরকে পেতেই হবে। আল্লাহ্তায়ালা প্রদত্ত শাস্তি প্রজ্ঞাময়তা-মিশ্রিত। কারণ তিনি প্রজ্ঞাময়। আর তিনি সর্বজ্ঞও। তাই অংশীবাদীদের উদ্দেশ্য, ধারণা ও কর্মকাণ্ডের সকল সংবাদ তাঁর জানা।

পরের আয়াতে (১৪০) বলা হয়েছে— 'যারা নির্বুদ্ধিতার দরুণ এবং অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করবার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথ প্রাপ্তও ছিলো না।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাকই সকল সৃষ্টির একমাত্র রিজিক দাতা। অথচ অংশীবাদীরা মনে করলো সন্তান লালন পালন করতে গেলে তাদের অর্থ সম্পদ কমে যাবে। সুতরাং তাদেরকে হত্যা করে ফেলো। এসকল সিদ্ধান্ত নিশ্চয় নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতা। আর নিজে নিজে হালাল হারাম নির্ধারণ করে তা আল্লাহ্র নামে চালিয়ে দেয়াও আর একটি গর্হিত কর্ম। এসব যারা করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয় তো কি? তারা অবশ্যই বিপথগামী। আর তারা আগে থেকেই ছিলো সত্যপথ বিচ্যুত। বাগবী বলেছেন, রবিয়া, মোজার ও অন্যান্য আরব গোত্র অভাব অনটনের আশংকায় কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দিতো। কিন্তু কেনানা সম্প্রদায় এ রকম করতো না। তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

www.eelm.weebly.com

وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ۗ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

❒ তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যান সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্য-শস্য, জায়তুন ও দাড়িম্বও সৃষ্টি করিয়াছেন — ইহারা একে অন্যের সদৃশ ও, বিসদৃশও। যখন উহা ফলবান হয় তখন উহার ফল আহার করিবে আর ফসল তুলিবার দিনে উহার দেয় প্রদান করিবে এবং অপচয় করিবে না; কারণ তিনি অপচয়কারীদিগকে পছন্দ করেন না।

❒ গবাদি পশুর মধ্যে কতক ভারবাহী ও কতক ক্ষুদ্রাকার পশু রহিয়াছে। আল্লাহ্ যাহা জীবিকারূপে তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না; সে তোমাদিগের প্রকাশ্য শত্রু;

'ওয়া হুওয়াল্লাজি আন্‌শাআ জান্নাতিম্ মা'রুশাতিঁউ ওয়া গইরা মা'রুশাতিন (তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যান সমূহ সৃষ্টি করেছেন)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে উল্লেখিত মা'রুশাতিন্ (লতা) শব্দটির অর্থ— ওই লতা, যা মাটির উপরে ছড়িয়ে পড়ে— যেগুলোকে মাচার উপর বিছিয়ে দেয়া হয়। যেমন— লাউ, আঙ্গুর খরবুজা ইত্যাদি। আর গইরা মা'রুশাতিন অর্থ— ওই সকল বৃক্ষ, যেগুলো শক্ত কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকে এবং শাখা বিস্তার করে। যেমন— খেজুর, যব, গম ইত্যাদি। জুহাক বলেছেন মা'রুশাত এবং গইরি মা'রুশাত— দু'টোরই উদ্দেশ্য এখানে আঙ্গুরের লতা। প্রথমোক্তটির অর্থ— ওই লতা, মানুষ যেগুলোকে মাচার উপর উঠিয়ে দেয়। আর শেষোক্তটির অর্থ— ওই বুনো লতা যেগুলো জংগলে বা পাহাড়ে আপনা আপনি গজিয়ে উঠে।

ওয়ান্নাখ্‌লা ওয়ায্ যারআ' মুখতালিফান উকুলুহু' (এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্য শস্য)। এখানে উকুলুন শব্দটির অর্থ ফল। ওই ফল, যেগুলো ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, গন্ধ এবং স্বাদবিশিষ্ট। 'উকুলুহু' শব্দটির 'হু' সর্বনাম এখানে আয্‌যারআ' (বৃক্ষ-উদ্যান সমূহ) এর প্রতি প্রত্যাবর্তিত। অথবা আন্‌নাখ্‌লার প্রতি। এখানে খেজুর বৃক্ষকে বৃক্ষ-উদ্যানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেননা বৃক্ষ -

www.eelm.weebly.com

উদ্যানের সঙ্গে রয়েছে খেজুর বৃক্ষের সম্পর্ক বা সংযোগ। তেমনি ভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্য শস্যের সংগেও রয়েছে উদ্যানের সংযোগ। খেজুর বৃক্ষ সৃষ্টি হলেই সঙ্গে সঙ্গে তাতে ফল ধরে না। কিন্তু এখানে উল্লেখিত হয়েছে 'খেজুর বৃক্ষ'। এ রকম উল্লেখ হচ্ছে হাল এ মুকাদ্দারাহ্ (পরিমাণের অবস্থা প্রকাশক)।

'ওয়ায্যাইতুনা ওয়ার্ রুম্মানা মুতাশাবিহাঁও ওয়াগইরা মুতাশাবিহিন' (যায়তুন ও দাড়িম্বও সৃষ্টি করেছেন— এরা একে অন্যের সদৃশ ও বিসদৃশও)। এ কথার অর্থ— যায়তুন ও আঙ্গুরের রয়েছে অনেক আকার ও প্রকার। কোনো কোনোটির মধ্যে রয়েছে মিল। আবার কোনো কোনোটির মধ্যে রয়েছে অমিল।

'কুলু মিনছামারিহি ইজা আছমারা' (যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে)। এ কথার অর্থ— বর্ণিত ফল ফলাদি তোমরা পূর্ণরূপে পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেও ভক্ষণ করতে পারবে। আলোচ্য বাক্যটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, শরিয়তের হক আদায়ের পূর্বে বৃক্ষের মালিক তার বৃক্ষজাত ফল ভক্ষণ করতে পারবে।

'ওয়া আতু হাক্কাহু ইয়াওমা হাসাদিহি' (আর ফসল তুলবার দিনে তার দেয় প্রদান করবে)। এখানে 'হাসাদিহি' শব্দটিকে 'হিসাদিহি' পড়লেও অর্থান্তর ঘটবে না। কারণ দু'টো শব্দই সমার্থক। এ রকম দু'রকম উচ্চারণ বিশিষ্ট সমার্থক শব্দের আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— সারামা এবং সিরামা, জাযারুন এবং জিযারুন। এখানে 'হক্ক' অর্থ দেয়। এই দেয় কি রকম এবং তা কিভাবে প্রদান করতে হবে— সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে কিঞ্চিত মতভেদ রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস, তাউস, হাসান, জাবের ইবনে জায়েদ এবং হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের মতে— এখানে দেয় অর্থ জাকাত বা ওশর। দশ ভাগের এক ভাগ। অথবা বিশ ভাগের এক ভাগ। আল্লাহ্পাকের নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। আর এখানকার 'তার দেয় প্রদান করবে'— নির্দেশটি একটি সাধারণ নির্দেশ। সুতরাং সকলের জন্য এই নির্দেশটি অবশ্য পালনীয়। এদিকে আবার আলেমগণের ঐকমত্য রয়েছে যে, সম্পদের জাকাত ছাড়া অন্য কোনো প্রকার দেয় ওয়াজিব নয় (কিন্তু জাকাত সর্ব সাধারণের উপর প্রযোজ্য নয়)।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত তালহা বিন আবদুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক লোক রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলো। তিনি স. তাকে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ, রমজানের রোজা এবং জাকাতের কথা জানালেন। লোকটি বললো, এগুলো ছাড়া অন্য কোনো কিছু কি আমার জন্য অবশ্য পালনীয়? তিনি বললেন, না। তবে তুমি যদি স্বেচ্ছায় (অতিরিক্ত ইবাদত, দান অথবা অন্য কোনো পুণ্যকর্ম) করো তবে তা হবে উত্তম। এই হাদিসের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে বুঝা যায়। আর এখানে রয়েছে ইমাম আবু হানিফার একটি অভিমতের প্রমাণ। তিনি বলেছেন, আনার জাতীয় ফলের জাকাত ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ওয়াজিব নয়।

www.eelm.weebly.com

তাঁদের মতে জাকাত ওয়াজিব হয় কেবল অপরিহার্য খাদ্য বস্তুর ক্ষেত্রে। সুরা বাকারায় রয়েছে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন করো এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করি, তার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো। এই আয়াতের তাফসীরে জাকাতের বিস্তারিত মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

ইমাম জয়নাল আবেদীন, আতা, মুজাহিদ এবং হাম্মাদ বলেছেন, এখানে 'দেয় প্রদান করবে' অর্থ— জাকাত ছাড়া অন্য দেয় প্রদান করবে। কেননা আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। আর জাকাত ফরজ করা হয়েছে হিজরতের পর মদীনায়।

ইব্রাহিম বলেছেন, এখানে 'দেয় প্রদান করবে' অর্থ— উৎপন্ন ফলের একটি অংশ প্রদান করবে। বর্ণনাকারী আরো বলেছেন, এখানে 'দেয়' অর্থ ঝরে পড়া ছড়া। নুহাস্ তাঁর নাসেখ গ্রন্থে এবং ইবনে মারদুবিয়া হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন, এখানে 'দেয়' অর্থ ঝরে পড়া ছড়া। মুজাহিদ বলেছেন, খেজুর কর্তনের সময় তখনকার মানুষ খেজুরের একটি গুচ্ছ পথের পাশে টাঙ্গিয়ে রাখতো। পথিকেরা সেগুলো খেতো।

ইয়াযিদ বিন আসেম বর্ণনা করেছেন, লোকেরা খেজুর কাটার সময় এক কাঁদি খেজুর মসজিদের এক কোনায় ঝুলিয়ে রাখতো। দরিদ্র জনতা লাঠি দিয়ে ওই খেজুর পেড়ে খেতো।

হজরত ফাতেমা বিন্তে কায়েস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ধনীদের সম্পদের মধ্যে জাকাত ছাড়াও দরিদ্রদের কিছু অধিকার রয়েছে। এরপর তিনি পাঠ করলেন এই আয়াত— তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরাও, এতে কোনো কল্যাণ নেই। তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারেমী। সুরা বাকারায় এই আয়াতের যথা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। আর এখানে 'দেয়' অর্থ সকল দেয়— অবশ্য পালনীয় হোক অথবা ইচ্ছাধীন।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এখানে উল্লেখিত 'দেয় প্রদান করবে' নির্দেশটি ছিলো একটি সাধারণ নির্দেশ, যা সকলকেই পালন করতে হতো। এরপর যখন ওশর ওয়াজিব করে দেয়া হলো তখন এই নির্দেশটি হয়ে গেলো রহিত।

হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে মুকসিম বর্ণনা করেছেন, কোরআন মজীদে উল্লেখিত আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার সকল নির্দেশ জাকাত ফরজ হওয়ার পর রহিত হয়ে গিয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়ালা তুসরিফু ইন্নাহু লা ইউহিব্বুল মুসরিফীন' (এবং অপচয় করবে না; কারণ তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না)। ইসরাফ অর্থ অপচয়। শব্দটি মিতব্যয়ীতার বিপরীতার্থক। কামুস গ্রন্থে এ রকম বলা হয়েছে। সিহাহ্ গ্রন্থে রয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে সীমাতিক্রমকেই বলা হয় ইস্‌রাফ বা অপচয়।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'ইসরাফ' অর্থ— সকল সম্পদ দান করে দেয়া। আল্লামা বায়যাবী বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটি ওই আয়াতের সমধর্মী যেখানে বলা হয়েছে— পরিপূর্ণরূপে হস্ত উন্মোচন কোরো না।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে কালাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস একবার তাঁর পাঁচ শত গাছের খেজুর দরিদ্র জনতাকে দান করে দিলেন। পরিবার পরিজনের জন্য কিছুই রাখলেন না। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতটি। ইবনে জুরাইজ থেকে ইবনে জারীরও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'অপচয় করবে না' কথাটির অর্থ— নিজের সকল সম্পদ দান করবে না, করলে দরিদ্র হয়ে যাবে।

আমি বলি, পরিবার পরিজনের যথাঅধিকার খর্ব করে দান করলে তা অবশ্যই অপচয় হবে। কিন্তু তাদের যথাপ্রাপ্য পরিশোধ করার পর আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করলে তা কিছুতেই অপচয় বলে গণ্য হবে না। বরং এ রকম করাই উত্তম। বলেছেন জুজায।

রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, উহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ আমার কাছে থাকলেও তা আমার জন্য আনন্দদায়ক নয়। আনন্দদায়ক হবে তখনই, যখন আমি তিন রাতের মধ্যেই ওগুলো দান করে দিতে পারবো। কাছে রাখবো কেবল ততটুকুই, যতটুকু রাখলে আমার ঋণ পরিশোধ হয়। বোখারী।

একবার যথা অনুমতি নিয়ে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের দরবারে প্রবেশ করলেন হজরত আবু জর। হজরত ওসমান তখন হজরত কা'বের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করছিলেন। তিনি বললেন, হে কা'ব! বলো, সদ্য প্রয়াত আবদুর রহমান ইবনে আউফের পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পর্কে তোমার কী অভিমত? হজরত কা'ব বললেন, তিনি যদি আল্লাহ্‌র হক যথাপ্রতিপালন করে থাকেন, তবে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ নিষ্কলুষ। এ কথা শুনে হজরত আবু জর তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে হজরত কা'বকে প্রহার করলেন এবং বললেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি— পর্বত পরিমাণ স্বর্ণাধিকারী হলেও আমি তা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে ফেলবো, আর আল্লাহ্ তা কবুল করে নেবেন। ওই সম্পদের ছয় আউকিয়াহ্ নিজের কাছে রেখে দেয়াও আমার পছন্দ নয়। হে ওসমান! তোমাকে আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি রসুল স. এর নিকট থেকে এই হাদিসটি স্বকর্ণে শোনোনি? প্রশ্নটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। হজরত ওসমান প্রতিবারেই বললেন— আমি শুনেছি।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে একবার রসুল স. দেখলেন, হজরত বেলালের নিকট রয়েছে প্রচুর খেজুর। তিনি স. বললেন, একি বেলাল? হজরত বেলাল বললেন, আমি এগুলোকে আগামীকালের জন্য রেখেছি। তিনি স. বললেন,

www.eelm.weebly.com

তোমার কি ভয় করে না? এই জমানো সম্পদের উত্তাপ দোজখের মধ্যেও তোমার দেহে অনুভূত হবে। হে বেলাল! নির্দ্বিধায় ব্যয় করতে থাকো। আরশাধিকারীর পক্ষ থেকে ন্যূনতার আশংকা কোরো না। বায়হাকী।

একবার হজরত আবু হোরায়রা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কোন্ দান সর্বোত্তম? তিনি স. বললেন, অনটনের সময় পরিশ্রমলব্ধ উপার্জন থেকে যথাসম্ভব দান। এই দান তোমার পরিবার থেকেই শুরু কোরো। আবু দাউদ।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, 'অপচয় করবে না' কথাটির অর্থ— দান খয়রাত করা বন্ধ করবে না। অর্থাৎ অত্যাবশ্যক দান থেকে বিরত থাকবে না।

মুকাতিল বলেছেন, 'অপচয় করবেনা' অর্থ— ক্ষেতের ফসল এবং চতুষ্পদ জন্তুর দানে দেব-দেবীদেরকে অংশী বানাবে না। জুহ্রী বলেছেন, অপচয় করবে না অর্থ— পাপ কাজে সম্পদ ব্যয় করবে না। মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহ্র অধিকার প্রতিপালন করতে কুণ্ঠিত হবে না— এ কথা বুঝাতেই এখানে বলা হয়েছে 'অপচয় করবে না।' আবু কুবাইস পাহাড়ের সমান সোনাও যদি কেউ আল্লাহ্র আনুগত্যের সীমার মধ্যে ব্যয় করে, তবুও তাকে অপচয়কারী বলা যাবে না। কিন্তু আল্লাহ্র আনুগত্য বহির্ভূত এক দিরহাম ব্যয় করলেও সে হয়ে যাবে অপচয়কারী। আয়াস বিন মুয়াবিয়া বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র নির্দেশের সীমা থেকে দূরে সরে যাওয়ার নামই অপচয়।

ইবনে ওয়াহাবের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু জায়েদ বলেছেন, বিচারকদেরকে লক্ষ্য করে এখানে বলা হয়েছে 'অপচয় করবে না'। বিচারকদের প্রতি আল্লাহ্পাকের এই নির্দেশ রয়েছে যে, তারা যেনো প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক গ্রহণ না করে। এই উক্তির প্রেক্ষিতে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে ওই হাদিসের অনুরূপ যেখানে বলা হয়েছে, তোমরা জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে মানুষের নিকট থেকে উত্তম সামগ্রী গ্রহণ কোরো না।

পরের আয়াতে (১৪২) বলা হয়েছে— 'গবাদি পশুর মধ্যে কতক ভারবাহী ও ক্ষুদ্রাকার পশু রয়েছে। আল্লাহ্ যা জীবিকারূপে তোমাদেরকে দিয়েছেন তা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না; সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' এখানে উল্লেখিত 'হামুলাতান' শব্দটির অর্থ— ভারবাহী পশু। যেমন, উট, ষাঁড় ইত্যাদি। 'ফারসান' অর্থ ক্ষুদ্রাকার পশু— যেগুলো ভার বহনের কাজে ব্যবহৃত হয় না। যেমন— ভেড়া, ছাগল, গো-শাবক, উষ্ট্র শাবক ইত্যাদি। 'কুলু' শব্দের অর্থ আহার করো। এই নির্দেশের মাধ্যমে জীবিকারূপে পশুর গোশত আহার বৈধ করে দেয়া হয়েছে। এখানে 'মিম্মা' (মিন্মা) শব্দটির অন্তর্ভূত 'মিন' হচ্ছে আংশিক অর্থ প্রকাশক মিন (মিন্ এ তাবইজিয়াহ্)। কারণ আল্লাহ্পাক প্রদত্ত সকল জীবিকা ভক্ষণের সামর্থ্য তো কারোই নেই। বরং ভক্ষণ করবে অংশতঃ।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না' কথাটির অর্থ— শয়তানের পথে চোলো না। অর্থাৎ শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বোলো না।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১৪৩, ১৪৪

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ
حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۙ وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ
حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ
وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ
بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۟

❒ এই পশুগুলি আট প্রকার ঃ মেষ হইতে দুইটি ও ছাগল হইতে দুইটি; বল, 'নর দুইটিই কিংবা মাদি দুইটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছেন অথবা মাদি দুইটির গর্ভে যাহা আছে তাহা? তোমরা সত্যবাদী হইলে প্রমাণ সহ আমাকে অবহিত কর।'

❒ এবং উট হইতে দুইটি ও গরু হইতে দুইটি; বল, 'নর দুইটিই কিংবা মাদি দুইটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছেন অথবা মাদি দুইটির গর্ভে যাহা আছে তাহা? এবং আল্লাহ্ যখন এই সব নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে?' সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহার চেয়ে বড় জালিম আর কে? আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

আল্লাহ্পাকই হালাল হারামের বিধান দানের একমাত্র অধিকারী। অথচ মুশরিকেরা নিজেরাই হালাল হারাম নির্ধারণ করেছে। তাদের কল্পিত দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বাহিরা, হাম ইত্যাদি পশুর উদরে জন্ম নেয়া পশুকে পুরুষের জন্য হালাল এবং মেয়েদের জন্য হারাম নির্ধারণ করে নিয়েছে তারা। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে ওই অপবিত্র ধারণার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে— এ পশুগুলো আট প্রকার ঃ মেষ থেকে দু'টো ও ছাগল

www.eelm.weebly.com

থেকে দু'টো; বলো নর দু'টোই কিংবা মাদি দু'টোই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন অথবা মাদি দু'টোর গর্ভে যা আছে তা? তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণসহ আমাকে অবহিত করো।' এখানে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, হে আমার রসুল! আপনি ওই অংশীবাদীদেরকে বলুন, বলো হে অবিবেচক জনতা! তোমাদের হালাল হারাম কবে কোথায় কে নির্ধারণ করলো? তোমাদের কথা যদি সত্য হয় তবে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করে দেখাও— আল্লাহ্তায়ালা নর, মাদি পশু অথবা মাদি পশুর গর্ভজাত নর ও মাদি শাবকগুলোকে কখন হারাম করলেন?

পরের আয়াতে (১৪৪) বলা হয়েছে— 'এবং উট থেকে দু'টি ও গরু হতে দু'টি; বলো 'নর দু'টিই কিংবা মাদি দু'টিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন অথবা মাদি দু'টির গর্ভে যা আছে তা'? আগের আয়াতে বলা হয়েছে, আট ধরনের পশু মানুষের জন্য হালাল করা হয়েছে। ভেড়া, ছাগল, উট ও গরু— এই চার ধরনের নর মাদি মিলে হয় আট প্রকার। আগের আয়াতে ভেড়া ও ছাগলের নর ও মাদি মিলে চার এবং আলোচ্য আয়াতে উট ও গরুর নর মাদি মিলে চার— এভাবে দেয়া হয়েছে আট প্রকার হালাল পশুর বিবরণ। এরপর আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে বলুন, বলো হে বিভ্রান্ত জনতা! কোন প্রকার পশু আল্লাহ্পাক হারাম করেছেন— নর না মাদি? মাদির গর্ভেও তো নর ও মাদি উভয় প্রকার পশুর জন্ম হয়? তবে বলো, নর না মাদি— কোনটি তোমাদের জন্য হারাম? এই আয়াত অবতীর্ণ হলে আবুল আহওয়াস মালেক ইবনে আউফ জাশামী রসুল পাক স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, মোহাম্মদ! আমরা জানতে পারলাম তুমি নাকি আমাদের বাপ-দাদাদের প্রচলিত রীতিকে অস্বীকার করছো? রসুল স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালা আট প্রকার পশুর গোশত ভক্ষণ এবং সেগুলো থেকে ভারবহন, আরোহন, চাষাবাদ ইত্যাদি উপকার গ্রহণ বৈধ করেছেন। অথচ তোমরা সেগুলোর কোনো কোনোটিকে কারো কারো জন্য হারাম করে দিয়েছো! বলো, কোনগুলো হারাম— নর না মাদি, না মাদি পশুর গর্ভজাত নর বা মাদি— না দু'টোই? রসুল স. এর এ কথা শুনে নির্বাক হয়ে গেলো মালেক ইবনে আউফ। সে এ কথা বলতে পারলো না যে, নর পশু হারাম। তাহলে তো সকল নর পশু সকলের জন্য হারাম হয়ে যায়। আর মাদির গর্ভে তো নর ও মাদি উভয় প্রকার পশুর জন্ম হয়। তাই সেগুলোর উপরেও তো হালাল হারামের বিধান সমভাবে প্রয়োগ করতে হয়।

রসুলপাক স. এর প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারা জনতাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্তায়ালা পুনঃ নির্দেশ দিচ্ছেন— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি ওই মূঢ় অংশীবাদীদেরকে পুনরায় প্রশ্ন করুন, হে অবিমৃশ্য জনতা! তোমরা বলো, — 'আল্লাহ্ যখন এই সব নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে?'

www.eelm.weebly.com

অবশেষে এরশাদ হয়েছে—'সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে? আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।' বলা বাহুল্য, মক্কাবাসী মুশরিকদেরকেই এখানে জালেম (অত্যাচারী) বলা হয়েছে— যারা ছিলো স্বরচিত হালাল হারামের অনুসারী। উমর বিন লুহাই ও তার অনুসারীরাই ছিলো এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী। তাই বিশেষভাবে তাদেরকে লক্ষ্য করেই এখানে বলে দেয়া হয়েছে— আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

প্রকৃত অর্থেই অংশীবাদীরা অত্যাচারী। তারা প্রকৃত বিশ্বাসের প্রতি আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত আর্তিকে গলাটিপে মেরেছে। এই আত্মঅত্যাচারই প্রকৃত অত্যাচার। তারা আল্লাহ্র নিরঙ্কুশ এককত্বকে অস্বীকার করেছে, অমান্য করেছে তাঁর প্রেরিত রসুলকে। নিজেরাই হালাল হারাম নির্ধারণ করে বলেছে— আল্লাহ্তায়ালাই এই হালাল হারাম নির্ধারণ করেছেন। অথচ তাদের এই অপধারণার পক্ষে কোনো প্রমাণই নেই। তারা মিথ্যাচারী, জালেম, সীমালংঘনকারী। আত্ম-অত্যাচারে প্রসন্ন। এ রকম সম্প্রদায় সৎপথপ্রাপ্তির অনুপযুক্ত। তাই আল্লাহ্পাকও এ রকম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

রসুল স. এর প্রশ্ন-শরে শরাহত নিরুত্তর অংশীবাদীরা এবার জানতে চাইলো— তাহলে আল্লাহ্ হারাম নির্ধারণ করেছেন কোনগুলোকে? তাদের এমতো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্আ'মঃ আয়াত ১৪৫

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِیْ مَآ اُوْحِیَ اِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلٰی طَاعِمٍ یَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ یَّكُوْنَ مَیْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِیْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ○

❑ বল, 'আমার প্রতি যে- প্রত্যাদেশ হইয়াছে তাহাতে, লোকে যাহা আহার করে তাহার মধ্যে নিষিদ্ধ আমি কিছুই পাই না মড়া, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত, কেননা, এইসব অপবিত্র— অথবা যাহা অবৈধ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম লওয়ার কারণে; তবে কেহ অবাধ্য না হইয়া এবং সীমালংঘন না করিয়া উহা গ্রহণে বাধ্য হইলে তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

www.eelm.weebly.com

মুশরিকেরা তাদের ইচ্ছামতো বাহিরা, হাম ইত্যাদি পশুর গোশত কারো কারো জন্য হারাম করে দিয়েছিলো। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ সম্পর্কিত কোনো জ্ঞান তাদের ছিলো না। তাই এ বিষয়ে জ্ঞানদান করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। বলা হয়েছে, হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি বলুন, 'আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে, লোকে যা আহার করে তার মধ্যে নিষিদ্ধ আমি কিছু পাই না; মড়া, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত, কেননা এই সব অপবিত্র।' এখানে 'আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে' কথাটির মাধ্যমে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, প্রত্যাদেশ ছাড়া হারাম হালাল নির্ধারিত হয় না। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকই তাঁর সৃষ্ট বস্তুকে হালাল হারাম নির্ধারণের একক অধিকর্তা। আর এখানে প্রত্যাদেশ বা ওহী অর্থ রসুলপাক স. এর প্রতি প্রদত্ত সকল ওহী। কেবল কোরআনই ওহী নয়। 'আজিদু' (আমি পাই) কথাটি এখানে অসম্পূর্ণ ক্রিয়া, দু'টি কর্মপদের দাবিদার। একটি কর্ম হচ্ছে 'তোয়ামু' (খাদ্য)— যা এখানে অনুক্ত রয়েছে। আর একটি কর্ম হচ্ছে 'মুহাররামান' অর্থাৎ 'তার মধ্যে নিষিদ্ধ আমি কিছুই পাই না'। 'লোকে যা আহার করে'— সম্পর্কে অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত হচ্ছে, এ কথাটির পূর্বে অর্থাৎ 'মুহার্‌রমান' এর পূর্বে 'তোয়ামান' (খাদ্য) কথাটি উহ্য রয়েছে ইসতিছনায়ে মুত্তাসিলকে (ব্যতিক্রমী সংযোজককে) সুসঙ্গত বা অর্থপূর্ণ করার নিমিত্তেই তাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

'মড়া, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত— এখানে 'মাইতাতুন' অর্থ মড়া যা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। অর্থাৎ কোনো মানুষ যাকে বধ করেনি। সুরা মায়িদায় অবশ্য আরো হারামের বিবরণ দেয়া হয়েছে। যেমন— লাঠির আঘাতে, পাথরের আঘাতে, উপর থেকে পড়ে, নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে এবং হিংস্র প্রাণী কর্তৃক বধকৃত পশুকেও হারাম বলা হয়েছে সেখানে। আর এখানে কেবল উল্লেখ করা হয়েছে 'মড়া'। অন্য আয়াতেও উল্লেখিত হারামগুলোর আংশিক অথবা সম্পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে। আর এ কথা তো সন্দেহাতীত যে, আল্লাহ্পাক কর্তৃক ঘোষিত সকল হারামই হারাম— কোরআন মজীদের যে স্থানেই সেগুলোর উল্লেখ থাক না কেনো।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে একটি বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ করে। ঘটনাটি হচ্ছে— একবার মুশরিকেরা রসুল স. কে বললো, হে মোহাম্মদ! তুমি বলো, তুমি ও তোমার সঙ্গীসাথীরা যে পশুগুলোকে হত্যা করো এবং যেগুলোকে বধ করে শিকারী কুকুর ও শিকারী পাখি— সেগুলো হালাল। আর আল্লাহ্তায়ালা যেগুলোর মৃত্যু ঘটিয়েছেন, সেগুলোকে বলো হারাম। কেনো? এই বিশেষ প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই এখানে বলা হয়েছে কেবল মড়া (স্বাভাবিকভাবে মৃত) হারাম।

www.eelm.weebly.com

বহমান রক্তও হারাম। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে উল্লেখিত 'আও দামাম্ মাসফুহা' কথাটির অর্থ— বহমান রক্ত, যা পশু জবাইয়ের সময় পশুর ঘাড়ের শিরা থেকে নির্গত হয়। জবাইকৃত পশুর কলিজা ও শিরায় যে রক্ত জমাট বেঁধে যায়— তা খাওয়া অবশ্য হারাম নয়। কারণ তা প্রবাহিত রক্ত নয়। যে রক্তকণিকা গোশতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য— তা খাওয়াও হালাল। কারণ সেগুলোও বহমান রক্ত নয়।

এরপর বলা হয়েছে শূকরের মাংস হারাম হওয়ার কথা। তারপর বলা হয়েছে—'কেননা, এই সব (মড়া, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস) অপবিত্র। এখানে অপবিত্রতাকে শূকরের মাংসের সঙ্গেই সব চেয়ে বেশী ঘনিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তাই শূকরের সকল কিছুই হারাম। আর শূকরের কোনো অংশ থেকে উপকার লাভ করাও বৈধ নয়। এমনকি মৃত বা জীবিত কোনো শূকর ক্রয় বিক্রয়ও বৈধ নয়। শূকর থেকে কোনো প্রকার উপকার লাভ করা অবৈধ।

এরপর বলা হয়েছে— অথবা যা অবৈধ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম নেয়ার কারণে (আও ফিসক্বান উহিল্লা লি গইরিল্লাহি বিহি)। এখানে 'ফিসক্বান' (অবৈধ) শব্দটির সংযোগ রয়েছে খিনজিরের (শূকরের) সঙ্গে। আর 'আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম নেয়ার কারণে' (উহিল্লা লি গইরিল্লাহি বিহি) কথাটিই অবৈধ (ফিসক্বান) শব্দটির বিশেষণ। আগের বাক্যের 'এই সব অপবিত্র' (ফা ইন্নাহু রিজসুন) ঘোষণাটি তাই গইরুল্লাহ্র (আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের) নামে জবাই করা পশুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য)। ফিসক্বান শব্দটির প্রকৃত অর্থ তাই ঘৃণ্য (কারণ তা অপবিত্র)। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে ফিসক্বান শব্দটি 'উহিল্লাবিহি' কথাটির মাফউলে লাহু (স্বতঃসিদ্ধ কর্মপদ)। এ কথাটি মেনে নিলে উহিল্লা (উৎসর্গীকৃত) শব্দটির সংযোগ ঘটবে আগের বাক্যের ইয়াকুনা (হয়) কথাটির সঙ্গে। তখন 'ইয়াকুনা' শব্দটির বিশেষ্য পরিণত হবে কর্মপদস্থিত কর্তায় (নায়েবে ফায়েলে)। এভাবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্র নির্দেশের বিরোধিতা করে যে পশু আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা হয়েছে (তা অবৈধ)।

শেষে বলা হয়েছে— তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে বাধ্য হলে তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু। 'ফা মানিদ্বতুর্‌রা' অর্থ— (হারাম ভক্ষণে বাধ্য হলে)। 'গইরা বাগিন' অর্থ— অবাধ্য না হয়ে। আর 'ওয়ালা আ'দিন' অর্থ— সীমালংঘন না করে। অর্থাৎ জীবন রক্ষার জন্য, প্রবৃত্তিতাড়িত না হয়ে, আল্লাহ্তায়ালার অবাধ্যতার উদ্দেশ্য না নিয়ে, হারামকে হালাল মনে না করে এবং সীমালংঘন না করে ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত না করে কেউ যদি কখনো

www.eelm.weebly.com

হারাম ভক্ষণ থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম না হয়— তবে ওইরূপ ব্যক্তিকে সৎ নিয়ত ও পরিস্থিতিগত কারণে আল্লাহ্পাক ক্ষমা করে দিবেন। কারণ তিনিই প্রকৃত ও পরমতম দয়ালু।

মাসআলাঃ কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াতে যেগুলোকে ভক্ষণ হারাম করা হয়েছে, সেগুলোই কেবল হারাম। হাদিস শরীফে যে সকল বস্তু হারাম করা হয়েছে, সে সকল বস্তু প্রকৃতরূপে ও পূর্ণরূপে হালাল নয়। কারণ ওই হাদিস একক বর্ণিত (খবরে আহাদ)। আর একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা কোরআনের অকাট্য নির্দেশকে রহিত করা যায় না। তাঁরা বলেন, এ রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন জননী আয়েশা এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। ইমাম মালেকও এই অভিমতের অনুসারী। তাঁর মতে হাদিস শরীফে উল্লেখিত হারামগুলোর প্রকৃত অর্থ মাকরূহ (নিন্দনীয়)— মাকরূহে তাহরিমি (নিষিদ্ধরূপী নিন্দনীয়) নয়। এই অভিমতের আলেমগণ আরো বলেন, সুরা মায়িদায় শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা, পতনের কারণে নিহত ইত্যাদি মৃত পশুও এই আয়াতের 'মড়া' কথাটির অন্তর্ভুক্ত।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি তাঁর 'তাফসীরে ইতকান' গ্রন্থে লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ী আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, অংশীবাদীরা যখন আল্লাহ্ কর্তৃক হালালকে হারাম এবং আল্লাহ্ কর্তৃক হারামকে হালাল বলেছিলো, তখন তাদের অপধারণার বিপরীতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে অংশীবাদীরা! জেনে নাও, যে সকল চতুষ্পদ পশুকে (বাহিরা, হাম ইত্যাদিকে) তোমরা হারাম বলছো, সেগুলো হালাল। আর যে সকল বস্তুকে (মড়া, প্রবহমান রক্ত, শূকরকে) হালাল বলছো, সেগুলোই হারাম। কেউ যদি বলে, তুমি মিষ্টি খেয়োনা তবে তার বিপরীত জবাব হচ্ছে, আমি মিষ্টি খাবোই খাবো। জবাবদাতার দৃঢ় মনোভাব এ রকম বক্তব্যের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। আলোচ্য আয়াতটির দৃষ্টান্তও এ রকম। এখানেও কাফেরদের নির্ধারিত হালাল হারামের সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। আয়াতের বক্তব্য এখানে হাঁ বা না সূচক (সমর্থন বা অসমর্থনসূচক) নয়। বরং সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান এবং পূর্ণ বৈপরীত্য প্রকাশক। এই ব্যাখ্যাটিকে ইমামুল হারামাইনও পছন্দ করেছেন। বলেছেন, ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত উত্তম উদ্দেশ্য সংবলিত।

আমি বলি, সুরা মায়িদায় উল্লেখিত শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা, পতনের ফলে মৃত ইত্যাদিকে আলোচ্য আয়াতের 'মড়া' কথাটির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কারণ সুরা মায়িদায় 'মড়া' শব্দটির উল্লেখ করার পরে বিভিন্নভাবে নিহত পশুর হারাম হওয়া সম্পর্কে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে কেবল উল্লেখিত হয়েছে 'মড়া' শব্দটি।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদসহ অধিকাংশ আলেম বলেছেন, হারামের তালিকা এই আয়াতে উল্লেখিত বস্তুগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

বায়যাবী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি মনসুখ (রহিত) নয়, বরং মুহকাম (সুস্পষ্ট)। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত হারাম সম্পর্কিত অন্য কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি— এ রকম বলা যায় কি? যদি না যায়, তবে একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা কোরআনের আয়াত রহিত হওয়ার প্রশ্নইতো ওঠে না। আমি বলি, বায়যাবীর এই অভিমতটি ভুল। কেননা কোনো আয়াত বা হাদিসে উল্লেখিত কোনো হুকুমের সঙ্গে যদি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া না হয়, তবে ওই হুকুমটি হবে একটি স্থায়ী হুকুম। আর আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞানের মধ্যে হুকুমটি হবে সাময়িক। এ রকম নস্ বা কোরআনের দলিল রহিত হওয়ার উপযুক্ত হয় তখনই, যখন নাসেখ (রহিতকারী) আয়াত অবতীর্ণ হয়ে আগের আয়াতটিকে মনসুখ (রহিত) করে দেয়। তাই নাসেখ ও মনসুখের বিবরণকে বলা হয় পরিবর্তনের বিবরণ (বয়ানে তাবদিলী)। এ রকম না হলে মনে করতে হবে আল্লাহ্তায়ালা রহিতকারী হুকুম সম্পর্কে এখনই জানলেন— আগে জানতেন না। কিন্তু এ রকম হওয়া সম্পূর্ণতঃই অসম্ভব। কারণ আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান আদি ও অন্তহীন, অসীম। আবার আলোচ্য আয়াতের মড়া, বহমান রক্ত এবং শূকর হারাম হওয়ার হুকুমটিও একটি স্থায়ী হুকুম। আর এটিকে চূড়ান্ত হুকুম ধরা হলে বুঝতে হবে এই তিনটি বস্তু ছাড়া অন্য সকল বস্তু হালাল এবং এ হালালও স্থায়ী। যদি তাই হয়, তবে বাহিরা, হাম ইত্যাদি পশুগুলোও হালাল হয়ে যায়। কিন্তু এ রকম হওয়াও অসম্ভব। কারণ অন্য আয়াতেও হারাম বস্তুর বিবরণ দেয়া হয়েছে। হাদিস শরীফেও কোনো কোনো বস্তুকে হারাম বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতের হুকুম একটি সাধারণ হুকুম। আর সুরা মায়িদায় এই আয়াতের হুকুমসহ বিশেষভাবে অন্যান্য হারামেরও বিবরণ দেয়া হয়েছে। অন্য আয়াতের মাধ্যমে মদ্যপানকেও হারাম করা হয়েছে— যা এর পূর্বে হারাম ছিলো না। কোরআন মজীদের এক আয়াতে এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন, আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন— যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা যা (ইতোপূর্বে) পান করেছে তা দূষণীয় নয়। সুতরাং বুঝা গেলো, আলোচ্য আয়াতে মড়া, বহমান রক্ত এবং শূকর হারাম করার মাধ্যমে এই তিনটি ছাড়া বাকী সবগুলোকে হালাল বলা হয়নি। তাই অন্যত্র বর্ণিত কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে হারামকৃত বস্তুগুলোও হারাম। একক বর্ণিত হাদিসে উল্লেখিত হারামও হারাম। অতএব প্রমাণিত হলো যে, একক বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমেও কোরআনের কোনো সাধারণ হুকুমকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া জায়েয। কিয়াসের মাধ্যমেও এ রকম করা যায়। তবে এক্ষেত্রে শর্ত এই যে, এই সুনির্দিষ্টকরণ একই

www.eelm.weebly.com

সময়ে করা যাবে না। আর সময়ের অগ্র পশ্চাতের কারণে এক্ষেত্রে মতভেদ দেখা দেয়াও স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে প্রতিপালনীয় নিয়ম হচ্ছে— প্রথমে কোরআনের সাধারণ নির্দেশকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে কোরআনেরই অন্য কোনো আয়াত দ্বারা। তারপর সুনির্দিষ্টকরণ করা যাবে হাদিসের মাধ্যমে। এমতোক্ষেত্রে নাসেখ বা রহিতকারী হবে ওই আয়াত অথবা ওই হাদিস যা আরো সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত। একই সময়ে নাসেখ ও মনসুখ, দু'টোকে মেনে নিলেও এ কথা প্রমাণিত হয় না যে মড়া, বহমান রক্ত এবং শূকর ছাড়া অন্য সকল কিছু হালাল। বরং প্রকৃত কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতটি ওই আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে—'আল্লাহ তোমাদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিয়েছেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, সকল পবিত্র বস্তুকে হালাল করেছেন এবং হারাম করেছেন সকল অপবিত্র বস্তুকে।' লক্ষ্যণীয় যে, এখানে সাধারণভাবে বলা হয়েছে পবিত্র ও অপবিত্রের কথা— যা বিস্তারিত বর্ণনার অপেক্ষা রাখে। আর এই বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে হাদিস শরীফে। সেখানে বলা হয়েছে, হিংস্র প্রাণী এবং গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম। অথচ হাদিস কোরআনের হুকুমকে রহিত করতে পারে না, বিশেষভাবে সীমাবদ্ধও করতে পারে না। বরং হাদিস হচ্ছে কোরআনের সংক্ষিপ্ত হুকুমের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। তাই আমি বলি, একক বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও হাদিস শরীফের এই বিস্তৃত বর্ণনাকে সকল যুগের মানুষ গ্রহণ করেছে। এমন কি তাহরীমে সিবা' (হিংস্র জন্তুর হারাম হওয়া সম্পর্কে) এর স্বপক্ষ না হওয়া সত্ত্বেও ইমাম মালেক এই অভিমতটিকে বিশুদ্ধ বলে মেনে নিয়েছেন। তাই তিনিও একক বর্ণিত ওই হাদিসের ভিত্তিতে হিংস্র জংলী পশুকে মাকরূহে তাহরীমি (হারামের নিকটবর্তী) বলেছেন। সুতরাং এককবর্ণিত হাদিসের বিশুদ্ধতা ঐকমত্যসমর্থিত। আর ঐকমত্যপুষ্ট হওয়ার কারণে হাদিসটি উপনীত হয়েছে কোরআনেরই প্রমাণ (দলিলে কেতয়ী) রূপে। অতএব প্রমাণিত হলো যে, এই নিয়মে হাদিসের মাধ্যমে কোরআনের হুকুম রহিত হওয়া জায়েয।

উল্লেখ্য যে — উদ, খেঁকশিয়াল, ধেড়ে ইঁদুর এবং গুইসাপের গোশত ভক্ষণ সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ কিন্তু ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধেও যায় না। কেননা তিনি ওগুলোকে হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর হিংস্র প্রাণীর গোশত হারাম হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই। মতভেদ রয়েছে কেবল— বর্ণিত প্রাণীগুলো হিংস্র কি না, সে সম্পর্কে। আরো উল্লেখ্য যে, সুরা মায়িদার 'আল ইয়াওমা উহিল্লা লাকুমুত্ তইয়্যেবাত'— আয়াতের তাফসীরে হালাল ও হারাম পশু সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই বিস্তারিত জানতে হলে ওই তাফসীরটি দেখে নেয়া যেতে পারে।

www.eelm.weebly.com

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ
جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ○ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ
وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ○

❐ ইহুদীদিগের জন্য নখযুক্ত সমস্ত পশু নিষিদ্ধ করিয়াছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাহাদিগের জন্য নিষিদ্ধ করিয়াছিলাম; তবে এইগুলির পৃষ্ঠের অথবা অন্ত্র কিংবা অস্থি-সংলগ্ন চর্বি নিষিদ্ধ ছিল না; তাহাদিগের অবাধ্যতার দরুন তাহাদিগকে এই প্রতিফল দিয়াছিলাম। আমি তো সত্যবাদী।

❐ অতঃপর যদি তাহারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে তবে বল, 'তোমাদিগের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক, এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর হইতে তাঁহার শাস্তি রদ করা হয় না'।

প্রথমে বলা হয়েছে—'ইহুদীদের জন্য নখরবিশিষ্ট সমস্ত পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম।' এখানে নখরবিশিষ্ট সমস্ত পশু অর্থ— উট, হিংস্র পশু ও পাখি। কুতাইবি বলেছেন, পাখিদের মধ্যে নখরবিশিষ্ট পাখি হচ্ছে ওই পাখিগুলো— যেগুলোর পাঞ্জা রয়েছে। আর নখরবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু হচ্ছে ওই পশুগুলো যেগুলোর রয়েছে ক্ষুর। কুতাইবি আরো বলেছেন, অন্যান্য তাফসীরকারগণও এ রকম বলেছেন। ক্ষুরকেই পরোক্ষার্থে নখর বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ কোনো জঘন্য জুলুমের কারণে শাস্তিস্বরূপ ইহুদীদের জন্য সকল পশু হারাম করে দেয়া হয়েছিলো। মুসলমানদের জন্যও অনেক পশু হারাম করা হয়েছে। কিন্তু এই নিষিদ্ধতা শাস্তিস্বরূপ করা হয়নি।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম; তবে এগুলোর পৃষ্ঠদেশের অথবা অন্ত্র কিংবা অস্থিসংলগ্ন চর্বি নিষিদ্ধ ছিলো না'। এখানে 'মা হামালাত জুহুরুহুমা' অর্থ— পশুর পৃষ্ঠদেশের ও পাঁজরের চর্বি। আবীল হাওয়াইয়া (নাড়ীভুঁড়িসম্বলিত) শব্দটি আল হাওয়াবিহ্ অথবা আল হাওয়াইয়াআ শব্দের বহুবচন। এর সম্পর্ক রয়েছে জুহুরুহুমা (সে দু'টির পিঠ) কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ যে চর্বি নাড়ীর সঙ্গে মিশে রয়েছে। 'মাখতালাত্ব বিআ'জমিন' কথাটির অর্থ— পিঠ ও নিতম্বের চর্বি, যা মিশ্রিত রয়েছে হাড়ের সঙ্গে। এভাবে পিঠ, পাঁজর এবং নিতম্বের চর্বি নিষিদ্ধ করার পর হালাল রয়ে গেলো কেবল পেট এবং গ্রীবাদেশের অস্থিসংলগ্ন চর্বি।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে—'তাদের অবাধ্যতার দরুণ তাদেরকে এই প্রতিফল দিয়েছিলাম।' ইহুদীরা ছিলো চরম অবাধ্য। নবী হত্যা, আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে বিচ্যুতি, সুদ ভক্ষণ, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ— এ রকম জঘন্য কর্মগুলো ছিলো ইহুদীদের অবাধ্যতার নিদর্শন।

একটি প্রশ্নঃ ইহুদীরা তো ওই জঘন্য পাপগুলোকে পাপই মনে করতো না। তবে তারা শাস্তি পেলো কীভাবে?

উত্তরঃ আখেরাতে ইহুদীরা যাতে করে অধিকতর শাস্তির উপযোগী হয়, তাই তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতের নিষেধাজ্ঞা। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌তায়ালা মদ, মড়া, শূকর এবং মূর্তির ব্যবসাকে হারাম করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! মৃত জীবের চর্বির কী হুকুম? এর দ্বারা তো নৌকায় পালিশ করা হয় এবং চামড়ার উপরিভাগকে করা হয় তৈলাক্ত। আবার চর্বি দ্বারা জ্বালানো হয় প্রদীপ। তিনি স. বললেন, না। মৃত জীবের চর্বি হারাম। তারপর বললেন, ইহুদীদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ। আল্লাহ্‌পাক তাদের প্রতি মৃত জীবের চর্বি হারাম করেছিলেন। কিন্তু তারা চর্বিকে রান্নার জ্বালানীরূপে প্রস্তুত করে বিক্রয় করতো এবং ওই বিক্রয়মূল্য ভক্ষণ করতো। হাদিসটি উল্লেখিত হয়েছে বোখারী ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে।

শেষে বলা হয়েছে—'ওয়া ইন্না লাসাদিকুন' (আমি তো সত্যবাদী)। এ কথার অর্থ— মন্দকর্মের শাস্তি, পুণ্যকর্মের পুরস্কার এবং অন্যান্য যে সকল সংবাদ আমি জানিয়েছি, সেগুলোর ব্যাপারে নিঃসন্দেহে আমি সত্যবাদী।

পরের আয়াতে (১৪৭) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যদি তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে তবে বলো, তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক, এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর থেকে তাঁর শাস্তি রদ করা হয় না।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি বলুন, আল্লাহ্‌পাকের রহমত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। আপনাকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, সে নির্দেশনাকে যদি ইহুদীরা প্রত্যাখ্যান করে তবে আপনিও তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ্‌পাকের দয়া সর্বত্র পরিব্যাপ্ত বলেই তোমাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। মনে কোরো না যে, এই অবকাশ চিরস্থায়ী। তিনি এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সাময়িক অবকাশ দিয়ে থাকেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাস্তি থেকে মুক্তি দেন না। আলোচ্য আয়াতের অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্‌পাক সর্বব্যাপী দয়ার্দ্র। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রদাতা। তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে— এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর থেকে তাঁর শাস্তি রদ করা হয় না।

www.eelm.weebly.com

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ○ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ○ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۖ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ○

❒ যাহারা শির্‌ক করিয়াছে তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে আমরা ও আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ শির্‌ক করিতাম না, এবং কোন কিছুই নিষিদ্ধ করিতাম না।' এইভাবে তাহাদিগের পূর্ববর্তীগণও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, অবশেষে তাহারা আমার শাস্তি ভোগ করিয়াছিল। বল, 'তোমাদিগের নিকট কোন যুক্তি আছে কি? থাকিলে আমার নিকট তাহা পেশ কর; তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর এবং শুধু মিথ্যাই বল।'

❒ বল, 'চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহেরই; তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তোমাদিগের সকলকে সৎপথে পরিচালিত করিতেন।'

❒ বল, 'আল্লাহ্ যে ইহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন এ-সম্বন্ধে যাহারা সাক্ষ্য দিবে তাহাদিগকে হাজির কর।' তাহারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাহাদিগের সাথে ইহা স্বীকার করিও না; যাহারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায় তুমি তাহাদিগের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না।

প্রথমেই বলা হয়েছে—'যারা শিরিক করেছে তারা বলবে, আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শিরিক করতাম না এবং কোনো কিছুই নিষিদ্ধ করতাম না।' রসুল স. এর প্রশ্নের যথাউত্তর না দিতে পেরে মুশরিকেরা এ রকম বলেছিলো। তাই আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে, 'যারা শিরিক করেছে তারা বলবে'। এখানে উদ্ধৃত মুশরিকদের বক্তব্যের মর্মার্থ হচ্ছে—আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ও শক্তি ছাড়া ভালো-মন্দ কোনো কাজই সংঘটিত হয় না। তাই তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তবে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা শিরিক করতো না।

www.eelm.weebly.com

আমরাও করতাম না। আর আল্লাহ্পাক যা হালাল করেছেন তাকেও আমরা বলতাম না হারাম। সুতরাং আমাদের দোষ কোথায়? মুশরিকেরা নিতান্তই মূর্খ। নতুবা তারা এ রকম কথা বলতো না। তারা জানে না, ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি— সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি বিষয়। আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ও শক্তি ভালো ও মন্দ উভয় কাজকে বাস্তবায়ন করে। তাই তিনি যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হয় না। কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টির সম্পর্ক কেবল ভালো কাজের সঙ্গে অর্থাৎ বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদের প্রতি তিনি তুষ্ট। আর অবিশ্বাসী ও অসৎ লোকদের প্রতি অতুষ্ট। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নবী-রসুলগণের মাধ্যমে মানুষকে এই তুষ্টির পথে আহ্বান জানান। অথচ অংশীবাদীরা এই আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে। সৃষ্টি করে জটিলতা।

এরপর বলা হয়েছে—'এভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণও প্রত্যাখ্যান করেছিলো, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিলো।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তাঁর নবী-রসুলগণের মাধ্যমে একই আহ্বান জানিয়েছিলেন। নিষেধ করেছিলেন আল্লাহ্তালার সঙ্গে শরীক করতে। কিন্তু তারাও এ রকম টালবাহানা করে আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির পথের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো । মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো প্রেরিত পুরুষগণকে। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশের অবমাননা করে নিজেরাই নির্ধারণ করে নিয়েছিলো হালাল ও হারাম। তাদের এই সত্যপ্রত্যাখ্যানের শাস্তিও তারা যথাসময়ে পেয়েছিলো। এভাবেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আমার শাস্তি ভোগ করে।

শেষে বলা হয়েছে—'বলো, তোমাদের নিকট কোনো যুক্তি আছে কি? থাকলে আমার নিকট তা পেশ করো; তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ করো এবং শুধু মিথ্যাই বলো।' যুক্তি বা জ্ঞান বুঝাতে এখানে 'ই'লমিন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির অর্থ ওই এলেম, জ্ঞান বা যুক্তি যা আল্লাহ্তায়ালার কিতাব থেকে সংগৃহীত হয়। অথবা এর অর্থ— ওই দলিল বা প্রমাণ, যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ শিরিককে পছন্দ করেন এবং তারা যাকে হারাম বলে, তাকে সত্যি সত্যি আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে হারাম করা হয়েছে। এ রকমও হতে পারে যে— এখানে এলেম বা যুক্তি অর্থ ওই জ্ঞান বা যুক্তি যা উথাপিত দাবির অনুকূলে উপস্থাপন করা হয়। আল্লাহ্পাক এখানে তাঁর প্রিয় রসুলকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, তোমাদের নিকট (তোমাদের অভিমতের পক্ষে) কোনো যুক্তি আছে কি? যদি থাকে তবে তা উপস্থাপন করো। তোমরা তো কল্পনাবিলাসী এবং তোমাদের বিভ্রান্ত কল্পনাপ্রবণ পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসারী। আর তোমরা মিথ্যাবাদীও।

পরের আয়াতে (১৪৯) বলা হয়েছে—'বলো, চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহ্রই; তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে বলুন, আল্লাহ্র

www.eelm.weebly.com

প্রমাণই চূড়ান্ত প্রমাণ। আর এ কথা সত্য যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতেন। কিন্তু তোমরা এ রকম বলতে পারো না। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা, শক্তি রহস্যময় ও অসীম। তোমরা সসীম। তাই তাঁর হেকমত বা রহস্য তোমরা জ্ঞানায়ত্ব করতে অক্ষম। আর এ বিষয়ে প্রশ্ন করার অধিকারও তোমাদের নেই। তোমাদের কর্তব্য তো কেবল তাঁর নির্দেশের যথাঅনুসরণ এবং তাঁর সন্তোষ অনুসন্ধান। তিনি তো তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক— আল্লাহ্। আর তোমরা তাঁর দাস। তাই তোমরা তাঁর হেকমতের বিশ্লেষণ করতে সমর্থ নও। সুতরাং তোমরা যথাকর্তব্য প্রতিপালনের চিন্তা ছেড়ে তাঁর দুর্জ্ঞেয় ও জ্ঞানাতীত রহস্য সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করবে কেনো? তিনি তো জবাবদিহিতার দায় থেকে চিরমুক্ত, চিরস্বাধীন। ইচ্ছাময়।

মোতাজিলারা বলে, কুফর বা অবিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাশক্তি বা অভিপ্রায়ের কোনো সম্পর্ক নেই। অবিশ্বাস হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার দাসদের অভিপ্রায়জাত। আলোচ্য আয়াত দ্বারা মোতাজিলারা তাদের অভিমত প্রমাণ করতে চায়। বলে, অবিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়ের সম্পর্ক থাকলে অংশীবাদীদের 'আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা এবং আমাদের পূর্ব পুরুষেরা শিরিক করতাম না'— কথাটিকে অগ্রাহ্য করা হতো না। নিঃসন্দেহে মোতাজিলাদের এই অভিমতটি ভুল। আমাদের উদ্ধৃত তাফসীরের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌পাকের অভিপ্রায় ব্যতিরেকে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। তাই এখানে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে— চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহ্‌তায়ালারই। তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতেন। অংশীবাদীদের উক্তিকে এখানে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে একারণে যে, তারা আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তোষ-অসন্তোষের ধার ধারে না। সন্তোষের পথে আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে। আহ্বানকারী নবী রসুলগণকে করে অবমাননা। প্রকাশ্যে শিরিক করা সত্ত্বেও মনে করে— এ পথেই রয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি। আরো বলে, বাহিরা, সায়েবা, হাম ইত্যাদি হারাম হওয়া যেহেতু আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারেই ঘটেছে, তাই তিনি অবশ্যই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি ইচ্ছা করলে এবং সন্তুষ্ট না হলে আমরা তো এ রকম করতেই পারতাম না। মুশরিকেরা মূর্খ। আর মোতাজিলারা অজ্ঞ। তাই তারা আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা ও সন্তোষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেনি।

এর পরের আয়াতে (১৫০) বলা হয়েছে— বলো, আল্লাহ্ যে এটা নিষিদ্ধ করেছেন এ সম্বন্ধে যারা সাক্ষ্য দিবে তাদেরকে হাজির করো। এখানে 'হালুম্মা' শব্দটির অর্থ— নিয়ে এসো বা হাজির করো। শব্দটি ইস্‌মে ফেল (ক্রিয়া বিশেষ্য)। হেজাজবাসীদের ভাষায় এর কোনো বিবর্তিত রূপ বা ধাতুরূপ নেই। শব্দটি এক বচন, বহু বচন— সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। 'শুহাদাআকুম' অর্থ— এ সম্বন্ধে যা সাক্ষ্য দেবে। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির পূর্ণ অর্থ হবে এ রকম—

www.eelm.weebly.com

হে আমার রসুল! বলুন, আল্লাহ্‌তায়ালা যে বাহিরা, হাম ইত্যাদি পশু হারাম করেছেন, সে সম্পর্কে যারা সাক্ষ্য দেবে তাদেরকে উপস্থিত করো। তাহলে সকল প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যাবে। এবং তোমাদের সকলের পথভ্রষ্টতার বিষয়টি সুপ্রমাণিত হবে। কেননা পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসারীদের মতো ওই সাক্ষ্যদাতাদের নিকটেও এ সম্পর্কে কোনো প্রকৃষ্ট প্রমাণ নেই।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাদের সাথে এটা স্বীকার কোরো না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! যদি ওই সাক্ষ্যদাতারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তবে আপনি তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। বরং তাদের সাক্ষ্য যে মিথ্যা, সে কথা উপযুক্ত যুক্তিসহ প্রমাণ করে দিবেন।

শেষে বলা হয়েছে— যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়, তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কোরো না। এখানে আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে এই মর্মে নির্দেশনা দিচ্ছেন যে— হে আমার রসুল! অংশীবাদীরা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, পরকালের প্রতি তাদের কোনোই আস্থা নেই। তারা খেয়াল-খুশী মতো আল্লাহ্‌তায়ালার সমকক্ষ নির্ধারণ করেছে। তাদের ওই খেয়াল-খুশীর অনুসরণ আপনি করবেন না। করতে তো পারবেনই না। কারণ, আপনি তো আমার রসুল। আমার আনুগত্যই তো আপনার জীবনের মূল ব্রত। অংশীবাদীদের স্বরচিত হালাল হারাম সম্পর্কিত ধারণা এভাবে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর জনতা জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহ্‌তায়ালা তবে কোন কোন বিষয় হারাম করেছেন? এমতো প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্‌আ'মঃ আয়াত ১৫১

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ
ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

❒ বল, 'আইস, তোমাদিগের জন্য যাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন তোমাদিগকে তাহা পড়িয়া শুনাই; উহা এইঃ 'তোমরা তাঁহার কোন শরীক করিবে না, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, দারিদ্রের জন্য তোমরা তোমাদিগের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না, আমিই তোমাদিগকে ও তাহাদিগকে জীবিকা দিয়া

www.eelm.weebly.com

থাকি। প্রকাশ্যে হউক কিংবা গোপনে হউক, অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাইবে না; আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করিবে না।' তোমাদিগকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা অনুধাবন কর।

আয়াতের শুরুতেই রয়েছে 'কুল' শব্দটি। এর অর্থ— বলো বা বলুন। এ সম্বোধনটি করা হয়েছে রসুল স. কে। বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, এসো! আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা তোমাদেরকে পড়ে শুনাই। শোনো— তোমরা তাঁর কোনো শরীক করবে না, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। এখানে 'তায়া'লাও' শব্দটির অর্থ— এসো। এই রূপান্তরিত শব্দটি বহুবচনবোধক। উচ্চ মর্যাদাশালী ব্যক্তি নিম্ন মর্যাদাধারী ব্যক্তিকে এভাবে আহ্বান করে থাকেন। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো লোককে এভাবে সম্বোধন করতে পারে। আলোচ্য বাক্যে দু'টি নিষেধাজ্ঞার বিবরণ দেয়া হয়েছে। ১. তোমরা আল্লাহ্র কোনো শরীক করবে না। ২. পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। দ্বিতীয় নিষেধাজ্ঞাটির বাক্যরূপ হওয়া উচিত ছিলো এ রকম— পিতা-মাতার সঙ্গে অসদাচরণ করবে না। নিষেধাজ্ঞার বাক্যরূপ 'করবে না' 'যাবে না'— এ রকমই হয়। কিন্তু এখানে 'সদ্ব্যবহার করবে'— এ রকম বলে প্রকৃতপক্ষে নিষেধাজ্ঞাটিকে অধিকতর গুরুত্ববহ করা হয়েছে। ফলে নিষেধাজ্ঞাটির প্রকৃত অর্থ দাঁড়াচ্ছে এ রকম— পিতামাতার সঙ্গে অসদাচরণ থেকে বিরত থাকাটাই যথেষ্ট নয়। তাঁদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে। কারণ তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার না করাই অসদাচরণ বা পাপ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং দারিদ্রের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে এবং তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি। এ কথার অর্থ— অভাব অনটনের দুশ্চিন্তায় তোমরা তোমাদের শিশু সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দাও। এ রকম করা নিষেধ। জেনে নাও, আমিই সকল সৃষ্টিকে জীবনোপকরণ (রিজিক) দিয়ে থাকি। তোমরা কেউ কারো রিজিকদাতা নও। তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে আমিই রিজিক দিয়েছি। তোমাদেরকেও দিচ্ছি। তোমাদের সন্তানদেরকেও দেবো। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে রিজিক সংকুচিত হওয়ার ভয়ে জীবন্ত অবস্থায় মৃত্তিকায় প্রোথিত কোরো না।

হজরত মুয়াজ বলেছেন, রসুল স. আমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। ১. কাউকে আল্লাহ্র সাথে শরীক কোরো না— যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ২. পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ো না— যদিও তোমার পিতা-মাতা তোমাকে তোমার স্ত্রী এবং সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নির্দেশ দেন (হাদিসটি বর্ণিত হলো সংক্ষিপ্তরূপে)। আহমদ।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এক লোক রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আল্লাহ্‌র নিকটে সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক করা— অথচ আল্লাহ্‌তায়ালাই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। প্রশ্নকারী পুনরায় বললেন, এরপর কোনটি? তিনি স. বললেন, রিজিকের অনটন হবে মনে করে শিশু সন্তানকে হত্যা করা (সংক্ষেপিতরূপে)। বোখারী, মুসলিম।

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না।' এখানে 'ফাওয়াহিশা' শব্দটির অর্থ বৃহৎ পাপ (কবীরা গোনাহ্) অথবা ব্যভিচার কিংবা অশ্লীল আচরণ। এই অশ্লীল আচরণগুলো প্রকাশ্য— যা করা হয় হাত, পা, চোখ ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে। আবার গোপন অশ্লীল আচরণগুলো হচ্ছে— অহংকার, হিংসা, লোভ ইত্যাদি। এগুলোর মূল সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে। বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে নয়।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত আলী ইবনে আবী তালেব বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌পাক যখন তাঁর প্রিয় রসুলকে বিভিন্ন আরব গোত্রের মধ্যে ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি একদিন গমন করলেন মীনা প্রান্তরে। আমি ও হজরত আবু বকর ছিলাম তাঁর সঙ্গী। আরববাসীরা রসুল স. এর বংশ পরিচয় সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলো। তিনি স. মীনায় অবস্থানরত বিভিন্ন গোত্রের তাঁবুতে উপস্থিত হলেন। সালাম দিলেন। সকলে তাঁর সালামের জবাবও দিলো। সেখানে উপস্থিত ছিলো মাফরুক বিন আমর, হানী বিন কবিসা, মাছনা বিন হারেসা, নোমান বিন শরীক প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। মাফরুক ছিলেন হজরত আবু বকরের সুহৃদ। ভাষাবিদ হিসেবে তিনি ছিলেন অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলেন, হে কুরায়েশ ভ্রাতা! আপনি আমাদেরকে কোন বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন? তিনি স. সম্মুখবর্তী হলেন। তাঁর পবিত্র মস্তকের উপর একটি বস্ত্র খণ্ড ঝুলিয়ে ছায়া বিস্তার করলেন হজরত আবু বকর। রসুল স. বললেন, আমার আহ্বান এই— তোমরা সাক্ষ্য প্রদান করো, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক, অংশীবিহীন এবং আমি তাঁর রসুল। তোমরা আমাকে কোনো কষ্ট প্রদান করবে না, আমার প্রতিপক্ষ হবে না। বরং আমাকে রক্ষা করবে। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওই বার্তাই প্রচার করবো, যা তিনি আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন। কুরায়েশেরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তাঁর রসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলেছে। অবস্থান গ্রহণ করেছে সত্যের বিরুদ্ধে এবং মিথ্যার পক্ষে। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি তো অতুলনীয় প্রশংসার অধিকারী। মাফরুক বললেন, আপনার আহ্বানের

www.eelm.weebly.com

অন্যান্য অনুসঙ্গগুলো কি কি? রসুল স. তখন এই আয়াতের 'কুল তায়া'লাও' থেকে 'লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন' পর্যন্ত (১৫১ থেকে ১৫৩ আয়াতের শেষ পর্যন্ত) পাঠ করলেন। মাফরুক বললেন, হে কুরায়েশ ভ্রাতা! আল্লাহ্‌র কসম এটা কোনো মানুষের কালাম নয়। মানুষের কালাম হলে আমি অবশ্যই চিনতে পারতাম। আরো পাঠ করুন। রসুল স. পাঠ করলেন—'ইন্নাল্লহা ইয়া'মুরু বিল্‌আ'দলি ওয়াল ইহ্‌সানি ওয়া ইতাই জিল্‌ কুরবা ওয়া ইয়ানহা আ'নিল ফাহ্‌শায়ি ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই ইয়াই'জুকুম লায়াল্লাকুম তাজাক্‌কারুন' (নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে ন্যায়বিচার, উত্তম আচরণ ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে সাহায্যদানের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং যাবতীয় অশ্লীল, অন্যায় ও অসৎ কাজ করতে নিষেধ করছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যেনো তোমরা সদুপদেশ প্রাপ্ত হও)। মাফরুক বললেন, হে ভ্রাতা! আপনি নিঃসন্দেহে উন্নত চরিত্রের মানুষ। আপনার আহ্বান অতি উত্তম। আপনার সম্প্রদায়ের যে সকল লোক আপনার বিরোধিতা করছে, তারা মিথ্যাবাদী। হানি বিন বুরাইসা বললেন, হে কুরায়েশ ভ্রাতা! আমি আপনার কথা শুনলাম এবং পছন্দ করলাম। আমার হৃদয় সাক্ষ্য দিচ্ছে— আপনি যা পাঠ করলেন তা সত্য। রসুল স. বললেন, সত্বর আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদেরকে দান করবেন সাম্রাজ্য এবং কল্যাণকর সন্তান (দান করবেন পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য, আর সেখানকার লোকেরা হবে আপনাদের পরিচারক)। আপনারা তখন আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করবেন। নোমান বিন শরিক বললেন, হে কুরায়েশ ভ্রাতা! নিশ্চয় আপনার প্রদত্ত সুসংবাদ সত্য। রসুল স. তখন তেলাওয়াত করলেন—'ইন্না আরসালনাকা শাহিদাঁও ওয়া মুবাশ্‌শিরাঁও ওয়া নাজিরাঁও ওয়াদায়িইয়ান ইলাল্লহি বিইজ্‌নিহি ওয়া সিরাজাঁও ওয়া মুনিরা'। (আর অবশ্যই আমি আপনাকে সাক্ষ্য, সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং তাঁর নির্দেশেই আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী ও দীপ্ত প্রদীপ হিসেবে প্রেরণ করেছি)। এর পর তিনি স. হজরত আবু বকরের হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না।' এ কথার অর্থ— যে সকল মারাত্মক অপরাধের কারণে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় সে সকল কারণ ব্যতিরেকে কোনো মুসলমান কিংবা অমুসলমানকে হত্যা করা যাবে না। মারাত্মক অপরাধগুলো হচ্ছে— ধর্মত্যাগ, খুন, ব্যভিচার, মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ, রাষ্ট্রদ্রোহ, রাহাজানি ইত্যাদি। এ সকল অপরাধ না করলে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায় না।

হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, 'আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল' এ রকম

www.eelm.weebly.com

সাক্ষ্য যে দেয়, তাকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু তিনটি অপরাধের শাস্তি অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড। ১. বিবাহিত ও বিবাহিতার ব্যভিচার। ২. খুন। ৩. ধর্ম পরিত্যাগ। বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন— 'ওয়া ইন নাকাছু আইমানাহুম মিম্বা'দী আ'হ্দিহিম ওয়া তোয়া'নু ফি দিনিকুম ফাক্বতুলু আইম্মাতাল কুফরী' (আর যদি তারা প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে অশ্লীল কথা বলে, তাহলে অবিশ্বাসীদের নেতাদেরকে হত্যা কোরো)। অন্যত্র এরশাদ করেছেন— 'ফা ইন বাগাত্ ইহ্দাহুমা আ'লাল উখরা ফাক্বতিলুল্লাতি তাব্গি' (যদি একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহী হয়, তবে বিদ্রোহী দলকে হত্যা কোরো)। অন্য আরেক স্থানে এরশাদ করেছেন— 'ইন্নামা জাযাউল্লাজিনা ইউহারিবুনাল্লহ্' (যারা আল্লাহ্র সঙ্গে যুদ্ধ করে, অবশ্যই তাদের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে.....)। এই সকল আয়াতের নির্দেশানুসারে বুঝা যায়— চুক্তিভঙ্গকারী কাফের, ধর্মত্যাগী, রাষ্ট্রদ্রোহী, খুনী ও ডাকাতকে হত্যা করা বৈধ।

শেষে বলা হয়েছে— 'জালিকুম ওয়াস্সা কুম বিহি লায়াল্লাকুম তা'ক্বিলুন' (তোমাদেরকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন, যেনো তোমরা অনুধাবন করো)। এ কথার অর্থ— এতক্ষণ ধরে আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে এই উদ্দেশ্যে উপদেশ দান করলেন তোমরা যাতে প্রকৃত সত্য অনুধাবন করো এবং লাভ করো হেদায়েত। জ্ঞানের পূর্ণতাই হচ্ছে প্রকৃত হেদায়েত। আর হেদায়েতের বিপরীত শব্দ— সাফাহাত বা মূর্খতা।

সুরা আন্আ'মঃ আয়াত ১৫২

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۙ

☐ পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্যে ছাড়া তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে দিবে; আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না; যখন তোমরা কথা বলিবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হইলেও ন্যায্য বলিবে এবং আল্লাহ্কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে; এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমেই বলা হয়েছে—'পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না।' এখানে 'ওয়ালা তাক্বরাবু' কথাটির অর্থ— নিকটবর্তী হবে না। 'আল্লাতি হিয়া আহ্সানু' অর্থ— সদুদ্দেশ্যে ছাড়া। আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— আত্মস্যাৎ, অপব্যবহার অথবা অন্য কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পিতৃহীনদের সম্পদের ধারে কাছে যেয়ো না। সদুদ্দেশ্য নিয়ে যাও। অর্থাৎ তাদের সম্পদের যথা সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে যাও।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'আল্লাতি হিইয়া আহ্সানু' কথাটির উদ্দেশ্য ব্যবসা। 'হাত্তা ইয়াব্লুগা আশুদ্দাহু' অর্থ— বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত। 'আশুদ্দা' শব্দটি শাদ্দুন এর বহুবচন। যেমন 'আফলাসু' শব্দটি 'ফালসুন' এর বহুবচন। কেউ কেউ বলেছেন, 'আশুদ্দা' শব্দটি একক অর্থ প্রকাশক। এর অর্থ— (শক্তির) পরিপূর্ণতা। আশুদ্দা বা বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত উপনীত হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। জোর করে বা অন্য কোনো উপায়ে কাউকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বয়ঃপ্রাপ্ত করা যায় না। আর যে বয়ঃপ্রাপ্ত তার সম্পদের নিকটবর্তী হওয়ার তো প্রয়োজনই নেই। বয়ঃপ্রাপ্তরা নিজেরাই নিজেদের সম্পদের সংরক্ষণকারী।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এতিমদের সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহার করা হতো। তারা বড় হলে অবশ্য নিজেরাই এই অপব্যবহারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতো। তখন আর কেউ অপব্যবহার করতে সাহস পেতো না। আল্লাহ্পাক তাই অপ্রাপ্তবয়স্ক এতিমদের সম্পদের নিকটে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গমন করতে নিষেধ করেছেন। প্রাপ্তবয়স্কদের সম্পর্কে কিছু বলেননি। কারণ তারা নিজেরাই তাদের সম্পদের হেফাজত করতে সক্ষম।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— তোমরা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ইত্যাদি শুভ উদ্দেশ্য ছাড়া অপ্রাপ্তবয়স্ক এতিমদের সম্পত্তির নিকটে যেয়ো না। আর যখন তারা প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দিবে তাদের হাতে।

আমি বলি, সম্ভবতঃ এখানে 'হাত্তা' (পর্যন্ত) শব্দটি অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রাপ্তবয়স্কের সীমানা নির্ণায়ক। তাই আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— তোমরা ওই সময় পর্যন্ত পিতৃহীনদের সম্পদের যথাসংরক্ষণ নিশ্চিত কোরো, যতক্ষণ না তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয় (কোনোক্রমেই তাদের সম্পদ নষ্ট কোরো না)।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে দিবে।' এ কথার অর্থ— তোমরা ওজনে কম বেশী করবে না। এ রকম না সূচক নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিপরীতার্থক নির্দেশ দেয়া। এভাবে বাক্যটির আদেশসূচক রূপ হবে এ রকম— তোমরা পরিমাণ ও ওজন ঠিক ঠিকভাবে দিবে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে—'আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না'। কথাটির মধ্যে এই নির্দেশনা রয়েছে যে— পারস্পরিক অধিকারের ক্ষেত্রে তোমরা যদি স্বেচ্ছায় কাউকে অতিরিক্ত প্রদান করো তবে তা অতি উত্তম হবে। আর এ রকম করা কোনো সাধ্যাতীত বিষয় নয়।

শিথিল সূত্রে হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে ইবনে মারদুবিয়ার একটি মুরসাল বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সঠিক মাপের নিয়ত করেছে এবং সঠিক মাপ দিয়েছে, কিয়ামতের দিন তাকে অভিযুক্ত করা হবে না। অর্থাৎ তার নিয়ত সঠিক রয়েছে বলে অজ্ঞাতসারে ওজনে কম বেশী হয়ে গেলেও আল্লাহ্ পাক তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন না। কারণ, বিষয়টি তার সাধ্যাতীত। তাই আল্লাহ্পাক বলেছেন—'আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না।'

হজরত সাবীদ ইবনে কায়েস থেকে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি এবং ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত ও হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত একটি হাদিসে এসেছে, রসুল স. এর উপরে একটি ঘোড়ার মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব বর্তেছিলো। তিনি তখন নির্দেশ দিয়েছিলেন, যথামূল্য প্রদান করো। তারপর অতিরিক্ত কিছু দাও।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক লোক রসুল স. এর নিকটে উপস্থিত হয়ে কর্কশ বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে তার পাওনা দাবি করে বসলো। তার দুর্হৃদ ব্যবহারে কোনো কোনো সাহাবী তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। রসুল স. বললেন, ক্ষান্ত হও। পাওনাদারের কথা বলার অধিকার রয়েছে।-তারপর বললেন, তার কাছ থেকে যে বয়সের উট নেয়া হয়েছিলো, সেই বয়সের উট তাকে প্রত্যর্পণ করো। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! অবিকল ওই বয়সের উট যদি পাওয়া না যায়। তার চেয়ে উত্তম উট যদি পাওয়া যায়। রসুল স. বললেন, তবে তাই দিয়ে দিও। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে উত্তম।

হজরত আবু রাফে থেকে মুসলিম কর্তৃকও এ রকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, এক লোকের কাছ থেকে রসুল স. অর্ধ ওসাক (আনুমানিক তিন মন) ঋণ নিয়েছিলেন। ঋণ পরিশোধের সময় তিনি স. তাকে দিলেন এক ওসাক। বললেন, অর্ধ ওসাক তোমার এবং বাকী অর্ধ ওসাক আমার (উপহার)। আর এক পাওনাদার এলে রসুল স. তাকে এক ওসাকের বদলে দিলেন দুই ওসাক। বললেন, এক ওসাক তোমার পাওনা। আর এক ওসাক আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি উপহার। তিরমিজিও এই হাদিসটির বর্ণনাকারী। হাদিসটির সূত্র পরম্পরায় কোনো রকম দুর্বলতা নেই। তাই প্রাপ্য থেকে কম গ্রহণ

www.eelm.weebly.com

করাই প্রাপকের জন্য উত্তম। হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক ওই বাহাদূর ব্যক্তির উপর যে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং ঋণ দেয়া নেয়ার ক্ষেত্রে বাহাদূরী প্রদর্শন করে। বোখারী। প্রাপ্য অপেক্ষা কম দেয়া বা নেয়া সাধারণতঃ স্বভাববিরোধী। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা এ রকম বদান্যতা প্রদর্শন অত্যাবশ্যক করেননি। এটাই 'আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না' বাক্যটির মর্মার্থ।

উপরে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে ইমাম শাফেয়ীর একটি অভিমতের সমর্থন রয়েছে। তিনি বলেছেন, ঋণদাতা যদি ঋণীর নিকট থেকে হাদিয়া বা উপহার গ্রহণ করে অথবা তার কোনো বাহনে বিনা ভাড়ায় আরোহণ করে কিংবা তার কোনো পশু বিনা ভাড়ায় স্বগৃহে রেখে দেয়, তবে তা জায়েয হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, ঋণদানের পূর্বে বা প্রাক্কালে এ রকম অতিরিক্ত সুবিধা গ্রহণের শর্ত করা যাবে না। অন্য ইমামত্রয় বলেছেন, ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণদাতার এ রকম উপকার গ্রহণ জায়েয নয়। বরং এ রকম করা মাকরূহে তাহরীমি (হারামের নিকটবর্তী)। সুরা বাকারার মদীনায় অবতীর্ণ আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে—'যখন তোমরা কথা বলবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্য বলবে।' এ কথার অর্থ— যখন তোমরা বিচারসভার সভাপতি হিসেবে অথবা সাক্ষ্য হিসেবে কথা বলবে— তখন অবশ্যই কথা বলবে ন্যায়ের পক্ষে— যদিও তা স্বজন বাদী অথবা বিবাদীর বিপক্ষে যায়। বাক্যটির মাধ্যমে এখানে মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুমানের উপর ভর করেও সাক্ষ্য দেয়া যাবে না— যদিও তা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখানে 'শাহাদাত' শব্দটির মাধ্যমে চাক্ষুষ সাক্ষ্যদানকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং বুঝতে হবে, প্রত্যক্ষগোচরতা ছাড়া দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয় না। আর দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া সত্যসাক্ষ্য প্রদান করাও সম্ভব নয়। একবার রসুল স. উপর্যুপরি তিনবার উচ্চারণ করলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান শিরিক তুল্য। এরপর তিনি পাঠ করলেন এই আয়াত— 'ফাজতানিবুর্ রিজ্‌সা মিনাল আওছানি ওয়াজতানিবু ক্বওলায্ যুরী হুনাফায়া লিল্লাহি গইরা মুশরিকীন' (তোমরা কেবল আল্লাহ্‌র জন্য একনিষ্ঠতার সঙ্গে মূর্তি পূজার মতো শিরিকের অপবিত্রতা থেকে বিরত থাকো এবং বেঁচে থাকো মিথ্যা কথা থেকে)। হজরত হুজাইম বিন ফাতেক থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও ইবনে মাজা। আহমদ ও তিরমিজি

www.eelm.weebly.com

বর্ণনা করেছেন, হজরত আহমদ বিন হুজাইম থেকে। ইবনে মাজার বর্ণনায় 'এরপর তিনি পাঠ করলেন এই আয়াত'— কথাটি নেই।

হজরত বুরাইদার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বিচারক তিন ধরনের। এক ধরনের বিচারক যাবে জান্নাতে। বাকী দু'ধরনের বিচারক প্রবেশ করবে দোজখে। যারা ন্যায্য বিচার করেছে তারাই হবে জান্নাতী। আর যে জেনে বুঝে ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছে সে হবে নরকবাসী। না বুঝে ভুল রায় যারা দেয় তারাও হবে নরকাগ্নির ইন্ধন। আবু দাউদ।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে'। এখানে আ'হ্‌দিল্লাহ্ অর্থ আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার হচ্ছে— কসম এবং মানত। অথবা আল্লাহ্‌তায়ালার সকল আদেশ নিষেধের পূর্ণ অনুসরণ, বাস্তবায়ন এবং ন্যায়ের উপর দৃঢ়পদ থাকা। 'আওফু' অর্থ পূর্ণ করো। শব্দটি আদেশ সূচক। এখানে অঙ্গীকার পূর্ণ করো অর্থ— আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের বিপরীত কিছু কোরো না এবং দৃঢ় শপথ ভঙ্গ কোরো না। আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো দৃঢ়রূপে কার্যকরী কোরো। আর ওই সকল বিষয় থেকেও নিজেকে বিরত রেখো, যেগুলো সন্দিগ্ধ (হালাল না হারাম তা স্পষ্ট বুঝা যায় না)।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। এ দু'টোর মাঝখানে যেগুলো রয়েছে সেগুলো সন্দিগ্ধ। এই সন্দিগ্ধতা থেকে যে বেঁচে থাকবে, সে-ই কেবল তার ধর্মকে নিষ্কলুস করে নিতে পারবে। আর যে এই সন্দিগ্ধতাকে প্রশ্রয় দেবে, সে অবশেষে উপনীত হবে হারামের সীমানায়। যেমন, নিষিদ্ধ কোনো চারণভূমির আশে পাশে বিচরণকারীর ওই চারণভূমিতে প্রবেশের রয়েছে সমূহ সম্ভাবনা। বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত নোমান বিন বশির থেকে।

তিবরানী রচিত সগীর নামক গ্রন্থে বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত হজরত ওমরের মারফু বর্ণনায় রয়েছে— হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। সুতরাং, যা সন্দেহজনক তা পরিত্যাগ করো এবং গ্রহণ করো সন্দেহমুক্তকে।

শেষে বলা হয়েছে—'এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেনো তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো'। এ কথার অর্থ— এতক্ষণ ধরে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদেরকে যে সঠিক নির্দেশনা দান করলেন, তা থেকে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। তাঁর নির্দেশানুসারে চলো।

www.eelm.weebly.com

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

❐ এবং এই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং ইহারই অনুসরণ করিবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করিবে না; করিলে উহা তোমাদিগকে তাঁহার পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও।

'ওয়া আন্না হাজা সিরাতি মুস্তাক্বিমান ফাত্তাবিউ'হু' (এবং এই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ করবে)। ফার্‌রা বলেছেন, এখানে 'ওয়াআন্না হাজা' কথাটির পূর্বে একটি ক্রিয়া অনুক্ত রয়েছে। ওই অনুক্ত ক্রিয়াটিসহ বাক্যটি শুরু হতে পারতো এভাবে— 'ওয়া আত্‌লু আ'লাইকুম আন্না হাজা'। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বলছি যে, এটাই আমার পথ। 'সিরাতি মুসতাক্বিমা' (সরল পথ) এখানে অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ হাজা (এই পথই) কথাটির মাধ্যমে কেবল এই সুরায় বর্ণিত বিষয়াবলীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই সুরায় রয়েছে তিনটি মৌলিক বিষয়ের বর্ণনা— তৌহিদ, রেসালত এবং নবীগণ প্রবর্তিত দ্বীন। এখানে মূল বক্তব্যবিষয় হচ্ছে— ধর্ম রক্ষা সম্ভব কেবল রসুলের একনিষ্ঠ অনুসরণের মাধ্যমে। নবীগণের দ্বীন, আমারই পথ, আমারই দ্বীন।

আমি বলি, এখানে 'আন্না' শব্দটির পূর্বে হরুফে জর (যের প্রদায়ক অক্ষরও) উহ্য থাকতে পারে। যদি তাই হয় তবে এর সংযোগ ঘটবে 'বিহী' (তার সাথে) শব্দের সঙ্গে। বায়যাবী বলেছেন, এখানে উহ্য রয়েছে 'লাম' অক্ষরটি। কেননা প্রথম বাক্যটির পর পরই বলা হয়েছে, ফাত্তাবিউ'হু (এরই অনুসরণ করবে)। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— এ পথেরই অনুসরণ করবে, কারণ এ পথই আমার সরল পথ। আর পথের সারল্যই হচ্ছে, পথ পরিক্রমনের যোগ্যতা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'এ পথই' কথাটির দ্বারা কেবল এ রকম বিষয়বস্তুসম্বলিত এ আয়াতের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বাগবী বলেছেন, আয়াতটি মোহকাম (সুস্পষ্ট)। পূর্বের আয়াত (১৫২) থেকে যে সকল নির্দেশাবলীর বিবরণ চলে এসেছে— সেগুলো রহিত হয়নি। নির্দেশনাগুলো পূর্ববর্তী নবী রসুলগণের শরিয়তেও ছিলো নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধতাই

www.eelm.weebly.com

সকল আসমানী কিতাবের মৌলিক নির্দেশনা। সুতরাং যে এ সকল নির্দেশনার অনুসরণ করবে সে সরল পথ ধরে প্রবেশ করবে জান্নাতে। আর যে অনুসরণ করবে না তার পথের শেষ গন্তব্যস্থল হচ্ছে দোজখ।

শেষে বলা হয়েছে—'করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেনো তোমরা সাবধান হও।' এ কথার অর্থ— তোমরা স্বেচ্ছাচারী হয়ো না। যদি হও তবে সরল পথ থেকে ছিটকে পড়বে। তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে শরিয়ত প্রতিপালনের দায়িত্ব। এর মূল কথা হচ্ছে— অনুসরণ করতে হবে কিতাব ও সুন্নতকে। এটাই আমার দেয়া সরল পথ। এই পথকে পুরোপুরি মেনে নিতে হবে। কিতাব মানবে, সুন্নত মানবে না অথবা কিতাব ও সুন্নতের কিছু অংশ মানবে, কিছু অংশ মানবে না— এ রকম চলবে না। এ রকম করলে তোমরা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। উল্লেখ্য যে, কিতাব ও সুন্নাহ্র পরিপূর্ণ আনুগত্য না করার কারণে উৎপত্তি হয়েছে রাফেজী, খারেজী, জাবারিয়া, কাদ্রিয়া, মুজাস্সামাহ্ ইত্যাদি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের। সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকে সুস্পষ্ট করার নিমিত্তেই আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করেছেন, আল কোরআন। এ কথাটি সুরা বাকারার একটি আয়াতের তাফসীরে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আয়াতটি এই— 'কুল্লামা আদ্বআ লাহুম মাশাও ফিহি ওয়া ইজা আজলামা আ'লাইহিম ক্বমু' (যখন তাদের জন্য আলোকিত হয়, তারা তাতে পথ চলে; আর তাদের উপর আঁধার নেমে আসলে তারা থেমে পড়ে)।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বর্ণনায় এসেছে, একদিন রসুল স. আমাদের সম্মুখে মাটির উপরে একটি রেখা আঁকলেন এবং বললেন, এটাই আল্লাহ্র পথ। এরপর ওই রেখাটির বামে এবং দক্ষিণে আরো অনেক রেখা অংকন করলেন। তারপর বললেন, এই পথগুলোর প্রতিটিতে বসে রয়েছে এক একটি শয়তান। তারা মানুষকে তাদের পথগুলোর দিকে আহ্বান জানিয়ে চলেছে। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াতটি। আহমদ, নাসাঈ, দারেমী।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না আমার আনীত ধর্মের আন্তরিক অনুরাগী হও। বাগবী সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর শরহে সুন্নাহ্ নামক গ্রন্থে। আরবাঈন নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ইমাম নববী। তিনিও হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

www.eelm.weebly.com

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ۟

❒ এবং মূসাকে দিয়াছিলাম কিতাব যাহা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ, যাহা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ নির্দেশ এবং দয়া স্বরূপ— যাহাতে তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস করে।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'ছুম্মা আতাইনা মুসাল কিতাবা' (অতঃপর মুসাকে দিয়েছিলাম কিতাব)। 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটি আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হয় প্রসঙ্গান্তরে গমনের জন্য। লক্ষ্যণীয় যে, এখানে বলা হয়েছে— অতঃপর মুসাকে দিয়েছিলাম কিতাব। অথচ কোরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার বহু পূর্বে হজরত মুসার উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো। তাই প্রশ্ন, এখানে এভাবে ছুম্মা (অতঃপর) শব্দটি ব্যবহৃত হলো কেনো? এর জবাব স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এখানে 'আতাইনা' (দিয়েছিলাম) শব্দটি সম্পর্কিত হবে, 'ওয়াস্‌সাকুম' (তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি) এর সঙ্গে এবং এখানে 'ছুম্মা' ব্যবহৃত হয়েছে কেবল বিলম্বিত বর্ণনা প্রদানের জন্য। সময়ের অগ্র-পশ্চাৎ প্রদর্শনের জন্য নয়। যেনো বক্তব্য বিষয়টি এখানে এ রকম— হে আমার রসুল! আপনি এ কথাটিও জেনে নিন যে, আমি মুসাকেও এ রকম সদুপদেশ সম্বলিত কিতাব দিয়েছিলাম। অথবা বক্তব্য বিষয়টি এখানে এ রকম— এতক্ষণ ধরে আপনার নিকট বিবৃত সদুপদেশাবলী চিরন্তন। আপনাকে যে সকল সদুপদেশ দান করেছি, সে রকম সদুপদেশ আমি মুসাকেও দান করেছিলাম। তাই আপনি ছাড়া, মুসা অন্য সকল নবী রসুলদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। এ রকম অর্থ করলে বুঝতে হবে 'আতাইনা' (দিয়েছিলাম) কথাটির পূর্বে কুল (বলুন) শব্দটি উহ্য রয়েছে এবং পূর্ববর্তী যে সকল আয়াতের শুরুতে কুল শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, তার সঙ্গে রয়েছে এখানকার উহ্য কুল— এর সম্পর্ক। এভাবে অর্থ হবে— হে আমার রসুল! আপনি জনতাকে এ কথাও জানিয়ে দিন যে, আমি মুসাকেও এ রকম কিতাব দিয়েছিলাম। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটির প্রকৃত অর্থ হবে 'ওয়াও' (এবং)। এ রকম অর্থ করা হলে সময়ের অগ্র-পশ্চাতের প্রশ্নটি আর উঠবে না। যেমন, সুম্মাল্লাহু শহীদ (আর আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন সাক্ষী)। এখানে সুম্মা অর্থ এবং, আর।

আমি বলি, সম্ভবতঃ এই আয়াতের বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষকে লক্ষ্য করে। কিন্তু আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে অনুপস্থিতদের উপর। তাই

www.eelm.weebly.com

এখানে ঘটেছে এ রকম শব্দরূপের ব্যবহার। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য আয়াতটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছিলাম। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী-রসুলের উপর প্রবর্তন করেছিলাম বিভিন্ন শরিয়তের। সেগুলোর প্রত্যেকটিতে এ রকম সদুপদেশ ছিলো— যেরূপ সদুপদেশ দেয়া হলো এখন, এ কোরআনের মাধ্যমে। আর এই কোরআনে আমি আরো কিছু অতিরিক্ত বিধান দান করেছি।

'তামামান আ'লাল্লাজি আহ্সানা' (যা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পন্ন)। এ কথার অর্থ— পূর্ববর্তী নবী-রসুলের শরিয়তের একনিষ্ঠ অনুসরণ যারা করেছিলো, তারা লাভ করেছিলো পূর্ণ সফলতা। কিন্তু যারা আল্লাহ্তায়ালার অতুলনীয় এককত্বের প্রতি ইমান আনেনি এবং তাদের প্রতি প্রবর্তিত শরিয়তের অনুসরণ করেনি, তারা যেমন তওরাত থেকে উপকৃত হয়নি তেমনি উপকৃত হবে না কোরআন থেকে। আর তারা সফলও হবে না। এখানে 'আলাল্লাজি আহ্সানা' (সৎকর্মপরায়ণ যারা) কথাটির উদ্দেশ্য হজরত মুসা। অর্থাৎ যারা হজরত মুসার শরিয়তের পূর্ণ অনুসরণ করেছে, তারা হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামতে পরিপূর্ণ। 'আল্লাজি' শব্দটি একবচন, বহুবচন— সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কথাটির উদ্দেশ্য হজরত মুসার ওই সকল উম্মত— যারা ইমানের সঙ্গে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (আল্লাজি আহ্সানা) বাক্যাংশটিকে পড়তেন আল্লাজিনা আহ্সানু। এই উচ্চারণরীতির মাধ্যমে বর্ণিত ব্যাখ্যাটি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে।

হজরত আবু উবাদা বলেছেন, 'আল্লাজি আহ্সানা' অর্থ নবী-রসুলগণ। এ অর্থটি গ্রহণ করলে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যরূপটি হবে এ রকম— আমি সকল নবী-রসুলের উপরে অধিকতর মর্যাদা প্রদানের জন্য কিতাব দান করেছি। তাকে তওরাত দান করে তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছি।

'ওয়া তাফসিলাল্ লিকুল্লি শাই ইঁউ ওয়া হুদাঁও ওয়া রহমাতা (যা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ নির্দেশ এবং দয়া স্বরূপ)। এখানে তাফসিল (বিশদ বিবরণ) শব্দটি একটি মূল শব্দ, যা কর্মকারক এবং মৌসুফ মাহ্জুফ (উহ্য বিশেষ্য) এর বিশেষণ হয়েছে। অর্থাৎ এখানে 'বিশদ বিবরণ' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই সকল বিস্তারিত বিবরণাবলীকে, যেগুলো দ্বীন ধর্মের জন্য অত্যাবশ্যক।

শেষে বলা হয়েছে— লায়া'ল্লাহুম বিলিক্বাই রব্বিহিম ইউ'মিনুন (যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে)। এ কথার অর্থ— মুসাকে আমি তওরাত দিয়েছিলাম এ জন্যে, যেনো তাঁর সময়ের লোকেরা আল্লাহ্র সম্মুখে যে এক সময় জবাবদিহির জন্য দাঁড়াতেই হবে, সে সম্বন্ধে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে হাশর, সওয়াব ও আযাবকে (আখেরাতের শাস্তি ও স্বস্তিকে)।

www.eelm.weebly.com

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۖ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ۝ اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ؕ سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ۝

❐ এই কিতাব আমি অবতারণ করিয়াছি যাহা কল্যাণময়। সুতরাং উহার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হইবে;

❐ যেন তোমরা না বলিতে পার যে, 'কিতাব তো শুধু আমাদিগের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হইয়াছিল; আমরা তাহাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে তো অনবহিতই ছিলাম,'

❐ কিংবা যেন তোমরা না বলিতে পার যে, 'যদি কিতাব আমাদিগের প্রতি অবতীর্ণ হইত তবে আমরা তো তাহাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দিশা পাইতাম।' এখন তো তোমাদিগের নিকট তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে স্পষ্ট প্রমাণ, পথ-নির্দেশ ও দয়া আসিয়াছে। অতঃপর যে-কেহ আল্লাহের নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিবে এবং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে তাহার চেয়ে বড় জালিম আর কে? যাহারা আমার নিদর্শন হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় তাহাদিগের এই আচরণের জন্য আমি তাহাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিব।

'এই কিতাব আমি অবতারণ করেছি যা কল্যাণময়'— এ কথার অর্থ, রসুল মুসার উপরে আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, আর এখন অবতারণ করছি এই কোরআন। কল্যাণময়তার দিক থেকে এই কোরআন তওরাত অপেক্ষা অধিকতর অগ্রগামী। এর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। কিন্তু মর্মার্থ ব্যাপক। এটাই সর্বশেষ কিতাব। এখন সকল মানুষের জন্য এই কিতাবই একমাত্র অনুসরণীয়। এ কথাই বলে দেয়া হয়েছে পরবর্তী বাক্যে এভাবে— 'সুতরাং, এর অনুসরণ কোরো এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।'

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১৫৬) বলা হয়েছে—'যেনো তোমরা না বলতে পারো যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছিলো; আমরা তাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে তো অনবহিতই ছিলাম।' এখানে 'দুই সম্প্রদায়' (ত্বইফাতাইনি) অর্থ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়। এই দুই সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপরও কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো। কিন্তু সেগুলো ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও ইঞ্জিলের চেয়ে অধিকতর প্রসিদ্ধ নয়। তাই প্রসিদ্ধ কিতাব দু'টির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আরববাসীদেরকে লক্ষ্য করে এখানে আরেকটি কথা বলা হয়েছে যে— এই কোরআন তোমাদের প্রতি তোমাদের ভাষায় অবতীর্ণ করা হলো, যেনো তোমরা এর বক্তব্য সহজে বুঝে নিতে পারো। এ কথা যেনো বলতে না পারো যে তওরাত ও ইঞ্জিলের ভাষাতো আমরা বুঝি না (সুতরাং অনুসরণ করবো কিভাবে)।

এই বক্তব্যের ধারাবাহিকতা চলে এসেছে পরবর্তী আয়াতেও (১৫৭)। বলা হয়েছে— কিংবা যেনো তোমরা না বলতে পারো যে, যদি কিতাব আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হতো তবে আমরা তো তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দিশা পেতাম। এখন তো তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, পথ নির্দেশ ও দয়া এসেছে।

বাগবী লিখেছেন, অবিশ্বাসীদের একটি দল বলেছিলো, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো আমাদের প্রতিও যদি কোনো কিতাব অবতীর্ণ হতো, তবে কতই না উত্তম হতো। এখানে উল্লেখিত 'বাইয়্যিনাতুম্ মির্‌রব্বিকুম' কথাটির অর্থ— প্রতিপালকের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণ। 'হুদান' অর্থ পথ নির্দেশ এবং 'রহমত' অর্থ দয়া। অর্থাৎ কোরআন হচ্ছে সুবিবেচকদের জন্য স্পষ্ট প্রমাণ, সত্যানুসন্ধানীদের জন্য নির্ভুল পথনির্দেশ এবং অনুগতদের জন্য রহমত। আলোচ্য বাক্যের বক্তব্যবিষয় হচ্ছে— হে মক্কাবাসী! দ্যাখো তোমাদের আপন ভাষায় সর্বশেষ কিতাব আল কোরআন অবতীর্ণ হয়ে চলেছে। এতে রয়েছে প্রকাশ্য প্রমাণ, পথনির্দেশ ও দয়া।

শেষে বলা হয়েছে— 'অতঃপর যে কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে? যারা আমার নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের এই আচরণের জন্য আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিবো।' এ কথার অর্থ— ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় অত্যাচারী কে— যে স্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশ এবং দয়ার আধার এই আল কোরআনকে প্রত্যাখ্যান করে ও এর কল্যাণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবে এ কথাও আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমার নিদর্শনের প্রতি বৈমুখ্য একটি গর্হিত ও অমার্জনীয় অপরাধ। যারা এই অপরাধে অপরাধী তাদেরকে অবশ্যই আমি নিকৃষ্ট শাস্তি (সুআল আ'যাব) দান করবো।

www.eelm.weebly.com

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ۝

❐ তাহারা শুধু ইহারই প্রতীক্ষা করে যে, তাহাদিগের নিকট ফেরেশ্‌তা আসিবে, কিংবা তোমার প্রতিপালক আসিবেন, কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে। যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে সেদিন যে-ব্যক্তি পূর্বে বিশ্বাস করে নাই তাহার বিশ্বাস কোন কাজে আসিবে না। কিংবা যাহার বিশ্বাস কল্যাণপ্রসূ ছিল না তাহার সৎকর্মও কোন কাজে আসিবে না; বল, 'প্রতীক্ষা কর, আমিও প্রতীক্ষা করিতেছি।'

'হাল ইয়ান জুরুনা ইল্লা আন তা'তিয়াহুমুল মালায়িকাতু আও ইয়া'তিয়া রব্বুকা আও ইয়া'তিয়া বা'দ্বু আয়াতি রব্বিক' (তারা শুধু এরই প্রতীক্ষা করে যে, তাদের নিকট ফেরেশ্‌তা আসবে কিংবা তোমার প্রতিপালক আসবেন কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন আসবে) এ কথার অর্থ— মক্কাবাসীরা কি শুধু এরই প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তাদের নিকট কোনো ফেরেশ্‌তা এসে রসুল স. এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে কিংবা আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে সাক্ষ্য দিবেন অথবা অবতীর্ণ হবে তাঁর কোনো বিশেষ নিদর্শন? এখানে 'হাল ইয়ান জুরুনা' (তারা কি শুধু এরই প্রতীক্ষা করে) কথাটি একটি নেতিবাচক জবাববিশিষ্ট প্রশ্ন (ইসতিফহামে ইনকারী)। অর্থাৎ মক্কাবাসীরা আসলে ইমানের জন্যে প্রতীক্ষা করছে না, প্রতীক্ষা করছে তাদের মূর্খজনোচিত দাবি পূরণের জন্য। সে দাবিগুলো হচ্ছে— কোনো ফেরেশ্‌তা কিংবা আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং তাদের নিকটে এসে রসুল স. এর পক্ষে সাক্ষ্যপ্রদান করবেন অথবা রসুল স. এর সত্যতার পক্ষে অবতীর্ণ হবে কোনো বিশেষ নিদর্শন। 'আল মালায়িকাতু' শব্দটির অর্থ ফেরেশ্‌তা। সাক্ষ্যদাতা ফেরেশ্‌তা অথবা মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা।

বায়যাবী বলেছেন, মক্কাবাসী মুশরিকেরা আসলে প্রতীক্ষারত ছিলো না। কিন্তু তাদের ভাব ছিলো এ রকম, যেনো তারা প্রতীক্ষায় রয়েছে। তাদের ওই অভিব্যক্তিকে সত্য বলে ধরে নিয়েই এখানে বলা হয়েছে— তারা কি শুধু এরই প্রতীক্ষা করে।

www.eelm.weebly.com

এ রকমও হতে পারে যে 'ফেরেশ্তা আসবে' কথাটির অর্থ এখানে— হাশরের ময়দানে যখন ফেরেশ্তারা সমবেত হবে। 'তোমার প্রতিপালক আসবেন'— কথাটির অর্থও তেমনি কিয়ামতের দিন হাশর প্রান্তরে আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং যখন বিচারকের ভূমিকায় আবির্ভূত হবেন। এ সম্পর্কে সুরা বাকারায় বলা হয়েছে— 'হাল ইয়ানজুরুনা ইল্লা আঁইয়াতইয়াইহুমুল্লহু ফি জিলালিম মিনাল গমামি ওয়াল মালায়িকাতি ওয়া কুদ্বিয়াল আমরা'(তারা কি অপেক্ষা করছে যে, মেঘের ছায়া থেকে তাদের নিকট আসবেন আল্লাহ্ এবং ফেরেশতামণ্ডলী। আর নিষ্পত্তি হয়েছে বিষয়টি)।

ইয়াওমা ইয়া'তি বা'দু আয়াতি রব্বিকা (যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন আসবে)। এ কথার অর্থ— যেদিন প্রকাশিত হবে কিয়ামতের আলামত। বাগবী লিখেছেন কথাটির অর্থ, যেদিন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ অভিমতটির সমর্থক। হজরত আবু সাঈদ খুদরীর একটি মারফু বর্ণনায় এ রকমই বলা হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ওমর একদিন বক্তৃতাপ্রদানকালে বললেন, এই উম্মতের মধ্যে এমন লোকও আসবে— যারা আল্লাহ্র বিধানকে অস্বীকার করবে, মিথ্যা বলবে দাজ্জালের আবির্ভাবকে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়কে এবং রসুল স. এর শাফায়াতকে। কতিপয় লোক যে সাময়িক দোযখের শাস্তি ভোগ করার পর শাস্তিমুক্ত হবে— সে কথাকেও অস্বীকার করে বসবে কেউ কেউ।

কিয়ামতের আলামতঃ হজরত হুযায়ফা বিন উসায়েদ গিফারী বর্ণনা করেছেন, আমরা একদিন নিজেদের মধ্যে কিয়ামত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। সহসা রসুলুল্লাহ্ স. সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, যতদিন পর্যন্ত কিয়ামতের পূর্বে দশটি নিদর্শন প্রকাশিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। সেই দশটি নিদর্শন হচ্ছে— ১. ধুম্র কুণ্ডলী ২. দাজ্জাল ৩. দাব্বাতুল আরদ্ব ৪. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ৫. হজরত ঈসার অবতরণ ৬. ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব, তিনবার পৃথিবী ধসে যাওয়া ৭. একবার পূর্বদিকে ৮. দ্বিতীয়বার পশ্চিম দিকে ৯. আরেকবার আরব দ্বীপে এবং ১০. পরিশেষে ইয়ামেনের আগুন— ওই আগুনগুলো মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এডেনের একটি কূপ থেকে আগুন বের হয়ে মানুষকে হাশরের প্রান্তরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, দশটি নিদর্শনের মধ্যে একটি হবে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা' বায়ু। ওই ঝঞ্ঝা তুফান সকল মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের সর্বপ্রথম নিদর্শন দু'টি হচ্ছে— পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় এবং দিবসের প্রারম্ভে দাব্বাতুল আরদের বহিঃপ্রকাশ। নিদর্শন দু'টোর প্রকাশকাল হবে পরস্পর সংলগ্ন। মুসলিম।

হজরত নাওআস বিন সামআন বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একদিন দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন। বললেন, আমার পৃথিবীবাসের সময়ে যদি তার আবির্ভাব ঘটে, তবে আমিই তোমাদের পক্ষ থেকে তার মোকাবিলা করবো। আর আমার পৃথিবী পরিত্যাগের পর যদি সে আত্মপ্রকাশ করে, তবে আত্মরক্ষার দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের। তোমরা সত্যপথে থাকলে নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালাই তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। দাজ্জাল হবে নওজোয়ান। তার মাথায় থাকবে ঝাঁকড়া চুল। তার এক চোখ হবে ফোলা। মনে হবে চোখটি যেনো বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। আবদুল উজ্জা বিন কাতানের সঙ্গে দাজ্জালের চেহারা তুলনা করা যায়। যদি তোমরা দাজ্জালের সাক্ষাত পাও, তবে সুরা কাহাফের প্রথম দিকের কিছু আয়াত পাঠ কোরো। যদি এ রকম করো তবে দাজ্জালের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে। ইরাক এবং সিরিয়া দেশের মধ্যবর্তী খালাহ্ নামক স্থানে হবে তার আবির্ভাব। সে তার বাম এবং দক্ষিণের সকল কিছু ধ্বংস করতে থাকবে। হে আল্লাহ্র দাস সকল! তোমরা আল্লাহ্র হুকুমের প্রতি (ইমানের প্রতি) সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সে পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করবে? তিনি স. বললেন, চল্লিশ দিন। তার মধ্যে একটি দিন হবে এক বৎসরের সমান। আরেকটি দিন হবে এক মাসের সমান এবং অন্য আরেকটি দিন হবে এক সপ্তাহের সমান। অবশিষ্ট দিনগুলো হবে এখনকার এক দিনের মতো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যে দিনটি এক বৎসরের সমান হবে সেই দিনে কি আমরা এক দিনের (পাঁচ ওয়াক্ত) নামাজ পড়বো? তিনি বললেন, না। অনুমান করে এখনকার দিনের মতো একটি করে দিন নির্ধারণ করে নিয়ে প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সে কি দ্রুত গতিসম্পন্ন হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বাতাস যেমন বৃষ্টিকে পশ্চাতে রেখে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে, তেমনি হবে তার গতি। তাকে যারা দেখবে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে বিশ্বাস করবে। দাজ্জালের হুকুমে তখন ওই লোকগুলোর জনপদে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। জন্ম হবে উদ্ভিদের। গৃহপালিত পশুগুলো চারণভূমি থেকে সন্ধ্যায় ফিরে আসবে যখন, তখন দেখা যাবে তাদের স্তনগুলো দুধে ভরপুর। তারপর দাজ্জাল আরো কিছু লোকের সম্মুখীন হবে। তাদেরকেও সে তাকে বিশ্বাস করার জন্য আহ্বান জানাবে। কিন্তু ওই লোকেরা তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে। দাজ্জাল অন্যত্র গমন করার পর ওই লোকগুলো

www.eelm.weebly.com

পড়ে যাবে বিপদে। তাদের সকল সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে। নিঃস্ব হয়ে পড়বে তারা। এরপর দাজ্জাল এক বিজন প্রান্তরের পথ ধরে গমন করবে। সে মৃতকে জীবিত করে দেখাবে। সকল সম্পদ থাকবে তার সঙ্গে, যেমন মৌচাকের সঙ্গে থাকে মৌমাছিরা। এরপর দাজ্জাল এক যুবককে তার তরবারি দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলবে এবং তার শরীরের বিভিন্ন অংশ ফেলে দেবে বিভিন্ন স্থানে। কিন্তু দাজ্জাল তার নাম ধরে ডাক দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই যুবক জীবিত হয়ে হাসতে হাসতে আত্মপ্রকাশ করবে। পৃথিবী জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হবে তার দোর্দণ্ড প্রতাপ। এমতাবস্থায় আকাশ থেকে অবতরণ করবেন হজরত ঈসা। তিনি আকসার মসজিদে শাদা মিনারের উপরে দু'জন ফেরেশ্‌তার কাঁধে ভর দিয়ে নামবেন। সামান্য মস্তক অবনত হলে তাঁর মস্তক থেকে ঝরে পড়বে রৌপ্যবিন্দুর মতো স্বেদবিন্দু। তার নিঃশ্বাস যে অবিশ্বাসীর উপর পতিত হবে, সে তৎক্ষণাৎ ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত পতিত হতে থাকবে তাঁর নিঃশ্বাস। তিনি দাজ্জালকে খুঁজে বেড়াবেন। অবশেষে বাবে লাদ নামক স্থানে তাকে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে ফেলবেন। এরপর হজরত ঈসার নিকটে কতিপয় লোক আসবে যাদেরকে আল্লাহ্‌পাক দাজ্জালের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। হজরত ঈসা তাদের মুখমণ্ডল থেকে আবিলতা অপসারণ করবেন এবং তারা যে জান্নাতের বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, সে কথা তাদেরকে বলবেন।

এরপর আল্লাহ্‌পাক হজরত ঈসার নিকট এই মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠাবেন যে, আমার এমন কিছু বান্দা রয়েছে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি কারো নেই। তাই তুমি তোমার সাথীদেরকে নিয়ে তুর পর্বতে গমন করো। এরপর পৃথিবীতে দলে দলে ছড়িয়ে পড়বে ইয়াজুজ মাজুজের দল। প্রতিটি উচ্চ ভূমির পশ্চাৎদেশ থেকে তারা হঠাৎ বের হয়ে পড়বে। তারা হবে অসংখ্য। তাদের প্রথম দল তিবরিয়া সাগর অতিক্রম করার সময় সেখানকার সকল পানি পান করে ফেলবে এমনভাবে যে, পানির কোনো চিহ্নই সেখানে অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের পরবর্তী দল সেখানে এলে বলবে, এখানে কখনোই কোনো পানির অস্তিত্ব ছিলো না। পথ চলতে চলতে তারা উপনীত হবে বায়তুল মাকদিসে খামর পর্বতে। বলবে, আমরা পৃথিবীবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আমরা হত্যা করবো আকাশবাসীকে। এই বলে তারা তাদের ছোট ছোট তীর আকাশের দিকে নিক্ষেপ করবে। তীরগুলো মাটিতে পড়লে তারা দেখবে সেগুলোর অগ্রভাগে লেগে রয়েছে রক্ত। ওই রক্ত দেখে তারা খুব খুশী হবে। আল্লাহ্‌র রসুল হজরত ঈসা সে সময়ে তাঁর সাথীদেরকে সঙ্গে নিয়ে তুর পাহাড়ে আত্মগোপন করে থাকবেন। অবস্থা তখন এমনই সংকটাপন্ন হবে যে, একটি ষাঁড়ের রান হবে তাদের জন্য অতি উত্তম— যেমন এখনকার একশত স্বর্ণমুদ্রা উত্তম। হজরত ঈসা ও তাঁর সহচরবৃন্দ ইয়াজুজ মাজুজকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌পাকের দরবারে প্রার্থনা জানাবেন। তাঁর প্রার্থনা গৃহীত হবে। আল্লাহ্‌তায়ালা ইয়াজুজ মাজুজদের ঘাড়ে ফোঁড়া অথবা গলায়

www.eelm.weebly.com

গলগণ্ড রোগ সৃষ্টি করে দেবেন। ফলে নিরাময়হীন ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে তারা একে একে সকলেই মৃত্যুবরণ করবে। তুর পাহাড় থেকে নেমে আসবেন হজরত ঈসা এবং তাঁর সাথীরা। কিন্তু দেখবেন সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ইয়াজুজ মাজুজদের উৎকট দুর্গন্ধে ভরা অসংখ্য মরদেহ। অসহ্য দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে হজরত ঈসা তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তখন উটের মতো দীর্ঘ গলদেশ বিশিষ্ট এক ঝাঁক পাখি পাঠিয়ে দেবেন। পাখিগুলো তাদের মৃতদেহগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহ্‌পাক যেখানে ইচ্ছে করবেন সেখানে নিক্ষেপ করবে। এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্‌তায়ালা ওই মৃতদেহগুলো নিক্ষেপ করবেন নাহবল নামক স্থানে।

জ্ঞাতব্যঃ কামুস রচয়িতা উল্লেখ করেছেন, ইমাম তিরমিজির হাদিস গ্রন্থে রয়েছে নাহবল নামক স্থানের কথা। কিন্তু উচ্চারণটি ঠিক নয়। নুন এর স্থলে মিম অক্ষর বসালে শব্দটি হবে মাহবল। আর এটাই সঠিক উচ্চারণ।

মৃত ইয়াজুজ মাজুজদের তীর এবং তীরাধারগুলোকে সাত বছর ধরে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করবে তখনকার মুসলমানেরা। এভাবে ইয়াজুজ মাজুজ নিধনের পর সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শুরু হবে তুমুল বৃষ্টি। ওই বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে সারা পৃথিবী। কোনো কিছুই তখন আর অপরিচ্ছন্ন ও অপবিত্র থাকবে না। পৃথিবীতে নূতন করে উৎপন্ন হবে সব্‌জি ও অন্যান্য উদ্ভিদ। তখনকার মাটি হবে অত্যন্ত উর্বর। ফলমূল হবে আকারে অনেক বড়। একটি আনার অথবা বেদানা ভক্ষণ করলে পরিতৃপ্ত হবে একটি দল। তারা আনারের খোসা দিয়ে বানাবে ঘরের ছাদ। দুধের মধ্যেও দান করা হবে অনেক বরকত। একটি বড় গোত্রের মানুষের জন্য একটি উটের দুধই হবে যথেষ্ট। গাভীর দুধ যথেষ্ট হবে একটি উপ-গোত্রের জন্য এবং একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে একটি ছাগলের দুধ। আল্লাহ্‌তায়ালা তখন প্রবাহিত করে দিবেন একটি সুবাসিত বাতাস। ওই বাতাস ইমানদার লোকের বগলে লাগলে সঙ্গে সঙ্গে জীবনাবসান হবে। এভাবে ইমানদারেরা চলে গেলে পৃথিবীতে পড়ে থাকবে কেবল অসৎ লোকেরা। তারা শুরু করবে বিশৃংখলা ও হানাহানি— যেমন করে নিজেদের মধ্যে বিশৃংখলা ও হানাহানি সৃষ্টি করে গর্দভের দল। এদের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে কিয়ামত। তিরমিজি। মুসলিমও এই হাদিসটির বর্ণনাকারী। তবে তাঁর বর্ণনায় এই কথাগুলো নেই।

হজরত হুযায়ফা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দাজ্জালের কাছে থাকবে স্বচ্ছ সলিল ও জ্বলন্ত অনল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওই স্বচ্ছ সলিলই হবে অগ্নিকুণ্ড এবং ওই জ্বলন্ত অনল হবে সুমিষ্ট সলিল। তোমরা দাজ্জালকে পেলে তার আগুনে ঝাঁপ দিও। তবেই তোমরা লাভ করবে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানি। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্ত উল্লেখিত হয়েছে এই কথাগুলো— দাজ্জালের এক চোখ হবে অন্ধ এবং পর্দাবৃত। আর থাকবে একটি বৃহৎ নখর। তার দু'চোখের

www.eelm.weebly.com

মাঝখানে লেখা থাকবে— কাফের। ওই লেখাটি কেবল ইমানদারেরা পড়তে পারবে— তাদের অক্ষরজ্ঞান থাকুক অথবা নাই থাকুক।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, দাজ্জালের সাথে থাকবে বেহেশত ও দোজখের প্রতিকৃতি (বেহেশতের আরাম অথবা দোযখের কষ্ট)। সে যেটাকে জাহান্নাম বলবে সেটাই হবে আসলে জান্নাত। আর যেটাকে সে বলবে জান্নাত সেটাই হবে আসলে দোজখ। মুসলিমে বর্ণিত হজরত হুযায়ফার বর্ণনায় এ রকমই বলা হয়েছে। মুসলিম কর্তৃক সংকলিত হজরত আবু সাঈদ খুদরীর আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে, দাজ্জালকে দেখলে ইমানদারেরা বলবে, এই সেই দাজ্জাল, যার কথা রসুল স. বলেছেন। দাজ্জাল তখন তাদেরকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত চিরে ফেঁড়ে আলাদা করে ফেলবে। তাদের দ্বিখণ্ডিত দেহের মাঝখানে বসে সে বলবে, হে ইমানদারেরা! ওঠো। দণ্ডায়মান হও। মৃত ইমানদারেরা তখন জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। দাজ্জাল বলবে, কী— এবার কি আমার উপর বিশ্বাস এসেছে? ইমানদারেরা বলবে, হ্যাঁ এবার আমাদের বিশ্বাস হয়েছে আরো বেশী মজবুত (তুমি নিশ্চয়ই দাজ্জাল)।

হজরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, দাজ্জালের কঠিনতম ফেৎনাটি হবে এ রকম— সে এক আরববাসীকে বলবে, আমি যদি তোমার মৃত উটনীকে জীবিত করে দেই তবে কি তুমি আমাকে প্রভুপালক বলে স্বীকার করবে? লোকটি বলবে, অবশ্যই করবো। তখন শয়তান উটনীর রূপ ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হবে। ওই উটনীটির থাকবে পুরুষ্ট স্তন এবং উঁচু কুঁজ। আরেকটি ঘটনা হচ্ছে— পিতৃহারা ও ভ্রাতৃহারা এক লোকের নিকট গিয়ে দাজ্জাল বলবে, তোমার পিতা ও ভাইকে আমি যদি জীবিত করে দেই তবে তুমি কি আমাকে প্রভুপ্রতিপালক বলে মানবে? লোকটি বলবে, অবশ্যই মানবো। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দু'টি শয়তান তার পিতা ও ভ্রাতার আকৃতি নিয়ে আবির্ভূত হবে।

অনালোচিত আলোচনা : ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবেন বর্ণিত আলামতগুলো প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে। হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীর আয়ুষ্কাল যদি একদিনও বাকী থাকে তবু আল্লাহ্ ওই দিনকে করে দিবেন সুদীর্ঘ এবং এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যে হবে আমাদের। অথবা বলেছেন, সে হবে আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। তার নাম হবে আমার নামের অনুরূপ এবং তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নামের মতো (তার নাম হবে মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্)। এখনকার মতো ওই সময়েও অত্যাচার ও অবিচারে ভরে থাকবে সারা পৃথিবী। পৃথিবীতে সে প্রতিষ্ঠা করবে সাম্য ও

www.eelm.weebly.com

ন্যায়বিচার। তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. বলেছেন, দুনিয়া ততদিন পর্যন্ত ধ্বংস হবে না, যতদিন না আরব সাম্রাজ্যের অধিপতি হবে আমার আহলে বাইতের একজন। আমার নামের মতো তার নামও হবে মোহাম্মদ।

হজরত উম্মে সালমার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, এক খলিফার মৃত্যুর পর মানুষের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হবে। তখন মদীনাবাসীদের একজন চলে যাবেন মক্কায়। মক্কাবাসীরা তাকে গৃহ থেকে বের করে নিয়ে আসবে। তিনি কিন্তু জনতার এমতো আচরণে প্রসন্ন হবেন না। তৎসত্ত্বেও রুকন (হজরে আসওয়াদ) এবং মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যস্থলে তিনি জনতাকে বায়াত করাবেন। তাঁর বিরুদ্ধে সিরিয়া থেকে প্রেরিত হবে একটি বাহিনী। কিন্তু আল্লাহ্পাক তাদেরকে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী বায়দা নামক স্থানে মাটিতে ধ্বসিয়ে দিবেন। মানুষ এ দৃশ্য দেখে বিস্মিত হবে। তাঁর কাছে আসবে সিরিয়ার আবদাল এবং ইরাকের একটি দল। তারা সকলে তাঁর নিকট বায়াত গ্রহণ করবে। ওই ব্যক্তি হবেন রসুলের আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী। আর কেবল ইসলামের জন্য তিনি মাটিতে বিছিয়ে দিবেন তাঁর বুক (সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলাম)। সাত বৎসর পৃথিবীতে শাসন প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি পরলোক গমন করবেন। মুসলমানেরা তাঁর জানাজা পড়বে। আবু দাউদ।

আবু দাউদের বর্ণনায় আরো রয়েছে, একদিন হজরত আলী হজরত হাসানকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, আমার এই প্রিয় পুত্র সাইয়েদ। রসুল স. নিজে এঁকে সাইয়েদ বলেছেন। এঁর পরবর্তী বংশধারা থেকে এমন এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন— যাঁর নাম হবে তোমাদের নবীর নামের অনুরূপ। স্বভাবগত দিক দিয়েও তিনি হবেন তোমাদের নবীর মতোন— যদিও শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে সে রকম হবেন না। সমগ্র পৃথিবীতে তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন ন্যায়ের শাসন।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম মাহদী সম্পর্কে এ কথাও এসেছে যে, তখন এক ব্যক্তি বলবে, হে ইমাম মাহদী! আমাকে কিছু দান করুন। ইমাম মাহদী তখন ওই ব্যক্তিকে দু'হাত ভরে দান করবেন, যতটুকু সে বহন করতে পারে। তিরমিজি।

হাকেম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসীরা তার প্রতি তুষ্ট থাকবে। তখন মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হবে পৃথিবীতে। উৎপন্ন হবে প্রচুর ফল ও ফসল। ওই অভূতপূর্ব প্রাচুর্য দেখে তখনকার লোকেরা তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের জন্য বলবে হায়! আজ যদি তারা জীবিত থাকতো তবে ফল ও ফসলের এই বিশাল সমারোহ দেখে পরিতৃপ্ত হতে পারতো। ইমাম

www.eelm.weebly.com

মাহদী সাত, আট অথবা নয় বছর পৃথিবীর শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন। তারপর চলে যাবেন পরপারে।

'যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন আসবে, সেদিন যে ব্যক্তি পূর্বে বিশ্বাস করেনি তার বিশ্বাস কোনো কাজে আসবে না। কিংবা যার বিশ্বাস কল্যাণপ্রসূ ছিলো না তার সৎকর্মও কোনো কাজে আসবে না'। আলোচ্য বক্তব্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— ইমান আনতে হবে যথা সময়ে। অর্থাৎ মৃত্যুকষ্ট শুরু হওয়ার পূর্বে। ইমান আনতে বলা হয়েছে অদৃশ্য বিষয়সমূহের উপর। যখন মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা এসে উপস্থিত হয়, যবনিকা উন্মোচিত হয় পরকালের— তখন তো বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ আর অদৃশ্য থাকে না। তাই তখনকার ইমান গৃহীতও হয় না।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সৎকর্ম বা আমল ব্যতীত শুধু ইমানের মাধ্যমে কোনো উপকার লাভ হয় না। তাই মৃত্যুর পূর্বে ইমান আনা হলেও আমলবিহীন ইমানও গ্রহণীয় নয়।

আমি বলি, এই আয়াতের মর্মার্থ এটা নয় যে, সৎকর্মহীন ইমান গ্রহণীয় নয়। এখানে বরং এ কথাই বলা হয়েছে যে, পরকাল যাত্রার প্রাক্কালে ইমান আনলেও নেক আমল করার আর সুযোগ থাকে না। তাই ওই সময়ের নেক আমলহীন ইমান গ্রহণ করা হয় না। এ রকমও জবাব দেয়া যেতে পারে যে, একই সঙ্গে উল্লেখিত দু'টি কর্মের যদি একটি না সূচক হয়, তবে অপর কর্মটিও ওই না সূচকতার বৃত্তভূত হয়ে যায়। অন্য এক আয়াতে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন—'ওয়ালা তুতিয়্ মিনহুম আছিমান আওকাফুরা' (এবং তাদের পাপ ও অবিশ্বাস ফলপ্রসূ হবে না)। এখানে 'আছিমান' (গোনাহ্) এবং 'কাফুরা' (অবিশ্বাস) শব্দ দু'টির মাধ্যমে আনুগত্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে (ইছমান শব্দটি এখানে 'লা' শব্দের অন্তর্গত এবং কাফুরা শব্দটি এখানে এসেছে 'আও' শব্দের পরে। কিন্তু আনুগত্য নিষিদ্ধকরণের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এখানে আছিমান ও কাফুরা— দু'টি শব্দেরই সঙ্গে)। এই ব্যাখ্যানুসারে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে এ রকম— যে সারা জীবন ধরে ইমান আনে নি, তার মৃত্যু যন্ত্রণার সময়ের ইমান কোনো উপকারে আসবে না এবং যে জীবদ্দশায় কোনো পুণ্যকর্ম করেনি, তার জন্যও মৃত্যুর সময়ের ইমান কোনো উপকারে আসবে না।

বাগবী বলেছেন, আলোচ্য বক্তব্যের অর্থ হবে এ রকম— মৃত্যুযন্ত্রণার সময় কোনো কাফের ইমান আনলে তা গৃহীত হবে না এবং কোনো ফাসেক তওবা করলে তা কবুলও হবে না। এখানে 'ফি ইমানিহা' কথাটির মধ্যে যে ইমানের উল্লেখ রয়েছে সেই ইমানের পরোক্ষ অর্থ হচ্ছে তওবা। তওবা বলতে অবিশ্বাস থেকে তওবা এবং পাপ থেকে তওবা দু'টোই বুঝায়।

www.eelm.weebly.com

রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ্ পশ্চিম দিকে তওবার জন্য একটি তোরণ নির্মাণ করেছেন। ওই তোরণের প্রশস্ততা সত্তর বছরের পথের পরিসরের সমান। পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় না ঘটা পর্যন্ত ওই তোরণ কখনও রুদ্ধ হবে না। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'যে দিন তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন আসবে'— কথাটির মাধ্যমে ওই তোরণ রুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। তাই কথাটির অর্থ হবে— যেদিন তোমার প্রতিপালকের নিদর্শন স্বরূপ পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় ঘটবে এবং রুদ্ধ হয়ে যাবে তওবার তোরণ। হজরত সাফওয়ান বিন আসসাল থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি ও ইবনে মাজা।

হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তওবা কবুল করার জন্য রাতে আল্লাহ্ তাঁর হস্ত প্রসারিত করে দেন, যেনো দিনের পাপীরা তওবা করে। আর দিনে তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করেন এ জন্যে যেনো রাতের পাপীরা তওবার সুযোগ পায়। এভাবে দিবস ও নিশিথের বিরতিহীন তওবার এই সুযোগ চলতেই থাকবে, যতক্ষণ না সূর্যোদয় ঘটবে পশ্চিম আকাশে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়ার পূর্বে যে তওবা করবে, আল্লাহ্পাক তার তওবা কবুল করবেন।

হজরত মুয়াবিয়া থেকে আহমদ, দারেমী এবং আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স, জানিয়েছেন, তওবার দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত নিষিদ্ধ হবে না এবং পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত তওবার দরজাও বন্ধ হবে না।

উপরের বর্ণিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, 'সেদিন যে ব্যক্তি পূর্বে বিশ্বাস করেনি'— কথাটির অর্থ হবে, সেদিন যে ব্যক্তি পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয়ের পূর্বে তওবা করেনি। কিন্তু কোনো কোনো হাদিসে 'ইমান' শব্দের দ্বারা তওবা ছাড়া অন্য অর্থ বুঝানো হয়েছে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে স্বসূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পশ্চিম দিকে সূর্য না ওঠা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। পশ্চিম দিকে সূর্য উঠতে দেখলে সকলেই ইমান আনবে। তখন পুণ্যকর্মের সুযোগও থাকবে না। সে সময়ের পুণ্যকর্মবিহীন ইমান উপকারে আসবে না।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, তিনটি বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে যারা ইমান আনবে না এবং ইমানসহ সৎকর্ম করবে না— তাদের ইমান তাদেরকে কোনো সুফলই দান করবে না। ওই বিষয়

www.eelm.weebly.com

তিনটি হচ্ছে— ১. দাজ্জালের আবির্ভাব ২. দাব্বাতুল আরদ্বের বহিঃপ্রকাশ এবং ৩. পশ্চিমাকাশের সূর্যোদয়। এই হাদিস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লেখিত তিনটি ঘটনার পূর্বে যারা ইমান আনবে না, তাদের ইমান গৃহীত হবে না।

দ্রষ্টব্যঃ আলোচ্য আয়াত দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো যে, যে ব্যক্তি বর্ণিত নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ইমান আনবে না এবং নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার প্রাক্কালে ইমান আনবে— তাদের ইমানকে গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু যদি কারো জন্ম বর্ণিত নিদর্শন সমূহের আংশিক অথবা সামগ্রিক প্রকাশের পরে হয়, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর যদি ইমান আনে, তবে তা গৃহীত হবে।

কিতাবুল ওফা নামক গ্রন্থে ইবনে জাওজী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হজরত ঈসা পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। বিবাহ করবেন। তাঁর সন্তানাদি হবে। তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর হওয়া পর্যন্ত তিনি বসবাস করবেন এই পৃথিবীতে। তারপর পৃথিবী পরিত্যাগ করবেন। আমার কবরের পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হবে। কিয়ামত দিবসে আমি ও হজরত ঈসা আবু বকর ও ওমরকে নিয়ে পুনরুত্থিত হবো।

শেষে বলা হয়েছে— 'কুলিনতাজিরু ইন্না মুনতাজিরুন' (বলো, প্রতীক্ষা করো, আমিও প্রতীক্ষা করছি)। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি বলুন, হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী মক্কাবাসী সকল! তোমরা অপেক্ষা করো। আমিও অপেক্ষা করছি। অপেক্ষা শেষে নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাবে— আমরা সফল এবং তোমরা বিফল।

সুরা আন্আ'মঃ আয়াত ১৫৯

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

❒ যাহারা দ্বীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে তাহাদিগের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নাই; তাহাদিগের বিষয় আল্লাহের ইখ্তিয়ারভুক্ত; আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

'ইন্নাল্লাজিনা ফার্‌রাকু দিনাহুম' (যারা দ্বীন সম্বন্ধে নানান মতের সৃষ্টি করেছে)। এ কথার অর্থ— যারা ধর্মের কোনো কোনো বিধান বিশ্বাস করেছে এবং কোনো কোনো বিধানকে করেছে অস্বীকার। অথবা যারা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে।

www.eelm.weebly.com

মুজাহিদ, কাতাদা এবং সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে খৃষ্টান ও ইহুদীদেরকে। বনী ইসরাইলেরা কেউ কেউ হয়েছে খৃষ্টান এবং কেউ কেউ হয়েছে ইহুদী। অথচ সকলের ধর্মাদর্শ মূলতঃ এক। এ উক্তিটি কিন্তু ভুল। কেননা ইহুদীধর্মের ভিত্তিমূল ছিলো হজরত মুসার নবুয়ত ও শরিয়তের উপর। আর খৃষ্টধর্মের ভিত্তি ছিলো হজরত ঈসার আনীত ধর্মমতের উপর। তাঁদের দু'জনেরই মৌলিক ধর্মাদর্শের ভিত্তি হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শের উপর। এরপর ইহুদীরা হজরত ঈসার নবুয়তকে অস্বীকার করে বসলো। আর খৃষ্টানেরা অস্বীকার করে বসলো রসুলুল্লাহ্ স. এর নবুয়তকে। তাই তারা সকলে হয়ে গেলো অবিশ্বাসী। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে সে কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে— তারা শয়তানের কুমন্ত্রণায় অথবা কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় সত্যধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত করেছিলো তাদের অনেক মনগড়া প্রথা। এভাবে তারা স্বমতের বশবর্তী হয়ে সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন দল, উপদল। এই ব্যাখ্যানুসারে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ধর্মবিকৃতকারী সকল দল, উপদল এই আয়াতের মর্মার্থের অন্তর্ভূত করা যায়।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতেরাও প্রতি পদে ওই ঘটনাগুলোই ঘটাবে, যা বনী ইসরাইলেরা ঘটিয়েছিলো। এমন কি বনী ইসরাইলদের কেউ যদি মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উম্মতের মধ্যেও কেউ না কেউ এ রকম করবে। বনী ইসরাইলেরা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো বাহাত্তুরটি দলে। আর তিয়াত্তুরটি দলে বিভক্ত হবে আমার উম্মতেরা। ওই তিয়াত্তুরটি দলের মধ্যে বায়াত্তুরটিই হবে জাহান্নামী। কেবল একটি হবে জান্নাতী। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! জান্নাতী দলটির পরিচয় কী? তিনি স. বললেন, যে দল হবে আমি ও আমার সহচরবৃন্দের একনিষ্ঠ অনুসারী। তিরমিজি, আবু দাউদ।

হজরত মুয়াবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তিয়াত্তুরটি দলের মধ্যে বাহাত্তুরটি নিক্ষিপ্ত হবে দোজখে। আর বেহেশ্তে প্রবেশ করবে কেবল একটি দল। ওই দলটি জমহুরের। অতি শীঘ্র আমার উম্মতের মধ্যে প্রবল প্রবৃত্তিপ্রবণ মানুষের আবির্ভাব ঘটবে। পোষা কুকুর যেমন তার মালিকের সঙ্গে অলিতে গলিতে বা রাস্তার মোড়ে গা ঘেঁষাঘেঁষী করে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি তারা হবে প্রবৃত্তিপরায়ণতালগ্ন। হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, তিরমিজি ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান এবং হাকেম। তিরমিজি ও হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনাটি এ রকম— ইহুদীরা বিভক্ত হয়েছে একাত্তুরটি দলে। তাদের একটি দল ছাড়া অন্যগুলো জাহান্নামী। বায়াত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছে খৃষ্টানেরা। তাদের মধ্যেও একটি দল ছাড়া অন্য দলগুলো দোজখী। আর আমার উম্মতের তিয়াত্তুরটি দলের মধ্যে বাহাত্তরটিই প্রবেশ করবে জাহান্নামে। কেবল একটি দল যাবে জান্নাতে।

www.eelm.weebly.com

হজরত ওমর থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. জননী আয়েশাকে বলেছেন, হে আয়েশা! যারা ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং নিজেরা দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে তারাই বেদাতী এবং তারাই কুপ্রবৃত্তির অনুগত (আলোচ্য বাক্যে তাদের কথাই বলা হয়েছে)। তিবরানী প্রমুখও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুদৃঢ় সূত্রপরম্পরার মাধ্যমে। উত্তম সূত্রে তিবরানীও এ রকম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

হজরত ইরবাস বিন সারিয়াহ্ থেকে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি এবং ইবনে মাজা উল্লেখ করেছেন, একবার রসুল স. আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ করে একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিলেন। ওই বক্তৃতা শুনে আমরা ভীত হলাম। অশ্রু নির্গত হতে শুরু করলো সকলের চোখ থেকে। তিনি স. বললেন, আমি উপদেশ দিচ্ছি— তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং তোমাদের নেতার অনুগত হও, যদিও সে নেতা হাবসী ক্রীতদাস হয়। আমার অন্তর্ধানের পর তোমরা দেখতে পাবে অনেক মতবিরোধ। তখন তোমরা আমার আদর্শ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ দৃঢ়ভাবে ধারণ কোরো। এই পথই হেদায়েতের পথ। তাই অত্যন্ত মজবুতভাবে তোমরা এই পথকে আঁকড়ে ধরবে, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে এবং নতুনত্ব থেকে বেঁচে থাকবে। প্রতিটি নতুনত্বই বেদাত এবং প্রতিটি বেদাতই ভ্রষ্টতা। তিরমিজি ও ইবনে মাজার বর্ণনায় 'আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়লেন'— কথাটি নেই। অন্য বিবরণগুলো সেখানে অবিকল এক।

হজরত ইবনে ওমর থেকে মাসাবীহ্ রচয়িতা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা আমার আদর্শের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদেরই অনুসরণ করবে তোমরা। আর যারা এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে দোজখের দিকে যাত্রা করেছে, তোমরা তাদের অনুসরণ কোরো না। ইবনে মাজা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আমার উম্মতেরা কোনো ভুল বিষয়ে একমত হবে না। জমহুরের উপরে রয়েছে আল্লাহ্র হাত। যারা জমহুরের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত তারা জাহান্নামী।

হজরত মুয়াজ থেকে আবু দাউদ ও আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র বিধান বিবর্জিত স্বমতাবলম্বী দল থেকে দূরে থাকো। ভালোবাসো জমহুরের জামাতকে।

হজরত আবু জর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি (সত্যানুসারী) জামাত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরত্ব সৃষ্টি করলো, সে তার কণ্ঠ থেকে খুলে ফেললো ইসলামের রজ্জু। আবু দাউদ, আহমদ। এখানে জামাত অর্থ সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের জামাত।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্তায়ালা রসুল স. কে কিতাবসহ প্রেরণ করেছেন। কিতাব ছাড়াও তিনি তাঁর প্রিয় রসুলকে আরো কিছু প্রত্যাদেশ দিয়েছেন, যেগুলোর মর্ম আল্লাহ্তায়ালার। কিন্তু ভাষা হজরত জিবরাইলের অথবা রসুল স. এর নিজের। ওই প্রত্যাদেশগুলোকে বলা হয় ওহীয়ে গায়ের মতলু। আবার কিতাব বা আল কোরআনের কিছু আয়াত সুস্পষ্ট। সেগুলো অজটিল, তাই সন্দেহমুক্ত। আর কিছু আয়াত জটিল ও রহস্যময়। ওই আয়াতগুলোকে বলে আয়াতে মুতাশাবেহাত্— যা সর্বসাধারণের অবোধ্য। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার নবী-রসুলগণ ওই আয়াতগুলোর মর্মার্থ সম্পর্কে সম্যক অবগত। কেননা আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং এরশাদ করেছেন— 'ছুম্মা ইন্না আ'লাইনা বায়ানাহ্' (অতঃপর নিশ্চয়ই আমার দায়িত্ব হচ্ছে সেগুলোকে বর্ণনা করা)। ওহীয়ে মতলু এবং ওহীয়ে গায়ের মতলুর মাধ্যমে রসুল স. যে জ্ঞান পেয়েছিলেন, সেই জ্ঞান তিনি দান করেছেন তাঁর প্রিয় সহচরবৃন্দকে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে এসেছে সেই জ্ঞানেরই ধারাবাহিকতা। তাই আল্লাহ্র কিতাব, রসুলের জীবনাদর্শ, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈগণের অভিমতকে মান্য করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। যে সকল আয়াত ও হাদিসের মর্মার্থ স্পষ্ট নয়, সেগুলো সম্পর্কে সাহাবীগণের মতামতকে শিরোধার্য করতে হবে। যারা স্বমতাবলম্বী এবং প্রবৃত্তিতাড়িত, তাদের কথার মধ্যে কোরআনের অনুকূল যতটুকু পাওয়া যাবে, ততটুকু মান্য করতে হবে। আর যা কোরআনের অনুকূল নয়, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কারণ তারা সুবিধাবাদী। রসুল স. এবং সাহাবীগণের তাফসীরকে তারা বিকৃত করে দেয়। এভাবে তারা অস্বীকার করে বসে আল্লাহ্র দীদার, কবরের আযাব, আমলনামা, পাপ-পুণ্যের ওজন, পুলসিরাত এবং হিসাব-নিকাশকে । তারা আল্লাহ্র কালামকে বলে সৃষ্ট। অথচ আল্লাহ্র কালাম যে চিরন্তন, সে বিষয়ে কোরআন ও হাদিসে স্পষ্ট দলিল রয়েছে। আর এ সম্পর্কে সংঘটিত হয়েছে সাহাবীগণের ঐকমত্যও। ওই সকল প্রবৃত্তিতাড়িতরা প্রকৃত ধর্মকে ত্যাগ করে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। গ্রহণ করেছে কিছু অংশ। আর কিছু অংশ করেছে পরিত্যাগ। এ রকম করেছে মোতাজিলারাও। তারা বলে থাকে, বান্দার জন্য যা কল্যাণকর, তা বান্দাকে দান করা আল্লাহ্তায়ালার উপরে বাধ্যতামূলক। তারা তকদীরকে অস্বীকার করে। তওবা করা সত্ত্বেও কবীরা গোনাহ্ মাফ হওয়াকে বলে অসম্ভব। তারা এ রকমও বলে থাকে যে, বান্দা নিজেই তার আপন কর্মের স্রষ্টা। তারা বলে, আল্লাহ্তায়ালাই তার বান্দাগণের স্রষ্টা। কিন্তু বান্দাদের কর্মের স্রষ্টা তারা নিজেই। তাই এই দলটি প্রকৃত ইসলামী পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে হয়েছে অগ্নিপূজকদের তুল্য। অগ্নিপূজারীরা বলে শুভকর্ম ও নূরের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্তায়ালা। আর পাপ ও অন্ধকারের সৃষ্টিকর্তা শয়তান। এভাবে তারা ওই দু'টি শক্তিকে মনে করে নিয়েছে তাদের সৃষ্টিকর্তা। একটির স্রষ্টা শুভ এবং অন্যটির অশুভ। মোতাজিলারাও তেমনি দুই স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাদের অভিমত হচ্ছে— সকল সৃষ্টির একক স্রষ্টা যদিও আল্লাহ্, কিন্তু বান্দার কর্মের সৃষ্টিকর্তা সে নিজেই।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. বলেছেন, কাদ্‌রিয়া সম্প্রদায় অগ্নি-উপাসক (তুল্য)। তাদের পীড়িত ব্যক্তির সেবাযত্ন কোরো না। আর মারা গেলে তাদের জানাযায় যেয়ো না। হজরত ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও আবু দাউদ।

রসুল স. বলেছেন, ইসলামে ওই দু'দলের কোনো অংশ নেই। দল দু'টো হচ্ছে মারজিয়াহ্ এবং কাদরিয়াহ্ (মারজিয়াহ্রা বলে, কেবল আল্লাহ্র প্রতি ইমান আনলেই সকল আযাব থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যাবে— ইবাদত বন্দেগী করার কোনো প্রয়োজনই নেই। তারা যেহেতু ইমানদার, তাই তারা পাপ করলেও আযাব হবে না)। তিরমিজি।

জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন ছয় ধরনের মানুষের উপর রয়েছে আল্লাহ্র, আমার ও অন্যান্য নবীর অভিসম্পাত। তারা হচ্ছে— ১. আল্লাহ্র কিতাবের সঙ্গে নতুন কিছু সংযোজনকারী। ২. তকদীর অস্বীকারকারী। ৩. বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে অবৈধ কর্মে নিয়োগকারী— আল্লাহ্ যাদেরকে সম্মান দান করেছেন তাদের অপদস্থ এবং যাদেরকে করেছেন অপদস্থ, তাদেরকে সম্মানকারী। ৪. যে সকল বস্তুকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন সে সকল বস্তুকে হালালকারী। ৫. আমার বংশের লোকদের সঙ্গে এমন আচরণকারী— যা আল্লাহ্পাক করেছেন নিষিদ্ধ এবং ৬. আমার আদর্শ পরিত্যাগকারী। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন রজিন তাঁর স্বরচিত গ্রন্থে এবং বায়হাকী তাঁর 'মাদখাল' নামক পুস্তকে।

আমি বলি, আল্লাহ্র কিতাবের সঙ্গে নতুন কিছু সংযোজনকারী দলটি হচ্ছে রাফেজী। তাদের বিশ্বাস— কোরআন মজীদে আরো অনেক আয়াত ছিলো, সাহাবীগণ সেগুলো বাদ দিয়েছেন। অথচ কোরআন মজীদেই রয়েছে— 'ইন্না লাহু লা হাফিজুন' (নিশ্চয় আমি কোরআনকে সংরক্ষণ করবো)। এই আয়াতের প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই। তকদীর অস্বীকারকারী দলটি হচ্ছে কাদরিয়াহ্। তারা মনে করে মানুষ নিজেই তার কর্মের স্রষ্টা এবং আপন ভাগ্যলিপি রচনাকারী। আর খারেজীরা হচ্ছে ওই দল— যারা রসুল স. এর বংশধরদের সঙ্গে ওইরূপ আচরণ করে— যা আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক নিষিদ্ধ। রসুল স. এর আদর্শ পরিত্যাগকারী দলটি হচ্ছে বেদাতী সম্প্রদায়। তারা স্বমতের অনুসারী। পবিত্র কোরআনের 'মুতাশাবিহাত' (রহস্যাচ্ছন্ন) আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দানকারী। সলফে সালেহীন প্রদত্ত কোরআনের ব্যাখ্যা তারা মানে না। এরা সৃষ্টির গুণাবলীকে আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলীর সমতুল্য মনে করে। আল্লাহ্তায়ালাকে মনে করে শরীর

www.eelm.weebly.com

বিশিষ্ট। তাদের মতো আরো দু'টি দল রসুল স. এর আদর্শ পরিত্যাগকারীদের মধ্যে গণ্য। রাফেজীরা তো ধর্ম পরিত্যাগকারীদের মতোই। তারা কোরআনকে পরিত্যাগ করেছে। কোরআন নির্ভরতাকেই করেছে অস্বীকার। তারা বলে, হজরত ওসমান কোরআনের এক চতুর্থাংশ বাদ দিয়েছেন। ইচ্ছে মতো কোরআনের সঙ্গে অনেক কিছু সংযোজন করেছেন। রসুল স. এর সুন্নতকেও পরিত্যাগ করেছে রাফেজীরা। তারা সাহাবীগণকে মুরতাদ ও কাফের বলে। অথচ সাহাবীগণই হাদিস শরীফের বর্ণনাকারী। তাঁরা রসুল স. এর পবিত্র বাণী সরাসরি শুনে প্রচার করেছেন। তাই তাঁদেরকে অস্বীকার করলে রসুল স. এর সকল হাদিসকে অস্বীকার করা হয়। রাফেজীরা সাহাবীগণের ঐকমত্যকেও অস্বীকার করে। আর মনগড়া হাদিস তৈরী করে সেগুলোর সঙ্গে ইমাম জাফর সাদেক, ইমাম মোহাম্মদ বাকের এবং আহলে বাইতের অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সম্পর্কিত করে। তাদের মূল নীতি হচ্ছে তাকিয়া বা আত্মগোপন। এর অর্থ হচ্ছে— জনসাধারণের নিকট সব কিছু প্রকাশ করা যাবে না। হজরত আলী এবং আহলে বাইতের অন্যান্য ইমামগণ তাকিয়া অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা নাকি বলেছিলেন, দেয়ালেরও কান আছে। সুতরাং সাবধান! জনসমক্ষে আসল কথা প্রকাশ কোরো না। প্রকৃত হেদায়েত নাকি এভাবেই ইমামগণের মাধ্যমে গোপনে গোপনে চলে এসেছে। নিঃসন্দেহে এ সকল বিশ্বাস হচ্ছে শয়তানি বিশ্বাস— যা প্রকারান্তরে অবিশ্বাস বৈ অন্য কিছু নয়। ইহুদী মুনাফিকেরাই রাফেজী মতবাদের প্রকৃত রচয়িতা। ওই মুনাফিকদের অগ্রণী হচ্ছে— আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা। সে ছিলো ইহুদী এবং মুনাফিক। আস্সাইফুল মাসলুল গ্রন্থে তাদের অপবিশ্বাসের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

রাফেজীরা নিজেদেরকে বলে শিয়া। কোরআনের এটিও একটি মোজেজা যে, রাফেজীদের অভ্যুদয়ের পূর্বেই তাদেরকে শিয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাই এখানে পরের বাক্যে বলা হয়েছে— 'ওয়া কানু শিয়াআন' (এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে)।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. স্বয়ং আমাকে বলেছেন, তোমার দৃষ্টান্ত হজরত ঈসার মতো। তাঁকে ইহুদীরা ঘৃণা করতো। আর খৃষ্টানেরা করতো অতি ভক্তি। ইহুদীরা তাঁকে বলে ব্যভিচারিণীর পুত্র। আর খৃষ্টানেরা বলে আল্লাহ্র পুত্র। হজরত আলী বলেছেন, আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে দুই শ্রেণীর মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। একদল ধ্বংস হবে অতিরিক্ত ভালোবেসে। তারা আমাকে এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী মনে করবে, যে মর্যাদা আমার মধ্যে নেই। আরেক

www.eelm.weebly.com

দল ধ্বংস হবে আমাকে ঘৃণা করে। তারা মনে করবে আমি ইসলামের শত্রু। আহমদ।

হজরত আলীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল রাফেজী নামে অভিহিত হবে। প্রকৃত ইসলামকে ত্যাগ করবে তারা। বায়হাকী।

হজরত আলী কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার অন্তিম যাত্রার পর অভ্যুদয় ঘটবে রাফেজীদের। তাদেরকে পেলে হত্যা কোরো। নিঃসন্দেহে তারা মুশরিক। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি তাদেরকে চিনবো কিভাবে? তিনি স. বললেন, তারা সীমালংঘন করে তোমাকে এমন বৈশিষ্ট্য দান করবে— যা তোমার মধ্যে নেই। তোমার পূর্বসূরীদেরকে অপবাদ দিবে তারা। দারা কুতনী। দারা কুতনী কর্তৃক অন্য একটি সূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে যে কথাগুলো অতিরিক্ত রয়েছে, তা হচ্ছে— তারা আমার আহলে বাইতের মহব্বতের দাবিদার হবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা আহলে বাইতকে ভালোবাসবে না। তাদেরকে চিনবার সহজ উপায় হচ্ছে তারা আবু বকর ও ওমরকে গালি দিবে। এ প্রসঙ্গে আরো অনেক হাদিস রয়েছে। আমি সেগুলোকে আমার আস্‌সাইফুল মাসলুল গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি।

আলোচ্য আয়াতের পরের বাক্যে বলা হয়েছে— 'লাসতা মিনহুম ফি শাইয়্যিন' (তাদের কোনো কাজের দায়িত্ব তোমার নেই)। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! বিভিন্ন দলে বিভক্ত ওই সকল ভ্রষ্টদের সঙ্গে আপনার কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই। আরবী পরিভাষানুসারে এখানে লাস্‌তা মিনহুম কথাটির অর্থ হবে এ রকম— যদি তুমি এরূপ করো তবে জেনো, তোমার সঙ্গে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইন্নামা আমরুহুম ইলাল্লহ্' (তাদের বিষয় আল্লাহ্‌র এখতিয়ারভুক্ত)। এ কথার অর্থ— বিভিন্ন দলে বিভক্ত ওই সকল লোকদেরকে শাস্তিদানের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র। সত্যপথ থেকে দূরত্বের পরিমাণানুসারে তিনি তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন। শেষে বলা হয়েছে— 'ছুম্মা ইউনাব্বিউহুম বিমা কানু ইয়াফয়া'লুন' (আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন)। এ কথার অর্থ— কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানাবেন। প্রথমে শাস্তি দিবেন তাদের অপবিশ্বাসের জন্য। তারপর মন্দ আমলের জন্য।

www.eelm.weebly.com

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○ قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

❐ কেহ কোন সৎকার্য করিলে সে তাহার দশগুণ পাইবে এবং কেহ কোন অসৎকার্য করিলে তাহাকে শুধু উহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে, আর তাহারা অত্যাচারিতও হইবে না।

❐ বল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। উহাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

'মান জাআ বিল হাসানাতি ফালাহু আ'শ্‌রু আমছালিহা' (কেউ কোনো সৎকাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে) কথাটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখানে একটি জটিলতা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। সেই সম্ভাব্য জটিলতাটি হতে পারে এ রকম— আল্লাহ্‌পাকই পুণ্য ও পাপের বিনিময় নির্ধারণ করেছেন। সেখানে বিবেক বুদ্ধির কোন প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু কাজ ও বিনিময়ের মধ্যে তেমন কোনো সাদৃশ্যও নেই। পুণ্যকথা ও পুণ্যকর্মের বিনিময় বেহেশ্‌ত। আর অসৎ উক্তি এবং অসৎকর্মের বিনিময় হচ্ছে দোজখ। শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে দেয়া হয় অর্থ। কিন্তু শ্রম ও অর্থ কখনো এক কথা নয়। তবুও অর্থকেই কাজের বিনিময় নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌পাক তেমনি সৎ ও অসৎকর্মের বিনিময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেই বিনিময় আবার দশগুণ হয় কি করে? দশগুণ হতে পারে তখনই, যখন বিনিময় নির্ধারণ করে কয়েকজন শ্রমিককে কাজে নিয়োগের পর কাজ শেষে কোনো কোনো শ্রমিককে নির্ধারিত বিনিময়ের দশগুণ দেয়া যায়। যেমন— একই কাজে দু'জন শ্রমিককে নিয়োগ করে বলা হলো, কাজ শেষে দু'জনকে এক টাকা করে দেয়া হবে। ওই টাকা দেয়ার পর একজনকে যদি দশ টাকা দেয়া হয়, তখনই কেবল দশগুণের কথা ভাবা যায়। কিন্তু দু'জনকেই দশ টাকা করে দিলে এ কথা বলা যাবে না যে, বিনিময় নির্ধারিত হয়েছিলো দশগুণ। অর্থাৎ যথামূল্য হিসেবে এক টাকা দিলেই কেবল দশগুণ দেয়ার কথা ভাবা যেতে পারে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে দশগুণের কথা বলা হয়েছে ঢালাওভাবে। তাই বলা যেতে পারে বক্তব্যটি জটিল অর্থাৎ স্পষ্ট নয়। এই জটিলতা বা অস্পষ্টতা নিরসনার্থে বলা

www.eelm.weebly.com

যেতে পারে যে, এখানে উল্লেখিত দশগুণ বিনিময় সকলের জন্য নয়। প্রথমে একই কাজের জন্য সকলকে একই রকম বিনিময় দান করা হবে। তারপর কাউকে কাউকে দেয়া হবে এর দশগুণ অর্থাৎ বিশুদ্ধচিত্ততার (খালেস নিয়তের) তারতম্যানুসারে আল্লাহ্পাক বিনিময় বর্ধিত করে দেবেন। তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে তাই কেউ কেউ দশগুণ, আবার কেউ কেউ সত্তর অথবা সাতশ' গুণ পর্যন্ত বিনিময় লাভ করবেন। আবার কেউ কেউ বিনিময় লাভ করবেন অগণিত, অসংখ্য। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দৃষ্টে সে কথাই প্রতীয়মান হয়। তাঁর হাদিসে রয়েছে রসুল স. বলেছেন, ধর্মকে বিশুদ্ধ করে নেয়ার পর একটি পুণ্যকর্ম করলে আল্লাহ্পাক তাঁর ইচ্ছানুসারে তাকে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত পুণ্য দান করতে পারেন। কিন্তু পাপকর্মের বিনিময় এভাবে বাড়ানো হবে না। এভাবেই বান্দারা আল্লাহ্পাকের সকাশে উপনীত হবে। বোখারী, মুসলিম। এক্ষেত্রে রসুল স. পুণ্যকর্মের বিনিময় বৃদ্ধির বিষয়টিকে ইসলামের সৌন্দর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা এবং প্রবৃত্তির পবিত্রতা অর্জনের পরই কেবল বিশুদ্ধচিত্ততা (এখলাস) নির্ভর ইহ্সান লাভ হয়। আর এখলাস হচ্ছে চিত্তবিশুদ্ধী ও প্রশান্ত প্রবৃত্তি।

এ রকমও বলা যেতে পারে যে, আগের নবীর উম্মতের পুণ্যকর্মের জন্য যে বিনিময়, সেই বিনিময়ের দশগুণ বিনিময় দেয়া হবে শেষ নবীর উম্মতকে অর্থাৎ একই কাজের জন্য পূর্ববর্তী উম্মত যে সওয়াব লাভ করবে, ওই একই কাজের জন্য এই উম্মত লাভ করবে তার দশগুণ।

হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, পূর্ববর্তী উম্মতের তুলনায় তোমাদের হায়াত সংক্ষিপ্ত। ইহুদী ও খৃষ্টানদের তুলনায় তোমাদের দৃষ্টান্তটি এ রকম— একদল শ্রমিক নিয়োগ করে বলা হলো, তোমরা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাজ করলে একটি করে মুদ্রা পাবে। আরেক দল শ্রমিককে বলা হলো, তোমরা দ্বিপ্রহরের পর থেকে আসর পর্যন্ত কাজ করলে পাবে একটি মুদ্রা। এরপর শ্রমিকদের তৃতীয় দলটিকে বলা হলো, তোমরা আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কাজ করলে পাবে দ্বিগুণ বিনিময় (দুইটি মুদ্রা)। শ্রমিকের প্রথম দলটি ইহুদী, দ্বিতীয় দলটি খৃষ্টান এবং তৃতীয় দল হচ্ছে মুসলমান। আল্লাহ্পাক এই তিন দলকে এভাবেই বিনিময় দান করবেন। তাঁর এমতো সিদ্ধান্ত জানতে পেরে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা অপ্রসন্ন হয়ে বলবে, আমাদের কাজ বেশী অথচ পারিশ্রমিক কম। আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, আমি কি তোমাদের হক নষ্ট করেছি? তারা বলবে, কিন্তু এই বৈসাদৃশ্যের কারণ কী। আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, এটা হচ্ছে আমার অনুগ্রহ। আমি যাকে ইচ্ছা করি, তাকেই আমার অনুগ্রহদানে ধন্য করি। বোখারী।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মতের নেক আমলের সওয়াব দেয়া হবে পূর্ববর্তী উম্মতের নেক আমলের সওয়াবের দ্বিগুণ। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে দশগুণ বিনিময়দানের কথা। বিষয়টি সামঞ্জস্য সাধনার্থে এ কথা বলা যেতে পারে যে, সাধারণভাবে এই উম্মতের প্রত্যেককে পূর্ববর্তী উম্মতের দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে। আর কাউকে কাউকে দেয়া হবে দশগুণ। বিশুদ্ধতার (এখলাসের) মান অনুসারে এই সওয়াব দানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

এরপর বলা হয়েছে, 'ওয়ামান জাআ বিস্‌সায়্যিআতি ফালা ইউজ্‌জা ইল্লা মিছলাহা ওয়া হুম লা ইউজ্‌লামুন' (এবং কেউ কোনো অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে, আর তারা অত্যাচারিতও হবে না)। এ কথার অর্থ— মন্দ কর্মের গোনাহ্ কখনো বাড়ানো হবে না। হজরত আবু জর গিফারীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, দ্যাখো, আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন— কেউ কোনো সৎ কাজ করলে তাকে তার দশগুণ প্রতিফল দেয়া হবে (গোনাহ্‌র পরিমাণ বাড়ানো হবে না)। পাপের শাস্তি দেয়া হবে পাপের পরিমাণ অনুযায়ী। আবার অনেক পাপীকে আল্লাহ্‌পাক ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করে দেবেন। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসবে, তার দিকে আমি এগিয়ে যাবো এক হাত। কেউ এক হাত অগ্রসর হলে আমি অগ্রসর হবো দু'হাত। যে আমার দিকে হেঁটে আসবে আমি তার দিকে গমন করবো দৌড়ে। যে পৃথিবীপূর্ণ পাপ নিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হবে, সে যদি মুশরিক না হয়, তবে আমি তার সঙ্গে মিলিত হবো ক্ষমাশীল হয়ে। বাগবী।

বর্ণিত হাদিসের শেষ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে, যদি আমি চাই তবে আমি তার সঙ্গে মিলিত হবো ক্ষমাশীল হয়ে। এ কথায় বুঝা যায় যে, পাপ মার্জনা করতে আল্লাহ্‌পাক বাধ্য নন। মার্জনার বিষয়টি সম্পূর্ণতঃই তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছে করলে মাফ করবেন, আর যদি তা না করেন তবে শাস্তি অবধারিত। আলোচ্য বাক্যে সে কথাই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেউ কোনো অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে। এটা পাপীদের প্রাপ্য। আর এই প্রাপ্যকে কখনো অত্যাচার বলা যায় না।

বাগবীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, সদ্‌কা (দান) ব্যতীত অন্য সকল পুণ্যকর্মের বিনিময় দানের কথা বলা হয়েছে এই আয়াতে। কেননা অন্যত্র বলা হয়েছে, সদ্‌কার বিনিময় সাতশ' গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হবে।

আমি বলি, হজরত ইবনে ওমরের উপরোক্ত উক্তির স্থলে রয়েছে কোরআন মজীদের এই আয়াত—'যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা

www.eelm.weebly.com

একটি শস্য দানার মতো, যে শস্য দানাটি সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রতিটি শীষে থাকে একশ'টি দানা। আর আল্লাহ্ যাকে চান তাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন।' এই আয়াতে সাতশত গুণ বিনিময় প্রদানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে সম্পদ দানের ক্ষেত্রে। কিন্তু হজরত ইবনে ওমরের হাদিসে বলা হয়েছে, কেবল সদ্কার কথা। অর্থাৎ সদ্কার সওয়াব দেয়া হবে সাতশত গুণ। রসুল স. বলেছেন, তসবিহ্ (সুবহানআল্লাহ্) এবং তাহ্মিদ (আলহামদুলিল্লাহ্) সদ্কাতুল্য। প্রতিটি তাহ্লিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ)ও সদ্কাতুল্য। মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজা। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু জর গিফারী থেকে।

আল্লাহ্র জিকিরের সওয়াব সদকার সওয়াব অপেক্ষা বেশী। হজরত আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলবো যা সকল আমল অপেক্ষা উত্তম? যে আমল তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের নিকট অতি পবিত্র এবং যে আমল তোমাদের মর্যাদাকে সকল আমল থেকে উন্নত করে? যে আমল স্বর্ণ, রৌপ্য দান করার চেয়েও উচ্চ, জেহাদের অংশগ্রহণ করে শত্রু বধ করা এবং নিজে শহীদ হয়ে যাওয়ার চেয়েও যে আমল অধিক নন্দিত? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! অনুগ্রহ করে বলুন। তিনি স. বললেন, সর্বক্ষণ আল্লাহ্র স্মরণ। ইবনে মাজা, হাকেম, তিরমিজি, আহমদ।

তিবরানীর আওসাত গ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র জিকির অপেক্ষা উত্তম কোনো সদ্কা নেই।

পরের আয়াতে (১৬১) বলা হয়েছে—'বলো, আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জনতাকে বলুন আল্লাহ্পাক জন্মগত ও স্বভাবগতভাবে আমাকে নিষ্পাপ করে সৃষ্টি করেছেন। এরপর প্রত্যাদেশ এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে আমাকে পথ প্রদর্শন করে চলেছেন।

শেষে বলা হয়েছে— দীনান্ ক্বিয়্যামান মিল্লাতা ইব্রহীমা হানিফা ওয়ামা কানা মিনাল মুশরিকীন (এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ, সে ছিলো একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না)। এখানে 'দীনান্ ক্বিয়্যামান' অর্থ সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। বাগবী লিখেছেন, 'মুসতাক্বীমুন' এবং 'ক্বায়্যিম' শব্দ দু'টো সমার্থক। 'মিল্লাতা ইব্রাহিম' অর্থ ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ। আর 'হানিফা' অর্থ একনিষ্ঠ। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে মক্কাবাসী, তোমরা হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দাবি করো। কিন্তু হজরত ইব্রাহিমের ধর্ম একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। তিনি ছিলেন এক আল্লাহ্র আনুগত্যে একনিষ্ঠ। আর তোমরা অংশীবাদী। কিন্তু হজরত ইব্রাহিম তো কস্মিনকালেও অংশীবাদী ছিলেন না।

www.eelm.weebly.com

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝

❒ বল, 'আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহেরই উদ্দেশ্যে'।

❒ 'তাঁহার কোন শরীক নাই, এবং আমি ইহাই আদিষ্ট হইয়াছি এবং আত্মসমর্পণকারীদিগের মধ্যে আমিই প্রথম'।

'কুল ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহ্ইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন' অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বলে দিন, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে। এখানে সলাত অর্থ নামাজ। নুসুকি বা নাসাকুন অর্থ হজ এবং ওমরাতে কোরবানী করা— এই ইবাদতগুলো। মুকাতিল বলেছেন, এর অর্থ হজ। কেউ কেউ বলেছেন দ্বীন বা ধর্ম। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শব্দটির মাধ্যমে নামাজ ছাড়া অন্য সকল ইবাদতকে বুঝানো হয়েছে। এই অর্থগুলো কামুস এবং সিহাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। 'মাহ্ইয়া' অর্থ আমার জীবন এবং 'মামাতি' অর্থ আমার মৃত্যু। শব্দ দু'টো ধাতু বা শব্দমূল। 'আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে' কথাটির অর্থ এখানে আমার জীবন এবং আমার মৃত্যুর মালিক আল্লাহ্। তিনি আমাকে জীবন দান করেছেন এবং তিনিই আমাকে দান করবেন মৃত্যু। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটির অর্থ— ইমান ও আনুগত্যশোভিত আমার এই জীবন, যার উপর আমি মৃত্যুবরণ করবো, তার সকল কিছুই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

এ রকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে মাহ্ইয়া অর্থ জীবদ্দশার আনুগত্যসমূহ— যেমন নামাজ, রোজা ইত্যাদি এবং মামাতি অর্থ মৃত্যুকালীন আনুগত্যসমূহ— যেমন, অসিয়ত, গোলাম আযাদ ইত্যাদি। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হবে এ রকম— আমার জীবনের সকল ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য এবং মৃত্যুর পর আমার প্রাপ্য সওয়াব রয়েছে আল্লাহ্‌র জিম্মায়। কেউ আবার বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— নন্দিত পুণ্যকর্ম সমূহের সঙ্গে একীভূত আমার জীবন এবং ইমানের সঙ্গে আমার অন্তিম যাত্রার বিষয়টি সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্‌তায়ালার অধীনে ন্যস্ত।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১৬৩) বলা হয়েছে—'তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি এ রকমই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার কোনো শরীক নেই। আমি আদিষ্ট হয়েছি এ কথা প্রচারের নিমিত্তেই। এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী হিসেবে যে বার্তা আমি পেয়েছি, তার প্রতিই আমি তোমাদেরকে আহবান জানিয়ে যাচ্ছি। অতএব, তোমাদের উপলব্ধি হওয়া উচিত যে, আমি তোমাদের কিরূপ হিতাকাংখী।

বাগবী লিখেছেন, একদিন কুরায়েশ নেতারা রসুল স. কে বললো, হে মোহাম্মদ! আমাদের মতাদর্শের অনুসারী হও। তাদের এমতো অপবিত্র ও অযথার্থ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১৬৪, ১৬৫

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰىكُمْ ۗ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

❒ বল, 'আমি কি আল্লাহ্কে ছাড়িয়া অন্য প্রতিপালককে খুঁজিব? অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক। প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না। অতঃপর তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকটেই, তৎপর যে বিষয়ে তোমরা মতান্তর ঘটাইয়াছিলে তাহা তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।

❒ তিনিই তোমাদিগকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করিয়াছেন এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদিগের কতককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করিয়াছেন; তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানে সত্বর এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

---

www.eelm.weebly.com

বলো, আমি কি আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্য প্রতিপালককে খুঁজবো? অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক। —এখানকার প্রশ্নটি একটি নেতিবাচক জবাববিশিষ্ট প্রশ্ন। আলোচ্য বাখ্যাটির মর্মার্থ হবে এ রকম— আল্লাহ্র ইবাদতে আমি কি অন্য কাউকে অংশীদার করবো? অন্য কাউকে আমার প্রভুপ্রতিপালক সাব্যস্ত করবো? কক্ষনো নয়। কেননা আল্লাহ্তায়ালাই হচ্ছেন সকল কিছুর একমাত্র প্রভুপ্রতিপালক। আমার মতো সকল সৃষ্টি তাঁর প্রতিপালনাধীন। সুতরাং, কোনো সৃষ্টি প্রভুপ্রতিপালক বা উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

আগের আয়াতে (১৬১) বলা হয়েছিলো— সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শানুসারে আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। —এ কথায় মনে হতে পারে, যে রসুল স. হয়তো হজরত ইব্রাহিমের ওইরূপ অনুসরণ করেন, যেরূপ অংশীবাদীরা অনুসরণ করে তাদের বাপ-দাদার ধর্মাদর্শের। এ রকম মনোভাবের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই এখানে এভাবে বলা হয়েছে— 'আগইরাল্লহি আব্গী রব্বাঁও ওয়া হুয়া রব্বু কুল্লি শাইয়্যিন' (বলো, আমি কি আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্য প্রতিপালককে খুঁজবো? অথচ তিনি সবকিছুর প্রতিপালক)।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওলিদ ইবনে মুগীরা মানুষকে বলতো, তোমরা আমার মতাদর্শের অনুসারী হও। এতে করে যদি পাপ হয় তবে সে পাপের দায়িত্ব বহন করবো আমি। তার এ কথা প্রত্যাখ্যান করে অবতীর্ণ হয়েছে পরের বাক্যটি। বলা হয়েছে— প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না। এ কথার অর্থ— শিরিকের পাপের বোঝা বহন করবে সে-ই, যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য নির্বাচন করবে। কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না। একজনের প্রাপ্য শাস্তি অন্যজনকে দেয়া হবে না।

শেষে বলা হয়েছে—'অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই, তৎপর যে বিষয়ে তোমরা মতান্তর ঘটিয়েছিলে তা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।' এ কথার অর্থ— কিয়ামতের দিন আল্লাহ্তায়ালা মানুষের ধর্ম সংক্রান্ত মতপার্থক্যের অবসান ঘটাবেন। সকলেই সেদিন জানতে পারবে, কার ধর্ম সত্য এবং কার মতাদর্শ মিথ্যা। তাই কৃতকর্ম অনুসারে সেদিন কেউ হবে পুরস্কৃত এবং কেউ তিরস্কৃত।

পরের আয়াতে (১৬৫) বলা হয়েছে—'তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন।' এ কথার অর্থ— হে উম্মতে মোহাম্মদী! পূর্ববর্তী উম্মতকে অপসারিত করার পর আল্লাহ্পাক তোমাদেরকেই বানিয়েছেন পৃথিবীর প্রতিনিধি।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্য তোমাদের কতককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাকই তোমাদেরকে সর্বশেষ উম্মত বানিয়েছেন। একজন অপেক্ষা অন্যকে দিয়েছেন অধিকতর উন্নত মর্যাদা। এখন তোমরা পরীক্ষার মুখোমুখী। এখন এখানেই প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, তোমাদের মধ্যে কে কৃতজ্ঞ এবং কে কৃতঘ্ন।

সবশেষে বলা হয়েছে—'তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে সত্বর এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্র শাস্তি অতি নিকটে। তাই তাঁর শাস্তিকে বিলম্বিত মনে করা ঠিক হবে না। অবিশ্বাসীদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তিদান করা হবে মনে করে ইমান ও তওবাকে বিলম্বিত করা যাবে না। যা অবশ্যম্ভাবী, তা কিন্তু দূরে নয়, নিকটেই। কারণ ওই শাস্তি নিশ্চিত। 'ইন্না রব্বাকা' (নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক) কথাটিতে সেই উদ্দেশ্যটিই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। 'সারিউল ই'ক্বাব্' অর্থ— শাস্তিদানে সত্বর। এই সত্বরতা শাস্তিদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সরাসরি আল্লাহ্তায়ালার জাত বা সত্তার সঙ্গে এর সংযোগ নেই। আল্লাহ্তায়ালার সত্তার সঙ্গে সরাসরি সংযোগ রয়েছে ক্ষমা ও দয়ার। তাই সবশেষে বলা হয়েছে— এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময় (ওয়া ইন্নাহু লা গফুরুর্রহীম)। এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্পাক অতি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়াময়। কিন্তু তিনি সকল সৃষ্টির প্রভুপ্রতিপালকও। তাই সৃষ্টির নিরাপত্তা ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বও তাঁর। তাই তিনি অবাধ্যদের শাস্তিদাতাও। এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, তাঁর দয়া ও ক্ষমা তাঁর শাস্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রবল। সে কারণেই তিনি বার বার তাঁর দাসদেরকে ক্ষমা করে থাকেন এবং তওবা বা প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেন।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সম্পূর্ণ সুরা আন্আ'ম আমার উপর এক সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। অবতীর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলো সত্তর হাজার ফেরেশ্তা। তাদের সুবহানআল্লাহ্ এবং আলহামদুলিল্লাহ জিকিরে তখন পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিলো কোলাহলমুখর। তিবরানী, আবু নাঈম, ইবনে মারদুবিয়া।

হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে, এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার সময় রসুল স. সুবহানআল্লাহ্ পাঠ করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার সময় অবতীর্ণ হয়েছিলো অসংখ্য ফেরেশ্তা। তাদের উপস্থিতির কারণে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো আকাশের সকল দিগন্ত। হাকেম। এই হাদিসের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, সম্পূর্ণ সুরা আন্আ'ম এক সঙ্গে নাজিল হয়েছিলো। কিন্তু এর বিভিন্ন আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত (শানে নুজুল) ছিলো পৃথক পৃথক।

www.eelm.weebly.com

সম্ভবতঃ প্রেক্ষিতগুলোর ঘটনাবলী ঘটেছিলো খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে। এবং সেগুলোর প্রকৃতি ছিলো প্রায় একই রকম। সমধর্মী ওই ঘটনাগুলোকেই এই সুরার বিভিন্ন আয়াতের প্রেক্ষিত বা প্রেক্ষাপট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এ সম্পর্কিত হাদিসগুলো তো স্পষ্টই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে— কোনো বিরতি দিয়ে নয়, একই সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে সম্পূর্ণ সুরা আন্আ'ম।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ওমর বলেছেন, কোরআন মজীদের সুরাগুলোর মধ্যে সুরা আন্আ'ম হচ্ছে একটি অনন্যসাধারণ মর্যাদাবিশিষ্ট সুরা। বায়হাকী শো'বুল ইমান গ্রন্থে একটি অপ্রসিদ্ধ সূত্রে মাওকুফ রূপে বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, কোনো রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে সুরা আন্আ'ম পাঠ করলে আল্লাহ্পাক ওই রোগ নিরাময় করবেন।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১, ২

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۝

الٓمّٓصٓ ۝ كِتٰبٌ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ فَلَا يَكُنۡ فِىۡ صَدۡرِكَ حَرَجٌ مِّنۡهُ لِتُنۡذِرَ بِهٖ وَذِكۡرٰى لِلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۝

❑ আলিফ, লাম, মীম, ছা'দ।

❑ তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে যাহাতে তুমি ইহার দ্বারা সতর্ক কর; এবং বিশ্বাসীদিগের জন্য ইহা উপদেশ। অতঃপর তোমার মনে যেন ইহার সম্পর্কে কোন দ্বিধা না থাকে।

আলিফ, লাম, মীম, সোয়াদ— এ রকম বিচ্ছিন্ন বর্ণ কোরআন মজীদের কোনো কোনো সুরার প্রারম্ভে বিদ্যমান। এগুলোকে বলা হয় হুরূফে মোকাত্তায়াত (বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি)। এগুলো আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসুলের এক ধরনের রহস্যময় আলাপন, যা দুর্জ্ঞেয়। বিষয়টি আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসুলের একান্ত বিষয়। সাধারণ মানুষ এখানে যোগ্যতারহিত। আর এ বিষয়ে সাধারণকে জ্ঞান দান করা আল্লাহ্র ইচ্ছা নয়। আল্লাহ্র রসুলও তাঁর পরম প্রিয় প্রভুপ্রতিপালকের অভিপ্রায়ানুসারী। তাই তিনিও এ সম্পর্কে প্রকাশ্য বর্ণনা দান করেন নি। বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বলেছেন— সকল গ্রন্থেরই একটি গোপন রহস্য থাকে। আর কোরআনের গোপন রহস্য হচ্ছে, কোনো কোনো সুরার প্রথমে ব্যবহৃত বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি। হজরত আলী রা. বলেছেন, প্রতিটি পুস্তকের একটি সার সংকলন থাকে। আর কোরআন মজীদের সার সংকলন হলো এই

www.eelm.weebly.com

বিচ্ছিন্ন হরফগুলো। এ সম্পর্কে প্রবীনগণের ঐকমত্য এই যে— 'ইন্নাহা সির্‌রুন বাইনাল্লহি ওয়া বাইনা নাবীইয়্যিহি সল্লাল্লহু ওয়া আলাইহি ওয়া সাল্লাম' (এগুলো একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর মধ্যকার গোপন রহস্য)। এ রকম বাকভঙ্গি গোপনতম আলামতের ইঙ্গিতবহ। রসুল স. এর একনিষ্ঠ অনুসারীগণের মধ্যে অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তিত্ব এই রহস্য সম্পর্কে অবগত। যেমন— ইমামে রব্বানি হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী কাদ্দাসা সির্‌রুহ্। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক দয়া করে হুরূফে মোকাত্তায়াতের রহস্য আমার নিকট উন্মোচন করেছেন। কিন্তু সাধারণ্যে এ সম্পর্কে বিবরণ প্রদান অসম্ভব।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে— 'কিতাবুন উনযিলা ইলাইকা' (তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে)। 'কিতাবুন' শব্দটি এখানে বিধেয়। এর উদ্দেশ্য রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ— 'হাজা কিতাবুন' (এই কিতাব) অথবা আলিফ, লাম, মীম সোয়াদ যদি উদ্দেশ্য হয় তবে তার বিধেয় হবে কিতাবুন। আর 'উনযিলা ইলাইকা' (তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে)— কথাটি হবে কিতাবুন এর সিফাত বা বৈশিষ্ট্য।

এরপর বলা হয়েছে—'যাতে তুমি এর দ্বারা সতর্ক করো; এবং বিশ্বাসীদের জন্য এটা উপদেশ। অতঃপর তোমার মনে যেনো এর সম্পর্কে কোনো দ্বিধা না থাকে।' এখানে 'ফালা ইয়াকুন ফি সদ্‌রিকা হারাজুম্ মিনহু' কথাটির অর্থ— হে আমার রসুল! এই কোরআন সম্পর্কে আপনার মনে যেনো কোনো দ্বিধা-সংকোচ না থাকে। 'হারাজুম' এর শাব্দিক অর্থ— দ্বিধা. সংকোচ, জড়তা বা আড়ষ্টতা। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'হারাজুম' শব্দটির অর্থ হবে সন্দেহ। কেননা সংকোচ হচ্ছে সন্দেহের কারণ। এটা এক ধরনের সংকীর্ণতা বা সংকুচিত অবস্থা। এর বিপরীত অবস্থা হচ্ছে বক্ষের প্রশস্ততা— যা বিশ্বাসের কারণ। বক্ষের প্রশস্ততা এবং সংকীর্ণতা সম্পর্কে সুরা আন্‌আ'মে উল্লেখিত হয়েছে— 'ফামাঁ ইয়ুরিদিল্লহু আঁইয়াহ্‌দিইয়াহু ইয়াশ্‌রাহ্ সদ্‌রাহু লিল ইসলাম'। যথাস্থানে এই আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

আবুল আলিয়া বলেছেন, কোরআন প্রচারের ক্ষেত্রে মানুষকে ভয় করাই হারাজ বা সংকোচ। অর্থাৎ এই ভেবে আড়ষ্ট হওয়া যে, কোরআনের প্রচার করলে মানুষ বিরোধিতা করবে এবং কষ্ট দিবে। নির্ভিকচিত্তে সফলতার পথে অগ্রসর হতে গেলে এ রকম আড়ষ্টতা পরিত্যাজ্য।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে যে দ্বিধা বা আড়ষ্টতার কথা বলা হয়েছে, তা এ রকম— আল্লাহ্‌পাকের এই বিশাল নেয়ামত মহাগ্রন্থ আল কোরআনের যথাযথ হক আদায় করতে আমি পারবো কি না। এই বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! কোরআনের যথাযথ হক আদায় করতে

www.eelm.weebly.com

পারবেন কি না— এ কথা ভেবে আপনি অনর্থক দ্বিধান্বিত হবেন না। এভাবে 'অতঃপর তোমার মনে যেনো এর সম্পর্কে কোনো দ্বিধা না থাকে' বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে আমার প্রিয় রসুল! নিশ্চয় আপনার আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এ সম্পর্কে কোনো দ্বিধা, সংকোচ বা সন্দেহকে প্রশ্রয় দেবেন না। কাউকে ভয় পাবেন না। কাউকে পরোয়া করবেন না। আমি আপনার রক্ষক। কোরআনের পরিপূর্ণ হক আদায় করতে পারবো না— এমতো সন্দেহও পোষণ করবেন না। আমি আপনার জন্য সকল কিছু সহজ করে দেবো। কোরআনের যথা অধিকার প্রতিপালনের তৌফিকও দান করবো।

'লিতুনজিরবিহি' কথাটির অর্থ— যাতে আপনি এর দ্বারা সতর্ক করেন। অর্থাৎ এই পবিত্র কিতাব আপনার প্রতি এ কারণে অবতীর্ণ করা হয়েছে যে, আপনি এর মাধ্যমে অবিশ্বাসীদেরকে ভয় প্রদর্শন করবেন। এভাবে কথাটি 'অবতীর্ণ করা হয়েছে' বক্তব্যটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 'কোনো দ্বিধা না থাকে'— কথাটির সঙ্গেও আলোচ্য বাক্যটি সম্পর্কিত। এভাবে 'সতর্ক করো' কথটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে আমার রসুল! এই কোরআন সম্পর্কে আপনার মনে যেনো কোনো দ্বিধা না থাকে। দ্বিধামুক্ত হলেই কেবল আপনি অবিশ্বাসীদেরকে এর মাধ্যমে ভয় প্রদর্শন করতে পারবেন। সুতরাং দ্বিধাহীন চিত্তে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সঙ্গে অবিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করতে থাকুন। অবিশ্বাসীদেরকে ভয় করবেন না। নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করবেন যে, এই কোরআন প্রচারের পথে আল্লাহ্‌তায়ালাই আমাকে সাহায্য করবেন এবং আমাকে তৌফিক দান করবেন।

'ওয়া জিকরা লিল মু'মিনীন' অর্থ— এবং বিশ্বাসীদের জন্য এটা উপদেশ। 'জিকরা' (উপদেশ) শব্দটির সংযোগ রয়েছে কিতাবুন (কিতাব) এর সঙ্গে। অথবা এই শব্দটি একটি অনুক্ত উদ্দেশ্যের বিধেয়। কিংবা একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্ম। নতুবা তুনজিরা (সতর্ক করো) শব্দটির সঙ্গে সংযোজিত হওয়ার কারণে শব্দটি এখানে যের বিশিষ্ট হয়েছে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৩

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○

❑ তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তোমরা তাহার অনুসরণ কর এবং তাঁহাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করিও না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

---

www.eelm.weebly.com

এই আয়াতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের অনুসরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো। এখানে 'তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে' কথাটির অর্থ 'আল-কোরআন' এবং 'আল-হাদিস'। কোরআন এবং হাদিস— দু'টোই প্রত্যাদেশের মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ দু'টোর মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে, কোরআনের মর্ম এবং ভাষা দু'টোই আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত। আর হাদিসের মর্ম আল্লাহ্ প্রদত্ত। কিন্তু ভাষা রসুল স. এর। কোরআন হচ্ছে 'ওহিয়ে মাতলু' এবং হাদিস হচ্ছে 'ওহিয়ে গায়ের মাতলু'। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে— তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট যে সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ করো। অর্থাৎ কোরআন ও হাদিসের একনিষ্ঠ অনুসারী হও।

এরপর বলা হয়েছে-'এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ কোরো না'। এ কথার অর্থ— তোমরা আল্লাহ্র অবাধ্য হয়ে কোনো পথভ্রষ্ট জ্বিন অথবা মানুষের অনুসারী হয়ো না। উল্লেখ্য যে, নবী-রসুল এবং আউলিয়ায়ে কেরাম উদ্ধৃত নিষেধাজ্ঞাটির অন্তর্ভূত নন। কারণ তাঁরা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহভাজন ও নৈকট্যভাজন। আর আল্লাহ্তায়ালাই কোরআনের অন্যত্র তাঁদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

শেষে বলা হয়েছে—'তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো'। এখানে 'কলিলাম্ মা' অর্থ অল্পই। এর বিশেষ্য এখানে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ— কৃলিলান এবং তাজাক্কুরান এর মধ্যে 'মা' শব্দটি এখানে অতিরিক্ত। এটি কোনো ধাতুগত 'মা' নয়। অধিকতর স্বল্পতা বুঝানোর জন্যই 'অল্প' ও 'উপদেশ' (কৃলিলান এবং তাজাক্কারুণ) এর মধ্যে শব্দটি বসানো হয়েছে। অর্থাৎ 'কৃলিলান তাজাক্কারুণ' অর্থ অল্প উপদেশ গ্রহণ করো। আর কৃলিলাম্ মা তাজাক্কারুণ অর্থ খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে মানুষ! তোমাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক অর্থাৎ বিশ্বাসীগণ আল্লাহ্কে স্মরণ করে বা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশই উপদেশ গ্রহণ করে না।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৪, ৫

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَآئِلُوْنَ ۝ فَمَا كَانَ

دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝

❒ কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি! আমার শাস্তি তাহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছিল রাত্রিতে অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তাহারা বিশ্রামরত ছিল।

www.eelm.weebly.com

❐ যখন আমার শাস্তি তাহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছিল তখন তাহাদিগের কথা শুধু ইহাই ছিল যে, ' নিশ্চয় আমরা জালিম ছিলাম' ।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি! আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিলো নিশীথে অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তারা বিশ্রামরত ছিলো।' এখানে 'কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি' কথাটির অর্থ— অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করার ইচ্ছে করেছি অথবা ওই সকল জনপদের অধিবাসীদেরকে সাহায্যবিহীন অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি। এখানে 'বা'সুন' শব্দটির অর্থ আযাব বা শাস্তি। 'বায়াতান' শব্দটি একটি মূল শব্দ এবং শব্দটি এখানে কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশক। শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে— যখন তারা নিশীথে স্বগৃহে নিদ্রামগ্ন ছিলো। আর 'ক্বায়লুলা' অর্থ দিবানিদ্রা বা দিবসের শয্যাসুখ। আয়াতের বক্তব্য বিষয়টি এ রকম— ওই সকল জনপদের অধিবাসীরা ছিলো অবিশ্বাসী, সীমালংঘনকারী এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তারা তাদের আপনাপন নবীদের আহ্বান বার বার প্রত্যাখ্যান করে যাচ্ছিলো। অবিশ্বাস ও অংশীবাদীতার মধ্যে নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রাত্যহিক জীবন ছিলো নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত। তাই সত্যধর্মের আহ্বানের প্রতি তারা প্রদর্শন করে যাচ্ছিলো চরম ঔদাসিন্য। অকস্মাৎ আল্লাহ্পাক তাদের প্রতি অবতীর্ণ করলেন ভয়াবহ আযাব। কোনো কোনো জনপদের অধিবাসী তখন ছিলো নিদ্রামগ্ন। আমার অভিপ্রায়ানুসারে নিশীথের ওই নিদ্রামগ্ন অবস্থাতেই তাদের উপর অবতীর্ণ হলো আযাব। যেমন আযাব পতিত হয়েছিলো নবী লুতের সম্প্রদায়ের উপর। আবার কোনো কোনো সম্প্রদায় ছিলো দ্বিপ্রহরে নিদ্রামগ্ন বা বিশ্রামরত। ওই নিশ্চিন্ততার মধ্যে হঠাৎ একদিন তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করলাম আমি। এ রকম শাস্তি আমি অবতীর্ণ করেছিলাম নবী শোয়ায়েবের সম্প্রদায়ের উপর। তখন হঠাৎ গগনভেদী বিকট আওয়াজের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম আমি। ওই সকল অবাধ্যরা ছিলো অদূরদর্শী ও সত্যবিমুখ। আযাবের প্রতি ছিলো তাদের অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা। তাই তাদের নিরুদ্বিগ্ন নিদ্রা ও বিশ্রাম ছিলো চরম ঔদাসীন্যপূর্ণ।

পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'যখন আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিলো তখন তাদের কথা শুধু এটাই ছিলো যে, নিশ্চয় আমরা ছিলাম 'জালেম' ।' এখানে 'দা'ওয়া' শব্দটির অর্থ উক্তি বা কথা। আর 'দু'আ' অর্থ— প্রার্থনা বা দোয়া।

প্রখ্যাত ব্যাকরণজ্ঞ সিব্ওয়াইহ্ বলেছেন, আরববাসীরা বলে, হে আল্লাহ্! মুসলমানের উত্তম দোয়ার মধ্যে আমাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করো। অর্থাৎ আমাদেরকেও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখো। কিন্তু যে জনপদবাসীদের উপর শাস্তি নেমে এসেছিলো তাদের কথা কিন্তু এ রকম দোয়া বা প্রার্থনার মতো ছিলো

www.eelm.weebly.com

না। ভীষণ শাস্তি দর্শনে তারা এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলো যে— নিশ্চয় আমরা ছিলাম জালেম। এভাবে অপরাধ স্বীকার করার পরেও তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো। কারণ এটাই আল্লাহ্তায়ালার বিধান যে— শাস্তি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর তা আর উঠিয়ে নেয়া হয় না। শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে গেলে অপরাধ স্বীকার করে তওবা করতে হয় যথাসময়ে— আযাব প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে।

সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৬, ৭

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ۝

❐ অতঃপর যাহাদিগের নিকট রসূল প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিবই এবং রসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব।

❐ তৎপর তাহাদিগের নিকট সজ্ঞানে তাহাদিগের কার্যাবলী বিবৃত করিবই, আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।

উদ্ধৃত আয়াত দু'টোর প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'অতঃপর যাদের নিকট রসুল প্রেরণ করা হয়েছিলো তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করবই এবং রসুলগণকেও জিজ্ঞাসা করবো।' হজরত আবু তালহা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্পাক আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা তোমাদের রসুলের আহ্বানের কী জবাব দিয়েছিলে? আর সকল নবী-রসুলকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার বিধানসমূহ মানুষের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছিলে?

ইবনে মোবারকের বর্ণনায় রয়েছে, ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ্ বলেছেন, কিয়ামতের দিন ইস্রাফিল ফেরেশতাকে ডাকা হবে। হজরত ইস্রাফিল ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উপস্থিত হবেন। আল্লাহ্পাক জিজ্ঞেস করবেন, লওহে মাহফুজ তোমাকে যা দিয়েছিলো তুমি তার কী করেছো? তিনি বলবেন, আমি তা জিবরাইলকে পৌঁছে দিয়েছি। তখন ডাকা হবে হজরত জিবরাইলকে। বলা হবে, ইস্রাফিল তোমাকে যা দিয়েছে তুমি তার কী করেছো? তিনি জবাব দিবেন, আমি তা পয়গম্বরগণের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। এরপর পয়গম্বরগণকে জিজ্ঞেস করা হবে, জিবরাইল তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছিলো, তোমরা সেগুলোর কী করেছো? তাঁরা উত্তর দিবেন, আমরা সেগুলো মানুষের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছি। এটাই আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা।

www.eelm.weebly.com

হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বিদায় হজের ভাষণে বলেছিলেন, আমার সম্পর্কে যখন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে তখন তোমরা কী বলবে? সেখানে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বলেছিলেন, আমরা সকলে এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবো যে, আপনি আমাদের নিকট আল্লাহ্‌র বার্তা পৌঁছিয়েছেন। যথাযথভাবে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। সদুপদেশ দিয়েছেন। রসুল স. বলেছিলেন, হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাকো।

হজরত মুয়াবিয়া বিন যায়েদাহ্ থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার প্রভুপ্রতিপালক আমাকে ডাকবেন এবং বলবেন, আপনি কি আমার দাসদের নিকট আমার বাণী পৌঁছিয়েছিলেন? আমি উত্তর দিবো, হ্যাঁ। আমি আপনার বার্তা যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছি। হে উপস্থিত জনতা! অনুপস্থিতদেরকে আমার এই বাণী পৌঁছে দিও। এটা তোমাদের দায়িত্ব। কিয়ামতের দিন যখন তোমরা বাকরুদ্ধ হবে, তখন সর্বপ্রথম সত্য সাক্ষ্যদান করবে তোমাদের হাত ও পা।

আবু শায়েখ তাঁর 'আল উজমা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আবু সানান বলেছেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম হিসাব গ্রহণের জন্য ডাকা হবে লাওহকে। ভীত সন্ত্রস্ত লাওহকে তখন জিজ্ঞেস করা হবে, যে গুরু দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়েছিলো, তা তুমি পালন করেছো কি? লাওহ বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্‌তায়ালা বলবেন, তোমার এ কথার সাক্ষ্য কে? লাওহ বলবে, ইস্রাফিল। তখন ডাকা হবে হজরত ইস্রাফিলকে। ভীত ও কম্পিত হজরত ইস্রাফিলকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্‌তায়ালা বলবেন, লাওহ কি সঠিকভাবে আমার বিধান তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলো? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। লাওহ বলবে, আল্লাহ্‌পাকের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা, ইস্রাফিল আমাকে অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা করেছে।

ইবনে মোবারকের আজ্‌জুহুদ গ্রন্থে রয়েছে, আবু হীলা বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে সকলের আগে ডাকা হবে হজরত ইস্রাফিলকে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে বলবেন, তুমি কি আমার হুকুম যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছো? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। আমি জিবরাইলকে সবকিছু পৌঁছে দিয়েছিলাম। তখন ডাকা হবে হজরত জিবরাইলকে। আল্লাহ্‌পাক তাঁকে বলবেন, ইস্রাফিল কি আমার বিধান তোমার নিকটে সঠিকরূপে পৌঁছে দিয়েছে? হজরত জিবরাইল বলবেন, হ্যাঁ। তাঁর এই স্বীকৃতিদানের পর হজরত ইস্রাফিল হয়ে যাবেন দায়মুক্ত। আল্লাহ্‌পাক তখন হজরত জিবরাইলকে বলবেন, তুমি আমার বিধানাবলী কী করেছো? তিনি বলবেন, হে আমার পরওয়ার দিগার! আমি আপনার বিধানাবলী নবীগণের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। এরপর নবীগণকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, জিবরাইল কি আমার বিধানসমূহ তোমাদের নিকট ঠিক ঠিক পৌঁছে দিয়েছিলো? নবীগণ বলবেন, হ্যাঁ।

www.eelm.weebly.com

পুনরায় জিজ্ঞেস করা হবে আমার বিধানসমূহ পেয়ে তোমরা কী করেছো। তাঁরা বলবেন, আমরা আমাদের উম্মতের নিকট সেগুলো প্রচার করেছি। এরপর নবীগণের উম্মতদেরকে প্রশ্ন করা হবে আমার নবী রসুলেরা তোমাদের নিকট কি আমার বিধান প্রচার করেছিলো? উম্মতেরা কেউ বলবে, না। কেউ বলবে, হ্যাঁ। নবীগণ বলবেন, হে আমাদের আল্লাহ্! আপনি দয়া করে অনুমতি দান করলে আমরা মিথ্যাবাদীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী উপস্থাপন করতে পারি। আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, কারা তোমাদের সাক্ষী? নবীগণ বলবেন, মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর উম্মত। শেষ নবীর উম্মতগণকে ডাকা হবে তখন। বলা হবে, তোমরা কি সাক্ষ্য দিতে পারো যে, এই নবী-রসুলগণ তাদের উম্মতের নিকট যথাযথভাবে আমার বিধান পৌঁছে দিয়েছিলো? উম্মতে মোহাম্মদী জবাব দিবে, হ্যাঁ। অন্যান্য উম্মতেরা বলবে, এরা তো পৃথিবীতে এসেছিলো আমাদের অনেক পরে। সুতরাং এরা কি করে আমাদের সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করবে? আল্লাহ্তায়ালা উম্মতে মোহাম্মদীকে বলবেন, তোমরা তবে কিভাবে সাক্ষ্য প্রদান করছো? ওই সময় তো তোমরা পৃথিবীতে আগমনই করনি। জবাবে উম্মতে মোহাম্মদী বলবে, হে আমাদের পরম প্রভুপ্রতিপালক! আপনি আমাদের প্রতি রসুল প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন মহাগ্রন্থ আল কোরআন। ওই পবিত্র বাণীসম্ভার পাঠ করতে গিয়ে আমরা লিপিবদ্ধ দেখতে পেয়েছি, আপনি আপনার নবী রসুলগণের মাধ্যমে তাঁদের আপনাপন উম্মতদের নিকট আপনার নির্দেশনা ও বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন।

শেষ উম্মতের এই সাক্ষ্যদান সম্পর্কে সুরা বাকারার এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া কাজালিকা জায়ালনাকুম উম্মাতাঁও ওয়াসাতা'। ওই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত একটি হাদিস সংকলিত হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

'ওয়ালা নাস্আলান্নাল মুর্সালিন' অর্থ— অবশ্যই রসুলগণকেও জিজ্ঞেস করবো। কথাটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, আমি আমার নবীগণকে তখন জিজ্ঞেস করবো, তোমাদের উম্মতেরা কী জবাব দিয়েছে? অন্য একটি আয়াতেও প্রসঙ্গটি বিবৃত হয়েছে। যেমন— যেদিন আল্লাহ্ সকল নবী-রসুলকে একত্র করে বলবেন (তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে) তোমাদের বক্তব্য কী? তাঁরা বলবেন, এ সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। নিশ্চয় আপনি অদৃশ্য সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে—'তৎপর তাদের নিকট সজ্ঞানে তাদের কার্যাবলী বিবৃত করবোই, আর আমিতো অনুপস্থিত ছিলাম না।' এ কথার অর্থ— যখন নবীগণ বলবেন, এ সম্পর্কে আমাদের জানা নেই অথবা যখন পূর্ববর্তী উম্মতেরা নবীগণের ধর্ম প্রচারের বিষয়টিকে অস্বীকার করবে এবং উম্মতে

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদী যখন নবীগণের ও তাদের উম্মতের কার্যাবলীর যথাবিবরণ দান করবে। এখানে 'বি ই'লমিন' অর্থ— অবহিতির সাহায্যে। অথবা আমি তাদের প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা জানতাম। প্রথম অবস্থায় শব্দটি কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশক এবং দ্বিতীয় অবস্থায় কর্মকারকের। আর 'আমিতো অনুপস্থিত ছিলাম না' কথাটির অর্থ— আমি তো নবীগণের ধর্মপ্রচার, নবীগণের উম্মতের স্বীকৃতি অথবা অস্বীকৃতিসূচক জবাব এবং উম্মতে মোহাম্মদীর সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কে অনবগত ছিলাম না। অর্থাৎ পূর্বাপর সকল কিছু সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত হওয়া সত্ত্বেও কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্পাক নবী ও তাঁদের উম্মতগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এই জিজ্ঞাসাবাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে— নবীগণের অনন্য মর্যাদা ও উম্মতে মোহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা। আর এর মাধ্যমে অবিশ্বাসীদেরকে তিরস্কার করা।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৮

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

❐ সেদিন ওজন ঠিকভাবেই করা হইবে, যাহাদিগের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই সফলকাম হইবে;

সেদিন ওজন ঠিক করা হবে— কথাটির অর্থ, যেদিন নবীগণ ও তাঁদের উম্মতদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সেদিন মীযানকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে ন্যায্যভাবে। আর সকলের পাপ-পুণ্য ওজন করা হবে সঠিকভাবে। 'আল ওয়াজনু' (ওজন) শব্দটি এখানে উদ্দেশ্য। এর বিধেয় হচ্ছে 'ইয়াওমাইজিন' (সেদিন)। আর 'আলহাক্কুন (ঠিকভাবেই) শব্দটি এখানে উদ্দেশ্যের সিফাত বা গুণ। অথবা আলহাক্কুন হচ্ছে বিধেয় এবং এর উদ্দেশ্য এখানে রয়েছে উহ্য। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়াচ্ছে— ওই হক বা সঠিকতা, যার মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। এ কথাটি মেনে নেয়া অত্যাবশ্যক।

হাদিসে জিবরাইলে হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের বর্ণনায় এসেছে— হজরত জিবরাইল বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ইমান কী? রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ ফেরেশ্তা, নবী-রসুল, বেহেশত-দোজখ, মীযান এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করা। এ কথাটিও বিশ্বাস করা যে, ভালো ও মন্দ আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়। যে এগুলোর উপর বিশ্বাস রাখবে, সেই হবে প্রকৃত ইমানদার। হজরত জিবরাইল বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। হাদিসটি বায়হাকী তাঁর আল বা'আ'ছ নামক গ্রন্থে হজরত ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে

www.eelm.weebly.com

মোবারক বর্ণনা করেছেন তার আজ্‌জুহুদ গ্রন্থে। হজরত সালমান থেকে বর্ণনা করেছেন আজরি তাঁর আশ্‌শরিয়ত পুস্তকে। আবু শায়েখ তাঁর তাফসীরে হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে উল্লেখ করেছেন, মীযানের হবে একটি মুখ ও দু'টি পাল্লা। পাপ-পুণ্যের ওজন কিভাবে হবে, সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট মতভেদ। কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের আমলনামা তুলে নিয়ে যাওয়া হবে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, হাকেম এবং বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত ও হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত একটি হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে আমার উম্মতের একজনকে সকলের সামনে উপস্থিত করা হবে। তার আমলনামা হবে নিরানব্বইটি। আমলনামাগুলোর আকৃতিও হবে বিশাল। আল্লাহ্‌পাক তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এই আমলনামার কোনো কিছু কি তুমি অস্বীকার করতে চাও? আমলনামা লিপিবদ্ধকারীরা কি তোমার কোনো হক নষ্ট করেছে? লোকটি বলবে, না। হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তারা আমার কোনো হক নষ্ট করেনি। বঞ্চিতও করেনি আমাকে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলবেন, তুমি যা বলছো তা যথার্থ নয়। আমার কাছে জমা রয়েছে তোমার একটি পুণ্য। আজ তোমার কোনো অধিকারই নষ্ট করা হবে না। এরপর বের করা হবে একটি ছোট্ট কাগজ যার মধ্যে লেখা থাকবে— 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু'। লোকটি বলবে, হে আমার দয়াময় প্রভু! এই বিশালাকৃতির আমলনামাগুলোর বিপরীতে এই ছোট্ট কাগজটি দিয়ে আর কী হবে। আল্লাহ্‌পাক বলবেন, আজ তোমার উপর কোনো জুলুম করা হবে না। এরপর নিরানব্বইটি বিশাল আমলনামা রাখা হবে মীযানের এক পাল্লায়। অপর পাল্লায় স্থাপন করা হবে ছোট্ট কাগজটি। সাথে সাথে কাগজের টুকরা রাখা পাল্লাটি হয়ে যাবে অধিকতর ভারী। আল্লাহ্‌তায়ালার নামের চেয়ে অধিক ভারী যে আর কিছুই নয়।

হাসান বসরী সূত্রে আহমদ বলেছেন, শেষ বিচারের সময় মীযান প্রতিষ্ঠিত করা হবে। এরপর এক লোককে ডেকে এনে এক পাল্লায় উঠানো হবে এবং অপর পাল্লায় রাখা হবে তার আমলনামা। দেখা যাবে তার পাপে ভরা আমলনামা তার চেয়ে অধিক ভারী। দোজখী সাব্যস্ত হবে সে। তাই ডানে বামে না তাকিয়ে দোজখের দিকে যাত্রা শুরু করবে। তখন তাকে লক্ষ্য করে বলা হবে, চলে যাচ্ছো কেনো? এখনো তো আমলনামার ওজন শেষ হয়নি। পুনরায় ওজন শুরু হবে। আবার তাকে উঠোনো হবে এক পাল্লায় আর অপর পাল্লায় রাখা হবে তার বিশাল পাপের বোঝা। এরপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' লেখা একটি ছোট্ট কাগজ লোকটির প্রাল্লায় রাখা হবে। আর কাগজটি রাখার সঙ্গে সঙ্গে লোকটির পাল্লাই হয়ে যাবে অধিক ভারী।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর থেকে ইবনে আবিদ্ দুনইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিচারের দিন একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে থাকবেন হজরত আদম। তিনি তখন থাকবেন দু'টি সবুজ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায়। দেখে মনে হবে, যেনো দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি সবুজ খেজুর বৃক্ষ। তিনি আপন স্থানে দাঁড়িয়ে দোজখে গমনকারীদের দেখতে থাকবেন। তখন আমার এক উম্মতকে দোজখের দিকে যেতে দেখে তিনি আমাকে ডাকবেন। বলবেন, আহমদ! এদিকে এসো। আমি বলবো, হে মহামানবতার জনক! আমি উপস্থিত। তিনি বলবেন, তোমার এক উম্মতকে দোজখের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ কথা শুনে আমি দ্রুত ওই ফেরেশতাদের কাছে ছুটে যাবো, যারা দোজখীদেরকে দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। বলবো, হে আল্লাহ্র দূত! একটু অপেক্ষা করুন। দলনেতা ফেরেশতা বলবে, আমি অত্যন্ত নির্দয় ও কঠোর। আমি যেমন নির্দেশ পাই, তেমনি কাজ করি। এর বিপরীত কিছু করার সাধ্য আমার নেই। বর্ণনাকারী বলেছেন, ওই ফেরেশতার কথা শুনে রসুল স. নিরাশ হয়ে পড়বেন। তিনি স. তখন বাম হাতে আপন কেশ গুচ্ছ মুষ্টিবদ্ধ করে আল্লাহ্র আরশের দিকে তাকিয়ে বলবেন, হে আমার পরম প্রিয় প্রভুপ্রতিপালক! আমাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমার উম্মতকে আপনি অপমানিত করবেন না। তখন আরশ থেকে ঘোষিত হবে মোহাম্মদের কথা শোনো এবং ওই লোককে মীযানের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। রসুল স. বলেছেন, লোকটিকে মীযানের নিকটে নিয়ে আসার পর পুনরায় ওজন শুরু হবে। আমি আমার আস্তিন থেকে ছোট্ট একটি শাদা কাগজ বের করে বিস্মিল্লাহ্ বলে মীযানের ডান পাশের পাল্লায় রাখবো। সঙ্গে সঙ্গে তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। ঘোষণা করা হবে— সফলতা, সফলতা। নির্দেশ হবে একে জান্নাতে নিয়ে যাও। লোকটি ফেরেশতাদেরকে বলবে, হে বেহেশতের বাহিনী! একটু দাঁড়াও। আমি মহাসম্মানিত ব্যক্তির নিকটে কিছু জিজ্ঞেস করবো। এরপর সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলবে, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। আপনি কে? আপনার পবিত্র মুখাবয়ব কতই না উজ্জ্বল। আল্লাহ্পাকের পবিত্র দরবারে আপনি কতইনা সম্মানিত। কী বিশাল অনুগ্রহ আপনার, আপনি আমাকে নিশ্চিত নরকযাত্রা থেকে উদ্ধার করেছেন। আমি বলবো, আমি তোমার নবী মোহাম্মদ। যে শাদা কাগজটির কারণে তোমার পাল্লা ভারী হয়েছে, ওই কাগজে লিখিত রয়েছে কিছু দরূদ— যা তুমি আমার নিকটে প্রেরণ করেছিলে। ওই দরূদের কারণেই তুমি পরিত্রাণ লাভ করলে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যার আমলনামা ওজন করা হবে তাকে রাখা হবে মীযানের একটি পাল্লায়। অপর পাল্লায় রাখা হবে তার আমলনামা। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

বিচারের দিন পাপ-পুণ্য ওজনের সময় কোনো কোনো বিশাল বপুধারী লোকের ওজন হবে মশার পাখার চেয়েও কম। এরপর তিনি স. পাঠ করবেন— 'ফালা' নুক্বিমু লাহুম ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ওয়ায্না (কিয়ামত দিবসে তাদের আমল ওজনযোগ্য বিবেচনা করবো না)।

আবু নাঈম এবং আজরীর বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, অতিরিক্ত পানাহারে অভ্যস্ত বিশাল দেহবিশিষ্ট কোনো কোনো লোককে মীযানের এক পাল্লায় রাখা হবে। তবুও দেখা যাবে তাদের চেয়ে পাপের পাল্লাটিই অধিকতর ভারী। ফেরেশতারা এ রকম সত্তর হাজার লোককে এক সঙ্গে তাড়িয়ে নিয়ে দোযখে ফেলে দিবেন।

মানুষের আমল সেদিন হবে আকৃতিবিশিষ্ট। ওই আকৃতিগুলোকে সেদিন ওঠানো হবে মীযানের এক পাল্লায়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দু'টি বাক্য এমন— যা বলতে সহজ কিন্তু ওজনে ভারী। আল্লাহ্পাকের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ওই ছোট্ট বাক্য দু'টি হচ্ছে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' এবং 'সুবহানাল্লাহিল আযীম'।

ইসপাহানী তাঁর তারগীব নামক গ্রন্থে হজরত ইবনে ওমর থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'সুবহানাল্লাহ্' শব্দটি অর্ধেক পাল্লাকে এবং 'আলহামদুল্লিাহ্' শব্দটি সম্পূর্ণ পাল্লাকে ভারী করে দেয়।

হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পবিত্রতা ইমানের অর্ধাংশ। আর 'আলহামদুলিল্লাহ্' পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে দেয়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আসাকেরও এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বায্যার এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অন্তিম সময়ে হজরত নূহ্ তাঁর দুই পুত্রকে ডেকে বললেন, আমি তোমাদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' (বিশ্বাস করতে ও পাঠ করতে) এর নির্দেশ দিচ্ছি। জেনে রেখো, আকাশ-পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে— সমস্ত কিছু এক পাল্লায় রেখে অপর পাল্লায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' রাখলে ওই পাল্লাটিই বেশী ভারী হবে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আবু ইয়া'লী, ইবনে হাব্বান এবং হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত একটি হাদিসে এসেছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে বলেছেন,সকল আকাশ এবং সপ্তস্তরবিশিষ্ট জমিনসহ সমগ্র সৃষ্টি এক পাল্লায় রেখে অপর পাল্লায় যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' স্থাপন করা যায়, তবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্র' পাল্লাটি হবে অধিক ভারী।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার জীবনাধিকারী ওই পবিত্র সত্তার শপথ! পৃথিবী ও তার মৃত্তিকাস্থিত সকল কিছু এবং আকাশ ও আকাশ জগতের সকল কিছু এক পাল্লায় রাখার পর অপর পাল্লায় লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ রাখলে অপর পাল্লাটিই হয়ে যাবে অধিকতর ভারী।

হজরত আবু দারদা থেকে আবু দাউদ, তিরমিজি ও ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পাপ-পুণ্য ওজনের সময় দেখা যাবে উত্তম চরিত্র অপেক্ষা অন্য কোনো কিছুই অধিক ভারী নয়।

হজরত আবু জর গিফারী থেকে উত্তম সূত্রে বায্যার, তিবরানী, আবু ইয়া'লী, ইবনে আবিদ্ দুনইয়া এবং বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন দু'টো আমলের কথা বলবো, যা সুবহ কিন্তু ওজনের সময় হবে অত্যন্ত ভারী। হজরত আবু জর বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! দয়া করে অবশ্যই বলুন। তিনি স. বললেন, পবিত্র চরিত্র এবং মৌনতা (স্বল্প ভাষ্যতা)। যার অধিকারে আমার জীবন তাঁর শপথ! এ দু'টো আমলের চেয়ে উত্তম আমল আর নেই।

ইমাম আহমদ আজ্জুহুদ পুস্তকে হাযেম নামক এক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. এর দরবারে বসে এক লোক কাঁদছিলেন। হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে বললেন লোকটি কে? রসুল স. লোকটির পরিচয় জানালেন। হজরত জিবরাইল বললেন, আদম সন্তানদের সকল আমলের ওজন হয় কিন্তু অশ্রুর ওজন হয় না। মহান আল্লাহ্ এক ফোঁটা অশ্রু দিয়ে একটি আগুনের সমুদ্র নিভিয়ে দিবেন।

হজরত মা'কাল বিন ইয়াসার থেকে বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যখন চোখ অশ্রু বিসর্জন দেয় তখন আল্লাহ্পাক চোখের অসিলায় অশ্রু বিসর্জনকারীর সমস্ত শরীর দোজখের জন্য হারাম করে দেন। যে গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে, ওই গণ্ডদেশ বিশিষ্ট মুখাবয়বে কখনই ফুটে উঠবে না অপমান বা অপদস্থতা। প্রতিটি বিষয় পরিমাপযোগ্য। কিন্তু চোখের জল কখনো পরিমাপযোগ্য নয়। এক বিন্দু আঁখি জল একটি বিশাল অগ্নিসিন্ধুকে নির্বাপিত করে দিতে পারে।

আমি বলি, উপরের বর্ণিত হাদিস সমূহের মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ওজন করা হবে ব্যক্তিকে ও তার পাপ-পুণ্যকে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, তখন পাপ-পুণ্যগুলো হবে আকৃতি বিশিষ্ট। পাপাকৃতিগুলোকে স্থাপন করা হবে এক পাল্লায় এবং অপর পাল্লায় স্থাপন করা হবে পুণ্যের আকৃতিগুলোকে। পুণ্যের পাল্লা

www.eelm.weebly.com

ভারী হলে পুণ্যের আকৃতিগুলোকে রেখে দেয়া হবে জান্নাতের একটি স্থানে। তারপর ওই পুণ্যের অধিকারী ব্যক্তিকে বলা হবে, যাও। তুমি তোমার সুন্দর পুণ্যগুলোর সঙ্গে মিলিত হও। ওই ব্যক্তি তখন জান্নাতে প্রবেশ করে মিশে যাবে তার পুণ্যগুলোর সঙ্গে। আপন পুণ্যগুলোকে সে তখন সহজেই চিনতে পারবে।

পাপীদের পাপাকৃতি হবে অত্যন্ত কুৎসিত দর্শন। সেগুলো হবে অত্যন্ত হাল্‌কা। অসত্য ও অবাধ্যতার ওজন এ রকম হাল্‌কাই হয়। ওজনের পর পাপিষ্ঠদের পাপানুকৃতিগুলোকে নিক্ষেপ করা হবে নরকের নির্ধারিত স্থানে। পাপিষ্ঠদের বলা হবে এবার যাও, নরকে প্রতীক্ষমান তোমাদের অসুন্দর আমলগুলোর সঙ্গে মিলিত হও। নরকে প্রবেশ করে পাপিষ্ঠরা সহজেই তাদের পাপানুকৃতিগুলোকে চিনতে পারবে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জুমার নামাজ পাঠের পর স্বগৃহে ফিরে এসে গৃহবাসী যেমন তার আপন আবাস সহজেই চিনে নেয়, তেমনি জান্নাতী ও জাহান্নামীরা জান্নাতে ও জাহান্নামে রক্ষিত তাদের আমলগুলোর কারণে সহজেই তাদের জন্য নির্ধারিত স্থান চিনে নিতে পারবে। স্বগৃহে ফিরে আসা নামাজপাঠকারীর চেয়েও অধিক পরিচিত হবে তাদের জান্নাতের ও জাহান্নামের অবস্থানগুলো। হাদিসটি অবশ্য অশক্ত সূত্রসম্বলিত।

ইবনে মোবারকের বর্ণনায় রয়েছে, হাম্মাদ বিন আবী সালমান উল্লেখ করেছেন, বিচারের দিবসে এক লোকের সামনে হাজির করা হবে তার নিকৃষ্ট আমলগুলোকে। হঠাৎ একটি ক্ষুদ্র বস্তু বৃষ্টির ফোঁটার মতো পতিত হবে মীযানের একটি পাল্লায়। ফেরেশ্‌তা অথবা অন্য কেউ তখন বলবে এটা ওই শিক্ষাদানের পুণ্য যে সৎ শিক্ষা তুমি মানুষকে দিয়েছো। পর্যায়ক্রমে ওই শিক্ষা একজনের নিকট থেকে অন্যজন পেয়েছে। ওই পুণ্যপ্রবাহের বিনিময় আজ দেয়া হলো তোমাকে। ইব্রাহিম নাখয়ী সূত্রে ইবনে আবদুর রাজ্জাকও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

তিবরানীর বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, জানাযার সঙ্গে গমনকারীর জন্য রয়েছে— দুই কিরাত পুণ্য, যা পাহাড় সদৃশ।

ইসপাহানীর বর্ণনায় রয়েছে, জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ফরজ নামাজের একটি ওজন রয়েছে। তাই ফরজ নামাজের কোনো ত্রুটি করলে আল্লাহ্‌পাকের নিকট জবাবদিহী করতে হবে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মারফু সূত্রে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, ফরজ নামাজে ত্রুটি থাকলে

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলবেন, দ্যাখো, আমার এই বান্দার কোনো নফল ইবাদত রয়েছে কিনা। যদি থাকে, তবে ওই ইবাদত দ্বারা ফরজ নামাজের ক্ষতিপূরণ করে নাও।

কোনো কোনো হাদিসের মাধ্যমে জানা যায়, দৈহিক ইবাদতের পুণ্য ওই দেহের সঙ্গে ওজন করা হবে। তিবরানী তাঁর আওসাত পুস্তকে হজরত জাবের থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পাপ-পুণ্য ওজনের সময় বান্দার ওই অর্থব্যয়কে সর্বপ্রথম ওজন করা হবে, যা সে তার পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করেছিলো।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধানকে সত্য বলে জেনেছে এবং মেনেছে এবং জেহাদে গমনের উদ্দেশ্যে নিজের জন্য অথবা অন্য কোনো মুজাহিদের জন্য ঘোড়া প্রতিপালন করেছে— তার ওই ঘোড়া, ঘোড়ার আহার্য, মল-মূত্র, সব কিছু পাপ-পুণ্য ওজনের সময়ে পুণ্যের পাল্লায় রেখে দেয়া হবে। হজরত আলী থেকে তিবরানী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র পথে জেহাদের উদ্দেশ্যে কেউ কোনো ঘোড়া প্রতিপালন করলে ওই ঘোড়ার খাদ্য এবং ঘোড়ার পায়ের চিহ্নসমূহ পাপ-পুণ্য ওজনকালে তার পুণ্যের পাল্লায় রেখে দেয়া হবে।

হজরত আলী থেকে উত্তমসূত্রে ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর প্রিয় কন্যা হজরত ফাতেমাকে বলেছেন, তোমার কোরবানীর পশু জবাইকালে তুমি নিজে সেখানে উপস্থিত থেকো। জবাইকৃত পশুর প্রবহমান রক্ত তোমার ক্ষমার কারণ হবে। আরো শোনো, কোরবানীকৃত পশুর রক্ত ও গোশত সত্তর গুণ বৃদ্ধি করে কিয়ামতের দিন পুণ্যের পাল্লায় রাখা হবে। এ কথা শুনে হজরত আবু সাঈদ খুদরী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এ বিধানটি কি কেবল আপনার বংশধরদের জন্য? তিনি স. বললেন, না, সকলের জন্য।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বায়হাকী, হজরত আবু জর গিফারী থেকে ইবনে হাব্বান, এবং দুর্বল সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওজুর পর পরিষ্কার বস্ত্র দিয়ে ওজুর পানি মুছে নেয়াতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু না মোছাই উত্তম। কেননা কিয়ামতের দিন অন্যান্য আমলের সঙ্গে ওজুকেও ডাকা হবে। ইবনে আবী শায়বা তাঁর স্বরচিত পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব ওজুর পর ভেজা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোনো বস্ত্র দ্বারা মুছে ফেলাকে পছন্দ করেন নি। তিনি বলতেন, ওজুর জন্য ব্যবহৃত পানি পুণ্যের পাল্লায় ওজন করা হবে।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে হজরত ওমর বিন খাত্তাব বলেছেন, আমি একজনকে একটি উট দান করেছিলাম। ওই উটের বাচ্চা হলে আমি সে বাচ্চাটি

www.eelm.weebly.com

ক্রয় করতে মনস্থ করলাম। এ ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করতেই রসুল স. বললেন, ওভাবেই থাকতে দাও। এই উটকে ও তার সকল অধঃস্তন শাবককে তোমার পুণ্যের পাল্লায় রেখে ওজন করা হবে।

হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে জাহাবী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমল ওজনের সময় আলেম সম্প্রদায়ের কলমের কালি এবং শহীদগণের রক্তও ওজন করা হবে। কলমের কালি তখন হবে রক্ত অপেক্ষা অধিক ভারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফামান ছাক্কুলাত মাওয়াযিনুহু ফা উলায়িকা হুমুল মুফলিহুন' (যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে)। এখানে 'মাওয়াযিনুন' শব্দটি 'মাওযু' শব্দের বহুবচন। শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যাদের পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। মুজাহিদ বলেছেন, মাওয়াযিনুন শব্দটি মিযানুন শব্দের বহুবচন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, নেক আমল ওজনকারী পাল্লা। এ ব্যাখ্যাটিকে গ্রাহ্য করলে মেনে নিতে হয় যে, সেদিন প্রত্যেকের দাঁড়িপাল্লা (মীযান) হবে পৃথক পৃথক।

'আল মুফলিহুন' অর্থ সফলকাম। এখানে সফলকাম বলা হয়েছে তাদেরকে, যাদের পাপের চেয়ে পুণ্যের পাল্লা অনেক ভারী। আল্লাহ্‌পাক বিশেষভাবে যে সকল পাপীকে ক্ষমা করে দিবেন, তারা এই সফলতার আওতায় পড়েন না। কারণ পাপ-পুণ্যের ওজনের মাধ্যমে নয়, তাদের পরিত্রাণ লাভ হবে ক্ষমার মাধ্যমে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৯, ১০

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ۝ وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

❒ আর যাহাদিগের পাল্লা হাল্‌কা হইবে তাহারাই নিজদিগের ক্ষতি করিয়াছে, যেহেতু তাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিত।

❒ আমি তো তোমাদিগকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং উহাতে তোমাদিগের জীবিকার ব্যবস্থাও করিয়াছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

---

www.eelm.weebly.com

এখানেও 'মাওয়াযিনুন' শব্দটির মাধ্যমে পুণ্যের পাল্লাকেই বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে— যাদের (পুণ্যের) পাল্লা হালকা হবে। এ অবস্থা হবে অবিশ্বাসীদের। যে সকল পাপী বিশ্বাসীর পুণ্যের পাল্লা হাল্কা হবে তারাও আলোচ্য বাক্যটির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসীরাই বাক্যটির লক্ষ্য। কেননা কোরআন মজীদের বর্ণনারীতির বৈশিষ্ট্য এই যে, বিশ্বাসীদের পাশাপাশি অবিশ্বাসীদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। কেবল পাপকর্মে অথবা পাপ ও পুণ্য উভয় কর্মে অভ্যস্ত বিশ্বাসীদের প্রসঙ্গ সাধারণত আলোচিত হয় না। আগের আয়াতে (৮) যেহেতু পুণ্যবান বিশ্বাসীদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, তাই ধরতে হবে আলোচ্য আয়াতটি আলোচিত হয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য।

'আল্লাজিনা খসিরু আনফুসাহুম' অর্থ— যারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা জন্মগত সৎস্বভাবগুলোকে নষ্ট করে দিয়ে শাস্তি পাওয়ার উপযোগী হয়েছে।

'বিমা কানু বি আয়াতিনা ইয়াজ্‌লিমুন' অর্থ—'যেহেতু তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করতো।' সুরা আলক্বারিআ'হ্র তাফসীরে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাল্লাহ্।

হজরত আবু বকরের পরকাল যাত্রার পর হজরত ওমর একদিন উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমলনামা ওজনের দিন পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে সত্যানুসরণের জন্য। সত্যকে যে পাল্লায় রাখা হবে, সে পাল্লা ভারী হবেই হবে। আর ওই সকল লোকের পুণ্যের পাল্লা হাল্কা হবে যারা পৃথিবীতে ছিলো মিথ্যানুসারী। আর মিথ্যাকে যে পাল্লায় রাখা হয়, সে পাল্লা হাল্কা হবেই হবে।

আমি বলি, এখানে মীযান অর্থ পুণ্যের পাল্লা। এবং মিথ্যা অর্থ ওই সকল মিথ্যা বিশ্বাস ও কর্ম, যেগুলোকে বাতিলপন্থীরা পুণ্যকর্ম বলে মনে করে। তাদের ওই পুণ্যকর্মগুলো আল্লাহ্র নিকটে সরাসরি কুফর ও বেদাত। আল্লাহ্র নিকটে সেগুলোর কোনো ওজনই নেই। কাফের ও বেদাতীদের পুণ্যকর্ম হচ্ছে মরুভূমিতে পরিদৃশ্যমান মরীচিকার মতো। দূর থেকে মনে হয় পানি। কিন্তু নিকটে গেলে দেখা যায় কিছুই নেই। কাফের ও বেদাতীরাও তেমনি আল্লাহ্তায়ালার সকাশে উপস্থিত হলে কিছুই পাবে না। আল্লাহ্পাক তাদের পরিপূর্ণ হিসাব গ্রহণ করবেন।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে—'আমিতো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছি।' এ কথার অর্থ— আমি পৃথিবীতে দিয়েছি তোমাদের বসবাসের অধিকার। দিয়েছি চাষাবাদ, বাণিজ্য, বৈভব, পরিবার পরিজন ইত্যাদি। আমার এই দানের কারণেই তোমরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছো পৃথিবীতে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— এবং ওতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। এখানে মায়াইশা শব্দটি মাইশাতুন শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ পৃথিবীতে আমি তোমাদেরকে ঘর-বাড়ী, চতুষ্পদ জন্তু, পানাহারের সামগ্রী, সাংসারিক সামগ্রী ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় জীবনোপকরণ দান করেছি। শেষে বলা হয়েছে—'তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।' এ কথার অর্থ— আপাদমস্তক আমার অনুগ্রহে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না। কৃতজ্ঞতা যারা প্রকাশ করে তাদের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১১

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○

❒ আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদিগের রূপ দান করি, এবং তৎপর ফেরেশ্‌তাদিগকে আদমের নিকট নত হইতে বলি; ইবলিস ব্যতীত সকলেই নত হয়। যাহারা নত হইল সে তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইল না।

'ওয়া লাকৃদ খালাক্বনাকুম' (আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি)। এ কথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদেরকে অস্তিত্বদানের পূর্বেই আমি নির্ভুল দৃষ্টিকোণের মধ্যে তোমাদের আদি-অন্তের বাস্তবতাকে পরখ করে নিয়েছি। সম্ভাব্য জগতের বৃত্তে তোমাদের অবস্থান ও গুরুত্ব আমি নির্ধারণ করে নিয়েছি পূর্বেই । আমার অতুলনীয় ও অদৃশ্য পরিকল্পনার মধ্যেই প্রথমে নিরুপিত হয়েছে তোমাদের অস্তিত্বের সূচনা। সেই সূচনা থেকে সৃষ্ট হয়েছো তোমরা। তোমাদের সেই পরিকল্পিত অস্তিত্ব, সূক্ষ্ম জগতের অস্তিত্ব, স্থুল জগতের অস্তিত্ব এবং তোমাদের চিরকালীন অস্তিত্ব— সকল অস্তিত্বের স্রষ্টা একমাত্র আমি। সৃজনশীলতা কেবল আমার। অন্য কারো নয়। তাই হে মানুষ! দোদুল্যমানতাকে পরিহার করে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এ কথাটি মেনে নাও যে, আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি।

'ছুম্মা সাওওয়ারনাকুম' (অতঃপর তোমাদের রূপ দান করি)। এ কথার অর্থ— হে মানুষ! আমি তোমাদের প্রথম পিতা আদমের জ্ঞানের পরিমাপ করেছি প্রথমে। তারপর তাকে দিয়েছি মানুষের আকার। সেই ধারাবাহিকতা ধরে বয়ে

www.eelm.weebly.com

চলেছে যথাবিবেকসম্পন্ন এবং যথাআকৃতিধারী মানুষের বংশধারা। আলোচ্য বাক্যটির ব্যাখ্যা সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা, জুহাক এবং সুদ্দী বলেছেন— এ কথার অর্থ, হে মানুষ! আমি তোমাদের প্রকৃতি নির্ধারণ করে প্রথমে সৃষ্টি করেছি তোমাদের পিতাদেরকে। তারপর মাতৃউদরে তোমাদেরকে দিয়েছি মানুষের রূপ।

মুজাহিদ বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবে এ রকম— আমি তোমাদের সকল পিতৃ-পুরুষের সূক্ষ্ম আকৃতি সৃষ্টি করার পর সকলকে স্থাপন করেছি তোমাদের প্রথম পিতা আদমের পৃষ্ঠদেশে। তিনিই তোমাদের আদি পিতা। তাই তার আকার নিয়েই তোমরা ভূমিষ্ঠ হয়ে চলেছো এই মাটির পৃথিবীতে। এভাবে আমি তোমাদের রূপ দান করেছি।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'সাওওয়ারনাকুম' কথাটির অর্থ হবে— তোমাদেরকে আমি রূহের (আত্মার) জগতে অঙ্গীকারাবদ্ধ করার সময়ে সূক্ষ্ম আকার দান করেছিলাম। সেই শপথের অনুষ্ঠানে আমার দেয়া সূক্ষ্ম আকার নিয়ে অসংখ্য পিপীলিকার মতো তোমরা সমবেত হয়েছিলে।

হজরত ইকরামা বলেছেন, এখানে 'সৃষ্টি করি' এবং 'রূপ দান করি' কথা দু'টোর অর্থ— আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি তোমাদের পিতাদের পৃষ্ঠদেশে। তারপর তোমাদের মাতৃকুলের উদরে তোমাদেরকে দিয়েছি মানুষের রূপ। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি মায়ের গর্ভে। তারপর সেখানেই তাদেরকে দিয়েছি চক্ষু, কর্ণ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট পরিপূর্ণ মানুষের প্রাথমিক রূপ।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বিলম্ব বুঝানোর জন্য এখানে ছুম্মা (অতঃপর) শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। ব্যবহৃত হয়েছে ওয়াও (এবং) অর্থে। তাই এখানে কথাটি হবে এ রকম— আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং আমিই তোমাদেরকে রূপ দান করেছি। এখানে রূপ বা আকৃতি দানের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এ কারণে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার সকল সৃষ্টি আকারবিশিষ্ট নয়। যেমন রূহ, নফস ইত্যাদির দর্শন গ্রাহ্য আকার বা রূপ নেই।

এরপর বলা হয়েছে—'তৎপর ফেরেশতাদেরকে আদমের নিকট নত হতে বলি; ইবলিস ব্যতীত সকলেই নত হয়। যারা নত হলো সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।' আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত আদমকে সেজদা দানের নির্দেশ জারী করেছিলেন ফেরেশতাকুল ও ইবলিসের উপর। কিন্তু সকল ফেরেশতা সেজদা করলেও ইবলিস সেজদা করেনি, সেই কথাই বলা হয়েছে এখানে। সুরা বাকারার তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরের আয়াতে এ সম্পর্কে আরো আলোচনা এসেছে। বলা হয়েছে—

www.eelm.weebly.com

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۖ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ۝

❒ তিনি বলিলেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত করিল যে তুমি নত হইলে না?' সে বলিল, 'আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ।'

'ক্বালা মা মানায়াকা আল্‌লা তাস্‌জুদা ইজ্ আমারতুকা (তিনি বললেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত করলো যে তুমি নত হলে না?)। এখানে আঁল্‌লা তাস্‌জুদা (তুমি নত হলে না) কথাটির 'লা' শব্দটি অতিরিক্ত। যেমন, লি আল্লা ইয়া'লামু কথাটির 'লা' শব্দটি অতিরিক্ত। এই 'লা' ক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। এখানে তাই 'কী তোমাকে নিবৃত্ত করলো' বলে আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশকে অধিক গুরুত্ববহ বা মজবুত করা হয়েছে। অর্থাৎ এই মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশ না মানা (হজরত আদমের নিকট নত না হওয়া) একটি চরম গর্হিত অপরাধ।

কেউ কেউ বলেছেন, 'লা' শব্দটি এখানে অতিরিক্ত নয়। কোনো ব্যক্তিকে যদি কোনো কাজ থেকে বিরত রাখা হয় তবে সে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। সে কারণে এখানে বক্তব্য বিষয়টি এ রকম হবে যে— কী (কোন্ কাজ) তোমাকে সেজদার নির্দেশ লংঘনে বাধ্য করলো।

কেউ আবার বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির কিছু অংশ অনুক্ত রয়েছে। ওই অনুক্ত অংশসহ আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— কোন্ বস্তু তোমাকে নির্দেশ বাস্তবায়ন থেকে বিরত রেখেছে। আর তোমার নত না হওয়ার কারণই বা কী? কোনো কিছুই আল্লাহ্‌তায়ালার অজানা নয়। তবু এ রকম প্রশ্ন করার কারণ এই যে, এতে করে ইবলিস যেনো তিরস্কৃত হয় এবং তার অবাধ্যতা ও প্রতারণার স্বরূপ সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে যায়। এখানে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে যে, সাধারণ নির্দেশ অবশ্যপালনীয়। অর্থাৎ যেখানে নির্দেশসূচক শব্দরূপ রয়েছে, সেখানে নির্দেশপালন আবশ্যক।

এরপর বলা হয়েছে— 'ক্বালা আনা খইরুম মিনহু খলাক্বতানী মিন্ নার ওয়া খলাক্বতাহু মিন্ ত্বীন' (সে বললো, আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছো এবং তাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করেছো।' শব্দগত দিক থেকে

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্তায়ালার প্রশ্নের যথা উত্তর এটা নয়। কিন্তু অর্থগত দিক থেকে এটাই প্রকৃত উত্তর। অর্থাৎ বাহ্যিক কোনো কারণ নয়, হজরত আদমের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষই ছিলো নত না হওয়ার প্রধান কারণ। আর অন্তরের গোপন নির্দেশটিই প্রতিভাত হয়েছে ইবলিসের আলোচ্য জবাবে। ইবলিস তাই বলে বসলো, আমি তো আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আগুন থেকে। আর কর্দম থেকে সৃষ্টি করেছো আদমকে। শয়তানের এই জবাবটি আল্লাহ্নির্ভর নয়, যুক্তিনির্ভর। তার যুক্তির সার কথাটি হচ্ছে— আগুন উত্তম এবং মৃত্তিকা অধম। উত্তম কখনো অধমের সম্মুখে নত হতে পারে না। তাই আগুন থেকে সৃষ্ট আমি মাটি থেকে সৃষ্ট আদমের নিকট নত হইনি। এখানে 'নার' অর্থ আগুনের প্রভা— যা স্বভাবতঃ ঊর্ধ্বমুখী। আর 'ত্বীন' অর্থ আগুনের বিপরীত অন্ধকার, অধম মৃত্তিকা।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইবলিসই প্রথম আনুমানিক যৌক্তিকতা প্রবর্তন করেছে। আবার বলা বাহুল্য, তার ওই অনুমান বা কিয়াস ছিলো সম্পূর্ণতঃই ভুল। সুতরাং যে ব্যক্তি ধর্মের ক্ষেত্রে কিয়াসকে আপন অভিমতের বাহন করে, আল্লাহ্পাক তাকে সম্পর্কিত করে দেন ইবলিসের সঙ্গে। ইবনে সিরীন বলেছেন, কেবল অনুমাননির্ভর যুক্তিকে অবলম্বন করে সূর্যপূজকেরা সূর্যকে উপাস্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাস এবং ইবনে সিরীনের বক্তব্য থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, কিয়াস অবাস্তব বা কল্পনানির্ভর। ইবলিস তো এখানে তার কিয়াসকে দাঁড় করিয়েছে শরিয়তের বিধানের বিপরীতে। হজরত ইবনে আব্বাস তাই বলেছেন, যে ব্যক্তি ধর্মের ক্ষেত্রে কিয়াসকে আপন অভিমতের বাহন করে, আল্লাহ্পাক তাকে সম্পর্কিত করে দেন ইবলিসের সঙ্গে। এ কথাটি একটি চরম ভ্রান্তি যে দৃশ্যতঃ কোনো বস্তুর উত্তম বা অধম অবস্থার উপরে উত্তমতা বা অধমতা নির্ভরশীল নয়। শ্রেষ্ঠত্ব এবং অশ্রেষ্ঠত্ব সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। আল্লাহ্পাক সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষকেই দান করেছেন সর্বোত্তম মর্যাদা। প্রথম মানুষ হজরত আদমকে তিনি সৃজন করেছেন তাঁর অলৌকিক ও অতুলনীয় হাতে। আপন আত্মার এক আনুরূপ্যবিহীন প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ করেছেন তাঁর প্রতি। দিয়েছেন সকল কিছুর শিরোনামসম্ভূত জ্ঞান। আরো শর্ত দিয়েছেন— তাঁর সন্তান-সন্ততিরা আল্লাহ্তায়ালার নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে বিরত থেকে নির্দেশিত পুণ্য কর্মসমূহ সম্পাদন করলে লাভ করবে আল্লাহ্পাকের নৈকট্য। সুতরাং আগুন থেকে সৃষ্ট

www.eelm.weebly.com

জ্বিন বা অন্য কোনো সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ নয়। মৃত্তিকা থেকে সৃষ্ট মানুষই শ্রেষ্ঠ। আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত ভীত হয়ে আল্লাহ্তায়ালার আমানতের গুরুভার বহনে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আর মানুষ আল্লাহ্তায়ালা প্রদত্ত প্রেমোন্মাদনাবশতঃ নির্দ্বিধায় সেই আমানত বহন করতে সম্মত হয়েছে।

একটি প্রশ্নঃ গবেষণাজনিত (ইজতেহাদী) ভুল তো ক্ষমার্হ। তৎসত্ত্বেও ইবলিসের কিয়াসী ভুলের জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হলো কেনো?

উত্তরঃ গবেষণাজনিত ভুলের কারণে গবেষণাকারীকে অভিযুক্ত করা হয় না। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, মুজতাহিদকে (গবেষণাকারীকে) সত্যানুসারী হতে হবে। এবং তাকে অবশ্যই হতে হবে আল্লাহ্তায়ালার একান্ত অনুগত। কিন্তু ইবলিস তো সে রকম নয়। আল্লাহ্পাকের নির্দেশের অনুগত সে নয়। তাই সে সত্যানুসারীও নয়। বরং সে আপন শ্রেষ্ঠত্ব অনুসন্ধানী এবং হজরত আদমের সঙ্গে সে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিদ্বিষ্ট। যে এ রকম করে, তাকে কখনও সত্যানুসারী গবেষক বলা যায় না। যে এ রকম সে কখনই ক্ষমার্হ নয়। লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্পাক একস্থানে এরশাদ করেছেন— আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করবো। ফেরেশতারা বললেন— আপনি কি এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। আমরাই আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করবো এবং প্রশংসাকীর্তন গাইবো। ফেরেশতাদের এই ইজতেহাদটিও ছিলো একটি গবেষণাজনিত ভুল। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাদের উক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন— আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। ফেরেশতারা ছিলেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তাদের ভুল চিন্তার কারণে আল্লাহ্পাক তাদের ভুলকে প্রত্যাখ্যান করলেও তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেননি। ফেরেশতাদের পরবর্তী উক্তি থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁরা ছিলেন সত্যানুগত। তাই তারা বলেছিলেন— সকল পবিত্রতা আপনার। আপনি যা আমাদেরকে জানিয়েছেন, তা ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই অবগত নই। নিশ্চয়ই আপনি অধিক জ্ঞাত ও বিজ্ঞানময়।

বিজ্ঞজনদের অভিমত এই যে, মাটির মধ্যে রয়েছে বিনয়, নম্রতা ও সহনশীলতা। তাই মৃত্তিকা থেকে সৃষ্ট হজরত আদমকে প্রথম থেকেই দেয়া হয়েছে চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের ঠিকানা। মাটির মধ্যে আরো রয়েছে অনুতাপ, অক্ষমতা এবং ক্রন্দন। তাই মাটির মানুষের লাভ হয়েছে তওবা, হেদায়েত এবং উচ্চ মর্যাদা। অপর দিকে আগুনের মধ্যে রয়েছে উগ্রতা, উত্তাপ ও চাঞ্চল্য। এই স্বভাবের কারণেই শুরু থেকে অগ্নি থেকে সৃষ্ট ইবলিসের মধ্যে ছিলো উগ্র অহংকার এবং

www.eelm.weebly.com

নির্দেশ লংঘনের প্রবৃত্তি। তাই তার উপর আপতিত হয়েছে নির্দয় অভিসম্পাত। আর এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনলের উপর মৃত্তিকার শ্রেষ্ঠত্ব। আগুনের উপর মাটির শ্রেষ্ঠত্বের আরেকটি কারণ এই যে— মাটি সব কিছুকে আত্মস্থ করে। আর আগুন সৃষ্টি করে বিপর্যয়। মাটি উদ্ভিদ ও অন্যান্য সৃষ্টির জীবনোপকরণের উৎস এবং প্রাণের ধারক। আর আগুন তরুলতাসহ সকল কিছুকে ভস্ম করে দেয়।

উল্লেখ্য যে, মানুষের সকল উপাদান মৃত্তিকাজাত নয়। তেমনি ইবলিস ও তার সম্প্রদায়ের অন্যান্য জ্বিনেরাও সর্বাংশে আগুন নয়। বরং বলতে হবে, মানুষের মুখ্য উপাদান মাটি এবং জ্বিনদের মুখ্য উপাদান আগুন। তাই এখানে 'আগুন দ্বারা' এবং 'কর্দম দ্বারা'— এ রকম বলা হয়েছে। অবিকল আগুন বা মাটি বলা হয়নি।

'মিন্ ত্বীন' (মাটি দ্বারা)— এ কথাটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আলমে খালক বা পৃথিবীই মানুষের মর্যাদা লাভের প্রধান ক্ষেত্র। তাই এই পৃথিবীতে মানবসত্তার অন্তর্ভুক্ত আলমে আমরের সূক্ষ্ম জগতের কলব, রুহ, সির, খফি, আখফা লতিফা পঞ্চক মৃত্তিকার অনুগামী। তাই এখানে আলমে খালকের রঙ দ্বারাই আলমে আমর রঞ্জিত হয়। আর আলমে খালকের প্রধান উপাদান মৃত্তিকাও রঞ্জিত হয় আলমে আমরের আলোয়। কারণ, শোষণ ও রঞ্জন মৃত্তিকার একটি মৌলিক স্বভাব। রূহ সূর্যকিরণের মতো এখানে প্রতিফলিত হয় দেহের আয়নায়।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. বলেছেন, আলমে আমরের মাধ্যমে আল্লাহ্পাকের গুণের প্রতিবিম্ব পর্যন্ত নফসের চরম উন্নতি। এই প্রতিবিম্ব ভেদ করে মূল সিফাত বা গুণের মুখোমুখী সে হতে পারে না। তবে আখফার (গোপনতম মর্যাদার) উন্নতি কোনো কোনো সিফাতের নিকটবর্তী হয়ে যেতেও পারে। আলমে আমরের লতিফাসমূহ আলমে খালক থেকে যা অর্জন করে তা হচ্ছে সিফাতের প্রকাশ্য দিকসম্ভূত অর্জন। ভূতচতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ছাড়া অন্য তিনটির (বাতাস, পানি ও আগুনের) উন্নতির চরম স্তর হচ্ছে সিফাতের গোপন দিক। জাহেরী ও বাতেনী সিফাতের (প্রকাশ্য ও গোপন গুণরাজির) পার্থক্যটি এ রকম— প্রকাশ্য গুণের ক্ষেত্রে এ বিষয়টির অনুমিতি দুঃসাধ্য যে এই সিফাতের বিকাশ কি জাতসহ না জাত বিমুক্ত। কিন্তু বাতেনী সিফাতের বিকাশ সকল অবস্থায় জাতসহ অনুমাননীয়। আর নিছক জাতের বিকাশ কেবল মৃত্তিকার জন্যই নির্ধারিত। দৃষ্টান্তটি এ রকম—স্বচ্ছ পদার্থের উপর সূর্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হয় না, বরং ভেদ করে চলে যায়। সূর্যকিরণ কেবল প্রতিবিম্বিত হয় অস্বচ্ছ ও স্থূল আধারে।

www.eelm.weebly.com

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّٰغِرِينَ ۝

قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝

❐ তিনি বলিলেন, 'এই স্থান হইতে নামিয়া যাও, এখানে থাকিয়া অহংকার করিবে, ইহা হইতে পারে না। সুতরাং বাহির হইয়া যাও, তুমি অধমদিগের অন্তর্ভুক্ত।'

❐ সে বলিল 'পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।'

❐ তিনি বলিলেন, 'যাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তুমি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইলে।'

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, এই স্থান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে, এটা হতে পারে না।' এ কথার অর্থ— হে ইবলিস, তুমি জান্নাত ও আসমান থেকে নেমে যাও। কারণ এ স্থান হচ্ছে আল্লাহ্‌র অনুগত দাসদের স্থান— যারা বিনয়ী, কৃতজ্ঞ এবং আনুগত্যনিষ্ঠ। আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে এই নির্দেশনাটি দেয়া হয়েছে যে, জান্নাতবাসীদের জন্য অহংকার প্রদর্শন বৈধ নয়। অহংকার তো কেবল আল্লাহ্‌র। ইবলিস সেই একচ্ছত্র অহংকারে অনুপ্রবেশ করতে চেয়েছিলো বলেই আল্লাহ্‌র দরবার থেকে বিতাড়িত হয়েছে। তাকে বের করে দেয়া হয়েছে আকাশ থেকে।

হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। মুসলিম। মুসলিমের এক স্থানে আরো বর্ণিত হয়েছে, এক লোক জিজ্ঞেস করলো হে আল্লাহ্‌র রসুল! কোনো কোনো মানুষ তো সুন্দর বস্ত্র, উত্তম পাদুকা পছন্দ করে (এগুলো কি অহংকারের চিহ্ন)। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ নিজে সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকেই পছন্দ করেন। আর অহংকার তো সত্য ও সৌন্দর্যের বিপরীত। অহংকারতো মানুষকে অসুন্দর ও অপদস্থ করে।

হজরত হারেসা বিন ওয়াহাব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি কি তোমাদের বলবো— বেহেশতবাসী এবং দোজখবাসী কে? জনতার দৃষ্টিতে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তিই বেহেশ্তবাসী। সে যদি আল্লাহ্‌র প্রতি তার বিশ্বাসের কসম করে বসে, তবে আল্লাহ্ তার কসম পূর্ণ করে দেন। আর ওই ব্যক্তি দোজখবাসী যে মন্দ স্বভাবসম্পন্ন, দুঃশ্চরিত্র, উগ্র এবং অহংকারী। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, মহত্ত্ব আমার উত্তরীয় এবং অহংকার আমার পরিধেয়। এ দু'টো নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করবে, আমি তাকে নরকে নিক্ষেপ করবো। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি তাকে দোজখে প্রবেশ করাবো। মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত। এ কথার অর্থ— হে অভিশপ্ত ইবলিস, তুমি আমার ও আমার বন্ধুদের দৃষ্টিতে অধমতম? সকলেই তোমাকে মন্দ বলবে। প্রতিটি রসনা থেকে তোমার জন্য উচ্চারিত হবে অভিসম্পাত।

কামুস ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে— সগির অর্থ ওই ব্যক্তি, যে অধমতার স্তরে থেকেও আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই অর্থটির মাধ্যমে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, অহেতুক নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবার অর্থ অপদস্থ ও অসম্মানিত হওয়া। আলোচ্য বাক্যে ইবলিসকে ওই অসম্মানিত দলের অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে এভাবে— ফাখরুজ ইন্নাকা মিনাস্ সগিরিন (বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত)।

রসুল স. বলেছেন, যে আল্লাহ্র জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ্ তার মর্যাদা সমুন্নত করেন। স্বদৃষ্টিতে সে ক্ষুদ্র হলেও মানুষের দৃষ্টিতে মহৎ। আর যে গর্ব করে আল্লাহ্পাক তাকে অপমানিত করেন। সে স্বদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে কুকুর এবং শূকরের চেয়েও নিকৃষ্ট। শো'বুল ইমান গ্রন্থে বায়হাকী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হজরত ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা মন্দ, যে দম্ভ প্রকাশ করে এবং দাম্ভিকতার সঙ্গে চলে। সে মহামহিম আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিচ্যুত। তিরমিজিও হজরত আসমা থেকে এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওই হাদিসটি শিথিল সূত্রবিশিষ্ট এবং দুঃষ্প্রাপ্য।

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— সে বললো, আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দাও। এ কথার অর্থ— ইবলিস বললো, আমার আয়ু বাড়িয়ে দেয়া হোক। ইস্রাফিল যখন দ্বিতীয় শিংগায় ফুঁ দিবে এবং যখন মানুষ তাদের আপনাপন কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে, ওই সময় পর্যন্ত আমাকে মৃত্যু থেকে মুক্ত রাখা হোক। এই অবকাশটুকু আমি চাই।

এর পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে—'তিনি বললেন, যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে।' আলোচ্য আয়াতে ইবলিসকে অবকাশ প্রদানের সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। তাকে প্রদত্ত অবকাশের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে অন্য একটি আয়াতে। বলা হয়েছে— নির্ধারিত দিন পর্যন্ত তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো। এই 'নির্ধারিত দিন' অর্থ কোন দিন— তা আমাদের অজানা। আল্লাহ্তায়ালাই এ বিষয়ে উত্তমরূপে অবগত। হতে পারে এই নির্ধারিত দিন অর্থ ওই দিন, যেদিন হজরত ইস্রাফিল তাঁর শিংগায় ফুঁ দিবেন। সেদিন সকল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। ধ্বংস হয়ে যাবে ইবলিসও।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্পাক কেবল তাঁর অনুগত দাসদের প্রার্থনাই কবুল করেন না, অবাধ্যদের প্রার্থনাও তিনি কবুল করে থাকেন। অবাধ্যদের প্রার্থনার মাধ্যমে তাদেরকে প্রদত্ত অবকাশ হচ্ছে

www.eelm.weebly.com

এক চরম পরীক্ষা— যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব। আপন কৃতকর্মের জন্য সলজ্জিত প্রত্যাবর্তন (তওবা) ছাড়া ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আর কোনো পথ নেই। এখানে আরেকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে— অবাধ্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত থেকে অবকাশ প্রার্থনার চেয়ে প্রার্থনা থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ ۝ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ وَيَٰٓـَٔادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّٰلِمِينَ ۝

❒ সে বলিল, 'তুমি আমার সর্বনাশ করিলে, এই জন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয় ওঁত পাতিয়া থাকিব;

❒ অতঃপর আমি তাহাদিগের নিকট আসিবই তাহাদিগের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে এবং তুমি তাহাদিগের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না;

❒ তিনি বলিলেন 'এই স্থান হইতে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও; মানুষের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে নিশ্চয় আমি তোমাদিগের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই।'

❒ এবং বলিলাম 'হে আদম! তুমি ও তোমার সংগিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর; কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না, হইলে তোমরা সীমালংঘনকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

ক্বলা ফাবিমা আগওয়ায়তানী লা আক্বউ'দান্না লাহুম সিরাত্বকাল মুস্তাক্বীম' অর্থ— সে বললো, তুমি আমার সর্বনাশ করলে, এজন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয়ই ওঁত পেতে থাকবো। এখানে 'ফাবিমা' শব্দের ফা' অক্ষরটি পরিণাম প্রকাশক এবং 'বা' অক্ষরটি বর্ণনামূলক। আর 'মা' অক্ষরটি এখানে মাস্‌দারী বা মূল অক্ষর। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এ

www.eelm.weebly.com

রকম— ইবলিস বললো, হে আল্লাহ্! মানুষের (আদমের) জন্য আমাকে শাস্তি পেতে হলো, পথচ্যুত হতে হলো। তাই আমিও কসম খেয়ে বলছি, যে কৌশলে সম্ভব মানুষকে (আদম সন্তানদেরকে) পথভ্রষ্ট করবো।

'লা আক্বউ'দান্না' শব্দটিতে রয়েছে লামে তাকীদ (দৃঢ়তা ব্যঞ্জক লাম)। তাই 'বিমা' শব্দটির সম্পর্ক 'আক্বউ'দান্না' এর সঙ্গে হতে পারে না। কোনো কোনো আলেম তাই বলেছেন, 'বিমা আগওয়ায়তানী' কথাটির 'বা' অক্ষরটি কসমের জন্য, অর্থাৎ কুপথে পরিচালিত করার কসমের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে কথাটির উদ্দেশ্য হবে— তোমার আদেশ ও কুদরতের কসম। 'লাআক্বউ'দান্না' কথাটি সেই কসমের উত্তর। আর 'সিরাতুন' (পথ) অর্থ এখানে ইসলাম বা ইসলামের পথ। যেমন বলা হয়— আসালাত্ ত্বরীক্বাছ্ ছা'লাবু (এই পথ দিয়ে খেঁকশিয়াল দ্রুত পালিয়েছে)। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে যের বিশিষ্ট শব্দকে যবর বিশিষ্ট করে নেয়া হয়েছে। যেমন 'দ্বারাবা যায়দুজ্ জাহ্‌রা ওয়াল বাত্‌না' (যায়েদ পিঠ ও পেটের উপর মেরেছে)। এভাবে সরল পথে ওঁত পেতে থাকার মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম—আমি মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করে যাবো— যেমন বাণিজ্যবাহিনী লুণ্ঠনের জন্য ডাকাতেরা পথের ধারে ওঁত পেতে বসে থাকে।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে—'অতঃপর আমি তাদের নিকট আসবোই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক থেকে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না?' শত্রুরা সাধারণতঃ চারটি দিক থেকে আক্রমণ করে থাকে। তাই এখানে চারটি দিক থেকে আক্রমণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কথাটির আসল অর্থ হবে— সবদিক থেকে, যে দিক থেকে সম্ভব।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, উপর ও নিচ থেকে আক্রমণের কথা এখানে বলা হয়নি এ কারণে যে, উপর থেকে অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত। আর নিম্নদিক থেকে আক্রমণ করা সাধারণতঃ অসম্ভব। আরো লক্ষ্যণীয় যে, সম্মুখ ও পশ্চাতের আক্রমণের কথা বলা হয়েছে 'মিন্' শব্দটির মাধ্যমে (মিম্‌বাইনি আইদীহিম ওয়ামিন্ খলফিহিম)। আর ডান ও বামের আক্রমণের কথা বলা হয়েছে 'আন্' সহযোগে (ওয়া আ'ন্ আইমানিহিম ওয়া আ'ন শামাইলিহিম)। এভাবে সামনে ও পিছনে যাওয়া ও আসা এবং দক্ষিণে ও বামে সরে যাওয়া এবং সরে আসার কথা বলা হয়েছে।

হজরত আলী বিন তালহার বর্ণনা সূত্রে বাগবী কর্তৃক উল্লেখিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শয়তানের 'সম্মুখ থেকে আসবো'— কথাটির অর্থ, আমি মানুষকে আখেরাতের বিষয়ে সন্দিহান করে তুলবো। পশ্চাৎ দিক থেকে আসবো

www.eelm.weebly.com

অর্থ— আমি মানুষের অন্তরে উৎপন্ন করবো পৃথিবীর মোহ। দক্ষিণ দিক থেকে আসবো অর্থ— আমি তাদেরকে ধর্মের বিধিবিধান সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ করে তুলবো এবং বাম দিক থেকে আসবো অর্থ, আমি তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিবো নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি অদম্য আকর্ষণ। আতিয়া ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের এই তাফসীরই বর্ণনা করেছেন।

হজরতইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মিম্‌বাইনি আইদীহিম' কথাটির অর্থ— আমি মানুষকে পৃথিবীর প্রেমে মগ্ন করে দিবো। 'মিন্ খালফিহিম' অর্থ— আমি তাদেরকে উদাসীন করে দিবো আখেরাতের স্মরণ থেকে। বলবো, জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামত, হাশর— এগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। 'আ'ন আইমানিহিম' অর্থ— আমি তাদেরকে ফিরিয়ে রাখবো দক্ষিণ দিক থেকে বা পুণ্যকর্ম থেকে। আর 'আ'ন্ শামাইলিহিম' অর্থ— তাদেরকে ধাবিত করবো বাম দিকে বা পাপের দিকে। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, হে মানুষ! ইবলিস তোমাদের কাছে সামনে, পিছনে, ডানে ও বাঁয়ে থেকে আসতে পারে কিন্তু উপর দিক থেকে আসতে পারে না। কারণ উপর থেকে অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্‌র রহমত। আর ওই রহমতের অন্তরায় হওয়ার সাধ্য তার নেই। আল্লামা সুয়ূতিও এই বিবরণটি এনেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে আমি তাদের নিকট আসবোই কথাটির অর্থ— যে দিকে তারা দৃষ্টিপাত করবে সেদিকেই আমি আমার প্রতারণার ফাঁদ পাতবো। বাকী তিনটি দিক (পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম) থেকে আসবো অর্থ— আমি তাদের অগোচরে তাদের নিকটবর্তী হয়ে কুমন্ত্রণাদানের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করতে সচেষ্ট হবো। মুজাহিদের এই উক্তি সম্পর্কে ইবনে জুরাইজ বলেছেন, এখানে দৃষ্টির সম্মুখে প্রতারণার ফাঁদ পাতবো কথাটির অর্থ হবে, জ্ঞাতসারে আমি তাদেরকে এমন প্রতারণায় লিপ্ত করবো যাতে করে তারা জ্ঞাতসারেও ভুল করতে থাকবে।

'তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না' অর্থাৎ ইমানদার পাবে না। এই উক্তিটি ইবলিসের একটি ধারণাপ্রসূত উক্তি। কারণ সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই সে ভবিষ্যতের কথা নিশ্চিতরূপে বলতেই পারে না। অন্য এক আয়াতে এসেছে— ওয়া লাক্বাদ সদ্দাক্বা আ'লাইহিম ইবলিসু জন্নাহু ফাত্তাবাআ'হু ইল্লা ফারিক্বা' (আর ইবলিস তার ধারণা তাদের উপর ফলপ্রসূ করলো, একজন ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করলো) এই আয়াতের মাধ্যমে অবশ্য দেখা যায় শয়তানের ধারণা অনেকটা ফলপ্রসূ হয়েছে। কিন্তু এ রকম মন্তব্য সে জ্ঞাতসারে বলেনি। অনুমান ফলপ্রসূ হওয়া এবং নিশ্চিতরূপে ভবিষ্যতের আগাম খবর দেয়া— নিশ্চয় এক কথা নয়। যা হোক, শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে। তাই দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ মানুষই অকৃতজ্ঞ।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— তিনি বললেন, এই স্থান থেকে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও। এখানে 'ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থা বুঝাতে 'মাজউমান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কামুস অভিধানে রয়েছে, 'জাআমাহু' অর্থ নিন্দিত ও অপমানিত। ইমাম জুহরী বলেছেন, জাআমাহু জা'মান, জায়ামাহু জাইমান এবং জাম্মাহু জাম্মান— শব্দ তিনটি সমার্থক। বাগবী বলেছেন, 'জাইমুন' এবং 'জাআমামুন' শব্দ দু'টির অর্থ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন 'জাম্মুন' শব্দটির চেয়ে জাইমুন এবং জা'মুন এর মধ্যে অধিকতর কঠোরতা রয়েছে। আর 'মাদহুরান' শব্দটির অর্থ এখানে বারংবার ধিকৃত বা লাঞ্ছিত হওয়া।

এরপর বলা হয়েছে— মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবোই। এ কথার অর্থ— হে ইবলিস! শুনে নাও, সকল মানুষ তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না। আরো শুনে নাও, যারা তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তুমি ও তোমার সেই সকল অনুসারী দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবো।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'এবং বললাম হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস করো এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার করো; কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, হলে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' এই আয়াতে বিবৃত প্রসঙ্গটি সুরা বাকারার তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে যথাস্থানে আলোচনাটি দেখে নেয়া যেতে পারে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২০, ২১

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَاوٗرِىَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَ
قَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْتَكُوْنَا
مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ○ وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ○

□ অতঃপর তাহাদিগের লজ্জাস্থান, যাহা গোপন রাখা হইয়াছিল তাহা, প্রকাশ করিবার জন্য শয়তান তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলিল, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশ্তা হইয়া যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এই জন্যই তোমাদিগের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।'

□ সে তাহাদিগের উভয়ের নিকট শপথ করিয়া বলিল, 'আমি তোমাদিগের হিতাকাংক্ষীদের একজন'।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমেই বলা হয়েছে—'অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান, যা গোপন রাখা হয়েছিলো তা, প্রকাশ করবার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিলো'। কামুস অভিধানে রয়েছে, ওয়াস্‌ওয়াসা অর্থ কুমন্ত্রণা— যা শয়তান কর্তৃক অন্তরে প্রক্ষিপ্ত হয়। ক্ষতিকর ধারণা মাত্রই কুমন্ত্রণা। বাগবী লিখেছেন, কুমন্ত্রণা অর্থ ওই কথা যা শয়তান মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে দেয়। 'ওয়াস্‌ওয়াসা' শব্দটির শাব্দিক অর্থ— অলংকারের শব্দ অথবা পায়ের আওয়াজ। 'লাহুমা' শব্দটির 'লাম' এখানে 'লামে আজালিয়া' (কালবোধক)। আর 'লিইউব্‌দিউ' শব্দটির 'লাম' পরিণাম প্রকাশক। অথবা উদ্দেশ্যজ্ঞাপক। কেননা হজরত আদম ও হজরত হাওয়াকে বিবস্ত্র করে মন্দকর্মে লিপ্ত করাই ছিলো শয়তানের উদ্দেশ্য।

'সাও আতিহিমা' অর্থ গোপন অঙ্গ যা হজরত আদম ও হজরত হাওয়া কখনো দেখতেন না। নিজের অথবা অপরের। আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে এ কথাটিও প্রতীয়মান হয় যে, বিনা প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রী নিজের অথবা একে অপরের গোপনাঙ্গ দর্শন করা একটি নিন্দনীয় কর্ম। শরিয়ত ও সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান— সকল দিক দিয়েই বিষয়টি নিতান্তই নিন্দনীয়।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং বলল, পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশ্‌তা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন'।

এ কথার অর্থ— ইবলিস হজরত আদম ও হজরত হাওয়াকে বললো, আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটে যেতে বারণ করেছেন, তার কারণ হচ্ছে, এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলে তোমরা ফেরেশ্‌তা হয়ে যাবে অথবা লাভ করবে অমরত্ব। আর আল্লাহ্‌পাক চান না যে তোমরা ফেরেশ্‌তা হয়ে যাও অথবা লাভ করো অমরত্ব। তাই তিনি তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। কেউ কেউ এ আয়াত দ্বারা নবীদের উপর ফেরেশ্‌তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে থাকেন। কিন্তু ধারণাটি ঠিক নয়। আলোচ্য বাক্যটির দ্বারা নবীগণের উপর ফেরেশ্‌তাদের আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় বটে, কিন্তু সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব নবীগণেরই। তবে এখানে এ কথাটি স্পষ্ট যে, হজরত আদম ও হাওয়া ফেরেশ্‌তাদের ওই আংশিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আকর্ষণবোধ করেছিলেন। ফেরেশ্‌তাদের পানাহারের প্রয়োজন হয় না। তাঁদের ইবাদত নিরবচ্ছিন্ন ও নিখুঁত। এ সকল বিশেষত্ব হজরত আদম ও হজরত হাওয়াও কামনা করতেন। কিন্তু তাঁরা তখন পর্যন্ত এ কথা জানতেন না যে, তাঁরা নিজেরাই সামগ্রিক বিচারে ফেরেশ্‌তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ফেরেশ্‌তারা নৈকট্যভাজন, কিন্তু তাঁরা আল্লাহ্‌পাকের প্রিয়ভাজন। আর প্রিয়ভাজন যারা তারাই শ্রেষ্ঠ।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বললো, 'আমি তোমাদের হিতাকাংখীদের একজন।' শপথ বলতে এখানে 'ক্বাসামা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য এবং গুরুত্ববহ করে

www.eelm.weebly.com

তুলবার জন্যই ইবলিস এভাবে কথা বলেছিলো। হজরত কাতাদা বলেছেন, ইবলিস আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে হজরত আদম ও হজরত হাওয়াকে ধোকা দিয়েছিলো। এতে করে বুঝা যায়, আল্লাহ্‌র নামে কাউকে শপথ করতে দেখলে সাধারণতঃ বিশ্বাসী নর-নারীরা প্রতারণায় পতিত হয়। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— ইবলিস বললো, হে আদম হাওয়া! আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি তোমাদের হিতাকাংখী। আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের অনেক আগে। তাই আমি তোমাদের চেয়ে প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ। সুতরাং তোমরা আমার নির্দেশনাকে মান্য করো। তাহলে সঠিক পথে চলতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, ইবলিসই প্রথম আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়েছিলো। আর হজরত আদম ও হাওয়া চিন্তা করতে পারেননি যে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারে। এই সরল বিশ্বাসের কারণেই ইবলিসের প্রতারণা ফলবতী হয়েছিলো।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২২, ২৩, ২৪, ২৫

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ٚ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ۝

❒ এইভাবে সে তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিল। তৎপর যখন তাহারা সেই বৃক্ষ-ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিল, তখন তাহাদিগের লজ্জাস্থান তাহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা উদ্যান-পত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। তখন তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আমি কি তোমাদিগকে এই বৃক্ষ সম্বন্ধে সাবধান করি নাই এবং শয়তান যে তোমাদিগের প্রকাশ্য শত্রু আমি কি তাহা তোমাদিগকে বলি নাই?'

www.eelm.weebly.com

❐ তাহারা বলিল 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা নিজদিগের প্রতি অন্যায় করিয়াছি, যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

❐ তিনি বলিলেন, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নামিয়া যাও এবং পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদিগের বসবাস ও জীবিকা রহিল।'

❐ তিনি বলিলেন, 'সেখানেই তোমরা জীবনযাপন করিবে, সেখানেই তোমাদিগের মৃত্যু হইবে এবং তথা হইতেই তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনা হইবে।'

শুরুতে বলা হয়েছে— 'এভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চিত করলো।' বাগবী বলেছেন, এখানে 'তাদেরকে' অর্থ হজরত আদম ও হজরত হাওয়াকে। অর্থাৎ দু'জনকেই প্রবঞ্চিত করেছিলো ইবলিস। এখানে 'গুরুর' শব্দটির অর্থ প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ধোকা, মিথ্যাবচন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'দাল্লাহুমা' শব্দটি এসেছে 'তাদ্‌লিইয়াতুন' থেকে। তাদ্‌লিইয়াতুন এবং ইদ্‌লাউ অর্থ— নিচের দিকে নামিয়ে দেয়া, ঝুলিয়ে দেয়া। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে— অধঃপতিত করা। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে— ইবলিস প্রবঞ্চনা দানের মাধ্যমে হজরত আদম ও হজরত হাওয়াকে উচ্চ মর্যাদা থেকে অধঃপতিত করেছিলো। স্খলিত করেছিলো আনুগত্যের স্তর থেকে।

এরপর বলা হয়েছে—'তৎপর যখন তারা সেই বৃক্ষ-ফলের আস্বাদ গ্রহণ করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা উদ্যানপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো।' 'বৃক্ষ ফলের আস্বাদ গ্রহণ করলো'— এ কথায় বুঝা যায়, প্রথম মানব-মানবী হজরত আদম ও হজরত হাওয়া পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেননি। কিঞ্চিত আস্বাদ গ্রহণ করেছিলেন মাত্র। আর আস্বাদ গ্রহণের সাথে সাথে শরীর থেকে খসে পড়লো তাঁদের বেহেশতি পরিচ্ছদ। আবদ বিন হুমাইদের বর্ণনায় রয়েছে, ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ বলেছেন, প্রথম মানব দম্পতির পোশাক ছিলো নূরের।

সুদ্দী ফারহাবীর উক্তিরূপে ইবনে আবী হাতেম এবং হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে ইবনে আবী শায়বা, আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়েখ এবং ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, প্রথম মানব-মানবীর পোশাক ছিলো নখ নির্মিত। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে ওই পোশাক অন্তর্হিত হলো। আর তার অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ রয়ে গেলো হাত ও পায়ের নখ রূপে। এভাবে বিবস্ত্র হওয়ার পর যে উদ্যানপত্রের দ্বারা তাঁরা নিজেদেরকে আবৃত করেছিলেন সেই উদ্যানপত্র হচ্ছে ডুমুর বৃক্ষের পত্র।

www.eelm.weebly.com

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হজরত আদম ছিলেন দীর্ঘকায়। উচ্চতায় ছিলেন দীর্ঘ খর্জুর বৃক্ষের মতো। মস্তকে পরিদৃশ্যমান হতো প্রলম্বিত কেশগুচ্ছ। হঠাৎ নিজেকে বিবস্ত্র দেখতে পেয়ে দৌড়ে আত্মগোপন করলেন একটি ঘন বৃক্ষ সন্নিবেশিত উদ্যানে। সেখানে একটি বৃক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে গেলো তাঁর লম্বা চুল। তিনি বৃক্ষটিকে বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। বৃক্ষটি বললো, আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। অদৃশ্য আওয়াজ উচ্চারিত হলো— হে আদম! তুমি কি আমার নিকট থেকে পালাতে চাও? তিনি বললেন, হে আমার পরম প্রভুপ্রতিপালক! তোমাকে ছেড়ে কোথায় পালাবো? কিন্তু আমি যে এখন বিবস্ত্র, লজ্জিত।

এরপর বলা হয়েছে—'তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষ সম্বন্ধে সাবধান করিনি এবং শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু আমি কি তা তোমাদেরকে বলিনি?' এখানে 'এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করিনি'— কথাটির মাধ্যমে বুঝা যায়, নিষেধাজ্ঞাটিকে বাস্তবায়ন ছিলো অত্যাবশ্যক। আর ফল ভক্ষণের কথা এখানে স্পষ্ট উল্লেখ না করা হলেও বিষয়টি এই নিষেধাজ্ঞারই অন্তর্ভুক্ত।

মোহাম্মদ বিন কায়েস বলেছেন, লজ্জিত আদম আ. কে আল্লাহ্পাক তখন বললেন, আমি তো ওই বৃক্ষের ফল তোমার জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম— তবু তুমি ভক্ষণ করলে কেনো? হজরত আদম বললেন, হাওয়া আমাকে খাইয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা তখন হাওয়া আ. জিজ্ঞেস করলেন, কেনো তুমি এ কাজ করলে? তিনি বললেন, সাপ আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা সাপকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ রকম পরামর্শ দিলে কেনো? সাপ বললো, ইবলিস আমাকে এ রকম করতে বলেছে। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, হে হাওয়া, তুমি বৃক্ষ থেকে রক্ত (রস) ঝরিয়েছো। তাই প্রতি মাসে কয়েকদিন তোমারও রক্ত ঝরবে। হে সর্প! আমি তোমার পা কেটে দিচ্ছি। তুমি এখন থেকে চলবে বুকে হেঁটে হেঁটে। মানুষ তোমাকে দেখলেই তোমার মস্তকে আঘাত করবে। আর হে ইবলিস! তুমি তো চির অভিশপ্ত।

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে—'তারা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।' এ কথার অর্থ— হজরত আদম ও হজরত হাওয়া বললেন, হে আমাদের দয়ার্দ্র প্রভুপালক! আমরা ভুল বুঝে তোমার নিষেধাজ্ঞাকে অতিক্রম করে আত্ম-অত্যাচার করেছি। তাই আমরা লজ্জিত,

www.eelm.weebly.com

অনুতপ্ত ও রোরুদ্যমান। আমরা তোমার সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তুমি দয়া করে আমাদেরকে মার্জনা করো। নতুবা আমরা হয়ে যাবো চিরক্ষতিগ্রস্ত। এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মার্জনা না করা হলে বৃহৎ ক্ষুদ্র, সকল পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে। মোতাজিলারা বলে, সগীরা (ক্ষুদ্র) গোনাহর শাস্তি দেয়া হবে না। আমরা বলি, সগীরা গোনাহ মাফ করা হয় তখনই যখন কবীরা গোনাহ থেকে বিরত থাকা হয়।

এর পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে—'তিনি বললেন, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও এবং পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইলো।' ইহ্‌বিতু (নেমে যাও) শব্দটি বহুবচনবোধক। কিন্তু এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিবচনরূপে। অর্থাৎ শব্দটির মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে হজরত আদম ও হাওয়াকে। কেননা এখানকার 'নেমে যাও' নির্দেশটির মধ্যে ইবলিস অন্তর্ভুক্ত নয়। তাকে অধঃপতিত করা হয়েছিলো এই ঘটনার অনেক আগে। এখানকার নির্দেশটি বর্তমান কালবোধক। তাই ইহ্‌বিতু (নেমে যাও) সম্বোধনটি দ্বিবচনই হবে। অবশ্য একে বহুবচন বলা যেতে পারে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে। সেটি হচ্ছে— হজরত আদম ও হাওয়ার অনাগত বংশধরেরাও এই নির্দেশটির অন্তর্ভূত। এখানে বহুবচন বিশিষ্ট শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে হয়তো সে কারণেই।

কেউ কেউ বলেছেন, 'নেমে যাও' নির্দেশটির মধ্যে ইবলিসও অন্তর্ভুক্ত। হজরত আদম, হজরত হাওয়া এবং ইবলিস— তিনজনকেই এক সঙ্গে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে— তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও। এ রকমও হতে পারে যে, ইবলিসকে এবং আদম-হাওয়াকে পৃথকভাবে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। ওই পৃথক নির্দেশাবলীর লক্ষ্য ছিলো তিনজন (হজরত আদম, হজরত হাওয়া এবং ইবলিস)। পৃথকভাবে প্রদত্ত নির্দেশিতদের কথা এই আয়াতে এক সঙ্গে জানানো হয়েছে। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনবোধক শব্দরূপ।

আয়াতের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো এই— ১. তোমরা পৃথিবীতে অবতরণ করো। ২. সেখানে নির্ধারিত হলো তোমাদের বসবাস। ৩. তোমাদের জীবনোপকরণ ওই পৃথিবীতে নির্ধারণ করা হলো। ৪. সেখানে তোমরা হবে একে অন্যের শত্রু— এক পক্ষে হজরত আদম, হজরত হাওয়া এবং অনাগত মানবতা। আর অপর পক্ষে ইবলিস এবং তার জ্বিন ও মানুষ অনুসারীর দল। ৫. মৃত্যু পর্যন্ত তোমাদেরকে অবস্থান করতে হবে সেখানে।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের শেষটিতে বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, সেখানেই তোমরা জীবন-যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে।' এ কথার অর্থ— এ পৃথিবীতেই হবে মানুষ ও জ্বিনের জীবনযাপন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২৬

يٰبَنِىٓ اٰدَمَ قَدۡ اَنۡزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسًا يُّوَارِىۡ سَوۡاٰتِكُمۡ وَرِيۡشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقۡوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيۡرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُوۡنَ ○

❒ হে বনি আদম! তোমাদিগের লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদিগকে পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং সাবধানতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা আল্লাহের নিদর্শন সমূহের অন্যতম, যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

আল্লামা বাগবী বলেছেন, মূর্খতার যুগের মানুষ উলঙ্গ হয়ে কাবাগৃহ তাওয়াফ করতো। দিনের বেলা তাওয়াফ করতো পুরুষেরা। আর রাতের বেলায় মেয়েরা। তারা বলতো, যে কাপড় পরে আমরা গোনাহ করেছি, সে কাপড় পড়ে তাওয়াফ করবো না। তাদের এই পাপাচারের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

হজরত কাতাদা বলেছেন, বিবস্ত্রা রমণীরা তাওয়াফের সময় তাদের গোপনাংগে হাত রেখে বলতো, আজ এর কিছু অংশ অথবা এর সম্পূর্ণটাই বস্ত্রবিবর্জিত। আজ আমি এটিকে ব্যবহৃত হতে দিবো না। এ ধরনের কথাবার্তাকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। বলা হয়েছে— হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার জন্য ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি।'

এখানে 'সাওআতিকুম' কথাটির অর্থ আবরণযোগ্য অঙ্গ। শব্দটি 'সাওআতুন' শব্দের বহুবচন। শরীরের আবরণযোগ্য অঙ্গ বা লজ্জাস্থান উন্মুক্ত রাখা একটি অত্যন্ত অসুন্দর ও লজ্জাজনক কর্ম। তাই গোপন অঙ্গসমূহকে বলা হয় সাওআতুন।

'আনযালনা' শব্দটির অর্থ অবতীর্ণ করা। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে 'আনযালনা আলাইকুম লিবাসান' (আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি)। এখানে কিন্তু 'আনযালনা' শব্দটির মাধ্যমে সরাসরি আসমান থেকে 'পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করা হয়েছে' এ রকম বলা হয়নি। তাই এখানে আনযালনা শব্দের অর্থ 'অবতীর্ণ

www.eelm.weebly.com

করেছি' না হয়ে হবে 'দিয়েছি' বা সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ— হে মানুষ! আসমানী ব্যবস্থাপনা এবং স্বর্গীয় রীতির নিদর্শন স্বরূপ আমি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি পোশাক-পরিচ্ছদ। 'আনযালা' শব্দের এ রকম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত অন্য আয়াতেও রয়েছে। যেমন— ওয়া আনযালা লাকুম মিনাল আ'নআম (তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি)। আরেক স্থানে বলা হয়েছে— ওয়া আনযালনাল হাদীদ্ (তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি লৌহ)। এ রকমও হতে পারে যে, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবে— হে মানুষ! লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য এবং বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পোশাক পরিধানের হুকুম অবতীর্ণ করেছি। এ অর্থটি গ্রহণ করলে সহজেই প্রমাণিত হবে যে— গোপনাঙ্গ উন্মুক্ত রাখা নিষিদ্ধ। তাই নগ্নতা মানুষের জন্য একটি বিপদ। এই বিপদটিই সর্বপ্রথম নেমে এসেছিলো মানুষের উপর। শয়তানই মানুষকে প্রথম এই বিপদে ফেলেছিলো। তার প্ররোচনায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার সাথে সাথে বেহেশতেই বিবস্ত্র হয়ে পড়েছিলেন প্রথম মানব-মানবী। সেই শয়তানই তাঁদের অনাগত বংশধরদেরকে নগ্নতার প্ররোচনা দিয়ে চলেছে। তাই নগ্নতা ও বেহায়াপনা সকল সময়ে সকল যুগে পরিহার্য।

'রিশান' অর্থ উত্তম পোশাক বা বেশ-ভূষা। কামুস গ্রন্থে এ রকম বলা হয়েছে। বায়যাবী বলেছেন, শব্দটির অর্থ সৌন্দর্য। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, জুহাক এবং সুদ্দী বলেছেন, শব্দটির অর্থ সম্পদ। যেমন বলা হয়— তারাইয়্যাশার রজুলু (ওই ব্যক্তি সম্পদশালী হয়েছে)।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সাবধানতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট।' সাবধানতার পরিচ্ছদ বুঝাতে আলোচ্য বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে 'লিবাসুত্ তাক্বওয়া' কথাটি। এই সাবধানতার পরিচ্ছদ বা লেবাসে তাকওয়াকে আলেমগণ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কাতাদা এবং সুদ্দী বলেছেন, লেবাসে তাকওয়া অর্থ ইমান। হাসান বসরী বলেছেন, লজ্জা। আতিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সৎকর্মই হচ্ছে লেবাসে তাকওয়া। হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান বলেছেন, লেবাসে তাকওয়া অর্থ উত্তম কারুকার্য বা সুন্দর চিত্র।

হজরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের বলেছেন, সাবধানতার পরিচ্ছদ অর্থ আল্লাহ্র ভয়। কালাবী বলেছেন, পবিত্রতাই হচ্ছে সাবধানতার পরিচ্ছদ। ইবনুল আমবারী বলেছেন, এই আয়াতের বক্তব্যের মধ্যেই লেবাসে তাকওয়ার আসল অর্থ নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ উলঙ্গ হয়ে কাবাগৃহ তাওয়াফ করার রীতি পরিত্যাগ করে তাওয়াফের সময় যে বস্ত্র পরিধান করা হবে সেই বস্ত্রই হচ্ছে সাবধানতার পরিচ্ছদ। মোটকথা, যে বস্ত্র নগ্নতার পাপ থেকে রক্ষা করে সেই বস্ত্রই হচ্ছে সাবধানতার বস্ত্র বা পরিচ্ছদ। কিন্তু হজরত জায়েদ ইবনে আলী বলেছেন, সমর প্রান্তরে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে যে পোশাক পরিধান করা হয়

www.eelm.weebly.com

সেই পোশাকই হচ্ছে সাবধানতার পোশাক। যেমন, লৌহবর্ম ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার বলেছেন, দুনিয়াবিরাগী সাধকেরা যে কম্বল পরিধান করে থাকে, সেই কম্বলই হচ্ছে সাবধানতার পরিচ্ছদ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।' এখানে আয়াতিল্লা কথাটির অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার ওই বিধান বা নিদর্শন, যা আল্লাহ্‌র রহমতের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। আর 'জিক্‌র' (স্মরণ) শব্দটি এখানে উপদেশ অর্থে ব্যবহৃত। এখানকার অন্তর্নিহিত সেই উপদেশটি হচ্ছে দয়া করে লজ্জা নিবারণের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা যে পোশাক-পরিচ্ছদ সৃষ্টি করেছেন, সেই পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে আল্লাহ্‌তায়ালার শুকরিয়া আদায় করো এবং আত্মরক্ষা করো আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশের বিরোধিতা থেকে। মনে রেখো, সাবধানতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২৭

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

❒ হে বনি আদম! শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রলোভিত না করে— যে-ভাবে তোমাদিগের পিতামাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদিগের লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্য বিবস্ত্র করিয়াছিল। সে নিজে এবং তাহার দল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না; যাহারা বিশ্বাস করে না শয়তানকে আমি তাহাদিগের অভিভাবক করিয়াছি।

শয়তানের প্ররোচনা থেকে সদা সতর্ক থাকবার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে— 'হে বনী আদম! শয়তান যেনো তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলোভিত না করে— যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে সে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছিলো, তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করেছিলো।'

এরপর বলা হয়েছে—'সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দ্যাখে যে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।' এখানে 'সে এবং তার দল' অর্থ শয়তান এবং তার বংশধর। এ রকম বলেছেন হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস।

www.eelm.weebly.com

আর হজরত কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ এখানে শয়তান ও তার অনুসারী জ্বিন সম্প্রদায়। বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! তোমরা শয়তানের কারসাজি থেকে সাবধানে থেকো। কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনাদানের মাধ্যমে সে সব সময় তোমাদের পদস্খলন ঘটাতে তৎপর। আর তোমরা শয়তান ও তার অনুসারীদের সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা করতেও সক্ষম নও। কারণ সে ও তার দল তোমাদেরকে দ্যাখে। কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। অতএব, তোমরা আল্লাহ্পাকের স্মরণসংযুক্ত হও। নিরবচ্ছিন্ন এই সংযোগের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। আর এভাবেই তোমরা শয়তানের আক্রমণ থেকে থাকতে পারবে পূর্ণ নিরাপদ। যুননুন মিসরী বলেছেন, শয়তান তোমাকে দ্যাখে, কিন্তু তুমি তাকে দেখো না। অতএব তুমি ওই সত্তার সাহায্যার্থী হও যিনি শয়তানকে দেখেন, কিন্তু শয়তান যাঁকে দেখতে পায় না।

শেষে বলা হয়েছে—'যারা বিশ্বাস করে না শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি।' এ কথার অর্থ— আমি শয়তানকে অবিশ্বাসীদের অভিভাবক নিযুক্ত করেছি। তাই অবিশ্বাসীরা তাদের অভিভাবক শয়তানের পরামর্শে ও উৎসাহে সত্যকে অবজ্ঞা করে এবং অনুসরণ করে চলে মিথ্যাকে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২৮

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

❒ যখন তাহারা কোন অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, 'আমরা আমাদিগের পূর্বপুরুষগণকে ইহা করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ্ও আমাদিগকে ইহার নির্দেশ দিয়াছেন।' বল, 'আল্লাহ্ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কী আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যে বিষয়ে তোমাদিগের কোন জ্ঞান নাই?'

প্রথমে বলা হয়েছে—'যখন তারা কোনো অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষগণকে এ রকম করতে দেখেছি।' এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে এ রকম নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথার অর্থ শিরিক, উলঙ্গ হয়ে কাবাগৃহ তাওয়াফ ইত্যাদি অপকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তারা এই যুক্তি দেখায় যে, আমাদের পূর্ব-পুরুষেরাও তো এ রকম করতো। আর নিশ্চয় আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা আল্লাহ্র নির্দেশেই এ রকম করে এসেছেন।

এখানে উল্লেখিত 'ফাহেশাতান' শব্দটির অর্থ অশ্লীল আচরণ। অর্থাৎ শিরিক। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ বলেছেন, এখানে কথাটির উদ্দেশ্য

www.eelm.weebly.com

হচ্ছে— উলঙ্গ অবস্থায় কাবাগৃহ তাওয়াফ। অবশ্য সাধারণভাবে ফাহেশা কথাটির মধ্যে সকল প্রকার কবীরা গোনাহ অন্তর্ভুক্ত। মক্কার মুশরিকদেরকে অশ্লীল আচরণসমূহ পরিত্যাগ করতে বললে তারা তাদের পক্ষে দু'টি দলিল পেশ করতো। একটি হচ্ছে— তারা বলতো, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এ রকম করতে দেখেছি। সুতরাং এগুলো নির্ভুল না হয়েই পারে না। দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে— আল্লাহ্ই এ রকম করতে আদেশ করেছেন। তাদের প্রথম যুক্তিটির জবাব এখানে দেয়া হয়নি। দেয়া হয়েছে দ্বিতীয় যুক্তিটির জবাব। অন্য আয়াতে অবশ্য তাদের প্রথম যুক্তিটি সম্পর্কে বলা হয়েছে— তাদের পূর্বপুরুষেরা কি কিছুই বুঝতো না এবং তারা কেনো সঠিক পথে চলতো না? আর এখানে আলোচ্য বাক্যটির পরক্ষণেই দেয়া হয়েছে তাদের দ্বিতীয় যুক্তিটির উত্তর।

বলা হয়েছে—'বলো, আল্লাহ্ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না।' এই বাক্যটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, অশ্লীলকর্মের নির্দেশদানও অশ্লীলতা। আরো প্রমাণিত হয়, ভালো-মন্দ সকল কর্মই আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক সৃজিত। আর স্বচ্ছ জ্ঞানের মাধ্যমে ভালো এবং মন্দ উপলব্ধি করা যায়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মধ্যে দু'টি প্রশ্ন এবং দু'টি উত্তর রয়েছে। যেমন— প্রশ্নঃ তোমরা অশ্লীল আচরণসমূহ করে চলেছো কেনো? উত্তরঃ আমরা আমাদের পিতা পিতামহদেরকে এ রকম করতে দেখেছি। প্রশ্নঃ তোমাদের পিতা পিতামহরা কোথা থেকে এ রকম হুকুম পেয়েছে? উত্তরঃ আল্লাহ্ই তাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। আর আমরা প্রতিপালন করে চলেছি সেই হুকুমেরই ধারাবাহিকতা। সুতরাং আমরা মনে করি, আল্লাহ্ আমাদেরকেও হুকুম দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য যে, এই আয়াতে পূর্বপুরুষদের প্রমাণবিহীন আমলের অন্ধ অনুকরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সার্বিক অনুকরণ নিষিদ্ধ করা হয়নি। পূর্বপুরুষেরা অনুমোদিত শরিয়তের বিধানের আমল করলে সেই আমলের অনুসরণ অত্যাবশ্যক। কিন্তু শরিয়ত বহির্ভূত আমলের অনুকরণ নিষিদ্ধ।

শেষে বলা হয়েছে—'তোমরা কী আল্লাহ্র সম্বন্ধে এমন কিছু বলছো, যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।' এই প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। বাক্যটির মাধ্যমে এই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে— তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে স্বরচিত কোনো কথা বোলো না। যা জানো তাই বলো। যা জানো না তা বোলো না।

www.eelm.weebly.com

قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ ۗ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ۝ فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۗ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

❒ বলো, 'আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়াছেন ন্যায় প্রতিষ্ঠার।' প্রত্যেক সালাতে তোমাদিগের লক্ষ্য স্থির রাখিবে এবং তাঁহারই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে ডাকিবে; তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমরা সেইভাবে ফিরিয়া আসিবে।

❒ এক দলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং অপর দলের পথভ্রান্তি সংগতভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া শয়তানকে তাহাদিগের অভিভাবক করিয়াছিল ও নিজদিগকে তাহারা সৎপথগামী মনে করিত।

এরশাদ হয়েছে—'কুল আমারা রব্বি বিল ক্বিস্‌ত (বলো, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায় প্রতিষ্ঠার)।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আলক্বিস্‌ত' কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'। জুহাক বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য তৌহিদ। মুজাহিদ বলেছেন, ইনসাফ বা ন্যায় বিচার। অর্থাৎ 'ক্বিস্‌ত' অর্থ ওই কর্ম, যাতে কোনো অতিরিক্ততা ও ন্যূনতা নেই।

এরপর বলা হয়েছে—'ওয়া আক্বিমু উজুহাকুম ই'নদা কুল্লি মাস্‌জিদিঁউ ওয়াদ্‌উ'হু মুখলিসীনা লাহুদ্‌দীন (প্রত্যেক নামাজে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে)। এখানে 'আক্বিমু' (লক্ষ্য স্থির রাখবে) কথাটি কর্ম। এর ক্রিয়া ('নামাজ') কথাটি এখানে উহ্য রয়েছে।' ওই উহ্য ক্রিয়াসহ আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— হে আমার রসুল! আপনি এ কথা বলে দিন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিটি নামাজে লক্ষ্য স্থির রাখবে। বিশুদ্ধচিত্তে একমাত্র আল্লাহ্‌কে সেজদা করবে। এই নির্দেশটির মাধ্যমে প্রথমে নামাজের সময় এবং পরে নামাজের স্থান অর্থাৎ মসজিদকে নির্দেশ করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

মুজাহিদ এবং সুদ্দী আলোচ্য বাক্যটির তাফসীর বর্ণনা করেছেন এ রকম— তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো, নামাজের সময় কাবামুখী হয়ে যাও।

জুহাক বলেছেন, অর্থ হবে এ রকম— যদি তোমরা কোনো মসজিদের ধারে কাছে অবস্থান করো এবং যদি দ্যাখো নামাজ শুরু হতে চলেছে, তবে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে নাও। এ কথা বলো না যে, আমি আমার মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়বো। ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এ রকম। তবে তিনি অতিরিক্ত এ কথাটিও বলেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো মসজিদের এমন ইমাম অথবা তত্ত্বাবধায়ক হয়, যার অনুপস্থিতিতে ওই মসজিদের নামাজের জামাত বিঘ্নিত হতে পারে— তবে ওই ব্যক্তি তার বর্তমান অবস্থান স্থলের মসজিদে আযান শোনার পরেও তার নিজস্ব দায়িত্বভূত মসজিদের দিকে চলে যেতে পারে। এ রকম করা জায়েয।

কোনো কোনো আলেম আলোচ্য বাক্যটির তাফসীর করেছেন এ রকম— আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও, একনিষ্ঠ হও, অন্য কোনো দিকে মুখ ফিরিয়ো না। এখানে 'ওয়াদ্‌উ'হু' অর্থ— কেবল তাঁর (আল্লাহ্‌র) ইবাদত করো। আর মুখলিসীনা লাহুদ্দীন অর্থ— আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও উপাসনাকে অংশীবাদীতা, দর্প এবং যশাকাঙ্খা থেকে পবিত্র রাখো।

শেষে বলা হয়েছে—'কামা বাদাআকুম তাউ'দুন (তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে)।' এ কথার অর্থ— যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে মাটি এবং অপবিত্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেভাবে তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত করা হবে এবং সেদিন তোমাদেরকে তোমাদের আমল অনুসারে বিনিময় প্রদান করা হবে। এখানে প্রথম সৃষ্টি এবং দ্বিতীয় সৃষ্টি এ রকম বলার কারণ হচ্ছে— আল্লাহ্‌পাকই সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, এ কথাটি বুঝিয়ে দেয়া। এ কথাটিও বুঝিয়ে দেয়া যে যিনি প্রথমে সৃষ্টি করতে সক্ষম. তিনি দ্বিতীয় সৃষ্টিতে অবশ্যই সক্ষম।

কোনো কোনো আলেম আলোচ্য বাক্যটির অর্থ করেছেন এভাবে— আল্লাহ্‌পাক প্রথমে যেমন তোমাদেরকে নগ্ন পা, উলঙ্গ শরীর এবং খতনাবিহীন অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, সেভাবেই তোমরা পুনরুত্থিত হবে।

জননী আয়েশার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হাশরের ময়দানে সকলকে খালি পা এবং বস্ত্রবিবর্জিত অবস্থায় উঠানো হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সেদিন কি নারী পুরুষ সকলেই বিবস্ত্র অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে? তিনি স. বললেন, আয়েশা! ওই দিনের অবস্থা হবে অত্যন্ত কঠিন (কারো প্রতি কেউ দৃষ্টিপাত করবার অবকাশ সেদিন পাবে না)।

www.eelm.weebly.com

বোখারী, মুসলিম এবং তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একদিন রসুল স. সহসা দাঁড়িয়ে বললেন, হে মানুষ! জেনে নাও, পুনরুত্থান দিবসে তোমরা হবে পাদুকা, বস্ত্র, এবং খতনাবিবর্জিত। এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন— তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে।

পুনরুত্থান দিবসে সর্বপ্রথম বস্ত্র পরিধান করানো হবে হজরত ইব্রাহিমকে। এ প্রসঙ্গে বহু বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী ও হাকেম কর্তৃক সংকলিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত একটি হাদিসে এসেছে, পরকাল যাত্রার প্রাক্কালে হজরত আবু সাঈদ খুদরী পরিচ্ছন্ন পরিধেয় চাইলেন। পরিধেয় আনা হলে তিনি তা পরিধান করে বললেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, মৃত ব্যক্তি ওই বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে, যে বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটেছিলো? হজরত মুয়াজ বিন জাবাল থেকে উত্তমসূত্রে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত মুয়াজ তাঁর মৃত মাকে নতুন কাপড়ের কাফন পরালেন এবং বললেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে উত্তম কাপড়ের কাফন পরাবে। কেননা পুনরুত্থান দিবসে ওই কাপড় পরেই তাকে ওঠানো হবে।

সাঈদ বিন মানসুরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে উত্তম বস্ত্রের কাফন পরাও। কেননা ওই কাপড়সহ তাকে পুনরুত্থান দিবসে ওঠানো হবে।

উপরে বর্ণিত হাদিস তিনটি কিন্তু ওই হাদিসটির মতো শক্তিশালী নয়, যে হাদিসে বলা হয়েছে বিবস্ত্র অবস্থায় পুনরুত্থিত হওয়ার কথা। অধিকাংশ আলেম বলেছেন, কাফনের কাপড় পরিহিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হওয়ার হাদিসগুলো শহীদগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হজরত আবু সাঈদ খুদরী শহীদদের জন্য প্রযোজ্য হাদিসকে সম্ভবত সকল মৃত ব্যক্তির জন্য ধরে নিয়েছিলেন। হাদিসের বর্ণনা ভিন্নতার সামঞ্জস্য সাধনার্থে বায়হাকী বলেছেন, সেদিন কেউ কেউ পুনরুত্থিত হবে বস্ত্রাবৃত অবস্থায়। আবার কেউ কেউ পুনরুত্থিত হবে বস্ত্রবিবর্জিত অবস্থায়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময় সকলে থাকবে বস্ত্রাবৃত। কিন্তু হাশর প্রান্তরে সমবেত হওয়ার শুরুতেই সকলে হয়ে পড়বে বস্ত্রহীন।

কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, যে সকল হাদিসে পরিধেয় বস্ত্রসহ ওঠানোর কথা বলা হয়েছে, ওই সকল হাদিসে উল্লেখিত বস্ত্র হচ্ছে পুণ্যকর্মসমূহ। যেমন, এক আয়াতে এসেছে—'ওয়া লিবাসুত্ তাক্বওয়া জালিকা খইরুন' (সাবধানতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট)।

www.eelm.weebly.com

হজরত জাবের এই আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন, যে আমলের উপর মানুষ মৃত্যুবরণ করবে সে আমলের উপরেই হবে তার পুনরুত্থান। মুসলিম, ইবনে মাজা। হজরত জাবের আরো বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, মানুষের পুনরুত্থান হবে তার আমলের উপর— যার উপর সে মৃত্যুবরণ করেছে। তাই বিশ্বাসীদের পুনরুত্থান হবে ইমানের উপর এবং অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাসের উপর।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মানুষের বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী হওয়ার ব্যাপারটি সৃষ্টির সূচনালগ্নেই নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্পাক বলেছেন—'তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করে কাউকে বিশ্বাসী এবং কাউকে অবিশ্বাসী বানিয়েছেন।' এই নির্ধারণের উপরেই হবে তাদের পুনরুত্থান।

আবুল আলীয়া বলেছেন, মানুষ ওই অবস্থার দিকে আসবে, যে অবস্থা আল্লাহ্তায়ালার চিরন্তন জ্ঞানের অন্তর্ভূত।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, নিজ নিজ ভাগ্যলিপি অনুসারে সকলে সেদিন পুনরুত্থিত হবে।

হজরত মোহাম্মদ বিন কা'ব বলেছেন, যে সৃষ্টির উন্মেষকাল থেকে মন্দ, সে শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস ও শাস্তির দিকেই চলে যাবে— যদিও সে সাময়িকভাবে পুণ্যকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমন, ইবলিস বহু দিন ধরে পুণ্যকর্ম করার পরেও শেষ পর্যন্ত চলে গিয়েছে শাস্তির দিকে। আর যে সূচনাকাল থেকে পুণ্যবান, পরবর্তিতে সে জান্নাতের পথই ধরবে— যদিও সাময়িকভাবে মন্দকর্মে লিপ্ত থাকে। যেমন হজরত মুসার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ যাদুকরগণ। জঘন্য যাদুকর্মে নিয়োজিত ছিলো তারা। কিন্তু শেষে এসে পড়েছিলো ইমানের পথে।

সহল বিন সা'দের বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. বলেছেন, কেউ কেউ দোজখীদের মতো মন্দকর্মে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও অবশেষে জান্নাতী হয়। আবার কেউ জান্নাতিদের মতো আমল করা সত্ত্বেও অবশেষে হয়ে যায় জাহান্নামী। জীবনের শেষ অধ্যায়ের উপরেই নির্ণীত হয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। বোখারী, মুসলিম। পরবর্তী আয়াতে (৩০) রয়েছে এ কথারই প্রতিধ্বনি।

বলা হয়েছে—'এক দলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং অপর দলের পথভ্রান্তি সংগতভাবে নির্ধারিত হয়েছে।' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের এক দলকে তাঁর চিরস্থায়ী জ্ঞানের মধ্যে হেদায়েত দানের ইচ্ছা করেছেন। তাই তিনি তাদেরকে দিয়েছেন ইমান এবং পুণ্যকর্মের সুযোগ। আর এক দলকে তিনি চেয়েছেন পথভ্রষ্ট করতে। তাই পথভ্রষ্টতাই হবে তার সর্বশেষ পরিণতি।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে—'তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছিলো এবং নিজেদেরকে তারা সৎপথগামী মনে করতো।' এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, অজ্ঞতা ক্ষমার্হ নয়। তাই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে অবিশ্বাসকে গ্রহণ করলেও সকল অবস্থায় অবিশ্বাসী ও অবিশ্বাস নিন্দার্হ।

মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইসলাম-পূর্ব সময়ের রমণীরা বিবসনা হয়ে কাবা গৃহের তাওয়াফ করতো। তাওয়াফের সময় তারা এক হাত তাদের লজ্জাস্থানের উপর রেখে বলতো, আজ সম্পূর্ণটাই উন্মোচন করা হবে অথবা উন্মোচন করা হবে আংশিক। আমি আজ এ অঙ্গ কাউকে ব্যবহার করতে দেবো না। এ সকল কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৩১

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ۝

❒ হে বনি আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিবে। আহার করিবে ও পান করিবে কিন্তু অমিতাচার করিবে না। তিনি অমিতাচারীকে পছন্দ করেন না।

ইয়া বনী আদামা খুজু যিনাতাকুম ই'নদা কুল্লি মাস্জিদ্ (হে বনী আদম! প্রত্যেক নামাজের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে)। মুফাসসিরগণের ঐকমত্য এই যে, এখানে 'যিনাত' শব্দটির অর্থ ওই পোশাক যার দ্বারা সতর ঢাকা হয়। মুজাহিদ বলেছেন, ওই পরিচ্ছদই সুন্দর পরিচ্ছদ যা সতরকে আচ্ছাদিত করে— যদিও তা হয় চোগা (পাজামা বিশেষ)। কালাবীও এ রকম বলেছেন।

বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'যিনাত' শব্দের অর্থ পরিচ্ছদ এবং 'মাস্জিদ্' অর্থ মসজিদ। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— তাওয়াফ এবং নামাজের জন্য পরিচ্ছদাবৃত হয়ে মসজিদে গমন করো। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে ইবনে হুম্মাম বলেছেন, উলঙ্গ অবস্থায় কাবাগৃহ তাওয়াফ নিষিদ্ধ করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

আমাদের মাজহাব অনুসারে তাওয়াফের সময় সতর ঢাকা ওয়াজিব, কিন্তু তা তাওয়াফের শর্ত নয়। বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফ করলেও তাওয়াফ হয়ে যাবে। কিন্তু বিবস্ত্র হওয়ার পাপ অবশ্যই হবে। এভাবে ফরজ নামাজ উলঙ্গ হয়ে পড়লেও নামাজ হয়ে যাবে, কিন্তু উলঙ্গ হওয়ার কারণে গোনাহ হবে অবশ্যই। সতর ঢাকা

www.eelm.weebly.com

ওয়াজিব, কিন্তু তা শর্ত নয়। সুতরাং আলোচ্য বাক্যটির দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, নির্জনে বিবস্ত্র হয়ে তাওয়াফ করলে এবং নামাজ পড়লে তাওয়াফ ও নামাজ আদায় হবে না। তবে সকল আলেমের ঐকমত্য এই যে, নামাজ পাঠকালে সতর ঢাকা ফরজ। তাই সতর না ঢাকলে নামাজ হবে না। নির্জনে অথবা লোকালয়ে যেখানেই হোক না কেনো।

কাযী ইসমাইল প্রমুখ মালেকী মাজাহাবের অনুসারী কোনো কোনো আলেমের অভিমত এর বিপরীত। কিন্তু ঐকমত্যের বিপরীতে এ রকম দু'একজনের অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। জননী আয়েশার একটি মারফু বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্পাক সাবালিকা মেয়েদের ওড়না ছাড়া নামাজ কবুল করেন না। আবু দাউদ, তিরমিজি, হাকেম, ইবনে খুজাইমা। তিরমিজি হাদিসটিকে বলেছেন উত্তম। আর হাকেম হাদিসটিকে বলেছেন বিশুদ্ধ।

আমি বলি, 'মাসজিদ' শব্দটি এখানে শব্দমূল। আর এখানে সিজ্‌দা অর্থ নামাজ। এখানে নামাজের এই অঙ্গটির উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে সম্পূর্ণ নামাজকে। এ রকম আংশিক উল্লেখের মাধ্যমে সামগ্রিকতাকে বুঝানোর আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'তোমরা রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করো।' (ওয়ারকাউ' মায়াররকিই'ন)। এখানে রুকু অর্থ নামাজ। অন্যত্র বলা হয়েছে— কোরআন থেকে তোমাদের জন্য যা সহজ, তা পড় (ফাক্বরাউ মা তাইয়াস্‌সারা মিনাল ক্বোরআন)। এখানেও 'ক্বোরআন' অর্থ নামাজ। এভাবে আলোচ্য বাক্যটিতে কেবল নামাজে সতর ঢাকার কথাই বলা হয়েছে। তাওয়াফের সঙ্গে এই আয়াতটি সম্পৃক্ত নয়।

মূর্খতার যুগে আরববাসী বিবস্ত্র হয়ে কাবা তাওয়াফ করতো। বলতো, যে কাপড় পড়ে আমরা আল্লাহ্র নাফরমানী করেছি, সে কাপড় পড়ে তাওয়াফ করা ঠিক হবে না। এ রকম অপধারণার বশবর্তী হয়ে তখন নারী পুরুষ সকলেই কাবা গৃহ তাওয়াফ করতো। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করেছেন— হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি........(আয়াত ২৬)। তাওয়াফ সম্পর্কিত এই আয়াতের ভূমিকাস্বরূপ ইতোপূর্বে শয়তান কর্তৃক প্রথম মানব-মানবীর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের প্ররোচনাদানের কথা উল্লেখিত হয়েছে। শয়তান কর্তৃক মানুষকে বিবস্ত্র করার প্রথম ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যস্থল হয়েছিলেন হজরত আদম ও হজরত হাওয়া। ওই আয়াতগুলোই ছিলো বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফ নিষিদ্ধ হওয়ার পটভূমিকা ও কারণ। ওই সকল আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্তায়ালাই নগ্নতাকে আড়াল করার জন্য সৃষ্টি করেছেন পোশাক-পরিচ্ছদ। এটা মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষকে প্রদত্ত একটি অত্যুত্তম অনুগ্রহ। এটাই তাকওয়া।

www.eelm.weebly.com

পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক প্রদত্ত নির্দেশগুলোর মর্মার্থ এ রকম— হে মানুষ! শয়তান তোমাদের আদি পিতামাতাকে নগ্নতার দিকে ঠেলে দিয়েছিলো। তোমাদেরকেও সে নগ্ন করে বিপথগামী করতে চায়। আর এ জন্য দোহাই দেয় তাদের পিতৃ পুরুষদের অন্ধ অনুসরণের। কিন্তু উত্তমরূপে জেনে নাও যে, এই আচরণটি একটি চরম অলজ্জিত আচরণ। মূর্খ অংশীবাদীরা আরো বলে, আল্লাহ্‌ই নাকি তাদেরকে এ রকম লজ্জাহীনতার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ কখনো কাউকে লজ্জাহীন হতে আদেশ দেন না।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে গোপনাঙ্গ উন্মোচন একটি চরম নির্লজ্জতা। সকল অবস্থায় নগ্নতা নিষিদ্ধ। পরিশুদ্ধ প্রবৃত্তি নগ্নতাকে জঘন্য অপরাধ বলে মনে করে। জ্ঞানী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিতে নগ্নতা অত্যন্ত ঘৃণিত। আর তাওয়াফ ও অন্যান্য ইবাদতের সময় বিবস্ত্র হওয়া তো আরো অধিক জঘন্য। এই অপকর্মটি হারাম হওয়াই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং তাওয়াফের সময় বিবস্ত্র হওয়া, হজের সময় গোশত ও মসলাযুক্ত আহার্য গ্রহণকে হারাম মনে করা — এ সকল কিছুই হারাম। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন — 'হে রসুল! আপনি বলে দিন, আল্লাহ্‌ তাঁর দাসদের জন্য যে সকল সৌন্দর্যমণ্ডিত বস্তু এবং বিশুদ্ধ জীবনোপকরণ সৃষ্টি করেছেন, কে তা নিষিদ্ধ করেছে?' আল্লাহ্‌তায়ালা আরো বলেছেন — 'হে আমার রসুল! আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার প্রভুপ্রতিপালক সকল অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন।

গোপনাঙ্গ উন্মোচন করা হারাম। আল্লাহ্‌পাকই এই অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন। কিন্তু তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য সতর আবৃত করা কোনো শর্ত নয়। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কেউ বিবস্ত্র অবস্থায় কাবাগৃহ তাওয়াফ করলে তার ফরজ তাওয়াফ হয়ে যাবে। কিন্তু নিষিদ্ধ নগ্নতার কারণে সে অবশ্যই গোনাহ্‌গার হবে। কিন্তু অধিকাংশ ইমাম ফরজ তাওয়াফ বিবস্ত্র অবস্থায় হবে— এ কথা বলেননি। কেননা হজরত আবু বকরকে দলনেতা করে রসুল স. মক্কায় একটি হজযাত্রীর দল প্রেরণ করেছিলেন। আমিও ছিলাম ওই দলে। রসুল স. তখন আমাকে বলেছিলেন, কোরবানীর দিন জনসমাবেশকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করে দিও— এরপর থেকে কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না। বিবস্ত্র অবস্থায় কেউ তাওয়াফও করতে পারবে না। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধপক্ষদের দলিল এই যে, বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফ করা শরিয়তে নিষিদ্ধ। সুতরাং নগ্ন অবস্থায় তাওয়াফ করলে তাওয়াফের ফরজ আদায় হবে না। যেমন কোরবানীর দিন রোজা রাখলে ফরজ রোজা আদায় হয় না। আর সূর্যোদয়কালে, দ্বিপ্রহরে এবং সূর্যাস্তের সময় নামাজ পড়লেও ফরজ নামাজ আদায় হয় না।

www.eelm.weebly.com

নামাজের সময় সতর ঢাকা ফরজ। নগ্ন হয়ে নামাজ পড়লে নামাজ শুদ্ধ হবে না। সাধারণভাবে সতর ঢাকা ফরজ হওয়া এবং সতর উন্মোচন হারাম হওয়া অন্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আর তাওয়াফের সঙ্গে এই আয়াতের কোনো সম্পর্কও নেই। অবশ্য এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কাবাগৃহ তাওয়াফ করাও নামাজ। কিন্তু তাওয়াফের সময় কথাবার্তা বলা বৈধ করে দেয়া হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, হাকেম, দারা কুতনী, ইবনে খুজাইমা এবং ইবনে হাব্বান। ইবনে খুজাইমা এবং ইবনে হাব্বান বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। হাদিসটিকে যদি এই আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়া যায়, তবে এর সম্পর্ক তাওয়াফের সঙ্গেও হয়ে যেতে পারে। যদি বলা যায় অন্য আয়াতের মতো এই আয়াতও সাধারণভাবে নগ্নতাকে নিষিদ্ধ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে এবং যদি মনে করা যায় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বিবস্ত্র অবস্থায় কাবাগৃহ তাওয়াফের পরিপ্রেক্ষিতে— তথাপিও এ কথাটি প্রমাণিত হবে না যে, এই আয়াত তাওয়াফ সম্পর্কিত বর্ণনার ধারাবাহিকতা। কোনো ঘটনা সম্পর্কে অথবা কোনো প্রশ্নের সূত্রে নির্দেশ অবতীর্ণ হলে ওই নির্দেশ থেকেই জানা যায় বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত এবং উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর। কিন্তু অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ব্যতীত অন্য কোনোভাবে নির্দেশ জানা যায় না— এ কথাটিও ঠিক নয়। অন্য আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টরূপে বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফ নিষিদ্ধ হওয়ার নির্দেশটি জানা যায়। তাই ইবনে হুম্মামের উত্থাপিত আপত্তিটি ঠিক নয়।

মাসআলাঃ রহমাতুল উম্মত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের মতে সতর ঢাকা নামাজের শর্ত। ইমাম মালেকের অনুসারীদের মধ্যে এ অভিমত সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জমহুরের অনুসরণে বলে থাকেন সতর ঢাকতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কোনো মহিলা যদি সতর না ঢেকে নামাজ পড়ে, তবে তার নামাজ শুদ্ধ হবে না। কেননা সতর ঢাকা নামাজের শর্ত। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন, সতর ঢাকা নিজের উপরে ওয়াজিব— কিন্তু নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক শর্ত নয়। সুতরাং সতর ঢাকার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ নগ্ন হয়ে নামাজ পড়ে, তবে তার নামাজের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সতর না ঢাকার জন্য সে অবশ্যই গোনাহ্গার হবে। মালেকী মাযহাবের পরবর্তী দলের অভিমত হচ্ছে, সতর আবৃত না করলে কিছুতেই নামাজ শুদ্ধ হবে না। ইবনে হুম্মাম পরবর্তী যুগের এই ঐকমত্যকে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, পরবর্তী জামানার ঐকমত্য পূর্ববর্তী জামানার মতভেদের কারণে বিনষ্ট হয় না।

www.eelm.weebly.com

অনুষঙ্গঃ সতর ঢাকা যে ওয়াজিব— সে কথা আলোচ্য আয়াতের মধ্যেই রয়েছে, কিন্তু সতরের যথাসংজ্ঞা এখানে দেয়া হয়নি। অর্থাৎ শরীরের কোন কোন অঙ্গ— কী পরিমাণ ঢেকে রাখতে হবে— সে কথা এই আয়াতে নেই। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে হাদিস শরীফের গ্রন্থে।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, পুরুষের সতর হচ্ছে, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। অর্থাৎ নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহ্মদ ইমাম মালেকের দু'টি অভিমতের কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি ইমাম আবু হানিফার অনুকূল। অন্যটি হচ্ছে— সুনির্দিষ্টভাবে কোনো বিশেষ অঙ্গের সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎভাগ ঢেকে রাখা ওয়াজিব। এই অভিমতটির সমর্থনে উপস্থাপন করা হয়েছে হজরত আনাসের একটি হাদিস, যার মধ্যে রয়েছে— তারপর রসুল স. তাঁর উরুদেশ থেকে পরিধেয় বস্ত্র সরিয়ে নিলেন। তাঁর সেই শুভ্র উরুদেশ এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। বোখারী, মুসলিম। আহমদের বর্ণনায় রয়েছে— তারপর তহবন্দ সরে গেলো।

জননী আয়েশার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. আমার প্রকোষ্ঠে শায়িত ছিলেন। তাঁর দুই উরু অথবা হাঁটুর নিচের অংশ উন্মুক্ত ছিলো। এমন সময় হজরত আবু বকর প্রকোষ্ঠে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। রসুল স. যেভাবে শুয়ে ছিলেন, সেভাবে থেকেই প্রবেশের অনুমতি দিলেন। একটু পরে এলেন, হজরত ওমর। তিনিও বাইরে থেকে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রসুল স. শায়িত অবস্থা থেকেই অনুমতি দান করলেন। কিছুক্ষণ পর এলেন হজরত ওসমান। তিনিও প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। রসুল স. শায়িত অবস্থা পরিত্যাগ করে সরে যাওয়া পরিধেয় ঠিক করে উঠে বসলেন। এই হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে 'দুই উরু অথবা হাঁটুর নিচের অংশ উন্মুক্ত ছিলো।' এখানে উরু না হাঁটু— সে কথা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই বর্ণনাটি দলিল হিসেবে গ্রাহ্য হয়নি। ইমাম আহমদ কিন্তু নির্দিষ্ট করে এ কথাই বর্ণনা করেছেন যে— তখন উন্মুক্ত ছিলো তাঁর উরুদেশ। হাদিসটি তিনি বর্ণনা করেছেন জননী হাফসা থেকে। বর্ণনাটি অবশ্য দলিল হিসেবে গ্রাহ্য। তাহাবী এবং বায়হাকীও জননী হাফসা থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় রয়েছে— জননী হাফসা বলেছেন, একদিন রসুল স. আমার প্রকোষ্ঠে বিশ্রাম করছিলেন। তখন তাঁর উরুদেশ ছিলো উন্মুক্ত। এমন সময় এলেন হজরত আবু বকর .... শেষ পর্যন্ত।

হজরত আবু মুসার বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. একদিন বসেছিলেন একটি কূপের পাড়ে। তার দুই হাঁটু ছিলো উন্মুক্ত। সহসা সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত ওসমান। তাঁকে দেখে রসুল স. তাঁর উন্মুক্ত হাঁটু আবৃত করলেন। বোখারী।

www.eelm.weebly.com

জমহুরের অভিমতের পক্ষে রয়েছে হজরত আলী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস। সেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, উরুদেশ উন্মোচন করবে না। জীবিত বা মৃত ব্যক্তির উরুদেশ দেখবে না। আবু দাউদ, ইবনে মাজা, হাকেম, বায্যার। কোনো কোনো আলেম হাদিসটি বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। হাদিসটির সূত্র-শৃংখল এ রকম, ইবনে জুরাইজ—হাবীব ইবনে সাবেত—আসেম ইবনে জামুরাহ্। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এই সূত্রশৃংখলভূত ইবনে জুরাইজ এবং হাবীবের মধ্যে কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। ইবনে আবী হাতেম তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইবনে জুরাইজ এবং হাবীবের সংযোগসূত্র ছিলেন হাসান ইবনে জাকওআন। আর এ সূত্রটি শিথিল। তাছাড়া আসেম থেকে হাবীব হাদিসটি শুনেছেন— এ তথ্যটিও প্রামাণ্য নয়। এটাও বর্ণনাটির একটি দুর্বল দিক। ইবনে মুঈন বলেছেন. আসেম থেকে হাবীব স্বকর্ণে কোনো হাদিস শোনেননি। তাদের দু'জনের মধ্যে রয়েছে আরো একজন বর্ণনাকারী— যে নির্ভরযোগ্য নয়। বায্যার বলেছেন, ওই দু'জনের মধ্যে রয়েছে আমর ইবনে খালেদ।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটির উরুদেশ ছিলো অনাবৃত। তিনি স. বললেন, উরুদেশ আবৃত করো। কারণ উরুদেশও আবৃতযোগ্য অঙ্গ। তিরমিজি, হাকেম, আহমদ। কোনো কোনো আলেম হাদিসটিকে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এর বর্ণনাসূত্রভূত আবু ইয়াহ্ইয়া কাত্তাতের বিরুদ্ধেও দুর্বলতার অভিযোগ রয়েছে।

রসুল স. একবার হজরত জারহাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। হজরত জারহাদ ছিলেন মসজিদে। আর তখন তার উরুদেশ ছিলো অনাবৃত। তিনি স. বললেন, জারহাদ! উরু ঢেকে নাও। কারণ উরুও আবৃতযোগ্য অঙ্গ। আহমদ। এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহভূত এক বর্ণনাকারীর নাম আবু জারআ। বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি অপ্রসিদ্ধ।

হজরত মোহাম্মদ বিন জাহাশ বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুল স. হজরত মুয়াম্মারের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। হজরত মুয়াম্মার তখন বসেছিলেন হাঁটু উঁচু করে। আর তখন তার উরুদেশের কিছু অংশ উন্মুক্ত ছিলো। তিনি স. বললেন, হে মুয়াম্মার! উরু আবৃত করো। কারণ উরুও অনুন্মোচনীয়। আহমদ, বোখারী, হাকেম। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, আবু কাসীর ব্যতীত অন্য সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। অবশ্য মুহাদ্দিসগণের একটি দল আবু কাসীরের বর্ণনাকে গ্রাহ্য করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আমি কাউকে বিরূপ মন্তব্য করতে শুনিনি।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু আইয়ুব আনসারী বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি— হাঁটু থেকে নাভিমূল পর্যন্ত আবরণযোগ্য অঙ্গ (সতর)। দারাকুতনী। কিন্তু এই হাদিসের সূত্রভূত ইবাদ বিন কাসীর এবং সাঈদ ইবনে রাশেদ পরিত্যক্ত।

আমর বিন শোয়াইবের পিতামহ থেকে বর্ণিত একটি হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে— নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবরণযোগ্য অঙ্গ। দারাকুতনী। এই হাদিসের সূত্রভূত সাওয়ার বিন দাউদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন উকাইলী। কিন্তু ইবনে মুঈন তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে মেনেছেন।

উপরে বর্ণিত হাদিসগুলোতে উরুদেশ আবৃত করতে বলা হয়েছে। এগুলো কিন্তু ওই হাদিসগুলোর সঙ্গে বিরোধপূর্ণ নয় যেগুলোর মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে উরুদেশ উন্মোচনের বৈধতা। কিন্তু আলেমগণ সাবধানতা অবলম্বনার্থে ওই হাদিসগুলোকেই গ্রহণ করেছেন— যেগুলোতে বলা হয়েছে 'উরুদেশ আবরণযোগ্য।' বোখারী বলেছেন, হজরত আনাসের হাদিসটি অধিকতর দৃঢ়। আর হজরত জারহাদের হাদিসটি সতর্কতাসম্ভূত। ওই হাদিসগুলোও সুদৃঢ়, যেগুলো হজরত আনাসের হাদিসের অনুরূপ। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বস্ত্রবিবর্জিত ব্যক্তি বসে নামাজ পড়বে এবং নামাজ পাঠের সময় দুই হাত দিয়ে ঢেকে রাখবে তার গোপনাঙ্গ। আর রুকু ও সেজদা আদায় করবে ইশারায়। কারণ নামাজের বাইরে এবং ভিতরে সতর আবৃত রাখা ফরজ। তাই তিনি এই ফরজ আদায় করতে গিয়ে বসে নামাজ পড়তে বলেছেন এবং রুকু ও সেজদা করতে বলেছেন ইশারায়।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, দুই হাঁটুও আবরণযোগ্য। হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, হাঁটুও আবৃতযোগ্য অঙ্গ। এই হাদিসের সূত্রভূত উক্‌বা বিন আলকামাকে দুর্বল বলেছেন আবু হাতেম রাজী এবং নসর বিন মানসুর। আবু হাতেম বলেছেন, সে অপরিচিত এবং পরিত্যক্ত হাদিসের বর্ণনাকারী। ইবনে হাব্বান বলেছেন তার বর্ণনাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

হজরত আবু আইয়ুব আনসারী এবং আমর বিন শোয়াইবের পিতামহ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ হাঁটুকে আবৃতযোগ্য অঙ্গ বলে স্বীকার করেননি। আমরা বলি,হাঁটু অর্থ উরুদেশ ও পায়ের সংযোগস্থল। এই সংযোগ স্থলের উপরিভাগ খোলা রাখা হারাম। এবং এর নিম্নভাগ খোলা রাখা বৈধ। আমরা সাবধানতা অবলম্বনার্থে হারামকে কারণের উপর প্রাধান্য দিয়েছি।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ স্বাধীনা রমণীদের সমস্ত শরীর আবৃতযোগ্য। ইমাম আবু হানিফার মতে মুখমণ্ডল, পা, পায়ের গোড়ালী এবং কব্জি পর্যন্ত দুই হাত আবৃতযোগ্য অঙ্গ নয়। এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ এ রকম অভিমত পোষণ করেন। অন্য বর্ণনানুসারে তাঁরা মুখমণ্ডল এবং পা ছাড়া অন্য সকল অঙ্গ আবৃতযোগ্য বলে মনে করেন।

রসুল স. বলেছেন, ওড়না ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্কাদের নামাজ কবুল হয় না। তিনি স. আরো বলেছেন, মেয়েরা সম্পূর্ণতই গোপনাঙ্গ বিশেষ। হজরত ইবনে মাস্‌উদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি। আবু দাউদের মুরসাল বর্ণনায় রয়েছে, প্রাপ্তবয়স্কাদের মুখমণ্ডল এবং দুই হাতের কব্জি ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ দর্শনযোগ্য নয়।

জননী সালমা বলেছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তহবন্দ (নিম্নাঙ্গের পরিচ্ছদ) ব্যতীত কোর্তা ও ওড়না পরে কি নামাজ পড়তে পারবো? তিনি স. বললেন, পারবে— যদি কোর্তা এ রকম লম্বা হয় যাতে করে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠদেশ ঢাকা পড়ে যায়। দারা কুতনী। এই বর্ণনাসূত্রভূত আব্দুর রহমান বিন আবদুল্লাহ্‌কে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ইয়াহ্‌ইয়া। আবু হাতেম বলেছেন, তার বর্ণনা দলিল হওয়ার অযোগ্য। উল্লেখ্য যে, হাদিসটিকে মারফু মনে করা ঠিক নয়। কেননা ইমাম মালেক এবং আলেমদের একটি দল হাদিসটিকে জননী সালমার নিজস্ব কথা বলে উল্লেখ করেছেন।

মাসআলাঃ আন্‌নাওয়াযিল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, ললনাকুলের কণ্ঠস্বরেরও পর্দা করতে হবে। তাই রসুল স. বলেছেন, পুরুষেরা সশব্দে সুবহানাল্লাহ্ পড়বে এবং ললনারা হাতে হাতে তালি বাজাবে। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, এই হাদিসের ভিত্তিতে যদি কেউ এ রকম বলে যে, নামাজের সময় মেয়েরা উচ্চস্বরে ক্বেরাত পড়লে তাদের নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে, তবে তার এ কথা ভুল হবে না।

মাসআলাঃ ইমামে আজম বলেছেন, ক্রীতদাসীর সতর পুরুষের সতরের মতো। কিন্তু তার পেট ও পিঠ ঢেকে রাখতে হবে। কারণ তা আবৃতযোগ্য। কিন্তু ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, ক্রীতদাসীর আবৃতযোগ্য অঙ্গ অবিকল পুরুষের আবৃতযোগ্য অঙ্গের মতো। অর্থাৎ তার পেট ও পিঠ আবৃতযোগ্য অঙ্গ নয়। অবশ্য কোনো কোনো শাফেয়ী মতালম্বী আলেম বলেছেন, ক্রীতদাসীর কনুইয়ের নিচের অংশ এবং হাঁটুর নিম্নদেশ ছাড়া অন্য অঙ্গগুলো আবৃতযোগ্য।

www.eelm.weebly.com

হজরত নাফে থেকে বায়হাকী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সাফিয়াহ্ বিন আবু উবায়িদ বলেছেন, এক মহিলা ওড়না পরে এবং চাদরাবৃত হয়ে পথ অতিক্রম করছিলো। হজরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? জনৈক ব্যক্তি জবাব দিলো আপনার বংশের অমুক ব্যক্তির বাঁদী। এ কথা শুনে হজরত ওমর তাঁর কন্যা এবং উম্মত জননী হজরত হাফসাকে বলে পাঠালেন, তুমি বাঁদীকে ওড়না এবং চাদর পরিয়েছো কেনো? স্বাধীনা রমণীর মতো এ রকম পোশাক দেখে আমি তো তাকে মনে করেছিলাম সে স্বাধীন পুরুষের স্ত্রী। ভাবছিলাম তার স্বামীকে ধরে এনে এ মর্মে জিজ্ঞাসাবাদ করবো যে, সে কেনো তার স্ত্রীকে স্বাধীনা রমণীর পোশক পরিয়েছে? আরো ভেবেছিলাম, আমি তাকে বলে দেবো— আর কখনও যেনো সে এ রকম না করে। বায়হাকী বলেছেন— হজরত ওমরের এই উক্তি বিশুদ্ধ।

ইমাম আহমদ বলেছেন, ফরজ নামাজের সময় দুই স্কন্ধ বস্ত্রাবৃত করা ফরজ। নফল নামাজের সময় তাঁর ফরজ এবং ফরজ নয় — দু'রকম উক্তিই বর্ণিত হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে, 'রসুল স. বলেছেন, একটি বস্ত্র পরিধান করে এবং কাঁধ উন্মুক্ত করে কেউ যেনো নামাজ না পড়ে। বোখারী, মুসলিম এবং আহমদও এ রকম বর্ণনা করেছেন। জমহুরের অভিমত হচ্ছে, নগ্ন কাঁধে নামাজ পাঠ মাকরূহে তানযিহী (মাকরূহে তাহ্রিমী নয়)। কারমানী বলেছেন, এই আমলটি হারাম হওয়াই সমীচীন। কেননা এ রকম সাধারণ নিষেধাজ্ঞা হারামেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ঐকমত্যাগত সিদ্ধান্ত এই যে, নামাজে কাঁধ উন্মুক্ত রাখা সিদ্ধ। তাই এই আমলটি মাকরূহে তানযিহী হওয়াই শোভনীয়।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, কারমানী এ সম্পর্কে রসুল স. এর হাদিস বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন, ইমাম আহমদ কাঁধ খোলা রাখাকে হারাম বলেছেন। তিনিই আবার ঐকমত্যাগত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন কি করে?

ইবনে মুনজিরও উল্লেখ করেছেন যে, মোহাম্মদ বিন আলী ঘাড় খোলা রাখাকে নাজায়েয বলেছেন।

তাহাবী তাঁর 'শারহুল মাআনীল আছার' গ্রন্থে এই মাসআলাটি সম্পর্কে একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন। সেখানে হজরত ইবনে ওমরের উক্তিরূপে তাউস এবং নাখয়ী উল্লেখ করেছেন, কাঁধ খোলা রাখা জায়েয। কেউ কেউ আবার ওয়াহার এবং ইবনে জারীর বর্ণনাসূত্রে এ রকমই বলেছেন। ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্যরূপে তকিউদ্দিন সুবকী বলেছেন, কাঁধ খোলা না খোলার ব্যাপারে সকলেই স্বাধীন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর সকল গ্রন্থে এর বিরুদ্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ উত্তম বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় নামাজ পাঠ করা মোস্তাহাব। আলোচ্য আয়াতেও বলা হয়েছে 'প্রত্যেক নামাজের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে।' সুতরাং নামাজের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করা ওয়াজিব। এই ওয়াজিব সতর ঢাকা পর্যন্ত। এর অতিরিক্ত বস্ত্র মোস্তাহাব। হজরত ইবনে ওমর থেকে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নামাজের সময় দুই প্রস্থ কাপড় পরিধান কোরো। কেননা নামাজের সময় পরিপূর্ণ ও সুন্দর পোশক পরার বিষয়টি আল্লাহ্তায়লার অধিকারের সীমানাভূত। বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন— এক লোক রসুল স. কে এক কাপড়ে নামাজ পড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। তিনি স. বললেন, তোমাদের সকলেরই দুই প্রস্থ কাপড় থাকে, তবে এক প্রস্থ কাপড় পরে নামাজ পড়া যাবে। এরপরে একদিন এক লোক হজরত ওমরের নিকট একই রকম প্রশ্ন করলো। হজরত ওমর উত্তরে বললেন, আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে সৌন্দর্যচেতনা দান করেছেন। তাই মানুষেরও উচিত সৌন্দর্যসচেতনাকে অগ্রাধিকার দেয়া। অতএব, নামাজের জন্য চাই উত্তম পরিচ্ছদ— তহবন্দ ও চাদর, তহবন্দ ও কামিজ, তহবন্দ ও কোর্তা, পায়জামা ও চাদর, পায়জামা ও কোর্তা, পায়জামা ও জুব্বা অথবা তাবান (ঢিলা ঢালা পোশাক) এবং কামিজ। সম্ভবতঃ হজরত ওমর তখন এ কথা বলেছিলেন যে, নামাজে পরিধান করা উচিত তাবান এবং চাদর।

কালাবী সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, মূর্খতার যুগে হজের সময় বনী আমের গোত্রের লোকেরা স্বল্প পানাহারে অভ্যস্ত ছিলো। চর্বি বা মসলা সংযুক্ত খাদ্য তখন তারা খেতো না। তারা এ রকম করতো হজের সম্মানার্থে। তাদেরকে এ রকম করতে দেখে মুসলমানেরা বলতে শুরু করলো, আমরাই তো হজের প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করার অধিকারী। তাঁদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আয়াতের অবশিষ্ট অংশটি।

বলা হলো— 'আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অমিতাচার করবে না। তিনি অমিতাচারীকে পছন্দ করেন না।' এ কথার অর্থ— 'তোমরা গোশত ও চর্বিযুক্ত খাদ্য ভক্ষণ করো এবং পান করো। আল্লাহ্পাক যা তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন তাকে অবৈধ মনে করে সীমালংঘন কোরো না।

ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইকরামা বলেছেন, 'তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার জন্য এবং বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি........ আয়াত (২৬) অবতীর্ণ হয়েছে কুরায়েশ, বনী আমের এবং কেনানা বিন বকরের বিভিন্ন গোত্র সম্পর্কে। তারা হজের সময় গোশত খেতো না। গৃহে প্রবেশের সময় সম্মুখদ্বার ব্যবহার না করে ব্যবহার করতো পশ্চাৎদ্বার।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজের সময় যথেচ্ছ আহার কোরো। কিন্তু বিরত থেকো দু'টো বিষয় থেকে— সীমালংঘন ও নগ্নতা। ইবনে আবী শায়বা এবং আব্দ বিন হুমাইদ্ও এ রকম বলেছেন।

জ্ঞাতব্যঃ হাসান বসরীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ওমর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ্র নিকটে গেলেন। দেখলেন, তাঁর সামনে রয়েছে একটি গোশতপূর্ণ পাত্র। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, গোশতগুলো কেমন? হজরত আবদুল্লাহ্ বললেন, আমি গোশত খুবই পছন্দ করি। হজরত ওমর বললেন, যতটুকু খেতে ইচ্ছে করে, খাও। এতে কোনো দোষ নেই।

হজরত ইবনে ওমরের মারফু বর্ণনায় রয়েছে, খাও। পান কোরো। দান কোরো। পরিধান কোরো। অপচয় কোরো না। সীমালংঘন কোরো না। বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, ইবনে মাজা এবং হাকেম।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ওমর ফারুক বলেছেন, উদর পরিপূর্ণ পানাহার থেকে বিরত থেকো। কারণ এ রকম অতি ভোজন শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এতে করে রোগ ব্যাধির সৃষ্টি হয় এবং নামাজে আসে আলস্য। পরিমিত পানাহার কোরো— শরীর সুস্থ থাকবে। আর দূরে থেকো অমিতাচার থেকে। আল্লাহ্তায়ালা স্থূল শরীরবিশিষ্টদেরকে পছন্দ করেন না। ধর্মবোধের উপর প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য না দেয়া পর্যন্ত মানুষ কখনও ধ্বংস হবে না।

বর্ণিত হয়েছে, খলিফা হারুনুর রশীদের সময়ে বাগদাদে বসবাস করতো একজন চতুর খৃষ্টান চিকিৎসক। একবার সে আলী বিন হাসান বিন ওয়াকেদকে বললো, তোমাদের আসমানী কিতাবে চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে কিছুই নেই। অথচ বিদ্যা হচ্ছে দু'টি। একটি চিকিৎসা বিদ্যা। আর অন্যটি ধর্মীয় বিদ্যা। আলী বললেন, আল্লাহ্তায়ালা সম্পূর্ণ চিকিৎসা বিদ্যাকে অর্ধ আয়াতের মধ্যে বিবৃত করেছেন। সেই অর্ধ আয়াতটি হচ্ছে — আহার করবে ও পান করবে, কিন্তু অমিতাচার করবে না। খৃষ্টান চিকিৎসকটি বললো, এ ব্যাপারে তোমাদের নবী কি কিছু বলেন নি? আলী বললেন, আমাদের রসুল চিকিৎসা শাস্ত্রকে প্রকাশ করেছেন অল্প কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে। সেই শব্দ কয়টি হচ্ছে — পাকস্থলি রোগের গৃহ। অতিভোজন থেকে বিরত থাকাই চিকিৎসার মূল কথা। তোমার শরীরকে ততটুকু দাও, যতটুকু সে আত্মস্থ করতে সক্ষম। চিকিৎসকটি বললো, তোমাদের আল্লাহ্ এবং তোমাদের রসুলতো চিকিৎসা বিদ্যাকে জালিনুসের উপর নির্ভরশীল করেননি (সকল ব্যবস্থাপত্রই দিয়েছেন)।

www.eelm.weebly.com

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِىٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

❐ বল, 'আল্লাহ্ স্বীয় দাসদিগের জন্য যে সব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে নিষিদ্ধ করিয়াছে?' বল, 'পার্থিব জীবনে বিশেষ করিয়া কিয়ামতের দিনে এই সমস্ত তাহাদিগের জন্য যাহারা বিশ্বাস করে।' এইরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি।

প্রথমেই বলা হয়েছে— বলো, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের জন্য যে সব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে? এই প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। এখানে 'শোভার বস্তু' কথাটির অর্থ— উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ, যার বক্তব্য বিষয় হচ্ছে— এ সকল পোশাক-পরিচ্ছদ রচিত হয় মানুষেরই উপকার ও আরাম আয়েশের জন্য। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালা এগুলোকে নিষিদ্ধ করবেন কেনো? আর এখানে 'বিশুদ্ধ জীবিকা' অর্থ হালাল আহার্য। হালাল পশুর গোশত এবং চর্বিও মানুষের উপকারার্থেই আল্লাহ্তায়ালা বৈধ করে দিয়েছেন। সেই বৈধতাকে পরিত্যাগ করা হবে কেনো? এভাবে আলোচ্য আয়াতটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে আমার রসুল! উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ ও বিশুদ্ধ জীবিকাকে আল্লাহ্তায়ালা তো নিষিদ্ধ করেননি। তবে কেনো মানুষ তাওয়াফের সময় নগ্ন হবে? কেনো হজের সময় পরিত্যাগ করবে গোশত ও চর্বি? কেনো স্বেচ্ছায় সায়েবা ও অন্যান্য হালাল পশুর শ্রম কাজে লাগানোকে হারাম মনে করবে? —আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে আরেকটি কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্তায়ালা নিষিদ্ধ না করা পর্যন্ত সকল কিছুই হালাল। হারাম কেবল সেগুলোই যেগুলোকে আল্লাহ্তায়ালা সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।' এ কথার অর্থ— দৃষ্টিনন্দন পরিচ্ছদ এবং বিশুদ্ধ ও সুস্বাদু খাদ্যবস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল বিশ্বাসীদের জন্য, যাতে করে তারা অর্জন করতে পারে ইবাদত করার নিমিত্তে শারীরিক শক্তি এবং রক্ষা করতে পারে শালিনতা। এসকল নেয়ামত ব্যবহার করে তারা যেনো প্রকাশ করতে পারে আল্লাহ্তায়ালার কৃতজ্ঞতা। অবিশ্বাসীদের জন্য শোভন বস্তু হিসাবে এ বিশুদ্ধ জীবিকা সমূহকে সৃষ্টি করা হয়নি। পৃথিবীতে কেবল এ সকল নেয়ামত

www.eelm.weebly.com

উপভোগের জন্য তাদেরকে দেয়া হয়েছে সাময়িক অধিকার। এ সকল নেয়ামতের চিরন্তন অধিকারী তারা নয়। এখানে 'খলিসাতান' (বিশেষ করে) কথাটির মাধ্যমে এটাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাকের বিশ্বাসী বান্দারা আল্লাহ্পাকের অসন্তোষ ও ক্রোধ থেকে চিরমুক্ত হবে। তাই পৃথিবীর মতো সেখানে তাদের কোনো দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থাকবে না। নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে তারা তখন উপভোগ করে চলবে আল্লাহ্তায়ালার এই নেয়ামত সমূহ। খলিসাতান শব্দটির উদ্দেশ্য এ রকমও হতে পারে যে— বিশেষ করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাকের যাবতীয় অনুগ্রহসম্ভার বিশেষভাবে উপভোগের অধিকারী হবে কেবল বিশ্বাসীরা। আর অবিশ্বাসীরা সেখানে হবে বিশেষভাবে চিরবঞ্চিত (পৃথিবীর মতো আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহরাজির উপরে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের সাধারণ অধিকার সেখানে থাকবে না)।

শেষে বলা হয়েছে — 'এরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিবৃত করি।' এ কথার অর্থ— আমি হালাল ও হারামের পার্থক্যরেখা স্পষ্ট করে দিয়েছি। এমতো পথ নির্দেশনা দিয়েছি যে— হালাল গ্রহণীয় এবং হারাম বর্জনীয়। যারা আল্লাহ্তায়ালার এককত্বে বিশ্বাসী এবং যারা তাঁকে মনে করে অংশীবিহীন— তারাই প্রকৃত জ্ঞানী। আর জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যই আমি দিয়ে চলেছি আমার নিদর্শনসমূহের বিশদ বিবরণ।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৩৩

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

❑ বল, 'আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করিয়াছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহের শরীক করা— যাহার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নাই, এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই।'

কতিপয় নিষিদ্ধ বিষয়াবলীর বিবরণ দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে— 'হে আমার রসুল! আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা।' এখানে 'ফাওয়াহিশা মা জাহারা মিনহা ওয়ামা বাত্বানা' অর্থ— প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা। এখানে প্রকাশ্য অশ্লীলতা অর্থ দিবসে পুরুষের বিবস্ত্র অবস্থার তাওয়াফ। আর গোপন অশ্লীলতা অর্থ— নারীর বিবস্ত্র অবস্থার তাওয়াফ। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতার অর্থ— প্রকাশ্য ও গোপন ব্যভিচার। হজরত ইবনে মাসউদের মারফু বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ্র চেয়ে অধিক লজ্জাশীল আর কেউ নয়। তাই তিনি

www.eelm.weebly.com

প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার বেহায়াপনাকে হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক আত্মপ্রশংসা পছন্দকারীও কেউ নেই। তাই তিনি নিজেই তাঁর প্রশংসা করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে — 'আর পাপ।' এখানে নিশ্চিত পাপ বুঝাতে 'আল ইছমা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ গোনাহ্ করা এবং আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়া। এটি একটি সাধারণ অর্থবোধক শব্দ। এর মধ্যে কুপ্রবৃত্তিও অন্তর্ভুক্ত। সুনির্দিষ্ট নির্দেশের পরে নির্দেশের গুরুত্ব প্রকাশার্থে এ রকম সাধারণ অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়। জুহাক বলেছেন, 'ইছমুন' অর্থ ওই সকল পাপ, যেগুলোর জন্য কোনো সুনির্ধারিত শাস্তি নেই। হাসান বলেছেন, শরাব। জনৈক কবি বলেছে, আমি এত বেশী ইছমুন পান করেছি যে, আমার জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং অসংগত বিরোধিতা।' এখানে 'আল বাগ্ইয়া' অর্থ বিদ্রোহ বা বিরোধিতা। আর 'গইরিল হাক্ব' অর্থ অসংগত। আলোচ্য বাক্যাংশটির মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কোনো কিছুকে আল্লাহ্‌র শরীক করা, যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেননি।' এ কথাটির মাধ্যমে অংশীবাদীদেরকে মৃদু উপহাস করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশনা ছাড়াই তারা হালাল ও হারাম নির্ধারণ করে নেয়। এ রকম স্বকল্পিত নির্ধারণ নিষিদ্ধ।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমার কোনো জ্ঞান নেই।' অংশীবাদীরা বাহিরা, সায়েবা ইত্যাদি পশুগুলোকে নিজেরাই হারাম করে নিয়েছিলো। অথচ তারা বলতো, আল্লাহ্ই এগুলোকে হারাম করেছেন। বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফকেও তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ বলে প্রচার করতো। না জেনে শুনে এ রকম অযথার্থ নির্ধারণকে আল্লাহ্‌পাক এখানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন— আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা হারাম, যে সম্পর্কে মানুষের কোনো জ্ঞান নেই। মুকাতিল বলেছেন, দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত ধর্ম সম্পর্কে কোনো কথা বলা আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে সাধারণভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৩৪

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَاۤءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

❑ প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাহাদিগের সময় আসিবে তখন তাহারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করিতে পারিবে না।

---

www.eelm.weebly.com

'প্রত্যেক জাতির জন্য এক নির্দিষ্ট সময় আছে'— কথাটির অর্থ, অবিশ্বাসীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর আযাব অবতীর্ণ হওয়ার জন্য রয়েছে বিভিন্ন সময়। আল্লাহ্তায়ালাই উত্তমরূপে অবগত যে, কোন্ সম্প্রদায়কে কখন তিনি শাস্তিদান করবেন। কথাটির মাধ্যমে মক্কার অংশীবাদীদেরকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে—'যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না।' এ কথার অর্থ— যখন আল্লাহ্র আযাব আপতিত হবে তখন কাউকে কোনো প্রকার সুযোগ দেয়া হবে না। কেউ চাইলে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও আযাব আনতে পারবে না। তেমনি আযাবকে কেউ এক মুহূর্ত বিলম্বও করাতে পারবে না। অবিশ্বাসীরা বলতো, হে আল্লাহ্! তোমার নবীর কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো এবং আমাদের উপর অবতীর্ণ করো কঠিন শাস্তি। তাদের এ রকম কথার পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আযাব অবতীর্ণ করার বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়াধীন। যখন তিনি চাইবেন, কেবল তখনই আযাব অবতীর্ণ হবে। মানুষ সেই আযাবের মুহূর্তকালও অগ্র-পশ্চাৎ ঘটাতে পারবে না।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের বর্ণনায় রয়েছে, আততায়ী কর্তৃক ছুরিকাঘাতে আহত হজরত ওমরকে লক্ষ্য করে হজরত কা'ব বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার হায়াত বৃদ্ধির প্রার্থনা করুন। আল্লাহ্পাক নিশ্চয়ই আপনার প্রার্থনা ফিরিয়ে দেবেন না? হজরত ওমর বললেন, তুমি কি জানো না, আল্লাহ্পাক বলেছেন, যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না। হজরত কা'ব বললেন, আয়ুর বৃদ্ধি ও স্বল্পতার পরিমাপ লিপিবদ্ধ রয়েছে লাওহে মাহ্ফুজে। আল্লাহ্ চাইলে কারো হায়াত বাড়িয়ে দেন এবং চাইলে কারো হায়াত দেন কমিয়ে। এভাবে সুনির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে আর অগ্রপশ্চাৎ করা হয় না।

আবু মালিকার বর্ণনায় রয়েছে, আততায়ীর অস্ত্রের আঘাতে হজরত ওমরের আহত হওয়ার কথা শুনে হজরত কা'ব বললেন, হায় আক্ষেপ! আমীরুল মু'মিনীন আল্লাহ্র নামে কসম করলে আল্লাহ্পাক নিশ্চয়ই তাঁর মৃত্যুর সময়কে পিছিয়ে দিতেন (আল্লাহ্পাক তাঁর কসমকে অফলপ্রসূ হতে দিতেন না)। হজরত ইবনে আব্বাস হজরত ওমরের নিকটে গিয়ে বললেন, কা'ব এ রকম করে বলছেন। হজরত ওমর বললেন, আমি তো আল্লাহ্র নিকট মৃত্যু বিলম্বিত হওয়ার প্রার্থনা জানাবো না।

www.eelm.weebly.com

يٰبَنِىٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

❒ হে বনি আদম! যদি তোমাদিগের মধ্য হইতে কোন রসূল তোমাদিগের নিকট আসিয়া আমার নিদর্শন বিবৃত করে তখন যাহারা সাবধান হইবে এবং নিজকে সংশোধন করিবে তাহাদিগের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।

❒ যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং অহংকারে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে তাহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে দিয়েছেন জ্ঞান ও বিবেক। দিয়েছেন কর্মস্পৃহা ও কর্মসম্পাদনের সামর্থ্য। তাই জ্ঞান ও চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে সংশোধিত করা মানুষের একটি অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। আল্লাহ্‌তায়ালা সকল প্রকার বাধ্যবাধকতা থেকে পবিত্র। কারো প্রতি তাঁর অবশ্যকরণীয় কর্তব্য বলে কিছু নেই। মানুষ ভিতরে বাইরে যেদিকে তাকাবে, সেদিকেই দেখতে পাবে তাঁর অস্তিত্বের ও এককত্বের অসংখ্য নিদর্শন। এতদসত্ত্বেও দয়া করে তিনি মানুষের নিকট যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন নবী ও রসুল। আরো অবতীর্ণ করেছেন আসমানী কিতাব। এসকল কিছুই তাঁর অপার অনুগ্রহ। মানুষের অবশ্যকর্তব্য হচ্ছে, এই বিশেষ অনুকম্পার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। যারা তাঁর রসুলের নির্দেশানুসারে সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং আত্মসংশোধনে ব্রতী হবে, তারা কবরে, কিয়ামতে, শেষ বিচারের সময়ে— কোথাও ভীত চিন্তিত হবে না। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে— হে বনী আদম! যদি তোমাদের মধ্যে কোনো রসুল তোমাদের নিকটে এসে আমার নিদর্শন বিবৃত করে, তখন যারা সাবধান হবে এবং নিজেকে সংশোধন করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।

পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।' এ কথার অর্থ— যারা আমার রসুলের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান

www.eelm.weebly.com

করেছে, প্রদর্শন করেছে অহংকার, তাদের নরকবাস হবে চিরস্থায়ী। এখানে অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নেয়া অর্থ— সত্যের আহ্বানে সাড়াদানকারী বিশ্বাসীদের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করা। অবজ্ঞাভরে তাঁদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাক এই মর্মে অঙ্গীকার করেছেন যে, রসুলের অনুসারী সাবধানী এবং সংশোধনকারীরা লাভ করবে সওয়াব এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও অহংকারীরা লাভ করবে আযাব। আর বিশ্বাসীদের সওয়াব যেমন চিরস্থায়ী হবে, তেমনি অবিশ্বাসীদের আযাবও হবে চিরস্থায়ী।

সূরা আ'রাফ : আয়াত ৩৭, ৩৮, ৩৯

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ط اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ
نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ لا قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ
تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ
كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ○ قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ
الْاِنْسِ فِى النَّارِ ط كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ط حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا لا
قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ط قَالَ
لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ○ وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا
مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○

❑ যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁহার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে? নির্ধারিত অংশ ইহাদিগের নিকট পৌঁছিবে, যতক্ষণ না আমার প্রেরিতরা প্রাণ হরণের জন্য তাহাদিগের নিকট আসিবে ও জিজ্ঞাসা করিবে, 'আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে তোমরা ডাকিতে তাহারা কোথায়?' তাহারা বলিবে 'তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে' এবং তাহারা স্বীকার করিবে যে তাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ছিল।

❑ আল্লাহ্ বলিবেন, 'তোমাদিগের পূর্বে যে জিন ও মানবদল গত হইয়াছে তাহাদিগের সহিত তোমরা অগ্নিতে প্রবেশ কর'; যখনই কোন দল উহাতে প্রবেশ করিবে তখনই অপর দলকে তাহারা অভিসম্পাত করিবে, এমন কি যখন সকলে

www.eelm.weebly.com

উহাতে একত্র হইবে তখন তাহাদিগের পরবর্তিগণ পূর্ববর্তিদিগের সম্পর্কে বলিবে 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! ইহারাই আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, সুতরাং তাহাদিগকে দ্বিগুণ অগ্নিশাস্তি দাও।' আল্লাহ্ বলিবেন, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রহিয়াছে, কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নহ।

❒ তাহাদিগের পূর্ববর্তিগণ পরবর্তিদিগকে বলিবে, 'আমাদিগের উপর তোমাদিগের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, সুতরাং তোমরা তোমাদিগের কৃতকর্মের ফল ভোগ কর।'

উদ্ধৃত আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা বড় জালেম আর কে?' এখানে আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার অর্থ— আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা, আল্লাহ্তায়ালার স্ত্রী ও পরিবার পরিজন রয়েছে এ রকম বলা, প্রতিমার নামে পশু উৎসর্গ করা, সেগুলোর গোশত ভক্ষণকে হারাম মনে করা, বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফ করা, আবার 'আল্লাহ্ই এ রকম করতে বলেছেন' এ রকম বলা ইত্যাদি। এই মিথ্যা রচনার মধ্যে এই উম্মতের রাফেজীরাও অন্তর্ভুক্ত। তারাও আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনাকারী। তারা বলে, কোরআন মজীদে আরো অনেক আয়াত ছিলো— সাহাবীগণ সেগুলোকে গ্রন্থিত করেননি। এ রকম বক্তব্য যে আল্লাহ্র সম্পর্কে মিথ্যা রচনার নিদর্শন— সেকথা বলাই বাহুল্য। এখানে 'আওকাজ্জাবা বি আয়াতিহি' (কিংবা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে) কথাটির মধ্যে 'আও' (কিংবা) অব্যয়টি মিথ্যা রচনা ও নিদর্শন প্রত্যাখ্যানকে একত্রিত করেনি। অর্থাৎ এ অব্যয়টির মাধ্যমে এখানে এ কথা বুঝানো হয়নি যে— মিথ্যা রচনাকারী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা জালেম বা অত্যাচারী। বরং বুঝানো হয়েছে এ কথা— মিথ্যা রচনাকারীরা যেমন জালেম, তেমনি জালেম সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও। আর যারা মিথ্যা রচনা ও সত্যপ্রত্যাখ্যান দু'টো অপরাধেই সিদ্ধহস্ত, তারা অতি অবশ্যই অধিকতর জালেম।

এরপর বলা হয়েছে— 'নির্ধারিত অংশ তাদের নিকট পৌঁছবে যতক্ষণ না আমার প্রেরিতরা প্রাণ হরণের জন্য তাদের নিকট আসবে ও জিজ্ঞেস করবে, আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা কোথায়?' এ কথার অর্থ— পৃথিবীর জীবনাবসানের সময় ফেরেশতারা অবিশ্বাসীদের নিকটে উপস্থিত হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের পূজিত প্রতিমাগুলো এখন কোথায়— আল্লাহ্কে ছেড়ে যেগুলোকে তোমরা উপাস্য নির্ধারণ করেছিলে?

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, তারা অন্তর্হিত হয়েছে এবং তারা স্বীকার করবে যে, তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ছিলো।' এ কথার অর্থ— ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে অবিশ্বাসীরা তখন বলবে, আমাদের উপাস্যগুলো এখন অন্তর্হিত। উদ্ধারের কোনো পথ না পেয়ে অবিশ্বাসীরা তখন এ কথাও স্বীকার করবে যে, হায়! আমরা তো ছিলাম প্রকৃতই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের পূর্বে যে জ্বিন ও মানব দল গত হয়েছে তাদের সঙ্গে তোমরা অগ্নিতে প্রবেশ করো; যখনই কোনো দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে।' এ কথার অর্থ আল্লাহ্তায়ালা যখন বলবেন, হে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীর দল! তোমরা এখন তোমাদের পূর্বে গত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জ্বিন ও মানবদলের সঙ্গে দোজখে প্রবেশ করো, তখন দোজখীদের একদল অন্যদলকে অভিসম্পাত করতে থাকবে। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নেতা ও জনতা দোজখে প্রবেশের সময় একে অপরকে অভিসম্পাত দিতে থাকবে। তাদের পরস্পরবিরোধী দলগুলোও তখন একে অপরকে অভিসম্পাত দিবে। এভাবে পারস্পরিক অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকবে ইহুদী, খৃষ্টান, অংশীবাদী ও অন্য সকল পথভ্রষ্ট দল।

এরপর বলা হয়েছে— এমন কি যখন সকলে তাতে একত্র হবে তখন তাদের পরবর্তিরা পূর্ববর্তিদের সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলো। সুতরাং তাদেরকে দ্বিগুণ অগ্নিশাস্তি দাও।' এ কথার অর্থ— দোজখে প্রবেশের সময় পথভ্রষ্ট নেতাদের সম্পর্কে তাদের অনুসরণকারীরা বলবে, হে আমাদের আল্লাহ্! এরাই আমাদেরকে ভুল পথে চালিত করেছিলো। সুতরাং, আমাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, তার দ্বিগুণ শাস্তি এদেরকে দাও।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বলবেন, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে, কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নও।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ বলবেন, তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তিই দেয়া হচ্ছে। কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারছো না। অর্থাৎ শাস্তির রয়েছে দু'টি রূপ, একটি প্রকাশ্য অন্যটি অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য শাস্তি দৃষ্টিগ্রাহ্য। কিন্তু অপ্রকাশ্য শাস্তি দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। ওই অপ্রকাশ্য শাস্তির দিকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে তোমরা ওই অপ্রকাশ্য শাস্তি সম্পর্কে জানো না। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, অবিশ্বাসীদের প্রতিটি দলের নেতা ও জনতার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি। কিন্তু হে অজ্ঞ অবিশ্বাসীর দল! তোমরা ওই দ্বিগুণ শাস্তির তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত নও। তত্ত্বটি এই, নেতাদের একগুণ শাস্তি হবে তাদের নিজস্ব অবিশ্বাসের জন্য। আর অন্যকে বিপথগামী করার জন্য হবে আরেকগুণ শাস্তি। অবিশ্বাসী জনতার শাস্তিও হবে দ্বিগুণ। একগুণ হচ্ছে পথভ্রষ্ট নেতার অনুসরণের জন্য। আর একগুণ হচ্ছে তাদের নিজস্ব পথভ্রষ্টতার দরুণ।

পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'তাদের পূর্ববর্তিগণ পরবর্তিদেরকে বলবে, আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করো।' এ কথার অর্থ— অবিশ্বাসী নেতাদের জন্য অনুসারীদের দ্বিগুণ শাস্তির আবেদনের কথা শুনে নেতারা বলবে, তোমরা ও আমরা এখন সমান। তোমরা যেমন শাস্তিপ্রাপ্ত, তেমনি আমরাও। আমরা এখন কেউ কারো চেয়ে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ নই। আমরা তো আমাদের কৃতকর্মের ফল

www.eelm.weebly.com

ভোগ করছি। সুতরাং তোমরাও তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করো। এখানকার 'সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করো' এই শেষ কথাটি অবিশ্বাসী নেতাদেরও হতে পারে, আবার আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্তমূলক ঘোষণাও হতে পারে। অর্থাৎ অবিশ্বাসী নেতা ও জনতার বিতর্কের শেষ দিকে যখন তাদের নেতারা বলবে 'আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই'— তখন আল্লাহ্পাক তাদের সকলের জন্য এই ঘোষণাটি প্রদান করবেন যে— সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করো।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৪০, ৪১, ৪২

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ○ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ○ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

❒ যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকারে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় তাহাদিগের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে না এবং তাহারা জান্নাতেও প্রবেশ করিতে পারিবে না— যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এইরূপে আমি অপরাধীদিগকে প্রতিফল দিব।

❒ তাহাদিগের শয্যা হইবে জাহান্নামের এবং তাহাদিগের উপরের আচ্ছাদনও; এইভাবে আমি জালিমদিগকে প্রতিফল দিব।

❒ আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না; যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে উহারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— 'যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না।' এ কথার অর্থ— যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী এবং যারা অহংকারবশতঃ সত্যের প্রতি অবজ্ঞা পোষণকারী, তাদের জন্য কোনো দিনও আকাশের প্রবেশপথ উন্মোচন করা হবে না। জান্নাতের প্রবেশাধিকারও তাদের নেই।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের আত্মা উর্ধ্বারোহণে সক্ষম হয় না, কারণ তাদের আত্মা অপবিত্র। অপবিত্র আত্মা নিক্ষেপ করা হয় নিম্নতম স্তর সিজ্জিনে।

হজরত বারা বিন আজীব থেকে ইমাম মালেক, নাসাঈ এবং বায়হাকী কর্তৃক এসম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ওই হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের রূহ্ কবজ করে ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের ফেরেশতারা। তারা ওই রূহ্কে দুর্গন্ধযুক্ত চটের থলিতে পেঁচিয়ে নিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে। আকাশের ফেরেশতারা তখন জিজ্ঞেস করে, এই দুর্গন্ধময় আত্মা কার? কৃষ্ণবর্ণ ফেরেশতারা ওই ব্যক্তির পৃথিবীর নিকৃষ্টতম নাম নিয়ে বলে, অমুকের পুত্র অমুকের। এভাবে সপ্তম আকাশে উপনীত হলে, সেখানকার প্রহরী ফেরেশতারা আর দরজা খুলে দেয় না। এরপর রসুল স. পাঠ করলেন— তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না। তারপর বললেন, আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশে তখন ওই অপবিত্র আত্মাকে সিজ্জিনে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তিনি স. তেলাওয়াত করলেন— 'ওয়া মাঁই ইউশ'রিক বিল্লাহি ফা কাআন্নামা খার্‌রা মিনাস্‌সামায়ী ফা তাখাত্তাফাহুত্ ত্বইরু আও তাহ্‌বি বিহির রিহু ফি মাকানিন্ সাহিক্ব'। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মাজাও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এরূপ আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেবো।' এ কথার অর্থ— সূচের ছিদ্রপথে যেমন উটের প্রবেশ অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব অবিশ্বাসীদের বেহেশতে প্রবেশ। আর এভাবেই আল্লাহ্পাক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। এটাই তার বিধান।

এরপরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও; এভাবে আমি জালেমদেরকে প্রতিফল দেবো।'এখানে 'মিহাদুন' শব্দটির অর্থ শয্যা। আর 'গাওয়াশীন্' শব্দটি গাশিয়াহ্ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ— আচ্ছাদন। এখানে শয্যা ও আচ্ছাদন জাহান্নামের হবে, কথাটির অর্থ হচ্ছে— দোজখে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হবে চতুর্দিক থেকে অগ্নি পরিবেষ্টিত। অন্য একটি আয়াতেও এ রকম বলা হয়েছে। যেমন— 'তাদের উপরে থাকবে আগুনের ছায়া এবং নিচেও থাকবে আগুনের ছায়া।'

আগের আয়াতে বলা হয়েছে— এভাবে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেবো। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে— এভাবে আমি জালেমদেরকে প্রতিফল দেবো। আগের আয়াতে বলা হয়েছে, অপরাধীরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর এই আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে, জালেমদের শয্যা ও আচ্ছাদন হবে আগুনের। এ রকম বিবরণভঙ্গির মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে, সাধারণ অপরাধ অপেক্ষা জুলুম অধিকতর শাস্তির যোগ্য।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৪২) দেয়া হয়েছে বিশ্বাসীদের প্রতিফলের বিবরণ। বলা হয়েছে— 'আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তারাই জান্নাতবাসী, সেখানেই তারা স্থায়ী হবে।' এখানে আ'মিলুস্ সলিহাত' কথাটির অর্থ— ভালো কাজ করা। এখানে একটি সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো যে, বিশ্বাসীরা কেবলই সৎকর্মশীল। যারা সারা জীবন ধরে কেবল পুণ্যকর্ম করেছে, কোনো পাপ করে নি অথবা কোনো প্রকার পুণ্যকর্মই পরিত্যাগ করে নি — তারাই কেবল হবে জান্নাতের চিরস্থায়ী বাসিন্দা। তাই সম্ভাব্য সন্দেহটি নিরসনার্থে আয়াতের প্রথমেই বলে দেয়া হয়েছে— আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। কথাটির মাধ্যমে বুঝা যায়— সাধ্যানুসারে যে যেমন পুণ্যকর্ম করবে সেরকমই প্রতিফল পাবে তারা। কেউ কম। কেউ বেশী। আর এভাবে বিশ্বাসীরা লাভ করবে জান্নাতের বিভিন্ন স্তর। কারো মর্যাদা হবে সাধারণভাবে উন্নত এবং কারো মর্যাদা হবে তদপেক্ষা অধিকতর উন্নত। কিন্তু তারা সকলেই হবে জান্নাতের চিরস্থায়ী অধিবাসী।

সূরা আ'রাফ : আয়াত ৪৩

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

❒ তাহাদিগের অন্তর হইতে ঈর্ষা দূর করিব, তাহাদিগের পাদদেশে প্রবাহিত হইবে নদী এবং তাহারা বলিবে, 'প্রশংসা আল্লাহেরই যিনি আমাদিগকে ইহার পথ দেখাইয়াছেন। আল্লাহ্ আমাদিগকে পথ না দেখাইলে আমরা কখনও পথ পাইতাম না। আমাদিগের প্রতিপালকের রসূলগণ তো সত্য বাণী আনিয়াছিলেন;' এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইবে যে, 'তোমারা যাহা করিতে তাহারই জন্য তোমাদিগকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে।'

প্রথমেই বলা হয়েছে— তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করবো। এখানে 'গিল্লিন' শব্দটি অর্থ ঈর্ষা বা শত্রুতা। আর 'নাযা'না' শব্দরূপটি এখানে ভবিষ্যতকালবোধক। তাই আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হয়েছে, তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করবো (করেছি বা করি— এ রকম নয়)। অর্থাৎ দুনিয়াতে বিশ্বাসীরা পরস্পরের প্রতি যে সকল ঈর্ষা পোষণ করে, আখেরাতে সে সকল ঈর্ষাকে আল্লাহ্তায়ালা চিরতরে দূর করে দিবেন। সেখানে থাকবে কেবল ভালোবাসা ও শান্তি। শান্তি ও ভালোবাসা। সেখানে উন্নততর মর্যাদার অধিকারীদের প্রতি কেউই হিংসা করবে না। ঈর্ষান্বিত হবে না। ঈর্ষার প্রবণতা সেখানে হয়ে যাবে চিরতরে অবলুপ্ত।

www.eelm.weebly.com

সাঈদ বিন মানসুর, আবু নাঈম, ইবনে আবী শায়বা, তিবরানী এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, আমার তো ওসমান, তালহা এবং যোবায়েরের মতো হতে ইচ্ছে করে। অর্থাৎ পারস্পরিক ঈর্ষা, দ্বেষ থেকে চিরতরে মুক্ত হতে ইচ্ছে করে।

আমি বলি, হজরত ওসমানের মহাতিরোধানের পর উপরে বর্ণিত সাহাবীত্রয় এবং তাঁদের দলের সঙ্গে হজরত আলীর বিবাদ উপস্থিত হয়েছিলো। তাই তিনি ওরকম করে বলেছিলেন।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী এবং ইসমাঈলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, বিশ্বাসী বান্দাগণকে নরক থেকে পৃথক করে ফেলা হবে। তারপর তাদের আটকে রাখা হবে বেহেশত ও দোজখের মধ্যবর্তী একটি সেতুর উপর। সেখানে মিটিয়ে দেয়া হবে তাদের পারস্পরিক হক। এইভাবে যখন তারা পরস্পরের নিকট থেকে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে দেয়া হবে জান্নাতে প্রবেশের অধিকার। যিনি আমার জীবনাধিকারী, তাঁর পবিত্র সত্তার শপথ! জান্নাতীদের নিকট জান্নাতের পথ হবে অধিকতর পরিচিত, স্বগৃহের পথের চেয়েও। হজরত কাতাদাও এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, জুমার নামাজ পাঠের পর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনকারীগণ যেমন তাদের প্রত্যাবর্তনের পথ বিস্মৃত হয় না, তেমনি জান্নাতিরাও কখনো জান্নাতের পথ বিস্মৃত হবে না।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, হাসান বসরী বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি যে রসুল স. বলেছেন, পুলসিরাত অতিক্রম করার পর জান্নাতবাসীদেরকে একত্র করা হবে। সেখানে মিটিয়ে দেয়া হবে তাদের পারস্পরিক অধিকার এবং সেখানেই প্রত্যেকের অন্তর থেকে চিরতরে বিদূরিত করে দেয়া হবে ঈর্ষাপরায়ণতা।

কুরতুবী উল্লেখ করেছেন, এ রকম আচরণ করা হবে ওই সকল জান্নাতীদের সঙ্গে যারা সরাসরি জান্নাতের পথ ধরবে। কিন্তু যারা কিছুকাল দোজখের শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতবাসের অনুমতি পাবে তাদেরকে পুলসিরাত কিংবা অন্য কোনো সেতু অতিক্রম করতে হবে না। সেতু অতিক্রম ব্যতিরেকেই তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী সূত্রে হাফেজ ইবনে হাজার উল্লেখ করেছেন, বিশ্বাসীদেরকে দোজখ থেকে পৃথক করে নেয়া হবে— কথাটির অর্থ, তাদেরকে দোজখ থেকে রক্ষা করা হবে এবং পুলসিরাত অতিক্রম করে তারা চলে যাবে জান্নাতে। হাদিসে উল্লেখিত 'ক্বান্‌তারাহ্' শব্দটির অর্থ পুল বা সেতু। কেউ কেউ বলেছেন শব্দটির অর্থ— পুলসিরাতের ওই প্রান্ত, যা জান্নাত সংলগ্ন। কেউ কেউ বলেছেন, এটি অন্য একটি পুল— পুলসিরাত নয়। প্রথমোক্ত অভিমতটিকে পছন্দ করেছে আল্লামা সুয়ূতি। আর কুরতুবী পছন্দ করেছেন শেষোক্ত অভিমতটিকে।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, সেখানে দিনার ও দিরহাম হবে অচল। পাপ-পুণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে সেখানে মিটিয়ে দেয়া হবে বিশ্বাসীদের পারস্পরিক অধিকার। সেখানে অত্যাচারের বিনিময় হিসেবে অত্যাচারীদের পুণ্য প্রদান করা হবে অত্যাচারিতকে। যদি অত্যাচারীর পুণ্য না থাকে তবে তাকে বহন করতে হবে অত্যাচারিতের পাপের বোঝা। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর ঘোষণা এ রকমই। মুসলিম ও তিরমিজির বর্ণনায় হাদিসটির ভাষ্য এ রকম— অত্যাচারিতের হক পরিশোধের পূর্বেই যদি অত্যাচারির নেকী শেষ হয়ে যায়, তবে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, অত্যাচারিতের গোনাহ্। তারপর তাকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে। উল্লেখ্য যে, পুলসিরাত অতিক্রমের পর কাউকে আর দোজখে নিক্ষেপ করা হবে না। অতএব যে পুলের উপর আটকে রেখে বান্দাদের পারস্পরিক হক মিটিয়ে দেয়া হবে, সেই পুল— পুলসিরাত নয়। পুলটি অন্য একটি পুল। আর ওই পুলকে হাদিসে বলা হয়েছে 'ক্বান্‌তারাত'।

সতর্কতাঃ শুধুমাত্র পারস্পরিক হক পরিশোধের মধ্যেই ঈর্ষা দূর করার বিষয়টি সীমাবদ্ধ নয়। অন্যভাবেও সেখানে ঈর্ষা দূর করে দেয়া হতে পারে। এ সম্পর্কে সুদ্দী বলেছেন, বেহেশতবাসীরা যখন বেহেশতে গমন করবেন, তখন দেখবেন— বেহেশতের দরজায় রয়েছে একটি বৃক্ষ। ওই বৃক্ষের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে দু'টি ঝর্ণা। তাঁরা একটি ঝর্ণার পানি পান করবেন। ফলে তাঁদের অন্তর থেকে চিরতরে দূর হয়ে যাবে ঈর্ষা-বিদ্বেষ। ওই ঝর্ণার পানি হচ্ছে 'শারাবান তহুরা' (পবিত্র পানীয়)। এরপর তাঁরা অপর ঝর্ণাটিতে গোসল করবেন এবং লাভ করবেন 'নাজারাতান নায়ীম' (সুন্দরতর ঔজ্জ্বল্য)। তারপর থেকে হবেন চিরবিদ্বেষবিমুক্ত। তাঁদের চেহারার প্রফুল্লতা আর কখনও অন্তর্হিত হবে না।

এরপর বলা হয়েছে — 'তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদী এবং তারা বলবে, প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রসুলগণ তো সত্য বাণী এনেছিলেন।' এখানে 'যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন' কথাটির অর্থ— যিনি আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— যিনি আমাদেরকে এমন পুণ্যের পথ প্রদর্শন করেছেন, যে পুণ্যপথে চলার বিনিময় এই জান্নাত।

'লি নাহ্‌তাদী (যেনো আমরা পথ পাই) কথাটির মধ্যে ব্যবহৃত 'লাম' হচ্ছে লামে জুহুদ (অস্বীকৃতিমূলক লাম)। পরবর্তী আলোচ্য বিষয়ের নেতিবাচকতাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার নিমিত্তে ব্যবহৃত হয় এই 'লাম'। আর এখানে 'ইন' (যদি) হচ্ছে নাসেবাহ্ (যবরযুক্ত)। এখানে মাসদার বা ধাতুমূল রয়েছে উহ্য। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'মা কানাল্লহু লিইউআ'জিবাহুম' (আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি না দেয়ার মানসে ......)।

www.eelm.weebly.com

এখানে লাওলা (যদি না) শব্দটির বিনিময় রয়েছে অনুক্ত — পূর্ববর্তী বাক্যে রয়েছে এর প্রমাণ। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না।

'লাক্বদ জায়াত্ রুসুলু রব্বিনা বিলহাক্ব' (আমাদের প্রতিপালকের রসুলগণতো সত্যবাণীসহ এসেছিলেন) কথাটির অর্থ — নবী ও রসুলগণ সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলেন বলেই আমরা পেয়েছিলাম সত্যপথের সন্ধান। বেহেশতবাসীরা নিজের চোখে পয়গম্বরগণের সুসংবাদের বাস্তবায়ন দেখে তখন এ রকম বলবেন।

এরপর বলা হয়েছে — 'এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে যে, তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।' জান্নাতবাসীদেরকে লক্ষ্য করে কোথায় এবং কখন এ রকম বলা হবে, সে সম্পর্কে আলেমগণের রয়েছে দু'টি অভিমত। একটি হচ্ছে— যখন তাঁরা দূর থেকে জান্নাত দেখতে পাবেন, তখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ঘোষিত হবে আলোচ্য সম্বোধনটি। দ্বিতীয় অভিমতটি হচ্ছে— জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে এ রকম বলা হবে জান্নাতের অভ্যন্তরে। আল্লামা সুয়ূতি শেষোক্ত অভিমতটিকেই পছন্দ করেছেন। এখানে বলা হয়েছে 'জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।' আরো বলা হয়েছে, এই উত্তরাধিকার দেয়া হয়েছে পুণ্যকর্মের কারণে।

মাদারেক রচয়িতা বলেছেন, এখানে জান্নাত প্রদানের বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়েছে মিরাস (উত্তরাধিকার) শব্দটির মাধ্যমে। প্রচেষ্টা ও শ্রম ব্যতিরেকেই যেমন ওয়ারিশেরা লাভ করে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার, তেমনি ঈমানদারেরাও আল্লাহ্পাকের নিছক দয়ায় লাভ করবে জান্নাত। কোনো পুণ্যকর্মের বিনিময়ে নয়। প্রকাশ্যতঃ পুণ্যকর্ম হচ্ছে জান্নাত লাভের কারণ। কিন্তু জান্নাতপ্রাপ্তির মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্পাকের মেহেরবানী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেখানে একজন ঘোষক জান্নাতীদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমাদের সম্মুখ-জীবনে রয়েছে পরিপূর্ণ স্বস্তি ও শান্তি। তোমরা আর কখনো দেখবে না ব্যাধি এবং মৃত্যু। তোমাদের এ জীবন চিরন্তন এবং চির যৌবনমণ্ডিত। দুঃখকে চিরদিনের জন্য অতিক্রম করে এসেছো তোমরা। লাভ করেছো চিরস্থায়ী সুখ। এ কথাই ঘোষিত হয়েছে আলোচ্য সম্বোধনটিতে।

বিশুদ্ধ সূত্রে ইবনে মাজা ও বায়হাকীর মাধ্যমে হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে দু'টি গৃহ। একটি

www.eelm.weebly.com

স্বর্গে আর একটি নরকে। যে নরকে যায়, তাদের স্বর্গের গৃহ অধিকার করে স্বর্গবাসীরা। তাই এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে— এরই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।

সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৪৪, ৪৫

وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۗ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ۘ

❐ জান্নাতবাসিগণ অগ্নিবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন আমরা তো তাহা সত্য পাইয়াছি। তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তোমরাও তাহা সত্য পাইয়াছ কি?' উহারা বলিবে 'হাঁ।' অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাহাদিগের নিকট ঘোষণা করিবে,'আল্লাহের অভিসম্পাত জালিমদিগের উপর —

❐ যাহারা আল্লাহের পথে বাধা দিত এবং উহাতে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করিত; উহারাই পরকালকে প্রত্যাখ্যান করিত।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'জান্নাতবাসীগণ অগ্নিবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা বলেছিলেন তোমরাও তা সত্য পেয়েছো কি? তারা বলবে, হ্যাঁ।' এখানে 'মা ওয়াআ'দানা রব্বুনা' (আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন) কথাটির অর্থ— আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে সওয়াব দানের অঙ্গীকার করেছিলেন। আর 'মা ওয়াআ'দা রব্বুকুম' (তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা বলেছিলেন) কথাটির অর্থ— তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে শাস্তিদানের অঙ্গীকার করেছিলেন। জান্নাতীরা আয়াতের উদ্ধৃত অংশের প্রশ্নটি করবে দোজখীদেরকে লক্ষ্য করে। সফলতার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দোজখীদের তিরস্কারার্থে তাঁরা তখন এ রকম প্রশ্ন করে বসবে তাদেরকে। নিরুপায় দোজখীরাও তখন প্রকৃত সত্যকে স্বীকার করে বলবে, হ্যাঁ।

www.eelm.weebly.com

এ রকম প্রশ্নোত্তরের পর ভেসে আসবে জনৈক ঘোষণাকারীর একটি আওয়াজ। আয়াতের পরবর্তী অংশে সে কথাই বিবৃত হয়েছে এভাবে— অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাদের নিকট ঘোষণা করবে, 'আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত জালেমদের উপর।'

এরপরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিতো এবং তাতে দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান করতো; তারাই পরকালকে প্রত্যাখ্যান করতো।' এখানে 'ইয়াসুদ্দুনা' অর্থ বাধা দিতো। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা নিজেরা সত্য গ্রহণে বিরত থাকতো এবং অন্যদেরও সত্যগ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ইয়াব্‌গুনাহা ই'ওয়াজা' কথাটির অর্থ— অবিশ্বাসীরা লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়তো এবং আল্লাহ্‌তায়ালা যাদেরকে সম্মান করতে নিষেধ করেছেন, তাদেরকে মনে করতো সম্মানার্হ।

আমি বলি, এখানে 'ইয়া সুদ্দুনা' শব্দটির পূর্বে 'কানু' শব্দটি উহ্য রয়েছে। তাই শব্দরূপটি হয়েছে দূরবর্তী অতীতকালবোধক। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা তাদের পৃথিবীবাসের সময় মানুষকে সত্য গ্রহণে বাধা দিতো, সত্য ধর্মের দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান করতো এবং সত্য প্রত্যাখ্যান করতো। আখেরাতে এরূপ করবে না। এখানে 'ইওয়াজুন' শব্দটির 'আইন' অক্ষরটি পড়তে হবে যের সহযোগে। শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক। এতে করে ধর্মীয় বিষয় সহ অন্য সকল বিষয়ের সকল প্রকার দোষ ত্রুটি ও বক্রতা নির্দেশ করা হয়। কিন্তু 'আইন' অক্ষরটি যবর সহযোগে পড়লে বুঝানো হতো কেবল ধর্মবহির্ভূত বিষয়ের বক্রতা বা দোষ-ত্রুটিকে। অর্থাৎ দেয়াল, বর্শা ইত্যাদি জাগতিক বিষয়ের বক্রতা বা দোষত্রুটিকে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৪৬, ৪৭

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ
أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۝ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ
أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

❒ উভয়ের মধ্যে পর্দা আছে এবং আ'রাফে কিছু লোক থাকিবে যাহারা প্রত্যেককে তাহার লক্ষণ দ্বারা চিনিবে এবং জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'তোমাদিগের শান্তি হউক।' তাহারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু আকাংখা করে।

❒ যখন তাহাদের দৃষ্টি অগ্নিবাসীদিগের প্রতি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে তখন তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে জালিমদিগের সঙ্গী করিও না।'

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমেই বলা হয়েছে — উভয়ের মধ্যে পর্দা আছে। এখানে 'উভয়ের মধ্যে' অর্থ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে। জান্নাত ও জাহান্নামের পর্দা (হেজাব) বা দেয়াল সম্পর্কে সুরা হাদীদের একটি আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইন্‌শাআল্লাহুতায়ালা।

এরপর বলা হয়েছে — 'আ'রাফে কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে'। এখানে উল্লেখিত আল আ'রাফ শব্দটি 'আ'রফুন' শব্দের বহুবচন। 'আ'রফুল ফারাস' অর্থ ঘোড়ার কেশর। 'আরফুদ্দিক' অর্থ মোরগের ঝুঁটি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কোনো কিছুর চূড়া বা শিখরকে বলে আ'রাফ। মারেফাত এবং ইরফান অর্থ পরিচিতি। আর পরিচিতির নিদর্শন হিসেবে চূড়া বা শিখরই সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয়।

আ'রাফ নামক স্থানে কারা থাকবে সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্নরূপ মন্তব্য করেছেন। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. বলেছেন, আ'রাফবাসীরা হবে ওই সকল লোক— যাদের পাপ ও পুণ্য সমান। তাদের পুণ্য তাদেরকে নরকাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। আবার পুণ্যের স্বল্পতা তাদেরকে করবে বেহেশতে প্রবেশের অযোগ্য।

হজরত তালহা এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আ'রাফ হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী দেয়াল। বৃহৎ পাপের কারণে আল্লাহ্পাক কোনো কোনো লোককে সেখানে আটকে রাখবেন। তারা মুখাবয়বের ঔজ্জ্বল্য ও মলিনতা দেখে কে বেহেশতী এবং কে দোজখী তা চিনতে পারবে। তারা জান্নাতীদেরকে দেখলেই বেহেশত কামনা করবে। আবার দোজখীদেরকে দেখলে চাইবে দোজখ থেকে পরিত্রাণ। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ্পাক তাদেরকে দান করবেন জান্নাতের প্রবেশাধিকার। এদিকে ইঙ্গিত করেই এক আয়াতে বলা হয়েছে— দ্যাখো এদের সম্বন্ধেই কি তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।

হান্নাদ, ইবনে আবী হাতেম এবং আবু শায়েখ তাঁদের তাফসীরে আবদুল্লাহ্ ইবনে হারেসের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন— আ'রাফ হচ্ছে বেহেশত ও দোজখের মধ্যবর্তী দেয়াল। আল্লাহ্পাক যাদেরকে সেখানে রাখবেন, তারাই হবে আ'রাফবাসী। আল্লাহ্পাকের ইচ্ছায় এক সময় তারা সেখান থেকে মুক্তি পাবে। মুক্তির সময় এলে প্রথমেই তাদেরকে নিয়ে

www.eelm.weebly.com

যাওয়া হবে একটি হ্রদের কাছে। হ্রদটির নাম 'নহরে হায়াত'। হ্রদটির দুইপাড় বাঁধানো থাকবে সোনা ও মোতি দিয়ে। অন্যপাড়ের মাটি হবে মেশ্‌ক সুরভিত। আ'রাফবাসীদেরকে ওই হ্রদের মধ্যে ফেলে দেয়া হবে। সেখানে গোসল করার পর তাদের চেহারার রঙ পরিবর্তিত হবে। মুছে যাবে সকল অপরিচ্ছন্নতা। কিন্তু তাদের বুকের উপর দেখা দেবে একটি শাদা উজ্জ্বল তিল। আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের কামনা বাসনাসমূহ প্রকাশ করো। তারা তাদের সকল কামনা বাসনা প্রকাশ করবে। আল্লাহ্‌পাক তাদের সকল কামনা বাসনা পূর্ণ করবেন। এছাড়াও দান করবেন আরো সত্তর গুণ। এরপর তাদেরকে দেয়া হবে বেহেশতের চিরস্থায়ী অধিকার। কিন্তু তাদের বুকের ওই শাদা উজ্জ্বল তিলও জ্বল জ্বল করতে থাকবে অনন্তকাল। এতে করে অন্য বেহেশতীরা সহজেই তাদেরকে চিনতে পারবে যে, এদেরকেই একসময় রাখা হয়েছিলো আ'রাফে। এই আ'রাফবাসের পরে বেহেশতে গমনকারীদেরকে মিস্‌কিন বলে ডাকবে অন্য বেহেশতবাসীরা।

আবু শায়েখের এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. কে আ'রাফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ওই লোকেরাই আ'রাফবাসী, যারা পিতার অনুমতি ছাড়া জেহাদে অংশগ্রহণ করেছে অথবা ওই অবস্থায় শহীদ হয়েছে। পিতার অবাধ্য হওয়ার কারণে তাকে বিরত রাখা হবে জান্নাত থেকে। কিন্তু সে শহীদ বলে তাকে দোজখেও দেয়া হবে না।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে শিথিল সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কে একবার আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, ওরা ওই সকল লোক যারা পিতার অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়েছে। তাদের শাহাদত হবে দোজখের এবং পিতৃ-অবাধ্যতা হবে বেহেশতের প্রতিবন্ধক। সেখানে তাদের গোশত চর্বি গলে যাবে। আল্লাহ্‌তায়ালা সকল সৃষ্টির হিসাব গ্রহণের পর তাদের প্রতি নিক্ষেপ করবেন রহমতের দৃষ্টি। এভাবে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তারা আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতবেষ্টিত হয়ে প্রবেশ করবে চিরসুখময় স্থান জান্নাতে।

তিবরানী, বায়হাকী ও হারেস ইবনে উসামা তাঁদের হাদিস গ্রন্থে এবং সাঈদ বিন মানসুর, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া এবং আবু শায়েখ তাঁদের তাফসীরে হজরত আবদুর রহমান মাজানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আ'রাফবাসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে রসুল স. বলেছিলেন, তারা ওই সকল লোক যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে।

আমি বলি, তাঁরা হচ্ছেন ওই সকল শহীদ, যাঁরা পিতার অবাধ্য অবস্থায় জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন। তাদের পুণ্য ও পাপ হবে

www.eelm.weebly.com

সমান। উল্লেখ্য যে, পিতৃদ্রোহী শহীদেরা ছাড়াও আরো অনেকে হবে আ'রাফের অধিবাসী। অর্থাৎ যাদের পাপ ও পুণ্য হবে সমপরিমাণের তাদেরকেই কিছুকাল রাখা হবে আ'রাফে।

জারীর বিন হাজাম বিন ওমরের বর্ণনা সূত্রে ইবনে আবী দাউদ এবং ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর নিকটে আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো। তিনি স. বললেন, আ'রাফবাসীদের বিচার হবে সকলের শেষে। সকলের বিচার সম্পন্ন করার পর আল্লাহ্তায়ালা আ'রাফবাসীদেরকে বলবেন, তোমাদের পুণ্য তোমাদেরকে দোজখ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আবার পুণ্যের স্বল্পতা তোমাদেরকে বেহেশতে গমন করতেও দেয়নি। কিন্তু এখন থেকে তোমরা মুক্ত। আমার নির্দেশে এবার জান্নাতে গমন করো।

আল্লামা সুয়ূতি বলেছেন, বর্ণনাটি মুরসাল ও হাসান। হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে দু'টি পদ্ধতির মাধ্যমে ইবনে মারদুবিয়া এবং আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, যাদের পাপ-পুণ্য সমান হবে তাদের সম্পর্কে রসুল স. এর নিকটে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন, তারাই আ'রাফবাসী। তারা প্রথম সুযোগে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, কিন্তু জান্নাতে প্রবেশের জন্য লালায়িত থাকবে।

হজরত হুজায়ফা থেকে বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন সকলকে একত্র করে আল্লাহ্তায়ালা পুণ্যবানদেরকে জান্নাতে যেতে বলবেন এবং পাপীদেরকে যেতে বলবেন দোজখে। এরপর তিনি আ'রাফবাসীদেরকে বলবেন, তোমরা কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছো? তারা বলবে, আপনার হুকুমের প্রতীক্ষায়। আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, তোমাদের পুণ্যকর্ম তোমাদেরকে দোজখের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আর পাপ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বেহেশতের পথের। এখন তোমরা আমার পক্ষ থেকে দয়া ও ক্ষমা গ্রহণ করো এবং বেহেশতে প্রবেশ করো।

হজরত হুজায়ফা থেকে সাঈদ ইবনে মানসুর, ইবনে জারীর, আবু শায়েখ, বায়হাকী এবং হান্নাদ বর্ণনা করেছেন, তারাই আ'রাফবাসী যাদের পাপ জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক এবং পুণ্য দোজখে প্রবেশের প্রতিবন্ধক। আ'রাফ নামক স্থানে তাদেরকে আটকে রাখা হবে। তারপর সকলের বিচার শেষে আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, ওঠো, তোমরাও জান্নাতে চলে যাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। হজরত হুজায়ফা থেকে আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনায় এসেছে— আ'রাফবাসী তারাই যাদের পাপ ও পুণ্য সমান। তারা অবস্থান করবে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। তারা জান্নাত আকাংখা করবে, অবশেষে জান্নাতেই প্রবেশ করবে।

www.eelm.weebly.com

স্বসূত্রে বাগবী, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং হজরত ইবনে মাসউদের উক্তিরূপে উল্লেখ করেছেন, শেষ বিচারের দিন মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যার পাপ অপেক্ষা একটি পুণ্য বেশী হবে সে প্রবেশ করবে জান্নাতে। আর যার পুণ্য অপেক্ষা একটি পাপ বেশী হবে সে প্রবেশ করবে জাহান্নামে। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন—'ওজনে যাদের নেক আমল ভারী হবে, তারাই সফলকাম এবং ওজনে যাদের নেক আমল কম হবে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে'। এভাবে এক দানা পরিমাণ পুণ্যের ওজন বেশী হলেও লাভ হবে জান্নাত। কিন্তু যাদের পুণ্য ও পাপ সমান সমান হবে, তারা হবে আ'রাফ নামক স্থানের অধিবাসী। পুলসিরাতের সর্বশেষ প্রান্তে তাদেরকে আটকে রাখা হবে। তারা জান্নাতী এবং জাহান্নামী উভয় দলকে দেখবে। জান্নাতীদেরকে দেখে তারা বলবে, 'সালামুন আলাইকুম' এবং জাহান্নামীদেরকে দেখে প্রার্থনা করবে— হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমাদেরকে ওই জালেমদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ো না। ওই সময় পুণ্যবানদেরকে প্রদান করা হবে একটি নূর— যা তাদের সামনে এবং ডানে চলাচল করতে থাকবে। প্রথমে অবশ্য সকল মানুষকে ওই নূর প্রদান করা হবে। কিন্তু পুলসিরাত অতিক্রমের সময় মুনাফিকদের নিকট থেকে ওই নূর ছিনিয়ে নেয়া হবে। তাদের ওই দুরবস্থা দেখে বিশ্বাসী বান্দারা আল্লাহ্তায়ালার নিকট প্রার্থনা জানাবে, হে আমাদের দয়াময় প্রভুপ্রতিপালক! দয়া করে আমাদেরকে প্রদত্ত নূর নিষ্প্রভ করে দেবেন না। তখন আ'রাফবাসীদের নিকট থেকেও নূর ছিনিয়ে নেয়া হবে না। কিন্তু তাদের সম্মুখ যাত্রার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে তাদের পাপরাশি। কিন্তু তাদের নূর অন্তর্হিত হবে না বলেই তাদের অন্তরে জাগ্রত থাকবে জান্নাত লাভের বাসনা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন—'তাদের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা তাতে প্রবেশ করেনি।' সকলের শেষে ওই আরাফবাসীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। সর্বশেষ জান্নাতগমনকারী হবে তারাই।

হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, পুণ্যবান ফকিহ্ এবং আলেমগণই হবে আ'রাফবাসী। আ'রাফ হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি দেয়াল। সম্ভবতঃ মুজাহিদের এই উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে আ'রাফবাসী হবে ওই সকল বিশ্বাসী ফকিহ্ ও আলেম যারা পাপ ও পুণ্য দু'টোই করেছে। তাদের আমল হবে পাপ-পুণ্য মিশ্রিত। তাদের পাপ ও পুণ্য হবে সমান সমান। আশা করা যায় আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে রহম করবেন।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে— আবু মুজলা বলেছেন, আ'রাফ একটি উঁচু স্থান। সেখানে ফেরেশতারা অবস্থান করবে। সেখান থেকে জান্নাতী ও জাহান্নামী উভয়

www.eelm.weebly.com

দলকে দেখা যাবে। ফেরেশতারা উভয় দলকে তাদের নিদর্শন দেখে চিনতে পারবে। এ উক্তিটি অবশ্য ভুল। কেননা বর্ণিত হয়েছে আ'রাফবাসী হবে পুরুষ। আর ফেরেশতারা নারী বা পুরুষ কোনোটাই নয়। তাছাড়া হাদিস শরীফের বর্ণনাও এই উক্তিটির বিরুদ্ধে।

কেউ কেউ মনে করেন, আ'রাফবাসী হবেন নবী, ওলী ও শহীদগণ। তাঁরা সেখান থেকে বেহেশতি ও দোজখীদেরকে চিনে নিতে পারবেন। এই উক্তিটিও ভুল। কারণ, হাদিস শরীফের বর্ণনা এই উক্তিটির অনুকূল নয়।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, আ'রাফবাসী হবে মুশরিকদের শিশু সন্তানেরা। এই অভিমতটিও সঠিক নয়। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, আ'রাফবাসীরা হবে পুরুষ। অর্থাৎ পরিণত পুরুষ। শিশু নয়। তাছাড়া হাদিস শরীফেও এ রকম বর্ণনা আসেনি।

'কুল্লাম বিসিমাহুম' কথাটির অর্থ— যারা প্রত্যেককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। এখানে সিমা (লক্ষণ) শব্দটি 'সামা ইব্লাহু' থেকে সংকলিত। যেমন— উট, উটের পালকে চিহ্নযুক্ত করে চারণভূমিতে ছেড়ে দেয়া হয়। অথবা শব্দটি 'রাসামা আ'লাল ক্বলবী' থেকে সংকলিত— যার অর্থ অন্তরে নিশানা লাগিয়েছে। এই দ্বিতীয় অবস্থায় নিশানা লাগানোর উদাহরণ স্বরূপ শব্দটি হবে ওয়াস্মুন— যেমন, উচ্চ মর্যাদা সুচিহ্নিত করার জন্য নিশানা লাগানো হয়।

এরপর বলা হয়েছে— এবং জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'তোমাদের শান্তি হোক।' তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু আকাংখা করে।' এ সম্পর্কে হাসান বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা তাদের অন্তরে শুভ আশা জাগ্রত রাখবেন। কারণ, তাদেরকে অবশেষে দয়া করা হবে। আর নৈরাশ্য তো কেবল অবিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত। 'লাম ইয়াদ্ খুলুহা' (তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি) — এই কথাটি 'জুমলা মুসতানিফা' (একটি নতুন বাক্য)। পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে এর কোনো সংযোগ নেই। অথবা কথাটি 'রিজালুন' এর গুণ বা সিফাত। কিংবা 'নাদও' এর গুণ বা সিফাত। কিংবা নাদাও কথাটির কর্তৃবাচক সর্বনামের অবস্থা প্রকাশক। অতএব যারা নবী ও ফেরেশতাগণকে আ'রাফবাসী বলে থাকেন, তাদের নিকট এ অবস্থাটি হবে জান্নাতবাসীদের অবস্থা।

পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— যখন তাদের দৃষ্টি অগ্নিবাসীদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালেমদের সঙ্গী কোরো না।' এ কথার অর্থ— দোজখীদের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র আ'রাফবাসীরা বলবে, হে আমাদের আল্লাহ্! আমাদেরকে ওই দোজখবাসীদের মতো দোজখী করে দিয়ো না। এখানে 'সুরিফাত' (ফিরিয়ে দেয়া হবে) কথাটির মাধ্যমে বুঝা যায়, আ'রাফবাসী স্বেচ্ছায় দোজখীদের প্রতি দৃষ্টিপাত

www.eelm.weebly.com

করবে না। আল্লাহ্তায়ালাই তাদের দৃষ্টি দোজখীদের দিকে ফিরিয়ে দেবেন, যেনো তারা দোজখীদের মর্মন্তুদ শাস্তি অবলোকন করে আল্লাহ্তায়ালার নিকট পরিত্রাণপ্রার্থী হয়। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আ'রাফবাসীরা বেহেশ্তের আশাধারী হয়ে থাকবে। তাদের পাপ-পুণ্য সমান বলে তারাই এ রকম আশায় ও অপেক্ষায় প্রহর অতিবাহিত করতে থাকবে। এতে করে বুঝা যায়— নবী, শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ণগণের (সলেহীনদের) অবস্থা এ রকম নয়। কারণ তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, ওই সময় তাদের ভয় ও চিন্তা বলে কিছু থাকবে না। সুতরাং আশা ও অপেক্ষার প্রয়োজন তাদের নেই।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৪৮, ৪৯

وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَٰهُمْ قَالُوا۟ مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ۝

❒ আ'রাফবাসিগণ যাহাদিগকে লক্ষণ দ্বারা চিনিবে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'তোমাদিগের দল ও তোমাদিগের অহংকার কোন কাজে আসিল না।'

❒ দেখ, ইহাদিগেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ করিয়া বলিতে যে, আল্লাহ্ ইহাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবেন না। ইহাদিগকেই বলা হইবে, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদিগের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আ'রাফবাসী যাদেরকে লক্ষণ দ্বারা চিনবে তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের দলবদ্ধতা ও তোমাদের অহংকার কোনো কাজে এলো না।' এখানে অহংকার অর্থ— ওই সকল অবিশ্বাসী নেতাদের অহংকার যা তারা সত্যধর্মের বিরুদ্ধে প্রদর্শন করতো। এখানে 'জামউন' (দল) অর্থ— অবিশ্বাসী নেতাদের দল— তাদের সতীর্থ, অনুগত সন্তান-সন্ততি ও সাহায্যকারী।

কালাবী বলেছেন, আ'রাফের ওই প্রাচীরের উপর থেকে দোজখবাসী নেতাদেরকে লক্ষ্য করে আ'রাফবাসীরা বলবে, হে ওলিদ বিন মুগীরা, হে আবু জেহেল বিন হিশাম, হে অমুক অমুক নেতারা! দেখো তোমাদের দল ও অহংকার এখন কোনো কাজেই এলো না। এরপর আ'রাফবাসীরা জান্নাতবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে এবং পৃথিবীতে যে সকল বিশ্বাসীদেরকে বিদ্রূপ ও উপহাসে

www.eelm.weebly.com

জর্জরিত করা হতো, তাঁদেরকে লক্ষ্য করে মন্তব্য করবে। ওই সকল জান্নাতীদের মধ্যে থাকবেন হজরত সালমান ফারসী, হজরত সুহাইব, হজরত বেলাল, হজরত খাব্বাব প্রমুখ। পরের আয়াতে (৪৯) আ'রাফবাসীদের সেই মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

বলা হয়েছে— 'দ্যাখো, এদেরই সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না।' এ কথার অর্থ, আ'রাফবাসী অত্যাচারিত সাহাবীদের সম্পর্কে বলবে, হে আবু জেহেল! হে ওলিদ! তোমরা তো এদের সম্পর্কে বলতে যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না এবং তারা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অথচ দ্যাখো, আজ তারাই জান্নাতী আর তোমরা জাহান্নামী।

এরপর বলা হয়েছে— এদেরকেই বলা হবে 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।' আমি বলি, এখানে 'উদখুলুল জান্নাহ' (তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো) কথাটি আ'রাফবাসীদের বক্তব্যের শেষাংশও হতে পারে। অর্থাৎ আ'রাফবাসী বলবে, হে অবিশ্বাসী নেতারা! তোমরা তো এ সকল দুর্বল ও অত্যাচারিতদের সম্পর্কেই বলতে যে, এরা আল্লাহ্তায়ালার রহমত পাবে না। অথচ তাঁদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। আরো বলা হয়েছে, এখন আর তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা আর কখনোই দুঃখিত হবে না।

বাগবী উল্লেখ করেছেন, কোনো কোনো তাফসীরবিদ আলোচ্য বাক্যটির আর একটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে—আ'রাফবাসীগণ অবিশ্বাসী নেতাদেরকে লক্ষ্য করে যখন এ রকম বলতে থাকবে, তারা তো আজ জান্নাতে প্রবেশ করেছে ঠিকই কিন্তু তোমরা তো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারোনি, পারবেও না। শপথ করে তারা এ কথাও বলবে যে, অবশেষে তোমরা অবশ্যই দোজখে আসবে। তাদের এ কথা শুনে যে ফেরেশতা আ'রাফবাসীদেরকে আটকে রাখবে, সেই ফেরেশতা বলবে— তোমরা কি এদের সম্পর্কে শপথ করে বলছো যে, এদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া প্রদর্শন করবেন না। পুনরায় ওই ফেরেশতা আ'রাফবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, যাও এবার তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করো। তোমাদের কোনো ভয় নেই। আর তোমরা দুঃখিতও হবে না। তোমরা এখন থেকে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত।

আতা সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আ'রাফবাসীদের জান্নাত যাত্রার পর দোজখীরাও আশান্বিত হয়ে উঠবে। বলবে, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমাদের কতিপয় আত্মীয়স্বজন জান্নাতবাসী হয়েছে। আমরা তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। কথাও বলতে চাই। আমরা অনুমতিপ্রার্থী। অনুমতিপ্রাপ্তির পর তারা তাদের জান্নাতী আত্মীয়দের অনাবিল সুখ-

www.eelm.weebly.com

শাস্তি দেখতে সক্ষম হবে। তাদেরকে সহজেই চিনতে পারবে দোজখীরা। কিন্তু বিবর্ণ ও কুৎসিৎ দর্শন দোজখী আত্মীয়দেরকে তাদের জান্নাতী আত্মীয়রা চিনতেই পারবে না।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩

وَنَادٰۤی اَصۡحٰبُ النَّارِ اَصۡحٰبَ الۡجَنَّۃِ اَنۡ اَفِیۡضُوۡا عَلَیۡنَا مِنَ الۡمَآءِ اَوۡ مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّٰہُ ؕ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰہَ حَرَّمَہُمَا عَلَی الۡکٰفِرِیۡنَ ۙ الَّذِیۡنَ اتَّخَذُوۡا دِیۡنَہُمۡ لَہۡوًا وَّ لَعِبًا وَّ غَرَّتۡہُمُ الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَا ۚ فَالۡیَوۡمَ نَنۡسٰہُمۡ کَمَا نَسُوۡا لِقَآءَ یَوۡمِہِمۡ ہٰذَا ۙ وَ مَا کَانُوۡا بِاٰیٰتِنَا یَجۡحَدُوۡنَ ﴿۵۱﴾ وَ لَقَدۡ جِئۡنٰہُمۡ بِکِتٰبٍ فَصَّلۡنٰہُ عَلٰی عِلۡمٍ ہُدًی وَّ رَحۡمَۃً لِّقَوۡمٍ یُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۵۲﴾ ہَلۡ یَنۡظُرُوۡنَ اِلَّا تَاۡوِیۡلَہٗ ؕ یَوۡمَ یَاۡتِیۡ تَاۡوِیۡلُہٗ یَقُوۡلُ الَّذِیۡنَ نَسُوۡہُ مِنۡ قَبۡلُ قَدۡ جَآءَتۡ رُسُلُ رَبِّنَا بِالۡحَقِّ ۚ فَہَلۡ لَّنَا مِنۡ شُفَعَآءَ فَیَشۡفَعُوۡا لَنَاۤ اَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَیۡرَ الَّذِیۡ کُنَّا نَعۡمَلُ ؕ قَدۡ خَسِرُوۡۤا اَنۡفُسَہُمۡ وَ ضَلَّ عَنۡہُمۡ مَّا کَانُوۡا یَفۡتَرُوۡنَ ﴿۵۳﴾

❒ অগ্নিবাসিগণ জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'আমাদিগের উপর কিছু পানি ঢালিয়া দাও, অথবা আল্লাহ্ জীবিকারূপে তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে কিছু দাও।' তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ্ এ দুইটি নিষিদ্ধ করিয়াছেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের জন্য।

❒ যাহারা তাহাদিগের দ্বীনকে ক্রীড়াকৌতুকরূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং পার্থিব জীবন যাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল।' সুতরাং আজ আমি তাহাদিগকে বিস্মৃত হইব, যে-ভাবে তাহারা তাহাদিগের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলিয়াছিল এবং যে-ভাবে তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছিল।

❒ অবশ্য তাহাদিগকে পৌঁছাইয়াছিলাম এমন এক কিতাব যাহাকে জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম এবং যাহা ছিল বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়া।

www.eelm.weebly.com

❒ তাহারা শুধু উহার পরিণামের প্রতীক্ষা করে যেদিন উহার পরিণাম বাস্তবায়িত হইবে সেইদিন যাহারা পূর্বে উহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'আমাদিগের প্রতিপালকের রসূলগণ তো সত্য আনিয়াছিল, আমাদিগের কি এমন কোন সুপারিশকারী আছে যে আমাদিগের জন্য সুপারিশ করিবে অথবা আমাদিগকে কি পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হইবে যেন আমরা পূর্বে যাহা করিতাম তাহা হইতে ভিন্ন কিছু করিতে পারি?' তাহারা নিজেরা নিজদিগের ক্ষতি করিয়াছে এবং তাহারা যে মিথ্যা রচনা করিত তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে।

উদ্ধৃত আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— অগ্নিবাসিগণ জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা জীবিকারূপে আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু দাও'। এখানে 'আফিদ্বু আ'লাইনা মিনাল মায়ি'— কথাটির অর্থ, আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও। এখানে অর্থ হবে— আমাদের উপরে কিছু বেহেশতের শরবত ঢেলে দাও। আর 'আও মিম্মা রযাক্বা কুমুল্লহ্' অর্থ— অথবা আল্লাহ্ জীবিকারূপে তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু দাও। এভাবে জাহান্নামীরা জান্নাতীদের নিকট বেহেশতী পানীয় ও আহারের জন্য কাকুতি মিনতি করতে থাকবে।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা বলবে, আল্লাহ্ এ দু'টি নিষিদ্ধ করেছেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।' এ কথার অর্থ জাহান্নামী আত্মীয়স্বজনদেরকে লক্ষ্য করে জান্নাতীরা বলবে— আল্লাহ্তায়ালা এই বেহেশতী পানীয় ও আহার্য কাফেরদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।

পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে—'যারা তাদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিলো এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিলো। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে বিস্মৃত হবো, যেভাবে তারা তাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলেছিলো এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিলো।' এ কথার অর্থ— অবিশ্বাসীরা পৃথিবীতে সত্যধর্মের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিলো। সত্যধর্মকে গ্রহণ করেছিলো ক্রীড়া-কৌতুকরূপে। এভাবে তারা ভুলে গিয়েছিলো আমাকে, কিয়ামত দিবসকে। তাই আজ আমি তাদেরকেও ভুলে যাবো। তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিলো তাই আমিও আজ তাদেরকে করবো অস্বীকার।

জায়েদ বিন রাফী সূত্রে ইবনে আবিদ্ দুনইয়া এবং জিয়া বর্ণনা করেছেন, অবিশ্বাসীরা দোজখে প্রবেশ করে দীর্ঘ সময় ধরে অশ্রুবিসর্জন করবে। তারপর দীর্ঘদিন ধরে তাদের চোখ থেকে ঝরবে রক্ত। নরকের প্রহরীরা বলবে, হে পাপিষ্ঠের দল! পৃথিবীতে তোমরা একটুও কাঁদোনি। আজ তবে এ রকম কেঁদে মরছো কেনো? এ কথা বলা সত্ত্বেও তারা চিৎকার করে বলতে থাকবে, হে আমার জান্নাতবাসী পিতা, হে আমার মাতা, অথবা হে আমার আদরের সন্তানেরা! আমি কবর থেকে তৃষ্ণার্ত হয়ে আছি। হাশরের বিচারানুষ্ঠানের সময়ও আমি ছিলাম

www.eelm.weebly.com

তৃষ্ণার্ত। সেই সীমাহীন তৃষ্ণা নিয়ে এখনও আমি জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হচ্ছি। আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে পানাহারের সামগ্রী হিসেবে যা কিছু দান করেছেন, সেগুলো থেকে আমাকে কিছু দাও। এভাবে চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ মাস কিংবা চল্লিশ বছর পর্যন্ত চিৎকার করে ডেকে ডেকেও দোজখীরা কোনো সাড়া পাবে না। তখন এক সময় বলা হবে, তোমাদের শাস্তি চলবে অনন্তকাল। এ কথা শুনে তারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়বে। উত্তম কোনো কিছুর আশা তখন তাদের থাকবেই না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক জাহান্নামী তার ভাইকে চিৎকার করে ডেকে বলতে থাকবে, ভাইরে ভাই! আমার মুক্তির জন্য সুপারিশ করো, আমি তো জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলাম। তার ভাই তখন বলবে, জান্নাতের পানাহার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য হারাম। আল্লাহ্তায়ালা বলবেন— সুতরাং আজ আমি তাদেরকে বিস্মৃত হবো, যেভাবে তারা তাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলেছিলো এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিলো। এখানে 'তাদেরকে বিস্মৃত হবো' কথাটির অর্থ হবে— তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করবো। আর 'এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলেছিলো' কথাটির অর্থ হবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পৃথিবীতে ওই সকল পুণ্যকর্ম পরিত্যাগ করেছিলো, যা আজ এই কিয়ামতে তাদের উপকারে আসতো।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে—'অবশ্য তাদেরকে পৌঁছে দিয়েছিলাম এমন এক কিতাব যাকে জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং যা ছিলো বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া।' এখানে 'কিতাবুন' অর্থ কোরআন মজীদ। 'ফাস্সালনাহু' অর্থ— বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলাম। অর্থাৎ হালাল ও হারামকে পৃথকরূপে বিশ্লেষণ করে দিয়েছিলাম। 'আ'লা ই'লমিন' অর্থ জ্ঞান দ্বারা। এভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে— আমি মানুষের নিকট কোরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছিলাম। ওই কিতাবে জ্ঞানের মাধ্যমে আমি হক ও বাতিলকে স্পষ্টরূপে পৃথক করে দিয়েছিলাম। বিশ্বাসীরা আমার সেই সঠিক বিশ্লেষণপূর্ণ নির্দেশনা মান্য করেছিলো। তাই ওই কিতাব তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছিলো। আর পথপ্রাপ্ত বলেই তারা পেয়েছিলো আমার দয়া।

এর পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে—'তারা শুধু তার পরিণামের প্রতীক্ষা করে, যেদিন তার পরিণাম বাস্তবায়িত হবে সেদিন যারা পূর্বে তার কথা ভুলে গিয়েছিলো তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের রসুলগণ তো সত্য এনেছিলো, আমাদের কি এমন কোনো সুপারিশকারী আছে যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হবে যেনো আমরা পূর্বে যা করতাম তা থেকে ভিন্ন কিছু করতে পারি।' এখানে 'হাল ইয়ান জুরুনা ইল্লা তা'বিলাহু' কথাটির অর্থ তারা শুধু তার পরিণামের প্রতীক্ষা করে। অর্থাৎ কোরআনের প্রতি

www.eelm.weebly.com

ইমান আনার জন্য প্রতীক্ষা করে। 'তা'বিলাহু' (তার) অর্থ এখানে কোরআনে উল্লেখিত পুরস্কারের ও শাস্তির। এ রকম বলেছেন মুজাহিদ। 'ইয়াওমা ইয়া'তি তা'বিলুহু' অর্থ, যেদিন তার পরিণাম বাস্তবায়িত হবে। অর্থাৎ মৃত্যুর দিন বা কিয়ামতের দিন যখন শাস্তি অথবা পুরস্কার সমুপস্থিত হবে। 'নাসুহু' অর্থ— যারা পূর্বে তার কথা ভুলে গিয়েছিলো যেমন করে কোনো বিস্মৃতিপ্রবণ ব্যক্তি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা ভুলে যায়। অর্থাৎ ইমান আনতে ভুলে যায়। 'ক্বদ জায়াত রুসুলু রব্বিনা বিল হাক্ব' কথাটির অর্থ— তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের রসুলগণ তো সত্য এনেছিলো। এভাবে অবিশ্বাসীরা কিয়ামতের সময় পয়গম্বরগণের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবে। কিন্তু এই সাক্ষ্য তাদের কোনো কাজে আসবে না। কারণ, তখন ইমান ও আমলের সময় নয়— প্রতিফল দানের সময়। পয়গম্বরগণের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়ার পর তখন তারা এ কথাও বলবে, 'আমাদের কি এমন কোনো সুপারিশকারী আছে, যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হবে যেনো আমরা পূর্বে যা করতাম তা থেকে ভিন্ন কিছু করতে পারি? কিন্তু অবিশ্বাসীদের এমতো আশা সেদিন ফলপ্রসূ হবে না। কারণ, পৃথিবীতে পুনরায় কাউকে প্রেরণ করা আল্লাহ্‌তায়ালার বিধান নয়।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করতো তাও অন্তর্হিত হয়েছে।' এ কথার অর্থ— তারা সারা জীবন ধরে মিথ্যাচারিতার মধ্যেই কাটিয়েছে, তাই পরিণামে তারা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। এখানে মিথ্যা রচনার অর্থ শিরিক বা আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে অংশীস্থাপন।

সুরা আ'রাফঃ আয়াত ৫৪

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○

❒ তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাহাতে উহাদিগের এক অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যাহা তাঁহারই আজ্ঞাধীন, তাহা তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁহারই। মহিমাময় বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্‌।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমেই বলা হয়েছে—'তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন'। এ কথার অর্থ-আল্লাহ্তায়ালা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে পৃথিবীর ছয় দিন অথবা আখেরাতের ছয় দিন পরিমাণ সময়ে সৃষ্টি করেছেন। উল্লেখ্য যে, আখেরাতের একটি দিন পৃথিবীর এক হাজার দিনের সমান।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা সকল আকাশ এবং পৃথিবীকে এক মুহূর্তে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু মানুষকে ধীরতা, স্থিরতা এবং ধারাবাহিকতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ এবং পৃথিবী।

বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে হজরত আনাস ইবনে মালিক থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন আল্লাহ্তায়ালার পছন্দ ধীরতা ও স্থিরতা। আর শয়তানের পছন্দ ব্যতিব্যস্ততা ও ত্বরা প্রবণতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন।' বাগবী বলেছেন, মোতাজিলাদের মতে সমাসীন হওয়ার অর্থ প্রাধান্য ও বিজয় প্রতিষ্ঠা করা। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হচ্ছে, আরশে সমাসীন হওয়া আল্লাহ্তায়ালার একটি সিফাত বা গুণ। আর আল্লাহ্তায়ালার অন্য সকল সিফাতের মতো সমাসীন হওয়া সিফাতটিও অতুলনীয়, উদাহরণ রহিত। এই সমাসীন হওয়ার ধরন ও অবস্থা জ্ঞানাতীত। কিন্তু এই ঘোষণাটির উপর ইমান আনা ওয়াজিব। আর বিষয়টি যেহেতু জ্ঞানাতীত তাই তা বুঝতে চাওয়ার প্রচেষ্টা নিরর্থক।

ইমাম মালেক বিন আনাসের নিকট এক লোক জিজ্ঞেস করলো, 'আররহমানু আ'লাল আ'রশিস্ তাওয়া' (রহমান আরশে সমাসীন হন) কথাটির অর্থ কী? প্রশ্নটি শুনে ইমাম মালেক অবনত মস্তকে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন। তারপর বললেন, 'ইস্তাওয়া' (সমাসীন) শব্দটির অর্থ আমি জানি। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার আরশে সমাসীন হওয়ার স্বরূপ আমার অজ্ঞাত। বিষয়টি জ্ঞানের আওতায় আনা অসম্ভব। কিন্তু কথাটি বিশ্বাস করা ওয়াজিব। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা পাপ। এ রকম প্রশ্ন রসুল স. এর আদর্শের বিরোধী এবং এটি নফসের একটি প্রতারণা। আমি মনে করি এই জ্ঞানাতীত বিষয়টি সম্পর্কে যে জানতে চায় সে পথভ্রষ্ট। এরপর তিনি হুকুম দিলেন, এই প্রশ্নকারী লোকটিকে মজলিশ থেকে বের করে দাও।

সুফিয়ান সওরী, আওযায়ী, লাইস বিন সাঈদ, সুফিয়ান বিন উয়াইনিয়া, আবদুল্লাহ ও অন্যান্য আলেম বলেছেন, এই আয়াতটি একটি মোতাশাবিহ্ (রহস্যাচ্ছন্ন) আয়াত। আয়াতের বক্তব্যটিকে বিনাশর্তে ও বিনাপ্রশ্নে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিতে হবে। আরশের অভিধানগত অর্থ প্রশাসনের কেন্দ্র বিন্দু বা সিংহাসন। আরশ আল্লাহ্পাকের একটি বিস্ময়কর ও উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ সৃষ্টি। আল্লাহ্তায়ালার

www.eelm.weebly.com

তাজাল্লীর সঙ্গে এর রয়েছে বিশেষ সম্পর্ক। তাই এই আরশকে বলা হয়েছে 'আরশুর্ রহমান' (আল্লাহ্তায়ালার আরশ)। কিন্তু এই আরশের সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালার সম্বন্ধ স্থানগত নয়। সম্বন্ধটি অবোধ্য। বরং সম্বন্ধটি কেবল সম্মানসূচক। যেমন কাবাগৃহকে কেবল সম্মান প্রদর্শনার্থে বলা হয় বায়তুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র গৃহ। বিভিন্ন হাদিসে এ সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। সুরা বাকারার আয়াতুল কুরসীর ব্যাখ্যাতেও এ সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে তাদের এক অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন'। এখানে 'ইয়ুগ্শি' অর্থ আচ্ছাদিত করেন। 'আল্লাইলা' অর্থ রাত্রিকে। 'বিন্নাহারি' অর্থ দিবস দ্বারা। রাত্রি দ্বারা দিবস আচ্ছাদিত হওয়ার বিষয়টি দৃষ্টিগ্রাহ্য। এখানে কেবল রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করার কথা বলা হয়েছে। দিবস দ্বারা রাত্রিকে আচ্ছন্ন হওয়ার কথাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে এ বক্তব্যটিতে। বাগবী বলেছেন, ওই প্রচ্ছন্ন কথাটিসহ বক্তব্যটির পূর্ণরূপ হবে এ রকম— 'ইউগ্শিল্ লাইলান্ নাহারা ওয়া ইউগ্শিন্ নাহারাল লাইলা' (তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা এবং রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন)।

'ইয়াত্লুবুহু' অর্থ— অনুসরণ করে। 'হাছিছান' অর্থ ক্ষিপ্রগতিতে বা দ্রুতগতিতে। 'বিআমরিহি' অর্থ আল্লাহ্তায়ালার আজ্ঞানুসারে। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র এবং দিবস-রাত্রির পালাবদল আল্লাহ্তায়ালার আজ্ঞাধীন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন এই সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও দিবস-রজনী এবং দিবস-রজনীর নিয়মিত বিবর্তনকে।

এরপর বলা হয়েছে—'জেনে রাখো, সৃজন ও আদেশ তাঁরই'। এ কথার অর্থ, মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ্। তিনিই একমাত্র সৃজক। সকল কিছুর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণভার তাঁরই। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন তেমনিভাবে পরিচালন করেন তাঁর এই মহাসৃষ্টি। অতুলনীয় তাঁর ক্ষমতা ও পরাক্রম। তাঁর কোনো কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করার যোগ্যতা ও অধিকার কারো নেই।

সুফিয়ানে কেরাম বলেন, এখানে 'আল খালক্' অর্থ সমগ্র সৃষ্টি। অর্থাৎ আরশ, আকৃতি জগৎ, আকাশ পৃথিবী এবং আকাশ পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত সকল জড় সৃষ্টি, ভূতচতুষ্টয়, উদ্ভিদরাজি, খনিজসম্পদ, সকল প্রাণীকুলের আত্মা, সৃষ্টির স্থূল শরীর ইত্যাদি। আর 'আল আমরু' অর্থ আলমে আমরের কলব, রূহ্, সির, খফি ও আখফা। মানুষ, ফেরেশতা এবং জ্বিনের আত্মা আরশ অপেক্ষা উচ্চ এই অর্থে যে— এদের আত্মা আয়না সদৃশ। ক্ষুদ্র আয়নায় যেমন বিশাল সূর্য প্রতিভাসিত হয়, তেমনি এদের অন্তরের আয়নায় ইমানের কারণে প্রতিবিম্বিত হতে পারে আল্লাহ্তায়ালার তাজাল্লী। তাই এদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল 'কুন' (হও) আদেশের মাধ্যমে।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, সুফিয়ান বিন উয়াইনিয়াহ্ বলেছেন, খালক্ ও আমর শব্দ দু'টোর মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। যে এ দু'টোকে সমার্থক মনে করবে, সে কাফের হয়ে যাবে।

শেষে বলা হয়েছে— 'মহিমাময় বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্।' কথাটির অর্থ— একক উপাস্য হওয়ার দিক দিয়ে আল্লাহ্ মহিমময়, পবিত্র, অংশীবিহীন। তিনিই সকল সৃষ্টির একক প্রভুপ্রতিপালক। এখানে 'তাবারাকা' শব্দটি এসেছে 'বারাকাতুন' থেকে। শব্দটির অর্থ পবিত্রাতিপবিত্র, মহিমাময়— যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ হওয়া অত্যাবশ্যক।

কেই কেউ বলেছেন, 'তাবারক' শব্দটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— তিনিই সেই মহিমময় সত্তা, যাঁর স্মরণ থেকে বরকত লাভ হয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শব্দটির অর্থ— তিনিই সকল বরকতের একক অধিকর্তা।

হাসান বসরী বলেছেন, তাঁর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ হয় সকল বরকত। কেউ কেউ বলেছেন, তাবারাকা অর্থ কুদ্স বা পাকপবিত্র। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটি মহান আল্লাহ্র একটি পবিত্র নাম। তিনিই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দান করেছেন বরকত। তত্ত্বানুসন্ধানীগণ বলেছেন, এর অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা চিরস্থায়ী, অবিনাশী। তিনি সদা বিদ্যমান। সর্বত্র বিদ্যমান। কারণ বরকত শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, সুদৃঢ়রূপে স্বতিষ্ঠ, সদাপ্রতিষ্ঠিত, অক্ষয়, অব্যয়। আল্লাহ্তায়ালার প্রতি তাবারাকা শব্দটির প্রয়োগ বৈধ। কিন্তু 'মুবারাকা' শব্দটির প্রয়োগ বৈধ নয়। কারণ মুবারক শব্দটি তাঁর শরিয়তসম্মত নামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সুরা আ'রাফঃ আয়াত ৫৫

ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۝

❑ তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদিগের প্রতিপালককে ডাক; তিনি সীমালংঘনকারীদিগকে পছন্দ করেন না।

উদ্‌উ' রব্বাকুম তাদ্বর্‌রুআঁও ওয়া খুফ্ইয়াতা' (তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো)। এ কথার অর্থ— তোমরা বিনয়াবনত হয়ে গোপনে তোমার প্রতিপালকের স্মরণ করো, ইবাদত করো, প্রার্থনা করো। 'তাদ্বর্‌রুআ'ন' একটি মূল শব্দ। এখানে শব্দটি কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশক। এর একবচন হচ্ছে দ্বরাউ'ন। যেমন 'দ্বরাআ'র্ রজুলু'। 'দ্বরাআ'তা' কথাটির অর্থ— ওই ব্যক্তি দুর্বল ও অক্ষম হয়েছে। দ্বরিউ'ন এবং দ্বনরিউ'ন অর্থ দুর্বল ও অক্ষম।

www.eelm.weebly.com

'তাদ্বর্‌রাউ' অর্থ দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা (বিনীতভাবে ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রার্থনা করা)। কামুস গ্রন্থে রয়েছে দ্বরাআ' ইলাইহি দ্বরাআ'ন ওয়া দ্বরাআ'তান কথাটির অর্থ— তাঁর সামনে বিনীত অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছে।

'খুফ্‌ইয়াতান' শব্দটির অর্থ— গোপন ইবাদত, যা বিশুদ্ধচিত্ততার সঙ্গে সম্পাদিত হয় এবং যা আত্মম্ভরিতা থেকে মুক্ত। উল্লেখ্য যে, আত্মম্ভরিতামুক্ত এবং শুদ্ধসংকল্পসম্বলিত না হলে প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য কোনো ইবাদতই আল্লাহ্‌পাকের দরবারে গৃহীত হয় না।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন, আমি আমার বান্দার ধারণার অনুকূল। যদি সে আমাকে গোপনে (মনে মনে) স্মরণ করে তবে আমিও তাকে স্মরণ করি গোপনে। যদি সে আমাকে দলবদ্ধভাবে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে স্মরণ করি পবিত্র ও মর্যাদাশীল দলের মধ্যে (ফেরেশতাদের সঙ্গে)। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় প্রকার জিকির সিদ্ধ। কেউ কেউ বলেছেন, এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকাশ্য ও স্বশব্দ জিকিরই উত্তম। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। বরং এখানে এ কথাটিই প্রতীয়মান হয় যে, নীরব ও সরব উভয় প্রকার জিকিরই গ্রহণীয়। বরং এখানে নীরব স্মরণকে সরব স্মরণাপেক্ষা প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে। এক আয়াতে এসেছে— 'ফাজকুরুল্লহা কাজিক্‌রিকুম আবাআকুম আও আশাদ্দা জিক্‌রা' (সুতরাং তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তিদের মতো অথবা তাদের চেয়ে বেশী আল্লাহ্‌র জিকির করো)। এখানে সরব জিকিরের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে অত্যধিক জিকিরের কথা।

আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, গোপন জিকিরই উত্তম এবং উচ্চস্বরে জিকির বেদাত। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সশব্দ জিকির অত্যাবশ্যক। যেমন— আযান, ইকামত, তকবির, তাশরিক ইত্যাদি। এ ছাড়া নামাজের সময় ইমামের ওজু ভঙ্গ হলে তাকে উচ্চ স্বরে তকবির বলতে হয়। নামাজে মোক্তাদির ওজু ভঙ্গ হলে উচ্চস্বরে সুবহানাল্লাহ্‌ বলে মসজিদ থেকে বের হতে হয়। হজের সময় উচ্চ স্বরে বলতে হয় 'লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' ইত্যাদি। হেদায়া গ্রন্থের টীকা ভাষ্যে শায়েখ ইবনে হুম্মাম উল্লেখ করেছেন, তাকবির ও তাশরিকের সীমা ও সংখ্যা নির্দেশের ক্ষেত্রে হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের অভিমতকে পছন্দ করেছেন ইমাম আবু হানিফা। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স, আরাফার দিন (৯ই জিলহজ) ফজরের নামাজের পর থেকে কোরবানীর শেষ দিন আসরের নামাজের পর পর্যন্ত তাকবির ও তাশরিক পড়তেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা। আর সাহেবাঈন (ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ) এই প্রসঙ্গে অনুসরণ করেছেন হজরত আলীর অভিমতকে। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স.

www.eelm.weebly.com

আরাফার দিন ফজরের পর থেকে তকবিরে তাশরিকের শেষ দিন আসরের নামাজ পর্যন্ত তকবিরে তাশরিক পড়তেন। এই হাদিসটিও বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা। মোহাম্মদ বিন হাসানও এ রকম বর্ণনা করেছেন। এর পর ইবনে হুম্মাম উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি সাহেবাঈনের উক্তির উপরে ফতওয়া দেয়, সে হয়ে যায় অত্যুত্তম অভিমতের বিরোধী। কেননা ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাঈনের মতভেদ তকবির কম বা বেশী বলার ক্ষেত্রে নয়— উচ্চ অথবা অনুচ্চস্বরে তকবির পড়া অথবা না পড়ার ক্ষেত্রে। সাহেবাঈনের অভিমত হচ্ছে, তকবির পড়তে হবে উচ্চস্বরে। আর ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে, অনুচ্চ আওয়াজে তকবির পড়াই উত্তম। নিম্নস্বরের জিকির অথবা গোপন জিকিরই প্রকৃত জিকির। উচ্চস্বরে জিকির করা বেদাত। এ কথাটিও প্রণিধানণীয় যে, সরবতা ও নীরবতার মধ্যে যেহেতু দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, সেহেতু নীরবতাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য হওয়াই সমীচীন। তাই গোপন জিকিরই উত্তম। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের ঐকমত্য ছিলো নীরব জিকিরের পক্ষে।

হাসান বসরী বলেছেন, উচ্চস্বরের দোয়া এবং নিম্নস্বরের দোয়ার মধ্যে সত্তর হাজার গুণ পার্থক্য রয়েছে। প্রথম যুগের মুসলমানেরা দীর্ঘক্ষণ ধরে দোয়া করতেন। কিন্তু তাঁদের সেই দোয়ার সামান্য আওয়াজও শোনা যেতো না। শুধু শোনা যেতো তাঁদের ওষ্ঠ সঞ্চালনের মৃদু শব্দ। কেননা, আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো। পুণ্যবানদের সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ করেছেন— 'ইজ্ নাদা রব্বাহু নিদাআন খফিয়্যা' (যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিলো নিভৃতে)।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, উত্তম জিকির হচ্ছে জিকিরে খফি (নীরব জিকির) এবং উত্তম জীবিকা হচ্ছে ওই জীবিকা যা ন্যূনতম সামর্থ্যের অন্তর্ভূত। আহমদ, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী। হজরত আবু মুসা আশআরী বর্ণনা করেছেন, খয়বর যুদ্ধের সময় একটি প্রান্তর অতিক্রমকালে মুসলিম সৈন্যরা উচ্চ শব্দে তকবিরধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন। রসুল স. তখন বলেছিলেন, শান্ত হও। তোমরা কোনো বধির এবং অনুপস্থিত সত্তাকে তো আহ্বান করছো না— তোমরা ওই সত্তাকে ডাকছো যিনি সর্বশ্রোতা এবং নিকটতম। বাগবী।

আমি বলি, বাগবী বর্ণিত এই হাদিসটির মাধ্যমে জিকিরে খফির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কিন্তু এখানে এ বিষয়টিও লক্ষ্যণীয় যে, রসুল স. এখানে উচ্চস্বরে তকবির উচ্চারণকে নিষিদ্ধ করেননি। বলেছেন, শান্ত হও। তাই এই হাদিসের মাধ্যমে জিকিরে খফির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটিও প্রমাণিত হয়েছে যে সরব ও নীরব উভয় প্রকার জিকির সিদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

দ্রষ্টব্যঃ জিকির তিন প্রকার।

১. চিৎকার করে জিকির করা। আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে এ রকম জিকির সকল অবস্থায় মাকরূহ। তবে বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে যদি অধিকতর উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, পরিস্থিতিগত কারণে আলেমগণ যদি সাময়িকভাবে এ রকম জিকিরকে কল্যাণকর মনে করেন তবে তাকে অসিদ্ধ বলা যাবে না। বরং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অত্যুচ্চ আওয়াজের জিকিরই উত্তম। যেমন— আযান, হজের তালবিয়া ইত্যাদি। চিশতিয়া তরিকার কোনো কোনো পীর ও মোর্শেদ প্রাথমিক অবস্থায় মুরিদগণকে উচ্চশব্দে জিকির করতে বলেন। শয়তান বিতাড়ণ, আলস্য বিদূরণ, ঔদাসীন্য অপসারণ, অন্তর উত্তপ্তকরণ, অনুপ্রেরণা ও অনুরাগের উজ্জীবন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে চিশতিয়া তরীকার পীরগণ প্রাথমিক সালেকদের জন্য এ রকম জিকির নির্ধারণ করে থাকেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আত্মপ্রসাদ এবং যশ লাভের উদ্দেশ্যে অত্যুচ্চ আওয়াজে জিকির করা থেকে বিরত থাকা একান্তরূপে বাঞ্ছনীয়।

২. রসনা সঞ্চালনার মাধ্যমে অত্যন্ত অনুচ্চ আওয়াজে জিকির করা। রসুল স. বলেছেন, সকল সময় আল্লাহ্র জিকিরে তোমার রসনাকে সিক্ত রাখো। ইমাম আহমদ ও তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল কোনটি? তিনি স. বললেন, পৃথিবী পরিত্যাগের সময় আল্লাহ্র জিকির দ্বারা রসনাকে সতেজ রাখা।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার কিছু ফেরেশতা জিকিরকারীদের অনুসন্ধান করে বেড়ায়। কাউকে আল্লাহ্র জিকির করতে দেখলে সেখানে দাঁড়িয়ে যায়। একজন অন্যজনকে ডেকে বলে, এসো এদিকে এসো। তারা সকলে সমবেত হয়ে তখন জিকিরকারীদের মজলিশ ঘিরে ফেলে। বেষ্টনী গড়ে তোলে তাদের ডানার মাধ্যমে। এভাবে তারা বেষ্টনী গড়ে তোলে পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত। আল্লাহ্তায়ালা সর্বজ্ঞ। তৎসত্ত্বেও তিনি ওই ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দারা কী বলছে? ফেরেশতারা বলে, তারা ঘোষণা করছে আপনার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব। আরো বর্ণনা করছে আপনার প্রশংসা (বলছে, সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর)। আল্লাহ্পাক বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশতারা বলে, না। আল্লাহ্ বলেন, আমাকে যদি তারা দেখতো, তবে কী অবস্থা হতো তাদের? ফেরেশতারা বলে, তাহলে তো তারা আরো বেশী ইবাদত করতো। আরো বেশী প্রকাশ ঘটাতো আপনার পবিত্রতার ও শ্রেষ্ঠত্বের। বর্ণনা করতো আরো অধিক পবিত্রতা। আল্লাহ্পাক পুনরায় বলেন, কী চায় তারা? ফেরেশতারা বলে, জান্নাত। আল্লাহ্পাক বলেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলে, না। আল্লাহ্পাক বলেন, যদি তারা জান্নাত দেখতো তবে কী অবস্থা হতো তাদের? ফেরেশতারা বলে, তাহলে তো তারা জান্নাতের প্রতি হতো আরো অধিক লালায়িত। আল্লাহ্পাক পুনরায় বলেন, কোন্ বস্তু থেকে পরিত্রাণ চায় তারা?

www.eelm.weebly.com

ফেরেশতারা বলে, দোজখ থেকে। আল্লাহ্পাক বলেন, তারা কি দোজখ দেখেছে? ফেরেশতারা বলে, না। আল্লাহ্ বলেন, কী অবস্থা হতো তাদের, যদি দেখতো। ফেরেশতারা বলে, তাহলে তো তারা দোজখের ভয়ে পাপ থেকে আরো অধিক দূরে থাকার চেষ্টা করতো। আল্লাহ্তায়ালা বলেন, তোমরা তবে সাক্ষী থাকো— আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। এক ফেরেশতা তখন বলে, ওই জিকিরের মজলিশে এক লোক উপস্থিত ছিলো, কিন্তু সে ছিলো জিকিরবিহীন অবস্থায়। তার উদ্দেশ্য ছিলো ভিন্ন। কার্যোপলক্ষ্যে এসে সে বসে পড়েছিলো জিকিরের মজলিশে। আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, জিকিরকারীদের সঙ্গে যে উপবেশন করে, সে কখনও দুর্ভাগা হয় না। বোখারী, মুসলিম।

৩. জিহ্বা সঞ্চালন ব্যতীত কেবল কলব, রূহ্ এবং নফ্স দ্বারা গোপনে জিকির করা। এই জিকিরকে বলে জিকিরে খফি। আমল লেখক ফেরেশতারা এই জিকির সম্পর্কে অজ্ঞাত।

মাতা আয়েশা সিদ্দিকা থেকে আবু ইয়া'লী বর্ণনা করেছে, রসুল স. বলেছেন, সরব জিকির অপেক্ষা নীরব জিকির সত্তর হাজার গুণ অধিক মর্যাদাপূর্ণ। শেষ বিচারের সময় ফেরেশতারা যখন মানুষের আমলনামা উপস্থিত করবে তখন আল্লাহ্তায়ালা এক লোককে দেখিয়ে বলবেন, ভালো করে দ্যাখো, আমার এই বান্দার কোনো পাপ-পুণ্য লেখা বাদ পড়লো কিনা? আমল লেখক ফেরেশতারা বলবে, আমরা যা কিছু জেনেছি, শুনেছি এবং দেখেছি— সকল কিছুই আমলনামায় লিখে নিয়েছি। কোনো কিছুই পরিত্যাগ করিনি। আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, আমার এই বান্দার গোপন আমলও রয়েছে, যার কথা তোমরা জানোই না। সেই আমল হচ্ছে জিকিরে খফি।

আমি বলি, এই জিকিরে খফি বা কলবী জিকিরের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হয় না। শারীরিক শ্রান্তি, ক্লান্তি ও আলস্য এই গোপন জিকিরের প্রতিবন্ধক নয়। জিকিরে জাগ্রত কলবে তাই প্রতিটি মুহূর্তে চলতে থাকে আল্লাহ্র জিকির।

এরপর বলা হয়েছে—'তিনি সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না।' কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে সীমালংঘনকারী অর্থ ওই সকল লোক, যারা আল্লাহ্তায়ালার দরবারে অবাস্তব প্রার্থনা করে। যেমন বলে, হে আল্লাহ্ আমাকে নবীর মর্যাদা দান করো, আকাশে উঠিয়ে নাও, মৃত্যুর আগেই স্বর্গদান করো ইত্যাদি। স্বসূত্রে বাগবী হজরত আবু দাউদ সিজিস্তানীর ধারাবাহিকতায় আবু নূয়ামার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল একবার তাঁর পুত্রকে দোয়া করতে শুনলেন— হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে এই মর্মে প্রার্থনা জানাই, যখন আমি বেহেশতে গমন করবো তখন আমাকে বেহেশতের ডানপাশে একটি শাদা স্থান দান করবেন। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল বললেন, প্রিয় পুত্র! তুমি আল্লাহ্তায়ালার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করো এবং দোজখ

www.eelm.weebly.com

থেকে নিষ্কৃতি চাও। আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ভবিষ্যতে এই উম্মতের কিছু লোক পবিত্রতা অর্জন এবং দোয়ার ক্ষেত্রে সীমাতিক্রম করবে। ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান।

হজরত সা'দ থেকে আবু ইয়া'লী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অতিশীঘ্রই এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হবে, যারা হবে দোয়ার মধ্যে সীমালংঘনকারী। মানুষের জন্য এ রকম প্রার্থনা করাই যথেষ্ট যে, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! আমি তোমার নিকট বেহেশত প্রার্থনা করি। আর চাই ওই কথা ও কাজ যা আমাকে জান্নাতের সমীপবর্তী করে এবং দোজখ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আবু ইয়া'লী বলেছেন, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই যে, বর্ণিত উক্তিটি কি রসুল স. এর না হজরত সা'দ এর।

আতিয়া বলেছেন, এখানে মু'তাদিন (সীমালংঘনকারীগণ) অর্থ ওই সকল লোক, যারা অবৈধ রীতিতে মুসলমানদের জন্য বদ্‌দোয়া করে। যেমন বলে— হে আল্লাহ্! তাদের প্রতি অভিশাপ অবতীর্ণ করো। স্মর্তব্য যে, এ রকম বদ্‌দোয়া করার ক্ষেত্রে রাফেজীরা সকলের চেয়ে অগ্রগামী। তারা সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতের প্রতি অভিশাপ দেয়।

ইবনে জুরাইজ বলেছেন, ই'তাদা (সীমালংঘন) অর্থ চিৎকার করে দোয়া করা। রসুল স. এর হাদিসে এ রকম চিৎকারসর্বস্ব প্রার্থনাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হজরত আবু মুসা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা আপন সত্তার উপর বিনম্র হও। তোমরা কোনো বধির সত্তাকে তো ডাকছো না এবং কোনো অনুপস্থিত অস্তিত্বকেও আহ্বান করছো না।

আমি বলি, এখানে সীমালংঘন অর্থ শরিয়তের সীমালংঘন। উপরে বর্ণিত সীমালংঘনের সকল সংজ্ঞাই এর অন্তর্ভুক্ত। দোয়া সম্পর্কে সীমালংঘনের আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— আমি এতো করে দোয়া করলাম তবু আমার দোয়া কবুল হলো না, অথবা আমার দোয়া অবশ্যই কবুল হবে, কিংবা এমন ওসিলার মাধ্যমে দোয়া করা যা শরিয়ত সমর্থিত নয়। যেমন, পরম প্রভু, প্রতিমা ইত্যাদি।

সুরা আ'রাফঃ আয়াত ৫৬

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

❑ দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর উহাতে বিপর্যয় ঘটাইও না, তাঁহাকে ভয় ও আশার সহিত ডাকিবে। আল্লাহের অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদিগের নিকটবর্তী।

---

www.eelm.weebly.com

'দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ঘটিও না।' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মাধ্যমে আহ্বান জানিয়েছেন আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে। স্পষ্ট করে দিয়েছেন শরিয়তের বিধি-বিধান। নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন প্রার্থনার সীমালংঘনকেও। এভাবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার শুভ উদ্যোগকে অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও বিশৃংখলার মাধ্যমে বিপর্যস্ত করে ফেলো না। আর কখনো আহ্বান জানিয়ো না গাইরুল্লাহ্র প্রতি। এ রকম অর্থ করেছেন বাগবী, হাসান, জুহাক, সুদ্দী এবং কালাবী। আতিয়া বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ এ রকম— হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্তায়ালার অবাধ্য হয়ো না। নতুবা আল্লাহ্তায়ালা বৃষ্টি বন্ধ করে দেবেন। তোমাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দেবেন ফল ও ফসল। এভাবে পৃথিবীতে শুরু হয়ে যাবে অশান্তি। আর এখানে 'দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর' কথাটির অর্থ হবে— নিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং ফল ও ফসলের সমারোহ নিশ্চিত করার পর।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাঁকে ভয় ও আশার সঙ্গে ডাকবে। আল্লাহ্র অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।' এখানে দৃঢ় আশা-আকাঙ্খাকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে। নির্দেশনা দেয়া হয়েছে— ভয় ও আশার মাধ্যমে যে দোয়া করা হয়, সে দোয়া কবুল করা হয়। আল্লাহ্তায়ালা করীম ও রহীম (কৃপাপরবশ ও দয়াপরবশ)। দয়াময় দাতা তিনি। মানুষের পাপ ও অবাধ্যতাই তাদের দোয়া কবুল হওয়ার প্রতিবন্ধক। নতুবা পরম দয়ালু দাতার দিক থেকে কারো প্রার্থনাকে প্রত্যাখ্যান করা শোভনীয় নয়।

রসুল স. একবার উপমাস্বরূপ বললেন! সুদীর্ঘ পথবাহী মলিন পরিচ্ছদাবৃত পরিশ্রান্ত এক মুসাফির আকাশের দিকে হস্ত উত্তোলন করে বলতে শুরু করলো, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! অথচ সে হারাম আহার্য ভক্ষণকারী এবং হারাম পানীয় পানকারী। তার পোশাক পরিচ্ছদও হারাম উপায়ে সংগৃহীত। অর্থাৎ তার অস্তিত্বই হারাম। এ রকম প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল হবে কিভাবে? হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম ও তিরমিজি। তাঁদের মাধ্যমে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বান্দার দোয়া আল্লাহ্তায়ালার কাছে সরাসরি পৌঁছে যায়। কিন্তু তা কবুলের শর্ত হচ্ছে— অবৈধ দোয়া না করা, রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রার্থনা না করা এবং দোয়া কবুলের জন্য তাড়াহুড়া না করা। একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এখানে তাড়াহুড়া না করা কথাটির অর্থ কী? তিনি স. বললেন, এ রকম বলা— মনে হয় আমার দোয়া কবুল হবে না। অথবা এ রকম বলে সে হয়তো দোয়া করাই বন্ধ করে ছিলো।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হৃদয় একটি আধার। এই আধার কারো কারো প্রশস্ত। কারো কারো সংকীর্ণ। হে মানুষ! প্রশস্ত অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালার নিকট প্রার্থী

www.eelm.weebly.com

হও। তোমার প্রার্থনা অবশ্যই গৃহীত হবে। আল্লাহ্‌তায়ালা ওই প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করেন না যার প্রার্থনা একাগ্রচিত্ততা বিবর্জিত। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

একটি প্রশ্নঃ উপরে বর্ণিত হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দোয়া কবুলের দৃঢ় আশা রাখতে হবে। কিন্তু ইতোপূর্বে উল্লেখিত একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে— আমার দোয়া অবশ্যই কবুল হবে, এ রকম বলা যাবে না। এই বৈপরিত্যের কারণ কী?

উত্তরঃ দোয়া অবশ্যই কবুল হবে— কথাটির অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌তায়ালা পরম দয়ালু ও দাতা, এ কথার উপর দৃঢ় আস্থা রাখলে দোয়া নিশ্চয়ই কবুল হবে । এ কথাও জানতে হবে যে, অবাধ্যতা ও পাপ, প্রার্থনা কবুলের অন্তরায়। সুতরাং নিজের আমলের দিকে দৃকপাত করে নৈরাশ্যে নিপতিত হওয়া যাবে না। দোয়ার সময় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে আল্লাহ্‌তায়ালার অতুলনীয় দয়া ও দানের প্রতি। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, বর্ণিত হাদিসদ্বয়ের বক্তব্যের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বৈসাদৃশ্য নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'ইন্না রহমাতাল্লহি ক্বরিবুম্ মিনাল মুহ্‌সিনীন' (আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী)। এখানে 'ক্বরিবুন্' (নিকটবর্তী) ব্যবহৃত হয়েছে পুংলিঙ্গের শব্দরূপে। সুতরাং বুঝতে হবে যিনি দয়াবান তাঁর গুণবত্তা প্রকাশক পুংলিঙ্গের শব্দরূপ এখানে রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী'— কথাটি একটি আদেশ। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং আদেশদাতা। ক্বরিবুন্ শব্দটি কখনো কর্তৃকারকরূপে আবার কখনো বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। আবার শব্দটি উভয় লিঙ্গেও ব্যবহৃত হতে পারে। উল্লেখ্য যে, অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র। কিন্তু এখানে যেহেতু বলা হয়েছে, অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী— তাই এই নৈকট্য হবে স্থানগত নৈকট্য। আর আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত গুণটি তো আল্লাহ্‌তায়ালার মতোই বেমেছাল (উদাহরণরহিত)।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৫৭

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۗ حَتّٰٓى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۚ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

❑ তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। যখন উহাকে ঘন মেঘ বহন করে তখন উহা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে প্রেরণ করি,

www.eelm.weebly.com

পরে উহা হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তৎপর উহার দ্বারা সর্বাধিক ফল উৎপাদন করি। এইভাবে মৃতকে জীবিত করি যাহাতে তোমরা শিক্ষা লাভ কর;

'ওয়া হুয়াল্লাজী ইউর্সিলুর্ রিয়াহা বুশ্রান্ বাইনা ইয়াদাই রহ্মাতিহি' (তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন)। এখানে 'বুশরান' (সুসংবাদবাহী) শব্দটি বুশুরান এর সংক্ষিপ্তরূপ। শব্দটি বাশিরুন এর বহুবচন। আর এখানে 'রহমত' (অনুগ্রহ) অর্থ বৃষ্টি। এখানে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পূবাল বাতাস মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। দখিনা বাতাস মেঘকে করে ঘনীভূত। মেঘকে আবর্তিত করে উত্তরের বাতাস। আর পশ্চিমা বাতাস বিক্ষিপ্ত করে দেয় মেঘকে।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, তিনি স. বলেছেন, বাতাস হচ্ছে আল্লাহ্পাক কর্তৃক প্রেরিত স্বস্তি। এই বাতাস হয় কখনো রহমত, আবার কখনো আযাবের প্রতিভূ। তাই তোমরা কখনো বাতাসকে মন্দ বোলো না। বরং বাতাস থেকে আল্লাহ্তায়ালার কল্যাণ কামনা কোরো এবং তার ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে আল্লাহ্তায়ালার নিকট পরিত্রাণপ্রার্থী হও। হাদিসটি উল্লেখিত হয়েছে বোখারী শরীফের আদব অধ্যায়ে। আবু দাউদ ও হাকেমও হাদিসটির বর্ণনাকারী। ইমাম শাফেয়ীর নীতিমালা অনুসারে বাগবীও হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। হাদিসটির আরেক বর্ণনাকারী হচ্ছেন আবদুর রাজ্জাক। আর হাকেম বলেছেন, হাদিসটি অধিকতর বিশুদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'হাত্তা ইজা আক্বল্লাত্ সাহাবান্ ছিক্বালান্ সুক্বনাহু লিবালাদিম্ মাইয়্যিতিন্ ফা আনযাল্না বিহিল্ মাআ ফাআখ্রাজনা বিহী মিনকুল্লিছ্ ছামারতি' (যখন তাকে ঘন মেঘ বহন করে তখন তা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে প্রেরণ করি, পরে তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তারপর তার দ্বারা সর্বাধিক ফল উৎপন্ন করি)। এখানে 'আক্বল্লাত্' শব্দটির অর্থ— যখন উহা বাত্যা তাড়িত হয়। অর্থাৎ মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায় বাতাস। আক্বল্লাত্ শব্দটি ক্বিল্লাত্ শব্দ থেকে সংকলিত। এর অর্থ কোনো কিছুকে বহন করা বা উত্তোলন করা। ক্বলীল অর্থ লঘু, তুচ্ছ। কোনো বস্তু লঘু হলেই তা বহন করা সম্ভব। তাই বহনযোগ্য বস্তুকেই বলে 'ক্বলীল''।

'ছিক্বালান্' শব্দটির অর্থ— পানির কারণে ঘনবদ্ধ হওয়া। শব্দটি ছাক্বীলুন্ এর বহুবচন। সুতরাং সাহাব (মেঘ) ব্যবহৃত হয় 'সাহাইবুন্' (মেঘপুঞ্জ) অর্থে। তাই এখানে বহুবচনের শব্দরূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'ছিক্বালান্'। 'সাহাব' (মেঘ) শব্দটি এখানে পুংলিঙ্গে একবচন। তাই শব্দটি একক পুংলিঙ্গের সর্বনাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

'লিবালাদিন' অর্থ ওই ভূখণ্ডের জন্য অথবা ওই ভূমিকে উর্বর বা পরিতৃপ্ত করার জন্য। কেউ কেউ বলেছেন, 'লি বালাদিন' শব্দটির 'লাম' অক্ষরটির অর্থ এখানে ইলা (দিকে) অর্থাৎ নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে।

'মাইয়্যিতিন্' অর্থ মৃত বা অনুর্বর। 'ফাআন্যালনা বিহী' (অবতরণ করি) কথাটির 'বা' অক্ষরটি এখানে কারণ প্রকাশক। অর্থাৎ মেঘ অথবা বাতাসের কারণে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি।

'ফা আখরাজনা বিহী' অর্থ— তার দ্বারা উৎপাদন করি। এখানে 'তার দ্বারা' (বিহী) সর্বনামটি 'বালাদুন্' (ভূখণ্ড) এর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হলে 'বা' অক্ষরটি এখানে ব্যবহৃত হবে আধার হিসেবে। আর সে আধার হবে— নির্জীব ভূখণ্ড। যদি সর্বনামটি বাতাস অথবা বৃষ্টি বর্ষণের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয় তবে 'বা' হবে এখানে কারণ প্রকাশক।

শেষে বলা হয়েছে—'কাজালিকা নুখ্রিজুল মাউতা লাআ'ল্লাকুম তাজাক্কারুন' (এভাবে মৃতকে জীবিত করি, যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ করো)। এখানে 'কাজালিকা' (এভাবে) অর্থ— অজন্মা ভূখণ্ডকে এভাবে করি শস্য-শ্যামল।

'নুখরিজুল্ মাউতা'—মৃতকে করি জীবিত। তাজাক্কারুন অর্থ— যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ করতে পারো। অর্থাৎ মৃত ভূমিকে জীবিত করার এই বিস্ময়কর নিদর্শন দেখে তোমরা যেনো এ বিষয়ে প্রত্যয়ী হয়ে উঠতে পারো যে, এভাবে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা যাঁর রয়েছে, তিনি নিশ্চয় আখেরাতে সকল মৃতকে পুনর্বার জীবিত করতে পারবেন। প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি অবশ্যই সহজ।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রথম বার শিংগায় ফুঁ দেয়া হলে সকল সৃষ্টি মৃত্যুবরণ করবে। তখন আল্লাহ্তায়ালা আরশের নিম্নদেশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ওই বর্ষণের নাম 'আবে হায়াত'— যেমন বর্ষিত হয় পুরুষের মণি বা বীর্য। ওই বর্ষণের মাধ্যমে মানুষ তাদের কবরে উদ্ভিদের মতো বেড়ে উঠতে থাকবে। এভাবে যখন তাদের অবয়ব পূর্ণ হবে, তখন সে অবয়বগুলোতে করা হবে জীবন সম্পাত। তারপর তাদের উপর আপতিত হবে ঘন ঘোর নিদ্রা। যখন তারা কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে, তখনও তাদের চোখে মুখে থাকবে ঘুমের প্রভাব। তারা বলতে থাকবে, হায়! কে আমাদেরকে এই ঘন ঘোর ঘুম থেকে জাগালো?

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে দু'বার। এই দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ। হজরত আবু হোরায়রার নিকট থেকে এই হাদিস শ্রবণ করে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, চল্লিশ অর্থ কি চল্লিশ দিন? হজরত আবু হোরায়রা বললেন, না। লোকেরা বললো, তবে কি চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, তাও নয়।

www.eelm.weebly.com

লোকেরা পুনরায় বললো, তবে কি চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, আমি তাও বলতে পারবো না (অর্থাৎ রসুল স. কেবল বলেছেন, চল্লিশ। দিন মাস বা বছরের উল্লেখ তিনি করেননি)। এরপর বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক তখন আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ওই বৃষ্টি বর্ষণের ফলে বৃক্ষের চারার মতো মানুষের জীবন অঙ্কুরিত হবে এবং তা ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠতে থাকবে। ওই পুনর্জীবন ক্রমপরিণতি লাভ করতে থাকবে তাদের অস্থিসমূহকে অবলম্বন করে। আবু দাউদও এই হাদিসটির বর্ণনাকারী। হজরত আনাসের বর্ণনায় অবশ্য স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, শিংগায় দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ বছর। ওই চল্লিশ বছর ধরে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর মৃত সৃষ্টির উপর জীবনসঞ্চারক বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শিংগার দুই ফুৎকারের অন্তর্বর্তী সময় হবে চল্লিশ বছর। ওই সময় আরশের নিম্নদেশ থেকে প্রবাহিত হবে পানির প্রস্রবণ। ওই পানি বর্ষণের মাধ্যমে মৃত মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু, পাখি ও অন্যান্য প্রাণীকুল লাভ করবে নতুন অবয়ব। সে অবয়ব হবে অবিকল পূর্বের অবয়বের মতো। এরপর ওই অবয়বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে রুহ্ বা আত্মাকে। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে— ওয়া ইজান্ নুফুসু যুইয়্যিজাত (যখন প্রাণগুলো সংযোজিত হবে)। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর। হুলাইমী বলেছেন, ঐকমত্য এই যে, শিংগার দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ বছর। মুরসাল, হাসান বর্ণনাসূত্রে ইবনে মোবারকও এ রকম বলেছেন।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৫৮

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

❑ এবং উৎকৃষ্ট ভূমি— ইহার ফসল ইহার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যাহা নিকৃষ্ট তাহাতে কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই জন্মায় না; এইভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিভিন্নভাবে বিবৃত করি।

এখানে 'আল বালদুত্ তইয়্যেব' অর্থ উৎকৃষ্ট ভূমি। 'বিইজ্নি রব্বিহি' অর্থ— আল্লাহ্র ইচ্ছায় বা আদেশে। 'ওয়াল্লাজি খাবুছা' অর্থ— যা অনুর্বর (ভূমি)। আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে— ফসল উৎপন্ন হয় আল্লাহ্তায়ালার আদেশেই। কিন্তু তা উৎকৃষ্ট ভূমিতে উৎপন্ন হয় অল্প আয়াসে এবং নিকৃষ্ট ভূমিতে উৎপন্ন হয় কঠোর পরিশ্রমের ফলে।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্তায়ালার অতুলনীয় পরাক্রম ও অনুগ্রহের বিবরণ দেয়া হয়েছে। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে, দয়াময় প্রভুপ্রতিপালক আল্লাহ্র অনুগ্রহ সকলের প্রতি সমভাবে বর্ষিত হয়। কিন্তু সৃষ্টির যোগ্যতার তারতম্য হেতু

www.eelm.weebly.com

সকলে সমভাবে উপকৃত হয় না। যেমন, বৃষ্টি— সকল মাটিতে বর্ষিত হলেও সকল ক্ষেত্রে একই রকম ফল ও ফসল উৎপাদিত হয় না। অধিকতর যোগ্য ও উৎকৃষ্ট ভূমিতে প্রকাশিত হয় ফল ও ফসলের বিপুল সমারোহ। আর ধারণযোগ্যতার ন্যূনতার কারণে নিকৃষ্ট ভূমিতে দেখা দেয় শস্যের স্বল্পতা। তাই দানের ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য না ঘটলেও তারতম্য ঘটে গ্রহণের ক্ষেত্রে।

আয়াতের অন্তর্নিহিত বক্তব্য এই যে, নবী ও রসুল প্রেরণ বিশ্বমানবতার জন্য এক বিশাল রহমত। এই রহমত সাধারণভাবে সকলের নিকট প্রেরিত। কিন্তু এই রহমতের নামে উপকৃত হয় কেবল বিশ্বাসীরা। আল্লাহ্তায়ালার দানের যথাসমাদর করার যোগ্যতা তাদের রয়েছে। তারা তত্ত্ব অনুসন্ধানী, বিবেচক এবং কৃতজ্ঞচিত্ত। তাই এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে— এভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিভিন্নভাবে বিবৃত করি।

হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে যে নির্দেশনা ও জ্ঞান দান করে প্রেরণ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত বৃষ্টিপাতের মতো। উৎকৃষ্ট ভূমিতে বৃষ্টিপাত হলে যেমন সেখানে উৎপন্ন হয় বিপুল ফল ও ফসল, তেমনি হেদায়েত গ্রহণের যোগ্য যারা তারা হয়ে উঠে ইমান, হেদায়েত ও সাফল্যের ফসলে পরিপূর্ণ। আর কঠিন মৃত্তিকায় বৃষ্টি বর্ষিত হলে, ধারণযোগ্যতার অভাবে যেমন সে মাটি সিক্ত হয় না, ফলে সেখানে জন্মলাভ করে না কোনো তৃণ, উদ্ভিদ এবং তৃণলতাও, তেমনি হেদায়েত গ্রহণের অযোগ্য চরিত্ররাও চিরবঞ্চিত রয়ে যায় প্রকৃত পথপ্রদর্শন থেকে। তাই সমভাবে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণের আওতায় আসা সত্ত্বেও বিশ্বাসী ও কৃতজ্ঞচিত্তরা হয় সফল। আর অসফল হয় অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞরা।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৫৯

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۖ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

❒ আমি তো নূহ্কে পাঠাইয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহের ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। আমি তোমাদিগের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করিতেছি।'

'লাক্বাদ্ আরসালনা নুহান ইলা ক্বওমিহি' অর্থ— আমি তো নূহ্কে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট। এখানে 'লাক্বাদ আরসালনা' (আমি তো পাঠিয়েছিলাম) কথাটি একটি অনুক্ত শপথের জবাব। এখানে উল্লেখিত 'লাম' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে নৈকট্য অর্থে। আর এ নৈকট্য প্রকাশক 'লাম' কখনো 'ক্বদ্' শব্দ ব্যতিরেকে ব্যবহৃত হয় না।

www.eelm.weebly.com

হজরত নূহের বংশপরিচয় এ রকম, হজরত নূহ্ ইবনে লামাক অথবা লামাক বিন মুতাশাআলিখ অথবা মুতা শাওলিখ বিন খুনুখ অথবা আখনুখ। তাঁর মায়ের নাম আওফাহ্ অথবা ফাইউনুস বিনতে বারালিক বিন কাতাশা ও আলিখ। আখনুখই হচ্ছেন হজরত ইদ্রিস। নবীগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কলম দিয়ে লেখার প্রথা প্রবর্তন করেন। আখনুখ বিন মাহ্লীল অথবা মাহ্লায়েল। এর পিতার নাম কিনান অথবা কানেন)। কানেনের পিতার নাম নুশ অথবা মানীশ। মানীশের পিতা হচ্ছেন হজরত শীশ। আর হজরত শীশ ছিলেন হজরত আদমের পুত্র।

মুসতাদ্রাক গ্রন্থে রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত আদম থেকে হজরত নুহ পর্যন্ত ব্যবধান ছিলো দশ পুরুষের। হজরত আবু জর গিফারী থেকে মারফু সূত্রে তিবরানীও এ রকম বর্ণনা করেছেন। উপরের আলোচনা থেকে এ কথাটিই স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, হজরত ইদ্রিস ছিলেন হজরত নুহের পূর্ববর্তী সময়ের নবী। অধিকাংশ সাহাবীও এ রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত নুহের প্রকৃত নাম ছিলো সাকান, শাকির অথবা ইয়াশাকির। হজরত আদমের পর তিনিই ছিলেন তাঁর সমকালীন মানবতার পথপ্রদর্শক এবং আশ্রয়স্থল। তাই তাঁর নাম হয়েছে সাকান। আল্লামা সুয়ূতি তাঁর ইতকান গ্রন্থে মুসতাদরাক গ্রন্থের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, হজরত নুহের প্রকৃত নাম ছিলো আবদুল গাফ্ফার। তিনি নিজের জন্য এবং স্বসম্প্রদায়ের জন্য অনেক কেঁদেছেন। তাই তাঁর উপাধি হয়েছে নুহ। অথবা কিয়ামতের ভয়ে তিনি অধিকাংশ সময় থাকতেন রোদন ভারাক্রান্ত। তাই তাঁর নাম হয়েছে নুহ।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি একবার একটি কুৎসিতদর্শন কুকুরকে দেখে বলেছিলেন, কী কুৎসিত! আল্লাহ্পাক তখন কুকুরের মুখে ভাষা দিলেন। কুকুর বললো, দোষ কি তবে আমার না আমার স্রষ্টার? এ কথা শুনে হজরত নুহ্ বেহুঁশ হয়ে গেলেন। যখন হুঁশ ফিরে এলো, তখন দীর্ঘক্ষণ ধরে রোদন করলেন তিনি।

বাগবী লিখেছেন, কপালে ফোঁটাবিশিষ্ট একটি কুকুরকে দেখে হজরত নুহ একবার বলেছিলেন, নাপাক, নাপাক। দূর হয়ে যাও। এরপর প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো— হে নুহ! তুমি কুকুরকে দোষ দিচ্ছো, না তার স্রষ্টাকে।

কেউ কেউ বলেছেন, তিনি অবিশ্বাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। তাই আল্লাহ্তায়ালা অবিশ্বাসীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন মহাপ্লাবনের মাধ্যমে। সেই বদদোয়া করার কারণে তিনি অনেক অনেক কেঁদেছেন। তাই তিনি হয়েছেন নুহ। কারো কারো অভিমত হচ্ছে, মহাপ্লাবনের সময় তাঁর এক অবিশ্বাসী পুত্র কেনানকে উদ্ধারের জন্য তিনি

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোয়া করেছিলেন। ওই স্বাভাবিক অথচ নিষিদ্ধ পুত্র বাৎসল্যের কথা স্মরণ করে তিনি প্রায়শঃ লজ্জিত ও রোদনার্ত থাকতেন। তাই তিনি উপাধি পেয়েছেন নুহ।

চল্লিশ বছর বয়সে হজরত নুহের উপর নবুয়তের গুরুভার অর্পণ করা হয়। হাকেমের মুসতাদ্‌রাক গ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাসের মারফু সূত্রে এসেছে, আল্লাহ্তায়ালা চল্লিশ বছর বয়সে হজরত নুহকে নবুয়ত দান করেছিলেন। নয়শত পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি ধর্মপ্রচার করেছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে। অল্পসংখ্যক লোক তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছিলো। অধিকাংশই ছিলো অবিশ্বাসী ও অত্যাচারী। তাদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাদের ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করেছিলেন তিনি। আর মহাপ্লাবনের পর তিনি পৃথিবীতে ছিলেন ষাট বছর।

'খুলাসাতুস সায়ের' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হজরত নুহ নবী হয়েছিলেন তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে। মহাপ্লাবনের পর তিনি পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন চারশত পঞ্চাশ বছর। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি নবী হয়েছিলেন দুইশত পঞ্চাশ, চারশত পঞ্চাশ অথবা চারশত ষাট বছর বয়সে। মহাপ্লাবন শেষ হওয়ার পর তিনি পৃথিবীতে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন আরো দুইশত পঞ্চাশ বছর। তাঁর পৃথিবীর বয়স ছিলো সর্বমোট চৌদ্দশত পঞ্চাশ বছর।

মুকাতিল বলেছেন, একশত বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেছিলেন হজরত নুহ। ইবনে জারীর বলেছেন, হজরত নুহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন হজরত আদমের মহাপ্রস্থানের আটশত ছাব্বিশ বছর পর। আমি বলি, এই হিসাবটি সঠিক হলে বুঝতে হবে হজরত নুহের মহাতিরোধান ঘটেছিলো হজরত আদমের মহাআবির্ভাবের দুই হাজার আটশত ছাপ্পান্ন বছর পর। হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত আদম পৃথিবীতে ছিলেন নয়শত ষাট বছর। তাঁর পৃথিবীর আয়ু ছিলো এক হাজার বছর। কিন্তু সে আয়ু থেকে চল্লিশ বছর আয়ু তিনি দিয়েছিলেন হজরত দাউদকে।

আল্লামা নববী তাঁর তাহ্জীব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কোনো নবীই পৃথিবীতে হজরত নুহের সমান হায়াত পাননি।

এরপর বলা হয়েছে— এবং সে বলেছিলো, ' হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি'। — সত্যের প্রতি এই উদাত্ত আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানেরা। সে কথাই বিবৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

www.eelm.weebly.com

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ۝

❒ তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিয়াছিল, 'আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি।'

❒ সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোন ভ্রান্তি নাই, আমি তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের রসূল,

❒ আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদিগের নিকট পৌঁছাইতেছি ও তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিতেছি এবং তোমরা যাহা জান না আমি তাহা আল্লাহের নিকট হইতে জানি।'

❒ 'তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে তোমাদিগেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের নিকট উপদেশ আসিয়াছে যাহাতে সে তোমাদিগকে সতর্ক করে, তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ কর।'

❒ অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাহাকে ও তাহার সঙ্গে যাহারা তরণীতে ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করি, এবং যাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করি। তাহারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।

উদ্ধৃত পাঁচটি আয়াতের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিলো, আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি'। এখানে 'আলমালাউ' অর্থ সম্প্রদায়ের প্রধানগণ। হজরত নুহের সম্প্রদায়-প্রধানেরা ছিলো অত্যন্ত প্রতাপশালী। তাই তাদেরকে বলা হতো 'মালা'। 'দ্বলালিম্ মুবীন' অর্থ স্পষ্ট

www.eelm.weebly.com

ভ্রান্তি। 'তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি'— সম্প্রদায়-প্রধানদের এই জঘন্য উক্তির যথাযথ জবাব দিয়েছিলেন হজরত নুহ। পরের আয়াতে (৬১) তা বলে দেয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে— 'সে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোনো ভ্রান্তি নেই, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রসুল'। 'দ্বলালুন' শব্দটির অর্থ— ভ্রান্তি। আর 'দ্বলালাতুন' শব্দটির অর্থ সামান্যতম ভ্রষ্টতা বা ভ্রান্তি। আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে 'দ্বলালাতুন'। অর্থাৎ এখানে হজরত নুহ সামান্যতম ভ্রান্তিকেও স্বীকার না করে এ রকম বলেছেন যে, হে জনতা! তোমরা নিতান্তই অজ্ঞ, মূর্খ। তাই তোমরা আমাকে ভ্রান্ত বলতে পারছো। কিন্তু শুনে নাও হে আমার সম্প্রদায়! আমার অস্তিত্বে ও চরিত্রে সামান্যতম বিভ্রান্তিও নেই। কারণ, আমি সমগ্র সৃষ্টির প্রতিপালক আল্লাহ্তায়ালার বাণীবাহক। আমি তো নিয়ে এসেছি ইমান, হেদায়েত এবং সরল পথের আহ্বান। আমি সত্য রসুল। সুতরাং আমার বিভ্রান্তি অসম্ভব। এই বক্তব্যের ধারাবাহিকতা প্রবহমান রয়েছে পরবর্তী আয়াতেও (৬২)।

বলা হয়েছে—'আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি ও তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছি এবং তোমরা যা জানো না আমি তা আল্লাহ্র নিকট থেকে জানি।' এখানে উল্লেখিত 'রিসালাতি' শব্দটি 'রিসালাতুন' শব্দের বহুবচন। এখানে বহুবচনের শব্দরূপ ব্যবহৃত হয়েছে এ কারণে যে— ১. রসুলগণের রেসালাতের সময় ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। ২. অর্থগত দিক থেকেও রেসালাত শব্দটি বিভিন্ন অর্থবোধক। কখনও এর সম্পর্ক বিশ্বাসের সঙ্গে, কখনও কর্মের সঙ্গে, আবার কখনও উপদেশ অথবা নির্দেশের সঙ্গে। ৩. অথবা এখানে রেসালাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই সকল বার্তা ও নির্দেশনা যেগুলো দেয়া হয়েছিলো পূর্ববর্তী নবীগণকে। যেমন, হজরত শীশ এবং হজরত ইদ্রিসের উপর অবতীর্ণ আসমানী সহীফাদ্বয়।

এখানে 'আনসাহু' (হিতোপদেশ) শব্দটি এসেছে 'নসহুন বা নসীহাতুন' (সদুপদেশ অথবা কল্যাণকামনা) থেকে। বাগবী লিখেছেন, এর অর্থ উত্তম ও কল্যাণকর এমন কিছু, যা নিজের জন্য এবং অন্যের জন্য সমানভাবে কাঙ্খিত।

'মিনাল্লহ্' অর্থ— আল্লাহ্র নিকট থেকে। অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হজরত নুহের শেষ উক্তিটি হচ্ছে— তোমরা যা জানো না আমি তা আল্লাহ্র নিকট থেকে জানি। এ কথার মর্মার্থ হচ্ছে— আমি আল্লাহ্তায়ালার সত্য রসুল। নির্ভুল প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমাকে জ্ঞান দান করা হয়। জ্ঞানার্জনের এ রকম সুরক্ষিত কোনো ব্যবস্থা তোমাদের নেই। তাই আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে, তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ করো।' এখানে 'আও আ'জিবতুম' (তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো) একটি অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। অর্থাৎ এই প্রশ্নটির মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের বিস্ময়কে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কথাটির পূর্বে বসানো হয়েছে সংযোজক অব্যয়—'আও' (অথবা)। কিন্তু সংযোগযোগ্য বিষয়টি এখানে রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ত বিষয়সহ তাই বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে এ রকম— তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো (আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করছো। বস্তুতঃ বিস্মিত হবার কিছু নেই)।

এখানে 'জিকরুন' শব্দটির অর্থ উপদেশ। এ রকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ— বিবরণ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ— প্রত্যাদেশিত বার্তা।

'আলা রজুলিম মিনকুম' কথাটির অর্থ— তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে। অর্থাৎ তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত একজনের মাধ্যমে। এ রকম বলার কারণ হচ্ছে, তাদের ধারণা ছিলো, মানুষ কখনো আল্লাহ্তায়ালার রসুল বা বাণীবাহক হতে পারে না। কেবল ফেরেশতারাই রসুল হওয়ার যোগ্য। অবিশ্বাসীরা এ রকম কথাও বলতো যে, এ রকম কথা তো আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শুনিনি।

'লিতুনজিরাকুম' কথাটির অর্থ— যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে। 'ওয়া লিতাত্তাকু' কথাটির অর্থ তোমরা সাবধান হও। আর 'ওয়া লায়া'ল্লাকুম তুরহামুন' কথাটির অর্থ— এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ করো। এখানে 'লাআ'ল্লা' শব্দটি হচ্ছে— হরফে তামান্না (আশাব্যঞ্জক অক্ষর)। সুতরাং এখানে—'তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ করো' কথাটির অর্থ হচ্ছে— তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো বা সাবধান হও, কিন্তু এ কথা মনে কোরো না যে, তাকওয়া অবলম্বন করলেই আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে অনুকম্পা করতে বাধ্য হবেন। আল্লাহ্তায়ালা সকল বাধ্যবাধকতা থেকে পবিত্র। তাকওয়া বা সাবধানতাকে তিনি বানিয়েছেন তাঁর রহমতপ্রাপ্তির উপায় বা অবলম্বন। তাই এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, অবলম্বন বা উপায় হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টি ও নির্ধারণ। সৃষ্টির অধীন হওয়া তাঁর পক্ষে একটি অসম্ভব ব্যাপার। তাই তিনি কাউকে অনুকম্পা প্রদান করতে বাধ্য নন। সুতরাং এই নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে যে— সাবধান হও এবং সাবধানতা অবলম্বনের মাধ্যমে আশাধারী হয়ে থাকো যে, আল্লাহ্তায়ালা যেহেতু অনুকম্পাপরবশ, তাই তিনি অনুকম্পা দানে নিরাশ করবেন না।

www.eelm.weebly.com

আবু নাঈমের মাধ্যমে হজরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বনী ইসরাইলের নবীর নিকট একবার প্রত্যাদেশ করা হলো— হে নবী! তোমার অনুগত উম্মতকে জানিয়ে দাও, তারা যেনো তাদের আমলের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত না হয়। কেননা কিয়ামতের দিন হিসাবের সময় আমি যাকে খুশী তাকে শাস্তি দান করবো। হে নবী! তুমি তোমার অবাধ্য উম্মতদেরকেও বলে দাও, নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলো না (মুক্তি অসম্ভব জেনে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না)। কেননা কিয়ামতের দিন আমি অনেক বড় বড় পাপীকে ক্ষমা করে দিবো। কারো পরোয়া করবো না।

এর পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাকে ও তার সঙ্গে যারা তরণীতে ছিলো আমি তাদেরকে উদ্ধার করি, এবং যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলো তাদেরকে নিমজ্জিত করি।' এখানে বক্তব্যবিষয় হচ্ছে— হজরত নুহের পথ প্রদর্শনের প্রচেষ্টা বিফল হলো। অবাধ্য জনগোষ্ঠী তাঁকে ক্রমাগত দিয়েই চললো মিথ্যাচারিতার অপবাদ। দীর্ঘ দিন ধরে এ অবস্থা চলার পর আমার নির্দেশে শুরু হলো মহাপ্লাবন। ওই মহাবিপর্যয় থেকে উদ্ধার লাভের জন্য নুহকে নৌকা নির্মাণের নির্দেশ দিলাম আমি। সেই নৌকায় উঠে বসলো নুহ ও তার অনুগত উম্মতেরা। ভয়াবহ প্লাবনে নিমজ্জিত হলো সারা পৃথিবী। নুহের নৌকার আরোহীরা কেবল উদ্ধার পেলো। এভাবে আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম এবং নিমজ্জিত করে দিলাম ওই সকল মানুষকে, যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো।

উল্লেখ্য যে, হজরত নুহের নৌকায় আরোহণ করেছিলেন তাঁর চল্লিশজন বিশ্বাসবান ও চল্লিশজন বিশ্বাসবতী উম্মত। এক বর্ণনায় এসেছে, নৌকার আরোহী ছিলেন আটজন কিংবা দশজন পুরুষ ও নারী। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, নৌকার আরোহী ছিলেন হজরত নুহ সহ তাঁর তিনপুত্র— শাম, হাম, ইয়াফিস, তাঁদের তিন স্ত্রী অথবা তিন সন্তান এবং আরো ছয়জন ইমানদার মানুষ। এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। আর তথ্যগত বৈসাদৃশ্যও রয়েছে সেগুলোতে।

শেষে বলা হয়েছে—'তারা ছিলো এক অন্ধ সম্প্রদায়'। এ কথার অর্থ— হজরত নুহের অবাধ্য সম্প্রদায় ছিলো অন্তর্দৃষ্টিবিবর্জিত। অর্থাৎ যে দৃষ্টিতে সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সেই অন্তর্নিহিত দৃষ্টি অবাধ্যদের ছিলো না। এখানে 'কৃওমান আ'মীন' অর্থ অন্ধ সম্প্রদায়। আ'মীন শব্দটি 'আ'মইউন' শব্দের বহুবচন। শব্দটি আসলে ছিলো 'আ'ম্মিইয়্যিন'। সহজ উচ্চারণের তাগিদে শব্দটির একটি 'ইয়া' অক্ষর বাদ পড়েছে।

www.eelm.weebly.com

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ○ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ○ قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِى سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ○ أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّى وَأَنَا۠ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ○

❒ আ'দ জাতির নিকট উহাদিগের ভ্রাতা হূদকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তোমরা কি সাবধান হইবে না?'

❒ তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা তো দেখিতেছি তুমি একজন নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদী মনে করি।'

❒ সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নহি, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রসূল।'

❒ 'আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদিগের নিকট পৌছাইতেছি এবং আমি তোমাদিগের একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা।'

উদ্ধৃত আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'আ'দ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা হূদকে পাঠিয়েছিলাম।' আ'দ সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ ছিলেন হজরত নুহ। তাদের বংশধারা এ রকম, আ'দ—আউস—এরম—সাম—নুহ। এখানে 'আখাহুম হুদান' অর্থ— তাদের সম্প্রদায়ভূত ভ্রাতা, ধর্মীয় ভ্রাতা নয়।

হজরত হূদের পিতা ছিলেন আবদুল্লাহ্ বিন রিয়াহ্। তাঁর পিতা ছিলেন খুলুদ। তাঁর পিতা ছিলেন আস এবং তাঁর পিতা ছিলেন আউস। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হজরত হূদ ছিলেন শালেখ বিন আরফাখশায বিন সাম বিন হজরত নুহ এর পুত্র।

শায়েখ আবু বকর তাঁর শরহে খুলাসাতুসসায়ের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত হূদের আসল নাম ছিলো আবার, আবের, উবাইর অথবা গুবাইর। আর তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন শালেখ বিন কায়নান বিন আরফাখশায বিন হিশাম বিন নূহের পূর্বে। সকল বংশপরিচয় (নসবনামা) বিষয়ক গ্রন্থে এ রকমই বর্ণিত

www.eelm.weebly.com

হয়েছে। কিন্তু একটি বিরল বর্ণনায় এসেছে, হজরত হূদের বংশধারা এ রকম— হূদ—খালিদ—খুলুদ—আয়েস—আমালি—কআ'দ—আউস—এরেম—শাম—নুহ। হজরত হূদের মায়ের নাম ছিলো মাকআবাহ্ বিনতে উয়াইলাম বিন শাম বিন নুহ। হজরত হূদের ললাটে রসুল মোস্তফা স. এর নূর সমুদ্ভাসিত ছিলো। মানুষ ওই নূরের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলতো, এই ব্যক্তি এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করবে এবং মূর্তি ভেঙে দিবে। মানুষ তাকে অত্যধিক শ্রদ্ধা করতো। তাঁর পরলোক গমনের পর একশত বছরের মধ্যে আর কোনো নবী আসেননি। একশত বছর পরে এসেছিলেন হজরত সালেহ্। তখন রাজা প্রজা সকলেই সরে গিয়েছিলো একত্ববাদের পথ থেকে। কেউ হয়ে গিয়েছিলো মূর্তিপূজক, কেউ সূর্যপূজক, আবার কেউ অগ্নিপূজক। হজরত সালেহ্কে আল্লাহ্তায়ালা পাঠিয়েছিলেন সামুদ জাতিকে হেদায়েতের জন্য। হজরত হূদ ছিলেন হজরত নুহের শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর পৃথিবীর আয়ু ছিলো চারশত বছর অথবা চারশত ষাট বছর। তাঁর মায়ের নাম ছিলো মারজানা। তাঁর পবিত্র সমাধি রয়েছে 'হাদ্বরা-মাউত' নামক স্থানে। কেউ কেউ বলেছেন মক্কায়। এই শেষ কথাটি শায়েখ আবু বকরের নিজস্ব অভিমত।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, হজরত হূদের পবিত্র সমাধি রয়েছে হাদ্বরা মাউতের লাল টিলায়।

হজরত আবদুর রহমান বিন সাবেতের বর্ণনায় রয়েছে, হাজরে আসওয়াদ, জমজম এবং মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যবর্তী স্থলে রয়েছে তিরানব্বই জন নবীর কবর। ওই কবরগুলোর মধ্যেই রয়েছেন হজরত হূদ, হজরত সালেহ্ এবং হজরত শোয়ায়েব। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নবীদের কোনো সম্প্রদায় সীমালংঘন করার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ওই নবীগণ তাঁদের অনুগত উম্মতদেরকে নিয়ে চলে আসতেন মক্কায়। সেখানে পৃথিবীর জীবন সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সকলে ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। ইন্তেকালের পর সেখানেই দাফন করা হতো তাঁদেরকে।

এখানে হজরত হূদকে বলা হয়েছে, 'তাদের ভ্রাতা'। ইবনে ইসহাক বলেছেন, এ কথার অর্থ— বংশগত ভ্রাতা। শায়েখ আবু বকর বলেছেন, হজরত হূদ ছিলেন 'আ'দ' জাতির সমকক্ষ বা সমগোত্রীয়। তাদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে হজরত হূদকে পয়গম্বর নির্বাচিত করার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, তারা যেনো সহজেই তাদের নবীর কথা বুঝতে পারে এবং সহজে আকৃষ্ট হতে পারে সত্যধর্মের দিকে। ভিন্ন ভাষাভাষী কাউকে নবী করলে, সেই নবীর বক্তব্য তাদের নিকট সহজবোধ্য হতো না এবং তাদের মূর্খ নেতারা দুর্বোধ্যতার দোহাই দিয়ে জনতাকে সহজেই সত্যবিমূখ করে দিতে পারতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই। তোমরা কি সাবধান হবে না'? এখানে 'ক্বলা ইয়া ক্বওমি' (সে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়) সম্বোধনটি

www.eelm.weebly.com

একটি না সূচক সম্বোধন। তাই এখানে ফাকুলা বলা হয়নি। 'ইয়াত্তাকুন' (তারা কি সাবধান হবে না)। কথাটির কর্ম এখানে উহ্য। তাই আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— তারা কি সাবধান হবে না?

পরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিলো তারা বলেছিলো, আমরা তো দেখছি তুমি একজন নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদী মনে করি।'

হজরত হূদের সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ ইমান এনেছিলো। কেউ কেউ আনেনি। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিলো তারা বলেছিলো'। হজরত নূহের সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে কেউই ইমান আনেনি। তাই ইতোপূর্বে (আয়াত ৬০) বলা হয়েছে 'তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিলো।' এখানে 'ফি সাফাহাতিন' অর্থ নির্বুদ্ধিতা। অর্থাৎ হজরত হূদের সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী প্রধানেরা তাঁকে বলেছিলো, 'আমরা তো দেখছি তুমি একজন নির্বোধ।' এ কথার অর্থ— হে হূদ! তুমি নির্বোধ। কারণ তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করতে চাচ্ছো। তারা আরো বলেছিলো—'এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদী মনে করি।' এ কথার অর্থ— হে হূদ! তুমি তো একটি অসম্ভব দাবি করে বসেছো। মানুষ কি কখনো রসুল হয়? এ কথায় বুঝা যায়, অন্যান্য নবীদের অবাধ্য উম্মতদের মতো হজরত হূদের সম্প্রদায়ের অবাধ্য উম্মতেরাও মনে করতো, নবী ও রসুল হতে পারে কেবল ফেরেশতা, মানুষ নয়।

পরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে—'সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রসুল।'

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে—'আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা।' এ কথার অর্থ— হজরত হূদ বললেন, হে আমার অবোধ সম্প্রদায়! আমি আমার প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত সত্য রসুল— বাণীবাহক। আমি আমার প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত সত্যবাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি। তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করো। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করো যে, আমি তোমাদের প্রকৃত হিতাকাংখী— বিশ্বস্ত উপদেষ্টা।

কালাবী বলেছেন, হজরত হূদের আলোচ্য বক্তব্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বলা যে— হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের মধ্যেই বেড়ে উঠেছি। তোমরা ভালো করেই জানো মিথ্যাচারিতার লেশমাত্র আমার চরিত্রে নেই। আজ যখন আমি আল্লাহ্তায়ালার বাণীবাহকরূপে তোমাদেরকে সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে নির্বুদ্ধিতা ও মিথ্যাচারিতার অভিযোগ আনছো কেনো?

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য যে, সকল নবী ও রসুল এ কথা ভালো করেই জানতেন যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা চরম ভ্রান্ত ও নির্বোধ। কিন্তু ধৈর্য ও শিষ্টাচারের সঙ্গে তাঁরা বারংবার তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, আমাদেরকে তোমরা বিরুদ্ধবাদী মনে করো কেনো? তোমাদের প্রকৃত হিতাকাংখী তো আমরাই। তাঁদের এ রকম কথায় প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত দয়ার্দ্র ও সহিষ্ণু। তাই শুভ সম্বোধনের মাধ্যমে তাঁরা অবাধ্যদেরকে আকৃষ্ট করতে চাইতেন সত্যপথের দিকে। অবাধ্যদের প্রতি কতোটুকু দয়ার্দ্র ও সহিষ্ণু হতে হবে, সেই নির্দেশনাটিই নিহিত রয়েছে আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত হজরত হূদের বক্তব্যের মধ্যে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৬৯, ৭০, ৭১

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوٓا۟ إِذْ
جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۖ فَاذْكُرُوٓا۟
ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُۥ وَنَذَرَ مَا كَانَ
يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ ۝ قَالَ قَدْ وَقَعَ
عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَٰدِلُونَنِى فِىٓ أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ
وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ فَانتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ۝

❐ তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে তোমাদিগের নিকট তোমাদিগের একজনের মাধ্যমে তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য উপদেশ আসিয়াছে? এবং স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদিগের অবয়ব অন্য লোক অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহের অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হইবে।'

❐ তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদিগের নিকট এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছ যে আমরা যেন শুধু আল্লাহের ইবাদত করি এবং আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ যাহার ইবাদত করিত তাহা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।'

www.eelm.weebly.com

❑ সে বলিল, 'তোমাদিগের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদিগের উপর নির্ধারিত হইয়াই আছে; তবে কি তোমরা আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাহ এমন কতকগুলি নাম সম্বন্ধে যাহা তোমরা ও তোমাদিগের পিতৃপুরুষগণ সৃষ্টি করিয়াছ এবং যে সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠান নাই? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদিগের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটির মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করছেন, হে আদ সম্প্রদায়! তোমরা কি এ কথা ভেবে বিস্মিত হচ্ছো যে, তোমাদের নিকট তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করবার জন্য উপদেশ অবতীর্ণ হচ্ছে কীভাবে? এই উপদেশ তো অবতীর্ণ হচ্ছে তোমাদেরই উপকারের জন্য। এর মাধ্যমে তোমাদের নবী হূদ অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার শাস্তি সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছে— সতর্ক করছে। স্মরণ করো, নূহের অবাধ্য সম্প্রদায়ের বিনাশ সাধনের পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে অধিকতর শারীরিক সৌষ্ঠব, শক্তিমত্তা। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত এই বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এই নেয়ামতের। যদি এ রকম করো, তবে তোমরা হয়তো হবে সফলকাম।

এখানে 'বাস্ত্বাতান্' অর্থ দীর্ঘ ও বলশালী। কালাবী এবং সুদ্দী বলেছেন, সামুদ সম্প্রদায়ের দীর্ঘতম ব্যক্তির উচ্চতা ছিলো একশত হাত। আর হ্রস্বতম ব্যক্তির উচ্চতা ছিলো সত্তর হাত। আবু হামজা ইয়ামিনী বলেছেন, তাদের গড় উচ্চতা ছিলো সত্তর হাত। আশি হাতের কথা বলা হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায়। মুকাতিলের বর্ণনায় রয়েছে বারো হাতের কথা। ওয়াহাব বলেছেন, তাদের কোনো কোনো লোকের মস্তক ছিলো গম্বুজসদৃশ এবং চোখের কোটর, নাক ও কানের ছিদ্র ছিলো এতো বড় যে, ভোঁদড় জাতীয় প্রাণী সেখানে অনায়াসে তাদের শাবক প্রসব করতে পারতো।

আয়াতের শেষে আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে বিশেষ অনুগ্রহরূপে প্রদত্ত অভূতপূর্ব শারীরিক সামর্থ্যের কথা স্মরণ করতে বলেছেন, যেনো এই স্মরণ হয় কৃতজ্ঞতার কারণ এবং কৃতজ্ঞতা যেনো কারণ হয় সফলতার। সে কারণে শেষ বাক্যটিতে বলা হয়েছে— সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।

পরের আয়াতটির (৭০) মর্মার্থ হচ্ছে— অবাধ্যরা বললো, হে হূদ! তুমি কি আমাদের কাছে এই উদ্দেশ্যে এসেছো যে, আমরা যেনো শুধু আল্লাহ্র ইবাদত করি, আর পরিত্যাগ করি ওই সকল প্রতিমাগুলোকে যেগুলোর উপাসক ছিলো

www.eelm.weebly.com

আমাদের পূর্বপুরুষেরা। হে হূদ! তুমি তো আমাদেরকে আযাবের ভয় দেখাও। সুতরাং, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদেরকে যে আযাবের ভয় তুমি দেখাচ্ছো; তা সত্বর নিয়ে এসো।

এখানে 'তুমি কি আমাদের নিকট এই উদ্দেশ্যে এসেছো' কথাটির অর্থ— হে হূদ! তুমি কি তবে অন্য কোনো স্থান থেকে অথবা আকাশ থেকে আমাদের কাছে নেমে এসেছো। 'আমাদের পূর্বপুরুষগণ যার ইবাদত করতো' অর্থ— আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে সকল দেব-দেবীর উপাসনা করতো। এই আয়াতে উল্লেখিত অবাধ্যদের উক্তিসমূহ ছিলো হজরত হূদের প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ও শ্লেষ। এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, হজরত হূদ তাদেরকে আল্লাহ্তায়ালার আযাবের ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। তাই তাদের বক্তব্য ছিলো এ রকম শ্লেষাত্মক। চিরভ্রষ্ট ছিলো বলেই তারা ছিলো আল্লাহ্তায়ালার আযাব সম্পর্কে নির্ভয়। তাই তারা এ কথাও বলতে পেরেছিলো যে— সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার (যে আযাবের) ভয় দেখাচ্ছো, তা আনয়ন করো।

উদ্ধৃত আয়াতত্রয়ের শেষটির (৭১) মর্মার্থ হচ্ছে— অবাধ্যদের অনড় অবিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে আল্লাহ্র নবী হজরত হূদ বললেন, হে অবাধ্য সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র আযাব কামনা করছো। কিন্তু তোমরা এ কথা জানো না যে, তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েই রয়েছে। হে অবিমৃশ্য জনতা! তোমরা কি তোমাদের পথভ্রষ্ট পিতৃপুরুষদের স্বসৃষ্ট কতিপয় দেব-দেবীদের নাম সম্পর্কে আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও— যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালার কোনো অনুমোদন মাত্র নেই? ঠিক আছে! নির্ধারিত সময়ের যে আযাব তোমাদের উপর আপতিত হবে, সেই আযাবের প্রতীক্ষায় তোমরা থাকো। আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষারত রইলাম।

এখানে 'ক্বদ ওয়াক্বয়া' অর্থ— শাস্তি ও ক্রোধ অবধারিত হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের উপর খুব শীঘ্রই আযাব নেমে আসবে। এর কোনো অন্যথা হবে না।

'রিজ্সুন' অর্থ আযাব। শব্দটি এসেছে, 'ইরতিজাস্' থেকে— যার অর্থ 'ইদ্বতিরাব্' (দুর্ভাবনা, বিরক্তি)। কোনো কোনো অভিধান বিশারদ বলেছেন, রিজ্সুন্ শব্দটি আসলে ছিলো 'রিজযুন'। সিহাহ্ গ্রন্থে রয়েছে রিজ্সুন এবং রিজযুন্ শব্দ দু'টোর অর্থ— হুঁশিয়ারী বা চিৎকার। 'গদ্বাবুন্' অর্থ প্রতিশোধ স্পৃহা। 'আসমায়ুন' অর্থ ওই সকল প্রতিমার নাম— যে সকল নাম দিয়েছিলো অংশীবাদীদের ধর্মগুরুরা। অথবা এখানে 'নাম' অর্থ ওই সকল প্রতিমার নাম যা সম্পূর্ণতই কল্পনানির্ভর ও অপ্রয়োজনীয়। যেমন গ্রীক দার্শনিকেরা নাম দিয়েছে

www.eelm.weebly.com

উকুলে আশারা (দশটি জ্ঞান)। হিন্দুরা নাম দিয়েছে দেবী, ভগবতী ইত্যাদি। তাদের ধারণা ওই সকল প্রতিমার মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা অনুপ্রবিষ্ট হন।

'সুলতান' অর্থ এখানে দলিল বা প্রমাণ— যা ওই সকল বাতিল উপাস্যকে উপাস্য বলে প্রমাণ করে। অংশীবাদীরাও আল্লাহ্তায়ালাকে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা বলে মানে। কিন্তু আল্লাহ্র বিশুদ্ধ ইবাদতের সঙ্গে তারা তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোকেও অংশ দান করে। তারা মনে করে প্রতিমাগুলো আল্লাহ্তায়ালার দরবারে তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। তাদের এ ধারণা সর্বৈব মিথ্যা। আর তাদের ধারণার পক্ষে কোনো জ্ঞানগত কিংবা বিশ্বস্ত বর্ণনাগত কোনো দলিলও নেই। তাদের অবিশুদ্ধ ধারণার সূত্র হচ্ছে তাদেরই পিতৃপুরুষদের মনগড়া অপবিশ্বাস। হজরত হূদও এ কথাই তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং শেষে বলেছিলেন, আমি যে আযাবের কথা তোমাদেরকে জানিয়েছি, সেই আযাব আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করো। আমিও অপেক্ষায় রইলাম।

সুরা আ'রাফঃ আয়াত ৭২

فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۟

❑ অতঃপর তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদিগকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করিয়াছিলাম; আর আমার নিদর্শনকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং যাহারা বিশ্বাসী ছিল না তাহাদিগকে নির্মূল করিয়াছিলাম।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অবিশ্বাসীরা যে আযাব কামনা করছিলো, সেই আযাব যখন এসে পড়লো, তখন আমি হূদ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করেছিলাম; আর আমার নিদর্শনকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং যারা ইমানদার ছিলো না তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করেছিলাম।

এখানে 'দাবীরুন' অর্থ মূল। এই শব্দটির মাধ্যমে এখানে অবিশ্বাসীদেরকে নির্মূল করার কথা বলা হয়েছে— যেমন ফুল ও ফলসহ সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন করা হয় কোনো বৃক্ষের, সেভাবেই আল্লাহ্পাক মূলোৎপাটন করেছিলেন অবিশ্বাসীদেরকে।

'ওয়ামাকানু মু'মিনীন' অর্থ— এবং তারা বিশ্বাসী ছিলো না। অর্থাৎ নির্মূল করা হয়েছিলো কেবল অবিশ্বাসীদেরকে। বিশ্বাসীরা ছিলো নিরাপদ। এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, পরিত্রাণ লাভের কারণ হচ্ছে বিশ্বাস। আর অবিশ্বাস ধ্বংসের কারণ।

www.eelm.weebly.com

আ'দ সম্প্রদায়ের কাহিনীঃ মোহাম্মদ বিন ইসহাক প্রমুখ লিখেছেন, 'আহ্কাফ' বা আম্মান এবং 'হাদ্বরা'মাউত' এর মধ্যবর্তী মরুভূমি এলাকায় ছিলো আ'দ সম্প্রদায়ের বসবাস। তারা ছিলো দীর্ঘদেহী ও বলবান। শারীরিক শক্তিমত্তার কারণে তারা হয়ে উঠেছিলো অহংকারী। অন্য সম্প্রদায়গুলির উপর তারা চালাতো অত্যাচার। ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখতো সকলকে। প্রতিমাপূজারী ছিলো তারা। পূজা করতো তিনটি প্রতিমার— সদা, সমুদ এবং হিবা। আল্লাহ্তায়ালা তাদের বংশের হূদ নামক এক ব্যক্তিকে নবুয়ত দান করলেন। বংশমর্যাদার দিক থেকে হজরত হূদ অত্যুন্নত না হলেও চরিত্রগত দিক থেকে ছিলেন সর্বাধিক উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আহ্বান জানালেন তৌহিদের দিকে। আরো বললেন, খবরদার! কারো প্রতি অত্যাচার কোরো না। কিন্তু তাঁর এই সরল ও পবিত্র আহ্বানে সাড়া দিলো না তাঁর সম্প্রদায়। উপরন্তু বললো, তুমি মিথ্যাবাদী। আর আমরা হচ্ছি এক শক্তিমান সম্প্রদায়। আমাদের সমকক্ষ কে? আ'দ সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করতো এবং সেগুলোকে জবর দখল করে রাখতো। অবাধ্যতার জন্য তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করলেন আল্লাহ্পাক। পরপর তিন বছর বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হলো। চরম দুঃখ কষ্টে নিপতিত হলো মানুষ। সে যুগের নিয়ম ছিলো— বিপদ মুসিবত দেখলে বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, অংশীবাদী সকলেই কাবা গৃহের চত্বরে উপস্থিত হয়ে বিপদমুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাতো। ওই সময় মক্কায় বসবাস করতো আমালিকা। অর্থাৎ আমালিক বিন লাদের বিন শাম বিন নূহের বংশধরেরা। তাদের সর্দার ছিলো মুয়াবিয়া বিন বকর। মুয়াবিয়ার মা কাল্হিদা বিনতেল খাইর ছিলো আদ কুলোদ্ভবা। তাই আদ সম্প্রদায় ছিলো মুয়াবিয়া বিন বকরের মাতুলকুল। তাঁর মাতুল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো কায়েল বিন উনায, ইয়াকিম বিন হাযাল বিন হুযায়েল, আতিল বিন যাদ বিন বড় আদ এবং মুরসাদ বিন সা'দ বিন আফীর। ফাবিয়া বিন বকরের মাতুল জাইসুমাহ্ বিন কুসাইর। প্রত্যেকেই গোত্রের কিছু কিছু লোক নিয়ে চলে গেলেন মক্কায়। এরপর কিছু অনুসারী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন লোকমান বিন ছোট আদ বিন বড় আদ প্রমুখ। তাদের সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ালো সত্তরে। মুয়াবিয়া বিন বকরের আতিথ্যে সেখানে তারা অবস্থান করলো মাসাধিককাল। তারা প্রতিদিন মদ্যপান করতো এবং মুয়াবিয়া বিন বকরের দু'টি সুন্দরী ও সুকণ্ঠী ক্রীতদাসীর গান শুনতো। ওই বাঁদী দু'জনকে একত্রে বলা হতো জাররাদাতাইন। এভাবে কেটে গেলো আরো এক মাস। মুয়াবিয়া বিন বকর বললো, আমার মামাবাড়ীর লোকেরা খরা ও দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হতে চলেছে। তাদের বিপদমুক্তির জন্য এরা এসেছে মক্কায়। তারপর আসল কথা ভুলে মত্ত হয়েছে নৃত্যগীত ও মদ্যপানে। এরা আমার অতিথি। তাই তাদেরকে

www.eelm.weebly.com

চলে যাওয়ার কথাও বলতে পারি না। কী করবো? যদি কিছু বলি তবে তারা বলবে, আমি মেহমানদারী করতে অনিচ্ছুক। ওদিকে আমার মাতৃকুলের আত্মীয়েরা মরতে বসেছে। এ রকম দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে উপায়ন্তর না দেখে তাঁর বাঁদীদের কাছে পরামর্শ চাইলো মুয়াবিয়া বিন বকর। বাঁদীদ্বয় বললো, আপনি এ সম্পর্কে একটি কবিতা রচনা করুন। আমরা তা মেহমানদের মজলিশে সঙ্গীতাকারে গাইবো। আমাদের সুরেলা আবৃত্তি শুনে নিশ্চয় তাদের অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। আর তারা বুঝতেও পারবে না যে, কবিতা রচনা করেছে কে? পরামর্শটি মনঃপুত হলো মুয়াবিয়ার। সে তখন একটি কবিতা রচনা করলো, যার মর্মার্থ নিম্নরূপ—

কায়েল, হে কায়েল এবং হাইছুম! ওঠো। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ বৃষ্টির দ্বারা আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করবেন। খরাতপ্ত আদ সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে তৃষ্ণার্ত। তাদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। বয়োবৃদ্ধরা মরোনোন্মুখ। ললনাকুল ছিলো ধৈর্যধারনকারিণী। কিন্তু তারাও এখন ছটফট করছে পিপাসায়। দুর্ভাগা আদ সম্প্রদায়কে ভক্ষণের জন্য যেনো হিংস্রপ্রাণীকুল আক্রমণোদ্যত। দুঃখের অকূল পাথারে দিশাহীন তারা। আর তোমরা এদিকে মদ-মত্ত আনন্দমগ্ন। হে আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ! ধিক তোমাদেরকে। তোমাদের কপালে নেই নিরাপত্তা এবং শুভবার্তা।

সুন্দরী ক্রীতদাসীদের উপরে বর্ণিত কবিতার সাংগিতিক আবৃত্তি শুনে অতিথিরা একজন আরেকজনকে বলতে শুরু করলো, দেখেছো! কী বেভুল আমরা। আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তো বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য আমাদেরকে পাঠিয়েছে এ মক্কায়। আর এদিকে আমরা সব ভুলে বসে আছি। চলো, চলো। এক্ষুণি চলো কাবা গৃহের চত্বরে গিয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা শুরু করি। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইমানদার। কিন্তু তাঁর সাথীরা তা জানতো না। হজরত হুদের সত্য আহ্বানকে স্বীকার করেছিলেন তিনি। তাঁর নাম মুরছাদ বিন মাসউদ বিন আফীর। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! তোমাদের দোয়ায় বৃষ্টি হবে না। তোমাদের দোয়া কবুল হবে তখনই, যখন তোমরা হবে নবী হুদের অনুগত এবং অংশীবাদীতা থেকে বিশুদ্ধ প্রত্যাবর্তনকারী। এরপর মুরছাদ ঘোষণা করলেন, আমি ইমানদার। এ কথা বলার পর তিনি আবৃত্তি করলেন কয়েকটি ছন্দবদ্ধ কবিতা, যেগুলোর মর্মার্থ নিম্নরূপ—

আদ সম্প্রদায় তাদের নবীর আদেশ লংঘন করেছে। তাই তারা আজ খরাপীড়িত, পিপাসিত। আকাশ তাদের প্রতি এক বিন্দু পানিও বর্ষণ করেনি। সমুদ্ নামক এক প্রতিমার উপাসক তারা। তার সঙ্গে আরো দু'টো প্রতিমা রয়েছে

www.eelm.weebly.com

তাদের। সে দু'টোর নাম— সদা ও হাবা। অসংখ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। তিনি আমাদেরই হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন সত্য রসুল। তাঁর অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা সন্ধান পেতে পারি সরল সত্য পথের। আমাদের অন্ধত্ব দূর হতে পারে কেবল তাঁরই আনুগত্যের মাধ্যমে। আমি স্পষ্ট ঘোষণা করছি, হজরত হুদের উপাস্যই আমার উপাস্য। সে-ই একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপাস্য আল্লাহ্‌তায়ালাই আমার একমাত্র নির্ভর। আমি তাঁরই প্রতি সম্পূর্ণ ভরসা করি।

আদ সম্প্রদায়ের অতিথিদল মুয়াবিয়া বিন বকরকে বললো, মুরছাদকে ঠেকাও। সে যেনো আমাদের সঙ্গে কাবা চত্বরে না যেতে পারে। কিন্তু মুরছাদ তাদের আগেই কাবাগৃহের চত্বরে গিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া প্রার্থনা করতে লাগলেন। একটু পরে অন্যান্যরাও সেখানে উপস্থিত হয়ে পৃথক অবস্থান গ্রহণ করে বৃষ্টি প্রার্থনা শুরু করলো। মুরছাদ তাঁর একক নিবেদনে জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! বিশ্বাসীদের মধ্যে এখানে আমি একা। তুমি আমার দোয়া কবুল করো। আমার অবিশ্বাসী সাথীদের অন্তর্ভুক্ত আমাকে কোরো না।

অবিশ্বাসীদের দলনেতা ছিলো কায়েল বিন উনায। তার দলের লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্! কায়েলের দোয়া কবুল করো। তার সঙ্গে আমাদের আবেদনও মঞ্জুর করে নাও।

অবিশ্বাসীদের আরেক নেতা ছিলো লোকমান বিন আদ। তাদের সম্মিলিত দোয়া শেষ হওয়ার পর সে পৃথক স্থানে গিয়ে এই বলে দোয়া শুরু করলো, হে আমার প্রভু! আমি তোমার সকাশে এবার আমার একক নিবেদন পেশ করছি। তুমি আমার হায়াত বাড়িয়ে দাও। তার ওই দোয়া কবুল হয়েছিলো। দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলো সে।

কায়েল বিন উনাযও তার একক প্রার্থনায় জানালো, হে প্রভু! হুদ যদি সত্য পয়গম্বর হয় তাহলে আমাকে অনাবৃষ্টির আযাব থেকে রক্ষা করো। বৃষ্টিবিহীন জীবন তো আমাকে নিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে। এ রকম প্রার্থনা করার ফলে আকাশে দেখা দিলো তিন রঙের মেঘ— শাদা, লাল ও কালো। ওই মেঘকুণ্ডলী থেকে আওয়াজ ভেসে এলো— হে কায়েল! তোমার জন্য এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য এই তিন রঙের মেঘের মধ্যে যে কোনো এক রঙের মেঘ নির্বাচন করো। কায়েল বললো, আমি কালো মেঘকে পছন্দ করলাম। কারণ ঘন কালো মেঘ থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টিপাত হয়। মেঘ থেকে পুনরায় আওয়াজ ভেসে

www.eelm.weebly.com

এলো— তুমি পছন্দ করেছো ধ্বংসকে। আদ সম্প্রদায়ের একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। এই ঘোষণার পর পর ভয়াবহ ঘন কালো মেঘপুঞ্জ উড়ে চললো আদ সম্প্রদায়ের বসতির দিকে।

দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো আদ সম্প্রদায়। বললো, এই মেঘ নিশ্চয় আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। কিন্তু নেপথ্যে ঘোষিত হলো, কক্ষনো নয়। এটি হচ্ছে সেই আযাব, যার প্রার্থী তোমরা হয়েছিলে। এটি হচ্ছে মর্মন্তুদ শাস্তি সম্বলিত একটি ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যা। এই ঘূর্ণিঝড় তোমাদের সকল কিছুর ধ্বংস সাধন করবে।

শুরু হলো সেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রভঞ্জন। নির্মম আযাব। ঝড়ের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে সর্বপ্রথম বেহুঁশ হয়ে গেলো মিহ্দার নামক এক রমণী। কিছুক্ষণ পর তার হুঁশ ফিরে এলে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কী দেখেছো তুমি? সে বললো, বিকটদর্শন লেলিহান অগ্নিকুণ্ডের মতো প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিঝড়। বিশাল আকৃতির কিছু লোক সেই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলেছে। এরপর শুরু হলো অভূতপূর্ব সেই প্রলয়ঙ্করী পবন। সাত রাত আট দিন ধরে বয়ে চললো সেই ভয়ঙ্কর প্রলয়। সেই তুফানে মৃত্যুমুখে পতিত হলো আদ সম্প্রদায়ের সকল সদস্য। সেই ভয়ঙ্কর তুফানের মধ্যেও হজরত হুদ ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরেরা রইলেন পূর্ণ নিরাপদ। তাঁদের সমাবেশস্থলে বয়ে যাচ্ছিলো মৃদুমন্দ সমীরণ। তাঁদের এলাকার বাইরে সবকিছু হয়ে যাচ্ছিলো তছ্নছ্। বিক্ষিপ্ত বাতাসে উড়ে যাচ্ছিলো উটের পিঠের বোঝা। আবার তা আছড়ে পড়ছিলো সেগুলোর উপর। বাতাস কখনো সকলকে উঠিয়ে নিচ্ছিলো আসমানে। আবার সকলকে সজোরে আছাড় দিচ্ছিলো পাথরের উপর।

ওদিকে আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদল তখন অবস্থান করছিলো তাদের মেজবান মুয়াবিয়া বিন বকরের বাড়িতে। ঝড়ের তৃতীয় দিনে এক চাঁদনী রাতে আদ সম্প্রদায়ের এক উষ্ট্রারোহী মক্কায় অবস্থানরত তাদের প্রতিনিধি দলের নিকট উপস্থিত হলো। উষ্ট্রারোহী ব্যক্তিটি তাদেরকে জানালো, মহাসর্বনাশ শুরু হয়েছে। মনে হয় আদ সম্প্রদায়ের আর কেউই অবশিষ্ট নেই। প্রতিনিধিদল তার কথা বিশ্বাস করতে পারছিলো না। তারা বললো, বলো কী? তুমি যখন রওয়ানা হয়েছিলে তখন হুদ ও তার সঙ্গীদেরকে কোথায় দেখেছো? সে বললো, আমি তাদেরকে দেখে এসেছি নিরাপদ সমুদ্র উপকূলে। এ কথা শুনে সেখানে উপস্থিত হারমিলা বিনতে বকর বললো, কাবার প্রভুর কসম! এ লোক সত্য কথা বলেছে।

বর্ণনাকারীগণ উল্লেখ করেছেন, মুরছাদ্ বিন সা'দ, লোকমান বিন আ'দ এবং কায়েল বিন উনাযের দোয়া কবুল হওয়ার প্রাক্কালে তাদেরকে বলে দেয়া

www.eelm.weebly.com

হয়েছিলো যে, তোমাদের দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। এখন তোমরা বলো, কে কি চাও? জেনে রেখো, তোমরা কেউই চিরদিন বেঁচে থাকতে পারবে না। মৃত্যু তোমাদের হবেই হবে। মুরছাদ দোয়া করলো, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমি আমাকে সততা ও পুণ্য দান করো। তাঁর প্রার্থনা কবুল করা হলো। লোকমান দোয়া করলো, হে প্রভু! আমার আয়ু বাড়িয়ে দাও। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কতো বছর বাঁচতে চাও তুমি? লোকমান বললো, সাতটি শকুন যতদিন বাঁচে ততদিন। তার দোয়া কবুল করা হলো। পরবর্তী সময়ে লোকমান নিয়ম করে নিয়েছিলো এ রকম— ডিম থেকে সদ্য বহির্গত পুরুষ শকুনের বাচ্চা প্রতিপালন করতো সে। পরিণত বয়সে ওই শকুন মরে গেলে সে পুনরায় আরেকটি শকুন শাবক পুষতে শুরু করতো। এভাবে একে একে সাতটি শকুন শাবক পুষেছিলো সে। প্রতিটি শকুন শাবক বেঁচে ছিলো আশি বছর ধরে। একে একে সেগুলো মরে যাওয়ার পর লোকমান ঢলে পড়েছিলো মৃত্যুর কোলে। তার সর্বশেষ শকুনটির নাম ছিলো লুবাত্।

কায়েলেরও দোয়া কবুল হয়েছিলো। সে বলেছিলো, হে প্রভু! আমার সম্প্রদায়ের লোকদের যে পরিণতি হয় আমি চাই সেই পরিণতি। তাকে বলা হয়েছিলো, তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তো ধ্বংস হতে চলেছে। সে বলেছিলো, তাহলে আমার জীবিত থাকার কোনো প্রয়োজনই নেই। তার এমতো প্রার্থনার প্রেক্ষিতে তাকেও গ্রাস করেছিলো ঝঞ্ঝাতুফানের ওই ভয়ংকর আযাব।

সুদ্দী বলেছেন, ঘন কৃষ্ণ মেঘ থেকে আদ সম্প্রদায়ের উপর নেমে এসেছিলো ভয়াবহ তুফানের আওয়াজ। তারা যখন দেখলো বোঝা বহনকারী উটের পালকে শূন্যে উঠিয়ে নিয়ে ঘুরপাক খাওয়ানো হচ্ছে, তখন ভয়ে তারা আশ্রয় গ্রহণ করলো আপনাপন গৃহে। সকল দরজা অর্গলাবদ্ধ করে দিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করলো তারা। কিন্তু এতে করেও আত্মরক্ষা করতে পারলো না। ঘর দরজাসহ সকলকে ধ্বংস করে ফেলা হলো। পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইলো তাদের মরদেহ। এরপর আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করলেন কালো রঙের পাখির এক বিশাল ঝাঁক। ওই পাখিরা তাদের মরদেহগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করলো সমুদ্রে।

এক বর্ণনায় এসেছে, ওই ভয়াবহ তুফান ওলটপালট করে দিলো আদ সম্প্রদায়ের সমগ্র জনপদ। সাত রাত আট দিনের সেই ভয়ংকর বালুঝড় বালির মধ্যে প্রোথিত করলো তাদেরকে। বিক্ষিপ্ত বালুকারাশির মধ্য থেকে উত্থিত হচ্ছিলো তাদের আর্তচিৎকার। তারপর সেই ভয়াবহ ঝড় বালুকারাশিসহ তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিলো সাগরে। ওই দিন ঝড়ো বাতাস ছিলো সর্বাপেক্ষা তীব্র গতিসম্পন্ন। সেই বিক্ষিপ্ত তীব্র গতির পরিমাপ করার সাধ্য ছিলো না কারো।

www.eelm.weebly.com

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ○ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ ○

❒ সামূদ জাতির নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা সালেহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তোমার নিকট তোমাদিগের প্রতিপালক হইতে স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে। এই আল্লাহের উষ্ট্রী তোমাদিগের জন্য একটি নিদর্শন। ইহাকে আল্লাহের জমিতে চরিয়া খাইতে দাও এবং ইহাকে কোন ক্লেশ দিও না, দিলে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হইবে।'

❒ স্মরণ কর, আ'দ জাতির পর তিনি তোমাদিগকে তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে তোমরা সমতলভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কাটিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিতেছ। সুতরাং আল্লাহের অনুগ্রহ স্মরণ কর, এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না।

❒ তাহার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা দুর্বল-বিশ্বাসীদিগকে বলিল, 'তোমরা কি জান যে সালেহ্ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত?' তাহারা বলিল, 'তাহার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হইয়াছে আমরা তাহাতে বিশ্বাসী।'

❒ দাম্ভিকেরা বলিল, 'তোমরা যাহা বিশ্বাস কর আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।'

www.eelm.weebly.com

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'ছামুদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহ্কে পাঠিয়েছিলাম'। এখানে 'তাদের ভ্রাতা' অর্থ তাদের ধর্মীয় ভ্রাতা নয়। অর্থাৎ হজরত সালেহ্ সামুদ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের সূত্রে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাদের সঙ্গে সম্প্রদায়গত বা বংশগতভাবে সম্পর্কিত। ওই সম্প্রদায় ছিলো খরা-পীড়িত। বৃষ্টিহীনতা দেখা দেয়ার কারণেই গোত্রটির নাম হয়েছিলো ছামুদ। যেমন 'ছামাদুল মাআ' শব্দটির অর্থ পানি হ্রাস পেয়েছে। ছামুদ সম্প্রদায় বসবাস করতো হেজাজ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে। তাদের জনপদ বিস্তৃত ছিলো কোরা উপত্যকা পর্যন্ত। হজরত সালেহের পিতা ছিলেন উবাইদ এবং পিতামহ ছিলেন আসাব বিন মাসেহ্। অথবা তিনি ছিলেন রিবাহ্ বিন উবাইদ বিন হাযের বিন ছামুদের পুত্র।

হজরত সালেহ্ নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি। অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে যিনি এনেছিলেন একটি উষ্ট্রী। এক আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য এবং ওই অলৌকিক উষ্ট্রীকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে কথাই বলা হয়েছে আয়াতের পরবর্তী অংশে।

বলা হয়েছে— সে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ্ নেই। তোমার নিকট তোমাদের প্রতিপালক থেকে স্পষ্ট নির্দশন এসেছে। এই আল্লাহ্র উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আল্লাহ্র জমিতে চরে খেতে দাও এবং একে কোনো ক্লেশ দিয়ো না, দিলে ব্যথাদায়ক শাস্তি তোমাদের প্রতি আপতিত হবে। এখানে 'বাইয়্যেনাত' শব্দটির অর্থ স্পষ্ট দলিল বা মোজেজা। 'হাজিহি নাক্বাতুল্লহ্' অর্থ— এই আল্লাহ্র উষ্ট্রী। এ কথায় বুঝা যায় ওই উষ্ট্রীটি ছিলো একটি অসাধারণ ও অলৌকিক উষ্ট্রী। তাই ওই উষ্ট্রীকে আয়াতে বলা হয়েছে স্পষ্ট নির্দশন বা মোজেজা। ওই অলৌকিক উষ্ট্রীকে সম্মান প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে এভাবে— উষ্ট্রীটিকে যথেচ্ছ চরে খেতে দিতে হবে। সকল জমিন তার জন্য করতে হবে অবারিত। উষ্ট্রীটিকে কোনো ক্লেশ দেয়া চলবে না। ক্লেশ দিলে নেমে আসবে মর্মন্তুদ শাস্তি।

পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছো। সুতরাং আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিও না।' এখানে 'বাওয়াআকুম' অর্থ— আশ্রয় দিয়েছেন। 'ফিল আরদ্বি' অর্থ— পৃথিবীতে। 'তাত্তাখিজুনা' অর্থ— নির্মাণ করো। 'মিন সুহুলিহা'

www.eelm.weebly.com

অর্থ— সমতল ভূমিতে। এখানে মিন (মধ্যে) শব্দটির অর্থ হবে (তে)। 'তাই সমতল ভূমির মধ্যে' না বলে এখানে বলা হয়েছে 'সমতল ভূমিতে'। কথাটি 'সমতল ভূমিতে' না হয়ে 'নরম ভূমিতে'ও বলা যেতে পারতো। কারণ কোমল মৃত্তিকায় কাঁচাপাকা ইট দ্বারা আরামদায়ক গৃহ নির্মাণ করতে অভ্যস্থ ছিলো ছামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা।

'তান্‌হিতুনা' অর্থ— পাহাড় কেটে কেটে। 'বুয়্যুতান' অর্থ গৃহ নির্মাণ করতো। অর্থাৎ ছামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা পর্বতগাত্রের পাথর খোদাই করে নির্মাণ করতো বাসোপযোগী গৃহ। উল্লেখ্য, ছামুদ সম্প্রদায় গ্রীষ্মকালে বসবাস করতো সমভূমিতে, কাঁচাপাকা ইট নির্মিত গৃহে। আর শীতকালে বসবাস করতো পর্বতগাত্রে নির্মিত পাথরের ঘরে।

এর পরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— 'তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা দুর্বল বিশ্বাসীদের বললো, তোমরা কি জানো যে সালেহ্ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত? তারা বললো, তাঁর প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী।' এখানে 'আল্লাজীনাস্ তাকবারু' অর্থ সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি বা নেতারা। ছামুদ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ নেতারা ছিলো হজরত সালেহের প্রতি বিদ্বেষী। হজরত সালেহের আনুগত্যকে তারা মনে করতো অপমানজনক। তাই সত্যধর্মের আহ্বানের প্রতি তারা প্রকাশ করতো স্পষ্ট অবজ্ঞা।

'আল্লাজীনাস তুদ্বই'ফু' অর্থ— দুর্বল ও অভাবগ্রস্ত। অবিশ্বাসী গোত্র প্রধানেরা বিদ্রূপবশতঃ তাদেরকে বলতো, 'আল্লাজীনাস তুদ্বই'ফু লিমান আমানা' (দুর্বল বিশ্বাসীরা)। অর্থাৎ হজরত সালেহের বিশ্বাসভাজন উম্মতেরা ছিলেন বিত্তবিবর্জিত এবং সামাজিক প্রভাব-প্রতিপ্রত্তিহীন। দাম্ভিক প্রধানদের প্রশ্নটি ছিলো এ রকম— তোমরা কি নিশ্চিত যে, সালেহ্ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত? ইমানদারেরা এই প্রশ্নের উত্তরে কেবল 'হাঁ' বলে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা এ রকম সংক্ষিপ্ত উত্তর না দিয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন তাঁদের মনোভাব। বলেছেন, 'তাঁর প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী।' এমতো জবাবের মাধ্যমে বিশ্বাসীরা এ কথাই বলতে চেয়েছেন, হজরত সালেহের নবুয়ত একটি চরম সত্য যার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। যার জ্ঞান আছে সে হজরত সালেহেকে বিশ্বাস না করেই পারে না।

এরপরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে—'দাম্ভিকেরা বললো, তোমরা যা বিশ্বাস করো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।' সত্যের আহ্বানকে এভাবেই অবজ্ঞা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলো ছামুদ সম্প্রদায়ের গর্বোন্মত্ত নেতারা। এর সমুচিত প্রতিফলও তারা পেয়েছিলো। সে বিবরণ রয়েছে পরবর্তী আয়াত সমূহে।

www.eelm.weebly.com

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝

❒ অতঃপর তাহারা সেই উষ্ট্রী বধ করে এবং আল্লাহের আদেশ অমান্য করে এবং বলে, 'হে সালেহ্! তুমি রসূল হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।

❒ অতঃপর তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তাহারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল।

উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'অতঃপর তারা সেই উষ্ট্রী বধ করে এবং আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে এবং বলে, হে সালেহ্! তুমি রসুল হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছো তা আনো।' এখানে আ'ক্বারু অর্থ— তারা হত্যা করলো। আজহারী বলেছেন, 'আক্বারু' অর্থ— উটের কুঁজ কর্তন করা। আসল অর্থ জবাই করা। পলাতক উটকে ধরে এনে প্রথমে কেটে দেয়া হয় তার কুঁজ। এভাবে প্রথমে দুর্বল করে নিয়ে জবাই করা হয় তাকে।

কামুস গ্রন্থে আ'ক্বর অর্থ— আহত করা, উট ও ঘোড়ার পায়ের গোড়ালীতে আঘাত হানা। সিহাহ্ গ্রন্থে রয়েছে, আ'ক্বরাদ্ দার অর্থ— মূল অবস্থান বা গৃহ। আ'ক্বরাল হাউদ্বি অর্থ— মূল চৌবাচ্চা। আ'ক্বারাতু নাখলা অর্থ— আমি খেজুর গাছটি শিকড় থেকে কেটে দিয়েছি। আর 'আ'ক্বারাতুল বায়ির অর্থ— আমি উটকে নহর (জবাই) করে দিয়েছি।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে—'তারা সেই উষ্ট্রী বধ করে'। অলৌকিক উষ্ট্রী বধের মতো জঘন্য পাপ কর্মটির সমর্থক ছিলো সকল অবাধ্য জনতা। তাই ওই উষ্ট্রের ঘাতক হিসেবে এখানে সকলকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে— পবিত্র উটটিকে বধ করেছিলো অবাধ্য জনতার সমর্থনপুষ্ট কাজার বিন সালেফ। মহাপ্রতারক ওই লোকটি আকৃতি ও প্রকৃতিতে ছিলো ফেরাউনের মতো লোহিতাভ ও নীল চক্ষু বিশিষ্ট।

রসুল স. একবার হজরত আলীকে বলেছিলেন, অতীত সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য হচ্ছে নবী সালেহের উটের হন্তারক এবং ভবিষ্যতের সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তিটিই হবে তোমার হন্তারক।

www.eelm.weebly.com

'ওয়া আ'তাও আ'ন আমরি রব্বিহিম' কথাটির অর্থ— এবং আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে। এখানে আ'তাও শব্দটির অর্থ— চূড়ান্ত পর্যায়ের সীমালংঘন। আ'তী, ই'য়াতু, উ'তু— শব্দত্রয়ের অর্থ সীমালংঘন, অবাধ্যতা, ভ্রান্তি। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, উ'তুওয়ান, উ'তুওয়ান্, ই'ত্ইয়ান্— এই তিনটিই শব্দমূল। শব্দগুলো সমার্থক। চূড়ান্ত পর্যায়ের সীমালংঘনকে বুঝানো হয় এই শব্দগুলোর মাধ্যমে।

অবাধ্য ছামুদ সম্প্রদায় ছিলো প্রকৃতই চূড়ান্ত পর্যায়ের সীমালংঘনকারী। তাই তারা পবিত্র উষ্ট্রীটিকে বধ করেই ক্ষান্ত হয়নি। উপরন্তু দম্ভ প্রকাশ করেছে এভাবে— হে সালেহ্! তুমি রসুল হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছো তা আনয়ন করো। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রার্থিত আযাব এসেই পড়লো। পরের আয়াতে (৭৮) সে কথাই বলে দেয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে—'অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো। ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেলো।'

এখানে 'আর্রজফাতু' অর্থ— ভূমিকম্প। 'দারিহিম' অর্থ— আপন বসবাসে বা নিজ গৃহে। 'জাছিমিন্' অর্থ— শেষ হয়ে গেলো। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ সত্যদ্রোহী ছামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা যে যেভাবে বসেছিলো সেভাবেই মরে গিয়েছিলো। কথা বলা বা নড়াচড়ার অবকাশ তারা পায়নি। অর্থাৎ বিকট আওয়াজে যখন ভূমিকম্প হলো, তখনই যে যেভাবে ছিলো, সেভাবেই সাবাড় হয়ে গেলো সত্য-বিদ্বেষী ছামুদ সম্প্রদায়।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৭৯

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ○

❑ তৎপর সে তাহাদিগের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদিগের নিকট পৌঁছাইয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তো উপদেষ্টাদিগকে পছন্দ কর না।'

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ছামুদ জনপদে পড়ে ছিলো অবাধ্যদের হাজার হাজার লাশ। সত্যপ্রত্যাখ্যানের এই ভয়ানক পরিণতি দেখে হজরত সালেহ্ তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মৃতদের উদ্দেশ্যে বললেন— হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার

www.eelm.weebly.com

প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তো উপদেশদাতাদেরকে পছন্দ করো না।

একটি প্রশ্নঃ ভূমিকম্পে উৎসন্ন হয়েছিলো গোটা জনপদ। সেক্ষেত্রে হজরত সালেহ্ আ. কীভাবে মৃতদেরকে সম্বোধন করলেন?

উত্তরঃ রসুলপাক স.ও মৃতদেরকে সম্বোধন করে কথা বলেছিলেন। বদর যুদ্ধে নিহত কাফেরদের লাশ ফেলে রাখা হয়েছিলো একটি গর্তে। ওই লাশের স্তূপকে লক্ষ্য করে কথা বলেছিলেন রসুলপাক স. স্বয়ং। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু তালহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, বদর যুদ্ধের তৃতীয় দিবসে রসুল স. তাঁর উটের চালককে উট সজ্জিত করতে বললেন। কিন্তু উটে না চড়ে সাহাবীগণকে নিয়ে তিনি পদব্রজে চললেন পরিত্যক্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে। সাহাবীগণ তখনও জানতেন না, কোথায় চলেছেন তাঁদের প্রিয় রসুল। রসুল স. উপস্থিত হলেন ওই গর্তটির পাড়ে। তারপর উচ্চস্বরে বললেন, হে আবু জেহেল বিন হিশাম, হে উমাইয়া বিন খালফ, হে উতবা বিন রবীয়া, হে শায়বা বিন রবীয়া! কতই না উত্তম হতো যদি তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে মান্য করতে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল যে বিষয়ে তোমাদেরকে ভয় দেখিয়েছিলেন, সে বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে তোমরা এখন অবহিত হয়েছো কি? আমি তো আল্লাহ্পাককৃত সকল অঙ্গীকারকেই সত্য হিসেবে প্রত্যক্ষগোচর করেছি। হে অবিশ্বাসীর দল! তোমরা তোমাদের নবীর স্বসম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও সর্ব নিকৃষ্ট। তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছো। আর অন্যেরা আমাকে সত্য বলে জেনেছে। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো— অথচ অন্যেরা হয়েছে আমার সুহৃদ ও সহায়ক। হে নিকৃষ্ট গোত্র! আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ই তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করেছেন। আমি ছিলাম বিশ্বাসভাজন (আমিন), অথচ তোমরা আমাকে বিশ্বাস করোনি। সত্যবাদী ছিলাম আমি। তৎসত্ত্বেও তোমরা মিথ্যাশ্রয়ী মনে করেছো আমাকে। রসুল স. এর কথা শেষ হলে হজরত ওমর বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্র প্রিয় রসুল! মৃত্যুর তিনদিন পর আপনি তাদেরকে ডেকে আপনার কথা শোনাচ্ছেন। তারা তো মৃত। তারা কি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছে? রসুল স. বললেন, নিশ্চয়। তোমাদের চেয়ে অধিক স্পষ্ট করে তারা শুনছে আমার কথা। কিন্তু উত্তর দেয়ার অধিকার তাদের নেই।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, জীবিত ও অনাগত মানবতাকে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যেই হজরত সালেহ্ মৃত ছামুদ সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ওরকম করে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে আয়াতের বর্ণনা বিন্যাসের মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ ঘটেছে। সঠিক বিন্যাসটি হতে পারতো এ

www.eelm.weebly.com

রকম—'অতঃপর হজরত সালেহ বিমুখ হয়ে ফিরে গেলেন। বললেন, হে আমার স্বজাতি! আমি অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছি আমার পালনকর্তার বার্তা। আর আমি সদুপদেশ দিয়েছি তোমাদেরকে। বাস্তবে তোমরা উপদেশ দাতাকে পছন্দও করোনি!' এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর—'অতঃপর ভূমিকম্প আঘাত হানলো তাদেরকে, তারা স্বীয় আবাসে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো' আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো।

ছামুদ সম্প্রদায়ের কাহিনীঃ হজরত আমর বিন খারেজা থেকে মোহাম্মদ বিন ইসহাক, ওহাব বিন মুনাব্বাহ্, ইবনে জারীর এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আদ জাতির ধ্বংসপ্রাপ্তির পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো ছামুদ জাতি। তারা ছিলো দীর্ঘদেহী এবং দীর্ঘ আয়ুসম্পন্ন। তারা কাঁচা পাকা ইট দিয়ে বাড়ি তৈরী করতো। সেগুলো এক সময় ধ্বংস হয়ে যেতো, অথচ তারা বেঁচে থাকতো। এতোই দীর্ঘ ছিলো তাদের আয়ুষ্কাল। তাই তারা পাহাড়ের পাথর কেটে কেটে ঘর বানাতো। তারা ছিলো আপাদমস্তক পৃথিবীর মোহে আচ্ছন্ন। ছিলো অনাচারী ও লুণ্ঠনকারী। তাদের হেদায়েতের জন্য তাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন নবী সালেহ্। তিনি ছিলেন আরব গোত্রভূত। বংশগত মর্যাদার দিক থেকে মধ্যম স্তরের হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মহান ও সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। রেসালতের দায়িত্ব তিনি পেয়েছিলেন যৌবনকালে। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ধর্ম প্রচারের পুরো দায়িত্ব বহন করেছিলেন তিনি। এভাবেই তিনি উপনীত হলেন বার্ধক্যে। কিন্তু তখনও তাঁর বিশ্বাসী উম্মতের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। তাছাড়া তারা ছিলো দরিদ্র ও প্রভাবপ্রতিপত্তিহীন। কিন্তু নবী সালেহ্ সমান উদ্যমে তখনও জানিয়ে চলেছিলেন সত্যধর্মের আহ্বান। অবাধ্যদেরকে তিনি প্রদর্শন করতে লাগলেন আল্লাহ্তায়ালার আযাবের ভয়। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা একদিন বললো, হে সালেহ্! তোমার নবুয়তের পক্ষে কোনো প্রমাণ পেশ করো। হজরত সালেহ্ বললেন, কী প্রমাণ চাও? তারা বললো, আগামীকাল তুমি আমাদের সঙ্গে আমাদের মেলায় চলো। পরদিন ছিলো তাদের বাৎসরিক উৎসবের দিন। বিরাট মেলা বসতো ওই দিন। ওই দিন তারা স্বহস্তে নির্মিত মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হলো মেলায়। তারা বললো, মেলায় গিয়ে তুমি তোমার মাবুদের নিকট প্রার্থনা কোরো। আর আমরা প্রার্থনা করবো আমাদের মাবুদের নিকট। যদি তোমার প্রার্থনা কবুল হয়, তবে আমরা হয়ে যাবো তোমার অনুগত। আর আমাদের প্রার্থনা গৃহীত হলে, আমাদের আনুগত্য করতে হবে তোমাকে। নবী সালেহ্ তাদের কথা মেনে নিলেন। পরদিন মেলায় গিয়ে মূর্তিপূজকেরা তাদের প্রতিমাগুলোর নিকট প্রার্থনা করলো— সালেহের প্রার্থনা যেনো গৃহীত না হয়।

www.eelm.weebly.com

তাদের নেতা জানদা বিন আমর বিন জাও বললো, হে সালেহ্! ওই প্রস্তরখণ্ডটি থেকে পূর্ণ গর্ভবতী ঘন পশমবিশিষ্ট একটি উটনীকে যদি তুমি বের করে নিয়ে আসতে পারো, তবে আমরা তোমাকে সত্য পয়গম্বর বলে মেনে নিবো। পয়গম্বর সালেহ্ তাদের সকলকে এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ করালেন। সকলে স্বীকার করলো, প্রার্থিত মোজেজা প্রকাশিত হলে আমরা হয়ে যাবো ইমানদার।

পয়গম্বর সালেহ্ দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। তারপর প্রার্থনা পেশ করলেন আল্লাহ্তায়ালার দরবারে। হঠাৎ একটি পাথরের অভ্যন্তর থেকে সন্তান প্রসবিনী উটের আওয়াজের মতো আওয়াজ বের হতে শুরু করলো। একটু পরে পাথরটি গেলো ফেটে, ওই ফাটল থেকে বেরিয়ে এলো একটি গর্ভবতী উটনী। উটনীটি একটু পরেই তার বাচ্চা প্রসব করলো। এই বিস্ময়কর নিদর্শন দেখে জানদা বিন আমর এবং তার বংশের কিছু লোক তৎক্ষণাৎ ইমানদার হয়ে গেলো। অন্যান্য গোত্র প্রধানেরাও ইমান আনার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। কিন্তু প্রধান পুরোহিত যাওয়াব বিন আমর বিন লবিদ ও হাব্বাব এবং গণক দাব্বাব বিন সাহর তাদেরকে নিরস্ত করলো। পুরোহিতদ্বয় ও গণকও ছিলো তাদের গোত্র প্রধান।

হজরত সালেহ্ তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের বললেন, এখানকার কূপের পানি একদিন পান করবে 'এই উটনী'। আরেকদিন পান করবে তোমাদের পশুগুলো। আর এর বিচরণে কেউ অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না। হজরত সালেহের এ নির্দেশ সঠিকভাবে পালন করা হলো কিছুদিন। অলৌকিক ওই উটনীটি তার শাবকসহ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে লাগলো। নির্বিঘ্নে ভক্ষণ করতে লাগলো বিভিন্ন স্থানের তৃণ ও উদ্ভিদ। কূপের পানি পান করতে লাগলো একদিন পর একদিন। যেদিন সে পানি পান করতো সেদিন কূপে আর কোনো পানি অবশিষ্ট থাকতো না। পানি পান করার পর সে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে যেতো। লোকেরা এসে দুগ্ধ দোহন করতো তার। দোহন শেষে পুনরায় যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতো সে। গ্রীষ্মকালে উটনীটি বিচরণ করতো সমভূমিতে। অন্য পশুরা তখন তাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যেতো মরুভূমির দিকে। কিন্তু শীতকালে দিনে সে বিচরণ করতো মরুভূমির তপ্ততায়। গৃহপালিত উট ভেড়া ছাগলগুলো তখন ভয়ে অবস্থান গ্রহণ করতো শীতার্ত মরুদ্যানে। সে পাহাড়ে উঠলে অন্য পশুরা নেমে যেতো নিচে আর নিচে নামলে অন্য পশুরা উঠে যেতো পাহাড়ে। মানুষ তাদের পশুগুলোর দুরবস্থা দেখে ধীরে ধীরে চঞ্চল হয়ে উঠতে শুরু করলো। উটনীটি হয়ে উঠলো তাদের নিকট চরম বিরক্তিকর। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করলো, ওটাকে হত্যা করাই সমীচীন। সকলে একমত হলো এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলো উটনীটিকে এবার সরিয়ে দিতেই হবে।

www.eelm.weebly.com

উনাইযাহ্ এর ডাক নাম ছিলো উম্মে গানাম। তার পিতার নাম ছিলো গামাম বিন মাজায এবং তার স্বামীর নাম ছিলো যাওয়াব বিন আমর। তার ছিলো কয়েকটি সুন্দরী কন্যা এবং অনেক গৃহপালিত পশু। এ রকম অনেক গৃহপালিত পশুর অধিকারিনী ছিলো মোখতারের কন্যা সাদুফও। এই দুই মহিলার সঙ্গে ছিলো রসুল সালেহের শত্রুতা। কারণ অলৌকিক উষ্ট্রীটির কারণে তাদের পশুগুলো কষ্ট পেতো খুব। তাই ওই দুই মহিলাই উটনীকে হত্যা করার ব্যাপারে গ্রহণ করেছিলো অগ্রবর্তিনীর ভূমিকা। সাদুফ প্ররোচিত করলো হাব্বাবকে। কিন্তু হাব্বাব রাজী হলো না। তখন সাদুফ উৎসাহিত করলো তার চাচাতো ভাই মাসদাকে। বললো, উটনীটিকে হত্যা করতে পারলে আমি হয়ে যাবো তোমার। সাদুফ ছিলো সুন্দরী ও বিত্তবতী। তাই মাসদা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্মত হলো। অপর মহিলা উনাইযাহ্ ঠিক করলো কাযার বিন সালিফকে। উনাইযাহ্ তাকে বললো, তুমি উটনীটিকে মেরে ফেলতে পারলে আমার কন্যাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে তুমি পাবে। কাযারের গায়ের রঙ ছিলো লাল। চোখ ছিলো নীল বর্ণের। দীর্ঘদেহ বিশিষ্ট ছিলো সে। বর্ণনাকারীদের ধারণা, সে ছিলো অবৈধ জাত। সালিফের গৃহে জন্ম হয়েছিলো বলেই তাকে বলা হতো কাযার বিন সালিফ। সালিফ ছিলো তাদের সম্প্রদায়ের এক প্রতাপশালী নেতা। 'ইজিম্বায়াছা আশক্বাহা' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রসুল স. বলেছেন, সে ছিলো তাদের গোত্র প্রধান। আবু জামআর মতো দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জামআ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বোখারী। হাদিসে বর্ণিত উষ্ট্রী বধের ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে— মাসদা ও কাযার দু'জনেই উষ্ট্রী বধ করতে চললো। সাহায্যকারী হিসাবে সাতজন লোককে সঙ্গে নিলো তারা। উষ্ট্রীটির প্রত্যাবর্তনের পথে পাথরের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে ওঁৎ পেতে বসে রইলো কাযার। অন্য পথে আত্মগোপন করে প্রতীক্ষা করতে লাগলো মাসদা। হঠাৎ সে উষ্ট্রীটিকে চলে যেতে দেখে নিক্ষেপ করলো একটি তীর। তীরটি বিদ্ধ হলো উষ্ট্রীটির পায়ের উপরিভাগে। ওদিকে উনাইযাহ্ তার সুন্দরী এক কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে কাযারকে গিয়ে বললো, এখানে নয়, ওদিকে যেয়ে দেখো উষ্ট্রীটি তীরবিদ্ধ হয়েছে। কাযার তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলো সেদিকে এবং সজোরে তার উপরে হানলো তরবারীর আঘাত। উষ্ট্রীটি তার শাবককে জোরে চিৎকার করে ডাকলো। তরবারীর আঘাতে কুঁজ কর্তিত হয়েছিলো তার। কাজার এবার তার বুকে ছুঁড়ে মারলো বর্শা। বর্শাবিদ্ধ উষ্ট্রীটি একটু পরেই মৃত্যুবরণ করলো। অবাধ্য জনতা আনন্দে হৈ চৈ করে উঠলো। তারা উটের গোশত ভাগ করে নিলো এবং সে গোশত রান্নাও শুরু করলো। শাবকটি তার গর্ভধারিণীর এ রকম পরিণতি দেখে উঠে গেলো একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়। কেউ কেউ বলেছেন, পাহাড়টির নাম সুর। আবার কেউ কেউ বলেছেন, খাযাহ্।

www.eelm.weebly.com

রসুল সালেহ্ সেখানে উপস্থিত হলেন একটু পরেই। তাঁর বিশ্বাসী অনুচরেরা বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের কোনো দোষ নেই। উষ্ট্রীটিকে হত্যা করেছে কাযার এবং মাসদা। রসুল সালেহ্ বললেন, শাবকটির সন্ধান করো। যদি তাকে পাও, তবে আশা করা যায় তোমরা আযাব থেকে বাঁচতে পারবে। লোকেরা তৎক্ষণাৎ শাবকটিকে খুঁজতে বের হলো। পাহাড়ের উপরে সেটিকে দেখতে পেয়ে ধরতে গেলো। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা পাহাড়কে করে দিলেন অনেক অনেক উচ্চ। যেখানে উড়ন্ত পাখিরাও পৌঁছতে সক্ষম হলো না।

বর্ণিত হয়েছে, শাবকটি হজরত সালেহ্কে দেখতে পেয়ে কেঁদে আকুল হলো। অনেক রোদনের পর সে তিনবার উচ্চারণ করলো বুকভাঙা আওয়াজ। সে আওয়াজে ফেটে গেলো একটি বড় পাথর। আর ওই ফাটলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করলো শাবকটি। এভাবে সে চিরদিনের জন্য চলে গেলো মানবচক্ষুর অন্তরালে। হজরত সালেহ্ হন্তারক জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শাবকটি চিৎকার করেছে তিনবার। তাই তোমাদের জন্য আয়ু নির্ধারিত হলো মাত্র তিনদিন। তিনদিন পর তোমাদের উপর নেমে আসবে আযাব। এর কোনো অন্যথা হবে না।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, অলৌকিক উষ্ট্রীটিকে হত্যা করার জন্য রওয়ানা হয়েছিলো নয়জন। পাঁচজন উষ্ট্রীটিকে এবং অবশিষ্ট চারজন তার শাবকটিকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হলো। শাবক হত্যার দলে ছিলো মাসদা ও তার ভাই যাব বিন মাহ্রাজ। শাবকটিকে দেখতে পেয়েই মাসদা নিক্ষেপ করলো তীর। তীরটি বিদ্ধ হলো তার হৃৎপিণ্ডে। মাসদা ও তার সঙ্গীরা তার পা ধরে পাহাড় থেকে নিচে টেনে নামালো এবং সেটিকেও তার মায়ের মতো জবাই করে গোশত বণ্টন করে নিলো নিজেদের মধ্যে। হজরত সালেহ্ বললেন, তোমরা চরম সীমালংঘনকারী। এবার তবে আল্লাহ্র আযাব আস্বাদনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু অবিশ্বাসীরা ভয় করলো না। তারা আরো উপহাস করে বলতে শুরু করলো, হে সালেহ্! আযাব তো আসবে বুঝলাম, কিন্তু কখন আসবে? সে আযাবের নিদর্শন কোথায়? ছামুদ সম্প্রদায় রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনিবারকে বলতো যথাক্রমে— আওয়াল, আওন, দিবার, জাব্বার, মোনেস, আরুবাহ্ এবং শায়ার। তারা উটনীটিকে হত্যা করেছিলো বুধবার। তাদের বিদ্রূপের উত্তরে হজরত সালেহ্ বলেছিলেন, বৃহস্পতিবার ভোর বেলা থেকে তোমাদের চেহারা হয়ে যাবে হলুদ। শুক্রবার সকাল থেকে হবে লাল এবং শনিবার সকাল থেকে হবে কালো। আর রবিবার সকালে তোমাদের প্রতি আপতিত হবে আযাব। এ কথা শুনে নয়জন হন্তারক বলতে লাগলো, এবার চলো আমরা সালেহ্কেই শেষ করে দেই। আযাব যদি আসেই তবে আযাব আসার আগেই তাকে শেষ করে দেয়া ভালো। আর যদি আযাব না আসে তবে সেও চলে

www.eelm.weebly.com

যেতে পারবে তার প্রিয় উটনীটির কাছে। হত্যার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো তারা। গভীর রাতে তারা একযোগে উপস্থিত হলো হজরত সালেহের বাসগৃহের নিকটে। কিন্তু যারা হত্যা করতে উদ্যত হলো তারা আর ফিরে এলো না। ফেরেশতারা পাথর নিক্ষেপ করে তাদেরকে মেরে ফেললো। ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে অবাধ্য জনতা এগিয়ে গেলো হজরত সালেহের বসতবাটির দিকে। মৃত সাথীদেরকে দেখে তারা বললো, হে সালেহ্! তুমিই এদেরকে হত্যা করেছো। তাই এবার আমরা তোমাকেও হত্যা করবো। তাদের কোনো কোনো লোক প্রতিবাদ করে উঠলো। বললো, সংযত হও। সালেহ্ যদি সত্য পয়গম্বর হয়, তবে তোমরা তাকে হত্যা করতে পারবে না, বরং কথিত আযাব এসে পড়বে আরো তাড়াতাড়ি। আমাদের জন্য তিনদিন অপেক্ষা করাই সংগত। তিনদিন পরেই আমরা বুঝতে পারবো সালেহের কথা সত্য না মিথ্যা। যদি মিথ্যা হয়, তবে তখন যে কোনো সময় আমরা তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবো। এই পরামর্শটি মেনে নিলো সকলে। তারা আর জটলা না করে সরে পড়লো।

বৃহস্পতিবার সকালে তারা সবিস্ময়ে দেখলো, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের চেহারা হয়ে গেছে হলুদ। তারা বুঝলো আর উপায় নেই। আযাব থেকে বাঁচবার আর কোনো আশাও নেই। কিন্তু আযাবের আলামত দেখতে পেয়েও এতটুকু অনুতপ্ত হলো না অবাধ্যরা। তওবা করার পরিবর্তে আরো বেশী উগ্র হয়ে পড়লো তারা। হত্যার উদ্দেশ্যে খুঁজে বেড়াতে লাগলো হজরত সালেহ্কে। কিন্তু হজরত সালেহ্ তখন আত্মগোপন করেছেন। গোপনে উপস্থিত হয়েছেন ছামুদ সম্প্রদায়ের বনী গানাম গোত্রাধিপতির নিকট। ওই গোত্রাধিপতির নাম ছিলো তাকাব্বাল। ডাক নাম আবু হারব। সে অংশীবাদী হওয়া সত্ত্বেও ছিলো হজরত সালেহ্র অনুরাগী। সে হজরত সালেহ্কে নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রাখলো। তাঁকে না পেয়ে দুরাচারেরা তাঁর অনুচরবর্গের উপর শুরু করে দিলো জুলুম। এই অত্যাচারের দৃশ্য দেখে এক বিশ্বস্ত অনুচর গোপনে হজরত সালেহ্র নিকটে উপস্থিত হলো। তার নাম ছিলো সদা' বিন হরোম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র নবী! পাষণ্ড অবিশ্বাসীরা আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে। আমরা কি আপনার ঠিকানা বলে দিবো? তিনি বললেন হ্যাঁ। তোমরা তাদেরকে বলো যে, আমাদের নবী কোথায় আছে তা আমরা জানি। কিন্তু তাঁর ঠিকানা বলে দিলেও তোমরা তাঁকে পাবে না। এ কথা বলে তোমরা আমার অবস্থানস্থলের সংবাদ তাদের জানাও। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। বিশ্বাসী অনুচরবৃন্দ জানিয়ে দিলেন, কোথায় রয়েছেন হজরত সালেহ্। কিন্তু বিশ্বাসীদের কথা শুনে অবিশ্বাসীরা হয়ে পড়লো উদ্যমহীন। আযাবের আতঙ্ক তাদেরকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছিলো। অবাক হয়ে তারা দেখছিলো তাদের চেহারার হলুদ রঙ। সন্ধ্যার পর তারা চিৎকার করে বলতে লাগলো হায়! তিনদিনের একদিন তো গত হয়ে গেলো। পরদিন সকালে তারা দেখলো, লাল টকটকে চেহারা হয়েছে সকলের। মনে হচ্ছিলো, চেহারায় লাগিয়ে দেয়া হয়েছে লাল রক্তের প্রলেপ। আহাজারিতে কেটে গেলো তাদের সমস্ত দিন— সমস্ত

www.eelm.weebly.com

রাত্রি। তৃতীয় দিন সকালে তারা দেখলো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গিয়েছে সকলের চেহারা। আতঙ্ক আর রোদন বেড়েই চললো তাদের। সন্ধ্যার পর বিশ্বাসী সহচরবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে হজরত সালেহ্ রওয়ানা দিলেন সিরিয়ার দিকে। ফিলিস্তিনের একটি মরুভূমিতে নিরাপদ অবস্থান গ্রহণ করলেন।

ওদিকে রবিবার সকালে অবাধ্য ছামুদ সম্প্রদায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলো। দেহে জড়িয়ে নিলো কাফনের কাপড়। তারা একবার তাকাতে লাগলো মাটির দিকে। আর একবার তাকাতে লাগলো আকাশের দিকে। বুঝতে চেষ্টা করছিলো— আযাব কি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবে, না উত্থিত হবে মাটি থেকে। কিন্তু তারা কোনো কিছুই ঠাহর করতে পারছিলো না। বেলা বাড়তে শুরু করলো। হঠাৎ বিকট আওয়াজে শুরু হলো ভূমিকম্প। একই সঙ্গে আকাশ থেকে উচ্চারিত হলো এক বিকট আওয়াজ। ওই আওয়াজ ছিলো বজ্রপাতের চেয়েও অনেক অনেক শক্তিশালী। ওই আওয়াজে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধবনিতা মুহূর্তের মধ্যে কলিজা ফেটে মরে গেলো। কিন্তু ওই আওয়াজের মধ্যেও সাময়িকভাবে বেঁচে গেলো এক রমণী। তার নাম যারিয়াত বিনতে সালাফ। হজরত সালেহ্র ঘোর শত্রু ছিলো সে। আযাব আসার আগেই আযাবের ভয়ে খসে পড়েছিলো তার এক পা; সে ভয়ে কোনো রকমে পালিয়ে পৌঁছেছিলো পাশের কুরা উপত্যকাতে। গ্রামবাসীদেরকে ভয়ানক আযাবের সংবাদ জানিয়ে সে পানি প্রার্থনা করলো। পানি দেয়া হলো তাকে, কিন্তু পানি পান করার সাথে সাথে সে মরে পড়ে রইলো।

সুদ্দীর বর্ণনায় এসেছে— আল্লাহ্তায়ালা হজরত সালেহ্র নিকটে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলেন— তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা অতি শীঘ্র তোমার উটনীকে হত্যা করবে। হজরত সালেহ্ তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এ কথা বলতেই তারা বলে উঠলো, আমরা কখনোই এ রকম করতে পারবো না। হজরত সালেহ্ বললেন, এ মাসে জন্মগ্রহণ করবে একটি শিশু। সে বড় হয়ে হত্যা করবে অলৌকিক উটনীটিকে। ফলে তোমাদের ধ্বংস হয়ে উঠবে অনিবার্য। তারা বললো, এ মাসে ভূমিষ্ঠ হওয়া সকল শিশুকে হত্যা করে ফেলবো আমরা। সে মাসে ভূমিষ্ট হলো দশটি শিশু। তাদের নয়টিকেই হত্যা করে ফেললো তারা। কিন্তু কেমন করে যেনো লাল রঙ এর নীল চক্ষু বিশিষ্ট একটি শিশু বেঁচে গেলো। অতি দ্রুত বেড়ে উঠতে লাগলো শিশুটি। তাকে দেখে নিহত শিশুদের পিতারা আক্ষেপ করে বলতো, হায়! আমাদের শিশুদের হত্যা না করলে সেও এতদিনে বড় হয়ে উঠতো। তাদের আক্রোশ তখন গিয়ে পড়তো হজরত সালেহ্র উপর। তারা বললো, এই লোকটির উস্কানিতেই আমাদের শিশু সন্তানগুলোকে হত্যা করা হয়েছে। তারা একজোট হলো। নিজেদের মধ্যে এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো যে, গভীর নিশীথে আমরা আক্রমণ করে সালেহ্ ও তার বাড়ির সকলকে হত্যা করে ফেলবো। তারা ঠিক করলো সকলকে দেখিয়ে আমরা বের হবো সফরে। মানুষ মনে করবে আমরা অন্য দেশে সফরে গিয়েছি। কিন্তু আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করে থাকবো কয়েকদিন। তারপর সালেহ্ যখন

www.eelm.weebly.com

ইবাদতের উদ্দেশ্যে গভীর রাতে উপাসনালয়ের দিকে যাবে তখন তাকে আমরা একযোগে আক্রমণ করে হত্যা করে ফেলবো। পুনরায় ফিরে যাবো পর্বতের গুহায়। কয়েকদিন পর ঘরে ফিরে এসে আমরা হত্যার সংবাদ শুনে বিস্মিত হবার ভান করবো। বলবো, হায়! কী মর্মবিদারক সংবাদ। আমরা তো তখন এখানে ছিলামও না। লোকেরা বুঝতেও পারবে না, কে আসলে হত্যা করেছে সালেহ্কে।

হজরত সালেহ্ তাঁর জনপদের লোকদের সঙ্গে রাত্রি অতিবাহিত করতেন না। তিনি রাত্রিযাপন করতেন এক মসজিদে। ওই মসজিদটির নাম মসজিদে সালেহ্। সকালে তিনি ওই মসজিদে আগত লোকজনদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ নসিয়ত করতেন। দিনের বেলায় ফিরে আসতেন স্বগৃহে। সন্ধ্যায় পুনরায় গমন করতেন ওই মসজিদে।

যারা তাঁকে হত্যা করতে মনস্থ করেছিলো তারা একদিন দিনের বেলায় সফরের ভান করে সকলের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলো। অদূরের একটি পাহাড়ে আত্মগোপন করে রইলো তারা। পরিকল্পনা করলো, রাত্রের অন্ধকারে মসজিদে অবস্থানরত হজরত সালেহ্কে একযোগে আক্রমণ করে হত্যা করে ফেলবে তারা। কিন্তু তাদের সে আশা সফল হলো না। আল্লাহ্পাকের হুকুমে গুহাটি ধ্বসে পড়লো। গুহার মধ্যেই পাথর চাপা পড়ে মারা পড়লো তারা। এভাবেই সকল কৌশলের উপর আল্লাহ্তায়ালার কৌশল বিজয়ী হয়। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা ফন্দি আঁটলো। আমিও তাদের ফন্দির জবাব দিলাম। অথচ তারা অনুভব করতে পারলো না।'

বিষয়টি কিন্তু চাপা রইলো না। কিছু লোকের নজরে পড়লো, ওই লোকগুলোর লাশ পাথর চাপা পড়ে বিক্ষিপ্তরূপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা জনপদের সকল লোককে একত্র করে জানালো, দ্যাখো সালেহ্ কেবল ওই লোকগুলোর সদ্যভূমিষ্ঠ নয়টি শিশুকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। তাদের পিতাদেরকেও হত্যা করে ফেলে রেখেছে পাহাড়ের পাশে। সকলে তখন একমত হলো যে, সালেহ্র উটনীটিকে এবার হত্যা করতেই হবে। ইবনে ইসহাক বলেছেন, উটনীকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিলো হজরত সালেহ্কে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে।

সুদ্দীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, দশটি শিশুর মধ্যে নয়টিকে হত্যা করা হয়েছিলো। একটিকে হয়নি। সেই শিশুটি খুব দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকলো। অন্য শিশুরা এক বছরে যতটুকু বাড়ে, সে ততটুকু বাড়তে থাকলো এক মাসে। এভাবে অতি দ্রুত বড় হলো সে। বড় হয়ে একদিন সে তার সাথীদেরকে নিয়ে মদ্য পান করতে বসলো। মদ্যপানের জন্য প্রয়োজন হলো পানির। ওই দিন ছিলো উটনীটির পানি পানের দিন। তাই কূপে কোনো পানি পাওয়া গেলো না। পানি না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো তারা। বললো, উটনীর দুধ দিয়ে আমরা কী করবো। আমাদের দরকার পানি। উটনীটি যেদিন পানি পান করে সেদিন কূপের আর কোনো পানিই থাকে না। আমাদের সকল পশুকে সেদিন থাকতে হয় পিপাসিত।

www.eelm.weebly.com

উটনীটি পানি পান না করলে আমরা ওই বিপুল পরিমাণ পানি দিয়ে আমাদের পশুগুলোকে পরিতৃপ্ত করতে পারতাম। ক্ষেতেও পানি সিঞ্চন করতে পারতাম। এই উটনীটির জন্যই আমাদের পশুগুলোকে একদিন পর একদিন তৃষ্ণার্ত থাকতে হয়। এই উপদ্রব আমরা সহ্য করি কী করে। উটনীটিকে তাই হত্যা করাই সমীচীন। সকলে এ প্রস্তাবে সায় দিয়ে বললো, ঠিক আছে, তাই করা হোক। এরপর সকলে মিলে হত্যা করলো ওই অলৌকিক উটনীটিকে।

আবদুল্লাহ্ বিন দীনারের চাচাতো ভাই থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তাবুক যুদ্ধের সময় রসুল স. হিজর নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সহচরবৃন্দকে নির্দেশ দিলেন, এখানকার কূপটির পানি কেউ পান কোরো না। পশুদেরকে পান করিয়ো না। সাহাবীগণ বললেন, আমরা তো ওই কূপের পানি সংগ্রহ করেছি। আর ওই পানি দিয়ে আটার খামিরও তৈরী করেছি। রসুল স. বললেন, পানি ও আটার খামির ফেলে দাও।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হুকুম দিয়েছিলো, হিজর এলাকার কূপ থেকে যদি তোমরা পানি সংগ্রহ করে থাকো, তবে সে পানি ফেলে দাও। আর ওই পানি দিয়ে যদি খামির প্রস্তুত করে থাকো, তবে তা খাইয়ে দাও তোমাদের উটগুলোকে। পানি সংগ্রহ করো ওই কূপ থেকে, যে কূপের পানি পান করেছিলো সালেহ্ নবীর উটনী।

বাগবী লিখেছেন, আবু যোবায়ের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত জাবের বলেছেন, তাবুক যুদ্ধের সময় রসুল স. যখন ছামুদ সম্প্রদায়ের এলাকা হিজর অতিক্রম করছিলেন, তখন সাহাবীগণকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা কখনো এই বিরান জনপদে বিচরণ করবে না। এখানকার পানিও পান করবে না। এ এলাকাটি হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার আযাবগ্রস্ত এলাকা। সুতরাং ভয়ে রোদন করতে করতে এই এলাকা অতিক্রমের সময় মনে মনে প্রার্থনা করতে থেকো যে, তোমাদের উপরে যেনো এ রকম আযাব আপতিত না হয়। আর তোমরা তোমাদের রসুলের নিকট কখনো কোনো মোজেজা দেখতে চেয়ো না। ছামুদ সম্প্রদায় তাদের রসুলের নিকট মোজেজা দেখতে চেয়েছিলো। আল্লাহ্তায়ালা তখন একটি পাথরের অভ্যন্তর থেকে বের করে দিয়েছিলেন একটি অলৌকিক উটনী। এই পাহাড়ী পথ ধরে ওই উটনীটি একটি কূপে পানি পান করতে যেতো। যেদিন পানি পান করতো, সেদিন কূপের পানি হয়ে যেতো নিঃশেষ। অবাধ্য ছামুদ সম্প্রদায় ওই অলৌকিক উটনীটিকে হত্যা করেছিলো। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এভাবে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে ওই প্রতাপশালী সম্প্রদায়কে। তাদের সম্প্রদায়ের আবু রাগাল নামক এক ব্যক্তি তখন ছিলো মক্কায়। তাই সে ওই আযাব থেকে তখন রক্ষা পেয়েছিলো। কিন্তু যখন সে হেরেমের সীমানার বাইরে গেলো তখন তার উপরেও আপতিত হলো আযাব। সে ভূমিতে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিলো। তার কাছে তখন ছিলো একটি স্বর্ণ খণ্ড। তার সাথে সাথে ওই স্বর্ণ খণ্ডটিও দেবে গিয়েছিলো মাটিতে। এ কথা বলে রসুল স. সাহাবীগণকে আবু রাগালের কবর দেখিয়ে দিলেন। সাহাবীগণ সেখানকার ভূমি খনন করে পেয়ে

www.eelm.weebly.com

গেলেন ওই স্বর্ণখণ্ডটি। ছামুদ গোত্রের চার হাজার লোক ইমান এনেছিলেন হজরত সালেহ্‌র প্রতি। হজরত সালেহ্ তাঁর বিশ্বাসী উম্মতগণকে নিয়ে আযাব আসার আগেই চলে গিয়েছিলেন হাদ্বরা মাউতে। সেখানেই গড়ে উঠেছিলো বিশ্বাসীদের এক নতুন জনপদ। সেখানেই মহাপ্রয়ান ঘটেছিলো হজরত সালেহ্‌র। তাই ওই স্থানের নাম হয়েছে হাদ্বরা মাউত। এরপর তাঁর উম্মতেরা গড়ে তুলেছিলো আর একটি জনপদ। ওই জনপদের নাম ছিলো হাসুরা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হজরত সালেহের মহাঅন্তর্ধান ঘটেছিলো মক্কায়। পরকাল যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর বয়স হয়েছিলো আটান্ন বছর। তিনি তাঁর বিশ্বাসী উম্মতগণের মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন মাত্র বিশ বছর।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ

يَتَطَهَّرُونَ ۝ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ۝ وَأَمْطَرْنَا

عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۝

❒ এবং লূতকেও পাঠাইয়াছিলাম। সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম করিতেছ যাহা তোমাদিগের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই';

❒ 'তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।'

❒ উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু বলিল, 'ইহাদিগকে জনপদ হইতে বহিষ্কৃত কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা পবিত্র হইতে চাহে।'

❒ অতঃপর তাহাকে ও তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহার স্ত্রী ছিলো ধ্বংসপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত।

❒ তাহাদিগের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম, সুতরাং অপরাধীদিগের পরিণাম কী হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর।

---

www.eelm.weebly.com

উদ্ধৃত পাঁচ আয়াতের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'এবং লূতকেও পাঠিয়েছিলাম। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমরা এমন কুকর্ম করছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি।' এখানে লূতান (লূত) শব্দটির পূর্বে 'আরসাল্না' (পাঠিয়েছিলাম) কথাটি উহ্য রয়েছে। অথবা উহ্য রয়েছে 'উজ্কুরু' (স্মরণ করো) কথাটি।

'আ তা'তুনাল ফাহিশাতা' (তোমরা কি কুকর্ম করছো) কথাটির মধ্যে রয়েছে চরম হুঁশিয়ারী। 'আল ফাহিশাতা' (কুকর্ম) কথাটির অর্থ এখানে পুরুষে পুরুষে সমকামিতা। 'মা সাবাক্বাকুম বিহা মিন আহাদিম্ মিনাল আ'লামীন' অর্থ— যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। এখানে 'মিন্ আহাদিন' কথাটির 'মিন' (মধ্যে) হচ্ছে মিন-এ জায়েদা (অতিরিক্ত সংযোজন)। এ রকম সংযোজনের মাধ্যমে বক্তব্যকে সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হয়। আর 'মিনাল আ'লামীন' কথাটির 'মিন' হচ্ছে মিন-এ তাবয়িযিয়াহ্ (আংশিক অর্থ প্রকাশক মিন)।

আমর বিন দীনার বলেছেন, পুরুষের উপর পুরুষের উপগত হওয়ার এই কুপ্রথাটি হজরত লূতের সম্প্রদায়ের লোকেরাই সর্বপ্রথম শুরু করেছিলো। আয়াতে তাই স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে— তোমরা এমন কুকর্ম করছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি।

পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'তোমরা তো কামতৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন করো, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।'

হজরত লূতের পিতা ছিলেন হারেছ অথবা হারম। তাঁর পিতামহ ছিলেন তারেক। তিনি ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র।

আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ তারা কাম-তৃপ্তির জন্য নারী গমনের স্বাভাবিক বিধানটিকে লংঘন করে পুরুষের উপর উপগত হতো। নিঃসন্দেহে ওই কুকর্মটি ছিলো ঘৃণ্য ও নিষ্ফল। আল্লাহ্তায়ালার সাধারণ ও স্বাভাবিক বিধান এই যে, কাম পরিতৃপ্তির জন্য ও সন্তান লাভের লক্ষ্যে নারী ও পুরুষ বৈধ স্বামী-স্ত্রী হিসেবে রতিকর্মে লিপ্ত হবে। কিন্তু হজরত লূতের অবাধ্য সম্প্রদায় হয়ে গিয়েছিলো জ্ঞানহীন পশুর মতো। এ আয়াতের মাধ্যমে এ কথাটিও প্রমাণিত হয় যে, রমণীদের সঙ্গে পায়ু সঙ্গম হারাম। কারণ তা পুরুষে পুরুষে সমকামের মতোই অপবিত্র, ঘৃণ্য এবং শুভ উদ্দেশ্যবর্জিত। সূরা বাকারার তাফসীরে এই মাসআলাটির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেখানকার এ সম্পর্কিত আয়াতটি হচ্ছে— তোমাদের অভ্যাসই হচ্ছে শরিয়তের যুক্তিসঙ্গত বিধানকে লংঘন করা। বিবাহকে ত্যাগ করে তোমরা এমন কাজের দিকে ধাবিত হয়েছো— যা মানবতাবিরোধী ও অকল্যাণকর।

www.eelm.weebly.com

এই আয়াতেও জঘন্য কুকর্মটি সম্পর্কে ঘৃণা ও নিন্দাজ্ঞাপন করা হয়েছে। এই নির্দেশনাটি দেয়াই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য যে, কামতৃপ্তির জন্য তোমরা অবলম্বন করেছো অপবিত্রতা, অবৈধতা ও অস্বাভাবিকতাকে। অতএব হে লুতের সম্প্রদায়! এ কথাটি জেনে রাখো যে, এটা নিশ্চিত সীমালংঘন। এটাও সুনিশ্চিত যে, তোমরা হচ্ছো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতেও (৮২)। বলা হয়েছে—'উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বললো, এদেরকে জনপদ থেকে বহিষ্কার করো, এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র হতে চায়।' পাপিষ্ঠদের এ বক্তব্যটি ছিলো হজরত লুত ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরবৃন্দের প্রতি একটি স্পষ্ট বিদ্রূপ। অপবিত্রতায় আপাদমস্তক নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলো তারা। তাই স্বাভাবিক পবিত্রতার বিরুদ্ধে বিদ্রূপপ্রবণ হতে বাধেনি তাদের ।

পরের আয়াতে (৮৩) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তাকে ও তার স্ত্রী ব্যতীত তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম, তার স্ত্রী ছিলো ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।' এখানে 'ওয়া আহ্লাহু' কথাটির অর্থ বিশ্বাসী পরিজনবর্গ। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত লুতের ছিলো দুই স্ত্রী। প্রকাশ্যে বিশ্বাসিনীর ভান করলেও তাঁর এক স্ত্রী ছিলো কাফের। ওই স্ত্রী সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে, 'তার স্ত্রী ছিলো ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের উপর যখন আল্লাহ্র আযাব নেমে এলো তখন আল্লাহ্তায়ালা হজরত লুত ও তাঁর বিশ্বাসী সাথীদেরকে ওই পাপিষ্ঠ জনপদ থেকে অন্যত্র গমনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই অবিশ্বাসী স্ত্রী তখন সেই নির্দেশ মানেনি। সে রয়ে গিয়েছিলো তার সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ লোকদের সঙ্গে এবং অবাধ্যদের সঙ্গে। সে-ও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো আল্লাহ্র আযাবে।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিলো তা লক্ষ্য করো।' এখানে 'মাতারান' (মুষলধারে বৃষ্টি) কথাটির অর্থ বিস্ময়কর বৃষ্টি। ওই বিস্ময়কর বৃষ্টি ছিলো পাথরের বৃষ্টি। প্রতিটি পাপিষ্ঠের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো একটি করে পাথর। ওই তীব্র গতিতে বর্ষিত নির্ধারিত পাথরের আঘাতে ধ্বংস হয়েছিলো পাপিষ্ঠরা। ওয়াহাব লিখেছেন, ওই বৃষ্টি ছিলো গন্ধক ও আগুনের বৃষ্টি। আবু উবায়দা বলেছেন, 'আমতারা' অর্থ রহমতের বৃষ্টি। আর মাতারা অর্থ গজবের বৃষ্টি। আর 'আল-মুজরিমীন' কথাটির অর্থ এখানে অপরাধী, সীমালংঘনকারী এবং কাফের।

বর্ণিত হয়েছে, হজরত লুত তাঁর পিতৃব্য হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে বাবেল শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সিরিয়া অতিক্রম কালে তিনি যাত্রা স্থগিত

www.eelm.weebly.com

করলেন জর্ডান নামক স্থানে। আল্লাহ্তায়ালা সেখান থেকে তাঁকে নবী বানিয়ে প্রেরণ করলেন সদোমবাসীদেরকে হেদায়েতের উদ্দেশ্যে। সদোমের লোকেরাই শুরু করেছিলো ঘৃণ্য সমকামিতা। হজরত লুত তাদেরকে ওই জঘন্য পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করতে বললেন। কিন্তু তারা হজরত লুতের কথায় কর্ণপাত করলো না। তখন আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে প্রস্তর বৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বংস করে দিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইসহাক বিন বশীর এবং ইবনে আসাকেরও এ রকম বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, গৃহবাসী সদোমদেরকে ভূমিধ্বসের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। আর মুসাফির সদোমদেরকে বিনাশ করা হয়েছিলো পাথরের বৃষ্টির দ্বারা।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, সদোম সম্প্রদায়ের এলাকাটি ছিলো সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা। আশে পাশের সকল অঞ্চলের চেয়েও সুন্দর অঞ্চল ছিলো ওই সদোম। তাই আশে পাশের লোকেরা প্রায়শঃই অত্যাচার করতো তাদের উপর। ফল ও ফসল লুঠ করে নিয়ে যেতো। অবাধে পশুপাল চরাতো ফসলের ক্ষেতে। ইবলিস একদিন মানুষের আকৃতিতে শুভাকাঙ্খীর ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত হলো বিমর্ষ সদোমদের নিকট। পরামর্শ দিলো— তোমরা যদি পুরুষ সম্ভোগ করো, তবে বেঁচে থাকতে পারবে সকল অত্যাচার থেকে। সদোমেরা প্রথমে এ পরামর্শকে ভালো মনে করলো না। কিন্তু বহিরাগতদের উপদ্রব যখন চরমে পৌঁছলো, তখন উদ্ধারের আশায় মরিয়া হয়ে চোর, ডাকাত অথবা তাদের অল্পবয়সী সন্তানদেরকে ধরে শুরু করলো পুরুষ সম্ভোগ।

হাসান বসরী বলেছেন, সদোম সম্প্রদায়ের লোকেরা এতো চরমে পৌঁছলো যে, তারা রমণীদেরকে কেবল বিয়েই করতো। কিন্তু কাম চরিতার্থ করতো পুরুষদের সঙ্গে। কালাবী বলেছেন, ইবলিসই সদোম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রথম এনেছিলো এই ঘৃণিত প্রথাটি। সদোমদের জনপদ ছিলো ফল ও ফসলে ভরা। বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকেরা সেখানে আসতো। কিন্তু সদোমবাসীরা ছিলো বড়ই সংকীর্ণচিত্ত। পথিক ও অনাথদেরকে তারা কিছুই দিতে চাইতো না। একদিন ইবলিস উঠতি বয়সের যুবকের আকৃতিতে লোভনীয় ভঙ্গিতে হাজির হলো তাদের এলাকায়। যারা তার প্রতি আকৃষ্ট হলো তাদেরকে সে ইঙ্গিত করলো তার পশ্চাৎদেশের দিকে। এভাবে তাদেরকে সে প্রথম শিক্ষা দিলো সমকাম। ধীরে ধীরে ওই ঘৃণ্য কুকর্মের মধ্যে ডুবে গেলো সকলে। পরিণাম হলো অত্যন্ত ভয়াবহ। পাথর বৃষ্টি এবং ভূমিধ্বসের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হলো সকলকে।

www.eelm.weebly.com

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ
قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ
وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ○ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا
بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ○

❒ মাদিয়ানবাসীদিগের নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা শোয়াইবকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তোমাদিগের প্রতিপালক হইতে তোমাদিগের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে; লোকদিগকে তাহাদিগের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না, এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাইবে না; তোমরা বিশ্বাসী হইলে তোমাদিগের জন্য ইহা কল্যাণকর।

❒ বিশ্বাসীগণকে ভয়-প্রদর্শনের জন্য কোন পথে বসিয়া থাকিবে না, আল্লাহের পথে তাহাদিগকে বাধা দিবে না, এবং উহাতে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করিবে না।' স্মরণ কর, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদিগের পরিণাম কিরূপ ছিল, তাহা লক্ষ্য কর।

www.eelm.weebly.com

❒ আমার প্রতি যাহা প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে যদি তোমাদিগের কোন দল বিশ্বাস করে এবং কোন দল বিশ্বাস না করে তবে ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদিগের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী'।

প্রথমে বলা হয়েছে—'মাদিয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম।' হজরত ইব্রাহিমের এক পুত্রের নাম ছিলো মাদিয়ান। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে মাদিয়ানবংশভূতদের কথা। বাগবী উল্লেখ করেছে, মাদিয়ানবাসীরাই আসহাবুল আয়কাত (অরণ্যবাসী)।

আতা বলেছেন, হজরত শোয়াইবের পিতা ছিলেন তাওবাহ্ এবং পিতামহ ছিলেন হজরত ইব্রাহিম। ইবনে ইসহাকের এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত লুতের কন্যা মীকাইলের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হজরত শোয়াইব। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত শোয়াইব ছিলেন মীকাইলের পুত্র, মীকাইল ইয়াশজারের, ইয়াশজার মাদিয়ানের, আর মাদিয়ান ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের সন্তান। । শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন হজরত শোয়াইব। তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী। তাই তাঁর উপাধি ছিলো খতিবুল আম্বিয়া। তাঁর স্বজাতি ছিলো অবিশ্বাসী ও পরিমাপে দিতো কম। হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, রসুলপাক স. যখনই হজরত শোয়াইবের আলোচনা করতেন তখনই বলতেন, তিনি ছিলেন খতিবুল আম্বিয়া। এ কারণেই তিনি স্বজাতিকে উত্তমরূপে সম্বোধন করতেন। তাঁর সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাবলী ছিলো সুললিত, সুগঠিত ও হৃদয়গ্রাহী। আলোচ্য আয়াতে তাঁর একটি আংশিক ভাষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

বলা হয়েছে, সে বলেছিলো, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই; তোমাদের প্রতিপালক থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে; লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না; তোমরা বিশ্বাসী হলে তোমাদের জন্য এটা কল্যাণকর।'

এখানে 'উয়্বুদুল্লহ' অর্থ— নির্জনে তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো। 'বাইয়্যেনাত' অর্থ মোজেজা। অবশ্য কোরআন মজীদে হজরত শোয়াইবের কোনো মোজেজার উল্লেখ নেই। তাই কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'বাইয়্যেনাত' শব্দটির অর্থ হবে— হেকমত অথবা নসিহত। উল্লেখ্য যে, হজরত শোয়াইবের বাচনশৈলী ছিলো যেমন কুশলী, তেমনি মাধুর্যমণ্ডিত।

'আল-মীযান' শব্দটি মীয়া'দ শব্দটির মতো একটি মূল শব্দ। এর অর্থ ওজন। অথবা দাঁড়িপাল্লা। মীযান অর্থ যদি শুধু দাঁড়িপাল্লা হয় তবে বুঝতে হবে 'ওজন' কথাটি এখানে রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ত কথাটিসহ মীযান শব্দটির পরিপূর্ণ অর্থ হবে— দাঁড়িপাল্লার ওজন।

www.eelm.weebly.com

'কাইলুন' অর্থ পরিমাপ। শব্দটির মূল ধাতু এখানে উহ্য রয়েছে। 'আ'য়শা' শব্দটির সঙ্গে 'মায়া'শ শব্দটির সম্পর্ক যে রকম, সে রকমই সম্পর্ক 'মাইল' শব্দটির সঙ্গে 'কমইয়াল' শব্দটির।

'তাব্খাসু' (প্রাপ্য বস্তু) শব্দটির দু'টি কর্ম রয়েছে এখানে। একটি হচ্ছে— 'আন্নাস' (লোকদেরকে)। আরেকটি হচ্ছে 'আশইয়াআহুম' (কম দিবে না)। আরবী পরিভাষা অনুসারে বলা হয়— 'বাখাসতু যায়দান হাক্কাহু' (আমি জায়েদকে তার যথাপ্রাপ্য অপেক্ষা কম দিয়েছি)। এখানে 'আশ্ইয়া' শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক। এর দ্বারা বুঝা যায় মাদিয়ানের আপামর জনসাধারণ কম-বেশী সকল সামগ্রী ওজন ও পরিমাপে কম দিতো। কেউ কেউ বলেছেন মাদিয়ানবাসীরা ছিলো অতিরিক্ত সঞ্চয়প্রবণ। তারা প্রতিটি দ্রব্য-সামগ্রী কুক্ষিগত করে রাখতে চাইতো।

'ওয়ালা তুফ্সিদু' অর্থ— বিপর্যয় ঘটিও না। অর্থাৎ কুফরী ও জুলুম কোরো না।

'বা'দা ইস্লাহিহা' অর্থ— শান্তি স্থাপনের পর। অর্থাৎ— হে মাদিয়ানবাসী! আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের নিকটে নবী প্রেরণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে ভালো কাজের আদেশ দেন এবং মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকতে বলেন। তাঁর এই শান্তি প্রচেষ্টাকে তোমরা বিপর্যস্ত করে তুলো না। তোমরা তাঁর নসিহত গ্রহণ করো। পরিমাপে ও ওজনে কম দিলে কিছু সম্পদগত উপকার হয়তো তোমাদের হবে, কিন্তু তোমরা ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

আলোচ্য আয়াতের শেষ কথাটি হচ্ছে— 'তোমরা বিশ্বাসী হলে তোমাদের জন্য এটা কল্যাণকর'। এ কথার অর্থ— হজরত শোয়াইব বলেছিলেন, হে মাদিয়ানের জনতা! তোমরা তো আমাকে সত্যবাদী বলে জানো। যদি তাই হয় তবে আমার কথা বিশ্বাস করো তোমরা। এ কথাটি সর্বান্তকরণে মেনে নাও যে, পরিমাপে ও ওজনে কম দেয়া একটি গর্হিত অপরাধ। এ অপরাধটি পরিত্যাগের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। উল্লেখ্য যে, মাদিয়ানবাসীরা ভালো করেই জানতো যে হজরত শোয়াইব সত্যবাদী। কারণ তারা দেখেছিলো নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেও তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি। কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে অন্ধ করে ফেলেছিলো। তাই তাঁর নবুয়তের প্রতি তারা জানিয়েছিলো অস্বীকৃতি।

বর্ণিত হয়েছে, মাদিয়ানের এক লোক তাদের জনপদের প্রধান সড়কের মাথায় বসে থাকতো। হজরত শোয়াইবের নিকট গমনকারী লোকদেরকে বাধা দিতো সে। বলতো, ওদিকে যেয়ো না। শোয়াইব তো মিথ্যাবাদী। সে তোমাদেরকে

www.eelm.weebly.com

ধর্মচ্যুত করতে চায়। লোকটি হজরত শোয়াইবের বিশ্বস্ত অনুচরবৃন্দকেও বিভিন্নভাবে ভয় দেখাতো। হত্যারও হুমকি দিতো। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেমও এ রকম বর্ণনা করেছেন। পরের আয়াতের (৮৬) বক্তব্যে সে কথাই উল্লেখিত হয়েছে।

বলা হয়েছে—'বিশ্বাসীগণকে ভয় প্রদর্শনের জন্য কোনো পথে বসে থাকবে না, আল্লাহ্র পথে তাদেরকে বাধা দিবে না এবং তাতে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবে না।' এখানে 'তাব্‌গুনাহা ই'ওয়াজা' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার পথে বক্রতা আনয়ন করতে চেষ্টা কোরো না বা সন্দেহ সৃষ্টি কোরো না। অথবা মানুষকে এ কথা বলো না যে, আল্লাহ্র নবী কর্তৃক প্রদর্শিত পথ বঙ্কিম। এ রকম কথা সরল মানুষদেরকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তোলে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'সিরাতুন' শব্দটির অর্থ সত্যধর্মের পথ। ধর্মের মূল পথ একটিই। কিন্তু এর শাখা-প্রশাখা রয়েছে অনেক। যেমন, বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ, আল্লাহ্র পরিচয় লাভের বিশেষ নির্দেশনা, নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার বিবরণ, শাস্তি ও শান্তির বিধান ইত্যাদি। এ সকল শাখা কিন্তু ধর্মের মূল পথের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্পৃক্ত। অবিশ্বাসী মাদিয়ানবাসীরা হজরত শোয়াইবের অনুসারীদেরকে ধর্মের যে কোনো এক শাখায় আমল করতে দেখলেও তাদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট প্রদান করতো এবং হত্যা করা হবে বলে ভয়ও দেখাতো।

এরপর বলা হয়েছে—'স্মরণ করো, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিলো, তা লক্ষ্য করো।' এ কথার অর্থ— ইতোপূর্বে তোমরা সংখ্যায় ছিলে কম। তোমাদের সম্পদও ছিলো সীমিত। আল্লাহ্তায়ালাই তোমাদের সন্তান-সন্ততি এবং ধন সম্পদে বরকত দান করেছেন। তাই তোমরা হয়ে উঠেছো ধনে জনে গরিষ্ঠ ও বৈভবিত। সুতরাং তোমরা অহমিকা কোরো না। স্মরণ করো, ইতোপূর্বে তোমাদের মতো এ রকম ধন-জন-শোভিত অনেক সম্প্রদায়কে তাদের পাপাচার ও অবাধ্যতার কারণে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন আল্লাহ্তায়ালা। ভেবে দেখো, কী নিদারুণ পরিণতি হয়েছিলো হজরত লুত, হজরত হুদ এবং হজরত নুহের সম্প্রদায়ের।

পরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে—'আমার প্রতি যা প্রেরিত হয়েছে তাতে যদি তোমাদের কোনো দল বিশ্বাস করে এবং কোনো দল বিশ্বাস না করে তবে ধৈর্যধারণ করো, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।' এ কথার অর্থ— হজরত শোয়াইব বলেছিলেন, হে

www.eelm.weebly.com

আমার সম্প্রদায়! উত্তমরূপে অবগত হও যে, আল্লাহ্তায়ালা বিশ্বাসীদেরকে বিজয় দান করবেন। আর অবিশ্বাসীদেরকে করবেন ধ্বংস। সুতরাং বিতণ্ডায় লিপ্ত না হয়ে প্রতীক্ষা করাই শ্রেয়। চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য রয়েছে নির্ধারিত সময়। ওই সময় এলে সত্যানুসারী ও মিথ্যাশ্রয়ীদের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে। মীমাংসা করবেন আল্লাহ্পাক স্বয়ং। তিনিই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।

www.eelm.weebly.com

নবম পারা

সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৮৮, ৮৯

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِينَ
اٰمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ؕ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِينَ ۝ قَدِ
افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ
وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ
عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِينَ ۝

❒ তাহার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বলিল, 'তোমাদিগকে আমাদিগের ধর্মাদর্শে ফিরিয়া আসিতে হইবে; অন্যথায় হে শোয়াইব! তোমাকে ও তোমার সহিত যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে আমাদিগের জনপদ হইতে বহিষ্কৃত করিবই।' সে বলিল, 'কী, আমরা উহা ঘৃণা করিলেও?

❒ তোমাদিগের ধর্মাদর্শ হইতে আল্লাহ্ আমাদিগকে উদ্ধার করিবার পর যদি আমরা উহাতে ফিরিয়া যাই তবে তো আমরা আল্লাহের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিব, আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করিলে আর উহাতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদিগের কাজ নয়; সব কিছুই আমাদিগের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত; আমরা আল্লাহের প্রতি নির্ভর করি; হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের ও আমাদিগের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করিয়া দাও; এবং তুমিই মীমাংসাকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

www.eelm.weebly.com

উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের প্রথমটির মর্মার্থ হচ্ছে— মাদিয়ানের অহংকারী নেতারা বললো, তোমাদেরকে আমাদের ধর্মে ফিরে আসতে হবে। যদি না আসো তবে শুনে নাও হে শোয়াইব! তোমাকে ও তোমার অনুসারীদেরকে আমরা আমাদের ভূখণ্ড থেকে বহিষ্কার করবোই।

হজরত শোয়াইব কখনোই অবিশ্বাসী বা অংশীবাদী ছিলেন না। সুতরাং কুফরী ধর্মমতে তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নই উঠতে পারে না। নবুয়ত ও রেসালাত লাভের পূর্বে অথবা পরে কোনো নবী রসুল মুহূর্তের জন্যও কুফরীর উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন না। কিন্তু যারা নবী-রসুল প্রবর্তিত সত্যধর্মে দীক্ষিত হন, তারাই কেবল ছেড়ে আসেন তাদের পূর্ববর্তী কুফরী মত ও পথ। তাই দাম্ভিক নেতারা তাদের বক্তব্যের শুরুতে হজরত শোয়াইবকে সম্বোধন না করে এ রকম বলেছে— তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে। অর্থাৎ তাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিলো এ কথা বলা যে, কুফরী মত ও পথ ছেড়ে যারা হজরত শোয়াইবের মত ও পথকে গ্রহণ করেছে, তাদেরকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে তাদের আগের ধর্মাদর্শে। এরপর হজরত শোয়াইবকে লক্ষ্য করে দাম্ভিকেরা বলছে— অন্যথায় হে শোয়াইব! তোমাকে এবং তোমার অনুচরদেরকে আমাদের জনপদ থেকে আমরা বহিষ্কার করবোই।

আয়াতের শেষাংশে উদ্ধৃত হয়েছে হজরত শোয়াইবের বক্তব্য। হজরত শোয়াইব তখন বলেছিলেন, 'কী, আমরা তা ঘৃণা করলেও?' এই প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। এ প্রশ্নের অনড় জবাব হচ্ছে— কখনোই নয়। অর্থাৎ সত্যের আলো প্রাপ্তির পর মিথ্যার অন্ধকারে পুনঃপ্রত্যাবর্তন অসম্ভব। কারণ মিথ্যা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও জঘন্য। হজরত শোয়াইবের বক্তব্যের এই ধারাবাহিকতা প্রবাহিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতেও।

পরের আয়াতে (৮৯) তাই বলা হয়েছে— 'তোমাদের ধর্মাদর্শ থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই তবে তো আমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করবো, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে আর তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের কাজ নয়।' এখানে 'ক্বদিফ্‌তারইনা' অর্থ— তবে তো আমরা মিথ্যা আরোপ করবো বা মিথ্যা বলবো। 'আ'লাল্লহি কাজিবা' অর্থ—আল্লাহ্র সঙ্গে আমরা কি কাউকে অংশীদার করবো? এখানে 'ইজ্ নাজ্জানা' (তবে তো) একটি শর্ত। 'ইফ্‌তারইনা' শব্দরূপটি অতীতকালবোধক হলেও এর অর্থ হবে ভবিষ্যতকালবোধক। শব্দটির পূর্বে ক্বদ্ (নিশ্চয়) যুক্ত হওয়ার কারণেই এর অর্থ হয়েছে ভবিষ্যতকালবোধক। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— আল্লাহ্তায়ালা আমাদেরকে দয়া করে সত্য ধর্মবিশ্বাস দান

www.eelm.weebly.com

করেছেন এবং জানিয়েছেন সত্য-মিথ্যার প্রভেদ। তাই আমরা বুঝতে পেরেছি আমাদের পূর্ববর্তী ধর্মমতটি ছিলো মিথ্যা। আর এখনকার ধর্মমতটি সত্য। এখন যদি আমরা আবার আগের ধর্মে ফিরে যাই, তবে তো আমরা আল্লাহ্‌কেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করবো। আমাদের পক্ষে এ রকম করা কখনোই সম্ভব নয়— হজরত শোয়াইবের অনুসারীদের এই বক্তব্যটি অত্যন্ত দৃঢ়তাব্যঞ্জক। নিশ্চিত বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে এই বক্তব্যের মধ্যে। কিন্তু তকদিরের উপর বিশ্বাস করাও ইমানের একটি শর্ত। তাই তাঁরা এই বিশ্বাসটিকেও প্রকাশ করেছেন এভাবে— আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে আর তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের কাজ নয়। এ কথার অর্থ— আমরা জানি না কী রয়েছে আমাদের অদৃষ্টে। আল্লাহ্‌তায়ালা চিরমুক্ত ও চিরস্বাধীন অভিপ্রায়ের অধিকারী। সুতরাং আমাদের ধর্মচ্যুত হওয়াই যদি তাঁর অভিপ্রায় হয়, সত্যধর্মে দৃঢ়পথে থাকতে তিনি যদি সাহায্য না-ই করেন তবে তো আমরা স্বেচ্ছায় ও স্বশক্তিতে সত্যকে ধরে রাখতে পারবো না। —এই বক্তব্যটির দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মোতাজিলাদের ওই অভিমতটি ভুল যেখানে তারা বলেছে— অবিশ্বাস ও পাপ আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছায় সংঘটিত হয় না। মোতাজিলারা অজ্ঞ ও ভ্রষ্ট। তাই তারা আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ ও অভিপ্রায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য বক্তব্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে অবিশ্বাসীদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ করে দেয়া। তাই তাঁর বক্তব্যে এই শর্তটি লাগিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তাই তিনি ইচ্ছা করলে কেবল পূর্ব ধর্মে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু আমরা এরূপ ইচ্ছা করি না। এ রকম ইচ্ছা করলে আমরা তো আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক প্রবর্তিত সত্য ধর্মকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করবো— যা আল্লাহ্‌তায়ালাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর।

এরপর বলা হয়েছে— 'সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ব।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার জ্ঞান সীমাহীন, আদি- অন্তহীন। তিনিই উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর কোন বান্দা অবিশ্বাসের দিকে যাবে এবং কোন বান্দা যাবে বিশ্বাসের দিকে।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! তোমাদের মধ্যে কিছু লোক সারা জীবন দোজখীদের মতো আমল করতে করতে এমন অবস্থায় পৌঁছে যে, দোজখের সঙ্গে তার দূরত্ব থাকে মাত্র এক হাত। সহসা অদৃষ্ট তার উপর প্রবল হয়। তার আমল তখন হয়ে যায় জান্নাতবাসীদের মতো এবং জান্নাতই হয় তার চূড়ান্ত গন্তব্য।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে—'আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করি।' এ কথার অর্থ— আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালাই আমাদেরকে ইমানের প্রতি সুদৃঢ় রাখবেন এবং বিশ্বাসের পথে দান করবেন অধিকতর সাফল্য। রসুল স. এরশাদ করেছেন, সকল মানুষের হৃদয় আল্লাহ্‌তায়ালার অলৌকিক ও অতুলনীয় দুই আঙ্গুলের নিয়ন্ত্রণে। তিনি যেদিকে ইচ্ছা করেন, সেদিকেই ঘুরিয়ে দেন মানুষের হৃদয়ের গতি। এরপর রসুল স. প্রার্থনা করলেন, হে আমার আল্লাহ্! হে হৃদয়সমূহের বিবর্তক! আমাদের হৃদয়গুলোকে তোমার আনুগত্য-অভিমুখী করে দাও। মুসলিম।

আয়াতের শেষাংশে হজরত শোয়াইবের একান্ত প্রার্থনাটি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দাও; এবং তুমিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' অবিশ্বাসী জনতার ইমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে হজরত শোয়াইব এ রকম সিদ্ধান্তমূলক প্রার্থনা পেশ করেছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালার মহান দরবারে। তাঁর ওই প্রার্থনার মধ্যে ছিলো সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার এবং মিথ্যাকে ধ্বংস করার নিবেদন।

সুরা আ'রাফ : আয়াত ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ۝ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۝ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۛ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ۝ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝

❑ তাহার সম্প্রদায়ের প্রধান অবিশ্বাসীগণ বলিল, 'তোমরা যদি শোয়াইবকে অনুসরণ কর তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।'

❑ অতঃপর তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল, ফলে তাহারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল।

❑ মনে হইল শোয়াইবকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা যেন কখনও সেখানে বসবাস করেই নাই। শোয়াইবকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

www.eelm.weebly.com

❑ সে তাহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইল এবং বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তো তোমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়াছি, এবং তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি; সুতরাং আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের জন্য কি করিয়া আক্ষেপ করি।

উদ্ধৃত আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটির মর্মার্থ হচ্ছে— তার সম্প্রদায়ের প্রধান অবিশ্বাসীরা তাদের অধীনস্থ বিভিন্ন উপদলের লোকদেরকে বললো, তোমরা শোয়াইবের অনুসরণ কোরো না। করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শোয়াইব বলেন, ওজনে ও মাপে কম দেয়া যাবে না। এ রকম করলে তোমাদের লভ্যাংশ যাবে কমে। তবে ভেবে দেখো, এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কি ঠিক?

পরের আয়াতে (৯১) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো, ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেলো।' এখানে 'আর রজফাতু' অর্থ— ভূমিকম্প। এ রকম বলেছেন কালাবী। 'ফিদারিহিম' অর্থ— তাদের নিজ গৃহে। আর 'জাছিমীন' অর্থ— মুখ থুবড়ে পড়ে মৃত।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা মাদিয়ানবাসীদের দিকে উন্মুক্ত করলেন জাহান্নামের দরজা। শুরু হলো অসহ্য গরম। গরমে হাঁশ ফাঁশ করতে লাগলো তারা। ছায়ায় বসে থেকে অথবা পানি পান করেও তাদের স্বস্তি মিললো না। প্রচণ্ড দাবদাহে অতিষ্ঠ হয়ে তারা চলে গেলো খোলা প্রান্তরের দিকে। সেখানে দেখলো আকাশে জমেছে অনেক মেঘ। ঠাণ্ডা বাতাসও বইছিলো সেখানে। তারা পরস্পরকে ডেকে বলতে লাগলো, এসো সবাই, এদিকে এসো। এখানে রয়েছে শ্রান্তিহারক হাওয়া। এ রকম ডাক শুনে একে একে তারা সকলেই সমবেত হলো সেখানে। সহসা শুরু হলো অগ্নুৎপাত। মেঘ থেকে শুরু হলো অগ্নিবৃষ্টি। ফলে আগুনে পোড়া ফড়িঙের মতো সকলেই মরে পড়ে থাকলো সেখানে।

ইয়াজিদ জারীরী বলেছেন, আল্লাহ্পাক মাদিয়ানের অবিশ্বাসীদের উপর সাত দিন ধরে প্রবাহিত করলেন তুফান। তুফান শেষে শুরু হলো অসহনীয় উত্তাপ। ওই সময় তারা দেখতে পেলো অদূরে একটি পাহাড়ে বয়ে চলেছে জলবতী ঝর্ণা। তারা একে একে সকলে গিয়ে সমবেত হলো সেখানে। তখন ওই সমাবেশের উপর সহসা ধ্বসে পড়লো বিশাল পাহাড়টি। 'ইয়াওমুজ্ জিল্লাতি' কথাটির অর্থ— পাহাড়ের ছায়ার দিন।

হজরত কাতাদা বলেছেন, আসহাবুল আইকাহ এবং আসহাবুল মাদিয়ান— উভয় সম্প্রদায়ের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন হজরত শোয়াইব। আইকাহ্ সম্প্রদায় বসবাস করতো অরণ্য পরিবেষ্টিত একটি এলাকায়। তাই তাদেরকে বলা হতো আসহাবুল আইকাহ বা অরণ্যবাসী। তাদের মধ্যেও অনেকে

www.eelm.weebly.com

অস্বীকার করেছিলো হজরত শোয়াইবকে। তাদেরকে একত্র করে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো মেঘের ছায়ায়, পাহাড়ের পাদদেশে। আর মাদিয়ানবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো ভূমিকম্পের মাধ্যমে। অনন্তর হজরত জিবরাইলও তখন তুলেছিলেন একটি গগনবিদারী আওয়াজ। সেই আওয়াজে মুহূর্তের মধ্যেই মরে সাবাড় হয়ে গিয়েছিলো তারা।

এর পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— 'মনে হলো শোয়াইবকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো তারা যেনো কখনো সেখানে বসবাস করেইনি। শোয়াইবকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো তারাই হয়েছিলো ক্ষতিগ্রস্ত।' এখানে 'কা আঁ'ল্ লাম ইয়াগনাও' কথাটির অর্থ সমূলে উৎপাটিত করা। সমূলে বংশনিপাত করা হয়েছিলো মাদিয়ানবাসী অবাধ্যদেরকে। সে কথাটিই আলোচ্য আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— মনে হচ্ছিলো, তারা যেনো কখনোই সেখানে বসবাস করতো না।

'হুম খসিরুন' কথাটির অর্থ— তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। অর্থাৎ মাদিয়ানবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো দুনিয়ায়। তেমনি তারা আখেরাতেও হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

মাদিয়ানবাসীদের এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণটিও ধ্বংসের বিজ্ঞপ্তিদানের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, শোয়াইবকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো। এ কথার অর্থ— হজরত শোয়াইবের সত্য ধর্মের আহ্বানকে অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ করেছিলো তারা। তাই তাদেরকে উৎখাত করা হয়েছে সমূলে।

এর পরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে—'সে তাদের থেকে মুখ ফিরালো এবং বললো, হে আমার সম্প্রদায়! আমাদের প্রতিপালকের বাণী আমি তো তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছি; এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি; সুতরাং আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আক্ষেপ করি।' এ কথার অর্থ— প্রত্যাখ্যানপ্রবণ স্বজাতিকে সত্যের আহ্বান জানিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাদের বোধোদয়ের জন্য অপেক্ষা করলেন হজরত শোয়াইব। তারপর যখন স্থির নিশ্চিত হলেন যে, এরা চিরভ্রষ্ট, কল্যাণরহিত— তাই তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়াই সমীচীন। তিনি তাই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আক্ষেপ ভরে শুধু বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি। তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি সত্যের সওগাত। দান করেছি তোমাদেরকে শুভ নির্দেশনা। কিন্তু তোমরা আল্লাহ্তায়ালার অপার অনুগ্রহ গ্রহণ করার যোগ্য নও। তোমরা স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করেছো সত্যকে। এভাবে নিজেদের উপর অবধারিত করে নিয়েছো আল্লাহ্র গজবকে। এ গজব তোমাদের নিজস্ব অর্জন। সুতরাং তোমাদের জন্য আমি আক্ষেপ করবো কেনো? এ রকম আক্ষেপ করেই বা কী লাভ? তোমরা তো ফিরে আসছো না। সংশোধনের সুযোগও আর তোমাদের নেই।

www.eelm.weebly.com

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ○ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

❒ আমি কোন জনপদে নবী পাঠাইলে উহার অধিবাসীবৃন্দকে দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি, যাহাতে তাহারা নতি স্বীকার করে।

❒ অতঃপর অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি; অবশেষে তাহারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, 'আমাদিগের পূর্বপুরুষগণও তো দুঃখ-সুখ ভোগ করিয়াছে। অতঃপর অকস্মাৎ তাহাদিগকে আমি বিধৃত করি, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

❒ যদি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ বিশ্বাস করিত ও সাবধান হইত তবে তাহাদিগের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করিতাম, কিন্তু তাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; সুতরাং তাহাদিগের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি।

উদ্ধৃত আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'আমি কোনো জনপদে নবী পাঠালে তার অধিবাসীবৃন্দকে দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি, যাতে তারা নতি স্বীকার করে।' এ কথার অর্থ— আমি কোনো জনপদে নবী প্রেরণ করলে ওই জনপদের অধিবাসীরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তখন আমি তাদের উপর আপতিত করি দুঃখ ও ক্লেশ। এ রকম করার উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেনো তাদের হঠকারিতা পরিত্যাগ করে বিনম্র হয়। এটাই স্বাভাবিকতা যে, বিপদ মানুষকে বিনম্র করে। জাগিয়ে তোলে সত্যবোধ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এখানে 'বা'সা' অর্থ দারিদ্র এবং 'দ্বর্‌রা' অর্থ ব্যাধি বা পীড়া। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে বা'সা এবং দ্বর্‌রা (দুঃখ ও ক্লেশ) শব্দ দু'টোর অর্থ যথাক্রমে যুদ্ধ ও অনটন।

www.eelm.weebly.com

'লাআল্লাহুম ইয়াতাদ্দররাউ'ন' কথাটির অর্থ— যাতে তারা নতি স্বীকার করে।

কেউ কেউ বলে থাকেন, আল্লাহ্‌তায়ালার বাণীতে আ'সা (আশা করা যায়), কাদা (সম্ভবত), লাআল্লা (যাতে, যেনো)— এ সকল শব্দের ব্যবহার শোভনীয় নয়। কারণ এতে করে আল্লাহ্‌তায়ালার শক্তি, অভিপ্রায় এবং জ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। আশা করা যায়, সম্ভবতঃ, যাতে বা যেনো ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করলে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালার জ্ঞান, ইচ্ছা ও শক্তি অপরিমেয় ও অতুলনীয় নয়। বরং আল্লাহ্‌তায়ালার ঘোষণায় সকল ক্ষেত্রে 'নিশ্চয়', 'অবশ্যই'— এ সকল শব্দ ব্যবহার হওয়াই সমীচীন। কারণ এতে করে আল্লাহ্‌তায়ালার জ্ঞান, ইচ্ছা ও শক্তি যে সুনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী— সে কথাই প্রমাণিত হয়। এই অভিমতটি কিন্তু ভুল। কেননা বহু আয়াতে আ'সা, কাদা, লা আল্লা— এই শব্দগুলোর ব্যবহার ঘটেছে। আর এগুলো কোনোক্রমেই আল্লাহ্‌তায়ালার জ্ঞান, ইচ্ছা ও শক্তিকে খর্ব করে না। বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতেই ব্যবহৃত হয়েছে এই শব্দগুলো। এই আয়াতে যেমন বলা হয়েছে উন্নাসিক জনতার উপর দুঃখ ও ক্লেশ আপতিত করার কথা। সত্য পথে প্রত্যাবর্তনের নিমিত্তেই আল্লাহ্‌পাক এ রকম দুঃখ বিপদ অবতারণ করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় চরম বিপদগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো অবাধ্য সম্প্রদায় সত্যের দিকে ফিরে আসার ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয়নি। এ রকম বাস্তব অবস্থা বুঝাতেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'লাআল্লা' (যাতে) শব্দটি। অন্য আয়াতেও তেমনি বাস্তব অবস্থাকে নির্দেশ করার জন্য 'আশা করা যায়', খুব সম্ভব বা সম্ভবতঃ ইত্যাদি শব্দগুলোর ব্যবহার ঘটেছে।

পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি; অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, আমাদের পূর্বপুরুষগণও তো সুখ-দুঃখ ভোগ করেছে।' এ কথার অর্থ— দুঃখ বিপদে পতিত হওয়া সত্ত্বেও যখন উন্নাসিক জনতার বোধোদয় ঘটে না, তখন আমি তাদেরকে দান করি প্রাচুর্য। বংশবিস্তার ও সম্পদের প্রাচুর্যও আমি দান করি একই উদ্দেশ্যে— যাতে তারা সেই সুখ-শান্তি লাভের কারণে কৃতজ্ঞ হয়। আর ওই কৃতজ্ঞতার সূত্র ধরে ফিরে আসে সত্যের পথে। এভাবে আমি তাদেরকে দুঃখ এবং সুখ উভয় প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ দান করি। আমি অবতীর্ণ করি অকল্যাণ। তারপর ওই অকল্যাণকে পরিবর্তিত করি কল্যাণে। কিন্তু চির অবাধ্য সম্প্রদায় আমার এই পরীক্ষা সম্পর্কে উদাসীন। তারা বিপদে বিনয়ী হয় না, তেমনি কৃতজ্ঞ হয় না সুখ-সন্দর্শনেও।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং বলে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণও তো সুখ-দুঃখ ভোগ করেছে।' এ কথার অর্থ অবিশ্বাসীরা বলে, এটা হচ্ছে সময়ের বিবর্তনের ফল। দুঃখ ও সুখ এভাবেই পালাক্রমে আসে। আমাদের পূর্বপুরুষদের উপরেও এ রকম পালাক্রমে এসেছিলো দুঃখ এবং সুখ।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে—'অতঃপর অকস্মাৎ তাদেরকে আমি বিধৃত করি, কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে পারে না।' এ কথার অর্থ— ওই অবিশ্বাসী সম্প্রদায় আল্লাহ্তায়ালার স্মরণ থেকে বিচ্যুত। তাই তারা বোধ ও উপলব্ধিহীন। দুঃখ এবং সুখ যে আল্লাহ্তায়ালাই অবতীর্ণ করেন— তা তারা বুঝতেও পারে না। এভাবে আল্লাহ্তায়ালার গজবের উপযোগী হয়ে পড়ে তারা। তাই অকস্মাৎ আমি তাদেরকে পাকড়াও করি। তাদের উপর আপতিত করি আমার গজব।

এর পরের আয়াতে (৯৬) বলা হয়েছে—'যদি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ বিশ্বাস করতো ও সাবধান হতো, তবে তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো; সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি।' এ কথার অর্থ— নির্দিষ্ট জনপদে প্রেরিত আমার নবীরা সঠিক পথের সন্ধান দান করেছিলেন। কিন্তু সত্যবিমুখ জনতা নিতান্ত মূর্খ ও অপরিণামদর্শী বলে তাদেরকে মান্য করেনি। তারা যদি তাঁদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতো, তবে আমি তাদেরকে দান করতাম সর্বপ্রকার কল্যাণ। আকাশের ও পৃথিবীর। ইহকালের ও পরকালের। কিন্তু তারা তা করেনি। তাই তাদের অবিশ্বাস ও অপকর্মের যথোপযুক্ত শাস্তি আমি তাদেরকে দিয়েছি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে আকাশমণ্ডলীর কল্যাণ বা বরকত অর্থ বৃষ্টি। আর পৃথিবীর কল্যাণ বা বরকত অর্থ ফল, ফসল ও অন্যান্য শাক-সজি। বরকত শব্দটির অর্থ এখানে প্রবৃদ্ধি-প্রাচুর্য বিনষ্ট না হওয়া, দূরীভূত না হওয়া, অপসৃত না হওয়া ইত্যাদি। 'তারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো'— কথাটির অর্থ এখানে, তারা আমার প্রেরিত পয়গম্বরগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। তাদের উপর শাস্তি আপতিত হয়েছিলো এ কারণেই। তাই শেষে বলা হয়েছে— তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৯৭, ৯৮, ৯৯

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ○ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ○ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ○

❒ তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাহাদিগের উপর আসিবে রাত্রিতে যখন তারা থাকিবে নিদ্রামগ্ন?

❒ অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাহাদিগের উপর আসিবে পূর্বাহ্নে যখন তাহারা থাকিবে ক্রীড়ারত?

www.eelm.weebly.com

❒ তাহারা কি আল্লাহের চক্রান্তের ভয় রাখে না? এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেহই আল্লাহের চক্রান্ত হইতে নিরাপদ বোধ করে না।

উদ্ধৃত আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— 'তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে রাতে যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন।' এখানে 'আফা আমিনা' (তবে কি তারা বিশ্বাস করে) কথাটির সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের (৯৫) 'অতঃপর অকস্মাৎ তাদেরকে আমি বিধৃত করি'— কথাটির সঙ্গে, যদিও বাক্য দু'টোর মধ্যে রয়েছে কিছুটা পরিভাষাগত অন্তরায়। এই যোগসূত্রের মাধ্যমে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এ রকম— অতীতের অবাধ্য জনপদবাসীরাও ছিলো আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে বেখবর, যেমন বেখবর এখনকার মক্কাবাসীরা। তাদের উপর আমি অতর্কিতে আযাব অবতীর্ণ করেছিলাম, যখন তারা ছিলো নিদ্রামগ্ন অথবা অন্য কোনো কর্মে ব্যস্ত। সুতরাং অবাধ্য মক্কাবাসীদের কি এই ভয় নেই যে, আমি তাদের উপর যে কোনো সময় আযাব অবতীর্ণ করতে পারি। এমন কি তাদের নিদ্রাবস্থাতেও। অতীতের অবাধ্যরা মিথ্যারোপ করেছিলো তাদের নবীদের প্রতি, আর এখনকার অবাধ্য মক্কাবাসীরাও মিথ্যারোপ করে চলেছে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ রসুল মোহাম্মদ স. এর প্রতি। কী নির্ভয় তারা! বলা বাহুল্য যে, আলোচ্য আয়াতের 'আহ্‌লুল কুরা' (জনপদের অধিবাসীবৃন্দ) অর্থ— মক্কা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ। আর 'ওয়াহুম নায়িমুন্' (যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন) কথাটির অর্থ— যখন তারা থাকবে গাফেল, আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন।

পরের আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে পূর্বাহ্নে যখন তারা থাকবে ক্রীড়ারত। আগের আয়াতের শুরুতে (৯৭) বলা হয়েছিলো 'আফা আমিনা' (তবে কি তারা বিশ্বাস করে) আর এই আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে 'আওয়া আমিনা' (অথবা কি বিশ্বাস করে)। এই দু'টো শব্দই ধমকের সুরে প্রশ্নাকারে ব্যবহার করা হয়েছে অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে। আগের আয়াতে বলা হয়েছে রাত্রিকালীন অসচেতনতার কথা। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে দিবসকালীন ঔদাসীন্যের কথা। দু'টো আয়াতের সম্মিলিত বক্তব্য এই যে, রাতে অথবা দিনে, নিদ্রামগ্ন অবস্থায় অথবা দিবসের কর্ম কোলাহলের মধ্যে, যে কোনো সময় অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপর পতিত হতে পারে আল্লাহ্র গজব, অতীতের অবাধ্য সম্প্রদায়গুলোর উপর যেমন আপতিত হয়েছিলো। এ কথা জানার পরেও মক্কা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের অংশীবাদীরা কী এতোটুকুও ভয় করে না? এখানে 'দোহা' (পূর্বাহ্নে) শব্দটির উদ্দেশ্য— দ্বিপ্রহরপূর্ব সময়, যখন মানুষ থাকে ক্রীড়া বা কর্মমুখর।

এর পরের আয়াতে (৯৯) বলা হয়েছে—'তারা কি আল্লাহ্র চক্রান্তের ভয় রাখে না? এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহ্র চক্রান্ত থেকে নিরাপদ

www.eelm.weebly.com

বোধ করে না।' আগের আয়াত দু'টোতে বলা হয়েছে— তারা কি আল্লাহ্র গজবের ভয় করে না? আর এখানে বলা হয়েছে— তারা কি আল্লাহ্তায়ালার চক্রান্তের বা কৌশলের ভয় করে না? অর্থাৎ অবাধ্যতার তাৎক্ষণিক শাস্তি অবতীর্ণ না করে আল্লাহ্তায়ালা যে তাদেরকে কৌশলমূলক অবকাশ দান করেছেন, সেকথা ভেবে কি তারা ভীত হয় না? এ রকম নিরুপদ্রব জীবন যাপনের মধ্যেই তো আগের অবাধ্য সম্প্রদায়গুলোর উপর নেমে এসেছিলো অতর্কিত আযাব। সে রকম আযাব তো এখনো অকস্মাৎ নেমে আসতে পারে— সে ভয় কি বর্তমানের অংশীবাদীদের নেই?

উদ্ধৃত প্রশ্নাবলীর সিদ্ধান্তমূলক একটি জবাব দেয়া হয়েছে আয়াতের শেষে এভাবে—'এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহ্র চক্রান্ত থেকে নিরাপদ বোধ করে না।' এ কথার অর্থ— চিরস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্ততাই যাদের ললাট-লিখন তারাই কেবল অবাধ্যতা ও অংশীবাদীতার মধ্যে নির্বিকার জীবন যাপন করতে পারে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১০০, ১০১, ১০২

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَٰهُم بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ○ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَٰتِ ۚ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَٰفِرِينَ ○ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ ۖ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفَٰسِقِينَ ○

❒ কোন দেশের জনগণের পর যাহারা উহার উত্তরাধিকারী হয় তাহাদিগের নিকট ইহা কি প্রতীয়মান হয় নাই যে আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগের পাপের দরুণ তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারি এবং তাহাদিগের হৃদয় মোহর করিয়া দিব, এবং তাহারা শুনিবে না।

❒ এই জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করিতেছি, তাহাদিগের নিকট তাহাদিগের রসূলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছিল কিন্তু যাহা তাহারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাতে তাহারা বিশ্বাস করিবার ছিলো না, এইভাবে আল্লাহ্ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের হৃদয় মোহর করিয়া দেন।

www.eelm.weebly.com

❒ আমি তাহাদিগের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাই নাই, কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশকে তো সত্যত্যাগীই পাইয়াছি।

প্রথমে বলা হয়েছে—'কোনো দেশের জনগণের পর যারা তার উত্তরাধিকারী হয় তাদের নিকট এটা কি প্রতীয়মান হয়নি যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের দরুন তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি।' এখানে 'আওয়া লাম ইয়াহ্‌দি' অর্থ— এটা কি প্রতীয়মান হয়নি? 'ইয়ারিছুনাল আরদ্ব' অর্থ— যারা এ ভূমির উত্তরাধিকারী হয়। 'মিমবা'দি আহ্‌লিহা' অর্থ— কোনো দেশের বিগত জনগণের ধ্বংসের পর। 'আঁল্ লাও নাশাউ' অর্থ— আমি ইচ্ছা করলে। 'আসাব্‌নাহুম' অর্থ— তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি। আর 'বিজুনুবিহিম' অর্থ— তাদের পাপের দরুন। এভাবে পূর্ণ বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায় এ রকম— ইতোপূর্বে কোনো দেশের অবাধ্য জনগণের বিনাশপ্রাপ্তির পর যারা তাদের শাস্তিসূত্রে উত্তরাধিকারীরূপে স্থলাভিষিক্ত হয়, তাদের নিকট কি এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি যে, আমি ইচ্ছে করলে স্থলাভিষিক্তদেরকেও তাদের পাপাচারের দরুণ শাস্তি দান করতে পারি।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং তাদের হৃদয় মোহর করে দিবো এবং তারা শুনবে না।' এ কথার অর্থ— অবাধ্যদের চরম ঔদাসীন্যের শাস্তি আমি অবশ্যই দেবো। আমি তাদের হৃদয়ের দরজা করে দেবো অর্গলিত। জুজায বলেছেন, একই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। এখানে বলা হয়েছে, হৃদয়কে অবরুদ্ধ করে সত্যের স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করে দেয়াই হচ্ছে অবাধ্যদের প্রধান শাস্তি। সেই শাস্তিই আমি তাদেরকে দেবো। তাদের হৃদয়কে করে দেবো আমি মোহরাঙ্কিত। ফলে তারা সত্যের আওয়াজ হৃদয় দিয়ে শুনবে না।

পরের আয়াতে (১০১) বলা হয়েছে— 'এ জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করছি, তাদের নিকট তাদের রসুলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিলো। কিন্তু যা তারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করেছিলো তাতে তারা বিশ্বাস করবার ছিলো না।' এখানে 'তিলকাল্ কুরা নাকুস্‌সু' মিন আমবায়িহা (এ জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করছি) কথাটির অর্থ— হজরত নুহ, হজরত লুত, হজরত শোয়াইবের সম্প্রদায় এবং আদ এবং ছামুদ জাতির বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করছি। 'ওয়ালাকুদ জায়াত্ হুম রুসুলুহুম বিল বাইয়্যেনাত' অর্থ— তাদের নিকট তাদের রসুলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণ বা মোজেজাসহ এসেছিলো। 'ফামা কানু লি ইউ'মিনু বিমা কাজ্জাবু মিন্ কুবলু' অর্থ— কিন্তু যা তারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করেছিলো তাতে তারা বিশ্বাস করবার ছিলো না। অর্থাৎ ওই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের প্রতি নবী-রসুল প্রেরণের পূর্বে যেমন অবিশ্বাসী ছিলো, তেমনি নবী রসুল প্রেরণের পরে অবিশ্বাসীই রয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহ্‌র এককত্বকে যেমন তারা আগে স্বীকার করতো না, তেমনি স্বীকার করতো না নবী-

www.eelm.weebly.com

রসুল প্রেরণের পরেও। নবুয়ত, শরিয়ত— কোনো কিছুরই পরোয়া করতো না তারা। সত্যের আহ্বান, মোজেজা দর্শন— কোনো কিছুই তাদের অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। তারা রয়ে গিয়েছিলো যথা পূর্বং তথা পরং।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং সুদ্দী এই আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন, আত্মার জগতে যখন সর্বপ্রথম সকল আত্মাকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করা হয়েছিলো, তখনও অবিশ্বাসীদের আত্মা আন্তরিক স্বীকৃতি দেয়নি— দিয়েছিলো বাহ্যিক স্বীকৃতি। তাই পৃথিবীতে এসেও তারা পয়গম্বর প্রেরণের পূর্বে ও পরে রয়ে গিয়েছিলো বেঈমান। তাই ধ্বংসের পর পুনরায় তাদেরকে পৃথিবীতে আনা হলেও তারা রয়ে যাবে অবিশ্বাসী। যতো কিছুই করা হোক না কেন, কোনো কিছুতেই কোনো দিনও তারা ইমান আনতো না। অন্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে— যদি তাদেরকে বিরত রাখা হয়, তবুও তারা নিষিদ্ধ কাজের প্রতি পুনরায় ধাবিত হয়।

ইয়ামন বিন যুবাব বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— প্রত্যেক নবী তার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু তারা তাদের নবীর কথা বিশ্বাস করেনি। ফলে আল্লাহ্র গজবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তারা। তাদের স্থলে এসেছে অন্য এক সম্প্রদায়। সেই সম্প্রদায়ের হেদায়েতের জন্য নবী প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু তারাও তাদের নবীকে প্রত্যাখ্যান করেছে পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মতো। তাদের এ অপ-আচরণের দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য একটি আয়াতেও। সেখানে বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট তাদের পূর্বে এমন কোনো রসুল আসেনি, যাকে তারা যাদুকর বা পাগল বলেনি।'

এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবে আল্লাহ্ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের হৃদয় মোহর করে দেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! অনড় অবিশ্বাসের কারণে আপনার পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের হৃদয় যেমন আমি মোহর করে দিয়েছিলাম, তেমনি আপনার সম্প্রদায়ের চির অবাধ্যদের হৃদয়ও আমি মোহর করে দিয়েছি। তাই তাদের অন্তরে ইমান অনুপ্রবেশ করবে না। অজস্র নিদর্শন দর্শনের পরেও তাই তাদের হৃদয় কখনো বিনম্র হবে না। হৃদয়ে তাদের জাগ্রত হবে না কখনো আল্লাহ্র ভয়ের পবিত্র অনুভূতি।

এর পরের আয়াতে (১০২) বলা হয়েছে—'আমি তাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাইনি, কিন্তু তাদের অধিকাংশকে তো সত্যত্যাগীই পেয়েছি।' এখানে 'ওয়ামা ওয়াজাদ্না লি আকছারিহিম' (তাদের অধিকাংশকে পাইনি) কথাটির অর্থ— ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের অধিকাংশকে। 'মিন্ আ'হ্দিন' অর্থ— কাউকেই। এখানে কৃত প্রতিশ্রুতিটি রয়েছে অনুক্ত। ওই প্রতিশ্রুতিটি হচ্ছে আহদে মীছাক। অর্থাৎ হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার সকল সন্তানদেরকে বের করে নিয়ে যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্তায়ালা গ্রহণ করেছিলেন, সেই

www.eelm.weebly.com

প্রতিশ্রুতি। অথবা ওই প্রতিশ্রুতি— যা বিপদ ও শত্রুকবলিত এক সম্প্রদায় করেছিলো এ কথা বলে যে— যদি আমাদেরকে এই মুসিবত থেকে রক্ষা করা হয়, তবে আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো (হবো ইমানদার ও অনুগত)।

'ওয়া ইঁউ ওয়াজাদ্না আক্ছারাহুম লা ফাসিক্বীন' কথাটির অর্থ— কিন্তু তাদের অধিকাংশকে তো সত্যত্যাগীই পেয়েছি। কুফাবাসী আলেমগণ বলেছেন, 'ইন' (না) শব্দটি এখানে নেতিবাচক আর 'লাম' অক্ষরটির অর্থ এখানে 'ইল্লা' (ব্যতীত)— 'ইস্তেছনা' (ব্যতিক্রম)। বসরার আলেমগণ বলেছেন, এখানে 'ইন' (না) হচ্ছে মুখাফফাফ (সংক্ষেপক)। এমতাবস্থায় এখানে 'ওয়াজাদ্না' (আমরা পেয়েছি) কথাটি অর্থ হবে— আ'লিমনা (আমরা জেনেছি)। কেননা সংক্ষেপণ ক্রিয়াটি এখানে উদ্দেশ্য ও বিধেয়র মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। এটাই এমতো বাকভঙ্গির নিয়ম।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝ قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۝

❒ তাহাদিগের পর মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট পাঠাই, কিন্তু তাহারা উহা অস্বীকার করে। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদিগের পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর।

❒ মূসা বলিল, ' হে ফেরাউন! আমি বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত।

❒ আমি ইহাতে দৃঢ় যে আমি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিব না; তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদিগের নিকট আনিয়াছি, সুতরাং বনী ইসরাইলকে আমার সহিত যাইতে দাও।'

www.eelm.weebly.com

❒ ফেরাউন বলিল, 'যদি তুমি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক তবে তুমি সত্যবাদী হইলে তাহা পেশ কর'।

❒ অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল।

❒ এবং সে তাহার হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদিগের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল।

প্রথমে বলা হয়েছে—'তাদের পর মুসাকে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট পাঠাই।' এখানে 'মিম বা'দিহিম' (তাদের পর) কথাটির অর্থ— ইতোপূর্বে প্রেরিত নবী হজরত নুহ, হজরত হুদ, হজরত সালেহ্, হজরত লুত এবং হজরত শোয়াইবের পর। অর্থাৎ উল্লেখিত নবীগণের পর পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন হজরত মুসা। তাঁর পিতার নাম ছিলো ইমরান।

এখানে 'বি আয়াতিনা' (নিদর্শন) অর্থ, হজরত মুসা কর্তৃক আনীত মোজেজাসমূহ— একটু পরেই সেগুলোর বিবরণ আসবে। ফেরাউন ছিলো মিসর রাজ্যের অধিকারী। যেমন পারস্য রাজ্যের অধিকারী ছিলো কিসরা। হজরত মুসা যে ফেরাউনের সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার নাম ছিলো কাবুস অথবা ওলিদ বিন মাসআব বিন রাইয়ান। 'মালাউন' শব্দটির অর্থ অভিজাত সম্প্রদায়, সম্প্রদায়াধিপতি, পারিষদ, সভাসদ ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফা জলামু বিহা' (কিন্তু তারা অস্বীকার করে) —এখানে 'জুলুম' শব্দের অর্থ অপাত্রে স্থাপন। এখানে তাই বলা হয়েছে, হজরত মুসার সত্য আহ্বানকে ফেরাউন ও তার একান্ত অনুচরেরা অপাত্রে স্থাপন করেছে। যথামূল্য দিতে স্বীকৃত হয়নি।

শেষে বলা হয়েছে—'বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিলো তা লক্ষ্য করো।' এ কথার অর্থ— স্মরণ করো, কী পরিণতি হয়েছিলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মিসর রাজ ও তার অনুসারীদের। আমি তো তাদেরকে সাগর বক্ষে সলিল সমাধি দিয়েছিলাম।

পরের আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে— মুসা বললো, হে ফেরাউন! 'আমি বিশ্বপ্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত।' এ কথার অর্থ, নবুয়ত প্রাপ্তির পর প্রত্যাদেশানুসারে মিসর রাজ্যের দরবারে উপস্থিত হয়ে হজরত মুসা ঘোষণা করলেন, হে মিসরাধিকারী! আমি বিশ্বসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক নির্বাচিত সত্য রসুল।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১০৫) বলা হয়েছে—'আমি এতে দৃঢ় যে, আমি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলবো না; তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদের নিকট এনেছি। সুতরাং বনী ইসরাইলকে আমার সাথে যেতে দাও।' এই আয়াতটিও হজরত মুসার বক্তব্যের ধারাবাহিকতা। অর্থাৎ ফেরাউনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হজরত মুসার বক্তব্য আগের আয়াত (১০৪) থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে এই আয়াতে এসে।

আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে—'হাক্বীক্বুন্ আ'লা'। কথাটির অর্থ— আমি এতে দৃঢ় যে, অথবা আমি এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত যে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'আ'লা' শব্দটি ছিলো আসলে আ'লাইয়া। পরে অতিরিক্ত বিবেচনায় 'ইয়া' অক্ষরটিকে বাদ দেয়া হয়েছে। অথবা 'আ'লা' শব্দটি এখানে হরফে জর (যের প্রদায়ক)। স্বাভাবিক নিয়মে 'হাক্বীক্বুন' শব্দটির পরে 'বা' অক্ষরটি ব্যবহার করা যেতো। অর্থাৎ বলা যেতো—'হাক্বীক্বু বী'। কিন্তু নিশ্চিতি ও দৃঢ়তা প্রকাশার্থে আনা হয়েছে 'আ'লা' শব্দটি। যেমন—'রমাইতু বিল ক্বাওসি' অর্থ, আমি ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করেছি। আর 'রমাইতু আ'লাল ক্বাওসি' অর্থ— আমি দৃঢ়রূপে ধনুক ধারণ করে তীর নিক্ষেপ করেছি। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে 'হাক্বীক্বুন আ'লা' কথাটির অর্ন্তনিহিত অর্থ হবে 'হারিসুন আ'লা'। তখন কথাটির মর্মার্থ হবে— এটা আমার প্রতি অত্যাবশ্যক যে, আমি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলবো না।

'বাইয়্যেনাত' অর্থ— প্রমাণ। এখানে হজরত মুসা তাঁর নবুয়তের পক্ষে আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ আনার কথা বলেছেন। এতে করে তিনি এ কথাটিই জানিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে যেহেতু স্পষ্ট প্রমাণ এনেছি, সেহেতু আমি সত্য রসুল। তোমরা আমার কথা মেনে নাও।

হজরত মুসার বক্তব্যের শেষ দিকে উল্লেখিত হয়েছে একটি প্রস্তাব। প্রস্তাবটি হচ্ছে— সুতরাং বনী ইসরাইলকে আমার সাথে যেতে দাও। এ কথার অর্থ— হে ফেরাউন! মিসর ভূমিতে বসবাসরত বনী ইসরাইল জনতাকে তাদের পিতৃ পুরুষের জন্মভূমিতে যেতে দাও। উল্লেখ্য যে, চারশত বছর আগে হজরত ইউসুফ যখন মিসররাজ ছিলেন, তখন মিসরে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন হজরত ইয়াকুব। তিনি ছিলেন হজরত ইউসুফের পিতা। তাঁর বংশধরগণকে বলা হয় বনী ইসরাইল। হজরত ইউসুফের মহাঅন্তর্ধানের পর পুনরায় রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় অবিশ্বাসী সম্রাটেরা। তারা বিদ্বেষবশতঃ ক্রমবর্ধমান বিশাল বনী ইসরাইল জনতাকে প্রায় বন্দী জীবন যাপনে বাধ্য করেছিলো। আদি মিসরীয়রা শ্রমিকের মতো খাটাতো তাদেরকে। মাটি কাটা, ইট পাথরের বিভিন্ন নির্মাণ ইত্যাদি তারা

www.eelm.weebly.com

করাতো বনী ইসরাইলদেরকে দিয়ে। তারা ভেবে নিয়েছিলো বনী ইসরাইলেরা তাদের ক্রীতদাস অথবা বন্দী। হজরত মুসাও ছিলেন বনী ইসরাইল বংশদ্ভূত। মজলুম বনী ইসরাইল জনতাকে মুক্ত করার প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন তিনি। সেই প্রত্যাদেশানুসারেই তিনি বলেছিলেন— সুতরাং বনী ইসরাইলদের আমার সাথে যেতে দাও।

পরের আয়াতে (১০৬) বলা হয়েছে— ফেরাউন বললো, 'যদি তুমি কোনো নিদর্শন এনে থাকো, তবে তুমি সত্যবাদী হলে তা পেশ করো।'

এর পরের আয়াতে (১০৭) বলা হয়েছে—'অতঃপর মুসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলো এবং তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাত অজগর হলো।' এখানে 'ছু'বানুন' অর্থ পুরুষ অজগর। ওই অজগরটি বিশালাকৃতি হলেও ছিলো ছোট সাপের মতো তীব্র গতি সম্পন্ন। অন্য এক আয়াতেও এ রকম বলা হয়েছে। যেমন—'কা আন্নাহা জান্নুন' (যেনো ছোট সাপের মতো সঞ্চরণশীল)। হজরত ইবনে আব্বাস এবং সুদ্দী বলেছেন, হজরত মুসার যষ্টি অজগরে রূপান্তরিত হতো। অজগরটি ছিলো হলুদ বর্ণের। তার সারা শরীর ছিলো পশমে ভরা। মস্তকের উপরিভাগে ছিলো ঝুঁটি। অজগরটি মুখব্যাদান করলে তার উভয় দন্তপাটির মাঝখানে সৃষ্টি হতো আশি হাতের ব্যবধান। নিচের পাটি মাটিতে এবং উপর পাটি থাকতো রাজপ্রাসাদের শিখর বরাবর। অজগরটি ফেরাউনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো।

বর্ণিত হয়েছে, অজগরটি ফেরাউনের রাজপ্রাসাদের গম্বুজ পুরে নিয়েছিলো তার মুখের মধ্যে। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ফেরাউন ঢুকে পড়লো রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে। সাপটি তখন জনতার দিকে অগ্রসর হতেই চিৎকার করে পালাতে শুরু করলো তারা। পরস্পরের পদতলে পিষ্ট হয়ে মারা গেলো পঁচিশজন। নিরুপায় ফেরাউন তখন রাজপ্রাসাদের ভিতর থেকে চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে মুসা! যে সত্তা কর্তৃক তুমি প্রেরিত হয়েছো, ওই সত্তার দোহাই দিয়েই আমি বলছি, তোমার সাপকে তুমি সামলাও। তাহলে আমি তোমার উপর ইমান আনবো এবং তোমার সাথে বনী ইসরাইলদেরকে যেতে দিবো। হজরত মুসা সাপটিকে ধরে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে গেলো লাঠি।

হজরত কাতাদা থেকে মুয়াম্মারের মাধ্যমে আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেমও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

শেষের আয়াতে (১০৮) বলা হয়েছে—'এবং সে তার হাত বের করলো আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হলো।' মোজেজাস্বরূপ সর্প দর্শনের পর ফেরাউন হজরত মুসাকে বলেছিলো, আরো কোনো মোজেজা আছে নাকি তোমার? হজরত মুসা বলেছিলেন, হ্যাঁ। এ কথা বলেই তিনি প্রদর্শন করেছিলেন হস্ত শুভ্র হওয়ার মোজেজাটি। তিনি তাঁর হাত প্রবেশ করালেন আস্তিনের অভ্যন্তরে। তারপর হাত বের করে নিয়ে আসতেই দেখা গেলো ওই হাত থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে শুভ্র উজ্জ্বল আলো। ওই শুভ্রতা ছিলো অসাধারণ। সূর্যের

www.eelm.weebly.com

আলোকচ্ছটা অপেক্ষা তা ছিলো তীব্র। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তা ছিলো দৃষ্টিনন্দন এবং হৃদয়হারক। কিছুক্ষণ পর হজরত মুসা পুনরায় তার হাত প্রবেশ করালেন আস্তিনে। তারপর হাত বের করে আনতেই দেখা গেলো সেই শুভ্র উজ্জ্বল অলৌকিক আলোটি আর নেই।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২

قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ۝ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ۝

❒ ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, 'এ তো একজন সুদক্ষ যাদুকর,

❒ এ তোমাদিগকে তোমাদিগের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে চায়; এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও?'

❒ তাহারা বলিল 'তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও।' এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদিগকে পাঠাও,

❒ যেন তাহারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বললো, 'এতো একজন সুদক্ষ যাদুকর।' অর্থাৎ দক্ষ যাদুকর বলেই সে মানুষের নজরবন্দী করে লাঠিকে দেখায় সাপরূপে, আর হাতকে করে আলোকিত। এ কথা বলেছিলো ফেরাউনের দরবারীরা। কিন্তু সুরা 'শুআরা'য় উক্তিটি ফেরাউনের উক্তিরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এতে করে মনে হয় ফেরাউন ও তার সভাসদেরা সকলেই এ রকম উক্তি করেছিলো। প্রথমে এ রকম বলেছিলো ফেরাউন। তারপর সে কথায় সায় দিয়েছিলো দরবারীরা। অথবা কথাটি পুনঃধ্বনিত হয়েছিলো তাদের কণ্ঠে। তারপর সকলে কথাটিকে সাধারণ্যে প্রচার করে দিয়েছিলো।

পরের আয়াতে (১১০) বলা হয়েছে—'এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করতে চায়; এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও?' এ কথাটি সম্ভবতঃ ফেরাউন বা তার দরবারীদের পূর্বের আয়াতে উক্ত বক্তব্যের ধারাবাহিকতা। এ ছিলো তাদের পরামর্শ বিনিময়। পরামর্শ বিনিময়ের স্বরূপটি ছিলো এ রকম— হজরত মুসার অলৌকিক নিদর্শন দেখে ফেরাউন তার একান্ত অনুচরদের বললো, মুসা তো দেখছি একজন সুদক্ষ যাদুকর। কি উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তার এ যাদু

www.eelm.weebly.com

প্রদর্শনের মধ্যে? নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে দূরভিসন্ধি। সে তোমাদেরকে তোমাদের জন্মভূমি থেকে উৎখাত করতে চায়। এখন তোমরা পরামর্শ দাও— কি করা উচিত আমাদের।

পরের আয়াতে (১১১) বলা হয়েছে— তারা বললো, 'তাকে ও তার ভ্রাতাকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও। এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও।' এখানে 'আরজিহ্ ওয়া আখাহু' কথাটির অর্থ— তাকে এবং তার ভাইকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও। 'আরজিহ্' শব্দটির পূর্ণ রূপ হচ্ছে 'আরজিউহু। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'আরজা'আল আম্‌রা' অর্থ— এই কর্মটিকে বিলম্বিত করেছি। এভাবে আলোচ্য আয়াতটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— পরামর্শরূপে ফেরাউনের সভাসদেরা বললো, হজরত মুসার প্রতি ইমান আনার ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এই মুহূর্তে মুসা ও হারুনকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও সমীচীন নয়। বরং তাদেরকে কিছুটা অবকাশ দেয়া হোক। কিছুদিন যাক। তাহলে আসল অবস্থাটা বুঝা যাবে। আর ইত্যবসরে রাষ্ট্রীয় কিছু কর্মচারী এবং শান্তিরক্ষকদেরকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো যেতে পারে। তারা খবর সংগ্রহ করে আনুক, বড় বড় যাদুকরেরা কোন্ কোন্ জনপদে বসবাস করে।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'যেনো তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।' এখানে 'সাহীরুন আ'লীম' অর্থ— সুদক্ষ যাদুকর। কথাটি 'ইয়াতুকা' (এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও?) —প্রশ্নটির উত্তর। অর্থাৎ পরামর্শরূপে ফেরাউনের সভাসদেরা ফেরাউনকে এই মর্মে পরামর্শ দিয়েছিলো যে, সম্রাট যদি সম্মত হন তবে দিকে দিকে তথ্য সংগ্রাহক এবং শান্তিরক্ষী বাহিনীকে পাঠিয়ে যাদুকরদের খোঁজখবর করা হোক। তারা বড় বড় যাদুকরদের ধরে আপনার দরবারে হাজির করবে। মুসার সঙ্গে তারা লিপ্ত হবে যাদুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। যদি মুসা বিজয়ী হয়, তবেই কেবল আমরা তার উপর ইমান আনবো। আর যদি পরাজিত হয়, তবে আমরা বুঝতে পারবো মুসা আল্লাহ্‌র প্রেরিত কোনো পয়গম্বর নয়, সে আসলে যাদুকর।

হজরত ইবনে আব্বাস, সুদ্দী এবং ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে বাগবী লিখেছেন, যখন ফেরাউন হজরত মুসার যষ্টির অলৌকিক ক্ষমতা দেখলো, তখন বললো, মুসাকে পরাস্ত করতে হলে বনী ইসরাইলদের মধ্য থেকে তার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাতে হবে। অন্য কোনো সম্প্রদায়ের লোক তার সঙ্গে পারবে না। এ কথা বলে সে বনী ইসরাইলের কিছু বালক নির্বাচন করে গুরাবা নামক এক পল্লীতে পাঠিয়ে দিলো। সেখানে বাস করতো বড় বড় যাদুকর। তারা শিক্ষানবীসদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলো। ফলে তারাও হয়ে গেলো বড় বড় যাদুকর। এরপর ফেরাউন তাদেরকে ডেকে বললো, কি রকম শিক্ষা পেয়েছো তোমরা? তারা বললো, এখন পৃথিবীর সকল যাদুকর মিলেও আমাদের মোকাবেলা করতে পারবে না। তবে আসমান থেকে অবতীর্ণ কোনো কিছুর মোকাবেলা করার সাধ্য আমাদের নেই।

www.eelm.weebly.com

এরপর ফেরাউন রাজ্যের বড় বড় যাদুকরদের একত্র করলো। মুকাতিল বলেছেন, তাদের সংখ্যা ছিলো বাহাত্তর জন— সত্তর জন বনী ইসরাইল এবং দুইজন কিবতী (মিসরের আদি অধিবাসী)। কিবতীদের প্রধান যাদুকরের নাম ছিলো শামউন। কালাবী বলেছেন, যাদুকরদের সংখ্যা ছিলো সত্তরজন। বনী ইসরাইল যাদুকরদেরও ছিলো একজন সর্দার। অন্যান্য যাদুকরেরা ওই দু'জন সর্দারের নিকট থেকে যাদু শিক্ষা করেছিলো। ঘটনাক্রমে ফেরাউনের কারাগারে বন্দী ছিলো তারা। হজরত কা'আব বলেছেন, ওই যাদুকরদের সংখ্যা ছিলো বারো হাজার। সুদ্দী বলেছেন, তিরিশ হাজার। ইকরামা বলেছেন সত্তর হাজার এবং মোহাম্মদ বিন মুনকাদির বলেছেন আশি হাজার।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯

وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ○ قَالَ نَعَمْ
وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ
الْمُلْقِيْنَ ○ قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ
بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ○ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا
يَاْفِكُوْنَ ○ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا
صٰغِرِيْنَ ○

❒ যাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট আসিয়া বলিল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদিগের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো?'

❒ সে বলিল, 'হাঁ' এবং তোমরা আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদিগেরও অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

❒ তাহারা বলিল, 'হে মূসা! তুমিই কি নিক্ষেপ করিবে, না আমরাই নিক্ষেপ করিব?'

❒ সে বলিল, 'তোমরাই নিক্ষেপ কর' যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন তাহারা লোকের চোখে যাদু করিল, তাহাদিগকে আতংকিত করিল এবং তাহারা এক বড় রকমের যাদু দেখাইল।

❒ মূসার প্রতি আমি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর' সহসা উহা তাহাদিগের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল;

www.eelm.weebly.com

❏ ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা যাহা করিতেছিল তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল।

❏ সেখানে তাহারা পরাভূত হইল ও লাঞ্ছিত হইল।

প্রথমে বলা হয়েছে— যাদুকরেরা ফেরাউনের নিকটে এসে বললো, 'আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?' এ কথার অর্থ— সংগ্রাহকরূপে প্রেরিত রাষ্ট্রীয় কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে মিসররাজের সঙ্গে বাক্যবিনিময়ের প্রাক্কালে যাদুকরেরা বললো, হে মিসরাধিরাজ! মুসার সঙ্গে যাদু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে যদি আমরা জয়লাভ করি তবে আমাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে তো? আপনার ঘনিষ্ঠজনের মর্যাদা কি আমরা তাহলে পাবো?

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— সে বললো, 'হ্যাঁ' এবং তোমরা আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদেরও অন্তর্ভুক্ত হবে।' যাদুকরদের প্রশ্নের উত্তরে কেবল হ্যাঁ বললেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু ফেরাউন হ্যাঁ বলার পরেও অতিরিক্ত এ কথাটি বলেছিলো যে—'এবং তোমরা আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদেরও অন্তর্ভুক্ত হবে।' বাকভঙ্গির দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, কথাটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর— যে প্রশ্নের মাধ্যমে ফেরাউনের একান্ত সান্নিধ্য কামনা করেছিলো যাদুকরেরা। আর ফেরাউন ইচ্ছে করেই যাদুকরদেরকে উৎসাহ প্রদানের জন্য তার বক্তব্যকে দীর্ঘ করেছিলো— এ রকমও বলা যেতে পারে।

মুকাতিল বলেছেন, ফেরাউনের উপস্থিতিতে হজরত মুসা যাদুকরদেরকে বলেছিলেন, যদি আমি বিজয়ী হই তবে কি তোমরা আমার উপর ইমান আনবে? প্রধান যাদুকর বললো, কোনো যাদুকর আমার উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আপনি যদি বিজয়ী হন, তবে বুঝবো, আপনি যাদুকর নন— সত্য রসুল। তখন আপনার উপর নিশ্চয়ই ইমান আনবো আমরা।

পরের আয়াতে (১১৫) বলা হয়েছে— তারা বললো, 'হে মুসা! তুমিই কি নিক্ষেপ করবে, না আমরাই নিক্ষেপ করবো? এ কথার অর্থ— হে মুসা! আপনিই কি প্রথমে আপনার যষ্টি নিক্ষেপ করবেন, না প্রথম লাঠি ও রশি নিক্ষেপ করবো আমরা? যাদুকরেরা চেয়েছিলো তারাই তাদের যাদু প্রদর্শন করবে প্রথম সুযোগে। তবুও নির্ভীকতা ও আনুষ্ঠানিকতা দেখাতে গিয়ে তারা হজরত মুসাকে এ রকম প্রশ্ন করেছিলো।

পরের আয়াতে (১১৬) বলা হয়েছে— সে বললো, 'তোমরাই নিক্ষেপ করো।' এখানে হজরত মুসার বক্তব্যে ফুটে উঠেছে রসুলসুলভ নির্ভীকতা। প্রতিপক্ষদের

www.eelm.weebly.com

বিশাল আয়োজন সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সত্যের বলে বলীয়ান। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তাই তিনি নির্ভীকচিত্তে জবাব দিয়েছিলেন— তোমরাই নিক্ষেপ করো।

এরপর বলা হয়েছে— যখন তারা নিক্ষেপ করলো তখন তারা লোকের চোখে যাদু করলো, তাদেরকে আতংকিত করলো এবং তারা বড় এক রকমের যাদু দেখালো। ঘটনাটি ঘটলো এভাবে— হজরত মুসার জবাব শুনে যাদুকরেরা প্রচণ্ড উৎসাহে তাদের লাঠি ও রশিগুলোকে নিক্ষেপ করলো মাটিতে। যাদুর প্রভাবে বিশাল দর্শক জনতার ঘটলো দৃষ্টিবিভ্রম। তারা দেখতে পেলো, মাটিতে নিক্ষিপ্ত লাঠি ও রশিগুলো বিশালাকৃতির অজগরে রূপান্তরিত হয়ে ফোঁসফোঁস করছে। সম্মুখবর্তী প্রান্তরে কেবল দৃষ্টিগোচর হচ্ছে সাপ আর সাপ। এভাবে উপস্থিত জনতাকে আতংকিত করলো যাদুকরেরা এবং প্রদর্শন করলো অভূতপূর্ব যাদুর খেলা।

এর পরের আয়াতে (১১৭) বলা হয়েছে—'মুসার প্রতি আমি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো, সহসা তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগলো।' আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অসংখ্য সাপের গর্জন শুনে কিছুটা বিচলিত হলো হজরত মুসা। আমি তখন তার উপর অবতীর্ণ করলাম প্রত্যাদেশ। বললাম, হে আমার রসুল! বিচলিত হয়ো না। যাদুকরদের প্রদর্শিত সকল কিছুই প্রতারণা। প্রতারকেরা কখনোই সফল হয় না। তুমিও তোমার যষ্টি নিক্ষেপ করো। হজরত মুসা নির্দেশ প্রতিপালন করলেন। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যষ্টিটি হয়ে গেলো— বিপুলাকৃতির একটি অজগর। দিগন্তকে আড়াল করে সেই অজগর ক্ষিপ্রতেজে তার শরীর সঞ্চালন করতে শুরু করলো এবং গ্রাস করতে লাগলো যাদুকরদের সাপগুলোকে। তারপর জনতার দিকে মুখ করতেই সকলে পালাতে শুরু করলো পড়িমরি করতে করতে। ভিড়ের চাপে পিষ্ট হয়ে মারা গেলো অনেকেই।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, যাদু প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ইস্কান্দারিয়ায়। আর ওই অলৌকিক অজগরটির লেজ রয়ে গিয়েছিলো বাহিরাহ্ নামক স্থানে। আশি হাত চওড়া ছিলো অজগরটির মুখগহ্বর।

যাদুকরদের বিশাল আয়োজন সম্পূর্ণ গ্রাস করার পর অলৌকিক অজগরটিকে ধরে ফেললেন হজরত মুসা। সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে গেলো তাঁর হাতের লাঠি। এতে করে প্রমাণিত হলো— হজরত মুসা যাদুকর নন, সত্য রসুল, যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাধ্য কোনো যাদুকরের থাকতে পারে না।

পরের আয়াতে (১১৮) বলা হয়েছে— 'ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারা যা করছিলো তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো।'

www.eelm.weebly.com

তার পরের আয়াতে (১১৯) বলা হয়েছে—'সেখানে তারা পরাভূত হলো ও লাঞ্ছিত হলো।' এ কথার অর্থ— মিসরাধিরাজ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের উপরে নেমে এলো চূড়ান্ত পরাজয়। চরমরূপে লাঞ্ছিত হলো তারা।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِينَ ۝ قَالُوٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ۝ رَبِّ مُوسٰى وَهٰرُونَ ۝

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ أَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي

الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَآ أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ

وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ قَالُوٓا إِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۝

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۝

❒ এবং যাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হইল।

❒ তাহারা বলিল, 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম বিশ্ব-প্রতিপালকের প্রতি,

❒ যিনি মূসা ও হারুনেরও প্রতিপালক।'

❒ ফেরাউন বলিল, 'কী! আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিলে? তোমরা এই চক্রান্ত করিয়াছ নগরবাসীদিগকে উহা হইতে বহিষ্কারের জন্য! ইহা তো এক চক্রান্ত; আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই ইহার পরিণাম জানিবে।

❒ আমি তো তোমাদিগের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিবই; অতঃপর তোমাদিগের সকলকেই শূলবিদ্ধও করিবই।'

❒ তাহারা বলিল, 'আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব;

❒ তুমি তো আমাদিগের উপর দোষারোপ করিতেছ শুধু এই জন্য যে আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস করিয়াছি যখন উহা আমাদিগের নিকট আসিয়াছে। হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আত্মসমর্পণকারী রূপে আমাদিগের মৃত্যু ঘটাও।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে—'ওয়া উলক্বিয়াস্ সাহারাতু সাজিদীন' (এবং যাদুকরেরা সেজদাবনত হলো)। আয়াতের বক্তব্যভঙ্গি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, যাদুকরেরা স্বেচ্ছায় সেজদাবনত হয়নি। আল্লাহ্পাকই তাদেরকে সেজদায় পতিত হতে বাধ্য করেছেন। সত্যদর্শনের আলো তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলো। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আতঙ্কিত হওয়া ছাড়া তাদের উপায়ন্তর ছিলো না। আখফাশ বলেছেন, অকস্মাৎ যাদুকরেরা সেজদায় পতিত হয়েছিলো। তাই বলা যায়, কেউ নিশ্চয় তাদেরকে সেজদায় পতিত করিয়েছিলো।

পরের আয়াতে (১২১) বলা হয়েছে— 'তারা বললো আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম বিশ্বপ্রতিপালকের প্রতি।'

এরপরের আয়াতে (১২২) বলা হয়েছে, 'যিনি মুসা ও হারুনের প্রতিপালক।' দুটো আয়াতের সম্মিলিত মর্মার্থ হলো এ রকম— সেজদা করার পর যাদুকরেরা ঘোষণা দিলো, আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রতি ইমান আনলাম। ইমান আনলাম ওই প্রতিপালকের প্রতি, যিনি হজরত মুসা এবং হজরত হারুনের প্রতিপালক। সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যরেখা সুস্পষ্ট করার নিমিত্তেই এ রকম করে বলেছিলেন সত্যের আলোকস্নাত নতুন ইমানদারেরা। ফেরাউন নিজেকে প্রভুপ্রতিপালক বলতো। প্রজাসাধারণও তাকে প্রভুপ্রতিপালক বা রব হিসেবে মেনে নিয়েছিলো। যাদুকরদের ইমানের ঘোষণা শুনে জনসাধারণ হয়তো মনে করতে পারতো যে, যাদুকরেরা হয়তো নতুন উদ্যমে ফেরাউনকে প্রভুপ্রতিপালক হিসাবে মেনে নেয়ার ঘোষণা দিচ্ছে। তাই তারা তাদের ঘোষণাটিকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন এভাবে— আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম বিশ্বপ্রতিপালকের প্রতি, যিনি মুসা ও হারুনের প্রতিপালক।

এর পরের আয়াতে (১২৩) বলা হয়েছে, 'ফেরাউন বললো, কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা এতে বিশ্বাস করলে? তোমরা চক্রান্ত করেছো নগরবাসীদেরকে এখান থেকে বহিষ্কারের জন্য। এটা তো এক চক্রান্ত; আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই এর পরিণাম জানবে।' যাদুকরদেরকে হজরত মুসার দলে ভিড়ে যেতে দেখে ফেরাউন যুগপৎ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হলো। সে ভাবলো, এটা নিশ্চয়ই পূর্ব-পরিকল্পিত। পূর্বেই তারা নিজেদের মধ্যে যোগসাজশ করেছিলো। রাজপরিবার ও মিসরের আদি অধিবাসীদেরকে উৎখাত করার জন্যই তারা নিজেদের মধ্যে আঁতাত করেছে। ফেরাউন তাই হুঙ্কার ছেড়ে বললো, কী! এতবড় স্পর্ধা তোমাদের। আমি তোমাদের প্রতিপালক। অথচ আমার অনুমতি ছাড়াই তোমরা মুসাকে বিশ্বাস করে বসলে। এটা নিশ্চয় তোমাদের চক্রান্ত। তোমরা এই নগরের অধিবাসীদেরকে এখান থেকে বহিষ্কার করতে চাও। কিন্তু জেনে রাখো, এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (১২৪) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করবোই; অতঃপর তোমাদের সকলকেই শূলবিদ্ধও করবোই।' এখানে 'মিনখিলাফিন' কথাটির অর্থ— বিপরীত দিক থেকে কর্তন। অর্থাৎ ডান হাত এবং বাম পা অথবা বাম হাত এবং ডান পা কর্তন। 'লাউসাল্লীবান্নাকুম' কথাটির অর্থ নীল নদের কূলে, বৃক্ষের নিচে তোমাদেরকে আমি শূলে চড়াবো— যাতে করে তোমাদের চরম লাঞ্ছনার বিষয়টি সর্বসমক্ষে প্রকট হয়ে ওঠে। আর সেই দৃশ্য দেখে অন্যেরাও যেনো শিক্ষা গ্রহণ করে।

হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ফেরাউনই শূলবিদ্ধ করার প্রথাটির আবিষ্কারক।

এর পরের আয়াতে (১২৫) বলা হয়েছে— তারা বললো, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবো।' এরপরে ১২৬ আয়াতে বলা হয়েছে— 'তুমি তো আমাদের উপর দোষারোপ করছো শুধু এজন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস করেছি যখন তা আমাদের নিকট এসেছে।' আয়াত দু'টোর সম্মিলিত মর্মার্থ হচ্ছে— সদ্য ইমান আনয়নকারী যাদুকরেরা বললো, হে মিসরের নৃপতি! আমরা লাভ করেছি সত্য পথ। বিশ্বাস করেছি আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন। এটা কোনো অপরাধ হতে পারে না। তবে তোমার আইনে যদি এটা অপরাধ হয়, তবে তুমি যা খুশি করতে পারো আমাদেরকে। আমরা সত্য থেকে একচুলও নড়বো না। আমরা সুনিশ্চিত যে, আমাদের প্রত্যাবর্তন আমাদের প্রতিপালকের নিকটেই। সুতরাং মৃত্যুর ভয় আমরা করি না।

শেষে উল্লেখিত হয়েছে, নতুন ইমানদারদের একটি প্রার্থনা। প্রার্থনাটির উল্লেখ এ রকম— হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করো এবং আত্মসমর্পণকারীরূপে আমাদের মৃত্যু ঘটাও। এ কথার অর্থ— হে আমাদের আল্লাহ্! আমরা তোমাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। আমরা এ বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করতে পারবো না। মিসররাজ আমাদেরকে হত্যা করতে চায়। কিন্তু তার হুমকির পরোয়া আমরা করি না। আমরা চাই, যে মুসিবত আমাদের উপর নেমে আসছে, সে মুসিবতে আমরা যেনো ধৈর্য ধারণ করতে পারি। হে আমাদের আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে ধৈর্য দান করো এবং তোমার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণকারীরূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার তৌফিক দান করো।

কালাবী বলেছেন, ফেরাউন সদ্য ইমানগ্রহণকারী ওই যাদুকরদের হাত ও পা কেটে দিয়েছিলো এবং তাদেরকে শূলে চড়িয়েছিলো। কিন্তু অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন, ফেরাউন এ রকম করতে পারে না। কারণ একস্থানে হজরত মুসা এবং হজরত হারুনকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন—'তাদের ক্ষমতা তোমাদের নিকটে পৌঁছবে না। তোমরা দু'জন এবং তোমাদের অনুসারীরাই বিজয়ী হবে।

www.eelm.weebly.com

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَ يَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ

❑ ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, 'আপনি কি মূসাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করিতে দিবেন?' সে বলিল, 'আমরা তাহাদিগের পুত্রদিগকে হত্যা করিব এবং তাহাদিগের নারীদিগকে জীবিত রাখিব আর আমরা তো তাহাদিগের উপর প্রবল।'

প্রথমে বলা হয়েছে—'ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বললো, আপনি কি মুসাকে ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাকে বর্জন করতে দিবেন?' এ কথার অর্থ— কিবতীদের বিভিন্ন গোত্রের নেতারা ফেরাউনকে বললো, মুসা ও তার সম্প্রদায়ের উত্থান তো অসহ্য। তারা আপনাকে যেমন মানে না, তেমনি মানে না আপনার পূজ্য প্রতিমাগুলোকে। এভাবে তারা দেশে শুরু করেছে ধর্ম বিপর্যয়। হে রাজন! আপনি কি এর কোনো বিহিত করবেন না? তাদেরকে কি এভাবেই ছেড়ে দেবেন?

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফেরাউনের কাছে ছিলো একটি গাভী। ওই গাভীটির পূজা করতো সে। প্রজাসাধারণের প্রতিও এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলো, সুন্দর কোনো গাভী পেলেই তার পূজা করতে হবে। পরবর্তী সময়ে সামেরীও তাই বনী ইসরাইলদেরকে গাই পূজার পরামর্শ দিয়েছিলো।

হাসান বসরী বলেছেন, ফেরাউন তার গলায় একটি ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখতো। ওই ক্রুশটির পূজা করতো সে।

সুদ্দী বলেছেন, ফেরাউন নির্মাণ করেছিলো একটি বিশাল মূর্তি এবং জনসাধারণকে বলেছিলো, এই মূর্তিটির পূজা করো তোমরা। এই মূর্তিটিই তোমাদের প্রভু। এ কথাও জেনে রাখো যে, তোমাদের এবং তোমাদের পূজ্য এই মূর্তিটির প্রভু আমি নিজে। সাধারণভাবে সে এই ঘোষণা দিয়েছিলো যে, 'আনা রব্বুকুমুল আ'লা' (আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু)। কিবতীরা ছিলো সূর্য ও নক্ষত্রের পূজারী।

এরপর বলা হয়েছে—'সে বললো, আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করবো এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখবো, আর আমরা তো তাদের উপর প্রবল।' এ কথার অর্থ— গোত্রীয় প্রধানদের কথা শুনে ফেরাউন বললো, ঠিক আছে।

www.eelm.weebly.com

এখন থেকে আমরা বনী ইসরাইলদের নবজাত পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলবো। আর নবজাত কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রেখে দেবো। এভাবে আমরা পর্যুদস্ত করে দেবো তাদেরকে। এ রকম করা আমাদের জন্য অতি সহজ। কারণ আমরা পরাক্রান্ত এবং তারা দুর্বল। উল্লেখ্য যে, হজরত মুসার জন্মের প্রাক্কালেও ফেরাউন এ রকম হুকুম জারী করেছিলো।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসার জন্মের বছরে ফেরাউন বনী ইসরাইলদের নবজাত পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করিয়েছিলো। পুনরায় সে এ রকম হুকুম জারী করেছিলো হজরত মুসার নিকট থেকে সত্যধর্মের আহ্বান শোনার পর। এ রকম হুকুম জারী করার আরো একটি উদ্দেশ্য ছিলো তার। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে— মানুষের কাছে এ কথা প্রমাণ করে দেয়া যে, জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ ভুল। তারা বলেছিলো, বনী ইসরাইলদের মধ্যে এক শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে এবং তার মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাবে ফেরাউন ও তার রাজত্ব। নতুন করে শিশু হত্যার নির্দেশ বলবৎ করে সে এ কথাটি সকলকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলো যে— দ্যাখো, মুসা কিন্তু জ্যোতিষীদের কথিত ব্যক্তিত্ব নয়। যদি তাই হতো তবে কিবতীরা নিশ্চয় বনী ইসরাইলদের উপর এ রকম পরাক্রান্ত থাকতে পারতো না।

দ্বিতীয়বার শিশু হত্যার নির্দেশ শুনে আতংকিত হলো বনী ইসরাইলেরা। অনুযোগ পেশ করলো হজরত মুসা সকাশে।

সুরা আ'রাফঃ আয়াত ১২৮

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

❐ মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, 'আল্লাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর; রাজ্য তো আল্লাহেরই! তিনি তাঁহার দাসদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো সাবধানীদিগের জন্য।'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বনী ইসরাইলদের অনুযোগ শুনে হজরত মুসা তাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহ্তায়ালার দরবারে বিনীতভাবে রোদন করো। শরণ প্রার্থনা করো তাঁর নিকটেই। আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের মাধ্যমে তোমাদের উপর যে দুঃখ বিপদ আপতিত হয়েছে তা সহ্য করে যাও। এটা হচ্ছে তোমাদের সহিষ্ণুতার পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সচেষ্ট হও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বর। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকেই করেন রাজ্যাধিকারী। কখনো অবিশ্বাসীকে আবার কখনো বিশ্বাসীকে। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্তের প্রতি অনুযোগ উত্থাপন কোরো না। মনে রেখো,

www.eelm.weebly.com

সাবধানীদের (মুত্তাকীদের) জন্যই নির্ধারিত রয়েছে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য। তাদের জন্য রাখা হয়েছে জান্নাত। পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। এখানকার সুখ বা দুঃখ কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং বিপদে ধৈর্য-ধারণ করো। ধ্বংসশীলতার প্রতি বিমুখ হয়ে দৃষ্টি ফেরাও অবিনাশী আখেরাতের দিকে।

এখানে 'রাজ্য তো আল্লাহ্রই'—কথাটির অর্থ, সকল রাজ্যের মতো এই মিসর রাজ্যও নিশ্চয় আল্লাহ্র। আর 'তিনি তার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করেন'— কথাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে একটি অনুক্ত শুভ সংবাদ। সেই শুভ সংবাদটি হচ্ছে— অচিরেই ফেরাউনের রাজত্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হবে আর তার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হবে তোমরা— বনী ইসরাইলেরা।

আলোচ্য আয়াতের শেষ বাক্যটি হচ্ছে— ওয়াল আ'ক্বিবাতু লিল মুত্তাক্বীন (এবং শুভ পরিণাম তো সাবধানীদের জন্য)। 'উক্ববা' এবং 'আ'ক্বিবাত্' শব্দদ্বয়ের অর্থ— পশ্চাৎ থেকে আসা কোনো কিছু, যা পরিণতি বা পরিণাম নির্ণায়ক। কর্মের নেপথ্যেই থাকে বিনিময় বা পরিণাম। শুভ পরিণাম বুঝাতে ব্যবহৃত হয় উক্ববা, আ'ক্বিবাত্, উ'ক্বব— এই শব্দগুলো। আর মন্দ পরিণতি বুঝাতে ব্যবহৃত হয় আ'ক্ববাত্, মুয়া'ক্বিবাত্ এবং ই'ক্বাব্। যেমন আল্লাহ্তায়ালা অন্যত্র এরশাদ করেছেন— উলায়িকা লাহুম্ উ'ক্ববাদ্ দার (তাদের জন্য শুভ পরিণতিস্থল), ওয়ানি'মা উক্ববাদ্দার (আর শুভ পরিণতিস্থল কতোইনা সুন্দর), ওয়া খইরু উ'ক্ববা (আর সুন্দর পরিণতি) ইত্যাদি। আবার অন্যত্র এরশাদ করেছেন— ওয়া হাক্কা ই'ক্বাব (আর বাস্তব হলো শাস্তি), শাদীদুল ই'ক্বাব (কঠোর শাস্তি), ওয়া ইন আ'ক্বাব্তুম ফাআ'ক্বাবু বিমিছলি মা উ'ক্বিব্তুম (যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তবে তোমাদেরকে প্রদত্ত শাস্তির অনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করো) ইত্যাদি।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১২৯

قَالُوٓا۟ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

❒ তাহারা বলিল, 'আমাদিগের নিকট তোমার আসিবার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হইয়াছি এবং তোমার আসিবার পরেও।' সে বলিল 'শীঘ্রই তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের শত্রুকে ধ্বংস করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে রাজ্যে তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিবেন; অতঃপর তোমরা কী কর তাহা তিনি লক্ষ্য করিবেন।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে—'তারা বললো, আমাদের নিকট তোমার আসবার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসবার পরেও।' এ কথার অর্থ— বনী ইসরাইলেরা বললো, হে আমাদের পয়গম্বর মুসা! আমরা তো একই অবস্থায় রয়ে গেলাম। তোমার পয়গম্বর হিসেবে আবির্ভাব হওয়ার পূর্বে ফেরাউন আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছে। এখনো দিচ্ছে। আগেও সে আমাদের শিশুদেরকে হত্যা করিয়েছে। এখনো দিয়েছে নতুন করে শিশু হত্যার নির্দেশ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— বনী ইসরাইলেরা বললো, হে নবী মুসা! তোমার নবুয়ত লাভের পূর্বে আমাদেরকে বিনা মূল্যে অর্ধ দিবস শ্রম দিতে হতো। আর এখন বিনা মূল্যে শ্রম দিতে হচ্ছে পূর্ণ দিবস।

কালাবী বলেছেন, হজরত মুসার নবুয়ত লাভের পূর্বে ফেরাউন নিয়ম করে দিয়েছিলো— মাটি ছেনে ইট তৈরীর জন্য খামীর প্রস্তুত করবে অন্য শ্রমিকেরা এবং ইট প্রস্তুতের জন্য শ্রম দেবে বনী ইসরাইলেরা। আর হজরত মুসার নবুয়ত লাভের পর সে নিয়ম করে দিলো— মাটি ছেনে খামীর প্রস্তুত করা থেকে ইট প্রস্তুত করা পর্যন্ত সব কাজই করতে হবে বনী ইসরাইলদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে রাজ্যে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তোমরা কী করো তা তিনি লক্ষ্য করবেন।' এ কথার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! উত্তমরূপে অবগত হও যে, অচিরেই আল্লাহ্পাক ফেরাউনের রাজত্ব ধ্বংস করে দিবেন। তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করবেন তোমাদেরকে। তখন তিনি তোমাদেরকে এই মর্মে পরীক্ষা করবেন যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো কি না।

আলোচ্য আয়াতে দেয়া হয়েছে বনী ইসরাইলদেরকে বিজয় ও সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি। সেই সঙ্গে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, ওই সুখের সময়েও কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা নেয়া হবে তোমাদের, যেমন এখন নেয়া হচ্ছে ধৈর্যের পরীক্ষা। এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, বিপদে ধৈর্য ধারণ এবং সুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অত্যাবশ্যক।

বলা বাহুল্য যে, বনী ইসরাইলেরা বিপদে যেমন ধৈর্য ধারণ করতে পারেনি, তেমনি বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করার পরেও প্রকাশ করতে পারেনি কৃতজ্ঞতা। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্তায়ালা সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। তাদের সাম্রাজ্য ও সম্পদের অধিকারী করে দিয়েছিলেন বনী ইসরাইলদেরকে। কিন্তু তারা এই অনুগ্রহের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে শুরু করে দিয়েছিলো গো-শাবকের পূজা। বর্ণিত হয়েছে, হজরত দাউদের সময় থেকে মিসর রাজ্যে বসবাস গড়তে শুরু করেছিলো বনী ইসরাইলেরা।

www.eelm.weebly.com

وَلَقَدْ اَخَذْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○
فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ
مَّعَهٗ ؕ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ وَقَالُوْا مَهْمَا
تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○

❒ আমি তো ফেরাউনের অনুসারিগণকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের স্বল্পতা দ্বারা আক্রান্ত করিয়াছি যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে।

❒ যখন তাহাদিগের কোন কল্যাণ হইত তাহারা বলিত ইহা তো আমাদিগের প্রাপ্য, আর যখন কোন অকল্যাণ হইত তখন উহা মূসা ও তাহার সঙ্গীদিগের উপর আরোপ করিত; শোন, তাহাদিগের শুভাশুভ আল্লাহের নিয়ন্ত্রণাধীন; কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশ ইহা জানে না।

❒ তাহারা বলিল, 'আমাদিগকে যাদু করিবার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদিগের নিকট পেশ কর না কেন আমরা তোমাতে বিশ্বাস করিব না।'

প্রথমে বলা হয়েছে—'আমি তো ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের স্বল্পতা দ্বারা আক্রান্ত করেছি। এখানে 'বিস্‌সিনীনা' শব্দটির অর্থ অভাব, দুর্ভিক্ষ। 'আস্‌সানাতুন' অর্থ সাল বা বছর। অভাবের বছর বুঝাতে গিয়ে অতি ব্যবহারের কারণে শব্দটির অর্থ হয়েছে অভাব বা দুর্ভিক্ষের বছর। দুর্ভিক্ষের বছরই ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকে। 'আস্‌সানাতুন' শব্দটি আরো অনেকভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন 'সান্নাতুল ক্বওমি' (ওই ব্যক্তি অভাবে পতিত হয়েছে) 'মাস্‌সাত্ হুমুস্‌সান্নাত' (তাদের উপর পতিত হয়েছে দুর্ভিক্ষ) ইত্যাদি। 'বিস্‌সিনীনা' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচন রূপে। কিবতীদের উপর বছরের পর বছর অথবা উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষ এসেছিলো বলেই শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচন হিসেবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ রকম মন্তব্য করেছেন।

'ওয়া নাক্বসিম্ মিনাছ্ ছামারত' কথাটির অর্থ— এবং ফল-ফসলের স্বল্পতা। হজরত কাতাদা বলেছেন, এখানে বুঝানো হয়েছে— ফসলের স্বল্পতা গ্রামবাসীদের জন্য দেখা দিয়েছিলো। আর ফলের স্বল্পতা দেখা দিয়েছিলো শহরবাসীদের জন্য।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'লাআল্লা হুম ইয়াজ্‌জাক্‌কারুন' (যাতে তারা অনুধাবন করে)। এ কথার অর্থ— পাপাচারে ও অবাধ্যতার কারণেই যে দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের স্বল্পতা, এ কথা যেনো তারা উপলব্ধি করে। অর্থাৎ সত্য উপলব্ধি জাগ্রত করার নিমিত্তেই তাদের উপর আমি অবতারণ করেছিলাম দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের স্বল্পতা।

পরের আয়াতে (১৩১) বলা হয়েছে—'যখন তাদের কোনো কল্যাণ হতো তারা বলতো, এটা তো আমাদের প্রাপ্য। আর যখন কোনো অকল্যাণ হতো তখন তা মুসা ও তার সঙ্গীদের উপর আরোপ করতো। এখানে 'হাসানাত' (কল্যাণ) অর্থ— শস্যশ্যামল শস্যক্ষেত, ফল ভরা বাগান, নিরাপত্তা, সুখ ইত্যাদি। 'ক্বালু' অর্থ— ফেরাউনের অনুসারীরা বলতো। 'লানা হাজিহি' অর্থ— এটাতো আমাদের প্রাপ্য। 'সাইয়েয়াতুন' অর্থ— অকল্যাণ বা বিপদ-মুসিবত, দুর্ভিক্ষ, দুর্দশা ইত্যাদি। 'বি মুসা ওয়ামাম্‌মাআ'হু' অর্থ— মুসা ও তার সঙ্গীদের জন্য। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— ভালো কিছু হলে বা নির্বিঘ্ন জীবন-যাপন চলতে থাকলে ফেরাউনের অনুসারীরা বলতো, এটা হচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা। আর এটাই আমাদের প্রাপ্য। কিন্তু কোনো অকল্যাণ হলে বা বিপদ মুসিবত এসে পড়লে তারা বলতো, মুসা ও তার সঙ্গীদের জন্যই আমাদের উপর নেমে এসেছে এই দুর্বিপাক। মুসার আবির্ভাবের আগে আমরা তো কখনো এ রকম খরা, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ দেখিনি।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং মোহাম্মদ বিন মুনকাদির বলেছেন, ফেরাউনের রাজ্য শাসনকাল ছিলো চারশত বছর। তার রাজত্বকাল পূর্ব সময় থেকে তার রাজ্য শাসনকাল পর্যন্ত ছয়শত ছাব্বিশ বছর ধরে মিসরে কোনো বালা মুসিবত আসেনি। আর মুসার সময়ে ফেরাউন তার সারা জীবনে কোনো রকম কষ্টই পায়নি। সামান্য ক্ষুধা অথবা জ্বরের কষ্টও যদি সে পেতো, তবে 'আমি তোমাদের বড় প্রভু'—এ রকম কথা কিছুতেই বলতে পারতো না। 'কল্যাণ আমাদের প্রাপ্য এবং অকল্যাণ মুসা ও তার সঙ্গীদের কারণে আপতিত হয়'—এ রকম কথাও তার মুখে উচ্চারিত হতো না। তার এমতো উক্তি যে চরম নির্বুদ্ধিতার নামান্তর তা বলাই বাহুল্য। তার হৃদয় হয়ে গিয়েছিলো পাথরের মতো। তাই সে এ কথা কিছুতেই বুঝতে পারতো না যে, নিরুপদ্রব জীবন হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রদত্ত একটি বিশেষ অনুগ্রহ। আর এটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি পরীক্ষাও বটে। ফেরাউন ও তার অনুসারীরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। প্রকৃত অনুগ্রহ-দাতা আল্লাহ্‌তায়ালা যখন তাঁর প্রিয় রসুলকে প্রেরণ করেছেন, তাঁর মাধ্যমে প্রদর্শন করেছেন অলৌকিক নিদর্শন, তখন তারা সত্যের আহ্বানকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। আশ্রয় করেছে অবাধ্যতাকে। এই অকৃতজ্ঞতার কারণেই তাদের উপর আপতিত হয়েছে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের স্বল্পতা। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারেনি।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে—'শোনো, তাদের শুভাশুভ আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণাধীন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ এ কথা জানে না।' এ কথার অর্থ, শুভ এবং অশুভ আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ্তায়ালাই ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে পার্থিব কল্যাণের মধ্যে রাখতে চেয়েছিলেন বলেই তারা পেয়েছিলো বিপদমুক্ত জীবন। আর এখন আল্লাহ্তায়ালাই তাদের অকল্যাণ চান বলে তারা হয়েছে অশুভ অবস্থার সম্মুখীন। এ অবস্থা হচ্ছে তাদের সত্য প্রত্যাখ্যান ও অবাধ্যতার শাস্তি। কিন্তু তারা অবোধ। তাই এ কথা বুঝতে পারছে না। তারা চির অবিশ্বাসী বলেই অদৃষ্টের রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞাত।

কামুস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, 'ত্বইরু' অর্থ শুভাশুভ— তকদির বা অদৃষ্ট। অথবা শব্দটির উদ্দেশ্য এখানে— আল্লাহ্তায়ালার হুকুম। কিংবা 'অশুভ' কথাটির উদ্দেশ্য এখানে অশুভ অবস্থার কারণ। অর্থাৎ অশুভ অবস্থার কারণ হিসেবে তাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের পাপসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে তাদের অদৃষ্টে। আর অদৃষ্ট অনুযায়ী আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশে তাদের উপর নেমে এসেছে বিভিন্ন প্রকার বিপদ।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফেরাউন ও তার অনুসারীদের সবচেয়ে অশুভ অবস্থা হচ্ছে— তাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে চিরস্থায়ী নরক।

আল্লামা বায়যাবী বলেছেন, এখানে 'আল হাসানাতু' (কল্যাণ) শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে লামে তারীফ (প্রত্যয়সূচক লাম) সহযোগে। 'সাইয়েয়াতুন' (অকল্যাণ) শব্দটিতে সে রকম করা হয়নি। 'আল হাসানাতু' এর সঙ্গে আবার উল্লেখিত হয়েছে 'ইজা' (যখন) শব্দটি— যা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াকে বাস্তবরূপে প্রমাণিত করেছে। অপরদিকে সাইয়েয়াতুন শব্দটির সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে ইন্ (যদি) শব্দটি— যা সুনির্দিষ্ট নয়। এই পার্থক্যটির কারণ হচ্ছে— অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুপ্রশস্ত রহমতের কারণে আল্লাহ্তায়ালাই স্বেচ্ছায় ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে পার্থিব কল্যাণ দান করেছিলেন। কিন্তু অকল্যাণের কারণ তারাই সৃষ্টি করেছিলো। অকৃতজ্ঞতা ও অসহিষ্ণুতার কারণে তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ডেকে এনেছিলো আল্লাহ্র আযাব। আর অবশ্যই তা আল্লাহ্তায়ালার অননুমোদিত ছিলো না। তাই এখানে 'লাম'কে লামে তারীফ এবং ইজা সহযোগে এবং অকল্যাণকে অনির্দিষ্ট অবস্থায় এবং ইন্ সহযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর পরের আয়াতে (১৩২) বলা হয়েছে—'তারা বললো, আমাদেরকে যাদু করবার জন্য তুমি যে কোনো নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ করো না কেনো আমরা তোমাতে বিশ্বাস করবো না।' বিদ্রূপবশতঃ হজরত মুসা কর্তৃক আনীত মোজেজাসমূহকে ফেরাউন ও তার লোকেরা বলতো যাদু। তাই তারা এভাবে

www.eelm.weebly.com

বলতে পেরেছিলো যে, হে মুসা! তুমি যতো কিছুই অলৌকিক নিদর্শন দেখাও না কেনো, যাদুর মাধ্যমে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়ে আমাদের ধর্মমত থেকে যতই সরাতে চেষ্টা করো না কেনো, কিছুতেই আমরা তোমাকে এবং তোমার ধর্মমতকে গ্রহণ করবো না।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৩৩

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ○

❒ অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্লাবন, পংগপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এইগুলি স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তাহারা দাম্ভিকই রহিয়া গেল, আর তাহারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

আলোচ্য আয়াতে ফেরাউন ও তার অনুসারীদের উপর আপতিত পাঁচটি শাস্তির কথা বলা হয়েছে। শাস্তিগুলো হচ্ছে— প্লাবন, পংগপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত। এরপর বলা হয়েছে, ওই শাস্তিগুলোও ছিলো আল্লাহ্তায়ালার আয়াত বা স্পষ্ট নিদর্শন। এ সকল নিদর্শন দেখেও তাদের বোধোদয় ঘটেনি। তারা বেরিয়ে আসতে পারেনি তাদের অহমিকার বৃত্ত থেকে। তাই এরপর বলা হয়েছে— কিন্তু তারা দাম্ভিকই রয়ে গেলো, আর তারা ছিলো এক অপরাধী সম্প্রদায়।

ইবনে আবী হাতেম এবং হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, উপরে বর্ণিত আযাবগুলো এসেছিলো এক মাস পর পর।

ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, একটি আযাব চলতে থাকতো এক শনিবার থেকে আরেক শনিবার পর্যন্ত— এক সপ্তাহকাল। তারপর দেয়া হতো এক মাসের বিরতি। বিরতির পর শুরু হতো দ্বিতীয় আযাব। এই নিয়মে ধারাবাহিকভাবে তাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিলো উপরে বর্ণিত পাঁচটি আযাব। তাঁর বর্ণনায় এ কথাও এসেছে যে, যাদুকরেরা পরাস্ত হওয়ার পর বিশ বছর পর্যন্ত হজরত মুসা তাদের সঙ্গে ছিলেন এবং কিছুদিন পর পর তাদেরকে প্রদর্শন করা হতো নতুন নতুন মোজেজা।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত কাতাদা, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, যাদুকরদের ইমান আনার পরেও ফেরাউন ও তার সঙ্গীরা অবিশ্বাসে অনড় হয়ে রইলো। এরপর আল্লাহ্তায়ালা তাদের উপর চাপিয়ে দিলেন দুর্ভিক্ষ। তাদের ফল ও ফসলের উৎপাদনে দেখা দিলো স্বল্পতা। এতে করে তাদের বোধোদয় ঘটলো

www.eelm.weebly.com

না। হজরত মুসা প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! ফেরাউন অবাধ্য। তারা বিপদে পড়লে ইমান আনবে বলে ঘোষণা দিচ্ছে। আর বিপদ সরে গেলে জানাচ্ছে অস্বীকৃতি। অতএব হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমি তাদের উপর এমন শাস্তি অবতীর্ণ করো, যা আমার সম্প্রদায় এবং অনাগত মানবতার জন্য হয় নসিহত। প্রার্থনা কবুল হলো। আল্লাহ্তায়ালা পাঠালেন প্লাবন। শুরু হলো আঝোর ধারায় বৃষ্টিপাত। ওই বৃষ্টির পানিতে ডুবে গেলো কিবতীদের ঘরদোর। বসা বা শোয়ার জায়গা তাদের রইলো না। পানির মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকতে হলো তাদেরকে। তাদের ফসলের ক্ষেতও নিমজ্জিত হলো প্লাবনে। চাষাবাদের কোনো সুযোগও আর রইলো না। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, পাশাপাশি বসবাস করলেও বনী ইসরাইলদের ঘরদোর ছিলো প্লাবনমুক্ত। ওই প্লাবন স্থায়ী ছিলো সাত দিন— এক শনিবার থেকে আরেক শনিবার পর্যন্ত।

মুজাহিদ এবং আতা বলেছেন, এখানে প্লাবন অর্থ মৃত্যু। জননী আয়েশা থেকে ইবনে জারীর কর্তৃক একটি মারফু বর্ণনায় রয়েছে, ওয়াহাব বলেছেন, ইয়ামিনি পরিভাষায় প্লাবন বা তুফানকে বলা হয় প্লেগ। আবু কালাবাহ্ বলেছেন, এখানে তুফান কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, বসন্ত রোগ। কিবতীরাই সর্বপ্রথম বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে ওই রোগ ছড়িয়ে পড়েছিলো অন্যান্য স্থানে।

মুকাতিল বলেছেন, ওই আযাব এসেছিলো পানির তুফানরূপে— যা তাদের ফসলের ক্ষেতকে নিমজ্জিত করেছিলো। আবু জুবিয়ানের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই তুফান ছিলো মহান আল্লাহ্র একটি হুকুম— যাকে বলা হয়েছে তায়েফ। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফাত্বাফা আলাইহিম ত্বয়েফুম্ মির্ রব্বিকা ওয়াহুম নায়েমুন' (আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি প্রদক্ষিণকারী দল তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় প্রদক্ষিণ করলো)।'

কুফাবাসী আলেমগণ বলেছেন, 'রূহ্জান' এবং 'নুকসান' শব্দ দু'টোর মতো 'তুফান' শব্দটিও একটি মূল শব্দ— যার বহুবচন নেই। কিন্তু বসরাবাসী আলেমগণের মতে তুফান শব্দটি বহুবচন— এর এক বচন হচ্ছে 'তুফানাতুন'।

প্লাবনে নিমজ্জিত নিরুপায় কিবতীরা কাকুতি মিনতি করে বললো, হে মুসা! আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের প্লাবন-মুক্তির জন্য দোয়া করুন। প্লাবন সরে গেলে আমরা আপনার উপর ইমান আনবো এবং বনী ইসরাইলদেরকে আর উত্যক্ত করবো না। হজরত মুসা দোয়া করলেন। সরে গেলো প্লাবনের আযাব। সে বছর ফল ও ফসলের উৎপাদন হলো প্রচুর ও অভূতপূর্ব। সবুজের সমারোহে ছেয়ে গেলো সারা দেশ। এ অবস্থা দেখে কিবতীরা বললো, প্লাবনের পানি তো এসেছিলো নেয়ামতরূপে। তাই তো দেশে এখন এতো ফসলের সমারোহ। তাদের প্রতিশ্রুতির কথা বেমালুম ভুলে গেলো তারা। এভাবে অতিবাহিত হলো একটি মাস। তারপর নেমে এলো দ্বিতীয় আযাব।

www.eelm.weebly.com

পঙ্গপালে ছেয়ে গেলো সারা দেশ। পঙ্গপালের দল প্রথম চোটেই সাবাড় করে দিলো ক্ষেতের সকল ফসল। তারপর একে একে খেতে শুরু করলো শাকসব্জী, গাছপালা, ঘরের দরজা, জানালা, কড়িকাঠ। বনী ইসরাইলেরা সব দিক থেকে রইলো নিরাপদ। পঙ্গপালের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কিবতীরা চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে মুসা! আমাদেরকে বাঁচাও। এক্ষুণি দোয়া করো তোমার আল্লাহ্‌র কাছে। বলো, পঙ্গপালের হাত থেকে রক্ষা পেলে আমরা অবশ্যই গ্রহণ করবো তোমার ধর্মমত। কিবতীদের কাকুতি মিনতি শুনে হজরত মুসা দোয়া করলেন। এক শনিবার থেকে পরের শনিবার পর্যন্ত একনাগাড়ে অত্যাচার চলার পর হজরত মুসার দোয়ার বরকতে আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, ওই পঙ্গপালগুলোর প্রত্যেকটির বুকে লেখা ছিলো—'আল্লাহ্‌র সৈন্য'। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, সাতদিন পর হজরত মুসা শহরের বাইরে এক প্রান্তরে পৌঁছে হাতের লাঠি দ্বারা ইশারা করলেন। তার লাঠির ইশারা অনুসরণ করে পঙ্গপালেরা তৎক্ষণাৎ যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে চলে গেলো। দেশের খাদ্যশস্য সম্পূর্ণই শেষ করে ফেলতো পঙ্গপাল। কিন্তু তার আগেই কার্যকর হলো হজরত মুসার দোয়া। পঙ্গপাল চলে যাওয়ার পর তাই কিবতীরা বলতে শুরু করলো, যাক, পঙ্গপাল তো আমাদেরকে পুরোপুরি অন্নহীন করতে পারেনি। কষ্টে সৃষ্টে এ দিয়েই আমরা ফসলের মওসুম পর্যন্ত চালিয়ে দিতে পারবো। কষ্ট হলেও এ ব্যাপারে আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। পিতৃপুরুষদের ধর্মরক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য।

তাদের এ সকল কথা শুনে মনঃক্ষুণ্ন হলেন হজরত মুসা। ভাবলেন, কী অবলীলায় কিবতীরা পুনঃপুনঃ ভঙ্গ করে চলেছে অঙ্গীকার। দেখতে দেখতে কেটে গেলো একটি মাস। কিবতীদের উপর আবার নেমে এলো গজব। হঠাৎ করে দেশ ছেয়ে গেলো উকুনে।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত 'কুম্মাল' শব্দটির অর্থ ঘুণ বা কীট। হজরত কাতাদা, মুজাহিদ, সুদ্দী এবং কালাবী বলেছেন, কুম্মাল হচ্ছে ডানাবিহীন ছোট ছোট ফড়িং। আগের পঙ্গপালগুলো ছিলো বড় বড় ডানা বিশিষ্ট। আর পরের উকুন বা ফড়িংগুলো ছিলো ডানাহীন।

হজরত ইকরামা বলেছেন, মাদী ফড়িংকে বলা হয় কুম্মাল। আবু উবায়দা বলেছেন, কুম্মাল হচ্ছে হামনান (কীট বিশেষ)। আতা খোরাসানী বলেছেন, কুম্মাণ শব্দটির অর্থ— উকুন।

www.eelm.weebly.com

বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত মুসাকে নির্দেশ দিলেন, আইনশ্‌শামস্‌ গ্রামের দিকে যাও। সেখানে রয়েছে একটি ধুসর টিলা। ওই টিলার পাদদেশে তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত করো। হজরত মুসা নির্দেশ পালন করলেন। যথাস্থানে লাঠির আঘাত করতেই সেখানে সৃষ্টি হলো একটি গহ্বর। আর ওই গহ্বর থেকে ঝাঁক বেঁধে বেরোতে শুরু করলো অসংখ্য উকুন। উকুনগুলো ঢুকে পড়লো তাদের ক্ষেতে, সব্‌জী বাগানে, ঘরে, কাপড়ে, খাবারের বাসনে— সবখানে। উকুনের কামড়ে চিৎকার করতে লাগলো কিবতীরা। খাওয়া দাওয়াও গেলো বন্ধ হয়ে। কারণ আহারের উদ্যোগ নিলেই আহার্য বস্তুর মধ্যে মুহূর্তমধ্যে ঢুকে পড়তো অসংখ্য উকুন।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, কুম্মাল অর্থ শস্যদানা ভক্ষণকারী কীট বা ঘুণ পোকা। কিবতীদের খাদ্যবস্তু দ্রুত খেয়ে ফেলতে শুরু করলো ওই পোকাগুলো। গম পিষে আটা তৈরী করতে না করতেই পোকাগুলো খেয়ে ফেলতো দশ ভাগের প্রায় নয় ভাগ। এ রকম বিপদে আর কখনো পড়েনি কিবতীরা। তারা তাই দিশাহারা হয়ে পড়লো। পোকাগুলো কিবতীদের মাথার চুল, শরীরের পশম, চোখের ভ্রূ সব খেয়ে ফেললো। সারা শরীরে সব সময় কিলবিল করতে থাকতো পোকাগুলো। দেখলে মনে হতো যেনো তাদের শরীরে দেখা দিয়েছে বসন্ত রোগ। শয়ন, বিশ্রাম, নিদ্রা সবকিছু বন্ধ হয়ে গেলো কিবতীদের। আর্তচিৎকার শুরু করে দিলো তারা। হজরত মুসাকে বললো, আমরা তওবা করছি। আপনি আপনার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন। আযাব সরে গেলে আমরা আপনার ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবো। হজরত মুসা প্রার্থনা জানালেন। দুই শনিবারের মধ্যবর্তী সময়ে উকুনের আযাবে বিপর্যস্ত থাকার পর উদ্ধার পেলো কিবতীরা। কিন্তু এবারও তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো। বললো, বুঝেছি। তুমি আসলে যাদুকর। না হলে পাহাড়ের টিলা থেকে তুমি এতো উকুন বের করলে কি করে। এক মাস আরামে কাটালো তারা। হজরত মুসা পুনরায় বদদোয়া করলেন। ফলে আল্লাহ্‌পাক তাদের উপর অবতীর্ণ করলেন ব্যাঙের আযাব।

অসংখ্য ব্যাঙে ভরে গেলো দেশ। গৃহ, গৃহাঙ্গন, প্রান্তর, খাদ্যপাত্র— সবকিছুতে কিলবিল করতে লাগলো কেবল ব্যাঙ আর ব্যাঙ। কিবতীদের মাথায়, শরীরে বার বার লাফ দিয়ে বসতো ব্যাঙেরা। কথা বলার জন্য মুখ খুলতেই মুখে ঢুকে পড়তো। বসে থাকতো হাড়ি পাতিলের মধ্যে। উনুনে আগুন জ্বালালে লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ে নিভিয়ে দিতো আগুন। শয্যা হয়ে উঠতো ব্যাঙের স্তূপ। ফলে বিশ্রাম ও নিদ্রা হয়ে গেলো বন্ধ। খাবার জন্য মুখ খুললে মুখে ঢুকে যেতো ব্যাঙ। ফলে পানাহারও বন্ধ করতে হলো তাদেরকে। খাদ্য প্রস্তুতকালেও আটার খামীরের মধ্যে মিশে যেতো ব্যাঙেরা। এই চরম বিপদ থেকে কোনোক্রমেই পরিত্রাণ পাচ্ছিলো না তারা।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইকরামার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ব্যাঙ প্রথমে ছিলো স্থলভাগের প্রাণী। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা যখন তাদেরকে কিবতীদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিলেন, তখন নির্দেশ পালনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো তারা। তখন মাটি পানি আগুন— কোনো কিছু পরোয়া না করে তারা বার বার লাফিয়ে পড়তে থাকলো কিবতীদের পানি ভর্তি বালতিতে, চৌবাচ্চায়, হাঁড়িতে, আবার কখনো জ্বলন্ত উনুনে। আল্লাহ্তায়ালা তাদের এই আনুগত্যে সন্তুষ্ট হয়ে তখন থেকে মাটি ও পানি উভয় স্থানে তাদের বসবাস করে দিলেন স্বচ্ছন্দ।

ব্যাঙের আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে কিবতীরা হজরত মুসার কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করলো খুব। বললো, এবার আমরা খাঁটি তওবা করছি। হে মুসা! এখন থেকে আপনার ধর্মই আমাদের ধর্ম। এটাই আমাদের অঙ্গীকার। আর কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করবো না আমরা। হজরত মুসা বিগলিত হলেন। দোয়া করলেন আযাব অপসারণের জন্য। ফলে এক শনিবার থেকে আরেক শনিবার পর্যন্ত সময়ে ব্যাঙের আযাব দূর হয়ে গেলো।

কিন্তু এক মাস যেতে না যেতেই তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো। হয়ে গেলো আনুগত্যবিমুখ। হজরত মুসা রুষ্ট হলেন। বদ্দোয়া করলেন আবার। সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো রক্তের আযাব। নীল দরিয়ার পানি হয়ে গেলো রক্ত। কূপ, হ্রদ, খাল-বিল— সবকিছুর পানি পরিণত হলো রক্তে। তারা আঁজলা ভরে পানি হাতে নিলেই দেখতো তাজা টকটকে রক্ত। কিবতীজনতা ফেরাউনের কাছে গিয়ে এই শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে জানালো। ফেরাউন বললো, ভয় পেয়ো না, এটা হচ্ছে মুসার যাদু। যাদুর প্রভাবে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে তোমাদের। জনতা বললো, আমরা তো আমাদের চোখের পানি ছাড়া আর কোথাও কোনো পানি দেখছি না। সব পানি পরিণত হয়েছে রক্তে।

রক্তের এই আযাব চলতেই থাকলো দিনের পর দিন। বনী ইসরাইলদের কিন্তু কোনোই অসুবিধা হলো না। এক পাত্রে পানি উঠিয়ে পান করতো তারা। কিন্তু ওই একই পাত্রে পানি ওঠালেও কিবতীদের পাত্র ভরে যেতো রক্তে। একই কূপ থেকে স্বচ্ছন্দে পানি পান করতো বনী ইসরাইল। কিন্তু কিবতীরা ওই কূপ থেকে পানি তুললেই দেখতো, এতো পানি নয়— তাজা রক্ত। কিবতীদের পিপাসার্ত রমণীরা বনী ইসরাইলের রমণীদের কাছে পানি পান করতে চাইতো। তারা কিবতী রমণীদের পাত্রে ঢেলে দিতো স্বচ্ছ সলিল। কিন্তু কিবতী রমণীরা দেখতো তাদের পাত্র ভরে উঠেছে তাজা রক্তে। তখন তারা বলতো, তোমরা তোমাদের মুখে পানি নিয়ে কুলি করে আমাদের মুখে ঢেলে দাও। বনী ইসরাইলী রমণীরা তাই করতো। কিন্তু তাদের কুলির পানিও কিবতী রমণীদের মুখে পৌঁছে পরিণত হতো রক্তে। ফেরাউন নিজেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল পিপাসায়। পিপাসা নিবারণের জন্য সে

www.eelm.weebly.com

একদিন গাছের তাজা পাতা চিবোতে শুরু করলো। কিন্তু দেখলো সেই রসের মধ্যেও রয়েছে রক্তের স্বাদ। এই চরম আযাব তাদের উপর চলতে থাকলো এক শনিবার থেকে অন্য শনিবার পর্যন্ত।

জায়েদ বিন আসলাম বলেছেন, কিবতীদের উপর রক্তের আযাব আপতিত হয়েছিলো এভাবে— তাদের সকলের নাক দিয়ে নির্গত হতে শুরু করেছিলো রক্ত। সে রক্ত কিছুতেই বন্ধ হচ্ছিলো না। তাই তারা অতিষ্ঠ হয়ে হজরত মুসার শরণাপন্ন হলো। বললো, আর আমরা ভুল করবো না। এবারের মতো আমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হোক। আপনি দোয়া করে এই মুসিবত থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণ দিন। বিপদমুক্ত হলে আমরা আর কখনো আপনার ধর্মমত পরিত্যাগ করবো না। আর বনী ইসরাইলদেরকেও আপনার সঙ্গে চলে যেতে দেবো। হজরত মুসা আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সরে গেলো রক্ত-আতংক। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো কিবতীরা। এবারো তারা ভঙ্গ করে ফেললো তাদের অঙ্গীকার। অবিশ্বাস ও অবাধ্যতাকেই ধরে রইলো তারা। তাই সবশেষে বলা হয়েছে— তারা অহংকারীই রয়ে গেলো, আর তারা ছিলো এক অপরাধী সম্প্রদায়।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৩৪

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَٰمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ۖ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَٰٓءِيلَ ۝

❑ এবং যখন তাহাদিগের উপর শাস্তি আসিত তাহারা বলিত 'হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদিগের জন্য প্রার্থনা কর; তোমার সহিত তাহার যে অঙ্গীকার রহিয়াছে তদনুযায়ী যদি তুমি আমাদিগ হইতে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা তো তোমাতে বিশ্বাস করিবই এবং বনি ইসরাইলকেও তোমার সহিত যাইতে দিব।'

আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে—'এবং যখন তাদের উপর শাস্তি আসতো'—এখানে ওই শাস্তিগুলোর কথাই বলা হয়েছে, যে শাস্তিগুলোর কথা এতোক্ষণ ধরে বর্ণনা করা হলো। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের অভিমত হচ্ছে, এখানে উল্লেখিত রিজযুন্ (শাস্তি) অর্থ প্লেগ। কিবতীদের উপর প্লেগের আযাব অবতীর্ণ হয়েছিলো ইতোপূর্বে বর্ণিত প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্তের আযাবের পর। অর্থাৎ প্লেগ ছিলো তাদের উপর আপতিত ষষ্ঠ আযাব। ওই প্লেগ মহামারীতে একদিনে সত্তর হাজার কিবতী মরে গিয়েছিলো। মৃতদেহগুলোকে দাফন করতে করতে নেমে এসেছিলো সন্ধ্যা। বোখারী, মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

হজরত উসামা বিন জায়েদ থেকে বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি এবং বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্লেগ হচ্ছে এক প্রকার আযাব— যা আল্লাহ্তায়ালা সর্বপ্রথম অবতীর্ণ করেছিলেন বনী ইসরাইল এবং তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর। কোনো স্থানে প্লেগ দেখা দিলে স্বেচ্ছায় সেস্থানে যেয়ো না। আর প্লেগের স্থানে অবস্থান করলে সে স্থানও পরিত্যাগ কোরো না।

জননী আয়েশা থেকে আহমদ ও বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্লেগ একটি আযাব। আল্লাহ্পাক যেখানে চান সেখানেই প্লেগ অবতীর্ণ করেন। কিন্তু প্লেগ মুমিনদের জন্য রহমত। কোনো জনপদ প্লেগে আক্রান্ত হলে কোনো মুসলমান যদি তকদিরের উপর বিশ্বাস রেখে ধৈর্যধারণ করে সওয়াবের আশায় সেখানেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, তবে সে পাবে শহীদের মর্যাদা।

আমি বলি, উপরে বর্ণিত হাদিস দু'টোর মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, প্লেগের আযাব অবতীর্ণ করা হয়েছিলো বনী ইসরাইলদের উপর। কিবতীদের উপরে নয়। সম্ভবতঃ কিবতীদের উপর ইতোপূর্বে উল্লেখিত আযাবগুলো শেষ হওয়ার পর বনী ইসরাইলদের উপর নেমে এসেছিলো প্লেগের আযাব। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের উক্তিটিকে যথার্থ মনে করা হলে হজরত মুসা কর্তৃক প্রদর্শিত অলৌকিক নিদর্শন সমূহের ধারাবাহিক তালিকা দাঁড়াবে এ রকম— ১. লাঠি ২. শুভ্র হস্ত ৩. দুর্ভিক্ষ ও ফল ফসলের স্বল্পতা ৪. প্লাবন ৫. পঙ্গপাল ৬. উকুন ৭. ভেক ৮. রক্ত এবং ৯. প্লেগ। এভাবে দেখা যায় আলোচ্য আয়াতে নবম শাস্তিটির কথা বলা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা বলতো, হে মুসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, তোমার সঙ্গে তাঁর যে অঙ্গীকার রয়েছে তদনুযায়ী যদি তুমি আমাদের উপর থেকে শাস্তি অপসারিত করো তবে আমরা তো তোমাতে বিশ্বাস করবোই এবং বনী ইসরাইলকেও তোমার সঙ্গে যেতে দিবো।'

'বিমা আ'হিদা ই'নদাকা' (তোমার সঙ্গে তার যে অঙ্গীকার রয়েছে) কথাটির অর্থ— হে মুসা! আমরা ইমান আনলে আল্লাহ্ আযাব দূর করে দেবেন, এই মর্মে আল্লাহ্র সঙ্গে আপনার যে অঙ্গীকার রয়েছে। আতা বলেছেন, কথাটির অর্থ এখানে— হে মুসা! আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে যে নবুয়ত দান করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে অঙ্গীকার অর্থ হজরত মুসার দোয়া কবুল হওয়ার অঙ্গীকার। সুতরাং এখানে 'বিমা' (যাতে) শব্দটি সম্পর্কিত হয়েছে 'উদ্‌উ' (প্রার্থনা করো) কথাটির সঙ্গে। অথবা উদ্‌উ শব্দটি এখানে সর্বনামের অবস্থা প্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— হে মুসা! আপনার নবুয়ত অথবা দোয়া

www.eelm.weebly.com

কবুলের অঙ্গীকার সূত্রে আপনি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করুন। অথবা এখানে কথাটি সম্পর্কিত হয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই উহ্য ক্রিয়াসহ অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে মুসা! আপনার নবুয়তের অসিলায় আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করুন। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে বিমা আ'হিদা কথাটির 'বা' অক্ষরটি শপথের অর্থ প্রকাশক। —যার উত্তর হচ্ছে 'লা ইন কাশাফ্‌তা' (যদি তুমি শাস্তি অপসারিত করো)। অর্থাৎ— আমরা এই মর্মে শপথ করছি, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছেন, সেই অঙ্গীকারানুযায়ী যদি আমাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেয়া হয়, তবে আমরা ইমান আনবোই আনবো।

শেষে বলা হয়েছে— এবং বনী ইসরাইলকেও তোমার সঙ্গে যেতে দিবো। এ কথার অর্থ— হে মুসা! আযাব সরে গেলে আমরা তো ইমান আনবোই, তদুপরি বনী ইসরাইলদেরকে নিয়ে সিরিয়া চলে যাওয়ার ব্যাপারেও আমরা তোমার পথরোধ করবো না।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৩৫, ১৩৬

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ۝ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝

❑ যখনই তাহাদিগের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত করিতাম এক নির্দিষ্টকালের জন্য যাহা তাহাদিগের জন্য নির্ধারিত ছিলো তাহারা তখনই তাহাদিগের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিত।

❑ সুতরাং আমি তাহাদিগের উপর প্রতিশোধ লইয়াছি এবং তাহাদিগকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছি, কারণ তাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিত এবং এই সম্বন্ধে তাহারা ছিল অনবধান।

প্রথমে বলা হয়েছে—'যখনই তাদের উপর থেকে শাস্তি অপসারিত করতাম।' এ কথার অর্থ— আমার রসুল মুসার প্রার্থনা মঞ্জুর করে যখনই কিবতীদের উপর থেকে শাস্তি উঠিয়ে নিতাম।

এরপর বলা হয়েছে—'এক নির্দিষ্টকালের জন্য যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিলো, তারা তখনই তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতো।' এখানে তাদের জন্য নির্ধারিত নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত— কথাটির অর্থ তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত। অথবা সাগর বক্ষে তাদের সলিল সমাধি হওয়া পর্যন্ত। কেউ কেউ

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, এখানে তাদের জন্য নির্ধারিত সময় অর্থ— কিবতীদের ইমান আনার জন্য নির্ধারিত সময়। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় এ রকম— তাদের অঙ্গীকারানুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ইমান আনার বদলে তারা ভঙ্গ করে ফেলতো তাদের অঙ্গীকার।

পরের আয়াতে (১৩৬) বলা হয়েছে—'সুতরাং আমি তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তাদেরকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি, কারণ তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করতো এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিলো অনবধান।' এখানে 'ফান্‌তাক্বামনা' কথাটির অর্থ— আমি তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি। 'ফাআগরাক্বনাহুম ফিল্ ইয়াম্মি' অর্থ— তাদেরকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি। ইয়াম্মি শব্দটির অর্থ এখানে গভীর অভ্যন্তরে। ইয়াম্মি শব্দটি এসেছে 'তায়াম্মুম' থেকে। তায়াম্মুম অর্থ— সংকল্প বা দৃঢ় ইচ্ছা। সমুদ্র ভ্রমণকারীরা সমুদ্র ভ্রমণে বহির্গত হয় স্বেচ্ছায়।

'বিআন্‌নাহুম কাজ্‌জাবু বিআয়াতিনা' অর্থ— তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করতো। আর 'ওয়া কানু আ'নহা গফিলীন' অর্থ— এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিলো অনবধান। বলা বাহুল্য যে, ফেরাউন ও তার অনুসারীরা বার বার আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শনরাজি প্রত্যক্ষ করেও ইমানের পথে আসেনি। তাই তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত ঘোষণা এখানে এসেছে এভাবে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৩৭

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ۚ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ○

❐ যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হইত তাহাদিগকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি; এবং বনী ইসরাইল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হইল, যেহেতু তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল; আর ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যে সব প্রাসাদ তাহারা নির্মাণ করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করিয়াছি।

এখানে 'যে সম্প্রদায়কে' কথাটির অর্থ বনী ইসরাইল সম্প্রদায়কে। 'দুর্বল গণ্য করা হতো' কথাটির অর্থ— সহায়হীন মনে করে যাদেরকে (বনী ইসরাইলদেরকে) ক্রীতদাস বানানো হতো, তাদের মেয়েদের নিকট থেকে নেয়া

www.eelm.weebly.com

হতো বিভিন্ন রকমের খেদমত। সদ্যজাত পুত্রসন্তানকে করা হতো হত্যা ইত্যাদি। 'তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি' কথাটির অর্থ— মিসর ও সিরিয়ায় আমি দান করেছি বরকত বা কল্যাণ। সেখানে রয়েছে নদী। রয়েছে শ্যামল শস্য ভূমি। আরো রয়েছে বৃক্ষরাজি, ফল ও ফসলের সমারোহ। সেই মিসর রাজ্য থেকে ফেরাউনকে সরিয়ে এবং সিরিয়া থেকে আমালিকাদের রাজত্ব উচ্ছেদ করে ওই বিশাল অঞ্চলের সামগ্রিক অধিকার আমি দান করেছি বনী ইসরাইলদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং বনী ইসরাইল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হলো, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিলো।' এ কথার অর্থ— শতাব্দীর পর শতাব্দী ফেরাউন ও তার অনুসারীদের হাতে নিগৃহীত হয়ে চলেছিলো বনী ইসরাইলেরা। ক্রমাগত অত্যাচারিত হয়েও পরিত্রাণের অপেক্ষায় প্রহর গুণে যাচ্ছিলো তারা। আল্লাহ্তায়ালা তাই তাদেরকে দান করেছিলেন শুভ প্রতিশ্রুতি। সেই শুভ প্রতিশ্রুতি এতোদিনে লাভ করেছে বাস্তবতা। আর এটাই ছিলো আল্লাহ্তায়ালার নির্ধারণ। উল্লেখ্য যে, এখানে বর্ণিত শুভ বাণী বা শুভ প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখিত হয়েছে সুরা কাসাসের আয়াতে—'ওয়া নুরিদু আন্নামুন্না' থেকে 'মাকানু ইয়াহ্জারুন' পর্যন্ত। এ সম্পর্কে আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে— আ'সা রব্বুকুমা আঁ ইউহ্লিকা আ'দুওয়াকুম ওয়া ইয়াস তাখলিফা কুম ফিল আরদ্ব' (অচিরে তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দিবেন তোমাদের প্রতিপালক, আর তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করবেন সে দেশে)।

শেষে বলা হয়েছে—'আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যে সব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিলো তা ধ্বংস করেছি।' হাসান বলেছেন, এখানে ফেরাউন ও তার অনুসারীদের সুবিন্যস্ত ও শিল্পসম্মত আঙ্গুরের বাগিচাগুলোকে ধ্বংস করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে ধ্বংস করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে ওই সকল অট্টালিকা ও রাজপ্রাসাদ সমূহকে যেগুলোর প্রধান নির্মাতা এবং পরিকল্পক ছিলো ফেরাউনের মুখ্য মন্ত্রণাদাতা হামান।

এই আয়াতে শেষ করা হয়েছে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাহিনী। পরবর্তী আয়াতগুলোতে এসেছে বিজয়ী বনী ইসরাইলদের অসদাচরণ, অকৃতজ্ঞতা এবং অনানুগত্যের বিবরণ। আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে প্রদর্শন করেছেন অনেক অলৌকিক নিদর্শন। দান করেছেন মুক্তি, স্বচ্ছলতা এবং নিরুপদ্রব জীবন। কিন্তু এতো কিছু পেয়েও তারা প্রকাশ করেছে অবাধ্যতা। ওই ঘটনাবলীর মাধ্যমে রসুল স. এর উম্মতগণকে সতর্ক করাই হচ্ছে প্রধান উদ্দেশ্য। বিবরণগুলোর মধ্যে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, ধৈর্যধারণের ফল অত্যন্ত শুভ। আল্লাহ্তায়ালা ধৈর্যধারণকারীদেরকে অবশেষে অজস্র নেয়ামত দান করেন। কিন্তু ওই নেয়ামতের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অত্যাবশ্যক। সুতরাং দুঃখে ধৈর্য এবং সুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে ইমানদারেরা যেনো সদা সতর্ক থাকে। প্রবৃত্তির প্ররোচনাকে প্রশ্রয় দিয়ে কোনোক্রমেই যেনো তারা না হয় অলস ও উদাসীন।

www.eelm.weebly.com

وَجٰوَزْنَا بِبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰىٓ اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۚ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ○ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○ وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

❒ এবং বনি ইসরাইলকে সমুদ্র পার করাইয়া দেই; অতঃপর তাহারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির সংস্পর্শে আসে। তাহারা বলিল, 'হে মূসা! তাহাদিগের দেবতার ন্যায় আমাদিগের জন্যও এক দেবতা গড়িয়া দাও;' সে বলিল, 'তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়;

❒ 'এই সব লোক যাহাতে লিপ্ত রহিয়াছে তাহা তো ধ্বংস করা হইয়াছে এবং তাহারা যাহা করিতেছে তাহাও অমূলক।'

❒ সে আরও বলিল, 'কী, আল্লাহ্কে ছাড়িয়া তোমাদিগের জন্য আমি অন্য ইলাহ্ খুঁজিব যখন তিনি তোমাদিগকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন?'

❒ স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে ফেরাউনের অনুসারীদিগের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছি যাহারা তোমাদিগকে মর্মান্তিক শাস্তি দিত; তাহারা তোমাদিগের পুত্র সন্তানকে হত্যা করিত এবং তোমাদিগের নারীদিগকে জীবিত রাখিত; ইহাতে ছিল তোমাদিগের প্রতিপালকের এক মহা পরীক্ষা।

প্রথমে বলা হয়েছে—'এবং বনী ইসরাইলকে সমুদ্র পার করিয়ে দেই; অতঃপর তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির সংস্পর্শে আসে।' কালাবী বলেছেন, ফেরাউন ও তার অনুসারীরা সাগরবক্ষে নিমজ্জিত হলো। আর নির্বিঘ্নে সাগরের অপর পাড়ে পৌঁছলেন হজরত মুসা ও তাঁর সম্প্রদায়। এ নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হজরত মুসা আশুরার রোজা রেখেছিলেন।

www.eelm.weebly.com

সাগর পার হয়ে প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির সংস্পর্শে এসেছিলো বনী ইসরাইলেরা। ওই জাতি গো-শাবকের মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করতো। তাদেরকে দেখেই গো-শাবক পূজার প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছিলো বনী ইসরাইলেরা।

ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে যোবায়ের বলেছেন, গো-শাবকের ওই মূর্তিটি ছিলো তামা ও পিতল নির্মিত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, গো-প্রতিমার পূজক ওই সম্প্রদায়টি ছিলো আমালিকা সম্প্রদায়। ইবনে ইমরান জুনির উক্তিরূপে ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, ওই মূর্তি পূজকেরা ছিলো জাযায়েম গোত্রের লোক। হজরত কাতাদার উক্তিরূপে বাগবী বর্ণনা করেছেন, তারা ছিলো লাখম গোত্রের।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা বললো, হে মুসা! তাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়ে দাও; সে বললো, তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়।' বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্তায়ালার এককত্বে সন্দেহ করে বনী ইসরাইলেরা উল্লেখিত আবেদনটি করেনি। করেছিলো নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতাবশতঃ। তারা মনে করেছিলো, এ রকম মূর্তি পূজার মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য অর্জন করা যায়। হজরত মুসা তাই তাদের এই অনভিপ্রেত আবেদন শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, তোমরা তো দেখছি এক মূর্খ সম্প্রদায়।

পরের আয়াতে (১৩৯) বলা হয়েছে—'এই সব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো ধ্বংস করা হয়েছে এবং তারা যা করছে তা-ও অমূলক।' এ কথার অর্থ— ওই মূর্তি পূজক আমালিকা সম্প্রদায়কে তো আল্লাহ্তায়ালা ধ্বংস করে দিবেন। সুতরাং হে বনী ইসরাইল! তোমরা ধ্বংসের অনুসারী হতে চাও কেনো। মূর্তির উপাসনা একটি তৌহিদ বিরোধী কর্ম— যা নিরর্থক ও অমূলক। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বাক্যটি হজরত মুসার। তাঁর বক্তব্যে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিষয় দু'টো হচ্ছে— ১. মূর্তিপূজকদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ২. তাদের পূজা পার্বন আল্লাহ্তায়ালার নিকট অগ্রাহ্য— যেহেতু তা অমূলক। স্বসম্প্রদায়ের অজ্ঞতা ও মূর্খতা অপসারণের উদ্দেশ্যে হজরত মুসা এমন কথা বলেছিলেন।

পরের আয়াতে (১৪০) বলা হয়েছে—'সে আরো বললো, কী, আল্লাহ্কে ছেড়ে তোমাদের জন্য আমি অন্য ইলাহ্ খুঁজবো, যখন তিনি তোমাদেরকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।' এ কথার অর্থ— বনী ইসরাইলদের মূর্খজনোচিত আবদার শুনে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হজরত মুসা তাদেরকে বললেন, একি বলছো তোমরা! মানবেতর জীবন যাপন থেকে উদ্ধার করে আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে দিয়েছেন স্বাধীনতা, স্বচ্ছলতা। দেখিয়েছেন বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ। সে পরম করুণা পরবশ আল্লাহ্কে ছেড়ে তোমরা অন্য কোন উপাস্য অনুসন্ধান করতে বলো আমাকে। আল্লাহ্তায়ালাই তো তোমাদেরকে দিয়েছেন বিশ্ব জগতের শ্রেষ্ঠত্ব। সেই আল্লাহ্র সমতুল আর কেউ নেই।

www.eelm.weebly.com

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ওয়াকেদ লাইসী বলেছেন, একবার আমরা রসুল স. এর সঙ্গে হুনাইন নামক এক স্থান অতিক্রম করছিলাম। পথিমধ্যে পড়লো একটি কুলবৃক্ষ। মূর্খতার যুগের মানুষেরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ওই বৃক্ষটিতে ঝুলিয়ে তার চার পাশে ঘুরতো। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের জন্যও এমন একটি বরই গাছ নির্ধারণ করে দিন, যাতে আমরাও সে গাছটিতে অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতে পারি। তিনি স. বললেন, আল্লাহু আকবার! তোমরা তো দেখি বনী ইসরাইলদের মতো কথা বলতে শুরু করেছো। তারা বলেছিলো, হে মুসা! তাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও একটি দেবতা গড়ে দাও। তোমরাও কি শেষে তোমাদের পূর্ববর্তিদের পথ ধরবে?

এর পরের আয়াতে (১৪১) বলা হয়েছে—'স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের অনুসারীদের হাত থেকে উদ্ধার করেছি, যারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দিতো; তারা তোমাদের পুত্র সন্তানকে হত্যা করতো এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখতো; এতে ছিলো তোমাদের প্রতিপালকের এক মহা পরীক্ষা।' এ কথার অর্থ— হে বনী ইসরাইল! অতীতের দিকে তাকাও। এই তো সেদিনের কথা, যখন ফেরাউন তোমাদেরকে কতোভাবে কষ্ট দিতো— তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে বধ করতো, তাদের বিভিন্ন কাজে লাগাতো তোমাদের নারীদেরকে। তোমরা ছিলে নিতান্ত অসহায়। সেই চরম অসহায় অবস্থা থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছি আমিই। সেটা ছিলো দুঃখের পরীক্ষা। সে পরীক্ষা শেষে তোমরা এখন এসেছো আরেক পরীক্ষায়। এ পরীক্ষা হচ্ছে সুখের পরীক্ষা। তোমরা কি চাও না, এই মহা পরীক্ষায় তোমরা উত্তীর্ণ হও?

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৪২, ১৪৩

وَوٰعَدْنَا مُوسٰى ثَلٰثِينَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهٖۤ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسٰى لِاَخِيهِ هٰرُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَلَمَّا جَآءَ مُوسٰى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيۤ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرٰىنِي وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِي ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّاۤ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

☐ স্মরণ কর, মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করি এবং আরও দশ দ্বারা উহা পূর্ণ করি। এইভাবে তাহার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে

www.eelm.weebly.com

পূর্ণ হয়। এবং মূসা তাহার ভ্রাতা হারুণকে বলিল, 'আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, সদাচার করিবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদিগের অনুসরণ করিবে না।'

❒ মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রতিপালক তাহার সহিত কথা বলিলেন তখন সে বলিল 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখিব' তিনি বলিলেন 'তুমি আমাকে কখনই দেখিবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি উহা স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখিবে' যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হইলেন তখন উহা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল আর মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। যখন সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল তখন বলিল, 'মহিমময় তুমি! আমি অনুতপ্ত হইয়া তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং বিশ্বাসীদিগের মধ্যে আমিই প্রথম।'

প্রথমে বলা হয়েছে—'স্মরণ করো, মুসার জন্য আমি তিরিশ রাত্রি নির্ধারণ করি এবং আরো দশ দ্বারা তা পূর্ণ করি। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়। এ সম্পর্কে ইবনে হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, আবুল আলীয়া বলেছেন, জিলকদ মাসের তিরিশ দিন এবং জিলহজ মাসের দশদিন মিলে মোট চল্লিশ দিন রোজা রেখেছিলেন হজরত মুসা।

ইমাম সুয়ূতি লিখেছেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে এক মাস (তিরিশ দিন) রোজা রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অঙ্গীকার করেছিলেন এক মাস পর তিনি হজরত মুসার সঙ্গে কথা বলবেন।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, ফেরাউনের জীবদ্দশায় মিসরে থাকতেই হজরত মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, আল্লাহ্পাক তোমাদের শত্রু নিধনের পর তোমাদেরকে দান করবেন একটি কিতাব। ওই কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকবে তাঁর আদেশ ও নিষেধের বিবরণ। এরপর যথাসময়ে ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে ধ্বংস করে দিলেন আল্লাহ্পাক। হজরত মুসা তখন অঙ্গীকৃত কিতাব যাচ্ঞা করলেন। আল্লাহ্তায়ালা নির্দেশ দিলেন তিরিশ দিন একটানা রোজা রাখো। হজরত মুসা নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু ঠিক তিরিশ রোজার দিন মুখে কিছুটা দুর্গন্ধ অনুভব করলেন তিনি। দুর্গন্ধ দূর করার জন্য তিনি তখন একটি নরম কাঠ দ্বারা মেসওয়াক করে ফেললেন। আবুল আলীয়া বলেছেন, হজরত মুসা তখন চিবিয়েছিলেন একটি গাছের ছাল। মেসওয়াক করার পর পরই সেখানে হাজির হলো একটি ফেরেশতার দল। তারা বললো, আপনার মুখ থেকে নির্গত হচ্ছিলো মেশকের সুঘ্রাণ। মেসওয়াক করে সেই সুঘ্রাণকে আপনি দূর করে দিয়েছেন। আল্লাহ্তায়ালা তখন পুনঃনির্দেশ দিলেন আরো দশ দিন রোজা রাখতে। বললেন, এভাবে রোজা অবস্থায় অতিবাহিত করতে হবে মোট চল্লিশ দিন। আরো

www.eelm.weebly.com

প্রত্যাদেশ করলেন, হে মুসা! তুমি কী এ কথা জানো না যে, রোজাদারদের মুখের দুর্গন্ধ আমার কাছে মেশক আম্বরের চেয়েও উত্তম। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে দায়লামীও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং মুসা তার ভ্রাতা হারুণকে বললো, আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সদাচার করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে কথোপকথনের উদ্দেশ্যে তুর পর্বতের দিকে যাত্রার প্রাক্কালে হজরত মুসা তাঁর ভ্রাতা হজরত হারুণকে এই মর্মে নির্দেশনা দিলেন যে, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানে আমার স্থলাভিষিক্ত। তোমার প্রতি উপদেশ এই যে, তুমি সকলের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে। এভাবে সংশোধন করবে তাদেরকে। পরিচালিত করবে সকলকে সুপথে। আর যারা বিপর্যয় সৃষ্টি করে, কস্মিনকালেও তাদেরকে সমর্থন করবে না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, হজরত মুসা তাঁর ভ্রাতাকে দু'টি নির্দেশ দিয়েছিলেন। একটি হচ্ছে— আসলিহ্ (সদাচার করবে বা সংশোধন করবে)। আর একটি হচ্ছে 'ওয়ালা তাত্তাবি' (অনুসরণ করবে না) —অর্থাৎ যারা অবাধ্য, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী তাদের আনুগত্য করবে না।

পরের আয়াতে (১৪৩) বলা হয়েছে—'মুসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলো এবং তার প্রতিপালক তার সহিত কথা বললেন তখন সে বললো 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখবো', তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনোই দেখবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করো, যদি উহা স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে।' এখানে 'ওয়ালাম্মা জাআ মূসা' (মুসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলো) কথাটির অর্থ— হজরত মুসা যখন সিনাই পর্বতমালার তুর পাহাড়ে উপনীত হলেন। 'লিমিক্বাতিনা' কথাটির অর্থ আমার নির্ধারিত স্থানে। লিমিক্বাতিনা কথাটির প্রথমে ব্যবহৃত 'লাম' অক্ষরটি সুনির্দিষ্ট অবস্থা প্রকাশক। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— কথোপকথনের জন্য আমি যে স্থান ও সময় নির্ধারণ করেছিলাম— সেই সুনির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে।

তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন, হজরত মুসা পাক পবিত্র হয়ে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে একান্ত আলাপনের জন্য আল্লাহ্পাক কর্তৃক নির্ধারিত তুর পাহাড়ে নির্ধারিত সময়ে গমন করেছিলেন। এখানে 'ওয়া কাল্লামাহু রব্বুহু' কথাটির অর্থ— তার প্রতিপালক তার সঙ্গে কথা বললেন। বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্পাক তখন তুর পাহাড়ের চার পাশে সাত ফারসাখ (২১ মাইল) এলাকা করে দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধকার। ওই এলাকা থেকে শয়তানকে বের করে দেয়া হয়েছিলো। মাটিতে অবস্থানরত কীট-পতঙ্গগুলোকেও সরিয়ে দেয়া হয়েছিলো সেখানে থেকে। আমল লেখক ফেরেশতাদ্বয়কেও পৃথক করে দেয়া হয়েছিলো। উন্মোচন করে দেয়া

www.eelm.weebly.com

হয়েছিলো উর্ধ্বাকাশের সকল আবরণ। হজরত মুসা তখন দেখলেন চারিদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ফেরেশতা। আর উপরের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন আল্লাহ্‌তায়ালার আরশ। ওই অবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত মুসার সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন। হজরত মুসার পাশে উপস্থিত থাকলেও হজরত জিবরাইল ওই বাক্যালাপ শুনতে পাননি। হজরত মুসা তখন তকদির লিপিবদ্ধকারী কলমের লেখার আওয়াজও শুনতে পেলেন।

বায়যাবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত মুসা শুনতে পেলেন, সকল দিক থেকে ভেসে আসছে আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র বাণীর উচ্চারণ। আমি বলি, এ কথার অর্থ— হজরত মুসা তখন কোনো নির্দিষ্ট দিক থেকে আল্লাহ্‌তায়ালার কথা শুনতে পাচ্ছিলেন না। অর্থাৎ ওই অতুলনীয় বাণীবৈভব কোনো এক বা একাধিক নির্দিষ্ট দিকের মুখাপেক্ষী নয়। কোনো দিক যাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, সেই অতুলনীয় ও অবিভাজ্য পবিত্র সত্তার বাণী তো দিকের অতীত হবেই। হজরত মুসা যখন স্বকর্ণে আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী শুনতে পেলেন, তখন তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত হলো, আল্লাহ্-দর্শনের তীব্র আকাংখা। তিনি প্রেমাতিশয্যবশতঃ বলে উঠলেন, হে আমার প্রভুপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখবো।

'আল্লাহ্‌তায়ালা বললেন, তুমি আমাকে কখনোই দেখবে না' এ কথার অর্থ— পৃথিবীর সময় এবং স্থানের অধীন তুমি এখন। এ অবস্থা দর্শন দানের উপযুক্ত নয়। এখানে থেকে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় না। এখানে এ রকম চেষ্টা কেউ করলে তার মৃত্যু অনিবার্য। হজরত মুসা বললেন, হে আমার প্রিয়তম প্রভুপ্রতিপালক! তোমার দর্শনধন্য মৃত্যু তো দর্শনবিহীন জীবনের চেয়েও মহীয়ান।

আল্লামা সুয়ূতি লিখেছেন, এখানে 'লান্ তারানি' কথাটির অর্থ— তুমি আমাকে দেখতে পাবেই না। অর্থাৎ— তুমি আমাকে এখানে দেখতে পাবে না, কিন্তু আখেরাতে বেহেশতে দেখতে পাবে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌পাক এখানে লা উরা (আমি দর্শনীয় নই) এ রকম বলেননি। এতে করে বুঝা যায় আল্লাহ্‌তায়ালাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব, কিন্তু তা পৃথিবীতে হবার নয়।

এরপর বলা হয়েছে—'তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করো, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে।' এখানে যে পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে বলা হয়েছে, সেই পাহাড়টি ছিলো মাদায়েনের সর্ববৃহৎ পাহাড়। পাহাড়টির নাম আল যোবায়ের।

সুদ্দীর বর্ণনায় রয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে হজরত মুসার বাক্যালাপের সময় ইবলিস ঢুকে গিয়েছিলো মাটির মধ্যে। তারপর সে মাটি ফুঁড়ে হজরত মুসার দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে উত্থিত হয়ে এই মর্মে কুমন্ত্রণা দিয়েছিলো যে, যে কথা ভেসে আসছে সে কথা শয়তানের, আল্লাহ্‌র নয়। হজরত মুসা তাই আল্লাহ্‌কে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

www.eelm.weebly.com

উপরের বর্ণনা থেকে এ কথাটিও তো প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীতেই আল্লাহ্কে দেখা সম্ভব। কারণ, হজরত মুসা ছিলেন একজন উলুল আজম পয়গম্বর। তাই তিনি কোনো অসম্ভব বিষয়ের প্রার্থী হতে পারেন না। অসম্ভব জেনেও তার প্রার্থনা করা বিজ্ঞতার পরিচয় নয়। অতএব, পৃথিবীতে আল্লাহ্র দীদার অসম্ভব বলা হলে হজরত মুসাকে বিজ্ঞ না বলে বলতে হয় অজ্ঞ। আল্লাহ্র পরিচয়প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিত্ব এ রকম অজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন না। এই অভিমতটির পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় যে, আল্লাহ্তায়ালা এখানে বলেছেন 'লান্ তারানি' (দেখতে পাবেই না)। 'লা উরা' (দর্শনীয় নই) এ রকম বলেননি। তাই এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, আল্লাহ্র দীদার পৃথিবীতে সম্ভব নয়, কিন্তু পরবর্তী পৃথিবীতে সম্ভব। এ ব্যাপারে প্রকৃত সমাধান এটাই।

একটি প্রশ্ন ঃ হজরত মুসা কি এতই অজ্ঞ ছিলেন যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্র দীদার যে অসম্ভব— সে কথাও জানতেন না?

উত্তর ঃ আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে 'লান্ তারানি'— ঘোষণাটির পূর্বে এ কথা তার জানা না থাকারই কথা এবং আল্লাহ্তায়ালা না জানানোর আগে কোনো কিছু না জানা কোনো দোষ নয়। হজরত নুহের ক্ষেত্রে এ রকম ঘটেছে। মহাপ্লাবনের সময় তিনি তাঁর এক পুত্রের জন্য পরিত্রাণপ্রার্থী হয়েছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা তখন তাঁকে জানিয়েছিলেন, এ রকম প্রার্থনা সমীচীন নয়। এ কথা জানার পর তিনি ওই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি আর করেননি। হজরত ইব্রাহিমও তাঁর পিতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন না জেনে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা যখন তাঁকে এ কথা জানালেন যে, মুশরিকদেরকে ক্ষমা করা হয় না, তখন থেকে তিনি এ রকম প্রার্থনা আর করেননি। আখেরী রসুল স.ও তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবের হেদায়েতের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন আল্লাহ্তায়ালার দরবারে। ওই প্রার্থনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা জানিয়েছেন— 'কোনো নবী এবং মুমিনের জন্য এটা সমীচীন নয় যে, তারা কোনো মুশরিকের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হবে— যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়'।

কোনো কোনো মুনাফিকের জন্য রসুলপাক স. আল্লাহ্পাকের সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন। সেই প্রার্থনাসূত্রে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন 'ইস্তাগফিরলাহুম আওলা তাসতাগফার লাহুম ইন তাসতাগফার লাহু সাব্ঈনা মার্রাতান ফালাঁই ইয়াগফিরাল্লহু লাহুম' (তাদের জন্য আপনি ক্ষমাপ্রার্থনা করুন অথবা না করুন। যদি তাদের জন্য আপনি সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, তবু কখনোই তা আল্লাহ্ মঞ্জুর করবেন না)। অন্যত্র এরশাদ করেছেন— 'আর কখনও তাদের মধ্য থেকে কেউ মারা গেলে তার জন্য দোয়া (জানাযা) করবেন না এবং কারো কবরের পাশেও দোয়ার জন্য দণ্ডায়মান হবেন না।'—এ সকল দৃষ্টান্তসমূহের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্তায়ালা কোনো বিষয়ে অবগত করানোর আগে সে বিষয়ের অবগতি না থাকা দোষের কিছু নয়।

www.eelm.weebly.com

মোতাজিলারা বলে, দুনিয়া কিংবা আখেরাত— কোনো স্থানেই আল্লাহ্র দীদার সম্ভব নয়। কারণ এখানে বলা হয়েছে— 'লান্ তারানি' (তুমি আমাকে কখনোই দেখবে না)। এখানে 'লান' শব্দটি (কখনোই না) একটি চূড়ান্ত নির্দেশনা, যার অন্যথা অসম্ভব। তাই দুনিয়া-আখেরাত কোনোখানে কখনো আল্লাহ্র দর্শন সম্ভব নয়। আমরা বলি, এখানে 'কখনোই' অর্থ— দুনিয়াতে কখনোই। আখেরাত এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানে এ রকম বলে দুনিয়ায় দর্শনের সম্ভাবনাকেই সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দেয়া হয়েছে। 'লান' শব্দটির এ রকম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। যেমন, ইহুদীদের সম্পর্কে একস্থানে এরশাদ হয়েছে, 'ওয়া লাঁই ইয়্যাতামান্নাওহু আবাদা' (এরা কখনোই মৃত্যু কামনা করবে না)। এ কথার অর্থ, ইহুদীরা দুনিয়ায় কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। কিন্তু আখেরাতে মৃত্যুর আকাংখী হবে তারা। যেমন এক স্থানে এরশাদ হয়েছে—'তারা দোয়া করবে, আক্ষেপ! আমাদের মালিক যদি এখন আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতো, আমাদের উপর আরোপ করতো মৃত্যুর আদেশ।' অন্যত্র বলা হয়েছে— (ইহুদীরা বলবে) 'হায় আফসোস! প্রথম মৃত্যুতেই যদি আমাদেরকে শেষ করে দেয়া হতো।' আরেক স্থানে উল্লেখিত হয়েছে— 'ওয়া ইয়াকুলুল কাফিরু ইয়া লাইতানি কুনতু তুরাবা' (হায় আক্ষেপ! আমরা যদি মাটি হয়ে যেতাম)।

কেউ কেউ বলেছেন, হজরত মুসা আল্লাহ্তায়ালাকে দেখতে চেয়েছিলেন, তার সম্প্রদায়ের লোকদের আবদার রক্ষা করার জন্য। যেমন এক আয়াতে এসেছে— (ইহুদীদের গোত্র নেতারা বললো) 'আরিনাল্লহা জাহরাতান' (আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্তায়ালাকে দেখিয়ে দিন)। এই অভিমতটি কিন্তু ঠিক নয়। কারণ ওই ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ঘটনা। বর্ণিত উক্তিটির কারণে তখন ওই গোত্র নেতাদের উপর আপতিত হয়েছিলো আল্লাহ্র আযাব। বজ্রপাতের মাধ্যমে মৃত্যু ঘটানো হয়েছিলো তাদের। আর ওই ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালার এরশাদ ঘোষিত হয়েছিলো— 'তারা এ কথা বলার অধিকার রাখে না, তাই তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছে।' আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে বিবরণ দেয়া হয়েছে আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁর প্রেমিক রসুলের একান্ত কথোপকথনের। তৃতীয় কারো উপস্থিতি এখানে নেই। আর হজরত মুসাও ছিলেন যোগ্য প্রেমিক। তাই তাঁর দর্শনাভিলাষের কারণে আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়নি। কেবল বলে দেয়া হয়েছে— হে আমার দর্শনমত্ত প্রেমিক রসুল! তোমার অভিলাষ পূরণের স্থান এটা নয়। পৃথিবী আল্লাহ্তায়ালার দীদারের ভার বহনে অক্ষম। এ কথা বলে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝিয়েও দিয়েছেন তাঁর প্রিয়

www.eelm.weebly.com

রসুলকে। বলেছেন— 'তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করো, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে।' প্রিয়তমের দর্শনেচ্ছা প্রেমরীতির প্রতিকূল নয়। যদি হতো তবে আল্লাহ্তায়ালা নিশ্চয় কঠোর ভাষায় এর প্রতিবাদ জানাতেন। কিন্তু যারা প্রকৃত প্রেমিক নয়, তাদের আল্লাহ্-দর্শনের আবদার অবশ্যই অন্যায়। তাই অবাঞ্ছিত ইহুদী গোত্রনেতাদের সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা অন্যত্র জানিয়েছেন—'তারা এ কথা বলার অধিকার রাখে না, তাই তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছে।' অতএব এ কথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্তায়ালার নির্ধারিত রসুলগণ যা করেন, তা কখনো অজ্ঞজনোচিত হতে পারে না। আর অজ্ঞদের আবদার অনুসারেও তিনি আল্লাহ্ দর্শনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নি।

এরপর বলা হয়েছে—'তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করো, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে।' এ কথার অর্থ— হে মহাপ্রমিক মুসা! উত্তমরূপে অবগত হও যে, ওই বিশাল পর্বতও আমার জ্যোতিচ্ছটার আবির্ভাব সহ্য করতে পারবে না। তা হলে তুমি কিভাবে সহ্য করবে। এখানে শর্ত করে দেয়া হয়েছে যে, পাহাড় স্বস্থানে স্থির থাকলে হজরত মুসার আল্লাহ্-দর্শন সম্ভব। এতে করে বুঝা যায়, পৃথিবীতে আল্লাহ্তায়ালার তাজাল্লির আবির্ভাবে পাহাড়ের স্বস্থানে স্থির থাকা সম্ভব নয়। তাই হজরত মুসার পক্ষেও পৃথিবীতে আল্লাহ্-দর্শন সম্ভব নয়। অতএব প্রমাণিত হলো যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্-দর্শন অসম্ভব। একই সঙ্গে এ কথাটিও প্রমাণিত হলো যে, আখেরাতে আল্লাহ্তায়ালার দর্শন সম্ভব। কারণ আখেরাতে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এরপর বলা হয়েছে—'যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলো আর মুসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লো। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেলো তখন বললো, মহিমময় তুমি! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম।' ওয়াহাব বিন মোনাব্বাহ্ এবং ইবনে ইসহাক বলেছেন, হজরত মুসা যখন বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখবো'— তখন চার ফারসাখ এলাকা জুড়ে নেমে এলো ঘন কুয়াশা ও অন্ধকার। শুরু হলো বিদ্যুৎ-চমক, এবং বজ্রপাত। আল্লাহ্তায়ালা আকাশের ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যাও— মুসার নিকটে গিয়ে সমবেত হও। নির্দেশ পেয়ে প্রথম আকাশের ফেরেশতারা বিড়ালের আকার ধারণ করে উড়ন্ত মেঘমালার মতো হজরত মুসার দিকে গমন করতে শুরু করলো। বজ্রগম্ভীর আওয়াজে তাদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিলো আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা ও পবিত্রতার ঘোষণা। এরপর দ্বিতীয় আকাশের ফেরেশতারা বাঘের আকার ধারণ করে যেতে শুরু করলো তুর পাহাড়ের সন্নিকটে। তাদের মুখেও বিরামহীনভাবে ধ্বনিত হচ্ছিলো আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা

www.eelm.weebly.com

ও পবিত্রতার উচ্চকিত আওয়াজ। ফেরেশতাদের এই বিশাল সমাবেশ ও আল্লাহ্পাকের প্রশংসা ও পবিত্রতার মুহুর্মুহু ঘোষণা শুনে ঘন কুয়াশা এবং অন্ধকার বেষ্টিত হজরত মুসা ভীত হয়ে পড়লেন। খাড়া হয়ে উঠলো তাঁর শরীরের সমস্ত পশম। তিনি কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আমার অসমীচীন আবেদনের জন্য আমি অনুতপ্ত। হায়! আমি যদি এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে পৃথক হয়ে যেতে পারতাম। সমবেত ফেরেশতাদের সর্দার তখন তাঁকে বললেন, হে দীদারাভিলাষী নবী! আপনি আপনার আবেদনের উপরেই স্থির থাকুন। এখনো সামনে রয়েছে অনেক বিস্ময়।

এরপর আবির্ভূত হলেন তৃতীয় আকাশের ফেরেশতারা। তাদের বর্ণ ছিলো আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো। আর আকার ছিলো ব্যাঘ্রের মতো। বিশাল সেনাদলের মতো সম্মিলিত পদবিক্ষেপে আগমন করছিলো তারা। উচ্চকণ্ঠে বর্ণনা করছিলো আল্লাহ্পাকের প্রশংসা ও পবিত্রতা। হজরত মুসা জীবনের আশা পরিত্যাগ করলেন। ফেরেশতা বাহিনীর অধিপতি বললেন, হে ইমরান তনয়! আপন স্থানে অটল থাকুন। সামনে তো রয়েছে আরো অনেক অসহনীয় দৃশ্য।

এরপর সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতি ধারণ করে আগুন ও বরফের শরীর বিশিষ্ট রক্তাভ ও শ্বেতাভ বর্ণের ফেরেশতাবৃন্দ উপস্থিত হলো। তারা এলো চতুর্থ আকাশ থেকে। পূর্বে সমবেত সকল ফেরেশতার সম্মিলিত আওয়াজের চেয়ে নবাগত ফেরেশতা বাহিনীর তসবী পাঠের কণ্ঠস্বর ছিলো আরো অনেক উচ্চ। হজরত মুসার মনে হচ্ছিলো কর্ণকুহর বুঝি বিদীর্ণ হয়ে যাবে। শরীরের গ্রন্থিসমূহ মনে হয় এই মুহূর্তে হয়ে যাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। ফেরেশতাধিপতি বললেন, হে রসুল মুসা! বিচলিত হবেন না। আরো অনেক কিছু রয়েছে সম্মুখে। সবে তো শুরু।

এরপর উপস্থিত হলো সপ্তবর্ণ বিশিষ্ট ফেরেশতার দল। তারা ছিলো পঞ্চম আকাশের। মনে হচ্ছিলো যেনো আগুনের ঢেউ। কিন্তু সে আগুন ছিলো উত্তাপ বিবর্জিত। সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতিসম্পন্ন ওই ফেরেশতাদের উচ্চকণ্ঠে তসবিহ্ পাঠ শুনে বিহ্বল হয়ে পড়লেন বিস্মিত ও আতংকিত হজরত মুসা। ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। অধিনায়ক ফেরেশতাটি বললেন, হে ইমরান পুত্র! ধৈর্যধারণ করুন। আরো বিস্ময় রয়েছে সামনে। সকল দৃশ্য উন্মোচিত হবে একে একে। আপনি কিন্তু ধৈর্যচ্যুত হবেন না।

ষষ্ঠ আকাশের ফেরেশতারা এরপর হাজির হলেন আগুনের পোশাক পরে। তাদের প্রত্যেকের হাতে শোভা পাচ্ছিলো একটি করে খেজুরের গাছের মতো লম্বা আগুনের লাঠি। লাঠিগুলো ছিলো সূর্যের আলোর চেয়ে অনেক উজ্জ্বল। চারটি করে মুখ ছিলো প্রত্যেকের। তাই তাদের তসবীহ্ পাঠের আওয়াজ ছিলো আরো বেশী ভয়ংকর। সেই আওয়াজে ডুবে যাচ্ছিলো পূর্বের সকল ফেরেশতাদের সম্মিলিত তসবিহ্ পাঠের আওয়াজ। চতুর্মুখী সেই আওয়াজে পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হচ্ছিলো—

www.eelm.weebly.com

সুব্বুহুন কুদ্দুসুন ওয়া রব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার্‌রুহ্, রব্বিল ই'য্‌যাতি আবাদান লা ইয়ামুতু। হজরত মুসা এবার রোদনসিক্ত কণ্ঠে সেই তসবী পাঠ শুরু করে দিলেন। বললেন, হে আমার প্রিয়তম প্রভুপ্রতিপালক! আমাকে বিস্মৃত হবেন না। আপনার এই দাসকে আর পরীক্ষা করবেন না। জানি না এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে আমি আর কখনো পরিত্রাণ পাবো কিনা। একি অসহনীয় অবস্থা! আমি নিশ্চিত, এই স্থান পরিত্যাগ করলে আমি ভস্মীভূত হবো। আর আমি এ বিষয়েও নিশ্চিত যে, এখানে আমার সামনে মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু নেই। অধিনায়ক ফেরেশতা বললেন, হে ইমরান নন্দন! ভয়-ভীতির সীমানা অতিক্রম করেছেন আপনি। আপনার জীবন এখন কণ্ঠাগত। তবু হে রসুল প্রবর! সহিষ্ণুতাকে আশ্রয় করাই আপনার পক্ষে সমীচীন।

এরপর এলো সপ্তম আকাশের ফেরেশতারা। তারা গগনবিদারী আওয়াজে পাঠ করতে শুরু করলো— 'সুব্‌হানাল মালিকুল কুদ্দুসি রব্বিল ই'য্‌যাতি আবাদান লা ইয়ামুতু'(যাবতীয় পবিত্রতার অধীশ্বরেরই সমস্ত পবিত্রতা। মহিমময় পালনকর্তা চিরঞ্জীব, অমর)। থর থর করে কাঁপতে শুরু করলো সিনাই পর্বতমালা। পর্দা উঠিয়ে দেয়া হলো আরশের। আল্লাহ্‌তায়ালার সৌন্দর্যচ্ছটার অতি দূরবর্তী এক বিন্দু প্রতিচ্ছায়া পতিত হলো সিনাই গিরিশ্রেণীর সর্বোচ্চ চূড়াবিশিষ্ট আল যোবায়ের পর্বতশৃঙ্গে। নিমেষে ভস্মীভূত হয়ে গেলো আল যোবায়ের। আর হজরত মুসা জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। ওই তাজাল্লি প্রক্ষেপণের লেলিহান প্রতিক্রিয়ায় হজরত মুসা যেনো ভস্মীভূত না হন, তাই যে পাথরের উপর হজরত মুসা দাঁড়িয়েছিলেন, সেই পাথরটিকেই আল্লাহ্‌পাক উল্টো করে গম্বুজের মতো স্থাপন করলেন ভূতলশায়ী হজরত মুসার উপর। এভাবে অতিবাহিত হলো কিছুটা সময়। হজরত মুসা সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। তসবী পাঠ করতে করতে পূর্ববৎ দণ্ডায়মান হলেন তিনি। বললেন, হে আমার জীবন মৃত্যুর অধীশ্বর! আমি তো আপনার উপর ইমান আনয়ন করেছি। এ কথাও এখন জানলাম যে, কেউ আপনার ফেরেশতাকুলকে চাক্ষুষ করলে ভীত-সন্ত্রস্ত হবেই। আর আপনাকে দেখতে চাইলে মৃত্যুবরণ করবেই। হে মহা বিশ্বের মহা অধিপতি! আপনিই শ্রেষ্ঠ। আপনিই মহান। আপনিই সকল সৃষ্টির একমাত্র প্রভুপ্রতিপালক। অতুলনীয় রাজাধিরাজ । একামাত্র উপাস্য । আপনার সমতুল কেউ নেই। আপনার সমকক্ষ হওয়ার ধৃষ্টতাও কেউ রাখে না। হে আমার প্রেমময় প্রেমাধিরাজ! আমি আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনকামী। সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা কেবলই আপনার। আপনার কোনো অংশীদার নেই। পবিত্রাতিতমপবিত্র আপনি। আপনি মহীয়ান, গরিয়ান। মহাবিশ্বের আপনিই একক প্রভুপ্রতিপালক।

এখানে তাজাল্লি শব্দটির অর্থ নূরের আবির্ভাব। আল্লামা সুয়ূতি লিখেছেন, ওই সময় মুহূর্তের জন্য একটি নূরের ঝলক বিম্বিত হয়েছিলো মাত্র। হাকেমের বিশুদ্ধ বর্ণনাতেও এ রকম বলা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

মহান সুফী সাধকগণ বলেন, প্রতিচ্ছায়ার স্তরের আবির্ভাবকে বলা হয় তাজাল্লি— যেমন আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। তুর পর্বতে যা ঘটেছিলো, তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালার দর্শন নয়। এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, তাজাল্লি সহ্য করার দিক থেকে হজরত মুসা নিশ্চয়ই পাহাড়াপেক্ষা অধিকতর যোগ্য। তাই পাহাড় ভস্মীভূত হয়েছিলো বটে, কিন্তু হজরত মুসা ভস্মীভূত হননি। তিনি বেহুঁশ হয়েছিলেন মাত্র। ক্ষণকাল পরে আবার সংজ্ঞাও ফিরে পেয়েছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— আমি তো আসমান জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা এ গুরুভার বহন করতে অস্বীকৃত হলো এবং শঙ্কিত হলো। আর মানুষ তা বহন করলো।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্র নূর তখন প্রকাশিত হয়েছিলো পাহাড়ের উপর। জুহাক বলেছেন, আল্লাহ্পাক তাঁর সত্তার জ্যোতি তখন অবারিত করেছিলেন এবং পর্দা উঠিয়ে ষাঁড়ের নাসিকা রন্ধ্রের পরিসরের সমান জ্যোতি প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, সূঁচের অগ্রভাগ পরিমাণ নূরের তাজাল্লি তখন পাহাড়ের উপর প্রক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ্তায়ালা। আর তাতেই পাহাড়টি হয়ে গিয়েছিলো চূর্ণ-বিচূর্ণ।

সুদ্দী বলেছেন, তখন নূরের তাজাল্লিসম্পাত ঘটেছিলো কনিষ্ঠা আঙ্গুলের অগ্রভাগ সমতুল্য। হজরত আনাসের বর্ণনায় রয়েছে কনিষ্ঠ আঙ্গুলের সর্বোচ্চ গিরায় বৃদ্ধ আঙ্গুলের অগ্রভাগ স্থাপন করে রসুল স. এই আয়াত পাঠ করে বলেছিলেন, ব্যস। এতোটুকুই তাজাল্লি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো তখন। আর তাতেই পাহাড় হয়ে গিয়েছিলো চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং মুসা হয়ে পড়েছিলেন বেহুঁশ। আবু শায়েখের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. কনিষ্ঠা আঙ্গুলের অগ্রভাগ দেখিয়ে বলেছিলেন, এতোটুকু তাজাল্লি নিক্ষেপের ফলে পাহাড় হয়ে গিয়েছিলো চূর্ণ-বিচূর্ণ।

হজরত সহল বিন সা'দ সায়াদীর বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর সত্তর হাজার নূরের পর্দা থেকে মাত্র এক দিরহাম পরিসরের পর্দা উঠিয়ে নিয়েছিলেন। তাতেই পাহাড় হয়ে গিয়েছিলো ভস্মীভূত।

দাক্কান শব্দটির অর্থ টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'দাক্কান, দাক্কুন এবং হাদামুন্' শব্দত্রয়ের অর্থ সমতল বালুকা ভূমি।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্পাক ওই পাহাড়কে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছিলেন। আর ওই জমাট ভস্মের পাহাড়টি তখন চলতে চলতে গিয়ে পড়েছিলো সমুদ্রবক্ষে। সমুদ্রের অভ্যন্তরে এখন পর্যন্ত সেটি সতত ধাবমান।

www.eelm.weebly.com

আতিয়া বলেছেন, পাহাড়টি তখন পরিণত হয়েছিলো বালির পাহাড়ে। কালাবী বলেছেন, 'দাক্কান' শব্দটির অর্থ কাস্‌রান। অর্থাৎ খণ্ড-বিখণ্ড। পাহাড়ের খণ্ড-বিখণ্ড অংশগুলো তখন যুক্ত হয়ে গিয়েছিলো ছোট ছোট পাহাড়ের সঙ্গে।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে বর্ণিত হয়েছে— নূরের তেজে তখন ছয় খণ্ডে বিভক্ত হয়েছিলো পাহাড়টি। তিনটি খণ্ড গিয়ে পড়েছিলো মদীনায় এবং অবশিষ্ট তিনটি খণ্ড গিয়ে স্থির হয়েছিলো মক্কায়। মদীনায় ওই তিনটির নাম হয়েছে উহুদ, অরকান এবং রিজবী। আর মক্কায় সেগুলোর নাম হয়েছে সাওর, সাবীর এবং হেরা।

তাখরিজে বায়যাবী গ্রন্থে সায়াফ উল্লেখ করেছেন, ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, আরাফা প্রান্তরে সন্ধ্যার সময় হজরত মুসার প্রতি আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করলেন— 'ইন্নানী আনাল্লহ্' (নিশ্চয় আমিই আল্লাহ)। হজের সমাবেশস্থলের সন্নিকটে তখন প্রক্ষিপ্ত হয়েছিলো নূরের বিচ্ছুরণ। ফলে ওই পাহাড়টি বিভক্ত হয়েছিলো সাতটি খণ্ডে। একটি খণ্ড এখনো স্বস্থানে অটুট। সেই স্থানটি হচ্ছে ইমামের অবস্থানস্থল। তিনটি খণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে পতিত হয়েছিলো মদীনায়। ওই তিনটির নাম— তাইয়্যেবা, উহুদ এবং রিজবী। একটি খণ্ড উড়ে গিয়ে পড়েছিলো সিরিয়ার সিনাই পর্বতমালায়। উড়ে গিয়ে পড়েছিলো বলেই ওই পর্বতটির নাম তুর। আমি বলি, বর্ণনাটি অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য। কারণ, আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসার সঙ্গে বাক্যবিনিময় করেছিলেন সিরিয়ার সিনাই গিরিশ্রেণীর তুর পাহাড়ে। সেখানেই তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো তওরাত শরীফ। আরাফা প্রান্তরে এ রকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। 'সয়িক্বা' শব্দটির অর্থ সংজ্ঞাহীন বা বেহুঁশ। এ রকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। হজরত কাতাদা বলেছেন, শব্দটির অর্থ— মৃত্যু। কালাবী বলেছেন, আরাফার দিন বৃহস্পতিবার হজরত মুসা বেহুঁশ হয়েছিলেন এবং জুমার কোরবানীর দিন আল্লাহ্পাক তাঁকে তওরাত দান করেছিলেন। ওয়াকেদী বলেছেন, বেহুঁশ অবস্থা থেকে সংজ্ঞা ফিরে পাবার পর ফেরেশতারা তাঁকে বলেছিলো, হে ইমরানের দুলাল! আপনার দীদারের বাসনা ফলপ্রসূ হয়েছে কি?

'ফালাম্মা আফাক্বা' অর্থ— হজরত মুসা জ্ঞান ফিরে পেলেন। 'ক্বলা' অর্থ— তখন বললেন। 'সুব্হানাকা তুব্তু ইলাইকা' অর্থ মহিমময় তুমি! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম। অর্থাৎ— অনুমতি ব্যতিরেকে দীদার যাচঞা করার দুঃসাহস থেকে আমি অনুতপ্ত ও সলজ্জিত প্রত্যাবর্তন (তওবা) করলাম। ওয়া আনা আউয়ালুল মু'মিনীন অর্থ— এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম। অর্থাৎ— এই উম্মতের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রগণ্য ইমানদার। বলাবাহুল্য যে, নবীর ইমান নিশ্চয় তাঁর উম্মতের ইমানাপেক্ষা অগ্রগামী।

www.eelm.weebly.com

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

❑ তিনি বলিলেন 'হে মূসা, আমি তোমাকে আমার বাণী ও বাক্যালাপ দ্বারা লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি; সুতরাং আমি যাহা দিলাম তাহা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও;

এখানে 'ইস্তাফাইতুকা আ'লান্নাস' কথাটির অর্থ, তোমার যুগের সকল লোকদের উপর আমি তোমাকে দান করেছি শ্রেষ্ঠত্ব। 'বিকালামি' অর্থ— আমার বাক্যালাপ। 'মা আতাইতুকা' অর্থ— যে প্রত্যাদেশ আমি তোমাকে দিয়েছি।

বর্ণিত হয়েছে, তুর পাহাড়ে আল্লাহ্তায়ালার সরাসরি বাক্যালাপের পর হজরত মুসার মুখমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত হতো তীব্র নূর। পৃথিবীর জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত ওই নূর ছিলো একই রকম তীব্র। কেউ তাঁর মুখমণ্ডলের প্রতি সরাসরি দৃষ্টিপাত করতে পারতো না। তাই তিনি তাঁর চেহারা সব সময় ঢেকে রাখতেন। একদিন তাঁর স্ত্রী বললেন, আল্লাহ্পাকের সঙ্গে সরাসরি বাক্যালাপের পর থেকে সব সময় আপনি তো সকল দিক থেকেই আমার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন। হজরত মুসা তাঁর মুখমণ্ডলের আবরণ উন্মোচন করলেন। জ্বলন্ত সূর্যের দিকে যেমন তাকানো যায় না, তেমনি হলো তাঁর স্ত্রীর অবস্থা। তিনি দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। সেজদাবনত হয়ে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি জানালেন অশেষ কৃতজ্ঞতা। সেজদা থেকে উঠে বললেন, আমার জন্য প্রার্থনা করুন, যেনো বেহেশতেও আমি আপনার সঙ্গিনী হতে পারি। হজরত মুসা বললেন, তাই হবে, যদি তুমি আমার পরলোকগমনের পর অন্য কোথাও বিবাহবদ্ধা না হও। কারণ, এটাই বিধান যে, বেহেশতিনীরা বেহেশতে বাস করবে তাদের সর্বশেষ স্বামীর সঙ্গে।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, হজরত মুসা তওরাত শরীফ অধ্যয়নের পর বললেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি তওরাতে দেখলাম শ্রেষ্ঠ এক উম্মতের কথা। তাদের আবির্ভাব হবে মানুষের কল্যাণের জন্য। তারা মানুষকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান জানাবে, আর বিরত থাকতে বলবে অসৎ কাজ থেকে। আল্লাহ্র প্রতি এবং আল্লাহ্র পূর্বাপর সকল কিতাবের প্রতি থাকবে তাদের বিশুদ্ধ বিশ্বাস। বিভ্রাট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তারা। লড়াই করবে দাজ্জালের বিরুদ্ধেও। হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমি ওই উম্মতকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, হে মুসা! তারা তো হবে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর উম্মত। হজরত মুসা বললেন, আমি পাঠ করলাম আর

www.eelm.weebly.com

এক উম্মতের কথা। তারা আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রশংসা করবে। তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখবে সূর্যের গতিবিধির প্রতি (নামাজের সময়ের প্রতি)। তারা কোনো কাজ করতে চাইলে বলবে, ইনশাআল্লাহ্ করবো। তাদেরকেই উম্মত করে দিন আমার। আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, হে নবী মুসা! তারা তো হবে সর্বশেষ রসুলের উম্মত। হজরত মুসা বললেন, আর এক উম্মতের কথা পড়লাম কিতাবে। তারা নিজেদের মান্নত, কাফ্ফারা ও সদকা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করবে, উপযুক্তরা তা ভক্ষণ করবে, আগের উম্মতদের মতো উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে আসমানী আগুনে পোড়াবে না। তারা দোয়া করলে কবুল হবে। সুপারিশ করলে কবুল হবে সুপারিশ। ওই সকল লোককেই আমি চাই আমার উম্মতরূপে। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, তারা তো হবে রসুল মোহাম্মদের উম্মত। হজরত মুসা এবার বললেন, আমি দেখলাম আর এক উম্মতের বিবরণ। তারা উচ্চভূমিতে আরোহণকালে বলবে 'আল্লাহু আকবার।' আর নিম্নভূমিতে আরোহণকালে বলবে 'সুবহানাল্লাহ্', আলহামদুলিল্লাহ্ (অর্থাৎ হজযাত্রী হবে তারা)। তাদের জন্য সমস্ত পৃথিবীকে করা হবে পবিত্র (তায়াম্মুম ও নামাজ পাঠের জন্য)। তারা পানি দ্বারা যেমন পবিত্র হবে ওজু ও গোসলের মাধ্যমে, তেমনি পানি না পেলে বা পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে পবিত্রতা অর্জন করবে মাটি দ্বারা তায়াম্মুমের মাধ্যমেও। কিয়ামতের দিন তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো হবে ওজুর কারণে উজ্জ্বল। হে আমার আল্লাহ্! আপনি ওই লোকদেরকে বানিয়ে দিন আমার উম্মত। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, হে রসুল মুসা! তারা তো হবে শেষতম রসুলের উম্মত। হজরত মুসা আবারো বললেন, হে আমার পরম প্রভুপ্রতিপালক! আমি দেখলাম, এক উম্মত শুভকর্মের নিয়ত করার সঙ্গে সঙ্গে পাবে একটি পুণ্য। আর কাজটি করলে পুণ্য পাবে কমপক্ষে দশটি। পাপকর্মের সংকল্প করলে তাদের কোনো পাপ হবে না। পাপ করে ফেললে পাপ হবে কেবল একটি। হে আমার আল্লাহ্! ওই লোকদেরকেই আমি চাই আমার উম্মত হিসাবে। আল্লাহ্পাক জানালেন, তারা যে মোহাম্মদ নবীর উম্মত হিসাবে নির্ধারিত। হজরত মুসা পুনরায় বললেন, হে আমার জীবন মৃত্যুর অধীশ্বর! আমি আরো দেখলাম এক দুর্বল উম্মতের কথা। সকল কিতাবের সত্যায়ণকারীরূপে পূর্ণাঙ্গ একটি কিতাব তুমি দান করবে তাদেরকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হবে পাপী। কারো কারো আমল হবে পাপ-পুণ্য মিশ্রিত। আবার কেউ কেউ হবে পুণ্যবান। কিন্তু তারা সকলেই হবে রহমতপ্রাপ্ত। রহমত-বঞ্চিত হবে না কেউই। হে আমার পরম প্রভু! আপনি তাদেরকেই বানিয়ে দিন আমার উম্মত। আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, তারা যে আমার আহমদ নবীর উম্মত। হজরত পুনর্বার নিবেদন করলেন, প্রিয়তম প্রভু আমার! আমি দেখলাম, এক উম্মত বক্ষবদ্ধ করবে আসমানী কিতাব (হাফেজে কোরআন হবে)। সজ্জিত থাকবে জান্নাতী পোশাকে। তাদের নামাজের কাতার হবে ফেরেশতাদের কাতারের মতো। মসজিদে তাদের কোরআন আবৃত্তি গুঞ্জরিত হতে থাকবে মধুমক্ষিকাদের গুঞ্জনের মতো। তাদের

www.eelm.weebly.com

কেউ দোজখের আগুনে স্থায়ী হবে না। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা হবে তাদের নিকট থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। হে আমার আল্লাহ্! তুমি ওই দলটিকে আমার উম্মত নির্ধারণ করে দাও। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, তারা আমার আহমদ নবীর উম্মতরূপে নির্ধারিত। হজরত মুসা শেষতম রসুলের উম্মতের এতো মর্যাদা দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। আক্ষেপের স্বরে বললেন, হায়! আমি নবী না হয়ে যদি ওই নবীর উম্মত হতে পারতাম। এরপর বিমর্ষ নবীকে প্রসন্ন করার নিমিত্তে আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যাদেশ করলেন— হে মুসা! আমি তোমাকে আমার বাণী ও বাক্যালাপ দ্বারা লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি; সুতরাং আমি যা দিলাম তা গ্রহণ করো এবং কৃতজ্ঞ হও।'—এই বেহেশতী শান্তি প্রদায়ক প্রত্যাদেশ শুনে হজরত মুসা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفٰسِقِينَ ۝ سَأَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَّرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَّرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِينَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

❒ আমি তোমার জন্য ফলকে সর্ব বিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখিয়া দিয়াছি; সুতরাং এইগুলি শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে উহাদিগের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা গ্রহণ করিতে নির্দেশ দাও। আমি সত্যত্যাগীদিগের বাসস্থান তোমাদিগকে দেখাইব।

❒ পৃথিবীতে যাহারা অন্যায়ভাবে গর্ব করিয়া বেড়ায় তাহাদিগের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হইতে ফিরাইয়া দিব। তাহারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখিলেও

www.eelm.weebly.com

উহাতে বিশ্বাস করিবে না, তাহারা সৎপথ দেখিলেও উহাকে পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে না, কিন্তু তাহারা ভ্রান্ত পথ দেখিলে উহাকে তাহারা পথ হিসাবে গ্রহণ করিবে, ইহা এই হেতু যে, তাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং সে সম্বন্ধে তাহারা ছিল অনবধান।

❒ যাহারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাৎকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগের কার্য নিষ্ফল হয়। তাহারা যাহা করে তদনুযায়ীই তাহাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে।

আগের আয়াতে উল্লেখিত প্রত্যাদেশের প্রবহমানতা চলে এসেছে উদ্ধৃত আয়াতগুলোতেও। প্রথমে নির্দেশনা এসেছে— আমি তার জন্য ফলকে উৎকীর্ণ তওরাতে সকল বিষয়ের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাও বিবৃত করেছি। সুতরাং ওগুলো দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং তোমার সম্প্রদায়কে তাদের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তা অবলম্বন করতে নির্দেশ দাও। আমি সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদেরকে দেখাবো।

যে ফলকগুলোতে তওরাত কিতাব লিপিবদ্ধ ছিলো, সেগুলোর সংখ্যা ছিলো সাতটি, অথবা দশটি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আলওয়াহ্' শব্দটির অর্থ— ফলকসমূহ। হাদিস শরীফে এসেছে, তওরাত শরীফের ফলকগুলো ছিলো বেহেশতের বরই গাছের তক্তা। প্রতিটি তক্তা ছিলো বারো হাত দীর্ঘ। হজরত জাফরের মধ্যস্থতায় হজরত আলী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু শায়েখ। ওই হাদিসে এ কথাও এসেছে যে, আল্লাহ্তায়ালা স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন হজরত আদমকে। স্বহস্তে ফলকে লিপিবদ্ধ করেছেন তওরাত। আর স্বহস্তে রোপণ করেছেন বেহেশতের তুবা নামক বৃক্ষটি।

হাসান বসরী বলেছেন, ওই ফলকগুলো ছিলো কাঠের তক্তা। কালাবী বলেছেন, সবুজ জবরজাদ নির্মিত ছিলো ফলকগুলো। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ফলকগুলো ছিলো লাল ইয়াকুতের। এ সম্পর্কে সর্বশেষ উক্তি করেছেন হজরত কা'ব আহবার। বর্ণনা করেছেন তিবরানী ও আবু শায়েখ।

রবী বিন আনাস বলেছেন, ফলকগুলো ছিলো জবরজাদের। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, জামরাদের— যা আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশে হজরত জিবরাইল এনেছিলেন এডেন থেকে। যে কলম দিয়ে অদৃষ্টলিপি লেখা হয়, সেই কলম দিয়েই লেখা হয়েছিলো তওরাত। আর নহরে নূরের পানি ব্যবহৃত হয়েছিলো কালিরূপে। আবু শায়েখের বর্ণনায় রয়েছে, ইবনে জুরাইজ বলেছেন, ফলকগুলো ছিলো জামরাদ ও জবরজাদের। ওয়াহাব বলেছেন, ঠুস নামক পাথর থেকে আল্লাহ্পাক ফলকগুলো উৎপাটনের হুকুম দিয়েছিলেন। তারপর সেগুলোকে করেছিলেন নরম। তারপর প্রস্তরখণ্ডকে চিরে বানানো হয়েছিলো দশটি মসৃণ ফলক। আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে বাক্যালাপের সময় হজরত মুসা ওই ফলকগুলোর

www.eelm.weebly.com

উপর কলমের লেখার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। জিলকদ মাসে সংঘটিত হয়েছিলো এই ঘটনা। ফলকগুলো দৈর্ঘ্যে ছিলো হজরত মুসার শরীরের সমান— দশ হাত।

মুকাতিল ও ওয়াহাব বলেছেন, আংটির নকশার মতো লিপির মাধ্যমে ফলকসমূহের উপরে লেখা হয়েছিলো তওরাত। রবী ইবনে আনাস বলেছেন, অবতরণকালে তওরাতের ওজন ছিলো সত্তরটি উটের বোঝা সদৃশ। এক বৎসরের কমে তওরাতের একটি খণ্ড পড়ে শেষ করা যেতো না। হজরত মুসা, হজরত ইউশা, হজরত উযায়ের এবং হজরত ঈসা ব্যতীত অন্য কেউ সম্পূর্ণ তওরাত পাঠ করতে পারেনি।

এখানে 'মিন কুল্লি শাইয়িম্ মাউয়ি'জাতাঁন অর্থ— সর্ব বিষয়ে উপদেশ। 'ওয়া তাফ্সিলল্ লি কুল্লি শাইয়িন' অর্থ— সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা। এখানে 'উপদেশ' অর্থ ওই সকল বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা যেগুলোর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। কামুস গ্রন্থে রয়েছে এর অর্থ— তিরস্কার ও পুরস্কারের এমন নির্দেশনা, যা পাঠ করলে হৃদয় বিনম্র হয়। 'সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা' কথাটির অর্থ— আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম ও অন্যান্য নির্দেশনাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ। 'ওয়া খুজহা বি ক্বুওয়াতিন' কথাটির অর্থ— সুতরাং এগুলো শক্তভাবে ধরো। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার এই নির্দেশসমূহ ধারণ করো দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে। কেননা অশক্ত অভিপ্রায় হচ্ছে আলস্য ও ঔদাসীন্যতুল্য। দুর্বল সংকল্পধারীরা কখনো সফলতার মুখ দেখে না।

'ওয়া মুর ক্বওমাকা ইয়াখুজু বিআহ্সানিহা' কথাটির অর্থ— এবং তোমার সম্প্রদায়কে এর মধ্যে (তওরাতের মধ্যে) যা শ্রেষ্ঠ; তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও। 'বিআহ্সানিহা' কথাটির অর্থ এখানে যা শ্রেষ্ঠ, সর্বাঙ্গসুন্দর বা সর্বোত্তম। স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্তায়ালার কিতাবে বর্ণিত সকল বিষয়ই সুন্দর, শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম। অসুন্দর বলে সেখানে কোনো কিছু নেই।

আতা বলেছেন, 'ইয়াখুজু বি আহ্সানিহা' কথাটির ব্যাখ্যাসূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস উল্লেখ করেছেন, এর অর্থ— তওরাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানবে। বিধানসমূহের প্রতি নিবদ্ধ করবে অভিনিবেশী দৃষ্টি। বিভিন্ন বিবরণ ও উদাহরণ থেকে গ্রহণ করবে উপদেশ। আর আমল করবে এর বিধানানুসারে। গভীর পর্যবেক্ষণে মগ্ন হবে না এর মোতাশাবাহাত (রহস্যাচ্ছন্ন বক্তব্য) সম্পর্কে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'বিআহ্সানিহা' কথাটির উদ্দেশ্য— ফরজ ও মোস্তাহাব বিধানসমূহ, যেগুলোর মাধ্যমে পুণ্য অর্জিত হয়। ফরজ ও মোস্তাহাব ব্যতিরেকে অন্য সকল বিষয় মোবাহ্ (বৈধ) —যেগুলো করলে সওয়াব হবে, কিন্তু না করলে কোনো শাস্তি দেয়া হবে না।

www.eelm.weebly.com

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'যা শ্রেষ্ঠ তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও' কথাটির অর্থ— হে রসুল মুসা! তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সর্বোত্তম আমলের নির্দেশ দাও। অর্থাৎ— রুখসত (সহজসাধ্য) নয়, নির্দেশ দাও আজিমত (দৃঢ়তাব্যঞ্জক) আমলের। প্রতিটি আমলের দু'টো দিক রয়েছে— একটি সর্বোত্তম, অন্যটি অপেক্ষাকৃত কম উত্তম। যেমন, কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) অপেক্ষা উত্তম ক্ষমা, প্রতিশোধ গ্রহণ করা অপেক্ষা উত্তম ধৈর্য ইত্যাদি। আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে এভাবে অপেক্ষাকৃত কম উত্তম আমল না করে অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তম আমলের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে—'আমি সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদেরকে দেখাবো।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল মুসা! আমি তোমাকে ও তোমার সম্প্রদায়কে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণামস্থল প্রদর্শন করাবো। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে দেখাবো মিসরের ফেরাউন ও তার সম্পদায়ের বিরান বসতবাটী। এ রকম বলেছেন আতিয়াহ্ আওফী। সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'বাসস্থান' অর্থ— কাফেরদের ধ্বংসের স্থান। হজরত কাতাদা এবং কালাবী বলেছেন, কথাটির অর্থ এখানে— আদ, ছামুদ ইত্যাদি অবাধ্য সম্প্রদায়ের বিরান জনপদের ধ্বংসচিহ্ন। হজরত মুসার অনুগমনকালে বনী ইসরাইলদেরকে এ সকল ধ্বংসাবশেষ দেখানো হয়েছিলো। মুজাহিদ, হাসান এবং আতা বলেছেন, এখানে 'সত্য-ত্যাগীদের বাসস্থান' অর্থ— জাহান্নাম, যেখানে অবিশ্বাসীরা বসবাস করবে অনন্তকাল।

পরের আয়াতে (১৪৬) বলা হয়েছে 'পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন থেকে ফিরিয়ে দিবো, তারা আমার নিদর্শন দেখলেও তাতে বিশ্বাস করবে না।'

এখানে 'পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করে বেড়ায়' কথাটির অর্থ— যারা ভ্রষ্ট ধর্মমতের কারণে গর্বিত এবং যারা পৃথিবীতে অহংকারবশতঃ মানুষের উপর অত্যাচার করে ও যারা আমার প্রিয়জনদের (নবী রসুলদের) বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

'তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন থেকে ফিরিয়ে দিবো' কথাটির অর্থ— আমি ওই অহংকারী অবিশ্বাসীদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ থেকে কোনো উপদেশ বা উপকার গ্রহণ করতে দেবো না। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে— আমি দাম্ভিক অবিশ্বাসীদেরকে আমার পক্ষ থেকে অবতারিত মোজেজাসমূহের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দিবো না, আল্লাহ্র নূরকে নির্বাপিত করার অপচেষ্টাসমূহকে হতে দেবো না ফলপ্রসূ। অর্থাৎ— আমার নিদর্শনসমূহকে আমি প্রতিষ্ঠিত করেই ছাড়বো। ধ্বংস করে দেবো মিথ্যাবাদীদেরকে— যেমন দিয়েছি ফেরাউন ও তার সঙ্গীদেরকে। কাফেরদের পছন্দ না হলেও আমি আমার সত্যধর্মের নূরকে করবো পূর্ণ বিকশিত। উদ্ধৃত কথাটির উদ্দেশ্য এ রকমও হতে পারে যে— অবিশ্বাসীরা

www.eelm.weebly.com

অবিবেচক ও অহংকারী বলে আমি তাদেরকে শুদ্ধ ধর্মমত থেকে করবো চিরবঞ্চিত। ফলে তারা কোরআনের আয়াতের উপর আস্থা রাখতে পারবে না, ছত্রছায়ায় আসতে পারবে না সত্যধর্মের। তাদের অন্তরকে আমি করে দেবো সত্যধর্মের প্রতি বিকর্ষণপ্রবণ। অন্য একটি আয়াতেও তাই বলা হয়েছে—'ফালাম্মা জাগু আজাগাল্লহু কুলুবুহুম' (যখন তারা বক্র হলো, আল্লাহ্ বক্র করে দিলেন তাদের অন্তরসমূহকে)। এ রকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, 'সাআস্‌রিফু' (দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবো) কথাটির অর্থ এখানে— আমি তাদেরকে কোরআনের মর্মার্থ ও রহস্যের সন্ধান দেবো না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে আয়াতী (আমার নিদর্শন) কথাটির অর্থ ওই নয়টি নিদর্শন, যা আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে দান করেছিলেন। যদি তাই হয় তবে এখানে 'পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায়' কথাটির লক্ষ্যস্থল হবে কেবল কিবতীরা (ফেরাউনের অনুসারীরা)। আর তখন আলোচ্য আয়াতটিও সুনির্দিষ্টভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়বে তাদের সঙ্গে।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে বিশ্বাস করবে না' কথাটির অর্থ— ওই গর্বিত অবিশ্বাসীদেরকে আমার সকল নিদর্শন দেখানো হলেও তারা তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও হঠকারিতা পরিত্যাগ করবে না। কারণ তাদের বোধ ও চিন্তা-চেতনা হয়ে গিয়েছিলো বিকৃত। অথবা তারা এ কারণেই ইমান আনতে পারবে না যে, আল্লাহ্তায়ালা তাদের হৃদয়কে করেছেন মোহরাঙ্কিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা সৎপথ দেখলেও তাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না। কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তাকে তারা পথ হিসেবে গ্রহণ করবে।' এখানে 'সাবীলার্ রুশ্দি' অর্থ— সৎপথ। 'রাশ্‌দা,' 'রুশদা' এবং 'রাশাদীন' শব্দত্রয় সমার্থক— যেমন সমার্থক 'সাক্বাম' 'সুক্বাম' এবং সাক্বামী' শব্দত্রয়। আবু আমর বলেছেন, কোনো কাজকে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করাকে বলা হয় রুশদ্। আর 'রাশ্‌দা' বলা হয় ধর্মের উপর দৃঢ়তাকে। 'সাবীলাল্ গায়্যী' অর্থ ভ্রান্ত পথ। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায় এ রকম— অন্যায়কারী গর্বিত অবিশ্বাসীরা অসুস্থ ও বিকৃত চিন্তাচেতনা দ্বারা পরিচালিত। তাই তারা সৎপথ পরিত্যাগ করে এবং গ্রহণ করে ভ্রান্ত পথ।

শেষে বলা হয়েছে—'এটা এই হেতু যে, তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা ছিলো অনবধান।' এ কথার অর্থ, দর্পিত অবিশ্বাসীদের ভ্রান্তপথ গ্রহণ এবং সৎপথ বর্জনের মূল কারণটি এই— তারা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে আমার নিদর্শনসমূহকে। আর এ সম্পর্কে তারা ছিলো বড়ই অসতর্ক ও উদাসীন।

পরের আয়াতে (১৪৭) বলা হয়েছে— 'যারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাৎকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের কার্য নিষ্ফল হয়।' এ কথার অর্থ— আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাৎ অস্বীকারকারীরা পুণ্যকর্ম করলেও তা হবে নিষ্ফল।

www.eelm.weebly.com

বাস্তবে দেখা যায়, অবিশ্বাসীরাও দরিদ্রকে অর্থ ও অন্ন দান করে, রক্ষা করে সামাজিক শিষ্টাচার। আত্মীয়তার সম্পর্ককে রাখে অটুট ইত্যাদি। তারা মনে করে এতে করে তাদের অনেক পুণ্য সঞ্চয় হচ্ছে। কিন্তু তাদের এই ধারণা মরীচিকার মতো অলীক। আখেরাতে তারা এ সকলের বিনিময় পাবে না। কারণ ইমানবিহীন সৎকর্ম গ্রহণীয় নয়। (মূল ব্যতীত বৃক্ষ যেমন ধারণামাত্র)।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা যা করে তদানুযায়ীই তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।' এ কথার অর্থ— শেষ বিচারের দিন বিশুদ্ধচিত্ত ও ধর্মনিষ্ঠদেরকে দেয়া হবে পুরস্কার। আর অবাধ্য ও পাপাচারীদেরকে দেয়া হবে শাস্তি। যারা অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী তারা সেদিন হবে সম্পূর্ণ অসফল। তাদের শাস্তি হবে চিরস্থায়ী।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسٰى مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا
أَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظٰلِمِينَ ○ وَلَمَّا سُقِطَ
فِيٓ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ۙ قَالُوا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ ○
وَلَمَّا رَجَعَ مُوسٰىٓ إِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ أَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ
بَعْدِي ۚ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهٗٓ إِلَيْهِ ۚ
قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَآءَ
وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ○ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّٰحِمِينَ ○

❑ মূসার লোকেরা তাহার অনুপস্থিতিতে নিজদিগের অলংকার দ্বারা গড়িল এক গো-বৎস, এক অবয়ব যাহা গরুর শব্দ করিত। তাহারা কি দেখিল না যে উহা তাহাদিগের সহিত কথা বলে না ও তাহাদিগকে পথও দেখায় না? তাহারা উহাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিল এবং তাহারা ছিল সীমালংঘনকারী।

www.eelm.weebly.com

❑ তাহারা যখন অনুতপ্ত হইল ও দেখিল যে তাহারা বিপথগামী হইয়া গিয়াছে তখন তাহারা বলিল, 'আমাদিগের প্রতিপালক যদি আমাদিগের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদিগকে ক্ষমা না করেন তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইবই।'

❑ মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল তখন বলিল 'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করিয়াছ! তোমাদিগের প্রতিপালকের আদেশ তোমরা ত্বরান্বিত করিলে?' এবং সে ফলকগুলি ফেলিয়া দিল আর স্বীয় ভ্রাতাকে চুলে ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিল। হারুণ বলিল 'হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করিয়াই ফেলিয়াছিল। তুমি আমার সহিত এমন করিও না যাহাতে শত্রুরা আনন্দিত হয়, এবং আমাকে সীমালংঘনকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত করিও না।

❑ মূসা বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে তোমার দয়ার আশ্রয় দাও আর দয়ালুদিগের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

হজরত মুসা যখন আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে একান্ত আলাপন ও কিতাব গ্রহণের জন্য তুর পাহাড়ে গিয়েছিলেন, তখন সত্যধর্ম বিশ্বাস থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছিলো বনী ইসরাইলেরা। তারা অলংকার দ্বারা একটি গো-শাবক নির্মাণ করেছিলো। ওই বাছুরের মূর্তিটি থেকে আবার জীবিত বাছুরের মতো হাম্বা আওয়াজ নির্গত হতো। আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের শুরুতে সেই ঘটনাটিরই উল্লেখ করা হয়েছে—'এবং মুসার লোকেরা তাঁর অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা গড়লো এক গো-বৎস, এক অবয়ব যা গরুর শব্দ করতো'। এখানে 'মুসার লোকেরা' অর্থ— হজরত মুসার উম্মত বা বনী ইসরাইল। 'তাঁর অনুপস্থিতিতে' অর্থ— হজরত মুসা যখন তুর পাহাড়ে চল্লিশ দিন অবস্থান করেছিলেন, সেই সময়ে। 'নিজেদের অলংকার' অর্থ— কিবতীদের গচ্ছিত অলংকার, যা বনী ইসরাইলেরা সঙ্গে নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে অপর পাড়ে উঠেছিলো এবং কিবতীদের সলিল সমাধির পর তারাই যেগুলোর হয়ে গিয়েছিলো প্রকৃত মালিক। ওই অলংকার দিয়েই তারা নির্মাণ করেছিলো একটি গো-বৎসের মূর্তি।

হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত কাতাদা এবং তাফসীরকারগণের একটি দলের অভিমত এই যে, ওই গো-প্রতিমাটি নির্মাণ করেছিলো সামেরী নামক এক ব্যক্তি। সে ওই মূর্তিটির মুখে দিয়েছিলো হজরত জিবরাইলের অশ্বপদস্পর্শিত কিছু মাটি। তাই মূর্তিটিতে ফুটে উঠেছিলো এক প্রকারের জীবনের চিহ্ন। এ সম্পর্কে সামেরীর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে সুরা তোয়াহা'য় এভাবে—'আমি দেখেছিলাম যা ওরা দেখেনি; অতঃপর আমি সেই স্বর্গীয় দূতের পদচিহ্ন থেকে একমুষ্টি মাটি নিয়েছিলাম এবং আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম।' যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হবে ইন্‌শাল্লাহুতায়ালা।

www.eelm.weebly.com

'খুওয়ারুন' শব্দটির অর্থ— ওই গো-অবয়বটি থেকে মাঝে মাঝে হাম্বা হাম্বা আওয়াজ উত্থিত হতো। কেউ বলেছেন, একবার মাত্র হাম্বা উচ্চারিত হয়েছিলো মূর্তিটি থেকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, মূর্তিটি বার বার হাম্বা হাম্বা বলে ডাকতো। বনী ইসরাইলেরা তার হাম্বা ডাক শুনলে সেজদায় পতিত হতো এবং হাম্বা ডাক বন্ধ হলে মাথা ওঠাতো সেজদা থেকে।

ওয়াহাব বলেছেন, মূর্তিটির আওয়াজ ছিলো ঠিকই, কিন্তু সেটি ছিলো চলচ্ছক্তিহীন। সুদ্দী বলেছেন, মূর্তিটি চলাফেরাও করতো। কোনো কোনো বিজ্ঞজন উল্লেখ করেছেন, সেটি ছিলো একটি নিস্প্রাণ স্বর্ণপ্রতিমা। বাতাস তার মুখ দিয়ে ঢুকে বের হয়ে যেতো পশ্চাৎদেশ দিয়ে। সেটিকে এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিলো যেনো বাতাস ধীরে অথবা জোরে গমনাগমনের সময় তা থেকে নির্গত হয় গরুর আওয়াজের মতো আওয়াজ।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা কি দেখলো না যে, সেটি তাদের সঙ্গে কথা বলে না ও তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা সেটিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করলো এবং তারা ছিলো সীমালংঘনকারী।' প্রচণ্ড রোষ প্রদর্শন করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে। বলা হয়েছে, নিরেট মূর্খ বনী ইসরাইল সম্প্রদায়। সহজ সরল বিবেচনাবোধও তাদের নেই। একটি গো-বৎসের মূর্তিকেই তারা উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করলো? অথচ সেটি বচনক্ষমতারহিত এবং তাদেরকে পথ দেখাতে অসমর্থ। অতএব এ কথা নিশ্চিত যে,তারা ছিলো সীমালংঘনকারী।

পরের আয়াতে (১৪৯) বলা হয়েছে—'তারা যখন অনুতপ্ত হলো ও দেখলো যে, তারা বিপথগামী হয়ে গিয়েছে তখন তারা বললো, আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবোই।' এখানে 'সুক্বিত্বা ফী আইদীহিম' অর্থ— যখন তারা হাত কামড়াতে লাগলো। অনুতপ্ত ব্যক্তি ক্ষোভে দুঃখে নিজের হাত কামড়াতে থাকে। তাই এখানে হাত কামড়াতে লাগলো কথাটির মর্মার্থ হবে— অনুতপ্ত হলো। অর্থাৎ— তুর পাহাড় থেকে ফিরে এসে হজরত মুসা তাঁর সম্প্রদায়ের এই চরম অধঃপতন দেখে ক্ষুব্ধ হলেন। তখন সম্বিত ফিরে পেলো বনী ইসরাইলেরা। বুঝলো, গো-বৎসের উপাসনা তাদেরকে ধর্মচ্যুত করে দিয়েছে। অন্তরে তাদের প্রজ্বলিত হলো অনুতাপের আগুন। তাই তারা আল্লাহ্তায়ালা সকাশে প্রার্থনা জানালো এভাবে— আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদেরকে মার্জনা না করেন তবে আমরা তো হবো নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত।

এর পরের আয়াতে (১৫০) বলা হয়েছে— 'মুসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করলো তখন বললো, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কতো নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছো! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশ তোমরা ত্বরান্বিত করলে?' এখানে 'আসিফান' শব্দটির অর্থ— চরম ক্ষুব্ধ হয়ে। এ রকম বলেছেন হজরত আবু দারদা। হজরত ইবনে আব্বাস এবং সুদ্দী বলেছেন— শব্দটির অর্থ— চরম দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে,

www.eelm.weebly.com

'আসাফুন' অর্থ— গভীর দুঃশ্চিন্তায় নিপতিত হওয়া। 'আসাফা আলাইহি' অর্থ— এর প্রতি ক্রোধান্বিত।

'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কতো নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছো।' হজরত মুসার এই সম্বোধনটির মূল লক্ষ্য হচ্ছেন হজরত হারুন। আর পরোক্ষ লক্ষ্য হচ্ছে ওই সকল লোক, যারা গো-বৎসের পূজা করতে সম্মত হয়নি। অথবা সম্বোধন করা হয়েছে শুধুমাত্র গো-বৎস পূজারীদেরকে। হজরত হারুণকে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করে হজরত মুসা গমন করেছিলেন তুর পর্বতে। ফিরে এসে লোকদের স্খলন দেখে তিনি হজরত হারুণকে লক্ষ্য করে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা প্রতিনিধি হিসাবে কতই না নিকৃষ্ট। আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে গিয়েছি বিশুদ্ধ তৌহিদ। অথচ তোমাদের উপস্থিতিতেই তোমাদের সম্প্রদায়ের অনেক লোক পা বাড়িয়েছে অংশীবাদীতার দিকে। তাদেরকে তোমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারো নি।

'তোমাদের প্রতিপালকের আদেশ তোমরা ত্বরান্বিত করলে?' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্ কর্তৃক সময় নির্ধারিত হওয়ার পূর্বেই তোমরা এরূপ আচরণ শুরু করে দিলে? তোমরা ভেবেছো আমি আর ফিরবো না। তাই অতীতের উম্মতদের মতো তোমরা তোমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করতে শুরু করেছিলে?

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সে ফলকগুলো ফেলে দিলো আর স্বীয় ভ্রাতাকে চুল ধরে নিজের দিকে টেনে আনলো।' আপন সম্প্রদায়ের লোকদেরকে শিরিক করতে দেখে চরম ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন হজরত মুসা। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ তওরাতের ফলকগুলো স্কন্ধ থেকে নামিয়ে মাটিতে রেখে দিয়েছিলেন এবং ক্রোধ প্রশমনার্থে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিলেন আল্লাহ্তায়ালার নিকট। এখানে 'ফলকগুলো ফেলে দেয়া'র প্রকৃত অর্থ হবে— দ্রুত রেখে দেয়া। একজন মহাসম্মানিত রসুল কর্তৃক আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের সন্দেহটি এখানে অমূলক ও অবান্তর।

ইবনে আবী হাতেম, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে জাবরজাদের সাতটি তক্তার উপর লিখিত তওরাত দান করেছিলেন। ওই কিতাবে ছিলো সকল কিছুর বিবরণ এবং সঠিক পথের দিশা। তওরাত নিয়ে আপন সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এসে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। তিনি লোকদেরকে গো-বৎসের পূজা করতে দেখে ক্ষুব্ধ হলেন চরম উত্তেজনার ফলে আল্লাহ্র কিতাবের সম্মান যেনো খর্ব না হয় তাই তিনি অতি দ্রুত তওরাতের ফলকগুলো একপাশে রেখে দিলেন। এভাবে রাখতে গিয়ে একটি ফলক বাদে অন্য ছয়টি ফলক গেলো ভেঙে। তখন

www.eelm.weebly.com

ভাঙা ফলকগুলো আল্লাহ্তায়ালা উঠিয়ে নিলেন। রইলো কেবল অটুট সপ্তম ফলকটি। বাগবী বলেছেন, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের বিবরণ সমৃদ্ধ ফলকগুলো কেবল উঠিয়ে নিয়েছিলেন আল্লাহ্পাক। আর রেখেছিলেন কেবল ওই ফলকটি, যাতে লিপিবদ্ধ ছিলো হেদায়েত, আহকাম এবং হালাল-হারামের বিবরণ।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, শ্রবণ কখনও দর্শন তুল্য নয়। তুর পাহাড়ে অবস্থানের সময়েই আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে বনী ইসরাইলদের পথভ্রষ্টতার সন্ধান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তখন তিনি তওরাতের ফলকসমূহ নিক্ষেপ করেননি। কিন্তু স্বচক্ষে শিরিক করতে দেখে তিনি সংযত করতে পারেন নি নিজেকে। ফলকগুলো ফেলে (রেখে) দিয়েছিলেন। ফলকগুলো ভেঙে গিয়েছিলো তখন। আহমদ, তিবরানী, হাকেম।

'স্বীয় ভ্রাতাকে চুল ধরে নিজের দিকে টেনে আনলো'—এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, আপনজনকে লক্ষ্য করেই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটে। হজরত মুসার তখন মনে হয়েছিলো, ভ্রাতা হারুণের ঔদাসীন্য ও অবহেলাই সকল গণ্ডগোলের মূল। তাই তিনি ক্ষোভে দুঃখে হজরত হারুনের কেশগুচ্ছ ধরে নিজের দিকে টেনে এনেছিলেন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত হারুনের মস্তকের অগ্রভাগের চুল এবং দাড়ি ধরে আকর্ষণ করেছিলেন হজরত মুসা। হজরত হারুন ছিলেন হজরত মুসার অগ্রজ। তিন বছরের বড় ছিলেন তিনি। তিনি হজরত মুসার মতো উষ্ণ স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন না। ছিলেন কোমল। তাই বনী ইসরাইলেরা হজরত মুসার চেয়ে অধিক অনুরাগী ছিলো হজরত হারুনের।

এরপর বলা হয়েছে— হারুন বললো, 'হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করেছিলো এবং আমাকে প্রায় হত্যাই করে ফেলেছিলো। তুমি আমার সঙ্গে এমন কোরো না, যাতে শত্রুরা আনন্দিত হয়, এবং আমাকে সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কোরো না'। এখানে 'ইবনা উম্মা' কথাটির অর্থ— হে আমার সহোদর! ক্বারী ইবনে আমের, ক্বারী হামজা, ক্বারী কাসায়ী ও অন্যান্যরা কথাটিকে পড়েছেন— 'ইবনা উম্মী'। এটাই অধিকতর শুদ্ধ। কেননা কথাটির প্রকৃত রূপ ছিলো—'ইয়া ইবনা উম্মী'। কিন্তু এখানে সম্বোধনসূচক শব্দ 'ইয়া' (হে) বাদ পড়েছে। কিন্তু এই বাদ পড়া সত্ত্বেও মিম অক্ষরের যের হরকতটি তো রয়েছেই। এরপর অধিকাংশ ক্বারী কথাটিকে সংক্ষেপ করতে গিয়ে যের এর স্থলে লাগিয়েছেন যবর। এখানে ওই সংক্ষিপ্ত রূপটিই উদ্ধৃত হয়েছে।

ক্ষুব্ধতাকে কোমলতার মাধ্যমে প্রশমিত করতে চাইলেন হজরত হারুন। তাই তিনি প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করলেন এভাবে— হে আমার ভ্রাতা! আমি লোকদেরকে এই অপকর্ম থেকে বিরত রাখার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা হয়ে পড়েছিলো

www.eelm.weebly.com

সংঘবদ্ধ ও প্রবল। আমার সদুপদেশকে তারা কোনো গুরুত্বই দেয়নি। আমাকে তারা ভেবে নিয়েছিলো তাদের প্রধান অন্তরায়। এমন কি হত্যা করতেও উদ্যত হয়েছিলো। সুতরাং হে আমার সহোদর! শত্রুকে আনন্দিত করে এমন আচরণ তুমি আমার সঙ্গে কোরো না। গো-বৎস পূজারীরা নিশ্চিত সীমালংঘনকারী। আমি তো তা নই। অতএব আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত মনে কোরো না।

এর পরের আয়াতে (১৫১) বলা হয়েছে— মুসা বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে তোমার দয়ায় আশ্রয় দাও। আর দয়ালুদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

'রব্বিগফিরলী ওয়ালি আখী' কথাটির অর্থ— হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা করো। অর্থাৎ— হজরত মুসা বললেন, হে আমার আল্লাহ্! আমার ভাইয়ের সঙ্গে যে অশিষ্ট আচরণ আমি করেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা করে দাও। আর গো-বৎস পূজারীদেরকে ওই অপকর্ম থেকে বিরত রাখার নিমিত্তে আমার ভ্রাতা হারুন যদি সামান্যতম কোনো অবহেলাও করে থাকে, তবে তুমি তাকেও মার্জনা করো। এখানে আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে হজরত হারুনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই ছিলো হজরত মুসার আলোচ্য প্রার্থনাটির উদ্দেশ্য। কিন্তু ভ্রাতার মনস্তুষ্টির জন্য এবং শত্রুদের আনন্দকে নিরানন্দে পরিণত করার জন্য হজরত মুসা নিজেকেও সংশ্লিষ্ট করেছিলেন তাঁর প্রার্থনার সঙ্গে। এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, অন্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হতে চাইলে নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে প্রথমে— যাতে নিজেকে নিষ্পাপ মনে করার অপরিচ্ছন্নতার অবকাশ আর না থাকে। আর একটি কথাও অবশ্য স্মরণীয়। সেটি হচ্ছে— গোনাহ্ দোয়া কবুল হওয়ার অন্তরায়। তাই দোয়া করতে গেলে প্রথমে ওই অন্তরায়টি অপসারণে সচেষ্ট হওয়া উচিত। একারণেই জানাযার নামাজের দোয়ায় উল্লেখ করতে হয়—'আল্লাহুম্মাগফিরলী হাইয়্যেনা ওয়া মাইয়্যেতেনা' (হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে যারা জীবিত এবং মৃত তাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও)। অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তি এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আগেই নিজের ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলে। আবার কবর জিয়ারতের দোয়ায় বলতে হয়—'ইয়াগফিরুল্লহু লানা ওয়ালাকুম' (আল্লাহ্ আমাকে ও তোমাকে ক্ষমা করুন)। এক্ষেত্রেও প্রার্থনাকারী নিজের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে আগে। নবী-রসুলগণ ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। পাপের সঙ্গে কোনো সম্পৃক্ততাই তাদের নেই। তৎসত্ত্বেও উম্মতদেরকে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্তায়ালা এক স্থানে এরশাদ করেছেন— 'ওয়াস্তাগ্ফির লীজাম্বিকা ওয়া লিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি ওয়াদ্খিলনা ফী রহ্মাতিকা' (আপনি আপনার অপরাধের জন্য

www.eelm.weebly.com

ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন ইমানদার পুরুষ ও মহিলাদের জন্য। আর বলুন, আমাদেরকে রহমতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিন)। কথাটির অর্থ— হে আল্লাহ্! আমাদের সকলকে দান করুন পাপবিবর্জিত জীবন। পরকালে আমাদের প্রতি রহম করুন এবং উভয় জগতে আমাদেরকে দান করুন উচ্চ মর্যাদা।

সবশেষে বলা হয়েছে—'ওয়া আন্‌তা আর্‌হামুর রহিমীন' (আর দয়ালুদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু)। এ কথার অর্থ— হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। আমরা নিজেদের প্রতি যতটুকু অনুকম্পা প্রদর্শন করতে পারি, তুমি তদপেক্ষা অধিক অনুকম্পাশীল।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৫২, ১৫৩

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَوٰةِ
الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۝ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن
بَعْدِهَا وَآمَنُوا ۚ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

❒ যাহারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে পার্থিব জীবনে তাহাদিগের উপর তাহাদিগের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আসিবে আর এইভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদিগকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

❒ যাহারা অসৎকার্য করে তাহারা পরে অনুতপ্ত হইলে ও বিশ্বাস করিলে তোমার প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ইন্নাল্লাজিনাত্‌তাখাজুল ই'জলা অর্থ— যারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে। সাইয়ানালুহুম গদ্বাবুম মির্‌রব্বিহিম ওয়া জিল্লাতুন ফিল্ হাইয়াতিদ্ দুন্‌ইয়া অর্থ— পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আসবে। এখানে 'গদ্বাবুন' অর্থ গজব বা ক্রোধ। 'জিল্লাতুন' অর্থ লাঞ্ছনা। আর একটি অর্থ— লাঞ্ছিত অবস্থায় দেশান্তরিত হওয়া। এই আয়াতের ঘোষণা অনুসারে পৃথিবীতেই বনী ইসরাইলদের উপর নেমে এসেছিলো আল্লাহ্‌র গজব ও লাঞ্ছনা। নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো গো-বৎসের পূজা থেকে তওবা করতে হবে এবং তওবার নিদর্শন স্বরূপ পরস্পরকে হত্যা করতে হবে। আর তাদের প্রতি দেশান্তরিত হওয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তাকেই এখানে বলা হয়েছে জিল্লাত্ বা লাঞ্ছনা।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু আতিয়াহ্ আওফী বলেছেন, এখানে ঘোষিত ক্রোধ ও লাঞ্ছনার লক্ষ্য হচ্ছে রসুল স. এর যুগের ইহুদীরা। এখানে ওই ইহুদীদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের গো-বৎসের উপাসনার কথা উল্লেখ করে লজ্জা দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, অবাধ্যতা ও মিথ্যা রচনার জন্য তোমাদেরকে পরকালে তো শাস্তি দেয়া হবেই, উপরন্তু ইহকালেও তোমাদের উপর নেমে আসবে আল্লাহ্র গজব এবং লাঞ্ছনা। তাই হয়েছিলো। বনী নাজির ও বনী কুরায়জার একটি দলের পুরুষদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো ও অন্য দলটিকে করা হয়েছিলো বিতাড়িত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মদীনার ইহুদীদের উপর যে কর আরোপ করা হয়েছিলো, সেই করকেও এখানে বলা হয়েছে লাঞ্ছনা।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া কাজালিকা নাজ্যিল মুফ্তারীন'। কথাটির অর্থ— এভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

পরের আয়াতে (১৫৩) বলা হয়েছে—'যারা অসৎ কাজ করে তারা পরে অনুতপ্ত হলে ও বিশ্বাস করলে তোমার প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এ কথার অর্থ— হজরত মুসার অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা গো-বৎসের মূর্তি বানিয়ে পূজা করেছিলো। তারপর ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপজর্জরিত হৃদয়ে তারা তওবা করেছিলো এবং ফিরে এসেছিলো বিশ্বাসের চির সুবাসিত কাননে। তওবার শর্তও তারা পালন করেছিলো দ্বিধাহীন চিত্তে। আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষ লাভের নিমিত্তে যথাযথভাবে তারা সম্পন্ন করেছিলো স্বজন-হননের নির্দেশটি। এভাবে গুরুতর অপরাধ করা সত্ত্বেও যারা অনুতাপজর্জরিত হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করে এবং অবলম্বন করে বিশ্বাসকে, আল্লাহ্পাক তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কারণ তিনি ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ালু।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৫৪

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۝

❑ মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হইল তখন সে ফলকগুলি তুলিয়া লইল; যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদিগের জন্য উহাতে যাহা লিখিত ছিল তাহাতে ছিল পথ নির্দেশ ও দয়া।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়া লাম্মা সাকাতা আ'ম্ মুসাল গদ্বাব্' (মুসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হলো)। এখানে 'সাকাতা' শব্দটির অর্থ সাকানা (প্রশমন)। হজরত হারুন যখন প্রকৃত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন এবং গো-বৎসের উপাসকেরা যখন

www.eelm.weebly.com

লজ্জিত হয়ে তওবা করতে সম্মত হলো, তখন প্রশমিত হলো হজরত মুসার ক্রোধ। এখানে 'সাকানা' শব্দটির বদলে সাকাতা শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় বক্তব্যটি হয়েছে অধিকতর গতিশীল। স্বচক্ষে শিরিক করতে দেখে চরম উত্তেজিত হয়েছিলেন হজরত মুসা। তাই তওরাতের ফলকগুলো অতি দ্রুত ফেলে দিয়েছিলেন। ফলে সাতটি ফলকের ছয়টি গিয়েছিলো ভেঙে। একটি ছিলো কেবল অটুট।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য তাতে যা লিখিত ছিলো তাতে ছিলো পথ নির্দেশ ও দয়া। এখানে 'তাতে যা লিখিত ছিলো' কথাটির অর্থ— তওরাতের ওই অটুট অনুলিপিটিতে যা লিখা ছিলো। অনুলিপি বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে নুসখাহ্ শব্দটি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যে ফলকটি ভাঙেনি সেই ফলকটিকে এখানে বলা হয়েছে নুসখাহ্ বা অনুলিপি। আর ওই অনুলিপি করা হয়েছে লাওহে মাহফুজ থেকে।

কেউ কেউ বলেছেন, সজোরে নিক্ষেপ করার ফলে তওরাতের মূল ফলকগুলো সবই ভেঙে গিয়েছিলো। পরে সেগুলো থেকে করা হয়েছিলো নতুন অনুলিপি। কেউ কেউ বলেছেন, নুসখাহ্ অর্থ লিখিত। শব্দটি কর্মকারকের অর্থ প্রকাশক। যেমন খুত্বাতুন (ভাষণ) অর্থ মাখতুবুন (ভাষণ)।

আতা বলেছেন, 'নুস্খাতুহা' শব্দটির অর্থ— অবশিষ্ট অংশ। হজরত ইবনে আব্বাস এবং আমর ইবনে আবিদ্ দুনইয়া বলেছেন, হজরত মুসা ফলকগুলো নিক্ষেপ করার ফলে সেগুলো এমনভাবে ভেঙে গিয়েছিলো যে, পাঠোদ্ধার আর সম্ভব হচ্ছিলো না। হজরত মুসা তাই চল্লিশ দিন রোজা রেখেছিলেন। তারপর তাঁকে দুইবারে ফলক প্রদান করা হয়।

'তাতে ছিলো পথ-নির্দেশ ও দয়া'। কথাটির অর্থ— তওরাত শরীফের ওই অনুলিপিটিতে এ কথাগুলো স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছিলো যে, কিভাবে ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত হয়ে লাভ করা যায় হেদায়েত এবং কি করেই বা আল্লাহ্তায়ালার ক্রোধ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে পাওয়া যায় আল্লাহ্তায়ালার দয়া।

শেষে বলা হয়েছে— 'লিল্লাজিনা হুম লিরব্বিহিম ইয়ার্‌হাবুন' (যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে)। এখানে 'লিরব্বিহিম' শব্দটির প্রথমে ব্যবহৃত 'লাম' অক্ষরটি অতিরিক্ত। কেননা 'ইয়ারহাবুন' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'লাম' ব্যতিরেকে। এটাই আরবী ভাষার নিয়ম। যেমন, 'রউফুল্লাকুম' কথাটির মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে অতিরিক্ত লাম। ক্বারী কাসায়ী বলেছেন, ক্রিয়া পরে উল্লেখিত হওয়ার কারণে এখানে বক্তব্যের কার্যকারিতা হয়ে পড়েছে দুর্বল। তাই কর্মের সঙ্গে এখানে 'লাম' অক্ষরটি উল্লেখিত হয়েছে অতিরিক্তরূপে। অন্যত্রও এর দৃষ্টান্ত

www.eelm.weebly.com

রয়েছে। যেমন— 'লিরুরুইয়্যা তা'বুরুন' (তোমরা যেনো স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারো)। কুতরব বলেছেন, এখানে 'লাম' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে 'মিন' (মধ্যে) অর্থে। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ইয়ারহাবুন' কথাটির অর্থ হবে 'রহিবুন'। অর্থাৎ কথাটি এখানে কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশক। কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'লাম' অক্ষরটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তা'লীল (হেতুবাচক) এর জন্য। এ কথাটিকে মেনে নিলে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্র জন্য তারা পাপকে ভয় করে।

সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৫৫, ১৫৬

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝

❒ মূসা স্বীয় সম্প্রদায় হইতে সত্তর জন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করিল। তাহারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল তখন মূসা বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করিলে পূর্বেই তো ইহাদিগকে এবং আমাকেও ধ্বংস করিতে পারিতে। আমাদিগের মধ্যে যাহারা নির্বোধ তাহারা যাহা করিয়াছে সে জন্য কি তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে? ইহা তো শুধু তোমার পরীক্ষা, যদ্বারা তুমি যাহাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই তো আমাদিগের অভিভাবক; সুতরাং আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদিগের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদিগের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ।

www.eelm.weebly.com

❒ 'আমাদিগের জন্য নির্ধারিত কর ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছি।' আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমার শাস্তি যাহাকে ইচ্ছা দিয়া থাকি আর আমার দয়া— তাহাতো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত; সুতরাং আমি উহা তাহাদিগের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা সাবধান হয়, জাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে।

প্রথমে বলা হয়েছে—'মুসা স্বীয় সম্প্রদায় থেকে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করলো।' উল্লেখ্য যে, হজরত মুসা কর্তৃক মনোনীত ওই সত্তরজন ছিলো বনী ইসরাইলের গোত্রীয় নেতৃবর্গ। তারা অংশগ্রহণ করেছিলো গো-বৎস পূজায়। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশানুসারে তাদেরকে নিয়ে হজরত মুসা নির্ধারিত সময়ে তুর পর্বতে গমন করেছিলেন। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে এই মর্মে নির্দেশ দান করলেন, হে আমার রসুল মুসা! তুমি তোমার সম্প্রদায়ের সত্তরজনকে সঙ্গে নিয়ে তুর পর্বতে এসো এবং গো-বৎস পূজারীদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্তায়ালার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও। বনী ইসরাইলের গোত্র ছিলো বারোটি। প্রতিটি গোত্র থেকে ছয়জন করে নির্বাচন করতে গিয়ে হজরত মুসা দেখলেন, তাদের সংখ্যা দাঁড়ালো বাহাত্তর জনে। তিনি বললেন, সঙ্গে নিতে হবে সত্তরজনকে। সুতরাং তোমরা দু'জনকে বাদ দাও। কিন্তু কেউ বাদ পড়তে রাজী হলো না। তিনি তখন বললেন, যে দু'জন বাদ পড়বে তারাও আমার সঙ্গে গমনকারীদের মতো সওয়াব লাভ করবে। একথা শোনার পর হজরত কালেব এবং হজরত ইউশা থেকে যেতে সম্মত হলেন। হজরত মুসা তখন সত্তর জনকে নিয়ে গমন করলেন তুর পাহাড়ের পাদদেশে। সেখানে হালকা মেঘপুঞ্জ এসে সকলকে আবৃত করলো। সকলে পতিত হলো সেজদায়। সেজদারত অবস্থায় তারা শুনলো, আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসার সঙ্গে কথা বলছেন। কিছুক্ষণ ধরে চললো আদেশ, নিষেধ ও হেদায়েত সম্পর্কিত আলোচনা। মেঘ কেটে গেলো। সাথীরা বললো, হে নবী মুসা! আমরা আল্লাহ্কে দেখবো। সুতরাং আপনি আল্লাহ্ দর্শনের ব্যবস্থা করুন। নয়তো আমরা কিভাবে বিশ্বাস করবো যে, আপনার সঙ্গে আল্লাহ্ কথা বলেছেন। আমরা যে কথাগুলো শুনেছি, সেগুলো তো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কথা হতে পারে। এমতোধৃষ্টতা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো বজ্রপাত। কেউ কেউ বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ভূমিকম্প। আর সেই ভূমিকম্পের ফলে সকলেই মারা গেলো। সুদ্দী এই অভিমতটিকে সমর্থন করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বজ্রপাতের ঘটনাটি ঘটেছিলো পরে। আলোচ্য ঘটনাটি সে ঘটনা নয়। আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে হুকুম দিয়েছিলেন, সত্তরজনকে মনোনীত করে জনপদ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসো। নির্দেশ মোতাবেক হজরত মুসা সত্তরজনকে নিয়ে চলে গেলেন জনপদ থেকে দূরে

www.eelm.weebly.com

একটি উন্মুক্ত এলাকায়। সেখানে তিনি সকলকে নিয়ে প্রার্থনা জানালেন, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমাদেরকে ওই নেয়ামত দান করো, যা ইতোপূর্বে কাউকে দান করোনি, ভবিষ্যতেও কাউকে দিবে না। আল্লাহ্তায়ালা প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করলেন। বজ্রপাতে আক্রান্ত হলো হজরত মুসার সাথীরা।

ওয়াহাব বলেছেন, ভূমিকম্প কবলিত হয়েছিলো তারা। কিন্তু সেই ভূমিকম্পের ফলে তারা মরেনি। তবে মৃত্যুর ভয়ে প্রকম্পিত হয়েছিলো সকলে। তাদের তখন মনে হয়েছিলো শরীরের গ্রন্থিসমূহ বুঝি খসে খসে পড়বে।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো তখন মুসা বললো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই তো এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতে। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা যা করেছে সে জন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? আল্লামা সুয়ূতী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে আর্‌রজ্‌ফাতু অর্থ— ভয়াবহ ভূমিকম্প। ওই ভয়াবহ ভূমিকম্পে আক্রান্ত হয়েছিলো তারা, যারা গো-বৎস পূজারীদের থেকে পৃথক হয়নি। হজরত মুসা আশংকা করলেন, এই ভূমিকম্পে হয়তো সকলেই মারা পড়বে। তারা ছিলো হজরত মুসার সকল উত্তম কর্মের সহযোগী। হজরত মুসার নির্দেশও তারা যথাযথভাবে পালন করতো। ভূমিকম্প আক্রান্তদের জন্য হজরত মুসার হৃদয় বিগলিত হলো। তিনি রোদনার্ত স্বরে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমিই তো জীবন মৃত্যুর মালিক। এর আগেও তো তুমি আমাদের সকলকে মেরে ফেলতে পারতে। মেরে ফেলতে পারতে ফেরাউনের মাধ্যমে। অথবা সাগর বক্ষে নিমজ্জিত করে। কিংবা অন্য যে কোনো ভাবে। কিন্তু তুমি তা না করে দয়া করে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছো। তাই এক্ষণে আমরা তোমার রহমত প্রার্থী। সুতরাং তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেইতো এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতে' কথাটির অর্থ— হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমি যদি চাইতে তবে এই স্থানে আসার পূর্বেই সম্প্রদায়ের সকল লোকের সামনে এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতে। তখন ঘটনাটি সকলে প্রত্যক্ষ করতে পারতো। আমি সকলকে এখানে নিয়ে এসে মেরে ফেলেছি— এ রকম অপবাদ আর তারা দিতে পারতো না।

'আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা যা করেছে, সে জন্যে কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে?'— কথাটির অর্থ, হে আমার আল্লাহ্! আমার সম্প্রদায়ের এই নির্বোধ লোকেরা তোমাকে দেখতে চাওয়ার দাবি তুলে যে গর্হিত

www.eelm.weebly.com

উন্নাসিকতা দেখিয়েছে, অথবা বাছুরের পূজা করে যে চরম অপরাধ তারা করেছে, তাদের কয়েকজনের কারণে তুমি কি আমাদের সকলকে ধ্বংস করে দেবে? মোবার্‌রাদ বলেছেন, প্রশ্নাকারে উত্থাপিত এই বাক্যটি আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত অন্বেষণের একটি বিশেষ ভঙ্গীর আবেদন। এভাবে প্রশ্নাকারে প্রার্থনা উপস্থাপনের কারণ এই যে, হজরত মুসা ভালো করেই জানতেন, আল্লাহ্‌তায়ালা শ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক। তাই তিনি কিছু লোকের অপরাধের কারণে সকলকে ধ্বংস করবেন না। এই নিবেদনটিই তিনি জানিয়ে দিলেন প্রশ্নের ভঙ্গীতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা তো শুধু তোমার পরীক্ষা, যদ্বারা তুমি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করো এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করো।' এ কথার অর্থ হজরত মুসা বললেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমি দয়া করে এই সত্তরজনকে তোমার পবিত্র বাণী শুনতে দিয়েছো। তাই তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছে তোমাকে দেখার অভিলাষ। অথবা তুমি একটি গর্জনরত গো-বৎস মূর্তির মাধ্যমে পরীক্ষা করেছো তাদেরকে। তুমি চাওনি তাই তারা এ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। উত্তীর্ণ হতে পেরেছে কেবল তারাই, যাদেরকে তুমি চেয়েছো সৎপথে পরিচালিত করতে।

'ইল্লা ফিত্‌নাতুকা' কথাটির অর্থ— এটা তো শুধু তোমার পরীক্ষা। এ কথা উল্লেখের মাধ্যমে হজরত মুসার নিবেদনটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে আমার আল্লাহ্‌! এ কথাতো তুমি আমাকে পূর্বেই জানিয়েছো যে, পরীক্ষার মাধ্যমে কাউকে কাউকে করবে পথভ্রষ্ট এবং কাউকে করবে পথপ্রাপ্ত। তাই তোমার ইচ্ছানুসারেই তাদের কেউ কেউ হয়েছে অনুত্তীর্ণ এবং কেউ কেউ হয়েছে উত্তীর্ণ। এ কথা নিশ্চিত যে, অভিপ্রায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন, মুক্ত, পবিত্র। শেষে বলা হয়েছে— 'তুমিই তো আমাদের অভিভাবক; সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করো ও আমাদের প্রতি দয়া করো এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ।' এ কথার অর্থ— হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! তুমি আমাদের অভিভাবক, রক্ষক। তুমিই মার্জনাকারী, দয়াময় এবং শ্রেষ্ঠ ক্ষমাপরবশ। তাই দয়া করে তুমি আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দাও।

পরের আয়াতে (১৫৬) বলা হয়েছে, 'আমাদের জন্য নির্ধারিত করো ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করেছি।' এ কথার অর্থ— হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! পূর্ণ কল্যাণ দান করো আমাদেরকে। পৃথিবীতে দান করো তোমার একনিষ্ঠ আনুগত্য, পার্থিব নেয়ামত ও মার্জনা। আর আখেরাতে দান করো মাগফেরাত, রহমত এবং জান্নাত। আমরা তো সর্বান্তকরণে তোমার সকাশে প্রত্যাবর্তন করেছি।

www.eelm.weebly.com

হজরত কাতাদা, ইবনে জারিহ্ এবং মোহাম্মদ বিন কা'য়াব বলেছেন, ভূমিকম্প কবলিতদের অপরাধ ছিলো এই— গো-মূর্তি উপাসকদের সঙ্গে তারা সম্পর্কচ্ছেদ করেনি। বরং অবাধে মেলামেশা করেছে তাদের সঙ্গে। তাদেরকে শুভ কাজের নির্দেশ দেয়নি, বিরত থাকতেও বলেনি অশুভ কর্মকাণ্ড থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বললেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর আমার দয়া—তাতো প্রতিটি বস্তুতে ব্যাপ্ত।' এ কথার অর্থ— হজরত মুসার প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, হে আমার রসুল মুসা! উত্তমরূপে অবগত হও যে, আমার রহমত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। পৃথিবীতে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী কেউই আমার রহমত থেকে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু আখেরাতে অবিশ্বাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে না। কেননা অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে নিজেরাই আল্লাহ্তায়ালার রহমতের বৃত্ত থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

রসুল স. বলেছেন, আমার সকল উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করবে, প্রবেশ করবে না কেবল তারা, যারা অস্বীকারকারী। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! কারা সেই অস্বীকারকারী? তিনি স. বললেন, যারা আমার আদর্শের প্রতিপক্ষ। বোখারী।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে আতিয়াহ্ আওফী বলেছেন, আকাশ থেকে অবতীর্ণ আল্লাহ্র রহমত সকলেই পায়। কিন্তু সেই রহমতের অধিকারী হয় কেবল মুত্তাকীরা (সাবধানীরা)। তাদের অসিলায় বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সকলকেই রিজিক প্রদান করা হয় এবং দূর করা হয় বিপদাপদ। কিন্তু অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্র রহমতের পরিচয় পায় না। পরকালে তাই বিশ্বাসীরা যখন আল্লাহ্র রহমত সঙ্গে নিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন অবিশ্বাসীরা হয়ে যাবে চিরবঞ্চিত। যেমন, উন্মুক্ত স্থানে প্রদীপ জ্বালালে প্রদীপের মালিকের সঙ্গে যারা মালিক নয় তারাও সমানভাবে আলো লাভ করে। কিন্তু প্রদীপের মালিক যদি প্রদীপ নিয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে তবে যারা মালিক নয় তারা নিপতিত হয় ঘোর অন্ধকারে।

শেষে বলা হয়েছে— 'সুতরাং আমি এটা তাদের জন্য নির্ধারণ করবো যারা সাবধান হয়, জাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল মুসার সম্প্রদায়! শুনে নাও, পরকালে আমি আমার রহমত তোমাদের মধ্য থেকে ওই ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারণ করবো যারা সাবধানী— অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা থেকে মুক্ত এবং যারা জাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে যারা বিশ্বাস করে। অন্যকে সম্পদ দান নফসের জন্য অত্যন্ত কঠিন। তাই এখানে বিশেষভাবে জাকাত দানের কথা বলা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

'আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে' কথাটির অর্থ এখানে— যারা আমার অবতারিত সকল কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এ কথার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়— এ বিষয়টি আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান ও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত যে পরবর্তী সময়ে হজরত মুসার শরিয়ত রহিত হবে। পরবর্তী আয়াতেও তাই ইঙ্গিত করা হয়েছে শেষতম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর প্রতি। সেখানে রয়েছে বনী ইসরাইলদের প্রতি শেষ রসুলের অনুসরণের প্রচ্ছন্ন নির্দেশ ও অনুপ্রেরণা।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৫৭

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞

❑ 'যাহারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক নিরক্ষর রসুলের যাহার উল্লেখ তওরাত ও ইঞ্জিল যাহা তাহাদিগের নিকট আছে তাহাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাহাদিগকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যে নিষেধ করে, যে তাহাদিগের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাহাদিগকে তাহাদিগের ভার হইতে ও বন্ধন হইতে যাহা তাহাদিগের উপর ছিল। সুতরাং যাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে সাহায্য করে এবং যে আলো তাহার সাথে অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অনুসরণ করে তাহারাই সফলকাম।

এখানে 'আল্লাজিনা ইয়াত্তাবিউ'না' (যারা অনুসরণ করে) হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং 'ইয়া' মুরুনা' (নির্দেশ দেয়) বিধেয়। অথবা উদ্দেশ্য এখানে অনুক্ত এবং আল্লাজিনা ইয়াত্তাবিউ'না বিধেয়। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তারা ওই সকল লোক যারা অনুসরণ করে।

'আর রসুলান্ নাবিইয়্যাল উম্মিইয়্যা' অর্থ— বার্তাবাহক অক্ষরের অমুখাপেক্ষী নবী। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার রসুল। উম্মী অর্থ মা। অর্থাৎ ওই শিশু যে জ্ঞানরূপ মায়ের (জ্ঞানের মূলের) সঙ্গে থাকে। জ্ঞানের দূরবর্তী বিবরণ— লিপিবিদ্যার সঙ্গে থাকে না।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. বলেছেন, আমি আমার দলের মধ্যে উম্মী। আমি লিখতে ও হিসাব কষতে জানি না (কারণ লিপিবিদ্যা ও হিসাব বিদ্যাসহ সকল বিদ্যা, বিদ্বান আমারই মুখাপেক্ষী। আর আমি মুখাপেক্ষী কেবল আল্লাহ্‌র)। হজরত ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। 'উম্মী' শব্দটির যথাব্যাখ্যা করা উচিত। রসুল স. জ্ঞান আহরণ করেছেন জ্ঞানের মূল কেন্দ্র থেকে (আল্লাহ্‌তায়ালার সিফাতুল এলেম থেকে)। অক্ষর পরিচিতির মাধ্যমে নয়। কারণ সকল মাধ্যম তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি মুখাপেক্ষী কেবল আল্লাহ্‌র। সুতরাং তাঁর উম্মী হওয়া একটি অতুলনীয় মোজেজা। আর এটাকে মোজেজা বলে সনাক্ত করতে পারেন কেবল তাঁরাই— যাঁরা প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'উম্মী' শব্দটির আসল সম্পর্ক উম্মতের সঙ্গে। উম্মত অর্থ উম্মতওয়ালা— বিপুল সংখ্যক উম্মতের অধিকারী। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন দেখা যাবে আমার অনুসারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। বেহেশতের কড়া প্রথম আন্দোলিত করবো আমিই। মুসলিম।

'উম্মী' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ছিলো 'উম্মাতী'। উচ্চারণ-সংক্ষেপের কারণে 'তা' অক্ষরটি হয়েছে অবলুপ্ত। যেমন 'মাক্কী' ও 'মাদানী'র আসল শব্দরূপ হচ্ছে— মাক্কাতী এবং মাদীনাতী। কেউ কেউ বলেছেন, উম্মী শব্দটি 'উম্মুল ক্বোরা' (মক্কাবাসী) কথাটির সঙ্গে সম্পর্কিত।

আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য ওই সকল ইহুদী যারা ছিলো রসুল স. এর সমসাময়িক। রসুল স. এর জামানা যারা পায়নি— অর্থাৎ যারা তাঁর মহাআবির্ভাবের আগেই পরলোকগমন করেছে, তারা কিন্তু এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল নয়। অন্যত্র তাই এরশাদ হয়েছে— 'মা তাফার্‌রাক্বাল্লাজিনা উতুল কিতাবা ইল্লা মিমবা'দি মা জাআত্‌ হুমুল বাইয়্যেনাহ্‌'(যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরেই শুধু তারা মতবিরোধ করেছে)।

হজরত আনাস থেকে ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. বলেছেন কিয়ামতের সময় প্রত্যেক নবী নূরের মিম্বরে বসবেন। আমি উপবেশন করবো সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক উজ্জ্বল মিম্বরে। জনৈক ঘোষণাকারী আহ্বান করবে— নবী উম্মী কোথায়? নবীগণ সমস্বরে বলবেন, আমরা তো প্রত্যেকেই নবী উম্মী (উম্মতের অধিকারী)। তখন ঘোষণাকারী বলবে, নবী উম্মী আরবী কোথায়? তখন আমি মিম্বার থেকে নেমে আসবো এবং বেহেশতের দরজার কড়া নাড়বো। ভিতর থেকে আওয়াজ আসবে, কে? আমি বলবো, আমি মোহাম্মদ, আহমদ। পুনরায় আওয়াজ আসবে, আপনি কি আমন্ত্রিত? আমি বলবো, হ্যাঁ। খুলে দেয়া হবে

www.eelm.weebly.com

বেহেশতের তোরণ। আমার আল্লাহ্ তখন অতুলনীয় ও অবর্ণনীয় রূপে জ্যোতিষ্মান হবেন। তাঁর ওই অবিভাজ্য সৌন্দর্যচ্ছটা অবলোকন করে আমি পড়ে যাবো সেজদায় এবং এমন গুণগান তাঁর গাইবো— যা আর কেউ কখনো করেনি। নির্দেশ হবে, মস্তক উত্তোলন করো। কথা বলো। সুপারিশ করো। তোমার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে। —এই হাদিসটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, উম্মী শব্দটির আসল অর্থ উম্মাতী (উম্মতধারী)। তাই কিয়ামতের ওই সময় সকল নবী নিজেদেরকে উম্মী বলে পরিচয় দিবেন এবং রসুল স.কেও সে অর্থেই সেদিন বলা হবে নবী উম্মী আরবী। অর্থাৎ ওই উম্মতওয়ালা নবী— যিনি আরবের অধিবাসী। সকল নবী উম্মতওয়ালা হলেও উম্মতের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় রসুল স.কে বিশেষভাবে সেদিন বলা হবে উম্মী (সর্বাধিক উম্মতওয়ালা)।

এরপর বলা হয়েছে—'যার উল্লেখ তওরাত ও ইঞ্জিল যা তাদের কাছে আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়।' এ কথার অর্থ— ইহুদীরা তওরাত খুললেই দেখতে পায়, সেখানে রয়েছে শেষ রসুল স. এর নাম ও বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ।

হজরত আনাসের বর্ণনায় রয়েছে, এক ইহুদীর ছেলে ছিলো রসুল স. এর একনিষ্ঠ ভক্ত ও সেবক। একবার সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। রসুল স. তাকে দেখতে গেলেন। দেখলেন তার পিতা ছেলেটির শিয়রে বসে তওরাত পাঠ করছে। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্র কসম দিয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, সত্যি করে বলো, তওরাতে আমার প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ রয়েছে কি না? ইহুদী বললো, না। ইহুদী পুত্র বললো, মিথ্যা কথা। তওরাতে স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে আপনার কথা। আমি নিজে সে সকল বিবরণ পাঠ করেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি— আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং নিঃসন্দেহে আপনিই সেই রসুল। রসুল স. তৎক্ষণাৎ সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলেন, ওই অবিশ্বাসীকে তোমাদের ধর্মীয় ভ্রাতার শয্যাপার্শ্ব থেকে সরিয়ে দাও। দায়িত্ব গ্রহণ করো তার শুশ্রূষার।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এক ইহুদীর কাছ থেকে ঋণ হিসেবে কিছু অর্থ গ্রহণ করেছিলেন। সে হঠাৎ একদিন তার ঋণ পরিশোধের দাবী জানালো। রসুল স. বললেন, এ মুহূর্তে তো আমি অপারগ। ইহুদী বলল না, আমি অতশত বুঝি না। প্রাপ্য না পাওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়ছি না। রসুল স. বললেন, তাই হবে। তিনি স. সেখান থেকে আর নড়লেন না। ওখানে আদায় করলেন জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর। সাহাবীগণ বিভিন্নভাবে ইহুদীকে বুঝাতে লাগলেন। কিন্তু তার মন গললো না। রসুল স. নির্বিকার। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এক ইহুদী আপনাকে আটকে রেখেছে— এটা আমাদের পক্ষে অসহনীয়। রসুল স. বললেন, আমাকে আমার প্রভুপ্রতিপালক কারো অধিকার খর্ব করতে নিষেধ করেছেন, সে অধিকার চুক্তিভূত হোক অথবা

www.eelm.weebly.com

হোক চুক্তিবহির্ভূত। বেলা বাড়তে শুরু করলো। দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে অকস্মাৎ পাওনাদার ইহুদী বলে উঠলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি— আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি— নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র রসুল। আমি আমার সম্পদের অর্ধেক আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কেবল পরীক্ষা করার নিমিত্তেই আমি আপনার সঙ্গে এরূপ আচরণ করেছি। কারণ আমি তওরাত কিতাবে আপনার সম্পর্কে যে বিবরণ পাঠ করেছি তা এ রকম— শেষ রসুলের নাম হবেন মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্। তিনি জন্মগ্রহণ করবেন মক্কায়। হিজরত করবেন মদীনায়। সুদূর সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হবে তাঁর প্রশাসন। তিনি কর্কশ স্বভাবের নন। বাজারের মধ্যেও তিনি কাউকে চিৎকার করে ডাকবেন না। কখনো উচ্চারণ করবেন না অশ্লীল বচন। বায়হাকী।

আতা বিন ইয়াছার বলেছেন, আমি হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আসের নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমাকে রসুল স. এর ওই সকল গুণাবলীর কথা বলুন, যেগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে তওরাতে। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! কোরআন মজীদেই রসুল স. এর সকল গুণাবলী আলোচিত হয়েছে। ওই আলোচনার কিছু অংশ লিপিবদ্ধ রয়েছে তওরাতে। তওরাতে বলা হয়েছে— হে নবী! আমি তোমাকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণায়ক, পুণ্যের ও জান্নাতের শুভ সংবাদদাতা, পাপ ও দোজখ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মীদের (আরবদের) রক্ষক বানিয়ে প্রেরণ করেছি। তুমি আমার বান্দা আমি তোমার নাম রেখেছি মোতাওয়াক্কিল। তাই তুমি কখনো বদমেজাজী হবে না, বাজারে শোরগোল করবে না, অশুভ দ্বারা অশুভকে প্রতিহত করবে না এবং ক্ষমা ও উদারতাই হবে তোমার সাফল্যের উপকরণ। বিপথগামীরা পূর্ণরূপে সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ স্বীকার না করা পর্যন্ত) আমি তোমার প্রাণ হরণ করবো না। তোমার মাধ্যমে আমি অন্ধকে দান করবো দৃষ্টি এবং বধিরকে দান করবো শ্রুতি। আর উন্মুক্ত করে দিবো বদ্ধ হৃদয়গুলোকে। বোখারী। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালেম থেকে দারেমীও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, তওরাতে সংকলিত রয়েছে— মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ হবে আমার নির্বাচিত দাস। সে উষ্ণ স্বভাব সম্পন্ন নয়। বাজারে শোরগোলকারী নয়, মন্দের মাধ্যমে মন্দের প্রতিকারকারী নয়। বরং ক্ষমা পরবশ। তাঁর জন্মস্থান মক্কা, হিজরতের স্থান মদীনা। তার রাজত্বের বিস্তৃতি সিরিয়া পর্যন্ত। আল্লাহ্র প্রশংসা করা হবে তাঁর উম্মতের অধিকাংশের স্বভাব, সুখ-দুঃখ সকল অবস্থায় তারা হবে আল্লাহ্র প্রশংসামুখর। নিম্নভূমিতে অবতরণের সময় তারা উচ্চারণ করবে আল্লাহ্র প্রশংসাধ্বনি। আর উচ্চভূমিতে আরোহণের সময় বলবে তকবির। সূর্যের গতিবিধির প্রতি তারা হবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিধারী। নামাজের সময় এলে নামাজ পড়বে। ওজুর সময় ধৌত করবে হাত, পা ও

www.eelm.weebly.com

মুখমণ্ডল। তাদের মোয়াজ্জিনেরা আজান দিবে উন্মুক্ত আকাশের নিচে। সমর প্রান্তরে ও নামাজে তারা হবে সুশৃঙ্খল ও সারিবদ্ধ। মধুমক্ষিকাদের গুঞ্জনের মতো হবে তাদের রাতের নামাজের আওয়াজ। 'মাআলিমুত্তানযিল' গ্রন্থে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন বাগবী। মাসাবীহ্ গ্রন্থেও হাদিসটি উল্লেখিত হয়েছে। দারেমী হাদিসটি উল্লেখ করেছেন কিছুটা পরিবর্তিত রূপে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেছেন, তওরাতে স্পষ্টাক্ষরে রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেখানে এ কথাও লেখা রয়েছে যে, হজরত ঈসা ইবনে মরিয়মকে তাঁর রওজা শরীফের পাশে দাফন করা হবে। তিরমিজি ও আবু দাউদ বলেছেন, সে কারণেই রসুল স. এর সমাধির পাশে হজরত ঈসার সমাধির জন্য জায়গা রেখে দেয়া হয়েছে।

'ইয়া'মুরুহুম বিল মা'রুফ' অর্থ— যে তাদেরকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয়। 'ওয়া ইয়ানহাহুম আ'নিলমুনকার' অর্থ— এবং অসৎকার্য নিষেধ করে। অর্থাৎ— ওই উম্মী নবী মানুষকে আল্লাহ্তায়ালার বিধানানুসারে শরিয়তের ফরজ নির্দেশসমূহ পালন করতে বলে, উৎসাহ দান করে মোস্তাহাব আমলগুলো পালন করতেও। আর নিষেধ করে হারাম কাজ করতে। মকরুহ্ কাজ করতেও করে নিরুৎসাহিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে' এ কথার অর্থ— অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ কতিপয় বৈধ বস্তুও হারাম করে দেয়া হয়েছিলো ইহুদীদের জন্য। আল্লাহতায়ালার প্রিয়তম উম্মী রসুল সেগুলোকে হালাল করে দেন। মূর্খতার যুগের লোকেরা স্বেচ্ছায় কতিপয় বস্তুকে হারাম করে নিয়েছিলো। যেমন বাহিরা, সায়েবা, ওসীলা, হাম ইত্যাদি। সেগুলোকেও হালাল করে দেন উম্মী রসুল। আর এই রসুল অপবিত্র বস্তুগুলোকে করে দেন অবৈধ (হারাম)। যেমন— রক্ত, মদ, শূকর, মড়া, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের ভার থেকে ও বন্ধন থেকে যা তাদের উপর ছিলো।' হজরত ইবনে আব্বাস, জুহাক, সুদ্দী ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে ইস্রা (ভার) কথাটির উদ্দেশ্য ওই অঙ্গীকার যাতে বনী ইসরাইলদেরকে তওরাতের পূর্ণ অনুসরণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। হজরত কাতাদা বলেছেন, এখানে 'ভার' অর্থ ওই কঠোরতা যা বনী ইসরাইলেরা নিজেরাই নিজেদের উপর আরোপ করেছিলো। 'ওয়াল আগলালা' অর্থ— বন্ধন। হজরত মুসার শরিয়তের বিধান ছিলো— পাপ থেকে তওবা করলে তওবাকারীরা একে অপরকে হত্যা করে ফেলবে (এটাই তওবা কবুলের শর্ত), কোনো কোনো অপরাধীর অঙ্গ কর্তন করবে, পরিধেয় বস্ত্রে অপবিত্রতা লেগে গেলে অপবিত্র

www.eelm.weebly.com

অংশ কেটে বাদ দিতে হবে, ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত সকল হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) হবে বাধ্যতামূলক, রক্ত প্রবাহ করতে হবে নিষিদ্ধ, শনিবার দিন কোনো পার্থিব কাজ করা যাবে না, উপাসনালয় ছাড়া অন্য কোথাও উপাসনা করা যাবে না ইত্যাদি। এ সকল কঠিন নির্দেশই ছিলা ইহুদীদের জন্য বন্ধন বা শৃংখলতুল্য। এ সকল ভার বন্ধন থেকে মুক্ত করবেন সেই উম্মী রসুল।

শেষে বলা হয়েছে—'সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে আলো তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।' এখানে 'আ'য্যারুহু' অর্থ— তাঁকে সম্মান করে। 'নাসারুহু' অর্থ— তাঁকে সাহায্য করে। অর্থাৎ— যারা এই উম্মী রসুলের দুশমনদেরকে পর্যুদস্ত করে তাঁর সম্মান প্রতিষ্ঠা করে ও তাঁকে সাহায্য করে ধন্য হয়।

'ওয়াত্তাবায়ু'না নুরাল্লাজী উনযিলা মায়া'হু' কথাটির অর্থ— এবং যে আলো তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে। এখানে নূর (আলো) অর্থ, কোরআন মজীদ। তাঁর সাথে, অর্থ তাঁর নবুয়তের সাথে। নূর নিজে উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য। অন্যকেও উজ্জ্বল করে এবং প্রকাশ করে দেয়। কোরআন মজীদও তেমনি আল্লাহ্তায়ালার প্রকাশ্য কালাম ও মোজেজা— যা মানুষের বিশ্বাস, চিন্তা ও আচরণকে করে তোলে উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য। এদিক থেকে নূরও কোরআন সমার্থক বলে কোরআনকে এখানে নূর নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এখানে 'মায়া'হু' (তাঁর সাথে) শব্দটির সম্পর্ক রয়েছে 'ইত্তাবায়ু' (অনুসরণ করে) কথাটির সঙ্গে। 'উনযিলা' (অবতীর্ণ হয়েছে) শব্দটির সঙ্গে নয়। এমতাবস্থায় বাক্যটির মমার্থ দাঁড়াবে এ রকম— অনুসরণ করে আলোর (কোরআনের) এবং এই নবীর সাথে যা অবতীর্ণ হয়েছে সেই আলোর। প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহ— দু'টোই অনুসরণীয়।

আলমুফলিহুন অর্থ সফলকাম— চিরস্থায়ী সফলতার অধিকারী। অর্থাৎ স্থায়ীভাবে আল্লাহ্র রহমতে নিমজ্জিত ব্যক্তি।

উল্লেখ্য যে, এখানেই শেষ হয়েছে হজরত মুসার প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ্তায়ালার বক্তব্যের ধারাবাহিকতা। পুনরায় আমরা শুরু করছি হজরত মুসা ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের প্রসঙ্গ।

নাওফবুকায়ী হামেরি বর্ণনা করেছেন, হজরত মুসা তাঁর সম্প্রদায়ের সত্তরজন ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন। তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে জানালেন হে নবী মুসা! তোমার সাথীদেরকে জানিয়ে দাও, এখন থেকে তোমরা সকলে নামাজের সময়

www.eelm.weebly.com

হলে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে পারবে। কেবল নামাজ পড়তে পারবে না শৌচাগারে, স্নানাগারে ও কবরস্থানে। আমি তোমাদের অন্তরে দান করবো বিশ্বাসী পরিতৃপ্তি। তোমরা সকলে তওরাত স্মৃতিবদ্ধ করতে পারবে। তওরাত মুখস্থ বলতে পারবে পুরুষ, নারী, স্বাধীন, ক্রীতদাস, ছোট বড়— সকলে। হজরত মুসা এ কথা প্রচার করলেন। লোকেরা শুনে বললো, আমরা আমাদের নির্ধারিত মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও নামাজ পড়বো না। স্মৃতিবদ্ধ করার মতো তওরাতের প্রতি আমরা অতো গভীর মনোযোগও দিতে পারবো না। আমরা দেখে দেখেই তওরাত পড়তে চাই। তাদের ওই অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— ফাসাআকতুবুহা লিল্লাজীনা ইয়াত্তাকুনা......ইয়ু'মিনুন' (যারা আল্লাহ্ভীরু অচিরেই তাদের জন্য তা লিখে রাখবো.....বিশ্বাসবান) ।

উপরে বর্ণিত নেয়ামতসমূহ বনী ইসরাইলেরা গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। আল্লাহ্ প্রদত্ত ওই নেয়ামতগুলো সাদরে গ্রহণ করেছেন রসুল স. এর উম্মতবৃন্দ। তাই হজরত মুসা বলেছিলেন হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! আমাকে ওই উম্মতের পয়গম্বর বানিয়ে দিন। আল্লাহ্তায়ালা বলেছিলেন, তাদের নবী তো হবে তাদের মধ্য থেকেই (যেমন তুমি নবী হয়েছো তোমার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে)। হজরত মুসা বললেন, তবে আমাকে ওই নবীর উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, তার আগেই সাঙ্গ হবে তোমার পৃথিবীর জীবন। হজরত মুসা বললেন, হে আমার পরম প্রভু! আমি বনী ইসরাইলদের একটি শাখা নিয়ে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হলাম। অথচ এরা তোমার প্রদত্ত অনুগ্রহ হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করলো। আর তুমিও তা দান করলে অন্য দলকে। আল্লাহ্তায়ালা এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন— 'ওয়া মিন ক্বওমি মূসা উম্মাতুঁই ইয়াহ্দুনা বিল হাক্বি ওয়াবিহি ইয়া'দিলুন' (মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দল রয়েছে যারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায়বিচার করে (আয়াত ১৫৯)। হজরত মুসা তখন আল্লাহ্তায়ালার এ রকম বাণী শুনে প্রসন্ন হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, নাওফবুকায়ীর এই বিবরণটি আলোচ্য আয়াতের প্রকাশ্য শব্দ ও বিবরণের পরিপন্থী। কারণ আলোচ্য আয়াতটি কেবল আহলে কিতাবদের ইমানদার লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্য কোনো ধর্ম থেকে ইসলামে আগমনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। (কারণ এখানে বলা হয়েছে 'যার উল্লেখ তওরাত ও ইঞ্জিল যা তাদের কাছে আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়')।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা এবং ইবনে জারিহ্ বলেছেন, যখন 'ওয়া রহমাতি ওয়াসিয়াত কুল্লা শাইয়্যিন' (আর আমার দয়া— তাতো সকল কিছুতে ব্যাপ্ত— আয়াত ১৫৬) —এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন ইবলিস বললো, আমিও তাহলে আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবো না। কারণ

www.eelm.weebly.com

আমিও 'কুল্লা শাইয়িন' (সকল কিছুতে) এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর অবতীর্ণ হলো— সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারণ করবো যারা সাবধান হয়, জাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে (আয়াত ১৫৬)। এই আয়াত শুনে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা বললো, আমরাও তাকওয়া (সাবধানতা) অবলম্বন করি, জাকাত প্রদান করি এবং আল্লাহ্র প্রতি আমাদের বিশ্বাসও রয়েছে। সুতরাং আমরাও বঞ্চিত হবো না আল্লাহ্র রহমত থেকে। এরপর আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রহমতকে কেবল এই উম্মতের জন্য সুনির্ধারিত করে দিলেন এভাবে— যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী রসুলের....... শেষ পর্যন্ত।

আলোচ্য আয়াতটি আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করেছেন হজরত মুসার প্রার্থনার জবাব হিসেবে। সেই জবাবটিই কোরআনে উদ্ধৃত করে আল্লাহ্তায়ালা যেনো রসুল স.কে জানিয়ে দিচ্ছেন— হে আমার আখেরী রসুল! আমি মুসার প্রার্থনার জবাবে এই কথাগুলো বলেছিলাম। প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ্তায়ালাই অবহিত।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৫৮

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ۨالَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۠ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

❐ বল, হে মানুষ! আমি তোমাদিগের সকলের জন্য রসূল আল্লাহের, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহের প্রতি ও তাঁহার নিরক্ষর বার্তাবাহক রসূলের প্রতি যে আল্লাহ্ ও তাঁহার বাণীতে বিশ্বাস করে, এবং তোমরা তাঁহার অনুসরণ কর যাহাতে তোমরা পথ পাও।

আপনি বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্র রসুল। —এ কথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. সকল সৃষ্টির রসুল। নবীদের, ফেরেশতাদের, জ্বিনদের— সকলের। অন্যান্য নবী রসুল প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য। আর বিশ্ব মানবতা ও নিখিল সৃষ্টির জন্য প্রেরিত হয়েছেন রসুলে পাক স.। তিনি স. এরশাদ করেছেন, অন্য নবীদের উপর আমাকে ছয়টি শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। ১. আমাকে জ্ঞানদান করা হয়েছে শব্দাবলীর গভীর রহস্য সম্পর্কে। তাই আমার সংক্ষিপ্ত কথার মর্ম গভীর ও

www.eelm.weebly.com

বিস্তৃত। ২. আমাকে দেয়া হয়েছে মহাপ্রতাপসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব, তাই দূরের শত্রুরাও আমার কথা শুনে ভয় পায়। ৩. আমার জন্য হালাল করা হয়েছে গণিমতের মাল। ৪. সমস্ত পৃথিবীর মৃত্তিকাকে ইবাদতের স্থান বানানো হয়েছে আমার জন্য। ৫. আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সকল সৃষ্টিকে পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে এবং ৬. নবুয়তের প্রবহমানতাকে সমাপ্ত করা হয়েছে আমার মাধ্যমেই। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম ও তিরমিজি।

হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পাঁচটি কারণে আমি অন্য নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১. আমি প্রেরিত হয়েছি সকল মানুষের জন্য। ২. আমার উম্মতকে দেয়া হয়েছে শাফায়াতের অধিকার। ৩. এমন পরাক্রমশীল ব্যক্তিত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে, যাতে করে এক মাসের দূরত্বে অবস্থারনত শত্রুরাও আমার কথা শুনে ভীত হয়। ৪. সকল স্থানের মাটি আমারই জন্য করা হয়েছে নামাজ পাঠের উপযোগী। ৫. আগের কোনো নবীর জন্য গণিমতের মাল হালাল ছিলো না, কিন্তু আমার জন্য গণিমত বৈধ।

হজরত আবু উমামা থেকে যথাসূত্রপরম্পরায় বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, অন্য নবীদের উপর চারটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে আমাকে। এই বর্ণনাটির মধ্যে শাফায়াতের উল্লেখ নেই।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে সাধারণভাবে সকল মানুষকে সম্বোধন করা হলেও সম্বোধনটি প্রত্যক্ষভাবে প্রযোজ্য মদীনার ইহুদী ও কতিপয় খৃষ্টানদের উপরে। যেহেতু তাদের কিতাবে রসুল স. প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। সুতরাং অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ন্যূনতম সুযোগও তাদের নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাজি লাহূ মুলকুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' (যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী)। উল্লেখ্য যে, এই সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্তায়ালার একটি অতুলনীয় সিফাত বা গুণ। এভাবে আয়াতের মর্ম দাঁড়িয়েছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি বলুন, আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী আল্লাহ্। রসুল আমি। আর আমি প্রেরিত হয়েছি তোমাদের সকলের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে—'তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর নিরক্ষর বার্তাবাহক রসুলের প্রতি, যে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে, এবং তোমরা তার অনুসরণ করো যাতে তোমরা পথ পাও।' এখানে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে অক্ষরের অমুখাপেক্ষী ওই পয়গম্বরের অনুসরণের, যিনি জীবন ও মৃত্যু প্রদাতা আল্লাহ্তায়ালার বার্তাবাহক রসুল— যিনি বিশ্বাস করেন আল্লাহ্কে এবং আল্লাহ্তায়ালার পূর্বাপর সকল প্রত্যাদেশকে। এ রকম যারা করবে তারাই পাবে

www.eelm.weebly.com

হেদায়েত। এখানে হেদায়েতপ্রাপ্তির দু'টি শর্তকে স্পষ্টাক্ষরে বলে দেয়া হয়েছে। সে দু'টি শর্ত হচ্ছে— বিশ্বাস ও আনুগত্য। সুতরাং যে রসুল স.কে রসুল বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর শরিয়তের উপর আমল করে না, সে পূর্ণ হেদায়েতপ্রাপ্ত নয়। বিশ্বাসের দিক দিয়ে পথপ্রাপ্ত বলে গণ্য হলেও আমলের দিক দিয়ে সে পথভ্রষ্ট।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৫৯

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰۤى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ○

❐ মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দল রহিয়াছে যাহারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও ন্যায় বিচার করে।

এখানে 'ওয়ামিন ক্বওমি মুসা' অর্থ— মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে। উম্মাতুন অর্থ এমন দল। ইয়াহ্দুনা বিল হাক্বি অর্থ— যারা ছিলো সত্য, সত্যের অনুসারী। অর্থাৎ যারা ছিলো সত্যাধিষ্ঠিত এবং সেই সত্যের প্রতি অন্যকে আহ্বানকারী। ওয়াবিহী ইয়াদিলুন অর্থ— এবং যারা ছিলো ন্যায় বিচারকারী। অর্থাৎ তারা পারস্পরিক সমস্যা সমাধান করতো ন্যায় বিচারের মাধ্যমে।

জুহাক, কালাবী এবং রবী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত দলটি বসবাস করে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে— চীন দেশের চেয়েও দূরে এক নদীর উপকূলে। নদীটির নাম দরিয়ায়ে আওরাখ। তারা কেউ বিত্তশালী নয়। বনী ইসরাইলদের অন্য কোনো দলের সঙ্গে তাদের কোনো প্রকার সংস্রব নেই। সেখানে রাতে বৃষ্টি হয়। দিনের আকাশ থাকে নির্মেঘ। তারা জীবিকা নির্বাহ করে চাষাবাদের মাধ্যমে। অন্য কোনো মানুষ সেখানে পৌঁছতে পারে না। তারা সকলেই সত্যধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বর্ণিত হয়েছে, মেরাজের রজনীতে হজরত জিবরাইল রসুলপাক স.কে সঙ্গে নিয়ে তাদের কাছে গেলেন। হজরত জিবরাইল জিজ্ঞেস করলেন, আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন, তোমরা কি তাঁকে চিনতে পেরেছো? তারা বললো, না। হজরত জিবরাইল বললেন, ইনিই উম্মী নবী মোহাম্মদ। এ কথা শুনে তারা সকলেই রসুল স. এর উপর ইমান আনলো এবং নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! হজরত মুসা আমাদেরকে অসিয়ত করেছিলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সেই উম্মী নবীর সাক্ষাত পাও, তবে তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দিও। হে মহাসম্মানিত রসুল! আপনি হজরত মুসার সালাম গ্রহণ করুন। রসুল স. সালাম গ্রহণ করলেন এবং তাঁর জবাবও দিলেন। তারপর তাদেরকে শিক্ষা দিলেন মক্কায় অবতীর্ণ দশটি সুরা। নির্দেশ দিলেন, তোমরা নামাজ পাঠ কোরো এবং জাকাত দিয়ো। আরো বললেন, তোমরা এই স্থানেই অবস্থান কোরো। আর সাপ্তাহিক বিশেষ ইবাদতের দিন হিসেবে শনিবারের পরিবর্তে এখন থেকে নির্ধারণ কোরো শুক্রবারকে।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বনী ইসরাইলদের সত্যপন্থী দল বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল ইহুদীদেরকে, যারা রসুল স. এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলো এবং মুসলমান হয়েছিলো।

বাগবী বলেছেন, প্রথমোক্ত বর্ণনাটি অধিকতর শুদ্ধ। আমি বলি, প্রথমোক্ত বর্ণনাটি গরীব (দুর্লভ)। আর বর্ণনাটি বিশুদ্ধতার স্তরেও উপনীত হয়নি। কেননা মেরাজের ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিলো রসুল স. এর হিজরতের পূর্বে— মক্কায়। ওই সময় জুমার নামাজ পাঠের নির্দেশ অবতীর্ণই হয়নি। আর তখন পর্যন্ত এমন দশটি সুরাও অবতীর্ণ হয়নি, যেগুলোর মধ্যে বিবৃত ছিলো ইসলামের সামগ্রিক বিধিবিধান। অতএব উল্লেখিত বনী ইসরাইলদের সত্যাধিষ্ঠিত দলটি ওই দল যারা হজরত মুসার সময় দৃঢ়ভাবে তাঁর অনুসরণ করেছে এবং ওই দল, যারা রসুল স. এর নিকট থেকে সরাসরি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে। যেমন হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম এবং তাঁর মতো অন্যান্য সাহাবী।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৬০, ১৬১, ১৬২

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ
قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ
قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ
كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ وَاِذْ قِيْلَ
لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا
كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۝

❐ তাহাদিগকে আমি দ্বাদশ গোত্রে তথা দলে বিভক্ত করিয়াছি। মূসার সম্প্রদায় যখন তাহার নিকট পানি প্রার্থনা করিল তখন তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তোমার লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর'; ফলে উহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবন উৎসারিত হইল, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনিয়া লইল, এবং

www.eelm.weebly.com

মেঘ দ্বারা তাহাদিগের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছিলাম, তাহাদিগের নিকট মান্না ও সালওয়া পাঠাইয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম 'ভাল যাহা তোমাদিগকে দিয়াছি তাহা আহার কর।' তাহারা আমার প্রতি কোন জুলুম করে নাই কিন্তু তাহারা নিজদিগের প্রতিই জুলুম করিতেছিল।

❒ স্মরণ কর, তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, "এই জনপদে বাস কর ও যেথা ইচ্ছা আহার কর এবং বল 'ক্ষমা চাই' এবং নতশিরে প্রবেশ কর; আমি তোমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিব। আমি সৎকর্মপরায়ণদিগের জন্য আমার দান বৃদ্ধি করিব।"

❒ কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সীমালংঘনকারী ছিল তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল তাহার পরিবর্তে তাহারা অন্য কথা বলিল। সুতরাং আমি আকাশ হইতে তাহাদিগের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করিলাম যেহেতু তাহারা সীমালংঘন করিতেছিল।

হজরত ইয়াকুবের একটি নাম ছিলো ইসরাইল। দ্বাদশ পুত্রের জনক ছিলেন তিনি। ওই দ্বাদশ পুত্রের বংশধারাই পরবর্তী সময়ে পরিণত হয়েছে বনী ইসরাইলের (হজরত ইয়াকুবের বংশের) বারোটি গোত্রে। আল্লাহ্পাকই এভাবে তাদের বারোটি গোত্রকে পরিচিতি দান করেছেন। তাই আলোচ্য আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে— তাদেরকে আমি দ্বাদশ গোত্রে তথা দলে বিভক্ত করেছি। এ রকম বলেছেন জুজায।

এরপর বলা হয়েছে— 'মুসার সম্প্রদায় যখন তাঁর নিকট পানি প্রার্থনা করলো, তখন তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তোমার লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত করো; ফলে তা থেকে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হলো, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনে নিলো।' ঘটনাটি এ রকম— তখন উন্মুক্ত তীহ্ প্রান্তরে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো বনী ইসরাইলদেরকে। রসুল মুসাও ছিলেন ওই তীহ্ প্রান্তরেই। পিপাসিত বনী ইসরাইল জনতা তখন পানি প্রার্থনা করলো হজরত মুসার নিকট। হজরত মুসা আল্লাহ্তায়ালার নিকট প্রার্থনা জানালেন। আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যাদেশ করলেন, যে অলৌকিক পাথরটি তোমার সঙ্গে রয়েছে, সেই পাথরটিতে তোমার লাঠির দ্বারা আঘাত করো। হজরত মুসা নির্দেশ পালন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের বারোটি কোণ থেকে প্রবল বেগে উৎসারিত হলো বারোটি ঝর্ণা। তখন প্রতিটি গোত্র তাদের নিজ নিজ ঝর্ণা চিনে নিলো। আর ওই ঝর্ণার পানি দ্বারা মেটালো তাদের পিপাসা।

লক্ষ্যণীয় যে, এখানে হজরত মুসা লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করলেন— এ কথাটির উল্লেখ নেই। উল্লেখ না থাকার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, হজরত মুসা ছিলেন আল্লাহ্র রসুল। তিনি তো আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতিপালন করবেনই। তাই 'তিনি লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করলেন'— এ রকম উল্লেখকে এখানে

www.eelm.weebly.com

নিষ্প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। এ কথাটিও এখানে প্রতীয়মান হয়েছে যে, হজরত মুসা স্বেচ্ছায় লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করেননি। করেছিলেন প্রত্যাদেশানুযায়ী।

এখানে 'আমবাজাস্' শব্দটির অর্থ— উৎসারিত হওয়া বা ফেটে বের হওয়া। কিন্তু আবু আমর বলেছেন, শব্দটির অর্থ ফিনকি দিয়ে ফুটে বের হওয়া। অর্থাৎ প্রচণ্ড বেগে নির্গত হওয়া।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছিলাম, তাদের নিকট মান্না ও সালওয়া পাঠিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম ভালো যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা আহার করো। তারা আমার প্রতি কোনো জুলুম করেনি, কিন্তু তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছিলো।

পরের আয়াতে (১৬১) বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, তাদেরকে বলা হয়েছিলো, এই জনপদে বাস করো ও যেথা ইচ্ছা আহার করো এবং বলো 'ক্ষমা চাই' এবং নতশিরে প্রবেশ করো; আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবো। আমি সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আমার দান বৃদ্ধি করবো।'

এই আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সুরা বাকারায় করা হয়েছে। সেখানকার এ সম্পর্কিত আয়াত ও এই আয়াতের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, সেখানে বলা হয়েছে 'ফাকুলু' (অতঃপর আহার করো)। আর এখানে বলা হয়েছে, কেবল 'কুলু' (আহার করো)। 'ফা' কথাটির উল্লেখ সেখানে এ কারণেই করা হয়েছিলো যে আহার করাটাই ছিলো ওই জনপদে অবস্থানের কারণ। অর্থাৎ নির্দেশটি ছিলো এ রকম— ওই জনপদে গিয়ে বসবাস করবে অতঃপর ওই জনপদেই আহার করবে। আর আলোচ্য আয়াতের বিবরণ ভঙ্গিটিই উপরোক্ত বক্তব্যকে পরিষ্কার করে দিয়েছে। তাই এখানে 'ফা' কথাটির উল্লেখ আর করা হয়নি। এ রকম বলেছেন বায়যাবী।

আমি বলি, সুরা বাকারায় ওই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিলো— 'উদ্খুলু হাজিহিল ক্বর্ইয়াতি ফাকুলু'(ওই জনপদে প্রবেশ করো তারপর আহার করো)। উল্লেখ্য যে, ওই জনপদে আহার করতে গেলে প্রথমে সেখানে প্রবেশ করতে হবে। তাই সেখানে পরিণাম প্রকাশকরূপে 'ফা' শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। আর এখানে বলা হয়েছে— 'উস্কুনু হাজিহিল ক্বর্ইয়াহ্' (ওই জনপদে বাস করো)। তাই এখানে 'কুলু' শব্দটির পূর্বে পরিণাম প্রকাশক 'ফা' সংযোজন যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ যে যেখানে অবস্থান করে, সে সেখানেই সম্পন্ন করে তার পানাহার। অর্থাৎ আহার ও বসবাসের মধ্যে কোনো অগ্র-পশ্চাৎ নেই। তাই বসবাস এবং আহারের মধ্যে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ওয়াও' (ও) সংযোজক অব্যয়টি। সে কারণে এখানকার বক্তব্যটির উদ্দেশ্যের মধ্যে নতুন কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয় নয়।

www.eelm.weebly.com

দু'টি বাক্য উল্লেখিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। শেষ বাক্যটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে পৃথকভাবে। বলা হয়েছে—'আমি সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আমার দান বৃদ্ধি করবো।' বক্তব্যটির মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্তায়ালার দান বা সওয়াব আল্লাহ্তায়ালারই একান্ত অনুগ্রহ। সে অনুগ্রহ কোনো আমলের বিনিময় নয়। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ প্রতিপালন করা না করার উপরে সেই বিশেষ অনুগ্রহের কোনো সম্পর্ক নেই।

পরের আয়াতে (১৬২) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তাদের মধ্যে যারা সীমালংঘনকারী ছিলো তাদেরকে যা বলা হয়েছিলো তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বললো। সুতরাং আমি আকাশ থেকে তাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করলাম যেহেতু তারা সীমালংঘন করেছিলো।'

সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ
اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۛ كَذٰلِكَ ۛ
نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا
بِهٖۤ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَـِٔيْسٍۭ
بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ○

❐ তাহাদিগকে সমুদ্রতীরবর্তী জনপদবাসীদিগের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা শনিবারে সীমালংঘন করিত; শনিবার উদ্‌যাপনের দিন মাছ পানিতে ভাসিয়া তাহাদিগের নিকট আসিত; কিন্তু যেদিন তাহারা শনিবার উদ্‌যাপন করিত না সেদিন উহারা তাহাদিগের নিকট আসিত না; এই ভাবে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম যেহেতু তাহারা সত্যত্যাগ করিত।

www.eelm.weebly.com

❒ স্মরণ কর, তাহাদের এক দল বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্ যাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন তোমরা তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও কেন?' তাহারা বলিয়াছিল 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দোষ-মুক্তির জন্য এবং যাহাতে তাহারা সাবধান হয় এই জন্য।'

❒ যে উপদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল তাহারা যখন উহা বিস্মৃত হয় তখন তাহারা অসৎ কার্য হইতে নিবৃত্ত করিত তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করি এবং যাহারা সীমালংঘন করে তাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিত বলিয়া আমি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিই।

❒ তাহারা যখন নিষিদ্ধ কার্যেও বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল তখন তাহাদিগকে বলিলাম 'ঘৃণিত বানর হও!'

উদ্ধৃত আয়াত চতুষ্টয়ে বিবৃত হয়েছে বনী ইসরাইলদের একটি চরম অবাধ্যতার ঘটনা। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ লংঘন করেছিলো তারা। সে কারণে আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তিও দিয়েছিলেন। পূর্বপুরুষদের ওই ঘটনাটি ইহুদীরা ভালো করেই জানতো। কিন্তু রসুল স. এর ওই ঘটনা জানার কোনো উপায় ছিলো না। প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই তাঁকে জানানো হয়েছে সেই ঘটনা। নিঃসন্দেহে এটা তাঁর একটি অনন্য মোজেজা। একই সঙ্গে তাঁর মোজেজা প্রকাশ করে ও ইহুদীদেরকে সত্যের পথে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে উদ্ধৃত আয়াতসমূহের বিবরণ।

প্রথমে উল্লেখিত আয়াতটির মর্মার্থ এই— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি ইহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করুন সমুদ্রতীরবর্তী ওই জনপদবাসীদের সম্বন্ধে, যারা সাপ্তাহিক বিশেষ ইবাদতের দিনের অবমাননা করতো। আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, শনিবার সকল পার্থিব কর্ম থেকে বিরত থেকে কেবল আল্লাহ্পাকের ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতে হবে। কিন্তু এই নির্দেশ লংঘন করেছিলো তারা। লোভ ছিলো তাদের সীমাহীন। তাদের অন্তরে সত্যবিশ্বাসের লেশ মাত্র ছিলো না। আল্লাহ্তায়ালা সেকথা অবশ্যই জানতেন। তবে তাদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজন ছিলো একটি পরীক্ষার। সে পরীক্ষাও আল্লাহ্তায়ালা করেছিলেন। পরীক্ষাটি ছিলো এই— তারা যে শনিবারে বিশেষভাবে ইবাদত করতো, সেই শনিবারে সাগরে জোয়ারে ভেসে আসতো অসংখ্য মাছ। আর যে শনিবারে ইবাদত করতো না, সেই শনিবারে জোয়ারের পানিতে কোনো মাছই আসতো না।

www.eelm.weebly.com

এখানে জনপদটির নাম উল্লেখ করা হয়নি। কেবল বলা হয়েছে— সমুদ্রতীরবর্তী জনপদবাসী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই জনপদটির নাম আয়লাহ্। জনপদটি ছিলো মাছায়েন এবং তুর পর্বতের মধ্যবর্তী একটি সমুদ্রোপকূলে। আজহারী বলেছেন, ওই অবাধ্য জনগোষ্ঠির বসবাস ছিলো সিরিয়ার যিলতাবরীয়াহ নামক সমুদ্রোপকূলে।

আয়াতে উল্লেখিত 'শুর্‌রাআ'ন' শব্দটি 'শারিই' শব্দের বহুবচন। কথাটির উদ্দেশ্য— পানির উপরে ভেসে ভেসে আসতো। জুহাক বলেছেন, কথাটির অর্থ— ঝাঁকে ঝাঁকে, ধারাবাহিকভাবে। বর্ণিত হয়েছে, শাদা দুম্বা অথবা ভেড়ার পালের মতো অসংখ্য মাছ ভেসে আসতো শনিবারের জোয়ারে। বলা বাহুল্য, মৎসজীবী ওই ইহুদী জনগোষ্ঠির জন্য এটা ছিলো ইমানের একটি পরীক্ষা। প্রবৃত্তির নির্দেশ না আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ— কোনটি তাদের কাছে বড়ো, এটাই ছিলো সে পরীক্ষার উদ্দেশ্য।

এক বর্ণনায় এসেছে, শয়তান তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিলো, আল্লাহ্ তো শনিবার দিন মাছ ধরতে নিষেধ করেননি। নিষেধ করেছেন খেতে। তোমরা তাঁর নির্দেশের অর্থই বুঝতে পারোনি। আর ভুল বুঝবার কারণেই দ্যাখো, এতগুলো মাছ তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। কুমন্ত্রণাটি প্রবৃত্তির অনুকূলে বলে খুবই পছন্দ হলো ইহুদীদের। তারা শনিবার দিন মাছ ধরতে শুরু করলো। কিন্তু পুরোপুরি দ্বিধামুক্ত হতে পারছিলো না তারা। তাই শয়তান পুনর্বার তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিলো, সরাসরি এ রকম নির্দেশ লংঘন না করাই ভালো। বরং সমুদ্রতীরে বড় বড় গর্ত খনন করা হোক। জোয়ারের পানিতে ভেসে আসা মাছ ভাটার সময় সেগুলোতে আটকা পড়বে। পরদিন রবিবার সেগুলো ধরে নেয়া যাবে সহজেই। শনিবারে মাছ ধরতে নিষেধ করা হয়েছে। আটকে রাখতে তো আর নিষেধ হয়নি। আর মাছ তো শনিবারে ধরাই হচ্ছে না। ধরা হচ্ছে রবিবারে। এভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশও পালন হবে। আর আমাদের কার্যসিদ্ধিও ঘটবে। এই সিদ্ধান্তটি খুবই মনঃপুত হলো তাদের। নির্দ্বিধায় তারা কার্যকর করলো সিদ্ধান্তটি। বেশ কিছুদিন ধরে এই নিয়মই জারী রাখলো তারা। ধীরে ধীরে হয়ে উঠলো আরো বেপরোয়া। বলতে শুরু করলো, শনিবারেই আমরা মাছ আটকে রাখি। সুতরাং ধরতে আর দোষ কী? আটকে রাখা আর ধরা তো একই কথা। কিছু দিন পর বলতে শুরু করলো, শনিবারে মাছ ধরা আমাদের জন্য হালাল। নিষেধাজ্ঞা হয়তো ছিলো এক সময়। কিন্তু এখন নেই। এরপর থেকে শনিবার দিন মাছ ধরা, খাওয়া, বিক্রি করা— সবই চলতে লাগলো তাদের।

www.eelm.weebly.com

এ রকম বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলো ওই জনপদের তিন ভাগের এক ভাগ লোক। বাকী এক ভাগ প্রতিবাদী হয়ে উঠলো। সতর্ক করে দিলো অবাধ্যদেরকে। বললো, আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ লংঘনের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। বাকী এক ভাগ রইলো নীরব। তারা নিজেরা মাছ ধরতো না। যারা ধরতো— তাদেরকে কোনো কিছু বলতোও না।

পরের আয়াতে (১৬৪) বলা হয়েছে 'স্মরণ করো, তাদের এক দল বলেছিলো, আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কাঠোর শাস্তি দিবেন তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেনো? তারা বলেছিলো, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দোষমুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধান হয় এই জন্য।'

মৎস শিকার থেকে বিরত দল দু'টোর কথোপকথন উদ্ধৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। 'মৌনাবলম্বনই শ্রেয়'—এ রকম ভাবতো যারা, তারা প্রতিবাদী দলটিকে বললো, অযথা তোমরা বাক্যব্যয় করছো কেনো? যে আল্লাহ্র নির্দেশ তারা লংঘন করেছে সেই আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে শাস্তি দিবেন— পৃথিবীতে এবং আখেরাতেও। এ কথার প্রেক্ষিতে প্রতিবাদীরা বলেছিলো, আল্লাহ্তায়ালার নিকট জবাবদিহির ভয়ে আমরা এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছি। 'অন্যায় হতে দেখেও বাধা দাওনি কেনো? '— এ রকম প্রশ্নের সম্মুখীন যদি আমাদেরকে হতে হয়! আখেরাতে অন্যায়ের নীরব সমর্থক বলে যদি আমাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়— সেই ভয়ে আমরা সতর্ক করছি অবাধ্যদেরকে। আর আমরা এ আশাও করি যে, আমাদের সতর্কবাণী শুনে হয়তো তাদের বোধোদয় ঘটবে। অনুতাপজর্জরিত হৃদয় নিয়ে পুনরায় হয়তো তারা ফিরে আসবে সত্যের পথে।

এর পরের আয়াতে (১৬৫) বলা হয়েছে— 'যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো তারা যখন তা বিস্মৃত হয়, তখন যারা অসৎকার্য থেকে নিবৃত্ত করতো তাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং যারা সীমালংঘন করে তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করতো বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেই।'

প্রতিবাদী দল ও অবাধ্য দলটির পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে এই আয়াতে। আল্লাহ্তায়ালা প্রতিবাদী দলটিকে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আর অবাধ্য দলটিকে দিয়েছিলেন কঠিন শাস্তি। কিন্তু মৌন দলটির পরিণতির কথা এখানে বলা হয়নি। বরং তাদের কোনো উল্লেখই এখানে নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস একবার এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, ওই পুণ্যবান নীরব দলটির কী হয়েছিলো তা আমি বলবো না। সেখানে উপস্থিত হজরত ইকরামা বললেন, হজরত! আপনার জন্য আমার জীবন কোরবান। আপনি কি ওই নীরব দলটি সম্পর্কে কিছুই বলবেন না? আমরা তবে রহস্যটি উদ্ধার করবো কী করে? অবাধ্যদেরকে যে আল্লাহ্তায়ালা উপযুক্ত প্রতিফল

www.eelm.weebly.com

দিবেন, সে বিশ্বাস তো তাদের ছিলোই। তাইতো তারা প্রতিবাদীদেরকে বলেছিলো, 'আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেনো?' অথচ এই আয়াতে তাদের উল্লেখমাত্র করা হলো না। তারা উদ্ধার পেয়েছিলো, না ধ্বংস হয়েছিলো— কিছুই তো বুঝতে পারছি না আমরা। হজরত ইকরামা বলেছেন, আমার কথা শুনে খুবই খুশী হলেন হজরত ইবনে আব্বাস। আমাকে উপহার দিলেন দুই প্রস্থ পরিধেয় বস্ত্র। তারপর বললেন, নিঃসন্দেহে উদ্ধার পেয়েছিলো মৌন দলটি।

ইমরান বিন রুকুব বলেছেন, প্রতিবাদী ও মৌন দু'টো দলকেই মুক্ত রাখা হয়েছিলো শাস্তি থেকে। শাস্তি পেয়েছিলো কেবল অবাধ্যরা। হাসান এবং মুজাহিদও এ রকম বলেছেন। কিন্তু ইবনে জায়েদ বলেছেন,অবাধ্য ও মৌনদল দু'টো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। পরিত্রাণ লাভ করেছিলো কেবল প্রতিবাদীরা।

উদ্ধৃত আয়াতগুলোর শেষটিতে (১৬৬) বলা হয়েছে— 'তারা যখন নিষিদ্ধ কার্যেও বাড়াবাড়ি করতে লাগলো তখন তাদেরকে বললাম 'ঘৃণিত বানর হও'। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, অবাধ্যদের সীমালংঘন পৌঁছলো চরমে। প্রতিবাদীদের সদুপদেশের প্রতি তারা কর্ণপাত মাত্র করলো না। তখন পাপিষ্ঠদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলো পুণ্যবানেরা। এভাবে জনপদের একাংশে পুণ্যবানদের এবং অপরাংশে পাপীদের বসবাস নির্ধারিত হলো। হজরত দাউদ ছিলেন তাদের নবী। তিনি পাপাচারীদের জন্য শাস্তি প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ ঘোষিত হলো— ঘৃণিত বানর হও। তখন রাতে আপন আপন গৃহে বিশ্রামরত ছিলো তারা। হঠাৎ একে অপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো তারা আর মানুষ নয়— বানর। সকাল হলো। কিন্তু তারা কেউ ঘরের দরজা খুললো না। ওদিকে পুণ্যবানদের পাড়ায় যথারীতি আপন কাজে নিয়োজিত পুণ্যবানেরা এক সময় লক্ষ্য করলো, ওপাড়ার সকল ঘরের দরজা বন্ধ। কৌতূহলবশতঃ তারা এগিয়ে গেলো সেদিকে। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অবাধ্য আত্মীয়দেরকে নাম ধরে ডাকতে লাগলো তারা। তারপর অবাক হয়ে দেখলো, সকল ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে কেবল বানর। বানরগুলো তাদের পুণ্যবান আত্মীয়দের সকলকেই চিনতে পারলো। কোনো আওয়াজ করতে পারলো না। কাঁদতে লাগলো কেবল। আল্লাহ্তায়ালাই পাপিষ্ঠদেরকে বানরে পরিণত করেছেন, সে কথা আর বুঝতে বাকী রইলো না পুণ্যবানদের। তাঁরা তখন বললেন, আমরা কি তোমাদেরকে সতর্ক করে দেই নি? বানরেরা মাথা নেড়ে জবাব দিলো, হ্যাঁ। তিনদিন বেঁচে ছিলো তারা। অনেক লোক বানরগুলোকে দেখতে আসতো। মাত্র তিনদিন পর পৃথিবী থেকে বিদায় নিলো বানরগুলো।

www.eelm.weebly.com

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

❐ স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন যে তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত এমন লোককে তাহাদিগের উপর শক্তিশালী করিতে থাকিবেনই যাহারা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকিবে আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি দানে সত্বর এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়ও।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়া ইজ তাআ'জ্জানা রব্বুকা' (তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন)। কথাটির প্রকৃত অর্থ— তোমার প্রতিপালক দৃঢ় সংকল্প করেছেন, অনড় ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন অথবা এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রয়েছেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে তাআ'জ্জানা শব্দটির অর্থ, বলেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, শব্দটির অর্থ হুকুম দিয়েছেন। আতা বলেছেন— নির্দেশ ঘোষণা করেছেন। এরপর আল্লাহ্তায়ালার ওই অনড় ঘোষণাটি উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— 'তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত এ রকম লোককে তাদের উপর শক্তিশালী করতে থাকবেনই, যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদীদেরকে শায়েস্তা করতে থাকবেন। কারণ তাদের মতো অবাধ্যতা আর কেউ করেনি। করবেও না। তাদেরকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে তাদের উপর আল্লাহ্তায়ালা সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন হজরত সুলায়মানকে। তারপর বখ্তে নসরকে। বখতে নসর তাদের যুবকদের হত্যা করেছিলো। মহিলা ও শিশুদেরকে বানিয়েছিলো ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী। অবশিষ্টদের উপর ধার্য করেছিলো কর। রসুল পাক স. এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত অগ্নিউপাসক বখ্তে নসরের বংশীয় রাজাদেরকে তারা ওই কর দিয়ে আসছিলো। রসুল স.কেও তারা বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়েছিলো। তারা ছিলো শঠ, প্রবঞ্চক, অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ও ষড়যন্ত্রপ্রবণ। তাই রসুল স.ও তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন। ফলে বনী কুরায়জার পুরুষেরা হয়েছিলো নিহত। মহিলা ও শিশুরা হয়েছিলো বন্দী। আর বনী নাজির ও বনী কাইনুকাকে বিতাড়িত করা হয়েছিলো মদীনা থেকে। এরপর হজরত ওমরের খেলাফতের সময় খয়বর ও ফেদাক থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো তাদেরকে। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশও এ রকম যে— ইহুদীদের বিরুদ্ধে ওই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও যতক্ষণ না তারা অপমানকর কর প্রদানে সম্মত হয়।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি দানে সত্বর এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়ও।' এ কথার অর্থ— কেবল আখেরাতে নয়, অবাধ্যতার শাস্তি তিনি দিয়ে থাকেন কখনো কখনো দুনিয়াতেও। যেমন শাস্তিদান করে চলেছেন ইহুদীদেরকে। এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, তিনি কেবল শাস্তিদাতাই নন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়। আর ওই ক্ষমা ও দয়া পেতে গেলে করতে হবে তওবা। আনতে হবে ঈমান।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৬৮

وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۫ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

❐ দুনিয়ায় আমি তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি; তাহাদিগের কতক সৎকর্মপরায়ণ ও কতক অন্যরূপ এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করি যাহাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।

'দুনিয়ায় আমি তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি'—এ কথাটি বলা হয়েছে শুরুতেই। কথাটির অর্থ— আমি বিভিন্ন দলে ভাগ করে দিয়েছি বনী ইসরাইলদেরকে। তাই তারা আর কখনও সম্মিলিত শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হতে পারবে না।

এরপর বলা হয়েছে—'তাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ ও কতক অন্যরূপ।' এখানে সৎকর্মপরায়ণ বলে বোঝানো হয়েছে ওই সকল ইহুদীদেরকে যারা রসুল স. এর নিকট থেকে ইসলামের আহ্বান পেয়ে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন সত্যকে। হয়ে গিয়েছিলেন মুসলমান।

আমি বলি, 'সলিহুন' (সৎকর্মপরায়ণ) বলে এখানে প্রকাশ্যতঃ তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা হজরত মুসার শরিয়ত রহিত হবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর খাঁটি অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ হজরত ঈসার মহা আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত যারা হজরত মুসার শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

'ওয়া মিনহুম দুনা জালিকা' (এবং তাদের কতক অন্যরূপ)। —এ কথার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই ইহুদীদেরকে যারা রসুল স. কে পেয়েও তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। এ রকম বলেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। অবশ্য কথাটির প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ওই ইহুদীরা, যারা হজরত দাউদ, হজরত সুলায়মান এবং হজরত ঈসার নবুয়তকে অস্বীকার করতো।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে—'এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।' এ কথার অর্থ— আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি সুস্থতা, সম্পদ, পরাক্রম ইত্যাদি দ্বারা— যেনো তারা কৃতজ্ঞতার পথ ধরে প্রত্যাবর্তন করে সত্যের দিকে। আবার পরীক্ষাস্বরূপ আমি কখনও তাদের উপর চাপিয়ে দেই অসুস্থতা, দারিদ্র ও পরাক্রমহীনতা— যেনো ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পথ ধরে তারা ফিরে আসে চিরস্থায়ী সফলতার দিকে।

সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৬৯

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ۗ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ۗ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

❒ অতঃপর অযোগ্য উত্তর পুরুষগণ একের পর এক তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত হয়; তাহারা কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়; তাহারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, 'আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে। কিন্তু উহার অনুরূপ সামগ্রী তাহাদিগের নিকট আসিলে উহাও তাহারা গ্রহণ করে; কিতাবের অঙ্গীকার কি তাহাদিগের নিকট হইতে লওয়া হয় নাই যে তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিবে না? এবং তাহারা তো উহাতে যাহা আছে তাহা অধ্যয়নও করে, যাহারা সাবধান হয় তাহাদিগের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি ইহা অনুধাবন কর না?

'ফাখালাফা মিম বা'য়দি হিম খালফুন' অর্থ অতঃপর অযোগ্য উত্তর পুরুষগণ একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। এখানে 'খালফুন' শব্দটির অর্থ— বংশানুক্রম বা বংশধারা। কামুস গ্রন্থে এ রকম বলা হয়েছে। ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, খালফুন শব্দটি পড়তে হয় 'লাম' অক্ষরে সাকিন সহকারে। শব্দটির অর্থ স্থলাভিষিক্ত হওয়া। সে স্থলাভিষিক্ত আপন সন্তানও হতে পারে, অথবা অন্য কেউ।

ইবনে আরাবী বলেছেন, শব্দটিকে পড়তে হবে 'খালাফুন'— 'লাম' অক্ষরে যবর দিয়ে, তাহলে শব্দটির অর্থ হবে উত্তম স্থলাভিষিক্ত। আর লামের উপর সাকিন দিয়ে পড়লে অর্থ হবে অনুত্তম স্থলাভিষিক্ত।

www.eelm.weebly.com

নজর বিন শামায়েল বলেছেন, মন্দ স্থলাভিষিক্ত বুঝানোর জন্য কখনও কখনও শব্দটির মধ্যবর্তী অক্ষর লামের উপরে যবর ব্যবহৃত হয় আবার কখনও ব্যবহৃত হয় সাকিন। কিন্তু উত্তম স্থলাভিষিক্ত বুঝানোর জন্য লাম অক্ষরের উপর ব্যবহৃত হয় কেবল যবর।

মোহাম্মদ ইবনে জারীর বলেছেন, নন্দিত অবস্থা প্রকাশের জন্য অধিকাংশ সময় যবর এবং নিন্দিত অবস্থা প্রকাশের জন্য সাকিন ব্যবহার করা হয় লাম অক্ষরটিতে।

বায়যাবী লিখেছেন, 'খালফুন' শব্দটি একটি মূল ধাতু। কর্তৃকারক এবং কর্মকারক উভয় রূপে ব্যবহৃত হয় শব্দটি। মূল ধাতু হওয়ায় একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। কেউ কেউ আবার বলেছেন, শব্দটি বহুবচন। এখানে খালফুন শব্দ দ্বারা রসুল স. এর সময়ের ইহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়ারিছুল কিতাব' (তারা কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়)। এ কথার অর্থ— ইহুদীদের উত্তর পুরুষেরা তাদের পূর্বপুরুষের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সাথে সাথে কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়। ওই কিতাব তারা পাঠও করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে'। এ কথার অর্থ— তারা কিতাব পাঠ করে ঠিকই, কিন্তু তা ব্যবহার করে দুনিয়ার স্বার্থে। উৎকোচ ও দুনিয়ার অন্য তুচ্ছ সামগ্রী গ্রহণ করে, মানুষের সন্তুষ্টির জন্য দান করে আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধানবিরোধী সিদ্ধান্ত। তাদের কিতাবে লিখিত রসুল স. সম্পর্কীয় বিবরণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গোপন করে তারা। নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও অর্থসমাগম বন্ধ হওয়ার আশংকায় তারা বজায় রাখে এই গোপনীয়তা। এভাবে তুচ্ছ দুনিয়াই তাদের কাছে হয়ে উঠেছে মুখ্য। আর গৌণ হয়ে গিয়েছে চিরস্থায়ী আখেরাত। তারা পাপী। অথচ তওবা না করা সত্ত্বেও তারা মনে করে— আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন। তাদের এই ধারণাটিও ঘৃণ্য ও জঘন্য। রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তি বুদ্ধিমান যে অনুগত ও পরবর্তী পৃথিবীর পাথেয় সংগ্রহে নিয়োজিত। আর নির্বোধ ওই ব্যক্তি, যে কুপ্রবৃত্তির অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ সম্পর্কে অলীক ধারণা রাখে। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম। বাগবী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত শাদ্দাত ইবনে আউস থেকে।

এরপর বলা হয়েছে—'কিন্তু তার অনুরূপ সামগ্রী তাদের নিকটে এলে তা-ও তারা গ্রহণ করে।' এ কথার অর্থ— তারা করে চলে পাপের পর পাপ। এতদ্‌সত্ত্বেও মনে করে তারা ক্ষমার্হ। সুদ্দী বলেছেন, বনী ইসরাইলদের মধ্যে কাউকে বিচারক নিযুক্ত করা হলে সে নির্বিকারচিত্তে উৎকোচ গ্রহণ করতো। ঘুষ ছাড়া কারো পক্ষে রায় দিতো না। কেউ তাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিলে তারা বলতো আল্লাহ্ আমাকে মাফ করে দিবেন। ঘুষখোর কোনো বিচারককে অপসারণ করে অন্য কাউকে বিচারকের আসনে বসালে দেখা যেতো, সেও নির্বিবাদে উৎকোচ গ্রহণ শুরু করেছে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে—'কিতাবের অঙ্গীকার কি তাদের নিকট থেকে নেয়া হয়নি যে তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলবে না? এবং তারা তো তাতে যা আছে তা অধ্যয়নও করে।' এ কথার অর্থ— তাদের কিতাব তওরাতে উল্লেখ রয়েছে ওই অঙ্গীকারের অর্থ— যারা (তাদের পূর্ব-পুরুষেরা) আল্লাহ্র সাথে করেছিলো। ওই অঙ্গীকারের মূল কথা ছিলো— আল্লাহ্ সম্পর্কে তারা কোনো মিথ্যা কথা বলবে না। আর তওরাতে এ কথাও স্পষ্ট লেখা রয়েছে যে, পাপিষ্ঠরা পাপের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা পর্যন্ত (তওবা না করা পর্যন্ত) আল্লাহ্পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। ইহুদীরা এ সকল কথা পড়ে জেনে বুঝে নির্বিচারে করে চলেছে মিথ্যাচারের বেসাতি। আর কতদিন চালাবে তারা তাদের মিথ্যাচার? তারা কি সাবধান হবে না?

শেষে বলা হয়েছে—'যারা সাবধান হয় তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি এটা অনুধাবন করো না?' এ কথার অর্থ— তোমরা কি এতটুকু অনুধাবন করতে পারো না যে, মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা হিংসা, ষড়যন্ত্র— এ সকলকিছুই পাপ। তোমরা কি বুঝতে পারো না, সময় থাকতে সাবধান হওয়া উচিত। যারা সময় থাকতে সাবধানতা (তাকওয়া) অবলম্বন করে তারাই উত্তম বিবেচনা করে পরকালের আবাসকে। আর পরকালের আবাস চিরস্থায়ী। হে অবিমৃশ্য ইহুদীকুল! তোমরা চলেছো অত্যন্ত নিকৃষ্ট গন্তব্যের দিকে যে গন্তব্যে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন লেলিহান শাস্তি— তোমরা কি তা অনুধাবন করতে পারো না (আফালা তা'ক্বিলুন)।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৭০, ১৭১

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝ وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

❑ যাহারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে আমি তো তাহাদিগের ন্যায় সৎকর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করি না।

❑ স্মরণ কর, আমি পর্বতকে তাহাদিগের ঊর্ধ্বে স্থাপন করি, আর উহা ছিল যেন এক চন্দ্রাতপ; তাহারা মনে করিল যে উহা তাহাদিগের উপর পড়িয়া যাইবে; বলিলাম 'আমি যাহা দিলাম তাহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং উহাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ কর যাহাতে তোমরা সাবধান হও'।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে—'যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে আমি তো তাদের মতো সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না'। মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও তাঁর সাথীগণকে লক্ষ্য করে। বনী ইসরাইলদের (আহলে কিতাবদের) মধ্যে তাঁরা ছিলেন খাঁটি ইমানদার। ছিলেন তওরাতের একনিষ্ঠ অনুসারী। তাঁরা কখনো তওরাতের কোনো বিধান পরিবর্তন করেননি। কখনো উৎকোচ গ্রহণ করে তওরাতের নামে ভুল সিদ্ধান্ত দেননি। রসুল স. হিজরত করে মদীনায় এলে তাঁরা বিশুদ্ধচিত্তে সত্যধর্ম ইসলামকে গ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন রসুল স. এর সম্মানিত সাহাবী। আতা বলেছেন, এই আয়াতের লক্ষ্য উম্মতে মোহাম্মদী।

'ইন্না লা নুদ্বীয়ু' অর্থ আমি নষ্ট করি না। 'আজরাল মুসলিহীন' অর্থ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল। এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, সৎকর্মপরায়ণতাই আসলে শ্রমফল বা সওয়াব বিনষ্ট হওয়ার অন্তরায়।

পরের আয়াতে (১৭১) বলা হয়েছে—'স্মরণ করো আমি পর্বতকে তাদের ঊর্ধ্বে স্থাপন করি, আর তা ছিলো যেনো এক চন্দ্রাতপ; তারা মনে করলো যে তা তাদের উপর পড়ে যাবে।' এখানে 'উজকুরু' (স্মরণ করো) কথাটি উহ্য রয়েছে। 'নাতাক্বনা' শব্দের অর্থ গুঁজে দেয়া বা ঠেলে দেয়া। কিন্তু এখানে 'নাতাক্বনাল জাবালা' কথাটির অর্থ হবে— আমি পর্বতকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করি। 'ফাওক্বাহুম' (তাদের উপর) অর্থ— বনী ইসরাইলদের উপর। বনী ইসরাইলেরা কঠিন বিধান সম্বলিত তওরাতের গুরুভার বহন করতে অস্বীকৃত হয়েছিলো। তখন আল্লাহ্পাক পাহাড় উঠিয়ে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। এ রকম করা হয়েছিলো এজন্য যে, পর্বতপতনের ভয়ে তারা যেনো তওরাতকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। 'কাআন্নাহু জুল্লাতুন' অর্থ— আর তা ছিলো যেনো এক চন্দ্রাতপ বা ঝুলন্ত ছাদ। 'ওয়া জন্নু আন্নাহু ওয়াক্বিউ'ম বিহীম' অর্থ— তারা মনে করলো যে তা তাদের উপর পড়ে যাবে।

এরপর বলা হয়েছে—'বললাম, আমি যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং এতে যা আছে তা স্মরণ করো যাতে তোমরা সাবধান হও।' এ কথার অর্থ— আমি বনী ইসরাইলদেরকে নির্দেশ দিলাম, আমি যে তওরাত তোমাদেরকে দান করলাম সেই পবিত্র তওরাত কিতাবকে নির্বিবাদে গ্রহণ করো। নয়তো মাথার উপরের ওই ঝুলন্ত পর্বত তোমাদের উপর ফেলে দেয়া হবে। সুতরাং সন্তুষ্টচিত্তে তওরাতকে গ্রহণ করে তার বিধানানুযায়ী আমল করো। তওরাতের নির্দেশ কখনো বিস্মৃত হয়ো না। যদি এ রকম করো, তবে সম্ভবতঃ তোমরা মুত্তাকী (সাবধানী) হতে পারবে। পরিত্যাগ করতে পারবে সকল অসৎ স্বভাব এবং বেঁচে থাকতে পারবে সকল পাপ থেকে।

www.eelm.weebly.com

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۙ اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

❒ স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদিগের নিজদিগের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন 'আমি কি তোমাদিগের প্রতিপালক নহি?' তাহারা বলে, 'নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী রহিলাম।' এই স্বীকৃতিগ্রহণ এই জন্য যে তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল 'আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম,

❒ কিংবা তোমরা যেন না বল, 'আমাদিগের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদিগের পূর্বে শিরক করে, আর আমরা তো তাহাদিগের পরবর্তী বংশধর; তবে কি মিথ্যাশ্রয়ীদিগের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে?'

❒ এইভাবে নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি যাহাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।

'তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরকে বের করেন' কথাটির অর্থ— তোমার প্রভুপ্রতিপালক আদম ও আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরকে বের করেন এবং 'তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন' কথাটির অর্থ— এবং তিনি আদম ও আদম সন্তানদেরকে একে অপরের সাক্ষী বানান। অর্থাৎ আপনাপন পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে বের হওয়ার পর সকল মানুষ হয়ে গিয়েছিলো একে অপরের দর্শক।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা সাক্ষী রইলাম। এই স্বীকৃতি গ্রহণ এই জন্য যে, তোমরা যেনো কিয়ামতের দিন না বলো, আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম।'

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ হজরত আদমকে সৃষ্টি করার পর তাঁর পিঠের উপর হাত বুলালেন। তখন কিয়ামত পর্যন্ত যে সকল মানুষ পৃথিবীতে আসবে তাদের সকলকে তাঁর সামনে উপস্থিত করলেন। তাদের সকলের দু'চোখের মাঝে সৃষ্টি করলেন নূর। আদম বললেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! এরা কারা? আল্লাহ্তায়ালা বললেন, এরা সকলেই তোমার সন্তান। হজরত আদম দেখলেন, এক ব্যক্তির দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থান খুব উজ্জ্বল। ওই ব্যক্তিকে খুব ভালো লাগলো তাঁর। বললেন, হে আমার পরম প্রভু! এই লোকটি কে? আল্লাহ্ বললেন, এর নাম দাউদ। হজরত আদম বললেন, হে আমার প্রভুপালক! তুমি তার পৃথিবীর আয়ু নির্ধারণ করেছো কতদিন? আল্লাহ্ বললেন, ষাট বছর। আদম বললেন, আমার আয়ু থেকে তুমি তাকে চল্লিশ বছর আয়ু দিয়ে দাও। পৃথিবীর জীবন যাপনের পর হজরত আদমের যখন পরকাল যাত্রার সময় হলো, তখন তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন মৃত্যুর ফেরেশতা হজরত আজরাইল। হজরত আদম বললেন, এখনো তো আমার চল্লিশ বছর আয়ু রয়েছে। হজরত আজরাইল বললেন, সেই চল্লিশ বছর কি আপনি আপনার সন্তান দাউদকে দিয়ে দেননি? হজরত আদম তাঁর আয়ু প্রদানের কথা মনে করতে পারলেন না। তাই বলেন, না। হজরত আদমের এই বিস্মৃতিপ্রবণতার কারণেই তাঁর সন্তানেরাও বিস্মৃতিপ্রবণ। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ ভুলে তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেছিলেন। তাই তাঁর সন্তানেরাও ভুলে যায়।

হজরত আবু দারদা থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হজরত আদমকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্তায়ালা তাঁর ডান কাঁধে হাত রাখলেন। তখন অসংখ্য পিপীলিকার মতো তাঁর অনাগত সুন্দর বংশধরেরা দৃষ্টিগোচর হলো। এরপর আল্লাহ্তায়ালা হাত রাখলেন তাঁর বাম কাঁধে। তখন বেরিয়ে এলো ছোট্ট পিপীলিকার মতো অসংখ্য কুৎসিতদর্শন মানুষ। আল্লাহতায়ালা বললেন, তোমার ডান কাঁধ থেকে যারা বেরিয়ে এসেছে, তারা জান্নাতী। তাদের আনুগত্যে আমার কিছু এসে যায় না। আর তোমার বাম কাঁধ থেকে যারা বেরিয়ে এসেছে, তারা দোজখী। তাদের অবাধ্যতায় আমার কোনো পরোয়া নেই। আহমদ। মুকাতিল ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ এ রকম বর্ণনা করেছেন। মুকাতিলের বর্ণনায় অতিরিক্ত যে কথাগুলো রয়েছে তা হচ্ছে— এরপর আল্লাহ্তায়ালা সকলকে হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশে পুনঃস্থাপন করলেন। অংগীকারাবদ্ধ সকল মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে বের হয়ে মাতৃ-উদরের মাধ্যমে পৃথিবীতে আগমন না করবে, ততদিন পর্যন্ত কবরবাসীরা কবরেই শায়িত থাকবে (মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান হবে না)। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে এসে আদম সন্তানদের অনেকেই আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে থাকেন। ওই অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা অন্যত্র এরশাদ করেছেন— আমি তাদের অধিকাংশকে অঙ্গীকার রক্ষকরূপে পাইনি।

www.eelm.weebly.com

মুসলিম ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমি নিজেও রসুল স. এর নিকট এর মর্মার্থ জানতে চেয়েছিলাম। তিনি স. বলেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা আদমকে সৃষ্টি করার পর তাঁর অলৌকিক দক্ষিণ হস্ত আদমের পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে এলো আদম সন্তানদের একটি দল। আল্লাহ্ বললেন, আমি এদেরকে সৃষ্টি করেছি জান্নাতের জন্য। এরা জান্নাতবাসীদের মতো আমল করবে। এরপর আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করলেন তাঁর অলৌকিক বাম হাত। সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে এলো অনেক আদম সন্তান। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, দোজখের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি এদেরকেই। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! জান্নাতীরা ও জাহান্নামীরা তো নির্ধারিতই। তবে আর আমলের প্রয়োজন কী? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালা যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে সে জান্নাতের অনুকূল আমলই করে। সারা জীবনে না করলেও মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সে এমন আমল করে, যার ফলে জান্নাত হয়ে যায় তার জন্য অনিবার্য। দোজখের জন্য নির্ধারিতরাও তেমনি পৃথিবীতে দোজখের অনুকূল আমলই করে। সারা জীবনে না করলেও মৃত্যুর পূর্বে সে এমন আমল করে যার ফলে তার দোজখযাত্রা হয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবী। মালেক, আবু দাউদ, তিরমিজি, আহমদ, বোখারী, ইবনে হাব্বান হাকেম, বায়হাকী। তিরমিজি হাদিসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে মুসলিম ইবনে ইয়াসার হজরত ওমর থেকে হাদিসটি স্বকর্ণে শোনেননি। তাই বাগবী বলেছেন, কোনো কোনো হাদিস বিশারদগণের অভিমত এই— হজরত ওমর ও মুসলিম ইবনে ইয়াসারের মধ্যে রয়েছে আর একজন বর্ণনাকারী, যার নাম জানা যায়নি।

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সকল সন্তানকে বের করে সকলের নিকট থেকে সম্মিলিতভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। আরাফার প্রান্তরে সংঘটিত হয়েছিলো ওই অঙ্গীকারানুষ্ঠানটি। পিপীলিকার মতো ক্ষুদ্র আকৃতিতে তখন আরাফা প্রান্তরে সমবেত হয়েছিলো সকলে। আল্লাহ্তায়ালা সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভুপালক নই? সকলে বলেছিলো, হে আমাদের আল্লাহ্! আপনিই আমাদের প্রভুপ্রতিপালক। আমরা সকলে এই অঙ্গীকারের সাক্ষী। এরপর তিনি স. আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করলেন। আহমদ, নাসাঈ, হাকেম। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি শুদ্ধ।

হজরত ইবনে ওমর থেকে শিথিলসূত্রে ইবনে জারীর বলেছেন, এই আয়াতের প্রেক্ষিতে রসুল স. বলেছেন, চিরুণী দ্বারা আঁচড়িয়ে যেমন মস্তকের কেশগুচ্ছ থেকে সকল উকুন বের করে আনা হয়, তেমনি করে আল্লাহ্তায়ালা আদমের

www.eelm.weebly.com

পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করে আনলেন সকলকে। তারপর বললেন, আমি কি তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক নই? সকলে বললো, নিশ্চয়ই। তখন ফেরেশতারা বললো, আমরা সকলেই এই অঙ্গীকারানুষ্ঠানের সাক্ষী।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত আদম পৃথিবীতে প্রথম অবতরণ করেছিলেন হিন্দুস্তানের 'দাহনা' নামক স্থানে। সেখানেই তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সকল সন্তানকে বের করেছিলেন আল্লাহ্তায়ালা। সেখানেই স্বীকৃতি নিয়েছিলেন তাঁর প্রভুপালকত্বের।

কালাবী বলেছেন, ওই অঙ্গীকারের আয়োজন করা হয়েছিলো মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে। সুদ্দী বলেছেন, হজরত আদম পৃথিবীতে অবতরণ করার আগেই তাঁর অনাগত সন্তানদের নিকট থেকে কথিত অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিলো।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা সকল আদম সন্তানকে একত্র করে তাদের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন পৃথকভাবে। তারপর তাদেরকে দান করেছেন অবয়ব ও বাকশক্তি। তারপর তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন অঙ্গীকার। বলেছেন, বলো হে আদম সন্তানেরা! আমি কি তোমাদের প্রভুপালয়িতা নই? সকলেই জবাব দিয়েছেন, অবশ্যই। আল্লাহ্তায়ালা তখন বলেছেন, আমি তোমাদের এই অঙ্গীকারের সাক্ষী রাখলাম সাত আসমানকে, জমিনকে এবং তোমাদের পিতা আদমকে, যেনো তোমরা পুনরুত্থান দিবসে এ কথা বলতে না পারো যে, আমার একক অস্তিত্ব ও প্রতিপালকত্ব সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিলো না। হে আদম সন্তান! উত্তমরূপে অবগত হও— আমিই আল্লাহ্। আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো প্রভুপ্রতিপালক নেই। আমার সঙ্গে কখনো কাউকে শরীক কোরো না। পৃথিবীতে তোমাদের নিকট আমি প্রেরণ করবো আমার বাণীবাহক রসুলদেরকে। তারা তোমাদেরকে অদ্যকার এই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। আর আমি আসমানী কিতাবও অবতীর্ণ করবো সেখানে। সকল আদম সন্তান সমস্বরে জবাব দিলো, নিশ্চয় তুমিই আমাদের প্রভুপ্রতিপালক আল্লাহ্। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ছাড়া আর কোনো প্রভুপ্রতিপালক নেই। উপাস্যও কেউ নেই। এরপর সকলকে উপস্থিত করা হলো হজরত আদমের দৃষ্টি সীমানায়। উর্ধ্বজগত থেকে হজরত আদম দেখলেন, বিচিত্র আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট তাঁর সন্তানেরা। কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত। কেউ ধনী, কেউ নির্ধন। আর কেউ অজ্ঞ, কেউ বিজ্ঞ। তিনি বললেন, হে আমার পরম প্রভুপালয়িতা! তুমি আমার সন্তানদেরকে এতো বিচিত্রদর্শন করলে কেনো? আল্লাহ্তায়ালা বললেন, আমি চাই, আমার সকল বান্দা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক (চেয়ে দেখুক তাদের নিজের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে, যা অন্যের মধ্যে নেই— এই ভেবে কৃতজ্ঞচিত্ত হোক তারা)। হজরত আদম আরো দেখলেন, তার সন্তানদের মধ্যে যারা নবী ও রসুল, তাঁরা প্রদীপের মতো

www.eelm.weebly.com

সমুজ্জ্বল। আর তাঁদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে পৃথকভাবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— ওয়া ইজ্ আখাজনা মিনান্ নাবিয়্যিনা মীছাক্বাহুম থেকে ওয়া ঈসাব্নু মার্ইয়াম পর্যন্ত। স্মর্তব্য যে, হজরত ঈসা কোনো পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে আসেননি। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশে কেবল মাতার মাধ্যমে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন পৃথিবীতে। কিন্তু তিনিও ছিলেন নবী রসুলদের জন্য বিশেষভাবে আয়োজিত ওই অঙ্গীকারানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। হজরত উবাই ইবনে ক'াব বর্ণনা করেছেন, হজরত ঈসা রূহানীভাবে হজরত মরিয়মের মুখ দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন তাঁর মাতৃগর্ভে। আহমদ।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, আদম সন্তানদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের সময় আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে বলেছিলেন, হুঁশিয়ার! কাউকে আমার অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। যে এ রকম করবে সে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী, অবিশ্বাসী। আমি অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। সকল আদম সন্তান তখন আল্লাহ্তায়ালার এই ঘোষণার প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করলো। আরো বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্পাক তখন সকল আদম সন্তানদের বয়স, জীবিকা এবং বিপদ-মুসিবত লিখে দিলেন এবং বললেন, আমি চাই সকলে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে, আদম সন্তানদের নিকট থেকে তৌহিদের স্বীকৃতি এবং পারস্পরিক সাক্ষ্য গ্রহণের পর আল্লাহ্তায়ালা পুনরায় তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশে। অঙ্গীকারাবদ্ধ আদম সন্তানদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে না আসা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

বাগবী বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা আদম সন্তানদেরকে হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে-'আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে।' এখানে 'আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে'—এ রকম বলা হলো না কেনো? আমি বলি, হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে সকল আদম সন্তানের বের করার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে হাদিস শরীফে।

কোনো কোনো আলেম উদ্ভূত সমস্যাটির সমাধান দিয়েছেন এভাবে—পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ আপনাপন পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে আসে। আর পিতাপুত্র সকলেই তো হজরত আদমেরই সন্তান। সুতরাং এই অতি বাস্তব কথাটি উল্লেখের প্রয়োজনই বা কী?। বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ বলেই সম্ভবতঃ আলোচ্য আয়াতে আর উল্লেখ করা হয়নি।

আমি বলি, ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসে হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশে আল্লাহ্তায়ালার অলৌকিক হস্তদ্বয় স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে সুন্দর ও অসুন্দর মানুষের কথা। এ সকল কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমের কাঁধের উপর অথবা তাঁর সন্তানদের কারো কাঁধের উপর তাঁর হস্ত স্থাপন করেছিলেন।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, তাফসীরকারগণ বলেছেন, অঙ্গীকার গ্রহণের সময় পুণ্যবানেরা আল্লাহ্তায়ালার এককত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিলো আন্তরিক প্রসন্নতার সঙ্গে। কিন্তু অবিশ্বাসী ও কপটেরা স্বীকৃতি দিয়েছিলো আন্তরিক অপ্রসন্নতার সঙ্গে। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া লাহু আসলামা মান্‌ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌দ্বি ত্বাওআঁও ওয়া কারহা' (আর তাঁর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পন করেছে যা কিছু আছে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায়)।

'তারা বলে, নিশ্চয় আমি সাক্ষী রইলাম।' সুদ্দী লিখেছেন, এই কথাটি আল্লাহ্র। ওই অঙ্গীকার গ্রহণের সময় বান্দারা কেবল বলেছিলো 'বালা' (হ্যাঁ)। তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে বলেছিলেন— আমি এই 'মীছাকে আযলের' (অঙ্গীকার দিবসের) সাক্ষী। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতে উদ্ধৃত কথাটি ছিলো বান্দাদের। তারা তখন 'বালা' বলার পরক্ষণেই বলেছিলো, 'শাহিদ্‌না' (আমরা সাক্ষী রইলাম)।

কালাবী বলেছেন, উদ্ধৃত উক্তিটি ছিলো ফেরেশতাদের। ঘটনাটি ছিলো এই রকম— 'আমি কি তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক নই', এই প্রশ্নের জবাবে আদম সন্তানদের বালা (হ্যাঁ) উচ্চারণের পর আল্লাহ্তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা এই স্বীকৃতির সাক্ষী থেকো, তখন ফেরেশতারা বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমরা সাক্ষী রইলাম।'

শেষে প্রকাশ করা হয়েছে ওই অঙ্গীকার গ্রহণের কারণ। কারণটি আলোচ্য আয়াতের (১৭২) শেষ থেকে শুরু করে পরবর্তী আয়াতের (১৭৩) শেষ পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে এভাবে— এই স্বীকৃতি গ্রহণ এ জন্য যে, তোমরা যেনো কিয়ামতের দিন না বলো, 'আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম' (১৭২) কিংবা তোমরা যেনো না বলো, আমাদের পূর্ব-পুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরিক করে। আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি মিথ্যাশ্রয়ীদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? (১৭৩)।

এর পরের আয়াতে (১৭৪) বলা হয়েছে—'এভাবে নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।' 'ওয়া কাজালিকা নুফাস্‌সিলুল আয়াতি' অর্থ— এভাবে নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি। 'ওয়া লাআল্লাহুম ইয়ারজিউ'ন' অর্থ— যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। ইতোপূর্বে বর্ণিত মানুষের জন্মপূর্ব সময়ের অঙ্গীকার সম্পর্কিত হাদিসসমূহের আলোকে জমহুর তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতটির মর্মার্থ করেছেন এভাবে— এভাবে আমি আমার আয়াতকে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করি যেনো বান্দারা তাদের বিস্মৃত অঙ্গীকারের বিষয়ে চিন্তা করে, উপদেশ গ্রহণ করে এবং ফিরে আসে ইমানের পথে।

বায়যাবী ও তাঁর অনুসারীগণ আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করেছেন এভাবে— আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সকল সন্তানকে বের করে সকলের নিকট থেকে তাঁর অতুলনীয় এককত্ব ও প্রতিপালকত্বের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। তারপর পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে। দেয়া হয়েছে জ্ঞান ও

www.eelm.weebly.com

সুস্থ বিবেচনাবোধ। এই জ্ঞান সৃষ্টিগতভাবেই দেয়া হয়েছে তাদেরকে। এরপর প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাদেরকে জানানো হয়েছে জন্মপূর্ব সেই অঙ্গীকারের কথা। এখন প্রত্যাদেশ সঞ্জাত জ্ঞান এবং সৃষ্টিগত জ্ঞানই সেই স্বীকৃতি ও সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত।

বায়যাবী লিখেছেন, পূর্বের আয়াতে (১৭২-১৭৩) বলা হয়েছে— 'তোমরা যেনো কিয়ামতের দিন না বলো, আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম। কিংবা তোমরা যেনো না বলো, আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরিক করে আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি মিথ্যাশ্রয়ীদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে?' অবিশ্বাসীদের এ রকম অজুহাত উত্থাপনের কোনো সুযোগ সেদিন থাকবে না। কারণ, আল্লাহ্তায়ালা বিশদভাবে সত্যধর্মের বিবরণ দান করেছেন। জাগিয়ে তুলেছেন জন্মপূর্ব সময়ের সেই পবিত্র অঙ্গীকারের স্মৃতি। দিয়েছেন স্বভাবজ জ্ঞান, বিবেচনা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা। এতকিছু করার পর পূর্বপুরুষদের অজুহাত গৃহীত হতে পারে কীরূপে?

বায়যাবী আরো লিখেছেন, 'বিশদভাবে বিবৃত করি' কথাটির উদ্দেশ্য এই যে— ইতোপূর্বে বনী ইসরাইলদের নিকট থেকে বিশেষ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিলো। সেকথা তওরাতের মাধ্যমে জানানো হয়েছে। পুনরায় কোরআনের মাধ্যমে জানানো হলো মানুষের জন্মপূর্ব সেই অঙ্গীকারের কথা। এভাবে উপস্থাপন করা হলো বর্ণনাসঞ্জাত (নকলী) প্রমাণ। এর সঙ্গে রয়েছে স্বভাবগত জ্ঞান, অনুধাবন যোগ্যতা। এভাবে নকলী, আকলী— সকল দিক থেকে আমি বিশদভাবে বিবৃত করেছি আমার নিদর্শনরাজিকে। এ রকম করেছি এ জন্য, যেনো রুদ্ধ হয় অজুহাত ও কৌশল এবং যেনো প্রকৃতপথে (ইসলামের পথে) প্রত্যাবর্তন হয় সহজ, সহজতর।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৭৫

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ○

❐ তাহাদিগকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়িয়া শুনাও যাহাকে আমি দিয়াছিলাম নিদর্শন, অতঃপর সে উহাকে বর্জন করে ও শয়তান তাহার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বালআম বাউর ছিলো ইহুদী সম্প্রদায়ভূত। সে ছিলো এক আধ্যাত্মিক সাধক। তার পদস্খলনের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এ রকম বলেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ। আতীয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বালআম ছিলো বনী ইসরাইল। তাঁর উক্তিরূপে আবু তালহা উল্লেখ করেছেন, সে ছিলো কেনান অঞ্চলের লোক।

www.eelm.weebly.com

আমালিকাদের রাজ্যের এক শহরে বসবাস করতো সে। মুকাতিল বলেছেন, সে ছিলো বালকা নামক শহরের বাসিন্দা। এ ব্যাপারে হজরত ইবনে আব্বাস, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক এবং সুদ্দী যে বিবরণ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ।

হজরত মুসা নির্দেশপ্রাপ্ত হলেন, আমালিকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তাদেরকে উৎখাত করে তাদের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বনী ইসরাইলকে। তিনি তখন বনী ইসরাইলদেরকে নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন কেনান অঞ্চলের দিকে। সেখানকার এক শহরে বাস করতো বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক বালআম বাউর। ইসমে আজম জানতো সে। সকল দোয়াই কবুল হতো তার। কেনানের লোকেরা উপায়ন্তর না দেখে সমবেত হলো বালাআমের দরবারে। বললো, হে সাধকপ্রবর! আমরা বিপদগ্রস্ত। মুসা নবী তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে আমাদের রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ নিচ্ছে। শুনেছি সে খুবই উগ্র ও কঠোর। সে আমাদেরকে এ রাজ্য থেকে উৎখাত করে বনী ইসরাইলদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আমাদের সকলকে সে নাকি হত্যা করে ফেলবে। এখন আপনার সাহায্য ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। আপনি আমাদের পক্ষে এবং মুসা নবীর বিপক্ষে যদি দোয়া করেন, তবেই কেবল আমাদের জীবন রক্ষা হয়।

বালআম বললো, রে হতভাগ্যের দল! মুসা তো নবী। তাঁর সঙ্গে রয়েছে ইমানদার লোকেরা এবং ফেরেশতারা। আমি কীভাবে তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করবো। তোমরা নিতান্ত অজ্ঞ বলেই এ রকম বলতে পারলে। তোমাদের আবদার শুনলে আমার দুনিয়া ও আখেরাত— দু'টোই ধ্বংস হয়ে যাবে।

আগন্তুক জনতা কিন্তু নিরস্ত হলো না। তারা কাকুতি মিনতি করে একই নিবেদন জানাতে লাগলো বার বার। তাদের করুণ নিবেদন শুনে কিছুটা নরম হলো বালআম বাউর। বললো, ঠিক আছে, আমি তাহলে এস্তেখারা করে নেই। এস্তেখারা না করে কখনোই দোয়া করতো না সে। এস্তেখারার পর স্বপ্ন-নির্দেশের অপেক্ষা করতো। স্বপ্নে দোয়া করতে বলা হলেই কেবল দোয়া করতো। তার এবারের এস্তেখারা কিন্তু অনুকূল হলো না। স্বপ্নযোগে তাকে হজরত মুসার বিরুদ্ধে দোয়া করতে পরিষ্কার ভাবে নিষেধ করে দেয়া হলো। সে অপেক্ষমান জনপ্রতিনিধিদেরকে জানিয়ে দিলো এ কথা। কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা। তারা বালআমকে অনেক উপঢৌকন দিলো। তারপর বললো, দয়া করে বিপদকবলিতদেরকে রক্ষা করুন। এতে করে বৃদ্ধি পাবে আপনারই মহানুভবতা। বালআম বললো, ঠিক আছে। দেখি আর একবার এস্তেখারা করে।

পুনরায় এস্তেখারা করলো সে। কিন্তু এবার স্বপ্নযোগে কোনো প্রকার নির্দেশই সে পেলো না। সে লোকদেরকে জানালো, আমাকে যে এবার হ্যাঁ, না— কোনো কিছুই বলা হলো না। লোকেরা বললো, এতে করে বোঝা যাচ্ছে দোয়া করতে

www.eelm.weebly.com

আপনাকে নিষেধ করা হয়নি। যদি আমাদের জন্য দোয়া করা আল্লাহ্ অপছন্দ করতেন তাহলে নিশ্চয় স্পষ্ট করে আপনাকে নিষেধ করে দেয়া হতো। সুতরাং আপনি কালবিলম্ব না করে আমাদের জন্য দোয়া করুন।

জনতার অনুনয় বিনয় ও তাদের দেয়া উপঢৌকনের কারণে গলে গেলো বালআম। প্রশংসা ও পার্থিব প্রাপ্তির প্রভাবে সে হারিয়ে ফেললো তার বিশ্বাস ও শুভবিবেচনা। এক খচ্চরে আরোহণ করে সে রওয়ানা দিলো হিতান পর্বতের দিকে। লোকেরাও চললো তার সঙ্গে। উদ্দেশ্য, পর্বত শিখরে আরোহণ করে সে দেখে নেবে হজরত মুসার বাহিনীকে। বুঝতে চেষ্টা করবে তাদের শক্তিমত্তাকে। কিন্তু পাহাড়ের কাছে গিয়ে খচ্চর থেমে গেলো। খচ্চরকে প্রহার করলো সে। কিন্তু কয়েক পা যাবার পর পুনরায় থেমে গেলো খচ্চর। বালআম সেটিকে বার বার প্রহার করতে থাকলো। আল্লাহ্র ইচ্ছায় খুলে গেলো খচ্চরের বাকশক্তি। খচ্চরটি বললো, হতভাগ্য বালআম। কোথায় চলেছো তুমি? দেখতে পাচ্ছো না ফেরেশতারা বার বার আমার পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে। আর তুমি চলেছো আল্লাহ্র সত্য নবী ও ইমানদারদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে।

বালআম বাউর তবুও চললো হিতান পাহাড়ের দিকে। উঠে পড়লো চূড়ায়। তার সঙ্গীরাও উঠে পড়লো সেখানে। সে দোয়া শুরু করলো। কিন্তু যা উচ্চারণ করতে চাচ্ছিলো তা পারছিলো না। উচ্চারণগুলো হয়ে যাচ্ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত। শত চেষ্টা করেও সে তার রসনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলো না।

লোকেরা বললো, আপনি তো দেখি বনী ইসরাইলদের জন্যই দোয়া করছেন। আর আমাদের জন্য করছেন বদদোয়া। বালআম বললো, আমি তো চেষ্টা করছি। কিন্তু যা চাচ্ছি, উচ্চারণ করছি তার বিপরীত। আমাকে এ রকম করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

বালআমের বদদোয়ার উদ্যোগটি ছিলো আল্লাহ্তায়ালার অসন্তোষের কারণ। সেই অসন্তোষের ফল পেলো সে হাতে হাতে। তার জিহ্বা ঝুলে পড়লো বুক পর্যন্ত। সে লোকদেরকে বললো, দ্যাখো, তোমাদের জন্য আমার দুনিয়া ও আখেরাত— দু'টোই বরবাদ হয়ে গেলো। তোমাদেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলো না। এখন কৌশল ও ষড়যন্ত্র ছাড়া তোমাদের বাঁচার কোনো উপায় নেই। তোমরা তোমাদের কতিপয় সুন্দরী রমণীদেরকে পসরা সাজিয়ে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করার ছল করে বনী ইসরাইলদের নিকট পাঠাও। তাদের সৈন্যদের কেউ যদি তাদের সম্ভোগ করতে চায়, তবে তারা যেনো সে প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করে। এভাবে তাদের একটি সৈন্যকেও যদি তোমরা ব্যভিচার করাতে পারো, তবে তারা আর তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। লোকেরা খুবই পছন্দ করলো পরিকল্পনাটি। তারা পণ্য-পসারিনীর ছলে কিছু সুন্দরী ও সুসজ্জিতা রমণীকে ছেড়ে

www.eelm.weebly.com

দিলো বনী ইসরাইল বাহিনীর দিকে। তাদের একজন ছিলো খুবই সুন্দরী। নাম ছিলো তার কিসতী বিনতে সুর। সে গমন করছিলো যামরী বিন শালুম নামের এক গোত্রীয় নেতার সামনে দিয়ে। সে ছিলো শামউন গোত্রের নেতা। কিসতীর চোখ ধাঁধানো রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেলো যামরী। তার হাত ধরে ফেললো সে। তারপর তাকে নিয়ে উপস্থিত হলো হজরত মুসার নিকট। বললো, আমার ধারণা, আপনি বলবেন, এই সুন্দরী নারী আমার জন্য হারাম।

হজরত মুসা বললেন, হ্যাঁ। ওকে ছেড়ে দাও। ওই মহিলা তোমার জন্য হালাল নয়। যামরী বললো, আল্লাহ্র কসম! এই নারী আমাকে উন্মাদ করে দিয়েছে। সুতরাং আপনার নিষেধাজ্ঞা মেনে নিতে আমি অপারগ। এ কথা বলেই সে মেয়েটিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়লো তার তাঁবুতে। চরিতার্থ করলো তার কামনা। কিন্তু তার রতিকর্ম শেষ হতে না হতেই প্লেগে আক্রান্ত হলো বনী ইসরাইল জনতা। অল্প সময়ের মধ্যে মারা গেলো সত্তর হাজার লোক।

যায়হাজ বিন আয়জার বিন মারঅন ছিলেন বনী ইসরাইলদের আর এক গোত্রাধিপতি। হজরত মুসা তাঁকে দিয়েছিলেন সৈনিকদের বিচারকের দায়িত্ব। তিনি তখন ঘটনাস্থলে ছিলেন না। আপন তাঁবুতে ফিরে এসেই তিনি দেখলেন, মহামারী প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। শুনলেন, যামরীর কারণেই আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করেছেন এই গজব। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্পূর্ণ লৌহনির্মিত তীক্ষ্ণ বর্শাটি নিয়ে ছুটে গেলেন যামরীর তাঁবুর দিকে। ঢুকেই দেখলেন, তখনো তারা পরস্পরলগ্ন। যায়হাজ বর্শা ছুঁড়লেন। একই বর্শায় বিদ্ধ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী। তিনি বর্শাবিদ্ধ অবস্থায় দুজনকে উর্ধে উঠিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর কনুই তখন লেগে গেলো পাঁজরে। আর পাপিষ্ঠ লাশ দুটো লেগে গেলো তাঁর চোয়ালের সাথে। এভাবে লাশ দু'টোকে শূন্যে তুলে ধরে তিনি কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে থাকলেন, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! তোমার নাফরমানদের জন্য এই পরিণতিই শোভনীয়।

ধীরে ধীরে অপসারিত হলো গজব। নেমে এলো আল্লাহ্র অফুরন্ত রহমত। প্লেগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেলো অবশিষ্ট জনতা। তখন থেকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ বনী ইসরাইলেরা পশু জবাই করলে পশুর চোয়াল ও সামনের পাঁজরের পা দিতে শুরু করলো যায়হাজকে। পরবর্তী সময়েও রয়ে গিয়েছে তাদের ওই প্রচলনটি। পরে তারা জবাইকৃত পশুর চোয়াল ও রান দিতো তাঁর অধস্তন বংশধরদেরকে। প্লেগের মূল হোতাকে বধ করেছিলেন বলেই যায়হাজ পেয়েছিলেন ওই সম্মান।

মুকাতিলের বর্ণনায় এসেছে, বাল্কা নামক রাজ্যের শাসনকর্তা বালআম বাউরকে ডেকে বলেছিলো, মুসা ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে দোয়া করুন। বালআম বলেছিলো, আমিও বনী ইসরাইল। সুতরাং আমি তার বিরুদ্ধে বদদোয়া

www.eelm.weebly.com

করতে পারবো না। রাজা বললো, আমার নির্দেশ না মানলে তোমাকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলা হবে। ভীত হলো বালআম। সে তখন একটি খচ্চরে আরোহন করে চললো বনী ইসরাইল বাহিনীর দিকে। পথ চলতে চলতে একস্থানে থেমে পড়লো খচ্চরটি। বালআম তাকে প্রহার করলো। খচ্চর বলে উঠলো, তুমি আমাকে প্রহার করছো কেনো? আমি দেখতে পাচ্ছি সামনে লেলিহান আগুন। ওই আগুনই আমার সম্মুখযাত্রা স্থগিত করে দিয়েছে। বালআম ফিরে এলো। রাজাকে সে খুলে বললো সব কথা। রাজা বললো, অতো শতো বুঝি না। তোমাকে বদদোয়া করতে হবেই। না করলে আমি তোমাকে শূলে চড়াবো। মৃত্যু ভয়ে ভীত বালআম তখন ইসমে আজম পড়ে নিয়ে শুরু করলো তার অপপ্রার্থনা। আল্লাহ্পাকের দরবারে গৃহীতও হলো তার ওই অপপ্রার্থনাটি। ফলে বনী ইসরাইলেরা আটকা পড়লো তীহ্ প্রান্তরে। হজরত মুসা নিবেদন জানালেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! সবদিকই তো উন্মুক্ত। অথচ আমরা এখানে বন্দী হয়ে গেলাম কেনো? আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, বালআমের বদদোয়ার পরিণতিতে। হজরত মুসা বললেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি বালআমের বদদোয়া যেমন কবুল করে নিয়েছো, তেমনি আমার বদদোয়াও কবুল করে নাও। তুমি তার নিকট থেকে তার ইমান ও ইসমে আজম ছিনিয়ে নাও। হজরত মুসার দোয়া কবুল করা হলো। জবাই করা ছাগলের শরীর থেকে যেমন চামড়া ছিলে নেয়া হয়, তেমনি করে ছিনিয়ে নেয়া হলো বালআম বাউরের ইমান, ইসমে আজম ও বেলায়েত। শাদা কবুতরের মতো জ্যোতির্ময় এক অবয়ব বের হয়ে গিয়েছিলো বালআমের ভিতর থেকে। বালআম বাউরের এই বিপথগামিতার কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, হজরত জায়েদ বিন আসলাম এবং হজরত লাইছ বিন সা'দ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উমাইয়া বিন সলত সাকাফী সম্পর্কে। ওই লোকটি ছিলো আসমানী কিতাবের একনিষ্ঠ অধ্যয়নকারী। তাই সে জানতো আরব ভূমিতেই আল্লাহ্তায়ালা প্রেরণ করবেন শেষ পয়গম্বর। মনে মনে সে ভাবতো, নিশ্চয়ই আমাকেই দেয়া হবে সেই পয়গম্বরীর দায়িত্ব। কিন্তু যখন রসুল স. এর নবুয়তপ্রাপ্তির সংবাদ তার কাছে পৌঁছলো তখন তার অন্তরে প্রজ্বলিত হলো ঈর্ষার আগুন। তাই সে প্রত্যাখ্যান করলো রসুল স.কে। উমাইয়া ছিলো প্রতিভাদীপ্ত কবি ও বিশুদ্ধ বাগ্মী।

একবার অন্য দেশ থেকে সফর করে ফিরে আসার সময় বদর প্রান্তর অতিক্রম করছিলো সে। সে জানতে পারলো, কিছুকাল আগে এই প্রান্তরেই রসুল স. প্রতিপক্ষের অনেক লোককে হত্যা করেছেন। এই প্রান্তরেই ফেলে রাখা হয়েছে নিহতদের মরদেহগুলো। উমাইয়া তখন বললো, মোহাম্মদ সত্য নবী হলে এভাবে তার নিকটাত্মীয়দেরকে হত্যা করতে পারতো না।

www.eelm.weebly.com

উমাইয়ার মৃত্যুর পর তার বোন ফারিয়া উপস্থিত হলো রসুল স. এর দরবারে। রসুল স. তাকে বললেন, মৃত্যুকালে কী অবস্থা হয়েছিলো তার? ফারিয়া বললো, তখন তার শয্যাপার্শ্বে ছিলাম আমি। হঠাৎ দেখলাম, দু'জন লোক ছাদ ভেদ করে ঘরে প্রবেশ করলো। একজন বসলো উমাইয়ার শিয়রে। আর একজন বসলো তার পায়ের দিকে। পায়ের দিকের লোকটি তার সাথীকে জিজ্ঞেস করলো, এর অন্তর্জগত কি সতর্ক? শিয়রের জন জবাব দিলো, হ্যাঁ। পায়ের দিকের লোকটি পুনরায় বললো, তার বক্ষদেশ কি কুপ্রবৃত্তির অপপ্রভাব থেকে মুক্ত? তার সাথী জবাব দিলো, না। এ লোক প্রবৃত্তিতাড়িত, প্রতারক। একটু পরে জ্ঞান ফিরে এলো আমার। আমি বললাম, একি দেখলাম আমি। তারপর উমাইয়াকে খুলে বললাম সব কিছু। শয্যাশায়ী উমাইয়া ছিলো পূর্ণ সচেতন। সে আমার দর্শনের ব্যাখ্যা করলো এভাবে— আমার জন্য উত্তম কিছু নির্ধারণ করা হয়েছিলো। কিন্তু তা ফিরিয়ে নেয়া হলো। এটুকু বলার পর সে রোগ যন্ত্রণায় বেঁহুশ হয়ে পড়লো। হুঁশ ফিরে এলে বললো, জীবন যতই দীর্ঘ হোক না কেনো, শেষ গন্তব্য তো ধ্বংসের দিকেই। আমার সম্মুখে যে অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে তার বিবরণ দেয়া অপেক্ষা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ছাগল চরানোই ছিলো আমার জন্য শ্রেয়। হায়! তা যদি করতে পারতাম (যদি পৃথক হয়ে যেতে পারতাম সকল মানুষের নিকট থেকে)। এরপর সে তার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করলো এভাবে—

'নিঃসন্দেহে হিসাবের দিনটি হবে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ দিবস। ওই দিবসটি হবে সবচেয়ে ভারী, সবচেয়ে ভয়াবহ। ওই ভয়াবহতা দর্শনে নিমেষের মধ্যে শিশু হয়ে যাবে বয়োবৃদ্ধ।'

রসুল স. বললেন, তোমার ভ্রাতার আরো কিছু কবিতা আমাকে শোনাও। ফারিয়া তার ভাইয়ের আরো কিছু কবিতা পাঠ করলো। তিনি স. বললেন, তোমার ভ্রাতার কবিতাগুলো ইমানদার, কিন্তু তার হৃদয় ছিলো কাফের। —এই ঘটনাটিই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত।

এক বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে এসেছে, বনী ইসরাইলের বাসুলাম নামক এক লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি। তাকে দেয়া হয়েছিলো তিনটি দোয়ার অধিকার। অর্থাৎ তাকে জানানো হয়েছিলো, তোমার তিনটি দোয়া কবুল করা হবে। লোকটি ছিলো স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। তার স্ত্রী একদিন বললো, তুমি আমার জন্য দোয়া করো— যেনো আল্লাহ্ আমাকে বনী ইসরাইলদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী করে দেন। বাসুলাম এ রকমই দোয়া করলো। সঙ্গে সঙ্গে দোয়া কবুল হলো। তার স্ত্রী হয়ে গেলো সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী। কিন্তু রূপসী নারী তখন স্বামীকে মনে করতে লাগলো তার অনুপযুক্ত। স্বামীর প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন শুরু করলো সে। বাসুলাম মনোক্ষুণ্ন হলো। সে আর ধৈর্য রাখতে পারলো না। দোয়া করলো, হে আল্লাহ্! একে কুকুর

www.eelm.weebly.com

বানিয়ে দাও। দ্বিতীয় দোয়াটিও কবুল হলো সঙ্গে সঙ্গে। তার স্ত্রী হয়ে গেলো কুকুর। অন্য কুকুরদের মতো সারাক্ষণ সে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিলো। বাসুলামের পুত্র কন্যারা পড়লো মহাবিপাকে। মায়ের এ দূরবস্থা তারা সহ্য করতে পারলো না। পিতাকে বললো, এ অবস্থা তো সহ্য করা যায় না। লোকেরা আমাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করে। কুক্কুরীর পুত্র কন্যা বলে লজ্জা দেয়। তুমি তাড়াতাড়ি দোয়া করে আমাদের মাকে ভালো করে দাও। বাসুলাম পুনরায় দোয়া করলো, হে আল্লাহ্! তুমি তাকে প্রথম অবস্থায় ফিরিয়ে দাও। তাই হলো। বাসুলামের স্ত্রী হয়ে গেলো আগের মতোই সাধারণ ঘরের সেই ছাপোষা গৃহিণী। এভাবে তিনটি দোয়াই বিফলে গেলো বাসুলামের।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতরূপে বালআম বাউর এবং উমাইয়ার ঘটনা দু'টোই ব্যাপকবিদিত। আমি বলি, ওই বর্ণনাটি অসঙ্গত যেখানে বলা হয়েছে— বালআমের বদদোয়ায় বনী ইসরাইলেরা আটকা পড়েছিলো তীহ্ প্রান্তরে। কারণ বর্ণনাটির বিপক্ষে রয়েছে কোরআনের সুস্পষ্ট বিবরণ। সুরা মায়িদার ২৪ থেকে ২৬ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করলেই বিষয়টি আর কারো নিকট অস্পষ্ট থাকবে না। সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের আদেশ তারা মানেনি বলেই চল্লিশ বছর তীহ্ প্রান্তরে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো তাদেরকে।

হাসান ও ইবনে কীসান বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদী সম্প্রদায়ভূত মুনাফিকদের সম্পর্কে— যাদের নিকট রসুল স. ছিলেন আপন সন্তান অপেক্ষা অধিক পরিচিত। এ রকম সন্দেহাতীত পরিচিতি লাভের পরও তারা বিশুদ্ধচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করতো না। তাদের মুখে বিশ্বাস। আর অন্তরে অবিশ্বাস।

কাতাদা বলেছেন, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলকে লক্ষ্য করে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়নি। সাধারণভাবে এখানে এ কথাটিই বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্তায়ালা কোনো কোনো লোককে হেদায়েত দান করেন। কিন্তু তারা আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত সেই হেদায়েত গ্রহণ করতে চায় না। হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল লোকের বৃত্তান্ত জনসমক্ষে বিবৃত করুন (যাতে মানুষ সতর্ক হয়)। এ রকম অর্থ গ্রহণ করলে এখানে আয়াতি (নিদর্শন) কথাটির মর্মার্থ হবে— হেদায়েত।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং সুদ্দীর নিকট এখানে 'নিদর্শন' কথাটির অর্থ হবে— ইসমে আজম। হজরত ইবনে আব্বাসের অপর বর্ণনায় রয়েছে, এখানে ওই ব্যক্তিদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, অথচ তারা কিতাবের বিধানাবলী থেকে এমনভাবে বিচ্যুত হয়েছিলো যেমন করে সাপ বেরিয়ে যায় তার খোলস থেকে।

www.eelm.weebly.com

ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে এমন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে আল্লাহ্‌র নিকটে যা চাইতো, তাই পেতো। এরপর তার পশ্চাতে লাগলো শয়তান। আর শয়তানের প্ররোচনায় পড়েই সে হয়ে পড়েছিলো বিপথগামী।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗۤ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○ سَآءَ مَثَلَا ۨ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ○ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

❒ আমি ইচ্ছা করিলে উহা দ্বারা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে ও তাহার কামনা বাসনার অনুসরণ করে। তাহার অবস্থা কুকুরের ন্যায়; উহাকে তুমি ক্লেশ দিলে সে জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে এবং তুমি ক্লেশ না দিলেও জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপায়; যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের অবস্থাও এইরূপ, তুমি কাহিনী বিবৃত কর যাহাতে তারা চিন্তা করে।

❒ যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি জুলুম করে তাহাদের অবস্থা কত মন্দ!

❒ আল্লাহ্ যাহাকে পথ দেখান সেই পথ পায় এবং যাহাদিগকে তিনি বিপথগামী করেন তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি ইচ্ছা করলে এর দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম' এখানে 'এর দ্বারা' অর্থ নিদর্শনের দ্বারা, যে নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে। এভাবে আলোচ্য কথাটির মর্ম দাঁড়াচ্ছে— আমি ইচ্ছে করলে যে নিদর্শন তাকে দিয়েছিলাম, সেই নিদর্শনের মাধ্যমে তাকে পুণ্যবানদের মতো উচ্চ মর্যাদা দান করতাম। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে এ রকম— যদি আমি চাইতাম তবে বর্ণিত নিদর্শনের মাধ্যমে আমি তাকে অবিশ্বাস থেকে বাঁচিয়ে দিতাম।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে—'কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও তার কামনা বাসনার অনুসরণ করে।' এখানে 'আরদ্ব' (মাটি) বলে বুঝানো হয়েছে পার্থিবতাকে— যা নিকৃষ্ট। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, দুনিয়ার সকল সম্পদ, উপভোগের সামগ্রী— সকল কিছুই উৎপন্ন হয় মৃত্তিকা থেকে। তাই এখানে 'আরদ্ব' শব্দটির মাধ্যমে দুনিয়াকেই বুঝানো হয়েছে।

আখলাদা ও খালাদা শব্দ দু'টো সমার্থক। শব্দ দু'টোর অর্থ— ঝুঁকে পড়া, আকৃষ্ট হওয়া, প্রবিষ্ট হওয়া বা অবস্থান করা। যেমন বলা হয়— আখলাদা ফুলান বিল মাকাম (অমুক ব্যক্তি অমুক স্থানে অবস্থান করছে)।

'ওয়াত্তাবায়া হাওয়াহু' অর্থ কামনা বাসনার অনুসরণ করে। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতি মোহগ্রস্ততার কারণে বা মানুষকে তুষ্ট করার জন্য বালআম বাউরের মতো বদ্‌দোয়া করে— এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমার নিদর্শন থেকে।

দুনিয়ার আকৃষ্টি মানুষের স্বভাবগত বিষয়। আর উচ্চ মর্যাদা লাভ হয় কেবল আল্লাহ্‌তায়ালার মোহেরবাণীর কারণে। তাই এখানে উচ্চ মর্যাদার সম্পর্ক করা হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা ও দানের সঙ্গে। আর দুনিয়ামুখী হওয়া ও কামনা বাসনার সম্পর্ক করা হয়েছে বান্দার সঙ্গে। ইমাম বায়যাবী বলেছেন, উচ্চ মর্যাদার বিষয়টি আল্লাহ্‌তায়ালা সম্পৃক্ত করেছেন তাঁর মাশিয়াত বা অভিপ্রায়ের সঙ্গে। এক্ষেত্রে সন্দেহ হতে পারে যে, বান্দার কর্মকাণ্ড তাহলে কিছুই নয়। এই সন্দেহটি দূর করবার জন্যই 'দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে', 'কামনা বাসনার অনুসরণ করে'—এ কথাগুলো বলা হয়েছে। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়ই চূড়ান্ত কিন্তু মানুষের কর্মকাণ্ড সেই অভিপ্রায় বাস্তবায়নের কারণ বা মাধ্যম। কেউ উচ্চ মর্যাদার অনুকূল কাজ না করলে বুঝতে হবে, তার কাজ না করাটাই আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা। এক্ষেত্রে কারণের উৎস যেহেতু নেতিবাচক, তাই কারণও হয়ে পড়েছে নেতিবাচকতার অধীন। সকল কারণ বা মাধ্যমের মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়। আমরা যে সকল কারণ দেখি ও বুঝি সেই প্রকাশ্য কারণগুলো ওই মূল কারণের ছায়া বা প্রতিচ্ছায়া। এভাবে মুল বক্তব্যটি হতে পারতো এ রকম— 'ওয়ালাকিন্নাহু আ'রাদ্বা আ'নহা'(কিন্তু এ থেকে বিমুখ হলেন তিনি)। কিন্তু তা না করে এখানে বলা হয়েছে 'সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও তার কামনা বাসনার অনুসরণ করে।' এভাবে বলাতেই আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে অমান্য করার প্রকাশ্য কারণগুলো পরিদৃষ্ট হয়েছে। এ কথাটিও জানা গিয়েছে যে— পৃথিবী-প্রীতি সকল পাপের উৎস। এই হাদিসটি মারফু সূত্রে বর্ণিত। হাদিসটিকে হাসান ও বায়হাকী বলেছেন মুরসাল। কারণ এই সূত্রে কোনো সাহাবীর নামোল্লেখ নেই।

এরপর বলা হয়েছে—'তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়; তাকে তুমি ক্লেশ দিলে সে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে এবং তুমি ক্লেশ না দিলেও জিহ্বা বের করে হাঁপায়' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শনকে বর্জন করে ও কামনা

www.eelm.weebly.com

বাসনার অনুগামী হয়ে যে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় তাদের অবস্থা কুকুরের মতো। সকল পশু পরিশ্রান্ত হলেই কেবল হাঁপায়, কিন্তু কুকুর হাঁপায় সকল অবস্থায়। পরিশ্রান্ত হলেও। না হলেও। সকল অবস্থায় সে যেমন তার জিহ্বা বের করে রাখে, তেমনি কাফের সম্প্রদায়ও সকল অবস্থায় প্রকাশ করতে থাকে তাদের ভ্রষ্টতা, নিচতা ও হীনতাকে।

মুজাহিদ বলেছেন, ওই সকল লোকের অবস্থা কুকুরের মতো যারা কোরআন পড়ে কিন্তু তার উপর আমল করে না। উদ্ধৃত বাক্যটির উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে— যারা প্রকৃত অবিশ্বাসী, তাদেরকে তোমরা যতই সতর্ক করো, উপদেশ দাও, অথবা অন্য কোনো উপায়ে বুঝাতে চেষ্টা করো— তারা কখনও ইমান ও হেদায়েতকে গ্রহণ করবে না। তারা চির ভ্রষ্ট, চির নিকৃষ্ট এবং চির হতভাগ্য। এই বক্তব্যটি অন্য একটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে—'এবং তোমরা যদি তাদেরকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান করো, তবে তারা তোমাদের এ আহ্বানের অনুসরণ করবে না। তাদের অবস্থা সর্বদাই একই রকম থাকবে, তোমরা তাদের আহ্বান করো অথবা চুপ থাকো।'

এরপর বলা হয়েছে—'যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবস্থাও এইরূপ'—এখানে 'যে সম্প্রদায়' বলে বুঝানো হয়েছে ইহুদীদেরকে। তারা আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তারা এতোদিন ধরে তওরাত শরীফে শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর বিবরণ পাঠ করে এসেছে। তাঁর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রচার করেছে। কিন্তু রসুল স. যখন মদীনায় এলেন, তখন তাঁকে দেখে, তাঁর মোজেজাসমূহ অবলোকন করে এবং পবিত্র কোরআনের বাণী শুনেও তাঁকে রসুল বলে স্বীকার করলো না। পিতা-মাতার চোখে আপন সন্তান যেমন অতি পরিচিত, তেমনি নিখুঁত পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও তারা রসুল স. এর অনুসারী হলো না। প্রত্যাখ্যান করলো তাঁকে, তাঁর রেসালাতকে এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে। এভাবে তারা হয়ে পড়লো জিহ্বা বের করে সকল সময় হাঁপাতে থাকা কুকুরের মতো নিকৃষ্ট। তওরাতের নির্দেশনা ও উপদেশ তাদের কোনোই উপকারে এলো না। উল্লেখ্য যে, ইহুদীদের মতোন অন্য সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও আলোচ্য দৃষ্টান্তটির অন্তর্ভুক্ত।

শেষে বলা হয়েছে—'তুমি কাহিনী বিবৃত করো যাতে তারা চিন্তা করে।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ইহুদীদের সামনে উপরে বর্ণিত বিবরণসমূহ বিবৃত করুন— যাতে তারা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে। এভাবে গভীর গবেষণার মাধ্যমে সদুপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। যেনো বিরত হয় ওই সকল ব্যক্তির অনুসরণ থেকে, যারা চির ভ্রষ্ট।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, উপরে বর্ণিত দৃষ্টান্তটি উপস্থাপন করা হয়েছে মক্কার কাফেরদের অবস্থা বুঝানোর জন্য। তারা আকাংখা করতো, যদি তাদের নিকট কোনো পথপ্রদর্শক প্রেরিত হতো, যদি কোনো আহ্বানকারী আহ্বান জানাতো আল্লাহ্র প্রতি। এরপর আবির্ভূত হলেন মহানবী মোহাম্মদ স.। তিনি যে

www.eelm.weebly.com

সত্যবাদী, তাও তারা জানতো। কিন্তু জানা সত্ত্বেও তাঁর রেসালাতের দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে লাগলো তারা। কিছুতেই তারা আসতে সম্মত হলো না হেদায়েতের পথে। তাদেরকে আহ্বান করা ও না করা হয়ে পড়লো সমার্থক।

পরের আয়াতে (১৭৭) বলা হয়েছে— 'যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি জুলুম করে তাদের অবস্থা কতো মন্দ।' এই আয়াতটি মর্মগত দিক থেকে পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অথবা এটি সম্পূর্ণ পৃথক বক্তব্যসমৃদ্ধ একটি আয়াত। আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পাপীদের কৃত পাপ তাদের উপরে আপতিত হয়। অত্যাচারীর অত্যাচার আত্মঅত্যাচারেরই নামান্তর। যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে, তারা নিজেরাই হয়ে পড়ে প্রত্যাখ্যাত। তাই মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শাস্তি ভোগ করবে মিথ্যাচারীরাই। হায়! কতোই না মন্দ তাদের পরিণতি।

এর পরের আয়াতে (১৭৮) বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায় এবং যাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।' এখানে বলা হয়েছে 'ফাহুয়াল মুহ্তাদী' (সে-ই পথ পায়)। পথ বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে একবচনের শব্দরূপ। কিন্তু 'মাই ইউদ্বলিল' (যাকে বিপথগামী করেন) কথাটির 'বিপথ' অর্থগত দিক দিয়ে বহুবচন। শেষে বহুবচনকে প্রকাশ করা হয়েছে স্পষ্টরূপে এভাবে— 'উলায়িকা হুমুল খসিরূন' (তারাই ক্ষতিগ্রস্ত)। এভাবে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, হেদায়েতপ্রাপ্তদের পথ প্রকৃতপক্ষে একটিই (তৌহিদ, রেসালত, আখেরাত, তকদীর ইত্যাদি একই বিশ্বাসের বলয়ভূত)। তাই বলা হয়েছে—'ফাহুয়াল মুহ্তাদী'। এভাবে এই নির্দেশনাটি দেয়া হয়েছে যে, সকল হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা একটি একক সত্তার মতো। কারণ তাদের পথ এক। কিন্তু বিপথ ও কুপথের সংখ্যা অনেক। তাই ক্ষতিগ্রস্ত বিপথগামীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনের শব্দরূপ— 'আলখসিরূন'।

আরেকটি বিষয় এখানে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, পথপ্রাপ্তি ও পথভ্রষ্টতা— দু'টোই নির্ধারিত হয় আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে। আর হেদায়েত দান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে হেদায়েতের অধিকারী করে দেয়া। কেবল হেদায়েতের পথ বলে দেয়া বা বর্ণনা করা নয়। আল্লাহ্তায়ালা যাকে হেদায়েতের অধিকারী করে দেন, সে-ই লাভ করে সফলতা। মোতাজিলারা বলে, হেদায়েতের পথ বলে দেয়া বা পথের বিবরণ দেয়াই হেদায়েতে ইলাহীর অর্থ। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য তাদের অভিমতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে।

'আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান সেই পথ পায়'—কথাটির মাধ্যমে এ বিষয়টিও সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, হেদায়েত প্রাপ্তিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। যে হেদায়েতপ্রাপ্ত সে লাভ করবে আল্লাহ্তায়ালার অসংখ্য নেয়ামত। হেদায়েতপ্রাপ্তির মধ্যেই সেসকল বিষয়ের শুভসংবাদ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সেসকল কিছু বুঝতে এই একটি মাত্র ঘোষণাই যথেষ্ট যে— আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায়।

www.eelm.weebly.com

একবার জাবিয়াহ্ নামক স্থানে হজরত ওমর ভাষণ দান করলেন। আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পর তিনি বললেন— মাইইয়াহ্ দিহিল্লাহু ফালা মুদ্বিল্লালাহু ওয়া মাইইউদ্বলিল্হু ফালা হাদিইয়ালাহ্ (আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না এবং যাকে তিনি বিপথগামী করেন তাকে পথ প্রদর্শনের অধিকার কেউ রাখে না)।

ওই সমাবেশে বসেছিলো জনৈক খৃষ্টান, ইহুদী অথবা অগ্নি উপাসক আলেম। সে হজরত ওমরের ভাষণ শুনে কিছু বললো। হজরত ওমর তাঁর অনুবাদককে বললেন, কী বলছে লোকটি? অনুবাদক বললো, সে বলছে, আল্লাহ্ কাউকে বিপথগামী করেন না। হজরত ওমর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্র দুশমন! তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ই তো তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাকে বিপথগামী করে দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ই তোমাকে প্রবেশ করাবেন দোজখে। তোমরা কর প্রদানের মাধ্যমে সন্ধিবদ্ধ হয়েছো আমাদের সঙ্গে। নতুবা এই মুহূর্তে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। এ কথা শুনে লোকটি সেখান থেকে উঠে চলে গেলো। তখন সমাবেশে তকদীর সম্পর্কে ভিন্নমতাবলম্বী আর কেউ রইলো না।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৭৯

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ○

❒ আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি; তাহাদিগের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্দ্বারা তাহারা উপলব্ধি করে না, তাহাদিগের চক্ষু আছে তদ্দ্বারা দেখে না এবং তাহাদিগের কর্ণ আছে তদ্দ্বারা শ্রবণ করে না, ইহারা পশুর ন্যায়, না, উহা অপেক্ষাও অধিক মূঢ়! তাহারাই উদাসীন।

এখানে 'জারা'না' অর্থ— সৃষ্টি করেছি। 'লি জাহান্নামা' অর্থ— জাহান্নামের জন্য। 'কাছিরম্ মিনাল্জিন্নি ওয়াল ইন্সি' অর্থ বহু জ্বিন ও মানবকে। আদি অন্তের সকল কিছু আল্লাহ্র জ্ঞানায়ত্ব। তিনিই সকল সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন। অসীম জ্ঞানের কারণে এ কথাও তিনি উত্তমরূপে অবগত যে, তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে অনেক জ্বিন ও মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে কথাটিই এখানে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— আমি তো বহু জ্বিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি।

www.eelm.weebly.com

হজরত আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন জান্নাতীদেরকেও— যখন তারা তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে ছিলো (সকলে মিলে ছিলো আদি পিতা হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশে)। আর আল্লাহ্‌তায়ালা জাহান্নামকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন জাহান্নামীদেরকেও— যখন তারা ছিলো তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে। মুসলিম। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সে সকল হাদিসে বলা হয়েছে, হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সকল সন্তানদেরকে বের করে নিয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ করার কথা।

হজরত আবদুল্লাহ্‌ বিন আমর বিন আস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একদিন রসুল স. দু'টি লিখিত ফলক দু'হাতে নিয়ে গৃহাভ্যন্তর থেকে বের হয়ে এলেন। বললেন, তোমরা কি জানো, এই লিখিত দপ্তর দু'টো কী। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা তো এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। দয়া করে আপনি আমাদেরকে জ্ঞান দান করুন। রসুল স. তাঁর ডান হাতের ফলকটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এই দপ্তরটি আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকে লিখিত। এর মধ্যে লেখা রয়েছে জান্নাতীদের নাম, পিতার নাম এবং গোত্রের নাম। এরপর শেষ করে দেয়া হয়েছে লিপিবদ্ধ করার কাজ। এই তালিকার মধ্যে আর কখনো সংযোজন বা বিয়োজন ঘটবে না। এরপর তিনি স. তাঁর বাম হাতের ফলকটি দেখিয়ে বললেন, এই দপ্তরটিও আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকে লিখিত। দোজখীদের নাম, পিতৃপরিচয় ও গোত্র পরিচয় লেখা রয়েছে এর মধ্যে। এটাই দোজখীদের চূড়ান্ত তালিকা। এখানে সংযোজন বা বিয়োজনের আর অবকাশ মাত্র নেই। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তাহলে আমাদের কি আর কোনো আমল করার প্রয়োজন রয়েছে? জান্নাত ও জাহান্নামের সিদ্ধান্ত তো সুনির্ধারিত। রসুল স. বললেন, সোজা পথে চলতে থাকো। জান্নাতীদের শেষ জীবন হবে জান্নাতবাসীদের আমলের মতো— সারা জীবন ধরে সে যে আমলই করুক না কেন। দোজখীদেরও জীবন সাঙ্গ হবে দোজখীদের আমলের উপরে— সারা জীবন ধরে সে যে আমলই করুক না কেনো। এরপর তিনি স. তাঁর দু'হাতের দিকে ইশারা করলেন। তারপর লিখিত দপ্তর দু'টো কোথায় যেনো নিক্ষেপ করলেন (আমরা তার দিশা খুঁজে পেলাম না)। তারপর বললেন, তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান থেকে মুক্ত। জান্নাতী ও জাহান্নামীদের ফয়সালা তিনি সুসম্পন্ন করেই রেখেছেন। তিরমিজি।

একটি প্রশ্নঃ এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়ামা খলাকৃতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদুন' (ইবাদতের উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করিনি)। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়ালাকৃদ্‌ জারা'না লিজাহান্নামা কাছিরম মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনসি' (আমি তো বহু জ্বিন ও

www.eelm.weebly.com

মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি)। আয়াত দু'টো পরস্পরবিরোধী নয় কি? যাদেরকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের হেদায়েতপ্রাপ্তি তো অসম্ভব। অথচ মানুষ ও জ্বিন সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইবাদত করা (আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করা)। এই দ্বন্দ্বটির তবে সমাধান কী?

উত্তরঃ এখানে কোনো দ্বন্দ্ব আসলে নেই। মানুষ ও জ্বিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে— তারা আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর পরিচয় লাভ করবে। কিন্তু এ বিষয়টিও আল্লাহ্তায়ালার জানা যে, সবাই এরূপ করবে না। কেউ করবে কেউ করবে না। উদ্দেশ্য ও জানা— দু'টো পৃথক বিষয়। আর 'বহু মানুষ ও জ্বিনকে দোজখের জন্য সৃষ্টি করেছি' কথাটির অর্থও এ রকম নয় যে, তাদেরকে আমি সৃষ্টিই করেছি জাহান্নামের উদ্দেশ্যে। বরং কথাটির অর্থ হবে— আমি জানি অনেক মানুষ ও জ্বিন জাহান্নামের পথ ধরবে। যারা এ রকম করবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে যারা কার্যকর করবে না— তাদের সৃজনের পরিণতি অবশ্যই জাহান্নাম। অন্য এক আয়াতে তাই আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন—'লা আমলাআন্না জাহান্নামা মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাসি আজমাঈ'ন (আমি অবশ্যই জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে অনেককে একত্রে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো)।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'আমি মানুষ ও জ্বিনকে আমার ইবাদতের উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি'—আয়াতটি সাধারণ অর্থবোধক হলেও তা কেবল বিশেষ মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই আয়াতটির আসল অর্থ হবে— আমি বিশেষ বিশেষ মানুষ ও জ্বিনকে আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে (আমার পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে) সৃষ্টি করেছি। আর কারা ওই বিশেষ মানুষ তা আল্লাহ্ আগে থেকেই জানেন। —এই অভিমতটি প্রমাণবিহীন এবং ভুল।

মোতাজিলারা বলে এখানে 'লি জাহান্নামা' শব্দটিতে ব্যবহৃত 'লাম' অক্ষরটি পরিণতিপ্রকাশক। তাই কথাটির অর্থ হবে— আধিকাংশ মানুষ ও জ্বিনের পরিণতি হবে জাহান্নাম। সুতরাং জাহান্নামই যাদের সুনির্ধারিত পরিণতি তাদেরকে 'জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি'—এ রকম বলা অযৌক্তিক নয়। মোতাজিলারা পাপীদের গোনাহ্ আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়ের বাইরে সংঘটিত হয় বলে মনে করে। তাই তারা সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই কোরআনের ব্যাখ্যা করে থাকে। কিন্তু তাদের এ রকম ব্যাখ্যা আয়াতের প্রকাশ্য বিবরণের বিপরীত। কারণ, কোরআনের বহুস্থানে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, পুণ্য ও পাপ— কোনোটিই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়বহির্ভূত নয়।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে—'তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্দারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে তদ্দারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে তদ্দারা শ্রবণ করে না, তারা পশুর মতো, না, পশু অপেক্ষাও অধিক মূঢ়!' এ কথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ওই জাহান্নামীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের জ্ঞানবুদ্ধি আহরণের সকল সূত্র রুদ্ধ। তাদের হৃদয় রয়েছে বটে, কিন্তু সত্যকে অনুভব করতে তারা অসমর্থ। চোখও তাদের রয়েছে, কিন্তু সে চোখ সত্যদর্শন করতে অপারগ। তারা শ্রবণেন্দ্রিয়ধারীও, কিন্তু তা সত্যের আহ্বান শুনতে অক্ষম। পশুদের মতো তারা কেবল আহার, বিহার ও রতিকর্মসর্বস্ব জীবন যাপনে অভ্যস্ত। পশুরই মতো তারা। না, তাও নয়। তারা প্রকৃতপক্ষে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। কারণ পশুরাও উপকার ও ক্ষতির প্রভেদ বোঝে। বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে ক্ষতিকর বিষয় থেকে। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা জাহান্নামের পথে চলেছে— এ কথা বুঝতে পেরেও কেমন নির্বিকার। জ্ঞাতসারে জাহান্নামযাত্রার বিষয়টি এক আয়াতে বিবৃত হয়েছে এভাবে—'আপন সন্তানের পরিচয়ের মতো জানে তারা রসুলের পরিচয়, কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করেছে জুলুম ও অহমিকার কারণে।

কোনো কোনো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী আবার স্বভাবজ জ্ঞানও পুরোপুরি বিনষ্ট করে ফেলে। হারিয়ে ফেলে সুস্থ বিবেচনাবোধ। অথচ তারা জানে না, সকল জ্ঞানবান মানুষের উপরে রয়েছে শরিয়ত প্রতিপালনের দায়িত্ব। পশুকুলের উপরে এ দায়িত্ব নেই। তাই পশুকুল অভিযুক্ত হবে না। কিন্তু মানুষ হবে। সুতরাং দায়-দায়িত্ববোধহীন উদাসীন মানুষ তো পশুর চেয়ে নিকৃষ্টই।

শেষে বলা হয়েছে— 'উলাইকা হুমুল গফিলুন' (তারাই উদাসীন) এ কথার অর্থ— বোধহীন, প্রকৃত দৃষ্টি ও শ্রুতিহীন যারা— তারাই প্রকৃত অর্থে উদাসীন। সৃষ্টিকুলের কেউই এ রকম উদাসীন নয়। সকল সৃষ্টি সর্বক্ষণ স্মরণমুখর। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'ওয়া ইম্‌মিন শাইইন ইল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদিহি' ('এমন কোনো বস্তু নেই যে, আল্লাহ্‌র প্রশংসার তসবীহ্ পাঠ করে না)। আরো এরশাদ করেছেন— 'আপনি কি লক্ষ্য করেন নি যে আল্লাহ্ এমনই এক সত্তা যার জন্য আকাশ ও জমিনের মধ্যস্থিত সকলে সেজদা করে। এছাড়া সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পাহাড়, বৃক্ষ, পশু ও অধিকাংশ মানুষ তাঁকে সেজদা করে, অথচ অনেকের উপরে নির্ধারিত রয়েছে শাস্তি।'

মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, এক লোক আল্লাহ্ নাম উচ্চারণ করে নামাজের মধ্যে দোয়া করলো। আর একজন নামাজের মধ্যে 'আল্লাহ্' নামের স্থলে উচ্চারণ করলো 'রহমান'। তখন প্রথম জন দ্বিতীয় জনকে বললো, তুমি কাফের। আমরা তো কেবল এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করি। তুমি (আল্লাহ্ ও রহমান) দু'জনকে সম্বোধন করলে কেনো? ওই দুইজনের কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

www.eelm.weebly.com

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

❒ উত্তম নামসমূহ আল্লাহেরই, তোমরা তাঁহাকে সেই সব নামেই ডাকিবে; যাহারা তাঁহার নাম বিকৃত করে তাহাদিগকে বর্জন করিবে; তাহাদিগের কৃতকর্মের ফল তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

উত্তম নামসমূহ অর্থ গুণবত্তাপ্রকাশক নামসমূহ— যে নাম কেবল গুণ বা সিফাতকে প্রকাশ করে না, গুণধারীকে (আল্লাহ্‌কেও) নির্দেশ করে। আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তাবাচক নাম এবং গুণবাচক নামের মধ্যে আবার যথেষ্ট পার্থক্যও রয়েছে। সত্তাবাচক নাম একটি। আর গুণবাচক নাম অনেক। কিন্তু সকল গুণবাচক নামই ওই এক পবিত্র সত্তাকে নির্দেশ করে। আরবী ছাড়াও অন্যান্য ভাষায় আল্লাহ্‌তায়ালার অনেক গুণ প্রকাশক নাম রয়েছে। যেমন- খোদা, পরমাত্মা, বিশ্বাত্মা, পরম পুরুষ, বিধাতা, সুফী সম্প্রদায়দের মধ্যে ব্যবহৃত— ওয়াজিবুল ওজুদ (অনিবার্য অস্তিত্ব), ইল্লাতি তাম্মাহ্ (সকল কারণের কারণ) ইত্যাদি।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ওই নামগুলো স্মরণে রাখবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্‌তায়ালা বেজোড় ও একক পছন্দ করেন।

বোখারী ও মুসলিম কোনো একটি নির্দিষ্ট হাদিসে আল্লাহ্‌তায়ালার নিরানব্বইটি নামের উল্লেখ করেন নি। কারণ, তাঁদের অভিমত হচ্ছে— একই হাদিসে নিরানব্বই নামের উল্লেখ নেই। 'আদ্‌দাওয়াত' গ্রন্থে তিরমিজি ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে এই নামগুলো স্মৃতিবদ্ধ করবে, সে বেহেশতে যাবে। সে নামগুলো হচ্ছে—

আল্লাহুল্ লাজি লা ইলাহা ইল্লাহুয়ার রহমানুর রহীমু, আল্ মালিকু, আল কুদ্দুসু, আস্ সালামু, আল্ মু'মিনু, আল মুহাইমিনু, আল-আমীনু, আল জব্বারু, আল্ খফিদু, আর্ রফিয়ু, আল্ মুয়িয্যু, আল মুজিল্লু, আস্ সামীয়ু, আল্ বাসীরু, আল্ হাকামু, আল্ আদ্‌লু, আল্ লাত্বীফু, আল্ খবীরু, আল্ হালীমু, আল্ আজীমু, আল্ গফূরু, আশ্ শাকূরু, আল্ আলীয়্যু, আল্ কাবীরু, আল্ হাফীজু, আল্ মুক্বীতু, আল্ হাসীবু, আল্ জ্বলীলু, আল্ করীমু, আর্ রক্বীবু, আল্ মুজ্বীবু, আল্ ওয়াসিয়ু,

www.eelm.weebly.com

আল্ হাকীমু, আল্ ওয়াদূদু, আল্ মাজ্বীদু, আল-বায়িসু, আশ্ শাহীদু, আল্ হাক্কু, আল্ ওয়াকীলু, আল্ ক্বাবীয়্যু, আল্ মাতীনু, আল্ ওয়ালীয়্যু, আল হামীদু, আল্ মুহ্সী, আল্ মুব্দী, আল্ মুয়ীদু, আল্ মুহ্য়ী, আল্ মুমীতু, আল্ হাইয়্যু, আল্ কাইয়্যুমু, আল্ ওয়াজ্বিদু, আল্ মাজ্বিদ, আস্ সমাদু, আল্ ওয়াহিদু, আল্ ক্বদিরু, আল্ মুক্বতাদিরু, আল্ মুক্বাদ্দিমু, আল্ মুআখ্খিরু, আল্ আওয়ালু, আল্ আখিরু, আজ্ জহিরু, আল্ বাত্বিনু, আল্ ওয়ালিয়্যু, আল্ মুতাআ'লী, আল্ বার্রু, আত্ তাওয়াবু, আল্ মুন্তাক্বিমু, আল্ আফুবু, আর্ রউফু, আল্ মালিকুল মুল্কি, জুল জ্বালালি ওয়াল্ ইকরম, আল্ জ্বামিয়ু, আল্ গনিয়্যু, আল্ মুগনী, আল্ মানিয়ু, আদ্ দ্বর্রু, আন্ নাফিয়ু, আন্ নূরু, আল্-হাদী, আল্ বাদীয়ু, আল্ বাক্বী, আল্ ওয়ারিছু, আর্ রশীদু, আস্ সবুরু,

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র নাম উল্লিখিত নামগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আরও নাম রয়েছে তাঁর। তবে উল্লিখিত নামগুলো উল্লেখের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, যে এগুলো স্মরণে রাখবে সে জান্নাতে যাবে। তাই হয়তো রসুল স. এসকল নাম একত্রে উল্লেখ করেছেন।

তিরমিজি শরীফের মধ্যে যে নামগুলোর উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে ২৭টি নাম এমন রয়েছে যা শব্দগত দিক দিয়ে পবিত্র কোরআনের মধ্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। সেগুলো হচ্ছে—

আল্ ক্বাবিদ্বু, আল্ বাসিত্বু, আল্ খাকিদু, আর্ রফীয়ু, আল্ মুয়িয্যু, আল্ মুজিল্লু, আল্ আদ্লু, আল্ জ্বালীলু, আল্ বায়িছু, আল্ মুহ্সী, আল্ মুব্দী, আল্ মুয়ীদু, আল্ মুহ্য়ী, আল্ মুমীতু, আল্ ওয়াজ্বিদু, আল্ মাজ্বিদু, আল্ মুক্বাদ্ দিমু, আল্ মুআখ্ খিরু, আল্ ওয়ালীউ, জুল্ জ্বালালি ওয়াল ইক্রামি, আল্ মুক্বসিত্বু, আল্ মুগ্নী, আল্ মানিয়ু, আদ্ দ্বর্রু, আন্ নাফিয়ু, আল্ বাক্বী, আর্ রশীদু, আস্ সবুরু,

নিম্নের আয়াতের মধ্যে কতকগুলো গুণবাচক নাম উল্লেখ হয়েছে, কিন্তু তিরমিজি শরীফের বর্ণনায় তা উল্লেখ নেই। যেমন—

হুয়া খইরুঁও ওয়া আবক্বা, ইলাহুন শাকিরুন, রব্বুল আলামীন, আহাদুন, মালিকু ইয়াওমিদ্দীন, আল আয়্লা, আল আকরামু, খফিয়্যুন্, আ'লামু বিমান দ্বল্লা আন্ সাবীলিহি, ওয়া আয়্লামু বিল মুহতাদীন, আল্ ক্বরীবু, আন নাসীরু, আল ক্বদীরু, আল মুবীনু, আল খাল্লাক্বু, মুবতালিকুম, আল্ মূসিয়ু, আল্ মালিকু, আল্ কাফী, ফাত্বিরুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব, আল্ ক্বাইমু বিল ক্বিসত্বি। গাফীরুজ্জ জম্বি, ক্বিবিলুত তওবি, শাদীদুল্ ইক্বাব, নিয়্মাল মাওলা, আল গলিবু আলা আম্‌রিহী, সারীয়ুল হিসাব, ফালিক্বুল হাব্বি ওয়ান্ নাওয়া, ফালিক্বুল ইসবাহ্, জ্বায়িলুল্ লাইলি সাকানা, আল্লামুল গুয়ুব, আলিমুল গইবি ওয়াশ্ শাহাদাতী, জুত্ তাওলি, জুন্ ইন্তিক্বম, রফিয়ুদ্ দারাজ্বাত, জুল্ আরশ্, জুল্ মায়ারিজ্ব, জুল্

www.eelm.weebly.com

ফাদ্বলিল্ আযীম, জুল্ কুওয়াতি, জুল্ মাগফিরাত, জামিয়ুন্ নাসি, লিইওয়ামিন লা রয়বা ফিহি, মুতিম্মু নিয়্মাতিহি, মুতিম্মু নূরিহি, আদুউল লিল্ কাফিরীন, ওয়ালীউল্ মু'মিনীনা, আল্ ক্বহিরু ফাওক্বা ইবাদিহি, আস্রাউল হাসিবীন, মুখরিজুল মাইয়্যেতা মিনাল্ হাইয়্যে, মুহ্মিল মাওতা, আরহামুর রহিমীন, আহ্কামুল হাকিমীন, খয়রুর রযিক্বীন, খয়রুল মাকিরীন, খয়রুল ফাতিহীন, মুখ্যিল কাফিরীন, মুহিনু কাইদিল্ কাফিরীন, ফায়্আলুল্ লিমা ইয়ুরীদ, আল্ মুস্তায়ান, নূরুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব, আহ্লুত্ তাকওয়া, আহ্লুল্ মাগফিরাহ্, নিয়্মাল মাহিদুনা, রাব্বিন্ নায়্, মালিকিন্ নাস, ইলাহিন্নাস্, আক্বরবু ইলাইহি মিন্ হাব্লিল্ ওয়ারীদ, আল ক্বইমু আলা কুল্লি নাফ্সিম্ বিমা কাসাবাত্ আহাক্ব আন্ তাখ্শাহুল্ লাজি হুয়া আগনা ওয়া আক্বনা, ওয়াল্ লাজি হুয়া আমাতাওয়া আহ্ইয়া, ওয়াল্লাজি হুয়া আদ্বহাকা ওয়া আরশ, ওয়াল্ লাজি হুয়া আদহাকা ওয়া আরক্বা, ওয়াল্লাজি খলিক্বজ্ জাওজাইন্, আজ্ জাকারু ওয়াল উনছা, ওয়াল্ লাজি আহ্লাকা আদা নিল্ উলা, ওয়াল্ লাম্ ইয়াকুল্ লাহু ওয়ালাদুন্ (লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ুলাদ ওয়ালাম্ ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ), ওয়ালাম্ ইয়াকুন্ লাহু শরীকুন্ ফিল মুলকি, ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু ওয়ালীউম্ মিনাজ্ জুল্লি, আল্লাজি আন্যালা আলা আবদিহিল্ কিতাবু, আল্লাজি বিয়াদিহি মালাকুতু কুল্লি শাইইন্, আল্লাজি ইয়াব্ সুত্বর রিযক্বা লিমাইইয়াশা, আল্ লাজি ইয়াবদাউল্ খলক্বা সুম্মা ইয়ায়িদুহু, আল্রাজি বিয়া দিহিল্ মুল্কু, আল্ লাজি বাআ'ছা ফিল্ উম্মিয়্যীনার রসুলা, লাইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ্ জলেমীন— এ আয়াতকে হাদীসের মধ্যে ইসমে আজম বলা হয়েছে। এ ছাড়াও কোরআন মজীদের মধ্যে আল্লাহ্র সিফাত (গুণ) আরও বর্ণনা করা হয়েছে।

কোনো কোনো নাম অন্য হাদিসের মধ্যে এরূপও এসেছে যা কুরআন মজীদের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিরমিজি শরিফের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়নি। যেমন— আল হান্নান, আল মান্নান, আল জাওয়াদুআল আজওয়াদ, আল ফারদু, আল বিতর, আসসাদিকু, আল জামীলু, আল ক্বাদীমু, আল বার্রু, আল ওয়াফী, আল আদিলু, আল মু'ত্বি, আল মুগীছু, আত তাইয়্যেবু, আত ত্বাহেরু, আল মুবারাকু, খলিক্বশ শামসি ওয়াল ক্বমার, আল মুনিরু, আর্ রফিক্ব, আত তিফলুস সগীর, জাবীরুল আজমুল কাবীর, কাবীরু কুল্লা কাবীবিন্, আল্লাজী নাফসী বি ইয়াদিহি ইত্যাদি। তারপর এটাও মনে করা উচিত হবে না যে, আল্লাহ্র যে নামগুলো কোরআন মজীদে ও হাদিসে রয়েছে সেগুলো ছাড়া আল্লাহ্র আর কোনো নাম নেই। কেননা এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্তায়ালা তওরাত শরীফে তাঁর এক হাজার নাম লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. দোয়া করতেন— হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার সকল নামের মাধ্যমে, যা তুমি তোমার সত্তার জন্য নির্ধারণ করেছো এবং যেগুলো অবতীর্ণ করেছো কিতাবে, অথবা যে নাম সৃষ্টিকুলের কাউকে শিখিয়েছো কিংবা যে নামসমূহ তুমি বিশেষভাবে রেখে দিয়েছো তোমার অদৃশ্য জ্ঞানে।

উদ্ধৃত হাদিস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্তায়ালার নাম রয়েছে অসংখ্য। আমাদের কর্তব্য আমাদেরকে আল্লাহ্তায়ালার সকল নামের উপরেই ইমান আনতে হবে। সে নাম আমরা জানি অথবা নাই-ই জানি।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা তাঁকে সে সব নামেই ডাকবে; যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে; তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেয়া হবে।' এখানে উল্লেখিত 'ইলহাদ' বা 'লাহদুন' অর্থ বিকৃত করা বা সোজা পথ পরিত্যাগ করে বক্র পথে চলে যাওয়া, যা সত্য নয় তাকে সত্য বলে জানা। শব্দ দু'টো সমার্থক। যেমন 'ধর্মবিকৃতি ঘটিয়েছে' কথাটি 'আলহাদা ফিদ্দীন' অথবা 'লাহাদা ফিদ্দীন'— দুভাবেই প্রকাশ করা যায়।

এখানে 'যারা তাঁর নাম বিকৃত করে' বলে বুঝানো হয়েছে মুশরিকদেরকে। কারণ, তারা আল্লাহ্র নাম বিকৃত করে ওই বিকৃত নামে ডাকে তাদের প্রতিমাগুলোকে। এভাবেই তারা আল্লাহ্কে বানিয়েছে আল্লাত, 'আল আজিজ' কে বিকৃত করে বানিয়েছে আল উজ্জা এবং মান্নান থেকে বানিয়েছে মানাত। এ রকম তাফসীর করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মুশরিকেরা তাদের দেবতাকে বলে 'ইলাহ্'। তাদের ওই বিকৃতিকেই এখানে নির্দেশ করা হয়েছে 'যারা তাঁর নাম বিকৃত করে' কথাটির মাধ্যমে। হজরত ইবনে আব্বাস তার তাঁফসীরে বলেছেন, অভিধানজ্ঞগণ বলেছেন, আল্লাহ্র নাম বিকৃত করার অর্থ ওই সকল নামে আল্লাহ্তায়ালাকে ডাকা, যা তিনি নিজের জন্য পছন্দ বা নির্ধারণ করেননি। যা কিতাবে এবং হাদিসে উল্লেখিত হয়নি। যেমন কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে বলে তাঁকে বলা যাবে— জাআদ (সুপ্রচুর দানশীল)। কিন্তু সখী (দাতা) বলা যাবে না তাঁকে— কারণ তা কোরআনে নেই। তেমনি তাঁকে আলীম (জ্ঞানী) বলা যাবে, কিন্তু বলা যাবে না আকেল (বুদ্ধিমান) ইত্যাদি।

আবার কোরআনে স্পষ্ট থাকলেও কতকগুলো বিশেষণে তাঁকে অভিহিত করা যাবে না। যেমন কোরআন মজীদে বলা হয়েছে— 'ইউখদিউনাল্লহা ওয়া হুয়া কদিউ'হুম' (তারা আল্লাহর সঙ্গে প্রতারণা করতে চায় অথচ তিনিই প্রতারণায় শ্রেষ্ঠ)। — এ রকম উল্লেখের কারণে আল্লাহ্কে কিছুতেই শ্রেষ্ঠ প্রতারক বলা যাবে না। উদ্ধৃত আয়াতের উদ্দেশ্য কিন্তু আল্লাহ্তায়ালাকে শ্রেষ্ঠ প্রতারক প্রমাণ

www.eelm.weebly.com

করা নয়। বরং আয়াতটির মর্মার্থ হচ্ছে— তোমরা প্রতারণা করো, আর যাই করো— কোনো দিক দিয়েই তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না। কারণ তোমরা দুর্বল। আর আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। দুর্বল প্রতারণা যেমন সবল প্রতারণার নিকটে পরাস্ত হয়, তেমনি আল্লাহ্‌তায়ালার অতুলনীয় শক্তির কাছে পরাভূত হয় তোমাদের সকল প্রতারণা, সকল অপচেষ্টা।

আর একটি দৃষ্টান্তঃ এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া মাকারু ওয়া মাকারল্লহ্ ওয়াল্লহু খইরুল মাকিরীন' (তারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, অথচ আল্লাহ্‌তায়ালাই উত্তম ষড়যন্ত্রকারী)। আয়াতে এ রকম উল্লেখ থাকলেও আল্লাহ্‌তায়ালাকে কখনোই অভিহিত করা যাবে না 'ষড়যন্ত্রকারী' বলে। কারণ ষড়যন্ত্রপ্রবণতা একটি দোষ। আর সকল দোষত্রুটি ও সৌন্দর্যহীনতা থেকে তিনি চিরমুক্ত, চির পবিত্র। আয়াতটির মর্মার্থ আসলে এ রকম— আল্লাহ্‌তায়ালার বিরুদ্ধে তোমাদের কোনো প্রকার প্রচেষ্টাই সফল হবে না। কোনো প্রকার ষড়যন্ত্রও নয়। কারণ তোমরা ও তোমাদের ষড়যন্ত্র দুর্বল। আল্লাহ্‌তায়ালার অসীম শক্তিমত্তার বিরুদ্ধে তোমাদের সকল ষড়যন্ত্র পরাভূত হবেই।

এ ধরনের দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। যেমন আল্লাহকে বলা যাবে— 'কৃইম বিল কিসত্' (নিষ্ঠার সাথে প্রতিষ্ঠিত), কিন্তু তাঁকে শুধু 'কৃইম' (নিষ্ঠাবান) বলা যাবে না। বলা যাবে সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। অথবা শুধু 'স্রষ্টা' (খালেক), কিন্তু 'বানর ও শূকরের স্রষ্টা'— এ রকম বলা যাবে না। কারণ এ রকম বলার মধ্যে রয়েছে অপবাদের গন্ধ। আবার এ রকমও বলা যাবে না যে— তিনি 'জায়েদ' নামের কোনো বাদশাহ্‌র চেয়ে বড়। এ রকম তুলনা থেকে তিনি পবিত্র। তিনি তো অতুল, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সমকক্ষহীন।

উপরের আলোচনায় এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, স্বধারণার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার কোনো নাম নির্ধারণ করা যাবে না। কেবল কোরআন মজীদ ও হাদিস শরীফে উল্লেখিত নাম সমূহের মাধ্যমে কেবল ভাবতে হবে আল্লাহ্‌কে। তওরাতে উল্লেখিত নামের মাধ্যমে ডাকা যাবে না। কারণ ইহুদীরা তওরাত বিকৃত করেছে। তবে যে সকল তওরাত বিশেষজ্ঞ রসুল স. এর নিকট আত্মসমর্পণ করে খাঁটি মুসলমান হয়েছিলেন, তারা যদি তওরাতে উল্লেখিত আল্লাহ্‌র কোনো নামের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, তবে সে নামে তাঁকে আহ্বান করা যাবে। এ রকম ব্যক্তিত্ব ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম। হজরত ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু হোরায়রা প্রমুখ তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন তওরাতের অনেক তথ্য। আর সেগুলোকে তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাসও করতেন।

www.eelm.weebly.com

উপরে বর্ণিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— ওই সকল লোকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করো, যারা আল্লাহকে শরিয়ত সমর্থিত নামে ডাকে না, ডাকে বিকৃত নামে। এ রকম অর্থও দাঁড়াতে পারে কথাটির— আল্লাহ্র নির্ধারিত নামসমূহ যারা মানে না, আল্লাহ্কে ডাকে তাদের স্বরচিত নামে, তাদের পরোয়া তোমরা কোরো না। তাদের বিদ্রূপবানকেও তোমরা উপেক্ষা করে চলো। যেমন তোমরা রহমান নামের মাধ্যমে আল্লাহ্কে ডাকলে তারা ঠাট্টা করে বলে— আমরা তো রহমানে ইয়ামাসা ছাড়া অন্য কাউকে চিনি না। আলোচ্য বাক্যের নির্দেশনাটি এ রকমও হওয়া সম্ভব যে— হে বিশ্বাসীগণ! মুশরিকেরা তাদের দেবতাকে আল্লাহ্র নামে ডাকে। তাদের ওই সম্বোধনের শব্দরূপটি দাঁড় করায় স্ত্রীলিঙ্গে। তোমরা সে কারণে মনোক্ষুণ্ণ হয়ো না। সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর লোক তোমরা। তারা অংশীবাদী। তোমরা বিশ্বাসী। সুতরাং বর্জন করো তাদেরকে। আল্লাহ্তায়ালাই তাদেরকে যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি দান করবেন। তাই এই নাম বিকৃতির প্রতিফল হবে অত্যন্ত ভয়ংকর।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৮১

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ۝

❐ যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এক দল লোক আছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায়বিচার করে।

বাগবী উল্লেখ করেছেন, আতার বিবরণে রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতে বলা হয়েছে মুহাজির, আনসার এবং তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের কথা।

কাতাদা বলেছেন, আমার নিকট এই তথ্যটি পৌঁছেছে যে, রসুল স. এই আয়াত পড়লে সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলতেন এই আয়াত তোমাদের জন্য। তোমাদের সামনে যারা রয়েছে, তাদেরকেও (ইহুদীদের পূর্ব পুরুষদেরকেও) দেয়া হয়েছিলো এ রকম সাধুবাদ। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে— 'মুসার সম্প্রদায় থেকে একটি দল সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন করবে এবং ন্যায়বিচার করবে।'

কালাবী বলেছেন, কোনো বিশেষ উম্মত এই আয়াতের লক্ষ্য নয়। বরং বিশেষ ও সাধারণ— সকল শ্রেণীর ও সকল যুগের ন্যায়বান বিশ্বাসীরাই এই আয়াতের বিবরণভূত। ইতোপূর্বে (১৭৯) আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছিলো— 'আমিতো বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি।' আর এখানে এসে বলে দেয়া হলো জান্নাতীদের কথা— যারা ন্যায়ের পথপ্রদর্শক এবং ন্যায়বিচারক।

www.eelm.weebly.com

কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক যুগের ন্যায়বানদের ঐকমত্য নির্ভুল। ওই হাদিসের সঙ্গে রয়েছে এর সম্পর্ক যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সব সময় এমন একটি দল থাকবে, যে দল হবে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশের বিশুদ্ধ অনুগামী। অসহযোগী ও বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবেই একদিন এসে পড়বে কিয়ামত। বোখারী, মুসলিম। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান ও মুগীরা বিন শো'বা থেকে। —এই অভিমতটি কিন্তু ভুল। আর আলোচ্য আয়াতের সঙ্গে উদ্ধৃত হাদিসটির কোনো সম্পর্কও নেই। কেননা, প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দল থাকবেই— এ রকম কথা আলোচ্য আয়াতে নেই।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৮২, ১৮৩

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۝

❒ যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে আমি তাহাদিগকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাই যে তাহারা জানিতেও পারিবে না।

❒ আমি তাহাদিগের সময় দিয়া থাকি; আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে তারা জানতেও পারবে না।' এখানে 'যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে' বলে নির্দেশ করা হয়েছে মক্কার কাফেরদেরকে। বলা হয়েছে, তাদেরকে আমি ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো, কিন্তু তারা জানতেও পারবে না। আতা বলেছেন, 'তারা জানতেও পারবে না' কথাটির অর্থ— আমি তাদেরকে চরম পরিণতিতে পৌঁছাবো অত্যন্ত গোপনে— ফলে তারা বিষয়টি অনুমানও করতে পারবে না। কালাবী বলেছেন, কথাটির অর্থ— আমি তাদের স্বভাব আচরণ— সব কিছু তাদের দৃষ্টিতে করে দিবো শোভন। ফলে তারা আত্মপ্রসাদে মগ্ন থাকবে সব সময়। আর এদিকে আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে নিয়ে যেতে থাকবো ধ্বংসের দিকে। জুহাক বলেছেন, বক্তব্যটির অর্থ— তারা যতো নতুন পাপ করবে, আমি ততই তাদেরকে দান করবো নতুন নতুন নেয়ামত। আর এদিকে চলতে থাকবে তাদের ধ্বংসের

www.eelm.weebly.com

পথে নীরব অভিযাত্রা। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— আমি তাদের সকল নেয়ামত দান করবো, কিন্তু ভুলিয়ে দেব কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিন্তা। আর এভাবেই আমি ক্রমে ক্রমে তাদেরকে নিয়ে যাবো বিনাশের দিকে কিন্তু তারা থাকবে বেখবর।

পরের আয়াতে (১৮৩) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি; আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।' এখানে 'আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি' কথাটির অর্থ— আমি তাদের পৃথিবীর আয়ু বাড়িয়ে দেই। কথাটির যোগসূত্র রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই' কথাটির সঙ্গে। ওই যোগসূত্রসহ বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— আমি তাদের বয়স বাড়িয়ে দেবো, তাদের মন্দকর্মসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে করে দিবো সুন্দর, ফলে পাপে পাপে ভরপুর হয়ে যাবে তারা। এভাবে অজ্ঞাতসারে তারা এগিয়ে যেতে থাকবে ধ্বংসের দিকে। 'আল্লাহ্‌র কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ'— এ কথায় বুঝানো হয়েছে, আল্লাহ্‌তায়ালার কৌশল অন্য কারো মতো নয়। অন্য সকল কৌশল সম্পর্কে তো ধারণা বা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আল্লাহ্‌র কৌশল অনুধাবন করতে অপারগ। এমন কি বিশ্বাসীরাও তাঁর কৌশলের পূর্ণ রহস্য সম্পর্কে অনবগত। কেননা তা আগমন করে নেয়ামতরূপে, যে নেয়ামতের নেপথ্যে প্রস্তুত রয়েছে বিনাশের অনিবার্য আয়োজন। হজরত ইবনে আব্বাস এ সম্পর্কে বলেছেন, কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে— আমার গোপন পরিকল্পনা অত্যন্ত কঠোর, বলিষ্ঠ।

কোনো বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াতে ওই সকল লোকের কথা বলা হয়েছে যারা প্রকৃত বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করার দরুণ অতর্কিত গজবের শিকার হয়েছিলো। এক রাতের মধ্যেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলো তারা।

হজরত কাতাদা থেকে ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, এক রাতে রসুল স. আরোহণ করলেন সাফা পাহাড়ে। তারপর উচ্চকণ্ঠে নাম ধরে ধরে ডাকতে শুরু করলেন বিভিন্ন গোত্র ও পরিবার প্রধানদেরকে। বললেন, হে অমুকের পুত্র অমুক। সাবধান হও। ইমান আনো এক আল্লাহ্‌র প্রতি। নয়তো অতি সত্বর তোমাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গজব। তাঁর এই উদাত্ত আহ্বান শুনে এতটুকুও বিচলিত হলো না সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। বরং বলাবলি করতে লাগলো, দেখেছো! তোমাদের সাথী মোহাম্মদ সারা রাত ধরে কীভাবে চিৎকার করে চলেছে। পাগল না হলে কী এ রকম কেউ করে। তাদের এ রকম অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

❑ তাহারা কি চিন্তা করে না যে তাহাদিগের সহচর উন্মাদ নহে; সে তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী।

❑ তাহারা কি লক্ষ্য করে না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের প্রতি এবং আল্লাহ্ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার প্রতি এবং ইহার প্রতিও যে তাহাদিগের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী সুতরাং ইহার পর তাহারা আর কোন কথায় বিশ্বাস করিবে!

❑ আল্লাহ্ যাহাদিগকে বিপথগামী করেন তাহাদিগের কোন পথ প্রদর্শক নাই, আর তাহাদিগকে তিনি তাহাদিগের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেন।

'আওয়ালাম ইয়াতাফাক্কারু' অর্থ তারা কি চিন্তা করে না। মা বিসাহিবিহিম মিন্ জিন্নাত্ অর্থ তাদের সহচর উন্মাদ নয়। এখানে 'সাহিবিহিম' (সহচর) অর্থ— রসুলুল্লাহ্ স.। জিন্নাত্ অর্থ জুনুউন্মাদ। মুবীন অর্থ— সুস্পষ্টরূপে ভীতির প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ যে ভীতিপ্রদর্শনকারী বা স্পষ্ট সতর্ককারীর কথায় কোনো অস্পষ্টতা নেই। তাই শেষে বলা হয়েছে— সে তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী (ইন্‌হুয়া ইল্লা নাজিরুম্‌মুবীন)।

পরের আয়াতে (১৮৫) বলা হয়েছে— তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের প্রতি এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি এবং তার প্রতিও যে, তাদের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী সুতরাং এরপর তারা আর কোন কথায় বিশ্বাস করবে!' সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিবেচনা ও আচরণের প্রতি প্রশ্নবিদ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের প্রতি, আল্লাহ্‌তায়ালার অসংখ্য সৃষ্টির প্রতি এবং মানুষ যে মরণশীল, সে কথার প্রতি তারা অভিনিবেশী হয় না কেনো। এই বিশাল নিসর্গের সকল কিছুই তো আল্লাহ্‌তায়ালার একক সৃজনশীলতার প্রমাণ। সেই মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসুল কোরআনের মাধ্যমে পুনঃপুনঃ তাদেরকে জানিয়ে যাচ্ছেন সত্যের আহ্বান। অথচ তারা আল্লাহ্‌র রসুলকে বলছে উন্মাদ। সামনে তাদের অনড় মৃত্যু। এ কথাও কি তারা ভেবে দেখে না! অনন্ত জীবনে মুক্তি পেতে হলে

www.eelm.weebly.com

মৃত্যুর আগেই আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল এবং কোরআনকে যে নির্বিবাদে মেনে নিতে হবে, সে কথাও কি তারা বুঝে না! রসুল ও কোরআনকে ছেড়ে তারা কার কথায় কোন্ কথায় বিশ্বাস করতে চায়!

এর পরের আয়াতে (১৮৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাদেরকে বিপথগামী করেন তাদের কোনো পথ প্রদর্শক নেই, আর তাদেরকে তিনি তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে দেন।' এ কথার অর্থ— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী স্বেচ্ছায় বিপথগামিতাকেই আরাধ্য করে নিয়েছে। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে বিপথগামী করেছেন। ছেড়ে দিয়েছেন পথ প্রদর্শকহীনভাবে। অবাধ্যতায় আবর্তমান উদ্‌ভ্রান্তের মতো তারা। আল্লাহ্পাকই তাদেরকে দিয়েছেন উদ্‌ভ্রান্তির সাময়িক অবকাশ।

হজরত কাতাদা থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, একবার কুরায়েশ নেতারা রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, হে মোহাম্মদ! তুমি আমাদের আপনজন। বলো তো দেখি, কিয়ামত কখন হবে? ইবনে জারীর প্রমুখের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার হামল বিন আবী কুশাইর এবং শামুল বিন জায়েদ রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলো, হে মোহাম্মদ! তুমি তো দাবী করো যে তুমি নবী। তবে বলো, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৮৭, ১৮৮

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّیْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا
لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؔۘ ثَقُلَتْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ يَسْـَٔلُوْنَكَ
كَاَنَّكَ حَفِیٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ
اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛۚ وَمَا مَسَّنِیَ السُّوْٓءُ ۛۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ
وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

❑ তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটিবে। বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাকালে উহা প্রকাশ করিবেন; উহা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা হইবে! আকস্মিকভাবেই উহা তোমাদিগের উপর আসিবে, তুমি এই বিষয়ে সবিশেষ

www.eelm.weebly.com

অবহিত মনে করিয়া তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'এই বিষয়ের জ্ঞান আমার প্রতিপালকেরই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক উহা জ্ঞাত নহে।'

❒ বল, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।'

এখানে কিয়ামত বুঝাতে 'আস্সাআ'ত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এটি কিয়ামতের একটি প্রসিদ্ধ নাম। অকস্মাৎ এসে পড়বে বলে কিয়ামতকে বলা হয় সাআ'ত। কিয়ামতকে সাআ'ত বলার আরেকটি কারণ এই যে, কিয়ামতের পরক্ষণেই গ্রহণ করা হবে হিসাব। আর একটি কারণ— কিয়ামতের দিন হবে সুদীর্ঘ। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার নিকট তা হবে মুহূর্তকাল মাত্র।

'আইয়্যানা মুরসাহা' অর্থ— কখন আসবে বা কখন শুরু হবে। হজরত ইবনে আব্বাস 'মুরসাহা' শব্দটির অর্থ করেছেন— মুনতাহা (সমাপ্তি)।

এরপর বলা হয়েছে— 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই তা যথাকালে প্রকাশ করবেন; তা হবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা।' হজরত কাতাদা বলেছেন, কিয়ামতের সঠিক দিনক্ষণ সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহ্পাক ছাড়া আর কেউ জানে না। নিকটবর্তী ফেরেশতাবৃন্দ অথবা কোনো নবী রসুল—কাউকেই তিনি এ জ্ঞান দান করেননি।

'লা ইউজাল্লিহা লিওয়াক্বতিহা ইল্লা হুয়া' অর্থ— শুধু তিনিই যথাকালে তা প্রকাশ করবেন। অর্থাৎ এই গোপন রহস্যটি তিনি কারো কাছেই উন্মোচন করবেন না।

'ছাকুলাত ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' অর্থ— তা হবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা। 'ছাকুলাত' অর্থ ভারী বা ভয়ংকর। আর ভারী বলে এর সঠিক দিনক্ষণ গোপন রাখা হয়েছে। জ্বিন মানুষ সকলেই এ বিষয়ে জানতে আগ্রহী। কিন্তু অত্যন্ত গুরুভার ও ভীতিপ্রদ হওয়ার কারণেই এই রহস্যটি রহস্যাচ্ছন্নই রাখা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে—'আকস্মিকভাবেই তা তোমাদের উপর আসবেই, তুমি এ বিষয়ে অবহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে।' ইল্লা বাগতাতান্ অর্থ— কিন্তু অকস্মাৎ, যখন সকল মানুষ থাকবে কিয়ামত সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তখন কাপড় ক্রেতা বিক্রেতা ঠিক করতে থাকবে কাপড়ের মাপ-জোক। কিন্তু তারা তাদের কাজ শেষ করতে পারবে না। এসে পড়বে ভয়াবহ কিয়ামত। তখন এক লোক মেরামত করতে থাকবে তার পানির চৌবাচ্চা। কিন্তু তার পানি পান করার আগেই কিয়ামত শুরু হয়ে যাবে। কেউ দুগ্ধ দোহন করবে তার উষ্ট্রীর। কেউ মুখে তুলে নিবে আহার্যের লোকমা। কিন্তু তারা কেউই পান ও আহার করতে পারবে না। শুরু হয়ে যাবে মহাপ্রলয় (কিয়ামতের নিদর্শন প্রকাশিত হতে থাকবে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু কিয়ামত শুরু হবে অতর্কিতে, হঠাৎ)।

হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, মানুষ রাস্তায়, বাজারে, বৈঠকে বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকবে, পরিশোধ করতে থাকবে পণ্যসামগ্রীর মূল্য, কিন্তু পণ্যসামগ্রী হস্তান্তর করার আগেই ফুৎকার দেয়া হবে শিংগায়। সে ভয়ংকর আওয়াজ শুনে সকলেই বেহুঁশ হয়ে পড়বে। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, এক আয়াতে কিয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'মা ইয়ানজুরুনা ইল্লা সাইহাতাঁও ওয়াহিদাতান' (এরা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানিনাদের)। তখন লোকেরা বাজারে কেনা-বেচা করতে থাকবে, কাপড় মাপতে থাকবে, উটনীর দুধ দোহন করতে থাকবে এবং ব্যস্ত থাকবে নানা কাজে। সহসা শুরু হবে ভয়াবহ মহাপ্রলয়। কেউ কাউকে কোনো অসিয়ত করতে পারবে না। ফিরতেও পারবে না স্বগৃহে।

'আজজুহুদ' গ্রন্থে হজরত যোবায়ের বিন আওয়াম থেকে আবদুল্লাহ্ বিন আহমদ বর্ণনা করেছেন। সহসা শুরু হবে কিয়ামত— তখন কিছু লোক কাপড় মাপতে থাকবে, কিছু লোক দোহন করতে থাকবে উটনীর দুধ। এরপর তিনি পাঠ করলেন— ফালা ইয়াস্‌তাত্বিউ'না তাওসিইয়াতাঁও ওয়ালা ইলা আহ্‌লিহিম ইয়ারজিউন (তারা অসিয়তও করতে পারবে না এবং বাড়ী ফিরেও যেতে পারবে না)।

হ্রস্বসূত্রে হজরত উকবা বিন আমের থেকে তিবরানী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে একটি ঢাল পরিমাণ ঘনকালো মেঘ পশ্চিমাকাশে উদিত হবে। তারপর ওই মেঘ ক্রমশঃ প্রসারিত হতে হতে ঢেকে ফেলবে সম্পূর্ণ আকাশ। তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ ঘোষিত হবে— হে মানুষ! আল্লাহ্‌র আদেশ আসবেই। সুতরাং তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না।

www.eelm.weebly.com

ইয়াস্আলুনাকা কাআন্নাকা হাফিয়্যুন আ'নহা অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কিয়ামত সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত মনে করে এ বিষয়ে তারা আপনার নিকট জানতে চায়। 'হাফিয়্যুন আ'নহা' অর্থ সবিশেষ অবহিত। বিশেষভাবে অবহিত বুঝাতেই এখানে 'হাফিয়্যুন আ'নহা' বলা হয়েছে। সাধারণভাবে অবহিত বুঝানো হলে হাফিয়্যুন শব্দটির পরে আন্হা শব্দটি ব্যবহারের আর কোনো প্রয়োজন পড়তো না।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, এখানে আনহা শব্দটির সম্পর্ক রয়েছে ইয়াস্ আলুনাকা (প্রশ্ন করে) কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ ওই সকল লোক আপনার নিকট কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে এ কথা ভেবে যে, আপনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

কোনো কোনো তাফসীরকার আবার বলেছেন, 'হাফিয়্যুন' শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে হাফাওয়াতুন থেকে। হাফাওয়াতুন অর্থ— মহানুভবতা, দয়ার্দ্রতা। কুরায়েশ নেতাদের কথায় এ রকম সুরই ধ্বনিত হয়েছিলো। তারা রসুল স. কে বলেছিলো, তুমি আমাদের মহানুভব স্বজন। অতএব আমাদেরকে বলে দাও কিয়ামত সংঘটিত হবে কখন?

এরপর বলা হয়েছে— বলো, 'এই বিষয়ের জ্ঞান আমার প্রতিপালকেরই আছে।' আলোচ্য আয়াতে এ কথাটি বলা হয়েছে দু'বার। কিয়ামতের বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্যই করা হয়েছে এ রকম পুনরুল্লেখ।

শেষে বলা হয়েছে— 'কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জ্ঞাত নয়।' এ কথার অর্থ— কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময় সম্পর্কে আল্লাহ্পাক কাউকে কোনো কিছু জানাননি। তাই এ ব্যাপারে কেউ কোনো কিছু জানে না।

পরের আয়াতে (১৮৮) বলা হয়েছে— 'বলো, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভালো-মন্দের উপরও আমার কোনো অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতো না। আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।' 'লা আমলিকু লিনাফ্সি নাফ্আ'ও ওয়ালা দ্বর্রা ইল্লা মা শাআল্লহ্' অর্থ— আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভালো-মন্দের উপরও আমার কোনো অধিকার নেই। এই উক্তিটি দাসত্বের (উবুদিয়াতের) চরম বহিঃপ্রকাশ। আর বাক্যটি গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান না রাখারই একটি প্রমাণ।

www.eelm.weebly.com

'লাস্‌তাকছারতু মিনাল খইরি ওয়ামা মাসানিইয়াস্‌ সুউ' অর্থ— তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতো না। অর্থাৎ— তোমরা দ্যাখো না কেনো, আমার উপরও তো বিপদ মুসিবত আসে। আমি যুদ্ধে পরাজিত হই। আবার কখনও হই বিজয়ী। অদৃশ্যের জ্ঞান যদি আমি রাখতাম, তবে পরাজয় আমাকে স্পর্শই করতো না। আমার জন্য আমি নির্ধারণ করতাম কেবল বিজয় আর বিজয়।

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে কোনো কোনো আলেম বলেছেন, উদ্ধৃত বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— গায়েবের খবর যদি আমি জানতাম, তবে এ কথাটিও আমি জানতাম যে, আমি কখন মৃত্যুবরণ করবো। তাহলে আমি সবসময় ভালো কাজ করতাম। অকল্যাণের সঙ্গে রাখতাম সযত্ন ও সতর্ক দূরত্ব। বেঁচে থাকতাম সকল বিশৃঙ্খলা থেকে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে এ রকম— কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে, সে কথা যদি আমি জানতাম, তবে আমি তা অবশ্যই বলে দিতাম। তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করতে অথবা অবিশ্বাস করতে। আর অবিশ্বাস করলে আমার তো কোনো ক্ষতি হতো না।

কেউ কেউ বলেছেন, 'মা মাস্‌সানিইয়াস্‌ সুউ' (কোনো অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতো না) বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। আগের বাক্যের সঙ্গে এ বাক্যের কোনো সংযোগ নেই। উক্তিটির মাধ্যমে মুশরিকদের ওই উক্তিটির প্রতিবাদ করা হয়েছে, যে উক্তির মাধ্যমে তারা রসুল স. কে উন্মাদ আখ্যা দিয়েছিলো। এখানে উদ্ধৃত উক্তিটির মর্মার্থ হচ্ছে— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! ভুল বলেছো তোমরা। উন্মাদ আমি কস্মিনকালেও নই। যদি তাই হতাম তবে অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতোই করতো। কিন্তু কোনো অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করেনি। কারণ আমি যে আল্লাহ্‌র রসুল।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী'। এখানে 'আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সতর্ককারী এবং সুসংবাদবাহী বিশ্বাসীদের জন্য'— এ রকম বলাই ছিলো সমীচীন। কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাব থেকে সতর্ক করা হলেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সেদিকে কর্ণপাত মাত্র করে না। তাই দেখা যায় সতর্কীকরণ ও সুসংবাদ দ্বারা উপকৃত হয় কেবল বিশ্বাসীরাই। সে কথাটিই এখানে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।

www.eelm.weebly.com

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّاۤ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○ فَلَمَّاۤ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَاۤ اٰتٰهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

❑ তিনিই তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা হইতে তাহার সংগিনী সৃষ্টি করেন যাহাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তাহার সহিত সংগত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভ ধারণ করে এবং ইহা লইয়া সে কাল অতিবাহিত করে; গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তাহারা উভয়ে তাহাদিগের প্রতিপালক আল্লাহের নিকট প্রার্থনা করে, 'যদি তুমি আমাদিগকে এক পূর্ণাংগ সন্তান দাও তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকিবই।'

❑ তিনি যখন তাহাদিগকে এক পূর্ণাংগ সন্তান দান করেন, তাহারা তাহাদিগকে যাহা দেয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহের শরীক করে; কিন্তু তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ তাহা অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতটির মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে হজরত আদম থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাঁর বক্ষপিঞ্জর থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী হজরত হাওয়াকে, যাতে আদম তাঁর সঙ্গিনীর নিকট থেকে পান সঙ্গসুখ ও ভালোবাসা। এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সংগত হলেন। ফলে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়লেন হাওয়া। সে গর্ভ ছিলো অনায়াসে বহনযোগ্য— লঘু। এক সময় সে গর্ভ হয়ে উঠলো গুরুভার। তখন স্বামী-স্ত্রী দু'জনে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে প্রার্থনা জানালেন, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমাদেরকে যদি সুঠাম, সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করো, তবে অবশ্যই আমরা হবো তোমার উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

বাগবী লিখেছেন, কোরআন-ব্যাখ্যাতাগণ উল্লেখ করেছেন, হজরত হাওয়ার সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর অচেনা আগন্তুকের বেশে তাঁর সামনে উপস্থিত হলো ইবলিস। বললো, তোমার উদরে কী? হজরত হাওয়া বললেন, জানি না। ইবলিস বললো মনে হয় কুকুর, শূকর বা অন্য কোনো পশু। যাই থাক— সমস্যা হচ্ছে,

www.eelm.weebly.com

বের হবে কিভাবে? নিম্নাঙ্গ দিয়ে বের হলে তো জীবন বিপন্ন হবেই। মুখ দিয়েও বের হয়ে আসতে পারে। না হলে পেট চিরে বের করতে হবে। এ কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন হজরত হাওয়া। তিনি স্বামীকে খুলে বললেন সব। হাওয়াকে একা পেয়ে আর একদিন এলো ইবলিস। বললো, আমি আল্লাহ্র এক বিশেষ বান্দা। আল্লাহ্ আমাকে অনেক উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। আমি দোয়া করলে তুমি সহজে মুক্তি পাবে গর্ভধারণের বিপদ থেকে। আল্লাহ্ তোমাকে নিরাপদে সন্তান প্রসব করিয়ে দেবেন। যদি নিরাপদে সবকিছু হয় তবে জেনে নিও, আমার দোয়ার কারণেই তা হয়েছে। তখন তোমার সন্তানের নাম রেখো আব্দুল হারেছ। উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাদের মধ্যে ইবলিস পরিচিত ছিলো হারেছ নামে। হজরত আদমের সঙ্গে দেখা হতেই হাওয়া তাঁকে খুলে বললেন সব। হজরত আদম বললেন, সম্ভবতঃ ওই লোকটিকে আমি চিনি। সে ইবলিস নয়তো! যখন নিরাপদে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো, তখন আদম হাওয়া দু'জনে ভাবলেন ওই লোকটি তবে ঠিক কথাই বলেছিলো। তাঁরা তাঁদের সন্তানের নাম রাখলেন আব্দুল হারেছ।

কালাবী বলেছেন, ইবলিস হজরত হাওয়াকে বলেছিলো, আমি তোমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবো। আমার দোয়ায় তোমার পেট থেকে যদি মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তবে তুমি তার নাম রেখো আমার নামে। হজরত হাওয়া বললেন, তোমার নাম কী? ইবলিস বললো, আল হারেছ। হারেছ যে ইবলিসের এক নাম সে কথা জানা ছিলো না হজরত হাওয়ার। তাই তাঁর সদ্যজাত সন্তানের নাম রাখলেন তিনি আব্দুল হারেছ।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, অনেক সন্তান সন্ততির জননী হয়েছিলেন হজরত হাওয়া। হজরত আদম কারো নাম রাখলেন আবদুল্লাহ্, কারো নাম রাখলেন ওবায়দুল্লাহ্। কারো আবদুর রহমান। কিন্তু শিশুরা অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছিলো। তাই তিনি তাঁর নবজাত এক সন্তানের নাম রাখলেন আব্দুল হারেছ। সেই সন্তানটি বেঁচে গেলো।

হজরত সামুরা বিন জুনদুব থেকে আহমদ, তিরমিজি ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হজরত হাওয়ার শিশুরা বেশীদিন বাঁচতো না। ইবলিস শুভাকাঙ্খীর বেশে তাঁকে পরামর্শ দিলো, এবার সন্তান জন্ম নিলে নাম রেখে দিয়ো আব্দুল হারেছ। তাই করলেন তিনি। নবজাতকের নাম রাখলেন আব্দুল হারেছ। সেই সন্তানটি বেঁচে গেলো। ইবলিসের কুমন্ত্রণাতেই এ রকম ঘটেছিলো। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। আর তিরমিজি বলেন, উত্তম ও বিরল (হাসান ও গরীব)।

www.eelm.weebly.com

বাগবী বলেছেন, হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত হাওয়ার কাছে দু'বার এসেছিলো ইবলিস। আর দু'বারই ইবলিসের প্রতারণায় পতিত হয়েছিলেন তিনি। একবার জান্নাতে। আর একবার পৃথিবীতে।

ইবনে জায়েদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আদম প্রথম সন্তানের নাম রাখলেন আবদুল্লাহ্। কিন্তু সে সন্তান মারা গেলো অল্পদিনের মধ্যে। পরের সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে ইবলিস এসে বললো, কী নাম রেখেছেন? হজরত আদম বললেন, ভাবছি আবদুল্লাহ্, ওবায়দুল্লাহ্ বা এ রকম কিছু রাখবো। ইবলিস বললো, এ রকম নাম রাখলে মনে করেছেন আল্লাহ্ কি তাকে এখানে রেখে দিবেন। আবদুল্লাহ্ (আল্লাহর দাস) কে তো আল্লাহ্ নিয়েই যাবেন তাঁর কাছে। বরং আমার কথা শুনুন। বাচ্চার নাম রাখুন আবদুস্ শামস্। এ নাম রাখলে আমি যতদিন বাঁচবো ততদিন বেঁচে থাকবে শিশুটি। হজরত আদম ও হজরত হাওয়া মিলে তখন তাঁদের সন্তানের নাম রাখলেন আবদুস্ শামস্। বাগবী বলেছেন, এই বর্ণনাটির চেয়ে পূর্বের বর্ণনাগুলো অধিকতর শুদ্ধ।

পরের আয়াতে (১৯০) বলা হয়েছে—'তিনি যখন তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন, তারা তাদেরকে যা দেয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ্র শরীক করে' এ কথার অর্থ— স্বামী-স্ত্রীর প্রার্থনা মঞ্জুর করে আল্লাহ্তায়ালা তাঁদেরকে দান করলেন পূর্ণাঙ্গ এক শিশু। কিন্তু তারা শিশুর নামকরণে প্রশ্রয় দিলো শিরিককে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তো প্রকৃত অপ্রকৃত সকল শিরিক থেকে পবিত্র।

হজরত আদম ও হজরত হাওয়ার বিশ্বাসে ও আচরণে শিরিক কখনোই ছিলো না। কেবল সন্তান-বাৎসল্যের কারণে তারা সন্তানের নামের মধ্যে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন শিরিককে। ভেবেছিলেন, নামে আর কি আসে যায়। শিরিক থেকে আমাদের বিশ্বাস ও ইবাদত তো মুক্ত রয়েছেই।

আবদ বা গোলামের একটি অর্থ সেবক বা খাদেম। দাস বা বান্দা নয়। আবার রব (প্রতিপালক) শব্দটিও কখনো কখনো পিতা মাতা বা লালন পালনকারী অভিভাবকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। কিন্তু তারা কেউই মাবুদ বা উপাস্য নয়। অর্থাৎ তাদেরকে কেউই আল্লাহ্ মনে করে না। বিনয় প্রকাশার্থে কেউ কেউ অতিথিকে বলে, নির্দেশ করুন। আপনার সেবার জন্য এই গোলাম হাজির। হজরত ইউসুফ আ. আজিজে মিসরকে বলেছিলেন— 'ইন্নাহু রব্বি আহসানা মাছওয়া' (তিনিই আমার মনিব, আমার উত্তম আশ্রয়)। হজরত ইউসুফের এ কথার উদ্দেশ্য এ রকম ছিলো না যে— আপনিই আমার উপাস্য প্রভুপ্রতিপালক। হজরত আদমও তাঁর সন্তানের নাম রেখেছিলেন এ রকম ধারণার বশবর্তী হয়ে— যা বাহ্যতঃ শিরিক, কিন্তু প্রকৃত অর্থে শিরিক নয়। অবশ্যই নয়। কারণ তিনি ছিলেন নবী। নবী-রসুল

www.eelm.weebly.com

মুহূর্তকালের জন্যও শিরিক করতে পারেন না। আর নবী বলেই আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে অপ্রকৃত শিরিক থেকেও মুক্ত রাখার নিমিত্তে আয়াতে এ রকম স্নেহসিক্ত ভর্ৎসনা করেছেন। এতে করে বরং ফুটে উঠেছে তাঁর প্রতি আল্লাহ্তায়ালার বিরল দয়া— যে দয়া লাভ করেন কেবল নবী-রসুলেরাই।

হজরত ইকরামা ও হাসান বলেছেন, এখানে 'তারা তাদেরকে যা দেয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ্র শরীক করে' কথাটির অর্থ— আদম-হাওয়ার সন্তানেরা আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে। উদ্ধৃত বাক্যটির লক্ষ্য আদম-হাওয়া নন, মক্কার মুশরিকেরাই বাক্যটির লক্ষ্য। অন্যত্রও এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ছুম্মাত্তাখাজতুম (অতঃপর তোমরা গ্রহণ করলে)। এখানে মদীনার ইহুদীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে গো-বৎস পূজা এবং তওবার স্বজন-হননের কথা। কিন্তু মদীনার ইহুদীরা তো ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলোই না। জড়িত ছিলো তাদের পূর্ব-পুরুষেরা।

হজরত আদম তাঁর পুত্রের নাম রেখেছিলেন আবুল হারেছ অথবা আবদুল হারেছ। অথচ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনের শব্দরূপ শুরাকাআ (তারা শিরিক করে)। এতে করে বুঝা যায়, এখানে হজরত আদম শিরিক করেছেন এ রকম বলা হয়নি। বলা হয়েছে তাঁর পরবর্তী বংশধরদের শিরিক করার কথা। বাক্যটির কর্তা এখানে রয়েছে উহ্য। বহুবচনরূপী ক্রিয়ার সূত্রে এখানে উহ্য কর্তা বা কর্তাদেরকে সনাক্ত করতে হবে। এভাবে সনাক্ত করতে গিয়েই প্রতীয়মান হয় যে, এখানে হজরত আদমকে শিরিকের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়নি। অভিযুক্ত করা হয়েছে তার পরবর্তী সময়ের মুশরিক সন্তানদেরকে। মক্কার মুশরিকদেরকে।

বাগবী উল্লেখ করেছেন, কোনো কোনো আলেমের ধারণা, আলোচ্য বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। আগের বক্তব্যের সঙ্গে এর কোনো সংস্রব নেই। এখানে মক্কার মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করার কথা। আগের বাক্যের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে— এ রকম বলা হলেও কোনো ক্ষতি নেই। এ রকম হলে বুঝতে হবে, হজরত আদম এখানে কেবল লংঘন করেছিলেন নামকরণ সম্পর্কিত উত্তম বিধানটি। উত্তম নামের বদলে রেখেছিলেন অনুত্তম নাম। নবীদের জন্য এ রকম অনুত্তম কর্ম শোভনীয় নয় বলেই আল্লাহ্পাক এখানে বিষয়টির উপর বিশেষভাবে আলোকসম্পাত করেছেন। আল্লামা সুয়ূতি বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত খলাক্বাকুম (সৃষ্টি করেছেন) কথাটির সঙ্গে। এ রকম হলে মধ্যবর্তী কথাগুলোকে বাদ দিয়ে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অথচ তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করো।

www.eelm.weebly.com

বাগবী বলেছেন, হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত হাওয়ার কাছে দু'বার এসেছিলো ইবলিস। আর দু'বারই ইবলিসের প্রতারণায় পতিত হয়েছিলেন তিনি। একবার জান্নাতে। আর একবার পৃথিবীতে।

ইবনে জায়েদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আদম প্রথম সন্তানের নাম রাখলেন আবদুল্লাহ্। কিন্তু সে সন্তান মারা গেলো অল্পদিনের মধ্যে। পরের সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে ইবলিস এসে বললো, কি নাম রেখেছেন? হজরত আদম বললেন, ভাবছি আবদুল্লাহ্, ওবায়দুল্লাহ্ বা এ রকম কিছু রাখবো। ইবলিস বললো, এ রকম নাম রাখলে মনে করেছেন আল্লাহ্ কি তাকে এখানে রেখে দিবেন। আবদুল্লাহ্ (আল্লাহর দাস) কে তো আল্লাহ্ নিয়েই যাবেন তাঁর কাছে। বরং আমার কথা শুনুন। বাচ্চার নাম রাখুন আবদুস্ শামস্। এ নাম রাখলে আমি যতদিন বাঁচবো ততদিন বেঁচে থাকবে শিশুটি। হজরত আদম ও হজরত হাওয়া মিলে তখন তাঁদের সন্তানের নাম রাখলেন আবদুস্ শামস্। বাগবী বলেছেন, এই বর্ণনাটির চেয়ে পূর্বের বর্ণনাগুলো অধিকতর শুদ্ধ।

পরের আয়াতে (১৯০) বলা হয়েছে—'তিনি যখন তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন, তারা তাদেরকে যা দেয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ্র শরীক করে' এ কথার অর্থ— স্বামী-স্ত্রীর প্রার্থনা মঞ্জুর করে আল্লাহ্তায়ালা তাঁদেরকে দান করলেন পূর্ণাঙ্গ এক শিশু। কিন্তু তারা শিশুর নামকরণে প্রশ্রয় দিলো শিরিককে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তো প্রকৃত অপ্রকৃত সকল শিরিক থেকে পবিত্র।

হজরত আদম ও হজরত হাওয়ার বিশ্বাসে ও আচরণে শিরিক কখনোই ছিলো না। কেবল সন্তান-বাৎসল্যের কারণে তারা সন্তানের নামের মধ্যে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন শিরিককে। ভেবেছিলেন, নামে আর কি আসে যায়। শিরিক থেকে আমাদের বিশ্বাস ও ইবাদত তো মুক্ত রয়েছেই।

আবদ বা গোলামের একটি অর্থ সেবক বা খাদেম। দাস বা বান্দা নয়। আবার রব (প্রতিপালক) শব্দটিও কখনো কখনো পিতা মাতা বা লালন পালনকারী অভিভাবকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। কিন্তু তারা কেউই মাবুদ বা উপাস্য নয়। অর্থাৎ তাদেরকে কেউই আল্লাহ্ মনে করে না। বিনয় প্রকাশার্থে কেউ কেউ অতিথিকে বলে, নির্দেশ করুন। আপনার সেবার জন্য এই গোলাম হাজির। হজরত ইউসুফ আ. আজিজে মিসরকে বলেছিলেন— 'ইন্নাহু রব্বি আহসানা মাছওয়া' (তিনিই আমার মনিব, আমার উত্তম আশ্রয়)। হজরত ইউসুফের এ কথার উদ্দেশ্য এ রকম ছিলো না যে— আপনিই আমার উপাস্য প্রভুপ্রতিপালক। হজরত আদমও তাঁর সন্ত-ানের নাম রেখেছিলেন এ রকম ধারণার বশবর্তী হয়ে— যা বাহ্যতঃ শিরিক, কিন্তু প্রকৃত অর্থে শিরিক নয়। অবশ্যই নয়। কারণ তিনি ছিলেন নবী। নবী-রসুল

www.eelm.weebly.com

মুহূর্তকালের জন্যও শিরিক করতে পারেন না। আর নবী বলেই আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে অপ্রকৃত শিরিক থেকেও মুক্ত রাখার নিমিত্তে আয়াতে এ রকম স্নেহসিক্ত ভর্ৎসনা করেছেন। এতে করে বরং ফুটে উঠেছে তাঁর প্রতি আল্লাহ্তায়ালার বিরল দয়া— যে দয়া লাভ করেন কেবল নবী-রসুলেরাই।

হজরত ইকরামা ও হাসান বলেছেন, এখানে 'তারা তাদেরকে যা দেয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ্র শরীক করে' কথাটির অর্থ— আদম-হাওয়ার সন্তানেরা আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে। উদ্ধৃত বাক্যটির লক্ষ্য আদম-হাওয়া নন, মক্কার মুশরিকেরাই বাক্যটির লক্ষ্য। অন্যত্রও এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ছুম্মাত্তাখাজতুম (অতঃপর তোমরা গ্রহণ করলে)। এখানে মদীনার ইহুদীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে গো-বৎস পূজা এবং তওবার স্বজন-হননের কথা। কিন্তু মদীনার ইহুদীরা তো ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলোই না। জড়িত ছিলো তাদের পূর্ব-পুরুষেরা।

হজরত আদম তাঁর পুত্রের নাম রেখেছিলেন আবুল হারেছ অথবা আবদুল হারেছ। অথচ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনের শব্দরূপ শুরাকাআ (তারা শিরিক করে)। এতে করে বুঝা যায়, এখানে হজরত আদম শিরিক করেছেন এ রকম বলা হয়নি। বলা হয়েছে তাঁর পরবর্তী বংশধরদের শিরিক করার কথা। বাক্যটির কর্তা এখানে রয়েছে উহ্য। বহুবচনরূপী ক্রিয়ার সূত্রে এখানে উহ্য কর্তা বা কর্তাদেরকে সনাক্ত করতে হবে। এভাবে সনাক্ত করতে গিয়েই প্রতীয়মান হয় যে, এখানে হজরত আদমকে শিরিকের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়নি। অভিযুক্ত করা হয়েছে তার পরবর্তী সময়ের মুশরিক সন্তানদেরকে। মক্কার মুশরিকদেরকে।

বাগবী উল্লেখ করেছেন, কোনো কোনো আলেমের ধারণা, আলোচ্য বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। আগের বক্তব্যের সঙ্গে এর কোনো সংস্রব নেই। এখানে মক্কার মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করার কথা। আগের বাক্যের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে— এ রকম বলা হলেও কোনো ক্ষতি নেই। এ রকম হলে বুঝতে হবে, হজরত আদম এখানে কেবল লংঘন করেছিলেন নামকরণ সম্পর্কিত উত্তম বিধানটি। উত্তম নামের বদলে রেখেছিলেন অনুত্তম নাম। নবীদের জন্য এ রকম অনুত্তম কর্ম শোভনীয় নয় বলেই আল্লাহ্পাক এখানে বিষয়টির উপর বিশেষভাবে আলোকসম্পাত করেছেন। আল্লামা সুয়ূতি বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত খলাক্বাকুম (সৃষ্টি করেছেন) কথাটির সঙ্গে। এ রকম হলে মধ্যবর্তী কথাগুলোকে বাদ দিয়ে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অথচ তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করো।

www.eelm.weebly.com

সবশেষে বলা হয়েছে—'কিন্তু তারা যাতে শরীক করে আল্লাহ্ তা অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে।' বাগবী লিখেছেন, এখানে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে— তারা যাকে শরীক করে। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ তাদেরকে নিষ্পাপ সন্তান-সন্ততি দান করেন। অথচ তারা তাদেরকে বানায় ইহুদী এবং খৃষ্টান। আল্লাহ্পাকের সঙ্গে শরীক করে তারা— যা থেকে আল্লাহ্তায়ালা অনেক উচ্চে।

ইবনে কীসান বলেছেন, এখানে 'তারা যাকে শরীক করে বলে নির্দেশ করা হয়েছে ওই সকল কাফেরের প্রতি, যারা তাদের সন্তানের নাম রাখতো আবদুল উজ্জা, আবদুল লাত, আবদুল মানাত, আবদুস শামস ইত্যাদি।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইকরামা এবং হাসান আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করেছেন ভিন্নরূপে। তাদের ব্যাখ্যাটি এ রকম— আল্লাহ্তায়ালাই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পাঁজর থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সহধর্মিনীকে। তারপর তাদের মিলনের ফলে প্রবহমান হতে শুরু করলো মানুষের বংশপ্রবাহ। কিন্তু অনেক মানুষ সেই অতুলনীয় ও এক সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে শরীক করলো অন্যকে। এই তাফসীরটি হজরত ইবনে আব্বাস হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, মুজাহিদ এবং প্রখ্যাত তাফসীরকারগণের অনুকূল নয়। কিন্তু আমি মনে করি এই তাফসীরটিই অধিকতর বিশুদ্ধ ও সঠিক। নিম্নে এই অভিমতটির প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো—

আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদম ও হাওয়াকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সেই নিষেধাজ্ঞা রক্ষা করতে পারেননি। তাঁদের ওই ভুলের জন্য তাঁদেরকে ভর্ৎসনাও করা হয়েছিলো। যেমন, একস্থানে বলা হয়েছে— 'ওয়াআ'সা আদামু রব্বাহু ফা গাওয়া' (আর আদমকে তার প্রতিপালক ভর্ৎসনা করলেন, এতে তিনি হলেন বিব্রত)। হজরত আদম ও হজরত হাওয়া তখন তাঁদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়েছিলেন। তাঁরা দোয়া করেছিলেন— 'রব্বানা জলামনা আংফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগ ফিরলানা ওয়াতার হামনা লা নাকুন্নানা মিনাল খসিরীন' (হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমরা তো আমাদের সত্তার উপর অত্যাচার করেছি। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করলে আমরা তো হবো ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত)। আল্লাহ্তায়ালা তাঁদের বিস্মৃতি মার্জনা করেছিলেন। তারপর ঘোষণা দিয়েছিলেন— অতঃপর আল্লাহ্ আদমকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন দান করলেন এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনকে গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে গ্রহণ করলেন পথপ্রদর্শক হিসেবে। বিস্মৃতি ক্ষমা করা সত্ত্বেও হজরত আদম ও হাওয়া তাঁদের ভুলের স্মৃতিচারণ করে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। বোখারী ও মুসলিমে এ রকম বর্ণিত হয়েছে।

হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে বলবে, হায়! এখন আমরা যদি কোনো সুপারিশকারী পেতাম, তবে সেই সুপারিশকারী আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করে আমাদেরকে এই অসহনীয় অবস্থা

www.eelm.weebly.com

থেকে মুক্ত করতে পারতেন। সকলে তখন হজরত আদমের নিকট সমবেত হয়ে বলবে, আপনি সকল মানুষের পিতা। আল্লাহ্‌তায়ালা অলৌকিক হস্তদ্বারা সৃজন করেছেন আপনাকে। দিয়েছিলেন জান্নাতে বসবাসের অধিকার। আল্লাহ্‌পাক আপনাকে ফেরেশতাদের সেজদার মাধ্যমে সম্মান দান করেছেন। আপনাকে শিখিয়েছেন সকল কিছুর নাম। অতএব আপনি আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে সুপারিশ করে আপনার সন্তানদেরকে এই কষ্টদায়ক অবস্থা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করুন। হজরত আদম তখন নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের কথা মনে করে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করবেন— যদিও সে ভুল মার্জনা করা হয়েছিলো। কিন্তু তখন তিনি সন্তানের শিরিকমিশ্রিত নাম রাখা সম্পর্কিত ভুলটির কথা স্মরণ করবেন— এ রকম কোনো বর্ণনা নেই। অথচ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করা অপেক্ষা দ্বিতীয় অপরাধটি অধিক মারাত্মক। দ্বিতীয় অপরাধটির মার্জনা সম্পর্কিত বিবরণও কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হলো যে, আলোচ্য আয়াতে হজরত ইকরামা ও হাসানকৃত তাফসীরটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ ○ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَّ لَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ○ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ○ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

❑ তাহারা কি এমন বস্তুকে শরীক করে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না? বরং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট,

❑ উহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না এবং উহাদের নিজদিগকেও নহে।

❑ তোমরা উহাদিগকে সৎপথে আহ্বান করিলে উহারা তোমাদিগকে অনুসরণ করিবে না; তোমরা উহাদিগকে আহ্বান কর বা চুপ করিয়া থাক তোমাদিগের পক্ষে উভয়ই সমান।

❑ আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে আহ্বান কর তাহারা তো তোমাদিগের ন্যায় দাস; তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাহারা তোমাদিগের ডাকে সাড়া দিক্।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে—'তারা কি এমন বস্তুকে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না? বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট।' এ কথার অর্থ— মুশরিকরা উপাসনা করে স্বহস্ত নির্মিত প্রতিমাগুলোর— যেগুলো নিষ্প্রাণ ও সৃজনক্ষমতাহীন। ওই বাতিল উপাস্যগুলো ও সেগুলোর উপাসকেরাও সৃষ্ট। আর প্রতিমাগুলো তো কেবল সৃষ্টই নয়, সৃষ্টদের দ্বারা সৃষ্ট।

পরের আয়াতে (১৯২) বলা হয়েছে— 'তারা তাদের সাহায্য করতে পারে না এবং তাদের নিজেদেরকেও নয়।' এ কথার অর্থ— মুশরিকদের পূজনীয় প্রতিমাগুলো তাদেরকে সাহায্য করবে কিভাবে, তারা নিজেরাই তো নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না। তাদেরকে আঘাত করলে বা ভেঙে ফেললে প্রতিবাদ বা প্রতিহত করার শক্তিও তারা রাখে না।

এর পরের আয়াতে (১৯৩) বলা হয়েছে—'তোমরা তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করলে তারা তোমাদেরকে অনুসরণ করবে না; তোমরা তাদেরকে আহ্বান করো বা চুপ করে থাকো তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান।' এ কথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা মুশরিকদেরকে আহ্বান করলেও তারা তোমাদের কথা মানবে না। সুতরাং তোমাদের আহ্বান করা বা চুপ থাকা দু'টোই সমান।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে মুশরিকদেরকে। বলা হয়েছে, হে অংশীবাদীর দল! তোমরা তোমাদের উপাস্য মূর্তিগুলোকে অনন্তকাল ধরে ডাকলেও তারা তোমাদের কথা শুনবে না। তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করার ক্ষমতাও তাদের নেই। অতএব তোমাদের ডাকা বা চুপ থাকা একই কথা।

উল্লেখ্য যে, প্রতিমা পূজকেরা প্রতিমাগুলোর সামনে তাদের প্রার্থনা পূরণের উদ্দেশ্যে চুপচাপ বসে থাকতো। মুখে কিছুই বলতো না। তাই এখানে বলা হয়েছে, তোমাদের নীরব ও সরব প্রার্থনা একই রকম গুরুত্বহীন, নিষ্ফল।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের শেষটিতে (১৯৪) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহ্বান করো তারা তো তোমাদের ন্যায় দাস; তোমরা তাদেরকে আহ্বান করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক।' এ কথার অর্থ— হে অংশীবাদীরা! চরমতম মূর্খ তোমরা। তাই বোঝো না, তোমরা যে দেব-দেবীর নিকট প্রার্থী হও তারা তো তোমাদেরই মতো আল্লাহ্তায়ালার দাস। তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ করো যে, তোমাদের আহ্বানে তোমাদের ওই জড়পদার্থ নির্মিত দেব-দেবীগুলো সাড়া দিচ্ছে।

মুকাতিল বলেছেন, এখানে ফেরেশতা-পূজারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই 'আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের আহ্বান করো' কথাটির অর্থ হবে এখানে— আল্লাহ্ ব্যতীত যে সকল ফেরেশতাদের পূজা তোমরা করো। উল্লেখ্য যে, এই ব্যাখ্যাটির চেয়ে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটি অধিকতর বিশুদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

'যদি তোমরা সত্যবাদী হও' কথাটির অর্থ— হে অংশীবাদীরা! তোমরা আদৌ সত্যবাদী নও। যদি হতে তবে কখনোই এ রকম জড়তার পূজারী হতে পারতে না। তোমরা রক্ত মাংসের মানুষ আর তোমাদের উপাস্যগুলো জড়পদার্থ নির্মিত। যদি তোমাদের উপাস্যগুলো উন্নতও হয়, তবে হয়তো হবে জীবন্ত মানুষের মতো সচেতন ও বিবেচক। এ রকম হলেও তো সেগুলো উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। কারণ যারা মুখাপেক্ষিতার দিক থেকে নিম্নস্তরের অথবা সমান্তরাল তারা সর্বাবস্থায় উপাস্য হওয়ার যোগ্যতারহিত। উপাস্য হওয়ার যোগ্যতাধারী কেবল ওই পবিত্র ও অতুলনীয় সত্তা, যিনি কারো মুখাপেক্ষী কিংবা সমান্তরাল নন।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ
بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا
تُنْظِرُونِ ۝ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۝ وَالَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ
تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝

❑ তাহাদিগের কি চলিবার পা আছে? তাহাদিগের কি ধরিবার হাত আছে? তাহাদিগের কি দেখিবার চক্ষু আছে? কিংবা তাহাদিগের কি শ্রবণ করিবার কর্ণ আছে? বল, 'তোমরা যাহাদিগকে আল্লাহের শরীক করিয়াছ তাহাদিগকে ডাক ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না;

❑ 'আমার অভিভাবক তো আল্লাহ্ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণদিগের অভিভাবকত্ব করিয়া থাকেন।'

❑ আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাকে আহ্বান কর তাহারা তো তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না এবং তাহাদিগের নিজদিগকেও নহে।

❑ যদি তাহাদিগকে সৎপথে আহ্বান কর তবে তাহারা শ্রবণ করিবে না এবং তুমি দেখিতে পাইবে যে তাহারা তোমার দিকে তাকাইয়া আছে কিন্তু তাহারা দেখে না।

---

www.eelm.weebly.com

উদ্ধৃত আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'তাদের কি চলবার পা আছে? তাদের কি ধরবার হাত আছে? তাদের কি দেখবার চক্ষু আছে? কিংবা তাদের কি শ্রবণ করবার কর্ণ আছে?' এ কথার অর্থ— ওই সকল প্রতিমার পা, হাত, চোখ, কান— কিছুই নেই। এরপরেও হে মূঢ় অংশীবাদীরা! তোমরা ওগুলোর উপাসনা করে চলেছো কেনো?

এরপর বলা হয়েছে— 'ছুম্মা কীদুনী ফালাতুনযিরুন' (বল, তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্র শরীক করেছো তাদেরকে ডাকো ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে অবকাশ দিও না)। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, হে অংশীবাদী নেতা ও জনতা! তোমরা উত্তমরূপে অবগত হও যে, আমি মহাবিশ্বের মহাঅধীশ্বর এক আল্লাহ্র উপাসক। সুতরাং আমি তোমাদের ও তোমাদের বাতিল উপাস্যগুলোর কোনোই পরোয়া করি না। তোমরা তোমাদের অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র বিরতিহীনভাবে চালিয়ে যাও। আমি ওগুলোকে তো আমলেই আনি না।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে (১৯৬)—'আমার অভিভাবক তো আল্লাহ্ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালাই আমার অভিভাবক ও রক্ষক। তিনি আমার উপর অবতীর্ণ করেছেন পবিত্র কোরআন। তিনি সকল নবী এবং রসুলেরও অভিভাবক ও সংরক্ষক।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে অন্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করে না, তার সহায়ক স্বয়ং আল্লাহ্। শত শত্রুর শত্রুতাও তার অনিষ্ট করতে অসমর্থ।

এর পরের আয়াতে (১৯৭) বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাকে আহ্বান করো তারা তো তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং তাদের নিজেদেরকেও নয়।'

শেষে উদ্ধৃত আয়াতটিতে (১৯৮) বলা হয়েছে— 'যদি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করো তবে তারা শুনবে না এবং তুমি দেখতে পাবে যে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু তারা দেখে না।' 'এখানে লা ইয়াছমাউ অর্থ— শ্রবণ করবে না। 'ওয়াতারাহুম' অর্থ— আর তুমি তাদেরকে দেখবে। অংশীবাদীরা তাদের পূজিত প্রতিমাগুলোর কান, চোখ— সবই নির্মাণ করে। মূর্তিগুলোর দিকে তাকালে মনে হয়, সেগুলো যেনো তাকিয়ে আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলোতো শ্রবণেন্দ্রিয়হীন এবং দৃষ্টিক্ষমতারহিত। তাই এখানে বলা হয়েছে— মুশরিকদের প্রতিমাগুলো শ্রুতিশক্তিহীন, দৃষ্টিহীন। হে আমার রসুল! সেগুলোর দিকে তাকালে মনে হবে সেগুলো যেনো তোমাকে দেখছে। কিন্তু সেগুলোতো দেখতেই পায় না।

www.eelm.weebly.com

হাসান বসরী বলেছেন, 'এখানে শুনতে পায় না' ও 'দেখতে পায় না'— কথা দু'টোর লক্ষ্য হচ্ছে অংশীবাদীরা। এভাবে আলোচ্য আয়াতটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে ইসলামের পথে আহ্বান জানালেও তারা তা বিশ্বাসের সঙ্গে শুনবে না। দেখবেও না বিশ্বাসের সঙ্গে। তাকিয়ে থাকবে শুধু। কিন্তু সে দৃষ্টিতে থাকবে না সত্যানুরাগের ন্যূনতম কোনো চিহ্ন।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৯৯, ২০০

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ۝ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

❒ তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা কর।

❒ যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহের শরণ লইবে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

প্রথমোক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যাসূত্রে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের এবং মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহ্পাক এই আয়াতের মাধ্যমে তাঁর রসুলকে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, হে আমার রসুল! আপনি মানুষের প্রতি প্রদর্শন করুন ক্ষমাপরায়ণতা। সাদরে গ্রহণ করুন তাদের অপরাগতা ও অনুযোগকে। সহজসাধ্য আমলের উপরেই তাদেরকে স্বস্তি পেতে দিন। বিব্রতকর কোনো প্রশ্ন তাদেরকে করবেন না।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য নির্দেশনাটির মাধ্যমে পাপিষ্ঠদেরকে ক্ষমা করতে বলা হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমরের ঘনিষ্ঠ সহচর ও পরামর্শদাতা ছিলো হুর বিন তাইয়াস। হুরের পিতৃব্য উয়াইনা বিন হুসাইন বিন হুজায়ফা একবার তাকে বললো, হে পিতৃব্য পুত্র! যে কোনো উপায়ে তুমি আমাকে খলিফা হজরত ওমরের সাথে কথা বলার সুযোগ করে দাও। খলিফার অনুমতিক্রমে সাক্ষাতের দিন ধার্য হলো। নির্দিষ্ট দিনে খলিফার সামনাসামনি হতেই ওয়াইনা বিন হুসাইন বললো, হে ইবনে খাত্তাব! তুমি দান করো না। ন্যায় বিচারও করো না। এ কথা শুনে হজরত ওমর ভয়ানক রেগে গেলেন। কঠোর কোনো নির্দেশ দিতে যাচ্ছিলেন তিনি। তখন হজরত হাসান বলে উঠলেন, 'হে আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহ্তায়ালা

www.eelm.weebly.com

তাঁর রসুলকে লক্ষ্য করে বলেছেন— 'তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করো, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা করো।' এই আয়াত শুনে সংযত হলেন হজরত ওমর। বুঝলেন, কটুভাষী এ লোকটিকে উপেক্ষা করতে হবে। কারণ সে অজ্ঞ।

হজরত আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামত সম্পর্কিত হাদিসে রসুল স. জানিয়েছেন, সেদিন হিসাবের জন্য সমবেত করা হবে সকল মানুষকে। অসহনীয় ওই পরিস্থিতিতে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে— আল্লাহ্র দায়িত্বে যাদের বিনিময় রয়েছে, তারা দাঁড়াও এবং বেহেশতে প্রবেশ করো। লোকেরা বলাবলি করবে, আল্লাহ্র দায়িত্বে আবার কার বিনিময় রয়েছে। ঘোষক বলবে— আল্লাহ্র দায়িত্বে যে বিনিময় রয়েছে তা হচ্ছে ক্ষমা। এ কথা শুনে হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে যাবে এবং দল বেঁধে সকলে প্রবেশ করবে জান্নাতে। উত্তম সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

এক বর্ণনায় এসেছে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন রসুল স. হজরত জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ভ্রাতঃ। এই নির্দেশনাটির মর্মার্থ কী? হজরত জিবরাইল বললেন, জানি না। আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ে পরে আপনাকে জানাবো। কিছুক্ষণ পর হজরত জিবরাইল পুনরায় আবির্ভূত হয়ে বললেন, হে রসুল! আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে আপনার উম্মতকে এই আয়াতের মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তোমরা তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করো। যে তোমাদেরকে বঞ্চিত করেছে তোমরা তাদেরকে দান করো। ক্ষমা করে দাও তাদেরকে যারা তোমাদেরকে কষ্ট দিয়েছে। জাবের, ইবনে আবীদ্ দুন্ইয়া, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও শা'বী থেকে ইবনে মারদুবিয়া।

হজরত উবাই বিন কাব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যে আপন অবস্থানকে উন্নত করতে চায় তার কর্তব্য হচ্ছে, সে যেনো ক্ষমা করে দেয় তার অধিকার খর্বকারীকে এবং সম্পর্ক স্থাপন করে সম্পর্কচ্ছেদকারী আত্মীয়ের সঙ্গে। এই হাদিসের সূত্র অবশ্য বিপর্যস্ত। হাকেম।

হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নিয়মিত দান করলেই নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা হয় না। সম্পর্কচ্ছেদকারী আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হলেই তাকে বলা যেতে পারে আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষাকারী। বোখারী।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর দরবারে এসে এক ব্যক্তি একবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার এমন কিছু আত্মীয় রয়েছে যারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে— তবুও আমি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলি। আমি তাদের উপকার করি, কিন্তু তারা আমার ক্ষতি করে। আমি তাদের জন্য ধৈর্যধারণ করি কিন্তু তারা করে আমার সঙ্গে নির্বোধজনোচিত আচরণ। রসুল স. বললেন, তুমি যেমন বললে সে রকমই যদি তোমার আচরণ হয়ে থাকে, তবে তো তাদের গরম পাত্রে ঘি ঢালছো। (এ রকম আচরণ করার কারণে তোমার সঙ্গে থাকবে আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ নেয়ামত ও সাহায্য, যে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকবে তোমার ওই আত্মীয়েরা)। মুসলিম।

হজরত ইবনে আব্বাস, জুহাক এবং কালাবী এই আয়াতের মর্মার্থ করেছেন এ রকম— হে রসুল! আপনি মানুষের নিকট থেকে তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ নিয়ে নিন। অন্য এক আয়াতেও এ রকম বলা হয়েছে। যেমন— তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, আমরা আল্লাহ্র রাস্তায় কি দিবো? আপনি বলে দিন, পরিবার-পরিজনের নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বাদে যা অতিরিক্ত থাকবে— সবই। জাকাত ফরজ হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হলে এই আয়াতটি অবশ্য রহিত হয়ে যায়।

'ওয়া' মুরু বিল মা'রুফ' কথাটির অর্থ— শরিয়ত ও জ্ঞানের দিক থেকে যা উত্তম তার নির্দেশ দিন। হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কাউকে মন্দ কাজ করতে দেখলে হাতের দ্বারা বাধা দিয়ো। না পারলে বাধা দিয়ো কথার মাধ্যমে। তাও যদি না পারো, তবে ওই মন্দ কর্মকে ঘৃণা কোরো অন্তর থেকে। আর এটাই হচ্ছে ইমানের দুর্বলতম স্তর। মুসলিম।

হজরত হুজায়ফার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার জীবনাধিকারী ওই পবিত্র সত্তার শপথ তোমরা উত্তমকর্মের নির্দেশ দিয়ো। মানুষকে বিরত রেখো মন্দকর্ম থেকে। নতুবা তোমাদের উপর অবতীর্ণ হবে আল্লাহ্তায়ালার শাস্তি। তোমরা তখন দোয়া করবে। কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে না। তিরমিজি।

ওয়া আ'রিদ্ব আ'নিল জাহিলীন অর্থ— এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা করো। অর্থাৎ মূর্খদের সঙ্গে সমান্তরাল আচরণ কোরো না। উপেক্ষা করো নির্বোধদেরকে। অন্য একটি আয়াতেও এ রকম বলা হয়েছে। যেমন 'ওয়া ইজা খত্বাবাহুমুল জাহিলুনা ক্বলু সালামা' (আর যখন নির্বোধেরা আহ্বান করে, বলে দাও সালাম)।

www.eelm.weebly.com

ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর সকল পয়গম্বরকে সর্বোত্তম স্বভাব গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আলোচ্য আয়াতেই রয়েছে সর্বোত্তম চরিত্র অর্জনের উত্তমতম নির্দেশনা।

হজরত জাবেরের বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে উত্তম চরিত্র ও সুন্দর কর্মপ্রণালীর পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরণ করেছেন।

জননী আয়েশার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. কখনও অশ্লীল কথা বলতেন না। অশ্লীল কথাকে পছন্দও করতেন না। বাজারে গিয়ে কাউকে চিৎকার করেও ডাকতেন না, মন্দের মাধ্যমে কখনও গ্রহণ করতেন না মন্দের প্রতিশোধ। বরং তিনি মার্জনা করতেন এবং উপেক্ষা করতেন। তিরমিজি, বাগবী।

পরের আয়াতে (২০০)বলা হয়েছে— 'যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্র শরণ গ্রহণ করবে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' 'নাজগুন' শব্দটির অর্থ আংগুলের অগ্রভাগ দিয়ে কোনো কিছু অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়া বা ঠুকে দেয়া। এখানে শব্দটির অর্থ হবে অনুপ্রাণিত করা, প্ররোচিত করা বা কুমন্ত্রণা দেয়া। তাই বলা হয়েছে— 'ওয়া ইম্মা ইয়ানযাগান্নাকা মিনাশ্‌শাইত্বনি নাজগুন' (যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে)। এখানে 'ইম্মা' শব্দটির 'মা' অতিরিক্ত।

আবদুর রহমান বিন জায়েদ বর্ণনা করেছেন, যখন 'তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করো' (১৯৯) আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. বললেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! আমি যদি ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ি, তখন কী করবো? তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াতটি— যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্র শরণ গ্রহণ করবে।

'ফাস্তায়িজ বিল্লাহ্' অর্থ— আল্লাহ্র শরণ গ্রহণ করবে। আল্লাহ্র শরণ গ্রহণ করলে কী হবে— সে কথাটি এখানে উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য কথাটি হচ্ছে— তখন আল্লাহ্তায়ালা শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণাকে অপসারিত করে দিবেন।

শেষে বলা হয়েছে— 'ইন্নাহু সামিউ'ন আ'লীম' (তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ)। এ কথার অর্থ— শয়তানের প্ররোচনা থেকে পরিত্রানের জন্য আল্লাহ্তায়ালার শরণপ্রার্থী হলে তিনি নিশ্চয়ই সে কথা শুনবেন। কারণ তিনি সর্বশ্রোতা। আর কীভাবে আপনার কার্য সমাধা হবে, সে কথাও তিনি উত্তমরূপে অবগত। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে— হে আমার রসুল! আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা বলে তিনি আপনার প্রার্থনা যেমন শোনেন, তেমনি তিনি সর্বজ্ঞ বলে

www.eelm.weebly.com

আপনার বিরুদ্ধবাদীদের অসৎ কর্মকাণ্ডের খবরও রাখেন। তাই তিনি নিজেই তাদেরকে শায়েস্তা করবেন। আপনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শয়তানের প্ররোচনাকে প্রশ্রয় দিয়ে আপনার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোনো বদলা নিতে যাবেন না।

সুরা আ'রাফঃ আয়াত ২০১, ২০২

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ۝ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۝

❒ যখন যাহারা সাবধান হয় তাহাদিগকে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় তখন তাহারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের চক্ষু খুলিয়া যায়।

❒ তাহাদিগের সংগী-সাথীগণ তাহাদিগকে ভ্রান্তির দিকে টানিয়া লয় এবং এ বিষয়ে তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

আলোচ্য আয়াত দু'টোতে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য উন্নততর জ্ঞান দান করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা সাবধানী, তাদেরকে যখন শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়, তখন তারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়।' এ কথার অর্থ— সাবধানীদেরকে (মুত্তাকীদেরকে) পথচ্যুত করার জন্য শয়তান সব সময় চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু তার চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। শয়তানের প্ররোচনা অনুভব করলেই তাঁরা হয়ে উঠেন আত্মসচেতন। তৎক্ষণাৎ অন্তরচক্ষু খুলে যায় তাঁদের। সে অন্তর্দৃষ্টির সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে শয়তানের প্ররোচনার কৌশল ও তত্ত্ব। তাই তাঁরা সহজেই আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন ওই প্ররোচনা থেকে।

সুদ্দী বলেছেন, পদস্খলনের সম্ভাবনা দেখা দেয়ার সাথে সাথেই মুত্তাকীরা হয়ে ওঠেন পূর্ণ সচেতন। মুকাতিল বলেছেন শয়তানের প্ররোচনা সহজেই অনুভব করতে সক্ষম হন সাবধানীরা। সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায় তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি। তাই সহজেই তারা মুক্ত হতে পারেন আল্লাহ্র নির্দেশবিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'শয়তান' অর্থ— শয়তানের সমাজ বা শয়তানের দল। যেমন, 'মানুষ' অর্থ— মনুষ্যকুল।

পরের আয়াতে (২০২) বলা হয়েছে, 'তাদের সঙ্গী-সাথীগণ তাদেরকে ভ্রান্তির দিকে টেনে নেয় এবং এ বিষয়ে তারা কোনো ত্রুটি করে না।' এখানে 'ইখওয়ানুহুম' অর্থ শয়তানের ভাই। অর্থাৎ ফাসেক ও পাপিষ্ঠ লোক সকল। কিংবা

www.eelm.weebly.com

সকল শয়তান। পাপিষ্ঠরা যেহেতু সাবধানী নয়, তাই তারা শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয় সহজেই। এভাবে আমস্তক ডুবে যায় পাপের গহ্বরে।

ছুম্মা লা ইয়ুক্বসিরুন অর্থ— এ বিষয়ে তারা কখনো ত্রুটি করে না অর্থাৎ পাপাচারীরা বিরত থাকে না পাপ থেকে। কারণ তারা অন্তর্দৃষ্টিবিবর্জিত এবং অসচেতন। তাদের অবস্থা মুত্তাকীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ রকম বলেছেন জুহাক ও মুকাতিল। কথাটির উদ্দেশ্য এ রকমও হতে পারে যে— তারা শয়তানকে বিরত রাখে না প্ররোচনা দান থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন কথাটির অর্থ— পাপীরা বিরত থাকে না পাপ থেকে এবং শয়তানও বিরত থাকে না প্ররোচনা প্রদান থেকে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২০৩

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

❑ তুমি যখন তাহাদিগের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর না তখন তাহারা বলে, 'তুমি নিজেই একটি কিছু বাছিয়া লও না কেন? বল, 'আমার প্রতিপালক দ্বারা আমি যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হই আমি তো শুধু তাহারই অনুসরণ করি। এই কুরআন তোমাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও দয়া।'

এখানে 'বি আয়াতিন' অর্থ কোরআন মজীদের আয়াত। অথবা ওই সকল মোজেজা, যা দেখতে চাইতো অবিশ্বাসীরা।

কালাবী বলেছেন, হিংসা ও বিদ্বেষবশতঃ অবিশ্বাসী মক্কাবাসীরা রসুল স. এর নিকট বিভিন্ন নিদর্শন (আয়াত) দেখতে চাইতো। কখনো কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটলে তারা বলতো, হে মোহাম্মদ! আগের আয়াতগুলোর মতো তুমি নিজে নিজে নতুন কোনো আয়াত বানিয়ে নাও না কেনো? তাদের এ রকম অপকথনের জবাবরূপে এই আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে—'তুমি যখন তাদের নিকট কোনো আয়াত উপস্থিত করো না, তখন তারা বলে, তুমি নিজেই একটা কিছু বেছে নাও না কেনো? বলো, আমার প্রতিপালক দ্বারা আমি যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হই আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি।'

শেষে বলা হয়েছে—'এই কোরআন তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এটা পথ নির্দেশ ও দয়া।' এ কথার অর্থ— কোরআন

www.eelm.weebly.com

আমার স্বরচিত কোনো বাণী নয়। কোরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার এক অতুলনীয় নিদর্শন। যারা এ কথা বিশ্বাস করে তাদের জন্য এই কোরআন পথনির্দেশ ও দয়া।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২০৪

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

❑ যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সহিত উহা শ্রবণ করিবে এবং নিশ্চুপ হইয়া থাকিবে যাহাতে তোমাদিগের প্রতি দয়া করা হয়।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কোরআন মজীদ পাঠ করার সময় মনোযোগের সাথে শুনতে হবে। এ রকম করলে কোরআন পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের উপর বর্ষিত হবে আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু আইয়াজের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, প্রথম দিকে নামাজীরা নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলতো। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়েখ, ইবনে মারদুবিয়া, ইবনে আবী শাইবা এবং সুনান গ্রন্থে বায়হাকী। হজরত আবু হোরায়রার অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর পশ্চাতে নামাজ পাঠকালে জোরে শব্দ করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নামাজ পাঠ করছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি স. নিরুত্তর রইলেন। ইতোপূর্বে নামাজের মধ্যেও সালাম আদান প্রদান চলতো। তাই আমি সালাম দিয়েছিলাম। কিন্তু এবার তিনি নামাজ শেষ করে আমার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যা চান তাই করেন। তখন অবতীর্ণ হয়েছিলো এই আয়াত। ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল বর্ণনা করেছেন, লোকেরা নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলতো। তাই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর রসুল স. নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিলেন। ইবনে মারদুবিয়া, বায়হাকী। হজরত কাতাদা বর্ণনা করেছেন, প্রথম দিকে লোকেরা নামাজে কথাবার্তা বলতো। নামাজ পাঠরত ব্যক্তিকে আগন্তুক জিজ্ঞেস করতো, কতো রাকাত পড়েছো? নামাজী জবাব দিতো, এতো রাকাত পড়েছি। এরপর এই আয়াত অবতীর্ণ হলে সকলের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। এই আয়াতে চুপচাপ মনোযোগের সঙ্গে কোরআন পাঠ শুনতে বলা হয়েছে। আবদুর রাজ্জাক, আব্‌দ ইবনে হুমাইদ, আবু শায়েখ, ইবনে জারীর।

জুহাক বর্ণনা করেছেন, লোকেরা নামাজের মধ্যে একে অপরকে ডাকতো। এরপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আব্‌দ ইবনে হুমাইদ।

www.eelm.weebly.com

উপরের বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, নামাজের অভ্যন্তরে কথাবার্তা নিষিদ্ধ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। ইমাম আবু হানিফা এবং এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমত এই যে, কম-বেশী, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত, জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে, অথবা বাধ্য হয়ে, যেভাবেই হোক না কেনো, নামাজের মধ্যে কথা বললে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। তবে বেখেয়ালে সালাম করলে নামাজ বাতিল হয় না। অন্য তিন ইমাম বলেছেন, ভুলবশতঃ কথা বললে, সালাম করলে, নামাজের মধ্যে কথা বলা যায় না এ কথা জেনেও কথা বলে ফেললে, সালামের সঙ্গে অন্য কথা বললে, অথবা আপনা আপনি মুখ থেকে সালাম উচ্চারিত হলে নামাজ বাতিল হবে না— কথা যতো বেশিই হোক না কেনো।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ভুলে অথবা না জেনে নামাজের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা বললে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম মালেক বলেছেন, নামাজের মধ্যে নামাজের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এ রকম বিষয়ে কথা বললেও নামাজ নষ্ট হয় না। যেমন— অন্ধকে রাস্তা বলে দেয়া, বিপথগামীকে পথের সন্ধান বলে দেয়া ইত্যাদি। এক্ষেত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে সিরীনের মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসটি তিন ইমামের ঐকমত্যের দলিল। সেখানে বলা হয়েছে, একবার রসুল স. আমাদেরকে মাগরিব অথবা ইশা— যে কোনো এক ওয়াক্তের নামাজ পড়িয়েছিলেন। দু'রাকাত নামাজ পড়ে তিনি সালাম ফিরালেন। মনে হলো তিনি স. খুবই রাগান্বিত। মসজিদের মধ্যে পড়ে ছিলো একটি তক্তা। তিনি তাতে হেলান দিয়ে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে আঙ্গুলের জাল বানালেন এবং বাম হাতের পিঠের উপর রাখলেন তাঁর দক্ষিণ গণ্ডদেশ। আমি তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলাম। সবাই বলাবলি করতে লাগলো, নামাজ কি কসর (সংক্ষিপ্ত) হয়ে গেলো? হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। কিন্তু তাঁরাও রসুল স.কে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিলেন না। সেখানে উপস্থিত লম্বা হাতবিশিষ্ট একজনকে বলা হতো জুলইয়াদাইন। তিনি বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! নামাজ কি কসর হয়ে গেলো। তিনি স. বললেন না। কসরও হয়নি। ভুলও হয়নি (পুরো নামাজই আমি পড়িয়ে দিয়েছি)। এরপর তিনি স. অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, জুলইয়াদাইন কি ঠিক কথা বলেছে? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ। এ কথা শুনেই রসুল স. সামনে চলে গেলেন এবং বাদ পড়ে যাওয়া নামাজ পড়ে নিলেন। শেষে সালাম ফিরিয়েই আল্লাহু আকবার বলে সেজদায় চলে গেলেন এবং সাধারণ সেজদার মতো অথবা তার চেয়ে একটু দীর্ঘ সেজদা করলেন। তারপর মস্তক উত্তোলন করলেন। পুনরায়

www.eelm.weebly.com

আল্লাহু আকবর বলে সেজদায় চলে গেলেন এবং সাধারণ সেজদার মতো অথবা তদাপেক্ষা কিছু দীর্ঘ সেজদা করলেন। তারপর আল্লাহু আকবার বলে মস্তক উত্তোলন করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন।

ইবনে সিরীনের নিকট এ ব্যাপারে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, আমি ইমরান বিন হুসাইনকে বলতে শুনেছি, তারপর তিনি স. সালাম ফিরিয়েছিলেন (এই কথাটুকু হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় নেই)। বোখারী ও মুসলিম হাদিসটির বর্ণনাকারী।

হজরত ইমরান বিন হুসাইন থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. আসরের নামাজ তিন রাকাত পড়িয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলো খারবাক নামক এক ব্যক্তি। তাঁর হাত ছিলো বেশ লম্বা। তিনি উচ্চস্বরে বিষয়টি বর্ণনা করলেন। রসুল স. তৎক্ষণাৎ গায়ে চাদর জড়াতে জড়াতে রাগান্বিত অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে এলেন। বললেন, এ লোক কি ঠিক কথা বলছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. তৎক্ষণাৎ অবশিষ্ট এক রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দু'টো সেজদা করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। মুসলিম। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, রসুলুল্লাহ্ স. এর ধারণা ছিলো, নামাজ পুরোপুরিই আদায় করা হয়েছে। ওদিকে জুলইয়াদাইনেরও ধারণা হয়েছিলো যে, নামাজ হয়তো সংক্ষেপ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এ রকম হলে তো নামাজ পূর্ণই হয়েছে। তাই তিনি ওরকম কথা বলেছিলেন। তাঁর ধারণায় নামাজ সংক্ষিপ্ত হওয়ার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাটিও বিদ্যমান ছিলো।

উপরের বর্ণিত হাদিস দু'টো বিশ্লেষণ করে যে আপত্তিগুলো তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে—

১. হজরত আবু হোরায়রা সপ্তম হিজরীতে মুসলমান হয়েছিলেন। আর জুলইয়াদাইন শহীদ হয়েছিলেন দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধে। সুতরাং এ কথা কেমন করে মেনে নেয়া যেতে পারে যে, ওই নামাজে হজরত আবু হোরায়রা ও জুলইয়াদাইন দু'জনে এক সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

২. বর্ণিত হাদিসে রয়েছে বৈসাদৃশ্য। কেউ বলেছেন, রসুল স. দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়েছিলেন। কেউ বলেছেন, সালাম ফিরিয়েছিলেন তিন রাকাত পড়ে।

৩. হাদিসে ওই সময়ের কথা বলা হয়েছে, যখন নামাজের মধ্যে কথা বলা ছিলো জায়েয। তাই তখন হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলেছিলেন।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখিত আপত্তিসমূহের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে— মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্যানুসারে হাদিসটি বিশুদ্ধ। কারণ, বদর যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেছিলেন হজরত যুশ্‌শামালাইন। কিন্তু হজরত জুলইয়াদাইন ইন্তেকাল করেছিলেন রসুল স. এর মহাতিরোধানের পর। হজরত ইমরান বিন হুসাইনের বর্ণনায় জুলইয়াদাইনকে বলা হয়েছে খারবাক। আর হজরত যুশ্‌শামালাইনের আসল নাম ছিলো উমাইর। প্রকৃতপক্ষে এই আপত্তিটি জুহুরীর বর্ণনায় প্রযোজ্য— যেখানে এসেছে, তখন যুশ্‌শামালাইন উঠে দাঁড়ালেন। আবু দাউদ।

আল্লামা সিজিস্তানী বলেছেন, নামের বিভ্রাট ঘটেছে এখানে। বর্ণনাকারীগণ ভেবেছেন, যুশ্‌শামালাইন এবং জুলইয়াদাইন একই ব্যক্তি। তাই তাঁরা জুলইয়াদাইনের পরিবর্তে উল্লেখ করেছেন যুশ্‌শামালাইনের কথা।

দ্বিতীয় জবাব এই যে, হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় কোনো তারতম্য নেই। হজরত ইমরান বিন হুসাইনের বর্ণনাতেও তো তিন রাকাত পড়ে সালাম ফিরানোর কথা আছে। তাঁর হাদিস সংকলন করেছেন মুসলিম। কিন্তু হজরত আবু হোরায়রার হাদিস অধিকতর বিশুদ্ধ। রসুল স. কয় রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়েছিলেন সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলেও দোষের কিছু নেই। এতে করে হাদিসের মূল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয় না।

এখন অবশিষ্ট রইলো, নামাজের মধ্যে কথাবার্তা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রসঙ্গটি। হজরত জায়েদ বিন আরকাম ছিলেন মদীনাবাসী। তিনি বলেছেন, আমরা নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলতাম। 'যখন কোরআন পাঠ আরম্ভ হয় তোমরা মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করবে' এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো এবং আমাদেরকে নামাজে চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হলো।

আবু সুলাইমান খাত্তাবী উল্লেখ করেছেন, হিজরতের কিছুকাল পরে নামাজের মধ্যে কথাবার্তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং এ কথাটি নিশ্চিত যে, হজরত আবু হোরায়ার ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই নামাজে কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আর হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং অন্যান্যদের কথাবার্তা বলা দ্বারা যে দলিল দেয়া হয়েছে, তার জবাব দেয়া হয়েছে দু'ভাবে। যেমন—

১. হজরত আবু আইয়ুব থেকে হাম্মাদ বিন যায়েদ উল্লেখ করেছেন, তখন নামাজিরা ইশারার মাধ্যমে 'হাঁ' বলেছিলেন। মুখে হাঁ উচ্চারণ করেননি। সুতরাং যে বর্ণনায় হাঁ বলেছেন— এ রকম বলা হয়েছে, সেই বর্ণনাটিরও উদ্দেশ্য হবে— মুখে হাঁ বলেননি, হাঁ বলেছিলেন ইশারায়।

www.eelm.weebly.com

২. হজরত আবু সাঈদ মুয়াল্লা বর্ণনা করেছেন, আমি মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়ছিলাম। এমন সময় রসুল স. আমাকে ডাকলেন। আমি সাড়া দিলাম না। নামাজ শেষ করার পর আমি রসুল স. এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমি নামাজ পড়ছিলাম তাই সাড়া দিতে পারিনি। রসুল স. বললেন আল্লাহ্পাক কি নির্দেশ দেননি— 'আসতাজীবু লিল্লাহি ওয়ালির্ রসুলিহি ইজা দাআ'কুম' (যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল তোমাদেরকে আহ্বান করে, তখন তাদের ডাকে সাড়া দাও)। বোখারী।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের স্বপক্ষে হজরত মুয়াবিয়া বিন হাকামের হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। হজরত মুয়াবিয়া বলেছেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে নামাজ পড়ছিলাম। এমন সময় একজনের হাঁচি উঠলো, আমি বলে উঠলাম ইয়ারহামুকুমুল্লাহ্। অন্যান্যরা আমার দিকে কটমট করে চাইলো। আমি বললাম তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছো কেনো? তারা তাদের নিজেদের উরুদেশে হাত দিয়ে আঘাত করলেন। আমি বুঝলাম তারা আমাকে চুপ করানোর চেষ্টা করছে। নামাজ শেষ হলো। রসুল স. আমাকে কাছে ডাকলেন। আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। আমি তাঁর পূর্বে ও পরে এ রকম শিক্ষাদানকারী দেখিনি। তিনি আমাকে প্রহারও করলেন না, মন্দও বললেন না। বরং বললেন, এটা হচ্ছে নামাজ। নামাজের মধ্যে কথাবর্তা বলা জায়েয নয়। নামাজের মধ্যে রয়েছে কেবল তসবিহ্, তকবির এবং কোরআন তেলাওয়াত। মুসলিম।

হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কথাবার্তা বললে নামাজ নষ্ট হয়, কিন্তু ওজু নষ্ট হয় না। দারাকুতনী।

প্রথমোক্ত হাদিসটি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, হাদিসটি ইমাম আবু হানিফার পক্ষে নয়— বিপক্ষে। হাদিসটিতে এ কথার উল্লেখ নেই যে, রসুল স. হজরত মুয়াবিয়াকে পুনরায় নামাজ পড়তে বলেছিলেন। এ কথা তিনি বলেননি। বরং বলেছিলেন, নামাজে কথা বলা যায় না। পরের হাদিসটির এক বর্ণনাকারীর নাম আবু কায়বা। তাকে বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল বলেছেন ইয়াহ্ইয়া বিন মুইন এবং আবদুর রহমান বিন ইসহাক। ইমাম আহমদ বলেছেন, তার বর্ণনা পরিত্যাজ্য। তার বর্ণনা প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা যায় না। ইবনে হাব্বানও এ রকম বলেছেন।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, আতা এবং মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে জুমআর খুতবার প্রসঙ্গে। এর মাধ্যমে ইমামের খুতবা

www.eelm.weebly.com

প্রদানের সময় চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অভিমতটিকে পছন্দ করেছেন আল্লামা সুয়ূতি। আমি খুতবার সময় চুপ থাকার মাসআলা বিবৃত করেছি সুরা জুমআর তাফসীরে।

ওমর বিন আবদুল আজিজ বর্ণনা করেছেন, বক্তার বক্তৃতার সময় শ্রোতাদের নীরব থাকাই সমীচীন। কালাবী বলেছেন, প্রথম দিকে নামাজের সময় কোরআন পাঠকালে বেহেশত ও দোজখের প্রসঙ্গ এলে নামাজিরা কেউ কেউ চিৎকার করে উঠতো। জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করতো। পরিত্রাণ প্রার্থনা করতো জাহান্নাম থেকে। কেউ কেউ ধারণা করেছেন, নামাজে ইমামের পিছনে উচ্চস্বরে ক্বেরাত না পড়ার হুকুম এই আয়াতের মাধ্যমেই দেয়া হয়েছে।

হজরত আবু হোরায়রা এবং জায়েদ বিন আসলাম থেকে বাগবী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. এর পশ্চাতে নামাজ পাঠকালে লোকেরা উচ্চ শব্দ করতো, অর্থাৎ সরবে কোরআন পাঠ করতো। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

বাগবী লিখেছেন, এক দল লোকের ইমাম হয়ে নামাজ পাঠের সময় হজরত মেকদাদ শুনতে পেলেন কেউ কেউ জোরে জোরে কোরআন পাঠ করছে। নামাজ শেষে তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা কি এ কথা জানোনা যে, নামাজে ইমামের কোরআন পাঠ নীরবে মনোযোগের সঙ্গে শুনতে হয়। আল্লাহ্তায়ালা এ রকমই নির্দেশ দিয়েছেন। বাগবী আরো লিখেছেন, হাসান, জুহুরী এবং নাখয়ীও এ রকম বলেছেন যে, ইমামের পেছনে মোক্তাদীর ক্বেরাত নিষেধ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। যারা বলেন জুমআর খুতবার সময় কথাবার্তা নিষেধ করার জন্য এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে— তাদের চেয়ে হাসান ও জুহুরীর উক্তিটি অধিকতর উত্তম, কেননা এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। আর জুমআর নামাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে মদীনায়।

বায়হাকী লিখেছেন, ইমাম আহমদের অভিমত এই যে, ঐকমত্যানুসারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে নামাজ সম্পর্কে, খুতবা সম্পর্কে নয়। ইবনে হুম্মামও এ রকম বলেছেন।

মুজাহিদের মাধ্যমে বাগবী উল্লেখ করেছেন, একবার রসুল স. নামাজে কোরআন পাঠ করছিলেন তখন এক আনসারী মোক্তাদীও কোরআন পাঠ করছিলেন। ওই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। আমি ইমামের পিছনে মোক্তাদীর ক্বেরাত বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেছি সুরা মুরসালের তাফসীরে।

জুহুরীর মাধ্যমে ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এক আনসারী যুবক সম্পর্কে। এক নামাজে রসুল স. কোরআন পাঠ করছিলেন। ওই যুবকটিও তাঁর সাথে সাথে কোরআন পাঠ করছিলো।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, নামাজের বাইরে কোরআন পাঠ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। সাঈদ বিন মানসুর বলেছেন, মোহাম্মদ বিন ক'াব থেকে বর্ণিত হয়েছে, লোকেরা রসুল স. এর নিকট থেকে কোরআন শিখতো। তিনি স. যা পাঠ করতেন, সকলেই সমস্বরে তাই পাঠ করতো। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 'লুবাবুন্ নুকুল' গ্রন্থের রচয়িতা লিখেছেন, এই বর্ণনাটির মাধ্যমে স্পষ্ট জানা যায় যে, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়।

অধ্যায় ঃ যে ব্যক্তি নামাজরত নয়, সে নামাজরত অথবা নামাজের বাইরের কাউকে কোরআন পাঠ করতে দেখলে কী করবে? কেবল নীরব থাকবে, না মনোযোগের সঙ্গে শুনবেও। এই মাসআলাটির ব্যাপারে মতপার্থক্য বিদ্যমান। বায়যাবী লিখেছেন, আলেমগণের মতে এমতাবস্থায় মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করা মোস্তাহাব— ওয়াজিব নয়। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, আলেমগণের কথায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, নামাজের ভিতরে ও বাইরে— উভয় অবস্থায় কোরআনের আবৃত্তি মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করা ওয়াজিব।

খুলাসা গ্রন্থে রয়েছে, কোনো ফেকাহ্র গ্রন্থ লিপিবদ্ধকালে কারো সামনে যদি কোরআন শরীফ পাঠ করা হয়— তখন গ্রন্থ রচনাকারী যদি কোরআন পাঠের দিকে মনোযোগী হতে না পারে, তবে কোরআন পাঠক গোনাহ্গার হবে। এই সূত্রটি ধরে এই মাসআলাটিও এসেছে যে, রাতে ছাদের উপর কেউ চিৎকার করে কোরআন পাঠ করলে সে গোনাহ্গার হবে, যেহেতু তা ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে মানুষের বিশ্রাম ও নিদ্রায়। আলোচ্য আয়াতে মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, বিশেষ একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের নির্দেশনাটি একটি সাধারণ নির্দেশনা।

আমি বলি, হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. রাতে উচ্চস্বরে কোরআন পাঠ করতেন। তাঁর প্রকোষ্ঠের বাইরে থেকেও ওই কোরআন পাঠ শ্রুত হতো। আর অনেকেই তা মন দিয়ে শুনতেন। হজরত উম্মে হানী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা। হজরত উম্মে হানী বলেছেন, আমি রাতে আমার গৃহের ছাদের উপর শয়ন করতাম। তখন শুনতে পেতাম রসুল স. এর কোরআন পাঠের আওয়াজ। ওই হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে আ'রিস শব্দটি। বাগবী তাঁর 'শারহুস সুন্নাহ্' গ্রন্থে লিখেছেন, আ'রিস অর্থ ছাদ। তখনকার মক্কার ঘরগুলোকে আ'রিস বলা হতো এই কারণে যে, সেগুলোতে থাকতো কাঠের ছাদ। মঞ্চের মতো নির্মিত ওই ছাদগুলোতে মানুষ উপবেশন করতো অথবা শয়ন করতো। আবু দাউদ।

তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শয়নগৃহে রসুল স. এর কোরআন পাঠ বাইরের মানুষও শুনতে পেতো। তাঁর পবিত্র সহধর্মিনীগণ কেউ কেউ ওই সময় ঘুমিয়ে থাকতেন। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে জননী আয়েশা

www.eelm.weebly.com

রা. বলেছেন, আমি রসুল স. এর সামনে শুয়ে থাকতাম। তিনি নামাজ পাঠ করতেন। সেজদার সময় আমার পায়ে হাত রেখে সরিয়ে নেয়ার ইশারা করতেন। আমি পা গুটিয়ে নিতাম। সেজদা শেষে তিনি দাঁড়িয়ে গেলে পুনরায় প্রসারিত করে দিতাম পা। তখন ঘরে কোনো আলো থাকতো না। এছাড়া সাহাবীগণের সাধারণ অভ্যাস ছিলো এই যে, তাঁরা দিনে রাতে সব সময় উচ্চস্বরে কোরআন পাঠ করতেন। কেউ কারো বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন না।

মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু মুসা আশয়ারী বলেছেন, রসুল স. একবার আমাকে বললেন, তুমি গত রাতে কোরআন তেলাওয়াত করছিলে। আর আমি তোমার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। বোখারী ও মুসলিমে আরো এসেছে হজরত আবু মুসা বলেছেন, রসুল স. বলতেন, সফরের সময়েও আমি আমার সফরসঙ্গী আবু মুসার কণ্ঠস্বর চিনতে পারি— যখন সে কোরআন তেলাওয়াত করে। যে স্থানে কোরআন তেলাওয়াত করা হয়, সেই স্থানও আমি চিনে নিতে পারি। অথচ দিনের বেলায় চিনতে পারি না। এতে করে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধযাত্রার সময় রাত্রে হজরত আবু মুসা কোরআন পাঠ করতেন, তখন সৈনিকদের অনেকেই থাকতেন নিদ্রিত।

ইবনে আবী দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী বিন আবী তালেব একবার মসজিদের মধ্যে কিছু লোকের কোরআন তেলাওয়াত শুনলেন এবং বললেন, এ সকল লোকের জন্য রয়েছে শুভ সংবাদ। রসুল স. এ রকম পছন্দ করতেন। —এ সকল হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, খুলাসা রচয়িতার অভিমতটি ভুল।

হজরত মুয়াবিয়া বলেন, সম্ভবতঃ আমি হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল প্রমুখ সাহাবীকে একবার জিজ্ঞেস করলাম, কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনতে পেলে শ্রোতার উপর কি মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করা ও চুপচাপ থাকা ওয়াজিব? তাঁরা বললেন, 'যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন মনোযোগ সহকারে শোনো ও চুপ করে থাকো।' —এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ইমামের পিছনে মোক্তাদীর কোরআন পাঠকে নিষিদ্ধ করার জন্য।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত আল কোরআন শব্দটির মধ্যে যে আলিফ লাম রয়েছে, তা আহাদি (সীমাবদ্ধ) —জিনস্ (সামগ্রিক) বুঝানোর জন্য নয়। আলিফ লাম এর এ রকম প্রয়োগের মাধ্যমে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, কোরআনের ওই তেলাওয়াত তোমরা মনোযোগের সঙ্গে শোনো এবং নিশ্চুপ থাকো যা পাঠ করা হয় তোমাদেরকে শোনানোর জন্যই। যেমন— ইমাম কোরআন পাঠ করেন মোক্তাদীকে শোনানোর জন্য, জনসমাবেশে বক্তা তেলাওয়াত করেন সমবেত জনতাকে শোনানোর জন্য, ক্বারী সাহেব তেলাওয়াত করেন তাঁর ছাত্রদেরকে শেখানোর জন্য ইত্যাদি। আল্লাহ্তায়ালাই সঠিক তত্ত্ব অবগত।

www.eelm.weebly.com

দ্রষ্টব্যঃ নিজের কোরআন পাঠে অথবা ইমামের তেলাওয়াতে বেহেশত দোজখের প্রসঙ্গ এলে সঙ্গে সঙ্গে বেহেশত প্রার্থনা ও দোজখ থেকে পরিত্রাণ কামনা করা উচিত নয়। বরং স্বাভাবিক গতিতে তেলাওয়াত চালিয়ে যাওয়া ওয়াজিব। কালাবীর এ রকম অভিমত ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, নীরবে কোরআন পাঠ শ্রবণকারীর জন্য রহমতের অঙ্গীকার করা হয়েছে। সে কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে এভাবে— যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার সত্ত্বেও যারা কোরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে উদাসীন, তাদের রহমত পাওয়া বা দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মাসআলা ঃ একা একা ফরজ নামাজ পাঠকারীও কোরআন তেলাওয়াতের সময় বেহেশতপ্রার্থনা বা দোজখমুক্তির প্রার্থনা করতে পারবে না। কিন্তু নফল নামাজ পাঠকারী তার নামাজে তেলাওয়াতের সময় জান্নাতের প্রসঙ্গ এলে জান্নাত প্রাপ্তির জন্য এবং জাহান্নামের প্রসঙ্গ এলে তা থেকে মুক্তির জন্য নামাজের মধ্যেই দোয়া করতে পারবে। বরং এ রকম করাই উত্তম। আর নফল নামাজের তেলাওয়াতে মনোযোগও দিতে হবে অত্যন্ত গভীরভাবে।

হজরত হুজায়ফা বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে একবার রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ) পড়লাম। রসুল স. কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে জান্নাতের কথা পাঠ করলে পাঠ থামিয়ে জান্নাতপ্রাপ্তির প্রার্থনা করলেন। আবার দোজখের বিবরণ এলে তেলাওয়াত থামিয়ে দোয়া করলেন দোজখ থেকে পরিত্রাণের জন্য।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২০৫

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝

❑ তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করিবে। এবং তুমি উদাসীন হইবে না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে নামাজের ক্বেরাতের উচ্চারণসীমা নির্দেশ করা হয়েছে। 'ওয়াজকুর রব্বাকা ফি নাফসিকা' কথাটির মধ্যে উল্লেখিত জিকির অর্থ নামাজের ক্বেরাত। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে, নামাজের মধ্যে গোপনে, মনে মনে ক্বেরাত পাঠ করবে। ওয়া দুনাল জাহ্‌রি মিনাল

www.eelm.weebly.com

ক্বওলি— এখানে আল জাহরি অর্থ, প্রকাশ্য নামাজ (যে নামাজে জোরে ক্বেরাত পড়তে হয়)। দুনাল জাহরি অর্থ অনুচ্চস্বরে। অর্থাৎ সুউচ্চস্বরের চেয়ে কম আওয়াজে এবং নিঃশব্দ আওয়াজের চেয়ে কিছুটা উচ্চস্বর। এ রকম বলার উদ্দেশ্য এই যে— যে নামাজগুলোতে উচ্চস্বরে ক্বেরাত পাঠের বিধান রয়েছে সে নামাজগুলোর মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট উচ্চারণে কোরআন পাঠ কোরো, অতিরিক্ত চিৎকার কোরো না। বরং এমন শান্তভাবে সুমধুর স্বরে পড়ো যেনো পশ্চাতের ব্যক্তিদের শুনতে কোনো অসুবিধা না হয়।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এ রকমও হতে পারে যে, কোরআন পাঠ করো মধ্যবর্তী আওয়াজে— খুব নিম্নস্বরে নয়, আবার খুব উচ্চ স্বরেও নয়। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন— তোমরা তোমাদের আওয়াজ অতি উচ্চ কোরো না এবং কোরো না অতি নিম্ন। বরং অবলম্বন করো মধ্যবর্তী পন্থা। হজরত আবু কাতাদার স্পষ্ট হাদিসেও এই বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

হজরত আবু কাতাদা বলেছেন, এক রাতে রসুল স. হজরত আবু বকরের গৃহে গমন করে দেখলেন, তিনি নামাজে মনে মনে কোরআন মজীদ পাঠ করছেন। এরপর হজরত ওমরের গৃহে গিয়ে দেখলেন, তিনি নামাজে কোরআন পাঠ করছেন উচ্চস্বরে। পরদিন দু'জনে রসুল স. এর দরবারে এলে তিনি স. হজরত আবু বকরকে বললেন, নামাজে এমনভাবে কোরআন পাঠ করো যে শোনাই যায় না। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি যার ইবাদত করি, তাঁকে শোনানোই আমার উদ্দেশ্য। রসুল স. তখন হজরত ওমরকে বললেন, তুমি তো কোরআন পাঠ করো উচ্চকণ্ঠে। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি উচ্চস্বরে কোরআন পাঠ করি এ জন্য যে, শয়তান যেনো আমার আওয়াজ শুনে পালিয়ে যায় এবং নিদ্রামগ্ন লোকেরা জাগ্রত হয় ইবাদতের জন্য। রসুল স. হজরত আবু বকরকে বললেন, তুমি তোমার আওয়াজ কিছুটা বাড়াও এবং হজরত ওমরকে বললেন, তুমি তোমার আওয়াজ কিছুটা কমাও। আবু দাউদ। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন রেবাহ আনসারী থেকে তিরমিজিও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, কোরআন পাঠের উচ্চারণসীমা সম্পর্কিত নির্দেশনাটি আসলে এ রকম— নীরবে ও সরবে, দু'ভাবেই তোমরা পাঠ করো কোরআন মজীদ। কিন্তু অতি উচ্চকণ্ঠ হয়ো না। কখনো পাঠ করো আওয়াজ করে, কখনো পাঠ করো বিনা আওয়াজে। পাঠ করো দু'ভাবেই।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রাতের নামাজে রসুল স. কখনো উচ্চ কণ্ঠে আবার কখনো নিম্ন কণ্ঠে কোরআন পাঠ করতেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন উবাই কায়েস বর্ণনা করেছেন, আমি জননী আয়েশার নিকট রসুল স. এর ক্বেরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বললাম, হে আমাদের জননী! আপনি দয়া করে বলুন, রসুল স. কীভাবে কোরআন পাঠ করতেন— সশব্দে না নিঃশব্দে? জননী বললেন, দু'রকমভাবেই কোরআন পাঠ করতেন তিনি— কখনো শব্দবিবর্জিতভাবে আবার কখনো শব্দসহযোগে। আমি বললাম, আল্লাহ্তায়ালার শোকর। রসুল স. তো সকল নিয়মই সিদ্ধ রেখেছেন। তিরমিজি। তিরমিজির মতে হাদিসটি উত্তম, বিশুদ্ধ ও দুর্লভ।

দ্রষ্টব্যঃ রাতে নামাজে এবং নামাজের বাইরে কিরূপে কোরআন পাঠ করতে হবে— সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন রকমের উক্তি করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, মনে মনে কোরআন পাঠ করা মকরূহ্। কোরআন পাঠ করতে হবে স্পষ্ট উচ্চারণে। তার প্রমাণ স্বরূপ রয়েছে হজরত উম্মে হানী এবং হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদিসগুলো— যেগুলোতে বলা হয়েছে, রসুল স. গৃহমধ্যে কোরআন পাঠ করতেন। কিন্তু তার আওয়াজ শোনা যেতো বাইরে থেকে। হজরত উম্মে হানী বলেছেন, তিনি রসুল স. এর কোরআন পাঠ শুনতে পেতেন তাঁর গৃহের ছাদ থেকে।

জমহুরের অভিমত হচ্ছে, সশব্দে বা নিঃশব্দে কোরআন পাঠ করার বিষয়টি পাঠকের নিজস্ব বিষয়। ইচ্ছে করলে সে সশব্দে, আবার ইচ্ছে করলে নিঃশব্দে কোরআন পাঠ করতে পারবে। হজরত আবু হোরায়রা এবং জননী আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. কখনো কোরআন তেলাওয়াত করতেন উচ্চ কণ্ঠে আবার কখনো কোরআন তেলাওয়াত করতেন নিম্ন কণ্ঠে।

তাহাবী লিখেছেন, হজরত উম্মে হানী এবং হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসগুলোতে উচ্চস্বরে কোরআন পাঠের কথা বলা হলেও রসুল স. কখনো নিঃশব্দে বা নিম্নস্বরে কোরআন পাঠ করেননি— এ রকম কোনো কিছু বলা হয়নি। অর্থাৎ সব সময়ই তিনি উচ্চস্বরে কোরআন পাঠ করতেন, এ রকম কথা তাদের হাদিসে নেই। হজরত আবু হোরায়রার এক হাদিসে বলা হয়েছে, নামাজী ব্যক্তি ইচ্ছে করলে নিঃশব্দে কোরআন পাঠ করতে পারে। আবার পাঠ করতে পারে উচ্চস্বরেও। অবশ্য শেষের উক্তিটিই অধিকতর উত্তম। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ এই অভিমতটির স্বপক্ষে।

যারা নামাজীকে সশব্দে বা নিঃশব্দে— যে কোনোভাবে কোরআন পাঠের স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন, তাদের মধ্যেও রয়েছে দু'টি দল। এক দলের মতে নিঃশব্দে পাঠ করাই উত্তম। কেননা হজরত উকবা বিন আমের বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, উচ্চস্বরে কোরআন পাঠকারী সর্বসমক্ষে সদকা প্রদানকারীর মতো এবং নিঃশব্দে কোরআনপাঠকারী গোপনে সদকা প্রদানকারীর

www.eelm.weebly.com

মতো। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম সূত্রসম্বলিত। এ কথা সন্দেহাতীত সত্য যে, প্রকাশ্য দান অপেক্ষা গোপন দান উত্তম। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— তোমরা প্রকাশ্যে যদি দান করো তবে তা উত্তম। আর যদি গোপন রাখো এবং দরিদ্রদেরকে দিয়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

হজরত আ'মাশ বর্ণনা করেছেন, আমি ইব্রাহিমের নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি কোরআন মজীদ দেখে দেখে পাঠ করছেন। একটু পরে এক ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলো। ইব্রাহিম তাড়াতাড়ি কোরআন মজীদ গুটিয়ে ফেলে পৃথক স্থানে রেখে দিলেন। বললেন, ওই লোকটি যাতে বুঝতে না পারে যে আমি সব সময় কোরআন মজীদ পড়ি।

আবুল আলীয়া বর্ণনা করেছেন, আমি জনৈক সাহাবীর নিকট বসেছিলাম। আরো কয়েকজন উপবিষ্ট ছিলো সেখানে। এক লোক বললো, আমি রাতে এতদূর পর্যন্ত কোরআন শরীফ পাঠ করেছি। সাহাবী বললেন, কোরআন মজীদ পাঠ করা এতটুকুই ছিলো তোমার ভাগ্যে।

অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে, উচ্চ কণ্ঠে কোরআন মজীদ পাঠ করাই উত্তম। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে কতিপয় হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এখানে আরো কতিপয় হাদিস বর্ণনা করা হলো।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নবীর সুমধুর স্বরের কোরআন পাঠ যেভাবে শ্রবণ করেন, সেভাবে আর কোনো কিছুই শ্রবণ করেন না। এখানে শ্রবণ করেন অর্থ প্রসন্ন হন এবং গ্রহণ করেন।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে হজরত আবু মুসা আশয়ারী বলেছেন, রসুল স. একবার মন্তব্য করলেন, হে আবু মুসা! নবী দাউদের কণ্ঠস্বর থেকে তোমাকে দেয়া হয়েছে একটি কণ্ঠস্বর।

হজরত ফুজালা বিন উবাইদ থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রমণীদের সঙ্গীত যেমন মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করা হয়, তার চেয়ে অধিক মনোযোগের সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালা শ্রবণ করেন সুমধুর কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট কোরআন পাঠকের আবৃত্তি।

আবু দাউদ, নাসাঈ প্রমুখ হজরত বারা বিন আজীব থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের কণ্ঠস্বর দ্বারা পবিত্র কোরআনকে সজ্জিত করো (সুমধুর স্বরে কোরআন পাঠ করো যাতে শ্রোতার শ্রুতি ও অনুভব প্রশান্ত হয়)।

www.eelm.weebly.com

নীরব পাঠ উত্তম না সরব— এই বিষয়টির সমাধান প্রদানার্থে ইমাম গাজ্জালী এবং কিছু সংখ্যক আলেম উল্লেখ করেছেন, যদি পাঠক ধারণা করে, উচ্চ কণ্ঠে কোরআন পাঠ করলে অন্তরে অহমিকার সৃষ্টি হবে, তবে তার জন্য নিঃশব্দ পাঠই উত্তম। আর অহমিকা থেকে নির্ভয় বোধ করলে উচ্চ কণ্ঠে পাঠ করাই উত্তম। এতে করে অন্যেরও উপকার হয়। পাঠক ও শ্রোতা দু'জনেই হয় উজ্জীবিত। দূর হয়ে যায় আলস্য, নিদ্রা এবং জড়তা। নিদ্রিত ব্যক্তি জেগে উঠে মনোযোগী হতে পারে তার ইবাদতে। এ সকল দিক বিবেচনা করে বলতে হয়— সশব্দে কোরআন পাঠই উত্তম। এতে সওয়াবও হয় বেশী। তাই আমরা বলি, পবিত্র কোরআন দেখে পড়াই উত্তম।

আমি বলি, এ কথাটি সন্দেহাতীত যে, সশব্দে কোরআন পাঠের স্বপক্ষে রয়েছে অনেক হাদিস। এ পক্ষে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের রয়েছে অসংখ্য উক্তি ও আমল। কিন্তু এই বিধানটি ওই ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য, যার অন্তরে রিয়া আগমনের কোনো সম্ভাবনা নেই। রিয়ামুক্ত তেলাওয়াত মানুষের জন্য কিছুতেই বিব্রতকর বা কষ্টকর নয়। বরং তা হৃদয়হারক। কিন্তু অহমিকার সম্ভাবনা থাকলে সশব্দে পাঠ না করাই উত্তম। অর্থাৎ অহমিকার সম্ভাবনা না থাকলে সশব্দে কোরআন পাঠ মোস্তাহাব। যদি কিছু লোক কোরআন শ্রবণের জন্য একত্র হয় তবে সশব্দে কোরআন পাঠ করা অধিকতর উত্তম। কিন্তু শ্রমসাধ্য ও চিৎকার সর্বস্ব কোরআন পাঠ জায়েয নয়। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, দুনাল জাহরি মিনাল ক্বওলি।

ইমাম মোহাম্মদ তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে ইমাম মালেক সূত্রে আবু সুহায়েলের পিতার উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বিন খাত্তাব নামাজে এতো জোরে ক্বেরাত পাঠ করতেন যে, আমি আবু জাহিমের ঘরের কাছ থেকেই তাঁর ক্বেরাত শুনতে পেতাম। এ কারণেই ইমাম মোহাম্মদ বলেন, জেহেরী (সরবে পঠিতব্য) নামাজে উচ্চস্বরে কোরআন তেলাওয়াত করা উচিত। কিন্তু এতো উচ্চস্বরে পাঠ করা উচিত নয়, যাতে পাঠক কষ্টের মধ্যে পড়ে।

একটি প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্‌র জিকির ও দোয়ায় উচ্চকণ্ঠ হওয়া বেদাত। নিঃশব্দে এবং অনুচ্চস্বরে জিকির করা এবং দোয়া করা সুন্নত। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে জিকিরের আলোচনাসূত্রে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ক্বেরাতের। তাহলে ক্বেরাত ও জিকিরের মধ্যে পার্থক্য কী? ক্বেরাতও তো জিকির— নয় কি?

উত্তর ঃ কোরআনের মধ্যে রয়েছে অনেক উপদেশ, অনেক শিক্ষণীয় ঘটনা এবং অনেক জরুরী বিধান। কোরআনের বিবরণ ও ব্যঞ্জনা হৃদয়গ্রাহী, মাধুর্যমণ্ডিত এবং প্রাঞ্জল। এই বৈশিষ্ট্যগুলো জিকির অপেক্ষা অতিরিক্ত। জিকিরের মাধ্যমে

www.eelm.weebly.com

অন্তরের ঔদাসিন্য বিদূরিত হয়। জিকির স্বয়ং একটি ইবাদত। কিন্তু এর মধ্যে অন্যকে শোনানোর মতো কিছু নেই— যেরকম রয়েছে কোরআনে। আর কবুল হওয়া না হওয়াই দোয়ার বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এর মধ্যেও অন্যকে জানানোর কিছু নেই। তাই নীরব জিকির ও দোয়া সর্বোত্তম। নীরব জিকিরের গতি মগ্নতার দিকে। জিকিরে মগ্ন ব্যক্তির স্মৃতিপটে কেবল আল্লাহ্ই সমুদ্ভাসিত থাকেন। এভাবেই তার লাভ হয় ফানাফিল্লাহ। এ সকল বৈশিষ্ট্য আবার কেরাতের মধ্যে নেই।

দ্রষ্টব্য ঃ শো'বা বর্ণনা করেছেন, আমাকে হজরত আবু উবায়দা 'তোমরা সুমধুর কণ্ঠস্বর দ্বারা পবিত্র কোরআনকে অলংকৃত করো'— এই হাদিসটি প্রচার করতে নিষেধ করেছিলেন। হজরত আবু উবায়দা তখন বলেছিলেন, এ হাদিস শুনলে লোকেরা কোরআনকে কেন্দ্র করে সুর চর্চা ও স্বর চর্চা শুরু করে দিতে পারে। এরপর অবশ্য হজরত আবু উবায়দা সুমধুর স্বরে কোরআন পাঠ প্রসঙ্গে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এই হাদিসগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে— কোরআন পাঠ করতে হবে আল্লাহ্র ভয় ও ভালোবাসা বুকে নিয়ে আবেগপ্রবণ স্বরে— নিছক প্রমোদ কিংবা চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে নয়। কেবল কণ্ঠশৈলীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রদর্শনের জন্যও নয়। তাঁর এ উক্তির স্বপক্ষে মারফু সূত্রে ও অন্যান্য সূত্রে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেমন তাউসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স.কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম কোরআন পাঠকারী কে? তিনি স. বললেন, ওই ব্যক্তি— যার পাঠ শুনলে মনে হয় আল্লাহ্র ভয় বুকে নিয়েই সে কোরআন পাঠ করছে।

দারেমী বলেছেন, তাউসের বর্ণনাটি মুরসাল। বর্ণনাটির সারমর্ম হচ্ছে, ওই ব্যক্তিই সুমধুর স্বর বিশিষ্ট পাঠক, যার পাঠের সঙ্গে রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার ভয়।

হজরত হুজায়ফা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আরবী উচ্চারণে ও নিয়মে কোরআন পাঠ করো। ওই দুই কিতাবওয়ালাদের সঙ্গিতমুখীনতা থেকে বিরত থাকো। ভবিষ্যতে এমন লোক আসবে, যারা গানের সুরে অথবা বিলাপ বা শোকগাঁথার সুরে কোরআন পাঠ করবে। কিন্তু কোরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিচে পৌঁছবে না। তাদের ও তাদের অনুরাগীদের অন্তর ফেতনায় নিমজ্জিত হবে। বায়হাকী এবং রজীন তাঁদের আপনাপন গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

মুজাহিদ বলেছেন, জিকির করবে অন্তরে অন্তরে। এটাই এই আয়াতের বক্তব্য। অর্থাৎ দোয়ার মধ্যে থাকতে হবে বিনয় ও শঙ্কা। উচ্চকণ্ঠ হবে না। চিৎকার করে আল্লাহ্কে ডাকাডাকি করবে না। মনে মনে দোয়া করলে হৃদয়ের বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি পায়।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, এখানে 'অনুচ্চস্বরে' এবং 'মনে মনে' কথা দু'টের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সংযোগ। কথা দু'টোর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে জিকিরে জেহেরী (উচ্চস্বরের জিকির) এবং জিকিরে খফিকে (মনে মনে জিকিরকে)। 'উদ্উ রব্বাকুম তাদ্বার্রুআঁ'ও ওয়া খুফ্ইয়াতান' (তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো সবিনয়ে চুপেচুপে) আয়াতের তাফসীরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বায়যাবী লিখেছেন, মনে মনে ও অনুচ্চস্বরে জিকির করার হুকুমটি প্রযোজ্য হবে মোক্তাদির উপর। অর্থাৎ ইমামের ক্বেরাত শেষ হলে মোক্তাদিরা মনে মনে বা অনুচ্চস্বরে ক্বেরাত পাঠ করবে। ইমাম শাফেয়ীও এ রকম বলেছেন। বায়যাবীর অভিমতটি কিন্তু ভুল। কেননা এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে কেবল রসুল স.কে। তিনি স. ছিলেন ইমাম। তাই এখানে সম্বোধনের শব্দরূপটি একবচনের। মোক্তাদিদেরকে সম্বোধন করা হলে এখানে বহুবচনের সম্বোধনরূপ ব্যবহৃত হতো। যেমন আগের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তোমরা মনযোগের সঙ্গে তা শ্রবণ করবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।' আরেকটি কথা এই যে, ক্বেরাত জেহেরী বা সির্‌রি (সশব্দ বা নিঃশব্দ) যে রকমই হোক না কেনো চুপচাপ মনোযোগের সঙ্গে তা শুনতে হবে। শুনতে না পেলেও অভিনিবেশী হতে হবে ইমামের ক্বেরাতের প্রতিই। এ রকম না করলে মোক্তাদির আমল হয়ে যাবে পূর্বের আয়াতের নির্দেশনা বিরোধী। মোক্তাদি ইমামের ক্বেরাতের প্রতি মনোযোগী হবে, আবার নিজেও ক্বেরাত পাঠ করবে— এ রকম তো হতেই পারে না। আর ইমামের ক্বেরাত শেষ হলে তো তিনি সঙ্গে সঙ্গে রুকুতে চলে যাবেন। মোক্তাদীকেও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। তাহলে মোক্তাদি আবার ক্বেরাত পড়বে কখন। তাই আলেমগণ বলেছেন, ইমামের অনুসরণ করা যেহেতু ফরজ, তাই ইমাম রুকুতে থাকবে আর মোক্তাদি ক্বেরাত পাঠ করবে— এ রকম করা কিছুতেই জায়েয নয়। আবার ক্বেরাত শেষে ইমাম রুকুতে না গিয়ে যদি মোক্তাদির ক্বেরাত পড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন তবে তো তিনি আর ইমামই রইলেন না— মোক্তাদির অনুগত হয়ে গেলেন।

'বিল গুদুয়্যি' অর্থ প্রত্যুষে, ভোরে, প্রভাতে অথবা দিবসের প্রারম্ভে। শব্দটি মূল ধাতু। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'আল গুদুওয়াতু' শব্দটির 'গইন' অক্ষরকে পড়তে হবে পেশ সহযোগে। 'গুদওয়াতু' অর্থ সুবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়।

'ওয়াল আসলি' অর্থ দিবসের শেষ ভাগ। শব্দটি 'আসিল' শব্দের বহুবচন। বাগবী লিখেছেন, আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়কে বলে 'আসিল'। প্রত্যুষ ও সায়াহ্ন— সময় দু'টো যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তাই ওই দুই সময়ে জিকির করতে

www.eelm.weebly.com

বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্‌র জিকির তো করতে হবে সর্বক্ষণ। তাই শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়ালা তাকুম্ মিনাল গফিলিন' (এবং তুমি উদাসীন হবে না)। এ কথার অর্থ— কোনো সময়েই আল্লাহ্‌র জিকির থেকে অমনোযোগী হবে না।

আমি বলি, আয়াতের প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়াজকুর্‌রব্বাকা ফি নাফসিকা'। পরে বলা হয়েছে 'বিল গুদুয়্যি ওয়াল আসালি ওয়ালা তাকুম্ মিনাল গফিলিন'। এই বিবরণভঙ্গির মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এখানে 'জিকির' বলে সব রকম জিকিরকেই বুঝানো হয়েছে। কোরআন তেলাওয়াত অথবা অন্য যে কোনো ধরনের জিকির এই আয়াতের নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্‌র স্মরণের বিষয়ে উদাসিনতা বা অমনোযোগিতা দূর করাই এখানে প্রধান উদ্দেশ্য— যে কোনো ধরনের জিকিরের মাধ্যমে হোক না কেনো।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২০৬

السجدة

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۩

❑ যাহারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রহিয়াছে তাহারা অহংকারে তাঁহার ইবাদতে বিমুখ হয় না ও তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁহারই নিকট সিজদাবনত হয়।

এখানে 'যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে' কথাটির উদ্দেশ্য— ফেরেশতাবৃন্দ, নবী রসুলগণ এবং পুণ্যবানগণ। এঁরাই আল্লাহ্‌তায়ালার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। উল্লেখ্য যে, সান্নিধ্য বা নৈকট্য বলতে আমরা যা বুঝি, সে রকম নৈকট্য বা সন্নিধান আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে কারো হয় না। কারণ তিনি দেহবিশিষ্ট বা স্থানবিশিষ্ট নন। আক্ষরিক অর্থে তাঁর সান্নিধ্য লাভ অসম্ভব। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালার সান্নিধ্য পাওয়ার অর্থ সম্মানিত ও মর্যাদাবান (মুআয্‌যাজ ও মুকাররম) হওয়া।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা অহংকারে তাঁর ইবাদতে বিমুখ হয় না ও তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁরই নিকট সেজদাবনত হয়।' এ কথার অর্থ— ফেরেশতা, নবী-রসুল এবং পুণ্যবানেরা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রকৃত দাস। একনিষ্ঠ দাসত্ব করেন বলেই তাঁরা অহংকার থেকে বিমুক্ত। অহংকার হচ্ছে আল্লাহ্‌র দাসত্ব বিরোধী একটি অপবিত্র অনুভূতি। তাই যারা আল্লাহ্‌তায়ালার সন্নিধানপ্রাপ্ত তাঁরা অহমিকামুক্ত দাসত্বে অভ্যস্ত। তাঁরা আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করেন। বলেন, 'সুব্‌হানা রব্বিয়াল আ'লা' (পবিত্র সেই প্রভুপ্রতিপালক, যিনি মহানতম)। আর তাঁরা সেজদাবনত হন কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। সে সেজদায় অন্য কারো কোনো প্রকার অংশীদারিত্ব থাকে না।

www.eelm.weebly.com

মা'দান বিন তালহা বর্ণনা করেন, আমি একবার হজরত ছাওবানের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি ছিলেন রসুল স. এর মুক্ত করা ক্রীতদাস এবং বিশিষ্ট সাহাবী। আমি বললাম, হজরত! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যে আমল করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। তিনি নিশ্চুপ রইলেন। আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম। এবারেও নীরব রইলেন তিনি। তৃতীয়বার যখন আমি একই প্রশ্ন করলাম, তখন তিনি বললেন, আমি রসুল স. এর নিকটে এই প্রশ্নটিই করেছিলাম। তিনি স. বলেছিলেন, আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী সেজদা করো। তুমি যে সেজদা করবে, আল্লাহ্‌পাক তোমার মর্যাদা তদপেক্ষা এক গুণ বৃদ্ধি করে দেবেন এবং মাফ করে দেবেন তোমার একটি গোনাহ্‌। মা'দান আরো বর্ণনা করেন, এরপর আমি দেখা করলাম হজরত আবু দারদার সঙ্গে। তাঁর নিকটও আমি একই প্রশ্ন করলাম। তিনিও আমাকে একই জবাব দিলেন, যে জবাব দিয়েছিলেন হজরত ছাওবান। মুসলিম।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, বান্দা আল্লাহ্‌কে সেজদা করলে ওই সেজদার কারণে আল্লাহ্‌তায়ালা তার এক স্তর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং মার্জনা করেন একটি পাপ। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান, বাগবী।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সেজদাবনত অবস্থায় বান্দা তার প্রভুপ্রতিপালকের অধিক নিকটবর্তী হয়। সুতরাং সেজদাবনত অবস্থায় বেশী বেশী দোয়া করো। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় আরো রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যখন আদম সন্তানেরা সেজদার আয়াত পাঠ করে আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়, তখন শয়তান কাঁদতে থাকে এবং দূরে সরে যায়। বলে— হায়! আদম সন্তানদেরকে সেজদা করার হুকুম দেয়া হয়েছে। তারা সেজদাও করেছে। ফলে তাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে জান্নাত। আমাকেও সেজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। আমি সে নির্দেশ পালন করিনি। তাই আমার জন্য নির্ধারিত হয়েছে জাহান্নাম। মুসলিম।

হজরত রবীয়া বিন কা'ব বর্ণনা করেছেন, আমি রাতে রসুল স. এর সঙ্গে থাকতাম। সংগ্রহ করে দিতাম তাঁর ওজুর পানি। গুছিয়ে দিতাম অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। একবার তিনি স. আমাকে বললেন, বলো কী চাও? বললাম, আমি জান্নাতে আল্লাহ্‌র রসুলের সঙ্গে থাকতে চাই। তিনি স. বললেন, অন্য কিছু যাচঞা করো। আমি বললাম, এটাই আমার বাসনা। তিনি বললেন, তাহলে বেশী বেশী সেজদা করে আমাকে সাহায্য করো (বেশী বেশী সেজদা করো যেনো জান্নাতে আমি তোমাকে আমার সঙ্গে রাখতে পারি)। মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

আমি তেলাওয়াতে সেজদার মাসআলা সুরা ইনশাক্কাত এর তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যথাস্থানে আলোচনাটি দেখে নেয়া যেতে পারে। আল্লাহ্তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত।

নির্দেশনাঃ এই আয়াত যাঁরা আরবীতে পাঠ করেছেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সেজদা করে নিবেন।

চতুর্থ খণ্ড শেষ

www.eelm.weebly.com

নবম পারা

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۗ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

❑ লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে; বল, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রসূলের; সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজদিগের মধ্যে সদ্‌ভাব স্থাপন কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর।'

সুরা আন্‌ফালের আয়াতের সংখ্যা ছিয়াত্তর অথবা সাতাত্তর। আলেমগণ বলেছেন, 'ওয়া ইজ ইয়াম্ কুরু বিকা' থেকে (৩০ আয়াত থেকে) সাতটি আয়াত (৩৬ আয়াত পর্যন্ত) অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কায়। অবশিষ্ট সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো মদীনায়। বিশুদ্ধ মত এই যে, ওই সাতটি আয়াতে বর্ণিত ঘটনাগুলো মক্কায় সংঘটিত হলেও আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিলো মদীনায়।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. থেকে ইবনে আবী শায়বা, আবু দাউদ, হাকেম, ইবনে হাব্বান, আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে আবেদ,ইবনে আসাকের এবং ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে ঘোষণা করলেন, শত্রু পক্ষের কাউকে বধ করলে অথবা বন্দী করলে তার পরিত্যক্ত সকল সরঞ্জামের মালিক হবে হত্যাকারী অথবা বন্দীকারী। আর এক বর্ণনায় এসেছে, কালাবীর মাধ্যমে ইবনে মারদুবিয়া, আবু সালেহ সূত্রে ইবনে উজলানের মাধ্যমে ইকরামার সূত্রে আতা হজরত ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ করেন, রসুল স. যখন ঘোষণা করলেন, মুসলিম যোদ্ধা কোনো কাফেরকে বন্দী করলে, অথবা হত্যা করলে তার যুদ্ধের সরঞ্জাম ও অন্যান্য সামগ্রীর অধিকার লাভ করবে সে-ই। এই ঘোষণা শুনে যুবকেরা বীরদর্পে এগিয়ে গেলো সম্মুখের দিকে। বৃদ্ধরা বললো, আমাদেরকেও তোমাদের গণিমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের) অংশ দিয়ো। কারণ আমরাইতো নিশ্চিত করবো পশ্চাদ্ভাগের নিরাপত্তা। যুবকেরা বৃদ্ধদের কথায় প্রতিবাদ করলো। এই

www.eelm.weebly.com

নিয়ে শুরু হয়ে গেলো বাক বিতণ্ডা। শেষে মীমাংসার জন্য রসুল স. সকাশে হাজির হলো সকলে। ইত্যবসরে হজরত আবুল ইয়াসির রা. দু'জনকে বন্দী করে নিয়ে এলেন সেখানে। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনিতো বলেছেন, বন্দী ও নিহত শত্রুর সম্পদের অধিকারী হবে বন্দীকারী অথবা হত্যাকারী। এ কথা শুনে দণ্ডায়মান হলেন হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি এভাবে সকল কিছুইতো সৈন্যদেরকে দিয়ে দিলেন। আপনার নিজের জন্য কিছুই রাখলেন না। আমরাওতো রণপ্রান্তরে এসে যুদ্ধরত অবস্থায় শত্রুর মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত। প্রতিটি মুহূর্ত আমরা শত্রুর আক্রমণাশংকায় কাটাচ্ছি। অথচ আমরাও রইলাম বঞ্চিত। আমরাওতো জীবনের মায়া ত্যাগ করে এসেছি যুদ্ধের ময়দানে। হে আমাদের প্রিয় রসুল! গণিমতের লোভে সবাই আপনাকে একাকী ফেলে চলে গিয়েছিলো সামনের দিকে। আপনার নিরাপত্তা হয়ে গিয়েছিলো বিঘ্নিত। অথচ আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধানতম কর্তব্য ছিলো না কি? এভাবে যোদ্ধৃবৃন্দের মধ্যে বাদানুবাদ চলতেই থাকলো। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতটি।

প্রথমেই এরশাদ হয়েছে—'ইয়াসআলুনাকা আ'নিল আন্‌ফাল কুলিল আন্‌ফালু লিল্লাহি ওয়ার রসুলি' (লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বলো, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ ও রসুলের)। এখানে উল্লেখিত 'আনফাল' শব্দটি 'নফল' শব্দের বহুবচন। নফল অর্থ অতিরিক্ত। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা ব্যবসা, কৃষি কিংবা অন্য কোনো উপায়ে অর্জিত সম্পদ নয়। তাই এই সম্পদকে বলা হয়েছে আনফাল বা অতিরিক্ত। উদ্ধৃত বাক্যের মর্ম হচ্ছে — আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন, হে আমার প্রিয় রসুল! লোকেরা আপনাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের। সম্পদের মালিকানা আল্লাহ্র। অতএব যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মালিকানাও তাঁরই। আর তাঁর রসুল ওই সম্পদের ব্যয় করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। তিনিই আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশানুসারে যথাসময়ে যথাস্থানে তা বণ্টন করবেন। হাদিস শাস্ত্রের ইমামগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীর অধিকার সাধারণ মানুষের নিকট থেকে নিয়ে রসুল স.এর হাতে ন্যস্ত করেছেন। রসুল স. সমতা রক্ষা করে সকলের মধ্যেই তা বণ্টন করেন। আল্লাহপাকের ভীতি,রসুলের আনুগত্য ও মানুষের পারস্পরিক আচরণ বিশুদ্ধকরণই ছিলো আয়াতের উদ্দেশ্য।

এরপর বলা হয়েছে — 'সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করো, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো।' এ কথার অর্থ — হে যোদ্ধৃবৃন্দ! আল্লাহ্‌তায়ালা গণিমতের মাল অধিকার করে তাঁর রসুলের হস্তে অর্পণ করেছেন। যথা সময়ে তিনি তা সুষ্ঠুভাবে তোমাদের মধ্যে বণ্টন করবেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। অযথা বাদানুবাদে লিপ্ত হয়ো না। প্রতিষ্ঠিত করো পারস্পরিক সম্প্রীতি। তোমরা বিশ্বাসী হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে। হজরত ইবনে আব্বাস এ রকম বলেছেন।

www.eelm.weebly.com

আল্লামা বায়যাবী লিখেছেন, রসুল স. প্রথমে ঘোষণা দিয়েছিলেন শত্রু নিধন করলে অথবা তাকে বন্দী করলে তার সকল সম্পদের অধিকারী হবে মুসলিম যোদ্ধা। এই ঘোষণা শুনে তরুণ যোদ্ধারা বীর বিক্রমে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নিহত করলেন সত্তর জনকে। সত্তর জনকে করলেন বন্দী। কিন্তু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ছিলো অপ্রতুল। অন্যান্য সরঞ্জামও ছিলো পুরোনো। পশ্চাৎভাগে ছিলেন প্রবীণেরা। তাঁরাও তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন বীরদর্পে। কিন্তু অগ্রভাগে ছিলেন না বলে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাঁরা পেলেন না। তরুণ যোদ্ধাদেরকে লক্ষ্য করে তাঁরা বললেন, আমরা পশ্চাদ্ভাগে দৃঢ় ব্যুহ রচনা না করলে তোমরা নিরাপদে ফিরে আসতে পারতে না। সুতরাং তোমাদের উচিত আমাদেরকেও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার করা। তখন অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্র করে সকল যোদ্ধার মধ্যে বণ্টন করে দেন।

বায়যাবী লিখেছেন, উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধের সময় সেনাপতি সৈন্যদেরকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক নয়। যুদ্ধের গতি প্রকৃতি ও পরিণামের প্রেক্ষিতে পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভেঙে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত দানের অধিকার রয়েছে সেনাপতির। ইমাম শাফেয়ীও এ রকম বলেছেন।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে ইবনে আবী শায়বা, ইমাম আহমদ, আবদ্ বিন হুমাইদ এবং ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধে আমার ভাই উমায়ের শহীদ হলেন, আর আমি সাঈদ বিন আসকে হত্যা করে হস্তগত করলাম তার তলোয়ার। তলোয়ারটির নাম ছিলো যুলকুতাইফাহ্। তলোয়ারটি নিয়ে আমি হাজির হলাম রসুল স. এর খেদমতে। বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! মুশরিককে খতম করতে পেরে আজ আমার অন্তর প্রশান্ত। গণিমত হিসেবে লাভ করেছি এই তলোয়ারটি। আমার নিবেদন, দয়া করে তলোয়ারটি আপনি আমাকে দিয়ে দিন। আপনিতো আমার সম্পর্কে অবগত (হে আল্লাহ্র রসুল! আপনিতো আমার ইমান ও বীরত্ব সম্পর্কে ভালো করেই জানেন)। রসুল স. বললেন, তলোয়ারটি তোমার নয়— আমারও নয়। সুতরাং ওটা রেখে দাও। আমি তাই করলাম। ভাবলাম, তলোয়ারটি কার হাতে গিয়ে যে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আমার মতো বীর নয় এ রকম লোকের হাতে গিয়ে পড়বে— এ কথা ভেবে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেলো। মনে হলো আমার ভাই শহীদ হয়েছে তলোয়ারটিও হস্তচ্যুত হয়েছে। আমার মতো হতভাগা আর কেউ নেই। মনোকষ্ট সহ্য করতে না পেরে আমি পুনরায় গেলাম রসুল স. সকাশে। পুনরায় জানালাম তলোয়ার প্রাপ্তির আবেদন। এরপর বেশ

www.eelm.weebly.com

জোরে ধমক দিলেন রসুল স.। মন ভার করে আমি চলে যাচ্ছিলাম। কয়েক পা যেতে না যেতেই অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে এ কথা প্রচার করে দিলেন। আর আমাকে ডেকে দিয়ে দিলেন তলোয়ারটি। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. হঠাৎ আমার নিকটে এসে বললেন, আমার কাছে তলোয়ার প্রার্থনা করেছিলে তুমি। কিন্তু আমি তো তলোয়ারটির মালিক ছিলাম না। তাই দিতে পারিনি। এখন আল্লাহ্পাক আমাকে মালিকানা দান করেছেন। তাই তলোয়ারটি তোমাকে দিতে পারলাম।

ইমাম বোখারী তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, আমি ও একজন আনসারী গণিমত সংগ্রহের জন্য এগিয়ে গেলাম। একটি তলোয়ার পেলাম আমরা। আমি বললাম, তলোয়ারটি আমার। আনসারী বললেন, না আমার। বাদানুবাদ চলছিলো। একটু পরেই এলেন রসুল স.। তিনি সব শুনে আমাকে বললেন, হে সাঈদ! তোমাদের দু'জনের একজনও তলোয়ারটির মালিক নও। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত— 'ইয়াস আলুনাকা আ'নিল আন্‌ফাল' (তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী সম্বন্ধে)। অবশ্য পরে এই আয়াতটি রহিত হয়েছে ওই আয়াতের মাধ্যমে যেখানে বলা হয়েছে— 'ওয়ালামু আন্‌না মা গানিমতুম মিন্ শাইয়্যিন ফাইন্‌নামা লিল্লাহি খুমুসাহু ওয়া লির রসুলি ওয়ালিজিল্ কুরবা' (আর জেনে রেখো তোমরা যুদ্ধে যা কিছু সামগ্রী অর্জন করো, এর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র, রসুলের এবং রসুলের আত্মীয়দের জন্য)।

ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম এবং বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীর একমাত্র অধিকারী ছিলেন রসুল স.। সেখানে আর কারো কোনো আধিপত্য ছিলো না। যা কিছু হস্তগত হতো মুসলিম যোদ্ধৃবৃন্দের, সব জমা হতো এক জায়গায়। যদি তিল পরিমাণ বস্তুও কেউ রেখে দিতো, সেটা পরিগণিত হতো চুরিতে। জনগণ রসুল স. সকাশে নিবেদন করেছিলেন — গণিমত থেকে আমাদেরকে কিছু দান করুন। তখনই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, গণিমতের সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন রসুল স.। সূঁচের পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা কম সম্পদও নিজের কাছে রাখলে তা হয়ে যাবে চুরি। কেউ কেউ গণিমত প্রার্থনা করেছিলো। তখন অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি। আয়াতে এই মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, হে মুজাহিদ বৃন্দ! গণিমতের মাল আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রসুলই তা বণ্টন করবেন। সুতরাং তোমরা এই মুহূর্তে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিতণ্ডা পরিহার করো। সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করো নিজেদের মধ্যে। পরে অন্য একটি আয়াতের মাধ্যমে এই আয়াতটি রহিত হয়।

www.eelm.weebly.com

রহিতকারী ওই আয়াতে বলা হয়েছে— 'গণিমতের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র, রসুলের, রসুলের স্বজনদের, পিতৃহীনদের, দরিদ্রদের এবং পথচারীদের।' বাকী চার অংশের এক অংশ পদাতিক সৈন্যের জন্য, তিন অংশ অশ্বারোহী সৈন্যের জন্য অর্থাৎ অশ্বের জন্য দুই ও যোদ্ধার জন্য এক।

মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী তাঁর সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে লিখেছেন, যখন রসুল স. যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী সকলের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টন করার নির্দেশ দিলেন তখন হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ নিবেদন করলেন— আয় আল্লাহ্র রসুল! ওই অশ্বারোহীকে আপনি সেই পরিমাণ গণিমত প্রদান করলেন, যে তার স্বজাতির রক্ষণাবেক্ষণে অতন্দ্র প্রহরী। একই পরিমাণ দান করলেন ওই দুর্বল লোককে যে নিজের হেফাজতেরও যোগ্যতা রাখে না। তিনি স. এরশাদ করলেন— তোমার মাতা তোমার জন্য রোদন করুক! তুমি এতটুকুও অবগত নও যে, এই দুর্বলদের দোয়ার বরকতে অর্জিত হয় বিজয়। তখন হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! অশ্বারোহীরাইতো লাভ করলো সবচেয়ে বেশী। ঘোড়ারও ভাগ পেলো তারা। যুদ্ধ করতে অসমর্থ লোকদেরকেও তো আপনি গণিমত দান করলেন। অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের এতোটুকুও অংশগ্রহণ নেই। রসুল স. বললেন, তোমাদের জননীরা কিভাবে প্রতিপালন করেছে তোমাদেরকে? তোমরা কি এতটুকুও অবগত নও যে, ওই দুর্বল লোকদের দোয়ার বরকতে তোমরা বিজয়ী হয়েছো। এরপর রসুল স. একজনকে নির্দেশ দিলেন, এই মর্মে ঘোষণা করে দাও যে— যে কোনো যুদ্ধরত কাফেরকে হত্যা করে তার মাল ছিনিয়ে নিবে, সে-ই হবে ওই মালের মালিক। আর কেউ কোনো কাফেরকে বন্দী করলে সেই বন্দীর মালিকও হবে সে।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে সাঈদ বিন মনসুর, আহমদ, ইবনে মুনজির, ইবনে হাব্বান এবং হাকেম উল্লেখ করেছেন, তুমুল যুদ্ধ হলো মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে। পরাজিত হলো অবিশ্বাসীরা। পলায়নরত অবিশ্বাসীদের পশ্চাদ্ধাবন করলো কতিপয় মুসলিম সৈন্য। তারা কাউকে করলো হত্যা, কাউকে বন্দী। কেউ কেউ যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের ফেলে যাওয়া গণিমত সংগ্রহের পর বললো, এগুলোতো জমা করেছি আমরা। সুতরাং আমরা ছাড়া অন্য কারো অংশ এগুলোতে নেই। পশ্চাদ্ধাবনকারী সৈন্যরা ফিরে এসে বললো আমরাই তো গণিমতের অধিক হকদার। আমরাই শত্রুদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছি দৃষ্টিসীমার বাইরে। তখন রসুল স. এর নিরাপত্তাবিধানে নিয়োজিত সৈন্যরা বলে উঠলো, আমাদের চেয়ে অধিক উপযুক্ত হকদার কেউ নয়। কারণ, আমরাই ছিলাম রসুল স. এর হেফাজতের দায়িত্বে। আমরা অতন্দ্র ছিলাম বলেই শত্রুরা রসুল স.কে আক্রমণ করার সুযোগ পায়নি। মুজাহিদগণের এমতো বাক্য বিনিময়ের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো 'ইয়াস্ আলুনাকা আনিল আন্ফাল।'

www.eelm.weebly.com

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ○ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ
عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

❒ বিশ্বাসী তো তাহারাই যাহাদিগের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁহার আয়াত তাহাদিগের নিকট পাঠ করা হয় তখন উহা তাহাদিগের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।

❒ যাহারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যাহা দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে তাহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী।

❒ তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট তাহাদিগেরই জন্য রহিয়াছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে — 'বিশ্বাসীতো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয়, যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয়।' এ কথার অর্থ, ওই সকল লোকই পরিপূর্ণ বিশ্বাসী যাদের অন্তর আল্লাহ্‌তায়ালার অতুলনীয় মহিমা, গৌরব ও পরাক্রম স্মরণ করে ভীত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ওই সকল লোকের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা কোনো পাপ কর্মের ইচ্ছা পোষণ করলে তাদেরকে যদি বলা হয় আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তখন তারা আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে তৎক্ষণাৎ সেই গোনাহের চিন্তা পরিত্যাগ করেন। এখানে আল্লাহ্‌পাকের স্মরণ অর্থ আল্লাহ্‌পাকের আযাবের স্মরণ। আল্লাহ্‌র আযাবের কথা এখানে উহ্য রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। এ কথার অর্থ— যখন ওই সকল ব্যক্তির সামনে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তাদের প্রতি বর্ষিত হয় অজস্র বরকত। তাদের চোখ ও হৃদয়ে সমুদ্ভাসিত হতে থাকে আল্লাহ্‌তায়ালার অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন। ফলে তাদের বিশ্বাস হয় অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ। তাই তারা তখন সকল অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন কেবল আল্লাহ্‌র উপর। অন্যের প্রতি তাঁরা যেমন নির্ভর করেন না, তেমনি অন্য কাউকে ভয়ও পান না। তাঁদের যাবতীয় কার্যকলাপ সমর্পিত হয় আল্লাহ্‌র প্রতি। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো আশাধারী তাঁরা নন।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী।' এখানে 'যারা সালাত কায়েম করে' কথাটির অর্থ— তারা সুচারুরূপে নামাজ সম্পাদন করে থাকে। নামাজে তীরের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কোনো কঠিন পদার্থ যেমন আগুনে গলিয়ে সোজা করে ফেলা হয়, তেমনি তারা নামাজকে প্রতিষ্ঠা করেন সরল ও শুদ্ধভাবে, পরিপূর্ণরূপে। এভাবে তারা তাদের অস্তিত্বকে করে ফেলেন 'কায়েম' শব্দটির বাস্তব অবয়ব।

এরপর বলা হয়েছে — 'এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।' এ কথার অর্থ — ওই সকল লোক তাদের সম্পদকে মনে করে আল্লাহ্তায়ালার দান। ওই সম্পদ দ্বারা তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করেন এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয়ও করেন। এভাবে তারা অর্জন করেন প্রকৃত ইমানদারের সকল বৈশিষ্ট্য।

এরপর বলা হয়েছে — 'তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী।' এ কথার অর্থ — উপরে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী যারা তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী।

হাসান বসরীকে এক লোক জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি মুমিন? তিনি বললেন, আপনার প্রশ্নের অর্থ যদি এই হয় যে, আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাব সমূহের প্রতি, রসুলগণের প্রতি, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি এবং হাশর ও হিসাবের প্রতি আমি বিশ্বাস রাখি কিনা, তবে আমি বলবো, আমি অবশ্যই বিশ্বাসী (মুমিন)। কিন্তু আপনি যদি বলেন, 'ইন্নামাল মু'মিনুনাল লাজিনা ইজা জুকিরাল্লহু ওয়াযিলাত কুলুবুহুম' (বিশ্বাসীতো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয়) আমি এই আয়াতের বৈশিষ্ট্যধারী কিনা, তবে আমি বলবো আমি তা জানি না। হাসান বসরীর এ কথার মর্মার্থ হচ্ছে — সাধারণ অর্থে অবশ্যই আমি মুমিন, কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যধারী মুমিন হওয়া না হওয়া সম্পর্কে আমি নিজে থেকে কিছু বলবো না (এ রকম বললে অহমিকাকে প্রশ্রয় দানের সুযোগ সৃষ্টি করা হতে পারে)। আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ দয়া ও দানের ফলেই কেবল এ রকম পরিপূর্ণ মুমিন হওয়া যায়। এমতো ক্ষেত্রে বান্দার প্রচেষ্টা যেহেতু গৌণ, তাই বান্দা কেনো নিজে থেকে এই ঝুঁকিপূর্ণ দাবিটি করে বসবে। এই মুমিনেরা তো সকল কুমন্ত্রণা ও পাপপ্রবণতা থেকে এমনভাবে পবিত্র, যেভাবে পবিত্র হয় মানুষের শরীর ওজু ও গোসলের মাধ্যমে।

সলফে সালেহীনের একটি বহুল আলোচিত প্রসঙ্গ হচ্ছে — 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ্,' এ রকম বলা জায়েয কিনা। 'ইনশাআল্লাহ্' শব্দটি দৃঢ় সংকল্পকে প্রকাশ করে না। তাই কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আপন ইমানকে এ রকম দৃঢ়তার অনুপযোগী শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা বৈধ নয়। ইনশাআল্লাহ্ অর্থ —

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্ যদি চান। তাই 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ্' বললে 'আমি ইমানদার', এ কথা সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ পায় না। 'আপনি কি মুমিন', এ রকম প্রশ্নের যথার্থ ও সুনির্দিষ্ট জবাবও এটা নয়। অবশ্য মৃত্যুকালে ইমান থাকবে কিনা, সে ব্যাপারে হলফ করে কিছু বলা যায় না। তাই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করে 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ্' বললে দোষেরও কিছু নেই।

আমি বলি, হাসান বসরীর 'আমি জানিনা, আমি পরিপূর্ণ ইমানদার কি না'— এ ধরনের জবাব 'আমি মুমিন ইন্শাআল্লাহ্' কথাটির মতোই। তাই তাঁর কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে এ রকম— 'আমার নাম পরিপূর্ণ পুণ্যকর্মধারী ইমানদারদের দপ্তরে আছে কি না তা আমি জানি না।'

আলকামা বলেছেন, একবার সফররত অবস্থায় কয়েকজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হলো আমার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কারা? তারা বললো, 'দৃঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত ইমানদার।' আমি নিরুত্তর রইলাম। ভাবলাম, কি বললাম আমি আর তারা জবাব দিলো কী? পরে একদিন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের সঙ্গে সাক্ষাত হলে আমি ঘটনাটি তাঁকে বললাম। তিনি বললেন, তাদের কথার পরে তুমি কি কিছু বললে? আমি বললাম, আমি আর কিছু বলিনি। তিনি বললেন, তুমি বলতে পারতে, তোমরা কি দৃঢ় প্রত্যয়ী যে তোমরা জান্নাতী? প্রকৃত মুমিনেরা নিজেদেরকে জান্নাতী বলে দৃঢ় আস্থা রাখে।

সুফিয়ান সওরী বলেছেন, যে ব্যক্তি দৃঢ়তার সাথে বলে, আমি মুমিন; এ কথাও বলে যে, আল্লাহ্ পাকের নিকটেও আমি মুমিন— এরপরও যদি সে তার জান্নাতী হওয়ার বিষয়ে সাক্ষ্য না দেয়, তবে বুঝতে হবে, সে পূর্ণ ইমানদার নয়। তার ইমান অর্ধেক। আর যারা 'আমি মুমিন ইন্শাআল্লাহ্' বলা জায়েয মনে করেন, তারা সুফিয়ান সওরীর অভিমতকেই গ্রহণ করেন তাদের পক্ষের দলিল রূপে। এ রকম ভাবে নিজের ইমান প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে— কেবল ভালোভাবে মৃত্যু নয়, খাতেমা বিল খায়ের (ইমানের সঙ্গে মৃত্যু) হলেই কেবল জান্নাত অবধারিত হয়। সুতরাং এ রকম হওয়ার আগে কীভাবে ইমানের ঘোষণা দেয়া যায়। তাদের কথার অর্থ এ রকম নয় যে, বর্তমানে যে বিশ্বাস সহ আমি আমল করে চলেছি, সেই বিশ্বাস দুর্বল বা সন্দেহপূর্ণ। খাতেমা বিল খায়েরের প্রতিই তাঁরা প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখেন বলেই বলেন, 'আমি বিশ্বাসী ইনশাআল্লাহ্।'

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ্'— এ রকম বলা মকরূহ। কারণ এ রকম বক্তব্যে রয়েছে সন্দেহ ও দোদুল্যমানতার অবকাশ। 'আমি সত্য ইমানদার' অথবা 'নিশ্চয় আমি মুমিন'— এ রকম বললে এ রকম বোঝায় না যে, 'আমার খাতেমা বিল খায়ের হবেই' বা 'আমি সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরের

www.eelm.weebly.com

ইমানদার' বরং এ কথাই বোঝায় যে— 'বর্তমানে আমি অবশ্যই ইমানদার।' আমি যে ইমানদার, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ মাত্র নেই। উল্লেখ্য যে, সন্দেহ ও ইমান পরস্পরবিরোধী বিষয়। এ দু'টোর একটি থাকলে অপরটি অন্তর্হিত হয়। তাই 'আমি নিশ্চয় মুমিন'— এ রকম বলাই অধিকতর সমীচীন। ইমাম আবু হানিফা তাই এ রকম নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথাটি অবশ্য মনে রাখা উচিত যে, শব্দবিভ্রাটের মতো লঘু কারণেই এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে মতভেদ। তাঁদের মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে এক্ষেত্রে গুরুতর কোনো বৈসাদৃশ্য নেই।

ইমাম আবু হানিফা একবার কাতাদাকে বললেন, 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ্' — এভাবে আপনি আপনার ইমানকে প্রকাশ করেন কেনো? কাতাদা বললেন, আমি হজরত ইব্রাহিমের শর্ত অনুসরণ করি। হজরত ইব্রাহিম ঘোষণা করেছিলেন, 'যিনি আমাকে আহার করান, তিনি কিয়ামতের দিন আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন।' এখানে 'তোয়ামা' শব্দের মাধ্যমে ওই ইমানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা অদৃঢ়। ইমাম আবু হানিফা বললেন, আপনি হজরত ইব্রাহিমের ওই কথার অনুসরণ করেন না কেনো, যেখানে তাঁকে বলা হয়েছিলো 'তুমি কি ইমান আনোনি।' হজরত ইব্রাহিম বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই আমি ইমান এনেছি। কিন্তু আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য এ রকম কামনা করছি (তুমি মৃতকে কীভাবে জীবিত করো, তা দেখতে চাচ্ছি)।' তাঁর ওই প্রার্থনা গৃহীত হয়েছিলো। হজরত ইব্রাহিমের মতো ইমানের দাবি উপস্থাপন করলে তার সওয়াবও পাওয়া যাবে। এ কথা অবশ্য সত্য যে, অন্তরে বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ বলে 'আমি ইমানদার' তবে তার অবিশ্বাস হয়ে যাবে আরো পাকাপোক্ত এবং এর জন্য শাস্তিও তাকে ভোগ করতে হবে।

পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরই জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।' এখানে 'ইনদা রব্বিহিম' অর্থ— তাদের প্রতিপালকের নিকট। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, অন্তরে কপটতা নেই এ রকম বিশ্বাসীর জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটে রয়েছে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদা। এ রকম বলা হয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন — 'তিলকাররসুলু ফাদ্দ্বাল্না বা'দ্বহুম আ'লা বা'দ্বিন' (এই রসুলগণ, তাদের মধ্যে একজনকে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি)। আতা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে মর্যাদা প্রদানের কথা বলা হয়েছে সে মর্যাদা হচ্ছে জান্নাতের মর্যাদা। সেখানে প্রত্যেকে তার আপন পুণ্যকর্মের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করবে (মর্যাদা নির্ণীত হবে প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী)।

হজরত উবাদা বিন সামেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতের রয়েছে একশত তোরণ। একটি তোরণ থেকে অন্য তোরণের দূরত্ব হবে আসমান ও জমিনের দূরত্বের সমান। ফেরদৌস নামক জান্নাতের তোরণ হবে সবচেয়ে

www.eelm.weebly.com

উঁচু। সেখান থেকে প্রবাহিত হয়েছে জান্নাতের চারটি নদী। জান্নাতুল ফেরদৌসের উপরে রয়েছে আল্লাহ্র আরশ। তোমরা দোয়ার সময় আল্লাহ্তায়ালার নিকট জান্নাতুল ফেরদৌস যাচনা করো। তিরমিজি।

বাগবী বলেছেন, হজরত রবী বিন আনাস এর বর্ণনায় রয়েছে, সত্তরটি দুয়ার রয়েছে জান্নাতের। একটি দ্রুতগামী অশ্ব সত্তর বছর ধরে দৌড়ে যতদূর অতিক্রম করতে পারে, ততদূর ব্যবধান রয়েছে একটির সঙ্গে অন্যটির।

'ওয়া মাগফিরাতুন্' অর্থ— এবং ক্ষমা। অর্থাৎ প্রকৃত ইমানদারের সকল অপরাধ ক্ষমা করা হবে। 'ওয়া রিয্কুন কারীম' অর্থ—এবং সম্মানজনক জীবিকা। জান্নাতের জীবিকাসম্ভারের বিবরণ দান অসম্ভব। সেখানকার নেয়ামতরাজি অফুরন্ত, অক্ষয়। প্রকৃত ইমানদারদের জন্য সেখানে রয়েছে ওই সকল নেয়ামতের সমারোহ — যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি। যার বিবরণ কোনো কান কখনো শুনেনি এবং যার অনুভূতি কোনো হৃদয় কখনো ধারণ করেনি।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ৫, ৬

كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَٰرِهُونَ ۝ يُجَٰدِلُونَكَ فِى ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۝

❒ ইহা এইরূপ, যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ভাবে তোমার গৃহ হইতে বাহির করিয়াছিলেন অথচ বিশ্বাসীদিগের এক দল ইহা পছন্দ করে নাই।

❒ সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তাহারা তোমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হয়; মনে হইতেছিল তাহারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হইতেছে আর তাহারা যেন উহা প্রত্যক্ষ করিতেছে।

'কামা আখরাজা' কথাটির অর্থ— যেমন আপনাকে বের করেছেন। কথাটি একটি উহ্য উদ্দেশ্যের বিধেয়। ওই উহ্য উদ্দেশ্যটি সহ প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতটির অর্থ হবে এ রকম — যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন একটি কঠিন সমস্যা। সমস্যাটি যুদ্ধের জন্য মদীনা থেকে বের হয়ে বদর প্রান্তরে আসার মতোই বিতর্কবহুল। অর্থাৎ বদর যুদ্ধে বের হওয়ার ব্যাপারে যেমন বাক বিতণ্ডার উদ্ভব হয়েছিলো, তেমনি বাক বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিলো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কেও। পরে দেখা গেলো মদীনা থেকে বদরে এসে ভালোই হয়েছে। লাভ হয়েছে পূর্ণ বিজয়। এখন যুদ্ধলব্ধ

www.eelm.weebly.com

সম্পদের বিষয়েও তোমরা নানা মত পোষণ করছো। কিন্তু তোমাদেরকে জানানো হচ্ছে — যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ ও রসুলের। এই ঘোষণাটি মেনে নিলে তোমাদেরই কল্যাণ হবে, যেমন কল্যাণলাভ হয়েছে যুদ্ধে এসে। অতএব, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নির্বিবাদে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের কথা মেনে নাও। এ কথা গুলোই আলোচ্য আয়াত দু'টোতে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে — হে আমার রসুল! এটা এরূপ যেমন আপনার প্রতিপালক আপনাকে ন্যায়ভাবে আপনার গৃহ থেকে (মদীনা থেকে) বের করে ছিলেন অথচ বিশ্বাসীদের একটি দল এটা পছন্দ করেনি। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা আপনার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়; মনে হচ্ছিলো তাদেরকে যেনো মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করা হচ্ছে; আর তারা যেনো তা প্রত্যক্ষ করছে।

এখানে 'বাইত' (গৃহ) বলতে মদীনাকে বুঝানো হয়েছে। মদীনা রসুল স. এর হিজরতের স্থান এবং তাঁর হিজরত পরবর্তী নিবাস। গৃহের সঙ্গে গৃহকর্তার যে সম্পর্ক, মদীনার সঙ্গে রসুল স. এর সম্পর্ক সেরকমই।

বদর যুদ্ধ

ইবনে উকবা ইবনে আবেদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর নিকট সংবাদ এলো সিরিয়া থেকে কুরায়েশদের একটি বিশাল বাণিজ্য বহর ফিরে চলেছে মক্কায়। আবু সুফিয়ানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হাজার উটের ওই বাহিনীতে মক্কার সকল মুশরিকেরই কিছু না কিছু আর্থিক অংশগ্রহণ ছিলো। প্রায় পঞ্চাশ হাজার দিনার মূল্যমানের পণ্য সামগ্রী বহন করে আনছিলো উটগুলো। সত্তর জন লোক ছিলো ওই বাণিজ্য বাহিনীতে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের, মোহাম্মদ বিন ইসহাক এবং সুদ্দীর বর্ণনানুসারে ওই বাণিজ্য কাফেলায় আবু সুফিয়ান সহ ছিলো চল্লিশ জন। আমর বিন আস এবং মাখরামা বিন নওফেল জুহুরীর মতো ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও ছিলো ওই কাফেলায়। রসুল স. আহ্বান জানালেন— ওই কাফেলাটিকে আক্রমণ করতে হবে। যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাদেরকেই দেয়া হবে গণিমত। রসুল স. এর এই আহ্বানে সাড়া দিলো অনেকেই। কেউ হালকা এবং কেউ ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হলো। কেউ কেউ আবার প্রকাশ করলো অনীহা। মদীনার বাইরে এসে কেউ কেউ বলাবলি করলো, আমরা বুঝতে পারছি না তিনি স. আমাদেরকে কোনো যুদ্ধে যেতে বলছেন কিনা। রসুল স. কারো তোয়াক্কা করলেন না। বললেন, যার যার বাহন আছে, তারাই কেবল গমন করবে আমার সঙ্গে। কেউ কেউ বললো, আমরা তবে মদীনায় ফিরে গিয়ে আমাদের বাহন গুলো নিয়ে আসি। রসুল স. বললেন, না শুধু তারাই আমার সাথে চলো, যাদের বাহন আছে। উল্লেখ্য যে, রসুল স. দশদিন আগে আবু

www.eelm.weebly.com

সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার গতিবিধির সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন হজরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ এবং হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদকে। তাঁরা দু'জন সিরিয়া ও মক্কার পথের নিকটে একস্থানে কাসিদ বিন মালেক জুহানীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সেখানে আত্মগোপন করে রইলেন। গোপন অবস্থানে থেকে তাঁরা আবু সুফিয়ানের বাহিনীকে পথ অতিক্রম করতে দেখলেন। তারপর এই সংবাদ নিয়ে ফিরে চললেন মদীনায়। কাসিদ তাঁদেরকে এগিয়ে দিলেন জুল মারওয়া পর্যন্ত। কিন্তু তারা মদীনায় পৌঁছানোর আগেই রসুল স. তাঁর বাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়েছেন। তাঁরাও রসুল স. এর সঙ্গে এগিয়ে চললেন নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। রসুল স. যখন ইয়াম্বু নামক স্থান দখল করলেন তখন কাসিদ কে ইয়াম্বুর জায়গীর থেকে উচ্ছেদ করলেন। কাসিদ আরজ জানালো, হে আল্লাহর রসুল ! আমি তো বুড়ো মানুষ। মৃত্যুর নিকটবর্তী প্রায়। সুতরাং জায়গীরটি আমার ভাতিজার নামে করে দিন। রসুল স. তাই করেছিলেন। পরে আব্দুর রহমান বিন সা'দ বিন জারারা সেটা ক্রয় করে নিয়েছিলো। আমর বিন শায়বা।

আবু সুফিয়ানের বাহিনী তখন মাকামে জুরকায়। সেখানে গিয়ে বনী হাজ্জামের একটি লোক আবু সুফিয়ানকে জানালো, মোহাম্মদ তার বাহিনী নিয়ে আপনার বাণিজ্য বহর লুণ্ঠন করতে এগিয়ে আসছে। আবু সুফিয়ান চিন্তিত হয়ে পড়লো। কোনো পথিককে দেখতে পেলেই জিজ্ঞেস করতে লাগলো রসুল স. এর গতিবিধি সম্পর্কে। শেষে একটি কাফেলার নিকট থেকে নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া গেলো যে, রসুল স. এই বাণিজ্য বহর লুণ্ঠনের জন্যই মদীনা থেকে সদলবলে বের হয়েছেন। এবার রীতিমতো ভীত হয়ে পড়লো আবু সুফিয়ান। সে বিশ দিনার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দূত হিসেবে নিযুক্ত করলো দমদম বিন ওমর গিফারিকে। বললো, যাও। মক্কায় পৌঁছে উটের কান ছিদ্র করে দিয়ো, আর উটের গদি উল্টো করে বেঁধে স্বীয় পরিধেয় সামনে পিছনে ছিঁড়ে দিয়ে কুরায়েশদের নিকট এই বলে ফরিয়াদ কোরো যে, তোমাদের সম্পদ যদি তোমরা হেফাজত করতে চাও, তবে এক্ষুণি অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়ো। মোহাম্মদ সদল বলে এগিয়ে আসছে তোমাদের বাণিজ্য বহর লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে। তৎক্ষণাৎ আবু সুফিয়ানের দূত ছুটে চললো মক্কার দিকে।

আতেকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের স্বপ্নঃ ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ওরওয়া, বায়হাকী, ইবনে শিহাব, ইসহাক ও হাকেম বর্ণনা করেছেন,মুসা বিন উকবাও এ রকম বলেছেন, আবু সুফিয়ানের দূত মক্কায় পৌঁছবার তিন দিন আগে আতেকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব দুঃস্বপ্ন দেখলেন। তিনি তাঁর ভাই হজরত আব্বাসকে ডেকে বললেন, ভ্রাতঃ! আমি একটি স্বপ্ন দেখার পর থেকে ভয়ে ভয়ে আছি। স্বপ্নটি ভয়ংকর। মনে হয় কুরায়েশদের উপর শীঘ্রই নেমে আসবে ভয়াবহ মুসিবত।

www.eelm.weebly.com

হজরত আব্বাস বললেন, বলো কি দেখেছো। আতেকা বললেন, বলবো। কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে — এ কথা তুমি কাউকে জানাবে না। কারণ অন্যেরা জানলে আমাদের বিপদ হতে পারে। হজরত আব্বাস বললেন, ঠিক আছে। কাউকে বলবো না।

আতেকা বললেন, আমি দেখলাম উষ্ট্রারোহী এক আগন্তুক এসে পর্বত উপত্যকায় দাঁড়ালো। তারপর চিৎকার করে বলতে শুরু করলো, ওরে বিশ্বাস-ঘাতকের দল! তিন দিনের মধ্যে তোরা তোদের মৃত্যুর স্থানে চলে আয়। লোকেরা তার নিকটে জড়ো হতে শুরু করলো। লোকটি সেখান থেকে গেলো মসজিদে। লোকেরাও চললো তার পিছু পিছু। এবার তার উটটি সোজা হয়ে দাঁড়ালো এবং তিনটি চিৎকার দিয়ে বললো, ওহে বিশ্বাসঘাতকেরা! মৃত্যু স্থানে চলে আয় তিন দিনের মধ্যে। এরপর লোকটি গেলো আবু কুবাইস পাহাড়ে। সেখান থেকে পুনরায় হুঙ্কার ছেড়ে বললো, হে বিশ্বাস হন্তারকেরা! তিন দিনের মধ্যে চলে আয় মৃত্যু স্থানে। এ কথা বলেই লোকটি পাহাড় থেকে গড়িয়ে দিলো একটি প্রকাণ্ড পাথর। প্রচণ্ড আওয়াজে খুব দ্রুত গড়াতে গড়াতে নিচে পড়েই টুকরো টুকরো হয়ে গেলো পাথরটি। ওই টুকরোগুলো নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো মক্কার প্রতিটি গৃহে।

স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে আব্বাস বললেন, এটাতো উত্তম স্বপ্ন। ভয় পাবার মতো কোনো কিছু এতে নেই। তবে স্বপ্নটির কথা গোপন রাখাই সমীচীন। অন্যেরা শুনে ফেললে আমাদেরকে ভালো চোখে দেখবে না।

আব্বাস কিন্তু কথাটিকে গোপন রাখতে পারলেন না। বলে দিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওলিদ বিন উত্বা বিন রবীয়া বিন আব্দুস্ শামস্‌কে। শোনার আগে অবশ্য ওলিদকেও স্বপ্নটি গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিলো।

কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতিও রক্ষিত হলো না। তিনি তার পিতা উত্বাকে ঘটনাটি জানালেন। উত্বা আর রাখ ঢাক না করে যাকে পেলো তাকেই জানাতে লাগলো স্বপ্ন বৃত্তান্তটি। ঘরে ঘরে শুরু হয়ে গেলো দুঃস্বপ্নটির আলোচনা।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত আব্বাস বলেছেন, আমি কাবা গৃহে তাওয়াফ করছিলাম। কাবা চত্বরে তখন আবু জেহেল কয়েকজনের সঙ্গে দুঃস্বপ্নটির আলোচনা করছিলো। আমাকে দেখে সে বললো, হে আবুল ফজল! তাওয়াফ শেষ করে এখানে একটু এসো। আমি তাওয়াফ শেষ করে তার কাছে গেলাম। আবু জেহেল বললো, ওহে আবদুল মুত্তালিবের গোষ্ঠী! তোমাদের মধ্যে আবার একজন নবী হয়ে গেলো না কি? আমি বললাম, কার কথা বলছো? সে বললো, আতেকার কথা বলছি। সে নাকি আবার কী এক স্বপ্ন দেখেছে। আমি বললাম, সেকি! আতেকা আবার স্বপ্ন টপ্ন দেখবে কেনো? আবু জেহেল বললো, মোহাম্মদতো আগেই নবুয়ত দাবী করেছে। এবার তবে মহিলারাও নবী হতে শুরু করলো?

www.eelm.weebly.com

ইবনে উকবার বর্ণনায় এসেছে, তখন আবু জেহেল বলেছিলো, হে বনী হাশেম! তোমরা হয়তো তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে মুখে মিথ্যাবাদী বলতে প্রস্তুত নও, কিন্তু আচরণের মাধ্যমে তোমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে চলেছো। তোমাদের ও আমার পূর্ব-পুরুষেরা ছিলো দু'টি পৃথক দল। কিন্তু তারা কেউ কারো প্রতিপক্ষ ছিলো না। কারণ তারা ছিলো অভিন্ন মতাবলম্বী। এক ধর্মমতানুসারী। কিন্তু এখন তোমরা দাবী করে বসেছো নবুয়ত (যেমন তোমার ভ্রাতুস্পুত্র মোহাম্মদ)। তোমরা আবার দেখি তাকে নবী বলে মানোও না। কুরায়েশেরা যে এবার কোন অশুভচক্রে পড়লো, কে জানে? শোনো আবুল ফজল। পুরুষদের মতো তোমাদের মহিলারাও দেখি কম মিথ্যুক নয়। শুনেছো তো, আতেকা নাকি স্বপ্নে দেখেছে, এক লোক নাকি চিৎকার করে বলেছে, আয়! মৃত্যুস্থানে তিন দিনের মধ্যে চলে আয়। আমি তোদের জন্য তিন দিনের অপেক্ষায় আছি। জানিনা আতেকার কথা সত্যি কিনা। সত্যি হলে তো ভালোই। আর সত্য না হলে বুঝবো, সারা আরবে তোমাদের মতো মিথ্যুক আর কেউ নেই। হজরত আব্বাস বলেছেন, আবু জেহেলের কথার অনেক জবাবই আমি দিতে পারতাম। কিন্তু আমি বাদানুবাদের দিকে আর গেলাম না। অস্বীকার করে বসলাম আতেকার স্বপ্নদর্শনকেই।

হজরত উকবার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আব্বাস তখন বলেছিলেন, তুমিই মিথ্যুক। তোমার গোষ্ঠীই মিথ্যুক গোষ্ঠী। উপস্থিত লোকেরা তাঁকে শান্ত করলো। বললো, হে আবুল ফজল! আপনিতো আগে কখনো এ রকম মূর্খতাকে প্রশ্রয়দানকারী ছিলেন না।

ইবনে আবিদের বর্ণনায় এসেছে, আবু জেহেলের কথা শুনে হজরত আব্বাস মনোকষ্ট পেয়েছিলেন খুব। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাঁর পিতা হজরত আব্বাস বললেন, সন্ধ্যা হয়ে গেলো। আব্দুল মুত্তালিব বংশের এমন কোনো রমণী ছিলো না, যে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেনি। তারা বলেছিলো আপনি সুযোগ দিয়েছেন তাই ওই নচ্ছার লোকটা প্রথমে আপনাদের পুরুষদের প্রতি কটাক্ষ করেছে, তারপর আপনাদের রমণীকুলেরও সমালোচনা করেছে। আপনারা শুধু শুনেই গেলেন। তার মুখের উপর জবাব দেয়ার মত হিম্মত কারো হলো না। আমি বললাম,আল্লাহ্‌র কসম! যা হবার তাতো হয়েছেই। এর অতিরিক্ত বলার মতো আমার নিকট কিছু ছিলো না। তবে হ্যাঁ, আবার যদি সে এ রকম বলে তবে তোমাদের পক্ষ থেকে আমি কিছু শুনিয়েই দিবো। আমাদের বংশের আর কেউ আবু জেহেলের কথার প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলো না। আমার মনে হলো, আবদুল মুত্তালিবের বংশকে অপদস্থ করার সুযোগ দিয়েছি আমিই। কিন্তু সে আমাদের নারী-পুরুষ সকলের প্রতি যে ভাষায় কটূক্তি করেছে, সেরকম কটু কোনো উক্তিই আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না প্রত্যুত্তর হিসেবে। তবে আমি তখন

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্র নামে কসম করে বলেছিলাম, আজ থেকে আমি তোমার পিছনে লাগলাম। আমি এ অপমানের প্রতিশোধ নিবোই নিবো। এ কথা বলে তার দিকে এগিয়ে গেলাম পুনরায় কথাগুলো শোনার জন্য। সে ছিলো খুবই চতুর। সে আমার প্রচণ্ড রোষ দেখে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে প্রস্থান করলো। আমি মনে মনে বললাম, এর উপর আল্লাহ্র গজব বর্ষিত হোক। কাপুরুষ! আমাকে গালি দেয়ার সুযোগও দিলো না।

সহসা ভেসে এলো একটি ঘোষণা। একটু এগিয়ে যেতেই দেখলাম, সামনের উপত্যকায় কান ছিদ্র করা গদি উল্টো করে বাঁধা উটের পাশে ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত দমদম চিৎকার করে বলে চলেছে, হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! হে লুয়াই বিন গালিব। তোমাদের বাণিজ্য বহরের সংবাদ শ্রবণ করো। আবু সুফিয়ান তোমাদের বাণিজ্য বহর নিয়ে মক্কার দিকে আসছে। আর তা লুণ্ঠনের জন্য পেছনে পেছনে এগিয়ে আসছে মোহাম্মদ ও তার বাহিনী। মনে হয় তোমরা তোমাদের সম্পদ আর হস্তগত করতে পারবে না। বাণিজ্য বহরের কাছেও ঘেঁষতে পারবে না তোমরা। ঘোষণাটি শুনে কুরায়েশরা ভয় পেয়ে গেলো। মনে পড়ে গেল ওই দুঃস্বপ্নটির কথা।

হজরত আব্বাস আরো বলেছেন, ওই দিন থেকে আবু জেহেলের সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল হয়ে গেলো আমার। তার সঙ্গে আর সংশ্রবও রাখলাম না। আর আমার বোন আতেকা ঘটনাটি সম্পর্কে রচনা করলো একটি কবিতা। কবিতাটি এ রকম—

'কীভাবে তোমরা ভাবতে পারলে যে, আমার স্বপ্ন সত্য নয়। আমার আপনজন আমাকে কিছু বললো না। অথচ তুমি বললে আমি মিথ্যাবাদিনী। এখন দেখো, তুমি নিজেই প্রমাণিত হলে মিথ্যুকরূপে। তুমি তো আমার সত্য কথাগুলোকেই বলেছিলে মিথ্যা, নয় কি?

প্রথমাবস্থায় ভীত হয়ে পড়লেও একটু পরেই সম্পদহানির চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলো তারা। ভাবলো— আমাদের সকলের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে মোহাম্মদ ও তার লোকেরা। অসম্ভব। সাজ সাজ রব শুরু হলো। অতি দ্রুত অস্ত্র সজ্জিত হয়ে বাণিজ্য বহর উদ্ধারের জন্য যুদ্ধযাত্রার আয়োজন শুরু করে দিলো তারা। যারা যেতে পারলো না তারাও নিজেদের পরিবর্তে অন্য লোক ঠিক করে দিলো। যারা ছিলো সামর্থ্যহীন তাদেরকে যুদ্ধোপকরণ ও পাথেয় সরবরাহ করলো সামর্থ্যবানেরা। রসুল স. এর বংশের (বনী হাশেমের) লোকজনদেরকে মুশরিকেরা সন্দেহের চোখে দেখতো। তাই তাদেরকেও সঙ্গে যেতে বললো তারা। যাদের দু'একজনকে মনে হলো রসুল স. এর প্রতি কিছু না কিছু অনুরাগী তাদেরকেও তারা ছাড়লো না। বনী হাশেমের মধ্যে হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব, নওফেল ইবনে হারিস, তালহা ইবনে আবু তালেব, আকিল বিন আবু তালেব এবং আরো দু'জন প্রস্তুত হলো যুদ্ধের জন্য।

www.eelm.weebly.com

আবু লাহাব কিছুতেই যেতে রাজি হলো না। অথচ নিজে না গেলে অন্য কাউকে পাঠাতেই হবে — এই নিয়ম ঘোষণা করেছিলো তারা। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আবু লাহাব নিজের বদলে যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলো আস ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরাকে। আস পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবু লাহাবের কাছ থেকে আস চার হাজার দিরহাম সুদী কর্জ নিয়েছিলো। যুদ্ধে গেলে সে কর্জ আর পরিশোধ করতে হবে না — বলাতে আস রাজি হলো যুদ্ধে যেতে। আবু লাহাবের অভিযানে অংশগ্রহণ না করার প্রধান কারণ ছিলো হজরত আতেকার সেই দুঃস্বপ্ন। সে বললো, আতেকার স্বপ্নই হচ্ছে আমার কাল।

উমাইয়া বিন খলফ, উত্বা বিন শায়বা, জমআ বিন আসওয়াদ, উমায়ের বিন ওহাব, হাকিম বিন হাজ্জাম এবং তাদের সঙ্গীরা উপস্থিত হলো তাদের উপাস্য দেবতা হুবল মূর্তিটির কাছে। যাত্রা শুভ না অশুভ — তা নির্ধারণ করলো তারা ভাগ্য নির্ণায়ক তীরের মাধ্যমে। তীর পরীক্ষার পর তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, আমরা আর এই অভিযানে যাচ্ছি না। আবু জেহেল অনেক অনুরোধ করে তাদের সিদ্ধান্ত বদলিয়ে দিলো। ফলে তারাও প্রস্তুত হলো যুদ্ধের জন্য। উমাইয়া বিন খলফ ছিলো খুবই মোটা। তার যাওয়ার ইচ্ছা ছিলো না মোটেও। কিন্তু তাকে উত্যক্ত করা হচ্ছিলো বার বার। এক বৈঠকে বসেছিলো উত্বা বিন আবু মুইত। সেখানে গিয়ে বসতেই তার সামনে আংটি রেখে বিদ্রূপের সুরে উত্বা বললো, আবু আলী! তুমি তো দেখি মহিলা হয়ে গেলে! উমাইয়া খুবই লজ্জিত হলো। বললো, আল্লাহ্ আমাকে সম্মানিত করেছেন। অথচ তুমি আমাকে অপমান করতে চাও! এ কথা বলে উমাইয়াও শুরু করে দিলো রণ প্রস্তুতি।

ইবনে ইসহাক প্রমুখ লিখেছেন, সেনাদলের সঙ্গে যাওয়ার জন্য গায়িকারাও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে তৈরী হলো। কিন্তু যাত্রার প্রাক্কালে তারা চিন্তা করলো বনী বকর বিন আবদে মানাত বিন কেনানার সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের শত্রুতা। আমরা সকলে মক্কা ছেড়ে চলে গেলে নিশ্চয় তারা আমাদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেবে। প্রতিশোধ গ্রহণের এই সুযোগ তারা ছাড়বে না কিছুতেই। এ কথা ভেবে কুরায়েশদের মধ্যে দেখা দিলো দোদুল্যচিত্ততা। তখন ইবলিস নিজে সুরাকা বিন মালিক কেনানীর অবয়ব ধারণ করে হাজির হলো তাদের সামনে। সুরাকা ছিলো বনী কেনানার এক প্রভাবশালী সরদার। তার আকার ধরে ইবলিস বললো, আমি তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছি। তোমাদের অনুপস্থিতিতে বনী কেনানা কাপুরুষের মতো আচরণ করবে না। তোমরা নিশ্চিন্তে যাত্রা করো। নইলে সকল সম্পদ হারিয়ে তোমরা হয়ে পড়বে নিঃস্ব। এ কথা শুনে আশ্বস্ত হলো মক্কাবাসীরা। নয়শত পঞ্চাশ জনের একটি সুসজ্জিত বাহিনী রওয়ানা হলো অভিযানে। কেউ

www.eelm.weebly.com

কেউ বলেছেন, তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো এক হাজার। তাদের মধ্যে ছিলো দুই শত অশ্বারোহী এবং ছয়শত লৌহ বর্ম পরিহিত যোদ্ধা। সকল কুরায়েশ গোত্রের লোক একত্র হলো। বাদ পড়লো কেবল বনী আদী গোত্রের দুই একজন।

ইবনে উকবা এবং ইবনে আবিদের বর্ণনায় এসেছে, ইবলিস স্বয়ং রওয়ানা হলো মুশরিক বাহিনীর সঙ্গে। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিলো, তোমরা নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে এগিয়ে চলো। তোমাদের সাহায্যের জন্য পিছন থেকে এগিয়ে আসছে বনী কেনানার বিশাল বাহিনী। আমি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিলাম, আমার পক্ষ থেকে আমি এ কথাই বলতে পারি যে — তোমাদের বিরুদ্ধে জয়ী হবার সাধ্য কারো নেই।

মুশরিক বাহিনী যাত্রা স্থগিত করলো জাহ্রানে। আবু জেহেল সেখানে জবাই করলো দশটি উট। প্রতিটি তাঁবুতে পৌঁছে দিলো উটের রক্ত। তারপর সমাপ্ত করলো উটের গোশতের ভোজ। দমদম বিন ওমর তখন দেখলো মক্কার উপত্যকায় বয়ে চলেছে রক্তের ঢেউ।

বিশ্রাম ও ভোজ শেষে পুনরায় যাত্রা শুরু করলো মুশরিক বাহিনী। এবার তারা যাত্রা স্থগিত করলো আসিফ নামক স্থানে। সেখানে সৈন্যদের খাওয়ার জন্য উমাইয়া বিন খলফ জবাই করেছিলো তার নয়টি উট। তৃতীয় দিবসে কাদিদ নামক স্থানে পৌঁছলে দশটি উট জবাই করলো সুহাইল বিন ওমর। সুহাইল পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কাদিদ থেকে সমুদ্রোপকূল ধরে চললো মুশরিকেরা। চতুর্থ দিবসে তাদের জন্য উকবা বিন আবী মুঈদ জবাই করলো দশটি উট। সকালে তারা উপস্থিত হলো আবওয়ায়। সেখানে হেজাজের দুই পুত্র নুবাইয়া ও মুনাইয়া সৈন্যদের জন্য উট জবাই করলো কুড়িটি। এরপর ঘোষণা করে দেয়া হলো, আগামীকাল থেকে পানাহারের ব্যবস্থা করতে হবে নিজেদেরকে।

বায়হাকী, ইবনে শিহাব এবং ইবনে উকবা হজরত ওরওয়া বিন যোবায়েরের বর্ণনানুযায়ী লিখেছেন, যখন মুশরিক বাহিনী হুজাফা নামক স্থানে বিশ্রামরত, তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলো জুহাইম বিন ছালাত বিন মাখরামা। সে ছিলো বনী মতলব বিন মানাত গোত্রের। অনেক পরে হুনায়েনের যুদ্ধের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন তিনি। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় হঠাৎ বলে উঠলেন, তোমরা কি ওই ঘোড় সওয়ারকে দেখতে পাচ্ছো? সাথীরা বলে উঠলো, কি বলছো তুমি? তন্দ্রাভঙ্গ হলো জুহাইমের। বললো, এই মাত্র আমি দেখলাম, এখানে এসে দাঁড়ালো এক ঘোড় সওয়ার। সে বললো, আবু জেহেল, উত্বা বিন রবীয়া, শায়বা, জামআ, আবুল বুখতারী এবং উমাইয়া বিন খলফ মারা গিয়েছে। এরপর দেখলাম তারা নিজেদের উটের বক্ষদেশে তলোয়ারের আঘাত করলো। রক্তাক্ত উটগুলো ছড়িয়ে পড়লো সৈন্যদের সকল

www.eelm.weebly.com

তাঁবুতে। ফলে সকল তাঁবু হয়ে গেলো রক্তাক্ত। এ কথা শুনে জুহাইমের সাথীরা বললো, তুমি শয়তানের চালবাজিতে পড়ে গিয়েছো। কথাটা সেনাপতি আবু জেহেলকেও জানানো হলো। আবু জেহেল বললো, জুহাইম বনী হাশেমের কাল্পনিক স্বপ্নের ফাঁদে পড়েছে।

অপর দিকে হজরত ইবনে উম্মে মাকতুমকে নামাজ ও ইমামতের দায়িত্ব দিয়ে রসুল স. বেরিয়ে পড়লেন মদীনা থেকে। মাকামে রুহায় পৌঁছে তিনি স. হজরত আবু লুবাবাকে মদীনায় ফিরে গিয়ে মসজিদের নামাজের দায়িত্ব নিতে বললেন। ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. মদীনা থেকে যাত্রা করেছিলেন ১২ই রমজান। ইবনে হিশাম বলেছেন, ৮ই রমজান।

মদীনা থেকে এক মাইল পথ অতিক্রম করার পর থামলেন রসুল স.। রসুল স. আবু উত্বাকে বললেন, সকলকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাও। সকলে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন। রসুল স. অপ্রাপ্ত বয়স্ক কয়েক জনকে আলাদা করে নিয়ে বললেন, তোমরা মদীনায় ফিরে যাও। ওই অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, হজরত উসামা ইবনে জায়েদ, হজরত রাফে ইবনে খাদিজ, হজরত বারা ইবনে আজীব, হজরত উসাইদ ইবনে হুদাইর, হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত এবং হজরত উমায়ের ইবনে আবী ওয়াক্কাস।

বাদ পড়ে যাওয়ায় কাঁদতে শুরু করলেন হজরত উমায়ের। রসুল স. তখন তাঁকে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দিলেন। তাঁর বয়স তখন হয়েছিলো ষোলো। বদর যুদ্ধেই শহীদ হয়েছিলেন তিনি।

মুসলিম বাহিনী চলতে শুরু করলো। পথে পড়লো একটি কূপ। একটি বসতি ছিলো কূপকে কেন্দ্র করে। রসুল স. বললেন, যাত্রা স্থগিত করো। এখানেই নামাজ পড়বো আমরা। আর পান করবো এখানকার এই কূপের পানি। থামলেন সকলে। নামাজ, পানাহার ও বিশ্রামের পর যাত্রা শুরুর পূর্বে রসুল স. হজরত কায়েস বিন আবী সা'সাকে বললেন, সৈন্যদের সংখ্যা গণনা করো। নির্দেশানুসারে সৈন্যদেরকে কূপের পাড়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গণনা করে দেখা গেলো মোট সৈন্য সংখ্যা তিনশত তেরো। রসুল স.কে এ কথা জানানো হলো। তিনি স. অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, তালুতের সৈন্যসংখ্যাও ছিলো তিনশত তেরো।

এরপর তিনি স. দোয়া করলেন মদীনার জন্য। নিবেদন করলেন, হে আমার আল্লাহ্! তোমার খলিল হজরত ইব্রাহিম দোয়া করেছিলেন মক্কাবাসীদের জন্য। আর আমি দোয়া করছি মদীনাবাসীদের জন্য। তুমি তাদের ওজন ও পরিমাপের মধ্যে বরকত দাও। বরকত দাও তাদের ফল ও ফসলে। হে আমার প্রভু

www.eelm.weebly.com

প্রতিপালক! তুমি আমাকে দান করো মদীনার ভালোবাসা। মদীনা থেকে তুমি দূর করে দাও সকল অশান্তি ও বিপদাপদ। দূর করে দাও বক্রতা। তোমার খলিল যেভাবে মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন, সেভাবেই আমি হারাম ঘোষণা করছি দুই প্রান্তের দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী মদীনার এলাকাকে।

হাবিব বিন আসাফ তখনো মুসলমান হননি। কেবল গণিমত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর আপন গোত্র খাজরাজের কিছু লোক নিয়ে রসুল স. এর সঙ্গে চলেছিলেন তিনি। রসুল স. ঘোষণা করলেন, আমাদের সঙ্গে কেবল যেতে পারবে তারাই, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। কোনো অমুসলমান আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন হাবিব।

ওই লোকালয় থেকে রবিবার রাতে রওয়ানা হলেন রসুল পাক স.। যাত্রারম্ভে দোয়া করলেন, হে আমাদের আল্লাহ্! তোমার পথে গমনকারী প্রাণগুলোকে দান করো বাহন, তোমার রাস্তায় বের হওয়া অনাবৃত শরীরগুলোকে দান করো পোশাক। ক্ষুধার্তদেরকে দান করো আহার। গৃহহীনদেরকে দান করো গৃহচ্ছায়া। তুমি মেহেরবাণী করে সচ্ছল জীবন দান করো এদেরকে।

কাফেলা এগিয়ে চললো। মাত্র সত্তরটি উট ছিলো তাঁদের। সেগুলোতেই পালাক্রমে আরোহন করে রসুল স. এর নির্দেশে এগিয়ে চললো মুজাহিদ সাহাবীগণের কাফেলা।

ইবনে সা'দ এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, বদর যাত্রার সময় আমরা তিনজনে পালাক্রমে সওয়ার হতাম একটি উটে। একজন করে সওয়ার হতেন। অন্যেরা চলতেন হেঁটে। রসুল স. এর সওয়ারী সঙ্গী ছিলেন প্রথমে হজরত আলী এবং হজরত আবু লুবাবা। পরে হজরত আলী ও আমি। আমরা দু'জনে তখন বলেছিলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি সওয়ারী হয়ে চলতে থাকুন। আমরা হেঁটে যেতে পারবো। তিনি স. বললেন, তোমরা আমার চেয়ে বেশী হাঁটতে পারবে না। আর তোমাদের চেয়ে সওয়াবের আশাও কম করিনা আমি।

বেদায়া এবং উয়ুন রচয়িতা লিখেছেন, হজরত আবু লুবাবার উটে পা রাখার ঘটনাটি ঘটেছিলো ওই সময় যখন রুহা থেকে তাঁকে ফেরত পাঠানো হয়েছিলো মদীনায়। রূহা থেকে রওয়ানা হবার পর রসুল স. এর বাহনের অপর দুই আরোহী ছিলেন হজরত আলী এবং হজরত জায়েদ। সমগ্র বাহিনীর মধ্যে ঘোড়া ছিলো মাত্র দুটি। একটি ছিলো হজরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদের এবং অপরটি ছিলো হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়ামের। ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, ঘোড়া ছিলো তিনটি। আরেকটি ঘোড়া ছিলো হজরত মারছাদ ইবনে আবী মারছাদের।

www.eelm.weebly.com

তুরবান নামক স্থানে পৌঁছে রসুল স. হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে বললেন, দ্যাখো কোনো হরিণ শিকার করতে পারো কি না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি তীর বিদ্ধ একটি হরিণ এনে হাজির করলেন রসুল স. এর সামনে। রসুল স. বললেন, এটিকে জবাই করে তোমার সঙ্গীদের মধ্যে গোশত বণ্টন করে দাও। তাই করা হলো। পুনরায় রওয়ানা হলো কাফেলা। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মক্কার পথ বাঁয়ে রেখে দিয়ে যাত্রা শুরু হলো বদরের দিকে। জুহফান উপত্যকা অতিক্রম করে মুজায়েকুস্ সুফরা পিছনে ফেলে সাফরান নামক স্থানে পৌঁছলো মুসলিম বাহিনী। রসুল স. সেখান থেকে হজরত লুবাইস বিন ওমর জিহ্নী এবং হজরত আদী বিন জাগবাকে পাঠালেন মুশরিক বাহিনীর সংবাদ সংগ্রহের জন্য। সেখানে তিনি সংবাদ পেলেন — আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য বাহিনী রক্ষা করার জন্য মক্কা থেকে বিপুল সংখ্যক যোদ্ধা রওনা হয়েছে। তখন সকলকে নিয়ে পরামর্শ বিনিময় করলেন রসুল স.। সর্ব প্রথম বক্তব্য পেশ করলেন হজরত আবু বকর। এরপর হজরত ওমর। তারপর হজরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে যে নির্দেশ করেছেন, সেই নির্দেশানুযায়ীই আপনি অগ্রসর হোন। আল্লাহ্র শপথ! হজরত মুসার সম্প্রদায়ের মতো আমরা এ কথা কখনো বলবো না যে, আপনি এবং আপনার আল্লাহ্ শত্রুদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে রইলাম। আমরা আপনার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আমরা আপনার সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে ও বামে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। যিনি আপনাকে সত্যের প্রতিভূ হিসেবে প্রেরণ করেছেন, সেই আল্লাহ্র শপথ! আপনি যদি আমাদেরকে আগুনে কিংবা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন তবুও নির্দ্বিধায় আমরা আপনার নির্দেশ পালন করবো। এ কথা শুনে প্রফুল্ল হলেন রসুলুল্লাহ্ স.। তাঁর পবিত্র মুখাবয়বে ফুটে উঠলো সেই প্রফুল্লতার উদ্ভাস।

আনসার সাহাবীগণ ভাবলেন, এবার তবে আমাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করা উচিত। এ কথা ভেবে দণ্ডায়মান হলেন হজরত সা'দ বিন মুয়াজ। বললেন, আমরা আপনার উপর ইমান এনেছি। আপনাকে সত্য বলে জেনেছি। আর এ বিষয়েও আমরা আপনার সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, মদীনায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটলে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে আপনাকে রক্ষা করবো। কিন্তু আজ আমরা ঘোষণা করছি, যে কোনো স্থানে যে কোনো অবস্থায় আপনার যে কোনো নির্দেশ আমাদের জন্য শিরোধার্য। আমাদেরকে একত্র করা অথবা পৃথক করা — সকল কিছুই আপনার অধিকারভূত। আমাদের জীবন ও সম্পদ আপনার। জীবন ও সম্পদাপেক্ষা আপনিই আমাদের নিকট অধিকতর প্রিয়। আল্লাহ্র কসম! আমাদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করার অধিকারও আপনার রয়েছে।

www.eelm.weebly.com

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে যদি আপনি আমাদেরকে ঝাঁপ দিতে বলেন, তবে অবনত মস্তকে নিঃশঙ্কচিত্তে সে নির্দেশও পালন করবো আমরা। এই নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো একজনকেও আপনি পশ্চাদবর্তী পাবেন না। হজরত মুসার সম্প্রদায়ের মতো আমরা নই। দ্বিধা-সংশয়, আড়ষ্টতা, কাপুরুষতা — সকল কিছু পরিত্যাগ করে কেবল আপনার আনুগত্যকেই আমরা করে নিয়েছি জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা আপনার সম্মুখের, পশ্চাতের, দক্ষিণের ও বামের সার্বক্ষণিক সতর্ক সঙ্গী। আমরা চাই আমাদের অকতোভয় যুদ্ধযাত্রা আপনার পবিত্র আঁখি যুগলকে শীতল করুক। হজরত সা'দের ভাষণ শুনে রসুল স. অত্যন্ত প্রীত হলেন। বললেন, তবে চলো আল্লাহ্‌র নামকে সম্বল করে আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হই। আল্লাহ্‌পাক তোমাদের প্রতি প্রসন্ন। আল্লাহ্‌র কসম! এবারের যুদ্ধে অবশ্যই নিহত হবে অংশীবাদীদের শ্রেষ্ঠ নেতারা।

'ওয়া ইন্না ফারিক্বাম মিনাল মু'মিনিনা লাকারিহুন' — কথাটির অর্থ, অথচ বিশ্বাসীদের একদল তা পছন্দ করেনি। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'ওয়াও' (অথচ, এবং) হচ্ছে অবস্থা প্রকাশক ওয়াও। অর্থাৎ শব্দটির মাধ্যমে আগের বাক্যের 'গৃহ থেকে বের করেছিলেন' — কথাটির অবস্থা প্রকাশ করা হয়েছে। এভাবে বক্তব্যটির অর্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম — হে আমার রসুল! আল্লাহ্‌পাক আপনাকে ন্যায়ভাবে আপনার গৃহ থেকে বের করেছিলেন, অথচ বিশ্বাসীদের একদল তা পছন্দ করেনি।

আমি বলি, 'ওয়াও' শব্দটি এখানে অবস্থা প্রকাশক নয়। বরং শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এখানে ইস্তিনাফ (অবতারণা) হিসেবে। স্থান, পাত্র এবং কাল এক না হলে অবস্থা প্রকাশক 'ওয়াও' (ওয়াও হালিয়া) ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু এখানে স্থান, কাল ও পাত্র এক নয়। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর রসুলকে পূর্ণ রণপ্রস্তুতি ব্যতিরেকেই মদীনা থেকে বের করে এনেছিলেন। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে বিশ্বাসীদের একটি দল প্রদান করেছিলেন ভিন্ন মত। তাঁরা মনে করেছিলেন মদীনা থেকে বের হয়ে গেলে মদীনা হয়ে পড়বে অরক্ষিত। আর সেই সুযোগে বনী নাজির সম্প্রদায় মুসলমানদের পরিবার পরিজনদের উপর আক্রমণ করে বসতে পারে। তাঁরা চেয়েছিলেন কুরায়েশদের বাণিজ্য বাহিনী লুণ্ঠন করা হোক। অল্প কয়েকজন মিলে প্রায় বিনা যুদ্ধে বাণিজ্যবাহিনীর বিপুল সম্পদ হস্তগত করা সম্ভব। কিন্তু মদীনা থেকে বের হয়ে কুরায়েশদের সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করা অত্যন্ত কঠিন। বিপুল জান-মাল ক্ষয়ের সম্ভাবনা রয়েছে এতে। সেই সঙ্গে রয়েছে রসুল স. এর জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা। তাই তাঁরা মুসলমান বাহিনীর মদীনা পরিত্যাগকে পছন্দ করতে পারছিলেন না।

www.eelm.weebly.com

ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু আইয়ুব আনসারী বলেছেন, রসুল স. এর সঙ্গে আমরা দুই তিন দিন পথ চললাম। তারপর এক স্থানে থেমে রসুল স. আমাদেরকে বললেন, কুরায়েশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি? সম্মুখযাত্রা না প্রত্যাবর্তন? আমি বললাম, অনর্থক আত্মদান সমীচীন নয়। তাই আমাদের আক্রমণকে বাণিজ্য বহর লুণ্ঠন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখাই উত্তম। যুদ্ধযাত্রার পক্ষে ছিলেন বিশ্বাসীদের আরেকটি দল। কারণ ইতোমধ্যে হজরত জিব্রাইলের মাধ্যমে রসুল স. এর নিকটে এই মর্মে প্রত্যাদেশ এসে পৌঁছেছিলো যে — হে বিশ্বাসীরা! আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের দু'টি দলের মধ্যে যে কোনো একটি দলের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। আল্লাহ্পাক কর্তৃক প্রদত্ত এই অঙ্গীকারকে ভিত্তি করে সাহাবীগণের মধ্যে গড়ে উঠেছিলো পরস্পরবিরোধী দু'টি অভিমত। একদল চাইছিলেন, মদীনা অরক্ষিত রেখে বিপুল ঝুঁকি নিয়ে সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হওয়া অপেক্ষা বাণিজ্য বাহিনীর প্রচুর সম্পদ অধিকার করাই উত্তম। আরেক দল চাইছিলেন, সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে প্রভূত বিজয়। এ নিয়েই শুরু হয়েছিলো বিশ্বাসীদের দুই দলের বিতণ্ডা।

এর পরের আয়াতে (৬) —বলা হয়েছে, 'সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়; মনে হচ্ছিলো তারা যেনো মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে এবং তারা যেনো তা প্রত্যক্ষ করছে।' এ কথার অর্থ — হে আমার রসুল! দেখুন, আমার পক্ষ থেকে বিজয়ের অঙ্গীকার প্রদান করা সত্ত্বেও বিশ্বাসীদের একটি দল পূর্ণরূপে নির্ভয় হতে পারছে না। কুরায়েশদের বিশাল সমর প্রস্তুতি এবং নিজেদের অল্প সমরায়োজনের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে তাদের। তাই তাদের মনে হচ্ছে, সশস্ত্র কুরায়েশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আর মৃত্যুকে ডেকে আনা একই কথা। তাই তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে তাদেরকে যেনো চালনা করা হচ্ছে মৃত্যুর দিকে। আর তাদের চোখে যেনো কেবল মৃত্যুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে 'মনে হচ্ছিলো তারা যেনো মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে, আর তারা যেনো তা প্রত্যক্ষ করছে' — কথাটি বলা হয়েছে মুশরিকদের সম্পর্কে। অর্থাৎ তখন মুশরিকদেরকে দেখে মনে হচ্ছিলো এ রকম, মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেয়ে তারা যেনো এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকেই। আর এই যুদ্ধযাত্রায় মৃত্যুই যেনো সতত প্রত্যক্ষগোচর হচ্ছে তাদের।

www.eelm.weebly.com

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

❐ স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেন যে দুই দলের এক দল তোমাদিগের আয়ত্তাধীন হইবে; অথচ তোমরা চাহিতেছিলে যে নিরস্ত্র দলটি তোমাদিগের আয়ত্তাধীন হউক আর আল্লাহ্ চাহিতেছিলেন যে তিনি সত্যকে তাঁহার বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে নির্মূল করেন;

❐ ইহা এইজন্য যে তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন যদিও অপরাধিগণ ইহা পছন্দ করে না।

উদ্ধৃত আয়াত দু'টির প্রথমটির মর্মার্থ হচ্ছে — আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায় এই যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং নির্মূল করবেন সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। কিন্তু, হে বিশ্বাসীরা! তোমরা চাও সহজ ও ঝুঁকিহীন বিজয়। তোমরা চাও বাণিজ্য বাহিনীটির সমস্ত সম্পদ অধিকার করে পার্থিবভাবে লাভবান হতে।

ইবনে জারীর এবং ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলের মাধ্যমে বিশ্বাসীগণকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বাণিজ্যবাহিনী অথবা যুদ্ধবাহিনী — যে কোনো একটি দলের উপরে আল্লাহ্পাক তাদেরকে বিজয় দান করবেন। বাণিজ্যবাহিনী অধিকার করাই ছিলো বিশ্বাসীদের অভিপ্রায়। সে উদ্দেশ্যেই তাঁরা সকলে রসুল স. এর সঙ্গে মদীনা থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন। পথিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেলো, কুরায়েশদের বাণিজ্য বাহিনীটি ততোক্ষণে চলে গিয়েছে আওতার বাইরে। তখন রসুল স. চাইলেন, বাণিজ্য বাহিনীকে রক্ষা করতে আসা কুরায়েশদের সশস্ত্র বাহিনীটির মোকাবেলা করতে। কিন্তু পূর্ণ ও পর্যাপ্ত মানসিক ও সামরিক প্রস্তুতি না থাকার কারণে মুসলমানেরা এমতো প্রস্তাবের সঙ্গে একাত্ম হতে পারছিলেন না। তাঁদের এই আড়ষ্টতার বিবরণ দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। আর শেষে ব্যক্ত করা হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র অভিপ্রায়। বলা হয়েছে, আর আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে নিশ্চিহ্ন করবেন।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে — 'এটা এজন্যে যে, তিনি সত্যকে সত্য এবং অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধীরা তা পছন্দ করে না।' এ কথার অর্থ — আল্লাহ্পাক চান সত্য তার স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। শুরু হোক জেহাদ। সে পবিত্র জেহাদে আল্লাহ্পাকের ফেরেশতারাও অংশগ্রহণ করবে। বিজয় হয়ে উঠবে অনিবার্য। কেউ কেউ বলেছেন, আগের আয়াতে উল্লেখিত 'তাঁর বাণী দ্বারা' (বিকালিমাতিহি) কথাটির অর্থ আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী। সেই প্রতিশ্রুতিটির মূল মর্ম এই — আল্লাহ্তায়ালা অচিরেই সত্যের নিশানবাহী বিশ্বাসীদেরকে আরব ভূমিতে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবেন। নিশ্চিহ্ন করে দিবেন অবিশ্বাস ও অবিশ্বাসীদেরকে। এভাবে বিশ্বাসীদেরকে তিনি দান করবেন দুনিয়া ও আখেরাতের সামগ্রিক কল্যাণ। আর এভাবেই আল্লাহ্তায়ালা সত্যকে সত্যরূপে এবং মিথ্যাকে মিথ্যারূপে প্রতিভাসিত করে থাকেন — যদিও এ রকম করা সীমালংঘনকারীদের মনঃপুত নয়।

আগের আয়াতে বলা হয়েছে — তিনি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে নির্মূল করেন। মুসলমানদের আড়ষ্টতা ও অস্থিরতা দূর করার মানসেই এ রকম বলা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে — তিনি সত্যকে সত্য এবং অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন। কথাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে রসুল স. ও তাঁর অনুগামীদের প্রতি জেহাদের নির্দেশ।

'ওয়ালাও কারিহাল মুজরিমুন (যদিও অপরাধীগণ এ রকম পছন্দ করে না)। এখানে মুজরিমুন বা অপরাধীগণ অর্থ — মক্কার মুশরিকেরা। অর্থাৎ বিশাল রণপ্রস্তুতি সত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালা মুশরিক বাহিনীকে মুসলিম বাহিনীর মাধ্যমে পরাভূত করবেনই — যদিও এই পরাভব তাদের মনপুতঃ নয়।

বদর যুদ্ধের পুনরালোচনা

হান্নান নামক টিলা অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনী আরো অগ্রসর হলো। শিবির স্থাপন করলো বদর প্রান্তরের সন্নিকটে । রসুল স. মুশরিক বাহিনীর গতিবিধির সংবাদ জানার জন্য হজরত আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে একটি উটে আরোহণ করে একদিকে বেরিয়ে পড়লেন। পথ চলতে চলতে এক স্থানে সাক্ষাত পেলেন এক বৃদ্ধের। আত্মপরিচয় গোপন রেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, মোহাম্মদের বাহিনী এবং কুরায়েশ বাহিনী কোথায়? বৃদ্ধ বললো, আমি সংবাদ পেয়েছি, মোহাম্মদের বাহিনী অমুক দিন রওনা হয়েছে। যদি সংবাদটি সত্য হয়, তবে তাঁর বাহিনী এখন অমুক স্থানে অবস্থান করছে। আর কুরায়েশরা অবস্থান করছে অমুক স্থানে। রসুল স. দেখলেন, বৃদ্ধের অনুমান যথার্থ। বৃদ্ধটি বললো, তোমরা কোত্থেকে আসছো? রসুল স. বললেন, 'ইন্না মিনাল মায়ি' (আমরা পানি

www.eelm.weebly.com

থেকে)। কথাটি দ্ব্যর্থবোধক। একটি অর্থ — আমাদের উৎপত্তি হয়েছে তরল শুক্রানু থেকে। আরেকটি অর্থ — আমাদের আগমন ঘটেছে পানি বহুল বা নদী-নালা পরিবেষ্টিত দেশ থেকে। আত্ম পরিচয় গোপন করার উদ্দেশ্যেই রসুল স. এ রকম জবাব দিয়েছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধটি বুঝে নিয়েছিলো, সম্ভবতঃ তারা প্রসিদ্ধ বনী মাইস্ সামায়ী গোত্রের লোক।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, শত্রুদলের গতিবিধির সংবাদ নিয়ে রসুল স. ও হজরত আবু বকর সেনা শিবিরে ফিরে এলেন। ততক্ষণে মরু চরাচরে নেমে এসেছে সন্ধ্যা। বদর প্রান্তরের সন্নিকটে ছিলো একটি কূপ। দুশমনদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য সেই কূপের দিকে এবার তিনি স. প্রেরণ করলেন হজরত আলী, হজরত যোবায়ের বিন আওয়াম এবং হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে। এই ত্রয়ী সাহাবী সেখানে গিয়ে দেখলেন, তিনজন লোক সেখানে মদ্যপানে রত। তাদের মধ্যে একজন ছিলো বনী হাজ্জাজের গোলাম আসলাম ও অপর জন বনী আস বিন সাঈদের গোলাম আবু ইয়াসির। তাঁরা এই দু'জনকে ধরে নিয়ে শিবিরে ফিরে এলেন। রসুল স. তখন নামাজে মশগুল ছিলেন। সাহাবীগণ ধৃত ব্যক্তিদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পরিচয় ব্যক্ত করো। তারা বললো, আমরা কুরায়েশদের পানি সরবরাহকারী । আমাদেরকে পাঠানো হয়েছিলো পানির অনুসন্ধান করতে। সাহাবীগণের মনে হলো লোক দু'টো মিথ্যে কথা বলছে। তাঁরা মনে করলেন, লোক দু'টো নিশ্চয়ই আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে পরিচালিত বাণিজ্য বাহিনীর লোক। আর বাণিজ্য বাহিনীটি নিশ্চয়ই নিকটে কোথাও অবস্থান করছে। এ কথা ভেবে তাঁরা লোক দু'টোকে প্রহার করলেন। অধিক প্রহারের ভয়ে তারা বললো, আমরা আবু সুফিয়ানের লোক। ইত্যবসরে রসুল স.এর নামাজ শেষ হলো। তিনি স. এসে বললেন, লোক দু'টো প্রথমে সত্য কথাই বলেছে। তোমাদের প্রহারের ভয়ে এখন বলছে মিথ্যে কথা। তিনি স. স্বয়ং প্রশ্ন করলেন, বলো কুরায়েশদের সেনাবাহিনী এখন কোথায়? লোক দু'টো বললো, সামনের ওই বালিয়াড়িটির পিছনে। রসুল স. বললেন, কতজন এসেছে তারা? লোক দু'টো বললো, অনেক। কিন্তু ঠিক কতজন তা আমরা বলতে পারবো না। রসুল স. বললেন, তাদের আহারের জন্য প্রতিদিন কয়টি উট জবেহ করা হয়। তারা বললো, একদিন জবেহ করা হয়েছিলো দশটি। আরেকদিন নয়টি। এ কথা শুনে রসুল স. অনুমান করতে পারলেন যে, মুশরিকদের সেনা সংখ্যা নয় শত থেকে এক হাজারের মধ্যেই হবে। তিনি স. পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কুরায়েশ নেতাদের মধ্যে কে কে যুদ্ধে এসেছে? তারা বললো, উত্বা, শায়বা, আবুল বুখতারী বিন হিশাম, হাকিম বিন হাজ্জাম, নওফেল বিন খুয়াইলিদ, হারিস বিন আমর, তাইমিয়া বিন আদি, নজর বিন হারেস, রবীয়াতুল আসওয়াদ, আবু

www.eelm.weebly.com

জেহেল বিন হিশাম এবং উমাইয়া বিন খলফ্। আরো এসেছে হাজ্জাজের দুই পুত্র নুবাইয়াহ্ ও লুসবাহ্, সহল বিন আমর ও আমর বিন আবদুদ। রসুল স. বললেন, তবে তো মক্কা তার হৃদয়কে এবার মক্কার বাইরে নিক্ষেপ করেছে।

ইবনে আবিদের বর্ণনায় এসেছে, দশদিন পথ চলার পর আমরা উপস্থিত হলাম জুহফায় । সেখান থেকে শত্রুদলের গতি বিধির সংবাদ সংগ্রহের জন্য বের হয়ে গেলেন হজরত লবিস বিন আমর এবং হজরত আদি বিন আবিল জগাবা। তাঁরা এক স্থানে গিয়ে দেখলেন, একটি কূপ থেকে দু'জন লোক পানি উঠিয়ে তাদের মশক পূর্ণ করছে। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য বাহিনীর মাজ্দি বিন ওমর জুহনীও উপস্থিত রয়েছে সেখানে। সেখানে এক ক্রীতদাসী আর এক ক্রীতদাসীর হাত ধরে টানছিলো এবং বলছিলো, বলো আমার ঋণ পরিশোধ করবে কবে? ক্রীতদাসীটি বললো, কুরায়েশদের কাফেলা কাল অথবা পরশুর মধ্যেই এখানে এসে পৌঁছবে। তখন আমি তাদের কাজ করে দিয়ে কিছু উপার্জন করতে পারবো এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করতেও সক্ষম হবো। এ কথা শুনে মাজদী বলে উঠলো, ওকে ছেড়ে দাও। সে ঠিক কথাই বলেছে। হজরত লবিস এবং হজরত আদি তাদের কথাবার্তা শুনে নীরবে তাঁদের উটে চড়ে ফিরে এলেন আপন শিবিরে। সব কথা খুলে বললেন রসুল স.কে।

ইবনে ইসহাক প্রমুখ লিখেছেন, বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কায় যাতায়াত করতে হয় মদীনার পাশ দিয়ে। আবু সুফিয়ান তাই ভয়ে ভয়ে পথ অতিক্রম করছিলো। এক স্থানে থেমে সে পানি সংগ্রহ করতে পাঠালো জমসম বিন ওমরকে। সেও ফিরতে দেরী করলো। ওদিকে পানি আনতে গিয়ে কূপের পাড়ে মাজদি বিন ওমরের সাথে দেখা হলো জমসমের। জমসম তাকে জিজ্ঞেস করলো, অপরিচিত কোনো লোকের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছে কি? মাজদি বললো, দু'জন উষ্ট্রারোহী এসেছিলো। তারা ওই টিলাটির নিকটে তাদের উট বেঁধে রেখে এই কূপ থেকেই তাদের মশক পূর্ণ করেছে। জমসম ফিরে এসে আবু সুফিয়ানকে এ কথা জানালো। আবু সুফিয়ান তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হলো সেই টিলাটির কাছে, যেখানে পানি নিতে আসা আগন্তুকদ্বয় বেঁধে রেখেছিলো তাদের উট। সেখানে পড়েছিলো উটের কিছু জমাট বিষ্ঠা। ওই বিষ্ঠা হাতে নিয়ে সজোরে মাটিতে নিক্ষেপ করতেই বেরিয়ে এলো খেজুরের আঁটি। ওই আঁটির আকার দেখেই আবু সুফিয়ান বুঝে নিলো, আগন্তুকদ্বয় ছিলো মদীনাবাসী। এ কথাও বুঝতে পারলো যে, মদীনা থেকে মোহাম্মদের বাহিনী কাছাকাছি কোথাও এসে উপস্থিত হয়েছে। আবু সুফিয়ান তৎক্ষণাৎ তার বাহিনীকে বদর প্রান্তরের বাঁ পাশ দিয়ে পরিচালিত করলো সমুদ্র সৈকতের পথে। নির্দেশ দিলো, এবার পথ পরিক্রমণ করতে হবে অতি দ্রুত এবং বিরতিহীনভাবে। এভাবে বাণিজ্য

www.eelm.weebly.com

কাফেলাটি চলে গেলো মুসলিম বাহিনীর আওতার বাইরে। মক্কার সন্নিকটে পৌঁছে আবু সুফিয়ান কায়েস বিন ইমরানের মাধ্যমে কুরায়েশদের সেনা বাহিনীর নিকট এই মর্মে সংবাদ প্রেরণ করলো যে, আমাদের বাণিজ্য কাফেলা এখন নিরাপদ। অতএব, তোমরা এখন ফিরে এসো। কুরায়েশদের সেনাদল তখন জুহফায়। আবু সুফিয়ান কর্তৃক প্রেরিত সংবাদ শুনে আবু জেহেল বলে উঠলো, আল্লাহ্র কসম! বদর মেলায় অংশ গ্রহণ না করে আমরা ফিরবো না। তিনদিন অবস্থান করবো সেখানে। উট জবাই করবো। বসাবো ভোজসভা। শরাব পান করবো। অনুষ্ঠিত হবে নাচ-গানের মহফিল। এ রকম করলে আমাদের পরাক্রম ও শক্তিমত্তার সংবাদ ছড়িয়ে পড়বে সবখানে। ভীত হবে মুসলমানেরা। উল্লেখ্য যে, তখন মেলার সময়ও হয়ে পড়েছিলো অত্যাসন্ন।

কুরায়েশ নেতারা প্রথম থেকেই যুদ্ধ যাত্রার ব্যাপারে অনাগ্রহ প্রকাশ করে আসছিলো। হারেস বিন আমের, উমাইয়া বিন খালফ, রবীয়ার দুই পুত্র — উত্বা এবং শায়বা, হাকেম বিন হাজ্জাম, আবুল বুখতারী, আলী বিন উমাইয়া বিন খলফ্ ও আবুল আ'স প্রমুখ কুরায়েশ নেতাদের মনোভাবও ছিলো যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তাই আবু জেহেল তাদেরকে কাপুরুষ বলে উত্তেজিত করেছিলো। বলেছিলো প্রতিশোধ গ্রহণার্থে সংকল্পবদ্ধ হও। আবু জেহেলের উস্কানি ও চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত উল্লেখিত নেতারাও যুদ্ধে গমন করেছিলো। আবু সুফিয়ানের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জানতে পেরে তারা মনে করতে লাগলো, এবার ফিরে যাওয়াই উত্তম।

আখনাস বিন শরিফ ছিলেন বনী জুহরার মিত্র। আবু সুফিয়ানের বাহিনীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জানতে পেরে আখনাস বনী জুহ্রার লোকদেরকে বললো, তোমরা তো আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য বাহিনীর অর্ন্তভুক্ত মাখরামা বিন নওফেলের জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য এসেছিলে। এখন শুনলে তো, বাণিজ্য বাহিনী নিরাপদে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছে। আল্লাহ্ দয়া করে তোমাদের লোকের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এবার মক্কায় ফিরে যাও। বনী জুহরার সংখ্যা ছিলো এক শত। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে তিন শত। আখনাসের কথা শুনে বনী জুহরার সকল লোক ফিরে গেলো মক্কায়। রয়ে গেলো কেবল দু'জন — মুসলিম বিন শিহাব এবং তার এক চাচা। তারা দু'জনেই কাফের অবস্থায় বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো।

হজরত ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, সংবাদ প্রদান শেষে সংবাদ বাহক ফিরে গেলো মক্কায়। আবু সুফিয়ানকে বললো, আমাদের কাফেলার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জেনেও আমাদের লোকেরা যুদ্ধ করতে চায়। আবু সুফিয়ান বললো, আহা আমার গোত্র! তোমরা এখন ওমর বিন হিশামের (আবু জেহেলের) ফাঁদে বন্দী।

www.eelm.weebly.com

বনী হাশেমও ফিরে যেতে চাইলো। কিন্তু আবু জেহেল তাদের জন্য সৃষ্টি করলো এক কৃত্রিম সমস্যা। বললো, এদেরকে হাত ছাড়া করা ঠিক নয়। এদেরকে রাখতে হবে মরুদ্যানের কোনো উপত্যকায়। প্রয়োজনে কুরায়েশ যুবকেরা তাদেরকে পাহারা দিয়ে রাখবে।

বদরের পানির কূপটি অধিকার করে বসলো মুশরিক বাহিনী। মুসলমানেরা পড়ে গেলেন বিপাকে। পানির অভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন তাঁরা। চারিদিকে কেবল ধু ধু বালুকারাশি। পানির অভাবে পানাহার, ওজু, গোসল — সব কিছু বন্ধ হয়ে গেলো তাঁদের। সুযোগ বুঝে শয়তান তাদেরকে এই মর্মে কুমন্ত্রণা দিলো যে — তোমরা না বিশ্বাসী! তোমরা না আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র! তোমাদের রসুলও তো রয়েছেন তোমাদের সঙ্গে। অথচ দেখো যাদেরকে তোমরা মন্দ বলো, সেই মুশরিকেরাই পেয়েছে পানির অধিকার। তাহলে ভেবে দ্যাখো, আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র কারা? তোমরা, না তারা?

আল্লাহ্‌তায়ালা বিশ্বাসীদেরকে শয়তানের এই কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করলেন। ওই রাতেই শুরু হলো মুষলধারায় বৃষ্টি। আর বৃষ্টির ফলে মুসলমানদের অবস্থান হয়ে উঠলো অধিকতর স্বচ্ছন্দ। নিম্নভূমিতে জমে রইলো প্রচুর পানি। মুসলমানেরা সেই পানি দিয়ে নিজেদের এবং পশুপালের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করলেন। কিন্তু এই প্রবল বারিপাত মুশরিকদের অবস্থানকে করে তুললো বিপর্যস্ত। তাদের চারিপাশ হয়ে উঠলো কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল। ওই রাতে ঘটলো আর একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। আল্লাহ্‌পাক তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন এক অপার্থিব তন্দ্রা। ফলে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন তাঁরা। ওই তন্দ্রা ছিলো আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ রহমতের এক অলৌকিক বর্ষণ। সারা রাত ধরে প্রবল বৃষ্টিপাতে সিক্ত ও শীতল হয়ে উঠেছিলো বাইরের মৃত্তিকা। আর সাহাবীগণের হৃদয় ও চেতনা পূর্ণরূপে সিক্ত ও প্রশান্ত হয়ে উঠেছিলো আল্লাহ্‌পাকের অপার রহমতের অলৌকিক বর্ষণে। নিদ্রারূপী সেই রহমতের সমুদ্রে তাই সারারাত নিমগ্ন ছিলেন তাঁরা।

আবু ইয়া'লী ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, বদর যুদ্ধের সময় মেকদাদ ছাড়া অন্য কারো কোনো বাহন ছিলো না। আর সেই বর্ষণ সিক্ত রাতে কেবল রসুল স. ছাড়া এমন কেউই ছিলো না, যে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। রসুল স. সেই রাতে বৃক্ষের নিচে স্থাপিত তাঁর তাঁবুর মধ্যে সারারাত ধরে নামাজ পড়ে কাটিয়েছিলেন। আর ওই রাত ছিলো জুমআর রাত। তখন আমাদের ও মুশরিক বাহিনীর মধ্যে ছিলো কেবল একটি ছোট্ট পাহাড়ের অন্তরাল।

রসুলে পাক স. শত্রুদলের যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং অবস্থান সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করলেন হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ এবং হজরত আম্মার বিন ইয়াসিরকে। তাঁরা শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করে এসে জানালেন, প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে শত্রুদের অবস্থা হয়ে পড়েছে নাজুক। তাদের বিচরণ হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত। তাই তারা এখন অপ্রস্তুত। এখন আমরা অগ্রসর হলে সহজেই অধিকার করতে পারবো পানির কূপগুলো।

www.eelm.weebly.com

বড় ছোট সকল কূপ ও নির্ঝরিণীই ছিলো পাহাড়ের ওপাশে। তাই পানির প্রস্রবণগুলো দখল করা হয়ে পড়েছিলো অত্যাবশ্যক। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণার্থে হজরত হাব্বাব বিন মুনজির বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ্! আমাদের বর্তমান অবস্থান কি আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশানুযায়ী নির্ধারিণ করা হয়েছে? না এ আপনার সমরকৌশল? রসুল স. বললেন, না। এ আমারই যুদ্ধ-কৌশল। হজরত হাব্বাব বললেন, তাহলে বলি, এখনই সম্মুখে অগ্রসর হয়ে পানির অবস্থানগুলো দখল করে নেয়া উচিত। আরো উচিত একটি বৃহৎ জলাধার নির্মাণ করা — যে জলাধারটি সংযুক্ত থাকবে পানির উৎসগুলোর সঙ্গে। এ রকম করতে পারলে আমরা আর পানির অসুবিধায় পড়বো না। তখন অসুবিধায় পড়বে শত্রুরা। রসুল স. বললেন, এটা কি তোমার সুচিন্তিত অভিমত? হজরত হাব্বাব বললেন, হ্যাঁ।

ইবনে সা'দ লিখেছেন, তখন হজরত জিব্রাইল অবতীর্ণ হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! হাব্বাবের পরামর্শটি যথার্থ। রসুল স. তৎক্ষণাৎ তাঁর বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। বিপর্যস্ত ও অপ্রস্তুত কুরায়েশেরা কিছু বুঝে উঠবার আগেই তিনি স. অধিকার করে বসলেন পানির উৎসগুলো। নির্মাণ করলেন একটি বৃহৎ জলাধার। নালা খনন করিয়ে সেগুলোকে যুক্ত করে দিলেন জলাধারটির সঙ্গে। সঙ্গীদের পানির প্রয়োজন নিশ্চিত করলেন তিনি এভাবে।

হজরত সা'দ বিন মুয়াজ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা আপনার জন্য একটি কুটির নির্মাণ করেছি। আপনি দয়া করে সেখানে অবস্থান গ্রহণ করুন। সেখানে আমরা গড়ে তুলেছি নিরাপত্তা বেষ্টনী। প্রস্তুত রেখেছি উট। আমরা সেখানে আপনাকে নিরাপদে রেখে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়বো শত্রুদলের উপর। যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে তো ভালোই। আর যদি অন্য কিছু ঘটে যায়, তবে আপনি ওই উটে চড়ে নিরাপদে পৌঁছে যেতে পারবেন ওই সকল লোকের নিকট, যাদেরকে আমরা পশ্চাতে রেখে এসেছি। তাঁদের ভালোবাসা আমাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আপনাকে পেলে তারা অবশ্যই পুনরাক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। আপনার নিরাপত্তা জীবন দিয়ে হলেও নিশ্চিত করবে। রসুল স. হজরত সা'দকে সাধুবাদ জানালেন এবং সকলের জন্য দোয়া করলেন। এরপর রসুল স. উঠে পড়লেন উঁচু টিলায় নির্মিত তাঁর নিজস্ব কুটিরে। উঠে দেখলেন, এখান থেকে যুদ্ধপ্রান্তরের সকল অবস্থা নিরীক্ষণ করা যায়। তিনি স. তাঁর সঙ্গে রাখলেন কেবল হজরত আবু বকরকে। প্রবেশ দ্বারে পাহারারত রইলেন হজরত সা'দ বিন মুয়াজ। হস্তে ধারণ করলেন উন্মুক্ত অসি। রসুল স. সেখান থেকে যুদ্ধের ময়দানে গমন করলেন, বললেন, ওই দেখো ওই স্থানটি

www.eelm.weebly.com

অমুক ব্যক্তির নিহত হওয়ার স্থান। আর অমুক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে ওই স্থানটিতে। রসুল স. কর্তৃক প্রদর্শিত ওই স্থানগুলোতেই নিহত হয়ে পড়েছিলো কুরায়েশদের বিভিন্ন নেতা— যাদের নামও তিনি স. উল্লেখ করেছিলেন। আহমদ, মুসলিম প্রমুখ।

হজরত রাফে' বিন খাদিজ থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, বদরের যুদ্ধের সময় রসুল স. বলেছেন, যার অলৌকিক হাতে আমার জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! মুসলমান ঘরের কোনো সন্তান সারা জীবন ধরে আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণ আনুগত্য করলেও তোমাদের এই এক রাতের (যুদ্ধ পূর্ববর্তী রাতের) মর্যাদায় পৌঁছতে সক্ষম হবে না। তিনি স. আরো বলেছেন, এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ফেরেশতারাও মর্যাদার দিক দিয়ে ওই ফেরেশতাদের অপেক্ষা উত্তম, যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়নি। এই বর্ণনাসূত্রভূত কেবল একজন বর্ণনাকারী সেকাহ্ (নির্ভরযোগ্য বা বলিষ্ঠ)। নাম তার জাফর বিন মুয়ালাস। কিন্তু তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন কেবল জাফর নামে।

রসুল স. যুদ্ধপ্রান্তরে উপস্থিত হলেন ভোর বেলায়। অপর দিকে শত্রুরাও প্রস্তুত। মুসলমান বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে তারা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তদুপরি তারা চায় ওমর হাজরামীর রক্তের বদলা নিতে। কিছুকাল পূর্বে সে নিহত হয়েছিলো মুসলমানদের হাতে। সুরা বাকারার 'ইয়াস্ আলুনাকা আনিস্ শাহ্রিল হারামি কিতালিন ফিহি'— আয়াতের তাফসীরে তার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

রসুলুল্লাহ্ স. টিলার উপর থেকেই লক্ষ্য করছিলেন শত্রুদের গতিবিধি। সর্বপ্রথম ঘোড়া ছুটিয়ে অগ্রসর হলো জাময়া বিন আসওয়াছ। তার পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলো তার পুত্রও। পিতা-পুত্র ঘোড়ায় চড়ে একটি চক্কর দিলো। উপযুক্ত অবস্থান খুঁজছিলো তারা। রসুল স. তাদেরকে দেখে বললেন, এরা কুরায়েশ। অহংকারী ও উদ্ধত। হে আমার আল্লাহ্! এরা আপনার রসুলকে অস্বীকার করেছে। আপনার রসুলের বিরুদ্ধে এরা যুদ্ধ করতে চায়। আপনি আমার সঙ্গে যে বিজয়ের অঙ্গীকার করেছেন, আজ প্রভাতে সেই বিজয় আমাদেরকে দান করুন। শত্রুদলকে ধ্বংস করে দিন। তিনি স. দেখলেন অদূরে একটি লাল উটের উপরে উপবিষ্ট রয়েছে উত্‌বা বিন রবীয়া। বললেন, যদি কুরায়েশেরা ওই লাল উটের আরোহীর পরামর্শ মেনে নিতো তবে লাভ করতো কল্যাণ। ওই আরোহীর নাম উত্‌বা। সে কুরায়েশদেরকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলো। আবু জেহেল বলেছিলো, উত্‌বা কাপুরুষ। তাই যুদ্ধে যেতে ভয় পায়।

মুসলমানদের অবস্থান সুদৃঢ় হওয়ার পর রসুল স.এর নির্দেশে নির্মিত জলাধারে পানি পান করার জন্য অগ্রসর হলো কুরায়েশদের কয়েকজন। হাকিম বিন হাজ্জামও ছিলো তাদের মধ্যে। রসুল স. বললেন, ওদেরকে আসতে দাও।

www.eelm.weebly.com

যে আমাদের জলাধার থেকে পানি পান করবে আজ এই রণপ্রান্তরে তার মৃত্যু অনিবার্য। ব্যতিক্রম কেবল হাকিম বিন হাজ্জাম। বলা বাহুল্য, অনেকের সাথে রসুল স. এর জলাধারে পানি পান করা সত্ত্বেও হাকিম বিন হাজ্জাম সেদিন বেঁচে গিয়েছিলেন। পরে তিনি ইসলামও গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি শপথ উচ্চারণ করতেন এভাবে— কসম ওই আল্লাহ্‌র, যিনি বদর যুদ্ধে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

কুরায়েশেরা তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার পর উমায়ের বিন ওয়াহাবকে মুসলমানদের সঠিক সেনাসংখ্যার খবর সংগ্রহের জন্যে পাঠালেন। পরবর্তী সময়ে এই উমায়ের মুসলমান হয়েছিলেন। উমায়ের তার ঘোড়া ছুটিয়ে মুসলিম বাহিনীর চতুর্দিকে চক্রাকারে ঘুরে এসে বললো, মুসলমানদের সেনা সংখ্যা তিনশ'র মতো হবে। পেছনে তাদের কোনো সাহায্যকারী দলও নেই। তবে কিছু লোককে আমি দেখেছি সুদর্শন উটের উপরে আরোহণ করে রয়েছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে অস্ত্রসজ্জিত দেহরক্ষী। পানি পান করার সময়েও তারা কথা বলে খুব সাবধানে। তাদের চেহারা বজ্রকঠিন। চোখের দৃষ্টি সাপের মতো— ভয়ঙ্কর। তাদেরকে দেখে আমার মনে হলো তোমাদেরকে হত্যা করার আগে তারা কেউ-ই মৃত্যুবরণ করবে না। এখন তোমরা ভেবে দেখো কি করবে? কুরায়েশেরা এবার পাঠালো আবু সালমা জিসমিকে। সে তার ঘোড়ায় চড়ে মুসলিম বাহিনীর আশেপাশে চক্কর দিয়ে ফিরে এসে বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদের মধ্যে চর্ম-বর্ম পরিহিত কোনো সৈন্য দেখিনি। তাদের কোনো যুদ্ধাশ্ব নেই। প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রও নেই। কিন্তু তাদের চেহারায় রয়েছে অসীম সাহসিকতার ছাপ। তারা মুসলমান। মৃত্যুভয় বলে কোনো কিছু তাদের নেই। তাদের হাতের তলোয়ারই তাদের সবকিছু। আর আমি তাদের মধ্যে দেখেছি নীলচক্ষুবিশিষ্ট কিছু লোক। আর তাদের পদতলে বিছানো রয়েছে যেনো পাথরের পাটি। এবার তোমরা পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো।

হাকিম বিন হাজ্জাম কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলেন। তিনি উত্‌বা বিন রবীয়ার নিকটে গিয়ে বললেন, হে আবুল ওয়ালিদ! আপনি আমাদের নেতা। আপনি আজ এই ক্ষণে এমন কিছু কি করতে পারেন না, যার কারণে আপনি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। উত্‌বা বললো, কী বলতে চাও তুমি? হাকিম বললেন, আপনি ওমর হাজরামীর রক্তপণ নিজে থেকে পরিশোধ করে দিয়ে কুরায়েশদেরকে নিয়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। আপনার এ রকম উদ্যোগ গ্রহণের ফলে এক্ষুণি সমাপ্ত হয়ে যাবে স্বজন-হননের এই রক্তাক্ত অধ্যায়। উত্‌বা বললো, তবে তুমি আবু জেহেলের কাছে যেয়ে বলো, আমি এ প্রস্তাবে সম্মত। ওমর হাজরামী ছিলো আমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই আমি তার রক্তপণ দিতে পিছপা হবো না। এরপর

www.eelm.weebly.com

উত্‌বা কুরায়েশ সেনাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! কী করতে চলেছো তোমরা। আল্লাহ্‌র শপথ! আজ যদি তোমরা বিজয়ীও হও, তবে সে বিজয় হবে সাময়িক। ভবিষ্যতে তোমরা পরাভূত হবেই। তখন তোমাদের স্বজনকে করা হবে হত্যা। তখন স্বজন হারানোর শোক সহ্য করবে কীভাবে? আর যদি তোমরা মোহাম্মদকে অন্য কোনো আরব গোত্রের মোকাবিলায় ছেড়ে দাও, তবু পরাভূত হবে তোমরা। তখন বিদ্রোহী গোত্রের হাত থেকে তোমাদের স্বজন মোহাম্মদকে রক্ষা করাও হয়ে পড়বে কঠিন। তখনও তোমরা হবে অপমানিত, লাঞ্ছিত। তাই হে কুরায়েশ জনতা! তোমাদের সকল লজ্জা আজ অর্পণ করো আমার স্কন্ধে। চারিদিকে ঘোষণা করে দাও, উত্‌বা স্বয়ং রণপ্রান্তরে হাজির। সে কখনো কাপুরুষ হতে পারে না।

হাকিম এবার উপস্থিত হলো আবু জেহেলের কাছে। দেখলো, আবু জেহেল উত্তমরূপে যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত হচ্ছে। বললো, হে আবুল হাকাম! উত্‌বা আমাকে আপনার নিকট এ কথাগুলো জানাতে বলেছেন। সবকথা শুনে আবু জেহেল বললো, উত্‌বা মোহাম্মদ ও তার সঙ্গীদেরকে কোমল দৃষ্টিতে দেখে থাকে। আমি সেরকম নই। আল্লাহ্‌র কসম! আজ মোহাম্মদের সঙ্গে চূড়ান্ত মীমাংসা না করে আমি এ স্থান পরিত্যাগ করবো না। উত্‌বার পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে তার পুত্রের নিরাপত্তা চায়। এরপর আবু জেহেল নিহত ওমর হাজরামীর আত্মীয়দের ডেকে বললো, তোমরা উত্‌বার প্রতি লক্ষ্য রেখো। সে আমাদের লোকদেরকে হতোদ্যম করে দিতে চায়। তোমরা সকলকে তাদের প্রতিজ্ঞায় অটল থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দাও। আর আজই বদলা নাও তোমাদের ভাইয়ের রক্তের। হে হাজরামী গোত্র! তোমরা সকলকে স্মরণ করিয়ে দাও, কুরায়েশ ও হাজরামী গোত্রদ্বয় পরস্পরকে সাহায্য করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

আবু জেহেলের কথা শুনে নিহত ওমর হাজরামীর ভাই আমের হাজরামী মাথা নিচু করে চিৎকার করে ফরিয়াদ জানাতে থাকলো, হায় ওমর! তোমার রক্তের বদলা কি আমরা নিতে পারবো না। তার চিৎকার শুনে সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। যুদ্ধের ব্যাপারে কারো মধ্যে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব রইলো না! পুত্র বাৎসল্যের কারণে উত্‌বা ছিলো যুদ্ধের প্রতি অনীহ। কিন্তু সে-ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ফেলে প্রস্তুত হলো যুদ্ধের জন্য। সে ঘোষণা করলো, এক্ষুণি প্রমাণিত হবে কে দুর্বল এবং কে সবল। দাও আমার শিরস্ত্রাণ। পরপর কয়েকটি শিরস্ত্রাণ দেয়া হলো তাকে। কিন্তু কোনোটি তার মাথায় লাগলো না। কারণ তার মাথা ছিলো প্রকাণ্ড। কাজেই সে চাদর দিয়ে জড়িয়ে নিলো তার মাথা। আবু জেহেলও তার তরবারী কোষমুক্ত করলো এবং আঘাত করলো তার ঘোড়ার পশ্চাৎদেশে। এ দৃশ্য দেখে ইমা বিন রিহ্‌দা বলে উঠলো, এটাতো দেখছি বড়ই বেয়াড়া।

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদ বিন ওমর আসলামী বেলাদরী এবং 'ইমতেনা' রচয়িতার বর্ণনায় এসেছে, শিবির স্থাপনের পর রসুল স. হজরত ওমর বিন খাত্তাবকে কুরায়েশদের নিকট এই মর্মে প্রস্তাব পাঠালেন যে, আমি আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পছন্দ করি না। কারণ আপনারা আমার স্বগোত্রীয় ও স্বজন। আপনাদের স্থলে অন্য কেউ হলে আমি এ রকম বলতাম না। এ কথা শুনে হাকিম বিন হাজ্জাম বললেন, মোহাম্মদের প্রস্তাবে রয়েছে সহমর্মিতা ও সহনশীলতা। সুতরাং তোমরা সংযত হও। আল্লাহ্‌র কসম! এ রকম ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব উত্থাপনের পরেও যদি তোমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তবে তা হবে চরম বাড়াবাড়ি। আর বাড়াবাড়ি যারা করে তারা কখনো জয়লাভ করতে পারে না। আবু জেহেল উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললো, অসম্ভব, আমরা যুদ্ধ পরিত্যাগ করতে পারি না। কারণ আল্লাহ্‌ই আমাদেরকে শক্তিমান করেছেন। আর তাদেরকে করেছেন দুর্বল।

ইবনে জারীহের বর্ণনা সূত্রে ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, বদর যুদ্ধের সময় আবু জেহেল বলেছিলো, ওদেরকে বন্দী করে রশি দ্বারা শক্ত করে বেঁধে নিয়ো। হত্যা কোরো না। তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে সুরা নূন এর এ আয়াত— ইন্না বালাওনাহুম কামা বালাওনা, আস্‌হাবুল জান্নাতি।

সেই ভোর বেলাতেই রসুল স. তাঁর সেনাদলকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন। একটি ছোট তীর হাতে নিয়ে তিনি স. সকলকে সোজা করে দিলেন। বললেন, এভাবেই সকলে সোজা হয়ে দাঁড়াও। একটুও অগ্রপশ্চাৎ হয়ো না। এরপর বললেন, যারা লৌহ বর্ম পরিহিত তারা সম্মুখে অগ্রসর হও। এরপর তিনি স. যুদ্ধের পতাকা তুলে দিলেন হজরত মুসআব বিন উমায়েরের হাতে। তিনি অগ্রসর হয়ে নির্দেশিত স্থানে পতাকা স্থাপন করলেন। বদর প্রান্তরের দক্ষিণভাগে অবস্থান গ্রহণ করেছিলো মুশরিক বাহিনী। আর মুসলিম বাহিনীর অবস্থান ছিলো উত্তরে। রসুল স. পুনরায় সেনাবিন্যাস করতে গিয়ে দেখলেন হজরত সাওয়াদ কিছুটা অগ্রগামী হয়েছে। তিনি স. তাঁর হস্তধৃত তীরের খোঁচায় তাকে সোজা করে দিলেন। হজরত সাওয়াদ বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে বানিয়েছেন ন্যায় ও সত্যের প্রতিভূ। অথচ আপনি আমাকে আঘাত করলেন। আমি এর বদলা চাই। রসুল স. তৎক্ষণাৎ তাঁর উদরের বস্ত্র উন্মোচন করলেন এবং বললেন, বদলা নাও। উন্মোচিত উদরে চুম্বন করতে শুরু করলেন হজরত সাওয়াদ এবং তাঁর পবিত্র শরীর জড়িয়ে ধরে ধন্য হলেন। রসুল স. বললেন, এমন করলে কেনো? হজরত সাওয়াদ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার মনে হয় আজ আমি শাহাদাত লাভ করবো। মন চাইছিলো, তার পূর্বে আমি আপনাকে একবার আলিঙ্গন করি। রসুল স. এবার নির্দেশ জারী করলেন, শুনে নাও সবাই। শত্রুরা অগ্রসর হতে শুরু করলে তোমরাও তীর নিক্ষেপ শুরু করবে। আর তলোয়ারের মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু করবে তখন, যখন তারা এসে পড়বে তোমাদের একেবারে কাছাকাছি। আবী উসাইয়েদ থেকে বর্ণনাটি এনেছেন আবু দাউদ।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা। তারপর বললেন, মনে রেখো আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষ অর্জনই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। যে নির্দেশ আমি আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে পেয়েছি, সেই নির্দেশই আমি দিয়েছি তোমাদেরকে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োজন দৃঢ়তার ও ধৈর্যের। যদি তোমরা সহিষ্ণু ও সুদৃঢ় হও, তবে আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে বিপদমুক্ত করবেন।

ওদিকে মুশরিক বাহিনীও সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মানুষের রূপ ধরে শয়তান স্বয়ং উপস্থিত ছিলো তাদের মধ্যে। সর্বপ্রথম এগিয়ে এলো নিহত ভ্রাতার প্রতিশোধের দাবিদার আমের হাজরামী। তাকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে গেলেন হজরত মুহাইজা বিন আয়াশ। তিনি ছিলেন হজরত ওমরের মুক্ত করা ক্রীতদাস। অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রুর শরবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করলেন তিনি। আনসার সাহাবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম শহীদ হলেন হজরত হারেসা বিন সুরাকা। তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন হাইয়ান বিন ইরকা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে।

এবার এগিয়ে এলো উত্‌বা, তার ভ্রাতা শায়বা এবং পুত্র ওলিদ। ওই তিনজনকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে গেলেন তিনজন আনসার সাহাবী— হজরত আউফ, হজরত মুয়াজ এবং হজরত আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা। উত্‌বা বললো, তোমরা অনভিজাত। সরে যাও। সামনে আসতে বলো কুরায়েশদেরকে। রসুল স. নির্দেশ করলেন, তোমরা সরে এসো। সম্মুখে অগ্রসর হও উবায়দা, হামযা ও আলী। উত্‌বা বললো, হ্যাঁ, তোমরা আমাদের সমকক্ষ। উত্‌বার সামনে দাঁড়ালেন হজরত হামযা, ওলিদের সম্মুখে হজরত আলী এবং শায়বার সম্মুখে হজরত উবায়দা। হজরত হামযার তরবারীর অব্যর্থ আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে ভূতলশায়ী হয়ে পড়লো উত্‌বা। হজরত আলীর অস্ত্রাঘাতে নিহত হলো ওলিদ। শায়বার সঙ্গে হজরত উবায়দার প্রচণ্ড সংঘর্ষ চললো কিছুক্ষণ ধরে। হজরত উবায়দা আহত হলেন। তখন হজরত হামযা ও হজরত আলী ঝাঁপিয়ে পড়লেন শায়বার উপর। তাঁদের যৌথ আক্রমণে শায়বা মৃত্যুমুখে পতিত হলো অল্পক্ষণের মধ্যে। তারপর তাঁরা দু'জনে আহত হজরত উবায়দাকে উঠিয়ে নিয়ে এলেন রসুল স. এর সামনে। উবায়দা রসুল স. এর পবিত্র পদযুগলে স্থাপন করলেন তাঁর গণ্ডদেশ। বললেন, হে আমার প্রিয় রসুল! আমি কি শহীদ নই? রসুল স. বললেন, নিশ্চয়ই। হজরত উবায়দা শাহাদাত বরণ করেছিলেন যুদ্ধ শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের সময়। অপর দিকে কুরায়েশ সর্দার উত্‌বার ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ উঠিয়ে নিয়ে গেলো মুশরিকেরা। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, হজরত হামযা ও হজরত আলীর বীরত্ব ব্যঞ্জকতার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে সুরা হজের এই আয়াত— 'হাজানি খাসমানিখতাসামু ফি রব্বিহিম।'

www.eelm.weebly.com

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. হজরত আবু বকরকে নিয়ে প্রবেশ করলেন তাঁর প্রকোষ্ঠে। সেখানে তিনি স. প্রার্থনা জানালেন— হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছো, তা পূর্ণ করো। ভাবের আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে রসুল স. বার বার এ রকম প্রার্থনা জানাতে থাকলেন। আরো বললেন, স্বল্পসংখ্যক এই মুসলিম সেনানীর উপর নির্ভর করছে ইসলামের ভাগ্য। সুতরাং হে আমার পরম প্রভুপ্রতিপালক! তাদেরকে বিজয় দান করো। এরা যদি আজ নিশ্চিহ্ন হয় তবে কিয়ামত পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে তোমার ইবাদতকারী বলে আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না

রসুল স. এর পুনঃ পুনঃ নিবেদন শুনে হজরত আবু বকর বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! দয়া করে শান্ত হোন। নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালা আপনার প্রার্থনা পূরণ করবেন । হজরত আবু আইউব আনসারী থেকে ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং তিবরানী লিখেছেন, পেরেশান হয়ে প্রার্থনা করতে দেখে হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার একটি সবিনয় জিজ্ঞাসা রয়েছে। জিজ্ঞাসাটি এই — আল্লাহ্পাক তো তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করবেনই। তবে কেনো আপনি এতো কাকুতি মিনতি করে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানিয়ে চলেছেন? রসুল স. বললেন, হে ইবনে রওয়াহা! আমি তো আমার প্রতিপালককে তাঁর প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে স্মরণ করে চলেছি। তিনি তো তার প্রতিশ্রুতিপালন করবেনই।

ইবনে সা'দ এবং ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, লড়াই শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর আমি আবির্ভূত হয়েছিলাম লড়াইয়ের ময়দানে। শত্রুনিধনের পর আমি ছুটে এসেছিলাম রসুল স. এর নিকটে। আমার প্রিয় রসুল কি অবস্থায় আছেন তা দেখাই ছিলো আমার উদ্দেশ্য। আমি দেখলাম, তিনি স. সেজদায় পড়ে বার বার কেবল উচ্চারণ করছিলেন, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু। অন্য কোনো কিছু তাঁকে উচ্চারণ করতে শুনিনি। আমি পুনরায় ছুটে গেলাম লড়াইয়ের ময়দানে। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর পুনরায় ছুটে এসে দেখলাম, রসুল স. সেজদায় পড়ে প্রার্থনারত অবস্থায় বলে চলেছেন কেবল, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু — ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু। এর কিছুক্ষণ পর আমরা লাভ করলাম পরিপূর্ণ বিজয়। বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে। তবে তাঁর বর্ণনায় রয়েছে অতিরিক্ত এ কথাগুলো — অতঃপর রসুল স. তাঁর পবিত্র বদন ফেরালেন। আমি দেখলাম, তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল পূর্ণিমার পূর্ণ শশী সদৃশ উজ্জ্বল। তিনি স. বলে উঠলেন, দিনান্তে আমি নিহত শত্রুদের স্থান পরিদর্শন করবো।

উবায়দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্র মাধ্যমে সাঈদ বিন মনসুর বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধের সময় রসুল স. তাঁর নিভৃত প্রকোষ্ঠে দুই রাকাত নামাজ পাঠ করলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন হজরত আবু বকর। নামাজ শেষে তিনি স. প্রার্থনা করলেন — হে

www.eelm.weebly.com

আমার আল্লাহ্! আমাকে সহায়হীন অবস্থায় পরিত্যাগ কোরো না। হে আমার আপনতম উপাস্য! আমি তোমাকে ওই প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে স্মরণ করছি, যে প্রতিশ্রুতি তুমি আমাকে দিয়েছো।

ইবনে আবী শায়বা, আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি প্রমুখ হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে বর্ণনা করেছেন, বদর প্রান্তরে রসুল স. দেখলেন, মুশরিকদের সেনাসংখ্যা প্রায় এক হাজার। আর মুসলিম বাহিনীর সেনা সদস্য তিন শত উনিশ। তিনি স. কাবামুখী হয়ে তাঁর পবিত্র দুই হস্ত প্রার্থনার ভঙ্গিতে উত্তোলন করলেন আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র দরবারের উদ্দেশ্যে। বললেন, হে আমার আপনতম আল্লাহ্! যে বিজয়ের অঙ্গীকার তুমি আমার সঙ্গে করেছো, সেই বিজয় আজ আমাকে দান করো। হে আমার প্রিয়তম প্রভু। বিশ্বাসীদের এই দল যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায় তবে পৃথিবীতে তোমার নামের মহিমা ঘোষণাকারী আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। রসুল স. প্রার্থনা করে চলেছিলেন গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে। পবিত্র স্কন্ধদেশ থেকে স্খলিত হয়ে পড়লো চাদর। কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপ মাত্র নেই। হজরত আবু বকর স্খলিত চাদর স্থাপিত করলেন যথাস্থানে। তারপর তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আমার প্রিয়তম রসুল! আল্লাহ্পাক অবশ্যই তাঁর কৃত অঙ্গীকার পূরণ করবেন। আপনি শান্ত হন। এরপর অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত —

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ৯

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ○

❒ স্মরণ কর, 'তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলে; তিনি উহা কবুল করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব এক সহস্র ফেরেশ্তা দ্বারা যাহারা একের পর এক আসিবে।'

বদর যুদ্ধে ফেরেশ্তা বাহিনীর সাহায্যের কথা বলা হয়েছে এই আয়াতে। ওই যোদ্ধা ফেরেশ্তাদের সংখ্যা ছিলো এক হাজার। হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত হাকিম বিন হাজ্জাম এবং হজরত ইবরাহিম তায়েমী থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, বদর প্রান্তরে রসুলুল্লাহ্ স. এর জন্য বিশেষভাবে নির্মিত অস্থায়ী প্রকোষ্ঠে তখন উপস্থিত ছিলেন মাত্র দু'জন। রসুল স. স্বয়ং এবং হজরত আবু বকর। রসুল স. ক্ষণেকের জন্য তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তন্দ্রা ভঙ্গ হলো তাঁর । তারপর বললেন, আবু বকর! শুভসংবাদ শ্রবণ করো। হরিদ্রাভ আমামা পরিহিত এবং অশ্বোপরি উপবিষ্ট হজরত জিবরাইল

www.eelm.weebly.com

এতক্ষণ ধরে অবস্থান করছিলেন আসমান ও জমিনের মাঝখানে। এখন তিনি নেমে এসেছেন নিচে। তিনি কিছুক্ষণ অন্তর্হিত থাকার পর পুনরায় আবির্ভূত হয়ে বললেন, আপনার প্রার্থনা গৃহীত হয়েছে। এসে পড়েছে আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য।

ইবনে ইসহাক এবং ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন হজরত জিবরাইল! বোখারী ও বায়হাকীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বদর দিবসে রসুল স.বলেছিলেন, তোমাদের নিকট এসে পড়েছে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হজরত জিবরাইল ও তাঁর সঙ্গীরা। তারা সকলে অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ়। আপনাপন অশ্বের লাগাম হাতে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

এখানে উল্লেখিত 'মুরদিফীনা ' শব্দটির অর্থ— একের পর এক সারিবদ্ধ ভাবে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যোদ্ধা ফেরেশতারা এসেছিলো সারিবদ্ধ ভাবে এক জনের পর একজন। বর্ণনা করেছেন ইবনে যোবায়ের এবং ইবনে মুনজির। কাতাদা বলেছেন, 'মুরদিফীনা' অর্থ এক জনের পর একজন । বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর এবং আবদ বিন হুমাইদ। কাতাদা আরো বলেছেন, আল্লাহতায়ালা প্রথমে পাঠিয়েছিলেন এক হাজার সৈনিক ফেরেশতা । পরে পাঠিয়ে ছিলেন আরো তিন হাজার। এরপর আরো এক হাজার। এভাবে ফেরেশতা সেনাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো পাঁচ হাজারে। হজরত রেফাআ' বিন রাফে' থেকে তিবরানীর বর্ণনায় এবং ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রসুল এবং মুসলিম বাহিনীর সাহায্যার্থে হজরত জিবরাইলের নেতৃত্বে প্রথমে প্রেরণ করেছিলেন এক হাজার ফেরেশতার একটি দল। তার পাঁচশত সেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন হজরত জিবরাইল এবং অবশিষ্ট পাঁচশতের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন হজরত মিকাইল।

শায়বার বর্ণনাসূত্রে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, রসুল স. সংবাদ পেলেন মুশরিকদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে চায় করোজ মাহাবেরীর দল। সংবাদটি ছিলো বেদনাদায়ক। তাই আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করলেন— 'আলা ইয়াক ফিকুম আঁই ইউমিদ্দুকুম রব্বুকুম বি ছালাছাতি আলাফিম্ মিনাল মালায়িকাতি মুনজিলিনা, বালাইন্ তাছবিরু ওয়া তাত্তাকু ওয়া ইয়াতিকুম মিন্ ফাওরিহিম হাজা ইয়ুমদিদ্কুম রব্বুকুম বি খামছাতি আলাফিম মিনাল মালায়িকাতি মুসাওবিমিন্' (তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। হ্যাঁ, তোমরা ধৈর্যধারন এবং আল্লাহ্কে ভয় করলে তোমাদের নিকট এ রকম চিহ্নিত পাঁচ হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন)।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য যে, করোজ মাহাবেরীর বাহিনী কুরায়েশদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে চায়— এই সংবাদটি শত্রু শিবিরে যথা সময়ে পৌঁছেনি। তাই আল্লাহ্তায়ালা পাঁচ হাজার ফেরেশতা না পাঠিয়ে পাঠিয়েছিলেন কেবল এক হাজার ফেরেশতা।

আবু ইয়া'লী এবং হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, আমি তখন ছিলাম বদর প্রান্তরের প্রধান কূপটির নিকটে। হঠাৎ আমার শরীরে লাগলো একটি বাতাসের ঝাপটা। এ রকম অপার্থিব বাতাসের ঝাপটা আমি আগে আর কখনো অনুভব করিনি। কিছুক্ষণ পর আরেকটি দামাল বাতাসের ঝাপটা অনুভব করলাম আমি। এরপর অনুভব করলাম আরেকটি বাতাসের ঝাপটা। হজরত জিবরাইল ও তাঁর সঙ্গী এক হাজার ফেরেশতা আবির্ভূত হওয়ার কারণে অনুভব করেছিলাম প্রথম বাতাসের ঝাপটাটি। দ্বিতীয় ঝাপটাটি অনুভূত হয়েছিলো হজরত মিকাইল ও তাঁর সঙ্গী এক হাজার ফেরেশতার আবির্ভাবের কারণে। আর তৃতীয় বাতাসের ঝাপটাটি লেগেছিলো তখন, যখন এক হাজার ফেরেশতা নিয়ে রণপ্রান্তরে নেমে এসেছিলেন হজরত ইসরাফিল। হজরত জিবরাইলের বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করেছিলো সম্মুখ ভাগে। আর হজরত মিকাইল ও হজরত ইসরাফিলের বাহিনী অবস্থান নিয়েছিলো যথাক্রমে দক্ষিণে ও বামে। তখন রসুল স. এর ডান দিকে ছিলেন হজরত আবু বকর এবং বাম দিকে ছিলাম আমি।

বিশুদ্ধ সূত্রে ইমাম আহমদ, বায্যার এবং হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে রসুল স. হজরত আবুবকর ও আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু বকর! তোমার সঙ্গে রয়েছে জিবরাইল। আর হে আলী! তোমার সঙ্গে রয়েছে মিকাইল। ইসরাফিলও তাঁর বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত। তারা কিন্তু তোমাদের মতো কাতার বদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করবে না।

আবু ইয়া'লীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের বলেছেন, আমি বদর যুদ্ধের সময় রসুল স. এর সঙ্গে নামাজ পাঠ করেছি। নামাজরত অবস্থায় তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মৃদু হাসির চিহ্ন। নামাজ শেষে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি দেখলাম নামাজরত অবস্থায় আপনার মুখে ফুটে উঠলো মৃদু হাসি। তিনি স. বললেন, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে শত্রুদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে এদিক দিয়েই যাচ্ছিলেন হজরত জিবরাইল । দেখলাম, প্রান্তরের পুবাল বাতাসে তাঁর পাখায় লেগে রয়েছে কিছু ধুলোবালি। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। আমিও হাসলাম।

হজরত আতিয়া বিন কায়েসের বর্ণনাসূত্রে ইবনে সা'দ এবং আবু শায়েখ লিখেছেন, যুদ্ধ শেষে লাল একটি ঘোড়ায় চড়ে হজরত জিবরাইল উপস্থিত হলেন রসুল স. এর নিকটে। তাঁর অবয়বে তখন শোভা পাচ্ছিলো যুদ্ধের পোশাক। হাতে

www.eelm.weebly.com

ছিলো একটি বর্শা। তিনি বললেন, মহা সম্মানিত ভ্রাতা মোহাম্মদ! আল্লাহ্পাক নির্দেশ করেছেন আপনি আপনার পূর্ণ পরিতুষ্টি ঘোষণা না করা পর্যন্ত আমি আপনার পবিত্র সংসর্গে অবস্থান করবো। এখন বলুন আপনি কি পরিতুষ্ট? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। আমি এখন অত্যন্ত আনন্দিত। এ কথা শুনে হজরত জিবরাইল প্রত্যাবর্তন করলেন।

দ্রষ্টব্যঃ বদর যুদ্ধের সময় কোনো কোনো ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলো। ইবরাহিম হারসির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সুফিয়ান বিন হারেস বলেছেন, আমি যুদ্ধের সময় কিছু সবুজ পোশাক পরিহিত লোককে দেখলাম। তারা উপবিষ্ট ছিলো শাদা ও কালো বর্ণ মিশ্রিত ঘোড়ার উপর। ঘোড়াগুলোর পা ছিলো শূন্যে। বায়হাকী এবং ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সুহাইল বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধের সময় আমি দেখেছি শাদা কালো রঙের চিহ্নিত কিছু ঘোড়ার উপরে বসে অচেনা লোকেরা যুদ্ধ করে চলেছে। ঘোড়াগুলোর পা মাটিতে ছিলো না। লোকগুলো মুশরিকদের কাউকে করেছিলো হত্যা এবং কাউকে করেছিলো বন্দী।

মোহাম্মদ ওমর আসলামী এবং ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ বলেছেন, আমি বদর যুদ্ধের সময় রসুল স.এর ডান দিকে এবং বাম দিকে দু'জন অপরিচিত লোককে দেখলাম। তাঁরা নির্মম হাতে বধ করে চলেছিলেন অংশীবাদীদেরকে। এরপর আবির্ভূত হলেন তৃতীয় এক অপরিচিত ব্যক্তি। তিনি অবস্থান গ্রহণ করলেন রসুল স.এর পশ্চাতে। চতুর্থ আরেকজন অপরিচিত ব্যক্তি এসে অবস্থান গ্রহণ করলেন সম্মুখ ভাগে।

মোহাম্মদ বিন ওমর আসলামীর বর্ণনায় আরো এসেছে, পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণকারী হজরত ইবরাহিম গিফারী বলেছেন, আমি এবং আমার পিতৃব্যপুত্র বদর যুদ্ধের সময়ে ছিলাম প্রতিপক্ষ। একটি কূপের পাশে ছিলাম আমরা। সেখান থেকে লক্ষ্য করলাম, কুরায়েশদের সৈন্যের তুলনায় রসুল স.এর সৈন্য সংখ্যা অনেক কম। আমি আপন মনে বললাম এখনই সমর প্রান্তরে সম্মুখ-সমরে লিপ্ত হবে পরস্পর বিরোধী দু'টো দল। আমি ইচ্ছা পূরণ করবো মোহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের উপর। এরপর আমি উপস্থিত হলাম রসুল স.এর সেনা বাহিনীর বাম প্রান্তে। এবার পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, রসুল স. এর সেনা সংখ্যা কুরায়েশদের সেনা সংখ্যার এক চর্তুথাংশের মতো হবে। হঠাৎ দেখলাম আমাদের মাথার উপরে এক খণ্ড মেঘ। সেদিকে তাকাতেই শুনতে পেলাম সেনা সঞ্চালন ও অস্ত্রের আওয়াজ। অশ্বারোহী এক লোক সজোরে বলে উঠলো—হাইজুম। সামনে চলো। সামনে চলো। ওই অশ্বারোহী গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন রসুল স. এর দক্ষিণ পাশে। এরপর মেঘ থেকে আবির্ভূত হলো আরেকদল সশস্ত্র সৈন্য।

www.eelm.weebly.com

আগন্তুক সৈন্যসহ তখন রসুল স. এর বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা হয়ে গেলো কুরায়েশদের দ্বিগুণ। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। আমার পিতৃব্যপুত্র নিহত হলো। আমি বেঁচে গেলাম। পরে ইসলাম গ্রহণের পর আমি রসুল স. কে এই ঘটনাটি বলেছিলাম।

জ্ঞাতব্যঃ অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ওই অপরিচিত অশ্বারোহী তখন উচ্চ কণ্ঠে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, 'আকদিম হাইজুম।' সম্মানিত গ্রন্থকর্তা র. তাঁর টীকা ভাষ্যে লিখেছেন উক্‌দুম, ইক্‌দাম, আক্‌দিম — তিনটি উচ্চারণই শুদ্ধ। ইমাম নববী 'ইক্‌দাম' উচ্চারণটিকে প্রাধান্য প্রদান করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখগমনের নির্দেশ হিসেবে শব্দটি উচ্চারিত হয়। আর 'হাইজুম' বলে বক্ষদেশকে। এ রকমও হতে পারে যে, ওই সেনাদলের অশ্বগুলোর নাম ছিলো হাইজুম। এমতাবস্থায় উল্লেখিত নির্দেশটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম — হে অশ্বারোহীরা! সম্মুখে অগ্রসর হও।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর এবং সায়েব বিন আবী জায়িস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন গিফারী গোত্রের এক লোক। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! কোনো মানুষ আমাকে বন্দী করেনি। বদর যুদ্ধে কুরায়েশরা পরাজিত হলো। আমিও পালিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমাকে বন্দী করে ফেললো শ্বেত শুভ্র বস্ত্র পরিহিত এক লোক। লোকটি ছিলো অশ্বারোহী এবং দীর্ঘ আকৃতির। তার অশ্বের পা গুলো ছিলো শূন্যে। হঠাৎ আবদুর রহমান বিন আউফ আমাকে দেখে ধরে নিয়ে এলেন রসুল স. এর নিকটে। রসুল স. বললেন, কে তোমাকে বন্দী করেছে? আমি বললাম, জানি না। তিনি স. বললেন, তোমাকে বন্দী করেছে এক ফেরেশতা।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম আহমদ, ইবনে সা'দ এবং ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত আবুল ইয়াসির ছিলেন ক্ষীণকায়। তদ্‌সত্ত্বেও তিনি বন্দী করে এনেছিলেন রসুল স. এর পিতৃব্য দীর্ঘকায় হজরত আব্বাসকে। রসুল স. তাঁকে বললেন, তুমি কীভাবে তাঁকে বন্দী করতে পারলে? হজরত আবুল ইয়াসির বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অচেনা এক লোক আমাকে সাহায্য করেছিলো। বন্দী করার পূর্বে ও পরে আমি আর তাকে দেখতে পাইনি। রসুল স. বললেন, ওই লোকটিতো ছিলো ফেরেশতা।

ইবনে ইসহাক এবং ইসহাক বিন রাহ্‌ওয়াইহ্‌র বর্ণনায় এসেছে, শেষ জীবনে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন হজরত আবু উসায়েদ সাআদী। তিনি তখন বলেছিলেন, এখনো বদর প্রান্তরে গেলে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারবো ওই পথটি, যে পথ বেয়ে নেমে এসেছিলো যোদ্ধা ফেরেশতারা। এখনও সে দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসে।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, বদর যুদ্ধের সৈনিক ফেরেশতারা ছিলো শাদা পাগড়ী পরিহিত। পৃষ্ঠোপরি ঝুলন্ত ছিলো তাদের পাগড়ীর পুচ্ছ। আর খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিক ফেরেশতারা ছিলো লাল রঙের পাগড়ী পরিহিত। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাসের অতিরিক্ত উক্তি হিসেবে এসেছে — কিন্তু হজরত জিব্‌রাইলের পাগড়ীর রঙ ছিলো হলুদ।

বিশুদ্ধ সূত্রে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওরওয়া বলেছেন, বদর যুদ্ধে হজরত যোবায়েরের রূপ ধরে লাল পাগড়ী পরে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলেন হজরত জিব্‌রাইল। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন যোবায়ের থেকে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে জারীর এবং ইবনে মারদুবিয়াও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

শিথিল সূত্রে তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মুসাউবিমীন' শব্দটির অর্থ— চিহ্ন বিশিষ্ট। বদর যুদ্ধের সময় ফেরেশতাদের বিশেষ চিহ্ন ছিলো কালো পাগড়ী। উহুদ যুদ্ধে তাদের পাগড়ীর রঙ ছিলো লাল । ইবনে সা'দ লিখেছেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফেরেশতাদের চিহ্ন ছিলো সবুজ, হলুদ ও লাল রঙের জ্যোতির্ময় আমামা। তাদের ঘোড়াগুলো ছিলো শুভ্র ও কৃষ্ণ বর্ণ দ্বারা সুচিত্রিত। ঘোড়াগুলোর পায়ের রঙ ছিলো শাদা। রসুল স. বলেছেন, যুদ্ধকালে ফেরেশতারা নির্দিষ্ট চিহ্ন ধারণ করে থাকে। তোমরাও ওই চিহ্নগুলোর অনুসারী হয়ো।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ১০

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

❑ আল্লাহ্ ইহা করেন কেবল শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে যাহাতে তোমাদিগের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহের নিকট হইতেই আসে, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমে বলা হয়েছে—ওয়ামা জায়ালাহুল্লাহু ইল্লা বুশ্‌রা। কথাটির অর্থ— আল্লাহ্ এ রকম করেন কেবল শুভ সংবাদ দেয়ার জন্য। কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ এখানে এ রকম— হে আমার রসুল! অবিশ্বাসীদের প্রবল পরাক্রম এবং বিপুল যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে আপনি যাতে বিন্দুমাত্র চিন্তিত না হন, তাই আল্লাহ্তায়ালা এ রকম করেছেন— সশস্ত্র ফেরেশতা বাহিনী পাঠিয়ে আপনাকে প্রদান করেছেন বিজয়ের শুভ সংবাদ।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ এ রকম— হে আমার রসুল! আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। তৎসত্ত্বেও শত্রুদের বিপুল সমরায়োজন দৃষ্টে যাতে দুর্ভাবনাকবলিত হয়ে না পড়েন, তাই আপনার নিকট পাঠানো হয়েছে সুসংবাদবাহী হজরত জিবরাইলকে এবং যোদ্ধা ফেরেশতাদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়ালী তাত্বমাইন্না কুলুবুকুম। কথাটির অর্থ— এবং এই উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। এই কথাটির মূল লক্ষ্যও রসুল স.। এখানে সেই চিত্ত প্রশান্তির কথা বলা হয়েছে, যে চিত্ত প্রশান্তি কামনা করেছিলেন হজরত ইব্রাহিম। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে বলেছিলেন, আমি মৃতকে জীবিত করি। তিনি বলেছিলেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক ! কী ভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করো, তা আমাকে দেখাও। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছিলেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না? তিনি বলেছিলেন, নিশ্চয়ই। তবু আমি তা দেখতে চাই কেবল আমার চিত্তপ্রশান্তির জন্য। সুরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। হজরত ইব্রাহিমের চিত্তপ্রশান্তির নিবেদনটি ছিলো নুযুলে আতেম (চরম অবতরণ) সম্ভূত। আলোচ্য বাক্যটিতেও তেমনি দেয়া হয়েছে রসুল স. এর চরম অবতরণসম্ভূত অবস্থার পরিচয়। নুযুল (আত্মিক অবতরণ) সংঘটিত হয় উরুজের (আত্মিক ঊর্ধারোহণের) পর। নবী রসুলগণ উরুজের সময় আল্লাহ্‌তায়ালার একান্ত সান্নিধ্যে উপনীত হয়ে লাভ করেন অসংখ্য নেয়ামত। আর সেই নেয়ামত সমূহ তাঁরা তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে বিতরণ করেন নুযুলের পর। নুযুল সংঘটিত না হলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের সৃষ্টি হতো সুদূর ব্যবধান। ফলে তাঁদের মাধ্যমে উপকারপ্রাপ্তি হয়ে উঠতো দুরূহ। যে সকল নবী রসুলের এবং তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের নুযুলে আতেম (চরম আত্মিক অবতরণ) সংঘটিত হয়, তাঁদের অনুসারীরাই হন পরিপূর্ণরূপে উপকৃত। সকল নবী রসুল অপেক্ষা রসুলুল্লাহ্ স. এর নুযুল ছিলো অধিকতর পূর্ণ ও পরিণত। তাই তিনি স. বিজয়ের অঙ্গীকার লাভ করা সত্ত্বেও বিজয়ের বাস্তবায়ন দর্শনের জন্য বদর প্রান্তরে আপন প্রকোষ্ঠে বসে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর দুর্ভাবনা ও চিত্তচাঞ্চল্য প্রশমিত করার জন্য শুভ সংবাদবাহী ফেরেশতা বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, সাহাবী হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহার নুযুল পরিপূর্ণ ছিলো না। তাই তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আল্লাহ্‌পাক তো তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করবেনই। সুতরাং সে কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে কেনো? পক্ষান্তরে সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলপ্রেমিক ও রসুলানুসারী হজরত আবু বকরের নুযুল ছিলো পরিপূর্ণ। তাই তিনি নীরবে শ্রবণ করে চলেছিলেন রসুল স. এর কথা। শেষে কেবল

www.eelm.weebly.com

বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার প্রার্থনা পৌঁছে গিয়েছে সর্বোচ্চ শিখরে (সুতরাং এবার ক্ষান্ত হোন)। কিন্তু রসুল স. এ কথা উত্তমরূপে অবগত ছিলেন যে আল্লাহ্‌তায়ালা বে নেয়াজ। সৃষ্টির বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস, ইবাদত-উপাসনা — কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী তিনি নন। সুতরাং চির অমুখাপেক্ষী পবিত্র সেই সত্তার দরবারে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানানোর মধ্যেই রয়েছে দাসত্বের চরম বহিঃপ্রকাশ।

জ্ঞাতব্যঃ দু'টি অবস্থা রয়েছে নবী রসুলগণের। একটির নাম সুয়ুদী। অপরটির নাম নুযুলী। প্রথম অবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য এবং মুখলুকের নৈকট্য লাভ হয় নবুয়তের মাধ্যমে। দ্বিতীয় অবস্থাটি কেবল রসুলগণের জন্য সুনির্ধারিত। তাঁরা সুয়ুদীর পরিপূর্ণতা লাভ করার পর লাভ করেন পরিপূর্ণ নুযুল। নুযুলের এই পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলেন হজরত ইব্রাহিম। রসুলুল্লাহ্‌ স. এই মর্যাদায় ছিলেন আরো অধিক অগ্রগামী। এই অবস্থায় সত্তার ভিতর বাহির, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ — সকল অংশে প্রতিষ্ঠিত হয় পরিপূর্ণ ইমান। তাই এই অবস্থায় উপনীত ব্যক্তিত্ববৃন্দ কেবল আত্মিক দর্শন ও অনুভবের মাধ্যমে প্রশান্ত হন না। তাঁরা চিত্ত প্রশান্তি লাভ করতে চান চাক্ষুস দর্শনের মাধ্যমেও। তাই হজরত ইব্রাহিম স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছিলেন মৃতকে জীবিত করার দৃশ্য। আর রসুলুল্লাহ্‌ স.ও দেখতে চেয়েছিলেন বিজয়ের প্রকাশ্য বাস্তবায়ন। আধ্যাত্মিক সাধকবৃন্দ এসকল বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

শেষে বলা হয়েছে — 'এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই আসে আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'

উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাদের সাহায্য সমর সরঞ্জামের অন্তর্ভূত নয়। যুদ্ধের রীতি নীতির মধ্যেও বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ্‌তায়ালা যাকে চান, তাকেই এই অনুগ্রহদানে ধন্য করেন।

দ্রষ্টব্যঃ প্রার্থনা শেষে রসুল স. স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছিলেন যুদ্ধের ময়দানে। তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন হজরত আবু বকর। একাধিক অবস্থান গ্রহণ করে রসুল স. এবং হজরত আবু বকর যেমন নিজেরা যুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন অন্যদেরকে। মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী তাঁর সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে এ সম্পর্কে সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন।

ইবনে সা'দ এবং ফারইয়ানির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, বদর যুদ্ধের সময় আমি রসুল স. কেই বানিয়েছিলাম আমার আড়াল ও আশ্রয়। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিলো সেদিন। আর সেদিন রসুল স.ই ছিলেন মুশরিক বাহিনীর সর্বাপেক্ষা নিকটে। ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী উল্লেখ করেছেন, আমি বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী। সেদিন আমি ছিলাম রসুল স. এর প্রত্যক্ষ ছত্রছায়ায়। বর্ণনাটি নাসাঈর মাধ্যমে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে — যখন ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো, তখন আমি আত্মরক্ষা করেছিলাম রসুল স. এর আড়ালে।

www.eelm.weebly.com

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝

☐ স্মরণ কর, তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে স্বস্তির জন্য তোমাদিগকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ হইতে তোমাদিগের উপর বারি বর্ষণ করেন উহা দ্বারা তোমাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য, তোমাদিগ হইতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য, তোমাদিগের হৃদয় দৃঢ় করিবার জন্য এবং তোমাদিগের পা স্থির রাখিবার জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে — ইজ্ ইউগাশ্‌শীকুমুন্ নুয়াসা আমানাতাম্ মিন্‌হু (স্মরণ করো, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন)। এখানে 'ইজ্ ইউগাশ্‌শীকুম' কথাটিকে আল্লামা ইবনে কাসীর এবং ক্বারী আবু আমর পড়তেন— ইজ্ ইয়াগ্‌শাকুম। সুরা আলে ইমরানেও এ রকম উচ্চারণভঙ্গির দৃষ্টান্ত রয়েছে। সেখানে একস্থানে বলা হয়েছে — আমানাতান্ নুয়াছাঁই ইয়াগ্‌শা। ক্বারী নাফে শব্দটিকে উচ্চারণ করেছেন — ইয়ুগ্‌শিকুম। এই দৃষ্টান্তটির উল্লেখ রয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে — কাআন্‌নামা উগশিয়াত উজুহুহুম। অন্য সকল ক্বারী উচ্চারণ করেছেন, ইউগাশ্‌শীকুম — যেমন উল্লেখ করা হয়েছে এখানে।

বদর যুদ্ধের তন্দ্রাচ্ছন্নতা যে সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিলো, সে কথা বুঝাতেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'আমানাতান্' শব্দটি। শব্দটি শাব্দিক দিক থেকে কর্মকারক। আর অর্থগত দিক থেকে কারণ বা ক্রিয়া। কেননা তন্দ্রাচ্ছন্নতাই এখানে স্বস্তির কারণ। ইউগাশ্‌শীকুমুন্ নুয়াসা বলতে অভ্যন্তরীণ আবেগ বা তন্দ্রালুতাকে বুঝায়। তন্দ্রা ঘনিভূত হলে নেমে আসে শ্রান্তিহারক নিদ্রা। সশস্ত্র অভিযানে বহির্গত মুসলিম বাহিনীর জন্য পরিপূর্ণ বিশ্রাম ছিলো অপরিহার্য। ঘন তন্দ্রার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা সেই বিশ্রাম ও স্বস্তিই তাঁদেরকে দিয়েছিলেন। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত এক বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন।

www.eelm.weebly.com

হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ বর্ণনা করেছেন, সমর প্রান্তরে তন্দ্রা অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে। আর নামাজের সময় তন্দ্রা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। কাতাদার মাধ্যমে আব্দ বিন হুমাইদ্ বর্ণনা করেছেন, সাহাবীবৃন্দের উপর এ রকম অবিস্মরণীয় তন্দ্রা অবতীর্ণ হয়েছিলো দু'বার। একবার বদর যুদ্ধের ময়দানে। আরেকবার উহুদের সমর প্রান্তরে।

এরপর বলা হয়েছে — 'এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন, ওই পানি দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করবার জন্যে।' এ কথার অর্থ — হে বিশ্বাসীবৃন্দ! পানির অভাবে তোমরা হয়ে পড়েছিলে তৃষ্ণার্ত ও অপবিত্র। পানির উৎসগুলো ছিলো শত্রুদের অধিকারে। তাই আল্লাহ্পাক দয়া করে তোমাদেরকে তৃপ্ত ও পবিত্র করবার জন্য আকাশ থেকে নামিয়েছিলেন রহমতের বৃষ্টি। আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় রসুল রয়েছেন তোমাদের সঙ্গে। তাই তোমাদের প্রতি করা হয়েছে এ রকম দয়ার্দ্র আচরণ।

এরপর বলা হয়েছে — 'তোমাদের নিকট থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য।' বৃষ্টি বর্ষণের আরেকটি উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে এই বাক্যটিতে। সেই উদ্দেশ্যটি হচ্ছে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করা। শয়তান তখন এই মর্মে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করেছিলো যে, তোমরা বলো, তোমরা বিশ্বাসী। তাই তোমরা আল্লাহ্র প্রিয় পাত্র। অথচ দ্যাখো, পানির সকল উৎস রয়েছে অবিশ্বাসীদের দখলে। তোমরা যদি আল্লাহ্র প্রিয় পাত্রই হয়ে থাকো, তবে তোমরা এ রকম দূরবস্থায় পড়েছো কেনো? ওজু, গোসল কিছুই করতে পারছো না তোমরা। পবিত্রতা অর্জন ব্যতিরেকে কি আল্লাহ্তায়ালার ইবাদত করা যায়? আর ইবাদত না করলে কি আল্লাহ্র প্রিয় পাত্র হওয়া যায়? শয়তানের এহেন কুমন্ত্রণা সেই মুহূর্তেই উবে গেলো, যখন আল্লাহ্তায়ালা ঘটালেন প্রবল বারিপাত। আলোচ্য বাক্যে তাই বলা হয়েছে — শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য।

শেষে বলা হয়েছে বারি বর্ষণের আরো দু'টো উদ্দেশ্যের কথা। সে দু'টো উদ্দেশ্য হচ্ছে — ১. হৃদয়কে দৃঢ় করবার জন্য। ২. পা স্থির রাখবার জন্য। এ কথার অর্থ — শ্রান্তি জর্জরিত, অপবিত্র এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রভাবিত হৃদয়ে কখনো সুদৃঢ় সংকল্প প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা এসকল প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করে তোমাদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করবার জন্য পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটিয়েছিলেন। তা ছাড়া তোমাদের সামনে ছিলো বন্ধুর বালিয়াড়ি। তোমাদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিলো অসমতল। পদবিক্ষেপ ছিলো না স্বস্তিদায়ক। বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এই প্রতিবন্ধকতাটিকেও সরিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ্তায়ালা। তোমাদের চলাচল করে দিয়েছেন স্বস্তিকর। 'তোমাদের পা স্থির রাখবার জন্য' কথাটির অর্থ 'যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখবার জন্য' — এ রকমও হতে পারে।

www.eelm.weebly.com

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَٰئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ○

❒ স্মরণ কর, তোমাদিগের প্রতিপালক ফেরেশতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, 'আমি তোমাদিগের সহিত আছি সুতরাং বিশ্বাসিগণকে অবিচলিত রাখ; ' যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে আমি তাহাদিগের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিব; সুতরাং তাহাদিগের স্কন্ধে ও সর্বাংগে আঘাত কর;

প্রথমে বলা হয়েছে — 'স্মরণ করো, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সুতরাং মুমিনগণকে অবিচলিত রাখো।' এখানে বলা হয়েছে ওই ফেরেশতাদের কথা, বদর যুদ্ধের সময় যাদেরকে পাঠানো হয়েছিলো মুসলমানদের সাহায্যার্থে। 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি' — কথাটির অর্থ এখানে, আমার সাহায্য তোমাদের সাথে রয়েছে। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে কারো স্থানগত বা অবস্থানগত নৈকট্য সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌তায়ালা স্থানবিশিষ্ট কিংবা শরীরবিশিষ্ট নন। তিনি আনুরূপ্যবিহীন। এখানে ফেরেশতাদের প্রতি আর একটি প্রত্যাদেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে — সুতরাং মুমিনগণকে অবিচল রাখো। এ কথার অর্থ, হে আমার প্রেরিত ফেরেশতারা! তোমরা বিশ্বাসী যোদ্ধৃবৃন্দকে সুসংবাদ প্রদান করো। তাদের পাশাপাশি অবস্থান গ্রহণ করে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করো। প্রশান্তিতে ভরে দাও তাদের হৃদয়। মুকাতিল বলেছেন, ফেরেশতাগণ সেরকমই করেছিলো। তারা সারিবদ্ধভাবে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলো। বার বার উচ্চারণ করে চলেছিলো — শুভ সংবাদ বিশ্বাসীদের জন্য। বিজয় অনিবার্য। এভাবে তারা তাদের কথা ও উপস্থিতির মাধ্যমে বিশ্বাসীদের অন্তরের চঞ্চলতা ও আশংকা দূর করে দিয়েছিলো। তাই সাহাবীগণের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো প্রশান্তি, স্বস্তি এবং নিশ্চিতি। অপরদিকে অবিশ্বাসীদের অন্তরে তারা করেছিলো ভীতির সঞ্চার। তাদের দৃষ্টিতে প্রদর্শন করেছিলো মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য। ফলে অবিশ্বাসীরা দেখতে পাচ্ছিলো মুসলমানদের সেনা সংখ্যা দ্বিগুণ অথবা চতুর্গুণ।

www.eelm.weebly.com

আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আমার পিতা! আমাকে বলুন, বদর যুদ্ধের সময় আপনার মতো দীর্ঘকায় ও বলশালী ব্যক্তিকে আবুল ইয়াসিরের মতো ক্ষীণকায় ব্যক্তি বন্দী করতে পেরেছিলো কি ভাবে! আপনি তো ইচ্ছা করলেই আবুল ইয়াসিরের গলা টিপে ধরতে পারতেন। আমার পিতা বলেছিলেন, প্রিয় পুত্র! এ রকম বোলো না। আমাকে তখন এমন কিছু দেখানো হয়েছিলো, যার ফলে আমি হয়ে পড়েছিলাম ভীত সন্ত্রস্ত।

আমি বলি, আল্লাহ্‌তায়ালা তখন কুরায়েশদের অন্তরে মুসলমানদের ভয় প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। এই ভীতি সৃষ্টি করার কথাই পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে এভাবে —'যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবো।'

এরপর বলা হয়েছে — সুতরাং তাদের স্কন্ধে ও সর্বাংগে আঘাত করো।' এ কথার অর্থ — হে বিশ্বাসীদের সাহায্যে প্রেরিত ফেরেশতারা ! তোমরা আঘাত করো অবিশ্বাসীদের স্কন্ধদেশে, কণ্ঠদেশে এবং মস্তকে। হজরত ইকরামা বলেছেন, 'ফাউকাল আনাক' অর্থ গ্রীবাদেশের উপরে। অর্থাৎ মস্তকে। কেননা গ্রীবাদেশের উপরেই রয়েছে মস্তক। জুহাক বলেছেন, গ্রীবাদেশেই। ফাউকা অর্থ উপর। অর্থাৎ কণ্ঠদেশেই আঘাত করো। 'কুল্লা বানান' অর্থ —সকল সন্ধিস্থলে আঘাত হানো। হজরত ইবনে আব্বাস, জুরাইজ ও জুহাক বলেছেন, 'বানানাতুন' এর বহুবচন 'বানান।' এর অর্থ— হাত ও পায়ের আঙ্গুলের অস্থিসন্ধিতে আঘাত করো। কামুস প্রণেতা বলেন, শব্দটির অর্থ —আঙ্গুলসমূহ। অথবা আঙ্গুলের অগ্রভাগ। আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, তখন সাহায্যকারী ফেরেশতারা কেবল বিশ্বাসীদের অনুপ্রাণিত করা, অবিচলিত রাখা এবং অবিশ্বাসীদের ভীতি সৃষ্টি করার দায়িত্বই পালন করেনি, যুদ্ধেও সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলো। সরাসরি আঘাত হেনে হত্যা করেছিলো অনেক অবিশ্বাসীকে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধের প্রাক্কালে রসুল স. তাঁর নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভরশীল হয়ে সকলকে যুদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেছি। তুমি সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী, ইচ্ছাময়। আর যদি তুমি বিশ্বাসীদেরকে পরাজিত করতে ইচ্ছা করো, তবে এ পৃথিবীতে তোমার দাসত্ব করার আর কেউ থাকবে না। রসুল স. পুনঃ পুনঃ এ রকম বলে চলেছিলেন। এক সময় হজরত আবু বকর তাঁর পবিত্র হস্ত স্পর্শ করে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয় রসুল! যথেষ্ট হয়েছে। এবার আপনি আপনার প্রার্থনা

www.eelm.weebly.com

ও রোদন সমাপ্ত করুন। রসুল স. তাঁর প্রার্থনা সমাপ্ত করলেন। পরিধান করলেন যুদ্ধের পোশাক। তারপর সশরীরে উপস্থিত হলেন রণপ্রান্তরে। রসুল স. এর সেই প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরার আলোচ্য আয়াতগুলো।

মুসলিম ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সেদিন এক মুসলিম এক মুশরিকের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। মুশরিক দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছিলো। মুসলিম যোদ্ধা শুনতে পেলেন, এক অশ্বারোহী যোদ্ধা বলছে, হাইজুম, হাইজুম। একটু পরেই তিনি দেখলেন মুশরিক লোকটি ভূতলশায়ী হয়ে পড়লো। তার নাক কাটা ও চেহারা বিধ্বস্ত। মুসলিম সেনা অন্যদেরকেও ডেকে দেখালেন ঘটনাটি। এক আনসার সাহাবী রসুল স. সকাশে ঘটনাটি জানালেন। রসুল স. বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। একাজ করেছে তৃতীয় আসমানের এক ফেরেশতা। হাকেম, আবু নাঈম ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সহল ইবনে হানিফ বর্ণনা করেছেন, বদরের যুদ্ধে আমাদের কিছু লোক তলোয়ার নিক্ষেপের আগেই দেখতে পাচ্ছিলো মুশরিকেরা ধরাশায়ী হয়ে পড়ছে। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত রবী বিন আনাস বলেছেন, গলদেশে ও অস্থিসন্ধিতে পোড়া দাগ দেখেই বোঝা যেতো তাকে অন্য কেউ হত্যা করেছে।

ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, হুয়াইতাব বিন আবদুল উজ্জা বলেছেন, বদর যুদ্ধে ফেরেশতার আঘাতে নিহত হয়েছিলো অনেক মুশরিক। ফেরেশতারা বন্দীও করেছিলো তাদের অনেককে। আমি স্বচক্ষে এ রকম ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। মোহাম্মদ ওমর আসলামী এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বুরদা বিন দীনার বলেছেন, আমি রসুল স. এর নিকটে হাজির করলাম দেহ বিচ্ছিন্ন তিনটি মস্তক। বললাম, হে আল্লাহর রসুল! এই তিন জনের মধ্যে আমি দু'জনকে হত্যা করে তাদের মস্তক ছেদন করেছি। আরেক জনকে হত্যা করেছে শাদা রঙের এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি। আমি তাকে চিনতে পারিনি। তিনি স. বললেন, সে ছিলো এক ফেরেশতা।

ইবনে সা'দের বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত ইকরামা বলেছেন, ওইদিন কোনো কোনো লোকের মস্তক ছেদন করা হয়েছিলো কিন্তু কেউ বুঝতে পারছিলো না, কারা এ রকম করেছে। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলো কারো কারো হাত। অথচ কেউ অনুমান করতে পারছিলো না, কেনো এ রকম হচ্ছে।

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু ওয়াকেদ লাইসি বর্ণনা করেছেন, আমি এক মুশরিককে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু আমি আঘাত হানার পূর্বেই দেখলাম, মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তার ছিন্ন মস্তক। আমি বুঝতে পারলাম না, কে এ রকম করলো। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত

www.eelm.weebly.com

খারেজা বিন ইব্‌রাহিম বলেছেন, রসুল স. একবার হজরত জিব্‌রাইলকে বললেন, হে ভ্রাতা জিব্‌রাইল! বদর প্রান্তরে আপনি 'আকদাম হাইজুম' বলেছিলেন কাদেরকে লক্ষ্য করে? হজরত জিবরাইল বললেন, বিশ্বাসীদের সাহায্যার্থে আগমনকারী ওই সকল ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে, যাদেরকে আমিও আর কখনো দেখিনি।

ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. কর্তৃক মুক্ত করা ক্রীতদাস হজরত আবু রাফে' বলেছেন, আমি ছিলাম আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের গোলাম। মনে মনে তিনি আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ভিতরে ভিতরে উম্মুল ফজল ও আমিও মুসলমান হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা কেউই গোত্রীয় নেতাদের দাপটে আমাদের ইমানকে প্রকাশ করতে পারিনি। হজরত আব্বাস ছিলেন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁর প্রদত্ত ঋণের অনেক অর্থ আটকে ছিলো মুশরিকদের কাছে। গোত্রীয় লোকদের অসন্তোষ এবং ঋণের অর্থ আদায় অসম্ভব হয়ে পড়বে বলে তিনি তাঁর ইমানকে প্রকাশ করেননি। আর তাই মুশরিকদের বাহিনীতে যোগ দিয়ে তাঁকেও যেতে হয়েছিলো বদর যুদ্ধে। আল্লাহ্‌র দুশমন আবু লাহাব বদর যুদ্ধে যায়নি। সে ছিলো মক্কায়। যুদ্ধে বন্দী হয়ে হজরত আব্বাসকে যেতে হয়েছিলো মদীনায়। কিছুকাল পর রক্তপণ প্রদানের মাধ্যমে তিনি ফিরে এলেন মক্কায়। আমি ছিলাম অসহায় এক ক্রীতদাস। তীর প্রস্তুত করতাম আমি। সেদিনও জমজম কূপের পাশে বসে আমি তীর প্রস্তুত করছিলাম। চেষ্টা করছিলাম তীর চালনা শিখতে। নিকটেই উপবিষ্ট ছিলেন উম্মুল ফজল। কিছুক্ষণ পর সেখানে উপস্থিত হয়ে আবু লাহাবও বসে পড়লো। কেউ কেউ সেখানে বসে ছিলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। তাদের একজন বলে উঠলো, ওই আসছেন আবু সুফিয়ান বিন হারেস বিন আবদুল মুত্তালিব। আবু লাহাব বললো, তাকে আমার কাছে আসতে বলো। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ জানা যাবে তার কাছ থেকে। লোকেরা আবু সুফিয়ানকে বললো, হে পানিওয়ালা! বলো কি খবর? আবু সুফিয়ান বললো, তেমন কিছু নয়। আল্লাহ্‌র কসম! মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের ঘোর যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমরা লাঞ্ছিত ও পরাজিত হয়েছি। তারা আমাদের অনেককে হত্যা করেছে। অনেককে করেছে বন্দী। কিন্তুএটা কোনো বড় ব্যাপার নয়। আমরা বিস্মিত হয়েছি অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখে। সেখানে আমরা দেখেছি শাদা-কালো রঙের অশ্বের উপরে আরোহী কিছু শ্বেত-শুভ্র লোক। আল্লাহ্‌র শপথ! তারা মানুষ নয়। তাদের মোকাবিলা করার সাধ্য কারো নেই। এ কথা শুনে আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, আল্লাহ্‌র কসম! সেগুলো নিশ্চয় ফেরেশতা। আবু লাহাব রেগে গিয়ে আমাকে চপেটাঘাত করলো। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। উম্মুল ফজল তখন একটি লাঠি নিয়ে এসে আবু লাহাবের মস্তকে সজোরে আঘাত করে বললো, এর

www.eelm.weebly.com

মনিব কাছে নেই বলে তুমি একে দুর্বল ভেবেছো। মাথা ফেটে গিয়েছিলো আবু লাহাবের। সে আর বাক্য ব্যয় না করে সেখান থেকে প্রস্থান করলো। এই ঘটনার পর সাত দিন যেতে না যেতেই সে আক্রান্ত হলো আদ্‌ছা নামক এক ব্যাধিতে। ওই ব্যাধিতেই তার মৃত্যু হয়।

ইবনে জারীর বলেছেন, আদ্‌ছা হচ্ছে এক প্রকার ফোঁড়া। আরব দেশে এ রকম ঘৃণ্য ফোঁড়াকে বলা হয় মাখুস। ওই ব্যাধিকে মনে করা হতো একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। তাই আবু লাহাবের মৃত্যুর পরেও তার সন্তান-সন্ততিরা তার কাছে ঘেঁসেনি। দাফন কাফনের কোনো আগ্রহই তাদের ছিলো না। তিন দিন পর দুর্ণামের ভয়ে তারা লাঠির সাহায্যে আবু লাহাবের অপবিত্র মরদেহ উঠিয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করলো একটি গর্তে। তারপর দূর থেকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করতে লাগলো পাথর। এভাবে পাথর চাপা দিয়ে দাফন করা হয়েছিলো তাকে।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, ইউনুস বিন বুকাইরের বর্ণনায় এসেছে, আবু লাহাবের লাশ দাফনের জন্য কোনো কবর খোঁড়া হয়নি। তার মরদেহ জনবসতির বাইরে এক স্থানে রেখে অনেক পাথর নিক্ষেপ করে তাকে দেয়া হয়েছিলো পাথরের কবর।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ১৩, ১৪

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○ ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ

❒ ইহা এই হেতু যে তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করে এবং কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করিলে আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।

❒ সুতরাং ইহার আস্বাদ গ্রহণ কর এবং সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদিগের জন্য অগ্নি শাস্তি রহিয়াছে।

প্রথমে বলা হয়েছে— হেতু এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে। এ কথার অর্থ— বদর যুদ্ধে মক্কার অংশীবাদীদেরকে পরাস্ত করা হয়েছে। তাদের কাউকে করা হয়েছে হত্যা এবং কাউকে বন্দী। এ রকম করার কারণ হচ্ছে, তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ্‌তো শাস্তিদানে কঠোর।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হলে আল্লাহ্‌তায়ালা তাদেরকে শাস্তিদান করবেনই।

'জালিকা অর্থ 'এই'। এ আঘাত বা এ আঘাতের নির্দেশ। সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স. কে। 'বিআন্নাহুম শাক্কু' অর্থ যেহেতু তারা বিদ্রোহ করেছিলো।

www.eelm.weebly.com

মর্মার্থ হচ্ছে— এ আঘাত হানার হেতু, তারা বিদ্রোহ করেছিলো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে। 'শাক্কু' শব্দের ধাতুমূল শিক্ব— অর্থ পার্শ্ব বা পাঁজর। বিদ্রোহী দু'টি দলের একটি অবস্থান করে অপরটির পাশে; তাই বলা হয়েছে এ রকম। 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে তার প্রতিফল কি? — কথাটি রয়েছে অনুক্ত। এর প্রতিফল হচ্ছে, আল্লাহ্পাক তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তি দিবেন। 'ফাইন্নাল্লহা শাদীদুল ইক্বাব' অর্থ আল্লাহ্ অবশ্যই কঠিন শাস্তিদাতা। বাক্যটিতে বিধৃত হয়েছে শাস্তি প্রদানের কারণ। অথবা বলা যায়— বাক্যটিতে ওই শাস্তির হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে, জাগতিক শাস্তির পরে যে শাস্তি তাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে পৃথিবী পরবর্তী জীবনে।

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং এর আস্বাদন গ্রহণ করো এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য অগ্নি-শাস্তি রয়েছে।' এ কথার অর্থ, আখেরাতে অবিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে — 'এবার আস্বাদন গ্রহণ করো লাঞ্ছনা ও শাস্তির। জাহান্নামের আগুন প্রস্তুত রাখা হয়েছে তোমাদের জন্যই। এই জলন্ত হুতাশনে তোমরা দগ্ধ হতে থাকবে চিরকাল।'

'জালিকুম' (তোমাদের এটা) এর পূর্বে জালিকা ব্যবহৃত হয়েছে উত্তম পুরুষে। সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। অতঃপর 'জালিকুম' দ্বারা সম্বোধন ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে কাফেরদের প্রতি। শাক্কু শব্দটি ছিলো উত্তম পুরুষে। আর এখানে বলা হয়েছে 'জালিকুম' মধ্যম পুরুষে। এ কথার অর্থ — তোমাদের এহেন উক্তির প্রতি অধিক আসক্তি অথবা উক্তি দ্বারা সতর্কতার উদ্দেশ্যে উত্তম পুরুষ থেকে সরাসরি মধ্যম পুরুষে সম্বোধন করা হয়েছে।

'ওয়া আন্নালিল কাফিরীনা আজাবান্নার অর্থ — কাফেরদের জন্য রয়েছে নরকের শাস্তি। বাক্যটির সংযোগ রয়েছে 'জালিকুম' এর সাথে। অথবা 'ওয়া আন্না' বাক্যের 'ওয়াও' (এবং) অব্যয়টি সাযুজ্য অর্থে ব্যবহৃত। সেক্ষেত্রে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়, শীঘ্র করে যুদ্ধের মাধ্যমে তোমাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে, তার সাথে ওই শাস্তিরও আস্বাদ গ্রহণ করো যা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে পরকালের জন্য। 'লিল কাফিরীনা' (কাফেরদের জন্য)। এখানে 'লিল কাফিরীনা' কাফেরদের জন্য না বলে 'লাহুম'— 'তাদের জন্য' বলা যেতো। তবে এ রকম বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এক যোগে জাগতিক ও পারলৌকিক শাস্তি একমাত্র কুফরী করার কারণেই ঘটে তা প্রকাশ করা। আর কোনো দুষ্কর্মের কারণে যদি কোনো মুমিন ব্যক্তি পার্থিব বিপদ-আপদগ্রস্ত হয়; তবে সেটা হবে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত। আল্লাহ্ না করুন, পরলোকে তাদের শাস্তি হবে না।

ইমাম বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী একবার বললেন, আমি কি তোমাদের সম্মুখে কোরআন মজীদের ওই মহা মর্যাদামণ্ডিত আয়াতটির কথা উল্লেখ করবো, যা রসুল স. আমাকে জানিয়েছেন? আয়াতটি এই— 'মা আসবাকুম মিম্ মুসিবাতিন ফাবিমা কাসাবাত্ আইদিকুম ওয়া ইয়া'ফুআন কাছীর' অর্থ— তোমাদের উপর আপতিত বিপদ তোমাদেরই অর্জন, যার অধিকাংশই মার্জনা করা হয়। এই আয়াত পাঠের পর রসুল স. আমাকে বলেছিলেন, হে

—৫

www.eelm.weebly.com

আলী! আমি কি তোমাকে এই আয়াতের মর্মার্থটি জানাবো না? এর মর্মার্থ হচ্ছে— তোমাদের কর্মফলের কারণেই পৃথিবীতে তোমাদের উপর নেমে আসে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-আপদ। ওই সকল বিপদ-আপদের মাধ্যমে তোমাদেরকে পাপ মুক্ত করা হয়। আখেরাতে তোমাদেরকে কোনো শাস্তি দেয়া হবে না বলেই এভাবে তোমাদেরকে সংশোধন করে নেয়া হয় পৃথিবীতেই— যদিও সকল ক্ষেত্রে পুণ্যবান-পাপী নির্বিশেষে সকলকে শাস্তিদানের ব্যাপারে তিনি পরিপূর্ণরূপে সক্ষম ও স্বাধীন।

হজরত ইকরামা থেকে তিরমিজি ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক উত্তম আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বদর যুদ্ধ শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! যাত্রা স্থগিত করে এবার কুরায়েশদের বাণিজ্য বাহিনীটির উপর হামলা করা হোক। আমাদের সঙ্গে ছিলো কুরায়েশ যুদ্ধ বন্দীরা। আমার পিতা আব্বাসও ছিলেন তাদের মধ্যে। তিনি বলে উঠলেন, এ রকম করা ঠিক নয়। রসুল স.বললেন, কেনো? হজরত আব্বাস বললেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে দু'টো দলের যে কোনো একটির উপর বিজয় দানের অঙ্গীকার করেছেন। সে অঙ্গীকার তো বাস্তবায়িত হয়েছেই। কুরায়েশ সেনাদলের উপর অর্জিত হয়েছে নিরঙ্কুশ বিজয়। রসুল স.বললেন, হে আমার পিতৃব্য! আপনি ঠিকই বলেছেন।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ১৫, ১৬

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ○ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদিগের সম্মুখীন হইবে তখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না;

❒ সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা স্বীয় দলে স্থান লওয়া ব্যতীত কেহ তাহাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে তো আল্লাহের বিরাগ-ভাজন হইবে এবং তাহার আশ্রয় জাহান্নাম, আর উহা কত নিকৃষ্ট!

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু ইজা লাক্বীতুমুল্ লাজীনা কাফারু যাহ্ফান ফালা তুও য়াল্লু হুমুল আদ্বারা (হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের সম্মুখীন হবে তখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না)। এখানে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে মুখোমুখী যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

পৃষ্ঠ প্রদর্শন বা পলায়ন ও পশ্চাদপসরণকে করা হয়েছে নিষিদ্ধ। নির্দেশনাটির মর্মার্থ হচ্ছে— সম্মুখ যুদ্ধে বিশ্বাসীদেরকে হতে হবে ক্ষিপ্র, আক্রমণপ্রবণ ও অকুতোভয়। এমতোক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন সম্পূর্ণতঃই নিষিদ্ধ। বাগবী এ রকম বলেছেন।

আমি বলি, এখানে উল্লেখিত 'যাহ্ফান' শব্দটির অর্থ প্রতিপক্ষের অতি সন্নিকটবর্তী হওয়া। বা শত্রুর একেবারে সামনে চলে যাওয়া। কথাটি এসেছে 'যাহাফাস্ সবিয়্যু' থেকে। শিশুরা নিতম্বে ভর করে চলতে শেখে, তখন ওই অবস্থাকে বলা হয় যাহাফাস্ সবিয়্যু। 'যাহাফাল্ বায়িরু' থেকেও শব্দটির উৎসারণ ঘটে থাকতে পারে। যাত্রা বিরতির পূর্বক্ষণে উটের ধীর পদবিক্ষেপকে বলা হয় 'যাহাফাল্ বায়িরু।' এখানে 'যাহাফান্' শব্দটির মাধ্যমে এ নির্দেশনাটিই দেয়া হয়েছে যে, শত্রুদলের প্রবল আক্রমণ বীর বিক্রমে প্রতিহত করতে হবে। শব্দটি একটি মূল শব্দ। তাই এর বহুবচনের শব্দরূপ এখানে ব্যবহৃত হয়নি। এ রকম আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'ক্বওমুন্ আদলুন' (ন্যায়-পরায়ণ সম্প্রদায়)। লাইস বলেছেন, 'যাহাফুন্' অর্থ ওই দল যা সম্মিলিতভাবে সামনে ধেয়ে আসে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, শত্রুদের যে অগ্রগামী দল সম্মুখে এগিয়ে আসে তাকে বলা হয় 'যাহ্ফান।' বায়যাবী এই অর্থটিকে গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি তাঁর তাফসীরে লিখেছেন এ রকম — তোমরা যখন বহুসংখ্যক শত্রুর সম্মুখীন হবে তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। অর্থাৎ তোমরা স্বল্পসংখ্যক হলেও অধিক সংখ্যক সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের আক্রমণ প্রতিহত করবেই করবে।

বদর যুদ্ধে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর বিশ্বাসীরা ছিলো সংখ্যালঘু। কিন্তু হুনায়েন যুদ্ধের অবস্থা ছিলো বিপরীত। সেখানে সংখ্যালঘু সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের সংঘবদ্ধ প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে বিক্ষিপ্ত মুসলিম বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিলো। সুতরাং এক্ষেত্রে বায়যাবীর তাফসীর অপেক্ষা বাগবীর তাফসীরটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। অর্থাৎ এখানকার নির্দেশনাটির অর্থ এ রকম নয় যে, শত্রুরা সংখ্যাগুরু হলেই কেবল বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে হবে এবং পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা চলবে না। বরং নির্দেশনাটির যথার্থ উদ্দেশ্য এই যে— শত্রুরা সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু, শক্তিমান, দুর্বল —যাই হোক না কেনো, প্রচণ্ড তেজে তাদেরকে আক্রমণ করতে হবে এবং প্রতিহত করতে হবে। পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা যাবে না। অর্থাৎ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তি, দলের বিরুদ্ধে দল— এভাবেই করতে হবে শত্রুর মোকাবিলা।

মাসআলাঃ অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া কবীরা গোনাহ্। চার ইমামের অভিমতও এ রকম। তবে সকলে এই শর্তটি আরোপ করেছেন যে, শত্রুদের তুলনায় বিশ্বাসীদের সেনাসংখ্যা কমপক্ষে হতে

www.eelm.weebly.com

হবে অর্ধেক। অর্ধেকের কম হলে প্রয়োজনে পশ্চাদপসরণ করা যাবে। কেননা, আল্লাহ্তায়ালা ঘোষণা করেছেন — 'আলআনাখাফ্ফা ফাল্লহু আনকুম ওয়া আলিমা আননা ফিকুম দ্বয়্ফান ফাইঁয়্যাকুম মিন্কুম মিয়াতুন সাবিরাতুঁই ইয়াগ্লিবু মিআতাইনি (এখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে সহজ করে দিলেন এবং জেনে নিলেন তোমাদের কিঞ্চিত দুর্বলতাকে। তোমাদের একশত ধৈর্যাবলম্বনকারী বিজয়ী হবে তাদের দুই শতের উপর)।

আতা বিন রেবাহ্ বলেছেন, উল্লেখিত আয়াতটি রহিত করে দেয়া হয়েছে এই আয়াতের মাধ্যমে— লা তুওয়াল্লুহুমুল আদবারা (তোমরা তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কোরো না)।

হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনাতেও এ রকম কথা এসেছে। তিনি বলেছেন, রসুল স. আমাকে একটি মুজাহিদ দলের সঙ্গে প্রেরণ করলেন। ওই দলটি শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই মদীনায় ফিরে এসে আমরা চুপচাপ রইলাম। আমরা সকলে মর্মপীড়া অনুভব করতে লাগলাম এই ভেবে যে, আমরা রসুল স.এর নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করেছি। তাই আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে আমরা রসুল স. এর নিকটে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে। পুনঃ আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। বর্ণনাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— রণকৌশলের কারণে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ বা পলায়ন সিদ্ধ। প্রতারণামূলক পলায়নও অসিদ্ধ নয়। তবে পুনঃ আক্রমণের সুযোগ সন্ধান করতে হবে। আমার অবস্থান স্থল তোমাদের মূল কেন্দ্র। তাই মুজাহিদেরা অনর্থক জীবন দানের পরিবর্তে আমার নিকটে ফিরে আসে। তিরমিজি, আবু দাউদ। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম।

মোহাম্মদ বিন সিরিনের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু উবায়দার শাহাদাতের সংবাদ জানতে পেরে হজরত ওমর বলেছিলেন, যদি তিনি আমাদের দিকে ফিরে আসতেন, তবে পেয়ে যেতেন আশ্রয়ের কেন্দ্র। আমি এখন সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা। তাই আমিই এখন সকলের আশ্রয়স্থল।

উপরে বর্ণিত হাদিস দু'টোর নির্দেশনা ওই অবস্থার প্রতি প্রযোজ্য হবে, যখন মুসলমানদের সেনাসংখ্যা কাফেরদের সেনাসংখ্যার তুলনায় হবে অর্ধেকের কম। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে ব্যক্তি তিন জন শত্রুর মোকাবিলা করার চেয়ে পলায়নকে শ্রেয়ঃ মনে করবে তাকে পলাতক বলা যাবে না। কিন্তু ওই ব্যক্তি অবশ্যই পলাতক, যে দু'জন শত্রুর মোকাবিলা না করে পালিয়ে আসে। কেউ কেউ এই হাদিসের আলোকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়নকে সিদ্ধ বলেছেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতের পৃষ্ঠ-প্রদর্শন না করার নির্দেশটি বিশেষভাবে বদর যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। বদর প্রান্তরে রসুল স. স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তাই তাঁর উপস্থিতিতে পলায়ন বা পশ্চাদপসরণকে করা হয়েছিলো নিষিদ্ধ। তখন মুসলমানদের জন্য দ্বিতীয় কোনো আশ্রয়স্থল ছিলো না। সুতরাং তাঁরা পালাবেন কোথায়? পরবর্তী সময়ের অবস্থা কিন্তু এ রকম ছিলো না। তখন অস্তিত্ব বিপন্ন হলে মুসলমানেরা লাভ করতেন একে অন্যের আশ্রয়। তাই পরবর্তী সময়ের কোনো যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য যদি কেউ পালিয়ে যায়, তবে তাকে কবীরা গোনাহ্কারী বলা যাবে না। হাসান, কাতাদা এবং জুহাকও এ রকম অভিমত পোষণ করেন।

ইয়াজিদ বিন আবী হাবিব বলেছেন, বদরের যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়নকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্পাক স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, তারা হবে জাহান্নামী। পরে উহুদ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে প্রাণ ভয়ে পলায়নকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে— 'ইন্নামাস তাজাল্লা হুমুশ্ শাইতানু বিবা'দি মা কাছাবু ওয়া লাক্বদ আফাল্লহু আন্হুম' (নিশ্চয় শয়তান কিছু সংখ্যকের পদস্খলন ঘটিয়েছিলো, যা ছিলো তাদেরই অর্জন। আর আল্লাহ্ তাদের মার্জনা করেছেন)। আর হুনাইন যুদ্ধ থেকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শনকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত— 'ছুম্মা ওয়াল্লাইতুম্ মুদবিরিনা ছুম্মা ইয়াতুবুল্লহু মিম্ বা'দি জালিকা আ'লা মাই ইয়াশাউ' (অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছিলে। অনন্তর আল্লাহ্ পরবর্তীতে যাকে ইচ্ছা তার তওবা কবুল করেন)।

আমি বলি, ইয়াজিদ বিন আবী হাবিবের উপরোক্ত বক্তব্যটি ঐকমত্য বিরোধী। তিনি উহুদ এবং হুনায়েন যুদ্ধ সম্পর্কে যে আয়াত দু'টোর উল্লেখ করেছেন, সে দু'টোর প্রথমটিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, শয়তানের প্রলোভনের কারণে তখন তীরন্দাজ বাহিনী তাদের অবস্থান থেকে সরে গিয়েছিলো। আল্লাহ্তায়ালা তাঁদের সে ভুল ক্ষমাও করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে, তোমরা যারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছিলে, তারা তওবা করলে আল্লাহ্তায়ালা তা কবুল করবেন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ যাকে ক্ষমা করেন, তার কোনো গোনাহ্ আর অবশিষ্ট থাকে না। রসুল স. যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়নের কারণ হিসেবে সাতটি ক্ষতিকর ও মনোমুগ্ধকর বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম এবং হজরত সাফওয়ান বিন আস্সাল থেকে সুনান প্রণেতাবৃন্দ। সুরা নিসার 'ইনতাজতানিবু কাবাইরা মা তুনহাওনা আনহু নুকাফ্ফির আনকুম সায়্যিআতিকুম'— আয়াতের তাফসীরে এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে—'সেই দিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান গ্রহণ ব্যতীত কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সেতো আল্লাহ্র বিরাগ ভাজন হবে এবং তার আশ্রয় হবে জাহান্নাম, আর তা কতো নিকৃষ্ট।' আলোচ্য আয়াতটি বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের নির্দেশনাটি একটি

www.eelm.weebly.com

সাধারণ নির্দেশনা। আয়াতের মমার্থ হচ্ছে— যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বনের নিমিত্তে পলায়ন, আত্মগোপন অথবা পশ্চাদপসরণ করা যাবে। অথবা আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে আপন শিবিরে। এ রকম অবস্থায় পুনঃ আক্রমণের সুযোগ খুঁজতে হবে। পুনঃ শক্তি সঞ্চয় করে কিংবা পুনঃ কৌশল নির্ধারণ করে পরাস্ত করতে হবে দুশমনদেরকে।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, বদর যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে কেউ কেউ বলাবলি করছিলেন আমি ওমুক কাফেরকে হত্যা করেছি, কেউ কেউ বলছিলেন আমি বধ করেছি অমুককে। এ সকল কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ১৭, ১৮

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ○

❑ তোমরা তাহাদিগকে বধ কর নাই, আল্লাহ্‌ই তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন, এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহ্‌ই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং ইহা বিশ্বাসীগণকে উত্তম পুরস্কার দান করিবার জন্য, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❑ এই ভাবে আল্লাহ্ সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদিগের ষড়যন্ত্র দুর্বল করেন।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটির মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীবৃন্দ! বিজয়ের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব অনুধাবন করো। জয়লাভের কৃতিত্বকে নিজেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোরো না। বিজয়ের কৃতিত্ব কেবল আল্লাহ্‌র। তিনি তোমাদের হৃদয় থেকে চাঞ্চল্য ও ভীতি অপসারিত করে দিয়েছেন। শত্রুসেনাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন তোমাদের প্রতাপ ও প্রভাব। আর তোমাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছেন যোদ্ধা ফেরেশ্‌তাদেরকে। তিনি এ রকম করেছেন বলেই তোমরা ছিনিয়ে নিতে পেরেছো বিজয়ের মুকুট। তোমরা তো মাধ্যম মাত্র। আমিই তোমাদের নিয়ন্ত্রক, পরিচালক ও বিজয়দাতা। সুতরাং প্রকাশ্যতঃ তোমরা শত্রু বধকারী হলেও মূলতঃ তোমাদের শত্রুদেরকে বধ করেছি আমিই। আর হে আমার প্রিয় রসুল! আপনিও শুনুন (যদিও আপনি বিজয়ের কৃতিত্বের দাবিদার নন) শত্রুদলের উদ্দেশ্যে যে মৃত্তিকা আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন, সেগুলোকে শত্রুদের চোখ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি আমি। সে কারণে তো তারা হয়ে পড়েছিলো অপ্রস্তুত, দিক-বিদিক জ্ঞান

www.eelm.weebly.com

শূন্য এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সুতরাং প্রকাশ্যতঃ আপনি মৃত্তিকা নিক্ষেপকারী হলেও প্রকৃত নিক্ষেপকারী আমি। তাই বিজয়ের নিরঙ্কুশ কৃতিত্ব ও গৌরব কেবলই আমার। এটা হচ্ছে আমার পক্ষ থেকে বিশ্বাসীদেরকে প্রদত্ত উত্তম পুরস্কার। এভাবেই আমি বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকে পুরস্কৃত করি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌-তায়ালা সকল কিছু শোনেন এবং সকল বিষয় জানেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও বায়হাকী এবং হজরত আবদুল্লাহ্‌ বিন ছা'লাবা বিন সফির থেকে উমুবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্‌! আজ এই বদর প্রান্তরে তুমি যদি বিশ্বাসীদের এই ক্ষুদ্র দলটিকে ধ্বংস করে দাও, তবে ভূ-পৃষ্ঠে তোমার ইবাদতকারী বলে আর কেউ থাকবে না। প্রার্থনা শেষ হলো। অবতীর্ণ হলেন হজরত জিবরাইল। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি এক মুঠো মাটি নিয়ে শত্রুদের প্রতি ছুঁড়ে মারুন। রসুল স. তাই করলেন। ওই মাটি নিক্ষিপ্ত হলো সকল শত্রুর চোখে, নাকে ও মুখে। ফলে তারা হয়ে পড়লো দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য। কিছুক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে টিকে থাকার চেষ্টা করলেও পলায়ন ছাড়া তাদের আর কোনো গত্যন্তর রইলো না। রসুল স. সাহাবীগণকে তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিলেন, আক্রমণ করো। আক্রমণ করো। শুরু হলো প্রচণ্ড আক্রমণ। একে একে নিহত হতে শুরু করলো কুরায়েশ নেতারা। কেউ কেউ হয়ে গেলো বন্দী। তখন অবতীর্ণ হলো এ আয়াত।

বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী এবং আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত আলীকে বললেন, আমাকে এক মুঠো কংকর দাও। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলী কংকর এনে দিলেন। রসুল স. সেগুলোকে মুষ্টিবদ্ধ করে কাফেরদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। ফলে তাদের মধ্যে এমন কেউই অবশিষ্ট রইলো না, যাদের চোখে কংকর নিক্ষিপ্ত হয়নি।

আবু শায়েখ, আবু নাঈম এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের বলেছেন, বদর যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে আমি শুনতে পেলাম আকাশ থেকে কংকর পতনের আওয়াজ। মনে হচ্ছিলো সেগুলো যেনো কোনো থালার উপর পতিত হচ্ছে। যখন দুশমনেরা কাতার বদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো, তখন রসুল পাক স. তাদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন এক মুঠো কাঁকর। মুহূর্তের মধ্যে শত্রুরা বিশৃংখল হয়ে পড়লো। পলায়নপ্রবণতা শুরু হয়ে গেলো তাদের মধ্যে।

হজরত ইবনে জায়েদের বর্ণনা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, রসুলুল্লাহ্‌ স. সেদিন তিনটি কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন। একটি শত্রুসেনাদের মধ্যভাগে, একটি দক্ষিণভাগে এবং একটি বামভাগে। প্রতিটি নিক্ষেপের সময় তিনি স. উচ্চারণ করেছিলেন 'শাহাতিল উজুহু'। এইভাবে প্রস্তর নিক্ষেপের ফলে শোচনীয়রূপে পরাজয় বরণ করেছিলো দুশমনেরা।

www.eelm.weebly.com

হজরত মোহাম্মদ বিন আমর আসলামী বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. এক মুঠো কাঁকর নিয়ে মুশরিকদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, 'শাহাতিল উজুহু আল্লাহুম্মারইব কুলুবাহুম ওয়া জালযিল আক্বদামাহুম'। পরিবর্তিত হয়ে গেলো তাঁর মুখ-মণ্ডলের রঙ। তিনি স. দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্! ওদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করো। তাদেরকে পদস্খলিত করে দাও। এরপর দেখা গেলো শত্রুরা দিশেহারা হয়ে পালাতে চেষ্টা করছে। তখন ওই ভীত সন্ত্রস্ত মুশরিক-দেরকে হত্যা করতে শুরু করলেন মুসলিম সেনারা। বন্দী করলেন অনেককে। তাদের সকলের চোখে মুখে লেগে ছিলো মাটি ও কাঁকর। যারা পালিয়ে যাচ্ছিলো তাদের কাউকে কাউকে হত্যা করে ফেললো ফেরেশতারা।

হজরত হাকিম বিন হাজ্জাম থেকে উত্তম সূত্রপরম্পরায় ইবনে হাতেম ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে আমি শুনতে পেলাম কংকর পতনের শব্দ। মনে হচ্ছিলো যেনো কোনো থালায় পতিত হচ্ছে অজস্র পাথর কণা। রসুল স. সেই পাথর হাতে নিয়ে 'শাহাতিল উজুহু' বলে নিক্ষেপ করলেন শত্রু সৈন্যদের দিকে। ওই প্রস্তর নিক্ষেপের ফলেই সেদিন বিজয় লাভ করেছিলাম আমরা।

হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের সূত্রে হজরত মুসাইয়্যেব বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন উবাই বিন খালফ রসুল স. এর দিকে অগ্রসর হলো । তাকে প্রতিহত করতে এগিয়ে গেলেন হজরত মাসয়াব বিন উমায়ের। উবাইয়ের যুদ্ধের পোশাকের এক স্থানে ছিলো ছেঁড়া। ওই ছেঁড়া অংশ দিয়ে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো তার গলার নিচের হাড়। রসুল স. একটি ছোট বর্শা নিক্ষেপ করলেন উবাইয়ের প্রতি। বর্ষাটি গিয়ে লাগলো তার ওই গলার হাড়ে। সামান্য জখম হলো সেখানে। কোনো রক্তপাতও হলো না। কিন্তু ওই টুকুর যন্ত্রণায় সে ষাঁড়ের মতো চিৎকার শুরু করে দিলো। সাথীরা বললো, সামান্য একটু চামড়া ছিলে গিয়েছে তোমার। অথচ যন্ত্রণায় তুমি ডুকরে ডুকরে উঠছো কেনো? সে বললো, মোহাম্মদের রোষ তো আমি সহ্য করতে পারছি না। সে আমাকে হত্যা করতে চায়। জখম সামান্য হলেও এতে রয়েছে মোহাম্মদের ক্রোধতপ্ত দৃষ্টি। সেই ক্রোধের আগুনে দগ্ধিভূত হচ্ছি আমি। জখম তো নিমিত্ত মাত্র। আল্লাহ্র কসম! জুলমাজায মেলায় সমবেত সকলকে যদি এই জখমটুকু ভাগ করে দেয়া হয় তবে সকলেই নির্ঘাত মৃত্যুবরণ করবে (জুলমাজাযে সুবৃহৎ মেলা বসতো ওকাজের মেলার পর)। যুদ্ধ শেষে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পথে মৃত্যু ঘটেছিলো উবাইয়ের। তখন অবতীর্ণ হয়েছে— এই বর্শা তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করোনি, আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন। এই হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ, কিন্তু বর্ণনাটি বিরল।

www.eelm.weebly.com

আবদুর রহমান ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, খায়বর যুদ্ধে রসুল স. একজনের কাছ থেকে তীর ও ধনুক চেয়ে নিলেন। তীর নিক্ষেপ করলেন দূর্গের দিকে। ওই তীরের আঘাতে মৃত্যু মুখে পতিত হলো ইবনে আবিল হাকিক্ বুস্তার। সে ছিলো শায়িত। 'তুমি যখন নিক্ষেপ করছিলে.............'এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে তখন। হাদিসটি মুরসাল এবং বলিষ্ঠ, কিন্তু দুর্লভ।

উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, জেহাদ হচ্ছে বিশ্বাসীদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্পাকের এক বিশেষ উপহার। এই জেহাদের মাধ্যমেই বিশ্বাসীরা লাভ করে থাকেন বিজয়, গণিমত এবং সম্মান। এতে করে তাদের বিশ্বাসও হয়ে ওঠে অধিকতর বলিষ্ঠ ও প্রোজ্জ্বল। এছাড়া জেহাদে রয়েছে শাহাদাত লাভের অনন্যসাধারণ সুযোগ। আরো রয়েছে সওয়াব, জান্নাত এবং আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য।

আমি বলি, প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল্লাহ্পাক তো ফেরেশতাদের সাহায্য ছাড়াই বিশ্বাসীদেরকে বিজয়ী করতে পারতেন। তাছাড়া কাফেরদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য একজন ফেরেশতাই তো যথেষ্ট ছিলো। কোরআন মজীদের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, অতীতের এক অবাধ্য উম্মতকে একজন ফেরেশতার হুংকারের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। তাহলে এখানে হাজার হাজার ফেরেশতার প্রয়োজন পড়লো কেনো? এ সকল প্রশ্নের উত্তর রয়েছে এই আয়াতের শেষে উল্লেখিত এই কথাটির মধ্যে— 'এবং এটা বিশ্বাসীগণকে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য। কথাটির মর্মার্থ এ রকম— বদর যুদ্ধে আমি বিশ্বাসীদেরকে বিভিন্নভাবে পুরস্কার লাভের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। দিয়েছি বিজয়, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও সম্মান। যুদ্ধ ছাড়াও আমি অবিশ্বাসীদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারতাম। একজন ফেরেশতার মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতাম তাদেরকে। সে রকম করলে বিশ্বাসীরা পুরস্কার লাভ করতো কীভাবে। আর সকল অবিশ্বাসীকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে ফেললে তাদের অনেকে পরবর্তী সময়ে কীভাবে পেতো ইসলাম গ্রহণের সুযোগ। বিশ্বাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধিও তো বিশ্বাসীদের জন্য একটি অনন্য উপহার। তাই তাদের অনেককে বাঁচিয়ে রাখা হলো বন্দীরূপে অথবা অন্য কোনোভাবে। বিশ্বাসীরাও পেলো বিজয়ীর সম্মান। আবার বিশ্বাসীদের মধ্যেও কাউকে কাউকে দেয়া হলো শাহাদাতের মর্যাদা। শহীদেরা পেলো শাহাদাতের সওয়াব এবং আল্লাহ্তায়ালার একান্ত সন্নিধান। গাজীরাও পেলো আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষ, জেহাদের সওয়াব এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফেরেশতারাও লাভ করলো এক বিরল সৌভাগ্য।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ফযীলত

হজরত রেফাআ বিন রাফে' জরকী থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত জিবরাইল রসুল স.কে বললেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? রসুল স. বললেন, তারা অন্য সকল মুসলমানের চেয়ে উত্তম। অথবা তিনি স. উচ্চারণ করলেন এ রকমই কোনো একটি উক্তি। হজরত

www.eelm.weebly.com

জিবরাইল বললেন, যথার্থ বলেছেন আপনি। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফেরেশতারাও অন্য ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম। হজরত রাফে' বিন খাদিজ থেকে আহমদ, ইবনে মাজাও এ রকম হাদিস উল্লেখ করেছেন। মুসলিমের পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ সূত্রে আহমদ হজরত জাবের থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা বদরে ও হুদাইবিয়ায় অংশ গ্রহণ করেছে, তাঁরা কখনোই দোজখে প্রবেশ করবে না। বলিষ্ঠ সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আহলে বদর সম্পর্কে জানিয়েছেন, তোমরা যা ইচ্ছে করতে পারো— আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় রয়েছে, জননী হাফসা বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে ঘোষণা করতে শুনেছি, যারা বদর ও হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিলো, ইনশাআল্লাহ্‌ তাঁরা কখনো জাহান্নামে যাবে না। ঘোষণাটি শুনে আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আল্লাহ্‌তায়ালা কি এরশাদ করেননি— 'ওয়া ইম্‌ মিন্‌কুম ইল্লা ওয়ারিদুহা' (তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে দোজখে পতিত হবে না)। তিনি স.বললেন, তুমি কি আল্লাহ্‌তায়ালার এই ঘোষণাটি শ্রবণ করোনি— 'ছুম্মা নুনাজজিয়াল্লাজিনা ত্তাকাউ ওয়ানাযারুজ্‌ জলিমীনা ফিহা জিছিয়্যা'(অতঃপর যারা সংযমী তাদেরকে আমি রক্ষা করেছিলাম। আর অত্যাচারীদেরকে সেখানে পরিত্যাগ করেছিলাম অধোমুখী অবস্থায়)।

হজরত জাবেরের মাধ্যমে মুসলিম ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার হজরত আবদুল্লাহ্‌ বিন হাতেব তাঁর পিতা হজরত হাতেবের বিরুদ্ধে রসুল স. এর দরবারে অনুযোগ উত্থাপন করলেন। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার পিতা হাতেব অশিষ্ট। তাঁর দোজখ গমন নিশ্চিত। তিনি স. বললেন, ভুল বলেছো তুমি। হাতেব কখনো দোজখে যাবে না। কারণ, সে বদরে এবং হুদাইবিয়ায় অংশ গ্রহণ করেছিলো। হজরত আলীর মাধ্যমে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত হাতেব বিন আবী বালতা একবার মুসলমানদের গোপন সিদ্ধান্তের সংবাদ উল্লেখ করে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন মক্কায় অবস্থিত তাঁর নিকটাত্মীয়দের উদ্দেশ্যে। রসুল স. তা জানতে পেরে হজরত আলীকে পাঠিয়ে পথিমধ্যেই আটক করিয়েছিলেন পত্রবাহককে। হজরত আলী পত্রটি ছিনিয়ে এনেছিলেন। তখন হজরত ওমর বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অনুমতি প্রদান করুন, আমি হাতেবের মস্তক ছেদন করি। রসুল স. বলেছিলেন, সে কি বদরে অংশ গ্রহণ করেনি? আল্লাহ্‌পাকতো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে লক্ষ্য করে জানিয়েই দিয়েছেন, তোমরা যা ইচ্ছে করো, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি। আরো জানিয়েছেন, তোমাদের জন্য জান্নাত অনিবার্য। এ বিষয়ের হাদিসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে সুরা ফাতাহ্‌ এবং সুরা মুমতাহিনার তাফসীরে।

হজরত আনাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধে শহীদ হলেন হজরত হারেসা বিন জায়েদ। তাঁর মা রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি তো জানেন হারেসা আমার কতো প্রিয়। সে

www.eelm.weebly.com

যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি ধৈর্য ধারণ করবো এবং সওয়াবের আশা করবো। আর যদি তা না হয় তবে আমি কী করবো তা বলে দিন। রসুল স. বললেন, জান্নাত তো একটি নয়— অনেক। আর তোমার পুত্রের জন্য নির্ধারিত হয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস। অন্য দু'টো বর্ণনায় এসেছে, তোমার ছেলে রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউসের সর্বোচ্চ স্তরে। হজরত হারেসা কিন্তু যুদ্ধরত অবস্থায় শহীদ হননি। তিনি তখন দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওই সময় শত্রুর একটি তীর তাঁকে বিদ্ধ করে। ফলে তিনি শহীদ হয়ে যান। এভাবে শহীদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি লাভ করবেন শ্রেষ্ঠ জান্নাত— যার নাম জান্নাতুল ফেরদাউস। জান্নাতের সকল স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয়েছে ওই জান্নাত থেকেই। এতে করে অনুমান করা যায় বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ফযীলত কতো বেশী। আর যারা শত্রুর সঙ্গে জীবন-পণ লড়াই করে গাজী অথবা শহীদ হয়েছেন তাদের ফযীলত আরো কতো বেশী।

'তোমরা যা খুশী করতে পারো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— বদর যোদ্ধাদের জন্য সকল কিছু বৈধ। কিন্তু এ রকম ধারণা শরিয়তের রীতি-নীতির পরিপন্থী। তাই কোনো কোনো আলেম বলেছেন, উল্লেখিত শুভ সংবাদটির অর্থ হবে এ রকম— বদর যুদ্ধের পূর্বে তোমরা যতো পাপই করে থাকো না কেনো, সে সকল প্যপ আল্লাহ্তায়ালা ক্ষমা করে দিয়েছেন। এই ধারণাটিও ঠিক নয়। কারণ বদর যোদ্ধা হজরত হাতেব বিন বালতার গোপন চিঠি প্রেরণের ঘটনাটি ঘটেছিলো বদর যুদ্ধের ছয় বছর পর। হজরত ওমর তখন তাঁকে কতল করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু রসুল স. বলেছিলেন, সে তো বদর যোদ্ধা। আল্লাহ্পাক বদর যোদ্ধাদের সম্পর্কে বলেছেন— তোমরা যা খুশী করতে পারো, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এই ঘটনাটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য শুভ সংবাদটির মর্মার্থ হবে— পূর্বাপর সকল অপরাধ মার্জনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব সময়ের সকল অপরাধ তো মার্জনা করা হয়েছেই, উপরন্তু মার্জনা করে দেয়া হবে তাদের ভবিষ্যতের সকল অপরাধ (যদি কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়)। ।

দ্রষ্টব্যঃ বর্ণিত শুভ সংবাদটির প্রকৃত অর্থ এই— আখেরাতে বদর যোদ্ধাদেরকে পূর্বাপর কোনো অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হবে না। কিন্তু শরিয়ত বিগর্হিত কোনো কাজের জন্য পৃথিবীতে তাঁরা অব্যাহতি পাবেন— এ রকম কথা সুসংবাদটির অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, পৃথিবীর জীবন শরিয়তের বিধানের আওতায়। আর এই বিধান সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা সর্বশ্রোতা বলেই তিনি তোমাদের সকল প্রার্থনা ও আবেদন নিবেদন শ্রবণ করেন। আর সর্বজ্ঞ বলেই জানেন সকলের অন্তরের নিয়ত।

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'এভাবে আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করেন'। আলোচ্য বাক্যটি একটি অনুক্ত উদ্দেশ্যের বিধেয়। ওই

www.eelm.weebly.com

অনুক্ত উদ্দেশ্যটিসহ পূর্ণ বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— আল্লাহ্তায়ালা চেয়েছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ষড়যন্ত্র অকার্যকর করতে। তাই তিনি এভাবে যুদ্ধের আয়োজন করে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের দূরভিসন্ধি ও অপচেষ্টা অকার্যকর করে দিয়েছেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ছা'লাবা থেকে মোহাম্মদ বিন ইসহাক ও আহম্মদ এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধ শুরুর পূর্বে যখন দুই পক্ষের সেনাবাহিনী কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো, তখন আবু জেহেল বললো, হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে যে দল আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করেছে এবং আমাদের মধ্যে যে দল নিকৃষ্ট, সেই দলকে তুমি ধ্বংস করে দাও। তার একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ১৯

إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ○

❒ তোমরা সত্যের জয় চাহিয়াছিলে, তাহা তো তোমাদিগের নিকট আসিয়াছে; যদি তোমরা বিরত হও তবে উহা তোমাদিগের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা পুনরায় কর, তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দিব এবং তোমাদিগের দল সংখ্যায় অধিক হইলেও তোমাদিগের কোন কাজে আসিবে না, এবং আল্লাহ্ বিশ্বাসীদিগের সহিত রহিয়াছেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা সত্যের জয় চেয়েছিলে।' উল্লেখ্য যে, এই বিজয় কামনাই ছিলো আল্লাহ্তায়ালার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। এর প্রেক্ষিতের পরক্ষণই তাই আল্লাহ্তায়ালা জানিয়েছেন 'তা তো তোমাদের নিকট এসেছে' (তোমাদের মনোস্কামনা পূর্ণ করা হয়েছে)।

হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ বর্ণনা করেছেন, আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে দেখলাম আমার দু'পাশের দুই সহযোদ্ধাই কিশোর। কিছুটা আশাহত হলাম আমি। ভাবলাম, পূর্ণ যুবক অথবা বয়স্ক যোদ্ধা আমার পাশে থাকলে কতইনা উত্তম হতো। হঠাৎ ডান পাশের কিশোরটি এগিয়ে এসে বললো, হে পিতৃব্য! আপনি কি আবু জেহেলকে চেনেন? আমি বললাম হ্যাঁ। কিন্তু তুমি তার কথা জিজ্ঞেস করছো কেনো? সে বললো, সে নাকি আল্লাহ্র রসুলকে মন্দ বলে।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌র কসম! তার সঙ্গেই বুঝাপড়া করতে চাই আমি। হয় সে মরবে। না হয় আমি। বাম পাশের কিশোরটি এগিয়ে এসে একই কথা বললো আমাকে। আমি বিস্মিত হলাম। এমন সময় বীর দর্পে সম্মুখে এগিয়ে এলো আবু জেহেল। এই কবিতাটি আওড়াচ্ছিলো সে— মা তানকিমুল হারবুল আওয়ানু মিন্নি বাজিলু আম্মাইনি হাদিদু মিন্নী (বর্ষনাসিক্ত রণভূমি আমার নিকট থেকে কি প্রতিশোধ গ্রহণ করবে? ফেঁসে গেছে আমার নবজীবনের দু'টি বছর)। আমি কিশোরদ্বয়কে বললাম, ওই দেখো, ওই লোকটিই আবু জেহেল। আমার কথা শোনা মাত্র তারা দু'জনেই তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো আবু জেহেলের উপর এবং তাকে হত্যাও করে ফেললো অল্পক্ষণের মধ্যে। তারপর ছুটে এসে রসুল স.কে একথা জানালো। কিশোরদ্বয়ের নাম মুয়াজ বিন আমর বিন জামুহ্ এবং মুয়াওবিজ বিন আফরা। রসুল স. আবু জেহেলের যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের পোশাক ওই কিশোরদ্বয়কেই দান করে দিলেন।

হজরত আনাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ একজন সংবাদ নিয়ে এসো আবু জেহেল এখন কোথায় এবং কী অবস্থায় আছে? হাকেমের বর্ণনা অনুসারে আজ্ঞা পালনার্থে অগ্রসর হলেন হজরত ইবনে মাসউদ। ঘটনা স্থলে গিয়ে তিনি দেখলেন, আফরার দুই পুত্র আবু জেহেলকে ধরাশায়ী করে ফেলেছে। কিন্তু গুরুতর আহত আবু জেহেল তখনো মরেনি। হজরত ইবনে মাসউদ তার দাড়ি ধরে বললেন, কী ব্যাপার আবু জেহেল! (খুব তো অহংকার করেছিলে)। আবু জেহেল বললো, যারা স্বসম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের দ্বারা হত্যা করায় (কুরায়েশকে হত্যা করায় অকুরায়েশ দ্বারা), তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট আর কে?

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আবু উবায়দা বিন আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেছেন, বদরের যুদ্ধে তলোয়ারের আঘাতে হাঁটু ভেঙে গিয়েছিলো আবু জেহেলের। ফলে ভূতলশায়ী হয়ে পড়েছিলো সে। তখন তার তলোয়ার দিয়েই আমি তাকে হত্যা করে ফেলি। রসুল স. ওই তলোয়ারটি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, বর্ণনাটি একটি বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপরীত। ওই বর্ণনায় এসেছে রসুল স. আবু জেহেলের যুদ্ধ সরঞ্জামগুলো দান করেছিলেন আফরার দুই পুত্রকে।

উপরে বর্ণিত হাদিস দু'টোর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনার্থে এ রকম বলা যেতে পারে যে, রসুল স. হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদকে দান করেছিলেন কেবল তলোয়ারটি। আর আফরার পুত্রদ্বয়কে দান করেছিলেন অপর সরঞ্জামগুলো।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুয়াজ বিন আমর বিন জামুহ্ বলেছেন, যুদ্ধের শেষ দিকে রসুল স. আবু জেহেলের লাশ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিলেন এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদন জানালেন, আয় আল্লাহ্! তোমার প্রতি

www.eelm.weebly.com

অশেষ কৃতজ্ঞতা, সে তোমার আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারেনি। একথা শুনে আমি খুঁজতে খুঁজতে আবু জেহেলের নিকট পৌঁছলাম। সে তখন মরণোন্মুখ। আমার তলোয়ারের আঘাতে সাঙ্গ হলো তার জীবন লীলা। তার ছিন্ন ভিন্ন শরীর থেকে কেটে আলাদা হয়ে পড়লো পায়ের নিম্নাংশ। তখন আবু জেহেলের পুত্র ছুটে এসে তলোয়ার চালালো আমার উপর। কেটে গেলো আমার বাহুমূল। কেবল চামড়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ঝুলতে থাকলো আমার হাতটি। ওই ঝুলন্ত হাত নিয়েই আমি বীর বিক্রমে যুদ্ধ করলাম। একটি হাত দিয়েই করতে থাকলাম শত্রুর মোকাবিলা। ঝুলন্ত হাতটির কারণে অসুবিধা হচ্ছিলো খুব। তাই পায়ের নিচে চেপে ধরে একটানে শরীর থেকে আলাদা করে ফেললাম হাতটিকে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আরো এসেছে, ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের খেলাফতের সময় পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন হজরত মুয়াজ। কাযী আয়ায তাঁর 'আল উয়ুন' গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনে ওয়াহাবের বর্ণনায় বলা হয়েছে, যুদ্ধ শেষে হজরত মুয়াজ তাঁর কর্তিত হাতটি নিয়ে রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলেন। রসুল স. তাঁর পবিত্র মুখের লালা দিয়ে হাতটি জোড়া লাগিয়ে দিলেন। এই বর্ণনাটি কাযী আয়ায তাঁর 'আশ্‌শিফা' গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, আবু জেহেল উপুড় হয়ে পড়েছিলো। তার এ রকম শোচনীয় অবস্থা হয়েছিলো হজরত মুয়াজ বিন আফরার অস্ত্রাঘাতে। এরপর হজরত মুয়াজ শহীদ হন। একটু পরে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ সেখানে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, প্রায় নিঃসাড় আবু জেহেল উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তখনও মরেনি। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি তখন তার গর্দানের উপর পা রেখে বললাম, রে আল্লাহ্‌র দুশমন! আল্লাহ্ তোকে লাঞ্ছিত করেছেন। সে বলে উঠলো, কীভাবে লাঞ্ছিত করলেন? তুই যাকে হত্যা করেছিস, তার চেয়ে অধিক মর্যাদা লাভ করেছে কে? (সে তো নিহত হতে চলেছে স্বগোত্রের অস্ত্রাঘাতে)। এবার বল্, যুদ্ধে জয়লাভ হলো কার? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ উল্লেখ করেছেন, আবু জেহেল আমাকে বললো, ওহে ছাগলের রাখাল, বড়ই দুঃসাহস তোর। তুই তো আরোহণ করেছিস পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গে (আমার বক্ষদেশ তো সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গের মতো)। আমি তখন তার মস্তক ছেদন করে রসুল স. এর খেদমতে হাজির করলাম। বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এই দেখুন আল্লাহ্‌র দুশমন আবু জেহেলের মস্তক। তিনি স. বলে উঠলেন, সেই সত্তাই পবিত্রাতিপবিত্র! তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি বললাম, হ্যাঁ, সেই পবিত্রাতিপবিত্র সত্তার কসম! তিনিই একমাত্র এবং একক মাবুদ।

www.eelm.weebly.com

অপর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সেজদায় পতিত হলেন। আর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি তখন আল্লাহ্‌পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে দুই রাকাত নামাজ পাঠ করলেন।

কাতাদা থেকে ইবনে আবিদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন করে ফেরাউন সৃষ্টি করা হয়। আর এই উম্মতের ফেরাউন হচ্ছে আবু জেহেল। এর উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। আফরার পুত্রদ্বয় একে হত্যা করেছে। হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছে ফেরেশতারাও। আর এর মস্তক ছেদন করেছে ইবনে মাসউদ।

হজরত ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, মুশরিকেরা বলেছিলো, মোহাম্মদের ধর্মকে আমরা সত্য বলে মনে করি না। হে আল্লাহ্! এই যুদ্ধে সত্যকে বিজয়ী করে দাও। তাদের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতের শুরুতেই বলে দেয়া হয়েছে—'তোমরা সত্যের জয় চেয়েছিলে, তা তো তোমাদের নিকট এসেছে।'

সুদ্দী এবং কালাবীর বর্ণনায় এসেছে— বদর যুদ্ধে রওনা হওয়ার পূর্বে মুশরিকেরা কাবাগৃহের গেলাফ ধরে বলেছিলো, যদি যুদ্ধ হয়, তবে যে ধর্ম ও যে দল উত্তম, সেই ধর্ম ও সেই দলকে তুমি বিজয়ী কোরো। তাদের এমতো প্রার্থনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

হজরত উবাই বিন কা'ব বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে। ইসলাম যে সত্য ধর্ম— সে বিষয়ে তাঁদের বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ ছিলো না। তাই তাঁরা চেয়েছিলেন সত্যের পরিপূর্ণ বিজয়। তাই তাঁদেরকে লক্ষ্য করেই আয়াতে বলা হয়েছে— তোমরা সত্যের জয় চেয়েছিলে, তা তো তোমাদের নিকট এসেছে।

স্বসূত্রে আল্লামা বাগবী উল্লেখ করেছেন, হজরত কায়েস বিন হাব্বাব বলেছেন, হিজরত পূর্ব সময়ে রসুল স. একদিন কাবা গৃহের ছায়ায় শায়িত ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা তো অত্যাচারিত। অথচ আপনি আমাদের জন্য দোয়া করছেন না। আমাদের নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্‌পাকের দরবারে কোনো দরখাস্তও পেশ করছেন না। একথা শুনেই উঠে বসলেন রসুল স.। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল তখন রক্তাভ। গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বে প্রকৃত বিশ্বাসীদেরকে মাটিতে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হয়েছে। কাউকে করা হয়েছে করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত। লৌহদণ্ডের আঘাতে ভেঙে ফেলা হয়েছে কারো কারো পৃষ্ঠদেশের অস্থি। তবুও তারা ছিলেন সত্যধর্মে অবিচল। উত্তমরূপে অবগত হও, জীবন কণ্ঠাগত হলেও সত্যাধর্মকেই করতে হবে একমাত্র অবলম্বন। আল্লাহ্‌পাক তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করবেনই। অতএব তোমরা ত্বরাপ্রবণতা পরিত্যাগ করো। বিজয়ের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বিজয়াভিলাষী হয়ো না। এমন সময় আসবে, যখন সানা- আর দূর্গের প্রাকার থেকে হাদ্বরা মাউত পর্যন্ত হবে তোমাদের নিঃশঙ্কচিত্ত পদচারণা। আল্লাহ্‌র ভয় ছাড়া কোনো ভয়ই তখন থাকবে না।

শেষে বলা হয়েছে— যদি তোমরা বিরত হও, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা পুনরায় করো তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দিবো এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোনো কাজে আসবে না, এবং

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের সঙ্গে রয়েছেন। একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীরা! যদি তোমরা আল্লাহ্র ও রসুলের নির্দেশের যথামূল্যায়ন থেকে বিরত হও, তবে তা হবে তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর যদি তোমরা তার নির্দেশনার যথাগুরুত্ব দিতে অস্বীকৃত হও, তবে আমি তোমাদের উপর অবতীর্ণ করবো শাস্তি। তখন তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনো কাজে আসবে না। অতএব বিশ্বাসে স্থিত হও। লোকবল এবং যুদ্ধোপকরণের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করো আল্লাহ্র উপর। একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করো তাঁর রসুলের নির্দেশনার। এটাই বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য। এ রকম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিশ্বাসীদের সঙ্গেই রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার সর্বাত্মক সাহায্য।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ২০, ২১, ২২, ২৩

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا۟ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ۝
وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ
عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكْمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا
لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ۝

❒ হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাহার কথা শ্রবণ করিতেছ তখন উহা হইতে মুখ ফিরাইও না;

❒ এবং তোমরা তাহাদিগের ন্যায় হইও না যাহারা বলে 'শ্রবণ করিলাম'; বস্তুতঃ তাহারা শ্রবণ করে না।

❒ আল্লাহের নিকট নিকৃষ্টতম জীব বধির ও মুক যাহারা কিছুই বুঝে না।

❒ আল্লাহ্ যদি তাহাদিগের মধ্যে ভাল কিছু দেখিতেন তবে তিনি তাহাদিগকেও শুনাইতেন, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে শুনাইলেও তাহারা উপেক্ষা করিয়া মুখ ফিরাইত।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটির মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীবৃন্দ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের। একথাও মনে রেখো যে, রসুলের আনুগত্যই আল্লাহ্র আনুগত্য। সুতরাং তোমরা যখন তাঁর নিকট থেকে জেহাদের নির্দেশপ্রাপ্ত হও (শ্রবণ করো), তখন সে নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।

দ্বিতীয়টির (২১) মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! দ্যাখো মুনাফিকদের অবস্থা। তারা রসুলের নির্দেশ শুনে বলে, আমরা শুনলাম (মান্য করলাম), কিন্তু তারা শোনেনা (মান্য করে না)। ওই সকল মুনাফিকদের মতো তোমরা হয়ো না।

www.eelm.weebly.com

তৃতীয়টির (২২) মর্মার্থ হচ্ছে— শোনো হে বিশ্বাসীরা! ওই সকল মুনাফিক আল্লাহ্পাকের নিকট অত্যন্ত নিকৃষ্ট। সত্য কথা শুনতে তারা আগ্রহী নয়। তাই কান থাকা সত্ত্বেও তারা শ্রুতিশক্তিহীন, বধির। সত্য কথা বলতেও তারা অনাগ্রহী। তাই তারা বাকশক্তিহীন— মুখ থাকা সত্ত্বেও। আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকেও দিয়েছিলেন, সত্য শ্রবণের এবং সত্য উচ্চারণের যোগ্যতা। কিন্তু সে যোগ্যতাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বনী আবদুদ্ দার গোত্রের লোকদেরকে লক্ষ্য করে। তারা বলতো, আমরা মোহাম্মদের আনীত ধর্মের কথা শুনবোই না। এ সম্পর্কে কোনো কথাও বলবো না। মাত্র দু'জন বাদে ওই গোত্রের সকল লোক উহুদ যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো। কেবল বেঁচে গিয়েছিলেন মুস্আব বিন উমাইর এবং সুবিত বিন হারমেলা। তারা দু'জনই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

শেষোক্ত আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখতেন তবে তিনি তাদেরকেও শোনাতেন, কিন্তু তাদেরকে শোনালেও তারা উপেক্ষা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিতো।' একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা ভালো করেই জানেন যে, অবিশ্বাসীরা (কাফেরেরা) এবং কপট বিশ্বাসীরা (মুনাফিকরা) সৃষ্টিগতভাবে হেদায়েত গ্রহণের যোগ্যতা রহিত। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই তারা সত্যচ্যুত। তাই তাদের ইন্দ্রিয়সমূহ সত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত। আল্লাহ্পাকও তাই চান না যে তারা সত্যের আহ্বান শুনুক এবং সত্যকে উপলব্ধি করুক। কারণ প্রত্যাখ্যান ও উপেক্ষা হচ্ছে তাদের সহজাত প্রবৃত্তি।

রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, কিছু লোক পুণ্যকর্ম করতে করতে পৌঁছে যায় জান্নাতের অতি নিকটে। জান্নাতের সঙ্গে তাদের ব্যবধান থাকে মাত্র এক হাত। শেষে তকদীর প্রবল হয়। মৃত্যুর পূর্বে তারা শুরু করে দোজখবাসীদের মতো আমল— অবশেষে প্রবেশ করে দোজখে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, কুরায়েশরা একবার রসুল স. কে বললো, আমাদের স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ কুসাই ছিলেন অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী। হে মোহাম্মদ! তুমি তাঁকে জীবিত করে দেখাও। তিনি যদি তোমাকে সত্য নবী বলে স্বীকার করেন, তবে আমরাও তোমাকে নবী বলে মান্য করবো। তাদের এমতো কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি। এই বর্ণনার ভিত্তিতে আয়াতের মর্ম দাঁড়াবে এ রকম— আল্লাহ্তায়ালা ভালো করেই জানেন যে, অংশীবাদী কুরায়েশরা সত্যকে স্বীকার করবে না। কারণ তারা সৃষ্টিগতভাবেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাই কুসাইকে জীবিত করে তার অভিমত শুনিয়ে দিলেও তারা সত্যের প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শন করবে। আগের মতোই থেকে যাবে সত্যবিমুখ।

—৬

www.eelm.weebly.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

❑ হে বিশ্বাসিগণ! রসুল যখন তোমাদিগকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে যাহা তোমাদিগকে প্রাণবন্ত করে তখন আল্লাহ্ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দিবে এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ মানুষ ও তাহার হৃদয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থান করেন এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে।

প্রথমেই বলা হয়েছে—'হে বিশ্বাসীগণ! রসুল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন, যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ্ ও রসুলের আহ্বানে সাড়া দিবে।' সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'প্রাণবন্ত করে এমন কিছুর দিকে'—কথাটির অর্থ, ইমানের দিকে। কারণ, ইমানই ইমানদারদেরকে প্রাণবন্ত করে। কাতাদা বলেছেন, এখানে 'এমন কিছুর দিকে' অর্থ, কোরআনের দিকে। কেননা কোরআনের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত প্রাণবন্ততা— ইহকাল ও পরকালের কল্যাণময় জীবন। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য— সত্যের দিকে। ইবনে ইসহাক বলেছেন— জেহাদের দিকে। কেননা জেহাদের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত জীবন, প্রভূত সম্মান। কুতাইবী বলেছেন, এখানে 'এমন কিছুর দিকে' কথাটির অর্থ হবে শাহাদাতের দিকে। কারণ শহীদগণই অক্ষয় প্রাণবন্ততার অধিকারী। তাই অন্য এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে— 'বাল আহ্ইয়াউন্ ইন্দা রব্বিহিম ইউরজাকুনা ফারিহীন' (বরং তারা জীবিত তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদেরকে জীবনোপকরণ দেয়া হয় প্রসন্নতার সঙ্গে)।

আমি বলি, এখানে 'এমন কিছুর দিকে' কথাটির অর্থ হবে— রসুল স. এর সকল নির্দেশের দিকে। কেননা রসুল স. এর সকল নির্দেশই বিশ্বাসীগণকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

উল্লেখ্য যে, রসুল স. এর আহ্বানে সাড়া দিলে অন্তর জীবন্ত হয়। আর সাড়া না দিলে অন্তর হয় মৃত। সুতরাং মৃত্যুর নিথরতাতুল্য উদাসীনতাকে অতিক্রম করে জাগ্রতজীবনের অধিকারী হতে গেলে রসুল স. এর ডাকে সাড়া দিতেই হবে। অন্যথায় নিজেকে বিশ্বাসী বলে চিহ্নিত করা যাবে না।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, হজরত উবাই বিন কা'ব একবার নামাজ পাঠ করছিলেন। রসুল স. তাঁর পাশ দিয়ে গমনকালে তাঁকে ডাকলেন। তিনি তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করে হাজির হলেন

www.eelm.weebly.com

রসুল স. এর নিকটে। রসুল স. বললেন, ডাকার সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলে না কেনো? হজরত উবাই বিন কা'ব বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি যে নামাজ পড়ছিলাম। তিনি স. বললেন, তুমি কি আল্লাহ্‌পাকের এই ঘোষণাটি শোনোনি— 'ইয়া আইয়ুহাল্লাজীনা আমানুস্ তাজীবু লিল্লাহি ওয়ার্ রসুলি ইজা দায়াকুম লিমা ইউহ্ইকুম' (হে বিশ্বাসীগণ! রসুল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন, যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ্ ও রসুলের আহ্বানে সাড়া দিবে)। হজরত উবাই বিন কা'ব বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এরপর থেকে আমি নিশ্চয় এই নির্দেশের অন্যথা করবো না।

মাসআলাঃ কোনো কোনো আলেম বলেছেন, নামাজরত অবস্থায় রসুল স. এর আহ্বানে সাড়া দিলে নামাজ ভঙ্গ হবে না। কেউ কেউ আবার বলেছেন, রসুল স. জরুরী কোনো কাজে তলব করলে নামাজ ছেড়ে দিয়ে তাঁর নিকটে উপস্থিত হতে হবে। প্রথমোক্ত অভিমতটিই অধিকতর শক্তিশালী। এখানে একথাটিও প্রণিধানযোগ্য যে, যে কোনো জরুরী প্রয়োজনে নামাজ ছেড়ে দেয়া জায়েয। যেমন, নামাজরত অবস্থায় যদি কেউ দেখে কোনো অন্ধ কূপের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এক্ষুণি তাকে না আটকালে কূপের মধ্যে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। এমতাবস্থায় নামাজ ছেড়ে দিয়ে ওই অন্ধকে রক্ষা করতে হবে। অন্যান্য দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও এ রকম করা সিদ্ধ। রসুল স. এর আহ্বানে সাড়া দেয়ার ব্যাপারটি কিন্তু এ রকম নয়। তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়া বিশ্বাসীদের জন্য অত্যাবশ্যক।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ মানুষ ও তার হৃদয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থান করেন।' একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! জেনে রাখো, আল্লাহ্‌তায়ালার অতুলনীয় অবস্থান মানুষ ও তার হৃদয়ের মধ্যে। সুতরাং দুনিয়ার এই জীবনে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্যকে বরণ করো। মৃত্যুর পর তোমরা এ সুযোগ আর পাবে না। এই পৃথিবীই পুণ্যকর্মের স্থান। তাই এখানেই তোমরা হও বিশুদ্ধচিত্ত। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, হে বিশ্বাসীরা! সকল মানুষের হৃদয়ে রয়েছে দীর্ঘ জীবনের বাসনা। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন সকলের হায়াত। সুতরাং তোমরা দীর্ঘ হায়াতের ভরসায় তোমাদের পুণ্যকর্মকে বিলম্বিত কোরো না। এ রকম মনে কোরো না যে, আজ নয়, পুণ্যকর্ম করবো আগামীকাল।

এক আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'নাহ্নু আক্রাবু ইলাইহি মিন হাবলিল্ ওয়ারিদ্' (আমি তোমাদের প্রাণরগ অপেক্ষাও নিকটে)। আলোচ্য আয়াতেও বলা হয়েছে— আল্লাহ্ মানুষ ও তার হৃদয়ের অন্তর্বর্তীস্থানে অবস্থান করেন। মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়াল্যার এই নৈকট্যের ধরন অজ্ঞাত। এ রকম

www.eelm.weebly.com

নৈকট্যের ঘোষণার মধ্যে এই নির্দেশনাটি নিহিত রয়েছে যে— হে মানুষ! আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলের সকল রহস্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। সুতরাং তোমরা তাঁকে ভয় করো ও ভালোবাসো। একনিষ্ঠ আনুগত্য করো তাঁর ও তাঁর রসুলের। না করলে তোমাদের সকল কামনা বাসনা হয়ে যেতে পারে নিষ্ফল— যদি আল্লাহ্তায়ালা সে রকম চান। কারণ তিনি তোমাদের অন্তর ও বাহিরের সকল কিছুর উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

আল্লাহ্তায়ালা ইচ্ছাময়। অভিপ্রায় বাস্তবায়নের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, স্বাধীন, পবিত্র। তিনি যাকে সৌভাগ্যশালী করতে চান, সে-ই হয় সৌভাগ্যশালী। আর যাকে করতে চান হতভাগ্য, সে অবশ্যই হয় দুর্ভাগা। তাই বিশ্বাসীদের কর্তব্য হচ্ছে অনিশ্চিত এই জীবনের উপর নির্ভরশীল না হওয়া। মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত থাকা। প্রতিটি মুহূর্ত অন্তরে আল্লাহ্র জিকির জাগ্রত রাখা। পুণ্যকর্মে ব্যাপৃত থাকা। আর এ সকলের জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট তৌফিক প্রার্থনা করা।

হজরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এই দোয়াটি অত্যধিক উচ্চারণ করতেন—'ইয়া মুক্বাল্লিবাল্ কুলুব্ ছাব্বিত ক্বালবি আ'লা দ্বীনিকা'(হে হৃদয়ের আবর্তন-বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো)। সাহাবায়ে কেরাম একবার নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো আপনার আনীত ধর্মে বিশ্বাস করেছি। ভবিষ্যতে কি আমাদের এই বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত হবার আশংকা রয়েছে? তিনি স. বললেন, হৃদয় তো আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। তিনি যেভাবে চান, সেভাবেই হৃদয়ের আবর্তন-বিবর্তন ঘটান। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত ইবনে ওমরের মারফু বর্ণনায় এসেছে, আদম সন্তানদের অন্তর পরম করুণাময় আল্লাহ্তায়ালার পরিপূর্ণ অধিকারে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা অন্তরের পরিবর্তন ঘটান। রসুল স. প্রার্থনা করতেন, হে আমাদের আল্লাহ্! হে আমাদের অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরগুলোকে তোমার নির্দেশমুখী করে দাও (তোমার নির্দেশ প্রতিপালনার্থে আমাদের অন্তরগুলোকে একত্রিত করে দাও)। মুসলিম।

হজরত ওমর বিন খাত্তাব একদিন দেখলেন, এক যুবক প্রার্থনা করছে— হে আমার আল্লাহ্! তুমি মানুষ ও তার হৃদয়ের অন্তর্বর্তীস্থানে অবস্থান করো। অতএব, তুমি পাপ ও আমার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে যাও, যেনো কোনো পাপকর্ম করবার সুযোগ ও ক্ষমতা আমি না পাই। একথা শুনে হজরত ওমর তাঁকে বললেন, আল্লাহ্পাক তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তোমার প্রার্থনা পূরণ করুন।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে—'এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।' একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীরা! আরো শুনে নাও, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, পাপী-পুণ্যবান— সকলকে পুনরুত্থান দিবসে একত্রিত করা হবে। তখন পুণ্যবানদেরকে দেয়া হবে পুণ্যের যথা পুরস্কার। আর পাপীদেরকে দেয়া হবে উপযুক্ত শাস্তি।

সুরা আনফাল ঃ আয়াত ২৫

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

❑ তোমরা এমন ফিত্নাকে ভয় কর যাহা বিশেষ করিয়া তোমাদিগের মধ্যে যাহারা জালিম কেবল তাহাদিগকেই ক্লিষ্ট করিবে না এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

অত্যাচারীকে বাধাদান না করলে অত্যাচার ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। অত্যাচারের ওই ব্যাপক বিস্তৃতিকেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ফেত্না। নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, ওই ফেত্নাকে ভয় করো। আত্মরক্ষা করো ওই ভয়াবহ বিশৃংখলা থেকে। কারণ ওই ফেত্না কেবল অত্যাচারীদের উপর আপতিত হবে না। আপতিত হবে পাপী-পুণ্যবান নির্বিশেষে সকলের উপর।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ এই যে, কোনো অন্যায়কে স্থায়ী হতে দেয়া যাবে না। অন্যথায় আল্লাহ্তায়ালা শাস্তি অবতীর্ণ করবেন সাধারণভাবে। ওই শাস্তি পতিত হবে পাপাচারী-পুণ্যবান নির্বিশেষে সকলের উপর।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক ঘোষণা করেছেন, হে মানুষ! তোমরা এই আয়াতের নির্দেশনা প্রতিপালনে যত্নবান হও— তোমরা এমন ফেত্নাকে ভয় করো, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা জালেম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর। আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখে বাধা না দিলে এ রকম হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর পক্ষ থেকে সকলের প্রতি অবতীর্ণ করবেন শাস্তি। অন্য খলিফাত্রয়ও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাব্বান বলেছেন, হাদিসটি শুদ্ধ। আর তিরমিজি বলেছেন— উত্তম ও বিশুদ্ধ।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, হে মানুষ! তোমরা কল্যাণের নির্দেশনা দাও এবং অকল্যাণ থেকে মানুষকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হও। এমন সময় আসবে, তোমরা আত্মরক্ষার জন্য দোয়া করবে, কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে না। পাপ মার্জনার জন্য তোমরা প্রার্থনা জানাবে, অথচ তোমাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। সুতরাং মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে

www.eelm.weebly.com

থাকো এবং বাধাদান করো অসৎকর্ম থেকে। তাহলে তোমাদের জীবন এবং সম্পদ নিরাপদ থাকবে। ইহুদী ও খৃষ্টান আলেমেরা যখন 'সৎকর্মের নির্দেশ দান এবং অসৎ কর্মে বাধাদান'—এই নির্দেশটিকে উপেক্ষা করেছিলো, তখন তাদের পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তাদের উপর আপতিত হয়েছিলো অভিসম্পাত। তাদের আপামর জনতা তখন সাধারণভাবে ভোগ করেছিলো আল্লাহ্তায়ালার শাস্তি। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আল্লামা ইস্পাহানী।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং জননী আয়েশা থেকে আদী বিন আদী কুনদীর পিতামহ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অপকর্মের কারণে আল্লাহ্তায়ালা সর্ব সাধারণের উপর আযাব অবতীর্ণ করেন না। কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তির সামনে কোনো অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখে বাধা দান না করলে সর্বসাধারণের উপর নেমে আসে আযাব। বাগবী।

হজরত নোমান ইবনে বশীরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশের সীমারেখা মান্যকারী ও অমান্যকারীদের দৃষ্টান্তটি এ রকম— একটি দ্বিতল জাহাজের যাত্রীরা লটারীর মাধ্যমে তাদের দোতলা ও একতলার অবস্থান নির্ধারণ করলো। পানির ব্যবস্থা ছিলো দোতলায়। নিচের তলার লোকদেরকে উপরতলা থেকে পানি সংগ্রহ করে আনতে হতো। কাজটি ছিলো শ্রমসাধ্য। উপরতলার লোকেরাও এতে করে বিরক্তি প্রকাশ করতে শুরু করলো। নিচের তলার লোকেরা ভাবলো, জাহাজের তলা ফুটো করলেই তো পানি পাওয়া যায়। অযথা উপরে ওঠা নামা করতে হয় না। এই ভেবে তারা জাহাজের তলা ফুটো করতে শুরু করলো। উপরের লোকেরা বললো, তোমরা অমন করছো কেনো? নিচের লোকেরা বললো, উপরে ওঠা নামা করতে আমাদের কষ্ট হয়। তোমরাও বিরক্ত বোধ করো। এমতাবস্থায় উপরের লোকেরা যদি নিচের লোকদেরকে বাধা না দেয়, তবে সকলেরই সলিল সমাধি ঘটবে। বোখারী।

আমি বলি, উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের মাধ্যমে এ রকম মনে করা ঠিক হবে না যে, অন্যায়কারীদের পাপ যারা অন্যায় করে না তাদের উপরে বর্তাবে। বরং হাদিসগুলোর মর্মার্থ হবে এ রকম— পাপের শাস্তি আপতিত হবে কেবল পাপীদের উপর। আর যারা সামনে পাপ সংঘটিত হতে দেখেও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অথবা কথার মাধ্যমে পাপীদেরকে পাপকর্ম থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা না করবে, তারা 'সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ'—এই দায়িত্বে অবহেলার কারণে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। কিন্তু তারা শাস্তিযোগ্য হবে না। এ সম্পর্কে শনিবারে মৎস্য শিকারের নিষেধাজ্ঞা লংঘনকারীদের ঘটনাটির প্রতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে একটি দল শনিবারে মৎস্য শিকার করেছিলো। দ্বিতীয় দলটি সদুপদেশ দানের মাধ্যমে তাদেরকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিলো। আর তৃতীয় দলটি নিষেধাজ্ঞা লংঘন যেমন করেনি, তেমনি

www.eelm.weebly.com

লংঘনকারীদেরকে বাধা প্রদানও করেনি। এই তিন দলের মধ্যে শাস্তিদান করা হয়েছিলো কেবল নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারী দলটিকে। অপর দল দু'টোকে শাস্তি দেয়া হয়নি। অতএব, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে এ রকম বলা যায় না যে, পাপের শাস্তি পাপী-পুণ্যবান নির্বিশেষে সকলের উপরে আপতিত হবে। তাই কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ফেত্না সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— তোমরা এমন ফেত্নাকে ভয় করো, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা জালেম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না।

ফেত্না অর্থ— যুদ্ধ বিগ্রহ, বিশৃংখলা, লুণ্ঠন ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড। এ রকম ফেত্না দ্বারা আপামর জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাতাদা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর জ্ঞানী ব্যক্তিরা বুঝতে পারলেন যে, অচিরেই শুরু হবে ফেত্না ফাসাদ। ওই ফেত্নাকে প্রতিহত করতে হবে। প্রতিহত না করলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিসাধিত হবে জীবন ও সম্পদের। তীব্র হয়ে উঠবে কলহ, বিবাদ-বিসংবাদ ও মতভেদ।

হাসান বসরীর বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আলী, হজরত আম্মার, হজরত তালহা এবং হজরত যোবায়েরের মতবিরোধকে লক্ষ্য করে। হজরত আলীর খেলাফতের সময় তাঁদের মতবিরোধ পারস্পরিক যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছিলো।

মাতরাফের বর্ণনায় এসেছে, আমি হজরত যোবায়েরকে একবার বললাম, হে আবু আবদুল্লাহ্! আপনি ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর পক্ষে দাঁড়াননি কেনো? খলিফার শাহাদাতের পর আপনিই তো আবার তাঁর রক্তের প্রতিশোধের (কিসাসের) দাবি তুলেছিলেন। হজরত যোবায়ের বললেন, আমি 'তোমরা এমন ফেত্নাকে ভয় করো.....' এই আয়াতটি এতদিন ধরে তেলাওয়াত করে এসেছি। কিন্তু বুঝতে পারিনি এই আয়াতে উল্লেখিত 'ফেত্না' আমার অজ্ঞাতসারে আমার মাধ্যমেই প্রকাশিত হবে। এখন বুঝতে পারছি আমিই ছিলাম এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল। রসুল স.ও এই ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। ফেত্না পরিগ্রহ করেছিলো তার চরম রূপ। তাই জংগে জামালে আলী ও আমি হয়েছিলাম পরস্পরের প্রতিপক্ষ। সুদ্দী, জুহাক এবং কাতাদার মাধ্যমেও এ রকম বর্ণনা এসেছে।

আমি বলি, জেহাদের প্রতি অনাগ্রহকে আলোচ্য আয়াতে ফেত্না বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন মুসলমানদের ইমামের পক্ষ থেকে জেহাদের আহ্বান জানানো হয়, তখন সে আহ্বানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হলে তা হবে ফেত্না। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— অথচ বিশ্বাসীদের একদল এটা পছন্দ করেনি (আয়াত ৫)। অন্যত্র এরশাদ করেছেন— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না

www.eelm.weebly.com

(আয়াত ১৫)। আর এক আয়াতে এরশাদ করেছেন— হে বিশ্বাসীগণ! রসুল স. যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন, যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে (আয়াত ২৪)।

উদ্ধৃত আয়াতগুলোর মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে— ফেত্না দমনার্থে জেহাদ করতে হবে। অন্যথায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উপর নেমে আসবে চরম মুসিবত। আর জেহাদের ময়দানে শৈথিল্যকেও প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। যেমন উহুদ যুদ্ধে তীরন্দাজ বাহিনীর শিথিলতা ও অসতর্কতার কারণে মুসলিম বাহিনীর অনেককে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিলো। রসুল স. এর পবিত্র অবয়ব হয়েছিলো রক্তে রঞ্জিত। সে কারণেই আলোচ্য আয়াতের প্রথমেই ভয় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, ফেত্নার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার কথা। বলা হয়েছে ফেত্নার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আম খাস সকলেই।

ফেত্না থেকে আত্মরক্ষা করাও এই আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— (পিপীলিকাদের নেতা বললো) 'হে পিপীলিকারা! তোমরা আপনাপন গর্তে প্রবিষ্ট হও। অন্যথায় সুলায়মানের সেনাবাহিনীর পদতলে পিষ্ট হবে।' ফেত্নাকে ভয় করে এভাবে আত্মরক্ষা করাও আলোচ্য আয়াতের নির্দেশ হওয়া সম্ভব।

আল্লামা বায়যাবী লিখেছেন, আমার মতে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে এ রকম— ফেত্না ফাসাদ ছড়িয়ে পড়লে তোমাদের মধ্যে যারা জালেম, কেবল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবাই। আমি বলি, এখানে বিপদ, মুসিবত থেকে বেঁচে থাকার জন্য একটি শর্ত অনুক্ত রয়েছে। সেই শর্তটি হচ্ছে— ফেত্নার মোকাবিলা করা অথবা ফেত্না থেকে আত্মরক্ষা করা। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— তোমরা ফেত্নার ভয়াবহতা অনুধাবন করো। ফেত্নাকে প্রতিহত করো অথবা ফেত্না থেকে আত্মরক্ষা করো। এই শর্তটি প্রতিপালন করলে ফেত্না থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। এটা সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব। মনে রেখো, ফেত্নাজাত বিপদ-মুসিবত সাধারণ, বিশেষ— সকল শ্রেণীর মানুষকে স্পর্শ করে। পিপীলিকাদের নেতার কথায়ও এ রকম শর্তের উল্লেখ রয়েছে। সে শর্তটি হচ্ছে গর্তে প্রবেশ করার শর্ত। অর্থাৎ এই শর্তটি' পালন করলে ফেত্না থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে—'আসলিম তাদ্খুলিল জান্নাতি' (ইসলাম গ্রহণ করলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে)। এখানেও জান্নাত গমনের শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ইসলামকে। ইতোপূর্বেও আমরা এ রকম ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। একথাটিও উল্লেখ করেছি যে পাপের শাস্তি পাপী-পুণ্যবান নির্বিশেষে সকলের উপর আপতিত হয় না। এ রকম ধারণা কোরআন ও হাদিসের বিরোধী। ঐকমত্যেরও পরিপন্থী। 'লা

www.eelm.weebly.com

তাজিরু ওয়াজিরাতাইঁ উইজ্‌রা উখ্‌রা'—এই আয়াতে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, পাপীদের পাপের বোঝা কখনও পাপহীনেরা বহন করে না। অতএব একথা মেনে নিতে হবে যে, এখানে ফেত্‌না অর্থ জেহাদের প্রতি বৈমুখ্য, যুদ্ধ প্রান্তর থেকে পলায়ন ইত্যাদি। সুতরাং জেহাদ অত্যাবশ্যক।

সবশেষে বলা হয়েছে—'এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।' একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীরা! আল্লাহ্‌তায়ালা যে শাস্তিদানে কঠোর সে কথা ভুলে যেয়ো না। জেহাদের নির্দেশ বাস্তবায়ন করো। আল্লাহ্‌তায়ালার কঠিন আযাবের ভয়ে বিরত থাকো ফেত্‌না থেকে।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ২৬

وَاذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَـَٔاوٰىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِۦ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

☐ স্মরণ কর, তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হইতে; তোমরা আশংকা করিতে যে লোকেরা তোমাদিগকে অকস্মাৎ ধরিয়া লইয়া যাইবে; অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদিগকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদিগকে উত্তম বস্তুসমূহ দান করেন যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

ওয়াজ্‌কুরু (স্মরণ করো) বলে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে মুহাজির সাহাবীগণকে— যারা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন। বলা হয়েছে—'তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বল বলে পরিগণিত হতে; তোমরা আশংকা করতে যে লোকেরা তোমাদেরকে অকস্মাৎ ধরে নিয়ে যাবে।' একথার অর্থ— হে মুহাজিরবৃন্দ! কিছুদিন পূর্বের কথা স্মরণ করো। তোমরা ছিলে নগণ্য সংখ্যক। তোমরা আশংকা করতে, যে কোনো মুহূর্তে মক্কার অংশীবাদী কুরায়েশরা তোমাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে। এখানে আন্‌নাস (লোকেরা) অর্থ— মক্কার প্রতাপশালী কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু শায়েখ লিখেছেন একবার রসুল স. কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এই আয়াতে আন্‌নাস (লোকেরা) বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? তিনি স. বললেন, পারস্যবাসীদেরকে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে উত্তম বস্তুসমূহ দান করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।' একথার অর্থ— হে মুহাজিরবৃন্দ! এরপর আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে আশংকামুক্ত করেন। দান করেন মদীনার নিরাপদ আশ্রয়। স্বীয় সাহায্য দ্বারা বিশ্বাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং দান করেন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ— যা অতীতের কোনো উম্মতের জন্য হালাল ছিলো না।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'স্মরণ করো' বলে সম্বোধন করা হয়েছে সমগ্র আরববাসীকে। প্রথমে আরবে ইসলাম ছিলো হত দরিদ্র অবস্থায়। ওদিকে রোম ও পারস্যের অধিবাসীরা ছিলো পরস্পর পরস্পরের শত্রু। তৎকালীন সময়ে রোম ছিলো পারস্য রাজ্যের অধীন। আবার রোম ও পারস্য দু'টো রাজ্যই ছিলো আরবের শত্রু। রসুলুল্লাহ্ স. এর মহাআবির্ভাবের পর তাঁর আনীত ধর্মমতের মাধ্যমে আরব হয়ে উঠতে শুরু করলো উত্তরোত্তর শক্তিশালী। ক্রমে ক্রমে রসুল স. কে কেন্দ্র করে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ালো আরব ভূখণ্ড। এভাবে আল্লাহ্পাক স্বীয় সাহায্যে আরব ভূখণ্ডকে করলেন শক্তিমান।

সাঈদ বিন মনসুরের বর্ণনাসূত্রে বাগবী লিখেছেন, আবদুল্লাহ্ বিন আবী কাতাদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বনী কুরায়জাকে অবরোধ করে রাখলেন একুশ দিন। অবরুদ্ধ ইহুদীরা আবেদন জানালো, হে মুসলমানদের রসুল! আপনি যে সকল শর্তের মাধ্যমে বনী নাজিরের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন, ওই সকল শর্তের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গেও সন্ধি স্থাপন করুন। তাদেরকে আপনি সিরিয়ার আজরুয়াত এবং আরীহা অঞ্চলে বসবাসের অনুমতি প্রদান করেছেন। আমাদেরকেও তেমনি অনুমতি প্রদান করুন। রসুল স. তাদের আবেদন অগ্রাহ্য করলেন। বললেন, তোমরা সা'দ বিন মুয়াজকে সালিশ হিসেবে মানো। আমরাও তাকে মানলাম। দূর্গ থেকে বের হয়ে এসো। সা'দ বিন মুয়াজ যে সিদ্ধান্ত দান করবে, সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সম্মত হও। বনী কুরায়জা এর কোনো উত্তর না দিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য প্রেরণ করলো হজরত আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনজিরকে। কিন্তু তাঁর পরিবার পরিজন ও ধনসম্পদকে আটকে রেখে দিলো দূর্গের মধ্যে। হজরত সা'দ বিন মুয়াজ এবং হজরত লুবাবা— দু'জনেই ছিলেন ইহুদী সম্প্রদায়ভূত। কিন্তু তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হয়েছিলেন রসুল স. এর বিশিষ্ট সাহাবী। রসুল স. এর সঙ্গে বাক্যালাপের পর হজরত আবু লুবাবা আলোচনার ফলাফল জানানোর জন্য বনী কুরায়জার নিকটে গেলেন। বললেন, তোমরা যদি সা'দ বিন মুয়াজকে সালিশ মানো, তবে দূর্গ থেকে বের হয়ে এসো। রসুল স. তাকে সালিশ মেনেছেন। এ কথা বলার সময় তিনি তাঁর কণ্ঠদেশের দিকে ইশারা করে দেখালেন। অর্থাৎ ইশারায় বললেন, সা'দের নির্দেশেই তোমাদের কণ্ঠচ্ছেদ করা হবে।

www.eelm.weebly.com

সাবিলুর রাশাদ্ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুল স. হজরত আবু লুবাবাকে অবরুদ্ধ বনী কুরায়জার নিকট পাঠালেন। তাঁকে দেখে অবরুদ্ধ নারী ও শিশুরা কান্না জুড়ে দিলো। স্বজনদের কান্না দেখে হজরত আবু লুবাবার হৃদয় হয়ে উঠলো দয়ার্দ্র। কা'ব বিন আসাদ বললো, হে আবু লুবাবা! আমরা তো আপনাকে সালিশ নিযুক্ত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদেরকে বলা হচ্ছে সা'দ বিন মুয়াজকে সালিশ নিযুক্ত করার কথা। আপনি কী বলেন? আমরা কি মোহাম্মদের প্রস্তাবানুসারে দূর্গ থেকে বের হয়ে আসবো? হজরত আবু লুবাবা বললেন, হ্যাঁ। একই সঙ্গে হাত দ্বারা নিজের গলার দিকে ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ বুঝালেন, তোমাদের কণ্ঠচ্ছেদন করা হবে। হজরত আবু লুবাবা বলেছেন, এভাবে ইশারা করার পরক্ষণে আমার মনে হলো, একি করলাম আমি! আমি তো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে প্রতারণা করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি পাঠ করলাম— ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। চোখ ফেটে কান্না এলো আমার। শ্মশ্রু হয়ে গেলো অশ্রুসিক্ত। ওদিকে রসুল স. তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে আমার জন্য প্রতীক্ষমাণ। আমি দূর্গ থেকে বের হয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে দূর্গের পিছন দিক দিয়ে অন্য রাস্তায় সোজা হাজির হলাম মসজিদে নববীতে। মসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেললাম আমার শরীরকে। প্রতিজ্ঞা করলাম, মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আমি এভাবেই থাকবো। মনে মনে বললাম, হে আমার আল্লাহ্! দয়া করে আমার তওবা কবুল করো।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু লুবাবা তখন বললেন, তওবা কবুল না হওয়া পর্যন্ত আমি পানাহার করবো না। আর যদি তওবা কবুল না হয়, তবে এভাবেই স্বেচ্ছা-বন্দী অবস্থায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবো আমি। অল্পক্ষণের মধ্যেই এই সংবাদ পৌঁছে গেলো রসুল স. এর নিকটে। তিনি স. বললেন, যদি সে আমার কাছে আসতো, তবে আমি তার জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করতাম। সে যখন এ রকম করেনি, তখন আমিও তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হবো না। তার ক্ষমাপ্রাপ্তির সংবাদ যদি আল্লাহ্তায়ালা আমাকে জানান, তবেই কেবল আমি তাকে মুক্ত করবো। সাতদিন কেটে গেলো। অনাহারক্লিষ্ট ও অনুতাপ জর্জরিত হজরত আবু লুবাবা বেহুঁশ হয়ে গেলেন। এরপর আল্লাহ্পাক তাঁর তওবা কবুল করলেন।

সাবিলুর রাশাদ্ গ্রন্থে আরো উল্লেখিত হয়েছে, ইবনে হাকাম বলেছেন, হজরত আবু লুবাবা মসজিদের খুঁটির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন ছয় দিন। নামাজের সময় হলে তাঁর স্ত্রী এসে তাঁর বাঁধন খুলে দিতেন। তিনি নামাজ পাঠ করতেন। পুনরায় খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলতেন নিজেকে।

হজরত ইবনে উকবার বর্ণনায় এসেছে, সম্ভবতঃ আবু লুবাবা স্বেচ্ছা-বন্দী অবস্থায় অতিবাহিত করেছিলেন বিশ দিন। বেদায়া গ্রন্থে এই অভিমতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। ইবনে ইসহাক বলেছেন, তিনি স্বেচ্ছা-বন্দী ছিলেন পঁচিশ দিন।

www.eelm.weebly.com

ইবনে ওয়াহাবের বর্ণনাসূত্রে মালেকের বিবরণে এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আবী বাকর বলেছেন, ছাগল বাঁধা দড়ি দিয়ে নিজেকে দশদিনেরও বেশী মসজিদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলেন আবু লুবাবা। শেষের দিকে তাঁর শ্রবণশক্তি এবং বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। নামাজের সময় তাঁর কন্যা এসে বাঁধন খুলে দিতেন। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন, ওজু, নামাজ ইত্যাদি সেরে আবার খুঁটির সঙ্গে দাঁড়াতেন। তাঁর কন্যা আবার তাঁকে ছাগলবাঁধা দড়ি দিয়ে শক্ত করে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিতেন। কোনো কোনো সময় একাজ করতেন তাঁর স্ত্রী। এরপর অবতীর্ণ হলো— 'ওয়া আখারুনা' তারাফু বিজুনুবিহিম খলাতু আমালান সালিহাঁও আখারু সাইয়্যিআন আসাল্লহু আঁইইয়াতুবা আ'লাইহিম ইন্নাল্লহা গফুরুর রহীম'(আর অন্যেরা তাদের পাপের স্বীকৃতি দিয়েছিলো। তারা মিশ্রিত করেছিলো পুণ্য ও পাপকে। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ, করুণাময়)।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনাসূত্রে ইয়াজিদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন কাসিদ উল্লেখ করেছেন, রসুল স. জননী উম্মে সালমার প্রকোষ্ঠে অবস্থান করছিলেন। ওই সময় অবতীর্ণ হলো হজরত আবু লুবাবার তওবা কবুলের শুভসংবাদ সংক্রান্ত আয়াত। পূব আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে তখন। ভোরের আলোর মতো রসুল স. এর পবিত্র মুখমণ্ডলও আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। পবিত্র ওষ্ঠাধারে ফুটে উঠলো মৃদু হাসির রেখা। জননী উম্মে সালমা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আজ যে আপনি বড়ই হৃষ্টচিত্ত। কী ঘটেছে বলুন। তিনি স. বললেন, আবু লুবাবার তওবা কবুল হয়েছে। জননী বললেন, আমি কি এই শুভসংবাদটি বহির্বাটির লোকদেরকে জানাতে পারবো না? তিনি স. বললেন, কেনো পারবে না? পর্দার হুকুম তখনও অবতীর্ণ হয়নি। তাই উম্মত জননী বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁর বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সন্তানকে বললেন, হে আবু লুবাবা! শুভ সমাচার শ্রবণ করো। আল্লাহ্পাক তোমার তওবা কবুল করেছেন। উপস্থিত লোকেরা একথা শুনে দৌড়ে তাঁকে বন্ধনমুক্ত করতে গেলেন। তিনি বলে উঠলেন, না, তোমরা কেউ এদিকে এসো না। আল্লাহ্তায়ালার শপথ! স্বয়ং রসুল স. আমাকে বন্ধনমুক্ত করবেন। একটু পরে ফজরের নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে রসুল স. বাইরে এলেন এবং মুক্ত করে দিলেন হজরত আবু লুবাবাকে।

ইমাম জয়নুল আবেদীনের বর্ণনাসূত্রে সুহাইল উল্লেখ করেছেন, হজরত সাইয়্যেদা ফাতেমা হজরত আবু লুবাবার রশি খুলে দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আবু লুবাবা বলে উঠেছিলেন, আমি এই মর্মে কসম খেয়েছি যে, রসুল স. ছাড়া আমি অন্য কারো দ্বারা বন্ধনমুক্ত হবো না। একথা শুনে রসুল স. বলেছিলেন, ফাতেমা তো আমারই অংশ (সে বন্ধনমুক্ত করলে তা হবে আমারই বন্ধনমুক্ত করার মতো)। এই বর্ণনাসূত্রভূত আলী বিন জায়েদ বিন জায়য়ান দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে চিহ্নিত। তাছাড়া ইমাম জয়নুল আবেদীনের এই বর্ণনাটিও মুরসাল। আর

www.eelm.weebly.com

তিনি তাঁর পিতামহী হজরত ফাতেমাতুজ্জোহরাকে দেখেননি। একথাও উল্লেখ করেননি যে, একথা তিনি কার কাছে শুনেছেন—পিতা ইমাম হোসাইন থেকে না পিতৃব্য ইমাম হাসান থেকে, না অন্য কোনো সাহাবী থেকে।

বন্ধনমুক্ত হবার পর হজরত আবু লুবাবা বললেন, সম্পদ ও স্বজনের আকর্ষণে আমি অন্যায় করেছিলাম। সুতরাং আমার সকল সম্পদ পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আমার তওবা পরিপূর্ণতা লাভ করবে না। আমি আমার সকল সম্পদ দান করে দিবো। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নিজের বসতবাটিও দান করে দেবো। কারণ, ওই বাড়ীতে বসবাসের সময়েই আমার এই অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে। রসুল স. বললেন, এক তৃতীয়াংশ দান করো। এটাই তোমার জন্য উত্তম। এরপর হজরত আবু লুবাবাকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ২৭

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

❑ হে বিশ্বাসীগণ! জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের সহিত বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে না এবং তোমাদিগের পরস্পরের গচ্ছিত দ্রব্যের সম্পর্কেও নহে;

বিশ্বাসভঙ্গ বা আমানতের খেয়ানত সম্পর্কে দু'টি নিষেধাজ্ঞা বিবৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। একটি হচ্ছে— জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করবে না। অপরটি হচ্ছে— তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত দ্রব্যের সম্পর্কেও না। 'লা তাখুনু' অর্থ— বিশ্বাসভঙ্গ কোরো না। শব্দটি এসেছে 'খওনুন' থেকে। খওনুন শব্দটি একটি মূল শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ, কম করা। এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'ওয়াফা'— যার আভিধানিক অর্থ পূর্ণ করা। তাই গচ্ছিত বিশ্বাস অথবা দ্রব্যের যথাসংরক্ষণ বা আমানতের বিপরীতার্থক শব্দ হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, খেয়ানত শব্দটি। বলা হয়েছে— লা তাখুনু (খেয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করো না)। আয়াতের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে— জ্ঞাতসারে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আমানত এবং আল্লাহ্র বান্দাগণের আমানত— দু'টোই রক্ষা করতে হবে। কোনো আমানতেরই খেয়ানত করা যাবে না।

'ওয়া আনতুম তা'লামুন' অর্থ জেনে শুনে। হজরত আবু লুবাবা জেনে শুনে তাঁর গলদেশের দিকে ইঙ্গিত করে ইহুদীদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাদের কণ্ঠচ্ছেদন করা হবে। সে ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে, হে বিশ্বাসীগণ! জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আমানতের খেয়ানত কোরো না। এভাবে বিশেষ একটি ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হয়েও আয়াতের নির্দেশনাটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয়েছে সকল বিশ্বাসীদের উপর।

www.eelm.weebly.com

সুদ্দী বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার যে কোনো ফরজ হুকুম লংঘন করলেও তাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আমানত খেয়ানত করা হয়েছে বলে ধরা যাবে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌পাকের ফরজ নির্দেশ পরিত্যাগ করলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আমানতের খেয়ানত করা হয়। তাই প্রকাশ্য, গোপন— সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালার ফরজ নির্দেশসমূহ প্রতিপালন করতে হবে। অন্যথায় বিশ্বাসভঙ্গ করা হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে। কাতাদা বলেছেন, ফরজ হুকুমসমূহ এবং শরিয়তের সীমারেখা বজায় রাখা আমানতের অন্তর্গত। আর মানুষের গচ্ছিত কথা ও দ্রব্য-সামগ্রী রক্ষা করাও আমানত। আমানতের যথাসংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। এর অন্যথা করা যাবে না।

একটি সন্দেহঃ হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন— আল মুসতাশারু মুউতামিনুন (যার নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, তাকে আমানতদার হতেই হবে)। অর্থাৎ জ্ঞাতসারে সে ভুল পরামর্শ দিবে না। জননী উম্মে সালমা থেকে তিরমিজি এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে মাজাও এ রকম বর্ণনা করেছেন। তাহলে একথা বলা যাবে না কেনো যে, ইশারায় কতল হওয়ার ইঙ্গিত করে হজরত আবু লুবাবা বরং ঠিক কাজই করেছিলেন। পরামর্শ দিয়েছিলেন বিশ্বাসভাজনতার মাধ্যমে। সুতরাং বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে তাঁকে অভিযুক্ত হতে হলো কেনো? এ রকম না করলেই তো পরামর্শদাতা হিসেবে তিনি আমানতের খেয়ানত করতেন।

সন্দেহভঞ্জনঃ এমতোক্ষেত্রে বিশ্বাসভঙ্গের দায় থেকে মুক্ত থাকার জন্য পরামর্শ দান থেকে বিরত থাকাই উত্তম। এমতাবস্থায় নিশ্চুপ থাকলে পরামর্শ দাতার ভূমিকায় আর অবতীর্ণ হতে হয় না। বিশ্বাসভঙ্গের দায়ও বর্তে না। হজরত আবু লুবাবা এ রকম বললেও দায়মুক্ত থাকতে পারতেন যে— আমি মুসলমান। তোমরা অমুসলমান। আমরা এখন পরস্পরের শত্রু। সুতরাং আমরা কেউ কারো পরামর্শদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারি না। আর শত্রুর পরামর্শ গ্রহণযোগ্যও নয়। ওয়াল্লহু আ'লাম।

আল্লামা সুদ্দী সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, প্রথমদিকে সাহাবায়ে কেরাম রসুল স. এর নিকট থেকে যা শুনতেন তা পাত্র অপাত্র নির্বিশেষে সকলকে বলে বেড়াতেন। এভাবে কথাগুলো মক্কার মুশরিকদের কান পর্যন্ত পৌঁছতো। এতে করে অনেক গোপনীয় সংবাদও তারা পেয়ে যেতো। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে ইবনে জারীর প্রমুখ উল্লেখ করেছেন, আবু সুফিয়ান তার সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনা অভিযানে বের হলো। হজরত জিবরাইল তার গতিবিধির সংবাদ রসুল স. কে জানালেন। বললেন, এগিয়ে আসছে আবু সুফিয়ানের লস্কর। মদীনা আক্রমণ করাই তার উদ্দেশ্য। অমুক পথ দিয়ে সে এভাবে এভাবে এগিয়ে আসছে। রসুল স. তখন সাহাবায়ে কেরামের একটি দলকে লক্ষ্য করে বললেন, আবু সুফিয়ানের বাহিনী এখন অমুক স্থানে।

www.eelm.weebly.com

তোমরা তার মোকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হও। আর তোমাদের অভিযানের সংবাদ গোপন রাখো। মুনাফিকেরা এ সংবাদ জানতে পারলে অবশ্যই আবু সুফিয়ানের নিকট পৌঁছে দেবে। অতএব সাবধান! —এ ঘটনাটিকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি। এই হাদিসটি অবশ্য বিরলসূত্র বিশিষ্ট।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ২৮

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

❑ এবং জানিয়া রাখ যে, তোমাদিগের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহেরই নিকট মহাপুরস্কার রহিয়াছে।

এখানে 'ফিত্‌না' শব্দটির অর্থ— পরীক্ষা। শব্দটির আভিধানিক অর্থ— সোনা আগুনে পুড়িয়ে কানের অলংকার বিশেষ নির্মাণ করা। যে পরীক্ষা দ্বারা সত্য-মিথ্যা যাচাই করা হয়, সে পরীক্ষাকেও ফেত্‌না বলা যায়। যেমন এক আয়াতে এসেছে— নাব্‌লুকুম বিশ্‌শাররি ওয়াল খইরি ফিত্‌নাতুন (আমি তোমাদেরকে ভালো ও মন্দের দ্বারা পরীক্ষা করবো)। অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে— আলান্‌নারি ইয়ুফ্‌তানুনা (তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে আগুনের উপরে)। কখনো কখনো সত্যপ্রত্যাখ্যানের পাপ, বিশৃংখলা এবং আযাবের কারণসমূহকেও ফেত্‌না নামে অভিহিত করা হয়। যেমন এরশাদ হয়েছে— ওয়াত্তাকু ফিত্‌নাতান (ফেত্‌নাকে ভয় করো)। আ'লা ফিল ফিতনাতি ছাকাতু (সাবধান! তারা ফেত্‌নাগ্রস্ত হয়েছে)। আল ফিত্‌নাতু আশাদ্দু মিনাল কাতলি (হত্যা অপেক্ষা ফেত্‌না জঘন্যতম)। ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও পাপ ও শাস্তিতে নিপতিত হওয়ার উপকরণ। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এটি একটি পরীক্ষা। তাই আলোচ্য আয়াতে এগুলোকে 'ফিত্‌না' বা পরীক্ষা বলা হয়েছে।

এক বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াতটিও অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু লুবাবাকে উপলক্ষ করে। তাঁর পরিবার-পরিজন ও সম্পদ আটকা ছিলো অবরুদ্ধ বনী কুরায়জার দূর্গে। তাই স্বজন ও সম্পদের মহব্বতে তিনি ইশারার মাধ্যমে গোপন কথা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর নিকটে একটি শিশুকে হাজির করা হলো। তিনি স. শিশুটিকে চুম্বন দান করলেন এবং বললেন, হে আমার আয়েশা। শোনো, শিশু সন্তানের কারণেই অনেকে কৃপণ অথবা কাপুরুষ হয়ে যায়। আবার সন্তান-সন্ততিই কারো কারো জন্য হয় আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত। বাগবী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আবু ইয়ালী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সন্তান-সন্ততি হচ্ছে অন্তরের প্রশান্তি। অথবা ভীরুতা, কৃপণতা ও দুঃখের কারণ।

www.eelm.weebly.com

হজরত খাওলা বিনতে হাকিম থেকে হাকিম বর্ণনা করেছেন, আত্মজরা বেহেশতি শান্তি সমূহের মধ্যে একটি শান্তি— ওই সকল লোকের জন্য, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পূর্ণ অনুগত।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্রই নিকটে মহাপুরস্কার রয়েছে।' এ কথার অর্থ— ওই মহাপুরস্কার লাভের জন্য সচেষ্ট হও, যা রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার নিকটে। এই প্রচেষ্টাকে সফল করতে হলে সন্তান-বাৎসল্য এবং সম্পদ-প্রীতিকে রাখতে হবে শরিয়তের সীমারেখার মধ্যে। সন্তান ও সম্পদের মহব্বতকে কখনো আল্লাহ্তায়ালার প্রসন্নতার উপরে প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ২৯

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

❏ হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ন্যায় অন্যায় পার্থক্য করিবার শক্তি দিবেন, তোমাদিগের পাপ মোচন করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং আল্লাহ্ অতিশয় মঙ্গলময়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ন্যায় অন্যায় পার্থক্য করবার শক্তি দেবেন।' একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীর দল! যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো (তাকওয়া অবলম্বন করো), তবে আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে অন্তর্দৃষ্টি (ফেরাসাত) দান করবেন। সেই অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে তোমরা ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য করতে পারবে।

রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় পাও। তারা আল্লাহ্র নূরের মাধ্যমে দৃষ্টিপাত করে। বোখারী, তিরমিজি। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিবরানী, হজরত আবু উমামা থেকে ইবনে আদী এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে ইবনে জারীরও এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। অন্য এক হাদিসে এসেছে রসুল স. বলেছেন, মুফতীর ফতোয়া দান সত্ত্বেও তুমি তোমার হৃদয়ের ফতোয়া অন্বেষণ করো। হজরত ওয়াবিসা থেকে উত্তমসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী। উল্লেখ্য যে, নফসের ফানা সংঘটিত হওয়ার পরেই কেবল হৃদয়ের (কলবের) ফতোয়া প্রদানের অধিকার জন্মে। ওই ফতোয়া গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিতও হয়। সুফী সাধকগণ বিশেষ আধ্যাত্মিক স্তরসমূহ অতিক্রমের পর লাভ করেন কলব ও নফসের ফানা। লাভ করেন তাকওয়া। ফলে অন্তর্দৃষ্টিও অর্জিত হয় তাঁদের। ওই অন্তর্দৃষ্টিকে তাঁরা বলে থাকেন বাতেনী কাশফ্ (আত্মিক দর্শন)।

www.eelm.weebly.com

ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য করা বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ফুরক্বানুন' শব্দটি। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসকে পার্থক্য করার এই জ্ঞান হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। আল্লাহ্‌তায়ালা এই জ্ঞানদানের মাধ্যমে বিশ্বাসীগণকে করেন সম্মানিত। আর এই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করে লাঞ্ছিত করেন অবিশ্বাসীদেরকে। এই জ্ঞান লাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহ্‌র ভয়)। আর তাকওয়া লাভ করেন কেবল বিশুদ্ধ চিত্ত এবং বিশুদ্ধ প্রবৃত্তির অধিকারীরা। তাঁদেরকে বলা হয় মুত্তাকী (সাবধানী)। মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁদেরকে সকল প্রকার স্খলন ও সন্দেহের দোদুল্যমানতা থেকে চির নিরাপদ করে দিয়েছেন।

মুকাতিল বিন হাইয়্যান বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক মুত্তাকীদেরকে সংশয়াচ্ছন্নতার অন্ধকার থেকে বিশ্বাসের আলোর দিকে পথ প্রদর্শন করেন। হজরত ইকরামা বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক মুত্তাকীদেরকে ভ্রষ্টতার কারাগার থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তিদান করেন। জুহাক বলেছেন, মুত্তাকীদেরকে দেয়া হয় চির অটল বিশ্বাস। ইবনে ইসহাক বলেছেন, মুত্তাকীদের নিকট সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য রেখাটি সুস্পষ্ট।

'ফুরক্বানুন' শব্দটি একটি মূল শব্দ। এ ধরনের মূল শব্দ আরো রয়েছে। যেমন, রুজহানুন, নুকৃসানুন ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে—'তোমাদের পাপ মোচন করবেন, তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্ অতিশয় মঙ্গলময়।' এ কথার অর্থ— হে বিশ্বাসীরা! তোমরা যদি মুত্তাকী হও (আল্লাহ্‌কে ভয় করো), তবে আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য করবার শক্তি তো দান করবেনই, তদুপরি তিনি মাফ করে দেবেন তোমাদের অতীতের সকল গোনাহ্। গোনাহ্ ও তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দেবেন এক অভেদ্য অন্তরায়। ফলে তোমরা লাভ করতে পারবে চিরস্থায়ী ক্ষমা।

হজরত আনাস থেকে বায্‌যার লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে মানুষের সামনে উপস্থিত করা হবে তিনটি বিষয়— বান্দার পাপ ও পুণ্য এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামত (যে নেয়ামতসমূহ আল্লাহ্‌তায়ালা পৃথিবীতে দান করেছিলেন)। তখন বান্দাকে বলা হবে পৃথিবীতে তোমাকে এই নেয়ামতগুলো দেয়া হয়েছিলো তোমার পুণ্যকর্মসমূহের বিনিময়ে। নেয়ামত নিজেই তখন বলবে, হে পরম দয়ালু দাতা আল্লাহ্! তোমার অতুলনীয় সম্মানের শপথ, আমি তো আমার বদলে তার নেক আমলসমূহকে পুরোপুরি পাইনি। তদুপরি তার পাপগুলো তো রয়েছেই। আল্লাহ্‌তায়ালা যদি তখন ইচ্ছা করেন তবে অনুগ্রহ করে বলবেন, আমি আমার এই বান্দার নেক আমলের পুণ্যসমূহ্ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবো এবং ক্ষমা করে দেবো তার পাপসমূহকে। আর তাকে পুরস্কৃত করবো আমার আপন করুণা থেকে।

—৭

www.eelm.weebly.com

হজরত ওয়াসিলা ইবনে আসকাআ থেকে তিবরানী উল্লেখ করেছেন, পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্‌পাক তাঁর এমন এক পুণ্যবান বান্দাকে উঠাবেন, যার আমলনামা থাকবে পুণ্যে পরিপূর্ণ এবং পাপহীন। আল্লাহ্‌পাক তাকে বলবেন, পাপ বলতে তো তোমার কিছুই নেই। এখন বলো, কীভাবে তুমি পুরস্কৃত হতে চাও— পুণ্যের বিনিময়ে, না আমার করুণায়? বান্দা বলবে, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমি তো জানো আমি কখনো তোমার অবাধ্যতা করিনি। অতএব তুমি আমাকে আমার পুণ্যের বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করো। আল্লাহ্‌পাক বলবেন, তাই হোক। এবার তবে তোমার পুণ্যের বিপরীতে পৃথিবীতে আমি যে সকল নেয়ামত দান করেছিলাম, সেগুলোর হিসেব করতে থাকো। এভাবে হিসেব করতে গিয়ে দেখা যাবে তার পুণ্যকর্মের চেয়ে অনেক বেশী নেয়ামত তাকে দেয়া হয়েছে পৃথিবীতেই। আল্লাহ্‌পাক তখন বলবেন, হে আমার বান্দা! তুমি কি তোমার পুণ্যকর্মকে আমার নেয়ামতের উপযুক্ত বিবেচনা করো? বান্দা আবেদন করবে, হে আমার আল্লাহ্‌! আমার পুণ্যকর্মের বিনিময়ে নয়, তুমি আমাকে নেয়ামত দান করো তোমার অফুরন্ত করুণাভাণ্ডার থেকে। এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার জন্যই রসুল স. অন্যত্র এরশাদ করেছেন, তোমাদের পুণ্যকর্ম তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার নেক আমলও কি আপনাকে বাঁচাতে পারবে না? তিনি স. বললেন, না— যদি আল্লাহ্‌তায়ালার করুণা দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত না হই। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

উম্মত জননী আয়েশা সিদ্দিকা থেকে বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পুণ্যকর্ম করতে থাকো। কিন্তু নির্ভরশীল হও আল্লাহ্‌তায়ালার দয়ার উপর। আল্লাহ্‌তায়ালার দয়া না হলে কেবল পুণ্যকর্মের মাধ্যমে বেহেশতে পৌঁছানো যায় না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার পুণ্যকর্মও কি আপনাকে জান্নাতে পৌঁছাবে না? তিনি স. বললেন, না— যদি না আমি আল্লাহ্‌তায়ালার দয়া দ্বারা আচ্ছাদিত হই (এই অবস্থাই আমার সার্বক্ষণিক অবস্থা)।

আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, ওয়াল্লহু জুলফাদ্বলিল্ আজিম (আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়া বা ফজলের অধিকারী)। আল্লাহ্‌পাকের এই বিশেষ দয়া যারা পায় তারাই লাভ করেন মুক্তি। আল্লাহ্‌পাক তাঁর দাসদেরকে পুণ্যকর্মের বিনিময় প্রদানের অংগীকার করেছেন। এই বিনিময় প্রদান করা হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে। পুণ্যকর্মসমূহকে তিনিই দয়া করে বানিয়েছেন মুক্তির কারণ বা অবলম্বন। তাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র দয়াতেই কেবল মুক্তিলাভ সম্ভব। দুনিয়াতে যে অজস্র নেয়ামত দেয়া হয়, মানুষের সকল নেক আমলের মাধ্যমেও সে সকল নেয়ামতের উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় না। এরপর আখেরাতে যদি কোনো নেয়ামত

www.eelm.weebly.com

দেয়া হয় তবে তাতো দয়া করেই দেয়া হবে। আর তা বান্দার পারিশ্রমিক হবে না, হবে পুরস্কার। বিষয়টি এ রকম— কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি তার দাসকে বললো, অমুক কাজটি করো, তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে। এটা হচ্ছে গোলামের প্রতি মনিবের দয়া। গোলাম তো তার মনিবের কাজকর্মের বিনিময়ে নির্ধারিত পারিশ্রমিক পেয়েই থাকে। পারিশ্রমিক ও পুরস্কার কখনো এক কথা নয়।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'তোমাদের পাপমোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন' কথাটির অর্থ হবে— আল্লাহ্পাক তোমাদের ক্ষুদ্র পাপসমূহকে মুছে দিবেন এবং ক্ষমা করে দিবেন বৃহৎ পাপসমূহকে।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ৩০

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَ يَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ○

❑ স্মরণ কর, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করিবার জন্য, হত্যা করিবার অথবা নির্বাসিত করিবার জন্য এবং তাহারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও ষড়যন্ত্র করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ।

রসুল স. এর হিজরত পূর্ব সময়ে তাঁকে হত্যা, বন্দী অথবা নির্বাসনদানের যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিলো সেই ষড়যন্ত্রের কথা বিবৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আল্লাহ্পাক স্বয়ং তাঁর প্রিয় রসুলের বিরুদ্ধে সংঘটিত ওই ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করেছিলেন। আয়াতের শেষাংশে সেকথাটিই বলে দেয়া হয়েছে এভাবে—'এবং আল্লাহ্ও ষড়যন্ত্র করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ।' উল্লেখ্য যে, ষড়যন্ত্রপ্রবণতা একটি দোষ। আর আল্লাহ্তায়ালা সকল দোষ থেকে মুক্ত, পবিত্র। কিন্তু ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেই ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করতে হয় বলে এখানে 'আল্লাহ্ও ষড়যন্ত্র করেন' এ রকম বলা হয়েছে।

ষড়যন্ত্রটি সংঘটিত হয়েছিলো এভাবে— ইবনে ইসহাক, আবদুর রাজ্জাক, ইমাম আহমদ, ইবনে জারীর, আবু নাঈম, ইবনে মুনজির ও তিবরানী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এবং আবদুর রাজ্জাক ও আবদ্ বিন হুমাইদ হজরত কাতাদা থেকে উল্লেখ করেছেন, গোপনে গোপনে ইসলাম প্রসার লাভ করছে জানতে পেরে আবু জেহেল ও অন্যান্য অংশীবাদী কুরায়েশ নেতারা চিন্তিত হয়ে পড়লো। তারা খবর পেলো ইতোমধ্যেই মদীনার কিছু লোক এসে মোহাম্মদ স. এর ধর্মে দীক্ষা নিয়ে গিয়েছে মক্কার কোনো কোনো মুসলমান হিজরত করে ঘাঁটি গেড়েছে

www.eelm.weebly.com

সেখানে। ইতোপূর্বে আবিসিনিয়ায় গিয়েও উপস্থিত হয়েছে মুসলমানদের একটি দল। এভাবে তারা মক্কার বাইরের লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে চলেছে। এখন যদি মোহাম্মদও গোপনে অন্যত্র গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে মক্কা আক্রমণ করে বসে তবে কী উপায় হবে? উপায় উদ্ভাবনের জন্য তারা পরামর্শ সভা আহ্বান করলো। একটি বড় বাড়ি ছিলো তাদের পরামর্শস্থল। নির্দিষ্ট দিনে সেখানে একত্রিত হলো তারা। ওই দিনটিকে বলা হয় ইয়াওমুজ্‌জহমত বা অভিসম্পাত দিবস। এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির রূপ ধারণ করে পশমী চাদরে আবৃত হয়ে ইবলিস নিজেও উপস্থিত হলো সেই পরামর্শ সভায়। সে দরজায় দাঁড়াতেই পরামর্শ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা বলাবলি করতে লাগলো এই প্রবীণ ব্যক্তিটি কে? ইবলিস বললো, আমার বসবাস নজদ প্রদেশে। শুনতে পেলাম আপনারা এক দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদনার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছেন। শুনে ভাবলাম আমিও হয়তো আপনাদেরকে এ ব্যাপারে কোনো অব্যর্থ পরামর্শ দিতে সক্ষম হবো। পরামর্শ সভার সদস্যরা বললো, বেশ, বেশ। আপনি আসন গ্রহণ করুন। দেখা গেলো পরামর্শ সভায় উপস্থিত হয়েছে কুরায়েশদের অধিকাংশ প্রভাবশালী নেতারা। উপস্থিত হয়েছে উত্‌বা বিন রবিয়া, শায়বা বিন রবিয়া, তাঈমা বিন আদী, নজর বিন হারেস, আবু বোখতারী বিন হিশাম, আবু জেহেল বিন হিশাম, মাসবিয়া ও মুনাব্বাহ্ ভ্রাতৃদ্বয়, উমাইয়া বিন খালফ্, আবু সুফিয়ান বিন হরব, যোবায়ের বিন মুতয়েম এবং হাকেম বিন হাজ্জাম। শেষোক্ত ব্যক্তিত্রয় পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কুরায়েশ ও আরো দু'টি গোত্রের কতিপয় নেতাও উপস্থিত ছিলো সেখানে। কিন্তু তাদের নাম জানা যায় না।

শুরু হলো পরামর্শ বিনিময়। একজন বললো, মোহাম্মদের অনুসারী দিন দিন বেড়েই চলেছে। এভাবে তার দল শক্তিশালী হলে সে নিশ্চয় আমাদের উপর চড়াও হবে। সুতরাং এখনই আমাদেরকে সম্মিলিতভাবে এর বিহিত করতে হবে। আবুল বোখতারী বললো, মোহাম্মদকে শৃংখলাবদ্ধ করে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কোনো ঘরে আটকে রাখা হোক। নজদের বৃদ্ধরূপী ইবলিস বললো, প্রস্তাবটি আমার মনঃপুত নয়। কারণ তাকে এভাবে আটকে রাখলে তার সঙ্গী সাথীরা এ সংবাদ পাবেই। তখন তারা জান বাজী রেখে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করবে। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও তখন তারা পিছপা হবে না। সকলে বললো, শায়েখ (বৃদ্ধ) তো ঠিক কথাই বলেছেন। এবার আবুল আসওয়াদ বললো, তাকে মক্কা থেকে বের করে দেয়া হোক। যেখানে খুশী সেখানে চলে যাক সে। তার কাজ সে করে বেড়াক। আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। নজদের শায়েখ বললো, এ রকম করাও ঠিক হবে না। এ রকম করলে সে অন্যত্র গিয়ে নির্বিঘ্নে তার অনুসারীর সংখ্যা বাড়াতে থাকবে। এভাবে সে তার দলবল নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে। তখন সমর্পণ অথবা সন্ধি ছাড়া তোমাদের কোনো গত্যন্তর থাকবে না। অতএব অন্য কোনো কৌশল নির্ধারণ করো।

www.eelm.weebly.com

আবু জেহেল বললো, আমি একটি প্রস্তাব করতে চাই। মনে হয় প্রস্তাবটি আপনাদের সকলের মনঃপুত হবে। সকলে বললো, ঠিক আছে এবার আপনার প্রস্তাবের কথাটাই শুনি। আবু জেহেল বললো, প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে তেজোদীপ্ত যুবক নির্বাচন করা হোক। এভাবে সকল যুবক একত্রিত হয়ে একযোগে আক্রমণ করে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করবে মোহাম্মদকে। এভাবে সকল গোত্র হত্যাকাণ্ডে শরিক হতে পারবে। আর মোহাম্মদের নিকটজনেরা সকল গোত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াবারও সাহস পাবে না। খুব বেশী হলে হয় তো রক্তপণ দাবী করে বসতে পারে। সম্মিলিতভাবে সেই রক্তপণের দাবী পরিশোধ করাও আমাদের জন্য হবে সহজ। নজদী শায়েখ বললো, হ্যাঁ, এটা একটা প্রস্তাবের মতো প্রস্তাব বটে। এরপর সে আবৃত্তি করলো একটি কবিতা যার মর্মার্থ এ রকম—

অনেক প্রস্তাবই তো শোনা হলো। কিন্তু শেষোক্ত প্রস্তাবটিই হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাব। একযোগে হানতে হবে তলোয়ারের আঘাত। আর এই পরিকল্পনাটির মধ্যেই রয়েছে সম্মান, গৌরব ও প্রশংসা।

আবু জেহেলের প্রস্তাবটিকে নজদী শায়েখের মতো অন্যান্যরাও সর্বান্তঃকরণে মেনে নিলো। ওই আসরেই প্রস্তাবটি কার্যকর করার দিনক্ষণ নির্ধারণ করে ফেললো তারা।

হজরত জিবরাইল এ সংবাদ পৌঁছে দিলেন আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় রসুলের নিকট। আরো বললেন, আবু জেহেলের দল ঠিক করেছে আজ রাতে তারা আপনাকে হত্যা করতে আসবে। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে হিজরতের নির্দেশ দিয়েছেন। আজ রাতেই আপনাকে গৃহত্যাগ করতে হবে।

রাত হলো। রসুল স. হজরত আলীকে ডেকে বললেন, আজ রাতেই আমাকে চলে যেতে হবে। তুমি আমার এই সবুজ চাদরটি মুড়ি দিয়ে আমার এই শয্যায় শুয়ে থেকো। গভীর রাতে আবু জেহেলের দল এসে রসুল স. এর গৃহের চতুর্দিকে ঘিরে ফেললো। তাদের পরিকল্পনা ছিলো ভোর বেলায় রসুল স. যখন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসবেন, তখন সকলে মিলে একযোগে তাঁর উপরে চালাবে তলোয়ারের আঘাত। রসুল স. তাদের উপস্থিতি টের পেলেন। হজরত আলীকে বললেন, এবার তুমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ো। বাইরে আবু জেহেলের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিলো। সে তার সাথীদেরকে বললো, মোহাম্মদ বলে, তোমরা তার অনুসরণ করলে নাকি আরব ও আজমের বাদশাহ্ হয়ে যাবে। মৃত্যুর পরে তোমাদেরকে নাকি আবার জীবিত করা হবে এবং দেয়া হবে আরদানের বাগানের মতো বাগান। আর তার অনুসরণ না করলে তোমরা তার হাতেই নিহত হবে। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে নিক্ষেপ করা হবে দোজখের আগুনে।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. এক মুষ্টি মাটি নিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। ওই মাটি আবু জেহেলের লোকদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করে যেতে যেতে বললেন, হ্যাঁ আমি এ রকম বলেছি। যারা আমার লোকদের মাধ্যমে নিহত হবে, তুমিও তাদের একজন। রসুল স. কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মাটি গিয়ে পড়লো তাদের সকলের মস্তকে। আল্লাহ্পাক তাদের চোখের সামনে সৃষ্টি করে দিলেন অন্তরায়। রসুল স. 'ইয়াসিন ওয়াল কুরআনিল হাকিম.......লা ইউব্ সিরুন' পর্যন্ত পাঠ করে তাদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেলেন। তারা কেউই তাঁকে দেখতে পেলো না। হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক এসে অপেক্ষমান আততায়ীদেরকে বললো কাকে খুন করার জন্য অপেক্ষা করছো তোমরা? তারা বললো, মোহাম্মদকে। লোকটি বললো, আল্লাহ্ তোমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম! সে তো তোমাদের সকলের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে তোমাদের চোখের সামনে দিয়েই চলে গিয়েছে। ভেবে দেখো, এখন কী করবে তোমরা। লোকটির কথা শুনে প্রত্যেকে নিজ নিজ মাথায় হাত দিয়ে দেখলো সত্যি সত্যিই কে যেনো তাদের মাথায় মাটি ছুঁড়ে মেরেছে। তবু লোকটির কথায় তারা পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলো না। একজন ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে এসে বললো, না লোকটি ঠিক বলেনি। আমি দেখলাম, মোহাম্মদ চাদর মুড়ি দিয়ে তার নিজের বিছানাতেই শুয়ে রয়েছে। ভোর হলো। হজরত আলী গাত্রোত্থান করলেন। বাইরে বেরিয়ে আসতেই তাঁকে দেখে আততায়ীরা বলে উঠলো, লোকটি তো তাহলে ঠিক কথাই বলেছিলো। সুরা তওবার তাফসীরে যথাস্থানে এই ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হবে ইনশাআল্লাহুতায়ালা।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী রসুল স. কে জীবনের চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। তাই তিনি জীবন দিয়ে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন রসুল স.কে। রসুল স. এর নির্দেশে তাঁরই শয্যায় তাঁরই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। ভোরে গাত্রোত্থানের সময় আবু জেহেলের লোকেরা তাঁকে চিনতে পেরে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালি দিলো। বললো, তুমি নিচ। তোমার কারণেই আমরা প্রতারিত হলাম।

হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, ইমাম জয়নুল আবেদীন একবার বললেন, 'মিনান্নাসি মাইইয়াশ্তারি নাফসাহুব তিগাআ মারদ্বতিল্লাহি' (মানুষের মধ্যে যারা নিজের সত্তাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষায় বিক্রয় করে।) এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল ছিলেন হজরত আলী। তিনিই আল্লাহ্পাকের সন্তোষ অন্বেষণের জন্যে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এরপর ইমাম জয়নুল আবেদীন পাঠ করলেন হজরত আলীর একটি কবিতা। কবিতাটির মর্মার্থ এ রকম—

'যে সকল লোক মক্কার পাথুরে রাস্তায় বিচরণ করে, চুম্বন করে কালো পাথর এবং প্রদক্ষিণ করে কাবাগৃহ— তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিত্বের জন্য আমি আমার জীবন সমর্পণ করেছি। তিনি ছিলেন আল্লাহ্তায়ালার রসুল। আমি

www.eelm.weebly.com

চেয়েছিলাম অংশীবাদীদের রক্তলোলুপ তরবারীর আঘাত যেনো তাঁর পবিত্র দেহ পর্যন্ত না পৌঁছে। অবশেষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে রক্ষা করেছেন। সে রাতে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে দান করেছিলেন পর্বতগুহার নিরাপদ আশ্রয়। আর এদিকে আমি সারারাত অংশীবাদীদের হন্তারক অপেক্ষার সামনে শহীদ অথবা বন্দী হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, উপরোক্ত ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি। আবুল হাকীক বলেছিলো, মোহাম্মদকে বন্দী করতে হবে। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করবার জন্য।' আবু জেহেল বলেছিলো, হত্যা করার কথা। আর আবুল আসওয়াদ বলেছিলো, নির্বাসনে পাঠানোর কথা। তাই এখানে বলা হয়েছে 'হত্যা করবার অথবা নির্বাসিত করবার জন্য।'

'মকর' অর্থ ষড়যন্ত্র। এখানে বলা হয়েছে— 'ইয়াম কুরুনা ওয়া ইয়াম কুরুল্লহ্' (তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও ষড়যন্ত্র করেন)। 'মকর' শব্দটির আভিধানিক অর্থ— কোনো পরিকল্পনার উদ্দেশ্যকে প্রতিহত করা। ষড়যন্ত্র হতে পারে দু'রকমের। কোনো মহৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য পরিকল্পনা করা হলে তা হবে উত্তম ষড়যন্ত্র। আর নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র বলা যাবে সেই পরিকল্পনাকে যা অসৎ উদ্দেশ্যে করা হয়। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্তায়ালা নিজের পক্ষ থেকে কখনোই কোনো ষড়যন্ত্র করেন না। তবে তিনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অসৎ ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করেন। এখানেও তেমনটি ঘটেছে। ষড়যন্ত্র করেছে আসলে আবু জেহেলের দল। আর আল্লাহ্তায়ালা তা প্রতিহত করেছেন। আর এই অবস্থাটিকেই প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও ষড়যন্ত্র করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ। এ রকম বলা হয়েছে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। আর আল্লাহ্তায়ালার ষড়যন্ত্রকে যদি সরাসরি ষড়যন্ত্রও বলা হয়, তবে তা হবে উত্তম ষড়যন্ত্র। কারণ অনুত্তম সকল কিছু থেকে আল্লাহ্তায়ালা মুক্ত, পবিত্র। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিলো সত্যের নূর। আর আল্লাহ্তায়ালা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সেই নূরকে করে তুলেছিলেন অধিকতর প্রোজ্জ্বল। এভাবেই আল্লাহ্তায়ালা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নিশ্চিহ্ন করে দেন অসত্যকে।

শেষে বলা হয়েছে— ওয়াল্লহু খইরুল মাকিরীন (এবং ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ)। আল্লাহ্তায়ালার সকল কর্মই শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। সুতরাং তিনি যা কিছু করেন তা উত্তমই হবে। অনুত্তম কখনোই হবে না। কোনো কোনো

www.eelm.weebly.com

তাফসীরকার বলেছেন, মুশরিকদের ষড়যন্ত্রকে অকার্যকর করে দেয়াকেই এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র ষড়যন্ত্র। কেউ কেউ আবার বলেছেন, ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধ গ্রহণ করাকে এখানে ষড়যন্ত্র আখ্যা দেয়া হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আল্লাহ্‌পাকের ষড়যন্ত্রের প্রকৃতি এ রকম— অবাধ্যদেরকে অবকাশ প্রদান করা এবং পৃথিবীর সুখ সম্ভোগের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা। একারণেই হজরত আলী বলেছেন, বিত্ত-বৈভবের অধিকারীরা যদি তাদের বিত্ত-বৈভবকে আল্লাহ্‌পাকের মকর (ষড়যন্ত্র)রূপে বুঝতে না পারে, তবে বুঝতে হবে সে প্রবঞ্চিত।

উবাইদ বিন উমায়েরের বর্ণনা সূত্রে ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, মতলব বিন ওয়াদাআ বলেছেন, রসুল স. এর পিতৃব্য আবু তালেব একবার বললেন, প্রিয় বৎস! তুমি কি জানো, তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে কী শলাপরামর্শ করছে? রসুল স. বললেন, তারা আমাকে হত্যা, বন্দী অথবা নির্বাসন দানের পরামর্শ করছে। আবু তালেব বললেন, এ কথা তোমাকে কে বলেছে? তিনি স. বললেন, আমার প্রভুপ্রতিপালক। আবু তালেব বললেন, তোমার প্রতিপালক অতি উত্তম। তিনি তোমার অনুগত। রসুল স. বললেন, না আমিই তাঁর একান্ত অনুগত। আর তিনি আমার কল্যাণকামী। এই কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি। এই বর্ণনাটি অবশ্য দুর্বল, বরং পরিত্যক্ত। কারণ রসুল স. এর বিরুদ্ধে হত্যা, বন্দী এবং নির্বাসনের পরিকল্পনা করা হয়েছিলো তাঁর হিজরতের প্রাক্কালে। আর আবু তালেব পরলোকগমন করেছিলেন হিজরতের তিন বছর পূর্বে। এ কথা বলেছেন আল্লামা ইবনে কাসীর।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলো উকবা বিন আবী মুয়ীত, তোয়াইল বিন আদী এবং নজর বিন হারেস। পরে তাদেরকে হত্যা করা হয়। নজর বিন হারেসকে বন্দী করেছিলেন হজরত মেকদাদ। অন্য দু'জনের সঙ্গে তাকেও হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হলে হজরত মেকদাদ নিবেদন করেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! নজর তো আমার বন্দী। রসুল স. বলেছিলেন, সে আল্লাহ্‌তায়ালার কিতাব সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে। তাই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। নজরের ওই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

وَاِذَا تُتۡلٰی عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتُنَا قَالُوۡا قَدۡ سَمِعۡنَا لَوۡ نَشَآءُ لَقُلۡنَا مِثۡلَ هٰذَاۤ ۙ اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِیۡرُ الۡاَوَّلِیۡنَ ○

❒ যখন তাহাদিগের নিকট আমার আয়াত পাঠ করা হয় তাহারা তখন বলে, 'আমরা তো শ্রবণ করিলাম, ইচ্ছা করিলে আমরাও ইহার অনুরূপ বলিতে পারি, ইহা তো শুধু সেকালের লোকদিগের উপকথা।'

কোরআনের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলো নজর বিন হারেস। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে— 'যখন তাদের নিকট আমার আয়াত পাঠ করা হয় তখন তারা বলে'; এক বচনের স্থলে এ রকম বহুবচন বোধক বাক্য ব্যবহারের কারণ এই যে— নজর একা এ রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলেও তাকে সমর্থন করেছিলো অন্যান্য অবিশ্বাসীরা। তাই তাদের সকলকেই এখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকারী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন হজরত সালেহের উটনীকে হত্যা করেছিলো একজন। অথচ ওই ঘটনার বিবরণদানকালে অবাধ্য ছামুদ জাতির সকলকে হত্যাকারী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ হত্যাকারী একজন হলেও সমর্থক হিসেবে অন্যান্যরাও ছিলো ওই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা তো শ্রবণ করলাম, ইচ্ছে করলে আমরাও অনুরূপ বলতে পারি।' চরমতম মূর্খতা প্রকাশ পেয়েছে অভিশপ্ত নজরের এই উদ্ধৃতিটিতে। কারণ তার এই অপকথনটি উচ্চারণের অনেক আগেই কোরআনের অনুরূপ কোনো বাণী রচনার জন্য সকল অবিশ্বাসী কবি ও পণ্ডিতদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার সাধ্য কোনো কালে কারো হয়নি। নজর অভিশপ্ত ও চরম মূর্খ ছিলো বলেই এ রকম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পেরেছিলো।

শেষে বলা হয়েছে— 'এটা তো শুধু সেকালের লোকদের উপকথা।' নজরের এ কথাটিও নিতান্ত মূর্খজনোচিত। কোনো জ্ঞানী ও বিবেচক ব্যক্তি কখনোই আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র বাণীবৈভবকে অতীতকালের জনমনরঞ্জনমূলক কিংবদন্তী বা উপকথা হিসেবে অভিহিত করতে পারে না। বাগবী লিখেছেন, নজর বিন হারেস ছিলো ব্যবসায়ী। ব্যবসা উপলক্ষে সে পারস্য এবং ইরাক অঞ্চলে গমনাগমন করতো। সেখানে বসতো অনারবদের বিভিন্ন কল্পকাহিনীর আসর। সেগুলো সে মন দিয়ে শুনতো। সেখানকার ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে সে তাদের উপাসনালয়ে

www.eelm.weebly.com

রুকু ও সেজদা করতে দেখেছিলো। তাই সে রসুল স. এর নামাজ ও কোরআন পাঠকে তুলনা করেছিলো বিধর্মীদের কল্পকাহিনী এবং উপাসনা পদ্ধতির সঙ্গে। বলেছিলো— আমরা তো শ্রবণ করলাম, ইচ্ছে করলে আমরাও অনুরূপ বলতে পারি, এটা তো শুধু সেকালের লোকদের উপকথা।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৩২, ৩৩

وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝

❑ স্মরণ কর, তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আল্লাহ্! ইহা যদি তোমার পক্ষ হইতে সত্য হয় তবে আমাদিগের উপর আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও।'

❑ আল্লাহ্ এরূপ নহেন যে, তুমি তাহাদিগের মধ্যে থাকিবে অথচ তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন, এবং তিনি এইরূপ নহেন যে, তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিবে অথচ তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে অভিশপ্ত নজর বিন হারেসকে লক্ষ্য করে। তার সমর্থক গোষ্ঠীও ছিলো আল্লাহ্‌তায়ালার কালামের প্রতি বিদ্রূপকারীদের মধ্যে গণ্য। তাই সকলকে অপরাধী ধরে নিয়ে নজরের বিদ্রূপাত্মক উক্তিকে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে-'তারা বলেছিলো, হে আল্লাহ্! এই কোরআন যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয় তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করো কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও।'

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, যখন অতীত যুগের উম্মতগণের কাহিনী প্রত্যাদেশরূপে অবতীর্ণ হতে শুরু করলো তখন নজর বিন হারেস বললো, আমিও ইচ্ছে করলে এ রকম কাহিনী রচনা করতে পারবো। এ সকল উপাখ্যান তো আগের যুগের লোকেরা অনেক আগেই রচনা করেছে। এ কথা শুনে হজরত ওসমান বিন মাজউন বললেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করো, মোহাম্মদ স. তো সত্য কথা বলছেন। নজর বললো, আমিই সত্য কথা বলছি। হজরত ওসমান বললেন, মোহাম্মদ স.তো উচ্চারণ করেন তৌহিদের বাণী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' (আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই)। আর তুমি হচ্ছো অংশীবাদী। নজর বললো, আমিও বলি আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। দেবী

www.eelm.weebly.com

প্রতিমাগুলোকে তো আমি আল্লাহ্ বলি না— বলি, আল্লাহ্র কন্যা। এরপর সে বলতে শুরু করলো, হে আল্লাহ্! এই কোরআন যদি সত্য হয় এবং তা তোমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয় তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করো। কিংবা আমাদেরকে অন্য কোনো কঠিন শাস্তি প্রদান করো। তার এই কথা ছিলো কোরআনের প্রতি সরাসরি উপহাস। সে সত্যি সত্যি চেয়েছিলো আবরাহার হস্তি বাহিনীর প্রতি যেরূপ প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিলো অথবা হজরত লুতের সম্প্রদায় কিংবা অন্যান্য অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপর যেমন বিভিন্ন প্রকার শাস্তি আপতিত হয়েছিলো, সে ধরনের কোনো শাস্তি তারও উপর আপতিত হোক। তখন অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াতটি— 'ছাআলা ছায়েলুম বিআজাবিঁউ ওয়াক্বি' (যাচ্ঞাকারী যাঞ্চা করেছিলো অবতরণ যোগ্য শাস্তির)।

আতা বলেছেন, নজর বিন হারেস সম্পর্কে কমপক্ষে দশটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সে সব সময় চাইতো তার উপর আযাব অবতীর্ণ হোক। শেষে তার কাংখিত আযাব অবতীর্ণ হয় বদর যুদ্ধের সময়। প্রথমে বন্দী করা হয় তাকে। তারপর করা হয় হত্যা।

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন, এবং তিনি এরূপ নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তো আমারই রহমতের প্রতিভূ। সুতরাং আপনার উপস্থিতিতে আমার গজব প্রকাশিত হবে কিরূপে? গজব অপেক্ষা আমার রহমতই যে প্রবল। আর অপরাধীরা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে তবুও তো আমি আমার গজবকে প্রকাশ করতে পারবো না। কারণ আমি যে গফুর (ক্ষমা পরবশ)।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ৩৪

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

❑ এবং তাহাদিগের কি-বা বলিবার আছে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না যখন তাহারা লোকদিগকে মসজিদুল-হারাম হইতে নিবৃত্ত করে? যদিও তাহারা উহার তত্ত্বাবধায়ক নহে, সাবধানিগণই উহার তত্ত্বাবধায়ক কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশ ইহা অবগত নহে।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বিভিন্ন রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন। মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, এই আয়াতটি পূর্বোক্ত আয়াতের (৩৩) বিষয় বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত। আগের আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলতে শুরু করলো, এবার তাহলে আমরা নিশ্চিত যে

www.eelm.weebly.com

আমাদের উপর আযাব আসবে না। কারণ আমাদের মধ্যে রয়েছেন মোহাম্মদ। আর আমরা আল্লাহ্তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করছি। তাদের এ কথার মধ্যেও রয়েছে প্রচ্ছন্ন উপহাস। তাই তাদের উক্তিকে নাকচ করে দিয়ে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে—'এবং তাদের কি-বা বলবার আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। যখন তারা লোকদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে নিবৃত্ত করে।' এ কথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জুলুমের কারণে মুসলমানেরা হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে। এভাবে তারা বিশ্বাসীদেরকে নিবৃত্ত করেছে কাবাগৃহের তাওয়াফ থেকে এবং মসজিদুল হারামে নামাজ পাঠের সুযোগ থেকে। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালা তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করবেন না কেনো?

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আগের আয়াতের বিষয়বস্তুর সঙ্গে এই আয়াতের বক্তব্যবিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। হজরত আনাস থেকে বোখারী লিখেছেন, 'হে আল্লাহ্! এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্যি হয় তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করো। কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও।'—এই জঘন্য প্রার্থনাটি করেছিলো আবু জেহেল। তার ওই প্রার্থনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করেছিলেন—আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং তিনি এরূপ নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মহাবিশ্বের রহমত। তাই আপনার উপস্থিতিতে আমি আমার গজবকে প্রকাশ করবো না। এ কথাটির মধ্যে এই বক্তব্যটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, রসুল স. এর হিজরতের পর আল্লাহ্পাক মক্কার মুশরিকদের উপর অবতীর্ণ করবেন আযাব। কারণ তখন রসুল স. তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন না। এ রকম তাফসীর করেছেন ইবনে জারীর। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আয়াতের এই অংশটি অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কায়। অপর অংশটি অবতীর্ণ হয়েছিলো মদীনায় হিজরতের পর। আর সেটি হচ্ছে—'এবং তিনি এরূপ নন যে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।' এ কথার অর্থ—প্রধান প্রধান সাহাবীগণকে নিয়ে রসুল স. মদীনায় চলে যাওয়ার পরও কতিপয় অক্ষম মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন মক্কায়। তাঁরা আল্লাহ্তায়ালার নিকটে তাদের অক্ষমতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন। এক সময় তাঁরাও মক্কা পরিত্যাগ করলেন। তখন কাফেরদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার কোনো অন্তরায় আর রইলো না। আর তখনই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতটি। বদর যুদ্ধের দিন সেই শাস্তি নিয়েছিলো বাস্তব রূপ। এভাবে মক্কা বিজয় পর্যন্ত তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিলো বিভিন্ন যুদ্ধের মাধ্যমে। ইসতেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা যে আল্লাহ্র গজব

www.eelm.weebly.com

অবতীর্ণ হওয়ার অন্তরায়, অন্য আয়াতেও সে কথার বিবরণ এসেছে। যেমন একস্থানে বলা হয়েছে— 'ওয়া লাওলা রিজালুম মু'মিনুনা ওয়া নিসায়ুম্ মু'মিনাতুন লাম তা'লামুহুম...........লাও তাজাইয়্যাহা লাআয্যাবনাল্লাজীনা কাফারু মিনহুম আযাবান আলীমা।'

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্পাক তাঁর নবী ও নবীর অনুসারীগণকে অন্যত্র সরিয়ে না নিয়ে কোনো সম্প্রদায়ের উপর আযাব অবতীর্ণ করেন না। তাই রসুল স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দ মক্কায় অবস্থান করার সময় অবাধ্য মক্কাবাসীর উপর আযাব অবতীর্ণ হয়নি। তাঁরা সকলে যখন মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় গিয়ে হাজির হলেন, তখন মক্কার কাফেরদের উপর আল্লাহ্র আযাব অবতীর্ণ হওয়ার কোনো অন্তরায় আর রইলো না। সে কথাই আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে এভাবে— 'এবং তাদের কি-বা বলবার আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যখন তারা লোকদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে নিবৃত্ত করে?' রসুল স. এর মহা তিরোধানের পর হজরত আবু মুসা আশআরী একবার বললেন, ওহে মুসলিম জনতা! দু'টি কারণে তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র আযাব থেকে নিরাপদ ছিলে। তার মধ্যে একটি কারণ এখন আর নেই, মহাপ্রস্থান ঘটেছে রসুল স. এর। এখন কারণ অবশিষ্ট রয়েছে মাত্র একটি। সেটি হচ্ছে— ইসতেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা। এই কারণটি অবশিষ্ট থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে তিরমিজি লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্পাক আমার উম্মতকে আযাব থেকে রক্ষা করার জন্য দু'টি অবলম্বন দান করেছেন। তার মধ্যে একটি অন্তর্হিত হবে আমার পৃথিবী থেকে প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে। অপর অবলম্বনটি (ইসতেগফার) জারী থাকবে মহা প্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত। তিরমিজি নিজেই এই বর্ণনাটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, উদ্ধৃত বক্তব্যটি সম্ভবত হজরত আবু মুসার নিজস্ব বক্তব্য। বক্তব্যটিকে রসুল স. এর বক্তব্য হিসেবে প্রমাণ করা কঠিন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আগের আয়াতের 'তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে (ওয়াহুম ইয়াস্তাগফিরুন)' কথাটির মাধ্যমে মক্কায় মুশরিকদের ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। 'হুম' (তারা) সর্বনামটি এখানে মুশরিকদের স্থলাভিষিক্ত তাই আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুশরিকেরাও কাবাগৃহ তাওয়াফ করতো এবং বলতো গুফরানাকা, গুফরানাকা (আমরা ক্ষমাপ্রার্থী, আমরা ক্ষমাপ্রার্থী)। তাদের এই ক্ষমা প্রার্থনাকেই আযাব অবতীর্ণ হওয়ার অন্তরায়রূপে আগের আয়াতে (৩৩) উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— এবং তিনি এরূপ নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

www.eelm.weebly.com

ইয়াজিদ বিন রুম্মান সূত্রে ইবনে জারীর লিখেছেন, মুশরিকেরা একে অপরকে বলতো, মোহাম্মদ একাই আল্লাহ্‌র কথা বলে যাচ্ছে। তারপর তারা প্রার্থনা করতো, হে আল্লাহ্! মোহাম্মদের কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করো। এ রকম বলেও তারা শাস্তি পেতো না। তাই দিনান্তে পেরেশান হয়ে দোয়া করতো, গুফরানাকাল্‌লাহুম্মা (হে আল্লাহ্ আমরা ক্ষমাপ্রার্থী)। তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো বলেই তখন তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করা হয়নি। এক আয়াতে বলা হয়েছে—আপনার প্রতিপালক কোনো জনপদবাসীকে অংশীবাদীতার কারণে ধ্বংস করেন না— যতক্ষণ তারা থাকে শুদ্ধাচারী। এতে করে বুঝা যায়, অংশীবাদীরা শুদ্ধাচারী থাকা পর্যন্ত আল্লাহর আযাব থেকে অব্যাহতি পেয়ে থাকে। কাতাদা এবং সুদ্দী বলেছেন, 'মুশরিকেরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্‌তায়ালা আযাব অবতীর্ণ করেন না'— এ কথার অর্থ মুশরিকেরা যদি মুমিন হয় তবে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বেঁচে যেতে পারে। এভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা খুলে রেখেছেন সংশোধনের পথ। এভাবেই মুশরিকদেরকে দেয়া হয়েছে তওবা ও আযাব থেকে অব্যাহতি লাভের উৎসাহ ও সুযোগ।

কেউ কেউ বলেছেন, রসুল স. যে আল্লাহ্‌তায়ালার কত প্রিয়, সে কথা জানাতে এবং তাঁর অনুসরণীয় পদ্ধতিতে ক্ষমা প্রার্থনা করলে যে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, সে কথা বুঝাতেই বলা হয়েছে— আল্লাহ্ এরূপ নন যে, ... অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন (৩৩)। রসুল স. এর সংসর্গ গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করাই ছিলো এমতো বক্তব্যের উদ্দেশ্য।

মুজাহিদ ও ইকরামা বলেছেন, 'তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে' কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে—তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। এভাবে বক্তব্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম—এবং আল্লাহ্ এরূপ নন যে, ইসলাম গ্রহণ করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ওয়ালেবী বর্ণনা করেছেন, সৃষ্টির সূচনালগ্নে এ বিষয়টি স্থিরকৃত হয়েছে যে, কারো কারো ইসলাম গ্রহণ হবে বিলম্বিত। তাই তাৎক্ষণিক অস্বীকৃতির কারণে সঙ্গে সঙ্গে আযাব অবতীর্ণ হয় না। দেয়া হয় দীর্ঘ দিনের অবকাশ। এই অবকাশদানের ফলে যাদের অদৃষ্টে হেদায়েত রয়েছে, তারা নির্ধারিত সময়ে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়। তাই দেখা যায়, প্রথম দিকে ইসলামের ঘোর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও অনেকে পরবর্তীতে মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। যেমন—হজরত আবু সুফিয়ান, হজরত সাফওয়ান, হজরত ইবনে উমাইয়া, হজরত ইকরামা ইবনে আবু জেহেল, হজরত সুহাইল ইবনে ওমর, হজরত হাকিম ইবনে হাজ্জাম প্রমুখ (রাদ্বিআল্লাহু আনহুম)। আবদুল ওয়াহাবের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, 'তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে' কথাটির অর্থ

www.eelm.weebly.com

হবে—ওই সকল মুশরিকের পরবর্তী বংশধরেরা ক্ষমা প্রার্থনা করবে (ইসলাম গ্রহণ করবে)। তাই তাদের সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণের পূর্বে আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে আযাব দিবেন কিরূপে?

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে সর্বগ্রাসী আয়াবের কথা। পূর্বের কোনো কোনো অবাধ্য সম্প্রদায়কে আল্লাহ্তায়ালা সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সর্বশেষ রসুলের উম্মতকে আল্লাহ্তায়ালা সেভাবে সমূলে উচ্ছেদ করবেন না। কারণ তারা অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করবে। কেউ গ্রহণ করবে দ্রুত। কেউ বিলম্বে। কেউ আবার নিজেরা গ্রহণ না করলেও গ্রহণ করবে তাদের পরবর্তী বংশধরেরা। আল্লাহ্পাকই এই সুযোগ তাদের দিয়েছেন। সে কারণে এ কথা বলেছেন যে— তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন, আল্লাহ্পাক এ রকম নন।

এরপর বলা হয়েছে—'যদিও তারা তার তত্ত্বাবধায়ক নয়, সাবধানীগণই তার তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ এ কথা অবগত নয়।' এ কথার অর্থ— মুসলমানদেরকে হিজরত করতে বাধ্য করে মুশরিকেরা পেয়েছে কাবা শরীফের একচ্ছত্র তত্ত্বাবধানের অধিকার। তাদের এই অধিকার অবৈধ। মুত্তাকীরাই (সাবধানীরাই) কাবা শরীফের যোগ্য তত্ত্বাবধায়ক। সুতরাং মুশরিকেরা কাবা শরীফের মোতোওয়াল্লির পদ ধরে রাখতে পারবে না। অচিরেই মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের এই পদমর্যাদা ছিনিয়ে নেয়া হবে। তখন থেকে মুত্তাকীরাই হতে থাকবে কাবা গৃহের চিরস্থায়ী মোতোওয়াল্লী। কিন্তু এই গুঢ় তত্ত্বটি অধিকাংশ লোক জানে না।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত রেফাআ বিন রাফে' বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার হজরত ওমরকে নির্দেশ দিলেন, সকল মুহাজিরকে সমবেত করো। হজরত ওমর সকল মুহাজিরকে সংবাদটি জানালেন। আনসার সাহাবীগণও উপস্থিত হলেন রসুল স. এর দরবারে। মুহাজির সাহাবীগণ সম্পর্কে কোনো বিশেষ আয়াত অবতীর্ণ হয় কিনা, সে কথা জানাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। সকলে সমবেত হলে রসুল স. তাঁর প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলেন। মুহাজিরগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শুধু কি তোমরা উপস্থিত হয়েছো? তাঁরা বললেন হ্যাঁ। আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিবেশীরাও (আনসারেরাও) সমবেত হয়েছেন। তিনি স. বললেন, আমাদের প্রতিবেশী ও নিকটজনেরা তো আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা নিশ্চয় কোরআনের এই বাণী শুনেছো—ইন্ আও'লিয়াউনু ইল্লাল মুত্তাকুনা ওয়ালাকিন্নান আকছারাহুম লা ইয়া'লামুন (যদিও তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়, সাবধানীগণই এর তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ এ তত্ত্বটি অবগত নয়)। সুতরাং তোমরা মুত্তাকী হও। উত্তমরূপে অবগত হও যে, মুত্তাকী না হলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের প্রতি সুদৃষ্টি দান করবেন না। ফলে তোমরা তখন হয়ে পড়বে অপরাধী।

www.eelm.weebly.com

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ○

❑ কাবা গৃহের নিকট শুধু শিস ও করতালি দেওয়াই তাহাদিগের সালাত, সুতরাং সত্যপ্রত্যাখ্যানের জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ করো।

'ওয়া মাকানা সালাতুহুম ইনদাল বাইতি ইল্লা মুকাআঁও ওয়া তাস্‌দিয়্যাহ্' অর্থ— কাবাগৃহের নিকট শুধু শিস ও করতালি দেয়াই তাদের সালাত। সালাত অর্থ প্রার্থনা, উপাসনা বা ইবাদত। 'মুকা' অর্থ শিস। এ রকম বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত হাসান। আসলে মুকা বলা হয় ওই সকল ধুসর কীটকে, যাদের আওয়াজ শিস দেয়ার মতো। হেজাজ অঞ্চলে ওই সকল কীট দেখা যায়। তাস্‌দিয়াতান অর্থ দুই হাতে তালি বাজানো। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কার মুশরিকেরা বিবস্ত্র হয়ে তাওয়াফ করতো। তাওয়াফ করার সময় শিস দিতো ও দুই হাতে তালি বাজাতো। হজরত ইবনে ওমর থেকে ওয়াহেদীও এ রকম বলেছেন।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, মুজাহিদ বলেছেন, আবদুদ্ দার জনপদের কিছু লোক একবার রসুল স. এর তাওয়াফের সময় তাঁর মুখোমুখি হলো এবং তাচ্ছিল্যভরে মুখে আঙ্গুল রেখে শিস দিলো। ওই ঘটনাই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এই বর্ণনার প্রেক্ষিতে 'মুকা' শব্দটির অর্থ হবে মুখে আঙ্গুল দেয়া এবং 'তাস্‌দিয়্যাতান' শব্দটির অর্থ হবে শিস। পর্বত গহ্বরে উচ্চারিত আওয়াজের প্রতিধ্বনিকে বলা হয় 'সদা'। তাস্‌দিয়্যাও বলা হয় ওই প্রতিধ্বনিকে। উন্মুক্ত প্রান্তর পাহাড় অথবা সুউচ্চ অট্টালিকার মধ্যে আওয়াজ করলে চারদিক থেকে যে প্রতিধ্বনি শোনা যায় ওই প্রতিধ্বনিকেই অভিধানে 'সদা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ বলেছেন, রসুল স. এর কাবাগৃহ তাওয়াফের সময় বিধর্মী কুরায়েশরা বিদ্রূপবশতঃ তাঁর সামনে শিস ও করতালি দিতো। এই প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

একবার জাফর বিন আবী রবীয়া হজরত আবু সালমা বিন আবদুর রহমানকে মুকা এবং তাস্‌দিয়্যা শব্দ দু'টোর অর্থ জিজ্ঞেস করলেন। হজরত আবু সালমা তাঁর দুই হাত বিশেষভাবে মিলিয়ে তাতে নিম্নমুখী হয়ে ফুঁ দিলেন। এর ফলে তা থেকে নির্গত হলো শিস দেয়ার মতো আওয়াজ। বলেছেন ইবনে জারীর।

www.eelm.weebly.com

মুকাতিলের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. একবার মসজিদুল হারামে নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হলেন। তখন তাঁর ডান পাশে দাঁড়িয়ে দু'জন লোক শিস দিতে শুরু করলো। আর বাম পাশে দু'জন দাঁড়িয়ে শুরু করলো করতালি। রসুল স. এর ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। ওই অভিশপ্ত লোকগুলো ছিলো আবদুদ্ দার গোত্রের।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, মুসলমানদেরকে মসজিদুল হারাম, নামাজ এবং অন্যান্য ধর্ম কর্ম থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যেই অংশীবাদীরা তাস্দিয়্যা করতো (করতালি দিতো)। এ রকম অপকর্ম তারা হরহামেশাই করতো। তাই উপহাসার্থে আলোচ্য আয়াতে এই অপকর্মগুলোকে তাদের নামাজ বলা হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে—'সুতরাং সত্যপ্রত্যাখ্যানের জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ করো।' এখানে 'শাস্তি ভোগ করো' বলে বুঝানো হয়েছে তাদের বদর যুদ্ধে নিহত হওয়াকে। অথবা আখেরাতের অনন্ত আযাবকে। এই আযাবের আবেদন তারা নিজেরাই জানিয়েছিলো। বলে ছিলো— আউইউতিনা বি আ'জাবিন আলিম (কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও (আয়াত ৩২)। এছাড়া তারা কাবা শরীফের তত্ত্বাবধায়ক সেজেছে। এই অনধিকার চর্চার বিষয়টিও শাস্তিযোগ্য। তাই এখানে বলা হয়েছে— তোমরা শাস্তি ভোগ করো।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ○ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ○

❒ আল্লাহের পথ হইতে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ তাহাদিগের ধন-সম্পদ্ ব্যয় করে, তাহারা ধন-সম্পদ ব্যয় করিতেই থাকিবে অতঃপর উহা তাহাদিগের মনস্তাপের কারণ হইবে, ইহার পর তাহারা পরাভূত হইবে এবং যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে জাহান্নামে একত্রিত করা হইবে।

www.eelm.weebly.com

❑ ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ কুজনকে সুজন হইতে পৃথক করিবেন এবং কুজনদিগের এককে অপরের উপর রাখিবেন, অতঃপর সকলকে স্তূপীকৃত করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন, ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

কালাবী বলেছেন, বদরের যুদ্ধে গমনের সময় কুরায়েশদের বারোজন নেতা যোদ্ধাদেরকে উট জবাই করে খাইয়েছিলো। তারা ছিলো—আবু জেহেল বিন হিশাম, রবীয়া বিন আবদুস্ শামসের দুই পুত্র, উতবা ও শায়বা, হাজ্জাজের দুই পুত্র, মামবিয়্যাহ ও মুনাব্বাহ্, আবুল বোখ্তারী ইবনে হিশাম, নজর বিন হারেস, হাকিম বিন হাজ্জাম, উবাই বিন খালফ, জময়া বিন আসওয়াদ, হারেস বিন আমের বিন নওফেল এবং আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব। তারা তাদের লোকদেরকে গড়ে প্রতিদিন দশটি করে উট জবেহ্ করে খাইয়েছিলো। সেই ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করেই উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'আল্লাহ্র পথ থেকে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে।'

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, আমার নিকট জুহুরী, মোহাম্মদ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন হাব্বান, আসেম বিন ওমর বিন কাতাদা এবং হোসাইন বিন আবদুর রহমান উল্লেখ করেছেন, বদর যুদ্ধে কুরায়েশদের শ্রেষ্ঠ নেতারা নিহত হলো। কেউ কেউ হলো বন্দী। অন্যেরা প্রতিশোধ গ্রহণের কসম খেয়ে পালিয়ে গেলো মক্কার দিকে। পিতৃহারা ইকরামা বিন আবু জেহেল, সাফওয়ান বিন উমাইয়া ও অন্য একজন হাজির হলো ওই লোকদের নিকট যারা লাভবান হয়েছিলো আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য বাহিনীর মাধ্যমে। বললো, হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! মোহাম্মদ তোমাদের শৌর্যবীর্যকে উড়িয়ে দিয়েছে। হত্যা করেছে তোমাদের শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দকে। এর প্রতিশোধ নিতে হবে। তোমরা যারা ব্যবসার মাধ্যমে সম্পদ লাভ করেছো তাদের কর্তব্য হবে পুনরায় সমর শক্তি গড়ে তোলার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করা। লোকেরা তাদের কথা মান্য করলো এবং যুদ্ধের জন্য অর্থ দান করতে লাগলো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইন্নাল্লাজিনা কাফারু থেকে ইয়াহ্শুরুন্ পর্যন্ত (আয়াত ৩৬) অবতীর্ণ হয়েছে এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করে।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হাকাম বিন উত্বা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আবু সুফিয়ান সম্পর্কে। তিনি মুশরিকদের জন্য চল্লিশ আউকিয়া স্বর্ণ ব্যয় করেছিলেন। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং আমবরী বলেছেন, আবু সুফিয়ানই এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ। তিনি দুই হাজার সৈন্যকে বদর পরবর্তী উহুদ যুদ্ধের জন্য তৈরী করেছিলেন। আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনাটি একটি সাধারণ

www.eelm.weebly.com

নির্দেশনা। যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা সকলেই এই আয়াতের লক্ষ্য। আর উপরে বর্ণিত লোকেরাও এর অন্তর্ভুক্ত।

এরপর বলা হয়েছে—'অতঃপর তা তাদের মনোস্তাপের কারণ হবে, এরপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যারা মানুষকে নিবৃত্ত করতে চায়, তারা কখনোই সফল হবে না। পরাভূত তারা হবেই। আর তখন ওই বৃথা অর্থ ব্যয় হবে তাদের মনঃপীড়নের কারণ। আর তাদের শেষ গন্তব্য হিসেবে নরকের লেলিহান শিখা তো অপেক্ষা করছেই। ওই জ্বলন্ত হুতাশনেই তাদেরকে একত্রিত করা হবে।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে—'এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ কুজনকে সুজন থেকে পৃথক করবেন এবং কুজনদের এককে অপরের উপর রাখবেন, অতঃপর সকলকে স্তূপীকৃত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।' এখানে খাবিছা (কুজন) অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বা কাফের। আর তৈয়্যেব (সুজন) অর্থ বিশ্বাসী বা মুমিন। আগের আয়াতে 'তারা পরাভূত হবে' অথবা 'তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে'— কথা দু'টোর সঙ্গে রয়েছে এই আয়াতের সংযোগ। এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে কীভাবে পরাভূত করা হবে এবং কীভাবে জাহান্নামে একত্রিভূত করা হবে — সে কথা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদেরকে একজনের উপর একজন — এভাবে স্তূপীকৃত করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। এ রকমও হতে পারে যে, খবছ শব্দটির অর্থ অপবিত্র সম্পদ— যা অংশীবাদীরা ব্যয় করেছিলো রসুল স. এর বিরুদ্ধে আর তুইয়্যেব অর্থ— ওই পবিত্র সম্পদ যা বিশ্বাসীরা ব্যয় করেছিলেন রসুল স. এর সাহায্যার্থে।

'ইয়ারকুমাহু' অর্থ স্তূপীকৃত করে। রাকামুন অর্থ একত্রিত করা। মারকুম অর্থ মেঘের ঘনঘটা — পুঞ্জীভূত মেঘ। অর্থাৎ পুঞ্জীভূত মেঘের মতো সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে স্তূপীকৃত বা পুঞ্জীভূত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

শেষে বলা হয়েছে—এরাই ক্ষতিগ্রস্ত। এ কথার অর্থ, আল্লাহ্‌তায়ালার পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে যারা ধন-সম্পদ ব্যয় করে তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র আযাবকে আমন্ত্রণ জানায়। আর অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

www.eelm.weebly.com

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ○

❑ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে বল ' যদি তাহারা বিরত হয় তবে যাহা অতীতে হইয়াছে আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিবেন, কিন্তু তাহারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তীদিগের দৃষ্টান্ত তো রহিয়াছে।'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বলে দিন, এখনও সময় আছে সত্য ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত হও। বিরত হও আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা থেকে। যদি এ রকম করো তবে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের ইতোপূর্বের সকল পাপ মার্জনা করবেন। যদি বিরত না হও তবে নিশ্চিত জেনো, পূর্ববর্তী অবাধ্য উম্মতদের মতো তোমাদের উপরেও নেমে আসবে কঠোর শাস্তি।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর শত্রুপক্ষের অনেক লোক গ্রহণ করেন ইসলামের চিরন্তন আশ্রয়। যেমন—হজরত আবু সুফিয়ান বিন হরব, হজরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া, হজরত ইকরামা বিন আবু জেহেল, হজরত আমর ইবনে আস প্রমুখ। বদর যুদ্ধে যারা বন্দী হয়েছিলেন তাদের মধ্যেও কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করেন। যেমন হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব, হজরত আকিল বিন আবু তালেব, হজরত নওফেল বিন হারেস, হজরত আবুল আস বিন রবী, হজরত উজায়ের বিন উমায়ের আবদারী, হজরত ছায়েব বিন আবু জায়েশ, হজরত খালেদ বিন হিশাম মখজুমী, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আবিস্ সাইব, হজরত মতলব বিন খাত্তাব, হজরত আবু বেদআ, হজরত ছাহমী, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আবী উবাই বিন খালফ্, হজরত ওয়াহাব বিন উমায়ের জমাহী, হজরত সুহায়েল বিন উমর আমেরী, উম্মত জননী হজরত সাওদার ভ্রাতা হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জাম্‌য়া, হজরত কায়েস বিন সানায়েব এবং হজরত উমাইয়া বিন খালফের মুক্ত করা ক্রীতদাস হজরত মিস্‌তাস।

হজরত সায়েব বিন উবায়েদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আঙ্গুরের ফিদিয়া প্রদানের পর। হজরত আদী বিন খাইয়ার মুসলমান হয়েছিলেন মক্কা বিজয়ের দিন। হজরত ওলিদ বিন মুগিরাকে বন্দী করেছিলেন হজরত হিশাম এবং হজরত খালেদ। তিনি মুক্তিপণ হিসেবে আঙ্গুরের ফিদিয়া দিয়ে মুক্ত হয়েছিলেন প্রথমে।

www.eelm.weebly.com

তারপর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সকলে তখন এই ভেবে বিস্মিত হয়েছিলেন যে, বন্দী অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করলেও তো তিনি মুক্ত হতে পারতেন। অযথা মুক্তিপণ দিলেন কেনো? তিনি বলেছিলেন, বন্দী অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ আমার মনোপুত নয়। লোকে হয়তো ভাববে শাস্তি অথবা মুক্তিপণ এড়ানোর জন্যই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমি ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম সত্যের আকর্ষণে, সর্বান্তঃকরণে। তিনি ছিলেন ক্রীতদাস। তাই ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর মনিবের নিকট। এদিকে রসুল স. তাঁর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে মুক্ত হয়ে রসুল স. এর মহাঅন্তর্ধানের বৎসরে তিনি রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হতে সক্ষম হন।

হজরত আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, ইসলামের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হলে আমি রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হই এবং নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার পবিত্র হস্ত প্রসারিত করুন। আমি ইসলামে বায়াত গ্রহণ করতে চাই। তিনি স. হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তিনি স. বললেন, হে আমর! কী হলো তোমার? আমি বললাম, আমার একটি শর্ত রয়েছে। তিনি স. বললেন, বলো। আমি বললাম, আমার অতীতের সকল গোনাহ্ যেনো মাফ করে দেয়া হয়। রসুল স. বললেন, হে আমর! তুমি কি এ কথা জানো না যে—ইসলাম অতীতের সকল পাপ মুছে দেয়। হিজরতও মোচন করে অতীতের পাপরাশি। আর হজও ঢেকে দেয় হজপূর্ব সময়ের সকল গোনাহ্কে। মুসলিম।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ৩৯, ৪০

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

❐ এবং তোমরা তাহাদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকিবে যতক্ষণ না ফিত্না দূরীভূত হয় এবং আল্লাহের দ্বীন সামগ্রীকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তাহারা বিরত হয় তবে তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

❐ যদি তাহারা মুখ ফিরায় তবে জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ই তোমাদিগের অভিভাবক এবং কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফেত্না দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্র দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।' ফেত্না অর্থ বিশৃংখলা। আর পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বিশৃংখলা হচ্ছে শিরিক

www.eelm.weebly.com

(অংশীবাদিতা)। আলোচ্য বাক্যে ফেত্‌না অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ কথার অর্থ—মুশরিকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত শিরিক পরিত্যাগ না করবে, অথবা মুসলমানদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে জিযিয়া দিতে সম্মত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম করতে হবে তাদের বিরুদ্ধে। আলোচ্য নির্দেশনাটিতে এ রকম বলা হয়নি যে, সকল অংশীবাদী ও অবিশ্বাসীকে যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে হবে। এ রকম মনে করা হলে আলোচ্য আয়াতটি চলে যাবে জিযিয়া সম্পর্কিত অন্য একটি আয়াতের বিরুদ্ধে, যেখানে বলা হয়েছে— মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করে যদি অবিশ্বাসীরা জিযিয়া দিতে সম্মত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোরো না। সুতরাং—এই আয়াতের নির্দেশনাটি দাঁড়াচ্ছে এ রকম—অবিশ্বাসীরা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত অথবা জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে পূর্ণ অনুগত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এখানে দ্বীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হবে শক্তি, বিজয় এবং একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা। 'দ্বীন' শব্দের এ রকম অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে কামুস গ্রন্থে।

হজরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এক সময় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে পৃথিবীর সকল গৃহে। অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতা হয়ে যাবে ইসলামের সম্পূর্ণ অধীন। সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য হবে কেবল আল্লাহ্‌র। আহমদ।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।' এ কথার অর্থ— 'অবিশ্বাসীরা যদি অবিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে তবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাদেরকে এই সর্বোত্তম কর্মের যথা পুরস্কার প্রদান করবেন। আল্লাহ্‌তায়ালা সকল কিছুর সম্যক দ্রষ্টা।' তাঁর অতুলনীয় দৃষ্টিপাতের মধ্যে সংঘটিত হয়ে চলেছে সকলের কর্মকাণ্ড। ভালো ও মন্দ—কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। তাই তিনি অবিশ্বাসীদেরকে যেমন শাস্তি দান করবেন, তেমনি পুরস্কৃত করবেন অবিশ্বাস পরিত্যাগকারীদেরকে।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমাকে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ওই সময় পর্যন্ত সংগ্রাম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে—যতক্ষণ না তারা বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্' প্রতিষ্ঠা করে নামাজ এবং প্রদান করে জাকাত। যে এ রকম করবে আমার পক্ষ থেকে তার জীবন ও সম্পদ হয়ে যাবে সুরক্ষিত। আল্লাহ্‌ই তাদের অভ্যন্তরীণ হিসাব গ্রহণ করবেন (তিনি বিচার করবেন, তারা তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্যে, না অন্তরের তাগিদে ইসলাম গ্রহণ করেছে)। বোখারী ও মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ছয়জন সাহাবী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, হাদিসটি সুবিদিত (মুতাওয়াতির)।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য বাক্যটির উদ্দেশ্য এ রকমও হতে পারে যে—এবং যদি তারা বিরত হয়, হয়ে যায় মুসলমান অথবা জিম্মি (জিযিয়া কর প্রদাতা), তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের আমলের সম্যক দ্রষ্টা। এমতাবস্থায় তোমরা আর যুদ্ধ কোরো না। আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং ইসলাম অথবা কুফরের কারণে পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করবেন।

ক্বারী ইয়াকুব এখানে উল্লেখিত ইয়ামালুন (তারা করে) শব্দটিকে পড়তেন তা'মালুন (তোমরা করো)। তাঁর উচ্চারণটিকে গ্রহণ করলে 'আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা' কথাটি সম্পৃক্ত হবে মুসলমানদের আমলের সঙ্গে। তখন অর্থ দাঁড়াবে এ রকম, হে মুসলিম বৃন্দ! তোমরা তোমাদের মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করো সেরূপ আচরণ করো জিম্মিদের সঙ্গে। যেহেতু তারা জিযিয়া দিয়ে তোমাদের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেছে, সেহেতু তোমরা আর তাদের প্রতি কোনো অত্যাচার কোরো না। অবশেষে তোমাদের ও তাদের আমলের যথা বিনিময় প্রদান করা হবে। তোমাদেরকে দেয়া হবে পুরস্কার এবং তাদেরকে দেয়া হবে শাস্তি।

কতিপয় সাহাবীর বর্ণনাসূত্রে সাফওয়ান বিন সালিম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ভালো করে শুনে নাও, যে লোক জিম্মিদের প্রতি অত্যাচার করবে, তাদের প্রাপ্য পুরোপুরি পূরণ করবে না, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু গ্রহণ করবে অথবা তাদের উপর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা অর্পণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো। আবু দাউদ। এই হাদিসের আলোকে 'যদি তারা বিরত হয়' কথাটির উদ্দেশ্য হবে দু'টি। একটি হচ্ছে—যদি তারা অবিশ্বাস থেকে বিরত হয়। অপরটি হচ্ছে—যদি তারা জিযিয়া প্রদান করে যুদ্ধ থেকে বিরত হয়।

আল্লামা বায়যাবী বলেছেন, 'ইয়ামালুন' এর স্থলে 'তা'মালুন' উচ্চারণ করলে অর্থ হবে এ রকম— হে মুসলমানেরা! তোমরা জেহাদ করছো, ইসলামের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছো, মানুষকে কুফুরীর অন্ধকার থেকে ইমানের দিকে আসতে বলছো—তোমাদের এ সকল আমলকে আল্লাহ্‌তায়ালা দেখছেন। এ সকল আমলের জন্য তিনি তোমাদেরকে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করবেন। বায়যাবীর এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, বিষয়টিকে ছেড়ে দিতে হবে তকদীরের উপর। অর্থাৎ মুসলমানেরা কেবল ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত থাকবে। যার তকদীরে ইমান রয়েছে সে ইমান গ্রহণ করবে, আর যার তকদীরে ইমান নেই সে ইমানহীন অবস্থাতেই থেকে যাবে। আল্লাহ্‌তায়ালা সকল কিছুর সম্যক দ্রষ্টা। তাই তাঁর অধিকারেই সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে পুরস্কার ও তিরস্কার প্রদানের বিষয়টি।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে—'যদি তারা মুখ ফিরায় তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক এবং কতো উত্তম অভিভাবক এবং কতো উত্তম সাহায্যকারী।' এ কথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! অবিশ্বাসীরা যদি ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে এবং যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত না হয় তবে তাতে করে তোমাদের চিন্তিত হবার কিছু নেই। কারণ আল্লাহ্তায়ালাই তোমাদের অভিভাবক, বন্ধু। বন্ধু কখনো বন্ধুকে ধ্বংস হতে দেয় না। আর অভিভাবক সব সময় তার অভিভাবকাধীনদেরকে সর্বোত্তম সহায়তা দান করে থাকে। আল্লাহ্তায়ালাও বিশ্বাসীদের সর্বোত্তম সাহায্যকারী। সুতরাং তোমরা কেবল আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হও। কাফেরদের প্রতাপ ও যুদ্ধ প্রস্তুতিকে আমলেই এনো না। সংগ্রাম করো। ক্রমাগত সংগ্রাম চালিয়ে যাও (যতক্ষণ না তারা শুভ বুদ্ধিকে মান্য করে ইসলামের পথে আসে অথবা জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে স্বীকার করে তোমাদের বশ্যতাকে)।

www.eelm.weebly.com

দশম পারা

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৪১

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ
بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۭ وَ
اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

❒ আরও জানিয়া রাখ যে যুদ্ধে যাহা তোমরা লাভ কর তাহার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহের, রসূলের, রসূলের স্বজনদিগের, পিতৃহীনদিগের, দরিদ্রদিগের এবং পথচারীদিগের, যদি তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহে এবং তাহাতে মীমাংসার দিন যাহা আমি আমার দাসের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছিলাম যখন দুই দল পরস্পরে সম্মুখীন হইয়াছিল এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গণিমত) সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। বিশেষভাবে বিবৃত হয়েছে গণিমতের এক পঞ্চমাংশ (খুমুস) সম্পর্কে। প্রথমেই বলা হয়েছে— 'ওয়ালামু আন্নামা গণিম্‌তুম মিন্ শাইইন' (আরো জেনে রাখো যে যুদ্ধে যা লাভ করো)। এ কথার অর্থ— যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যে সকল সম্পদ তোমাদের অধিকারে আসে। বিদ্রোহী অবিশ্বাসীদের নিকট থেকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া সম্পদ, যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত অবিশ্বাসীর পরিত্যক্ত সম্পদ—সব কিছুই গণিমতের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মুসলিম দেশের প্রশাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে একজন অথবা দুইজন মুসলমান যদি কাফেরদের রাজ্যে গিয়ে যুদ্ধ করে তাদের নিকট থেকে কিছু সম্পদ ছিনিয়ে আনে তবে বায়তুল মালে খুমুস প্রদান করা তাদের উপর ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি চারজন

www.eelm.weebly.com

মুসলমান দারুল হরবের (কাফের সাম্রাজ্যের) যুদ্ধবাজদের নিকট থেকে সম্পদ ছিনিয়ে আনে তবে খুমুস প্রদান করা তাদের উপরে হবে ওয়াজিব। মুহিত গ্রন্থে রয়েছে, ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, এমতোক্ষেত্রে মুসলিম যোদ্ধার সংখ্যাগত দিকটি বিবেচ্য। এ রকম অভিযানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গেলে কমপক্ষে দশজনের একটি প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, একাই একজন দারুল হরব থেকে সম্পদ ছিনিয়ে আনলেও তার পক্ষে খুমুস প্রদান করা হবে ওয়াজিব। কেননা ওই সম্পদ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে গণ্য। তাই ওই সম্পদের উপর পুরোপুরি প্রযোজ্য হবে গণিমতের বিধান।

ইমামে আজম এবং অন্য এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমত এই যে, চুরি করা সম্পদ গণিমতের মাল হতে পারে না। কারণ তা বলপূর্বক অর্জন করা হয়নি। সরিয়ে নেয়া হয়েছে গোপনে। বিধর্মীদের দেশ থেকে গোপনে কোনো সম্পদ আনলে তার দৃষ্টান্ত হবে গভীর অরণ্য থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করা অথবা অরণ্যবাসী কোনো প্রাণীকে শিকার করার মতো। এভাবে অর্জিত সম্পদকে গণিমত বলা যায় না। তাই তার উপর খুমুসের বিধানও প্রযোজ্য হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, মুসলিম শাসকের অনুমতি সাপেক্ষে একজন বা দু'জন যদি বিধর্মীদের রাজ্য থেকে কৌশলে কোনো সম্পদ অধিকার করে আনে, তবে সেই সম্পদের উপর সর্বসম্মতিক্রমে খুমুস ওয়াজিব হবে। কেননা মুসলিম শাসকের অনুমতি প্রদানের অর্থ তাঁর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার করা। নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গেলে অবশ্যই অভিযাত্রীদের সংখ্যা চার অথবা চারের অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য যে, শাসকের অনুমতি ছাড়া কোনো মুসলমান বিধর্মী রাজ্যে প্রবেশ করলে তার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করাও শাসকের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এ রকম না করলে ইসলাম ও মুসলমানদের নামে অপবাদ ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলে বিধর্মীদের রাজ্যে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে আর কেউ চোর বলতে পারবে না।

'যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করো'—কথাটির মধ্যে সম্পদের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যত কমই হোক না কেনো তার খুমুস প্রদান করা ওয়াজিব—সুঁই অথবা সূতা হলেও। হজরত উবাদা বিন সামেত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সূতা ও সুঁই জমা করে দিও। আর গণিমতের সম্পদকে মুক্ত রাখো অপহরণ থেকে। কিয়ামতের দিন গণিমতের সম্পদ অপহরণকারীরা লজ্জিত হবে। দারেমী। ইমাম শাফেয়ী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ওমর বিন শোয়াইবের বর্ণনা সূত্রে। একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবু

www.eelm.weebly.com

দাউদ। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এ কথাটি—এ কথা শুনে এক লোক, যার হাতের মধ্যে ছিলো এক গোছা চুল, সে বললো, আমি এই চুলটুকু নিয়েছিলাম আমার খচ্চরের জিন ঠিক করার জন্য। রসুল স. এ কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে, ওই পশমটুকু আমার এবং বনী আবদুল মুত্তালিবের অংশ থেকে তোমাকে দেয়া হলো।

এরপর বলা হয়েছে— ফা আন্না লিল্লহি খুমুসাহ্ (তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র)। এ কথার অর্থ—যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশের মালিকানা আল্লাহ্‌র। এ কথা এখানে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে। অবশিষ্ট চার অংশ সম্পর্কে এ রকম দৃঢ় ঘোষণা নেই। তাই হানাফী মতাবলম্বীগণ বলেছেন, অন্য চার অংশের অধিকারীদের উপরে খুমুস প্রদান করা ওয়াজিব নয়। কারণ খুমুস তাদের অধিকারভূত কোনো বিষয় নয়। খুমুস তাদের মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হলেই কেবল এ কথা বলা যেতে পারতো যে খুমুস তাদের উপর ওয়াজিব। কিন্তু আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে খুমুসকে শুরু থেকেই আল্লাহ্‌তায়ালার মালিকানার অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। জাকাতের প্রসঙ্গ টেনে বিষয়টিকে আরো ভালোভাবে বুঝে নেয়া সম্ভব। বিত্তশালীদের উপর জাকাত ওয়াজিব। কারণ এক্ষেত্রে সম্পদের পুরো মালিকানা দেয়া হয়েছে জাকাতদাতাদেরকে। আল্লাহ্‌তায়ালাই জাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু জাকাতের উপর তাঁর নিজের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেননি— যেমন করেছেন খুমুসের বেলায়। আর জাকাত দরিদ্র জনসাধারণের হক। তাই তা রসুল স. ও তাঁর নিকটজনের জন্য হারাম করা হয়েছে। আর খুমুসের মালিকানা সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্‌র। তাই রসুল স. ও তাঁর নিকটজনদের জন্য খুমুসকে করা হয়েছে হালাল। আল্লাহ্‌পাকের নিকট থেকে সরাসরি প্রাপ্ত এই খুমুস তাঁর রসুল কীভাবে ব্যয় করবেন, পরের বাক্যে সে কথা বলে দেয়া হয়েছে এভাবে—

'ওয়ালির্ রসুলি ওয়ালি জিলকুরবা' (রসুলের, রসুলের স্বজনদের)। 'রসুলের স্বজন' কথাটির ব্যাখ্যায় আলেমগণের মতপার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কুরায়েশ গোত্রের সকলেই রসুলের স্বজন। মুজাহিদ এবং ইমাম জয়নাল আবেদীনের মতে রসুলের স্বজন কেবল বনী হাশেমের লোকেরা। ইমাম শাফেয়ীর মত হচ্ছে, আব্‌দে মান্নাফের দুই পুত্র হাশেম ও মুত্তালিবের আওলাদেরা রসুলের স্বজন। আব্‌দে মান্নাফের অপর দুই পুত্র আবদুস্ শামস্ এবং নওফেলের বংশধরেরাও এর অন্তর্ভুক্ত।

www.eelm.weebly.com

বিশ্বস্তসূত্রে হজরত জাবের বিন মুত্য়েম থেকে ইমাম শাফেয়ী বর্ণনা করেছেন রসুল স. খুমুসের অংশ দিয়েছিলেন কেবল বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে। আবদুস্ শামস্ ও বনী নওফেলকে তিনি খুমুসের অংশ দেননি। বোখারীও তার সহিহ্ পুস্তকে এ রকম লিখেছেন। ইমাম শাফেয়ীর বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত যোবায়ের বিন মুত্য়েম বলেছেন, রসুল স. স্বজন হিসেবে খুমুসের সম্পদ বণ্টন করেছিলেন বনী হাশেম এবং বনী মুত্তালিবের মধ্যে। আমি এবং হজরত ওসমান বিন আফফান আবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরাও তো বনী হাশেমের অন্তর্ভুক্ত, যেমন অন্তর্ভুক্ত বনী মুত্তালিব। এ কথা বলা সত্ত্বেও তিনি স. আমাদেরকে খুমুসের অংশ দিলেন না। বরং এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, বনী হাশেম এবং বনী মুত্তালিব তো এ রকম (পরস্পরলগ্ন)। আবু দাউদ, নাসায়ী। প্রকৃত ঘটনা ছিলো এ রকমই। রসুল স. এর মক্কী জীবনে (হিজরতপূর্ব সময়ে) একবার কুরায়েশ নেতারা সকলে মিলে রসুল স.কে একঘরে করে দিয়েছিলো। এ ব্যাপারে তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিলো একটি চুক্তি। সেই চুক্তি মোতাবেক কুরায়েশ নেতারা তাদের গোত্রের লোকদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলো, তোমরা বনী হাশেমের সঙ্গে ওঠা-বসা কোরো না। কোনো প্রকার লেন-দেন এবং বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন কোরো না। তাদের ওই চুক্তিতে বনী মুত্তালিবের উল্লেখ ছিলো না। তৎসত্ত্বেও বনী মুত্তালিব রসুল স. এর সঙ্গ ত্যাগ করেনি। তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও বনী মুত্তালিব রসুল স. এর সঙ্গে শি'বে আবু তালেব পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলো এবং অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছিলো। এ রকম অন্তরীণ অবস্থায় তাদেরকে অতিবাহিত করতে হয়েছিলো পুরো একটি বছর। সুনান গ্রন্থের মাগাজী অধ্যায়ে এ রকম বলা হয়েছে। বায়হাকীও এ রকম বর্ণনা করেছেন। খাত্তাবী লিখেছেন, ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ীন সূত্রেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। উল্লেখ্য যে, কেবল বংশগত সূত্রে বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব রসুল স. এর স্বজন ছিলেন না, সুখে-দুঃখে সব সময় তাঁরা ছিলেন রসুল স. এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও। পরেও। বংশগত সূত্রে বনী আবদুস্ শামস্ এবং বনী নওফেলও রসুল স. এর স্বজন। তবুও রসুল স. তাদেরকে খুমুসের অংশ প্রদান করেননি।

হেদায়া প্রণেতা লিখেছেন, রসুল স. তাঁর স্বজন নির্বাচনের বেলায় বংশগত নৈকট্যকে বিবেচনা করেন নি। বিবেচনা করেছেন, সাহায্য সহযোগিতাকে। বনী মুত্তালিব ছিলো বনী হাশেমের সার্বক্ষণিক শুভাকাঙ্ক্ষী ও সাহায্যকারী। তাই তাদেরকে তিনি স. আকাবের বা স্বজন হিসেবে গণ্য করেছেন। বনী আবদুস্ শামস্ এবং বনী নওফেলকে এ রকম করেননি। তাই বনী হাশেমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও খুমুস বণ্টনের বেলায় রসুল স. তাদেরকে আকাবেরের (স্বজনের)

www.eelm.weebly.com

অন্তর্ভূক্ত করেননি। কারণ তারা ইসলামের সাহায্যকারী ছিলেন না। হেদায়া রচয়িতার এই অভিমতটি ভুল। ইসলামের সাহায্য করাই যদি রসুল স. এর স্বজন হওয়ার যোগ্যতা হয়, তবে হজরত আব্বাসের চেয়ে হজরত ওসমানই স্বজন হিসেবে অধিকতর উপযুক্ত হতেন। ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি শুরুতেই। আর হজরত আব্বাস ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন অনেক পরে—বদর যুদ্ধের পর। এ ছাড়াও অন্যান্য মুহাজির এবং আনসার সাহাবীগণ রসুল স. এর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের জীবন ও সম্পদ। তাঁরা ছিলেন রসুল স. এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী ও সাহায্যকারী। তৎসত্ত্বেও খুমুস বণ্টনের বেলায় রসুল স. তাঁদেরকে 'স্বজন' হিসেবে গণ্য করেননি। কিন্তু হজরত আব্বাসকে তিনি স. খুমুসের অংশ দিয়েছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে—'ওয়াল ইয়াতামা' (এবং পিতৃহীনদের)। ইয়াতামা শব্দটি ইয়াতিম শব্দের বহু বচন। যে সকল শিশুর পিতৃবিয়োগ ঘটেছে তাদেরকে বলা হয় ইয়াতিম। কামুস গ্রন্থে রয়েছে ইয়াতিম অর্থ পিতৃবিয়োগ। প্রাপ্ত বয়স্কদের পিতৃ বিয়োগ ঘটলে তাদেরকে ইয়াতিম বলা যায় না। কেবল পিতৃহীন অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে ইয়াতিম বলা হয়। হজরত আলী থেকে আবু দাউদ এ রকম বর্ণনা করেছেন। উকাইলি, আবদুল হক, ইবনে কাত্তান এবং ইবনে মুনজেরী হাদিসটিকে বলেছেন মুয়াল্লাল(অস্বচ্ছ)। ইমাম নববী বর্ণনাটিকে বলেছেন উত্তম। ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন তিবরানী, আবু দাউদ এবং তায়লাসী। হজরত তালহা বিন হুজায়ফা থেকেও এ রকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে তিবরানীর 'কবির' গ্রন্থে। হজরত জাবের থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন ইবনে আদী। কিন্তু এই বর্ণনাসূত্রভূত এক বর্ণনাকারী হাজেম বিন ওসমানকে হাদিস বিশারদগণ বলেছেন মাতরুক (পরিত্যক্ত)। হজরত আনাস থেকেও এ রকম হাদিস এসেছে।

এরপর বলা হয়েছে—'ওয়াল মাসাকীনা' (দরিদ্রদের)। মাসাকিন শব্দটি মিসকিন শব্দের বহুবচন। সুরা তওবার তাফসীরে যথাস্থানে মিসকিনদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে—'ওয়াব্‌নিস্‌সাবীল' (এবং পথচারীদের)। কথাটির শাব্দিক অর্থ, পথের পুত্র বা সন্তান। প্রকৃত অর্থ পথচারী বা মুসাফির। মুসাফিরদেরকে পথে পথে ভ্রমণ করতে হয়। ভ্রমণের সময় মনে হয় পথই তাদের পিতা-মাতা-সব। তাই তাদেরকে বলা হয় ইবনুস্ সাবীল বা পথের পুত্র।

লক্ষণীয় যে, নিঃস্ব হওয়ার কারণেই পিতৃহীন, দরিদ্র ও পথচারীদেরকে খুমুসের অর্থ গ্রহণের যোগ্য বিবেচনা করা হয়েছে। তাই ইমামগণের ঐকমত্যাগত অভিমত এই যে, তারা যদি নিঃস্ব না হয় (সম্পদাধিকারী হয়), তবে তাদেরকে

www.eelm.weebly.com

খুমুস দেয়া যাবে না। কিন্তু রসুল স. এর স্বজনদেরকে ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে খুমুস দেয়া যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, রসুল স. এর স্বজনদের মধ্যে যারা নিঃস্ব নয়, তাদেরকে খুমুস দেয়া যাবে না। কিন্তু কথাটি ভুল। কেননা আয়াতে স্পষ্ট করে এ রকম কিছু বলা হয়নি। কিন্তু এতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরদের উল্লেখে নিঃস্ব হওয়ার কথা পরিষ্কার অনুমান করা যায়। হজরত আব্বাস ছিলেন বিত্তশালী। তৎসত্ত্বেও রসুল স. তাঁকে খুমুসের সম্পদ প্রদান করেছিলেন।

হাদিস বর্ণনাকারী এবং ইমামগণের ঐকমত্য এই যে, রসুল স. গণিমতের মালকে পাঁচ ভাগে ভাগ করতেন। চার ভাগ দিয়ে দিতেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ-কারীদেরকে। অবশিষ্ট এক পঞ্চমাংশকে তিনি স. পুনরায় ভাগ করতেন পাঁচটি ভাগে। এক ভাগ রাখতেন নিজের জন্য এবং পরিবার পরিজনের জন্য। ওই অর্থ দিয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতেন তিনি। জেহাদের জন্য ক্রয় করতেন তরবারী ও অশ্ব। অন্য অংশগুলো খরচ করতেন মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। দান করতেন ধনী-নির্ধন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বনী হাশেম ও বনী আবদুল মুত্তালিবকে। কখনো এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরকে।

এখন কথা হচ্ছে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত পাঁচ শ্রেণী ছাড়া অন্য কাউকে খুমুসের সম্পদ দেয়া যাবে কি না এবং এক শ্রেণীর অংশ অন্য শ্রেণীকে দেয়া যাবে কি না অথবা এক শ্রেণীর অংশ ওই শ্রেণীর সকলকে না দিয়ে একজনকে দিলে তা যথার্থ হবে কিনা। যেমন একাধিক এতিম থাকা সত্ত্বেও একজন এতিমকে দিলে তা ঠিক হবে কিনা। ইমাম আজম বলেছেন এ রকম করা যাবে। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন এতিম, মিসকিন এবং মুসাফির— কেউই উজুবী হকদার (আবশ্যিক পাওনাদার) নয়। তাই ওই তিন শ্রেণীর যে কোনো একটি শ্রেণীকে তাদের অংশের সকল সম্পদ দান করলে তা সিদ্ধ হবে। কিন্তু পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের কতিপয় আলেম এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ওই তিন শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত অর্থ ওই তিন শ্রেণীকেই দিতে হবে। এক শ্রেণীর অংশ অন্য শ্রেণীর অংশের সঙ্গে মেলানো যাবে না। আর সনাক্ত করা সম্ভব হলে প্রতিটি শ্রেণীর সকল সদস্যকে ওই শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত সম্পদ সমভাবে বণ্টন করে দিতে হবে। কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না।

গণিমতের অপর চার অংশও তেমনি সকল যোদ্ধাদের মধ্যে নিয়মানুসারে বণ্টন করে দিতে হবে। কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। এটা ঐকমত্য। ইমাম শাফেয়ী সকল আত্মীয়স্বজনকে খুমুসের সম্পদ লাভের উপযোগী বলে মনে করেন। বলেন, নিকটাত্মীয়েরা মিরাস বা উত্তরাধিকারের অংশ পায়। দূরের আত্মীয়েরা পায় না। কিন্তু নিকটের ও দূরের সকল আত্মীয়ই খুমুসের অংশ পেতে পারে। মিরাসের ক্ষেত্রে যেমন মেয়েরা একগুণ এবং পুরুষেরা দ্বিগুণ অংশ পায় খুমুসের বেলায়ও তেমনি পাবে। যদি স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র এবং মুসাফিরের

www.eelm.weebly.com

সংখ্যা অনেক হয়, তবে প্রতিটি শ্রেণী থেকে দান করতে হবে তিনজনকে। আয়াতে রসুল স. এর স্বজনদেরকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'লিজিল কুরবা।' এই বাক্যাংশটির প্রথমে ব্যবহৃত লাম অক্ষরটি সেই বিশেষত্বের প্রমাণ। সুতরাং গণিমতের এক পঞ্চমাংশ আলাদা করে নিয়ে প্রথমেই দিতে হবে স্বজনদেরকে—সম্পদ বেশী-কম যাই হোক না কেনো। উল্লেখ্য যে, 'লিজিল কুরবা' কথাটি বহুবচন বোধক নয়। অর্থাৎ স্বজন বুঝাতে এখানে বহুবচনের শব্দরূপ ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু ইয়াতিম ও মিসকিনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনের শব্দরূপ (ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিনি)।

ইমাম আজম এবং আমাদের অভিমত হচ্ছে, এখানে প্রতিটি শ্রেণীর উল্লেখের শুরুতে লাম অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে শ্রেণীগুলোকে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করার জন্য। এভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের মালিকানা বা স্বত্ব নির্ধারণের জন্য নয়। এভাবে এ কথাটিই বলে দেয়া উদ্দেশ্য যে—এই চারটি শ্রেণী (স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, পথচারী) গণিমতের খুমুস লাভের অধিকারী। এই শ্রেণীগুলোর বাইরে অন্য কাউকে খুমুসের অংশীদার করা যাবে না। সুতরাং এখানে ব্যবহৃত 'লাম' অক্ষরটি ইস্তেগ্‌রাকী (নিমজ্জক) নয়। অর্থাৎ বর্ণিত শ্রেণীগুলোকে এখানে একীভূত করা হয়নি, চিহ্নিত করা হয়েছে কেবল আলাদাভাবে। তবে একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কেউ আবার অন্য তিনটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তও হয়ে যেতে পারে। যেমন, স্বজন হতে পারে পিতৃহীন, দরিদ্র অথবা মুসাফির অথবা পথচারী। পিতৃহীনও তেমনি হতে পারে একাধারে স্বজন, দরিদ্র এবং পথচারী। এভাবে দরিদ্র ও পথচারী ও দুই তিন বা চারটি শ্রেণীর গুণসম্পন্ন হয়ে যেতে পারে। এমতোক্ষেত্রে একজনকে একটি শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। নতুবা সে দুই তিন বা চার অংশ পাবে। তখন ব্যাপারটি হয়ে যাবে মিরাসের অংশ পাওয়ার মতো। ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীরা কখনো কখনো একবার তার অংশ লাভ করার পর পুনরায় অন্যভাবে অংশ পায়। যেমন কোনো মহিলার স্বামী যদি তার চাচাতো ভাই হয় তবে সে চাচার অংশ যেমন লাভ করবে, তেমনি লাভ করবে স্বামীর অংশ।

হজরত আলী থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, নিজ হাতে আটা পিষতে পিষতে হজরত ফাতেমার হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিলো। তিনি একবার সংবাদ পেলেন গণিমত হিসেবে রসুল স. এর নিকটে কতিপয় গোলাম ও বাঁদী এসেছে। এ কথা শুনে তিনি রসুল স. এর গৃহে গমন করলেন। রসুল স. তখন সেখানে ছিলেন না। তাই তিনি হজরত আয়েশাকে জানালেন, প্রয়োজনীয় গৃহকর্ম সম্পাদনের জন্য একটি গোলাম বা বাঁদীর বিশেষ প্রয়োজন। এ কথা বলে তিনি স্বগৃহে চলে এলেন। ওদিকে রসুল স. তাঁর ঘরে এসে হজরত আয়েশার নিকটে শুনলেন সব কিছু। তৎক্ষণাৎ তিনি স. চলে এলেন আমাদের গৃহে। আমি ও

www.eelm.weebly.com

হজরত ফাতেমা তখন শয্যা গ্রহণ করেছিলাম। রসুল স. এর আগমনের কথা বুঝতে পেরে আমরা তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। তিনি স. বললেন, ওভাবেই শুয়ে থাকো এ কথা বলে তিনি স. এসে উপবেশন করলেন আমাদের দু'জনের মাঝখানে। তাঁর পবিত্র হাঁটু আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করেছিলো। আমি অনুভব করছিলাম তাঁর পবিত্র পা শীতল। তিনি স. বললেন, তোমাদেরকে আমি এমন একটি আমলের কথা বলে দেবো, যা পরিচারক লাভ করা অপেক্ষা উত্তম। আমলটি হচ্ছে— তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ্ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার। মুসলিমের বর্ণনাটি এ রকম—হজরত ফাতেমাকে উদ্দেশ্য করে রসুল স. বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলবো, যা খাদেম লাভ করা অপেক্ষা উত্তম? তোমরা নামাজের সময় এবং শয্যা গ্রহণের সময় এই আমলটি কোরো—সুবহানাল্লাহ্ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার।

তাহাবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী একবার হজরত ফাতেমাকে বললেন, আল্লাহ্পাক তোমার জনককে স্বচ্ছলতা দান করেছেন। গণিমত হিসেবে তাঁর নিকট এসেছে কয়েকজন ক্রীতদাসী ও ক্রীতদাস। খাদেম হিসেবে তুমি তাদের একজনকে চেয়ে নিয়ে এসো। হজরত ফাতেমা তখন রসুল স. এর নিকটে গিয়ে একটি খাদেমের আবদার করলেন। রসুল স. বললেন, আমার সর্বহারা সহচরেরা (আহলে সুফফারা) অনাহারে থাকবে, আর আমি তোমাদেরকে খাদেম দান করবো—এটা কি করে সম্ভব (গোলাম এবং বাঁদী বিক্রয় করে সর্বহারাদের আহারের সংস্থান করাই বেশী জরুরী, যেহেতু আহার্য ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ আমার কাছে নেই)। হে আমার প্রিয় আত্মজা! হজরত জিবরাইল আমাকে একটি আমলের কথা বলে দিয়েছেন। ওই আমলটি গোলাম বা বাঁদী অর্জন অপেক্ষা উত্তম। আমলটির কথা আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না? অবশ্যই জানাবো। তোমরা শয্যা গ্রহণের প্রাক্কালে দশ বার সুবহানাল্লাহ্, দশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং দশবার আল্লাহু আকবার পড়ে নিয়ো।

ফজল বিন হোসাইন বিন ওমর বিন হাকিম সূত্রে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, ফজলের মা বলেছেন, আমি একবার আমার মায়ের সঙ্গে হজরত ফাতেমার খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. এর দরবারে। রসুল স. তখন কোনো এক জেহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সঙ্গে গণিমত হিসেবে এনেছেন কতিপয় দাস-দাসী। হজরত ফাতেমা প্রার্থী হলেন একটি গোলামের জন্য। তিনি স. বললেন, এ ব্যাপারে বদর যুদ্ধের শহীদগণের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততিদের অধিকার তোমার চেয়ে বেশী।

www.eelm.weebly.com

উপরোক্ত হাদিসসমূহের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স.চারটি শ্রেণীর মধ্যে সকল শ্রেণীকে খুমুসের অংশ দান করেন নি। যেমন তিনি স. একবার খুমুসের অংশ দান করেছিলেন আসহাবে সুফ্ফা এবং বদর যুদ্ধের পিতৃহীন-দেরকে। অথচ হজরত ফাতেমা ছিলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা নিকট স্বজন। ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হচ্ছে, এতিম ও মিসকিনকে দিতে হবে আলাদাভাবে। স্বজনদের অংশ থেকে নয়। ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল খেরাজ গ্রন্থে আশ্আস বিন সাওয়ারের মাধ্যমে আবু যোবায়ের সূত্রে হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্র যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তা আমাদের অভিমতের পরিপোষক। হজরত জাবের বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. খুমুসের অংশ থেকে যোদ্ধাদের জন্য বাহন ক্রয় করতেন। এবং কখনো কখনো সাংসারিক প্রয়োজনও মেটাতেন। পরবর্তী সময়ে বিপুল পরিমাণ গণিমতের সম্পদ আসতে শুরু করলো। তখন তিনি স. খুমুসের অংশ থেকে এতিম মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য খরচ করতে শুরু করলেন। আমি বলি, খুমুসের উপর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কোনো প্রকার মালিকানা নেই। আর আল্লাহ্ই তা রসুল স. কে খরচ করার পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন। তাই রসুল স. তাঁর ইচ্ছানুসারে খরচ করতে পারতেন। যতোটুকু ইচ্ছা করতেন নিজের জন্য রাখতেন, যতটুকু ইচ্ছা খরচ করতেন স্বজনদের জন্য। অথবা এতিম, মিসকীন কিংবা মুসাফিরের জন্য।

এখানে তিনটি শব্দের শুরুতে 'লাম' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে তিন রকম অর্থে। 'লিল্লাহি'তে মালিকানা অর্থে, 'লির্ রসুলি'তে খরচ করার অধিকার অর্থে এবং 'লি জিলকুরবা'তে গ্রহণের অধিকার অর্থে। আর এই খরচ করার অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অবশিষ্ট তিনটি শ্রেণী—এতিম, মিসকিন ও মুসাফির। অর্থাৎ এই তিনটি শ্রেণীও স্বজনদের মতো তিনটি খরচের ক্ষেত্র। এভাবে এই চারটি ক্ষেত্রে ইচ্ছামতো খরচ করার অধিকার দেয়া হয়েছে রসুল স.কে। আর স্বজনদের মধ্যে তাঁর পরিবার পরিজনেরাও পড়েন। আবার পরিবার পরিজনের বাইরের সদস্যরাও পড়েন। তারা আবার এতিম, মিসকিন কিংবা মুসাফিরও হতে পারেন। যাই হোক, এ সকল খরচ নির্বাহের জন্য তিনি খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ ছাড়া গণিমতের সম্পদ থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করতেন না। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার মালিকানা ছাড়া অন্য কারো মালিকানায় হস্তক্ষেপ করতেন না। ওমর ইবনে আমবাসের বর্ণনাসূত্রে আবু দাউদ উল্লেখ করেছেন, একবার রসুল স. উটের শরীর থেকে একটি চুল উঠিয়ে নিয়ে বললেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে খুমুস ব্যতীত এই পশমের পরিমাণ সম্পদও আমার জন্য হালাল নয়। আর এই খুমুসও অবশেষে তোমাদের মধ্যেই বণ্টন করে দেয়া হয়।

আমর ইবনে শোয়াইবের মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে— রসুল স. বলেছেন, গণিমতের সম্পদ থেকে খুমুস ব্যতীত অতিরিক্ত কোনো কিছু আমার

www.eelm.weebly.com

জন্য বৈধ নয়। উটের এই পশমটির পরিমাণও নয়। খুমুস অর্থ মালে গণিমতের এক পঞ্চমাংশ। পাঁচ অংশের পঞ্চমতম অংশ— এ রকম নয়। এতে করে বুঝা যায়, রসুল স. তাঁর ইচ্ছেমতো খুমুসের সম্পদ নির্ধারণ করতে পারতেন।

মাসআলাঃ রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পরেও খুমুসের বিধান অবশিষ্ট রয়েছে কিনা— সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতপৃথকতা রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, রসুল স. তাঁর পৃথিবীর জীবনে নিজের জন্য রক্ষিত খুমুসের অংশ থেকে মুসলমানদের উন্নতির জন্য এবং ইসলামের প্রসারের জন্য ব্যয় করতেন। জেহাদের জন্য ক্রয় করতেন যুদ্ধ পোশাক এবং ঘোড়া। ইব্রাহিমের বর্ণনাসূত্রে আমুস উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর তাঁদের খেলাফতের সময় খুমুসের অংশ থেকে ক্রয় করতেন যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধাশ্ব।

কাতাদার বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্‌র রসুল হওয়ার কারণে রসুল স, খুমুসের সম্পদ ব্যয় করার অধিকারী ছিলেন। শাসক হিসেবে নয়। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, রসুল স. এর পৃথিবী পরিত্যাগের পর আর কেউ খুমুসের অধিকার পাবে না। কারণ ওই অধিকার ছিলো রসুল হওয়ার কারণে। তিনিই সর্বশেষ রসুল। তাই তাঁর মহা অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে খুমুসের বিধানটিও অন্তর্হিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে রসুলের কথা। তাঁর স্থলাভিষিক্তদের কথা এখানে নেই। রসুল স. তাঁর ইচ্ছেমতো খুমুস গ্রহণ করতে পারতেন। যেমন তিনি বদরের যুদ্ধে মামবাহ্ বিন হাজ্জাজের জুলফিকার নামক তরবারীটি পছন্দ করে নিয়েছিলেন। আবার খায়বার যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে ইহুদী হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা হজরত সাফিয়াকে নিজের জন্য পছন্দ করে নিয়েছিলেন। জননী আয়েশা থেকে যথাসূত্রে (সহিহ্ সনদে) আবু দাউদ ও হাকেম এ রকম বর্ণনা করেছেন। তাই আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, রসুল স. এর পর কোনো মুসলমান শাসক কিংবা খলিফা এ রকম পছন্দ করার অধিকার রাখেন না। আর খুমুস গ্রহণ করার অধিকারও রসুল স. ছাড়া অন্য কারো নেই।

মাসআলাঃ রসুল স. এর মহাপ্রয়ানের পর তাঁর স্বজনেরাও আর খুমুসের অংশ পাবেন না। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, রসুল স. এর পৃথিবী পরিত্যাগের পর তাঁর স্বজনদের অংশও অবলুপ্ত হয়েছে। হানাফী মতাবলম্বীগণ বিভিন্ন দলিল প্রমাণের মাধ্যমে এ কথাটি প্রমাণ করেছেন। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে রসুল স. এর স্বজনেরা খুমুসের অংশ পেতেন না। পেতেন রসুল স. এর সাহায্যকারী হিসেবে। মূর্খতা ও ইসলাম উভয় যুগে বনী হাশেম ছিলেন রসুল স. এর একনিষ্ঠ সাহায্যকারী। একারণেই খুমুসের অধিকার লাভ করেছিলেন তাঁরা। ইতোপূর্বে হজরত যোবায়ের বিন মুতয়েমের হাদিসে এ কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি স. বনী মুত্তালিবকে খুমুসের অংশ

www.eelm.weebly.com

দিয়েছিলেন কিন্তু বনী আবদুস শামস এবং বনী নওফেলকে দেননি। অথচ বনী মুত্তালিবের মতো তারাও ছিলো বনী হাশেমের গোত্রভূত। রসুল স. তখন হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেখিয়ে বলেছিলেন, বনী মুত্তালিব ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্বে ও পরে এভাবে আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, কেবল বংশীয় নৈকট্যই খুমুসের অংশ লাভের যোগ্যতা নয়। সুখে-দুঃখে, অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থায় রসুল স. কে সহায়তা প্রদান করাই খুমুসের অংশ লাভের প্রকৃত যোগ্যতা। রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর তাঁকে সাহায্য করার সুযোগ আর নেই। তাই তারা আর খুমুসের অংশীদার নন। হেদায়া রচয়িতার এই দলিলটি দুর্বল। ইতোপূর্বেও সে কথা বলা হয়েছে। তাহাবী লিখেছেন, বংশগত নৈকট্যই খুমুস লাভের প্রধান যোগ্যতা। কিন্তু এই বংশগত নৈকট্য বিশেষ বিশেষ স্বজনের জন্য নির্ধারিত। আর এই নির্ধারণ সম্পূর্ণতঃই রসুল স. এর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। তাঁর সিদ্ধান্তনুসারেই বনী মুত্তালিব খুমুসের অধিকারী বলে বিবেচিত হয়েছিলেন এবং বনী আবদুস শামস ও বনী নওফেল। বিবেচিত হয়েছিলো অনুপযুক্ত বলে। রসুল স. এর পৃথিবী পরিত্যাগের পর এ রকম নির্ধারণের অবকাশ আর নেই। কারণ সিদ্ধান্তদাতা এখন অনুপস্থিত। তাই তাঁর স্বজনের অংশও এখন অবলুপ্ত। এভাবে রসুল স. নিজের জন্য যা গ্রহণ করতেন তা গ্রহণ করার অবকাশও আর নেই। কারণ তিনি পৃথিবীর প্রয়োজন থেকেও এখন সম্পূর্ণ মুক্ত।

তাহাবী তার অভিমতের পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন অন্য একটি পদ্ধতিতে। সেটি হচ্ছে—রসুল স. এর স্বজন বলতে বুঝানো হয়েছে সকল স্বজনকে। কাউকে কাউকে স্বজন বলে নির্দিষ্ট করা হয়নি। কিন্তু তিনিই স. বনী হাশেম এবং বনী মুত্তালিবকে খুমুসের অংশ দিয়েছেন। বনী নওফেল এবং বনী উমাইয়াকে কিছুই দেননি। যাদেরকে দিয়েছিলেন তাদের সংখ্যাও ছিলো স্থিরকৃত। ওই স্থিরকৃত ব্যক্তিদের কেউ কেউ ছিলেন বিত্তশালী আবার কেউ কেউ ছিলেন বিত্তহীন। আবার যাদেরকে অংশ দেননি তাদের সংখ্যাও ছিলো সুনির্ধারিত। বিত্তশালী ও বিত্তহীন ছিলো তাদের মধ্যেও। এতে করে বুঝা যায় ওই সম্পদ ছিলো রসুল স. এর নিজের। তাই তিনি যাকে পছন্দ করতেন তাকে দান করতে পারতেন। যেমন, মালে গণিমত থেকে কিছু কিছু সামগ্রী তিনি ইচ্ছেমত গ্রহণ করতে পারতেন। পৃথিবী থেকে চলে যাবার পর পছন্দমত গ্রহণ করা এবং পছন্দমত দান করার অবকাশটি আর নেই। ফলে, নিজের জন্য পছন্দমত গ্রহণ এবং পছন্দমত দান এখন আর সম্ভব নয়। তাহাবী লিখেছেন, এমতো অভিমত পোষণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, উপরে বর্ণিত দু'টি দলিলই দুর্বল। সকল অবস্থায় বনী মুত্তালিব ছিলো বনী হাশেমের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক। তাই রসুল স. গোত্র দু'টোকে একীভূত করেছিলেন। ওই একীভূতির মধ্যে আবদে মান্নাফের বংশধর ও আত্মীয় হওয়ার বিষয়টি অর্ন্তভূত ছিলো না। ওই একীভূতির কারণে সদ্কার সম্পদ বনী হাশেমের প্রতি হারাম করে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনী মুত্তালিবের জন্য তা হারাম করে দেয়া হয়েছিলো। এই বিষয়টিও নির্ভরশীল ছিলো আবদে মান্নাফের বংশধর হওয়া না হওয়ার উপর। এরপর এ রকম বললে ভুল হবে যে, রসুল স. এর বংশগত নৈকট্য বনী হাশেমের সঙ্গে যেরূপ ছিলো, ঠিক সেরূপই নৈকট্য ছিলো বনী মুত্তালিবের সঙ্গে। দাদার বংশ নিশ্চয় দাদার ভাইয়ের বংশ অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী।

যদি বলা যায়, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত রসুলের স্বজন অর্থ তাঁর সকল স্বজন নয়— তবু কথা থেকে যায় যে সেই স্বজনদের সংখ্যা কিন্তু নিরূপণ করা হয়নি। সুতরাং তাদের সংখ্যা বাড়তে অথবা কমতেও তো পারে। আর খুমুসের অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন রসুল স. এর উপর নির্ভরশীল হলেও এ কথা বলা যেতে পারে না যে, তাঁর মহাপ্রস্থানের পর তাঁর সিদ্ধান্তদানের ওই ধারাবাহিকতা অবলুপ্ত হয়ে যাবে। বরং এ কথা বলাই সমীচীন হবে যে, ওই ধারাবাহিকতা অবশ্যই বহন করবেন তাঁর খলিফাবৃন্দ। তাছাড়া সদকা ও মালে গণিমতের খুমুসের মধ্যে রয়েছে এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরের অংশ। কোরআন মজীদেও এগুলোর স্পষ্ট উল্লেখ এসেছে। সুতরাং দানের ধারাবাহিকতা তো চলতেই থাকবে। তাই তিনি যেমন তাঁর পছন্দমত দান করতেন, তেমনি তাঁর পছন্দের অনুসরণে পরবর্তী সময়ে দান করে যেতে থাকবেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলিফাবৃন্দ।

আত্মীয় স্বজনের হক যদি রসুল স. কে প্রদান করা হয়েও থাকে, তবু তার অর্থ এই নয় যে, রসুল স. পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর তাদের হক নষ্ট হয়ে যাবে। এভাবে রসুল স. এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরকেও তাঁর পছন্দমত দান করতেন। পছন্দমত দান করার অধিকার তাঁর ছিলো। কিন্তু ওই সম্পদের মালিক তিনি ছিলেন না। ওই সম্পদের হকদার ছিলো এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরেরা। রসুল স.এর মহাপ্রস্থানের পর তাদের হক পরিশোধের দায়িত্ব তো স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতিনিধিদের উপর বর্তায়। তাই আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, রসুল স. এর পৃথিবী পরিত্যাগের পর তাঁর স্বজনদের অংশ বিলুপ্ত হবে না, বরং তাদের অংশ বণ্টনের দায়িত্ব এসে পড়বে খলিফাগণের উপর।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলঃ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলকে আলেম-গণের প্রতিটি দল তাঁদের নিজেদের অভিমতের প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করেছেন। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, খোলাফায়ে রাশেদীন খুমুসের পাঁচটি অংশের মধ্যে দু'টি অংশ অবলোপন করেছিলেন এবং কার্যকর রেখেছিলেন তিনটি অংশ।

www.eelm.weebly.com

অবলোপন করেছিলেন রসুল স. এবং তাঁর স্বজনদের অংশ। আর জারি রেখে-ছিলেন এতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরের অংশ। উল্লেখ্য যে, খলিফাগণের আমল অবশ্য অনুসরণীয়। হেদায়া রচয়িতা এ কথাও লিখেছেন যে, চার খলিফার এই সিদ্ধান্তটির বিরুদ্ধে সাহাবীগণও কিছু বলেন নি। ফলে সিদ্ধান্তটি হয়ে গিয়েছে ঐকমত্যসম্ভূত। কিন্তু বাগবী লিখেছেন, রসুল স. এর মহাতিরোধানের পর খলিফাগণ তাঁর স্বজনদেরকে খুমুসের অংশ দিয়েছিলেন। আর এ ব্যাপারে তাঁরা ধনী ও নির্ধনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। রসুল স. এর পিতৃব্য হজরত আব্বাস ছিলেন বিত্তশালী। তৎসত্ত্বেও তাকে খুমুসের অংশ দেয়া হয়েছিলো।

কিতাবুল খেরাজ গ্রন্থে কালাবীর মাধ্যমে আবু সালেহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর পৃথিবীর জীবনে খুমুসকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হতো— এক ভাগ রসুল স. এর জন্য, এক ভাগ তাঁর স্বজনদের জন্য এবং বাকী তিন ভাগ পিতৃহীন, দরিদ্র এবং পথচারীদের জন্য। তাঁর মহাতিরোধানের পর হজরত আবু বকর সিদ্দিক, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব এবং হজরত ওসমান ইবনে আফফান, রসুল স. ও তাঁর স্বজনদের অংশ অবলোপন করেন। জারী রাখেন বাকী তিনটি অংশ। হজরত আলীও তা অনুসরণ করেন। মোহাম্মদ বিন ইসাহাকের মাধ্যমে জুহুরী সূত্রে ইমাম আবু ইউসুফ এর বিপরীত বর্ণনাও এনেছেন। বর্ণনাটি এই— একবার নাজদা হজরত ইবনে আব্বাসকে লিখলেন সম্মানিত হজরত! খুমুসের অন্তর্ভুক্ত রসুল স. এর স্বজনদের অংশ কাকে দেয়া যাবে বলে আপনি মনে করেন? এর উত্তরে হজরত ইবনে আব্বাস লিখলেন, আমাদেরকে। কিন্তু খলিফা ওমর ইবনে খাত্তাব এ কথা স্বীকার করেননি। আমাদের বংশের বিবাহ-শাদী, ঋণ পরিশোধ, পারিচারক-পরিচারিকা হিসেবে গোলাম বাঁদী কোনো কিছুই আমাদেরকে দিতে স্বীকৃতি হননি। অথচ আমি মনে করি, ওগুলো আমাদের প্রাপ্য ছিলো।

ইমাম আবু ইউসুফ আরো লিখেছেন, কায়েস বিন মুসলিম সূত্রে এসেছে, হাসান বিন মোহাম্মদ বিন হানাফিয়্যা বলেছেন, রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর তাঁর এবং তাঁর স্বজনদের অংশ সম্পর্কে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ বলেন, রসুল স. এর অংশ পাবেন তাঁর খলিফা। আর রসুল স. এর স্বজনদের অংশ তাঁদেরকেই দিতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, রসুল স. এর অংশ পাবেন তাঁর খলিফাগণ এবং রসুল স. এর স্বজনদের অংশ পাবেন খলিফাগণের স্বজনেরা। শেষে সকলে এই সিদ্ধান্তে একমত হন যে, রসুল স. এর স্বজনের অংশ খরচ করা হবে সমরাস্ত্র এবং সমরাশ্ব ক্রয়ের জন্য। কায়েস বিন মুসলিম সূত্রে তাহাবীও এ রকম বর্ণনা এনেছেন। ওই বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথাটিও রয়েছে যে— এ রকম ঘটনা ঘটেছিলো হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের খেলাফতের সময়।

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদ বিন খুজাইমা সূত্রে তাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, আমি একবার আবু জাফরকে বললাম, ইরাক অধিকার করার পর হজরত আলী রসুল স. এর স্বজনদের অংশ সম্পর্কে কি বিধান দিয়েছিলেন? আবু জাফর বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এ ব্যাপারে হজরত আলী ছিলেন হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের পূর্ণ অনুসারী। ইবনে ইসহাক বলেন, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, ইরাকবাসীরা ছিলেন হজরত আলীর পূর্ণ অনুসারী। আর হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের বিরোধিতার অপবাদ যেনো কেউ না দিতে পারে, সে কারণেই হজরত আলী এ রকম করেছিলেন। এ কথাটি সকলে অনুধাবন করতে পারেননি। তাই কেউ কেউ তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে।

আমি বলি, উপরের বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের চার খলিফা কেবল এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরের অংশ জারী রেখে-ছিলেন। বন্ধ করে দিয়েছিলেন রসুল স. ও তাঁর স্বজনদের অংশ। কিন্তু আমি ইতোপূর্বে লিখেছি যে, খুমুসের কোনো অংশকেই খলিফাগণ অবলোপন করেননি। রসুল স. যেমন যে কোনো এক বা একাধিক শ্রেণীকে দান করা এবং অপর এক বা একাধিক শ্রেণীকে দান না করার ব্যাপারে স্বাধীন ছিলেন, খলিফাগণও ছিলেন তেমনই। সুতরাং খলিফাগণ রসুল স. এর স্বজনদেরকে খুমুসের অংশ না দিয়ে থাকলেও এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁরা ওই অংশকে অবলোপন করেছিলেন। রসুল স. যেমন হজরত ফাতেমাকে সর্বাপেক্ষা নিকটজন হওয়া সত্ত্বেও খুমুসের অংশ দেন নি, অধিকতর প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে ব্যয় করেছিলেন কেবল আসহাবে সুফফা এবং বদর যুদ্ধের পিতৃহীনদের জন্য— খলিফাগণের আমলও ছিলো তদ্রূপ। ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এ রকম।

আবদুর রহমান বিন আবী লায়লার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! খুমুসে আপনার স্বজনদের যে অংশ রয়েছে, সেই অংশ বণ্টনের দায়িত্ব আপনি আমার উপর অর্পণ করুন। সুশৃংখলভাবে বণ্টন করার উদ্দেশ্যেই আমি এই দায়িত্বটি স্কন্ধে নিতে চাই। রসুল স. দয়া করে আমার নিবেদন মঞ্জুর করলেন। তখন থেকে আমিই বণ্টন করতে শুরু করলাম তাঁর স্বজনদের অংশ। পরে হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরও তাঁদের শাসনকালে আমাকে ওই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। হজরত ওমরের খেলাফতের শেষ বছর বিপুল পরিমাণ গণিমত উপস্থিত হলো। আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন! এ বছর রসুল স. এর স্বজনদের কোনো অর্থ সম্পদের প্রয়োজন হবে না। আপনি বরং দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত মুসলমানদের মধ্যে ওগুলো দান করে দিন। হজরত ওমর আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। আমি তাঁর দরবার থেকে বেরিয়ে

www.eelm.weebly.com

আসার পর দেখা হলো হজরত আব্বাসের সঙ্গে। তিনি বললেন, হে আলী! তুমি আমাকে এমন অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে, যা আমি আর কখনো ফিরে পাবো না। তাই হয়েছিলো। এরপর থেকে আমাকে আর কখনো রসুল স. এর অংশ বণ্টনের জন্য ডাকা হয়নি।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ওমর আমাদের বংশের লোকদের বিবাহ -শাদী ও আমাদের ঋণ পরিশোধের জন্য খুমুসের অংশ প্রদান করতেন। পরে তিনি তা বন্ধ করে দেন। সম্ভবতঃ হজরত ওমর তাঁর খেলাফতের শেষ বছর থেকেই হজরত আলীর পরামর্শক্রমে রসুল স. এর স্বজনদের খুমুসের অংশ প্রদান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এতে করে বুঝা যায় যে, রসুল স. এর পৃথিবী পরিত্যাগের পরেও প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা তাঁর স্বজনদের অংশ দান করতেন। আর এক্ষেত্রে ধনী-নির্ধনের কোনো প্রশ্ন ছিলো না। কিন্তু রসুল স. যেমন প্রয়োজনবোধে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করার অধিকারী ছিলেন, তেমনি প্রতিনিধিত্বের সূত্রে ওই অধিকার সংরক্ষণ করতেন তাঁর খলিফাগণও। আর তাই হজরত আলীর পরামর্শে হজরত ওমর তাঁর খেলাফতের শেষ বছরে রসুল স. এর স্বজনদের অংশ আর দেননি। পরবর্তী খলিফাদ্বয়ও ওই অংশটি আর পুনরুজ্জীবিত করেননি। আর এতে করে তারা অন্যায় কাজও করেননি। কারণ তাঁরা তা করেছিলেন শরিয়তের সীমা রেখার মধ্যেই।

ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন, আমাকে আতা ইবনে সায়েব বলেছেন, খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ জাবিল কুরবার (রসুল স. এর স্বজনের) অংশ বনী হাশেমকে দিতেন। কারণ, তাঁর খেলাফতের সময় তিনি জাবিল কুবরার অংশ দান করা জরুরী মনে করেছিলেন। আমি বলি, এ রকম করার কারণ হচ্ছে, খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে বনী হাশেম নির্ভরযোগ্য মনে করতেন।

আবু দাউদ লিখেছেন, হজরত যোবায়ের ইবনে মুতয়েম সূত্রে হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জাবিল কুরবার অংশ বনী হাশেম এবং বনী মুত্তালিবকে দিতেন। কিন্তু বনী আবদুস শামস্ ও বনী নওফেলকে দিতেন না। হজরত আবু বকর জাবিল কুরবার অংশ দিতেনই না। কিন্তু হজরত ওমর দিতেন। তাঁর পরের খলিফাগণও দিতেন। এই বর্ণনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, খলিফাগণ কখনও জাবিল কুরবার অংশ দিতেন, কখনও দিতেন না। আর এই দলিল আমাদের অভিমতের পক্ষে।

মতভেদঃ আলোচ্য আয়াতে মালে গণিমতের এক পঞ্চমাংশ যে আল্লাহ্‌র সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এবং এই অংশ কিভাবে বণ্টন করতে হবে, সে কথা বলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাকী চার অংশ কিভাবে কাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে এ কথা অনুমান করা যায় যে, বাকী চার অংশ বণ্টন করতে হবে ওই সকল যোদ্ধাদের মধ্যে যারা যুদ্ধের মাধ্যমে গণিমত

www.eelm.weebly.com

অর্জন করেছে। এখানকার বর্ণনাভঙ্গিটি মীরাস সম্পর্কিত ওই আয়াতের বর্ণনার মতো যেখানে বলা হয়েছে—'ওয়া ইল্লাম ইয়াকুল্লাহু ওয়ালাদুঁউ ওয়ারেছাহু আবাওয়াহু ফা লিউম্মিহীহু ছুলুছ (পিতা-মাতার জীবদ্দশায় সন্তানহীন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে ওই ব্যক্তির পিতা-মাতা হবে ওয়ারিশ। মাতা তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পাবে)। এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে কেবল মাতার অংশের কথা। পিতার অংশ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু পিতার অংশের কথা উল্লেখ না থাকলেও এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, পিতা পাবে দুই তৃতীয়াংশ। আলোচ্য আয়াতেও তেমনি এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, খুমুস বাদে অবশিষ্ট চার অংশ পাবে ওই সকল যোদ্ধারা যারা গণিমত অর্জন করেছে।

আলোচ্য আয়াতের বিবরণদৃষ্টে এই কথাটিও প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াতের মাধ্যমে সুরা আন্‌ফালের প্রথম আয়াতটি রহিত হয়েছে। ওই আয়াতে বলা হয়েছে— লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে; বলো, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্‌র এবং রসুলের।' ওই আয়াতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছিলো কেবল রসুল স. কে। তিনি স. ওই সম্পদ আদৌ বণ্টন করবেন কিনা, কিংবা করলেও কিভাবে কার কার মধ্যে তা বণ্টন করবেন, সে সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা দেয়া হয়নি। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে যথা নির্দেশনা দানের মাধ্যমে তাই ওই আয়াতটি রহিত (মনসুখ) করা হয়েছে। বোখারীর 'তারিখ' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন— আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে রসুল স. কে খুমুসের অধিকার দেয়া হয়েছে এবং তা কাকে কাকে দিতে হবে সেকথাও বলে দেয়া হয়েছে। ইঙ্গিতে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, অবশিষ্ট চার অংশ বণ্টন করতে হবে মুজাহিদগণের মধ্যে।

কোনো কোনো আলেম মনে করেন, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে 'কাইনুকা' যুদ্ধের সময়। বদর যুদ্ধের প্রায় একমাস পর ১৫ই শাওয়াল ওই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। বায়হাকী তাঁর 'দালায়েল' পুস্তকে হজরত সাঈদ ইবনে কা'ব থেকে এ রকমই বর্ণনা করেছেন। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, বদর যুদ্ধের সময়েই প্রথমে সুরা আন্‌ফালের প্রথম আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং তখনই অল্প সময়ের ব্যবধানে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে রহিত হয়ে যায় আগের আয়াতটি।

মাসআলাঃ ঐকমত্যাগত অভিমত এই যে, অবশিষ্ট চার অংশ বণ্টন করতে হবে যোদ্ধাদের মধ্যে, যারা যুদ্ধ করে গণিমত অর্জন করেছে। খলিফা বা শাসক একজন যোদ্ধাকেও তার অংশ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। কিন্তু কোনো যোদ্ধার সরাসরি আঘাতে নিহত শত্রুর পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি কে পাবে সে সম্পর্কে আলেমগণের মতপৃথকতা রয়েছে।

www.eelm.weebly.com

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহ্‌মদ বলেছেন, নিহত ব্যক্তির জেরা (যুদ্ধের পোশাক), হাতিয়ার, নগদ অর্থ ইত্যাদির অধিকারী হবে ওই মুজাহিদ যে তাকে সম্মুখ যুদ্ধে হত্যা করতে পেরেছে। অর্থাৎ এমন অবস্থায় যুদ্ধ করেছে যে, তাঁর নিজেরও ওই যুদ্ধে নিহত হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু দূর থেকে তীর নিক্ষেপ করে যদি কোনো বিধর্মীকে হত্যা করা হয়, তবে ওই নিহত ব্যক্তির যুদ্ধের সরঞ্জামাদি তীর নিক্ষেপকারী ব্যক্তি পাবে না। আবার হত্যা করা সত্ত্বেও ওই হত্যাকারী ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির সমর-সরঞ্জামের অধিকারী হবে না, যে মুজাহিদ বাহিনীর সদস্য নয়। অর্থাৎ হঠাৎ বাহির থেকে এসে কেউ যুদ্ধ শুরু করে কোনো বিধর্মীকে হত্যা করলেও সে ওই বিধর্মীর পরিত্যক্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম পাবে না।

ইমাম আহমদ বলেছেন, বিধর্মীর হন্তারক মুজাহিদ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও (গণিমত লাভের যোগ্য না হলেও) তাঁর মাধ্যমে নিহত বিধর্মীর যুদ্ধ সরঞ্জাম সে পাবে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, বহিরাগত যোদ্ধাও তার দ্বারা বধিত বিধর্মীর পরিত্যক্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম পাবে, যদি সে সেনাপতির নির্দেশে এরূপ করে। সেনাপতির নির্দেশ না থাকলে পাবে না। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বহিরাগত যোদ্ধার মাধ্যমে নিহতদের যুদ্ধ সরঞ্জাম মুজাহিদগণের অংশের অন্তর্ভুক্ত করে দিতে হবে। ইমাম মালেক বলেছেন, বহিরাগত ওই যোদ্ধাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে খুমুসের মধ্যে। তখন সে রসুল স. এর স্বজন, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরের মতো খুমুসের অন্তর্ভুক্ত হবে।

হজরত আবু কাতাদার বর্ণনায় এসেছে, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে 'হুনায়েন' যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যুদ্ধের প্রথম দিকে শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে মুসলমানেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। আমি দেখলাম এক মুশরিক একজন মুসলমান যোদ্ধার উপর আক্রমণোদ্যত। আমি পশ্চাৎ দিক থেকে ওই মুশরিকের স্কন্ধে আঘাত করলাম। আমার তলোয়ারের আঘাতে কেটে গেলো তার বর্ম। মুশরিক সৈন্যটি তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি ভাবলাম, এখনই হয়তো আমি মৃত্যুমুখে পতিত হবো। কিন্তু তার জখমটি ছিলো গুরুতর। তাই সে আর অগ্রসর হতে পারলো না। অল্পক্ষণের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলো। এরপর আমি হজরত ওমরের দেখা পেয়ে বললাম, মুসলমানেরা এ রকম ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে কেনো? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র হুকুমে আবার তারা সংঘবদ্ধ হবে। তাই হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে যুদ্ধের ময়দানে ফিরে এলো সকলে। বিজয়ী হলো মুসলিম বাহিনী। রসুল স. ঘোষণা করলেন, কেউ কোনো মুশরিককে সরাসরি হত্যা করেছে বলে প্রমাণ দিতে পারলে নিহত মুশরিকের যুদ্ধ সরঞ্জাম তাকেই দেয়া হবে। ঘোষণা শুনে আমি দাঁড়িয়ে বললাম, আমি এরূপ দাবী করি, কেউ কি আমার দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারবেন? সকলেই নিশ্চুপ রইলো। তাই আমিও বসে পড়লাম। রসুল স. পুনরায় একই ঘোষণা দিলেন। আমিও একই কথা বললাম। কিন্তু কোনো সাক্ষী পেলাম না। তৃতীয় বারও তিনি একই ঘোষণা দিলেন। আমিও সাক্ষী তলব করলাম। কিন্তু আমার পক্ষে কেউ সাক্ষ্য দিতে

www.eelm.weebly.com

এগিয়ে এলো না। রসুল স. তখন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। বললেন, হে আবু কাতাদা! তুমি কী বলতে চাও? আমি বললাম, আমি এক মুশরিককে হত্যা করেছি। তখন একজন বলে উঠলেন, আবু কাতাদা ঠিকই বলেছেন। তাঁর মাধ্যমে নিহত মুশরিকের পরিত্যক্ত সরঞ্জাম আমার কাছে রয়েছে। হজরত আবু বকর বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এক বীর যোদ্ধা এক অংশীবাদীকে হত্যা করে তার পরিত্যক্ত জিনিসপত্র হস্তগত করেছে। এখন অন্য কেউ সেগুলো দাবী করবে কেনো? রসুল স. বললেন, হে আবু বকর! আবু কাতাদা সত্য বলেছে। এরপর নিহত ব্যক্তির জিনিসপত্র আমাকে দেয়া হলো। আমি ওই পরিত্যক্ত সম্পদের মাধ্যমে বনী সালমা জনপদে একটি খেজুরের বাগান ক্রয় করেছিলাম। ওই সম্পদই ছিলো আমার জীবনের প্রথম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। বোখারী, মুসলিম।

তাহাবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু কাতাদা (হুনায়েন যুদ্ধে) এক মুশরিককে হত্যা করেন। রসুল স. তাঁকে ওই মুশরিকের জেরা ও অন্যান্য সামগ্রী দান করেন। তিনি ওগুলো বিক্রয় করেন পাঁচ আওকিয়া মূল্যে।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, হুনায়েন যুদ্ধের সময় রসুল স. বলেছিলেন, হত্যাকারীই পাবে তার দ্বারা বধকৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সামগ্রী। ওই যুদ্ধে হজরত তালহা বধ করেছিলেন বিশজন মুশরিককে এবং তাদের যুদ্ধ সরঞ্জাম ও অন্যান্য মালপত্র তিনিই পেয়েছিলেন। দারেমী, তাহাবী, আবু দাউদ।

হজরত সালমা ইবনে আকওয়া বলেছেন, বনী হাওয়াজেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমি তাদের একজনকে হত্যা করলাম। তারপর তার উট নিয়ে হাজির হই রসুল স. এর নিকটে। উটের পিঠে তার মালপত্রগুলো বাঁধা ছিলো। রসুল স. ঘোষণা করলেন, অমুক ব্যক্তিকে কে হত্যা করেছে? আমার সঙ্গীরা বলে উঠলো, ইবনে আকওয়া। তিনি স. তখন উটসহ সকল মালপত্র দিয়ে দিলেন আমাকে। তাহাবী।

হজরত সালমা ইবনে আকওয়ার বর্ণনায় আরো এসেছে, অংশীবাদীদের এক গুপ্তচর রসুল স. এর মজলিশে এসে বসে পড়লো এবং সাহাবীগণের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকলো। হঠাৎ সে গা ঢাকা দিলো। তখন বুঝা গেলো, সে ছিলো গুপ্তচর। রসুল স. আজ্ঞা করলেন, যাও, তাকে খুঁজে বের করে হত্যা করো। আমিই তাকে খুঁজে বের করে হত্যা করলাম। এবং তার জিনিসপত্রগুলো নিয়ে এলাম। ওগুলো আমাকেই দান করলেন রসুল স.। তাহাবী।

ওয়াকেদী সূত্রে হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমা মারহাব নামক এক মুশরিকের পার্শ্বদেশে আঘাত করলেন। খঞ্জরের আঘাতে কেটে গেলো অনেকটা। কিন্তু সে তখনও মরেনি। হঠাৎ হজরত আলী এসে তার ঘাড়ে আঘাত করলেন। তাঁর অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু মুখে পতিত হলো মারহাব। রসুল স. হজরত ইবনে মুসলিমাকেই দান করলেন মারহাবের জিনিসপত্র। অথচ প্রকৃত ঘটনা ছিলো হজরত আলীই ছিলেন তার প্রকৃত হন্তারক।

হজরত আউফ ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ঘোষণা দিয়েছিলেন, বধিত ব্যক্তির সম্পদ পাবে বধকারী। তাহাবী। হজরত আউফ ইবনে মালেক এবং হজরত খালেদ ইবনে ওলিদ থেকে ভিন্ন সূত্রে এ রকম বর্ণনা এসেছে। ইমাম

www.eelm.weebly.com

আহমদ, আবু দাউদ এবং তিবরানীর মাধ্যমেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। হজরত আউফ ইবনে মালেক এবং হজরত খালেদ ইবনে ওলিদ থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নিহত ব্যক্তির নিকট থেকে উদ্ধারকৃত জিনিসপত্র গণিমত হিসেবে সকলের মধ্যে বণ্টন করেন নি। দিয়েছেন তার বধকারীকেই। আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান এবং তিবরানীর বর্ণনায় একথাগুলোর সঙ্গে আরো এসেছে— রসুল স. নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সরঞ্জামাদির অধিকারী হিসেবে তার হত্যাকারীকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। গণিমতের মতো সেগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেন নি।

হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নিহত ব্যক্তির মাল সামানের মালিক হবে তার হত্যাকারী। হাদিসটির সূত্র পরম্পরা নিষ্কলুষ। তাহাবী

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক অংশীবাদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। রসুল স. হজরত যোবায়েরকে নির্দেশ দিলেন, ওকে হত্যা করো। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। রসুল স. হজরত যোবায়েরকেই দান করলেন ওই নিহত লোকটির পরিত্যক্ত মালপত্র। তাহাবী।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, নিঃসন্দেহে রসুল স. এরশাদ করেছেন, বধিত ব্যক্তির মাল সামান তার বধকারীর প্রাপ্য। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ঘোষণাটি কি রসুল স. দিয়েছিলেন কেবল উৎসাহ প্রদানার্থে, না এটাই শরিয়তের আইন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এটাই শরিয়তের আইন। কারণ বিধানটি দিয়েছেন রসুল স. স্বয়ং।

আমি বলি, হজরত আবু কাতাদা ও হজরত সালমা ইবনে আকওয়ার হাদিসের মাধ্যমে বুঝা যায়, রসুল স. সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া তাদের দ্বারা বধিত ব্যক্তির মাল সামান তাঁদেরকে দান করেন নি। দান করেছিলেন সাক্ষ্য প্রাপ্তির পর। উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের মাধ্যমে একথাও জানা গিয়েছে যে, সম্মুখ যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির মালপত্র তিনি স. পাঁচভাগে বণ্টনযোগ্য গণিমতের সঙ্গেও মেলান নি। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ এই মতে বিশ্বাসী। কিন্তু ইমাম মালেকের মত এর বিপরীত। তিনি মনে করেন, যেভাবেই শত্রু বধ করা হোক না কেনো, সকল শত্রু সম্পত্তি একত্র করতে হবে পাঁচ ভাগে বণ্টনযোগ্য গণিমতের সঙ্গে। একক ভাবে কাউকে দেয়া যাবে না।

দ্রষ্টব্যঃ হজরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেছেন, এক যুদ্ধে হজরত বারা ইবনে মালেক পারস্যবাসী এক শত্রুকে বর্শা বিদ্ধ করেন। সে মারা গেলে তিনি তার জিনিসপত্র খলিফা ওমরের দরবারে নিয়ে আসেন। কেউ কেউ বললেন, জিনিসপত্রগুলোর মূল্য হতে পারে তিন হাজার আউকিয়া। ফজরের নামাজের পর হজরত ওমরের উপস্থিতিতে হজরত আবু তালহা বললেন, জিনিসপত্রগুলোর মূল্য হবে অনেক— তিরিশ হাজার আউকিয়া। তাই আমার বিবেচনায় এগুলোর পাঁচ

www.eelm.weebly.com

ভাগের এক ভাগ রেখে বাকী অংশ হজরত বারাকে দেয়া সমীচীন। হজরত ওমর তাঁর কথাটিই গ্রহণ করলেন এবং জিনিসপত্রগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে এক পঞ্চমাংশ (ছয় হাজার আউকিয়া) রাখলেন এবং হজরত বারা ইবনে মালেককে দান করলেন বাকী অংশ (চব্বিশ হাজার আউকিয়া)। তাহাবী।

তাহাবীর অপর বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা ইবনে মালেক ফারেসের এক সর্দারকে হত্যা করেন এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদ অধিকার করে নেন। এই ঘটনাটি লিখে জানানো হলো তৎকালীন খলিফা হজরত ওমরকে। হজরত ওমর সেনাপতিকে লিখে পাঠালেন, ওই সম্পদের এক পঞ্চমাংশ (বায়তুল মালের জন্য) রেখে বাকী অংশ দেয়া হোক বারা ইবনে মালেককে।

উপরের বর্ণনা দু'টোর মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ নিয়মানুসারে নিহত শত্রুর ব্যক্তিগত সরঞ্জাম হত্যাকারীর প্রাপ্য, কিন্তু সরঞ্জামের মূল্যমান অত্যধিক হলে খলিফা বা শাসক ইচ্ছে করলে ওগুলোর এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের জন্য রেখেও দিতে পারেন।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, সেনাপতি বা শাসকের নির্দেশক্রমে শত্রু বধ করলেই কেবল হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির মাল-সামান লাভ করতে পারবে। 'আউসাত' ও 'কবির' গ্রন্থে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত একটি ঘটনা ইমাম আবু হানিফার অভিমতের পরিপোষক। ঘটনাটি এই—পারস্য অভিযানের সময় হজরত হাবীব বিন সালমা সংবাদ পেলেন, ওয়ালী কাবরিছের শাসক আজারবাইজানের পথে রওয়ানা হয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে ইয়াকুত, মোতি, জমরুদ ইত্যাদি মূল্যবান সামগ্রী। তিনি ওই শাসককে পথিমধ্যে আক্রমণ করেন এবং তাকে হত্যা করে তার বিপুল সম্পদ হস্তগত করেন। সেনাপতি হজরত আবু উবায়দা ওই সম্পদের এক পঞ্চমাংশ দাবী করেন। হজরত হাবীব বলেন, আল্লাহ্ পাক যা আমাকে দান করেছেন, তা থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন না। রসুল স. ঘোষণা করেছেন, নিহত শত্রুর সম্পদ হত্যাকারী মুজাহিদের প্রাপ্য। সেখানে উপস্থিত হজরত মুয়াজ বলেন, আমি স্বয়ং রসুল স. কে বলতে শুনেছি, সেনানায়কের সৌজন্য মূলক দানকেই গ্রহণ করা উচিত। বর্ণনাটি বিতর্কিত। কারণ, এই সূত্রভূত এক বর্ণনাকারী আমর ইবনে ওয়াকিদ তেমন বলিষ্ঠ নয়। এ সম্পর্কে স্বসূত্রে ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ্ জুনাদা ইবনে উমাইয়ার একটি বর্ণনা এনেছেন। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত হাবীব নিহত ওই শাসকের সম্পদ এনেছিলেন পাঁচটি খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে। ওই সম্পদের মধ্যে ছিলো রেশমী বস্ত্র, ইয়াকুত এবং এক প্রকার মূল্যবান পান্না। তিনি সমুদয় সম্পদ গ্রহণ করতে চাইলেন। কিন্তু সেনাপতি হজরত আবু উবায়দা বায়তুল মালের জন্য কিছু রেখে দিতে চাইলেন। হজরত হাবীব বললেন, রসুল স. বলেছেন, যে বিধর্মীকে বধ করবে, সেই পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পদ। হজরত আবু উবায়দা বললেন,

www.eelm.weebly.com

রসুল স.ওই ঘোষণা দিয়েছিলেন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। ঘোষণাটি চিরস্থায়ী নয়। সেখানে উপস্থিত হজরত মুয়াজ বললেন, হাবীব! আল্লাহ্‌কে ভয় করো। ইমামের (নেতার) নির্দেশ মান্য করো। ইমাম যতটুকু দান করেন, ততটুকুই তোমার জন্য হালাল। হজরত মুয়াজ তাঁর কথার সমর্থনে রসুল স. এর একটি হাদিসও বর্ণনা করলেন। শেষে তাঁর কথার উপরেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। হজরত আবু উবায়দা খুমুস গ্রহণের পর বাকী চার অংশ দান করলেন হজরত হাবীবকে। হজরত হাবীব তাঁর ভাগের সম্পদকে বিক্রয় করেছিলেন এক হাজার স্বর্ণমুদ্রায়। এই বর্ণনাসূত্রসংযুক্ত একজন বর্ণনাকারী আবার অজ্ঞাত।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—আবু জেহেলকে হত্যা করেছিলো মুয়াজ বিন আমর বিন জামুহ্ এবং মুয়াজ বিন আফ্‌রা। রসুল স. বললেন, তোমরা দু'জনেই আবু জেহেলকে হত্যা করেছো। একথা বলে তিনি স. আবু জেহেলের যুদ্ধের পোশাক, অস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে দিলেন মুয়াজ বিন আমরকে। মুয়াজ বিন আফ্‌রাকে কিছুই দিলেন না। নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল সামান তার হত্যাকারীর প্রাপ্য—বিধানটি অত্যাবশ্যক হলে তিনি স. নিশ্চয় এ রকম করতেন না।

মুসলিম ও আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে—হজরত আউফ বিন মালেক আশজায়ী বর্ণনা করেছেন, মুতা যুদ্ধে আমি গমন করেছিলাম জায়েদ বিন হারেসের সঙ্গে। মাদাবী নামক এক ইয়ামেনী সহযোদ্ধাও ছিলেন আমাদের সঙ্গে। রোমীয় সেনাবাহিনী ছিলো আমাদের প্রতিপক্ষ। তাদের এক উপ-অধিনায়ক মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করছিলো। তার ঘোড়াটি ছিলো লাল। ঘোড়ার জিন ছিলো সোনালী। আর তার তরবারীটি ছিলো স্বর্ণাভ। তাকে হত্যা করার জন্য মাদাবী আড়াল গ্রহণ করলো একটি প্রস্তর খণ্ডের। শত্রু-অধিনায়কটি কাছাকাছি আসতেই মাদাবী তলোয়ারের এক কোপে কেটে দিলো তার ঘোড়ার গর্দান। তারপর চড়াও হলো তার উপর। অল্পক্ষণের মধ্যে তাকে হত্যা করে দখল করে নিলো তার ঘোড়া এবং ঘোড়ার পিঠের সকল সরঞ্জাম। যুদ্ধশেষে সেনাপতি খালেদ বিন ওলিদ মাদাবীর নিকট থেকে তার অধিকৃত সম্পদের কিছু অংশ গ্রহণ করলেন। আমি সেনাপতিকে বললাম, আপনি কি জানেন না রসুল স. ঘোষণা করেছেন, নিহত ব্যক্তির সম্পদের অধিকারী হবে তার হত্যাকারী। সেনাপতি বললেন, জানি। সম্পদ অধিক ছিলো বলে আমি তার এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেছি। আমি বললাম, ওই অংশ তাকে ফিরিয়ে দিন। নয়তো একথা আমি রসুল স.কে জানাবো। সেনাপতি আমার কথা গ্রহণ করলেন না। সকলে মদীনায় ফিরে আসার পর আমি রসুল স.কে ঘটনাটি জানালাম। তিনি স. বললেন, খালেদ! যা নিয়েছো তা ফিরিয়ে দাও। একথা শুনে আমি খালেদকে বললাম, রসুল স. এর এই নির্দেশের কথা আমি কি আপনাকে আগে বলিনি? আমার একথা শুনে রসুল

www.eelm.weebly.com

স. রাগান্বিত হলেন। বললেন, খালেদ ঠিকই করেছে। নেতার নির্দেশের মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। তোমাদের সকলের উচিত নেতার নির্দেশ মান্য করে চলা। —এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে তার হত্যাকারীর স্বত্ব অত্যাবশ্যক নয়। নতুবা রসুল স. একবার সম্পদ ফিরিয়ে দিতে বলে পুনরায় তার বিরুদ্ধে নির্দেশ দিতেন না।

খাত্তাবী বলেছেন, হজরত আউফকে শিক্ষা প্রদানই ছিলো রসুল স. এর এরকম বিরোধী নির্দেশ দানের উদ্দেশ্য। আর সেই শিক্ষাটি ছিলো এই— নেতার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ যেনো কেউ না করে। হজরত খালেদের সিদ্ধান্তটি ছিলো ইজ্‌তেহাদী (গবেষণা সঞ্জাত)। রসুল স. তাঁর ওই ইজ্‌তেহাদকেই বহাল রেখেছিলেন। কারণ বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থ পরিহরণীয়। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, খাত্তাবীর এই অভিমতটি ঠিক নয়। কেননা রসুল স. তাঁর নিজের নির্দেশ স্থগিত করেছিলেন অন্য কারণে। কারণটি হচ্ছে— হজরত আউফ ওই সম্পদের অধিকারী ছিলেন না, ছিলেন মাবাদী। সুতরাং হজরত আউফের কথায় তিনি স. মাবাদীর হক নষ্ট করবেন— এরকম হতেই পারে না। একজনের শাস্তি অন্য জন বহন করবে কেনো? বরং রসুল স. এর এ রকম করার প্রকৃত কারণ ছিলো একথাটি বুঝিয়ে দেয়া যে, নিহত শত্রুর সম্পদের উপর হত্যাকারীর অধিকারের বিধানটি শরিয়তের কোনো অকাট্য বিধান নয়। বিষয়টি সম্পূর্ণতঃই অধিনায়ক, নেতা অথবা শাসকের উপর নির্ভরশীল।

আমি বলি, ইতোপূর্বে বর্ণিত আজারবাইজানের ঘটনাটিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, অধিনায়ক ইচ্ছে করলে নিহত ব্যক্তির সম্পদ থেকে এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করতে পারেন। অথবা তা গণিমতের সাধারণ সম্পদের সাথে মিলিয়ে দিতে পারেন। আবার আবু জেহেলের ঘটনাটিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, হত্যাকারী একাধিক হলে অধিনায়ক ইচ্ছে করলে নিহত ব্যক্তির সম্পদ একজনকে দান করে অন্যদেরকে বঞ্চিত করতে পারেন। অথবা কিছু অংশ একজনকে দিয়ে অবশিষ্ট অংশ মালে গণিমতের মধ্যে একত্র করতে পারেন।

বায়হাকী লিখেছেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিলো এই সুরার প্রথম আয়াতটি। বলা হয়েছিলো— 'কুলিল্ আন্‌ফালু লিল্লাহি ওয়ার্‌রসুলি' (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্‌র ও রসুলের)। এই নির্দেশানুসারে বদর যুদ্ধের সকল সম্পদের অধিকারী ছিলেন রসুল স.। তিনি ওই সম্পদ যাকে ইচ্ছে তাকে প্রদান করতে পারতেন। তিনি স. এরকম করেছিলেনও। যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি, তাদেরকেও তিনি স. বদরের গণিমতের অংশ দান করেছিলেন। পরে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতটি। এরপর রসুল স. 'নিহত ব্যক্তির সম্পদ হত্যাকারীর প্রাপ্য'— এই বিধানটি ঘোষণা করেন। তখন থেকে এই বিধানটিই প্রতিষ্ঠিত

www.eelm.weebly.com

হয়। সে কারণেই হজরত আউফ হজরত খালেদকে বলেছিলেন, আপনি কি জানেন না যে, রসুল স. এর ঘোষণা হচ্ছে— নিহত শত্রুর সম্পদ পাবে তারই হত্যাকারী। হজরত খালেদও একথা স্বীকার করেছিলেন। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, এটি ছিলো একটি সাধারণ বিধান, যা শরিয়তসম্মত। কিন্তু এটাও একটি সাধারণ বিধান যে, অধিনায়কের নির্দেশ মাননীয়। তাই হজরত মাবাদী হজরত খালেদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। প্রতিবাদ করেছিলেন হজরত আউফ। কিন্তু হজরত মাবাদী ছিলেন তাঁর মৌন সমর্থক। সুতরাং তাঁদের দু'জনকেই উপদেশ দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন রসুল স.। আর উপদেশটি ছিলো—অধিনায়কের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করা যায় না। অধিনায়কের নির্দেশ মান্য করা ওয়াজিব— প্রকাশ্য দৃষ্টিতে তা অন্যায় মনে হলেও। কারণ মান্যতার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ।

মাসআলাঃ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অধিনায়ক কম অথবা বেশী দান করতে পারেন। এটা ঐকমত্য। তিনি যুদ্ধের সময় এরকম ঘোষণাও দিতে পারেন যে— হত্যাকারীই হবে তার মাধ্যমে নিহত ব্যক্তির সম্পদের অধিকারী। এ রকম করলে তাঁর ওই ঘোষণাটি হবে অনুপ্রেরণামূলক। এ রকম অনুপ্রেরণা দানের নির্দেশ এসেছে অন্য এক আয়াতে এভাবে—হাররিদ্বিল মু'মিনীনা আ'লাল কিতালি (মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করো)। এই নির্দেশানুসারে সেনানায়ক যুদ্ধের প্রাক্কালে বিভিন্ন উৎসাহব্যঞ্জক ঘোষণা দেয়ার অধিকার রাখেন। যেমন— এক মুশরিককে হত্যা করলে দেয়া হবে দশটি স্বর্ণ মুদ্রা, যে ওই দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে, তাকে দেয়া হবে এতো এতো পুরস্কার, যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারলে দেয়া হবে খুমুস বাদে অবশিষ্ট যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অর্ধেক অথবা এক চতুর্থাংশ, শত্রুপক্ষের রমণী বন্দী করতে পারলে তার অধিকারী হবে বন্দীকারী নিজে ইত্যাদি। হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. ছোট ছোট সেনাদলকে বিভিন্ন স্থানে পাঠাতেন। তাদের মধ্যে সাধারণ সৈনিকদেরকে তাদের প্রাপ্যের চেয়ে পুরস্কার হিসেবে কিছু অধিক প্রদান করতেন।

উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত করার জন্য অধিনায়ক এ রকম ঘোষণা দিতে পারবে না— যুদ্ধকালে যে, যে সম্পদ হস্তগত করবে সে সম্পদ তার। এ রকম করলে তা হবে কোরআনের স্পষ্ট বিধানের বিপরীত। তখন পদাতিক এবং বাহনারোহী সৈন্যের নির্ধারিত অংশও হয়ে যাবে বাতিল। শত্রু নিধনে যারা অতিরিক্ত মগ্ন থাকবে, তারাও হয়ে যাবে গণিমত থেকে বঞ্চিত। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি যদি উপযুক্ত বিবেচনা করি, তবে সমুদয় গণিমত দিয়ে দিবো ওই ব্যক্তি বা দলকে, যে বা যারা তা অধিকার করেছে। হজরত আবু উমামা সূত্রে মাকহুলের মধ্যস্থতায় হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত উবাদা বিন সামেত

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, রসুল স. বদরের দিন এরশাদ করেছেন, যারা শত্রুর সম্পদ অধিকার করবে, ওই সম্পদের অধিকারী হবে তারাই। এ সকল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, এ সকল ঘটনা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের। খুমুস সম্পর্কিত এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ওই বিধানগুলো রহিত হয়ে গিয়েছে।

মাসআলাঃ খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ আলাদা করে নেয়ার পর বাকী চার অংশের মধ্য থেকে পুরস্কার প্রদান করা যেতে পারে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে ওই পুরস্কার প্রদান করতে হবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বায়তুল মালে জমা হওয়ার পূর্বে। সকল সম্পদ বায়তুল মালে জমা হওয়ার পর পুরস্কার দিতে চাইলে তা দিতে হবে খুমুস থেকে। এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমেদ। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক বলেছেন, সকল অবস্থায় পুরস্কার দিতে হবে খুমুস থেকে। অবশিষ্ট চার অংশ থেকে নয়। পুরস্কার সম্পূর্ণতঃই অধিনায়কের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। আবুল জিয়াদ সূত্রে ইমাম মালেক লিখেছেন, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, যোদ্ধা সাহাবীগণকে পুরস্কার দেয়া হতো খুমুসের অংশ থেকে। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে ইবনে আবী শায়বাও এ রকম বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. আমাকে খুমুসের নির্দিষ্ট অংশ ছাড়াও অতিরিক্ত প্রদান করেছেন। অতিরিক্ত হিসাবে আমি পেয়েছিলাম একটি বয়স্ক উট। বোখারী, মুসলিম। এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে স্বভূমিতে পৌঁছানোর পূর্বে পুরস্কার প্রদান করলে, সে পুরস্কার প্রদান করতে হবে খুমুস বাদে অবশিষ্ট চার অংশ থেকে—যা যোদ্ধাদের অংশ। খুমুসের অংশীদার হচ্ছে এতিম, মিসকিন ও মুসাফির। যোদ্ধারা এদের অন্তর্ভূত নয়।

বাগবী লিখেছেন, খুমুসের যে অংশ রসুল স. এর জন্য নির্ধারিত, পুরস্কার দিতে হবে সেই অংশ থেকে। এ রকম বলেছেন হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব। ইমাম শাফেয়ীও এই মতের সমর্থক। কারণ রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্পাকই তোমাদেরকে মালে গণিমত দান করেছেন। আমার জন্য নির্ধারিত খুমুস বাদে বাকী অংশ তোমাদেরকে দেয়া হয়। আমার থেকেও দেয়া হয় তোমাদেরকে। একথায় বুঝা যায়, পুরস্কার প্রদান করা হয় খুমুস থেকে।

আমি বলি, খুমুসের খুমুস (পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ) থেকে রসুল স.পুরস্কার প্রদান করতেন। এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, অবশিষ্ট চার অংশ থেকে পুরস্কার প্রদান করা যাবে না। হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে তিরমিজি, ইবনে মাজা এবং ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন— আন্নাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাফ্ফালা ফিল বিদায়াতির্ রুবায়া ওয়াফির রাজায়াতিছ্ ছুলুছা। খাত্তাবী এই হাদিস সম্পর্কে বলেছেন, এক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পরই যদি পুনরায় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হয়, তবে পুরস্কার প্রদানের মধ্যে তারতম্য ঘটবে।

www.eelm.weebly.com

এমতোক্ষেত্রে রসুল স. প্রথম যুদ্ধে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করতেন খুমুস বাদে অবশিষ্ট চার ভাগ থেকে। আর দ্বিতীয় যুদ্ধের জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করতেন তিন ভাগের এক ভাগ। প্রথম যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দ্বিতীয় যুদ্ধ কষ্টসাধ্য। তাই প্রথম যুদ্ধ অপেক্ষা দ্বিতীয় যুদ্ধের পুরস্কারের পরিমাণ হতো বেশী। হাবিব বিন সালমা ফেহরী সূত্রে এ রকম বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ।

আমি বলি, উপরোক্ত হাদিসের মাধ্যমে ওই সকল মহাত্মাগণের অভিমত খণ্ডন হয়ে গিয়েছে, যারা বলেন— অতিরিক্ত পুরস্কার দিতে হবে খুমুস থেকে। অথবা খুমুসের খুমুস থেকে। উল্লেখ্য যে, খুমুস বাদে অবশিষ্ট চার ভাগ থেকে অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করার কথা কোনো হাদিসে আসেনি। হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে চার ভাগ এবং তিন ভাগের কথা। আর খুমুস কখনো তিন অথবা চার ভাগ হয় না (খুমুস অর্থ এক পঞ্চমাংশ)। তাছাড়া হাদিসে পুরস্কার প্রদানের কথা বলা হয়েছে চার ভাগ এবং তিন ভাগ থেকে। তাহাবী বলেছেন, ওই চার ভাগ ও তিন ভাগ হচ্ছে খুমুসের চার ভাগ ও তিন ভাগ। তার এই অভিমতটি ভুল। খুমুস হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক একটি বিষয়, যা কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত। স্বয়ং ইমাম তাহাবীই হজরত হাবিব বিন সালমার হাদিসে উল্লেখ করেছেন, আর রুবৃয়ু বা'দাল খুমুসি ওয়াছ ছুলুছা বা'দাল খুমুসি। এতে করে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, প্রথমে খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) আলাদা করার পর অবশিষ্ট চতুর্থাংশ অথবা তৃতীয় অংশ পুরস্কার হিসেবে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছিলো। ইমাম আহমদও উদ্ধৃত শব্দগুলো উল্লেখ করেছেন। আর ওই উল্লেখ থেকে ইবনে জাওজী একথা প্রমাণ করেছেন যে, খুমুস বাদে অবশিষ্ট চার অংশ থেকে অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করা জায়েয।

মাসআলাঃ যুদ্ধ শেষে অধিনায়ক যদি কোনো যোদ্ধার অবদান অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, তবে তাকে তার নির্ধারিত অংশ অপেক্ষা পুরস্কার হিসেবে অতিরিক্ত দান করতে পারেন—যদি যুদ্ধের পূর্বে কোনো পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দেয়া না হয়। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করতে হবে খুমুস থেকে। যোদ্ধাদের প্রাপ্য অবশিষ্ট চার অংশ থেকে নয়। যোদ্ধাদের নির্ধারিত অংশের মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটানো যাবে না।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতের পর্যালোচনাঃ হজরত সালমা বিন আক-ওয়ার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাঁর গোলাম, হজরত রিবাহ্‌কে কয়েকটি উট চরাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমিও ছিলাম তার সঙ্গে। একদিন সকালে হঠাৎ আক্রমণ করে বসলো আবদুর রহমান ফুজারী। সে উটগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। আমি দ্রুত একটি পাহাড়ে উঠে মদীনার দিকে মুখ করে চিৎকার করে বললাম, ইয়া সাব্বাহাহু—ইয়া সাব্বাহাহু (আমাদের উট নিয়ে গেলো, আমাদের উট নিয়ে

www.eelm.weebly.com

গেলো)। এরপর ক্ষিপ্র গতিতে পশ্চাৎধাবন করলাম ফুজারীর। একের পর এক তীর নিক্ষেপ করলাম তার দিকে। আর চিৎকার করে বলতে লাগলাম-আনা ইবনুল আকওয়া ওয়াল ইয়াওমুর রদ্বয়ি (আমি আকওয়ার পুত্র— আজ হচ্ছে দুগ্ধ পানের দিন)।

আমার উপর্যুপরি তীর নিক্ষেপের ফলে সে উটগুলো ছেড়ে দিয়ে একাই পালিয়ে যেতে শুরু করলো। উটগুলো হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও আমি ক্ষান্ত হলাম না। যুদ্ধের নেশা তখন পেয়ে বসেছে আমাকে। ফুজারীর দলের লোকেরা তখন পলায়নের সুবিধার জন্য তেইশটি লৌহদণ্ড ও তেইশটি বর্শা ফেলে দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করলো। আমি সেগুলোর উপর চিহ্নস্বরূপ পাথর রেখে দিয়ে, পুনরায় তাদের পশ্চাৎধাবণ করলাম। ইত্যবসরে মদীনা থেকে এসে পড়লো আবু কাতাদার নেতৃত্বে একটি সাহায্যকারী দল। আবু কাতাদা দ্রুত ছুটে গিয়ে বন্দী করলো আবদুর রহমান ফুজারীকে এবং তাকে হত্যাও করে ফেললো। মদীনায় ফিরে আসার পর রসুল স. ঘোষণা করলেন, অদ্যকার সর্বোত্তম অশ্বারোহী আবু কাতাদা এবং সর্বোত্তম প্রহরী সালমা। এরপর রসুল স. আমাকে দ্বিগুণ পুরস্কারে ভূষিত করলেন। আক্রমণকারী হিসেবে একগুণ এবং প্রহরী হিসেবে আরেক গুণ। এরপর তিনি স. আমাকে তাঁর আদ্ববা নামক উষ্ট্রীর উপরে উঠিয়ে নিলেন। মুসলিম।

হানাফীগণের বক্তব্যঃ এই হাদিসের বর্ণনাকারী ইবনে হাব্বান বলেছেন, ওই যুদ্ধে হজরত সালমা বিন আকওয়া ছিলেন পদাতিক সৈন্য। রসুল স. তখন তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন খুমুসের অংশ থেকে। যোদ্ধাদের অংশ থেকে নয়।

কাসেম বিন সালামও এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন, ইবনে মাহ্দী বলেছেন, আমি এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছি সুফিয়ান সওরী থেকে। তিনি বলেছেন, রসুল স. যখন যাকে যতটুকু ইচ্ছা বেশী দান করতে পারতেন। এটা ছিলো তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। যদি রসুল স. তাঁর নিজের অংশ থেকে দান করে থাকেন, তবে তাকে বলতে হবে বদান্যতা, পুরস্কার নয়।

আমি বলি, এক্ষেত্রে ইবনে হাব্বান এবং কাসেম বিন সালামের মন্তব্যের কোনো প্রয়োজনই নেই। আমি এখন উল্লেখ করতে চাই হজরত সালমা বিন আকওয়া বর্ণিত ওই হাদিসটি যেখানে তিনি বলেছেন, হজরত আবু বকরের সহআরোহীরূপে আমরা বনী ফাজারাহের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। ওই যুদ্ধে মুসলিম ও অমুসলিম বাহিনীর মধ্যে বন্দী বিনিময় হয়েছিলো। হজরত আবু বকর আমাকে পুরস্কার হিসেবে দান করেছিলেন এক বন্দিনীকে।

www.eelm.weebly.com

হজরত উবাদা বিন সামেত এবং হজরত হাবিব বিন সালমা থেকে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে—আন্নান্ নাবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাফ্ফালা ফিল বিদায়াতির্ রুবায়া ওয়াফির রাজায়াতিছ্ ছুলুছা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে—যুদ্ধের পূর্বে রসুল স. পুরস্কার হিসেবে এক চতুর্থাংশ নির্দিষ্ট করেছিলেন। যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পর পুনঃযুদ্ধের পুরস্কার নির্ধারণ করেছিলেন এক তৃতীয়াংশ। এই প্রেক্ষাপটে তাহাবী লিখেছেন, রসুল স. পরের যুদ্ধের এক তৃতীয়াংশ দিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব অংশ থেকে অর্থাৎ খুমুস থেকে। এভাবেই প্রমাণিত হয় যে, এটা ইমাম আবু হানিফার অভিমতের একটি প্রমাণ।

ঐকমত্যসম্মত অভিমত এই যে, কোনো কোনো যোদ্ধাকে তার নির্ধারিত অংশ ছাড়াও পুরস্কার হিসেবে অতিরিক্ত প্রদান করা জায়েয। মতভেদ রয়েছে কেবল কোন অংশ থেকে পুরস্কার দেয়া হবে সে সম্পর্কে। বিভিন্ন সূত্রে তাহাবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, আমি হজরত ওবায়দুল্লাহ্ বিন আবী বকরের সঙ্গে এক জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তিনি ছিলেন ওই যুদ্ধের অধিনায়ক। তিনি গণিমত বণ্টনের আগে আমাকে এক বন্দী অথবা বন্দিনী দিতে চাইলেন। আমি বললাম, প্রথমে ভাগ করুন। তারপর খুমুসের অংশ থেকে আমাকে দিন। তিনি আমার কথায় সম্মত হলেন না। আমিও তাঁর প্রস্তাবে অস্বীকৃত হলাম।

তাহাবীর বর্ণনায় আরো এসেছে, সুলায়মান বিন ইয়াসার বলেছেন, আমি মুয়াবিয়া বিন খাদিজের সঙ্গে আফ্রিকার এক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। অধিনায়ক হজরত মুয়াবিয়া কোনো কোনো মুজাহিদকে উপহার হিসাবে অতিরিক্ত কিছু প্রদান করলেন। কতিপয় সাহাবীও ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আমাদের মধ্যে ওই উপহার নিতে অসম্মত হলেন কেবল জাবালা বিন আমর।

খালেদ বিন আবী ওমরের বর্ণনায় রয়েছে, আমি নিজে একবার সুলায়মান বিন ওমরের নিকট উপহার প্রার্থী হলাম। তিনি বললেন, আমি কাউকে এভাবে আবেদন করতে দেখিনি। কেবল ইবনে খাদিজকে এ রকম করতে দেখেছিলাম। আফ্রিকার যুদ্ধে খুমুস আলাদা করে নেয়ার পর বাকী চার অংশের অর্ধেক দেয়া হয়েছিলো আমাদেরকে। কতিপয় মুহাজির সাহাবীও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। সকলে তা গ্রহণ করেছিলেন। উপহার গ্রহণে বিরত ছিলেন কেবল জাবালা।

মাসআলাঃ খুমুস বাদে বাকী চার অংশ মুজাহিদগণের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে এভাবে—পদাতিক একগুণ এবং অশ্বারোহী তিন গুণ। অশ্বারোহীর ওই তিন গুণের একগুণ তার নিজের জন্য এবং বাকী দুইগুণ তার বাহনের জন্য। কাযী আবদুল ওয়াহাব বলেছেন, হজরত ওমর ও হজরত আলীর সিদ্ধান্ত ছিলো এ রকম। কোনো সাহাবীই তাঁদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি। তাবেয়ীগণের মধ্যে এই অভিমতের অনুসারী ছিলেন ওমর বিন আবদুল আজিজ ও ইবনে সিরিন। ফকিহগণের মধ্যে ছিলেন ইমাম মালেক, ইমাম আওজায়ী, ইমাম লাইস

www.eelm.weebly.com

বিন সা'দ, ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম আবু সওর, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান। কেবল ইমাম আবু হানিফা এক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। বলেছেন, অশ্বারোহী পাবে পদাতিকের দ্বিগুণ— তিনগুণ নয়।

এ সম্পর্কে জমহুর প্রমাণ পেশ করেছেন, হজরত যোবায়ের বিন আওয়াম বর্ণিত একটি হাদিস থেকে, যেখানে তিনি বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. আমার জন্য এক অংশ এবং আমার ঘোড়ার জন্য দুই অংশ প্রদান করেছিলেন। আহমদ।

ইবনে জাওজী লিখেছেন, খালেদ হোজ্জা বলেছেন, এ ব্যাপারে কারো কোনো মতপার্থক্য নেই যে, এ সম্পর্কে উদ্ধৃত সকল হাদিসে অশ্বারোহীদের জন্য তিন অংশ প্রদানের কথা এসেছে। দারা কুতনীও হজরত যোবায়ের বিন আওয়ামের অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত জাবের, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত সহল বিন হাসানা থেকে। ইবনে ইসহাক সূত্রে আবদুল্লাহ বিন আবী বকর বিন আমর বিন হাজ্জাম বলেছেন, বনী কুরায়জার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় রসুল স. অশ্বারোহীদের জন্য তিন অংশ নির্ধারণ করেছিলেন। এক অংশ যোদ্ধার জন্য এবং দুই অংশ তাদের বাহনের জন্য।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. ঘোড়ার জন্য দুই ভাগ এবং ঘোড়ার মালিকের জন্য এক ভাগ নির্ধারণ করেছিলেন। বোখারী এবং নাসাঈ বাদে অন্যান্য সুনান রচয়িতাগণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে ওমর থেকে মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. পুরস্কার হিসেবে অতিরিক্ত সম্পদ বণ্টনের সময় ঘোড়ার জন্য দুই এবং তার আরোহীর জন্য এক অংশ প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন। অপর বর্ণনায় পুরস্কারের কথা নেই। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে তিন অংশের কথা— দুই অংশ ঘোড়ার জন্য এবং এক অংশ সওয়ারীর জন্য। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ইবনে আব্বাস থেকে। আবু ওমরা থেকে ইসহাক বিন রহওয়াইহ্, আবু দাউদ এবং মুকাদ্দাস সূত্রে বায্যারও এ রকম বর্ণনা এনেছেন। হজরত আবু কাবশা আনসারীর বর্ণনায় এসেছে, মক্কা বিজয়ের সময় রসুল স. ঘোষণা করেছিলেন, আমি অশ্বের জন্য দুই অংশ এবং তার আরোহীর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। যারা এ বিধান পরিবর্তন করবে, আল্লাহ্ও তাদেরকে পরিবর্তন করবেন। দারা কুতনী, তিবরানী। ইবনে হুমাম লিখেছেন, এই হাদিসের বর্ণনা সূত্রভূত মোহাম্মদ বিন ইমরান ঈসাকে দুর্বল বলেছেন অধিকাংশ হাদিস বিশারদগণ।

হজরত আবু দরহামের বর্ণনায় এসেছে, আমি ও আমার ভাই রসুল স. এর সঙ্গে এক জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমাদের দু'জনেরই ছিলো দুটি ঘোড়া। আমাদেরকে রসুল স. দিয়েছিলেন ছয়টি অংশ। চারটি আমাদের ঘোড়ার জন্য এবং দুটি আমাদের জন্য। দারা কুতনী। ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল খেরাজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, হজরত আবুজর গিফারী বর্ণনা করেছেন, হুনায়েন

www.eelm.weebly.com

যুদ্ধে আমি ও আমার ভ্রাতা ছিলাম রসুল স. এর অধীনস্ত যোদ্ধা। দু'টি ঘোড়া ছিলো আমাদের। তিনি স. আমাদেরকে দিয়েছিলেন ছয়টি অংশ— ঘোড়ার জন্য চার এবং আমাদের জন্য দুই। এভাবে প্রাপ্ত অংশ বিক্রয় করে আমরা পেয়েছিলাম দু'টি তাজা উট।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতের সমর্থন রয়েছে, হজরত মজমা বিন জারিয়া আনসারীর হাদিসে, যেখানে তিনি বলেছেন, খায়বর যুদ্ধের মালে গণিমত ভাগ করে দেয়া হয়েছিলো হুদায়বিয়া অভিযানকারীদের মধ্যে। রসুল স. তখন মালে গণিমতকে ভাগ করেছিলেন আঠারো শত ভাগে। যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিলো পনের শত। তন্মধ্যে তিনশত ছিলো অশ্বারোহী। অশ্বারোহী দুই অংশ এবং পদাতিক এক অংশ — এভাবে তিনি স. ওই আঠারো শত অংশ ভাগ করে দিয়েছিলেন। (পদাতিকেরা পেয়েছিলো সর্বমোট বারোশত অংশ এবং অশ্বারোহীরা পেয়েছিলো ছয়শত)। আবু দাউদ। আবু দাউদ বলেছেন, এই হাদিসের সঙ্গে মিশ্রিত রয়েছে বর্ণনাকারীর কল্পনা। আসলে ওই যুদ্ধে অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিলো দুই শত। রসুল স. তখন ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং ঘোড়ার মালিকের জন্য এক অংশ প্রদান করেছিলেন। ইমাম শাফেয়ীও এ রকম বলেছেন। আমরাও সুরা ফাতাহের তাফসীরে খায়বর যুদ্ধের মালে গণিমত বণ্টনের বিবরণে এ রকমই লিখে দিয়েছি।

হজরত মেকদাদ বিন ওমরের হাদিসে এসেছে, আমি বদর যুদ্ধে ছিলাম অশ্বারোহী যোদ্ধা। রসুল স. আমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের দ্বিগুণ দান করেছিলেন। একগুণ আমার জন্য এবং আরেক গুণ আমার অশ্বের জন্য। তিবরানী। এই হাদিসের সূত্রভূত ওয়াকিদি বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। ওয়াকিদি সূত্রে জাফর বিন খারেজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত যোবায়ের বিন আওয়াম বলেছেন, বনী কুরায়জার যুদ্ধে আমি ছিলাম অশ্বারোহী সৈন্য। রসুল স. আমাকে এক অংশ এবং আমার অশ্বের জন্য এক অংশ প্রদান করেছিলেন। ইবনে মারদুবিয়া তাঁর তাফসীরে ওরওয়া সূত্রে উল্লেখ করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, বনী মুসতালিকের কতিপয় বন্দিনী রসুল স. এর অধিকারে আসে। রসুল স. তা থেকে এক পঞ্চমাংশ আলাদা করে নেয়ার পর বাকী অংশ যোদ্ধাদের মধ্যে ভাগ করে দেন এভাবে — অশ্বারোহী দ্বিগুণ এবং পদাতিক একগুণ। এই হাদিসের সনদ এ রকম, মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ ছুরী — মুনজির বিন মোহাম্মদ— মোহাম্মদের পিতা মুনজির— ইয়াহ্ইয়া বিন মোহাম্মদ বিন্ হানী— মোহাম্মদ বিন ইসহাক — মোহাম্মদ বিন্ জাফর বিন যোবায়ের— হজরত ওরওয়া।

ইবনে আবী শায়বা আবু উসামা এবং ইবনে নুমায়ের ওবায়দুল্লাহ্— নাফে' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে ওমর উল্লেখ করেছেন, রসুল স. ঘোড় সওয়ারের জন্য দুইভাগ এবং পদাতিকের জন্য একভাগ নির্ধারণ করেছেন। দারা কুতনীও হাদিস বর্ণনা করেছেন এই সূত্রে। আবু বকর নিশাপুরী বলেছেন, আমার মনে হয় ইবনে আবী শায়বা তাঁর বর্ণনাটির মধ্যে ভুল করেছেন। কেননা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আব্দুর রহমান বিন বশীর প্রমুখ ইবনে নুমাইয়েরের বর্ণনাসূত্রে

www.eelm.weebly.com

যে হাদিসটি বিবৃত হয়েছে, সে হাদিসটি ইবনে আবী শায়বার মতো নয়। বর্ণনাটিতে ঘোড় সওয়ারের তিন অংশ এবং পদাতিকের এক অংশের কথা বলা হয়েছে। দারা কুতনীর বর্ণনাটি আবার ইবনে আবী শায়বার বর্ণনার মতো। তবে তাঁর বর্ণনা সূত্রটি এ রকম, নাঈম— ইবনে মুবারক— ওবায়দুল্লাহ্ বিন ওমর— নাফে'— হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর। ইবনে জাওজী বলেছেন, এই বর্ণনাটির মধ্যে সম্ভবতঃ ভুল করেছেন নাঈম। ইবনে মুবারক ছিলেন বর্ণনাকারী হিসেবে পূর্ণ বিশ্বস্ত। ইবনে হুম্মামের মতও এ রকম।

দারা কুতনী, ইউনুস বিন আবদুল আ'লা, ইবনে ওয়াহাব, ওবায়দুল্লাহ্ বিন ওমর, নাফে— এই সূত্রে এসেছে হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর বলেছেন, রসুল স. ঘোড়ার জন্যও অংশ প্রদান করেছেন। পদাতিকের জন্য এক অংশ, ঘোড়া ও তার মালিকের জন্য দুই অংশ। ইবনে আবী মারিয়ম এবং খালেদ বিন আব্দুর রহমানের বর্ণনায় হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর উমরী থেকেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। কা'নাবীও হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর উমরীর এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এর মধ্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, হাদিসে উল্লেখিত শব্দটি আসলে কি ছিলো? অশ্বারোহী, না অশ্ব? দারা কুতনী— হেজাজ বিন মিনহাল— হাম্মাদ বিন সালমা— উবাইদুল্লাহ্ বিন ওমর— নাফে', এই সূত্রে এসেছে, হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর বলেছেন, রসুল স. অশ্বারোহীকে দুই অংশ এবং পদাতিককে এক অংশ ভাগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু নজর বিন মোহাম্মদ বিন হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন এর বিপরীত।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, উবাইদুল্লাহ্র বর্ণনার বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কারখীও রয়েছেন। সুতরাং বায়হাকীর বর্ণনা হয়েছে অধিকতর বলিষ্ঠ। উবাইদুল্লাহ্ বিন ওমরকে বর্ণনাকারী হিসেবে অদৃঢ় বলেছেন ইবনে জাওজী। স্বসূত্রে আবদুর রহমান বিন আমিনের মাধ্যমে দারা কুতনী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. অশ্বারোহীর জন্য দ্বিগুণ এবং পদাতিকের জন্য এক গুণ প্রদান করেছিলেন। হাসান বিন আম্মারা— হাকেম বিন উয়াইনা— মুকসিন সূত্রে ইমাম আবু ইউসুফ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. বদর যুদ্ধের গণিমত ভাগ করেছিলেন এভাবে— অশ্বারোহী দুই এবং পদাতিক এক। কিতাবুল খেরাজে ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন, ফকীহ্ শ্রেষ্ঠ ইমাম আবু হানিফা (আল্লাহ্তায়ালা রহমত বর্ষণ করুন) বলেছেন, গণিমত বণ্টনের নিয়ম হবে এ রকম— পদাতিক এক গুণ, ঘোড়া একগুণ এবং ঘোড়ার আরোহী একগুণ। আমি চতুষ্পদ জন্তুকে মুসলিমের উপরে মর্যাদা দিতে পারি না। (এ রকম বলতে পারিনা যে, ঘোড়ার অংশ দুই গুণ)। বর্ণনা বিভ্রাটের কারণে কোনো কোনো হাদিসে এসেছে, ঘোড়ার অংশ দুইগুণ। আবার কোথাও এসেছে, অশ্বারোহী পাবে তিনগুণ (ঘোড়ার জন্য দুই গুণ এবং তার নিজের জন্য একগুণ)।

www.eelm.weebly.com

উপরের বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে দেখা যায়, ইমাম আবু হানিফার নির্ধারণ হচ্ছে — এক অংশ ঘোড়ার জন্য এবং এক অংশ ব্যক্তির জন্য। মুনজির বিন আবী হামসা হামাদানীর সূত্রে জাকারিয়া বিন হারেস বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমরের জনৈক গোলাম ছিলেন এক যুদ্ধের সেনাপতি। সিরিয়ার দিকে পরিচালিত ওই যুদ্ধের গণিমত তিনি ভাগ করেছিলেন এভাবে— ঘোড়ার জন্য এক অংশ এবং ব্যক্তির জন্য এক অংশ। হজরত ওমর এই বণ্টন পদ্ধতি সমর্থন করেছিলেন। অতএব বুঝতে হবে— যে সকল হাদিসে ঘোড়ার জন্য দ্বিগুণ অংশের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য ছিলো ভিন্ন। দ্বিগুণ পুরস্কারের কথা শুনে মুজাহিদেরা যাতে ঘোড়া প্রতিপালন করতে উৎসাহিত হয়, সে কারণেই হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘোড়ার জন্য দুই অংশের কথা বলা হয়েছিলো। লক্ষ্যণীয় যে, ঘোড়ার জন্য দ্বিগুণ অংশ দেয়া হলেও ঘোড়া তাতে করে লাভবান হয়নি। লাভবান হয়েছিলো তার মালিক (ঘোড়ারতো পুরস্কার প্রাপ্তি বোধই নেই)।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে নেতিবাচকতাকে ইতিবাচকতার উপরে প্রাধান্য দিতে হয়। তাই আমরা ঘোড়ার জন্য এক অংশকেই ধরবো। আর দুই অংশের বর্ণনা যেখানে রয়েছে, সেখানে মনে করবো অতিরিক্ত এক অংশ ছিলো আসলে পুরস্কার। তাছাড়া ওই সকল বর্ণনা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ঘোড়ার দুই অংশের ব্যাপারটি স্থায়ী কোনো বিধান ছিলো না। স্থায়ী বিধান ছিলো— ঘোড়ার এক অংশ, যোদ্ধার এক অংশ। এভাবে পদাতিকের এক অংশ এবং অশ্বারোহীর দুই অংশ। আর হজরত আবু কাবশার বর্ণনাটিও বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়নি।

মাসআলাঃ যদি কেউ দুটি ঘোড়া নিয়ে জেহাদে শরীক হয়, তবে সে একটি ঘোড়ার অংশই পাবে। এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় লিখেছেন, আমি একাধিক ঘোড়া সম্পর্কে কোনো বর্ণনা শুনিনি। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, এমতো ক্ষেত্রে দুটি ঘোড়ার অংশই দিতে হবে। তবে এটা ঐকমত্য যে, দুইয়ের অধিক ঘোড়ার জন্য কোনো অংশ নেই। ইমাম আবু ইউসুফের পক্ষে রয়েছে এই হাদিসটি — দারাকুতনীর বর্ননায় এসেছে, হজরত বশীর বিন ওমর বিন মুহসীন বলেছেন, রসুল স. আমার দুই ঘোড়ার জন্য চার অংশ দিয়েছিলেন। মাকহুল সূত্রে আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, খায়বর যুদ্ধে হজরত যোবায়ের দুইটি ঘোড়া সহ অংশগ্রহণ করেছিলেন। রসুল স. তাঁকে দিয়েছিলেন পাঁচটি অংশ।

আব্দুল মালেক বিন ইয়াহ্ইয়া সূত্রে ওয়াকেদী লিখেছেন, ঈসা বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, খায়বর যুদ্ধের সময় হজরত যোবায়েরের ছিলো দুইটি ঘোড়া। রসুল স. তাঁকে অংশ দিয়েছিলেন পাঁচটি। হারেস বিন আব্দুল্লাহ্ বিন কা'ব সূত্রে ওয়াকেদীর বর্ণনায় আরো এসেছে, খায়বর যুদ্ধে রসুল স. তিনটি ঘোড়া নিয়ে গিয়েছিলেন।

www.eelm.weebly.com

ঘোড়া তিনটির নাম ছিলো— লাজাজ, জোরাব এবং সাকাব। হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম কয়েকটি ঘোড়া এবং হজরত হেরাস বিন সামেত নিয়ে গিয়েছিলেন দুটি ঘোড়া। দুটি করে ঘোড়া নিয়ে গিয়েছিলেন হজরত বারা বিন আউস এবং হজরত আবু ওমরা আনসারীও। রসুল স. তাঁদেরকে দুই ঘোড়ারই অংশ দিয়েছিলেন। দুইয়ের অধিক ঘোড়ার জন্য রসুল স. কোনো অংশ নির্ধারণ করেন নি।

স্বসূত্রে ইবনে জাওজী সাঈদ বিন মানসুরের মাধ্যমে ইবনে আয়্যাশ আওজায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ঘোড়ার অংশ প্রদান করতেন। কিন্তু দুইয়ের অধিক ঘোড়ার জন্য কোনো অংশ দিতেন না — যদিও কোনো কোনো যুদ্ধে কারো কারো দশটি পর্যন্ত ঘোড়া থাকতো।

সাঈদ বিন মানসুর — ফুরুজ বিন ফাদ্বালাহ— মোহাম্মদ বিন ওয়ালিদ — জুহুরী সূত্রে এসেছে, খলিফা হজরত ওমর সেনাপতি হজরত আবু উবায়দা বিন জাররাহকে লিখেছিলেন, এক ঘোড়ার জন্য দুই অংশ, দুই ঘোড়ার জন্য চার অংশ এবং ঘোড়ার মালিকের জন্য এক অংশ — এভাবে দুই ঘোড়ার মালিককে দিতে হবে পাঁচ অংশ। দুইয়ের অধিক ঘোড়ার জন্য কোনো অংশ নেই।

ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল খেরাজে লিখেছেন, আমাকে ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ জানিয়েছেন, হাসান বলেছেন, দুইয়ের অধিক ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেও যোদ্ধা পাবে কেবল দুটো ঘোড়ার অংশ। দুইয়ের অধিক ঘোড়ার জন্য কোনো অংশ নেই। মাকহুলের বক্তব্য ইয়াজীদ বিন ইয়াজীদ বিন জাবেরের মাধ্যমে মোহাম্মাদ বিন ইসাহাক কতৃক বর্ণিত হয়েছে এভাবে — যুদ্ধলব্ধ সম্পদে দুইয়ের অধিক ঘোড়ার কোনো অংশ নেই।

হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম আহমদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সকল বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে, ওই সকল বর্ণনায় বলা হয়েছে পুরস্কার প্রদানের কথা। মালে গণিমতের নির্ধারিত অংশের কথা সেগুলোতে বলা হয়নি। যেমন, পদাতিক হওয়া সত্ত্বেও রসুল স. হজরত সালমা বিন আকওয়াকে দিয়েছিলেন অতিরিক্ত অংশ।

আমি বলি, যুদ্ধের পরে সেনাধিনায়ক বা শাসক যোদ্ধার বিশেষ অবদানের মূল্যায়ন করে পুরস্কারের ঘোষণা দিবেন। এটাই পুরস্কার প্রদানের নিয়ম। যুদ্ধের পূর্বে এ রকম ঘোষণা দেয়া যাবে না। কারণ রসুল স. এ রকম করেননি।

মাসআলাঃ যুদ্ধশেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে যদি সাহায্যকারী বাহিনী এসে সম্মিলিত হয়, তবে তারাও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ পাবে — যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করা সত্ত্বেও। তবে শর্ত হচ্ছে সাহায্যকারী বাহিনী মূল বাহিনীর সাথে সম্মিলিত হতে হবে ইসলামী সাম্রাজ্যের বাইরে — বিধর্মীদের অঞ্চলে। এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। জমহুর বলেছেন অন্য কথা। তাঁদের অভিমতের

www.eelm.weebly.com

দলিল দিয়েছেন তাঁরা এভাবে— যথার্থ সূত্রে ইবনে আবী শায়েবা এবং তাহাবী তারেক বিন শিহাব আখমাসী থেকে বর্ণনা করেছেন— বসরাবাসীরা নাহাওয়ানদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলো। হজরত আম্মার বিন ইয়াসিরের নেতৃত্বে কুফাবাসীরা পরে রওনা হয়েছিলো সাহায্যকারী বাহিনীরূপে। কিন্তু তারা পৌঁছানোর পূর্বেই জয়লাভ করেছিলো বসরাবাসীরা। সাহায্যকারী বাহিনী তখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ পায়নি। বরং মূল বাহিনীর এক সদস্য মন্তব্য করেছিলো, যুদ্ধ না করেও তারা আমাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদে অংশীদার হতে চায় কেনো ? সেনাপতি হজরত আম্মার ঘটনাটি লিখে জানালেন খলিফা হজরত ওমরকে। জবাবে হজরত ওমর লিখলেন, যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে তারাই যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকারী। উল্লেখ্য যে, রসুল স. এর অধীনে সম্পন্ন এক জেহাদে হজরত আম্মারের একটি কান কেটে গিয়েছিলো। তিনি বলতেন, ওই কানটিই আমার ছিলো উত্তম কান যা ধর্ম যুদ্ধে কাজে লেগেছিলো।

মারফু ও মাওকুফ (সর্বোন্নোত ও উন্নত) সূত্রে তিবরানী উল্লেখ করেছেন— যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তারাই যুদ্ধলব্ধ সম্পদের দাবীদার। বর্ণনাটি উন্নত সূত্রে বিশুদ্ধ এবং সর্বোন্নত সূত্রে অবিশুদ্ধ। ইবনে আদীর পদ্ধতিতে বোখতারী বিন মোখতার সূত্রে আব্দুর রহমান বিন মাসউদের মাধ্যমে এসেছে, হজরত আলীও এ রকম ঘোষণা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ ঘোষণাটি রসুল স. এর নয়, হজরত আলীর। তাই তা মারফু নয়, মাওকুফ।

জায়েদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন কাসীতের পদ্ধতিতে ইমাম শাফেয়ী উল্লেখ করেছেন — হজরত আবু বকর হজরত ইকরামা বিন আবু জেহেলের নেতৃত্বে পাঁচশত সদস্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন হজরত জায়েদ বিন লবিদের অগ্রগামী বাহিনীর সাহায্যার্থে। এই বর্ণনাটির শেষ দিকে উল্লেখিত হয়েছে, ওই সময় হজরত আবু বকর একটি লিখিত নির্দেশনায় উল্লেখ করেছিলেন— যারা যুদ্ধে সশরীরে অংশ গ্রহণ করবে, তারাই হবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকারী। বর্ণনাটির সূত্র পরম্পরা অসংলগ্ন।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. হজরত আবান বিন সাঈদ বিন আস্ এর নেতৃত্বে একটি সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন নজদের দিকে। তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন খায়বর বিজয়ের পর। রসুল স. হজরত আবানের বাহিনীকে খায়বরের গণিমতের অংশ দেননি। আবু দাউদ, আবু নাঈম, বোখারী। এ সম্পর্কে হানাফীগণ বলেছেন, বিজয়ের ফলে খায়বর হয়ে গিয়েছিলো ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানাভূত এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদও হয়ে গিয়েছিলো সুসংরক্ষিত। হজরত আবানের বাহিনী সেখানে পৌঁছেছিলো পরে। যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ তাদের ঘটেনি। আর তারা বিধর্মীদের রাজ্যেও মিলিত হয়নি মূল বাহিনীর সাথে। তাই যুদ্ধলব্ধ সম্পদও দেয়া হয়নি তাদেরকে।

www.eelm.weebly.com

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে— হজরত আবু মুসা আশআরী বলেছেন, আমি রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলাম খায়বর বিজয়ের পর। রসুল স. আমাকেও দিয়েছিলেন গণিমতের অংশ। অংশ পেয়েছিলো আমার সঙ্গী সাথীরাও। এ সম্পর্কে ইবনে হাব্বান বলেছেন রসুল স. তখন হজরত আবু মুসা ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে অংশ দিয়েছিলেন খুমুস থেকে — পুরস্কাররূপে। মুজাহিদগণের অবশিষ্ট চার অংশ থেকে নয়।

মাসআলাঃ ব্যবসায়ী ও ঘোড়ার পরিচর্যাকারীরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে থাকলেও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার হবে না— যতক্ষণ না তারা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তারাও গণিমতের অংশ পাবে। কারণ হাদিস শরীফে এসেছে— আহাল্লাল গাণিমাতা লিমান শাহিদাল ওয়াকোয়াতা। (যুদ্ধের সঙ্গে যারা জড়িত তারাই গণিমত লাভের যোগ্য) অতএব যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সকলেই হবে গণিমতের অংশীদার। ইমাম শাফেয়ীর এই অভিমতটি দু'টি কারণে অশুদ্ধ। প্রথমটি হচ্ছে — বর্ণিত হাদিসটি সর্বোন্নত নয়, উন্নত (রসুল স. এর কথা নয় সাহাবীর কথা)। দ্বিতীয়টি হচ্ছে— হাদিসটির উদ্দেশ্য বুঝতে তিনি অসমর্থ হয়েছেন। হাদিসটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— যারা যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হবে, তারাই পাবে গণিমতের অংশ। এই উদ্দেশ্য বা নিয়ত চিহ্নিত করা যেতে পারে দু'ভাবে— ১. যুদ্ধের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ এবং ২. যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ। কাজেই যার রণ প্রস্তুতি নেই এবং যে যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেনি— তাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকারী বলা যায় না। এ রকম হলে তো সেনাবাহিনীর সঙ্গের মহিলা ও শিশুরাও গণিমতের অংশীদার হবে। কিন্তু তাদের অংশীদার হওয়ার কথা কেউই বলেননি।

মুসলিম এবং আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাসকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, রসুল স. এর সঙ্গে যে সকল রমণী জেহাদে গমন করতেন, তাদেরকেও কি গণিমতের অংশ দেয়া হতো? হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, রসুল স. প্রয়োজনবশতঃ তাদেরকে সঙ্গে নিতেন, কিন্তু গণিমতের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। আবু দাউদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এ কথাটি— তাদেরকে কিছু উদ্বৃত্ত প্রদান করা হতো (নির্ধারিত অংশ নয়, অতিরিক্ত কিছু দেয়া হতো উপহাররূপে)। এই বর্ণনাটি আবার আবু দাউদ ও নাসাঈর আরেকটি বর্ণনার পরিপন্থী। বর্ণনাটি এই— হাশরাজ বিন জিয়াদ, তাঁর পিতামহীর কথা উদ্ধৃত করেছেন এভাবে— রসুল স. পুরুষদের মতোই রমণীদেরকে গণিমতের অংশ দিয়েছেন। কিন্তু এই বর্ণনাটি শিথিল সূত্র বিশিষ্ট। আর বর্ণনাকারী হাশরাজও অপরিচিত।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ কিশোরদেরকে যদি মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে গমনের অনুমতি দেয়া হয় এবং শাসক বা অধিনায়ক যদি তাদের অংশ অনুমোদন করেন, তাহলে তারাও হবে মালে গণিমতের অংশীদার। ইমাম মালেক এ রকম বলেছেন। জমহুর বলেছেন, তাদেরকে অংশীদার করা যাবে না। তবে অবশ্যই তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে কিছু দিতে হবে। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, মাকহুল বলেছেন, রসুল স. মেয়েদের, কিশোরদের এবং ঘোড়ার অংশ প্রদান করেছিলেন। বর্ণনাটি মূলবিবর্জিত (মুরসাল)।

মাসআলাঃ শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত জমি, বাগান ইত্যাদি স্থাবর সম্পদ যুদ্ধলব্ধ অন্যান্য অস্থাবর সম্পদের মতো ভাগ করতে হবে। প্রথমে বের করে নিতে হবে খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), তারপর বাকী চতুর্থাংশ ভাগ করে দিতে হবে মুজাহিদগণের মধ্যে। এ রকম বলেছেন ইমাম শাফেয়ী। খায়বরের ভূমি মুজাহিদগণের মধ্যে এভাবেই ভাগ করে দিয়েছিলেন রসুল স.। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদও এই অভিমতের সমর্থক। কারণ, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে — 'মা গণিমতুম' (যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করো)। এখানে স্থাবর— অস্থাবরের পার্থক্য করা হয়নি। তবে মুজাহিদেরা যদি প্রসন্ন চিত্তে তাদের অধিকার পরিত্যাগ করে, তবে শাসক ওই স্থাবর সম্পত্তিকে সাধারণ মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দিতে পারবেন। খলিফা হজরত ওমর তাঁর সময়ে অধিকৃত ইরাকের ভূমি এভাবে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। ইমাম মালেক বলেছেন, স্থাবর সম্পত্তি মুজাহিদগণের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার অধিকার শাসকের নেই। স্থাবর সম্পত্তি অধিকারে আসার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মুসলমানদের সম্পত্তি হিসেবে আপনা আপনি ওয়াকফ হয়ে যাবে। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমতও এ রকম। বিপরীত বক্তব্য এসেছে অপর একটি বর্ণনানুসারে। ওই বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমত ইমাম মালেকের অভিমতের প্রতিকূল। সেখানে বলা হয়েছে, শাসক ইচ্ছে করলে অধিকৃত স্থাবর সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ আলাদা করে নেয়ার পর অবশিষ্ট চতুর্থাংশ মুজাহিদগণের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারেন। অথবা ইচ্ছে করলে সাধারণ মুসলমানদের জন্য ওয়াকফও করে নিয়ে বাকী অংশ মুজাহিদদের বিধানানুসারে বণ্টন করে দিতে পারেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, শাসক ইচ্ছে করলে খুমুস আলাদা করে দিতে পারেন। অথবা খেরাজ (খাজনা) প্রদানের শর্তে সাধারণ মুসলমানকেও দিয়ে দিতে পারেন। ওই সম্পত্তি ওয়াকফ্ করার অধিকার শাসকের নেই।

ইমাম আহমদ তাঁর অভিমতের পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন এভাবে — হজরত সহল বিন হাছানা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. খায়বরের স্থাবর সম্পত্তিকে সমান দুই অংশে ভাগ করেছিলেন। এক অংশ রেখেছিলেন নিজের জন্য। অপর অংশ ভাগ করেছিলেন আঠারো শত ভাগে। পদাতিক এক, অশ্বারোহী দুই এই নিয়মে বারোশত পদাতিক যোদ্ধাদেরকে দেয়া হয়েছিলো এক ভাগ করে বারোশত ভাগ। আর তিন শত অশ্বারোহী যোদ্ধাকে দেয়া হয়েছিলো দুই ভাগ করে ছয়শত ভাগ। ইবনে জাওজী।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তাহাবী লিখেছেন, রসুল স. অর্ধেক ফসল প্রদানের শর্তে খায়বরের জমিন খায়বরবাসীদেরকে প্রদান করেছিলেন। আর হজরত ইবনে রওয়াহাকে নিযুক্ত করেছিলেন তত্ত্বাবধায়করূপে। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে রসুল স. খায়বরবাসীদেরকে ফসলের অর্ধভাগ প্রদানের শর্তে বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন খায়বরের জমি জমা। হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে, যখন আল্লাহ্পাক খায়বরের জমি জমা ও বাগান এনে দিলেন মুসলমানদের অধিকারে, তখন সেগুলো সেখানকার জমির মালিকদেরকেই বন্দোবস্ত দেয়া হলো এবং হজরত আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহাকে নিযুক্ত করা হলো রাজস্বআদায়কারীরূপে। এরপর তাহাবী লিখেছেন, এতে করে প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. খায়বরের অধিকৃত ভূখণ্ড সম্পূর্ণ ভাগ-বণ্টন করে দেননি। সম্পূর্ণ ভূখণ্ড দুই ভাগ করে একভাগ বণ্টন করে দিয়েছিলেন। অপরভাগ রেখে দিয়েছিলেন বণ্টনবিহীন অবস্থায়।

আমি বলি, সুরা ফাতাহের তাফসীরে ইবনে ইসহাক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, খায়বরের সম্পত্তি বণ্টন করা হয়েছিলো তিন ভাগে — শেক, নাতাত এবং কুছাইবা। কুছাইবা হচ্ছে খুমুস। আর সৈন্যদের আঠারো শত অংশ। পাঁচশত অংশ নাতাত এবং তেরোশত অংশ শেক। অর্ধেক অংশ খাজনা প্রদানের চুক্তিতে সেখানকার ইহুদীদেরকে দিয়ে দেয়া হয়েছিলো। রাজস্ব আদায়কারী হজরত ইবনে রওয়াহা ফসল তোলার মৌসুমে সেখানে যেতেন এবং ফসলের পরিমাণের উপর খাজনা নির্ধারণ করে তা আদায় করে নিয়ে আসতেন। পরবর্তীতে হজরত ওমর তাঁর খেলাফতকালে ওই ইহুদীদেরকে বিতাড়িত করেন। কারণ, চুক্তিতে এ কথাটি উল্লেখিত ছিলো যে, আমরা যখনই ইচ্ছা করবো তখনই আমাদের ভূমি সরাসরি আমাদের অধিকারে নিয়ে আসবো।

ইরাক বিজিত হয়েছিলো হজরত ওমরের খেলাফতকালে। ইরাকের প্রেক্ষা-পটটি ছিলো ভিন্ন। ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল খেরাজ গ্রন্থে লিখেছেন, আমার নিকট মদীনার অনেক আলেম বলেছিলেন, যখন সেনাপতি হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বাহিনী ইরাক অধিকার করলো, তখন হজরত ওমর অধিকৃত ভূখণ্ড সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পরামর্শ গ্রহণ করলেন। বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিতে শুরু করলেন সাহাবীগণ। কেউ কেউ বললেন, যারা ইরাক অধিকার করেছে তাদের মধ্যেই বণ্টন করে দেয়া হোক সেখানকার জমিজমা। হজরত ওমর বললেন, যদি এ রকম করা যায়, তবে কি অবস্থা হবে। বিধর্মীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তারাতো আর কোনোদিন জমিজমার মালিকানা পাবে না। তাই আমি এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করি। হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ বললেন, বিষয়টিতো যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। হজরত ওমর বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আল্লাহ্র বান্দাদের সমস্যাটিও প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ্র শপথ! আমার পরে এতো বিশাল ভূখণ্ড আর আমাদের অধিকারে আসবে

www.eelm.weebly.com

না। সুতরাং ইরাক ও সিরিয়ার সমগ্র ভূখণ্ড বণ্টন করে দিলে সেনাবাহিনীর খরচ এবং দরিদ্র জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য কোত্থেকে আসবে? ইরাক বিজয়ী ও সিরিয়া বিজয়ীরা তখন বললেন, হে আমিরুল মু'মিনিন! আমাদের তরবারীর মাধ্যমে আল্লাহ্পাক আমাদেরকে যা দান করেছেন, আপনি কি তা ওই সকল লোককে ওয়াকফ্ করে দিতে চান, যারা এবং যাদের পুত্র-কন্যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণই করেনি? হজরত ওমর বললেন, আমি আমার মতামত প্রকাশ করলাম। যোদ্ধৃবৃন্দ বললেন, তবে আপনি সকলের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করুন। হজরত ওমর প্রথমে আলাপ-আলোচনা করলেন বিজ্ঞ মুহাজির সাহাবীগণের সঙ্গে। হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ বললেন, অধিকৃত সম্পত্তির অধিকারী মুজাহিদবৃন্দ। সুতরাং তাদের মধ্যেই ওই সম্পত্তি বণ্টন করে দেয়া হোক। কিন্তু হজরত আলী, হজরত ওসমান এবং হজরত তালহা মত প্রকাশ করলেন হজরত ওমরের অনুকূলে। এরপর হজরত ওমর পরামর্শে বসলেন আনসার সাহাবীগণের সঙ্গে। পরামর্শ সভায় অংশ গ্রহণ করলেন আউস গোত্রের দশজন এবং খাজরাজ গোত্রের দশজন। তাদেরকে একত্র করে হজরত ওমর প্রথমে বর্ণনা করলেন আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা। তারপর বললেন, আমি আপনাদেরকে ডেকেছি শুধু এ কথা বলতে যে, আমানতের গুরুভার রয়েছে আমার স্কন্ধে। আপনারাও এই গুরুভারের অংশীদার। আমি আপনাদের মতোই একজন সাধারণ ব্যক্তি। উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে কেউ কেউ আমার মতামতের বিরোধিতা করেছেন। কেউ কেউ হয়েছেন একমত। আপনাদের অধিকার সংরক্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। এটাও আমি চাই না যে, আপনারা আমার অযৌক্তিক কোনো সিদ্ধান্তের অনুসারী হোন। আপনাদের কাছে রয়েছে আল্লাহ্র কিতাব — যা সত্যের নির্দেশক। আল্লাহ্র শপথ! আমি চাই আমার কথায় ও আচরণে প্রকাশিত হোক প্রকৃত সত্য। আনসারী সাহাবীগণ বললেন, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! বিস্তারিত বর্ণনা করুন। আমরা শুনছি।

হজরত ওমর বললেন, কেউ কেউ বলছেন, আমি যোদ্ধাদের হক বিসর্জন দিচ্ছি। এ রকম করা থেকে আমি আল্লাহ্তায়ালার আশ্রয় যাচনা করি। জনগণের অধিকার নিশ্চিত না করতে পারলে তা হবে আমার জন্য বড়ই দুর্ভাগ্য। আমি মনে করি পারস্য বিজয়ের পর এতোবড় বিজয় আর আমাদের ভাগ্যে ঘটবে না। আল্লাহ্তায়ালা ইরাক সহ পারস্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল আমাদের অধিকারভূত করে দিয়েছেন। সেখানকার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি খুমুস গ্রহণের পর যোদ্ধাদেরকে দিতেও আমি সম্মত। কিন্তু সেখানকার ভূখণ্ড, জমি-জমা, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি খাজনা দেয়ার শর্তে আমি সেখানকার অধিবাসীদেরকেই দিয়ে দিতে চাই। জিযিয়াও ধার্য করতে চাই তাদের উপর। এভাবে আমরা পাবো খাজনা ও জিযিয়া। এভাবেই নিয়মিত উপার্জন আসতে থাকবে আমাদের। এটাই হবে সকলের জন্য অধিকতর কল্যাণকর। আমাদের আগামী বংশধরেরাও এতে

www.eelm.weebly.com

করে উপকৃত হবে। এছাড়াও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিজিত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে গড়ে তুলতে হবে সুশৃঙ্খল প্রশাসন কেন্দ্র। শাম, জাজিরা, কুফা, বসরা, মিশর ইত্যাদি স্থানে গড়ে তুলতে হবে স্থায়ী সেনানিবাস। সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন পড়বে বিপুল অর্থের। অতএব সমগ্র অধিকৃত ভূখণ্ড যদি আমি পারস্য বিজয়ী সৈন্যদের মালিকানায় দিয়ে দেই, তবে প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয় নির্বাহ হবে কিভাবে? উপস্থিত আনসারী সাহাবীগণ সমস্বরে বলে উঠলেন, হে আমিরুল মু'মিনিন! আপনি যথার্থ বলেছেন। আপনার সিদ্ধান্তের মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। হজরত ওমর বললেন, এবার আমার প্রয়োজন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির — যিনি ভূমির প্রকৃতি অনুপাতে অমুসলিম জনসাধারণের উপর এমন পরিমিত খাজনা নির্ধারণ করতে পারেন যা তাদের জন্য হবে সুবহ। সকলে বলে উঠলেন, ওসমান বিন হানিফের কথা। আরো বললেন, তিনি বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। হজরত ওমর তৎক্ষণাৎ হজরত ওসমান বিন হানিফকে ডেকে পাঠালেন এবং প্রদান করলেন বিজিত ভূখণ্ডের সীমানা ও কর নির্ধারণের দায়িত্ব। এর ফল হলো অত্যন্ত শুভ। হজরত ওমরের পরলোকগমনের বছর খানেক আগেই ওই এলাকাগুলো থেকে আয় হলো এক কোটি দিরহামের মতো।

ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন, জুহুরী সূত্রে আমার নিকট মোহাম্মদ বিন ইসহাক উল্লেখ করেছেন, হজরত ওমর ইরাক বিজয়ের পর সেখানকার ভূমি বণ্টন সম্পর্কে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সাধারণভাবে প্রায় সকলেই বললেন, যুদ্ধলব্ধ অস্থাবর সম্পদ বণ্টনের নিয়মে জমি-জমাও ভাগ করে দেয়া হোক মুজাহিদগণের মধ্যে। হজরত বেলাল বিন রিবাহ এই অভিমতের প্রতি ছিলেন অনমনীয়। আর হজরত ওমর ছিলেন ভাগ করার বিপক্ষে। তিনি দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্! বেলালের মতামতের উপর তুমি আমার মতামতকে জয়যুক্ত করো। এই নিয়ে বিতর্ক চললো দুই তিন দিন ধরে। অবশেষে হজরত ওমর বললেন, আমার অভিমতের পক্ষে রয়েছে কোরআনের একটি দলিল। সুরা হাশরে ঘোষণা করা হয়েছে— 'মা আফায়াল্লহু আ'লা রসুলিহি মিনহুম .... ওয়াল্লাজিনা জায়ু মিম বা'দিহিম। এই আয়াতের নির্দেশনা একটি সাধারণ নির্দেশনা। অনাগত বিশ্বাসী জনতাও এই নির্দেশনাটির অর্ন্তভূত। এই নির্দেশনাটির আলোকে আমি বলি, বিজিত দেশের সমগ্র ভূখণ্ড সকল মুসলমানের সম্পদ। এবার তবে আপনারা বলুন, ওই ভূখণ্ড আমি ভাগ করবো কিভাবে? যদি ভাগ করি তবে সাধারণ জনতার অধিকার ক্ষুণ্ন করা হবে। শেষ পর্যন্ত হজরত ওমরের সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হলো। খাজনা প্রদানের শর্তে সেখানকার জমি-জমা ফিরিয়ে দেয়া হলো আগের মালিকদেরকে।

ইমাম আবু ইউসুফ আরো লিখেছেন, আমার নিকট হাবীব বিন আবী সাবেত সূত্রে লাইস বিন লাইস বিন সা'দ বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণের অনেকে তখন বলেছিলেন, রসুল স. যেভাবে খায়বরের জমি-জমা ভাগ করে দিয়েছিলেন

www.eelm.weebly.com

সেভাবেই আপনি ভাগ করে দিন ইরাক ভূখণ্ডকে। এই অভিমতের দৃঢ় প্রবক্তা ছিলেন হজরত যোবায়ের বিন আওয়াম এবং বেলাল বিন আবী রিবাহ্। হজরত ওমর তখন বলেছিলেন, মুসলমানদের আগামী প্রজন্মকে বঞ্চিত করা সমীচীন নয়। এরপর তিনি দোয়া করেছিলেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমাকে বেলালের বিরুদ্ধে সাহায্য করো। মুসলমানেরা ধারণা করতেন হজরত ওমরের অপপ্রার্থনার ফলেই মহামারীরূপে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিলো সিরিয়ায়। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, হজরত ওমর তখন ইরাকের ভূখণ্ড খাজনা আদায়ের শর্তে সেখানকার অধিবাসীদেরকেই দিয়ে দিয়েছিলেন।

আমি বলি, এ কথাটি ব্যাপক বিদিত যে, ইরাকের জমি-জমা খাজনার বিনিময়ে সেখানকার অধিবাসীদের নিকটে হস্তান্তর করার বিষয়টি ছিলো ঐকমত্যসম্মত (পক্ষে বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করলেও অবশেষে সকলে হজরত ওমরের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন)।

একটি সন্দেহঃ ঐকমত্যের মাধ্যমে কোরআনের আয়াত রহিত হতে পারে না। আলোচ্য আয়াতেই দেয়া হয়েছে — যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের বিবরণ। তাহলে বন্টন না করার বিষয়ে ঐকমত্য সংঘটিত হতে পারে কি ভাবে? আর হজরত ওমর সুরা হাশরের যে আয়াত দলিল হিসেবে পেশ করেছিলেন, তাও এখানে দলিল হিসেবে প্রয়োগ করা যায় না। কারণ সেখানে যে সম্পদের কথা বলা হয়েছে, তা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নয়। আর ইরাকের বিজিত ভূখণ্ড যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অন্তর্ভূত। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে মুজাহিদদেরকে উৎসাহিত করার জন্য। তবে ইরাকের বিজিত ভূখণ্ড সম্পর্কে এ রকম করা হলো না কেনো?

সন্দেহের নিরসনঃ উম্মতে মোহাম্মদী কখনো ভুল বিষয়ে একমত হয় না। সুতরাং এখানকার ঐকমত্যটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থার বিরোধী নয়। তাই বুঝতে হবে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বণ্টনের নিয়ম প্রযোজ্য হবে, অস্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে নয়। আরো লক্ষ্যণীয় যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের কোনো কোনো সামগ্রী নিজের জন্য গ্রহণ করার অধিকার রসুল স. এর ছিলো। 'নিহত ব্যক্তির মাল সামান পাবে তার হত্যাকারী'— এই ঘোষণাও তিনি স. দিয়েছিলেন। অতএব বুঝতে হবে বিজিত দেশের ভূখণ্ড ভাগ না করাও তেমনি একটি বিশেষ ব্যবস্থা। আর বিশেষ ব্যবস্থার উপরে সংঘটিত হয়েছিলো ঐকমত্য।

মোহাম্মদ বিন আবীল মুজালিদ একবার আব্দুল্লাহ্ বিন আবু আওফাকে জিজ্ঞেস করলেন, রসুল স. কী তাঁর সময়ে ভূমিজাত শস্য ও পরিপক্ক ফলের খুমুস বের করেছিলেন? তিনি বললেন, খায়বরের বিস্তীর্ণ ভূভাগ অধিকারে আসার পর আমি পেয়েছিলাম কেবল কিছু খাদ্যশস্য এবং প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র। অন্যান্যরাও এ রকম পেয়েছিলেন। খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) তখন আলাদা করে

www.eelm.weebly.com

নেয়া হয়। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন রসুল স. এর জামানায় একদল মুজাহিদ গণিমত হিসেবে পেয়েছিলেন কেবল কিছু আহার্য দ্রব্য ও ছোট খাটো কিছু সামগ্রী। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তখন খুমুসকেও আলাদা করা হয়নি। হজরত উবাইদুর রহমানের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস কাসেমের বর্ণনায় এসেছে, কতিপয় সাহাবী বলেছেন জেহাদের সময় আমরা উটের গোশত খেতাম। যার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই খেতাম আমরা। উট বা গোশত আমাদেরকে ভাগ করে দেয়া হতো না। হাদিস তিনটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ।

দ্রষ্টব্যঃ শাওয়াফীয়্ বলেছেন, গণিমতের দাবিদারদের সম্মতিক্রমে ইরাক ও সিরিয়ায় সমগ্র ভূভাগ ওয়াকফ্ করে দিয়েছিলেন হজরত ওমর। আর মুজাহিদেরা ওই সম্মতি দিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়, প্রসন্নচিত্তে।

আমি বলি, এ রকম হয়ে থাকলে সবার আগে অবশ্যই খুমুস বের করে নেয়া হতো। কারণ খুমুস খলিফা অথবা মুজাহিদ— কারোই হক নয়। কেউ খুমুসকে পরিত্যাগ করার অধিকারও রাখে না। এরপর হজরত ওমর জরিপ করে আংগুর ও গমের উপর ভিন্ন ভিন্ন হারে খাজনা নির্দিষ্ট করেছিলেন। সাধারণ মুসলমানদের জন্য ওই জমি ওয়াকফ্ করা হলে বিভিন্নভাবে কর নির্ধারণের প্রয়োজন পড়তো না। ফসল উৎপাদনের আগেই ফসলের উপর কর নির্ধারণ করলে তা হবে অস্তিত্বহীন ক্রয়-বিক্রয়ের মতো— যা বৈধ নয়। সুতরাং তিনি ইরাক ও সিরিয়ার জমি ওয়াকফ করেছিলেন — কথাটি ঠিক নয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ইরাক ও সিরিয়ার ভূখণ্ড তিনি মুসলমানদের অধীনে প্রদানই করেননি। খাজনা নির্ধারণ করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পূর্ব মালিকদেরকে। জিযিয়াও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তাদের উপর। এভাবে বিজিত দেশে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইসলামী শাসন। এভাবে বিধর্মীরাই হয়েছিলো ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক। মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদের উপর কর নির্ধারণ করা না হলেও কর প্রদানকারীদের অধীনস্থ ও অধীনস্থা বলে এভাবে তারাও হয়ে গিয়েছিলো প্রশাসনের পরোক্ষ সহায়ক।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা বিশ্বাস করো আল্লাহে এবং তাতে মীমাংসার দিন যা আমি আমার দাসের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম, যখন দুইদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলো এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।' এ কথার অর্থ— বদর যুদ্ধের দিন মুখোমুখি হয়েছিলো মুসলিম বাহিনী ও কাফের বাহিনী। মুসলিম বাহিনীর সেনাধিনায়ক ছিলেন আল্লাহ্র রসুল স্বয়ং। আল্লাহ্পাক তাঁর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছিলেন ফেরেশতা বাহিনী। অবতীর্ণ করেছিলেন আরো অনেক মোজেজা। আল্লাহ্র ওই অলৌকিক সাহায্য এবং তাঁর রসুলকে প্রদত্ত মোজেজা সমূহকে তোমরা বিশ্বাস করো। এ কথাও বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

www.eelm.weebly.com

অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিলো বদর যুদ্ধের সময়। নিম্নে সেগুলোর উল্লেখ করা হলো—

১. আল্লাহ্পাক অংগীকার করেছিলেন — কুরায়েশদের দু'টি বাহিনীর মধ্যে একটির উপর মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন। মুসলমানেরা চেয়েছিলো সহজ বিজয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য বাহিনীকে আক্রমণ করা। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ছিলো ভিন্ন। তাঁর ইচ্ছাই কার্যকর হয়েছিলো। মুসলিম বাহিনীকে দাঁড়াতে হয়েছিলো কুরায়েশদের সশস্ত্র ও সুসজ্জিত বিশাল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে।

২. হঠাৎ নেমে এসেছিলো বৃষ্টি। ওই বৃষ্টি ছিলো মুসলমানদের জন্য রহমত এবং কাফেরদের জন্য অভিশাপ।

৩. সাহায্যকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছিলো সশস্ত্র ফেরেশতাদেরকে। কেউ কেউ তাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলেন। তাদেরকে দেখেওছিলেন কেউ কেউ। ওই ফেরেশতাদের আঘাতে অনেক কাফের ধরাশায়ী হয়েছিলো। কোনো কোনো কাফেরের মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো তাদের শরীর থেকে। আবু জেহেলের শরীরেও ছিলো ফেরেশতাদের চাবুকের চিহ্ন।

৪. রসুল স. এক মুষ্টি প্রস্তর কণা নিয়ে ছুঁড়ে মেরেছিলেন কাফেরদের দিকে। তাদের প্রত্যেকের চোখে পড়েছিলো ওই পাথরের কণাগুলো। ফলে তারা হয়ে পড়েছিলো দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য।

৫. কাফেরেরা সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখানো হয়েছিলো নগণ্য সংখ্যকরূপে। এভাবে মুসলমানদের অন্তর থেকে দূর করে দেয়া হয়েছিলো যুদ্ধভীতি। বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো সাহস।

৬. রসুল স. পূর্বাহ্নে দেখিয়ে দিয়েছিলেন মুশরিকদের মৃত্যুর স্থান। তাঁর নির্দেশিত স্থানেই মরে পড়েছিলো ওই সকল অংশীবাদীরা।

৭. রসুল স. তাঁর মক্কা বাসের সময় উক্বা বিন আবী মুয়িত্কে বলেছিলেন, মক্কার পর্বতমালার বাইরে পেলেই আমি তোমাকে হত্যা করবো। বদর যুদ্ধে এ রকমই ঘটেছিলো।

৮. রসুল স. তাঁর যুদ্ধবন্দী পিতৃব্য হজরত আব্বাসকে বলেছিলেন, আপনি অমুক বস্তু আপনার পত্নী উম্মুল ফজলের জ্ঞাতসারে ওমুক স্থানে রেখে এসেছেন। এ কথা শুনে হজরত আব্বাস রসুল স. এর রেসালত সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

৯. আল্লাহ্পাক মুসলমানদেরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যদি তোমরা বিশুদ্ধ চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করো, তবে যে সম্পদ তোমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম সম্পদ দেয়া হবে তোমাদেরকে। তাই হয়েছিলো। হজরত আব্বাস বিশুদ্ধ চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে, বিশ আউকিয়ার (সোনা অথবা চাঁদির) বিনিময়ে পেয়েছিলেন বিশটি গোলাম।

www.eelm.weebly.com

১০. আল্লাহ্‌পাক তাঁর রসুলকে জানিয়েছিলেন, মক্কায় বসে আমবার বিন ওয়াহাব এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়া আপনাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। তাদের পরিকল্পনা সফল হবে না। কারণ আপনার রক্ষক স্বয়ং আমি। এই সংবাদ উমায়েরকে জানানো হলে তিনি তা স্বীকার করেন এবং বিশুদ্ধ চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করেন। হয়ে যান ধর্মের একনিষ্ঠ প্রচারক। তখন খেজুরের একটি শুকনো শাখা হয়ে গিয়েছিলো তরবারী। হজরত জায়েদ বিন আসলাম এবং হজরত ইয়াজিদ বিন রুম্মান থেকে ইবনে সাঈদ এ রকম লিখেছেন। হজরত ওমর থেকে বায়হাকী এবং ইবনে আসাকেরও এ রকম বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, বদর প্রান্তরে যুদ্ধ করতে করতে হজরত উক্কাশা বিন মহসীনের তরবারী ভেঙে যায়। ভাঙা তরবারী নিয়ে তিনি উপস্থিত হন রসুল স. এর খেদমতে। রসুল স. তাঁর হাতে তুলে দেন খেজুরের একটি শুকনো ডাল। বলেন, উক্কাশা! এটাই তোমার তরবারী। যাও, যুদ্ধ করো। হজরত উক্কাশা ডালটি হাতে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন সেটি হয়ে গিয়েছে একটি সুতীক্ষ্ণ শাদা তরবারী। বিজয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ওই তরবারী দিয়েই বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন হজরত উক্কাশা। তরবারীটির নাম দেয়া হয়েছিলো উয়ূন। হজরত উক্কাশা ওই তরবারী দিয়ে এর পরেও অনেক যুদ্ধ করেছেন। শেষে নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার তালহা বিন খুওয়াইলিদ আসাদীর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি শহীদ হন।

১১. দাউদ বিন হোসাইন সূত্রে বায়হাকী লিখেছেন, আশহাল গোত্রের কিছু লোক বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধের সময় সালমা বিন আসলাম বিন হারেসের তলোয়ার ভেঙে গেলো। তখন রসুল স. এর হাতে ছিলো একটি খর্জুর শাখার ছড়ি। ছড়িটি তিনি স. হজরত সালমাকে দিয়ে বললেন, যাও, এটা দিয়েই যুদ্ধ করো। হজরত সালমা ছড়িটি হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুর উপর। দেখলেন ছড়িটি হয়ে গিয়েছে একটি অত্যুত্তম তলোয়ার। তলোয়ারটি সবসময় সঙ্গে রাখতেন তিনি। অবশেষে তিনি শাহাদাত বরণ করেন খায়বর যুদ্ধে।

১২. বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, শত্রুর অস্ত্রাঘাতে হজরত হাবীব বিন আদীর একটি হাত বাহুমূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। রসুল স. হাতটি তাঁর পবিত্র মুখের লালা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

১৩. বায়হাকীর বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত কাতাদা বিন নোমানের একটি চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছিলো। তাঁর সাথীরা বলেছিলেন, ঝুলন্ত চোখটি কেটে ফেলে দাও। রসুল স. বলেছিলেন, না। এমন কোরো না। এরপর তিনি স. তাঁর পবিত্র হাতে চোখটি যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন। মুছে গেলো জখমের চিহ্ন। বুঝার উপায় রইলোনা, কোন চোখটি জখম হয়েছিলো তাঁর।

১৪. বায়হাকী কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, হজরত রেফাআ বিন রাফে' বলেছেন বদর যুদ্ধে তীর বিদ্ধ হয়েছিলো আমার চোখে। রক্তাক্ত ও ছিন্ন ভিন্ন ওই চোখের উপরে পবিত্র হাত বুলিয়ে দিলেন রসুল স.। দোয়াও করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি লাভ করলাম নিরাময়।

www.eelm.weebly.com

১৫. ইসহাক থেকে ইবনে সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ্ বিন নওফেল বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা নওফেল বন্দী হলেন বদর যুদ্ধে। রসুল স. তাকে বললেন, মুক্তিপণ হিসাবে ওই বর্শাটি দিয়ে দাও, যা তুমি তোমার বাড়ীতে রেখে এসেছো, নওফেল বললেন, আমার ওই বর্শার কথা আল্লাহ্ এবং আমি ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। নিশ্চয় আল্লাহ্পাকই আপনাকে এ সংবাদ জানিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্র রসুল। আমি এবার মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করলাম। উল্লেখ্য, ওই বর্শাটি ছিলো এক হাজার দিরহাম মূল্যমানের।

আলোচ্য বাক্যে 'মীমাংসার দিন' বলে বুঝানো হয়েছে বদর যুদ্ধের দিবসকে। ওই দিন যুদ্ধের মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা করা হয়েছিলো। জয়যুক্ত করা হয়েছিলো সত্যধর্ম ইসলামকে এবং ধ্বংস করা হয়েছিলো অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতাকে।

'যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলো'—কথাটির অর্থ যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের দু'টি দল। একটি দল ছিলো আল্লাহ্র। অপরটি ছিলো শয়তানের।

সবশেষে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।' এ কথার অর্থ —আল্লাহ্তায়ালাই তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাবলে পরাস্ত করেছেন তাঁর শত্রুদেরকে। এভাবেই সর্ব সমক্ষে এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে — তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

সুরা আন্‌ফালঃ আয়াত ৪২

إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۙ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

❒ স্মরণ কর, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট-প্রান্তে এবং তাহারা ছিলো দূর-প্রান্তে আর উষ্ট্রারোহী দল ছিল তোমাদিগের অপেক্ষা নিম্ন ভূমিতে। যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করিতে চাহিতে তবে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটিত; কিন্তু বস্তুতঃ যাহা ঘটিবারই ছিল আল্লাহ্ তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমবেত করিলেন

www.eelm.weebly.com

যাহাতে যে-কেহ ধ্বংস হইবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকিবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে; আল্লাহ্ তো সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

এখানে বদর প্রান্তরে মুসলিম বাহিনী এবং মুশরিক বাহিনীর অবস্থানের বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেখানে উপত্যকার নিকটবর্তী সীমানায় ছিলো মুসলিম যোদ্ধাদের অবস্থান দূরবর্তী সীমানায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলো মুশরিক যোদ্ধারা। নিম্নভূমিতে ছিলো তাদের উষ্ট্রারোহী বাহিনী। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য বাহিনীকেই এখানে উষ্ট্রারোহী বাহিনী বলা হয়েছে। ওই বাহিনী তখন প্রায় তিন মাইল দূরের সমুদ্রোপকূলের পথে দ্রুত ফিরে যাচ্ছিলো মক্কায়। সমুদ্রোপকূলকেই এখানে বলা হয়েছে নিম্নভূমি। এ কথাগুলোই প্রথমে বলা হয়েছে এভাবে— স্মরণ করো, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট-প্রান্তে এবং তারা ছিলো দূর-প্রান্তে। আর উষ্ট্রারোহী দল ছিলো তোমাদের অপেক্ষা নিম্ন ভূমিতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত করতে চাইতে তবে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটতো।' এ কথার অর্থ— হে মুসলিম বাহিনী! তোমাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তোমরা একমত হয়ে এ রকম পরিকল্পনা করতেও পারতে না। মুশরিকেরা ছিলো তোমাদের চেয়ে তিনগুণ। তাদের সমরায়োজনও ছিলো বিশাল। ওই বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে অবশ্যই তোমাদের মধ্যে ঘটতো চরম মতভেদ। কারণ তোমরা ছিলে তাদের চেয়ে সেনা সংখ্যা, সমর সম্ভার— সব দিক দিয়ে দুর্বল। স্বাভাবিকভাবে তোমাদের মনে হতো এই অসম যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু বস্তুত! যা ঘটবার ছিলো আল্লাহ্তায়ালা তা সম্পন্ন করবার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমবেত করলেন।' এ কথার অর্থ—আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্য ছিলো সত্য ও মিথ্যা মুখোমুখি হোক। সত্য হোক বিজয়ী এবং মিথ্যা হোক পরাজিত। সৃষ্টি তার স্রষ্টার ইচ্ছা এবং পরিকল্পনা কার্যকর করতে বাধ্য। তাই হয়েছিলো। পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতিরেকেই পরিপূর্ণ লোকবল ও অস্ত্রবল ছাড়াই মুসলিম বাহিনী উপস্থিত হয়েছিলো বদরে। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য বাহিনীকে আক্রমণ করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। এভাবে বদরে এসে উপস্থিত হতেই তারা দেখলেন, পূর্ণ রণপ্রস্তুতি নিয়ে অদূরে অবস্থান গ্রহণ করেছে মুশরিকদের বিশাল সেনাবাহিনী। অপরদিকে মুশরিক বাহিনীরও উদ্দেশ্য ছিলো না যুদ্ধ হোক। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো বাণিজ্য বাহিনীটিকে রক্ষা করা। এভাবে অগ্রসর হতে হতে তারাও এসে দাঁড়ালো মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখী। অবশেষে তাই ঘটলো, যা ঘটাতে চেয়েছিলেন আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্তায়ালা চেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় রসুলকে সাহায্য করতে। তাই তাঁর পক্ষে প্রেরণ করেছিলেন সশস্ত্র ফেরেশতা বাহিনীকে। আল্লাহ্তায়ালা চেয়েছিলেন সমুন্নত হোক ইসলামের পতাকা। আরো চেয়েছিলেন ইসলামের শত্রুরা হোক লাঞ্ছিত ও অপমানিত। শেষ পর্যন্ত তাই ঘটেছিলো। পূর্ণ হয়েছিলো আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র অভিপ্রায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেনো সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেনো সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে।' এ কথার অর্থ— সত্য ও অসত্যের পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য একটি যুদ্ধ ছিলো অনিবার্য। যুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয়ের মাধ্যমেই সর্বসমক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সত্যের প্রকৃতরূপ। তাই আল্লাহ্পাক এইভাবে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থী উভয় দলকে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ করিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো— যারা মরবে তারা যেনো সত্যের পূর্ণরূপ দেখেই মরে। আর যারা বাঁচবে তারাও যেনো সত্যের স্বরূপ দেখে লাভ করে বিশুদ্ধ জীবন।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, এখানে 'যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেনো সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয়'— কথাটির মর্মার্থ হবে, যে কেউ কাফের হতে চায়, সে যেনো সত্য ও অসত্য স্পষ্ট হওয়ার পরই হয়ে যায় চিরস্থায়ী কাফের। আর যে জীবিত থাকবে সে যেনো সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে'— কথাটির মর্মার্থ হবে, যে ইমানদার হবে, সে যেনো সত্য ও অসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পরেই হয়ে যায় চিরস্থায়ী ইমানদার। এখানে ধ্বংস হওয়ার অর্থ হবে অবিশ্বাস বা কুফরীকে গ্রহণ করা। আর জীবিত হওয়ার অর্থ হবে গ্রহণ করা ইমান বা বিশ্বাসকে। ইমানই প্রকৃত জীবন। আর কুফরই প্রকৃত ধ্বংস বা মৃত্যু। আল্লাহ্পাক ভালো করেই জানেন, কে ইমান আনবে আর কে ইমান আনবে না। সৃষ্টির সূচনা ও সমাপ্তি, প্রারম্ভ ও পরিণতি— সবকিছুই তাঁর জ্ঞানবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র অভিপ্রায় হচ্ছে, সকলের সামনে উন্মোচিত হোক সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ। তাই তিনি পরস্পর বিরোধী ওই দল দু'টিকে তাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা ব্যতিরেকেই বদর প্রান্তরে সামনাসামনি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

শেষে বলা হয়েছে —' আল্লাহতো সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' এ কথার অর্থ — আল্লাহ্তায়ালা অবিশ্বাসের ঘোষণা যেমন শোনেন, তেমনি শোনেন বিশ্বাসের ঘোষণা। কারণ তিনি সর্ব শ্রোতা। আর আল্লাহ্তায়ালা বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে জানেন সকলের ভিতরের ও বাইরের সকল কিছু। অবিশ্বাসীরা যে চির নরকবাসী এবং বিশ্বাসীরা যে চির বেহেশতবাসী— সে কথাও আল্লাহ্তায়ালা উত্তমরূপে অবগত। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ।

www.eelm.weebly.com

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

❒ স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাকে স্বপ্নে দেখাইয়াছিলেন যে তাহারা সংখ্যায় অল্প; যদি তোমাকে দেখাইতেন যে তাহারা সংখ্যায় অধিক তবে তোমরা সাহস হারাইতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজদিগের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন এবং অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত।

❒ স্মরণ কর, বস্তুতঃ যাহা ঘটিবারই ছিল তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিলে তখন তিনি তাহাদিগকে তোমাদিগের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক দেখাইয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে তাহাদিগের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক দেখাইয়াছিলেন। সমস্ত বিষয় আল্লাহের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।

'ইজ ইউরিকাহুমুল্লহু ফী মানামিকা কুলীলা' (স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাকে স্বপ্নে দেখাইয়াছিলেন যে, তারা সংখ্যায় অল্প)। বদর প্রান্তরে রসুল স. গভীর আবেগে দোয়া করতে করতে এক সময় তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েন এবং স্বপ্নে দেখেন যে, শত্রুদের লোকবল, অস্ত্রবল নিতান্তই স্বল্প। সেই স্বপ্নের কথাই স্মরণ করার নির্দেশনা এসেছে এখানে। এটা ছিলো আল্লাহ্তায়ালার হেকমত। ঘটনাটি ছিলো এ রকম —

শত্রুদের মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণের পর রসুল স. সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি যুদ্ধের নির্দেশ না দিবো ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না। শত্রুরা তোমাদের নিকটবর্তী হতে চাইলে শর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাদেরকে প্রতিহত কোরো। তলোয়ার চালিয়োনা। একেবারে সামনে এসে পড়লে তলোয়ার চালিয়ো। এরপর তিনি প্রবেশ করলেন, তাঁর জন্য নির্মিত অস্থায়ী প্রকোষ্ঠে। প্রার্থনারত অবস্থায় হয়ে পড়লেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ পর হজরত আবু বকরের কথায় তন্দ্রা কেটে গেলো। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহের রসুল! দুশমনেরা একেবারে কাছে এসে পড়েছে। শুরু হয়েছে শোরগোল। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় রসুল স. কে দেখানো হয়েছিলো, কাফেরদের সংখ্যা নিতান্তই কম। এ কথা তিনি সাহাবীগণকে জানালেন। ফলে সকলে হয়ে পড়লেন প্রফুল্লচিত্ত ও নির্ভীক। প্রচণ্ড মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠলেন সকলে।

www.eelm.weebly.com

হজরত হাব্বান বিন ওয়াসে থেকে ইবনে ইসহাক এবং ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, তন্দ্রা ভঙ্গ হওয়ার পর রসুল স. বললেন, আবু বকর! সুসংবাদ শ্রবণ করো। আল্লাহ্পাকের সাহায্য তোমাদের নিকট এসে পড়েছে। জিবরাইল তাঁর অশ্বের লাগাম ধরে স্বয়ং উপস্থিত। তার উপরে পড়েছে যুদ্ধ প্রান্তরের ধুলো বালির প্রভাব।

হাসান বলেছেন—শত্রুদের সংখ্যা রসুল স. কে কম করে দেখানো হয়েছিলো জাগ্রত অবস্থায়। স্বপ্নে নয়। এখানে উল্লেখিত মানামিকা স্বপ্নে কথাটির অর্থ হবে — স্বপ্নের মতো করে। অর্থাৎ তখন জাগ্রত অবস্থাতেই রসুল স. এর পবিত্র দু'চোখে নেমে এসেছিলো স্বপ্নের ঘোর। আর আল্লাহ্পাক ওই অবস্থায় তাঁকে দেখিয়েছিলেন শত্রুদের সেনা সংখ্যা নগণ্য সংখ্যক। আর তাদের সমরায়োজনও অপ্রতুল।

এরপর বলা হয়েছে — 'ওয়ালাও আরাকাহুমকাসীরাল লাফাশিলতুম ওয়ালা-তানা মায়্'তুম ফীল আমরি।' এ কথার অর্থ— যদি তোমাকে দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় অধিক তবে তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। এখানে স্বপ্নে দুশমনদের সংখ্যা কম করে দেখানোর কারণটি বলা হয়েছে। বাস্তবে দুশমনেরা ছিলো বিপুল সংখ্যক জনবল ও অস্ত্রবলে সুসজ্জিত। এই অবস্থা দেখলে মনোবল হারিয়ে ফেলতো মুসলিম বাহিনী। অতি উৎসাহীরা বলতো মৃত্যু ভয়ে আমরা পশ্চাদপসরণ করতে পারি না। চলো সকলে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হই। বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্নরা বলতো, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও অগ্রসর হওয়া আত্মহননের নামান্তর। সুতরাং অগ্রসর না হওয়াই সমীচীন। এভাবে দেখা দিতো তুমুল বিরোধ।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়া লাকিন্নাল্লহা সাল্লামা ইন্নাহু আ'লীমুম্ বিজাতিস্ সুদুর।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে এই প্রচণ্ড অনৈক্য ও মতবিরোধ থেকে রক্ষা করেছেন। আর তিনি সকলের অন্তরের গতিবিধি সম্পর্কে সম্যক অবগত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শেষ কথাটির অর্থ হবে এ রকম— আল্লাহ্পাক তোমাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তিনিই জানেন, কার অন্তরে আল্লাহ্তায়ালার জন্য রয়েছে কতটুকু ভালোবাসা।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'স্মরণ কর, বস্তুতঃ যা ঘটবারই ছিলো তা সম্পন্ন করবার জন্য। তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন এবং তোমাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন। সমস্ত বিষয় আল্লাহ্র দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।' এখানে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্তায়ালাই চেয়েছিলেন যুদ্ধ সংঘটিত হোক। তাই তিনি উভয় দলের দৃষ্টিতে উভয় দলকে শক্তিহীনরূপে দেখিয়েছিলেন। ফলে উভয় দলই নিশ্চিত বিজয় জেনে শুরু করেছিলো প্রচণ্ড যুদ্ধ।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন— আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, দুশমনদের সংখ্যা খুবই কম। পাশের সহযোদ্ধাকে বললাম, ওরা তো দেখছি দুইশ'র বেশী হবে না। তুমি কি বলো? সে বললো, আমার তো মনে হয় নব্বই জন। পরে এক

www.eelm.weebly.com

যুদ্ধ বন্দীকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমরা যুদ্ধ করতে এসেছিলে কতজন? সে বললো, এক হাজার। অপর দিকে কাফেরেরাও দেখছিলো মুসলমানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। মুসলমানের সংখ্যা বেশী দেখলে তারা পালিয়েও যেতে পারতো। তাই আল্লাহ্পাক তাদের চোখে মুসলমানদেরকে দেখিয়েছিলেন দুর্বলরূপে। আবু জেহেল তাই বলেছিলো, মোহাম্মদের লোকেরা তো দেখছি একটি উটের গোশত ভক্ষণ করার মতোও নয়।

ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে— ইবনে জুরাইজ বর্ণনা করেছেন, আবু জেহেল তখন এ কথাও বলেছিলো যে, ওদেরকে হত্যা কোরো না। বন্দী কোরো। রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিও সকলকে। এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াতটি— 'ইন্না বালাওনাহুম কামা বালাওনা আসহাবাল জান্নাতি' (আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম যেমন পরীক্ষা করেছিলাম জান্নাতবাসীদেরকে)।

উল্লেখ্য যে, কাফেরেরা মুসলমানদেরকে নগণ্য সংখ্যক দেখতে পেয়েছিলো যুদ্ধ শুরুর পূর্বে। যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো, তখন তারা দেখতে পাচ্ছিলো, মুসলমানদের সংখ্যা তাদের দ্বিগুণ।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاۤءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হইবে তখন অবিচলিত থাকিবে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করিবে, যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

❒ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিবে ও নিজদিগের মধ্যে বিবাদ করিবে না, করিলে তোমরা সাহস হারাইবে এবং তোমাদিগের চিত্তের দৃঢ়তা বিলুপ্ত হইবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করিবে, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদিগের সহিত রহিয়াছেন।

❒ তোমরা তাহাদিগের ন্যায় হইবে না যাহারা গর্বভরে ও লোকদেখানোর জন্য স্বীয় গৃহ হইতে বাহির হয় এবং লোককে আল্লাহের পথ হইতে নিবৃত্ত করে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহা পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

---

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটির মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন কোনো কাফের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে তখন অবিচল থাকবে। পলায়ন করবে না। আল্লাহতায়ালার কথা বিস্মৃত হবে না। মনে মনে সাহায্য প্রার্থনা করবে। এই মর্মে দৃঢ় আশা পোষণ করবে যে, আল্লাহ্পাক নিশ্চয়ই বিজয় দান করবেন।

এখানে বলা হয়েছে, 'যখন কোনো দলের সম্মুখীন হবে।' এখানে নির্দিষ্ট করে কাফেরদের দলের সম্মুখীন হবে এ রকম বলার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। কারণ এ বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ যে, মুসলমানেরা সব সময় কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আর বলা বাহুল্য যে, এখানে 'সম্মুখীন হবে' কথাটির অর্থ, যুদ্ধ করবে। 'অবিচলিত থাকবে' কথাটির অর্থ— দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করবে, পলায়ন করবে না। সহীহ্ হাদিস সমূহে বর্ণিত হয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন কবীরা গোনাহ্। 'আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করবে' অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার নিকট বিজয়ের প্রার্থনা জানাবে। 'যাতে তোমরা সফলকাম হও' অর্থ— যাতে তোমরা বিজয়ী হও। এ কথার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্তায়ালার রহমত তাঁর বিশ্বাসী বান্দার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাই সঙ্গীন অবস্থায় সাহায্য ও বিজয়ের জন্য আল্লাহ্তায়ালার স্মরণ ও প্রার্থনার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— গাফেল হয়ো না। নির্ভর করো আল্লাহ্তায়ালার দয়ার উপর এবং বিশুদ্ধ অন্তরে স্মরণমগ্ন থাকো কেবল আল্লাহ্র।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের চিত্তের দৃঢ়তা বিলুপ্ত হবে। 'ফাতাফশালু ওয়া তাজহাবা রীহুকুম' অর্থ— করলে তোমরা সাহস হারাবে। সুদ্দী বলেছেন, এখানে রীহ্ শব্দটির অর্থ—সাহসিকতা, বীরত্ব। মুকাতিল বলেছেন, শব্দটির অর্থ ক্ষিপ্রতা, গতিশীলতা। নজর বিন শামিল বলেছেন শক্তিমত্তা। কাতাদা এবং ইবনে জায়েদ বলেছেন, বদর বিজয়ের উপলক্ষ ছিলো ওই বাতাস যার কারণে মুশরিকদের অগ্রযাত্রা পরিবর্তিত হয়েছিলো। ওই বাতাসের জন্যই অর্জিত হয়েছিলো বিজয়। অতএব, 'রীহ' শব্দটির অর্থ হবে বাতাস। আবু জায়েদের উক্তিরূপে ইবনে আবী হাতেম এ রকম উল্লেখ করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন— রসুল স. বলেছেন, আমরা বিজয়ী হয়েছি পূবাল বাতাসের মাধ্যমে। আর আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিলো পশ্চিমা বাতাসের মাধ্যমে।

www.eelm.weebly.com

হজরত নোমান বিন মাকরানের বর্ণনায় এসেছে, আমি রসুল স. এর সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তিনি স. সকালের দিকে যুদ্ধ শুরু করতে চাইতেন না। আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যের অপেক্ষায় থাকতেন। যুদ্ধ শুরু করতেন দ্বিপ্রহরের পর। ইবনে আবী শায়বা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন'। অমূল্য সম্পদ ধৈর্য অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এখানে। আল্লাহ্‌পাকের সাহায্য ও প্রতিদান ধৈর্যধারণকারীদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাই তারা হয় পৃথিবীতে আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যে বলীয়ান এবং আখেরাতে উত্তম প্রতিদানে বিভূষিত।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরের আজাদ করা ক্রীতদাস আবু নসর সালেম বলেছেন, আমি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরের সচিব ছিলাম। তাঁর নিকট আগত চিঠিপত্র পড়া, পড়ে শোনানো, জবাব প্রদান ইত্যাদিও ছিলো আমার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। একদিন আমি পাঠ করলাম হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই আওফার একটি চিঠি। চিঠিতে লেখা ছিলো— রসুল স. এক জেহাদে সামনাসামনি হলেন বিধর্মী বাহিনীর। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত তিনি আক্রমণ শুরু করলেন না। দ্বিপ্রহরের পর তিনি তাঁর ভাষণে বললেন, উপস্থিত জনমণ্ডলী! দুশমনদেরকে আক্রমণ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করো। নিরাপত্তার জন্য সাহায্য কামনা করো কেবল আল্লাহ্‌র। ক্রমাগত অগ্রসর হও সামনের দিকে। মনে রেখো, তরবারীর ছায়ার নিচেই জান্নাত। এরপর প্রার্থনা করলেন এভাবে— হে আমাদের আল্লাহ্! হে আমাদের উপর কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘপুঞ্জের পরিচালক, কাফের সম্প্রদায়কে পরাজয়দাতা— আমাদেরকে কাফেরদের উপরে জয়যুক্ত করো।

এর পরের আয়াতে (৪৭) দেয়া হয়েছে বিশুদ্ধচিত্ততার (এখলাসের) নির্দেশনা। এখলাসের অভাবে সকল পুণ্যকর্ম হয়ে পড়ে মূল্যহীন ও নিষ্প্রাণ। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন— রসুল স. বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের সুরত (আকৃতি) ও সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। দৃষ্টিপাত করেন তোমাদের অন্তর ও পুণ্যকর্মের প্রতি। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, বিশুদ্ধ নিয়তের উপরেই নির্ভর করে জেহাদ, হিজরত— সকল পুণ্যকর্ম। বোখারী, মুসলিম। আলোচ্য আয়াতত্রয়ের শেষটিতে বলা হয়েছে— 'তোমরা তাদের ন্যায় হবে না যারা গর্বভরে ও লোক দেখানোর জন্য স্বীয় গৃহ থেকে বের হয় এবং লোককে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে।' এখানে

www.eelm.weebly.com

'বাতারান' শব্দটির অর্থ গর্ব ও প্রদর্শন প্রবণতা। জুজায্ বলেছেন, 'বাতারান' অর্থ নেয়ামত প্রাপ্তির পরে অবাধ্য বা অকৃতজ্ঞ হওয়া। কোনো কোনো অভিধান বিশারদ বলেছেন, শব্দটির অর্থ হবে প্রাপ্তির আনন্দে আত্মহারা হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা বিস্মৃত হওয়া। 'রিয়া' অর্থ কৃতিত্ব ও সাফল্যকে মানুষের সামনে জাহির করা। প্রশংসা ও খ্যাতি অর্জনই এ রকম প্রদর্শন সর্বস্ব প্রবৃত্তির মূল উদ্দেশ্য।

আবু জেহেলের গর্বোন্মত্ততা এবং কৃতিত্ব প্রদর্শনের কথাই বর্ণিত হয়েছে এখানে। আর বিশ্বাসীদেরকে এই মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, তারা যেনো কস্মিনকালেও আবু জেহেলের মতো দম্ভ ও জনমনোরঞ্জনের আকাঙ্খার প্রতারণায় না পড়ে। ঘটনাটি ছিলো এ রকম— আবু সুফিয়ান সংবাদ পেলো, মুসলমানেরা তার বাণিজ্য বাহিনী আক্রমণ করতে ছুটে আসছে। সে তৎক্ষণাৎ বিপুল বাণিজ্য সম্ভার রক্ষার জন্য মক্কায় সংবাদ পাঠালো। ওই বাণিজ্যে অংশী ছিলো মক্কার প্রায় সকলেই। তাই এ সংবাদে সৃষ্টি হলো চরম উত্তেজনা। সাজ সাজ রব পড়ে গেলো যুদ্ধের জন্য। আবু জেহেল সকলকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করতে লাগলো। বাণিজ্য বাহিনীটি উদ্ধারের জন্য যুদ্ধযাত্রার পূর্বেই এসে পড়লো আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা। আবু সুফিয়ান বললো, কাফেলা এখন নিরাপদ। সুতরাং তোমরা যুদ্ধযাত্রা স্থগিত করো। আবু জেহেল বললো, না। আমরা ক্ষান্ত হবো না। বদর প্রান্তরে আমরা পৌঁছবোই। তিন দিন অবস্থান করবো সেখানে। উট জবাই করে বসাবো ভোজসভা। চলবে গান, বাজনা, মদ্যপান ও ভোজ। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়বে চতুর্দিকে। ফলে তাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের প্রতাপ ও পরাক্রম। এ সকল কথার প্রতি ইঙ্গিত করে বিশ্বাসীগণকে আলোচ্য আয়াতে গর্ব, লোক দেখানো কাজ এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধাদান থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— এ সকলের বিপরীত অবস্থাই প্রশংসনীয়। তাই বিশ্বাসীগণকে হতে হবে অহংকার মুক্ত, প্রদর্শন প্রবণতা মুক্ত এবং আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে আহ্বানকারী। সকল আমলের নেপথ্যে থাকতে হবে বিশুদ্ধ নিয়ত বা উদ্দেশ্য। আকাঙ্খী হতে হবে কেবল আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির ও সওয়াবের।

সবশেষে বলা হয়েছে— 'ওয়াল্লহু বিমা ইয়া'মালুনা মুহিত্ব'। এ কথার অর্থ— বান্দার সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহ্‌তায়াল্যার বেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত। 'ইহাত্বা' অর্থ— পরিবেষ্টন বা বেষ্টন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌তায়ালার এই পরিবেষ্টন আল্লাহ্‌-তায়ালারই মতো বেমেছাল (আনুরূপ্যবিহীন)।

www.eelm.weebly.com

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّىْ جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّىْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَ اللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۟

❒ স্মরণ করো, শয়তান তাহাদিগের কার্যাবলী তাহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল 'আজ মানুষের মধ্যে কেহই তোমাদিগের উপর বিজয়ী হইবে না, আমি সাহায্যার্থে তোমাদিগের নিকটই থাকিব।' অতঃপর দুইদল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইল তখন সে সরিয়া পড়িল ও বলিল 'তোমাদিগের সহিত আমার কোন সম্পর্ক রহিল না, তোমরা যাহা দেখিতে পাওনা আমি তাহা দেখি। আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।'

বদর প্রান্তরে আসার পূর্বে মক্কায় অনুষ্ঠিত কুরায়েশ নেতাদের পরামর্শ সভায় এক নজদী বৃদ্ধের রূপ ধরে ইবলিস স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বিভিন্ন অপপরামর্শ দিয়েছিলো। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো যুদ্ধের প্রতি। সেই ঘটনাই আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে এভাবে— স্মরণ করো, শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিলো এবং বলেছিলো আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটেই থাকবো। এ কথার অর্থ— শয়তান মুশরিকদেরকে বুঝিয়েছিলো, দেখো। তোমরাই সঠিক পথে রয়েছো। কারণ তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষের ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী। মোহাম্মদই নতুন করে ধর্মদ্রোহীতা শুরু করেছে। বলা বাহুল্য এই ধারণাই দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিলো মুশরিক নেতাদের মনে। তাই আবু জেহেল দৃঢ়তার সঙ্গে প্রার্থনা জানিয়েছিলো, হে আল্লাহ! যুদ্ধরত দু'টি দলের মধ্যে যারা সঠিক পথে রয়েছে, তাদেরকে জয়যুক্ত করো। আর ধ্বংস করে দাও ভ্রষ্টদেরকে।

যুদ্ধক্ষেত্রে শয়তান রূপ ধারণ করেছিলো সুরাকা বিন মালেক বিন জাশামের। বলেছিলো, তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে এমন কেউ নেই। আর আমিও সাহায্যকারী হিসেবে তোমাদের সাথে থাকবো। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করলো। পরবর্তী বাক্যে সে কথাই বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— অতঃপর দুইদল যখন পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হলো, তখন সে

www.eelm.weebly.com

সরে পড়লো এবং বললো, তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক রইলো না। তোমরা যা দেখতে পাও না, আমি তা দেখি। আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি, আল্লাহ্‌ শাস্তিদানে কঠোর।

হজরত রেফায়া বিন রাফে' থেকে তিবরানী এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌-তায়ালা রসুল স. এর সাহায্যার্থে এক হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করেছিলেন। এক প্রান্তে পাঁচশত ফেরেশতার নেতৃত্বে ছিলেন হজরত জিব্‌রাইল এবং অপর প্রান্তে পাঁচশত ফেরেশতা নিয়ে দণ্ডায়মান ছিলেন হজরত মিকাইল। অপরপক্ষে ইবলিসও তার দলবল ও নিশান নিয়ে উপস্থিত ছিলো। বনী মাদলাসের পশ্চাতে সে দাঁড়িয়েছিলো সুরাকা বিন মালেকের আকৃতি ধরে। তার সঙ্গে ছিলো অন্যান্য শয়তানেরা। শয়তান তখন মুশরিক সেনাদেরকে বললো, —'লা গালিবা লাকুমুল ইয়াওমা মিনান্‌নাসি ওয়া ইন্নী জারুল্লাকুম' (আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না। সাহায্যার্থে আমি তোমাদের নিকটেই থাকব)। হঠাৎ ইবলিসের নজর পড়লো হজরত জিব্‌রাইলের দিকে। জনৈক মুশরিকের হাত ধরে কথা বলছিলো ইবলিস। হজরত জিব্‌রাইলকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত ছেড়ে দিয়ে পালাতে শুরু করলো। এক মুশরিক বললো, কি ব্যাপার সুরাকা! পালাচ্ছো কেনো? তুমি তো বললে আজ আমাদের উপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না। ইবলিস বললো— তোমাদের সঙ্গে আর আমার কোনো সম্পর্ক রইলো না। তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তা দেখি। আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি, আল্লাহ্‌ শাস্তিদানে কঠোর।

ফেরেশতা বাহিনীকে দেখেই পলায়ন করেছিলো ইবলিস। হারেস বিন হিশাম শয়তানের উপরোক্ত কথাগুলো শুনেছিলো। সে মনে করেছিলো সুরাকাই কথাগুলো বলছে। সুরাকা অবশ্য বদরযুদ্ধের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হজরত জিব্‌রাইলকে দেখে পালাবার সময় হারেসের বুকে আঘাত করেছিলো শয়তান। ফলে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলো হারেস। পালাবার সময় একটি বারও পিছন ফিরে তাকাবার সাহস পায়নি শয়তান। সোজা গিয়ে সে ঝাঁপ দিলো সমুদ্রে। আর আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটে দুই হাত উঠিয়ে চিৎকার করে দোয়া করতে লাগলো, হে আমার প্রতিপালক! তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো, যে প্রতিশ্রুতি তুমি আমাকে দিয়েছো। তুমি বলেছো তুমি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত বাঁচতে দিবে।

শয়তান মনে করেছিলো, আজ হয়তো হজরত জিব্‌রাইল তাকে মেরেই ফেলবেন। তাই সে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন করেছিলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। আবু জেহেল তখন বলেছিলো, সুরাকাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমরা ভুল করেছি। সে তো ছিলো আসলে মোহাম্মদের পক্ষের লোক। তোমরা হতোদ্দম হয়ো না।

www.eelm.weebly.com

শপথ লাত্ ও উজ্জার! মোহাম্মদ ও তার সাথীদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে না ফেলা পর্যন্ত আমরা প্রত্যাবর্তন করবো না। সুতরাং তাদের কাউকে তোমরা হত্যা কোরো না। বন্দী কোরো। পরে আমরা তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিবো।

এক বর্ণনায় এসেছে, বদর যুদ্ধের পরে লোকেরা সুরাকাকে মক্কায় দেখে বললো, সুরাকা! তুমিই তো আমাদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছো। পলায়নের মনোবৃত্তি জাগ্রত করে দিয়েছো আমাদের যোদ্ধাদের অন্তরে। সুরাকা বললো, আমি বুঝতে পারছি না তোমরা কি বলছো। আমি তো সেখানে যাইইনি। তাই জানিও না সেখানে কে কি করেছে। কিন্তু লোকেরা তার কথা বিশ্বাস করলো না। পরে সুরাকা ইসলাম গ্রহণ করলেন। অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। তখন সকলে বুঝতে পারলো যে, বদর যুদ্ধে ইবলিসই সুরাকার আকৃতি ধারণ করেছিলো।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, 'তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তা দেখি'— ইবলিসের এ কথাটি সত্য। কিন্তু 'আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি'— তার এ কথাটি সত্য নয়। কারণ আল্লাহ্‌র ভয় তার ছিলো না। আসলে সম্পূর্ণ বিষয়টি ছিলো শয়তানের প্রতারণা। এভাবেই শয়তান প্রতারণা করে মানুষকে নিয়ে যায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। তারপর বিপদ দেখলে তাদেরকে পরিত্যাগ করে আত্মরক্ষা করে।

আতা বলেছেন 'আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি— শয়তানের এই কথাটির অর্থ হবে— আমার ভয় হচ্ছে, আবু জেহেলের বাহিনী ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও মনে হয় ধ্বংস হয়ে যাবো। সুতরাং আমি তাদের সঙ্গে থাকবো না। আমার তো রয়েছে জীবন হারানোর ভয়।

কালাবী বলেছেন, হজরত জিব্‌রাইলকে দেখে শয়তানের ভয় হয়েছিলো, এই বুঝি হজরত জিব্‌রাইল তাকে ধরে সকলের সামনে তার প্রতারণার বিষয়টি ফাঁস করে দিবেন। এভাবে সকলের সামনে চিহ্নিত হলে সবাই তো সাবধান হয়ে যাবে। প্রতারণা করা তখন আর সহজ হবে না। তাই তার বক্তব্যটি হবে এ রকম— এভাবে চিহ্নিত হওয়াকে আমি ভয় করি। শয়তানের 'আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি' কথাটিরও অর্থ হবে এ রকম।

কেউ কেউ বলেছেন, শয়তানের 'আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি' কথাটির অর্থ হবে— আমি জানি আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর রসুলকে সাহায্য করবেন। এ কথাও জানি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর দুশমনদেরকে শাস্তিদানে কঠোর। তাই হে আল্লাহ্‌র দুশমনেরা! তোমাদের ব্যাপারেই আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি। হজরত জিব্‌রাইলকে যখন আল্লাহ্‌তায়ালা পাঠিয়েছেন তখন এ কথা নিশ্চিত যে, আজ নিশ্চয়ই তিনি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। সে ভয়ই আমি করি।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি' একটি পূর্ণ বাক্য। এরপর ঘটবে যতিপাত। শেষের বাক্যটি (আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর) সম্পূর্ণ পৃথক একটি বাক্য।

হজরত তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, আরাফার দিবসে (হজের দিন) আল্লাহ্‌তায়ালার সীমাহীন রহমত বর্ষণ হতে দেখে এবং অসংখ্য মানুষকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হতে দেখে শয়তান নিজেকে খুবই অপমানিত ও লাঞ্ছিতবোধ করে। এ রকম লাঞ্ছনা এবং অপমানবোধ করেছিলো সে বদর যুদ্ধের দিন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! 'তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তা দেখি' শয়তানের এ কথাটির অর্থ কি? রসুল স. বললেন, হজরত জিব্‌রাইল এবং সাহায্যকারী ফেরেশতা দলকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে দেখে তাদের বিপরীতে শয়তান তার নিজের কৌশল ও সেনাসমাবেশের নিকৃষ্টতা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হয়। আর পরাজয় নিশ্চিত জেনে ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে দগ্ধীভূত হতে থাকে। তাই নিরাশ হয়ে বলে, 'তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তা দেখি।' মালেক, বাগবী।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৪৯, ৫০, ৫১

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ وَ
مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى
الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا
عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ
بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○

❒ স্মরণ কর, মুনাফিক ও যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা বলে 'ইহাদিগের দ্বীন ইহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে।' কেহ আল্লাহের প্রতি নির্ভর করিলে আল্লাহ্ তো পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

❒ তুমি দেখিতে পাইলে দেখিতে ফেরেশতাগণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিতেছে এবং বলিতেছে 'তোমরা দহন যন্ত্রনা ভোগ কর।'

❒ ইহা তোমাদিগের কর্মফল; আল্লাহ্ তাঁহার দাসদিগের প্রতি অত্যাচারী নহেন।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা বলে, এদের দ্বীন এদেরকে প্রতারিত করেছে।' মদীনার মুনাফিকেরা দেখলো, মাত্র তিনশত দলের অধিক লোক নিয়ে রসুল স. যুদ্ধযাত্রা করলেন। তারা এ সংবাদও পেলো যে, ওদিকে আবু জেহেল প্রায় এক হাজার লোক নিয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে রওনা হয়েছে। তারা তখন স্থির নিশ্চিত হলো যে, মুসলমানদের পরাজয় অনিবার্য। বিপুল সংখ্যক শত্রুর বিরুদ্ধে তারা কিছুতেই টিকতে পারবে না। তাই তারা বলতে শুরু করলো, মুসলমানদের ধর্মই তাদেরকে প্রতারিত করেছে। যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারাও এ রকম বলতে শুরু করলো। এখানে 'যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে দোদুল্য-চিত্ত মুসলমানদেরকে— যাদের বিশ্বাস ছিলো সন্দেহবিজড়িত। কেউ কেউ বলেছেন, 'যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মুশরিকদেরকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এ কথাটি বলে মুনাফিকদেরই আর একটি দলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ওই দলটিও মুনাফিক। মুনাফিকদের মতো তাদেরও অন্তর ছিলো ব্যাধিগ্রস্ত। তাই 'ওয়া'(ও) শব্দটির মাধ্যমে দল দু'টোকে এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। যেমন— 'ইলাল মালিকিল ইরামি ওয়াব্‌নুল হিমামি ওয়া লাইসাল কুতাইবাতু ফিল মুজদাহামি।'

এখানে একই বাদশাহ্‌কে বুঝানো হয়েছে— যার ছিলো বিভিন্ন দল। ওই দল সমূহকে এখানে ওওয়া (ও) শব্দের মাধ্যমে সংযোজন করা হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, এখানে 'যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল মুসলমানকে যারা দুর্বলতার কারণে হিজরত করতে পারেনি। মুশরিক আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তারা রয়ে গিয়েছিলো মক্কায়। বদর যাত্রার সময় কুরায়েশরা তাদেরকে জোর করে ধরে এনেছিলো। বদরে এসে তারা মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা দেখে হতাশ হয়ে পড়লো। ইসলামের প্রতি যেটুকু বিশ্বাস তাদের ছিলো সেটুকুও তারা হারিয়ে ফেললো তখন এবং বলতে শুরু করলো, 'এদের (মুসলমানদের) ধর্ম এদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে'। এ কথা বলার কারণে তারা হয়ে গিয়েছিলো ধর্মত্যাগী (মোরতাদ)। বদর যুদ্ধে তারা সকলেই নিহত হয়েছিলো। ;তাদের মধ্যে ছিলো— কায়েস বিন ওলিদ বিন মুগিরা মাখজুমী, আবু কায়েস বিন ফাকীহ্‌ বিন মুগিরা মাখজুমী, হারেস বিন জামআ বিন আসওয়াদ বিন মুত্তালিব, আলী বিন উমাইয়া বিন খলফ জামুহী, আস বিন মুনাব্বিহ্‌ বিন হাজ্জাজ প্রমুখ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে শিথিল সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, এ

www.eelm.weebly.com

কথা (এদের ধর্ম এদেরকে প্রতারিত করেছে) বলেছিলো উত্‌বা বিন রবিয়া এবং তার সঙ্গী সাথীরা। তারা সকলেই ছিলো মুশরিক। তাদের এই অপকথনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌পাক যা এরশাদ করেছেন, তা লিপিবদ্ধ রয়েছে আয়াতের পরবর্তী অংশে এভাবে—

'কেউ আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করলে আল্লাহ্‌ তো পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা প্রবল পরাক্রান্ত এবং প্রজ্ঞাময়। সুতরাং তাঁর প্রতি যারা নির্ভর করবে, তারাই লাভ করবে বিজয়। বদর যুদ্ধে সেরকমই ঘটেছিলো। মুসলমানদের বদর বিজয় আল্লাহ্‌পাকের ওই পরাক্রান্তি ও প্রজ্ঞাময়তার জ্বলন্ত নিদর্শন।

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— তুমি দেখতে পেলে দেখতে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করছে। এখানে 'তারা' শব্দটির অর্থ 'দেখছো'। শব্দরূপটি বর্তমান কালের কিন্তু এর অর্থ হবে অতীতকাল বোধক। কারণ এর পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে 'লাও' শব্দটি। এভাবে 'ওয়ালাও তারা' কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— তুমি দেখতে পেলে দেখতে।

এরপরে বলা হয়েছে— ইজ তাওয়াফ্‌ফা। এ কথার অর্থ— প্রাণ হরণ করছিলো। এরপর বলা হয়েছে আল্লাজিনা কাফারু (সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের)। এরপর বলা হয়েছে— আল মালাইকাতু ইয়াদ্বরিবুনা উজুহাহুম ওয়া আদবারাহুম (ফেরেশতাগণ মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে)। এভাবে সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— ফেরেশতাগণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করছে। এখানে প্রাণ হরণ করছে কর্মটির কর্তা হবে ফেরেশতাগণ। এ রকমও হতে পারে যে, কর্তা এখানে আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং আর 'ফেরেশতাগণ' হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং ইয়াদ্ব রিবুন (আঘাত করে) হচ্ছে বিধেয়।

উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাগণ বদর যুদ্ধে মুশরিক সেনাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করেছিলো আগুনের চাবুক এবং লৌহদণ্ড দ্বারা। সম্মুখভাগে ও পশ্চাৎভাগ উভয় দিক থেকে আঘাত করা হয়েছিলো তাদেরকে। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'পৃষ্ঠদেশ' কথাটির অর্থ হবে— পশ্চাদ্দেশ (নিতম্ব)। 'পশ্চাদ্দেশ' শব্দটি লজ্জাজনক বিধায় আল্লাহ্‌পাক এখানে উল্লেখ করেছেন 'পৃষ্ঠদেশ।'

এরপর বলা হয়েছে— ওয়া জুকু আ'জাবাল হারীক্ব (এবং বলছে, তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ করো)। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই কথাটুকু বদর যুদ্ধ সম্পর্কিত নয়— আখেরাতে বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদেরকে

—১২

www.eelm.weebly.com

যখন আযাব দেয়া হবে, সেই সময়কার। অর্থাৎ বদর প্রান্তরে যখন মুশরিকেরা মুসলমানদেরকে আক্রমণ করতে শুরু করলো তখন ফেরেশতারা চাবুকের আঘাত হানতে শুরু করলেন তাদের মুখমণ্ডলে। এর ফলে তারা পালাতে শুরু করলো। তখন ফেরেশতারা আঘাত শুরু করলো তাদের পশ্চাদ্দেশে। এইভাবে তাদেরকে বধ করতে করতে ফেরেশতারা তাদেরকে বলতে শুরু করলো— (আখেরাতেও তোমাদেরকে দহন যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।)। তখন শাস্তিদানকালে ফেরেশতারা বলবে— তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ করো।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, তখন ফেরেশতারা কাফেরদেরকে আঘাত করবে লৌহদণ্ড দ্বারা। ওই লৌহদণ্ডের আঘাতে তাদের জখমের স্থানে জ্বলে উঠবে আগুন। ওই অগ্নি-শাস্তিকেই এখানে বলা হয়েছে জুকু আ'জাবাল হারীক্ব। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফেরেশতারা এ রকম বলতে থাকবে কাফেরদের মৃত্যুর পর থেকে।

এর পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'জালিকা বিমা ক্বদ্দামাত আইদী-কুম ওয়া আন্নাল্লহা লাইসা বি জাল্লামিল্লিল আ'বীদ্' (এটা তোমাদের কর্মফল; আল্লাহ্ তাঁর দাসদের প্রতি অত্যাচারী নন)। এখানে 'বিমা' শব্দটির 'মা' কারণ প্রকাশক। 'মা ক্বদ্দামাত' (কর্মফল) অর্থ অবিশ্বাস ও পাপ। 'আইদিকুম' অর্থ হস্ত দ্বারা অর্জিত। মানুষের অর্জন সাধারণতঃ হস্ত দ্বারাই হয়। তাই এখানে কর্মফলকে ক্বদ্দামাত আইদিকুম (হস্ত দ্বারা অর্জিত কর্ম) বলা হয়েছে।

মানুষ অবিশ্বাস ও পাপকে গ্রহণ করে স্বেচ্ছায়। এভাবে তারা নিজেরাই হয়ে যায় শাস্তির উপযোগী। সে কারণেই আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে শাস্তি দান করেন। যারা শাস্তির উপযুক্ত নয়, আল্লাহ্পাক তাদেরকে শাস্তি দান করেন না। শাস্তিদান করেন কেবল শাস্তিযোগ্যদেরকেই। আর এ রকম শাস্তিদানকে জুলম বা অত্যাচার বলা যায় না। তাই এখানে বলা হয়েছে— আল্লাহ্ তাঁর দাসদের প্রতি অত্যাচারী নন।

'জাল্লামিন্' শব্দটি এখানে মুবালেগার (কর্তৃকারকের) শব্দরূপ হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে। শক্তি ও ক্রিয়ার ক্ষমতাকে প্রকাশ করার জন্য এ রকম করা হয়নি। করা হয়েছে শক্তি ও ক্রিয়াকে অধিকতর গুরুত্বদানের জন্য। কেননা 'দাসদের' বলে এখানে সকল দাসদেরকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে— আল্লাহ্তায়ালা তাঁর কোনো দাসের উপরে অত্যাচার করেন না।

এ পর্যন্ত বিবৃত হলো বদর যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনা। পরবর্তী আয়াতে সত্য ও মিথ্যার পরিণতির দৃষ্টান্তরূপে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে এভাবে—

www.eelm.weebly.com

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝

❒ ফেরাউনের স্বজন ও উহাদিগের পূর্ববর্তীগণের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা আল্লাহের নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে; সুতরাং আল্লাহ্ ইহাদিগের পাপের জন্য ইহাদিগকে শাস্তি দেন। আল্লাহ্ শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর;

❒ ইহা এই জন্য যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ্ এমন নহেন যে তিনি উহাদিগকে যে সম্পদ দান করেন তিনি উহা পরিবর্তন করিবেন; এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❒ ফেরাউনের স্বজন ও তাহাদিগের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা ইহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে। তাহাদিগের পাপের জন্য আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি এবং ফেরাউনের স্বজনকে নিমজ্জিত করিয়াছি এবং তাহারা সকলেই ছিল সীমালংঘনকারী।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে 'কাদা'বি আলি ফিরয়াউনা ওয়াল্লাজীনা মিন ক্বলিহিম কাফারু বি আয়াতিল্লাহি ফা আখাজাহুমুল্লহু বিজুনুবিহিম' (ফেরাউনের স্বজন ও তাদের পূর্ববর্তীগণের অভ্যাসের ন্যায় তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে সুতরাং আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেন)। এখানে কাদা'বি আলি ফিরয়াউনা (ফেরাউনের স্বজনের) অভ্যাসের ন্যায় কথাটি একটি উহ্য উদ্দেশ্যের বিধেয়। এ কথার অর্থ— অবিশ্বাসীদের কর্মকাণ্ড ও পদ্ধতি আল্লাহ্‌দ্রোহী ফেরাউনের স্বজনদের মতো। ওয়াল্লাজিনা মিন ক্বলিহিম (তাদের পূর্ববর্তীগণের) কথাটির অর্থ— ফেরাউনের পূর্ববর্তী অবাধ্য সম্প্রদায়ের। এ কথার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ফেরাউনের জামানার পূর্ববর্তী হজরত নূহের অবাধ্য সম্প্রদায়কে এবং আদ্, ছামুদ ইত্যাদি কাফের সম্প্রদায়কে। ফেরাউনের অনুসারীদের মতো ওই সকল সম্প্রদায়ও

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। আলোচ্য আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। তার সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে তাদের ওই পাপের জন্য বিভিন্নভাবে শাস্তিও দিয়েছিলেন।

শেষে বলা হয়েছে— ইন্নাল্লহা ক্বওবিয়্যুন শাদীদুল ইক্বাব। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌ শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর। এমন কেউই নেই যে তাঁর শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারে।

পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, যদি কোনো সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ্‌ এমন নন যে তিনি তাদেরকে যে সম্পদ দান করেন, তা পরিবর্তন করবেন।' এ কথার অর্থ— কাফেরদের উপর আযাব অবতীর্ণ করা হয় এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নেয়ামত স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে। অবাধ্যতা ও পাপের মাধ্যমে আহ্বান জানায় আযাবকে। অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য হয় বলেই আল্লাহ্‌পাক তাদের উপর অবতীর্ণ করেন শাস্তি। যেমন, মক্কাবাসীদেরকে আল্লাহ্‌পাক দান করেছিলেন সম্মানজনক জীবনোপকরণ ও নিরাপত্তা। তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন আবরাহার হস্তি বাহিনীর আক্রমণ থেকে। কিন্তু তারা পরবর্তীতে হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসমাইলের সত্য ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো। এভাবে দীর্ঘ দিন গত হওয়ার পরও আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেননি। শেষে তাদেরকে শাস্তি দান করেছিলেন বদর যুদ্ধে। কারণ তারা পৌঁছে গিয়েছিলো অবিশ্বাস ও পাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে। রসুল স. ও তাঁর অনুসারীদের সাথে শত্রুতা, মসজিদুল হারাম থেকে বিশ্বাসীদেরকে বিতাড়ন, কোরবানীর পশুর হেরেম শরীফে প্রবেশে বাধাদান, বিশ্বাসীদেরকে হত্যার অপতৎপরতা, কোরআনের আয়াতের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ— এ সকলকিছুই ছিলো তাদের চরম সীমালংঘন। আর এই সীমালংঘনের কারণেই তাদের উপর আপতিত হয়েছে শাস্তি। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, রসুল স. এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের পিতামহের নাম ছিলো আবদুল মান্নাফ। আবদুল মান্নাফ ছিলো কুসাইয়ের পুত্র এবং কেলাবের প্রপৌত্র। কেলাবের উর্ধ্বতন বংশধারা ছিলো এ রকম, মুররাহ্‌— কায়াব— লুওয়াই। কেলাবের পূর্ববর্তী পুরুষেরা ছিলেন হজরত ইসমাইলের সত্যধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তখন তাঁরা তাদের পরবর্তী বংশধরকে হজরত ইসমাইলের ধর্মাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য উপদেশ দিতেন। পরে কুসাই বিন কেলাবের জামানায় তাদের মধ্যে শুরু হয় মূর্তি পূজার প্রচলন। কা'য়াব বিন লুওয়াই একবার আরববাসীদেরকে একত্র করেছিলেন। তখন তাঁর পুত্র কুসাই জনতাকে এই মর্মে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সর্বশেষ রসুল জন্মগ্রহণ করবেন আমার বংশে। তোমরা তার অনুসরণ কোরো। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কোরো। এরপর তিনি পাঠ করেছিলেন কয়েকটি কবিতা। ওই কবিতাগুলোর

www.eelm.weebly.com

একটির মর্মার্থ এ রকম— হায়! আমি যদি তখন উপস্থিত থাকতে পারতাম যখন কুরায়েশরা সত্য প্রত্যাখ্যান করবে এবং শেষ রসুলকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবে।

কুসাই ছিলেন দানশীল, পরোপকারী। হজের সময় তিনি হাজীদেরকে পানাহার করাতেন। পানি সংরক্ষণের জন্য তিনি নির্মাণ করেছিলেন চর্ম-নির্মিত অনেক বৃহদাকৃতির পাত্র। মক্কা, মিনা ও আরাফায় তিনি ওই পাত্রগুলোকে পানি দ্বারা পূর্ণ করে রাখতেন এবং হাজীদেরকে ওই পাত্রগুলোর পানি পান করতে দিতেন। তাই তাকে বলা হতো পানি সরবরাহকারী। মূর্খতার যুগেও এই প্রথাটির প্রচলন ছিলো। ইসলামের আবির্ভাবের পরেও এর কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।

কুসাই কর্তৃক প্রচলিত আরেকটি রীতি ছিলো এই যে, হজের সময় মুজদালিফায় রাতে আগুণ জালিয়ে রাখা হতো। ওই আগুন দেখে হাজীগণ আরাফা থেকে সোজা মুজদালিফায় চলে আসতে পারতেন। রসুল স. এর সময়েও এ রকম করা হতো। পরবর্তী তিন খলিফার জামানাতেও এই নিয়মটি প্রতিপালিত হতো। কুসাইয়ের জামানার পরে মক্কাবাসীরা হজরত ইসমাইলের ধর্মমতকে পরিত্যাগ করে। আমর ইবনে লুহাই খাজায়ী প্রথম প্রচলন ঘটায় মূর্তি পূজোর। সমাজে শুরু হয় আরো অনেক অনাচার ও বিশৃঙ্খলা।

সুদ্দী বলেছেন, 'আল্লাহ্ তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন'— এ কথা বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর পবিত্র ব্যক্তিত্বকে। মক্কাবাসীরা ওই সম্পদের যথাসমাদর করেনি। তাই আল্লাহ্তায়ালা ওই সম্পদকে (নেয়ামতকে) দিয়ে দিয়েছিলেন মদীনাবাসীকে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মক্কাবাসী মুশরিকেরা ছিলো ফেরাউনের স্বজনদের মতো। তারা ছিলো দুরাচার ও নিকৃষ্ট। মূর্তি পূজাই ছিলো তাদের স্বকপোলকল্পিত ধর্মমত। তাই তারা রসুল স. এর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিলো তাঁকে। আল্লাহ্র পথে হয়েছিলো অনড় প্রতিবন্ধক। এমন কি রসুল স. এর হত্যার পরিকল্পনাও তারা করেছিলো। এতো কিছু করা সত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালা তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেননি। তাঁর প্রিয় রসুলকে দিয়েছিলেন হিজরতের নির্দেশ। তবু তারা সত্য ধর্মের বিরোধিতা পরিত্যাগ করেনি। হয়ে উঠেছিলো যুদ্ধংদেহী। তাদের ওই চরম সীমালংঘনের কারণে তাই বদর যুদ্ধের সময় তাদের উপর নেমে এসেছিলো আল্লাহ্র আযাব।

উল্লেখ্য যে, কোনো সম্প্রদায় তাদের অবস্থা পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালা অবিশ্বাসীদের উপর আযাব অবতীর্ণ করেন না। তওবার জন্য প্রদান করেন দীর্ঘ অবকাশ। কিন্তু তওবার সেই সুযোগ গ্রহণ না করে ক্রমাগত সীমালংঘন করতে থাকলে অকস্মাৎ একদিন কাফেরদের উপর নেমে আসে আল্লাহ্র আযাব। আল্লাহ্তায়ালা তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট থেকে চিরদিনের জন্য ছিনিয়ে নেন তার নেয়ামত। তাদেরকে নিপতিত করেন শাস্তির মধ্যে।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়া আন্নাল্লহা সামীউন আ'লীম' (এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক সীমালংঘনকারীদের সকল কথা শ্রবণ করেন। কারণ তিনি সর্বশ্রোতা। আর তাদের সকল অপচেষ্টা ও অবাধ্যতা সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবগত। তারা যে নেয়ামতের অনুপযুক্ত এবং আযাবের উপযুক্ত সে কথাও তিনি ভালো করে জানেন। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ।

এর পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে, 'ফেরাউনের স্বজন ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায় এরা এদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে। তাদের পাপের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফেরাউনের স্বজনকে নিমজ্জিত করেছি এবং তারা সকলেই ছিলো সীমালংঘনকারী।' এখানে ফাআহ্লাকনা হুম (তাদেরকে ধ্বংস করেছি) কথাটির অর্থ— ওই সকল অবাধ্যদের কাউকে কাউকে আমি দিয়েছি সলিল সমাধি, ভূমিকম্পের মাধ্যমে কাউকে কাউকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি মাটির সঙ্গে, কাউকে দিয়েছি আকৃতি পরিবর্তনের আযাব, কারো কারো মূলোৎপাটন করেছি ভয়াবহ তুফানের মাধ্যমে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তারা সকলেই ছিলো সীমালংঘনকারী।' এ কথার অর্থ— ওই সকল সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ও তাদের কর্মফলের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় ডেকে এনেছিলো আল্লাহ্র আযাব। আল্লাহ্তায়ালা তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি। পাপাচরণের যথাপ্রতিফল দিয়েছিলেন মাত্র।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ৫৫, ৫৬, ৫৭

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ○ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ○

❒ আল্লাহের নিকট নিকৃষ্ট জীব তাহারাই যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে এবং বিশ্বাস করে না।

❒ উহাদিগের মধ্যে তুমি যাহাদিগের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ তাহারা প্রত্যেকবার তাহাদিগের চুক্তি ভংগ করে এবং তাহারা সাবধান হয় না;

❒ যুদ্ধে উহাদিগকে তোমরা যদি তোমাদিগের আয়ত্তে পাও তবে উহাদিগকে উহাদিগের পশ্চাতে যাহারা আছে তাহাদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এমনভাবে বিধ্বস্ত করিবে যাহাতে উহারা শিক্ষা লাভ করে।

'ইন্না শার্রাদ দাওয়াব্বি ই'ন্দাল্লহ্' অর্থ— আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই। আল্লাজীনা কাফারূ অর্থ যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানে অনড়। ফাহুম লা ইয়ু'মিনূন অর্থ— এবং বিশ্বাস করে না। এখানে ফা (এবং) সংযোজক অব্যয়টির মাধ্যমে

www.eelm.weebly.com

এটাই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্তায়ালার অসীম জ্ঞানের মধ্যে ওই সকল সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী ও অবিশ্বাসীরা চিরভ্রষ্ট। তাই কস্মিনকালেও তারা ইমান আনবে না। এভাবে উদ্ধৃত আয়াতত্রয়ের প্রথমটি প্রযোজ্য হবে ওই সকল অবিশ্বাসীর প্রতি যারা মৃত্যুবরণ করবে সত্যপ্রত্যাখ্যান ও অবিশ্বাসের সঙ্গে, তারাই আল্লাহ্তায়ালার নিকট নিকৃষ্ট জীব। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদীদের ছয়টি গোত্র সম্পর্কে। ইবনুত্ তাবুতও ছিলো ওই সকল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে—'তাদের মধ্যে তুমি যাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ তারা প্রত্যেকবার তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে।' হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতটি (৫৫) অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদীদেরকে লক্ষ্য করে। যদি তাই হয় তবে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত চুক্তি ভঙ্গকারীরাও পূর্ববর্তী আয়াতে কথিত 'নিকৃষ্ট জীব' এর অন্তর্ভুক্ত রয়ে যাবে। এভাবে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা হবে আলোচ্য আয়াতেও প্রবহমান।

চুক্তিতে আবদ্ধ দু'টি পক্ষই থাকে পরস্পরের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এভাবে মদীনার ইহুদীরা মদীনার মুসলমানদের সঙ্গে ছিলো অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, 'চুক্তিভঙ্গ করে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে বনী কুরায়জার ইহুদীদেরকে। তাদের সঙ্গে মুসলমানেরা এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, মদীনাবাসীরা কেউ কারো বিরুদ্ধাচরণ করবে না। গোপনে বা প্রকাশ্যে কেউ কারো শত্রুকে সাহায্য করতে পারবে না। বনী কুরায়জা এই চুক্তি ভঙ্গ করেছিলো। গোপনে গোপনে তারা সাহায্য করতে শুরু করেছিলো মুসলমানদের শত্রুপক্ষকে। কা'ব বিন আশরাফ মক্কায় গিয়ে সেখানকার মুশরিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলো। এর ফলে সংঘটিত হয় খন্দকের যুদ্ধ। কিন্তু খন্দক যুদ্ধেও সুবিধা করতে পারেনি মুশরিকেরা। অসাফল্যের গ্লানি নিয়ে তাদেরকে ফিরে যেতে হয়েছিলো মক্কায়। এভাবে চুক্তিভঙ্গের বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়লে ইহুদীরা বলেছিলো, আমরা ভুল করেছি। সুতরাং আমরা পুনরায় চুক্তি করতে চাই। কিন্তু পরের চুক্তিটিও ভঙ্গ করেছিলো তারা। তাই এখানে বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি ইহুদীদের মধ্যে যাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ, তারা প্রত্যেকবার তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে।

শেষে বলা হয়েছে— ওয়াহুম লা ইয়াত্তাকুন (এবং তারা সাবধান হয় না) এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! ইহুদীরা তাদের সন্তান-সন্ততিদের চেয়েও অধিক চেনে আপনাকে। তারা ভালো করেই জানে যে, আপনি আমার রসুল। অথচ তারা সাবধান হয় না। জেনে শুনে বুঝে অস্বীকার করে আপনাকে। বার বার ভঙ্গ করে অঙ্গীকার।

www.eelm.weebly.com

আবদ্ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর এবং আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুয়াজ বিন জাবাল, হজরত বশীর বিন বারায়া এবং হজরত দাউদ বিন সালমা ইহুদীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! আল্লাহ্কে ভয় করো, মুসলমান হয়ে যাও। আমরা যখন মুশরিক ছিলাম তখন মোহাম্মদ স. এর নাম নিয়ে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলে। এ কথাও বলেছিলে যে, মোহাম্মদ স. এর আবির্ভাবের সময় সমাগত। তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণও তোমরা আমাদেরকে দিয়েছিলে।

উপরে বর্ণিত আলোচনার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী ও অবিশ্বাসীরাই আল্লাহ্তায়ালার নিকট নিকৃষ্ট জীব। আর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হচ্ছে ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, যারা চুক্তি ভঙ্গ করে। উল্লেখ্য যে, যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানের উপরে অনড়, তারাও চুক্তিভঙ্গকারী। কারণ তারাও রূহের জগতে আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করেছে।

এর পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'যুদ্ধে তাদেরকে তোমরা যদি তোমাদের আয়ত্তে পাও তবে তাদেরকে তাদের পশ্চাতে যারা আছে তাদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে, যাতে তারা শিক্ষালাভ করে।' এখানে উল্লেখিত 'ফাশাররিদ্ বিহিম' অর্থ বিধ্বস্ত করবে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে এখানে এই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, চুক্তি ভঙ্গকারী ইহুদীদেরকে দিতে হবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। শাস্তিদানের পূর্বে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে মক্কায় ও ইয়েমেনে বসবাসকারী তাদের মিত্রদের থেকে। এমনভাবে তাদেরকে বিধ্বস্ত করে ফেলতে হবে, যাতে করে তাদের সমগোত্রীয়রা ভীত হয়। হারিয়ে ফেলে মোকাবিলার সাহস। এই নির্দেশটি মান্য করেই রসুল স. ষড়যন্ত্রপ্রবণ ও চুক্তি ভঙ্গকারী বনী কুরায়জার সকল পুরুষকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের সম্পদ, রমণীকুল ও শিশুদেরকে ভাগ করে দিয়েছিলেন মুসলমানদের মধ্যে।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আসলাম আনসারী বলেছেন, আমাকে দূর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ বনী কুরায়জাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন রসুল স.। আমি সে দায়িত্ব পালন করেছিলাম। তাদের পুরুষদেরকে যেখানে পেয়েছি সেখানেই তাদেরকে হত্যা করেছি।

শেষ কথাটি হচ্ছে— লায়াল্লাহুম ইয়াজ্ জাককারূন (যাতে তারা শিক্ষালাভ করে)। এ কথার অর্থ— এ রকম ভয়াবহ শাস্তির নির্দেশ দেয়া হয়েছে এ কারণে যেনো অন্যান্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এতে করে সাবধান হয়ে যায়। চুক্তিভঙ্গের সাহস যেনো কখনো আর না পায়।

www.eelm.weebly.com

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنۡ قَوۡمٍ خِیَانَۃً فَانۡۢبِذۡ اِلَیۡہِمۡ عَلٰی سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِبُّ الۡخَآئِنِیۡنَ ۝

❐ যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথভাবে বাতিল করিবে; আল্লাহ্ বিশ্বাসভঙ্গকারীদিগকে পছন্দ করেন না।

আলোচ্য আয়াতের নির্দেশটি এ রকম— হে আমার রসুল! আপনার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কোনো সম্প্রদায়কে যদি আপনি বিশ্বাসভঙ্গ করবে বলে আশংকা করেন, তবে আপনি যথাযথভাবে ওই চুক্তি বাতিল করে দিন। চুক্তি বাতিল করা হলো— এ রকম সংবাদ আপনি পূর্বাহ্নে তাদেরকে পৌঁছে দিন। এতে করে বিশ্বাসভঙ্গের দায় আপনার উপরে বর্তাবে না। এ কথাও আপনি জেনে রাখুন হে আমার রসুল! আল্লাহ্তায়ালা বিশ্বাসভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

জুহ্‌রী সূত্রে আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পরই হজরত জিব্‌রাইল রসুল স.কে বললেন, হে সম্মানিত ভ্রাতা! আপনি তো যুদ্ধের সাজ পোশাক খুলে ফেলেছেন। কিন্তু আমরা এখনো সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের পশ্চাদ্ধাবনে রত। আপনিও প্রস্তুত হোন। যুদ্ধ করতে হবে বনী কুরায়জার বিরুদ্ধে। আল্লাহ্‌পাক আপনাকে বনী কুরায়জা নিধনের অনুমতি প্রদান করেছেন। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতটি।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণটি সৃষ্টি হয়েছিলো খন্দকের যুদ্ধের পর। হাফেজ মোহাম্মদ ইউসুফ সালেহী তাঁর সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে লিখেছেন, বনী কায়নুকা ও মুসলমানেরা ছিলো পরস্পরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। পরবর্তীতে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলো। প্রজ্জ্বলিত করেছিলো হিংসার আগুন। একদিন তাদের বাজারে ঘটলো একটি ঘটনা। আপাদমস্তক আবৃতা এক আরবী রমণী অলংকার ক্রয়ের জন্য তাদের বাজারের এক স্বর্ণকারের দোকানে গেলো। কেউ কেউ উন্মোচিত করতে বললো তার মুখমণ্ডলের আবরণ। কিন্তু সে এতে অস্বীকৃত হলো। তখন স্বর্ণকার কেটে নিলো তার আঁচলের কিছু অংশ। উত্তেজিত হলো সে। শুরু করে দিলো চিৎকার। অনেক লোক জড়ো হলো সেখানে। উত্তেজিত রমণীটিকে লক্ষ্য করে তারা শুরু করে দিলো হাসিঠাট্টা। জনৈক সাহাবীও উপস্থিত হলেন সেখানে। তিনি বুঝলেন স্বর্ণকারটিই উত্যক্তকারী। তাই

www.eelm.weebly.com

প্রচণ্ড ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তিনি তাকে হত্যা করে ফেললেন। স্বর্ণকারটি ছিলো ইহুদী। তাই উপস্থিত ইহুদীরা এক জোট হয়ে হত্যা করে ফেললো ওই সাহাবীকে। এভাবে ভঙ্গ হয়ে গেলো মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে সম্পাদিত অনাক্রমণ চুক্তিটি। মুসলমানেরা হলেন বিচারপ্রার্থী। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

রসুল স. তখন বললেন, বনী কায়নুকা চুক্তিভঙ্গের কারণে বিপদ কবলিত। এ কথা বলেই তিনি বনী কায়নুকার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন। অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন হজরত হামজা বিন আবদুল মুত্তালিবকে। মদীনা রক্ষার দায়িত্ব দান করলেন হজরত আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনজিরকে। বনী কায়নুকার লোকেরা দূর্গে আশ্রয় নিলো। দূর্গ অবরোধ করে রইলো মুসলিম বাহিনী। পনের দিন কেটে গেলো এভাবে। আল্লাহ্পাক অবরুদ্ধ ইহুদীদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করলেন। তাই তারা রসুল স. এর নিকটে এই মর্মে প্রস্তাব পাঠালো যে— আমাদের সকল সম্পদ পরিত্যাগ করতে আমরা রাজি। এখন শুধু রমণী ও শিশুদেরকে নিয়ে আমরা দেশান্তরে গমন করতে চাই। রসুল স. তাদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তিনদিন পর তারা তাদের সকল সম্পদ ফেলে রেখে পরিবার পরিজনসহ মদীনা থেকে বের হয়ে গেলো। রসুল স. তাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ রাখলেন নিজের জন্য। অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ ভাগ করে দিলেন তাঁর অনুচরবর্গকে। বদর যুদ্ধের পর গণিমত লাভ ও বণ্টনের এই ঘটনাটিই ছিলো প্রথম ঘটনা।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বিশ্বাসভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না।' বাগবী লিখেছেন, হজরত মুয়াবিয়ার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রোম সাম্রাজ্যের ছিলো অনাক্রমণ চুক্তি। হজরত মুয়াবিয়া ঠিক করলেন, চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের সাম্রাজ্য আক্রমণ করবেন। বীর বিক্রমে ঢুকে পড়বেন তাদের রাজ্যের অভ্যন্তরে। এমন সময় তিনি দেখেন, এক অশ্বারোহী দ্রুত ছুটে আসছে এবং বলছে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। বিশ্বাসভঙ্গ কোরো না। নিকটবর্তী হতেই চেনা গেলো অশ্বারোহী ব্যক্তিটি হচ্ছেন হজরত আমর ইবনে আমবাসা। হজরত মুয়াবিয়া তাঁকে কাছে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কী বলতে চান আপনি? তিনি বললেন, আমি রসুল স. কে ঘোষণা করতে শুনেছি, চুক্তিভঙ্গ কোরো না— যতক্ষণ চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ না হয়। অথবা প্রতিপক্ষের দ্বারা চুক্তিভঙ্গের কোনো কারণ সংঘটিত হয়। প্রতিপক্ষ যদি চুক্তিভঙ্গ করে, তবেই কেবল চুক্তি বিরোধী কোনো কিছু করা যেতে পারে। হজরত মুয়াবিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁর সেনাবাহিনীকে নিয়ে ফিরে এলেন স্বসাম্রাজ্যের সীমানায়।

www.eelm.weebly.com

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞

❑ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিগণ যেন কখনও মনে না করে যে তাহারা পরিত্রাণ পাইয়াছে; তাহারা সত্যানুসারিগণকে হতবল করিতে পারিবে না।

❑ তোমরা তাহাদিগের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব প্রস্তুত রাখিবে এতদ্দারা তোমরা সন্ত্রস্ত করিবে আল্লাহের শত্রুকে, তোমাদিগের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদিগকে যাহাদিগকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ জানেন; আল্লাহের পথে তোমরা যাহা কিছু ব্যয় করিবে উহার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে এবং তোমাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

বদর যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতটি। বলেছেন বাগবী। আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আপাততঃ পালাতে সমর্থ হলেও তারা যেনো এ কথা মনে না করে যে, চিরদিনের জন্য তারা পরিত্রাণ লাভ করেছে। এ কথাও যেনো মনে না করে যে পুনঃ শক্তি সঞ্চয় করে তারা আর কখনো বিশ্বাসীদেরকে পরাস্ত করতে পারবে।

পরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব প্রস্তুত রাখবে। এগুলোর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ্ জানেন'। এখানে 'যথাসাধ্য শক্তি' অর্থ— সমর শক্তি। আর 'অশ্ব' অর্থ— যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়া। সমর শক্তি সঞ্চয়ের মধ্যে রয়েছে তরবারী চালনা শিক্ষা, তীর চালনা শিক্ষা ইত্যাদি। যুদ্ধের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করাও সমর শক্তির অন্তর্ভুক্ত।

হজরত উকবা বিন আমের বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে মসজিদের মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় ভাষণ দিতে শুনেছি— সাবধান! সাবধান! জেনে রাখো তীর চালনা শিক্ষা সমর শক্তির অন্তর্ভুক্ত। সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ যোদ্ধারাও তীরন্দাজ বাহিনীর ছত্রছায়ায় সম্মুখে অগ্রসর হয়। মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু নাজিহ্ সালামী বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, যে আল্লাহ্পাকের রাস্তায় একটি তীর সরবরাহ করবে, সে জান্নাতের মধ্যে লাভ করবে একটি মর্যাদা। যে তীর নিক্ষেপ করবে সে ক্ষতিপূরণ করবে তার পাপের এবং লাভ করবে দোজখ থেকে মুক্তি। নাসাঈ। হজরত উকবা বিন আমেরের বর্ণনায় আরো এসেছে, রসুল স. বলেছেন, অনতিবিলম্বে তোমরা লাভ করবে রোম সাম্রাজ্যের অধিকার। তখন আল্লাহ্ই হবেন তোমাদের জন্য যথেষ্ট। অতএব তোমরা তীর চালনা বিদ্যা থেকে বিরত হয়ো না। মুসলিম, আবু দাউদ। তিরমিজিও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় উদ্ধৃত অতিরিক্ত কথাটি হচ্ছে— আল্লাহ্র রাস্তায় যার চুল শাদা হয়েছে, কিয়ামতের দিন তার ওই শাদা চুল হবে নূর। এ সম্পর্কে বর্ণিত তিনটি হাদিসই বায়হাকী লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে। তবে সেগুলোতে 'আল্লাহ্র রাস্তায়' এর বদলে লিপিবদ্ধ রয়েছে— 'ইসলামের রাস্তায়'।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত উকবা বিন আমের বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, যারা তীরন্দাজী বিদ্যা ছেড়ে দেয়, তারা আমার দলভুক্ত নয়। এ রকমও শুনেছি যে, তারা নাফরমানী করে।

হজরত আবু উসাইয়েদ বলেছেন, বদরের দিন যখন আমরা মুশরিকদের মুখোমুখি হলাম, তখন রসুল স. নির্দেশ করলেন, মুশরিকেরা অগ্রসর হলে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাদের গতিরোধ করা তোমাদের জন্য হবে অত্যাবশ্যক। বোখারী। হজরত উকবা বিন আমের উল্লেখ করেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্পাক একটি তীরের বদৌলতে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। ওই তিন ব্যক্তি হচ্ছে— তীর নির্মাতা, তীর সরবরাহকারী এবং তীর নিক্ষেপকারী। সুতরাং তোমরা হতে চেষ্টা করো তীরন্দাজ ও অশ্বারোহী যোদ্ধা। তিরমিজি, ইবনে মাজা। আবু দাউদ ও দারেমীর মাধ্যমেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এ কথাগুলো— যারা তীর চালনা বিদ্যা শিক্ষা করার পর তা পরিত্যাগ করে, তারা প্রকৃতপক্ষে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র একটি নেয়ামতকে। অথবা তিনি স. এ রকম বলেছেন— সে হয় আল্লাহ্র নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, একটি তীরের কারণে জান্নাত লাভ করবে তিনজন— তীরের নির্মাতা, সরবরাহকারী ও নিক্ষেপকারী।

যুদ্ধের জন্য অশ্ব প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এখানে অশ্ব প্রস্তুত রাখার অর্থ— অশ্ব প্রতিপালন করা। এ সম্পর্কে আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে 'রিবাতি' শব্দটি। বায়যাবী লিখেছেন, জেহাদের জন্য নির্ধারিত ঘোড়াকে বলা হয় রিবাত। শব্দটি একটি মূল শব্দ। কিন্তু এখানে এটি

www.eelm.weebly.com

ব্যবহৃত হয়েছে কর্মকারকরূপে। রিবাত শব্দটিকে রাবাতা, রাবৃতান এবং রিবাতারূপেও উল্লেখ করা যায়। রাবাতান এবং রিবাতান— দু'ভাবেই শব্দটি লেখা যেতে পারে। শব্দটি কর্মকারকরূপেও ব্যবহৃত হতে পারে। রিবাতা শব্দটি রাবিতা শব্দের বহুবচন— যেমন, ফাসিল শব্দের বহুবচন ফিসাল। এখানে মির্‌রিবাত (অশ্ব) এর সম্পর্ক রয়েছে মিনক্কুওয়াত্‌ (যথাসাধ্য শক্তি) এর সঙ্গে। অর্থাৎ বিশেষত্ব প্রকাশার্থে এখানে সাধারণ ও বিশেষ অবস্থাকে একত্র করা হয়েছে— যেমন, অন্য এক আয়াতে হজরত জিব্‌রাইল ও হজরত মিকাইলকে একত্র করা হয়েছে 'আল মালায়েকা' শব্দের মাধ্যমে। এভাবে সমর শক্তির অন্তর্ভুক্ত হলেও আলাদাভাবে উল্লেখ করে যুদ্ধাশ্বকে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, ঘোড়ার পেশানির চুলের মধ্যে রয়েছে বরকত। বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে।

হজরত জারীর বিন আবদুল্লাহ্‌ বর্ণনা করেছেন, আমি দেখেছি রসুল স. একবার ঘোড়ার পেশানির চুল হাতের মুঠোয় নিয়ে বললেন, এর মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত প্রবহমান থাকবে কল্যাণ, সওয়াব এবং মালে গণিমত। মুসলিম। হজরত ওরওয়া বারকী থেকে বোখারীর পদ্ধতিতে বাগবীও হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ঘোড়া কখনো হবে পাপের বোঝা, কখনো হবে পরিত্রাণের উপকরণ এবং কখনো হবে দোজখের আড়াল। যারা ঘোড়া প্রতিপালন করবে অহমিকা ও আভিজাত্য প্রদর্শনের জন্য তাদের ঘোড়া হবে পাপের বোঝা। নাজাতের অসিলা হবে তাদের ঘোড়া যারা তাদের ঘোড়াকে ব্যবহার করবে আল্লাহ্‌র পথে জেহাদের উদ্দেশ্যে। আর ওই সকল লোকের ঘোড়া হবে তাদের ও দোজখের আড়াল, যারা জেহাদের জন্য ধর্মযোদ্ধাদেরকে তাদের প্রতিপালিত ঘোড়া প্রদান করবে। জেহাদের ঘোড়া চারণভূমিতে যা ভক্ষণ করবে তার জন্যও পুণ্যলাভ করবে তাদের প্রতিপালনকারী। জেহাদের ঘোড়ার মলমূত্র পরিস্কারের কারণেও তার মালিক পাবে নেকী। রশি ছিঁড়ে ফেলে জেহাদের ঘোড়া কৌতুকভরে দৌড়াদৌড়ি করলে তাদের খুরের চিহ্ন ও মলমূত্রের কারণেও তাদের মালিকেরা লাভ করবে পুণ্য। ওই সকল ঘোড়াকে যদি কোনো জলাশয়ে পানি পান করানো হয়, তবে পানকৃত পানির বিনিময়েও পুণ্য লাভ করবে তার মালিকেরা। মুসলিম।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, ওই সকল ঘোড়া হবে তার মালিকের নাজাতের উপকরণ, যেগুলোর মালিক পার্থিব লাভালাভের আকাঙ্খা করে না, যারা স্মরণে রাখে যে, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আল্লাহ্‌র হক। হজরত আবু ওয়াহাব হাশেমীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, অশ্ব প্রতিপালন করো। অশ্বের ললাটদেশ, পৃষ্ঠদেশ ও স্কন্ধদেশে হাত বুলিয়ে দাও। আবু দাউদ, নাসাঈ।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'আল্লাহ্র শত্রু' বলে বুঝানো হয়েছে মক্কার মুশরিকদেরকে। 'তোমাদের শত্রু' বলে বুঝানো হয়েছে অন্যান্য বিধর্মীদেরকে। মুজাহিদ এবং মুকাতিল বলেছেন, বনী কুরায়জাকে এখানে বলা হয়েছে 'তোমাদের শত্রু'। সুদ্দী বলেছেন, তোমাদের শত্রু বলে এখানে বুঝানো হয়েছে পারস্যবাসী অগ্নি উপাসকদেরকে। ইবনে জায়েদ হাসান বলেছেন, মুনাফিকদেরকে।

'এতদ্ব্যতীত অন্যান্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ্ জানেন'— এ কথা বলে বুঝানো হয়েছে, মুনাফিকদেরকে। মুনাফিকেরা প্রকাশ্যতঃ মুসলমান। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা অন্তর্যামী। তাই তিনি জানেন যে, প্রকাশ্যতঃ মুসলমান হলেও অন্তরে অন্তরে তারা কাফের। কেউ কেউ বলেছেন, 'যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ্ জানেন' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে কাফের জ্বিনদেরকে। আবুল মাহাদির সূত্র পরম্পরায় মারফুরূপে আবু শায়েখ এ রকম বর্ণনা করেছেন। ইয়াজিদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন গরিব সূত্রে তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এ রকমই বলেছেন।

এর পর বলা হয়েছে — 'আল্লাহ্র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।' এ কথার অর্থ — হে বিশ্বাসীগণ! জেহাদের জন্য তোমরা যা কিছু খরচ করবে তার পরিপূর্ণ সওয়াব দেয়া হবে তোমাদেরকে। তোমাদের যে সওয়াব প্রাপ্য, তা থেকে কিছুমাত্র কম করা হবে না।

হজরত জায়েদ বিন খালেদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে মুজাহিদকে জেহাদের সামগ্রী প্রদান করলো সে যেনো নিজেই জেহাদ করলো। যে মুজাহিদের পরিবার পরিজনের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করলো, সেও যেনো জেহাদ করলো। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু মাসউদ আনসারীর বর্ণনায় এসেছে এক লোক একটি উষ্ট্রীর নাসারন্ধ্রে দড়ি পরিয়ে রসুল স. এর দরবারে হাজির হয়ে বললো, এই উট আমি দান করলাম জেহাদের জন্য। রসুল স. বললেন, কিয়ামতের দিন এর পরিবর্তে তোমাকে সাতশত উট দান করার সওয়াব দেয়া হবে। মুসলিম।

হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন তোমরা জীবন, সম্পদ ও পরিবার পরিজনসহ অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী।

হজরত মুজাইম বিন ফাতাক্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যারা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করবে তাদেরকে দেয়া হবে সাতশত গুণ প্রতিদান। তিরমিজি, নাসাঈ।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুজাহিদগণের যেমন প্রতিদান রয়েছে, তেমনি প্রতিদান রয়েছে সমরাস্ত্র নির্মাণকারীদের জন্য। আবু দাউদ। হজরত আলী, হজরত আবু দারদা, হজরত আবু হোরায়রা, হজরত আবু উমামা, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর, হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ এবং হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি জেহাদের জন্য অর্থ ব্যয় করে ঘরে বসে থাকে, সে প্রতি দিরহামের বদলে পায় সাত শত দিরহাম প্রদানের সওয়াব। আর যে অর্থ ব্যয়ের সঙ্গে নিজেও জেহাদ করে সে পায় এক দিরহামের পরিবর্তে সাত হাজার দিরহামের সওয়াব। এরপর রসুল স. পাঠ করলেন — 'ওয়াল্লাহু ইউদ্বয়িফু লিমা ইয়াশায়ু' (আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা দ্বিগুণ দান করেন)।

হজরত আবদুর রহমান বিন হাব্বাব বলেছেন, রসুল স. তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদেরকে প্রস্তুত করছিলেন এবং লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহিত করছিলেন। হজরত ওসমান দণ্ডায়মান হলেন এবং আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! হাওদাসহ আমি দান করবো এক শত উট। রসুল স. পুনরায় উৎসাহ প্রদান করলেন। হজরত ওসমান পুনরায় দাঁড়িয়ে বললেন, আমি অঙ্গীকার করলাম হাওদাসহ দুইশত উট প্রদানের। রসুল স. আবারও দানের প্রতি অনুপ্রাণিত করলেন। আবারও দাঁড়িয়ে গেলেন হজরত ওসমান। বললেন, আমি আল্লাহ্‌পাকের রাস্তায় দান করবো হাওদাসহ তিনশত উট। বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখলাম রসুল স. মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন এবং বললেন, ওসমান যা খুশী করুক না কেনো, তার কোনো হিসাব নিকাশ নেই। তার কোনো হিসাব নিকাশ নেই। তিরমিজি।

হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা বর্ণনা করেছেন, তাবুক যুদ্ধের সময় জামার আস্তিনে করে এক হাজার দিনার নিয়ে হাজির হলেন হজরত ওসমান। রসুল স. সেগুলো গ্রহণ করে রেখে দিলেন তাঁর কোলের মধ্যে। আমি দেখলাম, তিনি মুদ্রাগুলো ওলট-পালট করছেন এবং বলছেন, এরপর ওসমান যে আমলই করুক না কেনো, তাকে কোনো অনিষ্ট স্পর্শ করবে না (হিসাব নিকাশ হবে না)। তিনি স. এ কথা উচ্চারণ করলেন দু'বার। আহমদ।

সুরা আনফাল ঃ আয়াত ৬১, ৬২

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۗ هُوَ الَّذِىْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ○

❒ তাহারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকিবে ও আল্লাহের প্রতি নির্ভর করিবে; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

www.eelm.weebly.com

❒ যদি তাহারা তোমাকে প্রতারিত করিতে চাহে তবে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, — তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও বিশ্বাসিগণ দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছেন।

সলম বা সোলেহ্ অর্থ সন্ধি। এর বিপরীত হচ্ছে হরব বা যুদ্ধ। আরবী ভাষায় এমতোক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাই এখানে সলম শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দরূপে। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে, যদি অবিশ্বাসীরা বিনম্র হয় এবং শান্তিচুক্তি করতে চায়, তবে তোমরাও শান্তির দিকে অগ্রসর হও। সন্ধিবদ্ধ হও তাদের সঙ্গে। হাসান ও কাতাদার অভিমত হচ্ছে, আলোচ্য আয়াতটি (৬১) রহিত হয়েছে ওই আয়াতের মাধ্যমে যেখানে বলা হয়েছে— 'উক্‌তুলুল মুশরিকীনা হাইসু ওজাত্ তুমূহুম (মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও, হত্যা করো)। বায়যাবী লিখেছেন, এই আয়াতের নির্দেশনাটি আহলে কিতাবদের (ইহুদীদের) জন্য নির্দিষ্ট। কেননা, তাদের সঙ্গে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তিকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

আমি বলি, আয়াতটি রহিত যেমন হয়নি, তেমনি আহলে কিতাবদের সঙ্গেও এর বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এখানকার নির্দেশনাটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। প্রয়োজনবোধে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন যে বৈধ, সে কথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি স্থাপনে আগ্রহী অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মুসলমানদের নেতা প্রয়োজনবশতঃ শান্তিচুক্তি করতে পারেন। আর 'উক্‌তুলুল মুশরিকীনা'— আয়াতের নির্দেশনাটি প্রযোজ্য হবে বিশেষ পরিস্থিতির উপর। জিযিয়া প্রদানে সম্মত শান্তিকামী কাফের (জিম্মি) ওই হুকুমের বাইরে। তাই এখানে সাধারণভাবে বলে দেয়া হয়েছে— তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করবে; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! সন্ধিবদ্ধতার আড়ালে যদি অবিশ্বাসীরা ষড়যন্ত্রপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দেয়, তবে সেই ষড়যন্ত্রের পরওয়া আপনি করবেন না। নির্ভর করবেন কেবল আল্লাহ্‌র উপর। আল্লাহ্‌তায়ালাই তাদের প্রতারণা থেকে আপনাকে রক্ষা করবেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তাই তাঁর শ্রুতি ও জ্ঞানকে অতিক্রম করার সাধ্য কারো নেই। অতএব আপনার হেফাজতের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালাই যথেষ্ট।

পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায় তবে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও বিশ্বাসীগণের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! সন্ধিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে যদি কাফেরেরা যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করে, তবে তাদের ওই প্রতারণা থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনি আপনাকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর বিশেষ সাহায্যের দ্বারা এবং আপনার একনিষ্ঠ অনুচর বিশ্বাসীগণের দ্বারা।

www.eelm.weebly.com

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

❒ এবং তিনি উহাদিগের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করিলেও তুমি তাহাদিগের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করিতে পারিতে না; কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদিগের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

❒ হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী বিশ্বাসিগণের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

মদীনার আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে ছিলো সীমাহীন হিংসা ও শত্রুতা। রসুল স. এর মদীনায় আগমনের পর তারা ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে উভয় গোত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় সম্প্রীতি। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আলোচ্য আয়াতের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি পৃথিবীর সকল সম্পদ ব্যয় করলেও আউস ও খাজরাজদের অন্তহীন হিংসা ও শত্রুতার অনল নির্বাপিত করতে পারতেন না।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' এ কথার অর্থ— সকল কিছুই আল্লাহ্তায়ালার পরাক্রম ও প্রজ্ঞাময়তার অধীন। মানুষের হৃদয় সমূহও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই সকল অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন কেবল তিনি। এক্ষেত্রেও তাই করেছেন। অন্যের পক্ষে অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অপার করুণায় ও ক্ষমতায় মমতা ও সম্প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের বিশ্বাসীগণের মধ্যে।

পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী বিশ্বাসীগণের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।' অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন— এখানে হাস্‌বুকা (যথেষ্ট) শব্দটি সম্পর্কিত হবে 'মানিত্তাবায়াকা মিনাল মু'মিনীন' (অনুসারী বিশ্বাসীগণ) এর সঙ্গে। এভাবেই অর্থ দাঁড়াবে— হে

www.eelm.weebly.com

আমার নবী! আপনার জন্য আল্লাহ্ এবং আপনার অনুসারী বিশ্বাসীগণই যথেষ্ট। আবার কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'যথেষ্ট' শব্দটি সম্পর্কিত হবে কেবল আল্লাহ্‌র সঙ্গে। তখন অর্থ দাঁড়াবে— হে আমার প্রিয় নবী! আপনার জন্য ও আপনার অনুসারী বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (বঙ্গানুবাদে এ রকমই উদ্ধৃত হয়েছে)।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে যথাসূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, মুসলমানদের সংখ্যা তখন ছিলো উনচল্লিশ জন। তেত্রিশজন পুরুষ এবং ছয়জন রমণী। এরপর হজরত ওমর ইসলাম গ্রহণ করলেন। মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ালো চল্লিশে। আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে— হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, হজরত ওমর ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করেন এই আয়াত।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে তিবরানী ও অন্যান্যরা লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নারী-পুরুষ মিলে উনচল্লিশজন ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমান হন হজরত ওমর। মুসলমানদের সংখ্যা তখন হয় চল্লিশজন। ওই সময় আল্লাহ্পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

হজরত ইকরামা থেকে শিথিল সূত্রে বায্যার বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ওমরের মুসলমান হওয়ার কথা শুনে মুশরিকেরা বলেছিলো আজ আমাদের সম্প্রদায়ের শক্তি হয়ে গেলো অর্ধেক। আল্লাহ্পাক তখন এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কিন্তু আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দৃষ্টে এ কথাটিও বলা যেতে পারে যে, মক্কায় নয়— মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। কারণ আলোচ্য সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে বদর যুদ্ধের পর মদীনায়।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ৬৫

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ○

❐ হে নবী! বিশ্বাসীদিগকে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে এবং তোমাদিগের মধ্যে একশতজন থাকিলে এক সহস্র সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর উপর বিজয়ী হইবে। কারণ তাহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহার বোধশক্তি নাই।

---

www.eelm.weebly.com

'ইয়া আয়্যুহান্নাবীয়্যু হার্‌রিদ্বিল মু'মিনীন' অর্থ— হে নবী! বিশ্বাসীদেরকে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। 'হার্‌রিদ্বি' শব্দটির আভিধানিক অর্থ— পীড়ার কারণে শ্বেতাভ ওষ্ঠ বিশিষ্ট মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে নিরাময় দান পূর্বক বলিষ্ঠ ও কর্মক্ষম করে তোলা। অর্থাৎ এমন উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যাতে অনুৎসাহের কোনো কারণ আর অবশিষ্ট না থাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ' জনের উপর বিজয়ী হবে। তোমাদের মধ্যে একশ' জন থাকলে এক সহস্র সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর উপর বিজয়ী হবে।' এ কথার মাধ্যমে মুসলমানদের দশগুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন কাফেরদের বিরুদ্ধে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দেয়া হয়েছে বিজয়ের সুসংবাদ।

শেষে বলে দেয়া হয়েছে— 'কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই। এ কথার অর্থ— অংশীবাদীরা আল্লাহ্‌কে ও পরকালকে বিশ্বাস করে না। তাই তারা মৃত্যুভয়ে ভীত। আর বিশ্বাসী নয় বলে পুণ্যলাভের বাসনাও তাদের অন্তরে নেই। সুতরাং তারা বোধশক্তি বিবর্জিত। অতএব তারা অবশ্যই হবে পরাজিত এবং তোমরা হবে বিজয়ী।

আলোচ্য আয়াতটি বিজ্ঞপ্তিমূলক। একই সঙ্গে এখানে ধ্বনিত হয়েছে আল্লাহ্‌র আদেশ। এই আদেশ কার্যকর ছিলো বদর যুদ্ধের সময়। ওই যুদ্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা দশগুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বিশ্বাসীগণের উপর ফরজ করে দিয়েছিলেন। স্বসূত্রে ইসহাক বিন রহ্‌ওয়াইহ্‌ উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক মুসলমানের উপর দশজন কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অত্যাবশ্যক করে দিলেন, তখন নির্দেশটি হয়ে পড়লো তাদের উপর অত্যন্ত গুরু। পরে আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের ওই গুরুভার লাঘব করে দিয়েছেন। সেকথাই বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে—

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৬৬

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

❑ আল্লাহ্‌ এখন তোমাদিগের ভার লাঘব করিলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদিগের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সুতরাং তোমাদিগের মধ্যে একশত জন ধৈর্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে। আর তোমাদিগের

www.eelm.weebly.com

মধ্যে এক সহস্র থাকিলে আল্লাহের অনুজ্ঞাক্রমে তাহারা দুই সহস্রের উপর বিজয়ী হইবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদিগের সহিত রহিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— দশগুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশটি ছিলো তোমাদের উপর অত্যন্ত ভারী। তাই আমি তোমাদের ওই ভারকে হাল্কা করে দিলাম। কারণ আমি জানি তোমাদের কারো কারো মধ্যে রয়েছে দুর্বলতা। এ কারণে আমি এই মর্মে সহজ নির্দেশ দান করলাম যে— তোমরা ধৈর্যশীলতার সঙ্গে তোমাদের দ্বিগুণ শক্তিসম্পন্ন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করলেও বিজয়ী হবে। আল্লাহ্তায়ালা ধৈর্যশীলদের সঙ্গী। সুতরাং এ কথাটিও জেনে রেখো যে, সমর শক্তি এবং সৈন্যসংখ্যার বিষয়টি এখানে প্রধান বিষয় নয়, প্রধান বিষয় হচ্ছে ধৈর্যশীলতা। ধৈর্যশীলেরাই আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বিজয়ী— শত্রুদের শক্তি দ্বিগুণ, চতুর্গুণ অথবা যতগুণই হোক না কেনো।

সুফিয়ানের বর্ণনায় এসেছে— শুবরামা বলেছেন, এখানকার নির্দেশনাটি 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' (সৎকাজের নির্দেশদান এবং অসৎকাজকে প্রতিহতকরণ) সম্পর্কিত। কেউ কেউ বলেছেন, মুসলমানদের সংখ্যা যখন অল্প ছিলো, তখন তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো অধিক সংখ্যক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ। যখন তাঁদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলো, তখন নির্দেশটি করা হলো লঘু । এ কারণেই প্রথম দিকে দশগুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশটি পরিবর্তন করে দ্বিগুণ শক্তিসম্পন্ন শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়। তবে সাধারণ নির্দেশনাটি এই যে, স্বল্প অধিক যে রকমই হোক না কেনো, সকল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে ধৈর্যশীলতার সঙ্গে। তবেই লাভ হবে কাঙ্খিত বিজয়। তাই শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।'

হজরত আনাস থেকে আহমদ, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মারদুবিয়া, হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে আবী শায়বা, আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মুনজির, তিবরানী, হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে মুনজির, ইবনে মারদুবিয়া ও আবু শায়েখ এবং হজরত ইবনে ওমর থেকে আবু নাঈম উল্লেখ করেছেন, বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে রসুল স. এর পিতৃব্য হজরত আব্বাসও ছিলেন। এক আনসার সাহাবী তাঁকে বন্দী করেছিলেন। আনসার সাহাবীগণ চাইলেন, তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক। এ কথা রসুল স. এর কানে পৌঁছুলে তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। সারারাত ঘুম হলো না তাঁর। সকালে বললেন, আমার প্রিয় পিতৃব্যের পরিণতির কথা ভেবে সারারাত আমি অস্থির অবস্থায় কাটিয়েছি। ওদিকে আনসার সাহাবীগণ মনে করলেন,

www.eelm.weebly.com

এতক্ষণে নিশ্চয় হজরত আব্বাসের শিরচ্ছেদ করা হয়েছে। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি কি আনসারদের নিকট গমন করবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। হজরত ওমর আনসার সাহাবীগণের নিকটে গিয়ে বললেন, তোমরা আব্বাসকে ছেড়ে দাও। তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তাকে ছাড়বো না। হজরত ওমর বললেন, রসুল স. এ রকমই পছন্দ করেন। তাঁরা বললেন, রসুল স. এর পছন্দই আমাদের পছন্দ। এরপর হজরত ওমর হজরত আব্বাসকে একান্তে বললেন, আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। আমার পিতার ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা আপনার ইসলাম গ্রহণ আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। কারণ এটা রসুল স. এর পছন্দ।

হজরত আনাস বিন মালেক থেকে বোখারী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন— কতিপয় আনসারী সাহাবী রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি দয়া করে সম্মতি প্রদান করলে আমরা আপনার সম্মানিত চাচার মুক্তিপণ রহিত করে দিতে চাই। তিনি স. বললেন, না। আল্লাহ্‌র কসম! একটি দিরহামও ছাড়া হবে না। এরপর বললেন, এই বন্দীদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন। এরা তোমাদের ভ্রাতাতুল্য। তবে বলো, তোমাদের এই ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এই বন্দীরা তো আপনারই স্বজন। তাই আমার অভিমত হচ্ছে হত্যা না করে এদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করা হোক। মুক্তিপণের ওই অর্থের মাধ্যমে আমরা আমাদের সমর শক্তিকে সুসংহত ও শক্তিশালী করতে পারবো। এ রকমও হতে পারে যে, অবশেষে আপনার মাধ্যমে এদেরকে আল্লাহ্‌পাক হেদায়েত দান করবেন। তখন এরাই আপনার হস্তকে শক্তিশালী করবে। রসুল স. বললেন, ইবনে খাত্তাব! তুমি কী বলো? হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এরা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেছে আপনাকে। আবার যুদ্ধও করেছে। তাই আমি বলি আমাদের বন্দী স্বজনদেরকে আমাদেরই অধীনে অর্পণ করুন। আমরা নিজ নিজ নিকটাত্মীয়দেরকে হত্যা করি— যাতে করে আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্যে আমরা এ কথা প্রমাণ করতে পারি যে, আমাদের হৃদয়ে অংশীবাদীদের প্রতি ভালোবাসা একেবারেই নেই।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি নির্দেশ প্রদান করলে আমরা সামনের উপত্যকায় অনেক লাকড়ি একত্র করে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারি এবং বন্দীদেরকে নিক্ষেপ করতে পারি ওই আগুনে। বন্দী হজরত আব্বাস এ কথা শুনে বললেন, তোমরা তো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছো। এরপর রসুল স. প্রবেশ করলেন তাঁর গৃহে। বাইরে সমাগত সাহাবী-

www.eelm.weebly.com

গণের কেউ কেউ বললেন, রসুল স. আবু বকরের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। কেউ কেউ বললেন, তিনি গ্রহণ করবেন হজরত ওমরের মতামত। কেউ কেউ ধারণা করলেন, রসুল স. শেষ পর্যন্ত হয়তো হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহার অভিমতকেই গ্রহণ করবেন। কিছুক্ষণ পর রসুল স. বাইরে এলেন এবং বললেন, কোনো কোনো লোকের হৃদয়কে আল্লাহতায়ালা দুধের চেয়ে অধিক নরম করে দিয়েছেন। কারো কারো অন্তরকে করে দিয়েছেন পাথরের চেয়েও কঠিন। আবু বকরের দৃষ্টান্ত মিকাইল ফেরেশতার মতো— যিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আর নবী-গণের মধ্যে হজরত ইব্রাহিমের মতো যিনি বলেছিলেন— যারা আমার অনুসরণ করে তারা তো আমারই দলভুক্ত। আর যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করে— অতঃপর নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও করুণাপরবশ। ওমরের দৃষ্টান্ত হচ্ছে জিব্রাইল ফেরেশতার মতো— যিনি আল্লাহ্র দুশমনদের প্রতি অবতীর্ণ করেন কঠিন মুসিবত ও আযাব। নবীগণের মধ্যে নুহ্ এবং মুসার সঙ্গেও রয়েছে ওমরের সাদৃশ্য। নুহ্ বলেছিলেন— হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! পৃথিবীতে কোনো সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীকে অবশিষ্ট রেখো না। রসুল মুসা বলেছিলেন— হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তাদের সম্পদকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তরসমূহকে এমতো কঠিন করে দাও যেনো তারা ইমান গ্রহণ করতে না পারে— যে পর্যন্ত না প্রত্যক্ষ করে ভয়াবহ আযাব। এরপর তিনি স. বললেন, আমি আবু বকর ও ওমরের সম্মিলিত অভিমতকে অগ্রাহ্য করবো না। কিন্তু তোমরা এ বিষয়ে একমত নও। সুতরাং সিদ্ধান্ত দান করা হচ্ছে যে— বন্দীদের মধ্যে যে রক্তপণ প্রদান করবে, তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। আর যে রক্তপণ প্রদান করবে না তাকে দেয়া হবে মৃত্যুদণ্ড।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! সহল বিন বায়জাকে ক্ষমা করে দিন। আমি সাক্ষী— তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রসুল স. নির্বাক হয়ে গেলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন, মৌন রসুল স.কে দেখে আমি ভীত হলাম। ভাবলাম আমি একজন কাফের বন্দীর জন্য সুপারিশ করেছি। আসমান থেকে পাথর বর্ষণ হওয়ার চিন্তা ওই সময়ের চেয়ে বেশী আমি আর কখনোই করিনি। বেশ কিছুক্ষণ পর মৌনতা ভঙ্গ হলো রসুল স. এর। তিনি বললেন, সহল বিন বায়জাকে অব্যাহতি দেয়া হলো।

পরদিন সকালে হজরত ওমর রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, তিনি স. ও হজরত আবু বকর কাঁদছেন। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে বলুন, কী কারণে রোদন করছেন আপনারা? আমিও আপনাদের সঙ্গে রোদন করতে চাই। রসুল স. বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! তোমার

www.eelm.weebly.com

অভিমতের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে আমাদের উপর আযাব আপতিত হয়েছিলো প্রায়। নিকটের একটি বৃক্ষের দিকে ইশারা করে তিনি বললেন, আযাব এসে পড়েছিলো ওই বৃক্ষের কাছাকাছি। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা দয়া করে তা দূর করে দিয়েছেন। ওই আযাব আপতিত হলে ইবনে খাত্তাব ছাড়া আর কেউ বাঁচতে পারতো না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ৬৭

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

❒ দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নহে; তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ্ চাহেন পরলোকের কল্যাণ; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

'মা কানা লিনাবিয়্যিন আঁয়্যাকুনা লাহু আস্‌রা হাত্তা ইউছ্খিনা ফিল আরদ্বি' অর্থ— দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোনো নবীর জন্য সংগত নয়।

জ্ঞাতব্যঃ কাযী আবুল ফজল আয়ায তাঁর আশ্‌শিফা গ্রন্থে লিখেছেন 'দেশে সম্পূর্ণরূপে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোনো নবীর জন্য সংগত নয়' কথাটির মাধ্যমে রসুল স. এর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করা হয়নি। বরং এ কথাটির মাধ্যমেই ফুটে উঠেছে রসুল স. এর অনন্য সাধারণ মর্যাদা। যেমন অন্যান্য নবীগণের জন্য গণিমতের মাল গ্রহণ করা হালাল ছিলো না। কিন্তু রসুল স. এর জন্য তা হালাল করা হয়েছে। তাই তিনি স. বলেছেন, যুদ্ধলব্ধ-সম্পদ অন্য নবীদের জন্য হালাল ছিলো না। কিন্তু আমার জন্য হালাল।

কাযী আয়ায আরো লিখেছেন, 'তোমরা কামনা করো পার্থিব সম্পদ' এ কথাটিও রসুল স. কিংবা তাঁর সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বলা হয়নি। বলা হয়েছে ওই সকল লোককে লক্ষ্য করে, যারা পৃথিবীর বিত্ত-বৈভবের প্রতি লালসাপরায়ণ। জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, বদর যুদ্ধের দিন যখন অংশীবাদী সৈন্যরা পালিয়ে যাচ্ছিলো, তখন বিজয় নিশ্চিত জেনে কেউ কেউ তাদের ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলো। হজরত ওমর তখন আশংকা করেছিলেন, এ রকম করলে অংশীবাদীরা হয় তো পুনরাক্রমণের উদ্যোগ নিতে পারে।

'ইউছ্খিনা' অর্থ নিপাত করা, নিশ্চিহ্ন করা, পরাভূত করা, হত্যা করা অথবা পরাস্ত করা। এখানে মূল কর্ম বা হত্যা করার কথাটি রয়েছে অনুক্ত। এভাবে আয়াতে এই নির্দেশনাটি দেয়া হয়েছে— শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত না করা

www.eelm.weebly.com

পর্যন্ত বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়া যাবে না। হত্যা করতে হবে তাদেরকে। এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। যেমন— 'আছখানা ফলানা' অর্থ অমুক ব্যক্তিকে নিপাত করা হয়েছে, 'আছখানা ফিল আদুবি' অর্থ শত্রুকে যথেষ্ট পরিমাণে আঘাত করা হয়েছে ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে 'তুরিদুনা আরদ্বাদ্ দুন্ইয়া' (তোমরা কামনা করো পার্থিব সম্পদ)। এ কথার অর্থ— হে মুসলমানেরা! তোমরা চাও ধ্বংসশীল পার্থিব বৈভব।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়াল্লহু ইউরিদুল আখিরা' ওয়াল্লহু আযিযুন্ হাকীম' (এবং আল্লাহ্ চান পরলোকের কল্যাণ; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। তাই তিনি চান তাঁর অপার পরাক্রমের অধীনে এবং অতুলনীয় প্রজ্ঞাময়তার অনুসরণে তোমরা পরকালাভিমুখী হও। অংশীবাদীদেরকে হত্যা করে সাহায্যকারী হও সত্যধর্মের। অর্জন করো পুণ্য এবং আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ঘটনাটি ঘটেছিলো বদর যুদ্ধের সময়। তখন মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা ছিলো অল্প। পরবর্তী সময়ে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলো তখন অবতীর্ণ হলো— 'ফাইম্মা মান্না বা'দু ওয়া ইন্না ফিদাআন্' (এরপর হয় অনুগ্রহ করবে নয়তোবা রক্তপণ নেবে)। এই আয়াতের মাধ্যমে রসুল স. কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেয়া হলো। যুদ্ধবন্দীকে হত্যা, অথবা তাদেরকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীতে পরিণত করা কিংবা মুক্তিপণ গ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া— যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তখন থেকে রসুল স. কে এবং মুসলমানদেরকে দেয়া হয়েছে।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, মুসলমানদের শাসক বা অধিনায়ককে এই আয়াতের মাধ্যমে যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করার অধিকার দেয়া হয়েছে। তাই রসুল স. বনী কুরায়জার পুরুষদেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বন্দী করার পর হত্যা করিয়েছিলেন নজর বিন হারেস, তাইমিয়া বিন আদী এবং উকবা বিন আবী মুঈতকে। সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, উকবা বিন আবী মুঈত তখন বলেছিলো, মোহাম্মদ শিশুদেরকে দেখবে কে? রসুল স. বলেছিলেন, আগুন। ইবনে ইসহাক বলেছেন, উকবাকে হত্যা করেছিলেন হজরত ইবনে আবীল আফলা। ইবনে হিশাম বলেছেন, হজরত আবী ইবনে আবী তালেব।

মাসআলাঃ বন্দীদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করা সিদ্ধ। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। এর মাধ্যমে অংশীবাদীতা নিপাত করা হয় এবং সম্মানিত করা হয় ইসলামকে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, শাসক বা অধিনায়ক ছাড়া বন্দীকে হত্যা করার অধিকার অন্য কারো নেই। প্রয়োজনবোধে কেবল শাসকই যুদ্ধবন্দীকে হত্যার নির্দেশ দিতে পারেন। তবে কেউ যদি অতর্কিতে কোনো যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করে ফেলে তবে এর জন্য তাকে রক্তপণ দিতে হবে না।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ মুক্তিপণ গ্রহণ করে অথবা না করে বন্দীকে মুক্ত করে তাদের (কাফেরদের) রাজ্যে যেতে দেয়া, বন্দী-বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তি দেয়া, জিম্মি (কর প্রদানে সম্মত) হিসাবে মুসলিম রাজ্যে বসবাসের অধিকার দেয়া— এ সকল কিছুই 'ইম্মা মান্না বা'দু ওয়া ইম্মা ফিদাআন' — এই নির্দেশনাটির অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে অবশ্য আলেমগণের মতপৃথকতা রয়েছে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্, হাসান বসরী ও আতা বলেছেন, ফিদিয়া নিয়ে অথবা না নিয়ে ছেড়ে দেয়া এবং বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তিদান জায়েয। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম আওজায়ী, কাতাদা এবং জুহাক বলেছেন, মুক্তিপণ না নিয়ে মুক্তি দেয়া নাজায়েয। ইমাম আবু হানিফা এবং সাহেবাইনের (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের) মত হচ্ছে— মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়াও নাজায়েয। সিয়ারে কবীরে বলা হয়েছে, সম্পদের প্রয়োজন দেখা দিলে এ রকম করাতে কোনো দোষ নেই। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু হানিফার মতে, মূলতঃ এ রকম করা সিদ্ধ নয়। কুদুরী রচয়িতা এবং হেদায়া রচয়িতা এ রকম উল্লেখ করেছেন। বলিষ্ঠ বর্ণনা এই যে, বন্দীবিনিময় বৈধ। সাহেবাইনের মতও এ রকম।

বন্দীকে জিম্মি করে (কর প্রদানে সম্মত অবস্থায়) মুক্ত করে দেয়াও জায়েয। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক এ রকম বলেছেন। হজরত ওমর ইরাক ও সিরিয়া বিজয়ের পর সেখানকার বিধর্মীকে জিম্মি অবস্থায় মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন, বন্দীকে জিম্মি করা যায় না। কারণ তারা অধিকৃত (অধিকৃতরা তো বাধ্য হয়ে এ রকম প্রস্তাবে সম্মত হবে)। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মুক্তিপণ নিয়ে অথবা না নিয়ে অথবা বন্দীবিনিময়ের মাধ্যমে কাফের বন্দীকে তার স্বভূমিতে যেতে দিলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় তারা পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে। আর কাফেরদের হাতে বন্দী মুসলমানদেরকে মুক্ত করার ব্যাপারে কোনো দায়বদ্ধতাও নেই। ওই সকল বন্দীর বন্দীত্ব আল্লাহ্‌-তায়ালার পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ। তাছাড়া 'ফা ইম্মা মান্না বা'দু ওয়া ইম্মা ফিদাআন'— আয়াতটি রহিত হয়েছে। রহিতকারী আয়াতটি হচ্ছে— 'ফাইম্মা তাছকাফান্নাহুম বিল হরবি ফাশাররিদ বিহিম মান খালাহুম' এবং 'উকতুলুল মুশরিকীনা হাইছু ওয়াজাদতাহুম'। অবশ্য জমহুরের মতে মুক্তিপণ ও সৌজন্য-মূলক মুক্তি সম্পর্কিত আয়াতটি রহিত হয়নি। কেননা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি ঘটলো, তখন অবতীর্ণ হয় —'ইম্মা মান্না বা'দু ওয়া ইম্মা ফিদাআন'। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, 'উকতুলুল মুশরিকীন' আয়াতের মাধ্যমে বন্দী মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়নি। বরং আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, বন্দী বিধর্মীদেরকে হত্যা না করে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী বানানো যেতে পারে। ইমাম আবু হানিফার মতে তাদেরকে জিম্মী হিসাবে ছেড়ে দেয়াই উত্তম। (কারণ হত্যা ও বন্দী এক কথা নয়।— হত্যা করতে চাইলে তো বন্দী করার প্রাক্কালেই হত্যা করা যেতো)।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে মুসলিম, আবু দাউদ এবং তিরমিজি উল্লেখ করেছেন, রসুল স. দু'জন মুসলমান বন্দীর বিনিময়ে একজন বিধর্মী বন্দীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

মুসলিম, আহমদ এবং সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়ের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, হজরত সালমা ইবনে আকওয়া বলেছেন, রসুল স. হজরত আবু বকরের নেতৃত্বে আমাদেরকে এক জেহাদে প্রেরণ করলেন। নির্দেশ ছিলো যুদ্ধ করতে হবে বনী কাজায়ার বিরুদ্ধে। আমরা যুদ্ধ শুরু করলাম। হত্যা করলাম তাদের অনেককে। হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম মহিলা ও শিশুসহ কিছু লোক আশ্রয় লাভের জন্য একটি উঁচু টিলার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমি দেখলাম আমি তাদেরকে সামনাসামনি গিয়ে বাধা দিতে পারবো না। তার আগেই তারা পৌঁছে যাবে নিরাপদ স্থানে। তাই আমি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলাম। ফলে তারা আর অগ্রসর হতে পারলো না। আমি তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে অধিনায়ক হজরত আবু বকরের নিকটে এলাম। ওই দলে ছিলো এক অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী। হজরত আবু বকর ওই যুবতীকে দিলেন আমার অধিকারে। যুদ্ধশেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম আমরা। কিন্তু পথিমধ্যে আমি ওই যুবতীর বস্ত্র উন্মোচন করিনি। এরপর মদীনার বাজারে স্বয়ং রসুল স. আমাকে বললেন, হে সালমা! ওই যুবতীকে আমার হাতে দিয়ে দাও। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল। যুবতীটি আমার খুবই পছন্দ। এখন পর্যন্ত আমি তার বসনোন্মুচন করিনি। তিনি স. আর কিছু বললেন না। কয়েকদিন পর আবার বাজারে দেখা হলো রসুল স. এর সঙ্গে। তিনি স. বললেন, হে সালমা! আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ করবেন— মেয়েটিকে আমার হাতে দাও। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সে আপনারই জন্য। এখনো আমি তার গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করিনি। রসুল স. ওই যুবতীর বিনিময়ে মুক্ত করলেন মক্কার মুসলমান বন্দীদেরকে।

ইবনে ইসহাক ও আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, যখন মক্কাবাসীরা তাঁদের বন্দী স্বজনদের জন্য মুক্তিপণ পাঠাতে শুরু করলেন, তখন রসুল স. এর কন্যা হজরত জয়নাবও তাঁর বন্দী স্বামীর মুক্তিপণ হিসাবে পাঠিয়ে দিলেন একটি মুক্তার মালা। মালাটি রসুল স. তাঁর প্রথম বিবাহের সময় উম্মত জননী হজরত খাদিজাকে দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিনের দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি বিজড়িত ওই মালাটি দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন রসুল স.। সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে জয়নাবের বন্দীকে মুক্তি দিতে পারো এবং মালাটিও ফিরিয়ে দিতে পারো। রসুলঅন্তপ্রাণ সাহাবীগণ তাই করলেন। হাকেমের বিশুদ্ধ বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাগুলো (হজরত জয়নাবের স্বামী) আবুল আসকে মুক্তিদান কালে রসুল স. এই মর্মে তাঁর নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, তিনি মক্কায় গিয়ে অবশ্যই হজরত জয়নাবকে পাঠিয়ে দিবেন মদীনায়। আবুল আস তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন।

www.eelm.weebly.com

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, রসুল স. মুক্তিপণ ছাড়া যে সকল বদরের যুদ্ধ-বন্দীদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলো মুত্তালিব বিন হানতাব এবং আবদুল উজ্জা জামুহী। তারা ছিলো বিত্তহীন। রসুল স.কে তারা তাদের অক্ষমতার কথা জানিয়েছিলো। তিনি স. তাদেরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিলেন যে, তোমরা আমার শত্রুকে কখনো সাহায্য করতে পারবে না। তারা ছিলো কবি। কবিতায় তারা রসুল স. এর কিছু গুণগানও করেছিলো। শেষ পর্যন্ত তাদের একজন উহুদ যুদ্ধের সময় মুশরিক বাহিনীর সহযোদ্ধা হিসেবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিলো। যুদ্ধে তাকে বন্দী করা হয়। আবারও সে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। রসুল স. বলেন, মক্কার মাটিতে তুমি আর ফিরে যেতে পারবে না। সেখানে গিয়ে এ রকম বলার সুযোগও পাবে না যে, আমি মোহাম্মদকে দুই দুইবার প্রতারণা করতে পেরেছি। এরপর রসুল স. তার মস্তক ছেদনের নির্দেশ দেন।

সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে রসুল স. বিত্তহীন বন্দীদেরকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আর বিত্তশালী বন্দীদের মুক্তিপণ ধার্য করেছিলেন এক হাজার থেকে চার হাজার দিনার পর্যন্ত। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, বদরের যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিদানের প্রাক্কালে রসুল স. বলেছিলেন মুত্ইম বিন আবী জিন্দা নিহত না হয়ে যদি বন্দী হতো, তবে তার সুপারিশে আমি ফিদিয়া ব্যতিরেকেই বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিতাম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ইয়ামামার বনী হানিফার এক ব্যক্তিকে বন্দী করে আনবার জন্য একটি সেনাদলকে পাঠালেন। সেনাদল যথাসময়ে তাকে বন্দী করে নিয়ে এলো। বেঁধে রাখলো মসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে। তার নাম ছিলো সামামা বিন আছাল। রসুল স. তার কাছে এসে বললেন, তোমার নিকটে এখন কি রয়েছে? সামামা বললেন, যদি আপনারা আমাকে হত্যা করেন, তবে একজন খুনীকেই হত্যা করবেন। যদি ছেড়ে দেন, তবে আমি জানাবো কৃতজ্ঞতা ও সম্মান। এখন বলুন, মুক্তিপণ হিসেবে কী পরিমাণ অর্থ ধার্য করা হবে আমার জন্য? রসুল স. কিছু বললেন না। প্রস্থান করলেন সেখান থেকে। পরদিন তিনি স. পুনরায় এসে বললেন, সামামা! কী ভাবছো? সামামা আগের দিনের কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করলেন। রসুল স. নীরবে সরে গেলেন সেখান থেকে। তৃতীয় দিনে পুনরায় সেখানে উপস্থিত হয়ে রসুল স. বললেন, এবার বলো সামামা কী চিন্তা করছো তুমি? সামামা বললেন, আমি তো আমার কথা বলেই দিয়েছি। তিনি স. নির্দেশ দিলেন সামামাকে ছেড়ে দাও। সাহাবীগণ তাকে ছেড়ে দিলেন। মসজিদের অদূরেই ছিলো কিছু খেজুরের গাছ। সেদিকে চলে গেলেন সামামা। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে গোসল করে মসজিদে এসে ঘোষণা দিলেন— আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। এ

www.eelm.weebly.com

রকমও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মদ হচ্ছেন আল্লাহ্‌র রসুল। আল্লাহ্‌র শপথ! হে আল্লাহ্‌র রসুল, আপনার রূপে আমি মুগ্ধ। পৃথিবীর অন্য কেউ আমাকে এ রকম মুগ্ধ করতে পারেনি। এখন আপনিই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আপনার আনীত ধর্মের চেয়ে অন্য কারো ধর্ম আমাকে এতো বেশী মোহিত করেনি। এখন সকল শহর অপেক্ষা আপনার এই শহর আমার নিকট অধিকতর আকর্ষণীয়। আর সকল মানুষ অপেক্ষা আপনিই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। ওমরার উদ্দেশ্যে আমি মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলাম। আপনার সৈন্যরা আমাকে এখানে ধরে এনেছে। দয়া করে আজ্ঞা করুন, এখন আমি কী করবো? রসুল স. তাকে সুসংবাদ দান করলেন এবং ওমরার অনুমতি দিলেন। সামামা মক্কায় পৌঁছলে এক লোক বললো, শুনলাম তুমি নাকি ধর্মত্যাগ করেছো? সামামা বললেন, না আমি ধর্ম (প্রকৃত ধর্ম) গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্‌র কসম আমি এখন আল্লাহ্‌র রসুলের অনুগামী। তাঁর নির্দেশ ব্যতিরেকে ইয়ামামার একটি গমের দানাও আমি তোমাদের নিকট প্রেরণ করবো না।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে সাহাবীগণের সঙ্গে সলাপরামর্শ করলেন। বললেন, আল্লাহ্‌-পাক তোমাদেরকে তাদের উপর ক্ষমতাশালী করেছেন। হজরত ওমর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ওদের মস্তক কর্তনের অনুমতি প্রদান করুন। রসুল স. এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। হজরত আবু বকর বললেন, মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হোক। এটাই উত্তম। রসুল স. এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৬৮

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

❐ আল্লাহের পূর্ব বিধান না থাকিলে তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ তজ্জন্য তোমাদিগের উপর মহা শাস্তি আপতিত হইত।

আলোচ্য আয়াতের মর্ম হচ্ছে— প্রত্যাদেশের (ওহীর) মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধান লংঘন করলে তা হয় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে পূর্বাহ্নে কোনো নির্দেশনা দেয়া হয়নি। এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে। বিধান প্রদানের পরে যদি এ রকম করা হতো তবে আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে আপতিত হতো মহাশাস্তি। আলোচ্য আয়াতে এ কথাটিই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ রকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, হাসান এবং মুজাহিদ।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের পূর্বে অন্য কোনো উম্মতের জন্য গণিমত হালাল করা হয়নি। ইতোপূর্বে নিয়ম ছিলো— গণিমতের মাল জমা করে রাখতে হবে এক স্থানে। আর ওই স্তুপীকৃত গণিমতকে ভস্মীভূত করে দিবে আসমান থেকে নেমে আসা আগুন।

বদর যুদ্ধের সময় পলায়ণপর শত্রুদের পরিত্যক্ত সম্পদ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন সাহাবীগণ। ওই অবস্থার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতটি। আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— লাওহে মাহ্ফুজে পূর্বাহ্নে এ কথা লিখিত হয়েছিলো যে, মালে গণিমত শেষ উম্মতের জন্য বৈধ। যদি এ রকম লেখা না থাকতো তবে এসে পড়তো আল্লাহ্র আযাব। এ রকম তাফসীর করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস।

কেউ কেউ তাফসীর করেছেন এ রকম— বদরের যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করাই ছিলো অধিকতর উত্তম। এতে করে অবিশ্বাসীর অন্তরে সৃষ্টি হতো প্রচণ্ড ভীতি। প্রতিষ্ঠিত হতো ইসলামের নিরঙ্কুশ প্রতাপ। মুসলমানেরা এ কথা বুঝতে পারেননি। তাঁরা মনে করেছিলেন, মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়ার মধ্যে রয়েছে দু'টি উপকার। একটি হচ্ছে— এরা হয়তো নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে এক সময় তওবা করবে। আশ্রয় গ্রহণ করবে ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। এ রকমই ঘটেছিলো বাস্তবে। বন্দীদের অনেকেই পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় উপকার হচ্ছে— মুক্তিপণের অর্থ দিয়ে অস্ত্র, অশ্ব ইত্যাদি ক্রয় করে মুসলমানেরা হতে পারবে সমরশক্তিতে অধিকতর বলীয়ান। এই চিন্তাটি ছিলো ভুল। কিন্তু এটা বিশ্বাসগত ভুল নয়— চিন্তাপ্রসূত (ইজতেহাদী) ভুল। লাওহে মাহ্ফুজে পূর্বাহ্নে লিখিত রয়েছে যে, ইজতেহাদী ভুল কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। যদি এ রকম লেখা না থাকতো, তবে এসে পড়তো আল্লাহ্র আযাব। কোনো কোনো আলেম আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনাটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— অনেক আগেই লাওহে মাহ্ফুজে আল্লাহ্তায়ালা লিখে রেখেছিলেন যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশ্বাসীদের উপর তিনি আযাব অবতীর্ণ করবেন না। এ রকম লেখা না থাকলে অবশ্যই এসে পড়তো আযাব। 'ফি মা আখাজতুম' অর্থ তোমরা যা গ্রহণ করেছো। অর্থাৎ তোমরা অবিশ্বাসীদের নিকট থেকে যে মুক্তিপণ গ্রহণ করেছো। এই গ্রহণের ফলেই তোমাদের উপর এসে পড়তো আল্লাহ্র আযাব (যদি পূর্বাহ্নে এ রকম নিষেধাজ্ঞা আসতো)।

জ্ঞাতব্যঃ একদল আলেম আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা কোরআনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তোমরা ক্ষমার্হ। যদি তোমরা কোরআনের প্রতি বিশ্বাসী না হতে (যাদের জন্য গণিমত হালাল ছিলো

www.eelm.weebly.com

না, এ রকম উম্মতের মধ্যে কোনো এক উম্মত যদি হতে) তবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হতো আল্লাহ্‌র আযাব। তোমাদের জন্য গণিমত হালাল। তাই গণিমত গ্রহণ করা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে অব্যাহতি ল্যাভ করেছো তোমরা।

এ সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, গণিমত ও ফিদিয়া গ্রহণ করার কারণে সাহাবীগণ গোনাহ্‌গার বলে সাব্যস্ত হননি। নাফরমানীও করেননি আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে।

কাযী আবু বকর বিন আ'লা বলেছেন, শেষ উম্মতের জন্য গণিমত ও ফিদিয়া হালাল বলেই রসুল স. এর চিন্তাপ্রবাহ সেদিকেই প্রবাহিত হয়েছিলো। এ সম্পর্কে পৃথিবীতে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাই রসুল স. লাওহে মাহ্‌ফুজের ওই অনড় বিধানের অনুবর্তী হয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের এক বৎসর পূর্বেও এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছিলো। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহাশের তরবারীর আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছিলো ইবনে হাজরামী। রসুল স. ফিদিয়া প্রদানের শর্তে তাঁকে দায়মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তখন এ সম্পর্কে কোনো প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহ্‌তায়ালার অসন্তোষের কারণ ঘটলে তখনই এ সম্পর্কে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হতো। সুতরাং এ কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালার কোনো অসন্তোষের প্রকাশ ঘটেনি। বরং এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে রসুল স. এর অনন্যসাধারণ মর্যাদা। তাই আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে— আল্লাহ্‌র পূর্ববিধান না থাকলে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হবে এ রকম— আল্লাহ্‌পাকের লাওহে মাহ্‌ফুজে লিপিবদ্ধ ওই পূর্ব বিধান তোমাদের জন্য নির্ধারিত আল্লাহ্‌তায়ালার এক বিশেষ নেয়ামত। অতএব হে বিশ্বাসীরা! উত্তমরূপে অবগত হও, তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ নেয়ামতের অধিকারী। এ রকম নেয়ামতের অধিকারী না হলে তোমরা আল্লাহ্‌পাকের মহাশাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারতে না।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, তখন উপস্থিত সাহাবীগণের মধ্যে কেবল হজরত ওমর ও হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ ছিলেন বন্দীদেরকে হত্যা করার পক্ষে। অন্যরা ছিলেন হত্যার বিপক্ষে এবং মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্তি দেয়ার পক্ষে। তাই রসুল স. বলেছিলেন আসমান থেকে আযাব নেমে এলে ওমর ও সা'দ ছাড়া আর কেউ রক্ষা পেতো না।

হজরত আলী থেকে ইবনে আবী শায়বা, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে সা'দ, ইবনে জারীর, ইবনে হাব্বান এবং বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক উত্তম আখ্যায়িত হাদিসে এসেছে, হজরত জিব্‌রাইল রসুল স. কে বললেন, ভ্রাতা মোহাম্মদ! আপনার সম্প্রদায় ফিদিয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। কিন্তু এটা আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়। তবে আল্লাহ্ আপনাকে এই অধিকার দিয়েছেন যে, হত্যা

www.eelm.weebly.com

অথবা ফিদিয়া— যে কোনো একটিকে আপনি গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু ফিদিয়া গ্রহণ করলে প্রতি বন্দীর পরিবর্তে আপনার দলের একজন মৃত্যুবরণ করবে। রসুল স. এ কথা সাহাবীগণকে জানালেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! বন্দীরা আমাদেরই স্বজন। তাদেরকে ফিদিয়ার বিনিময়ে মুক্ত করে দিলে ফিদিয়ার অর্থে আমরা সমর-সরঞ্জাম বৃদ্ধি করতে পারবো। আর তাদের একজনের বদলে আমাদের একজন যদি শহীদও হয়, তবুও তা আমাদের নিকট অপছন্দনীয় নয়। তাই হয়েছিলো। বদরের সত্তরজন যুদ্ধবন্দীর বদলে উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন সত্তরজন সাহাবী।

জ্ঞাতব্যঃ কাযী আবুল ফজল আয়ায তাঁর আশ্‌শিফা গ্রন্থে লিখেছেন, হত্যা ও মুক্তিপণ গ্রহণ— দু'টোই ছিলো বৈধ। তবে হত্যা ছিলো উত্তম এবং মুক্তিপণ গ্রহণের মাধ্যমে বন্দী মুক্তির ব্যাপারটি ছিলো অনুত্তম। রূপকার্থে তাই মুক্তিপণ গ্রহণ করাকে অন্যায় বলা হয়েছে। নির্দেশনাটি ছিলো এ রকম— উত্তম আমল গ্রহণ করাই সমীচীন। তিবরানীও এ রকম বলেছেন। হজরত ওমর এবং হজরত সা'দ গ্রহণ করেছিলেন উত্তম আমলটি। তাই রসুল স. বলেছিলেন, আযাব এলে ওমর ও সা'দ ছাড়া আর কেউ বাঁচতে পারতো না। কিন্তু তকদীরের নির্ধারণ ছিলো আযাব আসবে না। তাই আযাব আসেনি।

দাউদ জাহেরী বলেছেন, পূর্বাহ্নে ফিদিয়াকে নিষেধ করা হয়নি। নিষেধ করা হলেও এ কথা বলা যেতো না যে রসুল স. আল্লাহ্‌র নিষেধের বাইরে কোনো কাজ করেন। এ রকম করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাই, বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌র পূর্ব বিধান না থাকলে'। এভাবে বলে বরং রসুল স. কে সম্মানিতই করা হয়েছে। প্রকাশ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতি রসুল স. এর একনিষ্ঠ আনুগত্যকে।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে সাহাবীগণ ফিদিয়ার অর্থ গ্রহণের প্রতি তাঁদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তখন অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্‌ফালঃ আয়াত ৬৯

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۚ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

❑ যুদ্ধে যাহা তোমরা লাভ করিয়াছ তাহা বৈধ ও উত্তম বলিয়া ভোগ কর ও আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! গণিমত ও ফিদিয়া হিসাবে যুদ্ধের মাধ্যমে তোমাদের যা কিছু অর্জিত হয়, তা তোমরা ভক্ষণ করতে এবং ব্যবহার করতে পারবে। এটা তোমাদের জন্য মোবাহ্‌ (বৈধ)। তবে তোমাদের অন্তরে সর্বদা জাগরুক রাখতে হবে আল্লাহ্‌র ভয়। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে— আল্লাহ্‌ ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ার্দ্র।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. বলেছেন, আমাকে অন্য নবীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে ছয়টি বিষয়ে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে— যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আমার জন্য হালাল। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি। এ সম্পর্কে হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে তিবরানীর বর্ণনাটি এ রকম— রসুল স. বলেছেন, অন্য নবীগণকে দেয়া হয়নি, এ রকম পাঁচটি বিশেষত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে। আর আমার জন্য মালে গণিমতকে করা হয়েছে হালাল— যা ইতোপূর্বে অন্য কারো জন্য হালাল করা হয়নি। হজরত আবু উমামা থেকে যথাসূত্রে বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে চারটি বিশেষত্বের কথা। হজরত আবু দারদা থেকে তিবরানীর বর্ণনাতেও এ রকম বলা হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার পূর্বে কারোর জন্য গণিমতের মাল হালাল ছিলো না। দুর্বলতা ও বিত্তহীনতার কারণে আমাদের জন্য গণিমতকে পবিত্র করে দেয়া হয়েছে।

হজরত জাবের থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার জন্য মালে গণিমত হালাল। ইতোপূর্বে কারো জন্য মালে গণিমত হালাল ছিলো না। আল্লাহ্তায়ালা সমধিক জ্ঞাত।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবও বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। যে দশজনের উপর মুশরিক সেনাদের আহার করানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, তিনি ছিলেন তাদের একজন। সৈন্যদেরকে আহার করানোর জন্য তিনি বিশ আউকিয়া স্বর্ণ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তার পালা আসার আগেই যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো। তাই ওই স্বর্ণ খরচ করার সময় তিনি পাননি। মদীনায় আসার পর তিনি বললেন, মোহাম্মদ! এই বিশ আউকিয়া স্বর্ণ আমার মুক্তিপণরূপে গ্রহণ করো। রসুল স. বললেন, হে আমার পিতৃব্য! ওগুলো তো আপনি ইসলাম বিরোধী কাজে ব্যয় করার জন্য এনেছিলেন। তাই ওগুলো আমি গ্রহণ করতে পারি না। দুই ভ্রাতুষ্পুত্র আকিল বিন আবু তালেব এবং নওফেল বিন হারেসের মুক্তিপণ পরিশোধের দায়িত্বও বর্তেছিলো হজরত আব্বাসের উপর। তাই তিনি বললেন, মোহাম্মদ! তুমি তো আমাকে নিঃস্ব করে দিলে। যতদিন বেঁচে থাকবো, ততোদিন আমাকে কুরায়েশদের কাছে হাত পাত্তে হবে। রসুল স. বললেন, ওই স্বর্ণগুলোর তাহলে কি হবে, যেগুলো আপনি মক্কা ছেড়ে আসার সময় উম্মুল ফজলের নিকট রেখে এসেছেন এবং তাঁকে বলে এসেছেন, জানি না আমার কী পরিণতি হবে। সে রকম কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে প্রিয় পুত্র চতুষ্টয় আবদুল্লাহ্, উবায়দুল্লাহ্, ফজল এবং কাসেমকে এগুলো দিও। হজরত আব্বাস বললেন, তোমাকে এ সংবাদ কে জানিয়েছে? তিনি স. বললেন, আমার প্রভুপ্রতিপালক। এ কথা শুনেই হজরত আব্বাস বলে উঠলেন, আশহাদুআল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নাকা আবদুহু ও রসুলুহু।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, বায়হাকী, আবু নাঈম, ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্, তিবরানী, আবু শায়েখ এবং হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে ইবনে ইসহাক ও আবু নাঈম উল্লেখ করেছেন বদর যুদ্ধে বন্দী করা হয় সত্তর জনকে। হজরত আব্বাস এবং হজরত আকিলও ছিলেন ওই সত্তর জনের মধ্যে। তাদের মুক্তিপণ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিলো চল্লিশ আউকিয়া স্বর্ণ। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, ইসমাইল বিন আবদুর রহমান বলেছেন, হজরত আব্বাস, আকিল এবং নওফেল ও তার ভ্রাতার জন্য ফিদিয়া নির্ধারণ করা হয়েছিলো। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে হজরত আব্বাসের মুক্তিপণই ছিলো সর্বাধিক। পরিমাণ ছিলো, চারশত দিনার। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ফিদিয়া ধার্য করা হয়েছিলো হজরত আব্বাসের। তার পরিমাণ ছিলো একশত আউকিয়া স্বর্ণ। হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. স্বয়ং হজরত আব্বাসের ফিদিয়া নির্ধারণ করলেন চারশত দিনার। হজরত আব্বাস বললেন, আমার কাছে তো কিছুই নেই। রসুল স. বললেন, ওই সম্পদগুলোর কী হবে, যা আপনি উম্মুল ফজলের নিকট গচ্ছিত রেখে আসার সময় বলেছিলেন, যদি খারাপ কোনো কিছু ঘটে, তবে এগুলো রইলো ফজল, আবদুল্লাহ্, ওবায়দুল্লাহ্ ও কাসেমের জন্য। হজরত আব্বাস বললেন, আল্লাহ্র কসম, এ ঘটনা তো আমি ও উম্মে ফজল ছাড়া আর কেউ জানে না। তাই আমি এ কথা বিশ্বাস করলাম যে, নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্র রসুল।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আব্বাসের ফিদিয়া নির্ধারিত হয়েছিলো চারশত আওকিয়া। কেউ কেউ বলেছেন, চল্লিশ আউকিয়া। আকিলের জন্য মুক্তিপণ ধার্য করা হয়েছিলো আশি আউকিয়া। তখন হজরত আব্বাস বলেছিলেন, তুমি আমাকে চিরদিনের জন্য কুরায়েশদের মুখাপেক্ষী করে দিলে। তার ওই কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত—

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৭০

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيۡدِيكُم مِّنَ ٱلۡأَسۡرَىٰٓ إِن يَعۡلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمۡ خَيۡرٗا يُؤۡتِكُمۡ خَيۡرٗا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

□ হে নবী! তোমাদিগের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদিগকে বল, 'আল্লাহ্ যদি তোমাদিগের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন; তবে তোমাদিগের নিকট হইতে যাহা লওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা উত্তম কিছু তিনি তোমাদিগকে দান করিবেন ও তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

---

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী তাঁর সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আব্বাস সহ বদর যুদ্ধের কয়েকজন বন্দী বললেন, আমরা তো ভিতরে ভিতরে মুসলমানই ছিলাম। মুশরিকদের জবরদস্তির কারণে আমরা বদরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদেরকে ফিদিয়া দিতে হবে কেনো? তাদের ওই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

এখানে উল্লেখিত 'ফি কুলুবিহিম খইরন' (যদি তোমাদের হৃদয়ে ভালো কিছু দেখেন) কথাটির অর্থ— যদি আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের অন্তরে ইমান ও এখলাস দর্শন করেন। ইউ'তিকুম খইরন (তদপেক্ষা উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করবেন) অর্থ— তোমাদের নিকট থেকে যে ফিদিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। মিম্মা উখিজা মিনকুম ওয়া ইয়াগ ফিরলাকুম (তোমাদের নিকট থেকে যা নেয়া হয়েছে, আর তোমাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে)। আল্লাহ্ ওই ফিদিয়া অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী তোমাদেরকে দান করবেন পৃথিবীতে এবং আখেরাতেও দান করবেন অনেক সওয়াব। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে আমার প্রিয় নবী! আপনার অধীন যুদ্ধবন্দীদেরকে বলুন, আল্লাহ্‌তায়ালা যদি তোমাদের অন্তরে ইমান ও এখলাসের উপস্থিতি দেখেন, তবে তোমাদের নিকট থেকে যে মুক্তিপণ নেয়া হয়েছে তার বিনিময়ে তিনি তো তোমাদেরকে পৃথিবীতেও যেমন বহুগুণ বেশী সম্পদ দান করবেন, তেমনি আখেরাতেও দান করবেন অনেক সওয়াব। আর তোমরা হবে ক্ষমার্হ। কারণ, আল্লাহ্‌তায়ালা ক্ষমাপরবশ এবং পরম দয়ালু।

তিবরানী তাঁর আল আওসাত পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমার পিতা হজরত আব্বাস জানিয়েছেন, আমি যখন রসুল স. কে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানালাম এবং মুক্তিপণরূপে স্বর্ণ প্রদান করলাম, তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। আল্লাহ্‌পাক ওই স্বর্ণের পরিবর্তে আমাকে বিশজন গোলাম দান করলেন। তারা প্রত্যেকে আমার উপার্জনের মাধ্যম। এর সঙ্গে আমি আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমাপ্রাপ্তির আশাও করি।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে এ রকম— (হজরত আব্বাস জানিয়েছেন), আল্লাহ্‌-পাক এই মুক্তপণের পরিবর্তে আমাকে দান করেছেন কুড়িজন ক্রীতদাস। তারা সকলে আমার ব্যবসার মাধ্যম এবং অধিকাংশই উপার্জনশীল। প্রত্যেকের ন্যূনতম উপার্জন বিশ হাজার দিরহাম। এ ছাড়া আল্লাহ্‌পাক আমাকে দিয়েছেন জমজম কূপের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব। ওই দায়িত্বের পরিবর্তে মক্কার সকল সম্পদের অধিকারী হওয়াও আমার মনঃপুত নয়। তদুপরি, আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমালাভের দৃঢ় আশাও পোষণ করি।

সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে হজরত আব্বাস বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার নিকট থেকে যে মুক্তিপণ আপনি গ্রহণ করেছেন, তার সঙ্গে আমার পাপরাশিও অন্তর্হিত হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্পাক ওই সম্পদ অপেক্ষা অধিকতর উত্তম সম্পদ দান করেছেন আমাকে। আমি হয়েছি চল্লিশজন গোলামের মালিক। তারা প্রত্যেকে উপার্জন করে আমার বিত্তবৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে। আবার আমাকে দেয়া হয়েছে মার্জনার শুভ সংবাদ।

বোখারী এবং ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর খেদমতে বাহরাইন থেকে কিছু সম্পদ এলো। তিনি স. নির্দেশ দিলেন, ওগুলোকে মসজিদের এক কোণে রেখে দাও। একটু পরে সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত আব্বাস। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে ওই সম্পদ থেকে কিছু প্রদান করুন। আমি তো আমার ও আকিলের ফিদিয়া পরিশোধ করেছি। রসুল স. বললেন, নিয়ে যান। হজরত আব্বাস দুই হাতে ওই সম্পদগুলো তাঁর পরিধেয় বস্ত্রে বেঁধে নিলেন। কিন্তু তা উত্তোলন করতে ব্যর্থ হলেন। বললেন, কাউকে হুকুম করুন, যেনো সে আমার বোঝাটি উঠিয়ে দেয়। রসুল স. বললেন, না। হজরত আব্বাস বললেন, তাহলে আপনি উঠিয়ে দিন। তিনি স. বললেন, না। হজরত আব্বাস নিরুপায় হয়ে কিছু অংশ রেখে দিলেন, এভাবে ভার কিছুটা হাল্কা করে বোঝাটি স্কন্ধে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। এ কথাও বলতে বলতে গেলেন যে, আল্লাহ্পাক তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। রসুল স. এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন হজরত আব্বাসের গমন পথের দিকে। আর অবশিষ্ট দিরহামগুলো দান করার আগে তিনি স. সে স্থান পরিত্যাগ করলেন না।

সুরা আনফালঃ আয়াত ৭১

وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

❒ তাহারা তোমার সহিত বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে চাহিলে করিতে পারে, তাহারা তো পূর্বে আল্লাহের সহিতও বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে; অতঃপর তিনি তোমাদিগকে তাহাদিগের উপর শক্তিশালী করিয়াছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! যারা মুক্তিপণ প্রদান করে অথবা বিনা মুক্তিপণে মুক্তিলাভের পর আপনার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে, তারা অবশ্যই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের দায়ে দায়ী হবে। তারা তো আল্লাহ্র সঙ্গেও এ রকম করে। সুতরাং আপনি চিন্তিত হবেন না। আল্লাহ্ তাদের উপর আপনাকে প্রবল করে দিবেন। আল্লাহ্তায়ালা সর্বজ্ঞ। তাই তিনি ওই সকল বিশ্বাস হন্তারকদের মনোবৃত্তি, অভিপ্রায় ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। আর তিনি প্রজ্ঞাময়ও। সকল কিছুই তাঁর ওই অতুলনীয় প্রজ্ঞাময়তার অধীন।

www.eelm.weebly.com

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আবু গুররা জামুহী নামক এক বদরের যুদ্ধবন্দীকে মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তার নিকট থেকে এই মর্মে এক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তুমি আর কখনো আমাদের শত্রুদের সহযোগী হতে পারবে না। কিন্তু সে এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিলো। উহুদ যুদ্ধে হাজির হয়েছিলো মুশরিকদের সহযোদ্ধা হয়ে। পুনরায় তাকে বন্দী করা হয়। পরে রসুল স. এর নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৭২

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

❒ যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে, দ্বীনের জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহের পথে সংগ্রাম করিয়াছে এবং যাহারা আশ্রয় দান করিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, আর যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে কিন্তু দ্বীনের জন্য গৃহ ত্যাগ করে নাই, গৃহত্যাগ না করা পর্যন্ত তাহাদিগের অবিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমার নাই; আর দ্বীন সম্বন্ধে যদি তাহারা তোমাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাহাদিগকে সাহায্য করা তোমাদিগের কর্তব্য, যে সম্প্রদায় ও তোমাদিগের মধ্যে চুক্তি রহিয়াছে তাহাদিগের বিরুদ্ধে নহে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

'যাহারা বিশ্বাস করেছে, দ্বীনের জন্য গৃহত্যাগ করেছে' অর্থ— যারা ইমান এনেছে এবং আল্লাহ্ ও রসুলের মহব্বতে মক্কার বসবাস ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেছে। 'জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করেছে' অর্থ— জেহাদ করেছে, জেহাদের অস্ত্র, অশ্ব ক্রয়ের জন্য এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করেছে। 'যারা আশ্রয় দান করেছে' অর্থ— যে সকল আনসার তাঁদের বসতবাটিতে মুহাজিরগণকে আশ্রয় দান করেছে। 'সাহায্য করেছে' অর্থ— যে সকল মদীনাবাসী আনসার, মুশরিক শত্রুর বিরুদ্ধে মুহাজিরগণকে সহযোগিতা

www.eelm.weebly.com

দান করেছেন। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— যারা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে, জান-মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, মুহাজিরগণকে আশ্রয় ও সাহায্য দিয়েছে— তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারেরা একে অপরের সুহৃদ। কিন্তু তাদের কাফের আত্মীয় স্বজনেরা বংশগত নৈকট্য সত্ত্বেও তাদের বন্ধু নয়। অবিশ্বাসীরা কখনো বিশ্বাসীদের প্রকৃত বন্ধু ও সুহৃদ হতে পারে না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মীরাস (উত্তরাধিকার) সম্পর্কে। মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। ওই উত্তরাধিকার ইসলামের কারণে ছিলো না। ছিলো হিজরতের কারণে। তাই মক্কা বিজয়ের পর যখন হিজরত রহিত হয়ে যায়, তখন ওই উত্তরাধিকারও রহিত হয়ে যায়। রহিতকারী আয়াতটি হচ্ছে— ওয়া উলুল আরহাম বা'দ্বহুম আওলা বি বা'দ্বিন ফি কিতাবিল্লাহি (আল্লাহ্র বিধানে তারা রক্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পর অপেক্ষা উত্তম) ।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতকে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত বলা হলেও আয়াতটি রহিত (মনসুখ) হয়েছে, এ রকম বলার কোনো কারণ নেই। কারণ, পরস্পর বিরোধী বিধানের ক্ষেত্রেই কেবল রহিত হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু এখানে সেরকম কোনো পরস্পরবিরোধিতা নেই। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্য হচ্ছে— মুহাজির ও আনসার একে অপরের উত্তরাধিকার পেতেন। কিন্তু মুসলমানেরা তখন তাদের কাফের আত্মীয়স্বজনের উত্তরাধিকার পেতেন না। কারণ তাদের মধ্যে ছিলো ধর্মীয় বিভেদ। এছাড়া যে সকল মুসলমান হিজরত করেননি তাদের সঙ্গেও হিজরতকারীদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক তখন ছিলো না। কারণ, তাঁরা ছিলেন কাফের অধ্যুষিত এলাকায় (মক্কায়)। আর মুহাজিরেরা ছিলেন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে (মদীনায়)। মক্কা বিজয়ের পর এই ব্যবধানটি উঠে গেলো। মক্কাবাসীরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। মক্কা হয়ে গেলো মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত। দূর হয়ে গেলো ধর্মের ও রাজ্যের ব্যবধান। ফলে আত্মীয়তার উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো পূর্ণরূপে। উল্লেখ্য যে, মুহাজির ও আনসারগণের পারস্পরিক উত্তরাধিকারের বিষয়টি শরিয়তের বিধানগত কোনো উত্তরাধিকার ছিলো না। ওই উত্তরাধিকার নির্ণীত হয়েছিলো সুগভীর প্রেম-প্রীতির ভিত্তিতে— যা রহিত হওয়া না হওয়ার পর্যায়ভূত নয়। তবে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সৌহার্দ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। আর সৌহার্দ সূত্রের উত্তরাধিকার অবশ্যই শরিয়ত সমর্থিত। ইমামে আজম বলেছেন, সৌহার্দ সূত্রভূত উত্তরাধিকার অবশ্য মাননীয়।

www.eelm.weebly.com

এখানে আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, আলোচ্য আয়াতে উত্তরাধিকারের বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। বলা হয়েছে আনসার ও সাহাবীগণের গভীর বন্ধুত্বের কথা। সুতরাং তাঁদের সৌহার্দ সূত্রের উত্তরাধিকার যে রহিত হবার মতো কিছু নয়— তা বলাই বাহুল্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর যারা বিশ্বাস করেছে কিন্তু দ্বীনের জন্য গৃহত্যাগ করেনি, গৃহত্যাগ না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকদের দায়িত্ব তোমার নেই।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! যারা ইমানদার হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম রক্ষার জন্য হিজরত করেনি, তাদের ব্যাপারে আপনার কোনো দায়িত্ব নেই। তারা বিশ্বাসী হলেও আপনাদের প্রকৃত সুহৃদ নয়। (অতএব তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন থেকে বিরত থাকুন)। এ কথার মাধ্যমে এই নির্দেশনাটি দেয়া হয়েছে যে— তওবা না করা পর্যন্ত পাপী (ফাসেক) বিশ্বাসীদের সঙ্গে পুণ্যবান বিশ্বাসীদের বন্ধুত্ব সমীচীন নয়। আর নির্দেশনাটিকে উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় বলা হলে অর্থ দাঁড়াবে— কাফের সাম্রাজ্যের অধিবাসী হওয়ার কারণে তাদের সঙ্গে মুসলিম রাজ্যের অধিবাসীদের উত্তরাধিকার অচল।

এরপর বলা হয়েছে — 'আর দ্বীন সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। এ কথার অর্থ— যারা মুহাজির নয় তারা যদি ধর্মরক্ষার জন্য সাহায্য কামনা করে তবে তাঁদেরকে সাহায্য করা মুহাজির ও আনসারগণের উপরে ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য)।

এরপর বলা হয়েছে — 'যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়।' এ কথার অর্থ ওই সকল বিধর্মীদের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মুসলমান-দেরকে সাহায্য করা যাবে না, যাদের সঙ্গে রয়েছে চুক্তি। কেননা চুক্তি ভঙ্গ করা নাজায়েয। এ কারণেই হুদায়বিয়ার চুক্তির পরক্ষণে হজরত আবু জান্দাল মক্কার অন্তরীণ অবস্থা থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করলেও রসুল স. তাঁকে আশ্রয় দান করেননি। আশ্রয় দিলে ভঙ্গ হয়ে যেতো চুক্তির একটি বিশেষ ধারা। সুরা ফাতাহ'র তাফসীরে এই ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে— ওয়াল্লহু বিমা তা'মালুনা বাসীর (তোমরা যা করো আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা)। এ কথার অর্থ— সবকিছু রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার উদাহরণ রহিত দৃষ্টিসীমানার মধ্যে। কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টিবহির্ভূত নয়। সুতরাং বিশুদ্ধ চিত্ত হও। হও বিশুদ্ধাচারী।

www.eelm.weebly.com

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ۞ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۞

❑ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, যদি তোমরা উহা না কর তবে দেশে ফিত্‌না ও মহা বিপর্যয় দেখা দিবে।

❑ যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে, দ্বীনের জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছে ও আল্লাহের পথে সংগ্রাম করিয়াছে এবং যাহারা আশ্রয় দান করিয়াছে তাহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী; তাহাদিগের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রহিয়াছে।

প্রথমোক্ত আয়াতটির মর্মার্থ হচ্ছে— অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদেরই বন্ধু। বিশ্বাসীদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হতে পারে না। তাই তাদেরকে সাহায্য করা বিশ্বাসীদের জন্য বৈধ নয়। বিশ্বাসীরা সাহায্য করবে কেবল বিশ্বাসীদেরকে। এ রকম না করলে দেখা দিবে বিপর্যয়।

হজরত উসামা ইবনে জায়েদ থেকে বোখারী, মুসলিম ও সুনান রচয়িতাগণ তাঁদের আপনাপন পুস্তকে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন মুসলমানেরা কাফেরদের উত্তরাধিকারী নয়। কাফেরেরাও নয় মুসলমানদের উত্তরাধিকারী। সুরা নিসার উত্তরাধিকার বিষয়ক আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গটির বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

মাসআলাঃ মাবসুত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, যদি কাফের সাম্রাজ্যে কিছু সংখ্যক কাফের অপর কোনো কাফের জনপদের উপর আক্রমন করে বসে, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে, ওই জনপদে বাস করে কিছু সংখ্যক আশ্রিত মুসলমান, তবে হামলাকারীদের প্রতিহত করা মুলমানদের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু যদি মুসলমানদের জান-মালের ক্ষতির আশংকা দেখা যায় তবে তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে। কারণ শত্রুর মোকাবিলা করার অর্থ— জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করা। আর আল্লাহ্‌তায়ালার বাণীকে সমুন্নত করা, ধর্মের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা ও আত্মরক্ষা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জীবনের ঝুঁকি নেয়া বৈধ নয়। তাই কাফেরদের জান মাল রক্ষার জন্য জীবনের ঝুঁকি নেয়া মুসলমানদের জন্য অবৈধ।

মাসআলাঃ যদি বিধর্মীদের সাম্রাজ্যের কোনো বসতির মুসলমান ও কাফের অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে; এমতাবস্থায় ওই বসতির কাফেররা যদি অন্য কোনো দেশ থেকে মুসলমানদেরকে বন্দী করে এনে মুসলিম বসতির পাশ দিয়ে

www.eelm.weebly.com

যেতে থাকে তবে ওই বসতির মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য হবে তাদের কাছ থেকে বন্দীদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে মুক্ত করে দেয়া। বন্দীরা যদি খারেজী হয়— তবুও। আর ওই হামলাকারীরা যদি অন্য দেশের মুসলমানদের কেবল সম্পদ লুণ্ঠন করে আনে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সমীচীন নয়। কারণ যেহেতু ইমাম আবু হানিফার মতে মুসলমানদের নিকট থেকে লুণ্ঠিত সম্পদের মালিক হয়ে যায় কাফেরেরা। অর্থাৎ যুদ্ধ করতে হবে কেবল বন্দী মুসলমানদেরকে অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য। তাদের সম্পদ উদ্ধারের জন্য নয়। ইমাম আবু হানিফা এ রকম বলেছেন।

পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করেছে, দ্বীনের জন্য গৃহত্যাগ করেছে ও আল্লাহ্র পথে জেহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দান করেছে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী, তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।' এই আয়াতে প্রকৃত ইমানদার বলে সম্মানিত করা হয়েছে হিজরতকারী, আল্লাহ্র পথে জীবন ও সম্পদ উৎসর্গকারী এবং হিজরতকারীদের আশ্রয়দাতাদেরকে। তাদের-কে দেয়া হয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবনোপকরণের সুসংবাদ। রসুল স. এরশাদ করেছেন, ইসলাম পূর্বের পাপরাশিকে ঢেকে দেয়। আর হিজরত মুছে দেয় হিজরতপূর্ব সময়ের গোনাহ সমূহকে। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আমর ইবনে আস থেকে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির পূর্বে যারা হিজরত করেছিলেন তাদেরকে বলা হয় প্রথম হিজরতকারী। আর ওই সন্ধি পরবর্তী হিজরতকারীদেরকে বলা হয় দ্বিতীয় হিজরতকারী। কেউ আবার দু'বার হিজরত করেছিলেন। প্রথমবার হিজরত করেছিলেন আবিসিনিয়ায়। পরে মদীনায়। হজরত ওসমান ও হজরত জাফর ছিলেন দুইবার হিজরতকারীদের অন্তর্ভূত। আলোচ্য আয়াতে আলোচিত হয়েছে প্রথম হিজরতকারীদের প্রসঙ্গে। পরের হিজরতকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে নিম্নের আয়াতে এভাবে—

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ৭৫

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

❒ যাহারা পরে বিশ্বাস করিয়াছে, দ্বীনের জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছে ও তোমাদিগের সঙ্গে থাকিয়া সংগ্রাম করিয়াছে তাহারাও তোমাদিগের অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মীয়গণ আল্লাহের বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।

---

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— প্রথম হিজরতকারীরাও পরে হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তারাও ধর্মরক্ষার জন্য স্বভূমি পরিত্যাগকারী এবং আল্লাহ্‌র পথে জেহাদকারী। আর ওই হিজরতকারীদের মধ্যে যারা আত্মীয়স্বজন, তাদের অধিকার অধিকতর শক্তিশালী। অতএব, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে তোমাদের ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ়তর করো। আল্লাহ্‌তায়ালা সকল বিষয় উত্তমরূপে অবগত। ধর্মীয় সূত্রে, বংশীয় সূত্রে এবং সৌহার্দ সূত্রে উত্তরাধিকারের প্রবর্তনা তাঁর অপার জ্ঞানেরই নিদর্শন।

এখানে 'আত্মীয়গণ আল্লাহ্‌র বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার' কথাটির অর্থ — আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী মুসলমান অপেক্ষা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী স্বজনেরা উত্তরাধিকার প্রাপ্তির অধিক হকদার। সুরা নিসার তাফসীরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উত্তরাধিকারের প্রথম হকদার হচ্ছে জাবিল ফুরুজ। তার পরের হকদার হচ্ছে আছাবা। সুতরাং যারা একেবারে অপরিচিত ও যারা দূরবর্তী আত্মীয়তারও অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা উত্তরাধিকার পাবে না। রসুল স. এরশাদ করেছেন, যারা জাবিল ফুরুজ কিংবা আছাবা নয়, তাদের উত্তরাধিকারী হয় তাদের মাতুলেরা।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যাদের জাবিল ফুরজ অথবা আছাবা কেউ নেই, তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ জমা করে দিতে হবে বায়তুল মালে (কোরআন মজীদে যাদের উত্তরাধিকারের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে তাদেরকে বলে জাবিল ফুরুজ। আর জাবিল ফুরুজের অংশ দেয়ার পর যারা মীরাসের অংশ পায়, তাদেরকে বলা হয় আছাবা)। উত্তরাধিকার বণ্টনের নিয়ম হচ্ছে— প্রথমে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করে দিতে হবে জাবিল ফুরুজের মধ্যে। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা বণ্টন করে দিতে হবে আছাবাগণের মধ্যে। জাবিল ফুরুজদেরকে দেয়ার পর কোনো কিছু অবশিষ্ট না থাকলে আছাবারা কিছুই পাবে না। আর জাবিল ফুরুজ না থাকলে সকল সম্পদ পাবে আছাবারা। মুসলমানের কাফের আত্মীয়রাও উত্তরাধিকার পাবে না। এমতোক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ জমা করতে হবে বায়তুল মালে। বরং অপরিচিত ও অনাত্মীয় মুসলমানদেরকেও এ রকম উত্তরাধিকারহীন সম্পদ দেয়া যেতে পারে। সুতরাং এ রকম বলা যায় যে, ইমাম শাফেয়ীর মাসআলাটি যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।

সুরা তওবা

হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক আল্লাহ্! আমরা তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করি। তুমিই একমাত্র উপাস্য। তুমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমরা আমাদের সকল বিচ্যুতি ও দুঃখ কষ্ট থেকে তোমার নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করি এবং যাচঞা করি ক্ষমা। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি সকল কিছুর উপরে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কেবল তোমার। তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে রাজ্যাধিকারী করো। আর যাকে ইচ্ছা করো রাজ্যহারা। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করো। যাকে ইচ্ছা করো

www.eelm.weebly.com

অসম্মানিত। তোমারই অধিকারে রয়েছে সকল কল্যাণ। সকল কিছু সম্পাদন করো তুমিই। তুমি আমাদের এবং আকাশ-পৃথিবী সহ সকল সৃষ্টির মালিক। আমরা তোমারই নিরাপত্তা ও করুণাপ্রার্থী। আমরা দরূদ ও সালাম প্রেরণ করি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি যিনি তোমার বার্তাবাহক ও প্রেমাস্পদ এবং যিনি আমাদের পথপ্রদর্শক ও প্রভু। অন্যান্য নবী রসুল এবং তোমার সকল পুণ্যবান দাসদের প্রতিও আমরা প্রেরণ করি দরূদ ও সালাম।

উপক্রমণিকাঃ মদীনায় অবতীর্ণ এই সুরায় রয়েছে ১২৯ অথবা ১৩০ আয়াত। আবু আতিয়াহ্ হামাদানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব এই মর্মে লিখিত নির্দেশ জারী করেছিলেন যে, হে মানুষ! তোমরা সুরা বারাআত (তওবা) নিজে শিক্ষা করো এবং পরিবার পরিজনকে শিক্ষা দাও। আরো পাঠ করো সুরা নূর। কারণ সুরা বারাআতে রয়েছে পুরুষের জন্য জেহাদের অনুপ্রেরণা। আর সুরা নূরে রয়েছে রমণীদের জন্য পর্দার নির্দেশ।

হজরত ওসমান বলেছেন, রসুল স. এর সময়ে এই সুরাকে আমরা সুরা আন্‌ফালের সঙ্গে পরস্পরযুক্ত মনে করতাম। আমিও তখন সুরা দু'টো পরস্পর যুক্তরূপে লিপিবদ্ধ করেছিলাম।

এই সুরার আরো অনেক নাম রয়েছে। যেমন—

১. বারাআত। কাফেরদের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার অসন্তোষ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বিবৃত হয়েছে এই সুরায়। তাই এর নাম সুরা বারাআত।
২. সুরা তওবা। মুমিনদের তওবা কবুলের শুভসংবাদ দেয়া হয়েছে এই সুরায়। তাই এর নামকরণ করা হয়েছে সুরা তওবা।
৩. মুকাশকাশা। অপবিত্রতা বা নেফাকের প্রতি প্রচণ্ড রোষ ঘোষিত হয়েছে এই সুরায়। তাই এর নাম সুরা মুকাশকাশা। হজরত জায়েদ ইবনে আসলাম থেকে আবু শায়েখ এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, এই সুরায় প্রকাশ করা হয়েছে নেফাকের প্রতি প্রবল অসন্তোষ।
৪. মোবায়ছিরা। ইবনে মুনজিরের মাধ্যমে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাসূত্রে এ নামটির কথা এসেছে। মানুষের অভ্যন্তরীণ রহস্য সমূহের যবনিকা উন্মোচন করা হয়েছে এ সুরায়। তাই এর নাম মোবায়ছিরা।
৫. আল বহুছ। হজরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ থেকে আবু রুশদ্ হেরানী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম তিবরানী এবং হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এ নামটি।
৬. আল্ মুছিরাহ্। এ নামটি কাতাদা সূত্রে উল্লেখ করেছেন ইবনে মুনজির, আবু শায়েখ এবং ইবনে আবী হাতেম। এই সুরার এরূপ

www.eelm.weebly.com

নামকরণের কারণ এই যে, এখানে এসেছে অপবিত্রতা উচ্ছেদের নির্দেশনা। মুনাফিকদের অভ্যন্তরীণ নেফাককে (অপবিত্রতাকে) প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এ সুরায়।

৭. মুনকিলাহ্। এর অর্থ — শাস্তিদাতা, ধ্বংস আনয়নকারী।

৮. আযাব। এ নামকরণের কথা জানিয়েছেন হজরত হুজায়ফা। বলেছেন, তোমরা যাকে সুরা তওবা বলো, সেই সুরাটির নাম সুরা আযাব। আল্লাহ্র কসম! এ সুরায় কাউকেই চিহ্নিতকরণ ব্যতীত ছেড়ে দেয়া হয়নি। ইবনে আবী শায়বা, তিবরানী, আবু শায়েখ, হাকেম এবং ইবনে মারদুবিয়া। হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে ওমর থেকেও এ রকম নামকরণের কথা এসেছে। খাজা আবু আওয়ানাতাহ্, ইবনে মুনজির, আবু শায়েখ, ইবনে মারদুবিয়া।

৯. আল ফাজেহাহ্। এ সুরার মাধ্যমে মুনাফিকদেরকে অপদস্ত করা হয়েছে বলে এর নাম হয়েছে আল ফাজেহাহ্। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আমি নিজে এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এ সুরার আয়াতগুলো ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ হতে থাকে এবং প্রকাশ করতে থাকে মুনাফিকদের অবস্থা। আমরা তখন মনে করতাম, মনে হয় কোনো কিছুই আর অনুল্লেখ্য থাকবে না। আমি বললাম, সুরা আন্ফাল। তিনি বললেন, সুরা বদর। আমি বললাম, সুরা হাশর। তিনি বললেন, এ সুরাকে সুরা নফির বলো (কারণ, এর মধ্যে রয়েছে কবর থেকে পুনরুত্থান ও হাশরের ময়দানে একত্র হওয়ার বিবরণ)।

প্রারম্ভে বিস্মিল্লাহ্ উল্লেখ করা হলো না কেনোঃ

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি একবার হজরত ওসমানকে বললাম, সুরা আন্ফাল শেষ করে সুরা তওবা লিপিবদ্ধ করার পূর্বে আপনি বিস্মিল্লাহির রহ্মানির রহীম লিখেননি কেনো? হজরত ওসমান বললেন, রসুল স. এর প্রতি একই সঙ্গে কয়েকটি সুরা কিছু কিছু করে অবতীর্ণ হতো। তিনি তখন তাঁর কোরআন লিপিবদ্ধকারীকে বলতেন. সদ্য অবতীর্ণ এ আয়াতগুলো অমুক সুরায় সন্নিবেশিত করো। মদীনায় আগমনের পর প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুরা আন্ফাল। আর সুরা বারাআত অবতীর্ণ হয়েছিলো শেষদিকে। পরে উভয় সুরা একত্রে মেলানো হয়েছিলো। কিন্তু তিনি স. এ কথা স্পষ্ট করে বলেননি যে, সুরা বারআত, সুরা আন্ফালের অংশ। তাই এ দু'টো সুরাকে আমি একত্র করেছি এবং সুরা বারাআত এর পূর্বে বিস্মিল্লাহির রহ্মানির রহীমও উল্লেখ করিনি। বাগবী

www.eelm.weebly.com

সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন— আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান, হাকেম এবং তিরমিজি। হাকেম বলেছেন হাদিসটি বিশুদ্ধ। আর তিরমিজি বলেছেন উত্তম।

সুরা বারাআতের প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ্ উল্লেখ না করার একটি কারণ এই যে, এখানে নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি পরিত্যক্ত হয়েছে। আর বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম হচ্ছে নিরাপত্তার নিদর্শন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি একবার হজরত আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, সুরা বারাআতের প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ্ নেই কেনো? তিনি বললেন বিস্‌মিল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। আর সুরা বারাআত হচ্ছে— খাপ খোলা তলোয়ারের মতো। আবু শায়েখ, ইবনে মারদুবিয়া।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে—এ ব্যাপারে সাহাবীগণের মতপৃথকতা ছিলো। কেউ কেউ মনে করতেন উভয় সুরা অবতীর্ণ হয়েছে সম্মিলিতরূপে। আবার কেউ কেউ মনে করতেন পৃথকরূপে অবতীর্ণ হয়েছে সুরা দু'টো। দু'টোর মধ্যে তাই পার্থক্যটিও সুস্পষ্ট। ব্যতিক্রম শুধু এই যে, অন্য সুরার মতো এই সুরার প্রথমে বিসমিল্লাহ্‌র উল্লেখ নেই।

বাগবী লিখেছেন তাফসীরকারগণ বলেছেন, রসুল স. তাবুক যুদ্ধে গমন করলে মুনাফিকেরা বাড়াবাড়ি শুরু করে দেয়। সৃষ্টি করে বিভিন্ন গুজব। তাদের প্রচারণার আঘাতে মুসলমানেরা হয়ে পড়ে পেরেশান। রসুল স. এর সঙ্গে কৃত সন্ধি-চুক্তিও তারা ভঙ্গ করে ফেলে।

আমি বলি, মুনাফিকেরা বিশ্বাস করতো মুসলমানেরা কিছুতেই রোমের প্রশাসক কায়সারের মোকাবেলা করতে পারবে না। ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। এ রকম অপবিশ্বাসের কারণেই তারা শুরু করে দেয় বাড়াবাড়ি। আল্লাহ্‌পাকও তাই তাঁর প্রিয় রসুলকে তাদের সঙ্গে কৃত সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করার নির্দেশ দেন। ঘোষণা করেন—

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১, ২

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ۝

❒ ইহা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে সেই সমস্ত অংশীবাদীদিগের সহিত যাহাদিগের সহিত তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলে।

www.eelm.weebly.com

❐ অতঃপর তোমরা দেশে চারিমাস কাল পরিভ্রমণ কর ও জানিয়া রাখ যে তোমরা আল্লাহ্কে হীনবল করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন।

'বারাআত' অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ। শব্দটি 'নাশাআত' এবং 'দানাআত' এর মতো একটি মূল শব্দ। প্রথমোক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য এখানে উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য উদ্দেশ্যসহ 'বারাআত' এর অর্থ করা হয়েছে— এটা সম্পর্কচ্ছেদ। এরপর বলা হয়েছে— আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে সে সকল অংশীবাদীদিগের সঙ্গে— যাদের সাথে তোমরা ছিলে চুক্তিবদ্ধ। জুজায বলেছেন, বক্তব্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— ওই সকল মুনাফিক যেহেতু নিজেরাই চুক্তিভঙ্গ করেছে, তাই এখন থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলও ওই চুক্তির দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত।

'আহাদতুম' অর্থ — তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছো। এখানে 'সম্পর্কচ্ছেদ' কথাটি সম্পৃক্ত হয়েছে আল্লাহ্ ও রসুলের সঙ্গে। আর 'চুক্তিবদ্ধ' হওয়ার সম্পর্ক করা হয়েছে রসুল স. এবং সাহাবীগণের সঙ্গে। এর মধ্যে এই নির্দেশনাটি রয়েছে যে, বিধর্মীরা যদি মুসলমানদের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে, তবে রসুল স. এর পক্ষ থেকে এর পরিসমাপ্তি ঘটানো হবে ওয়াজিব।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে — 'অতঃপর তোমরা দেশে চারমাস কাল পরিভ্রমণ করো ও জেনে রাখো যে, তোমরা আল্লাহ্কে হীনবল করতে পারবে না।' এ কথার অর্থ— হে বিধর্মীর দল! তোমরা পূর্ণ নির্ভয়ে চারমাস দেশের মধ্যে যেখানে ইচ্ছে সেখানে পরিভ্রমণ করো। এই চারমাস তোমরা মুসলমানদের আক্রমণ থেকে মুক্ত। কিন্তু তোমরা এ কথা মনে কোরো না যে, তোমরা আল্লাহ্তায়ালার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত। অন্যদের মতো তোমরাও কখনো আল্লাহ্তায়ালাকে হীনবল করতে সক্ষম নও।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন।' এ কথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর দল! আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেনই। তাই পৃথিবীতে অবশ্যই তোমাদের উপর নেমে আসবে হত্যা ও বন্দীত্বের অভিশাপ। আর আখেরাতে তোমাদের জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি তো রয়েছেই।

জুহুরী বলেছেন, এখানে 'চারমাস' কথাটির অর্থ— শাওয়াল, জিলক্বদ, জিলহজ এবং মহররম। কেননা এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো শাওয়াল মাসে। অধিকাংশ তাফসীরকারগণের মতে এখানে চারমাস বলে বুঝানো হয়েছে জিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে রবিউস সানি মাসের ১০ তারিখের সময়কে। পরবর্তী আয়াতে বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—

www.eelm.weebly.com

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ
مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝
اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ
اَحَدًا فَاَتِمُّوْۤا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

❐ মহান হজের দিবসে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে মানুষের প্রতি ইহা এক ঘোষণা যে আল্লাহের সহিত অংশীবাদীদিগের কোন সম্পর্ক নাই এবং তাঁহার রসূলের সহিতও নহে; তোমরা যদি তওবা কর তবে তোমাদিগের কল্যাণ হইবে; আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও তবে জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্কে হীনবল করিতে পারিবে না; এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও,

❐ তবে অংশীবাদীদিগের মধ্যে যাহাদিগের সহিত তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যাহারা তোমাদিগের চুক্তিরক্ষায় কোন ত্রুটি করে নাই; এবং তোমাদিগের বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য করে নাই, তাহাদিগের সহিত নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করিবে; আল্লাহ্ সাবধানীদিগকে পছন্দ করেন।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'ওয়াআজানুম মিনাল্লহি ওয়া রসূলিহি।' এর অর্থ— এটা আল্লাহ্ ও রসুলের পক্ষ থেকে এক ঘোষণা। বক্তব্যভঙ্গিটি প্রথম আয়াতের প্রারম্ভিক বক্তব্যের মতো (বারাআতুম মিনাল্লহ— এটা সম্পর্কচ্ছেদ)। এখানে আজান শব্দের অর্থ এলান বা ঘোষণা। শব্দটি ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশক। যেমন আমান অর্থ ঈমান, আতা অর্থ ই'তা। নামাজের আহ্বানকেও এই অর্থে বলা হয় আজান। যেমন বলা হয়— আজানতুহু ফাফাঅজিনা' (আমি তাকে সংবাদ দিলাম বলেই সে জানতে পারলো)। আজান শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে উজুন থেকে। উজুন অর্থ কর্ণ (অর্থাৎ আমি তার কর্ণ বিবরে ঢেলে দিলাম)।

'ইলান্নাসি ইয়াওমাল হাজ্জিল আক্বারি' অর্থ মহান হজের দিবসে মানুষের প্রতি। হজরত ইকরামা সূত্রে বাগবীর বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'মহান হজের দিবস' অর্থ আরাফার দিবস। হজরত ওমর, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের

www.eelm.weebly.com

মাধ্যমেও বাগবী এ রকম বর্ণনা করেছেন। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আতা, তাউস এবং মুজাহিদও এ মতের সমর্থক। আমি বলি, হজরত মুসাওওয়ার বিন মুখরিমা থেকে ইবনে আবী হাতেমের মাধ্যমে আবদুর রহমান বিন মু'তামির সূত্রে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি,নাসাঈ এবং ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে — রসুল স. বলেছেন, আরাফার দিনই হজে আকবারের (মহান হজের) দিন।

বাগবী লিখেছেন, হজে আকবারের দিন হচ্ছে কোরবানীর দিন। ইয়াহইয়া বিন খারাজের বর্ণনায় এসেছে— হজরত আলী কোরবানীর দিন একটি শাদা খচ্চরের উপর আরোহণ করে জেবানা অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছিলেন । তখন এক লোক তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে হজে আকবার কোন দিন, তা জানতে চাইলেন। হজরত আলী বললেন, আজকের দিন। তিরমিজি লিখেছেন, হজরত আলী তখন বলেছিলেন, আমিও রসুল স. এর নিকটে হজে আকবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি স. বলেছিলেন, ইয়াওমাল হাজ্জিল আকবার (মহান হজের দিবস) হচ্ছে কোরবানীর দিবস। হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে জারীরের মাধ্যমেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। অনুরূপ বর্ণনা এসেছে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা এবং হজরত মুগীরা বিন শো'বা থেকেও। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, শা'বী এবং সুদ্দীও এ অভিমতের সমর্থক। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, আরাফার দিবসের শেষে পরদিন (কোরবানীর দিন) জুমারাতের নিকটে (শয়তানকে পাথর মারার স্থানে) দাঁড়িয়ে রসুল স. ঘোষণা করেছিলেন, আজ হচ্ছে মহান হজের দিবস।

ইবনে জারীহ্ সূত্রে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মুজাহিদ বলেছেন— হজের সকল দিবসই মহান। অর্থাৎ যে কয়দিন মিনায় অবস্থান করতে হয়, সে কয়দিনই হচ্ছে মহান হজের দিন। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, হজ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে যে কয়দিন লাগে সে কয়দিনই মহান হজের দিন (ইয়াওমিল হাজ্জিল আকবার)। যেমন ইয়াও মিস সিফফিন (সিফফিনের দিবস), ইয়াও মিল জামাল (জামালের দিবস) ইত্যাদি। এ সকল যুদ্ধ নিশ্চয় একদিনে সম্পন্ন হয়নি। কিছুদিন সময় তো লেগেছিলোই। তবু বলা হয়ে থাকে সিফফিনের (যুদ্ধের) দিন, জামালের (যুদ্ধের) দিন ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্যঃ ১. হাসান বসরীকে ইয়াওমিল হাজ্জিল আকবার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন— রসুল স. প্রতিনিধিরূপে হজরত আবু বকরের নেতৃত্বে হজযাত্রীর একটি দলকে মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন। হজরত আবু বকরের নেতৃত্বে তখন মুসলিম, মুশরিক সকলেই হজ সম্পাদন করেছিলো। তাই ওই হজকে বলা হয় মহান হজ। ওই দিন আবার পড়েছিলো ইহুদী ও খৃষ্টানদের ঈদের দিন।

২. শা'বীর বর্ণনায় এসেছে— হজরত আবু জর এবং হজরত যোবায়েরের মধ্যে কোনো একজন স্বয়ং রসুল স. কে জুমআর দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে এ আয়াত পাঠ করতে শুনেছিলেন। তখন কেউ কেউ বলাবলি করছিলেন এ আয়াত আবার নাজিল হলো কবে? হজরত ওমর তাদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের জুমআ হয়নি।

---

www.eelm.weebly.com

ওমরাহ্‌কে বলা হয় গৌণ হজ (হজে আসগর) তাই হজকে বলা হয়েছে মহান বা মুখ্য হজ (হজে আকবার)। এই অভিমতের সমর্থক জুহরী, শা'বী এবং আতা। তাঁরা বলেছেন, পূর্বের আয়াতে যে চার মাসের কথা বলা হয়েছে, সেই চার মাসের ভিত্তি হচ্ছে হজে আকবার। আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে আকবারের দিন প্রদত্ত একটি ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। এই ঘোষণার সঙ্গে কথিত চার মাসের কোনো সংযোগ নেই। হজের প্রারম্ভ ও সমাপ্তির কোনো উল্লেখ এখানে নেই। উল্লেখ নেই কোনো মাস অথবা সময়ের।

প্রথম আয়াতের উল্লেখিত সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণাটি দেয়া হয়েছিলো কেবল ওই সকল মুশরিককে লক্ষ্য করে, যারা মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলো। আর আলোচ্য আয়াতের ঘোষণাটি দেয়া হয়েছে সাধারণভাবে। তাই এখানে বলা হয়েছে— ইলান্ নাস (মানুষের প্রতি) যারা চুক্তিবদ্ধ এবং যারা চুক্তিবদ্ধ নয়— তারা সকলে এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া যে সকল চুক্তিবদ্ধ মুশরিক চুক্তি ভঙ্গ করেনি, তাদের সম্পর্কে অন্যত্র নির্দেশ এসেছে— ফাআতিমমু ইলাইহিম আহাদহুম (কৃত চুক্তি পরিপূর্ণ কর)। এ বিষয়টিও লক্ষ্য করতে হবে যে, চার মাস পরিভ্রমণ করার নির্দেশের সঙ্গেও হজে আকবারের কোনো সম্পর্ক নেই। যদি থাকতো তবে, ভ্রমণের সূচনা বা তারিখের কথাও উল্লেখ করা হতো এখানে। কিন্তু এখানে সেরকম কিছু নেই।

আমি বলি, বারাআতুম মিনাল্লাহি ওয়া রসুলিহি (এটা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে) এবং আন্নাল্লহা বারিউম মিনাল মুশরিকীনা ওয়া রসুলুহু (আল্লাহর সঙ্গে অংশীবাদীদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং তাঁর রসুলের সঙ্গেও নয়) — এ আয়াত দু'টো কেবল তাবুক যুদ্ধের চুক্তিভঙ্গকারী বিধর্মীদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে, এ রকম বলা যায় না। বরং চুক্তিভূত এবং চুক্তিবহির্ভূত সকল বিধর্মীই ঘোষণা দু'টোর লক্ষ্যস্থল। তাদের সকলকে লক্ষ্য করেই চার মাস নির্বিঘ্নে চলাফেরা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ ওই চারমাস আল্লাহ্‌তায়ালা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছেন। তাই, একস্থানে এরশাদ করা হয়েছে— 'ফা ইজানসালাখাল আশহুরুল হুরুম (যখন সম্মানিত মাসগুলো অতীত হয়ে যায়) অন্য এক স্থানে এসেছে— মিনহা আরবাআতুন হুরুমুন (তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত)।

....

জ্ঞাতব্যঃ এই আয়াতে উল্লেখিত 'ওয়া রসুলুহু' কথাটিকে 'ওয়া রসুলিহি' পাঠ করা হতো। ইবনে আবী মালেকার বর্ণনায় এসেছে, এক আরববাসী হজরত ওমরের খেলাফতের সময় মদীনায় এসে বললো, আমাকে আপনারা কেউ আল্লাহ্‌র কালাম শিখিয়ে দিন। মোহাম্মদ বিন খাত্তাব তাকে শিখিয়ে দিলেন সুরা বারাআত এবং আলোচ্য আয়াতের 'রসুলুহু'কে পড়লেন 'রসুলিহি'। এ রকম পড়ার ফলে

www.eelm.weebly.com

অর্থ দাঁড়ালো এ রকম— আল্লাহ্তায়ালা মুশরিকদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রসুলের দায়িত্ব থেকেও মুক্ত। এ রকম পাঠ শুনে লোকটি বললো, তাহলে আমিও আল্লাহ্তায়ালার রসুলের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। এ কথা বলেই সে প্রস্থানোদ্যত হলো। হজরত ওমর তাকে ফিরিয়ে এনে বললেন, তুমি এমন করলে কেনো ? লোকটি বললো, আমি কোরআন শিখতে এসেছিলাম। কিন্তু এখানকার এক লোক আমাকে একটি আয়াত পড়ালেন এভাবে— 'আন্নাল্লহা বারিউম মিনাল মুশরিকিনা ওয়া রসুলিহি।' তাই আমি বলেছি, আমিও আল্লাহ্তায়ালার রসুলের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। হজরত তৎক্ষণাৎ মোহাম্মদ বিন খাত্তাবকে ডেকে এনে নির্দেশ দিলেন, এই লোকটি এখন থেকে তোমাদেরকে কোরআন পড়াবে। আর আবুল আসওয়াদকে ডেকে এনে বললেন, কোরআন লিপিবদ্ধ করার সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করো।

একটি সন্দেহঃ কেউ কেউ বলে থাকেন, এখানে চারমাস যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ঘোষণা করা হলেও অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কাতিলুল মুশরিকীনা কাফ্ফাতান' (মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকো)। সুতরাং বুঝতে হবে এ হুকুমটির মাধ্যমে চারমাস যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম হওয়ার নির্দেশনাটি রহিত হয়েছে। এ রকম বলেছেন কাতাদা, আতা খোরাসানী, জুহুরী এবং সুফিয়ান সওরী। তারা তাদের অভিমতের দলিল পেশ করেছেন এভাবে— রসুল স. হুনায়েন যুদ্ধের সময় হাওয়াজেনদের বিরুদ্ধে এবং তায়েফে সাক্বিফদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও অবরোধ করেছিলেন শাওয়াল মাসে এবং জিলক্বদের কিছু অংশে। অথচ জিলক্বদ ছিলো নিষিদ্ধ ঘোষিত চার মাসের অর্ন্তভূত।

সন্দেহ ভঞ্জনঃ আমি বলি 'ক্বতিলুল মুশরিকীনা কাফ্ফাতান' কথাটি একটি পূর্ণ আয়াতের অংশ বিশেষ। এ রকম আংশিক বাক্য দ্বারা কোনো পূর্ণ আয়াত রহিত হতে পারে না। পূর্ণ আয়াতটি এ রকম— ইন্না ইদ্দাতাস্ শূহূরী ইনদাল্লহি ইছনা আশারা শাহারান ফি কিতাবিল্লাহি ইয়াওমা খালাকাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব মিনহা আরবাআতুন হুরুমুন জালিকাদ্দীনুল ক্বায়্যিমু ফালা তাজলিমু ফিহিন্না আংফুসাকুম ওয়া ক্বতিলুল মুশরিকীনা কাফ্ফাতান কামা ইউক্বাতিলুনা কুম কাফ্ফাতান (আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ্র বিধানে আল্লাহ্র নিকট মাস গণনায় মাস বারোটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই প্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের মধ্যে জুলুম কোরো না এবং তোমরা অংশীবাদীদের সঙ্গে সমবেতভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে থাকে)। এই আয়াতটির সকল বাক্য একই সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এর কোনো বিশেষ বাক্য পূর্ণ কোনো আয়াতের রহিতকারী

www.eelm.weebly.com

(নাসেখ) হতে পারে না। এ রকম মনে করাও ঠিক নয় যে, 'কাফ্ফাতান' অর্থ মুশরিকদেরকে আওতায় পেলে যখন তখন হত্যা করতে হবে বা যখন তখন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। বরং 'কাফ্ফাতান' কথাটি বিশেষ অবস্থার ইঙ্গিতবহ।

এ কথা অবশ্য ঠিক যে, একটি একক বর্ণনায় (খবরে আহাদে) রসুল স. কর্তৃক শাওয়াল, জিলক্বদ মাসে তায়েফ অবরোধের কথা এসেছে। কিন্তু এ রকম একক বর্ণনার মাধ্যমে কোরআনের কোনো সুস্পষ্ট হুকুম রহিত হতে পারে না। তাছাড়া সুরা তওবা অবতীর্ণ হয়েছিলো তায়েফের যুদ্ধের পর। আর রসুল স. তাঁর মহাপ্রস্থানের আশিদিন পূর্বে বিদায় হজের সময় কোরবানীর দিন ঘোষণা করেছিলেন— কালচক্র এখন অতিক্রম করছে পরিপূর্ণতার পথ, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির সময় যেমন ছিলো। এক বৎসরে রয়েছে বারোটি মাস। তার মধ্যে চারটি মাস নিষিদ্ধ। ওই চার মাসের মধ্যে তিনটি মাস পরস্পরলগ্ন— জিলক্বদ, জিলহজ ও মহররম। চতুর্থ মাসটি হচ্ছে— জমাদিউস সানি ও শাবানের মধ্যবর্তী মাস— রজব। হজরত আবী বকরা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

এ রকমও বলা যেতে পারে যে, তায়েফের বনী সাক্বিফের অবরোধটি ছিলো রসুল স.এর একটি বিশেষ মর্যাদার প্রকাশ। যেমন হেরেম শরীফে হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রসুল স. এর সম্মানে কিছুকালের জন্য এই নিষেধাজ্ঞাটি উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো। তাই তিনি মক্কাবিজয়ের পর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইসলামের চরমতম কয়েকজন শত্রুকে হেরেম শরীফের সীমানাতেই হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আল্লাহতায়ালা আসমান ও জমিনের সৃষ্টিলগ্ন থেকে এই শহরকে মহামর্যাদামণ্ডিত করেছেন। এই মর্যাদা অটুট থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। এখানে আমার পূর্বে আর কাউকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। অল্পকিছু সময়ের জন্য কেবল আমাকেই আজ এখানে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে। বোখারী ও মুসলিমের মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

হজরত আবু শোরাইহ্ আদবী থেকে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে— রসুল স. এর এই দৃষ্টান্ত দৃষ্টে কেউ যেনো এ রকম মনে না করেন যে, হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে হত্যাকাণ্ড ঘটানো বৈধ। যে এ রকম মনে করে তাকে বলে দাও— এই অনুমতি ছিলো কেবল রসুল স. এর জন্য, তোমাদের জন্য নয়। আর তাকেও ওই অনুমতি দেয়া হয়েছিলো অল্পকিছু সময়ের জন্য, চিরকালের জন্য নয়। ওই সময়টুকু ব্যতিরেকে পূর্বাপর সকল সময়ে হেরেম শরীফের মর্যাদা চির অটুট।

www.eelm.weebly.com

নেপথ্যের কাহিনীঃ নবম হিজরীর শাওয়াল মাসে সুরা বারাআত অবতীর্ণ হলো। তখন রসুল স. এই সুরা হজযাত্রীদের সমাবেশে পাঠ করার জন্য প্রেরণ করলেন হজরত আলীকে। হজরত জাবের থেকে নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত আবু বকরকে নির্বাচন করেছিলেন হজযাত্রীদের নেতা (আমিরে হজ)। হজরত জাবের বলেছেন, আমিও ছিলাম ওই হজযাত্রীদের মধ্যে। মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা উরুজ নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলাম। অতি প্রত্যুষে মোয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো— আস্‌সালাতু খয়রুম মিনান্ নাউম (নিদ্রা অপেক্ষা নামাজ উত্তম)। আমরা সকলে ঘুম থেকে উঠে নামাজের জন্য প্রস্তুত হলাম। নামাজের জামাত শুরু হতে যাবে, এমন সময় আমরা শুনতে পেলাম একটি উট আগমনের আওয়াজ। হজরত আবু বকর আর তকবির উচ্চারণ করলেন না। বললেন রসুল স. এর উষ্ট্রীর পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে হয় তিনিও হজযাত্রার উদ্দেশে আগমন করেছেন। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমরা রসুল স. এর সঙ্গেই নামাজ পাঠ করতে পারবো। উষ্ট্রীটি নিকটবর্তী হতেই সকলে দেখলেন, উষ্ট্রারোহী হয়ে আগমন করছেন হজরত আলী। হজরত আবু বকর বললেন, হে আলী! আপনি কি হজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আগমন করছেন, না দূত হিসেবে । হজরত আলী বললেন, হজযাত্রীদের সমাবেশে সদ্য অবতীর্ণ সুরা বারাআত পাঠ করার দায়িত্ব দিয়ে রসুল স. আমাকে প্রেরণ করেছেন। আমরা নামাজ পাঠ করলাম, এর পর রওয়ানা হলাম মক্কাভিমুখে। মক্কায় পৌঁছে ৭ই জিলহজ হজযাত্রীদের উদ্দেশ্যে হজরত আবু বকর ভাষণ দান করলেন। জানিয়ে দিলেন হজের সকল নিয়মকানুন। তাঁর ভাষণ শেষে উঠে দাঁড়ালেন হজরত আলী এবং পাঠ করে শোনালেন সুরা বারাআত।

আরাফা ও মুজদালিফায় হজের অনুষ্ঠানসমূহ শেষ করে আমরা সমবেত হলাম মিনায়। কোরবানীর দিবসে হাজীদের উদ্দেশ্যে পুনরায় ভাষণ দান করলেন হজরত আবু বকর। ওই ভাষণে তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন কোরবানী ও অন্যান্য নির্দেশনা। তাঁর ভাষণ শেষে পুনরায় সুরা বারাআত পাঠ করে শোনালেন হজরত আলী। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে হজরত আবু বকর আবার আমাদের উদ্দেশে বক্তৃতা করলেন । ওই বক্তৃতায় তিনি শুনিয়ে দিলেন শয়তানকে কংকর নিক্ষেপের নিয়মাবলী। তাঁর বক্তৃতার পর হজরত আলী পাঠ করলেন সুরা বারাআত।

বাগবী লিখেছেন রসুল স. ওই বৎসর হজরত আবু বকরকে বানিয়েছিলেন আমীরে হজ। পরে তাঁর নিজের উটনীর উপরে আরোহণ করিয়ে হজরত আলীকে পাঠিয়েছিলেন হজ যাত্রীদের সমাবেশে সুরা বারাআত পাঠ করে শোনানোর জন্য। এমতো নির্দেশনাও তাঁকে দিয়েছিলেন যে, মক্কা, মিনা ও আরাফায় মুসলিম

www.eelm.weebly.com

অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে এ কথা জানিয়ে দিবেন, 'এখন থেকে অংশীবাদীদের সঙ্গে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের কোনো সম্পর্ক নেই।' যারা মুসলমান নয় তারা এখন থেকে বিবস্ত্র অবস্থায় কাবাগৃহে তাওয়াফ করতে পারবে না। এখন থেকে আর হজও করতে পারবে না। এই পয়গাম নিয়ে হজ কাফেলার সঙ্গে মিলিত হলে হজরত আবু বকর ফিরে এলেন রসুল স. এর নিকটে। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার সম্পর্কে কি নতুন কোনো নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে? রসুল স. বললেন, না। তবে আলীকে তোমার সঙ্গে মিলিত হতে বললাম সুরা বারাআত পাঠ করার জন্য এবং বিধর্মীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির ঘোষণা প্রদান করার জন্য। আপন খান্দানের লোকের দ্বারা এ রকম ঘোষণা না দিলে ঘোষণাটি সর্বমহলের আস্থা অর্জন করতে পারবে না। তাই আমি তাঁকে তোমার সঙ্গী করে পাঠালাম। হে আবু বকর! তুমি কি এ কথা ভেবে প্রসন্ন নও যে, তুমি ছিলে আমার সওর পর্বত গুহার একমাত্র সঙ্গী, আবার একান্ত সঙ্গী হবে হাউজে কাউছারের পাশে। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি আপনার সকল সিদ্ধান্তের প্রতি প্রসন্ন। এরপর হজরত আবু বকরের নেতৃত্বে তাঁর প্রধান সঙ্গী হজরত আলী সহ সকল হজযাত্রী যাত্রা করলেন মক্কার পথে। তখন ছিলো হিজরী সালের সপ্তম বর্ষ। মক্কায় পৌঁছে ৭ই জিলহজ হজরত আবু বকর হজের গুরুত্ব ও নিয়ম কানুন সম্পর্কে খুত্‌বা প্রদান করলেন। তখনকার রীতি অনুসারে অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও হজ প্রথা পালন করতো। হজরত আবু বকর সকল হাজীকে নিয়ে হজ সম্পাদন করলেন। কোরবানীর দিন মিনায় সমবেত সকল হাজীর সামনে সুরা বারাআত পাঠ করার পর হজরত আলী ঘোষণা করে দিলেন যে, এখন থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে বিধর্মীদের কোনো সম্পর্ক নেই। আর এখন থেকে কোনো বিধর্মী তাওয়াফ ও হজ করতে পারবে না।

হজরত জায়েদ বিন তয়েস বর্ণনা করেছেন, আমি তখন হজরত আলীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনাকে কোন কথা প্রচারের জন্যে পাঠানো হয়েছিলো? তিনি বলেছিলেন, চারটি বিষয় প্রচারের জন্য। সে চারটি বিষয় হচ্ছে — ১. এখন থেকে কেউ বস্ত্রবিবর্জিত অবস্থায় কাবাগৃহ তাওয়াফ করতে পারবে না। ২. যারা রসুল স. এর সঙ্গে চুক্তি করেছিলো তাদের চুক্তির মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না। আর যাদের সঙ্গে চুক্তি নেই তাদেরকে সময় দেয়া হবে চারমাস মাত্র। ৩. ইমানদার ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ৪. এই হজের পর মুশরিকেরা আর কখনো হজ করতে পারবে না।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে— হজরত আবু বকর আমাকে হজরত আলীর প্রচারসঙ্গী হিসেবে মিনার ময়দানে এ কথা প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন যে, এখন থেকে কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না, বিবস্ত্র অবস্থায় কেউ

www.eelm.weebly.com

তাওয়াফও করতে পারবে না। হুমাইদ বিন আবদুর রহমানও হজরত আবু হোরায়রা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর রসুল স. হজরত আলীকে তাঁর নিজের উটের পিঠে চড়িয়ে হুকুম দিলেন যে, তুমি সুরা বারাআতের নির্দেশ সকলকে পাঠ করে শোনাবে। সেই নির্দেশানুসারে হজরত আলী কোরবানীর দিন মিনা প্রান্তরে উপস্থিত জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন, এই হজের পর থেকে কোনো মুশরিক আর কখনো হজ করতে পারবে না, নগ্ন অবস্থায় তাওয়াফও করতে পারবে না।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ওরওয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, নবম হিজরীতে রসুল স. হজরত আবু বকরকে প্রদান করলেন আমিরে হজের দায়িত্ব। তাঁর হাতে দিলেন হজের নিয়মকানুন সম্বলিত লিখিত নির্দেশনামা। আর হজরত আলীর হাতে দিলেন সুরা বারাআতের লিখিত আয়াতসমূহ। তাঁকে বললেন, তুমি মক্কা, মিনা, আরাফা এবং হজের অন্যান্য সমাবেশস্থলে এ কথা প্রচার করবে— এ বৎসরের পর মুশরিকদের হজ ও বস্ত্রবিবর্জিত তাওয়াফ নিষিদ্ধ। এ বৎসরের পর আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি নিরাপত্তার দায়িত্ব আর নেই। আর যারা চুক্তিবদ্ধ তাদের চুক্তির মেয়াদ বলবৎ থাকবে মাত্র চার মাস। নির্দেশানুসারে হজরত আলী হজের সকল সমাবেশ স্থলে বারাআতুম মিনাল্লহি ওয়া রসুলিহি' এবং 'ইয়া বনী আদামা খুজু জিনাতাকুম ইন্দাকুল্লা মাসজিদিন' — আয়াত সমূহের নির্দেশগুলো শুনিয়ে দেন।

হজরত আনাস থেকে তিরমিজি লিখেছেন, রসুল স. প্রথমে সুরা বারাআত দিলেন হজরত আবু বকরের হাতে। কিছুক্ষণ পরে বললেন, না। এই ঘোষণা আমার পরিবার পরিজনভূত কোনো সদস্যের মাধ্যমে হওয়াই সমীচীন। এ কথা বলে তিনি স. সুরা বারাআতের প্রচারের দায়িত্ব প্রদান করলেন হজরত আলীকে। হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে — রসুল স. প্রথমে হজরত আবু বকরকে সুরা বারাআত প্রদান করে মক্কাভিমুখে প্রেরণ করলেন। পরে সুরা বারাআতের প্রচারকরূপে প্রেরণ করলেন হজরত আলীকে। হজরত আবু বকরকে বলে পাঠালেন, এ ধরনের ঘোষণা আরবীয় রীতি অনুসারে আপন বংশের লোকের মাধ্যমেই প্রচারিত হওয়া উচিত। নতুবা মানুষ এর উপর আস্থা রাখতে পারবে না। তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত ও উত্তম আখ্যায়িত এবং হাকেম কর্তৃক বর্ণিত ও বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. প্রথমে হজরত আবু বকরকে সুরা বারাআতের বাণীসমূহ প্রচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে প্রচারক হিসাবে পাঠিয়েছিলেন হজরত আলীকে। হজরত আবু বকর ছিলেন ওই হজ কাফেলার অধিনায়ক এবং হজরত আলী ছিলেন সুরা বারাআতের বিশেষ নির্দেশপ্রাপ্ত প্রচারক। কোরবানীর দিবস সমূহের মধ্যে হজরত

www.eelm.weebly.com

আলী পাঠ করিয়ে শুনিয়েছিলেন — 'আন্নাল্লহা বারিউম্ মিনাল মুশরিকীনা ওয়া রসুলুহু' এবং 'ফাসীহু ফিল আরদ্বি আরবাআ'তা আশহুরীন।' তারপর বলেছিলেন, এই বৎসরের পর থেকে কোনো অংশীবাদী হজ করতে পারবে না, বিবসন অথবা বিবসনা হয়ে কাবা প্রদক্ষিণও কেউ করতে পারবে না। আর বিশ্বাসী ব্যতীত বেহেশ্তেও কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, আমি দেখলাম হজরত আলীর এই ঘোষণা শেষে হজরত আবু বকর উঠে দাঁড়ালেন এবং তিনিও একই কথা ঘোষণা করলেন।

পরিণামঃ উপরে বর্ণিত 'নেপথ্যের কাহিনী' শিরোনামভূত আলোচনার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. হজরত আবু বকরকে হজের অধিনায়কত্ব থেকে দায়িত্বচ্যুত করেননি। পরে হজরত আলীকে ওই দলের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন কেবল সুরা বারাআত পাঠের জন্য এবং মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির বিশেষ ঘোষণা প্রদানের জন্য। আরবীয় রীতি অনুসারে এ ধরনের ঘোষণা ঘোষকের বংশদ্ভূত লোকের মাধ্যমে হওয়াই দস্তুর। বংশদ্ভূত নয় এমন কেউ এ ধরনের ঘোষণা দিলে লোকেরা বলতে পারতো চুক্তিভঙ্গের ঘোষণা অন্য লোকের মাধ্যমে দেয়া হলো কেনো? এ রকম প্রশ্ন যাতে উত্থাপিত হতে না পারে, তাই রসুল স. হজরত আলীকে নিযুক্ত করেছিলেন চুক্তিভঙ্গ সম্পর্কিত ঘোষণার বিশেষ প্রচারকরূপে। তাই রসুল স. বলেছিলেন— 'লা ইয়ামবাগি লী আহাদিন আঁই ইয়াবলুগা হাজা ইল্লা রজুলুম মিন আহ্লি' (আমার পরিবারভুক্ত নয় এমন কাউকে দিয়ে এটা প্রচার করা সমীচীন নয়)। হজরত আনাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ এবং তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম।

'নেপথ্যের কাহিনী' শিরোনামে উল্লেখিত বিবরণ সমূহের কিছু অংশ নেয়া হয়েছে মস্নদে আহমদ থেকে এবং কিছু অংশ নেয়া হয়েছে বায়হাকীর দলায়েল সূত্রে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে। অবশিষ্ট অংশ আমরা গ্রহণ করেছি হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত ইবনে মারদুবিয়ার তাফসীর থেকে।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা যদি তওবা করো তবে তোমাদের কল্যাণ হবে; আর তোমরা যদি মুখ ফেরাও তবে জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহ্কে হীনবল করতে পারবে না; এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তবে অংশীবাদীদের মধ্যে যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় ত্রুটি করেনি; এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি, তাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে; আল্লাহ্ সাবধানীদেরকে পছন্দ করেন।'

এই আয়াতে ওই সকল অংশীবাদীদের সঙ্গে চুক্তির সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যারা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর চুক্তি বিরোধী কোনো কিছু করেনি। এ ধরনের চুক্তিভূতদের মধ্যে ছিলো বনী কেনানার একটি উপগোত্র বনী হামজা।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু বকরের নেতৃত্বাধীন সম্পাদিত হজের সমাবেশে যখন হজরত আলী সাধারণভাবে মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির কথা প্রচার করেন, তখন তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তির মেয়াদ বাকী ছিলো নয় মাস। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কেই এই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এরপর অন্যান্য মুশরিকদের সম্পর্কে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে এভাবে—

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৫, ৬

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ○

❐ অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হইলে অংশীবাদীদিগকে যেখানে পাইবে বধ করিবে, তাহাদিগকে বন্দী করিবে, অবরোধ করিবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাহাদিগের জন্য ওৎ পাতিয়া থাকিবে; কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয় তবে তাহাদিগের পথ ছাড়িয়া দিবে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❐ অংশীবাদীদিগের মধ্যে কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে আশ্রয় দিবে যাহাতে সে আল্লাহের বাণী শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে, কারণ তাহারা অজ্ঞ লোক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে।' এখানে উল্লেখিত 'ইন সালাখা' শব্দটির অর্থ অতিবাহিত হলে। শব্দটি এসেছে 'সালখুন' থেকে। সালখু শ্শাত অর্থ বকরীর চামড়া টেনে নিচে নামানো। ইন সালাখা শব্দটির প্রকৃত অর্থ— কোনো কিছুকে তার আবরণ বা খোলস থেকে বের করে ফেলা।

www.eelm.weebly.com

'আশ্‌হারুল হুরুম' অর্থ নিষিদ্ধ মাস। মুজাহিদ ও ইবনে ইসহাক বলেছেন, এখানে আশ্‌হারুল হুরুম অর্থ চুক্তির মাস, যার মেয়াদ চার মাস। আর যাদের জন্য চুক্তি নেই, তাদের জন্য এর সময়সীমা হচ্ছে— মহররম মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত। অর্থাৎ যে তারিখে (কোরবানীর দিন — ১০ই জিলহজ) হজরত আলী সুরা বারাআতের ঘোষণা শুনিয়েছিলেন, সেই তারিখ থেকে মহররম মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত— পঞ্চাশ দিন। যে মাসগুলোতে আল্লাহ্‌তায়ালা মুসলমানদের জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও রক্তপাত হারাম করে দিয়েছেন, সেই মাসগুলোকে বলা হয় আশ্‌হারুল হুরুম (নিষিদ্ধ মাস)। মুজাহিদ বলেছেন, দশই জিলহজ থেকে মহররমের শেষ তারিখ পর্যন্ত ধরলে হয় পঞ্চাশ দিন। দুই মাস অর্থাৎ ষাট দিন পুরো হয় না। অথচ আয়াতে বলা হয়েছে মাসের কথা। পঞ্চাশ দিনের হিসাব ধরলে তো মাস পুরো হয় না (বিশ দিনে তো কোনো মাস হয় না)। তাঁর এমতো বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, দশই জিলহজ ঘোষণা দেয়া হলেও নিষিদ্ধ মাসের গণনা শুরু হবে পিছনের জিলকৃদ মাস থেকে। আর জিলকৃদ থেকে গণনা করলে মাস পূর্ণ না হওয়ার সমস্যা আর থাকে না। নিষিদ্ধ মাসের হিসাব করতে হবে এভাবেই। প্রতি বছরের নিষিদ্ধ মাস হচ্ছে জিলকৃদ, জিলহজ, মহররম এবং রজব।

'হাইছু' অর্থ যেখানে। অধিকাংশ তাফসীরকার লিখেছেন, এ কথার অর্থ— মুশরিকদেরকে হেরেম শরীফের সীমানার ভিতরে অথবা সীমানার বাইরে যেখানেই পাবে, সেখানেই হত্যা করবে। কিন্তু তাঁদের তাফসীর বিশুদ্ধ হাদিসের বিপরীত। কেননা রসুল স. বলেছেন, জমিন ও আসমানের সৃষ্টিলগ্ন থেকে আল্লাহ্‌পাক এই শহর (মক্কা) কে হারাম ঘোষণা করেছেন। হারামের এই বিধান বলবৎ থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। আমার পূর্বে এখানে কারো জন্য যুদ্ধ বৈধ করা হয়নি। কেবল আমার জন্য বৈধ করা হয়েছিলো অল্প কিছুক্ষণের জন্য। রসুল স. এ কথা বলেছিলেন মক্কাবিজয়ের পর। বিজয়ের পরক্ষণে তিনি তখন ইসলামের কয়েকজন কুখ্যাত শত্রুকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর এ কথার উপর ভিত্তি করে কেউ যদি বলে অন্যদের জন্যেও হেরেম শরীফের সীমানার মধ্যে মুশরিক বধ বৈধ, তবে তা হবে নিতান্ত ভুল। কারণ রসুল স. স্পষ্ট করে বলেছেন, কেবল আমার জন্য এখানে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছিলো মাত্র কিছুক্ষণের জন্য। এরপর ওই অনুমতি রহিত হয়ে যায়। সুতরাং অন্যদের জন্য এখানে যুদ্ধ করা বৈধ হতে পারে কীভাবে? বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, 'ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাতি' (কিয়ামত দিবস পর্যন্ত)। সুতরাং হেরেম শরীফের হুরমত (নিষিদ্ধতা) রহিত হতে পারে না। তাই এখানে 'হাইছু' শব্দের অর্থ হবে হেরেম শরীফের বাইরে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে, বধ করবে।

মাসআলাঃ যদি কোনো গর্বিত মুশরিক নিষিদ্ধ মাসের তোয়াক্কা না করে এবং হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে যুদ্ধ শুরু করে দেয় তবে তার গর্বের প্রত্যুত্তররূপে মুসলমানদের জন্য যুদ্ধ করা বৈধ। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা ঘোষণা করেছেন—

www.eelm.weebly.com

আশ্‌হারুল হারামু বিশ্‌শাহরিল হারামী ফাল হুরুমাতু কিসাসু ফামানি'তাদা আলাইকুম ফা'তাদু আলাইহি বিমিছলি মা'তাদা আলাইকুম (সম্মানিত মাসের বিনিময়ে সম্মানিত মাস)। এই মাসআলাটি সুরা বাকারার তাফসীরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

'ওয়াখুজুহুম' অর্থ— তাদেরকে বন্দী করবে। ওয়াহ্‌সুরুহুম অর্থ অবরোধ করবে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এ কথার অর্থ যদি মুশরিকেরা কোনো দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে, যেনো তারা যুদ্ধ অথবা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে বশ্যতা স্বীকার করে কিংবা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— এমনভাবে অবরোধ সৃষ্টি করো যেনো মুশরিকেরা হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে অথবা মুসলিম রাজ্যের সীমানায় নির্বিঘ্নে চলাচল করতে না পারে।

ওয়াক্বউদু লাহুম কুল্লা মারসাদ্‌ অর্থ— প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। মারসাদ অর্থ ঘাঁটি— এমন স্থানে অবস্থান করা, যে স্থান থেকে শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যায়। এখানে বলা হয়েছে প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। এ কথার অর্থ— তোমরা শত্রুর চলাচল সম্পর্কে সকল স্থানে সদা সতর্ক থাকবে, যেনো তারা মক্কায় প্রবেশ করতে এবং দেশে ষড়যন্ত্র বিস্তার করতে না পারে।

শেষে বলা হয়েছে— কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — এ কথার অর্থ 'আল্লাহ্‌তায়ালা ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ালু বলে অনুতপ্ত প্রত্যাবর্তন-কারীদেরকে ক্ষমা করে থাকেন। অতএব, হে বিশ্বাসীবৃন্দ! তোমরা সত্যের পথে প্রত্যাবর্তনকারী, সালাত প্রতিষ্ঠাকারী এবং জাকাত দানকারীদের পথ ছেড়ে দাঁড়াও।

হাসান ইবনে ফুজাইল বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ওই সকল আয়াত রহিত হয়েছে, যে গুলোতে অবিশ্বাসীদের অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রেক্ষিতে ধৈর্য ও মার্জনার নির্দেশনা দেয়া হয়েছিলো।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— অংশীবাদীদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দিবে যাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে, কারণ তারা অজ্ঞ। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! অংশীবাদীদের কেউ আশ্রয় প্রার্থী হলে আপনি তাকে আশ্রয় দিবেন, তাঁকে পৌঁছে দেবেন নিরাপদ স্থানে। এভাবে তাকে আল্লাহ্‌র বাণী শুনবার, বুঝবার এবং হৃদয়ঙ্গম করবার অবকাশ প্রদান করবেন। কারণ তারাতো অজ্ঞ। হাসান বলেছেন, এই আয়াতের নির্দেশনাটি একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা। এই হুকুমটি বলবৎ থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

www.eelm.weebly.com

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

❑ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের নিকট অংশীবাদীদিগের চুক্তি কি করিয়া বলবৎ থাকিবে? তবে যাহাদিগের সহিত মস্জিদুল-হারামের সন্নিকট তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলে যাবৎ তাহারা তোমাদিগের চুক্তিতে স্থির থাকিবে তোমরাও তাহাদিগের চুক্তিতে স্থির থাকিবে; আল্লাহ্ সাবধানীদিগকে পছন্দ করেন।

চুক্তিবদ্ধ দুই পক্ষের মধ্যে যদি একটি পক্ষ চুক্তিভঙ্গ করে, তবে অপর পক্ষ চুক্তি রক্ষা করতে পারে না। কোনো কোনো মুশরিক সম্প্রদায় রসুলুল্লাহ্ স. এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর চুক্তি ভেঙে ফেলেছিলো। তাদেরকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নিকট অংশীবাদীদের চুক্তি কী করে বলবৎ থাকবে? এটি একটি বিস্ময়বোধক ও নেতিবাচক জবাব বিশিষ্ট প্রশ্ন। উত্তরসহ এ প্রশ্নের বক্তব্য দাঁড়াবে এ রকম— 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নিকট ওই সকল অংশীবাদীদের চুক্তি বলবৎ থাকতে পারে না, যারা চুক্তিভঙ্গ করেছে।'

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে যাদের সঙ্গে মসজিদুল হারামের সন্নিকটে তোমরা পরস্পর চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে যাবৎ তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে, তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে; আল্লাহ্ সাবধানীদেরকে পছন্দ করেন।' এ কথার অর্থ, চুক্তি রক্ষা করা সাবধানতার (তাকওয়ার) অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। যারা সাবধানী (মুত্তাকী) তাদের কর্তব্য হচ্ছে কৃত চুক্তির যথাসংরক্ষণ করা। যারা এ রকম করে তাঁরা আল্লাহ্তায়ালার প্রিয়ভাজন। সুতরাং হে বিশ্বাসীগণ! মসজিদুল হারামের সন্নিকটে যারা তোমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং তা মান্য করে চলেছে, তোমরাও তাদের সঙ্গে চুক্তি রক্ষা করে চলো। তারা যতোদিন চুক্তিতে স্থির থাকে তোমরাও ততোদিন চুক্তিতে স্থির থাকো।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'যাদের সঙ্গে তোমরা মসজিদুল হারামের সন্নিকটে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে' বলে বুঝানো হয়েছে কুরায়েশ সম্প্রদায়কে। কাতাদা বলেছেন, ওই সকল মক্কাবাসীকে যারা হুদায়বিয়ার দিন রসুল স. এর সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি করেছিলো। অর্থাৎ হুদায়বিয়ার চুক্তি রক্ষা করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এখানে। বলা হয়েছে, যতোদিন তারা চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরাও ততো দিন চুক্তিতে স্থির থাকো, চিরস্থায়ীভাবে নয়। যারা চুক্তি ভঙ্গ

www.eelm.weebly.com

করবে তাদের বিরুদ্ধে করতে হবে যুদ্ধ। চুক্তির একটি শর্ত ছিলো, কেউ কারোর শত্রুকে সাহায্য করতে পারবে না। কিন্তু বনী খেজায়া এ রকম করেছিলো। সাহায্য করেছিলো মুসলমানদের শত্রু বনী বকরকে। রসুল স. তাই তাদের বিরুদ্ধে মক্কাবিজয় পর্যন্ত যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। মক্কাবিজয়ের পর সকল বিধর্মীর প্রতি নিরাপত্তার ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো এভাবে— আগামী চার মাসের মধ্যে মুসলমান হয়ে যেতে হবে, অথবা ছেড়ে যেতে হবে মক্কা। উল্লেখ্য যে, চারমাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই মক্কাবাসীরা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

সুদ্দী, কালাবী এবং ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, হুদায়বিয়ায় কুরায়েশ-দের পক্ষে বনী খুজাইমা, বনী জুমরা এবং বনী ওয়ায়েল— বনী বকরের এই তিন উপগোত্রও মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে বনী জুমরা ছাড়া অন্য সকলেই চুক্তি ভঙ্গ করেছিলো। আলোচ্য আয়াতে তাই চুক্তি রক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেবল বনী জুমরার সঙ্গে।

বাগবী লিখেছেন, বর্ণিত অভিমতটি সঠিক। কেননা কুরায়েশরা যখন চুক্তি ভঙ্গ করে তখনই অবতীর্ণ হয় এ আয়াত। ওই চুক্তিভঙ্গের কারণেই রসুল স. মক্কা বিজয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৮

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ○

❐ কেমন করিয়া থাকিবে! তাহারা যদি তোমাদিগের উপর জয়ী হয় তবে তাহারা তোমাদিগের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দিবে না; তাহারা মুখে তোমাদিগকে সন্তুষ্ট রাখে কিন্তু তাহাদিগের হৃদয়ে উহা অস্বীকার করে; তাহাদিগের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

আলোচ্য আয়াতের শুরুতে সন্নিবেশিত হয়েছে বিস্ময়বোধক একটি প্রশ্ন— 'কেমন করে থাকবে!' এ কথার অর্থ— চুক্তিভঙ্গকারীদের সঙ্গে কীভাবে চুক্তি রক্ষা করা যাবে। তারা তো শান্তিকামী নয়।

এরপর বলা হয়েছে, 'তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোনো মর্যাদা দিবে না।' এখানে 'লা ইয়ার কুবু' কথাটির অর্থ— সুদৃষ্টি দিবে না। জুহাক বলেছেন, সম্মান করবে না। কাতরাব্ বলেছেন, পক্ষপাতিত্ব করবে না।

কাতাদা বলেছেন, এখানে 'ইল্লা' অর্থ প্রতিজ্ঞার জন্য। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ— স্বজন। ইয়ামান বলেছেন, আত্মীয়তা। সুদ্দী বলেছেন, প্রতিজ্ঞা বদ্ধতা। এখানে উল্লেখিত 'জিম্মা' শব্দটির অর্থও প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা। উল্লেখিত

www.eelm.weebly.com

শব্দগুলোর বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন 'ইল্লা' অর্থ শিক্ষা, উপদেশ। বায়যাবী বলেছেন 'ইল্লুন' অর্থ পারিপার্শ্ব, প্রতিবেশ, নিবাস, আশ্রয়। একই প্রতিবেশীরা একে অপরকে সাহায্য করার ব্যপারে থাকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই শব্দটির অর্থ করা হয়েছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা। এ রকম প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে থাকে অধিকতর সুদৃঢ়রূপে। তাই শব্দটির অর্থ করা হয়েছে আত্মীয়তা। অভিভাবকেরা তাদের অধীনস্থদের শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জিম্মাদার। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'জিম্মা' শব্দটি।

কেউ কেউ বলেছেন 'ইল্লুন' অর্থ আত্মীয়। শব্দটি এসেছে 'আল্লাশ্ শাইআ সাইয়্যি' থেকে। আল্লাশ শাইয়া অর্থ কোনো বস্তুর সীমা নির্ধারণ করে দেয়া। 'আল্লাল বারকু' (বিদ্যুৎ চমক) থেকেও শব্দটির উৎসারণ ঘটে থাকতে পারে। আবু মাজিজ ও মুজাহিদ বলেছেন, 'ইল্লুন' শব্দটি ইবরানী। ইবরানী ভাষায় এর অর্থ আল্লাহ্। উবায়েদ বিন ওমর বলেছেন, জিব্রাইল। এক বর্ণনায় এসেছে— মুসাইলামা কাজ্জাবের কিছু লোক হজরত আবু বকর সিদ্দিকের খেদমতে উপস্থিত হলো এবং মুসাইলামার একটি চিঠি পড়ে শোনালো। হজরত আবু বকর বললেন, এই কালাম আল্লার (আল্লাহ্র) নয়। উচ্চারণ গত পার্থক্যের কারণে শব্দটির অনুবাদ বিভিন্ন রকম হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে— 'লা ইয়ার ক্বুবুনা ফি মু'মিনীন ইল্লা।' এ রকম বাক্যের মাধ্যমে কোনো মুমিন আল্লাহ্পাকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে না। কামুস গ্রন্থে রয়েছে শব্দটির অর্থ — চুক্তি, প্রতিজ্ঞা, আশ্রয়, আশ্রয়দাতা,আত্মীয়তা,খুনি, আকর, ঈর্ষা, প্রতিদান, স্বর্গীয় নিরাপত্তা, বিপদকালে অধৈর্য হওয়া ইত্যাদি। ইসমে মোরাক্কাব (যৌগিক নামপদ) এর অপর অংশ হবে 'ইল্লুন' (যেমন জিব্রাইল, মিকাইল)। আর একদিকে অর্থ হবে আল্লাহ্। এখানে 'জিম্মাতান' শব্দটির প্রকৃত অর্থ হবে চুক্তির ওই সকল অর্থ যেগুলো পরিত্যাগ করলে চুক্তি হয়ে পড়ে অকার্যকর। শেষে বলা হয়েছে— 'তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে কিন্তু তাদের হৃদয়ে তা অস্বীকার করে; তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী। এ কথার অর্থ— চুক্তি ভঙ্গকারী কাফেরদের মুখের কথা এবং অন্তরের বিশ্বাস এক নয়। তাদের মুখে উচ্চারিত হয় বিশ্বাসভাজনতার বাণী কিন্তু অন্তরে জ্বলতে থাকে হিংসা ও অবিশ্বাসের লেলিহান শিখা। অতএব হে বিশ্বাসীবৃন্দ! উত্তমরূপে অবগত হও যে, চুক্তি ভঙ্গকারীদের সঙ্গে চুক্তি রক্ষা করা যায় না।

উল্লেখ্য যে, সকল অবিশ্বাসী ফাসেক বা সত্যত্যাগী ছিলো না। তবে তাদের অধিকাংশই ছিলো চুক্তিভঙ্গকারী ও প্রতারক। তাই সবশেষে বলা হয়েছে— তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

www.eelm.weebly.com

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ لَا يَرْقُبُوْنَ فِىْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۞ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ؕ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۞

❒ তাহারা আল্লাহের আয়াতকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে ও তাহারা লোকদিগকে তাঁহার পথ হইতে নিবৃত্ত করে; তাহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা অতি নিকৃষ্ট!

❒ তাহারা কোন বিশ্বাসীর সহিত আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না, তাহারাই সীমালংঘনকারী।

❒ অতঃপর তাহারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয় তবে তাহারা তোমাদিগের দ্বীন সম্পর্কে ভাই; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপে বিবৃত করি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইশতারাও বি আয়াতিল্লাহি ছামানান ক্বলীলা' (তারা আল্লাহ্র আয়াতকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে)। এখানে 'আয়াতিল্লাহ্' অর্থ কোরআন মজীদ। 'ইশতারাও' অর্থ নগণ্য মূল্যে বা নগণ্য বিনিময়ে। আর 'ছামান' অর্থ পার্থিব সম্পদ। মুজাহিদ বলেছেন, আবু সুফিয়ানের আমন্ত্রণে যারা সত্যের বিরুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলো, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে আলোচ্য বাক্যটি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তায়েফবাসীরা কুরায়েশদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছিলো। ভেবেছিলো কুরায়েশরা যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে পারবে। তাদেরকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্র আয়াতকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে।'

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা লোকদেরকে তাঁর পথ থেকে নিবৃত্ত করে; তারা যা করে থাকে তা অতি নিকৃষ্ট।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্র আয়াতকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করা ও আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করা অতি নিকৃষ্ট কর্ম।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'তারা কোনো বিশ্বাসীর সঙ্গে আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না। তারাই সীমালংঘনকারী। এই আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের ধারাবাহিকতা নয়। বরং এই আয়াতে দেয়া হয়েছে 'মা কানু ইয়া'মালুম' (তাহারা যা করে থাকে) কথাটির ব্যাখ্যা। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আগের আয়াতে বলা হয়েছে সাধারণ মুনাফিকদের সম্পর্কে। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে ইহুদী ও ওই সকল আরব গোত্র সম্পর্কে যারা আবু সুফিয়ানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়েছিলো।

এর পরের আয়াতে (১১)বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে ভাই।'

এই আয়াতে দেয়া হয়েছে একটি চিরন্তন নির্দেশনা। পরোক্ষভাবে সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গকারী, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, পাপী— সকলকে দেয়া হয়েছে প্রত্যাবর্তনের অনুপ্রেরণা। আর বিশ্বাসীদের প্রতি এই মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যারা প্রত্যাবর্তন করবে, নামাজ পাঠ করবে ও জাকাত দিবে তারা তোমাদেরই মতো মুসলমান। সুতরাং তারা তোমাদের ভাই। তাদের লাভ তোমাদেরই লাভ। আবার তাদের ক্ষতিতে তোমাদেরই ক্ষতি।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতে সকল আহলে কেবলার (যারা কেবলামুখী হয়ে নামাজ পাঠ করে) রক্তপাত হারাম করা হয়েছে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমাদেরকে নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যারা জাকাত দিবে না তাদের নামাজও অগ্রাহ্য।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর মহাতিরোধানের পর আরবের কয়েকটি গোত্র জাকাত দিতে অস্বীকৃত হলো। খলিফা হজরত আবু বকর বললেন, তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই জেহাদ করতে হবে। হজরত ওমর বললেন, আমিরুল মুমিনীন! আপনি কীভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, যারা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমা পাঠ করে? রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি মানুষের বিরুদ্ধে ওই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করবো, যতক্ষণ না তারা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করে। আল্লাহ্পাক অন্তর্যামী। তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার হিসাব গ্রহণ করবেন তিনিই। হজরত আবু বকর বললেন, আল্লাহ্র শপথ! যে নামাজ ও জাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবোই। জাকাত

www.eelm.weebly.com

হচ্ছে সম্পদের হক (সম্পদগত ইবাদত)। ওই সকল লোক রসুল স. এর জামানায় যেভাবে জাকাত দিতো এখনও তাদেরকে সেভাবেই জাকাত পরিশোধ করতে হবে। তখন যদি তারা জাকাত হিসেবে ছাগলের বাচ্চাও দিয়ে থাকে, তবে এখনও তাই দিতে হবে। অন্যথায় যুদ্ধ অনিবার্য। হজরত ওমর এই ঘটনাটির শুভ পরিণাম লক্ষ্য করে পরবর্তী সময়ে বলেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত আবু বকরের বক্ষাভ্যন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

হজরত আনাস ইবনে মালেক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে, আমাদের জবাই করা পশুর গোশত ভক্ষণ করে, সে মুসলমান। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল তার জিম্মাদার।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমাকে ওই সময় পর্যন্ত জেহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না মানুষ পাঠ করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্। এ রকম করলে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ। তাদের বাহ্যিক আচরণই বিচার্য। আর আভ্যন্তরীণ অবস্থা তো আল্লাহ্তায়ালার দায়িত্বভূত। মুসলিমের বর্ণনায় শেষ বাক্য দু'টো নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপে বিবৃত করি।' এ কথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! এ কথাটিও উত্তমরূপে অবগত হও যে, এভাবেই আমি স্পষ্টরূপে বিবৃত করি আমার নিদর্শন।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১২

وَإِنْ نَّكَثُوْٓا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ○

☐ তাহাদিগের চুক্তির পর তাহারা যদি তাহাদিগের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তোমাদিগের দ্বীন সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে, তবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের প্রধানদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে; ইহারা এমন লোক যাহাদিগের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নহে; সম্ভবতঃ তাহারা নিরস্ত হইতে পারে।

বাগবী লিখেছেন, যারা প্রকাশ্যতঃ ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে তারাই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। আমি বলি, বাগবীর বক্তব্যটি দুর্বল। কারণ, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দু'টি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে এখানে— ১. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

www.eelm.weebly.com

এবং ২. দ্বীন ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা। সুতরাং দু'টো শর্ত একসঙ্গে পাওয়া না গেলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না।

এখানে বলা হয়েছে— 'তাদের চুক্তির পর তারা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে তবে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রধানদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।' 'আইম্‌মাতাল কুফরী' অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের অগ্রনায়ক বা প্রধান। কারণ, তারাই ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধের পরিকল্পনা করে। কেউ কেউ বলেছেন, 'আইম্মাতাল্ কুফরী' অর্থ— মক্কাবাসী কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ। কারণ, তারাই রসুল স. কে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলো এবং ক্রমাগত ইসলামের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে যাচ্ছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো আবু সুফিয়ান বিন হরব, হারেস বিন হিশাম, সুহাইল বিন আমর, ইকরামা বিন আবু জেহেল এবং অন্যান্য কুরায়েশ নেতাদের সম্পর্কে। তারা চুক্তিভঙ্গ করেছিলো, সকল মুসলমানকে মক্কা থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছিলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইন্নাহুম লাআইমানা লাহুম লায়াল্লাহুম ইয়ানতাহুন' (এরা এমন লোক যাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নয়। এখানে 'আইমান' শব্দটি 'ইয়ামিন' শব্দের বহুবচন। 'ইয়ামিন' অর্থ প্রতিজ্ঞা। 'তাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নয়'— এ কথার অর্থ, হে বিশ্বাসীরা! শুনে নাও, তারা যখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেই ফেলেছে তখন তোমাদের উপরেও চুক্তি রক্ষা করা অত্যাবশ্যক নয়। কাতরিব বলেছেন, 'লা আইমানালাহুম' অর্থ— তাদের প্রতিশ্রুতি চুক্তির অনুকূল নয়।

কোনো কোনো উচ্চারণ রীতিতে বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছে এভাবে— লা ইমানা লাহুম। এভাবে পড়লে অর্থ হবে— তাদের মধ্যে দ্বীন ও ইমানের কোনো কিছুই নেই। 'আমান' থেকেও 'আইমান' শব্দটি উৎসারিত হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ো না, যেখানে পাও তাদেরকে হত্যা করো।

জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে শেষ বাক্যটিতে এভাবে— সম্ভবতঃ তারা নিরস্ত হতে পারে। এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, অত্যাচারী সেনানায়ক কিংবা সাম্রাজ্যলিপ্সু রাষ্ট্রনায়কের মানোভাব নিয়ে যুদ্ধ করা যাবে না। যুদ্ধ করতে হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সংশোধনের নিমিত্তে। সত্যের মহিমা ও শৌর্য-বীর্য দর্শনে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যেনো নিরস্ত হয়, যেনো অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করে সত্যধর্ম ইসলামকে, সে কারণেই দেয়া হয়েছে জেহাদের নির্দেশ। পরবর্তী আয়াতেও ঘোষিত হয়েছে এই নির্দেশের ধারাবাহিকতা—

www.eelm.weebly.com

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُمْ وَهَمُّوا۟ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○ قَـٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ○ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

❐ তোমরা কী সেই সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিবে না, যাহারা নিজদিগের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে ও রসূলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করিয়াছে? উহারাই প্রথম তোমাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় কর? বিশ্বাসী হইলে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর; ইহাই আল্লাহের নিকট শোভনীয়।

❐ তোমরা তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিবে। তোমাদিগের হস্তে আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন, উহাদিগের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে বিজয়ী করিবেন ও বিশ্বাসীদিগের চিত্ত প্রশান্ত করিবেন,

❐ এবং উহাদিগের চিত্তের ক্ষোভ দূর করিবেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি ক্ষমা পরবশ হন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে— এখানে 'ক্বওমান' (সেই সম্প্রদায়)বলে বুঝানো হয়েছে ইহুদী, মুনাফিক ও মদীনার অন্যান্য বিধর্মীদেরকে। তারা রসুল স. এর সঙ্গে কৃত অংগীকার ভঙ্গ করেছিলো। রসুল স. তাবুক অভিযানে গমন করলে তারা তাঁকে বহিষ্কারের ষড়যন্ত্র করেছিলো এবং বলেছিলো— 'লা ইউখরি জান্নাল আআজ্জা মিন হাল আজাল্লা' (অবশ্যই সম্মানিতজন বহিষ্কার করবে অসম্মানিত-দেরকে) প্রথমদিকে তাদের বিরুদ্ধে রসুল স. যুদ্ধ ঘোষণা করেননি। কিন্তু তারা তাদের ষড়যন্ত্র চালিয়েই যাচ্ছিলো। শত্রুকে সাহায্য না করার প্রতিশ্রুতিদান সত্ত্বেও তারা মক্কার মুশরিকদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে যাচ্ছিলো। তাই তাদের বিরুদ্ধে আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ এসেছে— 'তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ও রসুলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্পবদ্ধ করেছে? তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।'

www.eelm.weebly.com

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো তাবুক যুদ্ধের পর। তখন মক্কা রসুল স. এর করতলগত। মক্কাবাসীরা তখন সকলেই মুসলমান। তাই আলোচ্য আয়াতে 'সেই সম্প্রদায়' বলে মদীনার মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে— এই অভিমতটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু মক্কাবাসীরাও এক সময় এ রকম ষড়যন্ত্র করেছিলো। তারা রসুল স.কে হত্যা করবে বলে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলো। তাই তিনি স. হিজরত করেছিলেন মদীনায়। আল্লাহ্পাক এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন— 'ওয়া ইখরাজু আহ্লিহি মিনহু আকবারো ইন্দাল্লহি (সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্র নিকট গুরুতর অপরাধ)।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না' কথাটির অর্থ হবে— তোমরা কি ওই সকল মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি লংঘন করেছিলো। অর্থাৎ সেই সম্প্রদায় বলে এখানে মক্কাবাসীদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিলো এবং দারুণ 'নাদওয়ায়' মিলিত হয়ে রসুল স. কে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো। দীর্ঘদিন ধরে রসুল স. তাদের প্রতি জানিয়ে চলেছিলেন দয়ার্দ্র আহ্বান। পেশ করেছিলেন কোরআন, জ্ঞান ও মোজেজার দলিল। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানে অটল।

এরপর বলা হয়েছে, 'তারাই প্রথমে তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।' এ কথার অর্থ— বিধর্মীরাই প্রথম যুদ্ধের অবতারণা করেছে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য বাহিনী নিরাপদে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করা সত্ত্বেও আবু জেহেল বলেছিলো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মোহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের ধ্বংস সাধন না করবো, ততক্ষণ প্রত্যাবর্তন করবো না। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, এখানে হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি লংঘনকারীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে— 'তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।' এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কাবিজয়ের পূর্বে। এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে হজরত ইবনে আব্বাসের কথাটিকে বিশুদ্ধ বলে মানতে হয়। কেননা তিনি বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবু সুফিয়ান ও তার সহযোগীদের সম্পর্কে। আর 'তবে যাদের সঙ্গে মসজিদুল হারামের সন্নিকটে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে' (আয়াত ৭) — এই আয়াতটিও অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কাবাসীদেরকে লক্ষ্য করে। নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, যতক্ষণ তারা চুক্তি রক্ষা করে চলবে ততক্ষণ তোমরাও চুক্তি রক্ষা করে চলবে। কিন্তু মক্কাবাসীরা ওই চুক্তি লংঘন করেছিলো প্রথমে। ওই চুক্তিভঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে— 'তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।'

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো?' বাক্যটি একটি অস্বীকৃতি জ্ঞাপক প্রশ্ন (ইসতেফ্হামে ইনকারী)। কথাটির অর্থ— তাদেরকে ভয় করা অনুচিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'বিশ্বাসী হলে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর; এটাই আল্লাহ্র নিকট শোভনীয়।' এ কথার অর্থ— হে বিশ্বাসীবৃন্দ! আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে জেহাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। সুতরাং তাঁর নির্দেশের অনানুগত্য থেকে আত্মরক্ষা করো। তোমরা না বিশ্বাসী? যে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে কি কখনো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় পায়? সে কি কখনো মনে করে যে, আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র অভিপ্রায়ের আনুকূল্য লাভ ব্যতিরেকে কেউ কারো কোনো কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ করতে সমর্থ হয়?

এভাবে উদ্বুদ্ধ করার পর পরবর্তী আয়াতে (১৪) জেহাদের জন্য নির্দ্বিধ নির্দেশ দেয়া হয়েছে এভাবে— 'তোমরা তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন ও বিশ্বাসীদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন।'

হজরত কাতাদা থেকে আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বনী খাজাআ সম্পর্কে। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দুশমন বনী বকরকে শাস্তি দিয়েছিলেন, লাঞ্ছিত করেছিলেন এবং বিজয়দানের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের হৃদয়কে করেছিলেন প্রশান্ত। হজরত ইকরামাও বলেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বনী খাজাআ সম্পর্কে। সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'ওয়া মু'মিনীন' (মুমিনদের) অর্থ বনী খাজাআ। তারা রসুল স. এর সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলো। বনী বকরকে পরাস্ত করতে পেরে তাদের হৃদয় হয়েছিলো প্রফুল্ল।

এর পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'এবং তাদের চিত্তের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর প্রতি ক্ষমাপরবশ হন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার কোনো কর্মই প্রজ্ঞার রহস্যময়তা থেকে মুক্ত নয়। 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর প্রতি ক্ষমাপরবশ হন'— এ কথাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে এক শুভ রহস্যময়তা। আল্লাহ্তায়ালা এ ঘোষণা দানের পর বহু সংখ্যক লোককে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্যদান করেছিলেন। ফলে আবু সুফিয়ান, ইকরামা এবং সুহাইল বিন ওমরসহ অনেক কুরায়েশ নেতা পেয়েছিলেন ইসলামের চিরন্তন আশ্রয়। এক বর্ণনানুসারে বাগবী লিখেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন রসুল স. ঘোষণা করেছিলেন, হত্যাকাণ্ড বন্ধ করো। কেবল বনী খাজাআকে অনুমতি দেয়া গেলো যে, তারা বনী বকরকে আসরের নামাজ পর্যন্ত হত্যা করতে পারবে।

www.eelm.weebly.com

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

❑ তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে এমনি ছাড়িয়া দিবেন, যখন তিনি এ পর্যন্ত প্রকাশ করেন নাই তোমাদিগের মধ্যে কে মুজাহিদ এবং কে আল্লাহ্, তাঁহার রসূল ও বিশ্বাসিগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণকারী নহে? তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

'আম হাসিবতুম আন তুত্রাকু ওয়ালাম্মা ইয়া'লামিল্লাহুল্ লাজীনা জাহাদু মিনকুম' (তোমরা কি মনে করো যে আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেবেন আর যখন জানবেন, তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে)। এখানে 'আম হাসিবতুম' কথাটির মাধ্যমে জেহাদের প্রতি অনুৎসাহী বিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে এখানে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে মুনাফিকদেরকে। 'আন তুত্রাকু' কথাটির উদ্দেশ্য— তোমাদেরকে জেহাদের কি হুকুম প্রদান করা হয়নি? অর্থাৎ জেহাদের হুকুম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যাকে সুস্পষ্ট না করে তোমাদেরকে কি এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? 'লাম্মা ইয়া'লামিল্লহু' কথাটির উদ্দেশ্য— এখন পর্যন্ত তো মুজাহিদগণের জেহাদের আমল বাস্তবায়িত হয়নি। এভাবে পূর্ণ বাক্যটির মাধ্যমে জেহাদের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়ালাম ইয়াত্তাখিজু মিন্ দুনিল্লাহি ওয়ালা রসুলিহি ওয়ালাল্ মু'মিনীনা ওয়ালীজাতান (যখন তিনি এ পর্যন্ত প্রকাশ করেননি তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ এবং কে আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীগণ ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণকারী নয়?)। এখানে 'ওয়ালাম ইয়াত্তাখিজু' (প্রকাশ করেননি) কথাটির সংযোগ রয়েছে 'জাহাদু' (জেহাদ) শব্দটির সঙ্গে। আর 'ওয়ালাম ইয়াত্তাখিজু' কথাটির কর্ম হয়েছে 'লাম্মা ই'য়ালা মিল্লাহু' (যখন আল্লাহ্ জানেন)। 'ওয়ালীজাতান' এর প্রকৃত অর্থ— অন্তরঙ্গ বন্ধু। 'লাম্মা ইয়ালাম' কথাটিতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা জেহাদের নেয়ামত প্রত্যাশী। রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহ্পাকের বিধান প্রতিষ্ঠা করবে। তাদেরকে কেউ সাহায্য করবে না। বরং বিরুদ্ধাচরণ করবে অনেকে। কিন্তু কেউ তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না (তারা হবে আল্লাহ্পাকের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ধন্য)। কিয়ামত পর্যন্ত

www.eelm.weebly.com

ক্রমাগত আবির্ভূত হতে থাকবে ওই সত্যপন্থীরা। হজরত মুয়াবিয়া থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা এবং হজরত ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন হাকেম। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। তাদের হাদিসের শেষ বাক্যটি ছিলো— আমার উম্মতের একদল সব সময় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এভাবে এসে পড়বে কিয়ামত।

'ওয়ালাম্মা ইয়া'লামিল্লাহুল্লাজীনা জাহাদু' কথাটির শাব্দিক অর্থ— যখন আল্লাহ্ এ কথা জানেন না যে তোমাদের মধ্যে কে যুদ্ধ করবে। এভাবে অর্থ করলে এ রকম একটি সন্দেহ প্রশ্রয় পেতে পারে যে, আল্লাহ্পাক কি তবে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা জানেন না? এ রকম সন্দেহ অপনোদনের জন্যই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়াল্লহু খবিরুন বিমা তা'মালুন' (তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত)।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধে বন্দী হয়ে আমার পিতা হজরত আব্বাস মদীনায় এলেন। সাহাবীগণের কেউ কেউ মুশরিকদের পক্ষাবলম্বন করার জন্য এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করার জন্য তাঁকে বিভিন্ন কথায় লজ্জা দিলেন। হজরত আলীও প্রয়োগ করলেন কিছু কর্কশ বাক্য। তিনি তখন বললেন, তোমরা আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করছো কেনো? আমার ভালো দিকের কোনো উল্লেখ তো তোমরা করলে না। হজরত আলী বললেন, আপনার মতো লোকের মধ্যে উত্তম বলে কি কোনো কিছু আছে? তিনি বললেন, তাতো আছেই। আমরা কাবাগৃহ সংস্কার করেছি। দায়িত্ব পালন করেছি কাবা শরীফের দ্বার রক্ষকের। হাজীদেরকে পানিও পান করাই আমরা। হজরত আব্বাসের (তিনি তখনও মুসলমান হননি) এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১৭

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ

بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚۖ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○

❒ অংশীবাদীরা যখন নিজেরাই নিজদিগের সত্যপ্রত্যাখ্যান স্বীকার করে তখন তাহারা আল্লাহের মস্‌জিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এমন হইতে পারে না। উহারা এমন যাহাদিগের সমস্ত কর্ম ব্যর্থ এবং উহারা অগ্নিতেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে।

মসজিদ হচ্ছে এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসীদের ইবাদতের স্থান। সুতরাং যারা অংশীবাদী তাদের মসজিদের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার নেই। তাই এখানে বলা হয়েছে— অংশীবাদীরা যখন নিজেরাই নিজেদের সত্য প্রত্যাখ্যান স্বীকার করে, তখন তারা আল্লাহ্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন হতে

www.eelm.weebly.com

পারে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে— 'মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ' কথাটির অর্থ কি? অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে 'মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ' অর্থ মসজিদে ইবাদত বন্দেগী করা। মসজিদ আবাদ বা রক্ষণাবেক্ষণের আসল অর্থ এটাই। অংশীবাদীরা এক আল্লাহ্‌র পূজারী নয়। তাই তারা মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণেরও উপযুক্ত নয়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ অর্থ— মসজিদের ইমারত নির্মাণ ও সংস্কার। একাজও করার অধিকার অংশীবাদীদের নেই। সুতরাং মসজিদ নির্মাণের অসিয়ত করে যদি কোনো অংশীবাদী মারা যায়, তবে তার অসিয়ত কার্যকর করা যাবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে মসজিদ আবাদ বা রক্ষণাবেক্ষণ করার অর্থ হবে, মসজিদে প্রবেশ করা এবং মসজিদের অভ্যন্তরে উপবেশন করা। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিরমিজি, ইবনে হাব্বান ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যদি তোমরা কাউকে মসজিদ আবাদ করতে দেখো, তবে তার মুমিন হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান কোরো। কেননা আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেছেন — 'ইন্নামা ইয়া'মুরু মাসাজিদাল্লাহি মান আমানা বিল্লাহি (যারা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাই মসজিদ সমূহ নির্মাণ করবে)।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে হাসান বলেছেন, এখানে বলে দেয়া হয়েছে, মসজিদুল হারামের সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান অথবা রক্ষণাবেক্ষণের কোনো অধিকার অংশীবাদীদের নেই। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'মাসাজিদাল্লাহি' কথাটির উদ্দেশ্য মাসজিদুল হারাম বা কাবার মসজিদ। শব্দটি বহুবচন বোধক হলেও এখানে অর্থ হবে একবচন বোধক। কারণ কাবার মসজিদ হচ্ছে সকল মসজিদের কেবলা। কাজেই এই একটি মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করার অর্থ সকল মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করা। হাসান এই অর্থটুকুকেই গ্রহণ করেছেন। ফাররা বলেছেন, এমতোক্ষেত্রে বহুবচন বোধক শব্দের এক বাচনিক, আবার কখনো একবচন বোধক শব্দের বহুবাচনিক অর্থ গ্রহণ করা হয়। যেমন কেউ যদি বলে, আমি খচ্চরগুলোর উপরে চড়ি। তবে তার কথার অর্থ হবে, আমি একটি খচ্চরে আরোহণ করি। আবার কেউ যদি বলে আমি দিনারের অধিকারী, তবে তার অর্থ হবে — আমি বহুসংখ্যক দিনারের অধিকারী।

'অংশীবাদীরা যখন নিজেরা নিজেদের সত্যপ্রত্যাখ্যান স্বীকার করে' — কথাটির মধ্যেই রয়েছে তাদের মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের অনুপযুক্ততা। তারা মূর্তি পূজা করবে, আবার মসজিদেরও রক্ষণাবেক্ষণ করবে— এ রকম তো হতেই পারে না। যে কোনো এক দিকে তাদেরকে আসতে হবে। বিশ্বাসের দিকে। অথবা অবিশ্বাসের দিকে।

হাসান বলেছেন, অবিশ্বাসীরা স্পষ্ট করে বলে না যে, আমরা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। কিন্তু তাদের প্রতিমা পূজার বিষয়টি তো প্রকাশ্য। তাই এখানে বলা হয়েছে তারা নিজেরাই নিজেদের সত্যপ্রত্যাখ্যান স্বীকার করে। জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তারা কাবা শরীফের প্রাঙ্গণে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা

www.eelm.weebly.com

করেছিলো। ওই প্রতিমাগুলোর পূজাও করতো তারা। বস্ত্র বিবর্জিত অবস্থায় তাওয়াফ করার পর প্রতিবারই তারা ওই মূর্তিগুলোর সামনে মস্তক অবনত করতো। সুতরাং তারা যে নিজেদেরকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী স্বীকার করতো, সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সুদ্দী বলেছেন, খৃষ্টানদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের বিষয়টিও সুবিদিত। কারণ তারা বলে, আমরা খৃষ্টান। ইহুদীরাও প্রকাশ্যে নিজেদেরকে ইহুদী বলে পরিচয় দেয়।

শেষে বলা হয়েছে — 'তারা এমন যাদের সমস্ত কর্ম ব্যর্থ এবং তারা অগ্নিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।' এ কথার অর্থ ওই সকল অংশীবাদী হাজীদেরকে পানি পান করালেও আল্লাহ্পাকের নিকট তা উত্তম কর্ম বলে বিবেচিত হবে না। কারণ এক আল্লাহ্র প্রতি নিষ্কলুষ বিশ্বাস তাদের নেই। আর আল্লাহ্র এককত্বের এই বিশ্বাস থেকে তারা বিচ্যুত বলেই চিরস্থায়ী অগ্নিবাস তাদের জন্য অবধারিত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১৮

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى
ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ○

❐ তাহারাই তো আল্লাহের মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে যাহারা বিশ্বাস করে আল্লাহে ও পরকালে এবং সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করে না, উহাদিগেরই সৎপথ প্রাপ্তির আশা আছে।

মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের পাঁচটি যোগ্যতা বর্ণিত হয়েছে এই আয়াতে সেগুলো হচ্ছে ১. আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস। ২. পরকালের প্রতি বিশ্বাস ৩. নামাজ প্রতিষ্ঠা ৪. জাকাত প্রদান এবং ৫. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকল কিছু থেকে নির্ভয় হয়ে যাওয়া (কারো ভয়ে আল্লাহ্র হুকুম পরিত্যাগ না করা)। রসুলের প্রতি বিশ্বাসের উল্লেখ এখানে নেই। এই বিশ্বাস নিহিত রয়েছে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে। কেননা, রসুলের প্রতি বিশ্বাস ব্যতিরেকে আল্লাহ্র প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাস অর্জিত হয় না। রসুলের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি সঠিক বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভবই নয়। আর যারা প্রকৃত বিশ্বাসী তাদের জ্ঞানে ও কর্মে বিশ্বাসের বাস্তব প্রতিফলন অবশ্যই হয়। এ রকম পূর্ণ বিশ্বাসীরাই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্য।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার আব্দুল কায়েসের অভিযাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে রসুল স. বললেন, তোমরা কি জানো এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রকৃত তত্ত্ব কি? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই সম্যক অবগত। তিনি স. বললেন— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহম্মদুর রসুলুল্লাহ্ এর সাক্ষ্য প্রদান।

www.eelm.weebly.com

মসজিদ আবাদ বা রক্ষণাবেক্ষণের অর্থ — মসজিদে নামাজ পাঠ, মসজিদে আল্লাহ্র জিকিরে মগ্ন থাকা, জ্ঞান চর্চা ও কোরআন পাঠ। হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা যদি ইবাদতের উদ্দেশ্যে কাউকে মসজিদের প্রতি অনুরক্ত দেখতে পাও, তবে এ কথা বোলো যে, সে বিশ্বাসী। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন — ইন্নামা ইয়া'মুরু মাসাজিদাল্লহি মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখির । তিরমিজি, দারেমী, বাগবী।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, তার প্রতিটি গমনের বিনিময়ে আল্লাহ্তায়ালা জান্নাতের মধ্যে তার জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করবেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. জানিয়েছেন, যেদিন আল্লাহ্র ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন ওই ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবে সাত ধরনের মানুষ। তার মধ্যে এক ধরনের মানুষ হচ্ছে ওই সকল লোক, যারা মসজিদ থেকে বের হয়ে এলেও তাদের মন পড়ে থাকে মসজিদে। বোখারী , মুসলিম।

হজরত সালমান ফারসী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার গৃহে উত্তমরূপে ওজু করার পর মসজিদে যায়, সে হয় আল্লাহ্র মেহমান। মেজবানের উপর তার এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তিনি তাকে সম্মান প্রদর্শন করবেন। তিবরানী, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর, বায়হাকী। হজরত আমর ইবনে মায়মুনার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ভূ-পৃষ্ঠের মসজিদসমূহ আল্লাহ্পাকের গৃহ। যারা ওই সকল গৃহে প্রবেশ করবে তাদেরকে তিনি সম্মানিত করবেন। বায়হাকী, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর।

মসজিদ আবাদ বা রক্ষণাবেক্ষণের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, মসজিদ ভবন নির্মাণ করা, মসজিদকে সুসজ্জিত করা এবং মসজিদ ভবনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা। আর মসজিদকে ক্রয় বিক্রয় ও পার্থিব আলোচনা থেকে মুক্ত রাখা। মাহমুদ বিন লবীদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওসমান ইবনে আফফান তাঁর খেলাফতের সময় একটি মসজিদ নির্মাণ করতে চাইলেন। কিন্তু লোকেরা তাঁর ওই পরিকল্পনাকে পছন্দ করলো না (কেননা মদীনায় রয়েছে রসুল স. কর্তৃক নির্মিত পবিত্র মসজিদ)। হজরত ওসমান তখন বললেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মসজিদ গৃহ নির্মাণ করবে, আল্লাহ্পাক তাঁর জন্য গৃহ নির্মাণ করবেন জান্নাতে। অপর বর্ণনায় এসেছে, ওই মসজিদের অনুরূপ গৃহ তার জন্য আল্লাহ্পাক নির্মাণ করবেন বেহেশতে। আর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তোষ সাধনের জন্য মসজিদ প্রস্তুত করবে, তার জন্য আল্লাহ্পাক জান্নাতে অনুরূপ স্থান প্রস্তুত করবেন। আহমদ, বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে মাজা, বাগবী। ইবনে মাজা এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আলী থেকে।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে যথাসূত্রে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কবুতরের বাসার মতো অনুল্লেখ্য কুটিরসদৃশ মসজিদও তৈরী করবে, আল্লাহ্পাক তার জন্যও জান্নাতে গৃহ তৈরী করবেন। হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী কর্তৃক যথাসূত্রসম্বলিত বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদ তৈরী করবে, আল্লাহ্পাক তার জন্য জান্নাতে ওই মসজিদের চেয়েও বৃহৎ গৃহ নির্মাণ করবেন। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কাউকে মসজিদের মধ্যে তার হারানো উট অনুসন্ধান করতে দেখলে তাকে বোলো, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তুমি যেনো তোমার উটের সন্ধান না পাও। কেননা এ রকম কাজের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি। মুসলিম।

জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ প্রদান করেছেন, ঘরের মধ্যে মসজিদ (নামাজের স্থান) নির্ধারণ করে নিয়ো এবং ওই স্থানকে পবিত্র ও সুবাসিত রেখো। আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত ওমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. মসজিদে কল্পকথার আসর, ক্রয় বিক্রয় এবং নামাজের পূর্বে গোল হয়ে বসাকে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ, তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, যদি তোমরা কাউকে মসজিদের অভ্যন্তরে ক্রয় বিক্রয় করতে দেখো, তবে তাকে বলে দিয়ো, আল্লাহ্ তোমার এই ব্যবসায় কল্যাণ প্রদান করবেন না। আর যদি কাউকে মসজিদের ভিতর তার হারানো উট খুঁজতে দেখো, তবে তাকে বোলো আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তুমি তোমার হারানো উট ফিরে পাবে না। তিরমিজি, দারেমী।

শেষে বলা হয়েছে, উলাইকা আঁইইয়া কুনু মিনাল মুহ্তাদীন (তাদেরই সৎপথ প্রাপ্তির আশা আছে) 'আল মুহ্তাদীন' অর্থ সৎপথ প্রাপ্তি বা আল্লাহ্তায়ালার আনুগত্য। এই আনুগত্যই বেহেশ্ত লাভের মাধ্যম বা অবলম্বন। এখানে বলা হয়েছে সৎপথ প্রাপ্তির আশা আছে। এ রকম বলার কারণ এই— ১. অবিশ্বাসীদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, তাদের অননুমোদিত আমলের জন্য তারা যেনো কল্যাণ লাভের আশা না করে। তাদের আমল বিশুদ্ধ বিশ্বাসনির্ভর নয়। তাই ওই সকল আমলের মাধ্যমে মুক্তি লাভ অসম্ভব। ২. পক্ষান্তরে বিশ্বাসীরা বিশুদ্ধ আমল করলেও তারা যেনো মুক্তি লাভকে নিশ্চিত মনে না করে। আমলের অহমিকাকে প্রশ্রয় না দেয়। বরং ভয় ও আশার মাধ্যমে সর্বক্ষণ আল্লাহ্পাকের দয়ার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে।

হজরত আলী থেকে আবু নাঈম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বনী ইসরাইলের এক নবীর প্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করলেন, হে আমার নবী! তোমার একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকে বলে দাও, তারা যেনো তাদের আমলের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত না হয়ে যায়। আমি কিয়ামতের দিন যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবো। (কোনো আমল সে শাস্তিকে রোধ করতে পারবে না)। আর যারা আমার অবাধ্য

www.eelm.weebly.com

তাদেরকে বলে দাও তারা যেনো নিজেদেরকে ধ্বংসে নিপতিত না করে (নিরাশ না হয়) আমি বড় বড় অপরাধ মার্জনা করবো। কারো পরোয়া করবো না। আল্লাহ্‌পাকই অধিক জ্ঞাত।

মুসলিম ইবনে হাব্বান এবং আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত নোমান বিন বশীর বলেছেন, রসুল স. মসজিদের মিম্বরে বসেছিলেন। সেখানে উপস্থিত সাহাবীগণের একজন বললেন, আমি মনে করি হাজীদেরকে পানি পান করানোই সর্বোত্তম আমল। আরেকজন বললেন সবচেয়ে উত্তম আমল হচ্ছে কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণ। অন্য আরেকজন বললেন, সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করা। রসুল স. বলে উঠলেন, চুপ করো তোমরা। ঘটনাটি ঘটেছিলো জুমআর দিন। হজরত ওমর তখন বলেছিলেন, দাঁড়াও। নামাজের পরে তোমাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে রসুল স.কে জিজ্ঞেস করবো। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১৯, ২০, ২১, ২২

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝
يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ۝
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

❒ যাহারা হাজীদিগের পানি সরবরাহ করে এবং মসজিদুল-হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করে তোমরা কি তাহাদিগকে উহাদিগের সমজ্ঞান কর যাহারা আল্লাহে ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহের পথে সংগ্রাম করে? আল্লাহের নিকট উহারা সমতুল্য নহে। আল্লাহ্‌ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

❒ আল্লাহের নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাহারা যাহারা বিশ্বাস করে, দ্বীনের জন্য গৃহত্যাগ করে এবং সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহের পথে সংগ্রাম করে; উহারাই সফলকাম।

www.eelm.weebly.com

❐ উহাদিগের প্রতিপালক উহাদিগকে সংবাদ দিতেছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের যেখানে আছে তাহাদিগের জন্য স্থায়ী সুখসমৃদ্ধি।

❐ সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। আল্লাহের নিকটই আছে মহা পুরস্কার ।

ইবনে সিরীন সূত্রে ফারইয়াবির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী মক্কায় উপস্থিত হয়ে হজরত আব্বাসকে বললেন, হে আমার পিতৃব্য। আপনি হিজরত করে মদীনায় রসুল স. এর সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন না কেনো (সেখানে গেলে আপনি লাভ করতেন দ্বীন ও দুনিয়ার সম্পদ)। হজরত আব্বাস বললেন, আমি মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও তোরণপ্রহরী। তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বদর যুদ্ধে বন্দী হয়ে আমার পিতা আব্বাস মদীনায় এলেন। আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা ইসলাম, হিজরত ও জেহাদে যতই অগ্রগামী হওনা কেনো, মনে রেখো, আমাদের মর্যাদাও কম নয়। আমরা মসজিদুল হারামের দেখা-শোনা করি। হাজীদেরকে পানি পান করাই। তাঁর এ কথার প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতের মর্মার্থ এই— অংশীবাদীদের কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণ, হাজীদেরকে পানি পান করানো ইত্যাদি আমল নিরর্থক। পক্ষান্তরে ইমানদার হয়ে রসুল স. এর সাহচর্য অবলম্বন এবং আল্লাহ্র পথে জেহাদ অনেক উত্তম।

বাগবী লিখেছেন হাসান, শা'বী ও মোহম্মদ বিন কা'ব কারাজী বলেছেন, অনুরূপ মোহাম্মদ বিন কা'ব থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আলী, হজরত আব্বাস এবং হজরত তালহা বিন শায়বার কারণে। একবার তাঁরা দর্পভরে তাঁদের আপনাপন কৃতিত্ব প্রকাশ করলেন। তালহা বললেন, আমি কাবা শরীফের তত্ত্বাবধায়ক ও কুঞ্জিরক্ষক। আব্বাস বললেন, আমি পালন করি হাজীদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্ব। হজরত আলী বললেন, কি যে বলো তোমরা। আমি কেবলামুখী হয়ে ছয় বছর নামাজ পড়েছি। আল্লাহ্র পথে জেহাদ করেছি। তাঁদের ওই কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

'সিক্বাইয়াহ্' অর্থ হাজীদের পানি সরবরাহ। শব্দটি এসেছে 'সাক্বা' থেকে। 'ইমারা' অর্থ মসজিদুল-হারামের রক্ষণাবেক্ষণ। শব্দটি এসেছে 'আমারা' থেকে। আজাআলতুম (সমজ্ঞান করো) কথাটির মাধ্যমে এখানে উত্থাপিত হয়েছে একটি অস্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন। বলা হয়েছে— 'যারা হাজীদের পানি সরবরাহ করে এবং মসজিদুল-হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করে তোমরা কি তাদেরকে ওই সকল লোকের সমজ্ঞান করো, যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে?' এ প্রশ্নটির মাধ্যমে এ কথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মু'মিন ও মুশরিক

www.eelm.weebly.com

কখনো এক নয়। তাদের আমল সমূহও তাই তাদের একে অপরের সঙ্গে তুলনীয় নয়। ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিস এই ব্যাখ্যাটির অনুকূলে। কারণ সেখানে বলা হয়েছে, মু'মিন ও মুশরিকের (আব্বাস, তালহা ও হজরত আলীর) বাদানুবাদকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। কিন্তু হজরত নোমান বিন বশীরের বর্ণনায় এসেছে, কয়েকজন সাহাবীর বাদানুবাদকে কেন্দ্র করে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এ কথা মেনে নিলে আরেকটি সমস্যার উদ্ভব হয়। সমস্যাটি হচ্ছে মসজিদ আবাদকারীরা (রক্ষণাবেক্ষণকারীরা) তখন হয়ে পড়েন মুজাহিদ অপেক্ষা গৌণ। কেননা এখানে জেহাদকে সর্বোত্তম আমল বলা হয়েছে। অথচ প্রকৃত কথা এই যে, জেহাদ অপেক্ষা জিকির উত্তম। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালার আযাব থেকে বাঁচবার অবলম্বন হিসেবে জিকিরের চেয়ে উত্তম কিছু নেই। হাদিসটি হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম মালেক, তিরমিজি এবং ইবনে মাজা। বায়হাকী তাঁর 'কবীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে। বায়হাকীর বর্ণনার শেষ দিকে উল্লেখিত হয়েছে— সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তাহলে জেহাদ? (জেহাদের চেয়েও কি জিকির উত্তম)। রসুল স. বললেন হ্যাঁ, জেহাদ করতে করতে তরবারী ভেঙে ফেললেও। হজরত আবু দারদার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বললেন, আমি কি বলবো, আল্লাহ্র নিকট তোমাদের কোন আমল সর্বোত্তম, পবিত্রতম, অধিকতর মর্যাদামণ্ডিত, আল্লাহ্র রাস্তায় স্বর্ণ রৌপ্য ব্যয় অপেক্ষা উচ্চতম, জেহাদে শত্রুর মস্তক ছেদন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! অবশ্যই বলুন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র জিকির। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা। ইমাম মালেকও হাদিসটি বর্ননা করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর সূত্র সমাপ্ত করেছেন হজরত আবু দারদা পর্যন্ত। রসুল স. পর্যন্ত একে সংযুক্ত করেননি।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স.কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাকের নিকট কোন ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাশালী ও উৎকৃষ্ট বিবেচিত হবেন? তিনি স. বললেন, যে আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে এবং অন্যকে অধিক স্মরণ করতে বলে। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! তবে কি জিকিরকারী মুজাহিদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। জেহাদ করতে করতে তলোয়ার টুকরো টুকরো করে ফেললেও এবং শত্রুর রক্তে তলোয়ার রঞ্জিত করলেও জেহাদকারীর চেয়ে জিকিরকারী শ্রেষ্ঠ। আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন হাদিসটি গরীব (দুর্লভ)।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র নিকট তারা সমতুল নয়। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।' এ কথার অর্থ— অংশীবাদীরা হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব পালন করলেও এবং মসজিদুল

www.eelm.weebly.com

হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করলেও কিছুতেই আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং আল্লাহ্র পথে সংগ্রামকারীদের সমতুল্য নয়। তারা সীমালংঘনকারী। আর সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে আল্লাহ্তায়ালা কখনো সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে আজ্জলিমীনা (সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়) বলে অংশীবাদীদেরকে বুঝানো হয়নি, বুঝানো হয়েছে ওই সকল লোককে, যারা বিভ্রান্ত করে অংশীবাদী ও মুসলমানদেরকে। অর্থাৎ মুনাফিকদেরকে লক্ষ্য করে এখানে এ কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

জমজমের পানি পান করা ও পান করানোর ঘটনা ঃ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী প্রমূখ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার জমজম কূপের পাশে উপস্থিত হলেন এবং পানি পান করতে চাইলেন। হজরত আব্বাস তার পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন, ফজল! তোমার মায়ের নিকট থেকে রসুল স. এর জন্য পানি এনে দাও। তিনি স. বললেন, আমি এখানেই পানি পান করবো। হজরত আব্বাস বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এখানে তো সাধারণ জনতা পানি পান করে। রসুল স. বললেন, আমিও এখান থেকে পান করবো। তখন সেখানে কিছু লোক পানি ওঠানো ও পানি পরিবেশনের কাজ করছিলো। তাদেরকে লক্ষ্য করে রসুল স. বললেন, তোমরা তোমাদের কাজ করতে থাকো। উত্তম কাজে নিয়োজিত রয়েছো তোমরা। এরপর বললেন, পানি প্রত্যাশী অনেক মানুষের ভিড়ে যদি তোমরা পেরেশান হয়ে যাও, তবে আমিও হবো তোমাদের কাজের সহযোগী। পানি তোলার রশি ও পাত্র নিঃসংকোচে তুলে নিবো আপন স্কন্ধে। এ কথা বলে তিনি স. আপন স্কন্ধদেশের প্রতি ইঙ্গিত করলেন।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, বকর বিন আবদুল্লাহ্ মাজানী বলেছেন, আমি একবার হজরত ইবনে আব্বাসের পাশে বসেছিলাম। এমন সময় এক আরববাসী এসে বললো, হে ইবনে আব্বাস! তোমার পিতৃব্য পুত্র তো দুধ ও মধু পান করাতেন। তোমরা পান করাচ্ছো সিরকা। এটা কি তোমাদের দরিদ্রতার নিদর্শন, না কৃপণতার? হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্ (সকল প্রশংসা আল্লাহ্র)। আমরা দরিদ্র বা কৃপণ কোনোটাই নই। রসুল স. স্বয়ং জমজম কূপের পাশে উপস্থিত হয়ে পানি সরবরাহকারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, উত্তম কাজে নিয়োজিত রয়েছো তোমরা। তাই আমরাও পছন্দ করি এই উত্তম কাজকে।

পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তারা যারা বিশ্বাস করে, দ্বীনের জন্য গৃহ ত্যাগ করে এবং সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে; তারাই সফলকাম।' এ কথার অর্থ— যারা অহমিকার

www.eelm.weebly.com

মনোভাব নিয়ে মসজিদুল-হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তারা নয়, আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ওই সকল লোক যারা বিশ্বাসী, হিজরতকারী এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী, তারাই সফলকাম।

এর পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সংবাদ দিচ্ছেন আপন দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের— যেখানে রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ ও সমৃদ্ধি।'

এর পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে,— 'সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্‌র নিকটই রয়েছে মহাপুরস্কার' (খলিদীনা ফিহা আবাদা ইন্নাল্লহা ই'নদাহূ আজ্‌রুন আ'জীম)। এখানে 'খুলুদ' শব্দের অর্থ দীর্ঘদিন। 'আবাদা' অর্থ অনন্তকাল। এভাবে 'খলিদিনা ফিহা আবাদা' বলে বুঝানো হয়েছে— উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিশ্বাসীদের বেহেশতবাস হবে চিরস্থায়ী।

'আজ্‌রুন আ'জীম' অর্থ— মহাপুরস্কার। অর্থাৎ ইমানদারেরা তাদের পুণ্যকর্মের বিনিময়ে যে পুরস্কারের যোগ্য, তার চেয়েও অধিক পুরস্কার দেয়া হবে তাদেরকে। এ রকম অর্থ হতে পারে যে, দুনিয়ার নেয়ামতের মোকাবিলায় আখেরাতের নেয়ামত হবে অতি বৃহৎ। তাই এখানে বলা হয়েছে— আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ২৩

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ○

❒ হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগের পিতা এবং ভ্রাতা যদি বিশ্বাস অপেক্ষা সত্যপ্রত্যাখ্যানকে শ্রেয় জ্ঞান করে তবে উহাদিগকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিওনা। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে অভিভাবক করে তাহারাই সীমালংঘনকারী।

বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াতের প্রসঙ্গ উপরে বর্ণিত আয়াতগুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তালহা ও আব্বাস যখন তাদের কৃতিত্ব জাহের করেছিলো এবং আব্বাস অস্বীকার করেছিলো হিজরতের ফযীলতকে, তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

www.eelm.weebly.com

আবু সালেহের সূত্রে কালাবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. মুসলমানদেরকে হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু মুসলমানদের অমুসলমান আত্মীয়স্বজনেরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বললো, তোমরা আমাদেরকে ছেড়ে যেয়ো না। তাদের ওই অনুনয় প্রভাব বিস্তার করলো কারো কারো উপর। তারা তখন পরিবার পরিজনের সঙ্গে বসবাস করাকেই উত্তম জ্ঞান করলো। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

মুকাতিল বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই লোকদেরকে কেন্দ্র করে যারা হিজরত করা সত্ত্বেও ফিরে গিয়েছিলো মক্কায়। তারা ছিলেন নয়জন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা কখনো তোমাদের পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য স্বজনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না, যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে, শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেছে বিশ্বাস অপেক্ষা সত্যপ্রত্যাখ্যানকে। সুতরাং যারা হিজরত ও জেহাদ পরিত্যাগ করে তাদেরকে সুহৃদ মনে করবে, তারা অবশ্যই সীমালংঘনকারী।

জুলুম শব্দের আভিধানিক অর্থ— কোনো কিছুকে অপাত্রে স্থাপন করা। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যেহেতু অন্তরঙ্গতা স্থাপনের যথার্থ পাত্র নয়, তাই তাদেরকে অন্তরঙ্গ মনে করা অবশ্যই জুলুম (সীমালংঘন)।

পরবর্তী আয়াতেও এই সীমালংঘনের বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অধিকতর স্পষ্ট, বলিষ্ঠ ও সতর্কতামূলক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এভাবে—

সুরা তওবা ঃ আয়াত ২৪

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

❑ বল, 'তোমাদিগের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁহার রসূল এবং আল্লাহের পথে সংগ্রাম করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদিগের পিতা, তোমাদিগের সন্তান, তোমাদিগের ভ্রাতা, তোমাদিগের পত্নী, তোমাদিগের স্বগোষ্ঠী, তোমাদিগের অর্জিত সম্পদ, তোমাদিগের ব্যবসা-বাণিজ্য যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদিগের বাসস্থান যাহা তোমরা ভালবাস; তবে অপেক্ষা কর আল্লাহের বিধান আসা পর্যন্ত।' আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

---

www.eelm.weebly.com

'আবাউকুম' অর্থ তোমাদের পিতা। 'আবনাউকুম' অর্থ তোমাদের সন্তান। 'ইখ্ওয়ানুকুম' অর্থ তোমাদের ভ্রাতা। 'আজ্ওয়াজুকুম' অর্থ তোমাদের পত্নী। 'আ'শীরাতুকুম' অর্থ তোমাদের স্বগোষ্ঠী। আমওয়ালুনিক্ব তারাফ্তুমুহা অর্থ তোমাদের অর্জিত সম্পদ। 'তিজারাতুন তাখ্শাওনা কাসাদাহা ওয়ামাসাকিনু' অর্থ তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যার মন্দা পড়ার আশংকা করো। 'ওয়া মাসাকিনু তার-দ্বাওনাহা আহাব্বা ইলাইকুম' অর্থ তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা ভালোবাসো। আয়াতে বলা হয়েছে, উল্লেখিত বিষয়সমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং আল্লাহ্র পথে জেহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয়, তবে আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। ইমানদারদের প্রতি এখানে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। আতা বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো' কথাটির অর্থ হবে— আল্লাহ্র আযাব আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। পৃথিবীতে অথবা পরবর্তী পৃথিবীতে। মুজাহিদ ও মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে এখানে— মক্কা বিজয় পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

শেষে বলা হয়েছে— ওয়াল্লহু লা ইয়াহ্দিল ক্বওমাল ফাসিক্বীন (আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না)। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে সত্যত্যাগী সম্প্রদায় বলা হয়েছে তাদেরকে, যারা উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহের আকর্ষণে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিধান পরিত্যাগ করে। উপরে বর্ণিত বিষয় সমূহের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ দূর করার কথা এখানে বলা হয়নি। দূর করতে বলা হয়েছে শরিয়তের বিধান বিরোধী অনুরাগকে।

আমি বলি, স্বভাবগত আকর্ষণকে শরিয়তের পূর্ণ অনুগত করাই পরিপূর্ণ ইমানের চিহ্ন। পূর্ণ ইমানদারের স্বভাবে কখনো শরিয়ত বিরোধী অনুরাগ থাকে না। রসুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তোষের জন্য ভালোবাসে এবং আল্লাহ্র সন্তোষের জন্যই শত্রুতা করে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই দান করে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই দান বন্ধ করে, সে ব্যক্তিই পূর্ণ ইমানদার। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাদের ইমান পরিপূর্ণ। হজরত আবু উমামা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ এবং হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে তিরমিজি। হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউই মুমিন হতে পারবে না, যদি আমি তার নিকট তার পিতা, পুত্র ও সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হই। এখানে 'মুমিন হতে পারবে না' কথাটির অর্থ হবে— পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।

www.eelm.weebly.com

জ্ঞাতব্যঃ হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হিশাম বলেছেন, আমি রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তিনি স. তখন হজরত ওমরের হাত ধরে রেখেছিলেন। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আমার নিকট আমার জীবন ব্যতীত অন্য সকল কিছু থেকে প্রিয়। রসুল স. বললেন, ওই সময় পর্যন্ত তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার জীবনাপেক্ষা অধিক প্রিয় হই।

হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তিন ধরনের লোক ইমানের স্বাদ পেয়েছে — ১. যাদের নিকট আল্লাহ্ ও রসুল অন্য সকল কিছু থেকে অধিকতর প্রিয়। ২. যারা আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসে এবং আল্লাহ্র জন্যই শত্রুতা করে। ৩. যারা অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে আশ্রয় গ্রহণ করার পর পুনরায় অবিশ্বাসে প্রত্যাবর্তন অপেক্ষা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয়াকে মনে করে অধিকতর শ্রেয়ঃ। এখানে ইমানের স্বাদ পাওয়া কথাটির অর্থ ইমানের সৌন্দর্যের সাক্ষাত পাওয়া— যেমন, নিসর্গের সৌন্দর্য দর্শন মনো-মুগ্ধকর ও আস্বাদ্য। পবিত্র অন্তর ও আলোকিত প্রবৃত্তির অধিকারী ব্যক্তিত্বের সংসর্গধন্য হলেই কেবল এ রকম আস্বাদ লাভ হতে পারে। আলোচ্য আয়াত এবং এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিস সমূহের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির জন্য মারেফতের সাধক পীর মাশায়েখগণের আনুগত্যময় সংসর্গ অত্যাবশ্যক (ফরজ)। তাই এখানে 'আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না' কথাটির অর্থ হবে আল্লাহ্পাক ফাসেকদেরকে তাঁর মারেফতের পথ প্রদর্শন করেন না। বায়যাবী লিখেছেন, এই আয়াতে উচ্চারিত হয়েছে কঠিন হুঁশিয়ারী। আয়াতের বক্তব্যে প্রমাণিত হয়, যাদের নিকট সকল কিছু অপেক্ষা আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল ও জেহাদ অধিকতর প্রিয় না হয় তারা খুব কমই রক্ষা পাবে এই হুঁশিয়ারী থেকে। আমি বলি, সুফিয়ানে কেরাম এই হুঁশিয়ারীর আওতা থেকে মুক্ত। মাদারেক রচয়িতা লিখেছেন, যে সকল লোকের বিশ্বাস অস্বচ্ছ ও দুর্বল, তাদের মন্দ স্বভাবের কথাই বিবৃত হয়েছে এই আয়াতে। বাস্তবে দেখা যায় অনেক ব্যক্তি ইবাদত বন্দেগী করলেও স্বজন, সন্তান ও সম্পদের চেয়ে ধর্মকে অধিক ভালোবাসতে পারে না। আমি বলি, যারা আল্লাহ্পাকের মারেফাত লাভ করেছেন তাদের ধারণা, চিন্তা ও আচরণ অন্য রকম। তাঁদের পবিত্র মানসের পরিচয় বিধৃত হয়েছে নিম্নে বর্ণিত কবিতাটিতে —

আঁকাস তেরা শানাখ্ত্ জান রাঁচে কুনাদ
ফারজন্দ ওয়া এয়াল ওয়াখাঁ ওয়া মাঁ রাচে কুনাদ
দেওয়ানা কুনি হর দোজাহানাশ বখশি
দেওয়ানায়ে তু হর দোজাঁহা রাচে কুনাদ

—১৭

www.eelm.weebly.com

অর্থঃ যারা তোমাকে পেয়েছে, তারা সন্তান-সন্ততি ও বংশ পরিচয় নিয়ে কি করবে? তুমি তো তাদেরকে তোমার প্রেমে আত্মহারা করে দিয়েছো। দান করেছো দুই জাহান (দুনিয়া ও আখেরাত)। কিন্তু তারা দুই জাহান নিয়েই বা কি করবে?

সুরা তওবা ঃ আয়াত ২৫

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۚ

❐ আল্লাহ্ তোমাদিগকে তো সাহায্য করিয়াছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হোনাইনের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদিগের সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে উৎফুল্ল করিয়াছিল কিন্তু উহা তোমাদিগের কোন কাজে আসে নাই এবং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্বেও তোমাদিগের জন্য সংকুচিত হইয়াছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে।

হুনায়েন যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বিবৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এখানে 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তো সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে' কথাটির অর্থ হবে ইতোপূর্বে আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বদর, কাইনুকা, খন্দক, নাজির, কুরায়জা, হুদাইবিয়া ও খায়বর যুদ্ধে এবং মক্কা বিজয়ের সময়।

এরপর বলা হয়েছে— 'হুনায়েন যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিলো কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিলো ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।' এ কথার অর্থ— হুনায়েন যুদ্ধে শত্রুদলের সৈন্য অপেক্ষা তোমাদের সৈন্য ছিলো অনেক বেশী। সে কারণে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলে তোমরা। নির্ভর করেছিলে সংখ্যাধিক্যের উপর। এ কথাটি ভুলে গিয়েছিলে যে, বিজয় কখনো সংখ্যাধিক্যনির্ভর নয়, আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যনির্ভর। তাই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। শত্রুর সংঘবদ্ধ আক্রমণের কারণে বিশাল পৃথিবী সংকুচিত মনে হয়েছিলো তোমাদের কাছে। ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ব্যতিরেকে অন্য কোনো উপায় তোমরা পাওনি।

হুনায়েন যুদ্ধে মুসলমানদের সেনা সংখ্যা ছিলো বারো হাজার অথবা চৌদ্দ হাজার। আর মুশরিকদের সৈন্য ছিলো চার হাজার। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী প্রমুখ অবশ্য বলেছেন, হুনায়েনে বিধর্মীদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো মুসলমানদের দ্বিগুণ। তাদের অভিমতানুসারে বলতে হয়, মুশরিকদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো চব্বিশ অথবা আটাশ হাজার।

www.eelm.weebly.com

মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী এবং জুলমাজাজের নিকটবর্তী একটি উপত্যকার নাম হুনায়েন। মক্কা থেকে স্থানটির দূরত্ব দশ মাইলের কিছু বেশী। সেখানে হাওয়াজেন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিলো রসুল স.কে। হাওয়াজেন গোত্রের ছিলো বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা।। বনী সাক্বিফও ছিলো তাদের একটি শাখা গোত্র।

হুনায়েন যুদ্ধঃ যুদ্ধের ইতিহাস রচয়িতাগণ লিখেছেন, মক্কা বিজয় সম্পন্ন হলো অষ্টম হিজরীর রমজান মাসে। ভীত হলো হাওয়াজেন গোত্রের নেতৃবৃন্দ। ভাবলো, এবার হয়তো মুসলমানেরা তাদের উপর আক্রমণ করে বসবে। এ কথাও ভাবতে লাগলো যে, মনে হয় মোহাম্মদ স. আর যুদ্ধ বিগ্রহ করবেন না। বরং আমাদেরই যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। চিরতরে থামিয়ে দেয়া উচিত মুসলমানদের বিজয়াভিলাষ। এ সকল কথা ভেবে তারা নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ শুরু করে দিলো। মালেক বিন আউফ বিন সা'দ সকল নেতাকে একত্র করলো (তিনি অবশ্য পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন)। হাওয়াজেনদের সঙ্গে একতাবদ্ধ হলো বনী সাক্বিফ, নজর এবং জাশাম। তাদের সঙ্গে যোগ দিলো বনী হেলালের কিছু লোক। তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো একশতের কম। যোগদান থেকে বিরত রইলো কায়েস বিন গইলান, বনী কা'ব এবং বনী কিলাব। তারা যোগদান থেকে বিরত হয়েছিলো ইবনে আবী বারআর কথায়। সে বলেছিলো, পূর্ব ও পশ্চিমের যে কেউ মোহাম্মদের বিরুদ্ধাচরণ করলে অবশ্যই পরাজিত হবে। সুতরাং তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ যুক্তিযুক্ত নয়।

দুরাইদ্‌বিনিস্‌ সামাহ্‌ ছিলো বনী জাশামের এক বয়োবৃদ্ধ নেতা। তার বয়স হয়েছিলো একশত বিশ অথবা একশত ষাট বছর। সকলে মিলে তাকে যুদ্ধের অধিনায়ক নির্বাচন করলো। দুরাইদ বললো, আমি দেখতে পাই না। কোনো বাহনেও ভালোভাবে বসতে পারি না। তোমরা যখন আমাকে অধিনায়ক নির্বাচন করেছো, তখন আমি নিশ্চয় যাবো। কিন্তু শর্ত এই যে, তোমরা আমার নির্দেশের পরিপন্থী কোনো কিছু করতে পারবে না। যদি সেরকম কিছু করতে চাও তবে এখনই বলো— আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো না। বনী হাওয়াজেনের ত্রিশ বৎসর বয়সের যুবক নেতা মালেক বিন আউফ বললো, ঠিক আছে। আমরা আপনার নির্দেশ বিরোধী কিছু করবো না।

মালেক নির্দেশ দিয়েছিলো, প্রত্যেকে তাদের স্ত্রী,পুত্র, কন্যা ও সম্পদসহ একত্র হবে আওতাস নামক স্থানে। সমবেত হতে শুরু করলো সকলে। দুরাইদ সেখানে গিয়েই বললো, কি হে আমি যে শিশুদের কান্না এবং উট, গাধা, বকরী ও গাভীর চিৎকার শুনতে পাচ্ছি? লোকেরা বললো, মালেক আমাদেরকে এ রকমই নির্দেশ দিয়েছে। দুরাইদ বললো, মালেক, সকলকে এভাবে একত্র করেছো

www.eelm.weebly.com

কেনো? মালেক বললো, আমার ধারণা, এভাবে সকলে স্ত্রী, পুত্র পরিজন ও পশুপাল নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে একত্রিত হলে কারো আর পিছু টান থাকবে না। পরিবার পরিজন ও সম্পদ রক্ষার জন্য সকলে যুদ্ধ করবে প্রাণপণে। দুরাইদ বললো, নারী, শিশু ও পশুপালের সঙ্গে যুদ্ধের কি সম্পর্ক। এরপর করতলের উপর করাঘাত করে বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, যদি তোমরা বিজয়ী হও, তবে পুরুষদের তলোয়ার ও বল্লমের মাধ্যমেই বিজয়ী হবে। বালক, বালিকা ও নারীর মাধ্যমে যুদ্ধ বিজয় অসম্ভব। আর যদি তোমরা পরাজিত হও তবে, তোমাদের পরিবার পরিজনের সকল সদস্য ও পশুপাল লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে শত্রুরা। তখন প্রাণে রক্ষা পেলেও তোমরা হয়ে পড়বে নিঃস্ব। অতএব, মহিলা, শিশু ও পশুপালকে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দাও। এরপর পদব্রজে অথবা অশ্বারোহী হয়ে প্রস্তুত হও যুদ্ধের জন্য। যদি বিজয়ী হও তবে তোমাদের পরিবার পরিজন ও পশুপাল তো রইলোই। আর যদি পরাজিত হও তবে তোমাদের পরিবার পরিজন পশুপাল রইলো নিরাপদ। মালেক বললো, আমি এই নির্দেশ মানি না। আপনি অতিবৃদ্ধ। তাই আপনার বুদ্ধিও জরাগ্রস্ত। দুরাইদ রাগান্বিত হলো। বললো, হে হাওয়াজেন সম্প্রদায়! বনী কা'ব এবং বনী কিলাব কোথায়? লোকেরা বললো, তারা আসেনি। দুরাইদ বললো, তাহলে তো শক্তি ও শৌর্যবীর্য অনুপস্থিত। যদি তোমরা বিজয়ী হতে, তবে নিশ্চয় বনী কা'ব ও বনী কিলাব অনুপস্থিত থাকতো না। ওহে হাওয়াজেন গোত্র! ফিরে যাও। বনী কা'ব ও বনী কিলাব যা করেছে, তোমরাও তাই করো। লোকেরা দুরাইদের এ প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করলো। দুরাইদ বললো, ঠিক আছে, এবার বলো, কে কে এসেছো তোমরা? লোকেরা বললো, আমেরের দুই পুত্র— ওমর ও আওফ। দুরাইদ বললো, এরা তো বনী আমেরের দুর্বল ব্যক্তিত্ব। এদের মাধ্যমে কোনো সফলতা আসতে পারে না। মালেক বললো, যথেষ্ট হয়েছে। এবার আপনি বলুন, আপনার আর কোনো বক্তব্য রয়েছে কিনা— যা আমরা মান্য করতে পারি। দুরাইদ বললো, তোমাদের কিছু লোককে গুপ্ত অবস্থানে রেখে দাও। তারা তোমাদের সাহায্যের জন্যে সদা প্রস্তুত থাকবে। শত্রুরা প্রবল আক্রমণ করলে, গুপ্ত স্থানের লোকেরা তাদেরকে পিছন দিক থেকে ঘিরে ফেলবে। এ রকম করলে তোমাদের প্রচণ্ড ধাওয়া খেয়ে শত্রুরা আর পালাতে পারবে না। মালেক এই পরামর্শটি মেনে নিলো। তার নির্দেশে যুদ্ধক্ষেত্রের সন্নিকটে একটি পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করে রইলো কিছু সৈন্য। ওদিকে রসুল স. সংবাদ পেলেন, হাওয়াজেন গোত্রের লোকেরা যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। রসুল স.ও যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করলেন। বিশ বৎসর বয়স্ক হজরত এতাব বিন উসাইয়েদকে নিযুক্ত করলেন মক্কার রক্ষক এবং ধর্মীয় বিধিবিধান শিক্ষা দানের জন্য নিযুক্ত করলেন হজরত মুয়াজ ইবনে জাবালকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন

www.eelm.weebly.com

এর পর রসুল স. ঘোষণা করলেন, ইনশাআল্লাহ্! আগামীকাল আমাদের বাহিনী বনী কেনানকে আক্রমণ করবে। তারা সত্যকে স্বীকার করবে না বলে দৃঢ় শপথ করেছে। এরপর রসুল স. সাফওয়ান বিন উমাইয়ার নিকট কিছু অর্থ এবং কিছু যুদ্ধাস্ত্র চাইলেন। সাফওয়ান বললেন, কীভাবে চান, ঋণ হিসেবে? রসুল স.বললেন, হ্যাঁ। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার সমর সরঞ্জামগুলোর যথা সংরক্ষণ করা হবে। ইবনে ইসহাকও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের থেকে। কিন্তু আবু দাউদ ও আহমদের বর্ণনায় সাফওয়ান বিন উমাইয়ার উপরোক্ত উক্তিটি উল্লেখিত হয়নি। সুহাইলির বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. নওফেল বিন হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব থেকে তিন হাজার বর্শা কর্জ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি দেখতে পাচ্ছি— তোমার এই বর্শাগুলো দুশমনদেরকে বিদীর্ণ করছে।

অষ্টম হিজরীর ৬ই শাওয়াল। বারো হাজার যোদ্ধা নিয়ে রসুল স. হুনায়েনের দিকে যাত্রা করলেন। ওই বারো হাজারের মধ্যে দশ হাজার ছিলেন মদীনাবাসী এবং দুই হাজার মক্কাবাসী। মোহাম্মদ বিন উবায়দুল্লাহ্ লাইছ থেকে আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর সঙ্গে তখন মদীনাবাসী যোদ্ধা ছিলেন দশ হাজার। তার মধ্যে চার হাজার ছিলেন আনসার, জোহাইনা, মুজাইনা, আসলাম, গাফ্ফার, আশজায়া— এই পাঁচটি গোত্রের এক হাজার এক হাজার করে পাঁচ হাজার। বাকী এক হাজারের মধ্যে ছিলেন মুহাজির ও অন্যান্য।

ওরওয়া এবং জুহুরীর বর্ণনায় এসেছে— মক্কা বিজয়ের সময় রসুল স. এর সঙ্গে ছিলেন বারো হাজার যোদ্ধা। ওই বারো হাজারের সঙ্গে মক্কাবাসী দুই হাজার স্বাধীন নওমুসলিম নিয়ে হুনায়েন অভিযানে বের হয়েছিলেন রসুল স.।

ইবনে ওকবা এবং মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. এর হুনায়েন যাত্রার সময় মক্কার সকল লোক তাঁর সঙ্গী হলো। কেউ চললো পায়ে হেঁটে। কেউ চললো বাহনারোহী হয়ে। মহিলারাও চললো সঙ্গে সঙ্গে। তখন মক্কায় উপস্থিত ছিলো বিভিন্ন গোত্রের লোক। তারাও সঙ্গী হলো মুসলিম বাহিনীর। যুদ্ধ দর্শন এবং গণিমতের সম্পদ আহরণই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। রসুল স. এর পরাজয় ঘটলে ওই সকল লোক তেমন কোনো দুঃখ পেতো না। হজরত আবু সুফিয়ান বিন হরব এবং সাফ্ওয়ান বিন উমাইয়াও চললেন রসুল স. এর সঙ্গে। সাফ্ওয়ান তখনও মুসলমান হননি। কিন্তু তার স্ত্রী মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু তখনো রসুল স. তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাননি। রসুল স. এর পবিত্র সহধর্মিণী হজরত উম্মে সালমা এবং হজরত মায়মুনাও অংশগ্রহণ করেছিলেন হুনায়েন অভিযানে। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের জন্য নির্মিত হয়েছিলো পৃথক শিবির।

www.eelm.weebly.com

ইবনে ইসহাক, নাসাঈ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে— হজরত হারেস বিন মালেক বলেছেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে হুনায়েন যাত্রা করলাম। তখন সবেমাত্র আমরা মূর্খতার অন্ধকার থেকে প্রবেশ করেছি ইসলামের আলোয়। কুরায়েশ ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা একটি বৃক্ষকে খুব সম্মান করতো। সতেজ ও সবুজ ওই গাছটি ছিলো একটি বরই গাছ। মূর্খতার যুগে ওই গাছটিকে বলা হতো 'জাতে আনওয়াত্'। প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে লোকেরা সেখানে সমবেত হতো। বৃক্ষটিতে ঝুলিয়ে রাখতো তাদের আপনাপন হাতিয়ার। সেখানে তারা একদিন অবস্থান করতো এবং কোরবানী করতো। ওই বৃক্ষটির পাশ দিয়ে যাবার সময় আমরা চিৎকার করে বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! বিধর্মীদের জন্য যেমন জাতে আনওয়াত্ রয়েছে, আমাদের জন্যও তেমনি একটি জাতে আনওয়াত্ নির্দিষ্ট করে দিন। রসুল স. বললেন, আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার— যার অধিকারে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তার শপথ! তোমরাতো দেখছি রসুল মুসার সম্প্রদায়ের মতো বলতে শুরু করেছো। এক সম্প্রদায়কে প্রতিমা পূজা করতে দেখে তারা রসুল মুসাকে বলেছিলো, আমাদেরকেও ওদের মতো উপাস্য নির্ধারণ করে দাও। তোমরা কি ওই লোকদের মতো মূর্খ হতে চাও?

হজরত সুহাইল বিন হানজালা থেকে বর্ণিত হয়েছে, একজন অশ্বারোহী এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি দেখে এলাম হাওয়াজেনরা তাদের পরিবার পরিজন ও পশুপালকে অমুক পাহাড়ে একত্র করে রেখেছে। এ কথা শুনে রসুল স. মৃদু হাসলেন। বললেন, আল্লাহপাক ইচ্ছে করলে ওগুলোর মালিক হবো আমরা। এরপর তিনি বললেন, আজ রাতের প্রহরী হবে কে? হজরত আনাস বিন মালেক বললেন, আমি। রসুল স. বললেন, তুমি তোমার অশ্বে আরোহণ করে আরো সামনে এগিয়ে যাও। ওই উঁচু টিলায় উঠে চতুর্দিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখো। যারা তোমার সম্মুখে রয়েছে তাদের সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ো না।

রাত শেষ হলো। রসুল স. সকলকে নিয়ে ফজরের নামাজ পাঠ করলেন। হজরত আনাস ফিরে এলেন তাঁর অবস্থান থেকে। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আপনার নির্দেশিত স্থানে জাগ্রত ছিলাম। কিন্তু রাতে অথবা ভোরে কাউকে দেখলাম না। রসুল স. বললেন, জান্নাত তোমার জন্য ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে। এখন তুমি যা খুশী করতে পারো (যে পুণ্য তুমি সঞ্চয় করেছো সে পুণ্যই তোমার জান্নাত লাভের জন্য যথেষ্ট— ভবিষ্যতে তুমি যদি কোনো পুণ্য সঞ্চয় না করো তবুও)। আবু দাউদ, নাসাঈ।

এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হদরদকে হাওয়াজেনদের অবস্থা জানবার জন্য প্রেরণ করলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হদরদ হাওয়াজেনদের দলের মধ্যে মিশে গেলেন। তাদের মধ্যেই অবস্থান করলেন

www.eelm.weebly.com

একদিন। সেখানে তিনি হাওয়াজেনদের অধিনায়ক মালেককে বলতে শুনলেন, মোহাম্মদের যুদ্ধ স্পৃহা স্তব্ধ করে দিতে হবে। মিটিয়ে দিতে হবে যুদ্ধের সাধ। প্রাতঃকালে তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনকে তোমাদের পশ্চাতে সারিবদ্ধ-ভাবে দাঁড় করাবে এবং প্রথমেই তাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। আমাদের বিশ হাজার বল্লম একই সঙ্গে নিক্ষেপ করবে তাদের দিকে। উত্তমরূপে অবগত হও, যে দল প্রথম আক্রমণ করবে সেই দলই বিজয়ী হবে। হাদিসটি ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্, হজরত ওমর বিন শোয়াইব এবং হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আবী বকর বিন আমর বিন হরম থেকে। হজরত আবু বুরদা থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন, মোহাম্মদ বিন ওমর। তাঁর বর্ণনায় এ কথাগুলোও এসেছে— আমরা আওতাস নামক স্থানে একটি বড় বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হলাম। রসুল স. অবস্থান গ্রহণ করলেন ওই বৃক্ষের নিচে। তিনি স. পরে আমাদেরকে বললেন, আমি বৃক্ষের নিচে শয়ন করেছিলাম। হঠাৎ দেখি, আমারই তলোয়ার নিয়ে একলোক দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার শিয়রে। সে বললো, মোহাম্মদ! আজ তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে কে? আমি বললাম, আল্লাহ্। হজরত আবু বুরদা বলেন, এ কথা শুনেই আমি আমার তরবারী কোষমুক্ত করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! নির্দেশ দিন, আমি ওই শত্রুর মস্তক ছেদন করি। আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয় সে শত্রু পক্ষের গুপ্তচর। রসুল স. বললেন, হে আবু বুরদা! চুপ করো। আল্লাহ্ই আমার রক্ষক। সকল ধর্মের উপর আমার ধর্মের বিজয় না হওয়া পর্যন্ত তিনিই আমাকে হেফাজত করবেন।

আবু নাঈম ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. হুনায়েন প্রান্তরে উপস্থিত হন শাওয়াল মাসের দশ তারিখে মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। শত্রুদলের অধিনায়ক মুসলিম বাহিনীর অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করলো তিনজন গুপ্তচরকে। মুসলিম বাহিনীর সংবাদ সংগ্রহ করে যখন তারা তাদের অধিনায়কের কাছে ফিরে গেলো, তখন তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিলো তারা ভীত সন্ত্রস্ত। অধিনায়ক মালেক জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে তোমাদের? এক গুপ্তচর বললো, আমরা দেখলাম কিছু শ্বেতাভ বর্ণ বিশিষ্ট লোক সুচিত্রিত অশ্বের উপরে আরোহণ করে রয়েছে। তাদেরকে দেখে আমরা শিউরে উঠেছি। এখন পর্যন্ত আমাদের ভয় কাটেনি। আল্লাহ্র শপথ! পৃথিবীর কোনো রাজা বাদশাহ্র বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইনি। আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে আসমানবাসীদের বিরুদ্ধে। মালেক বললো, তাই করবো। তোমরা ভীতু। আগে থেকেই ভয়ে মরছো। তাদের ভয়ের প্রভাব থেকে অন্যদেরকে বাঁচানোর জন্য তাদেরকে বন্দী করে রাখলো মালেক। তারপর তার লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললো, আমার সামনে একজন নির্ভীক নওজোয়ানকে উপস্থিত করো। তাকেই আমি পাঠাবো শত্রুদলের নির্ভরযোগ্য

www.eelm.weebly.com

সংবাদ সংগ্রহের জন্য। এবার এক সাহসী যুবককে গুপ্তচর নিযুক্ত করলো মালেক। কিন্তু সেও ফিরে এলো বিধ্বস্ত অবস্থায়। ভীত বিহ্বল স্বরে সেও জানালো তার পূর্বসূরীদের মতো একই সংবাদ।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে— রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর মালেক তার লোকদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালো। স্থানটি ছিলো বড়ই ভীতিপ্রদ। এদিকে ওদিকে চলে গিয়েছে বহু সংখ্যক গিরিপথ। মালেক তার সৈন্যদেরকে ওই গিরিপথের বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনের নির্দেশ দিলো। বললো, আমার নির্দেশ পেলে তোমরা সকলে একযোগে আক্রমণ কোরো। ওদিকে রসুল স. তাঁর সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করলেন। সকাল বেলা তাদেরকে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করালেন। পতাকা প্রদান করলেন একজনকে। তারপর নিজে বর্ম পরিধান করে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হলেন। সকলকে উদ্দেশ্য করে জানালেন বিজয়ের শুভ সংবাদ। হজরত খালেদ বিন ওলিদকে দায়িত্ব দিলেন অগ্রগামী বাহিনীর। প্রতিরোধ করতে বললেন বনী সলিমকে। সেনা সমাবেশ ঘটালেন তিনটি স্থানে— দক্ষিণে, বামে ও মধ্যখানে। মধ্যভাগে আক্রমণ স্থলে অবস্থান গ্রহণ করলেন রসুল স. স্বয়ং।

হজরত আনাস থেকে আবু শায়েখ, হাকেম, বায্যার এবং ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত ও হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে — হুনায়েন যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলেন মক্কা ও মদীনার সকল মুসলমান। এই বিপুল সেনা সমাবেশ দেখে অনেকে বলাবলি করতে লাগলো আজকের লড়াইয়ে আমরা জিতবোই। বায্যারের বর্ণনায় এসছে— এক আনসার যুবক বললো, আমাদের বিশাল সেনাবাহিনীর আক্রমণকে শত্রুরা প্রতিহত করতে পারবে না। তাদেরকে অবশ্যই পালিয়ে যেতে হবে। ইউনুস বিন বকরের বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. এ ধরনের দর্প প্রকাশক কথাবার্তা পছন্দ করছিলেন না। হাসান সূত্রে ইবনে মুনজিরও এ রকম বর্ণনা করেছেন। তা'ছাড়া আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিলো। কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। আরো বলা হয়েছে— পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিলো ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।

ইবনে ইসহাক, ইমাম আহমদ এবং ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে — হজরত জাবের বলেছেন, আমরা হুনায়েনের বিপদ সংকুল উপত্যকায় উপস্থিত হলাম। সেখানকার গিরিপথগুলো ছিলো অত্যন্ত সংকীর্ণ। সেখানে আগে থেকেই লুকিয়ে ছিলো শত্রুরা। আমরা যাচ্ছিলাম নিম্নভূমির দিকে। হঠাৎ আত্মগোপনকারী সৈন্যরা একযোগে বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করলো। আবু ইয়ালী ও মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, হাওয়াজেনরা মহিলা,

www.eelm.weebly.com

শিশু, পশুপাল সবকিছু নিয়ে হাজির হয়েছিলো যুদ্ধে। তাই দূর থেকে মনে হচ্ছিলো তাদের সৈন্য অসংখ্য। পুরুষদের পিছনে উটের পিঠে বসিয়ে রেখেছিলো মহিলাদেরকে। তার পিছনে রেখেছিলো পশুপাল। ভোরের আবছা আলোয় দূর থেকে দেখা যাচ্ছিলো কালো কালো অসংখ্য লোক যেনো তৈরী হয়ে রয়েছে যুদ্ধের জন্য। আমরা উপত্যকা থেকে নিম্নভূমির দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পর্বতগুহায় আত্মগোপনকারী তীরন্দাজ বাহিনী একযোগে তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। দিশাহারা হয়ে পড়লো আমাদের বনী সালিম গোত্রের লোকেরা। তাদেরকে ছত্রভঙ্গ হতে দেখে মক্কাবাসীরাও পালাতে শুরু করলো। তাদের দেখা দেখি অন্যান্যরাও ছুটতে শুরু করলো। কেউ কারো দিকে তাকাবার অবসর পেলো না। হজরত জাবের বলেছেন, ওই বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে আমি বলে উঠলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের বাহিনীর দক্ষিণ বাহু বিধ্বস্ত হয়েছে। রসুল স. তখন স্বস্থানে অটল থেকে বার বার আহ্বান জানাচ্ছিলেন, হে লোকসকল? আমার নিকটে সমবেত হও। আমি আল্লাহ্‌র রসুল। আমি মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌।

বোখারী, ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকীর বর্ণনার সঙ্গে ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক লোক হজরত বারা বিন আজীবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আবু ওমারা! আপনি কি হুনায়েন যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেছিলেন? হজরত বারা বলেছিলেন, না। রসুল স. যেমন পলায়ন করেননি, তেমনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবীগণও যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেননি। উত্তম অস্ত্রে সজ্জিত না হওয়া সত্ত্বেও তারা বীর বিক্রমে লড়েছিলেন। প্রথম দিকে শত্রুরা পিছনে হটে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। আমাদের লোকেরা তখন ব্যস্ত হয়ে পড়লো গণিমত সংগ্রহের জন্য। হঠাৎ তাদের তীরন্দাজ বাহিনী আক্রমণ করে বসলো। পঙ্গপালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসতে শুরু করলো তাদের তীর। আর তাদের তীর নিক্ষেপও ছিলো অব্যর্থ। তাই বাধ্য হয়ে আমাদের লোকেরা ছুটে পালাতে শুরু করলো। আমি অগ্রসর হতে হতে এসে পড়লাম রসুল স. এর সামনে। শাদা খচ্চরে আরূঢ় ছিলেন রসুল স.। আর তার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন আবু সুফিয়ান। রসুল স. তার খচ্চর থেকে নিম্নে অবতরণ করলেন এবং সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানালেন আল্লাহ্‌পাকের দরবারে। এরপর উচ্চ কণ্ঠে ক্রমাগত বলতে লাগলেন, আমি সত্য নবী। এ ঘোষণার মধ্যে মিথ্যার মিশ্রণ নেই। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা বিন আজীব বলেছেন, অবস্থা তখন চরমে। আমরা আত্মরক্ষার জন্য রসুল স. এর পশ্চাতে দাঁড়ালাম। আমাদের মধ্যে যারা ছিলেন অসম সাহসী, কেবল তাঁরা অবস্থান গ্রহণ করলেন রসুল স. এর সমান্তরালে। রসুল স. যখন অগ্রসর হতেন, তখন তাঁরাও অগ্রসর হতেন সামনের দিকে।

www.eelm.weebly.com

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আরো এসেছে, আমাদের দলের যে সকল নও-মুসলিম তখন পর্যন্ত মনে প্রাণে ইসলামকে গ্রহণ করেনি, তারা মুসলিম বাহিনীর বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে মনে মনে পুলক অনুভব করছিলো। আবু সুফিয়ানও ছিলেন ওই দলে। তাই তিনি বলেছিলেন, যারা ছত্রভঙ্গ হয়েছে, তারা আর ফিরে আসবে না। হিলা বিন হাব্বানের বর্ণনায় এসেছে, সাফওয়ান বিন উমাইয়ার বৈপিত্রেয় ভাই ইবনে হিশাম কেওলাহ্ বিন হামবাল তখন বলে উঠেছিলেন, আজ দেখছি বাস্তবতাই যাদুকে অতিক্রম করলো। সাফওয়ানও ওই সময় পর্যন্ত ছিলো মুশরিক, অথবা প্রায় মুশরিক। রসুল স. তাকে ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার অবকাশ দিয়েছিলেন। সে জাবালার কথার প্রেক্ষিতে বলেছিলো, চুপ করো। কুরায়েশদের তীর নিক্ষেপ অপেক্ষা হাওয়াজেনদের তীর নিক্ষেপ আমার নিকটে উত্তম।

হজরত আবদুল মালেক বিন উবায়দুল্লাহ্ সূত্রে ইবনে সা'দ, ইবনে আসাকের এবং হজরত ইকরামা সূত্রে তিবরানী, বায়হাকী, ইবনে আসাকের ও আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত শায়বা ইবনে ওসমান বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর যখন রসুল স. হুনায়েনের দিকে অগ্রসর হলেন, তখন আমি ভাবলাম আমি এবার যুদ্ধ করবো হাওয়াজেনদের পক্ষে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে রসুল স. কে হত্যার সুযোগ খুঁজতে থাকবো। আমার পিতাকে হত্যা করেছিলেন রসুল স. এর পিতৃব্য হজরত হামযা। আমি এবার রসুল স. কে হত্যা করে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। আরব ও আজমের সকলে তাঁর অনুসারী হয়ে গেলেও আমি তাঁর অনুসরণ করবো না। কাংখিত সুযোগ পেয়েও গেলাম আমি। মুসলিম বাহিনী যখন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে শুরু করলো, তখন ডান দিক দিয়ে আক্রমণ করতে গিয়ে দেখি সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হজরত আব্বাস। তাঁর অবয়বে শোভা পাচ্ছে সুউজ্জ্বল বর্ম। আমি ভাবলাম ইনি তো রসুল স. এর চাচা। ইনিতো তাঁকে জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করবেন। এরপর আমি গেলাম বাঁ পাশে। দেখলাম সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আবু সুফিয়ান বিন হারেস। ভাবলাম ইনিও রসুল স. এর রক্ষী। তাঁর উপস্থিতিতে আমি আমার আক্রমণ সফল করতে পারবো না। গেলাম পিছন দিকে। দেখলাম তাঁর পশ্চাতভাগ অরক্ষিত। আমি অগ্রসর হলাম। কিন্তু দেখলাম তাঁর ও আমার মাঝে জ্বল জ্বল করছে বিদ্যুতের মতো অগ্নিশিখা। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, ওই আগুন মনে হয় আমাকেই গ্রাস করবে। আর আমিও মনে হয় হয়ে যাবো দৃষ্টিহীন। আমি হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফিরে যেতে শুরু করলাম। বুঝলাম, তাঁর উপরে রয়েছে আল্লাহ্পাকের সার্বক্ষণিক হেফাজত। রসুল স. আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে ডাকলেন। আমি তাঁর নিকটে গেলাম। তিনি স. তার পবিত্র হাত আমার বুকের উপরে রেখে বললেন, হে আমার আল্লাহ্! এর ভিতর

www.eelm.weebly.com

থেকে শয়তানকে অপসারণ করো। আমি দৃষ্টিপাত করলাম তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে। মনে হলো, ইনিই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তিনি স. বললেন, শায়বা! যাও, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। আমি তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হলাম সামনের দিকে। আমার তখন মনে হচ্ছিলো, প্রতিটি আক্রমণ থেকে আমার প্রিয়তম রসুলকে রক্ষার জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করবো। যুদ্ধ শেষে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি স. আমাকে ডেকে বললেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি ওই পবিত্র সত্তার, তিনি তোমাকে কল্যাণ দান করেছেন (প্রদান করেছেন সুদৃঢ় ইমান)। এরপর তিনি স. বললেন তুমি তো আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে।

মোহাম্মদ ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত নজর বিন হারেস বলেছেন, আল্লাহ্পাকের জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেছেন। মোহাম্মদ স.কে প্রেরণ করে আমাদেরকে অনুগৃহীত করেছেন। আমরা এখন এ কথা ভেবে নিশ্চিত যে, আমরা ওই শিরিকের উপরে মৃত্যুবরণ করবো না, যে শিরিকসহ মৃত্যুবরণ করেছিলো আমাদের পূর্ব পুরুষেরা। হাদিসটি দীর্ঘ। হাদিসের শেষ দিকের উল্লেখ এ রকম— হজরত নজর বিন হারেস বলেন, বাইরে ইসলামকে স্বীকার করতে বাধ্য হলেও সুফিয়ান বিন হরব, সুফিয়ান বিন উমাইয়া, সুহাইল বিন আমর ও আমি তখন পর্যন্ত অন্তর থেকে ইসলামকে মেনে নিতে পারিনি। ইতোমধ্যে শুরু হলো হুনায়েন যুদ্ধ। আমরা ভাবলাম, যুদ্ধে মোহাম্মদের পরাজয় ঘটলে আমরাও লুণ্ঠন কার্যে শরীক হবো। হাওয়াজেন সম্প্রদায়ের লোকেরা একযোগে আক্রমণ করে বসলো। আমরা ছিলাম মুসলিম বাহিনীর মধ্যে। আমরা পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের মালমাত্তা লুণ্ঠন করতে যাবো— এমন সময় দেখলাম, রসুল স. একটি শাদা খচ্চরে চড়ে মুসলমানদের সামনেই রয়েছেন। একদল শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট লোক তাঁকে ঘিরে রেখেছে। আমি রসুল স. এর দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করলাম। ওই লোকগুলো বললো, ওদিকেই থাকো। অগ্রসর হয়ো না। তাদের কথা শুনে আমার হৃদয় ও শরীর কেঁপে উঠলো। আমি ভাবলাম, আজও তো দেখি বদর যুদ্ধের মতো ঘটনা ঘটতে চলেছে। নিশ্চয় মোহাম্মদ স. সত্যাধিষ্ঠিত এবং অদৃশ্য থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত। এ কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্পাক আমার হৃদয়ে ঢেলে দিলেন প্রকৃত ইমান। দূর হয়ে গেলো আমার পূর্বের অপবিত্র মনোভাব।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় আরো এসেছে — হজরত আবু কাতাদা বলেছেন, হুনায়েনের যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া কিছু লোক উপস্থিত হলো মক্কায়। সেখানে তারা প্রচার করলো মুসলিম বাহিনী পরাজয়বরণ করেছে। হজরত এতাব বিন উসাইদ তখন ছিলেন মক্কার তত্ত্বাবধায়ক। ধর্মীয় শিক্ষকরূপে হজরত মুয়াজ বিন জাবালও সেখানে ছিলেন। তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু মক্কার

www.eelm.weebly.com

কিছু লোক উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। বলতে শুরু করলো, এখন আরববাসীরা তাদের পিতৃপুরুষের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। মোহাম্মদ নিহত হয়েছে এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা হয়েছে পর্যুদস্ত। হজরত এতাব বললেন, যদি আল্লাহ্‌র রসুল শহীদ হয়ে থাকেন তো হয়েছেন, তাঁর আল্লাহ্ তো চিরঞ্জীব। মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আমরা সেই আল্লাহ্‌র বিধানকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। উৎফুল্ল লোকেরা এ কথ শুনে নিরাশ হয়ে গেলো। সাঁঝ বেলা সংবাদ পাওয়া গেলো, রসুল স. হাওয়াজেনদেরকে পরাজিত করেছেন। এ সংবাদ শুনে হজরত এতাব ও হজরত মুয়াজ আনন্দিত হলেন। আর ওই উৎফুল্লচিত্ত লোকেরা হলো বিমর্ষ। উল্লেখ্য যে, ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া মুসলিম সেনাদেরকে পুনরায় একত্র করেছিলেন রসুল স. এবং প্রচণ্ড সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাস্ত করেছিলেন হাওয়াজেন সম্প্রদায়কে। এরপর বিজয়ীবেশে যাত্রা করেন তায়েফের দিকে।

দ্রষ্টব্যঃ হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে— মুসলমানেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও রসুল স. একাকী দাঁড়িয়েছিলেন যুদ্ধের ময়দানে। কিন্তু মুসলিম ইবনে ইসহাক ও আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনায় এসেছে— হজরত আব্বাস বলেছেন, হুনায়েন যুদ্ধের সময় রসুল স. এর সঙ্গে ছিলাম আমি ও আবু সুফিয়ান বিন হারেস। আমরা কখনো তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করিনি। রসুল স. ছিলেন একটি শাদা খচ্চরের উপরে। হাওয়াজেনদের প্রচণ্ড আক্রমণে তিষ্ঠাতে না পেরে মুসলমানেরা যখন পশ্চাদপসরণ করলো, তখন আমি টেনে ধরলাম তাঁর খচ্চরের লাগাম। তিনি স. ছিলেন অকুতোভয়। শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কোনো লক্ষণও তাঁর মধ্যে ছিলো না। সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য তিনি স. তাঁর খচ্চরকে খোঁচা মারছিলেন। সে কারণেই আমি তাঁর খচ্চরের লাগাম টেনে ধরেছিলাম। আবু সুফিয়ান বিন হারেস টেনে ধরেছিলেন তাঁর খচ্চরের রেকাব। অন্য বর্ণনায় এসেছে, কিছুসংখ্যক সাহাবী তখনও উপস্থিত ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈসাদৃশ্য দূর করে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. ছিলেন সকলের সামনে। কিছু সংখ্যক সাহাবী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তাঁর পশ্চাতে। আবু সুফিয়ান বিন হারেস ধরেছিলেন রসুল স. এর খচ্চরের লাগাম। সুতরাং রসুল স. ই ছিলেন তখন একক যোদ্ধা। তাঁর পশ্চাতে তখন কারা ছিলেন এবং তাদের সংখ্যা কতো ছিলো সে সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। কালাবী বলেছেন, রসুল স. এর পাশে তখন অবস্থান করছিলেন তিনশত যোদ্ধা। তাঁরা বাদে অবশিষ্টরা করেছিলেন পলায়ন। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে হজরত হারেসা বিন নোমান বলেছেন, মুসলিম সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যাবার পর আমি দেখলাম, তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন একশত সাহসী সৈনিক। আহমদ, তিবরানী, হাকেম ও আবু নাঈমের নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি ছিলাম তখন রসুল স. এর সঙ্গে। সকলে পালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন আশিজন মোহাজির ও আনসার সাহাবী। সম্ভবতঃ

www.eelm.weebly.com

আমরাও তখন আশি কদম পিছনে এসে অবস্থান গ্রহণ করি। কিন্তু আমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিনি। হজরত আনাস আরো বলেছেন, হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান এবং হজরত আলী সকলের শরীরে লেগেছিলো কমপক্ষে তলোয়ারের দশটি করে আঘাত। হজরত আবু আমর থেকে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন— রসুল স. এর সঙ্গে তখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন প্রায় একশত জন— আশিজন নয়, আবার পুরো একশত জনও নয়। মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে হজরত হারেসা বিন নোমান বলেছেন, মুসলিম সৈন্যদের পলায়নের পর রসুল স. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হারেসা রণপ্রান্তরে এখন কতোজন? আমি ডানে বাঁয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললাম, একশ' জনের মতো। এটা ছিলো আমার অনুমান। কিন্তু ওই সকল অকুতোভয় যোদ্ধার সংখ্যা তখন একশ'জনই ছিলো। এ কথা জেনেছি আমি পরে। একদিন মসজিদের দরজার নিকটে আমি শুনতে পেলাম রসুল স. ও হজরত জিবরাইলের একান্ত কথোপকথন। হজরত জিবরাইল আমার সম্পর্কে বললেন, ভ্রাতঃ মোহাম্মদ! এই লোকটি কে? রসুল স. বললেন, হারেস বিন নোমান। হজরত জিবরাইল বললেন, হুনায়েন যুদ্ধে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি সেই একশজন বীর শ্রেষ্ঠদের মধ্যে এই লোকটিও ছিলো। পরে রসুল স. আমাকে এ কথা জানালেন। আমি বললাম, আমিতো আপনাদের কথাবার্তা শুনেছি। দাহিয়া কালবী আপনার সাথে দাঁড়িয়েছিলেন।

আল্লামা নববী বর্ণনা করেছেন, হুনায়েন যুদ্ধে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি তাঁদের সংখ্যা ছিলো বারোজন। এ সম্পর্কে হজরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের একটি কবিতা রয়েছে। ওই কবিতায় উল্লেখ করা হয়েছে, ওই সময় রসুল স. এর সঙ্গী ছিলো দশজন। কবিতাটি এই —

"নাসার না রসুলাল্লাহি ফিল হারবি তিস্‌য়াতুন
ওয়া ফার্‌রারা মান ক্বাদ ফার্‌রা আন্‌হু ফাকাশাউ
ওয়া আশিরুনা লাকাল হিমামা বি নাফসিহি
লিমা মাস্‌সাহু ফিল্‌লাহি লা ইয়াতাওয়াজ্জায়া।

অর্থঃ আমরা রসুল স. এর সাহায্যে দণ্ডায়মান ছিলাম তখন নয় জন। তাঁকে ছেড়ে যারা পলায়ন করেছিলো তারা পলায়নই করেছিলো, তারা হয়েছিলো চূর্ণবিচূর্ণ। আমাদের দশম ব্যক্তি আমাদেরকে নিয়েই মৃত্যুর মোকাবিলা করেছেন। আল্লাহ্‌র পথে তিনি কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু কাতর হননি।

সালেহী বলেছেন, প্রকৃত কথা এই যে, তখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিলেন দশজনের অধিক। আর হঠাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেও অতি দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এসেছিলেন অনেকে। চারজন মহিলা সাহাবীও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। তাঁদের নাম— হজরত উম্মে সালমা বিনতে মুলহান, হজরত উম্মে আম্মারা, হজরত উম্মে সালিত এবং হজরত উম্মে হারেস।

www.eelm.weebly.com

ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ○

❐ অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার রসূল ও বিশ্বাসীদিগের উপর দয়া বর্ষণ করেন যাহাতে উহাদিগের চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই এবং তিনি সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদিগকে শাস্তি প্রদান করেন। ইহাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের কর্মফল।

এখানে 'সাকিনা' অর্থ আল্লাহ্তায়ালার দয়া। আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মুসলিম বাহিনীর পৃষ্ঠপ্রদর্শন ও পলায়নের পর রসুল স. এর সম্মানে ও কারণে আল্লাহ্পাক দয়া বর্ষণ করেছিলেন— তাঁর রসুলের উপর এবং রসুলের অনুসারী বিশ্বাসীদের উপর। সে কারণেই পলাতক সৈন্যরা পুনরায় সমবেত হতে পেরেছিলো এবং রচনা করতে পেরেছিলো পুনরাক্রমণ। তৎসহ আল্লাহ্পাক আরো প্রেরণ করেছিলেন একটি অদৃশ্য সাহায্যকারীর দল। এভাবে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সেনাবাহিনী এনেছিলো কাংখিত বিজয়। বিধর্মীরা হয়েছিলো পরাস্ত। এভাবেই আল্লাহ্তায়ালা বিধর্মীদেরকে শাস্তি দান করে থাকেন। এরকম মর্মান্তিক পরিণতিই তাদের ললাট লিখন।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ওই সকল সাহাবীর প্রতি দয়া বর্ষণের কথা বলা হয়েছে যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাননি। আশি কদম পিছনে এসে তাঁরা যুদ্ধের নতুন অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন মাত্র। তাঁরা ছিলেন মুহাজির ও আনসার সাহাবী। তাঁদের সংখ্যা ছিলো আশিজন। বায়হাকী, তিবরানী, হাকেম ও আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনাসূত্রে হজরত আবদুল্লাহ্ বলেন, হুনায়েন যুদ্ধে আমি ছিলাম রসুল স. এর সঙ্গে। সকলে পালিয়ে গেলেও আমরা আশিজন মুহাজির ও আনসার যুদ্ধের ময়দান পরিত্যাগ করিনি। সম্ভবতঃ আশি কদম পিছিয়ে এসেছিলাম আমরা। কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিনি। সাকিনা বর্ষিত হয়েছিলো ওই আশি জনের উপর।

হজরত ইবনে ওকবা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তাঁর পবিত্র পদযুগল ঘোড়ার রেকাবে রেখে দাঁড়ালেন এবং পবিত্র দুই হাত উত্তোলন করে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমি আমাকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দান করেছো। এবার তোমার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করো। হে আমার আল্লাহ্! আমাদেরকে বিজয় দান করো। এরপর হজরত আব্বাসকে বললেন, হে পিতৃব্য!

www.eelm.weebly.com

আপনার লোকেরা কোথায়? তারপর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! হে বাবুল বৃক্ষের নিচে অঙ্গীকারাবদ্ধ লোকেরা! হে সুরা বাকারার অধিকারীরা! ফিরে এসো। হজরত আব্বাসের কণ্ঠ ছিলো অত্যন্ত উচ্চ। তিনি রসুল স. এর এই ঘোষণাটি উচ্চকণ্ঠে বার বার উচ্চারণ করতে শুরু করলেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এই ঘোষণাটি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পলাতক সৈন্যরা অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এলেন— যেমন মায়ের ডাকে শিশুরা ফিরে আসে মায়ের কাছে।

বায়হাকী ও বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওসমান বিন আবী শায়বা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তখন হজরত আব্বাসকে বলেছিলেন, হে আমার পিতৃব্য! হুদায়বিয়ার বৃক্ষের নিচে যারা বায়াত গ্রহণ করেছে এবং যে সকল মদীনাবাসী আল্লাহ্‌র রসুল ও মুহাজিরদেরকে আশ্রয় দান করেছে — তাদেরকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করুন। হজরত আব্বাস বলেন, আমি নির্দেশানুসারে উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান জানালাম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো সকল আনসার— যেমন উষ্ট্রশাবক ফিরে আসে তার মাতৃক্রোড়ে। সকলেই সমস্বরে উচ্চারণ করলো, লাব্বায়েক, লাব্বায়েক (আমরা হাজির, আমরা হাজির)। রসুল স. তাঁর বাহন থেকে অবতরণ করলেন। তাঁর নিরাপত্তা বিধানের জন্য উত্তোলিত হলো অসংখ্য বর্শা। আনসারদের উত্তোলিত সেই বর্শা সমূহ ছিলো কাফেরদের বর্শাগুলোর চেয়ে আরো ভয়ংকর। নির্ভরযোগ্য সূত্রে আবু ইয়ালী এবং তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. সেদিন এক মুঠো ধুসর পাথরকণা হাতে নিয়ে কাফেরদের দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন এবং বলেছিলেন, কাবার প্রভুর কসম! এই যুদ্ধে আমাদের বিজয় অনিবার্য। ওই দিন হজরত আলীর যুদ্ধও ছিলো অত্যন্ত বীরত্বব্যঞ্জক।

হজরত আবু আবদুর রহমান ইয়াজিদ ফেহরী থেকে ইবনে সা'দ, ইবনে আবী শোয়াইবা, আহমদ, আবু দাউদ, বাগবী প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে দিশাহারা হয়ে তখন মুসলমানেরা পালাতে শুরু করলো। রসুল স. পলায়নপর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, হে লোক সকল! আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসুল। এরপর তিনি অবতরণ করলেন তাঁর বাহন থেকে। মিশে গেলেন উপস্থিত সৈন্যদের মধ্যে। তারপর এক মুঠো মাটি নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন শত্রুদের দিকে। বললেন, তোমাদের চেহারা বিধ্বস্ত হোক। ইয়ালী বিন আতার বর্ণনায় এসেছে, হুনায়েনে যারা শত্রুপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করেছিলো, তাদের সন্তানেরা বলেছেন, আমরা আমাদের পিতাদেরকে বলতে শুনেছি, আমাদের চোখ মুখ তখন মাটিতে ভরে গিয়েছিলো। আর আমরা তখন শুনতে পেলাম একটি ঝন্ ঝন্ আওয়াজ। মনে হচ্ছিলো যেনো কোনো থালায় পতিত হচ্ছে অসংখ্য লোহার টুকরা। এসকল কারণেই আমরা তখন পরাজিত হয়েছিলাম।

www.eelm.weebly.com

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে সুদ্দীর 'কবির' গ্রন্থে রয়েছে, ওগুলো ছিলো যোদ্ধা ফেরেশতাদের আওয়াজ। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আল্লাহ্পাক হুনায়েনে রসুল স. এর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছিলেন পাঁচ হাজার নিদর্শনবিশিষ্ট ফেরেশতা। হজরত যোবায়ের ইবনে মুতয়েম থেকে ইবনে ইসহাক, ইবনে মুনজির, ইবনে মারদুবিয়া, আবু নাঈম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হুনায়েনে যুদ্ধ চলাকালে আমি দেখতে পেলাম, আসমান থেকে নেমে আসছে একটি কালো চাদর। চাদরটি পতিত হলো যুদ্ধের ময়দানে। তারপর ওই চাদর থেকে বের হতে শুরু করলো অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণের পিপীলিকা। সমস্ত উপত্যকা ভরে গেলো পিপীলিকায়। আমার তো মনে হলো ওগুলো ফেরেশতা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। একটু পরেই দেখলাম শত্রুরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হলো।

ইয়াহ্ইয়া বিন আবদুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মোহাম্মদ বিন ওমর বলেছেন, আমার নিকট প্রবীণ আনসার সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন, আমরা ওই দিন আসমান থেকে কালো চাদর পতিত হতে দেখেছি। ওই চাদর থেকে অসংখ্য পিঁপড়া বের হলো। পিঁপড়ায় পিঁপড়ায় ভরে গেলো পুরো এলাকা। আমাদের কাপড়েও পিঁপড়া উঠেছে মনে করে আমরা আমাদের কাপড়ও ঝাড়া দিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই অর্জিত হলো বিজয়।

স্বসূত্রে মুসাদ্দাদের বর্ণনায় এবং বায়হাকী ও ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, উম্মে বারছানের মুক্ত করা ক্রীতদাস আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, আমাকে হুনায়েন যুদ্ধে মুশরিক বাহিনীর পক্ষের এক যোদ্ধা বলেছে, হুনায়েনে মুসলমানেরা আমাদের সামনে ছাগল দোহনের সময় পরিমাণও তিষ্ঠাতে পারেনি। আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণে তারা পিছু হঠতে শুরু করলো। আমরাও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলাম। হঠাৎ সামনে দেখলাম খচ্চরের পিঠের উপরে উপবিষ্ট এক সৌম্যকান্তি পুরুষ আমাদের সাথে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত। দেখলাম, তিনি অন্য কেউ নন, রসুল স. স্বয়ং। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তখন রসুল স. ও আমাদের মধ্যস্থলে উপস্থিত ছিলো কিছু শাদা শাদা লোক। তারা আমাদেরকে বলতে লাগলো, তোমাদের চেহারা বিকৃত হয়েছে। ফিরে যাও। ফিরে যাও। আমরা ভয় পেলাম। ফিরে এলাম পিছনের দিকে।

ইবনে মারদুবিয়া, বায়হাকী ও ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত শায়বা ইবনে ওসমান বলেছেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে হুনায়েন যুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমি তখনও ইসলাম গ্রহণ করিনি। তবু মুসলমানদের পক্ষ নিয়েছিলাম একারণে যে, কুরায়েশদের উপর হাওয়াজেনদের বিজয় ছিলো আমার নিকট অকল্পনীয়। যুদ্ধের ময়দানে আমি ছিলাম রসুল স. এর কাছাকাছি। হঠাৎ আমি দেখলাম, সুচিত্রিত অশ্বের উপরে আরোহণ করে উপস্থিত হলো কিছু অপরিচিত

www.eelm.weebly.com

লোক। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি দেখতে পাচ্ছি কিছু অপরিচিত ঘোড় সওয়ারকে। ঘোড়াগুলো চিত্রিত। রসুল স. বললেন, শায়বা এ রকম দৃশ্যতো দেখতে পারে কেবল বিধর্মীরা। এরপর তিনি স. আমার বুকে হাত রেখে বললেন, হে আমার আল্লাহ্! শায়বাকে হেদায়েত করো। তিনি এ রকম করলেন তিন বার। আমার মনে হলো, এখন রসুল স. অপেক্ষা অন্য কেউই আমার নিকট অধিকতর প্রিয় নয়। এরপর ঘোর যুদ্ধ শুরু হলো। আমাদের কেউ কেউ শহীদ হলেন। রসুল স. অগ্রসর হলেন সামনের দিকে। হজরত ওমর ও হজরত আব্বাস ধরে ছিলেন তাঁর অশ্বের লাগাম। রসুল স. এর নির্দেশে হজরত আব্বাস উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, হে মুহাজিরবৃন্দ! হে আনসার! হে সুরা বাকারাওয়ালারা! তোমরা কোথায়? রসুল স. স্বয়ং ঘোষণা করলেন, আমি সত্য নবী। এ কথা মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন পশ্চাদ-পসরণকারীরা। যুদ্ধ শুরু করলো বীর বিক্রমে। রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, এবার চুল্লি উত্তপ্ত হয়েছে (যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করেছে)।

মোহাম্মদ বিন ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হজরত মালেক বিন আওম বিন হামমান বর্ণনা করেছেন, হুনায়েনে বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বনকারী আমাদের গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি আমাকে বলেছে, ওই দিন রসুল স. কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পাথরকণার আঘাত থেকে আমাদের কোনো লোকই রক্ষা পায়নি। পাথরকণাগুলো পড়েছিলো আমাদের চোখে। আর আমাদের বুকের ভিতরেও অনুভূত হচ্ছিলো অবিরল পাথর পড়ার শব্দ। আওয়াজ উত্থিত হচ্ছিলো থালার উপরে অঝোর ধারায় প্রস্তর খণ্ড বর্ষণের মতো। আমরা আরো দেখলাম আসমান ও জমিনের মাঝখানে চিত্রিত ঘোড়ার উপরে বসে রয়েছে শাদা বর্ণের অনেক লোক। মাথায় ছিলো তাদের লাল পাগড়ী। তাদের চোখের পাতা ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে। তাদের হস্তধৃত তলোয়ারও ছিলো বিচিত্র ধরনের। তাদের দিকে সরাসরি আমরা তাকাতেও পারছিলাম না। ইবনে আবী হাতেম ও সুদ্দী বলেছেন, ফেরেশতাদের ওই তলোয়ারগুলোর আঘাতেই সেদিন অনেক কাফেরকে হত্যা করা হয়েছিলো। নির্ভরযোগ্য সূত্রে বায্যার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. তখন নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, ওদেরকে দ্বিখণ্ডিত করো। নির্দেশ প্রদানের সময় তিনি স. ইশারা করেছিলেন তার কণ্ঠনালীর দিকে।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হারেস বলেছেন, বদরের মতো হুনায়েনেও নিহত হয়েছিলো অনেক লোক। তাদের বেশীর ভাগই ছিলো তায়েফবাসী। আর মুসলমানদের মধ্যে শহীদ হয়েছিলেন উম্মে আইমানের কন্যা, হজরত আইমান, হজরত সুরাকা বিন হারেস, হজরত ইয়াতিম বিন ছা'লাবা, হজরত ইয়াজিদ বিন জামআ এবং হজরত আবু আমের আশয়ারী।

www.eelm.weebly.com

হজরত মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন আ'সা থেকে মোহাম্মদ বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, ওই সংকটময় মুহূর্তে হজরত সা'দ বিন উবাদা চিৎকার করে আহ্বান জানালেন খাজরাজ গোত্রকে। আর আউস গোত্রকে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন হজরত উসায়েদ বিন হুদাইর। তাঁদের আহ্বান শোনার সঙ্গে সঙ্গে খাজরাজ ও আউস গোত্রের লোকেরা ছুটে এলো যুদ্ধের ময়দানে— যে ভাবে মৌমাছিরা ছুটে আসে রাণী মৌমাছির নির্দেশে।

যুদ্ধের ইতিহাস রচয়িতাগণ লিখেছেন, এরপর মুসলমানেরা ঝাঁপিয়ে পড়েন মুশরিকদের উপর। শত্রুনিধন করতে করতে তাঁরা পৌঁছে যান তাদের মহিলা ও শিশুদের নিকটে। রসুল স. নির্দেশ করেন, তোমরা মহিলাদের নিকটে গেলে কেনো? মহিলা ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধ। হজরত উসায়েদ বিন হুদাইর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তারা তো মুশরিকদের সন্তান। রসুল স. বললেন, প্রতিটি শিশু ইসলামের স্বভাব নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। পরে তাদের পিতামাতারা তাদেরকে ইহুদী অথবা খৃষ্টান বানায়।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় রয়েছে, সক্বিফ গোত্রের এক বৃদ্ধ বর্ণনা করেছেন, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিষ্ঠাতে না পেরে পলায়ন করলাম। মনে হচ্ছিলো যেনো রসুল স. আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে চলেছেন। শেষে তায়েফের একটি দূর্গে আমরা বলপূর্বক ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মোহাম্মদ বিন ওমর বলেছেন, এভাবে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর দুশমনদেরকে পরাস্ত করেছিলেন। মুসলিম বাহিনী তাদের অনেককে হত্যা করেছিলেন এবং বন্দী করেছিলেন তাদের নারী ও শিশুদেরকে। হাওয়াজেনদের অধিনায়ক মালেক বিন আউফও পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো তায়েফের দুর্গে।

ইবনে ইসহাক, মোহাম্মদ বিন ওমর প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, মালেক বিন আউফ এবং হাওয়াজেন গোত্রের কিছু লোক আশ্রয় নিয়েছিলো তায়েফে। আর কিছু লোক আওতাস এলাকার এক স্থানে বানিয়ে নিয়েছিলো তাদের সেনানিবাস। কেউ কেউ আবার চলে গিয়েছিলো নাখলার দিকে। এভাবে যারা পালিয়ে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলো, তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হয়নি। আর হাওয়া-জেনদের প্রবীণতম নেতা দুরাইদ বিন উসামাকে হত্যা করেছিলেন হজরত রবীয়া বিন রাফি সালামী।

বাগবী লিখেছেন, আওতাস এলাকায় যারা পরিবার পরিজন ও পশুপাল নিয়ে সেনানিবাস গড়ে তুলেছিলো, তাদের বিরুদ্ধে রসুল স. একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। ওই বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন হজরত আবু আমেরকে। তিনি মুশরিকদের সেনানিবাস আক্রমণ করেন। যুদ্ধে নিহত হয় দুরাইদ বিনিস্ সামাহ সহ আরো অনেকে। সম্পূর্ণরূপে পরাজয় বরণ করে দুশমনেরা। বন্দী হয় তাদের

www.eelm.weebly.com

মহিলা ও শিশুরা। মালেক পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো তায়েফ দুর্গে। অধিনায়ক হজরত আবু আমের ওই দুর্গ অবরোধ করেন। অবরুদ্ধ মুশরিকেরা উপায়ন্তর না দেখে যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু অবশেষে বরণ করে পরাজয়। অধিনায়ক হজরত আবু আমেরও শহীদ হন ওই যুদ্ধে। হুনায়েন যুদ্ধে মুসলমানদেরকে বিজয়ী হতে দেখে মক্কার বহুসংখ্যক লোক মুসলমান হয়ে যায়। তাদের মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, ইসলামই আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত ধর্ম। রসুল স. যুদ্ধলব্ধ সকল সম্পদ একত্রিত করতে বলেন জিয়িররানা নামক স্থানে। তায়েফ বিজয়ের পর রসুল স. স্বয়ং উপস্থিত হন জিয়িররানায়। ইবনে সা'দ এবং উয়ুন রচয়িতা লিখেছেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে ছিলো ছয় হাজার বন্দী, চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজারেরও বেশী ভেড়া ও বকরী এবং চার হাজার আউকিয়া চাঁদি।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, হুনায়েন যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলো ছয় হাজার যুবতী ও বয়স্কা মহিলা। আবু সুফিয়ান হরবকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো ওই সকল গণিমতের প্রহরী। বালাযুরী বলেছেন, প্রহরী নিযুক্ত করা হয়েছিলো হজরত বুদাইল বিন ওরাকা খাজায়ীকে। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হজরত মাসউদ ইবনে ওমর গিফারীকে।

আরবের সকল দুর্গের চেয়ে তায়েফের দুর্গই ছিলো সর্বাপেক্ষা উচ্চ। ওই দুর্গের শিখর দৃষ্টিগোচর হতো বহু দুর থেকে। ওই দুর্গেই আশ্রয় গ্রহণ করলো সাক্বিফ গোত্রের লোকেরা। মুসলিম বাহিনী দুর্গ অবরোধ করলো। রসুল স. স্বয়ং উপস্থিত হলেন সেখানে। অবরুদ্ধ বনী সাক্বিফেরা দুর্গের উপর বসিয়ে রাখলো একশত তীরন্দাজ। আগুনের গোলা নিক্ষেপের আয়োজনও তারা করলো। ফলে মুসলমানেরা দুর্গের কাছে ঘেঁষতে পারলেন না। দুর্গের দিকে অগ্রসর হলেই শুরু হতো তীর নিক্ষেপ ও আগুনের গোলা বর্ষণ। মনে হতো তারা যেনো একটি সংঘবদ্ধ পঙ্গপালের দল। তাদের তীর বর্ষণে আহত হলেন অনেকে। বারোজন পান করলেন শাহাদাতের পেয়ালা। রসুল স. অবস্থান গ্রহণ করলেন ওই স্থানে, যেখানে সাক্বিফ গোত্রের লোকেরা পরবর্তী সময়ে মুসলমান হয়ে মসজিদ বানিয়েছিলো। দুর্গ মধ্যে অবস্থান গ্রহণকারী আমর ইবনে উমাইয়া সাক্বাফীও পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার দলকে নির্দেশ দিলেন মুসলমানেরা মল্ল যুদ্ধে আহ্বান করলে তোমরা সাড়া দিয়োনা। যতোদিন ইচ্ছা পড়ে থাকতে দাও তাদেরকে। হজরত খালেদ বিন ওলিদ সম্মুখ সমরের জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু তারা কেউ উঁকি দিয়েও দেখলো না। তিনি পুনরায় আহ্বান জানালেন। তবুও তারা নিরুত্তর রইলো। অনেকক্ষণ পরে আবদ অথবা লাইল বলে উঠলো, আমাদের কেউই তোমাদের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ করবে না। এক বৎসরের পানাহারের ব্যবস্থা আমাদের রয়েছে। সুতরাং তোমরা এক

www.eelm.weebly.com

বৎসর অপেক্ষা করো। এক বৎসর পর আমরা দুর্গ থেকে বের হয়ে তলোয়ারের মাধ্যমে মৃত্যু পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। মুসলিম বাহিনী তীর ছুঁড়তে লাগলো। প্রত্যুত্তরে তারাও শুরু করলো তীর বর্ষণ। কিন্তু কেউ বাইরে এলো না। তাদের তীরে আহত হলেন অনেক মুসলিম যোদ্ধা। কেউ কেউ শহীদও হলেন।

ইবনে ইসহাক ও মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে— হুনায়েন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীনেরা বলেছেন, রসুল স. তখন ঘোষণা করলেন, যে ক্রীতদাস দুর্গ থেকে বের হয়ে আসবে তাকে স্বাধীন করে দেয়া হবে। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দুর্গ থেকে বের হয়ে এলো দশের অধিক ক্রীতদাস। রসুল স. তাদেরকে স্বাধীন করে দিলেন।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় আরো এসেছে — রসুল স. সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করলেন। হজরত সালমান ফারসী বললেন, পাথর নিক্ষেপক কামান প্রস্তুত করা হোক। তাই করা হলো। ওই কামানের মাধ্যমে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হলো পাথর। কিন্তু এতে করেও তাদেরকে কাবু করা গেলো না। তখন রসুল স. ঘোষণা করে দিলেন দুর্গ থেকে বের হয়ে না এলে তোমাদের খেজুর ও আঙ্গুর বাগানের সবগুলো গাছ কেটে ফেলা হবে। সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা প্রত্যেকে পাঁচটি করে খেজুরের গাছ এবং পাঁচটি করে ফলন্ত আঙ্গুরের গাছ কেটে দাও। তাঁরা নির্দেশ পালন করতে শুরু করলেন। বনী সাকিফেরা চিৎকার করে বললো, তোমরা আমাদের বাগান নষ্ট করছো কেনো? তোমরা যদি বিজয়ী হও তবেতো এগুলোর মালিক হবে তোমরাই। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এবং আত্মীয়তার সম্মানে তোমরা ওগুলো ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকো। রসুল স. বললেন, ঠিক আছে, তাই করা হবে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে — অবরোধ চলা কালে একদিন রসুল স. হজরত আবু বকরকে ডেকে বললেন, স্বপ্নে দেখলাম মাখন ভর্তি একটি বড় পেয়ালা আমার সামনে হাদিয়া হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে। হঠাৎ দেখলাম একটি মোরগ এসে পেয়ালাটি উল্টে ফেলে দিলো। হজরত আবু বকর বললেন, আমার মনে হয় আপনি যা কামনা করছেন তা পাবেন না (দুর্গ জয় করা যাবে না)। রসুল স. বললেন, আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু প্রথমে আমি এ কথা বুঝতে পারিনি।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন— তায়েফ অবরোধের পনেরো দিন অতিবাহিত হলো। রসুল স. নওফেল বিন মুয়াবিয়া দায়েলীকে ডেকে বললেন, আমাদের এ অবরোধ সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী? হজরত নওফেল বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! খেঁকশিয়াল গর্তে ঢুকে পড়েছে। আপনি যদি এখানে অবস্থান

www.eelm.weebly.com

করেন তবে এক সময় সে ধরা পড়বেই। যদি আপনি স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন, তবুও সে আপনাকে আক্রমণ করতে সমর্থ হবে না। হজরত ওমর এবং হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, দুর্গ অবরোধ করে কোনো লাভ হচ্ছে না দেখে রসুল স. বললেন, ইন্‌শাআল্লাহ্! আগামীকাল আমরা ফিরে যাবো। সাহাবীগণের কেউ এই সিদ্ধান্তটি পছন্দ করতে পারলেন না। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি এখন চলে গেলে আমরা বিজয় লাভ করবো কী ভাবে? তিনি স. বললেন, ঠিক আছে। আমরা চলে যাবো আর একদিন পর। এক দিন সময় হাতে পেয়ে সাহাবীগণ ভাবলেন, এই একদিনের মধ্যেই একটি ফয়সালা করে ফেলতে হবে। তাই পরদিন সকালেই তাঁরা শুরু করলেন প্রচণ্ড যুদ্ধ। অনেকে জখম হলেন, কিন্তু দুর্গ বিজিত হলো না। রসুল স. বললেন, ইনশাআল্লাহ্! আগামীকাল প্রাতে আমরা এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবো। সিদ্ধান্তটি সকলেই পছন্দ করলেন। এই অবস্থা দেখে মৃদু হাসলেন রসুল স.। সালেহী উল্লেখ করেছেন, তায়েফ অবরোধের সময় শহীদ হয়েছিলেন বারোজন মুসলমান।

হজরত ওরওয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ঘোষণা করলেন, আগামীকাল তোমরা তোমাদের উটগুলোকে চারণভূমির দিকে ছেড়ে দিয়ো না। কাল সকালে প্রত্যাবর্তন করবো আমরা। সিদ্ধান্ত অনুসারে পরদিন সকালে রসুল স. তাঁর বাহিনী নিয়ে ফিরে চললেন মক্কায়। প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! সাক্বিফ গোত্রকে হেদায়েত দান করো। যুদ্ধের কঠিন শ্রম থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও (তারা যেনো আমাদেরকে আক্রমণ না করে, আমরাও যেনো তাদের প্রতি সেনাভিযান না চালাই)।

হজরত জাবের থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং উত্তম আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে— সাহাবীগণ তখন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সাক্বিফদের তীরন্দাজ বাহিনী অত্যন্ত পারদর্শী। আপনি তাদের জন্য বদ্‌দোয়া করুন। তিনি স. দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্ ! সাক্বিফ গোত্রকে হেদায়েত করো। তাদেরকে ইমানের পথে নিয়ে এসো।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, তায়েফ অবরোধের সময়সীমা ছিলো তিরিশ রাত্রি অথবা তিরিশ রাত্রির কাছাকাছি। অপর বর্ণনায় এসেছে— বিশ রাত্রির চেয়ে কিছু বেশী। কেউ কেউ বলেছেন, বিশ দিন। কারো কারো মতে দশ দিনের কিছু বেশী। ইবনে হাজাম বলেছেন, এই অভিমতটিই সঠিক। হজরত আনাস থেকে ইমাম আহমদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, মুসলিম বাহিনী তায়েফ অবরোধ করে রেখেছিলেন চল্লিশ দিন। হেদায়া প্রণেতা বলেছেন, বর্ণনাটি গরীব (দুর্লভ)। বাগবী লিখেছেন, অবরোধ জারী ছিলো শাওয়াল মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে। জিলক্বদ মাস এসে পড়তেই অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো। কারণ যে চার মাস যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ, জিলক্বদ তার অন্তর্ভুক্ত। আমি বলি, এই বক্তব্যটি ইবনে

www.eelm.weebly.com

হাজামের বক্তব্যের অনুরূপ। কোনো কোনো আলেম বলে থাকেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে নিষিদ্ধ মাসের বিবরণ সম্বলিত আয়াতটি রহিত করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। কারণ এখানে জিলকৃদ মাস সম্পর্কে কোনো আলোচনাই নেই। সুতরাং বুঝতে হবে, তায়েফের অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো জিলকৃদ মাস আসার সঙ্গে সঙ্গে।

তায়েফ থেকে রওয়ানা হয়ে রসুল স. পৌঁছেছিলেন জিয়িররানায়। সেখান থেকে বেঁধেছিলেন ওমরাহ্‌র ইহ্‌রাম।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ২৭

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

❐ ইহার পরও যাহার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ হইতে পারেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ইউনুছ বিন বকরের মাধ্যমে ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমি হুনায়েন যুদ্ধে রসুল স. এর সঙ্গে ছিলাম। হাওয়াজেনদের পরিবার পরিজন ও পশুপাল আমাদের অধিকারে এলে তারা খুবই বিপদে পড়ে গেলো। তায়েফের অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে রসুল স. যখন জিয়িররানা নামক স্থানে উপনীত হলেন, তখন তার সঙ্গে এসে সাক্ষাত করলো হাওয়াজেনদের একটি প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলটি ছিলো চৌদ্দ সদস্য বিশিষ্ট। রসুল স. এর দুগ্ধ সম্পর্কীয় পিতৃব্য বুয়াইরকানও ছিলেন ওই দলে। জুহায়ের বিন সরোদ ছিলেন ওই দলের নেতা। পরে তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বুয়াইরকান বললেন, আমরা সকলে একই গোষ্ঠির লোক। আপনি জানেন এখন আমরা বিপদগ্রস্ত। আমাদের প্রতি দয়া করুন, আল্লাহ্ আপনাদেরকে দয়া করবেন। জুহায়ের বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! বন্দী রমণীদের মধ্যে আপনার ফুফু ও খালারাও রয়েছেন। তাদের মধ্যে তিনজনতো খুবই সুন্দরী। তারা শিশুকালে আপনাকে কোলে নিয়েছে। পানাহার করিয়েছে। আরো অনেক খেদমত করেছে আপনার। ইরাক ও সিরিয়ার সম্রাটের মাধ্যমে যদি আমরা এ রকম মুসিবতে পড়তাম, তবে আমরা আশা করতে পারতাম যে, আমাদের প্রতি করুণা করা হবে। হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি তো তাদের চেয়ে অনেক মহান ও করুণাপরায়ণ। এরপর তিনি রসুল স. কে কিছু কবিতা পাঠ করে শোনালেন।

সালেহীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত জুহায়ের বিন সরোদ জাসামী বলেছেন, রসুল স. হুনায়েনে আমাদের সবকিছু অধিকার করলেন। তারপর সকল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে শুরু করলেন তাঁর সৈন্যদের মধ্যে। আমি তাঁর নিকট

www.eelm.weebly.com

উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনার মতো মহান ব্যক্তিত্বের নিকটে আমরা যথাযোগ্য সম্মান ও অনুগ্রহ প্রত্যাশী। এরপর আমি কিছু কবিতা পাঠ করে শোনালাম। তিনি কবিতা শুনে বললেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদে আবদুল মুত্তালিবের যে অংশ রয়েছে, সেই অংশ আমি প্রত্যর্পন করতে পারি। কুরায়েশরা বললেন, আমাদের অংশও আল্লাহ্র রসুলের (আমরাও আমাদের অংশ ফিরিয়ে দিলাম)। আনসারগণও একই কথা বললেন। সালেহী বলেছেন, এই হাদিসের সূত্রপরম্পরা অত্যন্ত উন্নত মানের। শয্যাশূন্য খাটের মতো। মোকাদ্দেসিও হাদিসটি বিশুদ্ধ বলে গণ্য করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীও হাদিসটি উত্তম পদবাচ্য হওয়াকে প্রাধান্য প্রদান করেছেন। বোখারী তাঁর সহীহ্ পুস্তকে হজরত মারওয়ান ও হজরত মুছওয়ার বিন মাখরামা থেকে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এভাবে— হাওয়াজেন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলো। তারপর রসুল স. সকাশে হাজির হয়ে বললো, আমরা আমাদের পরিবার পরিজন ও মালমাত্তা ফিরে পেতে চাই। রসুল স. বললেন, তোমরা আমার সঙ্গী সাথীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। আমার নিকটে সত্য কথাই সর্বোত্তম কথা। আমার সাফ সাফ কথা এটাই— তোমরা যে কোনো একটি ফিরিয়ে নাও— পরিবার পরিজন অথবা সম্পদ। হাওয়াজেনরা বললো, আমরা চাই আমাদের পরিবার পরিজনকে। এ কথা শোনার পর রসুল স. দণ্ডায়মান হলেন। বর্ণনা করলেন আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা। তারপর বক্তব্য প্রদান করলেন এভাবে— আম্মা বা'দ — হুনায়েনের মুজাহিদ বৃন্দ ! হাওয়াজেনরা তওবা করেছে । তারা এখন তোমাদের ভ্রাতা। সুতরাং তাদের নিবেদন যারা গ্রাহ্য করবে তাদেরকেই সর্বপ্রথম দেয়া হবে গণিমত। মুজাহিদগণ বললেন, আমরা আনন্দিত চিত্তে তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। রসুল স. বললেন এভাবে সমস্বরে বলে উঠলে আমি বুঝতে পারবো না যে, তোমাদের মধ্যে কে এই সিদ্ধান্তে প্রসন্ন এবং কে প্রসন্ন নয়। সুতরাং তোমরা আপনাপন স্থানে ফিরে যাও। তোমাদের নেতাদের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দাও। সকলে প্রস্থান করলে রসুল স. গোত্রীয় নেতাদেরকে তাদের নিজ নিজ গোত্রের সকলের নিকট থেকে এ ব্যাপারে মতামত জেনে আসতে বললেন। নেতৃবৃন্দ তাদের লোকজনের মতামত জেনে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! সকলেই বন্দীদেরকে তাদের স্বজনদের নিকটে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে একমত।

আবু দাউদ, বায়হাকী ও আবু ইয়ালী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু তোফায়েল বলেছেন, আমি দেখলাম জিয়িররানায় গোশত বণ্টন করছেন রসুল স. (সম্ভবতঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে ভেড়া, বকরী ইত্যাদি বণ্টনের কথা বলা হয়েছে

www.eelm.weebly.com

এখানে)। ইত্যবসরে সেখানে উপস্থিত হলেন এক বেদুইন রমণী। তিনি রসুল স. এর একেবারে কাছে চলে গেলেন। রসুল স. তাঁর উপবেশনের জন্য তাঁর নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। তিনিও বসে পড়লেন ওই চাদরের উপর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? একজন বললেন, ইনি রসুল স. এর দুগ্ধদাত্রী জননী।

আবু দাউদের 'মারাসিল' গ্রন্থে রয়েছে, হজরত ওমর ইবনে সায়েবা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর নিকটে একদিন এলেন— তাঁর দুগ্ধদান সম্পর্কীয় পিতা। রসুল স. তাঁর চাদরের একাংশ বিছিয়ে বসতে দিলেন তাঁকে। তিনিও বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর এলেন তাঁর দুগ্ধদাত্রী মা। তাঁকে বসার জন্য রসুল স. বিছিয়ে দিলেন চাদরের অপরাংশ। এরপর এলেন তাঁর দুগ্ধ-ভ্রাতা। রসুল স. উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে বসালেন সামনে।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. হুনায়েন যুদ্ধে পরাজিতদের অনুসরণের নির্দেশ দিলেন। বললেন, বনী সা'দ গোত্রের ওই লোকটিকে ছেড়ো না। রসুল স. নির্দেশিত ওই লোকটি ছিলো খুনী। সে একজন মুসলমানকে টুকরো টুকরো করে কেটে আগুনে জ্বালিয়েছিলো। অনুসন্ধানী অশ্বারোহীরা ওই পলাতক খুনীকে বন্দী করতে সমর্থ হয়। তাঁরা রসুল স. এর দুধ বোন সীমাকেও বন্দী করে আনেন। বন্দী হওয়ার সময় তিনি তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা তাঁর কথা বিশ্বাস করেননি। বন্দিনী সীমাকে রসুল স. সকাশে উপস্থিত করা হলো। তিনি বললেন, মোহাম্মদ আমি তো তোমার বোন। রসুল স. বললেন, প্রমাণ কি? সীমা তাঁর শরীরের একটি কাটা দাগ দেখালেন। বললেন, এই ক্ষত চিহ্নটি তোমার কারণেই হয়েছে। একদিন পর্বত উপত্যকায় আমাদের পশুগুলো চরাচ্ছিলাম। তখন তুমি ছিলে আমার কোলে। মায়ের দুধ পান নিয়ে বচসা বেঁধেছিলো আমাদের মধ্যে। তখন তুমি আমার এ স্থানটি কেটে দিয়েছিলে। সব কথা মনে পড়ে গেলো রসুল স. এর। বহুদিন পর বোনকে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। আনন্দাশ্রু দেখা দিলো তাঁর পবিত্র দু'চোখে। গায়ের চাদর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, এখানে বসো। জানতে চাইলেন পিতা মাতার খবর। সীমা বললেন, তাঁরা তো চলে গিয়েছেন। রসুল স. নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, প্রিয় বোন, তুমি যদি এখানে থাকতে চাও তবে সসম্মানে থাকতে পারবে। আর যদি আপন গোত্রে ফিরে যেতে চাও, তবে যথাযোগ্য মর্যাদায় তোমাকে পৌঁছে দেয়া হবে। সীমা ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন, আমি আমার আপন আবাসে ফিরে যেতে চাই। রসুল স. তাঁকে দান করলেন তিনজন ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী। একটি বা দু'টি উট। বললেন, ঠিক আছে। তুমি জিয়িররানায় গিয়েই থাকো। আমি এখন তায়েফে যাচ্ছি। সীমা ফিরে গেলেন জিয়িররানায়। রসুল স. চললেন তায়েফে। তায়েফ থেকে ফেরার পথে জিয়ির-

www.eelm.weebly.com

রানায় হাজির হলেন তিনি। বোনের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে এবং তাঁর বাড়ীর লোকদেরকে দান করলেন আরো কয়েকটি উট ও বকরী। সীমা আবেদন করলেন, প্রিয় ভাই আমার! আমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ক্ষমা করে দাও। রসুল স. তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন।

ইউনুস বিন ওমর সূত্রে ইবনে ইসহাক লিখেছেন, রসুল স. হাওয়াজেন বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিলেন। একটি উটে চড়ে রওয়ানা হলেন তায়েফের দিকে। অনেক লোক অনুসরণ করলো তাঁর এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! গণিমতের সম্পদ থেকে আমাদেরকেও দান করুন। লোকের ভিড়ে রসুল স. যাত্রা স্থগিত করতে বাধ্য হন। বাহন থেকে নেমে একটি গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে যান। প্রার্থীরা তাঁর চাদর নিয়ে নেয়। তিনি স. বলেন, আমার চাদর ফিরিয়ে দাও। আমার জীবন যাঁর পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন সেই পবিত্র সত্তার শপথ, যদি তাহামা অঞ্চলের সকল বৃক্ষের সমান উটও আমার নিকটে থাকে, তবে আমি তোমাদের মধ্যেই বণ্টন করে দেবো। কোনোই কার্পণ্য করবো না।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, আরবের কতিপয় নেতাকে কেবল তাদের মনোরঞ্জনের জন্য হুনায়েনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দেয়া হয়েছিলো। রসুল স. সর্বপ্রথম তাদেরকেই গণিমত দান করেছিলেন। কাউকে দিয়েছিলেন একশতটি এবং কাউকে দিয়েছিলেন পঞ্চাশটি করে উট। পঞ্চাশের কমে কাউকে দেননি। সালেহী এ রকম সাতান্ন জনের নাম উল্লেখ করেছেন। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত হাকিম বিন হাজ্জাম বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. এর নিকট তখন একশ' উট চেয়েছিলাম। তিনি স. আমাকে একশ' উটই দিয়েছিলেন। আমি পুনরায় তাঁর নিকট একশ' উট চাইলাম। তিনিও পুনরায় এক'শ উট দিলেন এবং বললেন, হাকিম, এগুলো হচ্ছে সুমিষ্ট সম্পদ। উদার অন্তরে গ্রহণ করো। বরকত লাভ করবে। লোভের বশবর্তী হয়ে গ্রহণ করলে বরকত পাবে না। যেমন পেটুক ব্যক্তিরা যতই আহার করুক না কেনো, তৃপ্ত হয় না। উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম (গ্রহিতা অপেক্ষা দাতা উত্তম)। সুতরাং সবসময় দান করতে চেষ্টা করবে। হাকিম বললেন, যে আল্লাহ্ আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন সেই আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এখন থেকে কারো নিকটে কিছু চেয়ে নিজেকে ছোট করবো না। তাই করেছিলেন তিনি। হজরত ওমর তাঁর খেলাফত কালে হাকিমকে কিছু দিতে চাইলে তিনি তা নিতে অস্বীকার করেছিলেন। হজরত ওমর তখন বলেছিলেন, হে লোক সকল! আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমি হাকিমকে তাঁর অংশ দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। ইবনে আবী জিয়াদের বর্ণনায় এসেছে, হাকিম প্রথম বারের একশ' উট নিয়েছিলেন। পরের একশ' উট তিনি নেননি।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. তখন সুহাইল বিন আমরকে দিয়েছিলেন একশ' উট, আবু সুফিয়ান বিন হরবকে দিয়েছিলেন একশ' উট ও চল্লিশ আওকিয়া চাঁদি। মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান এবং ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানকেও দিয়েছিলেন একশত করে উট ও চল্লিশ আওকিয়া চাঁদি।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া বলেছেন, রসুল স. ছিলেন আমার দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা অপ্রিয়। কিন্তু হুনায়েন যুদ্ধের পর তিনি আমাকে এতো বেশী দান করলেন যে, তাঁকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় না ভাবা আমার পক্ষে হয়েছিলো অসম্ভব। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন সাফওয়ানকে দিয়েছিলেন একশ' উট। এরপর একশ'। তারপর আবার একশ'। মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, সাফওয়ান রসুল স. এর সঙ্গে চলতে চলতে এক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে জমা করা ছিলো অনেক উট, বকরী ও ভেড়া। ওগুলো ছিলো গণিমতের মাল— যা, আল্লাহ্পাক যুদ্ধ ব্যতীত রসুল স.কে দান করেছিলেন। সাফওয়ান পশুগুলোকে খুব পছন্দ করলেন। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেগুলোর দিকে। রসুল স. বললেন আবু ওহাব! এগুলো কি তোমার পছন্দ? সাফওয়ান বললো, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে, এগুলো সব তোমার। সাফওয়ান বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র রসুল। রসুল ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এ রকম আনন্দিত চিত্তসম্বলিত দান সম্ভব নয়।

ইমাম আহমদ, মুসলিম ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত রাফে বিন খাদিজ বলেছেন, মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে রসুল স. প্রথম দান করেছিলেন একজন পুরুষকে। এরপর অন্যদেরকেও শত শত উট প্রদান করেছিলেন। আব্বাস বিন মুরদাসকে দান করেছিলেন এক শতের কম উট। আব্বাস তখন এই কবিতাটি পাঠ করেছিলেন— আপনি কি আমাকে ওয়াইনা বিন হাসান ফাজারী এবং আকরা বিন হাবাসের সমান্তরাল করে দিতে চান? হাসান ও হাবাস তো কখনো আমার পিতা মুরদাসের সমমর্যাদা সম্পন্ন ছিলো না। এই কবিতা শুনে রসুল স. তার উট এক শত পুরো করে দিলেন।

রসুল স. ওসমান বিন ওয়াহাব, আদি বিন কায়েস, উমায়ের বিন ওয়াহাব, আলা বিন জরিয়া, মাখরামা বিন নওফেলকে তাদের মনোতুষ্টির জন্য পঞ্চাশটি করে উট প্রদান করলেন। এরপর হজরত যায়েদ বিন সাবেতকে নির্দেশ দিলেন, সৈন্যদের সংখ্যা নিরুপণ করো। আর গণিমতের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হও। নির্দেশানুযায়ী সেনা সংখ্যা ও সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণের পর গণিমত বণ্টন শুরু করা হয়। পদাতিকেরা পায় চারটি করে উট এবং চল্লিশটি করে বকরি। অশ্বারোহীদের দেয়া হয় বারোটি করে উট অথবা একশত বিশটি করে বকরি

www.eelm.weebly.com

(অশ্বারোহীরা পায় পদাতিকদের তিনগুণ) একাধিক অশ্বের অধিকারীদেরকে তাদের অতিরিক্ত অশ্বের জন্য কিছুই দেয়া হয় না। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে উট ছিলো চব্বিশ হাজার আর বকরি ছিলো চল্লিশ হাজারের বেশী। একটি উটকে ধরা হয়েছিলো দশটি বকরির সমান। মনোতুষ্টি সাধনার্থে সর্বমোট দেয়া হয়েছিলো চার হাজার উট। তাদের অংশ ধরা হয়েছিলো পঁচিশ শত (খুমুসুল খুমুস), অথবা তার চেয়েও কিছু বেশী। বরং সমস্ত সম্পদের সাত ভাগের এক ভাগ দেয়া হয়েছিলো তাদেরকে। এমতো অবস্থায় দু'টি অভিমতের একটিকে গ্রহণ করতে হবে। নতুবা হিসেবে থেকে যাবে বৈসাদৃশ্য। আসলে কিছু লোকের মনোতুষ্টির জন্য তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে সমস্ত সম্পদের প্রায় এক পঞ্চমাংশ দেয়া হয়েছিলো প্রথমে। তারপর সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়েছিলো অবশিষ্ট অংশ। সৈন্যদের সংখ্যা ছিলো বারো হাজার বা ষোল হাজার। কেউ কেউ ছিলেন অশ্বারোহী। পদাতিকদের ভাগে পড়ে চারটি করে উট। আর অশ্বারোহীরা পায় ষোলটি করে। এভাবে হিসাব করলে গণিমতের সর্বমোট উটের সংখ্যা দাঁড়ায় ষাট হাজার। অথচ উটের সংখ্যা ছিলো চব্বিশ হাজার বা আটাশ হাজার। সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে অতিরিক্ত উটগুলো কোত্থেকে এলো? এই জটিলতাটি নিরসনার্থে বলা যেতে পারে যে, সম্ভবতঃ গণিমতের চাঁদিগুলোকেও উটের মাপ কাঠিতে ফেলে দেয়া হয়েছিলো। এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়।

মোহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, মোহাম্মদ বিন হারেস তায়েমী বলেছেন জনৈক সাহাবী (মোহাম্মদ বিন ওমর বলেছেন, তাঁর নাম হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস) তখন বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি তো উয়াইনিয়া বিন হাসান এবং আকরা বিন হাবাসকে এক শত করে উট প্রদান করেছেন। কিন্তু জায়িল বিন সুরাকা জামেরীকে দিলেন অনেক কম। তিনি স. বললেন, আমার জীবনাধিকারী পবিত্র সত্তার শপথ! উয়াইনিয়াও আকরার চেয়ে অনেক উত্তম। ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তাকে আমি দান করেছি বেশী। আর সুরাকাকে তো আমি ইসলামে সমর্পিত করেই দিয়েছি (তার ইসলাম ও ইমান চির অনড়)।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আমর ইবনে সা'লাব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হুনায়েন যুদ্ধের পর কাউকে কাউকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিয়েছিলেন। কাউকে দেননি। যাদেরকে কিছুই দেয়া হয়নি তারা মনে করলেন, আল্লাহর রসুল হয়তো আমাদের উপর নারাজ। তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে রসুল স. বললেন, ইসলামের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করার জন্য দুর্বলচিত্ত ইমানদারদেরকে আমি এভাবে উপহার প্রদান করলাম । আর যাদের ইমান মজবুত তাদেরকে আমি কিছুই দেইনি। ওমর ইবনে সা'লাবও রয়েছে তাদের মধ্যে। হজরত ওমর ইবনে সা'লাব বলেছেন, রসুল স. এর এ কথা লাল উটের অধিকারী হওয়া অপেক্ষা

www.eelm.weebly.com

আমার নিকট অধিকতর প্রিয় মনে হলো। রসুল স. আরো বললেন, আমার প্রিয়জনদের ছেড়ে ওই সকল লোকদেরকে উপহার প্রদান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ কথা ভেবে আমি দুর্ভাবনাগ্রস্ত হয়ে পড়ি যে, আমার এহেন উপহার না পেয়ে তারা যদি ধর্মত্যাগ করে জাহান্নামের পথে চলে যায়, তবে কিভাবে তারা সহ্য করবে আল্লাহ্র আযাব। বোখারী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে মোহাম্মদ বিন ইসহাক, ইমাম আহমদ— হজরত আনাস বিন মালেক থেকে আহমদ, বোখারী, মুসলিম এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন ইয়াজিদ বিন আসেম থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. হুনায়েন যুদ্ধের গণিমত ইচ্ছে মতো কুরায়েশ ও অন্যান্য আরব নেতাদেরকে দান করেছিলেন। অপর বর্ণনায় এসেছে, তাদের প্রত্যেককে রসুল স. দান করেছিলেন একশ'টি করে উট। কিন্তু আনসারদেরকে তিনি কোনো কিছুই দেননি। এতে করে আনসারেরা মনোক্ষুণ্ন হলেন। কেউ কেউ বলতে শুরু করলেন, আল্লাহ্পাক তাঁর রসুলকে নিরাপদ রাখুন। আর্শ্চয! তিনি কুরায়েশদেরকে সব দিয়ে দিচ্ছেন, আমাদেরকে কিছুই দিচ্ছেন না। অথচ আমাদের তরবারীও শত্রুদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। বিপর্যয় দেখা দিলে আমাদেরকে আহ্বান করা হয়। অথচ গণিমত পায় অন্যেরা। আমরা জানি না কোন বিধান অনুসারে এ রকম করা হচ্ছে। যদি আল্লাহ্র নির্দেশে এ রকম করা হয় তবে আমরা ধৈর্য ধারণ করবো। আর যদি রসুল স. এর নির্দেশে এ রকম করা হয়ে থাকে তবে আমরা বেঁচে থাকার চেষ্টা করবো তাঁর অসন্তোষ থেকে। একজন আনসার বললেন, আমার তো আগেই ধারণা হয়েছিলো, কাজ শেষ হয়ে গেলে অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। আমরা তখন হয়ে পড়বো অপাংক্তেয়। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, আনসারগণের এ রকম কথোপকথনের সংবাদ রসুল স. পর্যন্ত পৌঁছলো। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, তখন হজরত ইবনে উবাদা রসুল স,এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আনসারগণ খুবই মনোক্ষুণ্ন। রসুল স. বললেন, কেনো? হজরত সা'দ বললেন আপনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিয়েছেন কেবল আপনার সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য আরব নেতাদেরকে। তাদেরকে কিছুই দেননি। রসুল স. বললেন, এ সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ? হজরত সা'দ বললেন আমি তো তাদেরই একজন। রসুল স. বললেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এ বেষ্টনীর মধ্যে একত্র করো। হজরত সা'দ বাইরে এসে আনসার সাহাবীদেরকে উচ্চস্বরে ডাকতে শুরু করলেন। একে একে উপস্থিত হলেন সকল আনসার। একজন মুহাজির সাহাবীও এলেন। হজরত সা'দ তাঁকেও বসবার অনুমতি দিলেন। তার দেখাদেখি অন্যান্য মুহাজির সাহাবীও ওই

www.eelm.weebly.com

মজলিশে বসবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু হজরত সা'দ অনুমতি দিলেন না। কিছুক্ষণ পর আনসার সাহাবীগণের সমাবেশে উপস্থিত হলেন রসুল স.। বর্ণনা করলেন আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা। তারপর বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট। আমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন। ছিলে নিঃস্ব। তারপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে করেছেন বিত্তশালী। ছিলে পরস্পরের শত্রু। তারপর পারস্পরিক শত্রুতা মিটিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ই তোমাদেরকে করেছেন একতাবদ্ধ। বলো, আমি ঠিক বলেছি কিনা? আনসারগণ জবাব দিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি ঠিকই বলেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল আমাদেরকে অনুগৃহীত করেছেন। এ রকম প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুগ্রহকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলেন। রসুল স. বললেন, হে আনসারগণ! তোমরা বাস্তবসম্মত কথা বলছো না কেনো? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এছাড়া আমরা আর কি বলতে পারি। রসুল স. বললেন, তোমরা বলতে পারো— হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি দেশত্যাগী হয়েছিলেন, আমরা আপনাকে স্বাগতম জানিয়েছি। আপনি ছিলেন সহায়হীন, আমরা আপনাকে দিয়েছি অন্তরঙ্গ আতিথ্য। আপনি ছিলেন শংকাগ্রস্ত। আমরা আপনাকে করেছিলাম শংকামুক্ত। যখন কেউ আপনাকে সাহায্য করেনি, তখন আমরা হয়েছি আপনার সাহায্যকারী। যখন আপনাকে সকলে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, তখন আমরাই বিশ্বাস করেছিলাম আপনাকে। আনসারগণ বললেন, আমাদের উপরে রয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অপার অনুগ্রহ। রসুল স. বললেন, যদি তাই হয়, তবে আমি এ রকম কথা শুনতে পাচ্ছি কেনো? আনসারগণ রইলেন নিরুত্তর। রসুল স. পুনরায় একই প্রশ্ন করে বসলেন। তখন কতিপয় বিজ্ঞ আনসার সাহাবী নিবেদন করলেন, আমাদের কিছু যুবক এ রকম বলেছে। রসুল স. বললেন, আমি এমন লোকদেরকে পুরস্কার প্রদান করেছি যাদের বিশ্বাস এখনো সুদৃঢ় নয়। যারা এখনো অতিক্রম করছে মূর্খতার ক্রান্তিকাল। অপর বর্ণনায় এসেছে এ রকম— আমি কুরায়েশদেরকে উপহার প্রদান করেছি এ জন্যে যে, তারা এখন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বহারা। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিহীনতার জখমের উপরে আমি বুলিয়ে দিচ্ছি সান্ত্বনার প্রলেপ। হে আনসার জনতা! তোমাদের অন্তরে নশ্বর পৃথিবীর সম্পদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে কেনো? আমি তো তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি আল্লাহ্র মনোনীত ইসলামের উপর, যে ইসলাম দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৌভাগ্যশালী করেছেন। হে ইসলামের সাহায্যকারী! তোমরা কি এ কথা ভেবে আনন্দিত নও যে, লোকেরা পশুপাল নিয়ে চলে যাবে, আর তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে আল্লাহ্র রসুলকে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা তাদের ঘরে নিয়ে যাবে দুনিয়া, আর তোমরা তোমাদের ঘরে নিয়ে যাবে আল্লাহ্র রসুলকে। যার

www.eelm.weebly.com

অলৌকিক হস্তে আমার জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! সকল লোক যে পথে চলে সে পথে নয়— আমি চলবো ওই পথে, যে পথের পথিক আনসার সম্প্রদায়। অন্য লোকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বাহ্যিক। আর আনসারদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আন্তরিক। আনসারেরা আমার কলিজা, গোপন সম্পদ। আমি যদি হিজরতকারী না হতাম, তবে অবশ্যই হতাম আনসারদের অন্তর্ভূত। হে আমার আল্লাহ্! আনসারদের প্রতি, তাদের সন্তানদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো। এই হৃদয়হারক বক্তৃতা শুনে আনসারগণ কাঁদতে শুরু করলেন। চোখের জলে ভিজে গেলো তাঁদের শ্মশ্রুসমূহ। তারা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, আমরা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলকে পেয়ে পরিতুষ্ট (পৃথিবীর সম্পদ আমরা চাই না)।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, এরপর রসুল স. বাহরাইনের জায়গীর আনসারদের নামে লিখে দিতে চাইলেন। তখনকার বাহরাইন ছিলো অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর একটি অঞ্চল। আনসারগণ বাহরাইনের জায়গীর গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! দুনিয়া আমরা চাই না। রসুল স. বললেন, আমার পরলোকগমনের পর অন্যেরা তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে (অধিকারী হবে সম্পদের ও কর্তৃত্বের)। তোমরা তখন ধৈর্য ধারণ কোরো— যে পর্যন্ত না হাউজে কাওসারের সন্নিকটে আমার সঙ্গে মিলিত হও।

যুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতাগণ লিখেছেন, যুদ্ধশেষে হাওয়াজেনদের প্রতিনিধি দলের নিকট রসুল স. জিজ্ঞেস করলেন, মালেক বিন আউফ কোথায়? তারা বললো, সাকিফ গোত্রের সঙ্গে। তিনি তায়েফ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। রসুল স. বললেন, তাকে গিয়ে বলো, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে আমি তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও সম্পদ ফিরিয়ে দিবো। একশত উটও দান করবো। রসুল স. মালেকের পরিবার পরিজনকে তার মক্কাবাসিনী ফুফী উম্মে আবদিল্লা বিনতে উমাইয়ার গৃহে বন্দী করে রেখেছিলেন। রসুল স. এর প্রস্তাব মালেকের নিকট পৌঁছানো হলো। সে বুঝতে পারলো, তার পরিবার পরিজন বিশেষ তত্ত্বাবধানে রয়েছে। সে মনস্থির করলো, রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত হতেই হবে। কিন্তু সে ভাবলো, এ কাজ করতে হবে অত্যন্ত গোপনে। নতুবা আপন সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাকে বন্দী করে ফেলবে। সে তার নির্ভরযোগ্য অনুচরকে ওহানা নামক স্থানে একটি উট প্রস্তুত রাখতে বললো। তারপর গভীর রাতে সকলের অগোচরে দুর্গ থেকে বের হয়ে একটি ঘোড়ায় চড়ে পৌঁছে গেলো সেখানে। তারপর সেখান থেকে উষ্ট্রারোহী হয়ে রওনা দিলো জিয়িররানা অথবা মক্কার দিকে। রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হলে ফিরিয়ে দেয়া হলো তার পরিবার পরিজন ও সম্পদ। দেয়া হলো একশত উটও। মালেক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সর্বান্তকরণে। পরবর্তী জীবনে সে কথা প্রমাণিত হয়েছে। রসুল স. তাঁকে হাওয়াজেন, সাক্বিফ ও সালমা গোত্র থেকে আগত নওমুসলিমদের নেতৃত্বে

www.eelm.weebly.com

অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ওই অঞ্চলের অন্যান্য নওমুসলিমদেরকেও করে দিয়েছিলেন তাঁর নেতৃত্বের অধীন। এরপর মালেক মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। লুণ্ঠন করেন জংগলে লুকিয়ে রাখা সাক্বিফদের পশুর পাল। প্রতিবাদী আকাদ অঞ্চলের লোকদের করেন হত্যা। যথারীতি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ পাঠিয়ে দেন রসুল স. এর দরবারে। এভাবে একবার পাঠান একশত উট ও এক হাজার ছাগল ও ভেড়া। তায়েফবাসীদের পশুগুলোকেও ধরে আনেন তিনি। এক দিনেই সেখান থেকে নিয়ে আসেন এক হাজার মেষ ও ছাগল।

ইবনে ইসহাক সূত্রে ইউনুস বর্ণনা করেছেন, নবম হিজরীর রমজান মাসে সাক্বিফ গোত্রের প্রতিনিধিরা রসুল স. এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ঘটনাটি ঘটেছিলো তাবুক যুদ্ধের পরে।

সুরা তওবাঃ আয়াত ২৮

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

❒ হে বিশ্বাসিগণ! অংশীবাদীরা তো অপবিত্র; সুতরাং এই বৎসরের পর তাহারা যেন মস্‌জিদুল হারামের নিকট না আসে। যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর তবে জানিয়া রাখ আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিজ করুণায় তোমাদিগকে অভাবমুক্ত করিতে পারেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

'নাজাসুন' অর্থ অপবিত্র। শব্দটির উৎসরণ ঘটেছে সামেয়া ও কারুমা রীতি অনুসারে। তাই শব্দটি একবচন বোধক, বহুবচন বোধক নয়। আবার পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রে শব্দটি একইরূপে ব্যবহৃত হয়। শব্দটিকে ধাতু বা শব্দমূল যেমন বলা যাবে না, তেমনি শব্দমূল নয়— এ রকমও বলা যাবে না। এখানে বিধেয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে উদ্দেশ্য। বিধেয় হওয়ার কারণেই শব্দটি এখানে মূল ধাতুরূপে গণ্য। এখানে বলা হয়েছে, আল মুশরিকুনা নাজাসুন (অংশীবাদীরা তো অপবিত্র)। এ রকম বক্তব্যভঙ্গির কারণে প্রমাণিত হয় যে, অংশীবাদীরা প্রকৃত অর্থেই অপবিত্র। অর্থাৎ তাদেরকে হাত দ্বারা স্পর্শ করলে হাত নাপাক হয়ে যাবে। তারা নাপাকী বহনকারী বা অপবিত্রতাবাহী— এ রকমও বলা যেতে পারে।

'নাজাসুন', 'নিজসুন', 'নাজিসুন', 'নাজুসুন'— শব্দগুলো সমঅর্থসম্পন্ন। 'কামুস' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, 'নাজাস' বলা হয় ওই সকল বস্তুকে, যেগুলোকে একজন সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি অপবিত্রতা বলে থাকে। যেমন— মল, মূত্র,

www.eelm.weebly.com

বীর্য, রক্ত ইত্যাদি। এগুলো প্রকৃত অর্থেই নাপাক। শরিয়তও এগুলোকে নাপাক বলেছে। এগুলোর নাপাকি অবশ্যই বাহ্যিক। এগুলোকে মুমিন, মুশরিক সকলেই নাপাক বলে থাকে। কিন্তু এখানে মুশরিকদেরকে অপবিত্র বলা হয়েছে এ সকল কারণে নয়। তাদের নাপাকি অস্তিত্বজ ও অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক নাপাকি থেকে যেমন মুক্ত থাকা আবশ্যক, তেমনি অভ্যন্তরীণ নাপাকী থেকেও মুক্ত থাকা অপরিহার্য। অতএব, অংশীবাদীদের স্পর্শ থেকেও মুক্ত থাকতে হবে। তাদের সঙ্গে একত্রবাস বৈধ নয়। বসতবাটিও নির্মাণ করা সমীচীন নয় তাদের বসতবাটির সঙ্গে।

হজরত আবু উবায়দা এবং জুহাক বলেছেন, এখানে নাজাসাত অর্থ নাজাসাতে গলিজা (গুরু অপবিত্রতা), নাজাসাতে খফিফা (লঘু অপবিত্রতা) নয়। ইমাম বাগবী লিখেছেন, এখানে শারীরিক অপবিত্রতার কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে বিধানগত (হুকুমী) অপবিত্রতার কথা। কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বা কারণ উল্লেখ ব্যতিরেকেই এখানে অংশীবাদীদেরকে কেবল হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে 'অপবিত্র'।

কাতাদা বলেছেন, কাফেরেরা এ কারণে অপবিত্র যে, তারা ওজু ও রতিকর্ম পরবর্তী গোসল কিংবা বীর্যস্খলন পরবর্তী গোসল করে না। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকে না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুশরিকেরা কুকুরের মতো অপবিত্র। কুকুরের দেহ যেমন নাপাক, তেমনি মুশরিকদের শরীরও নাপাক। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু শায়েখ ও ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, তোমরা অংশীবাদীদের সঙ্গে করমর্দন করলে ওজু করে নিয়ো। অথবা নির্দেশ করেছেন, হাত ধুয়ে নিয়ো। এই বিবরণটি আলেমগণের ঐকমত্যবিরোধী— তাই অগ্রহণীয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং এ বছরের পর তারা যেনো মসজিদুল হারামের নিকটে না আসে।' হানাফী মতাবলম্বীগণ বলেছেন, এ কথার অর্থ— এ বছরের পর থেকে মুশরিকেরা যেনো হজ ও ওমরা না করে। এই নির্দেশনাটির মাধ্যমে মসজিদুল হারামে তাদের প্রবেশকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। তাই অন্যান্য মসজিদে তাদের প্রবেশ অসিদ্ধ নয়। 'নিকটে না আসে' কথাটির অর্থ এখানে— তারা যেনো মসজিদুল হারামের সন্নিকটে এসে হজ ও ওমরা না করে।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'নিকটে না আসে' বলে এখানে অংশীবাদীদের হেরেম শরীফের সীমানায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার অর্থ হচ্ছে মসজিদের নিকটে চলে আসা। এখানকার

www.eelm.weebly.com

বাকভঙ্গিটি অন্য একটি আয়াতের মতো, যেখানে বলা হয়েছে— 'সুবহানাল্লাজী আস্‌রা বি আ'বদিহী লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকসা' (পবিত্র সেই আল্লাহ্, যিনি রাতে তাঁর আপনতম বান্দাকে ভ্রমণ করান মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায়)। আয়াতটি রসুল স. এর মেরাজ সম্পর্কিত। মেরাজের রাতে রসুল স.কে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো হজরত উম্মে হানির ঘর থেকে। মসজিদুল হারাম (কাবা শরীফ) থেকে নয়। অথচ আয়াতে বলা হয়েছে— মসজিদুল হারাম থেকে। সুতরাং আলোচ্য নির্দেশনাটির অর্থ হবে— মুশরিকেরা যেনো হেরেম শরীফের সীমানায় প্রবেশ না করে।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, ১. জিম্মী (কর প্রদাতা), বিদ্রোহী, সন্ধিবদ্ধ— সকল প্রকার মুশরিকদের জন্য হেরেম শরীফের সীমানায় অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ। আমিরুল মু'মিনীন (ইমানদারদের নেতা) হেরেম শরীফে অবস্থানের সময় যদি কাফের সাম্রাজ্যের কোনো দূত আগমন করে, তবে তাকে হেরেমে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যাবে না। আমিরুল মু'মিনীন তাঁর প্রতিনিধিকে হেরেমের বাইরে পাঠিয়ে দূতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলবেন।

২. হেরেম শরীফের বাইরে হেজাজের অন্যান্য অঞ্চলে কার্যোপলক্ষে কাফেরেরা আগমন করতে পারবে তবে তিন দিনের বেশী অবস্থান করতে পারবে না। হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীর জীবনে সময় পেলে আমি ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দিবো। মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ এখানে বসবাস করতে পারবে না। কিন্তু রসুল স. তাঁর এই ইচ্ছাটির বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারেননি। পরবর্তীতে খলিফা হজরত আবু বকরও একাজ সমাপ্ত করতে পারেননি। হজরত ওমরের খেলাফতকালে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবরূপ নিয়েছিলো। হজরত ওমর সকল অমুসলিমকে বের করে দিয়েছিলেন জাজিরাতুল আরব থেকে। অবশ্য বাণিজ্য ব্যাপদেশে অমুসলিম ব্যবসায়ীরা হেজাজে আসা যাওয়া করতে পারতো। কিন্তু তিন দিনের বেশী তাদেরকে থাকতে দেয়া হতো না। জাজিরাতুল আরবের সীমানা হচ্ছে দৈর্ঘ্যে এডেন বন্দর থেকে ইরাকের শস্যভূমি পর্যন্ত। আর প্রস্থে জেদ্দার সাগরোপকূল থেকে সিরিয়া পর্যন্ত।

৩. অন্যান্য মুসলিম রাজ্যের জিম্মিরাও মুসলমানদের অনুমতি ব্যতীত মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ী এ ব্যাপারে কাবা শরীফ ও অন্যান্য মসজিদের মধ্যে বিধানগত পার্থক্য নিরুপণ করেছেন। বলেছেন, বিধর্মীদের জন্য মসজিদুল হারামে প্রবেশ নিষিদ্ধ, কিন্তু অন্যান্য মসজিদে প্রবেশ জায়েয। মালেকী মতাবলম্বীগণ ও মাজানীর অভিমত হচ্ছে, হেরেম শরীফে বিধর্মীদের প্রবেশ যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি অন্যান্য মসজিদেও তাদের প্রবেশ নাজায়েয। ইমাম বোখারী মসজিদে বিধর্মীদের প্রবেশ সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। ওই অধ্যায়ে হজরত আবু হোরায়রা

—১৯

www.eelm.weebly.com

কর্তৃক এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. কতিপয় অশ্বারোহী যোদ্ধাকে প্রেরণ করলেন নজদের দিকে। তাঁরা সেখান থেকে ধরে নিয়ে এলেন বনু হানুফার সুমামা বিন আম্‌সাল নামের এক লোককে। তাকে মসজিদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। সুরা আন্‌ফালের তাফসীরে এই ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনার মাধ্যমে বিধর্মীদের মসজিদে প্রবেশ বৈধ প্রমাণ করা যায় না। কারণ ঘটনাটি ঘটেছিলো মক্কা বিজয়ের পূর্বে। আর মসজিদে বিধর্মীদের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে মক্কা বিজয়ের পর, নবম হিজরীতে।

কোনো কোনো আলেম ধারণা করেন, আহলে কিতাবকে (ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে) বিশেষ ব্যবস্থাধীনে মসজিদুল হারামে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার এই মতকে খণ্ডন করেছেন। বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন, সুমামাকে মসজিদের খুঁটিতে বেঁধে রাখার হাদিসটি উল্লেখিত অভিমতের একটি বিরুদ্ধ প্রমাণ। কারণ সুমামা আহলে কিতাব ছিলো না।

বায়যাবী এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ইসলামের শাখা-প্রশাখাগত নির্দেশ অমান্যকারীরাও কাফের। তাই তাদেরকে মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু বায়যাবীর এ অভিমতটি ভুল। কারণ আয়াতে নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে কাফেরদের প্রতি। মুসলমানদের প্রতি নয়। ইমানদারদেরকে সম্বোধন করে কেবল জানিয়ে দেয়া হয়েছে নির্দেশনাটি। তাই শুরুতে বলা হয়েছে— ইয়া আইয়্যুহাল্‌লাজীনা আমানু (হে বিশ্বাসীগণ)।

উল্লেখ্য যে, নির্দেশটি শাখা-প্রশাখাগত হলে হজও হয়ে পড়বে শাখা-প্রশাখাগত বিষয়। তখন মূল বিষয় হবে কেবল তৌহিদ (এক আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস) এবং রেসালত (রসুলে বিশ্বাস)। কিন্তু ব্যাপারটি সেরকম নয়। হজ ইসলামের মূল বিষয়ের অন্তর্ভূত। তাই আলোচ্য আয়াতে তাদের হজ ও ওমরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ রকম বললে আবার সৃষ্টি হয় বৈপরীত্য। আরো উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ প্রতিপালনের মধ্যে রয়েছে সওয়াব বা পুণ্য প্রাপ্তির সুযোগ। কিন্তু এ কথাও তো ঠিক যে, অবিশ্বাসীদেরকে তাদের ভালো কাজের জন্য সওয়াব দেয়া হয় না। কারণ সওয়াব ধারণের মূল পাত্র ইমানই তাদের নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে জারীর, আবু শায়েখ এবং হজরত ইকরামা থেকে আতিয়া আউফি, জুহাক, কাতাদা প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, বিধর্মী ব্যবসায়ীরা হেরেম শরীফের সীমানায় প্রবেশ করে ব্যবসা বাণিজ্য করতো। কিন্তু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাদের আগমন বন্ধ হয়ে যায়। মুসলমানেরা পড়ে যান সংকটে। তাঁরা বলাবলি করতে থাকেন, এখন আমরা প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী পাবো কেমন করে? তখন অবতীর্ণ হলো আয়াতের শেষ অংশ এভাবে— 'হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা করো তবে জেনে রেখো আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করতে পারেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভর করবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এখানে। বলে দেয়া হয়েছে— মানুষ বিত্তাধিকারী হতে পারে কেবল আল্লাহ্‌তায়ালার অনুকূল ইচ্ছায়। আল্লাহ্‌তায়ালা সর্বজ্ঞ। বিধর্মীদের ও বিশ্বাসীদের ধ্যান ধারণা, কথাবার্তা সবকিছুই তাঁর অসীম জ্ঞানের অধীন। আর তিনি প্রজ্ঞাময়ও। বিত্তাধিকারী ও বিত্তহীন করা না করার মধ্যে রয়েছে তাঁর অপার প্রজ্ঞাময়তার নিদর্শন। অতএব, হে বিশ্বাসীরা! তোমরা শুভ পরিণামের অপেক্ষা করো। সমর্পিত হও কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি— যিনি সকলের অভাব মোচনকারী।

হজরত ইকরামা বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক বিশ্বাসীদেরকে যে অচিরেই বিত্তশালী করবেন— তার সংবাদ দেয়া হয়েছে এখানে। আল্লাহ্‌তায়ালা প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটালেন। এরপর থেকে আরব অঞ্চলেই শুরু হলো ফল ও ফসলের আবাদ। মুকাতিল বলেছেন, জেদ্দা, সানাআ ও জরশবাসীরা মুসলমান হয়ে গেলো। সেখানকার ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসতে শুরু করলো প্রয়োজনীয় পণ্য। ফলে মক্কাবাসীদের আর কোনো অসুবিধা রইলো না।

জুহাক ও কাতাদা বলেছেন, এখানে 'তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করতে পারেন'— কথাটিতে এমতো ইঙ্গিত রয়েছে যে— অচিরেই বিজিত দেশ সমূহ থেকে আসতে থাকবে বিপুল জিযিয়া। তাই হলো। আসতে শুরু করলো বিপুল পরিমাণ জিযিয়া। আর ওই জিযিয়ার অংশ পেয়ে মুসলমানেরা হয়ে গেলেন বিত্তশালী।

সুরা তওবাঃ আয়াত ২৯

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝

❑ যাহাদিগের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে যাহারা আল্লাহে বিশ্বাস করে না ও পরকালেও নহে এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূল যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়।

মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াতে রোমানদের বিরুদ্ধে জেহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই রসুল স. এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রোমানদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য তাবুক গমন করেন।

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌কে ও পরকালকে বিশ্বাস করে না।' এখানে 'যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে। আল্লাহ্‌ ও আখেরাতের প্রতি সঠিক বিশ্বাস তাদের নেই।

একটি সন্দেহঃ ইহুদী ও খৃষ্টানেরা তো আল্লাহ্‌কে ও আখেরাতকে মানে। তবুও তাদেরকে এখানে এভাবে অবিশ্বাসী বলা হলো কেনো?

সন্দেহ ভঞ্জনঃ আল্লাহ্‌র প্রতি যেভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়েছে, ইহুদী ও খৃষ্টানেরা সেভাবে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে তাদের মনগড়া নিয়মে। এ রকম বিশ্বাস আল্লাহ্‌পাকের নিকট গ্রহণীয় নয়। যেমন— আল্লাহ্‌পাক চির অমুখাপেক্ষী। তিনি কারো সন্তান অথবা পিতা নন। অথচ ইহুদীরা হজরত উযায়েরকে এবং খৃষ্টানেরা হজরত ঈসাকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে। যারা এ রকম বলে, তাদের 'ইমান' বলে আর কি কিছু অবশিষ্ট থাকে? আখেরাতের প্রতিও তাদের সঠিক বিশ্বাস নেই। তারা মনে করে, জান্নাত তাদের জন্য অবধারিত। ইহুদীরা বলে, তারা দোজখে গমন করলেও সেখানে তারা অবস্থান করবে অল্প কয়েকদিন মাত্র। তারা আরো বলে, জান্নাত দুনিয়ার মতোই। দুনিয়ার মতোই সেখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকতে পারে। আবার নাও থাকতে পারে। আখেরাত সম্পর্কে এ রকম ধারণা যারা রাখে তাদেরকে কি বিশ্বাসী বলা যায়? উল্লেখ্য যে, মোতাজিলারাও আখেরাতের প্রতি সঠিক বিশ্বাস রাখে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুল যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা নিষিদ্ধ করে না।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা ও তাঁর রসুল মোহাম্মদ স. যে সকল বিষয়কে হারাম ঘোষণা করেন, সেগুলোকে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা হারাম বলে মান্য করে না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'রসুল' বলে মোহাম্মদ মোস্তফা স. কে বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে তাদের আপনাপন রসুলকে। অর্থাৎ হজরত মুসা ও হজরত ঈসাকে। তাঁরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, শেষ রসুল মোহাম্মদ স. আবির্ভূত হলে তাঁর অনুসারী হতে হবে। কিন্তু তারা এই নির্দেশ লংঘন করেছে। তাঁর অনুসরণ তো করেইনি, বরং করে চলেছে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র ও বিরুদ্ধাচরণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সত্য দ্বীনের অনুসরণ করে না।' কাতাদা বলেছেন, এখানে 'দ্বীনুল হাক্ব' (সত্য দ্বীন) কথাটির অর্থ হবে আল্লাহ্‌র দ্বীন। কেউ কেউ বলেছেন দ্বীন ইসলাম। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, এখানে 'সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না' বলে এ কথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যারা সত্যধর্মের অনুসারী, ইহুদী ও খৃষ্টানেরা তাদের প্রতি অনুগত নয়।

শেষে বলা হয়েছে 'তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়।'

www.eelm.weebly.com

'জিযিয়া' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিনিময় বা বদলা। শব্দটির শেষ অক্ষর 'তা' প্রতিদান প্রকাশক। 'জিযিয়া' হচ্ছে অপদস্থতার নিদর্শন। ওই সকল লোককে জিযিয়া কর দিতে হবে, যাদেরকে ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ জিযিয়া প্রদাতা নির্ধারণ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, জিযিয়া শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে 'জাযা দাইনাহু' থেকে, যার অর্থ— সে তার ঋণ পরিশোধ করেছে। এখানে আঁইয়্যাদিঁউ অর্থ আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ। 'ইয়াদ' অর্থ হাত। এখানে অর্থ আনুগত্যের হাত। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে, নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করতে হবে। অন্যের মাধ্যমে নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জিম্মীরা (কর প্রদাতা অবিশ্বাসীরা) নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করবে। অন্য কাউকে মাধ্যম নিযুক্ত করতে পারবে না। এ রকমও হতে পারে যে, 'আন ইয়াদিন' কথাটির অর্থ এখানে— অপদস্থতার সঙ্গে জিযিয়া পরিশোধ করা। আবু উবায়দা বলেছেন, কাফেরদেরকে জিযিয়া দিতে হবে বাধ্যতার বিস্বাদ ও ভয়ের অনুভূতির সঙ্গে। এভাবে বাধ্যতামূলক দেয়কে আরববাসীরা প্রকাশ করে এভাবে— ফুলানুন আয়্'তা আন ইয়াদিন। কেউ কেউ বলেছেন, 'আন ইয়াদিন' অর্থ নগদ প্রদান করা। বাকী না রাখা। কেউ কেউ আবার বলেছেন, কথাটির অর্থ এখানে— কৃতজ্ঞচিত্ততার নিদর্শনরূপে জিযিয়া দেয়া। অর্থাৎ জিযিয়া প্রদান করতে হবে এ রকম মনোভাব নিয়ে যে 'মুসলমানেরা অতি মহৎ— তাই দয়া করে জিযিয়া গ্রহণ করতে সম্মত হয়ে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে।'

'সগিরুন' অর্থ নত হয়ে, অপমানিত ও পরাজিত হয়ে। হজরত ইকরামা বলেছেন, এখানে কথাটির উদ্দেশ্য হবে— জিযিয়া গ্রহণকারী থাকবে উপবিষ্ট অবস্থায়। আর প্রদানকারী দাঁড়িয়ে থাকবে তার সামনে। এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁদের স্কন্ধদেশ পদদলিত করে আদায় করতে হবে জিযিয়া। কালাবী বলেছেন, জিযিয়া গ্রহণকালে তাদের ঘাড়ে মুষ্টাঘাত করে প্রাপ্তি স্বীকারের কথা জানিয়ে দেয়া যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, জিযিয়া গ্রহণের সময় তাদের দাড়ি ধরে তাদেরকে চড় থাপ্পড়ও মারা যাবে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তাদের জামার গলার কাছে ধরে বলপূর্বক তাদেরকে তাদের সঞ্চয়স্থলের দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বিধর্মীদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করার অর্থই তাদেরকে অপদস্থ করা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, জিম্মীদেরকে ইসলামের বিধানের আওতায় আনার অর্থই হচ্ছে তাদেরকে পরাভূত করা।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতে কেবল আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যান্য বিধর্মীর কথা এখানে বলা হয়নি। তাই হজরত ওমর তাঁর খেলাফতের সময় অন্যান্য বিধর্মীদের রাজ্য জয় করার পর তাদের উপর জিযিয়া আরোপ করেননি। কিন্তু হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ যখন এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করলেন যে, রসুলুল্লাহ্ স. অগ্নিউপাসকদের নিকট থেকেও জিযিয়া আদায় করতে বলেছেন, তখন হজরত ওমর অন্যান্য বিধর্মীদের উপরেও জিযিয়া নির্ধারণ করলেন। বোখারী এই বর্ণনাটি এনেছেন বাজালাহ্ বিন ইবাদ থেকে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বাজালাহ্ বর্ণনাকারী হিসেবে অপরিচিত। কিন্তু তাঁর গ্রন্থের 'জিযিয়া' অধ্যায়ে লিখেছেন, তার সূত্রে বর্ণিত হাদিস বিশুদ্ধ পদবাচ্য। এ কারণে অগ্নিউপাসকদের উপর জিযিয়া নির্ধারণের ব্যাপারটি ঐকমত্যসম্মত।

মতপার্থক্যঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আরব অনারব— সকল ইহুদী-খৃষ্টানদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করা যাবে। অনারব মুশরিকদের নিকট থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে— তারা অগ্নিপূজক হোক অথবা মূর্তিপূজক। মুরতাদদের (ধর্মত্যাগীদের) নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া যাবে না। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, আরববাসীদের নিকট থেকে পুরোপুরি জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না, তারা ইহুদী, খৃষ্টান, মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক— যেই হোক না কেনো। জিযিয়া আদায় করতে হবে কেবল অনারব আহলে কিতাব ও মুশরিকদের নিকট থেকে।

ইমাম মালেক এবং ইমাম আওজায়ী বলেছেন, আরব অনারব— সকল স্থানের কাফেরদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করা যাবে। তবে মুরতাদ এবং কুরায়েশ মুশরিকদের নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া যাবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ব্যক্তির উপর জিযিয়া আরোপ করা যাবে না। জিযিয়া আরোপ করতে হবে বিধর্মীদের দলের উপর। তাই জিযিয়া আদায় করতে হবে আরব ও অনারব ইহুদী-খৃষ্টানদের নিকট থেকে। মূর্তিপূজকদের নিকট থেকে সম্পূর্ণ জিযিয়া আদায় করা যাবে না। তবে ইমাম শাফেয়ীর নিকটে অগ্নিপূজারীরাও আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় এবং ইমাম শাফেয়ী তাঁর আল-উমে লিখেছেন, জাফর বিন মোহাম্মদ বলেছেন, আমার নিকট আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর একবার বললেন, আমি জানি না অগ্নিপূজারীদের ব্যাপারে আমার কি করা উচিত। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বললেন, আমি স্বয়ং রসুল স. কে বলতে শুনেছি, আহলে কিতাবেরা যে পদ্ধতিই অবলম্বন করুক না কেনো (তাদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করতে হবে)।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আমার নিকট নসর বিন আসেমের একটি বর্ণনা সাঈদ বিন মারজুবানের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন সুফিয়ান। ওই বর্ণনায় এসেছে, ফারওয়াহ্ বিন নওফেল বললেন, অগ্নিপূজারীর নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া হবে কিসের ভিত্তিতে? তারা তো আহলে কিতাব নয়। এ কথা শুনে রাগান্বিত হলেন

www.eelm.weebly.com

মাসতুরাদ। তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ফারওয়ার জামার গলদেশ পেঁচিয়ে ধরে হুংকার ছেড়ে বললেন, রে আল্লাহ্‌র দুশমন! কীভাবে তুই হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও হজরত আলীর প্রতি দোষারোপ করতে পারলি! তাঁরা তো অগ্নিপূজারীদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করেছিলেন। এরপর মাসতুরাদ গেলেন খলিফার গৃহে। হজরত আলী তখন বললেন, আহা! আমি তো অগ্নিপূজারীদের সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশী জানি। তাদের মধ্যেও ধর্মের জ্ঞান ও কিতাব ছিলো। তারা তা শিক্ষা করতো ও অন্যকে শিক্ষা দিতো। একবার তাদের রাজা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জড়িয়ে ধরলো তার মা অথবা কন্যাকে। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলো। তাদের আলেম সম্প্রদায় বললো, কিতাবের বিধান অনুসারে রাজাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাজা তখন জনসাধারণকে একত্র করে বললো, প্রথম নবী হজরত আদমের চেয়ে উত্তম ধর্ম আর কার হতে পারে? তিনি তাঁর আপন পুত্রের সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। আমি তাঁরই অনুসারী। তোমাদেরও উচিত হজরত আদমের ধর্মমতের অনুসারী হওয়া। জনসাধারণ রাজার বিধানকেই মেনে নিলো। রাজার বিরুদ্ধবাদীদেরকে করা হলো হত্যা। এক রাতের মধ্যেই শেষ হয়ে গেলো তাদের আলেম সম্প্রদায়। তাই অগ্নি উপাসকেরাও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। রসুল স. স্বয়ং, হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর তাদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করেছিলেন। হাদিসটি ইবনে জাওজী উল্লেখ করেছেন তাঁর 'আত্‌তাহকিক' গ্রন্থে। কিন্তু সাঈদ বিন মারজুবানের বিরূপ সমালোচনাও সেখানে করা হয়েছে। ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ বলেছেন, সাঈদ বিন মারজুবানের বর্ণনাকে আমি নির্ভরযোগ্য মনে করি না। ইয়াহ্‌ইয়া বিন কাত্তান বলেছেন, ওই লোকটি গ্রহণযোগ্য নয়। তার বর্ণনা লিপিবদ্ধযোগ্যও নয়। কাল্লাস বলেছেন, সাঈদ বিন মারজুবান পরিত্যক্ত। কিন্তু আবু উসামা তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আবু জারআ বলেছেন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, কিন্তু মুদলাস (প্রবঞ্চক)।

আমি বলি, ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল খেরাজ গ্রন্থে রয়েছে, সুফিয়ান বিন উয়াইনিয়ার মাধ্যমে নজর বিন আসেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, রসুলুল্লাহ্‌ স., হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর অগ্নিপূজারীদের নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় করেছেন। আর আমি অগ্নিপূজারীদের সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে ভালো জানি। তারা ছিলো আহলে কিতাব। তারা কিতাব পড়তো এবং শরিয়ত সম্পর্কে শিক্ষাও দিতো। কিন্তু তাদের বক্ষাভ্যন্তর থেকে ইলমে ইলাহী উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো। ইমাম আবু ইউসুফ নসর বিন খলিফা সূত্রে আরো লিখেছেন, ফারওয়াহ্‌ বিন নওফেল আশজায়ী একবার বললেন, অগ্নি উপাসকদের কাছ থেকে কর আদায় করা হয়েছিলো— এ কথাটি মেনে নেয়া কঠিন। কারণ

www.eelm.weebly.com

তারা আহলে কিতাব ছিলো না। এ কথা শুনে মাসতুর বিন আহনাফ রাগের চোটে দাঁড়িয়ে বললেন, তুই রসুল স. এর সিদ্ধান্ত নিয়ে রসিকতা করেছিস। এক্ষুণি তওবা কর। নয়তো আমি তোকে হত্যা করবো। রসুল স. তওবাজারে বসবাসকারী অগ্নিউপাসকদের নিকট থেকে কর আদায় করেছেন। শেষে দু'জনে বিষয়টি ফয়সালার জন্য উপনীত হলেন হজরত আলীর নিকটে। হজরত আলী বললেন, আমি অগ্নিউপাসকদের সম্পর্কে এমন একটি কথা বলবো, যা তোমাদের দু'জনেরই পছন্দ হবে। অগ্নিউপাসকেরা আসলে আহলে কিতাব। তাদের কাছে একটি আসমানী কিতাব ছিলো। তারা ওই কিতাবটি পাঠ করতো। তাদের এক রাজা ছিলো ঘোর মদ্যপ। সে একদিন মাতাল অবস্থায় তার নিজের বোনকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেলো এবং কামরিপু চরিতার্থ করলো তার সাথে। চারজন লোক অনুসরণ করেছিলো তাদের। তারা ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখলো। যখন নেশা কেটে গেলো, তখন তার বোন তাকে বললো, চারজন লোকের সামনে তুমি এ রকম অপকর্ম করলে! এখন তো শরিয়তের আইনে তোমাকে হত্যা করা হবে। রাজা বললো, তাইতো। আমার যে কিছুই খেয়াল ছিলো না। তার বোন বললো, এখন আমার কথা যদি শোনো, তবেই কেবল তুমি শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারবে। রাজা বললো, বলো, অবশ্যই আমি তোমার কথা মান্য করবো। তার বোন বললো, তুমি যা করলে সেটাকেই ধর্মীয় বিধানরূপে প্রচার করো। জনসাধারণকে ডেকে বলে দাও, এটাই আদমের ধর্মাদর্শ। হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো আদম থেকে। এই হিসেবে হাওয়া ছিলো আদমের কন্যা। অথচ দু'জনে ছিলেন স্বামী-স্ত্রী। প্রথম নবীর এই ধর্মাদর্শ আমাদের জন্য মান্য করা অত্যাবশ্যক। এই ঘোষণা দেয়ার পর যারা তোমার কথা মানবে তাদেরকে অব্যাহতি দিবে। আর যারা তোমার কথা মানবে না তাদেরকে তলোয়ারের মাধ্যমে হত্যা করে ফেলবে। রাজা তার বোনের কথামতো কাজ করলো। কিন্তু জনতার মধ্যে অনেকেই রাজার এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারলো না। কেউ কেউ বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। বিদ্রোহীদেরকে হত্যার নির্দেশ দিলো রাজা। কিন্তু জনবিদ্রোহ প্রশমিত হলো না। তার বোন বললো— জনতা এখনো ভীতসন্ত্রস্ত নয়। সুতরাং তুমি এবার ঘোষণা করে দাও, আমার বিধান যে মানবে না তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। তাই করলো রাজা। নির্মাণ করলো বিশাল অগ্নিকুণ্ড। ঘোষণা করে দিলো— যারা আমার ধর্মমতকে মানবে না তাদেরকে পুড়িয়ে মারা হবে এই অগ্নিকুণ্ডে। এবার ভীত হলো লোকেরা। মেনে নিলো রাজার বিধান। এই ঘটনাটি বর্ণনার পর হজরত আলী বললেন, এবার বুঝলে তো, অগ্নিউপাসকেরা ছিলো আহলে কিতাব। তাই রসুল স. তাদের নিকট থেকে কর আদায় করেছিলেন। অবশ্য পরে তারা মুশরিক হয়ে যায়। তাই তাদের সঙ্গে বিবাহ এবং তাদের দ্বারা জবাইকৃত পশুর গোশত হারাম করে দেয়া হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

ইবনে জাওজী তাঁর আত্ তাহ্কিক গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পারস্যবাসীদের পয়গম্বর যখন পরলোকগমন করলেন, তখন ইবলিস তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলো অগ্নিউপাসনার দিকে।

উত্তরঃ রসুল স. বলেছেন, অগ্নিপূজারী ও আহলে কিতাব এর সাথে একই ব্যবহার কোরো। এ কথায় প্রমাণিত হয় না যে অগ্নি উপাসকেরাও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত এবং আহলে কিতাবদের সঙ্গে যা করা যাবে, তা অগ্নি-উপাসকদের সঙ্গেও করা যাবে। ঐকমত্যাগত অভিমত এই যে, অগ্নিউপাসকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ এবং তাদের দ্বারা জবাইকৃত পশুর গোশত ভক্ষণও নিষিদ্ধ। হাদিসের উদ্দেশ্য শুধু এতোটুকুই যে, আহলে কিতাবের মতো অগ্নি-উপাসকদের উপরেও করারোপ সিদ্ধ। আর হাদিসের মাধ্যমে আমরা এ কথাও জানতে পারি যে, অগ্নিউপাসকদের পূর্বপুরুষেরা ছিলো আহলে কিতাব। তারা আল্লাহ্পাকের কিতাব পড়তো এবং প্রচার করতো। কিন্তু যখন তারা আল্লাহ্র দ্বীন পরিত্যাগ করলো, মুখ ফিরিয়ে নিলো কিতাবের বিধান থেকে, তখন এলেম উঠিয়ে নেয়া হলো তাদের হৃদয় থেকে। ইবলিস তখন তাদেরকে বানিয়ে ফেললো অগ্নিউপাসক। তখন থেকে তারা আর আহলে কিতাব নয়। তাই আলেমগণ বলেছেন, তারা আহলে কিতাব নয়। তবে ইমাম শাফেয়ীর এক বর্ণনায় এসেছে, তারাও আহলে কিতাব। আবার অপর বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর অভিমত জমহুরের অনুকূলে। সে অভিমতটি হচ্ছে— অগ্নিউপাসকেরা আহলে কিতাব নয়।

আমি বলি, যদি অগ্নিপূজারীদের পূর্বপুরুষ আহলে কিতাব হয়ে থাকে, তবে তাদেরকে আহলে কিতাব না বলার কোনো কারণ নেই। আর এ রকম হলে আমাদের দেশের হিন্দু মূর্তিপূজকদেরকেও আহলে কিতাব বলা যেতে পারে। কারণ তাদের কাছে রয়েছে বেদ নামক একটি কিতাব। ওই কিতাবে রয়েছে চারটি পর্ব। একত্রে সেগুলোকে বলা হয় চতুর্বেদ। ওই বেদসমূহের অনেক বিধান শরিয়তের বিধানের অনুরূপ। সেগুলোতে বর্ণনাবৈসাদৃশ্য অবশ্য রয়েছে। আর সেগুলো নিশ্চয় ঘটেছে শয়তানের প্রক্ষেপণের মাধ্যমে। শয়তানের কারসাজির ফলে মুসলমানদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে তিয়াত্তরটি ফেরকা। হিন্দুরা যে আহলে কিতাব, তার প্রমাণ কোরআন মজীদেও রয়েছে। যেমন, একস্থানে এরশাদ করা হয়েছে— ওয়া ইম্মিন উম্মাতিন ইল্লা খালা ফিহা নাজিরুন (আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কোনো না কোনো পয়গম্বর অবশ্যই প্রেরণ করেছি)। অগ্নি-উপাসকদেরকে আহলে কিতাব বললে হিন্দুদেরকে আরো বেশী আহলে কিতাব বলতে হয়। অগ্নিউপাসকদের রাজা মাতাল অবস্থায় তার বোনের সঙ্গে ব্যভিচার করেছিলো। বিধান দিয়েছিলো আল্লাহ্র কিতাবের বিরুদ্ধে। হজরত আদমের নামে প্রচার করেছিলো তার বিকৃত মতবাদ। কিন্তু হিন্দুরা তেমন কিছু করেনি। অবশ্য

www.eelm.weebly.com

তারা রসুল স. এর রেসালত অস্বীকার করার কারণে কাফের। আমার নিকট এ রকম সংবাদ পৌঁছেছে যে চতুর্বেদের মধ্যে রয়েছে রসুল স. এর আবির্ভাবের শুভসংবাদ। ওই শুভসংবাদ পাঠ করেই কোনো কোনো হিন্দু মুসলমান হয়েছে। ওয়াল্লহু আ'লাম।

মূর্তিপূজারীদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না— ইমাম শাফেয়ীর এই অভিমতের সমর্থনে এই আয়াতটি উপস্থাপন করা হয়েছে— কাতিলুহুম হাত্তা লাতাকুনা ফিত্নাতান (কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করো যতক্ষণ না ফেত্না উচ্ছেদ হয়)। কিন্তু কথা হচ্ছে, এ রকম কষ্ট করার দরকারই বা কি। আহলে কিতাবদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করার কথাতো আলোচ্য আয়াতেই সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আর অগ্নি পূজারীদের নিকট থেকে জিযিয়া সংগ্রহের কথা বর্ণিত হয়েছে হাদিস শরীফে। বলা হয়েছে, রসুল স. হেজাজের অধিবাসী অগ্নিপূজকদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করেছিলেন।

আমি বলি, ঐকমত্যানুসারে অগ্নিপূজকেরা আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভূত নয়। তাদের সম্পর্কে নির্দেশনা এসেছে হাদিস শরীফে। আর এ সম্পর্কে একটি যুক্তিপূর্ণ কারণও নির্দেশ করা হয়েছে। সে কারণটি হচ্ছে— শিরিক। অর্থাৎ তারা হবে মুশরিক (অংশীবাদী)। মূর্তিপূজকেরা অগ্নিপূজকদের মতো মুশরিক । তাই মূর্তিপূজক ও অগ্নিপূজকের উপর প্রবর্তিত হবে একই বিধান। এখন কথা হচ্ছে, অগ্নিপূজকদের পূর্বপুরুষগণ ছিলো আহলে কিতাব— এ কথা যদি বলা হয়, তবে এ কথাটিও মেনে নিতে হবে যে, মূর্তিপূজকদের পূর্বপুরুষও আহলে কিতাবই ছিলো। কিন্তু মূর্তিপূজক ও অগ্নিপূজকদেরকে কিছুতেই আহলে কিতাব বলা যায় না। কারণ তারা আহলে কিতাবদের আদর্শানুসারী নয়।

আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে অগ্নিপূজকদের মতো মূর্তিপূজকদেরকেও ক্রীত-দাস ও ক্রীতদাসী বানানো যাবে। তাই অগ্নিপূজকদের মতো মূর্তিপূজকদের নিকট থেকে জিযিয়াও আদায় করা যাবে। সুতরাং গোলাম অথবা স্বাধীন উভয় অবস্থায় তাদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করা বৈধ। উভয় অবস্থায় তারা নিজেরা উপার্জন করবে । সেই উপার্জন দ্বারা তাদের সংসারের ব্যয় নির্বাহ করবে এবং জিযিয়াও পরিশোধ করবে।

সুলায়মান বিন বুরায়দা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কোথাও কোনো সেনাদলকে প্রেরণ করলে অধিনায়ককে বিশেষভাবে আল্লাহ্কে ভয় করার এবং সঙ্গীগণের প্রতি সহমর্মী হওয়ার নির্দেশ দিতেন। তারপর বলতেন, আল্লাহ্র নাম নিয়ে আল্লাহ্র পথে জেহাদ কোরো, আল্লাহ্দ্রোহীদেরকে হত্যা কোরো, শত্রুরা পরাভূত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেয়ো, চুক্তি ভঙ্গ কোরো না, কারো

www.eelm.weebly.com

নাক কান কেটো না (চেহারা বিকৃত কোরো না), পশ্চাৎ দিক থেকে কাউকে আক্রমণ কোরো না, শত্রুরা সম্মুখীন হলে প্রথমে তাদেরকে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ো— ১. তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাও। যদি তারা এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তবে তোমরা আর যুদ্ধ কোরো না। তাদেরকে বোলো তারা যেনো মদীনায় চলে আসে। এ রকম করলে তারাও হয়ে যাবে মুহাজির। মুসলমানদের সুখ ও দুঃখের সঙ্গে তারা হবে সমঅংশীদার। যদি তারা মদীনায় আসতে সম্মত না হয় তবে তাদেরকে বোলো, তোমাদেরকে গণ্য করা হবে মদীনার বাইরের মুসলমান হিসেবে। সাধারণ মুসলমানদের প্রতি যে সকল বিধান প্রযোজ্য সে সকল বিধান প্রযোজ্য হবে তোমাদের উপরেও। তোমরা তখন আর গণিমত, ফায় এবং চুক্তির মাধ্যমে অন্যান্য উপার্জনের অংশ পাবে না। ২.যদি তারা ইসলামের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাদের নিকট জিযিয়া দাবী কোরো। জিযিয়া প্রদানে সম্মত হলে তাদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ কোরো না। ৩. যদি তারা জিযিয়া দিতে অসম্মত হয় তবে আল্লাহ্‌র সাহায্যকামী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কোরো। মুসলিম।

হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে, আরববাসী আহলে কিতাবদের নিকট থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করা জায়েয। তাঁর বর্ণনায় আরো এসেছে, রসুল স. হজরত খালিদ বিন ওলিদকে প্রেরণ করলেন দুমাতুল জানদলের শাসক উকায়দারের বিরুদ্ধে। তিনি তাকে বন্দী করে আনেন। রসুল স. উকায়দার জীবন ভিক্ষা দেন এবং জিযিয়া পরিশোধের শর্তে তার সঙ্গে চুক্তি করেন। আবু দাউদ।

হজরত ইয়াজিদ বিন রুমমান এবং হজরত আবদুল্লাহ্‌ বিন সিদ্দীকে আকবরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. দুমাতুল জানদলের শাসক উকায়দার বিন আব্দুল মালেক কান্দীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন হজরত খালিদ বিন ওলিদকে। রসুল স. জিযিয়ার বিনিময়ে নিরাপত্তা দান করেছিলেন তাকে। আবু দাউদ, বায়হাকী।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন উপরে বর্ণিত হাদিসের তথ্য সঠিক মনে করা হলে জিযিয়া কেবল আনসারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আরবেরাও জিযিয়ার আওতায় পড়বে। উকাইদা যে আরবী, সে কথা নিশ্চিত (বনী কুন্দা আরবের একটি শাখা)। এভাবে এ কথাটিও প্রমাণিত হবে যে, জিযিয়া কেবল আহলে কিতাব ও আজমীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তখন ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেকের অভিমতই বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত হবে। পার্থক্য থাকবে কেবল এতোটুকু যে, ইমাম আবু হানিফার মতে আরবের পৌত্তলিকদের নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া নাজায়েয। আর তাদেরকে গোলামও বানানো যাবে না। উকাইদা ছিলো খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক— পৌত্তলিক নয়।

www.eelm.weebly.com

আবদুর রাজ্জাক ও জুহুরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আরবের পৌত্তলিকদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু জিযিয়া গ্রহণ করেননি।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আরবের পৌত্তলিকেরা ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রভাবশালী। কোরআন মজীদও নাজিল হয়েছিলো তাদের স্বভাষায়। তাই তারা ছিলো দুর্বিনীত ও প্রকাশ্য মোজেজা অস্বীকারকারী। সেকারণেই তাদের নিকট থেকে ইসলামের স্বীকৃতি ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করা হবে না। ইসলাম গ্রহণ না করলে তারা হবে হত্যার উপযুক্ত। মুরতাদদের (ধর্ম পরিত্যাগকারীদের) বিধানও এ রকম। তারা স্বেচ্ছায় জেনে শুনে ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলাম সম্পর্কে সবকিছু জেনে শুনে বুঝে ধর্মত্যাগ করে। সুতরাং তাদের অজ্ঞতা ক্ষমার্হ নয়। তাদের সঙ্গে কেবল যুদ্ধ। জিযিয়া নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মুসলিমের মাধ্যমে ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আরবের অংশীবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক কেবল দু'টি— ইসলাম অথবা যুদ্ধ। মূর্তিপূজক ও মুরতাদেরা বন্দী হয়ে গেলে তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীতে পরিণত করা যাবে। রসুল স. আওতাস ও হাওয়াজেনদের পরিবার পরিজনদেরকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীতে পরিণত করেছিলেন। তারা ছিলো আরবী ও অংশীবাদী। বনী মুস্তালিকের পরিবার পরিজনদেরকেও এ রকম করা হয়েছিলো। আবু বনী হানিফা মুরতাদ হয়ে গেলে হজরত আবু বকর তাদের পরিবার পরিজনকে বানিয়েছিলেন গোলাম ও বাঁদী। আর ওই গোলাম বাঁদীদেরকে বণ্টন করে দিয়েছিলেন মুজাহিদদের মধ্যে। মোহাম্মদ বিন আলী বিন আবু তালেবের আম্মা এবং জায়েদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন ওমরের আম্মাও ছিলো তাদের মধ্যে।

বন্দী করে পূর্ণ কর্তৃত্বে নিয়ে আসার পর মুরতাদদের স্ত্রী-পুত্রকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে। কিন্তু অংশীবাদীদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো যাবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অংশীবাদী আরবীদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে বন্দী করে ক্রীতদাস বানানো যাবে।

ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন, উকাইদা সম্পর্কিত হাদিসে দেখা যায়— আরববাসী কাফেরদের নিকট থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করা হতো। তারা আহলে কিতাব, মূর্তিপূজক বা অগ্নিপূজক— যাই হোক না কেনো। অন্য হাদিসে এসেছে জাজিরাতুল আরব থেকে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো। সুতরাং উকাইদা সম্পর্কিত হাদিসের বিধানটি রহিত হয়েছে বলে স্বীকার করতে হবে। কারণ আরব এলাকায় বসবাসও ছিলো জিযিয়া প্রদানের উপযোগী হওয়ার একটি শর্ত। অতএব, বসবাসের অস্তিত্বই যখন নেই, তখন জিযিয়া ধার্য করার প্রেক্ষা-পটটি আর রইলো কোথায়?

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তিনটি উপদেশ প্রদান করেছিলেন— ১. আরব উপদ্বীপ থেকে অংশীবাদীদেরকে বিতাড়িত কোরো। ২. অন্যান্য দেশের কাফেরদেরকে কোরো বন্দী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তৃতীয় উপদেশটির কথা রসুল স. আর উচ্চারণ করেননি। অথবা আমিই তা বিস্মৃত হয়েছি।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্‌র বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে জাজিরাতুল আরব থেকে বহিষ্কার করবোই। এই আরবে মুসলমান ছাড়া অন্য কারো বসবাসের অধিকার নেই। মুসলিম।

ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় জুহুরী থেকে একটি বর্ণনা এনেছেন। অনুরূপ বর্ণনা হজরত আবু হোরায়রা থেকে সালেহ্ বিন আখদারের মাধ্যমেও জুহুরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি এই— জাজিরাতুল আরবে দুই ধর্মের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। সবশেষে ইসহাক বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন স্বসূত্রে।

হজরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর শেষ উপদেশ ছিলো— ইহুদীদেরকে হেজাজ থেকে এবং নাসারাদেরকে জাজিরাতুল আরব থেকে বের করে দাও। আহমদ, বায়হাকী।

জিযিয়ার পরিমাণঃ ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে— জিযিয়ার নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই। জিযিয়া আদায়কারী এবং জিযিয়া প্রদাতা পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করবে। রসুল স. দুই হাজার জোড়া কাপড় পরিশোধের শর্তে ইয়ামেনবাসীদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ লিখেছেন, রসুল স. দুই হাজার জোড়া বস্ত্রের বিনিময়ে নাজরানবাসীদের সঙ্গে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি করেছিলেন। ওই চুক্তি অনুসারে নাজরানবাসীদেরকে সফর মাসের মধ্যে এক হাজার জোড়া এবং রজব মাসের মধ্যে এক হাজার জোড়া কাপড় দিতে হতো। ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. নাজরানবাসীদেরকে একটি লিখিত ফরমান দিয়েছিলেন যাতে লেখা ছিলো— তারা বছরে দুই হাজার জোড়া কাপড় দিবে। প্রতি জোড়ার মূল্য হতে হবে এক আউকিয়া। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, কিতাবুল আমওয়ালের বিবরণ অনুসারে প্রতি জোড়া কাপড়ের দাম চল্লিশ দিরহাম হয়— পঞ্চাশ দিরহাম নয় (যেমন কেউ কেউ বলে থাকেন)।

এক জোড়া কাপড় অর্থ দু'টি কাপড়— তহবন্দ ও চাদর। ব্যক্তি ও ভূমি উভয়ের জন্য জিযিয়া হিসাবে কাপড় প্রদান করতে হতো। ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল আমওয়ালে এ রকমই লিখেছেন। জমিনের জিযিয়া প্রতিষ্ঠিত

www.eelm.weebly.com

থাকতো জমিনের উপরেই। ওই জমি খৃষ্টান অথবা অন্য কোনো বিধর্মী কিংবা মুসলমান ক্রয় করলেও জিযিয়ার পরিমাণে কোনো হেরফের হতো না। মহিলা ও শিশুদের জমিনেরও জিযিয়া পরিশোধ করতে হতো। তবে ব্যক্তির জিযিয়া মহিলা ও শিশুর উপরে ধার্য ছিলো না। ধার্য ছিলো কেবল পুরুষের উপর।

ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বনী তাগলীবের খৃষ্টানদের সঙ্গে এই শর্তে সন্ধিবদ্ধ হয়েছিলেন যে, সাধারণতঃ একজনের উপরে যে করারোপ করা হয়, তার দ্বিগুণ তাদেরকে পরিশোধ করতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মুসলমানদের অধিনায়ক শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে বিধর্মীদের এলাকা দখল করলে জিযিয়া ধার্য করতে পারবে এভাবে— সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য প্রতি মাসে চার দিরহাম হিসেবে বৎসরে আটচল্লিশ দিরহাম, মধ্যবিত্তদের জন্য মাসে দুই দিরহাম হিসেবে বৎসরে চব্বিশ দিরহাম এবং সুস্থ সবল উপার্জনক্ষম দরিদ্রদের জন্য মাসে এক দিরহাম হিসেবে বৎসরে বারো দিরহাম।

ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে— জিযিয়া নির্ধারণের জন্য ধনী দরিদ্র বাছ-বিচারের প্রয়োজন নেই। সকল জিম্মীদের নিকট থেকে বৎসরে বার দিনার অথবা চল্লিশ দিরহাম আদায় করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ীর মতে বিত্তশালী বিত্তহীন নির্বিশেষে সকলের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করতে হবে বৎসরে জন প্রতি এক দিনার। আর ইমাম আহমদের অভিমত এসেছে চারটি বর্ণনায় চার রকম। প্রথম বর্ণনানুসারে তাঁর অভিমত এসেছে ইমাম আবু হানিফার অনুকূলে। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে— পরিমাণ নির্ধারিত হবে নেতার সিদ্ধান্তানুসারে। ইমাম সুফিয়ান সওরীও এরকম বলেছেন। তৃতীয় বর্ণনায় এসেছে— সর্বনিম্ন জিযিয়া বছরে জনপ্রতি এক দিনার। সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত নেই। চতুর্থ বর্ণনায় এসেছে— কেবল ইয়ামেনবাসীদের জন্য বৎসরে জনপ্রতি এক দিনার (এটা কোনো সাধারণ নিয়ম নয়)। হাদিস শরীফে এরকমই বলা হয়েছে। হজরত মুয়াজ বলেছেন, রসুল স. যখন আমাকে ইয়ামেনের শাসক নির্বাচন করলেন তখন নির্দেশ দিলেন, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের নিকট থেকে এক দিনার মূল্যমানের কাপড় আদায় করবে। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, দারাকুতনী, ইবনে হাব্বান, হাকেম। ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও অনুরূপ। আবু দাউদ এই হাদিসকে মুনকার (অস্বীকৃত) বলেছেন। আরো বলেছেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, ইমাম আহমদও এই হাদিস কে মুনকার বলেছেন। বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বর্ণনাকারীদের মতপার্থক্য সহযোগে। তাঁর সূত্র পরম্পরাটি এ রকম, আমাশ — আবু ওয়ায়েল মাসরুক — হজরত মুয়াজ। কোনো কোনো সূত্রে পৌঁছেছে মাসরুক পর্যন্ত।

www.eelm.weebly.com

কাজেই বর্ণনাটি মাসরুকেরই হবে — হজরত মুয়াজের নয়। ইবনে হাজাম বর্ণনাটিকে বলেছেন মুনকাতে (কর্তিত)। তিনি একথাও বলেছেন যে, মাসরুক হজরত মুয়াজের সাক্ষাত পাননি। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ইবনে হাজামও এ রকম মত প্রকাশ করেছেন। আবার হাদিসটিকে উত্তম আখ্যা দিয়েছেন তিরমিজি। তিনি একথাও বলেছেন যে, কোনো কোনো আলেমের মতে হাদিসটি মুরসাল— এটাই শুদ্ধ মত।

ইমাম আবু হানিফার মতের অনুকূলে রয়েছে হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আলীর বক্তব্য ও আমল। সুনান রচয়িতাগণের গ্রন্থে আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে — হজরত হুজায়ফা বিন ইয়ামান এবং হজরত ওসমান বিন হানিফকে ইরাকে প্রেরণ করেন হজরত ওমর। তাঁরা দু'জনে সেখানে গিয়ে ভূমির জরিপ এবং কর নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করেন। কর প্রদাতাদেরকে বিন্যাস করেন তিনটি শ্রেণীতে— উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। এরপর তারা ফিরে এসে প্রতিবেদন পেশ করেন হজরত ওমরের নিকট। খলিফা হজরত ওমর তা অনুমোদন করেন। পরবর্তী খলিফা হজরত ওসমানও এই নিয়মটি বহাল রাখেন।

ইবনে আবী শায়বা সূত্রে আলী বিন মাসহার শাইবানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ইবনে আউন মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ সাক্বাফি বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর জিযিয়া নির্ধারণ করেছিলেন এভাবে— বাৎসরিক হিসেবে উচ্চবিত্ত জন প্রতি আটচল্লিশ দিরহাম, মধ্যবিত্ত চব্বিশ দিরহাম এবং নিম্নবিত্ত বারো দিরহাম। হাদিসটি মুরসাল। ইবনে জানজুইয়্যার কিতাবুল আমওয়ালে এই হাদিসের সূত্র পরম্পরা উল্লেখিত হয়েছে এভাবে, মনদেল—শাইবানী—ইবনে আউন—মুগিরা বিন শো'বা।

ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে নজরাহ থেকে লিখেছেন, হজরত ওমর বিজিত দেশ সমূহের জিম্মীদের জিযিয়া নির্ধারণ করেছিলেন উপরে বর্ণিত নিয়মে। অপর বর্ণনায় হারেস বিন মুজের সূত্রে এসেছে— হজরত ওমর হজরত ওসমান বিন হানিফকে জিযিয়া নির্ধারণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি জিযিয়া নির্ধারণ করেছিলেন এভাবে— বাৎসরিক হিসেবে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের জন্য যথাক্রমে জনপ্রতি আটচল্লিশ, চব্বিশ এবং বারো দিরহাম। সাহাবীগণের উপস্থিতিতে এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়েছিলো। কেউ এর প্রতিবাদ করেননি। তাই এই ঐকমত্যটি চিরস্থায়ী।

ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল খেরাজে সিররি বিন ইসমাইল আমের শা'বী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, শা'বী বলেছেন — হজরত ওমর ইরাকের ভূমি জরিপ করিয়েছিলেন। সমগ্র ভূমিকে বিভক্ত করিয়েছিলেন তিনশত ষাটটি খণ্ডে। প্রতি খণ্ডের জন্য বাৎসরিক কর নির্ধারণ করেছিলেন এভাবে — ফসলের জমি এক

www.eelm.weebly.com

দিরহাম ও এক কফিজ শস্য আঙ্গুরের বাগান দশ দিরহাম এবং খেজুরের বাগান পাঁচ দিরহাম। আর জন প্রতি বাৎসরিক কর — বারো, চব্বিশ এবং আটচল্লিশ দিরহাম (যথাক্রমে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের জন্য)। শা'বী বলেছেন, আমার নিকট সাঈদ বিন আবী ওরবার মাধ্যমে এসেছে, কাতাদা বিন মাজলিজ বলেছেন, হজরত ওমর নামাজের ইমামতি ও সৈন্যদের দেখা শোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন হজরত আম্মার বিন ইয়াসারকে। বিচার বিভাগ ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে। আর হজরত ওসমান বিন হানিফকে দিয়েছিলেন জমি-জমা দেখা শোনার ভার। তাদের আহারের জন্য একটি বকরী নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এভাবে — হজরত আম্মার অর্ধেক, হজরত ইবনে মাসউদ এক চতুর্থাংশ এবং হজরত ওসমান বিন হানিফ অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে ও আমাকে মনে করি পিতৃহীনদের সম্পদের তত্ত্বাবধায়কের মতো। আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন — 'যারা বিত্তশালী তারা (এতিমদের সম্পদ থেকে) নিরাপদ থাকবে এবং যারা বিত্তহীন তারা এতিমদের সম্পদ থেকে পূরণ করবে তাদের (ন্যূনতম) প্রয়োজন।' তোমরা বিত্তহীন তাই প্রাত্যহিক প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি বকরী গ্রহণ করাকেই যথেষ্ট মনে করবে। আল্লাহ্র কসম! তবু আমার আশংকা হয়, হয়তো অনতিবিলম্বে সেখানে বকরীর স্বল্পতা দেখা দিবে। হজরত ওসমান সেখানকার একখণ্ড আঙ্গুরের বাগানের কর নির্ধারণ করেন দশ দিরহাম। খেজুরের বাগানের জন্য আট খণ্ড জমির রাজস্ব ছয় দিরহাম। গমের জমির জন্য চার দিরহাম। যবের একখণ্ড জমির জন্য দুই দিরহাম। ব্যক্তির প্রতি কর বারো, চব্বিশ ও আটচল্লিশ দিরহাম। মহিলা ও শিশুদের প্রতি তিনি কোনো কর ধার্য করেননি। সাঈদের বর্ণনায় এসেছে, আমার এক সঙ্গী বর্ণনা করেছেন এভাবে— খেজুরের বাগানের জন্য দশ দিরহাম এবং আঙ্গুরের বাগানের জন্য আট দিরহাম।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক সূত্রে হারেসা বিন মুতরেফ বর্ণনা করেছেন, খলিফা হজরত ওমর প্রথমে বিজিত ইরাকের ভূমি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু আদমশুমারিতে দেখা গেলো সেখানকার কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে দুই তিন গুণ বেশী। তখন তিনি সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করলেন। হজরত আলী বললেন, ওই সকল লোক তো মুসলমানদের উপার্জনে সাহায্যকারী হতে পারে। সুতরাং তাদের ভূমি গ্রহণ না করে তাদের উপর বাৎসরিক কর আরোপ করা হোক। তাঁর এই পরামর্শটি হজরত ওমর পছন্দ করেন। কর নির্ধারণের জন্য সেখানে প্রেরণ করেন ওসমান বিন হানিফকে। তিনি তাদের প্রতি বাৎসরিক কর ধার্য করেন জন প্রতি আটচল্লিশ দিরহাম, চব্বিশ দিরহাম এবং বারো দিরহাম। হজরত মুয়াজ বর্ণিত এই হাদিস সম্পর্কে হানাফী মতাবলম্বীগণ বলেন, ইয়ামেনবাসীদের উপর নির্ধারিত করের হার

www.eelm.weebly.com

ছিলো এর চেয়ে কম। কারণ ইয়ামেন অধিকারে এসেছিলো সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে— যুদ্ধের মাধ্যমে নয়। আর সেখানকার অধিবাসীরাও তেমন সম্পদশালী ছিলো না। এ সম্পর্কে বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, আবু নাজীহ্ বলেছেন, আমি একবার মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলাম, সিরিয়াবাসীদের উপর কর নির্ধারণ করা হয়েছিলো জন প্রতি চার দিনার। আর ইয়ামেনবাসীদের উপর নির্ধারিত হয়েছিলো এক দিনার— কারণ কি? মুজাহিদ বললেন, এর কারণ হচ্ছে, সিরিয়াবাসীরা ছিলো সম্পদশালী এবং ইয়ামেনবাসীরা ছিলো স্বল্পবিত্ত। সুফিয়ান সওরী এবং ইমাম আহমদের অভিমতের দলিল এই যে, রসুল স. হজরত মুয়াজকে জন প্রতি এক দিনার কর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর নাজরানের খৃষ্টানদের নিকট থেকে আদায় করতে বলেছিলেন দুই হাজার জোড়া কাপড়। আবার হজরত ওমর জিম্মীদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন করের তিনটি স্তর। এ নিয়মটিকেই গ্রহণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা। বনী তাগলাব থেকে আদায়কৃত জিযিয়ার হার ছিলো— মুসলমানদের নিকটে যে সম্পদ ছিলো, তার চেয়ে দ্বিগুণ। এ সকল বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, জিযিয়া নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড নেই। বিষয়টি সম্পূর্ণতঃই মুসলিম শাসকের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদের মতে উপার্জনহীন নিঃস্ব লোকের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না। এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও অনুরূপ। কিন্তু অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, উপার্জনহীন দরিদ্র লোকের উপরেও জিযিয়া ধার্য করা ওয়াজিব। সুতরাং যখনই তারা স্বচ্ছল হবে তখনই তাদের নিকট থেকে জিযিয়া (বকেয়াসহ) আদায় করে নিতে হবে। অন্য একটি বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও যদি তারা স্বচ্ছল না হয়, তবে তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে দারুল হরবের (কাফের সাম্রাজের) সঙ্গে। তখন তাদেরকে আর জিম্মী বলা যাবে না। ইমাম শাফেয়ীর এ সকল কথার দলিল হচ্ছে— রসুল স. হজরত মুয়াজকে ঢালাওভাবে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই নির্দেশের মধ্যে স্বচ্ছল-অস্বচ্ছলের উল্লেখ ছিলো না। আর আমাদের কথার দলিল এই যে, হজরত ওসমান বিন হানিফ উপার্জনহীন ও বিত্তহীনদের উপর জিযিয়া আরোপ করেননি।

ইবনে জানজুইয়্যা কিতাবুল আমওয়ালে লিখেছেন, হাশেম বিন আদি সূত্রে ওমর বিন নাফেয়ের উদ্ধৃতিসহ। আবু বকর সিলাহ্ বিন জুফার আইনি বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর এক বৃদ্ধ জিম্মীকে ভিক্ষা করতে দেখে বললেন, ব্যাপার কি? বৃদ্ধ বললো, আমি কপর্দকহীন। অথচ আমার উপর জিযিয়া ধার্য করা হয়েছে। হজরত ওমর বললেন, আমরা তোমার প্রতি সুবিচার করিনি। যৌবনে

তুমি উপার্জন করেছো। তখন করও পরিশোধ করেছো। এখন তুমি বৃদ্ধ ও উপার্জন ক্ষমতারহিত। অথচ তোমার উপর কর ধার্য করা হয়েছে। এরপর তিনি রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদেরকে এই মর্মে লিখিত নির্দেশনামা পাঠালেন যে— বৃদ্ধ ও উপার্জন ক্ষমতারহিতদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না। কোনো কোনো বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে একথাটি এসেছে যে— উপার্জনশীল দরিদ্রদের নিকট থেকে আদায় করতে হবে বারো দিরহাম। বায়হাকী।

আমর ইবনে নাফেয়ে সূত্রে ইমাম আবু ইউসুফ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আবু বকর বলেছেন, হজরত ওমর এক লোকের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, এক অন্ধ বৃদ্ধ সেখানে ভিক্ষা করছে। এরপরের বিবরণ উপরে বর্ণিত হাদিসের অনুরূপ। শেষে কেবল এই কথাটি অতিরিক্ত এসেছে যে, হজরত ওমর ওই বৃদ্ধ এবং ওই রকম লোকদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় রহিত করেছেন (আবু বকর বলেছেন) আমি ওই সময়ে উপস্থিত ছিলাম এবং ওই বৃদ্ধটিকে দেখেও ছিলাম।

ওরওয়া বিন যোবায়ের বিন আওয়াম থেকে হিশাম বিন ওরওয়ার মাধ্যমে আবু ইউসুফ বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর সিরিয়া থেকে ফেরার পথে এক স্থানে দেখলেন, কয়েকজন লোককে প্রখর রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি বললেন, ব্যাপার কি? লোকেরা বললো, এদের উপর জিযিয়া অত্যাবশ্যক ছিলো। কিন্তু এরা জিযিয়া পরিশোধ করেনি। তাই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তিনি বললেন, এরা জিযিয়া পরিশোধ করতে চায় না কেনো? লোকেরা বললো, এরা বলছে, এরা কপর্দকহীন। হজরত ওমর বললেন, এদেরকে ছেড়ে দাও। সাধ্যবহির্ভূত বোঝা এদের উপর চাপিয়ো না। আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, মানুষকে শাস্তি দিয়ো না। পৃথিবীতে মানুষকে যারা শাস্তি দিবে, আখেরাতে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

আবু ইউসুফ বলেছেন, আমার নিকট এক জ্ঞানবৃদ্ধ একটি মারফু হাদিস বর্ণনা করেছেন। রসুল স. হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আরকামকে জিম্মীদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দিলেন। তিনি যখন যাত্রা শুরু করলেন, তখন রসুল স. উচ্চস্বরে বললেন, মনে রেখো, যে ব্যক্তি জিম্মীদের প্রতি অত্যাচার করবে, তাদের উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপাবে, তাদেরকে অপমান করবে অথবা বলপূর্বক তাদেরকে কোনো কাজে লাগাবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো। পক্ষ অবলম্বন করবো অত্যাচারিতের। এই হাদিসটি ইমাম আহমদের অভিমতের সমর্থক। কারণ, তিনি বিষয়টিকে সম্পূর্ণতঃই মুসলমান শাসকের নির্ধারণের উপর নির্ভরশীল বলে মেনেছেন। বলেছেন, নেতাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, জিযিয়া প্রদান জিম্মীদের সাধ্যাভূত কিনা। সাধ্যবহির্ভূত নির্দেশ তিনি দিতে পারেন না।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি কোনো জিম্মী মুসলমান হয়ে যায়, তবুও তাকে বিগত বৎসরের জিযিয়া পরিশোধ করতে হবে। এ রকম বলেছেন ইমাম শাফেয়ী। তাঁর মতে জিযিয়া হচ্ছে মুসলিম রাজ্যে কাফেরের নিরাপদ বসবাসের বিনিময়। সুতরাং তা রহিত হতে পারে না। কারণ, তার প্রাপ্য নিরাপত্তা সে পেয়েছে। মুসলিম রাজ্যের প্রতি সে ঋণী। ইসলাম গ্রহণ করলেও যেমন তার ইসলাম পূর্ব ঋণ মাফ হয়ে যায় না, তেমনি কোনো জিম্মী ইসলাম গ্রহণ করলেও তার জিম্মী অবস্থায় অতিবাহিত বৎসরের ঋণ (জিযিয়া) রহিত হবে না।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদের মতে জিযিয়া কুফরের (অবিশ্বাসের) শাস্তিস্বরূপ। তওবা করার পর তওবাকারীকে যেমন শাস্তি দেয়া যায় না, তেমনি ইসলামে প্রত্যাবর্তনের পর কাফের অবস্থার জিযিয়া আদায় করা সমীচীন নয়। জিযিয়া প্রদান করলে যেমন জিযিয়া দাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে, তেমনি ইসলাম গ্রহণ করলেও সমাপ্ত হয়ে যায় যুদ্ধ বিগ্রহ। নিরাপত্তা প্রাপ্তি হচ্ছে জিযিয়ার প্রতিদান। এই নিরাপত্তার সঙ্গে সে আসলে তার স্বভূমিতেই বসবাস করে।

আমাদের অভিমতের সমর্থনে রয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত একটি হাদিস। যেখানে বলা হয়েছে — রসুল স. বলেছেন, মুসলমানদের উপরে জিযিয়া নেই। আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ। আবু দাউদ লিখেছেন, সুফিয়ান সওরীর নিকট এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া মাত্র তিনি বলেছিলেন, মুসলমান হওয়ার পর জিম্মীর পূর্বের জিযিয়া আদায়যোগ্য নয়। তিনি তাঁর সমর্থনে হজরত ইবনে ওমরের একটি হাদিস উপস্থাপন করছিলেন— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে মুসলমান হয়ে যাবে, তার উপর জিযিয়া থাকবে না। তিবরানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদিসের এক বর্ণনাকারী ইবনে কাত্তান বলেছেন, হজরত ইবনে ওমরের হাদিসের সূত্রসংযুক্ত কাবুস বিন আবুজজুবিয়ান বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। তিবরানীর সূত্রপরম্পরায় কাবুসের নাম নেই। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, হাদিস শরীফে বিশেষভাবে ইসলাম পূর্ব সময়ের জিযিয়া রহিত করার অভিলাষ ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং এ কথা সঙ্গত নয় যে, মুসলমান হওয়ার পরেও তার সঙ্গে জিযিয়া সম্পৃক্ত করতে হবে। এ রকম আলোচনার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল খেরাজে লিখেছেন, আমাকে কুফায় এক জ্ঞানবৃদ্ধ বলেছেন, খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ তাঁর আঞ্চলিক প্রশাসক আবদুল হাইদ বিন আবদুর রহমানকে এই মর্মে পত্র প্রেরণ করেছিলেন যে— তোমরা আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছো, হেরা এলাকায় ইহুদী, খৃষ্টান ও

www.eelm.weebly.com

অগ্নিপূজারীরা মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদের নিকট বাকী রয়েছে পূর্ববর্তী সময়ের জিযিয়া। এখন আমরা কি করবো? তোমাদের প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে, তোমরা চাও, তাদের নিকট থেকে বকেয়া জিযিয়া আদায় করা হোক। কিন্তু তোমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্পাক তাঁর রসুলকে প্রেরণ করেছিলেন ইসলামের প্রতি আহ্বান করার জন্য। কর আদায়ের জন্যে নয়। সুতরাং নও মুসলিমদের উপরে প্রবর্তিত হবে জাকাতের বিধান — জিযিয়া নয়।

একটি সন্দেহঃ কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার জমির খাজনা মাফ হয় না। ক্রীতদাসেরা ইসলাম গ্রহণ করলেও স্বাধীন হয়ে যায় না। তাহলে কোনো বিধর্মী জিম্মী ইসলাম গ্রহণ করলে তার জিযিয়া মাফ হয়ে যাবে কেনো? (তিনটি বিষয়ইতো কুফরির শাস্তি, তাহলে তিনটির বিধান এক রকম হবে না কেনো?)।

সন্দেহের অপনোদনঃ জিযিয়ার ভিত্তি হচ্ছে অপমান বা অপদস্থতা। এই অপদস্থতার কারণ হচ্ছে কুফরী। ইসলাম ওই অপদস্থতা থেকে মুক্তি দেয়। ইসলাম গ্রহণ অর্থ লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে সম্মানের স্তরে উত্তরণ। জমির খাজনা ও গোলামীর বিষয়টি সে রকম নয়। খাজনা মুসলমানদের উপরেও বলবত্ থাকে। আর গোলামের উপরে থাকে ব্যক্তির (মনিবের) মালিকানা। ইসলামে রাষ্ট্র কখনো স্বীকৃত মালিকানায় হস্তক্ষেপ করে না। অভ্যন্তরীণ শৃংখলা ও প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে রাষ্ট্রের প্রয়োজন সরকারী কর্মচারী ও সেনাবাহিনী। খাজনা ধার্য করা হয় এ কারণেই। আর এই শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেরই প্রয়োজন। তাই খাজনাও ধার্য করা হয় মুসলমান অমুসলমান সকলের উপর। জিযিয়ার বিষয়টি এ রকম নয়। জিযিয়ার উপরে ব্যক্তি মালিকানা নেই। এ সকল কারণে ইসলাম গ্রহণ করলে জিযিয়াও অবলুপ্ত হয়। রাষ্ট্র এই অবলোপনের স্বীকৃতি দেয় মাত্র। ইসলাম গ্রহণের পরে কারো উপর জিযিয়া জারী রাখা রাষ্ট্রের অধিকার বহির্ভূত।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বৎসরের শুরুতেই জিযিয়া পরিশোধ করা ওয়াজিব। এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকের অভিমতও এ রকম। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের অভিমত হচ্ছে — জিযিয়া পরিশোধ অত্যাবশ্যক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর। বৎসরের শুরুতে নয়। ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মতটিও এ রকম।

যদি জিম্মী অন্তর্বর্তী সময়ে অথবা বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর মারা যায়, তবে তার উপর জিযিয়ার হুকুম অবলুপ্ত হয়ে যাবে। বকেয়া জিযিয়া আদায়ের অবকাশ আর থাকবে না। যেমন মৃত ব্যক্তির উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কার্যকর করা সম্ভব হয় না, তেমনি মৃত জিম্মীর উপরেও জিযিয়া আদায়ের কথা ভাবা যায় না। এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ। কিন্তু ইম্যম মালেক ও ইমাম

www.eelm.weebly.com

শাফেয়ী বলেছেন, মৃত্যুমুখে পতিত হলেও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ যেমন মাফ হয় না, তেমনি মৃত জিম্মীর বকেয়া জিযিয়াও মাফ হবে না। তাই বকেয়া জিযিয়া আদায় করা অত্যাবশ্যক। জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার বিনিময় হিসেবে জিযিয়া ধার্য করা হয়। আর সে তার জীবদ্দশায় এই নিরাপত্তা পেয়েছে। সুতরাং মরে গেলেও সে রাষ্ট্রের নিকট জিযিয়ার ঋণে ঋণী। তাই রাষ্ট্রকে তার প্রাপ্য ঋণ আদায় করতেই হবে।

মাসআলাঃ কোনো জিম্মীর দুই বা ততোধিক বৎসরের জিযিয়া বাকী পড়ে গেলে তার নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করতে হবে এক বৎসরের। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ এ রকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, প্রতি বৎসরের জিযিয়া আদায় করতে হবে। কারণ জিযিয়া হচ্ছে ঋণ স্বরূপ। আর পুরাতন হওয়ার কারণে ঋণ কখনো মাফ হয় না। হানাফীগণের যুক্তি হচ্ছে — জিযিয়া আরোপ করা হয় বিধর্মীদেরকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে। তাই নির্দেশ করা হয়েছে জিযিয়া পরিশোধ করবে জিম্মী নিজে, কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে নয়। সম্পদ জমা করার উদ্দেশ্যে জিযিয়া ধার্য করা হয় না। ধার্য করা হয় তাদেরকে দাবিয়ে রাখার জন্যে। আর এক বৎসরের জিযিয়া আদায় করলেও এই উদ্দেশ্যটি পূর্ণ হয়ে যায়। একাধিক বৎসরের জিযিয়া আদায়ের আর প্রয়োজন পড়ে না।

মাসআলাঃ মহিলা, শিশু ও উন্মাদের উপরে জিযিয়া নেই। বিষয়টি ঐকমত্য সমর্থিত। শিশু ও উন্মাদ কোনো শাস্তির আওতাভূতও নয়। ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল খেরাজে লিখেছেন, আমার নিকট উবাইদুল্লাহ্ নাফেয় — আসলাম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমর তাঁর রাজস্বআদায়কারীকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় কোরো। মহিলা ও শিশু জিযিয়ার আওতাভূত নয়। আর জিযিয়ার বাৎসরিক হার হচ্ছে জনপ্রতি চার দিনার অথবা চল্লিশ দিরহাম। এর অতিরিক্ত নয়।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, জায়েদ ইবনে আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর তাঁর সেনাপতিদের নিকট এই মর্মে লিখিত ফরমান প্রেরণ করেছিলেন যে — জিযিয়া আরোপ করতে হবে কেবল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের উপর। তিনি রমণী ও শিশুদের উপর জিযিয়া ধার্য করেননি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে (হজরত ওমর লিখেছিলেন) মহিলা ও শিশুকে জিযিয়ার সঙ্গে যুক্ত কোরো না।

মাসআলাঃ ক্রীতদাসের উপরে জিযিয়া নেই। মুকাতিব, মুদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ — সকল প্রকার ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী এই বিধানের আওতাভূত। (যে ক্রীতদাসকে তার মনিব বলে তুমি এতো অর্থ প্রদান করলে স্বাধীন, তাকে বলে মুকাতিব। 'আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত' — যে গোলামকে তার মনিব এরকম বলে, তাকে বলা হয় মুদাব্বার। আর উম্মে ওয়ালাদ বলে ওই ক্রীতদাসীকে যার গর্ভে তার মালিকের ঔরসজাত সন্তান জন্মলাভ করার পর সে মুক্ত হয়ে যায়)। ক্রীতদাসের মালিক ক্রীতদাসের জিযিয়া পরিশোধ করবে না।

www.eelm.weebly.com

আবু উবায়দা তাঁর কিতাবুল আমওয়ালে হজরত ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ইয়ামেনবাসীদের সম্পর্কে এই মর্মে লিখিত নির্দেশ প্রেরণ করেছিলেন, কোনো ইহুদী ও খৃষ্টানকে বলপূর্বক মুসলমান বানানো যাবে না। তবে জিযিয়া ধার্য করতে হবে তাদের পুরুষ, রমণী, শিশু, ক্রীত দাস-দাসী — সকলের উপর। জিযিয়ার হার হবে মাথা প্রতি এক দিনার অথবা দশ দিরহাম। ইবনে জানজুইয়্যাও উত্তম সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। উভয় বর্ণনাই মুরসাল। বর্ণনা দু'টো সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু উম্মতের সুস্বীকৃত ও স্থিরীকৃত ঐকমত্য হচ্ছে — মহিলা, শিশু ও ক্রীত দাস-দাসীর উপরে জিযিয়া নেই। ইজমায়ে উম্মত (উম্মতের ঐকমত্য) শরিয়তের দলিল। সুতরাং এ রকম সুস্বীকৃত দলিলের মোকাবিলায় মুরসাল হাদিসের বর্ণনা গ্রহণীয় নয়। এই আমলটি আবু ওবায়েদের একটি বর্ণনার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য প্রমাণিত হয়, যেখানে বলা হয়েছে, হজরত ওমর বলেছেন, তোমরা জিম্মীদের গোলাম ক্রয় কোরো না। করলে তাদের কর পরিশোধ করতে হবে।

মাসআলাঃ যদি জিম্মী জিযিয়া আদায়ে গড়িমসি করে, ইসলামের কোনো (জাগতিক) বিধান মানতে অস্বীকৃত হয়, কোনো মুসলমানকে হত্যা করে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কাউকে প্ররোচিত করে, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে লোকদেরকে একত্র করে, কোনো মুসলমান মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করে বা মুসলমান মহিলাকে বিবাহ করে, মুসলমানকে ধর্ম ত্যাগের প্রতি প্রলোভিত করে, মুসলমানদের যাতায়াতের পথে ওত পেতে লুণ্ঠন কার্য চালায়, ডাকাতি-রাহাজানি করে, মুসলমান শত্রুদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করে, শত্রুকে পথ দেখায়, গোপন তথ্য জানায়— তবে ইমাম আহমদের মতে সে আর জিম্মী (কর প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জনকারী) থাকবে না। আবদুর রাজ্জাক সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, দুই কিতাবী এক মুসলমান মহিলার উপর বলাৎকার করেছিলো। হজরত আবু উবাদা বিন জাররাহ্ এবং হজরত আবু হোরায়রা তাদেরকে হত্যা করেন।

শা'বী সূত্রে বায়হাকী লিখেছেন, সুহাইব বিন গাফলা বলেছেন, হজরত ওমর সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। ওই সময় আমি ছিলাম তাঁর সঙ্গে। হঠাৎ এক নাব্তী ব্যক্তি চিৎকার করতে করতে এলো। নালিশ জানালো, তাকে প্রহার করা হয়েছে। হজরত ওমর সেখানে উপস্থিত হজরত সুহাইবকে বললেন, দেখো তো কে এ রকম করলো? সুহাইব বাইরে গেলেন। একটু পরে হাজির হলেন হজরত আউফ বিন মালেককে নিয়ে। হজরত আউফ বললেন, এই লোকটি গাধার পিঠে আরোহন-কারিণী এক মুসলমান মহিলাকে উত্যক্ত করছিলো। মহিলাটি কোনো স্থানে যাচ্ছিলেন। এই লোকটি তাকে গাধার পিঠ থেকে নামতে বললো। মহিলাটি তার কথা শোনেনি বলে লোকটি তার গাধাকে আঘাত করে। এরপর ধাক্কা দিয়ে তাকে গাধার পিঠ থেকে ফেলে দেয় এবং সে নিজে গাধার পিঠে চড়ে।

www.eelm.weebly.com

তাই আমি লোকটিকে প্রহার করেছি। হজরত ওমর নাবৃতী লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, এভাবে তো আমরা তোমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ নই। এরপর তিনি লোকটিকে শুলে চড়ানোর নির্দেশ দিলেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে জনতা! তোমরা জিম্মীদের সঙ্গে শরিয়তসম্মত আচরণ কোরো (শরিয়ত যেমন নিরাপত্তা দিতে বলেছে, তেমন নিরাপত্তা দিয়ো)। কিন্তু এ ধরনের আচরণ যারা করবে, তাদের প্রতি আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আহমদ বলেছেন, জিম্মী জিযিয়া দিতে অস্বীকৃত হলে অথবা আমাদের নিয়ম কানুন না মানতে চাইলে তাদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তিনটি কারণে জিম্মীদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে। কারণ তিনটি হচ্ছে — ১. জিযিয়া দিতে না চাইলে, ২. ইসলামের বিধানাবলী মানতে না চাইলে এবং ৩. মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোকজনকে একত্রিত করলে। তাদের সঙ্গে লিখিত চুক্তি থাকলে লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেই তা ভঙ্গ করতে হবে।

ইমাম মালেক বলেছেন, মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণ করলে, বিবাহ করলে এবং রাহাজানি করলে জিম্মীদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না। এই তিনটি কারণ ছাড়া অন্য কোনো গুরুতর কারণ দেখা দিলে চুক্তিভঙ্গ করা যাবে। ইমাম মালেকের শিষ্য কাসেম বলেছেন, রাহাজানি করলেও চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জিম্মী যদি কাফের রাজ্যের সঙ্গে যোগ দেয় অথবা মুসলিম রাজ্যের বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশ ঘটিয়ে মুসলিম রাজ্যের কোনো অংশ দখল করে নেয়, তবে তারা আর জিম্মী থাকবে না, বিদ্রোহী হয়ে যাবে। আর তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গও করা যাবে। এই দুই অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না। কারণ তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং মুসলিম রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করবে — এ দুটো শর্ত মেনে নিয়েই তারা জিযিয়া দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলো। এ দুটি শর্তই ছিলো চুক্তির বুনিয়াদ। এরপর তারা যদি জিযিয়া পরিশোধ করতে গড়িমসি করে কিংবা জিযিয়া দিতে অসমর্থ হয় তবে তাদেরকে বিদ্রোহী বলা যাবে না। খুঁজে দেখতে হবে এর কারণ। উপযুক্ত কারণ ছাড়া যদি তারা জিযিয়া না দেয় তবে মুসলমানদের শাসক তাদেরকে বন্দী করতে পারবে, শাস্তিও দিতে পারবে।

মাসআলাঃ আল্লাহ্, রসুল ও কোরআন সম্পর্কে কটু কথা বললে অথবা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করলে জিম্মীয়াতের চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ রকম বলেছেন, ইমাম আহমদ। আর ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অধিকাংশ শিষ্য বলেছেন, চুক্তিনামার মধ্যে যদি এ রকম শর্ত থাকে তবেই কেবল চুক্তি ভঙ্গ হবে, অন্যথায় হবে না। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, এমতাবস্থায় জিম্মীয়াতের চুক্তি ভেঙে যাবে। কেননা, তাদের ব্যঙ্গবিদ্রূপের কারণে মুসলমানদের ইমান হারা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এ কারণে জিম্মীদের নিরাপত্তাও হয়ে পড়বে বিঘ্নিত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জিযিয়া প্রদাতা কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে স্থাপিত সন্ধি চিরস্থায়ী।

www.eelm.weebly.com

সুতরাং তারা আল্লাহ্, রসুল এবং কোরআন সম্পর্কে আজেবাজে কথা বললেও সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ হবে না। এ রকম আজেবাজে কথা যারা বলে তারা কাফের হয়ে যায়। আর তারা তো আগে থেকেই কাফের। তাহলে তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ হবে কেনো?

এই অভিমতের সমর্থনে জননী আয়েশা থেকে ইবনে হুম্মাম একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি এই — একবার কিছু সংখ্যক ইহুদী রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললো, আস্সামো আলাইকা (আপনার ধ্বংস হোক)। রসুল স. বললেন, ওয়া আলাইকুম (তোমাদেরও)। জননী আয়েশা নিকটেই ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, আলাইকুমাস্সামা ওয়াল্লানাতা (তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক ধ্বংস ও অভিসম্পাত)। রসুল স. বললেন, আয়েশা! বিনম্র হও। আল্লাহ্পাক করুণাপরবশ। তিনি নম্রতাকে ভালোবাসেন। জননী আয়েশা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি কি তাদের কথা শোনেন নি? রসুল স. বললেন, শুনেছি। উপযুক্ত জবাবও দিয়েছি। বলেছি, ওয়া আলাইকুম (আর তোমাদের উপরও)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন বলেছিলেন, আলাইকুম (তোমাদের উপর)। ওয়া আলাইকুম নয়। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে — রসুল স. তখন বলেছিলেন, আমি তাদের কথা তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছি। আমার কথা গৃহীত হবে। তাদের কথা গৃহীত হবে না। হাদিসটি বর্ণনা করার পর ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, নিঃসন্দেহে ইহুদীরা তখন প্রকাশ করেছিলো চরম ঔদ্ধত্য। তৎসত্ত্বেও রসুল স. তাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেন নি। যদি ভঙ্গ করতেন, তবে তাদেরকে দেয়া হতো মৃত্যুদণ্ড।

অন্যত্র ফতোয়া আকারে ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য এসেছে এভাবে — রসুল স.কে গালি প্রদানকারী সকলকেই হত্যা করতে হবে। সে মুসলমান হোক অথবা অমুসলমান। তার তওবা কবুল করা হবে না। এতে করে বুঝা যায় যে, রসুল স. এর মর্যাদাহানিকর বক্তব্য দ্বারা জিম্মীদের সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায়। ইমাম আবু ইউসুফও এ রকম বলেছেন। হাফস্ ইবনে আবদুল্লাহ বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি একবার হজরত আবদুল্লাহ্কে বললেন, আমি এক সন্যাসীকে রসুল স. সম্পর্কে কটুক্তি করতে শুনেছি। হজরত আবদুল্লাহ্ বললেন, আমি এ রকম শুনতে পেলে তাকে হত্যা করতাম। রসুল স. সম্পর্কে ব্যঙ্গবিদ্রূপ শুনবো — এ কারণে আমরা তাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইনি।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, ইহুদী ও খৃষ্টানেরা যথাক্রমে হজরত ঈসাকে এবং হজরত উযায়েরকে আল্লাহ্র পুত্র বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু রসুল স. এর প্রতি কটু বাক্য বর্ষণ তাদের বিশ্বাসের অংগীভূত কোনো বিষয় নয়। তাই এরূপ অপকর্ম করলে তাদের সঙ্গে সন্ধি প্রত্যাহার করে নিতে হবে। যদি তারা প্রকাশ্যে এ রকম না করে, তবে সন্ধি প্রত্যাহার করা হবে না। কারণ প্রকাশ্যে নত করে রাখাই ছিলো জিযিয়া গ্রহণের উদ্দেশ্য। প্রকাশ্যে দুর্বিনীত ভাব দেখালে সন্ধির ভিত্তি আর অবশিষ্ট থাকে না। জিযিয়া আদায়ের বিধানও অকার্যকর হয়ে পড়ে। এখন হজরত

www.eelm.weebly.com

আয়েশা বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, যে সকল ইহুদী রসুল স.কে আস্সামু আলাইকা বলেছিলো, তারা জিম্মী ছিলো না। তাদের নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া হয়নি এবং চুক্তির মাধ্যমে তাদেরকে নিরাপত্তাও দেয়া হয়নি। মুসলমানেরা তখন যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলো না। পরে আল্লাহ্তায়ালা যখন মুসলমানদেরকে শক্তিশালী করলেন, তখন তাদের একটি গোত্রকে দেশান্তর করা হলো এবং অন্য গোত্রের লোকদেরকে করা হলো হত্যা।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোনো জিম্মী মুসলমানদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে, তবে মুসলমানদের নেতা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে নিরাপত্তাহীনতার দিকে। অথবা দিবে মৃত্যুর দণ্ডাদেশ।

হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং হজরত ইকরামা থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলো সালাম বিন মাশকুম, নোমান বিন আওফা, আবু ইউনুস, মালেক বিন জয়িফ প্রমুখ। বললো, আপনি আমাদের কেবলাকে পরিত্যাগ করেছেন। আর আপনি হজরত উযায়েরকে আল্লাহ্র পুত্র বলে মানেন না। এ রকম করলে আমরা আপনার অনুসরণ করবো কিভাবে। তাদের এ রকম কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত —

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৩০

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ○

❑ ইহুদী বলে 'ওজাইর আল্লাহের পুত্র' এবং খৃষ্টান বলে 'মসীহ্ আল্লাহের পুত্র।' উহা তাহাদিগের মুখের কথা। পূর্বে যাহারা সত্য প্রত্যাখান করিয়াছিল উহারা তাহাদিগের মত কথা বলে। আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করুন। উহারা কেমন করিয়া সত্য বিমুখ হয়!

প্রথমে বলা হয়েছে — ইহুদী বলে, 'উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র।' তানবীন সহ 'উযায়রুন' শব্দটি পরিণত হয়েছে আরবী শব্দে। শব্দটি তাসগীর (ন্যূনতাবোধক নাম পদ)। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটি আজমী (অনারব)। তানবীনসহ শব্দটি হয়েছে চার অক্ষরের। তানবীন ছেড়ে দিলে শব্দটি হয় তিন অক্ষরের। যেমন নূহ, হুদ, লূত। ক্বারী কুসায়ী এবং ক্বারী ইয়াকুব ছাড়া অন্য ক্বারীগণ শব্দটিকে তানবীন ছাড়াই পড়েছেন। কেননা শব্দটি গায়েরে মুনসারেফ (আংশিক পরিবর্তনশীল)।

www.eelm.weebly.com

ওবায়েদ বিন উমায়ের বলেছেন, ইহুদী ফাখখাস বিন আজুরা বলেছিলো — উযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র। অন্য কেউ এ রকম বলেনি। অন্য আয়াতে উল্লেখিত 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌ দরিদ্র ও আমরা ধনী।' — কথাটিও উচ্চারণ করেছিলো ফাখখাস।

আতিয়া আউফি সূত্রে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইহুদীদের মধ্যে 'হজরত উযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র' এই ধারণাটি সৃষ্টি হয়েছিলো এভাবে — হজরত উযায়ের যখন নবী হিসেবে প্রেরিত হলেন তখন ইহুদীদের কাছে ছিলো তওরাত ও তাবুত। কিন্তু তারা তওরাতের উপর আমল করতো না। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের বক্ষাভ্যন্তর থেকে তওরাত উঠিয়ে নেন। সাথে সাথে তাবুতকেও উঠিয়ে নেন। এভাবে তাদের স্মৃতিপট থেকে আসমানী কিতাব সম্পূর্ণ মুছে যায়। পুনরায় তওরাত ও তাবুত ফিরে পাবার আশায় তারা সমবেত হয় হজরত উযায়েরের নিকটে। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট রোদনভরা প্রার্থনা পেশ করেন। আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় নবীর প্রার্থনা কবুল করেন এবং ফিরিয়ে দেন তওরাতকে। সম্পূর্ণ তওরাত তাঁর স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তখন তিনি ইহুদীদেরকে ডেকে বলেন, হে বনী ইসরাইল! আল্লাহ্‌পাক পুনরায় তওরাত ফিরিয়ে দিয়েছেন। শোনো, আমি তওরাত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করছি। বিস্মৃত তওরাতের আদ্যপান্ত পাঠ শুনে ইহুদীরা নির্বাক হয়ে যায়। এর দীর্ঘদিন পর আল্লাহ্‌পাক তাবুতও ফিরিয়ে দেন। তাবুতের মধ্যে রক্ষিত ছিলো তওরাত। হজরত উযায়ের কর্তৃক পঠিত তওরাত ও তাবুতে রক্ষিত তওরাতের মধ্যে সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করে ইহুদীরা বিস্মিত হয়ে যায় এবং বলতে থাকে নবী উযায়ের নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পুত্র। না হলে আল্লাহ্‌ তাঁকে এভাবে তওরাত দান করতেন না।

কালাবী বর্ণনা করেছেন, বনী ইসরাইলের উপর বিজয়ী হওয়ার পর সম্রাট বখতে নসর তওরাতের আলেমগণকে হত্যা করে। হজরত উযায়ের ওই সময় ছিলেন শিশু। তাই তাঁকে হত্যা করা হয়নি। সত্তর অথবা একশত বৎসর পর বখতে নসরের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে বনী ইসরাইলেরা যখন বাইতুল মাকদিসে ফিরে আসে, তখন তওরাত তারা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছে। ওদিকে এক বস্তিতে হজরত উযায়েরকে একশত বৎসর মৃতবৎ রেখে দিয়েছিলেন আল্লাহ্‌-তায়ালা। এরপর তাঁকে পুনর্জীবিত করে নবী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন বনী ইসরাইলের নিকটে। তিনি তাদেরকে বিস্মৃত তওরাতের শিক্ষা দান করেন। এই বিবরণটি সুরা বাকারার তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এক ফেরেশতা হজরত উযায়েরকে এক পেয়ালা পানি পান করান। সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ তওরাত তাঁর স্মৃতিবদ্ধ হয়। তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের নিকটে গিয়ে বলেন, আমি উযায়ের। লোকেরা বলে, যদি তুমি উযায়ের হও, তবে আমাদেরকে

www.eelm.weebly.com

তওরাত লিখে দাও। হজরত উযায়ের সম্পূর্ণ তওরাত লিপিবদ্ধ করেন। কিছুদিন পর এক লোক বলে আমার পিতাকে আমার পিতামহ বলেছিলেন তওরাতের একটি অনুলিপি মটকির মধ্যে পুরে পুষ্পপল্লবিত একটি আঙ্গুরের গাছের গোড়ায় পুঁতে রাখো। বখতে নসর সবকিছু ধ্বংস করে দিলেও যেনো ওই তওরাত সুসংরক্ষিত থাকে। তাই করা হয়েছিলো। ওই স্থানটি কোথায় তাও আমার মনে পড়েছে। একথা বলে সে কয়েকজন লোককে সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থান থেকে পুঁতে রাখা তওরাতের অনুলিপিটি উদ্ধার করে আনে। বিস্ময়ের সঙ্গে তারা দেখতে পায় উদ্ধারকৃত তওরাতের অনুলিপি এবং হজরত উযায়েরের মাধ্যমে লিপিবদ্ধকৃত তওরাত অবিকল এক। এই অলৌকিক ঘটনার কারণে তারা বলতে শুরু করে উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র না হলে বিস্মৃত তওরাত কিছুতেই অবিকল এভাবে আনতে পারতেন না। তখন থেকে ইহুদীরা বলতে থাকে — উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র (এরকম উচ্চারণ থেকে আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থী)।

এরপর বলা হয়েছে — 'এবং খৃষ্টান বলে, মসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র।' বাগবী লিখেছেন, হজরত ঈসাকে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পর একাশি বৎসর পর্যন্ত খৃষ্টানেরা তাঁর প্রদর্শিত পথে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তারা কেবলামুখী হয়ে নামাজ পাঠ করতো ও রোজাও রাখতো। এরপর খৃষ্টান ও ইহুদীদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। ইহুদী যোদ্ধা বুলেস হজরত ঈসার কয়েকজন সহচরকে হত্যা করে। এরপর ইহুদী-দেরকে বলে, যদি ঈসা সত্য নবী হয়ে থাকে তবে তো আমি নির্ঘাত জাহান্নামী। কিন্তু আমি একা জাহান্নামে যাবো না — খৃষ্টানদেরকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। এমন চাল চালবো যেনো জাহান্নাম তাদের জন্য অবধারিত হয়।

বুলেসের ছিলো একটি ঘোড়া। ঘোড়াটির নাম ছিলো আকাব্। ওই ঘোড়ার পিঠে চড়েই সে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো। সে ওই ঘোড়ার লাগাম কেটে দিলো। প্রকাশ করতে লাগলো সাড়ম্বর অনুতাপ। নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে করতে উপস্থিত হলো খৃষ্টানদের কাছে। খৃষ্টানেরা বললো, তুমি কে? সে বললো, আমি তোমাদের দুশমন বুলেস। আমাকে লক্ষ্য করে আকাশ থেকে ঘোষিত হয়েছে এই আওয়াজ — তুমি খৃষ্টান না হওয়া পর্যন্ত তোমার তওবা কবুল করা হবে না। তাই আমি ইহুদী ধর্ম পরিত্যাগ করেছি। গ্রহণ করেছি খৃষ্টান ধর্ম। খৃষ্টানেরা তখন তাকে তাদের গীর্জায় নিয়ে যায়। গীর্জার একটি কুঠরীতে সে নিজেকে এক বৎসর আবদ্ধ করে রাখে। এরপর কুঠরী থেকে বের হয়ে এসে বলে, এই এক বৎসরে আমি ইঞ্জিল শিখে ফেলেছি। আমার তওবা কবুল হয়েছে বলে সুসংবাদও পেয়েছি। খৃষ্টানেরা তার কথা বিশ্বাস করে এবং হয়ে পড়ে তার একান্ত অনুরাগী। বুলেস তখন একটি কক্ষের মধ্যে নিয়ে যায় নাসতুরাকে। তাকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে বলে, ঈসা, মরিয়ম এবং ইলাহ্ — এই তিনজনই আল্লাহ্। এরপর বুলেস চলে যায় রোমে। সেখানকার খৃষ্টানদেরকে দেয় লাহুত ও

www.eelm.weebly.com

নাসুতের শিক্ষা। বলে, ঈসা প্রকৃতপক্ষে মানুষ ছিলেন না। তার শরীরও মানুষের শরীর ছিলো না। তার মানবত্ব ও শরীর ছিলো এলমে নাসুতের মধ্যে। কিন্তু লাহুতের মধ্যে তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র পুত্র। এই বিশ্বাসটি প্রচার করার জন্য সে, রোমের চারজন খৃষ্টানকে প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করে। আরেক ব্যক্তিকে সে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে একথা প্রচারের জন্য যে — আল্লাহ্ অনাদি ও অনন্ত। আর ঈসাও আল্লাহ্‌র অনুরূপ। এই প্রতিনিধিদেরকে সে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ডেকে বলে, তুমি আমার বিশেষ সহচর। আমি ঈসাকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন। আমি তাঁর সন্তোষ সাধনার্থে নিজেই নিজেকে কোরবান করবো (এভাবে চলে যাবো ঈসার কাছে)। তুমি মানুষকে তোমার আকিদা বিশ্বাস শিক্ষা দিয়ো। চালিত কোরো তোমার পথে। এরপর সে তার কথিত সন্তোষ সাধনার্থে নিজেই নিজেকে জবাই করে ফেলে। এরপর তার প্রতিনিধিরা জোরে-শোরে প্রচার করতে থাকে তাদের ধর্মমত। বাড়তে থাকে বিকৃত বিশ্বাসীদের দল। বাড়তে থাকে মতপার্থক্য। শুরু হয় পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে — 'এটা তাদের মুখের কথা।' এই বাক্যটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপরে বর্ণিত অপবিশ্বাস ভিত্তিহীন ও অর্থহীন। এ রকমও হতে পারে যে, বাক্যটির অর্থ — তাদের ওই অপবিশ্বাস প্রসূত কথা মৌখিক কথার অতিরিক্ত কিছু নয়। তাদের কথা হচ্ছে প্রতারণার নামান্তর — যার কেবল শব্দ আছে, মর্ম নেই।

এরপর বলা হয়েছে — 'যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলো তারা তাদের মতো কথা বলে।' এখানে ইউদ্বহিউনা (তাদের মতো কথা বলে) শব্দটি হামযা সহযোগে অথবা হামযা ব্যতিরেকে উচ্চারণ করা যায়। দু'টো উচ্চারণই শুদ্ধ ও অভিধান সম্মত। কাতাদা ও সুদ্দী বলেছেন, এখানে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবে— খৃষ্টানেরা কথা বলে ইহুদীদের মতো। ইহুদীরা যেমন হজরত উযায়েরকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে থাকে, তেমনি খৃষ্টানেরা আল্লাহ্‌র পুত্র বলে থাকে হজরত ঈসাকে। তাই এখানে বলা হয়েছে — পূর্বে যারা (ইহুদীরা) সত্য-প্রত্যাখ্যান করেছিলো, তারা (খৃষ্টানেরা) তাদের (ইহুদীদের) মতো কথা বলে।

মুজাহিদ বলেছেন, অংশীবাদীদের কথার সঙ্গেও খৃষ্টানদের কথার মিল রয়েছে। আরবের অংশীবাদীরা লাত, উজ্জা এবং মানাত নামক মূর্তিগুলোকে বলতো আল্লাহ্‌র পুত্র।

হাসান বলেছেন, খৃষ্টানদের কথা ছিলো অতীত কালের কাফেরদের কথার মতো। আরবের মুশরিকদের সম্পর্কেও অন্য আয়াতে এরকম ঘোষণা এসেছে। বলা হয়েছে — 'কাজালিকা ক্বালাল্লাজিনা মিন ক্ববলিহিম মিছলা ক্বাওলিহিম তাশাবাহাত ক্বুলুবুহুম' (তাদের কথার মতো কথা বিগত যুগের লোকেরাও বলেছিলো। তাদের সকলের অন্তর একই রকম কুফরীতে আচ্ছন্ন)।

www.eelm.weebly.com

কুতাইবি বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির উদ্দেশ্য এই যে — রসুল স. এর সময়ের ইহুদীদের ও খৃষ্টানদের কথাও তাদের পূর্বপুরুষগণের মতো। অর্থাৎ তাদের এই সত্য-প্রত্যাখ্যান অত্যন্ত প্রাচীন। এটা কোনো নতুন বিষয় নয়।

এরপর বলা হয়েছে — 'আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন।' বাক্যটি একটি বদ্‌দোয়া। বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্‌তায়ালা উপরে বর্ণিত সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন! এরকম তাফসীর করেছেন ইবনে জারীহ্। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ, তাদের উপর আল্লাহ্‌পাক অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটি একটি বিস্ময় প্রকাশক বাক্য। অপপ্রার্থনা নয়।

শেষে বলা হয়েছে — 'তারা কেমন করে সত্য বিমুখ হয়।' একথার অর্থ — যখন পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়ে চলেছে, রসুল স. উপস্থিত রয়েছেন তাদের সামনে, প্রকাশিত হয়ে চলেছে অলৌকিক নিদর্শন সমূহ — তখন ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কোন্ যুক্তিতে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ
ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ
عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى
اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ
بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○

❑ তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদিগের পণ্ডিতগণকে ও সংসার বিরাগিগণকে তাহাদিগের প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং মরিয়ম-তনয় মসীহ্‌কেও। কিন্তু উহারা এক ইলাহের ইবাদত করিবার জন্যই আদিষ্ট হইয়াছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি কত পবিত্র!

❑ তাহারা তাহাদিগের মুখের ফুৎকারে আল্লাহের জ্যোতি নির্বাপিত করিতে চাহে। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ্ তাঁহার জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না।

❑ অংশীবাদিগণ অপ্রীতিকর মনে করিলেও অপর সমস্ত দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করিবার জন্য তিনিই পথ-নির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ তাঁহার রসুল প্রেরণ করিয়াছেন।

---

www.eelm.weebly.com

এখানে উল্লেখিত 'আহবার' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'হিবর।' হিবর অর্থ আলেম বা পণ্ডিত। আর আহবার অর্থ পণ্ডিতগণ বা আলেমগণ। 'রুহবান' শব্দটিও বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'রাহিব।' 'রাহিব' অর্থ সংসার-বিরাগী। আর রুহবান অর্থ সংসারবিরাগীগণ।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসারবিরাগীগণকে তাদের প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করেছে।' একথার অর্থ— বনী ইসরাইলেরা আল্লাহ্তায়ালার বিধানবিরোধী আলেমগণ ও সংসারবিরাগী দরবেশগণের অনুসারী হয়েছে।

ইমাম তিরমিজি তাঁর 'জামে তিরমিজি' পুস্তকে এবং ইমাম বাগবী তাঁর স্বরচিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত আদী বিন হাতেম বলেছেন, আমি গলায় সোনার ক্রুশ পরে একদিন রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি স. বললেন, আদী! তোমার গলার ঝুলন্ত মূর্তিটিকে ফেলে দাও। আমি তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করলাম। তিনি স. তখন পাঠ করলেন এই আয়াতটি। আমি বললাম, আমরা তো আলেম ও দরবেশদের পূজা করি না। রসুল স. বললেন, এমন কাণ্ড কি ঘটেনি যে, তোমাদের আলেম ও দরবেশরা আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক ঘোষিত হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বলেছিলো। আর তাদের কথা নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিলে তোমরা। আমি বললাম, হ্যাঁ। তাতো ঘটেছিলো। তিনি স. বললেন, সে জন্যই তো বলা হয়েছে— তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার-বিরাগীগণকে তাদের প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করেছে।

আবদুল্লাহ্ বিন মোবারক বলেছেন, ধর্মের বিধান পরিবর্তনকারী শাসক, আলেম, মাশায়েখ— সকলেই আলোচ্য নির্দেশনাটির অন্তর্ভুক্ত। ইবাদত বা উপাসনা অর্থ— বিধানের অনুসরণ। আল্লাহতায়ালার বিধানবিরোধী অনুসরণ নিষিদ্ধ। কিন্তু আল্লাহপাকের বিধানের অনুকূল অনুসরণ নিষিদ্ধ নয়। যেমন রসুল স. ও তাঁর খলিফাগণের অনুসরণ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহপাকের অনুসরণ। তাই তাঁদের অনুসরণ নিষিদ্ধ নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং মরিয়ম তনয় ঈসাকেও। কিন্তু তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলো। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই। তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি কতো পবিত্র।' এ কথার অর্থ, পথভ্রষ্ট বনী ইসরাইলেরা হজরত মরিয়মের পুত্র ঈসাকেও তাদের প্রতিপালক সাব্যস্ত করেছিলো। তাঁকে বলেছিলো আল্লাহর পুত্র— অথচ তারা ছিলো এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত। নিঃসন্দেহে তারা অংশীবাদী। তাদের আচরিত অংশীবাদ থেকে আল্লাহ্তায়ালা কতোই না পবিত্র।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৩২)বলা হয়েছে— 'তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র জ্যোতি নির্বাপিত করতে চায়। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া অন্য কিছু চান না।'

এখানে উল্লেখিত (নূর) শব্দটির অর্থ জ্যোতি। জ্যোতি বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে ওই সকল নিদর্শনকে যা আল্লাহ্পাকের এককত্বের দিকে পথনির্দেশ করে। শব্দটির মাধ্যমে কোরআন মজীদ অথবা রসুল স. কে কিম্বা তাঁর রেসালতকেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। 'মুখের ফুৎকারে' কথাটির অর্থ মৌখিক মিথ্যা প্রচারে বা অপপ্রচারে। কাফেররা বিভিন্ন অপবাদ ও অপপ্রচারের মাধ্যমে সত্যের জ্যোতি বা আলো নিভিয়ে দিতে চায়। তাদের এমতো প্রচেষ্টা মুখের ফুৎকারে চন্দ্র সূর্যের আলো নেভানোর প্রচেষ্টার মতো অসম্ভব একটি প্রচেষ্টা— যা আল্লাহপাকের অভিপ্রেতও নয়। তাই শেষে বলা হয়েছে — সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা পছন্দ না করলেও আল্লাহ্তায়ালা চান তার নিদর্শন সমূহের, কোরআনের, রসুল স. এর রেসালতের নূরের পূর্ণ উদ্ভাসন, পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা। এছাড়া অন্য কিছু তিনি চান না।

এর পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে — 'অংশীবাদীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথ নির্দেশ ও সত্য ধর্মসহ তাঁর রসুল প্রেরণ করেছেন।' এখানে আলহুদা(পথনির্দেশ) অর্থ আল কোরআন। আর কোরআনই হালাল হারাম সহ সকল বিধানাবলী ও জান্নাতের পথ প্রদর্শন করেছে। আর দ্বীনুল হক্ব (সত্যদ্বীন) অর্থ এখানে দ্বীন ইসলাম।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ইজহার কথাটির অর্থ পরিচিত করে দেয়া (জয়যুক্ত করা)। আর এখানকার 'হা' সর্বনামটি এখানে সম্পৃক্ত হয়েছে রসুল স. এর সঙ্গে। 'আলাদ্ দ্বীনি কুল্লিহি' অর্থ সকল ধর্ম বা শরিয়ত। এভাবে আয়াতের বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়ায় এ রকম— অংশীবাদীরা না চাইলেও আল্লাহ্-তায়ালা পূর্ববর্তী সকল শরিয়ত অপেক্ষা সর্ব শেষ শরিয়তকে অধিকতর পরিচিতি দানের উদ্দেশ্যে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শেষ রসুলকে।

জনৈক তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'ইজহার' কথাটির অর্থ হবে বিজয়ী করে দেয়া। আর এখানকার 'হা' সর্বনামটির সম্পৃক্তি ঘটেছে দ্বীনুল হক্ব (সত্য ধর্ম) এর সঙ্গে। এভাবে বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়িয়েছে এ রকম— পূর্বের যাবতীয় ধর্মের উপরে সর্বশেষ ধর্ম ইসলামের সামগ্রিক বিজয় প্রতিষ্ঠার জন্য (আগের ধর্ম গুলোকে রহিত করার জন্যই) আল্লাহ্পাক প্রেরণ করেছেন তাঁর রসুলকে — অংশীবাদীরা এ রকম করা পছন্দ না করলেও।

ইমাম বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা ও জুহাক বলেছেন, ইসলামের পরিপূর্ণ বিজয়ের ঘটনাটি ঘটবে হজরত ঈসার পুনঃ আবির্ভাবের পর। হজরত আবু হোরায়রার এক মারফু (সর্বোন্নত) বর্ণনায় এসেছে, হজরত ঈসার পুনরাগমনের পর ইসলাম ছাড়া সকল ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমি বলি, সকল

www.eelm.weebly.com

পরিত্যক্ত ধর্মের পূর্ণ বিলোপ ঘটিয়ে ইসলামের একচ্ছত্র বিজয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যে কোনো সময়ে। হজরত মেকদাদ বলেছেন, আমি রসুল স. এর নিকট থেকে স্বকর্ণে শুনেছি— এমন এক সময় আসবে যখন এমন কোনো মৃত্তিকা নির্মিত গৃহ, তাঁবু বা শিবির থাকবে না, যাতে ইসলাম অনুপ্রবেশ না করবে। তখন সম্মানিতরা থাকবে সম্মানের সঙ্গে। আর অসম্মানের সঙ্গে থাকবে অসম্মানিতরা। অর্থাৎ যারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে তারা হবে সম্মানিত। আর যারা বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা হবে অসম্মানিত। হজরত মেকদাদ বলেন, আমি তখন বললাম, সে সময়েই তাহলে আল্লাহ্‌র দ্বীন পরিপূর্ণ রূপে জয়যুক্ত হবে।

আমি বলি, আল্লাহ্‌পাকের দ্বীনকে সকল ধর্মমতের উপর জয়যুক্ত করার এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েই চলেছে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন সময়ে। এই বিজয় চিরস্থায়ী হবে— এমন নয়। জননী আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, রাত্রি ও দিবস কখনো অবলুপ্ত হবে না, যে পর্যন্ত পৃথিবীতে সংঘটিত হতে থাকবে লাত ও উজজার উপাসনা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি ভেবেছিলাম, অপর সকল দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করবার জন্য তিনিই পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহ তাঁর রসুল প্রেরণ করেছেন— এই সিদ্ধান্তটি একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। (অবিশ্বাসীরা আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না)। তিনি স. বললেন, বিজয় প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ আল্লাহ্‌পাক ইচ্ছে করবেন। এরপর প্রবাহিত হবে এক পবিত্র বাতাস। যার হৃদয়ে সরিষার দানা পরিমাণ ইমান থাকবে তার রূহও কবজ করে নেয়া হবে। তখন পৃথিবীতে থাকবে কেবল পাপাচারীরা। তারা প্রত্যাবর্তন করবে তাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মের দিকে (অংশীবাদিতার দিকে)। হাসান বিন ফজল বলেছেন, এখানে 'জয়যুক্ত' করার অর্থ সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ পেশ করা। দলিল প্রমাণ সমূহের মাধ্যমে সত্যধর্মের (ইসলামের) বিজয় প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ এই ধর্ম এমন দলিল প্রমাণের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, একে প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ইসলামকে ওই সকল ধর্মাবলম্বীদের উপর জয়যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে, রসুল স. যাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তারা ছিলো ইহুদী, খৃষ্টান, মূর্তিপূজক ও অগ্নিপূজক।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁর রসুলকে এমন বিজয় দান করেছেন যে, ইসলামের বাণী শ্রবণকারীরা বলতে বাধ্য হতো—রসুল স. সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা ভ্রষ্ট। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা ছিলো দু'ধরনের— আহলে কিতাব ও কিতাববিহীন। এদের সকলের উপরই আল্লাহ্‌পাক তাঁকে জয়যুক্ত করেছেন। কিতাবহীনেরাও ইসলামের প্রতাপের নিকটে হয়েছিলো পূর্ণ

www.eelm.weebly.com

নতজানু। কিতাবীরাও হয়েছিলো বন্দী। কাউকে কাউকে করা হয়েছিলো হত্যা। কাউকে আবার দেয়া হয়েছিলো— দেশান্তর। অধিকাংশ মূর্তিপূজক ও অগ্নি-পূজকেরা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। যারা হয়নি তাদেরকে বাধ্য হতে হয়েছিলো জিযিয়া দিতে। এসকল কিছুই ছিলো সকল ধর্মের উপর রসুল স. এর ধর্মের জয়-যুক্ততার প্রমাণ।

আগের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে — 'সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও।' আর এখানে (৩৩) বলা হয়েছে 'অংশীবাদীগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও।' এতে করে বুঝা যায়, আগের আয়াতে উল্লেখিতরা ছিলো কেবল সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের)। আর এই আয়াতে উল্লেখিতরা একই সঙ্গে সত্যপ্রত্যা-খ্যানকারী ও অংশীবাদী। উভয় আয়াতের মিলিত মর্ম এই যে— সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারী ও অংশীবাদীদের নিকট অপ্রীতিকর মনে হলেও আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ঘটাবেনই। ইসলামকেও জয়যুক্ত করবেন অন্য সকল ধর্মমতের উপরে। এর কোনো অন্যথা হবে না।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৩৪

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ○

❒ হে বিশ্বাসিগণ! পণ্ডিত এবং সংসার বিরাগীদিগের মধ্যে অনেকে লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করিয়া থাকে এবং লোককে আল্লাহের পথ হইতে নিবৃত্ত করে। যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং উহা আল্লাহের পথে ব্যয় করে না উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

এখানে 'পণ্ডিত' বা আলেম বলে বুঝানো হয়েছে, ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোভী আলেমদের কথা। আর 'সংসার বিরাগীগণ' বলে বুঝানো হয়েছে কেবল লালসাপরায়ণ খৃষ্টান দরবেশদের কথা। ইহুদীদের মধ্যে বৈরাগ্যের প্রচলন ছিলোই না। মানুষের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত করা— এই দু'টো অপরাধে এখানে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাদেরকে। বলা হয়েছে— হে বিশ্বাসীগণ! পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকে মানুষের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে।

www.eelm.weebly.com

ধন সম্পদ অর্জন করা হয় মূলতঃ পানাহারের জন্য এবং অন্যবিধ ব্যবহারের জন্য। কিন্তু পানাহারের প্রসঙ্গটি এখানে প্রধান বলা হয়েছে। 'ইয়া'কুলুনা' অর্থ ভোগ করে বা ভক্ষণ করে।

এখানে 'বিলবাত্বিলি (অন্যায়ভাবে) কথাটির অর্থ উৎকোচ গ্রহণ করে পক্ষপাতিত্বমূলক সিদ্ধান্ত দেয়, আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী বিকৃত করে, আল্লাহ্‌র হুকুম বলে চালিয়ে দেয় স্বহস্তলিখিত বক্তব্যকে ইত্যাদি। তওরাত শরীফে রয়েছে রসুল স. এর পরিচিতি ও তাঁর গুণাবলীর মনোমুগ্ধকর বিবরণ। ইহুদীদের অসৎ আলেমেরা সেগুলোকে গোপন করে। এটাও আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করা। নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও সম্পদ হারানোর ভয়েই তারা এ রকম করতো। তারা ভালো করেই জানতো যে, সাধারণ মানুষ রসুল স. এর পরিচয় পেলে তাদেরকে আর মানবে না। ছিন্ন হয়ে যাবে অর্থ সমাগমের সূত্র।

এরপর বলা হয়েছে — 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।' এখানেও যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল আলেম ও দরবেশদেরকে। কিন্তু কতিপয় সাহাবীর উক্তি উল্লেখ পূর্বক হাসান বলেছেন, কেবল ইহুদী ও খৃষ্টান আলেম দরবেশরাই এই বক্তব্যের লক্ষ্য নয়। তারা সহ সকল সম্পদ মওজুদকারীদেরকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে — 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে।' হজরত আবু জর বলেছেন, এখান থেকে শুরু হয়েছে নতুন প্রসঙ্গ। অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান আলেম দরবেশদের সঙ্গে এই বাক্যটি বিশেষভাবে সংযুক্ত নয়।

'এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না।' এখানে 'তা' হচ্ছে একবচন বোধক সর্বনাম। এই সর্বনামটি বিশেষভাবে 'রৌপ্য' কথাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ব্যয়, খরচ ও লেন-দেন সাধারণতঃ হয়ে থাকে রৌপ্য মুদ্রার মাধ্যমে। তাই এখানে 'সেগুলোকে (স্বর্ণ ও রৌপ্যকে) আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না' — এরকম না বলে বলা হয়েছে, 'এবং তা (রৌপ্য) আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না।' এটাই এখানে এক বচন বোধক সর্বনাম (তা) ব্যবহারের কারণ।

আরেকটি বিষয় এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে বলা হয়েছে স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করার কথা। কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, পুঁজি বা জমানো সম্পদ হিসেবে সোনা ও রূপাকে একসঙ্গে মিলানো যায়। আর জাকাতও দিতে হয় পুঞ্জীভূত, জমানো বা মেলানো সম্পদের উপর। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, একাধিক প্রকৃতির সম্পদ জমিয়ে রাখলে, ওই জমানো সম্পদের মূল্য যদি জাকাতের মাপকাঠিতে (নেসাবে) পড়ে, তবে জাকাত প্রদান হয়ে পড়বে অত্যাবশ্যক। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, একাধিক প্রকৃতির সম্পদের মূল্যমানের ভিত্তিতে জাকাতের নেসাব নির্ধারণ করা যাবে না।

www.eelm.weebly.com

নেসাব নির্ধারণ করতে হবে ওজনের ভিত্তিতে। যেমন, ধরা যাক, এক লোকের কাছে রয়েছে দশ মিসকাল স্বর্ণ এবং একশত দিরহাম। এমতোবস্থায় তার উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। কারণ দশ মিসকাল স্বর্ণের উপর জাকাত ওয়াজিব। কিন্তু যদি তার নিকটে পাঁচ মিসকাল স্বর্ণ (যার মূল্য একশত দিরহাম অথবা এর অধিক) থাকে, তবে জমানো সম্পদের মূল্যমান নির্ধারণ করতে হবে দিরহামের ভিত্তিতে। এই ভাবে সোনা ও দিরহামের মোট মূল্য যদি দুই শত দিরহামে গিয়ে দাঁড়ায়, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে জাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু সাহে-বাঈনের (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের) মতে ওয়াজিব হবে না। কারণ সাত মিসকালের কম সোনার উপরে জাকাত নেই। যদি ওই লোকের নিকট পাঁচ মিসকাল সোনা ও একশত দিরহাম থাকে, আর ওই একশত দিরহামের মূল্য যদি দশ মিসকাল সোনার সমান হয়, তবে ধরতে হবে পনের মিসকাল সোনা। এভাবে সমস্ত সম্পদকে সোনা ধরে নিয়ে জাকাত দিতে হবে। এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। কিন্তু সাহেবাঈন বলেন, এভাবে জাকাত নির্ধারণ করা যাবে না। কারণ সাত মিসকালের কম ওজনের সোনার উপর জাকাত ওয়াজিব নয়। আর একশত দিরহামের উপরেও জাকাত ওয়াজিব নয়। সুতরাং এখানে সম্পদের সংমিশ্রন অসিদ্ধ।

লক্ষণীয় যে, আলোচ্য বাক্যে বলা হয়েছে, 'স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে।' কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, জাকাত নির্ধারণ করতে হবে পুঞ্জীভূত সম্পদের উপর। একটিকে আরেকটি থেকে আলাদা করে নয়।

পুঞ্জীভূত সম্পদের মধ্যে সোনা ও রূপার কথা কেবল উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। অতএব বুঝতে হবে জাকাতের নেসাব নির্ধারিত হবে সোনা এবং রূপার মাপকাঠিতে। অর্থাৎ অন্য সকল সম্পদের মূল্য যদি সাড়ে সাত ভরি সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার মূল্যের সমান হয়, তবে জাকাত ওয়াজিব হবে। মনে রাখতে হবে যে, সোনা ও রূপা ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ জাকাতের মাপকাঠিরূপে গৃহিত হয়নি। সম্ভবতঃ এর কারণ এই যে, মানুষ এই সম্পদ দু'টোকেই পুঞ্জীভূত করে রাখতে চায়।

'আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না' কথাটির অর্থ হতে পারে এখানে দু'রকম — ১. একেবারেই ব্যয় করে না। আল্লাহ্‌র পথেও নয়। শয়তানের পথেও নয়। ২. আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না। কিন্তু শয়তানের পথে ব্যয় করে অবলীলায়। যেমন এক আয়াতে এসেছে,'ইনফিকুনা আম্‌ওয়ালাহুম লিইয়াসুদ্দু আন সাবিলিল্লাহি (তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে ফেরানোর জন্য)।

আলোচ্য আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আলেম ও মাশায়েখদের সম্পর্কে বলা হয়েছে — তারা লোককে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে তাদের সম্পর্কে ব্যয় না করার প্রথমোক্ত প্রকারটির কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা ভালো-মন্দ কোনো পথেই অর্থ ব্যয় করে না। তাই কৃপণতার সর্বোচ্চ সীমা বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইয়াকনিযুনা' শব্দটি।

www.eelm.weebly.com

'আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না' কথাটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। ফরজ, ওয়াজিব, নফল, মোস্তাহাব — সকল প্রকার দানের কথাই নিহিত রয়েছে এই নির্দেশনাটিতে। অর্থাৎ ওই সকল ইহুদী পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীরা বর্ণিত ব্যয়গুলোর কোনোটাই করে না।

হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করে, তার ওই খরচ হবে সদকাতুল্য (সওয়াবের কারণ)। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, কেউ যদি এক দিনার এক দিনার করে জেহাদে, ক্রীতদাস মুক্তিতে, মিসকিনের জন্য এবং আপন সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যয় করে — তবে সে সবচেয়ে বেশী সওয়াব লাভ করবে ওই দিনারের মাধ্যমে, যা সে খরচ করছিলো তার আপন সন্তান-সন্ততির জন্য। মুসলিম।

হজরত ছাওবান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সবচেয়ে বেশী সওয়াব লাভ হবে ওই দিনারের মাধ্যমে, যা সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যয় করা হয়, ওই দিনারের মাধ্যমে যা ব্যয় করা হয় মুজাহিদদের বাহনের জন্য এবং ওই দিনার যা ব্যয় করা হয় মুজাহিদের জন্য।

জননী উম্মে সালমা বলেছেন, আমি একবার বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল!(আমার পূর্ববর্তী স্বামী) আবু সালমার সন্তানেরা তো আমারও সন্তান। তাদেরকে কি আমি কিছু দিতে পারবো? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। তাদেরকে দিলে সওয়াবও পাবে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে মাসউদের পত্নী বলেছেন, আমি ও জনৈক মহিলা রসুল স. এর নিকট আবেদন করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমরা যদি আমাদের স্বামীদেরকে কিছু দেই, তবে কি সওয়াব পাবো? রসুল স. বললেন, দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। একগুণ দানের জন্য, আরেকগুণ সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য। বোখারী, মুসলিম।

শেষে বলা হয়েছে — 'তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।' এ কথার অর্থ — হে আমার রসুল! যারা একেবারেই দান করে না এবং যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করে কেবল শয়তানের পথে ব্যয় করে, তাদেরকে আপনি মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন।

দ্রষ্টব্যঃ সম্পদ পুঞ্জীভূত করা এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করা — এই দু'টি অপকর্মের জন্য আলোচ্য আয়াতে মর্মন্তুদ শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এতে করে বোঝা যায় কেউ যদি ফরজ জাকাত ও ওয়াজিব সদকা প্রদান করে, তবে তার সঞ্চয় হবে বৈধ। অতিরিক্ত (নফল) দান না করলেও সে আর শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। এটা ঐকমত্য।

তিবরানী তাঁর আওসাতে, ইবনে আদী তাঁর আল কামেলে এবং ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকী তাঁদের স্ব স্ব সুনানে হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা জাকাত আদায় করে তারা কৃপণ নয় (শাস্তি যোগ্যও নয়)।

www.eelm.weebly.com

মুজাহিদ সূত্রে বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবীগণ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে শুরু করলেন, স্ত্রী পুত্র পরিজনের জন্য সঞ্চয় করে না — এমন কেউ কি আছে? বিষয়টি তখন রসুল স. এর সকাশে উত্থাপন করলেন হজরত ওমর। রসুল স. বললেন, তোমাদের সঞ্চয়কে পবিত্র করবার জন্যই আল্লাহ্‌পাক প্রণয়ন করেছেন জাকাতের বিধি (জাকাত পরিশোধ করলে সম্পদ জমা করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। আর ওই সঞ্চয় অপবিত্রও নয়)। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ, আবু ইয়ালী, ইবনে হাতেম, হাকেম, ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকীও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাগুলো— উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধি প্রণীত হয়েছে তো এজন্যেই। তোমরা সঞ্চয় করো বলেই তো তোমাদের মৃত্যুর পর ওগুলো পায় তোমাদের উত্তরাধিকারীরা।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমার সঞ্চয়ে পাহাড় পরিমাণ সোনা থাকলেও আমি ভীত হবো না, যদি আমি তার জাকাত আদায় করি এবং আল্লাহ্‌র বিধান মতো চলি। ইবনে আবী হাতেম, হাকেম, আবু শায়েখ এবং ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যদি চার হাজার দিরহাম অথবা ততোধিক হয় তবে তা হবে পুঞ্জীভূত সম্পদ— জাকাত দেয়া হোক অথবা না হোক। চার হাজার দিরহামের কম হলে তা গণ্য হবে জীবন-ধারণের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন রূপে — যার জাকাত নেই।

কারো কারো ধারণা যা কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত — তাই পুঞ্জীভূত সম্পদ। হজরত আবু জর গিফারী বলেছেন, রসুল স. কাবা গৃহের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। আমাকে দেখে বলে উঠলেন, ওই সকল লোক ক্ষতিগ্রস্ত। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক (দয়া করে বলুন, ক্ষতিগ্রস্ত কারা)। তিনি স. বললেন, বিত্তশালীরা। তবে ওই বিত্তশালীরা নয় — যারা সম্মুখ-পশ্চাদ দক্ষিণ-বাম, সকল দিক থেকে (অতিরিক্ত) দান করতে অভ্যস্ত। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু জর গিফারীর একটি মারফু হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি অর্থবিত্ত পুঞ্জীভূত করে রেখে যায়, কিয়ামতের দিন ওই অর্থবিত্ত দ্বারা তার শরীরে দাগ দেয়া হবে। বোখারী, ইবনে জারীর, ইবনে মারদুবিয়া। আমি বলি, যে সকল বিত্তবানেরা জাকাত দেয় না, তাদেরকেই কিয়ামতের দিন এভাবে দাগ লাগানো হবে। অতএব জাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। অতিরিক্ত দান করার অভ্যাসও থাকা দরকার। হাদিস শরীফে জাকাত অত্যাবশ্যক যেমন বলা হয়েছে, তেমনি বর্ণনা করা হয়েছে অতিরিক্ত দানের ফযীলতও।

যে সকল আলেম প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদকে পুঞ্জীভূত সম্পদ বলেন, তাঁদের সমর্থনেও রয়েছে কয়েকটি হাদিস। যেমন ১. হজরত আবু উমামা বলেছেন, জনৈক সুফ্‌ফাবাসী (সর্বহারা) সাহাবী ইন্তেকাল করলেন। তাঁর লুঙ্গির ভাঁজে

www.eelm.weebly.com

পাওয়া গেলো একটি দিনার। রসুল স. তা দেখে বললেন, এটা একটা দাগ (কলংক)। ২. আর একজন পরলোক গমন করলে দেখা গেলো, তাঁর লুঙ্গির মধ্যে রয়েছে দুটি দিনার। রসুল স. বললেন, দুটি দাগ। বাগবী। ৩. হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আহ্‌লে সুফ্‌ফাদের একজন মৃত্যুবরণ করলে তাঁর চাদরের মধ্যে দুটি দিনার পাওয়া গেলো। রসুল স. বললেন, দুটি দিনার —দুটি কলংক। ৪. হজরত মাসউদ ইবনে ওমর বলেছেন, এক জনের জানাযা পড়ার সময় রসুল স. বললেন, এ লোকের ত্যাজ্য সম্পত্তির পরিমাণ কতো? সাহাবীগণ বললেন, তিন দিনার। রসুল স. বললেন, সেতো রেখে গেলো তিনটি কলংক। এরপর সাক্ষাতে আবদুল্লাহ্ আবুল কাসেম আমাকে বললেন, লোকটি ভিক্ষা করতো সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। ইয়াহ্ইয়া বিন আবদুল হামিদ হামানী থেকে বর্ণনাটি এনেছেন বায়হাকী। আমি বলি, ইতোপূর্বে হজরত আবু উমামা এবং হজরত ইবনে মাসউদের হাদিসে বর্ণিত লোকেরাও ছিলো ভিক্ষুক। আর জীবন ধারণ নয়, হয়তো সম্পদ সঞ্চয়ই ছিলো তাদের ভিক্ষার উদ্দেশ্য।

উপরের আলোচনা দৃষ্টে একথাই বলতে হয় যে, যারা সুফী হয়েছেন এবং দুনিয়া পরিত্যাগ করেছেন তাদের জন্য সম্পদের মুখাপেক্ষী হওয়া নাজায়েয। জীবন ধারনের ন্যূনতম প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত সম্পদ তাদের জন্য শোভনীয় নয়। আর তাঁরা অসংসারী বলে পরিবার পরিজনের হকও তাদের উপরে নেই। তাঁরা দুনিয়া পরিত্যাগ করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই তো তাদেরকে বলা হয় সুফী। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন — আউফু বিল উক্বুদি আউফু বিল আহদী (আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো)। সুফ্‌ফাবাসীগণও এ ধরনের দুনিয়া ত্যাগী ও আল্লাহ্ নির্ভরশীল ছিলেন। উল্লেখ্য যে, সর্বশ্রেষ্ঠ সুফী ছিলেন হজরত আলী। কিন্তু তিনি সংসারীও ছিলেন। তাঁর জীবনে রয়েছে সংসারী সুফীগণের প্রকৃষ্ট আদর্শ।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৩৫

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

❐ যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদিগের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে সেদিন বলা হইবে 'ইহাই উহা যাহা তোমরা নিজদিগের জন্য পুঞ্জীভূত করিয়াছিলে। সুতরাং আস্বাদ গ্রহণ কর তাহার যাহা তোমরা পুঞ্জীভূত করিতে।

যে সকল বিত্তশালীরা জাকাত দেয় না, তাদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বলা হয়েছে — পরকালে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে তাদের পুঞ্জীভূত সম্পদ। তারপর তার দ্বারা দাগ দেয়া হবে শরীরের বিভিন্ন অংশে— ললাটে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে এবং বলা হবে এবার আস্বাদন করো

www.eelm.weebly.com

পুঞ্জীভূত সম্পদের স্বাদ। এখানে 'জিবাহ্' শব্দটির অর্থ শরীরের সম্মুখ ভাগ (মুখমণ্ডল, বক্ষদেশ, উদর, উরুদেশ ইত্যাদি)। 'জুনুব' শব্দটির অর্থ পার্শ্বদেশ — শরীরের ডান ও বাম পার্শ্ব। 'জুহুরুহুম' অর্থ শরীরের পশ্চাৎভাগ, গ্রীবা, পিঠ, কোমর। কেউ কেউ বলেছেন, ওই সকল বিত্তবানেরা বিত্তহীনদেরকে দেখলে ভ্রূকুঞ্চন করতো এবং রাগত দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাতো। তাই দাগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে তাদের কপালে। ফকির মিসকিনদের দেখলে তারা পাশ ফিরিয়ে থাকতো অথবা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে প্রস্থান করতো। তাই দাগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে তাদের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত বুরায়দা বলেছেন, 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে' — যখন আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন সাহাবীগণ বলতে শুরু করলেন, জমানো সম্পদ সম্পর্কে এবার দেয়া হয়েছে চূড়ান্ত বিধান। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এখন আমরা আল্লাহ্র কাছে কী চাইবো? তিনি স. বললেন, স্মরণমগ্ন রসনা, কৃতজ্ঞতা ভরা হৃদয় এবং পুণ্যবতী স্ত্রী, যারা তোমাদের ধর্মাচরণের সহচরী।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জাকাতবিহীন জমানো সোনারূপা দোজখের আগুনে গলিয়ে চ্যাপ্টা করা হবে এবং সেগুলো দোজখের আগুনে গরম করে নিয়ে দাগ দেয়া হবে ওগুলোর মালিকের কপালে, পাঁজরে ও পিঠে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে পুনরায় দোজখের আগুনে তপ্ত করে দেয়া হতে থাকবে দাগ। বিরতিহীনভাবে এভাবে পঞ্চাশ হাজার বছর শাস্তি দেয়ার পর নির্ধারণ করা হবে তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান — হয় দোজখ, না হয় বেহেশত। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! উটের ব্যাপারে কি হুকুম? রসুল স. বললেন, যে উটের মালিক উটের জাকাত দিবে না, পানি পান করানোর দিন দুগ্ধদোহন কালে পরিশোধ করবে না দরিদ্রদের প্রাপ্য, কিয়ামতের দিন তাকে শোয়ানো হবে একটি সমতল ভূমিতে। এরপর তার মালিকানাধীন সকল উট ও উষ্ট্র শাবক একে একে তাকে কামড়াবে ও পদপিষ্ট করবে। এভাবে শাস্তি চলতে থাকবে পঞ্চাশ বছর ধরে। তারপর তাকে ঠেলে দেয়া হবে জাহান্নাম অথবা জান্নাতের দিকে। পুনঃ নিবেদন করা হলো, ইয়া রসুলাল্লাহ্! গরু-মহিষ ও ছাগলের ব্যাপারে কী নির্দেশ? তিনি স. বললেন, সেদিন গরু-মহিষ ও ছাগল একটি সমতল স্থানে তাদের শিঙ ও খুর দ্বারা আঘাত করতে থাকবে ওই সকল মালিককে, যারা জাকাত দেয়নি। সকল পশুর শিঙ হবে তখন তীক্ষ্ণ ও ধারালো। তাদের কারো শিঙই তখন বাঁকানো এবং ভাঙ্গা থাকবে না। এভাবে একের পর এক তারা শাস্তি দিতে থাকবে তাদের মালিককে। পঞ্চাশ হাজার বছর এভাবে অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের উপরে আসবে জাহান্নাম অথবা জান্নাতের ফয়সালা। মুসলিম। এই হাদিসটির মাধ্যমেই বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর।

হজরত আবু হোরায়রা সূত্রে এসেছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ যাদেরকে সম্পদ দান করেছেন, তারা জাকাত না দিলে কিয়ামতের দিন তাদের ওই সম্পদকে করে দেয়া হবে সাপ। চোখের উপরে কালো বিন্দু বিশিষ্ট ওই

www.eelm.weebly.com

সাপকে পেঁচিয়ে দেয়া হবে তাদের গলায়। সাপটি তাদেরকে দংশন করতে করতে বলবে, আমি তোমার সম্পদ। আমি তোমার ভাণ্ডার। এরপর রসুল স. পাঠ করলেন — ওয়াল ইয়াহ্‌ছাবান্নাল্লাজীনা ইয়াবখালুনা (যারা কৃপণ তারা যেনো ধারণা না করে যে ....)। বোখারী।

হজরত আবু জর গিফারী সূত্রে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, উট, মহিষ, গরু ছাগলের যে মালিক জাকাত আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন তাকে করা হবে বিশাল বপুর অধিকারী। তার পশুগুলো তখন তাকে পদপিষ্ট করতে থাকবে। আর আঘাত করবে শিঙ দিয়ে। এভাবে এক দলের পর আরেক দল তাকে শাস্তি দিতে থাকবে — যতক্ষণ না দেয়া হবে স্থায়ী সিদ্ধান্ত (বেহেশত অথবা দোজখের)। বোখারী, মুসলিম।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৩৬

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ○

☐ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হইতেই আল্লাহের বিধানে আল্লাহের নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং ইহার মধ্যে তোমরা নিজদিগের প্রতি জুলুম করিও না এবং তোমরা অংশীবাদীদিগের সহিত সমবেতভাবে যুদ্ধ করিবে যেমন তাহারা তোমাদিগের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করিয়া থাকে। এবং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ সাবধানীদিগের সঙ্গে আছেন।

এক বৎসরে মাস রয়েছে বারোটি। বৎসর ও মাস গণনায় এই নিয়মটি আল্লাহ্‌তায়ালার বিধানাধীন। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই এই বিধানটি প্রচলিত। এখানে আল্লাহ্‌র বিধানের অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালার কিতাব। অর্থাৎ লওহে মাহফুজ। বৎসরের বারো মাসের মধ্যে সম্পাদন করতে হয় বিভিন্ন ইবাদত। যেমন জিলহজ মাসে সম্পাদন করতে হয় হজ। রমজান মাসে রাখতে হয় রোজা। আবার বৎসর অন্তে দিতে হয় জমানো সম্পদের জাকাত। এর মধ্যে আবার চারটি মাস যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ। এই চারটি মাসের মধ্যে তিনটি মাস পরস্পর লগ্ন—

www.eelm.weebly.com

জিলকদ, জিলহজ্ব ও মহররম। আলাদা মাসটির নাম রজব। আলোচ্য আয়াতে এ সকল নির্দেশনাই দেয়া হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে— এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। হজরত ইব্রাহিমের সময় থেকে এই বিধানাবলী বলবৎ রয়েছে। সুতরাং এসকল বিধানের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন নাজায়েয। ইহুদী ও খৃষ্টানেরা এসকল বিধান পরিবর্তন করেছে বলেই তারা পথভ্রষ্ট। যেমন — খৃষ্টানেরা রমজান মাসে রোজা না রেখে অন্য সময় রোজা রাখে। আবার এক মাসের বদলে তারা রোজা রাখার নিয়ম করেছে পঞ্চাশ দিন ইত্যাদি। এ সকল স্বকপোলকল্পিত বিধান অসিদ্ধ ও অগ্রাহ্য।

এরপর বলা হয়েছে — 'সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম কোরো না।' একথার অর্থ— নিষিদ্ধ ঘোষিত চারটি মাসে তোমরা যুদ্ধ বিগ্রহ কোরো না। আল্লাহ্তায়ালার বিধানানুসারে মাসগুলো সম্মানিত। তাই রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে ওগুলোকে অসম্মানিত কোরো না।

কাতাদা বলেছেন, নিষিদ্ধ মাস সমূহে (জিলকদ, জিলহজ, মহররম ও রজবে) পুণ্যকর্ম করলে সওয়াব হয় অনেক বেশী। তাই এ মাসগুলোতে গোনাহ্র কাজ করলে তার শাস্তিও হবে অত্যন্ত কঠোর। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'জুলুম কোরো না' কথাটির অর্থ হবে হালাল মাস সমূহকে হারাম এবং হারাম মাস সমূহকে হালাল বানিয়ে নিয়ো না।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার বলেছেন, কথাটির অর্থ এখানে — মুশরিকদের মতো মাসের হুরমত (সম্মান) রদবদল কোরো না। তারা মহররম মাসের পরিবর্তে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলো সফর মাসকে। ওই নিয়মকে তারা বলতো নাসী। এরকম পরিবর্তনের অর্থই হচ্ছে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বানিয়ে নেয়া। অর্থাৎ জুলুম করা।

শেষে বলা হয়েছে — 'এবং তোমরা অংশীবাদীদের সঙ্গে সমবেতভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে থাকে। এবং জেনে রাখো, আল্লাহ্ সাবধানীদের সঙ্গে আছেন।' এখানে ব্যবহৃত 'কাফ্ফাতান' শব্দটি হচ্ছে শব্দমূল। এর অর্থ — রোধ করা বা প্রতিহত করা। অর্থাৎ যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করলে মুশরিকদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়া যায়, ততটুকুই শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এর বেশী করা যাবে না। তাই এখানে কাফ্ফাতান (যথেষ্ট পুরোপুরি) কথাটির অর্থ হবে জামিয়ান (সমবেতভাবে)। একারণেই আলোচ্য আয়াতাংশটির অর্থ দাঁড়িয়েছে এরকম— সমবেতভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা (মুশরিকেরা) সমবেতভাবে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।' এটাই সাবধানতা (তাকওয়া)। যারা সাবধানী (মুত্তাকী) তারাই কেবল এরকম যথাযথ ও ভারসাম্য-

www.eelm.weebly.com

মূলক আমল করতে সক্ষম। তারা আল্লাহ্‌তায়ালার আনুরূপ্যবিহীন সাহচর্য লাভে ধন্য। তাই সব শেষে বলা হয়েছে— এবং (হে আমার রসুল) আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ্ সাবধানীদের সঙ্গে রয়েছেন।

বাগবী লিখেছেন, নিষিদ্ধ মাসসমূহের বিধান সম্পর্কে আলেমগণের মতপৃথকতা রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, কাতিলুল মুশরিকীনা কাফফাতান (অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে সমবেত ভাবে যুদ্ধ করবে) — এই নির্দেশনাটি অবতীর্ণ হলে নিষিদ্ধ মাসের বিধানটি রহিত হয়ে যায়। কারণ, নির্দেশনাটিতে ঢালাওভাবে অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ এসেছে। নিষিদ্ধ মাস সমূহের কথা এখানে উল্লেখই করা হয়নি। এতে করে বুঝা যায়, যে কোনো মাসে তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে। লক্ষ্যণীয় যে, রসুল স. হুনায়েনে বনী হাওয়াজেনদের সঙ্গে এবং তায়েফে বনী সাক্বিফদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো শাওয়াল মাসে। আর তা প্রলম্বিত হয়েছিলো জিলক্বদ মাসের কিছুদিন পর্যন্ত। অথচ জিলক্বদ মাস হচ্ছে নিষিদ্ধ মাস। এতে করে বুঝা যায়, নিষিদ্ধ মাসের বিধানটি আর নেই। এ রকম অভিমত পোষণ করেন কাতাদা, আতা খোরাসানী, জুহুরী এবং সুফিয়ান সওরী।

আমি বলি, অভিমতটি সঠিক নয়। 'সমবেতভাবে অংশীবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে' এবং 'তন্মধ্যে চারটি মাস নিষিদ্ধ'— দু'টো নির্দেশনাই এখানে একটি আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আর এ দু'টো অবতীর্ণও হয়েছে এক সাথে। সুতরাং এদের একটি অপরটির রহিতকারী হতে পারে না। আর সমবেতভাবে অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিধানটি সাধারণ বিধান নয় যে, তা নিষিদ্ধ মাস সমূহের উপরে প্রভাব বিস্তার করবে। এ রকম কোনো ইঙ্গিতও আলোচ্য আয়াতে নেই। রসুল স. এর আমল দ্বারাও নিষিদ্ধ মাসের বিধান রহিত করা যায় না। কারণ, রসুল স. হুনায়েন যুদ্ধ শুরু করেছিলেন শাওয়াল মাসে। শাওয়াল মাস নিষিদ্ধ মাস নয়। আর তিনি স. তায়েফের অবরোধ উঠিয়ে নিয়েছিলেন জিলক্বদ মাস আসার সাথে সাথে। কারণ, জিলক্বদ মাস নিষিদ্ধ মাস। যদি জিলক্বদ মাসে অবরোধ বহাল রাখার হাদিস বিশুদ্ধ প্রমাণিতও হয়, তবু বর্ণনাটি হবে 'খবরে আহাদ'(একক বর্ণিত)। আর একক বর্ণনার দ্বারা কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা রহিত হতে পারে না। এ কথাও প্রণিধানীয় যে, তায়েফ অবরোধ সংঘটিত হয়েছিলো অষ্টম হিজরীতে। আর আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে নবম হিজরীতে। সুতরাং আগে সংঘটিত কোনো ঘটনা পরে অবতীর্ণ আয়াতকে রহিত করবে কীভাবে? তাছাড়া মহাতিরোধানের আশি দিন পূর্বে বিদায় হজের ভাষণেও রসুল স. নিষিদ্ধ মাস সমূহের কথা উল্লেখ করেছেন। কাজেই নিষিদ্ধ মাসের বিধানটি রহিত হতেই পারে না — যদিও জিলক্বদ মাসে তায়েফ অবরোধের কথা বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত

www.eelm.weebly.com

হয়। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আতা বিন আবী বেরাহ্ কসম খেয়ে উল্লেখ করেছেন, নিষিদ্ধ মাসের বিধান যেমন রহিত হয়নি, তেমনি রহিত হয়নি হেরেম শরীফের সীমানার অভ্যন্তরের যুদ্ধের নিষিদ্ধতা। তবে হ্যাঁ, যদি বিধর্মীরা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করে তবে তার উপযুক্ত জবাব দেয়ার বিষয়টি স্বতন্ত্র। যুদ্ধ করা, আর যুদ্ধ করতে বাধ্য হওয়া নিশ্চয় এক কথা নয়। পরবর্তী আয়াতেও বিষয়টি অতি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে —

সূরা তওবা ঃ আয়াত ৩৭

إِنَّمَا النَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

❒ নিষিদ্ধকাল অন্য মাসে পিছাইয়া দেওয়া কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানের মাত্রা বৃদ্ধি করা; যাহা দ্বারা, যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে তাহারা উহাকে কোন বৎসর বৈধ করে এবং কোন বৎসর অবৈধ করে যাহাতে তাহারা আল্লাহ্ যেগুলিকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা বৈধ করিতে পারে। তাহাদিগের মন্দ কাজগুলি তাহাদিগের জন্য শোভনীয় করা হইয়াছে; আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

'নাসীউন' শব্দটি এখানে ফায়িলুন শব্দের অনুসৃতিতে কর্তৃপদের অর্থবহ। যেমন সায়ীরুন, হারিকুন ইত্যাদি। অথবা শব্দটি এখানে কর্ম পদের অর্থে এসেছে। যেমন, জারিহুন এবং ক্বাতিলুন। 'নাসীউন' অর্থ মূলতবী রাখা, পেছনে ঠেলে দেয়া অথবা ওই বস্তু যাকে পশ্চাতে ঠেলে দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে 'আনশাহুল্লাহু আজালাহু (আল্লাহ্ তার আয়ুষ্কালে মন্থরতা দিয়েছেন)। নাস্‌সাআ ফিআজলিহি (তার মৃত্যুকষ্ট পিছিয়ে দিয়েছেন)।

এখানে 'নাসীউন' কথাটির প্রকৃত অর্থ নিষিদ্ধ মাস সমূহকে অগ্র-পশ্চাৎ করে দেয়া। মূর্খতার যুগে আরববাসীরা তাদের প্রয়োজনানুসারে কোনো নিষিদ্ধ মাসকে হালাল করে নিতো। আর ওই মাসের নিষিদ্ধতা আরোপ করতো পরবর্তী কোনো হালাল মাসে। আবু মালেক সূত্রে ইবনে জারীর লিখেছেন, মূর্খতার যুগে আরববাসীরা বছরের বারো মাসকে করে নিতো তেরো মাস (প্রতি তিন বছরে অতিরিক্ত কিছুদিন মিলিয়ে তৈরী করতো নতুন মাস)। কখনো মহররমকে বলতো সফর। মাসের হিসাবে এ রকম বিশৃংখলা সৃষ্টি করার কারণে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, আরবেরা মাসের নিষিদ্ধতা বিশ্বাস করতো হজরত ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ থেকে তারা লাভ করেছিলো এই শিক্ষা। এই শিক্ষাকে তারা মান্যও করতো। কিন্তু এতে করে তাদের অসুবিধা হতে লাগলো খুব। ইচ্ছেমতো শিকার, লুণ্ঠন, যুদ্ধ ইত্যাদি না করতে পেরে তাদের সাংসারিক জীবনে দেখা দিতো বিপর্যয়। বিশেষ করে পরস্পরলগ্ন তিনটি নিষিদ্ধ মাসে তারা অসুবিধা বোধ করতো খুব। ফলে কখনো কখনো নিষিদ্ধ মাসেই তারা শুরু করে দিতো যুদ্ধ ও লুণ্ঠন। তখন তারা ওই নিষিদ্ধতা আরোপ করতো পরবর্তী কোনো হালাল মাসের উপর। কিন্তু বিধান লংঘনের কারণে তারা অনুতপ্তও হতো না। এভাবে তারা মহররমকে করতো সফর। আর সফরকে করতো মহররম। আবার সফর মাসের নিষিদ্ধতা লংঘন করলে নিষিদ্ধ মাস ঘোষণা করতো রবিউল আওয়ালকে। এভাবে মাসচক্রের নিষিদ্ধতা ও অনিষিদ্ধতায় আক্রান্ত হতো পুরো বছর। বছরের পর বছর। ইসলামের আগমনের পর এমতো বিশৃংখলা অপসারিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় যথানিয়ম। রসুল স. তাঁর বিদায় হজের ভাষণেও এ বিষয়টির উল্লেখ করেন। হজরত আবু বকর থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. কোরবানীর দিন (দশই জিলহজ) আরাফা প্রান্তরে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, বিপর্যস্ত কালচক্র এবার পেয়েছে তার প্রকৃত রূপ— যে রূপ ছিলো আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির সময়। বারো মাস মিলে হয় এক বছর। এর মধ্যে চার মাস বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ তিনটি মাস পরস্পর সংলগ্ন— জিলক্বদ, জিলহজ, মহররম। আর একটি নিষিদ্ধ মাস রয়েছে জমাদিউস্‌সানি ও শাবানের মধ্যভাগে। সে মাসটির নাম রজব। এরপর রসুল স. বললেন, এটা কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই উত্তমরূপে অবগত। আমাদের কথা শুনে তিনি নিশ্চুপ রইলেন। আমরা ভাবলাম, এ মাসের নাম তবে কি বদল করা হবে? কিছুক্ষণ পর তিনি নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন, এটা কি জিলহজ মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, এটা কোন শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই তা ভালো জানেন। এ কথা শুনেও তিনি স. চুপ করে রইলেন। আমরা ভাবলাম, শহরের নাম হয়তো বা বদল করা হতে পারে। একটু পরে মৌনতা ভেঙে তিনি স. উচ্চারণ করলেন, এটা কি মক্কা শহর নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, এই দিন কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল সমধিক জ্ঞাত। এবারও তিনি কিছুক্ষণ মৌন হয়ে রইলেন। আমরা ভাবলাম, দিবসের নামও হয়তো বা বদলে যেতে পারে। তিনি বলে উঠলেন, এটা কি কোরবানীর দিবস নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়। তিনি স. বললেন, এই দিন এই মাস এবং এই শহর যেমন সম্মানিত, তেমনি সম্মানার্হ তোমাদের রক্ত, সম্পদ এবং ব্যক্তিত্ব। তোমাদের কারো রক্ত, সম্পদ ও মর্যাদা

www.eelm.weebly.com

কারো জন্য হালাল নয়। অচিরেই তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুপ্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হতে হবে। তিনি তোমাদের আমল সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণ করবেন। সুতরাং সাবধান! আমি চলে যাওয়ার পর তোমরা ভ্রষ্টতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। কারো গর্দানে কেউ আঘাত কোরো না। এবার বলো, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছি? আমরা বললাম, হ্যাঁ। হে আল্লাহ্র রসুল। আপনি আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। তিনি স. বললেন, আয় আল্লাহ্! তুমিও সাক্ষী থাকো। তারপর বললেন, হে উপস্থিত জনতা! তোমরাও আল্লাহ্র নির্দেশ যথাযথরূপে পৌঁছাতে থাকো। এমনও হতে পারে, যারা পৌঁছে দিবে, তাদের চেয়ে অধিক স্মরণে রাখবে তারা, যাদেরকে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

আলেমগণ বলেছেন, মূর্খতার যুগে নিষিদ্ধ মাস পিছিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটতো অহরহ। কোনো নির্দিষ্ট মাসে কয়েক বছর হজ করার পর আবার কয়েক বছরের জন্য হজের জন্য নির্দিষ্ট করতো অন্য মাসকে। মুজাহিদ বলেছেন, পর পর দু'বছর তারা একই মাসে হজ করতো। তারপর বদলিয়ে দিতো হজের মাস। জিলহজে দু'বছর, মহররমে দু'বছর, সফরে দু'বছর— এভাবে তারা প্রতি দু'বছর অন্তর হজের মাসকে বদলিয়ে নিতো। রসুল স. ওই বিশৃঙ্খলার অপনোদন ঘটান। যথা স্থানে স্থাপন করেন, হজের মাস ও স্থানকে। বিদায় হজের ভাষণে তিনি বলেন, মূর্খতার যুগের নিয়ম আজ থেকে রহিত হলো। সময়চক্রকে দেয়া হলো তার নিজস্ব আকার, যে আকার নির্ধারণ করা হয়েছিলো আসমান ও জমিন সৃষ্টির সময়।

সর্বপ্রথম নাসীউ'র (পিছিয়ে দেয়ার) প্রচলন কে ঘটিয়েছিলো, সে সম্পর্কে আলেমগণের মতভিন্নতা রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস, জুহাক, কাতাদা এবং মুজাহিদ বলেছেন, এই অপপ্রথাটি প্রথম প্রবর্তন করেছিলো মালেক বিন কিনানা গোত্র। এ কাজে তারা ছিলো তিনজন— আবু সামামা, জিন্দাল বিন আউফ এবং ইবনে উমাইয়া কিনানী। কালাবী বলেছেন, এই রীতিটির অগ্রণী ছিলো নাইম বিন ছা'লাবা কিনানী। সে ছিলো আমীরে হজ (হজের অধিনায়ক)। একবার সে হজ শেষে উপস্থিত হাজীদের উদ্দেশ্যে বললো, আমি একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করবো। আমার এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তোমরা কোনো রসিকতা করতে পারবে না, মতভেদ করতে পারবে না এবং বিরোধিতাও করতে পারবে না। তখনকার যুগে মুশরিক হাজীরাও 'লাব্বায়েকা' উচ্চারণ করতো এবং আবেদন করতো বারো মাসের স্থলে আমাদেরকে তেরো মাস নির্ধারণ করে দেয়া হোক। তাদের আবেদন গৃহীত হলো। তখন থেকে হজ শেষে ঘোষণা দেয়া হতে লাগলো, পরবর্তী নতুন নতুন হজের মাসের। নাইম বিন ছা'লাবার পরে আমীরে হজ নির্বাচিত হলো

www.eelm.weebly.com

জুনাদা বিন আউফ। সে রসুল স. এর জামানা পেয়েছিলো। আবদুর রহমান বিন জায়েদ বিন আসলাম বর্ণনা করেছেন, নাঈম বিন ছা'লাবার পরের আমীরে হজ ছিলো বনী কিনানার অন্য এক ব্যক্তি। তার নাম গালমাস। জনৈক কিনানী কবি বলেছে— ত্রয়োদশ মাস নির্ধারণকারী ছিলো গালমাস।

জুহাক সূত্রে ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— মাস অদল বদল করার অপনিয়মটির প্রথম প্রবর্তক ছিলো আমর ইবনে জুহাই, ইবনে আমর, ইবনে কামআ, এবং ইবনে খান্দাফ্। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম লিখেছেন, আমি আমর বিন নুহাই বিন কামআ বিন খান্দাফকে দেখেছি দোজখের অভ্যন্তরে। সে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলো।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে—' নিষিদ্ধকাল অন্য মাসে পিছিয়ে দেয়া কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানের মাত্রা বৃদ্ধি করা।' এখানে 'জিয়াদাতুন্ ফিল কুফ্‌রী' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানের মাত্রা বৃদ্ধি। মুশরিকেরা হালাল মাসকে হারাম এবং হারাম মাসকে হালাল করেছিলো। এই কর্মটিকেই এখানে বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানের মাত্রা বৃদ্ধিকারী কর্ম।

এরপর বলা হয়েছে— 'যা দ্বারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা তাকে কোনো বৎসর বৈধ করে এবং কোনো বৎসর অবৈধ করে যাতে তারা আল্লাহ্ যেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন তা বৈধ করতে পারে। তাদের মন্দকাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে; আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।'

মোহাম্মদ বিন ওমর এবং মোহাম্মদ বিন সাঈদ সূত্রে ইউসুফ সালেহী বর্ণনা করেছেন, কতিপয় নাবতি গোত্রের লোক সিরিয়া থেকে মদীনায় এসেছিলো চর্বিজাত তেল নিয়ে। তাদের মধ্যে একজন গল্পচ্ছলে বাজারের লোকজনকে বললো, রোমানরা বিশাল সেনা সমাবেশ ঘটিয়েছে। প্রশাসক হারকিল তার সৈন্যদেরকে এক বছরের টাকাও দিয়ে দিয়েছে। ওই সেনাদলে রয়েছে বনী লাখম, বনী জুযাম, বনী আমালা এবং বনী গাস্‌সান গোত্রের অনেক লোক। তারাও নিজ নিজ স্থান থেকে যাত্রা করেছে। তাদের অগ্রগামী বাহিনী পৌঁছে গিয়েছে বালকা পর্যন্ত। সংবাদটি ছিলো বানানো। তবুও রসুল স. সকলকে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বললেন।

শিথিল সূত্রে ইমরান বিন হোসাইন থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, আরবের খৃষ্টানেরা রোমানের আঞ্চলিক প্রশাসক হারকিলকে লিখে জানালো, মোহাম্মদ নামক এক লোক নিজেকে নবী দাবী করে বসেছে। লোকজনকে তার দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। এদিকে চলছে দুর্ভিক্ষ। গৃহপালিত পশু ধ্বংস হওয়ার পথে।

www.eelm.weebly.com

যদি আপনি আপনার ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতে চান, তবে এটাই প্রকৃষ্ট সুযোগ। হারকিলের এই প্রস্তাব মনোপুত হলো। সে তার এক সেনাধিনায়কের নেতৃত্বে চল্লিশ হাজার সৈন্য প্রস্তুত করলো। এ সংবাদ পৌঁছলো রসুল স. এর নিকটে। তিনিও তখন জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

উত্তম সূত্রে ইবনে আবী হাতেম এবং আবু সাঈদ নিশাপুরী বর্ণনা করেছেন, ইহুদীরা একবার বললো, আবুল কাসেম! যদি আপনি সত্যি সত্যি নবী হন, তবে সিরিয়ায় গমন করুন। কারণ সিরিয়া ছিলো অনেক নবী-রসুলের বিচরণ ভূমি। রসুল স. তখন মনস্থির করলেন, এবার অভিযান পরিচালনা করতে হবে সিরিয়ায়। এই অভিযান বাস্তবায়নের জন্য তিনি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলেন তাবুক নামক স্থানে। তখন অবতীর্ণ হয় সুরা বনী ইসরাইল। এক আয়াতে বলা হয়— ওয়া ইনকানু লা ইয়াস্তা ফিজ্জুনাকা মিনাল আরদ্বী (তারা তো আপনাকে মদীনা থেকে উচ্ছেদ করতে চায়)।

ইবনে মারদুবিয়া হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি, ইবনে আবী শায়বা ও ইবনে মুনজির মুজাহিদের অভিমত এবং ইবনে জারীর হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন এভাবে— যখন বিধর্মীদের জন্য হজ নিষিদ্ধ করা হলো তখন কুরায়েশরা বললো, এখন তো আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য শেষ হয়ে গেলো। দূরদেশের মানুষ বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী নিয়ে আসতো। লেন-দেন করতো আমাদের সঙ্গে। এখনতো তারা আর আসবে না। তাহলে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য চলবে কিভাবে। এ রকম কথোপকথনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক আহলে কিতাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন। বলে দিলেন, যুদ্ধ করতে হবে ওই সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যাবে অথবা অবনত মস্তকে জিযিয়া কর প্রদান করতে সম্মত হবে। এ সম্পর্কিত আয়াতটি এ রকম— ওয়া ইনখিফতুম আইলাতান ফাসাওফা ইউগনি কুমুল্লহু মিন ফাদ্বলিহ্ (যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা করো, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করতে পারেন)। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে— ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু কাতিলুল্লাজীনা ইয়া লাওনাকুম মিনাল কুফ্ফারী ওয়াল ইয়াজিদু ফিকুম গিলজাতান (হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা সংগ্রাম করো তাদের ...)। এরপর রসুল স. রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। কারণ রোমানদের আঞ্চলিক রাজ্য সিরিয়াই ছিলো আরব উপদ্বীপের সর্বাপেক্ষা নিকটে। নিকটস্থ প্রতিবেশী হিসেবে সিরিয়াবাসীরাই ছিলো ইসলাম গ্রহণের অধিক হকদার।

বাগবী লিখেছেন, তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রসুল স. রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন শুরু করলেন। মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহীর বর্ণনায় এসেছে, তাবুক যুদ্ধের সময় দেশ ছিলো দুর্ভিক্ষকবলিত। দেখা দিয়েছিলো প্রচণ্ড খরা। আর তখন ছিলো ফসল বপনের মৌসুম। এ সকল কারণে মুসলমানদের

www.eelm.weebly.com

মধ্যে দেখা দিয়েছিলো উদ্যমহীনতা। প্রচণ্ড খরায় গৃহচ্ছায়া ও বৃক্ষচ্ছায়াই ছিলো খরাতপ্ত জীবনের একান্ত কামনা। তার সঙ্গে ছিলো শস্য বপনের মৌসুম বিগত হওয়ার আশংকা। এ সকল কারণে দ্রুত মদীনায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা আচ্ছন্ন করেছিলো মুজাহিদবৃন্দকে। রসুল স. এর রীতি ছিলো তিনি যুদ্ধ গমনকালে ইংগিতে সকলকে জানিয়ে দিতেন বিজয়ের শুভসংবাদ। উৎসাহব্যঞ্জক ভঙ্গিতে ঘোষণা করতেন নতুনতর অভিযানের কথা। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি এ রকম করেননি। তিনি তখন সকল অসুবিধার কথা আগে থেকেই সকলকে বলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পথ দীর্ঘ। নিসর্গ খরাতপ্ত। শত্রু সেনাদের সংখ্যাও বিপুল। এ সকল বলে তিনি সকলকে নাম ধরে ধরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। হজরত কা'ব বিন মালেক থেকে ইবনে আবী শায়বা, বোখারী এবং ইবনে সা'দও এ রকম বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাগুলো— রসুল স. মদীনার আশেপাশে বসবাসকারী আরব গোত্র-গুলোকেও তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। আহ্বান জানালেন মক্কা-বাসীদেরকেও। ফলে বহুসংখ্যক লোক তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে গমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। পশ্চাতে থেকে গেলো কেবল মুনাফিক। কতিপয় বিশ্বাসীও আলস্য বশতঃ যুদ্ধ-গমন থেকে বিরত রইলো। তখন তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৩৮

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

❑ হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগের হইল কি যে যখন তোমাদিগকে আল্লাহের পথে অভিযানে বাহির হইতে বলা হয় তখন তোমরা ঘরমনা হইয়া গড়িমসি কর? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়াছ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিতকর।

আলস্য-আক্রান্ত মুজাহিদগণকে জেহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এই আয়াতে। এই উদ্বুদ্ধকরণের মধ্যে মুনাফিকেরাও পড়ে। কারণ প্রকাশ্যতঃ তারাও ছিলো ইমানের দাবিদার। এখানে মালাকুম (তোমাদের হলো কি) কথাটি ভর্ৎসনা প্রকাশক নয়, অনুপ্রেরণামূলক। ইজাক্বীলা (বের হতে বলা হয়) কথাটির অর্থ এখানে— যখন রসুল স. তোমাদেরকে যুদ্ধের জন্য বের হতে বলেন। ইনফিরু

www.eelm.weebly.com

অর্থ দলে দলে বের হও। ইছ্ছাক্বালতুম অর্থ— গড়িমসি করলে। ইলাল আরদ্বী অর্থ গৃহকাতর হয়ে গেলে। আরদ্বীতুম বিল হায়াতিদ্দুনইয়া মিনাল আখিরাহ্ অর্থ— তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছো। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— হে বিশ্বাসীগণ! কি হয়েছে তোমাদের! আল্লাহ্র রসুল তোমাদেরকে জেহাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। অথচ তোমরা গৃহ-কাতরতা থেকে মুক্ত হতে পারছো না। প্রশ্রয় দিচ্ছো আলস্যকে। এ রকম করার অর্থ কি? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হতে চাও?

শেষে বলা হয়েছে— 'ফামা মাতাউ'ল হায়াতিদ্দুন্ইয়া ফিল আখিরাতি ইল্লা ক্বলীল।' এ কথার অর্থ— পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো নিতান্ত নগণ্য, অকিঞ্চিতকর।

নাজদা বিন জাকিয়া সূত্রে ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. আরবের একটি গোত্রকে জেহাদের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তারা আলস্য বশতঃ জেহাদ যাত্রা থেকে বিরত রইলো। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত। বলা হলো—

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৩৯

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

❒ যদি তোমরা অভিযানে বাহির না হও তবে তিনি তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা তাঁহার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

জেহাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়া একটি গুরুতর অপরাধ। এর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। সে শাস্তি পৃথিবীতেও হতে পারে। আবার হতে পারে আখেরাতেও অথবা উভয় স্থানে। তাই এখানে বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন।'

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন।' এ কথার অর্থ— হে বিশ্বাসীরা! এ রকম মনে কোরো না যে, তোমরা জেহাদে অংশগ্রহণ না করলে জেহাদের মতো মহান কর্মকাণ্ড স্থগিত থাকবে। তোমরা না এলে আল্লাহ্পাক অন্য কোনো জাতিকে এই নেয়ামত দান করবেন। তখন তারা হবে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'অপর জাতিকে' বলে বুঝানো হয়েছে ইয়ামেনবাসীকে। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, পারস্যবাসীকে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা তার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না।' একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা মুখাপেক্ষিতারহিত। সুতরাং তোমরা জেহাদের নির্দেশ লংঘন করলেও তাঁর কোনো ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'হু' (তার) সর্বনামটি রসুল স. এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যদি তাই হয় তবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— তোমরা তাঁর রসুলের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্পাকই তাঁর সংরক্ষক ও সাহায্যকারী।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে, সর্ব শক্তিমান। একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তোমাদের স্থলে অন্য কোনো জাতিকে সাহায্য করতে যেমন সক্ষম তেমনি সক্ষম তাঁর রসুলকে অন্যের সাহায্যে সফল করতে। যারা যুদ্ধে যেতে আলস্য করেছিলো তাদের জন্য এই আয়াতটি একটি হুমকি।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৪০

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ
إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ
اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ
كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

❑ যদি তোমরা তাহাকে সাহায্য না কর তবে স্মরণ কর আল্লাহ্ তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন যখন সত্য-প্রত্যাখ্যানকারিগণ তাহাকে বহিষ্কার করিয়াছিল এবং সে ছিল দুই জনের একজন যখন তাহারা গুহার মধ্যে ছিল; সে তখন তাহার সঙ্গীকে বলিয়াছিল, 'বিষণ্ন হইওনা আল্লাহ্ আমাদিগের সঙ্গে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ্ তাহার উপর তাহার দয়া বর্ষণ করেন যাহাতে তাহার চিত্ত প্রশান্ত হয়। এবং তাহাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যাহা তোমরা দেখ নাই, এবং তিনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের কথা হেয় করেন, আল্লাহের কথাই সর্বোপরি। এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

'যদি তোমরা তাহাকে সাহায্য না করো তবে আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেছিলেন' কথাটির অর্থ— হে অসচেতন বিশ্বাসীরা! তোমরা যদি রসুলের সাহায্যকারী না হও, তবে আল্লাহ্পাক তো অবশ্যই তাঁর সাহায্যকারী। 'আল্লাহ্

www.eelm.weebly.com

তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাকে বহিষ্কার করেছিলো' কথাটির অর্থ— স্মরণ করো, ওই সঙ্গীন সময়ের কথা, যখন মক্কায় মুশরিকেরা রসুল স. কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো, তখন কেউ তাঁর সাহায্যকারী ছিলো না। কিন্তু আল্লাহ্পাক ঠিকই তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। দিয়েছিলেন হিজরতের নির্দেশ। এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সে ছিলো দুইজনের একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলো, সে তখন তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলো, 'বিষণ্ন হয়ো না আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।' এ কথার অর্থ, হিজরতের রাতে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যখন রসুল স. সওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন কেবল হজরত আবু বকর। ওই সময় আল্লাহ্তায়ালাই তাঁদেরকে হেফাজত করেছিলেন। হজরত আবু বকর রসুল স. এর নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। রসুল স. তখন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, বিষণ্ন হচ্ছো কেনো? আল্লাহ্ তো আমাদের সঙ্গে রয়েছেনই।

হজরত ইবনে ওমর থেকে তিরমিজি ও বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত আবু বকরকে লক্ষ্য করে একবার বলেছিলেন, তুমি ছিলে আমার পর্বতগহ্বরের সাথী। হাউজে কাওসারেও হবে আমার বিশেষ সহচর। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে খলিল (বন্ধু) বানাতাম, তবে আবু বকরই হতো আমার খলিল। আর আল্লাহ্ তোমাদের সাথীকে (আমাকে) খলিল বানিয়েছেন। হাসান বিন ফজল বলেছেন, যদি কেউ হজরত আবু বকরকে রসুল স. এর সাহাবী না বলে, তবে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, সে কোরআনের এই আয়াতের সুস্পষ্ট বিবরণকে অস্বীকারকারী। আর অন্যান্য সাহাবীদের কাউকে সাহাবী না বললে হবে ফাসেক।

আলোচ্য আয়াতে হজরত আবু বকরের বিশেষ ফযীলতের বিষয়টিও সুপ্রমাণিত। একবার তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে 'সে ছিলো দুইজনের একজন।' তারপর বলা হয়েছে 'সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিলো'। এরপর বলা হয়েছে (রসুল স. বলেছিলেন) বিষণ্ন হয়ো না। আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। এভাবে হজরত আবু বকরের রসুল স. এর সঙ্গী হওয়া এবং আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গী হওয়ার বিষয়টিকে প্রমাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্পাকের সঙ্গে থাকার বিষয়টি অন্য কারো সঙ্গে থাকার মতো নয়। আল্লাহ্পাকের অস্তিত্ব ও গুণাবলীর মতো তাঁর সঙ্গে থাকার বিষয়টিও আনুরূপ্যবিহীন। শহীদ শায়েখ মির্জা মাযহারে জানে জাঁনা র. বলেছেন, হজরত আবু বকরের সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবার জন্য এই আয়াতই যথেষ্ট। এখানে তাঁর রসুল স. এর সাহচর্য এবং রসুল স. এর সহচর হিসেবে আল্লাহ্তায়ালার সাহচর্যের কথা স্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে। সুতরাং যারা হজরত আবু বকরের ফযীলতকে অস্বীকার করবে, তারা এই আয়াতকে অস্বীকার করবে। আর আয়াতকে যে অস্বীকার করে সে কাফের।

www.eelm.weebly.com

সওর পর্বতের গুহায় রসুল স. তাঁর ঘনিষ্ঠতম সাথী হজরত আবু বকরের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, বিষণ্ন হয়ো না। আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। রাফেজীরা এ কথা উল্লেখ করে হজরত আবু বকরকে অপবাদ দেয়। বলে, হজরত আবু বকরের বিশ্বাস ছিলো দুর্বল। আর তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তাই রসুল স. আল্লাহ্তায়ালার উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপনের জন্য এবং তাঁর মৃত্যুভয় দূর করবার জন্য বলেছিলেন, 'বিষণ্ন হয়ো না আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।' কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এ রকম নয়। হজরত আবু বকর বিষণ্ন হয়েছিলেন রসুল স. এর নিরাপত্তার জন্য। মনে মনে তিনি ভাবছিলেন, আমার মৃত্যু হলে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু আল্লাহ্র রসুল শহীদ হয়ে গেলে তাঁর উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর বিষণ্নতা ও দুশ্চিন্তার কারণ ছিলো এটাই। আমরা পর্বতগহ্বর সম্পর্কিত হাদিসে যথাস্থানে এ কথা উল্লেখ করবো যে, হজরত আবু বকর তখন রসুল স. এর পবিত্র অস্তিত্ব নিরাপদ রাখবার জন্যই দুশ্চিন্তিত হয়েছিলেন। নিজের জীবনের জন্য তাঁর কোনো প্রকার দুশ্চিন্তা অথবা বিষণ্নতা ছিলো না।

হিজরতঃ জননী আয়েশা থেকে হিজরত সম্পর্কে বর্ণনা এনেছেন মুসা বিন উকবা, ইবনে ইসহাক, ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান এবং বোখারী। আর ইবনে ইসহাক ও তিবরানী বর্ণনা উপস্থিত করেছেন জননী আয়েশার বড় বোন হজরত আসমা থেকে। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেন, আমি যখন বুঝতে শিখেছি, তখন থেকেই আমি আমার পিতা মাতাকে প্রতিষ্ঠিত দেখেছি ইসলামের উপর। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা রসুল স. আমাদের বাড়ীতে আসতেন। মুসলমানদের তখন ঘোর দুর্দিন। ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছিলো অত্যাচার ও নিগ্রহ। তখন রসুল স. একদিন বললেন, আবু বকর! স্বপ্নের মাধ্যমে আমাকে হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। স্থানটি দুই পর্বতের মধ্যস্থলে একটি কংকরময় ভূমি। সেখানে রয়েছে খেজুরের বাগান। ইতোপূর্বে কেউ কেউ মদীনায় হিজরত করে গিয়েছিলেন। তারও আগে আবিসিনিয়ায় হিজরত করে গিয়েছিলো একটি দল। সেখান থেকে তারাও সম্ভবতঃ মদীনায় চলে গিয়েছিলেন। রসুল স. এর স্বপ্নের কথা শুনে আমার পিতা হজরত আবু বকরও হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। রসুল স. তাঁকে বললেন, কিছুকাল অপেক্ষা করো (এখনো আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হইনি)। মনে হয় হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে তোমাকেও। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক, আশা রাখি আমাকেও অনুমতি দেয়া হবে। তিনি স. বললেন, মনে হয় তাই। এরপর থেকে হজরত আবু বকর হিজরতের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তিনি দু'টি উষ্ট্রীকে বাবলার পাতা খাইয়ে বিশেষভাবে প্রতিপালন করতে লাগলেন। চার মাস কেটে গেলো এভাবে। একদিন আমার পিতার সঙ্গে আমাদের ঘরে বসেছিলাম

www.eelm.weebly.com

আমি ও আমার বড় বুবু। তখন দ্বিপ্রহর। বড় বুবু আসমা বললেন, আব্বা! দেখুন, আল্লাহ্‌র রসুল আগমন করছেন। আমরা সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখলাম, আরবীয় রীতিনীতির পরিপন্থী নিয়মে মাথায় কাপড় জড়িয়ে এগিয়ে আসছেন স্বয়ং রসুল স.। আমার পিতা বললেন, আমার জনক জননী কোরবান হোক রসুলের জন্য। অসময়ে রসুল স. এর আগমনের নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। মনে হয় এবার হিজরতের অনুমতি মিলবে। রসুল স. গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। সাদর অভ্যর্থনার সঙ্গে আমার পিতা রসুল স. কে আমাদের ঘরে নিয়ে এলেন। রসুল স. বললেন, এদেরকে সরে যেতে বলো। আমার পিতা বললেন, এরাতো আমার একান্ত অনুগতা দুই কন্যা। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এরা তো আপনারই পরিবারভুক্ত। রসুল স. বললেন, আমাকে হিজরতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমার পিতা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অনুগ্রহ করে আমাকেও আপনার সঙ্গী করে নিন। তিনি স. বললেন, অনুমতি দেয়া হলো। আনন্দে কেঁদে ফেললেন আমার পিতা। আমি ওভাবে আর কখনো তাঁকে কাঁদতে দেখিনি। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন, হে আমার প্রিয় রসুল! আমার জনয়িতা জনয়িত্রী আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। হিজরতের জন্য দু'টি উট প্রস্তুত রেখেছি আমি। দয়া করে সে দু'টোর একটি আপনি গ্রহণ করুন। রসুল স. বললেন, আমি উপযুক্ত মূল্যে তোমার উট ক্রয় করবো। আমার পিতা বললেন, আমি তো আপনার পবিত্র ইচ্ছার অনুগামী। তিনি স. বললেন, কতো টাকায় কিনেছিলে। আমার পিতা বললেন, এতো টাকায়। রসুল স. বললেন, আমি দিবো এতো টাকা। পিতা বললেন, অর্থ ও উট- সবই আপনার।

বোখারী তাঁর গ্রন্থের যুদ্ধবিষয়ক অধ্যায়ে লিখেছেন, ওই উষ্ট্রীটির নাম ছিলো জদআ। ওয়াকেদী লিখেছেন, উষ্ট্রীটির মূল্য ছিলো আটশত দিরহাম। উম্মত জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আমরা রসুল স. ও আমার পিতার জন্য উত্তম আহার্য প্রস্তুত করে একটি থলির মধ্যে রেখে দিলাম। ওয়াকেদী লিখেছেন, আহার্য সামগ্রীর মধ্যে ছাগলের ভুনা গোশতও ছিলো। জননী বলেন, বড় বুবু তাঁর কোমরের বন্ধনী কেটে তাই দিয়ে থলির মুখ সুন্দর করে বাঁধলেন। এজন্য তাঁর উপাধি হয়েছিলো যাতিন নাতাকাইন (দুই কোমর বন্ধনীর অধিকারিণী)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাঁর উপাধি হয়েছিলো যাতিন নিতাক (কোমর বন্ধনী-ধারিণী)। মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আসমা তখন তাঁর কোমর বন্ধ ছিঁড়ে দু'টুকরো করেছিলেন। এক টুকরা দিয়ে বেঁধে দিলেন খাদ্য সামগ্রীর থলি। অপর টুকরো বেঁধে রেখেছিলেন কোমরে। তাই তাঁকে যাত্তিন নাতাক এবং যাত্তিন নাতাকাইন বলা হতো। ইবনে সা'দ বলেছেন, কোমর বন্ধের একটি টুকরা কোমরে বেঁধে রেখে অপর টুকরোর দ্বারা খাদ্যের থলির মুখ

www.eelm.weebly.com

বেঁধেছিলেন বলেই হজরত আসমাকে বলা হয় 'দুই কোমর বন্ধনীর অধিকারিণী।' তিনি খাদ্যের থলি বাঁধার ফিতাটি আবার দুই টুকরা করেছিলেন। এক টুকরার মাধ্যমে বেঁধেছিলেন খাদ্য থলির মুখ এবং অপর টুকরার মাধ্যমে বেঁধেছিলেন পানির মশকের মুখ। রসুল স. পথ প্রদর্শক হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন বনী দায়েল গোত্রের এক ব্যক্তিকে। তিনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি ছিলেন অতি বিশ্বস্ত এবং পথ প্রদর্শনের কাজে প্রাজ্ঞ। পরে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। হিজরতের জন্য প্রস্তুতকৃত উট দু'টো তাকে অর্পণ করে বলা হয়েছিলো, আমরা যখন বের হয়ে যাবো, তার তিনদিন পর তুমি উট দু'টো নিয়ে উপস্থিত হয়ো সওর পর্বতের পাদদেশে। হিজরতের প্রাক্কালে রসুল স. হজরত আলীকে নির্দেশ দেন, তুমি আমার চাদর গায়ে দিয়ে আমার শয্যায় শুয়ে পড়বে। আর যাদের আমানত আমার কাছে জমা রয়েছে তাদেরকে যথাযথভাবে সেগুলো ফিরিয়ে দিবে। উল্লেখ্য যে, রসুল স. আমানতদার হিসেবে ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত। তাই মুসলমান, মুশরিক সকলে তাঁর নিকট অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী গচ্ছিত রাখতেন।

উম্মত জননী হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, এরপর রসুল স. হজরত আবু বকরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন সওর পর্বতের গুহায়। হজরত ওমর থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, তিনি স. রওয়ানা হয়েছিলেন রাতে। ইবনে ইসহাক ও ওয়াকেদী বলেছেন, হজরত আবু বকরের বসতবাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। হজরত আয়েশা বিনতে কুদামা থেকে আবু নাঈম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমরা পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। সামনে পড়েছিলো আবু জেহেল। আল্লাহ্‌পাক তখন তার দৃষ্টিশক্তি রহিত করে দিয়েছিলেন, তাই সে আমাদেরকে দেখতে পায়নি।

হজরত আসমা বর্ণনা করেন, আমার পিতার জমানো সম্পদ ছিলো পঞ্চাশ হাজার দিরহাম। সবগুলোই তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক বালাজুরি লিখেছেন, ইসলাম গ্রহণের সময় হজরত আবু বকরের নিকটে ছিলো চল্লিশ হাজার দিরহাম। হিজরতের প্রাক্কালে অবশিষ্ট ছিলো কেবল চার হাজার অথবা পাঁচ হাজার দিরহাম। ওই দিরহামগুলো হজরত আবু বকরের পুত্র সওর পর্বতের গুহায় পৌঁছিয়ে দেন। জননী আয়েশা বলেন, আমার পিতামহ কুহাফা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি আমার পিতার চলে যাওয়ার সংবাদ জানতে পেরে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! মনে হয় সে সবকিছু নিয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, না তিনি এমন করতে পারেন না। আমি তখন কিছু পাথর তাকের উপর রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলাম। এরপর আমার পিতামহের হাত ধরে এনে তাকের কাছে দাঁড় করালাম। বললাম, এখানে হাত দিয়ে দেখুন, সবকিছুই এখানে রয়েছে। তিনি

www.eelm.weebly.com

হাত বাড়িয়ে বস্ত্রাবৃত পাথরগুলো স্পর্শ করলেন এবং বললেন, তাহলে তো দোষের কিছু নেই। আবু বকর ঠিকই করেছে। জননী আয়েশা বলেন, আল্লাহ্র কসম! হজরত আবু বকর আমাদের জন্য কোনো কিছু রেখে যাননি। আমি আমার বৃদ্ধ পিতামহকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে এ রকম করেছিলাম।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, সওর পর্বত অভিমুখে যাত্রার সময় হজরত আবু বকর বার বার তাঁর স্থান পরিবর্তন করতে লাগলেন। কখনো সম্মুখে, কখনো পশ্চাতে। কখনো দক্ষিণে। আবার কখনো বামে। রসুল স. বললেন, এমন করছো কেনো? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! যখন আমার মনে হচ্ছে সামনে হয়তো কোনো গুপ্তঘাতক ওৎ পেতে রয়েছে, তখন আমি চলছি আপনার সামনে, আবার যখন মনে হচ্ছে, পিছন থেকে কেউ আপনাকে অনুসরণ করছে তখন চলে যাচ্ছি পিছনে। এভাবে আপনার হেফাজতের জন্য আমি ছুটাছুটি করছি, কখনো সামনে কখনো পশ্চাতে। কখনো দক্ষিণে আবার কখনো বামে। সওর পর্বতের গুহামুখে উপস্থিত হলেন তাঁরা। হজরত আবু বকর বললেন, যিনি আপনাকে রসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, সেই আল্লাহ্র শপথ! হে প্রিয় রসুল, আপনি আগে ভিতরে ঢুকবেন না। আমি আগে ভিতরে দেখে আসি। যদি কোনো বিষাক্ত প্রাণী থাকে তবে তা দংশন করুক আমাকে। আপনাকে নয়। ভিতরে প্রবেশ করলেন হজরত আবু বকর। ঘোর অন্ধকার গুহাগাত্রে হাত বুলাতে লাগলেন। এভাবে খুঁজে বের করে গুহাগাত্রের গর্তগুলো তাঁর পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে ছিঁড়ে বন্ধ করে দিলেন। গর্তের মুখে ভালো করে গুঁজে দিলেন বস্ত্রখণ্ডগুলো। কিন্তু বস্ত্রখণ্ডের অভাবে দু'টো গর্ত আর বন্ধ করতে পারলেন না। ওই গর্ত দু'টোর মুখ চেপে ধরলেন তাঁর দুই পায়ের গোড়ালী দিয়ে। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এবার আপনি ভিতরে আসুন। বিশ্রাম গ্রহণ করুন। রসুল স. প্রবেশ করলেন। হজরত আবু বকরের উরুদেশে মস্তক স্থাপন করে শুয়ে পড়লেন। ওদিকে হজরত আবু বকরের গোড়ালীতে দংশন করতে শুরু করলো গর্তবদ্ধ সাপ। হজরত আবু বকর রইলেন অবিচল। কিন্তু বিষের যন্ত্রণায় তাঁর দু'চোখ থেকে নির্গত হতে লাগলো অশ্রু। ইবনে আবী শায়বা এবং ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর স্বয়ং বলেছেন, গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর আমি দেখতে পেলাম একটি গর্ত। ওই গর্তের উপরে বিছিয়ে দিলাম দু'পায়ের হাঁটুর নিচের অংশ। বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন। গর্তের ভিতরে সর্প অথবা বৃশ্চিক যদি থাকে, তবে তা আমাকেই দংশন করবে। আপনি থাকবেন নিরাপদ। হজরত জুনদুব বিন সুফিয়ান থেকে ইবনে মারদুবিয়া উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু বকর বলেন, সওর পর্বতের গুহামুখে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি গুহা-অন্দরে প্রবেশ করবেন না। প্রথমে আমি প্রবেশ করে স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি।

www.eelm.weebly.com

একথা বলে হজরত আবু বকর গুহায় ঢুকলেন। পরিষ্কার করতে শুরু করলেন স্থানটি। তখন কিছু একটা লেগে তাঁর হাত থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করলো। তিনি উচ্চারণ করলেন— একটি আঙ্গুলই তো মাত্র জখম হয়েছে। আর এ যন্ত্রণা তো অর্জিত হয়েছে আল্লাহ্র পথে থেকে।

হজরত আনাস থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, সকাল হলো। রসুল স. বললেন, হে আবু বকর! তোমার গাত্রাবরণ কোথায়? হজরত আবু বকর বলেন, গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে গর্তগুলো বন্ধ করেছি। রসুল স. আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাঁর পবিত্র দু'হাত তুলে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ! আবু বকরকে জান্নাতেও আমার সঙ্গে রেখো। প্রত্যাদেশ হলো— আপনার প্রার্থনা গৃহীত হয়েছে।

রুজাইনের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমরের নিকটে একবার সওর পর্বতের গুহার ঘটনা বর্ণনা করা হলো। তিনি তখন কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার সারা জীবনের পুণ্যকর্ম একত্রিত করলেও হজরত আবু বকরের ওই এক রাত্রির পুণ্যের সমতুল্য হবে না। ওই রাতে হজরত আবু বকর গুহামুখে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল, আপনি আগে ভিতরে যাবেন না। আমি আগে যাই। যদি কিছু হয় তবে আমার উপরেই হোক। এ কথা বলে তিনি গুহায় ঢুকে স্থানটি পরিষ্কার করলেন। একটি গর্ত দেখতে পেয়ে পরিধেয় বস্ত্রের একাংশ ছিঁড়ে বন্ধ করে দিলেন গর্তটির মুখ। আরো দু'টি গর্ত দেখে সেগুলোর মুখে রাখলেন দুই পা। তারপর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এবার আসুন। রসুল স. গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং হজরত আবু বকরের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। গর্তে ছিলো একটি সাপ। সেই সাপটি দংশন করলো হজরত আবু বকরের পায়ে। বিষে জর্জরিত হলেন তিনি। কিন্তু রসুল স. এর বিশ্রামে ব্যাঘাত হবে মনে করে একটুও নড়াচড়া করলেন না। যন্ত্রণায় অশ্রু নির্গত হলো তাঁর চোখ থেকে। এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো রসুল স. এর পবিত্র মুখমণ্ডলে। রসুল স. সচকিত হলেন। বললেন, কি হয়েছে তোমার? হজরত আবু বকর বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। মনে হয় সাপ ছোবল মেরেছে। রসুল স. তাঁর পবিত্র মুখের থুথু লাগিয়ে দিলেন দংশিত স্থানে। অপসারিত হলো বিষের যন্ত্রণা। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন ওই বিষে। ওই বিষই কারণ হয়েছিলো তাঁর মৃত্যুর। রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর আরবের কতিপয় গোত্র ধর্মত্যাগ করলো। বললো, আমরা জাকাত দিতে পারবো না। হজরত আবু বকর বললেন, রসুল স. এর সময়ে যদি তারা জাকাত হিসেবে একটি উটের রশি দিয়ে থাকে, তবে এখনও তাই দিতে হবে। নয়তো আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। হজরত ওমর বলেন, আমি বললাম, হে খলিফাতুল মুসলিমীন! রসুল স. মানুষকে একত্র

www.eelm.weebly.com

রেখেছিলেন এবং প্রদর্শন করেছিলেন নম্রতা। হজরত আবু বকর বললেন, হে ওমর! মূর্খতার যুগে তুমি ছিলে বীর পুরুষ। তবে ইসলাম গ্রহণ করার পর এ রকম দুর্বলতা প্রদর্শন করছো কেনো? প্রত্যাদেশ রুদ্ধ হয়েছে, ধর্ম পেয়েছে তার পরিপূর্ণ রূপ। আমি বেঁচে থাকতেই কি ধর্মের মধ্যে দেখা দিবে ন্যূনতা।

ইবনে সা'দ, আবু নাঈম, বায়হাকী এবং ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, আবু মুসাইব বকসী বলেছেন, আমি হজরত আনাস বিন মালেক, হজরত জায়েদ বিন আরকাম এবং হজরত মুগিরা বিন শোবা প্রমুখ সাহাবীর দর্শনলাভে ধন্য হয়েছি। তাঁদের নিকট থেকে শুনেছি, রসুল স. সওর পর্বতের গুহায় প্রবেশ করার পর আল্লাহ্পাক গুহামুখে সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন বৃক্ষরাজি। মাকড়সা এসে জাল বিস্তার করেছিলো সেখানে। আর বাসা বেঁধেছিলো দু'টি জংলী কবুতর। পরদিন আবু জেহেলের দল বিভিন্ন অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে রসুল স. কে খুঁজতে খুঁজতে উপস্থিত হলো ওই গুহার নিকটে। রসুল স. এর সঙ্গে যখন তাদের ব্যবধান ছিলো মাত্র চল্লিশ গজ। গুহামুখের দিকে তাকিয়ে তারা দেখলো, সেখানে রয়েছে মাকড়শার জাল ও জংলী কবুতরের বাসা। তাদের একজন বললো, না, এ গুহায় কেউ থাকতে পারে না। রসুল স. শুনতে পেলেন তাদের কথা। বুঝলেন, তিনি ও হজরত আবু বকর রয়েছেন আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ নিরাপত্তার মধ্যে। তিনি কবুতর দু'টোর জন্য দোয়া করলেন। পরে ওই কবুতর দু'টো বাসা বেঁধেছিলো কাবা শরীফের চত্তরে। হেরেম শরীফের সকল কবুতর ওই কবুতর দু'টির বংশধর।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে উত্তম সূত্রে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে মুশরিকেরা পৌছে গিয়েছিলো সওর পর্বতের সানুদেশে। এরপর তারা দেখে, পদচিহ্নগুলো এলোমেলো ও অস্পষ্ট। গুহার মুখ পর্যন্ত তারা উপস্থিত হলো। কিন্তু গুহামুখে মাকড়সার জাল আর কবুতরের বাসা দেখতে পেয়ে বলে উঠলো, নাহ্। গুহায় কেউ প্রবেশ করলে মাকড়সার জাল অক্ষুণ্ন থাকতো না। রসুল স. ওই গুহায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তিনরাত্রি।

ইমাম নাসায়ীর শিক্ষক কাযী হাফেজ আবু বকর বিন সাঈদ তাঁর মাসদুস সিদ্‌ক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, কুরায়েশরা খুঁজতে খুঁজতে উপস্থিত হলো সওর পর্বতের ওই গুহাটির সামনে। গুহামুখে মাকড়সার জাল দেখতে পেয়ে বললো, কেউ গুহায় ঢুকলে মাকড়সার জাল অটুট থাকতো না। রসুল স. তখন দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন। পাহারা দিচ্ছিলেন হজরত আবু বকর। হজরত আবু বকর শিউরে উঠলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! শত্রুরা তো এসেই পড়েছে। নিজের জন্য আমি শংকিত নই। ভাবছি, আপনার উপর না জানি কোন বিপদ আপতিত হয়। রসুল স. বললেন, চিন্তিত হয়ো না। আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গী।

www.eelm.weebly.com

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক বলেছেন, আমি তখন ভয়ার্তস্বরে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা নিচে, আর উপরে গুহামুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে শত্রুরা। পায়ের দিকে তাকালেই তারা আমাদের দেখে ফেলবে। রসুল স. বললেন, আবু বকর! ওই দু'জন সম্পর্কে তোমার ধারণা কী, যাদের তৃতীয় সঙ্গী স্বয়ং আল্লাহ্? আবু নাঈম তাঁর হুলিয়া পুস্তকে আতা বিন মায়সারা সূত্রে লিখেছেন, মাকড়সার জালের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা হেফাজত করেছিলেন দু'জনকে। একবার তালুতের আক্রমণ থেকে হজরত দাউদকে। আর একবার কুরায়েশদের হাত থেকে রসুল স. কে।

ঐতিহাসিক বালাজুরী লিখেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, কুরায়েশরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিলো আলকামা বিন করজ বিন হেলাল খাজায়ীকে। আলকামা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো মক্কা বিজয়ের পর। হিজরতের সময় সে ছিলো মুশরিকদের ভাড়া করা গোয়েন্দা ও পথ প্রদর্শক। রসুল স. এর পদচিহ্ন ধরে সে নিয়ে চললো সকলকে। সওর পর্বতের পাদদেশে এসে বললো, এখানে পদচিহ্নগুলো কেমন এলোমেলো। বুঝতে পারছি না এবার ডান দিকে যেতে হবে, না বাম দিকে। এ কথা বলে পাহাড়ে আরোহণ করলো সে। অন্যরাও চললো সাথে সাথে। গুহামুখে দাঁড়িয়ে উমাইয়া বিন খলফ বললো, এখানে তো মোহাম্মদের জন্মের আগে থেকেই রয়েছে মাকড়সার জাল। এ কথা বলেই সে প্রস্রাব করলো সেখানে।

হজরত ওরওয়া থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কে না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো কুরায়েশ দলাধিনায়কেরা। অনুসন্ধানে বের হয়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। ভাড়া করা লোকও নিযুক্ত করলো। বলে দিলো মোহাম্মদের খোঁজ দিতে পারলে পুরস্কার দেয়া হবে। শুরু হয়ে গেলো সর্বাত্মক তল্লাশী। শেষে তারা পৌঁছলো সওর পর্বতের ওই নির্দিষ্ট গুহাটির সামনে। আত্মগোপনকারী রসুল স. ও হজরত আবু বকর শুনতে পেলেন তাদের আলাপচারিতার আওয়াজ। হজরত আবু বকর কেঁদে ফেললেন। ভয় ও চিন্তায় হয়ে পড়লেন ভারাক্রান্ত। রসুল স. বললেন, আবু বকর বিষণ্ণচিত্ত হয়ো না। আল্লাহ্ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। এ কথা প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালা অবতীর্ণ করেন, 'অতঃপর আল্লাহ্ তার উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন যাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়।'

ইবনে আবী হাতেম, আবুশ্ শায়েখ, ইবনে মারদুবিয়া, বায়হাকী ও ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'তার উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন' অর্থ— হজরত আবু বকরের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন। এখানে আলাইহি (তার উপর) সর্বনামটি হজরত আবু বকরের স্থলাভিষিক্ত। কারণ, রসুল স.এর চিত্তপ্রশান্তি তো আগে থেকেই ছিলো। তাই তিনি বলতে

www.eelm.weebly.com

পেরেছিলেন, 'বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।' তাঁর এই প্রশান্তিপ্রদায়ক কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন, 'অতঃপর আল্লাহ্ তার উপর তাঁর দয়া বর্ষণ করেন, যাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়।' সুতরাং 'আলাইহি' সর্বনামটি এখানে হজরত আবু বকরের স্থলাভিষিক্ত হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত।

শেষে বলা হয়েছে, 'এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখোনি।' এখানে 'এমন এক সৈন্য বাহিনী' অর্থ ফেরেশতাবাহিনী। নির্দেশিত ফেরেশতাবাহিনী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দৃষ্টিপথে সৃষ্টি করেছিলো অন্তরায়। ফলে লক্ষ্যস্থলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও দেখতে তারা পায়নি। আর ওই ফেরেশতারাও অদৃশ্য। তাই বলা হয়েছে 'যা তোমরা দেখনি।' আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আসমা বলেছেন, হজরত আবু বকর তখন দেখলেন, এক লোক গুহার দিকে এগিয়ে আসছে। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! লোকটি তো আমাদেরকে দেখে ফেললো। রসুল স. বললেন, কক্ষনো নয়। তার চোখের সামনে রয়েছে ফেরেশতাদের পাখার আড়াল। একটু পরে লোকটি রসুল স. ও হজরত আবু বকরের দিকে মুখ করে প্রস্রাব করতে বসলো। রসুল স. বললেন, আবু বকর! লোকটি আমাদেরকে দেখে ফেললেও তেমন কিছুই করতে পারতো না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফেরেশতারা তখন কাফেরদের অন্তরে ভীতির সৃষ্টি করেছিলো। তাই তারা হন্তদন্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিলো।

মুজাহিদ ও কালাবী বলেছেন, এখানকার বক্তব্য বিষয়টি এ রকম— আল্লাহ্-পাক ফেরেশতাদের মাধ্যমে রসুল স. এর শত্রুদেরকে সওর পর্বতের গুহামুখ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তারা হেয় ও হতাশ হয়েছিলো। এভাবে বদর যুদ্ধের সময়েও আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে করেছিলেন অপদস্থ ও নিরাশ।

হজরত আনাস থেকে ইবনে আদী ও ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার কবি সাহাবী হজরত হাস্সানকে বললেন, আবু বকর সম্পর্কে তুমি নাকি কি লিখেছো? হজরত হাস্সান বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, শোনাও। হজরত হাস্সান আবৃত্তি করলেন— তিনি ছিলেন সুউচ্চ পর্বতগহ্বরে দু'জনের একজন। শত্রুরা চষে বেড়াচ্ছিলো পাহাড়ে। জনতা জানে যে, আবু বকরই রসুল স. এর সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তাঁর মতো দৃঢ়তা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। — কবিতাটি শুনে হেসে ফেললেন রসুল স.। পূর্ণরূপে উন্মোচিত হলো তাঁর পবিত্র দন্তরাজি। বললেন, সুন্দর! তুমি ঠিকই লিখেছো।

উম্মত জননী হজরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ও আমার পিতা পর্বতগুহায় অতিবাহিত করেন তিন রাত্রি। আমার ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ ছিলেন পূর্ণ সতর্ক ও বিচক্ষণ। গোপনে তিনি যোগাযোগ রাখতেন তাঁদের সঙ্গে। দিনের বেলা কুরায়েশদের কথাবার্তা শুনে সেগুলো রাতে পৌঁছাতেন ওই গুহায়।

www.eelm.weebly.com

আবু ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, সন্ধ্যায় আহার্যদ্রব্য পৌঁছে দিতেন হজরত আসমা। আর হজরত আবু বকরের ছাগলের রাখাল আমের বিন ফুহায়রা নিয়ে যেতেন দুগ্ধবতী ছাগল। রাতের এক প্রহর অতিবাহিত হলে তিনি পৌঁছতেন সেখানে। ছাগল দোহন করে তাজা দুধ পান করতেন রসুল স. ও হজরত আবু বকর। দুধপান শেষে সন্তর্পণে স্বগৃহে ফিরে আসতেন আমের।

তিনদিন পর সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ে কুরায়েশরা। হারিয়ে ফেলে অনুসন্ধানের উৎসাহ। হিজরতের জন্য প্রস্তুতকৃত উট দু'টো হাজির করা হয় তাঁদের নিকটে। তাঁরা উটে আরোহণ করে যাত্রা শুরু করেন। ছাগলের রাখাল আমের পথ চলতে থাকেন তাঁদের সঙ্গে। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ্ বিন তোফায়েলের গোলাম। আবদুল্লাহ্ বিন তোফায়েল আবার ছিলেন হজরত আয়েশার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। এগিয়ে চললো রসুল স. এবং হজরত আবু বকরের উট। আসফান অতিক্রম করে সমুদ্রোপকূলের পথ ধরলেন তাঁরা। পাহাড় ও সমুদ্রশোভিত ওই পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন আমের ও আবদুল্লাহ্।

ইমাম আহমদ, বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা বিন আজীব বলেছেন, আমি একবার হজরত আবু বকরকে বললাম, সওর পর্বতের গুহা থেকে কিভাবে যাত্রা শুরু করলেন, সে বিষয়ে কিছু বলুন। তিনি বললেন, রাতে রওয়ানা হয়েছিলাম আমরা। পথ ছিলো জনশূন্য। একটানা পথ চলতে চলতে দ্বিপ্রহরে পৌঁছলাম একটি কংকরময় স্থানে। দাঁড়ালাম একটি বড় পাথরের পাশে। বাহন থেকে নেমে জায়গাটি পরিষ্কার করে সেখানে বিছিয়ে দিলাম আমার চামড়া নির্মিত শয্যাটি। বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। আমি নজর রাখছি। রসুল স. শয্যায় শরীর এলিয়ে দিলেন। আমি বসে রইলাম। হঠাৎ দেখলাম এক বকরীর রাখাল তার বকরীগুলোকে নিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। আমি এগিয়ে গেলাম। বললাম, তুমি কার গোলাম? সে তার মালিকের নাম বললো। আমি চিনতে পারলাম তার মক্কাবাসী মালিককে। পুনরায় বললাম, আমাকে কি তোমার বকরীর দুধ দিতে পারো? সে বললো, পারি। এ কথা বলেই সে ধরে আনলো একটি দুগ্ধবতী ছাগল। ছাগলের বাঁট পরিষ্কার করে দোহন করলো। পাত্র ভর্তি দুধ ঢেলে নিলাম আমার পানির মশকে। ফিরে এসে দেখলাম, রসুল স. গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। ভাবলাম, এ অবস্থায় তাঁকে ডাক দেয়া ঠিক নয়। আমি একটি পাত্রে দুধ ঢালতে শুরু করলাম। ভাবলাম, দুধ ঢালার শব্দে তিনি জেগে উঠলে ভালোই হয়। তাই হলো। তিনি জেগে উঠলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কিছু দুধ পান করুন। রসুল স. দুধ পান করলেন। তারপর বললেন, যাত্রার সময় কি হয়নি? আমি বললাম, হয়েছে। ততক্ষণে বেলা পড়ে এসেছে। আমরা পুনরায় শুরু করলাম আমাদের সফর।

www.eelm.weebly.com

হজরত সালিত বিন আমর আনসারী থেকে তিবরানী, হাকেম, আবু নাঈম এবং আবু বকর শাফেয়ী কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এবং হজরত আবু বকরের সঙ্গে পথপ্রদর্শকরূপে চলছিলেন আমের বিন ফুহায়রা। পথিমধ্যে তাঁরা থামলেন উম্মে মা'বাদের বসতবাটিতে। উম্মে মা'বাদের স্বামী ওমর ছিলো আমেরের পূর্ববর্তী মালিক। উম্মে মা'বাদ রসুল স. কে চিনতেন না। ওমর তাকে বললেন, আমাদের আহারের কোনো ব্যবস্থা করতে পারবে কি? উম্মে মা'বাদ বললো, কিছুই তো নেই। আমরা যে বড়ই অভাবগ্রস্ত। ঘরের একদিকে ছিলো একটি ছাগল। সেদিকে দেখিয়ে রসুল স. বললেন, ওই যে একটি বকরী। উম্মে মা'বাদ বললেন, বকরিটি খুবই দুর্বল। তাই ওটি অন্য ছাগলদের সঙ্গে চারণভূমিতে যেতে পারেনি। রসুল স. বললেন, অনুমতি পেলে আমি ছাগলটি দোহন করবো। উম্মে মা'বাদ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! ওই মাদি বকরীটি এখনো কোনো পুরুষ ছাগলের সঙ্গে মিলিতই হয়নি। এখন আপনার ইচ্ছা। রসুল স. বিসমিল্লাহ্ বলে ছাগলটি দোহন করতে শুরু করলেন। পাত্র পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। রসুল স. ছাগলটির জন্য দোয়া করলেন। সবাইকে দুধ পান করালেন। নিজে পান করলেন। সকলের শেষে বললেন, যে পান করায় সে পান করবে সকলের শেষে। রসুল স. পুনরায় ছাগলটি দোহন করে পাত্র পূর্ণ দুধ উম্মে মা'বাদকে দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। ইবনে সা'দ এবং আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণকারিণী হজরত উম্মে মা'বাদ বলেছেন, ওই বকরীটি আমার কাছে আঠারো হিজরী পর্যন্ত ছিলো। হজরত ওমরের খেলাফতের সময় একবার প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো। তখনও আমি ওই বকরীটি সকাল-সন্ধ্যা দোহন করে তার দুধ পান করতাম। বকরীটির দুধ কখনো বন্ধ হতো না।

ভিন্ন সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, সন্ধ্যায় ফিরে এলো উম্মে মা'বাদের পুত্র। উম্মে মা'বাদ তার পুত্রকে বললেন, এই কুমারী বকরী ও একটি ছুরি নিয়ে মেহমানদের কাছে যাও। বলো, তাঁরা যেনো এই ছুরি দিয়ে বকরীটি জবাই করে এর গোশত ভক্ষণ করেন। ছেলেটি তাই করলো। রসুল স. বললেন, ছুরিটি নিয়ে যাও এবং দুগ্ধ দোহনের একটি বড় পাত্র নিয়ে এসো। সে বললো, বকরীটি তো কুমারী। এর দুধ হবে কিভাবে? রসুল স. বললেন, তুমি পাত্র নিয়ে এসো। পাত্র আনা হলে রসুল স. বকরীটির স্তনে হাত বুলালেন এবং দুগ্ধ দোহন করতে শুরু করলেন। পাত্র পরিপূর্ণ হয়ে গেলো অল্পক্ষণের মধ্যে। এই বর্ণনায় আরো রয়েছে, উম্মে মা'বাদের গৃহে আমরা অবস্থান করেছিলাম দুই রাত্রি। তারপর আমরা যাত্রা শুরু করলাম। উম্মে মা'বাদ আমাদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। রসুল স. এর দোয়ার বরকতে উম্মে মা'বাদের বকরীর সংখ্যা অল্প দিনের মধ্যে অনেক হয়ে

www.eelm.weebly.com

গেলো। বকরীগুলো নিয়ে তিনি তখন উপস্থিত হলেন মদীনায়। মদীনায় ছিলেন উম্মে মা'বাদের কন্যা। তিনি হজরত আবু বকরকে দেখিয়ে তাঁর মাকে বললেন, আম্মা। এই সেই ব্যক্তি যিনি আপনার গৃহে মেহমান হয়েছিলেন। উম্মে মা'বাদ বললেন, আপনার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি কে? হজরত আবু বকর বললেন, আল্লাহ্র রসুল। উম্মে মা'বাদ বললেন, আমাকে তাঁর নিকটে নিয়ে চলুন। হজরত আবু বকর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. সকাশে। রসুল স. তাঁকে পানাহার করালেন এবং বস্ত্র উপহার দিলেন। এরপর মুসলমান হয়ে গেলেন উম্মে মা'বাদ।

হিশাম বিন হাবসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এবং হজরত আবু বকর চলে আসার পর বকরীর পাল নিয়ে গৃহে উপস্থিত হলেন উম্মে মা'বাদের স্বামী আবু মা'বাদ। পাত্র ভর্তি দুধ দেখে বিস্মিত হলেন তিনি। বললেন, দুধ কোত্থেকে এলো! ঘরে দুগ্ধবতী কোনো বকরী তো ছিলো না। উম্মে মা'বাদ খুলে বললেন পুরো ঘটনা। আবু মা'বাদ বললেন, ওই বরকত পূর্ণ ব্যক্তিটির কিছু বিবরণ দাও। উম্মে মা'বাদ বললেন, তিনি জ্যোতির্ময়, সুন্দর এবং প্রফুল্লচিত্ত। তিনি স্থুলাকার নন। ক্ষুদ্রাকৃতির মস্তকবিশিষ্টও নন। কৃষ্ণবর্ণ প্রশস্ত চক্ষু। চোখের পাতা নিবিড়। কণ্ঠস্বর গুরুগম্ভীর মেঘগর্জনের মতো। শ্মশ্রু ঘন, সুবিন্যস্ত। ভ্রূযুগল মিলিত ও অর্ধা চন্দ্রাকৃতির। তিনি স্বল্পভাষী নন। অতিভাষীও নন। তাঁর কণ্ঠ বাহুল্য বর্জিত, সুমিষ্ট, চিত্তরঞ্জক। কথা বললে মনে হয় যেনো নক্ষত্রপুঞ্জ স্খলিত হচ্ছে। অতিদীর্ঘ যেমন তিনি নন, তেমনি নন অতি হ্রস্বও। বরং মধ্যমাকৃতি বিশিষ্ট, দৃষ্টি নন্দন। আভিজাত্য ও মর্যাদার প্রতিভূ তিনি। তাঁর সহচর তাঁর একান্ত অনুগত, নম্র। একান্ত মনোযোগের সঙ্গে তিনি নির্দেশ শ্রবণ করেন এবং যথাযথভাবে তা পালন করেন। দেখে মনে হয় তিনি যেনো আনুগত্যের অতুলনীয় প্রতিভূ। আবু মা'বাদ বললেন, আল্লাহ্র শপথ ইনি নিশ্চয় সেই কুরায়েশ, যার আবির্ভাবের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে সবস্থানে। দুর্ভাগ্য আমার যে, এখন পর্যন্ত আমি তাঁর দর্শন পাইনি। আগামীতে যদি সুযোগ পাই তবে আমি নিশ্চয় উপস্থিত হবো তাঁর পবিত্র সংসর্গে।

হজরত আসমা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. ও আমার পিতা চলে যাওয়ার পর দল বেঁধে আমাদের বাড়ীতে হাজির হলো কুরায়েশরা। আবু জেহেলও ছিলো তাদের মধ্যে। তাদের কথা শুনে আমি বাইরে এলাম। আবু জেহেল বললো, তোমার পিতা কোথায়? আমি বললাম, জানি না। আবু জেহেল একটি চড় বসিয়ে দিলো আমার গণ্ডদেশে। খসে পড়লো আমার কানের বালি। তিনদিন পর এলো এক বেদুঈন। সে সুর করে আবৃত্তি করতে লাগলো একটি কবিতা। লোকজন দলবেঁধে তার পিছনে পিছনে চলতে শুরু করলো। কিন্তু কারো দিকে তার কোনো

www.eelm.weebly.com

ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আপন মনে আউড়িয়ে চললো— আরশের অধীশ্বর উত্তম প্রতিদান প্রদান করেছেন ওই জুটিকে। উম্মে মা'বাদের গৃহে দুই প্রহরের জন্য মেহমান হয়েছিলেন তাঁরা। হেদায়েতের নূরে রওশন করে তুলেছিলেন তাঁদের তাঁবু। তাঁদের মাধ্যমেই আমি পেয়েছি সত্যপথের দিশা। হে জনতা, শোনো, যে মোহাম্মদের সঙ্গী সে-ই সফলকাম। হে বনী কুসাই! শোনো, তিনি হচ্ছেন, অক্ষরের অমুখাপেক্ষী নবী। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার সাধ্য কারো নেই। বনী কা'বকে অভিনন্দন? পথিমধ্যে দণ্ডায়মান ছিলো এক রমণী। তাঁকে জিজ্ঞেস করো, সে বলতে পারবে ওই বকরী ও দুধের পাত্রটির সংবাদ। বকরীটি ছিলো কুমারী। অথচ তার স্তন থেকে নির্গত হয়েছিলো ফেননিভ দুগ্ধ। মোহাম্মদ বকরীটি ওই রমণীর কাছেই রেখে গিয়েছেন, যেনো দুগ্ধ দোহনকারী সেটিকে পানির উপরে নামায় এবং পানি থেকে ফেরৎ এনে দোহন করে (উম্মে মা'বাদের স্বামী ওই বকরীটির দুগ্ধ দোহন করে, চারণভূমিতে নিয়ে যায়, পান করায় ঝর্ণার পানি, তারপর ফিরিয়ে আনে স্বগৃহে)।

উত্তম সূত্রে বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. কে খুঁজতে খুঁজতে কুরায়েশরা উপস্থিত হলো উম্মে মা'বাদের গৃহে। জানতে চাইলো রসুল স. এর সংবাদ। উম্মে মা'বাদ বললেন, কার কথা বলছো তোমরা? সঙ্গীসহ এক অতিথি এসেছিলেন আমার গৃহে। দুগ্ধ দোহন করেছিলেন এক গর্ভবতী ছাগলের। কুরায়েশরা বললো, তাঁকেই তো খুঁজতে বের হয়েছি আমরা।

বায়হাকী বলেছেন, রসুল স. দুর্বল ও কুমারী বকরীটি দেখেছিলেন উম্মে মা'বাদের গৃহকোণে। তখন তাঁর পুত্র ও স্বামী ঘরে ছিলেন না। তাঁরা আসেন রসুল স. এর প্রস্থানের পর। দুগ্ধ দোহনের অলৌকিক ঘটনা শুনে তাঁরা জানতে চান, ওই অলৌকিক ব্যক্তির বিবরণ। উম্মে মা'বাদ তখন খুলে বলেন সবকিছু। আমি বলি, এ সকল কথা কানে পৌঁছেছিলো কুরায়েশদের। তাই তারা খুঁজতে খুঁজতে উপস্থিত হয়েছিলো সেখানে।

সুরাকার কাহিনীঃ সুরাকার কাহিনী বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম এবং ইমাম আহমদ। ইয়াকুব বিন সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকর থেকে। ঘটনাটি এই— সুরাকা স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, কুরায়েশদের এক দূত এসে উপস্থিত হলো আমার নিকটে। বললো, মোহাম্মদ অথবা তার সঙ্গীকে হত্যা অথবা বন্দী করতে পারলে তুমি পুরস্কার হিসেবে পাবে একশত উট। আমি তখন আমার সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে এক বৈঠকে বসেছিলাম। সেখানে উপস্থিতদের মধ্যে একজন বললো, সুরাকা! আমি কয়েকজন লোককে সমুদ্র উপকূলের পথে যেতে দেখেছি। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সমুদ্রতীরের পথ ধরে আমি যেতে দেখেছি তিনজনকে। মনে হয় ওই দলটিই মোহাম্মদের দল। আমি লোকটিকে ইশারায়

www.eelm.weebly.com

চুপ থাকতে বললাম। সে চুপ করে রইলো। আমি আমার বাড়ীতে এসে পরিচারিকাকে বললাম, আমার ঘোড়াটি নিয়ে বাতন উপত্যকায় চলে যাও। সে নির্দেশ পালন করলো। একটু পরে আমি একটি বল্লম নিম্নমুখী করে সন্তর্পণে বের হয়ে গেলাম বাড়ীর পিছনের পথ ধরে। নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দেখলাম ঘোড়া প্রস্তুত। ত্রস্তে উঠে পড়লাম ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া ছুটতে শুরু করলো। মনে মনে বললাম, ওই দু'জনের সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত আমি থামবো না। ছুটতে ছুটতে এক সময় পেয়ে গেলাম আমার শিকার। কিন্তু তাদের অধিক নিকটে যেতে পারলাম না। ঘোড়াটি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো। আমিও ছিটকে পড়লাম পিঠ থেকে। ভাগ্য পরীক্ষা করলাম তীরাধারের তীর দিয়ে। কিন্তু অনুকূল ফল পেলাম না। ভাগ্য নির্ণায়ক তীর বলে দিলো, আমি সফল হতে পারবো না। কিন্তু এই ফলাফল আমি মেনে নিতে পারলাম না। মনস্থির করলাম, এক শত উট আমাকে পেতেই হবে। আমি ঘোড়ায় উঠে পুনরায় তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলাম। এবার এতো নিকটে পৌঁছলাম যে, স্পষ্ট শুনতে পেলাম রসুল স. এর কোরআন পাঠের আওয়াজ। কোরআন পাঠে মগ্ন ছিলেন তিনি। তাই আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কিন্তু হজরত আবু বকরের দৃষ্টি ছিলো তীক্ষ্ণ ও সদাসতর্ক। আরো কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু হঠাৎ আমার ঘোড়ার দুই পা দেবে গেলো মাটিতে। আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলাম। অতিদ্রুত উঠে দাঁড়ালাম কিন্তু আমার ঘোড়া তার দেবে যাওয়া পা ওঠাতে পারলো না। পা ওঠাবার চেষ্টা করলে সেখান থেকে নির্গত হতে শুরু করলো ধূলিময় মেঘের মতো ধোঁয়া। আমি পুনরায় ভাগ্য নির্ণায়ক তীরের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। কিন্তু আগের মতোই ফল হলো নেতিবাচক। আমার প্রতীতি জন্মালো, তাদের ক্ষতি করার সাধ্য আমার নেই। আর মোহাম্মদ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রসুল। আল্লাহ্‌পাকই তাঁর হেফাজতকারী। তিনি তাঁর রসুলকে বিজয়ী করবেনই। আমি নিরুপায় হয়ে চিৎকার করে তাদেরকে ডেকে বললাম, দৃষ্টিপাত করুন আমার দিকে। আমার দুরাবস্থার দিকে দয়া করে তাকান। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কথা দিচ্ছি আমি আপনাদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট দেবো না। রসুল স. হজরত আবু বকরকে বললেন, জিজ্ঞেস করো, সে কি চায়? আমি বললাম, আপনাকে ধরিয়ে দিতে পারলে আপনার সম্প্রদায় একশত উট পুরস্কার দিবে বলে ঘোষণা করেছে। আপনি আমার পক্ষ থেকে কিছু পথ খরচ এবং কিছু সামগ্রী গ্রহণ করুন। কিন্তু আপনি কথা দিন, সমগ্র আরব যখন আপনার পদতলগত হবে, তখন আপনি আমাকে কষ্ট দিবেন না। এর বেশী আমার চাওয়ার কিছু নেই। রসুল স. বললেন, ঠিক আছে। তুমি কিন্তু আমাদের কথা কাউকে জানিয়ো না। আমি জানালাম, আমাকে একটি নিরাপত্তা পত্র লিখে দিন। রসুল স. হজরত আবু বকরকে নির্দেশ দিলেন, লিখে দাও। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন নিরাপত্তা পত্র লিখে দেয়ার নির্দেশ দিলেন আমের বিন ফুহায়রাকে। আমের এক টুকরা চামড়ায় লিখে দিলেন নিরাপত্তার অঙ্গীকারনামা।

www.eelm.weebly.com

এরপর রসুল স. অগ্রসর হলেন। মদীনা আর বেশী দূরে নয়। রসুল স. বললেন, আবু বকর! নবীর জন্য অসত্য ভাষণ নিষিদ্ধ। নবীর অনুসারীদের জন্যও। অতএব, সাবধানে মানুষের কথার জবাব দিয়ো। এই নির্দেশনা পেয়ে হজরত আবু বকর মানুষের কথার জবাব দিতে লাগলেন সাবধানে। কেউ যদি বলতো, আপনি কে? তিনি বলতেন, অনিশ্চিত যাত্রী। যদি বলতো, সঙ্গে কে? তিনি জবাব দিতেন, পথপ্রদর্শক।

মদীনার কাছাকাছি হতেই রসুল স. কে স্বাগতম জানালেন আবু বুরায়দা আসলামী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের সত্তর জন লোক। রসুল স. বললেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আবু বুরায়দা। রসুল স. বললেন, আবু বকর! আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে (বুরায়দা অর্থ শীতলতা)। রসুল স. পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ গোত্রের লোক তোমরা? আবু বুরায়দা বললেন, আসলাম গোত্রের। রসুল স. হজরত আবু বকরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমরা এখন নিরাপদ। বুরায়দাকে বললেন, বনী আসলাম কোন গোত্রের শাখা? আবু বুরায়দা বললেন, বনী সাহাম গোত্রের। রসুল স. বললেন, তোমার তীরাধার থেকে তীর বের হয়ে পড়েছে। রসুল স. সেই স্থানেই রাত্রি যাপন করলেন। সকালে আবু বুরায়দা বললেন, আপনার সঙ্গে একটি পতাকা থাকা প্রয়োজন। এই বলে তিনি নিজের পাগড়ী খুলে একটি বল্লমের মাথায় বাঁধলেন এবং পতাকা হিসেবে সেটিকে তুলে ধরলেন উচ্চে।

হাকেম লিখেছেন, এটা সুপ্রসিদ্ধ যে, রসুল স. মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন সোমবার। মদীনায়ও পৌঁছেছিলেন সোমবারে। কেবল মোহাম্মদ বিন মুসা খাওয়ারজামী বলেছেন, রসুল স. হিজরতের উদ্দেশ্যে গৃহ থেকে বের হয়েছিলেন জুমআর রাতে। হাফেজ ইবনে হাজার উদ্ভূত সমস্যাটির সমাধান দিয়েছেন এভাবে— রসুল স. জুমআর রাতেই (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) তাঁর গৃহ থেকে বের হয়েছিলেন। তারপর হজরত আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে সওর পর্বতের গুহায় অতিবাহিত করেছিলেন ওই রাত, পরদিন রাত (শুক্রবার দিবাগত রাত), তার পরদিনের দিবাগত রাত (শনিবার দিবাগত রাত)। এভাবে তিন রাত অবস্থানের পরের রাতে (সোমবার রাত— অর্থাৎ রবিবার দিবাগত রাতে) রওনা দিয়েছিলেন মদীনার উদ্দেশ্যে। আমি বলি, সম্ভবত কুরায়েশরা জুমআর রাতে পরামর্শ করে রসুল স. কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। তাই ওই রাতেই গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রসুল স. পৌঁছেছিলেন হজরত আবু বকরের বাড়ীতে। তারপর তাঁর বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে দু'জনে পৌঁছেছিলেন সওর পাহাড়ের গহ্বরে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথা হেয় করেন, আল্লাহ্‌র কথাই সর্বোপরি। এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শিরিক প্রভাবিত কথা ও পরি-

www.eelm.weebly.com

কল্পনাকে হেয় করেন। করেন অসফলকাম। যেমন রসুল স. এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় কাফেরদের শত প্রচেষ্টাও সফল হতে পারেনি। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর বিশেষ সাহায্যকারী ফেরেশতার মাধ্যমে তাদের সকল পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টাকে ভণ্ডুল করে দিয়েছেন। আর এভাবেই আল্লাহ্‌র কথা যে সর্বোপরি— তা আল্লাহ্‌তায়ালা প্রমাণও করেছেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'কালিমাতিল্লাজীনা কাফারু' (সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথা) অর্থ— কুরায়েশদের ওই সকল আলোচনা যা তারা উপস্থিত করেছিলো দারুণ নাদওয়ায়। আর কালিমাতিল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র কথা) অর্থ আল্লাহ্‌পাকের ওই অঙ্গীকার, যা তিনি করেছিলেন তাঁর রসুলের হেফাজতের উদ্দেশ্যে।

শেষে বলা হয়েছে— ওয়াল্লহু আযীযুন্ হাকীম (এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়)। এ কথার অর্থ— কাফেরদেরকে অপদস্থ করা এবং আল্লাহ্‌র বাণীকে সমুন্নত করার মধ্যে রয়েছে অপার পরাক্রম ও প্রজ্ঞার নিদর্শন। কারণ আল্লাহ্-তায়ালা অতুলনীয় পরাক্রমশালী ও অনন্ত প্রজ্ঞাময়।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৪১

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

☐ অভিযানে বাহির হইয়া পড় লঘু রণসম্ভারে হউক অথবা গুরু রণসম্ভারে, এবং সংগ্রাম কর আল্লাহের পথে তোমাদিগের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। উহাই তোমাদিগের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে!

'খিফাফান' অর্থ লঘু। আর 'ছিক্বালান্' অর্থ গুরু (ভার)। শব্দ দু'টোকে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন— ১. হজরত ইকরামা, কাতাদা এবং মুজাহিদ বলেছেন, 'খিফাফাঁউ ওয়া ছিক্বালান্' (লঘু অথবা গুরু অবস্থায়) কথাটির অর্থ— যুবক অবস্থায় অথবা বৃদ্ধ অবস্থায়। ২. কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— পানাহারে পরিতৃপ্ত অবস্থায় অথবা অভুক্ত অবস্থায়। ৩. আবার কেউ বলেছেন, বিত্তহীন অবস্থায় অথবা বিত্তবান অবস্থায়। ৪. হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— লঘু রণসম্ভারে অথবা গুরু রণসম্ভারে (হাল্‌কা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অথবা ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে)। ৫. আউফি বলেছেন, পদব্রজে অথবা অশ্বারোহী অবস্থায়। ৬. ইবনে জায়েদ বলেছেন, ভূমিহীন অবস্থায় অথবা ভূস্বামী অবস্থায়। ৭. হাকিম বিন উত্‌বা বলেছেন, কর্মহীন অবস্থায় অথবা কর্মমগ্ন অবস্থায়। ৮. শায়েখ হামাদানী বলেছেন, অসুস্থ অবস্থায় অথবা স্বাস্থ্যবান অবস্থায়। ৯. কোনো

www.eelm.weebly.com

কোনো আলেম বলেছেন, পরিবার পরিজনহীন অবস্থায় অথবা সংসারী অবস্থায়। ১০. ইবনে হুম্মাম বলেছেন, পরিচারক পরিচারিকাহীন অবস্থায় অথবা চাকর বাকরের মালিক অবস্থায়। ১১.আবু সালেহ বলেছেন, অল্প সম্পদের অধিকারী অবস্থায় অথবা অধিক সম্পদের অধিকারী অবস্থায়। কেউ কেউ বলেছেন, 'অভিযানে বের হয়ে পড়ো হাল্কাভাবে অথবা ভারীভাবে'— কথাটির অর্থ হবে এখানে, জেহাদের ডাক শোনামাত্র গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হও অথবা নিষ্ক্রান্ত হও যুদ্ধের সাজসজ্জা সমাপনের পর।

জুহুরীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের একটি চোখ নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। কিন্তু তিনি জেহাদের আহ্বান শোনার সঙ্গে সঙ্গে গৃহ থেকে বের হয়ে গেলেন। জনৈক ব্যক্তি বললেন, আপনি তো অসুস্থ এবং অসহায়। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তো লঘু-গুরু সকল অবস্থায় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতে বলেছেন। আমার দ্বারা যুদ্ধ যদি নাও হয়, তবে আমি তো যোদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবো। হিফাজত করতে পারবো তাদের মাল সামান।

আতা খোরাসানীর বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি রহিত হয়েছে ওই আয়াতের মাধ্যমে, যেখানে বলা হয়েছে— ওয়ামা কানালমু'মিনুনা লি ইয়াংফিরু কাফফাতান (বিশ্বাসীদের কি হলো, তাদেরতো সম্মিলিতভাবে বের হওয়া উচিত)। সুদ্দী বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীগণ খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তাদের মনে হতে লাগলো, আয়াতের নির্দেশনাটি অত্যন্ত কঠিন। তাই আল্লাহ্পাক আর একটি আয়াতের মাধ্যমে ওই আয়াতটিকে রহিত করে দিলেন। রহিতকারী ওই আয়াতটি হচ্ছে— লাইসা আলাদ্ দ্বুয়াফায়ি ওয়ালা আলাল মারদ্বা (দুর্বল ও অসুস্থদের উপর নয়)।

আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাস এবং সুদ্দীর মতে আলোচ্য আয়াতটি রহিত হয়েছে। কিন্তু রহিতকারী (নাসেখ) এবং রহিত (মনসুখ) আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সময় ও প্রেক্ষাপটের ব্যবধান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এখানে উল্লেখিত দু'টো আয়াতই অবতীর্ণ হয়েছে তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। তাই এখানে নাসেখ মানসুখের অবকাশ নেই। বরং উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে যারা স্বাস্থ্যগত অথবা সম্পদগত কারণে যুদ্ধ করতে সমর্থ নয়, তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এখানকার নির্দেশটি কেবল ওই ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হবে, যে জেহাদ করতে সমর্থ। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, 'লাইসা আলাদ্ দ্বুয়াফায়ি'— আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতের দু' একদিন পর। সুতরাং আয়াতটি তাবুক যুদ্ধের পরম্পরাভুক্ত। সুতরাং একই পরম্পরাভুক্ত আয়াতগুলো একে অপরের রহিতকারী কিংবা একে অপরের দ্বারা রহিত হতে পারে না। অতএব আলোচ্য

www.eelm.weebly.com

নির্দেশনাটির মর্মার্থ হবে এ রকম— তোমরা জেহাদের আহ্বান শোনামাত্র তোমাদের জীবন ও সম্পদসহ যুদ্ধযাত্রা করো, যদি এ রকম করার ক্ষমতা তোমাদের থাকে। মনে রেখো, জেহাদ বিমুখ হওয়া অপেক্ষা মুজাহিদ হওয়া শ্রেয়। জেহাদে অংশগ্রহণ করলে তোমরা দেখতে পাবে আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক বিজয়দানের শুভসংবাদটি কত সত্য। অতএব তোমরা কালবিলম্ব না করে অভিযানে বের হয়ে পড়ো।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য সকলকে আর্থিক সহযোগিতার আমন্ত্রণ জানালেন। সকলের আগে সাড়া দিলেন হজরত আবু বকর। তিনি চার হাজার দিরহাম এনে রসুল স. এর কাছে জমা করলেন। রসুল স. বললেন, আবু বকর! পরিবার পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছো। হজরত আবু বকর বললেন, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসুলকে। হজরত ওমর আনলেন তাঁর সম্পদের অর্ধাংশ। রসুল স. বললেন, ঘরের লোকদের জন্য রেখে এসেছো কতটুকু? হজরত ওমর বললেন, যতটুকু নিয়ে এসেছি। হজরত আব্বাস, হজরত তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ্ এবং হজরত সা'দ বিন উবাদা দান করলেন বাহন। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ দান করলেন দুইশত আউকিয়া সোনা। হজরত আসেম বিন আদী' দান করলেন নব্বই ওসাক খেজুর। হজরত ওসমান বিন আফফান প্রস্তুত করলেন এক তৃতীয়াংশ মুজাহিদকে। আরো অনেক মুজাহিদ তাদের প্রয়োজনের কথা জানালেন। হজরত ওসমান তাঁদের প্রয়োজনও পূর্ণ করে দিলেন। মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী বলেছেন, তাবুকের সৈন্য সংখ্যা ছিলো ত্রিশ হাজারেরও বেশী। হজরত ওসমান তন্মধ্যে দশ হাজার যোদ্ধাকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করে দিয়েছিলেন।

আবু ওমর তাঁর 'আদ্‌দুরার' এবং 'আল ইশায়া' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ওসমান তখন দান করেছিলেন নয়শত উট, একশত ঘোড়া ও তাদের আরোহীদের অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হজরত ওসমান সেনা সজ্জার জন্য তখন এতো বেশী ব্যয় করেছিলেন যে, এরপরে আর কেউ জেহাদের জন্য এতবেশী ব্যয় করতে পারেনি। ইবনে হিশামের এক প্রসিদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, তাবুক যোদ্ধাদের জন্য হজরত ওসমান ব্যয় করেছিলেন দশ হাজার দিরহাম মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী বলেছেন, ওই অর্থ তিনি দিয়েছিলেন উষ্ট্রারোহী ও অশ্বারোহীদের উট ও ঘোড়ার সাজ সজ্জার জন্য। রসুল স. তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন— ইয়া ইলাহী! তুমি ওসমানের প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তাঁর প্রতি প্রসন্ন।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা থেকে ইমাম আহমদ, তিরমিজি ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক উত্তম আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওসমান এক হাজার দিনার নিয়ে রসুল স. এর কোলের উপর রাখলেন। রসুল স. সেগুলোকে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, আজকের পর থেকে ওসমান যে আমলই করুক না কেনো, তার কোনো অনিষ্ট হবে না (তার কোনো আমলের গোনাহ্ হবে না অথবা কোনো গোনাহ্ তাঁর দ্বারা হবেই না)।

হজরত ইবনে উকবা বলেছেন, মুনাফিকরা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তারা মনে করেছিলো, রসুল স. তাবুক থেকে আর ফিরে আসতে পারবেন না। কিন্তু তিনি স. যখন সশরীরে ফিরে এলেন, তখন তারা বিভিন্ন কৈফিয়ত পেশ করতে শুরু করলো। মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে রসুল স. এর নিকটে মুনাফিকেরা বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলো। রসুল স. তাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। ওই মুনাফিকদের সংখ্যা ছিলো আশির অধিক। তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৪২

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○

❐ আশু লাভের সম্ভাবনা থাকিলে ও যাত্রাপথ নাতিদীর্ঘ হইলে উহারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করিত, কিন্তু উহাদিগের নিকট যাত্রা পথ সুদীর্ঘ মনে হইল। উহারা আল্লাহের নামে শপথ করিয়া বলিবে 'পারিলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদিগের সংগে বাহির হইতাম।' উহারা নিজদিগকেই ধ্বংস করে। উহারা যে মিথ্যাচারী ইহা তো আল্লাহ্ জানেন।

বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যে সকল মুনাফিক তাবুক অভিযান থেকে বিরত ছিলো, তাদের কপটতাকে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে— 'আশু লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও যাত্রাপথ নাতিদীর্ঘ হলে তারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করতো, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হলো।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! তাবুক যদি দূরের পথ না হতো এবং সহজে গণিমত পাবার সম্ভাবনা যদি থাকতো তবে মুনাফিকেরা নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে গমন করতো। কিন্তু তাদের নিকট তাবুকের পথ মনে হলো সুদীর্ঘ।

এখানে 'সাকারান ক্বাসেদান্' অর্থ— নাতিদীর্ঘ যাত্রাপথ। আর 'বাউদাত' অর্থ— সুদীর্ঘ যাত্রাপথ। দীর্ঘ পথ পরিক্রমণ শ্রমসাধ্য। তাই দীর্ঘ যাত্রাপথকে

www.eelm.weebly.com

এখানে বলা হয়েছে বাউদাত। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'বাউদাত' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মুনাফিকদের অনীহাকে। কারণ দীর্ঘ পথযাত্রার বাসনা তাদের ছিলোই না। তাই পথের দৈর্ঘ তাদের কাছে হয়ে উঠেছিলো একটি অজুহাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, পারলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে বের হতাম।' এ কথার অর্থ— হে আল্লাহর রসুল! মুনাফিকদের ওজরকে গ্রাহ্য করবেন না। আপনি তাবুক থেকে মদীনায় ফিরে এলে দেখবেন মুনাফিকেরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, আমরা ছিলাম অসমর্থ। সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই আমরা আপনার সঙ্গে যুদ্ধে যেতাম। এখানে 'সামর্থ্য থাকলে' অর্থ আমাদের শারীরিক সুস্থতা এবং প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সরঞ্জাম থাকলে। কিন্তু মুনাফিকেরা ছিলো মিথ্যাবাদী। শারীরিক সুস্থতা যেমন তাদের ছিলো, তেমনি ছিলো যুদ্ধ সরঞ্জামও। কিন্তু শ্রমসাধ্য সফর ও গণিমতের অনিশ্চয়তাই তাদেরকে যুদ্ধ বিমুখ করেছিলো। কারণ, তারা ছিলো কপটচারী (মুনাফিক)।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করে। তারা যে মিথ্যাচারী তা তো আল্লাহ্ জানেন।' রসুল স. এর অনানুগত্য, মিথ্যাচার ও মিথ্যা কসম খাওয়ার কারণেই মুনাফিকেরা আযাবের উপযুক্ত হয়েছে। এভাবেই তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের পথ করেছে প্রশস্ত। আর আল্লাহ্ তাদের মিথ্যাচারিতা সম্পর্কে তো জানেনই।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৪৩, ৪৪, ৪৫

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ○ لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ○ اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ○

❑ আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন! কাহারা সত্যবাদী তাহা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কাহারা মিথ্যাবাদী তাহা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে?

www.eelm.weebly.com

❐ যাহারা আল্লাহে ও পরকালে বিশ্বাস করে তাহারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা সংগ্রামে অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না। আল্লাহ্ সাবধানীদিগের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

❐ তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল উহারাই যাহারা আল্লাহে ও পরলোকে বিশ্বাস করে না এবং যাহাদিগের চিত্ত সংশয়যুক্ত। উহারা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।

প্রথমেই বলা হয়েছে— আ'ফাল্লহু আ'নকা (আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন)! এরপর বলা হয়েছে— 'কারা সত্যবাদী তা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি কেনো তাদেরকে অব্যাহতি দিলে?' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আল্লাহ্পাক আপনার উপর নিরতিশয় সদয়। তাই অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও মুনাফিকদেরকে অব্যাহতি দানের বিষয়টিকে তিনি ধরেননি। কিন্তু উচিত ছিলো মুনাফিকদের অসার অজুহাতকে পরীক্ষা করা। আপনি সরল মনে তাদের অসার অজুহাতকে সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা উচিত্ ছিলো যে, তাদের মধ্যে সত্যবাদী কে? মিথ্যাবাদীই বা কে? এ রকম না করে আপনি ঢালাওভাবে তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন কেনো? 'আমরা যুদ্ধে যেতে অসমর্থ'— এ ধরনের শঠতাপূর্ণ অজুহাতকে মেনেই বা নিলেন কেনো?

সুফিয়ান বিন উয়াইনিয়া বলেছেন, রসুল স. এর প্রতি অসীম মেহেরবাণী ও অনন্য মর্যাদা প্রকাশের জন্যই এখানে ভুলের উল্লেখের পূর্বে এভাবে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে। এ ধরনের বাক্য সদয় স্মরণমূলক, অভিযোগমূলক নয়। আমি বলি, রসুল স. এর আল্লাহভীতি ছিলো অতুলনীয়। তাই তাঁর ভয় বিহ্বলতা প্রশমনার্থে এখানে প্রথমেই বলে নেয়া হয়েছে 'আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন।' অনুযোগ উত্থাপিত হয়েছে পরে। এ রকম না করা হলে রসুল স. আল্লাহ্র ভয়ে পৃথিবীর জীবন পরিত্যাগ করতেও পারতেন।

কেউ কেউ বলেছেন, 'আফাল্লহু আনকা' কথাটি এখানে বলা হয়েছে সৌহার্দ-প্রকাশক সম্ভাষণ হিসাবে। অনুযোগের বিষয়টি এখানে গৌণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে— কেউ তাঁর একান্ত সুহৃদকে বললেন, আল্লাহ্পাক তোমার প্রতি সদয় হোন, তুমি তো দেখা সাক্ষাত করতেও আসো না। কেউ কেউ আবার বলেছেন, কথাটির অর্থ এখানে এ রকম— হে আমার রসুল! আপনার প্রতি আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমাপ্রবাহ নিরন্তর।

জ্ঞাতব্যঃ কাযী আয়ায তাঁর 'আশশিফা' গ্রন্থে লিখেছেন, এখানে 'আফা' শব্দটির অর্থ 'ক্ষমা' নয়। কথাটির অর্থ এখানে অব্যাহতি দান। প্রথমেই অব্যাহতি বা দায়মুক্তির ঘোষণা দেয়া হলে ক্ষমার প্রশ্ন আর উঠতেই পারে না। যেমন, রসুল স. বলেছেন, আকাল্লহু লাকুম আন সাদাক্বাতিল খইলি ওয়ার রক্বীব (আল্লাহ্পাক

www.eelm.weebly.com

ঘোড়া ও পরিচারক-পরিচারিকার জাকাত প্রদান করা থেকে তোমাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন)। অর্থাৎ— এগুলোর জাকাত ওয়াজিব করেননি। কুশাইরিও এ রকম বলেছেন। কাযী আয়ায আরো লিখেছেন, এখানে 'ক্ষমা করুন' কথাটির অর্থ এ রকমই। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, মুনাফিকদের অব্যাহতি দেয়া যাবে না— এ রকম কোনো নিষেধাজ্ঞা রসুল স. এর উপরে ছিলো না। সুতরাং নিষেধাজ্ঞা লংঘন এবং নিষেধাজ্ঞা লংঘনজনিত অপরাধও এখানে অনুপস্থিত। তাই এখানে ভর্ৎসনাজনিত কোনো বক্তব্য নেই। যারা মুনাফিকদের অব্যাহতি দানকে অপরাধ সাব্যস্ত করে আয়াতটিকে ক্রোধপ্রকাশক আয়াত বলেছেন এবং এ কারণে এখানে রসুল স. কে মার্জনা করা হয়েছে মনে করেছেন, তারা ভুল করেছেন। নাফতুইয়া বলেছেন, মুনাফিকদের অজুহাত গ্রহণ করা না করার বিষয়টি ছিলো সম্পূর্ণতঃই রসুল স. এর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ্পাক তাঁকে যেমন শত্রুর শত্রুতা থেকে হেফাজত করেছেন, তেমনি হেফাজত করেছেন গোনাহ্ থেকে।

'লিমা আজিনতা লাহুম (কেনো অব্যাহতি দিলে)কথাটির অর্থ এখানে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে অব্যাহতি দিতে বিলম্ব করলেন না কেনো? ত্বরিৎ অব্যাহতি না দিলেই বিষয়টি আপনার নিকট ধরা পড়তো যে, তারা মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রসুল স. মুনাফিকদের শঠতা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন না।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, আমর ইবনে মাইমুন বলেছেন, রসুল স. এর দু'টি কাজ কোনো পূর্ব নির্দেশের লংঘন না হলেও আল্লাহ্তায়ালা সমীচীন মনে করেননি। একটি হচ্ছে— মুক্তিপণ গ্রহণের মাধ্যমে বদরের যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তি দান (ইতোপূর্বে এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে), আর একটি হচ্ছে এই— আয়াতে উল্লেখিত মুনাফিকদেরকে যুদ্ধগমন থেকে নিষ্কৃতি দান। আর এ দু'টো ক্ষেত্রে আল্লাহ্তায়ালার অসন্তোষও বর্ণিত হয়েছে প্রিয়জনোচিত সংক্ষোভরূপে— অন্তরঙ্গ অনুযোগের ভিত্তিতে।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা সংগ্রামে অব্যাহতি পাওয়ার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না। আল্লাহ্ সাবধানীদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনে রাখুন, যারা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী, আল্লাহ্ ও কিয়ামতে প্রত্যয়ী, তারা মুনাফিকদের মতো জেহাদ বিমুখ নয়। আল্লাহ্র পথে জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত নয়। জেহাদ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য অযথা অজুহাত উপস্থিত করা তাদের স্বভাব নয়। তারা আপনার নির্দেশনার জন্য সদা অপেক্ষমাণ। তারা আপনার কথা শোনামাত্র তা প্রতিপালন করতে সদা সচেষ্ট। কারণ তারা মুত্তাকী (সাবধানী)। আর তাদের মানস ও স্বভাব সম্পর্কে আল্লাহ্পাক ভালো করেই জানেন (তিনি তাদেরকে যথাসময়ে যথাপ্রতিদান প্রদান করবেন)।

এরপরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল তারাই, যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যাদের চিত্ত

www.eelm.weebly.com

সংশয়যুক্ত। তারাতো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।' এখানেও বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপনের কথা। এতে করে বুঝা যায়, জেহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তোষ লাভ এবং আখেরাতে পুণ্য প্রাপ্তি। এ রকম উদ্দেশ্য মুনাফিকদের নেই। তাদের চিত্ত দ্বিধাসংশয়বিজড়িত। ওই সংশয়ের কারণে তারা তাদের সুবিধামতো কখনো কখনো মুসলমানদের সঙ্গে জেহাদে গমন করে, আবার কখনো বিরত থাকে। যখন তারা মনে করে অনায়াসে বিজয় লাভ হবে এবং গণিমত লাভ করা যাবে, তখন তারা জেহাদে অংশগ্রহণ করে। আর যখন মনে করে প্রতিপক্ষের আক্রমণে মুসলমানেরা টিকতে পারবে না, জেহাদে গমন করতে গেলে অতিক্রম করতে হবে সুদীর্ঘ পথ, তখন বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করে অব্যাহতি প্রার্থনা করে রসুল স. এর নিকটে।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৪৬

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ۝

❑ উহারা বাহির হইতে চাহিলে উহারা নিশ্চয়ই ইহার জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিত, কিন্তু উহারা যাত্রা করে ইহা আল্লাহের মনঃপূত ছিল না, সুতরাং তিনি উহাদিগকে বিরত রাখেন এবং উহাদিগকে বলা হয় 'যাহারা বসিয়া আছে তাহাদিগের সহিত বসিয়া থাক।'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মুনাফিকেরা যুদ্ধ করতে অনীহ। জেহাদ তাদের মনঃপূত নয়। যদি হতো, তবে তারা পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতো। সংগ্রহ করতো অস্ত্রসস্ত্র ও বাহন। তাদের এমতো মনোভাব আল্লাহ্‌রও মনঃপূত নয়। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে রেখে দিয়েছেন তাদের কপটতা ও অনীহার সঙ্গে। তাই তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে— যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে বসে থাকো। অর্থাৎ তোমরা বসে থাকো অসুস্থ হয়ে কিংবা বিকলাঙ্গ হয়ে অথবা সংসারমগ্ন হয়ে। এ রকমও হতে পারে যে, 'যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে বসে থাকো'— এ কথাটি মুনাফিকদের। এখানে তাদের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ তারা একে অপরকে বলেছিলো, তোমরা যে যার মতো ঘরে বসে থাকো (যারা জেহাদ ত্যাগ করে ঘরে বসে আছে, তাদের মতো তোমরাও ঘরে বসে থাকো)। রসুল স. মুনাফিকদেরকে লক্ষ্য করে এ রকম বলেছিলেন, এ কথাও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ রসুল স. অজুহাত উত্থাপনকারী মুনাফিকদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে বসে থাকো।

www.eelm.weebly.com

তাবুক অভিযানঃ নবম হিজরীর রজব মাস। রসুল স. মদীনার বাইরে সানিয়াতুল বিদায় সেনা সমাবেশ ঘটালেন। সেনা সংখ্যা দাঁড়ালো তিরিশ সহস্রাধিক। এ রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন মোহাম্মদ বিন ইসহাক, মোহাম্মদ বিন আমর এবং ইবনে সা'দ। হাকেম তাঁর 'আল ইকলিল' গ্রন্থে হজরত মুয়াজ থেকেও এ রকম উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি আরো লিখেছেন, আবু জারআ রাজী অভিমত প্রকাশ করেছেন, তাবুক অভিযাত্রীদের সংখ্যা ছিলো সত্তর হাজার। অর্থাৎ অগ্রগামী বাহিনী ও অনুগামী বাহিনী মিলে সর্বমোট সৈন্য ছিলো সত্তর হাজার। উপরে বর্ণিত মতপার্থক্য দূর করার জন্য হাকেম বিভিন্ন যুক্তি দিয়েছেন। বলেছেন, দশ হাজার ছিলো কেবল অশ্বারোহী।

আবদুর রাজ্জাক ও ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, রসুলুল্লাহ্ স. তাবুক অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন বৃহস্পতিবার। যাত্রা শুরুর দিন হিসেবে বৃহস্পতিবারই ছিলো তাঁর পছন্দ।

হিশামের অভিমতানুসারে রসুল স. মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন, হজরত মোহাম্মদ বিন মুসলিমা আনসারীকে। জারওয়াদীর বর্ণনায় এসেছে, তখন রসুল স. এর স্থলবর্তী নির্ধারিত হয়েছিলেন, হজরত সাবায় বিন ইরফাজা। মোহাম্মদ বিন ওমর এবং ইবনে সা'দ লিখেছেন, কেউ কেউ বলেছেন, তাবুক অভিযানকালে মদীনায় রসুল স. এর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হয়েছিলেন হজরত ইবনে উম্মে মাকতুম। আমাদের মতে, মোহাম্মদ বিন মুসলিমা ছিলেন তখন মদীনায় রসুল স. এর স্থলবর্তী। তিনি তাবুক ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধে রসুল স. থেকে পৃথক ছিলেন না।

আবু ওমর বলেছেন, রসুল স. তাবুক যাত্রার সময় মদীনায় তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্তি দিয়েছিলেন হজরত আলীকে। ইবনে দাহিয়াও এ রকম উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এটাই সঠিক। হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে যথাসূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, যখন রসুল স. তাবুক যাত্রা করলেন, তখন মদীনায় তাঁর স্থলবর্তী হিসেবে রেখে গেলেন হজরত আলী ইবনে আবু তালেবকে। মোহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. হজরত আলীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে আহলে বাইতের দেখাশুনার ভার দিয়েছিলেন। মুনাফিকেরা এই নিয়ে অপপ্রচার শুরু করে দিলো। বলাবলি করতে লাগলো, রসুল স. আলীর প্রতি অপ্রসন্ন, তাই তাঁকে বোঝা মনে করে পরিত্যাগ করেছেন। হজরত আলী এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রসজ্জিত হয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন এবং পথিমধ্যে মিলিত হলেন রসুল স. এর সঙ্গে। রসুল স. তখন অবস্থান করছিলেন জরফ নামক স্থানে। হজরত আলী রসুল স.কে সব কথা খুলে বললেন। রসুল স. বললেন, ওরা মিথ্যাবাদী। আমি তোমাকে রেখে এসেছিলাম আমার ও তোমার গৃহের তত্ত্বা-

www.eelm.weebly.com

বধায়করূপে। হে আলী! তুমি কি এ কথা জেনে প্রসন্ন নও যে, মুসার সঙ্গে হারুনের যে সম্পর্ক ছিলো, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক সেরূপ। কিন্তু আমার পরে কোনো নবী নেই (পার্থক্য কেবল এতটুকুই)। এ কথা শুনে প্রফুল্লচিত্ত হজরত আলী ফিরে এলেন মদীনায়। বোখারী, মুসলিম।

মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার কিছু অনুরক্তদেরকে সঙ্গে নিয়ে সেনাসমাবেশস্থল পর্যন্ত গিয়েছিলো। সেখান থেকে রসুল স. যখন তাবুক অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসে এবং বলতে থাকে, এই অসহ্য গরমের মধ্যে সুদীর্ঘ পথের অভিযাত্রী হয়েছেন রসুল স.। এতো দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তিনি বনী আসফার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান। কিন্তু সে ক্ষমতা কি তাঁর আছে? বনী আল আসফারের সঙ্গে যুদ্ধ করা কি একটা তামাশা নাকি? আল্লাহ্র কসম! আমি নিশ্চিত যে, মোহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে বন্দী করা হবে। আর আমি তা দেখতেও পাবো। এসকল কথা রসুল স. এর কানে পৌঁছলো। তিনি স. বুঝলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ফেত্না সৃষ্টি করে চলেছে। আল্লাহ্পাক তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও তাঁর অনুগামীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ করলেন নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৪৭, ৪৮

لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَّلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌۢ بِالظَّٰلِمِينَ ۝ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَٰرِهُونَ ۝

❒ উহারা তোমাদিগের সহিত বাহির হইলে তোমাদিগের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করিত এবং তোমাদিগের মধ্যে ফিত্না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদিগের মধ্যে ছুটাছুটি করিত। তোমাদিগের মধ্যে উহাদিগের কথা শুনিবার লোক আছে। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদিগের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

❒ পূর্বেও উহারা ফিত্না সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল এবং উহারা তোমার কর্ম পণ্ড করিবার জন্য গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়াছিল যতক্ষণ না উহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য আসিল এবং আল্লাহের আদেশ ব্যক্ত হইল।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে — 'তারা তোমাদের সঙ্গে বের হলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করতো।' বিভ্রান্তি বৃদ্ধি করার কথা এখানে বুঝানো হয়েছে 'ইল্লা খাবালা' কথাটির মাধ্যমে। 'খাবালা' অর্থ বিভ্রান্তি। আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— মুনাফিকেরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করলে ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ হতো না। মুনাফিকেরা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতোই। অপপ্রচার করতো, বিভিন্ন কথা বলে মুসলমানদের অন্তরে সৃষ্টি করতো শত্রুভীতি। গোপনে শত্রুকে সাহায্য করতো, প্রতারণা করতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের মধ্যে ফেত্না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করতো।' এখানে 'আউদ্বাউ' অর্থ ছুটাছুটি করা। যেমন— 'ওয়াদ্বাআল বাইরু ওয়াদ্বাআন' অর্থ— উটের দ্রুত ধাবমানতা। 'খিলাল' অর্থ এখানে— তোমাদের মধ্যে। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— মুনাফিকেরা দ্রুত সৃষ্টি করতো বিভিন্ন রকমের বিশৃঙ্খলা। শুরু করতো উদ্দীপনাবিরোধী কথাবার্তা। মুসলমানদেরকে সাহায্য তো করতোই না, বরং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দ্রুত পালিয়ে গিয়ে তাদেরকে ফেলে দিতো বেকায়দায়। মতপার্থক্য সৃষ্টি করতো মুসলমানদের মধ্যে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, কথাটির অর্থ এখানে — মুনাফিকেরা এমন অপকর্ম ঘটাতো যাতে করে সৃষ্টি হতো ফেত্না। মুজাহিদগণের মধ্যে সৃষ্টি করতো অনৈক্য, শত্রুভীতি ইত্যাদি। কাতাদাও এ রকম বলেছেন।

এরপর বলা হয়েছে — 'তোমাদের মধ্যে তাদের কথা শুনবার লোক আছে।' এ কথার অর্থ — হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যেও রয়েছে কিছু দুর্বলচিত্ত ও অজ্ঞ। তারা মুনাফিকদের অপপ্রচারে বিশ্বাস করতো। ফলে ফেত্না ছড়িয়ে পড়তো চরম আকারে।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।' এ কথার অর্থ— ওই সকল মুনাফিক নিঃসন্দেহে সীমালংঘনকারী (জালেম)। আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোভাবে জানেন (তিনি তাদেরকে যথাসময়ে যথাশাস্তি প্রদান করবেন)।

পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'পূর্বেও তারা ফেত্না সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো এবং তারা তোমার কর্ম পণ্ড করবার জন্য গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছিলো।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! স্মরণ করুন, ইতোপূর্বে উহুদ যুদ্ধের সময়েও মুনাফিকেরা এ রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো। তাদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তার দলবল সহ ফিরে গিয়েছিলো। এভাবে তারা আপনার মহান কর্মকাণ্ড জেহাদকে পণ্ড করে দিতে চেয়েছিলো।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে — 'যতক্ষণ না তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য এসেছিলো এবং ব্যক্ত হয়েছিলো আল্লাহ্র আদেশ।' এখানে 'আল হাক্ব' কথাটির অর্থ হবে— আল্লাহ্র সাহায্য। আর 'জাহারা আমরুল্লহি' অর্থ— আল্লাহ্র আদেশ বা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিজয়। এভাবে বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে — হে আমার রসুল! আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় এসেছিলো বলেই আপনি সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলেন। এই সাহায্য ও বিজয় মুনাফিকদের অভিপ্রায়বিরোধী। কিন্তু তাদের ইচ্ছাবিরুদ্ধ হলেও আল্লাহ্তায়ালা তাঁর সত্যধর্ম ইসলামকে বিজয়ী করেন।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৪৯, ৫০

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ
جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِن تُصِبْكَ
مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ ۝

❐ এবং উহাদিগের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বলে 'আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে ফিত্নায় ফেলিও না।' সাবধান! উহারাই ফিত্নাতে পড়িয়া আছে। জাহান্নাম তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগকে বেষ্টন করিয়াই আছে।

❐ তোমার মঙ্গল হইলে তাহা উহাদিগকে পীড়া দেয় এবং তোমার বিপদ ঘটিলে উহারা বলে 'আমরা তো পূর্বাহ্নেই আমাদিগের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলাম' এবং উহারা উৎফুল্লচিত্তে সরিয়া পড়ে।

মুনাফিক জদ বিন কায়েস সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে— 'এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে ফেত্নায় ফেলো না।' হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মুনজির, তিবরানী, ইবনে মারদুবিয়া, আবু নাঈম এবং হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া ও আপন মাশায়েখ সূত্রে মোহাম্মদ বিন ইসহাক, মোহাম্মদ বিন ওমর ইবনে উকবা বর্ণনা করেছেন, জদ বিন কায়েস তার দশ জনেরও কম সঙ্গী নিয়ে মসজিদে অবস্থানরত রসুল স. এর সান্নিধ্যে গমন করলো এবং বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে যুদ্ধ যাত্রা থেকে অব্যাহতি দিন। আমার কিছু ক্ষেত খামার রয়েছে। সেগুলোর দেখাশুনা খুবই জরুরী। তাই যুদ্ধ-গমন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রসুল স. বললেন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। গণিমত হিসেবে বনী আল আসফার (রোমানদের) কোনো রমণীও তো পেয়ে যেতে

www.eelm.weebly.com

পারো। জদ বললো, আমাকে দয়া করে দায়িত্বমুক্ত করুন। বিপদে নিক্ষেপ করবেন না। আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা ভালোভাবেই জানে যে, আমার চেয়ে অন্য কেউ অধিক রমণীপ্রেমিক নয়। আমার ভয় হয়, রোমান রমণী দেখলে আমি হয়তো নিজেকে সংবরণ করতে পারবো না। রসুল স. তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, অনুমতি দেয়া হলো।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে এই কথাগুলো— জদ বিন কায়েসের পুত্র হজরত আবদুল্লাহ্ ছিলেন খাঁটি ইমানদার। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। হজরত মুয়াজ বিন জাবাল ছিলেন তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই। তিনি তাঁর পিতার ছলচাতুরির কথা জানতে পেরে বললেন, হে আমার পিতা! আপনি রসুলুল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে বিরত রয়েছেন কেনো? আল্লাহ্‌র শপথ! বনী সালমার মধ্যে আপনিই অধিক সম্পদের অধিকারী। অথচ আপনি জেহাদে যাচ্ছেন না। কোনো মুজাহিদের জন্য বাহনের ব্যবস্থাও করে দিচ্ছেন না। জদ বললো, বৎস! দেখছো তো আবহাওয়া কেমন তপ্ত। এই গরমে কি যুদ্ধ করা যায়? আমি বরং বাড়িতেই থাকি। তা ছাড়া রোমানদের সম্পর্কে আমি নিঃশঙ্কও নই। ওই দুর্ধর্ষ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি সহজ কথা! তার পুত্র হজরত আবদুল্লাহ্ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আপনার কথা তো কপটতায় পরিপূর্ণ। আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয় রসুল স. এর প্রতি আপনার সম্পর্কে কোনো আয়াত অবতীর্ণ হবে। ওই আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা প্রকাশ করে দিবেন আপনার কপটতাকে। এ কথা শুনে জদ রেগে গেলো। রণনিশান উঠিয়ে ছুঁড়ে মারলো পুত্রের মুখের উপর। হজরত আবদুল্লাহ্ নীরবে প্রস্থান করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

তিবরানী, ইবনে মারদুবিয়া এবং আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. জদ বিন কায়েসকে বললেন, রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? জদ বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! নারীদের প্রতি আমি খুবই দুর্বল। রোমান নারী দেখলে আমি ফেত্‌নার মধ্যে পড়ে যাবো। সুতরাং আপনি আমাকে এখানেই থাকতে দিন। দয়া করে আমাকে ফেত্‌নায় নিক্ষেপ করবেন না। তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. জদ বিন কায়েসকে বললেন, হে আবু ওয়াহাব! রোম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তোমার মতামত কি? যুদ্ধে গেলে তুমিও পেয়ে যেতে পারো বাঁদী অথবা গোলাম। জদ বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে, রমণী দর্শনে আমি বিমোহিত হয়ে পড়ি। ভাবছি, রোমান রমণীকে দেখলে আমিতো নিজেকে সামলাতে পারবো না। অতএব আমাকে যুদ্ধযাত্রা থেকে অব্যাহতি দিন। অযথা আমাকে রমণীদের ফেত্‌নায় ফেলবেন না। আমি বরং আপনাকে কিছু আর্থিক সাহায্য করবো। ভিন্নসূত্রে তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, রসুল স. তাবুক যুদ্ধের সময় ঘোষণা দিয়েছিলেন, যুদ্ধযাত্রা করো। গণিমত হিসেবে পাবে রোমান নারী। এ ঘোষণা শুনে কোনো কোনো মুনাফিক বলতে শুরু করলো, দেখো তোমাদেরকে তো নারীর লোভ দেখানো হচ্ছে। তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে এ কথা জানা গেলো যে, এখানে 'আমাকে ফেত্‌নায় ফেলো না' কথাটির অর্থ হবে এ রকম — আমাকে রমণীর প্রলোভন দেখিয়ো না। রোমান সুন্দরীদের দেখলে আমি ধৈর্যধারণ করতে পারবো না। শেষে ফেত্‌নায় পড়ে গোনাহ্ করে ফেলবো এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ হবে— আমার সম্পদ ও বিবি বাচ্চাদের ক্ষতি হবে। আমি যুদ্ধে গেলে তাদের দেখাশুনার কেউ থাকবে না। ফলে তারা কষ্ট পাবে।

কেউ কেউ বলেছেন, মুনাফিক জদ বিন কায়েসের কথার অর্থ হবে এ রকম— হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাকে স্বগৃহে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করুন। নতুবা আপনার নির্দেশ পালন না করার কারণে আমি গোনাহ্‌গার হবো। ফেত্‌নায় নিপতিত হবো।

এরপর বলা হয়েছে— 'সাবধান! তারাই ফেত্‌নায় পড়ে আছে।' এ কথার অর্থ— যুদ্ধ গমন না করাই তো ফেত্‌না। যুদ্ধ বিমুখ হওয়ার কারণে তাদের কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এভাবে নিজেকে মুনাফিক হিসেবে চিহ্নিত করা ফেত্‌না নয়তো কি? সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি মুনাফিকদের সম্পর্কে সাবধান হোন।

শেষে বলা হয়েছে— 'জাহান্নাম তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে বেষ্টন করেই রয়েছে।' এ কথার অর্থ— এ সকল কপট সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য জাহান্নাম তো নির্ধারিত রয়েছেই। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, এ ধরনের মুনাফিকেরা জাহান্নামে প্রবেশের কারণসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং সন্দেহ নেই যে, তারা জাহান্নাম দ্বারাই পরিবেষ্টিত।

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'তোমার মঙ্গল হলে তা তাদেরকে পীড়া দেয় এবং তোমার বিপদ ঘটলে তারা বলে, আমরা তো পূর্বাহ্নেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম এবং তারা উৎফুল্লচিত্তে সরে পড়ে।' এখানে 'ইনতুসিবকা হাসানাতুন তাসুহুম' কথাটির অর্থ— তোমার মঙ্গল হলে তা তাদেরকে পীড়া দেয়।' এখানে হাসানাতুন অর্থ— বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। 'ওয়া ইনতুসিবকা মুসীবাতুন' অর্থ — এবং তোমার বিপর্যয় ঘটলে। এখানে 'মুসীবাতুন' অর্থ পরাজয় অথবা কঠিন মুসীবত— উহুদ যুদ্ধে যেমনটি ঘটেছিলো। উহুদ যুদ্ধের সময় মুনাফিকেরা কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এসেছিলো। যুদ্ধে মুসলমানদেরকে পর্যুদস্ত দেখে খুশী হয়েছিলো খুব। নিজেদের দূরদর্শীতার প্রশংসা

www.eelm.weebly.com

করে বলেছিলো, আমরা তো পূর্বাহ্নেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম। এ কথা বলে উৎফুল্লচিত্তে সরে পড়েছিলো তারা। আলোচ্য আয়াতে এ কথাগুলোই উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰـنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ○ قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۖ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

❒ বল, 'আমাদিগের জন্য আল্লাহ্ যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা ব্যতীত আমাদিগের অন্য কিছু হইবে না; তিনি আমাদিগের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহের উপরই বিশ্বাসীদিগের নির্ভর করা উচিত।'

❒ বল, 'তোমরা আমাদিগের দুইটি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষা করিতেছ এবং আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি যে আল্লাহ্ তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন সরাসরি নিজ পক্ষ হইতে অথবা আমাদিগের হস্ত দ্বারা, অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও তোমাদিগের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।'

❒ বল, 'তোমাদিগের অর্থ সাহায্য ইচ্ছাকৃত হউক অথবা অনিচ্ছাকৃত হউক তোমাদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইবে না; তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।'

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— ক্বুল লাঁই ইয়ুসীবানা ইল্লা মা কাতাবাল্লহু লানা (বলো, আমাদের জন্য আল্লাহ্ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছুই হবে না)। এ কথার অর্থ — হে আমার রসুল! আপনি মুনাফিকদেরকে বলে দিন, যুদ্ধে বিজয় অথবা শাহাদাত, যা কিছুই আমাদের অদৃষ্টলিপি হিসেবে আল্লাহ্পাক লওহে মাহ্ফুজে লিখে রাখুন না কেনো, তা ছাড়া অন্য কিছুই ঘটবে না। আরবী ভাষায় 'লাম' কল্যাণের জন্য এবং 'আলা' অকল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'লানা।' 'আলাইনা' অর্থাৎ 'লানা আও আলাইনা' বলা হয়নি। তাই আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবে এ রকম—

www.eelm.weebly.com

আমাদের কল্যাণ অথবা অকল্যাণ, যা কিছুই আল্লাহ্‌পাক আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রাখুন না কেনো, তা ছাড়া অন্য কিছুই হবে না। আর কল্যাণ ও অকল্যাণ (বিজয় ও শাহাদাত) — সবকিছুই তো আমাদের জন্য কল্যাণকর।

হজরত সুহাইব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীদের অবস্থা বিস্ময়কর। তাদের প্রতিটি বিষয় উত্তম। সবকিছু কল্যাণকর হওয়া বিশ্বাসীদেরই বৈশিষ্ট্য। সুখের সময় তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাই সুখ তাদের জন্য কল্যাণকর। আবার দুঃখের সময় তারা ধৈর্য ধারণ করে। তাই দুঃখও তাদের জন্য কল্যাণকর। আহমদ, মুসলিম। হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে বায়হাকীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— হুয়া মাওলানা (তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালাই প্রকৃত কর্মবিধায়ক। সুতরাং বিশ্বাসীদের প্রতি তিনি কোনো অকল্যাণ নির্ধারণ করতেই পারেন না।

শেষে বলা হয়েছে— ওয়া আ'লাল্লহি ফাল ইয়াতাওয়াক্‌কালিল মু'মিনুন (এবং আল্লাহ্‌র উপরই বিশ্বাসীদের নির্ভর করা উচিত)। এখানে 'আলাল্লহি' (আল্লাহ্‌র উপর) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই উহ্য ক্রিয়াটি এখানে উল্লেখিত ক্রিয়াকে (নির্ভর করা) অধিকতর গুরুত্ববহ করেছে। আর 'ফালইয়াতাওয়াক্‌কালি' কথাটির 'ফা' এর মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো উপর নির্ভর করা ইমানদারদের জন্য অনুচিত। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালাই প্রকৃত কর্মবিধায়ক এবং সকল বিষয়ে তিনি ক্ষমতাবান।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষা করছো।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল মুনাফিককে বলুন, হে মুনাফিকেরা! তোমরা চাও দু'টি কল্যাণের (বিজয় ও শাহাদাতের) একটি আমাদের ক্ষেত্রে ঘটুক। অর্থাৎ তোমরা চাও যে আমরা শহীদ হই। কিন্তু তোমরা এ কথা জানো না যে বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মতো আল্লাহ্‌র পথে জীবনপাত করাও আমাদের নিকটে সমান প্রিয়। শাহাদাতও আমাদের জন্য কল্যাণ।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ইমান রেখে এবং রসুল স. কে সত্য জেনে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদের উদ্দেশ্যে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় (পার্থিব কোনো অর্জন যদি উদ্দেশ্য না হয়), তার সঙ্গে আল্লাহ্‌পাক এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, আমি হয় তোমাকে সওয়াব ও গণিমতসহ ফিরিয়ে আনবো অথবা (শহীদ করে) প্রবেশ করাবো জান্নাতে। বোখারী, মুসলিম। এ কথার অর্থ— আমি মুজাহিদদেরকে যে কোনো

www.eelm.weebly.com

একটি নেয়ামত দান করবোই। বিজয় অথবা জান্নাত। কথাটির অর্থ এ রকম নয় যে, যুদ্ধ বিজয়ীরা জান্নাতে গমন করবেন না। প্রকৃত অর্থ এই যে, শহীদরা জান্নাত লাভ করবেন সরাসরি। আর যুদ্ধবিজয়ীরা জান্নাতে প্রবেশ করবেন পরে— পৃথিবীর জীবন পরিসমাপ্তির পর।

এরপর বলা হয়েছে — 'এবং আমরা প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন সরাসরি নিজ পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাতের মাধ্যমে, অতএব তোমরা প্রতিক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।' এ কথার অর্থ— হে মুনাফিকেরা! কিয়ামতের দিন আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে ভয়াবহ আঘাতে নিপতিত করবেন, যদি তোমরা যুদ্ধে জয়লাভ করতে সমর্থ হও। অথবা পৃথিবীতেই আমাদের হস্তধৃত অস্ত্রের মাধ্যমে তোমাদের উপর নেমে আসবে আযাব এবং হয়ে যাবে চির অগ্নিবাসী, যদি আমরা বিজয়ী হই। এই নির্দেশনাটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। অর্থাৎ সকল প্রকার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য এই নির্দেশনাটি প্রযোজ্য। যদি নির্দেশনাটি কেবল মুনাফিকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে মুনাফিকেরা! তোমাদের অন্তরের অবিশ্বাস ও কপটতা সংগুপ্ত থাকলেও তোমরা মৃত্যুবরণ করবে অবিশ্বাসের সঙ্গে। বিগত অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মতো দুনিয়াতেও তোমাদের উপরে নেমে আসবে আল্লাহ্র আযাব। আর যদি তোমরা তোমাদের অন্তরের সংগুপ্ত অবিশ্বাসকে প্রকাশ করে দাও, তবুও তোমাদের মৃত্যু হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরূপে। মৃত্যুর পর তোমাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি। এভাবে প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ শাস্তি তোমাদের জন্য অবধারিত।

হাসান বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে এ রকম— হে কপটচারী এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী! শয়তান তোমাদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছে তোমরা সেই অঙ্গীকারের প্রতীক্ষা করো। আর আমাদের সঙ্গে ধর্মের পরিপূর্ণ বিজয়ের যে অঙ্গীকার আল্লাহ্তায়ালা করেছেন, আমরা প্রতীক্ষা করি সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের শেষটিতে বলা হয়েছে — 'বলো, তোমাদের অর্থ সাহায্য ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত হোক, তোমাদের নিকট থেকে গৃহীত হবে না।' এখানে 'ত্বাওআন্' অর্থ ওই অর্থ সাহায্য, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে আবশ্যিক নয়। আর 'কারহান' অর্থ ওই অর্থ সাহায্য, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে প্রদান করা আবশ্যিক। এ রকম আবশ্যিক অর্থ সাহায্য মুনাফিকদের জন্য বিস্বাদপূর্ণ। তাই এ রকম অর্থ সাহায্যকে এখানে অনিচ্ছাকৃত অর্থ সাহায্য বলা হয়েছে। 'আনফিক' কথাটিকে এখানে আদেশসূচক বলা যেতে পারে। যদি তাই হয়, তবে এখানে বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়াবে এ রকম—

www.eelm.weebly.com

মুনাফিকদের ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত অর্থ সাহায্য, কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। আলোচ্য বাক্যটি মুনাফিক জদ বিন কায়েসের একটি কথার প্রত্যুত্তর। সে বলেছিলো, আমি আর্থিক সাহায্য করতে পারি। দু'টি বিষয় নিহিত রয়েছে আলোচ্য বাক্যে— ১. রসুল স. এবং তাঁর স্থলাভিষিক্তরা জ্ঞাতসারে মুনাফিকদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে না। ২. আল্লাহ্ মুনাফিকদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করবেন না। দানের সওয়াবও দিবেন না।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।' এ কথার অর্থ, হে মুনাফিকেরা! তোমরা মুসলমান সম্প্রদায়ভূত নও। তোমরা তো একটি ভিন্ন সম্প্রদায়। সুতরাং তোমাদের সম্পদ মুসলমানদের নিকটে গ্রহণযোগ্য নয়। পরবর্তী আয়াতে কথাটি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এভাবে —

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৫৪

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ○

❒ উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সহিত উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে বলিয়াই উহাদিগের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হইয়াছে।

মুনাফিকদের সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ না করার তিনটি কারণ উল্লেখিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। কারণ তিনটি হচ্ছে— ১. আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি অস্বীকৃতি। ২. নামাজে শৈথিল্য। ৩. দানে আন্তরিকতাহীনতা। প্রকাশ্যে দৃষ্ট না হলেও মুনাফিকদের অন্তর অবিশ্বাস ও কপটতায় পরিপূর্ণ। তাই তাদের সকল আমল প্রদর্শনপ্রবণ। বিশুদ্ধচিত্ততার সঙ্গে তারা সম্পূর্ণ সংশ্রবহীন। তাই তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি সমর্পিত নয়। এই সমর্পণহীনতার প্রকাশ রয়েছে তাদের নামাজে ও দানে। তারা নামাজে দাঁড়ায় শৈথিল্য ও অন্যমনস্কতার সঙ্গে এবং অর্থ সাহায্য করে অনিচ্ছাকৃতভাবে — আনন্দহীন অন্তরে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মুনাফিকেরা অর্থ সাহায্য করে অনিচ্ছাকৃতভাবে। তাই তাদের সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ। কিন্তু পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের অর্থ সাহায্য ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত হোক' — এতে করে বুঝা যায় মুনাফিকেরা ইচ্ছাকৃতভাবেও অর্থ সাহায্য করতে চায়, যদিও তাদের নিকট থেকে কোনো প্রকার সাহায্যই গৃহীতব্য নয়।

www.eelm.weebly.com

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُونَ ○ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ
وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ○ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغٰرٰتٍ
أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ○ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ
فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ○ وَلَوْ
أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتٰهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رٰغِبُونَ ۝

❒ সুতরাং উহাদিগের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো উহার দ্বারাই উহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাহেন। উহারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী থাকা অবস্থায় উহাদিগের আত্মা দেহ ত্যাগ করিবে।

❒ উহারা আল্লাহের নামে শপথ করে যে, উহারা তোমাদিগেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু উহারা তোমাদিগের অন্তর্ভুক্ত নহে, বস্তুতঃ উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহারা ভয় করিয়া থাকে।

❒ উহারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরি-গুহা অথবা কোন প্রবেশস্থল পাইলে উহাতে পলায়ন করিবে ক্ষিপ্র গতিতে।

❒ উহাদিগের মধ্যে এমন লোক আছে যে সাদাকা সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে, অতঃপর ইহার কিছু উহাদিগকে দেওয়া হইলে উহারা পরিতুষ্ট হয় এবং ইহার কিছু উহাদিগকে না দেওয়া হইলে উহারা বিক্ষুব্ধ হয়।

❒ ভাল হইত যদি উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল উহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে পরিতুষ্ট হইত এবং বলিত 'আল্লাহ্ই আমাদিগের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ্ আমাদিগকে দিবেন নিজ করুণায় এবং তাঁহার রসূলও; আমরা আল্লাহেরই প্রতি আসক্ত।'

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতটির মর্মার্থ হচ্ছে — হে আমার রসুল! আপনি যেনো এ রকম মনে না করে বসেন যে, আমি কাফের ও মুনাফিকদেরকে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি প্রসন্নচিত্তে। কখনোই নয়। আমি তো এভাবে তাদেরকে পার্থিব বৈভবের ফাঁদে স্থায়ীভাবে বন্দী করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যু পর্যন্ত তারা যেনো অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি দিবার সুযোগ না পায়। পার্থিবতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে ইমানবিহীন অবস্থায় পৃথিবী পরিত্যাগ করে। হে আমার প্রিয় রসুল! দেখুন, তারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে যেয়ে এবং সন্তান-সন্ততিদের দুশ্চিন্তায় কতো রকম ছল চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি না থাকলেও তারা পুড়তে থাকে আক্ষেপের আগুনে। উভয় অবস্থায়ই তাদের জন্য আযাব।

মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের শব্দ বিন্যাসের মধ্যে (আরবীতে) কিছু অগ্র-পশ্চাত ঘটেছে। সুতরাং অর্থ বিন্যাস হবে এ রকম— হে আমার রসুল! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পার্থিব বৈভব ও বংশবৃদ্ধি দর্শনে বিস্মিত হবেন না। মনে করবেন না যে তাদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালা প্রসন্ন। বৈধাবৈধের তোয়াক্কা না করে তারা উপার্জন ও ব্যয় করে। পুঞ্জীভূত করে রাশি রাশি সম্পদ। পার্থিব জীবনে এটাই তাদের শাস্তি। এই শাস্তিতে নিপতিত থাকা অবস্থায় তারা মৃত্যুবরণ করবে।

ওয়া তাজহাক্বা আনফুসুহুম ওয়াহুম কাফিরূন অর্থ—তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় তাদের আত্মা দেহ ত্যাগ করবে। এখানে 'যাহুক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ ক্লেশকর অতিক্রমণ। অর্থাৎ কাফেরদের আত্মা দেহ ত্যাগ করবে সীমাহীন কষ্ট নিয়ে। মৃত্যুর সময় বৈভবমগ্নতার ভয়াবহ পরিণাম স্পষ্ট হয়ে উঠবে তাদের দৃষ্টির সম্মুখে। কিন্তু ভুল সংশোধনের কোনো উপায়ই তারা পাবে না।

আলোচ্য আয়াতে মোতাজিলাদের একটি অভিমত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। তারা বলে, বান্দার জন্য যা শোভনীয় ও কল্যাণকর আল্লাহ্পাক তা দিতে বাধ্য। কিন্তু এখানে কাফেরদেরকে প্রদত্ত পার্থিব বৈভব ও সন্তান-সন্ততি যে কল্যাণকর অনুদান নয়, সে কথাই প্রমাণিত হয়েছে। স্পষ্ট বলা হয়েছে, শাস্তিদানের অভিলাষে কাফের অবস্থায় তাদের মৃত্যু নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আল্লাহ্পাক তাদেরকে দান করেছেন পার্থিব সফলতা।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বস্তুতঃ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা ভয় করে থাকে।'

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে — 'তারা কোনো আশ্রয়স্থল, কোনো গিরি-গুহা অথবা কোনো প্রবেশস্থল পেলে তাতে পলায়ন করবে ক্ষিপ্র গতিতে।' এখানে 'মালজ্বাআন্' অর্থ আশ্রয়স্থল। 'মাগারাতিন' অর্থ গিরি-গুহা সমূহ। শব্দটি বহুবচনবোধক। এর একবচন হচ্ছে — 'মাগারাত'। শব্দটি এসেছে 'গাওর' থেকে। 'গাওর' অর্থ গোপন স্থান। আতা বলেছেন, শব্দটির অর্থ— সুড়ঙ্গ অথবা সিঁড়ি।

www.eelm.weebly.com

'মুদ্দাখালান্' অর্থ এমন প্রবেশস্থল যেখানে কষ্ট করে প্রবেশ করতে হয়। 'লাওয়াল্লাও ইলাইহি' অর্থ পলায়ন করবে। 'ইয়াজমাহুন' অর্থ ক্ষিপ্র গতিতে, যেমন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ধাবিত হয় পলাতক অশ্ব। এভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে — হে আমার রসুল! জেনে রাখুন যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে অথবা যুদ্ধরত অবস্থায় মুনাফিকেরা ক্ষিপ্রগতিতে পালিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করবে। খুঁজবে নিরাপদ আশ্রয়, পর্বত গহ্বর অথবা এমন স্থান, যেখানে আত্মগোপন করা যায়। এভাবে তারা আপনার নিকট থেকে পৃথক হবেই হবে।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে — 'তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সদ্‌কা সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে।' মুনাফিকেরা রসুল স. এর গণিমত বণ্টনের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতো। আলোচ্য আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী, মুসলিম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন— হুনায়েন যুদ্ধে পরাজিত হাওয়াজেন সম্প্রদায়ের সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে রসুল স. কোনো কোনো নওমুসলিম জননেতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মদীনার এক লোক বলে বসলো, এই বণ্টন আল্লাহ্‌পাকের পরিতুষ্টির অনুকূল নয়। এক্ষেত্রে ইনসাফ করা হয়নি। হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, আমি সাথে সাথে বললাম, আমি অবশ্যই রসুল স. কে এ কথা জানাবো। তাই করলাম আমি। আমার কথা শুনেই রসুল স. এর পবিত্র মুখমণ্ডলের রঙ পরিবর্তিত হলো। তাঁর পবিত্র ত্বক হয়ে উঠলো গাঢ় লাল বর্ণের। তিনি স. বললেন, যদি আল্লাহ্‌র রসুল হয়ে আমি ইনসাফ না করি তবে ইনসাফ করবে কে? রসুল মুসার প্রতি বর্ষিত হোক আল্লাহ্‌র রহমত। তাঁকে তো এর চেয়ে বেশী দুঃখ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন। মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স.কে এভাবে দোষারোপ করেছিলো মো'তাব বিন কুশায়ের। সে ছিলো মুনাফিক।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে ইবনে ইসহাক এবং হজরত জাবের থেকে বোখারী, মুসলিম ও আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হাওয়াজেন সম্প্রদায়ের নিকট থেকে অর্জিত গণিমত বণ্টন করছিলেন। তখন এক লোক রসুল স. এর মুখোমুখি দাঁড়ালো। তিনি স. বললেন, কি বলতে চাও? সে বললো, ইনসাফ করুন। আমি মনে করি আপনার বণ্টন ন্যায়ানুগ নয়। হজরত ইবনে ওমর ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, ওই লোকটি ছিলো তামীম গোত্রের।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, লোকটি বলেছিলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ইনসাফের ভিত্তিতে বণ্টন করুন। তার কথা শুনে রসুল স. কুপিত হন এবং বলেন, আমি ইনসাফ না করলে ইনসাফ করবে কে? ন্যায়বিচার না করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবো আমিই। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন বলেছিলেন, ন্যায়পরায়ণতা যদি আমার নিকটে না থাকে তবে কার নিকটে থাকবে? হজরত ওমর নিবেদন

www.eelm.weebly.com

করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিককে হত্যা করি। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্র আশ্রয় যাঞ্চা করি। একে উপেক্ষা করো। এভাবে একে হত্যা করলে মানুষ বলবে, আমি আমার সঙ্গীদেরকে হত্যা করি। তবে ভালো করে চিনে রাখো এদেরকে। নামাজ রোজার পূর্ণ পাবন্দ হবে এরা। তাদের আমল দেখলে নিজেদের আমল তুচ্ছ মনে হবে তোমাদের কাছে। এরা কোরআন পাঠ করবে কিন্তু কোরআন এদের কণ্ঠনালী থেকে নিচে নামবে না। ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের মতো এরা বেরিয়ে যাবে ধর্ম থেকে। তীব্রগতিসম্পন্ন তীর যেমন শিকারের দেহ ভেদ করে তার শরীরে ক্ষত চিহ্ন না রেখেই পার হয়ে যায়, তেমনি তীব্র হবে এদের পতন। অথচ তার বাহ্যিক কোনো আলামত প্রকাশ পাবে না। তাদের মধ্যে থাকবে এক অতি কুৎসিত লোক। তার করতল হবে রমণীদের স্তনের মতো অথবা মাংশপিণ্ডের মতো পুরুষ্ট। ওই লোক দাঁড়াবে মুসলমানদের প্রতিপক্ষে। মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে সে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমি এ হাদিস স্বকর্ণে শুনেছি। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, হজরত আলী তাঁর খেলাফতকালে নাহ্রোয়ান নামক স্থানে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। আমিও উপস্থিত ছিলাম ওই যুদ্ধক্ষেত্রে। ব্যাপকভাবে শত্রু নিধনের পর আমরা ওই লোকটির মৃতদেহ অনুসন্ধান করতে থাকি। খুঁজতে খুঁজতে একস্থানে দেখি তার মরদেহ। দেখতে পাই রসুল স. কর্তৃক বর্ণিত চিহ্নগুলো সবই রয়েছে ওই মরদেহটির মধ্যে।

বাগবী লিখেছেন, ওই লোকটি ছিলো তামীম গোত্রের। তার সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। এই অভিমতটিই সুদৃঢ়। তার নাম ছিলো খিরাকাওস বিন জুহাইর। খারেজীদেরকে সংঘবদ্ধ করেছিলো সে-ই। কিন্তু আয়াতের শানে নুজুল (অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত) উপরে বর্ণিত অভিমতটিকে সমর্থন করে না। কেননা আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে সদ্কা বণ্টনের কথা। গণিমত বন্টনের কথা এখানে উল্লেখিত হয়নি। বোখারী ও মুসলিমের হাদিসে এসেছে, জিলখুওয়াইসিরা তামিমী এবং মো'তাব বিন কুশায়ের ইনসাফের কথা তুলেছিলো হুনায়েন যুদ্ধে গণিমত বণ্টনের সময়। সুতরাং এটা মানতে হবে যে, এই আয়াতে উল্লেখিত সদ্কা বণ্টনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তদুপরি আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে তাবুক যুদ্ধের সময়— যা সংঘটিত হয়েছিলো হুনায়েন যুদ্ধের অনেক পরে। আমি বলি, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো, তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের সময়। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য রসুল স. তখন সকলকে সদ্কা (দান) করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ওই সদ্কা বণ্টনের সময় কতিপয় মুনাফিক তাঁর বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলো।

কালাবী বলেছেন, আবুল খাওয়াস নামক এক মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। সে বলেছিলো, ন্যায়ানুগতার সঙ্গে বণ্টন করা হচ্ছে না।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'অতঃপর তার কিছু তাদেরকে দেয়া হলে তারা পরিতুষ্ট হয় এবং এর কিছু তাদেরকে না দেয়া হলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়।' এ কথার অর্থ— ওই সকল মুনাফিককে কিছু দিলে খুশী হয়, না দিলে হয় বেজার। অথচ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি প্রসন্ন থাকার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। পরের আয়াতে (৫৯) সে কথাই বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে — 'ভালো হতো যদি তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে পরিতুষ্ট হতো এবং বলতো, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ্ আমাদেরকে দিবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রসুলও; আমরা আল্লাহ্রই প্রতি আসক্ত।' এর মর্মার্থ হচ্ছে — আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দানে পরিতুষ্ট থাকাই বিশ্বাসীদের কর্তব্য। আল্লাহ্র রসুল কখনো আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছু করেন না। সুতরাং হে বিশ্বাসীরা! জেনে রাখো, রসুল স. এর সিদ্ধান্তই আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত। আল্লাহ্ কখনো ন্যায়পরায়ণতাবিরোধী কিছু করেন না। তাঁর রসুলও নয়। সুতরাং তোমরা বলো, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাঁর উপর আস্থা স্থাপনকারীদের প্রতি বড়ই করুণাপরবশ। আল্লাহ্র রসুলও তাঁর অনু-সারীদের প্রতি মহান অনুগ্রহকারী। সুতরাং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল আমাদেরকে নিশ্চয়ই অনুগৃহীত করবেন। আর আমরা কেবল অনুরক্ত আল্লাহ্র প্রতি।

পরবর্তী আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে সদ্কা বণ্টনের নিয়মাবলী। সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী বর্ণনার পর সদ্কা গ্রহণের জন্য যারা লালায়িত হয়েছিলো তারা স্তব্ধ হয়ে যায়। এতে করে এ কথাও প্রমাণিত হয়ে যায় যে, রসুল স. এর বণ্টনপদ্ধতি ছিলো সম্পূর্ণ সঠিক ও ন্যায়ানুগ।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৬০

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

❒ সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদিগের জন্য যাহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাহাদিগের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদিগের, আল্লাহের পথে সংগ্রামকারী ও পর্যটকদিগের জন্য। ইহা আল্লাহের বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

---

www.eelm.weebly.com

বায়যাবী লিখেছেন, এই আয়াতে বিবৃত হয়েছে জাকাত বণ্টনের নিয়মাবলী— যা গণিমত বণ্টনের নিয়মাবলী থেকে পৃথক।

আমি বলি, এই আয়াতে বলা হয়েছে, কেবল নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তরাই পাবে সদ্কা বা জাকাত। তারা সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব হতে পারে আবার কিছু সম্পদের অধিকারীও হতে পারে। তবে এতো পরিমাণ সম্পদ তাদের নিকট থাকা যাবে না যাতে করে তাদেরকে বিত্তবান বলা যায়। কাজেই এখানে ফকির (নিঃস্ব) এবং মিসকিন (অভাবগ্রস্ত) সম্পর্কিত নির্দেশনাটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। অধিকাংশ হানাফী মতাবলম্বীদের অভিমত এই যে, ওই সকল লোক ফকির, যাদের নিকট নেসাবে জাকাত (জাকাত ফরজ হয় এই পরিমাণ অর্থ) থাকে না। সম্পদ থাকলেও তা থাকে নেসাব অপেক্ষা কম। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মাজহাবই অধিকতর গ্রাহ্য। কেননা তিনি ঋণগ্রস্ত মুজাহিদদেরকেও 'ফকির' শব্দের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর অভিমত পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে হজরত মুয়াজ সম্পর্কিত একটি বিবরণে। বিবরণটি এই— হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী, মুসলিম ও সুনান রচয়িতাগণ লিখেছেন, রসুল স. হজরত মুয়াজকে ইয়ামেনের শাসক নিযুক্ত করে প্রেরণের সময় বলেছিলেন, মনে রেখো, তুমি যেখানে যাচ্ছো, সেখানে বসবাস করে আহলে কিতাব জনগোষ্ঠী। তুমি প্রথমে তাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্ কলেমার দাওয়াত দিয়ো। যদি তারা এই কলেমাকে গ্রহণ করে তবে তাদেরকে বোলো, আল্লাহ্পাক তোমাদের উপর দিবারাত্রি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যদি তারা এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে বোলো, আল্লাহ্ তোমাদের বিত্তশালীদের উপর ফরজ করেছেন জাকাত। জাকাত গ্রহণ করা হবে তোমাদের বিত্তবানদের নিকট থেকে এবং তা বণ্টন করে দেয়া হবে তোমাদেরই অভাবগ্রস্তদের মধ্যে। সাবধান! জাকাত হিসেবে পূর্ণ বয়স্ক পশু গ্রহণ কোরো না। অত্যাচারীদের অপপ্রার্থনা থেকে আত্মরক্ষা কোরো। মনে রেখো, মজলুমের বদ্দোয়া সরাসরি আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছে যায়। এক্ষেত্রে কোনো বিলম্ব বা বাধা নেই।

উপরের হাদিস থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, জাকাত গ্রহীতাদেরকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। জিম্মী অথবা স্বাধীন কোনো অমুসলমানকেই জাকাত দেয়া যাবে না। অবশ্য জুহুরী এবং ইবনে শুবরামা বলেছেন, জিম্মী কাফেরকে জাকাত দেয়া যায়। কেননা এই আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে হজরত ওমর বলেছেন, ফুকারা (নিঃস্ব জনগোষ্ঠী) হচ্ছে আহলে কিতাবদের বিকলাঙ্গ ও অকর্মন্যরা। কিন্তু জুহুরী ও ইবনে শুবরামার অভিমত আলেমগণের ঐকমত্য-বিরোধী। তাই তাদের অভিমতকে গ্রহণ করা যায় না।

www.eelm.weebly.com

একটি সন্দেহঃ ইমাম আবু হানিফা বলে থাকেন হাদিসে আহাদ (একক বর্ণিত হাদিস) কখনো নসের (কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণার) উপর প্রাধান্য পেতে পারে না। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে স্পষ্টাক্ষরে 'ফুকারা' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। মুসলমান কিংবা অমুসলমানের উল্লেখ এখানে নেই। তবুও জাকাত অমুসলমান-দেরকে দেয়া যাবে না এ রকম বলা হলো কেনো?

সন্দেহের অপনোদনঃ ইয়ানহাকুমুল্লহু আ'নিল্লাজীনা কাতালুকুম ফিদ্‌দ্বীন (আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তাদের সম্পর্কে যারা তোমাদের সঙ্গে জেহাদ করেনি) —এই আয়াতে আলোচ্য আয়াতের পূর্বে ঐকমত্য সূত্রে কাফের-দেরকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে খবরে আহাদের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে নির্দিষ্ট করে নেয়া ইমাম আবু হানিফার মতে সিদ্ধ। তাই এখানকার 'আল ফুকারা' অর্থ হবে নিঃস্ব মুসলমান। নিঃস্ব অমুসলমানেরা এর মধ্যে পড়বে না। তবে ফরজ জাকাত ছাড়া অন্য সকল নফল (অতিরিক্ত) দানের ক্ষেত্রে মুসলমান ও অমুসলমানদেরকে আলাদা করে দেখা যাবে না। ঐকমত্যাগত অভিমত এই যে, মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকল অভাবগ্রস্তদেরকে নফল সদ্‌কা প্রদান করা যাবে। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— লা ইয়ানহাকুমুল্লহু আ'নিল্লাজীনা লাম ইউক্বাতিলুকুম ফিদ্‌দীন। আবার হজরত মুয়াজ সম্পর্কিত হাদিসে বলা হয়েছে কেবল জাকাতের কথা। নফল সদ্‌কার ব্যাপারে তাঁকে কিছু বলা হয়নি। আর 'ইন্নামা ইয়ানহা কুমুল্লহু আ'নিল্লাজীনা কাতালুকুম ফিদ্‌দ্বীন' এর মধ্যে অমুসলিম রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে শিষ্টাচার প্রদর্শনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই যুদ্ধবাজ অমুসলিমদেরকেও নফল সদ্‌কা প্রদান করা যাবে না। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ রোজার ফিতরা, কাফফারা, মানত ইত্যাদি ওয়াজিব সদ্‌কার বিধানকেও ফরজ সদ্‌কার (জাকাতের) বিধানের অনুরূপ মনে করেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, ওয়াজিব সদ্‌কা জিম্মীদেরকেও দেয়া যাবে। তাঁর নিকট ফরজ সদ্‌কা ও ওয়াজিব সদ্‌কার বিধান এক নয়। কারণ ফরজ প্রমাণিত হয় কোরআনের সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নির্দেশনার মাধ্যমে। কিন্তু ওয়াজিবের প্রমাণ স্পষ্ট হলেও অপ্রত্যক্ষ। আবার হজরত মুয়াজ সম্পর্কিত হাদিসে রয়েছে কেবল ফরজ জাকাতের কথা। কোনো ওয়াজিব সদ্‌কার কথা সেখানে নেই।

'ফুকারা' শব্দের পরে উল্লেখ করা হয়েছে 'মাসাকীন' শব্দটি। এতে করে বুঝা যায় মিসকীনেরাও ফকিরদের অনুবর্তী বা অন্তর্ভূত। এখানে সাধারণভাবে ফকির কথাটি উল্লেখ করে পরক্ষণে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে মিসকীনদেরকে। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন— হাফিজু আলাস্‌সালাওয়াতি ওয়াস্‌সালাতিল উস্‌তা (নামাজের হেফাজত করো, বিশেষভাবে হেফাজত করো মধ্যবর্তী নামাজের)।

www.eelm.weebly.com

এবার আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো মিসকীন সম্পর্কে। যারা দ্বারে দ্বারে ঘুরে দাতাদেরকে বিরক্ত করে না, তারাই মিসকীন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ওই সকল লোক মিসকীন নয়, যারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায়। সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে মিসকীনেরা যাচঞাকারী হিসেবে পরিচিত নয়। অথচ তারা ফকিরদের মতোই অভাবগ্রস্ত। তাই ফকিরদেরকে দান করা যেমন অত্যাবশ্যক তেমনি অত্যাবশ্যক মিসকীনদেরকে দান করা। আলোচ্য আয়াতে তাই আল্লাহ্পাক ওই সকল সম্ভ্রমশীল অভাবগ্রস্তকে গুরুত্ব সহকারে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক আয়াতে এরশাদ করেছেন— লিল ফুকারা ইল্লাজীনা উহ্সিরু ফিসাবিলিল্লাহি লা ইয়াস্তাত্বীউনা দ্বারবান ফিল আরদ্বী ইয়াহ্সাবুহুমুল জাহিলু আগ্নিইয়াআ মিনাত্-তায়াফ্ফুফি তায়রিফুনা হুম বিসিমাহুম লা ইয়াসাআলুনান্ নাসা ইল্হাফা (যে সকল নিঃস্ব আল্লাহ্র পথে নিয়োজিত, যারা সাধারণভাবে উপার্জনক্ষম নয়, মূর্খেরা তাদেরকে মনে করে বিত্তবান, তাদেরকে চেনা যায় তাদের মুখমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করলে, তারা মানুষের নিকটে প্রার্থনাপ্রবণ নয়)।

এখানে 'ইলহাফ্' কথাটির অর্থ— জেদ করা , বিলাপ করা, কাকুতি মিনতি করে দাতাকে উত্যক্ত করা।

একটি সন্দেহঃ ভিক্ষুককেও (ফকিরকেও) তো মিসকীন বলা যায়। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হজরত আবু হোরায়রার এক বর্ণনায় এ রকম বলা হয়েছে। বর্ণনাটি বনী ইসরাইলদের কাহিনীমূলক। ওই দীর্ঘ কাহিনীতে এক কুষ্ঠ রোগী, এক টাক মাথাওয়ালা এবং এক অন্ধের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এক স্থানে বলা হয়েছে— এক মিসকীন তখন বললো, আমি মুসাফির। উপার্জন ও সম্পদ বিবর্জিত। স্বগৃহে পৌঁছানোর কোনো সম্বলও আমার কাছে নেই। এখন আল্লাহ্র সাহায্য ও আপনার সাহায্য ছাড়া আমি আর দেশে পৌঁছতে পারবো না। আমি আপনাকে আল্লাহ্র নামে দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে একটি উট দিন। যেনো আমি উটে চড়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারি।

সন্দেহের অপনোদনঃ ১. ইতোপূর্বে বর্ণিত এক হাদিসে মিসকীনদের সংজ্ঞা বলে দেয়া হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতেও ফকির ও মিসকীনকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর উপরে বর্ণিত বনী ইসরাইলের কাহিনীতো ফকির ও মিসকীনের সংজ্ঞা নির্ণায়কও নয়। ২. পরে বর্ণিত হাদিসে মিসকীন বলা হয়েছে ভাবার্থে। হাদিসটির মূল বক্তব্য বিষয়টি ছিলো— দরিদ্র ও নিঃস্বরা সাধারণতঃ কীভাবে যাচঞা করে তা দেখিয়ে দেয়া। প্রকৃত কথা হচ্ছে— মিসকীনেরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব নয়। কোনো কোনো শাফেয়ী মতাবলম্বী আলেম বলেছেন, যারা সর্বহারা, তারাই ফকির। আর মিসকীন তারাই, যারা কিছু না কিছু সম্পদের অধিকারী।

www.eelm.weebly.com

কেননা কাফ্ফারাত (প্রায়শ্চিত্ত) সম্পর্কে আল্লাহ্পাক এক স্থানে বলেছেন— ইতআমু আশারাতি মাসাকিনা (দশজন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান)। আর এক স্থানে বলেছেন— ইতআমু সিত্তিনা মিসকীনা (ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য দান)। আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে এই দুই স্থানে বলা হয়েছে ওই সকল দরিদ্রদের কথা, যারা মিসকীন অর্থাৎ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কিছু না কিছু সম্পদের মালিক। কিন্তু অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— আও মিসকীনাল জামাতরাবাতিন (অথবা ওই মিসকীন যে আশ্রয়হীন)। এখানে মিসকীন বলে বুঝানো হয়েছে সম্পূর্ণ নিঃস্বদেরকে। এতে করে বুঝা যায় যে, জ্ঞাতসারে মিসকীনদের জন্য কিছু সম্মান বা সম্পদ থাকা জরুরী নয়।

হানাফীগণের মতে 'মিসকীন' অর্থও সম্পূর্ণ নিঃস্ব। তাদের মতের সমর্থনে তাঁরা উপস্থাপন করেন এই আয়াত— আম্মস সাফিনাতু ওয়া কানাত লিমাসাকীনা ইয়ামালুনা ফিল বাহরি (আর ওই তরণীটি ছিলো কতিপয় মিসকীনের যা তারা ব্যবহার করে থাকবে সাগরে)। এখানে কিশতীওয়ালাকে বলা হয়েছে মিসকীন। এভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও কিশতীওয়ালা ওই কিশতীটির মালিক নয়। কিশতীটি সে নিয়েছিলো ইজারা বা ভাড়ায়। এ রকম কথা অবশ্য কোরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্যের (নসের) প্রতিকূল। কারণ এখানে নৌকাওয়ালাকেই সরাসরি বলা হয়েছে মিসকীন।

যারা বলেন, মিসকীন কিছু না কিছু সম্পদের অধিকারী, আর ফকির সম্পূর্ণ নিঃসম্বল— তারা দলিল হিসেবে পেশ করেন নিম্নে বর্ণিত হাদিসটিকে। হাদিসটি জননী আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম, হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম, হজরত আবু হোরায়রা, হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আনাস থেকে ইবনে হাব্বান ও হাকেম। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনাটিকে ইবনে হাব্বান বিশুদ্ধও বলেছেন। হাদিসটি এই— রসুল স. ফকর (ভিক্ষাবৃত্তি) থেকে পরিত্রাণ প্রার্থনা করতেন। দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্! আমাকে মিসকীন অবস্থায় রাখো এবং মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দিয়ো। এই হাদিসটি হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন তিরমিজি এবং হজরত আবু সাঈদ থেকে ইবনে মাজা। এই হাদিস দৃষ্টে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, মিসকীন অপেক্ষা ফকির নিকৃষ্ট। নতুবা রসুল স. ফকিরি (উনছবৃত্তি) থেকে পরিত্রাণ চাইতেন না। আর কামনা করতেন না মিসকিনিয়াত (দারিদ্র)কে। লক্ষণীয় যে, রসুল স. সম্পদগত দারিদ্র হতে পরিত্রাণ চাননি, পরিত্রাণ চেয়েছেন হৃদয়গত দারিদ্র থেকে। এক বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সেই প্রকৃত দরিদ্র, যার হৃদয় দরিদ্র— বহু সম্পদের অধিকারী হলেও। সে-ই প্রকৃত সম্পদশালী, যার হৃদয় সম্পদশালী— অর্থবিত্ত না থাকলেও। রসুল স. আসলে

www.eelm.weebly.com

পরিত্রাণ চেয়েছেন, ভিক্ষাবৃত্তি এবং ফেত্না থেকে। সম্পদের স্বল্পতা থেকে নয়। আর তিনি স. হতে চেয়েছেন ওই ধরনের মিসকীন, যে নির্ভর করে কেবল সম্পদের উপরে নয়। সবর (ধৈর্য), তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্নির্ভরতা), রেজা বিল কাজা (তকদীরের প্রতি সন্তোষ) ইত্যাদি বিশেষ গুণে ভূষিত মিসকীন হওয়াই ছিলো রসুল স. এর অভিপ্রায়।

শায়েখ ইবনে হাজার হজরত আনাস এবং হজরত আবু সাঈদ বর্ণিত উল্লেখিত হাদিসের সনদ দুর্বল। ইবনে জাওজী বলেছেন মওজু (বানানো)। কারণ রসুল স. এর দোয়া কবুল না হয়েই যায় না। অথচ পরকাল যাত্রার প্রাক্কালে রসুল স. মিসকীন ছিলেন না। এক সুবিশাল রাজ্যের তিনি ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতি। আবার কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে— ওয়াওয়াজাদাকা আয়েলান ফা আগনা (আল্লাহ্ আপনাকে বিত্তহীন পেয়েছিলেন, অতঃপর করেছেন বিত্তবান)।

এরপর বলা হয়েছে— 'ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য।' এখানে জাকাত আদায়কারী, আদায়কারীর সাহায্যকারী ব্যবস্থাপক, সংরক্ষক— সকলকেই রূপক অর্থে দরিদ্রের (ফকিরদের) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং জাকাত আদায়কারী ধনী হলেও ইচ্ছে করলে জাকাতের অংশ গ্রহণ করতে পারবে। কারণ তারা ফকির না হলেও ফকিরদের মুখপাত্র (উকিল)। এই হিসেবে ধনী দরিদ্র সকল আদায়কারীই ফকিরদের অন্তর্ভুক্ত। আর ফকিরদের উপরেও এটা অত্যাবশ্যক যে, তাদের জন্য যারা পরিশ্রম করছে (জাকাত সংগ্রহ করছে) তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া। এ সম্পর্কিত বিধান ও প্রমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

জাকাত সংগ্রাহককে কী পরিমাণ প্রদান করতে হবে ঃ

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অল্প বেশী সকল ক্ষেত্রে আদায়কৃত জাকাতকে ভাগ করতে হবে সমান আটভাগে। তার মধ্যে একভাগ দিতে হবে জাকাত সংগ্রাহক ও তাদের সহকারীদেরকে। হানাফীদের অভিমত এ রকম নয়। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

ইমাম আবু হানিফা এবং অধিকাংশ ইমাম বলেছেন, সংগ্রাহক জাকাত সংগ্রহের কাজে যতটুকু সময় ব্যয় করবে, ততটুকু সময়ের প্রয়োজন পূরণের পরিমাণ পারিশ্রমিক তাকে দিতে হবে। যেমন— কোনো সংগ্রাহক জাকাত সংগ্রহের কাজে একদিন ব্যয় করলো, এমতোক্ষেত্রে তাকে একদিনের ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক দিতে হবে। যে এই কাজে এক বৎসর ব্যয় করবে, তাকে দিতে হবে এক বৎসরের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের পরিমাণ অর্থ। জাকাতের সম্পদে ধনীদের কোনো অংশ নেই। অংশ রয়েছে দরিদ্রদের। আর জাকাত আদায়কারীরাও জাকাতের অংশ পাবে না, পাবে পারিশ্রমিক। আর ওই পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে।

www.eelm.weebly.com

যদি জাকাত সংগ্রাহকদের পারিশ্রমিক আদায়কৃত জাকাতের সমপরিমাণ হয়ে যায়, তবে সম্পূর্ণ মাল তাকে দেয়া যাবে না। অর্ধেক দেয়া যেতে পারে। এই অভিমতটি ঐকমত্যসম্মত। লক্ষণীয় যে, এমতোক্ষেত্রে অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশীও দেয়া যাবে না। কারণ অর্ধেকের চেয়ে অতিরিক্ত হলেই তাকে সম্পূর্ণ ধরে নেয়া হয়। তাই অর্ধেকের চেয়ে বেশী পারিশ্রমিকের অনুমোদন দেয়া হলে আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে। (দরিদ্ররাই যে জাকাতের হকদার, তার প্রমাণ আর থাকবে না)।

এরপর বলা হয়েছে — 'এবং যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য।' মনোরঞ্জন করার জন্য যাদেরকে দান করা হয় তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে আলোচ্য বাক্যটিতে। এখানে তাদেরকে বলা হয়েছে, 'মুওয়াল্লাফাতিল কুলুব।' মুওয়াল্লাফাতিল কুলুব আবার দুই প্রকার— মুসলমান ও কাফের। মুসলমানেরা আবার মুওয়াল্লাফাতিল কুলুব হয় দুইভাবে। জয়িফুল ইমান (যে সকল নওমুসলিমের ইমান ততো মজবুত নয়)। যেমন— উয়াইনিয়া বিন বদর ফাজারী, আকরা বিন হাবেস এবং আব্বাস বিন মারদাস্। শেষোক্ত দু'জন ছিলেন গোত্রনেতা। তারা নিজেরা দুর্বল ইমানদার ছিলেন না। দুর্বল ইমানদার ছিলো তাদের গোত্রের লোকেরা। রসুল স. দুর্বল ইমানদার এবং দুর্বল ইমানদারদের নেতা— উভয়কেই জাকাত দান করেছিলেন কেবল মনোরঞ্জনের জন্য। উদ্দেশ্য ছিলো এতে করে যাতে তারা ইসলামের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়। তাদের ইমান হয় অধিকতর বলিষ্ঠ। কিন্তু এ কথাটি প্রণিধানীয় যে, রসুল স. এ ধরনের দান জাকাত থেকে প্রদান করেননি। প্রদান করেছিলেন গণিমতের পঁচিশতম অংশ থেকে— যা রসুল স. এর জন্য ছিলো সুনির্দিষ্ট। আতা বলেছেন, মুসলমান মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবের দ্বিতীয় প্রকারে ওই সকল মুসলমানও অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে মুকাবিলা করা সহজ নয়। তারা নেতৃস্থানীয়, তাই তাদেরকে বশীভূত না করা পর্যন্ত তাদের অধীনস্থদেরকে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব নয়। এমতোক্ষেত্রে মুসলিম শাসক প্রয়োজনানুসারে কখনো মুজাহিদগণের গণিমতের অংশ থেকে, আবার কখনো জাকাতের অর্থ থেকে দান করতে পারবেন। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আদি বিন হাতেম তাঁর সম্প্রদায়ের তিনশত জাকাতী উট নিয়ে হজরত আবুবকরের খেদমতে উপস্থিত হন। হজরত আবুবকর ওই উটগুলো থেকে তিরিশটি উট তাঁকে প্রদান করেন।

অমুসলিম মুওয়াল্লাফাতিল কুলুব ওই সকল ব্যক্তি যারা অচিরেই ইসলাম গ্রহণ করবে বলে মনে করা হয় এবং যাদের পাপমুক্তি কামনা করা হয়। রসুল স. এ ধরনের লোককে মালে গণিমতের পঁচিশতম অংশ থেকে কিছু প্রদান করেছিলেন। সাফওয়ান বিন উমাইয়া ছিলেন তাদের অন্যতম।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য যে, বর্তমান সময়ে কোনো অমুসলিমকে জাকাতের অর্থ দেয়া জায়েয নয়। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালা ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। সুতরাং জাকাত দানের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রয়োজন আর নেই। হজরত ইকরামা, শা'বী, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী, ইসহাক বিন রাহ্‌ওয়াইহ্‌ ও অন্যান্য আলেমগণের ধারণা এই যে, অমুসলিম মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবের জাকাতের অংশ এখন অবলুপ্ত হয়েছে। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, অবলুপ্ত হয়নি। বিধানটি এখনো প্রবহমান। এ রকম বলেছেন, হাসান বসরী, জুহরী, মোহম্মদ বিন আলী, জয়নুল আবেদীন ইবনে ইমাম হোসাইন এবং আবু সাওয়ার। ইমাম আহমদ বলেছেন, যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তবে এখনো অমুসলিম মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে জাকাতের মাল দেয়া যাবে। অধিকাংশ গ্রন্থে এই মাসআলাটির বিষয়ে আলেমগণের মতপার্থক্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবের অংশ এখন নেই। কারণ বিষয়টি এখন অপ্রয়োজনীয়। ইমাম মালেক বলেছেন, কোনো জনপদে অথবা সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মুসলমানদেরকে প্রয়োজনানুসারে এখনো মনোরঞ্জনের জন্য জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে। কারণ প্রয়োজন দেখা দিলে অকার্যকর বিধান পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠে। এক বর্ণনানুসারে এসেছে, ইমাম আহমদও এই মতের সমর্থক। অন্য বর্ণনানুসারে এসেছে, এ ব্যাপারে ইমাম আহমদের অভিমত ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অধিকাংশ শাফেয়ী মতাবলম্বীগণও এই মত পোষণ করেছেন। অভিমতটি হচ্ছে— মিনহাজ গ্রন্থে রয়েছে, মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে জাকাতের অর্থ প্রদান করার বিধানটি এখনো সক্রিয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, দুর্বল বা সবল ইমানের অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে দান করলে যদি বহু লোক ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় তবে ওই ধরনের লোকদেরকে জাকাতের সম্পদ দান করা যেতে পারে। এই অভিমতানুসারে অমুসলিম মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে জাকাতের সম্পদ দান করা নাজায়েয হবে। সুতরাং অমুসলিম ফকির ও মিসকীনকেও দান করা হবে নাজায়েয। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর অনুসারীগণ দরিদ্র মুসলিম মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে জাকাতের মাল দেয়াকে নাজায়েয বলেননি। তাঁরা মতপার্থক্য করেছেন কেবল ধনী মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে প্রদানের ব্যাপারে। ইমাম শাফেয়ী ধনী মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে প্রদান করাকে জায়েয বলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন নাজায়েয। তাঁর নিকট জাকাত দেয়ার সময় জাকাত গ্রহিতা প্রকৃতই দরিদ্র কিনা তা দেখে নিতে হবে। এতে করে বুঝা যায় যে, মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে জাকাতের অর্থ প্রদান করার বিধানটি রহিত হয়নি। কারণ রহিতকারী কোনো বিধানের অস্তিত্ব এক্ষেত্রে নেই। সুতরাং রহিত হওয়ার সম্ভাবনা এখানে সম্পূর্ণ তিরোহিত। তাই ইমাম আবু হানিফার অভিমতের উদ্দেশ্য এখানে এই যে, কেবল অমুসলিম মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে জাকাতের অর্থ দেয়ার প্রসঙ্গটি এখন অবলুপ্ত।

www.eelm.weebly.com

একটি সন্দেহঃ হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে মুসলিম এবং তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া বলেছেন, তখন রসুল স. এর পবিত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি আমি ছিলাম ঈর্ষাপরায়ণ। তিনি স. আমাকে সম্পদ প্রদান করেন এবং মাঝে মাঝে এ রকম করতে থাকেন। এভাবে তিনি স. আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়ভাজন হন। এই হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, রসুল স. অমুসলমানদেরকে দান করতেন। ইবনে আসির তাঁর 'আস্সাহাবা' গ্রন্থে দৃঢ়তার সঙ্গে লিখেছেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রসুল স. হজরত সাফওয়ানকে দান করতেন। ইমাম নববী লিখেছেন, রসুল স. হজরত সাফওয়ানকে হুনায়েনের মালে গণিমত থেকে দান করেছিলেন। অথচ সাফওয়ান তখন ছিলেন অমুসলিম।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, হজরত রাফেয়ের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. হজরত সাফওয়ানকে দান করেছিলেন জাকাতের সম্পদ থেকে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, জ্যাকাতের অর্থ থেকে নয়, রসুল স. দান করেছিলেন গণিমতের সম্পদ থেকে। অর্থাৎ গণিমতের খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) থেকে। বায়হাকী, ইবনে সাইয়্যেদুন্নাস এবং ইবনে কাসিরও এ কথা বলেছেন।

ইবনে হুম্মাম তাঁর 'বায়ানুন নাসেখ' গ্রন্থে লিখেছেন, স্বসূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, উয়াইনিয়া বিন হাসিনকে হজরত ওমর বলেছিলেন— আলহাক্কু মির্‌রব্বিকুম ফামান শা-আ ফাল ইউমিম ওয়া মান শা-আ ফাল ইয়াক্‌ফুর্‌ (তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে, এখন যে ইচ্ছে হয় মানবে, যে ইচ্ছে হয় মানবে না)। তাঁর এ কথার উদ্দেশ্য ছিলো এখন মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে প্রদান করার বিধান আর নেই।

ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় এসেছে, শা'বী বলেছেন, মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবের নিয়মটি ছিলো রসুল স. এর জামানায়। হজরত আবু বকরের জামানায় এর পরিসমাপ্তি ঘটে। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, হজরত আবু বকরের খেলাফতের সময় হজরত উয়াইনিয়া এবং হজরত আকরা' তাঁর নিকট একটি জমি চেয়েছিলেন। হজরত আবু বকর তাঁদেরকে ওই জমির দলিল লিখে দিলেন। কিন্তু হজরত ওমর ওই দলিল হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, রসুল স. এ রকম দান করতেন ইসলামের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্য। এখন আল্লাহ্‌পাক ইসলামকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুসলমানদেরকে করেছেন অমুখাপেক্ষী। এখন যদি তোমরা ইসলামের উপর কায়েম থাকো তবে উত্তম। না হলে ফয়সালা হবে তলোয়ারের মাধ্যমে। উয়াইনিয়া এবং আকরা' তখন বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! খলিফা কে? আপনি না ওমর? হজরত আবু বকর বললেন, সে যদি ইচ্ছা করে তবে সে-ই খলিফা। এ কথা বলে তিনি হজরত ওমরের সিদ্ধান্তকেই

www.eelm.weebly.com

বহাল রাখেন। কোনো সাহাবী এই সিদ্ধান্তটিকে অস্বীকার করেননি। আমি বলি, হজরত ওমরের কথায় কোরআনের আয়াত রহিত হয়নি। এ সম্পর্কে তিনি যে আয়াত আবৃত্তি করেছিলেন, সেই আয়াতেও মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবের অংশ রহিত হওয়ার ইঙ্গিত নেই। ফামান শা-আ ফাল ইউ'মিন ওয়ামান শা-আ ফাল ইয়াক-ফুর— হজরত ওমর কর্তৃক উচ্চারিত এই আয়াত সুরা কাহাফের অন্তর্ভুক্ত। সুরা কাহাফ অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায় আর সুরা তওবা অবতীর্ণ হয়েছে অনেক পরে মদীনায়। আর সুরা তওবাতেই মুওয়াল্লাফাতিল কুলুব এর প্রসঙ্গটি স্থান পেয়েছে। সুতরাং পূর্বে অবতীর্ণ আয়াত পরে অবতীর্ণ আয়াতকে রহিত করতে পারে না। তাছাড়া উয়াইনিয়া ও আকরা' চেয়েছিলেন একটি ভূখণ্ড। জাকাতের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আর আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে জাকাত। কাকে কাকে জাকাত দেয়া যাবে, সেই তালিকায় উল্লেখিত হয়েছে মুসলমান মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবের কথা। আর রসুল স. কখনো কোনো অমুসলিমকে জাকাত প্রদান করেছেন এ রকম কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বিধানটি মুসলমান মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। অমুসলিম মুওয়াল্লাফাতিল কুলুব এর অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার সম্পদশালীরাও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ সম্পদশালীদের জন্য জাকাত হালাল না হওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত মুয়াজ সম্পর্কিত হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ এসেছে যে, রসুল স. তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন— জাকাত গ্রহণ করতে হবে তাদের সম্পদশালীদের নিকট থেকে এবং তা বণ্টন করে দেয়া হবে তাদেরই দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে। এতে করে প্রমাণ হয় যে, জাকাত গ্রহীতা হিসেবে মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে হতে হবে দরিদ্র। এভাবে মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবেরাও হয়ে গিয়েছে ফুকারাদের (দরিদ্রদের) একটি শাখা। এভাবে আল ফুকারার সঙ্গে মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবের সম্পর্ক সাধারণের সঙ্গে বিশেষের সম্পর্কের মতো।

এরপর বলা হয়েছে 'দাস মুক্তির জন্য' (ওয়াফীর্ রিক্বাব্)। এখানে 'ফী' শব্দটি গুরুত্ব প্রকাশক। 'রিক্বাব্' এর পূর্বে 'ফী' উল্লেখের মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, পূর্ববর্তী তিনটি খাত (ফকির, মিসকীন, মুওয়াল্লাফাতিল কুলুব) অপেক্ষা এই খাতটি (দাস মুক্তি) অধিকতর উপযুক্ত। অর্থাৎ এই খাতে জাকাতের অর্থ ব্যয় অত্যন্ত জরুরী।

'আর্ রিক্বাব' অর্থ মুকাতিব্ ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ এ রকম বলেছেন। ইবনে ওয়াহাবের বর্ণনায় এসেছে, ইমাম মালেকও এই অভিমতের প্রবক্তা। মুকাতিব্কে হতে হবে নিশ্চিতরূপে নিঃস্ব। এ ধরনের দাসমুক্তির ক্ষেত্রে নেসাব পরিমাণ সম্পদও প্রয়োজন হয়ে যেতে পারে। এ রকম হলেও দাস মুক্তির ক্ষেত্রে নেসাব পরিমাণ

www.eelm.weebly.com

মাল প্রদান করা জায়েয। কারণ মুক্তি নিশ্চিত করাই এখানে প্রধান ব্যাপার। অন্য বর্ণনায় এসেছে— ওয়াকাতিবুহুম ইন্ আলিমতুম ফিহিম খইরাঁও ওয়া আতুহুম মিম্ মালিল্লাহিল্লাজী আতাকুম (এবং তাদের মধ্যে কল্যাণ লক্ষ্য করলে তাদেরকে মুকাতিবা করো। আর তোমরা তাদেরকে ওই সম্পদ দান করো যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছেন)।

শক্তিশালী একটি সূত্রে এসেছে, ইমাম মালেক বলেছেন, এখানে 'আর্ রিক্বাব্' অর্থ খাঁটি গোলাম বা বাঁদী (মুকাতিব্ গোলাম বা বাঁদী নয়)। আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ এই যে, জাকাতের অর্থ দ্বারা ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীকে ক্রয় করে স্বাধীন করে দেয়া যাবে। এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আহমদও এ রকম বলেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি এই অভিমতটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

আবু উবায়দা তাঁর কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে আবুল আশরাস সূত্রে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আপন সম্পদের মাধ্যমে হজ করা, জাকাত দেয়া কিংবা বাঁদী খরিদ করে আযাদ করে দেয়ায় কোনো অসুবিধে নেই। আমাশ সূত্রে আবু মুয়াবিয়াও মুজাহিদের এ রকম উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। আবু নজিহ্ থেকে আমাশের মধ্যস্থতায় আবু বকর ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস জানিয়েছেন, আপন সম্পদের জাকাতের মাধ্যমে বাঁদী ও গোলাম ক্রয় করে স্বাধীন করে দাও। আবু মুয়াবিয়া সূত্রে উবাদা বিন সুলায়মানও এ রকম বর্ণনা এনেছেন।

উবাদা—আমাশ—আবুল আশরাস সূত্রে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস জাকাতের মাল বের করে নিয়ে আমাদেরকে হজের সামান প্রস্তুত করতে বলতেন।

মায়মুনার বর্ণনায় এসেছে, আমি আবু আবদুল্লাহ্কে একবার জিজ্ঞেস করলাম, যদি কেউ সম্পদের জাকাতের অর্থ দিয়ে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী ক্রয় করে মুক্ত করে দেয় অথবা মুসাফিরদের জন্য খরচ করে, তবে কি হবে? আবু আবদুল্লাহ্ বললেন, জায়েয হবে। হজরত ইবনে আব্বাস এ রকম করতেন। এর বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই।

জালালী বলেছেন, আমার নিকট আহমদ বিন হাশেম বলেছেন, একবার ইমাম আহমদ আমাকে বললেন, প্রথম প্রথম আমিও মনে করেছিলাম জাকাতের অর্থ দিয়ে ক্রীতদাসী মুক্ত করা যায়। পরে আমি এ ধারণাটি পরিত্যাগ করেছি। তাঁর নিকট জানতে চাওয়া হলো, কেনো? হজরত ইবনে আব্বাস তো এ রকম করা জায়েয বলেছেন। ইমাম আহমদ বললেন, হজরত ইবনে আব্বাসের কথা আবেগপ্রবণ। অথবা তাঁর কথার অর্থের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের মত্ততা ও উদ্বিগ্নতা।

www.eelm.weebly.com

ইমাম মালেক বলেন, জাকাতের অর্থ দিয়ে মুক্ত করা ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী মুসলমানদের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত (বাইতুল মালের অন্তর্ভুক্ত)। কথাটির অর্থ— এভাবে স্বাধীন হয়ে যাওয়া ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর মৃত্যুর পর যদি তাদের কোনো ওয়ারিশ না থাকে তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তি জমা করতে হবে বায়তুল মালে। অপর বর্ণনায় এসেছে, ইমাম মালেক বলেন, যে স্বাধীন করে দিয়েছে সে-ই হবে তার সম্পদের মালিক।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, আর রিক্বাবের তাফসীরে এ সম্পর্কে আলেমগণের আর একটি অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে। অভিমতটি এই যে— জাকাতের মালকে ভাগ করতে হবে দু'টি ভাগে। একটি ভাগ দ্বারা মুসলমান মুকাতিব্দেরকে আযাদ করতে হবে। অপর ভাগ দ্বারা মুসলমান ক্রীতদাসী খরিদ করে স্বাধীন করে দেয়া যাবে। ইবনে আবী হাতেম এবং 'কিতাবুল আমওয়াল' রচয়িতা আবু উবায়দা যথাসূত্রে বর্ণনা করেছেন, জুহুরী ওমর বিন আবদুল আজিজকে এ কথাই লিখে পাঠিয়েছিলেন।

আমি বলি, ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. হজরত মুয়াজকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে— জাকাত সংগ্রহ করতে হবে তাদের বিত্তবানদের নিকট থেকে এবং বন্টন করে দিতে হবে তাদেরই দরিদ্র জনতাকে। এই বিবরণটির মাধ্যমে ইমাম মালেকের অভিমত খণ্ডন হয়ে যায়। গোলাম খরিদ করে স্বাধীন করার নিয়মটি রদ্দে আলাল ফুকারা (ফকির ছাড়া অন্যকে দেয়া অর্থে) হবে না। আর হজরত ইবনে আব্বাসের কথা তো ইমাম আহমদের ভাষ্যানুযায়ী আবেগ তাড়িত। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাসের একটি অভিমত রয়েছে। কিন্তু সেই অভিমতটি বর্ণনা করা হয়নি। আমরা এখানে আর রিক্বাব্ এর তাফসীর করেছি মুকাতিবের অনুকূলে। অর্থাৎ আর্ রিক্বাবের উদ্দেশ্য হবে মুকাতিবই। এই মতের পৃষ্ঠপোষকতায় মোহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু মুসা আশয়ারী একদিন জুমআর নামাজের খুত্বা পাঠ করছিলেন। ওই সময় এক মুকাতিব নিবেদন করলেন, লোকদেরকে আমার মুক্তির জন্য চাঁদা দিতে বলুন। হজরত আবু মুসা উপস্থিত মুসল্লিদেরকে চাঁদা প্রদানে উৎসাহিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসল্লিবৃন্দ বিভিন্ন সামগ্রী ছুঁড়ে দিতে শুরু করলো। এভাবে জমা হলো পাগড়ী, হার, আংটি— অনেক কিছু। হজরত আবু মুসা সেগুলোকে একত্র করতে বললেন। নামাজ শেষে সেগুলো বিক্রয় করে মুকাতিবের মুক্তিপণ প্রদান করলেন। যা বেঁচে গেলো তা জমা রাখলেন অন্যান্য গোলাম আজাদের খাতে। চাঁদা দাতাদেরকে তিনি উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরত দিলেন না। বললেন, লোকেরা তো এগুলো দিয়েছে তাদের প্রতিবেশীদেরকে মুক্ত করার জন্যই।

www.eelm.weebly.com

সুতরাং এ বিষয়ে ইমাম আহমদের অভিমতের প্রতি কীভাবে সন্দেহ পোষণ করা যায়। তাঁর ও অন্যান্যদের বর্ণনায় এসেছে, এক লোক রসুল স. এর নিকটে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা জান্নাতকে নিকটবর্তী করে এবং দূরবর্তী করে দোজখকে। রসুল স. বললেন, বন্দী জীবনকে স্বাধীন করো এবং শৃঙ্খলিত স্কন্ধকে মুক্ত করে দাও। লোকটি বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! কথা দু'টো কি এক কথা নয়? রসুল স. বললেন, না। বন্দী জীবনকে স্বাধীন করার অর্থ একক উদ্যোগে ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে দাও। আর 'শৃঙ্খলিত স্কন্ধকে মুক্ত করো' অর্থ দাস-দাসী মুক্তির সম্মিলিত উদ্যোগে অংশগ্রহণ করো।

আমি বলি, এই বর্ণনাটি ইমাম মালেকের অভিমতের পরিপোষক নয়। অর্থাৎ 'আর রিক্বাব' অর্থ দাস-দাসী ক্রয় করে স্বাধীন করে দেয়া নয়। কারণ এখানে রসুল স. 'আর রিক্বাব' কথাটির তাফসীর উপস্থাপন করেননি। বর্ণনা করেছেন একটি পুণ্যময় আমলের কথা।

এরপর বলা হয়েছে— 'ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য' (ওয়াল গরিমীন)। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, এখানে ঋণগ্রস্তদেরকে জাকাতের অর্থ থেকে দান করার নির্দেশনা এসেছে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ আলেম ওই সকল ঋণগ্রস্তদেরকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে— ১. ওই ঋণগ্রস্ত, যে ঋণের অর্থ কোনো পাপকর্মে ব্যয় করেনি। ২. ওই করজদার, যে ঋণের টাকায় পুণ্যকর্ম (মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য অর্থ ব্যয় ইত্যাদি) সম্পাদন করেছে। এ ধরনের ব্যক্তি সম্পদশালী হলেও ঋণ পরিশোধের জন্য তাকে জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে। ৩. যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় খরচ করে অথবা পাপকর্মে অর্থ ব্যয় করে ঋণী হয়েছে, তাকে জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ঋণ পরিশোধের অর্থ যার নেই, তাকে জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে, যে কোনো কারণে সে ঋণপীড়িত হয়ে পড়ুক না কেনো (সৎকাজে অর্থ ব্যয় করে অথবা অসৎকাজে)। কারণ আলোচ্য বাক্যে কেবল বলা হয়েছে ওয়াল গরিমীনা (এবং ঋণ জর্জরিতদের জন্য)। কথাটি একটি সাধারণ অর্থবোধক শব্দ। বিশেষভাবে এখানে কোনো প্রকার ঋণভারাক্রান্তকে চিহ্নিত করা হয়নি। যার নিকট ঋণ পরিশোধের মতো অর্থ নেই, সে ফকির। সে সম্পদশালী হলেও সফরের সময় ঋণ পরিশোধের জন্য তাকে জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে। এক্ষেত্রেও অন্যান্য ইমামগণের সঙ্গে ইমাম আবু হানিফার মতপার্থক্য ঘটেছে। যেমন মতপার্থক্য ঘটেছে সফরের নামাজ এবং রোজার ক্ষেত্রে। ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে— বৈধ অবৈধ সকল সফরেই নামাজ কসর করা যাবে এবং রমজানের রোজা ইচ্ছা করলে ভাঙ্গা যাবে। কিন্তু অন্যান্য ইমাম বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

বৈধ সফরের ক্ষেত্রেই কেবল এ রকম করা যাবে। অবৈধ সফরের ক্ষেত্রে নয়। তাই তাদের কথা হচ্ছে— অন্যায় কাজে অর্থ ব্যয় করে কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাকে জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে না। এমনকি মুসাফির অবস্থাতেও নয়।

ঋণ পরিশোধের পরেও নেসাব পরিমাণ উদ্বৃত্ত অর্থ যদি কারো থাকে (যার উপর জাকাত অত্যাবশ্যক হয়) তবে তাকে জাকাত দেয়া যাবে না। এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এ রকম ব্যক্তি যদি সৎকাজে ব্যয় করার কারণে ঋণী হয়, তবে তাকেও জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র পথে সংগ্রামকারী।' এখানে অধিকতর গুরুত্ব আরোপের জন্য 'সাবীলিল্লাহ' এর পূর্বে 'ফী' অব্যয়টি বসানো হয়েছে। এভাবে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলে আল্লাহ্র পথে সংগ্রামকারীদেরকে জাকাত গ্রহীতা হিসেবে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ী এবং জমহুরের মতে আল্লাহ্র পথে সংগ্রামকারী অর্থ— মুজাহিদ (ধর্মযোদ্ধা), যারা তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে আল্লাহ্র পথে বের হয়েছে। ইমাম আহমদ এবং ইমাম মোহাম্মদের মতে এখানে আল্লাহ্র পথে সংগ্রামকারী অর্থ হজযাত্রী। ইমাম আহমদ এবং আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে— হজরত উম্মে মা'কাল বলেছেন, আমার স্বামী আবু মা'কাল রসুল স. এর সঙ্গে হজে যেতে ইচ্ছে করলেন। আমি তাকে বললাম, আপনি তো জানেন আমার উপর হজ অত্যাবশ্যক (সুতরাং আমাকেও নিয়ে যান)। তিনি আমাকে রসুল স. এর নিকটে নিয়ে গেলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার উপরে হজ অত্যাবশ্যক হয়েছে। আর আবু মা'কালের নিকট রয়েছে একটি প্রাপ্তবয়স্ক উট (উটটি বাহন হিসেবে আমাকে দেয়া হোক)। আবু মা'কাল বললেন, উটটি আমি আল্লাহ্র রাস্তায় দান করেছি। এখন তো এটা সদ্কা (জাকাত)। রসুল স. বললেন, ওই উটের পিঠে চড়েই সে হজ করতে পারবে। হজও ফী সাবীলিল্লাহ্ (হজও ফী সাবীলিল্লাহ্র অন্তর্ভুক্ত অথবা ফী সাবীলিল্লাহ্ অর্থই হজ)। এই হাদিসের বর্ণনা-সূত্রভূত ইবরাহিম বিন মুহাজির বর্ণনাকারী হিসেবে বলিষ্ঠ কিনা, সে সম্পর্কে বিভিন্ন কথা রয়েছে। ভিন্ন সূত্রে আবু দাউদ এবং ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে— হজরত উম্মে মা'কাল বলেছেন, রসুল স. এর বিদায় হজের সময় আমার নিকট ছিলো একটি উট। আবু মা'কাল সেটিকে আল্লাহ্র রাস্তায় উৎসর্গ করেছিলেন। এরপর আবু মা'কাল পীড়িত হয়ে পড়লেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই পরপারে পাড়ি দিলেন। ইত্যবসরে রসুল স. হজে চলে গেলেন। প্রত্যাবর্তনের পর আমি তাঁর নিকটে গমন করলে তিনি বললেন, মা'কালের মা! আমাদের সঙ্গে হজে গেলেন না কেনো? আমি বললাম, আমি তো প্রস্তুতই ছিলাম। কিন্তু মা'কালের বাপ হঠাৎ করেই চলে গেলেন।

www.eelm.weebly.com

একটি উট ছিলো তার। ওই উটে চড়ে তিনি হজে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু সন্নিকটবর্তী দেখে উটটিকে আল্লাহ্র পথে দান করার অসিয়ত করে গিয়েছেন। রসুল স. বললেন, ওই উটে চড়ে তুমি হজে যেতে পারবে না কেনো? হজও তো আল্লাহ্র পথ (ফী সাবীলিল্লাহ্)।

ইমাম শাফেয়ী তাঁর অভিমতের স্বপক্ষে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত একটি হাদিসকে প্রমাণরূপে পেশ করেছেন। ওই হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন তোমরা খালেদের প্রতি অন্যায় আচরণ করছো। সে তো তার অস্ত্রশস্ত্রসহ উৎসর্গীকৃত।

আমি বলি, নিঃস্ব হওয়া যখন জাকাতের সকল খাতের একটি সাধারণ উপযুক্ততা, তখন 'ফী সাবীলিল্লাহ্' কথাটিকে সাধারণভাবে রেখে দেয়াই সমীচীন। কথাটিকে জেহাদ বা হজ— কোনোটির সঙ্গেই সম্পৃক্ত করা ঠিক নয়। দরিদ্র কোনো তালেবে এলেমকে (শিক্ষার্থীকে) জাকাতের অর্থ প্রদান করাও 'ফী সাবীলিল্লাহ্' এর অন্তর্ভুক্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং পর্যটকদের জন্য।' এ কথার অর্থ ওই সকল মুসাফিরকে জাকাত দেয়া যাবে, যারা জাকাত গ্রহীতা হিসেবে অনুপযুক্ত নয় (সম্পদশালী নয়)। অর্থাভাবে যারা সফর করতে পারে না, তারাও এই খাতের অন্তর্ভুক্ত।

যদি কারো এতটুকু অর্থ থাকে যার কারণে সে জাকাত গ্রহণের অযোগ্য হয় এবং গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়, এমতোক্ষেত্রে তাকে জাকাত দেয়া যাবে না। সে ভ্রমণাবস্থায় থাক অথবা না থাক।

বাড়ীতে অনেক সম্পদ থাকলেও ভ্রমণাবস্থায় যদি সম্পদের স্বল্পতা দেখা দেয় এবং গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর সামর্থ্য যদি না থাকে তবে তাকে ঐকমত্যসম্মতভাবে জাকাত দেয়া যাবে। ইমাম আবু হানিফা 'ইবনি সাবিল' (পর্যটক, মুসাফির) বলতে এ ধরনের লোককেই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আপন সম্পদের কর্তৃত্বহারা ব্যক্তিরাও জাকাত গ্রহণের উপযুক্ত। সফরে সম্পদশালীরাও অসহায় হয়ে পড়ে। কারণ তখন তার সম্পদ তার কর্তৃত্বাধীন থাকে না। এ ধরনের ব্যক্তিরাও ফকিরের (নিঃস্বদের) অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দেশে ফিরে আসার সামর্থ্য যদি তার থাকে তবে সে জাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে না। ইমাম আবু হানিফার অভিমত এ রকম। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এ রকম অবস্থায়ও মুসাফির জাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নিঃস্বরাই জাকাত গ্রহণের যোগ্য। কিন্তু সম্পদশালী মুসাফির যদি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের সামর্থ্য রাখে তবে তাকে নিঃস্ব বলা যাবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এ রকম শর্ত আরোপ করলে জাকাতের খাত হিসেবে মুসাফিরদেরকে উল্লেখ করার প্রয়োজন আর অবশিষ্ট থাকে না।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, জাকাতের খাত আটটি। তার মধ্যে সাতটি খাতের সাধারণ যোগ্যতা এই যে, তাদেরকে নিঃস্ব হতেই হবে। অবশিষ্ট একটি খাতের নিঃস্ব হওয়া না হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা হচ্ছে জাকাত আদায়কারী। তারা যা পায় তা আসলে পারিশ্রমিক। আর বিত্তহীন, বিত্তশালী সকলেই পারিশ্রমিক লাভের যোগ্য। তারা জাকাতদাতা যেমন নয় তেমনি জাকাত গ্রহীতারও সম-যোগ্যতাসম্পন্ন নয়। কেবল অধিকার প্রকাশের জন্য তাদেরকে জাকাত গ্রহীতাদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট সাতটি খাতের সাধারণ যোগ্যতা হচ্ছে নিঃস্বতা। সেই নিঃস্বতার কারণ সমূহ এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে সাতটি পৃথক শিরোনামে। জাকাত গ্রহীতাদের অধিকার রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত। তাদের পারস্পরিক অগ্রগণ্যতার বিষয়টিও বিবেচ্য। যেমন মিসকীন কারো নিকট কিছু চায় না। তাই মিসকীনেরা জাকাত গ্রহণের ব্যাপারে ফকির অপেক্ষা অগ্রগণ্য। মুসাফির ফকির অগ্রগণ্য মুকিম ফকির অপেক্ষা। এভাবে মুজাহিদ, হজযাত্রী, মুকাতিব, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী, মুয়াল্লাফাতিল কুলুবও কম অগ্রগণ্য নয়। হাজী-দেরকে বাহন প্রদান করলে তা হজ সম্পাদনে সহায়তা করে। হজ ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। আবার মুজাহিদকে সাহায্য করার অর্থ জেহাদে সাহায্য করা। জেহাদও মহান ইসলামের একটি অত্যুচ্চ শিখর। দাসমুক্তিও উন্মোচন করে কল্যাণের বহুবিধ তোরণ। যে সকল অগ্রগণ্যতার গুরুত্বের উল্লেখ আমি করলাম, সেগুলো ছাড়াও আরো অনেক কিছু অগ্রগণ্যতার দাবী রাখে। ওই দানই সর্বোত্তম দান, যা শুরু করা হয় আপন পরিবার থেকে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী এবং হজরত হাকিম বিন হাজ্জাম থেকে মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার আর এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, এক লোক আল্লাহ্‌র রাস্তায়, ক্রীতদাস মুক্তিতে, মিসকীনকে এবং আপন পরিবারের জন্য এক দিনার করে ব্যয় করলো— এ রকম দানের মধ্যে সর্বোত্তম দান হিসেবে গৃহীত হবে ওই দিনারটি— যা সে তার পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করেছে। মুসলিম।

হজরত মায়মুনা বিনতে হারেস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর জামানায় আমি এক ক্রীতদাসীকে মুক্ত করলাম এবং এ কথা রসুল স.কে জানালাম। তিনি স. বললেন, ওই অর্থ তোমার মাতুলবর্গকে দান করলে অধিক সওয়াব লাভ করতে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত সুলায়মান বিন আমের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মিসকীনকে দান করলে পাবে একগুণ সওয়াব। আর আত্মীয়স্বজনকে দান করলে পাবে দ্বিগুণ। একগুণ দানের জন্য, আর একগুণ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার জন্য। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার আবু তালহা আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! বীরেহার বাগানটি আমার খুবই প্রিয়। ওই বাগানটি আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দান করতে চাই এবং আশা রাখি ওই দানের সওয়াব যেনো আমার

www.eelm.weebly.com

আমলনামায় জমা থাকে। আপনি দয়া করে আপনার ইচ্ছে মতো ওই সম্পদ ব্যয় করুন। রসুল স. বললেন, আমার ইচ্ছা, তুমি ওই বাগান তোমার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দাও। আবু তালহা তাই করলেন। বাগানটি বণ্টন করে দিলেন তাঁর চাচাতো ভাইদের মধ্যে। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম আবু হানিফার মতে জন্ম ও বৈবাহিক সূত্রের স্বজনদেরকে জাকাত দেয়া যাবে না। অর্থাৎ সন্তান-সন্ততিরা পিতামাতাকে, পিতামাতা তাদের সন্তানদেরকে, স্ত্রী তার স্বামী এবং স্বামী তার স্ত্রীকে জাকাত দিতে পারবে না। কারণ এরা একে অপরের সম্পদের স্বাভাবিক অংশীদার। নিয়ম হচ্ছে জাকাত গ্রহীতারা হবে প্রাপ্ত অর্থের পরিপূর্ণ মালিক। কিন্তু এমতোক্ষেত্রে সেরকম নির্ভেজাল মালিকানা অকল্পনীয়। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— ওয়া ওয়াজাদাকা আয়েলান ফা আগনা। আয়াতটির অর্থ— তিনি আপনাকে পেয়েছিলেন নিঃস্ব। হে আমার রসুল! খাদিজার সম্পদের মাধ্যমে আল্লাহ্ আপনাকে বিত্তবান করেছেন। আবার রসুল স. স্বয়ং আজ্ঞা করেছেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার (অধিকারভূত)। কিন্তু ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, জন্মসূত্রের আত্মীয়দেরকে জাকাত দেয়া যাবে। বরং এ রকম ঘনিষ্ঠজনকে জাকাত প্রদান করা উত্তম। এতে পরিবার পরিজনের প্রতিপালন সহজতর হবে। সাথে সাথে দান করাও হবে। অতএব, ভাই- বোন, চাচা, ফুফী, মামা, খালা— সকলেই জাকাতের হকদার।

যদি কারো প্রতিপালনাধীনে এতিম স্বজন থাকে এবং বিচারক যদি তার জন্য হকের পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকেন, তবে ওই ব্যক্তি জাকাতের অর্থ দিয়ে ওই ব্যয় নির্বাহ করলে তার জাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু বিচারক যদি প্রতিপালন ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট কোনো অংকে বেঁধে দিয়ে থাকেন, তবে জাকাতের অর্থ দিয়ে ওই অংক পূরণ করা যাবে না। কেননা এই অবস্থায় যে কোনো একটি ওয়াজিব (হয় প্রতিপালন ব্যয় অথবা জাকাত) আদায় হবে। দায়িত্বে রয়ে যাবে আর একটি ওয়াজিব। তবে প্রতিপালন ব্যয়ের অংক পূরণ না করে যদি আলাদা করে জাকাত দেয়া হয়, তবে জাকাত আদায় হয়ে যাবে। কারণ এমতোক্ষেত্রে জাকাতের উপর জাকাত গ্রহীতার মালিকানা পৃথকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের মতে এ ধরনের নিকটাত্মীয়কে জাকাত দান দুরস্ত নয়। কারণ এ ধরনের পোষ্যদের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের অত্যাবশ্যক দায়িত্ব তো প্রতিপালনকারীর উপরে আগে থেকেই বহাল। এ বিষয়ে বিস্তারিত মাসআলা আমরা লিখে দিয়েছি সুরা বাকারায় একটি আয়াতের তাফসীরে। আয়াতটি এই— 'ওয়া আ'লাল মাওলুদিলাহু রিজকুহুন্না ওয়া কিস্ওয়াতুহুনা বিল মা'রুফি ওয়া আ'লাল ওয়ারিছি মিছলু জালিকা।' এ বিষয়ে সাহেবাইনের (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের)

www.eelm.weebly.com

অভিমতও ইমামে আজমের (ইমাম আবু হানিফার) অনুকূল। পারস্পরিক সম্পদগত সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি তাঁদের নিকটও বিবেচ্য। কিন্তু তাঁরা একটি হাদিসের কারণে এ রকম বলেছেন যে, স্ত্রী তার স্বামীকে জাকাত দিতে পারবে। হাদিসটি এই—

হজরত আবুদল্লাহ্ ইবনে মাসউদের স্ত্রী হজরত জয়নাব বর্ণনা করেছেন, আমি দেখতে পেলাম রসুল স. মসজিদের অভ্যন্তরে বলে যাচ্ছেন, হে রমণীকুল! দান করো। তোমাদের অলংকারগুলো থেকে দান করো। আমি ভাবলাম আমি তো আমার স্বামী আবদুল্লাহ্র জন্য এবং কিছু এতিম পোষ্যদের জন্য খরচ করে থাকি। এতে করে আমি কি দানের সওয়াব পাবো? আমি আমার স্বামীকে বললাম, আপনি রসুল স.কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যে আপনার জন্য এবং এতিমের জন্য ব্যয় করি— তাতে করে আমার দান করা হবে কিনা? তিনি বললেন, তুমিই বলো। আমি একটু অগ্রসর হতেই সাক্ষাত পেলাম এক আনসারী রমণীর। শুনলাম, তিনিও আমার মতো আমল করেন। আমাদের সামনে দিয়ে গমন করছিলেন হজরত বেলাল। আমরা দু'জনে তাঁকে বললাম, রসুল স.কে আমাদের কথা বলুন। আমরা আমাদের স্বল্পবিত্ত স্বামীদের জন্য এবং এতিম পোষ্যদের জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকি। এতে করে আমরা দানের সওয়াব পাবো কিনা। আপনি কিন্তু আমাদের নাম উল্লেখ করবেন না। হজরত বেলাল রসুল স. এর নিকটে গিয়ে এ বিষয়ে জানতে চাইলেন। রসুল স. বললেন, কারা এ রকম জানতে চেয়েছে? হজরত বেলাল বললেন, জয়নাব। তিনি স. বললেন, কোন্ জয়নাব? হজরত বেলাল বললেন,আবদুল্লাহ্র স্ত্রী। রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। একগুণ দানের জন্য। আরেকগুণ আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য। বোখারীও হাদিসটির বর্ণনাকারী। তবে তাঁর বর্ণনায় বক্তব্য বিষয়ের কিছুটা অদলবদল ঘটেছে। আবু দাউদ ও তায়ালুসীর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাগুলো— এতিম পোষ্যরা ছিলো হজরত জয়নাবের ভাইয়ের ও বোনের সন্তান। আলকামা সূত্রে নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, হাদিসে বর্ণিত রমণী দু'জন ছিলেন বিত্তশালিনী। তাঁদের একজনের অধীনে ছিলো কিছু এতিম। অন্যজনও ছিলেন এতিমের প্রতিপালনকারিণী। আর তাঁর স্বামী ছিলো বিত্তহীন।

উপরোক্ত হাদিসের মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, হজরত জয়নাব জানতে চেয়েছিলেন তাঁর দান যথেষ্ট হয়েছে কিনা। এতে করে মনে হয় তিনি জানতে চেয়েছিলেন, এভাবে দান করলে তাঁর জাকাত আদায় হবে কিনা। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বর্ণিত হাদিসে উল্লেখিত সদ্কা ছিলো নফল সদ্কা। রসুল স. তখন নফল সদ্কার ব্যাপারেই রমণীগণকে উৎসাহ দান করেছিলেন।

www.eelm.weebly.com

এটা ছিলো তাঁর উপদেশ— নির্দেশ নয়। আর যথেষ্ট হওয়ার বিষয়টিকে দু'ভাবে গ্রহণ করা যায়। ওয়াজিব এবং নফল উভয় ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। ওই হাদিসে উল্লেখিত 'আজযা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ— যথেষ্ট গুণসম্পন্ন। এভাবে জিজ্ঞাস্যটি ছিলো এ রকম— যে অর্থ দান করা হয়েছে তা মূল্যগত দিক থেকে যথেষ্ট কিনা। অর্থাৎ এতে করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য, দোজখ থেকে পরিত্রাণ লাভ হবে কিনা। আগেই বলা হয়েছে, ইমাম আবু হানিফার মতে ওই দান ছিলো নফল দান। এই অভিমতের সমর্থনে তাহাবী একটি বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। বর্ণনাটি এই—

রাবেতা বিন্‌তে আবদুল্লাহ্ ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের স্ত্রী। তিনি হাতের কাজ করে কিছু কিছু উপার্জন করতেন। তাঁর স্বামী ছিলেন দরিদ্র। রাবেতা তাঁর স্বামীর পরিবারের খরচ চালাতেন। একদিন তিনি তাঁর স্বামীকে বললেন, আপনার পরিবারের খরচ চালাতে গিয়ে আমি আর কাউকে দান খয়রাত করার সুযোগ পাই না। হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, আমি চাই না যে, তুমি আমার জন্য খরচ করে দানের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হও। এ বিষয়ে নির্দেশনা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা দু'জনে রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হলেন। হজরত রাবেতা বললেন, আমি কিছু কিছু হাতের কাজ করি। সেগুলো বিক্রয় করে আমার কিছু আয় হয়। আমার স্বামী উপার্জনহীন। ফলে তাঁর এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের খরচ আমাকেই চালাতে হয়। এ কারণে আমি দান খয়রাত করতে পারি না। স্বামীর সংসারে আমি যা খরচ করি, তার জন্য কি আমি দানের সওয়াব পাবো? রসুল স. বললেন, অবশ্যই পাবে। তুমি সঠিক কাজই করেছো। তাহাবী লিখেছেন, রাবেতার আরেক নাম জয়নাব। আর তিনি ছিলেন হজরত ইবনে মাসউদের পত্নী।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একদিন ফজরের নামাজ শেষে রসুল স. মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে রমণীকুল! তোমাদের জ্ঞান অপূর্ণ। তোমাদের ধর্ম অপূর্ণ। তোমাদের বুদ্ধিমত্তা অনিষ্টকর। আমি দেখেছি আখেরাতে দোজখীদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই অধিক। সুতরাং তোমরা দান খয়রাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করো। উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে হজরত ইবনে মাসউদের পত্নীও ছিলেন। তিনি রসুল স. এর এই ঘোষণা শুনে তৎক্ষণাৎ হজরত ইবনে মাসউদের নিকটে উপস্থিত হলেন এবং কিছু অলংকার চাদরে বেঁধে নিয়ে রওনা হলেন রসুল স. এর পবিত্র দরবারের দিকে। হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, এগুলো নিয়ে কোথায় যাচ্ছো? তিনি বললেন,

www.eelm.weebly.com

এগুলো আমি দান খয়রাত করে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করবো। আশা করি এভাবে দান করলে আল্লাহ্পাক আমাকে দোজখ থেকে বাঁচাবেন। হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, এগুলো আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে দান করে দাও। আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে সওয়াব দান করবেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি রসুল স. এর নিকট থেকে না জেনে এ রকম করবো না। এ কথা বলে তিনি হাজির হলেন রসুল স. এর দরবারে। সব শুনে রসুল স. বললেন, এগুলো তোমার স্বামী ও সন্তান-সন্ততির জন্য খরচ করো। তাহলেই দানের সওয়াব পাবে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আজহার দিন ঈদগাহে গমন করলেন। নামাজের পর উপস্থিত জনতাকে বিভিন্ন বিষয়ে সদুপদেশ দিলেন। বিশেষভাবে বললেন দান খয়রাতের কথা। মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে নারী সম্প্রদায়! দান খয়রাত করো। আমি দেখেছি দোজখে তোমাদের সংখ্যাই বেশী। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এমন হলো কেনো? রসুল স. বললেন, তোমরা কথায় কথায় অভিসম্পাত দিতে থাকো। স্বামীদের প্রতি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না। এই হাদিসে আরো উল্লেখিত হয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদের সহধর্মিণী তখন বললেন, আমার কিছু অলংকার রয়েছে। আমি সেগুলোকে দান করতে চাই। হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, এর জন্য আমি ও আমার সন্তানেরাই তো রয়েছি। রসুল স. বললেন, ইবনে মাসউদ ঠিকই বলেছে। তোমার স্বামী সন্তানেরাই তোমার দানের অধিক হকদার।

উপরের হাদিসগুলো বর্ণনা করার পর তাহাবী লিখেছেন, উদ্ধৃত হাদিস সমূহের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, সেগুলোতে বলা হয়েছে নফল সদ্কার কথা। প্রথমোক্ত হাদিসে এসেছে— হজরত ইবনে মাসউদের স্ত্রী বলেছিলেন, আমি হাতের তৈরী কিছু জিনিস বিক্রী করে কিছু উপার্জন করি। এ কথায় বুঝা যায়, জাকাত ফরজ হয় এ রকম সম্পদের অধিকারিণী তিনি ছিলেন না। তাঁর উপার্জনের মাধ্যমে সংসারের প্রাত্যহিক ব্যয় নির্বাহ করা যেতো মাত্র। অতএব এ কথাটি নিশ্চিত যে, তিনি যে দান করতে চেয়েছিলেন তা নফল দান। আর সম্পূর্ণ অলংকার দান করাকে কখনো জাকাত বলা যায় না (জাকাত দিতে হয় জমানো সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ)। অতঃপর এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, নফল সদ্কা দরিদ্র স্বামী ও সন্তানদেরকে দেয়া জায়েয। আর আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, স্বামী ও সন্তানকে জাকাত দেয়া নাজায়েয। সুতরাং এ কথাটি স্পষ্ট যে, বর্ণিত হাদিসে যে দানের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে নফল দান। ফরজ জাকাত নয়।

www.eelm.weebly.com

হাফেজ ইবনে হাজার তাহাবীর অভিমতের জবাব দিয়েছেন এভাবে— মহিলারা তাদের স্বামী ও সন্তানকে জাকাত দিতে পারবে। কিন্তু কোনো লোক তার স্ত্রী ও সন্তানকে জাকাত দিতে পারবে না। এর কারণ হচ্ছে, স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ পোষণ করা স্বামী এবং পিতার উপর ফরজ। কিন্তু স্বামী ও সন্তানদের ভরণ পোষণ করা স্ত্রী এবং মাতার উপর ফরজ নয়। বর্ণিত হাদিসে স্ত্রী কর্তৃক স্বামী ও সন্তানকে দান করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং তা ফরজ জাকাত হতে পারবে না কেনো? এ রকম হওয়া সম্ভব যে, হজরত ইবনে মাসউদের স্ত্রী যে অলংকারগুলো চাদরে বেঁধেছিলেন, সেগুলোই ছিলো জাকাতের অংশ (সম্পূর্ণ অলংকারের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ)।

আমি বলি, হজরত ইবনে মাসউদ ও তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। কারণ বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্নভাবে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন রসুল স. এর ঈদগাহে যাওয়া এবং নামাজের শেষে বক্তৃতা করার ঘটনাটি একটি ভিন্ন ঘটনা। আবার মসজিদে ফজরের নামাজের পরে নসিহত প্রদান করার ঘটনাটিও পৃথক। আবার এতিমদের প্রতিপালন বিষয়ক বিবরণটিও নিশ্চয় অন্য একটি ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সে কারণে ভিন্ন সূত্রে এসেছে— ওই এতিমেরা ছিলো হজরত ইবনে মাসউদের বোনের ছেলে এবং মেয়ে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে দান করো। এক বর্ণনায় এ কথাও এসেছে— তুমি আমাকে দান করলে দানের সওয়াব পাবে না। এতে করে বুঝা যায় ফরজ জাকাত দিতে চেয়েছিলেন বলেই হজরত ইবনে মাসউদ তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন— সওয়াব পাবে না। আর নফল দানের ব্যাপারে বলেছিলেন, আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে দান করো। আর বর্ণিত ঘটনা দু'টোও নিশ্চয়ই পৃথক দু'টো ঘটনা। এ ছাড়াও এ কথাটি লক্ষ্যণীয় যে হজরত জয়নাব বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি যদি আমার স্বামীকে দান করি তবে কি তা যথেষ্ট হবে? রসুল স. বলেছিলেন, হ্যাঁ। এ রকম করলে সওয়াব পাবে দ্বিগুণ। রসুল স. এর এ কথায় বুঝা যায় ওই দান ছিলো সাধারণ দান। ফরজ জাকাত নয়।

জাকাত গ্রহীতা হিসেবে প্রতিবেশীরাও অগ্রগণ্য। হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে হজরত জিবরাইল আমাকে এতো বেশী উপদেশ দিয়েছেন যে, আমার মনে হচ্ছিলো সম্ভবতঃ প্রতিবেশীকেও শেষ পর্যন্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী বানানো হবে। আহমদ, বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি। জননী আয়েশা থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন আহমদ, বোখারী, মুসলিম এবং সুনান রচয়িতাবৃন্দ।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু জর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তরকারী রান্নার সময় ঝোল বেশী করে রাখার চেষ্টা কোরো এবং তা প্রতিবেশীদের প্রতি খেয়াল রেখে কোরো।

ক্ষুধার্তকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করানোও একটি অত্যুত্তম কর্ম। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ক্ষুধার্তদেরকে খুঁজে খুঁজে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করানো হচ্ছে সর্বোত্তম সদ্‌কা। বায়হাকী।

প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা পূর্ণ করাও সদ্‌কা বা দান। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন— ওয়া আম্মাস সায়িলা ফালা তান্‌হার (যাচঞাকারীকে বিমুখ কোরো না) রসুল স. বলেছেন, যাচঞাকারীদের হক রয়েছে— যদিও সে অশ্বারোহী হয়ে আসে। বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও আবু দাউদ। আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন হজরত আলী থেকে। আর তিবরানী বর্ণনা করেছেন হজরত হেরমাস বিন জিয়াদ থেকে।

হজরত উম্মে বুজাইদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, প্রার্থীকে কিছু দিয়ে বিদায় কোরো— যদিও রিক্ত হস্ত হও। মালেক, নাসাঈ, তিরমিজি, আবু দাউদ। আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন মুরসাল হিসেবে।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে বলবো, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কে? ওই ব্যক্তি সর্বনিকৃষ্ট, যে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যাচঞাকারীকে কিছুই দেয় না।

দান গ্রহীতা হিসেবে এতিম ও বন্দীরাও অগ্রগণ্য। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— ওয়া ইউত্‌ ইয়ুমুনাত ত্বোয়ামা আলা হুব্বিহি মিসকীনাও ও ইয়াতিমাও ওয়া আসিরা (এবং আল্লাহ্‌র মহব্বতে অন্নদানকে ভালোবেসে যারা মিসকীন, এতিম এবং বন্দীকে আহার করায়)।

এতক্ষণ ধরে গ্রহীতাদের অগ্রগণ্যতা সম্পর্কে কোরআন মজীদের আয়াত এবং হাদিস শরীফের উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করা হলো। এর মধ্যে আমরা নিঃস্বদের সাতটি শ্রেণীকে বিষয়ীভূত করেছি। আর আমাদের এই আলোচনাটি ইমাম আবু হানিফা এবং অধিকাংশ ইমামের অভিমতের অনুরূপ। এই ইমামগণের অভিমত হচ্ছে জাকাত গ্রহীতাদের সাতটি শ্রেণীর একটি সাধারণ যোগ্যতা হচ্ছে নিঃস্ব হওয়া।

ইমাম শাফেয়ী ফকিরদেরকে একটি পৃথক শ্রেণী হিসেবে গণ্য করেছেন। আরো বলেছেন, জাকাত গ্রহীতাদের আটটি খাত সম্পূর্ণ পৃথক। একটিকে অপরটির সঙ্গে মিলানো যাবে না। তাই তাঁর মতে মুওয়াল্লাফাতিল কুলুব, মুকাতিব, ঋণগ্রস্ত মুজাহিদ ও মুসাফির বিত্তবান হলেও তাদেরকে জাকাত প্রদান করা জায়েয। নিঃস্বদেরকে যেহেতু একটি পৃথক খাত হিসেবে চিহ্নিত করা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে, সেহেতু অন্য খাতগুলো নিঃস্ব হওয়া না হওয়ার ব্যাপারটি ধর্তব্য নয়। তিনি তাঁর মতের প্রমাণ হিসেবে আতা বিন ইয়াসারের একটি মুরসাল বর্ণনা উপস্থিত করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, পাঁচ ধরনের ব্যক্তি ধনী হলেও জাকাত গ্রহণ করতে পারবে। তারা হচ্ছে— ১. মুজাহিদ ২. জাকাত সংগ্রাহক ৩. ঋণপ্রপীড়িত ৪. জাকাতের সম্পদের ক্রেতা এবং ৫. জাকাত গ্রহীতার ওই ধনী প্রতিবেশী যাকে জাকাত গ্রহীতা জাকাতলব্ধ অর্থ থেকে কিছু হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে। মালেক, আবু দাউদ।

আমি বলি, এই হাদিসের সনদ এবং মতন উভয়টিই দ্বন্দ্বপূর্ণ। এখানে বর্ণনাকারী জায়েদ বিন আসলামের কথায় রয়েছে বৈসাদৃশ্য। একবার বলা হয়েছে, জায়েদ বিন আসলাম বর্ণনা করেছেন আতা থেকে এবং কোনো সাহাবীর নামোল্লেখ ছাড়াই মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন আতা। এভাবে ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। মুয়াত্তা থেকে সংকলন করেছেন আবু দাউদ। আরেকবার বলা হয়েছে, জায়েদ বর্ণনা করেছেন লাইস সূত্রে। পুনরায় বলা হয়েছে, জায়েদ বর্ণনা করেছেন আতা থেকে এবং আতা বর্ণনা করেছেন আবু সাঈদ থেকে। আবু দাউদের গ্রন্থে এই বক্তব্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে আতার মুরসাল বর্ণনাটি। আর আবু দাউদ এমরান বারকীর মধ্যস্থতায় আতার বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। সেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জাকাত কোনো ধনী ব্যক্তির জন্য হালাল নয়। ব্যতিক্রম কেবল ধর্মযোদ্ধা, পর্যটক এবং ওই ধনী ব্যক্তি যাকে তার দরিদ্র প্রতিবেশী জাকাতের অর্থের সঙ্গে মিলিয়ে হাদিয়া প্রেরণ করে অথবা দাওয়াত দেয়। ইবনে হুমাম লিখেছেন, কোনো কোনো আলেমের মতে হাদিসটি দৃঢ়সূত্রবদ্ধ নয়। আর হাদিসটি হজরত মুয়াজের হাদিসের অনুরূপ বলিষ্ঠও নয়। বলিষ্ঠ হিসেবে যদি মেনে নেয়াও যায়, তবুও হজরত মুয়াজের হাদিসটি হবে অধিকতর অগ্রগণ্য। আর ওই হাদিসে ধনীদেরকে জাকাতের অর্থ প্রদান করা স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ হয়েছে। এই হাদিসে আবার ধনীদের কোনো কোনো শ্রেণীকে জাকাতের সামগ্রী গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ কথা মানতে হবে যে, হুকুম নিশ্চয় অনুমতি অপেক্ষা অগ্রগণ্য। মুজাহিদ জাকাতের মাল গ্রহণ করতে পারবে তখন, যখন সে রাষ্ট্রীয়ভাবে কিছু পাবে না এবং ফায় এর মধ্য থেকে কিছু গ্রহণ করবে না। সুতরাং ঢালাওভাবে তারা জাকাতের হকদার নয়। বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। আর ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয় অপেক্ষা ওই হাদিস অধিকতর অগ্রগণ্য, যা ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী নয়।

ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের প্রমাণরূপে আরো একটি হাদিস উপস্থিত করা হয়েছে। হাদিসটির বর্ণনাকারী জিয়াদ বিন হারেস সাদায়ী। তিনি রসুল স. এর

www.eelm.weebly.com

খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর নিকট বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। এই দীর্ঘ হাদিসের এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, এক আগন্তুক এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে সদ্কার মাল থেকে কিছু দান করুন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ ইচ্ছামত সদ্কা (জাকাত) প্রদানের অধিকার কোনো নবী অথবা অনবীকে দান করেননি। ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন আটটি। তুমি ওই আটটি খাতের কোনো একটি খাতের মধ্যে যদি পড়ো, তবেই আমি তোমাকে জাকাত দিতে পারবো। আবু দাউদ।

আমি বলি, হাদিসটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। এর বর্ণনাপরম্পরাভূত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর বিন গানেম আফ্রিকীকে জাহাবী বলেছেন, মাজহুলিল হাল (বিপর্যস্ত)। ইবনে হাব্বান বলেছেন, মুত্তাহিম (অপবাদগ্রস্ত)। তার শায়েখ আবদুর রহমান বিন জিয়াদকেও ইবনে মুঈন এবং নাসাঈ চিহ্নিত করেছেন দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে। দারা কুতনী বলেছেন, বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি বলিষ্ঠ নন। আহমদ বিন হাম্বল বলেছেন, বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি দুর্বল।

হানাফীগণের মাসআলাটি সুপ্রমাণিত। অর্থাৎ নিঃস্বতা হতে হবে জাকাতের সাতটি শ্রেণীর সাধারণ যোগ্যতা। এভাবে যে কোনো এক শ্রেণীকে জাকাত দিলে তা অসঙ্গত হয়েছে বলে সন্দেহ করা যাবে না। আবার শ্রেণী নিরূপণ ও ব্যক্তি নিরূপণও বৈধ হওয়া চাই। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এক শ্রেণীর উপস্থিতিতে অন্য শ্রেণীকে জাকাতের সমস্ত মাল দেয়াকে জায়েয ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে জাকাত যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্দিষ্ট করা হয় এবং রাষ্ট্রনায়কের উপস্থিতিতে তা বণ্টন করা হয় তবে জাকাত সংগ্রাহক (আমেল) ছাড়া অন্য সাতটি শ্রেণীকে জাকাত প্রদান করা হবে অত্যাবশ্যক। বাগবী লিখেছেন, মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবের অংশও তখন অবলুপ্ত হবে। জাকাত বণ্টন করতে হবে অবশিষ্ট ছয়টি শ্রেণীর মধ্যে। তাদের প্রত্যেককে দিতে হবে সমান অংশ। এটা ওয়াজিব। গ্রহীতাদের মধ্যে যারা উপস্থিত থাকবে কেবল তাদের মধ্যেই জাকাত সমভাবে বণ্টন করতে হবে।

যদি প্রশাসক সংগৃহীত জাকাতের সম্পদ ভাগ করেন, তবে প্রতিটি শ্রেণীর সকল গ্রহীতাকে দান করবেন। আর যদি জাকাত প্রদাতা নিজে বণ্টন করতে চায়, তবে তার শহরের সকল হকদারকে প্রদান করবে। এ রকম সম্ভব না হলে দান করতে হবে প্রতিটি শ্রেণীর তিন ব্যক্তিকে, যদি সেখানে তিন অথবা তিনের অধিক ব্যক্তি উপস্থিত হয়। যদি কোনো শ্রেণীর কেবল এক ব্যক্তি হাজির থাকে, তবে তাকে দিতে হবে ওই শ্রেণীর সম্পূর্ণ অংশ। কিন্তু দেখতে হবে যে তার অধিকারের সীমা যেনো বজায় থাকে (দেয়া হয় যেনো তার প্রয়োজনানুসারে)। তার প্রয়োজন পূরণের পর কিছু মাল অবশিষ্ট থাকলে অন্যদের মধ্যে দ্বিতীয়বার তা বণ্টন করে দিতে হবে।

www.eelm.weebly.com

শ্রেণী সমূহের অংশ সমান সমান হওয়া চাই। ব্যক্তির অংশ সমান সমান হওয়া জরুরী নয়। তবে শাসক যদি নিজে জাকাত বণ্টন করেন এবং জাকাত গ্রহীতাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন সমান সমান হয়, তবে তাদেরকে কম বেশী দেয়া হবে নাজায়েয।

ইমাম শাফেয়ী তাঁর 'আল উম্ম' গ্রন্থে লিখেছেন, লিল ফুকারায়ি' (নিঃস্ব) কথাটির 'লাম' অক্ষরটি এসেছে অধিকার প্রমাণের জন্য। আল্লাহ্পাক আটটি শ্রেণীকে জাকাতের হকদাররূপে ঘোষণা করেছেন। তাই প্রতিটি শ্রেণীকে প্রদান করা হবে ওয়াজিব। সে কারণেই প্রতিটি শ্রেণীর উল্লেখে আলিফ লাম ইসতেগরাকী (নিমজ্জক লাম) সংযোজিত হয়েছে। সুতরাং প্রতিটি শ্রেণীকে প্রদান করা ওয়াজিব। প্রতিটি শ্রেণীর সকল লোককে দেয়া সম্ভব না হলে প্রতিটি শ্রেণীর তিনজন লোককে দিতে হবে। আয়াতে প্রতিটি খাতকে বহুবচনবোধকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই কমপক্ষে তিনজনকে দিলে বহুবচনবোধক শব্দরূপের বাস্তবায়ন নিশ্চিত হবে।

আমরা বলি, আলোচ্য আয়াতে জাকাত গ্রহীতাদের প্রতিটি শ্রেণীর সঙ্গে যে আলিফ লাম উল্লেখিত হয়েছে তা ইস্তেগরাকী নয়। কারণ জাকাতের সম্পদ পৃথিবীর সকল ফকিরদেরকে দেয়া সম্ভব নয়। আপন শহরের ফকিরদেরকেও সবসময় একত্র করা সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে আলিফ লাম হাকিকী অথবা আহাদী কোনোটাই নয়। সুতরাং কোনো শ্রেণীর তিনের অধিক ব্যক্তিকে প্রদান করাও ওয়াজিব নয়। এখানকার আলিফ লাম লামে ইস্তেগরাকী হলে উল্লেখিত শ্রেণীভুক্ত সকলকেই দান করা জরুরী হতো— যাদেরকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় তাদেরকেও। উদাহরণস্বরূপ প্রতিটি শ্রেণীর অংশ যদি এক শত টাকা হয় তবে ওই টাকা ভাগ করে দিতে হবে শহরের সকল ফকিরকে— যাদেরকে পাওয়া সম্ভব। আর 'কমপক্ষে তিন জনকে দিতে হবে' এ রকম বললে বহুবচনকে একটি নির্দিষ্ট অর্থে গ্রহণ করতে হয়। এতে করে বুঝা যায় এখানকার আলিফ লাম হচ্ছে লামে জিনসি (জাতিবাচক লাম)। আর জিনসিয়াত (জাতিবাচকতা) জামিয়াতের (বহুবচনবোধকতার পরিপন্থী। তাই নিঃস্বদের পুরো দলকে প্রদান করা জরুরী নয়। এক ব্যক্তিকে দিলে তা যথেষ্ট বলে গণ্য হবে— সে যে কেউ হোক। এরপরও যদি বলা হয় যে, বহুবচনবোধকতার বিষয়টি অবশিষ্ট রয়েছে, তবে বহুবচনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে হবে বহুবচন এবং একবচনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে হবে একবচনকে। এভাবে একক বণ্টনই হয়ে পড়বে জরুরী। এছাড়া ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এখানকার 'লাম' প্রকাশ করেছে ইসতেহাককে (অধিকারকে)। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। এখানে লাম সংযোজিত হয়েছে খাতগুলোকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করবার জন্য। এই বিশেষত্বটি একটি সাধারণ

www.eelm.weebly.com

বিশেষত্ব। কাজেই মালিকানা অথবা অধিকার অনুসারে 'লাম' প্রকাশ করেছে এই বক্তব্যটিকে যে, এটাই জাকাতের খাত। এছাড়া জাকাতের অন্য কোনো খাত নেই। সাহাবীগণের আমল (হাদিসে আসার) থেকেও আমাদের অভিমতটি পরিপুষ্টি লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে বায়হাকী ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাসের বক্তব্য এবং ইবনে শায়বা বর্ণনা করেছেন হজরত ওমরের বক্তব্য। বক্তব্যটি এই— যে শ্রেণীকে তুমি প্রদান করো না কেনো, যথেষ্ট হবে (প্রতিটি শ্রেণীকে প্রদান করা জরুরী নয়)। তিবরানী বলেছেন, হজরত ওমর একবার একই শ্রেণীকে দান করেছিলেন জাকাতের সমুদয় অর্থ। আবু উবায়দা তার কিতাবুল আমওয়ালে লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. এর নিকটে জাকাতের মাল এলো। তিনি স. সেগুলোকে বণ্টন করে দিলেন মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবদের মধ্যে। হজরত মুয়াজ ওই জাকাত প্রেরণ করেছিলেন ইয়েমেন থেকে। সেগুলো ছিলো স্বর্ণমুদ্রা। রসুল স. ওই স্বর্ণমুদ্রাগুলো দান করলেন আকরা বিন হাবেস, উয়াইনিয়া বিন হাসান, আলকামা বিন আলাসা এবং জায়েদ ইবনে লখাইলকে। তাঁরা সকলেই ছিলেন মুওয়াল্লাফাতিল কুলুব। এরপর পুনরায় জাকাত হাজির হলো। তিনি স. সেগুলো দান করলেন আরেক শ্রেণীকে, ঋণ জর্জরিতদেরকে। কিছু প্রাপ্তির আশায় সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন কাবিসা বিন মাখারেক। রসুল স.কে এভাবে দান করতে দেখে তিনি তার চঞ্চলতা প্রকাশ করলেন। রসুল স. বললেন, অপেক্ষা করো। আরো জাকাতের মাল আসবে। এলেই তোমাকে দেয়া হবে। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, এই বর্ণনাটির প্রতিকূলে আমি কোনো বক্তব্য অথবা কোনো আমলের সংবাদ পাইনি। বায়যাবী লিখেছেন, হজরত ওমর, হজরত হুজায়ফা, হজরত ইবনে আব্বাস ও আরো অনেক সাহাবী ও তাবেয়ীগণের বক্তব্য ও আমল থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, জাকাত গ্রহীতাদের যে কোনো একটি শ্রেণীকে জাকাতের সমুদয় অর্থ প্রদান করা জায়েয। ইমামত্রয়ের অভিমত এ রকম। ইমাম শাফেয়ীর কোনো কোনো অনুসারীও এই অভিমতটিকে পছন্দ করেছেন। আমার পিতাও এ রকম ফতোয়া প্রদান করেছেন। অবশিষ্ট কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে, এখানে উল্লেখিত আটটি খাত ছাড়া অন্য কোনো খাতে জাকাতের অর্থ খরচ করা যাবে না। কিন্তু এ রকম বলা হয়নি যে, কোনো একটি বিশেষ শ্রেণীকে জাকাত প্রদান করা ওয়াজিব।

মাসআলাঃ ফকির ও মিসকীন ছাড়া অন্যান্য খাতের অন্তর্ভুক্ত ধনীদেরকেও জাকাত দেয়া জায়েয। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু কারা ধনী এবং কারা ধনী নয়, সে সম্পর্কে রয়েছে বিস্তর মতভেদ। ইতোপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ওই ব্যক্তি ধনী, যে জাকাত ওয়াজিব হয়, এমতোপরিমাণ সম্পদের অধিকারী। কোনো কোনো আলেম

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, যার নিকট সকাল সন্ধ্যার আহার রয়েছে, তার জন্য জাকাত গ্রহণ করা জায়েয নয়। রসুল স. বলেছেন, অপরের মুখাপেক্ষী হতে হয় না, এতটুকু সামর্থ্য যার রয়েছে, সে যাচঞা করলে তার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে জাহান্নামের আগুন। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! ধনী ব্যক্তি তবে কে? তিনি স. বললেন, যে যাচঞা করা থেকে বিরত থাকে (যার রয়েছে দু'বেলা আহারের সংস্থান)। হজরত সুহাইল বিন হানযালা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ। ইবনে হাব্বান বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যারা চল্লিশ দিরহামের মালিক, তারা জাকাত গ্রহণ করতে পারবে না।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, এক আউকিয়ার অধিকারী যদি প্রার্থী হয়, তবে তাকে জাকাত গ্রহীতা হিসেবে গণ্য করা যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে করেছিলাম আমার উটনীটি তো এক আউকিয়ার চেয়ে অধিক মূল্যের। এ কথা ভেবে আমি পুনরায় মাসআলা জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে রসুল স. এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলাম। কিন্তু তাঁকে আর কোনো কিছু জিজ্ঞেস করিনি। হিশামের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— রসুল স. এর জামানায় এক আউকিয়ার মূল্য নির্ধারিত হয়েছিলো চল্লিশ দিরহাম। আবু দাউদ, নাসাঈ।

আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যার নিকট চল্লিশ দিরহাম থাকবে সে যদি সওয়াল করে, তবে সে অন্যায় করবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পঞ্চাশ দিরহামের অধিকারীদের জন্য জাকাত হালাল নয়। ইসহাক এবং আবু সওরও এই অভিমতের প্রবক্তা। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমতও এ রকম। হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যার নিকট এতটুকু সম্পদ থাকে যার কারণে তাকে সম্পদাধিকারী বলা যায়, সে সওয়াল করলে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে চাঁচা ছোলা মুখমণ্ডল নিয়ে (মুখাবয়বে গোশত থাকবে না, থাকবে কেবল হাড়)। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! সম্পদাধিকারী কে? তিনি স. বললেন, পঞ্চাশটি রৌপ্যমুদ্রা অথবা তার সমমূল্যের স্বর্ণের অধিকারী। আবু দাউদ, নাসাঈ। হাদিসটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট।

উপরে বর্ণিত দলিল সম্পর্কে এ কথা বলা যেতে পারে যে, যার নিকট সকাল সন্ধ্যার আহার রয়েছে অথবা দিরহাম রয়েছে চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশটি, তার জন্য সাহায্যপ্রার্থী হওয়া হারাম। কিন্তু এতে করে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রার্থনায় তার জন্য জাকাত গ্রহণ করা হারাম। তাই আমরা বলি, দু'বেলা আহারের ব্যবস্থা যাদের রয়েছে, তাদের জন্য হাত পাতা হারাম। কিন্তু বিনা চাওয়ায় তাকে জাকাতের অর্থ প্রদান করলে তা গ্রহণ করা তার জন্য জায়েয। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বিন খাত্তাব বলেছেন, একবার রসুল স.

www.eelm.weebly.com

আমাকে কিছু দান করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার চেয়েও অভাবী লোক রয়েছে। রসুল স. বললেন, তুমি তো যাচঞা করোনি। বিনা যাচঞায় পেলে দান গ্রহণে বিমুখ হয়ো না। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ওমরের নিকট দু'বেলা আহারের সংস্থান ছিলো। তাই তিনি বলেছিলেন, আমার চেয়েও অভাবী লোক রয়েছে। রসুল স. তাঁকে দান গ্রহণের হুকুম দিয়েছিলেন। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ জাকাত গ্রহণ করা না করা সম্পর্কে বলেছেন, প্রয়োজনীয় সামগ্রী থাকুক অথবা নাই থাকুক— উভয় অবস্থায় জাকাত গ্রহণ করা জায়েয। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি একটি দিরহামের অধিকারী হলেও তাকে ধনী বলা যাবে। আর বহুপোষ্যধারী উপার্জন-রহিত ব্যক্তি হাজার দিরহামের অধিকারী হলেও তাকে ধনী বলা যাবে না। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ীর অনুসরণে বাগবী বর্ণনা করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তির নিকটে তার নিজের এবং পরিবার পরিজনের প্রাত্যহিক প্রয়োজন পূরণের মতো সংস্থান থাকে তবে তাকে ধনী বলা যায়। হজরত কাবিসা বিন হারেসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আমাকে একবার বললেন, হে কাবিসা! শোনো, কেবল তিন ধরনের লোকের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি হালাল। তার মধ্যে এক ধরনের ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে তার নিকটে রক্ষিত জামানত নষ্ট করার ক্ষতিপূরণরূপে ঋণের বোঝা হ্রাস করার লক্ষ্যে ভিক্ষা করে (অতিরিক্ত যাচঞা করে না)। প্রয়োজন পূর্ণ হলে যাচঞা করা থেকে বিরত থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তি সে, যার বসতবাটী এবং ক্ষেতের ফসল ধ্বংস হয়েছে। ওই ব্যক্তিও এতটুকু পরিমাণ ভিক্ষা করতে পারবে, যাতে করে তাঁর জীবন রক্ষা হয়। তাকেও অতিরিক্ত প্রার্থনা থেকে বিরত থাকতে হবে। তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে দেউলিয়া। তিনজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যদি তাকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করে তবে তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি হালাল। কিন্তু তাকেও সংযত হতে হবে। ভিক্ষা করতে হবে কেবল জীবন বাঁচানোর জন্য। মুসলিম।

হজরত ইমাম হোসাইন বিন হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের উপর যাচঞাকারীর অধিকার রয়েছে— যদিও সে ঘোড়ায় চড়ে আসে। আহমদ, আবু দাউদ। লক্ষণীয় যে, ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, ভিক্ষা করতে হবে কেবল জীবন রক্ষার জন্য। আরো বর্ণিত হয়েছে, চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ দিরহামের অধিকারীদের জন্য জাকাত গ্রহণ হালাল নয়। এর পরের হাদিসে বলা হয়েছে, অশ্বারোহী যাচঞাকারীরও হক রয়েছে। এ কথাটিও লক্ষ্য করতে হবে যে, অশ্বারোহীও অভাবী হতে পারে। আর সকল প্রকার অভাবগ্রস্তকে জাকাত দেয়া জায়েয। এভাবে প্রমাণিত হয় যে— প্রয়োজন ব্যতীত ভিক্ষা করা হারাম। আর প্রয়োজন দেখা দিলে জায়েয। কারো নিকট চাওয়া যাবে কেবল তখনই, যখন তার দু'বেলা আহারের সংস্থানও থাকবে না। এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে

www.eelm.weebly.com

জাকাত কিন্তু ভিক্ষা নয়। তাই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ প্রার্থী না হলেও তাদেরকে জাকাত পৌঁছে দিতে হবে। তবে তাদের মধ্যে থাকতে হবে একটি সাধারণ যোগ্যতা। আর সেই যোগ্যতাটি হচ্ছে অভাবগ্রস্ততা। আর অশ্বারোহী যাচ্ঞাকারী সম্পর্কে বলা যেতে পারে, সে আসলেই অভাবগ্রস্ত। তাই তার বাহনে চড়ে সে অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। সে হতে পারে ধর্মযোদ্ধা অথবা ঋণভারাক্রান্ত। এ কথাটিও জেনে রাখতে হবে যে, ঘোড়ার বিক্রয় মূল্য দ্বারা জাকাতের নেসাব পুরা হয় না (কেবল একটি ঘোড়ার অধিকারীর উপর জাকাত ফরজ হয় না)।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ওই ব্যক্তি ধনী, যার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর এমতোপরিমাণ সম্পদ থাকে যার উপরে জাকাত ওয়াজিব হয়। হজরত মুয়াজকে রসুল স. নির্দেশ দিয়েছিলেন— তাদের ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে জাকাত গ্রহণ করে বণ্টন করে দিতে হবে তাদেরই দরিদ্র জনতার মধ্যে। এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, যাকে প্রদান করা হবে, সে ওই ব্যক্তি নয়— যার নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়। তাই সাহেবে নেসাবকে জাকাত প্রদান করা নাজায়েয। কারণ সে তো জাকাত প্রদাতা। সে আবার জাকাত গ্রহীতা হতে পারে কিরূপে? হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আউকিয়া হোক অথবা আউকিয়ার সমতুল্য হোক— উভয়ের বিধান একই রকম। স্বনামে বেনামে সকল অবস্থায় সকল যোগ্য ব্যক্তির উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। রসুল স. বলেছেন, কৃষিকাজের উপকরণরূপে ব্যবহৃত বাহন, ভারবাহী পশু এবং গৃহপালিত পশুর উপরে জাকাত নেই। এতে করে বুঝা যায় আল্লাহ্তায়ালা কেবল সহজে উৎপাদিত সম্পদের উপর শর্ত সাপেক্ষে জাকাত ফরজ করেছেন। অবশিষ্ট কথা এই যে, প্রয়োজন পূরণের পর যদি কারো নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং তা প্রয়োজন পূরণের জন্য অত্যাবশ্যক হয় তবে ওই সম্পদ না থাকার মতোই হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে— একজনের নিকট কেবল পিপাসা পূরণের মতো পানি আছে। এখন ওই পানি না থাকার মতোই। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয হবে। তেমনি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি মালেকে নেসাব হয়, আর ওই নেসাব যদি তার ঋণ অপেক্ষা বেশী না হয়, অথবা সে যদি মুজাহিদ হয়, অথবা মুসাফির হয়— তার ঘোড়ার মূল্য নেসাব পরিমাণ হোক অথবা না হোক, এ ধরনের লোককে জাকাত দেয়া যাবে। তেমনি কোনো শিক্ষক অথবা শিক্ষার্থীর নিকট যদি কোনো পাঠোপযোগী পুস্তক থাকে, অথবা যদি থাকে বসবাসের স্থান, তবুও তাদেরকে জাকাত দেয়া যাবে। হাদিস শরীফে তাই বলা হয়েছে মুজাহিদ, ঋণগ্রস্ত মুসাফির— এ রকম পাঁচ ধরনের ব্যক্তি সম্পদশালী হলেও তাদেরকে জাকাত দেয়া যাবে।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি উপার্জনের মাধ্যমে তার নিত্যদিনের প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম, এতদসত্ত্বেও অভাবগ্রস্ত, তাকেও জাকাত প্রদান করা জায়েয। কেননা সেও আলোচ্য আয়াতের 'ইন্নামাস সাদাকাতু লিল ফুকারায়ি'— এই সাধারণ নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ এ ধরনের ব্যক্তিকে জাকাত দেয়া নাজায়েয বলেছেন। কেননা হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যারা ধনী, ক্ষমতাশালী ও স্বাস্থ্যবান তাদের জন্য সদ্‌কা (জাকাত) হালাল নয়। আহমদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, হাকেম, আবু দাউদ, তিরমিজি। হাকেম বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর ইবনে আস থেকে। দারাকুতনী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর আল ইলাল গ্রন্থে। আবু ইয়া'লী বর্ণনা করেছেন হজরত তালহা থেকে। হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুল স. এর নিকটে জাকাতের কিছু সম্পদ এলো। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক তাদের বাহনে চড়ে রসুল স. এর দরবারে হাজির হলো। রসুল স. তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে লোক সকল! এই সম্পদ ধনীদের জন্য নয়। সরকারী কর্মচারী এবং স্বাস্থ্যবান উপার্জনক্ষমদের জন্যও নয়। আহমদ, দারা কুতনী।

ওবায়দুল্লাহ্ বিন আদী বলেছেন, একবার আমাকে দু'জন লোক বললো, আমরা রসুল স. এর দরবারে কিছু চাওয়ার জন্য হাজির হয়েছিলাম। রসুল স. গভীরভাবে আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর বললেন, যদি তোমরা চাও তবে আমি তোমাদেরকে দান করবো। কিন্তু এর মধ্যে ধনীদের কোনো অংশ নেই। স্বাস্থ্যবান ও উপার্জনক্ষমদেরও অংশ নেই (তোমরাতো স্বাস্থ্যবান ও উপার্জনক্ষম)। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ। 'তানকিহ্' রচয়িতা বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। এর সূত্র পরম্পরা উত্তম। এ বিষয়ের হাদিস সমূহ পরিপূর্ণ বিবরণ সমৃদ্ধ। ইবনে আদীর গ্রন্থে এ সম্পর্কে হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর থেকে। সুনানে তিরমিজি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হজরত হাবসী বিন জুনাদা থেকে। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন আবু জামিল সূত্রে বনী হেলালের এক ব্যক্তি থেকে এবং তিবরানী বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুর রহমান থেকে।

আমি বলি, 'যদি তোমরা চাও তবে আমি তোমাদেরকে দান করবো, কিন্তু এতে ধনীদের ও কর্মক্ষমদের কোনো অংশ নেই' —রসুল স.এর এই বাণীর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কর্মক্ষম অভাবী সম্প্রদায়কেও জাকাত দেয়া জায়েয। যদি এ রকম না হতো, তবে রসুল স. 'যদি তোমরা চাও তবে আমি তোমাদেরকে দান করবো'— এ রকম বলতেন না। এ সম্পর্কে হজরত ওমরের হাদিসটিও আমাদের পক্ষের দলিল। তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাকে নয়,

www.eelm.weebly.com

আমার চেয়েও যারা অভাবী তাদেরকে দান করুন। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিসটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলিমের বর্ণনায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, রসুল স. তখন বললেন, এগুলো নিয়ে যাও। এগুলোর দ্বারা প্রয়োজন পূর্ণ করো এবং অন্যকেও দান করো। সালেম বলেছেন, হজরত ইবনে ওমর এই হাদিস অনুযায়ী আমল করতেন। তিনি কারো নিকট কিছু চাইতেন না। কিন্তু কেউ কিছু দিলে তা প্রত্যাখ্যানও করতেন না।

একটি সন্দেহঃ রসুল স. হজরত ওমরকে যা দিয়েছিলেন, তা ছিলো পারিশ্রমিক। অভাবী হিসেবে তিনি স. হজরত ওমরকে দান করেননি। তাই বলেছিলেন, এগুলো নিয়ে যাও, খাও এবং খয়রাত করো। রসুল স. এর ওই দান যে পারিশ্রমিক ছিলো, তার প্রমাণ রয়েছে মুসলিমের একটি বর্ণনায়। আবু হুমাইদ সায়েদীও এ রকম বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি এই— হজরত ওমর বিন খাত্তাব আমাকে জাকাত সংগ্রাহকরূপে নিযুক্তি দিয়েছিলেন। জাকাত আদায় করে দেয়ার পর তিনি আমাকে পারিশ্রমিক প্রদান করেন। আমি বলি, হে বিশ্বাসীদের অধিনায়ক! আমি তো এ কাজ করেছি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে। আমার বিনিময় তো রয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার দায়িত্বে। তিনি বলেন, যা দেয়া হয়েছে তা নিয়ে যাও। রসুল স. এর জামানায় আমি জাকাত সংগ্রাহকের দায়িত্ব পালন করেছিলাম। এর জন্য রসুল স. আমাকে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন। তখন আমি তোমার মতোই আপত্তি তুলেছিলাম। রসুল স. বলেছিলেন, বিনা যাচঞায় যা পাও, তা খাও ও খয়রাত করো।

আমি বলি, পূর্বে বর্ণিত হাদিসের শব্দসমূহ সাধারণ অর্থবোধক। সেখানে বলা হয়েছে, যাচঞা ব্যতিরেকে যা পাও তা গ্রহণ করো। সুতরাং— ওই হাদিসটিকে অন্য কোনো হাদিসের মাধ্যমে বিশেষায়িত করা সমীচীন নয় (হজরত ওমরকে যে দান করেছিলেন সে দানকে পারিশ্রমিক বলা ঠিক নয়)। হাদিসটির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ কথা সহজেই বুঝা যায় যে, রসুল স. সুঠামদেহী যাচঞাকারীকেও জাকাতের সামগ্রী প্রদান করেছেন। যেমন মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে পথ চলছিলাম। তখন তাঁর শরীরে জড়ানো ছিলো মোটা জরির পাড়ওয়ালা একটি নাজরানী চাদর। হঠাৎ এক বেদুঈন এসে তাঁর চাদর ধরে জোরে টান দিলো। ফলে তাঁর গ্রীবাদেশের কাছে চাদরের একস্থান ছিঁড়ে গেলো। লোকটি বললো, মোহাম্মদ! তোমার জমানো সম্পদ থেকে আমাকেও কিছু দান করো। রসুল স. তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। তারপর তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এই অধ্যায়ের অধিকাংশ হাদিস এ কথার সাক্ষী।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, উদ্ধৃত হাদিস থেকে সর্বসম্মতিক্রমে এ কথাই বলতে হয় যে, সুঠাম শরীর বিশিষ্ট দরিদ্রকে জাকাত প্রদান করা সিদ্ধ। সে প্রার্থী হোক অথবা না হোক। কিন্তু এ রকম লোকের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অশোভনীয় (মাকরূহ)।

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে স্বাস্থ্যবান ও কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য জাকাত হালাল নয়। এ কথার অর্থ হবে তার জন্য ভিক্ষা করা হালাল নয়। এ ধরনের লোককে ভিক্ষা দেয়ার পর যদি জাকাত দেয়া হয় তবে তা তার জন্য হালাল হবে না। প্রকৃত কথা এই যে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারীদের জন্য ভিক্ষা হারাম। তবে ভিক্ষা ছাড়া সে যদি কিছু পায় অথবা ভিক্ষার পর যদি কোথাও থেকে কিছু পায় তবে তা তার জন্য হারাম হবে না।

মাসআলাঃ অধিকাংশ ইমামগণের মতে রসুল স. এর জন্য ফরজ নফল কোনো প্রকার সদ্কা হালাল ছিলো না। তবে নফল সদ্কা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ কিছুটা ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু জমহুরের মতে প্রমাণরূপে এসেছে হজরত আনাসের একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে— একদিন পথ চলতে চলতে রসুল স. দেখলেন এক স্থানে পড়ে আছে কিছু ফলমূল। তিনি স. বললেন, এগুলো সদ্কা বলে যদি আমার সন্দেহ না হতো তবে আমি এগুলো খেয়ে ফেলতাম। বোখারী ও মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর খেদমতে কোনো আহার্য দ্রব্য উপস্থিত করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন এগুলো কি হাদিয়া না সদ্কা? সদ্কা বলা হলে তিনি স. তাঁর সঙ্গীদেরকে বলতেন, তোমরা আহার করো। তিনি স. নিজে ওই আহার্য ভক্ষণ করতেন না। আর হাদিয়া বলা হলে তিনি স. হাত বাড়াতেন এবং সকলের সঙ্গে নিজেও আহার করতেন। বোখারী, মুসলিম। তাহাবীও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন বাহ্জাদ বিন হাকিমের পিতামহ থেকে।

রসুল স. এর বংশধরদের জন্য সদ্কা হালাল ছিলো না। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, শিশুকালে একবার হজরত হাসান ইবনে হজরত আলী সদ্কার একটি খেজুর মুখে দিলেন। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে খেজুরটি তাঁর মুখ থেকে বের করে ফেলে দিলেন এবং বললেন, আমরা সদ্কা খেতে পারি না। বোখারী, মুসলিম।

মাসআলা ঃ রসুল স. এর পরোলোক গমনের পর তাঁর বংশধরদের জন্য জাকাত ও খয়রাত হালাল কি না, সে সম্পর্কে আলেমগণের চারটি অভিমত রয়েছে। অভিমতগুলো নিম্নরূপ—

১. সম্পূর্ণতই জায়েয। অর্থাৎ রসুল স. এর পৃথিবী পরিত্যাগের পর তাঁর বংশধরদের জন্য জাকাত, সদ্কা সবই হালাল। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু হানিফারও অভিমত অনুরূপ। অবশ্য এ সম্পর্কে শরিয়তের কোনো

www.eelm.weebly.com

স্পষ্ট দলিল নেই। তাই মুজতাহিদ ইমামগণ শরিয়ত সমর্থিত কিয়াসের (অনুমানের) ভিত্তিতে বিষয়টির সমাধান দিতে চেষ্টা করেছেন এভাবে— রসুল স. এর পৃথিবীর জীবনে তাঁর বংশধরদের জন্য জাকাত ও নফল সদ্‌কা হারাম ছিলো। রসুল স. তখন তাঁদের প্রয়োজন পূরণ করতেন গণিমতের খুমুস (পঞ্চমাংশ) থেকে। যখন তাঁর মহাতিরোধান ঘটলো তখন ওই খুমুস অবলুপ্ত হয়ে গেলো। তাই পরবর্তীতে তাঁর বংশধরদের জন্য জাকাত ও নফল সদ্‌কা হারাম হওয়ার বিধানটিও অবলুপ্ত হয়েছে।

২. সম্পূর্ণতই নাজায়েয। অর্থাৎ রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পরেও তাঁর বংশধরদের জন্য জাকাত এবং নফল সদ্‌কা অসিদ্ধ। সাহেবাঈন এই অভিমতের প্রবক্তা। তাহাবী এবং ইবনে হুম্মাম বলেছেন, বিষয়টি রসুল স. এর বংশধরদের অভিপ্রায় নির্ভর। কেননা রসুল স. বলেছেন, আমরা (আমি ও আমার বংশধররা) সদ্‌কা ভক্ষণ করি না। — এই ঘোষণাটি একটি সাধারণ ঘোষণা। অন্য বর্ণনায় এসেছে আমাদের জন্য সদ্‌কা হালাল নয়। মুসলিম, তিবরানী ও তাহাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা এবং হজরত রুশদ বিন মালেক থেকে। হজরত হাসান থেকে ইমাম আহমদ ও তাহাবীর একটি বর্ণনাতেও একথাগুলো এসেছে।

৩. জাকাত জায়েয, কিন্তু খয়রাত জায়েয নয়। এ রকম বলেছেন কেবল ইমাম মালেক। তিনি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— জাকাত একটি ফরজ দায়িত্ব। আর জাকাতে রয়েছে জাকাত গ্রহীতাদের অপরিহার্য অধিকার। সুতরাং এতে অবমাননাকর কিছু নেই। কিন্তু খয়রাত বা নফল দানের মধ্যে রয়েছে করুণা ও অবমাননা। উল্লেখ্য যে এই অভিমত খণ্ডনের জন্য ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিস সমূহই যথেষ্ট।

৪. খয়রাত জায়েয, জাকাত জায়েয নয়। ইমাম আবু হানিফার প্রসিদ্ধ অভিমত এটাই। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বলেরও এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকের অভিমতও এরকম। এ সম্পর্কে অবশ্য ইমাম মালেকের চারটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে— যার সবগুলোই প্রসিদ্ধ। আলোচ্য অভিমতের দলিল এই যে, রসুল স. এর বংশধরদের জন্য যে সদ্‌কা নিষিদ্ধ হয়েছিলো তা হচ্ছে ফরজ সদ্‌কা (জাকাত)। হজরত মুত্তালিব বিন রবীয়া বিন হারেসের হাদিসে এ কথাই বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন, হজরত রবীয়া বিন হারেস এবং হজরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব একবার আমাকে ও

www.eelm.weebly.com

ফজল বিন আব্বাসকে রসুল স. এর নিকটে হাজির করে আবেদন জানালেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এ দু'জনকে জাকাত সংগ্রাহক হিসেবে নিযুক্তি দান করুন। তাহলে এরাও অন্য সংগ্রাহকদের মতো পারিশ্রমিক পাবে। হজরত আলী বললেন, এ রকম করবেন না। কিন্তু তাঁর কথা কেউ মানলেন না।। আমরা উম্মত জননী হজরত জয়নাব বিনতে জাহাশের ঘরে অবস্থানরত রসুল স. এর নিকটে হাজির হলাম। বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা এখন বিবাহের উপযুক্ত। কিন্তু আমাদের পরিবার অনেক বড়। তাই পারিবারিকভাবে বিবাহের জন্য অর্থ সংস্থান সম্ভব নয়। তাই আপনি যদি আমাদেরকে জাকাত সংগ্রাহকরূপে নির্বাচন করেন, তবে আমরাও অন্য সংগ্রাহকদের মতো পারিশ্রমিক পাবো। এভাবে বিবাহের ব্যয় নির্বাহ করতে সমর্থ হবো। আর আমাদের দৈনন্দিন জীবনও হবে সচ্ছল। রসুল স. আমাদের কথা শুনে দীর্ঘ সময় ধরে নিশ্চুপ রইলেন। এরপর বললেন, মোহাম্মদের বংশধরদের জন্য এ কাজটি অশোভন। তোমরা বরং মাহমিয়া বিন জুযা আসাদী এবং নওফেল বিন হারেস বিন আবদুল মুত্তালেবকে ডেকে আনো। মাহমিয়া ছিলেন, রসুল স. এর খুমুসের রক্ষণাবেক্ষণকারী। আমরা নির্দেশমতো উভয়কে ডেকে আনলাম। রসুল স. মাহমিয়াকে বললেন, এই ছেলেটির (ফজল বিন আব্বাসের) সঙ্গে তোমার মেয়ে বিয়ে দাও। এরপর রসুল স. নওফেল বিন হারেসকে বললেন, তুমি তোমার মেয়ে বিয়ে দাও এই ছেলেটির (রবীয়া বিন হারেসের) সঙ্গে। রসুল স. এর নির্দেশ তাঁরা দুজনেই পালন করলেন। রসুল স. পুনঃনির্দেশ দিলেন, খুমুসের অংশ থেকে দাও এদের মোহরানার অর্থ। মুসলিম। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর বংশের (হাশেমী বংশের) কেউ জাকাত সংগ্রাহকরূপে নিযুক্ত হলেও জাকাতের টাকা থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারবে না।

আর একটি ঘটনা থেকে রসুল স. এর বংশধরদের জন্য জাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। বর্ণনাটি এই— মদীনার এক ব্যবসায়ী দল কোনো এক স্থান থেকে কিছু পণ্য সামগ্রী নিয়ে এলো। রসুল স. সেগুলো থেকে কিছু ক্রয় করলেন এবং কিছু লাভে সেগুলোকে আবার বিক্রয় করে ফেললেন। তারপর লাভের টাকা তাঁর বংশের বিধবাদেরকে সদ্‌কা হিসেবে দান করলেন এবং বললেন, ভবিষ্যতে আর কখনো আমি নগদ মূল্য ছাড়া কিছু কিনবো না।

www.eelm.weebly.com

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, একবার ইমাম জাফর সাদেক মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থলে একটি কূপ থেকে পানি পান করলেন। সেখানে উপস্থিত হজরত ইব্রাহিম বিন মোহাম্মদ বললেন, আপনি সদ্‌কার পানি পান করেছেন (কূপটি সদ্‌কা করা হয়েছে)।

ইমাম জাফর সাদেক বললেন, আমাদের জন্য কেবল সদ্‌কায়ে মাফরুদা (জাকাত) হারাম (আর এই পানি তো সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে সদ্‌কা করা হয়েছে)। এই হাদিসটিকে যদি কেউ রসুল স. এর বংশধরদের জন্য নফল সদ্‌কা হালাল হওয়ার প্রমাণরূপে পেশ করেন, তবে তা হবে অযৌক্তিক। কারণ সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ করা বস্তুর মধ্যে রসুল স. এর বংশধরগণও স্বাভাবিক-ভাবে অন্তর্ভুক্ত। তাই ইমাম জাফর সাদেক বলেছিলেন, আমাদের জন্য কেবল ফরজ সদ্‌কা হারাম।

বোখারী ও অন্যান্যদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি আমার উত্তরাধিকারীদের জন্য কিছু রেখে যাবো না। যা রেখে যাবো তা হবে সর্ব সাধারণের জন্য সদ্‌কা। রসুল স. তাঁর পরিবার পরিজনকে সারা বৎসরের সংসারিক খরচ প্রদান করতেন এবং এর উদ্বৃত্ত সকল কিছু ব্যয় করতেন আল্লাহ্‌র পথে— জেহাদের প্রয়োজনে, যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধাশ্ব ক্রয়ের জন্য। রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত আলী এবং হজরত আব্বাস এ সকল বিষয়ে তাঁর পূর্ণ অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরাও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের জন্য কিছু রেখে যাননি। রসুল স. এর মহাতিরোধানের পর নফল খয়রাত অথবা নফল সদ্‌কার বিষয়টি বহাল ছিলো। তিনি স. তাঁর পৃথিবীর জীবনে তাঁর আত্মীয়স্বজনকে অতিরিক্ত হিসেবে যেমন দান করতেন, তেমনি এ রকম দান জারী ছিলো তাঁর মহাপ্রস্থানের পরেও। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, বনী হাশেমের জন্য প্রথম থেকেই নফল সদ্‌কা হারাম ছিলো না, হারাম ছিলো কেবল ফরজ সদ্‌কা (জাকাত)।

মাসআলাঃ অধিকাংশ ইমামের মতে বনী হাশেমের জাকাতও বনী হাশেমের জন্য হালাল নয়। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ এটাকে জায়েয বলেছিলেন। কেননা সদ্‌কা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগের অবলম্বন। তাই অন্য লোকের সদ্‌কা (জাকাত) বনী হাশেমের জন্য হারাম। কিন্তু তাঁদের নিজেদের বংশের লোকের জাকাত তাঁদের নিজেদের জন্য অবমাননাকর নয়। তাই তা গ্রহণ করাও নাজায়েয নয়।

আমি বলি, বনী হাশেমের সম্মানের দাবি এই যে, সকল গোত্র অপেক্ষা তাঁরা শ্রেষ্ঠ। তাই তাঁরা অন্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করবেন। তাই হাশেমীরাও হাশেমীদের জাকাত গ্রহণ করতে পারবেন না।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ বনী হাশেমের জন্য জাকাতের অর্থ গ্রহণ হারাম— এই বিধানটি প্রযোজ্য হবে পাঁচটি বংশধারার উপর। বংশধারাগুলো হচ্ছে— ১. হজরত আলীর বংশধর ২. হজরত আব্বাসের বংশধর ৩. হজরত জাফরের বংশধর ৪. হজরত আকিলের বংশধর ৫. হজরত হারেস বিন আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। ইমামে আজম এবং ইমাম মালেক এই অভিমতের প্রবক্তা। ইমাম শাফেয়ীর মতে বনী মুত্তালিবও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা রসুল স. তাঁদেরকে স্বজন হিসেবে খুমুসের অংশ প্রদান করেছিলেন। ইতোপূর্বে খুমুস প্রসঙ্গে হজরত যোবায়ের বিন মুতয়েমের বর্ণনা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মোহাম্মদের মতে বনী হাশেমের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের জন্যও জাকাত হারাম হবে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের অভিমতও অনুরূপ। কেউ কেউ আবার বলেছেন, বনী হাশেমের জাকাত বনী হাশেমের জন্য হারাম নয়। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, বনী হাশেমের জাকাত বনী হাশেম ছাড়া আর কাউকে দেয়া যাবে না। ইমাম আবু হানিফার অভিমতের প্রমাণ এই— রসুল স. মাখজুমী সম্প্রদায়ের এক লোককে জাকাত সংগ্রহকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি হজরত আবু রাফেকে বললেন, তুমিও আমার সঙ্গে চলো। তাহলে তুমিও আমার মতো কিছু পাবে। হজরত আবু রাফে বললেন, আমি আগে রসুল স.কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। তাঁর বিনা অনুমতিতে আমি যেতেই পারবো না। হজরত আবু রাফে রসুল স. এর নিকটে এ কথা জানালেন। রসুল স. বললেন, আমার বংশের লোকদের জন্য সদ্‌কা হালাল নয়। আমাদের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের জন্যও হালাল নয়। হাদিসটি হজরত আবু রাফে থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ এবং হাকেম। তিবরানী বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। হজরত আবু রাফের আরেক নাম ছিলো আরকাম বিন আবিল আরকাম।

মাসআলাঃ জাকাতের সম্পদ এক শহর থেকে অন্য শহরে নিয়ে যাওয়া মাকরূহ্। রসুল স. হজরত মুয়াজকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদের সম্পদশালীদের নিকট থেকে জাকাত গ্রহণ করে তাদেরই দরিদ্রদের মধ্যে জাকাত বণ্টন করে দিয়ো। খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের সময়ে একবার খোরাসানের জাকাতের মাল সিরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। তিনি পরে ওই মাল সিরিয়া থেকে পুনরায় খোরাসানে ফিরিয়ে দেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্‌র বিধান' (ফারিদ্বাতাম্ মিনাল্লহ্)। এ কথার অর্থ — এই আয়াতে বর্ণিত বিধান আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে ফরজ করা হয়েছে — যা অবশ্য পালনীয়।

শেষে বলা হয়েছে— ওয়াল্লহু আ'লীমুন্ হাকীম (আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা সকল কিছুর ক্রিয়া ও পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবগত। কারণ তিনি মহাজ্ঞানী। তাঁর সিদ্ধান্ত হেকমত বিবর্জিত নয়। তাই তাঁর প্রদত্ত এই বিধান অযৌক্তিক নয়। অচিরন্তনও নয়। কারণ তিনি মহাবিজ্ঞানময়।

www.eelm.weebly.com

মুজাহিদের উক্তিরূপে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এবং সুদ্দীর উক্তিরূপে ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হাল্লাস বিন সুবিদ বিন সামেত, মুখসি বিন হুমাইর, ওয়াদিয়া বিন সাবেত প্রমুখ মুনাফিক একবার ঠিক করলো, তারা রসুল স.কে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করবে এবং তাঁর প্রতি দোষারোপ করবে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন বললো, এ রকম করা ঠিক নয়। আমার আশংকা হচ্ছে আমাদের এই শলাপরামর্শের সংবাদ মোহাম্মদের নিকট পৌঁছে যাবে। আর এ রকম হলে তা হবে তোমাদের জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ। আরেক জন বললো, মোহাম্মদ তো সকলের কথা মনোযোগের সঙ্গে শোনেন। আমি কসম করে বলতে পারি, তিনি আমাদের কথাও শুনবেন। হাল্লাস বললো, আমি যা খুশী বলবো, শেষে মোহাম্মদের নিকটে যেয়ে সব কিছু অস্বীকার করবো এবং কসমও খাবো। তখন তিনি আমাদের কথা মেনে নিবেন। তিনি তো কেবল শ্রবণকারী। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৬১

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

❐ এবং উহাদিগের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে 'সে তো যাহা শুনে তাহাই বিশ্বাস করে।' বলো 'তাহার কান তোমাদিগের জন্য যাহা মঙ্গল তাহাই শুনে। সে আল্লাহে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসীদিগকে বিশ্বাস করে; তোমাদিগের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী সে তাহাদিগের জন্য আশীর্বাদ এবং যাহারা আল্লাহের রসূলকে ক্লেশ দেয় তাহাদিগের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

এখানে 'নবীকে ক্লেশ দেয়'— কথাটির অর্থ, মুনাফিকেরা পরোক্ষে নবীর নিন্দা করে থাকে। তাঁর প্রতি আরোপ করে অনেক কদর্য বিশেষণ। মনে করে এসকল কথাতো তিনি শুনতে পাবেন না। সামনাসামনি কথা বললেই কেবল তিনি শুনতে পান। দূরের কথা কীভাবে শুনবেন? এখানে 'উযুন' শব্দটির অর্থ কান। মর্মার্থ হচ্ছে— স্বকর্ণে যা শোনে তাই বিশ্বাস করে। গুপ্তচরের চোখ সদাসতর্ক থাকে বলে কেবল 'চোখ' বলে তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়। মুনাফিকেরাও ব্যঙ্গার্থে রসুল স.কে কেবল 'কান' বলে সম্বোধন করে এবং অগোচরে তাঁর নিন্দামন্দ করতে থাকে। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুনাফিক নাবতাল বিন হারেস রসুল স. এর দরবারে বসে তাঁর কথা

www.eelm.weebly.com

শুনতো এবং সব কথা বলে দিতো অন্যান্য মুনাফিককে। তার এই অপকর্ম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। বলা হয়েছে— 'এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, সে তো যা শোনে তাই বিশ্বাস করে।'

মোহাম্মদ বিন ইসহাক লিখেছেন, নাবতাল ছিলো লাল চুল ও চক্ষু বিশিষ্ট পুঁতিগন্ধময় ও অনিষ্টকর একটি চরিত্র। রসুল স. বলেছেন, যে শয়তানকে দেখতে চায় সে যেনো নাবতালকে দেখে নেয়। নাবতাল রসুল স. এর কথা শুনে অন্যান্য মুনাফিকদেরকে জানাতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে বলতো এভাবে বোলো না। মোহাম্মদের গোপন কান আছে। ওই কানই তাকে সব কিছু বলে দেবে। সে বলতো, আমি যা খুশী তাই বলবো। ধরা পড়লে তার নিকট মিথ্যা কসম করে বলবো, আমি এ রকম বলিনি। এভাবে কসম করতে দেখলে তিনি আমাকে সত্যবাদী মনে করবেন। তার এই কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, তার কান তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তাই শোনে।' এখানে 'উযুন' শব্দটি কল্যাণ প্রকাশক। যেমন বলা হয় রজুলু সিদ্‌ক্বিন (মঙ্গলের জন্য কান, সত্যবাদীতার জন্য মানুষ)। এখানে তাই অর্থ হবে নিঃসন্দেহে তিনি কর্ণধারী। আর তাঁর কর্ণ তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, তিনি (রসুল) তোমাদের পুণ্যবিষয়ক ও কল্যাণকর কথা কান লাগিয়ে শোনেন। অনৈক্য ও অন্যায়ের কথা শোনেন না। অগোচরে নিন্দাবাদও শোনেন না। শোনেন কেবল অনুযোগ স্থাপনকারীদের প্রয়োজন পূরণের নিবেদন। রসুল স. বলেছেন, মু'মিনেরা সজ্জন ও সচ্চরিত্র। আর কাফেরেরা অসৎ ও হতভাগ্য। আবু দাউদ, তিরমিজি। হাদিসটি হাকেম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। আলোচ্য বাক্যটির অর্থ এ রকম হওয়াও সম্ভব যে, রসুল স. শোনেন কেবল সত্য ও কল্যাণ সম্পর্কিত কথা এবং অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের কথা। এর পরিপন্থী তিনি স. কোনো কিছু শোনেন না।

এরপর বলা হয়েছে — 'সে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসীদেরকেও বিশ্বাস করে।' এ কথার অর্থ— তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি পরিপূর্ণরূপে আস্থাশীল। যারা তাঁর নিকট তাদের ইমানকে প্রকাশ করে, তিনি তাদেরকে সত্যবাদী বলে জানেন এবং গ্রহণ করেন। অর্থাৎ কেবল বিশুদ্ধ বিশ্বাসীদেরকেই তিনি সত্যবাদী মনে করেন। মুনাফিকদেরকে সত্যবাদী মনে করেন না। কিন্তু তিনি বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের আবেদন ও নিবেদন শ্রবণ করেন। এখানে 'ইউ মিনুবিল্লাহি' (আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে) — কথাটি কাফেরদের একগুঁয়েমীর জবাব। তাই এই ইমানকে 'বা' সহযোগে (বিল্লাহ্ রূপে) ঘোষণা করা হয়েছে। পরের 'ইমান' শব্দটিকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— ইউমিনু লিল্ মু'মীনিন। এখানে ইমান অর্থ স্বীকৃতি। তাই ইমান কথাটিকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে 'লাম' সহযোগে (লিল্ মু'মিনীনা রূপে)। এভাবে প্রথমে উল্লেখিত ইমানের অর্থ হয়েছে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করা এবং দ্বিতীয় ইমানের অর্থ হয়েছে বিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাসী হিসেবে মেনে নেয়া।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে — 'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী, সে তাদের জন্য আশীর্বাদ।' এ কথার অর্থ— যারা ইমানদার বলে নিজেকে প্রকাশ করে তাদের সকলের প্রতি রসুল স. রহমত বা আশীর্বাদ। তিনি সকলের প্রকাশ্য অবস্থাকেই ধর্তব্য মনে করেন। অন্তরের অবস্থাকে ছেড়ে দেন সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র হাতে। কারো গোপন অবস্থাকে তিনি উন্মোচন করেন না। সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করেন সকলের ওজর আপত্তি সমূহকে। কথাটির উদ্দেশ্য এ রকমও হতে পারে যে, তোমাদের মধ্যে যারা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী, রসুল তাদের জন্য সরাসরি রহমত। তিনি মানুষকে অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। কিয়ামতের দিন তিনি বিশ্বাসীদের জন্য শাফায়াত করবেন এবং তাদেরকে দোজখ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাবেন বেহেশতে।

শেষে বলা হয়েছে — 'এবং যারা আল্লাহ্‌র রসুলকে ক্লেশ দেয়, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।' এ কথার অর্থ আল্লাহ্‌র রসুল কপট বিশ্বাসীদের ওজর আপত্তি গ্রহণ করলেও তারা যেনো এ কথা মনে না করে যে, এর মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য কল্যাণ। তাদের এ ধরনের কপটতা রসুলকে ক্লেশ দেয়। যারা এভাবে তাঁকে ক্লেশ দিতে অভ্যস্ত, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো ওই সকল মুনাফিককে লক্ষ্য করে যারা তাবুক যুদ্ধে যায়নি এবং যারা তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বিভিন্ন ওজর আপত্তি নিয়ে রসুল স. এর নিকটে উপস্থিত হয়েছিলো। বিভিন্নভাবে কসম খেয়ে তারা আল্লাহ্‌র রসুলকে প্রসন্ন করতে চেয়েছিলো। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা অবতীর্ণ করেন —

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৬২, ৬৩

يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ۝

❑ উহারা তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তোমাদিগের নিকট আল্লাহের শপথ করে। আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল ইহারই অধিক হকদার যে উহারা তাহাদিগকেই সন্তুষ্ট করে যদি উহারা বিশ্বাসী হয়।

❑ উহারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করে তাহার জন্য আছে জাহান্নামের অগ্নি, যেথায় সে স্থায়ী হইবে? উহাই চরম লাঞ্ছনা।

---

www.eelm.weebly.com

এখানে 'তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য' কথাটির অর্থ হবে রসুলকে সন্তুষ্ট করবার জন্য। মুনাফিকেরা নিতান্তই অজ্ঞ। তাই তারা আল্লাহ্‌র শপথ করে আল্লাহ্‌র রসুলকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে। তারা এ কথা জানে না যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সন্তোষ একই। সুতরাং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে পরিতুষ্ট করতে হলে প্রয়োজন বিশুদ্ধ অন্তর এবং একনিষ্ঠ আনুগত্য। অথচ মুনাফিকেরা কলুষ অন্তর বিশিষ্ট ও অবাধ্য। এখানে 'ইউরদ্বুহু' কথাটির 'হু' সর্বনামটি আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, আল্লাহ্‌র নামে শপথ করলেও তারা আল্লাহ্‌কে পরিতুষ্ট করতে সক্ষম হবে না। কারণ তারা আন্তরিক বিশ্বাসহীন ও অবাধ্য। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'ইউরদ্বুহু' এর 'হু' সর্বনামটি আল্লাহ্ ও রসুল উভয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পরিতুষ্টির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে জমিরে ওয়াহেদ (একবচনবোধক সর্বনাম)। এ রকমও বলা হয়ে থাকে যে, সর্বনামটি কেবল রসুল স. এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কেননা রসুল স. এর সন্তোষ ও অসন্তোষের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

শেষে বলা হয়েছে — 'ইন কানু মু'মিনীন' (যদি তারা বিশ্বাসী হয়)। এ কথার অর্থ— তারা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী হলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে তুষ্ট করতে পারতো। কিন্তু তারা এ রকম পারেনি। না পেরেছে আল্লাহ্‌কে তুষ্ট করতে না তাঁর রসুলকে। না পেয়েছে বিশুদ্ধ বিশ্বাস।

পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'তারা কি জানেনা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি, সেথায় সে স্থায়ী হবে। এটাই চরম লাঞ্ছনা।' এখানে 'ইউহাদিদু' কথাটির অর্থ হবে ইউসালিফু (বিরোধিতা করে)। অর্থাৎ জেহাদে অংশগ্রহণ না করে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে। ইউহাদিদু এর ক্রিয়া হবে হাদ্দুন— যার অর্থ পাশ কাটানো। কোনো প্রস্তাবে কারো সায় না থাকলে সে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। মুনাফিকেরাও জেহাদকে পাশ কাটিয়ে চলে। তাই এখানে বলা হচ্ছে, মুনাফিকেরা পাশ কাটিয়ে চলে। এভাবে করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ।

জ্ঞাতব্যঃ ইয়াজিদ বিন হারুনের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর একদিন তাঁর ভাষণে বললেন, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর এমন এক বান্দার হিসাব গ্রহণ করবেন যাকে তিনি দুনিয়ায় দিয়েছিলেন অজস্র নেয়ামত, অফুরন্ত রিজিক। দিয়েছিলেন সুস্বাস্থ্য। আল্লাহ্‌পাক তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন, কী আমল নিয়ে উপস্থিত হয়েছো। ওই ব্যক্তি তখন নিজের ভালোর জন্যে কোনো কিছুই দেখতে পাবে না। কারণ দুনিয়ায় সে কোনো পুণ্য কর্মই করেনি। সে তখন অঝোর ধারায় অশ্রুপাত করতে থাকবে। এরপর তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে এবং করা হবে অপমানিত। এমতাবস্থায় সে বলে উঠবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দোজখে প্রেরণ করো। দোজখাগ্নি থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়ো না। এভাবে প্রমাণিত হবে আল্লাহ্‌তায়ালার এই কালাম— মাঁই য়্যুহাদি দিল্লাহা ওয়া রসুলাহু ফাআন্নালাহু নারা জাহান্নামা খলিদান ফীহা (যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন)।

---

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সন্তোষ অর্জনের কথা। সেই সন্তোষ অর্জন না করার পরিণতি সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এভাবে উভয় আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সন্তোষের তুলনায় অন্যের সন্তোষ মূল্যহীন। অন্য কেউ অসন্তুষ্ট হলে চিরস্থায়ী অগ্নিবাসের কোনো সম্ভাবনা নেই। চিরস্থায়ী অগ্নিবাসী হতে হবে কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে অপ্রসন্ন করলে। জনৈক কবি বলেছেন— আল্লাহ্ না করুন আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সন্তোষের অভিলাষী যদি আমি হই, তবে আমার জীবন হবে অন্তহীন দুঃখে পরিপূর্ণ। আর আল্লাহ্‌র সন্তোষ যদি আমি পাই, তবে পৃথিবীবাসীদের সন্তোষ থেকে আমি তো বিচ্ছিন্ন হবোই।

কাতাদা ও সুদ্দী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো মুনাফিকদের একটি দল সম্পর্কে। মুনাফিক হাল্লাসও ছিলো ওই দলের অন্তর্ভুক্ত। ওই দলের লোকেরা রসুল স. সম্পর্কে কটুক্তি করেছিলো। আরো বলেছিলো, যদি মোহাম্মদের কথা সত্য হয় তবে এ কথা নিশ্চিত যে, আমি গাধার চেয়ে নিকৃষ্ট। হজরত আমের বিন কায়েস এ কথাগুলো রসুল স.কে জানিয়েছিলেন। সামনের দিকে এ সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ আসবে।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৬৪

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ○

❒ মুনাফিকেরা ভয় করে এমন এক সুরা না অবতীর্ণ হয় যাহা উহাদিগের অন্তরের কথা ব্যক্ত করিয়া দিবে! বল 'বিদ্রূপ করিতে থাক; তোমরা যাহা ভয় কর আল্লাহ্ তাহা প্রকাশ করিয়া দিবেন।'

মুনাফিকদের ভয় ছিলো কখন না জানি তাদের বিরুদ্ধে কোন্ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আর নতুন অবতীর্ণ ওই আয়াতের মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে যায় তাদের গোপন হীন হিংসা ও শত্রুতা। মুসলমানেরা তাহলে তাদেরকে সহজেই চিনে ফেলবে। ফলে তারা চিহ্নিত হয়ে পড়বে সকলের নিকটে।

বাগবী লিখেছেন, মুনাফিকেরা নিজেদের মধ্যে গোপন শলাপরামর্শ করতো। আবার একথা ভেবে ভয়ও করতো যে, নতুন কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়ে হয়তো তাদেরকে চিহ্নিত করে ফেলবে। এ রকম বিরতিহীন উৎকণ্ঠা নিয়ে অতিবাহিত হতো তাদের সময়। আল্লাহ্ ও তার রসুলকে তারা অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে পারতো না। আবার প্রকাশ্যে অস্বীকারও করতে পারতো না। তারা ছিলো ঘোর

www.eelm.weebly.com

সন্দেহবাদী। তাই ভাবতো রসুল যদি সত্য হন, তাহলে আল্লাহ্ তাদেরকে চিহ্নিত না করে ছাড়বেন না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ইয়াহ্জারু (ভয় করে) কথাটি বিধেয়রূপী। কিন্তু আসলে কথাটি নির্দেশসূচক। অর্থাৎ মুনাফিক-দেরকে ভীতির মধ্যে রাখাই সমীচীন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, মুনাফিকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো, এমন কোনো সুরা যেনো আবার অবতীর্ণ না হয়, যাতে করে আমাদের গোপন কথাগুলো ফাঁস হয়ে পড়ে। এ রকম বলতো তারা উপহাসছলে। তাই পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে— 'বলো, বিদ্রূপ করতে থাকো; তোমরা যা ভয় করো আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিবেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মুনাফিকদের বলে দিন, তোমরা নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেই থাকো। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত জেনো যে, তোমরা তোমাদের কার্যকলাপ প্রকাশ হওয়া সম্পর্কে যে ভয় করো, সেই ভয় আল্লাহ্পাক বাস্তবায়ন করবেনই। প্রকাশ করে দিবেন তোমাদের গোপন দুরভিসন্ধি ও শত্রুতাকে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে, সত্তর জন মুনাফিকের নাম এবং তাদের পিতার নাম জানিয়ে দিয়েছিলেন। এটা ছিলো মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার অপার মেহেরবাণী। এতে করে ভবিষ্যতে খাঁটি বিশ্বাসীদেরকে এ কথা বলে কেউ লজ্জা দিতে পারবে না যে, তোমার পিতা ছিলো মুনাফিক। বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ওই বারোজন মুনাফিক সম্পর্কে যারা রসুল স.কে হত্যা করার জন্য এক স্থানে সমবেত হয়েছিলো। পরিকল্পনা করেছিলো, রসুল স. তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তারা অতর্কিতে আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। হজরত জিব্রাইল রসুল স.কে এই সংবাদ প্রেরণ করেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ —

ঘটনাটির বিবরণ দিয়েছেন হজরত আবু তোফায়েল থেকে ইমাম আহমদ, হজরত হুজায়ফা থেকে বায়হাকী এবং হজরত যোবায়ের বিন মুতয়েম থেকে ইবনে সা'দ। আরও বর্ণনা করেছেন জুহাক সূত্রে ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখ— ওরওয়া ও ইবনে ইসহাকের মধ্যস্থতায় বায়হাকী এবং আপন মাশায়েখ থেকে মোহাম্মদ বিন ওমর। ঘটনাটি এই— রসুল স. এক সফরে ছিলেন। ওই সময় কয়েকজন মুনাফিক রসুল স.কে হত্যার পরিকল্পনা করলো। তারা ঠিক করলো, রসুল স. যখন কোনো উঁচু টিলা অতিক্রম করবেন তখন তারা তাঁকে হঠাৎ ঘেরাও করে উপত্যকার দিকে নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ্পাক রসুল স.কে এই সংবাদ জানালেন। পথ চলতে চলতে একস্থানে পড়লো একটি পাহাড়। তিনি স. পার্বত্য পথে উঠতে শুরু করলেন। তাঁর নির্দেশে জনৈক ঘোষক উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলো, রসুল স. পার্বত্যপথ ধরে অগ্রসর হচ্ছেন। অন্য সকলকে তিনি উপত্যকার পথে অগ্রসর হতে বলেছেন। উপত্যকার পথে অগ্রসর হওয়াই সহজতর। নির্দেশা-নুসারে পুরো দলটি অগ্রসর হতে থাকলো উপত্যকার পথ ধরে। আর রসুল স.

www.eelm.weebly.com

অতিক্রম করতে লাগলেন পাহাড়ী পথ। ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকেরা ভাবলো এইতো সুযোগ। তারা তাদের মুখে কাপড় বেঁধে নিলো এবং অতি সন্তর্পণে অনুসরণ করতে শুরু করলো রসুল স.কে। হজরত আমমার বিন ইয়াসার রসুল স. এর উটের লাগাম ধরে আগে আগে চলছিলেন। আর হজরত হুজায়ফা বিন ইয়ামান চলছিলেন উটের পিছনে। হঠাৎ কানে এলো মৃদু শোরগোল। রসুল স. এর সঙ্গী সাহাবীদ্বয় তাঁর উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিয়ে চললেন। এভাবে দ্রুতগতিতে চলার কারণে উটের পিঠ থেকে কিছু জিনিষপত্র পড়ে গেলো। চতুর্দিকে তখন রাতের ঘোর আঁধার। মৃদু শোরগোল শুনতে পেয়ে হজরত হামযা বিন আমর আসলামী অতি দ্রুত উপস্থিত হন রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। হজরত হামযা বর্ণনা করেছেন ঘোর অন্ধকারে পথ দেখতে কষ্ট হচ্ছিলো। হঠাৎ আমার হাতের পাঁচটি আঙ্গুল হয়ে গেলো জ্যোতির্ময়। ওই আলোয় আমি রসুল স. এর উট থেকে পড়ে যাওয়া জিনিষপত্রগুলো (চাবুক, রশি) একত্র করলাম। রসুল স. হজরত হুজায়ফাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেউ পশ্চাদ্ধাবন করলে ফিরিয়ে দিয়ো। হজরত হুজায়ফার নিকটে ছিলো একটি বড় সড় বল্লম। তিনি ওই বল্লম দিয়ে মুনাফিক আততায়ীদের বাহনগুলোকে তাড়া করলেন এবং আরোহীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, রে আল্লাহ্‌র দুশমনেরা! অন্যত্র গমন করো। এ কথা শুনে পশ্চাদ্ধাবন-কারীরা বুঝতে পারলো রসুল স. নিশ্চয় তাদের পরিকল্পনার সংবাদ পেয়েছেন। তারা দ্রুত সরে পড়লো। মিশে গেলো দলের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে। রসুল স. বললেন, হুজায়ফা! উটকে প্রহার করো। আর আম্মার তুমি দ্রুত অনুগমন করো। পার্বত্যপথ অতিক্রম করে রসুল স. মিলিত হলেন তাঁর দলের লোকদের সঙ্গে। হজরত হুজায়ফাকে বললেন, পশ্চাদ্ধাবনকারীদের কাউকে কি তুমি চিনতে পেরেছো? হজরত হুজায়ফা বললেন, না। চারদিকে অন্ধকার। আর তাদের মুখগুলো ছিলো কাপড়ে ঢাকা। তবে উটগুলোকে আমি চিনেছি। রসুল স. বললেন, তাদের অভিপ্রায় কি ছিলো তাকি বুঝতে পেরেছো? হজরত হুজায়ফা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! হে আল্লাহ্ রসুল— আমিতো কিছুই বুঝতে পারিনি। রসুল স. বললেন, তাদের পরিকল্পনা ছিলো, তারা আমাকে পাহাড় থেকে নিচে নিক্ষেপ করে হত্যা করবে। আল্লাহ্‌পাক ওই লোকগুলোর নাম এবং পিতার নাম আমাকে বলে দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ্ তোমাকেও আমি তাদের সম্পর্কে জানাবো। হজরত হুজায়ফা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অনুমতি দিন। তারা এসে পড়লে আমরা তাদের শিরচ্ছেদ করবো। রসুল স. বললেন, না। তাহলে লোকেরা বলাবলি করবে, আমি আমার সঙ্গীদেরকে হত্যা করতে শুরু করেছি। (শব্দ ব্যবহারে কিছু ব্যতিক্রম ঘটলেও বাগবীর বর্ণনাটিও এ রকম)। কিন্তু আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। রসুল স. হজরত হুজায়ফা এবং হজরত আমমারকে ওই ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকদের নাম বলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বললেন, অন্য কাউকে এ কথা জানিয়ো না।

www.eelm.weebly.com

রাত শেষ হলো। আলোয় আলোয় ভরে গেলো মরু চরাচর। হজরত উসায়েদ ইবনে হুদায়ের বললেন— হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি গতরাতে উপত্যকার পথ ছেড়ে পার্বত্যপথ ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন কেনো? উপত্যকার পথই তো ছিলো সহজগম্য। রসুল স. বললেন, হে আবু ইয়াহ্‌ইয়া! তুমি কি জানো মুনাফিকেরা আমার বিরুদ্ধে কী ষড়যন্ত্র করেছিলো? তাদের পরিকল্পনা ছিলো, তারা অতি সন্তর্পণে আমাকে অনুসরণ করে প্রথমে আঘাত হানবে আমার উটের বক্ষস্থলে। কেটে দিবে লাগাম। তারপর আমাকে ফেলে দিবে পাহাড়ের পাদদেশে। হজরত উসায়েদ বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্‌! এখন সকলেই সমবেত হয়েছে। আপনি সর্বসমক্ষে ওই আততায়ীদের নাম প্রকাশ করুন তাহলে তাদের গোত্রের লোকেরাই তাদেরকে হত্যা করবে। সর্বসমক্ষে যদি প্রকাশ করতে না চান তবে শুধু আমাকে জানিয়ে দিন। যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সেই পবিত্র সত্তার শপথ! আমি ওই মুনাফিকদের কর্তিত মস্তক আপনার সমীপে হাজির না করা পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করবো না। রসুল স. বললেন, না। এ রকম করলে লোকেরা বলবে মুনাফিকদের সঙ্গে লড়াই শেষ করে এখন আমি আমার সঙ্গীদেরকে হত্যা করতে শুরু করেছি। হজরত উসায়েদ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তারা আপনার সংগী হতে পারে কিভাবে? রসুল স. বললেন, তারা তো 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' উচ্চারণ করে। হজরত উসায়েদ বললেন, হ্যাঁ, মুখে তো তাই বলে। রসুল স. বললেন, একারণেই আমি তাদেরকে হত্যা থেকে বিরত রয়েছি।

মোহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, সকাল হলে রসুল স. হজরত হুজায়ফাকে নির্দেশ দিলেন, আবদুল্লাহ্‌ বিন সা'দ বিন আবিস্‌ সার্‌রাহ, আবু হাজের আরারী, আমের বিন আবী আমের, হাল্লাস বিন সওবিদ বিন সামেত, মাজমাআ বিন হারেসা, মালিহ তামিমি, হুসায়ের বিন নুমায়ের, তোয়ামা বিন ইবরিক, আবদুল্লাহ্‌ বিন উয়াইনিয়া এবং মাররা বিন রবীকে ডেকে আনো। মুনাফিক হাল্লাস বলেছিলো, আজ রাতে মোহাম্মদকে পাহাড় থেকে ফেলে না দেয়া পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাবো না। যদি মোহাম্মদ ও তাঁর সাথীরা আমাদের চেয়ে উত্তম হয় তবে আমরা তো ছাগল এবং সে আমাদের রাখাল। আমরা তাহলে জ্ঞানহীন এবং সে একাই জ্ঞানী।

মালিহ্‌ তামিমী একবার কাবা গৃহের সুগন্ধিদ্রব্য চুরি করেছিলো এবং ধর্মত্যাগী হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। পরে ঠিকই বুঝতে পেরেছিলো যে, এভাবে আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়। আর জাকাতের সামগ্রী চুরি করেছিলো হুসায়ের বিন নুমায়ের। রসুল স. তাকে বলেছিলেন, ওহে হতভাগা! তুমি এমন অপকর্ম করলে কেনো? সে বলেছিলো, আমার ধারণা ছিলো আপনি আল্লাহ্‌র রসুল নন। তাই আমার অপহরণ সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন না। এখন দেখছি আপনি সবই জানেন। আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌রই রসুল। এবার আমি সর্বান্তকরণে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আপনার প্রতি ইমান আনলাম। এ কথা শুনে রসুল স. তাকে মার্জনা করে দিলেন।

www.eelm.weebly.com

আবদুল্লাহ্ উয়াইনিয়া তার সঙ্গীদেরকে বলেছিলো, আজ রাতে যদি জাগ্রত থাকো, তবে রাত্রি জাগরণ থেকে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি লাভ করবে। আল্লাহ্র কসম! ওই ব্যক্তিকে হত্যা করার চেয়ে উত্তম কোনো কর্মই নেই। রসুল স. তাকে ডেকে বললেন, হে দূর্ভাগা! আমি মৃত্যুবরণ করলে তোমার কী উপকার হতো? সে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্র কসম! আমি তো আপনার উপর্যুপরি বিজয় ও সাফল্যের কারণে লাভ করেছি প্রভূত কল্যাণ। আমি তো আল্লাহ্ এবং আপনার পবিত্র অস্তিত্বের কারণে পূর্ণ নিরাপদ। এ কথা শুনে রসুল স. তাকে ছেড়ে দিলেন।

মাররা বিন রবী ছিলো মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের একান্ত সুহৃদ। একবার সে আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের ঘাড়ে হাত রেখে বলেছিলো, এই সমস্যাকে দূর করে দাও। এই একজনকে হত্যা করলে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। রসুল স. তাকে ডেকে বললেন, তুমি এ রকম বলেছিলে কেনো? সে বললো— হে আল্লাহ্র রসুল! এমন কথা আমি কখনোই বলিনি। বললে তো আপনি জানতেনই।

উপরে বর্ণিত বারোজন মুনাফিকের কার্যকলাপ সম্পর্কে রসুল স.কে জানানো হয়েছিলো প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। রসুল স. তাদেরকে ডেকে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। মেনে নিয়েছিলেন তাদের মৌখিক স্বীকারোক্তিকে। কিন্তু তাদের পরিণতি হয়েছিলো অত্যন্ত করুণ। পরবর্তী সময়ে যুদ্ধাবস্থায় তাদেরকে বরণ করতে হয়েছিলো অপমানজনক মৃত্যু। 'ওয়াহাম্মু বিমা লাম ইয়ানালু' (যা তারা পায়নি, তাই তারা চেয়েছিলো)— এই আয়াতে ওই সকল মুনাফিকদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হজরত হুজায়ফা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ওই মুনাফিকদের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। বলেছিলেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি তাদেরকে দুম্বলের (অগ্নিকুণ্ডের) মধ্যে একত্রিত কোরো।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমাদের সঙ্গে রয়েছে বারোজন মুনাফিক। সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ না করা পর্যন্ত তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদের বক্ষ্যাভ্যন্তরে জ্বলতে থাকবে আগুনের শিখা।

বায়হাকী বলেছেন, হজরত হুজায়ফা জানিয়েছেন, ওই সকল মুনাফিকের সংখ্যা ছিলো চৌদ্দ জন অথবা পনের জন। তারা রসুল স.কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তণের সময়।

www.eelm.weebly.com

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ○

❑ এবং তুমি উহাদিগকে প্রশ্ন করিলে উহারা নিশ্চয়ই বলিবে, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছিলাম।' বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁহার নিদর্শন ও তাঁহার রসূলকে বিদ্রূপ করিতেছিলে?'

মুনাফিকেরা আল্লাহ্, আল্লাহ্র নিদর্শন ও আল্লাহ্র রসুলকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ঠাট্টা-মশ্করা করে থাকে। এ কথা তারা অস্বীকারও করে না। তাই এখানে বলা হয়েছে— 'এবং তুমি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আমরা তো আলাপ আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! মুনাফিকেরা নিজেদের মধ্যে প্রায়শই আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল ও কোরআনের আয়াত নিয়ে পরিহাস করে। আপনি তাদেরকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে দেখবেন, তারা ব্যাপারটি অস্বীকারও করবে না। বরং বলবে, আমরা কথাচ্ছলে কেবল চিত্তবিনোদনের জন্য এভাবে কিছু কিছু ক্রীড়া-কৌতুক করে থাকি। লঘু বিনোদন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আমরা এ রকম করি না।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শন এবং তাঁর রসুলকে বিদ্রূপ করছিলে?' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই বিদ্রূপ-প্রবণ মুনাফিকদেরকে বলে দিন, আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল এবং আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহ কি কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল হতে পারে? সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র বিষয় নিয়ে কি কখনো ক্রীড়া-কৌতুক করা যায়?

আমি বলি, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম'— মুনাফিকদের এ কথাটির মাধ্যমে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপের ব্যাপারটিকে অস্বীকার করতো না। বলতো আমরা এ রকম করি কেবল চিত্ত-বিনোদনের জন্য। এরমধ্যে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আমাদের নেই।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, একবার আমাদের এক মজলিশে একলোক বলে বসলো, আমরা কোরআন পাঠকারীদের মতো লোভী, মিথ্যুক ও ভীতু আর কোথাও দেখিনি। সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন বলে উঠলেন, তুমিই মিথ্যুক। তুমি মুনাফিক। আমি তোমার কথা রসুল স. কে অবশ্যই জানাবো। তিনি তাই করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

www.eelm.weebly.com

জ্ঞাতব্যঃ শোরাইহ্ বিন ওবায়েদের বর্ণনায় এসেছে, একবার একলোক হজরত আবু দারদাকে বললো— হে কোরআন পাঠকারী তোমরা এতো ভীতু ও কৃপণ কেনো? কিছু চাইলে দিতে চাওনা। আবার আহারের সময় দেখা যায় বড় বড় লোকমা মুখে পুরে দাও। হজরত আবু দারদা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কোনো জবাব দিলেন না। বিষয়টি জানালেন হজরত ওমরকে। হজরত ওমর তার কাপড় ধরে টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে এলেন রসুল স. এর নিকটে। তখন সে বলতে শুরু করলো, হে আল্লাহ্র রসুল— আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। এ প্রসংগে আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করলেন আলোচ্য আয়াত।

হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমি ওই মুনাফিককে দেখেছি, সে রসুল স. এর উটনীর হাওদার সঙ্গে কোনো রকমে ঝুলে ছিলো। পাথরের আঘাতে আহত হয়েছিলো সে। বার বার বলছিলো, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। আর রসুল স. বলছিলেন, তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর রসুলকে বিদ্রূপ করছিলে? হজরত ইবনে ওমর থেকে ভিন্ন সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, ওই মুনাফিকের নাম ছিলো আবদুল্লাহ্ বিন উবাই। বাগবীও এ রকম বর্ণনা করেছেন হজরত ওমর থেকে।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে কয়েকজন মুনাফিক বলেছিলো, এরা ভেবেছে কি? এদের পক্ষে সিরিয়া বিজয় কি সম্ভব? এরাতো দেখছি অসম্ভব আশার ফাঁদে পড়ে রয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা তাদের এমতো কথোপকথনের সংবাদ তাঁর রসুলকে জানিয়ে দিলেন। রসুল স. তাদের নিকটে গিয়ে বললেন, তোমরা এ রকম বলেছো কেনো? তারা বললো, আমরাতো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। তাদের এই অপকথনের সূত্রে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে কালাবী, মুকাতিল এবং কাতাদা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. তাবুক অভিমুখে চললেন। তাঁর সামনে পথ চলছিলো কতিপয় মুনাফিক। তাদের মধ্যে দু'জন কোরআন মজীদ ও রসুল স. কে নিয়ে কৌতুক করছিলো। আরেকজন হাসছিলো। অপর বর্ণনায় এসেছে, তারা তখন বলাবলি করছিলো, মোহাম্মদ মনে করেছে রোমানদেরকে পরাজিত করবে। দখল করে নিবে তাদের শহরগুলোকে। কিন্তু এটা যে সুদূর পরাহত। আরেক বর্ণনায় এসেছে, তারা তখন বলছিলো আমরা যারা মদীনায় বসবাস করি তাদের সম্পর্কেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কাজেই কোরআনের আয়াত আসলে মোহাম্মদের কথা, আল্লাহ্র কথা নয়। আল্লাহ্পাক এ কথা তাঁর প্রিয় রসুলকে জানালেন। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে তলব করলেন। বললেন, তোমরা এ রকম বলো কেনো? তারা বললো, আমরাতো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। লঘু বিনোদনে মগ্ন হয়েছিলাম। ঘটনাটি ঘটেছিলো মদীনা হতে তাবুক যাত্রার পথে।

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদ বিন ইসহাক এবং মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর তাবুক অভিযানের সময় কতিপয় মুনাফিক তাঁর সঙ্গী হয়েছিলো। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভই ছিলো তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। বনী আমর ইবনে আউফ, ওয়াদিয়া বিন সাবেত, হাল্লাস বিন সামেত এবং বনী আশজাআর মাখশী বিন হুমাইরও ছিলো তাদের মধ্যে। মোহাম্মদ বিন ওমর ছা'লাবা বিন হাতেবকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, যুদ্ধক্ষেত্রে এসকল লোককে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হবে। সৈন্যদের মধ্যে ভয় এবং সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তারা এ রকম বলেছিলো। হাল্লাস বিন ওমর বিয়ে করেছিলো উমাইয়েরের মাকে। তাছাড়া উমায়ের ছিলো তার পোষ্য। সে বললো— যদি মোহাম্মদ সত্য হয়, তবে আল্লাহ্র শপথ! আমরা গর্দভ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। যদি আমার এ কথার কারণে প্রত্যাবর্তনের পর প্রত্যেককে একশত করে কোড়া মারা হয়, তবে আল্লাহ্র কসম! সে আঘাতও আমার জন্য উত্তম। আমাদের সম্পর্কে তাদের নিকট কোরআন অবতীর্ণ হয়— বিষয়টি আমাদের নিকট অত্যন্ত অস্বস্তিকর। এর চেয়ে শত বেত্রাঘাতও উত্তম (তবুও কোরআন অসহ্য)। রসুল স. হজরত আম্মার বিন ইয়াসারকে বললেন, জলদি করে ওদের কাছে যাও। জিজ্ঞেস করো তারা এ রকম বলেছে কিনা। যদি অস্বীকার করে, তবে তাদের গোপন আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ো। হজরত আম্মার তাদের নিকটে গিয়ে সব খুলে বললেন। তারা বুঝলো, রসুল স. এর আর কিছুই জানতে বাকী নেই। তাই তৎক্ষণাৎ তারা রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন ওজর আপত্তি উত্থাপন করলো। ওয়াদিয়া বিন সাবেত ধরলো রসুল স. এর উটের হাওদার পিছনের অংশ। সে নিজের হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত ধূলি ধুসরিত করেছিলো। অনর্গল বলে চলছিলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে এ রকম বলিনি। আমরাতো করছিলাম কেবল আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতটি।

সূরা তওবা ঃ আয়াত ৬৬

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

❑ 'দোষ স্খলনের চেষ্টা করিও না; তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। তোমাদিগের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করিলেও অন্য দলকে শাস্তি দিব — কারণ তাহারা অপরাধী।'

'দোষ স্খলনের চেষ্টা কোরো না' কথাটির অর্থ — হে মুনাফিকেরা! অযৌক্তিক ও অযথার্থ অজুহাত উত্থাপন করে নিজেদের অপরাধ আড়াল করতে চেয়ো না। 'তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছো' কথাটির অর্থ

www.eelm.weebly.com

— হে মুনাফিকেরা! তোমরা অন্তরে অবিশ্বাসকে লালন করে মুখে মুখে বিশ্বাস স্থাপনের স্বীকৃতি দিয়েছিলে। এখন আমার রসুলের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে তোমাদের অভ্যন্তরীণ অবিশ্বাসকে প্রকাশ করে দিয়েছো। এখন তোমাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের বিষয়টি প্রকাশ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে কোনো দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দিবো, কারণ তোমরা এখন অন্তরে বাইরে নিশ্চিত সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারী।' বিশুদ্ধ তওবা (সত্যের প্রতি আনুগত্য ও সলজ্জিত প্রত্যাবর্তন) ব্যতিরেকে পরিত্রাণ লাভের অন্য কোনো উপায় আর নেই। সুতরাং এখন যারা সর্বান্তকরণে তওবা করবে, আমি তাদেরকে মার্জনা করবো। আর যারা এ রকম করবে না, গ্রহণ করবে অবিশ্বাসের উপর অনড় অবস্থান, তাদেরকে অবশ্যই আমি শাস্তি দিবো। কারণ, তারা অপরাধী।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, ওই সকল মুনাফিকদের মধ্যে কেবল একজনের অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছিলো। তার নাম মাখশি বিন হুমাইর আশ্‌জায়ী। সম্ভবতঃ ইবনে ইসহাক বলতে চেয়েছেন, এখানে 'ত্বাইফাতুন' কথাটির মাধ্যমে যে ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে, সেই ক্ষমা লাভ করেছিলেন মাত্র একজন। অর্থাৎ তাদের মধ্যে মাত্র একজনের ক্ষমাপ্রাপ্তির বিষয়টি সুপ্রমাণিত। অন্যদের ক্ষমাপ্রাপ্তির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ক্ষমাপ্রাপ্ত মাখশী বিন হুমাইর ওই সকল মুনাফিকের আলাপ-আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেননি। তাদের সব কথায় সায়ও দেননি। সামান্য হেসেছিলেন মাত্র। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি বিশুদ্ধ চিত্তে তওবা করেন এবং এ কথা বলে দোয়া করেন— হে আমার আল্লাহ্! এই আয়াত আমার চোখকে শীতল করে দিয়েছে। শ্রুতিকে করেছে প্রশান্ত। এই আয়াত শুনে খাড়া হয়েছে আমার শরীরের সকল পশম। আর হৃদয়ে জেগেছে প্রকম্পন। হে আমার প্রিয়তম আল্লাহ্! তোমার পথে আমার আত্মদানকে কবুল করো। কেউ যেনো না বলে, একে গোসল দেয়া হোক অথবা দাফন করা হোক। তার এ প্রার্থনা গৃহীত হয়েছিলো। তিনি শহীদ হয়েছিলেন ইয়ামামার যুদ্ধে। কিন্তু কেউ জানতে পারেনি কোথায় কিভাবে শহীদ হয়েছিলেন তিনি এবং কখন কিভাবে সম্পন্ন হয়েছিলো তার জানাজা ও দাফন।

তওবার পর তিনি রসুল স. এর নিকট নিবেদন করেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার নাম এবং আমার পিতার নাম পরিবর্তন করে দিন (অবিশ্বাসী জীবনের অপবিত্র স্মৃতিও যেনো অবলুপ্ত হয়ে যায় আমার এবং আমার পিতার নাম থেকে)। রসুল স. তাঁর নাম রেখেছিলেন আবদুর রহমান বা আবদুল্লাহ্।

www.eelm.weebly.com

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاؕ هِيَ حَسْبُهُمْۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

❑ মুনাফিক নর ও নারী একে অপরের অনুরূপ, উহারা অসৎ কর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম নিষেধ করে, উহারা ব্যয়কুণ্ঠ; উহারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হইয়াছে, ফলে তিনিও উহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন; মুনাফিকেরা তো সত্য-ত্যাগী।

❑ আল্লাহ্ মুনাফিক নর, নারী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জাহান্নামের অগ্নির, যেথায় উহারা স্থায়ী হইবে, ইহাই উহাদিগের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্ উহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং উহাদিগের জন্য আছে স্থায়ী শাস্তি।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মুনাফিক পুরুষ এবং নারী সমমানসিকতা-সম্পন্ন। তাদের চিন্তা চেতনা ও কার্যকলাপ মুসলিম পুরুষ এবং নারীর সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানেরা সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে, বিরত থাকতে বলে অসৎ কাজ থেকে। আর মুনাফিকেরা মানুষকে প্ররোচিত করে অশুভ কর্মের দিকে, আর নিষেধ করে সৎকর্ম করতে। আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করার জন্য যখন সকলকে আহ্বান জানানো হয় তখন তারা বলে, এই অসহ্য গরমে যুদ্ধযাত্রা ঠিক নয়। আল্লাহ্‌র পথে যখন তাদেরকে অর্থ ব্যয় করতে বলা হয়, তখনও তারা গুটিয়ে নেয় তাদের হাত। কারণ তারা ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ। তারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়েছে। আল্লাহ্-তায়ালাই যে সকল জীবন এবং সম্পদের একক স্রষ্টা, সেকথা তাদের মনেই নেই। তাই আল্লাহ্‌তায়ালাও তাদেরকে বিস্মৃত হয়েছেন এভাবে— পৃথিবীর জীবনে তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন ইমান ও হেদায়েত থেকে। আর আখেরাতে বঞ্চিত করবেন তাঁর অপার করুণা থেকে। নিক্ষেপ করবেন চিরস্থায়ী অগ্নিকুণ্ডে। আর কখনো তাদের প্রতি নিবদ্ধ করবেন না দয়ার্দ্র দৃষ্টি।

শেষে বলা হয়েছে— 'ইন্নাল মুনাফিক্বীনা হুমুল ফাসিকুন' (মুনাফিকেরা তো সত্যত্যাগী)। এ কথার অর্থ— মুনাফিকেরা ইমান ও ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত। তারা ফাসেক, সত্য-পরিত্যাগকারী।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ মুনাফিক নর, নারী ও সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাহান্নামের অগ্নির, সেখানে তারা স্থায়ী হবে— এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা মুনাফিক নর-নারী ও কাফেরদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন জাহান্নামের আগুন। ওই আগুনে তারা জ্বলতে থাকবে অনন্তকাল। আখেরাতের 'এই অনন্ত আযাবই তাদের জন্য উপযুক্ত এবং যথেষ্ট। পৃথিবী তাদের শাস্তিদানের উপযুক্ত স্থান নয়। পৃথিবীর জীবন সাময়িক। তাই এখানকার সাময়িক আযাব তাদের মহা অপরাধের তুলনায় কিছুই নয়। তাই তাদের জন্য কঠিন আযাব নির্ধারিত রয়েছে অনন্ত আখেরাতে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে অশেষ শাস্তি।' এ কথার অর্থ— 'আল্লাহতায়ালা তাঁর অসীম রহমত থেকে তাদেরকে চিরবঞ্চিত করেছেন। তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন সীমাহীন শাস্তি। এভাবে তিনি তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে করেছেন অভিসম্পাতগ্রস্ত। পৃথিবীর জীবনও তাদের জন্য সুখকর নয়। ফলে, মুনাফিকেরা বাহ্যিকভাবে হলেও নিজেদেরকে মুসলমান হিসবে পরিচয় দিতে বাধ্য হয়। আবার সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে, এই বুঝি সদ্য অবতীর্ণ কোনো আয়াতের মাধ্যমে তাদের মনোভাব, কথোপকথন ও কার্যকলাপ প্রকাশ হয়ে পড়বে।

সুরা তওবাঃ আয়াত ৬৯, ৭০

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ
فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ
اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ اَلَمْ يَاْتِهِمْ
نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۬ۙ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ
مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

❒ তোমরাও তোমাদিগের পূর্ববর্তীদিগের মত যাহারা শক্তিতে তোমাদিগের অপেক্ষা প্রবল ছিল এবং যাহাদিগের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছিল

www.eelm.weebly.com

তোমাদিগের অপেক্ষা অধিক, এবং উহারা উহাদিগের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা ভোগ করিয়াছে; তোমাদিগের ভাগ্যে যাহা ছিল তোমরাও তাহা ভোগ করিলে যেমন তোমাদিগের পূর্ববর্তীগণ উহাদিগের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা ভোগ করিয়াছে; উহারা যেরূপ অনর্থক আলাপ-আলোচনা করিয়াছে; তোমরাও সেরূপ আলাপ-আলোচনা করিয়াছিল; উহারাই তাহারা যাহাদিগের কর্ম ইহলোকে পরলোকে ব্যর্থ এবং উহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

❐ উহাদিগের পূর্ববর্তী নূহ, আ'দ ও সামুদের সম্প্রদায়, ইব্রাহিমের সম্প্রদায় এবং মাদ্য়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসিগণের সংবাদ কি উহাদিগের নিকট আসে নাই? উহাদিগের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদিগের রসূলগণ আসিয়াছিল। আল্লাহ্ জুলুম করিবার জন্য নহেন, কিন্তু উহারা নিজেরাই নিজদিগের প্রতি জুলুম করিত।

প্রথমোক্ত আয়াতটির মর্মার্থ হচ্ছে— হে মুনাফিক সম্প্রদায়! তোমরাও বিগত জামানার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতো। তারা যে অপকর্মগুলো করতো তোমরাও তাই করে চলেছো। তারা আল্লাহ্র বিধানকে অস্বীকার করেছিলো, তাই অভিসম্পাতগ্রস্ত হয়েছিলো। তোমরাও আমার রসুলের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছো। ফলে, তোমাদের উপরেও পতিত হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার লানত। তোমাদের পূর্বসূরীরা ছিলো তোমাদের চেয়ে প্রবল। তারা ছিলো অঢেল ধনসম্পদের অধিকারী ও অনেক সন্তান-সন্ততির জনক। তারা চেয়েছিলো কেবলই দুনিয়া। তোমরাও তাই চাও। তাদের ভাগ্যে দুনিয়ার যে উপভোগ আল্লাহ্তায়ালা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তোমরাও তেমনি দুনিয়ার নেয়ামত উপভোগ করে চলেছো — যতটুকু আল্লাহ্তায়ালা নির্ধারণ করেছেন তোমাদের ভাগ্যে। অনর্থক ও অযথার্থ আলাপ-আলোচনায় সময়াতিপাত করতো তারা। তোমরাও সেরকমই করছো। তাদের পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর সকল কিছুই ব্যর্থ এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত। তোমরাও তেমনি ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ তোমরা তাদেরই একনিষ্ঠ অনুসারী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরাও তোমাদের পূর্বসূরীদের পথে চলবে। যে অপকর্মগুলো তারা করতো, তোমরাও তার অনুসরণ করবে। গুঁইসাপ যেমন তার আপন গর্তে ঢুকে যায় তোমরাও তেমনি ঢুকে যাবে বিভ্রান্তির বিবরে। আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! ওই পূর্বসূরীরা কি ইহুদী ও নাসারা? তিনি স. বললেন, তারা ছাড়া আর কে? হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, হ্যাঁ, তারাই (ইহুদী ও খৃষ্টানেরাই)। বোখারী।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা তোমাদের পূর্বসূরীদের পদে পদে অনুসরণ করে চলবে। তারা যদি গুঁইসাপের গর্তে প্রবেশ করে, তবে তোমরাও তাই করবে। তারা যদি পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রকাশ্যে রতিকর্ম করে থাকে, তবে তোমরাও লোক সম্মুখে তেমনই আচরণ করবে।

www.eelm.weebly.com

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, তোমাদের চালচলন হবে বনী ইসরাইলের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। তাদের ছোটখাট সকল আমলের অনুসরণ তোমরা করবে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, অবশ্য এ কথা আমাদেরকে বলা হয়নি যে, এই উম্মত অবশেষে বনী ইসরাইলের মতো গো-বৎসের উপাসনাও করবে কিনা।

পরের আয়াতের (৭০) মর্মার্থ হচ্ছে— হে মুনাফিক সম্প্রদায়! তোমরা কি তোমাদের পূর্বসূরী হজরত নূহের অবাধ্য সম্প্রদায়, আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়, হজরত ইব্রাহিমের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়, অবিশ্বাসী মাদইয়ানবাসী এবং বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসীদের ঘটনা জানো না? তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ আমার পক্ষ থেকে তাদেরই সম্প্রদায়ভূত রসুল প্রেরিত হয়েছিলো। তারা সেই সকল সত্যবাহী রসুলকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। সে কারণেই আমি তাদেরকে বিভিন্ন গজবের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছি। মহাপ্লাবনের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি নূহের অবাধ্য সম্প্রদায়কে। আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি ভয়াবহ তুফানের মাধ্যমে। আর প্রচণ্ড ভূমিকম্পের মাধ্যমে নিস্তব্ধ করে দিয়েছি ছামুদ সম্প্রদায়কে। দূরাচার নমরূদ প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো রসুল ইব্রাহিমের। তাকেও আমি দিয়েছি যথোপযুক্ত শাস্তি। নিতান্ত অনুল্লেখ্য প্রাণী মশার মাধ্যমে বধ করেছি তাকে। তার সঙ্গী-সাথীদেরকেও করে দিয়েছি নিঃসাড়। আরও শোনো মাদইয়ানবাসীদের কথা। তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম নবী শোয়াইবকে। কিন্তু তাঁকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো। তাই ঘন মেঘপুঞ্জজাত অগ্নিবৃষ্টির মাধ্যমে আমি তাদেরকে করে দিয়েছি চিহ্নহীন। নবী লূতের সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকেও আমি দিয়েছিলাম ভয়ংকর শাস্তি। আমার নির্দেশে জিব্‌রাইল ফেরেশতা তাদের লোকালয়গুলোকে শূন্যে উঠিয়ে নিয়ে উল্টো করে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করেছিলো। অতঃপর শোনো হে মুনাফিকের দল! আমি অবাধ্যদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল এভাবেই দিয়ে থাকি। আল্লাহ্‌পাক এরূপ নন যে, তিনি কারো উপরে জুলুম করবেন। তারা নিজেরাই তো নিজেদের উপর জুলুম করেছিলো। চরম অবাধ্যতার মাধ্যমে উপযুক্ত হয়েছিলো আযাবের। তারা আমার প্রেরিত পুরুষগণের নির্দেশকে অবজ্ঞা করেছে। করেছে প্রত্যাখ্যান। তাই হয়েছে আল্লাহ্‌র গজবের লক্ষ্যস্থল। তোমরা এ সকল কাহিনী শোনো, বোঝো এবং বিবেচনা করো। ফিরে এসো সত্যের পথে। নতুবা তোমাদের পরিণতি হবে পূর্ববর্তী অবাধ্য উম্মতদের মতোই। সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তারা যেমন পরিত্রাণ পায়নি, তেমনি তোমরাও পাবে না।

www.eelm.weebly.com

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللّٰهَ
وَرَسُولَهُۥٓ أُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ
فِيهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنّٰتِ عَدْنٍ وَرِضْوٰنٌ مِّنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ
ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

❑ বিশ্বাসী নর-নারী একে অপরের বন্ধু, ইহারা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে; ইহাদিগকেই আল্লাহ্ কৃপা করিবেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

❑ আল্লাহ্ বিশ্বাসী নর ও নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জান্নাতের— যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে, — এবং স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানের। আল্লাহের সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উহাই মহা সাফল্য।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বিশ্বাসী নর-নারীরা আল্লাহ্র মনোনীত ধর্মকে সমুন্নত করবার কাজে একে অপরের সহযোগী ও সহযোগিনী। তারা সৎকাজের নির্দেশদাতা ও দাত্রী এবং অসৎকাজে বিরতকারী এবং বিরতকারিণী। তারা সালাত কায়েম করে। জাকাত দেয়। পরিপূর্ণরূপে নির্দেশানুগত থাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের। নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে দয়া করবেন। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী। তাই তাঁর বিধান অতিক্রম করবার সাধ্য কারো নেই। তিনি প্রজ্ঞাময়ও। তাই সকল কিছুর উপর তাঁর রয়েছে যথানিয়ন্ত্রণ।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বিশ্বাসী নর এবং নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানের।' এখানে 'জান্নাতি আদ্ন' অর্থ পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রতম স্থায়ী জান্নাত। অর্থাৎ যে জান্নাত দেখে বিশ্বাসী এবং বিশ্বাসিনীরা মুগ্ধ হয়ে যাবে।

www.eelm.weebly.com

মাদারেক রচয়িতা লিখেছেন, 'আদ্‌ন' একটি জান্নাতের নাম। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'জান্নাতু আদনি মিল্লাতি ওয়াদার রহমানু' (আদন জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রহমান)। এতে করে বুঝা যায়, আদ্‌ন একটি জান্নাতের নাম বা জান্নাতের একটি বিশেষ স্থান। আমি বলি, হাদিস শরীফেও এ কথার সমর্থন রয়েছে। হজরত ইমরান বিন হোসাইন এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মোবারক, তিবরানী ও আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স.কে 'ওয়ামাসাকিনা ত্বইয়্যেবাতান ফি জান্নাতি আদনিন' (এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসস্থানের) — এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। রসুল স. বললেন, আদ্‌ন হচ্ছে মোতির একটি মহল। সেখানে থাকবে লাল ইয়াকুত নির্মিত সত্তরটি ভবন। প্রতিটি ভবনে থাকবে সবুজ জমরুদ দ্বারা গঠিত সত্তরটি প্রকোষ্ঠ। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে থাকবে একটি করে সিংহাসন আর প্রতিটি সিংহাসনের উপরে বিছানো থাকবে বিচিত্র বর্ণের সত্তরটি শয্যা। প্রতিটি শয্যায় প্রতীক্ষারতা থাকবে একটি করে আয়াতলোচনা হুর। তারা সকলে হবে ওই মহলের অধিকারী জান্নাতি ব্যক্তির পবিত্র সহধর্মিণী। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করবে সত্তরজন পরিচারক ও পরিচারিকা। প্রতি প্রভাতে তারা ওই জান্নাতি ব্যক্তির জন্য নিয়ে আসবে পানাহারের অফুরন্ত সামগ্রী।

আবু শায়েখ তাঁর কিতাবুল আজমতে হজরত ইবনে ওমর থেকে লিখেছেন— আল্লাহ্‌তায়ালা চারটি বস্তুকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন। সেই চারটি বস্তু হচ্ছে— আরশ, কলম, আদম ও আদ্‌ন। এরপর ঘোষণা করেছেন, 'হও' তখন অস্তিত্ব পেয়েছে মহাবিশ্ব।

হজরত আবু দারদা, বায্‌যার, ইবনে জারীর, ইবনে মারদুবিয়া এবং দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আদ্‌ন আল্লাহ্‌পাকের এমন এক সৃষ্টি যা এখন পর্যন্ত কারো দৃষ্টিগোচর হয়নি। মানুষের অন্তর তার কল্পনা করতেও সক্ষম নয়। সেখানে থাকবেন তিন শ্রেণীর মানুষ— নবী, সিদ্দিক এবং শহীদ। তাঁরা সেখানে প্রবেশ করলে আল্লাহ্‌তায়ালা ঘোষণা করবেন, হে আদ্‌ন! তোমার অতিথিদের জন্য আনন্দিত হও।

হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দু'টি জান্নাত হবে রৌপ্য নির্মিত। ওই জান্নাত দু'টোর সকল তৈজসপত্র হবে রূপার। দু'টো জান্নাত হবে সোনার। সে দু'টোর আসবাবপত্রও হবে স্বর্ণ-নির্মিত। আর জান্নাতে আদ্‌নে যারা প্রবেশ করবে তাদের সংগে আল্লাহ্‌-তায়ালার কোনো অন্তরাল থাকবে না। থাকবে কেবল আল্লাহ্‌তায়ালার 'কিবরিয়াই' সেফাতের (গুণের) এক আবরণ। আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র অস্তিত্ব আনুরূপ্য-বিহীনভাবে থাকবে ওই অন্তরালে। কিছু শাব্দিক তারতম্যসহ এই হাদিসটি বর্ণনা

www.eelm.weebly.com

করেছেন আহমদ। আবু দাউদ, তায়ালাসি এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এ কথাটিও উল্লেখিত হয়েছে যে, জান্নাতুল ফেরদাউস হবে চারটি। তার মধ্যে দু'টি হবে স্বর্ণের। বায়হাকী কিবরিয়াই সেফাতের অন্তরাল সম্পর্কে লিখেছেন, আজমত ও কিবরিয়াই'র ওই অন্তরালের কারণে অনুমতি ব্যতীত কেউই আল্লাহ্‌কে দেখতে সক্ষম হবে না। ওই অন্তরালেই রয়েছে জ্ঞানাতীত ও কল্পনাতীত রহস্যরাজি।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, জান্নাতের কেন্দ্রস্থলের একটি অতুলনীয় পুষ্পোদ্যানের নাম আদ্‌ন।

হজরত আবুদল্লাহ্‌ ইবনে আমর ইবনে আস বলেছেন, জান্নাতের অভ্যন্তরে একটি মহল রয়েছে তার নাম আদ্‌ন। মহলটির চারপাশে থাকবে মিনার এবং অনন্ত শ্যামলতা। পাঁচ হাজার দরজা থাকবে মহলটির। নবী, সিদ্দিক ও শহীদ ব্যতীত অন্য কেউ ওই মহলে প্রবেশ করতে পারবে না।

হাসান বসরী বলেছেন, ওই মহলটি হবে স্বর্ণ নির্মিত। নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছাড়া কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।

আতা বিন সায়েদ বলেছেন, আদ্‌ন জান্নাতের মধ্যে রয়েছে একটি জলবতী নদী। ওই নদীর দুই তীরে রয়েছে কুসুম কানন।

মুকাতিল এবং কালাবী বলেছেন, আদ্‌ন জান্নাতের অভ্যন্তরে রয়েছে একটি সুউচ্চ তোরণ। একটি প্রশান্ত ঝরণা সেখানে প্রবহমান। নিবিড় বৃক্ষরাজি দ্বারা ওই তোরণটি পরিবেষ্টিত। নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং আল্লাহ্‌তায়ালা যাদেরকে ইচ্ছে করবেন কেবল সেই সকল পুণ্যবানেরা সেখানে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত ওই স্থানটি কারো দৃষ্টিগোচর হবে না। সেখানে রয়েছে মোতি, ইয়াকুত ও স্বর্ণ নির্মিত অনেক প্রাসাদ। আরশের নিম্নদেশ থেকে পবিত্র ও সুবাসিত বাতাস প্রবাহিত হবে সেখানে। বাতাস বয়ে নিয়ে যাবে রাশি রাশি শুভ্র কস্তুরী— যেমন তুফান এক স্থানের বালি বয়ে নিয়ে যায় অন্যস্থানে।

কুরতুবী বলেছেন, লোকে বলে জান্নাত সাতটি— দারুল খুলদ, দারুল জিনান, দারুস সালাম, জান্নাতে আদন, জান্নাতুল মাওয়া, জান্নাতুন নাঈম এবং জান্নাতুল ফেরদাউস। হজরত আবু মুসা থেকে বর্ণিত হয়েছে চারটি জান্নাতের কথা— জান্নাতুল মাওয়া, জান্নাতুল খুলদ, জান্নাতে আদন এবং দারুস সালাম। হাকেম ও তিরমিজি এই বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হাকেম বলেছেন, দু'টি জান্নাত রয়েছে মুকাররাবীন (নৈকট্যভাজন) দের জন্য। আর দু'টি জান্নাত রয়েছে আসহাবুল ইয়ামীনদের (দক্ষিণ হস্তে আমলনামা প্রাপ্তদের) জন্য। প্রত্যেক জান্নাতে থাকবে অসংখ্য দরজা এবং স্তর।

এখানে 'ওয়া মাসাকিনা ত্বইয়্যেবাতান ফী জান্নাতি আদনিন' কথাটির সংযোগ রয়েছে 'জান্নাতিন তাজরী' এর সঙ্গে। সুতরাং 'মাসাকিন' হবে একবচনবোধক। আবার একে বহুবচনবোধকও বলা যায়। তাই সেখানে প্রত্যেকের বাসস্থান হবে পৃথক পৃথক। আবার একজন হবে বহু বাসস্থানের অধিকারী। এখানে জান্নাতের তিনটি পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পৃথিবীর মাসাকিন (বাসস্থান)

www.eelm.weebly.com

অপেক্ষা জান্নাতের মাসাকিন অতি উচ্চ, বর্ণাঢ্য ও স্থায়ী। তাই এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে ত্বইয়্যেবাতান (পবিত্র, উত্তম) শব্দটি। তারপরে বলা হয়েছে 'জান্নাতি আদনিন'। এরপর বলা হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামতের কথা। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি। এই নেয়ামত যারা পাবে, তারাই লাভ করবে মহা সফলতা। তাই সবশেষে বলা হয়েছে— এটা মহা সফলতা। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্-তায়ালা জান্নাতবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! জান্নাতবাসীরা বলবেন, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমরা হাজির। আল্লাহ্পাক বলবেন, তোমরা কি আনন্দিত? জান্নাতবাসীগণ বলবেন, কেনো আনন্দিত হবো না। তুমি তো আমাদেরকে এমন নেয়ামত দান করেছো, যা অন্য কাউকে (অন্য কোনো ফেরেশতাকে) দাওনি। আল্লাহ্পাক বলবেন, একটি নেয়ামত এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। জান্নাতবাসীগণ বলবেন, কী? আল্লাহ্পাক বলবেন, আমার সন্তোষ। এবার আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করবো আমার পরিপূর্ণ সন্তোষ। আর কখনো আমি তোমাদের প্রতি নারাজ হবো না।

যথাসূত্রে তিবরানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে হজরত জাবের থেকে মারফুরূপে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, জান্নাতে প্রবেশের পর জান্নাতবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্পাক ঘোষণা করবেন, হে জান্নাতীরা! তোমরা আর কি চাও? জান্নাতীগণ বলবেন, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে সবকিছুই দিয়েছো। আর কি চাইবো? আল্লাহ্পাক বলবেন, আমার পরিতুষ্টিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত।

সুরা তওবাঃ আয়াত ৭৩

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ○

❐ হে নবী! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও মুনাফিকদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর ও উহাদিগের প্রতি কঠোর হও; উহাদিগের আবাসস্থল জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট পরিণাম।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর আচরণ করুন। জাহান্নামই তাদের স্থায়ী আবাস। তাদের পরিণাম কতোই না নিকৃষ্ট।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং জুহাক বলেছেন, এখানে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অর্থ মুখের কথায় যুদ্ধ করা। তাদের প্রতি কোমল আচরণ প্রদর্শন না করা। হাসান ও কাতাদা বলেছেন, 'মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন' কথাটির

www.eelm.weebly.com

অর্থ— তাদেরকে শরিয়তের সীমানার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আলোচ্য নির্দেশনাটির অর্থ হবে— হাত দ্বারা জেহাদ করুন। সম্ভব না হলে, জেহাদ করুন মুখ দ্বারা। তাও সম্ভব না হলে অন্তর দ্বারা জেহাদ করুন। হজরত ইবনে মাসউদ এ কথাও বলেছেন যে, মুনাফিকদের সঙ্গে কথা বলতে হবে বদ মেজাজের সঙ্গে। কথাবার্তাকে করতে হবে কর্কশ! দুনিয়া নয়, তাদের উপযুক্ত স্থান হচ্ছে অনন্ত জাহান্নাম। আর এটাই সর্বনিকৃষ্ট পরিণাম।

আতা বলেছেন, এই আয়াতে মুনাফিকদের জন্য নম্রতা ও ক্ষমাকে রহিত করে দেয়া হয়েছে। তাঁর মতে এটাই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ নির্দেশনা।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, রসুল স. উপবিষ্ট ছিলেন একটি বৃক্ষের ছায়ায়। উপস্থিত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, একটু পরে এমন এক লোক আসবে, যে শয়তানের চোখ দ্বারা দ্যাখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হলো নীলচক্ষু বিশিষ্ট এক লোক। রসুল স. তাকে কাছে ডেকে বললেন, তুমি ও তোমার সঙ্গীরা আমার বিরুদ্ধে কটূক্তি করো কেনো? এ কথা শুনে লোকটি চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে সে তার সঙ্গী সাথীকে নিয়ে পুনরায় হাজির হয়ে বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা আপনার বিরুদ্ধে কোনো কটূক্তি করিনি। এভাবে কসম করতে দেখে রসুল স. তাদেরকে মাফ করে দিলেন। এরপর অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৭৪

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۚ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۖ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

❑ উহারা আল্লাহের শপথ করে যে উহারা কিছু বলে নাই; কিন্তু উহারা তো সত্যপ্রত্যাখ্যানের কথা বলিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর উহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিয়াছে; উহারা যাহা কামনা করিয়াছিল তাহা পায় নাই। আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল নিজ কৃপায় উহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই উহারা দোষারোপ করিয়াছিল। উহারা তওবা করিলে উহাদিগের জন্য ভাল হইবে, কিন্তু উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে আল্লাহ্ ইহলোকে ও পরলোকে উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন; পৃথিবীতে উহাদিগের কোন অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী নাই।

---

www.eelm.weebly.com

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হাল্লাস বিন সুবিদ্ বিন সামেত ছিলো ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা রসুল স. এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধে গমন করেনি। হাল্লাস রসুল স. সম্পর্কে বলেছিলো, যদি ওই ব্যক্তি সত্য হয়, তবে আমরা গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট। হজরত উমায়ের বিন সা'দ এ কথা শুনে ফেললেন এবং রসুল স.কে এ সংবাদ জানালেন। হাল্লাসকে ডেকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে কসম খেয়ে বললো, না, আমি এ রকম বলিনি। তার এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। ধারণা করা হয় যে, হাল্লাস পরে খাঁটি অন্তরে তওবা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এ কথা প্রমাণিতও হয়েছে। ইবনে আবী হাতেম হজরত কা'ব বিন মালেক থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন। একই কথা বর্ণনা করেছেন হজরত কা'ব থেকে ইবনে ইসহাক, হজরত ওরওয়া থেকে ইবনে সা'দ।

কালাবী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হাল্লাস বিন সুবিদ সম্পর্কে। তাবুকে প্রদত্ত এক ভাষণে রসুল স. মুনাফিকদের নিন্দা করেছিলেন। বলেছিলেন, তারা নিকৃষ্ট ও আবর্জনা স্বরূপ। মদীনায় হাল্লাসের কানে এ কথাটি পৌঁছলে সে বলেছিলো, মোহাম্মদ যদি সত্য হয় তবে আমরা গাধার চেয়ে নিকৃষ্ট। রসুল স. মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন হজরত আমের বিন কায়েস রসুল স.কে জানালেন, হাল্লাস এ রকম করে বলেছে। হাল্লাস উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার নামে মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে। রসুল স. হজরত আমের এবং হাল্লাসকে বললেন, তোমরা দু'জনে মিম্বরের কাছে দাঁড়িয়ে শপথ করো। আসর নামাজের পর হাল্লাস মিম্বরের নিকটে দাঁড়িয়ে বললো, কসম ওই আল্লাহ্র! তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই। এরপর মিম্বরের নিকটে দাঁড়ালেন হজরত আমের। বললেন, যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, সেই আল্লাহ্র শপথ, আমি হাল্লাসকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিনি। এরপর তিনি আকাশের দিকে দুই হাত উত্তোলন করে বললেন, হে আমার আল্লাহ্! তোমার সত্য নবীর প্রতি সত্য কথা অবতীর্ণ করো। রসুল স. বললেন, বিশ্বাসীরা সত্যবাদী হয়ে থাকে। এরপর সেখান থেকে হজরত আমের ও হাল্লাসের স্থান ত্যাগের আগেই হজরত জিব্রাইল অবতীর্ণ হলেন এই আয়াতের প্রথম অংশ নিয়ে— তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে যে, তারা কিছু বলেনি; কিন্তু তারা তো সত্যপ্রত্যাখ্যানের কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে; তারা যা কামনা করেছিলো তা পায়নি। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল নিজ কৃপায় তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই তারা দোষারোপ করেছিলো। তারা তওবা করলে তাদের জন্য ভালো হবে।' সদ্য অবতীর্ণ এই আয়াত শুনে হাল্লাস বলে উঠলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্ তো এখানে স্পষ্ট বলেছেন, 'তারা তওবা

www.eelm.weebly.com

করলে তাদের জন্য ভালো হবে। আপনি সাক্ষী থাকুন আমি বিশুদ্ধ অন্তরে তওবা করছি। আমেরের কথাই সত্য। আমি আপনার বিরুদ্ধে কটূক্তি করেছিলাম। কিন্তু এখন আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। রসুল স. হাল্লাসের তওবা গ্রহণ করলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর তওবা বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বিন মালেক বলেছেন, রসুল স. একদিন ভাষণ দান করছিলেন। শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত এক মুনাফিক বলে বসলো, এ লোকের কথা যদি সত্য হয়, তবে আমরা গাধার চেয়েও খারাপ। হজরত জায়েদ বিন আরকাম তার এ কথা শুনতে পেলেন এবং রসুল স. কে এ সম্পর্কে জানালেন। কিন্তু তাকে ডেকে এ কথা জিজ্ঞেস করা হলে সে অস্বীকার করে বসলো। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

ইবনে জারীর লিখেছেন, কাতাদা বলেছেন, একবার দু'জন লোকের সঙ্গে ঝগড়া লেগে গেলো। একজন ছিলো জুহ্‌নিয়া গোত্রের এবং অপরজন ছিলো গিফারী সম্প্রদায়ের। জুহ্‌নিয়ার লোকটি ছিলো জনৈক আনসারী সাহাবীর মিত্র। গিফারী গোত্রের ওই লোকটি ছিলো প্রভাবশালী। তার নাম ছিলো আবদুল্লাহ্‌ বিন আউস। সে জুহ্‌নিয়ার লোকটিকে দাপটের সঙ্গে বললো, নিজ গোত্রের লোকদেরকে সাহায্য করো। আমাদের ও মোহাম্মদের মধ্যে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এ রকম— নিজের কুত্তাকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা তাজা করো, দেখবে সে তোমাকেই কামড়াচ্ছে। আমরা মদীনা ছেড়ে গেলে দেখবে অভিজাত লোকেরা ওই নিচ লোকদেরকে বের করে দিবে। জনৈক সাহাবী এ কথা শুনে রসুল স. কে জানালেন। রসুল স. আবদুল্লাহ্‌ বিন আউসকে ডেকে পাঠালেন। সে এসে আল্লাহ্‌র কসম খেতে খেতে বললো, না আমি এরূপ বলিনি। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

উল্লেখ্য যে, আবুদল্লাহ্‌ বিন আউসের এ ঘটনা ঘটেছিলো বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময়। সুরা মুনাফিকুনের তাফসীরে আমি ঘটনাটি বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। কেউ কেউ বলেছেন, কালিমাতাল কুফরী (সত্যপ্রত্যাখ্যানের কথা) অর্থ রসুল স.কে গালি দেয়া। কারো কারো মতে এর অর্থ হাল্লাসের ওই বাক্যটি (মোহাম্মদ যদি সত্য হয় তাহলে আমরা গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট)। কারো কারো মতে অভিজাতরা ওই নিচদেরকে বের করে দিবে'— আবুদল্লাহ্‌ বিন আউসের এই কথাটিকেই বলা হয়েছে কালিমাতুল কুফরী।

'তারা যা কামনা করেছিলো তা পায়নি'— এ কথার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে ওই সকল মুনাফিকদের প্রতি, যারা তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রাতের অন্ধকারে রসুল স.কে অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে হত্যা করতে চেয়েছিলো। পূর্বাহ্নে হজরত জিব্‌রাইল রসুল স. কে এ কথা জানিয়েছিলেন।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন, তাই তারা সফল হতে পারেনি। ওই ঘটনার দিকে ইশারা করেই এখানে বলা হয়েছে 'তারা যা কামনা করেছিলো তা পায়নি'। ইতোপূর্বে ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

তিবরানী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, আসউয়াদ নামের এক লোক রসুল স. কে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলো। কিন্তু সে সফল হয়নি। তাই আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা যা চেয়েছিলো তা পায়নি। মুজাহিদ বলেছেন, মুনাফিকেরা হত্যা করতে চেয়েছিলো ওই সাহাবীকে যিনি তাদের গোপন কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তাদের জিঘাংসা চরিতার্থ হয়নি। তাই এখানে বলা হয়েছে তাদের কামনা চরিতার্থ না হওয়ার কথা। কেউ কেউ বলেছেন, বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময় মুনাফিকেরা রসুল স. এর সাহাবীগণকে মদীনা থেকে বের করে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিলো। কিন্তু সফলতার মুখ তারা দেখেনি। তাদের ওই অচরিতার্থ অভিলাষের কথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে— তারা যা কামনা করেছিলো তা পায়নি। সুদ্দী বলেছেন, মুনাফিকেরা বলেছিলো মদীনা পৌঁছেই আমরা আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের মস্তকে স্থাপন করবো অধিনায়কত্বের মুকুট। কিন্তু তাদের পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হয়নি। তাই এখানে এ রকম বলা হয়েছে।

মুনাফিকেরা এতোকিছু করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়নি। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল স. নিজ কৃপায় তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই তারা দোষারোপ করেছিলো।' ইবনে জারীর এবং আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইকরামা বলেছেন, ইবনে আদি ছিলো ইবনে কা'বের গোলাম। জনৈক আনসারী সাহাবী তাকে হত্যা করেছিলেন। রসুল স. তার রক্তপণ নির্ধারণ করেন বারো হাজার দিরহাম। ইবনে কা'ব ওই অর্থ পেয়ে অভাবমুক্ত হয়ে যায়। বাগবী লিখেছেন, নিহত হয়েছিলো হাল্লাসের ক্রীতদাস। রসুল স. রক্তপণ হিসেবে বারো হাজার দিরহাম নির্ধারণ করেন। হত্যাকারীর নিকট থেকে ওই অর্থ পেয়ে হাল্লাস হয়েছিলো বিত্তবান। তাই এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল স. নিজ কৃপায় তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন।

কালাবী বলেছেন, মদীনা ছিলো একটি হতশ্রী অঞ্চল। রসুল স. এর মদীনা আগমনের পর সবদিক থেকে মদীনার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু মুনাফিকেরাই ছিলো মদীনার কলংক। তাই ওই অসুন্দর অবস্থা থেকে আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে ফিরে আসতে বলা হয়েছে এভাবে— 'তারা তওবা করলে তাদের জন্য ভালো হবে।' আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের এই বাক্যটি হাল্লাসকে তওবা করতে বাধ্য করেছিলো। এছাড়া তার কোনো গত্যন্তরও ছিলো না। কারণ এর পর পরই তওবা না করার পরিণতি হিসেবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে এই কথাগুলো— 'কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ্ ইহলোকে ও পরলোকে তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন; পৃথিবীতে তাদের কোনো অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী নেই।'

www.eelm.weebly.com

বাগবী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া, তিবরানী এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু উমামা বাহেলী বলেছেন— একবার হজরত সা'লাবা বিন হাতেব আনসারী রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার জন্য প্রার্থনা করুন আল্লাহ্ যেনো আমাকে প্রচুর অর্থ সম্পদের অধিকারী করে দেন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্‌র রসুলের রীতিনীতি কি তোমার জন্য অনুসরণীয় নয়? যার অলৌকিক হস্তে আমার জীবন সেই পবিত্র অস্তিত্বের শপথ! আমি চাইলেই হতে পারি স্বর্ণগিরির মালিক। আর আমি চাইলে ওই স্বর্ণগিরিটি আমার সাথে সাথে চলবে। সা'লাবা নীরবে প্রস্থান করলেন সেখান থেকে। কিছুক্ষণ পর পুনরায় তিনি হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! দোয়া করুন আল্লাহ্ যেনো আমাকে অনেক ধনসম্পত্তি দান করেন। আপনি আল্লাহ্‌র রসুল, তাই আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আপনার দোয়া কবুল করবেন। ধনসম্পদ পেলে আমি যথাযথভাবে হকদারদের হক পরিশোধ করবো। রসুল স. দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ্! সা'লাবাকে সম্পদশালী করো। বর্ণনাকারী বলেন, সা'লাবার ছিলো অল্প কয়েকটি ছাগল। রসুল স. এর দোয়া করার পর সেগুলোর ব্যাপক বংশবৃদ্ধি ঘটলো। সেগুলোর স্থান সংকুলান নিয়ে সৃষ্টি হলো সমস্যা। বাধ্য হয়ে সা'লাবা সেগুলোকে নিয়ে আবাস গড়লো মদীনার বাইরের এক প্রশস্ত স্থানে। কিন্তু তার ছাগলগুলো বেড়েই চললো। সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ভীষণ ব্যস্ত করে রাখতো তাকে। ফলে সে রসুল স. এর সঙ্গে জোহর ও আসর ছাড়া অন্য কোনো নামাজ পড়তে পারতো না। অন্য ওয়াক্তের নামাজগুলো সে আদায় করতো ছাগলের খোয়াড়ের পাশের একস্থানে। দেখতে দেখতে সে হয়ে গেলো এক বিশাল ছাগল বহরের মালিক। স্থান সংকটের কারণে এবার তাকে সরে যেতে হলো আরও অনেক দূরে। মদীনায় এসে সে কেবল পড়তো জুমআর নামাজ। অন্য নামাজে সে আর আসতে পারতো না। পুনরায় দেখা দিলো স্থান সংকুলান সংকট। ফলে, আরো দূরে না যেয়ে তার আর কোনো উপায় রইলো না। জুমআর নামাজেও আসা কষ্ট হয়ে গেলো তার। জুমআর দিন সে মদীনা থেকে আগমনকারী কারো কারো সঙ্গে কথা বলে কেবল সংবাদ জানতে লাগলো মদীনার। একদিন রসুল স. বললেন, সা'লাবার কি হয়েছে? সাহাবীগণ জবাব দিলেন, এখন সে থাকে অনেক দূরে। বিশাল এক উপত্যকা জুড়ে বিপুল সংখ্যক ছাগল নিয়ে তাকে বসবাস করতে হয়। তাই সে আর নামাজের জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। রসুল স. বললেন, সা'লাবা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কথাটি তিনবার উচ্চারণ করলেন তিনি। এরপর অবতীর্ণ হলো জাকাতের বিধান। রসুল স. বনী সালিম এবং বনী জুহনিয়ার জাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত করলেন দুই ব্যক্তিকে। তাদের হাতে দিলেন একটি লিখিত দলিল। ওই দলিলে লেখা ছিলো কিভাবে জাকাত আদায় করতে হবে, জাকাতের জানোয়ারের বয়স কতো হবে ইত্যাদি। মৌখিক নির্দেশ দেন, বনী সালিম ও বনী জুহ্নিয়া সহ সা'লাবারও জাকাত সংগ্রহ করো। নির্দেশ মোতাবেক তারা সা'লাবার নিকটে গেলেন এবং লিখিত দলিলটি পড়ে শোনালেন। সা'লাবা বললো, এ যে দেখছি কাফেরদের মতো কর ধার্য করা হয়েছে। ঠিক আছে। এখন আপনারা যেখানে যেতে চান যান,

www.eelm.weebly.com

পরে আসবেন। জাকাত সংগ্রাহকদ্বয় এবার গেলেন বনী সালেম গোত্রের নিকটে। তারা তাদের পশুপাল থেকে সর্বোত্তম পশুগুলো জাকাত হিসেবে প্রদান করলেন। সংগ্রাহকদ্বয় বললেন, এতো ভালো পশু দেয়াতো অত্যাবশ্যক কিছু নয়। সালেমী বললেন, নিয়ে যান। আমি আনন্দিতচিত্তে প্রদান করেছি। এরপর সংগ্রাহকদ্বয় অন্যান্যদের জাকাত সংগ্রহ করেন। শেষে আগমন করেন সা'লাবার নিকটে। সা'লাবা পুনরায় বলে দলিলটা আবার দেখাও তো? তাঁরা দলিল দেখালেন। সা'লাবা সব দেখে শুনে বললো আরে ভাই, এখানে তো কর ধার্য করার কথা বলা হয়েছে। আর এ কর আদায় করতে হবে অমুসলিমদের নিকট থেকে। ঠিক আছে। তোমরা এখন যাও। আমি ভেবেচিন্তে দেখি কি করা যায়। সংগ্রাহকদ্বয় সংগৃহীত জাকাতের সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হলেন মদীনায়। রসুল স. তাঁদের কথা শুনে তিনবার উচ্চারণ করলেন— সা'লাবা ধ্বংস হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে। এরপর সালেমী জাকাত প্রদাতার জন্য তিনি স. দোয়ায়ে খায়ের করলেন। ওই সা'লাবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ○ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

❒ উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল, 'আল্লাহ নিজ কৃপায় আমাদিগকে দান করিলে আমরা নিশ্চয়ই সাদাকা দিব এবং সৎ হইব।'

❒ অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় উহাদিগকে দান করিলেন তখন উহারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করিল এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইল।

❒ পরিণামে কপটতা উহাদিগের অন্তরে রহিল আল্লাহের সহিত উহাদিগের সাক্ষাৎ-দিবস পর্যন্ত, কারণ উহারা আল্লাহের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিল উহা ভঙ্গ করিয়াছিল এবং উহারা ছিল মিথ্যাচারী।

❒ উহারা কি জানিতনা যে উহাদিগের অন্তরের গোপন কথা ও উহাদিগের গোপন পরামর্শ আল্লাহ্ জানেন এবং যাহা অদৃশ্য তাহা তিনি বিশেষভাবে জানেন?

---

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটির মর্মার্থ সম্পর্কে আউফ, ইবনে জারীর এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কিছু সংখ্যক মুনাফিক আল্লাহ্র সঙ্গে এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিলো যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে সম্পদ দান করলে আমরা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করবো। জাকাত দিবো এবং আত্মীয়দের হকও আদায় করবো। এ কথাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— 'তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র নিকট অঙ্গীকার করেছিলো, আল্লাহ্ নিজ কৃপায় আমাদেরকে দান করলে আমরা নিশ্চয় সদ্কা দিবো এবং সৎ হবো।'

পরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় তাদেরকে দান করলেন তখন তারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করলো এবং বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরালো।'

এর পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'পরিণামে কপটতা তাদের অন্তরে রইলো আল্লাহ্র সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের শেষ দিন পর্যন্ত, কারণ তারা আল্লাহ্র নিকট যে অঙ্গীকার করেছিলো তা ভঙ্গ করেছিলো এবং তারা ছিলো মিথ্যাচারী।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার অবাধ্যতা ও কৃপণতার কারণে তাদের অন্তরে সৃষ্টি হলো অনড় কপটতা। তারা জাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। বলেছে, জাকাত হচ্ছে জিযিয়ার মতো এক ধরনের কর— যা কেবল অমুসলিমদের উপরে প্রযোজ্য। এই অপকথন ও অপবিশ্বাসের অপবিত্রতা (নেফাক) তাদের অন্তরে থাকবে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত। অথবা কবর আযাব শুরুর পূর্ব পর্যন্ত যখন তওবা করার সুযোগ আর থাকবে না। আল্লাহ্পাকই তাদেরকে তওবার সুযোগ থেকে করেছেন চিরবঞ্চিত। কারণ তারা অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ও মিথ্যাচারী। তাদের মৃত্যু অবশ্যই হবে ওই অনড় কপটতা ও অপবিত্রতার সঙ্গে।

সকল অঙ্গীকার ভঙ্গকারীরাই মিথ্যাবাদী। তাই অঙ্গীকার ভঙ্গকারীরা দ্বিগুণ অপরাধী। রসুল স. বলেছেন, মুনাফিকদের মধ্যে রয়েছে তিনটি বৈশিষ্ট্য— প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, মিথ্যাচার ও বিশ্বাসভঙ্গ (আমানতের খেয়ানত)। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাগুলো— তারা রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং মুসলমান হওয়ার দাবীও করে থাকে।

বাগবী, ইবনে জারীর প্রমুখ কর্তৃক হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত হয়েছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় রসুল স. সকাশে উপস্থিত ছিলো সা'লাবার এক আত্মীয়। সে সা'লাবাকে গিয়ে জানালো, দ্যাখো তোমার সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সা'লাবা তৎক্ষণাৎ রসুল স. এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললো,

www.eelm.weebly.com

আমার জাকাত গ্রহণ করুন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ আমাকে তোমার জাকাত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এ কথা শুনে সা'লাবা নিজের মাথায় নিজেই মাটি নিক্ষেপ করতে লাগলো। রসুল স. বললেন, এটাও তোমার প্রতারণা। তুমি আমার নির্দেশের অবমাননা করেছো। এ কথা বলেই রসুল স. গমন করেন গৃহাভ্যন্তরে। তাঁর মহাতিরোধানের পর সা'লাবা হাজির হলো খলিফা হজরত আবু বকরের নিকটে। নিবেদন করলো, আমার জাকাত গ্রহণ করুন। হজরত আবু বকর বললেন, রসুল স. তোমার জাকাত গ্রহণ করেননি। সুতরাং আমি গ্রহণ করবো কীরূপে? এরপর এলো খলিফা হজরত ওমরের শাসনামল। তাঁর নিকট জাকাত গ্রহণের আবেদন নিয়ে হাজির হলো সা'লাবা। হজরত ওমর বললেন, রসুল স. এবং ইসলামের প্রথম খলিফা তোমার জাকাত প্রত্যাখ্যান করেছেন। সুতরাং আমি তা গ্রহণ করতে পারি না। পরবর্তী খলিফা হজরত ওসমানের নিকটেও একই আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো সা'লাবা। কিন্তু তিনিও তার জাকাত গ্রহণ করেননি। হজরত ওসমানের শাসন কালেই তার মৃত্যু ঘটে।

হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং কাতাদার বর্ণনায় এসেছে, আনসার সাহাবীগণের এক মজলিশে সা'লাবা একদিন বললো, তোমরা সাক্ষী থাকো, আল্লাহ্ যদি দয়া করে আমাকে বিত্তবান করেন, তবে আমি হকদারদের হক পরিশোধ করবো, দান খয়রাত করবো এবং নিকটজনদের অভাবও পূরণ করবো। বোখারী, মুসলিম। কিছুদিন পর মারা গেলো তার চাচাতো ভাই। তার বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়ে গেলো সে। কিন্তু সে তার অঙ্গীকার পূরণ করলো না। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

হাসান বসরী ও মুজাহিদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সা'লাবা বিন হাতেব এবং মোতাব বিন কুশাইর সম্পর্কে। তারা দু'জনেই ছিলো বনী আমর ইবনে আউফের গোত্রভূত। একদিন তাদের নেতৃস্থানীয়দের একটি মজলিশের পাশ দিয়ে গমন করার সময় তারা বলে উঠলো, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে কৃপাপরবশ হয়ে বিত্তশালী করেন তবে আমরা (ফরজ, মোস্তাহাব) সকল প্রকার দান খয়রাত করবো। আল্লাহ্পাক কৃপাভরে তাদেরকে বিত্তশালী করেছিলেন। কিন্তু তারা হয়ে গেলো কৃপণ। ভঙ্গ করলো অঙ্গীকার।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের শেষটিতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'তারা কি জানতো না যে, তাদের অন্তরের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ্ জানেন এবং যা অদৃশ্য তা তিনি বিশেষভাবে জানেন।'। এ কথার অর্থ— মুনাফিকেরা কি জানে না যে, আল্লাহ্তায়ালা তাদের অন্তরের গোপন অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত (মুখে দান করার কথা বললেও তাদের অন্তরে তো রয়েছে অনড় অস্বীকৃতি— সেই অস্বীকৃতি সম্পর্কে কি তিনি জানেন না? নিশ্চয়ই জানেন)। আর তাদের গোপন পরামর্শ সম্পর্কেও আল্লাহ্তায়ালা অনবহিত নন। তারা বলেছিলো, জাকাত

www.eelm.weebly.com

তো এক ধরনের কর। তাদের এই অপকথন সম্পর্কেও তিনি অবগত। যা কিছু অদৃশ্য, তার সকল কিছুই তো তিনি বিশেষভাবে জানেন। —এ কথাটি কি মুনাফিকেরা জানে না?

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, সদ্কা সম্পর্কিত এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমরা ছিলাম শ্রমজীবি। এরপর থেকে অনেকে জাকাত দিতে শুরু করলো। কেউ দিতো বেশী আবার কেউ দিতো কম। একবার এক মুনাফিক লোক দেখাবার জন্য বেশী দান করে অল্পদানকারী এক সাহাবীকে বললো, এটুকু মাল দান করে আর কতটুকু সওয়াব পাওয়া যাবে। তার এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৭৯

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۚ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۫ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

❒ বিশ্বাসীদিগের মধ্যে যাহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদাকা দেয় এবং যাহারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না তাহাদিগকে যাহারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে আল্লাহ্ উহাদিগকে বিদ্রূপ করুন; উহাদিগের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

আল মুত্তাওবিয়্যিনা অর্থ স্বতঃস্ফূর্তদাতা। 'ফিস সাদাকাতি' অর্থ প্রচুর দান খয়রাত করা। অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দিতচিত্তে প্রচুর খয়রাত করা। 'জুহ্দা' অর্থ সামর্থ্যানুসারে।

বাগবী লিখেছেন, তাফসীরকারগণ বলেন, রসুল স. একবার সকলকে দান খয়রাত করতে অনুপ্রাণিত করলেন। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ নিয়ে এলেন চার হাজার দিরহাম। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার কাছে আট হাজার দিরহাম ছিলো সেগুলো থেকে চার হাজার দিরহাম নিয়ে এসেছি। আপনি এগুলোকে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করুন। অবশিষ্ট চার হাজার আমি রাখলাম আমার পরিবার পরিজনের জন্য। রসুল স. বললেন, তুমি যা রাখলে এবং যা দান করলে সবগুলোতে আল্লাহ্ বরকত দান করুন। রসুল স. এর এই দোয়ার প্রভাবে হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ হয়েছিলেন বিপুল বিত্তের অধিকারী। ইন্তেকালের পর তাঁর দুই স্ত্রীর প্রত্যেকে পেয়েছিলেন এক লক্ষ ষাট হাজার দিরহাম। অপর বর্ণনায় এসেছে, তাঁর অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা পেয়েছিলেন কমপক্ষে আশি হাজার দিরহাম।

www.eelm.weebly.com

হজরত আসেম বিন আদি ইজলানী আনলেন একশত ওসাক খেজুর। হজরত আবী আকীল আনসারী আনলেন মাত্র এক সা' যব। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সারা রাত পানি টানার কাজ করে আমি পারিশ্রমিক হিসেবে পেয়েছি দুই সা' যব। সেগুলো থেকে এক সা' নিয়ে এসেছি আপনার খেদমতে। রসুল স. ওই এক সা' যবকে সদ্‌কার স্তুপের উপর রাখতে বললেন। মুনাফিকেরা ভর্ৎসনার স্বরে বললো, আবদুর রহমান এবং আসেমের দান লোক দেখানো। আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রসুলের এক সা' যবের কোনো প্রয়োজনই নেই। নিজেদের অভাব প্রদর্শন করার জন্য এবং বায়তুল মাল থেকে কিছু পাবার আশায় তারা এ রকম করেছে। মুনাফিকদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এখানে 'যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয়' কথাটির লক্ষ্য হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও হজরত আসেম। আর 'যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না' কথাটির লক্ষ্য হজরত আবু আকিল।

আমি বলি, উপরের ঘটনাটি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, ইবনে জারীর এবং ইবনে মারদুবিয়া। ওই বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফের এক পত্নীর নাম ছিলো তুমাজির। তাঁর অংশের হাজার দিরহাম তাঁর ভাইয়ের হস্তগত হওয়ার ঘটনাটি তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু আকিল থেকে। প্রকৃত ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন ইবনে মারদুবিয়া— হজরত আবু হোরায়রা, হজরত আবু সাঈদ খুদরী, হজরত আবু আকিল এবং হজরত উমায়রা বিনতে সহল বিন রাফে থেকে।

'তাদেরকে যারা দোষারোপ ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে বিদ্রূপ করেন। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্‌র বিদ্রূপও এক ধরনের শাস্তি। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হাসান বলেন, রসুল স. বলেছেন, মুনাফিকদের সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হবে এভাবে— জান্নাতের দরজা খুলে বলা হবে, প্রবেশ করো। তারা ব্যস্তসমস্ত হয়ে অগ্রসর হবে। কিন্তু কাছে যেতে না যেতেই বন্ধ করে দেয়া হবে দরজা। এ ভাবে বিভিন্ন দরজা দিয়ে তাদেরকে ডাকা হবে। একইভাবে তাদের মুখের উপর বন্ধ করে দেয়া হবে দরজা। এভাবে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়বে। তখন আহ্বান করলেও তারা আর অগ্রসর হবে না।

বায়যাবী লিখেছেন, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ছিলো কট্টর মুনাফিক। কিন্তু তার পুত্র আবদুল্লাহ্‌ ছিলেন সাচ্চা ইমানদার। আবদুল্লাহ্‌ বিন উবাই যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তার ইমানদার পুত্র রসুল স. সকাশে পিতার মাগফিরাতের জন্য দোয়ার প্রার্থী হলেন। রসুল স. দোয়া করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ۠

☐ তুমি উহাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা উহাদিগের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা না কর একই কথা; তুমি সত্তর বার উহাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ্ উহাদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না, ইহা এই জন্য যে উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করিয়াছে। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মুনাফিকদের জন্য আপনার ক্ষমাপ্রার্থনা করা না করা এক বরাবর। আপনি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা যেমন করবেন না, তেমনি না করলেও করবেন না। আপনি সত্তর বার (অসংখ্যবার) ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে। অস্বীকার করেছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে। তারা সত্য পরিত্যাগকারী। আর সত্য পরিত্যাগকারীদেরকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন (হেদায়েত) করেন না।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. বললেন, তাহলে আমি তাদের জন্য সত্তরবারের অধিক ক্ষমাপ্রার্থনা করবো। তখন অবতীর্ণ হয়— 'সাওয়াউন আলাইহিম ইসতাগফারতা লাহুম আম লাম তাসতাগফির লাহুম (আপনি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন অথবা না করুন — দু'টোই এক বরাবর)। বোখারী ও মুসলিম এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে। ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন ওরওয়া, মুজাহিদ ও কাতাদা সূত্রে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আউফের মাধ্যমে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. বললেন, আমার প্রভুপ্রতিপালক আমাকে মুনাফিকদের জন্য সত্তর বারের অধিক প্রার্থনা করার অনুমতি দিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম আমি তাই করবো। এবং আশা করবো আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করে দিবেন। তাঁর এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— 'সাওয়ায়ুন আলাইহিম ইস্তাগফিরতা লাহুম আম লাম তাসতাগফির লাহুম।'

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে উল্লেখিত 'সত্তর' সংখ্যাটিকে গুণে গুণে সত্তর বারই মনে করেছিলেন রসুল স.। তাই তিনি বলেছিলেন, আমি সত্তর বারের অধিক ক্ষমাপ্রার্থনা করবো। এতে করে অনুমান করা যেতে পারে যে, মানুষের

www.eelm.weebly.com

প্রতি তাঁর ছিলো কী অপার দয়া ও ভালোবাসা। তিনি সর্বান্তঃকরণে চাইতেন সকলেই যেনো লাভ করে আল্লাহ্তায়ালার মাগফিরাত। একারণেই তিনি বলেছিলেন, আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করবো সত্তরবারের অধিক। কিন্তু এখানে সত্তর বারের অর্থ— গুণে গুণে সত্তর বার নয়। শব্দটির অর্থ এখানে— অসংখ্যবার। আরবী ভাষায় অসংখ্য বুঝাতে সাত, সত্তর, সাতশত— এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। তিনের কমকে বলা হয় ক্বালীল (অল্প)। আর তিনের অধিককে বলা হয় 'কাছির' বা অধিক— যার কোনো সীমা নেই।

আরো দু'রকমভাবে আরবীতে সংখ্যা গণনা করা হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে তাক বা বেজোড় আর একটি হচ্ছে জুফ্ফাত বা জোড়া। দুই প্রথম জোড় আর তিন প্রথম বেজোড়। যেমন ৩-৫-৭। জোড়ার নিয়ম এ রকম, ৪-৬-৮। আর বেজোড়ের নিয়ম ৩-৫-৭। এভাবে দশ পর্যন্ত গণনা শেষ হয়ে যায়। এর পর গণনা শুরু হয় দশক হিসেবে। যেমন, বিশকে বলা হয় দুই দশ, তিরিশকে বলা হয় তিন দশ, চল্লিশকে বলা হয় চার দশ ইত্যাদি। এভাবে সাত দশ, অর্থাৎ সত্তর অর্থ হবে অনেক, অসংখ্য।

আল্লাহ্তায়ালা গফুরুর রহীম (ক্ষমা পরবশ এবং পরম দয়ালু)। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, রসুল স. মুনাফিকদের জন্য অসংখ্যবার ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। এতে করে ক্ষমা প্রদর্শনে আল্লাহ্তায়ালার কৃপণতাকে প্রকাশ করা হয়নি। মার্জনা করতে তিনি কখনো কার্পণ্য করেন না। এখানে কেবল প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে মুনাফিক ও কাফেরদের বাস্তব অবস্থাকে। তারা নেফাক ও কুফরী (অপবিত্রতা ও অবিশ্বাস) কে পরিত্যাগ করতে কিছুতেই সম্মত নয়। আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমার বৃত্তভূত হওয়ার কোনো রকম ইচ্ছাই তাদের নেই। তারা চির কপট, চির অবিশ্বাসী। তারা সত্যত্যাগী (ফাসেক)। সত্যত্যাগীদেরকে আল্লাহ্ কখনোই পথপ্রদর্শন করেন না (পথপ্রদর্শন করেন কেবল সত্যানু-সন্ধানীদেরকে)।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৮১

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ○

❒ যাহারা পশ্চাতে রহিয়া গেল তাহারা রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসিয়া থাকাতেই আনন্দ লাভ করিল এবং তাহাদিগের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা

www.eelm.weebly.com

আল্লাহের পথে সংগ্রাম করা পছন্দ করিল না এবং তাহারা বলিল 'গরমের মধ্যে অভিযানে বাহির হইও না।' বল, 'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম।' যদি তাহারা বুঝিত!

তাবুক যুদ্ধের সময় আবহাওয়া ছিলো প্রচণ্ড তপ্ত। ওই উত্তপ্ততাকে অজুহাত করে মুনাফিকেরা যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত রইলো। বাইরে বাইরে ইমানদার বলে নিজেদেরকে প্রকাশ করলেও অন্তরে অন্তরে তারা ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাই জেহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করার মহান আমন্ত্রণে তারা সাড়া দিতে পারলো না। রসুল স. এর সংগ পরিত্যাগ করাকেই তারা মনে করলো বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যান্য মুজাহিদকেও তারা প্রচণ্ড দাবদাহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিরুৎসাহিত করতে লাগলো। এ অবস্থাগুলোই এই আয়াতে বিবৃত হয়েছে এভাবে— যারা পশ্চাতে রয়ে গেলো, তারা রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকাতেই আনন্দ লাভ করলো এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করা পছন্দ করলো না এবং তারা বললো, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।' হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, রসুল স. সকলকে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ দিলেন। প্রচণ্ড দাবদাহে তখন ঝলসে যাচ্ছে প্রকৃতি। এক লোক বললো, হে আল্লাহর রসুল! এই খরাতপ্ত পরিস্থিতিতে যুদ্ধে যাত্রা করবেন না। খুবই কষ্ট হবে আপনার। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াতের শেষাংশ— বলো উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তারা বুঝতো। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই অজ্ঞ জনতাকে বলে দিন, পৃথিবীর কষ্ট সাময়িক আর আখেরাতের কষ্ট চিরস্থায়ী। জাহান্নামের অনন্ত অনলের তুলনায় পৃথিবীর এই দাবদাহ কিছুই নয়। এই বাস্তব জ্ঞান তোমাদের থাকলে তোমরা এ কথা কিছুতেই বলতে পারতে না। হায়! তোমরা যদি বুঝতে পারতে।

মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহীর বর্ণনায় এসেছে, বনী সালমার জদ্, জব্বার বিন মুনছার ও তার সংগীরা বলেছিলো, এই প্রচণ্ড গরমে যুদ্ধযাত্রা করো না। যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা জদের একেবারেই ছিলো না। সে রসুল স. এবং ইসলাম সম্বন্ধে ছিলো সন্দিহান। তাই গরমের বাহানা দেখিয়ে যুদ্ধযাত্রা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলো। তার এই অপআচরণের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিলো— 'কুল নারু জাহান্নামা আশাদ্দু হাররান' (বলো, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম)। মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজীর সূত্রে ইবনে জারীর লিখেছেন, রসুল স. এর তাবুক অভিযানের সময় ছিলো গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ। বনী সালমার এক লোক তখন বলেছিলো, এতো গরমে বের হয়ো না। তার কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়— 'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম।'

www.eelm.weebly.com

বায়হাকী লিখেছেন, এক মুনাফিক তখন বলেছিলো, এই প্রচণ্ড খরায় গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ো না। 'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম'— এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো তার কারণেই।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৮২

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَّلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

❑ অতএব তাহারা কিঞ্চিৎ হাসিয়া লউক, তাহারা প্রচুর কাঁদিবে তাহাদিগের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— গরমের অজুহাত দেখিয়ে তাবুক অভিযান থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে মুনাফিকেরা খুবই হাসি খুশি। ঠিক আছে, এভাবে তারা কিছুকাল হাসি খুশির সঙ্গে থাকুক। আগামীতে (আখেরাতে) তাদের কান্নার সীমা পরিসীমা থাকবে না। আর অনন্ত ওই কান্না হবে তাদের বর্তমানের এই অপকর্মের পরিণতি।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন 'ফাল ইয়াদ্বহাকু ক্বলীলা' অর্থ— কিঞ্চিৎ হেসে নিক। তাদের এ হাসি পৃথিবীর হাসি আর পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। তাই বলা হয়েছে— (এখানে) কিঞ্চিত হেসে নিক। আর 'ওয়ালইয়াবকু কাছীরা' অর্থ প্রচুর কাঁদবে। অর্থাৎ আখেরাতে তারা অনন্তকাল ধরে কাঁদবে।

ইবনে মাজা, আবু ইয়ালী, বায়হাকী ও হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, জাহান্নামীদের কান্না প্রবাহিত হবে একটি স্রোতস্বিনী রূপে। কাঁদতে কাঁদতে শেষ হয়ে যাবে চোখের জল। তারপর চোখ থেকে ঝরতে থাকবে রক্ত। মুখমণ্ডলে দেখা দিবে গভীর ফাটল। ওই ফাটল এতো বড় হবে যে, অনায়াসে সেখানে নৌকা চলাচল করতে পারবে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস থেকে যথাসূত্রে হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নরকবাসীরা এতো অধিক রোদন করবে যে, ওই রোদনস্রোতে অনায়াসে চলতে পারবে তরণী। চোখের জল শেষ হয়ে গেলে চোখ থেকে ঝরতে থাকবে রক্তের ধারা।

হজরত জায়েদ বিন রাফে থেকে মারফুরূপে ইবনে আবিদ্দুনিয়া এবং ইবনে জিয়াদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এক বিশেষ সময় পর্যন্ত নরকবাসীদের চোখ থেকে ঝরতে থাকবে জলাশ্রু। তারপর তাদের চোখ থেকে ঝরতে থাকবে রক্তাশ্রু। ফেরেশতারা তখন বলবে, হে হতভাগারা ! পৃথিবীতে তো তোমরা

www.eelm.weebly.com

কাঁদতে না (কেবল আনন্দ ফুর্তি করতে), তবে এখন এভাবে কাঁদছো কেনো? নরকবাসীরা চিৎকার করে বলবে, আমাদের পিতা মাতা, পুত্র-কন্যা সকলেই পিপাসিত। কিছু পানি আমাদের দিকে প্রবাহিত করে দাও। চল্লিশ বছর ধরে এভাবে চিৎকার করতে থাকবে তারা। কিন্তু কোনো সাড়া পাবে না। শেষে তাদের উপর নেমে আসবে স্থায়ী নৈরাশ্য।

আমি বলি, এই আয়াতের মূল নির্দেশনা এ রকমও হতে পারে যে, পৃথিবীতে হাসতে হবে কম। বেশী হাসাহাসি করা মাকরূহ। বেশী হাসলে হৃদয় মরে যায়। পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদতে হবে বেশী করে। এ রকম কান্না হবে পাপের ক্ষতিপূরণ।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে রোদন করতে অধিক। হাস্য করতে কম। তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা। বোখারী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু হোরায়রা থেকে। আর বিশুদ্ধ সূত্রে হাকেম বর্ণনা করেছেন আবু জর গিফারী থেকে। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটি— তোমরা পানাহারও ছেড়ে দিতে।

হজরত আবু দারদা থেকে তিবরানী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তবে তোমরা রোদন করতে অধিক। হাসতে কম। আর খোলা প্রান্তরে যেয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনীত প্রার্থনা জানাতে। কারণ তোমরা জানো না, তোমাদের অদৃষ্টে পরিত্রাণ রয়েছে কিনা। হজরত আবু হোরায়রা থেকে যথাসূত্রে হাকেম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার যা জানা আছে, তা যদি তোমাদের জানা থাকতো, তবে তোমরা রোদন করতে অত্যধিক, আনন্দ করতে অল্প। শোনো নেফাক (কপটতা) প্রকাশ হয়ে পড়বে, আমানত উঠে যাবে। অবলুপ্ত হবে রহমত। আমানতদারের প্রতি অপবাদ দেয়া হবে খেয়ানতের। কৃষ্ণবর্ণ নিশিথের মতো অচিরেই এসে পড়বে ফেত্‌না।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি রসুল স. তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, হে জনতা! তোমরা অত্যধিক রোদন করো। স্বাভাবিকভাবে রোদন না এলেও রোদনের চেষ্টা করো। দোজখবাসীদের কান্নার সীমা পরিসীমা থাকবে না। তাদের নয়নাশ্রু থেকে প্রবাহিত হবে নদী। অশ্রুপ্রবাহও শেষ হয়ে যাবে এক সময়। তারপর চোখ থেকে শুরু হবে রক্ত প্রবাহ। ওই পানি এবং রক্তের প্রবাহে ইচ্ছে করলে নৌকাও চালানো যাবে।

ইমাম আহমদ ও তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. বলেছেন, আমার জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে যদি তোমরা জানতে, তবে হাসতে কম, কাঁদতে বেশী। রমণীরাও উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে বিলাপ করতে থাকতো।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে মাজা লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুমিন বান্দার দু'চোখ থেকে যদি মক্ষিকার মস্তকের পরিমাণ পানিও নির্গত হয়, তবে আল্লাহ্ তার প্রতি দোজখের আগুনকে করে দিবেন হারাম।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৮৩

فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا ۭ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ○

❑ আল্লাহ্ যদি তোমাকে উহাদিগের কোন দলের নিকট ফেরত আনেন এবং উহারা অভিযানে বাহির হইবার জন্য তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তখন তুমি বলিবে 'তোমরা তো আমার সহিত কখনও বাহির হইবে না এবং তোমরা আমার সঙ্গী হইয়া কখনও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে না; তোমরা তো প্রথম বার বসিয়া থাকাই পছন্দ করিয়াছিলে, সুতরাং যাহারা পিছনে থাকে তাহাদিগের সহিত বসিয়াই থাক।'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় কোনো যুদ্ধযাত্রার সময় তাবুক যুদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন ওই সকল মুনাফিকেরা যদি আপনার সঙ্গী হতে চায় তবে আপনি তাদেরকে বলে দিবেন, তোমরা তো আমার সহযোদ্ধা হতেই পারো না, আমার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই পারো না। ইতোপূর্বে তোমরা ঘরে বসে থাকাকে পছন্দ করেছিলে, এখনও ওই সকল লোকদের সাথে থাকো যারা রোগগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ ও অন্তঃপুরবাসিনী রমণী। তাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা যেমন নেই, তেমনি তোমরাও সমরযোগ্যতারহিত।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, মুনাফিকশ্রেষ্ঠ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তার পুত্র বিশুদ্ধ বিশ্বাসী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে মৃত পিতার কাফনের জন্য একটি কোর্তা প্রার্থনা করলেন। রসুল স. তাঁর প্রার্থনা পূরণ করলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ এরপর পিতার জানাযা পড়ানোর নিবেদন করলেন। রসুল স. তাতেও সম্মত হলেন। জানাযার উদ্যোগ নিতেই হজরত ওমর তাঁর পবিত্র পরিধেয় আকর্ষণ করে নিবেদন করলেন, হে

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌র রসুল! স্মরণ করুন, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে মুনাফিকদের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। রসুল স. বললেন, আমাকে বলা হয়েছে, আমি মুনাফিকদের জন্য সত্তর বার ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও আমার প্রার্থনা গৃহীত হবে না। কিন্তু সত্তর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারবো না, এ রকম আমাকে বলা হয়নি। এ কথা বলে রসুল স. আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের জানাযা পড়লেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৮৪, ৮৫

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ○ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَأَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ

❐ উহাদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও উহার জানাযায় প্রার্থনা করিবার জন্য উহার কবর-পার্শ্বে দাঁড়াইবে না; উহারা তো আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং সত্যত্যাগী অবস্থায় উহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে।

❐ সুতরাং উহাদিগের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো উহার দ্বারাই উহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাহেন; উহারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী থাকা অবস্থায় উহাদিগের আত্মা দেহ-ত্যাগ করিবে।

এখানে 'সলাত' (তুসাল্লি) অর্থ জানাযার নামাজ। জানাযার নামাজ মূলতঃ মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)। 'আবাদান' অর্থ— কখনোই নয়। 'আলা ক্বরিহি' অর্থ কবরের পাশে। এভাবে আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশে বলা হয়েছে— 'তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জানাযার প্রার্থনা করবার জন্য তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানের উপরে যাদের মৃত্যু হয়েছে বলে আপনি জানেন, তাদের জানাযা পড়বেন না এবং ক্ষমাপ্রার্থনার উদ্দেশ্যে তাদের কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। কারণ এখন তারা হেদায়েত এবং সওয়াব থেকে চিরদিনের জন্য সম্পর্কচ্যুত। আপনার দোয়ার প্রতিক্রিয়া এখন আর তাদের নিকট পৌঁছবে না। চিরস্থায়ী মৃত্যু

www.eelm.weebly.com

ঘটেছে তাদের। তাদের অবস্থা এখন এ রকম— 'লা ইয়ামুতু ফীহা ওয়ালা ইয়াহ্ইয়া' (সেখানে তারা না পাবে জীবন, না পাবে মৃত্যু)।

হজরত ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বিন খাত্তাব বলেছেন, মুনাফিক আবদুল্লাহ্ বিন উবাই মারা গেলে রসুল স.কে তার জানাযার নামাজ পড়ানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলো। আমি তখন বললাম, ইবনে উবাই খাঁটি মুনাফিক। সে অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছে। রসুল স. বললেন, সত্তর বার ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও আমার প্রার্থনা কবুল না করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সত্তর বারের অধিক ক্ষমাপ্রার্থনার ব্যাপারে আমার প্রতি কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। আমি তাই তার জন্য সত্তর বারের অধিক ক্ষমাপ্রার্থনা করবো। এ কথা বলে তিনি স. ইবনে উবাইয়ের জানাযার নামাজ পড়লেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্পক্ষণ পরেই অবতীর্ণ হলো সুরা বারাআতের দু'টি আয়াত।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে বোখারী লিখেছেন, রসুল স. ইবনে উবাইয়ের জানাযা পড়তে গিয়ে দেখলেন, ইতোমধ্যে তাকে কবরে শোয়ানো হয়েছে। তিনি কবর থেকে লাশ বের করালেন। তাঁর পবিত্র উরুদেশের উপর স্থাপন করলেন তার মাথা। তারপর তার মুখের উপর মুখ রেখে দোয়া করলেন এবং শেষে নিজের কোর্তাটি পরিয়ে দিলেন।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, মুনাফিক ইবনে উবাইয়ের পুত্র হজরত আবদুল্লাহ্ ছিলেন বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রসুল স. সকাশে দোয়ার দরখাস্ত করলেন । রসুল স.ও দোয়া করলেন। এই প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

বিশুদ্ধ সূত্রে হাকেম এবং দালায়েল পুস্তকে বায়হাকী লিখেছেন, হজরত উসামা ইবনে জায়েদ বলেছেন, ইবনে উবাই মৃত্যুশয্যায় রসুল স.কে ডেকে পাঠালো। বললো, আপনি আমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। আপনার দেহ সংলগ্ন বস্ত্র কাফন হিসেবে দান করুন এবং আমার জানাযার নামাজও পড়িয়ে দিন। রসুল স. তার মৃত্যুর পর কাফন হিসেবে দান করলেন গায়ের জামা এবং তার জানাযাও পড়লেন। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

হজরত জাবের থেকে বোখারী লিখেছেন, বদর যুদ্ধের বন্দীরূপে হজরত আব্বাসকে আনা হয়েছিলো মদীনায়। তখন তাঁর গাত্রাবরণ ছিলো না। তিনি

www.eelm.weebly.com

ছিলেন দীর্ঘদেহী। তাই কারো জামা তাঁর গায়ে লাগলো না। ইবনে উবাইও ছিলো দীর্ঘকায়। তাই তার গায়ের জামা ঠিকমতো লেগে গেলো আব্বাসের শরীরে। প্রিয় পিতৃব্যের প্রতি এই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে রসুল স. ইবনে উবাইয়ের মৃত্যুর পর কাফন হিসেবে দান করেছিলেন তাঁর নিজের গায়ের জামা। বাগবী লিখেছেন, মৃত ইবনে উবাইয়ের সঙ্গে রসুল স. যে আচরণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে কোনো কোনো সাহাবী জানিয়েছিলেন মৃদু অনুযোগ। রসুল স. তখন বলেছিলেন, আমার জামা ও জানাযা পাঠ তাকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তবুও আমি বস্ত্র দান ও জানাযা পাঠ করেছি এ কারণে যে, আমার এ আচরণ দেখে তার গোত্রের অন্ততঃ এক হাজার লোক যেনো মুসলমান হয়। তাই হয়েছিলো। রসুল স. এর এই মহান ও বিরল আচরণ দেখে ইবনে উবাইয়ের গোত্রের এক হাজার লোক সর্বান্তঃকরণে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।

ইমাম বাগবী আরো লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. আর কোনো মুনাফিকের জানাযা পড়েননি। কোনো মুনাফিকের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়াও করেননি।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে অস্বীকার করেছিলো এবং সত্যত্যাগী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।' মুনাফিকের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা না করার এবং তাদের কবরের পাশে না দাঁড়ানোর দু'টি কারণ বিবৃত হয়েছে আলোচ্য বাক্যে। একটি হচ্ছে— আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি অস্বীকৃতি। আরেকটি হচ্ছে— সত্যত্যাগী (ফাসেক্ব) অবস্থায় মৃত্যুবরণ।

পরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেনো বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো তার দ্বারাই তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান; তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা দেহ ত্যাগ করবে।' এই আয়াতেও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, হে আমার রসুল! মুনাফিকদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেনো আপনাকে বিমুগ্ধ না করে। এগুলো প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য পার্থিব জীবনের শাস্তি। এভাবে ঘোর পার্থিবতায় নিমগ্ন রেখে তাদের জীবনাবসান ঘটানোই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়। এ রকমও হতে পারে যে, এতক্ষণ ধরে আলোচিত মুনাফিকদের সম্পর্কে নয়, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে অন্য কোনো অবাধ্য সম্প্রদায় সম্পর্কে।

www.eelm.weebly.com

وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَجَٰهِدُوا۟ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَـْٔذَنَكَ
أُو۟لُوا۟ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا۟ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَٰعِدِينَ ۝ رَضُوا۟ بِأَن
يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لَٰكِنِ
ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ جَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ
لَهُمُ ٱلْخَيْرَٰتُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى
مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۝

❒ 'আল্লাহে বিশ্বাস কর এবং রসূলের সঙ্গী হইয়া সংগ্রাম কর' এইমর্মে যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন উহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের শক্তি সামর্থ্য আছে তাহারা তোমার নিকট অব্যাহতি চাহে এবং বলে, 'আমাদিগকে রেহাই দাও, যাহারা বসিয়া থাকে আমরা তাহাদিগের সঙ্গেই থাকিব।'

❒ উহারা অন্তঃপুরবাসিনীদিগের সঙ্গে অবস্থান করাই পছন্দ করিয়াছে এবং উহাদিগের অন্তর মোহর করা হইয়াছে; ফলে, উহারা বুঝিতে পারে না।

❒ কিন্তু রসূল এবং যাহারা তাহার সঙ্গে বিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহের পথে সংগ্রাম করিয়াছে; উহাদিগের জন্যই কল্যাণ আছে এবং উহারাই সফলকাম।

❒ আল্লাহ্ উহাদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে; ইহাই মহাসাফল্য।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটির মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং রসুলের অনুগামী হয়ে যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কিত নির্দেশ যখন অবতীর্ণ হয়, তখন শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী মুনাফিকেরাও আপনার নিকট অব্যাহতি চায় এবং বলে, আমাদেরকে রেহাই দেয়া হোক। আমরাও তাদের মতো ঘরে বসে থাকবো, যারা ঘরে বসে থাকে।

www.eelm.weebly.com

দ্বিতীয়টির (৮৭) মর্মার্থ হচ্ছে— ওই মুনাফিকেরা গৃহাভ্যন্তরবাসিনীদের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করে। তাদের অন্তরে মোহর করা হয়েছে বলেই তারা এ রকম করে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। এখানে 'আল খাওয়ালিফি' শব্দটির অর্থ অন্তঃপুরবাসিনী রমণীকুল। শব্দটি বহুবচন বোধক। এর একবচন হচ্ছে 'খালিফাতুন।' কেউ কেউ বলেছেন, অপ্রয়োজনীয়, অকর্মণ্য এবং কর্মহীন ব্যক্তিদেরকে বলা হয় 'আল খাওয়ালিফি।' 'আরবী প্রবাদে রয়েছে, 'ফুলানুন খালিফাতু কওমিহি' অর্থ— অমুক ব্যক্তি তার গোত্রের মধ্যে নিম্নমানের (অকর্মণ্য)। এ রকম হলে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে — মুনাফিকেরা অকর্মণ্য লোকদের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করে। এ রকম করার কারণ তাদের হৃদয় রুদ্ধ, মোহরাঙ্কিত। তাই তারা এ কথা বুঝতে পারে না যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং রসুল স. এর অনুগমনের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সৌভাগ্য। আর এর বিপরীতে রয়েছে দুর্ভাগ্য, কেবলই দুর্ভাগ্য।

তৃতীয়টির (৮৮) মর্মার্থ হচ্ছে — আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল কারো মুখাপেক্ষী নন। মুনাফিকেরা জেহাদে অংশগ্রহণ না করলেও আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না। ধর্ম রক্ষার জন্য এগিয়ে আসবে একদল বিশুদ্ধচিত্ত ধর্মযোদ্ধা। মহান জেহাদের আমন্ত্রণে কেবল আল্লাহ্‌র জন্য তারা উৎসর্গ করবে তাদের জীবন ও সম্পদ। ওই সকল সমর্পিতপ্রাণ বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে সমূহ কল্যাণ। তারাই সফলকাম। এখানে 'আল খইরাত্' শব্দটির অর্থ পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ বেহেশতের হুর সমূহ। আল্লাহ্‌পাক তাদের সম্পর্কে বলেছেন— ফীহিন্না খইরাতুন হিসানুন (সেখানে রয়েছে অনিন্দসুন্দরী হুর)। 'খইরাত্' শব্দটি 'খইরাহ্' এর বহুবচন। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'খইর' শব্দটির প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ অবগত নয়। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— ফালা তা' লামু নাফসুম্ মা উখ্‌ফিয়া লাহুম মিন্ কুররাতি আইনিন (কেউ জানে না যে, তারা কিরূপ নয়নের অধিকারিণী, তাদেরকে গোপন রাখা হয়েছে)।

আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাস 'খইর' শব্দটির মধ্যে সকল প্রকার কল্যাণ নিহিত বলে জেনেছেন। আর আল্লাহ্‌পাক প্রদত্ত সকল কল্যাণের প্রকৃতি ও পরিমাপ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি বলেছেন, শব্দটির প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।

চতুর্থটির (৮৯) মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্‌তায়ালা আল্লাহ্‌র পথে জীবন ও সম্পদ উৎসর্গকারী ওই সকল মুজাহিদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে রয়েছে প্রবহমান নদী, যেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে ; এটাই মহা সফলতা।

www.eelm.weebly.com

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

❐ মরুবাসীদিগের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করিয়া অব্যাহতি প্রার্থনার জন্য আসিল এবং যাহারা আল্লাহ্‌কে ও তাঁহার রসূলকে মিথ্যাকথা বলিয়াছিল তাহারা বসিয়া রহিল, উহাদিগের মধ্যে যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদিগের মর্মন্তুদ শাস্তি হইবে।

এখানে 'আল মুয়াজ্‌জিরূনা ' কথাটি এসেছে, বাবে ইফতিয়ালরূপে। কথাটির মূল রূপ ছিলো 'মুয়্‌তাজিরূনা'। ফাররা এ রকম বলেছেন। অথবা 'আল মুয়াজ্‌জিরূনা' এসেছে 'বাবে তাফয়িল' থেকে। অর্থাৎ ওই সকল মরুবাসী সঠিক অজুহাত পেশ করেনি। মিথ্যা অজুহাত উত্থাপন করেছিলো তারা। যেমন বলেছিলো, আমি পীড়িত। কিন্তু সে পীড়িত নয়। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে— 'মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করে অব্যাহতি প্রার্থনার জন্য এলো এবং যারা আল্লাহকে ও তাঁর রসুলকে মিথ্যা কথা বলেছিলো তারা বসে রইলো।'

মোহাম্মদ বিন ওমর বলেছেন , কতিপয় মুনাফিক রসুল স. এর নিকটে এসে জেহাদ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করলো। কিন্তু এর পশ্চাতে তাদের কোনো উপযুক্ত কারণ ছিলো না। রসুল স. তাদেরকে অব্যাহতি দান করেন।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে ইবনে মারদুবিয়া উল্লেখ করেছেন, উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন না করা সত্ত্বেও রসুল স. মুনাফিক জদ্ বিন কায়েসকে জেহাদ থেকে অব্যাহতি দিলেন। তার দেখাদেখি আরো কয়েকজন মুনাফিক রসুল স. এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল ! আমাদেরকেও দয়া করে যুদ্ধের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিন। এই অসহ্য গরমে আমাদের পক্ষে যুদ্ধে যাত্রা সম্ভব নয়। রসুল স. তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। আয়াতে পরিষ্কার করে বলা হলো— তারা আল্লাহ্‌কে ও তাঁর রসুলকে মিথ্যা বলেছে। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, ওই লোকগুলো ছিলো বনী গিফার সম্প্রদায়ের। তাদের সংখ্যা ছিলো দশের চেয়েও কম। মোহাম্মদ বিন ওমর বলেছেন, তাদের সংখ্যা ছিলো বিরাশি জন। খিফাফ বিন ঈশাও ছিলো তাদের মধ্যে। তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়— ওয়া ইজা উনজিলাত্ সুরাতুন ..... ওয়া তারাআল্লাহু আ'লা কুলুবিহিম ফাহুম লা ইয়া'লামুন।

www.eelm.weebly.com

জুহাক বলেছেন, মিথ্যা অজুহাত উপস্থাপন করেছিলো আমের বিন তোফায়েলের গোত্রের লোকেরা। তারা বলেছিলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা যদি যুদ্ধে গমন করি, তবে তাঈ গোত্রের লোকেরা এসে আমাদের পরিবার পরিজন ও পশুপাল লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে। রসুল স. বলেছিলেন, তোমাদের সম্পর্কে আমাকে পূর্বাহ্নে অবগত করানো হয়েছে। ভবিষ্যতেও আর তোমাদের দরকার পড়বে না। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে সকল লোক যুদ্ধে যেতে চায়নি, রসুল স. অতুষ্ট হলেও তাদের মিথ্যা অজুহাত মেনে নিয়েছিলেন।

'ওয়া জায়াল মুয়াজ্জিরূনা ' কথাটির মধ্যে মিথ্যা অজুহাত উত্থাপনকারীরা সহ ওই সকল মুনাফিকেরাও অন্তর্ভুক্ত, যারা অজুহাত উত্থাপন করেনি, কিন্তু আল্লাহ্র নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করেছিলো। উভয় সম্প্রদায় সম্পর্কে তাই আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে— তাদের মধ্যে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি হবে। উল্লেখ্য যে, এই শাস্তি তাদের জন্য নয়, যারা অলসতা বশতঃ যুদ্ধ গমন থেকে বিরত ছিলো। কারণ তারা মুনাফিক ও কাফের— কোনোটাই নয়।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত বলেছেন, আমি ছিলাম রসুল স. এর প্রত্যাদেশ লেখক (কাতেব)। আমি সুরা বারাআতের আয়াত সমূহ লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছিলাম। সেদিন রসুল স. প্রত্যাদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। কানে কলম গুঁজে আমিও বসেছিলাম তাঁর পাশে। ইত্যবসরে এক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রসুল! আমি অন্ধ। আমার উপরে কী নির্দেশ? তাঁর ওই কথার উপরে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত —

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৯১

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ

❐ আল্লাহ ও রসূলের প্রতি অবিমিশ্র অনুরাগ থাকিলে যাহারা দুর্বল, যাহারা পীড়িত এবং যাহারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ তাহাদিগের কোন অপরাধ নাই। যাহারা সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নাই। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

'দ্বয়াফায়ি' অর্থ বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ, অক্ষম, দুর্বল। এ রকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ শিশু। আবার কেউ বলেছেন নারী। 'মারদ্বা' অর্থ অন্ধ এবং এ ধরনের পীড়িত ব্যক্তি। 'হারাজুন' অর্থ স্বাধীনতা,

www.eelm.weebly.com

অপরাধ। এ ধরনের ব্যক্তিরা জেহাদে না গেলে তাদের গোনাহ্ হবে না— যদি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি তাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আনুগত্য থাকে)। এ কথাগুলোই এই আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি অবিমিশ্র অনুরাগ থাকলে যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ তাদের কোনো অপরাধ নেই।'

এরপর বলা হচ্ছে— 'যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের প্রতি অভিযোগের কোনো হেতু নেই ; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এ কথার অর্থ— যারা সৎকর্ম প্রিয় তাদেরকে অভিযুক্ত করার কোনো কারণই নেই। আল্লাহ্তায়ালা ক্ষমাপরবশ এবং পরম দয়ার্দ্র। তিনি বিশ্বাসী পাপীদের অপরাধ মার্জনা করে থাকেন এবং তাদের প্রতি দয়া বর্ষণ করেন। সুতরাং যারা সৎকর্মঅন্তপ্রাণ তাদের প্রতি তো ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করবেনই।

বাগবী লিখেছেন, কাতাদা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবেদ বিন আমর এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে। জুহাক বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম সম্পর্কে। তিনি ছিলেন অন্ধ। হজরত আনাস থেকে বোখারী ও ইবনে সা'দ এবং হজরত জাবের থেকে কেবল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে মদীনার কাছাকাছি এক স্থানে এসে বললেন, তোমরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছো, অতিক্রম করেছো দুর্গম পথ, সওয়াবও লাভ করেছো। আর একদল লোক মদীনায় বসে থেকেই তোমাদের সাথী হয়েছে। পেয়েছে যুদ্ধের সওয়াব। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তারা তো যুদ্ধেই যায়নি (থেকে গিয়েছে মদীনায়)। রসুল স. বললেন, তা ঠিক। কিন্তু তাদের ছিলো উপযুক্ত ওজর। এ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৯২, ৯৩

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ۝ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

❑ উহাদিগের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোন হেতু নাই যাহারা তোমার নিকট বাহনের জন্য আসিলে তুমি বলিয়াছিলে, তোমাদিগের জন্য কোন বাহন আমি পাইতেছিনা; উহারা অর্থ ব্যয়ে অসমর্থজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরিয়া গেল।

www.eelm.weebly.com

❐ যাহারা অভাবমুক্ত হইয়াও অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছে অবশ্যই উহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগের হেতু আছে। উহারা অন্তঃপুরবাসিনীদিগের সহিত থাকাই পছন্দ করিয়াছিল; আল্লাহ্ উহাদিগের অন্তর মোহর করিয়া দিয়াছেন, ফলে, উহারা বুঝিতে পারে না।

এই আয়াতেও চলে এসেছে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা। আর্থিক সমস্যার কারণে যে সকল সাহাবী জেহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেননি তাঁদের মনোবেদনার কথা বিবৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। তাঁদের নিজেদের বাহন ছিলো না। রসুল স.ও তাঁদের বাহনের কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারেননি। মহান জেহাদে অংশ গ্রহণ না করতে পারার দুঃখে তাঁরা অশ্রুসিক্ত চোখে ফিরে গিয়েছিলেন। তাই কিছুতেই তাঁদেরকে জেহাদে না যাওয়ার দায়ে দায়ী করা যায় না। এ কথাগুলোই আলোচ্য আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোনো হেতু নেই, যারা তোমার নিকটে বাহনের জন্য এলে তুমি বলেছিলে, তোমাদের জন্য কোনো বাহন আমি পাচ্ছি না; তারা অর্থ ব্যয়ে অসমর্থজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরে গেলো।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কতিপয় বিত্তহীন সাহাবী রসুল স.এর নিকটে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করে দিন। রসুল স. বললেন, তোমাদের বাহনের যোগাড় তো আমি করতে পারলাম না। এ কথা শুনে কেঁদে ফেললেন ওই জেহাদপ্রিয় সাহাবীগণ। জলভরা চোখ নিয়ে প্রস্থান করলেন সেখান থেকে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মারদুবিয়া, হজরত মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী থেকে ইবনে জারীর, হজরত ইয়াজিদ বিন রুম্মান থেকে ইবনে ইসহাক, ইবনে মুনজির, আবু শায়েখ, জুহুরী এবং হজরত কাতাদা থেকে আবদুল্লাহ্ বিন আবী বকর ও আসেম বিন মোহাম্মদ বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, তাবুক যুদ্ধের সময়ে রসুল স. এর নিকটে সাহাবীগণের একটি দল বাহনপ্রার্থী হলেন। তাঁরা ছিলেন বিত্তহীন। রসুল স. এর সঙ্গচ্যুত হওয়া তাঁদের জন্য ছিলো মর্মবিদারক। রসুল স. তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের জন্য কোনো বাহনের ব্যবস্থা আমি করতে পারলাম না। এ কথা শুনে তাঁরা কেঁদে ফেললেন। প্রস্থান করলেন অশ্রুবিগলিত নেত্রে।

মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী বলেছেন, ওই সকল সাহাবীগণের নামের তালিকা সম্পর্কে বর্ণনাকারীদের মতপ্রভেদ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বনী আমর বিন আউফ গোত্রের হজরত সালেম বিন উমাইর আউসি, হজরত উলিয়া ইবনে জায়েদ, হজরত আবু লায়লা বিন আবদুর রহমান বিন কা'ব এবং হজরত হরমী বিন আবদুল্লাহ্। এই কয়েকজন সম্পর্কে সকলেই একমত।

www.eelm.weebly.com

হজরত আরবাজ বিন সারিয়ার প্রতি একমত কারাজী। ইবনে ইসহাক ও ওয়াকেদী ইবনে সা'দ বিন হাজাম, আবু ওমর এবং সুহাইলীও এ রকম বলেন। আবু নাঈম কথাটিকে সম্পৃক্ত করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে। কারাজী ও ইবনে ইসহাকের মতে হজরত আমর ইবনে হাজাম ইবনে জামুহও ছিলেন তাঁদের দলে। ওই দলের একজন যে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল ছিলেন, সে ব্যাপারেও রয়েছে কারাজী, ইবনে উকবা এবং ইবনে ইসহাকের ঐকমত্য।

ইবনে সা'দ, ইয়াকুব বিন সুফিয়ান এবং ইবনে হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল বলেছেন, যাদের সম্পর্কে কোরআন মজীদে অর্থ ব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, আমিও ছিলাম তাদের একজন।

আউফি সূত্রে ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. জেহাদের জন্য সকলকে প্রস্তুত হতে বললেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল সহ কয়েকজন সাহাবী নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদেরকে যুদ্ধাশ্ব প্রদান করুন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমার নিকট তো অতিরিক্ত কোনো বাহন নেই। এ কথা শুনে নীরবে অশ্রু বর্ষণ করতে করতে চলে গেলেন তাঁরা। তাঁদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

কারাজী ও ইবনে ওমর বলেছেন, সাখারের পুত্র সালমাও ছিলেন ওই দলে। কারাজী সালমাকে উল্লেখ করেছেন সালমান বলে। হজরত ওমর ইবনে আনমা বিন আদী এবং হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর মাজানীর নামোল্লেখ করেছেন কারাজী এবং ইবনে উকবা। আর এককভাবে কারাজী নামোল্লেখ করেছেন হজরত আবদুর রহমান বিন জায়েদ হারেসী, হজরত হরমী বিন আমর মাজানীর।

মোহাম্মদ বিন ওমর বলেছেন, হজরত ওমর ইবনে আউফও ছিলেন ওই সকল সাহাবীর অন্তর্ভূত। ইবনে সা'দ লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত মা'কাল বিন ইয়াসারের কথা। হাকেম উল্লেখ করেছেন হজরত হারকী বিন মোবারক বিন নাজ্জারের নাম। ইবনে আবদ তাঁদের অন্তর্ভূত করেছেন হজরত মাহদী বিন আবদুর রহমানকে এবং মোহাম্মদ বিন কা'ব হজরত সালেম বিন আমর ওয়াকেফিকে।

ইবনে সা'দ লিখেছেন, কোনো কোনো লোক বলেছেন, যারা অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন মাকানের সাত পুত্র। তাঁরা সকলেই ছিলেন মাজানী গোত্রের। তাঁরা ছিলেন হজরত নোমান সুবীদ, হজরত মুগাফ্ফাল, হজরত আকিল, হজরত সানান প্রমুখ।

www.eelm.weebly.com

ইউনুস ও ইবনে ওমর সূত্রে ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হজরত উলিয়া বিন জায়েদের কোনো বাহন ছিলো না। তাই তিনি রসুল স. এর নিকটে বাহন চাইলেন। কিন্তু পেলেন না। মনের দুঃখে তিনি সারারাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লেন। তারপর কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি জেহাদের নির্দেশ দিয়েছো, অথচ আমি বাহনের অভাবে যুদ্ধযাত্রা করতে অসমর্থ। সুতরাং আমার যতটুকু সম্পদ আছে, সবই আমি আমার মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে দান করে দিলাম। পরদিন প্রাতে অন্য আরো অনেকের মতো হজরত উলিয়া উপস্থিত হলেন রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। রসুল স. বললেন, আজ রাতে যে সদ্কা প্রদান করেছে সে কোথায়? হজরত উলিয়া উঠে দাঁড়ালেন। রসুল স. বললেন, তোমার জন্য শুভ খবর। যার অলৌকিক হস্তে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ! (অপ্রতুল হওয়া সত্ত্বেও) তোমার দান আল্লাহ্পাক গ্রহণ করেছেন।

ইবনে ইসহাক এবং মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, বাহনপ্রার্থীরা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন। রোদনরত দুই সাহাবী হজরত আবু ইয়ালী ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফালের সঙ্গে পথিমধ্যে সাক্ষাৎ ঘটলো হজরত ইয়েমিন বিন আমর নাজারীর সঙ্গে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছো কেনো? তাঁরা বললেন, আমরা রসুল স. এর নিকটে বাহন চেয়েও পেলাম না। বাহন ক্রয় করবার সামর্থ্যও আমাদের নেই। এখন আমরা জেহাদে যাবো কেমন করে। মহান জেহাদের পুণ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ অসহনীয়। হজরত ইয়েমিন তাঁদেরকে দান করলেন একটি পানি সিঞ্চনের উট এবং দুই সা' যব। মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় অতিরিক্ত বলা হয়েছে এই কথাগুলো— হজরত আব্বাস বিন মুত্তালিবও দু'জনের বাহনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আর হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান প্রায় পুরো সেনাবাহিনীকে সোয়ারী সজ্জিত করে দেয়ার পরেও ওই দলের তিন সাহাবীকে বাহন প্রদান করেছিলেন।

আমি বলি, বাহনবিবর্জিত সাহাবী ছিলেন মোট ষোলো জন। তাঁদের মধ্যে সাতজনের বাহনের বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিলো। বর্ণনাকারীর সন্দেহের কারণে ওই সাতজনের মধ্যে দু'জনের নাম উল্লেখিত হয়নি। যা হোক, জেহাদের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখে অশ্রুভারাক্রান্ত ওই সকল সাহাবীকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু মুসা আশয়ারী বলেছেন, আমি আশয়ার গোত্রের কতিপয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে রসুল স. সকাশে বাহনপ্রার্থী হয়েছিলাম। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমার সঙ্গীরা রসুল স. সকাশে বাহন প্রার্থনার জন্য আমাকে প্রেরণ করলো। যথারীতি আমি আমার প্রার্থনা জানালাম। রসুল স.

www.eelm.weebly.com

ছিলেন রোষতপ্ত অবস্থায় (জালালী হালে)। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিবো না। আমি সরে এলাম। সঙ্গীদেরকে জানালাম এ কথা। চিন্তিত হয়ে পড়লাম এই ভেবে যে, আমি হয়তো রসুল স. এর পবিত্র মর্জিবিরোধী কিছু বলেছি। ইত্যবসরে এক স্থান থেকে গণিমতের কিছু উট এলো। ডাক পড়লো আমার। হজরত বেলাল ডেকে বললেন, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে কায়েস কোথায়? আমি তাঁর সামনে হাজির হলাম। তিনি বললেন, রসুল স. তোমাকে ডেকেছেন। আমি ভয়ে ভয়ে রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হলাম। তিনি স. বললেন, এই উট দু'টো নিয়ে যাও। তোমার সঙ্গীদেরকে বলো, আল্লাহ্‌ এ দু'টোকে প্রেরণ করেছেন। আমি উট দু'টো নিয়ে সাথীদের কাছে ফিরে এলাম। বললাম, বাহন ছিলো না বলে রসুল স. প্রথমে বাহন দিতে অস্বীকার করেছিলেন। পরে ব্যবস্থা হয়েছে বলে এই উট দু'টো দিয়েছেন। তোমরা এগুলোতে আরোহণ করো। এবার তোমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারো, আমি সত্য বিবরণ দিয়েছি কিনা। সাথীরা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি সত্য বলেছেন। এরপর আমরা সকলে এই ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লাম যে, এই উট দু'টোর মাধ্যমে আমরা কোনো বরকত মনে হয় পাবো না। কারণ, রসুল স. হয়তো উট দু'টো দিয়েছেন অসন্তোষের সঙ্গে। এ কথা ভেবে আমরা হাজির হলাম তাঁর মহান সাহচর্যে। তিনি স. বললেন, আমি তোমাদেরকে উট দু'টো দিইনি। দিয়েছেন আল্লাহ্‌তায়ালা। তাই আমি আমার কসম ভেঙেছি। ভবিষ্যতেও আমি এ রকম করবো। কসম করার পর কসমবিরোধী উত্তম কিছু পেলে কসম ভাঙতে দ্বিধা করবো না। প্রদান করবো কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা।

পরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— 'যারা অভাবমুক্ত হয়েও অব্যাহতি প্রার্থনা করেছে, অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের হেতু আছে। তারা অন্তঃপুর-বাসিনীদের সঙ্গে থাকাই পছন্দ করেছিলো; আল্লাহ্‌ তাদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন, ফলে তারা বুঝতে পারে না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, যুদ্ধাযাত্রার সামর্থ্য যাদের রয়েছে, তারা ক্ষমার্হ নয়। তাদের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত হওয়ার কারণ বিদ্যমান। তারা সুমহান জেহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্দরমহলের রমণীকুল, অন্ধ, বিকলাঙ্গ, অকর্মণ্য, বিত্তহীন, শিশু ও বয়োবৃদ্ধদের সঙ্গেই অবস্থান করাকে ভালো মনে করেছে। তাদেরই অনড় অনানুগত্য ও ঔদাসীন্যের কারণে আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন। তাই তাদের অবরুদ্ধ হৃদয়ে তাদের অপকর্ম সমূহের দূরবর্তী কোনো আত্মবিশ্লেষণ ও অপরাধবোধ একেবারেই নেই। তাই তারা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিবিবর্জিত।

www.eelm.weebly.com

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৯৪, ৯৫, ৯৬

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝

❒ তোমরা উহাদিগের নিকট ফিরিয়া আসিলে উহারা তোমাদিগের নিকট অজুহাত পেশ করিবে; বলিও, 'অজুহাত পেশ করিও না, আমরা তোমাদিগকে কখনই বিশ্বাস করিব না; আল্লাহ্ আমাদিগকে তোমাদিগের খবর জানাইয়া দিয়াছেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তোমাদিগের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন। অতঃপর, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তাঁহার নিকট তোমাদিগকে প্রত্যা-বর্তিত করা হইবে এবং তিনি, তোমরা যাহা করিতে তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন।'

❒ তোমরা উহাদিগের নিকট ফিরিয়া আসিলে উহারা আল্লাহের শপথ করিবে যাহাতে তোমরা উহাদিগকে উপেক্ষা কর এই উদ্দেশ্যে। সুতরাং তোমরা উহাদিগকে উপেক্ষা করিবে; উহারা ঘৃণ্য এবং উহাদিগের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ জাহান্নাম উহাদিগের আবাসস্থল।

❒ উহারা তোমাদিগের নিকট শপথ করিবে যাহাতে তোমরা উহাদিগের প্রতি তুষ্ট হও এই উদ্দেশ্যে; তোমরা উহাদিগের প্রতি তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হইবেন না।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের মধ্যেও ওই সকল মুনাফিকের কথা বিধৃত হয়েছে, যারা বিভিন্নভাবে টালবাহানা করে তাবুক অভিযান থেকে বিরত ছিলো। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, তাদের সংখ্যা ছিলো আশিজন। তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুনাফিকদের সঙ্গে কী আচরণ করতে হবে তার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতত্রয়ে। সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স. সহ সকল সাহাবীগণকে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা তাদের নিকট ফিরে এলে তারা তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ করবে; বোলো, অজুহাত পেশ কোরো না, আমরা তোমাদেরকে কখনোই বিশ্বাস করবো না; আল্লাহ্ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন।' এখানে 'আল্লাহ্‌পাক আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন' অর্থ— পূর্বাহ্নে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের সকল অপকথন ও অপকর্ম সম্পর্কে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের রসুল স.কে।

এরপর বলা হয়েছে—'অতঃপর যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তাঁর নিকট তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে এবং তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল মুনাফিককে জানিয়ে দিন, আল্লাহ্‌তায়ালা সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য অবস্থার সম্যক পরিজ্ঞাতা। তাই তোমাদের অন্তর বাহিরের কোনো কিছুই তাঁর অজানা নয়। তোমরা যা কিছুই করো না কেনো অবশেষে তোমাদের সকলকে তাঁর নিকটে ফিরে যেতেই হবে। তখন তোমাদের অপকর্মের যথোপযুক্ত শাস্তিদান তিনি করবেনই।

পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'তোমরা তাদের নিকট ফিরে এলে তারা আল্লাহ্‌র শপথ করবে যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো এই উদ্দেশ্যে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে; তারা ঘৃণ্য এবং তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নাম তাদের আবাসস্থল।' এ কথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! মুনাফিকেরা নিজেদেরকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বসবে, যেনো তোমরা তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত না করে বসো। তোমরা কিন্তু তাদের কথা বিশ্বাস কোরো না। তাদেরকে উপেক্ষা কোরো। কারণ তারা ঘৃণিত আর তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ রয়েছে জাহান্নামের আবাস। এখানে মুনাফিকদেরকে ঘৃণিত ও জাহান্নামী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্বাসীদের প্রতি এই মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, তারা যেনো মুনাফিকদেরকে উপেক্ষা করে এবং তাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করে। এ রকম করলে হয়তো কখনো তাদের শুভবোধ জাগ্রত হতেও পারে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মুনাফিক জদ্ বিন কায়েস, মু'তাব বিন কুশায়ের এবং তাদের সঙ্গীদের সম্পর্কে। তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিলো আশিজনের মতো। রসুল স. সাহাবীগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে ওঠাবসা ছেড়ে দাও, কথাবার্তাও বন্ধ করে দাও।

www.eelm.weebly.com

মুকাতিল বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মুনাফিক ইবনে উবাই সম্পর্কে। সে রসুল স.কে বলেছিলো, এযাত্রা আপনি আমার উপর প্রসন্ন হোন। যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, সেই আল্লাহ্র কসম খেয়ে আমি বলছি আর কোনো যুদ্ধেই আমি আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করবো না।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের শেষটিতে (৯৬) বলা হয়েছে— তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও এই উদ্দেশ্যে, তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হলেও আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হবেন না। এখানে 'আলফাসিক্বীনা' অর্থ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। এ কথার মাধ্যমে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তাবুক যুদ্ধ থেকে বিরত মুনাফিককদেরকে। বলা হয়েছে, হে আমার রসুল ও রসুলের অনুচরবৃন্দ! মুনাফিকদেরকে শপথ করতে দেখে তোমরা হয়তো তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে যেতেও পারো। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাদের প্রতি কিছুতেই প্রসন্ন হবেন না। কারণ তিনি সকলের সব কিছু জানেন। জানেন অন্তরের অন্তস্থলের সকল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সংবাদ। সুতরাং তোমাদের প্রসন্নতা তাদের কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ্র জ্ঞানে তারা খাঁটি মুনাফিক। তাই দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে সীমাহীন অপমান ও লাঞ্ছনা। অতএব হে আমার রসুলের অনুচরকুল! তোমরা মুনাফিকদের প্রতারণার ফাঁদে কিছুতেই পা দিয়ো না।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৯৭, ৯৮, ৯৯

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ۗ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ۗ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۗ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

❐ সত্যপ্রত্যাখ্যান ও কপটতায় মরুবাসীগণ কঠোরতর; এবং আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার সীমারেখার জ্ঞান লাভ না করার যোগ্যতা ইহাদিগের অধিক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

www.eelm.weebly.com

❐ মরুবাসীদিগের কেহ কেহ যাহা তাহারা আল্লাহের পথে ব্যয় করে তাহাকে বাধ্যতামূলক অনর্থক ব্যয় মনে করে এবং তোমাদিগের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র উহাদিগেরই হউক! আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❐ মরুবাসীদিগের কেহ কেহ আল্লাহে ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং যাহা ব্যয় করে তাহাকে আল্লাহের সান্নিধ্যে ও রসূলের আর্শীবাদ লাভের অবলম্বন মনে করে। বাস্তবিকই উহা উহাদিগের জন্য আল্লাহের সান্নিধ্য লাভের অবলম্বন; আল্লাহ্ উহাদিগকে নিজ করুণাগ্রাহী করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, মরুচারী বেদুইনদের স্বভাব চরিত্রের কথা। বলা হয়েছে, সভ্য সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বড়ই ক্ষীণ। বহু যুগ থেকে তারা নবী রসুল অথবা পুণ্যবানদের সাক্ষাত পায়নি। তাই সত্যপ্রত্যাখ্যান ও কপটতায় (কুফরী ও মুনাফিকিতে) তারা অনড়। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, চিহ্নিত করে দিয়েছেন সত্য ও মিথ্যার যে পার্থক্যরেখা, বৈধতা ও অবৈধতার যে সীমারেখা, সে সম্পর্কে তাদের অযোগ্যতা অত্যধিক। আর আল্লাহ্তায়ালা সর্বজ্ঞ (আ'লীম) ও প্রজ্ঞাময় (হাকিম)। তাই পৃথিবী ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয় তিনি সম্পন্ন করেন নির্ভুল প্রজ্ঞাময়তার সঙ্গে।

পরের আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'মরুবাসীদের কেউ কেউ যা তারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তাকে বাধ্যতামূলক অনর্থক ব্যয় মনে করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে।'

আতা বলেছেন, 'মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে ব্যয়কে বাধ্যতামূলক অনর্থক ব্যয় মনে করে' কথাটির অর্থ— তারা ইসলামের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের নিকটে বাধ্য হয়ে নতি স্বীকার করেছে। অন্তর থেকে তারা ইসলামকে স্বীকার করেনি। তাই আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয়কে তারা মনে করে বৃথা ব্যয়। ব্যয় করতে তারা বাধ্য হয়। কিন্তু দান করলে সওয়াব পাওয়া যাবে এবং অত্যাবশ্যক দান না করলে ভোগ করতে হবে আযাব— এ রকম বিশ্বাস নিয়ে তারা দান করে না। আর 'তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে' কথাটির অর্থ— তারা অপেক্ষা করে রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের। আশায় আশায় থাকে, তাঁর মহাতিরোধানের পর তারা পুনরায় হয়ে উঠতে পারবে স্বেচ্ছাচারী। মুক্তিলাভ করবে প্রবৃত্তিবিরোধী বাধ্যবাধকতা থেকে।

এখানে 'তারাব্বাসু বিকুমুদ্ দাওয়াইর়া' অর্থ ভাগ্যচক্র বা ভাগ্য বিপর্যয়। 'দায়রা' অর্থ চক্র বা বৃত্ত। শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক। এর ধাতুমূল হচ্ছে 'দাওরুন'। 'দারা'ই হচ্ছে অতীতকালবোধক। আর 'ইয়াদুরু' হচ্ছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল-বোধক সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উত্থান-পতন ও কল্যাণ অকল্যাণ চক্রাকারে আবর্তিত হয়। অবিশ্বাসী মরুবাসীরা তাই মনে করতো ইসলামের সর্বগ্রাসী প্রভাব নিশ্চয়ই চিরদিন থাকবে না । ইসলামের প্রবক্তা হজরত মোহাম্মদ স. পৃথিবী থেকে চলে যাবেনই। তখন আবার তারা ফিরে পাবে তাদের অবলুপ্ত প্রভাব প্রতিপত্তি। এমতো আশা নিয়েই তারা প্রতীক্ষারত।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে, মন্দভাগ্যচক্র তাদেরই হোক! আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। এ কথার অর্থ— অবিশ্বাসী কপট মরুবাসীদের আকাঙ্খা কখনোই ফলপ্রসূ হবে না। কারণ আল্লাহ্ চান তাদের মন্দ ভাগ্য চিরস্থায়ী হোক। তিনি সর্বশ্রোতা। তাই তাদের সকল অপকথন রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার আনুরূপ্যবিহীন শ্রুতির আওতায়। আর তিনি সর্বজ্ঞও। তাই সকলের সকল প্রকার ধ্যান ধারণা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে অবগত। তাই তিনি নিশ্চিত করবেন প্রত্যেকের যথোপযুক্ত পরিণতি।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে বনী আসাদের কতিপয় শীর্ষস্থানীয় বনী ব্যক্তি, গাতফান, বনী তামীম এবং কতিপয় মরুবাসী গোত্র সম্পর্কে। আবু শায়েখ ও কালাবীও এ রকম বলেছেন। কিন্তু তাঁদের বক্তব্যে বনী তামীমের উল্লেখ নেই।

পরের আয়াতে (৯৯) বলা হয়েছে— 'মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহের সান্নিধ্য ও রসুলের আশীর্বাদ লাভের অবলম্বন মনে করে। বাস্তবিকই তা তাদের জন্য আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অবলম্বন; আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ করুণাগ্রাহী করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'

বাগবী লিখেছেন, ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মুজায়েনা গোত্রের মাকরানের সন্তানদের সম্পর্কে। ইতোপূর্বেও তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলো— 'ওয়ালা আলাল্ লাজীনা ইজা মা আতাওকা লিতাহ্মিলাহুম।' (আর তাদের উপর নয়, যারা আপনার নিকট এসেছিলো আপনার সহগামী হওয়ার উদ্দেশ্যে)। হজরত আবদুর রহমান ইবনে মুগাফ্ফাল মাজানী স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, আমরাই ছিলাম মাকরানের দশ পুত্র। কালাবী বলেছেন, তামীম গোত্রের আসাদ বিন খুজাইমা এবং হাওয়াজেন ও গাতফান গোত্রভূত বনী আসলাম, বনী গিফার ও জুহ্নিয়া সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বনী গিফারকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। বনী আসলামকে রেখেছেন নিরাপদ। কিন্তু বনী ওসাইয়া করেছিলো আল্লাহ্ ও রসুলের নাফরমানী। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, (কুরায়েশ, আনসার, জুহ্নিয়া, মুজাইয়েনা, আসলাম, গিফার এবং আশজায়ীরা একে অপরের বন্ধু) আর তাদের সকলের বন্ধু আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুল ছাড়া আর কেউ নয়।

হজরত আবু বকর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আসলাম গিফার, মুজাইয়েনা ও জুহ্নিয়া গোত্র তামীম ও আমের গোত্রের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ ছিলো। তারা আসাদ ও গাতফান অপেক্ষা ছিলো উত্তম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, তামীম, আসাদ, খুজাইমা,

www.eelm.weebly.com

হাওয়াজেন, গাতফান গোত্রগুলো অপেক্ষা আসলাম, গিফার, কতিপয় জুহুনিয়া ও মুজাইয়েনা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্তায়ালার নিকটে অধিক উত্তম বলে বিবেচিত হবে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন, 'রসুলের আশীর্বাদ' কথাটির অর্থ রসুলের দোয়া বা ক্ষমাপ্রার্থনা। তিরমিজি ব্যতীত অন্য বিশুদ্ধবর্ণনাকারীরা লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আউফা বর্ণনা করেছেন, আমি যখন রসুল স. এর নিকটে আমার জাকাতের মাল অর্পণ করলাম তখন তিনি দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ ! আবু আউফা এবং তার সন্তান-সন্ততিদের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করো। 'বাস্তবিকই তা তাদের জন্য আল্লাহ্র সান্নিধ্যলাভের অবলম্বন'— কথাটির মাধ্যমে মরুবাসী বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদের ধারণাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এ কথা বলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের দান নিশ্চয় আল্লাহ্র সান্নিধ্য ও রসুলের আশীর্বাদ লাভের অবলম্বন।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ করুণাগ্রাহী করবেন।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে আপন করুণায় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। চিরদিনের জন্য ক্ষমা করবেন তাদেরকে। কারণ তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়াপরবশ।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১০০

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

❒ মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে যাহারা প্রাথমিক অগ্রানুসারী এবং যাহারা সদনুষ্ঠানের সহিত তাহাদিগের অনুগমন করে আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। ইহা মহাসাফল্য।

এখানে 'ওয়াস্ সাবিকুনাল আউয়ালুন' অর্থ— প্রাথমিক অগ্রানুসারী। মুহাজির বলা হয় তাদেরকে যারা ধর্ম রক্ষার জন্য জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ করে মদীনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। মক্কার ওই বিশিষ্ট সাহাবীগণকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মদীনার কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবী। আনসার বলা হয় তাঁদেরকে।

www.eelm.weebly.com

মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে সাবেক্বীন কারা?

মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে সাবেক্বীন বা অগ্রানুসারী কারা সে সম্পর্কে বিভিন্ন রকম বর্ণনা এসেছে। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, কাতাদা, ইবনে সিরিন ও তাবেঈনের একটি দল বলেছেন, যারা উভয় কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছেন তাঁরাই সাবেক্বীন। হজরত আতা বিন আবী রেবাহ্ বলেছেন, সাবেক্বীন হচ্ছে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীবৃন্দ। শা'বী বলেছেন, হুদায়বিয়ায় বায়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণকারীরা হচ্ছেন সাবেক্বীন। কারো কারো মতে মুহাজিরগণের মধ্যে কেবল আটজন সাহাবী সাবেক্বীনদের অন্তর্ভুক্ত— যারা সকলের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ওই আটজন মুহাজির হচ্ছেন হজরত আবু বকর, হজরত জায়েদ বিন হারেসা, হজরত ওসমান বিন আফ্ফান, হজরত যোবায়ের বিন আওয়াম, হজরত আলী বিন আবু তালেব, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং হজরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্।

বাগবী লিখেছেন, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন রসুল স. এর প্রিয়তমা সহধর্মিণী উম্মত জননী হজরত খাদিজাতুল কোবরা। এটা ঐকমত্যসম্মত। এরপর কে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতপ্রভেদ রয়েছে। হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বলেছেন, জননী খাদিজার পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হজরত আলী। এ সম্পর্কে হজরত আলীর কবিতাটি উল্লেখ্য। কবিতাটি এই— সাবাকতুকুম ইলাল ইসলামী তুররন গুলামাম মাবালাগতু আওয়ানা হুলমিন। অর্থ— আমি তখন বালকই ছিলাম, তখনও প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। কিন্তু আমি সকলের পূর্বে অনুপ্রবেশ করেছিলাম ইসলামে। মুজাহিদ ও ইবনে ইসহাকের মতে হজরত আলী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন মাত্র দশ বছর বয়সে। কারো কারো মতে জননী খাদিজার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হজরত আবু বকর। এই অভিমতের প্রবক্তা হজরত ইবনে আব্বাস, ইব্রাহিম নাখয়ী এবং আমের শা'বী। হজরত হাস্সানের কবিতায় এই অভিমতটির সমর্থন রয়েছে। কবি হজরত হাস্সান ওই কবিতায় হজরত আবু বকরের প্রশংসাছলে বলেছেন— রসুল স. তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন।

জুহরী এবং ওরওয়া ইবনে জুহরীর মতে জননী খাদিজার পরে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হজরত জায়েদ ইবনে হারেসা। মতপৃথকতা নিরসনার্থে ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম হানযালী বলেছেন, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন রমণীগণের মধ্যে জননী খাদিজা, প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে হজরত আবু বকর, বালকদের মধ্যে হজরত আলী এবং মুক্ত ক্রীতদাসদের মধ্যে হজরত জায়েদ ইবনে হারেসা।

www.eelm.weebly.com

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর হজরত আবু বকর তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে দেন এবং অন্য সকলের প্রতি ইসলামের আহ্বান জানান। তিনি ছিলেন সর্বজননন্দিত। মহান চরিত্রাধিকারী। কুরায়েশদের বংশীয় ইতিবৃত্ত এবং সমাজ তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক ওয়াকিফহাল। ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। ছিলেন দানশীল। বিচক্ষণতা, মানবিকতা ও উন্নততর দিক নির্দেশনাদাতা হিসেবে সকলেই তাঁকে মান্য করতো। শুভ পরামর্শ গ্রহণের জন্য সমবেত হতো তাঁর কাছে। তিনি তাঁর সুহৃদগণকে মহান ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। ফলে নির্দ্বিধায় ইসলামের পথে আগমন করেছিলেন হজরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান, হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, হজরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ প্রমুখ। এই সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করলে হজরত আবু বকর তাঁদের সকলকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে এবং আদায় করেছিলেন নামাজের জামাত। এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্যরাও ইসলামের পথে অগ্রসর হতে থাকেন। সাত বছরের মধ্যে মুসলমান নারী পুরুষের সংখ্যা দাঁড়ায় উনচল্লিশজনে। এরপর মুসলমান হন হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব। তিনি ছিলেন চল্লিশতম মুসলিম ব্যক্তিত্ব। তিনি মুসলমান হওয়ার পর অংশীবাদীরা বলেছিলো, আজ আমাদের শক্তিমত্তা অর্ধেক হয়ে গেলো। হজরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের পর থেকে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে ইসলামের। মুসলমানেরা হতে থাকেন ক্রমশঃ শক্তিমান। হজরত আলী তখন বলেছিলেন, হে মুসলিম জনতা ! আমি তোমাদের সাত বছর আগে থেকে নামাজ আদায় করে আসছি।

আনসার সাহাবীগণের মধ্যে সাবেক্বীন তাঁরা, যাঁরা রসুল স. এর নিকটে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন আকাবায়। গভীর রাতের ওই বায়াতানুষ্ঠানে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন ছয় সাত জন। পরের বছর ওই আকাবায় বায়াত গ্রহণ করেছিলেন বারো জন। তার পরের বছর সত্তর জন। প্রথম বায়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন হজরত আবু জারারাহ্ এবং হজরত মাসআব ইবনে উমায়ের। তাঁরা মদীনায় পৌঁছেই পূর্ণ উদ্যমে শুরু করেন ইসলামের প্রচার। নবদীক্ষিতদেরকে শিক্ষাদান করেন কোরআন। তাঁদের ওই পূর্ণ উদ্যমের ফলে পুরুষ, রমণী ও শিশুদের একটি বিরাট দল লাভ করেন ইসলামের চিরন্তন আশ্রয়।

কেউ কেউ বলেছেন, সাবেক্বীন সাহাবীগণ কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল জান্নাতীগণের অনুসরণীয়। অর্থাৎ ইমান, হিজরত ও রসুল স. এর ধর্মের সাহায্যকারীরূপে যারা ওই সাবেক্বীন সাহাবীর একনিষ্ঠ অনুসরণ করে চলবে তারাই হবে সফলকাম।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, সম্ভবতঃ এখানকার 'সাবেক্বীন' কথাটির অর্থ 'মুক্বাররাবীন' (নৈকট্যভাজনগণ)। আল্লাহ্পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন— 'ওয়াস্ সাবেক্বুনাস্ সাবেক্বুন উলায়িকাল মুক্বাররাবুনা। ফী জান্নাতিন নাঈম। সুল্লাতুম মিনাল আওয়ালীন (অগ্রগামীরাই অগ্রগামী। তারাই জান্নাতুম নাঈমে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসবাস করবে। তারা হবে প্রথম দিকের একটি দল)। সুল্লাতুনও একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী। সুল্লাতুনের অন্তর্ভূত রয়েছেন সাহাবায়েকেরাম, তাবেঈন এবং তাবে-তাবেঈন। এই উম্মত ওই সকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের অনুসরণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এরপরে বলা হয়েছে— 'কালিলুম মিনাল আখিরীন' পরবর্তীগণের মধ্যে অল্পসংখ্যক। এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তিবর্গ আবির্ভূত হবেন হাজার বছর পর। তাঁরাও হবেন কামালিয়তে নবুয়তের সম্পদে সমৃদ্ধ। ইসলামের প্রাথমিক জামানায় কামালিয়তে নবুয়তের বৈভবে বৈভবিত ব্যক্তিত্বের সংখ্যা ছিলো অনেক। কিন্তু হাজার বছর পর তাঁরা হবেন স্বল্পসংখ্যক। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দি র. বলেছেন, সকল সাহাবী, অধিকাংশ তাবেঈন এবং অল্পসংখ্যক তাবে-তাবেঈন ছিলেন নবুয়তের পূর্ণতার বরকতের অধিকারী।

আমি আরও বলি, এখানে 'মিনাল মুহাজিরীনা ওয়াল আনসার (মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে) কথাটির মিন্ 'মিনে তাবইজিয়াহ্' (আংশিক অর্থ প্রকাশক) নয়। এখানকার মিন্ হচ্ছে বায়ানিয়াহ্ (বর্ণনামূলক)। এর মাধ্যমে আস্সা-বিক্বুনাল আউয়ালুন (প্রাথমিক অগ্রানুসারী) — এই বিবৃতিটি উল্লেখিত হয়েছে। আর আল্লাজীনা তাবায়ু'হুম বি ইহসানিন (যারা সদনুষ্ঠানের সঙ্গে তাদের অনুগমন করে) — কথাটির উদ্দেশ্য হবে সাবেক্বীনাল আখেরীন (পরবর্তী সময়ের সাবেক্বীন) এবং আস্হাবিল ইয়ামীন (দক্ষিণ হস্তে আমলনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ)। যাঁদেরকে 'সুল্লাতুম মিনাল আউয়ালীন' বলা হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন প্রথম কুরূনের (প্রথম যুগের) মানুষ। প্রথম কুরূনের সময়সীমা ছিলো প্রথম তিরিশ বছর থেকে এক হাজার বছর পর্যন্ত। আর সুল্লাতুম্ মিনাল আখেরীনের সময় শুরু হবে হাজার বছরের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। আতা বলেছেন, 'যারা সদনুষ্ঠানের সঙ্গে তাদের অনুগমন করে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ওই সকল লোককে যারা সাহাবায়েকেরামকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে এবং তাদের জন্য সৎপ্রার্থনা করে।

আবু সাখার হুমাইদ বিন জিয়াদ বলেছেন, আমি একবার মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজীর নিকটে গেলাম এবং বললাম, সাহাবীগণ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? তিনি বললেন, সকল সাহাবীই জান্নাতি— তাঁরা পুণ্যবান অপুণ্যবান যাই হোন না কেনো। আমি বললাম, আপনি এ কথা কোথায় পেলেন? তিনি বললেন, কোরআন মজীদে। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'ওয়াস্ সাবেক্বুনাল আউয়ালুনা মিনাল মুহাজীরিনা ওয়াল আনসার।' এই আয়াতের শেষে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে

www.eelm.weebly.com

'রদ্বিআল্লাহু আনহুম ওয়া রদ্বু আনহ্ (আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট)। আর যারা সাহাবী নন তাদেরকে আল্লাহ্তায়ালার প্রসন্নতা লাভ করতে গেলে সাহাবীগণেরই অনুগমন করতে হবে। তাই বলা হয়েছে— যাঁরা সদনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের অনুগমন করে। এতে করে বুঝা যায় যে, যারা আল্লাহ্তায়ালার প্রসন্নতাকামী নয়, তারা সাহাবীগণের অনুসরণ করবে না। আবু সাখার বলেছেন, মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজীর আবৃত্তি শুনে আমার মনে হলো, এই আয়াত এর আগে আমি কখনও পড়িইনি। এই আয়াতের ব্যাখ্যাও আগে আমার জানা ছিলো না।

আমি বলি, সকল সাহাবীর জান্নাতি হওয়ার প্রমাণরূপে অন্য একটি আয়াত আরও অধিক যথার্থ। আয়াতটি হচ্ছে— 'লা ইয়াস্তাবি মিনকুম মান আনফাফা মিন ক্বলিল্ ফাত্হি ওয়া ক্বাতালা উলায়িকা আ'জামু দারাজাতাম মিনাল লাজিনা, আনফাক্ব মিম্বা'দু ওয়া ক্বতালু ওয়া কুল্লাহুওঁ ওয়াদল্লাহুল হুসনা' (যে সকল লোক মক্কা বিজয়ের পূর্বে নিজের সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করেছিলো এবং জেহাদ করেছিলো — তাদের সমতুল্য ওই সকল লোক হতে পারে না, যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করেছে এবং জেহাদ করেছে মক্কা বিজয়ের পরে)। এই আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণাপেক্ষা অধিক মর্যাদাশালী। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা উভয় দলকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, আমার সাহাবীগণকে মন্দ বোলোনা। যাঁর আনুরূপ্যবিহীন হস্তে আমার জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! তোমরা উহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলেও আমার সাহাবীগণের একসের অথবা অর্ধসের শস্য দান করার সমান সওয়াব লাভ করবে না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

হজরত জাবের থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, ওই সকল লোককে অগ্নি স্পর্শ করবে না যারা ইমানের সঙ্গে আমাকে দেখেছে এবং দেখেছে তাদেরকে, যারা প্রত্যক্ষ করেছে আমাকে।

হজরত বুরায়দা থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন রসুল স. বলেন, আমার কোনো সাহাবী কোনো গ্রাম অথবা শহরে মৃত্যুবরণ করলে কিয়ামতের দিন সে হবে ওই অঞ্চলের সকল লোকের নেতা এবং জ্যোতি। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে রজিন বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রপুঞ্জের মতো— যে তাদের যে কোনো এক জনের অনুসরণ করবে সে লাভ করবে হেদায়েত।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন কথাটির অর্থ— আল্লাহ্পাক সাহাবীগণের সত্যানুসরণ এবং আমল সমূহকে পছন্দ করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্কে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে এবং মোহাম্মদ স. কে নবী হিসেবে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গ্রহণ করেছেন। এই নেয়ামত আল্লাহ্তায়ালাই তাঁদেরকে দান করেছেন। তাঁদের অন্তর ভরপুর করে দিয়েছেন আল্লাহ্, ইসলাম ও রসুলের মহব্বতে। দান করেছেন পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। কারণ তিনি তাঁদের প্রতি প্রসন্ন।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহা সাফল্য।' এ কথার অর্থ— সাহাবায়েকেরাম তাঁদের একনিষ্ঠ প্রেমিক ও অনুসরণকারীদের জন্যই আল্লাহ্তায়ালা প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত। তলদেশে প্রবহমান নদী বিশিষ্ট ওই জান্নাতই হবে তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা। আর এটাই হচ্ছে মহা সফলতা।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১০১

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛؕ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛؔ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۟ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۝

❐ মরুবাসীদিগের মধ্যে যাহারা তোমাদিগের আশ-পাশে আছে তাহাদিগের কেহ কেহ এবং মদীনাবাসীদিগের কেহ কেহ মুনাফিক, উহারা কপটতায় সিদ্ধ। তুমি উহাদিগকে জান না, আমি উহাদিগকে জানি। আমি উহাদিগকে দুইবার শাস্তি দিব ও পরে উহারা প্রত্যাবর্তিত হইবে মহা শাস্তির দিকে।

এখানে 'মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ও মদীনাবাসীদের মধ্যে কাউকে কাউকে মুনাফিক বলা হয়েছে। ওই মুনাফিকেরা ছিলো জুহুনিয়া, মুজাইয়্যেনা, আশজায়া, আসলাম ও গিফার গোত্রভূত। হজরত ইকরামা সূত্রে এ রকম বলেছেন ইবনে মুনজির। এখানে 'মিম্মান' (তাদের মধ্যে) কথাটির— মিন্ হচ্ছে মিনয়ে তাবইজিয়া (আংশিক অর্থদায়ক মিন)। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে বর্ণিত কতিপয় হাদিসে উল্লেখিত গোত্রগুলোর প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু ওই প্রশংসা আলোচ্য আয়াতের বর্ণনার প্রতিকূল নয়। কারণ এখানে সকলকে মুনাফিক সাব্যস্ত করা হয়নি। বলা হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলো মুনাফিক। আর হাদিস শরীফ সমূহেও ঢালাওভাবে সকলের প্রশংসা করা হয়নি। প্রশংসা করা হয়েছে ওই সকল

www.eelm.weebly.com

ব্যক্তির যাঁরা মুনাফিক ছিলেন না। ছিলেন বিশুদ্ধ বিশ্বাসী। আরো উল্লেখ্য যে, 'মদীনাবাসীদের কেউ কেউ মুনাফিক' — এ কথা বলে এখানে নির্দেশ করা হয়েছে আউফ ও খাজরাজ গোত্রের মুনাফিকদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে — 'তারা কপটতায় সিদ্ধ।' এ কথার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে মুনাফিকদের প্রকৃত চরিত্র। এখানে 'মারাদ্ব' অর্থ স্বভাব সিদ্ধতা, অভ্যস্থতা অথবা পারদর্শিতা। যেমন, 'তাম্মারাদা জায়িদুল আলা রব্বিহী জায়েদ' (জায়েদ তার প্রভুর অবাধ্যতা করেছে)। অর্থাৎ সে অবাধ্যতায় সিদ্ধ। মারিদ ও মারিদা শব্দরূপ দুটোও বিশেষণ রূপে এসেছে উদ্ধৃত বাক্যস্থিত 'তাম্মারাদা' থেকে। ইবনে ইসহাক আলোচ্য বাক্যটি অনুবাদ করেছেন এভাবে — তারা উত্তোলন করেছে কপটতার অনড় প্রাচীর (নেফাক বা কপটতা ভিন্ন অন্য সকল কিছুর প্রতি তারা জানিয়েছে ঘোর অস্বীকৃতি)।

ইবনে জায়েদ বর্ণনা করেছেন, কথাটির অর্থ হবে তারা নেফাকের (কপটতা বা অপবিত্রতার) উপরে অনড় অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং তারা তওবাও করেনি। কামুস গ্রন্থে রয়েছে মারাদা ও ইয়ামরদু নাসারা শব্দটির অনুরূপ, এবং মারুদা ও ইয়ামরুদু কারুমা শব্দটির অনুরূপ। দুটোরই ধাতুমূল হচ্ছে 'মুরুদুন' ও 'মারাদাতুন।' 'মারিদুন' 'মারেদুন' ও 'মুতামাররেদুন' হয়েছে বিশেষণবাচক। এর অর্থ হবে — গোপন করা অথবা যে অবস্থানে রয়েছে, সে অবস্থান থেকে আরো সামনে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছানো। যেমন 'মারাদা আ'লা শাইয়ি' অর্থ — সে ওই বিষয়ে অভ্যস্ত স্থায়ী।

কোনো কোনো অভিধান বিশারদ বলেছেন, 'মারাদু আ'লান নিফাকি' অর্থ — তারা নেফাকের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে এবং সমস্ত কল্যাণ থেকে হয়েছে সম্পর্কচ্যুত। 'মারিদুন' বলা হয় ওই ব্যক্তিকে, যে কল্যাণবিচ্যুত, মঙ্গলশূন্য।

এরপর বলা হয়েছে — 'তুমি তাদেরকে জানো না, আমি তাদেরকে জানি।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অতুলনীয় বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হলেও আমার মতো সর্বজ্ঞ নন। তাই আপনি মুনাফিকদের সকল খবর রাখেন না। কিন্তু আমি তাদের সকল খবর রাখি। তারা আপনাকে প্রতারণা করতে সক্ষম হলেও, আমাকে প্রতারণা করতে সক্ষম নয়।

এরপর বলা হয়েছে— আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দিবো ও পরে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে মহা শাস্তির দিকে।' এখানে দু'বার শাস্তি দেয়ার কথা বলে কী বুঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে আলেমগণের মতপ্রভেদ রয়েছে। কালাবী এবং সুদ্দী বলেছেন, এক দিন রসুল স. ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। বলতে শুরু করলেন, হে অমুক! এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি খাঁটি মুনাফিক। হে অমুক ব্যক্তি! তুমিও চলে যাও। নিঃসন্দেহে তুমি মুনাফিক। এভাবে রসুল স. অনেক

www.eelm.weebly.com

মুনাফিককে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন। এটা ছিলো তাদের জন্য চরম অবমাননাকর শাস্তি। আর তাদের জন্য দ্বিতীয়বার আযাব হবে কবরে।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে প্রথম শাস্তি অর্থ যুদ্ধ ও বন্দীত্ব। আর দ্বিতীয় শাস্তি অর্থ কবরের আযাব। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে প্রথম আযাবের উদ্দেশ্য পৃথিবীতে তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর আপতিত মুসিবত সমূহ। আর দ্বিতীয় আযাবের উদ্দেশ্য কবরের আযাব। মুজাহিদের অপর বিবৃতিতে রয়েছে, মুনাফিকেরা দু'বার দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হয়েছিলো। সেদিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে 'আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দিবো।' কাতাদা বলেছেন, এখানে দু'বার শাস্তির অর্থ, পৃথিবীতে তাদের উপর আপতিত দুম্বল নামক ব্যাধি কবরের আযাব। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৃথিবীতে শরিয়তের শাস্তি ও কবরের বিভিন্ন রকমের শাস্তিকে এখানে বলা হয়েছে, 'দু'বার শাস্তি দিবো।'

ইবনে ইসহাক বলেছেন, তাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি হিংসা ও ঘৃণার জ্বলন্ত আগুন হচ্ছে প্রথম আযাব। আর দ্বিতীয় আযাব হচ্ছে কবরের আযাব। কেউ কেউ বলেছেন, রুহ কবজ করার সময় ফেরেশতারা তাদের মুখে, পার্শ্বদেশে ও পশ্চাৎদেশে আঘাত করতে থাকবে— এটাই প্রথম শাস্তি। আর দ্বিতীয়বার শাস্তি হবে কবরে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ষড়যন্ত্রের ঘাঁটিরূপে তারা একটি মসজিদ তৈরী করেছিলো। ওই মসজিদকে চিহ্নিত করা হয়েছিলো মসজিদে জেরা (ষড়যন্ত্রের মসজিদ) বলে। রসুল স. হজরত আলীর মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন ওই মসজিদ। এটা ছিলো তাদের প্রথম শাস্তি। আর পরের শাস্তি হবে কবরে এবং জাহান্নামে।

আমি বলি, উপরে বর্ণিত অভিমতগুলোর মূলমর্ম এই যে, মুনাফিকদের শাস্তি দেয়া হবে দু'বার — এক বার পৃথিবীতে আরেক বার কবরে।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১০২

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

❐ অপর কতক লোকে নিজদিগের অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, উহারা এক সৎকর্মের সহিত অপর এক অসৎকর্ম মিশ্রিত করিয়াছে; আল্লাহ্ হয়তো উহাদিগকে ক্ষমা করিবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াতে ওই সকল সাহাবীগণের কথা বলা হয়েছে, যারা আলস্যবশতঃ তাবুক অভিযান থেকে বিরত থেকে ছিলেন। তাঁরা যে বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী ছিলেন, এ কথা নিশ্চিত। মুনাফিকেরা যেমন মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে জেহাদ থেকে সরে পড়েছিলো, তাঁরা সেরকম করেন নি। আজ যাই, কাল যাই

www.eelm.weebly.com

করে যুদ্ধ যাত্রাকে তাঁরা করেছিলেন বিলম্বিত। এটা ছিলো তাঁদের কর্মগত ভুল, বিশ্বাসগত ভুল নয়। তাবুক অভিযান থেকে মুসলিম সেনা বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের আগেই তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। ওই ঘটনাটিকেই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে — 'অপর কতক লোকে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে; তারা এক সৎকর্মের সঙ্গে অপর এক অসৎকর্ম মিশ্রিত করেছে।' এ কথার অর্থ— ইমান, নামাজ, তাবুক ছাড়া অন্যান্য জেহাদে অংশগ্রহণ, তাবুকে না যেতে পারার জন্য অনুতাপ, ইত্যাদি সৎকর্মের সঙ্গে তাঁরা মিশ্রিত করেছেন তাবুক যুদ্ধে অনুপস্থিতির অসৎ কর্মটিকে। মুনাফিকদের সঙ্গে এই কর্মটির ছিলো বাহ্যিক সাদৃশ্য। তাই এখানে সৎ ও অসৎ কর্মকে মিশ্রিত করার কথা বলা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে — 'আল্লাহ্ হয়তো তাদেরকে ক্ষমা করবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এখানে 'হয়তো' বা 'আশা করা যায়' (আ'সা) বলে প্রকৃতপক্ষে ক্ষমার শুভসংবাদই দেয়া হয়েছে। কারণ পরক্ষণেই উল্লেখিত হয়েছে— আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকী এবং হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতে যাঁদের কথা বলা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন দশ জন। হজরত আবু লুবাবাও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। রসুল স. যখন তাবুক অভিযান থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন ওই দশজন সাহাবী তাঁদের ভুল বুঝতে পারলেন। পুড়তে শুরু করলেন অনুতাপের আগুনে। তাঁদের মধ্যে সাতজন মসজিদের খুঁটির সঙ্গে নিজেদেরকে বেঁধে ফেললেন। রসুল স. তাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞেস করলেন, এরা এভাবে কেনো? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আবু লুবাবা ও তার সঙ্গীরা তাবুকে যায়নি। তারা এখন অনুতপ্ত। তারা প্রতিজ্ঞা করেছে, যতক্ষণ আপনি না প্রসন্ন হন এবং স্বহস্তে তাদেরকে বন্ধন মুক্ত না করেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা এভাবে থাকবে। রসুল স. বললেন, আমিও আল্লাহ্র কসম করলাম। তাঁদের বাঁধন আমি খুলবো না — যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাদেরকে বন্ধন মুক্ত করেন। এরপর অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। রসুল স. তখন, স্বেচ্ছাবন্দী ওই সাহাবীগণকে সদ্য অবতীর্ণ আয়াতটি পড়ে শুনালেন এবং প্রসন্নচিত্তে তাঁদের বাঁধন খুলে দিলেন।

হজরত ইবনে মুসাইয়্যেবের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. হজরত আবু লুবাবাকে মুক্ত করার জন্য লোক পাঠালেন, কিন্তু হজরত আবু লুবাবা তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, রসুল স. এর পবিত্র হস্ত ছাড়া অন্য কারো হাতে আমরা বন্ধন

www.eelm.weebly.com

মুক্ত হবো না। তখন রসুল স.স্বয়ং তাঁদেরকে বন্ধন মুক্ত করে দিলেন। এরপর মুক্ত সাহাবীবৃন্দ রসুল স. কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সদকা হিসেবে আমরা এগুলো এনেছি। অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন এবং আমাদের জন্য আল্লাহপাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রসুল স. বললেন, তোমাদের সম্পদ গ্রহণ করার অনুমতি আমাকে দেয়া হয়নি। এর অব্যবহিত পরেই অবতীর্ণ হলো—

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১০৩

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

❑ উহাদিগের সম্পদ হইতে সাদাকা গ্রহণ করিবে। ইহার দ্বারা তুমি উহাদিগকে পবিত্র করিবে এবং পরিশোধিত করিবে। তুমি উহাদিগকে আশীর্বাদ করিবে। তোমার আশীর্বাদ উহাদিগের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

'তাদের সম্পদ থেকে 'সদকা' গ্রহণ করবে' কথাটির অর্থ এখানে— হে আমার রসুল! আপনার যে অনুচরেরা তাবুক অভিযান থেকে বিরত থেকে ভুল করেছে, সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাদের প্রদত্ত সদকা আপনি মঞ্জুর করুন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'সাদাকা' অর্থ হবে জাকাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং তাদেরকে পরিশোধিত করবে।' এখানে 'তুত্বাহ্‌হিরু' অর্থ পবিত্র করবে। একভাবে কথাটির সর্বনাম (তাদেরকে) স্ত্রীলিঙ্গবাচক রূপে সম্পৃক্ত হয়েছে 'সাদাকা' কথাটির সঙ্গে। আরেকভাবে কথাটি সম্বোধন সূচক। অর্থাৎ এর মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে এভাবে— (হে আমার রসুল) এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন। 'তুযাক্‌কীহিম' অর্থ — পরিশোধিত করবেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আলী ইবনে তালহার পদ্ধতিতে ইবনে জারীর একটি বর্ণনা এনেছেন। ওই বর্ণনাটিতে উল্লেখিত হয়েছে, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, জুহাক এবং যায়েদ ইবনে যোবায়ের এবং যায়েদ ইবনে আসলাম সূত্রে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আতিয়া সূত্রেও বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন বাগবী। বর্ণনাটি এই — মসজিদের খুঁটির সঙ্গে যাঁরা নিজেদেরকে বেঁধেছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিলো পাঁচ। হজরত আবু লুবাবাও ছিলেন ওই পাঁচ জনের মধ্যে। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং যায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, আট জনের কথা। আর সাতজনের কথা বলেছেন কাতাদা এবং জুহাক। আউফ সূত্রে ইবনে

www.eelm.weebly.com

মারদুবিয়া ও ইবনে হাতেম লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. তাবুক অভিমুখে চলে গেলেন। হজরত আবু লুবাবা ও তার পাঁচজন সঙ্গী রয়ে গেলেন মদীনায়। কয়েকদিনের মধ্যে তাঁদের মধ্যে দু'জন বুঝতে পারলেন, আমরা খুবই অন্যায় করে ফেলেছি। অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হতে লাগলেন তাঁরা। বললেন, আমরাতো রমণীদের সঙ্গে গৃহচ্ছায়ায় বসে আরামে সময়াতিপাত করছি। আর ওদিকে রসুল স. মুজাহিদগণকে নিয়ে মহান অভিযান পরিচালনা করছেন। আল্লাহ্র কসম! আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে মসজিদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখবো। যতক্ষণ না আমাদেরকে মার্জনা করা হবে এবং রসুল স. স্বয়ং আমাদেরকে বন্ধন মুক্ত না করবেন ততক্ষণ আমরা এভাবেই থাকবো। এ কথা বলে দু'জন মসজিদের খুঁটির সঙ্গে নিজেদেরকে বেঁধে ফেললেন। অবশিষ্ট তিনজন এরূপ করলেন না।

আবদ ইবনে হুমাইদের বর্ণনায় এসেছে — কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাবুক অভিযান থেকে বিরত সাতজন সাহাবী সম্পর্কে। তাঁদের মধ্যে চারজন মসজিদের খুঁটির সঙ্গে নিজেদেরকে বেঁধেছিলেন। ওই চারজনের নাম— হজরত আবু লুবাবা, হজরত মারদাস, হজরত আউস ও হজরত জুযাম।

আস্সিহাবা গ্রন্থে ইবনে মানদাহ্ এবং আবু শায়েখ সওরীর পদ্ধতিতে আমাশ ও আবু সুফিয়ান থেকে হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যাঁরা তাবুক যুদ্ধে রসুল স. এর সঙ্গী হননি, তাঁরা ছিলেন— হজরত আবু লুবাবা, হজরত আউস, হজরত জুযাম, হজরত সা'লাবা, হজরত ওয়াছিয়া, হজরত কা'ব বিন মালিক, হজরত মুরারাহ্ বিন রবী এবং হজরত হেলাল বিন উমাইয়া। তাদের মধ্যে কেবল হজরত আবু লুবাবা ও হজরত সা'লাবা স্বেচ্ছাবন্দিত্ব বরণ করেছিলেন। মুক্তিলাভের পর তাঁরা তাঁদের সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এগুলো গ্রহণ করুন। এগুলোই আমাদেরকে আপনার নিকট থেকে পৃথক করে দিয়েছিলো। রসুল স. তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, আমি তাদেরকে মুক্ত করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাদেরকে মুক্ত করেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। হাদিসটির সূত্রপরম্পরা অত্যন্ত মজবুত।

বাগবী লিখেছেন, এ সম্পর্কিত সকল বর্ণনায় হজরত আবু লুবাবার নামোল্লেখ রয়েছে। তাই কেউ কেউ মনে করেন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কেবল হজরত আবু লুবাবা সম্পর্কে।

বাগবী আরও লিখেছেন, হজরত আবু লুবাবার কোন অপরাধের প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন মতামত। মুজাহিদ বলেছেন, তাঁর অপরাধটি ছিলো এই — বনী কুরায়জার লোকেরা তাঁর নিকট

www.eelm.weebly.com

পরামর্শ চাইলো, আমরা কি মুয়াজকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নিবো? তিনি তাঁর কণ্ঠদেশের দিকে ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ ইশারায় এ কথা বুঝালেন যে, তোমাদের কণ্ঠচ্ছেদন করা হবে। সুরা আন্ফালের তাফসীরে যথাস্থানে এই ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়েছে। ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী বলেছেন, বনী কুরায়জার নিকট ইশারায় গোপনে কথা প্রকাশ করে দেয়ার অপরাধটিই ছিলো হজরত আবু লুবাবার স্বেচ্ছাবন্দিত্ব ও আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। জুহুরী বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হচ্ছে তাবুক যুদ্ধ থেকে হজরত আবু লুবাবার বিরত থাকা।

আমি বলি, সম্ভবতঃ উল্লেখিত দু'টো অপরাধের কারণেই হজরত আবু লুবাবা হয়েছিলেন স্বেচ্ছাবন্দী। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়াকেদী সূত্রে ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন, জননী উম্মে সালমা বলেছেন, আবু লুবাবার তওবা কবুল হওয়ার এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো আমার গৃহে। অতি প্রত্যুষে আমি রসুল স. কে হাসতে দেখলাম। বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আজ যে বড়ই প্রফুল্লচিত্ত। তিনি স. বললেন, আবু লুবাবার তওবা কবুল হয়েছে। আমি বললাম আমি কি তাকে এ কথা বলবো? রসল স. বললেন, বলতে পারো। আমি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে স্বেচ্ছাবন্দী আবু লুবাবাকে শুভ সংবাদ জানালাম। বললাম, তোমার তওবা কবুল হয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। বাঁধন খুলে দেয়ার জন্য অনেকে এগিয়ে গেলেন আবু লুবাবার দিকে। তিনি বললেন, থামুন! রসুল স. স্বয়ং আমাকে বন্ধনমুক্ত করবেন। কিছুক্ষণ পর রসুল স. তাঁর বন্ধন মুক্ত করে দিলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

উম্মত জননী হজরত উম্মে সালমার উপরে বর্ণিত হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হজরত আবু লুবাবা বনী কুরায়জার লোকদেরকে ইশারায় গোপন কথা জানিয়ে যে অপরাধ করেছিলেন, সেই অপরাধের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিলো আলোচ্য আয়াত। তাঁর এই বর্ণনাটি অন্যান্য বর্ণনাপেক্ষা অগ্রগামী। কেননা তাবুকের অভিযান সংঘটিত হয়েছিলো পর্দা সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। অথচ এখানে বর্ণিত হয়েছে, জননী উম্মে সালমা তাঁর গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে সরাসরি হজরত আবু লুবাবাকে শুভ সংবাদ জানিয়েছিলেন। এতে করে বুঝা যায়, হজরত আবু লুবাবার স্বেচ্ছাবন্দিত্বের ঘটনাটি ঘটেছিলো পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এবং বনী কুরায়জার ঘটনাটিই ছিলো আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ।

এরপর বলা হয়েছে — 'তুমি তাদেরকে আশীর্বাদ করবে।' বাগবী লিখেছেন, সদকার মাল গ্রহণ করার সময় শাসক বা নেতার পক্ষে ওয়াজিব হবে সদকা প্রদানকারীর জন্য দোয়া করা। কোনো কোনো আলেমও এ রকম দোয়াকে

www.eelm.weebly.com

ওয়াজিব বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, মোস্তাহাব। কেউ কেউ আবার বলেছেন, ওয়াজিব জাকাত গ্রহণের সময় জাকাত প্রদাতার জন্য দোয়া করা ওয়াজিব। আর নফল সদকা গ্রহণের সময় দোয়া করা মোস্তাহাব। কোনো কোনো আলেমের অভিমত এই যে, ইমাম (নেতা) যদি বায়তুল মালের সংরক্ষক হিসেবে সরাসরি জাকাত এবং নফল সদকা গ্রহণ করেন তবে দাতার জন্য দোয়া করা তার উপরে ওয়াজিব। আর অভাবগ্রস্তরা যদি সরাসরি সম্পদশালীদের নিকট থেকে দান গ্রহণ করে তবে দাতার জন্য দোয়া করা ইমামের জন্য মোস্তাহাব।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হুদায়বিয়ার বায়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আউফা বলেছেন, একবার আমি দেখলাম রসুল স. এর দরবারে লোকেরা জাকাতের মাল জমা করছে। আর রসুল স. তাদের জন্য দোয়া করছেন— আয় আল্লাহ্! এদের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করো। আমার পিতাও সদকার মাল অর্পণ করলেন। রসুল স. আশীর্বাদ করলেন— হে আল্লাহ্! আবী আউফার বংশধরদের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করো।

কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'সালাত' শব্দটির আভিধানিক অর্থ — আশীর্বাদ, প্রার্থনা, দয়া, ক্ষমা প্রার্থনা এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রসুল স. এর প্রশংসা। সালাত শব্দটি যখন বান্দার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তখন এর অর্থ হয় দোয়া ও ইস্তেগফার (আশীর্বাদ ও ক্ষমা প্রার্থনা)। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থেই শব্দটি উদ্ধৃত হয়েছে। রসুল স. বলেছেন, যদি কেউ আহারের আমন্ত্রণ জানায়, আর সে আমন্ত্রণ যদি গ্রহণ করতে চাও, তবে তা করতে পারো। আর যদি রোজাদার হও, তবে যেতে না চাইলে আমন্ত্রকের জন্য আশীর্বাদ (সালাত) করতে পারো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ এবং তিরমিজি।

হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার জনৈকা মহিলা সাহাবী রসুল স. এর নিকটে নিবেদন জানালেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার স্বামীর জন্য সালাত করুন (আশীর্বাদ বা ক্ষমাপ্রার্থনা করুন)। রসুল স. তাঁর নিবেদনানুসারে দোয়া করলেন। আহমদ। ইবনে হাব্বান প্রমাণ করেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত। 'সালাত' শব্দটি আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কিত হলে অর্থ হবে — আল্লাহ্র সন্তোষ ও রহমত। হজরত আবী আউফার জন্য কৃত দোয়ার মধ্যেও 'সালাত' শব্দটি 'আল্লাহ্র রহমত' অর্থে এসেছে। আবার হজরত কায়েস ইবনে সা'দ থেকে আবু দাউদ ও নাসাঈ লিখেছেন, রসুল স. একবার দোয়া করলেন এভাবে— হে আল্লাহ্ ! তোমার সালাত ও রহমত সা'দ ইবনে উবায়দার বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ করো। হাদিসটি উত্তম সূত্রবিশিষ্ট।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মারফু সূত্রে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ফেরেশতারা মুমিনদের রূহের উদ্দেশ্যে বলে থাকে, আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক তোমার প্রতি এবং তোমার মুখমণ্ডলের প্রতি।

উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের উল্লেখিত 'সালাত' শব্দটির আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে ইয়াহ্‌ইয়া বিন ইয়াহ্‌ইয়া বলেছেন, নবী-রসুল ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে 'সালাত' শব্দটি ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে দোয়া ও ইস্তেগফার। আর এ রকম শব্দ ব্যবহারে কোনো আপত্তিও নেই। তাই মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌গণ বলেছেন, প্রথমে শব্দটিকে সম্পৃক্ত করতে হবে বিশেষভাবে রসুল স. এর সঙ্গে অথবা অন্যান্য নবী রসুলগণের সঙ্গে কিংবা যাঁরা নবী রসুল নন, তাদের সঙ্গে। তারপর অর্থ করলে সে অর্থ হবে সুসঙ্গত ও যথাযথ। নতুবা বক্তব্য হয়ে পড়বে অসঙ্গতিপূর্ণ। তাই ইমাম মালেক বলেছেন, নবী রসুল ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে 'সালাত' শব্দের ব্যবহার মাকরূহ। কাযী আয়ায বলেছেন, সুফিয়ান সওরীও এ রকম বলেছেন। মুতা-কাল্লিমিন ও ফুকাহাও এই অভিমতের অনুসারী। তাঁরা বলেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম ছাড়া অন্যান্যদের জন্য ব্যবহার করতে হবে 'মাগফিরাত' ও 'রহমত' শব্দ দু'টো। 'সালাত' ব্যবহার করা যাবে না। খোলাফায়ে রাশেদীন এবং বনী উমাইয়ার শাসকদের সময়ে এ রকম ব্যবহার ছিলো না। পরবর্তী সময়ে বনী হাশেমের শাসনকালে নবী-রসুল ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে 'সালাত' শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়। তাই এই রীতিকে বেদাত বলা যায়।

ইমাম আবু হানিফা এবং আলেমগণের একটি দলের অভিমত হচ্ছে — নবী-রসুল ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে 'সালাত' প্রয়োগ করা রীতিসিদ্ধ নয়। তবে নবী-রসুলগণের ক্ষেত্রে 'সালাত' উল্লেখের পর আনুসাঙ্গিকরূপে অন্যদের জন্যও 'সালাত' ব্যবহার করা যেতে পারে। কেননা, শরিয়তের পরিভাষায় 'সালাত' বিশেষভাবে আম্বিয়ায়ে কেরামের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— লা তাজায়ালু দু আয়ার রসুলি বাইনাকুম কা দু আয়ি বা'দিকুম বা'দান (রসুলের দোয়াকে তোমরা তোমাদের নিজেদের দোয়ার সমতুল মনে কোরো না)। এই এরশাদের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. ছাড়া অন্য কারো জন্য 'সালাত' শব্দ সহযোগে দোয়া করা অনুচিত। বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত এই হাদিসটির পরম্পরাগত বিন্যাস এ রকম, হজরত ইকরামা— হাকেম—ওসমান—তারিক —ইবনে আবী শায়বা।

www.eelm.weebly.com

বায়হাকী বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের উপরে বর্ণিত বক্তব্যটির উদ্দেশ্য এই যে, সম্মানের ভিত্তিতে নবী-রসুল যারা নন তাদের ক্ষেত্রে 'সালাত' ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু দোয়ার ভিত্তিতে শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে সম্ভবতঃ তাঁর কোনো আপত্তি নেই। ইবনে কাইয়ুম বলেছেন, পছন্দনীয় কথা এই যে, ফেরেশতা, আম্বিয়া, উম্মত-জনয়িত্রিবৃন্দ, আহলে বাইত এবং তাঁদের একনিষ্ঠ প্রেমিক ও অনুসারীদের ক্ষেত্রে সম্মিলিত রূপে 'সালাত' কথাটি ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু পৃথকভাবে অন্যদের ক্ষেত্রে যাবে না। এককভাবে নবী-রসুল যারা নয়, তাদের ক্ষেত্রে শব্দটি প্রয়োগ করলে সৃষ্টি হবে একটি অপরীতি। ফলে এর মাকরূহাত (অপছন্দনীয়তা) উত্তরোত্তর বেড়েই যেতে থাকবে। রাফেজীরা এ রকম করে। বলেছেন হাফেজ ইবনে হাজার।

এরপর বলা হয়েছে—'তোমার আশীর্বাদ তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর।' এ কথার অর্থ, হে আমার রসুল! আপনার আশীর্বাদ (সালাত) সদকাপ্রদাতাদের জন্য চিত্তসুখকর। হজরত আবু ওবায়দা বলেছেন, এখানে 'সাকানুন্' শব্দটির অর্থ চিত্ত স্বস্তি বা চিত্ত-সুখ। আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে — রসুল স. এর দোয়া বিশ্বাসীদের অন্তরে আনে প্রশান্তি। তাঁদের আত্মা এ কথা ভেবে স্বস্তি পায় যে, নিশ্চিতরূপে আমাদের তওবা কবুল হয়েছে।

আমি বলি, গোপন পাপের আশংকায় পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারীদের অন্তরে জাগ্রত হয় পাপবোধ। ওই পাপবোধ বড়ই অসহনীয়। রসুল স. এর দোয়ার বরকতে সাহাবীগণের অন্তর থেকে ওই পাপবোধের তমসা মুহূর্তে অপসারিত হয়ে যেতো। অন্তরে প্রবাহিত হতো অনাবিল স্বস্তির স্রোত। ওই অবস্থাই অন্তরের প্রশান্ত অবস্থা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন — 'হৃদয় প্রশান্ত হয় আল্লাহ্র স্মরণে।'

শেষে বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' এ কথার অর্থ আল্লাহ্তায়ালা অনুতপ্ত বিশ্বাসীদের ক্ষমা প্রার্থনার নিবেদন খুব ভালো করেই শোনেন। কারণ তিনি সর্বশ্রোতা। আর তারা যে খাঁটি তওবাকারী সে কথাও তিনি ভালো করেই জানেন। কারণ, তিনি সর্বজ্ঞ।

বাগবী লিখেছেন, আলস্য অথবা অন্য কোনো কারণে যারা তাবুক অভিযানে যাননি তাঁদের মধ্যে যারা হজরত আবু লুবাবার মতো তওবা করেননি তারা বলতে শুরু করেন এ সকল লোকতো গতকাল পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই ছিলো। আজ যে দেখি কেউ আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করছে না। আমরাতো এর কারণ বুঝতে পারছিনা। তাঁদের এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো —

www.eelm.weebly.com

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَأْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○ وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَتُرَدُّوْنَ إِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

❐ উহারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্ তাঁহার দাসদিগের তওবা কবুল করেন এবং 'সাদাকা' গ্রহণ করেন, আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু?

❐ বল, 'তোমরা কর্ম কর; আল্লাহ্তো তোমাদিগের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন এবং তাঁহার রসূল ও বিশ্বাসীগণও করিবে এবং তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট অতঃপর তিনি তোমরা যাহা করিতে, তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন।'

প্রথমোক্ত আয়াতটির মর্মার্থ হচ্ছে — হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল নৈরাশ্যাচ্ছাদিত বিশ্বাসীগণকে বলে দিন, তোমরা কি এ কথা জানোনা যে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করে থাকেন এবং তওবাকারীদের বিনিময় (সদকাও) গ্রহণ করে থাকেন। আল্লাহ্তায়ালা যে ক্ষমাশীল ও পরম দয়াপরবশ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যাঁর হাতে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তার শপথ! যারা বৈধ উপার্জনের অর্থ দান করে, কেবল তাদের দানই আল্লাহ্পাকের নিকটে গৃহীত হয়। এমতো দানের মাধ্যমেই লাভ হয় প্রকৃত মর্যাদা। আল্লাহ্তায়ালা ওই দান রেখে দেন তাঁর আনুরূপ্যবিহীন করতলে। তারপর তাকে লালন পালন করেন। ফলে স্বল্পদান শেষ বিচারের ময়দানে আবির্ভূত হবে বিশাল পাহাড়ের আকারে। এরপর রসুল স. আবৃত্তি করলেন— আল্লাহ্ তাঁর দাসদের তওবা কবুল করেন এবং সদ্কা গ্রহণ করেন। শাফেয়ী। বোখারী ও মুসলিম সূত্রেও এ রকম বলা হয়েছে। তবে তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে এ কথাগুলো— কেউ তার পরিচ্ছন্ন উপার্জন থেকে একটি খেজুর দান করলে আল্লাহপাক তাঁর আনুরূপ্যবিহীন দক্ষিণ হস্তে তা গ্রহণ করেন।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়াপরবশ।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী। আর ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন ওই উদাহরণরহিত মর্যাদার একটি নিদর্শন।

পরের আয়াতে (১০৫)বলা হয়েছে— বলো, 'তোমরা কর্ম করো; আল্লাহ্তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীগণ করবে এবং তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট, অতঃপর তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি সকলকে জানিয়ে দিন, তোমরা যা খুশী করতে থাকো। তোমাদের ভালো-মন্দ, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কোনো কর্মই তাঁর নিকট গোপন নয়। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। আর তিনি তোমাদের গোপন সংবাদ তাঁর রসুলকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন। ফলে তোমাদের কর্মকাণ্ডের সংবাদ রসুল স. ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীরাও জানতে পারবে। শেষে তোমাদের কৃতকর্মের সংবাদ তোমাদেরকেও জানিয়ে দেয়া হবে।

মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াতে মুনাফিক ও অসতর্ক বিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। প্রচ্ছন্নভাবে জানানো হয়েছে তওবার উদাত্ত আহ্বান। আরও বলা হয়েছে রসুল স. ও বিশ্বাসীগণের পারস্পরিক সৌহার্দের কথা। তাঁদের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টি করে দিবেন গভীর সম্প্রীতি। আর যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে না, তাদের প্রতি সৃষ্টি করে দিবেন আন্তরিক ঘৃণা। তাই তারা আল্লাহ্পাকের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে মুনাফিকদের কার্যকলাপ সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করবেন।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১০৬

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

❒ এবং অপর কতকের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রহিল — আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, না ক্ষমা করিবেন তাঁহার এই আদেশের প্রতীক্ষায়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

'এবং অপর কতকের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রইলো' কথাটির অর্থ তাবুক যুদ্ধে যারা গমন করেনি, তাদের কারো কারো তওবা তো আল্লাহ্ কবুল করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ তওবাই করেনি— তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হলো।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না ক্ষমা করবেন, তাঁর এই আদেশের প্রতীক্ষায়।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তাদেরকে ক্ষমা করতেও পারেন, নাও পারেন। আল্লাহ্তায়ালা যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ক্ষমা করতে তিনি যেমন বাধ্য নন, তেমনি শাস্তি দিতেও বাধ্য নন। সকল প্রকার বাধ্যতা ও অত্যাবশ্যকতা থেকে তিনি চিরমুক্ত। তাই বান্দার অন্তরে জাগ্রত থাকতে হবে ক্ষমার আশা ও শাস্তির ভয়। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইম্মা' শব্দটি। শাস্তি না ক্ষমা, এ রকম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয় বান্দার দিক থেকে। সে কারণে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইম্মা' শব্দটি। বান্দাকে শাস্তি দিবেন না ক্ষমা করবেন এ রকম সংশয়, উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা আল্লাহ্তায়ালার দিকে একেবারেই নেই। তাঁর অপার জ্ঞানের কারণে তিনি ভালো করেই জানেন, কোন সময়ে কি সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করবেন। সুতরাং এখানে 'ইম্মা' শব্দটির কারণে উৎকণ্ঠা অথবা সিদ্ধান্তহীনতার সম্পর্ক আল্লাহ্র দিকে করা যেতেই পারে না।

শেষে তাই বলা হয়েছে— আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এ কথার অর্থ আল্লাহ্তায়ালা সকলের আদ্যঅন্তের সকল কিছুই জানেন। তাই তাঁর সকল সিদ্ধান্তে রয়েছে প্রজ্ঞাময়তার নিদর্শন।

হজরত কা'ব বিন মালেক থেকে একটি দীর্ঘ হাদিসে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— 'এবং অপর কতকের সিদ্ধান্ত স্থগিত রইলো।' এ কথা বলা হয়েছে হজরত কা'ব বিন মালেক, হজরত হেলাল বিন উমাইয়া এবং হজরত মারারা বিন রবীয়া সম্পর্কে। তাঁরা তাবুক অভিযান থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু পরে প্রকাশ্যে তাঁরা তাঁদের ভুল স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু মসজিদের খুঁটির সঙ্গে নিজেদেরকে বাঁধেন নি। রসুল স. ওই ত্রয়ী সাহাবীর সঙ্গে অন্যদের কথাবার্তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে 'সিদ্ধান্ত স্থগিত রইলো।' পরে অবশ্য আল্লাহ্তায়ালা তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেন। মোহাম্মদ বিন ইসহাকও এ রকম বর্ণনা করেছেন হুদায়বিয়ার বায়াতে রেদওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী হজরত আবু রুহাম কুলসুম বিন হুসাইন গিফারী থেকে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া, বায়হাকী— হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে মুনজির এবং ইয়াজিদ বিন রুমমান থেকে মোহাম্মদ বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, ওমর ইবনে আউফের সম্প্রদায়ের লোকেরা একটি মসজিদ তৈরী করেছিলো। তাঁরা রসুল স. এর নিকট নিবেদন জানালো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের মসজিদে একবার নামাজ পড়ুন। গানাম বিন আউফ সম্প্রদায়ের লোকেরা এ অবস্থা দেখে নতুন মসজিদ নির্মাণকারীদেরকে হিংসা করতে শুরু করলো। বললো, আমরাও একটি মসজিদ নির্মাণ করবো। এ কথা শুনে মুনাফিক

www.eelm.weebly.com

আবু আমের তার সঙ্গীদেরকে বললো, তোমরাও একটি মসজিদ তৈরী করো এবং মসজিদের ভিতরে তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র গোপনে জমা করে রাখো। আমি রোমান শাসকের নিকটে যাচ্ছি। তাদের একটি সেনাদল সঙ্গে নিয়ে এসে আমি মোহাম্মদ ও তাঁর সাথীদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিবো। এ কথা বলে সে রওনা হয়ে গেলো রোমানদের রাজ্যের দিকে। তার সাথীরা মসজিদ নির্মাণ করতে শুরু করলো। নির্মাণ কার্য শেষ হলে তারা রসুল স. কে তাদের মসজিদে নামাজ পড়ার আমন্ত্রণ জানালো। বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের মসজিদে এসে একবার দয়া করে নামাজ আদায় করুন। পীড়িত ও বয়োবৃদ্ধদের জন্য বিশেষ করে আমরা ওই মসজিদটি নির্মাণ করেছি। তাছাড়া প্রচণ্ড শীত ও বৃষ্টিবাদলার রাতে আপনার মসজিদে আসতে আমাদের কষ্ট হয়। সুতরাং দূর্যোগের সময়ে আমরাও সেখানে নামাজ আদায় করে নিতে পারবো। রসুল স. তখন তাঁর তাবুক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। তাই বললেন, এখনতো আমি জেহাদের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। ইন্শাআল্লাহ্ ফিরে আসার পর তোমাদের মসজিদে নামাজ পড়বো। তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে মদীনার কাছাকাছি এক স্থানে এসে রসুল স. যাত্রাবিরতি করলেন। স্থানটির নাম জিআওয়ান। মদীনা থেকে মাত্র এক ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত ওই স্থানেই অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত —

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১০৭

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○

❐ এবং যাহারা ক্ষতি সাধন, সত্য-প্রত্যাখ্যান, বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যাহারা সংগ্রাম করিয়াছে তাহাদিগের গোপন ঘাঁটি-স্বরূপ মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে তাহারা অবশ্যই শপথ করিবে, 'আমরা সদুদ্দেশ্যেই উহা করিয়াছি;' আল্লাহ্ সাক্ষী, তাহারাতো মিথ্যাবাদী।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে — হে আমার রসুল! আপনাকে যে মসজিদে নামাজ পড়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, ওই মসজিদটি আসলে মসজিদই নয়, মসজিদ নামের ওই ঘরটি হচ্ছে মুনাফিকদের একটি গোপন ঘাঁটি। ইতোপূর্বেও তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করেছে। মসজিদ নির্মাণ করা

www.eelm.weebly.com

হয় শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তারা ওই মসজিদটি নির্মাণ করেছে ইসলামের ক্ষতি সাধনের জন্য, সত্যপ্রত্যাখ্যানের জন্য এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টির জন্য। তারা মিথ্যা শপথ উচ্চারণকারী। মুখে তারা বলে আমরা এই মসজিদ নির্মাণ করেছি সদুদ্দেশ্যে। কিন্তু হে আমার রসুল! শুনে রাখুন আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, বারোজন মুনাফিক মিলে গোপন ঘাঁটি স্বরূপ ওই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলো। ওই বারোজন মুনাফিকের নাম— ১. বনী উবায়েদ বিন যায়েদ গোত্রের হুজাম বিন খালেদ ২. বনী উমাইয়া বিন যায়েদ গোত্রের সা'লাবা বিন হাতেব ৩. বনী সুরাইয়া বিন যায়েদ গোত্রের মো'তাব বিন কুশায়ের ৪. হাবীবা বিন আজআর ৫. নাবতাল বিন হারেস ৬. নাজোদ বিন ওসমান ৭. সহল বিন হানিফের ভ্রাতা ইবাদ বিন হানিফ ৮. হারেসা বিন আমের ৯. হারেসা বিন আমেরের পুত্র মুজমা বিন হারেসা ১০. অপর পুত্র যায়েদ বিন হারেসা ১১. উদিয়া বিন সাবেত এবং ১২. বাখরাজ। তারা সকলে মসজিদ নির্মাণ করেছিলো মসজিদে কোবার ক্ষতি সাধনের জন্য। তাদের মসজিদটি নির্মিত হওয়ার পর মসজিদে কোবায় নিয়মিত নামাজ পাঠকারীদের মধ্যে কেউ কেউ ওই মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে শুরু করেছিলেন। এভাবেই শুরু হয়েছিলো মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও মতপ্রভেদ।

বাগবী লিখেছেন, এখানে 'মান হারাবাল্লাহ্' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে আবু আমের রাহেবের দিকে। সে ছিলো ফেরেশতা কর্তৃক স্নাত বিশিষ্ট সাহাবী হজরত হানযালার পিতা। রসুল স. এর মদীনা আগমনের পূর্বে সে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে সংসার বিরাগী হয়ে গিয়েছিলো। রসুল স. যখন মদীনায় এলেন তখন সে বললো, আপনি কোন ধর্ম নিয়ে এসেছেন? রসুল স. বললেন, বিশুদ্ধ একত্ববাদের ধর্ম— হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ। আবু আমের বললো, আমিও তো দ্বীনে হানিফের (হজরত ইব্রাহিমের ধর্মের) উপরে রয়েছি। রসুল স. বললেন, না তুমি দ্বীনে হানিফের উপরে প্রতিষ্ঠিত নও। আবু আমের বললো, কেনো নই? আপনিতো দ্বীনে হানিফের সঙ্গে অন্যান্য রীতিনীতি সংযোজিত করেছেন। রসুল স. বললেন, আমি এমন করিনি। আমিতো এনেছি বিশুদ্ধ, জ্যোতির্ময় ও সুস্পষ্ট শরিয়ত। আবু আমের বললো, ঠিক আছে আমাদের দুজনের মধ্যে যার দাবী মিথ্যা আল্লাহ্ যেনো তাকে গৃহহীন ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুদান করেন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ যেনো এমনিই করেন। রসুল স. তার নাম রেখেছিলেন ফাসেক আবু আমের। উহুদ যুদ্ধের সময় সে রসুল স. কে বললো, আপনার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে আমি সবসময় তাদের পক্ষাবলম্বন করবো। হুনায়েন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল যুদ্ধে সে এ রকমই করেছিলো। হুনায়েনে হাওয়াজেনরা যখন পরাজিত হলো তখন সে পালিয়ে যায় সিরিয়ায়। সেখান থেকে মুনাফিকদেরকে সংবাদ পাঠায় 'তোমরা একটি মসজিদ নির্মাণ করো। ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হও। ওই মসজিদে গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র জমা করতে থাকো। আমি রোমান প্রশাসকের নিকটে যাচ্ছি। সেখান থেকে রোমান সৈন্যদের একটি দল নিয়ে আমি মদীনায় আগমন করবো। মদীনা

www.eelm.weebly.com

থেকে বের করে দেবো মোহাম্মদ এবং তার সঙ্গীদেরকে। আবু আমেরের সংবাদ পেয়ে মুনাফিকেরা নির্মাণ করলো একটি মসজিদ। এখানে 'মিন ক্বাবলু' (ইতোপূর্বে) বলে বুঝানো হয়েছে— ওই মসজিদ নির্মাণের আগেও তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো। এ রকমও হতে পারে যে, রসুল স. এর তাবুক অভিযানের পূর্বেই তারা নির্মাণ করেছিলো ওই ষড়যন্ত্রের মসজিদটি। তাই প্রথমোক্ত অভিমতটি ধরলে 'মিন ক্বাবলু' (ইতোপূর্বে) কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে হারাবা (বিরুদ্ধে) এর সঙ্গে। আর শেষোক্ত অভিমতটি ধরলে 'মিনক্বাবলু' এর সম্পর্ক ঘটবে 'ইত্তাখাজু' (বিভেদ) এর সঙ্গে।

'আল হুসনা' অর্থ— সদুদ্দেশ্যে। অর্থাৎ তীব্র দাবদাহ, ঘোর বৃষ্টি বর্ষণ — এ রকম দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় যাতে মানুষ কাছের মসজিদে সহজে নামাজ পড়তে পারে এবং দুর্বল ও অক্ষমেরাও যেনো জামাতে নামাজ আদায়ের সুযোগ পায়, এ রকম পূণ্যময় উদ্দেশ্যেই আমরা এই নুতন মসজিদটি নির্মাণ করেছি — মুনাফিকেরা হলফ করে এ কথা বলেছিলো।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আউফি সূত্রে ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন মসজিদে কোবা নির্মাণ করলেন, তখন নির্মাণ সহযোগী আনসার সাহাবীগণের সঙ্গে বাখরাজ নামের এক লোকও ছিলো। পরে সে আয়াতে উল্লেখিত ষড়যন্ত্রের মসজিদ নির্মাণ করে। রসুল স. তাঁকে বলেছিলেন, কী উদ্দেশ্যে তুমি মসজিদ তৈরী করলে? বাখরাজ বলেছিলো, হে আল্লাহ্র রসুল! কেবল পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে। তার ওই কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। আয়াতের শেষে বাখরাজের বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করা হয়েছে এভাবে — আল্লাহ্ সাক্ষী, তারাতো মিথ্যাবাদী।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১০৮

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ○

❏ তুমি সালাতের জন্য ইহাতে কখনও দাঁড়াইওনা; যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হইতেই স্থাপিত হইয়াছে ধর্মানুষ্ঠানের জন্য উহাতেই সালাতের জন্য দাঁড়ানো তোমার জন্য সমুচিত। উহাতে, পবিত্র হইতে চাহে এমন লোক আছে এবং যাহারা পবিত্র হয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে পছন্দ করেন।

পূর্ববর্তী আয়াতটির সঙ্গে এই আয়াতটিও অবতীর্ণ হয়েছে জিআওয়ানে। এখানকার নির্দেশনাটি এ রকম — 'হে আল্লাহ্র রসুল আপনি ওই ষড়যন্ত্রের মসজিদে কখনো যাবেন না। যে মসজিদ আপনি তাক্বওয়ার ভিত্তিতে স্বহস্তে নির্মাণ করেছেন ওই মসজিদই আপনার নামাজ পাঠের উপযুক্ত স্থান। সেখানে

www.eelm.weebly.com

পবিত্রতাপ্রেমি লোকেরা আপনার নিকট সমবেত হয়। আর পবিত্রতা অর্জনকারী-দেরকে আল্লাহ্তায়ালা ভালোবাসেন। এ রকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস।

ইবনে নাজ্জার বলেছেন, মুনাফিকেরা ষড়যন্ত্রের ওই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলো মসজিদে কোবার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে। সেখানে বসে তারা রসুল স. কে নিয়ে হাসি তামাশা করতো।

জুহুরী সূত্রে ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু রহম বলেছেন, রসুল স. বনী সালিম বিন আউফের হজরত মালেক বিন ওখশাম এবং মাআন বিন আদি গোত্রের হজরত মুঈন বিন আবী আদিকে তলব করলেন। বাগবী লিখেছেন, রসুল স. মালেক বিন ওখশামের সঙ্গে তলব করেছিলেন হজরত আমের বিন আসকান এবং হজরত ওয়াহ্শীকে। হজরত আসেমের উল্লেখ তিনি করেননি। জুহুরী তাঁর আত্তাজরিদ গ্রন্থে নামোল্লেখ করেছেন হজরত সুবিদ বিন আব্বাস আনসারীর। যাহোক, রসুল স. উপরে বর্ণিত সাহাবীগণকে ডেকে বললেন, যাও মুনাফিকদের ওই মসজিদটি ভেঙে ফেলো এবং ভস্ম করে দাও। নির্দেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ক্ষিপ্রগতিতে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সালিম বিন আউফ গোত্রের মহল্লায় পৌঁছে হজরত মালেক তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি। এ কথা বলে তিনি অতিদ্রুত তাঁর গৃহ থেকে নিয়ে এলেন কয়েকটি শুকনো খেজুরের ডাল। তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। ওই জ্বলন্ত ডালগুলো নিয়ে তাঁরা দৌড়ে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলেন মুনাফিকদের মসজিদে। তখন ছিলো মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়। ভিতরে দলবদ্ধভাবে ষড়যন্ত্ররত ছিলো মুনাফিকেরা। হঠাৎ আগুন জ্বলতে দেখে তারা দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন করলো। নির্দেশপ্রাপ্ত সাহাবীগণ মসজিদটিকে ভস্মীভূত করে দিলেন এবং মাটিতে মিশিয়ে দিলেন তার ধ্বংশাবশেষগুলোকে। রসুল স. নির্দেশ প্রদান করলেন, ওই স্থানটি নির্ধারিত করা হলো আবর্জনা ফেলবার স্থান হিসেবে। এখন থেকে ওই স্থানটি হবে মৃত পশুর ভাগাড় ও ময়লা ফেলার স্থান। ওদিকে সিরিয়ায় অবস্থানরত পলাতক আবু আমের নিঃস্ব, গৃহহীন ও ভবঘুরে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো।

মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী বর্ণনা করেছেন, জিআওয়ান থেকে রসুল স. মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। ষড়যন্ত্রের মসজিদের স্থানে গৃহ নির্মান করতে চাইলেন হজরত আসেম ইবনে আদী। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্তায়ালা এ স্থানে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন, তবে এখানে আমি কীভাবে গৃহ নির্মাণ করবো? আমি বরং সাবেত বিন আকরামকে এখানে বাড়ী করতে বলি। কারণ, তার বাড়ীঘর নেই। হজরত সাবেত সেখানে বাড়ী করেছিলেন বটে, কিন্তু সে বাড়ীতে তার কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। ওই বাড়ীর কোনো কবুতর বা মুরগী সেখানে কোনো বাচ্চাও ফুটাতে পারেনি।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, বনী আমর ইবনে আউফ গোত্রের লোকেরা মসজিদে কোবা নির্মাণ করেছিলেন। হজরত ওমরের শাসনকালে তাঁরা আবেদন করলেন, হজরত মাজমা বিন হারেসাকে ওই মসজিদের ইমাম বানিয়ে দেয়া হোক। হজরত ওমর বললেন, না। এ রকম সিদ্ধান্ত বড়ই দৃষ্টিকটু হবে। সে কি ষড়যন্ত্রের মসজিদে (মসজিদে জেরায়) ইমামতি করেনি? হজরত মাজমা বললেন, হে বিশ্বাসীদের দলাধিনায়ক! এ ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আমি মসজিদে জেরায় ইমামতি করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমিতো ওই মুনাফিকদের অসদুদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। জানলে নিশ্চয়ই আমি সেখানে যেতাম না। আমার বয়সও তখন বেশী ছিলো না। পরে কোরআন মজীদ পাঠ করে আমি তাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পেরেছি। হজরত ওমর তাঁর জবাব শুনে প্রীত হন এবং তাঁকে মসজিদে কোবার ইমাম হিসেবে নিযুক্তি দান করেন।

'যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে ধর্মানুষ্ঠানের জন্য' এ কথা বলে বুঝানো হয়েছে কোবার মসজিদকে। মদীনার উপকণ্ঠের ওই কোবায় রসুল স. কয়েকদিনের জন্য অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তারপর মদীনায় এসে শুরু করেছিলেন স্থায়ী বসবাস। ওই কোবার মসজিদকেই চিহ্নিত করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে। এ রকম বলেছেন সুহাইলী। কিন্তু হজরত ইবনে ওমর, হজরত জায়েদ বিন সাবেত এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মসজিদে নববীকে— মদীনার মসজিদকে। ইমাম আহমদ, ইবনে আবী শায়বা, তিরমিজি, নাসাঈ, আবু ইয়া'লী, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম,আবু শায়েখ, হাকেম, ইবনে মারদুবিয়া এবং বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমি উম্মত জননীগণের কোনো একজনের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত ছিলাম। তখন বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! তাকওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রথম দিনের মসজিদ বলে কোন মসজিদকে নির্দেশ করা হয়েছে? রসুল স. একমুঠো কাঁকর নিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করে বললেন, তোমাদের এই মদীনার মসজিদকে।

তিবরানী এবং জিয়া মুকাদ্দেসীর মাধ্যমে এসেছে হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত বলেছেন, রসুল স. এর নিকটে তাকওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিলো। তিনি বলেছিলেন, আমার এই মসজিদ।

ইবনে আবী শায়বা এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমরের নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো কোরআন মজীদে উল্লেখিত তাকওয়ার মসজিদ কোনটি? তিনি বলেছিলেন, রসুল স. এর মসজিদ।

মসজিদে নববীর মর্যাদা সম্পর্কে আরও অনেক হাদিস এসেছে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেন, আমার প্রকোষ্ঠ ও

www.eelm.weebly.com

মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে জান্নাতের বাগান। আর আমার মিম্বর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে হাউজে কাওছারের উপর। ওয়াল্লাহু আ'লাম। বাগবীর বর্ণনায় 'প্রকোষ্ঠ' এর পরিবর্তে উল্লেখিত হয়েছে 'কবর।'

বোখারী, মুসলিম, আহমদ ও নাসাঈ লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জায়েদ মাজানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে জান্নাতের একটি বাগান। হজরত আলী থেকে তিরমিজিও এ রকম লিখেছেন।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার এই মসজিদে এক রাকাত নামাজ কাবা মসজিদ ব্যতীত অন্যসকল মসজিদের এক হাজার রাকাত নামাজাপেক্ষা উত্তম।

কোনো কোনো আলেম মনে করেন, 'মাসজিদুল উস্সিসা আ' লাত্তাক্বওয়া' (ত্বাকওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত বা ধর্মানুষ্ঠানের জন্য মসজিদ) হচ্ছে মসজিদুল কোবা। আতিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এ রকম মনে করেন। হজরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং কাতাদাও এই অভিমতের প্রবক্তা। হিজরতের সময় মদীনায় পৌঁছানোর পূর্বে রসুল স. কোবায় অবস্থান করেছিলেন সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত। ওই কয়দিন তিনি সেখানেই মসজিদ বানিয়ে নামাজ পড়েছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী এবং জুহাক সূত্রে আবু শায়েখও এ রকম বলেছেন।

হজরত ইবনে ওমর থেকে আবদুল্লাহ্ বিন দিনারের মাধ্যমে বোখারী লিখেছেন, রসুল স. প্রতি শনিবার পদব্রজে অথবা বাহনে চড়ে মসজিদে কোবায় গমন করতেন। রসুল স. এর অনুসরণে হজরত ইবনে ওমরও এরূপ করতেন। হজরত ইবনে ওমর থেকে নাফেয়ের বর্ণনায় অতিরিক্ত উল্লেখিত হয়েছে এই কথাটুকু— তিনি স. দু'রাকাত নামাজ পাঠ করতেন। দাউদী, সুহাইলী এবং ইবনে হাজার বলেছেন, এ কথার মধ্যে কারো মতভেদ নেই যে, মসজিদে কোবা এবং মসজিদে নববী— উভয় মসজিদই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তাকওয়ার উপর।

আমি বলি, এই আয়াত বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হলেও এর নির্দেশনাটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। অর্থাৎ তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মসজিদে কোবা ও মসজিদে নববী সহ বিশুদ্ধ নিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত সকল মসজিদ। আর আলোচ্য আয়াতের বিবরণভঙ্গির মাধ্যমে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, এখানে মসজিদে কোবার কথাই বলা হয়েছে। কেননা মসজিদে জেরা নির্মাণ করা হয়েছিলো মসজিদে কোবার ক্ষতি সাধনের জন্য। পূর্ববর্তী আয়াতে তাই 'ক্ষতিসাধন' কথাটির উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতও

www.eelm.weebly.com

ওই বক্তব্যেরই পরিপুষ্টি সাধন করেছে। এখানে আরও বলা হয়েছে — 'এতে পবিত্র হতে চায় এমন লোক আছে এবং যারা পবিত্র হয়, আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন।' এখানে 'পবিত্র হতে চায়' কথাটির অর্থ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার অপবিত্রতা হতে মুক্ত হতে চায়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী লিখেছেন 'পবিত্র হতে চায়' কথাটি অবতীর্ণ হয়েছে কোবা মসজিদের নামাজীদেরকে লক্ষ্য করে। তিরমিজিও এরূপ বলেছেন।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. মুহাজির সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে পদব্রজে মসজিদে কোবায় পৌঁছলেন। দেখলেন, সেখানে আনসার সাহাবীগণের একটি সমাবেশ। তাঁদেরকে লক্ষ্য করে রসুল স. বললেন, তোমরা কি মুমিন? আনসার সাহাবীগণ নিশ্চুপ রইলেন। রসুল স. পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন। এবার হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এদের মুমিন হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত। আমিও এদের সঙ্গী। রসুল স. বললেন, তোমরা কি তকদিরের (ভাগ্যলিপির) প্রতি প্রসন্ন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, তোমরা কি বিপদের সময় ধৈর্য্যধারণ করে থাকো? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. পুনরায় বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্র রহমতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, কাবার অধিশ্বরের শপথ! তোমরা মুমিন। এরপর তিনি তাঁদের সঙ্গে বসে পড়লেন এবং বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের পরিচ্ছন্নতার প্রশংসা করেছেন। এবার বলো তোমরা ওজু ও ইস্তেনজা কীভাবে সমাধা করো? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা শৌচকর্মের সময় প্রথমে ব্যবহার করি তিনটি পাথর। তারপর ব্যবহার করি পানি। এ কথা শুনে রসুল স. আবৃত্তি করলেন — 'এতে পবিত্র হতে চায় এমন লোক আছে এবং যারা পবিত্র হয় আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন।'

ইবনে খুজাইমা তাঁর সহিহ্ পুস্তকে হজরত উয়াইমির বিন সায়েদা থেকে লিখেছেন, রসুল স. কোবা মসজিদে গমন করলেন। সেখানকার মুসল্লিগণকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্পাক তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা করেছেন। তোমরা কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করো? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্র কসম! আমরাতো এমন কিছু জানিনা। আশে পাশের ইহুদীরা পানি দ্বারা শৌচকর্ম সম্পন্ন করে থাকে। আমরাও সেরকম করি। অপর বর্ণনায় এসেছে, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা পাথর ব্যবহার করার পর পানি দ্বারা শৌচকর্ম সম্পাদন করে থাকি। তিনি স. বললেন, এ কারণেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসেন।

ওমর ইবনে শায়বা তাঁর আখবারুল মদীনা গ্রন্থে ওলিদ আবু মুনজিরের মাধ্যমে লিখেছেন, হজরত ইয়াহ্ইয়া বিন সহল আনসারী বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কোবা মসজিদের মুসল্লিদের সম্পর্কে। তাঁরা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতেন।

www.eelm.weebly.com

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, আতা বলেছেন, কোবাবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ পানি দ্বারা পবিত্র হওয়ার প্রথা চালু করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে প্রশংসা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১০৯

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

❑ যে ব্যক্তি তাহার গৃহের ভিত্তি আল্লাহ্-ভীতি ও আল্লাহের সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সেই উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তাহার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাতের ধ্বংসমুখ কিনারায়, ফলে, যাহা উহাকে সহ জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হয়? আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

আয়াতের প্রথমে উল্লেখিত 'আফামান' কথাটির মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তর দু'টোই রয়েছে। 'বুনইয়ানাহু' কথাটির অর্থ এখানে গৃহের ভিত্তি। 'আ'লা ত্বাকওয়া' অর্থ আল্লাহ্ভীতি। 'মিনাল্লহি ওয়া রিদ্বওয়ান' অর্থ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপর। 'শাফাজু-রুফিন্' অর্থ দুর্বল ভিত্তির উপর। শাফা শব্দটি এসেছে শাফির থেকে — যার অর্থ উপত্যকা বা নালার ওই তটভূমি যার অভ্যন্তরে নিরন্তর চলেছে স্রোতের আঘাত, যার ফলে ওই তটভূমির উপরে স্থাপিত ভবন ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। হারিন্ (ফাটা) শব্দটি এসেছে হারিরুন থেকে। বাগবীর মতানুসারে 'হাইর' থেকে। এ রকমও বলা যায় যে, শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে 'হারা-ইয়াহারু' থেকে। হারা অর্থ ঢলে পড়েছে, ধ্বসে পড়েছে। এখানে হারিন কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওই তটভূমি যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। অর্থাৎ যে তীরভূমি ধ্বসোন্মুখ।

এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে — যে ব্যক্তি তার (ধর্মীয়) গৃহের ভিত্তি আল্লাহ্-ভীতি ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত করে, সেই উত্তম, না ওই ব্যক্তি উত্তম যে তার অপবিশ্বাসের ভিত্তি নির্মাণ করে অসত্য ও অপবিত্রতার উপর— যা ধ্বসোন্মুখ যার পরিণতি স্বরূপ সে প্রবেশ করবে জাহান্নামে? আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। তাকওয়া বা আল্লাহ্-ভীতির বিপরীতে রয়েছে শিরিক (অংশীবাদিতা) এবং নেফাক (অপবিত্রতা)। এখানে 'শাফা জুরুফিন' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে শিরিক ও নেফাককে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাদের নেফাকই তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

www.eelm.weebly.com

বাগবী বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য এই যে, মুনাফিকদের মসজিদ নির্মাণ করা এবং জাহান্নামে গৃহ নির্মাণ করা একই কথা। যে অসৎ উদ্দেশ্যে তারা মসজিদ নির্মাণ করে, ওই উদ্দেশ্যই তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

ইবনে আতিয়ার মাধ্যমে মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, আগের আয়াতে (১০৮) তাকওয়ার উপরে নির্মিত মসজিদের ভিত্তিকে দৃঢ়তা প্রদান করা হয়েছে। আর ওই মসজিদ হচ্ছে রসুল স. এর মসজিদ (মসজিদে নববী)। আর আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্-ভীতি ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপরে স্থাপিত মসজিদ হচ্ছে— মসজিদুল কোবা এবং ধ্বসোন্মুখ কিনারায় স্থাপিত মসজিদ হচ্ছে, মসজিদে জেরা (ষড়যন্ত্রের মসজিদ)। এ রকম মসজিদ নির্মাণকারীরা সীমালংঘনকারী এবং বিপথগামী। তাই আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে — আল্লাহ্ সীমালংঘণকারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

এ সম্পর্কে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন হজরত সা'দ ইবনে যোবায়ের, কাতাদা এবং জারীহের উক্তি। আর ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখ উল্লেখ করেছেন কাতাদার বিবরণ। তাঁদের উক্তি ও বিবরণে রয়েছে, মসজিদে জেরার এক স্থানে খনন করা হলে লোকেরা সেখান থেকে ধোঁয়া নির্গত হতে দেখেছিলেন। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বলেছেন, আমি মসজিদে জেরা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেছি।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১১০

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

❑ উহাদিগের গৃহ যাহা উহারা নির্মাণ করিয়াছে তাহা উহাদিগের অন্তরে সন্দেহের কারণ হইয়া থাকিবে— যে পর্যন্ত না উহাদিগের অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

এখানে 'রীবাতান্' অর্থ সংশয় বা সংশয়জাত কপটতা। মুনাফিকদের অন্তরের ওই সংশয়াচ্ছন্নতার কারণেই তারা মনে করে, আমরা বোধ হয় পুণ্যকর্ম করেই চলেছি। হজরত মুসার সম্প্রদায়ের লোকদের হৃদয়ে যেমন সৃষ্টি হয়েছিলো গো-বৎসের প্রতি অপ্রতিরোধ্য অনুরাগ, তেমনি মুনাফিকদের অন্তরেও সৃষ্টি হয়েছিলো মসজিদে জেরার প্রতি অদম্য ভালোবাসা। এ রকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। কালাবী বলেছেন, রিবাতান কথাটির অর্থ এখানে সংশয়াকীর্ণ অন্তর্দাহ।

www.eelm.weebly.com

মুসলমানদের মসজিদ দেখে তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিলো ওই অন্তর্দাহ। সুদ্দী বলেছেন, এখানে রিবাতান অর্থ গাইজান (ক্ষোভ)। অর্থাৎ মুসলমানদের মসজিদের ক্ষতি সাধনের জন্য তাদের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো ক্ষোভাগ্নি। তাদের অন্তরে ওই ক্ষোভাগ্নি বিরতিহীনভাবে জ্বলতেই থাকবে, যতোক্ষণ না তাদের অন্তরের শুভ অনুভূতি চিরতরে ভস্মীভূত হয়ে যায়। তাই এখানে বলা হয়েছে— 'যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।' কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ার অর্থ, মুনাফিকদের নিহত হয়ে যাওয়া অথবা কবরের অভ্যন্তরে কিংবা নরকাগ্নিতে উপনীত হওয়া। জুহাক ও কাতাদা বলেছেন, পৃথিবীর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মুনাফিকেরা সংশয়াচ্ছন্ন হতেই থাকবে। তাদের সংশয় সন্দেহ দূর হবে মৃত্যুর পর। তখনই কেবল তারা পাবে সত্যের সাক্ষাৎ। কিন্তু তখন সংশোধনের কোনো উপায় আর থাকবে না।

শেষে বলা হয়েছে — 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' এ কথার অর্থ — আল্লাহ্তায়ালা সবকিছু জানেন। মুনাফিকদের অন্তরের বিচিত্র ও বক্র গতিবিধি সম্পর্কে তিনি উত্তম রূপে অবগত। কারণ তিনি যে সর্বজ্ঞ। আর মুনাফিকদের মসজিদে জেরা ধ্বংসের যে নির্দেশ তিনি দিয়েছেন সেই নির্দেশও অযৌক্তিক কিছু নয়। বরং তা আল্লাহ্তায়ালার অপার প্রজ্ঞাময়তার নিদর্শন। কারণ, তিনি আনুরূপ্যবিহীন প্রজ্ঞাময়।

রসুল স. এর জীবনী রচয়িতাগণ লিখেছেন, নবুয়তের দায়িত্ব প্রাপ্তির একাদশতম বৎসর। হজের মওসুম। রসুল স. মক্কা থেকে বের হয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিকট ইসলাম প্রচার শুরু করলেন। একদিন এক গিরিপথ অতিক্রম করার সময় খাজরাজ গোত্রের কতিপয় লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলো। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কে? তারা বললো, আমরা খাজরাজ গোত্রভূত। রসুল স. বললেন, তোমরা কি কিছু সময় দিতে পারো, আমি কিছু বলবো। খাজরাজেরা বললো, নিশ্চয়। এ কথা বলে উপবেশন করলো তারা। রসুল স. তাদেরকে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানালেন। বর্ণনা করলেন ইসলামের রীতিনীতি। আবৃত্তি করে শোনালেন পবিত্র কোরআন।

ইহুদীরা ছিলো খাজরাজদের প্রতিবেশী। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সংখ্যালঘু ইহুদীরা তাদেরকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। বলতো তোমরা মূর্তি পূজারী। আর আমরা আহলে কিতাব। শেষ জামানার নবী আমাদের এই মদীনায় আগমন করবেন। তাঁর আবির্ভাবের সময় সন্নিকটবর্তী। তিনি এলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তোমাদেরকে হত্যা করবো।

রসুল স. এর আহ্বান শুনে খাজরাজদের মনে পড়ে গেলো ইহুদীদের কথা। তাঁরা রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলী পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলো। সবিস্ময়ে দেখলো, ইহুদীদের কাছে শোনা বৈশিষ্ট্যাবলী নিয়ে স্বয়ং তাদের সামনে উপস্থিত শেষ জামানার পয়গম্বর স.। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি শুরু করলো, সাবধান,

www.eelm.weebly.com

ইহুদীরা যেনো তোমাদের আগে শেষ নবীর নিকটে পৌঁছে না যায়। এ কথা বলে তারা সকলে রসুল স. এর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। খাজরাজ গোত্রের ওই ছয় ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন মুসলমান। তাঁদের নাম— হজরত আস্য়াদ বিন দ্বারারা, হজরত আউফ বিন হারেস, হজরত রাফে বিন মালেক, হজরত কুতবা বিন আমের বিন জাদিদা, হজরত উক্বা বিন আমের বিন নাবী এবং হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বিন রুবাব। কোনো কোনো বর্ণনায় হজরত জাবেরের স্থলে এসেছে, হজরত উবাদা বিন সামেতের নাম। কেউ কেউ বলেছেন, তখন মুসলমান হয়েছিলেন সাত জন। সুতরাং আগের তালিকায় উল্লেখিত ছয়জনের সঙ্গে যুক্ত হবেন হজরত উবাদা ইবনে সামেত।

রসুল স. বললেন, আমি আমার প্রভুপ্রতিপালকের বাণী প্রচার করবো। তোমরা কি এই মহান কাজের সহায়তাকারী হবে? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের মধ্যে রয়েছে গোত্রদ্বন্দ্ব। গত বছর আমাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে বুগাছের যুদ্ধ। এমতো অন্তর্কলহের পরিস্থিতিতে আপনি যদি আমাদের নিকটে আগমন করেন তবে সম্মিলিত সহায়তা নাও পেতে পারেন। আপনি বরং আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরা স্বস্থানে ফিরে যাই। সম্ভবতঃ এবার আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো কাঙ্খিত সম্প্রীতি। আর আমরা আমাদের জনপদ-বাসীকেও একই আমন্ত্রণ জানাতে চাই, যে আমন্ত্রণ আপনি আমাদেরকে জানিয়েছেন। আশা করি আমাদের গোত্রের সকলে আপনার আশ্রয়ে ঐক্যবদ্ধ হবে। যদি আমরা সবাই আপনার অনুগত হয়ে যাই, তবে আপনার বিরুদ্ধবাদী হওয়ার সাহস কারো হবে না। ইনশাআল্লাহ্ আগামী বছর আমরা সকলে আবার আসবো। রসুল স. তাঁদেরকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিলেন।

সত্যের আলোয় আলোকিত দলটি মদীনায় উপস্থিত হলো। মদীনার গৃহে গৃহে শুরু হলো ইসলামের আলোচনা । গৃহে গৃহে দেখা দিলো প্রচ্ছন্ন উপপ্লব। পরের বছর ইসলাম গ্রহণ করলেন আরও সাতজন। তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন খাজরাজ গোত্রের এবং দু'জন ছিলেন আউস গোত্রের । খাজরাজীগণের নাম— হজরত আউফ ইবনে হারেসের ভ্রাতা হজরত মুয়াজ ইবনে হারেস, হজরত জাকওয়ান, হজরত উবাদা ইবনে সামেত, হজরত ইয়াজিদ ইবনে সা'লাবা এবং হজরত আব্বাস ইবনে উবাদা বিন নাজলা। আর আউস গোত্রভূত বনী আশহালের হজরত আবুল হাইছাম ইবনে তাইহান এবং হজরত উয়াইমির ইবনে সায়েদা।

পরের বছর কয়েকজন মহিলাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, আমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক করবো না, চুরি করবো না, ব্যভিচার করবো না ইত্যাদি। সুরা মুম্তাহিনার তাফসীরে যথাস্থানে মহিলাদের বায়াত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

নতুন মুসলমানেরা মদীনায় ফিরে গেলেন। হজরত আস্য়াদ ইবনে দ্বারারা সেখানকার সকল মুসলমানকে একত্র করলেন। সকলে পরামর্শক্রমে মক্কায় রসুল স. এর নিকটে এই মর্মে লিখিত নিবেদন জানালেন, হে আল্লাহর রসুল! একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করুন, যিনি আমাদেরকে কোরআন শিক্ষা দিতে

www.eelm.weebly.com

পারেন। রসুল স. প্রেরণ করলেন হজরত মাসআব ইবনে উমায়েরকে। তখন মদীনায় মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চল্লিশে। হজরত মাসআবের প্রচেষ্টায় আরো অনেকে ইসলাম গ্রহণ করলেন। সমাজপতি হজরত সায়াদ ইবনে মুয়াজ এবং হজরত উসায়েদ ইবনে হুদায়েরও মুসলমান হয়ে গেলেন। ফলে, বনী আবদ্ ও বনী আশহাল গোত্রের পুরুষ নারী সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

নবুয়তের ত্রয়োদশতম বৎসরে হজের সময় সত্তর অথবা তিয়াত্তর জন পুরুষ ও মহিলা ইসলামে বায়াত গ্রহণ করলেন। হাকেম বলেছেন পঁচাত্তর জনের কথা।

মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী থেকে ইবনে জারীর ও বাগবী উল্লেখ করেছেন, ওই সময় হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা নিবেদন করেছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনি যে কোনো শর্তে আপনার প্রভুপ্রতিপালক ও আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করুন। আমরা আপনার সকল শর্ত মানতে প্রস্তুত। রসুল স. বললেন, আমি আমার প্রভুপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে বলতে চাই, তোমরা কেবল তাঁরই উপাসনা করবে, কাউকে অথবা কোনো কিছুকে তাঁর অংশীদার নির্ধারণ করবে না। আর আমার পক্ষ থেকে বলতে চাই, যেভাবে তোমরা তোমাদের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করো সেভাবেই আমার নিরাপত্তা বিধান করবে। তাঁরা বললেন, আমরা যদি এরূপ করি, তবে আমাদের কী লাভ হবে? রসুল স. বললেন, জান্নাত। তাঁরা বললেন, জান্নাতের প্রতি রয়েছে আমাদের আন্তরিক অনুরাগ। আমরা এই অনন্য পণ্য প্রত্যাখ্যান করবো না। তাঁদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১১১

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

❑ আল্লাহ বিশ্বাসীদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, তাহাদিগের জন্য জান্নাত আছে ইহার বিনিময়ে। তাহারা আল্লাহের পথে সংগ্রাম করে, নিধন করে ও নিহত হয়। বস্তুতঃ তওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এই প্রতিশ্রুতিতেই আবদ্ধ। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করিয়াছ সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং উহাই মহাসাফল্য।

---

www.eelm.weebly.com

এখানে জান্নাতের বিনিময়ে বিশ্বাসীদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌তায়ালা বিষয়টিকে ক্রয় বিক্রয়ের সংগে তুলনা করেছেন।

রসুল স. এর জীবনী রচয়িতাগণ লিখেছেন, আকাবায় সর্বপ্রথম রসুল স. এর পবিত্র হস্ত ধারণ করে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন হজরত বারা বিন মা'রুর অথবা হজরত আবুল হাইছাম কিংবা হজরত আবুল আস্‌য়াদ। তাঁরা এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তাঁরা রসুল স. এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন এবং তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন। আল্লাহর পথে জেহাদ বা সংগ্রামের কথা এই আয়াতেই সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়। এরপর অবতীর্ণ হয় 'উজিনা লিল্লাজিনা ইউক্বাতিলুনা।'

গভীর রাতে অত্যন্ত গোপনে আকাবা প্রান্তরে সম্পন্ন হয়েছিলো ওই অঙ্গীকার-নামা। এরপর রসুল স. তাঁর মক্কার অনুচরবর্গকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন এবং তিনি স্বয়ং হিজরতের অনুমতির অপেক্ষায় মক্কায় অবস্থান করতে থাকেন।

প্রথম হিজরতকারী দলের অন্তর্ভুক্ত হজরত আবু সালমা বিন আবদুল আসাদ আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এলেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে খুবই কষ্ট দিতে শুরু করলো। মদীনাবাসীদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ হিজরত করে চলে গেলেন মদীনায়। তিনিই ছিলেন মদীনায় প্রথম হিজরতকারী। এরপর হিজরত করেন হজরত আমের বিন রবীয়া এবং তার পত্নী হজরত লায়লা। এরপর গেলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ। একের পর এক হিজরত চলতে লাগলো। হজরত ওমর ও তাঁর ভ্রাতা হজরত জায়েদ এবং হজরত আব্বাস বিন রবীয়াসহ বিশ জনের একটি দল এক সংগে হিজরত করলেন। এরপর গেলেন হজরত ওসমান বিন আফ্‌ফান। হজরত আবু বকর পুনঃ পুনঃ রসুল স. এর হিজরতের সাথী হবার আবেদন জানিয়ে চললেন। রসুল স. বললেন, ত্বরা কোরো না। সম্ভবতঃ তোমার বাসনা পূর্ণ হবে। পরিস্থিতি অতি দ্রুত সঙ্গীন হয়ে পড়লো, কুরায়েশরা শলা পরামর্শ করে ঠিক করলো, রসুল স.কে হত্যা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তারা এক রাতে রসুল স. এর গৃহ ঘেরাও করে ফেললো। ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে সুরা আনফালের তাফসীরে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাঁরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, নিধন করে ও নিহত হয়।' এখানে 'ইউক্বাতিলুনা' শব্দগত দিক থেকে ইচ্ছানির্ভরতাপ্রকাশক (যদি তোমরা ইচ্ছা করো তবে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করো)। কিন্তু অর্থগত দিক থেকে শব্দটি নির্দেশসূচক (আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো)।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এই প্রতিশ্রুতিতেই আবদ্ধ।' এখানে 'আলাইহি' কথাটির 'হি' (তিনি) সর্বনামটি 'ইশতারা' (ক্রয় করেছেন) কথাটির দিকে প্রত্যাবর্তিত। আর ওয়াদান (এই প্রতিশ্রুতি) কথাটির ক্রিয়া এখানে উহ্য। এই কথাটি এখানে এসেছে গুরুত্ব প্রকাশকরূপে। এভাবে 'হাক্কান' কথাটি হয়েছে 'ওয়াদান' এর বিশেষণ। অথবা কথাটি একটি অনুক্ত ক্রিয়ার কর্ম। তওরাত ও ইঞ্জিলে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ— এ কথা বলে পরিষ্কারভাবে বুঝানো হয়েছে যে, ইতোপূর্বে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকেও জেহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো এবং তার বিনিময় হিসেবে জান্নাতের প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়েছিলো।

এরপর বলা হয়েছে— নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? এই প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (ইস্তিফহামে ইনকারী)। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ আল্লাহ্তায়ালার পক্ষে অসম্ভব। সম্মানিত ব্যক্তিবর্গই কেবল যথাযথ-রূপে প্রতিজ্ঞাপালন করে থাকেন। আর আল্লাহ্তায়ালা তো অতুলনীয়রূপে সম্মানিত। সুতরাং প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নে আল্লাহ্র চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে?

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা যে সওদা করেছো সেই সওদার জন্য আনন্দ করো এবং এটাই মহাসাফল্য।' এই বাক্যটির মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম-কারীদেরকে (মুজাহিদদেরকে) সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে। মুজাহিদেরাই এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল হলেও ইতোপূর্বের বাক্যগুলোতে তাঁরা এভাবে সম্বোধিত হননি। আল্লাহ্তায়ালা মুজাহিদগণকে সরাসরি শুভ সংবাদ দান করবেন বলেই এ রকম বক্তব্যভঙ্গির প্রয়োগ ঘটেছে। মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— হে মুজাহিদবৃন্দ! তোমরা জানমাল দিয়ে যে সওদা (জান্নাত) ক্রয় করেছো তার জন্যে উৎফুল্ল হও, আনন্দ প্রকাশ করো। কারণ এটাই হচ্ছে মহাসফলতা।

হজরত ওমর বলেছেন— হে বিশ্বাসীরা! আল্লাহ্পাক নিজেই তোমাদেরকে জীবন ও সম্পদ দান করেছেন এবং নিজেই তা জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন। আবার এই ক্রয় বিক্রয়ের উপকারও তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্পাক মুজাহিদদেরকে বিনিময় প্রদান করেছেন অত্যধিক। হাসান বসরী বলেছেন, শুভসংবাদ শ্রবণ করো, আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেক মুমিনের সঙ্গে ক্রয় বিক্রয় করেছেন এবং মুনাফা তাদেরকেই দিয়ে দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে দুনিয়া দান করেছেন। এখন তোমরা ওই দুনিয়া দিয়ে জান্নাত কিনে নাও। এই ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে মহাসফলতার নাম। জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য এটাই।

www.eelm.weebly.com

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

❒ উহারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহ্র প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকু ও সিজদাকারী, সৎকার্যের নির্দেশ দাতা, অসৎকার্যে নিষেধকারী এবং আল্লাহের সীমারেখা সংরক্ষণকারী; এই বিশ্বাসীদিগকে তুমি শুভ সংবাদ দাও।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আত্তায়িবুনা (তারা তওবাকারী)। এর অর্থ— ওই সকল লোক যারা অংশীবাদিতা থেকে ফিরে এসেছে এবং কপটতা থেকে মুক্ত হয়েছে। আত্তায়িবুন এখানে বিধেয়। এর উদ্দেশ্যটি এখানে অনুক্ত। অর্থাৎ যে সকল লোক রসুল স. এর নিকটে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন, শরিয়তের আহকাম সমূহের প্রতি ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করেছেন। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে আত্তায়িবুনা হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় হচ্ছে এর পরে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। অথবা বলা যেতে পারে বিধেয়টিই এখানে উহ্য। অর্থাৎ তওবাকারীরা জান্নাতী। তারা জেহাদ থেকে ফিরে যাননি, গোয়ার্তুমি করেননি, জেহাদের যোগ্যতা প্রদান করা সত্ত্বেও এ কথা বলেননি যে, আমরা জেহাদ করবো না। জুজায বলেছেন, এভাবে ব্যাখ্যা করলে বলতে হয় সকল বিশ্বাসীকেই আল্লাহ্তায়ালা জান্নাত দানের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যেমন অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে— 'ওয়াকুল্লাওঁ ওয়াদাল্লহুল হুসনা' (এবং সকলের সঙ্গে আল্লাহ্ কল্যাণের অঙ্গীকার করেছেন)।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল আ'বিদুন' (ইবাদতকারী)। এ কথার অর্থ— তাঁরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন (জলি ও খফি) অংশীবাদিতা থেকে মুক্ত হয়ে কেবল আল্লাহ্র উপাসনায় মগ্ন থাকে।

এরপর বলা হয়েছে — 'আল হামিদুন' (আল্লাহ্র প্রশংসাকারী)। অর্থাৎ যারা সুখে ও দুঃখে আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসারত থাকে। রসুল স. বলেছেন, আনন্দে ও বেদনায় যারা আল্লাহ্তায়ালার অকুণ্ঠ প্রশংসা বর্ণনা করে, তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করা হবে সবার আগে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী, হাকেম ও বায়হাকী। এরপর

www.eelm.weebly.com

বলা হয়েছে— 'আস্ সায়িহুনা' (রোজা পালনকারী)। হজরত উবায়েদ ইবনে ওমর থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, রসুল স.কে একবার আস্ সায়িহুনা শব্দটির অর্থ জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, রোজা পালনকারী। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বাগবীও এ রকম বলেছেন। জননী আয়েশা থেকে মাওকুফরূপে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতে উল্লেখিত 'সিয়াহাত' এর অর্থ রোজা রাখা।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনিয়া বলেছেন, রোজাদার আহার বিহার এবং স্ত্রী সাহচর্য পরিত্যাগ করে থাকে। তাই তাকে বলা হয় সায়িহ্। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আদম সন্তানদের প্রতিটি পুণ্যকর্মের বিনিময় দেয়া হবে দশগুণ থেকে সাতশ'গুণ পর্যন্ত। কিন্তু রোজা এর ব্যতিক্রম। রোজা সম্পর্কে আল্লাহ্পাক বলেছেন, রোজা রাখা হয় কেবল আমার জন্য। সুতরাং আমিই এর যথাপুরস্কার প্রদান করবো। রোজাদারেরা কেবল আমার জন্য পানাহার ও কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে। বোখারী, মুসলিম। আতা বলেছেন, 'আস্সায়িহুনা' অর্থ গাজী (ধর্মযুদ্ধজয়ী)। তাঁরা আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ করেন। হজরত আবু উমামা থেকে যথাসূত্রে ইবনে মাজা, হাকেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমার উম্মতের ভ্রমণ আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদতুল্য। বাগবী লিখেছেন, হজরত ওসমান ইবনে মাসউদ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করুন। তিনি স. বললেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ। হজরত ইকরামা বলেছেন, আল্লাহ্র রাস্তায় ভ্রমণকারী অর্থ জ্ঞানানুসন্ধানী (তালেবে এলেম) —যারা জ্ঞানান্বেষণের জন্য দেশ দেশান্তরে পাড়ি জমান। হজরত আবু দারদা বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, যারা জ্ঞানান্বেষণের পথে চলে, আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেন। আর ফেরেশতারা জ্ঞানানুসন্ধানীদের চলার পথে তাদের পাখা বিছিয়ে দেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতে থাকেন। আকাশের ফেরেশতা, পৃথিবীর মানুষ এবং জ্বিন, পানির মৎস সকলেই তাদের জন্য দোয়া করতে থাকে। জ্ঞানী ও ইবাদতপ্রিয় ব্যক্তির তুলনা হচ্ছে চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি। আলেমগণ আম্বিয়াগণের উত্তরাধিকারী। আর আম্বিয়াগণ উত্তরাধিকারীরূপে দিনার বা দিরহাম রেখে যাননি। রেখে গিয়েছেন জ্ঞান। সুতরাং জ্ঞানের উত্তরাধিকার যারা লাভ করবে তারা বড়ই সৌভাগ্যশালী। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, আবু দাউদ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর রাকিউনাস্সাজিদুন (রুকু ও সেজদাকারী)। এ কথার অর্থ, যারা নামাজ পাঠ করে। রুকু ও সেজদা এ দু'টো শব্দের মাধ্যমে এখানে নামাজকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে করে বুঝা যায়, অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় নামাজ অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কোন আমল আল্লাহ্র

www.eelm.weebly.com

নিকটে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তিনি স. বললেন, যথাসময়ে নামাজ সম্পাদন। আমি বললাম এরপর? তিনি স. বললেন পিতামাতার আনুগত্য। আমি বললাম, তারপর? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র পথে জেহাদ। মুসলিম, বোখারী। হজরত ফজল বিন দাকাইন থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নামাজ ধর্মের স্তম্ভ।

হজরত আনাস থেকে ইবনে আসাকের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নামাজ মুমিনের নূর। হজরত আলী থেকে কাজায়ী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য নামাজ হচ্ছে আল্লাহ্র নৈকট্যের অবলম্বন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সেজদাবনত অবস্থায় বান্দা তার প্রতিপালকের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হয়। অতঃপর তোমরা সেজদাবনত অবস্থায় অত্যধিক দোয়া প্রার্থনা করো।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল আমিরুনা বিল মারুফী ওয়ান্নাহুনা আনিল মুনকার' (সৎকাজের নির্দেশ দাতা, অসৎ কাজ নিষেধকারী)। এ কথার অর্থ, তারা ইমান ও আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং পাপকর্মে বাধা প্রদান করে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'আল মা'রূফ কথাটির অর্থ সুন্নত এবং 'আল মুনকার' কথাটির উদ্দেশ্য বেদাত। একই সঙ্গে শব্দ দু'টির উল্লেখ করার কারণ এই যে, একই ব্যক্তিত্বের মধ্যে উভয় গুণাবলী যেনো প্রস্ফুটিত হয়। অর্থাৎ তারা যেনো হয় আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের অতন্দ্র প্রহরী।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াল হাফিজুনা লি হুদুদিল্লাহ্' (এবং আল্লাহ্র সীমারেখা সংরক্ষণকারী)। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলীর সঙ্গে আলোচ্য বৈশিষ্ট্যটি 'ওয়াও' (এবং) অব্যয় সহযোগে সংযোগ করার কারণ হচ্ছে, সংক্ষেপে সকল গুণাবলীকে একত্রিত করা। অর্থাৎ ইতোপূর্বে বর্ণিত বিস্তারিত গুণাবলীকে সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করা।

আমি বলি, 'আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী' কথাটির অর্থ এখানে আয়াতের প্রথমে বর্ণিত পুণ্যকর্মসমূহ নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর মহব্বতে যথানিয়মে সম্পাদন করে। নিজের পক্ষ থেকে কোনো সংযোজন ও বিয়োজন ঘটায় না। তাই এখানে আল্লাহ্র সীমারেখা সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হবে বর্ণিত পুণ্যকর্মসমূহ বিশুদ্ধ তা (এখলাস) ও পরিপূর্ণ একাগ্রচিত্ততা (হুজুরী কলব) সহ সম্পাদন করা। এখলাস ও হুজুরী কলব ছাড়া কোনোক্রমেই আল্লাহ্তায়ালার সীমা সংরক্ষণ সম্ভব নয়। যাঁরা এখলাস বা হুজুরী কলবের অধিকারী তাঁদের সংস্পর্শে না এলে এখলাস ও হুজুরী কলব পাওয়াও সম্ভব নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়া বাশ্শিরিল মু'মিনীন (এই বিশ্বাসীদেরকে তুমি শুভসংবাদ দাও)। এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, এতক্ষণ ধরে আলোচিত গুণাবলীর অধিকারী বিশ্বাসীরাই পূর্ণ বিশ্বাসী (মুমিনে কামেল)। এখানে কেবল বলা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে— শুভ সংবাদ দাও। কিন্তু কোন কোন নেয়ামত দেয়া হবে, তার উল্লেখ নেই। এতে করে বুঝা যায়, ওই নেয়ামতসমূহ হবে সুবিপুল ও বর্ণাঢ্য—যা বিবরণের অতীত, যা কারো জ্ঞান ও আওতায় আসতে পারে না। আল্লাহ্তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের পিতা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আবু তালেবের মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন রসুল স.। আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ্ বিন আবি উমাইয়া বিন মুগিরাও উপস্থিত ছিলো সেখানে। রসুল স. বললেন, হে আমার পিতৃব্য! অন্ততঃ একবার উচ্চারণ করুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, যাতে আমি আপনার পক্ষে দাঁড়াতে পারি। আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ বললো, হে আবু তালেব! আপনি কি আবদুল মুত্তালেবের ধর্ম পরিত্যাগ করতে চান? রসুল স. বার বার তাঁর নিবেদন জানাতে লাগলেন। আর আবু জেহেল আর আবদুল্লাহ বার বার বাধা সৃষ্টি করতে থাকলো। শেষে আবু তালেব বললেন, আমি আবদুল মুত্তালেবের ধর্মমতের উপরেই রইলাম। এক বর্ণনায় এসেছে আবু তালেব তখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলতে অস্বীকার করলেন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকবো। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১১৩

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○

❒ আত্মীয় স্বজন হইলেও অংশীবাদীদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং বিশ্বাসীদিগের জন্য সংগত নহে যখন ইহা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে উহারা জাহান্নামী।

এই আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দৃষ্টে বুঝা যায়, জীবিত মুশরিক ও অবিশ্বাসীদের জন্য দোয়া করা যাবে। কিন্তু মৃত মুশরিকদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা যাবে না। পৃথিবীবাসী মুশরিকদের জন্য 'হে আল্লাহ! তাদেরকে ইমান দাও' এ রকম দোয়া করা উত্তম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী পিতৃব্যকে বললেন, হে আমার পিতৃব্য! 'লা ইলাহা ইল্লালাহ্' উচ্চারণ করুন। কিয়ামতের দিন আমি আপনার সুপারিশ করবো। তাঁর পিতৃব্য বললেন, প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! 'আবু তালেব মৃত্যু ভয়ে ভীত এ রকম অপবাদ ছড়িয়ে পড়ার

www.eelm.weebly.com

সম্ভাবনা যদি না থাকতো' তবে নিশ্চয় আমি তোমার নয়নযুগল শীতল করতাম। তখন অবতীর্ণ হলো 'ইন্নাকা লা তাহদী মান আহবাবতা ওয়ালা কিন্নাল্লহা ইয়াহদি মাঁইয়াশাউ' (নিশ্চয় আপনি যাকে ভালোবাসেন, তাকে হেদায়েত করতে পারেন না, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকেই হেদায়েত করেন)।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে , হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াতের কিছু ফায়দা আমার চাচা আবু তালেব পাবেন। ফলে অন্যদের চেয়ে তার আযাব হবে কম। গ্রন্থি পর্যন্ত তাঁর দু' পা রাখা হবে আগুনে। আর ওই উত্তাপে টগবগ করে ফুটতে থাকবে তাঁর মাথার মগজ। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। তিরমিজি ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক উত্তম আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, আমি একবার এক ব্যক্তিকে তার মৃত মুশরিক পিতা মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুনলাম। বললাম, তাদের জন্য দোয়া করছো কেনো? তারা তো ছিলো মুশরিক। সে বললো, হজরত ইব্রাহিমও তো তাঁর মুশরিক পিতার জন্য দোয়া করেছিলেন। আমি রসুল স.কে ঘটনাটি জানালাম। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতটি। সম্ভবতঃ এই ঘটনাটিও ঘটেছিলো আবু তালেবের মৃত্যুর কাছাকাছি কোনো এক সময়ে। তাই এই ঘটনাটি আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে হতে পারে।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. এর প্রিয় জননী হজরত আমেনা সম্পর্কে। কিন্তু বর্ণনাগুলো অবিশুদ্ধ। তাই ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিস সমূহের সমপর্যায়ভূতও নয়। এ ধরনের বর্ণনা গ্রহণ না করাই সমীচীন।

হাকেম ও বায়হাকী আইয়ুব ইবনে হানীর পদ্ধতিতে মাস্রুক সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুল স. আমাদের কয়েকজনকে সংগে নিয়ে এক কবরস্থানে গেলেন। তিনি এক স্থানে আমাদেরকে বসতে বললেন। আমরা বসে পড়লাম। তিনি কয়েকটি কবর অতিক্রম করে অনতিদূরের একটি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অনুচ্চস্বরে কিছু পাঠ করতে থাকেন এবং কাঁদতে থাকেন। তাঁর কান্না দেখে আমরাও কাঁদতে শুরু করি। কিছুক্ষণ পর তিনি স. আমাদের নিকটে এলেন। আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনাকে কাঁদতে দেখে আমরাও কেঁদেছি। তিনি স. বললেন, তোমরা কি বিস্মিত হয়েছো? আমরা বললাম হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, আমি আমার জননী আমেনা বিনতে ওহ্হাবের কবর জিয়ারত করলাম। পূর্বাহ্নে আমি আল্লাহ্তায়ালার নিকট থেকে জিয়ারতের অনুমতি লাভ করেছি। কিন্তু তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারলাম না। কারণ আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে— আত্মীয়স্বজন হলেও

www.eelm.weebly.com

অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও বিশ্বাসীদের জন্য সংগত নয়। তাই মায়ের প্রতি স্বভাবজ ভক্তি ও ভালোবাসার কারণে আমি কেঁদে ফেলেছি। হাকেম এই হাদিসকে সহীহ্ বলেছেন, কিন্তু ইমাম জাহাবী তাঁর শরহে মুস্তাদরাক গ্রন্থে এ কথার সমালোচনা করেছেন। লিখেছেন, ইবনে মুঈন আইয়ুব ইবনে হানীকে বর্ণনাকারী হিসাবে দুর্বল বলেছেন। তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. তাবুক অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ওমরা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে আউফান নামক স্থানে তাঁর জননীর কবরের পাশে দাঁড়ালেন। এর পরের বর্ণনা ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনার অনুরূপ। আল্লামা সুয়ূতি বলেছেন, এই হাদিসের সূত্র পরম্পরা অত্যন্ত শিথিল।

হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত বুরায়দা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের পর রসুল স. তাঁর সম্মানিত জননী হজরত আমেনার কবর জিয়ারত করেন। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। হজরত বুরায়দা থেকে হজরত ইবনে সা'দ এবং ইবনে শাহিন কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসুল স. মক্কা বিজয়ের পর তাঁর প্রিয় জনয়িত্রীর সমাধিতে গমন করেন এবং সেখানে বসে পড়েন। হজরত বুরায়দা থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন ইতোপূর্বে উল্লেখিত বাগবীর বর্ণনার অনুরূপ। ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাত পুস্তকে হাদিসটি বর্ণনা করার পর স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিয়েছেন, বর্ণনাটি ভুল। কারণ হজরত আমেনার সমাধি আবওয়া নামক স্থানে, মক্কায় নয়।

ইমাম আহমদ এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত বুরায়দা বলেছেন, আমি রসুল স. এর সফর সংগী ছিলাম। আসফান নামক স্থানে আমাকে বসিয়ে রেখে রসুল স. ওজু করলেন এবং নামাজ পড়লেন। তাঁর সম্মানিত মাতার সমাধি দর্শন করলেন। তারপর আমার নিকটে এসে বললেন, আমি আমার মাতার শাফায়াতের জন্য আল্লাহ্তায়ালার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। এরপর অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। আল্লামা সুয়ূতি বলেছেন, এই হাদিসের সকল দিক মাজরুহ (ক্ষতবিক্ষত)।

বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, যারা হজরত ইবনে মাসউদের হাদিসকে সহিহ্ বলেছেন, তারা হাদিসটিকে সত্তাগত হিসেবে সহিহ্ বলেননি। সহিহ্ বলেছেন পদ্ধতিগত দিক থেকে। কিন্তু আমি পদ্ধতিগত দিক থেকেও পরীক্ষা করে দেখেছি এবং শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, পদ্ধতিগত দিক থেকেও হাদিসটি ক্ষতবিক্ষত (মাজরুহ)। এছাড়া হাদিসটি অগ্রহণীয় হওয়ার আর একটি কারণ এই যে, হাদিসটি সহিহাইনের (বোখারী ও মুসলিমের) পরিপন্থী। কারণ বোখারী ও মুসলিম শরীফে বলা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো আবু তালেবের মৃত্যুর প্রাক্কালে।

www.eelm.weebly.com

কাতাদা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. ঘোষণা করেছেন, হজরত ইব্রাহিম যেভাবে তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন আমিও তেমনি আমার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যাচ্ছিলাম। এরপর অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। বর্ণনাটি সহিহ্, মুরসাল, জয়ীফ যাই হোক না কেনো সহিহাইনের পরিপন্থীই হবে। সুতরাং এভাবে রসুল স. এর সম্মানিত মাতা পিতাকে মুশরিক সাব্যস্ত করা কিছুতেই ঠিক নয়। পক্ষান্তরে রসুল স. এর মাতা পিতা যে মুমিন ছিলেন সে সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতি কয়েকটি পুস্তিকা লিখেছেন। ওই সকল পুস্তিকায় তিনি হজরত আদম আ. থেকে শুরু করে রসুল স. এর ঊর্দ্ধতন সকল পিতা ও মাতাকে ইমানদার প্রমাণিত করেছেন। আমিও ওই সকল তথ্যপ্রমাণ সহযোগে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছি। সুতরাং এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করবার আর কোনো অবকাশই নেই।

একটি সন্দেহঃ সহিহাইনের হাদিসে এসেছে, আবু তালেবের মৃত্যুকালে আবু জেহেল বলেছিলো, হে আবু তালেব! আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম পরিত্যাগ করতে চান? আবু তালেব বলেছিলেন, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরেই রইলাম। এতে করে প্রমাণিত হয় আবদুল মুত্তালিব মুশরিক ছিলেন। যদি তাই হয়, তবে এ কথা কিভাবে বলা যেতে পারে যে, হজরত আদম পর্যন্ত রসুল স. এর সকল পিতৃপুরুষ মুমিন ছিলেন?

সন্দেহের জবাবঃ বর্ণিত হাদিস থেকে এ কথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না যে, হজরত আবদুল মুত্তালিব মুশরিক ছিলেন। বরং তিনি ছিলেন নিশ্চিত ইমানদার। স্বসূত্রে ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাত পুস্তকে লিখেছেন, হজরত আবদুল মুত্তালিব একবার রসুল স. এর পরিচর্যাকারিণী উম্মে আয়মানকে বলেছিলেন, হে উম্মে আয়মান! আমার পুত্রের পক্ষ থেকে আশীর্বাদকে অবহেলা করো না। আমি কুল বৃক্ষের নিকটে তাকে দেখেছিলাম। তখন আহলে কিতাবীরা বলেছিলো এর পুত্র এই উম্মতের পয়গম্বর হবেন। প্রকৃত কথা এই যে, হজরত আবদুল মুত্তালিব ছিলেন মূর্খতার যুগের মানুষ। তাই আসমানী শরিয়তের সংগে তাঁর পরিচয় ছিলো না। ওই জামানা ছিলো ফিতরতের জামানা। অর্থাৎ ওই জামানায় কেবল আল্লাহ্-তায়ালার এককত্বের স্বীকৃতিই ইমানদার হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো। কারণ তখন অতীতের সকল পয়গম্বরের শরিয়তের জ্ঞান প্রায় অদৃশ্যই হয়ে গিয়েছিলো। আর শেষ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. তখনও রেসালতের দায়িত্ব নিয়ে আবির্ভূত হননি। তাই তিনি শরিয়তের বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। আবু জেহেল এই প্রকৃত তত্ত্বটি বুঝতে পারেনি। সে মনে করেছিলো, রসুল স. আবু তালেবের বিরুদ্ধে কোনো ভিন্ন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। তাই সে আবু তালেবকে বলেছিলো, আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম পরিত্যাগ করতে চান? আবু তালেবেরও প্রকৃত তত্ত্ব জানা ছিলো না। তাই তিনি বলেছিলেন, আমি আমার পিতা আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরেই রইলাম।

www.eelm.weebly.com

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ○

❐ ইব্রাহীম তাহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল তাহাকে ইহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল বলিয়া; অতঃপর যখন ইহা তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল যে সে আল্লাহের শত্রু তখন ইব্রাহীম উহার সম্পর্ক ছিন্ন করিল। ইব্রাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল।

এখানে 'ইব্রাহিম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলো'— অর্থ ইব্রাহিম তাঁর পিতৃব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর ওই লালনপালনকারী পিতৃব্যের নাম ছিলো আজর। আর তাঁর পিতার নাম ছিলো তারিখ। প্রসংগটির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সুরা আনআমের তাফসীরে। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, 'তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো বলে' কথাটির অর্থ হবে এখানে— হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে। 'ইয়্যাহু' কথাটির উদ্দেশ্য এখানে হজরত ইব্রাহিম। অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিমের পিতা তাকে মুসলমান হওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন। সে কারণেই হজরত ইব্রাহিম বলেছিলেন, আমি আপনার জন্য আমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো, যখন আপনি মুসলমান হবেন। অধিকাংশ তাফসীরকার এ কথাও বলেছেন যে, এখানে ওয়াদা (প্রতিশ্রুতিদান) কথাটির কর্তা হজরত ইব্রাহিম। আর 'ইয়্যাহু' কথাটির উদ্দেশ্য হবে হজরত ইব্রাহিমের পিতা। অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতার মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমি আপনার জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনা করবো। এই তাফসীরের সমর্থকরূপে এই আয়াতটি উল্লেখ করা যায়— 'ক্বদ কানাত লাকুম উস ওয়াতুন হাসানাতুন ফী ইব্রাহিম.........লাআসতাগ ফারান্নালাকা' পর্যন্ত (ইব্রাহিমের আদর্শ তোমাদের জন্য প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত........অবশ্যই আমি তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হবো)। এই আয়াতে হজরত ইব্রাহিমের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতার যে মাগফিরাত কামনা করেছিলেন, তা এই সাধারণ নির্দেশনাটির অন্তর্ভূত নয়। অর্থাৎ তাঁর পিতা তাঁর অনুসারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মুশরিক। হজরত ইব্রাহিম তাঁর সংগে এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন যে, আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো।

www.eelm.weebly.com

বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, হজরত আদমের সময় থেকে অতিবাহিত শতাব্দীসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম শতাব্দীতে প্রেরিত হয়েছি আমি। সুতরাং এ কথা বলতে হয় যে, রসুল স. এর পূর্বে অতিবাহিত সকল শতাব্দীই ছিলো উত্তম। আর রসুল স.এর শতাব্দী ছিলো সর্বোত্তম। তাহলে এ কথা কিভাবে উচ্চারণ করা যেতে পারে যে, রসুল স. এর পিতৃপুরুষগণের মধ্যে কেউ অবিশ্বাসী বা মুশরিক ছিলেন?

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক আখেরাতের সংগে। অর্থাৎ আখেরাতে যখন হজরত ইব্রাহিমের নিকট তাঁর পিতার কাফের হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে তখন তিনি তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবেন।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন পিতার সংগে সাক্ষাৎ ঘটবে হজরত ইব্রাহিমের। তাঁর পিতার চেহারা হবে তখন ধূলি ধূসরিত। হজরত ইব্রাহিম বলবেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আমার প্রতিপক্ষে দাঁড়াবেন না। পিতা বলবেন, আজ আমি তোমার অবাধ্য হবো না। হজরত ইব্রাহিম প্রার্থনা জানাবেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! আপনি আমাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, পুনরুত্থান দিবসে আপনি আমাকে অপমানিত করবেন না। আজ আমার পিতা লাঞ্ছিত (এটা কি আমার জন্য অপমান নয়)। আল্লাহ্পাক বলবেন, কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম। হে ইব্রাহিম! নিচের দিকে তাকাও। হজরত ইব্রাহিম নিচের দিকে তাকিয়ে দেখবেন, একটি কর্দমাক্ত উদকে পা ধরে দোজখে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইব্রাহিম তখন প্রকাশ করবেন অসন্তোষ। এ কথাই এখানে এভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, 'অতঃপর যখন এটা তার নিকট সুস্পষ্ট হলো যে, সে আল্লাহ্র শত্রু তখন ইব্রাহিম তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করলো।'

শেষে বলা হয়েছে 'ইব্রাহিম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল।' এখানে 'আউয়াহুন' কথাটির অর্থ করা হয়েছে কোমল হৃদয়। আউয়াহুন বলা হয় তাদেরকে যারা আল্লাহ্পাকের ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকেন। হজরত ইব্রাহিম তাঁর জীবনে বহুবার এ রকম হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, পাপের ভয়ে তটস্থ ব্যক্তিকে বলে আউয়াহুন। মোট কথা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত ব্যক্তিকে বলে আউয়াহুন— সে ভীতি আল্লাহ্র হোক, দোজখের হোক অথবা পাপের। আতা বলেছেন, জাহান্নামের ভয়ে ভীত এবং আল্লাহ্তায়ালার অপ্রিয় বিষয় সমূহ থেকে পবিত্র ব্যক্তিকে বলে আউয়াহুন। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আউয়াহুন হচ্ছে অধিক দোয়া নিবেদনকারী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুমিন ব্যক্তিদের মধ্যে যারা অধিক সংখ্যক তওবা ইস্তেগফার করেন তাঁরাই আউয়াহুন (কোমল

www.eelm.weebly.com

হৃদয়)। হাসান ও কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্‌র বান্দাগণের জন্য যে সুপারিশ করে ও মেহেরবাণী করে, সে আউয়াহুন। মুজাহিদ বলেছেন, এর অর্থ দৃঢ় বিশ্বাসী। হজরত ইকরামা বলেছেন, শব্দটি আবিসিনীয়। আবিসিনিয়ার ভাষায় আউয়াহুন শব্দটির অর্থ প্রত্যয়ী। হজরত উকবা ইবনে আমের বলেছেন, আউয়াহুন বলা হয় আল্লাহ্‌কে অত্যধিক স্মরণকারীকে। হজরত সাঈদ বিন যোবায়েরের নিকটে শব্দটির অর্থ অত্যধিক ভ্রমণকারী। আরেক বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আউয়াহুন অর্থ 'মুয়াল্লিমুন খাইর' (উত্তম শিক্ষক)। ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, এর অর্থ বুদ্ধিমান। কামুস গ্রন্থে রয়েছে আউয়াহুন অর্থ— প্রত্যয়ী, দোয়া প্রার্থী, দয়ার্দ্র, বিবেচক অথবা ইমানদার। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, তিনিই আউয়াহুন, যিনি ভয়ে আহ্ উহ্ উচ্চারণ করেন, দৃঢ় বিশ্বাসের সংগে বিনীতভাবে প্রার্থনা করেন এবং আনুগত্যের উপরে অটল থাকেন। জুজায বলেছেন, হজরত আবু উবায়দারকৃত অর্থ ইতোপূর্বে বর্ণিত সকল অর্থকে একত্রিত করেছে।

'হালীম' অর্থ— অন্যের ক্ষতি অপসারণকারী হজরত ইব্রাহিম ছিলেন হালীম। তার পিতা তাঁকে বলেছিলো, যদি তুমি তোমার ধর্মমত প্রচারে বিরত না হও তবে, আমি প্রস্তর প্রক্ষেপণের মাধ্যমে তোমার মৃত্যু ঘটাবো। এর উত্তরে হজরত ইব্রাহিম বলেছিলেন, হে আমার পিতা! আমি আপনার পরিত্রাণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হালীম অর্থ অধিনায়ক। কামুস গ্রন্থে রয়েছে হালীমুন অর্থ তাহাম্মুল (সহিষ্ণুতা) এবং বিচক্ষণতা। হালীমুন হচ্ছে (বিশেষণের অনুরূপ)। শব্দটি এসেছে 'হিলমুন' থেকে। হজরত ইব্রাহিমের ক্ষমা প্রার্থনার ভাষা বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছে। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থেই হজরত ইব্রাহিম ছিলেন 'আউয়াহুন হালীম'(কোমল হৃদয় ও সহনশীল)। তাই তিনি ওভাবে তাঁর পিতার জন্য দোয়া করতে পেরেছিলেন।

মুকাতিল ও কালাবী বর্ণনা করেছেন, মদীনা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলের কিছু লোক রসুল স. এর নিকটে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তখন পর্যন্ত মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়নি এবং কেবলার হুকুমও পরিবর্তিত হয়নি। ওই সকল লোক ফিরে গেলেন স্বগৃহে। ইতোমধ্যে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে শরাব হারাম করা হলো এবং কেবলার হুকুমও পরিবর্তিত হলো। বেশ কিছুদিন পর ওই লোকেরা পুনরায় মদীনায় এলেন এবং শরাব ও কেবলার বিধান জানতে পেরে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! শরাব নিষিদ্ধ হয়েছে, কেবলার হুকুমও পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু আমরা না জানতে পেরে পরিবর্তিত বিধান দু'টোর উপরে আমল করতে পারিনি। এতদিন ধরে আমরা শরাবও পান করেছি এবং পূর্বের কেবলার দিকে (বায়তুল মাকদিসের) দিকে মুখ করে নামাজও পড়েছি। এখন আমাদের উপায় কি হবে? তাঁদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

www.eelm.weebly.com

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

❒ আল্লাহ্ ইহার জন্য নহেন যে তিনি কোন সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করিবার পর উহাদিগকে বিভ্রান্ত করিবেন— উহাদিগকে কী বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে ইহা উহাদিগের নিকট সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত না করা পর্যন্ত; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহেরই; তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদিগের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কাউকে সৎপথ প্রদর্শন করার পর পুনরায় পথভ্রষ্ট করা আল্লাহ্তায়ালার রীতি নয়। কোনো কোনো বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তা স্পষ্ট করে না জানানো পর্যন্ত তিনি কাউকে অভিযুক্ত করেন না। প্রবর্তিত বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হবার পরেও যারা তা লংঘন করে আল্লাহ্পাক কেবল তাদেরকেই শাস্তি দান করেন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, রসুল স. তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবকে বলেছিলেন, আমার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত না হওয়া পর্যন্ত আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো। এই আয়াতের প্রেক্ষাপটেও বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ রসুল স. তাঁর পিতৃব্যের জন্য দোয়া করেছিলেন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ার পূর্বে, পরে নয়। নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে যারা তাদের অবিশ্বাসী পিতামাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন তারাও ক্ষমার্হ। মুজাহিদ বলেছেন, ইতোপূর্বে উল্লেখিত আয়াতে মুশরিকদের জন্য দোয়া করার যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, সেই নিষেধাজ্ঞাটি একটি সাধারণ নিষেধাজ্ঞা। অর্থাৎ সেখানে কাউকে বা কোনো ঘটনাকে বিশেষায়িত করা হয়নি। সুতরাং নিষেধাজ্ঞা আরোপনের পূর্বের কোনো আমল ধর্তব্য নয়। আলোচ্য আয়াতেও তেমনি মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়া এবং কেবলার হুকুম পরিবর্তিত হওয়ার বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার পূর্বের আমলও ধর্তব্যযোগ্য কিছু নয়।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।' এ কথার অর্থ— কে জ্ঞাতসারে বিধান লংঘন করে এবং কে অজ্ঞাতসারে বিধান বিরোধী কর্মে লিপ্ত থাকে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা ভালো করেই জানেন। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। পরের আয়াতে (১১৬) বলা হয়েছে, 'আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্রই; তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই। সাহায্যকারীও নেই। এ কথার অর্থ— হে মানুষ! উত্তমরূপে অবগত হও যে, আল্লাহ্তায়ালাই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর একক অধীশ্বর। তিনি যেমন জীবন দান করেন, তেমনই ঘটান মৃত্যু। তিনি ব্যতীত তোমাদের কেউ নেই— না অভিভাবক না সাহায্য-কারী। সুতরাং তোমাদের পক্ষে এ রকম করা কিছুতেই সমীচীন নয় যে, তোমরা তোমাদের হৃদয়ে মুশরিকদের জন্য অনুরাগ লালন করবে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা তোমাদের স্বজন হয়। অতএব তোমরা অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসেবে কেবল আল্লাহ্কেই যথেষ্ট মনে করো।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১১৭

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

❐ আল্লাহ্ অনুগ্রহ-পরবশ হইলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদিগের প্রতি যাহারা তাহার অনুগমন করিয়াছিল সংকটকালে— এমন কি যখন তাহা-দিগের একদলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হইয়াছিল। পরে আল্লাহ্ উহাদিগকে ক্ষমা করিলেন; তিনি উহাদিগের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

মুনাফিকেরা রসুল স. এর নিকটে তাবুক অভিযান থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেছিলো। দেখিয়েছিলো মিথ্যা অজুহাত। রসুল স. তবুও তাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। আল্লাহ্তায়ালাও তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সেই ক্ষমাকে রসুল স., মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের সঙ্গে এখানে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— 'আল্লাহ্ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা তাঁর অনুগমন করেছিলো সংকটকালে— এমনকি যখন তাদের একদলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিলো। পরে আল্লাহ্ তাদেরকে

www.eelm.weebly.com

ক্ষমা করলেন; তিনি তাদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরমদয়ালু।' এ রকম বিবরণভঙ্গির দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য একটি আয়াতেও। সেখানে বলা হয়েছে— লি ইয়াগ্‌ফিরা লাকাল্লহ্‌ মা তাক্বাদ্‌দামা মিন জামবিকা ওয়ামা তা'য়াখ্‌খারা (আল্লাহ্‌ আপনার জন্য ক্ষমা করে দিবেন পূর্বাপর অনবধনতা)।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সকলকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে তওবার প্রতি। কারণ তওবা এমন একটি আমল, যা সকলের জন্যই প্রয়োজন। রসুল স. এবং সাহাবীগণও এই প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করো।' পুণ্যবানদেরকেও অতিক্রম করতে হয় মর্যাদার বিভিন্ন স্তর। সুতরাং সকলেই উন্নততর স্তরে পৌঁছতে ব্যগ্র। এই অনন্ত অভিযাত্রায় ক্রমঅগ্রসরমানতা কখনো হয় বিফল, আবার কখনো হয় বিলম্বিত। এ কারণে তাদের তওবা হয়ে পড়ে জরুরী। আলোচ্য আয়াতে তওবার এই গুরুত্বটি প্রকাশ করা হয়েছে যে, তওবার মাকামে রয়েছে নবী, রসুল ও পুণ্যবানদের বিশেষ স্থান। কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের শুরুতে রসুল স. এর উল্লেখ করা হয়েছে ভূমিকা বা মুখবন্ধরূপে। কারণ তিনিই হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্যদের তওবা কবুল হওয়ার অবলম্বন। এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন— লিল্লাহি খুমুসুহু ওয়ালির্ রসূলি ওয়ালি জিল্ কুরবা (এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র এবং রসুলের এবং রসুলের স্বজনদের)। এখানেও আল্লাহ্‌র উল্লেখ এসেছে ভূমিকারূপে।

'তার অনুগমন করেছিলো সংকটকালে। কথাটির অর্থ— তাবুক যুদ্ধে সাহাবীগণ রসুল স. এর প্রশ্নহীন অনুগামী হয়েছিলেন। কিন্তু তখন পরিস্থিতি ছিলো খুবই সংকটাপন্ন। এখানে 'উ'সরাতি' শব্দটির অর্থ সংকটকালে। তাবুক যুদ্ধের সময় বিভিন্ন সংকটে নিপতিত ছিলো মুসলিম বাহিনী। আহার্য ও পানীয় ছিলো অপ্রতুল ও দুষ্প্রাপ্য। এ কারণেই তাবুক যুদ্ধকে বলা হয় গাজওয়াতুল উ'সরা (সংকটকালীন যুদ্ধ) অথবা গাজওয়াতুল জাইশিল উ'সরা কিংবা গাজওয়াতুল জহিশ। এ রকম বলেছেন বাগবী।

হাসান বলেছেন, তখন দশ জন যোদ্ধার ভাগে পড়েছিলো একটি করে উট। পালাক্রমে তাঁরা ওই উটগুলোতে আরোহণ করতেন। খাদ্য হিসেবে তাঁদের সঙ্গে ছিলো শুকনো খেজুর এবং নিকৃষ্ট মানের যব। সবাই সেগুলোকে ভাগ করে খেতেন। কিন্তু সে খাদ্যও ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হতে শুরু করলো। শেষে অবস্থা দাঁড়ালো এ রকম— একটি খেজুর একজন কিছুটা খেয়ে অপর জনকে দিতেন। এক ঢোকের বেশী পানি পান করতেন না। এ রকম সংকটগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন। একনিষ্ঠ অনুগামী হয়েছিলেন রসুল স. এর।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আহমদ, ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাব্বান এবং হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, আমরা প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে তাবুক রওয়ানা হলাম। চলতে চলতে উপস্থিত হলাম একটি দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে। সেখানে আমরা এতো তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লাম যে, মনে হচ্ছিলো এখনই বুঝি আমাদের কণ্ঠদেশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। কেউ পানির অনুসন্ধানে গেলে মনে হতো সে বুঝি আর ফিরে আসবে না। কেউ কেউ মনে করতো নিজেদের উট জবাই করে উটের কুঁজে রক্ষিত পানি পান করবে এবং অবশিষ্ট পানি বুক দিয়ে আগলিয়ে রাখবে। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আল্লাহ্‌তায়ালা তো আপনাকে উত্তম প্রার্থনার জন্য নির্বাচন করেছেন। আমাদের জন্য দোয়া করুন। রসুল স. বললেন, তোমরা সকলেই কি তাই চাও। হজরত আবু বকর বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. তাঁর পবিত্র দুইহাত আকাশের দিকে উঠিয়ে মোনাজাত করতে শুরু করলেন। হাত নামানোর আগেই শুরু হলো মুষলধারায় বৃষ্টি। সকলের পাত্রগুলো ভরে উঠলো কানায় কানায়। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম, আমাদের সেনা সমাবেশের সীমানার বাইরে কোনো বৃষ্টিই হয়নি।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু হেরজা আনসারী বলেছেন, তাবুক গমনের পথে একস্থানে একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে রসুল স. নির্দেশ দিলেন, খবরদার! এখানকার পানি কেউ সংগ্রহ করবে না। পুনরায় যাত্রা শুরু করলাম আমরা। দীর্ঘক্ষণ পথ চলার পর এক স্থানে থামলাম। তখন সকলেই পিপাসার্ত। রসুল স. দুই রাকাত নামাজ পড়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ঢেকে গেলো মেঘে। শুরু হলো ঘনঘোর বৃষ্টি। পুরো এলাকা হয়ে গেলো সয়লাব। এক স্থানে অবস্থানরত জনৈক সাহাবী বললেন, রসুল স. এর দোয়ার বরকতে এ বৃষ্টিপাত ঘটলো। এক মুনাফিক বললো, আরে অমুক অমুক নক্ষত্রের গতিবিধির কারণেই তো বৃষ্টিপাত হয়। তার এ কথার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো— ওয়া তাজ্‌আলুনা রিজ্‌ক্বাকুম আন্নাকুম তুকাজ্জিবুন (আর তোমাদের জীবনোপকরণগুলোকে স্থাপন করো, নিশ্চয় তোমরা মিথ্যাবাদী)।

'ক্বুলুবু ফারিক্বিন' অর্থ চিত্তবৈকল্য। অর্থাৎ তখন কোনো কোনো লোকের চিত্তবৈকল্যের উপক্রম হয়েছিলো। এখানে 'ইয়াজিগু' অর্থ উপক্রম হয়েছিলো। অর্থাৎ অসহনীয় কষ্টের কারণে মুজাহিদগণের কেউ কেউ প্রত্যাবর্তনের চিন্তা শুরু করেছিলেন।

কালাবী বলেছেন, তখন কেউ কেউ আর অগ্রসর না হওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। ইবনে ইসহাক এবং মোহাম্মদ বিন ওমর বলেছেন, তখন কোনো কোনো মুজাহিদের উদ্যম হয়ে পড়েছিলো শ্লথ ও শিথিল। তাই কেউ কেউ আজ

www.eelm.weebly.com

যাবো কাল যাবো করতে করতে সময়ক্ষেপনকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হজরত কা'ব বিন মালেক, হজরত হেলাল বিন উমাইয়া, হজরত মুরারা বিন রবীয়া এবং হজরত আবু জর গিফারী। তাঁরা সকলেই ছিলেন বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কেউ কেউ আবার থেমে গিয়েছিলেন। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অমুক অমুক ব্যক্তি আপনার অনুগমন থেকে বিরত হয়েছে। রসুল স. বললেন, তাদেরকে ওভাবেই থাকতে দাও। উত্তম বিবেচনা করলে আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে দিবেন না। তাদের সম্পর্কে আমি আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম। হজরত আবু জর গিফারী যখন সঙ্গ ত্যাগ করলেন, তখন রসুল স. এর নিকটে আবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আবু জর অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। তার উটের গতি অত্যন্ত মন্থর। রসুল স. তাঁর আগের জবাবের পুনরুক্তি করলেন। হজরত আবু জর তাঁর উটকে আঘাত করলেন। কিন্তু পথশ্রান্ত উট অগ্রসর হতে পারলো না। এ অবস্থা দেখে হজরত আবু জর তাঁর মালপত্র আপন পৃষ্ঠদেশে বেঁধে নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। পদব্রজে অনুগমন করতে লাগলেন রসুল স. এর। মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু জর তখন বলতে শুরু করলেন, আমি তাবুক অভিযানের পশ্চাৎবর্তী এক সৈনিক। আমার উট অত্যন্ত শ্রান্ত। ভাবছি, কয়েকদিন এখানেই থাকি। উটকে বিশ্রাম দেই এবং উপযুক্ত পানাহার দিয়ে তাকে সতেজ করে তুলি। তারপর খুব দ্রুত পথ অতিক্রম করে মিলিত হই রসুল স. এর সঙ্গে। জিল মাওদা নামক স্থানে গিয়ে আমার উটটি থেমে গেলো। সারাদিন ধরে চেষ্টা করেও তাকে ওঠাতে পারলাম না। শেষে মাল-সামান পিঠের উপর বেঁধে নিয়ে পায়ে হেঁটে পথ চলতে শুরু করলাম। পরদিন দ্বিপ্রহরে আমি এমন স্থানে পৌঁছলাম, যেখান থেকে রসুল স. দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলেন। একজন আমার অবস্থা সম্পর্কে রসুল স. কে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! একজন আমাদের সঙ্গে চলেছে পদব্রজে। রসুল স. বললেন, ভালো করে দেখো, আবু জর নয়তো! লোকেরা আমার দিকে ভালো করে নজর করলো এবং বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! মনে হয় লোকটি আবু জরই হবে। রসুল স. বললেন, আবু জরের উপর রয়েছে আল্লাহ্‌র রহমত। সে একাকী চলে। তার মৃত্যুও হবে একাকী অবস্থায়। পুনরুত্থিতও হবে একাকী। মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী বলেছেন, পরবর্তী সময়ে এ রকমই ঘটেছিলো। হজরত আবু জর মৃত্যুবরণ করেছিলেন নিঃসঙ্গ অবস্থায়। হজরত আবু জর বলেন, আমি রসুল স. এর নিকটবর্তী হলাম। জানালাম আমার দুরবস্থার কথা। তিনি স. বললেন, হে আবু জর! তোমার প্রতিটি পদবিক্ষেপে আল্লাহ্ একটি করে গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু খাইছুমা থেকে তিবরানী এবং আপন মাশায়েখগণের সূত্রে ইবনে ইসহাক ও মোহাম্মদ বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর তাবুক যাত্রার পর কয়েকদিন অতিবাহিত হলো। তখন প্রচণ্ড গরমে যেনো ঝলসে যাচ্ছিলো প্রকৃতি। হজরত আবু খাইছুমা তাঁর বাগান বাড়ীতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর দুই স্ত্রী তাদের আপনাপন কুটিরকে পানি ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছে। উভয়ের ঘরেই তাঁর জন্য রয়েছে উত্তম পানাহারের ব্যবস্থা। তিনি তাঁদের আয়োজন দেখে বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ্! রসুল স. এর অগ্র-পশ্চাতের সকল ভুলকে আল্লাহ্ মার্জনা করে দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি স. এই আগুন ঝরা দিনে আল্লাহ্র পথে বের হয়ে পড়েছেন। আর আবু খাইছুমা এদিকে শীতল গৃহচ্ছায়া, উত্তম আহার্য ও রমণীপ্রেমে মশগুল। এটা কি কখনো ইনসাফ হতে পারে? আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের কারো ঘরেই প্রবেশ করবো না। আমাকে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত করে দাও। সমর-সম্ভার নিয়ে আমি এই মুহূর্তে যুদ্ধযাত্রা করবো। মিলিত হবো আমার প্রিয়তম রসুলের সঙ্গে। এ কথা বলেই তিনি তাঁর উটের পিঠে চড়ে তাবুকের পথে ছুটতে শুরু করলেন। পথিমধ্যে সাক্ষাত ঘটলো হজরত উমায়ের বিন ওয়াহাবের সঙ্গে। তিনিও ছিলেন তাঁর মতো বিলম্বিত অভিযাত্রী। তাবুকের নিকটবর্তী হয়ে হজরত আবু খাইছুমা, হজরত উমায়ের বিন ওয়াহাবকে বললেন, আমার দ্বারা একটি গোনাহ্ হয়েছে। তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আপনি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করবেন না। দু'জনে একত্রে পথ চলতে শুরু করলেন। উপনীত হলেন রসুল স. এর কাছাকাছি। সাহাবীগণ একে অপরকে বললেন, কার বাহন এগিয়ে আসছে? রসুল স. বললেন, নিশ্চয় আবু খাইছুমার। সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্র কসম! তিনি নিকটবর্তী হলে রসুল স. বললেন, হে আবু খাইছুমা, খুবই কষ্ট করে এসেছো। হজরত আবু খাইছুমা সবকথা খুলে বললেন। রসুল স. তাঁকে সাধুবাদ জানালেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। আলোচ্য আয়াতে সকলকে তওবা করার প্রচ্ছন্ন আহ্বান জানানো হয়েছে। আর পরবর্তী আয়াতের (১১৮) প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে ক্ষমা। অথবা আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে তওবার তৌফিক প্রদানের কথা। আর পরবর্তী আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে তওবা কবুল করার কথা।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যাদেরকে লক্ষ্য করে 'আল্লাহ্ অনুগ্রহ পরবশ হলেন' বলা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো শাস্তি প্রদান করবেন না।

www.eelm.weebly.com

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۚ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ۚ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

❑ এবং তিনি ক্ষমা করিলেন অপর তিন জনকেও যাহাদিগের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হইয়াছিল যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদিগের জন্য উহা সংকুচিত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের জীবন তাহাদিগের জন্য দুর্বিষহ হইয়াছিল এবং তাহারা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নাই, পরে তিনি উহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ পরবশ হইলেন যাহাতে উহারা তওবা করে। আল্লাহ্ ক্ষমা-পরবশ, পরম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু লুবাবা ও তাঁর সঙ্গীগণ সম্পর্কে। তাঁরা তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু এজন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন। অনুতাপজর্জরিত অবস্থায় তাঁদের কাছে মনে হয়েছিলো এ বিশাল পৃথিবী অত্যন্ত সংকুচিত ও দুর্বিষহ। গভীরভাবে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনোই আশ্রয় নেই। অবশেষে আল্লাহ্তায়ালা তাঁদেরকে ক্ষমা করেছিলেন। কারণ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। বিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর দয়ার সীমা পরিসীমা নেই। এটাই আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ। হজরত আবু লুবাবার সঙ্গীগণ ছিলেন হজরত কা'ব বিন মালেক, হজরত মারারা বিন রবীয়া এবং হজরত হেলাল বিন উমাইয়া। তাঁরা সকলেই ছিলেন আনসার।

বোখারী, মুসলিম, আহমদ, ইবনে আবী শায়বা, ইবনে ইসহাক এবং আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব ইবনে মালেক বলেছেন, আমি তাবুক অভিযান ব্যতীত অন্য কোনো অভিযানে পশ্চাৎবর্তী ছিলাম না। অবশ্য বদর অভিযানে আমি অংশগ্রহণ করিনি। কারণ তখন অভিযানে অংশগ্রহণ করার সুযোগও আমার ছিলো না। আর যারা বদরে যাননি তাদের প্রতি আল্লাহ্ অসন্তোষও প্রকাশ করেননি। কারণ ওই অভিযানটি পূর্বপরিকল্পিত ছিলো না। রসুল স. মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য বাহিনীটিকে আক্রমণ করার জন্য। তারপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় ঘটনাক্রমে মুসলমানদেরকে মক্কা থেকে আগত সেনা-বাহিনীর মুকাবিলা করতে হয়। তৃতীয় আকাবার বায়াতের অনুষ্ঠানে অন্যান্য আনসারগণের সঙ্গে আমিও বায়াত গ্রহণ করেছিলাম। আমি মনে করতাম এই বায়াতের চেয়ে বদর যাত্রার মর্যাদা বেশী নয়। এটাও ছিলো আমার বদর অভিযানে অংশগ্রহণ না করার একটি কারণ।

www.eelm.weebly.com

তাবুক অভিযানের সময় সবদিক দিয়ে আমি ছিলাম স্বচ্ছন্দ। ইতোপূর্বে কখনো আমার স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো না। তখন দু'টো উট ছিলো আমার। রসুল স. এর রীতি ছিলো, তিনি স. কোনো স্থানে অভিযান করতে চাইলে প্রথমে সেকথা প্রকাশ করতেন না। কয়েকদিন পথ চলার পর কোথায় কিভাবে কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু তাবুক অভিযানের সময় তিনি এরূপ করেননি— কারণ তখন ছিলো গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ। ভ্রমণ পথ ছিলো সুদীর্ঘ ও বন্ধুর। শত্রুসংখ্যাও ছিলো অনেক। তাই রসুল স. যাত্রার পূর্বেই সকল কিছুর স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাঁর ঘোষণা শুনে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন দশ হাজার অকুতোভয় যোদ্ধা। হাকেম তাঁর 'ইকলিল' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত মুআয বলেছেন, তাবুক গমনের সময় আমাদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো তিরিশ হাজারেরও বেশী। আবু জুরআ বলেছেন, ওই সৈন্যদের লিপিবদ্ধকৃত কোনো তালিকা ছিলো না। তাই কেউ কেউ এ কথা ভেবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হননি যে, এই বিশাল সমাবেশে আমার অনুপস্থিতি নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। আমি বাদ পড়লে অন্য কারো পক্ষে এ কথা অনুধাবন করাও সহজ নয়। এ সম্পর্কে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলেই কেবল সর্বসমক্ষে বিষয়টি প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। অন্যথায় নয়।

রসুল স. যখন যাত্রা শুরু করলেন, তখন ফসলের মৌসুম। খেজুরের বাগানগুলো ফলে ভরপুর। বৃহস্পতিবার দিন রসুল স. যাত্রা শুরু করলেন। এভাবে বৃহস্পতিবার সফর শুরু করা ছিলো তাঁর পবিত্র অভ্যাস। আমিও সকাল সকাল রওয়ানা হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভাবলাম আমার তো রয়েছে দ্রুতগামী বাহন। আমি পরে রওয়ানা করলেও তাদেরকে ঠিকই ধরতে পারবো। রসুল স. তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে চলে গেলেন। আমি ভাবলাম দু'দিন পর রওয়ানা হলেই চলবে। একদিন একদিন করে চলে গেলো বেশ কয়েকদিন। একদিন সত্যি সত্যিই প্রস্তুত হলাম কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। রওয়ানা হতেই আমি দেখলাম কেবল মুনাফিকদের জটলা। আর দেখলাম অকর্মণ্য ও অক্ষম কিছু লোক। বুঝতেও পারলাম অনেক বিলম্ব করে ফেলেছি। ওদিকে তাবুকে উপনীত হওয়া পর্যন্ত রসুল স. আমার খোঁজ করেননি। তাবুকে পৌঁছে তিনি বলেন, কা'ব বিন মালেক কোথায়? সালমা অথবা আমার গোত্রের এক লোক (মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনানুসারে তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ বিন আনিস সালাবী) বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! দু'টি চাদরের অধিকারী সে। ওই মূল্যবান চাদরে পরিবৃত হয়ে সে এখন আরামে আয়েশে দিন কাটায়। হজরত মুআয বিন জাবাল অথবা হজরত আবু কাতাদা তাকে বললেন, তুমি ঠিক বলোনি। হে আল্লাহ্র রসুল, আল্লাহ্র কসম! আমি তার মধ্যে মন্দ কিছু দেখিনি। এ কথা শুনে রসুল স. মৌন হয়ে গেলেন। হজরত কা'ব ইবনে মালেক আরো বর্ণনা করেছেন, আমি কিছুদূর অগ্রসর হতেই সংবাদ পেলাম রসুল স. তাবুক থেকে ফিরে আসছেন। চিন্তিত হলাম।

www.eelm.weebly.com

ভাবলাম, এখন আমি কিভাবে রসুল স. এর অপ্রসন্নতা থেকে আত্মরক্ষা করবো। ঘরে ফিরে পত্নীদ্বয়ের সঙ্গেও এ বিষয়ে পরামর্শ করলাম। যখন রসুল স. মদীনার নিকটবর্তী হলেন তখন আমার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেলো। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, অযৌক্তিক কোনো অজুহাত আমি প্রদর্শন করবো না। যা সত্য তাই বলবো। নিশ্চয় এর মধ্যেই রয়েছে আমার পরিত্রাণের উপায়।

রসুল স. মদীনায় পৌঁছলেন প্রাতঃকালে। ইবনে সা'দের বর্ণনানুসারে তখন ছিলো রমযান মাস। হজরত কা'ব বলেন, রসুল স. সর্বপ্রথম প্রবেশ করলেন মসজিদে। দুই রাকাত নামাজ পাঠ করলেন। তারপর সেখানেই বসে পড়লেন। একটু পরে গেলেন প্রাণপ্রিয় আত্মজা ফাতেমার গৃহে। সেখান থেকে এলেন তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীদের নিকটে। নামাজ পাঠের পর যখন তিনি মসজিদে বসেছিলেন, তখন অনেকে এসে তাদের তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে বিভিন্ন ওজরাপত্তি পেশ করছিলো। তাদের সংখ্যা ছিলো প্রায় আশিজন। রসুল স. সকলের ওজর গ্রহণ করেছিলেন, সকলের নিকট থেকে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং সকলের জন্য দোয়াও করেছিলেন। তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন প্রকাশ্য দিকটিকে। অভ্যন্তরীণ দিকটিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ্‌র জিম্মায়। আমিও উপস্থিত হলাম। তিনি স. আমাকে দেখে মৃদু হাসলেন। কিন্তু সে হাসিতে ছিলো রোষের আভাস। ইবনে আবিদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেন, রসুল স. আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এ রকম করছেন কেনো? আল্লাহ্‌র কসম! আমি মুনাফিক নই। ইমান ও ইসলাম হতে আমি একচুলও এদিক ওদিক সরিনি। রসুল স. বললেন, সঙ্গে গেলে না কেনো? তুমি কি যুদ্ধের জন্য বাহন ক্রয় করতে পারোনি? আমি বললাম, করেছি। হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি অন্যদের মতো ওজরাপত্তি পেশ করলে আপনি হয়তো প্রসন্ন হতেন, যেমন অন্যদের প্রতি হয়েছেন। কিন্তু আমি জানি অনতিবিলম্বে আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে আমার প্রতি অপ্রসন্ন করে দিতেন। এ কথাও জানি যে, আমি সত্যকথা বললে আপনি হয়তো সাময়িক রোষ প্রকাশ করবেন। কিন্তু আমি আশা করি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। তাই আমি সত্যকথা প্রকাশ করছি— আমার আসলে কোনো ওজরই ছিলো না এবং আমি ছিলাম ইতোপূর্বের সকল সময়াপেক্ষা অধিকতর স্বচ্ছন্দ। রসুল স. বললেন, তুমি ঠিক বলেছো। এখন তুমি যাও। হয়তো আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার সম্পর্কে আমাকে কিছু নির্দেশনা দান করবেন।

আমাকে এ রকম করতে দেখে বনী সালমার কিছু লোক আমাকে বললো, এমন করলে কেনো? একটা কিছু অজুহাত খাড়া করলেই রসুল স. তা গ্রহণ করতেন এবং তোমার জন্য দোয়াও করতেন যেমন আমাদের জন্য করেছেন।

www.eelm.weebly.com

তাঁর দোয়াইতো মাগফিরাতের জন্য যথেষ্ট। কেউ কেউ এ কথা বলে আমাকে এতো উত্যক্ত করলো যে, আমার মনে হলো রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে গমন করে আমি আমার পূর্বের উক্তি প্রত্যাহার করি। পরে ভাবলাম নাহ্। দু'টো পাপকে আমি একত্র করতে পারবো না। একটি অপরাধ করেছি রসুল স. এর সঙ্গে না গিয়ে, এখন মিথ্যা অজুহাত তুলে আর একটি পাপ করবো কেনো? আমি লোকদেরকে বললাম, আর কেউ কি এমন করেছে? জেহাদে যায়নি, অথচ মিথ্যা অজুহাতও দেখায়নি? লোকেরা বললো, হ্যাঁ। আরো দু'জন এমন করেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে কে? লোকেরা বললো, মুরারা বিন রবীয়া ও হেলাল বিন উমাইয়া। হাসান বসরী থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত কা'বের তাবুক অভিযানে না যাওয়ার কারণ ছিলো একটি বাগান। বাগানটি ছিলো অরক্ষিত। তিনি ভেবেছিলেন অনেক জেহাদ তো করলাম। এবার না হয় নাই গেলাম। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি বলেছিলেন, এ বাগানের মোহে আমি যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থেকেছি। সুতরাং বাগানটি আমি আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিবো। তাঁর দ্বিতীয় সঙ্গীর অবস্থা ছিলো এ রকম— তাঁর স্ত্রী বললো, এ তপ্ত আবহাওয়ায় এতো দূরের সফরে যেয়ো না। ইতোপূর্বের জেহাদগুলোতে তো অংশগ্রহণ করেছোই। অনেক লোক যাচ্ছে, তুমি না হয় নাই গেলে। এবার তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। তিনি তাই করেছিলেন। কিন্তু পরে ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপের আগুনে দগ্ধিভূত হতে লাগলেন। বললেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি আর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করবো না (যতক্ষণ না আমার সম্পর্কে নতুন কোনো নির্দেশ নাজিল হয়)।

হজরত কা'ব ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, লোকেরা আমাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দু'জন সাহাবীর নাম বললেন। শুনলাম তাঁরাও আমার মতো তাবুকে যাননি এবং তাঁরাও আমার মতো সত্যকথা বলেছেন, মিথ্যা অজুহাত তুলে ধরেননি। তাঁরা দু'জন ও আমি— আমাদের এই তিনজনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো। রসুল স. তাঁর সকল সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন, এদের সঙ্গে সালাম কালাম বন্ধ করে দাও। সকলে তাই করলেন। ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেন, সকালে আমরা কয়েকজনের সাক্ষাৎ পেলাম কিন্তু কেউ আমাদের সাথে কথাবার্তা বললেন না। আমাদের অভিবাদনের প্রত্যুত্তরও দিলেন না।

আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেন, তাদেরকে দেখে মনে হতো তাঁরা যেনো আমাদেরকে চিনেনেই না। মনে হতো আমরা যেনো বিদেশী। কারো নিকট থেকে সামান্য সহমর্মিতা পাবার যেনো কোনো অধিকারই আমাদের নেই। সবচেয়ে বেদনাদায়ক চিন্তাটি ছিলো এই— এমতাবস্থায় যদি আমি

www.eelm.weebly.com

মৃত্যুবরণ করি, তবে রসুল স. তো আমার জানাযার নামাজও পড়বেন না। আর যদি তাঁর মহাপ্রস্থান ঘটে, তবে আমাদের এই একঘরে অবস্থাটি হবে চিরস্থায়ী। কেউ আর কোনোদিন আমাদের সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখবে না। মরে গেলে জানাযাও পড়বে না। এভাবে আমরা হয়ে পড়বো সকল পৃথিবীবাসীর নিকটে অপাংতেয়। হায়! স্বভূমি আজ আমাদের জন্য প্রবাস। বিস্তৃত পৃথিবী আজ আমাদের জন্য শ্বাসরুদ্ধকর । এই অসহনীয় পরিস্থিতিতে অতিবাহিত হলো পঞ্চাশ রাত্রি। আমার সঙ্গী দু'জন দুশ্চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়লেন। নির্জীবের মতো পড়ে রইলেন আপন গৃহকোণে। কিন্তু আমি ছিলাম শক্তিশালী যুবক। তাই আমি নিয়মিত মসজিদে সকলের সঙ্গে নামাজের জামাতে অংশগ্রহণ করতাম এবং বাজারেও গমনাগমন করতাম। কিন্তু আমার দিকে কেউ দৃষ্টিপাতও করতো না, সালাম কালামও করতো না। মসজিদে নামাজের পর রসুল স.যখন সাহাবীদেরকে নিয়ে বসতেন, তখন আমি সালাম প্রদান করতাম কিন্তু কোনো উত্তর পেতাম না। একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতাম তাঁর পবিত্র ওষ্ঠাধর থেকে কোনো প্রত্যুত্তর ধ্বনিত হচ্ছে কিনা। কখনো কখনো তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নামাজ পাঠ করতাম। ভাবতাম তিনি কি দেখছেন? মনে হতো, হয়তো দেখছেন। নামাজ শেষে যখন তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতাম, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতেন অন্যদিকে। সাহাবীগণও সবসময় দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। একদিন আমি আবু কাতাদার বাগানের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে বাগানে প্রবেশ করলাম। তিনি ছিলেন আমার পিতৃব্যপুত্র ও বনী সালমা গোত্রভূত। অর্থাৎ আমার পিতার আপন ভাইয়ের পুত্র তিনি ছিলেন না। কিন্তু তার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা ছিলো অধিক। বাগানে তাকে দেখে আমি সালাম বললাম। কিন্তু তিনি নির্বাক। আমি বললাম, হে আবু কাতাদা! তুমিতো ভালো করেই জানো আমি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলকে কতো ভালোবাসি। তিনি নীরব রইলেন। আমি আবারও আমার কথার পুনরাবৃত্তি করলাম। তবুও তিনি রইলেন বাকহীন। তৃতীয় অথবা চতুর্থ বার একই কথা উচ্চারণ করার পর তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। এ কথা শুনে আমার চোখ ফেটে কান্না এলো। ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিয়ে আমি চলে এলাম সেখান থেকে। আর এক দিনের ঘটনা। বাজারে দেখা হলো এক সিরিয়াবাসীর সঙ্গে। মদীনার বাজারে সে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে এসেছিলো। আমার খোঁজ করছিলো সে। কেউ একজন হয়তো ইশারায় আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলো। সে আমাকে একটি চিঠি দিলো। চিঠিটি সিরিয়ার প্রশাসকের পক্ষ থেকে লেখা। ইবনে আবী শায়েবার বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেন, আমি ভেবেছিলাম সিরিয়া প্রবাসী আমার গোত্রীয় কোনো লোক হয়তো আমাকে চিঠি দিয়েছে। চিঠিটি ছিলো রেশমি বস্ত্রে মোড়ানো। মোড়ক খুলে আমি পড়তে শুরু করলাম— 'আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তোমার সঙ্গী তোমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তুমিতো এরূপ অসম্মানের উপযোগী নও। তোমার অধিকারকে পদদলিত করা হচ্ছে।

www.eelm.weebly.com

ইচ্ছে করলে তুমি আমাদের কাছে চলে আসতে পারো। তোমার জন্য রয়েছে আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি।' চিঠিটি পড়ে আমি আরো বেশী চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম হায় কোথায় গিয়ে পড়লাম। আমি এখন কাফেরদের লোভ লালসার শিকার। চিঠিটি আমি ফেলে দিলাম জ্বলন্ত উনুনে। ইবনে আবিদের বর্ণনায় এসেছে, চিঠিটি পড়ে হজরত কা'ব রসুল স.কে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের সম্পর্কচ্যুতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আমরা এখন হয়ে পড়েছি মুশরিকদের লালসার লক্ষ্য।

এভাবে অতিবাহিত হলো চল্লিশ রাত্রি। রসুল স. এর পক্ষ থেকে এক সংবাদ বাহক প্রেরিত হলো আমার নিকটে। মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, ওই সংবাদ বাহকের নাম হজরত খুজাইমা ইবনে সাবেত। তিনি আমার অপর দুইজন সঙ্গী মুরারা ও হেলালের নিকটও গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের প্রতি রসুল স. এর নির্দেশ— স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করো। আমি বললাম, তালাক দিবো, না অন্য কিছু করবো? তিনি বললেন, না তালাক নয়। কেবল সম্পর্কচ্ছেদ। নির্দেশ পেয়ে আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, আমার নিকট থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাও। পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এভাবেই থাকতে হবে আমাদেরকে। ওদিকে হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী খাওলা বিনতে আসেম মহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার স্বামী হেলাল বয়োঃবৃদ্ধ। নিজে নিজে তিনি তার প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পন্ন করতে পারেন না। আর আমাদের কোনো পরিচারকও নেই। এখন আমি যদি তার প্রয়োজনীয় কাজ করে দেই তবে কি দোষ হবে? ইবনে আবী শায়েবার বর্ণনায় এসেছে, হজরত খাওলা বললেন, তিনি বৃদ্ধ ও দুর্বল দৃষ্টিধারী। রসুল স. বললেন, তুমি তোমার স্বামীর অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলো করে দিতে পারো। কিন্তু সে তোমার শয্যাসঙ্গী হতে পারবে না। হজরত খাওলা বললেন, আল্লাহর শপথ! তার তো ওসবের খেয়ালই নেই। যখন থেকে আপনি তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন তখন থেকেই সে অবিরাম কেঁদে চলেছে। হজরত কা'ব বলেন, আমার গৃহবাসীরা আমাকে বলেছিলো, হেলালের স্ত্রীর মতো তুমিও তোমার স্ত্রীর মাধ্যমে তোমার খেদমতের অনুমতি নিয়ে নাও। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি এ রকম করবো না। তিনি হয়তো অপ্রসন্ন হবেন। কারণ আমি হেলালের মতো বৃদ্ধ নই। আমি তো যুবক। এভাবে অতিবাহিত হলো আরো দশটি রাত। পঞ্চাশটি রাত অতিবাহিত হলো এভাবে।

আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেছেন, পঞ্চাশতম রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশে আমাদের তওবা কবুল হওয়ার শুভ সংবাদ সম্বলিত আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। জননী উম্মে সালমা বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি কি কা'বকে সদ্য অবতীর্ণ এই শুভ সংবাদটি জানাবো? রসুল স. বললেন, না। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন এসে ভীড় করবে। ফলে বাকী রাত তুমি আর আরাম করতে পারবে না।

www.eelm.weebly.com

হজরত কা'ব বলেছেন, পঞ্চাশতম রাতের ভোরে নামাজের পর আমি বসেছিলাম আমার ঘরের ছাদে। আমার অবস্থা তখন তেমনি যেমন উল্লেখ করা হয়েছে কোরআন মজীদের আয়াতে এভাবে— পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিলো এবং তাদের জীবন তাদের জন্য হয়েছিলো দুর্বিষহ। হঠাৎ শুনলাম একজন চিৎকার করে বলছে, হে কা'ব বিন মালেক! তোমার জন্য শুভসমাচার। মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর তখন উচ্চস্বরে উচ্চারণ করেছিলেন, আল্লাহ্ কা'বের প্রতি দয়া করেছেন। হে কা'ব আনন্দিত হও। উকবার বর্ণনায় এসেছে, তখন হজরত কা'বকে সুসংবাদ জানানোর জন্য দৌড়ে গিয়েছিলেন দু'জন সাহাবী। যিনি পশ্চাতে ছিলেন তিনি পাহাড়ে উঠে চিৎকার করে বলেছিলেন, হে কা'ব! শুভসমাচার! শুভসমাচার! তোমার তওবা কবুল হয়েছে। তোমার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে কোরআনের আয়াত। ঐতিহাসিকদের মতে ওই দুইজন ব্যক্তির নাম হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর।

হজরত কা'ব আরো বলেছেন, শুভ সমাচার শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম। কাঁদতে শুরু করলাম অসহ্য আনন্দে। ফজরের নামাজের পর রসুল স. আমাদের তওবা কবুল হওয়ার সংবাদ প্রচার করেছিলেন। সে কথা শুনেই সংবাদ বাহকেরা দৌড়ে এসে আমাদেরকে সুসংবাদ জানিয়েছিলো। আমার অন্য সঙ্গীদ্বয়কেও সুসংবাদ দানের জন্য লোকেরা ছুটে গিয়েছিলো। একজন তো এসেছিলেন তাঁর ঘোড়া ছুটিয়ে। মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, ওই অশ্বারোহী ছিলেন হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম। আসলাম গোত্রের একলোকও ছুটে এসেছিলেন ঘোড়া নিয়ে। কিন্তু তার আগেই উচ্চকণ্ঠের আওয়াজ পৌঁছেছিলো আমার কানে। তবু ওই অশ্বারোহীকে (হজরত হামজা আসলামীকে) আমার দুই প্রস্থ কাপড় উপহার দিলাম। আল্লাহ্র কসম! আমার নিকট তখন ওই দুই প্রস্থ কাপড়ের অতিরিক্ত কিছুই ছিলো না।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু কাতাদা বলেছেন, কা'ব ওই দুই প্রস্থ কাপড় দিয়েছিলো কর্জ করে। হজরত হেলাল ইবনে উমাইয়াকে তওবা কবুল হওয়ার শুভ সংবাদ জানাতে ছুটে গিয়েছিলেন হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদ, হজরত হেলাল পানাহার পরিত্যাগ করেছিলেন। একাধারে রোজা রেখে চলেছিলেন তিনি। তার সঙ্গে চলছিলো তার অবিরাম রোদন। মনে হতো তিনি আর কখনো মাথা ওঠাতে পারবেন না। হজরত মুরারা বিন রবীয়াকে শুভ সংবাদ জানাতে ছুটে গিয়েছিলেন হজরত সুলকান বিন সালাম। তিনি ছিলেন হজরত সালামা বিন ওকাসের পিতা।

www.eelm.weebly.com

হজরত কা'ব কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, আমি রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে দলে দলে লোক আমাকে সাধুবাদ জানালো। করতে লাগলো করমর্দন ও আলিঙ্গন। মসজিদে উপস্থিত হয়ে আমি দেখলাম রসুল স. তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে বসে রয়েছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ এক লাফে আমার কাছে ছুটে এলেন। করমর্দন করলেন এবং বললেন, স্বাগতম। মুহাজিরদের মধ্যে তালহা ছাড়া আর কেউ দাঁড়ায়নি। আমি তালহার এই শিষ্টাচারের কথা ভুলতে পারবো না। আমি দেখলাম, রসুল স. এর পবিত্র মুখমণ্ডল আনন্দে ঝলমল করছে। আমি সালাম বললাম। প্রত্যুত্তর দেয়ার পর রসুল স. ঘোষণা করলেন, তোমার জন্মের পরে অতিবাহিত দিবসগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিবস হচ্ছে আজকের দিবস। আজ স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাকে শুভসংবাদ জানিয়েছেন। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি কি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শুভ সংবাদ জানাচ্ছেন, না আপনার পক্ষ থেকে। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। তোমরা সত্য কথা বলেছো, তাই আল্লাহ্ও তোমাদের সততার মূল্যায়ন করেছেন। আনন্দিত হলে রসুল স. এর পবিত্র মুখমণ্ডল আলোকজ্জ্বল হয়ে উঠতো। মনে হতো যেনো কিরণ প্রদানরত পূর্ণ শশী। আমি দেখলাম রসুল স. এর পবিত্র বদনমণ্ডল আনন্দালোকে সমুজ্জ্বল। নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! তওবা ও ক্ষমার পরিশিষ্টরূপে আমি আমার পক্ষ থেকে একটি বক্তব্য উত্থাপন করতে চাই। আমার সকল সম্পদ গ্রহণ করুন এবং তা সদ্কা হিসেবে বিলি বণ্টন করে দিন। রসুল স. বললেন, সম্পূর্ণ নয়, কিছু সম্পদ দান করো। এটাই তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, ঠিক আছে। অর্ধেক দান করবো। তিনি স. বললেন, না। আমি বললাম, তা হলে দান করবো এক তৃতীয়াংশ। তিনি স. বললেন, উত্তম। আমি বললাম, খায়বর যুদ্ধে যে গণিমত আমি লাভ করেছি, সেগুলো সবই আমি দান করতে চাই। এরপর বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আমার সত্যবাদিতার কারণে আমাকে পরিত্রাণ দান করেছেন। তাই আমি জীবনের কোনো মুহূর্তে কখনোই অসত্যকে প্রশ্রয় দিবো না। এখন থেকে এটাই হবে আমার একমাত্র কর্তব্য। মানুষের প্রতি এর চেয়ে অনুগ্রহ আর কি হতে পারে? ওই প্রতিজ্ঞার পর আমি আর কখনো মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেইনি। আশা করি অবশিষ্ট জীবনেও আল্লাহ্ আমাকে মিথ্যাচার থেকে রক্ষা করবেন। তওবা কবুল হওয়ার শুভ সংবাদের এই অধ্যায়ে আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন— লাক্বাদ তাবাল্লহু আলান্নাবিয়্যি ওয়াল মুহাজিরিনা ওয়াল আনসারী থেকে ওয়াকুনু মায়াস্ সদেক্বীন পর্যন্ত (১১৭ আয়াতের শুরু থেকে ১১৯ আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। হজরত কা'ব বলেন, আল্লাহ্র শপথ! যখন থেকে আল্লাহ্পাক আমাকে ইসলামের মাধ্যমে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন, তারপর থেকে এ রকম উচ্চ নেয়ামত ও অনুগ্রহ আর কেউ পায়নি। আর ওই নেয়ামত আমি পেয়েছিলাম রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে সত্য ভাষণের জন্য। আমি মিথ্যা বললে

www.eelm.weebly.com

মিথ্যাবাদীদের মতো নিশ্চয় ধ্বংস হয়ে যেতাম এবং অবতীর্ণ আয়াতে বিবৃত হতো আমার প্রতি ঘোর অসন্তোষ। যেমন অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে— সাইয়াহ্ লিফুনা বিল্লাহি লাকুম ইজান্ কালাবতুম ইলাইহিম......... ফাইন্নাল্লহা লাইয়ারদ্বা আনিল কওমিল ফাসেক্বীন (অচিরেই তারা আল্লাহ্র নামে আপনার নিকটে শপথ করবে যখন আপনি প্রত্যাবর্তন করবেন ...... নিশ্চয় পাপিষ্ঠদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট নন)।

হজরত কা'ব বলেন, যারা রসুল স. এর নিকটে কসম খেয়ে মিথ্যা অজুহাত পেশ করেছিলো, বায়াত গ্রহণ করেছিলো এবং লাভ করেছিলো রসুল স. এর দোয়া— আমরা ছিলাম তাদের ব্যতিক্রম। আমাদের বিষয়টিকে বিশেষভাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় মুলতবী রাখা হয়েছিলো। তাই আয়াতে বলা হয়েছে 'এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিন জনকেও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিলো।' এতে করে মিথ্যা অজুহাত প্রদর্শনকারীদের তুলনায় আমাদের অবমূল্যায়ন করা হয়নি। বরং আমাদের তিনজনকে বিশেষভাবে মর্যাদায়িত করার জন্য এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে—'যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিলো এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিলো এবং তারা উপলব্ধি করেছিলো যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো আশ্রয়স্থল নেই।' কেউ কেউ বলেছেন, পৃথিবী বিস্তৃত ও সংকীর্ণ হওয়া একটি বিশেষ দর্শনের ব্যাপার— যা সর্বজন দৃষ্টিগোচর নয়। মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থাই প্রতিফলিত হয় বাইরে। বিষণ্ন সাহাবীত্রয় এতো বেশী অস্বস্তিতে পড়েছিলেন যে, পৃথিবীর সকল কিছুই তাঁদের নিকটে হয়ে গিয়েছিলো বিস্বাদময়। ফলে পৃথিবীর বিশাল পরিসরে তাঁরা কোনো আশ্রয়ই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মনে হচ্ছিলো, ক্রমসংকোচনশীল এই পৃথিবী অসহ। তাঁরা সত্তাগতভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো আশ্রয় তাঁদের নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ পরবশ হলেন যাতে তারা তওবা করে। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।' এখানে 'তওবা করে' কথাটির অর্থ তওবার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অর্থাৎ তারা যেনো তওবাকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। আবু বকর ওয়ারাক বলেছেন, পাপ করার পর যদি এই বিশাল পৃথিবী সংকুচিত মনে হয়, জীবনকে মনে হয় দুর্বিষহ, তবে তাকেই বলা যেতে পারে বিশুদ্ধ তওবা। অর্থাৎ এতোক্ষণ ধরে বর্ণিত তিনজন সাহাবীর মতো তওবাই হচ্ছে প্রকৃত তওবা।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ দিনের তওবাকারীদের তওবা কবুল করার জন্য রাতে তাঁর আনুরূপ্যবিহীন হাত

www.eelm.weebly.com

প্রসারিত করেন। আর রাতের তওবাকারীদের তওবা কবুল করার জন্য হাত প্রসারিত করেন দিনে। পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়মটি চলতেই থাকবে। মুসলিম।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, এক মুসাফির কোনো বিজন প্রান্তরে হারিয়ে ফেললো তার উট। ওই উটের পিঠে বাঁধা ছিলো তার পানাহারের সরঞ্জামসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। হারানো উট খুঁজতে খুঁজতে পরিশ্রান্ত মুসাফির শুয়ে পড়লো এক বৃক্ষছায়ায়। শ্রান্তিহারক বাতাসের প্রভাবে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লো সে। দীর্ঘক্ষণ পর নিদ্রা ভঙ্গ হতেই সে দেখলো, চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তার হারানো উট। সে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। খুশির চোটে বলে উঠলো, হে আমার আল্লাহ্! নিশ্চয় তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার প্রভু। শোনো হে সাহাবীগণ! ওই মুসাফির তার হারানো উট পেয়ে যেমন আনন্দিত হয়, তার চেয়েও অনেক বেশী আনন্দিত হন আল্লাহ্, তার বান্দা তওবা করলে। মুসলিম। উল্লেখ্য যে, তওবা সম্পর্কে আরো অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

সুরা তওবা : আয়াত ১১৯

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ○

❒ হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত হও।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্কে ভয় করো এবং বিশ্বাসে ও অঙ্গীকারে সত্যানুসরণের অঙ্গীভূত হও। সংকল্পে হও শুদ্ধ (হও মুসলিম)। অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যকে আশ্রয় করো, সত্যাশ্রয়ী হও।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ভীতি সহ রসুল স. ও তাঁর সাহাবীদের সঙ্গী হও — যাঁরা বিশুদ্ধচিত্ত। তাঁদের অন্তরসমূহ কলঙ্কমুক্ত এবং আমল সমূহ বিশুদ্ধ। তাবুক অভিযানের সময় বিশুদ্ধচিত্ত সাহাবীগণ রসুল স. এর অনুগামী হয়েছিলেন। মুনাফিকদের মতো তাঁরা পশ্চাদপসরণ করেননি।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে আস্‌সদেক্বীন (সত্যবাদীগণ) এর লক্ষ্য হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের সঙ্গী হও। এক বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সত্যবাদীগণের সঙ্গী হও' কথাটির অর্থ— হজরত আলী ইবনে আবী তালেবের সঙ্গে থাকো। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যাগুলোর সব কয়টি আলোচ্য আয়াতের মর্মানুসারী।

www.eelm.weebly.com

ইবনে জারীহ বলেছেন, এখানে 'আস্‌সদেক্বীন' অর্থ মুহাজির সাদিক্বীন। আল্লাহ্‌পাক এক স্থানে ঘোষণা করেছেন— লিল ফুক্বরাইল মুহাজিরীনা ...... উলায়কা হুমুস্‌সদিক্বুন (দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য ...... তাঁরাই সত্যবাদী)। এই আয়াতে মুহাজির সাহাবীগণকে সদেক্বীন বা সত্যবাদী বলা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'আস্‌সদেক্বীন' বলে বুঝানো হয়েছে ওই তিন সাহাবীকে, যারা তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ না করার কারণে সত্য স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, মিথ্যা কৈফিয়ত দেননি।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, মিথ্যা কোনো অবস্থায়ই রীতিশুদ্ধ নয়। পরিহাসছলেও মিথ্যা প্রশ্রয়যোগ্য নয়। সুতরাং কেউ যেনো শিশুদেরকে এ রকম কিছু না বলে যা সে পূর্ণ করতে পারবে না। যদি তোমরা এ কথার প্রমাণ চাও তবে পাঠ করো— ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানুত্‌তাক্বুল্লহা ওয়াকুনু মায়াস্‌ সদেক্বীন (হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও)।

সুরা তওবাঃ আয়াত ১২০

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ○

❐ আল্লাহের রসূলের সহগামী না হইয়া পিছনে রহিয়া যাওয়া এবং তাহার জীবন অপেক্ষা নিজদিগের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা মদীনাবাসী ও উহাদিগের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদিগের জন্য সংগত নহে; কারণ আল্লাহের পথে উহাদিগের তৃষ্ণা, ক্লান্তি এবং ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের ক্রোধ-উদ্রেক করে এমন স্থানে পদক্ষেপ করা এবং শত্রুদিগের নিকট হইতে কিছু লাভ করা উহাদিগের সৎকর্মরূপে গণ্য হয়। আল্লাহ্‌ সৎকর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

---

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! রসুল স. যখন কোনো অভিযানে বহির্গত হন তখন তাঁর সহগামী না হয়ে স্বগৃহে অবস্থান করা এবং রসুলের জীবনাপেক্ষা তোমাদের নিজের জীবনকে অধিক প্রিয় মনে করা সংগত নয়। বিশেষ করে মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসী (জুহনিয়া, আশজায়া, আসলাম ও গিফার গোত্রভূত) দের জন্য এ রকম করা কিছুতেই সমীচীন নয়। কারণ আল্লাহ্‌র পথে তাদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া সৎকর্মরূপে গণ্য। তেমনি শত্রুদেরকে হত্যা করা, বন্দী করা, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করা— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ক্রোধ-উদ্রেককারী এ রকম পদক্ষেপ গ্রহণও সৎকর্ম। গণিমত হিসেবে শত্রুদের সম্পদ অধিকার করাও সৎকর্ম। আর আল্লাহ্ সৎকর্ম-পরায়ণদের শ্রমফল কখনো নষ্ট করেন না।

জেহাদ একটি কল্যাণকর কর্ম। জেহাদ হচ্ছে মানবতার সত্যপ্রত্যাখ্যানরূপী ব্যাধির অত্যাবশ্যক চিকিৎসা। জেহাদের মাধ্যমেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সত্যের পথে প্রত্যাবর্তনের সর্বশেষ সুযোগ করে দেয়া হয়। যেমন, উন্মাদকে শাস্তি দেয়া কখনো কখনো রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা হিসেবে কার্যকর করা হয়। শিশুদেরকে প্রহার করা হয় সুশিক্ষা দেয়ার জন্য। এভাবে জেহাদ কাফেরদেরকে সংশোধনের সুযোগ করে দেয়। এটাই হচ্ছে কাফেরদের জন্য জেহাদের কল্যাণকর দিক। আর মু'মিনদের জন্য কল্যাণকর দিক হচ্ছে— এতে করে ইসলামের অভ্যন্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানের অনধিকার অনুপ্রবেশ প্রতিহত হয়। মুসলমানদের ইমান ও আমল থাকে নিষ্কলুষ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌র পথে যার পদযুগল ধূলি ধূসরিত হবে, আল্লাহ্‌পাক তার জন্য দোযখ হারাম করে দিবেন। বোখারী, আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যুদ্ধরত মুজাহিদেরা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত প্রতিদিন রোজা পালনকারী, প্রতিরাতে নামাজ পাঠকারী এবং কোরআন পাঠকারীদের মতো। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াতের নির্দেশনাটি বিশেষ না সাধারণ— সে সম্পর্কে আলেমগণের মতপ্রভেদ রয়েছে।

কাতাদা বলেছেন, এই আয়াত রসুল স. এর সশরীরে যুদ্ধ-গমনের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর যুদ্ধ যাত্রার সময় শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করা বৈধ ছিলো না। তাঁর অনুপস্থিতিতে এই আয়াতের নির্দেশনাটির কার্যকারিতা আর নেই। এখন জেহাদের প্রয়োজন দেখা দিলে শাসক অথবা খলিফার সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণ না করাও জায়েয।

ওলিদ বিন মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আমি ইমাম আওজায়ী, আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক ইবনে জাবের এবং সা'দ বিন আবদুল আজিজকে বলতে শুনেছি, আলোচ্য আয়াতের কার্যকারিতা অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে যেরূপ ছিলো, সকল যুগে সেরূপই থাকবে। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেক যুগের শাসকগণের সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক।

www.eelm.weebly.com

ইবনে জায়েদ বলেছেন, এই আয়াতের কার্যকারিতা ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলো, যতদিন মুসলমানেরা ছিলো স্বল্পসংখ্যক। ইসলামের ব্যাপক বিস্তারের ফলে আলোচ্য আয়াতের বিধানটি রহিত হয়েছে। এখন কেউ জেহাদে যেতে না চাইলে তাকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা যাবে না। তাই এক আয়াতে এসেছে— ওয়ামা কানাল মু'মিনুনা লি'ইয়ানফিরু কাফ্ফাতান (বিশ্বাসীদের কী হলো, তারা এখনো সমবেতভাবে বের হচ্ছে না)।

আমি বলি, সকল ইমামের ঐকমত্য এই যে, জেহাদ ফরজে কেফায়া। প্রয়োজন দেখা দিলে মুসলমানদের একটি দল জেহাদ করবে। এ রকম করলে অন্য মুসলমানেরা ফরজ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করবে।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, জেহাদ ফরজে আইন। কারণ জেহাদের বিধান একটি সাধারণ বিধান। যারা তাবুক যুদ্ধে গমন করেনি তাদের সম্পর্কে কঠিন বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছিলো।

আমি বলি, সাধারণভাবে ব্যাপক ভিত্তিতে যদি জেহাদের প্রচারণা চালানো হয়, তবে আলেমদের ঐকমত্যানুসারে প্রত্যেক মুসলমানের উপর জেহাদ করা ফরজ হবে। তাবুক যুদ্ধের বেলায় এ রকমই ঘটেছিলো। যদি ব্যাপক ভিত্তিতে জেহাদের প্রচারণা চালানো না হয়, তবে জেহাদ হবে ফরজে কেফায়া। কেননা আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন— লা ইয়াসতাবিল ক্বায়েদুনা মিনাল মু'মিনীন (বিশ্বাসীদের মধ্যে উপবিষ্ট....)। এক আয়াতে বলা হয়েছে— ওয়া কিল্লাওঁ ওয়াদুল্লহুল হুস্না (প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্ কল্যাণের অঙ্গীকার করেছেন)। এখানে স্পষ্ট করে আল্লাহ্তায়ালা সকলের জন্য কল্যাণের অঙ্গীকার করেছেন। সেই কল্যাণের মর্যাদার মধ্যে তারতম্য অবশ্য ঘটতে পারে। কিন্তু এ কথা বলতে হবে যে, সকলেই কল্যাণ লাভের অধিকারী। তাই অন্যত্র বলা হয়েছে— ওয়ামাকানাল মু'মিনুনা লিইয়ানফিরু কাফ্ফাতান।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১২১

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

❑ এবং উহাদিগের ব্যয়, ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ এবং উহাদিগের প্রান্তর-অতিক্রমণ, উহাদিগের অনুকূলে লিপিবদ্ধ হয়— যাহাতে আল্লাহ্ উহারা যাহা করে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার উহাদিগকে দিতে পারেন।

হজরত ওসমান বিন আফ্ফান এবং হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ তাবুক যুদ্ধের জন্য অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তাঁদেরকে লক্ষ্য করে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'এবং তারা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যা কিছু ব্যয় করে।' এরপর বলা হয়েছে— 'যে কোনো প্রান্তরই অতিক্রম করে তা তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ হয়।'

www.eelm.weebly.com

এর অর্থ— মুজাহিদগণ যুদ্ধযাত্রার সময় যে পথ-প্রান্তর, উপত্যকা অতিক্রম করে তাও পুণ্যকর্ম হিসেবে পুণ্যের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে আল্লাহ্ তারা যা করে তা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদেরকে দিতে পারেন।' এভাবে পূর্ণ আয়াতটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— যারা মুজাহিদগণের জন্য অল্পবিস্তর অর্থ-ব্যয় করে এবং মুজাহিদেরা জেহাদের সময় পথের যে কষ্ট সহ্য করে, আল্লাহ্ তা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাদের পুণ্যকর্মের আমলনামায় লিখে রাখেন। তাদেরকে তাদের আমল অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট পুরস্কার প্রদানের জন্যই আল্লাহ্তায়ালা এ রকম করেন।

হজরত আবু মাসউদ আনসারী বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নাকে দড়ি লাগানো একটি উট নিয়ে হাজির হলো। বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! উটটি আল্লাহ্র রাস্তায় দান করলাম। রসুল স. বললেন, কিয়ামতের দিন এর বিনিময়ে তোমাকে সাতশত নাকে দড়ি লাগানো উট দেয়া হবে। মুসলিম।

হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ বর্ণনা করেছেন, খালেদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথের মুজাহিদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করে দিয়েছে, সে-ও জেহাদে অংশগ্রহণ করেছে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবার পরিজনের খোঁজ খবর নিয়েছে, সে-ও জেহাদে শরীক হয়েছে। বোখারী, মুসলিম। ওয়াল্লহু আ'লাম।

কালাবী উল্লেখ করেছেন— বনী আসাদ বিন খুজাইমা গোত্র দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে পড়লো। তাই তারা এসে আশ্রয় গ্রহণ করলো মদীনার রাস্তাঘাটের পাশে। ফলে রাস্তাঘাট হয়ে পড়লো অপরিচ্ছন্ন। বাজারে জিনিসপত্রের দামও গেলো বেড়ে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১২২

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ○

❑ বিশ্বাসিদিগের সকলের অভিযানে বাহির হওয়া সংগত নহে, উহাদিগের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হউক, অবশিষ্টরা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করুক এবং উহাদিগের সম্প্রদায়ের যাহারা ফিরিয়া আসিবে তাহাদিগকে সতর্ক করুক যাহাতে উহারা সতর্ক হয়।

---

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— জেহাদের উদ্দেশ্যে সকল মুসলমানের বহির্গমন সংগত নয়। একদল জেহাদ করবে। আর একদল করবে জ্ঞানানুশীলন। আর ওই জ্ঞানানুশীলনে নিয়োজিত ব্যক্তিরা অন্যদেরকে সতর্ক করবে। পথপ্রদর্শন করবে। অর্থাৎ যুদ্ধ অথবা জ্ঞানানুশীলন কোনোটার জন্যই সকল মুসলমান স্বস্থান ত্যাগ করবে না। করলে দেখা দিবে অনেক পারিবারিক, সামাজিক এবং উপার্জনগত বিপর্যয়।

এখানে 'ফাক্কাহু ফিদ্দীন' অর্থ ধর্মের জ্ঞানানুশীলন। ফেকাহ্ কথাটি এখান থেকেই এসেছে। নেহায়া রচয়িতা লিখেছেন, ফেকাহ্ শব্দটির আভিধানিক অর্থ অনুধাবন করা।

এখানে উল্লেখিত 'ফিরক্বাতিন্' অর্থ বৃহৎ দল। আর 'ত্বাইফাতুন' অর্থ ক্ষুদ্র দল। কামুস গ্রন্থে রয়েছে ফেকাহ্ অর্থ কোনো কিছু সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। আর সকল জ্ঞান অপেক্ষা ধর্মীয় জ্ঞানের মর্যাদা অনেক বেশী। তাই ধর্মীয় বিষয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ববর্গের জন্য 'ফকীহ্' শব্দটিকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, জ্ঞানার্জনের কারণ সমূহকে অবলম্বন করে অজানাকে জানার নাম ফেকাহ্। তাই প্রমাণনির্ভর জ্ঞানকে বিশেষভাবে 'ফেকাহ্' আখ্যা দেয়া হয়েছে। সাধারণ জ্ঞান অর্থে এলেম এবং বিশেষ জ্ঞান অর্থে ফেকাহ্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্পাক একস্থানে বলেছেন— 'ফামালি হাউলায়িল ক্বাউমি লাইয়াকাদুনা ইয়াফ্কাহুনা হাদীসা' (ওই সকল লোকের কী হয়েছে যে, তারা কথাবার্তাও বুঝতে সক্ষম নয়।)। অর্থাৎ ওই সকল লোক কথার অন্তর্নিহিত ভাবকে বুঝতে পারে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, প্রবৃত্তিবিরোধী কল্যাণকর দানের বিষয়কে বলে ফেকাহ্। কাজেই চিন্তা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে হোক অথবা কথা ও কর্মের মাধ্যমে হোক, সকল কল্যাণকর অর্জনকেই বলা যেতে পারে ফেকাহ্। ধর্মের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে জ্ঞানকে বিশেষভাবে ফেকাহ্ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে পরবর্তী সময়ে। প্রথম যুগে (রসুল স. এর যুগে) এই বিশেষায়ণটি ছিলো না।

প্রকাশ্যতঃ ফেকাহ্ শব্দটির মধ্যে মুকাল্লিদ (অনুসরণকারী) দের জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মুজতাহিদ (গবেষক) দের গ্রন্থ থেকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ফরজ দায়িত্বটি প্রতিপালিত হয়ে থাকে, যে ফরজ দায়িত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে এভাবে— 'দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করুক।'

'এবং তাদের সম্প্রদায়ের যারা ফিরে আসবে তাদেরকে সতর্ক করুক যাতে তারা সতর্ক হয়'— কথাটির অর্থ দূর দেশে জ্ঞানার্জনের পর দেশে ফিরে এসে জ্ঞানীদেরকে পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আল্লাহ্র বিধান-বিরোধী কিছু হতে দেখলে বিধান লংঘনকারীদেরকে সাবধান করে দিতে হবে। ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তার যথা উত্তর প্রদান করতে হবে।

www.eelm.weebly.com

ইমাম শাফেয়ীর বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, কয়েকজন লোক ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রাম অঞ্চলের দিকে চলে গিয়েছিলো। সেখানকার এক লোক প্রচারক দলটিকে বললো, তোমরা রসুল স.কে ছেড়ে এলে কী করে? এ কথা শুনে তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলো এবং রসুল স.কে সব কথা খুলে বললো, তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। রসুল স. বললেন, তোমরা পেয়েছো স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি— ভালো ও মন্দের জ্ঞান। মূর্খতার যুগে উত্তম ছিলাম কেবল আমি। এখন তোমরাও ধর্মের জ্ঞান অর্জন করে উত্তম পদবাচ্য হয়েছো। এই বিবরণটি উল্লেখিত হয়েছে বোখারী ও মুসলিমে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জ্ঞানী ও জ্ঞানদানকারী ছাড়া অন্য কেউই উত্তম নয়।

আলোচ্য আয়াতে এই ইঙ্গিতটিও এসেছে যে, খবরে আহাদ (একক বর্ণনা) ও দলিল হিসেবে গ্রাহ্য। কেননা এখানে বলা হয়েছে— কুল্লু ফিরক্বাতিন (প্রত্যেক দলের)। বিধানটি একটি সাধারণ বিধান। এতে করে বুঝা যায় যে, কোনো জনপদে যদি মাত্র তিন ব্যক্তি বসবাস করে তবে তার মধ্যে একজনকে জ্ঞানার্জনের জন্য সফর করতে হবে। শিক্ষা সমাপ্তির পর ফিরে আসতে হবে আপন আবাসে এবং অন্যকে দিতে হবে যথাযথ ধর্মীয় নির্দেশনা। এ রকম না করা হলে কুল্লি ফিরক্বাতিন কথাটি হয়ে পড়বে অনর্থক। ফেকাহ্ শাস্ত্রের কিছু অংশ ফরজে আইন এবং কিছু অংশ ফরজে কেফায়া। বিশুদ্ধ আকিদা এবং অবশ্য পালনীয় আমলসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ফরজে আইন। যেমন তাহারাত, নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ ইত্যাদি। আরো কিছু বিদ্যা অর্জন করা ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়, সুদ, ইজারা, শ্রম, চাকুরী, ইত্যাদি। এ সকল পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে তাদের স্ব স্ব পেশার জ্ঞানাহরণ ফরজ। রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জ্ঞানান্বেষণ ফরজ। হাদিসটি হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে আদী এবং ইমাম হাসান বিন আলী থেকে বায়হাকী। আরো বর্ণনা করেছেন খতিব ও তিবরানী। তিবরানী বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। আর খতিব বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে। হজরত আলী থেকেও তিবরানী বর্ণনা করেছেন। আর বায়হাকী বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। হজরত আনাস থেকে ইবনে আবদুল বারের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— জ্ঞানানুসন্ধানীর (তালেবে এলেমের) জন্য সকলেই দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। সাগরভ্যন্তরের মৎস্যও। এক বর্ণনায় এসেছে, 'এবং আল্লাহ্ বিপদগ্রস্তদের ফরিয়াদ পছন্দ করে থাকেন।'

www.eelm.weebly.com

ওই সকল এলেম ফরজে কেফায়া যেগুলো অর্জন না করলে ফতোয়া দেয়া যায় না। এ ধরনের বিজ্ঞ ফকিহ্ কোনো জনপদে না থাকলে ওই জনপদের সকলে গোনাহ্গার হবে। কিন্তু এক ব্যক্তিও থাকলে সকলের মাথা থেকে ফরজ দায়িত্ব সরে যাবে। আর ওই জনপদবাসীর সকলের অবশ্য কর্তব্য হবে ওই বিজ্ঞ আলেমের অনুসরণ (তাকলিদ) করা। তিনি যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন, তাই তাদেরকে মেনে নিতে হবে।

এলেম অর্জন সকল প্রকার নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে 'সনদুল ফেরদৌস' প্রণেতা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র নিকট এলেম অন্বেষণ, নামাজ, রোজা, হজ এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ করার চেয়ে উত্তম। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, কিছুক্ষণ জ্ঞানার্জনে ব্যাপৃত থাকা সারা রাত্রি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম। আর জ্ঞান সংগ্রহের জন্য একদিন নিয়োজিত থাকা তিনদিন রোজা রাখার চেয়ে উত্তম। রসুল স. বলেছেন, আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা এ রকম, যেমন তোমাদের মধ্যে আমার মর্যাদা। নিঃসন্দেহে জ্ঞানানুসন্ধানীদের উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হয়। আসমানবাসী ফেরেশতাকুল এবং জমিনবাসী সকল সৃষ্টি, এমন কি গর্তের পিপীলিকা এবং পানির মাছও তাদের জন্য দোয়া করে থাকে। হজরত আবু উমামা থেকে যথাসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজা ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হাজার আবেদ অপেক্ষা একজন আলেম শয়তানের নিকট অধিক বিপদের কারণ। রসুল স. আরো বলেছেন, মৃত্যুর পর মানুষের সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। প্রবহমান সওয়াবের সূত্র হিসেবে অবশিষ্ট থাকে কেবল তিনটি সূত্র। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ওই এলেম, যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়েছে। অপর দু'টো হচ্ছে জনহিতকর কর্ম ও পুণ্যবান সন্তান।

সুফিয়ানে কেরামের মাধ্যমে প্রচারিত ইলমে লাদুন্নী বা বাতেনে এলেম অর্জন করাও ফরজে আইন। এই এলেমের মাধ্যমে দু'টি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যেমন ১. আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের আকর্ষণ অন্তর থেকে অপসারিত হয়। মুহুর্মুহু আল্লাহ্র স্মরণ জাগ্রত থাকে সত্তায়। তাই হিংসা, লোভ, পরশ্রীকাতরতা, অহংকার, যশাকাঙ্খা, ধর্মীয় বিষয়ে আলস্য ইত্যাদি অসৎ স্বভাব দূর হয়ে যায়। প্রবৃত্তি হয়ে যায় পরিচ্ছন্ন। ২. পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনের (তওবার বিষয়টি হয়ে যায় চিরস্থায়ী। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও অন্যান্য শুভবৃত্তি। নফস্ হয় পবিত্র। আরো লাভ হয় বিশুদ্ধচিত্ততা। এই চিত্তবিশুদ্ধতা (এখলাস) অর্জিত না হলে নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদতসমূহ হয়ে পড়ে গ্রহণের অযোগ্য। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ কেবল ওই আমলগুলোকে গ্রহণ করেন, যেগুলো তাঁর সন্তোষ সাধনার্থে কেবল তাঁর উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হয়। হজরত আবু উমামা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নাসাঈ।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের প্রকাশ্য রূপ ও পার্থিব বৈভবের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, দৃষ্টিপাত করেন অন্তরের দিকে।

উল্লেখ্য যে, যে সূত্রে ফরজে আইনের বিদ্যা অর্জিত হয়, সেই সূত্রবদ্ধ হওয়াও ফরজে আইন। তাই ইলমে লাদুন্নী লাভের প্রয়োজনে সুফিয়ানে কেরামের অনুসারী হওয়াও ফরজে আইন।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আরো একটি কারণ রয়েছে। কারণটি এই— বাগবী সূত্রে কালাবী এবং ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইকরামা, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমায়ের এবং হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাবুক যুদ্ধের সময় আল্লাহ্ মুনাফিকদের দোষত্রুটি বর্ণনা করে বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণ করেন। অবতীর্ণ হয়— 'ইনল্লা তানফিরু ইয়ু আজ্জিব্কুম আ'জাবান আলীমা' (যদি বহির্গত না হও তাহলে তোমাদেরকে দেয়া হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)। রসুল স. জেহাদের ডাক দেন। চতুর্দিক থেকে মুজাহিদেরা সমবেত হয়। কেউ কেউ আবার রসুল স. এর সঙ্গ পরিত্যাগ করে। হজরত ইকরামা বলেছেন, মরু গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধ যাত্রা থেকে বিরত থাকে। মুনাফিকেরা বলতে শুরু করে, এবার মরুবাসীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তখন অবতীর্ণ হয়— মাকানাল্ল মু'মিনুনা লি'ইয়ানফিরু কাফ্ফাতা ফালাওলা নাফারা মিন কুল্লি ফিরক্বাতিন তাইফাতুন লিইয়াতাফাক্কাহু ফিদ্দীন (বিশ্বাসীদের সকল অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বের হোক, অবশিষ্টরা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করুক)। এই নির্দেশানুসারে সমগ্র মুসলিম জামাত থেকে বৃহৎ দলকে প্রেরণ করতে হবে সশস্ত্র যুদ্ধে এবং ক্ষুদ্র দলকে রাখতে হবে রসুল স. এর সঙ্গে। তাঁরা বিশেষভাবে দ্বীনের জ্ঞানানুশীলন করবেন। মুজাহিদ বাহিনী ফিরে এলে তাঁরা তাঁদেরকে সদ্য অবতীর্ণ বিধান সম্পর্কে অবহিত করবেন। সেরকমই করা হয়েছিলো। তাই জ্ঞানানুশীলনের প্রবাহ কখনো রুদ্ধ হয়নি।

দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিদ্যা চর্চা হচ্ছে জেহাদে আকবর (বড় জেহাদ)। আর সশস্ত্র যুদ্ধ হচ্ছে জেহাদে আসগর (ছোট জেহাদ)। কারণ রেসালতের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে বিশ্বমানবতার সম্মুখে দলিল প্রমাণ পেশ করা। সত্য ধর্মকে যথার্থরূপে উপস্থাপন করা। সশস্ত্র জেহাদের প্রয়োজন সাময়িক। কিন্তু বিদ্যা চর্চার প্রয়োজন সার্বক্ষণিক। তাই ধর্মীয় বিদ্যা প্রচারের মর্যাদা সকল কিছুর উর্ধ্বে। রসুল স. তাই এরশাদ করেছেন, বিদ্বানগণ নবী রসুলগণের উত্তরাধিকারী। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার এই প্রেক্ষিতটি বিবেচনায় আনলে বলতে হয় 'লি ইয়া তাফাক্কাহু' (জ্ঞানানুশীলন করুক) এবং 'লিইউনজিরু' (সতর্ক করুক) শব্দ দু'টোর সর্বনাম ওই সকল লোকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে যারা জেহাদের সফরে রসুল স. এর সাহচর্যে জ্ঞানানুশীলনে রত থাকতেন। আর 'রাজাউ' (তারা ফিরে আসে) কথাটির সর্বনাম সম্পর্কযুক্ত হবে জেহাদে গমনকারীদের সঙ্গে।

www.eelm.weebly.com

আল্লামা সুয়ূতি লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতের বিধান কার্যকর ছিলো ওই সময়ে, যখন রসুল স. এর সহযোদ্ধা হওয়া ছিলো অত্যাবশ্যক এবং তখন জেহাদ পরিত্যাগ ছিলো নিষিদ্ধ।

হাসান বলেছেন, 'লি ইয়াতাফাক্কাহু' এবং 'লি ইউনজিরু' শব্দ দু'টোর সর্বনাম এখানে প্রত্যাবর্তিত হবে সশস্ত্র মুজাহিদদের সঙ্গে। এ রকম হলে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— এমন কেনো হবে না যে, দু'টি বৃহৎ দল থেকে একটি দল যুদ্ধযাত্রা করবে এবং বিধর্মীদেরকে পরাজিত করে ফিরে এসে স্বভূমির কাফেরদেরকে বলবে, আল্লাহ্ তাঁর রসুল এবং বিশ্বাসীগণকে বিজয় দান করেছেন। এভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করার উদ্দেশ্য এই হবে যে, কাফেরেরা যেনো সংযত হয় এবং এই ভেবে ভীত হয় যে, রসুল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ওই পরাজিত কাফেরদের যে অবস্থা হয়েছে, আমাদের অবস্থাও হবে সেরকম। তাই আয়াতের সব শেষে বলা হয়েছে 'যাতে তারা সতর্ক হয়'।

উপরে বর্ণিত আলোচনার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, জেহাদ ফরজে কেফায়া। মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক জেহাদ করলে অন্য সকলে দায়মুক্ত হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সকলের প্রতি সাধারণভাবে জেহাদের ডাক দেয়া হলে প্রত্যেকের জন্য জেহাদে অংশগ্রহণ করা হবে ফরজ।

সূরা তওবা ঃ আয়াত ১২৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

❑ হে বিশ্বাসিগণ! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের মধ্যে যাহারা তোমাদিগের নিকটবর্তী তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ কর এবং উহারা তোমাদিগের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ সাবধানীদের সহিত আছেন।

এখানে নিকটে বসবাসকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জেহাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশোধন। আর সংশোধিত হওয়ার অধিকার স্বজন ও প্রতিবেশীদেরই বেশী। তাই রসুল স.কে নিকট প্রতিবেশী ও স্বজনদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। হিজরতের পর জেহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো প্রতিবেশী বনী কুরায়জা ও বনী নাজিরের বিরুদ্ধে। এরপর খায়বরের ইহুদীদের বিরুদ্ধে। মক্কা বিজয়ের পর যখন সমগ্র আরব ভূখণ্ড অধিকৃত হলো, তখন আরব জাহানে জেহাদের প্রয়োজনও শেষ হয়ে গেলো। তাই এই আয়াতের মাধ্যমে জেহাদের নির্দেশ দেয়া হলো পার্শ্ববর্তী রোমানদের বিরুদ্ধে।

www.eelm.weebly.com

পারস্য, ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যে সিরিয়াই ছিলো মদীনার অধিকতর নিকটে। সিরিয়া ছিলো রোম রাজ্যের শাসনাধীন একটি অঞ্চল। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাই রসুল স. তাবুক অভিযানে বের হয়ে গেলেন। কারণ আয়াতে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে— (হে আমার রসুল ও রসুলের একনিষ্ঠ অনুসারী) 'হে বিশ্বাসীগণ! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক।' আলোচ্য আয়াতের এ রকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মারদুবিয়া, মুজাহিদের উক্তিরূপে ইবনে আবী শায়বা ও ইবনে মুনজির এবং হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে জারীর।

আলোচ্য আয়াতের আলোকে ফকীহ্‌গণ অভিমত প্রকাশ করেছেন এ রকম— পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা মুসলমানদের উপরে ওয়াজিব। যদি তারা এই ওয়াজিব দায়িত্ব পালন না করে, তবে ওই মুসলমান-দের পার্শ্ববর্তী রাজ্যে বা অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানদের উপর জেহাদ ওয়াজিব হবে। তারা যদি শক্তিহীনতা, আলস্য, কাপুরুষতা অথবা অন্য কোনো কারণে ওয়াজিব দায়িত্ব পালনে অনীহ হয়, তবে তাদের পাশের মুসলমানের উপরে এসে পড়বে ওয়াজিব দায়িত্বটি। এভাবে সারা পৃথিবীর মুসলমানদের উপরে জেহাদ ফরজ হয়ে যাবে। মৃত ব্যক্তির কাফন দাফন ও জানাযার দায়িত্বটিও এ রকম। মহল্লা বা গ্রামের লোকেরা কাফন-দাফন ও জানাযা না করলে পরের মহল্লা, তারা না করলে তার পরের মহল্লা— এভাবে ফরজ দায়িত্বের বলয়ভূত হবে সারা পৃথিবীর মুসলমানেরা।

এখানে 'গিলজাতান' শব্দটির অর্থ কঠোরতা। হাসান বলেছেন, গিলজাতান অর্থ জেহাদে ধৈর্য ধারণ। 'লিইয়াজিদু' এখানে নির্দেশসূচক শব্দরূপ। এর সর্বনাম কাফের বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দিকে প্রত্যাবর্তিত। তাই কাফেররা এর লক্ষ্য। আর নির্দেশটি প্রযোজ্য হবে বিশ্বাসীদের উপর। অর্থাৎ মুসলমানদেরকেই কঠোরতা দেখাতে হবে কাফেরদের সঙ্গে। তাদেরকে কোমলতা বা দুর্বলতা দেখানো যাবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'জেনে রাখো আল্লাহ্ সাবধানীদের সঙ্গে আছেন।' এ কথার অর্থ— হে বিশ্বাসীরা! জেনে রাখো, যারা মুত্তাকী (সাবধানী), তাদের সঙ্গেই রয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য, কাফেরদের সঙ্গে নয়। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় পাবে কেনো?

www.eelm.weebly.com

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كٰفِرُونَ ۝ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ۖ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا ۚ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۝

❒ যখনই কোন সুরা অবতীর্ণ হয় তখন উহাদিগের কেহ কেহ বলে, 'ইহা তোমাদিগের মধ্যে কাহার বিশ্বাস বৃদ্ধি করিল?' যাহারা বিশ্বাসী ইহা তো তাহাদিগেরই বিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং তাহারাই আনন্দিত হয়।

❒ এবং যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে ইহা তাহাদিগের কলুষের সহিত আরও কলুষ যুক্ত করে এবং উহাদিগের মৃত্যু ঘটে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায়।

❒ উহারা কি দেখে না যে, উহারা প্রতি বৎসর দুই একবার বিপর্যস্ত হয়? ইহার পরও উহারা তওবা করে না, এবং উপদেশ গ্রহণ করে না,

❒ এবং যখনই কোন সুরা অবতীর্ণ হয়, তখন উহারা একে অপরের দিকে তাকায় এবং ইশারায় জিজ্ঞাসা করে তোমাদিগকে কেহ লক্ষ্য করিতেছে কি? অতঃপর উহারা সরিয়া পড়ে। আল্লাহ্ উহাদিগের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করিয়াছেন, কারণ উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদের বোধ-শক্তি নাই।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমোক্তটির মর্মার্থ হচ্ছে— যখনই কোরআন মজীদের নতুন কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন মুনাফিকেরা তাদের বন্ধু-বান্ধবদের বৈঠকে ঠাট্টাচ্ছলে বলে, সদ্য অবতীর্ণ এই আয়াতের মাধ্যমে তোমাদের আবার বিশ্বাস টিশ্বাস বেড়ে টেড়ে গেলো নাকি? তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জবাবে আল্লাহ্তায়ালা জানাচ্ছেন, কোরআনের অবতারিত আয়াত সমূহ তো বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকেই অধিকতর দৃঢ় ও প্রোজ্জ্বল করে। আয়াতের অন্তর্নিহিত জ্যোতি ও বক্তব্য বিষয় তাদের বিশ্বাসকে অবশ্যই করে তোলে অধিকতর বলিষ্ঠ। তাদের বিশ্বাসিত আত্মাও এতে করে আনন্দিত হয়।

www.eelm.weebly.com

দ্বিতীয় আয়াতে (১২৫) বলা হয়েছে— 'এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এটা তো তাদের কলুষের সঙ্গে আরো কলুষ যুক্ত করে এবং তাদের মৃত্যু ঘটে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায়।' এখানে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানে অনড়, তাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় মৃত্যু ঘটার কথাটি বলে দেয়া হয়েছে সুস্পষ্টরূপে। আরো বলা হয়েছে, কোরআনের আয়াত শ্রবণকারী ও পাঠকারী অবিশ্বাসীদের অন্তরের অপবিত্রতা ক্রমাগত বেড়েই যেতে থাকে। কারণ আগে থেকেই তাদের অন্তরে ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানের অটুট অন্ধকার। তার সঙ্গে এবার যোগ হলো সদ্য অবতীর্ণ আয়াতের প্রতি অস্বীকৃতির তমসা।

প্রকৃত কথা এই যে, ইমান হচ্ছে আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক প্রদত্ত একটি বিশেষ ও সর্বোত্তম অনুগ্রহ। এই ইমান অন্তরে থাকলেই কেবল কোরআন মজীদের আয়াত সমূহ থেকে উপকার লাভ করা যায়। আয়াত কখনো কাউকে ইমান প্রদান করে না। বরং যাদের অন্তরে ইমান নেই, তাদের অবিশ্বাসকে করে আরো অধিক তমসাচ্ছন্ন।

মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। হজরত ওমর তাঁর সতীর্থদের দু'জন অথবা একজনের হাত ধরে একবার বলেছিলেন, এরা আমাদের ইমান বাড়াবে। হজরত ওমর তাই নতুন অবতীর্ণ আয়াত পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে শুনতেন এই উদ্দেশ্যে যে, এই আয়াত আমার ইমানের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে ইমানকে করবে অধিকতর বৃহৎ। হজরত আলী বলেছেন, হৃদয়াভ্যন্তরে ইমান একটি শ্বেতশুভ্র বিন্দুর মতো সতত সমুদ্ভাসিত থাকে। ইমান যতো বাড়ে, ততই তার শুভ্রতা সমুজ্জ্বলিত হয়। এভাবে তার হৃদয়ের সমগ্র পরিসরে সুবিস্তৃত হয়ে পড়ে ওই শুভ্রতা। পক্ষান্তরে অবিশ্বাস ও সত্যপ্রত্যাখ্যান হৃদয়ে থাকে একটি কৃষ্ণবিন্দুর আকৃতিতে। সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতা যত বৃদ্ধি পায়, ততই বিস্তৃত হয় ওই কৃষ্ণবিন্দুটি। এভাবে হৃদয়ের সমগ্র পরিসর হয়ে যায় কৃষ্ণাভ। আল্লাহ্‌র শপথ! বিশ্বাসীদের হৃদয় চিরে দেখা সম্ভব হলে দেখা যেতো তার সম্পূর্ণ হৃদয়ই শ্বেতশুভ্র। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের হৃদয় চিরে দেখা সম্ভব হলে দেখা যেতো তার সম্পূর্ণ হৃদয় কৃষ্ণকায়।

তৃতীয় আয়াতে (১২৬) বলা হয়েছে— 'তারা কি দেখে না যে, তারা প্রতি বছর দুই একবার বিপর্যস্ত হয়?' এ কথার অর্থ— মুনাফিকেরা কেনো অনুধাবন করতে চায় না যে, প্রতি বছর কমপক্ষে একবার দু'বার তাদেরকে বিভিন্নভাবে অপদস্থ করা হয়? ওই সকল ঘটনার মধ্যে প্রকাশিত হয় আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ নিদর্শন। সুতরাং হঠকারিতা ও উন্নাসিকতা কেনো? সমর্পণই তো শ্রেয়। মুজাহিদ বলেছেন, দুর্ভিক্ষ মহামারীতে বার বার আক্রান্ত হয়েছিলো মুনাফিকেরা। কাতাদা বলেছেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করতাম এবং যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক প্রকাশিত নিদর্শনসমূহ গভীরভাবে অবলোকন করতাম। মুকাতিল বিন হাব্বান বলেছেন, প্রায়শঃ বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে মুনাফিকদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দেয়া হতো। যার ফলে তারা হয়ে পড়তো বিব্রত ও বিপর্যস্ত। হজরত ইকরামা বলেছেন, তারা বার বার

www.eelm.weebly.com

লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে ইমানদার বলে প্রকাশ করতো, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মুনাফিকই থেকে যেতো। হাসান বলেছেন, তারা বার বার অঙ্গীকার ভঙ্গ করতো (পুনঃ পুনঃ পর্যুদস্ত হওয়া সত্ত্বেও)।

এরপর বলা হয়েছে— 'এর পরও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।' এ কথার অর্থ— বার বার হেয় প্রতিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও মুনাফিকেরা সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে না। সদুপদেশকেও মান্য করে না।

রসুল স. এর মজলিশে সাহাবীগণের সঙ্গে মুনাফিকেরাও বসে থাকতো। কারণ তারা ছিলো দৃশ্যতঃ মুসলমান। ওই মজলিশে কোরআনের নতুন কোনো আয়াত অবতীর্ণ হলে তারা পড়ে যেতো বিপাকে। তাদের মনে হতো, এই বুঝি সদ্য অবতীর্ণ আয়াতের মাধ্যমে তাদের অভ্যন্তরীণ কপটতাকে চিহ্নিত করা হবে। তাই তারা সেখান থেকে সরে পড়ার জন্য উশ্‌খুশ করতো। কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে উঠতেও পারতো না। ভয়, কৌতুক ও বিদ্রূপ মেশানো দৃষ্টিতে কেবল একে অপরের দিকে তাকাতো। চোখের ইশারায় বলতো, সাবধান! তোমাদেরকে কেউ লক্ষ্য করছে না তো আবার? ইশারায় এভাবে ভাবের আদান প্রদান করে এক সময় মজলিশ থেকে সরেই পড়তো তারা। ভাবতো এখানে বসে থাকলে অপমান ও লাঞ্ছনা নিশ্চিত। এ কথাগুলোই আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের শেষটিতে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— 'এবং যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় তখন তারা একে অপরের দিকে তাকায় এবং ইশারায় জিজ্ঞেস করে, তোমাদেরকে কেউ লক্ষ্য করছে কি? অতঃপর তারা সরে পড়ে।'

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করেছেন, কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।' এ কথার অর্থ— মুনাফিকেরা একটি শুভবোধ ও বুদ্ধিবিবর্জিত কুটকৌশলপ্রিয় সম্প্রদায়। সরলতার রহস্য সম্পর্কে তারা জানে না। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাদের হৃদয়কে করেছেন সত্যবিমুখ। আবু ইসহাক বলেছেন, এটাই তাদের চতুরতার শাস্তি।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১২৮

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ○

❐ তোমাদিগের মধ্য হইতেই তোমাদিগের নিকট এক রসূল আসিয়াছে। তোমাদিগকে যাহা বিপন্ন করে উহা তাহার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদিগের মংগলকামী, বিশ্বাসীদিগের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

'লাক্বদ জাআকুম রসুলুম মিন আনফুসিকুম' অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের নিকটে প্রেরিত রসুল তোমাদেরই বংশবিজড়িত। অর্থাৎ তোমাদের মতো তিনিও হজরত ইসমাইলের অধঃস্তন পুরুষ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আরবের

www.eelm.weebly.com

সকল গোত্রের সঙ্গে রসুল স. এর বংশীয় সম্পর্ক ছিলো। ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, হজরত আদম থেকে আগত রসুল স. এর সকল ঊর্ধ্বতন পিতা ও মাতা অশুদ্ধ বিবাহবন্ধন থেকে পবিত্র ছিলেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি মূর্খতা ও ব্যভিচারজাত নই। আমার ঊর্ধ্বতন সকল পিতৃপুরুষগণ ও জননীকুল ছিলেন শরিয়তসম্মত পরিণয়াবদ্ধ।

'আযীজুন আ'লাইহি মা আ'নিত্তুম হারীস্' অর্থ— তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। এখানে 'মা আনিত্তুম' কথাটির মা জায়েদা (অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশক)। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তোমাদের বিপদগ্রস্ত হওয়া রসুলের জন্য কষ্টদায়ক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ— তোমাদের বিপথগামীতা তাঁর জন্য ক্লেশকর। কুতাইবি বলেছেন, এর অর্থ তোমাদের মুসিবত কবলিত অবস্থা তার জন্য অস্বস্তিকর। এমতাবস্থায় 'মা আনিত্তুম' এর মা হবে মায়ে মাওসুলা (সংযোজক)। আর অর্থ দাঁড়াবে— হে মানুষ! হে আরববাসী! তোমরা যদি বিপথযাত্রা স্থগিত করে বিশ্বাসের চিরন্তন আশ্রয়ে স্থিত হতে তবে তোমাদের রসুলের জন্য বিষয়টি হতো চিত্তস্বস্তিকর। তোমরা সত্য ইসলামকে গ্রহণ করো না বলেই তো তাঁর হৃদয় সতত বেদনা ভারাক্রান্ত।

শেষে বলা হয়েছে— হারিসুন আলাইকুম বিল মু'মিনীনা রউফুর রহীম (সে তোমাদের মঙ্গলকামী, বিশ্বাসীদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু)। 'রউফ' অর্থ অপরিসীম দয়ার্দ্র। 'রহীম' অর্থ— পরম দয়ালু। 'রউফ' এর মধ্যে রয়েছে অনুরাগসম্ভূত দয়ার্দ্রতা। আর 'রহীম' এর মধ্যে রয়েছে করুণাসঞ্জাত আশীর্বাদ। তাই কেউ কেউ বলেছেন, রসুল স. তাঁর সতীর্থদের জন্য রউফ এবং পাপিষ্ঠদের জন্য রহীম।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১২৯

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

❑ অতঃপর উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তুমি বলিও, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যদি সত্য ধর্মের প্রতি আপনার উদাত্ত আহ্বানে সাড়া না দেয়, যদি আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবে আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, আমি কেবল আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীল, তাই আমার জন্য আল্লাহ্তায়ালাই যথেষ্ট। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আর তিনি মহা আরশের অধীশ্বর।

www.eelm.weebly.com

মহা বিশ্বের প্রশস্ততম পরিসরের নাম আরশ। তাই আরশকে বলা হয় আরশিল আজীম (মহান আরশ)।

আবদুল্লাহ্ বিন আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবী বিন কা'ব বলেছেন, সুরা তওবায় সর্বশেষ আয়াত (১২৮, ১২৯) দু'টোই কোরআন মজীদের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত। এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে অবতারিত আয়াতগুলোর মধ্যে এই আয়াত দু'টোই আমাদের সময়ের সর্বাপেক্ষা নিকটতম।

জ্ঞাতব্যঃ ইয়াহ্ইয়া বিন আবদুর রহমান বিন হাতেব বলেছেন, হজরত ওমর তাঁর খেলাফতের সময় কোরআন মজীদের সকল আয়াত একত্র করতে চেয়েছিলেন। ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, হে জনতা! তোমরা রসুল স. এর নিকটে কোরআনের যে আয়াতগুলো শিক্ষা করেছো, সেগুলো নিয়ে এসো। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন সকলে। যারা কাষ্ঠখণ্ড, চামড়া, বৃক্ষপত্র ইত্যাদিতে কোরআনের আয়াত লিখে রেখেছিলেন, তারা সেগুলো জমা দিলেন হজরত ওমরের কাছে। আয়াতগুলো কোরআনের আয়াত এবং সেগুলো যে রসুল স. এর নিকট থেকে সরাসরি শিক্ষা করা হয়েছে, এই মর্মে দু'জন সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত তিনি সে-গুলোকে গ্রহণ করলেন না। এরপর এলো হজরত ওসমানের জামানা। তিনিও ঘোষণা করলেন, যারা কোরআনের আয়াত সংগ্রহে রেখেছেন, তাঁরা সেগুলো নিয়ে আসুন। সাহাবীগণ হজরত ওসমানের নিকটে কোরআনের আয়াত সমূহ জমা করতে লাগলেন। হজরত ওসমানও দু'জন ব্যক্তির সাক্ষ্য সহযোগে আয়াত-গুলোকে জমা করতে লাগলেন। হজরত খুজাইমা ইবনে সাবেত বলেছেন, আমি দেখলাম, সুরা তওবার শেষ দুই আয়াত তখনও লিপিবদ্ধ হয়নি। আমি এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি বললেন, কোন আয়াত বাদ পড়েছে? আমি আয়াত দু'টো পড়ে শোনালাম। বললাম, আমি আয়াত দু'টো রসুল স. এর নিকট থেকে শিখেছি। হজরত ওসমান বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এই আয়াত দু'টো আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এখন বলুন আয়াত দু'টো কোন স্থানে সন্নিবেশিত করবো? আমি বললাম, আয়াত দু'টো অবতীর্ণ হয়েছে সকলের শেষে। তাই সর্বশেষে অবতীর্ণ সুরা বারাআতের সঙ্গেই আয়াত দু'টো সংযোজিত করুন। এ কথা বলার পর তিনি সুরা দু'টোকে সংযুক্ত করলেন সুরা বারাআতের শেষে।

পরিশিষ্টঃ সুরা তওবার অধিকাংশ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। ওই সময়ে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিলো। প্রকাশিত হয়েছিলো কিছু মোজেজাও। এবার সেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম বলেছেন, তাবুকের পথে রসুল স. উপনীত হলেন খোলাইজা নামক স্থানে। সাহাবীগণ বললেন, হে

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্র রসুল! যাত্রা বিরতির জন্য এই স্থানটিই উত্তম মনে হয়। এখানে আছে বৃক্ষছায়া ও পানির প্রস্রবণ। রসুল স. বললেন, এটা শস্যভূমি। উটকে থামিও না। আমার উটের পদবিক্ষেপ আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। দেখা যাক সে কোথায় গিয়ে থামে। উট চলতে চলতে দুমা নামক স্থানে থামলো। সেখানে ছিলো জিলমারওয়ার মসজিদ।

মোহাম্মদ ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. উপস্থিত হলেন ক্বিরা উপত্যকায়। সেখানে যাত্রা বিরতি করলেন। বনী আরিজের ইহুদীরা বাস করতো সেখানে। তারা হাদিয়া হিসেবে হারিসা (এক প্রকার উৎকৃষ্ট আহার্য) পেশ করলো রসুল স. এর নিকটে। হাদিয়ার খাদ্য রসুল স. নিজে আহার করলেন। চল্লিশ জন ইহুদীকেও দাওয়াত দিয়ে খাওয়ালেন। বনী আরিজের এই সৌভাগ্য চির ভাস্বর হয়ে রয়েছে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে ইমাম মালেক, আহমদ, বোখারী, মুসলিম এবং হজরত আবু কাবশা আনসারী, হজরত জাবের ও হজরত আবু হুমাইদ সায়াদী থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, পথে পড়লো অভিশপ্ত ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রাচীন জনপদ মাকামে হাজারা। রসুল স. চাদরে মুখ ঢাকলেন। তাঁর উটকে চালাতে শুরু করলেন জোরে শোরে। মাকামে হাজারা অতিক্রম করে দূরে এক স্থানে যাত্রা স্থগিত করলেন। সাহাবীগণের অনেকে মাকামে হাজারার কূপ থেকে পানি সংগ্রহ করেছিলেন। কেউ কেউ ওই পানি দিয়ে আটার খামির বানালেন। কেউ কেউ পানি দিয়ে গোশত চড়ালেন উনুনে। নামাজের সময় হলো। রসুল স. মুয়াজ্জিনের আহ্বানের মাধ্যমে সকলকে একত্রিত করলেন। নামাজ শেষে বললেন, ছামুদ জাতি ছিলো অবাধ্য। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের এলাকা দ্রুত অতিক্রম করে এসেছি আমি এজন্যই। আমার ভয় হচ্ছিলো কখন না জানি এসে পড়ে আযাব। ওই এলাকায় আল্লাহ্র রোষের প্রতিক্রিয়া এখনো বর্তমান। সুতরাং সেখান থেকে সংগৃহীত পানি পান কোরো না। ওই পানি দিয়ে ওজুও কোরো না। ওই পানি দ্বারা প্রস্তুতকৃত আহার্যও ভক্ষণ কোরো না। ফেলে দাও আটার খামির। উল্টিয়ে দাও গোশতের হাঁড়ি। ওগুলো খাইয়ে দাও তোমাদের উটগুলোকে। সাহাবীগণ তাই করলেন। রসুল স. পুনরায় বললেন, ছামুদ সম্প্রদায় নবী সালেহের নিকট মোজেজা দেখতে চেয়েছিলো। তাঁর দোয়ার ফলে আল্লাহ মোজেজা প্রকাশ করেছিলেন। প্রকাণ্ড পাথরখণ্ড থেকে বের হয়ে এসেছিলো এক অলৌকিক উট। ওই উট একদিন পর এক দিন নিঃশেষে তাদের কূপের পানি পান করতো। আর একদিন পর একদিন পানি পান করতো তাদের নিজেদের পশুকুল। এই অবস্থা তারা বেশী দিন মেনে নিতে পারলো না। একদিন তারা উটটির কুঁজ কেটে ফেললো। তারপর হত্যা করলো

www.eelm.weebly.com

উটটিকে। অকস্মাৎ একটি বিকট চিৎকারে ধ্বংস হয়ে গেলো তাদের জনপদের সকলে। একজন কেবল বেঁচে গেলো। সে তখন অবস্থান করছিলো মক্কায়। পরে সেখান থেকে বের হয়ে এলে সেও পতিত হলো একই গজবে। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রসুল, ওই লোকটির নাম কি ছিলো ? রসুল স, বললেন আবু রেগাল। পুনরায় বললেন, অতএব সাবধান! ওই সকল অঞ্চলে কখনো যেয়ো না, যে অঞ্চল আল্লাহ্র গজব কবলিত। জনৈক সাহাবী ছামুদ সম্প্রদায়ের কাহিনী শুনে সবিস্ময়ে বলে উঠলো, সুবহানাল্লাহ! রসুল স. বললেন, এরচেয়ে অনেক বড় বিস্ময় রয়েছে তোমাদের সামনে। তোমাদেরই এক লোক অতীত কালের কাহিনী বর্ণনা করছেন। আবার তিনি দান করছেন ভবিষ্যতের সংবাদ (কিয়ামত, বেহেশত্, দোযখ ইত্যদির সংবাদ)। এটা কি আরো বেশী বিস্ময়কর নয়? সুতরাং হে জনমণ্ডলী! সত্য ধর্মের উপরে অটল থাকো। সরল হও। সোজা পথে চলো। যদি এ রকম না করো তবে তোমাদেরকে আযাব দিতেও আল্লাহ্ দ্বিধা করবেন না। ভবিষতে এমন লোকও আসবে যারা কিছুতেই আল্লাহ্র শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। শোনো! সাবধান! আজ রাতে প্রবাহিত হবে একটি প্রচণ্ড তুফান। তোমরা কেউ দাঁড়িয়ে থেকো না। রাতে শয্যা গ্রহণের পূর্বে তোমাদের উটগুলোকে ভালো করে বেঁধে রেখো। নিতান্ত প্রয়োজন পড়লে একাকী কেউ তাঁবু থেকে বের হয়ো না। রাত হলো। সকলে উটগুলোকে শক্ত করে বেঁধে শয্যা গ্রহণ করলেন। সারা রাত কেউ তাবু থেকে বের হলেন না। দু'জন লোক বাইরে গিয়েছিলেন। একজন প্রকৃতির ডাকে আর একজন উট খুঁজতে। বাতাস প্রথম জনকে উঠিয়ে নিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেললো। আর যে উট খুঁজতে বেরিয়েছিলো, তাকে তুফান নিয়ে গিয়ে ফেললো অনেক দূরে তাঈ জনপদের পাহাড়ে। সকালে রসুল স. তাদের কথা শুনে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে একাকী বের হতে নিষেধ করে দেইনি? প্রথম জনকে ধরাধরি করে নিয়ে এলেন সাহাবীগণ। সে তখন প্রায় পঙ্গু। রসুল স. তার জন্য দোয়া করলেন। সে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে গেলো। আর তাঈ পাহাড়ে পতিত লোকটি রসুল স. এর সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছিলো অনেক দিন পরে— রসুল স. এর মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর।

পানির জন্য দোয়া ও পানির সমস্যার সমাধানের বিষয়ে ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন বর্ণনা করা হচ্ছে আর একটি অলৌকিক ঘটনা। এর বর্ণনাকারী হচ্ছেন মোহাম্মদ বিন ওমর ও মোহাম্মদ বিন ইসহাক। ঘটনাটি এই— একবার রসুল স. এর নিজস্ব উটটি হারিয়ে গেলো। সাহাবীগণ উটটিকে খুঁজতে শুরু করলেন। বনী কাইনুকার এক ইহুদী যায়েদ বিন লুসাইব প্রকাশ্যতঃ মুসলমান হয়েছিলো। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে ছিলো মুনাফিক। সে বললো, মোহাম্মদ নবুয়তের দাবী করে। অদৃশ্য সম্বন্ধে নাকি অনেক কিছু জানে। অথচ নিজের উট

www.eelm.weebly.com

কোথায় আছে তাই বলতে পারে না। হজরত আবু ওমারা এ কথা শুনলেন। তৎক্ষণাৎ রসুল স.কে গিয়ে এ কথা জানালেন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমিতো ততটুকু জানি, যা আমাকে জানানো হয়। নিজে থেকে আমি কিছু জানি না। উটের সংবাদ আগে আমাকে জানানো হয়নি। এই মাত্র জানানো হলো। এবার গিয়ে দেখো অমুক উপত্যকায় অমুক গাছের সংগে উটটি আটকে রয়েছে। সাহাবীগণ যথাস্থানে উটটিকে পেয়ে গেলেন। নিয়ে এলেন রসুল স. এর নিকটে। হজরত ওমারা বললেন, আমি সংগে সংগে যায়েদের নিকট গিয়ে তার ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বললাম, রে আল্লাহ্র দুশমন! এই মুহূর্তে আমাদের মহল্লা থেকে বের হয়ে যা। ইবনে ইসহাক বলেছেন, কোনো কোনো লোকের ধারণা যায়েদ খাঁটি নিয়তে তওবা করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সে আজীবন মুনাফিকই ছিলো এবং মুনাফিক অবস্থাতেই মৃত্যু ঘটেছিলো তার।

আরেকটি ঘটনা ঘটেছিলো তাবুক যুদ্ধের সময়। ঘটনাটি হজরত মুগিরা বিন শো'বা থেকে বর্ণনা করেছেন মুসলিম। ঘটনাটি এই— ফজরের নামাজের সময়। রসুল স. প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পন্ন করতে গেলেন। সাহাবীগণ নামাজের জামাতের অপেক্ষায় বসে রইলেন। সূর্যোদয়ের উপক্রম হলো। রসুল স. তখনও এলেন না। সাহাবীগণ হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফকে সামনে এগিয়ে দিলেন। অথবা তিনি নিজেই ইমামতি করার জন্য সামনে এগিয়ে গেলেন। প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে এসে ওজু করতে বসলেন রসুল স.। তাঁর কোর্তার আস্তিন ছিলো অপ্রশস্ত। তাই তিনি আস্তিন হাতের উপরে উঠাতে পারলেন না। ভিতরের দিক থেকে হাত বের করে নিয়ে ওজুর সময় হাত ধৌত করলেন। পা ধৌত করলেন না। মোসেহ্ করলেন মোজার উপর। এরপর এসে জামাতে শরীক হলেন। জামাতের সাথে পড়তে পারলেন এক রাকাত। বাকী এক রাকাত পড়ে নিলেন ইমামের সালাম ফিরানোর পর। নামাজ শেষে বললেন, তোমরা উত্তম কাজ করেছো। নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়তে হয়। জেনে রেখো, নিজ উম্মতের কোনো পুণ্যবান ব্যক্তির পশ্চাতে নামাজ না পড়া পর্যন্ত কোনো নবী পৃথিবী পরিত্যাগ করেন না। এটাই সকল নবীর আদর্শ।

আহমদ ও তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে— হজরত সুহাইল ইবনে বায়জা বলেছেন, একবার রসুল স. তাঁর উষ্ট্রীর পেছনে আমাকে বসিয়ে নিলেন। তারপর উচ্চ কণ্ঠে বললেন, সুহাইল, সুহাইল! আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! এই যে আমি। রসুল স. এ রকম বললেন তিনবার। প্রতিবারই আমি বললাম, এই যে আমি। এভাবে উচ্চকণ্ঠের ডাক শুনে অন্যান্য সাহাবীগণ বুঝতে পারলেন যে, রসুল স. সকলকে সমবেত হতে বলছেন। সবাই জড়ো হলো। রসুল স. বললেন, যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, সে আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে বলছি, আল্লাহ্ সুহাইলের জন্য দোজখ হারাম করে দিয়েছেন।

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদ বিন ওমর ও আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে— একবার একটি খুব লম্বা মোটা সাপ চলাচলের রাস্তায় অবস্থান গ্রহণ করলো। রসুল স. উষ্ট্রারোহী হয়ে ওই পথে গমন করছিলেন। উষ্ট্রী থেমে পড়লো। উপস্থিত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে রসুল স. বললেন, সাপটি বাতনে নাখলা থেকে এসেছে। সে সেখানকার আটজন জিনের একজন। সে আমাদের কোরআন পাঠ শুনতে চায়। সে তোমাদেরকে সালাম জানাচ্ছে। সাহাবীগণ জবাব দিলেন ওয়া লাইহিস সালাম ওয়া রহমতুল্লাহ্ ওয়া বারাকাতুহ্।

হজরত হুজায়ফা থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন — হজরত মুয়াজ বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, ইনশাআল্লাহ্ তোমরা কাল সূর্যোদয়ের সময় তাবুকের একটি ঝর্ণার কাছে পৌঁছবে। আমি সেখানে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ ওই ঝর্ণার পানি স্পর্শ করবে না। পরদিন সকালে আমরা ঠিকই একটি ঝর্ণার কিনারায় উপস্থিত হলাম। একটু পরেই রসুল স. সেখানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সেখানে আমাদের আগেই উপস্থিত হয়েছিলো দু'জন লোক। তাদেরকে লক্ষ্য করে রসুল স. বললেন, তোমরা কি ঝর্ণার পানি স্পর্শ করেছো? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি তাদেরকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন। তারপর একটি মশকে করে সামান্য পানি আনার নির্দেশ দিলেন একজনকে। পানি আনা হলো। তিনি ওই পানি দিয়ে হাত ও মুখ ধুয়ে নিলেন। তারপর কুলি করলেন। কিন্তু কুলির পানি নিক্ষেপ করলেন ওই মশকের মধ্যে। তারপর ওই পানি ফেলে দিলেন ঝরণায়। সঙ্গে সঙ্গে ঝর্নার পানি প্রবল তেজে ফুলে ফেঁপে উঠে তীব্র তেজের সাথে প্রবাহিত হতে শুরু করলো। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, পানি বের হচ্ছিলো মাটি ফেটে এবং আওয়াজ উত্থিত হচ্ছিলো বজ্রনির্ঘোষের মতো। তাবুকে আজও ওই ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। তীব্র তেজে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়ার পর রসুল স. বললেন, হে মুয়াজ ! বেশী দিন যদি বেঁচে থাকো তবে দেখতে পাবে এখানে হবে পাঁচটি বাগান।

হজরত ওরওয়া থেকে বায়হাকী ও আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন— রসুল স. তার কুলি মিশ্রিত পানি ফেলার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলো ঝর্ণাটি। ভরে উঠেছিলো কানায় কানায়। আজও একই রূপে বয়ে চলেছে ওই ঝর্ণা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম আহমদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন— তাবুক যুদ্ধের বছর রসুল স. একদিন এক স্থানে একটি খেজুর গাছে হেলান দিয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলবো, সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি কে এবং সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিই বা কে? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! অবশ্যই বলুন। তিনি স. বললেন, ওই ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট, যে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে বা উটের পিঠে চড়ে কিংবা পায়ে হেঁটে জীবন ভর জেহাদ করে চলে। আর সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে কোরআন পড়েছে কিন্তু কোরআনের বিধানের আনুগত্য করেনি।

www.eelm.weebly.com

হজরত ওমর থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন— তাবুক যুদ্ধের সময় রসুল স. এর সামনে বকরি অথবা ভেড়ার সীনার গোশত পেশ করা হলো। তিনি স. ছুরি আনতে বললেন। ছুরি আনা হলে ওই ছুরি দিয়ে বিস্মিল্লাহ্ বলে তিনি গোশত কাটতে শুরু করলেন।

ইমাম আহমদ ও আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. নামাজ পড়ছিলেন। হঠাৎ একটি ছেলে তাঁর সামনে দিয়ে চলে গেলো। তিনি স. বললেন, আয় আল্লাহ! ওর চিহ্ন কেটে দাও। এ কথা বলার ফলে ছেলেটি পঙ্গু হয়ে পড়লো।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে— বনী সা'দ গোত্রের এক লোক বলেছেন, তাবুক যুদ্ধের সময় এক স্থানে রসুল স. কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। রসুল স. বললেন, বেলাল আমাকে খেতে দাও। হজরত বেলাল বেশ কয়েকবার খাবার পাত্র নিয়ে এলেন। প্রতি বারই পরিবেশন করলেন ঘি ও পনির মিশ্রিত খেজুর। রসুল স খেলেন। আমরাও খেলাম পেট পুরে। বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি তো অনেক বেশী খেয়ে ফেললাম। তিনি স. বললেন, কাফেরেরা খায় সাত পেটে। আর মুমিনেরা খায় এক পেটে। পরে আর একদিন গেলাম রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। তখন তাঁর সঙ্গে বসেছিলেন দশ জন সাহাবী। তিনি স. বললেন, বেলাল আমাদেরকে খেতে দাও। হজরত বেলাল মুঠো মুঠো খেজুর বের করে পরিবেশন করতে লাগলেন। রসুল স. বললেন, দিতে থাকো। ফুরিয়ে যাওয়ার আশংকা কোরো না। কারণ আরশের মালিক কৃপণ নন। এ কথা শুনে হজরত বেলাল খাদ্যের পুরো থলিটি উপুড় করে ঢেলে দিলেন। আমার অনুমানে ওগুলো দুই সেরের বেশী ছিলো না। রসুল স. তাঁর পবিত্র হাত রাখলেন ওই খাদ্যে। বললেন, বিস্মিল্লাহ্ বলো এবং খাও। আমরা সকলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলাম। শেষে দেখলাম দস্তরখানায় আগের মতোই খাদ্য মওজুদ। মনে হলো আমরা যেনো সেগুলো থেকে কিছুই খাইনি। আরো একদিন সকালে হাজির হলাম রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গে। সেদিনও দেখলাম দশজন বসে রয়েছে তাঁর সঙ্গে। রসুল স. বললেন, বেলাল আহার্য পরিবেশন করো। হজরত বেলাল সেই খাদ্যের থলিটি নিয়ে এলেন এবং সব খাদ্য উপুড় করে ঢেলে দিলেন দস্তরখানায়। রসুল স. খাদ্যে হাত রেখে বললেন, আল্লাহ্র নাম নিয়ে আহার করো। আমরা তাই করলাম। শেষে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম, আহার্য দ্রব্য আগে যেমন ছিলো তেমনই আছে।

মোহাম্মদ বিন ওমর, আবু নাঈম এবং ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইরবাজ বিন সারিয়া বলেছেন, আমি, জুয়াল বিন সুরাকা এবং আবদুল্লাহ

www.eelm.weebly.com

বিন মুগাফ্‌ফাল মাজানী ছিলাম আসহাবে সুফ্‌ফাদের দলভুক্ত। রসুল স. এর পবিত্র অঙ্গনেই পড়ে থাকতাম আমরা। সেদিন তিনজনেই ছিলাম ক্ষুধার্ত। রসুল স. বুঝতে পেরে জননী উম্মে সালমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সেখানে কিছু পেলেন না। বাইরে এসে ডাকলেন, বেলাল, খাবারের কোনো ব্যবস্থা আছে কি? হজরত বেলাল কয়েকটি থলি এনে উপুড় করে ঝাড়তে শুরু করলেন। দুই একটি করে খেজুর পড়তে লাগলো, এভাবে সর্বমোট বের হলো সাতটি শুকনো খেজুর। খেজুরগুলো একটি থলিতে রেখে রসুল স. সেগুলোর উপর তাঁর পবিত্র হাত রাখলেন। বললেন, বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে খেতে শুরু করো। আমরা তাই করলাম। খেজুর খেয়ে খেয়ে সেগুলোর আঁটি রেখে দিচ্ছিলাম আমরা বাম হাতে। এভাবে পঁয়তাল্লিশটি খেজুর খেলাম আমি। তিন জনে গড়পড়তায় খেলাম পঞ্চাশটি করে খেজুর। শেষে হাত গুটিয়ে নিলাম। সবিস্ময়ে দেখলাম, যে কয়টি খেজুর আগে ছিলো এখনও সে কয়টিই আছে। রসুল স. বললেন, বেলাল, এগুলো উঠিয়ে নিয়ে যাও। পরদিন সকালে ফজর নামাজের পর রসুল স. উপবেশন করলেন তাঁর প্রকোষ্ঠের বহিরাঙ্গনে। আমরাও একে একে বসে পড়লাম সেখানে। এভাবে জড়ো হলাম দশজন। রসুল স. বললেন, সকালের খাবার কি আছে তোমাদের কাছে? আমরা বললাম না। তিনি বেলালকে খাবার আনতে বললেন। বেলাল আনলো আগের দিনের খেজুরগুলো। রসুল স. সেগুলোর উপর হাত রেখে বললেন, নাও, এবার আল্লাহ্‌র নাম করে খেতে শুরু করো। আমরা তাই করলাম। যে আল্লাহ্‌ রসুল স.কে সত্য রসুল হিসাবে প্রেরণ করেছেন, সেই আল্লাহ্‌র কসম! আমরা দশ জন পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলাম। তারপরেও দেখলাম খাবার রয়ে গিয়েছে আগের মতোই। রসুল স. বললেন, এর চেয়ে বেশী চাইতে আমার লজ্জা হয়। নয়তো এগুলো দিয়ে সকল মদীনাবাসীকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করানো যেতো। হঠাৎ একটি ছোট ছেলে এলো সেখানে। রসুল স. তাকে খেজুর কয়টি দিয়ে দিলেন। সে খেজুর চিবুতে চিবুতে চলে গেলো।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, তাবুকে হঠাৎ একদিন একটি প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হলো। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, এক কট্টর মুনাফিকের মৃত্যু হয়েছে। পরে মদীনায় এসে আমরা জানলাম, রসুল স. ঠিকই বলেছিলেন। ওই দিনই মৃত্যু হয়েছিলো একজন কুখ্যাত মুনাফিকের।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় আরো এসেছে, বনী সা'দের সহায়সম্বলহীন কিছু লোক রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হলেন। নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা আমাদের পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততিকে একটি কূপের পাড়ে রেখে আপনার পবিত্র সান্নিধ্যে হাজির হয়েছি। কূপটিতে পানিও বেশী নেই। আবার স্থান ত্যাগ করলে কূপটিও হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে আমাদের। কারণ

www.eelm.weebly.com

আশে পাশে আছে আমাদের প্রতিপক্ষের অনেক গোত্র। ইসলামের আলো ওই এলাকাগুলোতে পৌঁছেনি। আপনি আল্লাহ্পাকের দরবারে আমাদের জন্য দোয়া করুন। যদি আমাদের কূপটি পানিতে পূর্ণ হয়ে যায়, তবে আমাদেরকে অন্যের মুখাপেক্ষী থাকতে হবে না। রসুল স. বললেন, কয়েকটি পাথর নিয়ে এসো। একজন নিয়ে এলো তিনটি পাথর। রসুল স. ওই তিনটি পাথরের খণ্ড নিলেন হাতের মুঠোয়। তারপর বললেন এগুলো নিয়ে যাও। একটি একটি করে নিক্ষেপ করো কূপের মধ্যে। লোকগুলো চলে গেলো। মিলিত হলো পরিবার পরিজনের সঙ্গে। এরপর রসুল স.এর নির্দেশানুসারে একটি একটি করে পাথর নিক্ষেপ করলো কুয়ায়। পানিতে পরিপূর্ণ হলো কুয়াটি। সেখানেই তারা তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করলো। পানাহারের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো। প্রতিপক্ষদেরকে তাড়িয়ে দিলো দূরে। ওদিকে তাবুক থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন রসুল স.। তখন বনী সা'দ গোত্রের সকল লোক তাঁর নিকট ইসলাম গ্রহণ করলো। হয়ে গেলো ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক।

হজরত ইবনে ওমর এবং হজরত মুয়াবিয়া থেকে তিবরানী এবং হজরত আনাস থেকে বায়হাকী ও ইবনে সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— বর্ণনাকারী বলেন, একদিন ভোরে আমি দেখলাম অন্য দিনের চেয়ে সূর্য অধিক উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ। আগে কখনো আমি এরূপ দেখিনি। রসুল স.ও হজরত জিবরাইলকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। হজরত জিবরাইল বললেন, আজ মদীনায় ইন্তেকাল করেছেন মুয়াবিয়া বিন মুয়াবিয়া মাজানী। সূর্যের তীক্ষ্ণ দীপ্তি এ কারণেই। আল্লাহ্পাক তাঁর জানাযায় অংশ গ্রহণের জন্য সত্তর হাজার ফেরেশ্তা প্রেরণ করেছেন। হে সম্মানিত ভ্রাতঃ! আপনি কি তাঁর জানাযা পড়বেন? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. আমাদেরকে নিয়ে গায়েবানা জানাযা পড়লেন। কারণ আমরা ছিলাম মদীনা থেকে অনেক দূরে— তাবুকে। জানাযার নামাজে ফেরেশ্তারাও সকলের পিছনে দুইটি সারিতে দাঁড়িয়েছিলেন। জানাযা শেষে রসুল স. বললেন, ভ্রাতা জিবরাইল! এবার বলুন মুয়াবিয়া এ রকম অসাধারণ মর্যাদা পেলো কী কারণে? হজরত জিবরাইল বললেন, তিনি কুল হুআল্লাহু আহাদ সুরাকে ভালো বাসতেন। উঠতে বসতে হেঁটে বাহনে চড়ে— সর্বাবস্থায় তিনি কুল হুআল্লাহু সুরা পাঠ করতেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, বিভিন্ন সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এক সূত্র অন্য সূত্রকে পরিপুষ্ট করে।

তিবরানী ও আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, ওমর আসলামীর পিতামহ বর্ণনা করেছেন, তাবুক যুদ্ধের সময় আমি ছিলাম রসুল স. এর খেদমতগার। আমি তাঁর খাবার তৈরী করে দিতাম। একটি পাত্রে রেখেছিলাম কিছু ঘি। ঘিটুকু জমাট বেঁধে গিয়েছিলো। তাই গলানোর জন্য ঘি ভর্তি পাত্রটি আমি রোদে রেখে শুয়ে

www.eelm.weebly.com

পড়লাম। হঠাৎ দেখলাম, ঘিটুকু টগবগ করে ফুটছে। সেই শব্দ শুনে আমি উঠে বসলাম এবং পাত্রের মুখটি বন্ধ করে দিলাম। রসুল স. বললেন, পাত্রের মুখ বন্ধ না করলে সারা প্রান্তরে ছুটতো ঘিয়ের বন্যা।

হারেস ইবনে উসামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত বকর বিন আবদুল্লাহ মাজানী বলেছেন, রসুল স. একবার এরশাদ করলেন, এই চিঠিটি যে রোম সম্রাটের নিকট নিয়ে যেতে পারবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত। সঙ্গে সঙ্গে একজন নিবেদন করলো, যদি রোম সম্রাট চিঠিটি না গ্রহণ করেন ? রসুল স. বললেন, করবেন। লোকটি চিঠি নিয়ে রোম সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হলো। চিঠি পড়ে রোম সম্রাট কায়সার বললো, তুমি তোমার নবীর নিকটে বোলো, আমি তাঁর অনুগত। কিন্তু আমি রাজত্বহারা হতে চাই না। এরপর কায়সার পত্রবাহককে কিছু আশরাফী দিলেন। বললেন, এগুলো হাদিয়াস্বরূপ তোমার নবীর নিকটে পেশ কোরো। পত্রবাহক ফিরে এলেন। প্রদত্ত হাদিয়া পেশ করে খুলে বললেন সকল ঘটনা। রসুল স. বললেন, সে মিথ্যে কথা বলেছে। এরপর তিনি স. আশরাফীগুলো দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

উত্তম সূত্র পরম্পরায় ইমাম আহমদ ও আবু ইয়ালীর বর্ণনায় এসেছে— হজরত সাঈদ বিন আবী রাশেদ বলেছেন, রসুল স. তাবুকে উপস্থিত হয়ে হজরত দাহিয়া কালবীকে দূত নিযুক্ত করলেন। ইসলামের প্রতি আহ্বান সম্বলিত একটি পত্রসহ দাহিয়া কালবীকে রোমান প্রশাসক হেরাক্লিয়াসের নিকট পাঠালেন। যথাসময়ে চিঠিটি পেয়ে হেরাক্লিয়াস খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আলেম ও পাদ্রীদেরকে তলব করলেন। সকলে উপস্থিত হলে তার পূর্ব নির্দেশ অনুসারে বাহির থেকে বন্ধ করে দেয়া হলো দরবারের সকল দ্বার। হেরাক্লিয়াস বললো, হে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ! নিজেকে নবী দাবি করে, এমন একজনের চিঠি পেয়েছি আমি। অনুগামী সৈন্য পরিবেষ্টিত সেই নবী এখন তাবুকে। তিনি আমাকে তিনটি প্রস্তাব পাঠিয়েছেন— ১. ইসলাম গ্রহণ করো। ২. যদি না গ্রহণ করো তবে জিযিয়া দিতে সম্মত হও। ৩. যদি তাও না করো তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। তোমাদের কিতাবেও আমার অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা আমার বিরুদ্ধে সফল হতে পারবে না। ইসলাম গ্রহণ না করলে জিযিয়া তোমাদেরকে দিতেই হবে। নতুবা যুদ্ধের বিকল্প আর কিছু নেই। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লো আলেম ও পাদ্রীরা। প্রত্যাগমনোন্মুখ ধর্মীয় নেতারা বলে উঠলো, তুমি আমাদেরকে যীশুর ধর্ম পরিত্যাগ করে এক অখ্যাত আরববাসীর ক্রীতদাস বানাতে চাও। দরবার থেকে বেরোতে পারলো না তারা। দেখলো সকল দরজা অর্গলিত। হেরাক্লিয়াস জানতো, এ রকমই ঘটবে। ধর্মীয় নেতারা বাইরে যেতে পারলেই জনতাকে ক্ষিপ্ত করে তুলবে তার বিরুদ্ধে। তাই সে বন্ধ করে দিয়েছিলো সকল নির্গমন পথ। হেরাক্লিয়াস এবার নরম সুরে বললো, আপনারা সংযত হোন। শান্ত হোন। খৃষ্টধর্মের প্রতি আপনাদের অনুরাগ কতটুকু তা পরীক্ষা করবার জন্যই

www.eelm.weebly.com

আমি এ রকম বলেছি। হেরাক্লিয়াসের এ কথা শুনে প্রসন্ন হয়ে ফিরে এলো ধর্মীয় নেতারা। এরপর হেরাক্লিয়াস বললো, এমন এক লোককে আমার নিকট হাজির করা হোক যার স্মৃতি শক্তি প্রখর এবং যার মাতৃভাষা আরবী। আমি তাকে দূত হিসেবে প্রেরণ করবো। এ কথা শুনে দাঁড়ালো তাজাইয়া নামের এক লোক। সে ছিলো আরবী খৃষ্টানদের মুখপাত্র। বর্ণনাকারী বলেন, তাজাইয়া তখন আমাকে নিয়ে হাজির করলো হেরাক্লিয়াসের সামনে। হেরাক্লিয়াস আমাকে একটি চিঠি দিয়ে বললো, নবুয়তের দাবিদার ব্যক্তিটির নিকটে চিঠিটি নিয়ে যাও। তিনি যা বলবেন তা স্মৃতিবদ্ধ কোরো। তিনটি বিষয়ে খেয়াল রেখো ১. আমার নিকটে তিনি যে চিঠি প্রেরণ করেছেন তার উল্লেখ তিনি করেন কিনা। ২. আমার চিঠি পড়ে কোনো মন্তব্য করেন কিনা। ৩. তাঁর গ্রীবাদেশের প্রতি লক্ষ্য করে দেখবে সেখানে সন্দেহজনক অথবা প্রশংসনীয় কোনো চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় কিনা। আমি হেরাক্লিয়াসের পত্র নিয়ে তাবুক পৌঁছলাম। রসুল স. তখন তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে তাবুকের ঝর্ণার দিকে মুখ করে বসেছিলেন। আমি রসুল স. এর সাথীদেরকে বললাম, আপনাদের অধিনায়ক কোথায়? তাঁরা বললেন, ওই তো। আমি নিকটে গিয়ে তাঁর সম্মুখে উপবেশন করলাম এবং হেরাক্লিয়াসের চিঠিটি তাঁকে দিলাম। তিনি স. চিঠিটি তাঁর কোলের উপরে রেখে দিলেন এবং বললেন, তুমি কোন গোত্রের? আমি বললাম, তানাওয়াখ গোত্রের। রসুল স. বললেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে? ইসলাম হচ্ছে বিশুদ্ধ একত্ববাদের ধর্ম। তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের দ্বীন। আমি বললাম, আমি একটি দেশের দূত। একটি গোত্রের ধর্মাবলম্বী। আমি স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ধর্মান্তরিত হবো না। রসুল স. মৃদু হাসলেন, বললেন 'ইন্নাকা লা তাহ্দি মান আহ্বাবতা ওয়ালা কিন্নাল্লহা ইয়াহ্দি মাঁইইয়াশায়ু ওয়াহুয়া আ'লামু বিল মুহ্তাদিন' (নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে হেদায়েত করতে পারো না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকেই হেদায়েত করেন। আর তিনি হেদায়েতকামীদেরকে ভালো করেই জানেন)। হে তানাওয়াখী! পারস্যের রাজদরবারে আমি একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। পারস্যরাজ সেটিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে। আল্লাহ্তায়ালা তাকে, তার রাজত্বকেও টুকরো টুকরো করে ফেলবেন। আরেকটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম আমি আবিসিনিয়ার সম্রাটের দরবারে। তিনি আমার আহ্বানের যথা সমাদর করেছেন। সাড়া দিয়েছেন সত্যের আহ্বানে। তোমাদের শাসকের নিকটেও আমি একটি চিঠি প্রেরণ করেছি। তিনি অবশ্য আমার চিঠির অবমাননা করেননি। এর পরিনাম শুভ। তার শাসন প্রলম্বিত হবে। আমি বললাম, হেরাক্লিয়াস যে তিনটি কথা আমাকে স্মৃতিবদ্ধ করতে বলেছেন, তার একটি হলো এই। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার শরাধার থেকে একটি শর বের করে শরটির তীক্ষ্ণ ফলা দ্বারা তরবারীর খাপের উপর কথাগুলো লিখে রাখলাম। রসুল স. এবার হেরাক্লিয়াসের চিঠি তাঁর বাঁ পাশে উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে দিলেন। আমি বললাম, যাকে চিঠি দেওয়া হলো, তিনি কে? একজন বললেন, মুয়াবিয়া। মুয়াবিয়া চিঠিটি পাঠ করে শোনালেন। চিঠিতে লিপিবদ্ধ ছিলো— আপনি আমাকে জান্নাতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন।

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, বিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে জান্নাত। আর জান্নাতের প্রশস্ততা নাকি আসমান জমিনের প্রশস্ততার সমান। যদি তাই হবে তবে দোযখের অবস্থান কোথায়? রসুল স. এ কথা শুনতেই বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ! যখন রাত্রি আসে তখন দিন কোথায় যায়? আমি তাড়াতাড়ি তূন থেকে তীর বের করে তীরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দ্বারা কথাটি লিখে রাখলাম। সম্পূর্ণ চিঠিটি শুনে রসুল স. বললেন, হে দূত ! তুমি অতিথি। আমাদের উপরে রয়েছে তোমার আতিথ্যের অধিকার। কিন্তু তোমাকে উপহার দেয়ার মতো এখন আমাদের কিছু নেই। আমরা এখন মুসাফির। রসুল স. এর এক সঙ্গী তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, আমি উপহার দিবো। এ কথা বলে তিনি তাঁর জিনিসপত্র ঘেঁটে বের করলেন হলুদ বর্ণের এক জোড়া কাপড়। তারপর কাপড় জোড়া রেখে দিলেন আমার কোলে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, উপহারদাতার নাম কি? লোকেরা বললো, ওসমান। রসুল স. বললেন, মেহমানের দেখাশুনা করবে কে? একজন মদীনাবাসী যুবক বললো, আমি। বলেই উঠে পড়লো যুবক। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে যাওয়ার উদ্যোগ নিতেই রসুল স. বললেন, তানওয়াখী অতিথি! উপবেশন করো। আমি তাঁর সামনে বসে পড়লাম। তিনি স. তাঁর পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগের বস্ত্র উম্মোচন করে বললেন, পিছনের দিকে যাও। আমি তাঁর পশ্চাদ্দিকে গিয়ে বসলাম। সবিস্ময়ে দেখলাম, তাঁর গ্রীবাদেশের মধ্যস্থলে স্পষ্ট জ্বল জ্বল করছে মোহরে নবুয়ত। মোহাম্মদ বিন ওমর লিখেছেন, অতঃপর দূত ফিরে গেলো। আদ্যপান্ত খুলে বললো হেরাক্লিয়াসকে। হেরাক্লিয়াস তার দেশবাসীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালো। কিন্তু জনতা অস্বীকার করলো। হেরাক্লিয়াস পড়ে গেলো বিপাকে। একদিকে রাজ্য হারানোর ভয়। অন্যদিকে জনতার অস্বীকৃতি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো সে। রোমের মহাসম্রাটের দরবারে এ বিষয়ে কিছু জানালো না। আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করারও উদ্যোগ নিলো না। হেমস শহরেই বসে রইলো। রসুল স. সংবাদ পেলেন হেরাক্লিয়াস তার বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার দিকে এগিয়ে আসছে। পরে জানতে পারলেন তথ্যটি ভুল। হেরাক্লিয়াস যেখানে ছিলো সেখানেই আছে।

সুহাইলি উল্লেখ করেছেন, হেরাক্লিয়াস রসুল স.কে কিছু উপঢৌকন দিয়েছিলো। রসুল স. তা গ্রহণ করেন এবং অন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। হেরাক্লিয়াস এক ঘোষকের মাধ্যমে প্রচার করলো, আমি মোহাম্মদের ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। ঘোষণাটি প্রচার হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে একদল বর্মপরিহিত সৈন্য এসে ঘিরে ফেললো হেরাক্লিয়াসের প্রাসাদ। সৈনিকেরা জানালো, আমরা আপনাকে হত্যা করবো। হেরাক্লিয়াস তাদের সামনাসামনি হয়ে বললো, তোমাদের ধর্মবোধ কতটা দৃঢ় তা পরীক্ষার জন্যই আমি এ রকম ঘোষণা দিয়েছিলাম। এখন তোমাদের ধর্মপ্রীতি ও উচ্ছ্বাস দেখে সত্যই আমি গর্বিত ও আনন্দিত। এ কথা শুনে সৈনিকেরা খুবই খুশি হলো। নিশ্চিত মনে চলে গেলো যার যার জায়গায়। এরপর প্রেরিত দূত হজরত দাহিয়া কালবীকে একটি চিঠি

www.eelm.weebly.com

দিয়ে বিদায় করলো সে। বললো, চিঠিটি তোমাদের রসুলকে দিয়ো। চিঠিতে লেখা ছিলো আমি নিঃসন্দেহে মুসলমান। কিন্তু শাসনাধিকারচ্যুত হবার ভয়ে আমি আমার বিশ্বাসকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে পারছি না। এ কথা শুনেই রসুল স. বলে উঠলেন, আল্লাহ্‌র দুশমন মিথ্যা বলেছে। সে মুসলমান নয়, খৃষ্টান।

আবদুল্লাহ্ বিন বকর—ইয়াজিদ বিন রুমমান—ইসহাক সূত্রে এবং সরাসরি ওরওয়া বিন যোবায়ের থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, তাবুক থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে একস্থানে থামলেন রসুল স.। সেদিন ছিলো ৯ই রজব। সেখান থেকে হজরত খালেদ বিন ওলিদের নেতৃত্বে চার শত বিশ জনের একটি অশ্বারোহী সৈনিকের দলকে পাঠালেন দুমা অভিযানে। সেখানকার শাসক ছিলো উকাইদার বিন আবদুল মালেক। সে ছিলো খৃষ্টান। হজরত খালেদ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এতো অল্প সৈন্য নিয়ে আমরা কি উকাইদারের বিরুদ্ধে টিকতে পারবো? রসুল স. বললেন, অবশ্যই পারবে। তোমরাই হবে বিজয়ী। খুব সহজেই উকাইদারকে বন্দী করতে সক্ষম হবে তোমরা। তাকে কিন্তু হত্যা কোরো না। বন্দী করে হাজির কোরো আমার সামনে।

দুমার দিকে ঘোড়া ছোটালেন হজরত খালেদ। অবস্থান গ্রহণ করলেন উকাইদারের প্রাসাদের দৃষ্টিসীমানার মধ্যে। তখন রাত। প্রবাহিত হচ্ছিলো তপ্ত বাতাস। প্রাসাদের ছাদে স্ত্রী রুবাব বিনতে আনীফকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে বসেছিলো উকাইদার। এক ক্রীতদাসী গান গাইছিলো। চলছিলো নৃত্যগীত ও মদ্যপান। হঠাৎ খবর পেলো একটি জংলী নীল গাই এসে প্রাসাদের দরজায় শিঙ দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে যাচ্ছে। উকাইদার ভাবলো, নীল গাইটি বধ করতেই হবে। নিচে নেমে এলো সে। শিকারীর পোশাক পরে বের হলো। গাইটি ততক্ষণে হাওয়া। ঘোড়ায় চড়ে গাইটিকে খুঁজতে বের হলো সে। সঙ্গে রওনা হলো তার ভাই হাসান ও দু'জন ক্রীতদাস। তাদের হাতে ছিলো ছোট ছোট বর্শা। কিছুদূর অগ্রসর হতেই হজরত খালেদের বাহিনী ঘিরে ফেললো উকাইদার ও তার সঙ্গীদেরকে। হাসানের পরনে ছিলো স্বর্ণখচিত পোশাক। তার ওই মূল্যবান পোশাকটি খুলে নেয়া হলো। হজরত খালেদ বললেন, শোনো উকাইদার। আমি তোমাকে হত্যা করবো না। বন্দী অবস্থায় নিয়ে যাবো রসুল স. এর দরবারে— যদি তুমি দুমার দুর্গ আমার অধিকারভূত করে দাও। উকাইদার বললো, ঠিক আছে, চলো। দুর্গের বাইরে দাঁড়িয়ে উকাইদার দুর্গবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বললো, দরজা খুলে দাও। দুর্গবাসীরা দুর্গের দরজা খুলে দেয়ার উপক্রম করতেই বাধা দিলো উকাইদারের ভাই মুসাদ। উকাইদার বললো, দুর্গবাসীরা বুঝতে পেরেছে আমি বন্দী। তাই এখন তারা আর আমার কথা শুনবে না। সুতরাং আমাকে মুক্ত করে দেয়া হোক। আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি, যদি তোমরা আমার

www.eelm.weebly.com

পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনের নিরাপত্তা দান করতে সম্মত হও, তবে আমি দুর্গের দরজা খুলে দিবো। হজরত খালেদ বললেন, হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে আমরা এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হবো। উকাইদার বললো, কর নির্ধারণ করবে কে? তুমি না আমি? হজরত খালেদ বললেন, তুমিই করো। উকাইদার ঠিক করলো মুসলিম বাহিনীকে দেয়া হবে দুই হাজার উট, চারশ' শিরোস্ত্রাণ, চারশ' লৌহবর্ম ও চারশ' বর্শা। আর একটি শর্ত করাহলো, উকাইদার ও তার ভাইকে রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হতে হবে। চুক্তির চূড়ান্ত অনুমোদন দিবেন রসুল স. স্বয়ং। উকাইদারকে ছেড়ে দেয়া হলো। এবার নিজেই সে খুলে দিলো দুর্গের দরজা। হজরত খালেদ সহজে দুর্গে প্রবেশ করে বন্দী করলেন উকাইদারের ভাই মুসাদকে। আদায় করে নিলেন নির্ধারিত যুদ্ধ-বিনিময়। এরপর রসুল স. এর নিকট আগে শুভসংবাদ জানানোর জন্য প্রেরণ করলেন আমর ইবনে উমাইয়া জুমাইরীকে। হাসানের স্বর্ণখচিত পোশাকটিও পাঠালেন তাঁর সঙ্গে। হজরত আনাস ও হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর দরবারে হাসানের পোশাকটি পৌঁছলে সেখানে উপস্থিত সাহাবীগণ বহু মূল্যবান পোশাকটি নেড়ে চেড়ে দেখলেন এবং বিভিন্ন কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। রসুল স. বললেন, তোমরা পোশাকটি দেখে বিস্মিত হচ্ছো। কিন্তু আমার জীবনাধিকারী সত্তার শপথ! জান্নাতে সা'দ বিন মুয়াজের রুমাল হবে এর চেয়ে অধিক সুন্দর।

হজরত খালেদ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে বিশেষ বিশেষ কিছু সামগ্রী রসুল স. এর জন্য আলাদা করে রাখলেন। রসুল স. এর জন্য খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) রেখে অবশিষ্ট গণিমত হিসেবে ভাগ করে দিলেন মুজাহিদদের মধ্যে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমি তখন আমার ভাগে পেয়েছিলাম একটি লৌহবর্ম, একটি শিরোস্ত্রাণ ও দশটি উট। হজরত ওয়াসেলা বলেছেন, আমি পাই দশটি উট। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বর্ণনা করেছেন, মাজানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমরা চল্লিশজন অংশগ্রহণ করেছিলাম। পেয়েছিলাম লৌহবর্মসহ পাঁচটি করে বল্লম।

আমি বলি, মূল্যের তারতম্যের কারণে ওভাবে (কখনো পাঁচ ভাগে কখনো ছয় ভাগে) বণ্টন করতে হয়েছিলো। ভাগ বণ্টনের পর বন্দী উকাইদার ও মুসাদকে নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হলেন হজরত খালেদ।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের বলেছেন, আমি দেখেছি, তখন বন্দী উকাইদারের পরনে ছিলো বহু মূল্যবান রেশমী পরিচ্ছদ। আর গলায় ঝুলছিলো স্বর্ণনির্মিত ক্রুশ। রসুল স.কে দেখেই সে সেজদা করলো। রসুল স. 'না' 'না' বলে বাধা দিলেন। এরপর কিছু হাদিয়া পেশ করলো উকাইদার। ওগুলোর মধ্যে ছিলো মূল্যবান কিছু পরিচ্ছদও। ইবনে আছির

www.eelm.weebly.com

লিখেছেন, হাদিয়ার সামগ্রীগুলোর মধ্যে একটি খচ্চরও ছিলো। রসুল স. জিযিয়া প্রদানের শর্তে উকাইদারের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হলেন। তাকে একটি নিরাপত্তাপত্রও লিখে দিলেন। জিযিয়া ধার্য করা হলো বাৎসরিক তিন শত দিনার।

ওদিকে আইলার শাসক ইয়াহান্না বিন রুওয়াওবাও ভীত হলো। ভাবলো এবার নিশ্চয় আইলার দিকে সৈন্য প্রেরণ করা হবে। এ কথা ভেবেই সে আগে ভাগে উপস্থিত হলো রসুল স. এর দরবারে। তার সঙ্গে উপস্থিত হলো জারবা ও আজরাজের বাসিন্দারাও। আবু হুমাইদ সায়েদীর বর্ণনায় এসেছে, আইলার শাসক তখন রসুল স.কে উপঢৌকন হিসেবে একটি শাদা খচ্চর দিয়েছিলো। রসুল স.ও তাকে দিয়েছিলেন একটি চাদর। নিরাপত্তাপত্রও লিখে দিয়েছিলেন তাকে। ইবনে আবী শায়বা ও বোখারীর বর্ণনায় এ রকম এসেছে।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের বলেছেন, আমি আইলার শাসক ইয়াহান্না বিন রুওয়াওবাকে রসুল স. এর দরবারে হাজির হতে দেখেছি। তার গলায় ঝুলছিলো সোনার ক্রুশ। মাথার সামনের চুল সে ঝুঁটি বেঁধে রাখতো। মহান দরবারে হাজির হয়েই সে তার মস্তক অবনত করে দাঁড়ালো। রসুল স. ইশারায় মাথা ওঠাতে বললেন। রসুল স. তাকে একটি ইয়েমেনী চাদর উপহার দিলেন। আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ বিন মোহাম্মদ চাদরটি কিনে এনেছিলেন তিনশত দিনার দিয়ে। রসুল স. ইউহান্নার দেখা শোনার ভার অর্পণ করেছিলেন হজরত বেলালের নিকটে।

রসুল স. এর পবিত্র জীবনী রচয়িতারা লিখেছেন, তিনি স. জারবাবাসীদের জিযিয়া নির্ধারণ করেছিলেন তিনশত দিনার। নিরাপত্তাপত্রও লিখে দিয়েছিলেন তাদেরকে। তাদের সংখ্যা ছিলো তিন শত। আজরাজবাসীদেরকেও নিরাপত্তাপত্র লিখে দিয়েছিলেন তিনি স.। মেকনাবাসীদের সঙ্গেও তাদের ফসলের এক চতুর্থাংশ প্রদানের শর্তে সন্ধি করে নিয়েছিলেন।

হজরত আবু হুমাইদ সায়েদী থেকে ইবনে শায়বা, আহমদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আইলার শাসকের পক্ষ থেকে সন্ধিপ্রস্তাব সম্বলিত একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিলো এক দূতের মাধ্যমে। সে হাদিয়া হিসেবে নিয়ে এসেছিলো একটি খচ্চরও। রসুল স. সেটিকে গ্রহণ করেন। একটি নিরাপত্তাপত্র লিখে দেন। সৌহার্দের নিদর্শন স্বরূপ একটি চাদরও পাঠিয়ে দেন তার কাছে।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে ইমাম আহমদ এবং ইয়াহইয়া বিন কাছির সূত্রে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাবুকে ছিলেন। অবস্থানের সময় পূর্ব নির্ধারিত ছিলো না বলে পুরো বিশদিনই তাঁকে নামাজে কসর করতে হয়েছিলো। মোহাম্মদ বিন ওমর, ইবনে সা'দ এবং ইবনে হাজ্জামের মাধ্যমে এ রকম বর্ণনা এসেছে। ইবনে উকবা এবং ইবনে ইসহাক বলেছেন, রসুল স. তাবুকে অবস্থান করেছিলেন দশদিনের কিছু বেশী।

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, তাবুক থেকে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা সে সম্পর্কে রসুল স. সাহাবীগণের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আল্লাহ্পাকই তাঁর নির্দেশানুসারে আপনাকে পরিচালিত করেন। এক্ষেত্রেও আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করুন। সিরিয়ায় রয়েছে রোমানদের বিশাল সেনানিবাস। আমরা তো তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি। এখন রোমানদেরকে সিরিয়া থেকে এগিয়ে আসতে দিন। যুদ্ধের আগ্রহ থাকলে তারা এটুকু পথ অতিক্রম করে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে। আমাদের আর অগ্রসর না হওয়াই সমীচীন। আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতীক্ষায় থাকাই আমাদের কর্তব্য।

আহমদ, তিবরানী ও তাহাবীর বর্ণনায় এসেছে, তাবুক অভিযানের সময় রসুল স. বলেছিলেন, কোনো স্থানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে সে স্থান ত্যাগ কোরো না। আর অন্যত্র অবস্থান করলে প্লেগ কবলিত এলাকায় যেয়ো না।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, সম্ভবত: রসুল স. সংবাদ পেয়েছিলেন যে, সিরিয়া অঞ্চলে তখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। তাই তিনি তাবুক থেকে আর অগ্রসর হননি।

ইবনে আবী হাতেম এবং বায়হাকীর শিথিল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ইহুদীরা একবার রসুল স.কে বললো, আপনি যদি সত্যিই নবী হন, তবে সিরিয়ায় আসুন। সিরিয়া হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কেরামের বিচরণভূমি। আর সিরিয়া তো পবিত্র ভূমি হিসেবেও পরিচিত। রসুল স. তাদের কথা স্বীকার করলেন। তাবুক গমন করেছিলেন তিনি সে কারণেই। তাবুকে উপস্থিত হবার পর ইহুদীরা শুরু করে ষড়যন্ত্র। তাদের ষড়যন্ত্র অকার্যকর করবার জন্য আল্লাহ্তায়ালা রসুল স.কে মদীনা প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ, হজরত ওমর থেকে আবু ইয়ালী, আবু নাঈম এবং ইবনে আসাকের এবং আপন শায়েখগণের সূত্রে মোহাম্মদ বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, তাবুকে দেখা দিয়েছিলো খাদ্য সংকট। তাই সাহাবীগণ একদিন বললেন, হে আল্লাহর রসুল! অনুমতি দিন, বাহন হিসেবে ব্যবহৃত উটগুলো আমরা জবাই করে খাই। এমতো কথোপকথনের সময় সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত ওমর। বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি কি তাদেরকে অনুমতি দিতে চান ? রসুল স. বললেন, কি আর করি। তারা যে ক্ষুধার্ত। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এ রকম করলে তো বাহনের অভাবে মহাসংকটে পড়বো আমরা। তাই আমার প্রস্তাব এই যে, যার কাছে যতটুকু খাদ্য আছে সবগুলোকে একত্র করতে বলুন। তারপর সেগুলোর বরকতের জন্য দোয়া করুন। রসুল স. বললেন, তাই হোক। একটি চামড়ার দস্তরখানা বিছানো হলো।

www.eelm.weebly.com

ঘোষণা করে দেয়া হলো, যার যা কিছু খাদ্য আছে, সব এখানে একত্র করো। সকলেই নির্দেশ পালন করলেন। কেউ নিয়ে এলেন এক মুঠো খেজুর। কেউ নিয়ে এলেন রুটির টুকরা। কেউ ছাতু, আটা ইত্যাদি। সব মিলিয়ে দেখা গেলো খাদ্য বস্তুগুলোর ওজন সাতাশ সা' এর মতো হবে। রসুল স. ওজু করলেন। দুই রাকাত নামাজ পাঠ করলেন। তারপর খাদ্যের বরকত চেয়ে প্রার্থনা জানালেন মহান আল্লাহ্‌র দরবারে। আল্লাহ্‌তায়ালা দান করলেন অফুরন্ত বরকত। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, আমরা সকলেই পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলাম। বিভিন্ন পাত্র পূর্ণ করে নিলাম। তারপরেও দেখা গেলো অনেক অবশিষ্ট রয়েছে। হজরত ওমর বর্ণনা করেছেন, লোকেরা তাদের পাত্র ভরে ভরে খাদ্য নিয়ে যেতো। পরক্ষণেই খাদ্যগুলো হয়ে যেতো আগের মতো। রসুল স. তখন বলেছিলেন, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং আমি অবশ্যই তাঁর রসুল। যে আল্লাহ্‌র এই অলৌকিকত্বে অবিশ্বাস করবে, সে হবে জান্নাতের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত।

আবু নাঈম ও মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু কাতাদা বলেছেন, তাবুক যাত্রার সময় এক স্থানে থামলাম আমরা। তখন রাত। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম সকলে। জেগে উঠে দেখলাম সকালের সূর্য প্রখর তাপ ছড়াতে শুরু করেছে। আমরা প্রায় সমস্বরে বলে উঠলাম, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন। রসুল স. বললেন ঠিক আছে। শয়তান যেভাবে আমাদের অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করলো, আমরাও তেমনি করে তাকে করবো ক্ষতবিক্ষত। আমার কাছে ছিলো পানির একটি পাত্র। রসুল স. পাত্রটি নিয়ে ওজু করতে বসলেন। ওজু শেষে বললেন, আবু কাতাদা! পাত্রভ্যন্তরের অবশিষ্ট পানি সংরক্ষণ কোরো। তিনি স. আমাদের সকলকে নিয়ে ফজরের কাজা আদায় করলেন। তারপর বললেন, যদি তোমরা আবু বকর ও ওমরের কথা শুনতে তবে এভাবে বিপদে পড়তে না। স্থানটি ছিলো পানি শূন্য। তাই হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর এখানে যাত্রা স্থগিত করতে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, আরো সম্মুখে অগ্রসর হওয়াই উত্তম। পানির অভাবে সকলেরই কষ্ট হচ্ছিলো খুব। পিপাসায় শুকিয়ে গিয়েছিলো সকলের কণ্ঠনালী। ঘোড়া ও উটগুলোর গলা থেকেও আওয়াজ বের হচ্ছিলো না। রসুল স. একটি চামড়ার পাত্র চেয়ে নিলেন। তাতে ঢাললেন তাঁর ওজুর অবশিষ্ট পানিটুকু। তারপর তাঁর পবিত্র হাতের আঙ্গুলগুলো ডুবিয়ে দিলেন ওই পানিতে। তাঁর পবিত্র আঙ্গুলগুলো থেকে শুরু হলো পানির প্রস্রবন। সবাই সেখান থেকে পানি নিতে শুরু করলেন। পিপাসা মিটালেন নিজেদের, পশুদের। এভাবে বাহিনীর তিরিশ হাজার সৈন্য, বারো হাজার উট, বারো হাজার ঘোড়া সকলেই পরিতৃপ্ত হলো।

www.eelm.weebly.com

ইবনে ইসহাক ও মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে এক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন রসুল স.। স্থানটি ছিলো মরুভূমি। অদূরে ছিলো ক্ষীণকায়া প্রস্রবন। ওই অপ্রতুল পানি এই বিশাল সেনাবাহিনীর জন্য কিছুই নয়। রসুল স. বললেন, আমার আগে কেউ সেখানে যেয়ো না। গেলেও ওই নদীর পানি পান কোরো না। কিন্তু চারজন মুনাফিক এই নির্দেশের তোয়াক্কা করলো না। তারা আগে ভাগে যেয়ে পানি পান করলো। সঙ্গে সঙ্গে নদীর পানি গেলো শুকিয়ে। রসুল স. সেখানে পৌঁছে বললেন, কে এসেছিলো আগে? সাহাবীগণ বললেন, মোতাব বিন কুশায়ের, হারেস বিন ইয়াজিদ, ওয়াদিয়া বিন সাবেত এবং জায়েদ বিন ইয়াসির। রসুল স. বললেন, আমি কি তোমাদেরকে নিষেধ করে দেইনি? তিনি স. ওই চার মুনাফিকের জন্য বদদোয়া করলেন। অভিশাপ দিলেন তাদেরকে। এরপর শুষ্ক নদীতে নেমে মাটিতে রাখলেন তাঁর পবিত্র হাত। সঙ্গে সঙ্গে মাটি ফেটে প্রবল বেগে পানি উঠতে লাগলো। রসুল স দোয়া করলেন। পানির গতি হলো আরো তীব্র। হজরত মুয়াজ বিন জাবাল বর্ণনা করেছেন, যাঁর অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, সেই সত্তার কসম! আমি স্বকর্ণে শুনলাম বজ্রের আওয়াজের মতো প্রচণ্ড আওয়াজ। তারপর ছুটলো তীব্র পানির ফোয়ারা। আমরা সকলে ওই পানি পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করলাম। পশুদেরকেও পান করালাম। রসুল স. বললেন, বেঁচে থাকলে দেখতে পাবে অচিরেই এ অঞ্চল হয়ে যাবে শস্য-শ্যামল।

যুদ্ধের ইতিহাস রচয়িতাগণ সূত্রে মোহাম্মদ বিন ওমর ও আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর বাহিনী নিয়ে উচ্চভূমি থেকে নিম্নভূমির দিকে রওয়ানা হলেন। পানি নিঃশেষ হয়ে এসেছিলো। কিন্তু কোথাও কোনো পানির চিহ্ন পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো না। তৃষ্ণার্ত সৈন্যরা তাঁদের কষ্টের কথা জানালেন। রসুল স. হজরত উসায়েদ ইবনে হুদায়েরকে বললেন, যেখান থেকে পারো সামান্য কিছু পানি নিয়ে এসো। হজরত উসায়েদ খোঁজাখুঁজি করে এক রমণীর কাছে পেলেন সামান্য পানি। মশকসহ ওই সামান্য পানি নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। রসুল স. ওই পানিতে বরকত দানের জন্য প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা শেষে বললেন, এসো। আমি তোমাদের সবাইকে পানি পান করাবো। সকলেই তাঁদের পানির পাত্রগুলো পূর্ণ করে নিলেন। পান করলেন পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে। এরপর রসুল স. বললেন, এবার তোমাদের উটগুলোকে আনো। উট-গুলোকেও পানি পান করানো হলো তৃপ্তির সঙ্গে। এক বর্ণনায় এসেছে— উসায়েদ পানি নিয়ে এলেন। রসুল স. ওই পানি ঢাললেন একটি বড় পেয়ালায়। তারপর ওই পানিতে হাত চুবিয়ে হাত ধৌত করলেন। মুখ ও পা ধুয়ে নিলেন ওই পানিতে। তারপর দুই হাত তুলে দোয়া করতে শুরু করলেন। হাত নামাবার

www.eelm.weebly.com

আগেই পেয়ালা থেকে প্রবল তেজে পানি নির্গত হতে শুরু করলো। রসুল স. বললেন, ইচ্ছেমতো পান করো। বাড়তে লাগলো পানির পরিসর। এত বেশী বেড়ে গেলো যে, এক সঙ্গে দুশ' লোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পানি পান করতে পারলেন। সেনাবাহিনীর সকল সদস্য পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানি পান করার পর পান করালেন তাঁদের পশুপালকে।

বিশুদ্ধ সূত্রে ফুজালার মাধ্যমে তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত উবায়েদ বলেছেন, রসুল স.এর তাবুক অভিযানের সময় ছিলো ঘোর গ্রীষ্মকাল। ফেরার পথে দেখা দিলো খাদ্য ও পানির সংকট। উট ও ঘোড়াগুলোও যথেষ্ট পানাহারের অভাবে হয়ে পড়লো দুর্বল। রসুল স.কে এ কথা জানানো হলো। তিনি এমন স্থানে দাঁড়ালেন যেখানে পথ অতিক্রম করতে হয় একজনের পিছনে একজন করে। সেখানে দাঁড়িয়ে প্রতিটি যাত্রী ও তার বাহনে ফুঁ দিয়ে রসুল স. দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি এদেরকে এবং এদের বাহনগুলোকে শক্তি সামর্থ্য দাও। এদের পথ পরিক্রমণকে করে দাও সহজ। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর কাফেলা হলো প্রচণ্ড গতিশীল। উটগুলো এত দ্রুত ছুটতে শুরু করলো যে, লাগাম টেনে ধরেও সেগুলোকে থামানো যাচ্ছিলো না। মদীনা পৌঁছানো পর্যন্ত এভাবেই চললো সেগুলো। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম, আবী হুমাইদ, সায়েদী প্রমুখ। আরো বর্ণিত হয়েছে, মদীনায় প্রবেশের আগে উহুদ পাহাড় দেখতে পেয়ে রসুল স. বলে উঠলেন, এই উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে। আর আমরাও তাকে ভালোবাসি।

জননী আয়েশা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, তাবুক থেকে ফিরে মদীনায় প্রবেশের সময় বালক বালিকারা পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে সুর করে আবৃত্তি করতে লাগলো—

ত্বলায়াল বাদরু আ'লাইনা
মিনসানীয়াতিল বিদায়ী
ওয়াজাবাশ্ শুকরু আ'লাইনা
মাদায়া লিল্লাহি দায়ী।

অর্থঃ বিদা উপত্যকা জুড়ে দেখা দিয়েছে পূর্ণ শশী। যতকাল প্রার্থনাকারীরা প্রার্থনারত রইবে ততকাল আমাদের দায়িত্বে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অত্যাবশ্যক।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, তাবুক অভিযান থেকে ফিরে এসে সৈনিকেরা তাদের যুদ্ধের পোশাক বিক্রয় করতে শুরু করলেন। সকলেই বলাবলি করতে লাগলেন, যুদ্ধ শেষ। যুদ্ধ শেষ। রসুল স. এ কথা জানতে পেরে বললেন, খবরদার! এ রকম কোরো না। দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল সত্যাধিষ্ঠিত হয়ে যুদ্ধ করতে থাকবে।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. তাবুক অভিযানে রওয়ানা হয়েছিলেন নবম হিজরীর রজব মাসে। আর সেখান থেকে মদীনায় ফিরে এসেছিলেন রমজান মাসে। মদীনা থেকে তাবুকের দূরত্ব চৌদ্দ মন্‌জিল। সুরা আন্ নূরের তাফসীরে এ রকম লেখা হয়েছে। রসুল স. এর জীবনালেখ্য প্রণেতাগণও এ রকম লিখেছেন। আমরা একবার হজ যাত্রার সময় তাবুক গিয়েছিলাম। তখন দেখেছি মদীনা থেকে সেখানকার দূরত্ব বারো মন্‌জিল (চৌদ্দ মন্‌জিল নয়)। তাবুক থেকে দামেশকের দূরত্ব এগারো মন্‌জিল (এক মন্‌জিল বলে একদিনের পথকে)।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ

❒ আলিফ-লাম-র। এইগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আয়াত।

এই সুরার আয়াত সংখ্যা ১০৯টি। তিনটি আয়াত ছাড়া বাকী সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। প্রথম আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে আলিফ, লাম, র। এই অক্ষরগুলোকে বলা হয় হরূফে মুকাত্তায়াত (বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি)। বর্ণগুলো দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যাচ্ছন্ন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তাফসীরে মাযহারী প্রথম খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় এবং চতুর্থ খণ্ডের ৩৮১ পৃষ্ঠায়। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিল্‌কা আয়াতুল্ কিতাবিল্ হাকীম' (এগুলো জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আয়াত)। এখানে 'তিলকা' শব্দটি একটি রূপক অর্থবোধক শব্দ। শব্দটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে কোরআন মজীদের দিকে। কেউ কেউ বলেছেন, ইঙ্গিত করা হয়েছে ওই সকল আয়াতের দিকে যা উল্লেখিত হয়েছে ইতোপূর্বে। কিতাবুল হাকীম অর্থ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ। এখানে হাকীম শব্দটি কিতাব শব্দের বিশেষণ। এই গ্রন্থকে জ্ঞানগর্ভ বা বিজ্ঞানময় বলার কারণ এই যে, এই গ্রন্থের বিধানসমূহ নির্ভুল ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এর মধ্যে উল্লেখিত কোনো কোনো সামাজিক বিধান কোনো কোনো সময় রহিত হলেও গ্রন্থের মূল মর্ম ও বক্তব্য চিরন্তন— যা কখনো রহিত হতেই পারে না। হাসান বসরী বলেছেন, এই গ্রন্থে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং উত্তম কর্ম সম্পাদনের জন্য। আর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে সকল অতিরঞ্জন ও অন্যায় থেকে বিরত থাকার জন্য। আরো বলে দেয়া হয়েছে, যারা ধর্মনিষ্ঠ ও আল্লাহ্‌তায়ালার বিধানের পূর্ণ অনুগত তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। আর অবাধ্যদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী অগ্নিবাস।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর ও জুহাক বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্পাক রসুলপাক স.কে রেসালতের দায়িত্ব দান করলেন এবং তা প্রচার করতে বললেন। কিন্তু মক্কাবাসীদের অধিকাংশই তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলো। বলতে শুরু করলো, আল্লাহ্ কোনো মানুষকে রসুল বানাতে পারেন না। যদি বানাতেন তবে প্রতাপশালী কোনো নেতাকে বানাতেন। কোনো বিত্তহীন ও অক্ষরবিবর্জিত লোককে নয়। তাদের এ সকল অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ২

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ○

❑ মানুষের জন্য ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাহাদিগেরই এক জনের নিকট ওহি প্রেরণ করিয়াছি এই মর্মে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক কর এবং বিশ্বাসীদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহাদিগের জন্য তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট আছে উচ্চ মর্যাদা! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, 'এতো এক সুদক্ষ যাদুকর।'

মানুষের জন্য মানুষের মধ্যে থেকে নবী রসুল প্রেরণ করাই আল্লাহ্তায়ালার রীতি। মানুষের নবী কখনো ফেরেশতা, জ্বিন বা অন্য কোনো সম্প্রদায় হতে পারে না। এ রকম করলে পথ-প্রদর্শন ও পথপ্রাপ্তির বিষয়টি হয়ে পড়বে বিশৃঙ্খল, ভারসাম্যহীন ও অসফল। উপকার প্রদান ও প্রাপ্তি সফল হতে গেলে নবী ও তার উম্মতকে সমসম্প্রদায়ভূত হতেই হবে। তাই আল্লাহ্তায়ালা মানুষের জন্য মানুষের মধ্যে থেকেই নবী নির্বাচন করেন এবং তাদেরকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে পরিচালিত করেন। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এই চিরন্তন তত্ত্বটি জানে না। তাই বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে, মানুষ আবার কখনো মানুষের নবী হতে পারে নাকি? আল্লাহ্তায়ালা তাদের এই অজ্ঞজনোচিত ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে অবতীর্ণ করেছেন এই আয়াত। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওমা আরসালনা মিন ক্বাবলিকা ইল্লা রিজালান' (আমি আগে থেকেই সর্বযুগে পুরুষদেরকে পয়গম্বর বানিয়েছি)। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কুল লাও কানা ফিল্ আরদ্বি মালায়িকাতুন ইয়ামশুনা মুতমাইন্নিনা লানায্যালনা আ'লাইহিম মিনাস্সামায়ী মালাকার রসুলা' (যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বিচরণ করতো ও বসবাস করতো তাহলে আমি তাদের প্রতি আকাশ থেকে কোনো ফেরেশতাকে রসুলরূপে প্রেরণ করতাম)।

www.eelm.weebly.com

সাধারণ মানুষ মনে করে পৃথিবীর বিত্ত-বৈভবের অধিকারীরাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাই তারা এমন কথা বলতো যে, নবী যদি বানাতেই হয় তাহলে ধনী ও প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তিকে নবী বানানো হলো না কেনো? অন্য এক আয়াতেও এ রকম উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— 'লাওলা নুয্যিলা হাজাল কুরআনু আ'লা রজুলিম মিনাল ক্বারইয়াতাইনি আ'জীম'। এ কথার অর্থ— দু'টি জনপদের (মক্কা ও তায়েফের) কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির উপরে কোরআন নাজিল হলো না কেনো? অর্থাৎ মক্কার মুশরিকেরা মনে করতো মক্কার ওলিদ বিন মুগিরা এবং তায়েফের মাসউদ বিন ওমর সাক্বাফির মতো প্রতাপশালী সমাজপতির উপর কোরআন অবতীর্ণ হলো না কেনো। কারণ, পার্থিব দৃষ্টিতে তারা ছিলো রসুল স. অপেক্ষা প্রভাবশালী। আল্লাহ্‌পাক মুশরিকদের ওই কথার জবাবে জানিয়েছেন— 'আহুম ইয়াক্বসিমুনা রহমাতা রব্বিকা'। এ কথার অর্থ— তারা কি আল্লাহ্‌পাকের রহমত (নবুয়ত ও রেসালত) কে নিজেরাই বণ্টন করবে! মুশরিকেরা মূর্খ, অবিবেচক ও স্থূলদর্শী। যদি এ রকম না হতো, তবে তারা দেখতে পেতো রসুল স. এর পবিত্র চরিত্রে ঘটেছে সকল শুভ গুণাবলীর সমাবেশ। পার্থিব বৈভব ও প্রভাব সেসব গুণাবলীর তুলনায় কিছুই নয়। আর পূর্ববর্তী নবী-রসুলগণও এমনই ছিলেন। দুনিয়ার বৈভব ও প্রভাবকে তাঁরা গ্রাহ্যই করেননি।

আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের বিকৃত ধারণা ও অপকথনকে প্রত্যাখ্যান করে রসুল স.কে প্রেরণের উদ্দেশ্য বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— 'মানুষের জন্য এটা কী আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই একজনের নিকট ওহি প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক করো।' এখানে 'সতর্ক করো' বলে সাধারণভাবে সকল মানুষকে আল্লাহ্‌র ভয় প্রদর্শন করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই যে, সবাই আল্লাহ্‌কে ভয় করে না, ভয় করে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি। তারাই ইমানদার। তাই পরক্ষণেই তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে— 'বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে উচ্চ মর্যাদা।'

এখানে 'ক্বাদামা সিদক্বিন' এর মর্মার্থ উচ্চ মর্যাদা, যে মর্যাদার দিকে ইমানদারেরা ধাবিত হতে থাকেন। 'ক্বাদাসা সিদক্বিন' কথাটির শাব্দিক অর্থ সত্যের প্রতি পদবিক্ষেপ (সত্য পদক্ষেপ)। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হবে উচ্চ মর্যাদা (উচ্চ মর্যাদার প্রতি পদবিক্ষেপ) অর্থাৎ কারণকেই এখানে উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন, 'হাত বড়' অর্থ দানের হাত বড়। দান করা হয় হাতের মাধ্যমে। অতএব হাত হচ্ছে দানের কারণ। তবুও 'দান' বুঝাতে 'হাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। শব্দ ব্যবহারের এই রীতিটিই এখানে প্রবর্তিত হয়েছে।

এখানে 'সত্য পদক্ষেপ' কথাটি বসিয়ে এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হতে গেলে প্রয়োজন সত্য কথন ও বিশুদ্ধ সংকল্প (নিয়ত)। আর সেই সত্য কথন হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। হজরত ইবনে আব্বাস এবং জুহাক প্রদত্ত তাফসীরের অনুসরণে আমি এখানে ক্বাদামা সিদক্বিন কথাটির অর্থ করেছি 'উচ্চ মর্যাদা'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তারাই সত্য

www.eelm.weebly.com

পদবিক্ষেপকারী উচ্চ মর্যাদাশালী, যারা তাদের পুণ্যকর্মসমূহ পূর্বাহ্নে প্রেরণ করেন। উত্তম প্রতিদান বা উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন তাঁরাই। জুহাক বলেছেন, ক্বাদামা সিদক্বিন অর্থ সত্যবাদিতার সওয়াব। অর্থাৎ হজরত ইবনে আব্বাসের নিকটে কথাটির অর্থ 'উত্তম প্রতিদান' এবং জুহাকের নিকটে 'সওয়াব'।

হাসান বসরী বলেছেন, ক্বাদামা সিদক্বিন অর্থ পুণ্যর্কম সমূহ যা বিশ্বাসীরা মৃত্যুর পূর্বেই অর্জন করে থাকেন। তাঁর নিকট 'ক্বদ্ ক্বাদিম' অর্থ তাকাদ্দুম (পূর্বাহ্নে সম্পাদিত পুণ্যকর্ম সমূহ)। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক এখানে এই সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, ইমানদার ব্যক্তিরা উত্তম আমলসমূহ মৃত্যুর পূর্বেই প্রেরণ করে থাকেন এবং সেগুলোর সঙ্গেই মিলিত হবেন মৃত্যুর পর।

হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, আরববাসীরা অগ্রগামী হওয়াকে বলে ক্বাদম— তা কল্যাণের দিকে হোক অথবা শিরিকের দিকে। যেমন বলা হয়, ইসলামে অমুক ব্যক্তির পদক্ষেপ (সাবাকাত) অর্জিত হয়েছে। আমার নিকট কথাটির অর্থ— গৃহীত পদক্ষেপ অথবা ক্রম-অগ্রসরমান পদক্ষেপ— তা কল্যাণের দিকে হোক অথবা অকল্যাণের দিকে।

এক বর্ণনানুসারে হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমত এ রকম— ক্বাদামা সিদক্বিন অর্থ অতীত সৌভাগ্য। হজরত জায়েদ বিন আসলাম বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য রসুল স. এর শাফায়াত। বোখারী লিখেছেন, হজরত জায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, শাফায়াত তাদের জন্য যারা সত্যের পথে পদবিক্ষেপকারী।

শেষে বলা হয়েছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, এতো এক সুদক্ষ যাদুকর।' এ কথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যখন রসুল স. এর মাধ্যমে বিকশিত মোজেজাসমূহ অবলোকন করে তখন হিংসা, ক্ষোভ ও গোঁয়ার্তুমির কারণে বলতে থাকে, এতো দেখছি এক সুদক্ষ যাদুকর।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৩

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

☐ তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁহার অনুমতি লাভ না করিয়া সুপারিশ করিবার কেহ নাই। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদিগের প্রতিপালক; সুতরাং তাঁহার ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করিবে না?

---

www.eelm.weebly.com

'ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি', 'আরশে সমাসীন হন'— দু'টো কথাই জটিল ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল্লাহ্‌পাক তো এক মুহূর্তে সকল কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম। তাহলে তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করতে ছয় দিন সময় ব্যয় করলেন কেনো? উত্তরে বলা যেতে পারে, মানুষকে দৃঢ়তা, ধৈর্য ও ধারাবাহিক বিন্যাস সম্পর্কে জ্ঞান দানের জন্যই আল্লাহ্‌পাক এ রকম করেছেন। বলেছেন— 'তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।'

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন।' কথাটির প্রকাশ্য ও সরাসরি অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সর্বজনবিদিত ঐকমত্য এই যে, আল্লাহ্‌পাক শরীরবিশিষ্ট অথবা সীমানাভূত হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাই আলোচ্য বাক্যটির অন্তর্নিহিত অর্থ গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের অন্যান্য আয়াতেরও অর্থ গ্রহণ করতে হবে অন্তর্নিহিত মর্মের প্রেক্ষিতে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের এই রীতি সম্পর্কে জবাব প্রদান করা যেতে পারে দু'রকমভাবে—

১. এ ধরনের আয়াত হচ্ছে আয়াতে মুতাশাবিহাত (রহস্যাচ্ছন্ন আয়াত)। আল্লাহ্‌তায়ালার আনুরূপ্যবিহীন মর্যাদার আনুকূল্য বজায় রাখতে গেলে এ সকল আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ গ্রহণ করতেই হয়। এ সকল আয়াতের প্রকৃত অর্থ জানেন আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং। আর জানেন তাঁরা যাঁদেরকে—আল্লাহ্‌তায়ালা এ জ্ঞান দান করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন ওলামায়ে রাসিখীন। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়ামা ইয়া'লামু তাবিলাহু ইল্লাল্লহু ওয়াররসিখুনা ফিল্ ইলমি' (আল্লাহ্ ও যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা ছাড়া এর ব্যাখ্যা কেউ জানে না)। এখানে 'ওয়ার-রসিখুনা' শব্দটি আল্লাহ্‌পাকের সংগে সংযুক্ত। অর্থাৎ মুতাশা-বিহাত আয়াতের প্রকৃত মর্ম জানেন কেবল আল্লাহ্। আর জানেন ওলামায়ে রসিখীন। আল্লাহ্‌পাকই তাঁদেরকে এ জ্ঞান দান করেছেন। এ জ্ঞান সর্বসাধারণের জন্য নয়। তাই তাঁরা এ ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করে থাকেন। এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এখানে ইসতাওয়া (সমাসীন) কথাটির অর্থ দাঁড়াবে ইস্‌তাওয়াল্লা (অধিকার করা)। অর্থাৎ আরশ হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার সর্ববৃহৎ সৃষ্টি। আর সর্বাপেক্ষা অধিক পরিসর বিশিষ্ট এই সৃষ্টি আল্লাহ্-পাকের এক একচ্ছত্র ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রশাসন কেন্দ্র। এই আরশের উপরে রয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। সমাসীন হওয়ার অর্থ এটাই।

জ্ঞাতব্যঃ ইসতাওয়া এর অর্থ যে 'ইসতাওয়াল্লা' (অধিকার করা) এবং 'তাসাল্লাতা' (কুক্ষিগত করা) — এ কথা আরবী গ্রন্থাদির বহু স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন জনৈক কবির কবিতায় বলা হয়েছে— কাদিস্‌তাওয়া বাশারুন

www.eelm.weebly.com

আ'লাল ইরাকি — মিন গইরি সাইফিন ওয়া দামিন মুহ্রাক্বিন (বশির অসি সঞ্চালন ও রক্তপাত ছাড়াই ইরাককে নিয়ে এসেছে তার একচ্ছত্র প্রশাসনাধীনে)।

বাগবী বলেছেন, মুতাজিলাদের মতে ইসতাওয়া অর্থ ইস্তী'লা (অধিকার কামিতা) এবং তাসাল্লুত (অধিকার গ্রহণ)।

২. সলফে সলেহীন (পূর্ববর্তী যুগের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ববৃন্দ) এ সকল আয়াতের জটিল ব্যাখ্যার পক্ষপাতি নন। তাঁরা বলেন, এ সকল আয়াত যে আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। মুক্ত থাকতে হবে এ সকলের মনগড়া ব্যাখ্যা থেকে। বিষয়টিকে সম্পূর্ণ সোপর্দ করতে হবে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান বলেছেন, পূর্ব ও পশ্চিমের সকল ফকীহ্ এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন মজীদ ও সহীহ্ হাদিসসমূহে আল্লাহ্-পাকের যে সকল গুণ বিবৃত হয়েছে, সেগুলোকে ব্যাখ্যা ও অনুমান ব্যতিরেকেই মেনে নেয়া ওয়াজিব। যে ব্যক্তি সেগুলোকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে চাইবে, সে চলে যাবে রসুল স. ও সলফে সালেহীনের ঐকমত্যের বিরুদ্ধে। ইসলামের সঠিক দলের সঙ্গে তারা সম্পর্কচ্যুত। ইমাম মালেক বলেছেন, ইসতাওয়া অর্থ অস্পষ্ট— এ রকম বলা ঠিক নয়। আসল কথা হচ্ছে শব্দটির প্রকৃত অর্থ আমরা জানি না। সুতরাং এর সোজা সাপটা অর্থ গ্রহণ করা বেদাত।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এ কথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ রয়েছেন আসমানে, জমিনে নয়। বায়হাকীর বর্ণনাতেও এ রকম এসেছে। এই অভিমতটিও ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে সম্পর্কিত যে, যে ব্যক্তি বলবে 'আমার প্রতিপালক আসমানে না জমিনে, এ কথা আমি জানি না'— সে কাফের। কেননা আল্লাহ্পাক স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন— আররহমানু আ'লাল আ'রশিস্তাওয়া (দয়াময় আল্লাহ্ আরশে সমাসীন)— আর আরশ হচ্ছে আসমানের দিকে। ইমাম আবু হানিফার আরেকটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে এ রকম— যে ব্যক্তি আসমানে আল্লাহ্র অবস্থান অস্বীকার করে, সে কাফের।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা সমাসীন রয়েছেন আকাশে— আরশে। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে সৃষ্টির নিকটবর্তী হন, যেভাবে ইচ্ছা অবতীর্ণ হন (অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার আরশে অধিষ্ঠিত হওয়া, সৃষ্টির নিকটবর্তী হওয়া এবং অবতীর্ণ হওয়ার তিনটি বিষয়ই শুদ্ধ। কিন্তু এগুলোর প্রকৃতি আমাদের জ্ঞানের অতীত। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলও এ রকম বলেছেন।

ইসহাক বিন রহ্ওয়াইহ্ বলেছেন, সকল আলেমের ঐকমত্য এই যে, আল্লাহ্পাক আনুরূপ্যবিহীন অবস্থায় তাঁর আরশে আসীন এবং তিনি সকল কিছু সম্পর্কে অবগত। মাজানী, জাহবী, বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা ইবনে আবী শায়বা, আবু ইয়া'লী, বায়হাকী ও অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্যও

www.eelm.weebly.com

অনুরূপ। আবু জরয়া রজী'র বর্ণনায় এসেছে— এ বিষয়ে রয়েছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য। হাফেজ ওসমান বিন সাঈদ দারেমী লিখেছেন, 'আল্লাহ্‌পাক আকৃতিবহির্ভূতরূপে তাঁর আরশে সমাসীন'— এ বিষয়টি ঐকমত্যসম্ভূত। সহল বিন আবদুল্লাহ্ তসতরী বলেছেন, 'আরশ আল্লাহ্‌র সসীম সৃষ্টি, সুতরাং আল্লাহ্ কিভাবে আরশে অধিষ্ঠিত হতে পারেন'— এ রকম বলা জায়েয নয়। যেহেতু কোরআন মজীদে আল্লাহ্‌র আরশে সমাসীন হওয়ার কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু তা মানতে আমরা বাধ্য। আল্লাহ্‌পাক আরশে সমাসীন— এ কথা রসুল স.ও বলেছেন। মোহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী লিখেছেন, বিশ্বাসীদের জন্য এতোটুকুই জানা জরুরী যে, আল্লাহ্ আরশের উপরে অধিষ্ঠিত। চিন্তাকে এর চেয়ে অধিক অগ্রসর হতে দেয়া উচিত নয়। যারা এ রকম করে তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত। মোহাম্মদ ইবনে খুজাইমা বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে সপ্তম আকাশের উপরে প্রতিষ্ঠিত আরশে সমাসীন বলবে না সে কাফের সাব্যস্ত হবে। যদি সে কল্যাণ চায় তবে তাকে তওবা করতে হবে। অন্যথায় তার মস্তক ছেদন করতে হবে।

তাহাবী লিখেছেন, আরশ ও কুরসী তেমনই, যেমন আল্লাহ্‌পাক বর্ণনা করেছেন তাঁর পবিত্র কালামে। আল্লাহ্‌তায়ালা আরশ এবং অন্য কোনো সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন। আনুরূপ্যবিহীনভাবে তিনি সকল কিছুকে পরিবেষ্টনকারী এবং সকল কিছুর উর্ধ্বে।

ইমাম আবুল হাসান আশআরী তাঁর 'ইখতিলাফুল মুদাল্লিন ওয়া মুকালাতিল ইসলামিয়্যীন' গ্রন্থে লিখেছেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইমাম ও হাদিস বিশারদগণের বক্তব্য এই— আল্লাহ্‌র প্রতি, আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাবের প্রতি এবং নবী রসুলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। ওই সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে, যেগুলো কোরআন মজীদে এবং সহীহ্ হাদিসের মাধ্যমে এসেছে। এই বিশ্বাসের কোনো হেরফের হতে পারবে না। যেমন, কোরআন মজীদে রয়েছে, আল্লাহ্‌তায়ালার আরশে সমাসীন হওয়ার কথা, আল্লাহ্‌পাকের দুই হাতের কথা।

আবু নাঈম তার 'হুলিয়া' পুস্তকে লিখেছেন, আমাদের পথ হচ্ছে সলফে সালেহীনের পথ। তাঁরা ছিলেন কোরআন, হাদিস ও এজমার (ঐকমত্যের) অনুসারী। তাঁরা এ কথা বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ্‌পাক স্বাধিষ্ঠ এবং আত্মজাত গুণাবলীতে পরিপূর্ণ। আবু নাঈম আরো বলেছেন, আল্লাহ্‌পাকের আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টিকেও সলফে সালেহীন মান্য করে থাকেন। এ কথাও বলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা কখনো সৃষ্টির সীমানাভূত নন। ইবনে আবদুল বার লিখেছেন, জ্ঞানাতীতরূপে আল্লাহ্‌তায়ালা সাত আকাশের উপরে অবস্থিত আরশে সমাসীন। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত।

www.eelm.weebly.com

খতিব বাগদাদী লিখেছেন, সলফে সালেহীনের রীতি হচ্ছে, আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্যকে স্বীকার করতে হবে। এর অনুকূলে ব্যাখ্যাও প্রদান করা যাবে। কিন্তু ওয়াজহুল্লহ্ (আল্লাহ্র বদন), ইয়াদুল্লহ্ (আল্লাহ্র হাত) এবং ইস্তাওয়া আলাল আরশ (আরশে সমাসীন) — এসকল কথাকে সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আল্লাহ্পাক আনুরূপ্যবিহীন। সুতরাং তাঁর এসকল গুণাবলীও ব্যাখ্যা করতে হবে আনুরূপ্যবিহীনতার অনুকূলে। ইমামুল হারামাইন বলেছেন, সলফে সালেহীনই অনুসরণীয়। তাঁরা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী। রহস্যাচ্ছন্ন আয়াতের জটিল ব্যাখ্যা থেকে তাঁরা সবসময় আত্মরক্ষা করেন। আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্যকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এর অর্থগত দিকটি রেখে দেন আল্লাহ্র জিম্মায়।

বাগবী লিখেছেন, আরশে সমাসীন হওয়া আল্লাহ্তায়ালার একটি সেফাত বা গুণ। বিনা ব্যাখ্যায় এ কথার উপর ইমান আনা ওয়াজিব। আল্লামা বায়যাবী লিখেছেন, এ কথার উদ্দেশ্য— আল্লাহ্তায়ালা আরশে সমাসীন ওইভাবে, যেভাবে সমাসীন হওয়া তাঁর অতুলনীয় মর্যাদার অনুকূল। আকৃতি ও সমাসীনতার মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে তিনি পবিত্র।

আবু বকর আলী বিন ঈসা শিবলী ছিলেন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ সুফী ও আলেম। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ আসমানে আছেন, তিনি নির্দেশ প্রদান করেন এবং প্রকাশ করেন তাঁর সিদ্ধান্ত। শায়খুল ইসলাম আবদুল্লাহ্ আনসারী লিখেছেন, আল্লাহ্পাক সপ্তম আসমানের আরশে অধিষ্ঠিত।

শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী র. তাঁর 'গুণিয়াতুত্ তুলেবীন' পুস্তকে এ বিষয়ে অনেক প্রতর্কের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শেষে এইমর্মে সিদ্ধান্ত দান করেছেন যে, সলফে সলেহীনের বক্তব্য হচ্ছে, বিষয়টির অবগতি সম্ভব কিন্তু এর প্রকাশ সম্ভব নয়। সুতরাং মর্ম বুঝতে পারলেও বিষয়টি বিবরণের অতীত। আল্লাহ্তায়ালার সত্তা ও গুণাবলী সকল আনুরূপ্য থেকে পবিত্র।

এ সকল বক্তব্য ইমাম জাহবী তাঁর 'কিতাবুল উলুমে' সন্নিবেশিত করেছেন। সাহাবায়েকেরাম, তাবেঈন, মোহাদ্দেসীন, ফুকাহা, ও অধিকাংশ সুফীর অভিমত এ রকমই। আমি সুরা আরাফের 'ছুম্মাসতাওয়া আলাল আরশী ইউগশীল লাইলান্ নাহারা' এবং সুরা বাকারার 'ইয়াতিয়া হুমাল্লহু ফি জুলালিম মিনাল গামামী' এ আয়াত দু'টোর তাফসীর ব্যপদেশে লিখেছি, আসহাবে কুলুব (জাগ্রত হৃদয়ের অধিকারী) গণের কলবে আল্লাহ্তায়ালার তাজাল্লী বিশেষভাবে বর্ষিত হয় এবং সাধারণভাবে বর্ষিত হয় সমগ্র সৃষ্টির উপর। এই বর্ষণ বিরতিহীন। এ কথাটি মেনে

www.eelm.weebly.com

নিলে আল্লাহ্তায়ালার সমাসীন হওয়ার বিষয়টিতে আর কোনো সমস্যা থাকে না। আল্লাহ্পাক অবিনশ্বর ও চিরন্তন। সুতরাং নশ্বরতা ও অচিরন্তনতার বেষ্টনীবদ্ধ হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর সমাসীনতা, অবতরণ তাই জ্ঞানাতীত একটি বিষয়। আমি সুরা বাকারার 'ছুম্মাস তাওয়া আলাস্ সামায়ী ফাসাওয়াহুন্না সাবআ সামাওয়াতিন' এর তাফসীরে তাজাল্লীর বিষয়টি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি। ওই তাজাল্লী বর্ষণের কারণেই বলা হয় বিশ্বাসীদের অন্তরে, কাবায় এবং আরশে আল্লাহ্তায়ালা বিশেষভাবে সমাসীন। আর সাধারণভাবে সমাসীন তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে। কিন্তু সৃষ্টির মুখাপেক্ষী তিনি নন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন।' এ কথার অর্থ— তিনি স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে অপার প্রজ্ঞাময়তার মাধ্যমে সৃষ্টির সকল সমস্যা সমাধান করেন। নিয়ন্ত্রণ করেন সকল বিষয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করবার কেউ নেই।' এ বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে নজর বিন হারেস সম্পর্কে। সে বলেছিলো কিয়ামতের দিন লাত ও উজ্জা— এই দুই দেবীমূর্তি আমাকে সুপারিশ করবে। কারণ আমি তাদের পূজা করি। তার কথার প্রেক্ষিতেই এখানে বলে দেয়া হয়েছে যে, কখনই নয়। আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে সুপারিশ করার অধিকার কারোই নেই। জড়প্রতিমাদের তো নেইই।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং তাঁর ইবাদত করো।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলী সম্পর্কে এতোক্ষণ ধরে যা বলা হলো, সে সকল গুণাবলীর অধিকারী যিনি, তিনিই আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত আর কোনো প্রভুপালক নেই। তাঁর গুণাবলীর মধ্যে কারো কোনো অংশও নেই। সুতরাং হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা কেবল তাঁরই উপাসনা করো। পরিত্যাগ করো জড় অজড় সকল কিছুর উপাসনা। কারণ কল্যাণ অথবা অকল্যাণ করার ক্ষমতা তাদের নেই। অতএব হে মানুষ! তোমরা এই মুহূর্তে পরিত্যাগ করো মানুষ, ফেরেশতা, পাথর ও প্রতিমা পূজাকে।

শেষে বলা হয়েছে— 'তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? এ কথার অর্থ— হে মানুষ এ সকল বিবরণ শোনার পর তোমরা কি প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে চেষ্ট করবে না? এ কথা অনুধাবন করতে কি সক্ষম হবে না যে, আল্লাহ্তায়ালা ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই?

www.eelm.weebly.com

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ○

❑ তাঁহারই নিকট তোমাদিগের সকলের প্রত্যাবর্তন; আল্লাহের প্রতিশ্রুতি সত্য। সৃষ্টিকে তিনি অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর উহার পুনরাবর্তন ঘটান যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগকে ন্যায় বিচারের সহিত কর্মফল প্রদানের জন্য। এবং যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিত বলিয়া তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

'ইলাইহি মারজিউ'কুম জামীয়াঁ' অর্থ তাঁর নিকট তোমাদের সকলের প্রত্যা-বর্তন। অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থান দিবসে সকলকে আল্লাহ্তায়ালা সকাশে উপস্থিত হতে হবে। 'ওয়াদাল্লহি হাক্কা' অর্থ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। এখানে 'ওয়াদাল্লাহি' হচ্ছে মাফউলে মতলক (সাধারণ কর্মপদ)। এই সত্য প্রতিশ্রুতি সেই আল্লাহ্র, যাঁর প্রতি সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এখানে প্রতিশ্রুতিকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদানের জন্য বলা হয়েছে ওয়াদাল্লহ্ (আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি)।

এরপর বলা হয়েছে— 'সৃষ্টিকে তিনি অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর তার পুনরাবর্তন ঘটান।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালাই দান করেন পার্থিব জীবন। তারপর এই জীবনের পুনরাবর্তন ঘটান এভাবে— পৃথিবীর জীবন শেষ হবে, পুনরায় তিনি জীবন দান করবেন আখেরাতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের ন্যায়বিচারের সঙ্গে কর্মফল প্রদানের জন্য।' এখানে বিলক্বিসত্ অর্থ ন্যায়বিচারের সঙ্গে। ন্যায়বিচার আল্লাহ্র দিক থেকেও হতে পারে, আবার বান্দার দিক থেকেও হতে পারে। বান্দার দিক থেকে হওয়ার অর্থ— বান্দা তার প্রতিটি কাজে ন্যায়নিষ্ঠ হবে। অথবা মর্মার্থ হবে ইমান। যেহেতু ইমানই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়নিষ্ঠতা। এর বিপরীতে শিরিক হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জুলুম। শেষোক্ত মর্মার্থটিই এখানে সুসঙ্গত। কারণ পরবর্তী বাক্যে ঘোষিত হয়েছে কাফেরদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী এভাবে— 'এবং যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করতো বলে তাদের জন্য রয়েছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।'

www.eelm.weebly.com

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۖ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○ اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

❒ তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করিয়াছেন এবং উহার মঞ্জিল নির্দিষ্ট করিয়াছেন যাহাতে তোমরা বৎসর গণনা ও কাল নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পার। আল্লাহ্ ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।

❒ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে নিদর্শন রহিয়াছে সাবধানী সম্প্রদায়ের জন্য।

❒ যাহারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না এবং পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত এবং ইহাতেই নিশ্চিন্ত থাকে এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে অনবধান,

❒ উহাদিগেরই আবাস অগ্নি উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালাই সূর্য্যকে করেছেন তেজস্কর এবং চন্দ্রকে করেছেন সেই তেজস্কর সূর্যের আলোকে আলোকিত। আর তাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন কক্ষপথ। তারা নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে বলে দিবস-রাত্রি, মাস ও বছর গণনা করা যায়। এভাবে গণনা করা হতে থাকে শতাব্দী। শতাব্দীর পর শতাব্দী। হে মানুষ! আল্লাহ্তায়ালার এ সকল সৃষ্টি নিরর্থক নয়। তোমরা আল্লাহ্তায়ালার এই বিস্ময়কর দুই সৃষ্টির মাধ্যমে কাল নিরুপণ করতে পারো। নির্ধারণ করতে পারো নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতের সময়। এ কথাও সহজে অনুভব করতে পারো যে, সূর্য ও চন্দ্রের এই সুশৃঙ্খল বিবর্তন নিশ্চয় অপার ক্ষমতার অধিকারী কোনো সত্তার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ নিদর্শন। তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য এ সকল নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে সাবধানী সম্প্রদায়ের জন্য।' দিবস ও রাত্রির বিবর্তনের মধ্যেও রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ অভিজ্ঞান। রয়েছে সময়াতিপাতের এক দুর্ভেদ্য রহস্য। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজন রহস্যের মধ্যে রয়েছে বিস্ময় আর বিস্ময়। এই নিদর্শন সমূহের যথামর্যাদা দিতে পারেন কেবল তারাই যারা মুত্তাকী (সাবধানী)। কারণ তাঁরা চিনেছেন এই বিশাল সৃষ্টির স্রষ্টাকে। পূর্ণ সমর্পিত হয়েছেন কেবল তাঁরই নিকটে। তাই তাঁরা সেই মহাক্ষমতাধর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অসমকক্ষ আনুরূপ্যবিহীন পবিত্র স্রষ্টার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত।

এর পরের দুই আয়াতে (৭ ও ৮) বলা হয়েছে— 'যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না এবং পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত এবং এতেই নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে অনবধান, তাদেরই আবাস অগ্নি তাদের কৃতকর্মের জন্য।' এখানে 'যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না' অর্থ যারা আল্লাহ্র নিকটে সওয়াবের আশা করে না। আর আল্লাহ্র দীদার বা সাক্ষাত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সওয়াব।

'পার্থিব জীবনে পরিতৃপ্ত' কথাটির অর্থ— তারা আখেরাতের অনন্ত জীবন অপেক্ষা দুনিয়ার সাময়িক জীবনকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। এই নশ্বর পৃথিবীর বিত্ত-বৈভব ও সুখের উপকরণসমূহে তারা আসক্তা নিমজ্জিত। অনন্ত জীবনের কথা তাদের মনে নেই। তাই পরক্ষণেই বলা হয়েছে 'এতেই নিশ্চিন্ত থাকে।'

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে অনবধান, তাদেরই আবাস অগ্নি তাদের কৃতকর্মের বিনিময়।'

আলোচ্য আয়াত দু'টোতে ইহুদী এবং খৃষ্টানদের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের কথা বিবৃত হয়েছে। তারা আল্লাহ্কে ভয় করে না। মুখে মুখে তারা আল্লাহ্কে মানলেও অন্তরে অন্তরে তারা ঘোর পৃথিবীপূজক। তাই তারা পৃথিবীর আরাম আয়েশে পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত। আল্লাহ্তায়ালার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে তারা বেখবর। চিরস্থায়ী অগ্নিবাস তাদের ললাট লিখন। আর তারা সেখানে স্থায়ী হবে তাদের কৃতকর্মের জন্যই। আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'আল্লাজীনা' (যারা) কথাটির মাধ্যমে এখানে ওই ইহুদী খৃষ্টানদেরকেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে প্রথমে উল্লেখিত 'আল্লাজীনা (যারা) এর উদ্দেশ্য — যারা কিয়ামতকে স্বীকার করে না এবং আখেরাতের বিনিময়ের আশা যাদের নেই। এরা ভোগোন্মত্ত, পৃথিবীর সাফল্যে পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত।

পরে উল্লেখিত 'আল্লাজীনা (যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে অনবধান) এর উদ্দেশ্য— যারা দুনিয়ার মহব্বতে নিমজ্জিত হয়ে আখেরাতের প্রস্তুতি সম্পর্কে গাফেল। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এখানে দু'বার 'আল্লাজীনা' উল্লেখ করে সাধারণভাবে বুঝানো হয়েছে সকল কাফেরকে। তাদের দোষ ত্রুটি অফুরন্ত

www.eelm.weebly.com

তাই সংযোজক অব্যয়ের (হরফে আতফের) মাধ্যমে, অর্থাৎ 'এবং' সহযোগে বাক্য দু'টোকে সংযোজিত করা হয়েছে। যেমন, একটি কবিতায় উল্লেখ করা হয়েছে, ইলাল মালিকিল কারিমি ওয়াব্নিল হিমামি ওয়া লাইসাল কুতাইবাতু ফিল মুজদাহাম (মহান প্রাণ প্রিয় ও মহা প্রতাপশালী এবং রণপ্রান্তরে ব্যাঘ্রের ন্যায় হুঙ্কারক নৃপতির প্রতি)। এখানে বিশেষণগুলি একইজনের। অথচ সংযোজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'রিজ্বা' অর্থ আশা, ভয় অথবা লোভ। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— তাদের না আছে আমার শাস্তির ভয়, না আছে আমার সওয়াবের লোভ। তাই আখেরাতের কোনো প্রস্তুতিই তাদের নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আন আয়াতিনা' (আমার নিদর্শনা-বলী) অর্থ রসুলপাক স. অথবা কোরআন মজীদ। এভাবে 'যারা আমার নিদর্শনা-বলী সম্বন্ধে অনবধান' কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— যারা আমার রসুল ও কোরআন সম্পর্কে বেখবর।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৯, ১০

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ○ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

❑ যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগের বিশ্বাস হেতু তাহাদিগকে পথ নির্দেশ করিবেন; সুখদ কাননে তাহাদিগের পাদদেশে নদী প্রবাহিত হইবে।

❑ সেথায় তাহাদিগের ধ্বনি হইবে 'হে আল্লাহ্! তুমি মহান, পবিত্র!' এবং সেথায় তাহাদিগের অভিবাদন হইবে 'সালাম' এবং তাহাদিগের শেষ ধ্বনি হইবে 'প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহের প্রাপ্য!'

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে বিশ্বাসী ও পুণ্যকর্মপরায়ণগণের শুভ পরিণামের বিবরণ দেয়া হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ' তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাস হেতু তাদেরকে পথ নির্দেশ করবেন'। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'পথ নির্দেশ করবেন' কথাটির অর্থ আল্লাহ্তায়ালা তাঁদেরকে পুলসিরাত অতিক্রমের সময় সঠিক পথের নির্দেশ দিবেন। তখন তাঁদেরকে দেয়া হবে একটি নূর। ওই নূরের আলোকে পথ দেখে দেখে তাঁরা সহজেই পৌঁছে যেতে পারবেন জান্নাতে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এখানে 'পথ নির্দেশ

www.eelm.weebly.com

করবেন' অর্থ যারা ইমানদার তাদেরকে আল্লাহ্তায়ালা সঠিক ধর্মবোধ দান করবেন। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে তার শরীর সহযোগে উত্তম আমল করবে, আল্লাহ্পাক তাকে দান করবেন অজানা জ্ঞান। কথাটি আবু নাঈম উল্লেখ করেছেন তাঁর হুলিয়া পুস্তকে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ইয়াহ্দিহিম (পথ নির্দেশ করবেন) কথাটির অর্থ আল্লাহ্পাক তাদেরকে দান করবেন পুণ্য ও প্রতিদান। তাঁদেরকে পৌঁছে দিবেন কাঙ্খিত জান্নাতে।

বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যের বিবরণভঙ্গির মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, পথপ্রদর্শন বা হেদায়েতের চিরন্তন ভিত্তি হচ্ছে ইমান। আর পুণ্যকর্মসমূহ ওই ইমানের বিস্তার, পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্য।

এরপর বলা হয়েছে — 'সুখদ কাননে তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে।' এখানে 'তাহাত' (নিচে) শব্দটির অর্থ হবে 'সম্মুখে।' নহর বা নদী সম্মুখভাগেই দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং এখানে 'পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে' কথাটির অর্থ হবে— তাদের সম্মুখভাগে প্রবাহিত হবে নদী।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে—'সেখানে তাদের ধ্বনি হবে, হে আল্লাহ্! তুমি মহান, পবিত্র! এবং তাদের অভিবাদন হবে সালাম এবং তাদের শেষ ধ্বনি হবে, প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রাপ্য।' এ কথার অর্থ— জান্নাতে জান্নাতবাসীরা উচ্চারণ করবেন, হে আল্লাহ্! তুমি সকল অসুন্দর অবস্থা থেকে পবিত্র। সকল ক্ষয়ক্ষতি ও বিনষ্টি থেকে তুমি পাক। তুমি মহান। বাগবী লিখেছেন, তাফসীরকারগণ বলেন, বেহেশতবাসীরা পানাহার করতে চাইলে উচ্চারণ করবেন 'সুবহানাকাল্লহুম্মা', পরিচারকেরা তখন বুঝতে পারবে তাঁরা কি চান। তৎক্ষণাৎ তারা বেহেশতবাসীদের কাঙ্খিত খাদ্য সম্ভারের আয়োজন করবে। খাদ্যাধারগুলো হবে এক বর্গমাইল পরিসরের। প্রতিটি খাদ্যাধারের বিভাগ থাকবে সত্তর হাজার। প্রতি বিভাগে থাকবে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ও প্রকৃতির খাদ্য। সেগুলোর স্বাদও হবে পৃথক পৃথক। পানাহার শেষে তাঁরা আল্লাহ্পাকের প্রশংসা করবেন এভাবে— 'ওয়া আখিরু দাওয়া হুম আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' (তাঁদের শেষ প্রার্থনা হবে— সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভুপালয়িতা)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বেহেশতবাসীরা আহারের স্বাদ গ্রহণ করতে করতে বলবেন, 'সুবাহানাকাল্লহুম্মা।' এতে করে তাঁদের আহার্য হয়ে উঠবে অধিকতর আস্বাদ্য। হজরত জাবের থেকে সর্বোন্নত সূত্রে মুসলিম, আবু দাউদ ও ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে মুহুর্মুহু 'সুবহানাল্লহ্ ও আলহামদুলিল্লাহ্' এলহাম হতে থাকবে।

বেহেশতবাসীদের অভিবাদন ও প্রত্যাভিবাদন হবে 'সালাম'। একে অপরের উদ্দেশ্যে বলবে 'সালাম'। ফেরেশতারাও বলতে থাকবে 'সালামুন আ'লাইকুম বিমা সাবারতুম' (তোমাদের উপরে শান্তি যেমন তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে)। আর আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে সালামবাহী ফেরেশতারা বলবে, আল্লাহ্পাক আপনাদেরকে 'সালাম' বলেছেন (সুসংবাদের সঙ্গে নিরাপত্তা দান করেছেন)।

www.eelm.weebly.com

হজরত জাবের থেকে ইবনে মাজা, ইবনে আবিদ্‌দুনিয়া ও দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা আনন্দে বিভোর হয়ে থাকবে। অকস্মাৎ ঊর্ধ্বদেশে প্রজ্জ্বলিত হবে একটি নূর। তখন তারা মাথা উঠিয়ে দেখবে আনুরূপ্যবিহীন সেই পবিত্র সত্তা তাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্য নিয়ে জ্যোতিষ্মান। শুনতে পাবে— আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল জান্নাত (হে জান্নাতবাসীরা! তোমাদের উপরে শান্তি)। এ কথার প্রকৃত অর্থ হবে— 'সালামুন ক্বাওলাম মির্‌রব্বির রহীম' (দয়াময় প্রভুপালকের কথায় তোমাদের উপরে শান্তি)।

হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ, বায্‌যার ও ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে দরিদ্র মুহাজিরবৃন্দ— যারা পৃথিবীতে ইসলামকে মহিমান্বিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো এবং যারা নিজেকে সংরক্ষণ করেছিলো সকল অসুন্দর বিষয়াবলী থেকে। তারা দেখাতে চাইতো ইসলামের প্রতি অপরিসীম ত্যাগ তিতীক্ষা। কিন্তু সুযোগ ও সামর্থ্যের অভাবে তারা তাদের হৃদয়ের অভিলাষ বাস্তবায়ন করতে পারতো না। এভাবে পৃথিবী পরিত্যাগ করতো অভিলাষাহত হয়ে। বেহেশতে প্রবেশ করার পর নির্দেশিত ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম পৌঁছাবে। আল্লাহ্ ওই ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ করবেন, মুহাজিরদের নিকটে যাও। তাদেরকে আমার সালাম পৌঁছাও। ফেরেশতারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে করেছো আকাশের অধিবাসী। আমরা কি মর্ত্যবাসীদের নিকটে তোমার সালাম পৌঁছাবো! আল্লাহ্‌পাক বলবেন, তারা আমার ইবাদত ছাড়া আর কারো ইবাদত করেনি। আমার ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীও সাব্যস্ত করেনি। পৃথিবীতে তাদের প্রতি আরোপ করা হয়েছিলো অনেক সীমাবদ্ধতা। তবুও তারা নিজেদেরকে মুক্ত রেখেছিলো অযথার্থ বিষয়াবলী থেকে। সত্যের মহিমা সমুন্নত করবার জন্য অনেক কিছু উৎসর্গ করার বাসনা ছিলো তাদের অন্তরে। সেসকল বাসনা চরিতার্থ হওয়ার আগেই আমি সাঙ্গ করে দিয়েছি তাদের পৃথিবীর জীবন। তাই তাদের অন্তরে রয়েছে সীমাহীন অতৃপ্তি। ফেরেশতারা তখন জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে, সালামুন আ'লাইকুম বিমা সবার্‌তুম ফানি'মা উক্ববাদ্‌দারি (তোমাদের উপরে শান্তি যেমন তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে, কতোইনা উত্তম পরকালের জীবন)।

'ওয়া আখিরু দা'ওয়া হুম আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন' অর্থ— এবং তাদের শেষ উচ্চারণ হবে, প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। অর্থাৎ যখন বেহেশতবাসীরা বেহেশতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ্‌তায়ালার অনির্বচনীয় মহিমা ও মাহাত্ম অবলোকন করবে, তখন তারা বর্ণনা করতে শুরু করবে, আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা। এরপর আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে ফেরেশতারা উপস্থিত হয়ে বিনয়ের সঙ্গে ঘোষণা করবে তাদের সম্মান ও প্রশান্তির শুভ সংবাদ। তখন বেহেশতবাসীরা বর্ণনা করবে আল্লাহ্‌তায়ালার শুভ স্তুতি এবং প্রশস্তি।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, বেহেশতবাসীদের ওই প্রশস্তি শুরু হবে 'সুবহান আল্লাহ্' বলে এবং সমাপ্ত হবে 'আলহামদু লিল্লাহ্' উচ্চারণের সঙ্গে। এর মধ্যে তাঁরা অন্য যা কিছু চান, তা বলতে পারবেন।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهٖٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَأَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ إِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ۚ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ○ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ○

❒ আল্লাহ্ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতেন যেভাবে তাহারা তাহাদিগের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতে চাহে তবে তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইত। সুতরাং যাহারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না তাহাদিগকে আমি তাহাদিগের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দিই।

❒ এবং মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুইয়া, বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিয়া থাকে; অতঃপর যখন আমি তাহার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করি সে তাহার পূর্বপথ অবলম্বন করে, যেন তাহাকে যে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিয়াছিল তাহার জন্য সে আমাকে ডাকেই নাই। যাহারা সীমালংঘন করে তাহাদিগের কর্ম তাহাদিগের নিকট এইভাবে শোভন প্রতীয়মান হয়।

❒ তোমাদিগের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যখন তাহারা সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাহাদিগের নিকট তাহাদিগের রসূল আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি।

❒ অতঃপর আমি উহাদিগের পর দুনিয়ায় তোমাদিগকে প্রতিনিধি করিয়াছি, দেখিবার জন্য তোমরা কী প্রকার আচরণ কর।

---

www.eelm.weebly.com

মানুষ রাগের মাথায় নিকটজন বা প্রতিবেশীকে অভিশাপ দেয়। বলে, তোমার উপর আল্লাহ্‌র গজব পড়ুক, তুমি ধ্বংস হও ইত্যাদি। এ রকম পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে অবতীর্ণ হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতটি। এ রকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস।

কাতাদা বলেছেন, এখানকার প্রথমোক্ত আয়াতটির অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, মানুষ যখন বদদোয়া করে, তখন সে চায় তাড়াতাড়ি দোয়ার ফল প্রকাশিত হোক— যেমন তাড়াতাড়ি কবুল করা হয় নেক দোয়া। লক্ষ্যণীয় যে, নেক দোয়া দ্রুত কবুল হওয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু নেক দোয়ার প্রতিফল সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। বলা হয়েছে বদ্‌দোয়া দ্রুত কবুল করলে ধ্বংস নেমে আসবে যদি তা নেক দোয়ার মতো দ্রুত কবুল করা হয়। কিন্তু নেক দোয়া কবুল করলে কি ঘটবে তার উল্লেখ এখানে নাই। এভাবে বাক্যটিকে এখানে করা হয়েছে সংক্ষেপিত।

এক বর্ণনায় এসেছে, নজর বিন হারেস একবার বললো, হে আল্লাহ্! মোহাম্মদ যে কথাগুলোকে তোমার কথা রূপে প্রচার করছে, সেগুলো যদি সত্যিসত্যিই তোমার কথা হয়, তবে আকাশ থেকে আমার উপরে পাথর বর্ষণ করো। তার এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— 'আল্লাহ্ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতেন যেভাবে তারা তাদের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায় তবে তারা ধ্বংস হয়ে যেতো।'

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের ভয় করে না তাদেরকে আমি তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে দেই।' এ কথার অর্থ— যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদের অন্তরে আমার ভয় নেই। তারা 'আমার প্রতি পাথর বর্ষণ করো' এ রকম কথা বললেও আমি তার বাস্তবায়ন ঘটাই না। বরং তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই তাদেরকে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেই (যাতে করে তাদের পেরেশানী ও পাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকে, পাপের শাস্তি তো নিশ্চিত)।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'এবং মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাকে ডেকে থাকে; অতঃপর আমি যখন তার দুঃখ দৈন্য দূরীভূত করি, সে তার পূর্ব পথ অবলম্বন করে, যেনো তাকে যে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করেছিলো তার জন্য সে আমাকে ডাকেইনি।' এখানে 'আদ্‌দুর্‌রু' কথাটির অর্থ দুঃখ-দৈন্য। মানুষের অকৃতজ্ঞতার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে, হে মানুষ! তুমি বিপদে পড়লে উঠতে বসতে আমাকে স্মরণ করতে থাকো। বার বার সাহায্যের জন্য হন্যে হয়ে দোয়া করতে থাকো। আর আমি বিপদ দূর করে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাও আমাকে। ভাবসাব দেখে তখন মনে হয় তুমি যেনো আমার নিকট কখনোই বিপদমুক্তির জন্য প্রার্থনা করোনি।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা সীমালংঘন করে তাদের কর্ম তাদের নিকট এভাবে শোভন প্রতীয়মান হয়।' এ কথার অর্থ— সীমালংঘনকারীরা আপন আকাঙ্খার উপাসক। আপন প্রবৃত্তির পূজক। তাই তাদের সকল কর্ম তাদের চোখে সুন্দর।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তোমাদের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি যখন তারা সীমা অতিক্রম করেছিলো। স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট তাদের রসুল এসেছিলো, কিন্তু তারা বিশ্বাস করবার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।' এ কথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! জেনে রাখো, তোমাদের মতো সীমালংঘনকারী অনেক মানব গোষ্ঠীকে ইতোপূর্বে আমি ধ্বংস করেছি। তোমাদের নিকটে যেমন রসুল প্রেরণ করেছি, তেমনি রসুল প্রেরণ করেছিলাম তাদের প্রতিও। কিন্তু তারা আমার প্রেরিত রসুলকে মান্য করেনি। এভাবে তারা হয়ে গিয়েছিলো শাস্তির উপযুক্ত। তাই যথাশাস্তিই আমি তাদেরকে দিয়েছি। অবাধ্যদেরকে এভাবেই আমি শাস্তি দিয়ে থাকি।

'তারা বিশ্বাস করবার জন্য প্রস্তুত ছিলো না'— এ ধরনের কথা অন্য এক আয়াতেও বলা হয়েছে এভাবে— 'ওয়ামা কুন্না মুয়াজ্জিবীনা হাত্তা নাআসা রসুলা (আমি রসুল প্রেরণ ব্যতীত তাদের শাস্তিদাতা ছিলাম না)। এ কথার অর্থ— তাদের ভাগ্যে ইমান ছিলোই না। তাদের সম্পর্ক ছিলো আল্লাহ্পাকের এক নাম আলমুদ্বিল্লুন (গোমরাহ্কারী) এর সঙ্গে। আর এই নামের সঙ্গে সম্পর্কধারীরা ইমান আনবে কিভাবে ? কারো পক্ষে স্বসত্তার সূচনাচ্যুত হওয়া কি সম্ভব ? এ রকমও হতে পারে যে, আল্লাহ্তায়ালা আদি অন্তের সকল কিছু জানেন। তাই তিনি এ কথাও ভালো করে জানেন যে, কে ইমান আনবে এবং কে ইমান আনবে না। কে মৃত্যুবরণ করবে অবিশ্বাসী অবস্থায় এবং কে শাস্তির উপযুক্ত। নবী রসুলগণকে অস্বীকার করার শাস্তি হচ্ছে ধ্বংস। সেই ধ্বংসের মধ্যেই নিপতিত করা হয়েছে তাদেরকে। আলোচ্য আয়াতের শেষে তাই বলে দেয়া হয়েছে— এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

এর পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাদের পর দুনিয়ায় তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছি, দেখবার জন্য তোমরা কী প্রকার আচরণ করো।' এ কথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! পূর্ববর্তী মানবগোষ্ঠীগুলোকে ধ্বংস করার পর আমি এখন পৃথিবীতে এনেছি তোমাদেরকে। এখন তোমাদেরকে এই মর্মে পরীক্ষা করা হবে যে, তোমরা আমার রসুলের অনুসরণ করো কিনা। আমার রসুলের মাধ্যমে প্রবর্তিত ধর্মকে গ্রহণ করো কিনা। তোমরা এখন তোমাদের পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের স্থলবর্তী। এখন তোমরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো— কি করবে তোমরা, কোথায় যাবে? সফলতার দিকে? না ধ্বংসের দিকে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দুনিয়া সুমিষ্ট ও সতেজ। আর তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী মানবগোষ্ঠীর স্থলাভিষিক্ত। এখন আল্লাহ্পাক দেখবেন, তোমরা কাকে গ্রহণ করো (ভালো আমলকে না মন্দ আমলকে)?

www.eelm.weebly.com

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

❒ যখন আমার আয়াত, যাহা সুস্পষ্ট, তাহাদিগের নিকট পাঠ করা হয় তখন যাহারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না তাহারা বলে, 'অন্য এক কুরআন আন ইহা ছাড়া, অথবা ইহাকে বদলাও।' বল, 'নিজ হইতে ইহা বদলান আমার কাজ নহে। আমার প্রতি যাহা ওহী হয় আমি তাহারই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রতি-পালকের অবাধ্যতা করিলে আমি আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তি।'

কাতাদা বলেছেন, এই আয়াতের লক্ষ্য মক্কার মুশরিকেরা। মুকাতিল বলেছেন, মাকরাজ বিন হাফস, আমর বিন আবদুল্লাহ্ বিন আবু কাবিস আমেরী, আস বিন আমের বিন হিশাম, আবদুল্লাহ্ বিন উবাই মাখজুমী এবং ওলিদ বিন মুগীরা— এ পাঁচজনকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তারা আল্লাহ্র সাক্ষাতকে ভয় করে না। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র শাস্তি, হাশর, কিয়ামত কোনো কিছুকেই স্বীকার করতো না। তারা ছিলো মূর্তিপূজক। একদিন তারা রসুল স.কে বললো, হে মোহাম্মদ! তুমি ইচ্ছে করলেই আমরা তোমার উপর ইমান আনতে পারি। যে কোরআন তুমি পাঠ করো সেই কোরআনকে পরিত্যাগ করো। নতুন কোনো কোরআন আনো, যে কোরআনে আমাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর উপাসনার ব্যাপারে কোনো বাধা নিষেধ থাকবে না। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যদি এ রকম কোরআন না পাও তবে তুমি তোমার নিজের পক্ষ থেকে নতুন একটি কোরআন তৈরী করে নাও। হারামসমূহকে করো হালাল এবং হালালসমূহকে করো হারাম। আযাবের আয়াতসমূহকে করো রহমতের আয়াত আর রহমতের আয়াতগুলোকে করো আযাবের আয়াত। এ রকম যদি করো তবে তোমার উপরে আমরা সহজেই ইমান আনতে পারবো। পাঁচ মুশরিকের এমতো বাতুল বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করলেন 'যখন আমার আয়াত, যা সুস্পষ্ট, তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না তারা বলে, এটা ছাড়া অন্য এক কোরআন আনো অথবা এটাকে বদলাও।'

www.eelm.weebly.com

আয়াতের শেষাংশে মুশরিকদের কথার জবাব কিভাবে দিতে হবে, সে কথা আল্লাহ্‌পাক জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে— 'বলো, নিজে থেকে এটা বদলানো আমার কাজ নয়। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি তারই অনুসরণ করি। আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে,আমি আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তির।' এ কথার অর্থ, হে আমার রসুল! আপনি বলে দিন, আমি এই কোরআনের কোনো একটি আয়াতও বদলাতে পারি না। সম্পূর্ণ কোরআন বদলানো তো দূরের কথা। এ রকম কর্ম মানুষের সাধ্যের অতীত। আমি তো কেবল প্রত্যাদেশানুসারে চলি। আমি যে তাঁর রসুল। আর প্রত্যাদেশ ছাড়া স্বমতে চলা কোনো নবী রসুলের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তোমাদের মতো অজ্ঞ, মূর্খ, অপরিণামদর্শী ও অবাধ্য নই। তাই তোমরা যা বলো, আমি তা চিন্তাও করতে পারি না। আমি তো ভয় করি মহাদিবসের শাস্তির।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ১৬

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَاۤ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

❒ বল, 'আল্লাহের সেরূপ অভিপ্রায় হইলে আমি তোমাদিগের নিকট ইহা পাঠ করিতাম না এবং তিনি তোমাদিগকে এ বিষয়ে অবহিত করিতেন না। আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদিগের মধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি; তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না?'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! যারা আপনাকে কোরআন বদলাতে বলে ওই সকল মুশরিককে বলে দিন, যদি আল্লাহ্‌তায়ালা আমার এই কোরআনের প্রচারকে পছন্দ না করতেন তবে আমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণই করতেন না। সে রকম হলে আমি তো তোমাদের নিকটে কোরআন পাঠ করার সুযোগও পেতাম না। নিজে নিজে যদি কোরআন প্রস্তুত করে পাঠ করার চেষ্টা করতাম তবে আল্লাহ্‌তায়ালা আমার কণ্ঠকে করে দিতেন চিরস্তব্ধ। অথবা কোরআন সম্পর্কে আমাকে অবহিতই করতেন না। আমি তো তোমাদের সামনে চল্লিশ বছর অতিবাহিত করেছি। এই চল্লিশ বছর ধরে আমার নিকটে কোনো ওহী (প্রত্যাদেশ) আসেনি। তাই তোমাদেরকে এ সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টাও করিনি। এখন তোমাদের সামনে আমি অবতীর্ণ আয়াতসমূহ পাঠ করি। এটাকি আল্লাহ্‌তায়ালার অলৌকিক নিদর্শন নয়? তোমাদের মতো অক্ষরের মুখাপেক্ষী আমি নই। অক্ষরের মুখাপেক্ষী কোনো জ্ঞানীর সংস্পর্শ থেকে আমাকে পবিত্র রাখা হয়েছে। আরো স্মরণ করো, আমি কি কখনো কোনো কবিতা রচনা করেছি? তোমাদেরকে অক্ষয় বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করেছি? করিনি। আজ দ্যাখো আমার মুখে পবিত্র কোরআনের আয়াত উচ্চারিত হয়— যে আয়াতের বাণী-বৈভব অন্য সকল বাণীকে করে দিয়েছে ম্লান, নিষ্প্রভ। এতে রয়েছে অতীত ও

www.eelm.weebly.com

ভবিষ্যতের বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্বস্ত বিবরণ। আছে নির্ভুল বিধি-বিধান। এ রকম জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনার সাধ্য কি কারো আছে? নেই। অতএব হে মক্কাবাসী! সুবিবেচক হও। এ কথা স্বীকার করো যে, এই মহাগ্রন্থ কোনো মানব রচিত গ্রন্থ হতেই পারে না। নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে মহাবিশ্বের একক অধীশ্বর, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র নিকট থেকে।

দ্রষ্টব্যঃ রসুল স. এর উপরে ওহী (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ হতে শুরু করে তাঁর চল্লিশ বছর বয়সের সময়। এরপর তিনি স. মক্কায় অবস্থান করেছিলেন তেরো বছর। তারপর হিজরত করে মদীনায় যান। সেখানে অবস্থান করেন দশ বছর। পবিত্র মহাপ্রয়াণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো তেষট্টি বছর। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহীর বর্ণনায় এসেছে, সকল আলেম এব্যাপারে একমত যে, হিজরতের পর রসুল স. মদীনায় বসবাস করেছিলেন দশ বছর। প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন মক্কায় চল্লিশ বছর বয়সে। প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির পর মক্কায় কত বছর ছিলেন, সে সম্পর্কে অবশ্য মতপ্রভেদ রয়েছে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, ওহী লাভের পর তিনি স. মক্কায় ছিলেন তেরো বছর।

হজরত আনাস থেকে বাগবী লিখেছেন, প্রত্যাদেশ লাভের পর রসুল স. মক্কায় ছিলেন দশ বছর। আর তিনি পৃথিবী পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁর ষাট বছর বয়সে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে সা'দ, ওমর ইবনে শায়বা এবং হাকেমও এ রকম উল্লেখ করেছেন। বাগবী লিখেছেন, প্রথমোক্ত বর্ণনাটি অধিক নির্ভরোপ-যোগী। হজরত আনাস থেকে মুসলিম লিখেছেন, ইন্তেকালের সময় রসুল স. এর বয়স হয়েছিলো ৬৩ বৎসর। হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরও ইন্তেকাল করেছিলেন ৬৩ বৎসর বয়সে।

হজরত মুয়াবিয়া বিন আবী সুফিয়ান থেকে আবু দাউদ ও তা'লাসী লিখেছেন, রসুলপাক স., হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের পৃথিবীর বয়স ছিলো ৬৩ বছর। জননী আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. এর মহাতিরোধান ঘটেছিলো ৬৩ বছর বয়সে। আল্লামা নববী বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ, প্রসিদ্ধ ও ঐকমত্যসম্মত।

আহমদ ও মুসলিম লিখেছেন, আম্মার বিন আবী আম্মার বলেছেন, আমি একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, হে ইমাম! শেষ যাত্রার সময় রসুল স. এর বয়স কতো ছিলো ? তিনি বললেন, গণনা করো— চল্লিশ বছরে নবুয়ত প্রাপ্তি, তারপর পনেরো বছর মক্কায়, দশ বছর মদীনায়— কতো হলো?

হাকেম তাঁর 'ইকলিল' পুস্তিকায় আলী ইবনে আবী জায়েদের মধ্যস্থতায় ইউসুফ বিন মেহরানের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন এভাবে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর পৃথিবীর আয়ু ছিলো ৬৫ বছর। কিন্তু হাকেম ও নববী মন্তব্য করেছেন, ঐকমত্যোৎসারিত অভিমত এই যে, তিনি দুনিয়ায় ছিলেন ৬৩ বছর। ৬৫ বছরের কথাটি অবাস্তব। ৬৫ বছরের বর্ণনাটিও অনুমান নির্ভর। হজরত ইবনে আব্বাসের ৬৫ বছর সম্পর্কিত বর্ণনাটিকে অস্বীকার করেছেন

www.eelm.weebly.com

ওরওয়া। বর্ণনাটিকে তিনি ভুলও প্রমাণ করেছেন। বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস নবুয়তের সূচনাকালে জন্মগ্রহণই করেননি। আবার মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহীর মাধ্যমে বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের অধিকাংশ হাদিসে এসেছে ৬৩ বছরের কথা। এতে করে বোঝা যায়, হজরত ইবনে আব্বাস প্রথম দিকে হয়তো ৬৫ বছরের কথাই বলতেন। পরে তিনি অধিকাংশের বর্ণনাকে জানিয়েছিলেন স্বাগতম।

কাযী আয়াযের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, রসুল স. নবুয়ত লাভ করেছিলেন ৪৩ বছর বয়সে। বর্ণনাটি বিরল। তবে ৪০ বছরে নবুয়ত প্রাপ্তির তথ্যটিই অধিকতর শুদ্ধ।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ১৭, ১৮, ১৯, ২০

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَاۗءِ شُفَعَاۗؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ۭ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ۭ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝ وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝

❑ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা আল্লাহের নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? অপরাধিগণ সফলকাম হয় না।

❑ উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহার ইবাদত করে তাহা উহাদিগের ক্ষতিও করে না, উপকারও করে না। উহারা বলে, 'এইগুলি আল্লাহের নিকট আমাদিগের সুপারিশকারী।' বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিবে যাহা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র।' এবং তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি ঊর্ধ্বে।

www.eelm.weebly.com

❐ মানুষ ছিল এক জাতি, পরে উহারা মতভেদ সৃষ্টি করে, তোমার প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকিলে তাহারা যে বিষয়ে— মতভেদ ঘটায় তাহার মীমাংসা তো হইয়াই যাইত।

❐ উহারা বলে, 'তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল, 'অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহেরই আছে। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদিগের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই ব্যক্তির চেয়ে নিকৃষ্ট আর কে, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে এ রকম বলে যে, আল্লাহ্র পরিবার পরিজন ও সন্তান আছে এবং যে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্তায়ালার নিদর্শন? সে তো সীমালংঘনের অপরাধে অপরাধী। আর অপরাধীরা কস্মিনকালেও সফল হয় না।

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যার ইবাদত করে তা তাদের ক্ষতিও করে না, উপকারও করে না। তারা বলে, এগুলো আল্লাহ্র নিকট আমাদের সুপারিশকারী।' এ কথার অর্থ— মক্কাবাসী মুশরিকেরা কতই না অজ্ঞ! পাথরের মূর্তির সামনে তারা তাদের মস্তক অবনত করে। কেনো করে? একবার কি তারা এ কথা ভেবেও দেখবে না যে, নিষ্প্রাণ কোনো বস্তু কখনোই কারো কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। উপাসনার উপযোগী তো ওই সত্তা যিনি চিরঞ্জীব, যিনি উপকার ও অপকার করতে সক্ষম। যিনি তাঁর উপাসকদের প্রয়োজন পূরণ করেন। তারা আবার এমনও বলে, আমাদের পূজ্য প্রতিমাগুলো আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবে— দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো তোমরা কি আল্লাহ্কে আকশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিবে যা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র। এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি ঊর্ধ্বে।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা কি ভেবেছো, আল্লাহ্পাক সর্বজ্ঞ নন? আকাশ ও পৃথিবীর কোনো কিছু সম্পর্কে তিনি কি অনবগত? তাই কি তোমরা আকাশের ফেরেশতা এবং পৃথিবীর নিষ্প্রাণ বিগ্রহগুলোকে তাঁর অংশী সাব্যস্ত করতে চাও? অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুই তাঁর সৃষ্টি। আর সৃষ্টি কখনো তার স্রষ্টার অংশ হতে পারে না। তিনি তো তোমাদের অংশীবাদিতাজাত অপবিত্র ও অযথার্থ ধারণা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি তো মহান, পবিত্র।

এর পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'মানুষ ছিলো এক জাতি, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে।' 'ওয়ামা কানান্ নাসু ইল্লা উম্মাতান ওয়াহিদান' অর্থ, মানুষ ছিলো এক জাতি। 'ফাখতালাফু' অর্থ, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। এ কথার

www.eelm.weebly.com

অর্থ, হজরত আদম থেকে হজরত নূহের সময় পর্যন্ত সকল মানুষ ছিলো এক আল্লাহ্‌র উপাসক, পরে সৃষ্টি হয় মতপৃথকতা। অথবা হজরত ইব্রাহিমের পর থেকে আমর বিন লুহাইয়ের জামানা পর্যন্ত সকলে ছিলো এক মুসলিম জাতিভুক্ত। পরে কেউ কেউ মূলস্রোত থেকে পৃথক হয়ে যায়। অথবা এখানে কোনো এক নির্দিষ্ট উম্মতকে উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ পথভ্রষ্টরা প্রথমে থাকে সত্যপ্রত্যাখ্যানের উপর একতাবদ্ধ। তারপর তাদের নবী-রসুল কেউ আবির্ভূত হলে তাদের সে ঐক্যে দেখা দেয় ফাটল। এক দল স্বীকৃতি দান করে। আর এক দল থেকে যায় পূর্ববৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এভাবে এক জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দেয় বিভেদ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তার মীমাংসা তো হয়েই যেতো।' এ কথার অর্থ— হে অংশীবাদী জনতা! ভালো করে শুনে নাও, আল্লাহ্‌পাক তওবা করার জন্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে কিছুদিন অবকাশ দিয়ে থাকেন। এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র দয়ার্দ্র নির্ধারণ। অতীত উম্মতদেরকে এ রকম সুযোগ দেয়া হয়েছে। এখন দেয়া হচ্ছে তোমাদেরকেও। এই অবকাশ দানের বিষয়টি আল্লাহ্‌পাক পূর্বাহ্নে নির্ধারণ না করলে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হয়ে যেতো সহজেই। সত্যপ্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গেই নেমে আসতো আযাব।

হাসান বসরী বলেছেন, এটা আল্লাহ্‌র চিরন্তন সিদ্ধান্ত যে, পৃথিবীতে তিনি সওয়াব ও আযাবের কার্যকারিতা প্রকাশ করবেন না। দান করবেন না চূড়ান্ত *সিদ্ধান্ত। চূড়ান্ত মীমাংসার সময় হচ্ছে আখেরাত। সেখানেই দেয়া হবে বেহেশত* ও দোজখের চূড়ান্ত ঘোষণা।

শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা বলে, তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেনো? বলো, অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই আছে। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমি তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! মোহাম্মদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আমাদের পছন্দমতো কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয় না কেনো'— এ রকম কথা যারা বলে তাদেরকে জানিয়ে দিন, কখন, কার জন্য, কী ভাবে, কোন আয়াত অবতীর্ণ করতে হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। সত্তাগত ও স্বয়ম্ভূরূপে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী কেবল তিনিই। সুতরাং তোমরা সত্যপ্রত্যাখ্যানের যথাপ্রতিফলের জন্য অপেক্ষা করো। তোমাদের সঙ্গে আমিও প্রতীক্ষায় রইলাম।

www.eelm.weebly.com

وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِىٓ ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ○

❒ এবং আমি মানুষকে, তাহাদিগের দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর, অনুগ্রহের আস্বাদ দিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ আমার নিদর্শনকে বিদ্রূপ করে। বল, আল্লাহ্ বিদ্রূপের শাস্তিদানে আরও তৎপর। তোমরা যে বিদ্রূপ কর তাহা আমার ফেরেশতাগণ লিখিয়া রাখে।

এক বর্ণনায় এসেছে, একবার মক্কাবাসীরা দুর্ভিক্ষ কবলিত হলো। আল্লাহ্ দয়া করে তাদের উপর থেকে দুর্ভিক্ষ অপসারিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রদর্শন করতে লাগলো অকৃতজ্ঞতা। আল্লাহ্পাকের দয়াকে নিয়ে শুরু করলো বিভিন্ন প্রকার ঠাট্টাবিদ্রূপ। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, মক্কার অংশীবাদীদের ঔদ্ধত্য চরমে পৌছলে অতিষ্ঠ হয়ে রসুল স. অপপ্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! হজরত ইউসুফের সময় যেমন তুমি একটানা সাত বছর দুর্ভিক্ষ দিয়েছিলে, তেমনি উদ্ধত মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ করে আমাকে সাহায্য করো। তাঁর দোয়া কবুল হলো। নেমে এলো ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ধীরে ধীরে অবস্থা এমন চরমে পৌছলো যে, চামড়া ও মৃত জন্তু ভক্ষণ ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। আবু সুফিয়ান রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, মোহাম্মদ! দেখছো কি নিদারুণ অবস্থা। দুর্ভিক্ষ অপসারণের জন্য দোয়া করো। আল্লাহ্পাক তো তোমাকে প্রতিবেশীদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। রসুল স. দোয়া করলেন। দূর হয়ে গেলো জীবনহারক দুর্ভিক্ষ। আর এক বর্ণনায় এসেছে, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অংশীবাদীরা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর থেকে এই শাস্তিটি সরিয়ে নাও, আমরা ইমান আনবো। আল্লাহ্পাক রসুল স. কে জানিয়ে দিলেন তারা ইমান আনবে না। তাই হলো। দুর্ভিক্ষ অপসারণের পর অংশীবাদীরা শুরু করে দিলো বিভিন্ন রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ। সত্যপ্রত্যাখ্যানকে আঁকড়ে ধরলো আরো শক্ত করে। আল্লাহ্পাক এর জন্য তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়েছিলেন বদর যুদ্ধের সময়।

উপরে বর্ণিত ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'এবং আমি মানুষকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর অনুগ্রহের আস্বাদ দিলে তারা তৎক্ষণাৎ আমার নিদর্শনকে বিদ্রূপ করে।' এখানে উল্লেখিত 'দ্বররাআ' শব্দটির অর্থ, দুঃখ-দৈন্য— দারিদ্র, পীড়া, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জীবনাশংকা ইত্যাদি। আর 'রহমত' অর্থ অনুগ্রহ— স্বচ্ছলতা, সুস্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ, সফলতা ইত্যাদি।

www.eelm.weebly.com

ঠাট্টা বিদ্রূপ বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'মকর' শব্দটি। মকরের প্রকৃত অর্থ— গোপনে কারো ক্ষতি সাধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা। অংশীবাদীরা প্রকাশ্যতঃ আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করতো। তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতো রসুল স. এর সঙ্গে। আর তাদের এমতো ঔদ্ধত্য তো ছিলো পরোক্ষভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিই। এভাবে তারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে বিদ্রূপ করে।

মুকাতিল বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাদেরকে দিয়েছিলেন বৃষ্টি। ফল ও ফসলের সমারোহ জেগে উঠেছিলো শস্যপ্রান্তরে। দুর্ভিক্ষও দূর হয়ে গিয়েছিলো সহজে। কিন্তু তারা এর জন্য কোনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। বরং ঠাট্টা বিদ্রূপের সুরে বলেছে, আরে বৃষ্টি তো বর্ষিত হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। তাদের এমতো আচরণকেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে মকর— প্রতারণা, চালাকী বা বিদ্রূপ।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, আল্লাহ্ বিদ্রূপের শাস্তি দানে আরো তৎপর।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ্‌পাক সকল বিষয়ে তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক পারদর্শী। তোমাদের বিদ্রূপের প্রতিবিদ্রূপ বা শাস্তি দানেও তো তিনি তৎপর। এই তৎপরতা আপাত-দৃশ্যমান না হলেও মনে রেখো, তোমাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছে শাস্তির বৃত্তে। যথাসময়ে নিশ্চয় তা কার্যকর করা হবে। হজরত আলী বলেছেন, যাকে সুপরিসর পৃথিবী দেয়া হয়েছে, সে বুঝতে পারে না যে, সে বন্দী হয়েছে আল্লাহ্‌র গোপন কৌশলে। আমি বলি, পৃথিবীর বিত্তবৈভব ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের পর কেউ যদি আল্লাহ্‌তায়ালার কৃতজ্ঞতাভাজন না হতে পারে, তবে বুঝতে হবে সে জড়িত হয়েছে আল্লাহ্‌র আযাবের ফাঁদে।

কেউ কেউ 'শাস্তি দানে তৎপর' কথাটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সত্যকে ধ্বংস করে দেয়ার যে ষড়যন্ত্র সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা করে, তার চেয়ে অতি দ্রুত তাদের উপরে এসে পড়বে আল্লাহ্‌র শাস্তি। এ রকম করতে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ সক্ষম। আল্লাহ্‌র সে শাস্তি অপসারণ করার সাধ্য তাদের নেই। সুতরাং এ কথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌র তৎপরতার তুলনায় তাদের তৎপরতা অতি মন্থর। বরং তাদের তৎপরতা তৎপরতাই নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা যে বিদ্রূপ করো তা আমার ফেরেশতাগণ লিখে রাখে।' এ কথার অর্থ— হে অংশিবাদীরা শুনে নাও, পরিত্রাণের কোনো পথই তোমাদের জন্য খোলা নেই। আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতারা তোমাদের অপতৎপরতা ও অবাধ্যতাগুলো লিখে রাখছে। তাদের নিকটেই তোমরা তোমাদের অপরাধ ঢেকে রাখতে পারছো না। তাহলে আমার নিকটে কীভাবে গোপন রাখবে?

www.eelm.weebly.com

هُوَالَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ
بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ
مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ
اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○ فَلَمَّآ اَنْجٰهُمْ اِذَا هُمْ
يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ
مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

❒ তিনি তোমাদিগকে জলে-স্থলে ভ্রমন করান, এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এইগুলি আরোহী লইয়া অনুকূল বাতাসে বহিয়া যায় এবং তাহারা উহাতে আনন্দিত হয়, অতঃপর এইগুলি বাত্যাহত এবং সর্বদিক হইতে তরঙ্গাহত হয় এবং তাহারা উহা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে মনে করে, তখন তাহারা আল্লাহের আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া ডাকিয়া বলেঃ তুমি আমাদিগকে ইহা হইতে ত্রাণ করিলে আমরা অবশ্য কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।

❒ অতঃপর, তিনি যখনই উহাদিগকে বিপদ-মুক্ত করেন তখনই উহারা দেশে অন্যায়ভাবে জুলুম করিতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদিগের জুলুম বস্তুতঃ তোমাদিগের নিজদিগের প্রতিই হইয়া থাকে; পার্থিব জীবনের সুখ ভোগ করিয়া লও, পরে আমারই নিকট তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব তোমরা যাহা করিতে।

'হুওয়াল্লাজী ইউসায়্যিরুকুম ফিল বাররি ওয়াল বাহারি' অর্থ— তিনি তোমাদেরকে জলে স্থলে ভ্রমন করান। অর্থাৎ তোমাদের সকল ভ্রমনকে আল্লাহ্তায়ালাই নির্বিঘ্ন করেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'হাত্তা ইজা কুনতুম ফিল ফুল্‌ক' (এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও)। এ কথার অর্থ— তোমরা যখন নৌকা কিংবা কোনো জলযানে তোমাদের সফর শুরু করো।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং এগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, অতঃপর এগুলো বাত্যাহত এবং সবদিক দিয়ে তরঙ্গাহত হয় এবং তারা তা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে মনে করে, তখন তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে ডেকে বলেঃ তুমি আমাদেরকে এ থেকে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্য কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো।' এ কথার মর্মার্থ হচ্ছে— অনুকূল বাতাসে যখন জলযানগুলো চলে, তখন আরোহীরা হয় আনন্দিত। কিন্তু যখন ঝড় ওঠে, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে ভয়ংকরভাবে দুলতে থাকে তাদের তরণী, তখন আরোহীরা যায় ঘাবড়ে। বিপদমুক্তির জন্য বিশুদ্ধ চিত্তে কেবল আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকে। বলে, হে আমাদের আল্লাহ্! আমাদেরকে বাঁচাও। এ যাত্রা আমরা যদি রক্ষা পাই, তবে আমরা অবশ্যই হবো কৃতজ্ঞচিত্তদের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, আরবের অংশীবাদীরা এ রকম করতো। তারা মূর্তিপূজারী হলেও সমুদ্রের ঝড়ে পড়লে তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোকে ডাকতো না। ডাকতো কেবল আল্লাহ্‌কে। আল্লাহ্‌ইতো একমাত্র পরিত্রাতা। কিন্তু এ কথা তারা বিপদে পড়লে বুঝতো। বিপদ কেটে গেলে পুনরায় শুরু করতো পূজাপার্বন। সেকথাই বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি যখনই তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখনই তারা দেশে অন্যায়ভাবে জুলুম করতে থাকে।' এখানে 'ইউবগুনা ফিল আরদ্বি' অর্থ, দেশে জুলুম করে। 'গইরিল হাক্ক' অর্থ অন্যায়ভাবে। এভাবে 'গইরিল হাক্ক' কথাটি ব্যবহারের মাধ্যমে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, জুলুম বা ফেত্‌না ফাসাদ অবশ্য অবশ্যই অন্যায়। এখানে এ রকম একটি প্রশ্ন উদ্ভবের সুযোগও থেকে যেতে পারে যে, মুসলমানেরা যে জেহাদের সময় অনেক জনপদ ও সম্পদ ধ্বংস করে। তাদের এসকল কাজ কি জুলুম নয়? উত্তরে বলতে হয়, অবশ্যই নয়। কারণ জেহাদ করা হয় এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। বিকৃত বিশ্বাসের সংশোধন, অহংকার ও অকৃতজ্ঞতার অবদমন— এ রকম বহুবিধ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পাদিত হয় জেহাদ। আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জনই থাকে জেহাদের মূল লক্ষ্য। প্রবৃত্তিপ্রসূত ফেত্‌না ফাসাদ সম্পূর্ণতই জেহাদের বিপরীত ধর্মী একটি বিষয়। সুতরাং বাহ্যিক কিছু সাদৃশ্য সত্ত্বেও জেহাদ ও ফেত্‌না কখনো এক নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! তোমাদের জুলুম বস্তুতঃ তোমাদের নিজেদের প্রতিই হয়ে থাকে।' এ কথার অর্থ— হে অপরিণামদর্শী মানুষ! তোমরা অন্যের উপর জুলুম করো, কিন্তু এ কথা জানো না যে, তোমাদের জুলুমের আসল প্রতিক্রিয়া পতিত হয় তোমাদেরই উপর। জুলুমের গোনাহ্ ও শাস্তি ভোগ করবে কে? তোমরাই তো।

উম্মতজননী হজরত আয়েশা থেকে উত্তম সুত্রে তিরমিজি ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেকে উত্তম কর্ম সমূহের পরিণাম ভোগ করে,

www.eelm.weebly.com

তেমনি ভোগ করে তার অন্যায়ের প্রতিফল। আবু শায়েখ, খতিব ও ইবনে মারদুবিয়া তাঁদের আপনাপন তাফসীর গ্রন্থে হজরত আনাস থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কর্ম সম্পাদনকারীর উপরেই পতিত হয় তিনটি কর্ম—নির্যাতন, প্রতারণা ও শোষণ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে লাআলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যদি এক পাহাড় অন্য পাহাড়ের উপর নির্যাতন চালাতো তবে, নির্যাতক পাহাড় ফেটে চৌচির হয়ে যেতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'পার্থিব জীবনের সুখ ভোগ করে নাও। পরে আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবো তোমরা যা করতে।' এ কথার অর্থ— হে অকৃতজ্ঞ, অপরিণামদর্শী ও অবিশ্বাসী জনগোষ্ঠী! ঠিক আছে, পার্থিব ভোগ বিলাসের মধ্যেই ডুবে থাকো। মৃত্যু পর্যন্ত দেয়া হলো এই অবকাশ। এরপর মৃত্যু-উত্তর জীবনে পুনরুত্থান দিবসে তো তোমাদেরকে আসতেই হবে কর্মফল গ্রহণের জন্য। তখন আমি তোমাদেরকে ভালো করেই জানিয়ে দিবো— পৃথিবীতে কী জঘন্য অপকর্মে নিয়োজিত ছিলে তোমরা।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ২৪, ২৫

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتّٰٓى إِذَآ أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ أَتٰىهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا إِلٰى دَارِ السَّلٰمِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

❑ পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির ন্যায় যাহা আমি আকাশ হইতে বর্ষণ করি এবং যদ্দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া উদ্‌গত হয়, যাহা হইতে মানুষ ও জীব-জন্তু আহার করিয়া থাকে। অতঃপর, যখন ভূমি তাহার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং উহার অধিকারিগণ মনে করে উহা তাহাদিগের আয়ত্তাধীন তখন দিবস অথবা রজনীতে আমার নির্দেশ আসিয়া পড়ে ও আমি উহা এমনভাবে নির্মূল করিয়া দিই, যেন ইতিপূর্বে উহার অস্তিত্বই ছিল না। এইভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

www.eelm.weebly.com

❑ আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

পার্থিব জীবন অবক্ষয় প্রবণ ও ধ্বংসোন্মুখ, অথচ মানুষ চিরস্থায়ী জীবনের কথা বিস্মৃত হয়ে পার্থিবতাকেই করে তোলে মূল উদ্দেশ্য— এই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতটিতে। প্রথমেই পার্থিব জীবনের উপমা দেয়া হয়েছে এভাবে— 'পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির মতো, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি এবং যদ্দারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়, যা থেকে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করে থাকে।' এখানে 'ফাখতালাতা বিহি' অর্থ ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে। 'মা ইয়াকুলুন্নাসু ওয়ালআনআম' অর্থ, মানুষ জীবজন্তু যা আহার করে থাকে। অর্থাৎ শস্য, ফলমূল, সজী ও তৃণলতা।

এরপর বলা হয়েছে —'অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারীরা মনে করে তা তাদের আয়ত্ত। তখন দিবস অথবা রজনীতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে ও আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দেই যেনো ইতোপূর্বে এর অস্তিত্বই ছিলো না। এভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিবৃত করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

আমি বলি, উদ্ধৃত বক্তব্যটির মর্মার্থ এরকম— পরিমিত বৃষ্টিপাতের ফলে যখন পরিদৃশ্যমান হয় ফুল, ফল ও ফসলের নয়নাভিরাম সমারোহ, তখন সেই শস্যভূমি বা বাগানের মালিক মনে করে, এ সকল কিছু কেবল আমার। আমার এই বিপুল বৈভবে হস্তক্ষেপ করার সাধ্য কারো নেই। তখন দিবস অথবা নিশীথের যে কোনো সময় আমার নির্দেশ এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ফল ও ফসলের সমারোহ হয়ে যায় নিশ্চিহ্ন। হে মানুষ! এই উপমাটির কথা গভীরভাবে চিন্তা করো। ভেবে দেখো, তোমার পৃথিবীর জীবনও এরকম। তোমরা এখানে কতো স্বপ্ন রচনা করো। পার্থিব অর্জনকে মনে করো চিরন্তন। মনে করো তোমাদের ওই অর্জন থেকে বিচ্যুত করবার সাধ্য কারো নেই। অথচ দিবস অথবা রাত্রির যে কোনো সময় আমি প্রেরণ করি মৃত্যুর ফেরেশতাকে। তারা তোমাদেরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে পার্থিবতা থেকে। তোমাদের পৃথিবীর অর্জন হয়ে যায় বহুদূরের অপসৃয়মান এক স্মৃতি। নির্মূল হয় তোমাদের সব কিছু। এরকম উপমা হচ্ছে আমার পক্ষের বিশেষ নিদর্শন। এভাবে আমি আমার নিদর্শনসমূহকে বিবৃত করি ভাবুকদের জন্য। যারা ভাবে। ভাবে আর ভাবে। বুঝতে চেষ্টা করে জীবনের রহস্য, সত্যের মহিমা।

পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।' এ কথার অর্থ— 'হে মানুষ আল্লাহ্ তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন চির সুখময় চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে।'

www.eelm.weebly.com

কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্পাকের এক নাম সালাম। সুতরাং এখানে 'দারিস্সালাম' কথাটির অর্থ হবে আল্লাহ্র আবাস— 'শান্তির আবাস' বা নিরাপত্তা নয়।

হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. নিদ্রিত ছিলেন। কয়েকজন ফেরেশতা এসে দাঁড়ালেন তাঁর শয্যাপাশে। একজন ফেরেশতা বললো, বলো এই ব্যক্তি কোন অবস্থায় রয়েছেন? আর একজন ফেরেশতা বললো, ইনি তো নিদ্রিত। অন্য একজন ফেরেশতা বললো, এই ব্যক্তির চোখ নিদ্রাভিভূত কিন্তু হৃদয় জাগ্রত। আর একজন ফেরেশতা বললো, এই ব্যক্তির দৃষ্টান্তটি এ রকম— অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী একজন একটি সুবিশাল ভবন নির্মাণ করলেন। তারপর সেখানে অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য বিছিয়ে দিলেন দস্তরখানা। ঘোষক হিসেবে নিযুক্ত করলেন একজনকে। ওই ঘোষক মানুষকে আমন্ত্রণ জানাতে লাগলেন। কেউ কেউ তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো এবং তাদের পানাহার সম্পন্ন করলো ওই দস্তরখানায়। কেউ কেউ তাঁর আমন্ত্রণকে করলো প্রত্যাখ্যান। তারা হয়ে গেলো বঞ্চিত। একজন ফেরেশতা বললো, এবার দৃষ্টান্তটি ব্যাখ্যা করো, যাতে ইনি বুঝতে পারেন। একজন বললো, ইনি তো নিদ্রিত। অন্যজন বললো, কিন্তু তাঁর অন্তর জাগ্রত। আর একজন বললো, তোমার বর্ণিত দৃষ্টান্তটির ব্যাখ্যা এই— এখানে সুবিশাল ভবনের নির্মাতা হচ্ছেন আল্লাহ্। ভবনটি হচ্ছে জান্নাত। আর জান্নাতের দিকে আহ্বানকারী হচ্ছেন মোহাম্মদ মোস্তফা স., যিনি এখানে এখন নিদ্রিত। সুতরাং যারা মোহাম্মদ স. এর আনুগত্য করবে তারা আল্লাহ্তায়ালারই আনুগত্য করবে। আর যারা তাঁর অবাধ্য হবে তারা হবে আল্লাহ্তায়ালারই অবাধ্য। বোখারী।

হজরত রবীয়া জারাশী থেকে দারেমী বর্ণনা করেছেন— রসুল স. বলেছেন, এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একটি গৃহ নির্মাণ করলো। দস্তরখানায় রাখলো পানাহারের সামগ্রী। এরপর একজনকে নিযুক্ত করলো আহ্বায়করূপে। তিনি সকলকে আমন্ত্রণ জানালেন। এখন যে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে, সে পানাহার করে তৃপ্ত হবে। আর গৃহের মালিকও হবে তার প্রতি প্রসন্ন। আর যে আসবে না সে বঞ্চিত হবে পানাহার থেকে। আর গৃহস্বামীও হবে তার প্রতি অপ্রসন্ন। বর্ণনাকারী বলেছেন, এখানে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হচ্ছেন আল্লাহ্। আহ্বায়ক হচ্ছেন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স.। গৃহ হচ্ছে ইসলামের গৃহ এবং দস্তরখানা হচ্ছে জান্নাত।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ইসলাম শব্দের মধ্যে যে অর্থে সালাম সন্নিবেশিত হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে সেই অর্থেই সালাম শব্দটির ব্যবহার ঘটেছে। জান্নাতবাসীরা একে অপরকে 'সালাম' উচ্চারণের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানাবে। তাই জান্নাতকে বলা হয়েছে 'দারিস্সালাম।' ফেরেশতারাও সেখানে 'সালাম' উচ্চারণের মাধ্যমে অভিবাদন জানাবে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ওয়াল মালায়িকাতু ইয়াদ্খুলুনা আ'লাইহিম মিন কুল্লি বাবিন সালামুন আ'লাইকুম বিমা সাবারতুম ফানি'মা উক্বাদ্ দারি (আর ফেরেশতারা প্রতিটি

www.eelm.weebly.com

দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে এবং বলবে, 'তোমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছিলে তার বিনিময়ে আজ তোমাদের প্রতি প্রশান্তি, আর আখেরাত কতই না উত্তম)।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্পাক যাকে ইচ্ছা তাকে দ্বীন ইসলামের প্রতি পথ প্রদর্শন করেন। এখানে 'সরল পথ' অর্থ দ্বীন ইসলাম, সুন্নত পদ্ধতি ও আল্লাহ্ পর্যন্ত উপনীত হওয়ার পথ। এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, পথ প্রদর্শন বা হেদায়েত সম্পূর্ণতই আল্লাহ্পাকের ইচ্ছাধীন। আরো প্রমাণিত হয় ইচ্ছা ও নির্দেশ (এরাদা ও আমর) সম্পূর্ণ পৃথক দুটি বিষয়। পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হয়েছে আমরের কথা। বলা হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন। এই আহ্বান বা আমর সকলের জন্য। কিন্তু হেদায়েত সকলের জন্য নয়। তাই বলা হয়েছে, যাকে ইচ্ছা সরলপথে পরিচালিত করেন। তাই বাস্তবে দেখা যায়, মানুষ আল্লাহ্তায়ালার আমর বা নির্দেশের বিরুদ্ধে যেতে পারে কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারে না। আল্লাহ্পাক যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন (হেদায়েত) করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট (গোমরাহ্) করেন। আল্লাহ্তায়ালার এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা কারোই নেই। মোতাজিলারা বিভ্রান্ত একটি দল। তারা আল্লাহ্তায়ালার আমর ও এরাদার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তাই তারা বলে, হেদায়েত করা আল্লাহ্র ইচ্ছা কিন্তু গোমরাহ করা আল্লাহ্র ইচ্ছা নয়।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ২৬, ২৭

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ
جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَا
أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ○

❐ যাহারা মঙ্গলকর কার্য করে তাহাদিগের জন্য আছে মঙ্গল এবং আরো কিছু। কালিমা ও হীনতা উহাদিগের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিবে না। উহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে।

❐ যাহারা মন্দ কাজ করে তাহাদিগের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাহাদিগকে হীনতা আচ্ছন্ন করিবে; আল্লাহ্ হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ

www.eelm.weebly.com

নাই; উহাদিগের মুখমণ্ডল যেন অন্ধকার রাত্রির আস্তরণে আচ্ছাদিত। উহারা অগ্নির অধিবাসী, সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে।

'আহসানুল হুসনা' অর্থ মঙ্গলকর কার্য। 'জিয়াদাতুন' অর্থ আরো কিছু। প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা মঙ্গলকর কার্য করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল এবং আরো কিছু।' এ কথার অর্থ— বিশ্বাসীরা তাদের উত্তম কর্মের যথোপযুক্ত পুণ্য তো পাবেই, তদুপরি পাবে অতিরিক্ত পুরস্কার। রসুলপাক স. ইহ্সান (এবাদতের সৌন্দর্য) সম্পর্কে বলেছেন, ইহ্সান হচ্ছে এমনভাবে ইবাদত করা যাতে আল্লাহ্ পরিদৃশ্যমান হন। সৌন্দর্যের এই সর্বোন্নত স্তরে যে পৌঁছতে পারবে না তাকে অন্ততঃ এতোটুকু বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তো আমাকে দেখছেন। বোখারী ও মুসলিমে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'লিল্লাজিনা আহ্সানু' অর্থ— 'লাইলাহা ইল্লালাহ্' কলেমার সাক্ষ্য প্রদান, আল হুসনা অর্থ জান্নাত এবং জিয়াদাতুন অর্থ আল্লাহ্র দীদার।

হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন— রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্পাকের এক ঘোষক এইমর্মে ঘোষণা করবেন যে, অগ্র-পশ্চাৎ খেয়াল রেখে যারা বিশুদ্ধ নিয়তে আল্লাহ্র ইবাদত করেছে, তারা পাবে জান্নাত এবং অতিরিক্ত পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ্র দীদার। হজরত উবাই বিন কা'ব থেকে মারফুরূপে ইবনে জারীর, ইবনে মারদুবিয়া, লালেকানি এবং ইবনে আবী হাতেমও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ রকম আরো বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে ইবনে মারদুবিয়া, আবু শায়েখ ও লালেকানি এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে মারফুরূপে আবু শায়েখ। ইবনে জারীর, ইবনে মারদুবিয়া, ইবনে মুনজির ও আবু শায়েখ তাঁদের আপনাপন তাফসীরে এবং লালেকানি তাঁর 'কিতাবে রেওয়ায়েত' গ্রন্থে হজরত আবু বকর সিদ্দিক থেকে এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবার হজরত হুজায়ফা থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, আবু শায়েখ, লালেকানি এবং আজরী। আরো অনেক সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। যেমন, হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে হান্নাদ, ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়েখ, লালেকানি— হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামা সূত্রে ইবনে মারদুবিয়া— হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু সালেহ ও আবু মালেকের মাধ্যমে সুদ্দীর পদ্ধতিতে ইবনে আবী হাতেম ও লালেকানি এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইকরামা। লালেকানি এ হাদিসটির সূত্র সংযোজিত করেছেন হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, হাসান বসরী, আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা, আমের বিন সাঈদ বাজাদী, ইবনে আবী ইসাহাক সাবয়ী, আবদুর রহমান বিন সাবেত, ইকরামা,

www.eelm.weebly.com

মুজাহিদ ও কাতাদার সঙ্গে। কুরতুবী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, উল্লেখিত ব্যাখ্যাটি সাহাবায়েকেরাম ও তাবেয়ীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। আর এ ধরনের ঐকমত্যসম্মত ব্যাখ্যা রসুল স. থেকে না শুনে করা সম্ভবই নয়।

হজরত সুহাইব থেকে ইবনে মাজা, মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স.বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্‌তায়ালা জান্নাতবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা আর কী চাও? তারা বলবে, আপনি কী আমাদের বদনকে সমুজ্জ্বল করে দেন নি? আপনি কী আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? আপনি কী আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাননি (তবে আমরা আর কী চাইবো)? আল্লাহ্ সহসা তাঁর আনুরূপ্যবিহীন বদনের উপর থেকে যবনিকা অপসারিত করবেন। বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে জান্নাতীরা চেয়ে থাকবে তাঁর দিকে। ওই অনির্বচনীয় সৌন্দর্য দর্শনের পর তাদের মনে হবে দীদারের তুলনায় জান্নাতের সকল কিছুই অতি তুচ্ছ। কুরতুবী লিখেছেন, যবনিকা অপসারণ করার উদ্দেশ্য হবে বিরহ বেদনার চির অপসারণ। জান্নাতীরা তখন স্বচক্ষে দেখবে তাদের আল্লাহ্‌কে। উল্লেখ্য যে, যবনিকা তো দৃষ্টির একটি সমস্যা। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার দিক থেকে যবনিকা থাকা না থাকার কোনো সমস্যাই নেই। কারণ তিনি সকল সমস্যা থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র।

এরপর বলা হয়েছে— 'কালিমা ও হীনতা তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না।' এ কথার অর্থ জান্নাতে দুঃখ বেদনা কিংবা বিষণ্ণতার উপস্থিতি নেই। তাই জান্নাতীদের মুখমণ্ডল থাকবে সদা সমুজ্জ্বল। ইবনে আবী হাতেম প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'ক্বতারুন' অর্থ কালো কুয়াশা। আর জিল্লাত অর্থ হীনতা। অর্থাৎ জাহান্নামীদের মতো জান্নাতীদের চেহারায় কালো কুয়াশার আবরণ থাকবে না। আর সেখানে হীনতা বলতে তো কিছু থাকবেই না।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে।'

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে—'ওয়াল্লাজিনা কাসাবুস্ সায়্যিয়াতি জাযাউ সায়্যিয়াতিন্ বি মিছলিহা ওয়াতার হাক্বুহুম জিল্লাতুন্ (যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে)। এখানে আল্লাজিনা কাসাবু (মন্দ কাজ করে) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে বিগত আয়াতের 'আল্লাজিনা আহ্‌সানু' (মঙ্গলকর কাজ করে) এর সঙ্গে অথবা আল্লাজিনা কাসাবু এখানে উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় হচ্ছে জাযাউ সায়্যিয়াহ্।

এরপর বলা হয়েছে— 'মা লাহুম মিনাল্লাহি মিন্ আ'সিম (আল্লাহ্ থেকে তাদেরকে রক্ষা করবার কেউ নেই) এখানে মিন্‌আ'সিম এর মিন্ অতিরিক্ত (মিন্ এ জায়েদা)। এরপর বলা হয়েছে— কাআন্‌নামা উগ্‌শিইয়্যাত উজুহুহুম ক্বিত্বআ'ম্ মিনাল্‌লাইলি মুজ্‌লিমান (তাদের মুখমণ্ডল যেনো অন্ধকার রাত্রির

www.eelm.weebly.com

আস্তরণে আচ্ছাদিত)। এ কথার অর্থ— জাহান্নামীদেরকে দেখলে মনে হবে, তাদের মুখমণ্ডলের ভাঁজে ভাঁজে যেনো অন্ধকার রাতের রাশি রাশি আস্তর লেপন করে দেয়া হয়েছে। এখানে 'ক্বিত্বআ'ম' (আস্তরণ) শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে কাত্বয়াত।

এরপর বলা হয়েছে— 'উলায়িকা আসহাবুন্নার হুম ফিহা খলিদুন' (তারা অগ্নির অধিবাসী সেখানে তারা স্থায়ী হবে)। এ কথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীরা আগুনেরই অধিবাসী। আর তাদের ওই অগ্নিবাস চিরস্থায়ী।

একটি সন্দেহঃ মোতাজিলারা বলে, কবীরা গোনাহকারীদের জাহান্নামবাস চিরস্থায়ী। আরো বলে, কেউ কবীরা গোনাহ করলে সে আর মুমিন থাকে না। তাদের এমতো বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ তারা আলোচ্য আয়াতটিকেই উপস্থাপন করে।

সন্দেহের অপনোদনঃ আলোচ্য আয়াতে 'মন্দ কাজ করে' বলে বুঝানো হয়েছে সগীরা গোনাহকে। কবীরা গোনাহও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যদি কেউ 'মন্দ কাজ করে' কথাটিকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করে, তবে সগীরা গোনাহ হিসেবে গ্রহণ করবে। কিন্তু 'প্রতিফল অনুরূপ মন্দ' কথাটি এমতো ধারণার বিরুদ্ধে। কেননা 'অনুরূপ' কথাটির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছে শ্রেণীগত পার্থক্য। তাই ব্যাপারটা দাঁড়াবে এ রকম— সগীরা গোনাহ্র তুলনায় কবীরা গোনাহ্র শাস্তি হবে বেশী। কিন্তু কুফরের তুলনায় শাস্তি হবে কম। তাই 'যারা মন্দ কাজ করে' কথাটির সম্পর্ক সাধারণভাবে 'তারা অগ্নির অধিবাসী' এর সঙ্গে হতে পারে না। চিরস্থায়ী অগ্নিবাসের সম্পর্ক হতে পারে কেবল কুফরী বা সত্যপ্রত্যাখ্যানের সঙ্গে। যেমন— 'ওয়ালমুতাল্লাক্বাতু ইয়াতারাব্বাসনা বি আন-ফুসিহিন্না'। আর 'হিন্না' এর পরে এসেছে 'ওয়া বাউলাতুহুন্না আহাক্কু বি রদ্দিহিন্না'। আর 'হিন্না' এর প্রত্যাবর্তন স্থল সাধারণ তালাকপ্রাপ্তরা নন। বরং এমতো বক্তব্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে কেবল ওই রমণীগণ, যাদেরকে রেজয়ি তালাক দেয়া হয়েছে।

এ রকম হওয়া সম্ভব যে, 'আল্লাজীনা কাসাবু সায়্যিয়াতি (যারা মন্দ কাজ করে) কথাটির উদ্দেশ্য হবে যারা কুফরী করে। কেননা পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এর বিপরীতার্থক বক্তব্য (যারা মঙ্গলকর কাজ করে)। আর ইমান বা বিশ্বাস হচ্ছে সকল মঙ্গলকর কার্যের শিখর। এভাবে কবীরা গোনাহ্কারীরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে 'যারা মঙ্গলকর কার্য করে' বক্তব্যটির মধ্যে। যদি তাই হয় তবে 'যারা মন্দ কাজ করে' কথাটির অর্থ 'যারা কুফরী করে'-ই তো হবে।

www.eelm.weebly.com

এ রকমও হতে পারে যে, এখানে 'যারা মন্দকাজ করে' বলে রসুল স. এর সময়ের মন্দ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। ওই সময়ে সকল মন্দ লোকেরা ছিলো কাফের। আর সৎকর্মশীলেরা সকলেই ছিলেন ইমানদার সাহাবী। সাহাবীগণ সকলেই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও পুণ্যবান। ঘটনাক্রমে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তওবা করে ফেলতেন। আর তওবাকারীরা কখনোই গোনাহ্গার নয়। তাই আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে 'যারা মন্দ কাজ করে বলে' ওই সময়ের কাফেরদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

সুরা ইউনুস ঃ ২৮, ২৯, ৩০

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ○ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ○ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

❒ এবং যেদিন আমি উহাদিগের সকলকে একত্রিত করিয়া যাহারা অংশীবাদী তাহাদিগকে বলিব, 'তোমরা এবং তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছিলে তাহারা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর,' আমি উহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া দিব এবং উহারা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছিল তাহারা বলিবে 'তোমরা তো আমাদিগের ইবাদত করিতে না,'

❒ আল্লাহ্ই আমাদিগের ও তোমাদিগের পারস্পরিক ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট যে, তোমরা আমাদিগের ইবাদত করিতে এ বিষয়ে আমরা অনবধান ছিলাম,'

❒ সেই দিন তাহাদিগের প্রত্যেকে তাহার পূর্ব কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত হইবে এবং উহাদিগকে উহাদিগের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহের নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে এবং উহাদিগের উদ্ভাবিত মিথ্যা উহাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবে।

প্রথমেই বলা হয়েছে—'এবং যেদিন আমি তাহাদিগের সকলকে একত্রিত করে যারা অংশীবাদী তাদেরকে বলবো, তোমরা এবং তোমরা যাদেরকে শরীক করেছিলে তারা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করো।' এ কথার অর্থ— তোমরা ওই দিনের

www.eelm.weebly.com

কথা স্মরণ করো যেদিন আমি তোমাদের সকলকে একত্র করবো এবং অংশীবাদী ও তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোকে বলবো, তোমরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াও। যে সকল অপকর্ম তোমরা করেছো, সেগুলো আগে দেখে নাও।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেবো।' এ কথার অর্থ— সেদিন আমি অংশীবাদী ও তাদের বাতিল উপাস্যগুলোর মধ্যে সৃষ্টি করে দিবো প্রচণ্ড বিতণ্ডার। বিচ্ছিন্ন করে দিবো পৃথিবীর মধুর সম্পর্কের। তাই বাতিল উপাস্যগুলো তাদের উপাসকদের প্রতি প্রকাশ করবে প্রবল বিরক্তি। আলোচ্য বাক্যটির অর্থ এ রকমও হতে পারে— সেদিন আমি মুমিন ও কাফেরদেরকে পৃথক করে দিবো। অন্য এক আয়াতেও এই পার্থক্যের কথাটি বিবৃত হয়েছে এভাবে— ওয়ামতাজুল ইয়াওমা আইয়্যুহাল্ মুজরিমুন (হে পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়, তোমরা আজ থেকে পৃথক হয়ে যাও)।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা যাদেরকে শরীক করেছিলো তারা বলবে, তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না।' এ কথার অর্থ— বাতিল উপাস্যগুলো তখন তাদের উপাসকদের বলবে, তোমরা তো আমাদের কথা মতো পূজা করতে না। আমরা কি এ রকম কখনো বলেছি যে, তোমরা আমাদের উপাসনা করো? এ রকমও হতে পারে যে, তখন যারা হজরত ঈসাকে আল্লাহ্র পুত্র বলতো এবং ফেরেশতাদেরকে বলতো আল্লাহ্র কন্যা— তাদেরকে লক্ষ্য করে হজরত ঈসা এবং ফেরেশতারা বলবেন, তোমরা তো আসলে আমাদের ইবাদত করতে না— ইবাদত করতে তোমাদের মনগড়া মতবাদের। কারণ, 'আমাদের ইবাদত করো' এ রকম কথা আমরা তোমাদেরকে কখনোই বলিনি। উল্লেখ্য যে, অংশীবাদীরাও তখন বলবে, আমরা কখনোই তোমাদের উপাসনা করতাম না।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই আমাদের ও তোমাদের পারস্পরিক ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট যে, তোমরা আমাদের ইবাদত করতে এই বিষয়ে আমরা অনবধান ছিলাম।' এ কথার অর্থ— বাতিল উপাস্যগুলো তখন উপাসকদেরকে বলবে, তোমরা সত্যবাদী না আমরা, সে বিষয়ে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তোমরা আমাদের উপাসনা করতে কি না সে বিষয়ে আমরা বেখবর। আমরা তোমাদের কথা শুনিনি, তোমাদেরকে দেখিনি, বুঝতেও পারিনি তোমাদের অপকর্ম সম্পর্কে।

পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'সেই দিন তাদের প্রত্যেকে তার পূর্ব কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত হবে এবং তাদেরকে তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্র নিকট ফিরিয়ে আনা হবে।' এ কথার অর্থ— সেদিন প্রত্যেককে দেখানো হবে

www.eelm.weebly.com

তার কৃতকর্মের ফিরিস্তি এবং তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্র দিকে। অর্থাৎ আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের দিকে অথবা আল্লাহ্র আযাবের দিকে।

একটি সন্দেহঃ কাফেরদের কোনো প্রভু নেই। তবুও আল্লাহ্তায়ালা এ রকম বলেছেন কেনো— ওয়া আন্নাল কাফিরিনা লা মাওলালাহুম (আর নিশ্চয় সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের কোনোই অভিভাবক নেই)।

সন্দেহের অপনোদনঃ আলোচ্য আয়াতের 'মাওলা' শব্দটির অর্থ প্রভুপ্রতি-পালক এবং মালিক। আর উদ্ধৃত আয়াতে 'লা মাওলা লাহুম' কথাটির অর্থ হবে সাহায্যকারী এবং পৃষ্ঠপোষক।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তাদের উদ্ভাবিত মিথ্যা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হবে।' এ কথার অর্থ, অংশীবাদীরা যাদেরকে উপাস্য নির্ধারণ করেছিলো, সেদিন তারা সকলেই হবে ভীতসন্ত্রস্ত। এখানে 'ইয়াফ্তারূন' (অন্তর্হিত হবে) কথাটির মাধ্যমে বুঝা যায় অংশীবাদীরা তাদের উপাস্যদেরকে শাফায়াতকারী বা সুপারিশকারী ভেবেছিলো। কিন্তু সেদিনকার বাস্তব অবস্থা দেখে তাদের এই ধারণাটি কর্পূরের মতো উবে যাবে।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

❒ বল, 'কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কাহার কর্তৃত্বাধীন, কে জীবিতকে মৃত হইতে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হইতে নির্গত করে এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করে?' তখন তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?'

❒ তিনিই আল্লাহ্, তোমাদিগের সত্য প্রতিপালক, সত্যত্যাগ করিবার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কী থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হইতেছ?

❒ এইভাবে সত্যত্যাগীদিগের সম্পর্কে, 'তাহারা বিশ্বাস করিবে না' তোমার প্রতিপালকের এই বাণী সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে।

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতটির মর্মার্থ হচ্ছে — হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন আকাশের আলো ও বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মাটি থেকে রিজিক বা জীবনোপকরণ দান করেন কে? তোমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দান করেন ও নিয়ন্ত্রন করেন কে? কে নির্গত করেন জীবিত প্রাণী থেকে মৃতবৎ শুক্র অথবা ডিম্ব। মৃতবৎ শুক্র অথবা ডিম্ব থেকে জীবন্ত প্রাণী? এভাবে সমগ্র সৃষ্টির সকল বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করেন? এর জবাবে সকলেই বলবে (বলা উচিত) 'আল্লাহ্।' হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, তবু কি তোমরা সাবধান হবে না? তবুও কি তোমরা অংশীবাদিতা পরিত্যাগ করবে না? তবুও কি ভয় করবে না আল্লাহ্কে?

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের সত্য প্রতিপালক। সত্য-ত্যাগ করবার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কী থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছো?' এ কথার অর্থ— সকল কিছুর ব্যবস্থাপক, অভিভাবক ও উপাস্য হিসেবে আল্লাহ্ই তো যথেষ্ট। তিনিই তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক। তাঁর প্রতিপালকত্ব তোমাদের নিজেদের অস্তিত্ব ও মহাবিশ্বের বিদ্যমানতা দ্বারা সুপ্রমাণিত। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, রিজিক প্রদান করে চলেছেন, তোমাদের সকল বিষয়কে করেছেন সচল ও সমৃদ্ধ— তাহলে তোমরা সেই আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হও কেনো? সুতরাং শাশ্বত এই সত্যকে তোমরা প্রত্যাখ্যান কোরো না। সত্যকে প্রত্যাখ্যান করলে বিপথগামীতা ছাড়া আর কি কিছু অবশিষ্ট থাকে? অতএব, হে মানুষ! ভেবে দেখো, কোন পথে তোমরা পদবিক্ষেপরত।

এর পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'এভাবে সত্য-ত্যাগীদের সম্পর্কে 'তারা বিশ্বাস করবে না,' তোমার প্রতিপালকের এই বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা আদি-অন্তের সকল কিছুই জানেন। এ কথাও জানেন যে, জাহান্নামে প্রবেশ করবে কারা। এটাও তাঁর চিরন্তন নির্ধারণ যে, কেউ কেউ প্রবেশ করবে জান্নাতে, কেউ কেউ জাহান্নামে। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই হবে জাহান্নামী। এ কারণেই 'তারা বিশ্বাস করবে না'— সত্যত্যাগীদের সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালার এই বাণী সত্য প্রতিপন্ন হবে। এখানে 'কালিমাতু রব্বি' অর্থ প্রতিপালকের বাণী।

'ফিসক্ব' শব্দটির অর্থ আত্মশুদ্ধির বৃত্ত থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানের বৃত্তে স্থিত হওয়া। আর 'কালিমাতি রব্বি' এর স্থলবর্তী হয়েছে এখানে আন্নাহুম লা ইউ'মিনুন (তারা বিশ্বাস করবে না)। অর্থাৎ প্রতিপালকের বাণী এই যে, তারা বিশ্বাস করবে না। অথবা কলেমার পরিসমাপ্তি এবং তাদের দোজখী হওয়ার কারণে তারা বিশ্বাস করবে না। এটাই হচ্ছে কালেমাতুর রব্বি কথাটির তাত্ত্বিক কারণ।

www.eelm.weebly.com

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ۭ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ۭ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ۭ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ○ وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ۭ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○

❐ বল, 'তোমরা যাহাদিগকে শরীক কর তাহাদিগের মধ্যে কি কেহ আছে যে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করে ও পরে উহার পুনরাবর্তন ঘটায়?' বল, 'আল্লাহ্ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ও পরে উহার পুনরাবর্তন ঘটান, সুতরাং তোমরা কেমন করিয়া সত্য বিচ্যুত হইতেছ?'

❐ বল, 'তোমরা যাহাদিগকে শরীক কর তাহাদিগের মধ্যে কি কেহ আছে যে সত্যের পথ নির্দেশ করে?' বল, 'আল্লাহ্ই সত্যের পথ নির্দেশ করেন। যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যের অধিকতর হকদার, না সে যাহাকে পথ না দেখাইলে পথ পায় না? তোমাদিগের কি হইয়াছে? তোমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত করিয়া থাক?'

❐ উহাদিগের অধিকাংশ অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না। উহারা যাহা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদী-দেরকে বলে দিন, তোমরা যাদের উপাসনা করো তাদের মধ্যে এমন কেউ কি রয়েছে যে সৃষ্টির অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম? মৃত্যুদানের পর পুনরায় জীবন দান করতে সক্ষম? হে আমার রসুল ! তাদের নিরুত্তরতার প্রেক্ষিতে আপনি পুনরায় বলুন, আল্লাহ্তায়ালাই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন এবং তিনিই পুনরুত্থান দিবসে জীবনের পুনরাবর্তন ঘটাবেন। সুতরাং হে অংশীবাদী জনতা! তোমরা কীভাবে চিরন্তন সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে অংশীবাদিতাকে গ্রহণ করেছো?

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতের (৩৫) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, হে মুশরিক জনগোষ্ঠী! নবী রসুলগণের মাধ্যমে সত্যের প্রতি পথ নির্দেশ করতে পারে, তোমাদের উপাস্যদের মধ্যে এমন কেউ কি রয়েছে? এ প্রশ্নের জবাবও তারা দিতে পারবে না, তাই আপনি বলুন, সত্যের প্রতি পথ নির্দেশ করতে পারেন কেবল আল্লাহ্। তিনি নবী রসুলগণের মাধ্যমে পথ না দেখালে কেউ পথ পায় না। পথ প্রদর্শনের ক্ষমতা অন্য কারোই নেই। সুতরাং উপাস্য হওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁর। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হজরত ঈসাকে বলে আল্লাহ্র পুত্র। কেউ কেউ বলে হজরত উযায়েরকে। আবার কেউ কেউ ফেরেশতাদেরকে বলে আল্লাহ্র কন্যা। অথচ তারা কি জানে না যে, হজরত ঈসা, হজরত উযায়ের এবং ফেরেশতাসহ সমগ্র সৃষ্টি সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণতই এক আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। অতএব হে অংশীবাদী জনমণ্ডলী! তোমাদের হলো কি? কেমন করে তোমরা সত্যের বিরুদ্ধে এবং মিথ্যার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে? কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, হেদায়েত (পথনির্দেশ) কথাটির প্রকৃত অর্থ— স্থানান্তরিত হওয়া। এখানে 'তাদের মধ্যে কি কেউ আছে যে সত্যের পথ নির্দেশ করে' কথাটির মাধ্যমে অংশীবাদীদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর অসহায়ত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, দেখো হে অংশীবাদীরা! তোমাদের উপাস্যসকল কেমন নিষ্প্রাণ। নিজে নিজে তারা স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং তোমাদেরকে তারা স্থানান্তরে (সত্যের দিকে) নিয়ে যাবে কীভাবে?

এর পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'তারা অধিকাংশ অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোনো কাজে আসে না।' এ কথার অর্থ— অংশীবাদীদের মতাদর্শ অনুমান নির্ভর। তারা স্বধারণার অনুগামী। আপন স্রষ্টা সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ও জ্ঞান কোনোটাই নেই। যদি থাকতো, তবে কখনোই তারা সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমান্তরাল ভাবতে পারতো না। তাদের অনুমান কেবলই অনুমান। প্রকৃত সত্যের সঙ্গে সে অনুমানের কোনোই সম্পর্ক নেই। এ রকম অনুমান ও কল্পনা কোনো কাজেই আসে না।

আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ধর্মীয় বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে মূর্খদের অনুসরণ বৈধ নয়। কেননা তারা অনুমান করে কথা বলে। আকলী ও নকলী (জ্ঞানগত ও বর্ণনা পরম্পরাগত) কোনো জ্ঞান তাদের নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা যা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।' এই বাক্যটির মধ্যে ওই সকল লোককে শাস্তিদানের হুমকি দেয়া হয়েছে, যারা কল্পনা ও অনুমানের অনুসারক। অর্থাৎ আল্লাহ্ ওই সকল লোককে ভালো করেই জানেন। সুতরাং যথাসময়ে যথাশাস্তি তাদের জন্য অনিবার্য।

www.eelm.weebly.com

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۗ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ۗ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ۗ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝

❏ এই কুরআন আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারও রচনা নহে, পক্ষান্তরে ইহা, ইহার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার সমর্থন এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের বিধান সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা।

❏ তাহারা কি বলে 'সে ইহা রচনা করিয়াছে?' বল, 'তবে তোমরা ইহার অনুরূপ এক সুরা আনয়ন কর এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাকে পার আহ্বান কর।'

❏ পরন্তু উহারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করে না তাহা অস্বীকার করে এবং এখনও ইহার ব্যাখ্যা উহাদিগের বোধগম্য হয় নাই। এইভাবে উহাদিগের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল, সুতরাং দেখ, সীমালংঘনকারীদিগের পরিণাম কী হইয়াছে!

❏ উহাদিগের মধ্যে কেহ ইহাতে বিশ্বাস করে এবং কেহ ইহাতে বিশ্বাস করে না এবং তোমার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদিগের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— নিঃসন্দেহে এই কোরআন আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে অবতারিত। অন্য কেউ এর রচয়িতা নয়। আর কোরআন পূর্বে অবতারিত কিতাব সমূহের প্রত্যায়ক। পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে আল্লাহ্র একত্ব, মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, নবী রসুল প্রেরণ ইত্যাদি বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে এই কোরআনে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে আরো রয়েছে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। যেমন, ফরজ, ওয়াজিব, হালাল,

www.eelm.weebly.com

হারাম ইত্যাদি। সুতরাং এই কোরআনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশই নেই।

এখানে 'আল্লাজী বাইনা ইয়াদাইহি' কথাটির উদ্দেশ্য রসুল স. এর পবিত্র সত্তা। আরেকটি অর্থ পূর্বে অবতীর্ণ কিতাব সমূহ— যা বঙ্গানুবাদে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পূর্বের আয়াতে (৩৬) আনুমানিকতার অনুসরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। আর আলোচ্য আয়াতে 'এতে কোনো সন্দেহ নেই' বলে কোরআনের অনুসরণকে করা হলো অত্যাবশ্যক।

দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা কি বলে, সে এটা রচনা করেছে? বলো, তবে তোমরা এর অনুরূপ এক সুরা আনয়ন করো এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাকে পারো আহ্বান করো।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! অংশীবাদীরা কি বলতে চায় আপনি এই কোরআন রচনা করেছেন? আপনি বলুন, আমি যদি এর রচয়িতা হই, তবে তোমরাও তো এ রকম রচনা করতে পারবে। তোমাদের মধ্যে রয়েছে অনেক পণ্ডিত, কথাশিল্পী ও কবি। তোমরা তবে এই কোরআনের অনুরূপ অন্ততঃ একটি সুরা রচনা করে দেখাও। ব্যক্তিগতভাবে না পারো সমষ্টিগতভাবে এ রকম করে দেখাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু তোমরা এ রকম করতে পারবে না। কারণ—

তৃতীয়োক্ত আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'পরন্ত তারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করে না তা অস্বীকার করে এবং এখনো এর ব্যাখ্যা তাদের বোধগম্য হয়নি।' এ কথার অর্থ অংশীবাদীরা অবুঝ। কোনো প্রকার শুভবোধ ও বুদ্ধি তাদের নেই। কোরআনের মর্ম তাদের বোধগম্যই হয়নি। তারা কেবল শোনে কিন্তু এর মর্ম বুঝে না। এ কথাও বুঝতে পারে না যে, এই কোরআন মানব রচিত গ্রন্থ হওয়া সম্ভবই নয়। এতে রয়েছে বহু অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ, আদি ও অন্তের দিক নির্দেশনা। আরো রয়েছে পুণ্য ও পাপের, স্বস্তি ও শাস্তির সংবাদ। অংশীবাদীদের উচিত ছিলো কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবের কোনো বিশেষজ্ঞের শরনাপন্ন হওয়া, যাদের চোখে ধরা পড়বে কোরআনের সত্যতার বিষয়টি। যদি তারা এ রকম করতো, তবে কোরআনের পবিত্র শিক্ষা ও অলৌকিকত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারতো।

এখানে 'লাম্মা ইয়া'তিহিম' কথাটির অর্থ 'এখনো এর তত্ত্ব তাদের বোধগম্য হয়নি'। 'লাম্মা' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'তাওয়াক্কায়' (সুস্থিরতা) অর্থে— যা নির্দেশ করেছে কোরআনের বোধগম্যতাকে। তাই বার বার তাদেরকে কোরআনের মর্ম উপলব্ধি করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। কিন্তু তারা এদিকে কর্ণপাত না করে তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। অথচ কোরআনের বাণী যে সত্য তা বিভিন্ন ভাবে একের পর এক তাদের সামনে প্রমাণিত হচ্ছে। যেমন কোরআনের এক আয়াতে দেয়া হয়েছিলো রোমানদের বিজয়ের সংবাদ। পরে সে সংবাদ যথাযথরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। আবু লাহাবের ধ্বংসের সংবাদ পূর্বাহ্নে প্রদান করা হয়েছিলো। বলা হয়েছিলো— তাব্বাত্

www.eelm.weebly.com

ইয়াদা আবী লাহাবিও ওয়াতাব্ব। সে সংবাদও কার্যকর হয়েছে। এ সকল ঘটনা দেখে অবশ্য কেউ কেউ ইমান গ্রহণ করেছে। কিন্তু অধিকাংশই এখনও আঁকড়ে ধরে রেখেছে সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা আরোপ করেছিলো। সুতরাং দ্যাখো, সীমালংঘনকারীদের পরিণাম কী হয়েছে!' এ কথার অর্থ— হে অংশীবাদী সম্প্রদায়! স্মরণ করো, বিগত যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীরাও তাদের নবী রসুলের মাধ্যমে অবতীর্ণ কিতাবকে তোমাদের মতোই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। এভাবে তারা হয়েছিলো আল্লাহ্র গজবের শিকার। এখনো সময় আছে। আগমন করো কোরআনের আশ্রয়ে। স্বীকার করো চিরন্তন সত্যকে। নতুবা তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতো আল্লাহ্র গজবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

চতুর্থোক্ত আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'তাদের মধ্যে কেউ এতে বিশ্বাস করে এবং কেউ এতে বিশ্বাস করে না এবং তোমার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল ! শুনুন, আপনি যাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনাকে বিশ্বাস করবে এবং কেউ কেউ করবে না। তারা তো তাই করবে যা লেখা রয়েছে তাদের ললাটলিপিতে। আর আল্লাহ্ ওই সকল বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। সুতরাং যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের কোনো উপায়ই তাদের নেই।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ
وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ○ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ
الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ○ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تَهْدِى
الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ○

❐ এবং তাহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তুমি বলিও, 'আমার কর্মের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদিগের কর্মের দায়িত্ব তোমাদিগের। আমি যাহা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়ী নহ এবং তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আমিও দায়ী নহি।'

❐ উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে। তুমি কি বধিরকে শুনাইবে, তাহারা না বুঝিলেও?

www.eelm.weebly.com

❑ উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে। তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাইবে, তাহারা না দেখিলেও?

প্রথমে উল্লেখিত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি দিনের পর দিন অংশীবাদী সম্প্রদায়কে বিভিন্নভাবে সত্যের স্বরূপ বুঝানোর চেষ্টা করে চলেছেন। এতোকিছু করেও যদি তাদের বোধোদয় না ঘটে, আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্য যদি তারা থেকে যায় অনড় অবস্থানে, তবে আপনি তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করুন। বলুন, আমার কর্মের জন্য আমি দায়ী এবং তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী তোমরা। আমরা প্রত্যেকেই আপনাপন কর্মের প্রতিফল অবশ্যই লাভ করবো। সুতরাং অনাবশ্যক বিতণ্ডা পরিহার করো। আমার কাজের জন্য যেমন তোমাদেরকে অভিযুক্ত করা হবে না, তেমনি আমিও অভিযুক্ত হবো না তোমাদের কাজের জন্য। মনে রেখো আমি তোমাদেরকে যা কিছু বলেছি, তা তোমাদের কল্যাণের জন্যই বলেছি।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি তার স্বজাতিকে বললো, পর্বতমালার ওধারে আমি দেখে এসেছি তোমাদের একদল শত্রুকে। শেষ রাতে তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করবে। সুতরাং তোমরা অতি দ্রুত এ স্থান পরিত্যাগ করো। একদল লোক লোকটির কথা শুনলো। তারা রাত্রির প্রথম প্রহরেই চলে গেলো নিরাপদ স্থানে। অন্যেরা লোকটির কথা বিশ্বাস না করে স্বস্থানেই রয়ে গেলো। শেষ রাতে শত্রুরা তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধ্বংস করে দিলো তাদেরকে। আমার অবস্থা ওই সতর্ককারী ব্যক্তিটির মতো। এখন আমার কথা যে মানবে সে পরিত্রাণ পাবে। আর যে মানবে না তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য। হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, জেহাদ সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন' আয়াতটির মতো আলোচ্য আয়াতটিও রহিত হয়েছে।

এরপরে উল্লেখিত আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে কান পেতে রাখে। তুমি কি বধিরকে শোনাবে, তারা না বুঝলেও? এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার কোরআন পাঠ শোনে। কিন্তু সে শোনার সঙ্গে তাদের মনের কোনো যোগ নেই। তাই তারা কোরআনের হকিকত ও হেকমতকে উপলব্ধি করতে পারে না। সুতরাং তারা শুনলেও প্রকৃত শ্রোতার অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা বধির। সুতরাং হে রসুল! যে বধির তাকে আপনি শোনাবেন কীভাবে, যদি তারা তাদের বধিরতা সম্পর্কে সচেতন না হয়?

www.eelm.weebly.com

শেষে উল্লেখিত আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে, তারা না দেখলেও? এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করে। কিন্তু সে দৃষ্টিপাতের সঙ্গে তাদের হৃদয়ের কোনো সংযোগ নেই। তাই তাদের সত্যদর্শন ঘটে না। চোখ থাকলেও তারা চক্ষুষ্মানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা অন্ধ। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে পথ দেখাবেন কীভাবে, যদি তারা তাদের অন্ধত্ব সম্পর্কে সজাগ না হয়?

ইতোপূর্বে (আয়াত ৪১) বলা হয়েছে, 'আমার কর্মের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদের কর্মের দায়িত্ব তোমাদের' এ কথা বলে রসুল স.কে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলা হয়েছিলো। আর পরের আয়াত দু'টোতে (৪২,৪৩) তাঁকে দেয়া হয়েছে সান্ত্বনা। মূল কথাটি জানিয়ে দেয়া হয়েছে এভাবে— আল্লাহ্তায়ালাই জঘন্য মানসিকতাসম্পন্ন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে কান থাকতেও বধির এবং চোখ থাকতেও অন্ধ করেছেন। আল্লাহ্তায়ালা নিজেই চান না যে, তারা সত্য পথের পথিক হোক। সুতরাং হে রসুল! আপনি তো তাদের বধিরতা ও দৃষ্টিহীনতা ঘোচাতে পারবেন না। তা হলে আপনি তাদের জন্য ভেবে ভেবে দুঃখ পাবেন কেনো?

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৪৪, ৪৫

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ○

❑ আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন জুলুম করেন না, বস্তুতঃ মানুষ নিজদিগের প্রতিই জুলুম করিয়া থাকে।

❑ এবং যে দিন তিনি উহাদিগকে একত্রিত করিবেন সেদিন উহাদিগের মনে হইবে যে, উহাদিগের অবস্থিতি দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র ছিল; উহারা পরস্পরকে চিনিবে। আল্লাহের সাক্ষাৎ যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং তাহারা সৎপথ প্রাপ্ত ছিল না।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্পাক সকল দোষত্রুটি থেকে পবিত্র। জুলুম বা অত্যাচার একটি দোষ। সুতরাং জুলুম করা থেকেও তিনি পবিত্র। আল্লাহ্পাক কখোনই কারো প্রতি জুলুম করেন না। বরং মানুষই প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের পথ থেকে সরে যায়। এভাবে তারা নিজেরা নিজেদের উপরে অত্যাচার করে।

www.eelm.weebly.com

রসুল স.বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে হেদায়েত (ধর্মজ্ঞান) সহকারে প্রেরণ করেছেন। এই হেদায়েত গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে তারতম্য ঘটে যায়। দৃষ্টান্তটি এ রকম— বৃষ্টিপাতের পর উত্তম মৃত্তিকায় উৎপন্ন হয় তরুলতা, ফল ও ফসল। পাথরের মতো শক্ত মৃত্তিকায় সে রকম কিছু হয় না। কিন্তু সেখানে পানি জমা হলে অন্যেরা সে পানি থেকে উপকৃত হয়। সেই পানি কেউ পান করে, কেউ বা সেখান থেকে অন্য জমিতে পানি সিঞ্চন করে। কিন্তু ওই শক্ত মাটি ওই পানির মাধ্যমে নিজে উপকৃত হতে পারে না। আমার জ্ঞান বিতরণের কর্মটিও বৃষ্টিপাতের মতো। কারো কারো অন্তর এর দ্বারা সিক্ত হয়। তারা লাভ করে ইমান ও হেদায়েতের ফল ও ফসল। নিজেরা যেমন উপকৃত হয়, তেমনি উপকার প্রদান করতে পারে অন্যকে। আর কেউ কেউ এর দ্বারা কোনোই উপকার লাভ করতে পারে না। কঠিন মাটির মতো থেকে যায় চির বঞ্চিত। হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্তায়ালা মানুষের বোধ বুদ্ধি ছিনিয়ে নিবেন, এর পরেও তাদেরকে সত্যপথে চলার নির্দেশ দান করবেন— এ রকম জুলুম আল্লাহ্ করেন না। এই আয়াতের মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ জ্ঞানকে আল্লাহ্তায়ালা অপসারিত করেন না। মানুষ নিজেই জিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে শুভবোধ ও বুদ্ধিকে নষ্ট করে ফেলে। বিশ্বাস ছেড়ে গ্রহণ করে সত্য-প্রত্যাখ্যানকে। সুতরাং জুলুম মানুষই করে। আল্লাহ্ করেন না। এই আয়াতের বক্তব্য পথভ্রষ্ট জাবরিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাসবিরুদ্ধ। তারা বলে, মানুষ জড়পদার্থতুল্য। বোধ ও বুদ্ধি বলে তার কিছু নেই। কিন্তু এখানে প্রমাণিত হলো যে তাদের ধারণাটি ভ্রান্ত।

এ রকমও হতে পারে যে, আখেরাতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে সেই শাস্তি জুলুম হবে না, হবে সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগ— এ কথাই আলোচ্য আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে। কারণ আখেরাতের আযাব হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিজস্ব অর্জন। পৃথিবীতে সত্য ত্যাগ ও পাপাচরণের কারণেই তারা সেখানে শাস্তির উপযুক্ত হবে। সুতরাং আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোনো জুলুম করেন না, মানুষ নিজেই নিজের প্রতি জুলুম করে থাকে। পরের উদ্ধৃত আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'এবং যে দিন তিনি তাদেরকে একত্র করবেন সেদিন তাদের মনে হবে যে, তাদের অবস্থিতি দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র ছিলো; তারা পরস্পরকে চিনবে। আল্লাহ্র সাক্ষাৎ যারা অস্বীকার করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিলো না।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা পুনরুত্থান দিবসে সকল মানুষকে একত্র করবেন। তখন তাদের মনে হবে পৃথিবীতে, কবরে এবং কিয়ামতে তারা ছিলো মুহূর্তকাল মাত্র। সেখানে

www.eelm.weebly.com

সবাই সবাইকে চিনতে পারবে। মনে হবে মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো। আর তারা একে অপরকে চিনবে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার কারণে কেউ কারো সঙ্গে কথা বলবে না। তারা সেদিন এ কথা ভালো করেই বুঝবে যে, যারা এই পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করেছে তারা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ তারা সৎপথ পায়নি।

বাগবী লিখেছেন, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ ঘটবে কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়। বিচারের ময়দানে সমবেত হলে তারা একে অপরকে চিনতে পারবে। কিন্তু ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকবে বলে কেউ কারো সঙ্গে কথা বলবে না। ওই সময়ে আল্লাহ্‌তায়ালার এক ফেরেশতা ঘোষণা করবে— যারা আজ এই বিচারের দিনে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের জন্য সমবেত হওয়াকে অস্বীকার করেছিলো তারা ক্ষতিগ্রস্ত, তারা সৎপথ প্রাপ্ত ছিলো না। অথবা এ কথা তারা আক্ষেপের সঙ্গে নিজেরাই নিজেদেরকে বলবে।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৪৬, ৪৭, ৪৮

وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ۝ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

❒ আমি ইহাদিগকে যে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি তাহার কিছু যদি তোমাকে দেখাইয়াই দিই অথবা তোমার কাল পূর্ণ করিয়াই দিই, উহাদিগের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট; এবং উহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহার সাক্ষী।

❒ প্রত্যেক জাতির জন্যে আছে এক জন রসূল এবং যখন উহাদিগের রসূল আসিয়াছে তখন ন্যায়বিচারের সহিত উহাদিগের মীমাংসা হইয়াছে এবং উহাদিগের প্রতি জুলুম করা হয় নাই।

❒ এবং উহারা বলে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বলো, 'এই ভীতি প্রদর্শন কবে ফলিবে?"

প্রথমে বর্ণিত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের সকল কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক সতত সচেতন। আমার নিকটে তো তাদেরকে ফিরে আসতেই হবে। এখন পৃথিবীতে আপনার চোখের সামনে তাদেরকে আমি শাস্তি দিতেও পারি, অথবা দিতে পারি সাময়িক অবকাশ। তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক নিজেই সাক্ষী।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌তায়ালা কাফেরদেরকে দুনিয়ায় শাস্তি দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। কিন্তু আখেরাতে তাদের জন্য শাস্তি ভোগ অনিবার্য। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা তোমার কাল পূর্ণ করে দেই।' (আপনার সময়ে তাদেরকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেই)।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'ছুম্মা' শব্দটির অর্থ 'অতঃপর' হলেও এখানে শব্দটির অর্থ হবে 'এবং'। এভাবে 'প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকটে' ও 'তারা যা করে আল্লাহ্ তার সাক্ষী'— দু'টো বাক্যকেই সমগুরুত্বসম্পন্ন করা হয়েছে। কোনো একটিকে অপরটি অপেক্ষা অগ্রবর্তী অথবা পশ্চাৎবর্তী করা হয়নি।

মুজাহিদ বলেছেন, 'আমি তাদেরকে যে ভীতি প্রদর্শন করেছি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই'— এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে রসুল স.কে অংশীবাদীদের উপরে আযাব কীভাবে হয়, তা দেখিয়ে দেয়া হয়েছিলো বদর যুদ্ধের সময়। অন্যান্যদেরকে আযাব দেয়া হবে আখেরাতে।

পরে বর্ণিত আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক জাতির জন্যে আছে এক জন রসুল এবং যখন তাদের রসুল এসেছে তখন ন্যায়বিচারের সঙ্গে তাদের মীমাংসা হয়েছে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হয়নি।' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! শোনো, তোমাদের নিকটে যেমন রসুল প্রেরণ করা হয়েছে, তেমনি রসুল প্রেরণ করা হয়েছিলো বিগত সময়ের জাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে। সেই সকল রসুল তাঁদের স্ব স্ব জাতি গোষ্ঠীকে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করেছিলেন। কেউ তাঁদেরকে মেনেছে, কেউ তাঁদেরকে মানেনি। যারা মানেনি তাদের বিষয়টি ফয়সালা করা হয়েছিলো ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গেই। অবাধ্যরা শাস্তির উপযুক্ত— ন্যায়বিচার এ কথাই বলে। তাই তাদেরকে আমি উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছি। রক্ষা করেছি ওই সকল রসুল ও তাদের বিশ্বাসী অনুচরবর্গকে।

মুজাহিদ ও মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— পূর্ববর্তী রসুলগণ তাঁদের আপনাপন জন গোষ্ঠীকে পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কেউ কেউ তাদেরকে মান্য করেছে। কেউ করেনি। কিয়ামতের দিন ওই সকল রসুল এই মর্মে সাক্ষী প্রদান করবেন যে, তাঁদের উম্মতদের মধ্যে কে কে বিশ্বাসী এবং কে কে বিশ্বাসী নয়। এরপর আল্লাহ্‌তায়ালা বিষয়টিকে চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন। বিশ্বাসীদেরকে দিবেন নাজাত এবং অবিশ্বাসীদেরকে দিবেন শাস্তি। এ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া জিআ বিন্নবিয়্যিনা ওয়াস্ শুহাদায়ি ওয়া কুদ্বিয়া বাইনাহুম (আর নবী ও সাক্ষ্যদাতাগণ কর্তৃক আনীত হবে এবং মীমাংসা করা হবে তাদের মধ্যে)। আরেক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফা কাইফা ইজাজি'না মিন কুল্লি উম্মাতিন বিশাহিদিঁও ওয়া জি'না বিকা আ'লা হা উলায়ি শাহীদা' (তখন কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একজন সাক্ষ্যদাতাকে নিয়ে আসবো এবং আপনাকে নিয়ে আসবো সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য-দাতারূপে)।

www.eelm.weebly.com

শেষে বর্ণিত আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'এবং তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বলো, এই ভীতি প্রদর্শন কবে ফলবে?' এ কথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা বলে, হে মোহাম্মদ! তুমি ও তোমার সঙ্গীরা প্রায়শঃই বলে থাকো তোমাকে এবং তোমার আল্লাহ্কে না মানলে আমাদের উপরে আযাব নেমে আসবে। তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো, কখন আযাব আসবে?

মুশরিকদের এই প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে, পরবর্তী আয়াত সমূহে এভাবে—

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ اِذَا
جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ
اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝ اَثُمَّ اِذَا
مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ آٰلْئٰنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝ ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝ وَ
يَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ قُلْ اِىْ وَرَبِّىْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

❒ বল, 'আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভালোমন্দের উপর আমার কোন অধিকার নাই। প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে; যখন তাহাদিগের সময় আসিবে তখন তাহারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করিতে পারিবে না।'

❒ বল, 'তোমরা আমাকে বল, যদি তাঁহার শাস্তি তোমাদিগের উপর রজনীতে অথবা দিবসে আসিয়া পড়ে তবে অপরাধীরা উহার কী ত্বরান্বিত করিতে চাহে?'

❒ তোমরা কি ইহা ঘটিবার পর ইহা বিশ্বাস করিবে? এখন? তোমরা তো ইহাই ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছিলে!

❒ পরে সীমালংঘনকারীদিগকে বলা হইবে, 'স্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো; তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেয়া হইতেছে।'

www.eelm.weebly.com

❑ এবং উহারা তোমার নিকট জানিতে চাহে 'ইহা কি সত্য?' বল, 'হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ, ইহা অবশ্যই সত্য। এবং তোমরা ইহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, আমি আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের পরিপূর্ণ অনুসারী। আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া নিজের ভালো মন্দের উপরেও আমার কোনো অধিকার নেই। আমি যেমন জোর জবরদস্তি করে কাউকে কল্যাণের অধিকারী করতে পারি না, তেমনি কাউকে স্বেচ্ছায় শাস্তিও দিতে পারি না। প্রত্যেক অবাধ্য সম্প্রদায়ের শাস্তির জন্য আল্লাহ্পাক কর্তৃক নির্ধারিত সময় রয়েছে। ওই নির্দিষ্ট সময় যখন সমাগত হবে তখনই আপতিত হবে শাস্তি। তখন এক মুহূর্তও অগ্র-পশ্চাৎ ঘটবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ইল্লা মাশাআ'ল্লাহ্' (আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন) কথাটির অর্থ হবে আল্লাহ্র ইচ্ছানুসারেই সকল কিছু ঘটবে। কল্যাণ অথবা অকল্যাণের নির্ধারক আমি নই।

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা আমাকে বলো, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের উপর রজনীতে অথবা দিবসে এসে পড়ে তবে অপরাধীরা তার কী ত্বরান্বিত করতে চায়?' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, হে অবোধ জনতা! আল্লাহ্র আযাব কি কোনো আস্বাদ্য কোনো কিছু? দিনে যখন তোমরা কর্মমুখর থাকো তখন যে কোনো মুহূর্তে অথবা রাতে যখন তোমরা নিদ্রামগ্ন থাকো, তখন যে কোনো সময়ে আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তো আযাব অবতীর্ণ করতেই পারেন। তবে তোমাদের এই ত্বরাপ্রবণতার হেতু কি?

এখানে 'মাজা' শব্দটির মাধ্যমে আয়াতের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে বিস্ময়বোধক প্রশ্নের আকারে। এভাবে এ কথাই বলা উদ্দেশ্য যে, আক্ষেপ! বড়ই আক্ষেপ!! তোমরা এতোই বিকৃতবোধ বুদ্ধি সম্পন্ন যে, নিজের ধ্বংসকে নিজেরাই দ্রুত ডেকে আনতে চাও!

'ইন আতাকুম' (যদি তোমাদের নিকট আসে) কথাটির প্রতিদান এখানে রয়েছে উহ্য। ওই উহ্য কথাটি হচ্ছে— দিন অথবা রাতের যে কোনো মুহূর্তে আযাব এসে পড়লে অবশ্যই পাপিষ্ঠ অবস্থায় তোমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

বাগবী লিখেছেন, মক্কার মুশরিকেরা আল্লাহ্র নিকট দ্রুত আযাব কামনা করতো। একবার একজন বললো, হে আল্লাহ্! মোহাম্মদ যা উচ্চারণ করে, তা যদি তোমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে তুমি আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করো। অথবা অন্য কোনো আযাব আপতিত করো। তার এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করেছেন এই আয়াত।

আমি বলি, এখানে 'মাজা তাসতা'জিলু' কথাটির উদ্দেশ্য হবে এ রকম— যদি আল্লাহ্পাকের আযাব তোমাদের প্রতি এসেই পড়ে তবে তোমাদের কী উপায় হবে? নিশ্চিহ্ন হওয়া ছাড়া তোমাদের কোনো উপায় তো আর থাকবে না। তবু তোমরা আযাব প্রার্থনা করছো কেনো? বলো কেনো?

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'তোমরা কি এটা ঘটবার পর এটাকে বিশ্বাস করবে? এখন? তোমরা তো এটাই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে! এ কথার অর্থ— হে উগ্রপন্থী অংশীবাদীরা! তোমাদের প্রার্থনানুসারে আযাব যদি এসেই যায়, তবে ওই আযাবকে অথবা আযাবের সংবাদ প্রদানকারীকে কি তোমরা বিশ্বাস করবে? অথবা আযাব এসে পড়ার পরেও কি তোমরা আযাব ত্বরান্বিত করার জন্য জেদ্ ধরবে? আর মেনে নিবে আযাবের সত্যতাকে ও আযাবের সংবাদ প্রদাতাকে? কিন্তু তখন তোমাদের মান্যতা কোনো কাজে আসবে না।

'আল আ-না' অর্থ এখন? অর্থাৎ এখন তোমাদের এই মৃত্যু যন্ত্রণার সময় অথবা কবরে কিংবা কিয়ামতে আযাব দর্শনের পর তোমরা কি ইমান আনবে? কিন্তু এখন ইমানের প্রয়োজন তো আর নেই।

এর পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'পরে সীমালংঘনকারীদেরকে বলা হবে, স্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো; তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।' শেষে উল্লেখিত আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'এবং তারা তোমার নিকট জানতে চায়, এটা কি সত্য? বলো, হ্যাঁ। আমার প্রতিপালকের শপথ, এটা অবশ্যই সত্য এবং তোমরা এটা ব্যর্থ করতে পারবে না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! মুশরিকেরা আপনার নিকট জানতে চায়, তৌহিদ, নবুয়ত, কোরআন, কিয়ামত, আযাব, সওয়াব ইত্যাদি কি সত্য? আপনি বলুন, অবশ্যই। আমার প্রতিপালকের শপথ, আমি যা কিছু তোমাদেরকে জানিয়েছি তার সবকিছুই সত্য। তোমরা এগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারবে না। ব্যর্থও করতে পারবে না।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৫৪, ৫৫, ৫৬

وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○ اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

☐ প্রত্যেক সীমালংঘনকারীই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাহার হইলে সে উহা মুক্তির বিনিময়ে দিত এবং শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে মনের অনুতাপ মনেই রাখিত। উহাদিগের মীমাংসা ন্যায় বিচারের সহিত করা হইবে এবং উহাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

www.eelm.weebly.com

❐ সাবধান! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহেরই। সাবধান! আল্লাহের ভবিষ্যৎবাণী সত্য, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই অবগত নহে।

❐ তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ওয়ালাও আন্না লিকুল্লি নাফ্সিন্ জালামাত মা ফিল আরদ্বি লাফ্তাদাত্ বিহি (প্রত্যেক সীমালংঘনকারীই পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তার হলে সে তার মুক্তির বিনিময়ে দিতো)। এ কথার অর্থ— কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা দেখে অংশীবাদীরা চিন্তা করবে, পৃথিবীর সকল সম্পদ যদি তাদের থাকতো তবে তার সবকিছুই দিয়ে দিতো মুক্তিপণ হিসেবে। এখানে 'মাফিল আরদ্বি' অর্থ পৃথিবীতে যা কিছু আছে। 'জুলুম' শব্দটির অর্থ এখানে শিরিক।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া আসার্রুন্ নাদামাতা লাম্মা রাআউল আ'জাব' অর্থ— এবং শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে মনের অনুতাপ মনেই রাখতো। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, এখানে 'আসার্রুন নাদামাতা' এর অর্থ— ওই ভয়াবহ দিবসে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ইচ্ছা করলেও মনের অনুতাপকে গোপন রাখতে পারবে না। কারণ কিয়ামতের দিন কাল্পনিক ধৈর্য ধারণ করা অসম্ভব। সেদিন কষ্ট এতো কঠিন হবে যে মিথ্যা ধৈর্য ধারণ করা সম্ভবই হবে না।

কিন্তু কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'আসারু' অর্থ গোপন অনুতাপ। অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের অনুসারীদের নিকটে নিজের মনের আক্ষেপকে গোপন করবে। অন্যান্য আলেম বলেছেন, এখানে আসার্রু শব্দটির মাধ্যমে গোপন অনুশোচনাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ অসহনীয় কষ্টের কারণে তারা হয়ে যাবে বাকরুদ্ধ। অন্তরে জ্বলবে আক্ষেপের আগুন। সে আগুনে দগ্ধীভূত হতে থাকলেও সে কথা তারা মুখে প্রকাশ করতে পারবে না। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, গোপনতাকেই বলা হয় সির। কথাটি 'রাজ' বা 'রহস্য' কথাটির সমার্থক। অর্থাৎ তখন আক্ষেপের ব্যাপারটি থাকবে সংগুপ্ত ও সংরক্ষিত। এভাবে ইসরার (আসার্রু) কথাটির অর্থ হবে বিশুদ্ধ অনুতাপ, অনুশোচনা বা আক্ষেপ।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়া কুদ্বিয়া বাইনাহুম বিল কিস্ত্বি ওয়াহুম লা ইউজলামুন (তাদের মীমাংসা ন্যায় বিচারের সঙ্গে করা হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না)। এ কথার অর্থ— সেদিন সম্পূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান করা হবে। অর্থাৎ অপরাধ করেনি অথচ শাস্তি পাবে এ রকম সেখানে কিছুতেই হবে না। এখানে 'কুদ্বিয়া' বলে বুঝানো হয়েছে অংশীবাদীদের শিরিক বা অংশীবাদিতার শাস্তিকে।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'সাবধান! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। সাবধান! আল্লাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণী সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অবগত নয়।' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! উত্তমরূপে অবগত হও যে, আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর সকল কিছুই আল্লাহ্‌র। তাই তিনিই কেবল সওয়াব ও আযাব দেয়ার একচ্ছত্র অধিকারী। আকাশ ও পৃথিবীর কোনো কিছুই তাঁর অধিকার বহির্ভূত নয়। সুতরাং সাবধান! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি বিশ্বাসীদেরকে পুণ্য এবং অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দানের যে অংগীকার করেছেন, সে অংগীকার বাস্তবায়িত হবেই হবে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই চিরন্তন সত্যটি অনুধাবন করতে সচেষ্ট হয় না। পার্থিবতা ও প্রাত্যহিকতাকেই করে তোলে মূল উদ্দেশ্য।

এর পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌ই পৃথিবীতে জীবন দান করেন এবং পৃথিবীতেই সেই জীবনের মৃত্যু ঘটান। আখেরাতে পুনরায় জীবন দান করবেন কিন্তু সেখানে আর কখনোই মৃত্যু ঘটাবেন না। এটা হচ্ছে তাঁর অপার ক্ষমতার একটি অতুলনীয় নিদর্শন। আর হে মানুষ! তোমাদের সকলকে আপনাপন সমাধি থেকে পুনরুত্থিত হয়ে তাঁর সকাশে উপস্থিত হতেই হবে।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৫৭, ৫৮

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ○ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ○

❒ হে মানুষ! তোমাদিগের প্রতি তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে উপদেশ ও তোমাদিগের অন্তরে যে ব্যাধি আছে তাহার প্রতিকার এবং বিশ্বাসীদিগের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়া।

❒ বল,'ইহা আল্লাহের অনুগ্রহ ও তাঁহার দয়ায়, সুতরাং ইহাতে উহারা আনন্দিত হউক।' ইহা উহারা যাহা পুঞ্জীভূত করে তাহা অপেক্ষা শ্রেয়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে উপদেশ।' এ কথার অর্থ— হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুপ্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে মহান উপদেশ। অর্থাৎ তোমাদের রসুলের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে কোরআন মজীদ। এই কোরআন তোমাদেরকে সতর্ক করে। আহ্বান জানায় কল্যাণের দিকে এবং বিরত থাকতে

www.eelm.weebly.com

বলে অন্যায় থেকে। সুতরাং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে পুণ্য-কর্মসমূহ সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন, তা অতি উত্তম এবং তার পরিণতিও অত্যুত্তম। আর যা করতে নিষেধ করেছেন, তা অতি মন্দ এবং তার পরিণতিও অতি মন্দ। জেনে রাখো, উত্তম কর্মের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আর মন্দ কর্মের জন্য রয়েছে যথোপযুক্ত শাস্তি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের অন্তরে যে ব্যাধি আছে তার প্রতিকার।' এ কথার অর্থ— এই কোরআনে আরো রয়েছে, তোমাদের অন্তরের সকল অপবিশ্বাসের চিকিৎসা, ব্যবস্থাপত্র ও নিরাময়। এখানে 'অন্তরের ব্যাধি' অর্থ ভ্রান্ত বিশ্বাস, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রতি আকর্ষণ, সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতা, কপটচারিতা ইত্যাদি। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল স. এর মহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার বক্ষদেশ অসুন্দর ধারণাজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত। রসুল স. বললেন, কোরআন পড়ো। কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ্পাক বলেছেন— ওয়া শিফাউল্ লিমা ফিস্সুদুর (এবং তোমাদের অন্তরে যে ব্যাধি আছে এর প্রতিকার)। ইমাম বায়হাকীর শো'বুল ইমানে হাদিসটির উল্লেখ রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথ-নির্দেশ।' এ কথার অর্থ— এই কোরআনে আরো রয়েছে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের বিবরণ। রয়েছে দিক-নির্দেশনা জান্নাতের, আল্লাহ্পাকের নৈকট্যভাজনতার। রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থানের পর কোরআন পাঠকারীকে বলা হবে— পড়ো ও উন্নততর হও। পৃথিবীতে যেভাবে যত্নসহকারে পাঠ করতে, এখানেও তেমনি সযত্ন পাঠক হও। যতক্ষণ তুমি পড়বে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবহমান থাকবে তোমার মর্যাদার ক্রমোন্নতি। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ ও নাসাঈ।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং দয়া।' এ কথার অর্থ— বিশ্বাসীদের জন্য এই কোরআনে যেমন পথ-নির্দেশ রয়েছে, তেমনি রয়েছে দয়া বা রহমত। এই দয়ার সূত্রে বিশ্বাসীগণ কোরআনের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করে। আর এই কোরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দান করে চিরন্তন আশ্রয় লাভ করে আল্লাহ্তায়ালার রহমতের সীমানায়।

পরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— 'বলো, এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায়, সুতরাং এতে তারা আনন্দিত হোক। এটা তারা যা পুঞ্জীভূত করে তা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।' *এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে* বলুন, আমি এই কল্যাণ লাভ করেছি কেবল আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ার কারণে। আল্লাহ্পাকই আমাকে দয়া করে দান করেছেন এই উপদেশ, নিরাময়, পথ-নির্দেশ

www.eelm.weebly.com

ও দয়া। এটা আমার নিজস্ব সাধনাভূত কিছু নয়। সুতরাং এই কোরআন যারা পেয়েছে তারা এখন আনন্দ প্রকাশ করুক। কারণ, পৃথিবীতে এতো মহৎপ্রাপ্তি আর নেই। পৃথিবীর কোনো প্রাপ্তিই এতো আনন্দের নয়। হতে পারে না।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ফজল (অনুগ্রহ) এবং রহমত (দয়া) অর্থ কোরআন মজীদের অবতরণ। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, এখানে ফজল অর্থ ইমান এবং রহমত অর্থ আল কোরআন। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, ফজল অর্থ ইমান এবং রহমত অর্থ কোরআনুল করীম।

হজরত আনাস থেকে আবু শায়েখ প্রমুখ লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, এ কথা ভেবে তোমাদের আনন্দ প্রকাশ করা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্পাক আমাদেরকে ফজলস্বরূপ দান করেছেন কোরআন এবং রহমত স্বরূপ করেছেন, কোরআনধারী। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আল্লাহ্পাকের ফজল হচ্ছে ইসলাম এবং রহমত হচ্ছে ইসলামের প্রতি হৃদয়ের অনুরাগ।

হজরত খালেদ বিন মা'দান বলেছেন, আল্লাহ্পাকের ফজল হচ্ছে ইসলাম এবং আল্লাহ্পাকের রহমত হচ্ছে রসুল স. এর সুন্নত। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, ইমান হচ্ছে ফজল এবং জান্নাত হচ্ছে রহমত।

শেষে বলা হয়েছে— 'এটা তারা যা পুঞ্জীভূত করে তা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাকের ফজল ও রহমত পৃথিবীর সকল কিছু অপেক্ষা উত্তম।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৫৯, ৬০

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ○ وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

❐ বল, 'তোমরা আমাকে বল— আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছেন তোমরা যে তাহার কিছু বৈধ ও কিছু অবৈধ করিয়াছ আল্লাহ্ কি তোমাদিগকে ইহার অনুমতি দিয়াছেন, না তোমরা আল্লাহের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিতেছ?

❐ যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে কিয়ামত-দিবস সম্বন্ধে তাহাদিগের কী ধারণা? নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা আমাকে বলো— আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন, তোমরা যে তার কিছু বৈধ ও কিছু অবৈধ করেছো।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে বলুন, হে বিভ্রান্ত জনতা! আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ বা রিজিক দিয়েছেন, সেই রিজিকের কিছু অংশ তোমরা নিজস্ব বিবেচনায় হালাল এবং কিছু অংশ হারাম করে নিয়েছো কেনো? যিনি রিজিকদাতা তিনি কি তোমাদেরকে এ রকম করতে বলেছেন?

'আনজালা' শব্দটির অর্থ— অবতীর্ণ করেছেন। কিন্তু এখানে শব্দটির অর্থ হবে দিয়েছেন বা সৃষ্টি করেছেন। রিজিক সৃষ্টি করাকে অবতীর্ণ করা বলা যায় এ কারণে যে, ঊর্ধ্বদেশ থেকে পতিত বৃষ্টির মাধ্যমে মাটিতে উৎপন্ন হয় রিজিক। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, মহাবিশ্বের সকল কিছু সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্পাক সেগুলোর নাম ও বিধান লিখে রেখেছেন লওহে মাহ্ফুজে। সেখানকার বিধানানুসারে সৃষ্টিকূলের রিজিকের বন্দোবস্ত করা হয়। এই অর্থে রিজিক অবতীর্ণ হয় লওহে মাহ্ফুজ থেকে। কিন্তু তা উৎপন্ন হয় চাষাবাদ ও পশুপালনের মাধ্যমে। এখানে 'লাকুম' (তোমাদের জন্য) শব্দটি প্রয়োগ করার ফলে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্পাক কর্তৃক বৈধ ঘোষিত জীবনোপকরণের কিছু অংশকে হালাল এবং কিছু অংশকে হারাম সাব্যস্ত করেছিলো অংশীবাদীরা। এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, অংশীবাদীরা বলেছিলো— হাজিহিল আনআ'মু খলিসাতুন লিজুকুরিনা ওয়া মুহাররামুন আ'লা আজওয়াজিনা (ওই সকল পশুর পেটের মধ্যে যা কিছু আছে, তা পুরুষদের জন্য বিশেষভাবে হালাল এবং মহিলাদের জন্য হারাম)। তারা বাহিরা, সায়েবা, ওসিলা ও হাম— এ ধরনের উষ্ট্রশাবকগুলোকেও হারাম ঘোষণা করেছিলো।

এরপর বলা হয়েছে— আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো? এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তো ওগুলোকে হারাম করেননি। হারাম করেছো তোমরা। কিন্তু তোমরা বলো, আল্লাহ্ই এগুলোকে হারাম করেছেন। এভাবে তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছো। কেনো এ রকম করেছো ? পরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— যারা আল্লাহ্ সমন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে তাদের কি ধারণা ? এ কথার অর্থ, হে পথচ্যুত জনগোষ্ঠী! তোমরা যারা মনগড়া হালাল হারামের বিধানকে আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত করো, মিথ্যার উদ্ভাবন ঘটাও, তাদের প্রতি প্রশ্ন— মহাপ্রলয় দিবস সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী? তোমরা কি ওই ভয়ংকর দিবস সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করো? এখানে আয়াতের শুরুতে 'মা'

www.eelm.weebly.com

শব্দটির উল্লেখের মধ্যে এই ইঙ্গিতটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। শেষে বলা হয়েছে— নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। এ কথার অর্থ— মানুষের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহপরায়ণতার বিষয়টি সুনিশ্চিত। ওই অনুগ্রহপরায়ণতার সূত্রেই মানুষকে দেয়া হয়েছে জ্ঞান, নবী, রসুল এবং আসমানী কিতাব। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্তায়ালার এই অযাচিত অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। যদি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো, তবে তাদের জ্ঞানপ্রবাহ অবশ্যই পরিচালিত হতো শুভবোধের দিকে। আর তখন তারা এভাবে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করতে পারতো না। আলোচ্য বাক্যের এ রকম অর্থও হতে পারে যে— আল্লাহ্পাক মানুষের প্রতি অত্যধিক কৃপাপরায়ণ। তাই তাদের সীমাহীন অবাধ্যতার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে এই পৃথিবীতে শাস্তি অবতীর্ণ করেন না। বরং জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত উন্মুক্ত করে রাখেন তওবার তোরণ।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৬১

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

☐ তুমি যে-কোন কার্যে রত হও এবং তুমি তৎসম্পর্কে কুরআন হইতে যাহা আবৃত্তি কর এবং তোমরা যে-কোন কার্য কর, আমি তোমাদিগের পরিদর্শক— যখন তোমরা উহাতে প্রবৃত্ত হও। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নহে এবং উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ— হে আমার রসুল ! আপনি যে কোন কাজ শুরু করেন না কেনো এবং তৎসম্পর্কে কোরআনের যে কোনো আয়াত আবৃত্তি করেন না কেনো এবং হে মানুষ! তোমরা যে কোনো কাজ করোনা কেনো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুই আমি পর্যবেক্ষণ করি।

এখানে 'তাকূনু' শব্দটির মাধ্যমে রসুল স.কে সম্বোধন করা হয়েছে এবং 'লাতা'লামুনা' এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য করা হয়েছে সকল মানুষকে। 'শা'নিন্' অর্থ এখানে আমর বা বিধান। জনৈক শুদ্ধচিত্ত আলেম বলেছেন, এখানে 'শান' অর্থ

www.eelm.weebly.com

মহান। অর্থাৎ মহান বিধান। বায়যাবী লিখেছেন এখানে 'শান' অর্থ হবে ক্বাসদুন। 'শা'নাতু শা'নাহু' কথাটির অর্থ— আমি এটাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করেছি। এখানে 'মিনহু' এর 'হু' সর্বনাম 'শান' শব্দটির দিকে প্রত্যাবর্তিত। কোরআন আবৃত্তি ছিলো রসুল স. এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য কর্ম। অর্থাৎ রসুল স. মহান কর্তব্য জ্ঞানে কোরআন মজীদ আবৃত্তি করতেন। এখানে 'মিন কোরআন' কথাটির 'মিন' বর্ণনামূলকও হতে পারে। আবার হতে পারে অতিরিক্ত। এর অর্থ— আপনি কোরআনের যা কিছু অথবা যে কোনো অংশ আবৃত্তি করেন। 'ওয়ালা তা'মালুনা মিন আ'মালিন (তোমরা যে কোনো কাজ করো) কথাটির মধ্যে মূখ্যতঃ রসুল স.কে এবং গৌণতঃ অন্য সকলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা রসুল স. সকল মানুষের জন্য চিন্তান্বিত ছিলেন। তাই আয়াতের শুরুতেই তাঁর মহান কর্তব্য কর্মের কথা প্রথমেই গুরুত্বপূর্ণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে উল্লেখ করা হয়েছে অন্য সকলকে। এর পরে বলা হয়েছে— ক্ষুদ্র বৃহৎ অন্যান্য কর্মসমূহের কথা। বক্তব্যের যতিপাত ঘটেছে 'আমি তোমাদের পরিদর্শক' কথাটির শেষে। পরক্ষণেই আবার বক্তব্যটিকে প্রলম্বিত করা হয়েছে এই বলে যে, যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও'। 'ইজ তুফিদ্বুনা ফীহ্' অর্থ যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। অর্থাৎ যখন তোমরা কর্মসমূহের সূচনা করে থাকো। কেউ কেউ বলেছেন, 'ইফাদ্বা' শব্দটির অর্থ বহুসংখ্যক কর্ম। তাই 'তুফিদ্বুনা' কথাটির অর্থ হবে 'তাকছারুনা' (অত্যধিক কর্ম)।

এরপর বলা হয়েছে—'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণুপরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয় এবং তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।' এ কথার অর্থ— হে রসুল! আপনার প্রতিপালকের নিকটে আকাশ ও পৃথিবীর কোনো কিছুই গোপন নয়। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়াত্ব এবং সকল কিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহ্ফুজে।

এখানে 'মাইয়াজুবু' অর্থ অগোচর নয়। 'মিম্‌মিছ্‌ক্বালি' (অণু পরিমাণ) কথাটির 'মিন্' এখানে অতিরিক্ত। 'মিছক্বলা' শব্দটি একটি মূল শব্দ। 'জাররাতিন' অর্থ মৃত্তিকা কণা। এখানে পৃথিবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে আকাশের আগে। বলা হয়েছে, 'ফিল্‌আরদ্বি ওয়ালা ফিস্‌সামায়ি'। পৃথিবীবাসীদের নিকটে আকাশাপেক্ষা পৃথিবীই অধিকতর নিকটে। তাই এখানে পৃথিবীর উল্লেখ করা হয়েছে আকাশের আগে। এখানে পৃথিবী ও আকাশ অর্থ সম্ভাব্য জগত (আলমে এমকান) এবং অস্তিত্বের জগত (আলমে হাসতি)। এভাবে মূল বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে এ রকম— ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং বৃহদাতিবৃহৎ কোনো কিছুই আল্লাহ্‌র দৃষ্টির অগোচর নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার অসীম জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত। সমগ্র সৃষ্টি তাঁর দর্শনায়ত্ত।

এখানে 'যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই' কথাটির অর্থ হবে, যা লওহে মাহফুজে নেই। অথবা যা ওই আমলনামায় নেই, যে আমলনামা সংরক্ষণ করে কিরামান এবং কাতেবিন ফেরেশতাদ্বয়।

www.eelm.weebly.com

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

❒ জানিয়া রাখ! আল্লাহের বন্ধুদিগের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে— অলি আল্লাহ্গণের (আল্লাহ্র বন্ধুগণের) কোনো ভয় নেই। পুনরুত্থান দিবসে তাঁদের অন্তরে আযাব গজবের কোনো ভয় তো থাকবেই না, থাকবে না অপ্রাপ্তিজনিত কোনো আক্ষেপ। কারণ তাঁরা তখন হবেন পূর্ণপরিতৃপ্ত।

'ওয়ালায়ি' এবং 'তাওয়ালি' শব্দ দু'টোর আভিধানিক অর্থ— দুই বা ততোধিক বস্তুর সহজ সরল সম্পৃক্তি ও নৈকট্য। রূপক অর্থ এখানে গ্রহণীয়। অর্থাৎ এখানে নৈকট্য শব্দটিই বিবেচ্য। সে নৈকট্য স্থানগত, পরিবারগত, ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বন্ধীয়, সৌহার্দিক, সাহায্য ও সম্মান সম্পর্কীয়— যাই হোক না কেনো। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'ওয়ালইউন কুরীব ওয়ালিউন।' 'ওয়াল্ইয়ুন' হচ্ছে বিশেষণাত্মক শব্দ। এর অর্থ— নৈকট্য প্রদানকারী, বন্ধু এবং সাহায্যকারী।

বেলায়েত বিষয়ক আলোচনাঃ স্বাভাবিকভাবে সকল ব্যক্তি ও বস্তু আল্লাহ্-পাকের নিকটবর্তী। কিন্তু এই নৈকট্যের ধরন ও তত্ত্ব কারো জানা নেই। আল্লাহ্-পাক এরশাদ করেছেন— নাহনু আক্বরাবু ইলাইহি মিন হাব্লিল ওয়ারীদ (আমি তোমাদের প্রাণরগ অপেক্ষা নিকটে)। এই নৈকট্যের কারণে সৃষ্টি তার অনস্তিত্ব পরিত্যাগ করে অস্তিত্বে স্থিত হতে পেরেছে এবং প্রবহমান রাখতে পেরেছে জীবনকে। এই নৈকট্য ছাড়া সৃষ্টির অস্তিত্ব প্রাপ্তি ছিলো অসম্ভব। আল্লাহ্র পবিত্র অস্তিত্বের আনুরূপ্যবিহীন আলোয় পূর্ণরূপে অপসারিত হয়েছে অনস্তিত্বের দুর্জ্ঞেয় অধ্যায়। আল্লাহ্র সঙ্গে সৃষ্টির এই নৈকট্যটি একটি সাধারণ নৈকট্য। কিন্তু তাঁর বিশেষ দাসদের সঙ্গে তাঁর একটি বিশেষ নৈকট্য রয়েছে। ওই নৈকট্য হচ্ছে মহব্বত বা প্রেম-ভালোবাসা। যারা আত্মিক দর্শনধারী (কাশফ্ধারী) তারা আলমে মেসালে (উদাহরণের জগতে) এই নৈকট্যের একটি আনন্দদায়ক আকৃতি অবলোকন করেন। সৃষ্টির স্বাভাবিক নৈকট্য এবং বিশেষ ব্যক্তিগণের বিশেষ নৈকট্যের মধ্যে বাহ্যতঃ সাদৃশ্য থাকলেও নৈকট্যের ধরন দু'টো পৃথক। আর বিশেষ নৈকট্যের পথ অন্তহীন। হাদিসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্পাক বলেন, আমার বান্দারা নফলের কারণে আমার নৈকট্য অর্জন করতে সমর্থ হয়। এমতাবস্থায় আমি তাকে ভালোবাসি। যখন ভালোবাসি, তখন আমি হয়ে যাই তার শ্রুতি, যার মাধ্যমে সে শোনে এবং হয়ে যাই তার দৃষ্টি, যার মাধ্যমে সে অবলোকন করে (তার ওই সময়ের সকল কাজ দৃশ্যতঃ তার, কিন্তু মূলতঃ আমার)। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী। ভালোবাসাজাত এই নৈকট্যের প্রথম স্তর হচ্ছে ইমান বা বিশ্বাস। আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'আল্লাহু ওয়ালিউল্লাজীনা আমানু (আল্লাহ্ই বিশ্বাসীগণের অভিভাবক)।

www.eelm.weebly.com

আর এই বিশেষ নৈকট্যের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে নবী ও রসুলগণের নৈকট্যের স্তর। ওই স্তরের মূল নায়ক হচ্ছেন রসুল মোহাম্মদ স.। তাঁর নৈকট্য ও ভালোবাসার সীমা পরিসীমা নেই।

মহান সুফীগণের অভিমতানুসারে যারা এই বিশেষ নৈকট্য অর্জন করেন তারাই আল্লাহ্‌র অলি। আল্লাহ্‌র জিকিরে সতত সচল থাকে তাঁদের হৃদয়। প্রত্যূষে ও সায়াহ্নে তাঁরা আল্লাহ্‌পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকেন। প্রেম সাগরে হাবুডুবু খান সারাক্ষণ। তাই আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের মহব্বত তাঁদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয় না। পিতা-পুত্র, বন্ধু-বধু কারো সঙ্গেই তাঁরা সত্তাগতভাবে সম্পৃক্ত নন। কাউকে ভালোবাসলে তাঁরা আল্লাহ্‌র জন্যই ভালোবাসেন। ঘৃণা করলেও ঘৃণা করেন আল্লাহ্‌র জন্যই। দান করলেও দান করেন আল্লাহ্‌র জন্যেই। আল্লাহ্‌র জন্যেই সৃষ্টির সঙ্গে কখনো হোন সম্পৃক্ত, কখনো হোন পৃথক। সূফীগণের মতে এই অবস্থার নাম ফানায়ে কলব (হৃদয়ের সমাহিতি)। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য উভয় অবস্থায় তাঁরা বিশুদ্ধচিত্ত। আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয় বিষয়াবলী থেকে তাঁরা মুক্ত। শিরকে জলী ও শিরকে খফী (স্থুল শিরিক ও সূক্ষ্ম শিরিক) থেকে পবিত্র। পবিত্র শিরকে আখফা (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরিক) থেকে। যে শিরিক পিপীলিকার পদবিক্ষেপের চেয়েও মৃদু সে শিরিককেও তাঁরা পরিত্যাগ করেন। পরিত্যাগ করেন অহংকার, পরিত্যাগ করেন অহমিকা, হিংসা, লোভ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি অপপ্রবণতাগুলোকে। তখন তাঁদের প্রবৃত্তিও হয় পরিশুদ্ধ। সূফীগণ বলেন, এই অবস্থার নাম ফানায়ে নফস্ (প্রবৃত্তির সমাহিতি)। তাঁরা এ কথাও বলেন, যাঁরা এই স্তরে উন্নীত হোন, সেই সকল অলিআল্লাহ্‌র নিকটে শয়তান হয় চিরদিনের জন্য পরাস্ত।

দ্রষ্টব্যঃ সমানার্হ গ্রন্থকর্তা এখানে (টীকাভাষ্যের স্থানে) একটি ফারসী কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। ইতোপূর্বে এই গ্রন্থের ১৯৭ পৃষ্ঠায় কবিতাটি উল্লেখ করা হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

সুরা ইউনুসঃ আয়াত ৬৩

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

❒ যাহারা বিশ্বাস করে এবং সাবধানতা অবলম্বন করে,

এখানে 'যারা বিশ্বাস করে' বলে বুঝানো হয়েছে অলিআল্লাহ্‌গণকে। তাঁরাই পূর্ণ ইমানদার। হৃদয় বা কলব হচ্ছে ইমানের আধার। আল্লাহ্‌পাকের স্মরণে হৃদয় পরিতৃপ্ত রাখাই হচ্ছে পূর্ণ ইমানদারদের বৈশিষ্ট্য। তাদের হৃদয় আল্লাহ্‌তায়ালার জিকির থেকে এক মুহূর্ত গাফেল থাকে না। সৃষ্টির প্রতি অন্তরের অন্তস্থলজনিত মনোযোগ তাদের নেই।

এরপর বলা হয়েছে, 'ওয়াকানু ইয়াত্তাকুন'(এবং সাবধানতা অবলম্বন করে)। এ কথার অর্থ— ওইসকল আওলিয়া প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র পূর্ণ আনুগত্যকে আশ্রয় করে থাকেন।

www.eelm.weebly.com

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে ওমর রা. বলেছেন, কোনো কিছু থেকে তুমি নিজেকে উত্তম মনে কোরো না। এটাই তাকওয়া। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. বলেছেন, যে নিজেকে ফিরিঙ্গি কাফেরের চেয়ে উত্তম মনে করে, তার উপর আল্লাহ্‌র মারেফত হারাম।

হজরত ওমর থেকে আবু দাউদ লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌পাকের বান্দাগণের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা নবী অথবা শহীদ কোনোটাই নয়। কিন্তু কিয়ামতের দিন ওই সকল লোককে নবী, রসুল ও শহীদগণ সমমর্যাদাসম্পন্ন হতে দেখে তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করবেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তারা কারা? তিনি স. বললেন, যারা কেবল আল্লাহ্‌র জন্য আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্য সকলকে ভালোবাসে (ধন সম্পদ বা অন্য কোনো কারণে নয়)। আল্লাহ্‌র শপথ! কিয়ামতের দিন তাদের নূরই হবে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রোজ্জ্বল নূর। আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে তখন মানুষ থাকবে ভীত সন্ত্রস্ত। কিন্তু তাদের সেখানে কোনো ভয়-ডর থাকবে না। মানুষ তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে কিন্তু তারা কোনো দুশ্চিন্তায় পড়বে না। এরপর রসুল স. উচ্চারণ করলেন, আ'লা ইন্না আউলিয়া আল্লহি লা খওফুন আ'লাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্‌জানূন (জেনে রাখো! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না)। হজরত আবু মালেক আশআরী থেকেও বাগবী এ হাদিসটি লিখেছেন। বায়হাকী লিখেছেন তাঁর শো'বুল ইমানে।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার 'আলা ইন্না আউলিয়া আল্লহি' সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন, তারা ওই সকল লোক, যারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একে অপরকে ভালোবাসে। হজরত জাবের থেকে ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বর্ণনা করেছেন।

বেলায়েত অর্জনের মাধ্যমঃ বেলায়েত বা নৈকট্য অর্জনের প্রধানতম মাধ্যম হচ্ছেন স্বয়ং রসুলে মকবুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.। সাহাবায়েকেরাম তাঁর মাধ্যমে বেলায়েত অর্জন করেছিলেন। পরবর্তী সময় বেলায়েত অর্জনের মাধ্যম হচ্ছেন রসুল স. এর প্রতিনিধিবৃন্দ অর্থাৎ আউলিয়ায়েকেরাম। সুতরাং আউলিয়ায়েকেরামের আনুগত্য ও অনুসরণ অত্যন্ত জরুরী। তাঁদের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে অন্তর ও বাহির আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হয়। একেই বলে সিবগাতুল্লহ্ (আল্লাহ্‌র রঙ)। এ সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'সিবগাতুল্লহ্ ওয়ামান আহ্‌সানু মিনাল্লহি সিবগাহ্ (আমরা গ্রহণ করলাম আল্লাহ্‌র রঙ। রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর)। আউলিয়ায়েকেরামের প্রবর্তিত তরিকার মাধ্যমে বিরতিহীন জিকির অর্জন করা যায়। অপসারিত করা যায় হৃদয়ের অপরিচ্ছন্নতাসমূহকে। হৃদয় হয়ে যায় দর্পণের মতো স্বচ্ছ ও পবিত্র। রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি বস্তু পরিষ্কার করার জন্য রয়েছে শানযন্ত্র। আর হৃদয় পরিষ্কার করার জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র জিকির। বায়যাবী।

www.eelm.weebly.com

আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস থেকে ইমাম মালেক, আহমদ ও বায়হাকী লিখেছেন, হজরত মুয়াজ বিন জাবাল বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে এ রকম বলতে শুনেছি— আল্লাহ্পাক বলেন, দু'জন ব্যক্তি যদি আমার জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, এক সঙ্গে ওঠাবসা করে এবং একে অপরের জন্য ব্যয় করে, তবে তাদেরকে ভালোবাসা আমার উপরে হয়ে যায় ওয়াজিব। হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে ইমাম আহমদ, তিবরানী ও হাকেম এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, এক লোক রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে দূরে থেকে কোনো সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসে কিন্তু তাদের নিকট পৌঁছতে পারে না। রসুল স. বললেন, ওই লোকের হিসাব হবে তার ওই প্রিয়জনদের সঙ্গে। এখানে উল্লেখিত প্রশ্নটির উদ্দেশ্য ছিলো এ কথা বলা যে, আমলের দিক থেকে ওই ব্যক্তি তার প্রিয়দলের লোকদের নিকটবর্তী নয়। হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিমও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমানে লিখেছেন, হজরত আবু রজীন উল্লেখ করেছেন, আমাকে রসুল স. বলেছেন, নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করো, কোন্ পথে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ? প্রকৃত কল্যাণের পথ এই— জিকিরকারীদের সভায় উপস্থিত হয়ে তাদের অনুসরণ করো। যখন একাকী থাকবে, তখনও অন্তরে জিকির জারী রাখো। আর মানুষকে ভালোবাসো আল্লাহ্র ওয়াস্তে এবং ঘৃণাও করো আল্লাহ্র ওয়াস্তে।

হজরত আবু জর গিফারী থেকে ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্পাকের নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় আমল হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তোষ সাধনের উদ্দেশ্যে ভালোবাসা ও শত্রুতা করা।

আল্লাহ্পাকের মহব্বতঃ আউলিয়ায়েকেরামের একটি দল আল্লাহ্পাকের মাহবুব (প্রিয়ভাজন)। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্পাক যখন তাঁর কোনো বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন জিবরাইলকে ডেকে বলেন, আমি আমার অমুক বান্দাকে মহব্বত করি, তুমিও তাকে মহব্বত করো। তখন জিবরাইলও তাকে ভালোবাসতে থাকে এবং আসমানের অন্য ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলে, আল্লাহ্ তাঁর অমুক বান্দাকে মহব্বত করেন, তোমরাও তাকে মহব্বত করো। তখন আসমানের সকল ফেরেশতা ওই লোককে ভালোবাসে। সে তখন পৃথিবীবাসীদের নিকটেও ভালোবাসার পাত্র হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যখন তাঁর কোনো বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন জিবরাইলকে ডেকে বলেন, আমি অমুক লোককে ঘৃণা করি, তুমিও তাকে ঘৃণা করো। জিবরাইলও তখন তাকে ঘৃণা করতে থাকে এবং আকাশের

www.eelm.weebly.com

ফেরেশতাগণকে ডেকে বলে, আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন তোমরাও তাকে ঘৃণা করো। একথা শুনে ফেরেশতারাও ওই লোককে ঘৃণা করতে থাকে। শেষে পৃথিবীবাসীদের নিকটেও সে হয় ঘৃণার পাত্র।

অলি আল্লাহ্গণের বৈশিষ্ট্যঃ রসুল স.কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আউলিয়া কারা? তিনি স. বললেন, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্পাকের কথা মনে হয়। রসুল স. আরো বলেছেন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, আমার বান্দাগণের মধ্যে তারাই আওলিয়া, যাদের কথা স্মরণ হলে আমার কথা স্মরণ হয় এবং আমার কথা স্মরণ করলেও তাদের কথা স্মরণ হয়ে থাকে। হাদিস দু'টো বর্ণনা করেছেন ইমাম বাগবী।

হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ বলেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, আমি কি বলবো তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে? সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! অবশ্যই বলুন। তিনি স. বললেন, যাকে দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়। ইবনে মাজা।

দ্রষ্টব্যঃ উপরে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম রহস্য। সে সূক্ষ্ম রহস্যটি এই— আল্লাহ্ ও আউলিয়া একে অপরের সঙ্গে প্রেম ভালোবাসা সূত্রে সম্পর্কিত। আর এ রকম সম্পর্কধারীরা আনুরূপ্যবিহীনভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই একজনের স্মরণে অন্যজন সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্ভাসিত হয় স্মৃতিপটে। যেমন, সূর্যরশ্মি সম্মুখে স্থাপিত আয়না। ওই আয়নায় পড়ে সূর্যকিরণের প্রতিফলন। ফলে আয়নার সম্মুখে স্থাপিত বস্তুও সূর্যকিরণের প্রতিবিম্বের প্রতিফলনে সমুজ্জ্বল হয়। ওই আয়নার খুব কাছে তুলা রাখলে সে তুলোতে ধরে যায় আগুন। অথচ সরাসরি সূর্যকিরণে তুলায় আগুন ধরে না। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্পাক তাঁর আউলিয়াদেরকে দান করেছেন শুদ্ধিকরণের যোগ্যতা এবং সঠিক পরিমাপের ক্ষমতা। আল্লাহ্র নূরে আনুরূপ্যবিহীনভাবে নূরান্বিত হওয়ার কারণে তাঁরা মানুষকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন। তাই তাঁদের সংসর্গ আল্লাহ্পাকের সংসর্গতুল্য এবং তাঁদের স্মরণ আল্লাহ্র স্মরণের অনুরূপ। তাই তাঁদের দর্শন যাঁদের ভাগ্যে ঘটে এবং যাঁরা তাঁদের সঙ্গে উপবেশন করেন, তাঁরা কখনো বঞ্চিত হবেন না। পথভ্রষ্ট হবেন না। আর যারা তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করে তারা কখনো হেদায়েতের ফয়েজ লাভ করতে পারবে না। তারা ফাসেক। আর ফাসেক সম্পর্কে আল্লাহ্পাক বলেছেন— 'ওয়াল্লহু লা ইয়াহ্দিল কওমাল ফাসিক্বীন।'

রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেন, যারা আমার অলিদের সঙ্গে শত্রুতা করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী।

একবার হজরত হানজালা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার সঙ্গে থাকলে মনে হয় জান্নাত ও জাহান্নামকে চাক্ষুষ করছি। আর আপনার সংসর্গচ্যুত হয়ে সাংসারিক বিষয়ে মগ্ন হয়ে গেলে মনে হয় সবকিছু হারিয়ে ফেলেছি। রসুল

www.eelm.weebly.com

স. বললেন, আমার জীবনাধিকারী পবিত্র সত্তার শপথ। যদি আমার সংসর্গে সবসময় থাকতে তবে ফেরেশতারা উঠতে বসতে তোমাদের সঙ্গে করমর্দন করতো। কিন্তু হে হানজালা, এটা হচ্ছে পৃথিবী। তাই এখানে সে সুযোগ দেয়া হয়নি। রসুল স. একথাটি উচ্চারণ করলেন তিনবার। মুসলিম।

দ্রষ্টব্যঃ সাধারণ মানুষ কাশ্‌ফ ও কারামাতকে (আত্মিক দৃষ্টি ও অলৌকিকত্বকে) বেলায়েতের বিশেষ নিদর্শন বলে মনে করে। কিন্তু তাদের এ ধারণাটি যথার্থ নয়। কারণ অনেক আউলিয়ার মধ্যে বিষয় দু'টো বিদ্যমান থাকে না। আবার যারা ইমানদার নয়, তাদের মধ্যেও কখনো কখনো অলৌকিক অনেক কিছু প্রকাশিত হয়। সুতরাং অলৌকিকত্ব কখনো আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজনতার (বেলায়েতের) মাপকাঠি নয়। আউলিয়ায়েকেরামের মাধ্যমে কাশ্‌ফ ও কারামত প্রকাশিত হলেও এ দু'টোকে বেলায়েতের প্রধান নিদর্শন বলে মনে করা যাবে না। আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন— 'কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিছলুকুম ইউহা ইলাইয়া' (হে রসুল! আপনি বলুন, আমি তোমাদের মতো মানুষ কিন্তু আমার উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়)। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কুল লাওকুনতু আ'লামুল গইবা লাস্‌তাকসাবতু মিনাল খইরি ওয়ামা মাস্‌সানিইয়াস্‌ সুউ'(হে রসুল! আপনি বলুন, আমি যদি অদৃশ্যের সকল জ্ঞানের অধিকার লাভ করতাম তবে নিজের জন্য সঞ্চয় করতে পারতাম কেবল কল্যাণ এবং কোনো মন্দ আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না)। অন্য আরেক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে— 'কুল ইন্নামাল আয়াতু ইনদাল্লহ্‌' (হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি বলুন, মোজেজাসমূহ আল্লাহ্‌পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন)।

সম্মানার্হ সুফী সাধকগণ বলেছেন, কারামত গোপন রাখাই সমীচীন। কেবল কারামতের কারণে এক জন অলি আল্লাহ্‌কে অন্যজন অপেক্ষা অধিক মর্যাদামণ্ডিত মনে করা ঠিক নয়। যারা প্রকৃতই আল্লাহ্‌র ওলি তাঁরা তাঁদের মাধ্যমে প্রকাশিত কারামতের জন্য লজ্জাবোধ করেন।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৬৪

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

❒ তাহাদিগের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে ; আল্লাহের বাণীর কোন পরিবর্তন নাই; ইহাই মহাসাফল্য।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্যভাজনদেরকে পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে সুসংবাদ দানের কথা বলা হয়েছে। তাই পৃথিবীতে সকল সাহাবীগণকে সাধারণভাবে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিলো। আর বিশেষভাবে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিলো বিশেষ সাহাবীগণকে।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুর রহ্মান ইবনে আউফ থেকে তিরমিজি এবং হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদ থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যোবায়ের জান্নাতী, আবদুর রহ্মান ইবনে আউফ জান্নাতী, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইবনে জায়েদ জান্নাতী এবং আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ জান্নাতী।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হে আবু বকর! আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তুমি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, সর্বপ্রথম সমাধি থেকে উত্থিত হবো আমি। এরপর আবু বকর। তারপর ওমর। হজরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ থেকে তিরমিজি লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক নবীর একজন প্রিয়জন থাকে। জান্নাতে আমার প্রিয়জন হবে ওসমান। হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. হজরত আলীকে বলেছেন, রসুল মুসার সঙ্গে নবী হারুণের যে সম্পর্ক, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক সেরকম। কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী নেই।

হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম থেকে আহমদ ও তিরমিজি উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি যার মাওলা (বন্ধু), আলীও তার মাওলা। হজরত মুসাওয়ার ইবনে মাখরামা থেকে বোখারী ও মুসলিম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ফাতেমা আমার অংশ। যারা তাকে কষ্ট দিবে তারা আমাকে কষ্ট দিবে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিরমিজি উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার যুগল দৌহিত্র হাসান ও হোসাইন হবে জান্নাতী যুবকদের সর্দার। আর জান্নাতের রমণীদের মধ্যে সর্বোত্তমা হবে মরিয়ম বিন ইমরান এবং খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ। তিনি স. আরো বলেছেন, সকল আহার্যের তুলনায় ছরিদের মর্যাদা যেরকম, সকল রমণীদের তুলনায় আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব তেমনি। তিনি স. আরো বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর পুণ্যবান (সালেহ্)। শেষোক্ত হাদিসটি হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি স. আরো বলেছেন, আমার আনসার সাহাবীগণকে যারা মহব্বত করবে তারা মুমিন এবং যারা তাদেরকে হিংসা করবে তারা মুনাফিক। যারা আনসারগণকে ভালোবাসবে আল্লাহ্পাক তাদেরকে ভালোবাসবেন। আর যারা তাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে আল্লাহ্ তাদেরকে ঘৃণা করবেন। তিনি স. আরো বলেছেন, উসায়েদ ইবনে হুদায়ের উত্তম ব্যক্তি, সাবেত ইবনে কায়েস, মুয়াজ ইবনে জাবাল ও মুয়াজ বিন

www.eelm.weebly.com

ওমর জামুহ্ও ভালো লোক। তিনি স. আরো বলেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত আগ্রহান্বিত— আলী,আম্মার ও সালামান। রসুল স. এভাবে অনেক সাহাবীকে সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। আর সকল সাহাবীগণকে আল্লাহ্পাক নিজেই সুসংবাদ দিয়েছেন এভাবে— ওয়াকুল্লাও ওয়াদাল্লহুল হুসনা (আর প্রত্যেকের সঙ্গে কল্যাণের অঙ্গীকার করা হয়েছে)। আল্লাহ্পাক বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদেরকেও (মুখলিসদেরকেও) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। সাধারণভাবে এরকম আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ওয়াল্লাজীনা মাআ'হু (আল্লাহর রসুল মোহাম্মদ আর যারা তার সহচর) শেষ পর্যন্ত।

রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, আমার সাহাবীগণের দোষচর্চা কোরো না। তোমরা যারা আমার সাক্ষাত পাওনি, তারা আল্লাহ্র রাস্তায় উহুদ পর্বত পরিমাণ সোনা ব্যয় করলেও আমার সাহাবীগণের এক সা অথবা অর্ধ সা যব ব্যয় করার সওয়াব পাবে না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

হজরত ওমর থেকে রজীন উল্লেখ করেছেন, রসুল স. ঘোষণা করেছেন, আমার সাহাবীবৃন্দ নক্ষত্রপুঞ্জতুল্য। তাদের যে কোনো একজনকে অনুসরণ করলেও তোমরা হেদায়েত পেয়ে যাবে। হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে বোখারী ও মুসলিম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গ হচ্ছে আমার সহচরবৃন্দ। তারপর তাদের সহচরবৃন্দ। তারপর তাদের সহচরবৃন্দ।

রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর আওলিয়ায়েকেরাম সুসংবাদ পেয়ে থাকেন স্বপ্নে অথবা জাগ্রত অবস্থায় আলমে মেসালের মাধ্যমে। আলমে মেসাল থেকে আসা স্বপ্নই হচ্ছে উত্তম স্বপ্ন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এখন সুসংবাদ ব্যতীত নবুয়তের কোনো প্রতি-বিম্বজাত অংশ নেই। (নবুয়ত বন্ধ, তাই প্রত্যাদেশ আর আসবে না)। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! সুসংবাদ তাহলে কী? রসুল স. বললেন, সত্য স্বপ্ন।

হজরত উবাদা বিন সামেত বলেছেন, আমি রসুল স. এর নিকট 'তাদের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে'— এই আয়াতে উল্লেখিত সুসংবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি স. বলেছিলেন, এখানে উল্লেখিত সুসংবাদের অর্থ সত্য স্বপ্ন।

হজরত আবু দারদা বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর নিকটে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলাম। জবাবে তিনি স. বলেছিলেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তুমি ছাড়া আর কেউ এই আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চায়নি।

www.eelm.weebly.com

এখানে উল্লেখিত বুশরা বা সুসংবাদ হচ্ছে সত্য স্বপ্ন— যা মুমিনদেরকে দেখানো হয়। এটাই পার্থিব জীবনের সুসংবাদ। আর আখেরাতের সুসংবাদ হচ্ছে জান্নাত। বিভিন্ন সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও সাঈদ ইবনে মনসুর।

এখানে সত্য স্বপ্ন বলে সাধারণ মুমিনদের স্বপের কথা বোঝানো হয়নি। বোঝানো হয়েছে আওলিয়া ও সালেহীনদের স্বপ্নকে। রসুল স. বলেছেন, স্বপ্ন তিন প্রকার— ১. আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ। ২. অপপ্রবৃত্তির পক্ষ থেকে কল্পনা প্রসূত ঘটনা। ৩. শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতিপ্রদ দৃশ্যাবলী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তিরমিজি ও ইবনে মাজা। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

একটি সন্দেহঃ স্বপ্ন তো স্বপ্নই। তাহলে আওলিয়া ও পুণ্যবানদের স্বপ্নকে নির্ভরযোগ্য বলা হবে কেনো?

সন্দেহ ভঞ্জনঃ স্বপ্ন যদি নির্ভরযোগ্য না হয় তবে শুভ বুদ্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তকেই বলতে হবে সুসংবাদ। রসুল স. এরশাদ করেছেন, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের একভাগ। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী, হজরত ইবনে ওমর ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আহমদ ও ইবনে মাজা। হজরত আউফ বিন মালেক থেকেও ইবনে মাজা অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

জ্ঞাতব্যঃ প্রথম দিকে রসুল স. এর উপর নবুয়তের হাল (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ হতো স্বপ্নে। ছয় মাস ধরে এরকম হয়েছিলো। রসুল স. স্বপ্নে যা দর্শন করতেন তা-ই প্রতিফলিত হতে দেখতেন বাস্তবে। এরপর শুরু হয় ওহীর (প্রত্যাদেশের) প্রকাশ্য ধারাবাহিকতা। এ অবস্থা চলে তেইশ বছর ধরে— মহাপ্রস্থানের পূর্ব পর্যন্ত। এভাবে স্বপ্নজাত সুসংবাদের সময়সীমা (ছয় মাস), তেইশ বছরের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগই হয় (ছয় মাস এক বৎসরের দুই ভাগের এক ভাগ এই হিসেবে ছয়মাস তেইশ বৎসরের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ)।

হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ এবং হজরত ওমর থেকে ইবনে মাজা উল্লেখ করেছেন, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের সত্তর ভাগের এক ভাগ। হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে নাজ্জার উল্লেখ করেছেন, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের পঁচিশ অংশের এক অংশ।

আল বুশরা (সুসংবাদ) কথাটি সাধারণ অর্থে জান্নাত ও সওয়াবরূপে বর্ণিত হয়েছে। এই সাধারণ সুসংবাদটি সকল ইমানদারদের প্রতি প্রযোজ্য। অর্থাৎ সকল বিশ্বাসী সওয়াব ও জান্নাত লাভ করবে— যদি তারা ইমানের সঙ্গে পৃথিবী পরিত্যাগ করে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মানুষেরা সাতাশ গুণ সওয়াব

www.eelm.weebly.com

প্রাপ্তিকে সুসংবাদ বলে থাকে। আবদুল্লাহ্ বিন সামেত সূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু জর গিফারী একবার নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! মানুষ তো পুণ্যকর্ম করে তার নিজের জন্য। কিন্তু তবুও মানুষেরা তাকে ভালোবাসে। রসুল স. বললেন, ওই ভালোবাসা হচ্ছে পার্থিব সুসংবাদ। মুসলিমের বর্ণনায় 'ভালোবাসে' কথাটির স্থলে এসেছে 'প্রশংসা করে'। জুহুরী এবং কাতাদা বলেছেন, অন্তিম যাত্রার সময় আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে ফেরেশতারা সুসংবাদ নিয়ে অবতীর্ণ হয়। এই সুসংবাদকে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'আল বুশরা'। যেমন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— তাতানায্যালু আ'লাইহিমুল মালাইকাতু আল্লা তাখাফু ওয়ালা তাহ্জানু ওয়া আবশিরূ বিল্ জান্নাতি (তাদের প্রতি ফেরেশতামণ্ডলী অবতীর্ণ হয়ে বলে, ভীত ও দুঃখিত হয়ো না, গ্রহণ করো জান্নাতের শুভসংবাদ)।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আতাও এরকম বর্ণনা করেছেন। 'ওয়াফিল আখিরাতি' অর্থ পারলৌকিক জীবনে। অর্থাৎ মৃত্যু- উত্তর জীবনে ইমানদারদের রূহ্কে আল্লাহ্তায়ালার নিকটে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাকে দেয়া হবে আল্লাহ্তায়ালার প্রসন্নতার সুসংবাদ। কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়েও ইমানদারদেরকে সুসংবাদ দেয়া হবে।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াকে পছন্দ করে, আল্লাহ্ও তাকে সাক্ষাৎ দান করতে পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায় না, আল্লাহ্ও তাকে সাক্ষাৎ দিতে চান না। জননী আয়েশা অথবা অন্য কোনো উম্মত জননী একবার আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! মৃত্যু তো আমাদের কারো নিকটে পছন্দনীয় নয়। রসুল স. বললেন, মৃত্যুকালে ইমানদারদেরকে আল্লাহ্র সন্তোষ ও রহমতের সুসংবাদ দেয়া হয়। তাই তারা তখন আল্লাহ্র সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। কিন্তু মৃত্যুকালে কাফেরদেরকে দেয়া হয় আযাব ও আল্লাহ্র অসন্তোষের সংবাদ। তাই তারা মৃত্যুকে কিছুতেই পছন্দ করতে পারে না। বোখারী ও মুসলিম।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'তে বিশ্বাসী, তারা মৃত্যুর সময় ভীত হয় না। কবরের মধ্যেও তারা ভয় করে না। তারা তখন নিজের মস্তক থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বলে, আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আজহাবা আন্নাল হাযানা (সেই আল্লাহ্র প্রশংসা যিনি আমার নিকট থেকে দুর্ভাগ্যকে অপসারণ করেছেন)। তিবরানী। হজরত ইবনে আববাস থেকে মারফু সূত্রে খাত্তালীও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— লাতাব্দীলা লিকালিমাতিল্লাহ্ (আল্লাহ্র বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্র কালাম (সেফাতুল কালাম) অপরিবর্তনীয়, অক্ষয়, চিরন্তন। আর আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতিও অপরিবর্তনীয়। শেষে বলা হয়েছে— জালিকা হুওয়াল ফাউজুল আ'জীম (এটাই মহাসাফল্য)। এ কথার অর্থ— পার্থিব ও পারলৌকিক সুসংবাদ প্রাপ্তিই হচ্ছে চরম কৃতকার্যতা বা মহাসফলতা।

সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ৬৫, ৬৬, ৬৭

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۚ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ أَلَآ إِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ۚ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝

❐ উহাদিগের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। সমস্ত শক্তিই আল্লাহের; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❐ জানিয়া রাখ! যাহারা আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহারা আল্লাহেরই। যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে শরীক করে, তাহাদিগকে ডাকে তাহারা কিসের অনুসরণ করে? তাহারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং তাহারা শুধু মিথ্যাই বলে।

❐ তিনিই রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন উহাতে তোমাদিগের বিশ্রামের জন্য এবং দিবস সৃষ্টি করিয়াছেন দেখিবার জন্য। যে-সম্প্রদায় কথা শোনে নিশ্চয়ই তাহাদিগের জন্য ইহাতে আছে নিদর্শন।

'ওয়ালা ইয়াহ্যুনকা ক্বাওলুহুম (তাদের কথা তোমাকে যেনো দুঃখ না দেয়)। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদের কটু কথা ও ঠাট্টা পরিহাসের কারণে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। কেনো হবেন? তারা তো অজ্ঞ। আর স্মরণ করুন, 'ইন্নাল ইজ্জাতা লিল্লাহি জামীয়া' (সমস্ত শক্তিই আল্লাহ্র)। অর্থাৎ সাময়িক অবকাশের মধ্যে তারা যা কিছুই করুক না কেনো সকল কিছুর উপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ তো কেবল আল্লাহ্রই। তিনি তো অপ্রতিদ্বন্দ্বী, চির বিজয়ী। তিনিই তো আপনার সাহায্যদাতা। সুতরাং আপনি দুঃখিত হবেন কেনো?

www.eelm.weebly.com

হুওয়াস সামিউল আ'লীম (তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ)। এ কথার অর্থ— তিনি তো ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সব কিছুই শোনেন ও জানেন। তাই তিনি যথাসময়ে অবশ্যই তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি দান করবেন।

পরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'জেনে রাখো, যারা আকাশমণ্ডলে আছে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তারা আল্লাহ্রই।'এ কথার অর্থ— আকাশ পৃথিবী এবং জড় অজড় সকল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্। সুতরাং জেনে রাখো, হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! কোনো সৃষ্টিই কখনো স্রষ্টার মর্যাদা পেতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে—'যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে শরীক করে, তাদেরকে ডাকে তারা কিসের অনুসরণ করে?' এ কথার অর্থ— যারা সম্পূর্ণ অবাস্তবতা ও মিথ্যাচারিতার ভিত্তিতে নিজের হাতে গড়া প্রতিমাগুলোকে উপাস্য স্থির করেছে, আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করেছে এবং সেগুলোর নিকটে সাহায্যার্থী হয়েছে তারা কোন বিবেচনার অনুসারী? তারা কি বিবেচক?

উদ্ভূত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে শেষে বলা হয়েছে— 'তারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু মিথ্যাই বলে।' এ কথার অর্থ— অংশীবাদিতা কেবল অনুমান ও মিথ্যাচার মাত্র। আক্ষেপ! অংশীবাদীদের প্রতি। তারা সুনিশ্চিতরূপে অনুমানানুসারী এবং অসত্যভাষী।

এর পরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'তিনিই রাত্রি সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিবস সৃষ্টি করেছেন দেখবার জন্য।' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! দৃষ্টিপাত করো দিবস-নিশিথের বিবর্তনবিন্যাসের প্রতি। আল্লাহ্ তোমাদের কর্মমুখরতাজনিত শ্রান্তি নিবারণের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রান্তিহারক যামিনী। আর দিবসকে সৃষ্টি করেছেন সূর্যকরোজ্জ্বল শোভিতরূপে— যাতে তোমাদের নিকটে সকল কিছু হয়ে উঠে পরিদৃশ্যমান। যাতে সবকিছু দেখে দেখে তোমরা সম্পাদন করতে পারো তোমাদের প্রয়োজনীয় কর্মাদি।

শেষে বলা হয়েছে— 'যে সম্প্রদায় কথা শোনে নিশ্চয়ই তাদের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।' এ কথার অর্থ দিবস রাত্রির এই বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ নিদর্শন। এই বিশাল সৃষ্টির আলো ও আঁধারের অনুবর্তনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আল্লাহ্পাকের অপার পরাক্রম; সামগ্রিক কল্যাণ এবং পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাময়তা। এই বিশাল সৃষ্টি ও সময়ের বিবর্তন প্রতিনিয়ত এ কথা প্রমাণ করে যাচ্ছে যে, আল্লাহ্পাকই এ সকল কিছুর একক স্রষ্টা। সুতরাং তিনিই সকলের একমাত্র উপাস্য। যে সম্প্রদায় এই মূলতত্ত্ব কথাটি শোনে, নিশ্চয়ই তারাই বুঝতে পারে এ সকল নিদর্শনরাজির প্রকৃত মহিমাকে।

www.eelm.weebly.com

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ هُوَ الْغَنِيُّ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○ قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ○ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ○

❒ তাহারা বলে 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি মহান, পবিত্র! তিনি অভাবমুক্ত! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। এ বিষয়ে তোমাদিগের নিকট কোন সনদ নাই। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যে-বিষয়ে তোমাদিগের কোন জ্ঞান নাই?

❒ বল, 'যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিবে তাহারা সফলকাম হইবে না।'

❒ পৃথিবীতে উহাদিগের জন্য আছে কিছু সুখ-সম্ভোগ; পরে আমারই নিকট উহাদিগের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর সত্যপ্রত্যাখ্যান হেতু উহাদিগকে আমি কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাইব।

প্রথমে বলা হয়েছে—'তারা বলে আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি মহান, পবিত্র। তিনি অভাবমুক্ত।' এ কথার অর্থ— অংশীবাদীরা বলে, আল্লাহ্‌র সন্তান রয়েছে। আর ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা। এ রকম জঘন্য বক্তব্য থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। এ রকম মিথ্যা কল্পনা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি প্রয়োগ করা অসম্ভব। কারণ আল্লাহ্ মহান। প্রতিদ্বন্দ্বীতাহীন ও সমকক্ষতাহীনরূপে সুমহান। আর তিনি অভাব মুক্ত, চির অমুখাপেক্ষী। সৃষ্টি নিজেদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে তাঁরই মুখাপেক্ষী। কিন্তু তিনি কোনো বিষয়ে কারো মুখাপেক্ষী নন। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক গড়ে উঠে স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে এবং তারা কোনো না কোনো বিষয়ে একে অপরের মুখাপেক্ষী। যোগ্য সন্তান পিতার সম্মান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। আর অযোগ্য সন্তান পিতার সম্মানহানি ঘটায়। এভাবে পিতা সম্মান, অসম্মানের প্রশ্নে পুত্রের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ্ সৃষ্টির প্রশংসা ও অপ্রশংসার মুখাপেক্ষী নন। কারণ তিনি সকল অভাব থেকে মুক্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের নিকট কোনো সনদ নেই।' এ কথার অর্থ— আকাশ পৃথিবীসহ সমগ্র মহাবিশ্বকে আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই বিশাল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা ও প্রভুপ্রতিপালক। সুতরাং চির মুখাপেক্ষী সৃষ্টির সঙ্গে চির অমুখাপেক্ষী আল্লাহ্‌তায়ালার পিতা-পুত্রের সম্পর্ক হয় কীভাবে? হে অংশীবাদী

www.eelm.weebly.com

জনগোষ্ঠী! এ সম্পর্কে তোমাদের প্রকৃষ্ট কোনো প্রমাণই নেই। অপবিত্র কল্পনা ও অনুমান ছাড়া তোমাদের কোনো কিছুই নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছো, যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই?' এ কথার অর্থ— হে অংশীবাদী সম্প্রদায়! শোনো, কোনো কিছুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে গেলে প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রয়োজন। কিন্তু সেরকম প্রমাণ তোমাদের কাছে নেই। তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে কিছু জানো না। অথচ এমন কিছু বলো, যা ভিত্তিহীন। কেনো এ রকম বলো? ধিক তোমাদেরকে! পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'বলো, যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই অজ্ঞ অংশীস্থাপকদেরকে বলে দিন, আল্লাহ্ সম্বন্ধে যারা মিথ্যাচারিতার প্রবর্তন ঘটাবে তারা কখনো সফলকাম হবে না। না জান্নাতে পৌঁছতে পারবে, না জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি পাবে।

এর পরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'পৃথিবীতে তাদের জন্য আছে কিছু সুখ-সম্ভোগ; পরে আমারই নিকটে তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর সত্যপ্রত্যাখ্যান হেতু তাদেরকে আমি কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাবো।' এ কথার অর্থ— ঠিক আছে। অংশীস্থাপকদের জন্য পৃথিবীতে কিছু দিনের সুখ-সম্ভোগ নির্ধারণ করা হলো। কারণ মহাজীবনের তুলনায় পৃথিবীর অল্প কয়েকদিনের জীবন তেমন কিছুই নয়। এই সাময়িক অবকাশ শেষে তাদেরকে তো আমার নিকট ফিরে আসতেই হবে। তখন আমি তাদেরকে তাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের যথোপযোগী শাস্তি আস্বাদন করাবোই।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِىْ
وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ
اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَىَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ۝ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ
اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ فَكَذَّبُوْهُ
فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝

❑ উহাদিগকে নূহ-এর বৃত্তান্ত শোনাও । সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহের নিদর্শন দ্বারা আমার উপদেশ

www.eelm.weebly.com

দান তোমাদিগের নিকট যদি দুঃসহ হয় তবে, আমি তো আল্লাহের উপর নির্ভর করি; তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছ তৎসহ তোমাদিগের কর্তব্য স্থির করিয়া লও, পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদিগের কোন সংশয় না থাকে। আমার সম্বন্ধে তোমাদিগের কর্তব্যকর্ম নিষ্পন্ন করিয়া ফেল এবং আমাকে অবসর দিও না।

❒ তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইলে কিছু আসে যায় না, কারণ তোমাদিগের নিকট আমি কোন শ্রমফল প্রার্থনা করি নাই, আমার শ্রমফল আছে আল্লাহের নিকট, আমি তো আত্ম-সমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতে আদিষ্ট হইয়াছি।

❒ অতঃপর উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে; তাহাকে ও তাহার সঙ্গে যাহারা তরণীতে ছিল তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করি এবং তাহাদিগকে প্রতিনিধি করি ও যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করি। সুতরাং দেখ, যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদিগের পরিণাম কী হইয়াছে?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি মক্কাবাসীদেরকে রসুল নূহের বৃত্তান্ত শোনান। রসুল নূহ তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো দীর্ঘ দিন ধরে তোমাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করে চলেছি। এখন যদি আমার উপস্থিতিই তোমাদের নিকট অসহ্য হয় এবং আল্লাহ্‌র নিদর্শন দ্বারা যে সদুপদেশ আমি তোমাদেরকে দান করে চলেছি তা যদি দুঃসহ হয়ে ওঠে, তবে আমার পক্ষ থেকে আর কী করার আছে? আমি তো কেবল আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা রাখি। এখন তোমরা এবং তোমাদের উপাস্যগুলো মিলে যা করতে চাও করতে পারো। দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে পড়ে থেকে আর কী হবে? তোমাদের কর্তব্য তোমরা করে ফেলো এবং আমাকে কোনো অবসর দিয়ো না।

এখানে শেষ বাক্যটিতে ফুটে উঠেছে হজরত নূহের চরম আল্লাহ্ নির্ভরতা। 'কর্তব্য স্থির করে নাও', 'আমার সম্বন্ধে তোমাদের কর্তব্যকর্ম নিষ্পন্ন করে ফেলো', 'আমাকে অবসর দিয়ো না'— এ সকল বাক্যের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত নূহ চরম দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে, তার সম্প্রদায়ের অংশীবাদী ও বাতিল উপাস্যরা শত চেষ্টা করলেও তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। কারণ কল্যাণ ও অকল্যাণ কোনো কিছুরই নিয়ন্ত্রক তারা নয়।

উল্লেখ্য যে, হজরত নূহ ছিলেন হজরত শীশের বংশধর। আর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো কাবিলের বংশধর। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে হজরত নূহ তাঁর সম্প্রদায়কে সম্বোধন করেছেন 'হে আমার সম্প্রদায়' বলে। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত নূহের সম্প্রদায়ের লোকেরাও হয়তো বা হজরত শীশের বংশধরই ছিলো।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে কিছু আসে যায় না, কারণ তোমাদের নিকটে আমি কোনো শ্রম-ফল প্রার্থনা করিনি, আমার শ্রম-ফল আছে আল্লাহ্র নিকট। আর আমিতো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদিষ্ট হয়েছি।' এ কথার অর্থ— হজরত নূহ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেও করতে পারো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তোমাদেরকে পথ প্রদর্শনের জন্য যে পরিশ্রম আমি করি, তার বিনিময় তো আমি তোমাদের কাছে চাই না। আমাকে বিনিময় প্রদান করবেন তো আমার আল্লাহ্। সুতরাং আমার শুভ নির্দেশনার অনুগামী যদি তোমরা না হও তবে ক্ষতিগ্রস্ত তো হবে তোমরাই। আমার কোনো ক্ষতি এতে নেই। আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো সংঘর্ষ রচনা করতে আসিনি। এসেছি কল্যাণের পথ প্রদর্শন করতে। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেনো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। অন্যদেরকেও আত্মসমর্পণকারী হতে বলি।

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যদৃষ্টে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম প্রচারের জন্য মানুষের নিকট বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নয়। অতএব কোরআন ও হাদিস শিক্ষা দানের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণও নাজায়েয।

এর পরের আয়াতের (৭৩) মর্মার্থ হচ্ছে— দীর্ঘদিন গত হলো কিন্তু অবাধ্যরা হজরত নূহের ডাকে সাড়া দিলো না। বরং বারংবার তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করলো। তখন আমি নূহকে নির্মাণ করতে বললাম একটি তরণী। নির্দেশ দিলাম, তুমি এবং তোমার অনুসারীরা ওই তরণীতে আরোহণ করো। তাহলে আযাবরূপী মহাপ্লাবন থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পারবে। যথাসময়ে শুরু হলো ভয়াবহ প্লাবন। সেই প্লাবনে আমি চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত করলাম আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। আর নূহ্ ও তার অনুসারীদেরকে দান করলাম প্লাবন পরবর্তী প্রতিষ্ঠা । ধ্বংসপ্রাপ্ত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের স্থলবর্তী হলো তারা। সুতরাং হে মানুষ! দ্যাখো, ওই অবাধ্যদেরকে পুনঃপুনঃ সতর্ক করা সত্ত্বেও তারা ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানে অনড় কিন্তু তার পরিণাম কি রকম ভয়াবহ হয়েছিলো, হে মানুষ— অনুধাবন করো।

উল্লেখ্য যে, হজরত নূহের তরণীর আরোহী ছিলেন সর্বমোট আশিজন।

www.eelm.weebly.com

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْۤا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ قَالَ مُوْسٰۤى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ۝

❒ অনন্তর, তাহার পরে আমি রসূলদিগকে প্রেরণ করি তাহাদিগের সম্প্রদায়ের নিকট; তাহারা উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিল। কিন্তু উহারা পূর্বে যাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাতে বিশ্বাস করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এইভাবে আমি সীমালংঘনকারীদিগের হৃদয় মোহর করিয়া দিই।

❒ পরে আমার নিদর্শনসহ মূসা ও হারুনকে ফেরাউন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু উহারা অহংকার করে এবং উহারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।

❒ অতঃপর যখন উহাদিগের নিকট আমার নিকট হইতে সত্য আসিল তখন উহারা বলিল 'ইহা তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট যাদু।'

❒ মূসা বলিল 'সত্য যখন তোমাদিগের নিকট আসিল তখন তৎসম্পর্কে তোমরা এইরূপ বলিতেছ? ইহা কি যাদু? যাদুকরেরা তো সফলকাম হয় না।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— নূহের পরবর্তী সম্প্রদায়গুলোর জন্য আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী ও রসুল প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাঁদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের নিকটে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু তারা আগের মতোই সত্যপ্রত্যাখ্যানকে আঁকড়ে ধরেছিলো। ইমান গ্রহণ করতে চায়নি। আমিও তাই ওই সকল সীমালংঘনকারীদের হৃদয় অবরুদ্ধ করে দিয়েছি, যেনো কোনো দিনও আর সেই হৃদয়ে সত্যের আলো প্রবেশ না করে। অতএব হে আমার রসুল! আপনিও শুনুন, আপনার অবাধ্য উম্মতদের হৃদয়ও আমি অবরুদ্ধ করে দিবো, যেহেতু তারা বারংবার আপনার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে।

পরের আয়াতের (৭৫) মর্মার্থ হচ্ছে— পরবর্তী সময়ে আমি প্রেরণ করলাম মুসা ও হারুনকে । সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আমি তাদেরকে প্রেরণ করলাম ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের হেদায়েতের জন্য। কিন্তু তারা নবী ভ্রাতৃদ্বয়কে মান্য করলো না। প্রদর্শন করলো অহমিকা। কারণ তারা ছিলো স্বভাবগতভাবে অপরাধী। তাই তারা আল্লাহ্র প্রেরিত পয়গম্বরদ্বয়কে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে বসলো।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতের (৭৬) মর্মার্থ হচ্ছে— অতঃপর যখন তাদের নিকটে নবী মুসা সত্য মোজেজাসমূহ প্রকাশ করলো, তখন তারা মনে মনে বুঝতে পারলো যে, মুসা সত্য পয়গম্বর। কিন্তু মুখে সে কথা স্বীকার করলো না। প্রবৃত্তিপূজক ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন সুস্পষ্ট মোজেজা সম্পর্কে বললো, এগুলো যাদু ছাড়া আর কিছু নয়।

এর পরের আয়াতের (৭৭) মর্মার্থ হচ্ছে— মুসা তখন বললো, আল্লাহ্পাক প্রদত্ত এই অলৌকিক নিদর্শনসমূহকে তোমরা এভাবে প্রত্যাখ্যান করছো কেনো? এটা কি যাদু না মোজেজা! যাদুর তো কোনো বাস্তব ভিত্তিই নেই। তাই যাদুকরেরা কখনো সফলকাম হয় না। আমি তো সত্য রসুল। এই মোজেজাসমূহই আমার রেসালতের প্রমাণ।

'যাদুকর তো সফলকাম হয় না'— কথাটি ফেরাউনের কথা হতে পারে। অর্থাৎ হজরত মুসার 'এটা কি যাদু' এই প্রশ্নের জবাবে ফেরাউন তখন বলেছিলো, 'যাদুকরেরা তো সফলকাম হয় না।'

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ۝ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ۝ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

❒ উহারা বলিল, 'আমরা আমাদিগের পিতৃপুরুষগণকে যাহাতে পাইয়াছি তুমি কি তাহা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিবার জন্য আমাদিগের নিকট আসিয়াছ? এবং যাহাতে দেশে তোমাদিগের দুই জনের প্রতিপত্তি হয় এই জন্য? আমরা তোমাদিগে বিশ্বাসী নহি।'

❒ ফেরাউন বলিল 'তোমরা আমার নিকট সুদক্ষ যাদুকরদিগকে লইয়া আইস।'

❒ অতঃপর যখন যাদুকরেরা আসিল তখন উহাদিগকে মূসা বলিল, 'তোমাদিগের যাহা নিক্ষেপ করিবার নিক্ষেপ কর।'

❒ যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন মূসা বলিল 'তোমরা যাহা আনিয়াছ তাহা যাদু, আল্লাহ্ উহাকে অসার করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ অশান্তি সৃষ্টিকারীদিগের কর্ম সার্থক করেন না।'

www.eelm.weebly.com

❒ অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ্ তাঁহার বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

উদ্ধৃত পাঁচটি আয়াতের মর্মার্থ এ রকম— তখন ফেরাউন ও তাঁর অনুচরেরা বললো— হে মুসা! এবার বলো, তোমার মতলব কি? তুমি কি আমাদেরকে আমাদের পিতৃপুরুষগণের ধর্মমত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাও, এটাই কি আমাদের নিকট তোমার আগমনের হেতু? নাকি দেশে প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য তোমরা এ রকম করছো? নাহ্। তোমাদেরকে আমরা বিশ্বাস করতেই পারি না (৭৮)। এ কথা বলেই ফেরাউন শান্ত হলো না। সে ভাবলো, বড় বড় যাদুকরকে এনে মুসার মোকাবিলা করতে হবে। তাই সে তার পারিষদবর্গকে উদ্দেশ্য করে বললো, তোমরা আমার নিকটে সুদক্ষ যাদুকরদেরকে নিয়ে এসো (৭৯)। ফেরাউনের নির্দেশ মতো দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সুদক্ষ যাদুকরদেরকে জড় করা হলো। উন্মুক্ত প্রান্তরে হজরত মুসার মুখোমুখী হলো যাদুকরেরা। যাদুর প্রতিদ্বন্দ্বীতা শুরুর প্রাক্কালে হজরত মুসা বললেন, নিক্ষেপ করো, তোমরা যা নিক্ষেপ করতে চাও (৮০)। যাদুকরেরা তাদের যাদু দেখানো শুরু করলো। তখন হজরত মুসা বললেন, আল্লাহ্পাক তোমাদের যাদুকে অকার্যকর করে দিবেন। তোমরা বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী। আর আল্লাহ্ বিশৃংখলাকারীদেরকে কখনো সফল করেন না (৮১)। আরো শোনো, অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বাণী অনুসারে সত্যকে সত্য হিসেবে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করবেন (৮২)।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰۤى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ
يَّفْتِنَهُمْ ۭ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ○ وَقَالَ
مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ○
فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○ وَنَجِّنَا
بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

❒ ফেরাউন ও তাহার পারিষদবর্গ নির্যাতন করিবে এই আশংকা লইয়া তাহার সম্প্রদায়ের এক দল ব্যতীত আর কেহ তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। দেশে তো ফেরাউন পরাক্রমশালী ও ন্যায়লংঘনকারীই ছিল।

www.eelm.weebly.com

❐ মূসা বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহে বিশ্বাস করিয়া থাক, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা তাঁহারই উপর নির্ভর কর।'

❐ অতঃপর তাহারা বলিল, 'আমরা আল্লাহের উপর নির্ভর করিলাম। হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে জালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও না।'

❐ 'এবং আমাদিগকে তোমার অনুগ্রহে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায় হইতে রক্ষা কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ নির্যাতন করবে এই আশংকা নিয়ে তার সম্প্রদায়ের এক দল ব্যতীত আর কেউ তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি। এ কথার অর্থ— হজরত মুসার মোজেজার নিকটে যাদুকরদের যাদু পরাস্ত হলো। দর্শকেরা বুঝলো যে, হজরত মুসা সত্য পয়গম্বর। কিন্তু তবু তারা ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নির্যাতনের ভয়ে হজরত মুসার প্রতি ইমান আনতে পারলো না। কিন্তু নির্যাতনের আশংকা সত্ত্বেও তাঁর সম্প্রদায়ের কিছু লোক ইমান গ্রহণ করলো। 'ইল্লা জুর্‌রিয়াতুম মিন্ ক্বওমিহি' অর্থ তার সম্প্রদায়ের এক দল ব্যতীত। তাফসীরকারগণ বলেছেন, এখানে 'তার সম্প্রদায়ের' কথাটির অর্থ হজরত মুসার সম্প্রদায়ের। অর্থাৎ বনী ইসরাইলের। হজরত ইউসুফের শাসন কাল থেকে বনী ইসরাইলেরা মিসরে বসবাস করে আসছিলো। আর মিসরের স্থায়ী অধিবাসীদের বলা হতো কিবতী।

মুজাহিদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'তার সম্প্রদায়ের এক দল' কথাটির অর্থ ওই সকল বনী ইসরাইল যাদের হেদায়েতের জন্য হজরত মুসাকে প্রেরণ করা হয়েছিলো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মিসররাজ যখন বনী ইসরাইলের সদ্যজাত শিশুদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলো তখন কোনো কোনো ইসরাইলী রমণী তাদের শিশু সন্তানদেরকে কিবতী রমণীদের নিকট হস্তান্তর করেছিলো। ওই শিশুরা কিবতী পরিবারেই লালিত পালিত হয়। যাদুকরদের উপরে হজরত মুসার পরিপূর্ণ বিজয় দেখে ইমান এনেছিলো তারাই। প্রকাশ্যে তারা কিবতী বলে পরিচিত হলেও তারা ছিলো বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ভূত।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'তাদের সম্প্রদায়ের এক দল' কথাটির অর্থ হবে মিসর সম্প্রদায়ের এক দল। অর্থাৎ কিবতীদের মধ্যে একটি দল। আতিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফেরাউন গোত্রের কেউ কেউ হজরত মুসার প্রতি ইমান এনেছিলো। তাদের মধ্যে ছিলেন

www.eelm.weebly.com

ফেরাউনের পত্নী হজরত আসিয়া। ফেরাউনের খাজাঞ্চী, খাজাঞ্চীর পত্নী, হজরত আসিয়ার কেশ বিন্যাসকারিণী এবং ওই সকল কিবতী যাদের কথা বলা হয়েছে সুরা ইয়াসিনের এই আয়াতে— ওয়াজায়া মিন আকসাল মাদীনাতি রজুলুঁন ইয়াস আ (আর শহরের উপকণ্ঠ থেকে এক লোক দৌড়াতে দৌড়াতে এলো)। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসার প্রতি ইমান আনয়নকারী লোকগুলোর পিতা ছিলো কিবতী এবং মাতা বনী ইসরাইলী। যেমন কোনো কোনো পারস্যবাসী ইয়েমেনে এসে বসবাস করতো। তারা স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করতো। তবু তাদের সন্তানদেরকে বলা হতো পারসিক।

এরপর বলা হয়েছে— 'দেশে তো ফেরাউন পরাক্রমশালী ও ন্যায়লংঘনকারীই ছিলো'। এ কথার অর্থ— মিসরাধিপতি ছিলো দোর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী এবং অবশ্যই সীমালংঘনকারী। সে প্রজাসাধারণকে পদানত করে রেখেছিলো। বলেছিলো 'আমি তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক' (সুতরাং আমার উপাসনা তোমাদের জন্য আবশ্যিক)।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'মুসা বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাকো, যদি তোমরা আত্মসমর্পনকারী হও, তবে তোমরা তাঁরই উপর নির্ভর করো।' এ কথার অর্থ— নবাগত বিশ্বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে হজরত মুসা বললেন, এখনো তোমরা মিসরাধিকারী ফেরাউনকে ভয় করছো কেনো, তোমরা তো এখন বিশ্বাসী। বিশ্বাসীরা কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় পায়? হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি বিশ্বাসী ও আত্মসমর্পণকারী হয়েই থাকো, তবে যাকে বিশ্বাস করেছো কেবল তার উপর নির্ভরশীল হও। তিনি যে সিদ্ধান্ত দান করেন সেই সিদ্ধান্তকে আনতমস্তকে স্বাগত জানাও।

এখানে ' ইনকুনতুম মুসলিমীন' (যদি তোমরা আত্মসমর্পনকারী হও)। কথাটির প্রতিদান (জাযা) উহ্য। আর 'ইনকুনতুম আমানতুম' (যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাকো) কথাটির প্রতিদান হবে এখানে 'ফা আ'লাইহি তাওয়াক্কালু' (তবে তোমরা তারই উপর নির্ভর করো)। আলোচ্য আয়াতের বিবরণভঙ্গি দৃষ্টে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা) ছাড়া পরিপূর্ণ ইমানদার হওয়া যায় না। অথবা যে প্রকৃত বিশ্বাসী তাকে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হতেই হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌পাকের সকল সিদ্ধান্ত বিনা প্রশ্নে

www.eelm.weebly.com

না মেনে নেয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাওয়াক্কুল আসবে না। প্রবৃত্তিপরিকীর্ণ বিশ্বাস এবং তাওয়াক্কুল কখনো একত্র হতে পারে না। সুফিগণের তরিকার একটি মাকামকে বিশেষ ভাবে তাওয়াক্কুল বলা হয়েছে।

এর পরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা বললো, আমরা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করলাম। হে আমার প্রতিপালক! আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র কোরো না।' এ কথার অর্থ— নবাগত ইমানদারেরা বিশুদ্ধচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন হজরত মুসার ধর্মমতকে। এ ব্যাপারে তাদের কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিলোই না। তাই তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর উপরেই নির্ভর করলাম। হজরত মুসাকে এ রকম বলার পর তাঁরা আল্লাহ্তায়ালার নিকট প্রার্থনা জানালেন— হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ সীমা-লংঘনকারী ও উৎপীড়ক। তারা আমাদেরকে এবার নিশ্চয় উৎপীড়ন করতে শুরু করবে। অতএব হে আমাদের আল্লাহ্। আমাদেরকে ওই সীমালংঘনকারীর উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করো। তাঁদের প্রার্থনার মূলমর্ম এ রকমও হতে পারে যে— হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদেরকে এমন পরীক্ষায় ফেলবেন না, যাতে আমরা অকৃতকার্য হই। ফেরাউন আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করলে লোকে বলবে, এই লোকগুলো সত্যপথে থাকলে নিশ্চয় অত্যাচারের শিকার হতো না। হে আমাদের আল্লাহ! আমাদেরকে উৎপীড়নের পাত্র করে ওই সকল অবিশ্বাসীকে এ রকম অপমন্তব্য করার সুযোগ দিয়ো না।

এর পরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'এবং আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করো।' আলোচ্য আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত প্রার্থনার শেষাংশ। মিসরাধিনায়ক ও তার অনুচরবর্গের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রার্থনা জানানো হয়েছে এই আয়াতে। লক্ষ্যণীয় যে, এই প্রার্থনার শুরুতে বলা হয়েছে 'আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম।' এতে করে বুঝা যায়, প্রার্থনাকারীদের প্রথম কাজ হচ্ছে আল্লাহর উপর নির্ভর করা বা তাওয়াক্কুল করা। অর্থাৎ আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে প্রার্থনা জানালে সে প্রার্থনা গৃহীত হয়।

আমি বলি, সুফীগণের অভিমত হচ্ছে আল্লাহ্র নিকটে কোনো কিছু প্রার্থনা করা হোক বা না হোক, তওয়াক্কুলের বিষয়টি সার্বক্ষণিক। আর দোয়া করা অত্যাবশ্যক কোনো বিষয় নয়। কিন্তু তাওয়াক্কুল অত্যাবশ্যক।

www.eelm.weebly.com

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○ قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

❒ আমি মূসা ও তাহার ভ্রাতাকে প্রত্যাদেশ করিলাম, 'মিসরে তোমাদিগের সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ স্থাপন কর, এবং তোমাদিগের গৃহগুলিকে ইবাদত-গৃহ কর, সালাত কায়েম কর এবং বিশ্বাসীদিগকে সুসংবাদ দাও।'

❒ মূসা বলিল, হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি ফেরাউন ও তার পারিষদ-বর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করিয়াছ যদ্দারা, হে আমাদের প্রতিপালক! উহারা মানুষকে তোমার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে। হে আমাদিগের প্রতিপালক! উহাদিগের সম্পদ বিনষ্ট কর, উহাদিগের হৃদয় মোহর করিয়া দাও, উহারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করিবে না।'

❒ তিনি বলিলেন, 'তোমাদিগের দুইজনের প্রার্থনা গৃহীত হইল, সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখনও অজ্ঞদিগের পথ অনুসরণ করিও না।'

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি নবী ভ্রাতৃদ্বয়কে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করলাম, তোমরা তোমাদের মিসরবাসী সম্প্রদায়কে বলো, তারা যেনো নামাজের জন্য বিশেষ ঘর তৈরী করে এবং ওই ঘরে নামাজ পাঠ করে। আর তোমরা তাদেরকে এই সুসংবাদটি দাও। অচিরেই আল্লাহ্পাক তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে করবেন তাদের স্থলবর্তী। আর আখেরাতে তোমাদেরকে দান করবেন জান্নাত।

বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত হচ্ছে, বনী ইসরাইলেরা তাদের বাড়ীর পাশে নির্মিত খানকায় নামাজ আদায় করতো। হজরত মুসার আবির্ভাবের পর যখন তারা হজরত মুসার অনুসারী হয়ে গেলো তখন ফেরাউনের

www.eelm.weebly.com

নির্দেশে ওই খানকাগুলো ধ্বংস করে দেয়া হলো। তখন আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশ করলেন, এখন থেকে বাড়ীর সীমানার ভিতরে বিশেষভাবে নামাজের জন্য ঘর নির্মাণ করে সেখানে নামাজ পড়তে হবে। এ রকম বলেছেন ইব্রাহিম নাখয়ী। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামা সূত্রেও এ রকম বর্ণিত হয়েছে।

মুজাহিদের বর্ণনায় এসেছে, তখন ফেরাউনের অত্যাচারের ভয়ে জামাতবদ্ধ হয়ে প্রকাশ্যে নামাজ পাঠ করা হয়ে পড়লো অসম্ভব। তাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হলো, বনী ইসরাইলেরা অন্দর মহলে নামাজের ঘর নির্মাণ করে গোপনে সেখানে নামাজ পাঠ করবে।

এখানে ' বুয়ুতাকুম ক্বিবলাতান' অর্থ ইবাদত গৃহ। এখানে ক্বিবলা শব্দটির অর্থ হবে নামাজের স্থান। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসা ও তার অনুসারীগণের কেবলা ছিলো বায়তুল মাকদিস।

আয়াতের শুরুতে নবী ভ্রাতৃদ্বয়কে উদ্দেশ্য করে দেয়া হয়েছে নামাজের জন্য বিশেষ গৃহ নির্মাণের নির্দেশ। কারণ তাঁরা যৌথভাবে বনী ইসরাইলদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে চলেছিলেন। উল্লেখ্য যে, নামাজের জন্য নির্মিত ওই বিশেষ গৃহগুলোতে নামাজ আদায় করা ছিলো অত্যাবশ্যক। অন্য কোথাও নামাজ পাঠ করা তাদের জন্য বৈধ ছিলো না। আরো উল্লেখ্য যে, আয়াতের শেষে কেবল হজরত মুসাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে— (হে মুসা) বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও। এ রকম করার কারণ এই যে, নবী ভ্রাতৃদ্বয় যৌথভাবে নবুয়তের দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও হজরত মুসা ছিলেন এককভাবে শরিয়তপ্রবর্তক। তাই সুসংবাদ প্রদান করার দায়িত্বটি তাঁরই উপরে বর্তেছিলো।

বাগবী লিখেছেন, এখানে 'বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও' কথাটির অর্থ হবে, হে নবী মুসা! আগামীতে আবির্ভূত হবেন মহানবী মোহাম্মদ স.। তাঁর আবির্ভাবের সুসংবাদ তোমরা গ্রহণ করো।

এর পরের আয়াতে (৮৮) উল্লিখিত হয়েছে, ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হজরত মুসার একটি অপপ্রার্থনা। হজরত মুসা তাঁর ওই অপপ্রার্থনায় বললেন, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! তুমি ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছো যদ্দারা, হে আমাদের প্রতিপালক! তারা মানুষকে তোমার পথ থেকে সরিয়ে দেয়, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদ বিনষ্ট করো, তাদের হৃদয় মোহর করে দাও, তারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করবে না।

এখানে 'জিনাত' শব্দটির অর্থ শোভাবর্ধক সামগ্রী। যেমন সুন্দর পরিচ্ছদ, আভরণ, অশ্ব, গৃহের আসবাবপত্র, যানবাহন, পরিচারক-পরিচারিকা ইত্যাদি। 'লিইউদ্বিল্লু' অর্থ পথচ্যুত করে। অর্থাৎ ফেরাউন ও তার লোকেরা মানুষকে সত্য

www.eelm.weebly.com

পথ থেকে বিচ্যুত করে। যেমন, এক আয়াতে এসেছে— ফালতাক্বাত্বহু আলুফিরআ'উনা লিইয়াকুনা লাহুম আদুওয়ান ওয়া হাযানা (ফেরাউনের লোকেরা মুসাকে পেয়েছিলো যেনো তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় শত্রুতা ও উৎপীড়ন)। এখানে ইউদ্বিল্লু' কথাটির 'লি' (লাম অক্ষরটি) পরিণতি প্রকাশক। কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, পরিণতি প্রকাশক নয়, বরং কারণ প্রকাশক। অর্থাৎ এর মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তোমা কর্তৃক প্রদত্ত পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদের কারণে তারা নিজেরা যেমন পথভ্রষ্ট হয়েছে, তেমনি পথভ্রষ্ট করে চলেছে অন্যকে। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, ফেরাউন ও তার লোকেরা পার্থিব শোভা ও সম্পদকে নিজেরাই পথভ্রষ্টতার কারণ বানিয়ে নিয়েছে। এভাবে তারা নিজেরা যেমন গোমরাহ্ হয়েছে, তেমনি অন্যদেরকেও গোমরাহ্ করে চলেছে।

আলোচ্য আয়াতে 'রব্বানা' (হে আমার প্রভুপ্রতিপালক) কথাটি উচ্চারিত হয়েছে দু'বার। স্বীয় দোয়াকে অধিকতর বিনয়মণ্ডিত করবার জন্য হজরত মুসা তাঁর দোয়ায় 'রব্বানা' সম্বোধনটি উচ্চারণ করেছেন দু'বার।

শায়েখ আবু মনসুর মাতুরিদী বলেছেন, আল্লাহ্পাক সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে পৃথিবীর বিত্ত-বৈভব দান করেন অসন্তোষের সঙ্গে। বিত্ত-প্রেমে নিমগ্ন হয়ে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হোক এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করে আরো বেশী গোনাহ্গার হোক— এটাই আল্লাহ্র ইচ্ছা (কারণ এটা তারাও চায়)। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ইন্নামা নুমলী লাহুম লিইয়াযদাদু ইছমান (আমি তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছি এ কারণে যে, তারা যেনো পাপাচরণে অগ্রগামী হয়)। এই আয়াত মোতাজিলাদের মতবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রমাণ। মোতাজিলারা বলে, বান্দাদের জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করা আল্লাহ্পাকের জন্য ওয়াজিব। তাই আল্লাহ্পাক কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না। বান্দারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ বিশ্বাস এই যে, করা বা সৃষ্টি করার ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। বান্দারা ইচ্ছা করে। আর আল্লাহও তাঁর ইচ্ছানুসারে তাদের ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটান। মানুষ ইচ্ছা করে। আল্লাহ্ও সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন এবং সৃষ্টি করেন। কেউ পুণ্যকর্ম করতে চাইলে আল্লাহ্ও তা চান এবং বাস্তব জগতে পুণ্যকর্ম সৃজন করেন। আবার কেউ মন্দ কর্ম করতে চাইলে আল্লাহ্ও তা চান এবং মন্দ কর্মটি সৃজন করেন। অতএব সৃজনের ইচ্ছা ও সৃজন কেবল আল্লাহর। আর ইচ্ছার সূচনাকারী হিসেবে অর্জন বান্দার।

বায়যাবী লিখেছেন, 'রব্বানা উয়ুদ্বিল্লু আ'ন্ সাবিলিকা' কথাটির 'লি ইয়ুদ্বিল্লু' হচ্ছে নির্দেশ প্রকাশক শব্দরূপ। শব্দটির মাধ্যমে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। এরপরে শুরু করা হয়েছে বদ্দোয়া।

www.eelm.weebly.com

মুজাহিদ প্রমুখ বলেছেন, এখানে 'তাদের সম্পদ বিনষ্ট করো' কথাটির অর্থ 'তাদের সুন্দর চেহারাকে কুৎসিত করে দাও'। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ 'তাদের সকল সম্পদ পাথরে পরিণত করে দাও'। তাই হয়েছিলো। তাদের মূল্যবান সামগ্রীগুলো পরিণত হয়েছিলো পাথরে। কোনো কোনোটি ফেটে দুই তিন টুকরো হয়ে গিয়েছিলো। তাদের গৃহপালিত হাঁস-মুরগীর ডিম বের হতো কিন্তু সে ডিম ফুটতো না। গাছে আখরোট হতো। কিন্তু তা পাথরে পরিণত হয়ে ফেটে পড়ে যেতো। খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের কাছে একটি থলিতে সংরক্ষিত ছিলো ওই সময়ের বদ্‌দোয়া-সৃষ্ট কতিপয় বিবর্ণ বস্তু।

সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হজরত মুসার অপপ্রার্থনার ফলে আল্লাহ্‌পাক কিবতীদের মূল্যবান সম্পদ, গাছ, ফল, আটা, আহার্য সব কিছুকে পাথর করে দিয়েছিলেন। এই মোজেজাটি হজরত মুসার নয়টি মোজেজার অন্তর্ভুক্ত।

'ওয়াশ্‌দুদ্ আ'লা কুলুবিহিম' অর্থ 'তাদের হৃদয় মোহর করে দাও।' হজরত মুসা কিবতীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে তাদের জন্য এ রকম বদ্‌দোয়া করেছিলেন। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের হেদায়েতের জন্য। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন তারা কোনো দিনই ঈমান আনবে না তখন তিনি তাদের জন্য আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বদ্‌দোয়াটি করলেন।

একটি সন্দেহঃ হজরত মুসা যদি জেনেই থাকেন যে তারা কোনো দিনই ঈমান আনবে না, তবে তিনি আবার 'তাদের হৃদয় মোহর করে দাও' এ রকম বললেন কেনো? তাঁর এই কথাটি একটি অতিরিক্ত কথা ছিলো নাকি?

জবাবঃ সম্ভবতঃ তিনি আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে এ রকম বদ্‌দোয়া করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। আর এরকম করা অযৌক্তিক কিছু নয়। যেমন, ইবলিস আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক অভিসম্পাতগ্রস্ত। তৎসত্ত্বেও তিনি নির্দেশ করেছেন— 'ইন্নাশ্‌শাইত্বানা লাকুম আদুওয়ান ফাত্তাখিজুহু আদুওয়ান' (শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা শয়তানকে শত্রু মনে করো এবং তাকে অভিসম্পাত দাও)।

'তারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করবে না' এ কথার অর্থ— ফেরাউন ও কিবতীরা গজব কবলিত হলেই কেবল বাধ্য হয়ে ঈমান আনবে। কিন্তু তাদের ওই ঈমান গৃহীত হবে না। কারণ শাস্তি ভোগ করার সময় অপরাধীদের সাক্ষ্য গ্রহণের কোনো বিধান নেই।

এর পরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, তোমাদের দু'জনের প্রার্থনা গৃহীত হলো, সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাকো এবং তোমরা কখনো অজ্ঞদের পথ অনুসরণ কোরো না।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক নবী ভ্রাতৃদ্বয়কে বললেন, তোমাদের দু'জনের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো। তোমরা আমার নিকট থেকে

www.eelm.weebly.com

মানুষের হেদায়েতের যে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছো, সেই দায়িত্বের উপরেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। যথাসময়ে তোমাদের প্রার্থনা বাস্তব রূপ লাভ করবে। ওই অবুঝদের মতো তোমরা কখনো হয়ো না, যারা প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গে ঈপ্সিত ফল লাভ করতে চায়। ত্বরাপ্রবণতা পরিহার করো। অপেক্ষা করো, তোমাদের প্রার্থনার প্রতিফল অবশ্যই প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

দোয়া করেছিলেন হজরত মুসা। আর হজরত হারুন তাঁর দোয়ার সমর্থনে আমিন, আমিন বলেছিলেন। তাই তাঁদের দু'জনকেই প্রার্থনাকারী বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমাদের দু'জনের প্রার্থনা গৃহীত হলো।' বাগবী লিখেছেন, নবী ভ্রাতৃদ্বয়ের দোয়া মঞ্জুর করা হয়েছিলো চল্লিশ বছর পর।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৯০, ৯১, ৯২

وَجٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتّٰىٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلٰهَ إِلَّا الَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا إِسْرَآءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○ ءَآلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ○ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَايٰتِنَا لَغٰفِلُونَ ○

❐ আমি বনি-ইস্‌রাঈলকে সমুদ্র পার করাইলাম এবং ফেরাউন ও তাহার সৈন্য বাহিনী বিদ্বেষ পরবশ হইয়া ও ন্যায়ের সীমা লংঘন করিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হইল তখন সে বলিল, 'আমি বিশ্বাস করিলাম যে, বনি-ইস্‌রাঈল যাঁহাতে বিশ্বাস করে তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নাই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত।

❐ 'এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করিয়াছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।'

❐ 'আজ আমি তোমার দেহ চড়াভূমিতে রক্ষা করিব যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীদিগের জন্য নিদর্শন হইয়া থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে অনবধান।'

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, আমার নির্দেশে নবী ভ্রাতৃদ্বয় বনী ইসরাইল জনতাকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মিসর থেকে রওয়ানা দিয়ে সমুদ্র তীরে উপনীত হলো। সামনে আর কোনো পথ নেই। নবী ভ্রাতৃদ্বয় আমার সাহায্যপ্রার্থী হলো। আমি সাগরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালাকে দু'পাশে সরিয়ে দিলাম। তার মাঝখানে দেখা গেলো শুষ্ক পথ। নবী ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের অনুসারীদেরকে নিয়ে সে পথে যাত্রা শুরু করলো। ওদিকে ফেরাউন ও তার লোকেরা সকালে উঠে দেখলো বনী ইসরাইলেরা আর নেই। সঙ্গে সঙ্গে তারা বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীকে ধরে আনবার জন্য রওয়ানা হলো। পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে পৌঁছে গেলো সেই সমুদ্রের কিনারায়। সাগর অভ্যন্তরে শুকনো পথ দেখে তারাও এগিয়ে চললো সেই পথ ধরে। যখন নবী ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁর অনুসারীরা সমুদ্র অতিক্রম করে অপর পাড়ে গিয়ে উঠলো, তখন সাগর অভ্যন্তরের পথে ধাবমান ফেরাউন ও তার দলবলকে আল্লাহ্‌তায়ালা সলিল সমাধি দান করলেন। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে ফেরাউন চিৎকার করে বললো আমি বিশ্বাস করলাম, বনী ইসরাইল যে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে, সেই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং আমিও আত্মসমর্পণকারীদের দলভূত।

এখানে 'আত্‌বায়া' অর্থ পশ্চাদ্ধাবন করলো। 'ইত্‌তাবায়া' অর্থ অনুসরণ। শব্দটি বাবে ইফতেয়াল। কেউ কেউ বলেছেন, 'আত্‌বায়া' হচ্ছে বাবে ইফয়াল এবং 'ইত্‌তাবায়া' হচ্ছে বাবে ইফতেয়াল। শব্দ দু'টো সমার্থক।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে, 'বাগ্‌ইয়া' অর্থ সীমালংঘন এবং 'আদ্‌ওয়ান' অর্থ বিদ্বেষবশতঃ। ঘটনাটি ঘটেছিলো এ রকম— নবীবিদ্বেষী ও ন্যায়ের সীমালংঘন-কারী ফেরাউন ও তার দলবল সাগর তীরে উপস্থিত হয়ে দেখলো, দু'পাশে পানির পাহাড়। আর মাঝখানে শুকনো পথ। এ রকম অলৌকিক দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে গেলো তারা। তখন হজরত জিবরাইল মানুষের রূপ ধরে একটি ঘোড়ায় চড়ে এলেন এবং সকলের আগে নেমে পড়লেন সাগর অভ্যন্তরের পথে। তাঁর ঘোড়ার পশ্চাতে ফেরাউন ও তার লোকদের ঘোড়াও ছুটতে শুরু করলো। এভাবে তার পুরো বাহিনী যখন সাগরের পথে, তখন দু'পাশের বিভক্ত পানির পাহাড়কে আল্লাহ্‌পাক এক বরাবর করে দিলেন। এভাবে পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করলো ফেরাউন ও তার লোকজন।

এক বর্ণনায় এসেছে, মরনোম্মুখ ফেরাউন যখন চিৎকার করে বললো, আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত, হজরত জিবরাইল তৎক্ষণাৎ তার মুখে কাদা নিক্ষেপ করলেন। আর সে মৃত্যুবরণ করলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায়।

পরের আয়াতের (৯১) মর্মার্থ হচ্ছে— মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ফেরাউন যখন ইমান আনয়নের ঘোষণা দিলো, তখন আল্লাহ্ বললেন, এখন! এখন কেনো এ কথা

www.eelm.weebly.com

বলছো? সারা জীবন ধরে তোমাকে তওবার সুযোগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তুমি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছো। নিঃসন্দেহে তুমি ছিলে অশান্তি সৃষ্টিকারী। যথাসময়ে তুমি সত্যকে স্বীকার করোনি, তাই এ অসময়ে তোমার স্বীকৃতি কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, ফেরাউন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বলেছিলো, 'বনী ইসরাইল যে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে, সেই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। ওই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে জিবরাইল ফেরেশতা আমাকে বলেছেন, ভ্রাতা মোহাম্মদ! ওই সময় আমি ফেরাউনের মুখে সমুদ্রের কাদা মাখিয়ে দিয়েছিলাম। আল্লাহ্‌র রহমত সর্বত্রগামী। ফেরাউনের চিৎকার শুনে মনে হচ্ছিলো, হয়তোবা সে আল্লাহ্‌র রহমত পেয়েই যাবে। তাই আল্লাহ্‌র রহমত যেনো সে না পায়, তার তওবা যেনো গ্রহণ করা না হয়, সে কারণেই আমি তার মুখ ঢেকে দিয়েছিলাম কাদায়।

দ্রষ্টব্য ঃ জালালউদ্দিন দাওয়ানী বলেছেন, ফেরাউন জীবদ্দশায় আল্লাহ্‌র প্রতি ইমান এনেছিলো। তাই একথা বলতে কোনো বাধা নেই যে, তার মৃত্যু ঘটেছিলো ইমানদার অবস্থায়। শায়েখ দাওয়ানী এ ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন শায়েখ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবীকে। শায়েখ আরাবীও ফেরাউনের মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুর কথা বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তাঁদের অভিমত কোরআনের অনেক আয়াতের পরিপন্থী। বিশুদ্ধ হাদিস এবং উম্মতের ঐকমত্যের বিরোধী।

দাওয়ানী বলেছেন, ফেরাউনের দোজখী হওয়ার প্রমাণ কোনো আয়াতে নেই। দোজখের আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে ফেরাউনের বংশের লোকদের জন্য। ফেরাউনকে দোজখের আযাবের ভয় দেখানো হয়নি। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে— আদ্‌খিলু আ'লা ফিরাউনা আশাদ্দাল আ'জাবি (ফেরাউনের বংশকে কঠিন শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দাও)। অন্যত্র বলা হয়েছে— ফা আওরাদা হুমুন্ নারা' (ফেরাউনের অনুসারীদিগকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে)। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— ওয়া হাক্বা বি আ'লি ফির্আউনা সূউল আজাবী (ফেরাউনের বংশধরদেরকে ঘিরে রেখেছে কঠিন আযাব)। এ সকল আয়াতে কোথাও ফেরাউনের আযাব হবে, এ রকম বলা নেই। তবে হ্যাঁ, সে মানুষকে অত্যাচার করতো। তাই অত্যাচারের শাস্তি সে পাবে।

আমি বলি, দাওয়ানীর অভিমতটি যুক্তিযুক্ত নয়। আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেছেন— ফাহাশারা ফানাদা ফাক্বালা আনা রব্বুকুমুল আ'লা ফাআখাজাহুল্লহু নাকালাল আখিরাতি ওয়াল উলা (ফেরাউন সকলকে একত্র করে বললো, আমি তোমাদের বড় প্রভুপালক। পরিশেষে আল্লাহ্ তাকে পাকড়াও করেন এবং তাকে

www.eelm.weebly.com

দুনিয়া ও আখেরাতে দৃষ্টান্ত করা হয়েছে)। এই আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, কুফুরীর কারণে আখেরাতে ফেরাউনের শাস্তি হবে। এ ছাড়া এই সুরার ৮৮ নম্বর আয়াতে হজরত মুসার যে দীর্ঘ দোয়া উল্লেখিত হয়েছে, সেই দোয়ার এক স্থানে বলা হয়েছে, 'তাদের হৃদয় মোহর করে দাও।' এর প্রেক্ষিতে পরবর্তী আয়াতে (৮৯) আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা দিচ্ছেন 'তোমাদের দু'জনের প্রার্থনা গৃহীত হলো।' এতে করে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ফেরাউন মৃত্যুবরণ করেছিলো কুফুরী অবস্থায়। কারণ মোহরাঙ্কিত হৃদয়ের অধিকারীরা কখনো ইমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে পারে না। সুতরাং 'ফেরাউন মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলো'— এ রকম বললে কোরআনের আয়াতকেই অস্বীকার করা হবে।

এর পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— 'আজ আমি তোমার দেহ চড়া ভূমিতে রক্ষা করবো যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে অনবধান।'

এখানে 'নুনাজ্‌জি' শব্দটির অর্থ চড়া ভূমি বা উঁচু টিলা। শব্দটি এসেছে 'নাজওয়া' থেকে। 'নাজওয়া' অর্থও উচ্চস্থান। এখানে বলা হয়েছে, আজ আমি তোমার দেহকে উচ্চ স্থানে রাখবো। এ কথার অর্থ— হে ফেরাউন! তোমাকে সাগর সলিলে নিমজ্জিত করা হলো ও তোমার মরদেহকে আমি পানির নিচে অথবা পানির উপরে ভাসমান অবস্থায় রাখবো না। রাখবো কোনো উচ্চ ভূমিতে। 'যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো' কথাটির অর্থ— তোমার মৃত দেহকে আমি পচতে দেবো না। রেখে দেবো পরবর্তী সময়ের মানুষের জন্য নিদর্শন হিসেবে। এখানে 'বি বাদানিকা' অর্থ মৃতদেহ বা লাশ। অথবা শুধুই দেহ। কিংবা অনাবৃত শরীর। আবার কথাটির মাধ্যমে এমতো বক্তব্যও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আমি তোমাকে তোমার কোর্তাসহ পচনহীন অবস্থায় রেখে দিবো। উল্লেখ্য যে, ফেরাউনের একটি দামী পাথর বসানো সোনালী রঙের মহামূল্যবান কোর্তা ছিলো।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, ফেরাউনের দলবলকে চোখের সামনে সাগরে নিমজ্জিত হতে দেখেও বনী ইসরাইলেরা বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে, ফেরাউনের মৃত্যু ঘটেছে। দীর্ঘ দিন ধরে ফেরাউনের মহা প্রতাপ লক্ষ্য করে বনী ইসরাইলদের কারো কারো ধারণা জন্মেছিলো ফেরাউন অমর। তাই হজরত মুসা, তার সলিল সমাধি হওয়ার সংবাদ জানালেও তাদের মনে সন্দেহ থেকেই যায়। সেকারণেই তাদেরকে ফেরাউনের মরদেহ দেখানো হয়। সমুদ্রোপকূলের একটি উচ্চ স্থানে তারা ফেরাউনের মরদেহ দেখতে পায় এবং তাকে পরিষ্কাররূপে চিনতে পারে। তখন হজরত মুসার কথার উপরে তাদের পূর্ণ প্রত্যয় জন্মে। পরবর্তীদের

www.eelm.weebly.com

জন্য নিদর্শন হিসেবে ফেরাউনের লাশকে রেখে দেয়ার উদ্দেশ্য এই যে, এতে করে যেনো মানুষের নিকটে অতি সহজে প্রতিভাত হয়, আল্লাহ্পাক কিরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাধর এবং মানুষ কি রকম অক্ষম ও অসহায়।

শেষের কথাটি এই— 'অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে অনবধান।' এ কথার অর্থ— অধিকাংশ মানুষ বিস্মৃতি, বিভ্রান্তি এবং উদাসীনতায় নিমগ্ন। তাই আমার নিদর্শন সম্বন্ধে তাদের ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই।

সুরা ইউনুস : আয়াত ৯৩

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

❒ আমি বনি ইসরাঈলকে উৎকৃষ্ট আবাসভূমিতে বসবাস করাইলাম এবং আমি উহাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দিলাম, অতঃপর উহাদিগের নিকট জ্ঞান আসিলে উহারা বিভেদ সৃষ্টি করিল। উহারা যে বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিনে তাহার বিচার করিবেন।

এখানে মুবাওওয়াআ সিদ্কি্ন কথাটির অর্থ— উৎকৃষ্ট আবাস ভূমি। 'উৎকৃষ্ট আবাস ভূমি' বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে মিসর, জর্দান এবং ফিলিস্তিনের ওই সকল অঞ্চল, যে অঞ্চলগুলো আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধর-দেরকে দান করবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। জুহাক বলেছেন, এখানে উৎকৃষ্ট ভূমি বলে বুঝানো হয়েছে সিরিয়াকে। উৎকৃষ্ট আবাস ভূমির পর বলা হয়েছে উত্তম জীবনোপকরণ দানের কথা। আলোচ্য আয়াতের ভাষ্য শুরু হয়েছে এভাবে— 'আমি বনী ইসরাইলকে উৎকৃষ্ট আবাস ভূমিতে বসবাস করালাম এবং আমি তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দিলাম।'

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তাদের নিকট জ্ঞান এলে তারা বিভেদ সৃষ্টি করলো।' এ কথার অর্থ— যখন আখেরী পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. আবির্ভূত হলেন, তখন বনী ইসরাইলেরা (ইহুদীরা) দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেলো। কেউ কেউ তাঁকে মেনে নিলো। কিন্তু অধিকাংশই অহংকার ও হিংসাবশতঃ তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করলো। অথচ তারা বহুদিন ধরে রসুল স. এর আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলো। তওরাতে লিপিবদ্ধ তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করতো। অন্য ধর্মের লোকদেরকে এ কথাও বলতো যে, শেষ নবীর আগমন সমাসন্ন। আমরা অচিরেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদেরকে উচ্ছেদ করবো।

www.eelm.weebly.com

এখানে রসুল স.কেই সরাসরি ইলম বা জ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন 'খালাক' অর্থ মখলুক (সৃষ্টি)। আল্লাহ্পাক এক স্থানে এরশাদ করেছেন, 'হাজা খালকুল্লহি' (এটা আল্লাহ্র সৃষ্টি)। এরকমও হতে পারে যে, রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে ইহুদীরা ভালোভাবেই জানতো। তাই যাঁর সম্পর্কে তারা স্পষ্ট জ্ঞান রাখতো, সেই রসুল স.কেই এখানে বলা হয়েছে জ্বাআহুমুল ইল্ম (তাদের নিকট জ্ঞান এলে)।

শেষে বলা হয়েছে— তারা যে বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি করেছিলো, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তার বিচার করবেন। এ কথার অর্থ— আখেরী জামানার সত্য রসুল সম্পর্কে যে বিতর্ক ও বিসম্বাদ ইহুদীরা সৃষ্টি করেছে, সে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান করা হবে পরবর্তী পৃথিবীতে। তখন অনুগত ও অবাধ্য দল দু'টোকে চিরদিনের জন্য আলাদা করে দেয়া হবে। অনুগতদেরকে দান করা হবে চিরন্তন স্বস্তি। আর অবাধ্যদেরকে দেয়া হবে চিরকালিন শাস্তি।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭

فَاِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ مِّمَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○

❐ আমি তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি উহাতে যদি তুমি সন্দিগ্ধচিত্ত হও তবে তোমার পূর্বের কিতাব যাহারা পাঠ করে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর; তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার নিকট সত্যই আসিয়াছে। তুমি কখনও সন্দিগ্ধ-চিত্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না,

❐এবং তুমি কখনও, যাহারা আল্লাহের নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না— হইলে, তুমি ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

❐ যাহাদিগের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সত্য হইয়াছে তাহারা বিশ্বাস করিবে না,

❐ এমন কি, উহাদিগের নিকট প্রত্যেকটি নিদর্শন আসিলেও— যতক্ষণ না উহারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে।

---

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ে রসুল স.কে সম্বোধন করে সাধারণ মানুষকে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বক্তব্য শুরু করা হয়েছে এভাবে— 'আমি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তুমি সন্দিগ্ধচিত্ত হও, তবে তোমার পূর্বের কিতাব যারা পাঠ করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো; তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্যই এসেছে।' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! যদি আমার রসুল এবং আমার কোরআন সম্পর্কে তোমাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে তোমরা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সম্পর্কে যারা বিশেষজ্ঞ তাদেরকে জিজ্ঞেস করো। *তোমাদের নিকটে প্রেরিত রসুল ও অবতীর্ণ কোরআন অবশ্যই সত্য।*

জ্ঞাতব্যঃ সম্মানিত গ্রন্থকার বলেছেন, 'কুনতা' কথাটির উদ্দেশ্য সাধারণ জনতা। কারণ রসুল স. এর উপরে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হতো। এভাবে যে সকল পবিত্র ব্যক্তিত্ববর্গের উপর প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়, তাঁরা সন্দেহ সংশয় থেকে চিরমুক্ত। যারা নবী নন, কেবল তাদের ক্ষেত্রেই সন্দেহের অপনোদনের অবকাশ রয়েছে। তাই এখানে প্রকাশ্যতঃ রসুল স.কে লক্ষ্য করে আয়াতে বক্তব্য পেশ করা হলেও সাধারণ জনতাই হচ্ছে আয়াতের লক্ষ্য। অর্থাৎ তাদেরকেই সন্দেহ নিরসনের জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও জুহাক বলেছেন, এখানে 'পূর্বের কিতাব যারা পাঠ করে' বলে বুঝানো হয়েছে, ওই সকল আহলে কিতাবকে, যারা ইসলাম গ্রহণ করে রসুল স. এর বিশিষ্ট সাহাবী বলে গণ্য হয়েছিলেন। অর্থাৎ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, রসুল স. এর সময়ে ছিলো তিন ধরনের মানুষ— ইমানদার, কাফের ও সন্দিগ্ধচিত্ত। আলোচ্য আয়াতে রসুল স.কে সম্বোধনের মাধ্যমে সন্দিগ্ধচিত্ত জনতাকে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্যের মধ্যে এখানে একটি প্রচ্ছন্ন ধর্মীয় বিধানও রয়েছে। সে বিধানটি হচ্ছে— ধর্মীয় বিষয়ে সংশয়-সন্দেহ উপস্থিত হলে শরণাপন্ন হতে হবে আলেম বা জ্ঞানীদের।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে রসুল স. এর নিঃসন্দিগ্ধতা প্রকাশার্থেই সোজাসুজি তাঁকে উদ্দেশ্য করে এ রকম বলা হয়েছে। অর্থাৎ আয়াতের বক্তব্যভঙ্গিটি এখানে এ রকম— হে আমার রসুল! যদি আপনি আপনার উপরে অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন তবে কিতাব বিশেষজ্ঞদের নিকটে জিজ্ঞেস করুন। কিন্তু আমি জানি, আপনি তা করবেন না। কেন করবেন? আপনি তো আমার নিকট থেকে প্রত্যাদেশ লাভ করেন, যে প্রত্যাদেশ সংশয়-সন্দেহ থেকে চিরমুক্ত। আবদুর রাজ্জাক ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, বিশ্বস্তসূত্রে আমি জানতে পেরেছি, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. বলেছিলেন, আমি সন্দেহপোষণকারী নই। আর কোনো কিছু জানার জন্য আমাকে কারো নিকটে কিছু জিজ্ঞেস করতেও হয় না।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে রসুল স. এর মাধ্যমে আসলে সম্বোধন করা হয়েছে সন্দেহবাদীদেরকে। আরবী ভাষায় এই নিয়মটি প্রচলিত। অন্যান্য ভাষাতেও এ রকম রীতি রয়েছে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতেও রীতিটির দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যেমন, 'ইয়া আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ইত্তাক্বিল্লাহ্ (হে নবী! আল্লাহ্কে ভয় করুন)। এখানে সরাসরি নবীকে উদ্দেশ্য করা হলেও নির্দেশটি আসলে অন্যান্য ইমানদারদের প্রতি প্রযোজ্য। কারণ আল্লাহ্র ভয় নবীদের সত্তাসম্পৃক্ত একটি বিষয়। সুতরাং নবীর প্রতি আল্লাহ্কে ভয় করার নির্দেশদানের প্রয়োজন পড়ে না। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— ইন্নাল্লহা কানা বিমা তা'মালূনা খাবীর (তোমরা যা কিছু করবে, আল্লাহ্পাক তার খবর জানেন)। এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে একটি দলকে। অন্য এক আয়াতে এসেছে— ইয়া আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ইজা তাল্লাক্তুমুন্ নিসাআ (হে নবী! যখন আপনি ওই মহিলাদেরকে তালাক দিবেন)। এখানেও রসুল স.কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু তালাক সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে মুমিনদেরকে।

ফাররা বলেছেন, আল্লাহ্পাক তো জানেনই যে, তাঁর রসুল অক্ষয় ও অব্যয় বিশ্বাস এবং প্রজ্ঞার অধিকারী। তাই আরবী ভাষার নিয়মানুসারে এখানে তিনি তরজে কালামের রীতি প্রয়োগ করেছেন। দৃষ্টান্তটি এ রকম— কেউ তার ক্রীতদাসকে বললো, 'তুমি যদি আমার গোলাম হও তবে আমার নির্দেশ অনুসরণ করো।' অথবা কেউ তার আপন পুত্রকে বললো, 'তুমি যদি আমার পুত্র হও, তা হলে তোমাকে অবশ্যই এ কাজ করতে হবে।' এ সকল ক্ষেত্রে কেউ বলতে পারবে না যে, কেউ তার ক্রীতদাস এবং আপন পুত্রকে ক্রীতদাস ও পুত্র হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। আলোচ্য আয়াতের সম্বোধন রীতিটিও সে রকম।

শেষে বলা হয়েছে— 'তুমি কখনো সন্দিগ্ধচিত্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তো অতি অবশ্যই সন্দিগ্ধচিত্ত নন। কখনো এ রকম হবেনও না। কিন্তু আপনার অনুসারীদের মধ্যে কেউ কেউ এ রকম বিপদে পড়তে পারে। সুতরাং তাদেরকে আপনি রক্ষা করুন। তাদেরকেও সন্দিগ্ধচিত্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে দিবেন না। পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'এবং তুমি কখনো যারা আল্লাহ্র নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' এই আয়াতেও পূর্বের আয়াতের মতো রসুল স.কে লক্ষ্য করে সন্দেহবাদীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। এ রকম সতর্কবাণীর দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন— ফালা তাকুনান্না জাহিরান লিল্কাফিরীন (সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকুন)।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৯৬) বলা হয়েছে— 'যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতি-পালকের বাক্য সত্য হয়েছে তারা বিশ্বাস করবে না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, যারা চিরভ্রষ্ট, মহা ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞানানুসারে চিরস্থায়ী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরূপে যারা চিহ্নিত ও নির্ধারিত, তারা কখনোই ইমান আনবে না।

এখানে 'কালিমাতু রব্বি' (তোমার প্রতিপালকের বাক্য) কথাটির অর্থ চিরন্তন নির্ধারণ। হজরত মুসলিম বিন ইয়াসার থেকে মালেক, তিরমিজি ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ওমরকে 'ওয়া ইজ আখাজা রব্বুকা মিম্ বানী আদামা মিন্ জুহুরিহিম জুর্‌রিয়াতাহুম' এই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো। তিনি বললেন, আমিও এ বিষয়ে রসুল স.কে প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে তিনি স. বলেছিলেন, আল্লাহ্‌পাক আদমকে সৃষ্টি করলেন। তারপর তাঁর পৃষ্ঠদেশের উপর তাঁর অলৌকিক হস্ত স্পর্শ করলেন। তখন সমুদ্ভাসিত হলো আদমের অনাগত বংশধরের একটি দল। আল্লাহ্ বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি। পৃথিবীতে এরা জান্নাতবাসীদের মতোই আমল করবে। এরপর আল্লাহ্ পুনরায় আদমের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করলেন। এবার সমুদ্ভাসিত হলো আদমের অনাগত বংশধরদের আরেকটি দল। আল্লাহ্ বললেন, এদেরকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। পৃথিবীতে এরা জাহান্নামীদের মতোই কাজ করবে।

আবু নাসেরার মাধ্যমে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু আবদুল্লাহ্ বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তাঁর অলৌকিক ও আনুরূপ্যবিহীন দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলেন, এই মুঠোর মধ্যে যারা তারা জান্নাতী আর এই মুঠোর মধ্যে যারা তারা জাহান্নামী— আমি কারো পরওয়া করি না।

শেষোক্ত আয়াতে (৯৭) বলা হয়েছে— 'এমন কি তাদের নিকট প্রত্যেকটি নিদর্শন এলেও যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।' পূর্ববর্তী আয়াতের ধারাবাহিকতারূপে বিবৃত হয়েছে এই আয়াতটি। এভাবে আয়াতদ্বয়ের মিলিত বক্তব্য দাঁড়িয়েছে এ রকম— যারা আল্লাহ্‌তায়ালার অপার জ্ঞান ও সিদ্ধান্তানুসারে চিরভ্রষ্ট, তারা কখনোই ইমান আনবে না, প্রতিটি নিদর্শন প্রকাশিত হলেও, যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি অবলোকন করবে।

'হাত্তা ইয়ারাউল আ'জাবাল আ'লীম' অর্থ, যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। অর্থাৎ চিরভ্রষ্টরা যে সময়ে ইমান গ্রহণ করা হয় না ওই সময় ইমান আনবে। যেমন মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলে অথবা কবরের আযাব শুরু হলে কিংবা মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান দিবস ইত্যাদি চাক্ষুষ করলে। ফেরাউনও এ রকম করেছিলো। জান কবজের সময় চিৎকার করে তার ইমানের ঘোষণা দিয়েছিলো। কিন্তু সে ঘোষণা কোনো কাজে আসেনি।

www.eelm.weebly.com

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا

عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ○

❑ ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোন জনপদ-বাসী ছিল না যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল এবং তাহাদিগের বিশ্বাসের দ্বারা উপকৃত হইয়াছিল। তাহারা যখন বিশ্বাস করিল তখন আমি তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে হীনতাজনক শাস্তি হইতে মুক্ত করিলাম এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিলাম।

হজরত ইউনুসের সম্প্রদায়ের তওবা গৃহীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। সঠিক সময়ে তওবা করেছিলো তারা। অন্যান্য নবীর অবাধ্য সম্প্রদায়গুলো এ রকম করেনি, অর্থাৎ আযাব প্রকাশিত হওয়ার আগে তারা তওবা করেনি, তাই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। ফেরাউনও ছিলো এমনি দুর্ভাগা, যে যথাসময়ে তওবা করেনি।

প্রথমেই বলা হয়েছে—'ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোনো জনপদবাসী ছিলো না যারা বিশ্বাসের দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলো।' হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, মৃত্যুকষ্ট শুরু না হওয়া পর্যন্ত তওবা কবুল করা হয়। তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, হাকেম ও বায়হাকী।

হজরত আবু জর গিফারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করে দেন যতক্ষণ পর্যন্ত আবরণ না পড়ে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আবরণ আবার কি? তিনি স. বললেন, অংশীবাদী অবস্থায় মৃত্যুবরণ। আহমদ, বায়হাকী।

আয়াতের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে 'লাওলা' শব্দটি। শব্দটি উৎসাহবাচক অব্যয়। আর এই উৎসাহব্যঞ্জকতাটি এখানে সম্পৃক্ত হয়েছে ইল্লা ক্বওমা ইউনুসা (ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত) কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্য দাঁড়িয়েছে এ রকম— কেবল হজরত ইউনুসের সম্প্রদায় যথাসময়ে অর্থাৎ আযাব প্রকাশিত হওয়ার পূর্বক্ষণে তওবা করতে পেরেছিলো। তাই সে তওবা তাদের উপকারে এসেছিলো। আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন এবং নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন প্রায় অবধারিত আযাব থেকে। এভাবে পৃথিবী ও আখেরাত উভয় জগতের আযাব থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছিলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যখন বিশ্বাস করলো, তখন আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে হীনতাজনক শাস্তি থেকে মুক্ত করলাম এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।' এখানে 'লাম্মা আ'মানু' অর্থ যখন তারা বিশ্বাস

www.eelm.weebly.com

করলো । জননী আয়েশা থেকে ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করার পর বলেছিলেন, তারা আযাব আসার পূর্বেই ইমান গ্রহণ করেছিলো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলো। 'কাশাফ্‌না আ'নহুম আ'জাবাল খিজ্‌ই ফিল্‌ হায়াতিদ্‌দুন্‌ ইয়া' অর্থ— তখন আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে অপমানজনক শাস্তি থেকে মুক্ত করলাম। 'ফামাত্‌তা' নাহুম ইলা হীন' অর্থ— মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে আমি পৃথিবীর জীবন উপভোগ করার অবকাশ দিলাম।

বাগবী লিখেছেন, অতীতের সকল অবাধ্য উম্মত পৃথিবীতেই শাস্তি ভোগ করেছিলো, তওবা ব্যতিরেকেই মৃত্যুবরণ করেছিলো। কেবল হজরত ইউনুসের অবাধ্য উম্মতেরা শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলো। তারা শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার আগেই বিশুদ্ধচিত্তে তওবা করেছিলো। তাই আসন্ন আযাব থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলো। এ সম্পর্কে আলেমগণের দু'টি মত রয়েছে। একটি হচ্ছে, হজরত ইউনুসের উম্মত আযাব প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে ইমান এনেছিলো। আরেকটি হচ্ছে— তারা আযাবের কিছু আলামত দেখেছিলো মাত্র, আযাব দেখেনি। অধিকাংশ আলেম প্রথমোক্ত মতটিকেই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছেন। কারণ এখানে বলা হয়েছে— 'কাশ্‌শাফনা আ'নহুম আ'জাবাল খিজই।' বাগবী আরো বলেছেন, আযাব শুরু হওয়ার পর ক্ষমাপ্রার্থনা, তওবা অথবা ইমান— কোনোটাই গৃহীত হয় না। কিন্তু হজরত ইউনুসের উম্মতের ঘটনাটি একটি ব্যতিক্রম। আযাব দেখার পরে তারা তওবা করা সত্ত্বেও কেবল তাদের তওবা কবুল করা হয়েছিলো।

প্রকৃত কথা এই যে, জান কবজের সময় মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখার পর ইমান আনলে সে ইমান আর গ্রহণ করা হয় না। কারণ ওই আযাব আখেরাতের আযাব। কিন্তু দুনিয়ার আযাব দেখে ইমান আনলে সে ইমান গ্রহণ করা হয়। লক্ষ্যণীয় যে, বদর যুদ্ধের সময় হত্যা ও বন্দীত্বের রূপে অংশীবাদীদের উপর আযাব অবতীর্ণ হয়েছিলো। যারা বন্দী হয়েছিলো তাদেরকে পরে মুক্ত করে দেয়া হয়েছিলো এবং তাদের ইমানও গ্রহণ করা হয়েছিলো। হজরত ইউনুসের সম্প্রদায়ের ঘটনাটিও ছিলো এ রকম। তারাও পার্থিব শাস্তি শুরু হওয়ার সাথে সাথে অর্থাৎ আখেরাতের শাস্তি শুরু হওয়ার পূর্বে ইমান এনেছিলো। তাই দুনিয়ার শাস্তি থেকে আল্লাহ্‌ তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আর ফেরাউনের ইমান গৃহীত না হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে ইমান এনেছিলো আখেরাতের আযাব শুরু হওয়ার পর। তার ইমান গ্রহণ না করার আরো একটি কারণ এই হতে পারে যে, আল্লাহ্‌পাক হয়তো জানতেন তার ইমানী স্বীকৃতি ছিলো মৌখিক, আন্তরিক নয়। তা ছাড়া হজরত মুসা তার কুফরী অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার জন্য বদ্‌দোয়া করেছিলেন। তার দোয়া কবুলও হয়েছিলো। তাই এ কথা নিশ্চিত যে, ফেরাউন

www.eelm.weebly.com

অন্তর থেকে ইমান আনেনি। আর এটা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের সহজাত স্বভাবে পরিণত হয়েছিলো যে, আযাব এলেই তারা হজরত মুসার নিকটে হাজির হয়ে বলতো, হে মুসা! দোয়া করে আমাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে দাও। তাহলে আমরা ইমান আনবো এবং বনী ইসরাইলদেরকে তোমার সঙ্গে চলে যেতে দিবো। বহুবার তারা এ রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো এবং ভঙ্গও করেছিলো। অতএব এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ফেরাউনের ইমানের স্বীকৃতিটি ছিলো মৌখিক, আন্তরিক নয়। মৃত্যু কষ্টের মাধ্যমে আখেরাতের আযাব শুরু হয়ে গেলে ইমান কবুল না হওয়ার বিষয়ে সুরা নিসার একটি আয়াতের তাফসীরে আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে— ইন্নামাত্ তাওবাতু আ'লাল্লহি লিল্লাজীনা ইয়া'মালুনাস্ সূয়া বিজ্বাহালাতিন (যারা ভুলে অন্যায় কাজ করে আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন)।

হজরত ইউনুসের কাহিনীঃ হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও হজরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ প্রমুখ থেকে বাগবী লিখেছেন— হজরত ইউনুসের সম্প্রদায় বসবাস করতো মোসেল বন্দরের সন্নিকটে নিনুয়া নামক অঞ্চলে। তারা ছিলো মুশরিক। আল্লাহ্পাক তাদের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করলেন হজরত ইউনুসকে। হজরত ইউনুস তাদেরকে সত্যের প্রতি আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তারা এ শুভ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলো। দীর্ঘদিন অবকাশদানের পর আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় নবী হজরত ইউনুসকে প্রত্যাদেশ করলেন, হে আমার নবী! অবাধ্যদেরকে বলে দাও, তিন দিন পর সকালে তোমাদের উপর অবতীর্ণ হবে আযাব। লোকেরা তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করলো, ইউনুস তো কখনো মিথ্যা কথা বলেনি। সুতরাং অতিগুরুত্বের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলো তারা। বললো, তিনদিন পূরণ হওয়ার আগের রাতে যদি দেখো ইউনুস আমাদের সঙ্গে রয়েছে, তবে বুঝতে হবে, সকালে কিছু হবে না। আর যদি দেখো রাতের মধ্যেই সে অন্য কোথাও গমন করেছে, তবে বুঝতে পারবে, পরদিন সকালে অবশ্যই আযাব নেমে আসবে। কথিত আযাব অবতীর্ণ হওয়ার আগের রাতে, রাত দুপুর হওয়ার আগেই হজরত ইউনুস তাঁর লোকালয় ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। সকাল হতেই লোকেরা দেখলো ভয়াবহ আযাব শুরু হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ওয়াহাবের বর্ণনায় এসেছে, একটি ঘোর কালো বিশাল অন্ধকার চারিদিকে ঘিরে ফেলেছে। ধীরে ধীরে গ্রাস করতে চলেছে সমস্ত শহর। গৃহের ছাদগুলোতে চেপে বসেছে চাপ চাপ অন্ধকার। শহরবাসীরা বুঝলো, ধ্বংস ছাড়া সামনে আর কিছুই নেই। ব্যস্তসমস্ত হয়ে হজরত ইউনুসকে খুঁজতে শুরু করলো তারা। কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া গেলো না। আল্লাহ্পাক তাদের অন্তরে খাঁটি তওবার ইচ্ছা প্রবল করে দিলেন। শহরের সকল পুরুষ-নারী, তাদের সকল

www.eelm.weebly.com

চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার-সহ শহরের বাইরে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে একত্রিত হলো। পরিধান করলো সংসারবিরাগীদের পোশাক। মা ও শিশুদেরকে করে ফেললো আলাদা।

এমনকি পশুগুলোকেও তাদের শাবক থেকে আলাদা করে ফেললো তারা। এ রকম করার ফলে মানব শিশু ও পশু শাবকেরা উচ্চ কণ্ঠে কাঁদতে শুরু করলো। তাদের মায়েরাও কাঁদতে শুরু করলো অঝোর ধারায়। পুরুষেরাও কাঁদতে শুরু করলো ডুকরে ডুকরে। আহাজারি ও বিলাপে ভারী হয়ে গেলো বাতাস। এভাবে একটানা কেঁদে কেঁদে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করলো আল্লাহ্পাকের মহান দরবারে। এই বলে বার বার ঘোষণা করতে লাগলো যে, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমরা এখন অনুতপ্ত ইমানদার। দয়া করে আমাদেরকে ক্ষমা করো। আল্লাহ্পাক তাদের বিশুদ্ধ অনুতাপ ও ইমান গ্রহণ করলেন। ক্ষমা করলেন তাঁদেরকে। ধীরে ধীরে অপসারিত হলো ভয়াবহ ও বিশাল আঁধার। ঘটনাটি ঘটেছিলো দশই মহররমে। ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মুনজির ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, হজরত ইউনুসের সম্প্রদায় বসবাস করতো নিনুয়া অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ শহরে। আল্লাহ্ তাদের আন্তরিক অনুতাপকে গ্রহণ করেছিলেন। অপসারিত করে দিয়েছিলেন প্রায় অবতীর্ণ আযাবকে।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, হজরত ইউনুসের সম্প্রদায়ের তওবা কবুল হয়েছিলো আশুরার দিন। শহরবাসীরা তখন সকলেই শহরের বাইরে চলে গিয়েছিলো। আযাবের স্থানে অবস্থান সমীচীন নয় বলে হজরত ইউনুস রাতের মধ্যেই শহর ছেড়ে চলে গেলেন। পরদিন জানতে পারলেন, আযাব শুরু হওয়ার উপক্রম হলেও শেষ পর্যন্ত আর আযাব আসেনি। হজরত ইউনুস ভাবলেন, এখন কোন মুখে আমি শহরে ফিরে যাবো। লোকেরা ভাববে, আমি মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদীকে হত্যা করাই ছিলো তখনকার রীতি। হজরত ইউনুস তাই ভাবলেন, এখন শহরে ফিরে গেলে মৃত্যু নিশ্চিত। তিনি বিষণ্ন চিত্তে অন্য দেশের দিকে রওয়ানা হলেন। পথ চলতে চলতে পৌঁছলেন এক সমুদ্রের তীরে। দেখলেন, ঘাটে বাধা একটি নৌকায় যাত্রীরা উঠে বসেছে। তাঁকে দেখে যাত্রীরা নৌকায় উঠতে বললো। তিনি নৌকায় উঠলেন। নৌকা চলতে শুরু করলো। কিন্তু থেমে গেলো মাঝ দরিয়ায় এসে। মাঝিরা ও যাত্রীরা শত চেষ্টা করেও সেখান থেকে নৌকাটিকে নড়াতে পারলো না। নৌকার মালিক বললো, এভাবে নৌকা আটকে যাওয়ার কোনো কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে। হজরত ইউনুস বললেন, কারণটি আমি জানি। নৌকার আরোহীদের মধ্যে রয়েছে পাপিষ্ঠ কোনো ব্যক্তি। যাত্রীরা বললো, কে সে? হজরত ইউনুস বললেন, আমি। আমাকে তোমরা সমুদ্রে ফেলে দাও। তারা বললো, বিনা প্রমাণে আমরা এ রকম করবো কেনো? তার চেয়ে লটারী করা হোক। যার নাম লটারীতে উঠবে, তাকেই আমরা চিহ্নিত

www.eelm.weebly.com

করবো পাপিষ্ঠ বলে। একে একে তিনবার লটারী করা হলো। তিনবারই লটারীতে উঠলো হজরত ইউনুসের নাম। হজরত ইউনুস বললেন, এবার আমাকে ফেলে দাও। নতুবা তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। নৌকার মালিক, মাঝি ও যাত্রীরা নিরুপায় হয়ে হজরত ইউনুসকে নিক্ষেপ করলো সমুদ্র তরঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে নৌকা চলতে শুরু করলো। একটি বিশাল মৎস্য মুখ ব্যাদান করে অপেক্ষা করছিলো হজরত ইউনুসের জন্য। হজরত ইউনুস গিয়ে পড়লেন ওই মাছের মুখে। মাছটি সঙ্গে সঙ্গে হজরত ইউনুসকে গিলে ফেললো এবং চলে গেলো সমুদ্রের গভীর তলদেশে। এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্পাকের নির্দেশে একটি বিশাল আকৃতির মাছ নৌকাটিকে থামিয়ে দিলো। যাত্রীরা সবিস্ময়ে দেখলো, বিরাট পাহাড়ের মতো মাছটি মুখ হাঁ করে রয়েছে। মনে হচ্ছিলো মাছটি যেনো কাকে অনুসন্ধান করছে। হজরত ইউনুস এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মাছটির দিকে। তাঁর মনে হলো মাছটি যেনো তাঁকেই চায়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ইউনুস তাঁর সম্প্রদায়ের উপর অতুষ্ট হয়ে অন্য দেশে যাত্রা শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতে উপস্থিত হলেন পারস্য উপসাগরের পাড়ে। দেখলেন, যাত্রী ভর্তি একটি নৌকা ছাড়বো ছাড়বো করছে। তিনিও নৌকায় উঠে বসলেন। একটু পরে নৌকা ছেড়ে দেয়া হলো। তটভূমি থেকে অনেক দূরে এক স্থানে যেয়ে নৌকা থেমে গেলো। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখলো নৌকাটি আস্তে আস্তে ডুবতে শুরু করেছে। মাঝি বললো, নিশ্চয়ই এখানে কোনো গোনাহ্গার লোক রয়েছে অথবা রয়েছে কোনো পলাতক ক্রীতদাস। তাই আমাদের এই দুরবস্থা। এখন যে কোনো একজনকে পানিতে ফেলে দিতেই হবে। না হলে সকলকে ডুবে মরতে হবে এখানে। কেউ যখন অপরাধ স্বীকার করলো না, তখন মাঝি বললো আমাদের জন্য লটারী করাই উত্তম। লটারীতে যার নাম উঠবে তাকেই ফেলে দিতে হবে নৌকা থেকে। তিনবার লটারী করা হলো। তিনবারই উঠলো হজরত ইউনুসের নাম। হজরত ইউনুস দাঁড়ালেন। বললেন, আমিই সেই গোনাহ্গার ব্যক্তি। আমিই পলাতক গোলাম। এ কথা বলেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সাগরের উত্তাল তরঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে একটি মাছ এসে তাঁকে গিলে ফেললো। একটু পরেই আরো একটি বড় মাছ ওই মাছটিকে গ্রাস করলো। মাছটি বললো, আমি আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত। আমাকে বলা হয়েছে, হে সমুদ্রের মৎস! ইউনুস তোমার রিজিক নয়। তোমার উদরকে আমি তার জন্য বানালাম বন্দীশালা। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, মাছটি বললো, আল্লাহ্পাক আমার উদরে হেফাজতে রাখতে বলেছেন নবী ইউনুসকে। বলেছেন, আমার উদর এখন তাঁর উপাসনালয়। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, লটারী শুরু হওয়ার আগেই হজরত ইউনুস দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন, আমিই পাপাচারী। আমিই পলায়নপর দাস। যাত্রীরা বললো, আপনার পরিচয়? হজরত ইউনুস বললেন, ইউনুস ইবনে মাতা। কেউ কেউ বলে উঠলো, আপনি তো আল্লাহ্র নবী। আমরা আপনাকে পানিতে ফেলে দিতে পারি না। আপানি নিজে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, অপেক্ষমান মাছটি হজরত ইউনুসকে উদরস্থ করার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলো সাগরের গভীর তলদেশে। মৎস্য-উদরের অন্ধকার গহ্বরে বসে হজরত ইউনুস শুনতে পেলেন চতুর্দিকে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হচ্ছে আল্লাহ্পাকের পবিত্রতা ও মহিমা। তিনিও চিৎকার করে বলে উঠলেন, লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ্‌জলিমীন (তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তুমিই পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমি আত্মঅত্যাচারী)। চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলো এভাবে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী হজরত ইউনুসের ক্ষমাপ্রার্থনাকে গ্রহণ করলেন। আল্লাহ্পাকের নির্দেশে মাছটি তাঁকে উগলে দিলো একটি নির্জন বেলাভূমিতে। মৎস্য-উদরবাসী নবী ইউনুস এবার পেলেন মাটির আশ্রয়। তাঁর অবস্থা তখন পালকবিহীন পক্ষী শাবকের মতো। অসহ্য মনে হচ্ছিলো সূর্যের তাপ। হঠাৎ তিনি দেখলেন, একটি লাউ গাছ অঙ্কুরিত হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে পরিণত হলো একটি ছায়াময় মালঞ্চে। হজরত ইউনুস আশ্রয় নিলেন ওই লাউ গাছটির ছায়ায়। এরপর অকস্মাৎ সেখানে এলো পাহাড়ী বকরী। তিনি ওই বকরীর দুধ পান করলেন। কিছুদিন কেটে গেলো এভাবে। লাউ গাছটি ধীরে ধীরে শুকিয়ে মরে গেলো। মৃত গাছটির দিকে তাকিয়ে হু হু করে কেঁদে ফেললেন হজরত ইউনুস। আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশ করলেন, হে আমার নবী! তুমি একটি গাছের শোকে কাঁদছো। অথচ তোমার সম্প্রদায়ের লক্ষাধিক লোকের বিপদ দেখে কাঁদোনি। তুমি তো চেয়েছিলে তারা ধ্বংস হোক। হজরত ইউনুস সেখান থেকে অন্যত্র যাত্রা করলেন। এক স্থানে দেখা হলো একজন ক্রীতদাসের সঙ্গে। তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কে? সে বললো, আমি নবী ইউনুসের সম্প্রদায়ভূত। হজরত ইউনুস বললেন। তুমি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে গেলে বোলো, আমি নবী ইউনুসের সাক্ষাৎ পেয়েছি। সে বললো, সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া এ রকম বললে আমাকে হত্যা করা হবে। হজরত ইউনুস বললেন, এখানকার মাটি ও বৃক্ষ আমার নবুয়তের সাক্ষ্য প্রদান করবে। ক্রীতদাসটি বললো, মাটি ও বৃক্ষকে সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দিন। হজরত ইউনুস বললেন, এই ক্রীতদাস যখন তোমাদেরকে সাক্ষ্য দিতে বলবে তখন তোমরা সত্য সাক্ষ্য দিয়ো। মাটি ও বৃক্ষ বললো, তাই করবো। ক্রীতদাস চলে গেলো। তাদের সম্প্রদায়ের শাসককে গিয়ে বললো, আমি নবী ইউনুসের দেখা পেয়েছি। শাসক বললো, তোমার কথার সত্যতা প্রমাণ করবে কে? ক্রীতদাস বললো, সেখানকার বৃক্ষ ও মাটি। আমার সঙ্গে কয়েকজনকে প্রেরণ করুন। তারা স্বকর্ণে শুনে আসবে বৃক্ষ ও মৃত্তিকার সাক্ষ্য। কয়েকজনকে নিয়ে ক্রীতদাস হাজির হলো নির্দিষ্ট স্থানে। বললো, হে মৃত্তিকা! হে বৃক্ষ! বলো, নবী ইউনুসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো কিনা? মৃত্তিকা ও বৃক্ষ বললো, হ্যাঁ। হয়েছিলো। আপন সম্প্রদায়ের লোকদের নিকটে ফিরে যাওয়ার পর সকলে তারা দেখা করলো শাসকের সঙ্গে। শাসক ক্রীতদাসের হাত চেপে ধরে বললো, এখন থেকে তুমিই আমাদের শাসক। তখন থেকে শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হলো ওই ক্রীতদাস। সে এই দায়িত্ব পালন করলো চল্লিশ বছর ধরে।

www.eelm.weebly.com

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۭ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى
يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَيَجْعَلُ
الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝ قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا
مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝
ثُمَّ نُنَجِّىْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

❐ তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলেই বিশ্বাস করিত, তবে কি তুমি বিশ্বাসী হইবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে?

❐ আল্লাহের অনুগত ব্যতীত বিশ্বাস করা কাহারও সাধ্য নহে এবং যাহারা অনুধাবন করে না আল্লাহ্ তাহাদিগকে কলুষলিপ্ত করেন।

❐ বল, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য কর।' নিদর্শনাবলী ও ভীতি-প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।

❐ উহারা উহাদিগের পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে উহার অনুরূপ ঘটনারই প্রতীক্ষা করে। বল, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদিগের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।'

❐ পরিশেষে, আমি আমার রসূলদিগকে উদ্ধার করি এবং এইভাবে বিশ্বাসীদিগকেও উদ্ধার করি। আমার দায়িত্ব বিশ্বাসীদিগকে উদ্ধার করা।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার প্রভুপ্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীবাসী সকলেই ইমান আনতো। কারণ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা কারো নেই। কিন্তু তিনি কাউকে ইমান গ্রহণে বাধ্য করেন না। তবে আপনি এ ব্যাপারে মানুষের উপরে জবরদস্তি করবেন কেনো?

বাতিল ফেরকার লোকেরা বলে, আল্লাহ্তায়ালা চান সকলেই ইমানদার হোক। কিন্তু অবিশ্বাসীরা ইমান আনতে চায় না। তারা ইচ্ছা ও অনুমোদনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তারা বলে ইচ্ছা অর্থ পছন্দ। সত্যপন্থী আশায়েরা সম্প্রদায়ের অভিমত হচ্ছে, সকলে ইমান আনুক আল্লাহ্পাক এটাই পছন্দ করেন, কিন্তু তাঁর

www.eelm.weebly.com

ইচ্ছা এ রকম নয়। তাই মানুষ আল্লাহ্‌র পছন্দের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার সাধ্য কারো নেই। অতএব সন্তোষ ও অভিপ্রায় কখনো এক নয়। পথভ্রষ্ট কাদরিয়া সম্প্রদায় বলে, সন্তোষ ও অভিপ্রায় একই। সন্তোষ ও অভিপ্রায় দু'টোই সাধারণ বিষয়। সুতরাং মানুষ আল্লাহ্‌র সন্তোষ বিরোধী যা কিছু করে তা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করে। কিন্তু এই আয়াত তাদের অভিমতের বিরুদ্ধে। এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে— আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকল মানুষ বিশ্বাস করতো, ইমান গ্রহণ করতে বাধ্য হতো। তবে হ্যাঁ, সকলের ইমান আনা আল্লাহ্‌র পছন্দ— অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুকূল কর্ম। —এ কথার প্রেক্ষিতে কাদরিয়ারা আবার বলে, এখানে কেবল আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কথাই বলা হয়েছে, কাউকে বাধ্য করার কথা বলা হয়নি। —এ কথাটিও ঠিক নয়। কারণ, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বাধ্যতামূলক। যদি তা না হয় তবে আল্লাহ্ যে ইচ্ছাময়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অসীম ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, তা প্রমাণ হবে কীভাবে? সৃষ্টি কী কখনো স্রষ্টার ইচ্ছাকে অতিক্রম করতে পারে?

'তবে কি তুমি বিশ্বাসী হবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে?' কথাটি একটি অস্বীকৃতিপ্রকাশক প্রশ্ন (ইস্তেফাহামে ইনকারী)। কথাটির অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কি তবে মানুষকে বিশ্বাসী হতে বাধ্য করবেন? আল্লাহ্ তো কাউকে বিশ্বাসী অথবা অবিশ্বাসী হতে বাধ্য করেন না। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা না করেন, তবে কারো পক্ষে ইচ্ছা করাও সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ্ ইচ্ছা প্রকাশ করার ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী। আর মানুষ সর্ববিষয়ে আল্লাহ্‌রই মুখাপেক্ষী। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি কেবল সকলকে সত্যের আহ্বান জানাতে থাকুন। এটাই আপনার কাজ। সত্য গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা আপনার দায়িত্বভূত নয়।

উল্লেখ্য যে, দয়ার রসুল স. চাইতেন সকল মানুষ ইমান গ্রহণ করে নিরাপদ হয়ে যাক আল্লাহ্‌র অসন্তোষ থেকে। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা সান্ত্বনা প্রদানার্থে অবতীর্ণ করেছেন আলোচ্য আয়াতটি। আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে, হে আমার রসুল! ইমান হচ্ছে হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত একটি বিষয়। ইমানের নিকটে আসতে হয় হৃদয়ের টানে। প্রেমভালোবাসা যেমন জোর জবরদস্তি করে হয় না, তেমনি ইমান ও দান করা শোভনীয় নয় জোর করে। তাই হে আমার রসুল! আপনি অকারণে পেরেশান হয়ে নিজের কষ্ট বাড়াবেন না। যারা সৌভাগ্যশালী তারা ইমান গ্রহণ করবেই। আর যারা দুর্ভাগা তারা রয়ে যাবে ইমানহীন। আল্লাহ্‌পাকের জ্ঞান অসীম ও আনুরূপ্যহীন। তাই তিনি ভালো করেই জানেন কারা সৌভাগ্যশালী এবং কারা সৌভাগ্যশালী নয়। আপনি আমার বাণীবাহক মাত্র। সুতরাং চির দুর্ভাগা যারা, তাদের জন্য ভেবে ভেবে আপনি ব্যাথা পাবেন কেনো?

পরের আয়াতে (১০০) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত বিশ্বাস করা কারো সাধ্য নয় এবং যারা অনুধাবন করে না আল্লাহ্ তাদেরকে কলুষলিপ্ত

www.eelm.weebly.com

করেন।' এখানে 'রিজসা' অর্থ কলুষ বা অপবিত্রতা অথবা আযাব কিংবা আল্লাহ্র সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়া। কলুষলিপ্ত করেন' অর্থ আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত করেন। আর যারা বঞ্চিত তারাই শাস্তির যোগ্য। এখানে 'লা ইয়া'ক্বিলুন' কথাটির অর্থ অনুধাবন করে না। অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ বুঝতে পারে না।

এর পরের আয়াতে (১০১) বলা হয়েছে— 'বলো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য করো। 'নিদর্শনাবলী ও ভীতিপ্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না'। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, দৃষ্টিপাত করো মহাকাশ ও পৃথিবীর দিকে। দৃষ্টিপাত করো চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রপুঞ্জ, পাহাড়, সমুদ্র, বৃক্ষরাজি, বহু প্রজাতির প্রাণীকুলের দিকে। এ সকল কিছুর মধ্যে রয়েছে মহাবিশ্বের মহাশক্তিশালী মহাস্রষ্টার অসংখ্য নিদর্শন। কিন্তু যারা চির অবিশ্বাসী তাদের জন্য তো নিদর্শন, নবী রসুলগণের মাধ্যমে ভয় প্রদর্শন— কোনো কিছুই কাজে আসে না। এখানে 'মা তুগনী' (উপকারে আসে না) কথাটির 'মা' নিবারণমূলক। অথবা অস্বীকৃতি প্রকাশক (ইসতেফহামে ইনকারী)।

'আন্নুজুর' (ভীতি প্রদর্শন) কথাটির অর্থ— নবী-রসুলগণের মাধ্যমে আল্লাহ্র শাস্তির ভীতি প্রদর্শন। এখানে কথাটির অর্থ মৃত্যুভীতিও হতে পারে। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত মানুষের মৃত্যু দর্শন কিংবা মৃত্যুভয়ও ইমান গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদেরকে কোনো উপকার প্রদান করেনা। এভাবে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্পাকের ইচ্ছার আনুকূল্য লাভ করলেই কেবল ইমানদার হওয়া যায়। আর এই আনুকূল্য না লাভ করলে শত সহস্র নিদর্শন দর্শন এবং ভীতি প্রদর্শন— কোনো কিছুই কাজে আসে না।

পরের আয়াতে (১০২) বলা হয়েছে— 'তারা তাদের পূর্বে যা ঘটেছে তার অনুরূপ ঘটনারই প্রতীক্ষা করে।' এখানে 'আইয়াম' কথাটির মর্মার্থ তিরস্কার ও পুরস্কার দু'টোই। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'জাক্কিরহুম বি আইয়ামিল্লাহি' (তাদেরকে কল্যাণ ও অকল্যাণ স্মরণ করিয়ে দাও)। এভাবে কল্যাণ অকল্যাণ দু'টোকেই একত্রে প্রকাশ করা হয় 'আইয়াম' শব্দটির মাধ্যমে। আইয়াম অর্থ এখানে— পূর্বে ভালো-মন্দ যা কিছু ঘটেছে। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ— হজরত নূহের সম্প্রদায়ের প্রতি এবং আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি যে সকল আযাব অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা ওইরূপ আয়াতের অপেক্ষাতেই রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমি তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আযাবের জন্য প্রতীক্ষমান

www.eelm.weebly.com

ওই সকল অবিশ্বাসীকে আপনি বলুন, তোমরা আমার ধ্বংসের জন্য যেমন প্রতীক্ষা করছো, তেমনি আমিও প্রতীক্ষা করছি তোমাদের ধ্বংসের জন্য।

এর পরের আয়াতে (১০৩) বলা হয়েছে— 'পরিশেষে আমি আমার রসুলদেরকে উদ্ধার করি এবং এভাবে বিশ্বাসীদেরকেও উদ্ধার করি। আমার দায়িত্ব বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করা।' এ কথার অর্থ— এটা আমার চিরন্তন প্রতিশ্রুত রীতি যে, আমি আমার বাণীবাহকবৃন্দকে এবং তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণকে উদ্ধার করি। সুতরাং শেষ রসুল মোহাম্মদ স. ও তাঁর একাগ্রচিত্ত অনুগামীদেরকেও আমি অবশ্যই রক্ষা করবো। তাদের প্রতি এটা আমার অনুগ্রহসিক্ত দায়িত্ব।

সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ১০৪, ১০৫, ১০৬

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

❐ বল, 'হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দ্বীনের প্রতি সংশয়যুক্ত হও তবে জানিয়া রাখ, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহার ইবাদত কর আমি তাহার ইবাদত করি না, পরন্তু আমি ইবাদত করি আল্লাহের যিনি তোমাদিগের মৃত্যু ঘটান এবং আমি বিশ্বাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি।'

❐ এবং তিনি বলেন, 'তুমি একনিষ্ঠভাবে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনই অংশীবাদিদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না,

❐ এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিবে না, যাহা তোমার উপকারও করে না, অপকারও করে না, কারণ ইহা করিলে তখন তুমি সীমালংঘনকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, ওহে লোক সকল! আমি যে সত্যের প্রতি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি সেই সত্যের প্রতি যদি তোমরা সন্দিহান হও, তবে এখনো সময় আছে সংশয়াচ্ছন্নতা থেকে

www.eelm.weebly.com

মুক্ত হতে চেষ্টা করো। জেনে রাখো, তোমরা যে সকল প্রতিমার উপাসনা করো, আমি সেগুলোকে মান্য করি না। কারণ কোনো প্রকার কল্যাণ অথবা অকল্যাণ নির্ধারণ করার ক্ষমতা ওগুলোর নেই। আমি উপাসনা করি ওই আল্লাহ্‌র, কল্যাণ ও অকল্যাণ যার মুখাপেক্ষী এবং যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান— তোমাদের। আমাদের। সকলের। সেই মহাশক্তিধর ও মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ই আমার আরাধ্য। তিনি আমাকে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদেশ করেছেন। তাই আমি সেই নির্ভুল প্রত্যাদেশের (কোরআনের) অনুসারী।

পরের আয়াতে (১০৫) বলা হয়েছে— 'এবং তিনি বলেন, তুমি একনিষ্ঠভাবে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনোই অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' এ কথার অর্থ— আমার প্রভুপ্রতিপালক আমাকে এমতো আদেশও করেছেন যে, তুমি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মাধিষ্টিত হও। বিশুদ্ধচিত্ততার সঙ্গে যথানিয়মে পালন করো ফরজ দায়িত্বসমূহ এবং বিরত থাকো নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে। এখানে 'আক্বিম' (প্রতিষ্ঠিত হও) কথাটির অর্থ 'কেবলামুখী হয়ে নামাজ পাঠ করো'— এ রকম হওয়াও সম্ভব।

এর পরের আয়াতে (১০৬) বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না, যা তোমার উপকারও করে না, অপকারও করে না। কারণ এ রকম করলে তখন তুমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' আলোচ্য আয়াতের মধ্যে চলে এসেছে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা। এভাবে পূর্ববর্তী আয়াতের 'কখনোই অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' কথাটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আলোচ্য আয়াতের 'এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না' কথাটি। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি তো আমারই বাণীবাহক। সুতরাং মানুষকে পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে এ কথাটি মনে রাখুন যে, অংশীবাদকে আশ্রয় করা এবং উপকার বা অপকার করতে পারে না, এ রকম কোনো পাষাণ মূর্তির নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করার অর্থ একক উপাস্য আল্লাহ্‌র হককে অবমাননা করা। এমতো অপকর্ম নিঃসন্দেহে সীমালংঘন। আর যারা এরূপ করে তারা অবশ্যই সীমালংঘনকারী।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ১০৭

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا
رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

❑ 'এবং আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত ইহা মোচনকারী আর কেহ নাই এবং আল্লাহ্ যদি তোমার মঙ্গল চাহেন তবে তাহা রদ করিবার কেহ নাই। তাঁহার দাসদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

www.eelm.weebly.com

এখানে 'মাস্‌সুন' অর্থ দেয়া বা পৌঁছে দেয়া। 'দ্বররিন' অর্থ ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, বিপদ ইত্যাদি। 'ফালা কাশিফা' অর্থ মোচনকারী কেউ নেই। 'খইর' অর্থ পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। এভাবে প্রথমেই বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই।' এ কথার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ক্লেশ মোচন যেহেতু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, তাই কল্যাণ প্রদান করাই আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র অভিপ্রায়। পরক্ষণেই বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ যদি তোমার মঙ্গল চান তবে তা রদ্ করবার কেউ নেই। এখানে মঙ্গল বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে 'ফজল' শব্দটি। এতে করে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌পাক যে মঙ্গল বা কল্যাণ প্রদান করেন তার সম্পূর্ণই তার অপার করুণা থেকে উৎসারিত। কারো কোনো অধিকার সেখানে নেই। অর্থাৎ ওই মঙ্গলের দাবিদার কেউ হতে পারে না। পরের বাক্যেই কথাটি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে এভাবে— 'তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকেই মঙ্গল দান করেন।' এ কথার অর্থ— কল্যাণ ও অকল্যাণ দু'টোই আল্লাহ্‌তায়ালার অধীন। তাই কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ধারণের নিরঙ্কুশ অধিকার কেবল তিনিই সংরক্ষণ করেন। অতএব মানুষের উচিত পূর্ণ সমর্পণের মাধ্যমে কল্যাণান্বেষী হওয়া। নিজের পুণ্যকর্মের উপর ভরসা না রাখা এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা থেকে নিরাশ না হওয়া। অর্থাৎ একই সঙ্গে হৃদয়ে জাগ্রত রাখা আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় ও আল্লাহ্‌র রহমতের আশা। হজরত আলী থেকে আবু নাঈম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বনী ইসরাইলের এক নবীকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করেছিলেন যে, তুমি তোমার উম্মতের পুণ্য কর্মশীলদেরকে জানিয়ে দাও, তারা যেনো কেবল তাদের আমলের উপর ভরসা করে বসে না থাকে। কিয়ামত দিবসে আমি যাকে আযাব দিতে ইচ্ছা করবো তার নিকট থেকে গ্রহণ করবো কঠোর হিসাব। আর তুমি তোমার পাপী উম্মতকে বলে দাও, তারা যেনো নিরাশ না হয়ে যায়। কারণ পুনরুত্থান দিবসে আমি অনেক বড় বড় পাপীকে ক্ষমা করে দিবো। স্বাধীন সিদ্ধান্তদাতা হিসেবে কারোর পরোয়াই আমি করবো না।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা এবং অন্য কারোর প্রতি নির্ভরশীল হওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাকের রোষ অপেক্ষা দয়া অগ্রগামী। তাই তিনি ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়াবান।

www.eelm.weebly.com

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۤءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝ وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝

❒ বল, 'হে মানুষ! তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের নিকট সত্য আসিয়াছে, সুতরাং যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজদিগেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে তাহারা তো পথভ্রষ্ট হইবে নিজদিগেরই ধ্বংসের জন্য এবং আমি তোমাদিগের কর্মবিধায়ক নহি।'

❒ তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হইয়াছে তুমি তাহার অনুসরণ কর এবং তুমি ধৈর্যধারণ কর যে-পর্যন্ত না আল্লাহের বিধান আসে এবং আল্লাহ্ই সর্বোত্তম বিধানকর্তা।

এখানে 'সত্য এসেছে' কথাটির অর্থ— এসেছে বিশুদ্ধ জ্ঞান। অর্থাৎ কোরআন মজীদ ও রসুল স. এর পবিত্র মুখনিসৃত বাণীর মাধ্যমে প্রকাশিত আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীসম্ভূত জ্ঞান এবং বিভিন্ন বিধানাবলী। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে 'সত্য এসেছে' কথাটির অর্থ হবে অবতীর্ণ হয়েছে কোরআন মজীদ অথবা প্রেরিত হয়েছেন রসুল স.। এভাবে সত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে ইমান না আনার কোনো অজুহাত আর অবশিষ্ট রাখা হয়নি। এখন যে কল্যাণানুগামী সে সত্যাশ্রয়ী এবং যে ভ্রষ্টতানুসারী সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে। আর আল্লাহ্তায়ালা পাপিষ্ঠদের কর্মনির্ণায়ক নন। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, হে পৃথিবীবাসী মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকটে এসেছে কোরআন ও হাদিসের সুষ্ঠু জ্ঞান। এখন যারা এ সুষ্ঠু ও সত্য জ্ঞানকে অবলম্বন করে সৎপথ ধরবে, সে নিশ্চিত করবে তার কল্যাণ এবং ধ্বংস ডেকে আনবে সে, যে চলবে বিপথে। তাদেরকে এ কথাও বলে দিন হে আমার রসুল! আমি ওই বিপথগামীদের কর্মনির্ধারক নই।

শেষ আয়াতে (১০৯) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করা হয়েছে তুমি তার অনুসরণ করো এবং তুমি ধৈর্যধারণ করো যে পর্যন্ত না আল্লাহ্র বিধান আসে এবং আল্লাহই সর্বোত্তম বিধানকর্তা।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল!

www.eelm.weebly.com

আপনি ওই প্রত্যাদেশের অনুসরণ করুন, যে প্রত্যাদেশ আমি অবতীর্ণ করেছি আপনার উপর। যথাযথরূপে সম্পাদন করুন প্রত্যাদেশিত আদেশ ও নিষেধ-সমূহ। আর আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অন্যান্য অত্যাচারের বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করুন— যে পর্যন্ত না আপনার উপরে অবতীর্ণ হয় জেহাদের নির্দেশ। আর আল্লাহ্ই সর্বোত্তম বিধানকর্তা। কারণ তিনি সকল দোষ-ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

ওয়াল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন— ওয়া সাল্লাল্লাহু আ'লা খইরি খলক্বিহি মোহাম্মাদিঁও ওয়া আলিহি ওয়া আস্হাবিহি আজ্মাঈন। আমিন।

পঞ্চম খণ্ড শেষ

www.eelm.weebly.com

একাদশ পারা

হে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্! তুমি ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য কেউই নেই। আমরা কেবল তোমারই পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করি। নিশ্চয় তুমি সকল প্রকার ত্রুটি থেকে চিরমুক্ত। আমরা শুধু তোমারই শরণ প্রার্থনা করি। মার্জনা প্রার্থনা করি কেবল তোমারই সকাশে। আমাদেরকে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করো। দান করো পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। আমাদেরকে ওই সকল মহাত্মাগণের দলভূত করো, যারা হাশর প্রান্তরে থাকবেন নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত। আমরা সাক্ষ্য ঘোষণা করি, তুমিই আমাদের এবং সমগ্র সৃষ্টির একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর। তোমার অপার করুণা-সলিলের জন্যই আমরা হৃদয়ে লালন করি অনন্ত তৃষ্ণা। আমরা আরো প্রার্থনা করি আমাদের প্রিয়তম অগ্রণী ও প্রাণসখা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজন, বংশধর ও শ্রদ্ধার্হ অনুচরবর্গের প্রতি মহাপ্রলয়ের দিবস পর্যন্ত বর্ষিত হোক তোমার বিশেষ রহমতের অনিঃশেষ প্রবাহ। শান্তি-স্রোতধারা। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

সুরা হূদঃ আয়াত ১, ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ

اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ

❒ আলিফ-লাম-রা, যিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ এই কিতাব তাঁহার নিকট হইতে; ইহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত করা হইয়াছে ও পরে বিশদভাবে বলা হইয়াছে যে,

❒ তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করিবে না, আমি তাঁহার পক্ষ হইতে তোমাদিগের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ-বাহক।

---

www.eelm.weebly.com

এই সুরার আয়াত সংখ্যা ১২৩। কেবল 'আক্বিমিস্ সলাতা তারফাই (শেষ পর্যন্ত)' আয়াতটি বাদে অন্য সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে— আলিফ লাম র। এই অক্ষরগুলোকে বলা হয় হরূফে মুক্বাত্তায়াত্ (বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি)। এই অক্ষরগুলোর প্রকৃত মর্ম চির রহস্যাচ্ছাদিত। এগুলোর জ্ঞান রাখেন কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয়তম রসুল। অতি নগণ্য সংখ্যক আলেমও অবশ্য এ বিষয়ে কিঞ্চিত জ্ঞান রাখেন। তাঁদেরকে বলা হয়েছে ওলামায়ে রসিখীন (জ্ঞানে সুগভীর)। এ সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়েছে প্রথম খণ্ডের ৩১ এবং চতুর্থ খন্ডের ৩৮১ পৃষ্ঠায়। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ এই কিতাব তাঁর নিকট থেকে।' একথার অর্থ, এই মহাগ্রন্থ আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে অতুলনীয় প্রজ্ঞাধিকারী ও সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে। সুতরাং এর মধ্যে সংশয়-সন্দেহ বলে কিছুই নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।' এখানে 'উহ্কিমাত' অর্থ সুস্পষ্ট, সুদৃঢ়, বলিষ্ঠ বা নয়নাভিরাম। মুক্তার মালার মতো সুগ্রথিত। অর্থাৎ এই পবিত্র গ্রন্থের বক্তব্য-বৈভব শব্দগত এবং মর্মগত অসংলগ্নতা ও সামঞ্জস্যহীনতা থেকে মুক্ত। 'সুস্পষ্ট' কথাটির অর্থ 'অরহিত'— এরকমও বলা যেতে পারে। কারণ, এই সুরার কোনো আয়াতই রহিত হয়নি। প্রকৃষ্ট দলিল প্রমাণাদি দ্বারা সুরা হুদের অথবা সমগ্র কিতাবের আয়াতসমূহকে সুস্পষ্ট বা বলিষ্ঠ করা হয়েছে— এরকমও বলা যেতে পারে। 'উহ্কিমাত' কথাটির আর একটি অর্থ হতে পারে সুবিন্যস্ত বা নৈপুণ্যমণ্ডিত। কারণ এই পবিত্র বাণীসম্ভারে রয়েছে প্রজ্ঞা ও কল্যাণের সুনিপুণ বিন্যাস।

'ফুস্সিলাত' কথাটির অর্থ— পৃথকরূপে। অর্থাৎ একত্রে গ্রথিত হওয়া সত্ত্বেও মুক্তার মালার প্রতিটি দানা যেমন পৃথকরূপে পরিদৃষ্ট হয়, কোরআনের নির্দেশনাসমূহও তেমনি পৃথক পৃথকরূপে পরিদৃশ্যমান। এভাবেই কোরআন মজীদে কখনো এসেছে বিশ্বাস্য বিষয় সমূহের বিবরণ। কোথাও এসেছে কর্তব্য কর্মসমূহের যথানির্দেশ। কোথাও উপদেশামৃত। আবার কোথাও প্রাসঙ্গিক ঘটনাপঞ্জী।

কোরআনের সুরাসমূহ পৃথক পৃথক স্বাতন্ত্র্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে, 'ফুস্সিলাত' কথাটির মর্ম এরকমও হতে পারে। অথবা অর্থ হতে পারে, কোরআনের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে পৃথক পৃথক সময়ে।

'ফুস্সিলাত' কথাটির আর একটি অর্থ, বিশদভাবে। অর্থাৎ মানুষের পরিশুদ্ধি ও পরিত্রাণের প্রয়োজনে এই মহাগ্রন্থে দেয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় কর্তব্যাকর্তব্যের সুবিশদ বিবরণ। 'বিশদভাবে বলা হয়েছে যে'— এতটুকু বলার পর পরবর্তী বক্তব্যটি উপস্থাপন করা হয়েছে পরের আয়াতে। অর্থাৎ ২ সংখ্যক আয়াতে।

 www.eelm.weebly.com

বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করবে না, আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ-বাহক।' এ কথার অর্থ — 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদত করবে না' এই মূল কথাটি কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিশদভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই হে মানুষ! আমার প্রিয়তম রসুল এই কোরআন ক্রমাগত প্রচার করে চলেছেন এবং তোমাদেরকে জানাচ্ছেন, আমি, একমাত্র উপাস্য সেই পরমতম সত্তার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ-বাহক।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৩, ৪

وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ۞ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۞

❐ আরও বলা হইয়াছে যে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদিগকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করিতে দিবেন এবং তিনি ধর্মাচরণে অধিক নিষ্ঠাবান প্রত্যেককে অধিক দান করিবেন; যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তবে আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করি মহা দিবসের শাস্তি।

❐ আল্লাহেরই নিকট তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

প্রথমে বলা হয়েছে—'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করো।' একথার অর্থ— এই সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত আয়াতবিশিষ্ট কোরআনে আরো বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকটে কৃত পাপ ও অবাধ্যতার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং বিশ্বাস ও আনুগত্যসহ তাঁর প্রতি ধাবিত হও। ফাররা বলেছেন, এখানে 'ছুম্মা' অব্যয়টি সাধারণ সংযোজক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত। আর তওবা (প্রত্যাবর্তন) এবং ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) শব্দ দু'টো সমার্থক।

এরপর বলা হয়েছে—'তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করতে দিবেন।' এখানে 'উত্তম জীবন' অর্থ নিরাপদ জীবন। কৃত পাপের কারণেই মানুষের উপরে বিপদাপদ আপতিত হয়। আল্লাহ্পাক অধিকাংশ পাপ মার্জনা করেন। তবুও কোনো কোনো পাপের কারণে মানুষের উপরে এসে পড়ে নৈসর্গিক বিপদ-মুসিবত। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে—'আর তোমাদের

www.eelm.weebly.com

উপর যে সকল দুর্বিপাক উপগত হয়, তা তোমাদেরই অর্জিত কৃতকর্মের প্রতিফল; আর তিনি তা বহুলাংশে মার্জনা করে দেন।' কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'মাতাআ'ন হাসানা' কথাটির অর্থ আল্লাহ্পাকের নির্ধারণের প্রতি প্রসন্নচিত্ত থাকা । অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার সকল সিদ্ধান্তে ধৈর্যধারণ করা। এরকম জীবনই উত্তম জীবন। যেহেতু মানুষের আয়ুষ্কাল সুনির্ধারিত, তাই এখানে 'আজ্বালিম্ মুসাম্মা' (নির্দিষ্ট কালের জন্য) কথাটির অর্থ হবে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং তিনি ধর্মাচরণে অধিক নিষ্ঠাবান প্রত্যেককে অধিক দান করবেন।' একথার অর্থ— যারা বিশুদ্ধচিত্ত ও ধর্মনিষ্ঠ, আল্লাহ্পাক তাদেরকে মর্যাদার স্তর অনুসারে প্রতিদান দিবেন। পার্থিব জীবনে দিবেন আত্মিক প্রশান্তি ও আল্লাহ্র স্মরণের আস্বাদ এবং পৃথিবী-পরবর্তী জীবনে দিবেন পুণ্যের প্রাচুর্য ও নৈকট্যভাজনতার মহিমা।

এরপর বলা হয়েছে—'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তি।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য ও উপাসনা থেকে সরে যাও, তবে আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি মহাপুনরুত্থান দিবসের শাস্তির। এখানে 'মহা দিবস' অর্থ সুদীর্ঘ পুনরুত্থান দিবস। হাশরের দিবস। যার সময়সীমা পঞ্চাশ হাজার বছর। ওই মহান দিবসে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য নির্ধারিত হবে অনন্ত শাস্তি। আর বিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত হবে অফুরন্ত কল্যাণ।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্রই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার প্রতি প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি সুনিশ্চিত। আর পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর পুরস্কার ও তিরস্কার সম্পূর্ণতই তাঁর পবিত্র অভিপ্রায়নির্ভর।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৫

أَلَآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

❑ সাবধান! উহারা তাঁহার নিকট গোপন রাখিবার জন্য উহাদিগের অন্তরের বিদ্বেষ গোপন রাখে। সাবধান! উহারা যখন উহাদিগের অভিসন্ধি গোপন করে তখন উহারা যাহা গোপন করে ও প্রকাশ করে তিনি তাহা জানেন, অন্তরে যাহা আছে তিনি তাহা সবিশেষ অবহিত।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম বোখারী লিখেছেন, কোনো কোনো মুসলমান অপ্রকাশ্য স্থানেও নিজেদেরকে অতিরিক্ত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত রাখতে পছন্দ করতেন। রমণীদের মুখোমুখী হতেও তারা লজ্জাবোধ করতেন।

www.eelm.weebly.com

তাঁদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে মোহাম্মদ বিন উব্বাদ বিন জাফরের মাধ্যমে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়েখ এবং ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।

ইবনে আবু মুলাইকা সূত্রে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজির লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াত পাঠ করার পর বলতেন, কোনো কোনো লোক বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়ে তাদের প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদন করতো। মহিলাদের সামনেও তারা নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত রাখতো। উন্মুক্ত পরিবেশে বস্ত্রবিবর্জিত শরীরে থাকাকে তারা ভালো মনে করতো না। তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ সূত্রে ইমাম বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কতিপয় মুনাফিকদেরকে লক্ষ্য করে। তারা রসুলেপাক স. এর পাশ দিয়ে গমনকালে নিজেদেরকে কাপড় দ্বারা আড়াল করার চেষ্টা করতো। আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ থেকে ইবনে জারীর ও আরো অনেকে অনুরূপ বর্ণনা এনেছেন। কিন্তু বর্ণনাটি অযথার্থ। কারণ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। আর মক্কায় কোনো মুনাফিক ছিলো না।

এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে— আলা ইন্নাহুম ইয়াছনুনা সুদুরাহুম লি ইয়াস্তাখফু মিনহু। একথার অর্থ— সাবধান! তারা তাঁর নিকট গোপন রাখবার জন্য তাদের অন্তরের বিদ্বেষ গোপন রাখে। এখানে 'মিনহু' (তাঁর) সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে রসুল স. এর সঙ্গে। আল্লাহ্র সঙ্গে নয়।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বক্তব্যরূপে বাগবী লিখেছেন, উদ্ধৃত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আখনাস ইবনে শুরাইককে লক্ষ্য করে। সে ছিলো মিষ্টভাষী ও সুদর্শন। রসুল স. সকাশে সে ছিলো মিষ্টভাষী। কিন্তু তার অন্তরে ছিলো বিদ্বেষ। এখানে 'ইয়াছনুনা সুদুরাহুম' কথাটির অর্থ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ গোপন রাখে।

কাতাদা বলেছেন, তারা তাদের বক্ষাভ্যন্তরকে সংকুচিত করে রাখতো। কোরআন মজীদের আয়াত কিছুতেই শুনতে চাইতো না তারা। সুদ্দী বলেছেন, 'ইয়াছনুনা' কথাটির অর্থ এখানে আন্তরিক উপেক্ষা প্রদর্শন করা। হৃদয়জ আর্তিকে অবদমিত করা। কিছু সংখ্যক অসমর্থিত সূত্রে এসেছে, কোনো কোনো লোক সারা শরীরে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে গর্বভরে বলতো, এখনো কি আল্লাহ্ আমাদের মনের কথা জানতে পারবে? তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

এরপর বলা হয়েছে— 'সাবধান! তারা যখন তাদের অভিসন্ধি গোপন করে তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে তিনি তা জানেন, অন্তরে যা আছে তিনি তা সবিশেষ অবহিত।' এখানে 'ইয়াছতাগ্ শুনা ছিয়াবাহুম' কথাটি একটি আরবী বাগধারা। এর শাব্দিক অর্থ বস্ত্রাবৃত হওয়া। আর প্রকৃত অর্থ, অভিসন্ধি

www.eelm.weebly.com

গোপন করা। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— আল্লাহ্‌-তায়ালা নিঃসন্দেহে দূরভিসন্ধিপ্রবণদের গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে জানেন। তাদের গোপন, প্রকাশ্য— সকল কিছুই আল্লাহ্‌র জ্ঞানায়ত্ত্ব। অন্তরের অন্তস্থলের অতীব গোপন ভাবনা সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত। তাই তিনি ইচ্ছে করলে তাঁর প্রিয় রসুলকে এবং তাঁর অনুগতদেরকে সতর্ক করণার্থে ওই সকল গোপন তথ্যাবলী সম্পর্কে যে কোনো সময় জানিয়ে দিতে পারেন।

www.eelm.weebly.com

দ্বাদশ পারা

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৬

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

❑ পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহেরই; তিনি উহাদিগের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।

'ওয়ামা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদ্বি ইল্লা আ'লাল্লহি রিযকুহা' অর্থ— পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকই পরম করুণাবশতঃ প্রয়োজনীয় রিজিক প্রদানের মাধ্যমে সকল প্রাণীর লালন ও পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এখানে 'আ'লাল্লহ্' কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, রিজিক বা জীবিকা অবশ্যই পৌছবে। তাই এ ব্যাপারে কেবল আল্লাহ্‌পাকের উপরেই নির্ভরশীল হওয়া উচিত। তাফসীরকারগণ বলেছেন, এখানে 'আ'লা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'মিন' অর্থে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকের জ্ঞানে রিজিকের যে বরাদ্দ রয়েছে, প্রাণীকুল তা অবশ্যই পাবে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে রিজিক পাওয়া সম্ভবই নয়। মুজাহিদ বলেছেন, রিজিক অর্থ ওই জীবনোপকরণ যা আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত। তিনি যখন রিজিক প্রদান বন্ধ করেন, তখনই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা মৃত্যুবরণ করে।

জ্ঞাতব্যঃ দাব্বাতুল আরদ্ব অর্থ চতুষ্পদ জন্তু। কিন্তু এখানে একথার মাধ্যমে সকল প্রাণীকুলকে বোঝানো হয়েছে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হলো— আল্লাহ্‌তায়ালা কোনো কিছু করতে বাধ্য নন। কিন্তু তিনি অবশ্য তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেন। যেমন, এখানে তিনি অঙ্গীকার প্রদান করেছেন রিজিকের। অন্যত্র অঙ্গীকার প্রদান করেছেন পুণ্যবানদের জান্নাত প্রদানের ইত্যাদি।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া ইয়া'লামু মুস্তাক্বার্রাহা ওয়া মুস্তাওদায়াহা' (তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত)। বাগবী লিখেছেন, ইবনে মুকসিম বলেছেন, 'মুস্তাক্বার্' অর্থ প্রাণীদের আবাসস্থল— এদিক ওদিক চলে গেলেও প্রাণীরা যে আবাসে ফিরে আসে । আর 'মুস্তাওদায়া' অর্থ সমাধি-স্থান। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'মুস্তাক্বার' অর্থ মাতৃ-জঠর এবং 'মুস্তাওদায়া' অর্থ পিতৃ-পৃষ্ঠ। সাঈদ ইবনে যোবায়ের, আলী বিন তালহা এবং ইকরামার বর্ণনানুসারে হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যও অনুরূপ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম হচ্ছে 'মুস্তাক্বার' এবং কবরসমূহ হচ্ছে 'মুস্তাওদায়া'। কারণ আল্লাহ্পাক জান্নাত সম্পর্কে বলেছেন— 'হাসুনাত মুস্তাক্বার্রা'। আর জাহান্নাম সম্পর্কে বলেছেন, 'সাআত্ মুস্তাক্বার্রা'।

এরপর বলা হয়েছে— কুল্লুন ফী কিতাবিম্ মুবীন (সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে)। একথার অর্থ— রিজিকসহ আদি অন্তের সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহফুজে। অথবা লেখক ফেরেশতাকুলের রোজনামচায়।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ সৃষ্টির ভাগ্যলিপি প্রস্তুত করেছেন তাদেরকে অস্তিত্বদানের পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে। তখন আল্লাহ্র আরশ বা সিংহাসন ছিলো পানির উপর।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের সৃষ্টির মৌল পদার্থ মাতৃজরায়ুতে বারিবিন্দুবৎ বিদ্যমান থাকে চল্লিশ দিন। পরের চল্লিশ দিনে ওই বিন্দুটি পরিণত হয় রক্তপিণ্ডে। এর পরের চল্লিশ দিনে তা ধারণ করে গোশ্তপিণ্ডের আকার। তখন আল্লাহ্ একজন ফেরেশতাকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন— আয়ুষ্কাল, কর্মকাণ্ড, জীবনোপকরণ এবং সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য।

হজরত আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেকের পাঁচটি বিষয় নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ— আয়ু, কর্ম, মৃত্যু, প্রভাব ও জীবিকা।

সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী আয়াত (৫) এবং এই আয়াতে আল্লাহ্পাক যে সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিধর— সে কথারই দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। একথাও বলে দেয়া হয়েছে, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে সুদৃঢ়। পরের আয়াতদ্বয়ে (৭ ও ৮) দেয়া হয়েছে তাঁর অতুলনীয় সৃজনক্ষমতা ও প্রজ্ঞাময়তার বিবরণ।

www.eelm.weebly.com

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى
الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ
مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○
وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰٓى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ
اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

❒ যখন তাঁহার আরশ্ পানির উপর ছিল তখন তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন তোমাদিগের মধ্যে কে আচরণে শ্রেষ্ঠ তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য। 'মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হইবে' তুমি ইহা বলিলেই সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারিগণ নিশ্চয় বলিবে 'ইহা স্পষ্টতঃ অলীক কল্পনা।'

❒ নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্য আমি যদি উহাদিগের শাস্তি স্থগিত রাখি তবে উহারা নিশ্চয় বলিবে, 'কিসে ইহা নিবারণ করিতেছে?' সাবধান! যেদিন উহাদিগের নিকট ইহা আসিবে সেদিন উহাদিগের নিকট হইতে উহা ফিরিবে না এবং যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

প্রথমেই বলা হয়েছে—'যখন তাঁর আরশ্ পানির উপরে ছিলো তখন তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন।' এখানে 'সামাওয়াত' অর্থ আকাশমণ্ডলী। আর 'আরদ্ব' পৃথিবী। আকাশকে বহুবচনে এবং পৃথিবীকে একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। এতে করে বুঝা যায় আকাশ অনেক। আর পৃথিবী মাত্র একটি। বাগবী লিখেছেন, পানি ছিলো বায়ুর কাঁধে ভর করে। কাআব আহবার বলেছেন, আল্লাহ্পাক সৃষ্টি করলেন একটি সবুজ ইয়াকুত। তার উপর তিনি রোষতপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। এতে প্রস্তরটি পরিণত হলো উদ্বেলিত সলিলে। অতঃপর আল্লাহ্পাক সৃষ্টি করলেন বায়ু। এরপর তার পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করলেন পানি। অনন্তর পানির উপর স্থাপন করলেন আরশে আজীম। জুমরাহ্ বলেছেন, আল্লাহ্পাকের সিংহাসন ছিলো পানির উপর। অতঃপর আল্লাহ্পাক সৃজন করলেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল। আরো সৃষ্টি করলেন কলম। অনন্তর তদ্দারা লিখে দিলেন ভবিষ্যতের ঘটিতব্য যাবতীয় বিষয়। আর ভবিষ্যতের সৃজিতব্য বস্তু। প্রতিটি বস্তু সৃজনের পূর্বে হাজার বছর ব্যাপী স্তব ও স্তুতি করেছিলো কলম। হজরত ইমরান বিন হোসাইন সূত্রে ইমাম বোখারী বর্ণনা করেন রসুল স. এরশাদ

www.eelm.weebly.com

করেছেন, আল্লাহ্‌পাকের সিংহাসন পানিতে স্থাপনের পূর্বে কোনো বস্তুরই অস্তিত্ব ছিলোনা। অতঃপর তিনি সৃজন করলেন আকাশ সমূহ ও পৃথিবী। আর স্মারকলিপিতে লিপিবদ্ধ করলেন যাবতীয় বিষয়। আল হাদিস। আরশ সম্পর্কিত হাদিস সমূহের কিয়দংশ সুরা বাকারার আয়াতুল কুরসির ব্যাখ্যায় পরিবেশিত হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে কে আচরণে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করবার জন্য।' একথার অর্থ—সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও এক বিচক্ষণ পরীক্ষকের মতো মানুষের আচরণ বা আমল পরীক্ষা করার নিমিত্তে আল্লাহ্‌পাক আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ পৃথিবীর কর্মকাণ্ডের উপরেই মানুষের জন্য নির্ধারণ করা হবে পুরস্কার অথবা তিরস্কার। একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, আকাশ ও পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিজড়িত রয়েছে মানুষের জীবন। মানুষের জন্যই এই বিশাল আয়োজন। সুতরাং মানুষেরা আল্লাহ্‌পাকের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হবে না কেনো? কেনো মানুষ ভেবে দেখবে না এই বিশাল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই কেউ রয়েছেন। আকাশ ও পৃথিবীর শত সহস্র নিদর্শন তো সেই একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৃজকের আনুরূপ্যবিহীন অস্তিত্বের প্রমাণ। এখানে 'ইয়াব্‌লুওয়াকুম' (পরীক্ষা করবার জন্য) কথাটির সম্পর্ক ঘটেছে 'খাল্‌ক' (সৃষ্টি করেন) কথাটির সঙ্গে। এভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টিই মানব সৃষ্টির উপলক্ষ। বরং মানুষের মধ্যে যারা বিশ্বাসী, তাদের সৃষ্টির উপলক্ষ। গভীরতর অর্থে মানবশ্রেষ্ঠ রসুল স. এবং তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামী পুণ্যবানদের সৃষ্টির উপলক্ষ।

'আহ্‌সানু আমালা' অর্থ— আচরণে শ্রেষ্ঠ। বিশ্বাসগত এবং শরীরগত উভয় প্রকার উপাসনাকে বুঝানো হয়েছে এই কথাটির মাধ্যমে। অপেক্ষাকৃত শিথিলসূত্রে ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রেই সম্ভবতঃ রসুল স. বলেছেন, 'আচরণে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ওই সকল বিচক্ষণ ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌তায়ালার নিষিদ্ধকৃত বস্তুসমূহ থেকে সর্বাধিক দূরত্বে অবস্থান করে। আর অতীব গুরুত্বসহকারে পালন করে আল্লাহ্‌র নির্দেশ সমূহ।' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ আচরণ হচ্ছে হৃদয়ের আচরণ। আর হৃদয়জ আচরণের মধ্যে সর্বোত্তম বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌প্রেম এবং আল্লাহ্‌-স্মরণের বিভোরতা। প্রকৃত কথা এই যে, গগনপুঞ্জ ও ভুবন সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো আহ্‌লুল্লাহ্‌ বা আল্লাহ্‌র পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করা। 'আহ্‌সান' (শ্রেষ্ঠ বা সুন্দর) কথাটির মধ্যে এই শিক্ষা নিহিত রয়েছে যে, প্রজ্ঞা ও কীর্তির ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উত্থান কাম্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হবে, তুমি এরকম বললেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ নিশ্চয় বলবে, এটা স্পষ্টতঃ অলীক কল্পনা।' এ

www.eelm.weebly.com

কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি যদি অংশীবাদকে আশ্রয়কারী জনতাকে বলেন, কোরআনে বর্ণিত মৃত্যু-উত্তর পুনরুত্থান নিশ্চিত, তবে তারা নিশ্চয় বলবে, এটা তো সুস্পষ্ট অলীক কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছে, 'মানুষের হিসাব নিকাশের দিবস সন্নিকটবর্তী'— এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে কেউ কেউ বলতে শুরু করলো, হাশরের দিবস তাহলে এসেই পড়লো। আবার কেউ কেউ ভয়ে অসৎকর্মসমূহ পরিত্যাগ করলো। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই পুনরায় লিপ্ত হয়ে পড়লো পাপাচরণে। এরপর অবতীর্ণ হলো 'আল্লাহ্র আদেশ এসে পড়েছে, কাজেই ত্বরা কোরো না।' তখন কিছু লোক বললো, এই নাও, আল্লাহ্র নির্দেশ এসেই গেলো। কেউ কেউ ভয়ে তাদের মন্দ কর্মগুলো ছেড়ে দিলো। কিছুদিন পর তারা পুনরায় লিপ্ত হয়ে পড়লো পাপকর্মে। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষোক্তটি। ইবনে জুরাইজের উদ্ধৃতিসূত্রে ইবনে জারীর এরকম বলেছেন।

শেষোক্ত আয়াতে (৮) বলা হয়েছে—'নির্দিষ্ট কিছুদিনের জন্য আমি যদি তাদের শাস্তি স্থগিত রাখি তবে তারা নিশ্চয় বলবে, কিসে এটা নিবারণ করছে।' একথার অর্থ— কিছুকালের জন্য আমি যদি শাস্তি স্থগিত রাখি, তবে ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলতে শুরু করবে, কোন শক্তির বলে শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে? এখানে উল্লেখিত 'উম্মাত' শব্দটির অর্থ সময় বা কাল— কামুস অভিধান প্রণেতা এরকম লিখেছেন। বাগবীও এরকম অর্থ করেছেন। আসলে 'উম্মাত' বলতে বুঝায় একটি দলকে— একটি দলের শেষ থেকে অপর দলের সূচনা কাল পর্যন্ত সময়কে। বায়যাবী শব্দটির অর্থ করেছেন, সময়ের সমষ্টি। আর 'মা'দুদাত্' অর্থ এখানে— কিছুদিন।

এরপর বলা হয়েছে— 'সাবধান! যে দিন তাদের নিকট শাস্তি আসবে সেদিন তাদের নিকট থেকে তা ফিরবে না এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাকের জ্ঞানে যে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে (যেমন বদর যুদ্ধের শাস্তি), সে শাস্তি যখন এসেই পড়বে, তখন সে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ তারা পাবে না। যে শাস্তি সম্পর্কে তারা ঠাট্টাস্থলে 'শাস্তি আসেনা কেনো' 'শাস্তি আগমনের ক্ষেত্রে বাধাটা কোথায়'— এরকম মন্তব্য করতো, সে শাস্তি অতি অবশ্যই তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। রুদ্ধ হয়ে যাবে নিষ্কৃতির সকল সুযোগ। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে অতীতকালবোধক বাকভঙ্গি। এভাবে বুঝানো হয়েছে, শাস্তি যেনো এসেই পড়েছে।

www.eelm.weebly.com

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ ۝ وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

❒ যদি আমি মানুষকে আমার নিকট হইতে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই ও পরে তাহা হইতে উহাকে বঞ্চিত করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়।

❒ দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর যদি আমি তাহাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তখন সে বলিয়াই থাকে, 'আমার বিপদ-আপদ কাটিয়া গিয়াছে' আর সে হয় উৎফুল্ল ও অহংকারী;

❒ কিন্তু যাহারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগেরই জন্য আছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

প্রথমে বলা হয়েছে—'যদি আমি মানুষকে আমার নিকট থেকে অনুগ্রহের আস্বাদ দেই ও পরে তা থেকে তাকে বঞ্চিত করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়।' এখানে 'আল ইনসান' শব্দটিতে আলিফ লাম ব্যবহৃত হয়েছে জাতিগত অর্থে। এভাবে বুঝানো হয়েছে মনুষ্য জাতিকে। এখানে 'ইয়াউসুন' অর্থ নেয়ামত বা স্বাচ্ছন্দ্যচ্যুত হওয়ার পর আশাহত হওয়া। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীল নয়, ধৈর্যধারণকারী নয় এবং আল্লাহ্র বিধানের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তও নয়। তাই তারা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাঘাত ঘটলেই হতাশ হয়ে পড়ে। তাদের বিদ্যমানতাই যে একটি নেয়ামত তা তারা বিলকুল ভুলে যায়। অতীতের নেয়ামতরাজির কথা বিস্মৃত হয়েও প্রকাশ করে অকৃতজ্ঞতা। তাই এখানে বলা হয়েছে— 'অবাধ্য মানুষকে যদি আমি আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তারপর যদি তাদেরকে ওই অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করি, তখন সে অবশ্যই হয়ে পড়ে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ।'

পরের আয়াতে (১০)বলা হয়েছে—'দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করবার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দেই তখন সে বলে থাকে, আমার বিপদ আপদ কেটে গিয়েছে আর সে হয় উৎফুল্ল ও অহংকারী।' একথার অর্থ— অবাধ্য মানুষের দুঃখ-দৈন্য অপসারণের পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দান করি, তবে সে বলে, যাক এবার আপদমুক্ত হওয়া গেলো। আল্লাহ্পাকই যে এ বিপদ থেকে তাকে মুক্ত করেছেন, সে কথা তখন তার মনেই পড়ে না। মনে করে এটা একটা সাধারণ ব্যাপার। তাই আসল কথা হচ্ছে, সে উন্নাসিক ও আত্মগর্বিত। তাই সে প্রকৃত পরিত্রাতার কথা বিস্মৃত হয়ে প্রকাশ করে প্রবৃত্তির আনন্দ। উদ্দেশ্য সফল

www.eelm.weebly.com

হওয়ার পর প্রবৃত্তির উৎফুল্লতাকে বলে 'ফারিহ্'। তাই এখানে 'ফারিহুন' শব্দটির অর্থ হবে অহংকার প্রকাশ করা। আর 'ফাখূর' শব্দটির অর্থ এখানে— উৎফুল্লপ্রবৃত্তি বিশিষ্ট আস্ফালন। অবাধ্যরা আল্লাহ্-প্রদত্ত অনুগ্রহ সম্ভারকে মনে করে তাদের প্রাপ্য অধিকার। তাই তারা গর্বিত হয় ও প্রদর্শন করে প্রবৃত্তিজাত প্রতাপ। ওই গর্ব ও প্রতাপই তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পথের প্রতিবন্ধক।

এর পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে—'কিন্তু যারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্ম-পরায়ণ, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও পুরস্কার।' এ কথার অর্থ— মানুষের মধ্যে যারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপ্রবণ, তারা কিন্তু সে রকম নয়। তারা নৈরাশ্য ও অকৃতজ্ঞতা থেকে মুক্ত। তাদের হৃদয়ে রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে কল্যাণ লাভের আশা। তারা অতীত ও বর্তমানের সকল অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। নেয়ামত লাভের পর প্রতাপ প্রদর্শন তাদের স্বভাব নয়। আত্মগর্বিতও নয় তারা। বিপদে ধৈর্যধারণ এবং স্বাচ্ছন্দ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশই তাদের বৈশিষ্ট্য। তারাই লাভ করবে আল্লাহ্র তুষ্টি ও জান্নাত।

হজরত সুহাইবের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. ব্যক্ত করেছেন, বিশ্বাসীদের আচরণ বিস্ময়কর। তাদের বচন ও আচরণ সুন্দর। তারা সুখে কৃতজ্ঞ ও দুঃখে ধৈর্যশীল। আর ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা দু'টোই কল্যাণকর। মুসলিম।

ফাররা বলেছেন, এই আয়াতে বিবৃত হয়েছে বিশিষ্ট মানুষের কথা। এখানে আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'ইল্লা' শব্দটি ইসতেছনায়ে মুনকাতি (বিকর্তিত ব্যতিক্রম)। এভাবে 'ইল্লা'র মাধ্যমে এখানে বিকর্তিত করা হয়েছে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে, যাদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে।

হজরত আয়াজ বিন আম্মার আশ্জায়ীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. জানিয়েছেন, আমার প্রতি এইমর্মে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে যে, বিনয়াবনত হও। গর্বিত হয়ো না। সীমাতিক্রম কোরো না। মুসলিম।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ১২

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ؕ

❑ 'তাহার নিকট ধন-ভাণ্ডার প্রেরিত হয় না কেন অথবা তাহার সহিত ফেরেশ্তা আসে না কেন?'— উহারা তোমার সম্বন্ধে এই কথা বলে বলিয়া তুমি যেন তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার কিছু বর্জন করিও না এবং উহার জন্য ব্যথিত হইও না। তুমি তো কেবল সতর্ককারী এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের কর্মবিধায়ক।

---

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, মক্কার মুশরিকেরা বলতো, হে মোহাম্মদ! তুমি এমন ধরনের কোরআন আনো, যাতে আমাদের উপাস্য প্রতিমাগুলোর নিন্দাবাদ নেই। তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। সুতরাং 'বা'দ্বা মা ইউহা' কথাটির অর্থ হবে এখানে ওই সকল প্রত্যাদেশিত আয়াত, যেগুলোতে মুশরিকদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলা হয়েছে।

এখানে উল্লেখিত 'লাআল্লা' শব্দটির সরাসরি অর্থ, সম্ভবতঃ। কিন্তু এখানে এর অর্থ হবে সুনিশ্চিত। জনসমক্ষে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করাই রসুলগণের দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বাতিল উপাস্যদের সমালোচনাসম্বলিত আয়াত প্রচার করা থেকে তাঁরা বিরত থাকতে পারেন না। এমতোক্ষেত্রে কাফেরদের অতুষ্টির পরওয়া করা তাঁদের জন্য অশোভন। কাজেই 'সম্ভবতঃ' বলার অবকাশ এক্ষেত্রে নেই। আল্লাহ্‌র বাণীকে গোপন রাখা রেসালতের (বাণীবহনের দায়িত্বের) পরিপন্থী। তাই অনুকূল-প্রতিকূল সকল অবস্থায় রসুলগণকে ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব পালন করতেই হয়। আমি বলি, আল্লামা বায়যাবীর ব্যাখ্যার মর্মার্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে কোনো কাজের নিশ্চয়তা প্রদানের অর্থ— ওই কাজ সম্পাদনের বিষয়টি সুনিশ্চিত। কারণ অপারগ বা অক্ষম হওয়া আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষে অসম্ভব।

আলোচ্য আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে— 'তার নিকট ধনভাণ্ডার প্রেরিত হয় না কেনো?'— তারা তোমার সম্বন্ধে এরকম কথা উচ্চারণ করে বলে তুমি যেনো তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু বর্জন কোরো না এবং তার জন্য ব্যথিত হয়ো না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! অংশীবাদীদের অযথার্থ ও অসঙ্গত উক্তি শ্রবণ করে আপনি ব্যথিত হবেন না। যে কোরআন আপনার উপরে অবতীর্ণ হয়েছে, সেই কোরআনের প্রচারও বন্ধ করবেন না। তারা তো মূর্খ ও অবাধ্য। তাই আপনার নিকট ধনভাণ্ডার প্রেরিত হয় না কেনো এবং আপনার নিকট ফেরেশতারা আসে না কেনো— এ ধরনের অজ্ঞজনোচিত বাক্য তাদের মুখে উচ্চারিত হয়। তারা মনে করে রাজা বাদশাহদের মতো আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষেরাও ধনভাণ্ডারের মালিক হবেন এবং তাদের সঙ্গে থাকবে একজন করে ফেরেশতা, যে তার রেসালতের সাক্ষ্য প্রদান করবে। এসকল অপবিত্র উক্তি চরম বিরক্তি ও মনোকষ্টের কারণ। কিন্তু আপনি তো আমার রসুল। আমার বার্তা বহনই আপনার মূল কর্তব্য। সুতরাং কাফেরদের অপমন্তব্য সমূহকে আপনি গণ্য করবেন কেনো? সত্যের প্রচার বর্জন করবেন কেনো? কেনোইবা হবেন বেদনাহত? এ ধরনের ব্যাখ্যা এসেছে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন উমাইয়া মাখজামী থেকে। আলোচ্য বাক্য প্রসঙ্গে এরকমও বলা যেতে পারে যে, অংশীবাদীরা আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক অবতীর্ণ প্রত্যাদেশের গুরুত্ব কিছুতেই বুঝতে পারতো না। তাই রসুল স. কতিপয় আয়াতের প্রচার বন্ধ রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন আয়াতগুলো শুনে অংশীবাদীরা

www.eelm.weebly.com

হাসাহাসি করে। শুরু করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ। তাদের এমতো বিদ্রূপের কারণে আল্লাহ্পাক যদি ওই আয়াতগুলো উঠিয়ে নেন— একথা ভেবে তিনি মনোকষ্ট অনুভব করতেন। কখনো ভাবতেন, সাক্ষ্যদাতা কোনো ফেরেশতা সঙ্গে থাকলে হয়তো তারা ইমান আনতো। তাই আল্লাহ্তায়ালা এখানে তাঁর প্রিয় রসুলকে ধর্ম প্রচার বন্ধ না করার ও ব্যথিত না হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

শেষে বলা হয়েছে— 'তুমি তো কেবল সতর্ককারী।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তো ভীতি প্রদর্শনকারী মাত্র। সুতরাং তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের তোয়াক্কা না করে সত্য ধর্মের প্রচার অব্যাহত রাখুন। মনোকষ্টকে পরিত্যাগ করুন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের কর্মবিধায়ক। তাই তিনি তাদের অপবিত্র উক্তির যথোপযুক্ত প্রতিফল অবশ্যই দান করবেন।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ১৩, ১৪, ১৫

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ○ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ○

❒ তাহারা কি বলে,'সে ইহা রচনা করিয়াছে?' বল,'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা ইহার অনুরূপ দশটি স্বরচিত সুরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাকে পার আহ্বান কর।'

❒ যদি তাহারা তোমাদিগের আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে জানিয়া রাখ ইহা আল্লাহেরই নিকট হইতে অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তবে কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হইবে না।

❒ যদি কেহ পার্থিব জীবন ও উহার শোভা কামনা করে তবে দুনিয়াতে আমি উহাদিগের কর্মের পরিমিত ফল দান করি এবং দুনিয়াতে উহারা কম পাইবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! অংশীবাদীরা আপনাকে বলে, আপনিই এই কোরআনের রচয়িতা। আপনি তাদেরকে বলুন, তোমাদের

www.eelm.weebly.com

কথা অসত্য। যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা এই কোরআনের অনুরূপ দশটি সুরা রচনা করে দেখাও। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের বাতিল উপাস্যসমূহসহ যাকে খুশি সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো।

একটি সন্দেহঃ সুরা ইউনুসে উল্লেখ করা হয়েছে, হে মুশরিককুল! কোরআনকে যদি তোমরা আল্লাহ্র বাণী বলে স্বীকার না করো, তবে এই কোরআনের অনুরূপ যে কোনো একটি সুরা রচনা করো। মুশরিকেরা আল্লাহ্পাক প্রদত্ত এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারেনি। তবে এখানে পুনরায় 'দশটি সুরা আনয়ন করো'— এরকম বলা হলো কেনো? যে ব্যক্তি এক টাকা দিতে অক্ষম, তার কাছে দশ টাকা চাওয়া কী অসমীচীন নয়? আল্লাহ্তায়ালার কালামে এরকম বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হবে কেনো?

সন্দেহভঞ্জনঃ উদ্ভূত সমস্যার প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত দশটি সুরা আনয়ন করার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অসমর্থ হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়েছে সুরা ইউনুসের ওই আয়াত। এভাবে সমস্যাটি সুরাহা করা যায়। কিন্তু আল্লামা মোবার্রাদ এ কথার ঘোর প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, সুরা ইউনুসই অবতীর্ণ হয়েছে প্রথমে। তারপর অবতীর্ণ হয়েছে সুরা হুদ। তাঁর মতে সুরা দু'টো অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। সুরা ইউনুসে বলা হয়েছে অদৃশ্যের সংবাদ, নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসম্বলিত বিধান এবং পুরস্কার, তিরস্কার বিষয়ক প্রতিশ্রুতির বিবরণ সমৃদ্ধ একটি আয়াত রচনার কথা, যে আয়াত হবে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের অনুরূপ। এ রকম রচনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তারপর সুরা হুদের আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, বক্তব্যের ব্যঞ্জনা ও শৈল্পিক সুষমার দিক থেকে কোরআনের অনুরূপ দশটি সুরা আনয়নের কথা। সুতরাং বর্ণনা-বৈসাদৃশ্যের অবকাশ এক্ষেত্রে নেই। আমি বলি, মুশরিকেরা দু'টো চ্যালেঞ্জের কোনো একটিরও মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়নি। তখন সুরা বাকারার এক আয়াতে কোরআনের সুরাগুলো যে রকম ধারাবাহিক ও সুসঙ্গতরূপে অবতীর্ণ হয়, সেরকম ধারাবাহিকভাবে পুনরায় একটি সুরা রচনার আহ্বান জানানো হয়। বলা বাহুল্য যে, এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলাও তারা করতে পারেনি।

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে, 'যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রেখো, এটা আল্লাহ্র নিকট থেকে অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।' এখানে লাকুম (তোমাদের) বলে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। মহাসম্মানিত ব্যক্তিত্বকে এভাবে বহুবচনবোধক শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়। অবশ্য এখানে 'তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়' একথা বলে অন্যান্য মুসলমানদেরকেও সম্বোধন করা হয়ে থাকতে পারে। কারণ তাঁরাও অংশীবাদীদের প্রতি কোরআনের অনুরূপ সুরা রচনা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, সম্বোধন করা হয়েছে এখানে রসুল স.কে। আর দলগতভাবে তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। কিছুসংখ্যক বিশেষ

www.eelm.weebly.com

নির্দেশ ছাড়া কোরআন মজীদে উল্লেখিত অধিকাংশ নির্দেশ এরকম। অর্থাৎ ওই সকল ক্ষেত্রে সম্বোধিতজন স্বয়ং রসুল স. হলেও সমগ্র মুসলিম জনতার উপরে তা সমভাবে কার্যকর। সুতরাং সকল যুগের মুসলমানেরা তাদের সময়ের অবিশ্বাসীদেরকে আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত চ্যালেঞ্জের মতো চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। আর এমতো দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন হবে তাঁদের জন্য অসমীচীন।

'তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়' একথার মাধ্যমে এখানে বলে দেয়া হয়েছে— এমতো আহ্বানে সাড়া দেয়া মুশরিকদের জন্য অসম্ভব। সুতরাং আল্লাহ্ই যে কোরআনের একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী রচয়িতা, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। তাই পরক্ষণেই বলা হয়েছে 'এটা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ।'

'তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই'— কথাটির মাধ্যমে এটাই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্পাকই যেহেতু একক উপাস্য ও সর্বশক্তিমান, তাই এ রকম অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাণী-বৈভব রচনা করা কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব। অবিশ্বাসীরা এ রকম করতে সমর্থ নয়। আর এ ব্যাপারে তাদের বাতিল উপাস্যগুলো তাদেরকে কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারে না। এভাবে এখানে অবিশ্বাসীদেরকে এইমর্মে প্রচ্ছন্ন হুমকি দেয়া হয়েছে যে, বাতিল উপাস্যগুলো যেমন এখন তাদের উপাসকদেরকে সাহায্য করতে পারছে না, তেমনি আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকেও তারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'তবে কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে না?' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুলের সহচরবৃন্দ! এভাবে অবিশ্বাসীদের পরাজয় ও কোরআনের বিজয় দর্শনের পর তোমরা কী আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটে পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধচিত্ত আত্মসমর্পণকারী হবে না? হবেই তো। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'লাম ইয়াস্‌তাজীবু' (যদি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে) কথাটির ক্রিয়াবাচক সর্বনামের সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের (১৩) 'মানিস্‌তাত্বা'তুম' (তোমাদের মধ্যে যে সক্ষম) এর সঙ্গে। এ সম্পর্কটিকে মান্য করলে এখানকার বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়াবে এরকম— হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমাদের সাহায্যকারীরা আমার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারলো না। এটা তো তোমরা স্বচক্ষেই দেখলে। তবুও কী তোমরা এই কোরআনকে আল্লাহ্‌র বাণী বলে স্বীকার করবে না? ভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলামের চিরন্তন ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করবে না? প্রত্যাখ্যানের সকল অবলম্বন তো এখন অবলুপ্ত।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে তবে দুনিয়াতে আমি তাদের কষ্টের পরিমিত ফল দান করি এবং দুনিয়াতে তারা কম পাবে না।' এ কথার অর্থ— যে ব্যক্তি তার সৎকর্ম-

www.eelm.weebly.com

সমূহের প্রতিদান এই পৃথিবীতেই চায়, কামনা করে সম্ভোগ-সম্ভার, বিলাসের উপকরণ, রূপসী রমণী ও অধিক সন্তান-সন্ততি, আমি তা পূর্ণ করি। কিন্তু পরবর্তী পৃথিবীতে তারা কিছুই পাবে না। পাবে কেবল জাহান্নাম। কারণ, পৃথিবীতেই তাদেরকে দেয়া হয়েছে তাদের সৎকর্মের বিনিময়। অতএব অসৎকর্মের প্রতিফলরূপে তাদের জন্য অনন্ত আগুন তো নির্ধারিত হবেই।

সূরা হূদ ঃ আয়াত ১৬

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

❐ উহাদিগেরই জন্য পরলোকে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই এবং তাহারা যাহা করে পরলোকে তাহা নিষ্ফল হইবে এবং উহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা নিরর্থক।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অবিশ্বাসীদের পুণ্যকর্ম নিরর্থক। কারণ তারা আল্লাহ্র প্রতি আস্থাবান নয়। আল্লাহ্পাকের সন্তোষ সাধনার্থে তারা পুণ্য কর্ম করে না। করে প্রবৃত্তির তৃপ্তির জন্য। সুনাম বা সুখ্যাতির জন্য। এরকম জনপ্রদর্শনপ্রবণ কোনো সৎকাজের বিনিময় প্রদানের দায়িত্ব আল্লাহ্তায়ালার উপরে বর্তায় না। পার্থিবতাই যেহেতু তাদের কাম্য, তাই আল্লাহ্পাক পৃথিবীতেই তাদের পুণ্যকর্মের বিনিময় পরিশোধ করে দেন। আখেরাতের অনন্ত জীবনে তাদের পুণ্যকর্ম কোনো কাজে আসবে না বলেই সেগুলো নিরর্থকতায় পর্যবসিত। উল্লেখ্য যে, 'ফীহা' সর্বনামটি আখেরাতের সঙ্গে সম্বন্ধিত হলে শব্দটির সম্পর্ক ঘটবে 'হাবিত্বা' (নিষ্ফল) এর সঙ্গে। আর দুনিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধিত হলে সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত হবে 'সানাউ' (করে) এর সঙ্গে।

এটা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে। বোখারী কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর ঘরে তিনটি কাঁচা চামড়া ব্যতীত অন্য কিছু দেখলাম না। বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আপনার উম্মতের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আল্লাহ্পাকের নিকট প্রার্থনা করুন। আল্লাহ্পাক পারস্যবাসী ও রোমানদেরকে অগাধ সম্পদ দান করেছেন। অথচ তারা আল্লাহ্দ্রোহী। রসুল স. তাঁর আসনে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমার কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, হে খাত্তাব তনয়, তুমি এখনও পার্থিবতার প্রতি তোমার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখেছো! অবিশ্বাসীরা পৃথিবী প্রত্যাশী। তাই তাদেরকে দেয়া হয়েছে ভোগ বিলাসের অঢেল উপকরণ। আর বিশ্বাসীরা চায় পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। সুতরাং ইহকালে তারা পাবে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ এবং পরকালে পাবে পুণ্য।

www.eelm.weebly.com

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদেরকে পীড়ন করেন না। ইহজগতে দেন সৎকর্মের যথাবিনিময় এবং পরজগতে দেন অঢেল পুণ্য। আর অবিশ্বাসীদের সৎকর্মের সম্পূর্ণ বিনিময়রূপে ইহজগতে দেন প্রচুর বিত্ত-বৈভব ও জাগতিক সুখ্যাতি। কিন্তু তাদের পরজগতের প্রাপ্তি শূন্য। সুতরাং সেখানে তারা হবে কল্যাণরহিত। মুসলিম, আহমদ।

আমি বলি, 'তাদের জন্য পরলোকে অগ্নি ব্যতীত কিছুই নেই'— এ ঘোষণাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। 'আর বিশ্বাসীদের শেষ পরিণতি জান্নাত।' আলেমগণের ঐকমত্যও এরকম। সুতরাং এই আয়াতে যে কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো কোনো আলেম মন্তব্য করেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে প্রদর্শনপ্রবণ সৎকর্মে অভ্যস্ত অহংকারীদেরকে লক্ষ্য করে। হজরত আবু সাঈদ বিন ফুজালার বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. বলেছেন, পরকালে সকল মানুষ যখন আল্লাহ্পাক সকাশে সমুপস্থিত হবে, তখন জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যারা সৎকর্ম সম্পাদনের সময় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অন্যের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যকে সংমিশ্রিত করেছে, তারা যেনো তাদের সৎকর্মের প্রতিদান গ্রহণ করে ওই সকল অংশীদারদের নিকট থেকে। আল্লাহ্ যাবতীয় অংশীবাদিতা থেকে চিরমুক্ত। আহমদ।

হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. বলেন, আখেরাত যার উদ্দেশ্য, আল্লাহ্পাক তার হৃদয়কে পার্থিব বস্তুর অভাব থেকে মুক্ত রাখেন। দূর করে দেন তার সকল সংশয়। পৃথিবীর সকল অর্জন তখন তার চোখে হয়ে পড়ে তুচ্ছ। আর যার উদ্দেশ্য পৃথিবী, আল্লাহ্ তার দু'চোখের দৃষ্টিতে স্থাপন করেন অভাব আর অভাব। তখন অন্তহীন লোভের বশবর্তী হয়ে পড়ে সে। পার্থিব বৈভব ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য সে তখন হয় বিরামহীন অস্থিরতা ও পেরেশানীর শিকার। অথচ সে লাভ করে ততটুকুই, যতটুকু নির্ধারিত রয়েছে তার ললাটলিপিতে। তিরমিজি। যথাসূত্রে বর্ণিত এই হাদিসটি আবানের মধ্যস্থতায় হজরত জায়েদ ইবনে সাবেতের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন আহমদ ও দারেমী।

একটি সন্দেহঃ কোরআন মজীদে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক পৃথিবীতে প্রদান করেন কাফেরদের কর্মের সম্পূর্ণ বিনিময়। আর হাদিস শরীফে বলা হলো, 'যতটুকু নির্ধারিত রয়েছে তার ললাট লিপিতে।' তাহলে কোরআন ও হাদিসের বক্তব্যবিষয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে না কি?

সন্দেহের নিরসনঃ যদি বলা যায় পুণ্যকর্মের সম্পূর্ণ বিনিময়ই লিপিবদ্ধ রয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ললাট লিপিতে, তাহলে কিন্তু দ্বন্দ্ব বলে আর কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকে না। অর্থাৎ ভাগ্যলিপি অনুসারে সম্পাদিত হবে তাদের কর্ম এবং ভাগ্যলিপি অনুসারেই তারা পাবে তাদের কর্মের সম্পূর্ণ প্রতিফল।

www.eelm.weebly.com

তাদের তকদীরে যা আছে তার চেয়ে একটুও কম বা বেশী তারা পাবে না। কিন্তু তারা সর্বক্ষণ জ্বলতে থাকবে লালসার আগুনে। তাই এক হাদিসে বলা হয়েছে, যদি পৃথিবীপূজকের নিকট দু'টি উন্মুক্ত প্রান্তর ভর্তি স্বর্ণ সঞ্চিত থাকে, তবুও সে এরূপ তৃতীয় আর একটি প্রান্তরের অভিলাষী হবে।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতটি যদি অহংকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে প্রদর্শনপ্রবণ আমলের কারণে তাদের জন্যও নির্ধারিত হবে জাহান্নাম।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ১৭

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ ۚ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

☐ যাহারা কেবল পার্থিব জীবন ও উহার শোভা কামনা করে তাহারা কি উহাদিগের সমতুল্য যাহারা প্রতিষ্ঠিত উহাদিগের প্রতিপালক-প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে, যাহার অনুসরণ করে তাঁহার প্রেরিত সাক্ষী এবং যাহার পূর্ব-সাক্ষী মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ? উহারাই ইহাতে বিশ্বাসী। অন্যান্য দলের যাহারা ইহাকে অস্বীকার করে অগ্নিই তাহাদিগের প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি ইহাতে সন্দিগ্ধ হইও না। ইহা তো তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না।

'আফা মান কানা আ'লা বাইয়্যেনাতিম মিররব্বিহি' অর্থ, যারা প্রতিষ্ঠিত তাদের প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে। এখানে 'মান কানা' (যারা) বলে বুঝানো হয়েছে বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদেরকে। কেউ কেউ বলেছেন, রসুল স.কে। কিন্তু 'মান' শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত। তাছাড়া পরবর্তী বাক্যে যেহেতু বহুবচনবোধক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে, বলা হয়েছে, উলাইকা ইউ'মিনুনা বিহি (তারাই তাতে বিশ্বাসী), সেহেতু 'মান কানা ' বলে রসুল স. এবং তাঁর একনিষ্ঠ বিশুদ্ধচিত্ত অনুচরবৃন্দকেই বুঝানো হয়েছে বলে মনে করতে হবে। আবু শায়েখ, আবুল আলীয়া ও ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, 'মান কানা আ'লা বাইয়্যেনাত' কথাটির লক্ষ্যস্থল হচ্ছেন রসুলপাক স.। ইবনে মারদুবিয়া এবং ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, হজরত আলী। আবু নাঈম তাঁর 'মারেফাত' গ্রন্থে এ রকমই

www.eelm.weebly.com

লিখেছেন। আর 'বাইয়্যেনাত' (স্পষ্ট নিদর্শন) শব্দটির অর্থ কোরআন মজীদ। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক প্রেরিত মহাগ্রন্থ আল কোরআনের আলোকে প্রতিষ্ঠিত রসুল স. ও তাঁর সাহাবীগণের সমতুল্য হতে পারে কি ওই সকল লোক, যারা কেবল কামনা করে পৃথিবীর জীবন ও পার্থিব চাকচিক্য?

এরপর বলা হয়েছে— 'যার অনুসরণ করে তাঁর প্রেরিত সাক্ষী এবং যার পূর্বসাক্ষী মুসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ।' একথার অর্থ— যে কোরআন পাঠ করেন হজরত জিবরাইল অথবা হজরত রসুল স.। আর যে কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে পূর্বে অবতীর্ণ তওরাত। হজরত মুসার উপরে অবতীর্ণ ওই তওরাত ছিলো অগ্রণী ও রহমত।

এখানে 'শাহেদ' (সাক্ষী) শব্দটির মাধ্যমে হজরত জিবরাইলকে বুঝানো হয়েছে বলে একটি অভিমত রয়েছে। আল্লামা ইবনে জারীর, ইবনে মারদুবিয়া, ইবনে আবী হাতেম ও আবু নাঈম বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য বাক্যের 'শাহেদ' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে হজরত জিবরাইলকে। কারণ হজরত জিবরাইল রসুল স. এর নিকটে কোরআন মজীদ পাঠ করে শোনাতেন। হজরত মুসার নিকটেও তিনি পাঠ করে শুনিয়েছিলেন তওরাত শরীফ। হজরত ইবনে আব্বাস ছাড়াও আলকামা, ইব্রাহিম, মুজাহিদ, ইকরামা ও জুহাক পর্যন্ত এই বর্ণনাটির বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন আল্লামা বাগবী।

হাসান ও কাতাদা বলেছেন, এখানে 'শাহেদ' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর পবিত্র রসনাকে, যার দ্বারা কোরআন উচ্চারিত হয়। সুতরাং সাক্ষ্যদাতা এখানে রসুল স. স্বয়ং। আর কোরআনের সাক্ষ্যদাতা বা প্রত্যয়নকারী হচ্ছে হজরত মুসার কিতাব, যা অবতীর্ণ হয়েছিলো পূর্বে।

এখানে 'শাহেদ' বলে হজরত আলীকে বুঝানো হয়েছে— এরকম একটি অভিমত রয়েছে। ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, তিবরানী ও আবু শায়েখ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, মোহাম্মদ বিন হজরত আলী বলেছেন, আমি একবার আমার মহান পিতা হজরত আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আমার শ্রদ্ধার্হ পিতা! অনেকে মনে করে 'ওয়া ইয়াতলুহু শাহিদুম মিনহু' আয়াতাংশের শাহেদ হচ্ছেন আপনি। তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তাই। কিন্তু না। শাহেদ হচ্ছেন রসুল স. স্বয়ং। মুজাহিদ থেকে আবু বখীহের মাধ্যমে আবু শায়েখ বলেছেন, শাহেদ হচ্ছেন রসুল স. স্বয়ং।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'ইয়াতলু' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'তিলবুন' থেকে। 'তিলবুন' অর্থ অনুসরণ করা, অনুগামী হওয়া। আর 'শাহিদ' অর্থ সংরক্ষক ফেরেশতা। 'ইয়াতলুহু' এর 'হু' সর্বনামটি এখানে 'মানকানা' এবং 'বাইয়্যেনাত' কথা দু'টোর সঙ্গে সম্পর্কিত। 'বাইয়্যেনাত' অর্থ সুস্পষ্ট দলিল বা প্রমাণ। আর 'মিন ক্বলিহি কিতাবু মুসা' বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য।

www.eelm.weebly.com

ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'মান কানা আ'লা বাইয়্যেনাত' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে। আর 'শাহিদুন' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এক ফেরেশতাকে। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত আলীকে। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী একবার একদল লোকের সম্মুখে বললেন, কুরায়েশ গোত্রের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে কোনো না কোনো আয়াত নাজিল হয়েছে। কেউ কেউ বললেন, তবে আপনার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে কোন্‌টি? তিনি বললেন— 'ইয়াতলুহু শাহিদুম মিনহু।'

প্রশ্ন উঠতে পারে, হজরত আলীকে এখানে শাহিদুন বলা হবে কেনো? এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, সম্ভবতঃ তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।

আমি বলি, উদ্ভূত প্রশ্নের যথাযথ জবাব হবে এ রকম— হজরত আলী ছিলেন কামালিয়তে বেলায়েতের (নৈকট্যের পূর্ণতার) কেন্দ্র বা শিখর। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যান্য সাহাবী এবং পরবর্তী সময়ের সকল আউলিয়া অপেক্ষা অগ্রগামী ছিলেন তিনি। নিঃসন্দেহে হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও হজরত ওসমান হজরত আলীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো কামালিয়তে নবুয়তের (নবুয়তের পূর্ণ বরকতের) ক্ষেত্রে। প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্য এটাই। কিন্তু বেলায়েতের পরিপূর্ণ বরকত লাভে হজরত আলীই ছিলেন সকলের অগ্রণী। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী রহঃ তাঁর মকতুবাত শরীফে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যারা এ বিষয়ে অধিক আগ্রহী তারা যথাস্থানে আলোচনাগুলো দেখে নিতে পারেন।

উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যাগুলোর প্রেক্ষাপটে আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— রসুল স. আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে এনেছিলেন অনেক অকাট্য ও বিস্ময়কর প্রমাণ বা মোজেজা। ওই সকল মোজেজার মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তাঁর রেসালাত। আর সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেজা হচ্ছে কোরআন মজীদ। তাছাড়া খাস বেলায়েতের (বিশেষ নৈকট্যের) পরিচিতিমূলক জ্ঞানও দেয়া হয়েছিলো রসুল স.কে। ওই সকল জ্ঞানে হজরত আলীই ছিলেন সকলের শীর্ষে। তাই বেলায়েতের ক্ষেত্রে সকল আউলিয়ার তিনি ইমাম। আউলিয়া কেরামের মাধ্যমে প্রকাশিত কারামতসমূহ হচ্ছে রসুল স. এর মোজেজাসমূহের অনুসৃতি। তাঁদের কাশ্‌ফ্‌ এবং এলহামও ওহীর (প্রত্যাদেশের) অনুসরণজাত প্রতিবিম্ব। অলিআল্লাহ্‌গণের কারামত, কাশ্‌ফ্‌ ও এলহাম আসলে রসুল পাক স. এর রেসালতেরই প্রমাণ ও প্রকাশ।

বিশুদ্ধ সূত্রে ইমাম তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি প্রজ্ঞা-গৃহ এবং আলী তার তোরণ। আরো বলেছেন, আমি জ্ঞান-নগরী আর আলী সেই নগরীর সদর দরজা। জ্ঞানান্বেষীরা জ্ঞান-নগরে প্রবেশের লক্ষ্যে সদর দরজায়

www.eelm.weebly.com

উপস্থিত হয়। হাদিসটি ইবনে আদী তাঁর 'আল কামেল' গ্রন্থে এবং উকাইলি তাঁর 'জুয়াফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আদী ও হাকেম। হাদিসে বর্ণিত এলেম এবং হেকমত হচ্ছে আউলিয়া কেরামদের প্রজ্ঞা। ফেকাহ্ শাস্ত্রের জ্ঞান নয়। কেননা হজরত আলী কেবল ফেকাহ্ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন না, ছিলেন মারেফত জ্ঞানে সমৃদ্ধ। ফেকাহ্ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের সকলেই।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'শাহিদ' অর্থ ইঞ্জিল শরীফ এবং 'মিন ক্বলিহি কিতাবু মুসা' অর্থ তওরাত শরীফ। কারো কারো মতে 'বাইয়্যেনাত' অর্থ জ্ঞান প্রসূত দলিল এবং 'শাহিদ' অর্থ কোরআন মজীদ। হোসাইন বিন ফজল বলেছেন, এখানে কোরআন হয়েছে 'বাইয়্যেনাত'। আর মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত বর্ণনারীতি হয়েছে 'শাহিদ'। এভাবে মর্ম দাঁড়িয়েছে— যাদের নিকট ধর্ম সম্পর্কীয় জ্ঞানগত কোনো দলিল অথবা লিখিত কোনো প্রমাণ নেই তারা কিভাবে জ্ঞানগত দলিল প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিতদের সমকক্ষ হতে পারে? আর কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রসুল মুসাও মৌখিক ও লিখিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর প্রতি অবতারিত কিতাবেও এই কোরআনের সত্যতার সাক্ষ্য রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— উলায়িকা ইউ'মিনুনা বিহী (তারাই এতে বিশ্বাসী)। একথার অর্থ, মুসলমানেরাই কোরআনুল করীমের উপর ইমান আনয়নকারী। এখনে 'উলায়িকা' (তারা) শব্দটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে 'মান কানা' এর প্রতি, যেহেতু মুসলমানেরাই 'স্পষ্ট নিদর্শনে' (বাইয়্যিনাতে) সুপ্রতিষ্ঠিত। এখানে 'উলায়িকা' দ্বারা 'শাহিদুন' এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে— এরকমও বলা যেতে পারে। এ রকম হলে শাহিদুন এর মর্ম হবে হজরত আলী ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়ামাঁই ইয়াকফুর বিহি মিনাল আহ্জাবি ফান্নারু মাওই'দুহ্ (অন্যান্য দলের যারা একে অস্বীকার করে আগুনই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান)। এখানে 'আল আহ্জাব' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীকে। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যার আওতায় আমার জীবন সেই পরম সত্তার শপথ, আমি যে হেদায়েত সহকারে প্রেরিত হয়েছি, সেই হেদায়েত গ্রহণ না করে কাফের, মুশরিক, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যদি কেউ মারা যায় তবে সে নরকবাসী হবে।

শেষে বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি এতে সন্দিগ্ধ হয়ো না। এটা তো তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুলের অনুগামীবৃন্দ! তোমরা কখনো দ্বিধা সন্দেহে পতিত হয়ো না। জেনে রাখো এই কোরআন সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শুভবোধ ও বুদ্ধির অভাবে এই কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করতে সক্ষম হয় না।

www.eelm.weebly.com

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

❒ যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? উহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে উহাদিগের প্রতিপালকের সম্মুখে এবং সাক্ষীগণ বলিবে, 'ইহারাই ইহাদিগের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল।' সাবধান! আল্লাহের অভিশাপ জালিমদিগের উপর,

❒ যাহারা আল্লাহের পথে বাধা দেয় এবং উহাতে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে; এবং ইহারাই পরলোককে প্রত্যাখ্যান করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, তাদের চেয়ে অধিক জালেম আর কে?' একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বিভিন্নভাবে আল্লাহ্পাকের সঙ্গে শিরিক করে। নবী-রসুলগণের কাউকে বলে আল্লাহ্র পুত্র, আবার ফেরেশতাদেরকে বলে আল্লাহর কন্যা। তিনি যা অবতীর্ণ করেননি তাকে তারা বলে এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আবার আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন, তাকে তারা করে অস্বীকার। নিজেরাই হালাল হারাম নির্ধারণ করে বলে, এই নির্ধারণ আল্লাহ্র। তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনাকারী। সুতরাং তাদের চেয়ে জালেম আর কে?

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে উপস্থিত করা হবে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে এবং সাক্ষীগণ বলবে, এরাই এদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিলো।' একথার অর্থ— হাশরের ময়দানে হিসাব গ্রহণের জন্য এই সকল মিথ্যা রচয়িতাকে আল্লাহ্পাকের সম্মুখে হাজির করা হবে এবং তখন সাক্ষীগণ এইমর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, এই সকল লোকই আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনাকারী। এখানে 'সাক্ষীগণ বলবে' কথাটির অর্থ হবে আমল লেখক ফেরেশতাগণ সাক্ষ্য প্রদান করবেন। মুজাহিদ থেকে এরকম ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন আবু শায়েখ। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, এখানে 'সাক্ষীগণ' অর্থ 'নবী-রসুলগণ'। জুহাকও এরকম বলেছেন। এক

www.eelm.weebly.com

আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— 'অতঃপর সেটা কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক নবীর উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করবো, তাদের উপর সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করবো আপনাকে।' ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, এমন কোনো দিবস অতিক্রান্ত হয় না, যে দিবসে পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতকে রসুলপাক স. এর সম্মুখে হাজির করা হয়। তিনি তাদের আচরণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ অবলোকন করেন। আর এ সম্পর্কে তিনি সাক্ষ্য প্রদান করবেন হাশরের মাঠে।

কাতাদা বলেছেন,'আশহাদ' অর্থ সমগ্র সৃষ্টিজগত। এ সম্পর্কে বোখারী ও মুসলিম শরীফে একটি বিবরণ এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্ তাঁর এক বিশ্বাসী পাপী বান্দার উরুদেশে হাত রেখে চুপে চুপে বলবেন, তোমার অমুক পাপের কথা কি মনে আছে? সে বলবে,হ্যাঁ। এভাবে আল্লাহ্ তার সকল পাপের কথা একে একে উল্লেখ করবেন। আর ওই বান্দাও তার পাপের স্বীকৃতি দিতে থাকবে। ভাববে, ধ্বংস ব্যতীত আমার আর গত্যন্তর নেই। আল্লাহ্ বলবেন, পৃথিবীতে আমি তোমার পাপগুলোকে ঢেকে রেখেছিলাম। আজ সেগুলোকে ক্ষমা করে দিলাম। একথা বলার পর তাকে দান করবেন পুণ্যের আমলনামা। তারপর সকল বিশ্বাসী ও কপটদের উদ্দেশ্যে বলবেন, এরাই ওই সকল লোক যারা তাদের প্রভুপালনকর্তার উপর অসত্যারোপ করেছিলো। সাবধান! জালেমদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত।

আল্লাহ্ সম্বন্ধে অসত্যকথনের নামই জুলুম। আর যারা জালেম, জনান্তিকে তারা আল্লাহ্র আযাব দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই আয়াতে ওই সকল জালেমদের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথাই বলে দেয়া হয়েছে।

আমি বলি, কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কিয়ামতের দিন শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সাক্ষ্য দান করবে। সেদিকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে 'সাক্ষীগণ বলবে।' আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'সেদিন আমি তাদেরকে বাকরুদ্ধ করে দিবো। তখন আমার সঙ্গে কথা বলবে তাদের হাত ও পা।' আরো বলেছেন, 'তারা তাদের গাত্রচর্মের দিকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে বলছো কেনো?' অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের রসনা, হাত ও চরণ।'

ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, 'সেদিন আল্লাহ্ তাদের মুখের উপরে সীল মেরে দিবেন। অঙ্গ- প্রত্যঙ্গগুলোকে বলবেন, এবার তোমরা সাক্ষ্য প্রদান করো। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর সঙ্গে তখন স্থান ও সময়ও সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে। এ সম্পর্কে সুরা জিলজালে বলা হয়েছে, 'সেদিন (স্থানও) তাদের সঙ্গে কথা বলবে।'

www.eelm.weebly.com

ইমাম বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, মোয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি শ্রবণকারী মানুষ ও জ্বিন পুনরুত্থান দিবসে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

ইবনে খুজাইমা বলেছেন, মাটি, পাথর, মানব, দানব, যারা আজান শুনবে, তারা হবে হাশরের প্রান্তরে মোয়াজ্জিনের পক্ষের সাক্ষী। হজরত আবু হোরায়রার মারফু হাদিস উল্লেখ করে ইবনে খুজাইমা ও আবু দাউদ উল্লেখ করে বলেছেন, আজানের ধ্বনির বিস্তার যতবেশী হবে, ততই প্রশস্ত হবে মোয়াজ্জিনের মাগফিরাত। জড় ও অজড় সকলেই তার জন্য সাক্ষ্য দান করবে।

ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, যে স্থানে সেজদা করা হবে, সেই স্থানের মাটি, বৃক্ষ ও প্রস্তরখণ্ড সেজদাকারীর জন্য সাক্ষ্য দিবে হাশরের ময়দানে। আতা খোরাসানীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে আবু নাঈম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নতুন দিবস বলে, হে আদম সন্তানেরা! আমি তো এসেছি। আজ তোমাদের দ্বারা সম্পাদ্য সকল কাজের আমি সাক্ষী। তোমরা যা করবে আগামীতে আমি তার সাক্ষ্য প্রদান করবো। সুতরাং সাবধান! উত্তম কর্ম করতে সচেষ্ট হও। চলে গেলে আমি আর কখনো ফিরে আসবো না। নতুন নিশীথও বলে এরকম।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পার্থিব বৈভব দৃষ্টিনন্দন ও চিত্তরঞ্জক। যথাব্যবহার করা হলে এই বিত্ত-বৈভব হবে বিশ্বাসীদের উত্তম সঙ্গী। যুদ্ধবন্দী, এতিম, অভাবকবলিত ও ভ্রমণকারীদের জন্য ব্যয়কৃত অর্থ হবে পক্ষের সাক্ষী। আর অন্যায়ভাবে সম্পদভক্ষণকারীরা ওই সকল লোকের মতো, যারা পানাহারের পরেও থাকে অপরিতৃপ্ত। তাদের সম্পদ হবে তাদের বিরুদ্ধ পক্ষ। আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, তাউস বলেছেন, হাশরের দিন সম্পদ ও সম্পদের মালিককে একত্র করা হবে। তখন দু'জনের মধ্যে শুরু হবে তুমুল বাক-বিতণ্ডা।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে—'যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় এবং তাতে দোষত্রুটি অনুসন্ধান করে, এবং তারাই পরলোককে প্রত্যাখ্যান করে।' একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলাম গ্রহণের পথের প্রতিবন্ধক এবং এই ধর্মের মধ্যে দোষত্রুটি তালাশ করে অথবা বিশ্বাসীদেরকে বিপথে পরিচালিত করতে চায়, তারাই আখেরাতকে অস্বীকারকারী। 'ওয়াহুম বিল আখিরাতিহুম কাফিরূন' অর্থ— এবং এরাই পরলোককে প্রত্যাখ্যান করে। এখানে 'হুম' (তারা) ব্যবহৃত হয়েছে দু'বার। এভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ওই সকল অবিশ্বাসীর সত্যপ্রত্যাখ্যানের বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার তাদের বিশেষত্ব।

www.eelm.weebly.com

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۘ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ○ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ○ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

❒ উহারা পৃথিবীতে আল্লাহের বিধান ব্যর্থ করিতে পারিত না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদিগের অপর কোন অভিভাবক ছিল না; উহাদিগের শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে; উহাদিগের শুনিবার সামর্থ্য ছিল না এবং উহারা দেখিতও না।

❒ উহারা নিজদিগেরই ক্ষতি করিল এবং যাহা ছিল উহাদিগের কল্পনা-প্রসূত তাহা উহাদিগের নিকট মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল।

❒ নিশ্চয়ই উহারা হইবে পরলোকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

❒ যাহারা বিশ্বাসী, সৎকর্মপরায়ণ এবং তাহাদিগের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

❒ দল দুইটির উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি-সম্পন্নের উপমা; তুলনায় এই দুই কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?

প্রথমে বলা হয়েছে— উলায়িকা লাম ইয়াকুনু মু'জিযীনা ফিল আরদ্ব (তারা পৃথিবীতে আল্লাহ্র বিধান ব্যর্থ করতে পারতো না)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মু'জিযীন' অর্থ অগ্রগামী। কাতাদা বলেছেন, পলায়নকারী। মুকাতিল বলেছেন, বন্ধনমুক্ত হয়ে পলায়নপর। অর্থগুলো সৌসাদৃশ্যপূর্ণ। মূল কথা হচ্ছে— তারা পৃথিবীতে আল্লাহ্র বিধান ব্যর্থ করতে পারতো না। না পারতো অগ্রগামী হতে। না পারতো পালাতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের অপর কোনো অভিভাবক ছিলো না।' একথার অর্থ— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর কোনো অভিভাবক বা সুহৃদও নেই, যারা তাদের শাস্তি দূর করার চেষ্টা করতে পারে। আল্লাহ্পাক

www.eelm.weebly.com

পরকালে তাদের জন্য শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। সে শাস্তি পৃথিবীর শাস্তির তুলনায় কিছুই নয়। তা ছাড়া পৃথিবীর শাস্তি এক সময় শেষ হয়ে যাবে কিন্তু পরকালের শাস্তি অনিঃশেষ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে।' সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধকতা রচনাকারী ও সত্য ধর্মের ত্রুটি অনু-সন্ধানকারী, তাদের অপরাধ দ্বিগুণ। তারা নিজেরা ভ্রষ্ট। আবার অপরকেও ধর্মচ্যুত করতে সচেষ্ট। তাই তাদের শাস্তিকে করা হবে দ্বিগুণ।

শেষে বলা হয়েছে—'তাদের শুনবার সামর্থ্য ছিলো না এবং তারা দেখতোও না।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ তাদেরকে সত্যশ্রবণের ক্ষমতাই দান করেননি। তাই প্রকৃত সত্যবাণী শুনবার সামর্থ্য তাদের নেই। আর প্রকৃত দৃষ্টিপ্রাপ্তি থেকেও তারা বঞ্চিত। তাই আল্লাহ্র পবিত্র বাণী শ্রবণ করে এবং নিদর্শন সমূহ অবলোকন করেও তাদের কোনো ভাবান্তর ঘটে না।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তারা নিজেদেরই ক্ষতি করলো এবং যা ছিলো তাদের কল্পনাপ্রসূত তা তাদের নিকট মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো।' এ কথার অর্থ, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এক আল্লাহ্র ইবাদত ছেড়ে মূর্তিপূজা করে নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করলো। জান্নাতের বদলে গ্রহণ করলো জাহান্নামকে। তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিলো, পূজিত প্রতিমাগুলো তাদের জন্য সুপারিশ করবে। কিন্তু পৃথিবী পরিত্যাগের পর তারা বুঝবে, এই অলীক কল্পনা তাদের নিকটে আজ মিথ্যায় পর্যবসিত হলো।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'লা জারামা আন্নাহুম ফিল আখিরাতি হুমুল আখসারুন' (নিশ্চয় তারা হবে পরলোকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত)। এখানে উল্লেখিত 'লা জারামা' কথাটির শব্দগত বিন্যাস ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আলেমগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। কারো কারো মতে 'লা' অব্যয়টি এখানে অতিরিক্ত। অর্থাৎ অংশীবাদীরা যেমন ধারণা করে, তেমন কিছুতেই হবে না। 'জারামা' অর্থ অর্জন করা। অংশীবাদীরা পরকালে পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে, তাদের ধারণার্জিত সবই নিষ্ফল। তাই তখন তারাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। অথবা 'জারামা' অর্থ অবধারিত বা অনিবার্য। তাই বলা হয়েছে 'নিশ্চয় তারা হবে পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত'। অর্থাৎ পরকালে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'লা জারামা' হচ্ছে দু'টি শব্দসম্বলিত একটি পূর্ণ বাক্য এবং এর অর্থ হবে বাস্তব সত্য। অর্থাৎ পরলোকে মুশরিকদের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপারটি একটি বাস্তব সত্য। 'কামুস' রচয়িতা লিখেছেন, 'লা জারামা' অর্থ যার বিকল্প নেই। অর্থাৎ আখেরাতে তাদের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিকল্প কিছু নেই। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ— দাঁড়াবে অন্যান্য অবিশ্বাসীদের তুলনায় মক্কাবাসী মুশরিকেরা অধিক অপরাধী। কারণ তারা নিজেরা বিভ্রান্ত। আবার অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করতে সচেষ্ট। সুতরাং আখেরাতে তাদের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি বিকল্পবিহীন অনিবার্য।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাসী, সৎকর্মপরায়ণ এবং তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত, তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আখবাতু' অর্থ শঙ্কিত বা ভীত। কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্মুখী ও অবনত। মুজাহিদ বলেছেন, প্রশান্ত। কামুস প্রণেতা বলেছেন, শব্দটির অর্থ হবে বিনয়াবনত।

শেষোক্ত আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'দল দু'টির উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্নের উপমা; তুলনায় এই দুই কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?' একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অন্ধ ও বধির। আর বিশ্বাসীরা চক্ষুষ্মান ও শ্রবণ ক্ষমতাসম্পন্ন। এই দল দু'টো কি একে অপরের তুল্য হতে পারে? মিথ্যা কি কখনো সত্যের সমতুল্য হয়? সুতরাং হে সত্যপ্রত্যাখ্যানপরায়ণ জনতা! এই পরিচ্ছন্ন উপমাটি থেকে এখনো তোমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করবে না ?

দ্রষ্টব্যঃ 'মেছাল' শব্দটির অর্থ মর্যাদা, গুণাগুণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তুল্যমূল্য বিচার। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে 'মেছাল' শব্দটি এসেছে অবস্থাভেদের তুল্যতা অর্থে।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ২৫, ২৬, ২৭

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْۤا
اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۝ فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا
الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ
نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ۝

❒ আমি তো নূহ্কে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'আমি তোমাদিগের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী,

❒ 'যাহাতে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কিছুর ইবাদত না কর; আমি তোমাদিগের জন্য এক মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তি আশংকা করি।'

❒ তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা, যাহারা ছিল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, তাহারা বলিল, 'আমরা তোমাকে তো আমাদিগের মতই মানুষ দেখিতেছি; আমরা তো দেখিতেছি অনুধাবন না করিয়া তোমার অনুসরণ করিতেছে তাহারাই যাহারা আমাদিগের মধ্যে অধম, এবং আমরা আমাদিগের উপর তোমাদিগের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতেছি না, বরং আমরা তোমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করি।'

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! শুনুন, আমি নূহ্কে তার সম্প্রদায়ের হেদায়েতের জন্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছিলাম। সে আমার প্রত্যাদেশানুসারে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। আমি তোমাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করছি যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো উপাসনা কোরো না। যদি করো, তবে আমি তোমাদের জন্য এক মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। এখানে 'মুবীন' অর্থ প্রকাশ্য। আর 'আলীম' অর্থ মর্মন্তুদ বা যন্ত্রণাদায়ক।

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা, যারা ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তারা বললো, আমরা তোমাকে তো আমাদের মতই মানুষ দেখছি।' এ কথার অর্থ, হে নূহ্! তুমি তো আমাদের মতই সাধারণ মানুষ। তুমি আবার নবী হবে কীরূপে? তোমাকে আমরা নবী বলে মান্যই বা করবো কেনো? উল্লেখ্য যে, হজরত নূহের সম্প্রদায় মনে করতো বাদশাহ্ বা ফেরেশতা ছাড়া অন্য কেউ নবী হতে পারে না। 'মালাউ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ যে ভর্তি করে। এখানে মর্ম হবে সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ, জনতা যাদেরকে মান্য করে এবং যাদের উপস্থিতিতে জনসমাবেশের গুরুত্ব ও জৌলুস বৃদ্ধি পায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা তো দেখছি অনুধাবন না করে তোমার অনুসরণ করছে তারাই, যারা আমাদের মধ্যে অধম এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না, বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি।' এখানে উল্লেখিত 'আরাজিল' শব্দটি 'রজুলুন' এর বহুবচন। এর অর্থ অধম বা ইতর শ্রেণী। ইকরামা বলেছেন, তাঁতী, মুচি ইত্যাদি । 'রাই' অর্থ চোখের দেখা বা অন্তরের দেখা। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'রাই' অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস বা বদ্ধমূল ধারণা। 'বাদি' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'বুদ্‌বুন' থেকে। এর অর্থ প্রকাশ পাওয়া। অর্থাৎ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে মতামত প্রদান। 'বাদ্উন' থেকেও শব্দটি উৎসারিত হয়ে থাকতে পারে। 'বাদ্উন' অর্থ প্রারম্ভিক বা প্রাথমিক মত। অর্থাৎ গোত্র প্রধানদের মতে দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ভাবনা চিন্তা না করেই হজরত নূহের অনুসারী হয়েছিলো। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী গোত্র প্রধানেরা বললো, হে নূহ্! আমরা তো দেখছি অবিবেচক ও বুদ্ধিহীন একদল নিম্ন শ্রেণীর লোক তোমার অনুসারী হয়েছে। বিত্তহীন ও প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন ওই লোকেরা কোনো দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। তাই তোমাকে ও তোমার অনুসারীদেরকে আমরা মিথ্যাবাদী বলে মনে করি।

www.eelm.weebly.com

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ۝ وَيٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝ وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَاۤ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْۤ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ ۚۖ اِنِّيْۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

❒ সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক-প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁহার নিজ অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন, অথচ এ বিষয়ে তোমরা জ্ঞানান্ধ হও, আমি কি এ বিষয়ে তোমাদিগকে বাধ্য করিতে পারি যখন তোমরা ইহা অপছন্দ কর?

❒ 'হে আমার সম্প্রদায়! ইহার পরিবর্তে আমি তোমাদিগের নিকট ধন সম্পদ যাচ্‌ঞা করি না। আমার শ্রমফল আছে আল্লাহের নিকট এবং বিশ্বাসিগণকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নয়; তাহাদিগের প্রতিপালকের সহিত নিশ্চিতভাবে তাহাদিগের সাক্ষাৎকার ঘটিবে। কিন্তু আমি দেখিতেছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

❒ 'হে আমার সম্প্রদায় ! আমি যদি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেই তবে আল্লাহের শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে? তবুও কি তোমরা অবধান করিবে না?

❒ আমি তোমাদিগকে বলি না, 'আমার নিকট আল্লাহের ধন-ভাণ্ডার আছে।' অদৃশ্য সম্বন্ধে আমি অবগত নহি, 'এবং আমি ইহাও বলি না যে আমি ফেরেশ্‌তা।'

www.eelm.weebly.com

তোমাদিগের দৃষ্টিতে যাহারা হেয় তাহাদিগের সম্বন্ধে আমি বলি না যে আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনই মংগল দান করিবেন না; তাহাদিগের অন্তরে যাহা আছে, তাহা আল্লাহ্ সম্যক অবগত। এইরূপ বলিলে আমি অবশ্যই সীমালংঘনকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত নুহ্ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা জ্ঞানান্ধ। যদি চক্ষুষ্মান হতে, তবে দেখতে আমি আমার প্রভুপালনকর্তা প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমার প্রভুপালক আমাকে দান করেছেন তাঁর আপন অনুগ্রহ। এ কথা যদি তোমরা বুঝতে না পারো, তবে কি করতে পারি আমি। হেদায়েতপ্রাপ্তি যদি তোমাদের কাম্য না হয়, তবে কিই বা করার আছে আমার। এ ব্যাপারে কি জোর জবরদস্তি করা যায়? তোমরা চাও না, অথচ হেদায়েত গ্রহণে তোমাদেরকে কি বাধ্য করা যায়? কাতাদা বলেছেন, বল প্রয়োগের মাধ্যমে হেদায়েত প্রদানের নিয়ম থাকলে নবী-রসুলগণ তাই করতেন। কিন্তু তাঁরা এরকম নির্দেশপ্রাপ্ত নন।

পরের আয়াতের (২৯) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত নুহ্ পুনরায় বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! শোনো, তোমাদেরকে সত্য ধর্মের আশ্রয়ে ফিরিয়ে আনবার জন্য যে পরিশ্রম আমি করছি, আমি তো তোমাদের নিকটে সেই পরিশ্রমের বিনিময়-প্রত্যাশী নই। এর জন্য কোনো ধন-সম্পদ আমি চাই না। আমার শ্রমফল রয়েছে আল্লাহ্র নিকট। প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন বলে আমার অনুসারীদেরকে তোমরা তাড়িয়ে দিতে বলো। এ কথাও বলো যে, তাদেরকে তাড়িয়ে দিলে তোমরা আমার অনুগত হতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? তারা যে বিশ্বাসী! তারা আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যভাজন। পৃথিবীর জীবন শেষে তারা লাভ করবে আল্লাহ্তায়ালার সন্দর্শন। সুতরাং তাদেরকে আমি বিতাড়িত করতে পারি না। অজ্ঞ তোমরা। তাই বিশ্বাসীদের মর্যাদা বুঝতে প্যারো না। একথাও জানো না যে, আগামীতে তোমাদেরকেও জবাবদিহির জন্য আল্লাহ্পাকের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে।

পরের আয়াতের (৩০) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত নুহ্ পুনরায় বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি আল্লাহ্পাকের এই প্রিয়জনদেরকে তাড়িয়ে দেই, তখন স্বয়ং আল্লাহ্ কি আমার উপরে অপ্রসন্ন হবেন না? তাঁর অপ্রসন্নতাজনিত শাস্তি থেকে আমাকে তখন রক্ষা করবে কে? সুতরাং এখনো কি তোমরা বুঝতে পারছো না যে, বিশ্বাসীদের অমর্যাদা করা অত্যন্ত গর্হিত একটি অপরাধ?

শেষোক্ত আয়াতের (৩১) মর্মার্থ হচ্ছে— আমি তোমাদেরকে বলি না, আমার নিকট আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডার আছে, অদৃশ্য সম্বন্ধে আমি অবগত এবং আমি এমনও বলিনা যে, আমি ফেরেশতা। এরকম অযৌক্তিক ও অসমীচীন দাবী তুললে তোমরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ পেতে। বলতে পারতে আমার দাবী

www.eelm.weebly.com

অসত্য। তোমরা আমার অনুসারী বিশ্বাসীদেরকে হেয় মনে করো। কিন্তু আমি সেরকম মনে করি না। একথাও বলতে পারি না যে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনোই মঙ্গল দান করবেন না। কারণ অদৃশ্যের (ভবিষ্যতের) জ্ঞান আমার নেই। তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্থূল ও অসম্পূর্ণ। তাই তোমরা পার্থিব বিত্ত-বৈভবহীনদেরকে অন্ত্যজ বা ব্রাত্যজন মনে করছো। কিন্তু তোমরা জানো না, তাদের হৃদয়ে রয়েছে ইমান ও হেদায়েতের মতো অক্ষয় বৈভব, যার কারণে আখেরাতের অনন্ত জীবনে তারা লাভ করবে চিরস্থায়ী মর্যাদা ও সৌভাগ্য। ওই অক্ষয় কল্যাণের তুলনায় তোমাদের জাগতিক বিত্ত-বৈভব ও প্রতিপত্তি কিছুই নয়। সুতরাং কীভাবে আমি বলবো যে, আল্লাহ্ তাদেরকে মঙ্গল দান করবেন না। এরকম বললে আমি হবো সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভূত। কেবল আল্লাহ্ই জানেন তাদের অন্তর্গত বিশ্বাস কতখানি বিশুদ্ধ ও উন্নত।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৩২, ৩৩, ৩৪

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ
كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○ قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ
بِمُعْجِزِيْنَ ○ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ
كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۟ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

❑ তাহারা বলিল, 'হে নূহ! তুমি আমাদিগের সহিত বিতণ্ডা করিয়াছ— তুমি বিতণ্ডা করিয়াছ আমাদিগের সহিত অতি মাত্রায়; সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।'

❑ সে বলিল, 'ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ই উহা তোমাদিগের নিকট উপস্থিত করিবেন এবং তোমরা উহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।'

❑ 'আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতে চাহিলেও আমার উপদেশ তোমাদিগের উপকারে আসিবে না যদি আল্লাহ্ তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে চাহেন। তিনিই তোমাদিগের প্রতিপালক এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তন করিবে।'

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— গোত্র প্রধানেরা বললো, হে নূহ্! তুমি অযথা আমাদের সঙ্গে ক্রমাগত বাক-বিতণ্ডা করে চলেছো। এরকম করে কোনো লাভ নেই। এভাবে তুমি আমাদেরকে কিছুতেই তোমার দিকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। তুমি বলো, তোমাকে না মানলে আমাদের উপরে আল্লাহ্র আযাব আপতিত হবে। এভাবে আযাবের ভয় দেখিয়েও তুমি আমাদের ভীত করতে পারবে না। যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে বাদানুবাদ পরিহার করে এখনই আযাব

www.eelm.weebly.com

নিয়ে এসো। হজরত নুহ্ বললেন, হে আমার অবোধ সম্প্রদায়! তোমরা এই সহজ কথাটি কেনো বুঝতে পারছো না যে, আমি বার্তাবাহক মাত্র। যার বার্তা আমি তোমাদের নিকট প্রচার করে চলেছি, সেই ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্ই আযাব দেয়া না দেয়ার মালিক। বিষয়টি সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায়াধীন। যদি সেই চিরস্বাধীন পবিত্রাতিপবিত্র আল্লাহ্ শাস্তি দিতে চান, তবে কিছুতেই তা রোধ করতে পারবে না। আরো শোনো হে অবিমৃশ্য জনগোষ্ঠী! যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান, তবে আমি এভাবে ক্রমাগত উপদেশ দিতে থাকলেও তা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ্ যেমন আমার প্রভুপ্রতিপালক, তেমনি তোমাদেরও প্রভুপালয়িতা। শেষ পর্যন্ত অন্যদের মতো তোমাদেরকেও তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনিই তখন প্রদান করবেন প্রত্যেকের কৃতকর্মের যথাপ্রতিফল।

শেষোক্ত আয়াতের মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিভ্রান্তি সৃষ্টিও আল্লাহ্পাকের ইচ্ছাসম্পৃক্ত একটি বিষয়। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কোনো কর্ম বাস্তবায়িত হওয়া অসম্ভব। এরকমও হতে পারে যে 'ইউগবিয়াকুম' শব্দটির অর্থ হবে এখানে, ধ্বংস করা। এরকম হলে বক্তব্যবিষয়টি দাঁড়াবে এ রকম— হে আমার অবুঝ সম্প্রদায়! আল্লাহ্ যদি তোমাদেরকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার হিতোপদেশ তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন। ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বেপরোয়া।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৩৫

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ۝

❑ তাহারা কি বলে যে, সে ইহা রচনা করিয়াছে? বল, 'আমি যদি ইহা রচনা করিয়া থাকি তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হইব। তোমরা যে অপরাধ করিতেছ তাহার জন্য আমি দায়ী নহি।'

'তারা কি বলে যে, সে এটা রচনা করেছে' অর্থ মক্কার মুশরিকেরা কি বলে যে, আমার রসুল মোহাম্মদ এই কোরআনের রচয়িতা? মুকাতিল ও হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উদ্ধৃত বাক্যটির অর্থ হবে— নুহের সম্প্রদায়ের লোকেরা কী মনে করে, আমার রসুল নুহ্ তার প্রতি প্রত্যাদেশগুলোর রচয়িতা?

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, আমি যদি এটা রচনা করে থাকি তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হবো। তোমরা যে অপরাধ করছো, তার জন্য আমি দায়ী নই।' এ কথার অর্থ (মোহাম্মদ অথবা নুহ্) আপনি বলুন, যদি আমি এই

www.eelm.weebly.com

গ্রন্থ (প্রত্যাদেশ) রচনা করে থাকি, তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হবো। আর তোমাদের কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে তোমরা। কিছুতেই তোমাদের অপরাধের দায় আমার উপরে বর্তাবে না। তোমাদের অংশীবাদিতা ও সত্য-প্রত্যাখ্যান থেকে আমি মুক্ত ও পবিত্র।

জুহাকের মাধ্যমে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত নূহ্ আ.কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্মম প্রহারে জর্জরিত করতো। প্রহৃত হয়ে তিনি কখনো কখনো মাটিতে ঢলে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। লোকেরা খুশী হতো। মনে করতো, তিনি পরলোকগমন করেছেন। অচেতন নবীকে তারা বস্ত্রাচ্ছাদিত করে ফেলে রেখে আসতো তাঁরই গৃহে। কিন্তু দেখা যেতো দু'একদিন পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে আহত নবী পুনরায় শুরু করতেন সত্যধর্মের অন্তরঙ্গ প্রচার। এক বর্ণনায় এসেছে, জনৈক বৃদ্ধ তার ছেলের সঙ্গে পথ চলতে চলতে সাক্ষাত পেলো হজরত নূহের। বৃদ্ধটি বললো, বৎস, সাবধান! এই বুড়োর খপ্পরে পোড়ো না। সে কিন্তু পাগল। ছেলেটি বললো, লাঠিটা দিনতো। একথা বলেই পিতার লাঠিটি নিলো সে। উপর্যুপরি প্রহার করতে লাগলো বয়োবৃদ্ধ নবীকে। তখন আহত নবীকে লক্ষ্য করে প্রেরিত হলো প্রত্যাদেশ। সেই প্রত্যাদেশগুলোর কথাই বিবৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতগুলোতে এভাবে—

সূরা হূদঃ আয়াত ৩৬

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

☐ নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল, 'যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেহ কখনও বিশ্বাস করিবে না। সুতরাং তাহারা যাহা করে তজ্জন্য তুমি ক্ষোভ করিও না।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! নূহের বৃত্তান্ত কিছু শুনুন। তিনি সুদীর্ঘ দিবস ধরে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানালেন। কিন্তু অল্প কিছুসংখ্যক লোক ব্যতীত অন্যান্যরা সত্য-প্রত্যাখ্যানকেই আঁকড়ে ধরে রইলো। দিনের পর দিন ক্রমাগত উৎপীড়ন চালিয়ে যেতে লাগলো তাঁর উপর। আমি তখন প্রত্যাদেশ করলাম— হে আমার প্রিয় নবী নূহ্! এবার আপনি ক্ষান্ত হোন। যে কয়জন এ পর্যন্ত আপনার উপর ইমান এনেছে, তারা ছাড়া আর কেউ ইমান আনবে না। সুতরাং অবাধ্যদের জন্য আপনি আর আক্ষেপ করবেন না। ব্যথিত হবেন না।

উবাইদ বিন উমাইর লায়সী সূত্রে মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, স্বসম্প্রদায়ের লোকেরা হজরত নূহের উপর অকথ্য অত্যাচার করতো। কখনো করতো প্রহার। আবার কখনো গলাধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতো মাটিতে। তারপর

www.eelm.weebly.com

গলাটিপে ধরতো। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতেন। জ্ঞান ফিরে পেলে প্রার্থনা জানাতেন, হে করুণাময়! হে আমার দয়ার্দ্র প্রভুপ্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা বোধ-বুদ্ধিহীন। তুমি তাদেরকে মার্জনা করো। কিন্তু এতে করেও বোধোদয় ঘটলো না অবাধ্যদের। বেড়েই চললো অত্যাচার। অত্যাচারের পর অত্যাচার। নবী নুহ্ নিরাশ হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন, পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো ফিরে আসবে সত্য ধর্মের আশ্রয়ে। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা হয়ে পড়লো আরো অধিক উন্নাসিক। বলতে শুরু করলো, এই লোকটি কয়েকজন ইতর শ্রেণীর লোককে নিয়ে আমাদের পিতা, পিতামহের যুগ থেকে আমাদেরকে উত্যক্ত করে চলেছে। এরা বদ্ধ উন্মাদ না হলে একই কথা বার বার বলতে থাকবে কেনো। মনোবেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়লেন হজরত নুহ্। প্রার্থনা জানালেন— রব্বি দাআইতু ক্বওমি লাইলাঁও ওয়া নাহারা রব্বি লা তাজার্ আ'লাল আরদ্বি মিনাল কাফিরীনা দাইয়ারা (হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার জাতিকে অবশ্যই আহ্বান জানিয়েছি নিশিদিন হে আমার প্রতিপালক! ধরাপৃষ্ঠের কোনো কাফেরকুলকে বাদ দিয়ো না)।

এমতো প্রার্থনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৩৭, ৩৮, ৩৯

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۝ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۝ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝

❒ 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর এবং যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে তাহাদিগের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও না; তাহারা তো নিমজ্জিত হইবে।'

❒ সে নৌকা নির্মাণ করিতে লাগিল এবং যখনই তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তাহার নিকট দিয়া যাইত তাহাকে উপহাস করিত; সে বলিত, 'তোমরা যদি আমাদিগকে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদিগকে উপহাস করিব যেমন তোমরা উপহাস করিতেছ;

❒ 'এবং তোমরা অচিরে জানিতে পারিবে কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি ও স্থায়ী শাস্তি কাহার জন্য অবশ্যম্ভাবী।'

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করো এবং যারা সীমালংঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বোলো না।' এখানে 'আমার প্রত্যাদেশ'(ওহী) অনুযায়ী কথাটির অর্থ হবে আমার নির্দেশ অনুযায়ী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— এখানে 'আইনুন' শব্দটির অর্থ হবে, দৃষ্টি (দৃষ্টির সম্মুখে)। মুকাতিল বলেছেন, জ্ঞান (জ্ঞানের আওতায়)। কেউ কেউ বলেছেন, পৃষ্ঠপোষকতায় বা তত্ত্বাবধানে চাক্ষুষ তত্ত্বাবধানই অধিকতর কার্যকর। তাই এখানে অর্থ করা হয়েছে— আমার তত্ত্বাবধানে (আমার চোখের সামনে)। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার প্রিয় নবী নুহ্! আপনি আমার সুদৃষ্টিসম্ভূত তত্ত্বাবধান ও আমার প্রত্যাদেশিত নির্দেশানুসারে একটি নৌকা নির্মাণ করুন এবং যারা সীমালংঘনকারী, তাদের সম্পর্কে আমার নিকটে কোনো সুপারিশ করবেন না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা তো নিমজ্জিত হবে।' একথার অর্থ, হে আমার নবী! এটা সুনিশ্চিত যে, আপনার সম্প্রদায়ের সীমালংঘনকারীদেরকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। এটাই তাদের ললাটলিপি। হজরত নুহের কাহিনী লিপিবদ্ধকালে বাগবী লিখেছেন, তখন হজরত জিবরাইল হজরত নুহ্‌কে বললেন, হে ভ্রাতঃ নুহ্! আপনার পালনকর্তা আপনাকে একটি নৌকা নির্মাণ করতে বলেছেন। হজরত নুহ্ বললেন, আমি তো নৌকা নির্মাণের কলাকৌশল জানি না। হজরত জিবরাইল বললেন, আপনি তো আপনার প্রভুপালকের সুদৃষ্টিজাত তত্ত্বাবধানে নির্মাণ কার্য শুরু করবেন। তাই একাজে সফলও হবেন। আর আমিও একর্মে আপনার সহযোগী। হজরত নুহ্ নৌকা নির্মাণ শুরু করলেন। ধীরে ধীরে নির্মিত হলো একটি সুদৃশ্য তরণী। তরণীটির আকৃতি দাঁড়ালো পক্ষীর বক্ষদেশ সদৃশ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৩৮ ও ৩৯) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত নুহ্ তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে সাথে নিয়ে একটি বৃহদাকৃতির নৌকা নির্মাণ করতে শুরু করলেন। লোকেরা দেখলো নৌকা নির্মাণ ছাড়া আর কোনো দিকেই তাঁর দৃকপাতমাত্র নেই। বাগবী লিখেছেন, তখন হজরত নুহের সম্প্রদায়ের রমণীকুল হয়ে পড়লো বন্ধ্যা। রুদ্ধ হয়ে গেলো তাদের গর্ভধারণ ক্ষমতা।

নৌকা নির্মাণে ব্যস্ত নবীর পাশ দিয়ে গমনাগমন কালে তাঁর সম্প্রদায়ের নেতারা বিভিন্নভাবে তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে শুরু করলো। কোথাও পানির কোনো চিহ্ন নেই। শুকনো মাটিতে চলেছে নৌকা তৈরীর মহা আয়োজন। এ দৃশ্য দেখে তারা কৌতুক বোধ করলো। ঠাট্টা করে বললো, হে নুহ্! তুমি তো আগে ছিলে নবী। এখন হয়েছো পরহিতৈষী। এক বর্ণনায় এসেছে, তারা জিজ্ঞেস করতো, কী করছো নুহ্? তিনি জবাব দিতেন, একটি গৃহ নির্মাণ করছি, যা হবে সলিলে সঞ্চারমান। একথা শুনে হেসে উঠতো তারা।

www.eelm.weebly.com

সম্প্রদায় প্রধানদের বিদ্রূপের জবাবে হজরত নূহ্ বলতেন, তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছো। কিন্তু শুনে নাও, একদিন আমরাও তোমাদেরকে এভাবে উপহাস করবো। অর্থাৎ এখন যেভাবে তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছো, আগামীতে তেমনি তোমাদেরকে উপহাস করবো তোমাদের সলিল সমাধির সময় এবং তোমাদের নরকবাসের সময়। যেমন তোমরা আমাদেরকে নির্বোধ ভাবছো, তেমনি তখন তোমাদেরকেও নির্বোধ ভাববো আমরা। এই বিদ্রূপের মাশুল তোমাদেরকে দিতেই হবে। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কার উপর স্থায়ী শাস্তি হবে অনিবার্য।

বাগবী লিখেছেন, ইহুদীরা মনে করে, হজরত নুহের উপর আল্লাহ্পাকের নির্দেশ ছিলো এ রকম— নৌকা বানাতে হবে গোফর অথবা শাল কাঠ দিয়ে। অগ্রভাগ ঝুঁকে থাকবে সামনের দিকে। তেলের সঙ্গে ধূপ মিশিয়ে পালিশ করতে হবে ভিতর ও বাহির। নৌকার দৈর্ঘ্য হতে হবে আশি হাত, প্রস্থ পঞ্চাশ হাত এবং গভীরতা ত্রিশ হাত। আর নৌকাটি হতে হবে ত্রিতলবিশিষ্ট। আল্লাহ্পাকের এই পরিকল্পনা অনুসারে হজরত নুহ্ তাঁর নৌকা নির্মাণ করেছিলেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইসহাক বিন বাশার এবং ইবনে আসাকের উল্লেখ করেছেন, কিশ্তি নির্মাণের নির্দেশ পেয়ে হজরত নুহ্ নিবেদন করলেন, তক্তা কোথায় পাবো? আল্লাহ্পাক জানালেন, গোফর অথবা শাল গাছ বপন করুন। তিনি তাই করলেন। গাছ বেড়ে উঠার জন্য অপেক্ষা করলেন বিশটি বছর। ওই বিশ বছর তিনি আর ধর্ম প্রচারের কাজ করেননি। বিরুদ্ধবাদীরাও আর অত্যাচার করেনি। শাল বৃক্ষগুলো যখন পরিণত হলো, তখন তিনি সেগুলোকে কেটে ফেঁড়ে তক্তা বানালেন। শুকিয়ে নিলেন ভালো করে। তারপর নিবেদন করলেন, হে আমার মহাপ্রজ্ঞাধর প্রভুপ্রতিপালক! কী ধরনের গৃহ তৈরী করবো ? আল্লাহ্পাক জানালেন, ত্রিতলবিশিষ্ট। সম্মুখভাগ হবে মোরগের মাথার মতো। পশ্চাৎভাগ হবে মোরগের পুচ্ছের মতো। আর মধ্য ভাগ হবে পাখির বুকের মতো সামনের দিকে প্রসারিত। দু'পাশে থাকবে দরজা। দরজা দু'টোর চারপাশ বেঁধে দিতে হবে লোহা দিয়ে। এরপর আল্লাহ্ হজরত জিবরাইলের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন কিশ্তি নির্মাণের সকল কলাকৌশল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও হজরত কা'ব থেকে হজরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যেইবের মাধ্যমে ইবনে আসাকেরও এরকম বর্ণনা করেছেন।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে নির্মিত হয়েছিলো হজরত নুহের নৌকা। সে নৌকার দৈর্ঘ্য ছিলো তিনশত হাত, প্রস্থ পঞ্চাশ হাত এবং উচ্চতা ত্রিশ হাত। কাঠের তক্তা দ্বারা নির্মিত ওই নৌকাটির ছিলো তিনটি তলা। নিচের তলায় ছিলো বন্য প্রাণী ও হিংস্র জানোয়ার। মধ্যম তলায় ছিলো উট, ঘোড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশু। আর উপরের তলায় পানাহারের সামগ্রী ও অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন হজরত নুহ্ ও তাঁর সঙ্গীগণ।

www.eelm.weebly.com

হজরত সামুরা ইবনে জুন্দুব থেকে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, নৌকাটি লম্বায় ছিলো তিনশ' হাত, পাশে পঞ্চাশ হাত আর উচ্চতায় ত্রিশ হাত।

ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিতে নৌকাটির প্রস্থের পরিমাপ উল্লেখিত হয়নি। কাতাদা সূত্রে আব্দ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির এবং আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, তিনশ' হাত লম্বা, পঞ্চাশ হাত চওড়া এবং ত্রিশ হাত উঁচু ছিলো নৌকাটি। প্রস্থের দিকে ছিলো একটি দরজা।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ত্রিতলবিশিষ্ট ওই তরণীর এক তলায় ছিলো চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র জানোয়ার। এক তলায় ছিলো পক্ষীকুল। খুলাসাতুস্ সিয়ার গ্রন্থে রয়েছে, নিচের তলায় ছিলো পাখি, গৃহ পালিত পশু ও বন্য জন্তু। দ্বিতীয় তলায় ছিলো পানাহারের সামগ্রী ও পরিধেয় বসন। তৃতীয় তলা নির্ধারিত ছিলো মানুষের জন্য।

আল্লামা শামী লিখেছেন, হজরত নুহের নৌকা ছিলো আশি হাত লম্বা, পঞ্চাশ হাত চওড়া ও ত্রিশ হাত উঁচু। আর হাত মানে হবে গজ। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণনাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, হাত অর্থ হাতই, গজ নয়।

সূরা হূদ ঃ আয়াত ৪০

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ؕ وَمَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝

❒ অবশেষে আমার আদেশ আসিলে ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হইল। আমি বলিলাম, 'ইহাতে উঠাইয়া লও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া, যাহাদিগের বিরুদ্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনকে এবং যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে।' তাহার সংগে বিশ্বাস করিয়াছিল অল্প কয়েক জন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হাত্তা ইজা জ্বাআ আমরুনা ওয়া ফারাত্ তান্নূর' (অবশেষে আমার আদেশ এলে ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হলো)। আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা ও জুহরী বলেছেন, 'তান্নূর' অর্থ ভূপৃষ্ঠ। বাগবীও এরকম বলেছেন। সাঈদ বিন মনসুর, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম এবং আবু শায়েখ উক্তিটি সম্পৃক্ত করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়— অবশেষে একদিন আমার আদেশে ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হলো।

www.eelm.weebly.com

আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, এখানে 'তান্নূর' অর্থ হবে ভূপৃষ্ঠের উচ্চ স্থান। ইবনে আবী হাতেম বক্তব্যটির সম্পর্ক ঘটিয়েছেন হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে এবং 'তান্নূর' থেকে মর্ম গ্রহণ করেছেন— আইনুল ওয়ারদা। আইনুল ওয়ারদা সিরিয়ার একটি ঝর্ণার নাম।

এক বর্ণনানুসারে হজরত আলীর অভিমত হচ্ছে 'ফারাত্ তান্নূর' অর্থ— ভোরের আলো প্রস্ফুটিত হলো, সকাল হলো। হাসান বসরী, মুজাহিদ ও শা'বীর মতে রুটি প্রস্তুত করার তন্দুরকে বলে তান্নূর। অধিকাংশ তাফসীরকার এই অভিমতটিকে গ্রহণ করেছেন। আতিয়ার বর্ণনানুসারে হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতও এরকম। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন এরকম— যখন উনুন থেকে পানি উৎসারিত হলো। হাসান বর্ণনা করেছেন, প্রথম জননী হজরত হাওয়ার একটি প্রস্তর নির্মিত উনুন ছিলো। ওই উনুনটি বংশানুক্রমে পেয়েছিলেন হজরত নূহ্। তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিলো— ওই উনুন থেকে জলোৎসারণ দেখতে পেলে নৌকায় আরোহণ কোরো।

কথিত তন্দুরের চুলাটি কোথায় ছিলো, সে সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ রয়েছে। মুজাহিদ ও শা'বী বলেছেন, উনুনটি ছিলো কুফা নগরীর প্রান্তদেশে। শা'বী শপথ করে বলেছেন, কুফানগরীর এক পাশে অবস্থিত ওই চুলা থেকেই উদগত হয়েছিলো পানির প্রস্রবণ। এখন কুফা মসজিদ যেখানে, সেখানেই হজরত নূহ্ নির্মাণ করেছিলেন তাঁর তরণী। চুলাটি ছিলো বাবে কুন্দার প্রবেশ পথের দক্ষিণ প্রান্তে। ওই চুলা থেকে পানি উদগিরিত হওয়াই ছিলো প্লাবন শুরুর আলামত।

ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, কুফা মসজিদের বাবে কুন্দার পাশ থেকেই উচ্ছ্বসিত হয়েছিলো জলস্রোত। শা'বীর মধ্যস্থতায় আবু শায়েখ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী শপথ করে বলেছেন, মসজিদটি মুসলমানদের প্রধান চারটি মসজিদের একটি। মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববী ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে দশ রাকাত নামাজ পড়ার চেয়ে ওই মসজিদে এক রাকাত নামাজ পড়াকে আমি প্রিয় বিবেচনা করি। ওই মসজিদের ডান পাশে কেবলার দিকে ছিলো তন্দুরের চুলাটি।

মুকাতিল বলেছেন, চুল্লিটি ছিলো প্রথম পিতা হজরত আদমের । সিরিয়ার আইনুল ওয়ারদাতে রক্ষিত ছিলো চুল্লিটি। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, চুল্লিটি ছিলো হিন্দে। কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া মুশকিল যে, এই হিন্দ কি হিন্দুস্থান, না ইরাকের হিন্দ নামক স্থান। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণিত উক্তিটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়েখ ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, উক্তিটি বিশুদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি বললাম, এতে উঠিয়ে নাও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া।' এখানে 'জাওজাইন' অর্থ এক এক জোড়া। বাগবী লিখেছেন, তখন হজরত নুহ্ নিবেদন জানালেন, হে আমার প্রভুপালক! আমি জীবকুলের জোড়া বুঝবো কী রূপে? আল্লাহ্পাক সকল প্রাণীকে একত্র করলেন। হস্ত প্রসারিত করলেন হজরত নুহ্।

তাঁর ডান হাতে এলো পুরুষ জাতীয় প্রাণী, আর নারী জাতীয় প্রাণী এলো বাম হাতে। এভাবে জোড়া নির্ধারণ করে তিনি সেগুলোকে নৌকায় উঠালেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ব্যতীত তোমার পরিবার পরিজনকে এবং যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে।' একথার অর্থ— হে আমার নবী নুহ্! জীবের এক এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার পরিবার পরিজনকে এবং তোমার অনুগামী বিশ্বাসীদেরকেও নৌকায় উঠিয়ে নাও। কিন্তু তোমার পরিবার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে উঠিয়ো না। কারণ প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়াই তাদের অদৃষ্টলিপি। উল্লেখ্য যে, হজরত নুহের স্ত্রী ওয়াহিলা এবং তার উদরজাত পুত্র কিনান ছিলো কাফের। এখানে 'যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়েছে' কথাটি বলা হয়েছে তাদেরকে লক্ষ্য করে।

শেষে বলা হয়েছে—'তার সঙ্গে বিশ্বাস করেছিলো অল্প কয়েকজন।' এ কথায় বুঝা যায় হজরত নুহের সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ছিলো কাফের। ইমানদার ছিলেন অল্প কয়েকজন।

হজরত নুহের সহআরোহী ক'জন ছিলেন সে সম্পর্কে মতপৃথকতা পরিদৃষ্ট হয়। কাতাদা, ইবনে জুরাইজ ও মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজীর মতানুসারে তাঁর সহআরোহী ছিলেন আটজন। হজরত নুহ্ নিজে, তাঁর এক স্ত্রী, তিন পুত্র শাম, হাম ও ইয়াফিস ও তাঁদের তিন বধু।

ইবনে জারীর ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, ইবনে জুরাইজ বলেছেন, হজরত নুহের সঙ্গে নৌকায় উঠেছিলেন তাঁর তিন পুত্র ও তিন পুত্রবধু। পুত্রগণের নাম ছিলো শাম, হাম ও ইয়াফিস। ভাসমান ওই নৌকায় আপন স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে মিলিত হয়েছিলেন হাম। একারণে হজরত নুহ্ অতুষ্ট হয়েছিলেন তাঁর প্রতি। ফলে, হামের স্ত্রী প্রসব করেছিলো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একটি সন্তান। আ'মাশ বলেছেন, সর্বমোট নৌকা আরোহী ছিলেন সাতজন— হজরত নুহ্, তাঁর তিনপুত্র ও তাঁদের তিন পত্নী।

বর্ণিত উক্তিগুলো কোরআনের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ এখানে পরিবার পরিজন ছাড়াও বলা হয়েছে 'এবং যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে।' এক

www.eelm.weebly.com

বর্ণনানুসারে কাতাদা বলেছেন, নৌকার পুরুষ আরোহী ছিলেন দশজন— হজরত নুহ্, তাঁর তিন তনয় এবং হজরত নুহের পরিবার বহির্ভূত ছয়জন। এই দশজনের স্ত্রীরাও ছিলেন ওই নৌকায়। মুকাতিল বলেছেন, হজরত নুহের নৌকায় সর্বমোট আটাত্তরজন আরোহণ করেছিলেন। ওই আটাত্তরজনের অর্ধেক ছিলেন পুরুষ এবং অর্ধেক ছিলেন নারী।

হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যরূপে এক বর্ণনায় এসেছে— হজরত নুহের সহআরোহীগণের সংখ্যা ছিলো সর্বসাকুল্যে আশিজন। তার মধ্যে একজন ছিলেন জুরহাস গোত্রভূত। ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত নুহের সঙ্গে আশিজন আরোহণ করেছিলেন নৌকাটিতে। আর হজরত নুহ্ ছিলেন আরবী ভাষী। হজরত ইবনে আব্বাস একথাও বলেছেন যে, হজরত নুহ্ তাঁর নৌকায় সর্বপ্রথম উঠিয়েছিলেন একটি পিপীলিকা। আর সবশেষে উঠিয়েছিলেন একটি গাধা। নৌকার দরজা দিয়ে প্রবেশকালে ইবলিশ গাধাটির লেজ ধরে আটকিয়ে দিলো। গাধাটি আর অগ্রসর হতে পারলো না। হজরত নুহ্ বললেন, আরে গাধা! ভিতরে প্রবেশ করছোনা কেনো? গাধাটি অগ্রসর হতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। হজরত নুহ্ বললেন, ভিতরে ঢোকো, যদিও তোমার সাথে শয়তান থাকে। অতর্কিতে একথা উচ্চারণ করলেন হজরত নুহ্। শয়তান সুযোগ পেলো। সে গাধার লেজ ছেড়ে দিলো। গাধাটি ভিতরে ঢুকলো। সেও ঢুকলো তার সঙ্গে সঙ্গে। হজরত নুহ্ তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, রে আল্লাহ্র দুশমন! তুই কিভাবে নৌকায় ঢুকলি? সে বললো, আপনি তো গাধাকে এরকম বললেন। হজরত নুহ্ বললেন, এক্ষুণি বের হয়ে যা। সে বললো, আপনার অনুমতি পেয়েছি। সুতরাং আপনি আর আমাকে বের করে দিতে পারবেন না। কেউ কেউ মনে করেন, হজরত নুহের নৌকায় শয়তানও আরোহণ করেছিলো। কিছুসংখ্যক বর্ণনাকারীর অভিমত এরকম— সর্প ও বৃশ্চিক তখন উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র নবী! আমাদেরকেও নৌকায় উঠিয়ে নিন। হজরত নুহ্ বললেন, না। তোমরা মানুষকে কষ্ট দাও। সর্প ও বৃশ্চিক বললো, যদি কেউ আপনার নাম উচ্চারণ করে, তবে আমাদের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে। অদ্যাবধি এই বিশ্বাসটি প্রচলিত যে, কেউ 'সালামুন আ'লা নুহিন্ ফিল আ'লামীন' পাঠ করলে সাপ ও বিচ্ছু তাকে কামড়ায় না।

হাসান বলেছেন, হজরত নুহ্ তাঁর নৌকায় যে সকল প্রাণীকে উঠিয়েছিলেন, তারাই পরবর্তীতে শাবক অথবা ডিম্বের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে। আর যে সকল প্রাণী নর্দমাজাত অথবা পচনক্রিয়ার মাধ্যমে জন্ম নেয়, তিনি সেগুলোকে তাঁর নৌকায় ওঠাননি।

www.eelm.weebly.com

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ۭ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۣ وَنَادٰى نُوْحُ ۨ ابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ قَالَ سَاٰوِيْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَاۗءِ ۭ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ۝

❒ সে বলিল,'ইহাতে আরোহণ কর, আল্লাহের নামে ইহার গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

❒ পর্বতপ্রমাণ তরংগ মধ্যে ইহা তাহাদিগকে লইয়া বহিয়া চলিল; নূহ তাহার পুত্র, যে উহাদিগের হইতে পৃথক ছিল তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল, 'হে আমার পুত্র! আমাদিগের সংগে আরোহণ কর এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের সংগী হইও না।'

❒ সে বলিল, 'আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় লইব যাহা আমাকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিবে।' সে বলিল,'আজ আল্লাহের বিধান হইতে রক্ষা করিবার কেহ নাই, রক্ষা পাইবে সে যাহাকে আল্লাহ্ দয়া করিবেন।' ইহার পর তরংগ উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল এবং সে নিমজ্জিতদিগের অন্তর্ভুক্ত হইল।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সে বললো, এতে আরোহণ করো, আল্লাহ্র নামে এর গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।' এ কথার অর্থ— হজরত নুহ্ তাঁর সঙ্গীগণকে বললেন, নৌকায় উঠতে উঠতে এই দোয়া পড়তে থাকো— বিস্মিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রব্বি লা গফুরুর রহীম (আল্লাহ্র নামের বরকতে এই জলযানের গতি ও স্থিতি, আমার প্রভুপালক অবশ্যই ক্ষমাপরবশ ও দয়ার্দ্র)। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, জুহাক বলেছেন, হজরত নুহ্ তাঁর নৌকা চালাতে চাইলে বলতেন, বিসমিল্লাহ্ (আল্লাহ্র নামে)। সঙ্গে সঙ্গে নৌকা চলতে শুরু করতো। থামাতে চাইলেও বলতেন, বিস্মিল্লাহ্। অমনি থেমে যেতো ।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ মধ্যে সেটি তাদেরকে নিয়ে বয়ে চললো।' এখানে 'মউজ' অর্থ তরঙ্গ। শব্দটি 'মউজাতুন' এর বহুবচন।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'নূহ্ তার পুত্র, যে তাদের থেকে পৃথক ছিলো তাকে আহ্বান করে বললো, হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ করো এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গী হয়ো না।' হজরত নূহের এক পুত্র ছিলো কাফের। তার নাম ছিলো কিনান অথবা উবাইদ বিন উমাইর ইয়াম। আলোচ্য বাক্যে তার কথাই বলা হয়েছে।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নিবো যা আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে।' এ কথার অর্থ— কিনান বললো, প্লাবনের ভয় আমার নেই। যত প্লাবনই হোক সুউচ্চ পর্বত তো আর ডুববে না । আমি তেমনি একটি প্লাবন মুক্ত পাহাড়ে উঠে আত্মরক্ষা করবো।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, আজ আল্লাহ্র বিধান থেকে রক্ষা করবার কেউ নেই, রক্ষা পাবে সে যাকে আল্লাহ্ দয়া করবেন।' এ কথার অর্থ — হজরত নূহ্ বললেন, এ প্লাবন তো সেই প্লাবন নয়। এটা হচ্ছে আল্লাহ্র গজব। আজ এই বিধান জারী করা হয়েছে যে, সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে আজ এই মহাপ্লাবনে ডুবিয়ে মারা হবে । আজ আল্লাহ্ যাকে দয়া করবেন, সেই কেবল রক্ষা পাবে। সুতরাং হে আমার পুত্র! বাঁচতে যদি চাও, তবে আল্লাহ্র বিশেষ দয়ার প্রতীক এই নৌকায় আরোহণ করো। পাহাড়-পর্বত কোনো কিছুই আজ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'এরপর তরঙ্গ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো।' একথার অর্থ— কথোপকথনের সময় পিতা ও পুত্রের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো একটি বিশাল তরঙ্গ। ওই তরঙ্গ মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো কিনান। হয়ে গেলো অন্যান্য নিমজ্জিত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ডুবন্ত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতো সেও ডুবে গেলো অথৈ পানির তলায়। এক বর্ণনায় এসেছে, ওই মহাপ্লাবনের পানির উচ্চতা ছিলো সর্বোচ্চ পাহাড়ের চেয়েও দশ অথবা পনের হাত বেশী।

বাগবী লিখেছেন, বানের পানি বাড়তে থাকলে এক মাতা তার শিশু পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। সে শিশুকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে আরোহণ করলো এক পাহাড়ে। কিন্তু পাহাড়ও ডুবতে শুরু করলো। মহিলাটি উঠে গেলো সর্বোচ্চ শিখরে। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ভয়াবহ বন্যা ডুবিয়ে দিলো শিখরটিকে। গলা পর্যন্ত ডুবে গেলো সে। দু'হাতে শিশুটিকে তুলে ধরলো উচ্চে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো

www.eelm.weebly.com

না। ভয়ংকর তরঙ্গমালা ভাসিয়ে নিয়ে গেলো তাকে। আল্লাহ্পাক তখন ছিলেন রোষতপ্ত। তাঁর করুণার বিন্দুবৎ প্রকাশও যদি তখন থাকতো তবে তিনি নিশ্চয় ওই শিশু ও তার মাতাকে রক্ষা করতেন।

আমি বলি, ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, মহাপ্লাবনের কয়েক বৎসর পূর্ব থেকেই হজরত নুহের সম্প্রদায়ের রমণীরা বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিলো। এতে করে বুঝা যায় প্লাবনের প্রাক্কালে কারো কোনো শিশু পুত্র ছিলো না। সুতরাং মা ও শিশুর নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাটি অসংগত বলে মেনে নিতে হয়।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৪৪

وَقِيلَ يَٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝

❑ ইহার পর বলা হইল, 'হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি শোষণ করিয়া লও এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও।' ইহার পর বন্যা প্রশমিত হইল এবং কার্য সমাপ্ত হইল, নৌকা জুদী পর্বতের উপর স্থির হইল এবং বলা হইল 'ধ্বংসই সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়ের পরিণাম।'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাপ্লাবনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আল্লাহ্পাকের নির্দেশ ঘোষিত হলো, হে পৃথিবী! তোমার অভ্যন্তর থেকে যে পানি তুমি উদ্গীরণ করেছিলে তা শোষণ করে নাও। পৃথিবী নির্দেশ পালন করলো। রয়ে গেলো বৃষ্টির পানি। পুনরায় ঘোষিত হলো, হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। বন্ধ হয়ে গেলো বৃষ্টি। বানের পানি কমতে শুরু করলো। এভাবে প্রশমিত হলো আল্লাহ্র গজব। ভূ-পৃষ্ঠে সৃষ্টি হলো অনেক স্রোতবতী নদী। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো কাফেরকুল। হজরত নুহের নৌকা ঠেকলো মোসেল শহরের সন্নিকটে অথবা সিরিয়ার জুদী পাহাড়ে। পুনঃঘোষিত হলো, আল্লাহ্র কৃপাপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও ধ্বংস হওয়াই সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিণাম।

বাগবী বলেছেন, কোথাও মৃত্তিকা জেগে উঠলো কি না, তা জানবার জন্য হজরত নুহ্ তাঁর নৌকা থেকে ছেড়ে দিলেন একটি কাক। কাকটি দেখলো এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সীমালঙ্ঘনকারীদের গলিত মথিত মরদেহ। মৃতভক্ষণে মগ্ন হয়ে গেলো সে। নৌকায় ফিরে যাবার কথা ভুলে গেলো। হজরত নুহ্ এবার পাঠালেন একটি কবুতরকে। কিছুকাল পর ফিরে এলো কবুতরটি। হজরত নুহ্ দেখলেন, কবুতরটির পায়ে লেগে রয়েছে জয়তুনের ঝরা পাতা ও

www.eelm.weebly.com

কর্দম। হজরত নুহ্ বুঝলেন, বন্যার পানি আর নেই। শীঘ্রই অবতরণ করা যাবে। তিনি অবাধ্য কাকটির প্রতি অতুষ্ট হলেন। আর প্রসন্ন হলেন কবুতরটির প্রতি। কাককে বললেন, জনবসতিতে তোমার উপস্থিতি হবে তোমার জন্য ভীতিকর। তখন থেকে কাক মনুষ্য সমাজে বসবাস করতে পারে না। কিন্তু হজরত নুহের আশীর্বাদে কবুতর বাস করে মানুষের গৃহসীমানায়।

আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির ও আবু শায়েখ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, কাতাদা আমাদেরকে বলেছেন, হজরত নুহ্ ও তাঁর সাথীদেরকে বহনকারী নৌকাটি প্রলয়ংকরী বন্যায় ভাসতে শুরু করেছিলো দশই রজবে। দীর্ঘ একশত পঞ্চাশ দিন ধরে পানিতে ভেসে ভেসে চলার পর দশই মহররমে সেটি ঠেকে গিয়েছিলো জুদী পাহাড়ের গায়ে। যাত্রীরা সেখানেই নেমেছিলেন। খালেদ ইবনে যাইয়াত সূত্রে ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে এই কথাটুকু— মাটিতে অবতরণের প্রাক্কালে হজরত নুহ্ তাঁর সহচরগণকে বলেছিলেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আজ সকলে রোজা রাখো।

বাগবী লিখেছেন, দশই রজব নৌকাটি ভেসেছিলো। ভাসতে ভাসতে যখন কাবা শরীফের স্থানে পৌঁছলো তখন অদৃশ্য থেকে ঘোষিত হলো সাতটি আওয়াজ। বন্যাগ্রস্ত হওয়ার আগেই কাবাকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন আল্লাহ্পাক। বানের পানি কমেছিলো দীর্ঘ ছয় মাস পর। মহাপ্লাবনের নবী তাঁর অনুচরবৃন্দসহ ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করেছিলেন দশই মহররম তারিখে। সেদিন কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ তিনি রোজা রেখেছিলেন। অনুচরবৃন্দকেও রোজা রাখতে বলেছিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন, কাফেরদের মধ্যে রক্ষা পেয়েছিলো কেবল উজ বিন উনুক। অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ উজের কটিদেশ পর্যন্ত ডুবেছিলো বানের পানিতে। হজরত নুহের নৌকা নির্মাণের জন্য সে বহন করে আনতো শাল কাঠের ভারী স্তূপ। কিছু কাঠ নাকি সে সিরিয়া থেকেও বয়ে নিয়ে এসেছিলো। সে কারণেই রক্ষা পেয়েছিলো সে।

আমি বলি, উজের বিবরণটি কোরআন মজীদের বর্ণনার বিরুদ্ধে। কোরআনে বলা হয়েছে 'নুহ্ বললো, হে আমার প্রভুপালক! ভূ-পৃষ্ঠের কোনো কাফেরকে অব্যাহতি দিবেন না।' অন্যত্র বলা হয়েছে, 'সীমালংঘনকারীরা আল্লাহ্র রহমত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।' আর এক জায়গায় বলা হয়েছে 'সেদিন আল্লাহ্র আক্রোশ থেকে কেউ রক্ষা পায়নি।' এরকম সুস্পষ্ট প্রমাণের পর উজের কল্পকাহিনীটিকে কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। সম্ভবতঃ কিংবদন্তিটি পথভ্রষ্ট ইহুদী খৃষ্টানদের নিজস্ব রচনা।

www.eelm.weebly.com

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ
وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ۝ قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ
غَيْرُ صَالِحٍ ۫ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّيْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ
مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ
عِلْمٌ ؕ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

❒ নূহ তাহার প্রতিপালককে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং আপনি বিচারকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।'

❒ তিনি বলিলেন, 'হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নহে। সে অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে-বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি তুমি যেন অজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত না হও।'

❒ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে-বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই সে-বিষয়ে যাহাতে আপনাকে অনুরোধ না করি এই জন্য আমি আপনার শরণ লইতেছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কিনানের নিমজ্জিত হওয়ার প্রাক্কালে হজরত নূহ্ নিবেদন জানালেন, হে আমার পালনকর্তা! তুমিতো অঙ্গীকার করেছো, আমার পরিবার পরিজনকে রক্ষা করবে। অতএব আমার পুত্রকে বাঁচাও। এরকমও বলা যেতে পারে যে, প্লাবন প্রশমিত হওয়ার পর হজরত নূহ্ তাঁর কাফের পুত্রের সলিল সমাধি হওয়ার কারণ জানতে চেয়ে নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালক! তুমিতো বলেছিলে আমার পরিবার পরিজনকে বাঁচাবে। কিনানও তো আমার পরিবার পরিজনভূত। সুতরাং দয়া করে আমাকে এই রহস্যটি অবগত করাও যে, তাকে তুমি বাঁচালে না কেনো? প্রভুপালয়িতা আমার! নিশ্চয় তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য। আর তুমিতো শ্রেষ্ঠতম ন্যায় বিচারক। অপ্রতিদ্বন্দ্বী সিদ্ধান্তদাতা। সুতরাং তোমার প্রতিশ্রুতি ও সিদ্ধান্তের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং গূঢ় রহস্য সম্পর্কে আমাকে জ্ঞানদান করো।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতের (৪৬) মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্‌তায়ালা বললেন, হে আমার নবী! প্রকৃত তত্ত্ব শোনো। ইমানদারের সঙ্গে কাফেরের অক্ষয় ও কল্যাণকর কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি ইমানদার। আর সে কাফের। সুতরাং কিনান তোমার পুত্র হলেও তোমার পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভূত নয়। সে অসৎ। আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত ছিলো, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আমি জলমগ্ন করে ধ্বংস করবো। বাঁচাবো কেবল তোমাকে, তোমার বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী পরিবার পরিজন ও অন্যান্য বিশ্বাসীদেরকে। আমার এই সিদ্ধান্তই আমি কার্যকর করেছি। তুমি একথা বুঝতে পারোনি। তাই তাকে রক্ষার অনুরোধ করেছো। না জেনে এরকম অনুরোধ করা নির্বোধজনোচিত কর্ম। তুমি তো আমার নবী। আমার একান্ত প্রিয়ভাজন। সুতরাং এরকম অসমীচীন অনুরোধ জ্ঞাপন তোমার জন্য শোভনীয় নয়। আর কখনো এরকম কোরো না। এটাই আমার উপদেশ।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হাসান বসরী ও মুজাহিদ বলেছেন, কিনান আসলে হজরত নুহের পুত্র ছিলো না। সে ছিলো ব্যভিচারজাত। ইমাম আবু জাফর বলেছেন, কিনান ছিলো তার মায়ের পূর্বতন স্বামীর সন্তান। এ কারণেই হজরত নুহ্‌ তাঁর আবেদনে বলেছিলেন 'মিন আহ্‌লী' (স্ত্রীর গর্ভজাত হিসেবে আমার পরিবারভূত)। 'মিন্নী' (আমার ঔরসজাত পুত্র) —এরকম বলেননি।

হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, জুহাক প্রমুখ বিজ্ঞজনের অভিমত হচ্ছে, কিনান হজরত নুহের ঔরসজাত সন্তানই ছিলো। তাকে ব্যভিচারজাত বললে একজন নবীর স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী বলতে হয়। কিন্তু এরকম হওয়া অসম্ভব। সুতরাং এখানে 'হে নুহ্‌! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়'— কথাটির অর্থ হবে, সে তোমার ধর্মমতানুসারী নয়। সে কাফের। আর কাফের কখনো ইমানদার পরিবারের প্রকৃত সদস্য নয়। আর 'তুমি যেনো অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' কথাটির অর্থ হবে এখানে এরকম— হে আমার নবী! শতাব্দীর পর শতাব্দী উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে তুমি নিজেই তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংসের আবেদন জানিয়েছিলে। আবার নিজেই তাদের একজনের জীবন রক্ষার আবেদন জানাচ্ছো। এটা অজ্ঞজনোচিত কর্ম নয় কি?

শায়েখ আবু মনসুর বলেছেন, কিনান ছিলো মুনাফিক। অর্থাৎ প্রকাশ্যতঃ সে ছিলো বিশ্বাসী। কিন্তু অন্তরে অবিশ্বাসী। হজরত নুহ্‌ তার প্রকাশ্য অবস্থা দেখেই বলেছিলেন 'আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত।' কিনানের অন্তর্গত অবস্থা তিনি জানতেন না। তার জীবন রক্ষার আকাংখাও করতেন না। কারণ ইতোপূর্বে তাঁকে জানানো হয়েছিলো, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সুপারিশ নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য যে, শায়েখ আবু মনসুরের এই অভিমতটি যথার্থ নয়। কারণ হজরত নুহ্‌ কিনানকে বলেছিলেন, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ করো। সত্যপ্রত্যাখ্যান-

www.eelm.weebly.com

কারীদের সঙ্গে থেকো না' (আয়াত ৪২)। আবার কিনান বলেছিলো, 'আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নিবো, যা আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে' (আয়াত ৪৩)। বর্ণিত উক্তি দু'টোর প্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয় যে, কিনান ছিলো কাফের। আর হজরত নূহ্ তা অবগতও ছিলেন।

এরপরের আয়াতের (৪৭) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত নূহ্ বললেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমি পুনঃ আবেদন করা থেকে আপনার শরণ যাচ্ঞা করি। আমি বুদ্ধিগত ভুলের কারণে এরকম করেছিলাম। আমি জানি তোমার মার্জনা ও প্রশ্রয় ব্যতিরেকে ক্ষতি থেকে কারো মুক্তি নেই। তাই আমি মার্জনাপ্রার্থী। ক্ষতিগ্রস্তদের দলভূত হওয়া থেকে আমার পরিত্রাণকে নিশ্চিত করো।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৪৮, ৪৯

قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۛ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

❒ বলা হইল, 'হে নূহ! অবতরণ কর আমার দেওয়া শান্তিসহ ও তোমার প্রতি ও যে-সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সংগে আছে তাহাদিগের প্রতি কল্যাণ সহ; অপর সম্প্রদায় সমূহকে জীবন উপভোগ করিতে দিব, পরে আমা হইতে মর্মন্তুদ শাস্তি উহাদিগকে স্পর্শ করিবে;

❒ 'এই সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ঐশীবাণী দ্বারা অবহিত করিতেছি যাহা ইহার পূর্বে তুমি জানিতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানিত না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর, শুভ পরিণাম সাবধানীদিগেরই জন্য।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ক্বীলা ইয়া নূহুহ্‌বিত্ব বিসালামিম্ মিন্না ওয়া বারাকাতিন্ আ'লাইকা ওয়া আ'লা উমামিম্ মিম্মাম মায়াক।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক বললেন, হে নূহ্! আমার দেয়া শান্তি ও তোমার প্রতি ও যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাদের প্রতি কল্যাণসহ অবতরণ করো। অর্থাৎ— জুদী পাহাড় থেকে তুমি ও তোমার সঙ্গীরা আমার পক্ষ থেকে বর্ষিত শান্তি ও কল্যাণসহ প্লাবনমুক্ত পৃথিবীতে নেমে এসো। 'আল উমাম' অর্থ দল। হজরত নূহের সহআরোহীবৃন্দের মাধ্যমেই ঘটেছে পরবর্তী মানুষের বংশবিস্তার। তাই

www.eelm.weebly.com

এখানে তাঁদেরকে বলা হয়েছে 'উমাম'। অথবা 'মিম্‌মান' শব্দটির মিন অব্যয়টি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সূচনার্থে। অর্থাৎ তারা সহ তাদের পরবর্তী বংশধরেরাও আল্লাহ্‌র দেয়া শান্তি ও কল্যাণের অধিকারী (যদি তারা হজরত নুহের সঙ্গীদের মতো ইমানদার হয়)। মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী বলেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনরত সকল বিশ্বাসীই এই মর্যাদার আওতাভূত।

একটি জটিলতাঃ আয়াতের বিবরণভঙ্গি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত নুহের বংশ থেকেই জন্ম লাভ করে চলেছে পরবর্তী মানবতা। অন্যান্য সহআরোহী থেকে নয়। প্রকৃত ঘটনা তাহলে কী?

জটিলতার নিরসনঃ হজরত নুহের তিন পুত্র ছিলেন তাঁর নৌকার সহআরোহী। তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করেই আয়াতে বলা হয়েছে 'মিম্‌মাম মায়াক'। এতে করে বুঝা যায়, তাঁদের বংশধরেরাই প্লাবনপরবর্তী পৃথিবীর বাসিন্দা। অন্যান্য আরোহীর বংশবিস্তার আর ঘটেনি।

এরপর বলা হয়েছে— 'অপর সম্প্রদায় সমূহকে জীবন উপভোগ করতে দিবো, পরে আমার পক্ষ থেকে মর্মন্তুদ শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে।' একথার অর্থ— হজরত নুহের পরবর্তী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে এই পৃথিবীর জীবন সম্ভোগ করার সুযোগ দান করবো। এরপর মৃত্যু-উত্তর জীবনে তাদেরকে দিবো কঠোর শাস্তি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'উমাম' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে হজরত হুদ, হজরত লুত ও হজরত শোয়াইবের সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'এই সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি, যা তুমি ইতোপূর্বে জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানতো না।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল মোহাম্মদ! এতক্ষণ ধরে অদৃশ্যলোক থেকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে সুদূর অতীতের নুহ্‌ নবী ও তার সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত আপনাকে জানালাম। এ সকল ঘটনা আপনি ও আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আগে কখনো শোনেনি। আপনি তো অক্ষরের অমুখাপেক্ষী। তাই বিগত যুগের আসমানী কিতাবসমূহ অধ্যয়ন ব্যতিরেকেই আপনাকে এসকল তথ্য জানানো হলো। আর আপনার মাধ্যমে জানানো হলো আপনার সমকালের ও ভবিষ্যতের সকল পাঠক ও শ্রোতাকে। এই অলৌকিকত্ব আপনার রেসালতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয় কি?

শেষে বলা হয়েছে— 'সুতরাং ধৈর্য ধারণ করো, শুভ পরিণাম সাবধানীদের জন্য।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! নুহ্‌ নবীর ইতিবৃত্ত অনুধাবন করুন এবং এই উপদেশ গ্রহণ করুন যে, সত্যধর্ম প্রচারকদের জন্য ধৈর্যধারণ বাঞ্ছনীয়। সুতরাং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের রূঢ় আচরণে মনোক্ষুণ্ন হবেন না। নিশ্চয় জানবেন যে, শিরিক ও অবাধ্যতা থেকে যারা সাবধান (মুত্তাকী), তাদের জন্যই রয়েছে শুভ পরিণাম।

www.eelm.weebly.com

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ
إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ○ يَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ
إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِىٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○ وَيَٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ
تُوبُوٓا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ
وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ○

❒ আদ্ জাতির নিকট উহাদিগের ভ্রাতা হূদকে পাঠাইয়াছিলাম, সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী।'

❒ 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি ইহার পরিবর্তে তোমাদিগের নিকট শ্রমফল যাচ্ঞা করি না। আমার শ্রমফল আছে তাঁহারই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমরা কি অনুধাবন করিবে না?

❒ 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তিনি তোমাদিগের জন্য প্রচুর বারি বর্ষাইবেন। তিনি তোমাদিগকে আরও শক্তি দিয়া তোমাদিগের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন এবং তোমরা অপরাধী হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইও না।'

এখান থেকে শুরু হয়েছে হজরত হুদের কাহিনী। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো প্রতিমাপূজারী। তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন হজরত হুদ। প্রথমোক্ত আয়াতে সেকথাই বলা হয়েছে— আদ্ জাতির নিকট তাদের স্বগোত্রীয় ভ্রাতা হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী।

পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'হে আমার স্বজাতি! এই আহ্বান কার্যের পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট শ্রমফল যাচ্ঞা করি না। আমার শ্রমফল রয়েছে

www.eelm.weebly.com

তাঁর নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?' একথার অর্থ— হে আমার দেশবাসী! সত্যের প্রতি আমার এই পথপ্রদর্শন স্বার্থবিমুক্ত। এরজন্য আমি তোমাদের কাছে পারিশ্রমিকপ্রত্যাশী নই। যে আল্লাহ্ আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে এর শ্রমফল প্রদান করবেন। সুতরাং বিষয়টিকে বুঝতে চেষ্ট করো। এই নিঃস্বার্থ আহ্বানকে উপেক্ষা কোরো না।

এরপরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করো।' এ কথার অর্থ— হে আমার জনপদবাসী স্বজন! বিগত জীবনের পাপাচরণের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হও। ক্ষমাপ্রার্থী হও এবং আল্লাহ্র দিকে ফিরে এসো। অংশীবাদিতাকে প্রত্যাখ্যান করো। গ্রহণ করো বিশ্বাসকে। উল্লেখ্য যে, এভাবে সানুতপ্ত ও সলজ্জিত প্রত্যাবর্তন পিছনের পাপচিহ্ন সমূহকে মুছে ফেলে। হজরত আমর বিন আস থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইসলাম অতীতের পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদেরকে আরো শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।' একথার অর্থ— যদি তোমরা ইমান আনো, তবে আল্লাহ্পাক তোমাদের খরাদগ্ধ জনপদে বারি বর্ষণ করবেন। শারীরিক শক্তিমত্তায় যে বৈশিষ্ট্য তোমাদের রয়েছে, তার চেয়েও তোমাদেরকে করা হবে আরো অধিক বীর্যবান। সুতরাং অবজ্ঞাভরে আমার এই সত্য আহ্বান থেকে তোমরা বিমুখ হয়ো না।

আমি সুরা আরাফে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি। তিন বছরের অধিক সময় ধরে আদ্ সম্প্রদায় ছিলো দুর্ভিক্ষকবলিত। একটানা অনাবৃষ্টির কারণে রমণীকুল হয়ে পড়েছিলো গর্ভহীনা। উদ্ভিদকুল হয়ে পড়েছিলো পুষ্পহীন, ফল ও ফসলবিহীন। তখন হজরত হুদ তাদেরকে বলেছিলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করো। অংশীবাদিতা পরিত্যাগ করে গ্রহণ করো বিশ্বাসকে। এরকম করলে আল্লাহ্ তোমাদের জনপদে ঘটাবেন সুপ্রচুর বৃষ্টিপাত। নিরর্গল করে দেবেন মানব শিশু ও ফল-ফসলের জন্মপ্রবাহ। তোমরা স্বচ্ছল হবে। ফিরে পাবে শারীরিক ও আর্থিক বল-বীর্যের বৈভব। এখানে উল্লেখিত 'কুওয়াত' শব্দটির অর্থ দৈহিক শক্তি।

www.eelm.weebly.com

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَ
مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ
قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝ مِنْ دُوْنِهٖ
فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ۝ اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ
مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝
فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ؕ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا
غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۝

❒ উহারা বলিল, 'হে হূদ! তুমি আমাদিগের নিকট কোন স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর নাই, তোমার কথায় আমরা আমাদিগের ইলাহ্‌দিগকে পরিত্যাগ করিবার নহি এবং আমরা তোমাতে বিশ্বাসী নহি।'

❒ 'আমরা তো ইহাই বলি, আমাদিগের ইলাহ্‌দিগের মধ্যে কেহ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করিয়াছে।' সে বলিল, 'আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে আমি তাহা হইতে নির্লিপ্ত যাহাকে তোমরা আল্লাহের শরীক কর।'

❒ 'আল্লাহ্ ব্যতীত। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না।'

❒ আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহের উপর; এমন কোন জীব-জন্তু নাই যে তাঁহার পূর্ণ আয়ত্তাধীন নহে; আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে।

❒ 'অতঃপর তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইলেও আমি যাহা সহ তোমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছি আমি তো তাহা তোমাদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছি এবং আমার প্রতিপালক তোমাদিগ হইতে ভিন্ন কোন সম্প্রদায়কে তোমাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা তাঁহার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন।'

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোনো স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন করোনি।' একথার অর্থ— আদ্ সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, হে হূদ! তোমার কথা আমরা বিশ্বাস করবো কি করে। তুমি নিজেকে নবী বলে দাবী করো। কিন্তু তোমার নবুয়তের পক্ষে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ বা মোজেজা প্রদর্শন করো না। সুতরাং প্রমাণবিহীন কোনো দাবী তো আমরা মেনে নিতে পারি না। উল্লেখ্য যে, হজরত হূদ তাদের নিকট যথারীতি মোজেজা প্রদর্শন করেছিলেন। তবু তারা তাঁকে মেনে নেয়নি। কারণ তাদের অন্তরে ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানের অনড় অপরিচ্ছন্নতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার কথায় আমরা আমাদের ইলাহ্দেরকে পরিত্যাগ করতে পারি না এবং আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসী নই।' এ কথার অর্থ— হে হূদ! তুমি যতো মোজেজা প্রদর্শনই করো না কেনো দীর্ঘদিন ধরে লালিত ও আচরিত ধর্মমত থেকে আমরা সরে দাঁড়াতে পারি না। যে সকল বিগ্রহের বন্দনা আমরা এতোদিন করে এসেছি তাদেরকে পরিত্যাগ করা আমাদের কর্ম নয়। আর আমরা তো তোমাকে বিশ্বাসই করি না।

পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে — 'আমরা তো একথাই বলি, আমাদের পূজিত দেব-দেবীগুলোর মধ্যে কেউ হয়তো তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে।' একথার অর্থ— আদ্ জাতি বললো, হে হূদ! আমরা তো মনে করি তুমি কুপ্রভাবগ্রস্ত। তুমি আমাদের দেব-দেবীদের সম্পর্কে কটুক্তি করো। তাদের পূজা অর্চনা করতে নিষেধ করো। তাই তো তারা তোমার উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। তোমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়েছে। সে কারণে তোমার কথাবার্তায় ফুটে উঠেছে অসংলগ্নতা ও ধর্মদ্রোহিতা। এখানকার 'ইয়্তারা' শব্দটির বুৎপত্তি ঘটেছে 'আ'রা' থেকে। আর 'সু' অর্থ এখানে জ্বিনের প্রভাব বা কুপ্রভাব। 'ইয়্তারা' শব্দটি অতীতকালবোধক হলেও এখানে এর অর্থ ভবিষ্যতকালবোধক। আদ্ জাতির বদ্ধমূল ধারণা ছিলো তাদের কোনো এক দেবতা নিশ্চয় হজরত হূদকে ধ্বংস করে দিবে। সে কারণে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালবোধক শব্দরূপ।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী করছি এবং তোমরা সাক্ষী হও যে আমি তা থেকে নির্লিপ্ত, যাকে তোমরা আল্লাহ্র শরীক করো।' অর্থাৎ হজরত হূদ তখন বললেন, হে আমার অবোধ সম্প্রদায়! আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে বলছি তোমাদের দেব-দেবীদেরকে আমি স্বীকারই করি না। আমি তো এক আল্লাহ্র পূজারী। তোমরাও আমার এ কথার সাক্ষী হয়ে থাকো।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ব্যতীত। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না।' হজরত হুদ আরো বললেন, হে অংশীস্থাপকের দল! আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকলে মিলে তোমরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে চাইলে করতে পারো, আমাকে মোটেও অবকাশ দিয়ো না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ভয় আমি করি না। উল্লেখ্য যে, হজরত হুদের সাহসিকতা ও আল্লাহ্নির্ভরতার স্বরূপ ফুটে উঠেছে এ কথাটিতে। আদ্ জাতি ছিলো প্রচণ্ড প্রতাপশালী। ছিলো রক্ত পিপাসু, নিষ্ঠুর ও খুনী। কিন্তু আল্লাহ্র নবী হজরত হুদের বিরুদ্ধে কিছু করবার সাহস তাদের হতো না।

এরপরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র উপর; এমন কোনো জীব জন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়।' এ কথার অর্থ— হজরত হুদ বললেন, হে অংশীবাদিতানির্ভর জনগোষ্ঠী! শোনো, যে আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের প্রভুপালনকর্তা সেই আল্লাহ্র প্রতি আমি নির্ভরশীল। সকল প্রাণী তাঁর কর্তৃত্বকবলিত, সকলেই তাঁর অধীন।

বাগবী লিখেছেন, এখানে 'নাসিয়া' শব্দটির অর্থ— হেয় করা, লাঞ্ছিত করা অথবা আয়ত্তাধীন রাখা। অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শব্দটি সন্নিবেশিত হয়েছে এই আয়াতে। এখানে 'আখিজুম্ বিনাসিয়াতিহা' কথাটির শাব্দিক অর্থ কারো মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরে রাখা। আর অন্তর্নিহিত অর্থ— কাউকে কর্তৃত্বাধীন রাখা। জুহাক বলেছেন, 'মস্তকের অগ্রভাগের কেশগুচ্ছ ধরে রাখা' কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে সকল প্রাণীর জীবন ও মৃত্যু আল্লাহ্রই কর্তৃত্বাধীন। ফাররা বলেছেন, কথাটির অর্থ তিনিই সকল সৃষ্টির একমাত্র পালনকর্তা এবং তাদের সকলের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগকারী। কুতাইবি বলেছেন, আল্লাহ্পাকই সকল সৃষ্টিকে অক্ষম করতে সক্ষম। যাকে তিনি পাকড়াও করেন, সেই ধৃত ব্যক্তিই বুঝতে পারে তার ক্ষমতাহীনতার কথা।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে।' এ কথার অর্থ, আমার প্রভুপালক সত্য ও ন্যায়াধিষ্ঠিত। তাঁর শরণপ্রার্থীরা কখনো নিরাশ হয় না। তিনিই নির্ধারণ করেন পুণ্য ও পাপের যথাবিনিময়।

এরপরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমি যে সত্যসহ তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি, আমি তো তা তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি।' এ কথার অর্থ— হে আমার অপরিণামদর্শী সম্প্রদায়! আমি নবী। আমি অন্য সকল নবীর মতো সত্যনিষ্ঠ ও সত্যধর্মের প্রচারক। আমি আমার দায়িত্ব সুসম্পন্ন করেছি। পৌঁছে দিয়েছি সত্যের বাণী। এখন যদি তোমরা সত্যবিমুখ হও, তবে—

'এবং আমার প্রতিপালক অন্য কোনো সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।' এ কথার অর্থ— হে অবুঝেরা! সত্যের প্রতি তোমাদের এই বৈমুখ্য যদি অনড় হয়, তবে

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করবেন এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী, উপাসনাপ্রিয় ও অনুগত কোনো সম্প্রদায়কে। আর তোমরা ধ্বংস হলে একথা মনে কোরো না যে, এতে করে আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি সাধিত হবে। তিনি তো সকল ক্ষতি ও বিনষ্টির অতীত।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন।' এ কথার অর্থ— এ কথাও শুনে নাও হে আমার স্বজাতি! তিনিই সকলের, সকল কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। তোমাদের সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত। তোমাদেরকে শাস্তিদান করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। এরকমও অর্থ করা যেতে পারে যে— সকল কিছুর উপর রয়েছে তাঁর নিরঙ্কুশ আধিপত্য। তিনি সর্বজ্ঞ। সুতরাং তাঁর তিল পরিমাণ ক্ষতি-বৃদ্ধি ঘটানোর সাধ্য কারো নেই।

সুরা হূদঃ আয়াত ৫৮, ৫৯, ৬০

وَلَمَّا جَآءَ اَمۡرُنَا نَجَّيۡنَا هُوۡدًا وَّالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ بِرَحۡمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيۡنٰهُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ غَلِيۡظٍ ۝ وَتِلۡكَ عَادٌ جَحَدُوۡا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمۡ وَعَصَوۡا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوۡۤا اَمۡرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيۡدٍ ۝ وَاُتۡبِعُوۡا فِىۡ هٰذِهِ الدُّنۡيَا لَعۡنَةً وَّيَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ عَادًا كَفَرُوۡا رَبَّهُمۡ ؕ اَلَا بُعۡدًا لِّعَادٍ قَوۡمِ هُوۡدٍ ۝

❐ এবং যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি হূদ ও তাহার সংগে যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম এবং রক্ষা করিলাম তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি হইতে।

❐ এই আদ জাতি তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছিল এবং অমান্য করিয়াছিল তাঁহার রসূলগণকে এবং উহারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করিত।

❐ এই দুনিয়ায় উহাদিগকে করা হইয়াছিল অভিশাপগ্রস্ত এবং অভিশাপগ্রস্ত হইবে উহারা কিয়ামতের দিনেও। জানিয়া রাখ! আদ সম্প্রদায় তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই ছিল হূদের সম্প্রদায় আদের পরিণাম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং যখন আমার নির্দেশ এলো তখন আমি হূদ ও তার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিলো তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং রক্ষা করলাম তাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল মোহাম্মদ! শুনুন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী আদ্ জাতিকে দেয়া হলো দীর্ঘ অবকাশ। তবু তারা সত্যের আহ্বানে সাড়া দিলো না। তখন আমার পক্ষ থেকে

www.eelm.weebly.com

অবতারিত হলো ভয়াবহ শাস্তি। আর সে শাস্তি থেকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম নবী হুদ ও তার বিশ্বাসবান অনুচরবৃন্দকে। 'আমার অনুগ্রহ' কথাটি উল্লেখ করে এখানে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পুণ্যকর্মের বিনিময়ে নয়, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই কেবল তাঁর শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। হজরত হুদ ও তাঁর অনুচরবৃন্দও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহভাজন হওয়ার কারণে শাস্তিমুক্ত হতে পেরেছিলেন। রহমত শব্দটির অর্থ এখানে অনুগ্রহ না হয়ে ইমানও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে এরকম— আল্লাহ্ অনুগ্রহবশতঃ তাদেরকে ইমান দান করেছিলেন। ওই ইমানের কারণেই তারা আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। হজরত হুদের বিশ্বাসী অনুচরবৃন্দের সংখ্যা ছিলো চার হাজার। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো ভয়ংকর এক ঝঞ্ঝাবাতের মাধ্যমে।

পরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'এই আদ্ জাতি তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন অস্বীকার করেছিলো এবং অমান্য করেছিলো তাঁর রসুলগণকে এবং তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করতো।' এ কথার অর্থ— সকল নবীর মৌল আদর্শ হচ্ছে তওহীদ (আল্লাহ্‌র এককত্ব)। এই তওহীদ প্রচার সূত্রে তাঁরা একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্পৃক্ত। তাই এক নবীকে অমান্য করার অর্থ সকল নবীকে অমান্য করা। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী আদ্ সম্প্রদায় হজরত হুদকে অস্বীকার করেছিলো। সুতরাং তারা সকল নবী-রসুলকে অমান্যকারী। আল্লাহ্-পাকের নিদর্শনের প্রতিও তারা অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী। তারা ছিলো তাদের সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারী নেতাদের অনুসারী। 'আনীদ্' শব্দটির অর্থ এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী বা স্বেচ্ছাচারী। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'আনুদ্' থেকে। আবু উবাইদ বলেছেন, 'আনীদ্' শব্দটি এসেছে 'উনুদ্' থেকে। আর এর অর্থ বিরুদ্ধাচারী। এভাবে 'জাব্বারিন আ'নীদ্' কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— আদ্ জাতির উদ্ধত ও স্বৈরাচারী নেতৃবর্গ। তারা সকলেই ছিলো আত্মবিধ্বংসী স্বেচ্ছাচরণের শিকার।

এরপরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'এই দুনিয়ায় তাদেরকে করা হয়েছিলো অভিশাপগ্রস্ত এবং তারা অভিশাপগ্রস্ত হবে কিয়ামতের দিনেও।' এ কথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী আদ্ জাতি পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী উভয় স্থানে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত কবলিত। এখানে 'লা'নাত্' অর্থ অভিশপ্ত, অভিসম্পাতকবলিত, অনুকম্পাবিচ্যুত, বিতাড়িত।

এরপর বলা হয়েছে— 'জেনে রাখো! আদ্ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিলো। জেনে রাখো! ধ্বংসই ছিলো হুদের সম্প্রদায় আদের পরিণাম।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল মোহাম্মদ! জেনে রাখুন, দুর্বিনীত আদ্ জাতি ছিলো নিশ্চিত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আর ধ্বংসই ছিলো তাদের চূড়ান্ত পরিণাম। বাগবী লিখেছেন, কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'বু'দান' শব্দটির একটি অর্থ দূরবর্তী। আরেকটি অর্থ ধ্বংস। এখানে 'আলা বু'দান' কথাটি একটি

www.eelm.weebly.com

অপপ্রার্থনা বা বদ্‌দোয়া। অবাধ্য আদ্ সম্প্রদায় ছিলো শাস্তির উপযোগী। তাই তাদের উপরে আপতিত হয়েছিলো আযাব। উল্লেখ্য যে, 'আলা বু'দান' কথাটি প্রার্থনাবোধক হলেও এখানে অর্থ হবে বিবৃতিবোধক। আল্লাহ্‌পাক কারোর নিকট প্রার্থী হতে পারেন না। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে কথাটির মাধ্যমে এই বিবৃতিটি দেয়া হয়েছে যে, আদ্ জাতি ছিলো প্রকৃত অর্থেই শাস্তিযোগ্য। তাদের উপরে আপতিত শাস্তি ছিলো সম্পূর্ণতই ন্যায়ানুগ।

আরো উল্লেখ্য যে, আদ্ জাতির উদ্ধত চরিত্র ও দ্রোহী স্বভাবকে সুচিহ্নিত করার জন্য এখানে বার বার ব্যবহৃত হয়েছে তিরস্কারসূচক 'আলা' শব্দটি। আর 'ক্বওমি হুদ' (হুদের সম্প্রদায়) উল্লেখের মাধ্যমে এ কথাই বলে দেয়া হয়েছে যে, হজরত হুদের বিরোধীরাই ছিলো হতভাগ্য আদ্ সম্প্রদায়ের শাস্তি পাওয়ার একমাত্র কারণ। অর্থাৎ হজরত হুদের প্রতি দুর্ব্যবহারই তাদের শাস্তিকে করেছিলো ত্বরান্বিত। এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'ক্বওমি হুদ' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে হজরত হুদের স্বজাতি আদ্‌কে। কারণ কেউ কেউ বলেছেন, আদ্ জাতি ছিলো আদ্ ও সামুদ এই দুইভাবে বিভক্ত। ভিন্ন একটি সম্প্রদায়ের নামও ছিলো আদ্। ওই সম্প্রদায়ের নবী ছিলেন হজরত হুদ।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৬১, ৬২, ৬৩

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝ قَالُوا۟ يَٰصَٰلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَآ ۖ أَتَنْهَىٰنَآ أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝ قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَءَاتَىٰنِى مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُۥ ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِى غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۝

❒ সামূদ জাতির নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা সালিহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম, সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তিনি তোমাদিগকে ভূমি হইতে সৃষ্টি

www.eelm.weebly.com

করিয়াছেন এবং উহাতেই তিনি তোমাদিগকে বসবাস করাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন কর। আমার প্রতিপালক নিকটেই, তিনি আহ্বানে সাড়া দেন।'

❒ তাহারা বলিল, 'হে সালিহ্! ইহার পূর্বে তুমি ছিলে আমাদিগের আশাস্থল। তুমি কি আমাদিগকে নিষেধ করিতেছ ইবাদত করিতে তাহাদিগের যাহাদিগের ইবাদত করিত আমাদিগের পিতৃ-পুরুষেরা? আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সে-বিষয়ে যাহার প্রতি তুমি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ।'

❒ সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক-প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁহার নিজ অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন তবে আল্লাহের শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে আমি যদি তাহার অবাধ্যতা করি? সুতরাং তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করিতেছ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি ছামুদ জাতির নিকটে তাদের ভ্রাতা সালেহ্‌কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলাম। আমার প্রত্যাদেশানুসারে নবী সালেহ্ তাদেরকে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে এবং মৃত্তিকাপৃষ্ঠকেই নির্ধারণ করেছেন পৃথিবীর জীবনের নিবাস। সুতরাং বিগত জীবনের অবাধ্যতার জন্য তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করো। আমার প্রভুপালক অতি নিকটে। তাঁকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন।

এখানে উল্লেখিত 'ইস্‌তা'মারা' শব্দটি এসেছে 'উমর' থেকে। 'উমর' অর্থ জীবনকাল। জুহাক কথাটির অর্থ করেছেন— দীর্ঘ করা হয়েছে তোমাদের আয়ুষ্কাল। উল্লেখ্য যে, আদ্ ও ছামুদ জাতির আয়ুষ্কাল ছিলো তিনশত থেকে হাজার বছর।

মুজাহিদ বলেছেন, 'ইস্‌তা'মারা' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'উমরা' থেকে— যার অর্থ জীবনব্যাপী। সারা জীবনের জন্য কোনো কিছু দেয়া হলে আরববাসীগণ এরকম শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে থাকেন। মৃত্যুর পর এই দান দাতার নিকটেই ফিরে যায়। তাই এখানে বক্তব্যবিষয়টির মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— তোমরা মৃত্তিকাজাত। এই মৃত্তিকাই তোমাদের আবাস। অবশেষে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ্‌র নিকটে। তখন তোমাদের পার্থিব আধিপত্য আর অবশিষ্ট থাকবে না। এরকমও অর্থ করা যেতে পারে যে— ভূপৃষ্ঠে তোমাদেরকে যাবজ্জীবন অবস্থানের সুযোগ দেয়া হয়। আর মৃত্যুর পরে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হয় অন্যেরা। সুতরাং তোমরা কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও এবং ফিরে চলো আল্লাহ্‌র দিকে।

www.eelm.weebly.com

'আমার প্রভুপালক নিকটেই'— একথার অর্থ, আত্মিক দিক থেকে আমাদের প্রভুপালক আমাদের অতি নিকটে। এই নৈকট্যের ধরন আমাদের জ্ঞানের অতীত। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— তিনিই সকলকে অস্তিত্ব দান করেছেন। কিংবা বলা যেতে পারে— তিনি তাঁর প্রিয়ভাজনগণের সন্নিকটবর্তী।

পরের আয়াতের (৬২) মর্মার্থ হচ্ছে— নবী সালেহের কথা শুনে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা বললো, হে সালেহ্! এতোদিন তুমিই তো ছিলে আমাদের আশা ভরসা। আমরা ভেবেছিলাম তুমি আমাদের নেতৃত্ব দিবে। উৎকর্ষ ঘটাবে আমাদের ধর্মের। আশা করেছিলাম তুমিই হবে আমাদের ধর্মের অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু আজ একি কথা বললে তুমি! হৃদয়ে জাগালে আশাভঙ্গের বেদনা। আমরা তো আমাদের স্বনামধন্য পিতৃপুরুষদের ধর্মের অনুসারী। তারা প্রতিমা পূজা করতো। আমরাও করি। অথচ আজ আমাদের সম্প্রদায়ভূত হয়েও তুমি বিদ্রোহী। তাই আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তুমি বিভ্রান্ত। যে আল্লাহ্র প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছো সেই আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান। এখানে 'মুরীব্' অর্থ সন্দেহ উদ্রেককারী। অথবা অশান্তি সৃষ্টিকারী।

এরপরের আয়াতের (৬৩) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত সালেহ্ বললেন, হে আমার অবুঝ সম্প্রদায়! আমার প্রভুপালক আমাকে স্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমাকে দান করেছেন তাঁর অন্তরঙ্গ অনুগ্রহ। এমতাবস্থায় আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই তবে তাঁর অসন্তোষ ও শাস্তি থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? তোমরা তো দেখছি সত্যপ্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে কেবলই আমার ক্ষতি করতে চাও।

উল্লেখ্য যে, ছামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা হজরত সালেহের কথা বিশ্বাস করতে পারছিলো না। তাই তিনি তাঁর বক্তব্যে বার বার 'ইন্' (যদি) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর বিশ্বাস নিশ্চয় এরকম 'যদি' কণ্টকিত ছিলো না। কারণ তিনি তো ছিলেন সত্য পয়গম্বর। এরকমও হতে পারে যে, 'ইন্' (যদি) শব্দটি যেমন সন্দেহসূচক, তেমনি শব্দটি 'ইন্না' (নিশ্চয়) শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপও হয়ে থাকতে পারে। এখানে 'রহমত' শব্দটির অর্থ হবে নবুয়ত ও হেকমত। 'মিনাল্লহ্' কথাটির অর্থ হবে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে। 'যদি তার অবাধ্যতা করি' কথাটির অর্থ হবে এখানে— যদি আল্লাহ্র বাণী তোমাদের নিকটে প্রচার করতে গিয়ে শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেই। আর 'তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতি বৃদ্ধি করছো' কথাটির অর্থ হবে এ রকম — আল্লাহ্পাক আমাকে নবুয়ত ও হেকমত দান করেছেন। তোমরা এই অনুগ্রহকে অস্বীকার করে শাস্তির যোগ্য হচ্ছো। তোমরা আমার স্বজন। তোমাদের ক্ষতি প্রকারান্তরে আমারই ক্ষতি। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে এভাবেই তোমরা আমার ক্ষতি বৃদ্ধি করে চলেছো।

হোসাইন বিন ফজল বলেছেন, হজরত সালেহ্ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। বরং আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'তাখসীর' শব্দটির অর্থ হবে— ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়া। অতএব এক্ষেত্রে ক্ষতির বিষয়টি সম্পৃক্ত হবে অবাধ্য ছামুদ

www.eelm.weebly.com

সম্প্রদায়ের প্রতি। যেমন, 'তাকফীর' ও 'তাস্ফীক' শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে অপরের সঙ্গে কুফরী ও ফাসেকির সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়া হয়। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে ছামুদ সম্প্রদায়! আমার প্রতি তোমরা অসত্য আরোপ করছো। তাই আমি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত সাব্যস্ত করছি। হজরত ইবনে আব্বাস শব্দটির অর্থ করেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত দেখা। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তোমাদের অসত্য আরোপের ফলে আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্রমাগত নিক্ষিপ্ত হবে ধ্বংসের গহ্বরে।

হজরত সালেহের সম্প্রদায় বলেছিলো, হে সালেহ! তুমি যদি তোমার নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ প্রস্তরখণ্ডের অভ্যন্তর থেকে পূর্ণ অন্তঃসত্ত্বা একটি উষ্ট্রী বের করে আনতে পারো, তবেই কেবল আমরা তোমাকে নবী হিসেবে স্বীকার করবো। হজরত সালেহ্ আল্লাহ্পাকের দরবারে প্রার্থনা জানালেন। প্রার্থনা গৃহীত হলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি পাথর ফেটে বেরিয়ে এলো একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী। একটু পরেই উষ্ট্রীটি প্রসব করলো তার শাবক। তখন হজরত সালেহ্ তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন—

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۝ فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ۗ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ۝ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۝ وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۗ اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَاۡ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۗ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ۝

❑ 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহের এই উষ্ট্রী তোমাদিগের জন্য একটি নিদর্শন। ইহাকে আল্লাহের জমিতে চরিয়া খাইতে দাও। ইহাকে কোন ক্লেশ দিও না, ক্লেশ দিলে আশু শাস্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হইবে।'

www.eelm.weebly.com

❐ কিন্তু উহারা উহাকে বধ করিল। অতঃপর সে বলিল,'তোমরা তোমাদিগের গৃহে তিন দিন জীবন উপভোগ করিয়া লও। ইহা একটি প্রতিশ্রুতি যাহা মিথ্যা হইবার নহে।'

❐ এবং যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি সালিহ্ ও তাহার সংগে যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম এবং রক্ষা করিলাম সেই দিনের লাঞ্ছনা হইতে। তোমার প্রতিপালক তো শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

❐ অতঃপর যাহারা সীমালংঘন করিয়াছিল মহা নাদ তাহাদিগকে আঘাত করিল; ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল,

❐ যেন তাহারা সেথায় কখনও বসবাস করে নাই। জানিয়া রাখ! সামূদ সম্প্রদায় তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই ছিল সামূদ সম্প্রদায়ের পরিণাম।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত সালেহ্ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! পাথর ফেটে বেরিয়ে আসা এই উষ্ট্রীটি আল্লাহ্তায়ালার এক অভূতপূর্ব নিদর্শন। এটা তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা। আল্লাহ্ একে সৃষ্টি করেছেন প্রজনন-বিধান ব্যতিরেকেই। এই নিদর্শনের যথাসমাদর করা তোমাদের কর্তব্য। ভূপৃষ্ঠে একে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দাও। তাকে যথেচ্ছ আহার করতে দাও ধরণীর সবুজ লতাগুল্ম এবং পান করতে দাও প্রাকৃতিক পানি। এর লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কোনো দায়দায়িত্ব তোমাদের নেই। সাবধান! একে কখনো ক্লেশ দিয়ো না। ক্লেশ দিলে তোমাদের উপরে ত্বরিৎ শাস্তি অনিবার্য।

পরের আয়াতের (৬৫) মর্মার্থ হচ্ছে— ছামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা হজরত সালেহের সতর্কবাণীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলো। অলৌকিক ওই উটনীটির পা কেটে দিলো তারা। এভাবে বধ করলো সেটিকে। হজরত সালেহ্ তখন বললেন, তোমাদের আয়ু মাত্র তিনদিন। স্বগৃহে এই তিনদিন তোমরা জীবনোপভোগ করে নাও। এই অলৌকিক উটনীটির ক্ষতি করলে তিনদিন পরে অবতীর্ণ হবে শাস্তি। এটাই আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত বা অংগীকার। এই অংগীকার কখনো মিথ্যে হতে পারে না। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র, এই তিনদিনই তোমাদের আয়ু। তার পরদিন শনিবারে সকালে তোমাদের মুখমণ্ডলের রঙ হয়ে যাবে হরিদ্রাভ। দ্বিতীয় দিবসে হয়ে যাবে রক্তিম। আর তৃতীয় দিবসে হবে কৃষ্ণাভ। তারপর তোমরা সকলে মারা পড়বে।

পরের আয়াতের (৬৬) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল মোহাম্মদ! অবাধ্য ছামুদ সম্প্রদায়ের ইতিকাহিনীটির ভয়াবহ পরিণতির কথা এবার শুনুন। তখন আমি তাদের উপরে অবতীর্ণ করলাম ভয়ংকর শাস্তি। কিন্তু সেদিনের সে

www.eelm.weebly.com

শাস্তি ও লাঞ্ছনা থেকে আমি রক্ষা করলাম আমার প্রিয় নবী সালেহ্কে এবং তার একনিষ্ঠ অনুগামী বিশ্বাসীদেরকে। এটা ছিলো তাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুগ্রহ। নিশ্চয় জানবেন, আপনার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ও সকল ক্ষেত্রে প্রবল পরাক্রান্ত।

এরপরের আয়াতের (৬৭) মর্মার্থ হচ্ছে— অতঃপর সীমালংঘনকারীদেরকে আঘাত করলো একটি বিকট আওয়াজ। ওই বিকট ও বীভৎস আওয়াজের আঘাতে ভোর না হতেই আপনাপন গৃহে উপুড় হয়ে মরে পড়ে রইলো তারা।

উল্লেখ্য যে, ওই বিকট আওয়াজ বা মহা নাদ উচ্চারিত হয়েছিলো হজরত জিবরাইলের মাধ্যমে। অথবা তখন আকাশ থেকে নেমে এসেছিলো জীবনহারক এক প্রলয়ংকরী বজ্রধ্বনি। একই সঙ্গে ধরাপৃষ্ঠ থেকেও উত্থিত হয়েছিলো প্রাণবিধ্বংসী এক নাদ। সেই ভীষণ নাদে প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছিলো সীমা-লংঘনকারীদের ।

এরপরের আয়াতের (৬৮) মর্মার্থ হচ্ছে— ছামুদ জাতির বিরান জনপদ দেখে তখন মনে হচ্ছিলো, সেখানে যেনো কখনো মনুষ্য-বসবাস ছিলোই না। হে আমার প্রিয় রসুল মোহাম্মদ! এই কথাটি স্মরণে রাখুন যে, ছামুদ সম্প্রদায় ছিলো অবাধ্য। তারা তাদের প্রভুপালককে অস্বীকার করেছিলো। একথাও আপনি জেনে রাখুন যে, ধ্বংসই ছিলো তাদের যথোপযুক্ত পরিণাম।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৬৯, ৭০

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرٰهِيمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا
لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ۝ فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ
وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلٰى قَوْمِ لُوطٍ ۝

❒ আমার প্রেরিত ফেরেশ্তাগণ সুসংবাদ লইয়া ইব্রাহীমের নিকট আসিল, তাহারা বলিল, 'সালাম'। সেও বলিল, 'সালাম'। সে অবিলম্বে এক কাবাব-করা গো-বৎস আনিল।

❒ সে যখন দেখিল তাহারা উহার দিকে হাত বাড়াইতেছে না তখন তাহাদিগকে অবাঞ্ছিত মনে করিল এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে তাহার মনে ভীতি সঞ্চার হইল। তাহারা বলিল, 'ভয় করিও না, আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি।'

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল মোহাম্মদ! এবার শুনুন নবী ইব্রাহিমের ইতিবৃত্ত। একদিন আমার নির্দেশপ্রাপ্ত ফেরেশতারা শুভসংবাদ জানানোর জন্য তার কাছে গেলো। তারা ইব্রাহিমকে অভিবাদন

www.eelm.weebly.com

জানালো। ইব্রাহিমও জানালেন প্রত্যাভিবাদন। এভাবে সালাম বিনিময়ের পর অতিথি সৎকারার্থে ইব্রাহিম সত্বর তাদের সামনে উপস্থিত করলেন একটি কাবাব করা গো-বৎস।

শুভসংবাদটি ছিলো হজরত ইসহাক অথবা হজরত ইয়াকুবের জন্ম সম্পর্কিত। অথবা হজরত লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের শাস্তি বিষয়ক। হজরত ইবনে আব্বাস এবং আতা খোরাসানীর বক্তব্যানুসারে ওই মেহমান ফেরেশতারা ছিলেন হজরত জিবরাইল, হজরত মিকাইল ও হজরত ইস্রাফিল। মোহাম্মদ বিন কা'ব বলেছেন, হজরত জিবরাইল ও তাঁর সহচর সাতজন ফেরেশতা গিয়েছিলেন মেহমান হিসেবে। জুহাক বলেছেন, হজরত জিবরাইলের সঙ্গে তখন ছিলেন নয় জন ফেরেশতা। মুকাতিল বলেছেন, বারোজন। সা'দী বলেছেন এগারো জন। ফেরেশতাগণ ছিলেন সুসজ্জিত ও সুন্দর। তাঁরা অভিবাদন জানিয়েছিলেন ক্রিয়া পদবাচ্যে (সালাম) যা ছিলো অস্থায়ী। আর হজরত ইব্রাহিম জবাব দিয়েছিলেন নাম পদবাচ্যে (সালামুন) —যা ছিলো ঘটমান, স্থায়ী। এরূপ সালামই সর্বোত্তম। কেউ কেউ বলেছেন, ফেরেশতাগণ প্রদত্ত সালামের অর্থ ছিলো— আপনার সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টিকারী আমরা নই। আমরা নিরাপত্তাবাহী। আমরা আপনার বন্ধু ।

এখানে উল্লেখিত 'হানিজ' কথাটির অর্থ— উত্তপ্ত প্রান্তরে ভুনা করা কোনো বস্তু। 'কামুস' অভিধানে রয়েছে— ছাগলের গোশত ভুনার জন্য যাতে তপ্ত পাথর রেখে দেয়া হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ— চর্বিবিগলিত ছাগলের গোশত। কাতাদা বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের সম্পদের অধিকাংশই ছিলো গরু। গো-পালনই ছিলো তাঁর সম্পদের প্রধান সূত্র।

পরের আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অতিথিরা কিন্তু কাবাব করা গরুর গোশতের দিকে হাত বাড়ালো না। আহারের কোনো আগ্রহই ছিলো না তাদের । ইব্রাহিম তখন ভাবলেন, এরা কি তাহলে কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে এসেছে? ভীত হলেন তিনি। অতিথিরা বললো, ভীত হবেন না। আমরা নবী লুতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত।

এখানে উল্লেখিত 'নাকেরা' শব্দটির অর্থ , মেজাজ বিগড়ে যাওয়া। 'আওজাসা' অর্থ গুপ্ত অনুভূতি। কামুস গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। মুকাতিল বলেছেন, 'আওজাসা' অর্থ হজরত ইব্রাহিম মনে করলেন। বাগবী বলেছেন, 'আওজাসা' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'ওয়াজুস' থেকে— যার অর্থ প্রবেশ করা। অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিমের অন্তরে ভীতির অনুপ্রবেশ ঘটলো। 'মিনহুম' কথাটির মাধ্যমে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, অতিথিদের দিক থেকে হজরত ইব্রাহিমের অন্তরে সঞ্চারিত হলো ভীতি। উল্লেখ্য যে, মেজবানের বাড়ীতে মেহমানের আহার গ্রহণ না করা একটি অশুভ প্রতীক। এটাই ছিলো ওই সময়ের প্রথাগত ধারণা। বিশেষ করে নৈশ অতিথি এরকম করলে মনে করা হতো সে বা তারা অবশ্যই অপহারক অথবা লুণ্ঠনকারী। এরকম ক্ষেত্রে নির্ঘুম নিশীথ অতিবাহিত করতে হতো গৃহকর্তাকে। মেহমানেরা আহার না করায় হজরত ইব্রাহিমও তাই ভীত হয়ে

www.eelm.weebly.com

পড়েছিলেন। তবে অধিকতর শোভন মর্মার্থ হবে এরকম— আহারের প্রতি হস্ত প্রসারিত না করাতে হজরত ইব্রাহিম স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, এরা ফেরেশতা। কিন্তু তিনি এই ভেবে শংকিত হলেন যে, তাহলে কী জন্য এসেছেন এঁরা। এঁরা কী পাপাচারী মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র গজব অবতীর্ণ করার নির্দেশপ্রাপ্ত!

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ○ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ○ قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

❒ তখন তাহার স্ত্রী দাঁড়াইয়া ছিল এবং সে হাসিল। অতঃপর আমি তাহাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকূবের সুসংবাদ দিলাম।

❒ সে বলিল, 'কী আশ্চর্য! সন্তানের জননী হইব আমি যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! ইহা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার!'

❒ তাহারা বলিল, 'আল্লাহের কাজে তুমি বিস্ময়বোধ করিতেছ? হে নবীর পরিবার! তোমাদিগের প্রতি রহিয়াছে আল্লাহের অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ।'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— নবী ইব্রাহিম ও অতিথিবৃন্দের কথোপকথনের সময় নবীজায়া পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি মৃদু হাসলেন। আমি তাকে ইসহাক ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের শুভসংবাদ দিলাম।

উল্লেখ্য যে, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের পত্নী হজরত সারা বিনতে হারান বিন নাখুর। হজরত ইব্রাহিমের পিতৃব্যপুত্রী ছিলেন তিনি। এরকমও বর্ণনা এসেছে যে, হজরত ইব্রাহিম উপবিষ্ট ছিলেন। আর তাঁর স্ত্রী সেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন আপ্যায়নকারিণী হিসেবে।

মুজাহিদ ও ইকরামা বলেছেন, এখানে 'দ্বহিকাত' কথাটির অর্থ হবে— হজরত সারা ওই সময় ঋতুবতী হলেন। কারণ, আরববাসীরা বলেন, 'দ্বহিকাতুল আরনাবু' — যার অর্থ, খরগোশটি ঋতুবতী হলো। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'দ্বহিকাতুস্ সামুরা' অর্থ বাবুলবৃক্ষের রসক্ষরণ শুরু হলো। তবে অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন 'দ্বহিকাত' অর্থ হাস্য করা। তাই এখানে অর্থ করা হয়েছে— 'এবং তিনি হাসলেন।' এই হাস্য করার কারণ সম্পর্কে আবার রয়েছে বিভিন্ন অভিমত। যেমন—

www.eelm.weebly.com

১. হজরত সারার ওই হাসি ছিলো পুলকের হাসি। 'ভয় করবেন না, আমরা প্রেরিত হয়েছি লুতের সম্প্রদায়ের প্রতি'— অতিথি ফেরেশতাদের একথা শুনে শংকা দূরীভূত হয়েছিলো হজরত ইব্রাহিমের ও তাঁর । তাই তিনি পুলক প্রকাশার্থে হেসেছিলেন।

২. নবীপত্নী তখন হেসেছিলেন বিস্মিত হয়ে। মহাসমাদরে মেহমানদের সামনে উপস্থিত করা হলো উপাদেয় আহার্য। কিন্তু মেহমানেরা নির্বিকার। তাঁরা আহার্য বস্তুর দিকে হাত বাড়ালেন না দেখে হজরত ইব্রাহিম শংকিত হলেন। বললেন, আপনারা আহারে অনাগ্রহী কেনো? তাঁরা বললেন, বিনা মূল্যে আমরা কোনো কিছু গ্রহণ করি না। তিনি বললেন, বেশতো। মূল্য পরিশোধ করুন। তাঁরা বললেন, কীভাবে? তিনি বললেন, আহারের পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্ ও পরে আলহাম-দুলিল্লাহ্ পাঠ করতে হবে। হজরত জিবরাইল তখন হজরত মিকাইলের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, ইনি নিশ্চয় আল্লাহ্‌র খলিল (বন্ধু) হওয়ার যোগ্য। এর পরেও কিন্তু মেহমানেরা খাবারের দিকে হাত বাড়ালেন না। তাই অবাক হয়ে মৃদু হাসলেন হজরত সারা। বললেন, আমরা অতিথি সৎকারের এতো আয়োজন করলাম। অথচ আপনাদের ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। তাজ্জব ব্যাপার যে!

৩. নবীজায়ার ওই হাসিটি ছিলো উৎকণ্ঠার হাসি। অতিথি ফেরেশতারা যখন জানালেন 'আমরা প্রেরিত হয়েছি লুতের সম্প্রদায়ের প্রতি' তখন হজরত বুঝলেন, এবার ওই অবাধ্যদের ধ্বংস অবধারিত। উৎকণ্ঠিত হলেন তিনি। আর তাঁর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠলো উৎকণ্ঠাজনিত হাসির রেখা।

৪. আত্মতৃপ্তির হাসি হেসেছিলেন তখন হজরত সারা। ইতোপূর্বে তিনি হজরত ইব্রাহিমকে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী। লুতের কথা ভাবুন। তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে ক্রমাগত অস্বীকার করে চলেছে। তাদের বাড়াবাড়ি পৌঁছেছে চরমে। এখন যেকোনো সময় তাদের উপরে এসে পড়বে গজব। সুতরাং লুতকে আপনার কাছে ডেকে নিন। সেতো আপনার ভাগিনেয়। এখন ফেরেশতাদের কথা শুনে হজরত সারা বুঝলেন, তাঁর ধারণাটি ছিলো যথার্থ। তাই তখন তাঁর বদনমণ্ডলে ফুটে উঠেছিলো আত্মতৃপ্তিজনিত হাসির আভা।

৫. নবী-সঙ্গিনী তখন হেসেছিলেন উপহাস প্রকাশার্থে। মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, হজরত সারা তখন ভাবলেন, আহারে নির্লিপ্ত অতিথি তো মাত্র তিনজন। আর হজরত ইব্রাহিমের পরিবারভূত ও পরিবারবহির্ভূত কর্মচারী, পরিচারক তো অনেক। ওই তিনজন তবে আমাদের ক্ষতি করতে পারবে কীভাবে? একথা ভেবেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের হাসি দেখা দিয়েছিলো তাঁর ওষ্ঠাধারে।

৬. সন্তান লাভের সংবাদ জানতে পেরে যারপরনাই উল্লসিত হয়ে পড়েছিলেন হজরত সারা। তাই তখন তাঁর হাসিতে জেগে উঠেছিলো আনন্দ ভরা উল্লাস।

www.eelm.weebly.com

৭. হর্ষ-বিষাদের হাসি হেসেছিলেন হজরত সারা। সন্তান লাভের সংবাদে তিনি হয়েছিলেন হৃষ্টচিত্ত। আর হজরত লুতের সম্প্রদায়ের উপর গজব নাজিলের সংবাদ জানতে পেরে হয়ে পড়েছিলেন বিমর্ষ। তাই তাঁর হাসিতে যুগপৎ জেগে উঠেছিলো হর্ষ ও বিষাদ।

এবার আর একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা যাক। বিষয়টি হচ্ছে— আলোচ্য আয়াতে বিশেষ করে হজরত সারাকে সন্তানলাভের সুসংবাদটি জানানো হলো কেনো? সুসংবাদটি তো এককভাবে নবী ইব্রাহিমকে জানানোই যথেষ্ট ছিলো। প্রত্যাদেশের রীতিও এই যে, সকল নির্দেশনা জানানো হয় নবী-রসুলগণকে। আর তাঁরা সেগুলো প্রচার করেন অন্যদের নিকটে। কিন্তু এই ব্যতিক্রমটি করা হলো কেনো? জবাবে বলা যেতে পারে যে—

১. এখানে সুসংবাদটির মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইসহাক ও তৎপরবর্তী হজরত ইয়াকুবের বংশপ্রবাহের আদি মাতা হবেন তিনিই। হজরত ইব্রাহিমের অন্য কোনো স্ত্রী এই বংশলতিকার আদি জননী হবেন না। সুতরাং এই বংশের প্রথম জনয়িত্রী হিসেবে তিনিই তো সুসংবাদ লাভের অধিকারিণী।

২. সন্তানলাভের সংবাদ পুরুষদের চেয়ে রমণীদের নিকটে অধিক উপভোগ্য। তাই তাঁকেই এখানে নির্বাচিত করা হয়েছে সুসংবাদ শ্রবণকারিণী হিসেবে।

৩. হজরত সারা ছিলেন বয়োবৃদ্ধা। সন্তান জন্মদানের বয়স তিনি পেরিয়ে-ছিলেন অনেক আগেই। অথচ আল্লাহ্পাকের নির্ধারণ এই যে, তিনি পুনরায় জননী হবেন। শুধু তাই নয়, তাঁর পুত্রের বংশও হবে দীর্ঘ, দীর্ঘতর। যাঁকে কেন্দ্র করে এই অলৌকিক কর্মকাণ্ডটি সম্পন্ন হবে, তিনিই তো সংরক্ষণ করবেন সুসংবাদ শ্রবণের অধিক অধিকার। তাই এখানে তাঁকে সুসংবাদটি জানানো হয়েছে সরাসরি।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'ক্বালাত্ ইয়া ওয়াইলাতাআ আলিদু ওয়া আনা আ'জুযুঁ ওয়া হাজা বা'লী শাইখা।' এখানে 'ইয়া ওয়াইলাতা' একটি বিস্ময়সূচক সম্বোধন। এর আভিধানিক অর্থ মর্সিয়া বা শোকগাঁথা। মৃত ব্যক্তির শোকে মাতম বা বিলাপ কালে আরববাসীরা এই কথাটি ব্যবহার করে। বিপদাপদ ও অন্যান্য বিস্ময়কর কার্যের ক্ষেত্রেও শব্দটির বহুল ব্যবহার রয়েছে। ইবনে ইসহাকের বর্ণনানুসারে ওই সময় নবী-পত্নী হজরত সারার বয়স ছিলো নব্বই বছর। মুজাহিদের মতে নিরানব্বই বছর। 'বায়াল' অর্থ স্বামী। ওই সময় হজরত ইব্রাহিমের বয়স ছিলো একশ' বিশ বছর। সুসংবাদ লাভের এক বৎসর পরেই তিনি সন্তান লাভ করেছিলেন। এভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এরকম— হজরত সারা বললেন, কী আশ্চর্য! আমি জননী হবো। আমি তো বৃদ্ধা। আমার স্বামীও বৃদ্ধ। এ যে দেখছি অদ্ভুত ব্যাপার!

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— কৃলু আতা'জাবীনা মিন আমরিল্লাহি (তারা বললো, আল্লাহ্র কাজে তুমি বিস্ময়বোধ করছো)। এ কথার অর্থ— ফেরেশতাগণ বললেন, হে নবীজায়া! আপনি বিস্মিত হচ্ছেন কেনো? আল্লাহ্ তো যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন। সুতরাং তাঁর কাজে বিস্ময়ের তো কিছু নেই। এখানে 'আমর' শব্দটির অর্থ আদেশ, শক্তি, সমাধান, কার্য অথবা সিদ্ধান্ত।

একটি জটিলতাঃ অস্বাভাবিক ঘটনার কথা শুনলে বা দেখলে আপনাআপনি বিস্ময়বোধ জাগ্রত হয়। নবতিপর বৃদ্ধার সন্তান লাভের সংবাদ একটি বিস্ময়কর সংবাদই বটে, যদিও তা আল্লাহ্র শক্তিবহির্ভূত নয়। হজরত সারা বিস্ময়বোধ করেছিলেন সে কারণেই। তাহলে ফেরেশতারা তাঁর এই স্বাভাবিক বিস্ময়বোধকে অশোভন মনে করলেন কেনো?

জটিলতার নিরসনঃ হজরত সারা ছিলেন নবীপত্নী। ওহী, মোজেজা, ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনি অনভিজ্ঞ নন। তাই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত সুসংবাদ শ্রবণ করে বিস্ময়বোধ না করাই ছিলো হয়তো তাঁর জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু তবু তিনি বলে উঠেছিলেন, 'এযে দেখছি অদ্ভুত ব্যাপার' সে কারণেই ফেরেশতারা বলেছিলেন,'আল্লাহ্র কাজে আপনি বিস্ময়বোধ করছেন কেনো?'

এরপর বলা হয়েছে— ওয়া বারাকাতুহু আলাইকুম আহ্লাল বাইত (হে নবীর পরিবার! আপনাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কল্যাণ)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটি প্রার্থনাসূচক। আবার কেউ কেউ বলেছেন বিবৃতিমূলক। এখানে 'রহমত' অর্থ নেয়ামত বা অনুগ্রহ। আর বরকত অর্থ অধিকতর কল্যাণ। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে রহমত অর্থ নবুয়ত । আর বরকত অর্থ বনী ইসরাইলের বারোটি গোত্র, যে গোত্রের নবী-রসুলগণের তিনি ছিলেন ঊর্ধ্বতন জননী। উল্লেখ্য যে, 'রহমাতুল্লহি' থেকে শুরু হয়েছে পৃথক একটি বাক্য। এভাবে পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে এই বাক্যটি মিলিত হয়ে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এরকম— হে নবীর সহধর্মিণী! সন্তান প্রাপ্তির সুসংবাদে বিস্মিত হবেন না। আপনি তো এরকম রহমত, বরকত ও অলৌকিকত্বের সঙ্গে অপরিচিত নন। 'আহলাল বাইত' কথাটির 'আহ্‌ল' শব্দটি বিধেয় সংযুক্ত হওয়ার কারণে এখানে একটি প্রশংসাসূচক ক্রিয়া অনুক্ত রয়েছে। অথবা শব্দটি একটি আহ্বানসূচক অব্যয়।

শিয়া সম্প্রদায় মনে করে রসুলেপাক স. এর সহধর্মিণীগণ আহলে বাইত নন। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাদের ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। হজরত ইব্রাহিমের সহধর্মিণীকে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে আহলে বাইত (হে নবীর পরিবার) বলে। ভাষাবিদগণও পরিবারের কর্ত্রীকে আহলে বাইত বলেন।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— ইন্নাহু হামীদুম মাজীদ (তিনি প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ)। 'হামীদ' অর্থ প্রশংসার যোগ্য। 'মাজীদ' অর্থ সত্তাগতভাবে সম্মানের যোগ্য। অর্থাৎ মহিমা ও ক্ষমাপরায়ণতার ক্ষেত্রে সম্মানার্হ। আল্লাহ্পাকের আরেকটি গুণবাচক নাম হচ্ছে কারীম। এর অর্থ, মহানুভব ও নেয়ামতদাতা । যখন কোনো মানুষের চরিত্রে প্রশংসিত বৈশিষ্ট্যসমূহের বিকাশ ঘটে তখন তাকেও কারীম বলে অভিহিত করা যায়। বাগবী বলেছেন,'মাজীদ' অর্থ অত্যুচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী। বায়যাবী বলেছেন, সুপ্রচুর কল্যাণদাতা। কামুস প্রণেতা বলেছেন, অধিক সম্মানের অধিকারী। আর কারীম হচ্ছে মহীয়ান, গরীয়ান।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৭৪, ৭৫, ৭৬

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرٰهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجٰدِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ۝ يٰٓإِبْرٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَآ ۖ إِنَّهُ

قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۝

❒ অতঃপর যখন ইব্রাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ আসিল তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার প্রেরিত ফেরেশ্তাদিগের সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল।

❒ ইব্রাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল-হৃদয়, সতত আল্লাহ্-অভিমুখী।

❒ হে ইব্রাহীম! ইহা হইতে বিরত হও; তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিয়া পড়িয়াছে; উহাদিগের প্রতি তো আসিবে শাস্তি যাহা অনিবার্য।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— এরপর যখন হজরত ইব্রাহিমের শংকা দূরীভূত হলো, তখন তাঁকে দেয়া হলো আর একটি সংবাদ। সেই সংবাদটি ছিলো হজরত লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার সংবাদ। সংবাদটি শুনে হজরত ইব্রাহিম অতিথি ফেরেশতাদের সঙ্গে বাদানুবাদ শুরু করেছিলেন। এখানে 'ইউজাদিলুনা' কথাটির শাব্দিক অর্থ আমার সঙ্গে বাদানুবাদ করতে লাগলো। কিন্তু আল্লাহ্র সঙ্গে হজরত ইব্রাহিম খলিলের বাদানুবাদ একটি অসম্ভব ব্যাপার। তাই এখানে কথাটির মর্মার্থ হবে— হজরত ইব্রাহিম তখন তর্কবিতর্ক জুড়েছিলেন অতিথি ফেরেশতাদের সঙ্গে। তর্কবিতর্কটি ছিলো এরকম— হজরত ইব্রাহিম বললেন, লুতের স্বজাতির মধ্যে পঞ্চাশজন ইমানদার যদি থাকে, তবুও কি

www.eelm.weebly.com

আপনারা তাঁর স্বজাতির সকল লোককে ধ্বংস করবেন? ফেরেশতারা বললেন, না। হজরত ইব্রাহিম পুনরায় বললেন, যদি চল্লিশজন ইমানদার থাকে? তাঁরা বললেন, তবুও না। এরপর হজরত ইব্রাহিম ক্রমে ক্রমে ইমানদারদের সংখ্যা তিরিশ, বিশ— এভাবে পাঁচ পর্যন্ত কমিয়ে আনলেন। আর তাঁর মনোতুষ্টির জন্য প্রতিবারই তাঁরা জবাব দিলেন, না। তবুও না। শেষে তিনি বললেন, যদি একজন ইমানদারও সেখানে থাকে? ফেরেশতারা বললেন, তবুও তাদেরকে ধ্বংস করা হবে না। তখন তিনি বললেন, সেখানে তো লুত স্বয়ং বর্তমান। সুতরাং আপনারা তাঁর কওমকে ধ্বংস করবেন না। ফেরেশতারা বললেন, একথা আমরা জানি। তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের ইমানদার সদস্যকে রক্ষা করা হবে। তবে তাঁর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী স্ত্রী হবে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ।

পরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— ইন্না ইব্‌রহীমা লাহালীমুন আউওয়াহুম্ মুনীব (ইব্রাহিম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল-হৃদয়, সতত আল্লাহ্ অভিমুখী)। 'হালীম' শব্দের অর্থ অপরাধীর উপরে ত্বরিত প্রতিশোধ কার্যকর না করা। আরেকটি অর্থ ধৈর্যশীল, সংযমী। পাপীদের সংশোধন-চিন্তায় যারা অত্যধিক কাতর, তাদেরকে বলে আউওয়াহ্ । অর্থাৎ যারা সংবেদনশীল অন্তরবিশিষ্ট তারাই আউওয়াহ্ । আর মুনীব বলে আল্লাহ্‌র প্রতি সমর্পিতপ্রাণ ব্যক্তিকে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে সুদৃঢ় বিশ্বাস ও সংকল্পবদ্ধদেরকে বলা হয় আউওয়াহ্। বিনয়াবনত, দয়ার্দ্রচিত্ত ও বিচক্ষণ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাফ্রী ভাষায় আউওয়াহ্ অর্থ বিশ্বাসী (মুমিন)।

হজরত ইব্রাহিমের চরিত্রে প্রধানতঃ তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি ছিলেন— ১. বিনম্রচিত্ত ২. কোমলহৃদয় ৩. অপরাধীকে শাস্তি প্রদানে নমনীয়। এসকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার কারণেই তিনি ফেরেশতাদের সঙ্গে প্রতর্কের অবতারণা করেছিলেন। আর ফেরেশতারা প্রতর্ক-পর্বটির অবসান ঘটিয়েছিলেন এভাবে—

এর পরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'হে ইব্রাহিম! এ থেকে বিরত হও; তোমার প্রতিপালকের বিধান এসে পড়েছে; তাদের প্রতি তো আসবে শাস্তি যা অনিবার্য।' একথার অর্থ— হে আল্লাহ্‌র খলিল! এবার বিতর্কের ইতি টানুন। আপনার প্রভুপালকের নির্দেশ সমাগত । নবী লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি আপতিত হবেই। বাদানুবাদ, আবেদন-নিবেদন, কোনো কিছুতেই এই অনিবার্য আযাবকে আর ফেরানো যাবে না।

www.eelm.weebly.com

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ○ وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِىْ ضَيْفِىْ ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ○ قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِىْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ○

❒ এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্তাগণ লূতের নিকট আসিল তখন তাহাদিগের আগমনে সে বিষণ্ন হইল এবং নিজকে তাহাদিগের রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল এবং বলিল,'ইহা নিদারুণ দিন।'

❒ তাহার সম্প্রদায় তাহার নিকট উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল, এবং পূর্ব হইতে তাহারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! ইহারা আমার কন্যা, তোমাদিগের জন্য ইহারা পবিত্র। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অতিথিদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়া আমাকে হেয় করিও না। তোমাদিগের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নাই?'

❒ তাহারা বলিল 'তুমি তো জান, তোমার কন্যাদিগকে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই; আমরা কী চাই তাহা তো তুমি জানই।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লুতের নিকটে এলো, তখন তাদের আগমনে সে বিষণ্ন হলো এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলো এবং বললো, এটা নিদারুণ দিন।' এ কথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিমের গৃহ থেকে ফেরেশতারা উপস্থিত হলেন হজরত লুতের গৃহে। তাঁরা তখন আকৃতি ধারণ করেছিলেন গুম্ফ-শ্মশ্রুবিহীন চিত্তাকর্ষক কিশোরের। সুদর্শন কিশোরদেরকে দেখে বিষণ্ন হয়ে পড়লেন হজরত লুত। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো উগ্র সমকামী। তিনি ভাবলেন, কিশোর অতিথিদেরকে দেখলেই তারা কামার্ত হয়ে উঠবে। বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। অথচ তিনি একা। কীভাবে সম্মান রক্ষা করবেন সম্মানিত অতিথিদের। এ কথা ভেবেই বিষণ্ন-চিত্ত নবী বলে উঠলেন, হায়! আজ আমার বড়ই দুর্দিন।

www.eelm.weebly.com

'জারআ'ন' অর্থ অন্তঃকরণ। বাগবী এরকম বলেছেন। বায়যাবী বলেছেন, মেহমানদের দেখে হজরত লুত হয়ে পড়লেন দ্বিধান্বিত। ভাবলেন, পাপিষ্ঠদেরকে প্রতিহত করবার বুদ্ধি ও সামর্থ্য কোনোটাই তাঁর নেই। তাঁর এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাকেই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে 'জারআ'ন' শব্দটির মাধ্যমে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ কনুই থেকে হাতের নিচের অথবা উপরের অংশ। রূপক অর্থ হচ্ছে শক্তি-সামর্থ্য। হাত হচ্ছে শক্তি সামর্থ্যের প্রতীক। তাই এখানে 'জারআ'ন' শব্দটির মাধ্যমে দুর্ধর্ষ সমকামীদের তুলনায় তাঁর সামর্থ্যবিবর্জিত অবস্থাটিকে প্রকাশ করা হয়েছে।

কাহিনীটি আল্লামা সুদ্দী ও কাতাদার বিবরণে এসেছে এভাবে— তখন দ্বিপ্রহর। হজরত ইব্রাহিমের গৃহ থেকে ফেরেশতারা রওনা দিলেন হজরত লুতের জনপদ অভিমুখে। হজরত লুত তখন কর্মরত ছিলেন তাঁর কৃষিক্ষেত্রে। অথবা সংগ্রহ করছিলেন জ্বালানি কাঠ। ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ ছিলো— নবী লুত তাঁর সম্প্রদায়ের পাপাচার সম্পর্কে চারবার সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস করা যাবে না। ফেরেশতারা ধারণ করলেন চিত্তহারক বালকের রূপ। নবী লুতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমরা আপনার অতিথি । হজরত লুত তাদেরকে নিয়ে যাত্রা করলেন গৃহাভিমুখে। চলতে চলতে বললেন, আমার প্রতিবেশীদের স্বভাব- চরিত্র সম্পর্কে আপনারা কি কিছু জানেন? অতিথিরা বললেন, না তো। তিনি বললেন, এই জনপদটি পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট একটি জনপদ। কথাচ্ছলে এই বাক্যটি তিনি উচ্চারণ করলেন চার বার। এভাবে কথা বলতে বলতে ফিরলেন স্বগৃহে। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত লুত কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে আগে আগে চললেন। পিছনে পিছনে চললো অতিথিবৃন্দ। পথচারীরা অশ্লীল দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো অতিথি বালকদের প্রতি। পথ চলতে চলতে হজরত লুত অতিথিদেরকে বললেন, এখানকার লোকগুলো এরকমই। এরকম জঘন্য লোক আর কোথাও নেই। চলন্ত পথে একথা তিনি উচ্চারণ করলেন চার বার। অতিথিরা পরস্পর পরস্পরের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে বললেন, শুনলে তো, সাক্ষ্যদানের সংখ্যা চার এবার পূর্ণ হলো। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, জনচক্ষুর অন্তরালে হজরত লুতের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন অতিথিরা। নবীগৃহের সদস্য ব্যতীত অন্য কেউ তাঁদের আগমন সংবাদ জানতে পারেনি। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী নবী-পত্নীই সংবাদটি রটিয়ে দিয়েছিলো পাড়ার যুবকদের মধ্যে। বলেছিলো, এমন সুন্দর মেহমান আমি আর কখনো দেখিনি।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'তার সম্প্রদায় তার নিকট উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে এলো।' হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও কাতাদা বলেছেন, এখানে 'ইউহ্‌রাউ'না' অর্থ দ্রুততার সঙ্গে আগমন করা। মুজাহিদ বলেছেন, শ্লথ ও স্বাভাবিক গতিতে আগমন করা। শাম্মার বিন আতিয়া বলেছেন, শ্লথ ও ত্বরিৎ কোনোটাই নয়, বরং এর মাঝামাঝি। অর্থাৎ সমকামীরা তাদের স্বভাবের টানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত হলো হজরত লুতের গৃহে। কামুস প্রণেতা বলেছেন, এ ধরনের চলনকে বলে 'হারা', যে গতি বিক্ষিপ্ত ও বেগবান।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং পূর্ব হতে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিলো।' একথার অর্থ ওই লোকগুলো আগে থেকেই লিপ্ত ছিলো সমকামীতায়। বেহায়াপনা ছিলো তাদের সত্তাগত স্বভাব। এছাড়া আরো অনেক অপরাধে অভ্যস্ত ছিলো তারা।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা।' একথার অর্থ— হে আমার স্বজাতি! আমার কন্যারা তো রয়েছে। তোমরা তাদের সঙ্গে বিবাহের মাধ্যমে বৈধ সম্পর্ক গড়ে তোল। এক বর্ণনায় এসেছে, প্রথমে হজরত লুত ওই সকল যুবকের সঙ্গে তাঁর কন্যাদের বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের জঘন্য স্বভাবের কারণে এ ব্যাপারে আর অগ্রসর হননি। তারা ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। সে কারণেই তিনি কন্যা সম্প্রদান করতে চাননি, একথা ঠিক নয়। কারণ রসুলেপাক স. এর নবুয়ত লাভের পূর্বে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও বিশ্বাসীদের মধ্যে বিবাহ সিদ্ধ ছিলো। তাই নবুয়ত লাভের পূর্বে তিনি স. তাঁর দুই কন্যাকে আবু লাহাবের পুত্র উকবা এবং রবীয়ার পুত্র আবুল আসের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। তারা দু'জনেই ছিলো কাফের।

হোসাইন বিন ফজল বলেছেন, হজরত লুত তাঁর কন্যাগণের বিয়ের প্রস্তাব উপস্থাপনকালে যুবকদের উপর ইমান গ্রহণের শর্ত আরোপ করেছিলেন। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'বানাতী' (আমার কন্যা) কথাটির অর্থ হবে আমার সম্প্রদায়ের কন্যাসকল। নবীগণ তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের পিতৃতুল্য। তাই তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের বিবাহযোগ্য কুমারী ও বিধবাদেরকে 'আমার কন্যা' বলে উল্লেখ করেছেন। কোরআন মজীদে উল্লেখিত একটি আয়াতে বলা হয়েছে — 'বিশ্বাসীগণের মধ্যে নবী হলেন সর্বোত্তম, আর তাঁর সহধর্মিণীগণ বিশ্বাসীদের মাতা।'এরপর হজরত উবাই বিন কা'বের ক্বেরাতে রয়েছে, ওয়াহুয়া আবুল লাহুম (আর তিনি হলেন তাদের পিতা)। অর্থাৎ রসুলে পাক স. হচ্ছেন সকল মুমিনের পিতা (আধ্যাত্মিক জনক)।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য যে, হজরত লুতের ঔরসজাত কন্যা ছিলো দু'জন। তাঁর সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক যুবকের জন্য দুই কন্যা নিশ্চয় যথেষ্ট নয়। তাই এখানে 'আমার কন্যা' কথাটির অর্থ আমার স্বজাতির কন্যা সকল হওয়াই সমীচীন। একদল আলেম বলেন, এখানে 'আমার কন্যা' বলে হজরত লুত তাঁর আপন কন্যাদ্বয়কেই বুঝিয়েছিলেন। তাঁদের মতে হজরত লুতের সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলো দু'জন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী নেতা। ওই নেতৃদ্বয়ের সঙ্গেই তিনি বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন তাঁর দুই কন্যাকে। ভেবেছিলেন, অত্যন্ত প্রতাপশালী দুই নেতা প্রশমিত হলে অন্যদেরকেও কুকর্ম থেকে ফেরানো হয়তো সম্ভব। কেউ কেউ আবার বলেছেন, হজরত লুত প্রদত্ত বিবাহের প্রস্তাবটি প্রকৃত প্রস্তাব ছিলো না। ছিলো অতিথিদেরকে অসম্মান থেকে বাঁচানোর একটি কৌশল।

এরপর বলা হয়েছে—'তোমাদের জন্য এরা পবিত্র।' কথাটির অর্থ এরকম নয় যে, পুংমৈথুন পবিত্র, আর অযথার্থ স্ত্রীমৈথুন পবিত্রতর। বরং কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে, নির্লজ্জতার দিক দিয়ে নারীমৈথুন পুংমৈথুন থেকে অপেক্ষাকৃত কম ঘৃণ্য। বৈবাহিক সূত্রে স্ত্রীমৈথুন অবশ্য পবিত্র। একথা বুঝাতেই 'তোমাদের জন্য এরা পবিত্র'— এরকম বলা হয়ে থাকতে পারে। বক্তব্য বিষয়টি আসলে এ রকম— ছিনতাই করা সম্পদের চেয়ে মৃত জন্তু ভক্ষণ পবিত্র। একথার অর্থ—লুণ্ঠন লব্ধ সম্পদ ও মৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ, দু'টোই অপবিত্র। তবে লুণ্ঠনলব্ধ সম্পদ অধিকতর অপবিত্র ও নিষিদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার অতিথিদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে আমাকে হেয় কোরো না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই?' একথার অর্থ— হে আমার উচ্ছৃঙ্খল সম্প্রদায়? আল্লাহ্‌র কথা ভেবে শংকিত হও । পাপের জন্য তিনি শাস্তি প্রদান করবেনই। সুতরাং তোমরা সংযত হও। আমার সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে অপমান করে তোমরা আমাকে হেয় প্রতিপন্ন কোরো না। কী হলো তোমাদের! তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই, যে সদুপদেশের মাধ্যমে তোমাদেরকে সংযত করতে পারে?

এর পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, তুমি তো জানো, তোমাদের কন্যাদেরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই; আমরা কী চাই তাতো তুমি জানোই।' একথার অর্থ— পাপিষ্ঠরা বললো, হে লুত! আমরা তো রমণী বিলাসী নই। সুতরাং তোমার কন্যাদেরকে নিয়ে আমরা কি করবো? আমরা কী পছন্দ করি তাতো তুমি জানোই। এই মুহূর্তে আমরা চাই তোমার অতিথি বালকদের।

www.eelm.weebly.com

قَالَ لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ○ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا
رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا
يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ۭ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ۭ اِنَّ
مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۭ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ○ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا
عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ○ مُّسَوَّمَةً
عِنْدَ رَبِّكَ ۭ وَمَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ○

❒ সে বলিল, 'তোমাদিগের উপর যদি আমার শক্তি থাকিত অথবা যদি আমি আশ্রয় লইতে পারিতাম কোন শক্তিশালী দলের।'

❒ তাহারা বলিল,'হে লূত! আমরা তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত ফেরেশ্তা। উহারা কখনই তোমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তোমাদিগের মধ্যে কেহ পিছন দিকে চাহিও না, কিন্তু তোমার স্ত্রী যাইবে না। উহাদিগের যাহা ঘটিবে তাহারও তাহাই ঘটিবে। প্রভাত উহাদিগের জন্য নির্ধারিত কাল; প্রভাত কি নিকটবর্তী নহে?

❒ অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিল তখন আমি নগরগুলিকে উল্‌টাইয়া দিলাম এবং উহাদিগের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করিলাম কংকর

❒ যাহা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। এই স্থান সীমালংঘন-কারীদিগ হইতে দূরে নহে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— দুরাচারদের দাপট ও আস্ফালন দেখে হজরত লূত অসহায় বোধ করলেন । বললেন, তোমাদের উপর যদি আমি শক্তি প্রয়োগ করতে পারতাম অথবা এই মুহূর্তে যদি কোনো শক্তিশালী দলের সাহায্য পেতাম। অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ একটি পারিবারিক অথবা সামাজিক সংঘবদ্ধ দল যদি আমার থাকতো, তবে আজ আমার পরিবার ও অতিথিবৃন্দকে নিরাপদ রাখতে পারতাম। 'রুক্‌নিন্ শাদীদ' কথাটির মাধ্যমে এখানে পারিবারিক সংঘবদ্ধতাকেই নির্দেশ করা হয়েছে। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'রুকন্' অর্থ শক্তিশালী বাহু, শক্তির সকল উৎস । যেমন, সরকারী নিরাপত্তা বাহিনী, সেনাবাহিনী, প্রভাবপ্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, আমার ভ্রাতা লুতের প্রতি আল্লাহ্ করুণা করুন; তিনি রুক্‌নিন্ শাদীদের শরণপ্রার্থী হয়েছিলেন। ভিন্ন সূত্রের বর্ণনায় 'করুণা করুন' কথাটির স্থলে রয়েছে 'মার্জনা করুন'।

জুহাক সূত্রে জারীর ও মুকাতিলের পদ্ধতিতে ইবনে আসাকের ও ইসহাকের বর্ণনায় এবং বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— হজরত লুত তখন হয়ে পড়েছিলেন গৃহবন্দী। অতিথিবৃন্দও হয়েছিলেন অবরুদ্ধ। গৃহাভ্যন্তর থেকেই তিনি দুর্বৃত্তদের সঙ্গে বাদানুবাদ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বিকৃত রুচির লোকগুলোকে কিছুতেই প্রশমিত করতে পারছিলেন না তিনি। শেষে পাষণ্ডরা তাঁর গৃহের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নবীকে দেখে অতিথিরা তখন বললেন—

পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে লুত! আমরা তোমার পালনকর্তা প্রেরিত ফেরেশতা। তারা কখনোই তোমার নিকট পৌঁছতে পারবে না।' একথার অর্থ— হে নবীপ্রবর! আমরা আপনার প্রভুপালক কর্তৃক প্রেরিত ফেরেশতা। সুতরাং আমাদের কোনো ক্ষতি করার সাধ্য তাদের নেই। আপনি নিশ্চিন্ত মনে এবার প্রাচীরের দরজা খুলে দিতে পারেন। হজরত লুত বহির্বাটির দরজা উন্মুক্ত করে দিলেন। পঙ্গপালের মতো গৃহাঙ্গনে প্রবেশ করলো দুর্বৃত্তরা। আল্লাহ্পাকের অনুমতি নিয়ে হজরত জিবরাইল তখন আবির্ভূত হলেন স্বরূপে। সামান্য সঞ্চালন করলেন তাঁর ডানা। তাতেই তারা হয়ে গেলো অন্ধ। আর অগ্রসর হতে পারলো না। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে শুরু করলো। চিৎকার করে একে অপরকে বলতে লাগলো, পালাও, পালাও। লুতের বাড়ীতে এসেছে মস্ত যাদুকর। তারা আমাদেরকে যাদু করেছে। আরো বলতে লাগলো, দাঁড়াও ভোর হতে দাও। কাল সকালে তোমার সঙ্গে আমরা শেষ বুঝাপড়া করবো। হজরত লুত দুর্বৃত্তদের কথায় এবার ভয় পেলেন না মোটেও। ফেরেশতাদেরকে শুধু জিজ্ঞেস করলেন, আযাব শুরু হবে কখন? ফেরেশতারা বললেন, ভোর বেলা।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি রাতের কোনো এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড়ো এবং তোমাদের মধ্যে কেউ পিছন ফিরে চেয়ো না, কিন্তু তোমার স্ত্রী যাবে না ।' 'ক্বিত্বই'ম্ মিনাল লাইল' অর্থ রাতের এক অংশে। হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। জুহাক বলেছেন, রাতের অবশিষ্ট অংশে। কাতাদা বলেছেন, নিশীথের প্রথমার্ধ উত্তীর্ণ হওয়ার পর। কেউ কেউ বলেছেন, সুবহে কাজেবের সময়। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— ফেরেশতারা বললেন, হে নবীপ্রবর! আপনি রাত্রির শেষ ভাগে পরিবার-পরিজনসহ গৃহ থেকে

www.eelm.weebly.com

নিষ্ক্রান্ত হবেন এবং আপনাদের মধ্যে কেউ যেনো পশ্চাতে দৃষ্টি না ফেরায়। কেউ কেউ বলেছেন, শেষ রাতে বের হওয়ার নির্দেশটি সরাসরি ছিলো হজরত লুতের প্রতি। আর পেছনে না তাকানোর নির্দেশটি ছিলো তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের প্রতি।

'কিন্তু তোমার স্ত্রী যাবে না' কথাটির অর্থ, হে লুত! শেষ রাতের ওই যাত্রায় তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী পত্নীকে সঙ্গে নিতে পারবে না। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে— ওই যাত্রায় তোমার পত্নী ব্যতীত অন্য কেউ পশ্চাতে ফিরে তাকাবে না। বাগবী বলেছেন, নির্দেশটি ছিলো এ রকম— স্ত্রীকে না নিয়েই আপনি রাতের শেষ ভাগে ঘর থেকে বের হয়ে পড়ুন। তাকে সঙ্গিনী করা যাবেই না। কারণ তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে অবাধ্যদের সঙ্গে। এই মর্মার্থটির পোষকতা লক্ষ্য করা যায় হজরত ইবনে মাসউদের উচ্চারণ রীতিতে। তিনি 'ফা আসরি বি আহ্লিকা' এর পরে পড়েছেন 'ইল্লাম রাআতাকা'। এ সম্পর্কে আবার রয়েছে দু'টি বিবরণ। একটিতে হজরত লুত তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। এমতাবস্থায় যাত্রা পথে পদবিক্ষেপকালে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করা তাঁর স্ত্রী ব্যতীত অন্যদের প্রতি নিষিদ্ধ ছিলো। তাঁর স্ত্রীর মনের টান ছিলো কাফেরদের সঙ্গে। তাই সে পিছনে না তাকিয়ে পারেনি। অবাধ্যদের প্রতি ভয়ংকর আযাব দেখে সে বলে উঠেছিলো, হায়! আমার স্বজাতি যে ধ্বংস হয়ে গেলো। অন্য বিবরণটিতে এসেছে— হজরত লুতের প্রতি নির্দেশ ছিলো স্ত্রীকে ছাড়াই যাত্রা করতে হবে। কারণ সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দলভূত। বিবরণ দু'টো পরস্পর বিরুদ্ধ। যে কোনো একটিকে গ্রহণ করলে অবশ্য সমস্যা আর থাকে না। তবে সেটাও দুর্বোধ্য। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

এরপর বলা হয়েছে—'তাদের যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। প্রভাত তাদের জন্য নির্ধারিত কাল।' একথার অর্থ— হে লুত! অবাধ্যদের প্রতি যে শাস্তি আপতিত হবে, তোমার স্ত্রীকেও স্পর্শ করবে সেই শাস্তি। বলা বাহুল্য যে, হজরত লুতের স্ত্রী ছিলো কাফের। কিন্তু সে নবীর পরিবারভুক্ত ছিলো কিনা সে সম্পর্কে কোরআন ব্যাখ্যাদাতাগণ একমত নন। যে অর্থে হজরত নুহের পুত্র কিনান প্লাবন পূর্ব সময়ে নবী-পরিবারভুক্ত বলা যায়, সেই অর্থেই আযাব আপতিত হওয়ার পূর্বে হজরত লুতের ওই কাফের স্ত্রীকে নবী-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে মেনে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ও স্থায়ী অর্থে কিনান ও হজরত লুতের স্ত্রী কেউই নবী-পরিবারভূত নয়। তাই হজরত নুহের পুত্র কিনান সম্পর্কে আল্লাহ্পাক বলেছেন— সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। আর আলোচ্য আয়াতে হজরত লুতের স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড়ো...........কিন্তু তোমার স্ত্রী যাবে না। ভিন্ন পাঠ অনুসারে— তোমার স্ত্রী ব্যতীত কেউ পিছনে পড়ে থাকবে না বা

www.eelm.weebly.com

পিছনে ফিরে তাকাবে না। অর্থাৎ হে লুত! তোমার ওই স্ত্রী পিছনে পড়ে থাকুক অথবা পিছনে ফিরে দেখুক, তাতে করে তোমার কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। অন্যান্য অবাধ্যদের মতো তার জন্যও নির্ধারিত রয়েছে শাস্তি। এতক্ষণের আলোচনা থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সম্ভবতঃ হজরত লুত তাকে পরিত্যাগ করেই প্রস্থান করেছিলেন অথবা সে নিজেই পিছনে পড়ে থেকে কিংবা পিছনে তাকিয়ে শাস্তি অবলোকন করেছিলো এবং নিজেও হয়েছিলো শাস্তির শিকার।

শেষে বলা হয়েছে— 'প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?' একথার অর্থ— অতি প্রত্যুষে শাস্তি আপতিত হবে, এটাই ছিলো আল্লাহ্‌তায়ালার নির্ধারণ। একথা জানতে পেরে হজরত লুত নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি কামনা করলেন প্রত্যুষের আগেই যদি শাস্তি আপতিত হতো। তাঁর এমতো মনোভাব লক্ষ্য করে ফেরেশতাবর্গ বললেন, আর এক প্রহর মাত্র। প্রত্যুষতো নিকটেই। নয় কি?

এরপরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে—'অতঃপর যখন আমার আদেশ এলো, তখন আমি নগরগুলোকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম কংকর।' একথার অর্থ— প্রেরিত ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমার আদেশ কার্যকর হলো। তাদের মাধ্যমে আমি নগরগুলোকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পাথরের বৃষ্টি। প্রস্তর বর্ষণ ও নগরগুলোকে উল্টিয়ে দেয়ার কাজ করেছিলেন ফেরেশতারা। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে 'উল্টিয়ে দিলাম' ও 'বর্ষণ করলাম'। অর্থাৎ ফেরেশতাদের কর্মকে আল্লাহ্ তাঁর নিজের কর্ম বলে প্রকাশ করেছেন। নির্দেশদাতা তিনিই। তাই এখানে এ রকম বাকভঙ্গি সন্নিবেশিত হয়েছে। আর এতে করে একথাই প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র হুকুমই সর্বোচ্চ।

বাগবী লিখেছেন, পাঁচটি পৃথক শহরে বসবাস করতো হজরত লুতের সম্প্রদায়। হজরত জিবরাইল ওই জনপদগুলোর নিম্নে প্রবেশ করালেন তাঁর একটি ডানা। তারপর শহরসহ শহরের অধিবাসীদেরকে উত্তোলন করলেন অনেক উপরে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তখন ওই শহরগুলোর মোরগ ও কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছিলো। গৃহবাসীরা তখন ছিলো ঘুমন্ত। হজরত জিবরাইল শহরগুলোকে আকাশে উঠিয়ে দিলেন এমনভাবে যে, কোনো গৃহের তৈজসপত্রও সামান্য স্থানচ্যুত হয়নি। নিদ্রাভঙ্গও হয়নি গৃহবাসীদের। এভাবে শহরগুলোকে তিনি উল্টিয়ে পুনরায় সজোরে প্রোথিত করলেন মৃত্তিকায়। শহরগুলোর মোট জনসংখ্যা ছিলো পাঁচ লাখ। মতান্তরে পাঁচ কোটি। এখনও চিহ্ন রয়েছে সেগুলোর। সেই স্থানটিকে এখনও বলা হয় মু'তাফিকাত (উল্টানো জনপদ)। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

www.eelm.weebly.com

'হিজারাতাম মিন সিজ্জীল' অর্থ—বর্ষণ করলাম কংকর। উল্লেখ্য যে, ওল্টানো অবস্থায় ওই পাঁচটি জনপদ মৃত্তিকায় প্রোথিত করার পর সেগুলোর উপর বর্ষণ করা হয়েছিলো প্রস্তর লোষ্ট্র। এ রকমও হতে পারে যে, যে সকল দুরাচার জনপদগুলোর বাইরে এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিলো, প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিলো তাদের উপরে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'সিজ্জীল' হচ্ছে এক ধরনের কঠিন শিলা। কাতাদা ও ইকরামা বলেছেন, শব্দটির অর্থ গলিত মাটি। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— লি নুরসিলা আ'লাইহিম হিজারাতাম্ মিন্ত্বীন। মুজাহিদ বলেছেন, প্রথমে বর্ষিত হয়েছিলো প্রস্তর এবং পরে শুষ্ক মৃত্তিকা। প্রস্তর যাঁরা বলেছেন, তাঁরা যথার্থই বলেছেন। কারণ পলিমাটি থেকেই গঠিত হয় পাললিক শিলা। জুহাক বলেছেন, 'সিজ্জীল' হচ্ছে পাকা ইট। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, নিক্ষেপ করা হয়েছে 'এমন' প্রস্তর। অথবা বলা যেতে পারে খোদিত পাষাণ। ওই পাষাণের টুকরোগুলোর উপর খোদিত ছিলো ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদগুলোর নাম। কেউ কেউ বলেছেন, 'সিজজীল শব্দটি এসেছে'সিজ্জীন' থেকে। 'সিজ্জীল' একটি দোজখের নাম। এখানে 'নুন' অক্ষরটির বদলে 'লাম' বসেছে মাত্র। কেউ কেউ আবার বলেছেন, আকাশের একটি পাহাড়ের নাম 'সিজ্জীল'। আর 'মান্দুদ্' শব্দটির অর্থ এখানে স্তরিভূত অবস্থায় বা স্তরে স্তরে সাজানো অবস্থায় অথবা ক্রমাগত।

এরপরের আয়াতে (৮৩) বলা হয়েছে—'যা তোমার প্রতিপালকের নিকটে চিহ্নিত ছিলো।' ইবনে জুরাইজ বলেছেন, ওই পাথরগুলো ছিলো পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সেগুলো ধরাপৃষ্ঠের পাথরের মতো ছিলো না। কাতাদা ও ইকরামা বলেছেন পাথরগুলো ছিলো রক্তিম রেখাবিশিষ্ট। হাসান এবং সুদ্দী বলেছেন, সীলমোহর অঙ্কিত। অর্থাৎ শাস্তিপ্রাপ্তব্যদের নাম নির্দিষ্ট করে লিপিবদ্ধ ছিলো প্রতিটি পাথরে।

শেষে বলা হয়েছে—'এই স্থান সীমালংঘনকারীদের থেকে দূরে নয়।' এখানে সীমালংঘনকারী বা জালেম বলে বুঝানো হয়েছে মক্কার পৌত্তলিকদেরকে। বাগবী লিখেছেন, কাতাদা ও ইকরামার মতানুসারে এখানে জালেম বলে বুঝানো হয়েছে উম্মতে মোহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত দুরাচারদেরকে। কাতাদার এই মতকে সমর্থন করেছেন ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং আবু শায়েখ। অর্থাৎ তারা বলতে চেয়েছেন, এখানে এই হুঁশিয়ারীটি নিহিত রয়েছে যে, এই উম্মতের অন্তর্ভূত জালেমদের উপরেও অনুরূপ প্রস্তর বর্ষণ করা উচিত। অর্থাৎ এরাও হজরত লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের মতো শাস্তিযোগ্য।

কাতাদা ও ইকরামা বলেছেন, আল্লাহ্পাক সেদিন কোনো জালেমকেই বাঁচিয়ে রাখেননি। বাগবী লিখেছেন, সাহাবায়ে কেরামের কতিপয় উদ্ধৃতিতে এ রকমই বলা হয়েছে যে, সেদিন কোনো জালেমই প্রস্তরখণ্ডগুলোর লক্ষ্যস্থলের বাইরে ছিলো না। সুনির্দিষ্ট সময়ে পাথরগুলো তাদেরকে আঘাত করেছিলো। রসুল স.

www.eelm.weebly.com

একবার আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত জালেম সম্পর্কে হজরত জিবরাইলের নিকটে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আপনার উম্মতের মধ্যে যারা জালেম তারাই এই আয়াতের লক্ষ্য। আর এমন কোনো জালেম নেই যে ওই পাথরের লক্ষ্যবস্তু নয়। যে কোনো মুহূর্তে তাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষিত হতে পারে। দুররে মনসুর গ্রন্থে বলা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষাপটে ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, রবী বিন আনাস বলেছেন, এ সম্পর্কে আমি যা শুনেছি তা হচ্ছে, প্রতিটি জালেমের দিকে লক্ষ্য করে নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে একটি করে পাথর। ওই পাথর নিক্ষিপ্ত হওয়ার নিমিত্তে আল্লাহ্পাকের নির্দেশের জন্য সতত প্রতীক্ষ্যমাণ। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে 'হিয়া' (এই স্থান) সর্বনামটি ওই জনপদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যে জনপদটি মক্কার মুশরিকদের সিরিয়ায় গমন পথের এপাশে অথবা ওপাশে অবস্থিত। 'হিয়া' সর্বনামটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক হওয়া সত্ত্বেও এখানে পুংলিঙ্গবাচক 'বায়িদ' ব্যবহৃত হয়েছে। এ রকম করা হয়েছে পাথর ও স্থানের দিকে লক্ষ্য রেখে।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُۥ ۖ وَلَا تَنقُصُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّىٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّىٓ أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ○ وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ
وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○ بَقِيَّتُ
ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ○ قَالُوا۟
يَٰشُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن
نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُا۟ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ○

❑ মাদিয়ানবাসীদের নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা শোয়াইবকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ নাই, মাপে ও ওজনে কম করিও না; আমি তোমাদিগকে সমৃদ্ধিশালী দেখিতেছি, কিন্তু আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করিতেছি শাস্তি এক সর্বগ্রাসী দিবসের।'

www.eelm.weebly.com

❒ 'হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপিবে ও ওজন করিবে। লোকদিগকে তাহাদিগের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইবে না'

❒ 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্-অনুমোদিত যাহা থাকিবে তোমাদিগের জন্য তাহা উত্তম; আমি তোমাদিগের তত্ত্বাবধায়ক নহি।'

❒ উহারা বলিল, 'হে শোয়াইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদিগের পিতৃপুরুষেরা যাহার ইবাদত করিত আমাদিগকে তাহা বর্জন করিতে হইবে এবং আমরা ধন-সম্পদ সম্পর্কে যাহা খুশি করিতে পারিব না? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, সদাচারী।'

হজরত ইব্রাহিমের এক পুত্রের নাম ছিলো মাদ্ইয়ান। মাদিয়ান জনপদটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তাঁরই নামানুসারে। মাদিয়ানবাসীরা ছিলো আল্লাহ্র অবাধ্য। বেচাকেনার সময় ওজনে কম দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো তারা। এই ভয়াবহ অপরাধ থেকে উদ্ধারের নিমিত্তে আল্লাহ্পাক প্রেরণ করলেন তাদের স্বগোত্রীয় হজরত শোয়াইবকে। মাদিয়ানবাসী অথবা মাদ্ইয়ানের বংশভূতদেরকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতগুলো। সত্য ধর্মের মূল কথা তওহীদ (আল্লাহ্র এককত্বের উপরে বিশ্বাস)। তাই এখানে নবী শোয়াইব প্রথমে তাঁর সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছেন তওহীদের প্রতি। তারপর সচেতন করে দিয়েছেন ওজনে কম দেয়ার মতো গর্হিত অপরাধ সম্পর্কে। প্রথমোক্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে—'মাদিয়ানবাসীদের নিকটে তাদের ভ্রাতা শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র উপাসনা করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নেই, মাপে ও ওজনে কম কোরো না'

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমাদেরকে সমৃদ্ধশালী দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য আশংকা করছি শাস্তি এক সর্বগ্রাসী দিবসের।' একথার অর্থ— হজরত শোয়াইব বললেন, তোমরা তো ধনবান। কিন্তু এভাবে মাপে ও ওজনে কম দিয়ে মানুষ ঠকাও কেনো? এরকমও বলা যেতে পারে যে— আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে প্রচুর ধনসম্পদ দান করেছেন। সুতরাং তোমরা কৃতজ্ঞ হও। হও ন্যায়নিষ্ঠ। ন্যায্য পাওনা থেকে কাউকে বঞ্চিত কোরো না। যদি এই অপরাধ থেকে তওবা না করো, তবে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রদত্ত ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিবেন। আর তোমরা পতিত হবে ভয়াবহ শাস্তির মধ্যে। মুজাহিদ বলেছেন, হজরত শোয়াইব তাঁর সম্প্রদায়কে এইমর্মে ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন যে, যদি তোমরা এ অপকর্ম পরিত্যাগ না করো, তবে আল্লাহ্পাক তাঁর সকল নেয়ামত থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করবেন। তখন প্রাত্যহিক দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য হয়ে

www.eelm.weebly.com

পড়বে মহার্ঘ। এভাবে আল্লাহ্‌র আক্রোশ আপতিত হবে তোমাদের উপর। 'এক সর্বগ্রাসী দিবসের শাস্তি' কথাটির অর্থ হবে এখানে— আমার আশংকা হচ্ছে নেপথ্যের শাস্তি তোমাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তোমরা এসে পড়েছো ধ্বংসের তটভূমিতে। 'মুহীত্ব' শব্দটির অর্থ কেউ কেউ করেছেন— ধ্বংসকারী। আবার কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন— মহাপ্রলয়ের তূর্য-নিনাদ।

পরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়সংগতভাবে মাপ দিবে ও ওজন করবে।' পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষিত হয়েছে মাপে ও ওজনে কম দেয়ার নিষিদ্ধতা। আর আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে ন্যায়সংগতভাবে মাপ ও ওজনের আদেশ। এভাবে একবার নিষেধ ও আরেকবার আদেশের মাধ্যমে বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তোলা হয়েছে। এতে করে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, মাপে ও ওজনে কম দেয়া যেমন ক্ষতিকর, তেমনি যথাযথরূপে মাপ ও ওজন করা একটি কর্তব্য। একারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোনো ব্যবসায়ী বিশুদ্ধ মাপে পণ্য ক্রয় করার পর বিক্রয়ের সময় পুনরায় মাপ ও ওজন সহকারে বিক্রয় না করলে তার বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। এরকম মাপ ও ওজনহীন সামগ্রী সে নিজে ব্যবহারও করতে পারবে না, বিক্রয়ও করতে পারবে না। রসুলেপাক স. পরিমাপহীন কোনো খাদ্যবস্তু গ্রহণ করেননি। তাঁর সময়ে 'সা', 'ওসক' ইত্যাদি পরিমাপের প্রচলন ছিলো। তখনও অনুমান-ভিত্তিক কোনো ক্রয় বিক্রয় হতো না। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা, ইসহাক ও ইবনে আবী শায়বা। তবে হাদিসটির এক বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা সম্পর্কে হাদিস বিশারদগণ বিরূপ মন্তব্য করেছেন। হাদিসটি আবার ভিন্ন সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা, হজরত আনাস এবং হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তবে ওই বর্ণনাসূত্রগুলোও শিথিল। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, হাদিসটি বহু সূত্রসম্বলিত ও হাদিসের ইমামগণ কর্তৃক অনুমোদিত। তাই হাদিসটিকে অগ্রাহ্য করা যায় না। এর অনুমোদনকারীদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ।

রসুল স. এরকমও বলেছেন যে, ওজন করার সময় পাল্লা একটু ঝুঁকিয়ে দিয়ো। নবী-সমাজ এভাবেই পরিমাপ করে থাকেন। সুয়াইদ বিন কয়েস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, হাকেম ও ইবনে হাব্বান। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে—'লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না।' একথার অর্থ— মানুষের প্রাপ্য অধিকার খর্ব করবে না। এতে করে বুঝা যায়, সঠিক মাপ ও ওজন ক্রেতার প্রাপ্য। সেই প্রাপ্য আত্মসাৎ করাকে সাধারণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না।' এখানে উল্লেখিত 'তা'ছাও' শব্দটি ক্রিয়ামূল (মাসদার)। শব্দটির মাধ্যমে কারো অধিকার হরণসহ সব ধরনের অপকর্মকে বুঝানো হয়ে থাকে। বিদ্বানগণ বলেছেন, 'বখছ' শব্দটির অর্থ— কর ইত্যাদি ব্যবহারিক জীবনের অধিকার হরণ। আর 'তা'ছাও' অর্থ— লুণ্ঠন, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি ব্যক্তিগত অধিকার হরণ।

একটি জটিলতাঃ 'তা'ছাও' অর্থ যদি অপকর্ম, বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা বা ফাসাদ হয়ে থাকে তবে, এখানে 'মুফ্‌সিদীন' শব্দটির উল্লেখ করা হলো কেনো?

জটিলতার জবাবঃ কোনো কোনো বিষয় দৃশ্যতঃ ফাসাদ, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা ফাসাদ নাও হতে পারে। যেমন হজরত খিজিরের বালক হত্যা, নৌকা নষ্ট করা ইত্যাদি। এ ধরনের ফাসাদ বর্ণিত বিধানের আওতামুক্ত। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে 'মুফ্‌সিদীন' (বিপর্যয় সৃষ্টিকারী) কথাটির অর্থ হবে ধর্মীয় বিধি-বিধান লংঘনকারী, জাগতিক রীতি-নীতি ভঙ্গকারী, অনাসৃষ্টির উপস্থাপক।

এরপরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লহ্-অনুমোদিত যা থাকবে তোমাদের জন্য তা উত্তম।' একথার অর্থ— মাপ ও ওজনে কম দিয়ে হারাম পদ্ধতিতে অর্জিত সম্পদ অপেক্ষা সঠিক মাপ ও ওজনের মাধ্যমে অর্জিত হালাল উপার্জন তোমাদের জন্য অধিক উত্তম, যদি তোমরা মুমিন হও। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। মুজাহিদ বলেছেন,'আল্লাহ্-অনুমোদিত যা থাকবে' কথাটির অর্থ আল্লাহ্‌র বিধানানুসারে ব্যবসা করলে যে উদ্বৃত্ত বা লাভ থাকবে । যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ওয়াল বাকিয়াতুস্ সলিহাতু খইর। 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' কথাটির মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র বিধানের আনুগত্য ফলপ্রসূ হবে তখনই, যখন তোমরা হবে মুমিন। ফলকথা পুণ্যকর্ম গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ইমান শর্ত। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এরকম— যদি তোমরা প্রকৃতই আমার নির্দেশ মান্য করো, তবে মাপ-পরিমাপ সম্পর্কে যে বিধান দেয়া হলো তা কার্যকর করে দেখাও।

শেষে বলা হয়েছে—'আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।' একথার অর্থ হজরত শোয়াইব বললেন, স্বজাতি আমার! একথা যেনো কিছুতেই ভেবে বোসো না যে আমি তোমাদেরকে তোমাদের অপকর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবো। তারপর তোমাদের এই পুণ্যের জন্য তোমাদেরকে প্রতিদান প্রদান করবো। আমি তো কেবল সদুপদেশদানকারী প্রচারক। আল্লাহ্‌র বিধান প্রচার করাই আমার কর্তব্য। বিধান পালন করা না করা তোমাদের ব্যাপার। অথবা বাক্যটির মর্ম দাঁড়াবে এরকম— আমি কি এ কথা বলে তোমাদের তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করবো যে,

www.eelm.weebly.com

অপকর্ম পরিত্যাগ না করলেও আল্লাহ্‌র করুণারাশি তোমাদের প্রতি প্রবহমান থাকবে? একথা বলে তোমাদের তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা আমার পক্ষে তো সম্ভবই নয়।

এরপরের আয়াতে(৮৭) বলা হয়েছে—'তারা বললো, হে শোয়াইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যার উপাসনা করতো আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে এবং আমরা ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা খুশী তা করতে পারবো না?' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত শোয়াইব অত্যধিক নামাজ পাঠ করতেন। তাই তাঁর সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের কথাবার্তায় 'তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয়'— বলে নামাজের প্রসঙ্গ টেনে আনতো। আ'মাশ বলেছেন, এখানে 'সালাত' অর্থ নামাজ আদায় করা। হজরত শোয়াইব তাদেরকে আহ্বান করেছিলেন তওহীদের প্রতি। অথচ তারা তাঁর নামাজ আদায়কে বানিয়েছিলো উপহাসের অনুষঙ্গ। ইঙ্গিতে তারা বলতে চাইতো, তোমার আহ্বান কার্যের উদ্দেশ্য তো ওই একটিই— নামাজী বানিয়ে দেয়া। এই কাজটিই তোমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়েছে। এটা নিশ্চয় সুস্থ মস্তিষ্কবিশিষ্ট লোকের কাজ নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, সদাচারী।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অহমিকাবশতঃ হজরত শোয়াইবকে বলেছিলো, হালীম (সহিষ্ণু) ও 'রশীদ' (সদাচারী)। তাদের বক্তব্য ছিলো আসলে এরকম— তুমি তো বাপু সাদাসিধে গোবেচারা। এভাবে উদ্দেশ্যের বিপরীত বক্তব্য প্রকাশ করা আরবীভাষীদের একটি রীতি। কেউ কেউ বলেছেন, তারা হজরত শোয়াইবকে সহিষ্ণু ও সদাচারী বলেছিলো উপহাসার্থে। এভাবে তাঁকে বিদ্রূপবানে জর্জরিত করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। কেউ কেউ আবার বলেছেন, বিষয়টি এরকম নয়। হজরত শোয়াইবের সহিষ্ণুতা ও সদাচার সম্পর্কে তারা ভালোভাবেই জানতো। তাঁকে সহিষ্ণু ও সদাচারী বলে মানতোও। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম, হে শোয়াইব! তুমি তো অতি বিচক্ষণ ও সজ্জন। তোমার সহনশীলতা ও উত্তম আচরণ সম্পর্কেও আমরা জানি। তাই তোমার মুখে এসব কথা শোভা পায় না। তুমি আমাদেরকে পিতৃপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলবে কেনো? আর কেনোই বা বলবে, আমাদের ধনসম্পদ আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারবো না? উল্লেখ্য যে, হজরত সালেহের স্বগোত্রীয়রাও বলেছিলো এরকম। তারা বলেছিলো— 'ক্বদ্‌ কুনতু ফিনা মারজু ক্বব্‌লু হাজা' (ইতোপূর্বে আমরা এরূপ আশা করেছিলাম)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, অবাধ্যদের বক্তব্যবিষয় হবে এখানে এরকম— হে শোয়াইব! তোমার ধারণামতে তুমি সহিষ্ণু ও সদাচারী। কাজেই এমন কথা তুমি বলো কেনো?

www.eelm.weebly.com

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ۚ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝ وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ۝ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ۚ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ۝

❒ সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক-প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি তাঁহার নিকট হইতে আমাকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করিয়া থাকেন তবে কি করিয়া আমি আমার কর্তব্য হইতে বিরত থাকিব, আমি তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করি আমি নিজে তাহা করিতে ইচ্ছা করি না। আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করিতে চাহি। আমার কার্য-সাধন তো আল্লাহেরই সাহায্যে; আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী;

❒ 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার সহিত মতানৈক্য যেন কিছুতেই তোমাদিগকে এমন আচরণ না করায় যাহাতে তোমাদিগের উপর তাহার অনুরূপ আপতিত হইবে যাহা আপতিত হইয়াছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর, হূদের সম্প্রদায়ের উপর কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর; আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদিগ হইতে দূরে নহে।'

❒ 'তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর; আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, প্রেমময়।'

প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আমাকে বলো, আমি যদি আমার প্রভুপালক-প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি তাঁর নিকট থেকে আমাকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করে থাকেন, তবে কি করে আমি আমার কর্তব্য থেকে বিরত থাকবো? 'বাইয়্যেনাত'

www.eelm.weebly.com

অর্থ সুস্পষ্ট প্রমাণ, দলিল বা নিদর্শন। 'মির্‌রব্বী' অর্থ আমার প্রভুপালকের পক্ষ থেকে। অর্থাৎ আমার প্রভুপালকের পক্ষ থেকে ওহী ও নবুয়তের মাধ্যমে। 'রাজাক্বানী মিনহু' অর্থ বিনা শ্রমে প্রাপ্ত আল্লাহ্‌পাক প্রদত্ত রিজিক বা জীবনোপকরণ। 'রিজক্বান্ হাসানা' অর্থ হালাল রিজিক। শোনা যায় হজরত শোয়াইব ছিলেন বিত্তশালী। তবে কথাটির কোনো ভিত্তি নেই। 'ইন্‌কুনতু' কথাটির 'ইন্' হচ্ছে শর্তসূচক অব্যয়। কিন্তু ফলাফল এখানে অনুল্লেখিত। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের প্রথমাংশের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— হজরত শোয়াইব বললেন, হে আমার দেশবাসী! আল্লাহ্‌পাক যখন আমাকে প্রত্যাদেশ ও নবুয়তের মাধ্যমে দূরদর্শীতা দান করেছেন, আরো দান করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে শ্রমহীন হালাল রিজিক, তখন কি করে এটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে যে, আমি তাঁর বিধানের বিরুদ্ধে চলবো, ওহীর অবমাননা করবো এবং তাঁর বাণী প্রচার না করবো? এটা যে আমার কর্তব্য।

এরপর বলা হয়েছে—'আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি আমি নিজে তা করতে ইচ্ছা করি না।' একথার অর্থ হজরত শোয়াইব আরো বললেন, কী ভেবেছো তোমরা? আমি কি তাই করবো, যা তোমাদেরকে নিষেধ করে থাকি। তোমাদের কর্মকাণ্ড যদি শুদ্ধ হতো, তবে আমি তোমাদেরকে তা করতে নিষেধ করবো কেনো? আমিই বা তা থেকে বিরত থাকবো কেনো? বরং আমি তোমাদের জন্য যা শুভ মনে করি, আমার নিকটও তা শুভ। আর তোমাদের জন্য যা অশুভ মনে করি, আমার জন্যও তা অশুভ। আমিই তো তোমাদের একান্ত সুহৃদ।

এরপর বলা হয়েছে—'আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করতে চাই।' একথার অর্থ— হে মাদিয়ানবাসী! আমি তো আল্লাহ্‌র নবী। মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ। আমি যে তাঁর বার্তাবাহক। তাই আমি আহ্বান জানাই তওহীদের প্রতি। আহ্বান জানাই বিশুদ্ধ জীবনের প্রতি। তাই তো তোমাদেরকে বলি, মাপে ও ওজনে কম দিয়ো না। এ রকম অপকর্মের পরিণতি অত্যন্ত অশুভ। এভাবে আমি তোমাদের বিশ্বাসগত এবং কর্মগত স্খলনের সংশোধন করতে চাই। সুসজ্জিত করে দিতে চাই তোমাদের পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর জীবনকে।

এরপর বলা হয়েছে—'আমার কার্যসাধন তো আল্লাহ্‌র সাহায্যে।' একথার অর্থ—আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ্‌র সমর্থনধন্য না হলে আমার এই শুভ প্রচেষ্টা কখনো সাফল্য লাভ করবে না। এখানে 'তওফীক' শব্দটির অর্থ অভীষ্ট লাভের উপকরণসমূহ, উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে যথাসামর্থ্য লাভ।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে—'আমি তাঁর উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।' একথার অর্থ আমি জানি আল্লাহ্ই সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই মুখাপেক্ষী। সেকারণেই আমি তো কেবল তাঁর উপরেই নির্ভর করি এবং তাঁর অভিমুখী হয়েই জীবন কাটাতে চাই। ভালো ও মন্দ সব কিছুই সোপর্দ করি তাঁর প্রতি। এখানে 'ইলাইহি উনীব্' কথাটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে—পৃথিবীর জীবন শেষে আমি তো তাঁর নিকটেই ফিরে যাবো। 'ইনাবাত্' শব্দটির অর্থ প্রতিটি কর্মে আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রতীতি ও সামর্থ্য কামনা করা। সকল কামনা বাসনা তাঁরই প্রতি নিবেদিত করা। মূল কথা এই যে, হজরত শোয়াইব তাঁর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, তোমাদের পরোয়া আমি করি না। তোমাদের বা অন্য কারো মুখাপেক্ষী আমি নই। আমি তো আল্লাহ্তে সমর্পিত। আমি তো তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তনকামী। হজরত শোয়াইবের এই কথাটির মধ্যে ফুটে উঠেছে তওহীদের এক অমোঘ দৃঢ়তা। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য তাঁর এই কথাটি একটি তির্যক তিরস্কার।

পরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার সঙ্গে মতানৈক্য যেনো কিছুতেই তোমাদেরকে এমন আচরণ না করায় যাতে তোমাদের উপর অনুরূপ আপতিত হবে যা আপতিত হয়েছিলো নুহের সম্প্রদায়ের উপর, হুদের সম্প্রদায়ের উপর কিংবা সালেহের সম্প্রদায়ের উপর।' একথার অর্থ, হজরত শোয়াইব বললেন, হে আমার গোত্র! আমি তোমাদেরকে আহ্বান করে চলেছি সত্যের দিকে। আর তোমরা করে চলেছো ক্রমাগত বিরুদ্ধাচরণ। আমি তাই বলি, ক্ষান্ত হও এবার। সংযত হও। বিরুদ্ধাচরণকে প্রকট অথবা প্রলম্বিত করে হজরত নুহ, হজরত হুদ ও হজরত সালেহের অবাধ্য সম্প্রদায়ের মতো প্লাবন, ঝঞ্ঝাবায়ু ও ভূমিকম্পের মতো আযাব ডেকে এনো না। এখানে 'শিক্বাক্ব' শব্দটির অর্থ শত্রুতা, মতানৈক্য, জেদ।

শেষে বলা হয়েছে—'আর লুতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে দূরে নয়।' একথার অর্থ— হে মাদিয়ানবাসী। হজরত লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের ধ্বংস হওয়ার ঘটনা তো বেশী দিনের নয়। তাই তাদের পরিণতির কথাও বিশেষভাবে স্মরণ করতে পারো। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে— হে মাদিয়ানবাসী! হজরত লুতের ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকালয় তো তোমাদের জনপদ থেকে বেশী দূরে নয়। ওই বিরান স্থানটি চাক্ষুষ করেও তো তোমরা তোমাদের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করতে পারো। কথাটির মর্ম এ রকমও হওয়া সম্ভব যে— হে মাদিয়ানের লোকেরা! অপকর্ম ও অবিশ্বাসের দিক থেকে তোমাদের ও হজরত লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য তো বেশী নয়। উল্লেখ্য যে, আয়াতের শেষ শব্দটি একবচনবোধক। এর বহুবচনবোধক শব্দরূপও একই রকম। ক্বরীব-বায়ীদ, ক্বলীল, কাছীর— এই শব্দগুলোরও পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গবাচক রূপ এক।

এর পরের আয়াতে (৯০) বলা হয়েছে—'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করো ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করো; আমার প্রতিপালক

www.eelm.weebly.com

পরম দয়ালু। প্রেমময়।' একথার অর্থ—হজরত শোয়াইব বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের বিগত জীবনের অপকর্মসমূহের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমাপ্রার্থী হও। লজ্জা ও অনুতাপজর্জরিত অন্তরে প্রত্যাবর্তন করো তাঁর দিকে। একান্ত তাঁরই দিকে। নিশ্চয় আমার প্রভুপালক প্রভূত করুণাপরবশ ও প্রেমময়। এখানে উল্লেখিত 'ওয়াদুদ' শব্দটি কর্তৃ ও কর্ম উভয় কারকের অর্থ প্রকাশক। আল্লাহ্‌পাক যেমন বিশ্বাসীদেরকে ভালোবাসেন, তেমনি বিশ্বাসী বান্দারাও ভালোবাসেন তাঁকে। এভাবে তিনি কখনো প্রেমিক, কখনো প্রেমাস্পদ।

পূর্ববর্তী আয়াতে (৮৯) প্রদর্শিত হয়েছিলো আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়। আর আলোচ্য আয়াতে আলোচিত হয়েছে ক্ষমা ও ভালোবাসার কথা। হজরত শোয়াইব তাঁর বক্তব্যের শেষপাদে বলেছেন, আমার প্রভুপালক পরম দয়ার্দ্র ও প্রেমময়। এভাবে ভীতিপ্রদর্শনের পর আশার সঞ্চার করাই আল্লাহ্ ও তাঁর প্রেরিত পুরুষগণের রীতি।

সূরা হূদ ঃ আয়াত ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا
وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ز وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ۝ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ
اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ط وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ط اِنَّ رَبِّيْ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۝ وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ط سَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ لا مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ط وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّيْ
مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ۝ وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ
بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ج وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ
جٰثِمِيْنَ ۝ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ط اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ۝

❒ উহারা বলিল, 'হে শোয়াইব! তুমি যাহা বল তাহার অনেক কথা আমরা বুঝি না এবং আমরা তো আমাদিগের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখিতেছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকিলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলিতাম, আমাদিগের উপর তুমি শক্তিশালী নহ।'

www.eelm.weebly.com

❒ সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদিগের নিকট কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী?' তোমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছ। তোমরা যাহা কর আমার প্রতিপালক তাহা পরিবেষ্টন করিয়াছেন;

❒ 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেমন করিতেছ করিতে থাক; আমিও আমার কাজ করিতেছি; তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদিগের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।'

❒ যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি শোয়াইব ও তাহার সঙ্গে যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম, অতঃপর তাহারা সীমালংঘন করিয়াছিল মহা নাদ তাহাদিগকে আঘাত করিল, ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল;

❒ যেন তাহারা সেথায় কখনও বসবাস করে নাই। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই ছিল মাদিয়ানবাসীদিগের পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হইয়াছিল সামূদ সম্প্রদায়।

প্রথমে বলা হয়েছে—'তারা বললো, হে শোয়াইব! তুমি যা বলো তার অনেক কথা আমরা বুঝি না'। একথার অর্থ— মাদিয়ানবাসীরা বললো, হে শোয়াইব! তুমি কি বলো না বলো আমরা তো বুঝতেই পারি না। আমাদেরকে পিতৃ-পুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে হবে কেনো, মাপ ও ওজনই বা ঠিক করতে হবে কেনো? তোমার যুক্তি প্রমাণ শুনেই বা আমাদের কী লাভ? উল্লেখ্য যে, মাদিয়ানবাসীদের মেধা ও চেতনা শক্তি ছিলো অস্বচ্ছ। তাই তারা নবীর হৃদয়স্পর্শী বচন সম্পর্কে এ রকম বলতে পেরেছিলো। অথবা হজরত শোয়াইবের পৌত্তলিকতাবিরোধী ও সততপূর্ণ কথার প্রতি ছিলো তাদের আন্তরিক ঘৃণা। খোলা মন নিয়ে তারা তাঁর কথা শুনতো না। তাই অধিকাংশ উপদেশই তাদের বুঝে আসতো না।

আমি বলি, প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্তায়ালা মাদিয়ানবাসীদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছিলেন। তাই তারা হজরত শোয়াইবের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো না। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, মানুষের হৃদয় আল্লাহ্তায়ালার আনুরূপ্যহীন করতলে। তিনি যে দিকে ইচ্ছা তাদের হৃদয়কে ফিরিয়ে দেন।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখছি।' একথার অর্থ— তোমার তো আত্মরক্ষার মতো শক্তিও নেই। এখানে 'দ্বয়ীফা' অর্থ হীন, প্রতাপ-প্রতিপত্তিহীন, ঘৃণ্য। বাগবী বলেছেন, দৃষ্টিশক্তিহীন। অর্থাৎ হজরত শোয়াইব ছিলেন দৃষ্টিশক্তিহীন। আরবী প্রচলিত অর্থানুসারে এ রকমই বলতে হয়। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে 'ফীনা' (আমাদের মধ্যে)। সুতরাং হজরত শোয়াইব অন্ধ ছিলেন, এরকম বলা যায় না। তাই 'দ্বয়ীফা' অর্থ হবে এখানে অদূরদর্শী অথবা দুর্বল।

www.eelm.weebly.com

দ্রষ্টব্যঃ মোতাজিলারা বলে অন্ধ ব্যক্তি যেহেতু সাক্ষ্যদাতা ও বিচারক হতে পারে না, তাই তারা নবুয়তের অযোগ্য। কথাটি কিন্তু ঠিক নয়। কারণ সাক্ষ্যদান ও বিচারকার্যের জন্য চক্ষুষ্মান হওয়া জরুরী। কিন্তু নবুয়ত ও রেসালতের দায়িত্বটি সে রকম নয়। হজরত ইয়াকুব ছিলেন সত্য পয়গম্বর। পুত্রশোকে কাঁদতে কাঁদতে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও তিনি নবীই ছিলেন। কোরআন মজীদে ঘটনাটির উল্লেখও রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম।' বাগবী লিখেছেন, হজরত শোয়াইবের নিকটজনেরা ছিলো প্রতাপশালী। তারাই তাঁকে নিরাপদ রাখতো। বায়যাবী বলেছেন, মাদিয়ানবাসীরা বলতো, হে শোয়াইব! তোমার স্বজনেরা আমাদের স্ব-ধর্মভূত। তারা আমাদের সম্মানের পাত্র। যদি তা না হতো, তবে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তারা প্রতাপশালী ছিলো না। কারণ স্বজনবর্গ বোঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'রাহাত'। রাহাত বলে তিন থেকে দশজন পুরুষের সমষ্টিকে। আর এই নগণ্যসংখ্যক লোককে প্রতাপশালী বলা যায় না।

আমি বলি, প্রথমোক্ত বক্তব্যটির সমর্থনে 'তিস্‌য়াতু রাহাত' (নয় রাহাত) আয়াতটি ধর্তব্য। জুহুরী লিখেছেন, দশের কম লোকের দলকে বলে রাহাত। কেউ কেউ বলছেন, চল্লিশ জনের দলকে বলা হয় রাহাত। নেহায়া রচয়িতা লিখেছেন, রাহাত বলা হয় নারীবর্জিত দশজনের নিম্নসংখ্যার দলকে। শব্দটির এক বচন নেই। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে বাগবীর বক্তব্য কামুস রচয়িতার বক্তব্য সদৃশ।

এরপর বলা হয়েছে—'আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও।' একথার অর্থ—তারা বললো, হে শোয়াইব! তুমি এমতো ক্ষমতা রাখো না, যাতে করে আমাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারো। উল্লেখ্য যে, মূর্খেরা যথার্থ যুক্তি প্রমাণের মোকাবিলা না করতে পেরে ক্ষিপ্ত হয়। আশ্রয় নেয় গালাগালির। মাদিয়ানবাসীদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিলো। হজরত শোয়াইবের সুললিত বাণী ও প্রমাণসমূহের মুখোমুখি দাঁড়াতে না পেরে তারা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত অসংলগ্ন ও অসমীচীন কথাগুলো বলেছিলো। কিন্তু হজরত শোয়াইবের বংশ মর্যাদা ছিলো সর্বোচ্চ। বংশমর্যাদার প্রতি সমীহবোধের কারণে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীরা তাঁকে অপদস্থ করতে পারতো না।

পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী? তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছো।' একথার অর্থ— হজরত শোয়াইব বললেন, হে আমার নির্বোধ সম্প্রদায়! তোমরা আমার বংশের প্রভাবে আমাকে হত্যা করছো

www.eelm.weebly.com

না। অথচ আল্লাহ্‌পাক নবুয়তের মতো যে অমূল্য সম্পদ আমাকে দান করেছেন, তার মর্যাদার প্রতি তোমাদের ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। তোমরা তো বোধ ও বুদ্ধিহীন, সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র স্মরণবিচ্যুত। তোমাদের দ্বিধা-সংকোচ, ভয়-ডর বলে কিছু নেই। নয়তো মহাপরাক্রান্ত ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্‌র নবীর প্রতি তোমরা এভাবে অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পারতে না। কী মনে করো তোমরা? আমার স্বজনবর্গ কি মহাবিশ্বের একক অধীশ্বর আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী? এখানে 'আরাহত্বী' শব্দের 'হামযা' অক্ষরটির কারণে উদ্ধৃত বাক্যটি হয়েছে একটা অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (ইসতেফ্‌হামে ইনকারী)। এ ধরনের বাক্য তিরস্কারপ্রকাশক। 'ইত্তিখাজ্‌তুমুহু ওয়ারাআকুম জিহ্‌রিয়্যা' কথাটির শাব্দিক অর্থ তাকে তোমরা তোমাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছো। আর মর্মার্থ হচ্ছে— তাঁকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছো। আয়াতের অনুবাদে এ কথাই লেখা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা যা করো আমার প্রতিপালক তা পরিবেষ্টন করে আছেন।' এ কথার অর্থ— তোমরা ও তোমাদের সকল কার্যকলাপ রয়েছে আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও ক্ষমতার পরিবেষ্টনীতে। যথাসময়ে তিনি এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

এর পরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেমন করছো, করতে থাকো; আমিও আমার কাজ করছি; তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী।' এখানে 'মাকানাতিকুম' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে—স্বীয় শত্রুতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। 'মান' শব্দটি এখানে প্রশ্নবোধক (ইসতিফামিয়া)। অর্থাৎ কার উপর শাস্তি আসবে? অথবা সংযোজক (মাওসুলা)। অর্থাৎ যার উপর শাস্তি আসবে। অর্থাৎ দু'ভাবেই কথাটির অর্থ করা যায়। এখানে 'মানহুয়া কাজিব' (কে মিথ্যাবাদী) কথাটি সম্পৃক্ত হবে 'মাঁই ইয়াতী' (কার উপর) কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়াবে এরকম—অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার উপর আপতিত হবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি? আমার উপর, না তোমাদের উপর? একথাও অচিরে জানতে পারবে যে, মিথ্যাবাদী কে? আমি, না তোমরা?

শেষে বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।' এখানে 'রক্বীব্' শব্দটির অর্থ 'রাক্বেব্' (প্রতীক্ষাকারী), অথবা 'মুরাক্বিব' (যৌথভাবে প্রতীক্ষাকারী)।

এর পরের আয়াতে (৯৪) বলা হয়েছে—'যখন আমার নির্দেশ এলো, তখন আমি শোয়াইব ও তার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিলো তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম।' উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে বর্ণিত আদ্ জাতির কাহিনীতে ও আলোচ্য আয়াতে শাস্তির কথা পূর্বে আলোচিত হয়নি। তাই সেখানে ও এখানে বাক্যের সূচনা হয়েছে 'ওয়াও' সহযোগে। আর হজরত লুত ও হজরত সালেহের সম্প্রদায়ের কাহিনীতে শাস্তি দানের পূর্বেই শাস্তির অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। তাই এ দু'টো স্থানে বাক্য সূচিত হয়েছে 'ফা' সহযোগে। সম্ভবতঃ 'ফা' দ্বারা এ দু'টো ক্ষেত্রে পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে—'অতঃপর যারা সীমালংঘন করেছিলো, মহা নাদ তাদেরকে আঘাত করলো, ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে অধোমুখো অবস্থায় শেষ হয়ে গেলো।' উল্লেখ্য যে, এক বিকট আওয়াজের মাধ্যমে শেষ করে দেয়া হয়েছিলো হজরত শোয়াইবের অবাধ্য সম্প্রদায়কে। ওই বিকট হুংকার দিয়েছিলেন হজরত জিবরাইল। অথবা ওই ভয়ংকর আওয়াজটি নির্গত হয়েছিলো আকাশ থেকে। ওই আওয়াজ শুনে বুক ফেটে মরে গিয়েছিলো কাফেরেরা এবং মুখ থুবড়ে মরে পড়েছিলো নিজ নিজ গৃহে। এখানে 'জাছুম' অর্থ মাটির সঙ্গে লেপ্টে থাকা।

এর পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে—'যেনো তারা সেথায় কখনো বসবাস করেনি।' একথার অর্থ— ওই বিরান জনপদটি দেখে মনে হচ্ছিলো সেখানে ইতোপূর্বে কোনো জনবসতি ছিলোই না।

শেষে বলা হয়েছে— জেনে রাখো! ধ্বংসই ছিলো মাদিয়ানবাসীদের পরিণাম। যেভাবে ধ্বংস হয়েছিলো ছামুদ সম্প্রদায়। উল্লেখ্য যে, ছামুদ সম্প্রদায়কেও এ রকম বিকট আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। তাই আলোচ্য বাক্যে মাদিয়ানবাসীদের ধ্বংসপর্বকে ছামুদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসপর্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পার্থক্য ছিলো এতটুকু— ছামুদ সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিলো ভূগর্ভ থেকে উত্থিত ভয়াবহ আওয়াজের মাধ্যমে। আর মাদিয়ানের অধিবাসী-দেরকে মেরে ফেলা হয়েছিলো আকাশজাত ভীষণ আওয়াজ দ্বারা।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৯৬, ৯৭, ৯৮

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ○ يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ؕ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ

❑ আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিলাম

❑ ফিরাউন ও তাহার প্রধানদিগের নিকট। কিন্তু উহারা ফিরাউনের কার্যকলাপের অনুসরণ করিত এবং ফিরাউনের কার্য-কলাপ সাধু ছিল না।

❑ সে কিয়ামতের দিনে তাহার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকিবে এবং সে উহাদিগকে লইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। যেখানে তাহারা প্রবেশ করিবে তাহা কত নিকৃষ্ট স্থান!

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি মুসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ও স্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউন ও তার সভাসদগণের নিকটে। ওই সভাসদেরা ছিলো ফেরাউনের একনিষ্ঠ অনুসারী। আর ফেরাউনের কার্যকলাপ

www.eelm.weebly.com

উত্তম ছিলো না। এখানে উল্লেখিত 'আয়াত' অর্থ তওরাত শরীফের আয়াত নয়। কারণ তওরাত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছিলো ফেরাউন ও তার অনুসারীদের সলিল সমাধিলাভের পর। সুতরাং এখানে আয়াত শব্দটির অর্থ হবে হজরত মুসার মোজেজাসমূহ বা নিদর্শনাবলী। 'সুলত্বানিম্ মুবীন' কথাটির অর্থ এখানে হজরত মুসার অলৌকিক যষ্টি। ওই যষ্টির অলৌকিকত্বের কারণেই ফেরাউন ও তার যাদুকরের দল তাঁর নিকট পরাস্ত হয়েছিলো। তাই পৃথকভাবে ওই অলৌকিক লাঠিটিকে 'সুলত্বানিম্ মুবীন' অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে। এভাবে আয়াতে 'সুলত্বানিম্ মুবীন' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত মুসার সকল অলৌকিক নিদর্শনসমূহকে। ওই নিদর্শনগুলোই ছিলো হজরত মুসার রেসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ফেরাউন ছিলো আল্লাহ্দ্রোহী, সীমালংঘনকারী ও অত্যাচারী, যা সম্পূর্ণতই মানব-কল্যাণের অননুকূল। তাই এখানে বলা হয়েছে 'ফেরাউনের কার্যকলাপ সাধু ছিলো না' (ওয়ামা আমরু ফিরআ'উনা বিরশীদ)। সকল প্রশংসনীয় বিষয় হচ্ছে 'রুশ্দ' আর সকল নিন্দনীয় বিষয় 'গই'।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে ফেরাউন ও তার সভাসদগণের নির্বুদ্ধিতার বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে। ফেরাউন নিজেকে খোদা বলে দাবী করতো। আর তার পারিষদবর্গও নির্বিবাদে তা মেনে নিতো। নিঃসন্দেহে এটা ছিলো ঘৃণ্য অংশীবাদিতা ও মিথ্যাচার। অপরদিকে হজরত মুসা ছিলেন সত্য পয়গম্বর। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত অনেক নিদর্শনাবলী দ্বারা শোভিত ও সাহায্যমণ্ডিত। তাঁর সকল কর্মকাণ্ডই ছিলো মানব কল্যাণে নিবেদিত। অথচ তাঁর শুভ-আহ্বানকে বার বার প্রত্যাখ্যান করেছিলো তারা। তাই অত্যন্ত মন্দ পরিণতি ছিলো তাদের জন্য অবধারিত। সেকথাই বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (৯৮)।

বলা হয়েছে— 'সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং সে তাদেরকে নিয়ে দোজখে প্রবেশ করবে। যেখানে তারা প্রবেশ করবে তা কত নিকৃষ্ট স্থান।' একথার অর্থ— পৃথিবীতে পথভ্রষ্টদের নেতা হিসেবে ফেরাউন যেমন সর্বাগ্রে ছিলো, আখেরাতেও থাকবে তেমনি। বিষয়টি সুনিশ্চিত। অর্থাৎ যেনো তা ঘটেই গিয়েছে। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালের শব্দরূপ (আওরাদাহুম)। 'ওয়ারূদ' অর্থ গহ্বরে অবতরণ করা। দোজখে প্রবিষ্ট হওয়ার বিষয়টিকে এখানে জলাশয়ে অবতরণ করা রূপে বিবৃত করা হয়েছে। যেনো দোজখ একটি জলময় গহ্বর বা জলাশয়। ফেরাউন তার পশ্চাদ্ভাগে অনুসারী কাফেরদেরকে নিয়ে পিপাসা নিবারণের জন্য জন্তুদের মতো সেখানে অবতরণ করবে।

জলাশয়ে অবতরণের উদ্দেশ্য থাকে পিপাসা-নিবৃত্তি। কিন্তু সেখানে থাকবে আগুন আর আগুন। ওই আগুনেই দগ্ধীভূত হতে থাকবে ফেরাউনেরা। স্থানটি অবশ্যই অতি নিকৃষ্ট। তাই শেষে বলা হয়েছে— যেখানে তারা প্রবেশ করবে তা কতো নিকৃষ্ট স্থান।

www.eelm.weebly.com

আগের আয়াতের 'ফেরাউনের কার্যকলাপ সাধু ছিলো না'— কথাটি ছিলো একটি দাবী। আর আলোচ্য আয়াতটি তার প্রমাণ। কারণ দোজখ যাত্রায় যে পুরোভাগে থাকবে, তার কর্মকাণ্ড যে ভুল সে কথা প্রমাণ করা জরুরী। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, যা রশীদ (সাধু) তার পরিণাম শুভ। কিন্তু ফেরাউনের কার্যকলাপ সাধু ছিলো না। একথা প্রথমে (৯৭ আয়াতে) বলে নিয়ে কথাটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২

وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ۝ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ۝ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِىْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ۝ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ۝

❒ এই দুনিয়ায় উহাদিগকে করা হইয়াছিল অভিশাপগ্রস্ত এবং অভিশাপগ্রস্ত হইবে উহারা কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার যাহা উহারা লাভ করিবে!

❒ ইহা জনপদসমূহের কতক সংবাদ যাহা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি; উহাদিগের মধ্যে কতক এখনও বিদ্যমান এবং কতক নির্মূল হইয়াছে।

❒ আমি উহাদিগের প্রতি জুলুম করি নাই কিন্তু উহারাই নিজদিগের প্রতি জুলুম করিয়াছিল। যখন তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিল তখন উহাদিগের ইলাহ্সমূহ আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগের ইবাদত উহারা করিত তাহারা, উহাদিগের কোন কাজে আসিল না। ধ্বংস ব্যতীত উহাদিগের অন্য কিছু বৃদ্ধি পাইল না।

❒ এইরূপই তোমার প্রতিপালকের আঘাত! তিনি আঘাত করেন জনপদসমূহকে যখন উহারা সীমালংঘন করিয়া থাকে। তাঁহার আঘাত মর্মন্তুদ, কঠিন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরাউন ও তার অনুসারীরা পৃথিবীতে যেমন অভিশপ্ত ছিলো, তেমনি অভিসম্পাতগ্রস্ত হবে আখেরাতে। যে প্রতিফল তারা লাভ করবে, তা কতোই না নিকৃষ্ট। এখানে 'রিফদ্' অর্থ সাহায্য। 'মারফুদ'

www.eelm.weebly.com

অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত। অথবা 'রিফ্দ্' অর্থ দান। আর 'মারফুদ' অর্থ দান প্রাপ্ত (পুরস্কার বা প্রতিফলন প্রাপ্ত)। কামুস গ্রন্থে লেখা হয়েছে 'ইরফাদ' অর্থ সাহায্য ও দান।

পরের আয়াতে (১০০) বলা হয়েছে—'এই জনপদসমূহের কতক সংবাদ আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, তাদের মধ্যে কতক এখনও বিদ্যমান এবং কতক নির্মূল হয়েছে।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল মোহাম্মদ! এতক্ষণ ধরে আমি আপনাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদগুলোর কিছু কিছু বিবরণ শোনালাম। ওই জনপদগুলোর কোনো কোনোটি এখনও পরিদৃশ্যমান। আর কোনো কোনোটি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'ক্বইমুন্' অর্থ যার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। আর 'হাসীদ' অর্থ চিহ্নহীন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'ক্বইমুন' অর্থ লোকালয়। আর 'হাসীদ' অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত।

এর পরের আয়াতে (১০১) বলা হয়েছে— 'আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি, কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো। যখন তোমার পালনকর্তার বিধান এলো, তখন তাদের উপাস্যসমূহ আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের উপাসনা তারা করতো তারা, তাদের কোনো কাজে এলো না। ধ্বংস ব্যতীত তাদের অন্য আর কিছুই বৃদ্ধি পেলো না।' এখানে 'আমরু রব্বিকা' কথাটির অর্থ আল্লাহ্র শাস্তি। 'তাত্বীব' অর্থ ধ্বংস।

এর পরের আয়াতে (১০২) বলা হয়েছে—'এইরূপই তোমার প্রতিপালকের আঘাত! তিনি আঘাত করেন জনপদসমূহকে যখন তারা সীমালংঘন করে থাকে। তাঁর আঘাত মর্মন্তুদ, কঠিন।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! শুনুন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপর আল্লাহ্ এভাবেই দীর্ঘ অবকাশ দানের পর তাঁর গজব নাজিল করেন। তওবার জন্য অনেক সুযোগ ও সময় দেয়া সত্ত্বেও যেহেতু তারা আল্লাহ্র রহমতের আশ্রয়ে (প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসে) ফিরে আসে না, তাই গজব তো তাদের জন্য অনিবার্য হবেই। আর আল্লাহ্র গজব অত্যন্ত মর্মন্তুদ, সুকঠিন। তাই গজবকবলিতদের পরিত্রাণ অসম্ভব। হজরত আবু মুসা থেকে বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি ও ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের দীর্ঘ সময় ধরে অবকাশ দিতেই থাকেন। শেষে এক সময় এসে পড়ে শাস্তি। তখন তাদের রেহাই পাওয়ার আর কোনো উপায়ই থাকে না। একথা বলার পর তিনি স. পাঠ করলেন, 'ওয়া কাজালিকা আখজু রব্বিকা ইজা আখাজাল কুরা ওয়া হিয়া জলিমাতুন্' (আর আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও হয় এরকমই। যখন তিনি পাকড়াও করেন কোনো জনপদ যে জনপদবাসীরা হয় অত্যাচারী)। বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

www.eelm.weebly.com

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ○ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ○ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ○ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ○

❒ যে পরলোকের শাস্তিকে ভয় করে ইহাতে তো তাহার জন্য নিদর্শন আছে; ইহা সেইদিন যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হইবে; ইহা সেইদিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হইবে;

❒ এবং আমি নির্দিষ্ট কিছু কালের জন্য উহা স্থগিত রাখিব।

❒ যখন সেদিন আসিবে তখন আল্লাহের অনুমতি ব্যতীত কেহ বাক্যালাপ করিতে পারিবে না; উহাদিগের মধ্যে অনেকে হইবে হতভাগ্য ও অনেকে ভাগ্যবান।

❒ অতঃপর যাহারা হতভাগ্য তাহারা থাকিবে অগ্নিতে এবং সেথায় তাহাদিগের জন্য থাকিবে চীৎকার ও আর্তনাদ,

---

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যে পরলোকের শাস্তিকে ভয় করে এতে তো তার জন্য নিদর্শন আছে।' একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিনাশ সাধনের যে ইতি কাহিনীগুলো এতক্ষণ ধরে আলোচনা করা হলো, সেগুলোর মধ্যে আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। শিক্ষাটি এ রকম— এতে করে তাদের জন্য পারলৌকিক জীবন হয়ে পড়বে অধিকতর গুরুত্ববহ। তারা বুঝতে পারবে, অবিশ্বাসীদের এ সকল শাস্তি আখেরাতের শাস্তির প্রকৃত উদাহরণ বা নিদর্শন। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, ইতিবৃত্তগুলো শুনে ইমানদারেরা হয়ে যাবে অধিকতর সতর্ক। তখন আল্লাহ্‌র ভয়ে তারা অবাধ্যদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে। ভীত হবে এই ভেবে যে, আল্লাহ্‌পাক সর্বশক্তিধর ও ইচ্ছাময়। যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিতে পারেন এবং যাকে খুশী করতে পারেন অনুগ্রহভাজন। পক্ষান্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মনোভাব এর বিপরীত। তাদের না আছে জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে গভীরতর ভাবনা, না আছে দূরদৃষ্টি। তারা এ সকল ঘটনাকে মনে করে থাকে দৈবদুর্বিপাক অথবা আপনাআপনি সংঘটিত কোনো বিপর্যয়।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা সেই দিন, যেদিন সকল মানুষকে একত্র করা হবে; এটা সেই দিন, যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হবে।' একথার অর্থ— আখেরাতে সকল মানুষকে একত্র করে উপস্থিত করা হবে হাশরের ময়দানে। শুরু হবে পাপ-পুণ্যের বিচার। দেয়া হবে শাস্তি অথবা স্বস্তি।

পরের আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে— 'এবং আমি নির্দিষ্ট কিছু কালের জন্য তা স্থগিত রাখবো।' (ওয়ামা নুওয়াখ্‌খিরুহু ইল্লা লি আজ্বালিম্ মা'দূদ্)। এখানে 'আজ্বাল' অর্থ জীবনের সম্পূর্ণ পরিসর। অর্থাৎ আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাস্তি বিলম্বিত করি। পৃথিবীর যে আয়ু আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করেছি, সেই আয়ুষ্কালের মধ্যে গজব অবতীর্ণ করি না।

এর পরের আয়াতে (১০৫) বলা হয়েছে— 'যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কেউ বাক্যালাপ করতে পারবে না।' একথার অর্থ— ওই মহা বিচারের দিবসে বিস্ময়ে ও ভয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়বে সকলে। কেউ কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না। এমন কোনো বাক্যও উচ্চারণ করতে পারবে না, যাতে করে কারো কিছু উপকার হয়। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'সে দিন কেউ কোনো কথাই বলতে পারবে না; পরম করুণাময়ের অনুমতি ব্যতিরেকে।'

'ইয়াওমা ইয়াতি' অর্থ প্রতিফল দিবস। অর্থাৎ পুরস্কার ও তিরস্কার দিবস। অথবা সেদিন হবে আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ আবির্ভাবের দিন। যেমন এক আয়াতে বিঘোষিত হয়েছে— 'তারা কি আল্লাহ্‌র আগমনের প্রতীক্ষা করছে? বস্তুতঃ এসেই গিয়েছেন তোমাদের মহান প্রতিপালক।'

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের মধ্যে অনেকে হবে হতভাগ্য ও অনেকে ভাগ্যবান।' একথার অর্থ— অদৃষ্টলিপিতে পূর্বাহ্নে যাদেরকে হতভাগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তারাই সেদিন হবে হতভাগ্য। আর যাদের অদৃষ্টলিপিতে পূর্বাহ্নে সৌভাগ্যশালী বলে নির্ধারণ করা হয়েছে, তারাই সেদিন হবে ভাগ্যবান।

হজরত আলী বলেছেন, আমি একদিন এক জানাযার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে উপস্থিত হতেই দেখলাম, আমার দিকেই এগিয়ে আসছেন প্রাণপ্রিয় রসুল। তাঁর হাতে ছিলো একটি ছড়ি। আমার কাছাকাছি এসে মাটিতে উপবেশন করলেন তিনি। তারপর ছড়িটি মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, এমন কোনো জনমানব নেই যার জান্নাত অথবা জাহান্নাম পূর্বনির্ধারিত নয়। একজন বললেন, হে প্রিয়তম রসুল! যদি তাই হয়, তবে আমরা তকদিরের উপর নির্ভর করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবো না কেনো? তিনি স. বললেন, ব্যাপারটি সে রকম নয়। কাজ করতে থাকো। তকদির অনুসারেই সময় এগিয়ে আসবে। যারা

www.eelm.weebly.com

হতভাগ্য তারা উদ্দীপিত হবে দুর্ভাগ্যের দিকে। আর যারা সৌভাগ্যশীল তারা সামর্থ্য লাভ করবে পুণ্যকর্মের। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন— 'অনন্তর যারা দান করে, সংযত হয় এবং এ সকল বিষয়কে সত্য জ্ঞান করে; ফলতঃ সুনিশ্চিত যে, আমি তার জন্য সহজতর করবো তার সরল পথকে।' বাগবী, বোখারী, মুসলিম।

এর পরের আয়াতে (১০৬) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যারা হতভাগ্য তারা থাকবে অগ্নিতে এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উচ্চস্বরে চিৎকারকে বলে জাফীর এবং অনুচ্চস্বরের আর্তনাদকে বলে শাহীক্ব। জুহাক ও মুকাতিল বলেছেন, গাধার প্রারম্ভিক বিকট চিৎকারকে বলে জাফীর, আর শেষের ক্লান্ত অনুচ্চ স্বরকে বলে শাহীক্ব। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, গর্দভের বক্ষ ও উদর থেকে উচ্চারিত আর্তচিৎকারই শাহীক্ব। আবুল আলিয়া বলেছেন, কণ্ঠমিশ্রিত ধ্বনি হচ্ছে জাফীর, আর বক্ষ-উৎসারিত কেঁপে কেঁপে উঠা আওয়াজকে বলে শাহীক্ব। আল্লামা বায়যাবী বলেছেন, প্রশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত বহির্মুখী ধ্বনির নাম জাফীর। আর নিঃশ্বাসের সঙ্গে উত্থিত অন্তর্মুখী ধ্বনির নাম শাহীক্ব। তবে গর্দভের প্রাথমিক বীভৎস চিৎকারের নাম জাফীর, আর শেষ দিকের নিস্তেজ আওয়াজের নাম শাহীক্ব — এই অর্থটিই বহুল ব্যবহৃত। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, ধাক্কা দিয়ে দিয়ে প্রশ্বাস উদ্‌গীরণের সঙ্গে 'আহ্' 'উহ্' ধ্বনিকে বলে জাফীর।

সূরা হূদ ঃ আয়াত ১০৭

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۗ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ○

❒ সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

এখানে 'যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে'— উক্তিটি সম্পর্কে জুহাক বলেছেন, আকাশ ও পৃথিবী বলে এখানে বেহেশতের আকাশ ও মাটিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সেখানকার উর্ধ্বদেশ হচ্ছে আকাশ এবং পদতলের ভূমি হচ্ছে পৃথিবী। এটা নিশ্চিত যে, হাশরের দিবসে সকল মানুষকে সমবেত করা হবে একটি স্থানে। ওই স্থানের উপরের দিক হচ্ছে সেখানকার আকাশ এবং ওই স্থানটিই হচ্ছে সেখানকার পৃথিবী। ভাষা বিশারদগণ বলেছেন, আরবীভাষীরা

www.eelm.weebly.com

আকাশ ও পৃথিবীর সঙ্গে যখনই কোনো কর্ম সম্পন্ন করা না করার শর্ত সংযুক্ত করে, তখনই তারা এর মর্মার্থ গ্রহণ করে— চিরস্থায়ী।

'যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন'— কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, দোজখবাসীরা দোজখে অবস্থান করবে একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য। তারপর তারা নিষ্কৃতি পাবে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসেও এই ধারণাটির পোষকতা বিদ্যমান। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এমন সময়ের আগমন অবশ্যই ঘটবে, যখন দেখা যাবে দোজখে আর কেউ নেই। শতাব্দির পর শতাব্দি অতিক্রান্ত হওয়ার পর ওই সময়টির আগমন ঘটবে। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনাও অনুরূপ। সুফী দার্শনিক শায়েখ মুহিউদ্দিন আরাবীও এই অভিমতের প্রবক্তা। কিন্তু অভিমতটি কোরআন ও সুন্নাহ্র অননুকূল। কোরআন মজীদে স্পষ্ট বলা হয়েছে 'সেখানে তারা স্থায়ী হবে।' রসুল স. বলেছেন, যদি নরকবাসীদেরকে বলা হয় এখানকার অগণিত পাথরের সংখ্যা যত, ততদিন তোমরা থাকবে নরকে, তবে তারা হবে মহা আনন্দিত। আর স্বর্গবাসীদেরকে যদি বলা হয়, এখানকার এই বিপুল পরিমাণ প্রস্তরগুলোর সংখ্যা যত, তোমাদের স্বর্গবাসের মেয়াদ হবে তত দিবস, তবে তারা হবে ভয়ানক অপ্রসন্ন। কিন্তু এ রকম হবে না। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিবরানী ও আবু নাঈম। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে মারদুবিয়াও এ রকম বর্ণনা এনেছেন। আল্লামা তিবরানী তাঁর আল কবির গ্রন্থেও এ রকম লিখেছেন। হজরত মুয়াজ বিন জাবাল থেকে হাকেমও এ রকম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদিসটি বিশুদ্ধ। হজরত মুয়াজ বিন জাবাল বলেছেন, রসুল স. আমাকে ইয়েমেনের শাসক হিসেবে প্রেরণ করলেন। সেখানে এক জনসমাবেশে আমি বললাম, হে জনতা! আমি আল্লাহ্র রসুল কর্তৃক প্রেরিত দূত। তিনি আমাকে একথা জানানোর জন্য পাঠিয়েছেন যে, আল্লাহ্পাকের দিকেই ফিরে যেতে হবে সকলকে। গন্তব্যস্থান হবে জান্নাত, অথবা জাহান্নাম। দু'টোর যে কোনো একটিতে আমাদের বসবাস হবে চিরস্থায়ী। মৃত্যু নেই সেখানে। নেই স্থানান্তরের কোনো সুযোগ। সেখানে আমরা হবো অক্ষয় ও অমর।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বলেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে ও জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জাহান্নামবাসী তোমাদের আর মৃত্যু নেই। হে জান্নাতবাসী তোমরাও অমর। তোমাদের সকলের বসবাস চিরস্থায়ী। তিনি স. বলেছেন, তখন বলা হবে, হে জান্নাতী জনতা! তোমরা এখন মৃত্যুহীন ও চিরস্থায়ী। আর হে জাহান্নামী জনতা! তোমরাও মৃত্যু বিবর্জিত ও চিরন্তন। অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তখন মৃত্যুকে জবাই করা হবে। বলা হবে, এবার মৃত্যুর

www.eelm.weebly.com

মৃত্যু ঘটলো। আরো ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীবৃন্দ! মৃত্যু আর নেই। হজরত ইবনে ওমর ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে,'এমন সময়ের আগমন অবশ্যই ঘটবে, যখন দেখা যাবে দোজখে আর কেউ নেই।' হাদিসটিকে হাকেম ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হাদিসটি যদি বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়, তবে তার ব্যাখ্যা হবে এরকম, এমন সময় আসবে যখন দেখা যাবে, মহাপাপের কারণে যে সকল ইমানদার দোজখবাসী হয়েছিলো, তারা আর কেউ সেখানে নেই। সেখানে কেবল থাকবে কাফেরেরা।

'সেখানে তারা স্থায়ী হবে' একথাটির ব্যাখ্যা ব্যাপদেশে আমি বলি, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে বেদাতী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে। অবশ্য অধিকাংশ ভাষ্যকারগণ বলেছেন, এখানে 'স্থায়ী' কথাটির অর্থ হবে 'সীমাহীন সময়'। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, কাফেরকুল জাহান্নামে অবস্থান করবে অনন্তকাল। যদি তাই হয়, তবে এই আয়াত ও আয়াতে উল্লেখিত ইস্‌তিস্‌না (ব্যতিক্রম) দু'টির মর্ম কি হবে, সে সম্পর্কে আলেমগণ মতপ্রভেদ করেছেন। আমার মতে সর্বোত্তম মর্মার্থটি হবে এরকম, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জাহান্নাম বাস হবে চিরস্থায়ী। আর তারা সেখানে স্থানান্তরিত হবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড থেকে ফুটন্ত পানিতে। অর্থাৎ 'জাহীম' থেকে 'হামীমে'। আবার 'হামীম থেকে 'জাহীমে'। ওই দু'টো স্থানের যে কোনো একটিতে তারা স্থায়ীভাবে আবদ্ধ থাকবে না। 'তারা চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে হামীম আর জাহীমের চতুষ্পার্শ্বে'— এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বাগবী লিখেছেন, কাফেরেরা নরকের হামীম ও জাহীম নামক স্থানে চক্রাকারে আবর্তিত হবে। লেলিহান আগুনের প্রাণান্তকর দহনে পিপাসিত নরকবাসীরা যখন পানি প্রার্থনা করবে, তখন তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে অত্যুষ্ণ পানি যা হবে তেল ও তরল তাম্র সদৃশ।

এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা আবর্তিত হতে থাকবে কল্পনাতীত উষ্ণতা ও ধারণাতীত শৈত্যের মধ্যে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, জাহান্নাম তার পালনকর্তার নিকটে আবেদন জানিয়েছিলো, হে পরোয়ারদিগার! সুতীব্র উত্তপ্ততার কারণে আমার এক অংশ অপর অংশকে বিলোপ করে দিচ্ছে। ওই প্রার্থনার কারণে আল্লাহ্‌পাক তাকে বৎসরে দু'বার নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছেন। একবার গ্রীষ্মকালে। আরেকবার শীতকালে। তাই গ্রীষ্মকালে অনুভূত হয় প্রখর উত্তাপ। আর শীতকালে অনুভূত হয় প্রচণ্ড শৈত্য। বায়যার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ থেকে। আর তিনি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে।

www.eelm.weebly.com

কতিপয় বিচক্ষণ ভাষ্যকার মনে করেন 'ফা আম্মাল্লাজীনা শাকু' (অতঃপর যারা হতভাগ্য) —এই আয়াতের উদ্দেশ্য গোনাহ্গার মুমিনেরা। পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে নরকে। প্রায়শ্চিত্তের মেয়াদ শেষে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কিছু সংখ্যক পাপী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হলেও এক সময় নিষ্কৃতি লাভ করবে। তারপর প্রবেশ করবে জান্নাতে। জান্নাতবাসীরা তাদেরকে বলবে তোমরা তো ছিলে জাহান্নামী। বোখারী। হজরত ইমরান বিন হোসাইন বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার শাফায়াতে কিছু সংখ্যক লোক জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে বলা হবে জাহান্নামী। হজরত মুগীরা বিন শো'বা থেকে তিবরানীও অনুরূপ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত সংযোজনটি এরকম—ওই লোকগুলো তাদের জাহান্নামী নাম মুছে দেয়ার জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে আবেদন জানাবে। আল্লাহ্পাক তখন তাদের জাহান্নামী নাম বিলুপ্ত করে দিবেন।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের কিছু লোক জাহান্নামী হবে। অবশ্য আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই তারা অবস্থান করবে জাহান্নামে। কাফেরেরা তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে বলবে, তোমরা না ইমানদার। কী লাভ হলো ইমানদার হয়ে? এখন তোমরাও তো জাহান্নামী। তখন আল্লাহ্ সকল পাপী ইমানদারকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। এরপর তিনি স. তেলাওয়াত করলেন, মাঝে মাঝেই কাফেরেরা মনে করবে, 'যদি আমরা ইমানদার হতাম।' হজরত আবু মুসা থেকে তিবরানী, বায়হাকী ও ইবনে আবী হাতেমও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন তিবরানী। উল্লেখ্য যে, পাপী ইমানদারদের জাহান্নামে প্রবিষ্ট হওয়া এবং সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্পর্কিত হাদিসগুলো সর্বজনবিদিত পর্যায়ের।

বায়যাবী লিখেছেন, গোনাহ্গার মুমিনদেরকে নরক থেকে বের করা হবে— এতটুকু বলাই যথেষ্ট। বিষয়টি সেখানকার চিরস্থায়ী নিয়মের একটি ব্যতিক্রম। 'চিরস্থায়ী' কথাটি তাদের প্রতি পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। কারণ তারা শাস্তির সময়ে থাকবে দোজখে। আবার শাস্তিমুক্ত হওয়ার পর থাকবে বেহেশতে। সুতরাং তাদের দোজখ এবং বেহেশতবাস খাঁটি কাফের এবং খাঁটি ইমানদারের মতো চিরস্থায়ী নয়। একারণেই তাদেরকে পাপের কারণে হতভাগ্য এবং ইমানের কারণে সৌভাগ্যবান বলা যায়।

একটি জটিলতাঃ আখেরাতে মানুষ বিভক্ত হবে দু'টি দলে। একদল হবে সৌভাগ্যবান এবং আরেক দল হবে দুর্ভাগা। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে দল হবে আরো একটি— যারা প্রথমে দুর্ভাগা এবং পরে সৌভাগ্যশালী। বিষয়টি পরস্পর বিরোধী নয় কি ?

www.eelm.weebly.com

জটিলতার জবাবঃ পরস্পরবিরোধী দু'টি বিষয়ের সমাধান করা যেতে পারে এভাবে— ১. দু'টি পরস্পরবিরোধী বস্তুর একই সঙ্গে উপস্থিত হওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় বস্তু দু'টির যুগপৎ বিলুপ্তিও। এমতাবস্থায় একটি থাকলে অপরটি থাকবে না। যেমন— অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, হাঁ ও না। ২. দু'টি পরস্পরবিরোধী বস্তু এক হতে পারে না। কিন্তু একই সঙ্গে বস্তু দু'টো অবলুপ্ত হলে তৃতীয় একটি বস্তুর উপস্থিতি সেখানে ঘটতে পারে। যেমন একই সঙ্গে একটি বস্তু সাদা ও কালো হতে পারে না। কিন্তু একই সঙ্গে তা সবুজ বা লাল হতে পারে। ৩. এরকমও সম্ভব নয় যে, পরস্পরবিরোধী বস্তু দু'টি একই সঙ্গে অনুপস্থিত। বরং সে দু'টোর একত্র হওয়া সম্ভব। যেমন, হাশরের দিন সৌভাগ্যশালী ও হতভাগ্য কোনোটাই নয়— এরকম হওয়া সম্ভব নয়। তবে এরকম হওয়া সম্ভব যে, একই সঙ্গে সে হতভাগ্য ও সৌভাগ্যবান। এ ধরনের ব্যক্তি হতভাগ্য বলে কিছুকাল নরকে বাস করবে। আর সৌভাগ্যবান বলে এক সময় নিষ্কৃতি লাভের পর প্রবেশ করবে বেহেশ্তে।

আলোচ্য আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'মাশাআ' শব্দটির মূলরূপ হবে 'মানশাআ'। আর মানশাআর উদ্দেশ্য হবে পাপিষ্ঠ মুমিন। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, বিচার দিবসে হাশরের মাঠে উপস্থিতির সময় অথবা আলমে বারযাখে (কবরের জগতে) অবস্থানের সময়টি এর ব্যতিক্রম। হাশরের হিসাব-নিকাশ শেষে চিরদিনের জন্য নির্ধারিত হবে জান্নাত ও জাহান্নাম। আলমে বারযাখ ও হাশরের সময় চিরকালীন নয়। এই দুই অবস্থায় মানুষ জান্নাতবাসী যেমন নয়, তেমনি জাহান্নামবাসীও নয়। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ও বায়যাবীর বক্তব্যানুসারে চিরস্থায়ী কথাটি ব্যতিক্রমধর্মী। অর্থাৎ আলমে বারযাখ ও হাশরের সময় বাদে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী।

কোনো কোনো ভাষ্যকারের মতে এখানে 'ইসতিসনা' (ব্যতিক্রম) সম্পৃক্ত হবে জাফীর ও শাহীক্ব শব্দদ্বয়ের সঙ্গে। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের মনোনীত সময়সীমার মধ্যে শোনা যাবে না তাদের বিকট চিৎকার ও গাধার মতো নিস্তেজ আওয়াজ।

আল্লামা সুয়ূতি তাঁর বুদূরুস্ সাফিরাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'ইল্লা' শব্দটি 'লা' (না সূচক) অর্থে ব্যবহৃত। তাই এর অর্থ 'ব্যতিক্রমী' না হয়ে হবে 'ব্যতীত'। যেমন আরবীভাষীরা বলে থাকে— 'লাকা আলাইয়্যা আলফু দারাহিমা ইল্লাল আলফানিল ক্বাদিমানি' (আগের দুই হাজার ব্যতীত আমাকে তোমার একহাজার দিরহাম দেয়া কর্তব্য)। এর অর্থ— তুমি আমাকে সর্বসাকুল্যে তিনহাজার দিরহাম দিবে। এই ব্যাখ্যাটির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে— হাশরের মাঠের অবস্থানকাল হবে আকাশ ও ভূমণ্ডলের স্থিতিকালের সমান। আর অনন্তকালের অবস্থিতি হবে আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়ানুরূপ। ওই অবস্থিতিই চিরকালীন অবস্থিতি। তবে ভেবে দেখতে হবে,

www.eelm.weebly.com

এ রকম অসার যুক্তি-তর্ক ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আমাদের কি লাভ। আর 'ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে'— আল্লাহ্‌পাকের এই উক্তির সার্থকতাই বা কোথায়? প্রকৃত কথা হচ্ছে, বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে প্রয়োজন গভীরতর প্রজ্ঞার। এখানে প্রথমতঃ সুদীর্ঘ সময় বুঝাতে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতিকালের সময়সীমাকে উল্লেখ করা হয়েছে— যে বিষয়ে মানুষ ধারণা রাখে। অতঃপর ইঙ্গিত করা হয়েছে অনন্ত ও অগম্য সময়ের প্রতি— যাতে মানুষ অনন্তকাল সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ইল্লা' শব্দটি 'ওয়াও' বা 'এবং' অর্থে ব্যবহৃত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— লিআল্‌লা ইয়াকুনা লিন্‌নাসি আলাইকুম হুজ্জাতুন্‌ ইল্লাল্লাজীনা জলামু (তোমাদের বিরুদ্ধে যেন, কোনো প্রমাণ না থাকে, না মানবকুলের না অত্যাচারীদের)। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— যতদিন আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থান ছিলো এবং সেখানে অবস্থান করবে ততদিন। এছাড়াও ততদিন, যতদিন আল্লাহ্‌পাক ইচ্ছা করবেন। অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নামবাস হবে সার্বক্ষণিক।

প্রখ্যাত ব্যাকরণজ্ঞ ফাররা বলেছেন, এটা এমন এক ধরনের ইসতিস্‌না (ব্যতিক্রম) — যা কার্যতঃ কখনো প্রকাশ পাবে না। যেমন, কাউকে প্রহার করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বলা হলো, আল্লাহ্‌র কসম, আমি অবশ্যই তোমাকে প্রহার করবো। তবে হ্যাঁ প্রহার না করাই যদি আমার নিকটে ভালো মনে হয়, তবে তো ভালোই। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— তারা সেখানে ততকাল অবস্থান করবে, যতকাল বিদ্যমান থাকবে আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা। আর আল্লাহ্‌পাক এর বিপরীত ইচ্ছা করলেই কেবল তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক ইচ্ছে করলেই তাদেরকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন। তবে তিনি এ রকম করবেন না।

কাতাদা বলেছেন, আমাদের জ্ঞান আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ ধারণ করতে অক্ষম। কাজেই শেষ কথা হচ্ছে, আল্লাহ্‌পাকই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তাই করেন।' একথার অর্থ, হে আমার রসুল! শুনে রাখুন, আপনার প্রভুপালক তাঁর ইচ্ছা প্রকাশের বিষয়ে চিরমুক্ত ও চিরস্বাধীন। সুতরাং কেউ যেনো মনে না করে যে, নরকবাসীদেরকে চিরকাল নরকে রাখতে তিনি বাধ্য। অতএব বিশ্বাস করুন যে, তিনি ঔচিত্য ও বাধ্যতা থেকে পবিত্র। ইচ্ছে করলে তিনি তাদেরকে নিষ্কৃতিও দিতে সক্ষম (যদিও তিনি এরকম করবেন না)। এদিক থেকে ইস্‌তিস্‌না (ব্যতিক্রম) সঠিক।

www.eelm.weebly.com

وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ
الْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ۝ فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ
مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ؕ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ وَاِنَّا
لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ۝

❐ এবং যাহারা ভাগ্যবান তাহারা থাকিবে জান্নাতে সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; ইহা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

❐ সুতরাং উহারা যাহাদিগের ইবাদত করে তাহাদিগের সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত হইও না, পূর্বে উহাদিগের পিতৃপুরুষেরা যাহাদিগের ইবাদত করিত উহারা তাহাদিগের ইবাদত করে। অবশ্যই আমি উহাদিগকে উহাদিগের প্রাপ্য পুরাপুরি দিব— কিছুমাত্র কম করিব না।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী আয়াতের (১০৭) অনুরূপ। তবে এখানকার শেষ বাক্যটি সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বাক্যটি হচ্ছে 'এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার ।' এই নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত ও আল্লাহ্পাকের দর্শন (দীদার)। তবে আল্লাহ্পাকের দীদারই শ্রেষ্ঠতম। আমি বলি, এখানে নিরবচ্ছিন্ন কথাটির মর্মার্থ হবে এরকম— কখনো কখনো জান্নাতবাসী-দেরকে জান্নাত অপেক্ষাও উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করা হবে। সেই স্তর হচ্ছে দীদারের স্তর। আর ওই দীদার বর্ণনাতীত একটি বিষয়। যেমন আল্লাহ্পাক বলেন, 'উজুহুঁই ইয়ামাযিজিন্ নাদ্বিরাতুন ইলা রব্বিহা নাজিরাহ। অর্থাৎ ওই পবিত্র দর্শনে জান্নাতীরা এমনই নিমগ্ন হবেন যে, জান্নাতের অনাবিল সুখ-সম্ভোগের কথা আর তাদের মনেই পড়বে না।

হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে, জান্নাতের আনন্দে মগ্ন জান্নাতীরা সহসা দেখতে পাবে উর্ধ্বদেশ থেকে বিচ্ছুরিত আল্লাহ্র জ্যোতিসম্পাত। আনুরূপ্যবিহীন দর্শন দান করবেন আল্লাহ্ স্বয়ং। নেপথ্যের এক ঘোষক উচ্চারণ করবে 'সালামুন ক্বওলাম মির রব্বির রহীম'(মহান প্রভুপালকের পক্ষ থেকে সালাম)। তখন

www.eelm.weebly.com

জান্নাতের সুখস্মৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হবে আল্লাহ্প্রেমিকেরা। এক সময় তিনি নিজেকে আড়াল করবেন। হুঁশ ফিরে পাবে তারা। কিন্তু তাদের অন্তর ও বাহিরে জেগে থাকবে দীদারের অক্ষয় প্রভাব। ইবনে মাজা, দারাকুতনী, ইবনে আবিদ্দুনিয়া।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি রহঃ তাঁর মকতুবাত শরীফের তৃতীয় খণ্ডের ১০০ সংখ্যক মকতুবে হজরত ইয়াকুব আ. ও হজরত ইউসুফ আ. এর প্রেমবন্ধন সংক্রান্ত ব্যাখ্যাদানের পরেই লিখেছেন আল্লাহ্পাকের এক একটি নাম এক এক ব্যক্তির সূচনা স্থল (মাবদায়ে তায়ুন)। ওই নাম সমূহের জ্যোতিচ্ছটার সন্নিপাত ঘটবে জান্নাতীদের আপনাপন জান্নাতে। এভাবে স্ব স্ব মাবদায়ে তায়ুন অনুসারে প্রত্যেকের জান্নাতে প্রতিভাত হয়ে উঠবে বৃক্ষলতা, নির্ঝর, অট্টালিকা, হুর ও গেলেমান। রসুল স. বলেছেন, জান্নাতের জল সুমিষ্ট। মৃত্তিকা পবিত্র। সেখানে রয়েছে সুবিশাল প্রান্তর। ওই প্রান্তরের ফসল হবে সুবহানাল্লহ (আল্লাহ্ পবিত্র), আলহামদু লিল্লাহ্ (সমূহ প্রশংসা আল্লাহর) এবং আল্লাহু আকবর (আল্লাহ মহান)। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি রহ. বলেছেন, সেখানকার উদ্ভিদরাজি, স্রোতস্বিনী হবে স্বচ্ছ দর্পন সদৃশ। ওই স্বচ্ছতাই আল্লাহপাকের উদাহরণরহিত দর্শনের উপলক্ষ। জান্নাতীরা পুনঃ পুনঃ দর্শনধন্য হয়ে ফিরে আসবে তাদের স্বর্গের স্বচ্ছতায়। তাদের ওই সৌভাগ্য হবে নিরবচ্ছিন্ন। সুরা কিয়ামতের দর্শন সংক্রান্ত আলোচনায় এই বিষয়টির বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্র মিলন ও দর্শন হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম উপহার। ওই দর্শনের পুনঃপৌনিকতা রুদ্ধ হবে না কিছুতেই। বেহেশতের বৈভবরাজিও চিরন্তন ও অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু তা প্রতিবিম্বপ্রসূত। আর আল্লাহ্র দীদার হলো মূল— যা আল্লাহ্র সত্তাসম্ভূত। দীদারের তুলনায় অন্য সকল নেয়ামত যেনো কিছুই নয়। আল্লাহ্তায়ালা স্বাধিষ্ঠ। আর অন্য সকল কিছুর অধিষ্ঠান স্থল তিনিই। যেমন ভিক্ষার বস্ত্র দাতার, গ্রহিতার নয়। তেমনি সকল সৃষ্টি তাঁর। সৃষ্টির নয়। তাই দীদার-তুল্য আর কিছুই নেই। সুতরাং আল্লাহ্র দীদারকেই এখানে অভিহিত করা হয়েছে 'নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার' বলে।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, আল্লাহ্পাক বেহেশতবাসীদেরকে 'নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার' দানের কথা বলেছেন। কিন্তু দোজখবাসীদের সম্পর্কে এরকম বলেননি যে, তাদের শাস্তি নিরবচ্ছিন্ন হবে, না করা হবে লাঘব। তাদের সম্পর্কে কেবল বলেছেন, 'নিশ্চয় আপনার প্রভুপালক যা ইচ্ছা তাই করেন।'

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১০৯) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তারা যাদের ইবাদত করে, তাদের সম্পর্কে সংশয়যুক্ত হয়ো না, পূর্বে তাদের পিতৃপুরুষেরা যাদের ইবাদত করতো, তারা তাদের ইবাদত করে।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! এতক্ষণ ধরে আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জির মাধ্যমে তাদের অংশীবাদিতার স্পষ্ট পরিচয় আপনাকে প্রদান করলাম। এখন আপনি দেখুন, আপনার সমসাময়িক মুশরিকেরাও তাদের মতো। পূর্বসুরীদের মতো এরাও আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপাসনায় মগ্ন। সুতরাং আপনি নিশ্চিত থাকুন, পূর্বসুরীদেরকে যেমন শিরিকের শাস্তি দেয়া হয়েছিলো, তেমনি উত্তরসুরীদেরকেও শাস্তি দেয়া হবে যথাসময়ে। এরকমও বলা যেতে পারে যে— হে আমার রসুল! আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, এদের দেব-দেবীগুলো এদের কোনো উপকারেই আসবে না, যেমন উপকারে আসেনি তাদের পূর্বপুরুষদের। প্রথম ব্যাখ্যানুসারে এখানে 'মিম্মা' শব্দটির 'মা' হচ্ছে মায়ে মাছদারী এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে মায়ে মাউসুল।

'ইল্লা কামা ইয়াবুদু' বাক্যটি এখানে নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে ব্যক্ত। অর্থাৎ এদের পূর্বপুরুষদের নিয়মেই এরা উপাসনা করে। অথবা তাদের পূর্বপুরুষদের মতো পরিণাম হবে এদেরও। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি যেহেতু পূর্বসুরীদের পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন এদের পরিণাম সম্পর্কেও নিশ্চয় ধারণা করতে পারবেন।

শেষে বলা হয়েছে— 'অবশ্যই আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরোপুরি দিবো— কিছুমাত্র কম দিবো না।' এখানে 'নাসিবাহুম' কথাটির অংশ প্রাপ্য অংশ (নসব)। অর্থাৎ শাস্তির অংশ। এভাবে বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— শাস্তির যে অংশ এদের পূর্ববর্তীরা পেয়েছিলো, তেমনি এরাও পাবে। একটুও কম পাবে না। 'নাসিবাহুম' কথাটির মাধ্যমে এখানে 'রিজিকের অংশ'ও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যবিষয়টির অর্থ দাঁড়াবে— নির্ধারিত রিজিক পূর্ণ থাকার কারণেই এখানকার অংশীবাদীদের শাস্তি বিলম্বিত হচ্ছে। অর্থাৎ এদেরকেও এদের মুশরিক পূর্বপুরুষদের মতো অবশ্যই যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু সে শাস্তি শুরু হবে তাদের নির্ধারিত জীবনোপকরণ নিঃশেষ হবার পর।

'গইরি মানকুস' অর্থ— কিছু মাত্র কম করা হবে না। কথাটির মাধ্যমে বক্তব্য বিষয়টিকে (শাস্তি দানের সংবাদটিকে) এখানে করে তোলা হয়েছে অধিকতর গুরুত্ববহ।

www.eelm.weebly.com

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۖ وَاِنَّهُمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝ وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ۖ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

❒ আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, অতঃপর ইহাতে মতভেদ ঘটিয়াছিল। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকিলে উহাদিগের মীমাংসা হইয়া যাইত। উহারা অবশ্যই ইহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল।

❒ যখন সময় আসিবে তখন অবশ্যই তোমার প্রতিপালক উহাদিগের প্রত্যেককে তাহার কর্মফল পুরাপুরি দিবেন। উহারা যাহা করে তিনি সে-বিষয়ে সবিশেষ অবহিত;

মক্কার মুশরিকেরা রসুল স. এর আহ্বানকে বার বার প্রত্যাখ্যান করে চললো, বিভিন্নভাবে অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে লাগলো কোরআনের প্রতি। রসুল স. মনোক্ষুণ্ন হলেন। তাই তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে আল্লাহ্পাক এরশাদ করলেন — 'আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটেছিলো। তোমার পালনকর্তার পূর্ব ঘোষণা না থাকলে তাদের মীমাংসা হয়ে যেতো। তারা অবশ্যই এর সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিলো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! অবিশ্বাসীদের পুনঃপুনঃ সত্যপ্রত্যাখ্যানের কারণে ব্যথিত হবেন না। এটাই তাদের চিরন্তন স্বভাব। স্মরণ করুন রসুল মুসার কথা। তার উপরে আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, যেমন আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছি কোরআন। কিন্তু তার সম্প্রদায় সর্বসম্মতিক্রমে তওরাতকে গ্রহণ করেনি। ঘটিয়েছে প্রচণ্ড মতভেদ। একদল স্বীকার করেছে, আর একদল করেছে অস্বীকার। আপনার সম্প্রদায়ের অবস্থাও তেমনি। কেউ কেউ আপনাকে বিশ্বাস করেছে, আবার কেউ কেউ করে চলেছে প্রত্যাখ্যান। হে আমার প্রিয়তম রসুল! আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত এই যে, দীর্ঘদিন ধরে তাদেরকে তওবার (প্রত্যাবর্তনের) সুযোগ দেয়া হবে। ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যু পর্যন্ত, আর সমষ্টিগতভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তারা লাভ করবে এই অবকাশ। এই পূর্ব সিদ্ধান্তটি না থাকলে বিষয়টি আমি মীমাংসা করেই ফেলতাম। আপতিত করতাম তাৎক্ষণিক শাস্তি। তবে এটা নিশ্চিত যে, আপনার বিরুদ্ধবাদীরা বিভ্রান্ত ও দোলায়িতচিত্ত।

পরের আয়াতে (১১১)বলা হয়েছে— 'যখন সময় আসবে, তখন অবশ্যই তোমার প্রভুপ্রতিপালক তাদের প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি দিবেন। তারা যা করে তিনি সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।' এখানে 'ইন্না' শব্দটি স্বীকৃতিসূচক।

www.eelm.weebly.com

ক্বারী নাফে বিন কাসীর এবং ক্বারী আবু বকরের মতে শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইন্' মূলতঃ ইন্না (অবশ্যই) অর্থে। তাই 'তাদের প্রতেককে' কথাটির মর্মার্থ হবে 'অবশ্যই মতভেদ সৃষ্টিকারী সকল মুমিন ও কাফেরকে'। আর এখানকার 'লাম্মা' শব্দটির মূল রূপ হচ্ছে 'লামান্ মা'। শব্দটি সংক্ষিপ্তকরণের কারণে 'নুন্' অক্ষরটি এখানে হয়েছে অবলুপ্ত। এভাবে আয়াতের বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়িয়েছে এরকম— 'হে আমার রসুল! একথাটিও জেনে রাখুন যে, আখেরাতে চূড়ান্ত বিচারের সময় যখন হবে, তখন আপনার প্রভুপালক অবশ্যই মতভেদ সৃষ্টিকারী সকল বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিবেন। তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ জ্ঞাত।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ১১২, ১১৩

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○ وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ○

❒ সুতরাং তুমি ও তোমার সহিত যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাহারা তুমি যেভাবে আদিষ্ট হইয়াছ তাহাতে স্থির থাক এবং সীমালংঘন করিও না। তোমরা যাহা কর তিনি তাহার দ্রষ্টা।

❒ যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে তাহাদিগের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িও না; পড়িলে, অগ্নি তোমাদিগকে স্পর্শ করিবে। এই অবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদিগের কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং তোমাদিগের সাহায্য করা হইবে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি ও তোমার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছে তারা, তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছো তাতে স্থির থাকো।' এখানে আল্লাহ্পাক রসুল স. এবং তাঁর একনিষ্ঠ অনুচরবর্গকে সত্যের প্রতি দৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এই স্থিরতা বা দৃঢ়তা নিম্নরূপ—

১. বিশ্বাসগত দৃঢ়তা। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার প্রতি দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তিনি সকল পূর্ণতা ও উৎকর্ষতার সমষ্টি । কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব ও গুণাবলী সৃষ্টির অস্তিত্ব ও গুণাবলীর মতো নয়। সৃষ্টিকুলের মতো তিনি অসহায় যেমন নন, তেমনি নন স্বেচ্ছাচারীও। তবে তিনি সর্বশক্তিধর ও ইচ্ছাময়। যা ইচ্ছা তাই করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। সৃজন ও লালন-পালন সম্পূর্ণত তাঁরই করুণা নির্ভর। সুতরাং তিনি ব্যতীত উপাস্য কেউ নেই ইত্যাদি।

www.eelm.weebly.com

২. কর্মগত দৃঢ়তা। অর্থাৎ পালন করতে হবে সত্যধর্ম প্রচারের গুরু দায়িত্ব। প্রত্যাদেশিত শরিয়তকে রাখতে হবে অক্ষুণ্ন। শরিয়তের বিধানে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো চলবে না।

৩. ইবাদত ও ব্যবহারিক জীবনে দৃঢ়তা। অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রেও অতিআগ্রহকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। যেমন, সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর ইবাদত হচ্ছে নামাজ। নামাজ ফরজ করা হয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত। কিন্তু কল্যাণ লাভের আশায় নামাজকে ছয় অথবা সাত ওয়াক্ত বানানো যাবে না। নামাজের নির্ধারিত রাকাতও বাড়ানো যাবে না কোনোক্রমে। আর পারিবারিক, সামাজিক ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে হালাল-হারামের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা।

হজরত সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ সাক্বাফী বর্ণনা করেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! দয়া করে আমাকে এমন উপদেশ দান করুন, যাতে আপনার মহাপ্রয়াণের পর আমাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয়। তিনি স. বললেন, বলো 'আমানতু বিল্লাহ্' (আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ্‌র প্রতি) এবং এই কথার উপরেই দৃঢ় থাকো । মুসলিম।

হজরত ইবনে খাত্তাব বলেছেন, 'ইস্তেক্বামাত' (দৃঢ়তা) অর্থ আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের যথামান্যতার উপরে সুস্থির থাকা। শৃগালের মতো এদিক ওদিক বিচরণ না করা। মুসলিম।

ইস্তেক্বামাত বা দৃঢ়তার নির্দেশটি একটি কঠিন নির্দেশ। নির্দেশটির বাস্তবায়ন ততোধিক কঠিন। তাই সুফী সাধকগণ বলেন, ইস্তেক্বামাত কারামত (অলৌকিকত্ব প্রদর্শন) অপেক্ষা উন্নত। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর উপরে এর চেয়ে গুরুভার কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তাই তিনি স. বলেছেন, সুরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাস 'সুরা হুদ' বলে বিশেষভাবে আলোচ্য আয়াতটিকেই বোঝাতে চেয়েছেন। তবে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করতে গেলে বলতে হয়, রসুল স. স্বভাবগতভাবেই দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। আর তাঁর সকল কিছুই ছিলো দৃঢ়তাব্যঞ্জক। কিন্তু তিনি তাঁর বিশ্বাসী সহচরগণকে ভালোবাসতেন অত্যধিক। তাঁরা দৃঢ়তার উপরে সতত প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন কিনা, সেটাই ছিলো তাঁর দুশ্চিন্তার বিষয়। আর এই দুঃসহ চিন্তার কারণেই তিনি ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, সুরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। আর একথা বলে তিনি স. ইঙ্গিত করেছিলেন এই আয়াতটির দিকে। অবশ্য তিনি একথা বলে সম্পূর্ণ সুরা হুদের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন— এরকম বলাতেও কোনো দোষ নেই। কারণ এই সুরায় বিধৃত রয়েছে অতীতের অনেক উম্মতের সত্যপ্রত্যাখ্যানজনিত বিবরণ ও তাদের মর্মান্তিক পরিণতির ভয়াবহ আলেখ্য। এ সকল বিষয় অবগত হয়ে স্বভাবতই তিনি

www.eelm.weebly.com

তাঁর আপন উম্মতের ভাবনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভেবেছিলেন, হায়! আমার উম্মতের মধ্যে যারা অবাধ্য তাদের কি হবে। আর যারা বিশ্বাসী, তারাই বা প্রদর্শন করতে পারবে কতটুকু একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা।

এরপর বলা হয়েছে — 'এবং সীমালংঘন কোরো না। তোমরা যা করো তিনি তার দ্রষ্টা।' কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'সীমালংঘন কোরো না' কথাটির অর্থ নির্দেশ ও নিষেধাবলীর ক্ষেত্রে নির্ধারিত সীমানা অতিক্রম কোরো না। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ধর্ম একটি সহজসাধ্য বিষয়। যারা একে কঠোর মনে করবে, তারা হয়ে পড়বে কঠোরতার হাতে বন্দী। তারাই অকারণে হারাবে শক্তি ও সামর্থ্য। সুতরাং তোমরা সহজ সরল হও। মধ্যবর্তী পথে চলো। এ পথে যারা সফল তাদের জন্য শুভসংবাদ। সাহায্য কামনা করো সকাল সন্ধ্যার উপাসনায় ও রাত্রি জাগরণে। বোখারী, নাসায়ী।

আমি বলি, রসুল স. দুশ্চিন্তার ভারে বৃদ্ধ হয়েছিলেন সকল মানুষের কথা ভেবে। তিনি জানতেন, মানুষ স্বভাবতই উদাসীন ও অসতর্ক। সুতরাং তারা দৃঢ়তা রক্ষা করবে কী ভাবে। কী করে রক্ষা পাবে আল্লাহ্‌র এই সুস্পষ্ট নির্দেশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব থেকে।

পরের আয়াতে (১১৩) বলা হয়েছে— 'ওয়ালা তারকানু ইলাল্ লাজীনা জলামু' (যারা সীমালংঘন করেছে তাদের দিকে ঝুঁকে পোড়ো না)। এখানে 'রুকুন' শব্দটির অর্থ অনুরাগ বা আকর্ষণ। হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। এভাবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— জালেমদের অনুরাগী হয়ো না। আবুল আলীয়া বলেছেন, তাদের কাজকর্মের প্রতি আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট হবে না। সুদ্দী বলেছেন, সীমালংঘনকারীদের অনুগামী হবে না। ইকরামা বলেছেন, তাদের কথা মানবে না। বায়যাবী বলেছেন, তাদের সম্পর্কে সামান্যতম আগ্রহ প্রদর্শন করবে না। উল্লেখ্য যে, জালেমদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহান্বিত হওয়া এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে তাদেরকে স্মরণ করা অসমীচীন।

এরপরে বলা হয়েছে— 'ফাতামাস্‌সাকুমুন্ নার (নতুবা অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে)। বায়যাবী লিখেছেন, জালেমদের প্রতি ঝুঁকে পড়া বা আগ্রহান্বিত হওয়ার শাস্তি যদি জাহান্নাম হয়, তবে বুঝে নেয়া উচিত যে, জুলুম করা এবং জুলুমে নিমগ্ন থাকার পরিণাম হবে কী। মূলতঃ জুলুম থেকে অনেক দূরে অবস্থান করার জন্য এসেছে আলোচ্য নির্দেশটি। সতর্কবাণীকে গুরুত্ববহ করে তোলা হয় এভাবেই। এক বর্ণনায় এসেছে, এক লোক জামাতে নামাজ পাঠ করছিলো। ইমাম যখন এই আয়াত পাঠ করলেন, তখন সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো। জ্ঞান ফিরলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এভাবে অজ্ঞান হলে কেনো? সে বললো, জালেমদের প্রতি আগ্রহান্বিতরা যদি জাহান্নামী হয়, তবে জালেমদের পরিণাম কী হবে— একথা ভাবতে গিয়েই আমার জ্ঞান লোপ পেয়েছে।

www.eelm.weebly.com

হাসান বসরী বলেছেন, বিশুদ্ধ ধর্মের অবস্থান দু'টি 'লা' (না) এর মধ্যে। একটি হচ্ছে 'লা তাত্গাও' (নিজে সীমাতিক্রম কোরো না)। আর একটি হচ্ছে 'লা তারকানু' (জালেমদের প্রতি আগ্রহী হয়ো না)। ইমাম আওজায়ী বলেছেন, যে আলেম জালেমদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যায়, সে সর্বনিকৃষ্ট।

হজরত আউস বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, যে জালেমদের সহায়তা কামনা করে, সে বের হয়ে যায় ইসলাম থেকে।

এক লোক একবার বললো, প্রকৃতপক্ষে জালেম ক্ষতি করে নিজের, অন্যের নয়। হজরত আবু হোরায়রা বললেন, অন্যেরাও তার ক্ষতির শিকার। তার অত্যাচারে পক্ষীকুলও অনাহারে মৃত্যুবরণ করে আপন নীড়ে।

বায়যাবী বলেছেন, এখানে রসুলপাক স.কেও সম্বোধন করা হয়েছে সম্মিলিতভাবে। বলা হয়েছে, 'নতুবা অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে।' তিনি স. সকল জুলুম থেকে সতত পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও এভাবে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা। পূর্বের আয়াতে (১১২) উল্লেখিত দৃঢ়তাকে পরিপূর্ণ ও নিষ্কলুষ রাখার উদ্দেশ্যেই সেখানকার নির্দেশের মতো এখানকার নির্দেশটিতেও অবলম্বিত হয়েছে সম্মিলিত সম্বোধন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এই অবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমার কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং তোমাদের সাহায্য করা হবে না।' 'আউলিয়া' অর্থ বন্ধু, অভিভাবক যে বিপদাপদে সাহায্য করতে সক্ষম। 'ছুম্মা লা তুনসারূন' অর্থ, তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। অর্থাৎ জুলুমবাজদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে চিরকালীন শাস্তি। কারণ তারা আল্লাহ্র সাহায্য থেকে অনেক দূরে। 'ছুম্মা' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এই 'দূরত্বব্যঞ্জক' অর্থে।

বাগবী বলেছেন, তিরমিজি ও নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবুল ইয়াসির আমর বিন আরীয়া আনসারী উল্লেখ করেছেন, একবার এক রমণী আটা ক্রয়ের জন্য আমার নিকটে আগমন করলো। আমি বললাম ঘরে এসো। ভালো আটা আছে। রমণীটি ঘরে এলে আমি তাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে চুম্বন করলাম। কিন্তু হুঁশ ফিরে পেলাম পরক্ষণেই। লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলাম। আবু বকরকে কথাটি না জানিয়ে থাকতে পারলাম না। তিনি বললেন, তওবা করো। গোপন পাপ গোপনই থাক। কাউকে জানিয়ো না। আমার ভিতরে তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে অনুশোচনার আগুন। স্বস্তি পাচ্ছিলাম না কিছুতেই। ওমরকে বলে ফেললাম কথাটা। তিনিও বললেন, বিশুদ্ধ অন্তরে তওবা করো। যা বলেছো বলেছো, আর কাউকে বোলো না। কিন্তু আমার দগ্ধমান অন্তর শান্ত হলো না কিছুতেই। শেষে কথাটা জানালাম প্রিয়তম রসুল স.কে। তিনি বললেন, তার স্বামী গিয়েছে জেহাদে। আর তার স্ত্রীর প্রতি তুমি এহেন আচরণ করলে। একথা শুনে আমার মনে হলো, আমি নিশ্চিত জাহান্নামী। আল্লাহ্র রসুল মস্তক অবনত করে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। তখন অবতীর্ণ হলো—

www.eelm.weebly.com

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۭ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۭ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝ وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

❐ সালাত কায়েম করিবে দিবসের দুই প্রান্ত ভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎ কর্ম মিটাইয়া দেয়। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে ইহা তাহাদিগের জন্য এক উপদেশ।

❐ তুমি ধৈর্য ধারণ কর, কারণ আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সালাত কায়েম করবে দিবসের দুই প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে।' এই আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এই নির্দেশটি কেবল আপনার জন্য, না আমরাও এর অন্তর্ভুক্ত? তিনি স. বললেন, সবার জন্য। 'লুবাবুন নুকুল' প্রণেতা লিখেছেন, হজরত ইয়াসার ছাড়াও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু উমামা, হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত বুরাইদা থেকে।

'দিবসের দুই প্রান্তভাগে' অর্থ সকালে ও সন্ধ্যায়। আর 'রজনীর প্রথমাংশে' অর্থ রাতের ওই অংশ যা দিনের সঙ্গে জড়িত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'দিবসের দুই প্রান্তভাগে অর্থ জোহর ও মাগরিব। আর 'রজনীর প্রথমাংশে' অর্থ ইশার সময়। হাসান বসরী বলেছেন, 'দিবসের দুই প্রান্তের নামাজ হচ্ছে ফজর ও আসর। আর রাতের প্রথমাংশের নামাজ হচ্ছে মাগরিব ও ইশা। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনানুসারে জোহর, আসর এবং মাগরিব, ইশা একই নামাজ। এই সূত্রানুসারে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক বলেন, আসরের শেষ দিকে কেউ মুসলমান হলে অথবা কোনো ঋতুবতী নারী ঋতু থেকে পবিত্র হলে কিংবা কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক বয়োপ্রাপ্ত হলে তার উপর জোহর ও আসর উভয় ওয়াক্তের নামাজ পাঠ হবে ওয়াজিব। ইশার নামাজের শেষ দিকে এরকম ঘটলেও ওয়াজিব হবে মাগরিব ও ইশা। ইমাম আবু হানিফার অভিমত কিন্তু এরকম নয়। তিনি বলেন, এমতোক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে কেবল আসর অথবা ইশা। আমি সুরা নিসার 'ইন্নাস সলাতা .....কিতাবাম্ মাওকুতা' আয়াতটির ব্যাখ্যায় একথা প্রমাণ করেছি যে, প্রতিটি নামাজের সময় পৃথক পৃথক। একারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেন, সফর, অসুস্থতা কিংবা ঝড়বাদলের সময়েও জোহর-আসর ও মাগরিব-ইশা একসময়ে

www.eelm.weebly.com

পড়া যাবে না। আর বিনা প্রয়োজনে (ওজরে) দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্র করা কোনো ইমামের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মতে ভ্রমণের সময় দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্র করা সিদ্ধ। আর অতি বৃষ্টির সময় একত্র পাঠ সিদ্ধ কেবল মাগরিব-ইশা— এরকম বলেছেন ইমাম আহমদ। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ঝড় বৃষ্টির সময় জোহর-আসরের সম্মিলিত পাঠ সিদ্ধ। ইমাম আহমদের মতে পীড়িত ব্যক্তির জন্য জোহর-আসর ও মাগরিব-ইশা এক সময়ে পাঠ করা সিদ্ধ।

জমহুর তাঁদের অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেন হজরত হামনা বিনতে জাহাশের হাদিসটি। তখন হজরত হামনা ছিলেন ইস্তেহাজার রোগিণী (অনবরত ঋতুস্রাবজনিত রোগকে বলে ইস্তেহাজা)। রসুলপাক স. তাঁকে এক নামাজের শেষভাগে ও অপর নামাজের প্রথম ভাগে দুই নামাজকে একই সময়ে পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং নামাজ পাঠের পূর্বে দিয়েছিলেন গোসলের নির্দেশ। আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. ভ্রমণাবস্থায় জোহরকে আসরের সাথে এবং মাগরিবকে ইশার সাথে পাঠ করতেন। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. দ্বিপ্রহরের পূর্বে কোথাও যাত্রা করলে আসরের পূর্বক্ষণে থামতেন এবং একসঙ্গে পাঠ করতেন জোহর ও আসর। আর দ্বিপ্রহরের পরে রওনা হতে চাইলে যাত্রা শুরু করতেন জোহর পাঠের পর।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবালের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাবুক যুদ্ধের সময় জোহর-আসর ও মাগরিব-ইশা একসঙ্গে পড়তেন। আমি তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি এভাবে নামাজ পাঠ করছেন কেনো? তিনি স. বলেছিলেন, উম্মতের কষ্ট যেনো না হয়।

বর্ণিত হাদিসসমূহ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এক সঙ্গে নামাজ আদায়ের অর্থ একই ওয়াক্তে নামাজ আদায় নয়। রসুল স. প্রতিটি নামাজ তার নির্দিষ্ট ওয়াক্তেই পাঠ করেছিলেন। জোহর পড়েছিলেন জোহরের শেষ সময়ে, আর আসর পড়েছিলেন আসরের সূচনালগ্নে। তেমনি তিনি মাগরিবের অন্তিম লগ্নে মাগরিব সমাপনের পর ইশার সূচনাকালে পড়েছিলেন ইশা। তাই দৃশ্যতঃ দুই নামাজ সম্মিলিত হলেও তা প্রকৃতপক্ষে পঠিত হতো পৃথক পৃথক সময়ে, নির্ধারিত ওয়াক্তে। হজরত হামনার হাদিসের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট। এভাবে বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদিসগুলোও পরীক্ষা করা যেতে পারে। তাঁদের অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. মদীনায় ভীতিপ্রদ অবস্থা অথবা ভ্রমণকালীন অবস্থা ছাড়াই দুই ওয়াক্তের নামাজকে মিলিয়েছিলেন এভাবে— এক নামাজ ওয়াক্তের শেষভাগে, আর এক নামাজ ওয়াক্তের প্রথম

www.eelm.weebly.com

ভাগে। মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, ভয়ার্ত অবস্থা ও ঝড়বাদল ব্যতিরেকেই রসুল স. জোহরকে আসরের সাথে এবং মাগরিবকে ইশার সাথে পাঠ করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাসের নিকট এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন, উম্মতের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যেই তিনি স. এরকম করেছিলেন। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, কোনো কারণ ব্যতিরেকেই রসুল স. মদীনায় দুই নামাজকে একত্র করেছিলেন। হেতু জানতে চাইলে তিনি স. বলেছিলেন, উম্মতের যেনো কষ্ট না হয়। এতদসত্ত্বেও ঐকমত্য এই যে, বিনা কারণে দুই নামাজের একত্র পাঠ অসিদ্ধ। বোখারীর এক বর্ণনায় এসেছে, আমর ইবনে দীনার একবার তাঁর এক সতীর্থকে বললেন, হে আবু শায়বা! আমার ধারণা মিলিতভাবে পাঠ করলেও রসুল স. প্রতিটি নামাজ পাঠ করেছিলেন যথাসময়ে— জোহরের অন্তিমে জোহর এবং আসরের সূচনায় আসর এবং মাগরিবের শেষ ভাগে মাগরিব এবং ইশার প্রথম ভাগে ইশা। আবু শায়বা জবাব দিলেন, আমারও তাই মনে হয়।

একটি পর্যবেক্ষণ ঃ এক নামাজকে নির্ধারিত সময়ের শেষে নিয়ে পরের নামাজকে ওয়াক্তের শুরুতে এনে একত্রে পাঠ করলে যথাসময়ে নামাজ পড়া হয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো বর্ণনায় এক নামাজকে ওয়াক্তের প্রথমে বা মধ্যবর্তীতে রেখে পরের নামাজকে এগিয়ে এনে পাঠ করার কথা এসেছে। এভাবে পাঠ করলে পরের ওয়াক্তের নামাজ যথাসময়ে পঠিত হয়েছে বলা যাবে না। যেমন হোসাইন বিন ওবায়দুল্লাহ্ বিন আবদুল্লাহ্ সূত্রে ইকরামা ও কুরাইবের মাধ্যমে আহমদ, বায়হাকী ও দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোনো মনজিলে অবস্থানকালে দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হলে রসুল স. যাত্রারম্ভের পূর্বে জোহরের সঙ্গে আসরও আদায় করে নিতেন। আর সূর্য ঢলে পড়ার আগে রওনা দিলে জোহর না পড়েই যাত্রা করতেন। যাত্রা স্থগিত করতেন আসরের সময়। তারপর জোহর ও আসর আদায় করতেন এক সাথে। আবার কোনো সেনাশিবিরে অবস্থানকালে মাগরিবের সময় মাগরিব পড়ার পরক্ষণেই আদায় করতেন ইশা। আর মাগরিবের পূর্বে যাত্রা শুরু করলে থামতেন ইশার সময় এবং মাগরিব সমাধা করতেন ইশার সঙ্গে। হজরত আনাস থেকে ইসহাক বিন রহ্ওয়াইহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. প্রবাসকালে সূর্য ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন করতেন জোহর ও আসর। তারপর যাত্রা শুরু করতেন। ইমাম নববী বলেছেন, হাদিসটির সূত্রপরম্পরা বিশুদ্ধ। হজরত মুয়াজ থেকে আবু তোফায়েল— ইয়াজিদ বিন হাবীব— লাইস— কুতাইবা সূত্রে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, হাকেম ও দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, তাবুক যুদ্ধের দিনগুলোতে যাত্রার পূর্বে সূর্য ঢলে পড়লে জোহর ও আসর একসঙ্গে সমাধার পর যাত্রা শুরু করতেন রসুল স.। আর সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে রওনা হলে জোহরকে করতেন বিলম্বিত। আসরের সময় থেমে জোহর ও আসর পড়তেন

www.eelm.weebly.com

একসাথে। পুনরায় যাত্রা করতেন এবং ইশার সময় থেমে এক সাথে পড়তেন মাগরিব ও ইশা।

পর্যালোচনাঃ বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, উপরে বর্ণিত হোসাইন বিন আবাদুল্লাহ্র বর্ণনাটি দুর্বল। বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি নিজেও দুর্বল। এরকম মন্তব্য করেছেন ইবনে মুঈন। আর নাসায়ী তাকে বলেছেন পরিত্যক্ত। হজরত আনাসের হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন ইমাম নববী। জাহাবীর বর্ণনা পরম্পরাভূত ইসহাক বিন রহ্ওয়াইহ্কে বাতিল আখ্যা দিয়েছেন আবু দাউদ। তবে তার বর্ণনা সদৃশ একটি বর্ণনা এসেছে ইমাম হাকেমের 'আল আরবাইন' গ্রন্থে এভাবে— সূর্য ঢলে পড়লে জোহর-আসর এক সঙ্গে সম্পন্ন করে যাত্রা শুরু করতেন রসুল স.। বর্ণনাটি দুস্প্রাপ্য হলেও বিশুদ্ধ। তিবরানীর 'আল আওসাত' গ্রন্থে এসেছে, রসুল স. ভ্রমণরত অবস্থায় সূর্য ঢলে পড়লে জোহর-আসর একসঙ্গে পড়ে নিয়ে রওয়ানা হতেন। আর নামাজ না পড়ে যাত্রা শুরু করলে আসরের সময় থেমে একসঙ্গে সম্পন্ন করতেন জোহর ও আসর। মাগরিবকেও ইশার সঙ্গে মেলাতেন এভাবে। তিবরানী বলেছেন, ইয়াকুব বিন মোহাম্মদ জুহুরী এই হাদিসটির একক বর্ণনাকারী। আবার ইমাম তিরমিজির মতে হজরত মুয়াজের হাদিসের একক বর্ণনাকারী কুতাইবা। তবে মুসলিমের বর্ণনাটি সুবিদিত। আবু দাউদ বলেছেন, হাদিসটি যথাসমর্থনপুষ্ট নয়। ওয়াক্তের নামাজ পড়া সম্পর্কিত কোনো বিশুদ্ধ হাদিস আসলে নেই। আবু সাঈদ বিন ইউনুস বলেছেন, কুতাইবা ছাড়া আর কেউ এরকম বর্ণনা করেননি। কেউ কেউ বলেছেন, তার বর্ণনা প্রমাদমুক্ত নয়। আবী হাতেম বলেছেন, বর্ণনাটি ভ্রান্তিময়। বর্ণনাটিকে সমালোচনাহত করেছেন হাকেম। বোখারী ও ইবনে হাজামও তাকে করে তুলেছেন প্রতর্কিত। আর দারাকুতনী পরিবেশিত বর্ণনাটিতে রয়েছে একাধিক অপরিচিত বর্ণনাকারী। একজনের নাম মানজার কাবুসী। সে বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের একটি বর্ণনা। বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ রয়েছে বোখারী ও মুসলিমে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি মুজদালিফা ব্যতীত অন্য কোথাও রসুল স.কে নির্ধারিত ওয়াক্তের বাইরে নামাজ পড়তে দেখিনি। হজের সময় তিনি স. মাগরিব আদায় করেছিলেন ইশার ওয়াক্তে, ইশার সঙ্গে। ফজর পড়েছিলেন অতি প্রত্যুষে। ফজরের সাধারণ সময়ের কিছু আগে। আরাফা প্রান্তরে দুই নামাজ একত্র করার কথা তিনি বলেননি। বিষয়টি সুবিদিত বলেই হয়তো তিনি এরকম করেছেন।

www.eelm.weebly.com

আর একটি ঘটনা ইমাম আবু হানিফার মতামতকে পরিপুষ্ট করেছে। ঘটনাটি ঘটেছিলো 'লাইলাতুত্ তা'রীসে'। কথাটির অর্থ শিবিরের শেষ রজনী। গভীর রাতে এক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন রসুল স.। শিবির স্থাপন করলেন সেখানে। হজরত বেলালকে পাহারা ও ফজরের আজানের দায়িত্ব অর্পণ করে নিদ্রাভিভূত হলেন তিনি। কিন্তু হজরত বেলাল ঘুমিয়ে পড়লেন এক সময়। সকলের ঘুম ভাঙলো সূর্যোদয়ের পর। নামাজ কাজা হলো সকলের। তখন রসুল স. যে বক্তব্য প্রদান করলেন তাতে এই কথাগুলোও ছিলো— নিদ্রার কারণে নামাজ কাজা হলে অপরাধ নেই। অপরাধ হবে তখন যখন জাগ্রত অবস্থায় নামাজকে নিয়ে যাওয়া হবে পরবর্তী নামাজের সময়ে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যটির ব্যাখ্যাসূত্রে এতক্ষণ ধরে আলোচনা করা হলো। এবার আলোচিত হবে পরের বাক্যটি। পরের বাক্যে বলা হয়েছে— 'সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্মকে মিটিয়ে দেয়।' এ কথার অর্থ— পুণ্য মুছে ফেলে পাপকে। শিথিল সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নতুন পুণ্য পুরাতন পাপকে অতি দ্রুত সুচারুরূপে বিলোপ করে। এতো দ্রুত বিলোপ করে যে, তার দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই।

ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু জর গিফারী বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে প্রিয়তম রসুল! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি স. বললেন, পাপ সংঘটিত হলে পরক্ষণেই পুণ্য করবে। কারণ পুণ্য পাপকে মুছে দেয়। আমি বললাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ও কি পুণ্য কর্ম? তিনি স. বললেন, এটাতো পুণ্য সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এক লোক পরস্ত্রীকে চুম্বন করেছিলো। পরক্ষণে অনুতপ্ত হয় সে। রসুল স.কে ঘটনাটি জানায়। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। লোকটি বলে, হে দয়ার রসুল! সুসংবাদটি কি কেবল আমার জন্য? তিনি স. বললেন, না। তামাম উম্মতের জন্য। অন্য বর্ণনায় রয়েছে 'আমার ওই সকল উম্মতের জন্য যারা পুণ্য কর্ম করে।' বোখারী, মুসলিম। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর তখন লোকটিকে বলেছিলেন, যদি তুমি তোমার পাপের কথা প্রকাশ না করতে তবে আল্লাহ্ও তা গোপন রাখতেন।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ, জুমআর নামাজ ও রমজান মাস মধ্যবর্তী সময়ের পাপরাশিকে অপসারণ করে। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় আরো উল্লেখিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের গৃহের সম্মুখে যদি একটি প্রবহমান নদী থাকে, আর তোমরা যদি ওই নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার স্নান করো, তবে বলো, তোমাদের শরীরে কি কোনো ময়লা থাকবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না। তিনি স. বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দৃষ্টান্তটি এরকম। আল্লাহ্ এর মাধ্যমে পাপ-সমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। বোখারী, মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটা তাদের জন্য এক উপদেশ।' এ কথার অর্থ— ইতোপূর্বে বর্ণিত 'ইস্তেক্বামাত' (স্থিরতা) যারা অবলম্বন করবে অথবা পালন করবে ধর্মীয় বিধানসমূহ কিংবা চলবে কোরআন নির্দেশিত পথে, তাদের জন্য এই কোরআন এক অনন্য উপদেশ।

পরের আয়াতে (১১৫) বলা হয়েছে— 'তুমি ধৈর্য ধারণ করো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে অবিচল থাকুন। অথবা দুঃখ-বিপদে থাকুন অচঞ্চল। কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মর্ম হবে— হে রসুল! আপনি একাগ্রচিত্তে নামাজে নিমগ্ন থাকুন। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আপনার পরিবারবর্গকে নামাজ পাঠের আদেশ দিন, আর ধৈর্য ধারণ করুন।' উল্লেখ্য যে, এখানে নামাজ ও ধৈর্য সমার্থক। অথবা অবিচ্ছিন্ন।

এরপর বলা হয়েছে— 'কারণ আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।' একথার অর্থ— যারা নামাজী ও সৎকর্মপ্রবণ, তাদের শ্রমের প্রতিফলকে আল্লাহ্ কখনো বিনষ্ট করেন না।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ১১৬, ১১৭

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ۝

❑ তোমাদিগের পূর্ব যুগে আমি যাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম তাহাদিগের মধ্যে অল্প কতক ব্যতীত সজ্জন ছিল না যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইতে নিষেধ করিত। সীমালংঘনকারীগণ যাহাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাইত তাহারই অনুসরণ করিত এবং উহারা ছিল অপরাধী।

❑ অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নহে যখন উহার অধিবাসীরা শুদ্ধাচারী।

'বাক্বিয়্যাতুন' অর্থ যা অবশিষ্ট রাখা হয়। অথবা যা অবশিষ্ট থাকে। কিংবা কথাটির অর্থ হবে জ্ঞান, বিবেক বা মর্যাদাধারী সজ্জন। তাঁরাই মানবতার জন্য অবশিষ্ট রেখে যান উত্তম কথা ও কর্মের শুভনির্দেশনা। কেউ কেউ আবার

www.eelm.weebly.com

'বাক্বিয়্য' বলেছেন আনুগত্যকে অথবা অনুগতকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'বাক্বিয়্যাতুল্লহি খইর'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আল বাক্বিয়্যাতুস্ সলিহাতু।' এভাবে আয়াতের প্রথমাংশের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— 'হে আমার রসুল! আপনি ও আপনার যুগের পূর্বে আমি রক্ষা করেছিলাম কেবল তাদেরকে যারা আমার নবীগণকে মান্য করতো।' তারা ছিলো সজ্জন ও সংখ্যালঘু। তারা মানুষকে সদুপদেশ দিতো। নিষেধ করতো পৃথিবীতে বিপর্যয় না ঘটাতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সীমালংঘনকারীগণ যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেতো তারই অনুসরণ করতো এবং তারা ছিলো অপরাধী।' এখানে 'আল্লাজীনা জলামু' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে— ওই সকল অবাধ্যরা অসৎকর্ম পরিত্যাগ করেনি। তোয়াক্কা করেনি আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধের। ভোগ বিলাসই ছিলো তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। মুকাতিল বিন হাব্বান এখানকার 'মা উৎরিফু' কথাটির অর্থ করেছেন এরকম— ওই সকল লালসার বস্তু যেগুলোর পেছনে তারা আবর্তিত হতো। ফাররা বলেছেন, তারা যে সকল সুখের উপকরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো, অনুসারী হয়ে পড়েছিলো সেগুলোরই।

পরের আয়াতে (১১৭) বলা হয়েছে— 'অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নয়, যখন তার অধিবাসীরা থাকে শুদ্ধাচারী।' এখানে 'লি ইউহ্‌লিকা' কথাটির 'লাম' না সূচকতার শক্তিবর্ধক। এখানে একটি 'আন' মুসদারিয়া (ধাতুমূল 'আন') অনুক্ত রয়েছে। 'আহলুহা' অর্থ জনপদের অধিবাসীরা। 'মুসলিহুন' অর্থ শুদ্ধাচারী। এভাবে আয়াতটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্‌পাক এমতো অন্যায় কর্ম করেন না যে, কোনো জনপদের অধিবাসী সৎ, অথচ তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। অর্থাৎ কেবল শিরিকের কারণে তিনি কোনো স্থানের লোককে ধ্বংস করেন না, ধ্বংস করেন সামাজিক বিভিন্ন অপকর্মের কারণে। মানুষ যখন অন্যের অধিকার খর্ব করে, বিস্তার ঘটে শঠতা, প্রবঞ্চনা,ব্যভিচার, খুন রাহাজানি ইত্যাদির— অথবা প্রসার ঘটে ওজনে কম দেয়া অভ্যাসের, তখনই এসে পড়ে আল্লাহ্‌র গজব।

হজরত জারীর বিন আবদুল্লাহ্ থেকে তিবরানী ও আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হলে রসুল স. 'মুসলিহুন' শব্দটির ব্যাখ্যা সূত্রে বলেছেন, পরস্পরের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ হও, আল্লাহ্‌র গজব থেকে রক্ষা পাবে। শুধু শিরিকের কারণে তিনি কাউকে ধ্বংস করেন না। কারণ তিনি পরম করুণাপরবশ। তাঁর অধিকার তিনি উপেক্ষা করেন। কিন্তু মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হলে ক্ষমা করেন না। ফেকাহ্‌বিদগণ সব সময় আল্লাহ্‌র অধিকারের তুলনায় বান্দার অধিকারকেই অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেন। প্রচলিত প্রবাদ এই যে, শিরিকের রাজত্ব তবু টিকে যায়, কিন্তু জুলুমের রাজত্ব কিছুতেই রক্ষা পায় না।

www.eelm.weebly.com

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ○ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

❒ তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহারা মতভেদ করিতেই থাকিবে,

❒ তবে উহারা নহে যাহাদিগকে তোমার প্রতিপালক দয়া করেন এবং তিনি উহাদিগকে এই জন্যেই সৃষ্টি করিয়াছেন। 'আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই' তোমার প্রতিপালকের এই কথা পূর্ণ হইবেই।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক্ ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে সৎকর্মশীল মুসলমান বানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেরকম ইচ্ছা করেন না। যদিও তাঁর নির্দেশ এরকম। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌পাকের অভিপ্রায় ও নির্দেশ এক নয়। নির্দেশের রীতি একটি, আর ইচ্ছার গতি আরেকটি। তাই মানুষ তাঁর নির্দেশ লংঘন করতে পারে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে।' একথার অর্থ, মানুষের মতৈক্য কখনোই প্রতিষ্ঠিত হবে না। বিভিন্ন পন্থায় তারা ঝুঁকে পড়বে অন্যায় ও মিথ্যাচারের দিকে। কেউ হবে ইহুদী, কেউ খৃষ্টান। কেউ কেউ হবে অগ্নিপূজারী, মূর্তিপূজারী। আবার কেউ কেউ হবে রাফেজী, খারেজী, জবরী, কদরী ইত্যাদি। কদরিয়ারা বলে, মানুষ তার আপন কর্মের স্রষ্টা। আর জবরিয়ারা বলে, মানুষ জড়পদার্থ তুল্য। এভাবে বিভিন্ন পন্থায় মতভেদকারীরা প্রতিষ্ঠিত করেছে বিভিন্ন দল।

পরের আয়াতে (১১৯) বলা হয়েছে— 'তবে তারা নয় যাদেরকে তোমার প্রতিপালক দয়া করেন।' একথার অর্থ— তবে ওই সকল লোক মতানৈক্য সৃষ্টি করে বিভ্রান্তিকে স্বাগত জানাবে না যাদেরকে আল্লাহ্‌পাক দয়া করে সফলতার পথ

www.eelm.weebly.com

প্রদর্শন করেছেন। বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও উত্তম কর্মসমূহকে আশ্রয় করে তারা থাকবে ঐক্যবদ্ধ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, একবার রসুল স. মাটিতে একটি সরলরেখা আঁকলেন; বললেন, এটাই আল্লাহ্‌র পথ। এরপর এদিকে ওদিকে আরো কিছু রেখা টেনে বললেন, এগুলো হচ্ছে ভ্রান্ত পথ। এই পথগুলোর প্রতিটিতে শয়তান বসে থাকে এবং মানুষকে আহ্বান জানায়। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন— 'আর এটাই আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এ পথের অনুসারী হও। অন্য পথের অনুসরণ কোরো না।' আহমদ, নাসায়ী, দারেমী।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি এদেরকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন।' একথার অর্থ— তিনি এ সকল লোককে সত্যের উপরে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই তারা সত্যাধিষ্ঠিত। এখানে 'জালিকা' (ওই) কথাটির লক্ষ্যস্থল হচ্ছে রহমত (দয়া)। আর 'হুম' (যাদেরকে) সর্বনামটি এখানে সম্পৃক্ত হবে 'মার্ রহিমা' (যাকে দয়া করেন) কথাটির সঙ্গে। হাসান ও আতা বলেছেন, পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত মতানৈক্য সৃষ্টিকারীরাই 'জালিকা' কথাটির লক্ষ্যস্থল এবং 'হুম' সর্বনামটি তাদের সাথেই জড়িত। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্ তাদেরকে মতানৈক্য করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আশহাব বলেছেন, আমি একবার মালেককে জিজ্ঞেস করলাম এই আয়াতটির মর্মার্থ কি ? সে বললো, একদল মানুষ যাবে জান্নাতে, আরেকদল যাবে জাহান্নামে— এটাই মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আবু উবাইদা বলেছেন, আমিও বলি, এক দলের উপর বর্ষিত হবে রহমত, আরেকদলের উপরে আপতিত হবে আযাব। এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে। ফার্‌রা বলেছেন, রহমতের অধিকারীদেরকে রহমতের উদ্দেশ্যে এবং শাস্তির অধিকারী-দেরকে শাস্তির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। যারা শাস্তির যোগ্য, তারা মতভেদ করতেই থাকবে।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমি জ্বিন ও মানুষ উভয়ের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবোই, তোমার প্রতিপালকের এই কথা পূর্ণ হবেই।'

www.eelm.weebly.com

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ؕ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ○ وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ○

❒ রসূলদিগের সকল বৃত্তান্ত, যদ্দ্বারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি, তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। ইহার মাধ্যমে তোমার নিকট আসিয়াছে সত্য এবং বিশ্বাসীদিগের জন্য আসিয়াছে উপদেশ ও সাবধান বাণী।

❒ যাহারা বিশ্বাস করে না তাহাদিগকে বল 'তোমরা যেমন করিতেছ করিতে থাক এবং আমরাও আমাদিগের কাজ করিতেছি।'

❒ 'এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর আমরাও প্রতীক্ষা করিতেছি।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'হে আমার রসুল! আপনার পূর্ববর্তী রসুলগণের বৃত্তান্ত এতক্ষণ ধরে আমি আপনাকে জানালাম। আপনার চিত্তকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই আমি এরকম করলাম। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে বিবৃত এ সকল বৃত্তান্তে আপনার সম্মুখে তুলে ধরলাম সত্যের স্বরূপ এবং আপনাকে যারা বিশ্বাস করেছে, তাদেরকে প্রদান করলাম উপদেশ ও সতর্কবাণী। সুতরাং আপনি সত্যধর্ম প্রচারে অবিচল থাকুন। সহ্য করুন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

পরের আয়াতের (১২১) মর্মার্থ হচ্ছে— আর যারা আপনার কথা বিশ্বাস করে না, তাদেরকে বলুন, ঠিক আছে। তোমরা যখন ফিরবেই না, তখন তোমরা তোমাদের কাজেই ব্যপৃত থাকো। আমরাও নিমগ্ন থাকি আমাদের কাজে।

এর পরের আয়াতের(১২২) মর্মার্থ হচ্ছে— আর তোমরা প্রতীক্ষারত থাকো অশুভ পরিণতির জন্য। আমরাও অপেক্ষা করতে থাকি শুভ পরিণতির।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ১২৩

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহেরই এবং তাঁহারই নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হইবে। সুতরাং তাঁহার ইবাদত কর এবং তাঁহার উপর নির্ভর কর। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নহেন।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই।' একথার অর্থ— আকাশ ও পৃথিবীসহ সমগ্র অদৃশ্য বিষয়াবলীর জ্ঞান কেবলই আল্লাহ্‌র । কোনো কিছুই তাঁর অজানা নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাঁরই নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি এবং আপনার স্বপক্ষ-বিপক্ষ সকলের অবশেষ প্রত্যাবর্তন আমারই নিকটে। আমিই সকলকে যথাসময়ে যথোপযুক্ত প্রতিফল দান করবো।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর উপর নির্ভর করো।' একথার অর্থ— অতএব হে আমার রসুল! কেবল আমার ইবাদতকে শিরোধার্য্য করুন এবং অন্যদেরকে এরকম করতে বলুন। আর নির্ভর করুন কেবল আমার উপর। উল্লেখ্য যে, ইবাদতসহ আল্লাহ্‌নির্ভরশীলতা ফলপ্রসূ। ইবাদতশূন্য আল্লাহ্‌নির্ভরশীলতা জন্ম দেয় অহংকারের। আর তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্ নির্ভরতাবিহীন ইবাদত দৃষ্টি বিবর্জিত চোখের মতো। এরকম ইবাদতকারীর কর্মকাণ্ডে দায়বদ্ধতা বলে কিছু নেই।

শেষ বাক্যটি দেয়া হয়েছে এভাবে— 'তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি একথাও জেনে রাখুন যে, আপনার সম্পর্কে এবং আপনার অনুগামী ও বিরোধীদের সম্পর্কে আমি মোটেও উদাসীন বা অমনোযোগী নই।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেছেন, তওরাত শরীফ যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই শুরু হয়েছে সুরা হুদ।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত আবু বকর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! বার্ধক্য আপনার উপর প্রবল হয়ে পড়েছে। তিনি স. বললেন, আমাকে বৃদ্ধ করেছে সুরা হুদ, সুরা ওয়াকেয়া, সুরা মুরসালাত, আম্মা ইয়া তাসাআলুন এবং ইজাশ্ শামসু কুয়্যিরাত। তিরমিজি, হাকেম। হাকেম ও বাগবী বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। হাকেম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু বকর থেকে এবং ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন হজরত সা'দ থেকে।

হজরত আবু বকর থেকে ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার অকাল বার্ধ্যক্য এনে দিয়েছে সুরা হুদ ও তার সমগোত্রীয় সুরাগুলো।

শিথিল সূত্রে হজরত আনাস থেকে আবু ইয়া'লী এবং হজরত ইমরান থেকে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে সুরা হুদ ও সুরা মুফাস্সিলাত।

www.eelm.weebly.com

হজরত আনাস থেকে ইবনে মারদুবিয়া এরকমও বর্ণনা এনেছেন যে, রসুল স.এরশাদ করেছেন, আমাকে বৃদ্ধের মতো ভারাক্রান্ত করেছে সুরা হুদ ও তার সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সুরা ওয়াকিয়া, সুরা আলক্বারিয়া, আল হাক্কা, ইজাস শামসু কুয়্যিরাত ও সাআলা সায়িল।

তিবরানী তাঁর আল কবীর গ্রন্থে হজরত উকবা বিন আমের ও হজরত হুজায়ফা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে সুরা হুদ ও তার সাথী সুরাগুলো বুড়ো বানিয়ে দিয়েছে। শিথিল সূত্রে হজরত সুহাইল ইবনে সা'দ থেকে তিবরানীর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে সুরা ওয়াকিয়া, সুরা আলহাক্কা এবং ইজাস্ শামসু কুয়্যিরাতের কথা। মোহাম্মদ ইবনে আলীর মাধ্যমে মুরসালরূপে ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সুরা হুদ ও হুদের সতীর্থ সুরাগুলোতে বিবৃত অবাধ্যদের শাস্তিদানের ইতিবৃত্তসমূহ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।

জাওযাইহুজ্ জুহুদ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ, আপন তাফসীরে আবু শায়েখ এবং মুরসাল পদ্ধতিতে ইমরান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. উল্লেখ করেছেন, সুরা হুদ ও হুদের সমগোত্রীয় সুরাগুলোর কিয়ামত ও অবাধ্যদের শাস্তি সম্পর্কিত বিবরণসমূহ আমাকে বার্ধ্যক্যে উপনীত করিয়েছে।

উপরে বর্ণিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স. এর বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার উপলক্ষ ছিলো কিয়ামত ও অবাধ্যদের ধ্বংসের বিবরণসমূহ, ইস্তেকামাতের (দৃঢ়তা অবলম্বনের) আয়াত নয়। কারণ হুদ ছাড়া বর্ণিত সুরাগুলোতে ইস্তেকামাতের প্রসঙ্গ নেই। আল্লাহ্পাক অধিক অবগত।

www.eelm.weebly.com

সুরা ইউসুফ

১১১ আয়াত ও ১২ রুকু সম্বলিত এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং সপ্তম আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। সুরা ইউসুফ অবতীর্ণ হয়েছে সুরা হূদের পরে।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓرٰ○ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ○ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ○

❑ আলিফ-লাম-রা; এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

❑ কুরআন, ইহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

❑ আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করিতেছি ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করিয়া; ইহার পূর্বে তুমি তো ছিলে অনবহিতদিগের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমে বলা হয়েছে— আলিফ লাম রা; তিলকা আয়াতুল কিতাবিল মুবীন (আলিফ লাম রা; এগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত)। 'আলিফ লাম রা' হচ্ছে হরুফে মুকাত্তায়াত (বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি)। এই বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলোর মর্ম রহস্যাচ্ছন্ন। এ সকল রহস্যাচ্ছন্নতা সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র এবং তাঁর প্রিয়তম রসুলের। আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ দয়া ও রসুল স. এর একনিষ্ঠ অনুসরণের কারণে যারা জ্ঞানে সুগভীর (ওলামায়ে রসিখীন), তাঁরাও এ দুর্জ্ঞেয় রহস্যের জ্ঞান লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অতি নগণ্য। সুরা বাকারার শুরুতে এ সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে ওই আলোচনাটি দেখে নেয়া যেতে পারে।

এখানে 'তিলকা' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে কোরআনের দিকে। 'আয়াত' ও 'কিতাব' হচ্ছে সম্বন্ধ পদ। শব্দ দু'টোর মধ্যে 'মিন' অব্যয়টি এখানে উহ্য। 'কিতাব' অর্থ কোরআন মজীদ। অর্থাৎ আয়াতগুলো ওই কোরআনের যা অবশ্য

www.eelm.weebly.com

মাননীয়। অথবা আয়াতগুলো ওই কোরআনের, যে কোরআন হালাল-হারাম ও অন্যান্য সুস্পষ্ট বিধানাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। কাতাদা বলেছেন, এই সুস্পষ্ট গ্রন্থের বরকত, হেদায়েত ও দিক নির্দেশনা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। জুজায বলেছেন, কোরআন হচ্ছে সত্য-মিথ্যা ও সিদ্ধ-নিষিদ্ধের প্রোজ্জ্বল বা সুস্পষ্ট আলোকবর্তিকা।

কেউ কেউ বলেছেন, 'তিলকা' দ্বারা এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে এই সুরার আয়াতগুলোর দিকে। তাই এখানে 'কিতাব' অর্থ হবে সুরা। অর্থাৎ এই সুরার আয়াতসমূহ নিয়ে কেউ পর্যালোচনা ও গবেষণা করলে বুঝতে পারবে, এগুলো আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ, কোনো মানুষ এগুলোর রচয়িতা নয়।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'সুস্পষ্ট' কথাটি প্রযোজ্য হবে ইহুদীদের প্রতি। বায়যাবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, ইহুদী পণ্ডিতেরা পৌত্তলিকদের বলতো, তোমরা মোহাম্মদের কাছে জানতে চাও— ইয়াকুব নবীর সন্তানেরা সিরিয়া ছেড়ে মিসরে গিয়েছিলো কেনো? ইউসুফ নবীরই বা কী পরিণতি ঘটেছিলো? তাদের একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে সুরা ইউসুফ। 'বাবুন্ নুজুল' প্রণেতা অবশ্য এই বর্ণনাটি গ্রহণ করেননি।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'কোরআন, এই কোরআন আমি অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় যাতে তোমরা বুঝতে পারো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এই কোরআন আমি অবতীর্ণ করেছি আপনার নিজের ভাষায় যাতে এর শব্দগত ও অর্থগত ব্যঞ্জনা অতি সহজে আপনার হৃদয়ঙ্গম হয়। আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরাও যেনো সহজে বুঝতে পারে এর মর্ম। এভাবে আকৃষ্ট হয় সত্য ধর্মের প্রতি।

জ্ঞাতব্যঃ মালেক ইবনে আরফুজা বর্ণনা করেছেন, আমি বসেছিলাম হজরত ওমরের পাশে। আব্দুল কায়েস বংশীয় এক জনকে তাঁর সামনে আনা হলো। হজরত ওমর তাকে বললেন, তুমি আব্দুল কায়েস বংশের অমুক? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি তখন তার হাতের ছড়ি দিয়ে লোকটিকে প্রহার করলেন। তারপর বললেন, বসো। সে বসলো। হজরত ওমর পাঠ করলেন 'আলিফ লাম রা' থেকে 'তা'ক্বিলুন' পর্যন্ত (১-২)। তারপর পুনরায় প্রহার করলেন তাকে। সে বললো, হে আমিরুল মু'মিনীন! আমার অপরাধ কি? তিনি বললেন, তুমি নাকি নবী দানিয়েলের কিতাবকে বেশী পছন্দ করো? সে বললো, তাহলে কী করবো? তিনি বললেন, বাড়ি যাও। কয়লা ও পশমী কাপড় দিয়ে ঘসে ঘসে মুছে ফেলো ওই কিতাবের লিপিসমূহ। এরপর তুমিতো পাঠ করবেই না, অপরকেও পাঠ করতে দিবে না। হজরত ওমর আরো বললেন, আমি একবার ইহুদীদের কিতাবের কিছু কিছু বক্তব্যের অনুলিপি চামড়ায় জড়িয়ে নিয়ে হাজির হলাম রসুল স.এর নিকটে। তিনি স. বললেন, তোমার হাতে কি ? আমি বললাম, একটি কিতাবের অনুলিপি,

www.eelm.weebly.com

জ্ঞানার্জনের জন্য সংগ্রহ করেছি। একথা শোনামাত্র রোষান্বিত হলেন তিনি। পবিত্র মুখমণ্ডল হয়ে গেলো রক্তিমাভ। জনৈক আনসার ঘোষণা করলেন, আসসালাতু জামিয়াহ (অস্ত্রসজ্জিত হও)। এরপর ঘোষণাকারী সশস্ত্র প্রহরীরূপে দাঁড়ালো মিম্বারের পাশে। মিম্বরে দণ্ডায়মান হলেন রসুল স.। বললেন, 'হে মানবমণ্ডলী! উত্তমরূপে অবগত হও যে, আমাকে দেয়া হয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট ও চিরন্তন বাণীবৈভব। উন্মোচিত করে দেয়া হয়েছে প্রাচীন ইতিবৃত্তসমূহ। আমি তোমাদের নিকট সেগুলো ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করে চলেছি সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায়। সুতরাং দ্বিধাসংশয়ের অবকাশ আর নেই। সাবধান! যারা সংশয়ান্বিত, তাদের দ্বারা তোমরা প্রতারিত যেনো না হও।' আমি বলে উঠলাম, আল্লাহ্‌কে প্রভুপালক হিসেবে, আপনাকে নবী হিসেবে এবং কোরআনকে আল্লাহ্‌র বাণী হিসেবে পেয়ে আমি চিরপ্রসন্ন। রসুল স. প্রসন্ন হলেন। নেমে এলেন মিম্বর থেকে। ইব্রাহিম নাখয়ী, ইজালাতুল খাফা।

হাকেম প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, একে একে বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণ হয়ে চললো রসুলুল্লাহ্‌র প্রতি। তিনি সেগুলো মানুষকে পাঠ করে শোনাতে লাগলেন। সাহাবায়ে কেরাম একবার বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! দয়া করে আপনি যদি আমাদের প্রাচীন ইতিবৃত্তসমূহ শোনাতেন। তখন অবতীর্ণ হলো— আল্লাহু নায্‌যালা আহ্‌সানাল হাদিস.....(আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন অত্যুত্তম বাণী...)। ইবনে আবী হাতেম এই বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন কিছু বর্ধিত আকারে। ওই বর্ধিত অংশটুকু এরকম— সাহাবায়ে কেরাম আরো নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! যদি আমাদেরকে কিছু সদুপদেশ দিতেন। তখন অবতীর্ণ হলো— আলাম ইয়ানি লিল্লাজীনা আমানু আন তাখ্‌শাআ কুলুবুহুম লি জিকরিল্লাহ্‌ (যারা বিশ্বাসী তাদেরকে কি আমি এরকম করিনি যে, তাদের অন্তরগুলো ভীত হবে আল্লাহ্‌র স্মরণে?)। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে মারদুবিয়াও অনুরূপ বর্ণনা এনেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস অথবা হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, সাহাবীগণ আবেদন জানালেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! অতীতের একটি কাহিনী আমাদেরকে শোনান। তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াতটি (৩)।

বলা হলো— 'আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কোরআন প্রেরণ করে; এর পূর্বে তুমি তো ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আমি আপনাকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে এই কোরআনের সুরা ইউসুফ এবার অবতীর্ণ করছি আপনার প্রতি। সুরা ইউসুফের এই কাহিনীটি অতি উত্তম কাহিনী। এই কাহিনীটি সম্পর্কে আপনি তো ইতোপূর্বে ছিলেন অনবহিত।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'আলকাসাস' অর্থ কাহিনী। শব্দটি হয়তো বা শব্দমূল। সেক্ষেত্রে কর্মকারকরূপে শব্দটির অর্থ দাঁড়াবে চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান, যা বর্ণিত হয়েছে অনুপম ভঙ্গিতে। অথবা 'আলকাসাস' অর্থ কেবলই 'কাহিনী', যে কাহিনীতে বিবৃত হয়েছে হজরত ইউসুফের বৈচিত্রময় জীবনের কথা। আরো বর্ণিত হয়েছে মহান আল্লাহ্‌র অপার ক্ষমতার বিস্ময়কর নিদর্শনরাজি এবং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ। প্রজ্ঞার বিচিত্র বিচ্ছুরণ। পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর সফল ও নির্ভুল দিক নির্দেশনা। আরো রয়েছে রমণী চরিত্রের রহস্যময় উন্মোচন। রাজানুজ্ঞা ও প্রজাপালনের দূরদৃষ্টি সঞ্জাত জ্ঞান। শত্রুশংকুল জীবনে সম্পাদ্য কর্তব্যনিচয়। বিজয় ও বিজয় পরবর্তী ঔদার্য ও মহানুভবতা ইত্যাদি।

খালেদ বিন মা'দান বলেছেন, বেহেশতবাসীরা অত্যন্ত আগ্রহভরে পাঠ করবেন সুরা ইউসুফ ও সুরা মারইয়াম। ইবনে আতা বলেছেন, দুঃখভারাক্রান্ত ব্যক্তি সুরা ইউসুফ পাঠ করে সান্ত্বনা লাভ করে।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৪, ৫, ৬

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَ

الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَٰجِدِينَ ۝ قَالَ يَٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ

إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَٰنَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ

نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ

إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

❒ স্মরণ কর, ইউসুফ তাহার পিতাকে বলিয়াছিল,'হে আমার পিতা! আমি একাদশ নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে দেখিয়াছি— দেখিয়াছি উহাদিগকে আমার প্রতি সিজ্‌দাবনত অবস্থায়।'

❒ সে বলিল, 'হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদিগের নিকট বর্ণনা করিও না; করিলে, তাহারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

www.eelm.weebly.com

❒ এইভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করিবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করিবেন যেভাবে তিনি ইহা পূর্বে পূর্ণ করিয়াছিলেন তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি। তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'আহসানুল কাসাস' (উত্তম কাহিনী) কথাটিকে যদি মাফউলে বিহি (কর্মপদ) ধরা হয়, তবে এখানকার ইজ ক্বলা ইউসুফ (ইউসুফ বললো) কথাটি হবে 'বদলে ইশতেমাল' (সামগ্রিকরূপে প্রতিস্থাপন)। নতুবা এর পূর্বে 'উজ্কুর' (স্মরণ করো) কথাটি অনুক্ত রয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। বঙ্গানুবাদে অবশ্য এরকমই করা হয়েছে। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন নবী ইউসুফ তাঁর পিতা নবী ইয়াকুবকে বললেন, হে আমার পিতা! অদ্ভুত একটি স্বপ্ন দেখেছি আমি। দেখেছি সূর্য, চন্দ্র ও এগারোটি নক্ষত্র আমাকে সেজদা করছে।

'ইউসুফ' শব্দটি হিব্রু। তাই শব্দটি গায়ের মুনসারেফ (অপরিবর্তনশীল)। হজরত ইউসুফের পিতা ছিলেন হজরত ইয়াকুব। তাঁর পিতা হজরত ইসহাক। আর হজরত ইসহাকের পিতা হজরত ইব্রাহিম। তাঁরা সকলেই ছিলেন মহামান্য নবী। হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ ও বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ইউসুফের পিতা ইয়াকুব। ইয়াকুবের পিতা ইসহাক। আর ইসহাকের পিতা ইব্রাহিম। তাঁরা সকলেই ছিলেন মহান নবী।

এখানে 'রআইতু' কথাটির অর্থ স্বপ্নে দেখেছি। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে'রুয়ত' ধাতুমূল থেকে। এর অর্থ— স্বপ্ন। সা'দ ইবনে মানসুর তাঁর সুনানে, বায্যার ও আবু ইয়ালী তাঁদের মসনদে, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া ও আবু শায়েখ তাঁদের আপনাপন তাফসীরে, উকাইলি ও ইবনে হাব্বান জুয়াফাতে, হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে এবং আবু নাঈম ও বায়হাকী দালায়েলুন নবুয়তে হজরত জাবের থেকে একটি বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। মুসলিমের শর্তানুসারে বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন হাকেম। বর্ণনাটি এই— এক ইহুদী (বায়হাকীর মতে তার নাম বুস্তান) একবার মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, মোহাম্মদ! নবী ইউসুফ স্বপ্নে যে নক্ষত্রগুলোকে দেখেছিলেন, সেগুলোর নাম বলুন। রসুল স. নিশ্চুপ রইলেন। ইত্যবসরে হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে রসুল স.কে নক্ষত্রগুলোর নাম জানিয়ে দিলেন। তিনি স. বললেন, যদি আমি নক্ষত্রগুলোর নাম বলতে পারি, তবে তুমি কি তা মানবে? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, ওই এগারোটি নক্ষত্রের নাম — ১. জিরছান ২.

www.eelm.weebly.com

তারিক ৩. জুবার ৪. কাবিস ৫. আমুদান ৬. আল ফালিক ৭. আলমিসবাহ ৮. জরুহ ৯. আল ফরগ ১০. ওছাব এবং ১১. জুল কাফাতাইন। ইহুদী বললো, আল্লাহর কসম আপনি ঠিকই বলেছেন।

সেজদা করা বিবেক সম্পন্ন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এখানে নক্ষত্রের মতো বিবেকবর্জিত সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে বিবেকসম্পন্নদের সর্বনাম 'হুম' । এতে করে বুঝা যায়, ওই এগারোটি নক্ষত্র ছিলো হজরত ইউসুফের এগারোজন ভ্রাতার প্রতীক। পিতার প্রতীক সূর্য, আর মাতার প্রতীক চন্দ্র।

সুদ্দী বলেছেন, হজরত ইউসুফের মাতা ছিলেন রাহীল। তিনি তখন পরলোকগতা। তাই চন্দ্র ছিলো তাঁর খালার প্রতীক। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আরবী ভাষায় 'শামস'(সূর্য) ব্যবহৃত হয় স্ত্রীলিঙ্গে। আর 'কমার'(চন্দ্র) ব্যবহৃত হয় পুংলিঙ্গে। সুতরাং এখানে সূর্য দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে মাতার প্রতি এবং পিতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে চন্দ্রের মাধ্যমে। কিন্তু বক্তব্যটি প্রমাদপূর্ণ। অভিধানে শব্দ দু'টোকে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ সাব্যস্ত করলেও বাস্তবে সূর্য ও চন্দ্র কোনোটিরই লিঙ্গ নেই। সূর্য চন্দ্রাপেক্ষা উজ্জ্বল। তাই সূর্যকে পিতার এবং চন্দ্রকে মাতার প্রতীক ধরা হয়েছে। এটাই যুক্তিসঙ্গত। হজরত ইউসুফের স্বপ্ন দর্শনের রাতটি ছিলো শুক্রবারের রাত। ওই দিন ছিলো শবে কদরও। কোনো কোনো বিদ্বান্ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত স্বপ্ন দর্শনের পরেই মহামর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন হজরত ইউসুফ।

পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদের নিকট বর্ণনা কোরো না; করলে, তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।' একথার অর্থ— হজরত ইয়াকুব স্নেহসিক্ত স্বরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ইউসুফকে বললেন, বৎস! সাবধান! তোমার অগ্রজদেরকে তোমার স্বপ্নের কথা জানিয়ো না। জানালে তারা তোমাকে হিংসা করবে এবং ষড়যন্ত্র উপস্থিত করবে তোমার বিরুদ্ধে। সুতরাং শয়তানকে এমতো সুযোগ দিয়ো না। কারণ সে মানুষের নিশ্চিত শত্রু। এখানে 'বুনাইয়া' অর্থ বৎস। স্নেহের আতিশয্যবশতঃ বয়োকনিষ্ঠদেরকে 'বুনাইয়া' বলে সম্বোধন করা হয়। এখানেও তাই করা হয়েছে। বাগবী লিখেছেন, তখন হজরত ইউসুফ ছিলেন বারো বছরের বালক।

'রুইয়া' অর্থ নিদ্রা। আর 'রুইয়াত' অর্থ স্বপ্ন। নিদ্রা অথবা তন্দ্রাজাত দর্শনকে বলে স্বপ্ন। বায়যাবী লিখেছেন, ধারণার গণ্ডি অতিক্রম করে অনুভূতির একটি বিশেষ অবস্থানে লীন হওয়াকে স্বপ্ন বলা হয়। মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তার সঙ্গে একটি গূঢ় সম্পর্ক রয়েছে ফেরেশতা জগতের। নিদ্রা বা অন্য কোনো উপায়ে দৈহিক সম্পর্কের প্রভাব স্তিমিত হলে মানবাত্মা হয়ে পড়ে ফেরেশতামুখী। কারণ

www.eelm.weebly.com

ফেরেশতাজগতে রয়েছে সত্তার কায়াহীনতা ও মূল তত্ত্ব। আত্মা সেখান থেকেই লাভ করে তার অস্তিত্বের নিগূঢ় অভিজ্ঞান। ফিরে এসে সেই অভিজ্ঞান উপস্থাপন করে বিবেকের সামনে। তখন উদঘাটিত হয় স্বপ্নের স্বরূপ। সত্য স্বপ্ন দর্শনের এটাই নিয়ম। সাকার ও নিরাকার সত্তার মধ্যে সুগভীর সম্পর্ক থাকলে বিষয়টি হয় অধিকতর সহজ। তখন স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন আর থাকে না।

আমি বলি, ধারণার জগতে বোধ ও বুদ্ধির অবলোপন ঘটলে জেগে ওঠে আত্মা। শুরু হয় তার সংগুপ্ত পর্যালোচনা। এরকম ঘটতে পারে কেবল নিদ্রা অথবা আত্মসমাহিত অবস্থায়। এ সময় আত্মা অবস্থান করে দৈহিক নিয়ম-নিগড়ের বাইরে। তিনটি রূপ রয়েছে এ অবস্থায়, তন্মধ্যে দু'টি প্রমাদপূর্ণ, আর একটি প্রমাদবিমুক্ত। প্রমাদমুক্তটিও আবার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। এ অবস্থায় তাবীর বা ব্যাখ্যা কখনো ভুল হয়ে যায়, আবার কখনো হয় শুদ্ধ। স্বপ্নরূপের প্রকার তিনটি এরকম—

১. জাগ্রত অবস্থায় দর্শিত দৃশ্যাবলীই প্রতিভাত হয় স্বপ্নে। অথবা স্বপ্নে পরিদৃশ্যমান হয় মস্তিষ্কজাত ধারণার বিভিন্ন আকার। এ ধরনের স্বপ্নকে বলা যেতে পারে কুপ্রবৃত্তিজাত স্বপ্ন।
২. শয়তান চলাচল করে মানুষের শিরা উপশিরায়। এভাবে সে নিদ্রাবস্থায় মানুষের ধারণা প্রবাহে সঞ্চালন করে ভীতি অথবা উল্লাস। এ ধরনের স্বপ্নকে বলে শয়তানী স্বপ্ন।
৩. আল্লাহ্‌র অদৃশ্যভাণ্ডার থেকে বা তাঁর কোনো গোপন গুণবত্তা থেকে স্বপ্নে দেয়া হয় সুসংবাদরূপী বিশেষ অনুগ্রহ। এই বিশেষ অনুগ্রহই স্বপ্নে প্রদত্ত ইলহাম বা ইলক্বা। হজরত উবাদা ইবনে সামেতের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের সঙ্গে স্বপ্নে আলাপন করেন। বিশুদ্ধ সূত্র পরম্পরায় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী।— এ ধরনের স্বপ্নই হচ্ছে বিশুদ্ধ স্বপ্ন।

স্বপ্ন সম্পর্কে সুফী দার্শনিকগণের ধারণা এরকম— জগত দু'টি, বৃহৎ জগত ও ক্ষুদ্র জগত (আলমে কবীর ও আলমে সগীর)। সমগ্র সৃষ্টি হচ্ছে বৃহৎ জগত। আর এক এক জন মানুষ হচ্ছে এক একটি ক্ষুদ্র জগত। বৃহৎ জগতের সকল উপকরণ ও বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত ও সংক্ষিপ্ত সমাহার ঘটেছে ক্ষুদ্র জগতে। তাই এই দুই জগতের মধ্যে রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক ও সুনিপুণ সাদৃশ্য। এ বিশাল সৃষ্টির রহস্যে মানুষের সত্তাও রহস্যাচ্ছাদিত। অনুভূতি ও অনুভূতির অতীত বিষয়াবলীও তাই দুই জগতেই বিদ্যমান। যেমন রোগ-ব্যাধি, জন্ম-মৃত্যু, সময়-অসময় ইত্যাদি। দৃশ্যতঃ বৃহৎ জগত জড় বস্তু তুল্য মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তা নয়। আর যার আকার নেই, তার আকারও প্রতিভাসিত হতে পারে অন্তর্দৃষ্টিতে।

www.eelm.weebly.com

যেমন রসুল স. জ্বরকে স্বপ্নে দেখেছিলেন কৃষ্ণমুখী রমণীরূপে। আর ইউসুফ সুদিন ও দুর্দিনকে দেখেছিলেন যথাক্রমে স্থুলকায় ও কৃশকায় গাভীরূপে। তবে এ কথাটি ঠিক নয় যে, বৃহৎজগতে প্রতিভাত রূপ ও ক্ষুদ্রজগতে প্রতিভাত রূপ সব সময় সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। এমনও হতে পারে যে, স্বপ্নে দর্শিত ঘটনা বাস্তবের সম্পূর্ণ বিপরীত। অথবা স্বপ্নে ধরা পড়েছে প্রতীকি দৃশ্য— যা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এধরনের প্রতীকি বা উপমাময় স্বপ্ন বাহ্যতঃ বাস্তবতাবিরোধী মনে হলেও অন্তর্গত দিক থেকে সম্পূর্ণতই সাদৃশ্যশোভিত। এ ধরনের স্বপ্নই দেখেছিলেন হজরত ইউসুফ। পিতা, মাতা ও তাঁর এগারোজন অগ্রজের উপমারূপে সূর্য, চন্দ্র ও এগারোটি নক্ষত্রকে দেখেছিলেন তাঁকে সেজদা করতে।

রসুল স. বলেছেন, ছয়টি স্বপ্নের তাবীর এরকম— ১. স্বপ্নে রমণী দর্শনের তাৎপর্য শুভ, ২. উট দেখলে যুদ্ধ অনিবার্য, ৩. দুধ দেখলে বুঝতে হবে লাভ হবে শুদ্ধাচারী জীবন, ৪. শাক-সব্জী দেখলে লাভ হবে জান্নাত, ৫. নৌকা দেখলে পরিত্রাণ লাভ হবে, আর ৬. শীষ দেখলে বাড়বে রিজিক। হাদিসটি মুয়াজ্জম গ্রন্থে শিথিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবু ইয়ালী।

আলমে কবীরের এই খেয়ালী জগতকে বলে আলমে মেছাল বা উপমার জগত। ইমাম গায্যালী ও শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী এই জগতকে বলেছেন আলমে ইশবাহ। ইন্দ্রিয়জ প্রভাব থেকে মানবাত্মা যখন মুক্ত হয়, তখন সে মনোযোগী হয় এই জগতের প্রতি। আর তখনই আলমে মেছালের কিছু কিছু দৃশ্য ছায়া ফেলে আত্মার আয়নায়। এই দর্শনের নাম শুভস্বপ্ন।

নবী রসুলগণের অন্তরাত্মা সতত পবিত্র। শয়তান ও রিপুর প্রভাব থেকে তাঁরা সুরক্ষিত। তাঁদের নিদ্রা চোখ ও দেহকে বিবশ করে মাত্র। কিন্তু তাঁদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে সদা জাগ্রত। তাঁদের স্বপ্নে বিচ্যুতির প্রবেশাধিকার মাত্র নেই। তাই তাঁদের স্বপ্ন হচ্ছে ওহী বা প্রত্যাদেশ, যা সম্পূর্ণ নির্ভুল। হজরত ইব্রাহিম স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি তাঁর পবিত্র পুত্রকে কোরবানী করছেন। স্বপ্নদর্শনের পর প্রিয় পুত্রকে বললেন, প্রিয় পুত্র আমার! স্বপ্নে দেখলাম, আমি তোমাকে কোরবানী করছি। পুত্র প্রত্যুত্তরে বললেন, হে আমার মহান জনয়িতা! যা আদিষ্ট হয়েছেন, তা করে ফেলুন। পিতার মতো তিনিও ছিলেন নবী। তাই তিনি জানতেন পিতার স্বপ্ন হচ্ছে প্রত্যাদেশ, যা অবশ্যই পালনীয়।

আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ দয়ায় ও কঠোর সাধনার ফলে আউলিয়া সম্প্রদায়ও অর্জন করেন আত্মার পবিত্রতা। আপনাপন নবীর একনিষ্ঠ অনুসরণের ফলে তাঁদের অন্তরাত্মাও হয় স্বচ্ছ দর্পণ বা অনাবিল সলিলের মতো। তাই তাঁদের অধিকাংশ স্বপ্নই সত্য ও শুভ। নবীগণের মতো তাঁরা সতত সুরক্ষিত নন বলেই তাঁদের কোনো কোনো স্বপ্নে থাকে ভুলের মিশ্রণ। পার্থিব জীবন বড়ই জটিল ও

www.eelm.weebly.com

আবিল। তাই তাঁদেরকে অনবধানতাবশতঃ কখনো কখনো ভক্ষণ করতে হয় সন্দিগ্ধ আহার্য। ফলে অন্তর্দর্পনে পড়ে মলিনতার ছাপ। ওই সময়ের দর্শিত স্বপ্ন তাই জটিলতা ও আবিলতামুক্ত নয়। নির্ভুলও নয়। নবী রসুলগণ নিষ্পাপ। আর আউলিয়া কেরাম সুরক্ষিত। তাই তাঁদের দর্শিত স্বপ্নে তারতম্য তো থাকবেই। নবী রসুলগণ প্রত্যাদেশের অবতরণ স্থল। আর আউলিয়াগণ প্রত্যাদেশের অনুসারী। পাপাচারী জনতা ও সমাজের প্রবল প্রভাব তাঁদেরকে কখনো কখনো আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাই তাঁদের স্বপ্ন নবীগণের স্বপ্নের মতো নির্ভুল, অকাট্য ও অনুসরণীয় নয়। রসুল স. এর পবিত্র বাণীর মাধ্যমে তাই তাদের স্বপ্নের মর্যাদা নির্ণীত হয়েছে এভাবে— মুমিনদের শুভ স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর এক হাদিসে এসেছে—চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। হজরত আনাস, হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। আহমদ, তিরমিজি ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, কেবল হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে। হজরত আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী। আর কেবল হজরত ইবনে ওমর ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম। হজরত আবু রজীন থেকে বর্ণনা করেছেন আহমদ ও ইবনে মাজা। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন তিবরানী। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনাগুলো ছাড়া অন্য বর্ণনাগুলোতে স্বপ্ন(রুইয়াত) এর স্থলে উল্লেখিত হয়েছে 'রুইয়াতে সালেহা' (সত্য দর্শন)।

ইবনে মাজা ও আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, একজন আল্লাহ্‌ভীরু মুসলমানের স্বপ্ন নবুয়তের সত্তর ভাগের একভাগ। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু রজীন বলেছেন, মুমিনগণের স্বপ্ন নবুয়তের চল্লিশ অংশের এক অংশ। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব বলেছেন, একজন পুণ্যবান মুসলমানের স্বপ্ন আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে তার প্রতি সুসংবাদ এবং তার নবুয়তের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। ইবনে নাজ্জার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, বিশ্বাসীদের স্বপ্ন নবুয়তের পঁচিশ অংশের এক অংশ।

একটি জিজ্ঞাসাঃ স্বপ্ন নবুয়তের একটি অংশ— একথার অর্থ কী? উপরের আলোচনায় বিবৃত হয়েছে, অংশের সংখ্যাগত তারতম্য। এর সমাধানই বা কী?

জবাবঃ রসুল স. এর উপরে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিলো তেইশ বছর ধরে। প্রথমদিকের ছয়মাস ছিলো সত্য স্বপ্ন দর্শনের সময়। তখন যে সকল স্বপ্ন তিনি দেখতেন, বাস্তবে তাই প্রতিফলিত হতো প্রভাতের আলোর মতো।

স্বপ্ন দর্শনের ওই ছয়মাস তেইশ বৎসরের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগই হয়। তাই বলা হয়েছে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের একভাগ। চল্লিশ-পঞ্চাশ

www.eelm.weebly.com

ভাগের বর্ণনাগুলো সম্ভবতঃ অনুমান নির্ভর। আর সত্তর ভাগের বর্ণনা দ্বারা আধিক্য বুঝানো হয়েছে। নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তাদের জন্য আপনি সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও।' একথার অর্থ— তাদের জন্য আপনি অসংখ্যবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও। এভাবে 'সত্তর অংশের এক অংশ' কথাটির অর্থ হবে 'অসংখ্য অংশের এক অংশ।' আর পঁচিশ অংশের এক অংশ বর্ণনাটি একটি বিরল বর্ণনা।

উল্লেখ্য যে, সর্বসাধারণের স্বপ্ন কিন্তু নবীগণের স্বপ্নের মতো নয়। তাদের স্বপ্নও উপমার জগতের প্রতিবিম্বজাত। কিন্তু পাপ ও প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। তাই তাদের অধিকাংশ স্বপ্ন প্রমাদপূর্ণ ও অসত্য। প্রতিবিম্ব ধারণের প্রকৃতি ও উপমার জগতের আকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত না হলে স্বপ্নের তাৎপর্য হবে ভ্রমাত্মক। স্বপ্নের সঠিক তাৎপর্য অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে। তাই এরশাদ হয়েছে— 'আল্লাহ্ স্বপ্নের তাৎপর্য তোমাদেরকে ইলহামরূপে শিক্ষা দেন।' পুণ্যবান ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভাগ্যেই জোটে ইলহাম। আর সেই ইলহামের স্বরূপ নির্ণীত হয় বিশুদ্ধ বোধের মাধ্যমে। হজরত আবু রজীন থেকে যথাসূত্রে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীগণের স্বপ্ন নবুয়তের চল্লিশভাগের একভাগ। বর্ণনা করার পূর্ব পর্যন্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত ঝুলতে থাকে পাখির ডানায়। বর্ণনা করার পর তা ডানা থেকে খসে পড়ে। অন্তরঙ্গ বন্ধু অথবা বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া স্বপ্নের কথা কাউকে বোলো না। কোনো কোনো বর্ণনায় 'অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া' কথাটির স্থলে উল্লেখিত হয়েছে 'যাকে ভালো মনে করো তাকে ছাড়া'। আবু দাউদ ও ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসে এসেছে, পাখির পাখায় ঝুলন্ত থাকে তোমাদের স্বপ্নগুলো। বিবৃত করার সাথে সাথে তা পাখা থেকে ঝরে যায়। বিচক্ষণ ও সুহৃদ ব্যতীত অন্য কারো সম্মুখে স্বপ্নের বিবরণ দিয়ো না।

আমার মতে হাদিসে উল্লেখিত 'তাইর' শব্দটির অর্থ নিয়তি বা ভাগ্যলিপি। প্রতিটি মানুষের ভাগ্যলিপি সুনির্ধারিত। কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে— 'প্রত্যেকের স্কন্ধে আমি অবধারিত করে দিয়েছি তার নিয়তি।' এভাবে হাদিসের মর্ম হবে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশ্বাসীর স্বপ্ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার নিয়তির বিধানের উপর। স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ না করা পর্যন্ত ওই নিয়তি থাকে অজ্ঞাত। যখন কোনো ইলহাম প্রভাবিত ব্যক্তি, বিবেচক ও বিজ্ঞজন কর্তৃক এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়, তখন তা খসে যায় পাখির পালক থেকে। অর্থাৎ স্বপ্নের উদ্দেশ্য তখন প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিচক্ষণ ও সজ্জন ছাড়া অন্য কাউকে স্বপ্নের কথা বলা যায় না। বলা যায় কেবল তাদেরকেই, যারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসীদেরকে ভালোবাসে। 'মান তুহিব্বু' কথাটির মর্ম এটাই। সজ্জন ও বিচক্ষণজনেরাই কেবল বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা করতে পারে স্বপ্নের।

www.eelm.weebly.com

হজরত আউফ বিন মালেক থেকে যথাসূত্রে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, স্বপ্ন তিন ধরনের— ১. শয়তানের পক্ষ থেকে শংকাসঞ্চারক স্বপ্ন, ২. জাগ্রত অবস্থায় কথোপকথন ও কল্পনারঞ্জিত স্বপ্ন, ৩. ওই স্বপ্ন, যা নবুয়তের ছয়চল্লিশ অংশের একটি অংশ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, স্বপ্ন তিন প্রকার — ১. আল্লাহ্পাক কর্তৃক প্রদত্ত শুভসংবাদ ২. অপপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ৩. শয়তানের প্ররোচনা। শুভ স্বপ্ন প্রকাশ করা যেতে পারে। আবার তা গোপনও রাখা যায়। কিন্তু অশুভ স্বপ্ন প্রকাশ করা যায় না। তাই অশুভ স্বপ্ন দেখলে শয্যা থেকে গাত্রোত্থান করবে এবং নামাজ পাঠ করবে। আমি স্বপ্নে গলার মালা দেখাকে অশুভ মনে করি। আর শুভ মনে করি বরই (কুল) দেখাকে।

হজরত কাতাদা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, শুভ স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং অশুভ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। অশুভ স্বপ্ন দেখে জেগে উঠার সাথে সাথে বাম পাশে থুথু নিক্ষেপ করবে। শয়তানের প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করবে। আর স্বপ্নের কথা কারো কাছে বলবে না। এরকম করলে ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। আর শুভ স্বপ্ন দেখলে পুলকিত হবে। প্রিয়জন ছাড়া অন্য কারো কাছে স্বপ্নবৃত্তান্ত উন্মোচন করবে না। বোখারী ও মুসলিম তাঁদের আপনাপন গ্রন্থে, আবু দাউদ তাঁর সুনানে এবং তিরমিজি তাঁর 'জামে' গ্রন্থে লিখেছেন, সুন্দর স্বপ্ন আসে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে । আর শয়তানের পক্ষ থেকে আসে অশুভ স্বপ্ন। স্বপ্নে অশুভ কোনো কিছু দর্শন করলে জাগ্রত হয়ে বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে। যাচ্ঞা করবে আল্লাহ্র শরণ। তাহলে কোনো ক্ষতি হবে না।

উল্লেখ্য যে, শয়তানের প্ররোচনাজনিত অশুভ স্বপ্ন দর্শনের পর আল্লাহ্র সাহায্যপ্রার্থী হলে অশুভ প্রভাব লুপ্ত হয়ে যায়। আর উপমার জগতের প্রতিচ্ছবিরূপী স্বপ্নের ফলাফল থাকে ঝুলন্ত। আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিত হলে ওই ঝুলন্ত পরিণাম শূন্যেই বিলীন হয়ে যেতে পারে। অশুভ স্বপ্নদৃষ্টে নামাজ পাঠ করতে বলা হয়েছে, অযথা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা নামাজ পাঠ অবশ্যই শ্রেয়। নামাজের মাধ্যমে অশুভ পরিণতি প্রতিহত হওয়াও সম্ভব। কারণ নামাজ হচ্ছে দোয়া। হজরত সালমান ফারসী থেকে বোখারী ও মুসলিম এবং হজরত সাওবান থেকে ইবনে হাব্বান ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স.বলেছেন, ঝুলন্ত নিয়তিকে দোয়া ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই প্রতিরোধ করতে পারে না।

www.eelm.weebly.com

স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ না করার নিষেধাজ্ঞাটি হারামসুলভ (তাহরীমি) নয়, হালালসুলভ (তানজিহি)ও নয়। এই নিষেধাজ্ঞাটি উল্লেখ করা হয়েছে উদ্বেগ প্রশমনার্থে। রসুল স. উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাঁর জুলফিকার তরবারিটির ধার ভেঙে গিয়েছে। এটা ছিলো বিপদের আলামত। আরো দেখেছিলেন, গাভী জবাই করার দৃশ্য। এটাও ছিলো মুসিবতের আগাম সংকেত। সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করা হয়েছে। রসুল স. আর একবার স্বপ্নে দেখেছিলেন, বনী উমাইয়া আরোহণ করেছে তাঁর পবিত্র মিম্বরে। স্বপ্নটি দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন তিনি। হৃদয়ের উদ্বেগ প্রশমনকল্পে তিনি স্বপ্নবৃত্তান্তটি প্রকাশও করে দিয়েছিলেন। সুরা কৃদরের তাফসীরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্তায়ালা।

কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসাইনের শহীদ হওয়ার সংবাদ স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস। জনসমক্ষে তিনি তা প্রকাশও করে দিয়েছিলেন।

আমি বলি, অশুভ বার্তা শত্রুকুলকে উল্লসিত করে। আর শুভ স্বপ্ন তাদের অন্তরে জ্বালিয়ে দেয় হিংসার আগুন। তাই স্বপ্নের কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। হজরত ইয়াকুবও তাই তাঁর প্রিয় পুত্র হজরত ইউসুফকে তাঁর স্বপ্নবৃত্তান্তের কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্নবৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদের নিকটে প্রকাশ কোরো না। যদি করো তবে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'এভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন।' হজরত ইউসুফকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে কথাটি। কথাটির অর্থ— হে ইউসুফ! আমিই তোমাকে সুসংবাদবাহী স্বপ্ন দেখিয়েছি। এখন তুমি বালক। কিন্তু আগামীতে তুমিই হবে আমার মনোনীত নবী, রাষ্ট্রনায়ক এবং আরো অনেক মহৎ কর্মকাণ্ডের আয়োজক।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন।' স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে বলে তা'বীর। শব্দটি স্বপ্ন-সংশ্লিষ্ট। তাই একে তা'বীলও বলে। প্রকৃত পক্ষে তা'বীল বলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পবিত্র বাণীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যভেদ ও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের পরিবার পরিজনের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন যেভাবে তিনি এটা পূর্বে পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম ও ইসহাকের প্রতি।' এখানে নেয়ামত বা অনুগ্রহ অর্থ নবুয়ত। আর 'ইয়াকুবের পরিবার পরিজন'— কথাটির অর্থ, ইসরাইল বংশীয় নবীগণ। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত ইয়াকুবের ঔরসজাত সন্তানগণ— যেহেতু তাঁর সকল সন্তানই ছিলেন নবী। উক্তিটি কিন্তু দুর্বল। এখানে 'আবাওয়াইকা' শব্দটির অর্থ পিতামহ ও প্রপিতামহ। অর্থাৎ পিতৃপুরুষ।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় বলেই তাঁর নির্বাচন নির্ভুল। তাই তিনি যোগ্য ব্যক্তিকেই নবী নির্বাচন করেন।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯, ১০

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ ۝ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ۝

❒ ইউসুফ এবং তাহার ভ্রাতাদিগের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদিগের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

❒ স্মরণ কর, উহারা বলিয়াছিল, 'আমাদিগের পিতার নিকট ইউসুফ এবং তাহার ভ্রাতাই আমাদিগের অপেক্ষা অধিক প্রিয়, যদিও আমরা দলে ভারী; আমাদিগের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছেন।

❒ 'ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাহাকে কোন স্থানে নির্বাসন দাও, ফলে তোমাদিগের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদিগতেই নিবিষ্ট হইবে এবং তাহার পর তোমরা ভাল লোক হইয়া যাইবে।'

❒ উহাদিগের মধ্যে একজন বলিল, 'ইউসুফকে হত্যা করিও না এবং তোমরা যদি কিছু করিতেই চাহ তাহাকে কোন গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, যাত্রীদলের কেহ তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইবে।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— নবী ইউসুফ ও তাঁর ভ্রাতৃবর্গের কাহিনীটির মধ্যে রয়েছে ঘটনার বহু বিচিত্র কল্লোল। রয়েছে মানব চরিত্র ও মানব সমাজের বহুমাত্রিক উন্মোচন। তাই অনুসন্ধিৎসুরা এই কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেন না।

হজরত ইয়াকুবের প্রথম পত্নী ছিলেন তাঁর মাতুল-তনয়া লিয়া বিনতে লিয়াম। ছয় পুত্র ও এক কন্যার জননী ছিলেন তিনি। বয়োক্রমানুসারে ছয় পুত্রের নাম — রুবেল, শামউন, লাদী, ইয়াহুদ, রাইয়ান ও ইয়াশহার। আর কন্যার নাম ছিলো

www.eelm.weebly.com

দীনা। জুলফা ও ইয়ালহামা নাম্নী দুই দাসীর গর্ভে জন্মেছিলো চারটি পুত্র সন্তান। তাদের নাম— দানা, তাদ্‌তালী, জাদা ও আশার। বর্ণনা করেছেন বাগবী। তিনি একথাও লিখেছেন যে, প্রথমার পরলোকগমনের পর তাঁর ছোট বোন রাহীলকে বিবাহ করেছিলেন হজরত ইয়াকুব। এই দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন অগ্রজ হজরত ইউসুফ এবং অনুজ বিনইয়ামিন। এভাবে হজরত ইউসুফেরা হয়ে যান দ্বাদশ ভ্রাতা।

বায়যাবী লিখেছেন, ইসরাইলী শরিয়তে একই সঙ্গে দুই বোনকে বিবাহবন্ধ করা যেতো। তাই লিয়া এবং রাহীল সহোদরা হওয়া সত্ত্বেও একই সময়ে হজরত ইয়াকুবের সহধর্মিণী ছিলেন।

কতিপয় ইহুদী রসুল স. এর নিকটে হজরত ইউসুফের কাহিনী শুনতে চেয়েছিলো। ওই সকল ইহুদীকেই আলোচ্য আয়াতে জিজ্ঞাসু বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের জন্যই এই কাহিনীতে রয়েছে নিদর্শন। বাগবী এরকম বলেছেন।

কোনো কোনো আলেম হজরত ইয়াকুবের পুত্রগণের কেনান থেকে মিসর গমণের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলেছেন। রসুল স. কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন প্রত্যাদেশানুসারে। তওরাত শরীফের পূর্ণ অনুকূল ছিলো বলে ইহুদীরাও কাহিনীটিকে মেনে নিয়েছিলো। আর কাহিনীটি শুনতে চেয়েছিলো তারাই। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'জিজ্ঞাসুদের' বলে কেবল ইহুদীদেরকে বুঝানো হয়নি, বুঝানো হয়েছে সকল অনুসন্ধিৎসুকে। কারণ এতে রয়েছে তওহীদ ও নবুয়তের অনেক প্রোজ্জ্বল নিদর্শন। কারো কারো মতে দৃষ্টান্তস্থাপন ও সতর্কীকরণই এই কাহিনীটির উদ্দেশ্য। হজরত ইউসুফের ভ্রাতৃবর্গ ছিলো ঈর্ষাপরায়ণ। কূপে নিক্ষিপ্ত হজরত ইউসুফ দাসরূপে গমন করেছিলেন মিসরে। কাম ও ক্ষোভের অগ্নিতে দগ্ধিভূত হয়েছিলো আজিজ-গৃহিনী জুলায়খা। ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অনুপ্রবেশ করেছিলেন কারাগারে। সেখানে আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে পেয়েছিলেন স্বপ্ন সংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞান। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পর হয়েছিলেন মিসরের অধীশ্বর। এভাবে তিনি ইতিহাসে অঙ্কিত হয়েছেন সত্য, সংগ্রাম ও সফলতার এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে। আর এভাবেই তাঁর কাহিনীর মাধ্যমে সতর্ক করা হয়েছে ঈর্ষাপ্রবণ, কামান্ধ ও অংশীবাদীদেরকে। এই কাহিনীটি আবার শেষ নবী মোহাম্মদ স. এর নবুয়তের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রসুল স. এই কাহিনীটি কোনো গ্রন্থ পাঠ করে কিংবা কারো নিকটে শুনে বলেননি। বলেছেন প্রত্যাদেশানুসারে। প্রত্যাদেশই হচ্ছে নবুয়তের চরম ও পরম পরাকাষ্ঠা।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, তারা বলেছিলো, আমাদের পিতার নিকট ইউসুফ ও তার ভ্রাতাই আমাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়, যদিও আমরা দলে ভারী। এ কথার অর্থ— হজরত ইউসুফ ও তাঁর সহোদর অনুজ বিন

www.eelm.weebly.com

ইয়ামিনকে হিংসা করতে লাগলো তাদের বৈমাত্রেয় দশ ভাই। বললো , ইউসুফ ও তার ছোট ভাইটাই পিতৃমহোদয়ের অধিক প্রিয়। আমাদের প্রতি তাঁর ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই, যদিও আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

'নাহ্নু উস্বাতুন' অর্থ আমরা দলে ভারী। ফাররা বলেছেন, দশ অথবা তদূর্ধ সংখ্যক লোকের দলকে বলে উস্বাহ্ । কেউ কেউ বলেছেন, এক থেকে দশ জন পর্যন্ত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তিন থেকে দশ। কারো কারো মতে দশ থেকে চল্লিশ। মুজাহিদের মতে দশ থেকে পনের । কামুস অভিধানে রয়েছে মানুষ, ঘোড়া ও পাখি গণনার ক্ষেত্রে দশ থেকে চল্লিশ সংখ্যার দলকে বলে উস্বাহ্। জামারী বলেছেন, উস্বাহ্ কথাটি প্রযোজ্য হবে কেবল মানুষের বেলায়। শব্দটির বহুবচন 'উসাব'। কেউ কেউ বলেছেন, সংহত ও সংঘবদ্ধ দলকে বলে উস্বাহ্। সুতরাং এখানে 'নাহ্নু উস্বাতুন' কথাটির অর্থ হবে— আমাদের এই দশ জনের দলটি একটি সুসংহত দল।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছেন।' এখানে 'দ্বলাল' শব্দটির অর্থ সাংসারিক বিভ্রান্তি, ধর্মীয় বিভ্রান্তি নয়। অর্থাৎ হজরত ইউসুফের বিদ্রোহী ভ্রাতারা হজরত ইয়াকুবকে ধর্মভ্রষ্ট মনে করতো না। করলে তারা হয়ে যেতো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাদের ধারণাটি ছিলো এরকম— আমাদের পিতা ইউসুফ ও তার অনুজের প্রতি স্নেহান্ধ। তাই তিনি তাদেরকে বেশী ভালোবাসেন। অথচ কৃষিকাজ, পশুপালন সবকিছুই আমরা করি। আর ওরা দু'জন থাকে পিতার একান্ত সান্নিধ্যে। আমরা কর্মব্যস্ত। আর ওরা নিষ্কর্মা।

এর পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে—'ইউসুফকে হত্যা করো।' ওয়াহাব বলেছেন, এই উক্তিটি করেছিলো শামউন। কা'ব বলেছেন, কথাটি উচ্চারণ করেছিলো দানা। মুকাতিল বলেছেন, 'ইউসুফকে হত্যা করো' কথাটি বলেছিলো রুবেল। মোট কথা, তাদের দশ জনের মধ্যে যে কোনো একজন এরকম বলেছিলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'অথবা তাকে কোনো স্থানে নির্বাসন দাও, ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের দিকেই নিবিষ্ট হবে।' এখানে 'আরদ্বান্' শব্দটিতে 'তানভিন' ব্যবহারের কারণে অর্থ দাঁড়িয়েছে এরকম— নির্বাসন দিতে হবে ধুসর, দুর্গম ও অচেনা কোনো স্থানে । অর্থাৎ এরকম স্থানে ইউসুফকে নির্বাসন দিলে পিতা কোনো দিনই আর তাকে খুঁজে পাবেন না। ফলে তাঁর সকল স্নেহের ভাগীদার হবো কেবল আমরা।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তারপর তোমরা ভালো লোক হয়ে যাবে।' একথার অর্থ— ইউসুফকে হত্যা অথবা নির্বাসনদানের পর আল্লাহ্পাকের নিকটে মার্জনা চেয়ে নিলেই চলবে। তিনি তো পরম ক্ষমাপরবশ। তাই তিনি আমাদেরকে

www.eelm.weebly.com

মার্জনা করবেনই। আর আমরাও তখন হয়ে যাবো শুদ্ধাচারী। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— আমরা তখন নানাবিধ ওজর আপত্তি দেখিয়ে এবং আন্তরিক সম্মান ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করে পিতাকে প্রসন্ন করতে চেষ্টা করবো। তিনিও প্রসন্ন হবেন। কারণ তিনিতো আমাদের পিতা। আর আমরাও তখন হয়ে যাবো সাধু। এরকম বলেছেন মুকাতিল। এরকম বলাও অসংগত হবে না যে— আমরা তখন সত্যিসত্যিই সংশোধিত হবো। ফলে পিতার সম্পূর্ণ মনোযোগ আকৃষ্ট হবে কেবল আমাদের প্রতি।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'তাদের মধ্যে একজন বললো, ইউসুফকে হত্যা কোরো না এবং তোমরা যদি কিছু করতেই চাও, তবে তাকে কোনো গভীর কূপে নিক্ষেপ করো, যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।' কাতাদা বলেছেন, এই উক্তিটি করেছিলো রুবেল। বাগবী লিখেছেন, ইয়াহুদা। এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ। হত্যা একটি মহা অপরাধ। তাই তারা শেষ পর্যন্ত হজরত ইউসুফকে বিজন প্রান্তরের কোনো অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো। এখানে 'গাইয়াবাত' অর্থ কূপ বা গর্ত। প্রকৃতপক্ষে শব্দটির দ্বারা ওই স্থানকে বুঝানো হয় যেখানে প্রবেশ করলে হতে হয় নিরুদ্দেশ।

বাগবী লিখেছেন, অতল কূপকে বলে জুব্। কামুস অভিধানে রয়েছে, জুব্ বলে গভীরতম কূপকে, যে কূপে থাকে অগাধ জলরাশি। অথবা ওই কূপকে, যা প্রবহমান থাকে কোনো উত্তম স্থানে বা কৃষিক্ষেত্রে। অথবা কথাটির অর্থ অতল কোনো প্রাকৃতিক কূপ । এখানে 'ইয়াল্‌তাক্বিত' শব্দটির অর্থ সহজলভ্য, অযাচিত প্রাপ্তি।

মোহাম্মদ বিন ইসাহাক লিখেছেন, হজরত ইউসুফকে কূপে নিক্ষিপ্ত করার পাপটি ছিলো অনেক পাপের সমাহার। যেমন— স্বজন-বন্ধন-ছেদন, পিতৃ-আজ্ঞা লংঘন, নিরপরাধ বালকের উপর উৎপীড়ন, নির্মমতা, বিশ্বাসভঙ্গ, অঙ্গীকার লংঘন, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি। আল্লাহ্‌পাক অবশেষে তাদেরকে মার্জনা করে দিয়েছিলেন। কারণ মার্জনাপ্রার্থীরা কখনো বিফল হয় না। আমি বলি, তাদের পিতৃভক্তি ছিলো অসাধারণ। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। পিতৃভক্তির আতিশয্যই তাদেরকে করে তুলেছিলো ঈর্ষাকাতর। পিতার ভালোবাসা আকর্ষণ করাই ছিলো তাদের মূল লক্ষ্য। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বিদ্রোহী ভ্রাতারা হজরত ইউসুফকে হত্যা করার ব্যাপারে দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করেছিলো। আল্লাহ্‌পাকই কৃপাপরবশ হয়ে তাদেরকে ওই মহাপাপ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। নতুবা তাদের ধ্বংস ছিলো অনিবার্য।

আবু আমর বলেছেন, তারা নবুয়ত না পাওয়ার কারণেই ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলো। কেউ কেউ মনে করেন, হজরত ইয়াকুবের দ্বাদশ পুত্রই ছিলেন নবী। সুতরাং যারা নবী হন, তাদের নবুয়তপূর্ব জীবনেও এমতো মহাপাপ থেকে মুক্ত

www.eelm.weebly.com

থাকেন। তবে অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে, হজরত ইউসুফের অন্যান্য ভাইয়েরা নবী ছিলেন না। অবশ্য কোরআন মজীদে নবীগণের আলোচনা প্রসংগে 'আসবাতে ইয়াকুব' কথাটির অর্থ ইসরাইলী নবীবর্গ, যারা আবির্ভূত হয়েছিলেন হজরত ইয়াকুবের বংশপ্রবাহ থেকে।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ۝ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝ قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ۝ قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝

❒ উহারা বলিল,'হে আমাদিগের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেছ না কেন, যদিও আমরা তাহার শুভাকাংক্ষী?

❒ 'তুমি আগামীকল্য তাহাকে আমাদিগের সংগে প্রেরণ কর, সে ফলমূল খাইবে ও খেলাধুলা করিবে। আমরা তাহার রক্ষণা-বেক্ষণ করিব।'

❒ সে বলিল, 'ইহা আমাকে কষ্ট দিবে যে তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবে এবং আমি আশংকা করি তোমরা তাহার প্রতি অমনোযোগী হইলে তাহাকে নেকড়ে বাঘ খাইয়া ফেলিবে।'

❒ উহারা বলিল, 'আমরা এক ভারী দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলে তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হইব।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো, হজরত ইউসুফকে বিজন কোনো প্রান্তরের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে হবে। এদিকে আবার হজরত ইয়াকুব তাকে চোখের আড়াল হতে দেন না। কিন্তু পিতার নিকট থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে উদ্দেশ্য সাধনও অসম্ভব। তাই তারা প্রস্তাব করলো, ইউসুফকে আমাদের সঙ্গে যেতে দিন। আমরা এতোগুলো ভাইতো তার সঙ্গেই থাকবো। আল্লাহ্‌র সত্য নবী হজরত ইয়াকুব তাদের প্রস্তাব শুনে শঙ্কিত হলেন। একটি অশুভ ছায়া বার বার আচ্ছন্ন করতে লাগলো তাঁর স্বচ্ছ ও পবিত্র হৃদয়কে। তাঁর এমতো অবস্থা দেখে তারা বললো, হে আমাদের পিতা! ইউসুফ তো আমাদেরই ভাই। তবু আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করতে পারছেন না কেনো? আমরা তো তার শুভ কামনাই করি।

www.eelm.weebly.com

মুকাতিল বলেছেন, পরের আয়াতের (১২) প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই হজরত ইয়াকুবের আশঙ্কার কারণটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমে বলা হয়েছে— তুমি আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করো, সে ফল-মূল খাবে ও খেলাধুলা করবে। আমরা তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো। এর প্রত্যুত্তরে হজরত ইয়াকুবের বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে এভাবে— ইন্নি লাইয়াহ্‌জুনুনি। তাঁর ওই বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই হজরত ইউসুফের ভ্রাতারা বলেছিলো, 'ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদেরকে বিশ্বাস করছো না কেনো?'

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'সে বললো, এটা আমাকে কষ্ট দিবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী হলে তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।' একথার অর্থ— হজরত ইয়াকুব বললেন, ইউসুফের বিরহে আমি ব্যথিত হবো। পশুপাল নিয়ে যে জঙ্গলের দিকে তোমরা যেতে চাও সেদিকে নেকড়ে ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে খুব। না জানি তোমরা কখন অমনোযোগী হও। আর সেই সুযোগে এই নিরীহ বালক নেকড়ের শিকার হয়। সুতরাং বিশ্বাস অবিশ্বাসের বিষয়টি এখানে প্রধান বিষয় নয়।

বাগবী লিখেছেন, এ ঘটনার কিছুদিন পূর্বে হজরত ইয়াকুব স্বপ্ন দেখেছিলেন, ইউসুফকে আক্রমণ করেছে একটি হিংস্র বাঘ। ওই স্বপ্ন দেখার পর তিনি হজরত ইউসুফের ব্যাপারে সদা শঙ্কিত থাকতেন। আমার মতে বর্ণনাটি সুসংগত নয়। কারণ নবীগণের স্বপ্নের বাস্তবায়ন অপরিহার্য । তিনি এমন স্বপ্ন দেখে থাকলে হজরত ইউসুফ ব্যাঘ্র কবলিত হতেনই। কিন্তু বাস্তবে তো সেরকম কিছু ঘটেনি।

এর পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে — 'তারা বললো, আমরা এক ভারী দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে তবে তো আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবো।' একথার অর্থ— তারা বললো, হে আমাদের মহান পিতা! আমরা তো একটি সুসংহত দল। আমাদের পশুপালকে আমরাই তো হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে সব সময় রক্ষা করে এসেছি। সুতরাং ইউসুফের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমরা অবশ্যই করতে পারবো। না পারলে পৃথিবীতে আমাদের মতো এমন হতভাগ্য হবে কে? আমরা কি অসমর্থ? না অযোগ্য?

হজরত ইউসুফকে তাঁর ভাইদের সঙ্গে যেতে দিতে না চাওয়ার দু'টি কারণ উপস্থাপন করেছিলেন হজরত ইয়াকুব। একটি হচ্ছে, প্রিয় পুত্রের বিচ্ছেদ যাতনা, অপরটি হচ্ছে তার নিরাপত্তাজনিত দুশ্চিন্তা। হজরত ইউসুফের ভায়েরা কেবল নিরাপত্তার নিশ্চয়তাই দিয়েছিলো। বিচ্ছেদ যাতনা সম্পর্কে তারা কোনো কিছু বলেনি। তারা ঈর্ষাপরায়ণ ছিলো বলেই এ ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। পিতা ইউসুফকে বেশী ভালোবাসেন, একথা ভাবতে না চাওয়াই ছিলো তাদের নিকটে স্বস্তিদায়ক।

www.eelm.weebly.com

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○ وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ○ قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ○ وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ۗ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۗ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۗ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ○

❒ অতঃপর উহারা যখন তাহাকে লইয়া গেল এবং তাহাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করিবার সিদ্ধান্ত করিল তখন উহারা তাহাকে কূপে নিক্ষেপ করিল এবং আমি তাহাকে জানাইয়া দিলাম 'তুমি উহাদিগকে উহাদিগের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলিয়া দিবে যখন উহারা তোমাকে চিনিবে না।'

❒ উহারা রাত্রিতে কাঁদিতে কাঁদিতে উহাদিগের পিতার নিকটে আসিল।

❒ উহারা বলিল,'হে আমাদিগের পিতা! আমরা দৌড়ে প্রতিযোগিতা করিতেছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদিগের মাল-পত্রের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম, অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু তুমি তো আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে না যদিও আমরা সত্যবাদী।'

❒ উহারা তাহার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করিয়া আনিয়াছিল। সে বলিল, 'না, তোমরা এক মন-গড়া কথা লইয়া আসিয়াছ, সুতরাং পূর্ণ ধৈর্য ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়, তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেলো এবং তাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করবার সিদ্ধান্ত করলো তখন তারা তাকে কূপে নিক্ষেপ করলো।' ওয়াহাব প্রমুখের উক্তি উল্লেখপূর্বক বাগবী লিখেছেন, বালক ইউসুফকে মহাসমাদরে বাহনে উঠিয়ে নিয়ে বিজন প্রান্তরের দিকে যাত্রা করলো তার ভায়েরা। কিন্তু লোকালয় থেকে দূরে যাওয়ার পর তারা প্রকাশ করলো তাদের স্বরূপ। ইউসুফকে টেনে নামালো বাহন থেকে। তাঁকে নির্যাতন করতে লাগলো

www.eelm.weebly.com

বিভিন্নভাবে। চলতে লাগলো প্রহারের পর প্রহার । একজন ছেড়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তো আরেকজন। এভাবে পালাক্রমে অনেকক্ষণ ধরে নির্যাতন চালালো তারা। হজরত ইউসুফ চিৎকার করে বলতে লাগলেন, হে আমার মহান পিতা! দেখুন আপনার প্রিয় ইউসুফের কী হাল করেছে ক্রীতদাসীর সন্তানেরা। ইয়াহুদ বললো, দ্যাখো, তোমরা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে ইউসুফকে তোমরা হত্যা করবে না। তাই বলছি, এবার ক্ষান্ত হও। নির্যাতন বন্ধ করো। এবার একে ফেলে দাও কোনো গভীর কূপের মধ্যে। সকলে ক্ষান্ত হলো। খুঁজে খুঁজে বের করলো একটি গভীর কূপ। অরণ্য-পথের পাশের ওই কূপটির মুখ ছিলো সংকীর্ণ। কিন্তু তার অভ্যন্তরভাগ ছিলো প্রশস্ত। হজরত ইয়াকুবের বসতবাটী থেকে কূপটির দূরত্ব ছিলো ছয় মাইল।

কা'ব বলেছেন, কূপটি ছিলো মিসর ও মাদিয়ানের মধ্যবর্তী একটি স্থানে। কাতাদা বলেছেন,বায়তুল মাকদিসে। আর সে সময় হজরত ইউসুফের বয়স ছিলো বারো বছর অথবা আঠারো বছর। কূপে নিক্ষেপের আগে তাঁর গায়ের জামা খুলে নিয়েছিলো তারা। জামাটি তিনি ফেরত চাইলেন। ভায়েরা বললো, নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যকে ডাকো। তারাই তোমাকে সাহায্য করবে। একথা বলেই তারা ইউসুফকে ফেলে দিলো কুয়ায়। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁকে একটি বালতিতে বসিয়ে বালতির রশি ধরে ধীরে ধীরে নামিয়ে দেয়া হয়েছিলো কুয়ার অভ্যন্তরে। মাঝামাঝি স্থানে নামানোর পর তারা রশিটি দিয়েছিলো ছেড়ে। মনে করেছিলো, ইউসুফের মৃত্যু নির্ঘাত। অত্যন্ত গভীর ওই কূপটিতে ছিলো অনেক পানি। অন্ধকার ওই পানিতে আছড়ে পড়লেন হজরত ইউসুফ। ভেসে থাকার চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ পায়ের নিচে লাগলো একটি পাথর। ওই পাথরের উপরেই অর্ধ ডুবন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো ক্রন্দনরত অবস্থায়। কূপে পতিত হওয়ার পর উপর থেকে ভায়েরা তাঁর নাম ধরে ডাকতে লাগলো। ইউসুফ ভাবলেন, ভাইদের মনে হয়তো করুণার উদ্রেক হয়েছে। অন্ধকার গহ্বর থেকে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দিলেন। তাঁর আওয়াজ শুনতে পেয়ে আবারও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো তারা। প্রস্তর নিক্ষেপের উদ্যোগ নিলো । কিন্তু ইয়াহুদ বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে নিরস্ত্র করলো তাদেরকে।

এ প্রসঙ্গে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক উপস্থাপিত সুদ্দীর বর্ণনাটি বেশ দীর্ঘ। ওই দীর্ঘ আলোচনার এক অংশে তিনি লিখেছেন, হজরত ইয়াকুব ছিলেন সিরিয়ার অধিবাসী। ইউসুফ ও বিন ইয়ামিনের স্নেহে তিনি ছিলেন অন্ধ। তাই অন্য দশ ভাই তাঁদেরকে হিংসা করতো। তারা ইউসুফকে পিতার

www.eelm.weebly.com

নিকট থেকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করতে চাইলো। গোপন পরামর্শক্রমে প্রণয়ন করলো একটি নিখুঁত পরিকল্পনা। বিভিন্ন কথা বলে পিতার মন যুগিয়ে ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে তারা চললো অনেক দূরের অরণ্যসংকুল চারণভূমিতে। সেখানে সকলে মিলে ইউসুফকে একটি বালতিতে বসিয়ে বালতিসমেত তাঁকে নামিয়ে দিলো একটি গভীর গহ্বরে। গহ্বরটির মাঝামাঝি যেতে না যেতেই তারা ছেড়ে দিলো বালতির রশি। ভাবলো হাড়গোড় ভেঙে ওই কূপেই তাঁর মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু তারা যা কামনা করেছিলো তা হলো না। কূপে ছিলো অনেক পানি। ফলে ইউসুফ তেমন একটা আঘাত পেলেন না। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে পেয়ে গেলেন একটি পাথর। দাঁড়াতে পারলেন ওই পাথরের উপর। অনতিবিলম্বে সেখানে প্রত্যাদেশসহ উপস্থিত হলেন হজরত জিবরাইল। পরবর্তী বাক্যে সেকথাই বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে — 'এবং আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলে দিবে, যখন তারা তোমাকে চিনবে না।' এই ওহী বা প্রত্যাদেশটি নবুয়তের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত প্রত্যাদেশ নয়। এটা ছিলো ইলহাম প্রকৃতির একটি জ্ঞাতব্য মাত্র। হজরত মুসার মাতার প্রতিও এরকম ইলহাম হয়েছিলো। হজরত ইউসুফ ছিলেন তখন বালক মাত্র। নবুয়তের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ তাঁকে দেয়া হয়েছিলো পরিণত বয়সে এভাবে— ওয়ালাম্মা বালাগা আশুদ্দাহূ আতাইনাহু হুকমাওঁ ওয়া ই'লমা (আর যখন তিনি উপনীত হলেন পরিণত বয়সে, আমি তাকে দান করলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান)। কিন্তু ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মুনজির ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার প্রত্যাদেশটি নবুয়তেরই প্রত্যাদেশ। কারণ এখানে বলা হয়েছে— 'আওহাইনা ইলাইহি'। ওহী শব্দটির উল্লেখ এখানে স্পষ্ট। অনেকের মতে এখানকার সম্পূর্ণ বক্তব্যটিই ওহী বা প্রত্যাদেশ। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে হজরত ইউসুফকে এখানে এইমর্মে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, হে আমার নবী! বিচলিত হবেন না। আল্লাহ্‌পাকই আপনার পরিত্রাতা । এমন দিন আসবে যখন এরা হবে আপনার করুণার মুখাপেক্ষী। তখন আপনি তাদেরকে চিনবেন। কিন্তু তারা আপনাকে চিনতে পারবে না। তখন তাদের আজকার এই অপকর্মের কথা আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। পরবর্তীতে এরকমই ঘটেছিলো। হজরত ইউসুফ তখন মিসরের রাজা। দুর্ভিক্ষকবলিত ভায়েরা রাজদরবারে গিয়েছিলো সাহায্যের আশায়। অন্য আয়াতে ওই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'যখন তারা প্রবেশ করলো, তখন তিনি তাদেরকে চিনলেন, কিন্তু তারা চিনতে পারলো না তাঁকে।'

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, ইয়াহুদ ছিলো কোমল হৃদয়। সে প্রতিদিন অন্তরীণ ইউসুফকে আহার্য পৌঁছে দিতে শুরু করলো। এভাবে তিনদিন গত হওয়ার পর সেখানে প্রত্যাদেশ নিয়ে উপস্থিত হলেন হজরত জিবরাইল।

ইমাম আহমদ তাঁর জুহুদ গ্রন্থে এবং ইবনে আবদুল হাকাম তাঁর ফত্হে মিসর গ্রন্থে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়েখ ও ইবনে মারদুবিয়ার মাধ্যমে হাসান বসরীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। উক্তিটি এই— তখন হজরত ইউসুফের বয়স ছিলো সতের বছর। কেউ কেউ বলেছেন, তখন ছিলো তাঁর যৌবনের উন্মেষকাল । তাই বলতে হয় তিনি প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন যুবক হওয়ার আগেই। হজরত ঈসা ও হজরত ইয়াহ্ইয়ার ক্ষেত্রেও এরকম যৌবনপূর্ব প্রত্যাদেশ লাভের ঘটনা ঘটেছে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, ইউসুফকে কূপে ফেলে দেয়ার পর তারা জবাই করলো একটি ছাগল ছানা। তাঁর গাত্রাবরণটি রঞ্জিত করলো ছাগলের রক্তে। সবাই মিলে ঠিকঠাক করলো, কী বলতে হবে এবার পিতাকে গিয়ে। হজরত ইউসুফের রক্তরঞ্জিত বস্ত্রটি নিয়ে তারা এবার বাড়ীর পথ ধরলো।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'তারা রাতে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকটে এলো।' তাদের অন্তর ছিলো অপরাধী। তাই তারা পছন্দ করলো নিশীথের প্রত্যাবর্তনকে। ইশার সময়। চরাচরে নেমে এসেছে ঘন ঘোর অন্ধকার। দশ ভাই একসাথে উপস্থিত হলো বহির্বাটিতে। এক বর্ণনায় এসেছে, বহির্বাটিতে তারা পৌঁছলো আর্তনাদ করতে করতে। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে হজরত ইয়াকুব বললেন, কী হয়েছে? তোমাদের উপর কি কোনো নেকড়ে আক্রমণ করেছিলো? তারা জবাব দিলো না। নবী ইয়াকুব বললেন, ইউসুফ কোথায়?

'তারা বললো, হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। তারপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু তুমি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবে না, যদিও আমরা সত্যবাদী।' কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ওয়ামা আনতা বিমু'মিনিল লানা' (তুমি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবে না) — কথাটির মাধ্যমে হজরত ইউসুফের দশ ভাই একথাই বলতে চেয়েছিলো যে, হে আমাদের পিতা! আপনি তো ইউসুফের মোহে মগ্ন। সুতরাং আমাদের কথা আপনি বিশ্বাস করবেন কীরূপে? আমরা সত্যকথা বললেও তো আপনার প্রতীতি আনয়ন করতে সক্ষম হবো না । অথচ আমরা সত্য কথাই বলছি। এখানে 'নাস্তাবিক্ব' কথাটির অর্থ প্রতিযোগিতা। কারো কারো মতে তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা। আর 'মাতায়' অর্থ বস্ত্র, দ্রব্য সামগ্রী।

এর পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'তারা জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিলো।' এখানে 'কাজিব্' শব্দটির অর্থ মিথ্যা। শব্দটি ধাতুমূল।

www.eelm.weebly.com

ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও আবু শায়েখ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হাসান বসরী বলেছেন, প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ শুনে আর্তনাদ করে উঠলেন হজরত ইয়াকুব। তাঁর রক্তরঞ্জিত পরিধেয়টি দেখে আঁচ করতে পারলেন প্রকৃত ঘটনা কী। বললেন, ব্যাঘ্রটি বড়ই দূরদর্শী। আমার সন্তানকে সে ভক্ষণ করলো, অথচ অক্ষতরূপে ফেরত দিলো তার পরিধেয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, না। তোমরা এক মনগড়া কথা নিয়ে এসেছো।' এ কথার অর্থ— এখানে 'সাওয়ালাত লাকুম' কথাটির অর্থ তোমাদের প্রবৃত্তি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অতি তুচ্ছ করে দিয়েছে। অর্থাৎ ইউসুফকে হত্যা করা অথবা গুম করা তোমাদের কাছে মনে হয়েছে একটি সাধারণ ব্যাপার। তাইতো তোমরা এরকম মনগড়া কথা বলতে পারলে। 'সাওয়ালাত' শব্দটি এসেছে সুয়াল থেকে, যার অর্থ ঝুলে পড়া বা অবনমিত হওয়া। শব্দের পরিমাপানুসারে (বাবে তাফয়ীলের সূত্রানুসারে) কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— অনুত্তম কোনো কিছুকে উত্তমরূপে প্রদর্শন।

এরপর বলা হয়েছে — 'সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়।' একথার অর্থ— হজরত ইয়াকুব বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যা করেছো, তাতো করেই ফেলেছো। তোমাদের বিরুদ্ধে আমার আর কোনো অভিযোগ নেই। আমি এই অসহনীয় বিপদে ধৈর্যকেই আশ্রয় করে রইলাম। এটাই আমার পক্ষে উত্তম। বাগবী লিখেছেন, 'সবরে জামীল' অর্থ ওই ধৈর্য, যার মধ্যে কোনো সৃষ্টির বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অভিযোগ থাকে না। থাকে না কোনো চাঞ্চল্য অথবা বিলাপ। তিবরানীর মাধ্যমে হাব্বান বিন হুমাইয়ার মুরসাল(অবিন্যস্ত) বর্ণনায় এসেছে,'সবরে জামীল' হচ্ছে অনুযোগ-অভিযোগ বিবর্জিত ধৈর্য।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা যা বলছো, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল।' একথার অর্থ— হজরত ইয়াকুব আরো বললেন, হে বৎসবর্গ! তোমাদের বক্তব্যের প্রতিকূলে আমি আমার নিজস্ব কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করতে চাই না। আমি কেবল চাই আল্লাহ্র আশ্রয় ও সহায়তা। চাই নীরব ধৈর্যধারণের যথোপযুক্ত শক্তি ও সাহস।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইউসুফের কাহিনীতে এ কথাগুলোও এসেছে— হজরত ইউসুফের বিরোধী ভ্রাতারা জঙ্গল থেকে একটি বাঘ ধরে এনেছিলো। বলেছিলো, হে মহান পিতা! এই বাঘটিই আমাদের প্রিয় ভ্রাতা ইউসুফকে ভক্ষণ করেছে। হজরত ইয়াকুব বাঘটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এবার তুমি বলো ঘটনাটি কি সত্যি? বাঘ বললো, না। আমি তো তাকে চোখেও কোনোদিন দেখিনি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি এ অঞ্চলে এসেছো কেনো? সে বললো, স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। আপনার এ সন্তানেরা আমাকে এখানে জোর করে ধরে এনেছে।

www.eelm.weebly.com

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ○ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ○

❒ এক যাত্রীদল আসিল, ইহারা উহাদিগের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করিল: সে তাহার পানির ডোল নামাইয়া দিল। সে বলিয়া উঠিল, 'কি সুখবর! এ যে এক কিশোর!' অতঃপর উহারা তাহাকে পণ্যরূপে লুকাইয়া রাখিল; উহারা যাহা করিতেছিল সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ছিলেন।

❒ এবং উহারা তাহাকে বিক্রয় করিল স্বল্পমূল্যে— মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, উহারা ছিল ইহাতে নির্লোভ।

প্রথমোক্ত আয়াতের বক্তব্য বিষয়টি এরকম— তিনদিন পর মিসর অভিমুখী একটি বাণিজ্য কাফেলা পথ ভুলে এসে পড়লো ওই কূপটির কাছে। কূপটি ছিলো প্রায় পরিত্যক্ত ও লোকালয় থেকে অনেক দূরে। কচিৎ কখনো কোনো বিপথগামী পথিক অথবা কোনো পশুপালের রাখাল কূপটি থেকে পানি উত্তোলনের চেষ্টা করতো। কূপটির পানি ছিলো লবনাক্ত। তাই তা সুপেয় ছিলো না। কিন্তু হজরত ইউসুফ সেখানে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর থেকে সেখানকার পানি হয়ে গেলো সুপেয়। মিসরগামী দলটি তাদের একজনকে পানি সংগ্রহের জন্য পাঠালো কূপটির কাছে। পানি সংগ্রাহকের নাম ছিলো মালিক বিন দোবার। সে ছিলো মাদিয়ানের অধিবাসী। আয়াতে তাকে 'ওয়ারিদ' বলা হয়েছে। পানির সন্ধানে কাফেলার আগে আগে যে চলে তাকেই বলে ওয়ারিদ বা পানি সংগ্রাহক। যাহোক পানি সংগ্রাহক মালিক বিন দোবার পানির ডোল বা বালতি রশিতে বেঁধে নামিয়ে দিলো কূপটির ভিতরে। হজরত ইউসুফ ওই বালতির রশিটি শক্ত করে ধরে বসলেন। মালিক বিন দোবার পানি তোলার সময় টের পেলো বালতিটি বেশ ভারী। কষ্টে-সৃষ্টে বালতিটি উপরে তুলতেই সে বিস্মিত হয়ে বললো, এযে দেখছি অপরূপ এক কিশোর। কাফেলার লোকেরাও বিস্মিত হলো তাঁকে দেখে। ভাবলো, এই সুন্দর কিশোরকে ক্রীতদাসরূপে চড়া দামে বিক্রি করা যাবে। মিসরের বাজারে ক্রীতদাস ক্রেতারা একে নিয়ে শুরু করবে কাড়াকাড়ি। এ কথা ভেবে তারা লুকিয়ে রাখলো হজরত ইউসুফকে। এ তো গেলো ঘটনার বাইরের দিক। কিন্তু এ ঘটনার প্রকৃত নিয়ন্ত্রক আল্লাহ্। তিনি এসকল ঘটনার মধ্যে দিয়ে হজরত ইউসুফের কী পরিণতি ঘটাবেন তা কেবল তিনিই জানেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইউসুফ ছিলেন সৌন্দর্যের খনি। রসুল স. বলেছেন, সকল মানুষকে যে সৌন্দর্য দেয়া হয়েছে, তার অর্ধেক সৌন্দর্য দেয়া হয়েছে নবী ইউসুফকে। হজরত আনাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা, আহমদ, আবু ইয়া'লী ও হাকেম।

বাগবী লিখেছেন, মহিমান্বিতা পিতামহী হজরত সারার রূপমঞ্জুসার এক ষষ্ঠাংশ পেয়েছিলেন হজরত ইউসুফ। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হজরত ইউসুফ ও তাঁর মহাসম্মানিতা জননীর রূপমাধুরী ছিলো সমগ্র সৃষ্টির রূপ-সৌন্দর্যের দুই তৃতীয়াংশ।

'বুশরা' শব্দটির অর্থ সুসংবাদ। মালিক বিন দোবার হজরত ইউসুফকে দেখেই চিৎকার করে বলে উঠেছিলো, 'ইয়া বুশরা হাজা গুলাম' (কী সুখবর! এ যে এক কিশোর!) এ কথার অর্থ— হে আমার সঙ্গী সাথীরা! তোমাদের জন্য সুসংবাদ। এরকমও হতে পারে যে, যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে সে 'সুসংবাদ' 'সুসংবাদ' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, বুশরা ছিলো তাদের দলের একজনের নাম। তাকেই সম্বোধন করে আনন্দধ্বনি দিয়ে উঠেছিলো সে। অথবা ডেকেছিলো সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে। মুজাহিদ তাঁর পিতার উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, কূপ থেকে হজরত ইউসুফকে উত্তোলন করলে কূপটি তাঁর বিরহে ক্রন্দন শুরু করেছিলো।

'তারা তাঁকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখলো'— কথাটির অর্থ, মালিক বিন দোবার ও তার সঙ্গীসাথীরা মিসর যাত্রার সারা পথে তাঁকে আগলে রাখলো। তারা আশঙ্কা করছিলো অন্য কেউ হয়তো জোর পূর্বক এই অপরূপ কিশোরের মালিকানা দাবি করে বসতে পারে। তাই তারা লুকিয়ে লুকিয়ে রাখলো তাঁকে। মিসরের বাজারে গিয়ে অত্যন্ত উচ্চ মূল্যে এই রূপবান কিশোরকে বিক্রয়ের লোভ পেয়ে বসেছিলো তাদেরকে। পথে কেউ অকস্মাৎ হজরত ইউসুফকে দেখে ফেললে তারা বলতো, এই সুন্দর গোলামটি আমরা উপঢৌকন হিসেবে পেয়েছি। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত ইউসুফের কোমল হৃদয় ভ্রাতা ইয়াহুদ প্রতিদিন তাঁর জন্য আহার্যদ্রব্য নিয়ে হাজির হতো কূপটির পাশে। তৃতীয় দিবসে যেয়ে সে দেখলো ইউসুফ নেই। সে তৎক্ষণাৎ একথা গিয়ে জানালো তার অন্য ভাইদেরকে। তারা হন্যে হয়ে ইউসুফকে খুঁজতে খুঁজতে সাক্ষাত পেলো মালিক বিন দোবারের। ইউসুফকে দেখিয়ে বললো, এতো আমাদের পলাতক ক্রীতদাস। কিন্তু মালিক বিন দোবারের দল তাঁকে কিছুতেই হস্তান্তর করতে সম্মত হলো না। শেষে বিশ দিরহাম মূল্যে তাঁকে বিক্রয় করে দিলো তাঁর ভাইয়েরা। পরের আয়াতে (২০) সেকথা বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে— 'এবং তারা তাঁকে বিক্রয় করলো স্বল্পমূল্যে মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে।' কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে উল্লেখিত 'শারওহ্' শব্দটির দ্বারা ক্রয় ও বিক্রয় উভয়টি বুঝানো হয়ে থাকে। তাই আলোচ্য

www.eelm.weebly.com

আয়াতের মর্মার্থ হতে পারে এরকম— যাত্রীদলের লোকেরা হজরত ইউসুফকে মাত্র কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছিলো। জুহাক, মুকাতিল ও সুদ্দী বলেছেন, 'বাখ্‌স্' শব্দের অর্থ হারাম। অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তির বিক্রয় মূল্য হারাম। আবার বাখ্‌স্ অর্থ মূল্য পড়ে যাওয়া বা মূল্য হ্রাস হওয়া। হারাম সম্পদের বরকত হ্রাস পেতে থাকে। সে কথা বুঝাতেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বাখ্‌স্ (স্বল্পমূল্যে) শব্দটি। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'বাখ্‌স্' অর্থ অচল মুদ্রা। ইকরামা ও শা'বী বলেছেন, স্বল্পমুদ্রা। কারণ উকিয়া সমতুল্য মুদ্রা হলে বেচাকেনা হতো পরিমাপের মাধ্যমে। আর উকিয়ার নিম্নতম পরিমাণের বিনিময় হতো গুণতি হিসেবে। হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত ইবনে মাসউদ ও কাতাদা বলেছেন, তাঁকে বিক্রয় করা হয়েছিলো কুড়ি দিরহামের বিনিময়ে। অর্থাৎ হজরত ইউসুফের ভাইয়েরা মালিক ইবনে দোবারের নিকট কুড়ি দিরহাম নিয়ে তাদের দাবি ছেড়ে দিয়েছিলো। এভাবে দশ ভাইয়ের প্রত্যেকে পেয়েছিলো দুই দিরহাম করে। ইকরামা বলেছেন, তারা বিক্রয় করেছিলো চল্লিশ দিরহাম মূল্যে। মুজাহিদ বলেছেন, বাইশ দিরহামের কথা।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা ছিলো এতে নির্লোভ।' একথার অর্থ— হজরত ইউসুফের ভ্রাতারা তাঁর প্রতি ছিলো নিরাসক্ত বা উপেক্ষাপ্রবণ। তারা এটা জানতো না যে হজরত ইউসুফ তাঁর পিতার দৃষ্টিতে কতো প্রিয়, কতো মূল্যবান। তারা চাইতো যেভাবেই হোক ইউসুফ দেশান্তরে গমন করুক। এটাই ছিলো তাদের আসল উদ্দেশ্য। তাই তাঁর মূল্য তাদের কাছে বড় কিছু ছিলো না। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, মূল্যের প্রতি একেবারেই আসক্তি ছিলো না তাদের। যাত্রীদলের সঙ্গে ইউসুফ দূরদেশে চলে যাবে, একথা জানতে পেরে তারা হয়েছিলো মহা আনন্দিত। এটাই তো ছিলো তাদের মূল উদ্দেশ্য।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'কানু' শব্দস্থিত সর্বনামটি যদি যাত্রীদলের সঙ্গে সম্বোধিত হয় তবে অর্থ দাঁড়াবে দু'রকম— ১. ক্রেতা হিসেবে যাত্রীরাও ছিলো ইউসুফের প্রতি অনাগ্রহী। কারণ বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে তিনি ছিলেন পলাতক দাস। ২. তারা ছিলো পণ্য বিক্রেতা। কেনা বেচাই তাদের কাজ। আর স্বল্প মূল্যে ক্রয় করার কারণেই হজরত ইউসুফ ছিলেন তাদের নিকটে উপেক্ষার পাত্র। এমতো আশংকাও তাদের ছিলো যে, আবার হয়তো কোনো দাবিদার এসে পড়বে। তাই তারা তাঁকে সত্বর বিক্রি করে ঝামেলা মুক্ত হতে চাইলো। দ্রুত পথ চলতে লাগলো মিসর অভিমুখে। হজরত ইউসুফের ভাইয়েরা কিছুদূর তাদের সাথে সাথে গেলো। এই বলে বার বার সতর্ক করে দিলো যে, একে সাবধানে রেখো। পালিয়ে যায় না যেনো। মিসরে পৌঁছে সোজা বাজারে গিয়ে উপস্থিত হলো যাত্রীদল। হজরত ইউসুফকে ক্রয় করলেন কিত্‌ফীর অথবা ইত্‌ফীর। এরকম বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস।

www.eelm.weebly.com

কিত্‌ফীর অথবা ইত্‌ফীর ছিলো মিসর রাজের একজন মহামান্য সভাসদ। তার উপনাম ছিলো আজিজ বা প্রতাপশালী। রাজকোষ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতেন তিনি। তৎকালীন মিসর রাজের নাম ছিলো রাইয়ান বিন ওয়ালিদ বিন ছারওয়ান। তিনি ছিলেন আমালিকা সম্প্রদায়ভূত। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, পরবর্তী সময়ে রাজা রাইয়ান মুসলমান হয়েছিলেন। হজরত ইউসুফকে করেছিলেন রাজা। আর তাঁর জীবদ্দশাতেই গমন করেছিলেন পরলোকে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মিসর গমনের পর মালিক ইবনে দোবার হজরত ইউসুফকে বাজারজাত করলো। কুড়ি দিনার মূল্যে তাঁকে ক্রয় করলেন কিত্‌ফীর। ক্রয়মূল্য হিসেবে সঙ্গে আরো দিলেন একজোড়া পাদুকা ও এক জোড়া সাদা ধবধবে বস্ত্র। ওয়াহাব বিন মুনাব্‌বাহ্‌ বলেছেন, তাঁকে বাজারে নেয়ার পর তাঁর মূল্যমান ক্রমাগত উর্ধ্বগতি হতে লাগলো। শেষে ঠিক হলো তাঁর ওজনের সমপরিমাণ সোনা, চাঁদি, রেশমী বস্ত্র ও কস্তুরী দিতে হবে। হজরত ইউসুফের বয়স তখন ছিলো তেরো বছর এবং ওজন ছিলো চারশ' রত্‌ল। কিত্‌ফীর ওই উচ্চ মূল্যেই ক্রয় করে নিলেন তাঁকে।

সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ২১, ২২

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

❐ মিশরের যে ব্যক্তি উহাকে ক্রয় করিয়াছিল সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'সম্মানজনকভাবে ইহার থাকিবার ব্যবস্থা কর, সম্ভবতঃ সে আমাদিগের উপকারে আসিবে অথবা আমরা উহাকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করিতে পারি।' এবং এইভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম তাহাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবার জন্য। আল্লাহ্‌ তাঁহার কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

❐ সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইল তখন আমি তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম। এবং এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'মিসরের যে ব্যক্তি তাঁকে ক্রয় করেছিলো, সে তার স্ত্রীকে বললো, সম্মানজনকভাবে এর থাকবার ব্যবস্থা করো।' একথার অর্থ— বালক ইউসুফকে ক্রয় করে আজিজ ফিরে এলেন স্বগৃহে। স্ত্রীকে বললেন, সম্মান ও যত্নের সঙ্গে এই বালকটির থাকবার ব্যবস্থা করো। এখানে 'মাছওয়াহ্' অর্থ— সম্মানজনকভাবে। কাতাদা এরকম বলেছেন। ইবনে জুরাইজেরও বক্তব্য অনুরূপ। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ আহার, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা। উল্লেখ্য যে, আজিজের স্ত্রীর নাম রায়ীল অথবা জুলায়খা। এরপর বলা হয়েছে— 'সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করতে পারি।' একথার অর্থ, আজিজ তার সহধর্মিণীকে বললেন, এই বালকটি আমাদের উপকারে আসবে। একে বেচে দিলে মুনাফা হবে অনেক। আর ঘরে রাখলেও সে আমাদের অনেক কাজে সাহায্য করবে। অথবা একে তো আমরা পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। উল্লেখ্য যে, আজিজ ছিলেন নিঃসন্তান। আর সুদর্শন ইউসুফের মধ্যেও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন আভিজাত্য ও সুন্দর স্বভাবের আভাস। তাই তাঁকে পালিত পুত্র হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন আজিজ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং এভাবেই আমি ইউসুফকে সেদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবার জন্য।' একথার অর্থ— এভাবেই আমি অনেক ঘাত প্রতিঘাতের পর ইউসুফকে এনে দিলাম সম্মানজনক অবস্থায়। প্রতিষ্ঠিত করলাম রাজধানী শহর মিসরে। আজিজকে করে দিলাম তার প্রতি বিশেষ করুণাপরবশ। তাকে দান করলাম স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিষয়ক অনন্যসাধারণ জ্ঞান।

এখানে 'তায়বীলিল আহাদীছ্' কথাটির মর্ম হবে দু'রকম— ১. আল্লাহ্র বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। ২. স্বপ্নের তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞান দান। কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, সম্মুখ জীবনেও রয়েছে অনেক ঘাত প্রতিঘাত। আর ওই ঘাত প্রতিঘাত মোকাবিলার প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকেই। হজরত ইউসুফ সে সকল ঘাত প্রতিঘাত যথার্থরূপে মোকাবিলা করেছিলেনও। যেমন— মিসর রাজ স্বপ্নে দুর্ভিক্ষকে দেখেছিলেন সাতটি কৃশকায় গাভীরূপে। হজরত ইউসুফ ওই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, দুর্ভিক্ষ আসন্ন। সুতরাং এখন থেকে খাদ্যশস্য গুদামজাত করতে হবে। তাই করা হয়েছিলো। আর এভাবেই মোকাবিলা করা হয়েছিলো দুর্ভিক্ষের।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাঁর কার্যসম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।' একথার অর্থ— মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্ যেমন অভিপ্রায় করেন, তেমনি করেন। তাঁর বিধান প্রতিহত করার সাধ্য কারো নেই। ইউসুফের ভ্রাতারা চেয়েছিলো এক রকম, আর আল্লাহ্ চেয়েছিলেন অন্যরকম। শেষে আল্লাহ্র ইচ্ছাই তো বাস্তবায়িত হলো। আল্লাহ্র ইচ্ছাকে কেউ প্রতিহত করতে পারলো কী? প্রকৃত কথা হচ্ছে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র গোপন অনুগ্রহ সম্পর্কে অনবহিত। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তাই করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক একথা জানে না।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, তখন আমি তাকে হেকমত ও জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি।' যৌবনের পূর্ণত্ব প্রাপ্তিকে বলে 'আশুদ্দাহ্'। যৌবনে উপনীত হওয়ার বয়স সম্পর্কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলেছেন। মুজাহিদ বলেছেন তেত্রিশ বছর। সুদ্দী বলেছেন ত্রিশ বছর। জুহাক বলেছেন বিশ বছর। আবার কালাবী বলেছেন আঠারো থেকে তিরিশ বছর। একবার 'আশুদ্দাহ্' শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইমাম মালেককে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা।

এখানে 'হুক্মা' অর্থ নবুয়ত। কেউ কেউ বলেছেন, বিশুদ্ধ বাক্যাবলী। আর 'ই'ল্মা' অর্থ ধর্মীয় জ্ঞান অথবা স্বপ্নবৃত্তান্তের তাৎপর্য। কেউ কেউ বলেছেন, হাকিম ও আ'লীমের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে— যারা জ্ঞান অর্জন করেন তারা আ'লীম। আর যারা অর্জিত জ্ঞানানুসারে আমল করেন তারা হাকীম।

'মুহ্সিনীন' অর্থ সৎকর্মপরায়ণ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যারা মুমিন, তারাই মুহ্সিন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যারা সৎপথ প্রাপ্ত তারাই মুহ্সিন। জুহাক বলেছেন, বিপদে যারা ধৈর্য ধারণ করে, মুহ্সিন তারাই। বায়যাবী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে পরিষ্কাররূপে বলে দেয়া হয়েছে যে, আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি। আর হজরত ইউসুফ ছিলেন সত্যিকারের সৎকর্মপরায়ণ। তাই তিনি লাভ করেছিলেন পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর পুরস্কার। বাক্যটির মধ্যে এই উপদেশ নিহিত রয়েছে যে, যারা আল্লাহ্পাক কর্তৃক পুরস্কৃত হতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই হতে হবে সতত সৎকর্মপরায়ণ।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ২৩, ২৪

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۝

❑ সে যে মহিলার গৃহে ছিল সে তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিল এবং দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিল ও বলিল, 'আইস'। সে বলিল, 'আমি আল্লাহের শরণ লইতেছি, তোমার স্বামী আমার প্রভু; তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকিতে দিয়াছেন, সীমা লংঘনকারিগণ সফলকাম হয় না।

www.eelm.weebly.com

❐ সেই মহিলা তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল এবং সে-ও উহার আসক্ত হইয়া পড়িত যদি না সে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিত। তাহাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হইতে বিরত রাখিবার জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধ-চিত্ত দাসদিগের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সে যে মহিলার গৃহে ছিলো সে তার নিকট থেকে অসৎকর্ম কামনা করলো এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিলো ও বললো, এসো।' এখানকার 'রাওয়াদাত্' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'মুরাদিয়াত' থেকে, যার ক্রিয়ামূল 'রাওদুন্'। এর অর্থ কোনো কিছু পাওয়ার অভিলাষে গমনাগমন করা। তাই যাত্রীদল অথবা সেনাদলের আহার্য ও পানির সন্ধানে যে অগ্রভাগে চলে তাকে বলে 'রায়েদ'। কেউ কেউ বলেন, বিনয়ের সঙ্গে কোনো কিছু যাচ্ঞা করাকে 'রাওদ' বলে। এ থেকে পরিগঠিত হয়েছে 'রুয়াইদা'। এখানে তাই বলা হয়েছে, আজিজ-ভার্যা জুলায়খা অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে তার কামনা চরিতার্থ করার জন্য হজরত ইউসুফের প্রতি আহ্বান জানালো। বন্ধ করে দিলো ঘরের সকল দরজা। বললো, এসো।

এখানে 'হাইতা' শব্দটির অর্থ— এসো। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. কথাটি আমাকে শিখিয়েছেন এভাবে— 'হাইতালাকা'। কাসায়ী বলেছেন, শব্দটি মূলতঃ হাওরানের একটি পরিভাষা। কিন্তু শব্দটির ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিলো হেজাজ ভূখণ্ডে। কাসায়ীর এই উক্তিটি উল্লেখ করেছেন আবু উবায়দা। শব্দটির অর্থ— এসো। মুজাহিদ বলেছেন, কোনোকিছুর প্রতি অনুপ্রেরণা বা উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কামুস অভিধানে রয়েছে 'হাইতা', 'হাইতি', 'হাইতু' সব ক'টির অর্থ— এসো।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি আল্লাহ্র শরণ গ্রহণ করছি। তোমার স্বামী আমার প্রভু; তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন।' এখানে 'ইন্নাহু' শব্দের 'হু' সর্বনামটি একটি অভিজাত সর্বনাম (জমীরে শান)। এভাবে বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হজরত ইউসুফ বললেন, আমি তোমার অপবিত্র আহ্বান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমার স্বামী আমাকে ক্রয় করে এনেছেন। সম্মানজনকভাবে এখানে থাকতে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি আমার করুণাপরবশ প্রভু। তিনি আমাকে সসম্মানে রাখার জন্য তোমাকেও নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমি বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারি না। এখানে 'ইন্নাহু' শব্দের 'হু' সর্বনামটি আজিজের সঙ্গে সম্বোধিত হওয়ার সম্ভাবনা যেমন রয়েছে, তেমনি সম্ভাবনা রয়েছে আল্লাহ্র সঙ্গে সম্বোধিত হওয়ার । যদি তাই হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে এরকম— নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আমার স্রষ্টা। তিনিই তোমাদের এখানে

www.eelm.weebly.com

আমার উত্তম বাসস্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তোমার স্বামীকে আমার প্রতি করে দিয়েছেন করুণাপরায়ণ। তাই আমি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ। যে আল্লাহ্ আমাকে এভাবে অনুগৃহীত করেছেন, সেই পবিত্র সত্তার সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করা আমার কাজ নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'সীমালংঘনকারীগণ সফলকাম হয় না।' উপকার পেয়ে উপকার দাতার অনিষ্ট যে করে, তাকেই এখানে বলা হয়েছে সীমালংঘনকারী। কেউ কেউ বলেছেন, ব্যভিচারীরাই জালেম বা সীমালংঘনকারী। তারা নিজের উপরে যেমন জুলুম করে, তেমনি অন্যের প্রতি জুলুম করে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারের মাধ্যমে।

সুদ্দী, ইবনে ইসহাক প্রমুখ কোরআন ব্যাখ্যাতা বর্ণনা করেছেন, জুলায়খা একদিন হজরত ইউসুফকে নির্জনে পেয়ে তাঁর অতুলনীয় রূপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু করলো। বললো, কী অপরূপ তুমি! তোমার কৃষ্ণ কেশপাশ দৃষ্টিকে মোহিত করে। হরণ করে হৃদয়কে। হজরত ইউসুফ বললেন, মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম এই কেশ আমার শরীর থেকে বিছিন্ন হয়ে যাবে। জুলায়খা বললো, তোমার আঁখিযুগল কতই না সুন্দর, দৃষ্টিকে বিবশ করে দেয়। হজরত ইউসুফ বললেন, একদিন মৃত্যু এসে আমার চোখ দু'টোকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দিবে। জুলায়খা বললো, এমন পূর্ণশশী সদৃশ মুখাবয়ব আর তো কখনো দেখিনি। তুমি তো রূপের রাজা। হজরত ইউসুফ বললেন, একদিন এসকল কিছু হবে মৃত্তিকার আহার্য।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে— জুলায়খা বললো, প্রাণাধিক আমার ! ওঠো। পূরণ করো আমার অভিলাষ। হজরত ইউসুফ বললেন, জান্নাতে আমার ঠাঁই হবে না, যদি আমি এরূপ করি। জুলায়খার প্রণয়ার্তির তরঙ্গ বার বার আছড়ে পড়তে লাগলো হজরত ইউসুফের যৌবনের তটভূমিতে। সে আহ্বান রোধ করা ছিলো অসম্ভব। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক তাকে বিশেষভাবে হেফাজত করলেন। পরের আয়াতে (২৪) সেই হেফাজতেরই বিবরণ দেয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে— 'সেই মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়েছিলো এবং সে-ও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তো, যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতো।' মানুষ জন্মগত ও স্বভাবগতভাবে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। কিন্তু সে তার ইচ্ছামত কাজ করতে পারে আবার নাও করতে পারে। হজরত ইউসুফ ছিলেন তখন পরিপূর্ণ যুবক। তাই যৌবনের স্বভাবধর্ম অনুসারে জুলায়খার আহ্বানে তাঁর মধ্যে বাসনার বহ্নি জ্বলে উঠা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু তিনি সেই বাসনা বা ইচ্ছাকে দমন করেছিলেন। আর প্রবৃত্তির অবদমন ছিলো তাঁর আয়ত্তভূত। কারণ তিনি ছিলেন নবী। ছিলেন নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ । ছিলেন আল্লাহ্‌র বিশেষ হেফাজত দ্বারা সতত পরিবেষ্টিত । প্রবৃত্তির এই অবদমনের

www.eelm.weebly.com

সুযোগ রয়েছে কেবল মানুষের। ফেরেশতাদের এমতো প্রতিকূলতা নেই। তাই তারা নিষ্পাপ হলেও মানুষের মতো মর্যাদামণ্ডিত নয়। বিজয়, সাফল্য ও মর্যাদা তো প্রতিকূলতাকে জয় করলেই অর্জিত হয়। ইচ্ছার উন্মেষের মধ্যে কোনো পাপ নেই। পাপ রয়েছে ইচ্ছাকে প্রশ্রয়দান ও ইচ্ছাপূরণের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্যে। তাই আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র যারা, তারা কখনো অসৎ ইচ্ছাকে হৃদয়ে লালন করেন না। বরং তা অবলোপন করেন, নিশ্চিহ্ন করে দেন।

শায়েখ আবু মনসুর মাতুরিদি বলেছেন, জুলায়খার কামনার বিপরীতে হজরত ইউসুফের হৃদয়ে অকস্মাৎ উদিত হয়েছিলো কামনার একটি ঝলক। এ ধরনের অতি অস্থায়ী কল্পনায় কোনো পাপ নেই। তাই এর জন্য আল্লাহ্‌পাক তাঁকে কোনো প্রকার ভর্ৎসনাই করেননি। দেখিয়েছেন তাঁর বিশেষ নিদর্শন। এভাবে তাঁকে নিষ্কলুষ রেখে করেছেন অকুণ্ঠ প্রশংসা। বলেছেন, 'সে তো ছিলো আমার বিশুদ্ধচিত্ত দাসগণের অন্তর্ভুক্ত।'

কোনো কোনো দার্শনিক বলেছেন, ইচ্ছাশক্তি দু'ধরনের ১. দৃঢ় সংকল্প। এরকম সংকল্প করেছিলো জুলায়খা। তাই সে ছিলো অপরাধিনী। ২. অতি অস্থির কল্পনা, যা নিজের অজান্তেই জেগে ওঠে হৃদয়ে। এ ধরনের অতি তাৎক্ষণিক ইচ্ছাই জেগে ওঠেছিলো হজরত ইউসুফের অন্তরে। আর এ ধরনের কল্পনা অপরাধের আওতায় পড়ে না। এমতো কল্পনাকে দীর্ঘায়িত করে কথা ও কর্মের মাধ্যমে তাকে কার্যকর করতে সচেষ্ট হলেই কেবল তা বিবেচিত হয় অপরাধরূপে।

রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন, আমার কোনো বান্দা সৎকর্মের ইচ্ছা পোষণ করলেই আমি তার আমলনামায় দান করি দশটি পুণ্য। আর অসৎকর্মের ইচ্ছা পোষণ করলে আমি তা মার্জনা করি। যদি সে তার ওই ইচ্ছার বাস্তব রূপায়ণ ঘটায়, তবে তার আমলনামায় পাপ প্রদান করি কেবল একটি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বাগবী। হাদিসটি বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এভাবে— আমার বান্দার সৎকর্ম বাস্তবায়নের পূর্বেই আমি তাকে দান করি একটি সওয়াব। কার্যকর করলে দান করি দশটি। আর অসৎকর্মের ইচ্ছা পোষণ করলে তার কোনো গোনাহ্‌ই লেখা হয় না। আর কার্যকর করলে লেখা হয় মাত্র একটি গোনাহ্।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের প্রমুখ বলেছেন, জুলায়খা হজরত ইউসুফের কটিদেশের বন্ধনী খুলে ফেলেছিলো। অথবা ছিঁড়ে ফেলেছিলো তাঁর পাজামার ফিতা। এখানে 'হাম্মা' (আসক্ত হয়েছিলো) কথাটি একারণেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাখ্যাটি ভুল। কারণ তা আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র বাণীভঙ্গির প্রতিকূল । কারণ পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে— 'তাকে মন্দকর্ম ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখবার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম' (লি নাস্‌রিফা আ'নহুস্ সুআ ওয়াল ফাহ্‌শাআ)। 'সু' অর্থ সগীরা গোনাহ্। সুতরাং বুঝতে হবে সগীরা

www.eelm.weebly.com

গোনাহ্ থেকেও আল্লাহ্ তাকে মুক্ত রেখেছিলেন। অতএব কবীরা তো অসম্ভব, সগীরা ভুলও তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়নি। যদি হতো, তবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমাপ্রার্থনা (ইস্তেগফার) করতে বলতেন। যেমন বলেছিলেন হজরত আদম, হজরত নুহ, হজরত দাউদ ও হজরত ইউনুসকে। সকল নবীর মতো তাঁরাও ছিলেন নিষ্পাপ। কিন্তু তাঁদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো অনিচ্ছাকৃত ভুল। উল্লেখ্য যে, ভুল এবং গোনাহ্ কখনো এক নয়। অন্য আয়াতে তাই হজরত ইউসুফের বক্তব্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে— সে (জুলায়খা) নিজেই আমাকে প্ররোচিত করেছে। আর এক আয়াতে হজরত ইউসুফের বক্তব্য এসেছে এভাবে— 'এটা একারণে যে, নিশ্চয় আমি অগোচরেও বিশ্বাসভঙ্গ করিনি।' এক স্থানে আল্লাহ্ তাঁর নিজের বক্তব্যরূপে বলেছেন— 'তাহলো, যারা ভয় করে, ধৈর্যধারণ করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।' এই আয়াতের শেষাংশে হজরত ইউসুফের প্রশংসা করেছেন এভাবে— 'নিশ্চয় সে ছিলো আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাগণের একজন।'

'যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতো' কথাটির অর্থ, আল্লাহ্‌র বিশেষ নিদর্শন প্রত্যক্ষ না করলে হজরত ইউসুফ জুলায়খার চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতেন না। কেউ কেউ বলেছেন, এই বাক্যটির সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী একটি বাক্যের সঙ্গে। যদি তাই হয়, তবে অর্থ দাঁড়ায়— তাহলে তিনি জুলায়খার চক্রান্তজালে পড়তেন। কিন্তু এরকম অর্থ ব্যাকরণ সিদ্ধ নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে— বুরহান বা নিদর্শন কি? আর হজরত ইউসুফই বা কি দেখেছিলেন? এ প্রশ্নের বিভিন্ন প্রকার জবাব পরিলক্ষিত হয়। ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, ওই বুরহান ছিলো নবুয়তের পদমর্যাদা (শানে নবুয়ত)— যা অর্পণ করা হয়েছিলো হজরত ইয়াকুবের বক্ষে। ওই নবুয়তের নূরই অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করেছিলো হজরত ইউসুফকে। এভাবে আল্লাহ্‌পাকই তাঁকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন বলেই তিনি অশ্লীলতা মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন। এটাই সর্বোৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে হজরত ইউসুফ তখন দেখেছিলেন হজরত ইয়াকুবের জ্যোতির্ময় অবয়ব। ওই জ্যোতির্ময় আকৃতি তখন বলেছিলো, ইউসুফ! তোমার নাম লিখিত রয়েছে নবুয়তের দপ্তরে। সুতরাং সাবধান! হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, হাসান, মুজাহিদ, ইকরামা ও জুহাক বলেছেন, ছাদের একটি খিলানে হজরত ইউসুফ তখন দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর মহান পিতার প্রতিচ্ছবি। দেখেছিলেন মহান পিতা আক্ষেপের সঙ্গে তাঁর হাতের আঙ্গুল দাঁত দিয়ে দংশন করছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, হজরত ইয়াকুব তখন সশরীরে হাজির হয়েছিলেন সেখানে। বক্ষে আঘাত করেছিলেন প্রিয় পুত্রের। ফলে তাঁর প্রাণপাখি বহির্গত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো।

www.eelm.weebly.com

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে মোহাম্মদ ইবনে সিরীন বলেছেন, দাঁতে আঙ্গুল কর্তন অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন হজরত ইয়াকুব। বলেছিলেন, হে ইউসুফ বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্! তুমি নবী। সুতরাং অবুঝ হয়ো না।

সুদ্দী বলেছেন, হজরত ইউসুফ তখন নেপথ্য থেকে আওয়াজ শুনতে পেলেন, ইউসুফ! ওই রমণীর ফাঁদে ধরা না পড়া পর্যন্ত তুমি আকাশে উড়ন্ত মুক্ত বিহঙ্গের মতো , যাকে ধরার সাধ্য কারো হয় না। আর ধরা পড়লে তুমি হবে ওই প্রাণহীন পাখি যা লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। হে ইউসুফ! উপগত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তুমি ওই উন্মত্ত ষাঁড়, যা কারো নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। আর উপগত হওয়ার পর তুমি হবে ওই ভূলুণ্ঠিত মৃত ষাঁড়, যার শিঙে কিলবিল করতে থাকে অসংখ্য কীট।

ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, কাসেম ইবনে আবী বায্যার বলেছেন, তখন অদৃশ্য থেকে ধ্বনিত হলো, হে ইয়াকুব তনয়! তুমি তো ওই সুস্থ সবল আকাশ-বিহারী পক্ষীর মতো। সাবধান! ব্যভিচার তোমাকে করে দিবে পক্ষহীন। নেপথ্যের ওই আওয়াজ শুনে হজরত ইউসুফ অপ্রস্তুত হলেন না মোটেও। উপরের দিকে তাকাতেই তিনি দেখতে পেলেন হজরত ইয়াকুবকে। দাঁতে আঙ্গুল কাটছিলেন তিনি। পিতাকে এভাবে দেখতে পেয়ে তিনি লজ্জায় অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুজাহিদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত জিবরাইল। অনভিপ্রেত দৃশ্য দেখে তিনি দাঁতে আঙ্গুল কাটতে শুরু করলেন। আক্ষেপের স্বরে বললেন, হায়! নবুয়তের দফতরে লিপিবদ্ধ রয়েছে যার নাম, তার পক্ষে এমতো অসুন্দর কর্ম সম্পাদন কি প্রকারে সম্ভব? এরপর তিনি হজরত ইউসুফকে স্পর্শ করলেন। ফলে হজরত ইউসুফ হয়ে গেলেন সুস্থ ও সুদৃঢ়।

মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী বলেছেন, হজরত ইউসুফ তখন উপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন সেখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে এই আয়াত— লা তাক্বরাবুয্ যিনা ইন্নাহু কানা ফাহিশাহ্ (ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, অবশ্যই ব্যভিচার একটি গর্হিত কর্ম)।

আতিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ইউসুফের বুরহান বা নিদর্শন দর্শনের মর্ম হচ্ছে ফেরেশতা দর্শন।

হজরত ইমাম হাসানের পুত্র হজরত আলী বলেছেন, জুলায়খার ঘরে ছিলো একটি প্রতিমা। সে ওই প্রতিমাটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে উদ্যত হলো। হজরত ইউসুফ বললেন, এরকম করছেন কেনো? জুলায়খা বললো, এ বিগ্রহটি তো আমাদের মিলন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে। লজ্জিত হবো আমি। হজরত ইউসুফ বললেন, তুমি একটা জড় পদার্থকে ভয় করছো। তোমার তো ভয় থাকা উচিত ওই আল্লাহ্‌র, যিনি তোমার ও আমার প্রভুপালক এবং যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা।

শেষে বলা হয়েছে— 'তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখবার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিলো আমার বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের অন্তর্ভুক্ত।' এখানে 'সূ' অর্থ সগীরা গোনাহ্ এবং 'ফাহ্শা' অর্থ কবীরা গোনাহ্ বা

www.eelm.weebly.com

ব্যভিচার। 'মুখলাসীন' অর্থ বিশুদ্ধচিত্ত। অন্য এক উচ্চারণ রীতিতে এসেছে 'মুখ্লিসীন।' যারা আল্লাহ্তায়ালার বিধানের যথাবাস্তবায়ন ঘটান তাঁরাই 'মুখলিস'। আর আল্লাহ্ স্বয়ং যাদেরকে বিশুদ্ধচিত্ত করে নেন তাঁরা 'মুখলাস'। নিঃসন্দেহে হজরত ইউসুফ সেরকমই ছিলেন।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَّأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا
جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ قَالَ هِيَ
رَاوَدَتْنِي عَنْ نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ
قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ
وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ
إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۝ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۖ
إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۝

❒ উহারা উভয়ে দৌড়াইয়া দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পিছন হইতে তাহার জামা ছিঁড়িয়া ফেলিল। তাহারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার নিকট পাইল। স্ত্রীলোকটি বলিল, 'যে তোমার পরিবারের সহিত কুকর্ম কামনা করে তাহার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন মর্মন্তুদ শাস্তি ব্যতীত আর কী দণ্ড হইতে পারে?

❒ ইউসুফ বলিল, 'সে-ই আমা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিল।' স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, 'যদি উহার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলিয়াছে এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী;

❒ কিন্তু উহার জামা যদি পিছন দিক হইতে ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলিয়াছে এবং ইউসুফ সত্যবাদী।'

❒ গৃহস্বামী যখন দেখিল যে তাহার জামা পিছন দিক হইতে ছিন্ন করা হইয়াছে তখন সে বলিল, 'ইহা তোমাদের নারীদিগের ছলনা! ভীষণ তোমাদিগের ছলনা!

www.eelm.weebly.com

❒ 'হে ইউসুফ! তুমি এ বিষয়ে কিছু মনে করিও না এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর; তুমিই অপরাধী।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কামার্ত নারীর অপবিত্র আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে হজরত ইউসুফ দৌড় দিলেন দরজার দিকে। পিছনে পিছনে জুলায়খাও দৌড়াতে লাগলো তাঁকে ধরবার জন্য। পিছন দিক থেকে টেনে ধরলো তাঁর জামা। জামা ছিঁড়ে গেলো। হজরত ইউসুফ অগ্রসর হতে চেষ্টা করলেন। দরজা উন্মুক্ত হলো অলৌকিকভাবে। দু'জনেই বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্বয়ং আজিজ। জুলায়খা সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, স্বচক্ষে দেখো তোমার এই গুণধর গোলামের কীর্তি। তুমি তার আশ্রয়দাতা, প্রতিপালনকারী। অথচ সে তোমার স্ত্রীকে তার শয্যাসঙ্গিনী করতে চায়। এখনই তোমাকে বলতে হবে এই অপরাধীকে তুমি কারাগারে পাঠাবে না অন্য কোনো দণ্ড দান করবে। এখানে 'আলবাব' শব্দটির অর্থ বহির্গমনের দরজা। 'ক্বাদ্‌দাত' অর্থ ছিঁড়ে ফেলা। লম্বালম্বি ছিঁড়ে ফেলাকে 'ক্বাদ্‌দাত' আর পাশাপাশি ছিঁড়ে ফেলাকে বলে 'ক্বাত্‌তু।' বাগবী লিখেছেন, তখন দরজার সামনে দণ্ডায়মান হয়েছিলো জুলায়খার চাচাতো ভাইসহ আজিজ।

পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'ইউসুফ বললো, সে-ই আমার দ্বারা অসৎকর্ম কামনা করেছিলো।' একথার অর্থ— জুলায়খার অপবাদ প্রদানের প্রেক্ষিতে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলেন হজরত ইউসুফ। বললেন, আপনার স্ত্রী-ই আমাকে অসৎকর্মে প্ররোচিত করেছিলো। আমি নির্দোষ।

হজরত ইউসুফ ছিলেন স্বল্পভাষী ও গম্ভীর প্রকৃতির। জুলায়খা মিথ্যার আশ্রয় না নিলে তিনি হয়তো বা এ সম্পর্কে কোনো কথা উত্থাপন করতেন না। কেবল অপবাদ নিরসনার্থেই তিনি মুখ খুলেছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলো, যদি তার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী।' কেউ কেউ বলেছেন, ওই সাক্ষী ছিলো জুলায়খার পিতৃব্যপুত্র। কেউ বলেছেন, মাতুলপুত্র। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও জুহাক বলেছেন, সে ছিলো দুগ্ধপোষ্য শিশু।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আউফি সূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, চারটি শিশু দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় কথা বলেছিলো— ১. ফেরাউনের স্ত্রীর কেশ পরিচর্যাকারিণীর শিশু সন্তান। ২. হজরত ইউসুফ সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতা শিশু। ৩. বনী ইসরাইলের অভিযুক্ত জুরাইজকে নির্দোষ প্রমাণকারী সাক্ষ্যদাতা শিশু। ৪. হজরত মরিয়মের শিশু সন্তান হজরত ঈসা। মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ সাআফ তাঁর তাখ্‌রীজুল বায়যাবী গ্রন্থে লিখেছেন, বর্ণিত হাদিসটি লিপিবদ্ধ রয়েছে ইমাম

www.eelm.weebly.com

আহমদের মসনদে, ইবনে হাব্বানের সহীহ্ গ্রন্থে এবং হাকেমের মুসতাদরাকে। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। তিনি বোখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লামা তিব্বীর নিকট এর বিশুদ্ধতার কোনো প্রমাণ নেই। এর বিপরীতে তিনি উল্লেখ করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস। হাদিসটি এই— দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় কথা বলেছিলো তিনটি শিশু— ১. হজরত মরিয়মের পুত্র হজরত ঈসা। ২. জুরাইজের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিশু। ৩. ওই শিশু যার দুগ্ধপানের সময়ে এক সুদর্শন যুবককে দেখে তার মা বলেছিলো, হে আল্লাহ্! আমার এই শিশু সন্তানটিকে ওই যুবকের মতো করে দাও। শিশুটি তখন বলেছিলো, না ওরকম নয়। বর্ণিত হাদিস দু'টোর মাধ্যমে দুগ্ধপোষ্য সাক্ষ্যদাতার সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচজন।

আল্লামা সুয়ূতি বলেছেন, শিশু সাক্ষ্যদাতার সংখ্যা এর চেয়েও বেশী। মুসলিম শরীফে রয়েছে— ইয়েমেনের এক প্রতাপশালী রাজা একবার একটা গর্ত খনন করে তার মধ্যে সৃষ্টি করলো অগ্নিকুণ্ড। তারপর ইমানদারদেরকে ধরে ধরে নিক্ষেপ করতে লাগলো ওই অগ্নিকুণ্ডে। মাতৃক্রোড় থেকে একটি শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকেও নিক্ষেপ করলো আগুনে। ডুকরে কেঁদে উঠলো তার মা। মায়ের বিলাপ শুনে শিশুটি অগ্নিগহ্বর থেকে বলে উঠলো, কেঁদোনা মা কেঁদোনা। এটা অগ্নিকুণ্ড নয়, পুষ্প কানন। আল্লামা সুয়ূতি তাঁর এক কবিতায় এরকম শিশুর সংখ্যা এগারো জন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন— ১. হজরত মোহাম্মদ স. এর মা ২. হজরত ইয়াহ্ইয়া ৩. হজরত ইসহাক ৪. হজরত ইব্রাহিম খলিল ৫. হজরত মরিয়ম ৬. জুরাইজের সাক্ষ্যদাতা ৭. হজরত ইউসুফের সাক্ষ্যদাতা ৮. অগ্নিগহ্বরে নিক্ষিপ্ত শিশু ৯. মায়ের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সাক্ষ্যদাতা শিশু ১০. ফেরাউনের যুগের এক অধিক সন্তানধারীর শিশু ১১. যে শিশু সাক্ষ্যদান করবে ইমাম মেহেদীর যুগে।

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তার জামা যদি পিছন দিক থেকে ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ সত্যবাদী।' আগের আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা চলে এসেছে এই আয়াতেও। এভাবে সাক্ষ্যদাতা শিশুর বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে এরকম— ইউসুফ ও জুলায়খার মধ্যে কে সত্য কথা বলেছে তা প্রমাণ করা অতি সহজ। যদি ইউসুফের জামা সামনের দিকে ছিঁড়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে ইউসুফ বলপূর্বক আলিঙ্গন করতে চেয়েছিলো জুলায়খাকে। আর জুলায়খা বাধা দিতে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে তাঁর জামার সম্মুখভাগ। আর যদি জামা পিছনের দিক ছেঁড়া থাকে, তবে বুঝতে হবে জুলায়খা তাঁকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছিলো। আর ইউসুফ পালিয়েছিলো দরজার দিকে। তখন পিছন থেকে তাঁকে ধরতে যেয়ে জুলায়খা ছিঁড়ে ফেলেছে তাঁর জামা। ব্যাপারটি অবশ্য সাক্ষী প্রমাণ ছাড়াও অনুধাবন করা যায়। কিন্তু এ কথা যেহেতু উচ্চারণ করেছে এক শিশু তাই তাকে এখানে সাক্ষ্যদাতা বলা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'গৃহস্বামী যখন দেখলো যে তার জামা পিছন দিক থেকে ছিন্ন করা হয়েছে, তখন সে বললো, এটা তোমাদের নারীদের ছলনা, ভীষণ তোমাদের ছলনা।' একথার অর্থ— আজিজ দেখতে পেলেন হজরত ইউসুফের জামার পশ্চাৎভাগ ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে। তিনি বুঝতে পারলেন প্রকৃত ঘটনা কি? স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে বললেন, তুমি ছলনাময়ী। নারীরা এভাবে ছলনা করে থাকে। উহ্! কী ভীষণ তোমাদের ছলনা।

রমণীকুল সাধারণতঃ দুর্বল ও কোমল হৃদয়া। কিন্তু কুটিলতা, জটিলতা ও ছলনায় তারা পারদর্শিনী। তাই আজিজ এখানে জুলায়খাকে লক্ষ্য করে সাধারণভাবে রমণীকুলকে অভিযুক্ত করে বলেছেন, 'কী ভীষণ তোমাদের ছলনা।'

ললনাকুলকে সৃষ্টি করা হয়েছে বক্ষদেশের বক্র অস্থি থেকে। তাই তাদের স্বভাব বঙ্কিম। শয়তান সহজেই ললনাকুলকে বশ করতে পারে। তাই শয়তান প্রভাবিত নারী পুরুষের সম্মুখে আবির্ভূত হয় ছলনাময়ীরূপে। পুরুষেরাও অধিকাংশ সময় সে ছলনার জাল ছিন্ন করতে পারে না। রসুল স. এরশাদ করেছেন, নারী জাতি হচ্ছে শয়তানের জাল। তিনি স. আরো বলেছেন, বিবেকহীন ব্যক্তি কোনো বিবেকবান ব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না। অথচ বিবেকহীনা নারী তা পারে। কোনো কোনো বিজ্ঞজন বলেছেন, চক্রান্তপ্রবণা নারী কূচক্রিশ্রেষ্ঠ শয়তানের চেয়েও ভয়ংকর। আল্লাহ্পাক স্বয়ং এরকম বলেছেন। এক স্থানে বলেছেন— 'শয়তানের চক্রান্ত ছিলো দুর্বল।' আরেক স্থানে নারীদের চক্রান্ত সম্বন্ধে বলেছেন— 'তোমাদের চক্রান্ত ভয়ংকর।'

এর পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'হে ইউসুফ! তুমি এ বিষয়ে কিছু মনে কোরো না এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।' একথার অর্থ— আজিজ বললেন, হে ইউসুফ! যা ঘটেছে ঘটেছে। তুমি বিষয়টি ভুলে যাও। এ সম্পর্কে কাউকে কোনো কিছু বোলো না। এর পর তাঁর স্ত্রীকে বললেন, জুলায়খা! তুমি অপরাধিনী। অতএব অনুতপ্ত হও ও তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো। এখানে 'আলখত্বিয়ীন' শব্দটি এসেছে 'আল খাত্বা' ক্রিয়ামূলের কর্তৃকারকরূপে। জুলায়খা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অপরাধ করেছিলো। শব্দটির মাধ্যমে সে কথাই বুঝানো হয়েছে। এখানে জুলায়খা একা অপরাধিনী হওয়া সত্ত্বেও ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনবোধক শব্দ 'আল খত্বিয়ীন্।' এভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে রমণীকুলের উপরে পুরুষকুলের প্রাধান্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে— ওয়া কানাত্ মিনাল ক্বানিতীনা ওয়া ইন্নাহা কানাত্ মিন ক্বওমিল কাফিরীন। উল্লেখ্য যে, আজিজ ছিলেন অতিশয় ভদ্র। তাই তিনি জুলায়খার ভুলের জন্য এভাবে তিরস্কার করাকেই যথেষ্ট মনে করেছিলেন। কঠিন কোনো শাস্তির দিকে আর অগ্রসর হননি।

www.eelm.weebly.com

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ
شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ
اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ
اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا
هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ○ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ؕ
وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ
وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ○ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْۤ
اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ○
فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ ثُمَّ
بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ○

❒ নগরের কিছু নারী বলিল, 'আযীযের স্ত্রী তাহার যুবক-দাস হইতে অসৎকর্ম কামনা করিতেছে; প্রেম তাহাকে উন্মত্ত করিয়াছে, আমরা তো তাহাকে দেখিতেছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।'

❒ সে যখন উহাদিগের ষড়যন্ত্রের কথা শুনিল তখন সে উহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইল, উহাদিগের জন্য আসন প্রস্তুত করিল, উহাদিগের প্রত্যেককে একটি করিয়া ছুরি দিল এবং ইউসুফকে বলিল, 'উহাদিগের সম্মুখে বাহির হও।' অতঃপর উহারা যখন তাহাকে দেখিল তখন উহারা তাহার গরিমায় অভিভূত হইল এবং নিজদিগের হাত কাটিয়া ফেলিল। উহারা বলিল, 'অদ্ভুত আল্লাহের মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নহে, এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশ্তা।'

❒ সে বলিল, 'এ-ই সে যাহার সমন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করিয়াছ; আমি তো তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছি কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রাখিয়াছে;

www.eelm.weebly.com

আমি তাহাকে যাহা আদেশ করি সে যদি তাহা না করে তবে সে কারারুদ্ধ হইবেই এবং নীচদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

❒ ইউসুফ বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! এই নারীগণ আমাকে যাহার প্রতি আহ্বান করিতেছে তাহা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি উহাদিগের ছলনা হইতে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি উহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িব এবং অজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

❒ অতঃপর তাহার প্রতিপালক তাহার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাহাকে উহাদিগের ছলনা হইতে রক্ষা করিলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❒ নিদর্শনাবলী দেখিবার পর উহাদিগের মনে হইল যে তাহাকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করিতেই হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— জুলায়খার প্রেম নিবেদন ও হজরত ইউসুফের প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি চাপা রইলো না। একান ওকান করতে করতে রটে গেলো সারা শহরে। গৃহে গৃহে উঠলো নিন্দার ঝড়। কয়েকজন গৃহিনী ছিলো এর পুরোভাগে। তারা বলতে লাগলো শুনেছো, আজিজের বৌ কী কীর্তি করেছে। ফষ্টিনষ্টি বাঁধিয়েছে তার যুবক ক্রীতদাসের সঙ্গে। সে এখন প্রেমোন্মাদিনী। ছিঃ ছিঃ এতো নিচে কেউ নামে? আমরা তো স্পষ্ট দেখছি, সে বিপথগামিনী।

মুকাতিল বলেছেন, ওই রটনাকারিণীরা ছিলো পাঁচজন। তারা বলেছিলো 'প্রেম তাকে উন্মত্ত করেছে।' সুদ্দী বলেছেন, এখানে উল্লেখিত 'শিগাফ' শব্দটির অর্থ হৃদয়তন্ত্রী। কালাবী বলেছেন, জুলায়খার হৃদয় সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয়েছিলো ইউসুফের প্রেমে। ফলে তার বিবেক হয়ে পড়েছিলো নিষ্ক্রিয়। তাই রটনাকারিণীরা বলেছিলো 'আমরা তো তাকে দেখছি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে।'

পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'সে যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনলো, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠালো, তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করলো, তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিলো এবং ইউসুফকে বললো, ওদের সম্মুখে বের হও।'

এখানে 'মকর' অর্থ কানাঘুষা, পরচর্চা, ষড়যন্ত্র। 'গীবত' শব্দটির অর্থও এ রকম। দু'টো শব্দই দ্ব্যর্থবোধক। ইবনে ইসহাক বলেছেন, 'মকর' অর্থ চক্রান্ত। ঘটনাটি ঘটেছিলো এরকম— রটনাকারিণীরা ছিলো জুলায়খার সহচরী। মাঝে মাঝেই সে তার সহচরীদের সম্মুখে হজরত ইউসুফের অনন্যসাধারণ রূপলাবণ্যের প্রশংসা করতো প্রেমজ্বালা সহ্য করতে না পেরে। সেদিনের গোপন কাহিনীটিও সে তাদেরকে জানালো। সঙ্গে সঙ্গে একথাটিও তাদেরকে জানিয়ে দিলো যে, খবরদার! ঘটনাটি যেনো জানাজানি না হয়। কিন্তু তারা বিষয়টি আর চাপা রাখতে পারেনি। রটিয়ে দিয়েছিলো শহরময়। তাদের ওই রটনাকেই এখানে চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে।

'আরসালাত্' (ডেকে পাঠালো) ক্রিয়াটির কর্মপদ এখানে উহ্য। ওই উহ্য কর্মপদসহ এখানে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— একজন সংবাদ বাহকের মাধ্যমে জুলায়খা নিমন্ত্রণ করলো রটনাকারিণীদেরকে।

www.eelm.weebly.com

ওয়াহাব বলেছেন, জুলায়খা তার ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো চল্লিশজন মহিলাকে। যে পাঁচজন তাকে প্রেমোন্মাদিনী ও বিভ্রান্তিনী বলেছিলো, তারাও আমন্ত্রিতা হয়েছিলো ওই ভোজসভায়।

'মুত্তাকাআন' অর্থ ভোজাসন। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, হাসান বসরী, কাতাদা ও মুজাহিদ শব্দটির অর্থ করেছেন ভোজসভা। ভোজসভায় অভ্যাগতদের জন্য আরামদায়ক আসনের ব্যবস্থা থাকে। এখানে ভোজের জন্য আসন প্রস্তুত করলো— কথাটির মাধ্যমে ভোজসভাকেই বুঝানো হয়েছে। আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে আহার করা বিত্তশালীদের অভ্যাস। রসুল স. তাই হেলান দিয়ে আহার করতে বারণ করেছেন। ইবনে আবী শায়বা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন হজরত জাবের থেকে। কেউ কেউ বলেছেন, কাঁটা চামুচের মাধ্যমে আহার করাকে বলে 'মুত্তাকাআন'। আবার কেউ বলেছেন হিব্রু ভাষায় 'মুত্তাকাআন' অর্থ লেবু। ইকরামা এবং আবু জায়েদ আনসারী বলেছেন, ছুরি দ্বারা কর্তিত বস্তুকে আরবী ভাষায় বলে 'মুত্তাকী'। বাগবী বলেছেন, আজিজ-পত্নী ভোজসভা বসিয়েছিলেন একটি বৃহৎ কামরায়। সেখানে অতিথিদের জন্য ছিলো বর্ণাঢ্য আয়োজন। ছিলো সুসজ্জিত ও সুচিত্রিত আসন। আর সে আসনগুলোর সম্মুখে রাখা হয়েছিলো বিভিন্ন রকমের ফলমূল। আর প্রত্যেকের জন্য সেখানে রাখা ছিলো একটি করে ছুরি। ফলমূল, গোশত ইত্যাদি খাদ্য বস্তু ছুরি দিয়ে কেটে কেটে খাওয়া ছিলো মিসরবাসীদের অভ্যাস।

যথাসময়ে শুরু হলো ভোজন পর্ব। জুলায়খা বললো, ইউসুফ এবার বেরিয়ে এসো। অতিথিদের সামনে গিয়ে দাঁড়াও। ইকরামা বলেছেন, সমগ্র মানব জাতির তুলনায় হজরত ইউসুফের সৌন্দর্যবিভা যেনো নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদ। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইবনে জারীর, হাকেম ও ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মেরাজের রাত্রে আকাশে পরিভ্রমণকালে আমি নবী ইউসুফকে দেখেছি। তিনি ছিলেন পূর্ণতিথির শশী সদৃশ।

আবু শায়েখ তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, ইবনে ইসহাক বিন আবদুল্লাহ্ আবী ফারাদাহ্ বলেছেন, হজরত ইউসুফ যখন মিসর নগরীর অলিগলিতে পথ চলতেন তখন তাঁর রূপের ছটায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতো প্রাচীরগাত্র, যে ভাবে সূর্য রশ্মি-সম্পাতে পানিতে প্রতিবিম্বিত সূর্যকিরণ বিচ্ছুরিত হয় দেয়াল গাত্রে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা যখন তাঁকে দেখলো তখন তারা তাঁর গরিমায় অভিভূত হলো এবং নিজেদের হাত কেটে ফেললো। তারা বললো, অদ্ভুত আল্লাহ্র মাহাত্ম্য! এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা। আবুল আলীয়া বলেছেন, ইউসুফকে দেখে রমণীকুল হয়ে গেলো হতভম্ব। হতভম্ব অবস্থা বা অভিভূতি বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'আকবারনা' শব্দটি। কোনো কোনো

www.eelm.weebly.com

আলেম বলেছেন,'আকবারনা' শব্দটির মাধ্যমে এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, হজরত ইউসুফের ভূবন ভুলানো রূপ দেখে অস্বাভাবিক চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছিলো অতিথিনীদের। শুরু হয়ে গিয়েছিলো রজঃস্রাব। আরববাসীরা যুবতী নারীকে বলে 'আকবাবাতিল্ মারআতু'। কথাটির অর্থ— মেয়েটি প্রাপ্তবয়স্কা হয়েছে। অর্থাৎ সে এখন ঋতুবতী।

অতিথি রমণীরা তাদের ছুরি দিয়ে ফল কাটতে শুরু করেছিলো। হঠাৎ হজরত ইউসুফকে সামনে দেখে মোহিত হয়ে গেলো তারা। ফল কাটতে গিয়ে কেটে ফেললো নিজেদের হাত। কিন্তু রক্তরঞ্জিত হাতের দিকে তাদের খেয়ালই হলো না। জখমের অনুভূতিও লোপ পেয়ে গেলো তাদের। মুজাহিদ বলেছেন, তখন রক্তক্ষরণের অনুভূতিও তাদের বিলুপ্ত হয়েছিলো। কাতাদা বলেছেন, ছুরির আঘাতে তাদের হাত কেটে পৃথক হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। নিজেদের হাত তারা কেটে ফেলেছিলো ঠিকই, কিন্তু কারো হাত কর্তিত হয়ে খসে পড়েনি। ওয়াহাব বলেছেন, হস্ত কর্তনের পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তখন কয়েকজন পুরনারী ঢলে পড়েছিলো মৃত্যুর কোলে।

দিশেহারা নারীরা তখন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠেছিলো, অদ্ভুত আল্লাহ্র মাহাত্ম্য! এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশ্তা। এখানে 'বাশার' শব্দটি যবরযুক্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'মা' এবং 'লাইসা' শব্দদ্বয় বর্তমান কালের না সূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। একারণেই ভাষাবিদগণ 'লাইসা' ও 'মা' শব্দ দু'টোর বিধেয়কে যবর সংযুক্ত করেন। বাগবী লিখেছেন, মূলতঃ এই বিধেয়টি ছিলো যেরযুক্ত। অর্থাৎ 'মা হাজা বি বাশারিন্ '। কিন্তু এখানে হরুফে জর (যের) উঠিয়ে দিয়ে বিধেয়ের উপর নসব দেয়া হয়েছে (যবরযুক্ত করা হয়েছে)।

হজরত ইউসুফের অভূতপূর্ব সৌন্দর্য দেখে রমণীকুল তাঁকে ফেরেশতা বলে অভিহিত করেছিলো। কারণ ইতোপূর্বে তারা এমতো রূপবান আর কাউকে দেখেনি। তারা একথাও জানতো যে, এই ভুবনজয়ী রূপবান পুরুষ জুলায়খার কামনার আগুনে কিছুতেই আত্মাহুতি দিতে সম্মত হয়নি। এরকম মহিমান্বিত চরিত্রের মানুষ অতি বিরল। তাই তারা অকুণ্ঠচিত্তে বলে উঠেছিলো, 'এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা।'

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'সে বললো, এ-ই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছো । আমি তো তার নিকট থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছি কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে।' এ কথার অর্থ— জুলায়খার উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো। সে তার সখী ও অন্যান্য নারীদেরকে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছিলো যে, ইউসুফের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখে আত্মসংবরণ করা কোনো নারীর পক্ষে সম্ভব

www.eelm.weebly.com

নয়। যে তাকে দেখবে সে অবশ্যই তাঁর রূপের আগুনে জ্বলে পুড়ে দগ্ধিভূত হতে থাকবে। একথা প্রমাণের পর জুলায়খা আত্মপ্রসাদ লাভ করলো। দিশেহারা রমণীদেরকে লক্ষ্য করে বললো, দেখলে তো, ইউসুফের দিকে তাকালে কী অবস্থা হয়। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারবে যে, ইউসুফের রূপের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। সুতরাং হে সখীকুল! তোমরাই বলো, একই বাড়ীতে ইউসুফকে রেখে আমি আত্মরক্ষা করি কীরূপে? আমি তো তাকে চাই । কিন্তু সে আমাকে চায় না। আমি কামোন্মাদিনী। কিন্তু সে পবিত্র ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তাকে যা আদেশ করি সে যদি তা না করে তবে সে কারারুদ্ধ হবেই এবং নিচদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' একথার অর্থ— জুলায়খা ভেবেছিলো এক সময় হয়তো ইউসুফের মন গলবে, কিন্তু তা হলো না। দিশেহারা রমণীরাও তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করলো। বললো, শোনো ইউসুফ। তুমি তো এ বাড়ীর গোলাম। নির্দেশ পালন করাই তোমার কাজ। সুতরাং তোমার প্রভুপত্নী যেমন চান, তেমনি করো। কিন্তু হজরত ইউসুফ অটল, অবিচল। তিনি তো নবী। পবিত্রতার অত্যুচ্চ পর্বত। তাই কামাতুরা নারীর অপবিত্র আহ্বান তাঁকে টলাবে কীভাবে? কিন্তু জুলায়খাও পশ্চাদপসরণের পাত্রী নয়। ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান তাকে করে তুললো ভয়ংকরী, নির্মমা, নিষ্ঠুরা । সমব্যথিনীদের নিকটে সে চূড়ান্ত ঘোষণা দিলো এভাবে— এবার আমি আর তাকে ক্ষমা করবো না। আমাকে প্রশমিত না করলে আমি তাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করবোই। হেয় প্রতিপন্ন করবোই।

এর পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'ইউসুফ বললো, হে আমার প্রতিপালক! এই নারীগণ আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়।' একথার অর্থ— হজরত ইউসুফ আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করলেন। বললেন, হে আমার প্রভুপালক! জুলায়খা ও তার সহচরীরা বলপূর্বক আমাকে পাপের আগুনে পোড়াতে চায়। কিন্তু তুমি তো জানো, আমি চাই পবিত্র জীবন। চাই তোমার সন্তোষ । আমাকে রক্ষা করো। আশ্রয় দাও। তোমার বিধান-বিরোধী উপায়ে কাম চরিতার্থ করা অপেক্ষা কারাগারই আমার কাম্য।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়'— এরকম না বললে আল্লাহ্‌পাক অন্য কোনো উপায়ে হজরত ইউসুফকে রক্ষা করতেন। কিন্তু তিনি প্রকারান্তরে স্বেচ্ছায় কারাগারকে নির্বাচন করেছিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছিলেন মাত্র। হজরত মুয়াজ থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক লোককে আল্লাহ্‌র দরবারে ধৈর্যধারণের আবেদন করতে দেখে রসুল স. বললেন, তুমি তো আল্লাহ্‌র কাছে বিপদাপদ কামনা করছো। ধৈর্যধারণ করতে হয় তো বিপদাপদের সময়েই। এরকম কোরো না। কেবল মার্জনাপ্রার্থী হও। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি একবার আবেদন জানালাম, হে আমার প্রিয়তম রসুল! আমাকে

www.eelm.weebly.com

প্রার্থনার ভাষা শিক্ষা দিন। তিনি স. বললেন, কেবল ইসতেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকো। কিছুদিন পর আমি পুনরায় নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি আমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিন, যা আমি আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থাপন করতে পারি। তিনি স. বললেন, পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর জন্য কেবল ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো।

এরপর বলা হয়েছে— আপনি যদি ওদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন, 'তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।' এখানে 'সাবুয়াতুন' কথাটির অর্থ অপপ্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়া। আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থটি এরকম— হজরত ইউসুফ আরো বললেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমিই আমার ও সকলের একমাত্র রক্ষাকর্তা। সুতরাং আমাকে রক্ষা করো। যদি রক্ষা না করো তবে তো আমি শেষ পর্যন্ত স্বভাবগত আকর্ষণকে রোধ করতে পারবো না। ঝুঁকে পড়বো অপপ্রবৃত্তির দিকে। অবশেষে হয়ে যাবো অজ্ঞদের দলভূত।

আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, যারা অজ্ঞ ও মূর্খ, পাপ কর্ম করে কেবল তারাই। বিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা অপকর্ম সাধিত হলে বুঝতে হবে সে হয়ে পড়েছে অজ্ঞতার অধীন। অজ্ঞতা ও মূর্খতাবশতঃ বিশ্বাসীরাও কখনো কখনো পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এর পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তার প্রতিপালক তার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাকে তাদের ছলনা থেকে রক্ষা করলেন, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

এর পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে নিদর্শনাবলী দেখবার পর তাদের মনে হলো যে, তাকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করতে হবে।' একথার অর্থ— অবস্থা হয়ে পড়লো আরো সঙ্গিন। বার বার প্রত্যাখ্যাতা হয়ে জুলায়খা হয়ে গেলো উম্মাদিনীপ্রায়। আজিজ হয়ে পড়লো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ইউসুফের মতো সুদর্শন, পবিত্র ও উন্নত চরিত্রবিশিষ্ট পুরুষের এহেন বিপদ দেখে তিনি তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করলেন। শেষে ঠিক করলেন, এ বাড়িতে ইউসুফকে রাখা কিছুতেই সমীচীন নয়। পবিত্রতা রক্ষার যুদ্ধে এখন সে বিধ্বস্ত প্রায়। সুতরাং কিছুদিন তাকে কারাভ্যন্তরে রাখাই উত্তম। তাছাড়া জুলায়খাও বার বার এমতো পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। পত্নী-প্রভাবিত আজিজ শেষে তাই করলো। ইউসুফকে পাঠিয়ে দেয়া হলো কারাগারে। জুলায়খা ভাবলো কারাগারের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ইউসুফ নিশ্চয় অবনমিত হবে। শেষে হয়তো গ্রহণ করবে তার প্রণয় নিবেদন। ইতোমধ্যে তার নিন্দা ও কুৎসার আগুনও হয়ে পড়বে স্তিমিত। এরকমও হতে পারে যে— আজিজের কাছে বিষয়টি ধরা পড়ার পর তিনি ইউসুফের সঙ্গে জুলায়খার দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বিরহবিধুরা জুলায়খা তখন ক্ষোভে দুঃখে দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পুনঃপুনঃ আজিজের কাছে হজরত ইউসুফকে কারারুদ্ধ করার কথা বলতে লাগলো। ছলনাময়ী নারীর ছলনা বিচিত্র। সে কথাটি আজিজকে বুঝাতে লাগলো এভাবে— দ্যাখো, ইউসুফের

www.eelm.weebly.com

জন্যই আমাদের এতো দুর্নাম। সারা শহরে বয়ে চলেছে নিন্দার তুফান। তুমিও আমাকে ঘর থেকে বের হতে দাও না। এখন তোমাকে দু'টি কাজের একটি করতে হবে। আমাকে অনুমতি দাও, আমি বাইরে গিয়ে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিন্দার তুফান প্রশমিত করার চেষ্টা করি। নয়তো ইউসুফকে এক্ষুণি জেলে ঢোকাও। তাহলে আপনাআপনি নিভে যাবে নিন্দার আগুন। তখন তোমাকে আমাকে নয়, ইউসুফকেই অপরাধী মনে করবে লোকেরা।

বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ইউসুফের তিনটি অনিচ্ছাকৃত ভুলের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁকে বেছে নিতে হয়েছিলো জেলখানার জীবন। ১. এক মুহূর্তের জন্য হলেও তাঁর অন্তরে জ্বলে উঠেছিলো কামনার বহ্নি। ২. তিনি তাঁর এক সহবন্দীকে বলেছিলেন, তোমার মনিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমার (মুক্তির) কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ো। ৩. পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁর ভাইকে বলেছিলেন, নিঃসন্দেহে তোমরা অপহারক। তারা বলেছিলো, 'বিন্‌ইয়ামিন' হয়তো অপহরণ করতে পারে। ওর অগ্রজ ইউসুফও এরকম করেছিলো।

সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ۖ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَ
قَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا
بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ
تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ۖ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ
رَبِّيْ ۖ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۖ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ
نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَ
لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ
خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً

www.eelm.weebly.com

سَمَّيْتُمُوهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

❒ তাহার সহিত দুইজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করিল। উহাদিগের এক জন বলিল, 'আমি স্বপ্নে দেখিলাম আমি আংগুর নিংড়াইয়া রস বাহির করিতেছি' এবং অপর জন বলিল,'আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি আমার মস্তকে রুটি বহন করিতেছি এবং পাখী উহা হইতে খাইতেছে। আমাদিগকে তুমি ইহার তাৎপর্য জানাইয়া দাও, আমরা তোমাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখিতেছি।'

❒ ইউসুফ বলিল, 'তোমাদিগকে যে খাদ্য দেওয়া হয় তাহা আসিবার পূর্বে আমি তোমাদিগকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানাইয়া দিব। আমি যাহা তোমাদিগকে বলিব তাহা আমার প্রতিপালক আমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা হইতে বলিব। যে সম্প্রদায় আল্লাহে বিশ্বাস করে না ও পরলোকে অবিশ্বাসী, আমি তাহাদিগের মতবাদ বর্জন করিয়াছি;

❒ 'আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইস্‌হাক এবং ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহের সহিত কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদিগের কাজ নহে। ইহা আমাদিগের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।'

❒ 'হে কারা-সংগীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না এক, পরাক্রমশালী আল্লাহ্?'

❒ 'তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমরা কতগুলি নামের ইবাদত করিতেছ— যাহা তোমাদিগের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রাখিয়াছ; এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নাই। বিধান দিবার অধিকার কেবল আল্লাহেরই। তিনি আদেশ দিয়াছেন— অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে কেবল তিনি ব্যতীত; ইহাই সরল দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি এরকম— হজরত ইউসুফকে যখন কারাগারে প্রবেশ করানো হলো, তার একটু আগে পরে, অথবা সঙ্গে সঙ্গে কারাগারে ঢোকানো হলো দু'জন যুবককে। তারা ছিলো মিসর রাজ রাইয়ানের ক্রীতদাস। একজন ছিলো রন্ধনশালার প্রধান, আরেকজন ছিলো পানশালার মদ্য পরি-বেশনকারী।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, মিসররাজকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে জড়িত হয়ে পড়েছিলো যুবকদ্বয়। শত্রুপক্ষ তাদেরকে উৎকোচ দিয়ে বলেছিলো, কাজটা ততো কঠিন নয়। খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে খুব সঙ্গোপনে মেশাতে হবে বিষ। কাক-পক্ষীটিও যেনো টের না পায়। শত্রু পক্ষের এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হলো রন্ধনশালার প্রধান। কিন্তু পানশালার প্রধান এতে রাজী হলো না। আহারের সময় উপস্থিত হলো। পরিবেশিত হলো রাজকীয় আহার্য ও পানীয়। রাজার কানে কানে মদ্য পরিবেশনকারী যুবক বললো, খাদ্যে বিষ মেশানো হয়েছে। রাজা রন্ধনশালার প্রধানকে কাছে ডাকলেন। বললেন, তুমি প্রথমে পান করো। সে সঙ্গে সঙ্গে সামনে রক্ষিত পানীয় পান করলো। রাজা বললেন, এবার তুমি প্রথমে আহার করো। রন্ধনশালার প্রধান আহার করতে অস্বীকৃত হলো। রাজা কিছু খাদ্য খাওয়াতে বললেন একটি পশুকে। খাওয়ানোর সাথে সাথে পশুটি অক্কা পেলো। রাজা বুঝলেন, এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র থেকে তিনি রক্ষা পেলেন। তিনি দু'জনের একজনকেও আর বিশ্বাস করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন, এ দু'জনকে এক্ষুণি কারারুদ্ধ করা হোক।

হজরত ইউসুফের রূপ ও গুণের কথা জুলায়খা ও তার সখীদের কারণে সারা মিসরে রাষ্ট্র হয়ে পড়েছিলো। জেলখানার বন্দীদের কানেও পৌঁছে গিয়েছিলো তাঁর মহান বৈশিষ্ট্যাবলীর বিভিন্ন বিবরণ। তিনি একজন স্বপ্নবিশারদ সে কথাও তাদের জানতে আর বাকী রইলো না। তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিষয়ক জ্ঞান পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিলো দু'জন যুবক। প্রথমে তারা বর্ণনা করলো মনগড়া স্বপ্ন। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে মাসউদ। কেউ কেউ বলেছেন, তারা সত্য স্বপ্নই বিবৃত করেছিলো। হজরত ইউসুফ তাদেরকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত দেখে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এমন বিমর্ষ কেনো? তারা বললো, আমরা দু'জনে দুঃস্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নের ব্যাখ্যাও বুঝতে পারছি না। তিনি বললেন, আমার কাছে খুলে বলো।

একজন বললো, আমি দেখলাম, রাজার জন্য মদ্য প্রস্তুত করছি । এখানে উল্লেখিত 'খামার' শব্দটির অর্থ আঙ্গুর। আঙ্গুর থেকে প্রস্তুত করা হয় উৎকৃষ্ট মদ্য। তাই এখানে 'খামার' কেই মদ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, আম্মানের অধিবাসীরা আঙ্গুরকে বলে খামার। স্বপ্নবৃত্তান্ত দানকারী যুবকটি বললো, আমি রাজার পানপাত্র নিয়ে বাগানে গেলাম। দেখলাম একটি দ্রাক্ষাকুঞ্জে ঝুলে রয়েছে তিনটি গুচ্ছ। আমি ওই তিন গুচ্ছ আঙ্গুর নিষিক্ত করে শরাব প্রস্তুত করলাম। পরিবেশন করলাম রাজার সামনে। রাজা হৃষ্টচিত্তে সেই শরাব পান করলেন।

অপরজন বললেন, আমি দেখলাম, তিন টুকরী রুটি ও গোশত মাথায় নিয়ে আমি পথ চলছি। আর শিকারী পাখিরা ছোঁ মেরে তুলে নিচ্ছে টুকরির রুটি ও গোশত।

www.eelm.weebly.com

স্বপ্নের বিবরণ শেষ হলে দু'জনেই বললো, আমাদেরকে এবার স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দিন। আমরা জানি আপনি সজ্জন, সৎকর্মপরায়ণ, মহানুভব অথবা স্বপ্নসহ অন্যান্য ব্যাপারে বিজ্ঞ।

এখানকার 'আমরা তোমাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখছি' কথাটির ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে জুহাক বিন মাজহীমকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবে বলেছিলেন, হজরত ইউসুফ ছিলেন মহানুভব। জেলখানায় কোনো কয়েদী পীড়িত হলে তিনি তার সেবা যত্ন করতেন। কারো থাকার কষ্ট হলে তার কষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন। সকলের প্রয়োজন মেটাতেন। এভাবে সবার হৃদয় জয় করে তিনি আহ্বান জানাতেন এক আল্লাহর উপাসনার দিকে। সারা রাত কাটিয়ে দিতেন নামাজ পাঠ করে।

এক বর্ণনায় এসেছে— কারাগারে প্রবেশ করেই হজরত ইউসুফ দেখলেন বন্দীরা বিমর্ষ ও চিন্তাগ্রস্ত। বন্দীজীবনের অভিশাপের ছাপ ফুটে রয়েছে সকলের চোখেমুখে। তিনি সান্ত্বনার বাণী শোনালেন সকলকে। বললেন, হে বন্দী জনতা! বিপদে মুষড়ে পোড়ো না । ধৈর্য ধারণ করো। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধৈর্যের বিনিময় দান করবেন। বন্দীরা বললো, হে যুবক! আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ করুন। তুমি সুন্দর। তোমার আচরণও সুন্দর। আমরা তোমাকে দেখে মুগ্ধ, আনন্দিত। আমরা নিশ্চিত, তোমার প্রেমময় সান্নিধ্য আমাদের জীবনকে করবে কল্যাণময়। এবার বলো, কী তোমার পরিচয়? হজরত ইউসুফ বললেন, আমি ইউসুফ বিন ইয়াকুব সফিউল্লাহ বিন ইসহাক জবিহুল্লাহ বিন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্।

কারারক্ষক বললেন, হে যুবক! আমার সামর্থ্য থাকলে আমি তোমাকে এই মুহূর্তে মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু সে অধিকার আমার নেই। তবে আমি তোমাকে উত্তম সঙ্গ দিতে চাই। তোমার প্রতি প্রদর্শন করতে চাই যথোপযুক্ত সৌজন্য ও সম্মান। কারাগারের যে প্রকোষ্ঠ তোমার পছন্দ সেই প্রকোষ্ঠেই তুমি নির্বাচন করতে পারো তোমার বসবাস।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে— যে যুবকদ্বয় তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলো তারা বললো, ইউসুফ! প্রথম দর্শনেই আমরা তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। তিনি বললেন, না। আমাকে তোমরা ভালোবেসো না। আল্লাহর শপথ! কেউ যখন আমাকে ভালোবাসে তখনই আমি হই বিপদগ্রস্ত। আমার ফুফু আম্মা আমাকে ভালোবেসেছিলেন। তাই আমি হয়েছিলাম সকলের চক্ষুঃশূল। মহান পিতা আমাকে স্নেহ করতেন অত্যধিক। তার পরিণামে আমাকে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো অন্ধকার গহ্বরে। এরপর আজিজপত্নী আমাকে ভালোবেসেছে। সে কারণেই আমি আজ বন্দী। সুতরাং হে আমার সহবন্দীদ্বয় ! ভালোবাসার কথা আমাকে আর তোমরা বোলো না।

www.eelm.weebly.com

যুবকদ্বয়ের মধ্যে একজনের স্বপ্নের পরিণাম ছিলো অশুভ। তাই তিনি আর সরাসরি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে গেলেন না। বক্তব্যের অবতারণা করলেন অন্যভাবে। সে কথা বিবৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'ইউসুফ বললো, তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা আসবার পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দিবো। একথার অর্থ— হে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু যুবকদ্বয়! একটু অপেক্ষা করো। আহারের সময় উপস্থিত প্রায়। আহার্য আগমনের পূর্বেই আমি তোমাদেরকে তোমাদের স্বপ্নের বিষয়ে বলবো। কেউ কেউ হজরত ইউসুফের এই বক্তব্যটির মর্মার্থ এনেছেন এভাবে— লঙ্গরখানা থেকে তোমাদেরকে যে খাবার দেয়া হয় তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে বলে দিবো ওই আহার্যের রঙ, প্রকার, প্রকৃতি ও পরিমাণ। ঠিক কখন খাবার আসবে তার সুনির্দিষ্ট সময়ও আমি বলে দিতে পারি। উল্লেখ্য যে, হজরত ঈসার মাধ্যমেও এরকম মোজেজার প্রকাশ ঘটেছিলো। তিনি বলেছিলেন— 'আমি তোমাদেরকে বলে দিতে পারি যা তোমরা আহার করো, আরো বলতে পারি যা তোমরা স্বগৃহে সঞ্চয় করো।' যাহোক, হজরত ইউসুফের এরকম কথা শুনে যুবকদ্বয় বলতে লাগলো, এ বিদ্যা তুমি কোত্থেকে শিখেছো? ভবিষ্যৎ-বক্তা ও গণৎকারেরা সাধারণত এরকম বলে থাকে। পরবর্তী বাক্যে যুবকদ্বয়ের মন্তব্যের জবাব দেয়া হয়েছে এভাবে—

'আমি যা তোমাদেরকে বলবো, তা আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে বলবো।' একথার অর্থ— হজরত ইউসুফ বললেন, হে সঙ্গীদ্বয়! ভবিষ্যৎ-বক্তা বা গণৎকার আমি নই। আমি নবী। আমি জ্ঞান আহরণ করি আল্লাহ্র জ্ঞান থেকে— প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। এ জ্ঞান অর্জিত নয়— প্রদত্ত। সেই প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমেই আমি তোমাদেরকে তোমাদের স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করবো।

বায়যাবী লিখেছেন, স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানের পূর্বে হজরত ইউসুফ ওই যুবকদ্বয়কে আল্লাহ্র এককত্বের দিকে আহবান জানিয়েছিলেন। প্রেরিত পুরুষগণের আহবানের প্রকৃতি এরকমই। প্রথমে তাঁরা মোজেজা বা অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করে মানুষকে আকৃষ্ট করেন। তারপর জানান তৌহিদের আহবান।

সে কারণেই পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে— 'যে সম্প্রদায় আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না ও পরলোকে যারা অবিশ্বাসী, আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি।' একথার অর্থ— শোনো হে যুবকদ্বয়! আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি যারা অবিশ্বাসী, তাদের বিভ্রান্ত মতবাদ আমি পরিত্যাগ করেছি। কারণ আমি নবী। সত্যের দিশারী। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতবাদ বর্জন করার কারণে মহান আল্লাহ্ দয়াপরবশ হয়ে আমাকে দান করেছেন স্বপ্ন সম্পর্কিত বিশেষ প্রজ্ঞা।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসাহাক এবং ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ করি।' পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত সত্যের প্রতি আহ্বানের ধারা বিবৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতেও । এখানে তিনি তাঁর মহাসম্মানিত পিতৃপুরুষগণের পরিচয় দিয়েছেন। বলেছেন, পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের কথা। তাঁরা সকলেই ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী। সাথীদ্বয়কে অধিকতর আগ্রহী করে তোলার জন্য হজরত ইউসুফ এভাবে তুলে ধরেছিলেন তাঁর নবী বংশজাত পরিচিতি। একথার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স. এর প্রকৃত প্রতিনিধি কোনো আলেম অপরিচিত কোনো স্থানে গমন করলে এরকম পরিচিতি প্রদান করা সিদ্ধ। এতে করে মানুষের কাছে তাঁর বক্তব্য অধিকতর গুরুত্ববহ হতে পারে। এরকম আত্মপরিচিতি আত্মম্ভরিতার পর্যায়ভূত নয়। উদ্দেশ্যের সাধুতার উপরেই নির্ভর করে সফলতা। নবী রসুলগণের ক্ষেত্রে আত্মপরিচিতি প্রকাশ করা অত্যাবশ্যক। কারণ তাঁরা আত্মপ্রচারক নন। তাঁদের প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহের প্রচারক। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া আম্মা বিনি'মাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিস্' (আপনাকে প্রদত্ত অনুগ্রহ সমূহ প্রচার করুন)।

উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আউলিয়া তাঁদের আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও সফলতার কিছু কিছু বিবরণ দিয়েছেন। যেমন হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী ও শায়েখ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী। আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হয়, মূর্খতা ও হিংসার কারণে কেউ কেউ এ ব্যাপারে তাঁদের সমালোচনা করেছে। কিন্তু তারা জানে না যে, এসকল আধ্যাত্মিক প্রাপ্তির বিবরণ তারা আত্মপ্রচারার্থে করেননি। করেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার নেয়ামত প্রচারার্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোনো বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়।' একথার অর্থ— আমরা নবী। আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর সঙ্গে কাউকে শরীক করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ একত্ববাদ হচ্ছে আমাদের স্বভাবজাত ধর্ম। আল্লাহ্‌ই আমাদেরকে বিশেষভাবে হেফাজত করে থাকেন। তাই আমরা শিরক বা অংশীবাদিতা থেকে সতত সুরক্ষিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।' একথার অর্থ— আমাদেরকে প্রদত্ত এই নবুয়ত আমাদের জন্য ও সকল মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র এক সুবিপুল অনুগ্রহ। আমাদেরকে পরিচালনা করা হয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। আর অন্যদেরকে পরিচালিত হতে বলা হয় আমাদের মাধ্যমে। এভাবে আমরা

www.eelm.weebly.com

এবং আমাদের অনুসারীরা লাভ করি আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তোষ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই বিধানটি মানে না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না আল্লাহ্‌র এই অপার অনুগ্রহের। উল্লেখ্য যে, আমাদের মহান রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা স. এর উম্মতও এভাবে দ্বিধাবিভক্ত। তাঁর একদল উম্মত তাঁর অনুসরণকে আশ্রয় করে হয়েছেন উম্মতে ইজাবত (স্বীকৃত উম্মত)। আর একদল উদাসীনতাকে অবলম্বন করে হয়ে আছে উম্মতে দাওয়াত (আমন্ত্রিত উম্মত)।

আলোচ্য বাক্যটির মর্ম এরকমও হতে পারে যে— এই অনন্য একত্ববাদ ও প্রজ্ঞা সকল নবীর মতো আমিও পেয়েছি নিছক আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে। আর আল্লাহ্ আমাদের অনুসরণের মাধ্যমে এই অনুগ্রহের অংশীদার হবার সুযোগ দিয়েছেন সকল মানুষকে । আমাদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন অনেক অলৌকিক নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণ। এভাবে সকলকে দিয়েছেন উম্মত হবার সুযোগ। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না। তারা প্রত্যাখ্যানপ্রবণ, অকৃতজ্ঞ।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে— হে কারাসঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না এক, পরাক্রমশালী আল্লাহ্? এখানে 'মুতাফার্‌রিক্বুনা' অর্থ বহু, অসংখ্য। অংশীবাদীরা বহু দেব-দেবীর উপাসক। ওই সকল বাতিল উপাস্যদেরকে এখানে নির্দেশ করা হয়েছে এই শব্দটির মাধ্যমে। 'আল্ ওয়াহিদ' অর্থ সত্তাগত ও গুণগত দিক থেকে যিনি এক, অবিনশ্বর ও উপমাবিহীন। 'আল্‌ক্বাহ্‌হার' অর্থ মহা-পরাক্রমশালী, যার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হজরত ইউসুফ বললেন, হে আমার কারাসহচরদ্বয়! বুঝতে চেষ্টা করো। অংশীবাদীরা কতোই না অজ্ঞ। তারা উপাসনা করে বৃক্ষের, প্রস্তরের, বিগ্রহের, কল্পিত দেব-দেবীর। এরা সকলেই ধ্বংসশীল, অবক্ষয়প্রবণ, অক্ষম। আর আল্লাহ্ আনুরূপ্যহীনরূপে এক, সর্বশক্তিধর, অসমকক্ষ। এবার তবে বলো, কোন প্রভুপালক শ্রেয়ঃ— বহুধাদীর্ণ মিথ্যা উপাস্যসমূহ, না প্রবল পরাক্রান্ত ও অতুলনীয় আল্লাহ্?

এর পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'তাঁকে ছেড়ে তোমরা কতগুলো নামের ইবাদত করছো— যা তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো; এগুলোর কোনো প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠাননি।' এখানে 'আসমা' অর্থ ওই সকল উপাস্যের নাম যেগুলো উপাস্য হওয়ার যোগ্যতারহিত। আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকম— হে বন্দীদ্বয়! দ্যাখো, তোমাদের মতো লোকেরা আল্লাহ্‌কে কীভাবে পরিত্যাগ করেছে। উপাসনা করে চলেছে কতগুলো নামের, যেগুলোর কোনো

www.eelm.weebly.com

অস্তিত্বই নেই। আর এসকল নাম নির্বাচন করেছে তারা ও তাদের পিতৃপুরুষেরা। এই বিশাল সৃষ্টির সকল কিছুই সেই এক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও আনুরূপ্যবিহীন আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ। সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী। সুতরাং এগুলো কিছুতেই উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এগুলোর উপাস্য হওয়ার কোনো প্রমাণও আল্লাহ্‌তায়ালা প্রেরণ করেননি।

এরপর বলা হয়েছে— 'বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌র। তিনি আদেশ দিয়েছেন— অন্য কারো ইবাদত না করতে কেবল তিনি ব্যতীত।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক স্বাধিষ্ঠ, চিরঞ্জীব ও চিরবিদ্যমান। সকল সৃষ্টির তিনি একক স্রষ্টা ও প্রতিপালক। দাতা তিনি। চিরবিজয়ী তিনি। তিনিই সকল ভালো ও ক্ষতির চূড়ান্ত নির্ধারক। তাই সত্তাগতভাবে তিনিই সকলের একমাত্র উপাস্য। তিনিই বিধানদাতা। তিনিই বিধান দিয়েছেন, কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে হবে অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না। অন্য কারো ইবাদত যদি সিদ্ধ হতো, তবে তা সিদ্ধ হতো তাঁরই বিধানানুসারে। কিন্তু সেরকম বিধান তিনি দেননি। নবী ও রসুলগণের মাধ্যমে তাই তিনি যুগে যুগে এই বিধানটি প্রচার করেছেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'এটাই সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।' একথার অর্থ— তওহীদের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। এই ধর্মই সরল, সহজ ও সুপ্রমাণিত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ করতে অক্ষম।

বায়যাবী লিখেছেন, হজরত ইউসুফ এভাবে তাঁর সত্যধর্মের প্রতি আহ্বানকে সুপরিণতি দান করেছেন। সহবন্দীদ্বয়কে প্রথমে বলেছেন, আল্লাহ্ ও পরকালে যারা অবিশ্বাসী তাদের মতবাদ পরিত্যাজ্য। তারপর তাঁর মহান পূর্ব পুরুষগণের পরিচিতি দিয়ে বলেছেন, আমিও তাঁদের মতো নবী। তারপর তাদের সামনে একথা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা অপেক্ষা এক আল্লাহ্‌র উপাসনা শ্রেয়ঃ। আরো বলেছেন, অংশীবাদিতা তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের একটি অসার ও প্রমাণবিহীন কল্পনা মাত্র। আল্লাহ্‌পাক এরকম করতে বলেননি। এভাবে শেষে এসে চূড়ান্ত ঘোষণা দিলেন এভাবে যে, এতোক্ষণ ধরে যে ধর্মের বিবরণ আমি দিলাম এটাই প্রকৃত ধর্ম। বিবেক ও প্রজ্ঞাও একথা বলে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ একথা বুঝে না। নবী রসুলগণের মূল কর্ম হচ্ছে সত্য ধর্মের প্রচার। হজরত ইউসুফ তাই এভাবে প্রথমে ধর্ম প্রচারের মহান কর্তব্য সম্পাদন করলেন। তারপর অগ্রসর হলেন স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনার দিকে।

www.eelm.weebly.com

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِىْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِىَ الْاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ○ وَقَالَ لِلَّذِىْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ ۫ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ○

❑ 'হে কারা সংগীদ্বয়! তোমাদিগের একজন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে তাহার প্রভুকে মদ্য পান করাইবে এবং অপর সম্বন্ধে কথা এই যে, সে শূল বিদ্ধ হইবে; অতঃপর তাহার মস্তক হইতে পাখী আহার করিবে— যে বিষয়ে তোমরা জানিতে চাহিয়াছ তাহার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে।'

❑ ইউসুফ, উহাদিগের মধ্যে যে মুক্তি পাইবে মনে করিল তাহাকে বলিল, 'তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বলিও' কিন্তু শয়তান উহাকে উহার প্রভুর নিকট তাহার বিষয় বলিবার কথা ভুলাইয়া দিল; সুতরাং ইউসুফ কয়েক বৎসর কারাগারে রহিল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইউসুফ বললেন, হে সহবন্দীদ্বয়! এবার শোনো তোমাদের স্বপ্নের তাবীর। প্রথম জনকে বললেন, শীঘ্রই তুমি মুক্তি পাবে। বহাল হবে পূর্ব পদে। রাজা পুনরায় তোমাকে দান করবেন মদ্য পরিবেশনার দায়িত্ব। স্বপ্নে তিনটি আঙ্গুর গুচ্ছ দেখেছিলে তুমি । এর অর্থ— তুমি কারা মুক্ত হবে তিনদিন পর। দ্বিতীয় জনকে বললেন, তুমি স্বপ্নে দেখেছিলে, রুটি ও গোশতের তিনটি টুকরি রয়েছে তোমার মাথায়। আর শিকারী পাখিরা সেগুলো ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। ওই তিনটি টুকরি দেখার অর্থ তোমাকেও তিনদিন পর জেলখানা থেকে বের করা হবে। তারপর শূলবিদ্ধ করা হবে তোমাকে। পাখিরা তখন ঠুকরে ঠুকরে খাবে তোমার মাথার মগজ। হে আমার সঙ্গীদ্বয়! এই হচ্ছে তোমাদের দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা।

আমি বলি, স্বপ্নের এমতো ব্যাখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রন্ধনশালার প্রধান সত্যিসত্যিই খাদ্যে বিষ মিশিয়েছিলো। আর মদ্য পরিবেশনকারী ছিলো নিরপরাধ।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, হজরত ইউসুফের স্বপ্ন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা শুনে তাঁর সহবন্দীদ্বয় বলে উঠলো, আমরা তো এরকম স্বপ্ন দেখিইনি। স্বপ্নগুলো বানানো। আপনাকে খুশি করার জন্য আমরা এরকম করলাম। হজরত ইউসুফ

www.eelm.weebly.com

তখন বললেন, এরকম স্বপ্ন তোমরা দেখে থাকো আর না থাকো, আমি যা বললাম তাই হবে। এটাই আল্লাহ্‌র নির্ধারণ। পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'ইউসুফ তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করলো তাকে বললো, 'তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বোলো' কিন্তু শয়তান তাকে তার প্রভুর নিকট তার বিষয় বলবার কথা ভুলিয়ে দিলো, সুতরাং ইউসুফ কয়েক বৎসর কারাগারে রইলো।' এখানে 'জন্না' (মনে করলো) ক্রিয়ার কর্ম যদি হজরত ইউসুফ হন, তবে কথাটির অর্থ হবে দৃঢ়প্রত্যয়। আগের আয়াতে উল্লেখিত 'যে বিষয়ে তোমরা জানতে পেরেছিলে তার সিদ্ধান্ত হয়েই গিয়েছে'— কথাটিই এর প্রমাণ। আর যদি 'জন্না' ক্রিয়ার সর্বনাম সম্পর্কিত হয় পানশালার প্রধানের সঙ্গে, তবে 'মনে করলো' কথাটির অর্থ হবে— যে লোকটির সম্পর্কে প্রবল ধারণা জন্মালো।

এখানে 'রব' শব্দটির অর্থ হবে রাজা। পানশালাধ্যক্ষের নিকটে হজরত ইউসুফ বলেছিলেন, পূর্ব পদে বহাল হয়েই তুমি রাজাকে আমার সংবাদ জানাবে। বলবে, এক নিরপরাধ অভিজাত যুবক বিনা দোষে বন্দী। কিন্তু সে রাজাকে একথা বলতে ভুলে গিয়েছিলো। শয়তানই তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিলো। ফলে হজরত ইউসুফের কারাবাস প্রলম্বিত হলো।

হজরত ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য ব্যাখ্যাতা বলেছেন, শয়তান ইউসুফকে অসতর্ক করে দিয়েছিলো। তাই তিনি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। নবী রসুলগণের জন্য এরকম বিস্মরণ অশোভন। এই অসতর্কতার কারণেই বিলম্বিত হয়েছিলো হজরত ইউসুফের মুক্তি।

রসুল স. এরশাদ করেন, আমার ভ্রাতা ইউসুফের প্রতি আল্লাহ্ করুণা করুন। তিনি 'তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বোলো'— এরকম না বললে তাঁর বন্দী জীবন দীর্ঘায়িত হতো না। ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া।

'ফালাবিছা ফিস্‌সিজ্‌নি বিদ্‌আ' সিনীন' কথাটির অর্থ 'ইউসুফ কয়েক বৎসর কারাগারে রইলো'। তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় 'বিদ্‌আ' শব্দটি। 'বিদ্‌আ' বা 'বিদ্‌উন' অর্থ কর্তন করা। মুজাহিদ বলেছেন, শব্দটি ব্যবহৃত হয় তিন থেকে সাত পর্যন্ত সংখ্যার ক্ষেত্রে। অধিকাংশ কোরআন ভাষ্যকার বলেছেন, হজরত ইউসুফ জেলখানায় কাটিয়েছিলেন সাত বৎসর। পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি বলেছিলেন, 'উজ্‌কুর ইন্‌দা রব্বিক' (তোমার প্রভুকে আমার কথা বোলো)। তারপর অতিবাহিত হয়েছিলো আরো সাত বৎসর। এভাবে সর্বসাকুল্যে বারো বৎসর বন্দী জীবন যাপন করতে হয়েছিলো তাঁকে।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, হজরত ইউসুফ এবং রন্ধনশালা ও পানশালার দায়িত্বপ্রাপ্ত যুবক রাজকর্মচারীদ্বয় একই সঙ্গে প্রবেশ করেছিলো জেলখানায়। যুবকদ্বয় সেখানে ছিলো মাত্র তিনদিন। ওই সময় হজরত ইউসুফ তাদের একজনকে বলেছিলেন 'তোমার প্রভুকে আমার কথা বোলো' এটাই প্রকৃত ঘটনা। যদি তাই হয় তবে এর পূর্বে হজরত ইউসুফ পাঁচ বৎসর জেলখানায় কাটিয়েছিলেন— এরকম বলা যায় কীভাবে? তাই বলতে হয়, মাননীয় তাফসীরকারের এই অভিমতটি একটি অসতর্কতা প্রভাবিত অভিমত।

মালেক ইবনে দীনার বলেছেন, হজরত ইউসুফ যখন রাজার মদ্য পরিবেশনকারীকে রাজার নিকট সুপারিশ করতে বললেন, তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো, তুমি আমাকে ছেড়ে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল হয়েছো। ঠিক আছে, আমি তোমার বন্দী জীবন দীর্ঘায়িত করলাম। হজরত ইউসুফ বললেন, হে আমার পরোয়ারদিগার। বন্দী জীবনের গ্লানি আমাকে অতিষ্ঠ করেছিলো। আমি বুঝতে পারিনি। আমি অনুতপ্ত। এমন কথা আর আমি কখনো বলবো না।

হাসান বসরী বলেছেন, তখন হাজির হলেন হজরত জিবরাইল। হজরত ইউসুফ তাঁকে চিনতে পেরে বললেন, হে আল্লাহ্র শাস্তির ভীতিপ্রদর্শনকারী মহাসম্মানিত দূত! এই বন্দীশালায় আপনার দর্শন লাভ ঘটলো। কী সৌভাগ্য! হজরত জিবরাইল বললেন, হে মহান পিতৃপুরুষের মহান সন্তান! আল্লাহ্পাক আপনাকে সালাম প্রেরণ করেছেন। আরো বলেছেন, আমি সকল স্থানে ও স্থানাতীতে সতত বিদ্যমান— একথা জেনেও ইউসুফ সাহায্য কামনা করলো আমার এক সৃষ্টির কাছে। এমতো কর্ম করতে কী সে লজ্জা পেলো না! আমার মর্যাদার শপথ! আমি আরো কিছুদিন তাকে রেখে দেবো জেলখানায়। হজরত ইউসুফ বললেন, তবু কি আমার আল্লাহ্ আমার প্রতি প্রসন্ন থাকবেন। হজরত জিবরাইল বললেন, হ্যাঁ। হজরত ইউসুফ বললেন, তবে বন্দী জীবনের কষ্ট আমার নিকটে অতি তুচ্ছ।

কা'ব বলেছেন, তখন হজরত জিবরাইল বললেন, আপনার সৃজনকর্তা কে? হজরত ইউসুফ বললেন, আল্লাহ্। পুনরায় বললেন, আপনার প্রিয়তম জন কে? হজরত ইউসুফ বললেন, আল্লাহ্। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, কে আপনাকে করেছেন আপনার মহান পিতার নয়নমনি? হজরত ইউসুফ জবাব দিলেন, আল্লাহ্। হজরত জিবরাইল আবারো জিজ্ঞেস করলেন, অন্ধ কূপ থেকে রক্ষাকারী কে? তিনি বললেন, আল্লাহ্। হজরত জিবরাইল আবার প্রশ্ন করলেন, আপনাকে

www.eelm.weebly.com

স্বপ্নের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন কে? তিনি বললেন, আল্লাহ্। হজরত জিবরাইল বললেন, আপনার ভুলসমূহ উপেক্ষা করেছেন কে? হজরত ইউসুফ জবাব দিলেন, আল্লাহ্। হজরত জিবরাইল বললেন, তাহলে আপনি আপনার মতো একজন মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন কেনো ?

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার ভ্রাতা ইউসুফ মানুষের কাছে সাহায্য কামনা না করলে সুদীর্ঘ দিবস ধরে তাঁকে বন্দী জীবন কাটাতে হতো না।

কেটে গেলো দীর্ঘ সাতটি বছর। মিসর রাজ একরাতে দেখলেন একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন। দেখলেন, সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী উঠে এলো সাগর থেকে। পরক্ষণেই উঠে এলো আরো সাতটি কৃশকায় গাভী। কৃশকায় গাভীগুলো হৃষ্টপুষ্ট গাভীগুলোকে খেয়ে ফেললো। এরপর দেখলেন সাতটি শ্যামল শস্যময় শীষ। পরক্ষণেই দেখলেন, শুকনো সাতটি শীষ এসে পেঁচিয়ে ধরলো শ্যামল শীষ-গুলোকে। সবুজ শীষগুলো আর্তনাদ করে উঠলো। রাজা ঘাবড়ে গেলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন তিনি। একত্রিত করলেন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অতিন্দ্রিয়বাদী, গণৎকার ও জ্যোতিষদেরকে । পরবর্তী আয়াতে এ কথারই বিবরণ এসেছে। বলা হয়েছে—

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৪৩, ৪৪, ৪৫

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّيٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ
وَسَبْعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ ۖ يَٰٓأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ
إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ○ قَالُوٓا أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ
الْأَحْلَٰمِ بِعَٰلِمِينَ ○ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم
بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ○

❒ রাজা বলিল, 'আমি স্বপ্নে দেখিলাম সাতটি স্থূলকায় গাভী, উহাদিগকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করিতেছে এবং দেখিলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে বিধান দাও।'

www.eelm.weebly.com

❒ উহারা বলিল, 'ইহা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা অর্থহীন স্বপ্ন-ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নহি।'

❒ দুইজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পাইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যাহার স্মরণ হইল ইউসুফের কথা সে বলিল,'আমি ইহার তাৎপর্য তোমাদিগকে জানাইয়া দিব। সুতরাং তোমরা আমাকে যাইতে দাও।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মিসররাজ সমবেত গণৎকার, জ্যোতিষ ও অতিন্দ্রিয়বাদীদেরকে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভীকে ভক্ষণ করছে সাতটি শীর্ণকায় গাভী। আর সাতটি সবুজ শীষকে গিলে ফেলছে সাতটি শুষ্ক শীষ। এবার তোমরা বলো আমার এই স্বপ্নের অর্থ কী? এখানে উল্লেখিত 'ইজাফা' শব্দটির বহুবচন হচ্ছে 'উজাফ'। আর 'তাবীর' অর্থ অতীত হওয়া। মূল শব্দটি 'উবুর'। তাবীর শব্দটির মূল মর্ম হচ্ছে— উপমার জগতে বিদ্যমান অবস্থার প্রতি প্রত্যাবর্তন করা।

পরের আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— গণৎকার, জ্যোতিষ ও অতিন্দ্রিয়বাদীরা বললো, মহারাজ! আপনার দেখা স্বপ্নটির কোনো অর্থই নেই। আর এরকম নিরর্থক স্বপ্নের অর্থ উদ্ধারের বিদ্যা আমরা জানি না। এখানে 'আদ্বগাছু আহলাম' কথাটির অর্থ— কাল্পনিক স্বপ্ন বা অর্থহীন স্বপ্ন। 'আদ্বগাছু' শব্দটি বহুবচনবোধক। একবচন হচ্ছে 'দ্বাগছুন' । এর শাব্দিক অর্থ ঘাস-পাতার স্তুপ। আর রূপক অর্থ নিরর্থক বা অমূলক স্বপ্ন।

পরের আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই সভায় রাজার মদ্য পরিবেশনকারীও ছিলো। দীর্ঘ সাত বছর পর হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো হজরত ইউসুফের কথা। সে বললো, মহারাজ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এক স্বপ্নবিশারদকে চিনি। তাঁর নিকট থেকে আমি আপনার স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা এনে দিতে পারবো। 'উম্মাত' অর্থ দল বা জামাত। এখানে শব্দটির অর্থ হবে দীর্ঘকাল পর বা দীর্ঘ সাত বছর পর।

বাগবী লিখেছেন, তখন ওই মদ্যপরিবেশনকারী মিসরাধিপতির সামনে নতজানু হয়ে বললো, আমাকে বন্দীশালায় যেতে দেয়া হোক। সেখানে রয়েছে ইউসুফ নামক এক বন্দী। সে-ই যথাযথ ব্যাখ্যা করতে পারবে আপনার স্বপ্নের । রাজা অনুমতি দিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বন্দীশালাটি ছিলো নগরীর বাইরে।

www.eelm.weebly.com

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِىْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ لَّعَلِّىْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○ قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا فَمَا حَصَدْتُّمْ
فَذَرُوْهُ فِىْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ○ ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ
سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ○ ثُمَّ
يَاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ○

❐ সে বলিল, 'হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, উহাদিগকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করিতেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদিগকে বিধান দাও, যাহাতে আমি রাজা ও সভাসদদিগের নিকট ফিরিয়া যাইতে পারি ও যাহাতে তাহারা অবগত হইতে পারে।'

❐ ইউসুফ বলিল, 'তোমরা সাত বৎসর একাদিক্রমে চাষ করিবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করিবে উহার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করিবে তাহা ব্যতীত সমস্ত শীষ সমেত রাখিয়া দিবে;

❐ 'এবং ইহার পর আসিবে সাতটি কঠিন বৎসর, এই সাত বৎসর যাহা পূর্বে সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, লোকে তাহা খাইবে; কেবল সামান্য কিছু যাহা তোমরা রাখিয়া দিবে, তাহা ব্যতীত।

❐ এবং ইহার পর আসিবে এক বৎসর, 'সেই বৎসর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হইবে এবং সেই বৎসর মানুষ প্রচুর ভোগ-বিলাস করিবে।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মদ্য পরিবেশনকারী উপস্থিত হলো বন্দীশালায়। হজরত ইউসুফকে দেখে সসম্মানে বলে উঠলো, হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী! আমাদের রাজা এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছেন। আমি সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে এসেছি। তাড়াতাড়ি আমাকে ব্যাখ্যাটি জানিয়ে দাও। রাজা ও তাঁর সভাসদেরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানবার জন্য উদগ্রীব। তাই আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। স্বপ্নটি এই—রাজা দেখেছেন, সাতটি জীর্ণশীর্ণ গাভী সাতটি হৃষ্টপুষ্ট

www.eelm.weebly.com

গাভীকে খেয়ে ফেলছে। আরো দেখেছেন সাতটি সবুজ শীষকে আক্রমণ করছে সাতটি শুষ্ক শীষ। ইতোপূর্বে মদ্য পরিবেশনকারী দেখেছিলো, হজরত ইউসুফ প্রদত্ত স্বপ্ন-ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বাস্তব। তাই সে তাঁকে সম্বোধন করেছিলো 'সত্যবাদী' বলে। এখানে 'লাআ'ল্লা' শব্দটির অর্থ সম্ভবতঃ। এরকম শব্দের মাধ্যমে মদ্য পরিবেশনকারীর বক্তব্য প্রদানের কারণ ছিলো স্বপ্নটি উদ্ভট, অলীক। জ্যোতিষী-গণকেরা অথবা সভাসদেরা কেউই স্বপ্নের মর্মোদ্ধার করতে পারছিলো না। রাজাও ছিলেন ভাবনা-ভারাক্রান্ত। আসলে মদ্য পরিবেশনকারী তখন ছিলো নানা ভাবনায় দোদুল্যমান। সে ভাবছিলো, কী জানি ইউসুফের ব্যাখ্যাকে রাজা ও অমাত্যবর্গ কী দৃষ্টিতে দেখবেন। কারণ, বিশিষ্ট মন্ত্রী আজিজ তাঁর শুভ্র ব্যক্তিত্ব ও বিশেষ প্রজ্ঞার পরিচয় পেয়েও তাঁকে জেলখানায় ঢুকিয়েছে। অবহেলা করেছে তাঁকে। তেমনি যদি এবারও রাজা ও অমাত্যরা তাঁর স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেন। আবার একথাও তার বার বার মনে হচ্ছিলো যে, হয়তো এবার তিনি যথাসমাদর পাবেনই। রাজা তাঁর স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করবেন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। মেনে নিবেন এই পুষ্প-সদৃশ্য চরিত্রের অধিকারী নবীকুলোদ্ভব বন্দীর মর্যাদা। শেষ হবে তাঁর সুদীর্ঘ বন্দী জীবন। এসকল পরস্পরবিরোধী চিন্তাভাবনার কারণেই মদ্যপরিবেশনকারী তার বক্তব্যে ব্যবহার করেছিলো 'লাআ'ল্লা' শব্দটি।

এর পরের আয়াতদ্বয়ের (৪৭, ৪৮) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইউসুফ বললেন, রাজার দেখা স্বপ্নের তাৎপর্য এই— একটানা সাত বছর দেশে প্রচুর ফসল হবে। আর পরের সাত বছর হবে প্রচণ্ড খরা। সুতরাং প্রথম সাত বছর ব্যাপক ভাবে চাষবাস করতে হবে। উদ্বৃত্ত ফসল শীষসমেত গুদামজাত করতে হবে। ওই উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য কাজে লাগবে পরের সাত বছর, যখন দেখা দেবে প্রচণ্ড অজন্মা। এভাবে আগাম সঞ্চয় করে রাখলে দেশবাসী বেঁচে যেতে পারবে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ থেকে।

এখানে 'দাবুন' অর্থ চিরাচরিত নিয়ম। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেন, শব্দটি আদেশসূচক। অর্থাৎ হজরত ইউসুফ আদেশের সুরে বললেন, 'তোমরা চিরাচরিত নিয়মে সাত বছর একটানা চাষবাস করবে।' উল্লেখ্য যে, শীষসমেত ফসল রাখলে খাদ্যশস্য নষ্ট হয় না। হজরত ইউসুফ তাই শীষসমেত ফসল মওজুদ করার কথা বলেছিলেন। এই পরামর্শটি তাঁর বিশেষ প্রজ্ঞার পরিচায়ক। খাদ্যঘাটতির বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য সঞ্চয়ের পরামর্শের মধ্যেও রয়েছে তাঁর নবীসুলভ বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার প্রমাণ।

এর পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'এবং এরপর আসবে এক বৎসর, সেই বৎসর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সেই বৎসর মানুষ প্রচুর ভোগবিলাস করবে।' এখানকার 'ইউগাছু' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'গাইছু' থেকে— যার অর্থ মেঘমালা, প্রচুর বৃষ্টিপাত। 'গউছু' থেকেও শব্দটি গঠিত হয়ে থাকতে পারে। এর অর্থ প্রার্থনা। 'ইয়াসিরুন' কথাটির শাব্দিক অর্থ শস্যদানা থেকে তেল নিঃসরণ করা অথবা ফল নিংড়িয়ে রস বের করা। অর্থাৎ সুদিন ফিরে আসা।

www.eelm.weebly.com

আবু উবায়দা বলেছেন, শব্দটির অর্থ পরিত্রাণ পাওয়া। অর্থাৎ খরা ও অজন্মা থেকে রক্ষা পাওয়া। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে, দুর্ভিক্ষের সাত বৎসর গত হলে আল্লাহ্ মানুষের প্রার্থনা কবুল করবেন। ফিরে আসবে সুদিন। তখন পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হবে। ফলে ঘটবে ফল ও ফসলের বিপুল সমারোহ। মানুষের জীবনে ফিরে আসবে স্বস্তি।

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি স্বপ্ন-ব্যাখ্যা-বর্হিভূত। হজরত ইউসুফের এ কথাটি ছিলো প্রত্যাদেশ। অথবা 'দুঃখের পরে সুখ' এই রীতি অনুসারে তিনি নিজেই একথা বলেছিলেন। বায়যাবী লিখেছেন, এ কথাটি ছিলো হজরত ইউসুফের নবীসুলভ প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৫০, ৫১, ৫২

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ
فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ
عَلِيمٌ ۝ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ۚ قُلْنَ
حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ
حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝
ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۝

❒ রাজা বলিল, 'তোমরা ইউসুফকে আমার নিকট লইয়া আইস।' যখন দূত তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন সে বলিল, 'তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাকে জিজ্ঞেসা কর যে-নারীগণ হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল তাহাদিগের অবস্থা কী। আমার প্রতিপালক তাহাদিগের ছলনা সম্যক অবগত।'

❒ রাজা নারীগণকে বলিল, 'যখন তোমরা ইউসুফ হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিলে তখন তোমাদিগের কী হইয়াছিল? তাহারা বলিল, 'অদ্ভুত আল্লাহের মাহাত্ম্য! আমরা উহার মধ্যে কোন দোষ দেখি নাই।' আযীযের স্ত্রী বলিল, 'এক্ষণে সত্য প্রকাশ হইল, আমিই তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিলাম, সে তো সত্যবাদী।'

www.eelm.weebly.com

❒ সে বলিল, 'আমি ইহা বলিলাম, যাহাতে সে জানিতে পারে যে, তাহার অনুপস্থিতিতে আমি তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই এবং আল্লাহ্ বিশ্বাসহন্তাদিগের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'রাজা বললো, তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' এ কথার অর্থ— স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে রাজা অভিভূত হলেন। তাঁর দৃঢ় প্রতীতি জন্মালো, ব্যাখ্যাটি নির্ভুল। আর এরকম ব্যাখ্যা যিনি করতে পারেন তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁকে যথামর্যাদা প্রদান করা উচিত। একথা ভেবে রাজা এক বিশেষ দূত পাঠালেন হজরত ইউসুফের নিকটে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখন দূত তার নিকট উপস্থিত হলো, তখন সে বললো, তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে নারীগণ হাত কেটে ফেলেছিলো তাদের অবস্থা কী?' একথার অর্থ— রাজদূত হজরত ইউসুফের নিকটে উপস্থিত হয়ে বললো, শীঘ্র চলুন। মহারাজ আপনার জন্য প্রতীক্ষ্যমাণ। হজরত ইউসুফ বললেন, না। এভাবে আমি মুক্ত হতে চাই না। আমাকে অপবাদ দিয়ে জেলে ঢোকানো হয়েছে। সুতরাং আমার বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত করা হোক। জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক ওই রমণীদেরকে যারা আমার সম্মানহানি ঘটিয়েছে। হ্যাঁ, ওই রমণীদেরকে যারা আমাকে দেখে তাদের হাত কেটে ফেলেছিলো।

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, অপবাদ অপনোদনের চেষ্টা একটি জরুরী কর্তব্য। বিশেষ করে অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গের জন্য। হজরত ইউসুফ তাই মুক্ত হওয়ার আগেই এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে মূল অপরাধিনী ছিলো জুলায়খা। কিন্তু তিনি এখানে তার নাম উল্লেখ করেননি। এটা ছিলো তার আভিজাত্য ও মর্যাদাবোধের প্রকাশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্যক অবগত।' একথার মাধ্যমে জুলায়খার সহচরীদের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে হজরত ইউসুফের বিশেষ উষ্মা। কারণ তারাই বিষয়টিকে করে তুলেছিলো অধিকতর জটিল। অপ-পরামর্শ দিয়েছিলো এই বলে যে, প্রভুপত্নীর নির্দেশ পালন করো। কারণ তুমি গোলাম। তারা নিজেরাও জ্বালিয়েছিলো কামনার নিন্দিত বহ্নি। এভাবে তারা সকলেই বিস্তার করেছিলো ছলনা ও ষড়যন্ত্রের জাল। তাই নিরুপায় নবী এ ব্যাপারে আল্লাহ্কে সাক্ষী মেনে ছিলেন। এতে করে তাঁর পবিত্রতার বিষয়টি হয়েছে অধিকতর পরিস্ফুট। একই সঙ্গে সাবধান করে দেয়া হয়েছে ওই সকল ছলনাময়ী সহ পৃথিবীর সকল ছলনাময়ীকে।

ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্ তাঁর মসনদে, তিবরানী তাঁর মুয়াজ্জামে এবং ইবনে মারদুবিয়া হজরত ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি বিস্ময় মানি আমার ভ্রাতা ইউসুফের মহত্ব ও সহনশীলতা দর্শনে। আল্লাহ্

www.eelm.weebly.com

তাঁকে মার্জনা করুন। কারাগারে তাঁর কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে এলো রাজার লোক। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দিলেন। আমি হলে কারামুক্ত হওয়ার আগে কিছুতেই স্বপ্ন-ব্যাখ্যা প্রকাশ করতাম না। আমি অবাক হই তাঁর মহানুভবতা ও নম্রতা দেখে। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন। রাজদূত এলো মুক্তির পরওয়ানা নিয়ে। তিনি আপত্তি উত্থাপন করলেন। আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিতাম প্রধান ফটকের দিকে। আমি আরো বিস্মিত হই একথা ভেবে যে, তিনি মুক্তির চেষ্টা করেছিলেন মানুষের মাধ্যমে। যার জন্য তাঁর কারাবাস বর্ধিত হয়েছিলো আরো সাত বছর। আবদুর রাজ্জাক ও ইবনে জারীর তাঁদের তাফসীর গ্রন্থে হজরত ইকরামা থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন ভ্রাতা ইউসুফের উদারতা ও সহনশীলতায় আমি মুগ্ধ। আল্লাহ্ তাঁকে মার্জনা করুন। তিনি রাজার স্বপ্নের কথা শোনা মাত্র ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন। তাঁর স্থলে আমি হলে স্বপ্ন-ব্যাখ্যা করতাম মুক্তির শর্তে। আমি আশ্চর্যান্বিত হই এই ভেবে যে, রাজদূতের মুখে মুক্তির কথা শুনে তিনি বলেছিলেন, আগে তদন্ত করা হোক কে অপরাধী— তিনি, না ললনাকুল। আমি হলে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে বেরিয়ে যেতাম কারাগারের বাইরে। কোনো রকম আপত্তি তুলতাম না।

দ্রষ্টব্যঃ উর্ধ্বারোহণ (উরুজ) ও অবরোহণ (নুজুল)— এই দুই অবস্থা থাকে নবী- রসুলগণের। যাঁরা উর্ধ্বারোহী তাঁদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক থাকে ক্ষীণ। আর উর্ধ্বারোহনের পর অবরোহনে স্থিত হন যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হয় অতি ঘনিষ্ঠ। তাই অবরোহী নবী-রসুলগণের দ্বারা বিপুল জনগোষ্ঠী উপকৃত হতে পারে। রসুল স. ছিলেন অবরোহীশ্রেষ্ঠ। তাই উর্ধ্বারোহী হজরত ইউসুফের আচরণ দৃষ্টে তিনি বিস্ময়বোধ করেছিলেন। রসুল স. হলেন সর্বসাধারণের তথা বিশ্বমানবতার নবী। তাই তাঁর কথায় এখানে ফুটে উঠেছে সাধারণ মানুষের অনুসরণযোগ্য অতি সহজ সরল অভিব্যক্তি। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ নবী-রসুল ছিলেন উর্ধ্বারোহী। আর পূর্ণ অবরোহন (কামালে নুজুল) মহিমান্বিত করেছে অতি অল্প সংখ্যক নবীকে। তাঁরা হচ্ছেন হজরত ইব্রাহিম, হজরত মুসা, হজরত ইসা, ও মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা স.। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি তাঁর মকতুবাত শরীফে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।

পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে — 'রাজা নারীগণকে বললো, যখন তোমরা ইউসুফ থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিলে তখন তোমাদের কি হয়েছিলো?' একথার অর্থ— রাজা আজিজ-পত্নী জুলায়খা ও তার সহচরীদেরকে রাজ দরবারে ডেকে আনলেন। তারপর জুলায়খাকে অথবা তার সহচরীদেরকে কিংবা তাদের সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, সত্য করে বলো, তোমরা নিজেরা ইউসুফকে প্ররোচিত করেছিলে, না ইউসুফ তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো?

www.eelm.weebly.com

এখানে 'খতব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। কারো কাছে কোনো বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হলে আরবী ভাষায় এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বললো, অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম! আমরা তার মধ্যে কোনো দোষ দেখিনি'। একথার অর্থ— জুলায়খার সহচরীরা বললো, বিস্ময়কর ! আল্লাহ্‌র মাহাত্ম বিস্ময়কর! আমরা তার স্বভাবে ও আচরণে মন্দ কিছু দেখতে পাইনি। এখানে 'সু' অর্থ পাপ-পঙ্কিলতা ও আত্মসাৎ। 'আ'লিমনা আ'লাইহি মিনসুইন' অর্থ তার মধ্যে কোনো পাপ-পঙ্কিলতা দেখিনি।

শেষে বলা হয়েছে— আজিজের স্ত্রী বললো, এখন সত্য প্রকাশ হলো, আমিই তাঁর নিকট থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিলাম, সে-তো সত্যবাদী।' একথার অর্থ— জুলায়খা লক্ষ্য করলো, তার সহচরীরা সত্য সাক্ষ্য দিয়েছে। এখন সত্যকে স্বীকার করা ছাড়া তার উপায়ন্তর নেই। তাই সে বললো, এখন সত্য প্রকাশিত হয়েছে। সে কারণেই আমি অকপটে একথা স্বীকার করছি যে, আমিই তার প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিলাম। আমিই অপরাধী। সে নির্দোষ । এখানে 'হাস্‌হাসাল হাক্ব' অর্থ সত্য প্রকাশিত হলো।

এভাবে রাজদরবারে হজরত ইউসুফ নিষ্কলুষ প্রমাণিত হলেন। কিন্তু হজরত ইউসুফ ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। এর কারণ এই যে, আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা ছিলো, হজরত ইউসুফের অনুপস্থিতিতেই একথা প্রমাণিত হোক যে, তাঁর দ্বারা আজিজ পত্নীর শ্লীলতাহানি ঘটেনি। পরস্ত্রীর এমতো শ্লীলতাহানি ঘটানো বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। আল্লাহ্‌র নবীর পক্ষে এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করা অসম্ভব। আর আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র কখনো নিরবচ্ছিন্ন রাখেন না। এ কথাগুলোই পরবর্তী আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে এভাবে— সে বললো, আমি এটা বললাম, যাতে সে (আজিজ) জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার (আজিজের) প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। এবং আল্লাহ্ বিশ্বাসহন্তাদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।

এখানে 'আন্নি লাম আখুনহু বিলগইব' কথাটির অর্থ আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অর্থাৎ হজরত ইউসুফ একথার মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে, সেই আবদ্ধ ঘরে আজিজ ছিলো অনুপস্থিত। তবুও আমি তার স্ত্রীর শ্লীলতা লুণ্ঠন করিনি। এরকম বিশ্বাসঘাতকতা আল্লাহ্‌র নবীর দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না। বরং বিশ্বাসঘাতকতা করেছে জুলায়খা। কিন্তু আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখেন না। রাজদরবারের তদন্ত অনুষ্ঠানে আজ সেকথাই প্রমাণিত হলো।

www.eelm.weebly.com

ত্রয়োদশ পারা

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৫৩

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

❐ সে বলিল,'আমি নিজকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্ম-প্রবণ, কিন্তু সে নহে যাহার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি নিজকে নির্দোষ মনে করি না।' কথাটির অর্থ— আমি নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে নিজেকে নিরপরাধ মনে করি না। আল্লাহ্ই আমাকে রক্ষা করেছেন। তাই আমি নির্দোষ। আর রাজার তদন্তানুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে আল্লাহ্ই নিষ্কলুষ প্রমাণ করেছেন আমাকে। হজরত ইউসুফ যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মম্ভরিতা থেকে মুক্ত, উদ্ধৃত বাক্যটি তার প্রমাণ। এ বিষয়টিও এখানে সুপ্রমাণিত যে, সকল নবীর মতো তিনিও ছিলেন আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ সমর্পিত প্রাণ।

হজরত আনাস থেকে মারফুরূপে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ভ্রাতা জিবরাইল জিজ্ঞেস করলেন, হে নবী ইউসুফ! জুলায়খার প্ররোচনার প্রতিক্রিয়ারূপে মুহূর্তের জন্য হলেও আপনি তো কামনাকম্পিত হয়েছিলেন, তবে একথা কেনো বললেন যে, 'আজিজের অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি?' হজরত ইউসুফ তখন বললেন, আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না। এই হাদিসটিই বায়যাবী বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্মপ্রবণ।' একথার অর্থ মানব-প্রবৃত্তি (নফস) স্বভাবতই মন্দকর্মপ্রবণ। উল্লেখ্য যে, আগুন, পানি, মাটি ও

www.eelm.weebly.com

বাতাস এই ভূতচতুষ্টয়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে মানুষের নফস ও শরীর। আর তার অন্তর্জগত গঠিত হয়েছে কলব, রূহ, সির, খফি ও আখফা এই লতিফা পঞ্চকের মাধ্যমে। কিন্তু নফস ও শরীর হচ্ছে তার অন্তর্জগতের প্রকাশ বা অবলম্বন। ভূতচতুষ্টয়ের ভারসাম্য বা সুসমন্বয় ঘটলেই কেবল মানুষ রক্ষা করতে পারে তার মর্যাদা ও মহত্ব। কিন্তু ক্ষতিকর নয়, এরকম এক ধরনের অপপ্রবৃত্তির রেশ তখনো থেকেই যায়। কিন্তু ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে বিষয়টি গড়ায় ক্ষতির দিকে। যেমন অগ্নির প্রাবল্য ঘটলে প্রকাশ পায় ক্রোধ ও আত্মম্ভরিতা। পানির প্রাবল্য হলে দেখা দেয় বহুরূপী স্বভাব ও ধৈর্যহীনতা। মাটির প্রভাব প্রবল হলে স্বভাবে দেখা দেয় নীচতা ও নম্রতা । আর বায়ুর অতি প্রভাব তাকে করে তোলে চপল, চঞ্চল ও ক্রীড়াপ্রবণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন।' একথার অর্থ, আল্লাহ্‌পাক যাদের প্রতি দয়া করেন, তাদের নফস হয়ে যায় অপকর্মপ্রবণতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। এখানে 'মা' (যা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে মান (যার) অর্থে । এরকম শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হচ্ছে— মা তবা লাকুম মিনান্ নিসা (রমণীদের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ হয়)। প্রকৃত কথা হচ্ছে, আল্লাহ্‌তায়ালার করুণাভাজন যারা, তারাই আত্মরক্ষা করতে পারেন কু রিপুর তাড়না থেকে। তাঁরা তখন তাঁদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও জয়ী হন। এই যুদ্ধই তাঁদেরকে ক্রমাগত উন্নীত করে চলে উন্নততর স্তরে। ফেরেশতাদের এ সুযোগ নেই। তাদের প্রবৃত্তি নেই । তাই যুদ্ধের প্রয়োজন ও পারিশ্রমিক কোনোটাই নেই। তাই তাদের মর্যাদা স্থবির। অথচ মানুষের আত্মোন্নয়নের সুযোগ সীমাহীন। তাই বিশিষ্ট মানুষ বিশিষ্ট ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্‌তায়ালার দয়া সরাসরি লাভ করেন নবী-রসুলগণ। অন্যেরা লাভ করেন নবী-রসুলগণের মাধ্যমে অথবা নবীর প্রিয়ভাজন প্রতিনিধি কোনো পীর মোর্শেদের মাধ্যমে। এটাই আল্লাহ্‌র দয়া প্রাপ্তির বিধান। আর এভাবেই একজন সত্যান্বেষী আল্লাহ্‌র করুণাসিক্ত হয়ে নিজের নফসকে করে তোলেন পবিত্র ও প্রশান্ত। একা একা চেষ্টা করে এই পবিত্রতা ও প্রশান্তি লাভ হয় না। তাই আল্লাহ্‌পাক এক আয়াতে এরশাদ করেছেন— 'ফালা তুজাক্কু আনফুসাকুম' (তোমরা নিজেকে পবিত্র স্থির কোরো না)। অন্য আয়াতে বলেছেন—'বালিল্লাহু ইউজাককি মাঁইইয়াশাআ' (বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন)। প্রশান্ত প্রবৃত্তির অধিকারীদের সম্পর্কে আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ইয়া আইয়্যাতুহান নাফসুল মুত্বমাইন্না তুরজিই ইলা রব্বিকি রদ্বিয়াতাম্ মারদ্বিইয়্যা, ফাদ্‌খুলি ফী ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি' (হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি ! তুমি ফিরে চলো তোমার পালনকর্তা সকাশে, তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন, অন্তর্ভূত হও তাঁর প্রিয় দাসদের দলে এবং প্রবেশ করো জান্নাতে)। উল্লেখ্য যে, প্রশান্ত প্রবৃত্তি (নাফসুল মুত্বমাইন্না) অর্জিত হলে মানবদেহের সকল সূক্ষ্ম অংশ (লতিফা) সমূহ হয়ে যায় পুণ্যকর্মের পুরোধা। অবস্থা তখন এমন দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্‌র যে সকল সিফাতের (গুণাবলীর) বিকিরণ (তাজাল্লি) লতিফাসমূহ ধারণ করতে পারে না, সেগুলোর

www.eelm.weebly.com

আনুরূপ্যহীন বিকিরণও ধারণ করে ওই নফস। কোনো কোনো ভাষ্যকার এখানে 'ইল্লা' (ব্যতীত) শব্দটির অর্থ করেছেন 'কিন্তু' (উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদে এরকমই লেখা রয়েছে)। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— মানব প্রবৃত্তি অপকর্মপ্রবণ, কিন্তু আমার মহান পালনকর্তা সেই অপপ্রবণতাকে ফিরিয়ে দেন, বিপথকে করে দেন সুপথ— যাকে তিনি দয়া করেন। এরকমও বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত উক্তিটি জুলায়খার । যদি তাই হয় তবে অর্থ দাঁড়াবে এরকম— ইউসুফকে আমিই অপবাদ দিয়ে কারাবন্দী করিয়েছি। কিন্তু এখন এই রাজসভায় তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে আমি সত্য সাক্ষ্যই দিলাম। তবু আমি নিজেকে নির্দোষ ভাবতে পারি না। আর আমিও ছিলাম নিরূপায়। কারণ মানব-প্রবৃত্তি স্বভাবই মন্দকর্মপ্রবণ। কিন্তু আমাদের প্রভুপালক যাকে দয়া করেন, সে এর ব্যতিক্রম। যেমন ইউসুফ।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু।' একথার অর্থ— আমার প্রভুপালক অবশ্যই ক্ষমাপরবশ ও দয়ার্দ্র। তাই তিনি ক্ষমা করে দেন প্রবৃত্তির অপ-প্রবণতাকে, যদি তা বাস্তবায়িত না হয়। আর তাকেও তিনি ক্ষমা করেন যে ক্ষমা চায় ও প্রত্যাবর্তনকামী হয় সলজ্জিত ও সানুতপ্তরূপে।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৫৪

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ○

☐ রাজা বলিল, 'ইউসুফকে আমার নিকট লইয়া আইস; আমি উহাকে আমার বিশ্বস্ত সহচর নিযুক্ত করিব।' 'অতঃপর রাজা যখন তাহার সহিত কথা বলিল তখন রাজা বলিল, 'আজ তুমি আমাদিগের নিকট মর্যাদাশালী ও বিশ্বাস-ভাজন হইলে।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'রাজা বললো, ইউসুফকে আমার নিকটে নিয়ে এসো, আমি তাকে আমার বিশ্বস্ত সহচর নিযুক্ত করবো।' একথার অর্থ— মিসররাজ হজরত ইউসুফের জ্ঞান গরিমার ও নিষ্কলুষ চরিত্রের প্রমাণ পেয়ে অভিভূত হলেন। ভাবলেন, এই মহামূল্যবান রত্ন কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না। আর তাঁকে কোনো মন্ত্রী বা সভাসদের অধীনস্থ রাখাও ঠিক নয়। তাই তিনি ঠিক করলেন ইউসুফকে বানাবেন তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সহচর, একান্ত সচিব । এই প্রস্তাব দিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ পাঠালেন এক বিশেষ দূত। সে কারাগারে গিয়ে হজরত ইউসুফকে জানিয়ে দিলো সম্রাটের প্রস্তাব। বললো, জলদি চলুন। সম্রাট একান্ত আগ্রহভরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আবদুল হাকাম তাঁর 'ফত্হে মিসর' গ্রন্থে কালাবী সূত্রে আবু সালেহের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন রাজদূত হজরত ইউসুফের নিকটে উপস্থিত হয়ে বললো, এবার বন্দীর পোশাক খুলে ফেলুন। নতুন পোশাকে

www.eelm.weebly.com

সজ্জিত হয়ে চলুন সম্রাটের দরবারে। তিনি আপনাকে তলব করেছেন। ফরীদ আম্মীর বর্ণনা উদ্ধৃত করে ইবনে আবী শায়বা ও ইবনে মুনজির বলেছেন, সম্রাটের দরবারে প্রবেশকালে দৃষ্টি পড়লো আজিজের প্রতি। তৎক্ষণাৎ হজরত ইউসুফ প্রার্থনা জানালেন, ইয়া ইলাহী! আমি তাঁর নিকটে নয়, আপনার নিকটেই মঙ্গলপ্রার্থী। তাঁর অশুভ পরিকল্পনা থেকে আমি তোমার পরাক্রমের আশ্রয় যাচ্ঞা করি। বাগবী লিখেছেন, রাজদূতের মুখে শুভসংবাদ শুনে হজরত ইউসুফ দণ্ডায়মান হলেন। দোয়া করলেন সকল বন্দীর জন্য। বললেন, হে আমার আল্লাহ্! বন্দীদের জন্য সদয় করে দাও পুণ্যশীলদের হৃদয়। তাদের জন্য গোপন কোরো না দেশ ও জাতির সংবাদ প্রবাহ। হজরত ইউসুফের এভাবে দোয়া করার কারণ হচ্ছে, বন্দীরা দেশের সকল নগর-বন্দরের খবরাখবর জানতে পারতো না। দোয়া সমাপনের পর রওয়ানা হলেন সদর ফটকের দিকে। সদর ফটকের গায়ে লিখে রাখলেন, বন্দীশালা হচ্ছে জীবিতদের সমাধিক্ষেত্র। দুঃখ যাতনার আবাস। বন্ধুদের পরীক্ষাগার। শত্রুদের প্রমোদ ভবন। এরপর তিনি গোসলখানায় প্রবেশ করে উত্তমরূপে গোসল করলেন। হৃদয় ভরে গেলো মুক্তির আনন্দে। পরিধান করলেন সম্রাটের পক্ষ থেকে পাঠানো মূল্যবান পরিধেয়। তাঁর সৌন্দর্যের ছটা বিকশিত হলো আরো অধিক মনোহররূপে। এরপর তিনি যাত্রা করলেন সম্রাটের দরবারে।

ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে পৌঁছে হজরত ইউসুফ বললেন, আমার প্রভুপালকই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই পরমুখাপেক্ষিতা থেকে রক্ষাকর্তা। তাঁর আশ্রয় যাচ্ঞাকারীরাই হয় বিজয়ী। তাঁর স্তব-স্তুতি সর্বোপরি। তিনি ব্যতীত উপাস্য কেউ নয়। এরপর তিনি প্রবেশ করলেন সম্রাটের দরবারে। বললেন, আয় আল্লাহ্! সম্রাট-সান্নিধ্যের সুফলের চেয়ে তোমার সন্নিধানের সুফলই আমার অধিক কাম্য। আর তার সান্নিধ্যের অমঙ্গলাশঙ্কা থেকে আমি তোমারই সহায়তাপ্রার্থী। এরপর সম্রাটের দৃষ্টি তাঁর প্রতি পতিত হতেই তিনি সম্ভাষণ জানালেন আরবী ভাষায়। সম্রাট বললেন, এটা কোন ভাষা? হজরত ইউসুফ বললেন, এটা আমার মহান পূর্বপুরুষ পিতৃব্য ইসমাইলের ভাষা। এরপর তিনি সম্রাটের কল্যাণ কামনা করলেন হিব্রু ভাষায়। সম্রাট বললেন, এটা আবার কোন ভাষা? তিনি বললেন, আমার মহান পিতৃপুরুষের। দু'টো ভাষাই অজানা ছিলো সম্রাটের। অথচ সত্তরটি ভাষা জানা ছিলো সম্রাটের। এরপর শুরু হলো কথোপকথন। সম্রাট যে ভাষায় কথা বলেন, সে ভাষাতেই বাক্যালাপ চালিয়ে যান হজরত ইউসুফ। হজরত ইউসুফ তখন তিরিশ বছরের যৌবনদীপ্ত পুরুষ। সম্রাট তাঁর বাক্যালাপ শুনে অত্যন্ত প্রীত হলেন। বসালেন আপন আসনের পাশে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর রাজা যখন তার সঙ্গে কথা বললো, তখন জানালো, আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাশালী ও বিশ্বাসভাজন হলে।' বাগবী লিখেছেন, সম্রাট তখন বললেন, ওহে ইউসুফ! আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যাটি এবার তোমার নিজ মুখে শুনতে চাই। হজরত ইউসুফ বললেন, বেশতো। শুনুন। আপনি দেখেছেন, সুন্দর ও মোটাতাজা সাতটি গাভী উঠে এলো সমুদ্র সৈকত থেকে। গাভীগুলোর স্তন ছিলো দুধে পরিপূর্ণ। এরপর নীল নদীর কর্দমাক্ত তীর থেকে উঠে এলো সাতটি শীর্ণকায় গাভী। সেগুলো ছিলো হিংস্র জন্তুর মতো ধারালো দাঁত ও নখর বিশিষ্ট। ওই গাভীগুলো আক্রমণ করে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলো মোটাতাজা গাভীগুলোকে। তারপর উদরপূর্তি করলো সেগুলোর অস্থি-চর্ম ও গোশতের দ্বারা। আপনি তো বিস্ময়ে ও শঙ্কায় হতবাক। এরপর দেখলেন, সাতটি শ্যামলকোমল শীষবিশিষ্ট একটি গুচ্ছ। পরক্ষণেই দেখলেন, সাতটি শুষ্ক শীষবিশিষ্ট আর একটি গুচ্ছ। গুচ্ছ দু'টো ভাসছে তটিনীর তীব্র স্রোতে। আপনি অবাক হলেন। ভাবলেন, পানি থেকে কী করে উদগত হলো শস্যের শীষ! বাতাস তখন ধীর। ওই মন্দ সমীরণে শুষ্ক শীষ সাতটি ঝরে পড়লো সতেজ সবুজ শীষগুলোর উপর। সহসা হলো অশনিসম্পাত। ওই অশনিপাতে জ্বলতে লাগলো সকল শস্যদানা। ভেসে উঠলো একটি কৃষ্ণকায় অদ্ভুত আকৃতি। দৃশ্যটি একই সঙ্গে বিস্ময়বিমণ্ডিত ও ভয়ার্ত। নয় কি? রাজন! বলুন, তখন কি আপনি ভীত হননি? সম্রাট বললেন, হ্যাঁ, হয়েছি। তবে তোমার বিবরণ আরো বেশী ভয়ংকর। এবার বলো হে প্রাজ্ঞ যুবক! এখন আমাকে কী করতে হবে? হজরত ইউসুফ বললেন, হে রাজ্যাধিপতি! শুনুন, এবার কী করতে হবে। প্রথম সাত বছর ব্যাপক ফলন হবে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে চাষবাসের প্রচলন ঘটান ব্যাপক হারে। উদ্বৃত্ত শস্যগুলো শীষ সহকারে সংরক্ষণ করুন। এভাবে জমানো সাত বছরের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য কাজে লাগবে পরবর্তী সাত বছরে। তখন মানুষ, পশু ও পক্ষীকুল কেউ অনাহারে মৃত্যুবরণ করবে না। আর জনগণের মধ্যে এই মর্মে রাষ্ট্রীয় আজ্ঞা প্রচার করে দিন, তারা প্রত্যেকে তাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের এক পঞ্চমাংশ যেনো গোলায় তুলে রাখে। এভাবে রাষ্ট্রীয় ও জনগণের উদ্যোগে যে বিশাল খাদ্যভাণ্ডার গড়ে উঠবে তাই দিয়ে আপনি অনায়াসে অতিক্রম করতে পারবেন ওই প্রলম্বিত দুর্ভিক্ষকে। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর খাদ্যের চাহিদাও আপনি তখন মেটাতে পারবেন। বিনিময়ে যে অর্থ সমাগম ঘটবে, তাই দিয়ে ভরপুর হবে আপনার রাজকোষও। সম্রাট এই বিশাল কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা শুনে তাজ্জব হলেন। বললেন, বুঝলাম। কিন্তু এই বিরাট আয়োজন বাস্তবায়ন করবে কে? মওজুদ করবে কারা? বিতরণই বা করবে কারা? কে থাকবে এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও ব্যবস্থাপনায়?

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۝ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

❏ ইউসুফ বলিল, 'আমাকে দেশের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন; আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অভিজ্ঞ।'

❏ এইভাবে ইউসুফকে আমি সেইদেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম; সে সেদেশে যথা ইচ্ছা বসবাস করিত। আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি দয়া করি; আমি সৎকর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করি না।

❏ যাহারা বিশ্বাসী এবং সাবধানী তাহাদিগের পরলোকের পুরস্কারই উত্তম।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইউসুফ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বললেন, হে মিসরাধিরাজ! ব্যাপক ভিত্তিতে চাষাবাদ, খাদ্যশস্য মওজুদ ও বিতরণ ইত্যাদির সার্বিক ব্যবস্থাপকরূপে যে দায়িত্ববান লোকের কথা আপনি ভাবছেন, সেই দায়িত্ব নির্দ্বিধায় আপনি অর্পণ করতে পারেন আমার স্কন্ধে। আমি এ ব্যাপারে সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত। উল্লেখ্য যে, নবুয়তের মহান উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তেই এই গুরুভার বহন করতে চেয়েছিলেন হজরত ইউসুফ। ভেবেছিলেন, এরকম জনসেবামূলক কাজের মাধ্যমে তিনি যেতে পারবেন মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি। সেই সুযোগে করতে পারবেন সত্য ধর্মের সফল প্রচার। মানুষও তাঁকে আপনজন ভেবে মেনে নিবে তাঁর ধর্মমতকে। নবীজীবনের উদ্দেশ্য তো এটাই। তাঁরাই তো এভাবে নিশ্চিত করেন মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ। হজরত ইউসুফের এই স্বতঃপ্রণোদিত প্রস্তাবের মধ্যে পার্থিব নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বাকাংখা ছিলো না মোটেও। সকল নবী ও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীরা এমতো আকাংখা থেকে মুক্ত। পরবর্তী সময়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের দায়িত্বও ছিলো এরকম। পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো না। উদ্দেশ্য ছিলো কেবল আল্লাহ্র সন্তোষ সাধন ও পুণ্যলাভ। চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর সঙ্গে একারণেই বিবাদ বেধেছিলো হজরত মুয়াবিয়ার। তাঁদের দু'জনের একজনও পৃথিবীপূজক ছিলেন না। ছিলেন বিশুদ্ধ আল্লাহ্প্রেমিক।

www.eelm.weebly.com

বায়যাবী বলেছেন, সম্রাটের সঙ্গে আলাপের সময় হজরত ইউসুফ বুঝতে পেরেছিলেন, সম্রাট তাঁকে দুর্ভিক্ষ মুকাবিলার বিশাল কর্মকাণ্ডটির দায়িত্ব দিতে চান। তাই তিনি পেতে চেয়েছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। সর্বসাধারণের উপকারের জন্যই তিনি এই গুরুভারটি আপন স্কন্ধে তুলে নিতে চেয়েছিলেন।

আলোচ্য আয়াত থেকে একথাটি প্রমাণিত হয় যে, আপন বিশ্বস্ততা ও দক্ষতার উপরে আস্থাশীল হলে রাষ্ট্রের কোনো গুরুদায়িত্ব অথবা বিচারকার্যের দায়িত্ব প্রার্থনা করা সিদ্ধ। এমতোক্ষেত্রে স্বীয় যোগ্যতা প্রদর্শন করাতে কোনো দোষ নেই। আর একথাটিও প্রমাণিত হয় যে, শাসক কাফের অথবা জালেম হলেও তার অধীনে এরকম জনকল্যাণমূলক দায়িত্ব গ্রহণ করা অন্যায় নয়। আমাদের সম্মানিত পূর্বসুরীদের জীবনেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাঁদের অনেকেই জালেম ও ফাসেক শাসকের অধীনে বিচারকের পদে সমাসীন ছিলেন। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, হজরত ইউসুফ কিন্তু কোনো রাজ কর্মচারী বা রাজার অধীনস্থ কোনো শাসক হতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন রাজার বিশেষ উপদেষ্টা হতে। রাজা তো তাঁর উপদেশ ও পরিকল্পনাকেই গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং রাজাই ছিলেন এক্ষেত্রে তাঁর অনুসারী। তিনি কিন্তু রাজার অনুসারী ছিলেন না।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ভ্রাতা ইউসুফের প্রতি আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। 'আমাকে দেশের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন'— এরকম কথা তিনি বললে সম্রাট তাঁকে দান করতেন মহাসচিবের দায়িত্ব। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দায়িত্বগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন বলেই সম্রাট তাঁকে তৎক্ষণাৎ দায়িত্ব না দিয়ে রাজ প্রাসাদে রেখেছিলেন কিছু দিনের জন্য।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে অপর একটি সূত্রে বাগবী লিখেছেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদানের এক বৎসর পর রাজ্য পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার হজরত ইউসুফের উপবে ন্যস্ত করে সম্রাট অবসর গ্রহণ করলেন। অনুষ্ঠিত হলো বর্ণাঢ্য অভিষেক। অবসর প্রাপ্ত সম্রাট নিজ হাতে তাঁর শিরে পরিয়ে দিলেন রাজ মুকুট। কটিদেশে বেঁধে দিলেন স্বর্ণখচিত কোষাবদ্ধ অসি। বসালেন মণিমুক্তা খচিত রাজ সিংহাসনে। আলো ঝলমল রাজ দরবারে সংস্থাপিত ওই রাজসিংহাসনের উপরে ঝুলিয়ে দেয়া হলো মহামূল্যবান রেশমী ঝালর। বহুবিচিত্র ও মহামূল্যবান বসনে সুশোভিত হয়ে হজরত ইউসুফ যখন রাজাসনে উপবেশন করলেন, তখন তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়ে পড়লো অসম্ভব। এমনিতেই তিনি ছিলেন পৃথিবীপাগল করা সৌন্দর্যের সম্রাট। এখন সেই সৌন্দর্যের সঙ্গে সংযোজিত হলো রাজকীয় ঋদ্ধি। যেনো আলোয় আলোয় ভরে গেলো ভুবন। রাজদণ্ডধারী নবী ইউসুফের প্রতি নতজানু হয়ে অভিবাদন জানালো সকল সভাসদ।

www.eelm.weebly.com

ইবনে ইসহাক বলেছেন, মিসরের ওই মহান নরপতি আজিজকে পদচ্যুত করেছিলেন। তদস্থলে বসিয়েছিলেন হজরত ইউসুফকে। ইবনে জায়েদের বর্ণনায় এসেছে, নরপতি রাইয়ানের কোষাগারে সঞ্চিত ছিলো বিপুল ধনসম্পদ। ওই ধনসম্পদ যথেচ্ছ ব্যয়ের অধিকার তিনি দিয়েছিলেন হজরত ইউসুফকে। ইবনে ইসহাকের এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম।

ঐতিহাসিকেরা বলেছেন, ওই সময় আজিজ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো। তারপর নরপতি রাইয়ান হজরত ইউসুফকে বিবাহ দিয়েছিলেন জুলায়খার সঙ্গে। পরিণয়াবদ্ধ হওয়ার পর প্রথম দর্শনেই হজরত ইউসুফ জুলায়খাকে বলেছিলেন, এবার তো আমরা পরস্পরের জন্য হালাল। এবার বলো, পূর্বের অপবিত্র আকাংখা অপেক্ষা এটাই আমাদের জন্য উত্তম নয় কি? জুলায়খা বলেছিলেন, প্রিয়তম! আপনিতো জানেন, আমি রূপসী। বিত্তশালিনী। অথচ আপনি একথা জানেন না যে, আজিজ ছিলো পৌরুষহীন। আর আপনার ভুবন পাগল করা রূপ যে আল্লাহ্ প্রদত্ত। তাইতো আপনাকে দেখলে ভেঙে যেতো আমার ধৈর্যের বাঁধ। ঐতিহাসিকেরা একথাও বলেছেন যে, জুলায়খা ছিলেন অনাঘ্রাতা। কারণ আজিজ ছিলেন নপুংশক। জুলায়খাকে পেয়ে নবী ইউসুফের সংসারে নেমে এসেছিলো স্বর্গ সুখ। দুই সন্তানের জননী হয়েছিলেন তিনি। সন্তানদ্বয়ের নাম ছিলো ইফরাইম ও মাইসা। হজরত ইউসুফ ছিলেন জনগণনন্দিত নরপতি। প্রজাসাধারণ তাঁকে দেখতো যথেষ্ট ভক্তি ও সমীহের দৃষ্টিতে।

পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে — 'এভাবে ইউসুফকে আমি সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; সে সেদেশে যথাইচ্ছা বসবাস করতো।' একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক এরশাদ করছেন, হে আমার রসুল মোহাম্মদ স.! এতক্ষণ ধরে যে রকম বিবরণ উপস্থাপন করা হলো, সেভাবে দীর্ঘ ঘাতপ্রতিঘাতের পর আমি নবী ইউসুফকে নরপতিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করলাম মিসরে। ওই দেশে সে ছিলো সর্বমান্য নৃনায়ক। তাই সে দেশের যে কোনো স্থানে সে বসবাস করতে পারতো পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি; আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না ।'

এখানে উদ্ধৃত 'রহমত' শব্দটির অর্থ কল্যাণ বা শ্রমফল— যা লাভ হয় তাৎক্ষণিকভাবে অথবা বিলম্বে। হজরত ইবনে আব্বাস ও ওয়াহাব বলেছেন, এখানকার 'মুহসিনীন্' শব্দটির অর্থ ধৈর্যশীল। মুজাহিদ প্রমুখ বলেছেন, হজরত ইউসুফ মাঝে মাঝেই স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণকারী নরপতি রাইয়ানকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাতেন। অভিভূত হয়ে তিনি পান করতেন নবী ইউসুফের কথামৃত। এভাবে এক সময় তিনি হয়ে গেলেন এক আল্লাহ্র প্রতি এবং সত্য নবী ইউসুফের প্রতি বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী। লাভ করলেন অনন্ত জীবনের অক্ষয় রাজত্বের চিরস্থায়ী অধিকার।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাসী এবং সাবধানী তাদের পরলোকের পুরস্কারই উত্তম।' হজরত ইউসুফ সারাদেশ জুড়ে শুরু করলেন চাষবাসের মহা আয়োজন। দুর্ভিক্ষের আগমন অবশ্যম্ভাবী— একথা প্রচার করে দিলেন রাজ্যের সর্বত্র। ফলে কৃষকেরাও অতিরিক্ত খাদ্য ফলাতে শুরু করলো। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গড়ে তোলা হলো বিরাট বিরাট শস্য ভাণ্ডার। কৃষকদের উদ্বৃত্ত শস্য ক্রয় করে খাদ্যশস্য জমা করা হলো সে সকল ভাণ্ডারে। নগদ মূল্যে খাদ্য বিক্রয় করতে পেরে কৃষকেরা তো মহা খুশী। পরের বছর থেকে আর কাউকে তেমন কিছু বলতে হলো না। নগদ অর্থ সমাগমের কথা ভেবে দ্বিগুণ উদ্যোগে চাষবাস শুরু করে দিলো সকলে। আর সম্রাট ইউসুফ এভাবে বছরে বছরে খাদ্য শস্য ক্রয় করে খাদ্য ভাণ্ডারগুলো পরিপূর্ণ করে ফেললেন। কেটে গেলো সাতটি বছর। অষ্টম বছর থেকে শুরু হলো অনাবৃষ্টি, অজন্মা, খরা। প্রথম বছরে তেমন কোনো অসুবিধে হলো না। কিন্তু দ্বিতীয় বছর থেকেই দেখা দিলো খাদ্যাভাব। জনতা হয়ে পড়লো রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী। নগদ মূল্যে খাদ্য বিক্রয়ের অনুমতি দিলেন হজরত ইউসুফ। নির্দেশ দিলেন প্রতিদিনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য কেউ ক্রয় করতে পারবে না।

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, প্রাক্তন রাজা, তার পরিবার পরিজন ও অন্যান্য সভাসদদের নিকটেও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করলেন হজরত ইউসুফ। কাউকেই অতিরিক্ত খাদ্য শস্য দেওয়া হতো না। তিনি নিয়ম করলেন প্রতিদিন সকলকে একবার মাত্র আহার করতে হবে। দ্বিপ্রহর হবে ওই আহারের সময়। প্রাক্তন রাজা প্রথম প্রথম রাত্রি বেলায় ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়তেন। হজরত ইউসুফ তাঁকে বুঝাতেন, হে রাজন ! অনুভব করতে শিখুন জঠরজ্বালা কাকে বলে। হজরত ইউসুফ নিজেও প্রতিদিন একবার মাত্র আহার করতেন।

প্রথম বছর মানুষ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করলো নগদ অর্থের বিনিময়ে। অলংকারের বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহ করলো দ্বিতীয় বছরে । তৃতীয় বছরে গৃহপালিত পশুর বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহ করলো তারা। চতুর্থ বছরে বিনিময় মূল্য হিসেবে দিয়ে দিলো গোলাম বাঁদীকে। পঞ্চম বছরে হস্তান্তর করলো স্থাবর সম্পত্তি। ষষ্ঠ বছরে দিতে হলো শিশু সন্তানদেরকে। আর সপ্তম বছরে আত্মবিক্রয় করা ছাড়া কোনো উপায়ই আর রইলো না। এভাবে সারা দেশের সকল মুদ্রা, অলংকার, পশুপাল, মানবসম্পদ সকল কিছুর অধিকারী হলেন হজরত সম্রাট ইউসুফ।

আমি বলি, বর্ণনাটি যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে বুঝতে হবে, হজরত ইউসুফের শরিয়তে সন্তান-সন্ততি বিক্রয় ও আত্মবিক্রয় সিদ্ধ ছিলো। কোনো কোনো জ্ঞান

www.eelm.weebly.com

প্রবীণ বলেছেন, চরম অনটনের সময় উপায়ন্তর না থাকলে নিজেকে বন্ধক রেখে অথবা সন্তান-সন্ততি বিক্রয় করে আহার্য সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু শরিয়তে এরকম মতামতের কোনো ভিত্তি নেই।

মিসরের মানুষ বলতে শুরু করলো, এভাবে সকল কিছুর মালিকানা সম্রাট ইউসুফ ছাড়া আর কেউ কখনো পায়নি। তিনি আমাদের জান-মাল সহায়-সম্পদ সকল কিছুর অধিকর্তা। এমতাবস্থায় হজরত ইউসুফ একদিন প্রাক্তন নরপতি রাইয়ানের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করলেন। বললেন, হে প্রবীণ রাজা! এখন তো প্রজাসাধারণের সকল কিছুই আমার আয়ত্তে। এসকল কিছু নিয়ে আমি কী করবো? রাইয়ান বললেন, রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে এখন আপনিই একমাত্র সিদ্ধান্তদাতা। আমিও আপনার অভিপ্রায়ানুসারী। হজরত ইউসুফ বললেন, আমি আল্লাহ্ ও আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি সকলকে মুক্তি দিলাম। তাদের সকল সহায় সম্পদও ফেরত দিয়ে দিলাম।

বর্ণিত হয়েছে, ওই ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের সময় হজরত ইউসুফও সকলের মতো মাত্র একবেলা আহার করতেন। কেউ কেউ বলতো, হে মহান সম্রাট! আপনি তো সাম্রাজ্যের সকল খাদ্যশস্যের অধীশ্বর । তবে আপনি এভাবে কষ্টভোগ করবেন কেনো? তিনি জবাব দিতেন, মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। আর আমি উদরপূর্তি করে পরিতৃপ্ত হবো— এরকম হয় না। অতিরিক্ত আহার করলে আমি প্রজাসাধারণের দুঃখ বুঝবো কী করে? তিনি তাঁর পাচককে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আহারের আয়োজন করতে হবে কেবল দুপুরে। সম্রাটও তো মানুষ। সাধারণ মানুষের সমব্যথী না হলে সম্রাট তাঁর মনুষ্যত্ব রক্ষা করবেন কী করে?

শুধু মিসর নয়, অনটনের আগুন লেগে গেলো আশে পাশের দেশগুলোতেও। তাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানুষও খাদ্যক্রয়ের জন্য আসতে লাগলো মিসরে। হজরত ইউসুফ নিয়ম করে দিয়েছিলেন, বিদেশীরা সংগ্রহ করতে পারবে প্রতিবারের জন্য একটি উটের বহনযোগ্য খাদ্যশস্য। সে কুলীন অকুলীন, যে-ই হোকনা কেনো। দুর্ভিক্ষের নিকটে অভিজাত-অনভিজাত বলে কিছু নেই।

দিনদিন খাদ্য সংগ্রাহকদের সমাগম বেড়ে চললো। কিনান ও সিরিয়াতেও দেখা দিলো মন্বন্তর। সম্রাট ইউসুফের জন্মভূমি ফিলিস্তিনেও লাগলো খাদ্য সংকটের আগুন। স্থানটি ছিলো সিরিয়ার প্রান্তবর্তী ফিলিস্তিন অঞ্চলের গারমাত নামক এলাকায়। পশুপালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন হজরত ইয়াকুব ও তাঁর গোত্রের লোকেরা। মিসর সম্রাটের মহানুভবতার কথা সেখানেও গিয়ে পৌঁছলো। হজরত ইয়াকুব তাঁর পুত্রদেরকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য মিসর প্রেরণ করলেন। কিন্তু বিনইয়ামিনকে রেখে দিলেন নিজের কাছে।

www.eelm.weebly.com

وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ○ وَلَمَّا
جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ اَلَا تَرَوْنَ
اَنِّيْٓ اُوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ
لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ○ قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ○
وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا
اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

❑ ইউসুফের ভ্রাতাগণ আসিল এবং তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সে উহাদিগকে চিনিল কিন্তু উহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না,

❑ এবং সে যখন উহাদিগের রসদের ব্যবস্থা করিয়া দিল তখন সে বলিল, 'তোমরা আমার নিকট তোমাদিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে লইয়া আইস। তোমরা কি দেখিতেছ না যে আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিই? এবং আমি উত্তম অতিথি-সেবক?'

❑ 'কিন্তু তোমরা যদি তাহাকে আমার নিকট লইয়া না আইস তবে আমার নিকট তোমাদিগের জন্য কোন রসদ থাকিবে না এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হইবে না।'

❑ উহারা বলিল; 'উহার বিষয়ে আমরা উহার পিতাকে সম্মত করিবার চেষ্টা করিব এবং আমরা নিশ্চয়ই ইহা করিব।'

❑ ইউসুফ তাহার ভৃত্যগণকে বলিল, 'উহারা যে পণ্যমূল্য দিয়াছে তাহা উহাদিগের মালপত্রের মধ্যে রাখিয়া দাও— যাহাতে স্বজনগণের নিকট প্রত্যাবর্তনের পর উহারা বুঝিতে পারে যে উহা প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে; তাহা হইলে উহারা পুনরায় আসিতে পারে।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সম্রাট ইউসুফ একদিন জানতে পারলেন সিরিয়া থেকে কয়েকজন অতিথি এসেছে। তাদের থাকবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে অতিথিশালায়। সম্রাট তাদেরকে তলব করলেন। তারা এলে সবিস্ময়ে দেখলেন, এরা তাঁকে অন্ধকূপে নিক্ষেপকারী সেই দশ ভ্রাতা। প্রথম দর্শনেই তিনি তাদেরকে ভালোভাবে চিনতে পারলেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনলো না।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ বলেছেন, দেখার সঙ্গে সঙ্গে হজরত ইউসুফ তাঁর ভাইদেরকে চিনতে পেরেছিলেন। হাসান বলেছেন, তিনি তাদেরকে চিনতে পেরেছিলেন পরিচয় দানের পর।

দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর হজরত ইউসুফের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটেছিলো তাদের। তাই অবয়বগত পরিবর্তনের ফলে তারা তাঁকে চিনতে পারেনি। চিনতে না পারার এটাই ছিলো মুখ্য কারণ। আতা বলেছেন, হজরত ইউসুফ তখন ছিলেন মহামূল্যবান রাজকীয় ভূষণে সুসজ্জিত। সেকারণেই তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে চিনতে পারেনি। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত ইউসুফের অঙ্গাবরণে তখন শোভিত হচ্ছিলো রেশমী পোশাক। আর তাঁর গলদেশে শোভা পাচ্ছিলো স্বর্ণনির্মিত হার। আমি বলি, একথায় প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ইউসুফের শরিয়তে পুরুষের জন্য রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণালংকার ব্যবহার ছিলো বৈধ।

হজরত ইউসুফ ভাইদের সাথে আলাপ করলেন হিব্রু ভাষায়। বললেন, অতিথিবৃন্দ! তোমাদের পরিচয় প্রদান করো। তারা বললো, আমরা সিরিয়ার এক পশুপালক পরিবারের লোক। আমাদের অঞ্চল এখন ভয়ানক অন্নসংকটে নিপতিত। তাই খাদ্যশস্য সংগ্রহের নিমিত্তে আমরা এখানে এসেছি। সম্রাট বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা গুপ্তচর। এখানকার অভ্যন্তরীণ বিষয়ের সংবাদ অবগত হতে এসেছো। তারা বললো, আমরা গুপ্তচর নই। আমরা সকলেই সহোদর ভ্রাতা এবং এক পিতার সন্তান। আর আমাদের পিতা হচ্ছেন বয়োপ্রবীণ ও মহানুভব নবী হজরত ইয়াকুব। সম্রাট বললেন, তোমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা কতো? তারা বললো, এখানে উপস্থিত রয়েছি আমরা দশ ভাই। আমাদের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৈশবে আমাদের সঙ্গে পশু চারণকালে অরণ্যমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। তার ছোট আর এক ভাই এখন পিতার সান্নিধ্যে। পিতা তাকে কাছ ছাড়া করতে চান না। সন্তানবিচ্ছেদের যাতনায় সে-ই এখন মহান পিতার একমাত্র সান্ত্বনা। সম্রাট বললেন, আমি কী করে জানবো যে, তোমরা সত্য বলছো। তারা বললো সম্রাট এই বিদেশ বিভূঁয়ে আমরা তো আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে অক্ষম। সম্রাট আর কথা বাড়ালেন না। নির্দেশ দিলেন, এদের উটগুলোকে খাদ্য শস্য দিয়ে বোঝাই করে দেয়া হোক।

এর পরের আয়াত চতুষ্টয়ের (৫৯, ৬০, ৬১, ৬২) মর্মার্থ হচ্ছে— দশ ভ্রাতার উটগুলো খাদ্যশস্যে বোঝাই করে দেয়া হলো। সম্রাট বললেন, শোনো হে অতিথি সকল! আবার এলে অবশ্যই তোমাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে এসো। তাকে আনলে তার উটও খাদ্য দ্বারা বোঝাই করে দিবো। তোমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থাও করবো অধিক মাত্রায়। তোমরা নিশ্চয় স্বীকার করবে এখানকার পরিমাপ পূর্ণমাত্রাবিশিষ্ট। আর আমি উত্তম অতিথিবৎসল। আরো শোনো, তাকে সঙ্গে না আনলে আমি তোমাদেরকে কোনো খাদ্যশস্য দিবোই না। আর তাকে ছাড়া তোমরা এসোই না।

www.eelm.weebly.com

দশ ভ্রাতা বললো, মহানুভব সম্রাট! আমরা এ বিষয়ে আমাদের মহান পিতাকে সম্মত করতে চেষ্টা করবো। আর এ চেষ্টার মধ্যে আমরা কোনো কার্পণ্যই করবো না। তিনি আমাদের ওই ছোট ভাইকে ছেড়ে থাকতেই পারেন না। তবুও আমরা আপনাকে কথা দিচ্ছি, যেভাবেই হোক পিতাকে রাজী আমরা করাবোই। সম্রাট বললেন, তোমাদের মধ্যে একজন তাহলে জামানত হিসাবে থাকো। তারা বললো, ঠিক আছে। এরপর তারা জামানত হিস্যাবে কে থাকবে, তার জন্য লটারী করলো। লটারীতে উঠলো শামউনের নাম। এ হচ্ছে সেই শামউন, যে চল্লিশ বছর আগে বালক ইউসুফকে হত্যার পরিকল্পনায় বাধা দিয়েছিলো। শেষে শামউনকে রাজদরবারে জামিন হিসাবে রেখে অন্য নয় ভাই যাত্রা করলো সিরিয়া অভিমুখে। ইতোপূর্বে সম্রাটের নির্দেশে খাদ্য শস্যের মূল্য হিসাবে প্রদত্ত অর্থ তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছিলো। সে সময় সম্রাট তার আজ্ঞাবহকে বলেছিলেন, বাড়ীতে গিয়ে মালপত্র খুললেই তাদের প্রদত্ত অর্থ দেখতে পেয়ে নিশ্চয় বুঝতে পারবে যে, আমিই গোপনে এগুলো ফেরত দিয়েছি। বিস্মিত হবে তারা। আমার এই উদারতা পুনরায় তাদেরকে এখানে আসতে অনুপ্রাণিত করবে।

হজরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে জুহাক বলেছেন, হজরত ইউসুফের ভাইয়েরা খাদ্যশস্যের মূল্য হিসাবে দিয়েছিলো জুতা এবং চামড়া। মুদ্রার প্রচলন তখন ছিলো না। তাই তখন ক্রয়-বিক্রয় হতো দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্যের মাধ্যমে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য নগদ মুদ্রা বিনিময়ের প্রচলনও ছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, তারা বিনিময় মূল্য হিসাবে দিয়েছিলো কয়েক বস্তা ছাতু। বাগবী লিখেছেন এই অভিমতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। ওই ছোট ছোট ছাতুর বস্তাগুলো খাদ্য শস্যের বড় বড় বস্তার ভিতরে রেখে দেয়া হয়েছিলো।

কেউ কেউ বলেছেন, উদারতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ভাইদেরকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে হজরত ইউসুফ ওরকম করেছিলেন। অর্থাৎ তাদের পুনরাগমন নিশ্চিত করার জন্যই তিনি ওরকম করেছিলেন। কোনো কোনো আলেম মন্তব্য করেছেন, পিতা, ভ্রাতৃত্ববন্ধন, বিদেশাগত অতিথিদের জন্য সার্বিক মমত্ববোধ— এসকল কারণেই তাদের পণ্য মূল্য গ্রহণ করাকে সমীচীন মনে করেননি হজরত ইউসুফ। কালাবী বলেছেন, অর্থসঙ্কটের কারণে তাদের পুনরাগমন বিলম্বিত হতে পারে— এটাই ছিল তাঁর পণ্যমূল্য ফেরৎ দেয়ার কারণ। আবার কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, বাড়ীতে যেয়ে মালপত্রগুলো খুলে তাদের পরিশোধিত পণ্য সামগ্রী দেখে তারা চিন্তা করবে, নিশ্চয়ই ভুলবশতঃ এরকম করা হয়েছে। তখন তারা ভাববে এগুলো তো মিসর সম্রাটের সম্পদ। সুতরাং এগুলো তাকে অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। এগুলো আত্মসাৎ করা কিছুতেই বৈধ হবে না। তখন তারা ফিরে আসবে আবার।

www.eelm.weebly.com

فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝ قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ۝

❒ অতঃপর উহারা যখন উহাদিগের পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল তখন উহারা বলিল, 'হে আমাদিগের পিতা! আমাদিগের জন্য রসদ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, সুতরাং আমাদিগের ভ্রাতাকে আমাদিগের সহিত পাঠাইয়া দিন যাহাতে আমরা রসদ পাইতে পারি। আমরা অবশ্যই তাহার রক্ষণা-বেক্ষণ করিব।'

❒ সে বলিল,'আমি তোমাদিগকে উহার সম্বন্ধে সেইরূপই বিশ্বাস করিব যেরূপ বিশ্বাস পূর্বে তোমাদিগকে করিয়াছিলাম উহার ভ্রাতা সম্বন্ধে। আল্লাহ্ই রক্ষণা-বেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং দয়ালুদিগের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

❒ যখন উহারা উহাদিগের মাল-পত্র খুলিল তখন উহারা দেখিতে পাইল উহাদিগের পণ্যমূল্য উহাদিগকে প্রত্যপর্ণ করা হইয়াছে। উহারা বলিল, 'হে আমাদিগের পিতা! আমরা আর কি প্রত্যাশা করিতে পারি? ইহা আমাদিগের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে; পুনরায় আমরা আমাদিগের পরিবারবর্গকে খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া দিব এবং আমরা আমাদিগের ভ্রাতার রক্ষণা-বেক্ষণ করিব এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক উষ্ট্র-বোঝাই পণ্য আনিব; যাহা আনিয়াছি তাহা পরিমাণে অল্প।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলো নয় ভাই। হজরত ইয়াকুবকে বললো, হে আমাদের মহান পিতা! আমরা মিসরাধিপতির আতিথ্যে মুগ্ধ, অভিভূত। আমরা সেখানে দিনযাপন করেছি তাঁর বিশেষ অতিথিরূপে। তাঁর আপ্যায়ন দর্শনে আমাদের মনে হয়েছিলো, এরকম মধুর মেহমানদারী ইয়াকুব বংশীয় কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। হজরত ইয়াকুব

www.eelm.weebly.com

বললেন, এবার গেলে অবশ্যই আমার সালাম তাঁকে পৌঁছিয়ে দিয়ো এবং বোলো তাঁর অত্যুত্তম আচরণের নিমিত্তে আমি তার জন্য দোয়া করে চলেছি। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি কৃপাবর্ষণ করুন। এরপর তিনি জানতে চাইলেন, শামউন কোথায়? তারা বললো, সম্রাট তাকে জামিন হিসাবে রেখে দিয়েছেন। এরপর তারা বিবৃত করলো পুরো ঘটনা। তারপর বললো, হে মহান জনয়িতা! এরপর আমরা বিনইয়ামিনকে সঙ্গে না নিলে আমাদেরকে আর খাদ্যশস্য দেয়া হবে না। সম্রাট নিজেই একথা জানিয়েছেন। সুতরাং কিছুকাল পর আমাদের মিসর যাত্রার সাথী হিসেবে আপনি অবশ্যই বিনইয়ামিনকে আমাদের সাথে যেতে অনুমতি দিবেন। এতে করে আমাদের খাদ্যশস্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। হে পিতা! আপনি এতে অমত করবেন না। বিনইয়ামিন তো আমাদেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সুতরাং আমরা তার রক্ষণাবেক্ষণে কোনো প্রকার ত্রুটিই করবো না।

হাসান বলেছেন, এখানে 'কাইল' অর্থ খাদ্যশস্য। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বাক্যটির অর্থ করেছেন এভাবে— মিসরাধিরাজ আমাদের প্রত্যেকের নামে নামে খাদ্যশস্য দিয়েছেন। বিনইয়ামিনের জন্য কিছুই দেননি। সুতরাং হে আমাদের মহান পিতা! তাকেও আমাদের সাথী হতে দিন। তাহলে আমরা সকলের অংশ পেয়ে যাবো। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো এবং সে নিশ্চিত পেয়ে যাবে তার অংশ।

পরের আয়াতের (৬৪) মর্মার্থ হচ্ছে — হজরত ইয়াকুব বললেন, ঠিক আছে। আমি তোমাদের কথা বিশ্বাস করলাম। চল্লিশ বছর পূর্বে ইউসুফকে নিয়ে যাবার সময়েও তোমরা এরকম বলেছিলে। তখনও তোমাদেরকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। এখনও করছি। তবে আমার প্রকৃত বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং অনুকম্পাপরবশগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ অনুকম্পাপরবশ।

এর পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'যখন তারা তাদের মালপত্র খুললো তখন তারা দেখতে পেলো তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। তারা বললো, হে আমাদের পিতা! আমরা আর কী প্রত্যাশা করতে পারি? এটা আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে।' একথার অর্থ— নয় ভাই মালপত্রগুলো খুলে দেখলো খাদ্যশস্যের মধ্যে রয়েছে তাদেরই পরিশোধিত পণ্যমূল্য। অবাক হয়ে গেলো তারা। আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠলো, হে মহানুভব। তিনি আমাদেরকে রাজকীয় মর্যাদায় রেখেছেন। খাদ্যশস্য দ্বারা বোঝাই করে দিয়েছেন আমাদের উট। আবার দেখুন, পরিশোধিত পণ্যমূল্য গোপনে গোপনে আমাদেরকেই ফেরত দিয়েছেন। এর চেয়ে বেশী আর কী আশা করতে পারি আমরা? এর অধিক কী প্রত্যাশা থাকতে পারে আমাদের? কোন ভাষায় আমরা প্রকাশ করবো তাঁর অভূতপূর্ব বদান্যতার কথা। তাঁর অসাধারণ দানশীলতা সম্পর্কে আপনিও সাক্ষী থাকুন। আমরা পুনরায় খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য নতুন কোনো তহবিলের প্রত্যাশী নই। যে পণ্যমূল্য আমারা ফেরত পেয়েছি, সেই পণ্যমূল্যই নতুন খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট। এরপর আর কী প্রত্যাশা থাকতে পারে আমাদের?

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্যশস্য এনে দিবো এবং আমরা আমাদের ভ্রাতার রক্ষণাবেক্ষণ করবো এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক উষ্ট্র-বোঝাই পণ্য আনবো; যা এনেছি তা পরিমাণে অল্প।' এ কথার অর্থ— তারা বললো, হে আমাদের মহান জনক! যে পণ্যমূল্য আমরা এখন ফেরত পেলাম, সেই পণ্যমূল্য নিয়েই আমরা আবার খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য মিসর অভিমুখে যাত্রা করবো। বিনইয়ামিনকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। তার যত্নের কোনো ত্রুটি আমরা করবো না। এবার আমরা অতিরিক্ত আর এক উষ্ট্র বোঝাই পণ্যও আনবো। যা এনেছি তা আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। আর অতিরিক্ত পণ্য লাভ হবে আমাদের জন্য সহজ। যেহেতু সম্রাটের সদাশয়তা সুপ্রমাণিত। আর আমাদের উপরে তিনি আরো অধিক সদয়।

অন্য শহর থেকে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করাকে আরবী ভাষায় বলে 'মারা' অথবা 'ইয়ামিরু।' আর এখানে 'নাহ্ফাজু আখানা' অর্থ 'আমরা পথিমধ্যে আমাদের ভ্রাতার রক্ষণাবেক্ষণ করবো'। 'নাজ্দাদু কাইলা বাই'র' অর্থ 'কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য আমরা আনবো অতিরিক্ত আর এক উষ্ট্র বোঝাই পণ্য।'

সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৬৬, ৬৭, ৬৮

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا
أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ○
وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ
وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ○ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ
مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ
قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

❑ পিতা বলিল, 'আমি উহাকে কখনই তোমাদিগের সহিত পাঠাইব না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহের নামে শপথ কর যে, তোমরা উহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হইয়া না পড়।' অতঃপর যখন উহারা তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল তখন সে বলিল, 'আমরা যে বিষয়ে কথা বলিতেছি আল্লাহ্ তাহার বিধায়ক। '

www.eelm.weebly.com

❒ সে বলিল, 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিও না, ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে। আল্লাহের বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদিগের জন্য কিছু করিতে পারি না। বিধান আল্লাহেরই। আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং যাহারা অপরের উপর নির্ভর করিতে চাহে তাহারা আল্লাহেরই উপর নির্ভর করুক।'

❒ এবং যখন তাহারা তাহাদিগের পিতা তাহাদিগকে যে ভাবে আদেশ করিয়াছিল সেইভাবেই প্রবেশ করিল তখন আল্লাহের বিধানের বিরুদ্ধে উহা তাহাদিগের কোন কাজে আসিল না; কিন্তু ইয়াকুব যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিল তাহা ছিল তাহার নিজের ইচ্ছা এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমি তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

প্রথমে বলা হয়েছে— পিতা বললো, আমি তাকে কখনোই তোমাদের সঙ্গে পাঠাবো না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করো যে, তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হয়ে না পড়ো।' একথার অর্থ— হজরত ইয়াকুব বললেন, হে আত্মজবর্গ! তোমরা আমার নিকট এই মর্মে শপথ করো যে, বিনইয়ামিনকে তোমরা আমার কাছে ফেরত আনবেই। এরকম শপথ না করা পর্যন্ত তাকে আমি তোমাদের সঙ্গে পাঠাবো না। কিন্তু তোমরা যদি অপারগ হয়ে পড়ো, তবে তা ভিন্ন কথা।

এখানে 'মাওছিক্বাম্ মিনাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় শপথ অথবা যে শপথের মূল লক্ষ্য কেবলই আল্লাহ্। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'ইল্লা আঁইয়ুহাত্বা বিকুম' অর্থ 'তোমরা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে না পড়ো।' কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— তবে হাঁ, তোমরা যদি একান্ত অসহায় হয়ে না যাও। অর্থাৎ 'যদি না ভেঙে পড়ে তোমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।' এখানে ইল্লা (যদি) শব্দটি পার্থক্য নির্দেশক। তাই কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে তোমরা তার নিরাপত্তার ব্যাপারে থাকবে সদাসতর্ক। কিন্তু যদি তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়ো, অথবা পরাস্ত হও, তবে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার।

কথিত আছে, তারা শপথ করেছিলো আল্লাহ্ ও শেষ নবী মোহাম্মদ স. এর নামে। তাই হজরত ইয়াকুব বিনইয়ামিনকে তাদের সঙ্গে মিসর গমনের ব্যাপারে আর আপত্তি তুলতে পারেননি।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন তারা তাঁর নিকট প্রতিজ্ঞা করলো তখন সে বললো, আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তার বিধায়ক।' কা'ব বলেছেন, হজরত ইয়াকুব যখন একথা বললেন, তখন আল্লাহ্‌পাক স্বীয় পরাক্রমের শপথ করে বলেছিলেন, হে আমার নবী! 'তুমি আমাকে বিধায়ক' (ওয়াকিল) বলে যখন সম্পূর্ণ আমারই উপর নির্ভরশীল হলে, তখন আমি অবশ্যই এর উত্তম প্রতিফল প্রদান করবো। ইউসুফ ও বিনইয়ামিন— দু'জনকেই তুমি এবার পাবে।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দ্বার দিয়ে প্রবেশ কোরো না, ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়ে প্রবেশ কোরো।' একথার অর্থ— হজরত ইয়াকুব ভাবলেন, একই দরজা দিয়ে এক সঙ্গে তাঁর সুদর্শন সন্তানবর্গ রাজদরবারে প্রবেশ করলে তাদের উপরে পড়তে পারে অসৎ লোকের অশুভ দৃষ্টি। তাই তিনি বললেন, হে আমার আত্মজবৃন্দ! তোমরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ কোরো পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে। এক দরজা দিয়ে নয়। উল্লেখ্য যে, কুদৃষ্টি বা অশুভ দৃষ্টির বিষয়টি সত্য। হাদিস শরীফে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ আমি সুরা নুনের তাফসীরে অশুভ দৃষ্টি বা বদনজর সম্পর্কিত হাদিসগুলোর সমাবেশ ঘটাবো।

প্রথম যাত্রার সময় হজরত ইয়াকুব কিন্তু তাঁর পুত্রদেরকে এরকম উপদেশ দেননি। তখন হয়তো ভেবেছিলেন মিসরবাসীরা এদেরকে তো চেনেই না। কিন্তু সেখানে রাজকীয় আতিথ্য লাভের পর এখন হয় তো তাদেরকে অনেকেই চেনে। তাছাড়া এবার বিনইয়ামিন রয়েছে তাদের সঙ্গে। সে তো অন্যদের চেয়ে সুন্দর। তাই তাদের সৌন্দর্য দর্শনে এবং সম্রাটের বিশিষ্ট অতিথি হওয়ার কারণে কোনো হিংসুক ব্যক্তির অশুভ দৃষ্টিতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এবার প্রচুর। তাই তিনি পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, হজরত ইয়াকুব তাঁর পুত্রগণকে পৃথক পৃথকভাবে যাত্রা শুরু করতে বলেছিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না।' এ কথার অর্থ, তিনি বললেন, এতো হচ্ছে কেবল সতর্কতা অবলম্বন মাত্র। এ হচ্ছে জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা অদৃষ্টে রয়েছে তা ঘটবেই। অদৃষ্টের বিধান খণ্ডন করার ক্ষমতা আমার নেই। জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বললেন, সাবধানতা কখনও তকদিরের সিদ্ধান্ত থেকে রক্ষা করতে পারে না। হাকেম। হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে আহমদ এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে বায়যারও এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'বিধান আল্লাহ্রই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং যারা অপরের উপর নির্ভর করতে চায়, তারা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করুক।'

এর পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'এবং যখন তারা তাদের পিতা তাদেরকে যেভাবে আদেশ করেছিলো সেভাবেই প্রবেশ করলো, তখন আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের কোনো কাজে আসলো না।' এ কথার অর্থ— পিতার উপদেশানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে রাজদরবারে প্রবেশ করলো হজরত

www.eelm.weebly.com

ইউসুফের ভ্রাতাগণ। তবু তারা বিপদ এড়াতে পারলো না। কীভাবে তারা বিপদগ্রস্ত হলো, সেই বিবরণ রয়েছে পরবর্তী আয়াতসমূহে। এক বর্ণনায় এসেছে, রাজদরবারে প্রবেশের দরজা ছিলো চারটি। তারা পূর্বাহ্নে বিভক্ত হয়ে প্রবেশ করেছিলো ওই চার দরজা দিয়ে। এখানে 'মিনাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্র বিধান বা সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার পূর্ব সিদ্ধান্ত ছিলো বিনইয়ামিনকে বন্দী করা হবে। হয়েছিলোও তাই। কিন্তু আল্লাহ্পাকের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাদের কৌশল (ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করা) কোনো কাজে এলো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু ইয়াকুব যা সিদ্ধান্ত করেছিলো তা ছিলো তার নিজের ইচ্ছা এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিলো, কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম।' এখানে 'ইল্লা হাজাতান' অর্থ শুধুই প্রত্যাশা বা বাসনা। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বলার নেপথ্যে হজরত ইয়াকুবের কেবল এই ইচ্ছাটি কার্যকর ছিলো যে, তারা যেনো অশুভ দৃষ্টিতে নিপতিত না হয়। সুগভীর পুত্রবাৎসল্যের কারণেই তিনি এমতো ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সাথে সাথে একথাও বলেছিলেন যে 'আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না' তাঁর এমতো বিশ্বাস ও আচরণ জ্ঞানসম্মত। আর এই জ্ঞান আল্লাহ্ই তাঁকে দিয়েছিলেন। আলোচ্য বাক্যের মর্ম এটাই।

এখানে 'আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম' অর্থ 'এই জ্ঞান আমি তাকে দিয়েছিলাম প্রত্যাদেশের মাধ্যমে।' এখানে 'মা' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে আল্লাহ্প্রদত্ত বুদ্ধির দিকে। 'মা আল্লামনা' কথাটির 'মা' অব্যয়টি যদি এখানে সংযোজক অব্যয় হয় তবে এর মর্ম হবে— পূর্ববর্তী আয়াতের 'আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না' কথাটি। আর 'মা' অব্যয়টি যদি এখানে ধাতুগত হয়, তবে 'মা আল্লামনা' কথাটির অর্থ হবে 'শিক্ষা দিয়েছিলাম।'

'জু ই'লমিন্ অর্থ জ্ঞান কার্যকর করা। অর্থাৎ 'আমি যে জ্ঞান দান করেছিলাম, ইয়াকুব তা কার্যকর করেছে।' সুফিয়ান সওরী বলেছেন, যে আলেম তার জ্ঞান কার্যকর করে না সে আলেমই নয়। কেউ কেউ বলেছেন 'জু ই'লমিন' অর্থ তত্ত্বাবধানকারী।

শেষে বলা হয়েছে— 'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।' এ কথার অর্থ, অধিকাংশ মানুষ নবী ইয়াকুবের এই বিশেষ প্রজ্ঞার কথা অবগত নয়। অথবা অবহিত নয় নিয়তির গূঢ় রহস্য সম্পর্কে। কিংবা অধিকাংশ মানুষ তকদিরের এই সূক্ষ্ম বিধান সম্পর্কে অবগত নয় যে, নিয়তির লিখন কোনো কৌশলেই খণ্ডন করা যায় না। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয়জনদের প্রতি কী রহস্য উন্মোচন করেন, অধিকাংশ মানুষ তার খবর রাখে না।

www.eelm.weebly.com

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلٰى يُوسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

☐ উহারা যখন ইউসুফের সম্মুখে উপস্থিত হইল তখন ইউসুফ তাহার সহোদরকে নিজের কাছে রাখিল এবং বলিল, 'আমিই তোমার সহোদর, সুতরাং উহারা যাহা করিত তাহার জন্য দুঃখ করিও না।'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সম্রাট সকাশে উপস্থিত হলো তারা। বললো, হে মহামান্য সম্রাট! আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। সঙ্গে নিয়ে এসেছি আমাদের ছোট ভাইটিকে। এবার আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করুন। সম্রাট বললেন, সাধু! সাধু! আমি অবশ্যই পূর্ণ করবো আমার প্রতিশ্রুতি। সম্রাট সকলের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায়। তারা হলো সম্রাটের বিশেষ মেহমান। আহারের সময় পরিচারক এসে জানালো, ভোজনালয়ে চলুন। মহামান্য সম্রাট আপনাদেরকে নিয়ে আহার করবেন। ভোজনালয়ে গেলে বলা হলো, আপনারা সকলে মুখোমুখি জোড়ায় জোড়ায় উপবেশন করবেন। সেভাবেই বসলো সকলে। এভাবে পাঁচ জোড়া পূর্ণ হওয়ার পর বিনইয়ামিন পড়ে গেলো একা। সম্রাট এগিয়ে এসে বললেন, বিনইয়ামিনের তো কোনো আহার-সঙ্গী জুটলো না। ঠিক আছে আমিই হলাম তার সঙ্গী।

সকলের সামনে সাজানো রয়েছে রাজকীয় আহার্য সম্ভার। আল্লাহ্‌র নামে শুরু হলো পানাহার পর্ব। দশ ভাই যতো ভাবে, ততই আশ্চর্য হয়। তাদের অদৃষ্টে আজ একি অভূতপূর্ব আপ্যায়ন। আর বিনইয়ামিনের সৌভাগ্যের তো তুলনাই হয় না। স্বয়ং মিসরাধিরাজ আজ তার ভোজনসঙ্গী।

দিবাবসান হলো। পূর্বের নিয়মে নিশীথের পানাহার পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর তারা দেখলো, প্রতি দুজনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে একটি করে শয়নকক্ষ। এবারেও দেখা গেলো সকলে জোড়ায় জোড়ায় শয়নকক্ষে প্রবেশের পর বিনইয়ামিন হয়ে পড়েছে একা। সম্রাট বললেন, সেতো এবারেও হয়ে পড়লো নিঃসঙ্গ। ঠিক আছে, আমিই রাত্রিযাপন করবো তার প্রকোষ্ঠে।

পরদিন সম্রাট ঘোষণা দিলেন বিনইয়ামিন নিঃসঙ্গ। সুতরাং এখন থেকে সদরে অন্দরে সব সময় সে আমার সঙ্গে থাকবে। বিনইয়ামিনকে লক্ষ্য করে বললেন, এখন থেকে আমি তোমার ভাই। সময় বয়ে চলে। সম্রাট কিছুতেই বিনইয়ামিনকে কাছ ছাড়া করেন না। একদিন তিনি একান্তে বললেন, তোমার নাম কি? সে বললো, বিনইয়ামিন। সম্রাট বললেন, অর্থ কি? বিনইয়ামিন বললো পরলোক-গমনকারিণীর সন্তান। আমার জন্মের সময়ে আমার জন্মদাত্রী মাতা পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বলেই আমাকে এ নামে ডাকা হয়। সম্রাট বললেন, শুনেছি তোমার অগ্রজকে শৈশবে বাঘে খেয়ে ফেলছে— মনে করো আমিই তোমার সেই

www.eelm.weebly.com

ভাই, একথা বললে কি তুমি খুশী হবে? বিনইয়ামিন বললো, সম্রাটকে ভ্রাতারূপে পাওয়ার সৌভাগ্য ক'জনের কপালে জোটে। কিন্তু আপনি তো আর নবী ইয়াকুব ও তাঁর পুণ্যবতী সহধর্মিণী রাহীলের সন্তান নন। বিনইয়ামিনের একথা শুনে কেঁদে ফেললেন মহামান্য সম্রাট। বিনইয়ামিনকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। অনেকক্ষণ ধরে অশ্রুপাত করলেন অঝোর ধারায়। নিজের পরিচয় উন্মোচন করলেন। বললেন, আদরের ভাইটি আমার। আমিই তো তোমার আসল ভাই। আমি ইউসুফ। তোমার ও আমার পিতা এক। মাতাও এক। সৎভাইয়েরা আমাকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে দিয়েছিলো। এক সওদাগরের দল আমাকে উদ্ধার করেছিলো। আল্লাহ্ই আমার জীবন রক্ষা করেছেন। এভাবে অদৃষ্টের স্রোতে ভাসতে ভাসতে আমাকে এখানে এনেছেন। অনেক ঘাতপ্রতিঘাত, অপবাদ, কারাবাস ইত্যাদির পর আমাকে বানিয়েছেন মিসরের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ভাই! আমার কাহিনী তো শুনলে। দুঃখ কোরো না। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি মেহেরবান। তিনিই আজ দ্যাখো মিলিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে। সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। সৎভাইদের নির্মম আচরণের কথা ভেবে দুঃখিত হয়ো না।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ
أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ○ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ○ قَالُوا
نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ○ قَالُوا
تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ○ قَالُوا
فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ ○ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ
جَزَاؤُهُ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ○

❒ অতঃপর সে যখন উহাদিগের রসদের ব্যবস্থা করিয়া দিল তখন সে তাহার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে রাজার পান-পাত্র রাখিয়া দিল। তখন এক আহ্বায়ক চীৎকার করিয়া বলিল, 'হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর।'

❒ উহারা তাহাদিগের দিকে চাহিয়া বলিল, 'তোমরা কী হারাইয়াছ?

❒ তাহারা বলিল, 'আমরা রাজার পানপাত্র হারাইয়াছি; যে উহা আনিয়া দিবে সে এক উষ্ট্র-বোঝাই মাল পাইবে এবং আমি উহার জামিন।'

www.eelm.weebly.com

❒ উহারা বলিল, 'আল্লাহের শপথ! তোমরা তো জান আমরা এই দেশে দুষ্কৃতি করিতে আসি নাই এবং আমরা চোরও নহি।'

❒ তাহারা বলিল, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে যে চুরি করিয়াছে তাহার শাস্তি কী?

❒ উহারা বলিল, 'যাহার মাল-পত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাইবে দাসত্ব হইবে তাহার শাস্তি। এইভাবে আমরা সীমালংঘনকারীদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইউসুফের ভ্রাতাগণ দেশে ফিরে যেতে মনস্থ করলো। তাদের উটগুলো খাদ্যশস্যের বোঝা দ্বারা সজ্জিত করা হলো। সম্রাটের নির্দেশে তখন এক লোক বিনইয়ামিনের নামে প্রস্তুত মালপত্রের ভিতরে সঙ্গোপনে রেখে দিলো সম্রাটের বিশেষ পানপাত্রটি। মালপত্রের বাঁধা ছাদা ঠিক ঠাক করে তারা রওনা হলো সিরিয়া অভিমুখে। কিছুদূর যেতে না যেতেই দেখতে পেলো দৌড়ে আসছে এক রাজকর্মচারী। সে চিৎকার করে ঘোষণা করছে, হে যাত্রীদল, থামো। তোমরা নিশ্চয় অপহারক।

'সিকায়াহ্' ও 'সুকায়াহ্'— শব্দ দু'টোর অর্থ 'পানপাত্র।' এখানে ব্যবহৃত 'সিকায়াহ্' শব্দটির অর্থ হবে সম্রাটের বিশেষ পানপাত্র। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই পানপাত্রটি ছিলো জবরজদ প্রস্তরনির্মিত। ইবনে ইসহাক বলেছেন রৌপ্যনির্মিত। কেউ কেউ বলেছেন, পাত্রটি ছিলো স্বর্ণের। ইকরামা বলেছেন রূপার। তবে তা ছিলো মহামূল্যবান রত্নখচিত। অতিথিদের আভিজাত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্রাট নিজেই তাঁর ওই বিশেষ পানপাত্রটি দিয়ে খাদ্যশস্য মেপে দিতে বলেছিলেন। সুদ্দী বলেছেন, সম্রাটের নির্দেশে অত্যন্ত গোপনে ওই পানপাত্রটি রেখে দেয়া হয়েছিলো তাদের মালপত্রের মধ্যে।

কা'ব বলেছেন, সম্রাট যখন বিনইয়ামিনের নিকটে আত্মপরিচয় উন্মোচন করলেন তখন বিনইয়ামিন বলে উঠলো, ভাই আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। হজরত ইউসুফ বললেন, না তা হয় না। এমনিতে আমাদের মহান পিতা দীর্ঘদিন ধরে শোকাচ্ছন্ন। এমতাবস্থায় তুমিও যদি তাঁর কাছছাড়া হও, তবে এতো বিচ্ছেদ যাতনা তিনি সইবেন কীভাবে? তাছাড়া তোমাকে আটকাতেও তো আমি পারবো না। ভাইয়েরা তোমাকে পিতার সমীপে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পিতৃআজ্ঞাও এটাই। এখন তোমাকে আটকাতে গেলে সর্বসমক্ষে তোমাকে অপরাধী সাজাতে হবে। যদি তুমি এতে রাজী হও। তবে সেরকম একটা গোপন পরিকল্পনা করা যায়। বিনইয়ামিন বললো, যা ইচ্ছা করুন। এতোদিন পর আমি আপনাকে পেয়েছি। তাই আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। তখন হজরত ইউসুফ বললেন, তোমার রসদসম্ভারের মধ্যে আমার পানপাত্রটি গোপনে রেখে দেয়া হবে। পরে সকলের সামনে সেটি বের করে তোমাকে বানানো হবে চোর।

 www.eelm.weebly.com

এখানে 'মুয়াজ্জিন' অর্থ ঘোষক বা আহ্বায়ক। অর্থাৎ ওই রাজকর্মচারী যে ঘোষণা করেছিলো 'তোমরা নিশ্চয় চোর।' আর এখানে 'ছুম্মা' (অতঃপর বা তখন) শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় একথা প্রতীয়মান হয় যে, যাত্রীদল কিছুপথ অতিক্রম করার পর তাদেরকে থামতে বলা হয়েছিলো। অর্থাৎ এক মঞ্জিল পথ পেরিয়ে যাওয়ার পর অথবা লোকালয় অতিক্রম করে উন্মুক্ত প্রান্তরে উপনীত হওয়ার পর তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিলো 'তোমরা নিশ্চয় চোর।'

'আল ই'রু' বলে পণ্যবাহী উটকে। রূপক অর্থে উটের আরোহীকে। যেমন রসুল স. বলেছিলেন 'ইয়া খইলাললহী ইরকাব্' (হে আল্লাহ্র অশ্ব, আরোহণ করো)। কথাটির প্রকৃত অর্থ— হে আল্লাহ্র অশ্বারোহী, অগ্রসর হও। আল্লাহ্র অশ্ব বলে রূপকভাবে এখানে অশ্বারোহীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, ওই দলটি ছিলো গর্দভারোহী। ফার্‌রা বলেছেন উষ্ট্রারোহী।

প্রশ্নঃ হজরত ইউসুফের ভ্রাতারা চোর ছিলেন না। তবুও এখানে তাঁদেরকে চোর বলা হলো কেনো?

জবাবঃ 'তোমরা নিশ্চয় চোর' কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন ওই ঘোষকটি। হজরত ইউসুফ তাকে এরকম কথা শিখিয়ে দেননি। আর একদিক থেকে বিনইয়ামিন ছাড়া অন্য সকল ভ্রাতা তো প্রকৃতই চোর ছিলো। তারা হজরত ইউসুফকে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করেছিলো অন্ধকূপে। পরে তাকে বিক্রিও করেছিলো। আমার মতে এই উক্তিটিই যথার্থ। অর্থাৎ তাদেরকে চোর বলার নির্দেশটি এসেছিলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর আল্লাহ্র নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্নের অবতারণা করা যায় না। তাই এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— 'তিনি যা করেন তার বিরুদ্ধে কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে না, বরং তারা যা করে তার বিরুদ্ধেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।' প্রকৃত কথা হচ্ছে, এসকল ঘটনা ছিলো প্রিয় নবী হজরত ইয়াকুবের জন্য আল্লাহ্র এক বিশেষ পরীক্ষা।

পরের আয়াতের (৭১) মর্মার্থ হচ্ছে— ঘোষকের কথা শুনে যাত্রীদল থামলো। বললো, এভাবে চিৎকার করছো কেনো? কি হারিয়েছে তোমাদের? এখানে 'ফাকদুন' শব্দটির অর্থ অপহৃত বস্তু, যার কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

এর পরের আয়াতের (৭২) মর্মার্থ হচ্ছে— ঘোষক ও তার সাথীরা বললো, আমরা সম্রাটের পানপাত্রটি খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদেরকে সেটি খুঁজে আনতে বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, যে পানপাত্রটির সন্ধান দিতে পারবে পুরস্কার হিসেবে সে পাবে মালপত্র বোঝাই করা একটি উট। আমরা একথার জামীনদার অর্থাৎ আমাদেরকেই দেয়া হয়েছে সন্ধানকারীকে পুরস্কার দেয়ার দায়িত্ব। আমাদের ধারণা পানপাত্রটি রয়েছে তোমাদের মালপত্রের মধ্যে। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাটিও প্রমাণিত হয় যে, কর্ম সম্পাদনের পূর্বেই পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা উচিত।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতের (৭৩) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইউসুফের ভাইয়েরা বললো, শপথ আল্লাহ্‌র! তোমরা তো জানো, আমরা কোনো দুষ্কর্ম করবার জন্য এদেশে আসিনি। আর আমরা চোরও নই। এ নিয়ে আমরা দু'বার এখানে এলাম। বেশ কিছুকাল অবস্থানও করলাম। গতবারে আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য আমাদের মালপত্রের সঙ্গে চলে গিয়েছিলো। সেই পণ্যমূল্য এবার আমরা ফেরতও দিয়ে গেলাম। এসকল ঘটনা তোমরা জানো। একথাটিও অনেকে জানে যে, আমাদের বাহনগুলো যাতে কারো ক্ষেতের ফসল ভক্ষণ না করে, সে জন্য আমরা সেগুলোর মুখ বেঁধে এখানে যাওয়া আসা করি। আমরা যে বিশ্বস্ত, এ সকল কিছু হচ্ছে তার প্রমাণ। সুতরাং আমরা চোর হতে পারি কীভাবে?

এর পরের আয়াতের (৭৪) মর্মার্থ হচ্ছে— ঘোষক ও তার সঙ্গীরা বললো, তোমরা যথার্থই বলেছো। কিন্তু তোমাদের চৌর্যকর্ম যদি প্রমাণিত হয়, তবে তোমরাই বলো, তার শাস্তি কি হতে পারে?

শেষোক্ত আয়াতের (৭৫) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইউসুফের ভাইয়েরা বললো, ঠিক আছে তাহলে তোমরা আমাদের মালপত্রগুলো খুলে খুলে দেখো। যদি কারো মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যায় তবে দাসত্বই হবে তার উপযুক্ত শাস্তি। আমরা ইয়াকুব নবীর উম্মত। তাঁর শরিয়তের বিধানের কথাই আমরা তোমাদেরকে বললাম। বিধানটি হচ্ছে— কেউ চোর প্রমাণিত হলে তাকে সমর্পণ করা হবে অপহৃত বস্তুর মালিকের নিকট। মালিক তখন তাকে তার ক্রীতদাস বানিয়ে নিবে। একথা শুনে অনুসন্ধানকারী দলটি বললো, ঠিক আছে। এবার তবে আমাদের সঙ্গে রাজদরবারে চলো। সেখানে রাজার উপস্থিতিতে তোমাদের মালপত্রগুলো তল্লাশী করা হবে।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৭৬

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاۤءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاۤءِ اَخِيْهِ ؕ
كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ
يَّشَاۤءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۤءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۝

❐ অতঃপর ইউসুফ তাহার সহোদরের মাল-পত্র তল্লাশির পূর্বে উহাদিগের মাল-পত্র তল্লাশি করিতে লাগিল; পরে তাহার সহোদরের মাল-পত্রের মধ্য হইতে পাত্রটি বাহির করিল। এইভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলাম। রাজার আইনে তাহার সহোদরকে সে দাস করিতে পারিত না আল্লাহ্ ইচ্ছা না করিলে। আমি যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে অধিকতর জ্ঞানীজন।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতপর ইউসুফ তার সহোদরের মালপত্র তল্লাশীর পূর্বে তাদের মালপত্র তল্লাশী করতে লাগলো।' একথার অর্থ— সম্রাট ইউসুফ তাদের মালপত্র তল্লাশীর নির্দেশ দিলেন। নির্দেশানুসারে বিনইয়ামিনের মালপত্র ছাড়া অন্যদের মালপত্র একে একে অনুসন্ধান করে দেখা হলো। কিন্তু পাত্রটির কোনো হদিস মিললো না। বিষয়টি পূর্বপরিকল্পিত— একথা যাতে অন্য ভাইয়েরা বুঝতে না পারে, তাই তাদের মালপত্রই খুঁজে দেখা হলো আগে। কাতাদা বলেছেন, আমার নিকট এই তথ্যটি পৌঁছেছে যে, পাত্রটি অনুসন্ধানের সময় যার মালপত্র খোলা হতো, তিনিই তখন উচ্চস্বরে উচ্চারণ করতেন 'আস্তাগফিরুল্লাহ্' (আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমাপ্রার্থী)। দশ ভাইয়ের মালপত্র খুঁজে দেখার পরেও পাত্রটি না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লো অনুসন্ধানকারীরা। বিনইয়ামিনের মালপত্র তল্লাশী করার কোনো আগ্রহ আর তাদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হলো না। দশ ভাই বললো, বিনইয়ামিনের মালপত্রগুলো তল্লাশী না করা পর্যন্ত আমরা এখান থেকে এক পা-ও অগ্রসর হবো না। অতএব আপনারা তল্লাশী সমাপ্ত করুন। আমরা সন্দেহ-সংশয় থেকে নিষ্কৃতি পাই। আর আপনারাও পুরোপুরি আশ্বস্ত হোন।

এরপর বলা হয়েছে— 'পরে তার সহোদরের মালপত্রের মধ্য থেকে পাত্রটি বের করলো।' একথার অর্থ— এবার তল্লাশী শুরু হলো বিনইয়ামিনের মালপত্র-গুলোর মধ্যে। শেষে একটি বস্তার মধ্যে পাওয়া গেলো পানপাত্রটি। লজ্জায় মস্তক অবনত করলো দশভাই। শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বিনইয়ামিনকে লক্ষ্য করে বললো, হে রাহীলের পুত্র! এরকম অপকর্ম তুমি করলে কিরূপে? আমরা কোন মুখে আর সততার বড়াই করবো। তোমাদের দুই ভাইয়ের জন্যই আমাদেরকে বার বার বিপদগ্রস্ত হতে হয়। বিনইয়ামিন বললো, হে ভ্রাতৃবর্গ! রাহীলের সন্তানদ্বয়কে এভাবে অপবাদ দিয়ো না। তাদের জন্য তোমরা বিপদগ্রস্ত হও, না তোমাদের কারণেই তারা বিপদগ্রস্ত হয়ে থাকে? তোমরা কি আমার অগ্রজকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গুম করে দাওনি? এখন তোমরা যাই বলো না কেনো, আমি এই ঘটনায় বিস্মিত নই। আমার মনে হয়, আমার মাল-পত্রের মধ্যে পানপাত্রটি রেখেছে সে-ই যে ইতোপূর্বে তোমাদের মাল-পত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছিলো পরিশোধিত পণ্যমূল্য। এরপর কেউ আর কথা বাড়ালো না। বিনইয়ামিনকে শৃঙ্খলিত করে ক্রীতদাসরূপে নিয়ে যাওয়া হলো সেখান থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম।' একথার অর্থ— বিনইয়ামিনকে কাছে রাখার জন্য আমার নবী ইউসুফ যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সে কৌশল তাকে আমিই শিক্ষা দিয়েছি। একথায় প্রতীয়মান হয় যে 'তোমরা নিশ্চয় চোর' ঘোষককে একথাটি বলতে বলেছিলেন স্বয়ং হজরত ইউসুফ। উক্তিটি অতর্কিতে উচ্চারিত কোনো উক্তি নয়। আর হজরত

www.eelm.weebly.com

ইউসুফ এরকম বলেছিলেন প্রত্যাদেশানুসারে। প্রত্যাদেশই হচ্ছে সকল নবী রসুলগণের বক্তব্যের ভিত্তি। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'কাইদ' অর্থ প্রতিশোধ। অর্থাৎ এ হচ্ছে চল্লিশ বছর পূর্বের চক্রান্তের প্রতিশোধ। ওই চক্রান্ত সম্পর্কে হজরত ইয়াকুব বালক ইউসুফকে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে' (আয়াত ৫)। বাগবী আরো লিখেছেন, কাইদ শব্দটি সৃষ্টজগতের কারো সাথে সম্পর্কিত হলে তার অর্থ হবে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত। আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কিত হলে তার অর্থ হবে চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্রের জবাব বা প্রতিশোধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'রাজার আইনে তার সহোদরকে সে দাস করতে পারতো না আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে।' লক্ষণীয় যে, মিসর রাজ্যের আইন ছিলো চুরি প্রমাণিত হলে চোরকে দৈহিক শাস্তি দিতে হবে এবং তার নিকট থেকে জরিমানা হিসেবে আদায় করতে হবে চুরি যাওয়া সম্পদের দ্বিগুণ। আর হজরত ইয়াকুবের শরিয়তের আইন ছিলো, চোর ক্রীতদাস হবে চুরিকৃত সম্পদের মালিকের। মিসরের আইন অনুসারে হজরত ইউসুফ কিছুতেই তার ভাইকে আটকাতে পারতেন না। তাই তিনি হজরত ইয়াকুবের শরিয়তের আইনে তাকে আটক করেছিলেন। এভাবে আটক করার কৌশলটি আল্লাহ্পাকই তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস এখানে উল্লেখিত 'দ্বীন' শব্দটির অর্থ করেছেন প্রজ্ঞা। আর কাতাদা অর্থ করেছেন— বিধান বা আইন।

'আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে'— কথাটির অর্থ আল্লাহ্পাক অনুমোদন না করলে। এখানে 'হরফে ইসতিসনা' (ব্যতিক্রমী বর্ণটি) বিচ্ছিন্ন। ব্যতিক্রমী ও সংযোগ বিবর্জিত। যেমন হজরত ইউসুফ তাঁর ভাইদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের দেশে চুরির শাস্তি কি? তারা বলেছিলো, চোরকে বানাতে হবে ক্রীতদাস। এভাবে হজরত ইউসুফ আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায় সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এবং তা কার্যকরও করেছিলেন। ফলে তাঁর উদ্দেশ্য হয়েছিলো সফল।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নত করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে অধিকতর জ্ঞানীজন।'

জ্ঞানে সকল বিজ্ঞজন অপেক্ষা আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ। এখানে 'আ'লীম' অর্থ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। সৃষ্ট জগতের কেউ এরকম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নয়। তাই দেখা যায় এক‌েক জন এক‌েক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। হজরত মুসা ও হজরত খিজিরের ঘটনাটি এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন রসুল হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ এক প্রকারের জ্ঞান আহরণের জন্য তাঁকে হজরত খিজিরের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছিলো। তিনি ছিলেন শরিয়তের শাহানশাহ্ আর হজরত খিজির ছিলেন ইলমে লাদুন্নীর সম্রাট। সৃষ্টি-রহস্যের একটি বিশেষ দিক ছিলো তাঁর জন্য উন্মুক্ত। ওই জ্ঞান হজরত মুসার ছিলো না। তাই হজরত খিজির তাঁকে বলেছিলেন, হে নবীপ্রবর! আল্লাহ্ যে রহস্যময় প্রজ্ঞা আমাকে দান করেছেন, আপনি সে সম্পর্কে অনবগত। আর যে জ্ঞানে তিনি আপনাকে সমৃদ্ধ করেছেন, আমিও সে বিষয়ে

www.eelm.weebly.com

অনবহিত। হজরত মুসা ও হজরত খিজিরের কাহিনী থেকে একটি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন বোখারী। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, তোমরা জাগতিক বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখো। এভাবে একেক জন একেক বিষয়ে জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও সকল বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান কারো নেই। এরকম পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে কেবল মহান আল্লাহ্‌র। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, চরমোৎকর্ষ জ্ঞান সৃষ্টিজগতের কারো নেই। চরম, পরম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহাজ্ঞানী কেবল আল্লাহ্। এখানে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— আমি যাকে উন্নততর মর্যাদা দান করি, যেমন দান করেছি ইউসুফকে। বিনইয়ামিন ও ইউসুফের মিলনের জন্য যে কৌশলের অবতারণা আমি করেছি তা আমারই অপার প্রজ্ঞাবলে এখন পরিগ্রহ করলো বাস্তব রূপ। মহাজ্ঞানী আমি। তাই এরকম নিখুঁত পরিকল্পনা করা কেবল আমার পক্ষেই সম্ভব।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৭৭, ৭৮, ৭৯

قَالُوٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ○ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ○

❑ উহারা বলিল; 'সে যদি চুরি করিয়া থাকে তাহার সহোদরও তো পূর্বে চুরি করিয়াছিল।' কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখিল এবং উহাদিগের নিকট প্রকাশ করিল না; সে মনে মনে বলিল, 'তোমাদিগের অবস্থা তো হীনতার এবং তোমরা যাহা বলিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।'

❑ উহারা বলিল, 'হে আযীয, ইহার পিতা আছেন, যিনি অতিশয় বৃদ্ধ; সুতরাং ইহার স্থলে আপনি আমাদিগের একজনকে রাখুন। আমরা তো আপনাকে দেখিতেছি মহানুভব ব্যক্তিদিগের একজন।'

❑ সে বলিল, 'যাহার নিকট আমরা আমাদিগের মাল পাইয়াছি তাহাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হইতে আমরা আল্লাহের শরণ লইতেছি। এরূপ করিলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হইব।'

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'তারা বললো, সে যদি চুরি করে থাকে তার সহোদরও তো পূর্বে চুরি করেছিলো।' এ কথার অর্থ— দশ ভাই বললো, হ্যাঁ, বিনইয়ামিন চুরি করতেও পারে। এরকম অভ্যাস তার বড় ভাই ইউসুফেরও ছিলো। সুতরাং ব্যাপারটি আমাদের নিকটে বিস্ময়কর কিছু নয়। ঘটনাটি ছিলো এরকম— হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং কাতাদার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইউসুফের এক নানা ছিলো প্রতিমাপূজক। তিনি তাঁর নানার সেই প্রতিমাটি চুরি করে ভেঙে চুরে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, তাঁর নানা যেনো আর প্রতিমা পূজা না করতে পারে। সর্বোন্নত সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মারদুবিয়াও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে মুজাহিদ বলেছেন, একদিন এক ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইলো। তখন হজরত ইউসুফ গৃহ থেকে গোপনে কিছু খাদ্যদ্রব্য দিয়েছিলেন তাকে। দশ ভাই ইঙ্গিত করেছিলো ওই ঘটনাটির প্রতি।

মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, জননীর মৃত্যুর পর শিশু ইউসুফের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁর ফুফু। তিনি ছিলেন হজরত ইসহাকের পুত্রী। হজরত ইয়াকুব ছিলেন তাঁর ছোট ভাই। একটু বড় হতেই হজরত ইউসুফকে ফেরত চাইলেন তাঁর পিতা। কিন্তু তাঁর ফুফু তাঁকে ফেরত দিতে সম্মত হলেন না। এদিকে হজরত ইয়াকুবও নাছোড়বান্দা। অগত্যা তাঁর ফুফু রাজি হলেন। বললেন, ঠিক আছে, তবে আমাকে কয়েকটা দিন সময় দাও। মনে হয় এর মধ্যে আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে পারবো। আর এরমধ্যে আল্লাহ্ও হয়তো আমাকে ধৈর্য ধারণের সামর্থ্য দান করবেন। বড় বোনের দাবি এবার মেনে নিলেন হজরত ইয়াকুব। হজরত ইসহাকের ছিলো একটি মূল্যবান মেখলা। পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে হজরত ইউসুফের ফুফুই পেয়েছিলেন ওই কটিভূষণটি। ওই কটিভূষণটি তিনি গোপনে বেঁধে দিলেন হজরত ইউসুফের কোমরে। তারপর প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, হায়! আমার মহান পিতার মেখলাটি কোথায় গেলো। কে চুরি করলো আমার পিতার কোমরবন্ধ। সবাই খুঁজতে শুরু করলো। শেষে কোমরবন্ধটি দেখা গেলো হজরত ইউসুফের কোমরে। তাঁর ফুফু তখন তাঁর ছোট ভাই ইয়াকুবকে ডেকে বললেন, দেখো তোমার পুত্রের কাণ্ড। আমার পিতার মূল্যবান স্মৃতিচিহ্নটি সে চুরি করেছে। সুতরাং শরিয়তের আইন অনুসারে সে এখন আমার ক্রীতদাস। তুমি আর তাকে দাবি করতে পারো না। হজরত ইয়াকুব বললেন, না তাতো পারিই না। সেই থেকে ফুফুর মৃত্যু পর্যন্ত হজরত ইউসুফকে তাঁর ফুফুর কাছেই থাকতে হয়েছিলো। এই ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করেই দশভাই বলেছিলো, 'তার সহোদরও তো পূর্বে চুরি করেছিলো।'

শেষে বলা হয়েছে— 'কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখলো এবং তাদের নিকট প্রকাশ করলো না। সে মনে মনে বললো, তোমাদের

 www.eelm.weebly.com

অবস্থা তো হীনতর এবং তোমরা যা বলছো সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।' একথার অর্থ— ভাইদের কথা শুনে হজরত ইউসুফ বিচলিত হলেন না। তাদের প্রদত্ত অপবাদ খণ্ডনের চেষ্টাও করলেন না। মনের কথা মনেই রেখে দিলেন। মনে মনে কেবল বললেন, তোমরা আমাকে চোর বলছো। কিন্তু তোমরা তো চোরের চেয়েও নিকৃষ্ট। তোমরা ছিলে ষড়যন্ত্রকারী ও হন্তারক। আল্লাহ্তায়ালাই ভালো জানেন, অপরাধী কে? আমি, না তোমরা?

বিনইয়ামিনকে নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন সম্রাট ইউসুফ। নিরুপায় দশ ভাই অসহায় দৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে রইলো কেবল। ক্ষোভে, দুঃখে তারা হয়ে পড়লো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এরপর রাগে ফুঁসতে লাগলো তারা। হজরত ইয়াকুবের পুত্রগণের স্বভাব ছিলো, একবার তারা রেগে গেলে তাদেরকে সামলানো হয়ে পড়তো খুবই কষ্টকর। রুবেলের রাগ ছিলো সবচেয়ে বেশী। রাগ হলে বিকট চিৎকার দিয়ে বসতো সে। সেই ভয়ঙ্কর চিৎকারে গর্ভপাত ঘটে যেতো গর্ভিণী নারীর। আরেকটি বিশেষত্ব ছিলো ইয়াকুব তনয়দের। ওই সময় কেউ তাদেরকে স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাগ হয়ে যেতো পানি। কেউ কেউ বলেছেন, এই বিশেষত্বটি ছিলো শামউনের।

বিনইয়ামিনকে ছাড়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের কল্পনাই করতে পারছিলো না দশ ভাই। পরদিন ক্রোধান্ধ অবস্থায় তারা পুনরায় উপস্থিত হলো রাজ দরবারে। রুবেল বললো, মহামান্য সম্রাট, বিনইয়ামিনকে ফিরিয়ে দিন। না হলে আমি এমন বিকট চিৎকার দিবো যে, শহরের সকল গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটে যাবে। সম্রাটের পাশে ছিলো তাঁর এক শিশু সন্তান। তিনি তাকে বললেন, যাও, ওই লোকটিকে ছুঁয়ে এসোতো বাবা। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, সম্রাট তাঁর শিশু পুত্রকে বললেন, লোকটির হাত ধরে আমার কাছে নিয়ে এসো তো বাবু। শিশুটি এগিয়ে গিয়ে তার হাত স্পর্শ করলো। সঙ্গে সঙ্গে রুবেলের ক্রোধ অন্তর্হিত হলো। সে অবাক হয়ে বললো, নিশ্চয় এখানে হজরত ইয়াকুবের বংশধর কেউ রয়েছে।

এক বর্ণনায় এসেছে, পুনরায় রাগান্বিত হলো রুবেল। সম্রাট তখন অগ্রসর হয়ে তাকে ধাক্কা দিলেন। সেও হলো ধরাশায়ী। বললেন, হে সিরিয়াবাসী! তোমরা কি মনে করো তোমাদের চেয়ে শক্তিশালী কেউ নেই? দশ ভাই সম্রাটের এমতো আচরণ দেখে পরাভব মানলো। নিজেরা সলাপরামর্শ করে ঠিক করলো, না। এভাবে আমরা আমাদের কার্য সফল করতে পারবো না। সম্রাটের নিকটে দাবি উত্থাপন করতে হবে বিনয়ের সঙ্গে।

পরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে আজিজ! এর পিতা আছেন, যিনি অতিশয় বৃদ্ধ; সুতরাং এর বদলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন। আমরা তো আপনাকে দেখছি মহানুভব ব্যক্তিবর্গের একজন।' একথার অর্থ— পিতাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে সম্রাটের কাছে তারা তাদের শেষ নিবেদনটি জানালো এভাবে, মহামহিম সম্রাট! আমাদের মহান পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। বিনইয়ামিনকে তিনি অত্যধিক ভালোবাসেন। তাকে না পেলে তিনি শোকে দুঃখে শয্যা গ্রহণ করবেন। হে মিসরের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা! আমাদের প্রতি

www.eelm.weebly.com

সদয় হোন। বিনইয়ামিনের পরিবর্তে আমাদের যে কোনো একজনকে রেখে দিন। আপনি তো আমাদের প্রতি অনেক মহানুভবতা দেখিয়েছেন। এখন আমাদের এই শেষ আবেদনটি আপনার মহানুভবতার মাধ্যমে গ্রহণ করুন।

এর পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'সে বললো, যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ থেকে আমরা আল্লাহ্‌র শরণ গ্রহণ করছি। এরূপ করলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হবো।' এ কথার অর্থ— সম্রাট বললেন, না। তা হয় না। আমরা আমাদের মাল পেয়েছি বিনইয়ামিনের রসদসম্ভারের মধ্যে। তাই বিনইয়ামিনকেই রেখে দিতে হবে। এর জন্য অন্য কাউকে আটকে রাখলে তা হবে জুলুম। এরকম জুলুম আমরা করি না। লক্ষণীয় যে, হজরত ইউসুফ এখানে বিনইয়ামিনকে চোর বলেননি। বলেছেন 'যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি।' বস্তুত সম্পূর্ণ বিষয়টি ছিলো বিনইয়ামিনকে আটকে রাখার একটি কৌশল। হজরত ইউসুফ এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন আল্লাহ্‌র পরিতোষ সাধনার্থে। এর বিপরীত কিছু করলে তা হতো আল্লাহ্‌র পরিতোষের প্রতিকূল। তাই হজরত ইউসুফ এখানে বলেছেন, 'তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার জুলুম থেকে আমরা আল্লাহ্‌র শরণ গ্রহণ করছি।'

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৮০, ৮১

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِى يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِىٓ أَبِىٓ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِى ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ ۝ ٱرْجِعُوٓا إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَٰفِظِينَ ۝

❒ যখন উহারা তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইল তখন উহারা নির্জনে গিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। উহাদিগের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল সে বলিল, 'তোমরা কি জান না যে তোমাদিগের পিতা তোমাদিগের নিকট হইতে আল্লাহের নামে অংগীকার লইয়াছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করিয়াছিলে; সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করিব না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ্ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই বিচারকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

www.eelm.weebly.com

❒ তোমরা তোমাদিগের পিতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং বলিও, 'হে আমাদিগের পিতা! তোমার পুত্র চুরি করিয়াছে এবং আমরা যাহা জানি তাহারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা কিছুই জানিতাম না।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যখন তারা তাঁর নিকট থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হলো তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগলো। তাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলো সে বললো, তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট থেকে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।' একথার অর্থ— বিনইয়ামিনকে উদ্ধারের প্রচেষ্টা বিফল হলো। নৈরাশ্য জর্জরিত অন্তরে একটি জনমানবহীন স্থানে পরামর্শ সভায় বসলো দশ ভাই। যে ভাই সকলের বড় সে বললো, তোমরা এ কথা ভুলে যেয়ো না যে, পিতা তোমাদের নিকট থেকে এ ব্যাপারে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। এখানে 'নাজিয়া' শব্দটি এক বচন হলেও বহুবচনার্থক। এর অর্থ একে অপরের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করা।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'বয়োজ্যেষ্ঠ' বলে যে ভাই বয়সে সকলের বড় তাকে বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে জ্ঞানে ও গুণে যে বড়, তাকে। আর তাদের মধ্যে জ্ঞানপ্রবীণ ছিলো ইয়াহুদ। কালাবীও এ কথা বলেছেন। কিন্তু কাতাদা, সুদ্দী ও জুহাক বলেছেন, এখানে বয়োজ্যেষ্ঠ বলে বয়সে যে সকলের বড় তাকে বুঝানো হয়েছে। আর সে ছিলো রুবেল। এই রুবেলই হজরত ইউসুফকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলো। মুজাহিদ বলেছেন, বয়োজ্যেষ্ঠ ভাইটির নাম ছিলো শামাউন। সে-ই ছিলো অভিযাত্রী দলের নেতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করেছিলে' (ওয়ামিন্ ক্বব্লু মা ফার্রাত্বতুম ফী ইউসুফ)। এখানকার 'মা' অব্যয়টি অতিরিক্ত, ধাতুমূল অথবা সংযোজক। বায়যাবী বলেছেন, এখানে 'মা' উপক্রমণিকামূলক উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। যদি তাই হয়, তবে মিন্ক্বব্লু বাক্যাংশটির বিধেয় হওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে যায়। এবং 'ক্বব্লু' শব্দটিও সম্বন্ধবাচকরূপে ব্যবহৃত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করবো না, যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ্ আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।' একথার অর্থ— জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আরো বললো, আমি পণ করলাম, কিছুতেই আমি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করবো না। প্রত্যাবর্তন করবো তখন যখন পিতা আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে বলবেন। অথবা তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাকে ফিরে যেতে নির্দেশ দিবেন। অথবা বিনইয়ামিনকে নিষ্কৃতি দানে সম্রাটকে বাধ্য করবেন বা আমাকে এখানে মৃত্যুদান করবেন।

'আল্লাহ্ আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেন' কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— অথবা আল্লাহ্ নবী ইয়াকুবের মাধ্যমে আমাকে মিসরবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তিনিই বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' একথার অর্থ— প্রকৃত বিচারকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ্। মিসরাধিরাজের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। এই অন্যায়ের বিচার তিনি নিশ্চয় করবেন।

পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বোলো, হে আমাদের পিতা! তোমার পুত্র চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম।' একথার অর্থ— দশ ভাইয়ের মধ্যে একজন বললো, হে মহান পিতার সন্তানেরা! পিতার নিকটেই তোমরা ফিরে যাও এবং যা জানো তাই বলো। যা সত্য তাইতো তোমরা বলবে। সুতরাং একথা পিতাকে জানাতে দ্বিধান্বিত হয়ো না যে, বিনইয়ামিনের চৌর্যকর্ম প্রমাণের দৃশ্য আমরা চাক্ষুষ করেছি। আমরা যা দেখেছি, তাই আপনাকে বললাম। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে 'আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ বললাম— কথাটির অর্থ হবে আমরা বানিয়ে কিছু বলিনি। যা দেখেছি তাই বলেছি। বিন-ইয়ামিনকে আমরা চুরি করতে দেখিনি। কিন্তু তদন্তকালে সম্রাটের পানপাত্র বের হতে দেখেছি তারই মাল-পত্র থেকে।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, পুত্রদের এরকম কথা শুনে হজরত ইয়াকুব বলেছিলেন, চুরি করলে চোরকে যে দাসত্ববরণ করতে হবে একথা তো মিসরাধিপতির জানার কথা নয়। নিশ্চয় তোমরাই এ বিধানটি সম্পর্কে তাঁকে বলেছো। তাঁর পুত্রগণ তখন বলেছিলেন, হ্যাঁ। আমরাই একথা বলেছি।

শেষে বলা হয়েছে— 'অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতাম না।' হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, একথার অর্থ— আমরা তো বিনইয়ামিনকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে পারিনি। তাঁর মাল-পত্র বাঁধাছাদার সময়ও সেগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখিনি। তবে মনে হয় কে বা কারা অত্যন্ত গোপনে সম্রাটের পানপাত্রটি তার মালপত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছিলো। এটা আমাদের অনুমান। কেননা অদৃশ্য বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে এরকম— যখন আমরা বিনইয়ামিনের রক্ষণাবেক্ষণ করবো বলে আপনার নিকটে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলাম, তখন কি আমরা একথা ঘুনাক্ষরেও জানতাম যে বিনইয়ামিন শেষ পর্যন্ত চুরি করবে। আর তার ফলে আপনাকে পুনরায় ভোগ করতে হবে বিচ্ছেদ-যাতনা, যেমন ভোগ করতে হয়েছিলো ইউসুফের ব্যাপারে। যে সকল বিষয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব, আমরা তো কেবল সে সকল বিষয়েই সংরক্ষণের অঙ্গীকার করেছিলাম।

 www.eelm.weebly.com

وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۚ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۚ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

❑ 'যে জনপদে আমরা ছিলাম উহার অধিবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করুন এবং যে যাত্রীদলের সহিত আমরা আসিয়াছি তাহাদিগকেও। আমরা অবশ্যই সত্য বলিতেছি।'

❑ ইয়াকুব বলিল, 'না, তোমরা এক মন-গড়া কথা লইয়া আসিয়াছ; সুতরাং পূর্ণ ধৈর্য ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ্ উহাদিগকে এক সংগে আমার নিকট আনিয়া দিবেন। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইয়াকুবের পুত্রগণ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে প্রত্যাবর্তন করলো স্বগৃহে। পিতাকে আনুপূর্বিক সকল ঘটনা জানিয়ে শেষে বললো, হে আমাদের পিতা! আমরা যা বললাম সত্য বললাম। আমাদের বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইলে আপনি ওই জনপদের অধিবাসীদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। ওই যাত্রীদলকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন, যারা এখান থেকে খাদ্য সংগ্রহের জন্য মিসর গিয়েছিলো এবং যারা আমাদের সঙ্গেই দেশে ফিরে এসেছে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'জনপদ' বলে ওই জনপদকে বুঝানো হয়েছে, যে স্থানে সম্রাটের ঘোষক তাদেরকে আটক করেছিলো। অর্থাৎ যেখান থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো রাজদরবারে। আর এখানে যাত্রীদল অর্থ সিরিয়ার ওই খাদ্য সংগ্রহকারী যাত্রীদল, যারা মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলো হজরত ইয়াকুবের পুত্রগণের সঙ্গে। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, দশ ভাইয়ের মধ্যে ওই ভাইটি মিসরে রয়ে গিয়েছিলো, যে ইউসুফকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে ছিলো অনুতপ্ত। অনুতাপ-জর্জরিত হওয়ার কারণেই সে বিনইয়ামিনের ঘটনায় নিজেকে নির্দোষ ভাবতে পারছিলো না। ইউসুফের জন্য পিতার যে কি কষ্ট, তা তাকে দেখতে হয়েছে চল্লিশ বছর ধরে। এবার তার সঙ্গে যোগ হবে বিনইয়ামিন-বিচ্ছেদের ঘটনা। তাই দ্বিগুণ যাতনাক্লিষ্ট পিতার মুখ দর্শন ছিলো তার জন্য অসহনীয়। মিসরে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সে নিয়েছিলো এ কারণেই। তার আরো আশঙ্কা ছিলো, পিতা হয়তো

www.eelm.weebly.com

ভাববেন, ইউসুফের ঘটনার মতো বিনইয়ামিনের ক্ষেত্রেও সেরকম কোনো ঘটনা ঘটিয়েছি আমরা। তাই সে ভাইদের বলে দিয়েছিলো, তোমরা যা দেখেছো তাই বলবে, অনুমান করে কিছু বলবে না। শেষে একথাও বলবে যে, আমরা যা বললাম, সত্য বললাম।

একটি জটিলতাঃ বাগবী লিখেছেন, পুত্র বিরহে জর্জরিত পিতার সঙ্গে হজরত ইউসুফ দেখা করতে যাননি। তিনি এখন কোথায় কি ভাবে রয়েছেন, সে সংবাদও জানাননি। তার উপরে বিনইয়ামিনকেও তিনি আটকে রেখে দিলেন। পিতৃহৃদয়ে সৃষ্টি করলেন সীমাহীন শূন্যতা। এটা কি হজরত ইউসুফের নির্মমতা ও স্বজন-বন্ধনছিন্নতার প্রমাণ নয়?

জটিলতার জবাবঃ বিষয়টি বাহ্যতঃ সমালোচনাযোগ্য বটে। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে হজরত ইউসুফ ছিলেন সত্য নবী। সুতরাং তিনি যে কিছুতেই প্রবৃত্তিতাড়িত নন, সেকথা বলাই বাহুল্য। নবীগণ যা আদিষ্ট হন তাই করেন। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় ছিলো, তিনি হজরত ইয়াকুবের মর্যাদা আরো উন্নত করবেন। তাই এটা ছিলো তাঁর প্রতি আল্লাহ্র এক মহা পরীক্ষা। পরীক্ষার মাধ্যমেই তো উন্নততর মর্যাদা লাভ হয়। তাঁর পিতামহ হজরত ইব্রাহিমও সম্মুখীন হয়েছিলেন মহা পরীক্ষার। স্বপ্নে তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তোমার প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে স্বহস্তে জবাই করতে হবে। এই মহা পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। হয়েছিলেন আল্লাহ্র বন্ধু (খলিল)। এরও আগে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো প্রিয়তমা ভার্যা ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাইলকে দূর দেশে বিজন প্রান্তরে নির্বাসন দিতে হবে। এই মহা পরীক্ষায়ও তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। হজরত ইয়াকুবের প্রতি আপতিত পরীক্ষা অপেক্ষা ওই সকল পরীক্ষা অধিকতর জটিল ও কঠিন ছিলো না কি? আসলে প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে তার প্রেমিকের উপর এরকম জটিল ও কঠিন পরীক্ষার আয়োজন করা হয়।

কেউ কেউ বলেছেন, হজরত ইউসুফ তো জানতেন যে, তাঁর ভাইয়েরা চক্রান্তপ্রবণ। তারা নতুন কোনো চক্রান্ত শুরু করতে পারে, এ কথা ভেবেই তিনি তাঁর আত্মপরিচয় গোপন করেছিলেন। আর অতিপ্রিয় কনিষ্ঠ পুত্রের আকর্ষণে মহান পিতা হয়তো মিসরে আগমন করবেন। তখন সরাসরি সংঘটিত হবে পিতা ও হারানো পুত্রদ্বয়ের মিলন। একথা ভেবেই তিনি কৌশলে বিনইয়ামিনকেও আটক করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত অভিমতটিই সমধিক যুক্তিসংগত ও বিশুদ্ধ।

পরের আয়াতে (৮৩) বলা হয়েছে— 'ইয়াকুব বললো, না, তোমরা এক মনগড়া কথা নিয়ে এসেছো; সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ্ তাদেরকে একসঙ্গে আমার নিকটে এনে দিবেন।' একথার অর্থ— বিরহাহত হজরত ইয়াকুব পুত্রদের কথা শুনে বললেন, না। তোমরা ঠিক বলোনি।

www.eelm.weebly.com

তোমাদের উদ্দেশ্য ছিলো অসৎ। তাই চোরকে ক্রীতদাস বানানোর বিধান তোমরা মিসররাজকে জানিয়ে দিয়েছিলে। তোমাদের এই দুরভিসন্ধি কার্যকর করার উদ্দেশ্যেই তোমরা বিনইয়ামিনকে মিসরে নিয়ে গিয়েছিলে। হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যা করেছো, তাতো করেছোই। আমি আর তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করবো না। ধৈর্য সর্বোত্তম। তাই পরিপূর্ণ ধৈর্যধারণ করাই হবে আমার পক্ষে শ্রেয়। হয়তো একদিন আল্লাহ্ আমার প্রতি দয়া করবেন। সেদিন হয়তো আমি এক সঙ্গে ফিরে পাবো তাদেরকে।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও পরম প্রজ্ঞাময়। আমার উপর আপতিত এই মহা পরীক্ষা নিশ্চয় ওই মহাজ্ঞান ও মহাপ্রজ্ঞার একটি বিশেষ নিদর্শন।

উল্লেখ্য যে, বিনইয়ামিনের বন্দী হওয়ার সংবাদ শুনে উথ্লে উঠেছিলো তাঁর শোকের সমুদ্র। শোকসাগরের সংক্ষুব্ধ তরঙ্গে নিমজ্জিত হয়েছিলেন তিনি। আর এই প্রতীতিও তাঁর জন্মেছিলো যে, বিনইয়ামিনের এই দুরাবস্থার নেপথ্যে তার সৎ ভাইদের দুরভিসন্ধি ছাড়া অন্য কিছু নেই।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৮৪

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ○

❑ সে উহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল 'আফসোস ইউসুফের জন্য।' শোকে সে অন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললো, আফসোস ইউসুফের জন্য।' এখানে 'আসাফ্' শব্দটির অর্থ আফসোস বা আক্ষেপ। দুঃখ-যাতনার শেষ সীমা বুঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে মওকুফ পদ্ধতিতে আবদুর রাজ্জাক এবং ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, উম্মতে মোহাম্মদী ছাড়া অন্য কোনো নবী বা তাঁদের উম্মতকে বিপদাপদের সময় ইন্নালিল্লাহ্ ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন— দোয়াটি পাঠ করার রীতি শিক্ষা দেয়া হয়নি। তাই হজরত ইয়াকুবও তাঁর বিপদকালে দোয়াটি পাঠ করেননি। তিনি কেবল তাঁর ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। ইমাম বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, বর্ণনাটি শিথিল সূত্রে মারফু পদ্ধতিতে হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও উল্লেখিত হয়েছে। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে মারফু পদ্ধতিতে সা'লাবীও হাদিসটির বর্ণনাকারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'শোকে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো এবং সে ছিলো অসহনীয় মনোস্তাপে ক্লিষ্ট।' একথার অর্থ— প্রিয়তম পুত্র ইউসুফের বিরহে কাঁদতে কাঁদতে দৃষ্টিহীন হয়ে গিয়েছিলেন হজরত ইয়াকুব। চোখের কৃষ্ণ-বর্ণ অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিলো। আর তিনি ছিলেন অসহ ব্যথা-বেদনায় ভারাক্রান্ত। মুকাতিল বলেছেন, তিনি দৃষ্টিহীন অবস্থায় ছিলেন ছয় বছর। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, তাঁর দৃষ্টিশক্তি হয়ে পড়েছিলো অত্যন্ত দুর্বল। এখানে বলা হয়েছে, তাঁর চোখ হয়ে গিয়েছিলো শাদা। আর শাদা হওয়া মানে একেবারে অন্ধ হওয়া নয়।

নিঃশ্বাস নির্গমনের পথকে বলে 'কাজম'। আর 'কাজুম' বলে নিঃশ্বাস রহিত হওয়াকে। রূপক অর্থে মৌনতাকে। 'কাজীম' অর্থ শ্বাসরহিত। এভাবে আয়াতের শেষ বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হজরত ইয়াকুব অসহনীয় মনোস্তাপে অহর্নিশি দগ্ধিভূত হতেন। কিন্তু প্রকাশ্যে বিলাপ করতেন না। যেমন বলা হয় 'কাজামাল বায়ীরু' (উট তার রোমন্থন বন্ধ করেছে, উদরের খাদ্য উদরেই আটকে রেখেছে)। অনুরূপ 'কাজামাস্ সিকাউ' (পানি ভর্তি করার পর পাত্রের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে)। মোট কথা হজরত ইয়াকুব তাঁর নিজের আগুনে নিজেই পুড়ে দগ্ধিভূত হতেন। সেই অন্তর্গত দুঃখ যাতনায় ছিলো না কোনো অভিযোগ অথবা বিলাপ।

কাতাদা বলেছেন, হজরত ইয়াকুবের হৃদয় ছিলো বেদনাকাতর। কিন্তু তাঁর মুখে ছিলো উপদেশের অমিয় বাণী। হাসান বলেছেন, প্রিয়তম পুত্র ইউসুফকে হারানোর পর পিতা-পুত্রের মিলন ঘটেছিলো প্রায় আশি বছর পর। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কোনো একটি মুহূর্তও তাঁর চোখ অশ্রুহীন ছিলো না। অথচ তিনি ছিলেন ওই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্প্রেমিক ও বিশুদ্ধচিত্ত সাধক। আরও তিনি ছিলেন আল্লাহ্র একান্ত প্রিয়ভাজন।

একটি বিপত্তিঃ আধ্যাত্মিক সাধকবৃন্দ বলেন, কলবের ফানা হওয়ার পর আধ্যাত্মিক সাধকগণ আল্লাহ্র সঙ্গে স্থায়ী আত্মিক সম্পর্ক লাভ করেন। তখন তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ভালোবাসা থাকে না। হজরত ইয়াকুব ছিলেন সাধকশ্রেষ্ঠ ও মহাসম্মানিত এক নবী। তাহলে—

১. পুত্রের বিরহে তিনি এতো মনোকষ্ট পেয়েছিলেন কেনো? পুত্র-বিচ্ছেদে কাঁদতে কাঁদতে তিনি অন্ধই বা হয়ে গিয়েছিলেন কেনো?

২. এর জবাবে যদি বলা হয়, এই মহাবিশ্ব তো সেই এক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী আল্লাহ্র নাম গুণাবলীর বিকাশস্থল। মহাসত্যের দর্পণ। সুতরাং এ কথা বলতে কোনো বাধা নেই যে, প্রকারান্তরে ইউসুফপ্রেম ছিলো সেই মহামহিম আল্লাহ্ প্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে ইউসুফ ব্যতীত অন্য কোনো সৃষ্টির প্রতি তাঁর এমতো আকর্ষণ জন্মেনি কেনো?

www.eelm.weebly.com

৩. আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রতি আকর্ষণ কচিৎ কখনো সাময়িকভাবে প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক পর্যায়ের সাধকগণের আচরণে পরিলক্ষিত হতেও পারে। কিন্তু হজরত ইয়াকুব তো ছিলেন আধ্যাত্মিকতার সর্বোন্নত স্তরে উন্নীত। অথচ তিনি হজরত ইউসুফের শোকে সাময়িকভাবে কখনো কখনো বেদনাহত হননি। তাঁর ব্যথা-বেদনা ও মনোস্তাপ ছিলো সার্বক্ষণিক। এরকম হওয়াই বা কী করে সম্ভব?

বিপত্তির অপনোদনঃ আত্মিক বিনাশনের পর পার্থিবতার সঙ্গে আন্তরিক আকর্ষণ আর থাকে না। অন্তরে তখন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় আখেরাতের আকর্ষণ। আর আখেরাতের আকর্ষণও আল্লাহ্র আকর্ষণ। পৃথিবীর কোনো প্রভাব সেখানে নেই। রসুল স. এরশাদ করেছেন, পৃথিবী অভিশপ্ত। অভিশপ্ত পৃথিবীর বস্তুনিচয়ও, কিন্তু জ্ঞান ও জ্ঞানীরা নয়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং তিবরানী বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে। বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত আবু দারদা থেকে তিবরানী এবং হজরত ইবনে মাজা থেকে বায্যারও হাদিসটির বর্ণনাকারী।

আল্লাহ্পাক চিরস্থায়ী। আখেরাতও চিরস্থায়ী। তাই আখেরাত আল্লাহ্পাকের প্রিয়। তিনি এরশাদ করেছেন— 'ওয়াজকুর ইবাদানা ইব্রহীমা ওয়া ইসহাকা ও ইয়াকুবা উলিল আইদি ওয়াল আবসার।' একথার অর্থ— আমার বান্দা ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে স্মরণ করো, যারা ছিলো বলশালী ও বিচক্ষণ। অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন আল্লাহ্র আনুগত্যে সুদৃঢ় ও তাঁর পরিচিতি লাভের ক্ষেত্রে বিচক্ষণ। আরো এরশাদ করেছেন— ইন্না আখলাসনাহুম বিখলিসাতিন জিকরাদ্দার (আমি তাদেরকে দান করেছি এক বিশেষ স্বভাব, যাতে নেই কোনো আবিলতা এবং যা পারলৌকিক আবাসের স্মরণে বিভোর)। মালেক ইবনে দীনার আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি তাদের হৃদয় থেকে অপসারিত করেছি পৃথিবীপ্রীতি ও উদ্দেশ্যের অসাধুতা। তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করেছি পরকালপ্রেম ও পরকালের স্মরণ। তাই তাদের চিন্তায় ও আচরণে অগ্রাধিকার পায় আখেরাত। তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবী প্রবাস মাত্র। প্রকৃত আবাস হচ্ছে আখেরাত। সুতরাং একথা সুপ্রমাণিত যে, আখেরাতই আল্লাহ্র প্রিয়। আখেরাতের সকল কিছুই প্রশংসার্হ।

রসুল স. বলেছেন, এক রাতে আমাকে স্বপ্নে দেখানো হলো, এক মহামান্য গোত্রপ্রধান নির্মাণ করলেন এক সুদৃশ্য অট্টালিকা। অভ্যন্তরভাগে বিছিয়ে দিলেন সুপ্রশস্ত দস্তরখানা। মানুষকে নিমন্ত্রণ জানানোর জন্য জনসমাজে প্রেরণ করলেন এক আহ্বানকারীকে। কেউ কেউ তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলো। যথাসময়ে সুদৃশ্য ভবনটিতে এসে পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানাহার করলো। প্রাসাদস্বামীও তুষ্ট হলেন। আর যারা নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলো, তারা বঞ্চিত হলো। প্রাসাদকর্তাও তাদের প্রতি হলেন রুষ্ট। রবীয়াতুল জারাশী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারেমী। এখানে মহামান্য গোত্রপ্রধান হচ্ছেন আল্লাহ্। আহ্বানকারী হচ্ছেন রসুল স.। প্রাসাদ হচ্ছে ইসলাম। আর দস্তরখানা হচ্ছে জান্নাত।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, হজরত ইয়াকুব ছিলেন অতি উন্নত আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারী। ওই অনন্যসাধারণ মর্যাদার পরিচয় লাভ করা সাধারণ সাধকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে রাবেয়া বসরীর মতো তাপসীও সাধারণ সাধকদের মতো। তিনি এই সুউচ্চ মারেফতের ক্ষেত্রে অপূর্ণ ও অপরিণত ছিলেন বলেই বলতে পেরেছিলেন, আমি জান্নাতকে আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিবো, যাতে জান্নাতের লোভে নয়, মানুষ উপাসনা করে কেবল আল্লাহ্‌কে ভালোবেসে। তিনি ও তাঁর মতো অপরিণত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীরা আসলে আখেরাতের মর্যাদাই বুঝতে সক্ষম হননি। আল্লাহ্‌পাক এক আয়াতে জানিয়েছেন— 'মান কানা ইয়ারজু লিক্বাআল্লহি ফাইন্না আজালাল্লহি লাআত (যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলনাকাঙ্খী, তার মিলনলগ্ন আগমন করবে আখেরাতে)। বলা বাহুল্য যে, জান্নাতই হবে ওই মহামিলনের স্থান।

রসুল স. আরো বলেছেন, জান্নাতের মৃত্তিকা পূতঃপবিত্র, সুবাসিত। সলিল সুমিষ্ট। সেখানে রয়েছে সুবিশাল প্রান্তর। আর ওই প্রান্তরে রয়েছে অসংখ্য বৃক্ষ। ওই বৃক্ষগুলো হচ্ছে মূলতঃ 'সুবহানাল্লহ্', 'আলহামদুলিল্লাহ্', ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবর'। তিরমিজি এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে। বোখারী ও মুসলিমে লিখিত হাকেম ও তিবরানীর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাগুলো 'তোমাদের আপ্ত বাক্যগুলোকে বৃক্ষরূপে রোপন করা হবে সেখানে।'

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি বলেছেন, 'তানজিহি কালিমাত্' বা আপ্ত বাক্যগুলো হচ্ছে 'সুবহানাল্লহ্' আলহামদুলিল্লাহ্ ইত্যাদি। এ সকল উচ্চারণ হচ্ছে পার্থিব ভূষণ। আখেরাতে এগুলোর প্রকাশ ঘটবে জান্নাতের তরুলতা ও ফলমূল হিসেবে। পৃথিবীতেই বাক্যগুলো উচ্চারণ করতে হয়। তাই বাহ্যতঃ এগুলোর আকর্ষণকে পার্থিব বলা যায়। কিন্তু আখেরাতেই যেহেতু এগুলোর প্রকৃত ও পরিণত বিকাশ তাই এগুলোর আকর্ষণ মূলতঃ আখেরাতেরই আকর্ষণ।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি আরো বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার নাম ও গুণাবলী অগণিত। ওই সকল নাম ও গুণাবলীর যে কোনো একটি হচ্ছে একজন মানুষের সূচনাস্থল (মাবদায়ে তা'য়ুন)। ওই নাম ও গুণই তার প্রতিপালক বা রব। আখেরাতে ওই মাবদায়ে তা'য়ুন বা প্রতিপালনকারী নাম ও গুণাবলী বিকশিত হবে বেহেশতের বৃক্ষসম্ভার, নয়নাভিরাম প্রাসাদ, স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণী ও হুরগেলেমান-রূপে। আর তা হবে মানুষের অপার আনন্দের কারণ। আল্লাহ্‌পাকের নাম গুণাবলী পৃথক-পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কোনো কোনো গুণ সমষ্টিভূত, আবার কোনো কোনো গুণ বিস্তৃত। কোনো কোনোটি তাঁর সত্তার (জাতের) সন্নিকটে। কোনো কোনোটি আবার দূরে। এমতো ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে মাবদায়ে তা'য়ুন অনুসারে বেহেশতবাসীদের বেহেশতও হবে বহুধাবিচিত্র। উন্নত ও অধিকতর উন্নত জান্নাতগুলোর স্তর বিন্যাস ঘটেছে এ কারণেই। বেহেশতের কোনো কোনো বৃক্ষ হবে অধিকতর উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়। ওই অতীব সুন্দর বৃক্ষরাজিই হবে চির

www.eelm.weebly.com

আনুরূপ্যবিহীন আল্লাহ্‌র দর্শনের উপলক্ষ। ওই বৃক্ষগুলোতে প্রতিফলিত জ্যোতি একবার প্রকাশিত হবে। আর একবার থাকবে সংগুপ্ত। এভাবে পালাক্রমে অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে দীদার ও দীদার বিরতি।

একটি সংশয়ঃ ইহকাল ও পরকালের সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব হচ্ছে সম্ভাব্য অস্তিত্ব (মুমকিনুল অজুদ)। এরা সকলেই অনস্তিত্বনির্ভর, অসম্পূর্ণ। অপকর্ষই হলো এগুলোর ভিত্তি। সত্তাগতভাবেই সমগ্র সৃষ্টি সৌন্দর্যবঞ্চিত। সুতরাং সৃষ্টির মধ্যে পরিদৃশ্যমান সৌন্দর্য, পুণ্য ও পূর্ণত্ব হচ্ছে সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র দয়া ও দান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি তাই হয়, তবে পৃথিবী ও আখেরাতের মধ্যে পার্থক্য করা হচ্ছে কেনো? কেনো নিন্দনীয় হবে পৃথিবীপ্রীতি? আর কেনোই বা প্রশংসনীয় হবে আখেরাতের প্রেম।

সংশয়ের অপনোদনঃ এর জবাবে আমরা বলি, আল্লাহ্‌পাকের নাম ও গুণাবলীর দৃশ্যমান প্রতিবিম্বই হচ্ছে এই সম্ভাব্য জগত। আবার পরম সত্তার (জাতে বাহাতের) চিরন্তন অস্তিত্বের তুলনায় তাঁর গুণাবলীও এক ধরনের সম্ভাব্য। কারণ তাঁর গুণাবলী তাঁরই সত্তার মুখাপেক্ষী। মুখাপেক্ষিতা হচ্ছে সম্ভাব্য জগতের ধর্ম।

একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌পাকের সত্তা যেহেতু চিরবিদ্যমান, তাই তাঁর গুণাবলীও চিরবিদ্যমান হেতু তাঁর সত্তার মতো গুণাবলীও অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব (ওয়াজিবুল ওজুদ) সম্পৃক্ত। কারণ সিফাতবিহীন জাত (গুণাবলী বিবর্জিত সত্তা) হওয়া অসম্ভব। তাই তাঁর সত্তার চিরন্তনতার কারণে তার গুণাবলীও চিরন্তন। সুতরাং জাতের মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও সিফাত সম্ভাব্য নয়, অবশ্যম্ভাবী। সিফাতকে সম্ভাব্য বললে তা জাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু এরকম হওয়াও অসম্ভব। মারেফাতের সাধকবৃন্দের অন্তর্দৃষ্টিতে যখন পরম সত্তার গুণাবলী সমূহের প্রতিভাস ঘটে, তখন পরিস্ফুট হয় গুণাবলীর গুণগুলোর দু'টি দিক। একদিক সম্ভাব্য আর একদিক অবশ্যম্ভাবী। একদিকে থাকে শূন্যতা এবং অপরদিকে থাকে পূর্ণতা। তাই আল্লাহ্‌র গুণাবলীর দৃশ্যমান দিকটি সম্ভাব্য এবং দৃষ্টির অতীত দিকটি অবশ্যম্ভাবী। সৃষ্টির সীমাবদ্ধতার কারণে অবশ্য আল্লাহ্‌র গুণাবলীর একটি দিককে সম্ভাব্য বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অবশ্যম্ভাবী। একারণেই সৃষ্টি-সংশ্লিষ্ট দিকটি নিন্দনীয়, অশুভ, অসম্পূর্ণ এবং সৌন্দর্য ও পুণ্য বঞ্চিত। আর আল্লাহ্‌পাকের সত্তাসম্পৃক্ত দিকটি কল্যাণ, পূর্ণত্ব ও অক্ষয় সৌন্দর্য দ্বারা বিভূষিত। এই দর্শন অবশ্য সৃষ্টির দিক থেকে ধারণাপ্রসূত একটি দর্শন। সাধকগণের আত্মিক দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর বিকাশ ও জ্যোতির্ময় আবির্ভাব দৃশ্যতঃ এভাবেই দ্বিধাবিভক্ত। পৃথিবীর বস্তুনিচয়ের উপর আল্লাহ্‌র গুণাবলীর অনুমাননির্ভর সম্ভাব্য দিকটি থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। আর তাঁর অস্তিত্বের জ্যোতি বা তাজাল্লী প্রতিবিম্বিত হয় আখেরাতের বস্তুনিচয়ের প্রতি। তাই পৃথিবীর

www.eelm.weebly.com

সম্পদের প্রতি আকর্ষণ আল্লাহ্পাকের অপছন্দ। পক্ষান্তরে আখেরাতের বৈভব সমূহের প্রতি আকর্ষণ তাঁর পছন্দ। সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো যে, আখেরাতকে ভালোবাসার অর্থ আল্লাহ্কে ভালোবাসা। অর্থাৎ প্রকৃত আল্লাহ্-প্রেমিকেরাই আখেরাতপ্রেমিক হয়। একারণেই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগত সৃষ্টির সীমানাভূত হওয়া সত্ত্বেও একটি জগতের প্রতি অনুরাগ অসিদ্ধ এবং আর একটি জগতের প্রতি অনুরাগ অপরিহার্য।

উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহের উপরে আলোকপাত করার পর হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি তাঁর মকতুবাত শরীফের ১০০ সংখ্যক মকতুবে উল্লেখ করেছেন, হজরত ইউসুফের অতুলনীয় রূপ-সৌন্দর্য পৃথিবীতে বিকশিত হলেও তা অন্যান্য পার্থিব সৌন্দর্যের মতো ছিলো না। আসলে ওই সৌন্দর্য ছিলো আখেরাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। পার্থিব বস্তুনিচয়ের প্রতিপালনকারী হচ্ছে আল্লাহ্র গুণাবলীর সম্ভাব্য দিকটি। আর অবশ্যম্ভাবী দিকটি হচ্ছে বেহেশতী বস্তুনিচয়ের প্রতিপালনকারী। তাই কামেল ও মোকাম্মেল মনীষীবৃন্দের আন্তরিক অনুরাগ থাকে বেহেশতী বস্তুসমূহের প্রতি। হজরত ইয়াকুবের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছিলো। অবিকল বেহেশতের সৌন্দর্যধারী হজরত ইউসুফের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা তাই নিন্দনীয় তো নয়ই, বরং প্রশংসনীয়।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির এই সমাধানটি বিশুদ্ধ ও অনবদ্য। তবে এর বাস্তবতা মেনে নিতে গিয়ে সৃষ্টি হয় আরো দু'টো জটিলতার। সেই জটিলতা দু'টোর একটি হচ্ছে— ১. এক স্থানে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি বলেছেন, নবী-রসুল ও ফেরেশতামণ্ডলী ছাড়া অন্য সকলের সূচনাস্থল (মাবদায়ে তা'য়ুন) হচ্ছে আল্লাহ্পাকের নাম ও গুণাবলীর প্রতিবিম্ব, অবিকল নাম ও গুণাবলী নয়, কিন্তু এখানে তিনি বলেছেন, সম্ভাব্য সকল কিছুর প্রতিপালক হচ্ছে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী। অর্থাৎ নাম-গুণাবলীর প্রতিবিম্ব নয়, অবিকল নাম-গুণাবলীই সকলের মাবদায়ে তা'য়ুন। এই বর্ণনাবৈষম্যের হেতু কি? আর এটাই বা কি করে সম্ভব যে, পার্থিব বস্তুনিচয় নাম-গুণাবলীর বিকাশস্থল, আর পারলৌকিক বস্তুনিচয়ে প্রতিফলিত হয় আল্লাহ্র নামসমূহের জ্যোতি বা তাজাল্লী? আবার এখানে নাম-গুণাবলীর সম্ভাব্য ও অবশ্যম্ভাবী দু'টো দিকের অবতারণা করা হলো। এভাবে সৃষ্টি করা হলো জটিলতা। এই জটিলতার সমাধান তাহলে কি ?

সমাধানঃ এটা ঠিক যে, নবী-রসুল ও ফেরেশতাগণ ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টির সূচনাস্থল হচ্ছে আল্লাহ্র নাম-গুণাবলীর প্রতিবিম্ব। এমতাবস্থায় সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর নাম-গুণাবলীর প্রকাশস্থল বলা যাবেনা কেনো? প্রতিবিম্বের প্রতিচ্ছায়া তো মলিন প্রতিচ্ছায়া। প্রকৃত কথা হচ্ছে, এই বিশাল সৃষ্টি আল্লাহ্তায়ালার নাম-গুণাবলীর প্রতিবিম্বের প্রতিচ্ছায়া। অর্থাৎ মূলের যে প্রতিবিম্ব সেই প্রতিবিম্বের

www.eelm.weebly.com

প্রতিচ্ছায়া। একটি সরাসরি প্রতিবিম্ব, আরেকটি হচ্ছে প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব। তাই নবী-রসুল ও ফেরেশতামণ্ডলীর উপরে আল্লাহ্‌র নাম-গুণাবলীর তাজাল্লী বর্ষিত হয় সরাসরি। আর অপরাপর সৃষ্টির প্রতি বর্ষিত হয় মাধ্যম সহকারে। অতএব আল্লাহ্‌পাকের সত্তা ও তাঁর নাম-গুণাবলীই চিরন্তন। কারণ তা প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

২. এতক্ষণের আলোচনায় প্রমাণিত হলো যে, নবী-রসুল ও ফেরেশতা-মণ্ডলীসহ সকল সৃষ্টির প্রতিপালনকারী বা মাবদায়ে তা'য়ুন হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার আসমা ও সিফাতের (নাম ও গুণাবলীর) প্রতিবিম্ব। অথবা প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব। কেবল হজরত ইউসুফ হচ্ছেন এর ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন সিফাতে ইলাহীর (আল্লাহ্‌র গুণাবলীর) এক দৃষ্টিগ্রাহ্য নিদর্শন, যে সিফাতের সরাসরি সম্পৃক্তি রয়েছে জাতের (আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের) সঙ্গে। একারণেই তিনি হয়েছিলেন আখেরাতের সৃষ্টবস্তুনিচয়ের সমগোত্রীয়। এখন প্রশ্ন, যদি তাই হয়, তবে নবী শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর উপরে তাঁর মর্যাদা অনিবার্য হয়ে পড়ে না কি?

সমাধানঃ সকল নবী-রসুল আখেরাতের সৌন্দর্য দ্বারা বিভূষিত। কিন্তু পৃথিবীতে সে সৌন্দর্য রয়েছে সংগুপ্ত অবস্থায়। এই সৌন্দর্যের দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রকাশ ঘটেছিলো কেবল হজরত ইউসুফের বেলায়। এই প্রকাশ হওয়া না হওয়ার উপরে মর্যাদার তারতম্য নির্ভর করে না। নির্ভর করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও প্রেমের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপরে— যা সংগুপ্ত থাকাই সমীচীন। হজরত ইউসুফের মতো অন্যান্য নবীর এই সংগুপ্ত সৌন্দর্য প্রকাশ করা হয়নি কেনো, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌পাকই অধিক পরিজ্ঞাত। প্রকৃত কথা হচ্ছে, নবী-রসুলগণের মাবদায়ে তা'য়ুন সাধারণ মানুষের মাবদায়ে তা'য়ুন থেকে পৃথক। আল্লাহপাকের নাম-গুণাবলীর কথিত সম্ভাব্য দিক থেকে নয়, নবী-রসুলগণ প্রতিপালিত হন নাম-গুণাবলীর অবশ্যম্ভাবী দিকটির দ্বারা।

রসুল স. এর রূপ-লাবণ্য সম্পর্কে মোজাদ্দেদে আলফেসানি লিখেছেন, মোহাম্মদ স. এর উৎপত্তিস্থল (মাবদায়ে তা'য়ুন) এবং প্রতিপালনকারী সিফাত হচ্ছে সিফাতে এলেম (জ্ঞান নামক গুণ)। এই গুণটি অন্য সকল গুণকে একত্র করেছে বা পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর অন্য সকল গুণ অপেক্ষা এলেম গুণ আল্লাহ্‌র জাতের (সত্তার) অধিকতর ঘনিষ্ঠ। আলেম, এলেম এবং মা'লুম (জ্ঞানী, জ্ঞান এবং জ্ঞানায়ত্ব বিষয়) এক বা একাকার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কুদরত (ক্ষমতা), ইরাদা (অভিপ্রায়), কালাম (কথা), সামা (শ্রুতি), বাসার (দৃষ্টি) ইত্যাদি গুণগুলোর ক্ষেত্রে এরকম ঘটে না। সে কারণেই অন্যান্য গুণ অপেক্ষা এই

www.eelm.weebly.com

'এলেম' গুণ জাতের (আল্লাহ্‌র সত্তার) নিকটতম। আবার এলেম সিফাতের রূপ-লাবণ্য বা সৌন্দর্য সত্তাগত। অপরাপর সিফাতগুলো কিন্তু এরকম নয়। তাই এলেম সিফাত আল্লাহ্‌র প্রিয়তম। এলেম সিফাতের রূপ-লাবণ্য বর্ণনার অতীত। দৃষ্টিও তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সৌন্দর্য যেমন নয়নগোচর নয়, তেমনি তাঁর প্রিয়তম রসুল মোহাম্মদ স. এর রূপ-সৌন্দর্যও পৃথিবীবাসীদের দৃষ্টিতে পরিদৃশ্যমান হয়নি। অবশ্য আখেরাতে তাঁর ওই অতুল রূপ পূর্ণরূপে বিকশিত হবে এবং তা দৃষ্টিগোচরও হবে।

ইহজগতকে যে রূপ-সৌন্দর্য দেয়া হয়েছে, তার দুই-তৃতীয়াংশ পেয়েছেন হজরত ইউসুফ— এ কথাটি সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু আখেরাতে মোহাম্মদ স. ই হবেন সৌন্দর্যের সম্রাট। রসুল স. স্বয়ং বলেছেন, আমার ভ্রাতা ইউসুফকে দেয়া হয়েছে সাবাহাত্ (চোখধাঁধানো রূপ)। আর আমাকে দেয়া হয়েছে মালাহাত (চোখ জুড়ানো লাবণ্য)। সূর্যকিরণের প্রখরতা এবং চাঁদের আলোর স্নিগ্ধতার মধ্যে ও স্বর্ণ-রৌপ্যের দ্যুতিচ্ছটার মধ্যে পার্থক্য যেমন, তেমনই পার্থক্য রয়েছে সাবাহাত্ ও মালাহাতের মধ্যে। হজরত ইউসুফের রূপে মুগ্ধ ছিলেন হজরত ইয়াকুব, জুলায়খা ও মিসর নন্দিনীরা। আর মোহাম্মদ স. এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ স্বয়ং মহান প্রভুপালক আল্লাহ্। তবুও শেষ কথা হচ্ছে, মৃত্তিকা কি কখনো তার স্রষ্টার সহচর হতে পারে?

এতক্ষণের আলোচনায় প্রতীয়মান হলো যে, ফানা বা আত্মলীন হওয়ার পর পার্থিব বস্তুনিচয়ের প্রতি সুফী সাধকগণের কোনো আকর্ষণই থাকে না। তাদের হৃদয় তখন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় আল্লাহ্‌র স্মরণে ও প্রেমে। কিন্তু এরকম ভাবা ঠিক নয় যে, তাঁদের অন্তরে তখন নবী-প্রেমের সংকুলান হয় না। বস্তুতঃ নবীপ্রেমই আল্লাহ্‌প্রেম। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না, যদি না আমি তার নিকটে তার মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি এমন কি সকল মানুষ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় না হই। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আনাস থেকে। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিনটি উত্তম স্বভাবের যে কোনো একটি হস্তগত হলেই ইমানের স্বাদ অনুভব করা যায়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভাবা।

তাপসী রাবেয়া বলেছেন, আমার হৃদয় আল্লাহ্‌প্রেমে কানায় কানায় পরিপূর্ণ তাই রসুল প্রেমের সংকুলান সেখানে হয় না। তার এই কথাটি ছিলো

 www.eelm.weebly.com

মত্ততাসম্ভূত। বিপরীত ধরনের মত্ততা মোজাদ্দেদে আলফেসানির ক্ষেত্রেও পরিদৃষ্ট হয়। তিনি নবীপ্রেমের আবেগে আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমণের একপর্যায়ে বলে ফেলেছিলেন, মোহাম্মদের স্রষ্টা বলেই আমি আল্লাহ্‌কে ভালোবাসি।

মাসআলাঃ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, শোক-কাতর ব্যক্তির জন্য রোদন ও শোক প্রকাশ সিদ্ধ। তবে শর্ত হচ্ছে ওই প্রকাশের মধ্যে আর্তনাদ ও বিলাপ থাকবে না। হাত-পা ছোঁড়া ছুঁড়িও চলবে না।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস উল্লেখ করেছেন, রসুল স. এর প্রিয় পুত্র একবার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাই দেখে তিনি অশ্রুপাত শুরু করলেন। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনিও কি শোকাক্রান্ত হোন? তিনি স. বললেন, হে আউফ তনয়! অন্তর শোকাচ্ছন্ন ও ভারাক্রান্ত। চোখ রোরুদ্যমান। কী করবো! কিন্তু আমি মুখে এমন কিছু উচ্চারণ করিনি যাতে আমার মাহবুব (প্রেমাস্পদ) অতুষ্ট হোন। এরপর তিনি জ্ঞানহীন পুত্রের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে ইব্রাহিম! আমি তোমার জন্য ব্যথিত, শোকার্ত।

হজরত উসামা ইবনে জায়েদ থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর এক দৌহিত্রের অন্তিম সময় উপস্থিত হলো। তার গলদেশ থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ উত্থিত হচ্ছিলো। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন রসুল স.। তিনি আর অশ্রুসংবরণ করতে পারলেন না। দু'চোখ থেকে ঝরে পড়তে শুরু করলো তপ্ত অশ্রুর ধারা। সেখানে উপস্থিত হজরত সা'দ নিবেদন করলেন, হে প্রিয়তম রসুল! আপনি কাঁদছেন! তিনি স. বললেন, এ হচ্ছে প্রেমানুভূতি, যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করে দিয়েছেন মানুষের অন্তরে। আর আল্লাহ্ প্রেমিক ও দয়ার্দ্রচিত্তদেরকে ভালোবাসেন।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জীবিতদের অশ্রুবর্ষণ ও হৃদয়ের শোকাকুলতার কারণে আল্লাহ্ শাস্তি দেন না। বরং অনুগ্রহের দ্বারা নিষিক্ত করেন। অর্থাৎ মার্জনা করে দেন। একথা বলে তিনি তাঁর মুখের দিকে ইঙ্গিত করলেন। আর মৃতের শোকাকুল গৃহবাসীদের কান্নার কারণে মৃতকে শাস্তি দেয়া হয়— হাদিসটির এমনও অর্থ করা যেতে পারে যে, মৃতের স্বজনেরা তার সৎকর্মগুলোর উল্লেখ করে কাঁদতে থাকলেও তার শাস্তি হতে থাকে।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত আর একটি হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মৃতের জন্য যারা মাতম করে, মাথা-বুক চাপড়ায় ও পরিধেয় বসন-ছিন্ন করে, আমি তাদের উপর অতুষ্ট।

www.eelm.weebly.com

قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ○ قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○ يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

❐ উহারা বলিল, 'আল্লাহের শপথ। আপনি তো ইউসুফের কথা ভুলিবেন না যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হইবেন, অথবা মৃত্যুবরণ করিবেন।'

❐ সে বলিল, 'আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহের নিকট নিবেদন করিতেছি এবং আমি আল্লাহের নিকট হইতে জানি যাহা তোমরা জান না।'

❐ হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তাহার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহের আশিস হইতে তোমরা নিরাশ হইও না, কারণ, আল্লাহের আশিস হইতে কেহই নিরাশ হয় না সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায় ব্যতীত।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— শোকাকুল পিতাকে লক্ষ্য করে পুত্রগণ বললো, হে আমাদের পিতা! আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো দেখছি জ্বরাগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত অথবা মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত ইউসুফের কথা ভুলতে পারবেন না।

এখানে 'হারাদ্বান' অর্থ মুমূর্ষু, জ্বরাগ্রস্ত বা মরনোন্মুখ। 'হারাদ্ব' শব্দটি ক্রিয়ামূল হিসেবে বহুবচনরূপে ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয় না। কামুস প্রণেতা লিখেছেন, 'হারাদ্ব' অর্থ দুঃখ শোকে জর্জরিত মুমূর্ষু ব্যক্তি, যার ধর্মকর্ম ও বোধ-বুদ্ধি বিকৃত হয়েছে। অথবা যার দেহ, ধর্মবোধ ও বিবেক হয়ে পড়েছে বিশৃঙ্খল। কিংবা ওই ব্যক্তি যার প্রাণ ওষ্ঠাগত।

পরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করছি।' একথার অর্থ, আমি আমার অসহ বেদনা, দুঃখ-যাতনা প্রকাশ করছি কেবল আল্লাহ্ সকাশে। অতএব হে আমার পুত্রগণ। আমাকে বাধা দিয়োনা। শোক প্রকাশ করতে দাও।

'বাছ্' বলে অত্যধিক শোকাকুলতাকে। অর্থাৎ যে শোক চেপে রাখা অসম্ভব, সেই শোককে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ— প্রকাশ করা। হাসান বসরী শব্দটির অর্থ করেছেন, অসহনীয় অবস্থা।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, একবার হজরত ইয়াকুবের এক প্রতিবেশী তাঁকে বললেন, ইয়াকুব! তোমার শরীর যে দিন দিন ভেঙে পড়ছে। এভাবে তুমি তো নিঃশেষ হতে চলেছো। অথচ এখনো তুমি তোমার পিতার বয়সে পৌঁছাওনি। তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইউসুফের বিচ্ছেদ অসহনীয়। ক্রমাগত নিঃশেষ হয়ে চলেছি আমি। আল্লাহ্ আমাকে মহা পরীক্ষায় ফেলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, হে আমার নবী! তুমি মানুষের সম্মুখে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করছো। হজরত ইয়াকুব বললেন, হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালক! ভুল হয়েছে। দয়া করে আমাকে মার্জনা করুন। আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, মার্জনা করলাম। এরপর থেকে কেউ তাঁর দুরবস্থা দেখে আলাপচারিতা শুরু করলে তিনি বলতেন,'ইন্নামা আশকু বাছ্ছী ওয়া হুজনী ইলাল্লহ্'।

এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার দৃষ্টি শক্তি এমন নিষ্প্রভ হলো কেনো? কেনো হলো কটিদেশ এমন বঙ্কিম? তিনি বললেন, ইউসুফের জন্য কাঁদতে কাঁদতে আমার চোখের এই অবস্থা। আর বিনইয়ামিনের বিচ্ছেদের কারণে কটিদেশের এই হাল। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাদেশ হলো, ইয়াকুব! তুমি আমার সৃষ্টির নিকটে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছো? তুমি না আমার নবী। ঠিক আছে। আমিও আমার মর্যাদার শপথ করে বলছি, যতক্ষণ তুমি আমার নিকট প্রার্থনা করাকে যথেষ্ট মনে না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার দুঃখ দূর করবো না। হজরত ইয়াকুব তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'নিশ্চয় আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহ্র নিকট নিবেদন করছি'। আল্লাহ্পাক পুনরায় বললেন, আমার সম্মানের শপথ! তোমার পুত্রদ্বয় মৃত্যুবরণ করলেও আমি তাদেরকে জীবিত করে তোমাকে অর্পণ করতাম। কিন্তু এই বিচ্ছেদকে আমি দীর্ঘায়িত করবো একটি কারণে। কারণটি এই— একবার তোমরা একটি ছাগল জবাই করেছিলে। জনৈক দরিদ্র তখন উপস্থিত হয়েছিলো তোমাদের কাছে। কিন্তু তোমরা ওই দরিদ্রকে কিছুই দাওনি। আরো শুনে রাখো, নবীগণই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তারপর প্রিয় মিসকিনেরা। এবার তুমি আহার্য প্রস্তুত করো। দাওয়াত করো মিসকিনদের। হজরত ইয়াকুব তাই করলেন। আহার্য প্রস্তুত করে মিসকিনদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা রোজাদার, আমার বাড়ীতে আজ তাদের দাওয়াত।

আরো বর্ণিত হয়েছে, এরপর থেকে দিবসের আহার গ্রহণের সময় তিনি আহ্বান জানাতেন এভাবে— যে নিরন্ন, সে যেনো ইয়াকুবের বাড়ীতে আসে। নৈশ আহারের সময় আবার বলতেন, যারা অন্নহীন তারা যেনো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ইয়াকুবের গৃহে। এভাবে প্রতিদিন তিনি দুইবেলা আহার গ্রহণ করতেন ক্ষুধার্ত মিসকিনদের সঙ্গে বসে।

www.eelm.weebly.com

ওয়াহাব বিন মুনাববাহ্ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী ইয়াকুবের প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন, হে আমার নবী! বলতে পারো, কী কারণে তোমাকে আমি আশিবছর ধরে পুত্র শোকে কাতর করে রেখেছি? হজরত ইয়াকুব বললেন, ইয়া ইলাহী! আমি তা জানি না। আল্লাহ্পাক বললেন, তোমার গৃহে একবার প্রস্তুত হয়েছিলো উপাদেয় ব্যঞ্জন। কিন্তু তুমি ওই গোশত্ প্রতিবেশীকে আহার করাওনি। লংঘন করেছিলে প্রতিবেশীর অধিকার।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইয়াকুবকে সুদীর্ঘ শোকের পাথার অতিক্রম করতে হয়েছিলো এ জন্যে যে, তিনি একবার একটি গো-শাবককে তার মাতার সামনেই জবাই করেছিলেন। গোমাতা ক্রমাগত আর্তনাদ করছিলো। কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি।

ওয়াহাব, সুদ্দী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, একবার কারাবন্দী ইউসুফের নিকটে হাজির হলেন হজরত জিব্রাইল। বললেন, হে সিদ্দিক! আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? হজরত ইউসুফ বললেন, আমি তো দেখছি একটি পবিত্র অবয়ব। আর অনুভব করছি অপার্থিব সুবাস। হজরত জিব্রাইল বললেন, আমি রূহুল আমিন। বিশ্বপ্রতিপালকের বাণীবাহক। হজরত ইউসুফ বললেন, তাহলে আপনিই আল্লাহ্র সেই সৌভাগ্যশালী নিকটজন, আল্লাহ্র একান্ত বিশ্বাসভাজন। কিন্তু হে রূহুল আমিন! এ স্থান তো পাপীতাপীদের আবাস স্থল। এখানে আপনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? হজরত জিব্রাইল বললেন, আপনি কি জানেন না যে, নবীগণের অবস্থান স্থলকে আল্লাহ্পাক পবিত্র করে দেন? আর নবীগণের আবির্ভাব স্থল হয় পৃথিবীর অন্য সকল স্থানের চেয়ে অধিকতর সম্মানিত? হে পবিত্র নবী! হে নির্বাচিত পুণ্যাত্মাগণের সন্তান! আপনার অসিলায় এই কারাগার ও কারাগার সংলগ্ন চতুষ্পার্শ্ব মহিমান্বিত হয়েছে। হজরত ইউসুফ বললেন, আপনি আমাকে সিদ্দিক বলে সম্বোধন করলেন কেনো? আর আমাকে নির্বাচিত পুণ্যাত্মাগণের অন্তর্ভুক্তই বা করলেন কেনো ? আমি তো এখন অপরাধীদের দলে। আমাকে করা হয়েছে দুর্বৃত্তদের দলভূত। হজরত জিব্রাইল বললেন, আল্লাহ্ই সিদ্দিক বানিয়েছেন আপনাকে। আপনাকে নির্বাচিতও করেছেন তাঁর প্রিয় বান্দারূপে। আপনি পবিত্র রেখেছেন আপনার প্রবৃত্তিকে। প্রভুপত্নীর অসুন্দর প্রস্তাবকে করেছেন প্রত্যাখ্যান। হজরত ইউসুফ বললেন, হে রূহুল আমিন! আপনি কি আমার সম্মানিত পিতার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত? হজরত জিব্রাইল বললেন,হ্যাঁ। আপনার বিচ্ছেদ বেদনায় তিনি কাতর। শোকে দুঃখে মুহ্যমান। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে দিয়েছেন অনন্যসাধারণ সহিষ্ণুতা। হজরত ইউসুফ বললেন, আপনি কি অনুমান করতে পারেন, তাঁর শোক কতো গভীর? হজরত জিব্রাইল বললেন, হ্যাঁ। তাঁর শোক সদ্য সন্তানহারা সত্তর জন সন্তানহারা রমণীর মতো। হজরত ইউসুফ বললেন, তাঁর সেই অসহনীয় বেদনার প্রতিফল কী? হজরত

www.eelm.weebly.com

জিব্‌রাইল বললেন, একশত শহীদের পুণ্য। হজরত ইউসুফ বললেন, তাঁর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে কি না, সে সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন? হজরত জিব্‌রাইল বললেন, জানি। একদিন পিতা-পুত্রের মিলন অবশ্যই ঘটবে। হজরত ইউসুফ বললেন, তবে শত বিপদ মুসিবতেও আমি দুঃখিত নই।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যা জানি, তা তোমরা জানো না। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুশলী ও অপার দয়াপরবশ। অশ্রুবর্ষণকারীকে তিনি নিরাশ করেন না। প্রত্যাখ্যান করেন না সমর্পণকারীর নিবেদনকে। তিনি অসহায়ের সহায়। এ সকল কথা আমি অতি উত্তমরূপে অবগত। কিন্তু তোমরা এ সকল কথা অবগত নও। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, আমাকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইউসুফ জীবিত। দীর্ঘ দিন পর তার সঙ্গে আমার সাক্ষাতও ঘটবে। এই গোপন সংবাদটি আমি জানি। কিন্তু তোমরা জানো না।

এক বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত ইয়াকুবের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন হজরত আজরাইল। নবীপ্রবর বললেন, হে পুতঃপবিত্র মৃত্যুদূত! তুমি কি আমার প্রিয়তম পুত্র ইউসুফের প্রাণ হরণ করেছো? হজরত আজরাইল বললেন, না। হজরত ইয়াকুব একথা শুনে প্রীত হলেন। তখন থেকে তিনি পুত্রদর্শনের প্রতীক্ষায় সময়াতিপাত করে চললেন।

কোনো কোনো ভাষ্যকার আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ করেছেন এরকম— হজরত ইয়াকুব তাঁর পুত্রগণকে বললেন, আরো শোনো। একথাটি আমি ভালো করেই জানি যে, ইউসুফের স্বপ্ন সফল হবে। একসময় আমি ও তোমরা সকলে তাকে সেজদা করবো। কিন্তু এ তথ্যটি তোমরা জানো না।

সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, প্রথমবার মিসর থেকে ফিরে হজরত ইউসুফের ভ্রাতাগণ যখন মিসরপতির মহানুভবতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু করেছিলো, তখনই হজরত ইয়াকুব বুঝতে পেরেছিলেন, ইউসুফ জীবিত। আর এক সময় তার সঙ্গে সাক্ষাত ঘটবেই। একথা তিনি বলেও বসেছিলেন যে, মনে হয় মিসরপতিই ইউসুফ।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, নসর বিন আরাবী বলেছেন, প্রিয় পুত্রকে হারাবার পর তেইশ বছর পর্যন্ত হজরত ইয়াকুব একথা জানতেন না যে, ইউসুফ জীবিত না মৃত। এরপর একদিন মানবরূপে হজরত ইয়াকুবের সামনে আবির্ভূত হলেন হজরত আজরাইল। তিনি বললেন, আপনি কে? হজরত আজরাইল বললেন, মৃত্যুদূত। তিনি বললেন, হে মৃত্যুদূত ! আল্লাহ্‌র শপথ উচ্চারণ করে আমি জানতে চাই, আপনি কি ইউসুফের জীবন হরণ করেছেন? হজরত আজরাইল বললেন, না।

এর পরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহ্‌র আশিস থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না, কারণ আল্লাহ্‌র আশিস থেকে কেউই নিরাশ হয় না সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ব্যতীত।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে

www.eelm.weebly.com

'তাহাস্সাসু' (অনুসন্ধান করো) শব্দটির আভিধানিক অর্থ জিজ্ঞাসাবাদসহ অনুসন্ধান করো। 'রউহুন' অর্থ রহমত বা দয়া। কেউ কেউ বলেছেন, বিপদ থেকে নিষ্কৃতি। অথবা আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রশান্তি। আর 'আলকাফিরূন' অর্থ আল্লাহ্পাকের সত্তা ও গুণবত্তা সম্পর্কে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী বা অজ্ঞ। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। অর্থাৎ আল্লাহ্পাককে যারা বিশ্বাস করে ও তাঁর পরিচয় যারা জানে তারা কখনো নিরাশ হয় না। নিরাশ হয় কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৮৮, ৮৯, ৯০

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ○ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ○ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي ۖ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ○

❒ যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন বলিল, 'হে আযীয! আমরা ও আমাদিগের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি এবং আমরা তুচ্ছ পণ্য লইয়া আসিয়াছি; আপনি আমাদিগকে রসদ পূর্ণমাত্রায় দিন এবং আমাদিগকে দান করুন; আল্লাহ্ দাতাগণকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন।'

❒ সে বলিল, 'তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তাহার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছিলে যখন তোমরা ছিলে অপরিণামদর্শী?'

❒ উহারা বলিল, 'তবে কি তুমিই ইউসুফ?' সে বলিল, 'আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর ; আল্লাহ্ আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সাবধানী এবং ধৈর্যশীল সেই সৎকর্মপরায়ণ এবং আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করেন না।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পিতার নির্দেশে বিনইয়ামিনকে উদ্ধারের প্রচেষ্টায় ও হজরত ইউসুফের অনুসন্ধানে ইয়াকুব তনয়গণ পুনরায় মিসরে গমন করলো। সাক্ষাত করলো মিসরপতির সঙ্গে। বললো, হে মহামান্য সম্রাট! আমরা ও আমাদের পরিবারের লোকজন অন্ন-সংকটে পতিত। তাই আমরা পুনরায় খাদ্য শস্য সংগ্রহ করতে এলাম। কিন্তু উপযুক্ত পণ্যমূল্য আমরা আনতে পারিনি। তবুও

www.eelm.weebly.com

আমাদের নিবেদন, আপনি আমাদের পূর্ণমাত্রায় রসদপত্র দান করুন। এর অতিরিক্ত অনুদানও আমরা চাই। আপনি হয়তো জানেন, আল্লাহ্ দাতাগণকে পুরস্কৃত করে থাকেন।

এখানে 'আদ্ দুর্‌রু' অর্থ ক্ষুধার যন্ত্রণা। 'মুয্‌জাতিন' অর্থ অচল মুদ্রা। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। তাঁর এই উক্তিটি বর্ণনা করেছেন, আবু উবাইদ, ইবনে আবু শায়বা, ইবনে মুনজির, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখ। ইবনে আবী হাতেম ইকরামা থেকেও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে সাঈদ বিন মানসুর, ইবনে মুনজির ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, শব্দটির অর্থ— স্বল্পসংখ্যক দিরহাম।

ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ্ বিন হারেস বলেছেন, 'বিদ্বআ'তিম্ মুয্‌জাতিন' অর্থ মরুচারীদের সম্পদ। অর্থাৎ পশম ও ঘি। কোনো কোনো বর্ণনায় ঘিয়ের স্থলে উল্লেখিত হয়েছে পনির। আবু সালেহের উদ্ধৃতি সহযোগে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, কথাটির অর্থ সবুজ শস্য ও সনুর কাঠের জ্বালানী। ইবনে নাজ্জার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ইউসুফের ভ্রাতারা তখন পণ্যমূল্য হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলো মাকালের ছাতু। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কাঁচা চামড়া ও জুতা। 'মুয্‌জাতিন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ— তাড়িয়ে দেয়া। যেমন, আল্লাহ্-পাক এরশাদ করেন— আন্নাল্লহা ইয়ুয্‌জি সাহাবা (আল্লাহ্ মেঘমালা পরিচালনা করেন)। অচল মুদ্রা কেউ গ্রহণ করতে চায় না। দূরে নিক্ষেপ করে। তাই অচল মুদ্রাকে বলা হয় 'মুয্‌জাতিন'। তেমনি অধিক পণ্যের জন্য স্বল্প মুদ্রা দিলেও তা কেউ গ্রহণ করতে চায় না। তবে দয়া করে কেউ যদি তা গ্রহণ করে, তবে তা ভিন্ন কথা।

'ফাআওফি লানা' অর্থ আমাদেরকে রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন, যেমন ইতোপূর্বে দিয়েছিলেন উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে। অর্থাৎ পূর্ণ মাত্রায় দান করলে যে ঘাটতিটুকু আপনার হবে সেটুকু আপনি দিবেন অনুদান হিসেবে। অধিকাংশ ভাষ্যকার 'তাস্বাদ্‌দাক্ব আ'লাইনা' কথাটির অর্থ এরকমই করেছেন। কিন্তু ইবনে জুরাইজ ও জুহাক বলেছেন, এখানে 'দান করুন' কথাটির মর্ম হবে আপনি আমাদের যে ভাইটিকে আটকে রেখেছেন সেই ভাইটিকে ফেরত দিন।

এখানে 'জাযা' অর্থ ইহ-পরকালের প্রতিদান। 'জাযা' এবং 'তাস্বাদ্‌দাক্ব'— দু'টো শব্দেরই অর্থ হবে করুণাপরবশ হওয়া। রসুল স. প্রবাসকালীন নামাজ সম্পর্কে বলেছেন, কসরের নামাজ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সদকা (করুণা বা

www.eelm.weebly.com

মেহেরবানি) কাজেই তোমরা আল্লাহ্র সদকা গ্রহণ করো। বোখারী। তবে শরিয়তের পরিভাষায় সদকা হচ্ছে ওই করুণা, যার মধ্যে রয়েছে সওয়াবের প্রত্যাশা এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি।

হাসান বসরী বলেছেন, আমি একদিন এক লোককে দোয়া করতে শুনলাম এভাবে— হে আমার আল্লাহ্! আমার প্রতি সদকা। আমি বললাম সদকার নেপথ্যে থাকে পুণ্যার্জনের বাসনা। তুমি বরং এভাবে দোয়া করো— হে আল্লাহ্! আমার প্রতি মেহেরবানি করো, আমাকে দান করো। উল্লেখ্য যে, হাসান বসরী যে সদকা চাইতে নিষেধ করেছেন, তা হচ্ছে, শরিয়ত নির্দেশিত সদকা— যা পুণ্যের আশায় করা হয়।

জুহাক বলেছেন, হজরত ইউসুফের ভ্রাতারা মিসরপতিকে একথা বলেনি যে, আল্লাহ্ আপনাকে পুরস্কৃত করুন। তারা বলেছিলো, আল্লাহ্ দাতাগণকে পুরস্কৃত করে থাকেন। এরকম বলার কারণ হচ্ছে— তারা তখন পর্যন্ত জানতো না যে সম্রাট ইমানদার কি না। আর তিনি যে দান করবেনই সে সম্পর্কেও তারা নিশ্চিত ছিলো না।

একটি সমীক্ষাঃ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে এক লোক জিজ্ঞেস করলো, রসুল স. এর জন্য সদকা গ্রহণ হারাম ছিলো। অন্যান্য নবীগণের বেলায়ও এরকম ছিলো কি? তিনি বললেন, না। তুমি কি শোনোনি এই আয়াত— 'ওয়া তাস্বাদ্দাক্ব আ'লাইনা ইন্নাল্লহা ইয়াজ্যিল মুতাস্বদ্দিক্বীন' (এবং আমাদেরকে দান করুন; আল্লাহ দাতাগণকে পুরস্কৃত করে থাকেন)। ইবনে জারীর। আমি বলি, এই আয়াতের মাধ্যমে সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা প্রমাণ করেছেন যে, অন্যান্য নবীগণের জন্য সদকা গ্রহণ সিদ্ধ ছিলো। কিন্তু এই প্রমাণ তখনই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, যখন নিশ্চিত হওয়া যাবে যে হজরত ইউসুফের ভ্রাতাগণ নবী ছিলেন। কারণ উদ্ধৃত বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলো তারাই। হজরত ইয়াকুব তো সেখানে ছিলেনই না।

পরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'সে বললো, তোমরা কি জানো, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে যখন তোমরা ছিলে অপরিণামদর্শী?' এ কথার অর্থ— সম্রাট ইউসুফ বললেন, হে নবী ইয়াকুবের সন্তানগণ! তোমাদের কি মনে পড়ে তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছিলে? তোমরা কি ইউসুফকে ঘর ছাড়া করোনি? অন্ধকূপে কি নিক্ষেপ করোনি? বিদেশী বণিকের কাছে ক্রীতদাস হিসেবে কি বিক্রয় করে দাওনি? তখন কত অজ্ঞই না ছিলে তোমরা! এরকমও অর্থ হতে পারে যে— সম্রাট বললেন, হে সিরিয়াবাসীগণ! ইউসুফের উপর তোমরা এক সময় অকথ্য

www.eelm.weebly.com

অত্যাচার চালিয়েছিলে। কিন্তু তোমরা জানতে না, এর প্রতিফল কি হবে। সেই মহা অপরাধ থেকে বিশুদ্ধচিত্তে তওবা করা প্রয়োজন। এখনকি তোমরা তওবা করবে না?

এখানে 'ইয্ আনতুম জাহিলূন' কথাটির অর্থ— যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ বা অপরিণামদর্শী। একথার মাধ্যমে হজরত ইউসুফ তাঁর ভাইদেরকে তওবার প্রতি উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এ বক্তব্যটি তিরস্কারার্থক নয়। বরং সৌহার্দ প্রকাশক। পরবর্তী আয়াতে (৯২) একথা আরো খোলাখোলিভাবে বলা হয়েছে এভাবে— 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।'

কালাবী বলেছেন, সম্রাট ইউসুফ তখন বলেছিলেন, হে দূরাগত পথিকবর্গ! তোমাদের কি ওই দিনের কথা মনে পড়ে, যখন তোমরা অন্ধকূপ থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত ইউসুফকে দাস হিসেবে বিক্রি করার জন্য নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করেছিলে? তখন মালেক বলেছিলো, আমি এই সুন্দর বালকটিকে পেয়েছি একটি কূপ থেকে এবং আমি তাকে ক্রয় করেছি এতো দিরহামে। হজরত ইউসুফের ভাইয়েরা বললো, মহামান্য সম্রাট! সেই ক্রীতদাসকে তো বিক্রয় করেছিলাম আমরাই। একথা শুনে সম্রাট ইউসুফ ক্রোধান্বিত হলেন। নির্দেশ দিলেন, এদের শিরশ্ছেদ করা হোক। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো জল্লাদ বাহিনী। তারা হজরত ইউসুফের ভাইদেরকে নিয়ে চললো বধ্যভূমির দিকে। যেতে যেতে ইয়াহুদা বললো, কয়েক যুগ ধরে আমাদের মহান পিতা তাঁর এক পুত্রের শোকে মরণোন্মুখ। দৃষ্টিক্ষমতারহিত। এবার তাঁর নিকটে পৌঁছবে সকল সন্তানের মৃত্যু সংবাদ। হায় ! কী নিদারুণ অবস্থা হবে তখন তাঁর। একথা শুনে থমকে দাঁড়ালো সকলে। সম্রাটের নিকটে নিবেদন করলো, হে মহামান্য নরপতি! আমাদের শেষ অনুরোধটি দয়া করে রক্ষা করবেন। আমাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর আমাদের জিনিস-পত্রগুলো পৌঁছে দিবেন আমাদের মহান পিতার নিকটে। সম্রাট ইউসুফ একথা শুনে নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। কেঁদে ফেললেন এবং বললেন আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে ফারওয়া বলেছেন, বিনইয়ামিনকে যখন চুরির দায়ে মিসরে আটকে রাখা হলো, তখন হজরত ইয়াকুব মিসররাজের নিকটে প্রেরণ করলেন একটি পত্র। পত্রটি ছিলো এরকম— আল্লাহ্র বান্দা ইয়াকুব ইবনে ইসহাক জবীহুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম খলিলুল্লার পক্ষ থেকে— আল্লাহ্পাকের জন্য সকল পবিত্রতা ও প্রশংসা। পর সমাচার এই যে, যে পরিবারে বিপদাপদ নিত্যদিনের ভূষণ, আমি সেই পরিবারের লোক। আমার পিতামহ নবী ইব্রাহিমকে হাত-পা বেঁধে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো অগ্নিকুণ্ডে। আল্লাহ্ সেই অগ্নিকুণ্ডকে তাঁর জন্য করে দিয়েছিলেন শীতল ও

www.eelm.weebly.com

শান্তিদায়ক। আমার মহান পিতাকে চোখ ও হাত পা বাঁধার পর তাঁর কণ্ঠদেশে চালানো হয়েছিলো ছুরি। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাঁর স্থলে জবাই হয়ে গিয়েছিলো স্বর্গ থেকে প্রেরিত একটি দুম্বা। আর আমার বিপদ আরো প্রলম্বিত ও অসহনীয়। আমার কলিজার টুকরা ইউসুফকে তাঁর সৎভাইয়েরা বিজন বনে নিয়ে গিয়ে নিরুদ্দেশ করেছিলো। তখন তারা আমাকে দেখালো শুধু তার রক্তমাখা অঙ্গাবরণ। বললো, বনের বাঘ নাকি তাকে ভক্ষণ করেছে। তার জন্য কাঁদতে কাঁদতে এখন আমি প্রায়ান্ধ। তার কনিষ্ঠ সহোদরই ছিলো আমার একমাত্র সান্ত্বনা। কিন্তু হে নৃপতি ! আপনি তাকে আটক করে রাখলেন কেনো? কী অপরাধ তার? চুরি? চুরি সে তো করতেই পারে না। আমাদের বংশে চোরের জন্ম অসম্ভব। অতএব হে মিসরের নৃনায়ক! সত্বর বিনইয়ামিনকে মুক্তি দিন। নতুবা শোকাকুল পিতার নিষ্পাপ নয়ণমনিকে যে বন্দী করেছে তার জন্য অপপ্রার্থনা করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় থাকবে না। আর ওই বদদোয়ার প্রতিক্রিয়া চলতে থাকবে আপনার অধঃস্তন সাত পুরুষ পর্যন্ত। পত্রটি পাঠ করে সম্রাট ইউসুফ আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলেন না। দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো বাঁধ ভাঙা অশ্রুর প্রপাত। প্রবেশ করলেন রাজদরবারে। ভাইদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা কি জানো, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে অপরিণামদর্শী?' কেউ কেউ এখানকার 'জাহিলূন' শব্দটির অর্থ করেছেন— অপরাধী, পাপী। হাসান বসরী বলেছেন, শব্দটির মাধ্যমে হজরত ইউসুফ তাঁর ভাইদেরকে একথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, ইউসুফের প্রতি তোমাদের নির্মম আচরণের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে যুবক। আর যখন যৌবনের দুর্বিনীত অজ্ঞতায় ছিলে নিমজ্জিত।

এর পরের আয়াতে (৯০) বলা হয়েছে—'তারা বললো, তবে কি তুমিই ইউসুফ?' প্রশ্নটি ইতিবাচক। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, সম্রাট ইউসুফ তার ভাইদের সঙ্গে ইতোপূর্বে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলতেন। কিন্তু 'তোমরা কি জানো তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কী আচরণ করেছিলে' বলার সময় তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। উন্মুক্ত করলেন মুখাবয়ব। তখনই তাঁকে চিনতে পারলো তার ভাইয়েরা। সবিস্ময়ে বললো, তবে কি তুমিই ইউসুফ!

আমি বলি, কাহিনীর পূর্বাপর বিবরণে ইবনে ইসহাকের বক্তব্যের সমর্থন নেই। আর বিষয়টি সাধারণ বিচার বিবেচনার অনুকূলও নয়। তাছাড়া জুহাক কর্তৃক বিবৃত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন কথা বলার সময় হজরত ইউসুফ মৃদু হেসেছিলেন। উন্মোচিত হয়েছিলো তাঁর শাদা মুক্তাসদৃশ দন্তরাজি। তাই দেখে তাঁকে চিনতে পেরেছিলো তাঁর ভাইয়েরা।

www.eelm.weebly.com

আতা কর্তৃক বিবৃত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উষ্ণীষ উন্মোচন না করা পর্যন্ত তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে চিনতে পারেনি। জন্ম থেকে তাঁর কপালের একপাশে ছিলো অতি ক্ষুদ্র একটি মাংশপিণ্ড। ওইরূপ ক্ষুদ্র মাংশপিণ্ড ছিলো তাঁর পিতা, পিতামহ এবং পিতামহের মাতা অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিমের সহধর্মিণী হজরত সারার কপালেও। বংশগত ওই নিদর্শনটি দেখেই তাঁর ভাইয়েরা উল্লসিত হয়ে বলে উঠেছিলো, নিশ্চয় তুমিই ইউসুফ। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, হজরত ইউসুফের ভ্রাতাগণ এরকম নিশ্চয়তার সাথে কথা বলেনি। সংশয়িত কণ্ঠে বলেছিলো, তবে তুমি ইউসুফ না কি?

এরপর বলা হয়েছে—'সে বললো, আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর; আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।' ভাইদের প্রশ্নের জবাব তিনি দিলেন এভাবে। আত্মপরিচয় দানের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অনুজ বিনইয়ামিনের কথাও বললেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্ আমার ও আমার অনুজের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি সাবধানী এবং ধৈর্যশীল সে-ই সৎকর্মপরায়ণ এবং আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।' একথার অর্থ— যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে মুক্ত, তাঁর নির্দেশ সমূহের প্রতি সতত অনুগত এবং বিপদে ধৈর্য অবলম্বনকারী, তারাই পুণ্যকর্মপরায়ণ। আর আল্লাহ এ ধরনের পুণ্যকর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না। ইহকালেও না পরকালেও না। এখানে 'আজরাল মুহ্সিনীন' বলে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, যারা সাবধানী বা ধর্মভীরু এবং যারা ধৈর্যশীল, তারাই পুণ্যকর্মপরায়ণ।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৯১, ৯২, ৯৩

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ ۝ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ
عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۗ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ
هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

❒ উহারা বলিল, 'আল্লাহের শপথ! আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাকে আমাদিগের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন এবং আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম।'

❒ সে বলিল, 'আজ তোমাদিগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

❒ 'তোমরা আমার এই জামাটি লইয়া যাও এবং ইহা আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রাখিও; তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইবেন। তোমাদিগের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট লইয়া আইস।'

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইউসুফের ভাইয়েরা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি রূপে ও গুণে বিশ্বের বিস্ময়। ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানে আল্লাহ্‌পাক তোমাকে করেছেন মহিমান্বিত। আমরা প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে তোমার মর্যাদাকে অবমাননা করেছি। তাই আজ অকপটে স্বীকার করছি আমাদের অপরাধ।

পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— সে বললো, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। এখানে 'তাছ্রীব' অর্থ অক্ষিগোলকের পর্দা অপসারণ করে দেয়া। রূপক অর্থ অভিশাপ দেয়া বা তিরস্কার করা। অর্থাৎ অপরাধীকে লাঞ্ছিত করা। এভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে— হজরত ইউসুফ বললেন, হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ! কৃত অপরাধের জন্য আমি আজ তোমাদেরকে অভিশাপ দিতে পারতাম। তিরস্কৃতও করতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করলাম না। ভবিষ্যতেও এরকম করবো না। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— আমি তোমাদেরকে আজ সর্বান্তকরণে মার্জনা করে দিলাম। আল্লাহ্‌ও যেনো তোমাদেরকে মার্জনা করেন। তিনি ক্ষমাপরবশ ও দয়ালু। আমি মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও যখন মার্জনা করলাম তখন চির অমুখাপেক্ষী ও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু আল্লাহ্‌ও নিশ্চয় তোমাদেরকে মার্জনা করবেন।

বায়যাবী লিখেছেন, হজরত ইউসুফকে চিনতে পেরে তার ভাইয়েরা বললো, তুমি আমাদেরকে সকাল-সন্ধ্যা আহারের জন্য ডেকে থাকো। অথচ কতো অবোধ আমরা। তোমার মতো উদারচিত্ত ভাইয়ের সঙ্গে কী অন্যায় আচরণই না আমরা করেছি। প্রত্যুত্তরে হজরত ইউসুফ বললেন, হে আমার অগ্রজবর্গ! আজ তোমাদের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার পর মিসরবাসীরা জানতে পারলো যে, আমি ইব্রাহিমের মতো মহান নবীর বংশধর নবী ইয়াকুবের পুত্র। মিসরবাসীরা তো আমাকে জানে অন্য পরিচয়ে। তারা বলে, কুড়ি দিরহাম মূল্যের ক্রীতদাসের কি সৌভাগ্য দেখো। আল্লাহ্ তাকে কোথায় সমাসীন করেছেন! হে প্রিয় ভ্রাতৃবর্গ ! তোমাদের কারণেই আজ তারা জানতে পারলো আমার প্রকৃত পরিচয়। তা হলে কেনো আমি তোমাদের সমাদর করবো না।

বাগবী লিখেছেন, পরিচয়পর্ব শেষ হওয়ার পর হজরত ইউসুফ জানতে চাইলেন মহান পিতার সমাচার। ভ্রাতাগণ বললো, তোমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি অন্তর্হিতপ্রায়। হজরত ইউসুফ বললেন, পিতাসহ পরিবারের সকলকে নিয়ে তোমরা এখানে এসে পড়ো। একথাই বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (৯৩) এভাবে—

www.eelm.weebly.com

'তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার মুখমণ্ডলে রেখো; তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট নিয়ে এসো' একথার অর্থ— হজরত ইউসুফ বললেন, আমার এই জামাটি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। জামাটি তোমরা নিয়ে গিয়ে আমার পিতার মুখমণ্ডলে রেখে দিয়ো। তাহলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। তারপর তোমরা পিতা ও তোমাদের পরিবারের সকল সদস্যসহ স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে এখানে চলে এসো।

হাসান বলেছেন, হজরত ইউসুফ নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, হজরত ইয়াকুব পুনরায় দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হবেন। এরকম কথা তিনি নিজে থেকে বলেননি। মুজাহিদ বলেছেন, হজরত জিবরাইল তাঁকে বলেছিলেন, হে নবী ইউসুফ ! আপনি আপনার ওই বিশেষ পরিধেয়টি আপনার পিতার নিকটে পাঠিয়ে দিন। আল্লাহ্ এরকম নির্দেশ করেছেন। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ওই পরিধেয় বস্ত্রটি ছিলো হজরত ইব্রাহিমের। যখন তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো, তখন হজরত জিবরাইল ওই রেশমী অঙ্গাবরণটি পরিয়ে দিয়েছিলেন হজরত ইব্রাহিমকে। এরপর থেকে ওই অঙ্গাবরণখানি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন হজরত ইসহাক। তারপর হজরত ইয়াকুব। তিনি ওই বেহেশতী বস্ত্রটি বালক ইউসুফের গলদেশে তাবিজ বানিয়ে ঝুলিয়ে দেন। জামাটি ছিলো স্বর্গীয় সুবাসে সুবাসিত। হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে বললেন, হে নবী ইউসুফ ! আপনার তাবিজের মধ্যে রক্ষিত বস্ত্রখানি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। বস্ত্রখানির মধ্যে রয়েছে সকল রোগের নিরাময়। হজরত ইউসুফ একথা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ তাবিজের ভিতর থেকে বস্ত্রটি বের করলেন এবং ভাইদের হাতে দিয়ে বললেন, আপনারা এই জামাটি পিতার মুখের উপরে রাখবেন। তাহলে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন।

আমি বলি, হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির আত্মিক দর্শনের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হজরত ইউসুফের অবয়ব ও সৌন্দর্যচ্ছটা ছিলো জান্নাতী। যদি তাই হয়, তবে হজরত ইউসুফের জামাটি যে জান্নাতী জামা ছিলো, সেকথা প্রমাণের আর আবশ্যক হয় না। এটুকু বললে যথেষ্ট হয় যে, জামাটি ছিলো হজরত ইউসুফের অর্থাৎ তিনি যখন জান্নাতী অবয়ব বিশিষ্ট তখন তাঁর পরিধেয় বস্ত্রে জান্নাতী প্রভাব তো থাকবেই।

www.eelm.weebly.com

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ○ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ○ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ○ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

❒ অতঃপর যাত্রীদল যখন মিশর হইতে বাহির হইয়া পড়িল তখন উহাদিগের পিতা বলিল, 'তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর তবে আমি বলিব যে, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাইতেছি।'

❒ উপস্থিত ব্যক্তিগণ বলিল, 'আল্লাহের শপথ! আপনি তো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রহিয়াছেন।'

❒ অতঃপর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হইল এবং তাহার মুখমণ্ডলের উপর জামাটি রাখিল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল। সে বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে আমি আল্লাহের নিকট হইতে জানি যাহা তোমরা জান না?'

❒ উহারা বলিল, 'হে আমাদিগের পিতা! আমাদিগের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আমরা তো অপরাধী।'

❒ সে বলিল,'আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইউসুফের ভ্রাতারা ওই অলৌকিক জামাটি নিয়ে যখন গৃহাভিমুখে যাত্রা শুরু করলো, তখন সুদূর সিরিয়ার কেনান অঞ্চলে বসে হজরত ইয়াকুব তাঁর কাছে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না করো, তবে আমি বলতে চাই, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। পিতা-পুত্রের মিলনলগ্ন আসন্ন। লক্ষণীয় যে, এখানে ইউসুফের জামার ঘ্রাণ বলা হয়নি। বলা হয়েছে ইউসুফের ঘ্রাণ। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত ইউসুফের সুরভি ছিলো জান্নাতের সুরভি। জামার নিজস্ব কোনো সুরভি নয়।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, প্রত্যুষের সমীরণ আল্লাহ্পাকের অনুমোদনক্রমে প্রত্যাবর্তনকারী যাত্রীদলের গৃহগমনের পূর্বেই হজরত ইয়াকুবের নিকটে পৌঁছে দিয়েছিলো শুভসংবাদটি।

মুজাহিদ বলেছেন, যাত্রীদল তিনদিনের পথের দূরত্বে অবস্থানকালেই হজরত ইয়াকুব পেয়েছিলেন প্রিয়পুত্রের অঙ্গাবরণের সুবাস। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আট রাতের দূরত্বের কথা। এরকমও বলা হয়েছে যে, প্রভাতের বাতাসই জান্নাতী জামাটির আগাম সুবাস পৌঁছে দিয়েছিলো হজরত ইয়াকুবের নিকটে। হজরত ইব্রাহিম কর্তৃক প্রাপ্ত ওই জামাটি ছিলো জান্নাতাগত। বহুদূর থেকে ওই জামার সুগন্ধ পেয়েই হজরত ইয়াকুব দৃঢ় প্রতীতির সঙ্গে বলেছিলেন 'আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।'

এখানে 'ফান্‌দুন' শব্দটির অর্থ অপ্রকৃতিস্থ, বয়সজনিত বুদ্ধিবিকৃতি। আর 'তাফনিদ' অর্থ, কাউকে অপ্রকৃতিস্থ স্থির করা। একারণেই বৃদ্ধাকে বলা হয় 'আজুজুন মুফান্‌নাদাতুন' (নির্বোধ বৃদ্ধা)। সাধারণতঃ সকল বয়সের নারীকে এরকম সম্বোধন করা হয়ে থাকে। কারণ স্বভাবগতভাবেই তারা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্না। এখানে 'লাওলা' এর জবাব উহ্য। অর্থাৎ হজরত ইয়াকুবের বক্তব্যটি ছিলো এরকম, যদি তোমরা আমাকে নির্বোধ, অপ্রকৃতিস্থ বা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মনে না করো, তবে বলতে চাই ইউসুফের সঙ্গে আমার মিলনকাল অত্যাসন্ন। কারণ আমি তার সুবাস পাচ্ছি।

পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'উপস্থিত ব্যক্তিগণ বললো, আল্লাহ্র শপথ! আপনি তো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন। একথার অর্থ— উপস্থিত লোকেরা বললো, হে নবী ইয়াকুব! আপনি তো ইউসুফ ইউসুফ করেই জীবনপাত করলেন। এখনও সেই বিভ্রান্তির মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে চলেছেন। এখানে 'দ্বলাল' শব্দটির অর্থ বিভ্রান্তি। অর্থাৎ ইউসুফ-মিলনের বিভ্রম।

এর পরের আয়াতে (৯৬) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হলো এবং তার মুখমণ্ডলের উপর জামাটি রাখলো, তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো।'

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, অভিযাত্রীদলের গৃহে প্রত্যাগমনের পূর্বেই শুভসংবাদ নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলো এক লোক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই লোকটির নাম ইয়াহুদা। ইয়াহুদা বলেছিলো, ইউসুফের রক্তমাখা জামা আমি প্রথমে পিতাকে দেখিয়েছিলাম। বলেছিলাম, ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। এভাবে দুঃসংবাদ প্রদান করে আমিই প্রথমে মহান পিতাকে করে তুলেছিলাম দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাই আমিই প্রথমে শুভসংবাদ প্রদান করে তাঁকে

www.eelm.weebly.com

করে তুলবো প্রসন্ন। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, হজরত ইউসুফের জামা নিয়ে তিনি দৌড় দিয়েছিলেন দেশের দিকে। সঙ্গে নিয়েছিলেন মাত্র সাতটি রুটি। সুদীর্ঘ আশি ফরসখ দূরত্বের পথ অতিক্রম করে গৃহে পৌঁছে গিয়েছিলেন রুটি নিঃশেষ হওয়ার পূর্বে। কেউ কেউ বলেছেন, ওই শুভসমাচার প্রদাতা ছিলো মালেক বিন ওয়ারছিলা। এখানে 'ফারতাদ্দা বসীরা' কথাটির অর্থ হজরত ইয়াকুব পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। দূর হয়ে গেলো তাঁর বার্ধক্যজনিত অবসাদ।

তারপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহ্র নিকট থেকে জানি, যা তোমরা জানো না।' এ কথার অর্থ— হজরত ইয়াকুব বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, ইউসুফ জীবিত এবং তার সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটবেই? একথাও কি বলিনি যে, আল্লাহ্র রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না? একথাও তো বলেছি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। এ সকল তথ্য ও তত্ত্ব আল্লাহ্ই আমাকে জানিয়েছেন। কিন্তু তোমরা এসকল রহস্য সম্পর্কে অবগত নও। বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইয়াকুব শুভসমাচার প্রদাতাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো ইউসুফ কেমন আছে? সে বললো , ইউসুফ তো এখন মিসরের মহামান্য সম্রাট। হজরত ইয়াকুব বললেন, সেটা কোনো বড় কথা নয়। তোমরা আমাকে বলো, সে বর্তমানে কোন ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত? শুভসমাচার দাতা বললো, আল্লাহ্র মনোনীত ধর্মের উপর। তিনি বললেন, তবে তো পূর্ণ হয়েছে আল্লাহ্র নেয়ামত।

এর পরের আয়াতে (৯৭) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আমরা তো অপরাধী।' একথার অর্থ— গৃহে আগমনের পর হজরত ইউসুফের ভাইয়েরা বললো, হে আমাদের মহান পিতা! আপনাকে ও ইউসুফকে কষ্ট দিয়ে মহা অপরাধ করেছি আমরা। এজন্য আল্লাহ্র দরবারে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আপনিও আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

এর পরের আয়াতে (৯৮)বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' প্রখ্যাত তাফসীরবিদগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হজরত ইয়াকুব সঙ্গে সঙ্গে দোয়া করেননি। অপেক্ষা করেছিলেন সেহেরীর সময় পর্যন্ত। কারণ সেহেরীর সময় হচ্ছে দোয়া কবুলের প্রকৃষ্ট সময়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমাদের প্রভুপালক রজনীর তৃতীয় প্রহরে আবির্ভূত হন প্রথম আকাশে এবং

www.eelm.weebly.com

ঘোষণা করেন, কে আমাকে এখন আহ্বান করতে চাও, আহ্বান করো। কে আমার কাছে যাচ্ঞা করতে চাও, যাচ্ঞা করো। আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করবো। ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাও কে? ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমি তোমাকে ক্ষমা করবো। হজরত ইয়াকুব তাই নিশীথের তৃতীয় যামে নামাজে দণ্ডায়মান হলেন। নামাজ সমাপনান্তে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করলেন তাঁর পবিত্র দুই হাত। নীরবে নিভৃতে নিবেদন করলেন, হে পরওয়ার দিগারে বেনীয়াজ! হে পরিত্রাতা! হে নিঃস্ব জনের সহায়! ইউসুফের জন্য যে ধৈর্যচ্যুতি আমার ঘটেছে, তা তুমি মাফ করে দাও। ইউসুফ ও আমার সঙ্গে আমার যে সকল সন্তান দুর্ব্যবহার করেছে, তাদের অপরাধও মার্জনা করো। প্রার্থনা শেষ হতে না হতেই আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলেন, আমি মার্জনা করে দিলাম, তোমাকে ও তোমার সন্তানদেরকে।

ইকরামা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো,' কথাটির অর্থ হবে— আমি তোমাদের জন্য দোয়া করবো শুক্রবার রাতে। ওয়াহাব বলেছেন, হজরত ইয়াকুব তাঁর পুত্রদের জন্য কুড়ি বছরেরও অধিক সময় ধরে প্রতি শুক্রবার রাতে দোয়া করেছিলেন। তাউস্ বলেছেন, শুক্রবার রাতে সেহেরীর সময় দোয়া করবেন বলে হজরত ইয়াকুব তাঁর দোয়া বিলম্বিত করেছিলেন। ভাগ্যক্রমে শুক্রবারের ওই রাত্রিটি ছিলো দশই মহররমের রাত্রি। শা'বী বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির মর্ম হচ্ছে— আমি ইউসুফকে বলবো, সে যেনো তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়। সে ক্ষমা করার পর আমি তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো আল্লাহ্পাকের দরবারে। কারণ যার অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে, সে ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না। পুত্রগণ প্রকৃতই অনুতপ্ত কিনা এবং আন্তরিকভাবে তারা ক্ষমাপ্রার্থী কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যই হজরত ইয়াকুব বিলম্বিত করেছিলেন তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনাকে।

ইমাম নববী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, সম্রাট ইউসুফ শুভসমাচারবাহী যাত্রীদলের সঙ্গে উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন দুইশত উট ও অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যেনো তাঁর মহান পিতার পরিবারের সকল সদস্য নির্বিঘ্নে পৌঁছতে সক্ষম হয় মিসরে।

হজরত ইয়াকুব মিসর যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। নারী পুরুষ মিলে যাত্রীদলের সংখ্যা দাঁড়ালো বায়াত্তর। মাকরুস্ বলেছেন, বিশাল পরিবারের তিনশত নব্বই জন সদস্য সমভিব্যাহারে হজরত ইয়াকুব যাত্রা করলেন মিসর অভিমুখে। রাজধানীর উপকণ্ঠে পৌঁছে দেখতে পেলেন, মিসরের সম্রাট তাঁর সভাসদবর্গ ও চার হাজার সৈন্যসহ তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এগিয়ে আসছেন। সাধারণ জনতাও যোগ দিয়েছে তাঁদের সঙ্গে। ইয়াহুদার কাঁধে ভর

www.eelm.weebly.com

দিয়ে পদব্রজে অগ্রসর হলেন হজরত ইয়াকুব। বিপুল সংখ্যক মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে ইয়াহুদা! এতো লোক কেনো? ওরা কি সকলেই ফেরাউন? ইয়াহুদা বললো, না, ওরা হচ্ছে আপনার প্রিয় পুত্রের পারিষদবর্গ ও প্রজাসাধারণ।

সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৯৯

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ○

❒ অতঃপর উহারা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল তখন সে তাহার পিতা-মাতাকে আলিংগন করিল এবং বলিল, 'আপনারা আল্লাহের ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করুন।'

অভ্যর্থনা কেন্দ্র স্থাপন করা হলো শহরের বাইরে। মহামান্য পিতা এবং মহান পুত্র অগ্রসর হলেন একে অপরের দিকে। শেষ হয়ে এলো শোক ও সন্তাপের সুদীর্ঘ অধ্যায়। বিরহের অমা-বিভাবরী শেষে এলো মহা মিলনের আলোকজ্জ্বল প্রত্যুষ। পিতা ও পুত্রের হৃদয়ে ছায়াপাত করে চললো অতীতের শত সহস্র স্মৃতি। সেই বাল্যবেলা। পিতৃবক্ষের স্বর্গীয় স্নেহচ্ছায়া। ভাইদের চক্রান্ত। অন্ধকূপ। বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে মিসর যাত্রা। আজিজের আশ্রয়। আজিজ-পত্নীর ষড়যন্ত্র। কারাগার। সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ। ওদিকে পিতার বিরতিহীন রোদনার্ত জীবন। বিরামহীন অশ্রুপাত ও ধৈর্য। বিরতিবিহীন ধৈর্য ও অশ্রুপাত। এভাবেই তো হারিয়ে গিয়েছিলো চোখের জ্যোতি। কিন্তু প্রতীক্ষার প্রদীপ ছিলো সতত প্রোজ্জ্বল। সেই অশ্রুভেজা প্রতীক্ষার অবসান হলো আজ। অশীতিপর বৃদ্ধ মহান নবী হজরত ইয়াকুব ইয়াহুদার স্কন্ধে ভর দিয়ে এগিয়ে গেলেন। এগিয়ে এলেন পুত্র ইউসুফ। ভুলে গেলেন, তিনি বিশাল মিসর সাম্রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা। আজ তিনি ফিরে পেয়েছেন মিসরের চেয়ে, বরং সারা বিশ্বের চেয়ে অধিক বিশাল চিরন্তন পিতৃস্নেহের হৃত সাম্রাজ্যের অমূল্য অধিকার। বাকরুদ্ধ পিতা-পুত্র পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। অভিবাদন, প্রত্যাভিবাদন কোনো কিছুই উচ্চারিত হতে পারলো না বাকরুদ্ধ পিতা-পুত্রের কণ্ঠে। মহামিলনের আনন্দে উল্লসিত হলো আল্লাহ্‌র আরশ। ফেরেশতারা ভুলে গেলো তাদের যথাকর্তব্য। আর যিনি এই মহামিলন ঘটালেন, সেই পবিত্র সত্তার পক্ষ থেকে এই মিলনমেলায় বর্ষিত হতে থাকলো অজস্র-অসংখ্য-অগণনীয় দয়া ও রহমত।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইউসুফ প্রথমে অভিবাদন জানাতে চেয়েছিলেন পিতাকে। কিন্তু হজরত জিব্‌রাইল তখন বলেছিলেন, না। তাঁকেই প্রথমে সালাম করতে দিন।

আমি বলি, হজরত ইউসুফ তখন ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রেমে আসক্তা নিমজ্জিত। তাই পিতাকে সালাম করার ইচ্ছা তখন তাঁর হৃদয়ে ছায়াপাত করতে পারেনি। হজরত ইয়াকুবই প্রথমে সালাম বলেছিলেন এভাবে— হে শ্রান্তিহারক স্নেহাস্পদ সন্তান! তোমার উপর বর্ষিত হোক শান্তি কেবলই শান্তি।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমে সেই মহামিলনের বিবরণ দেয়া হয়েছে এভাবে— 'অতঃপর তারা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হলো, তখন সে তার পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করলো।' অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এখানে 'মাতা' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত ইউসুফের খালাকে। কারণ তাঁর জন্মদাত্রী জননী পরলোকগমন করেছিলেন বিনইয়ামিনের জন্মের পর পর। যেমন অন্য এক আয়াতে পিতামহ, প্রপিতামহ সকলকেই পিতা বলা হয়েছে এভাবে— আবাইকা ইব্‌রহীমা ওয়া ইসমাঈলা ও ইসহাক। এখানেও মাতৃতুল্য হিসেবে খালাকে বলা হয়েছে মা। হজরত ইউসুফের ওই খালার নাম ছিলো লাইয়া। এরকমও বলা যেতে পারে যে, হজরত ইয়াকুব প্রথম স্ত্রীর পরলোকগমনের পর বিবাহ করেছিলেন স্ত্রীর ছোট বোন লাইয়াকে। সেই হিসেবে তিনি ছিলেন হজরত ইউসুফের মা। ওই খালাই ছিলেন তাঁর প্রতিপালনকারিণী। সেদিক থেকেও তিনি মাতৃতুল্য বটেন।

হাসান বসরী বলেছেন, এখানে হজরত ইউসুফের জন্মদাত্রী জননীর কথাই বলা হয়েছে। কারণ তিনি তখনও জীবিত ছিলেন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁর মাকে পুনর্জীবিত করে দিয়েছিলেন। আর তিনিও ছিলেন তখন হজরত ইয়াকুবের সহযাত্রী। এভাবে মাতা-পিতা দু'জনের সঙ্গেই মিলন হয়েছিলো হজরত ইউসুফের।

বাগবী লিখেছেন, তখন পিতা-পুত্র বুকে বুক রেখে জড়িয়ে ধরেছিলেন পরস্পরকে। সুফিয়ান সওরী লিখেছেন, তাঁরা তখন করেছিলেন গলাগলি। আর কেঁদেছিলেন অঝোর নয়নে। পুত্র বলেছিলেন, হে আমার পিতা! আমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে আপনি প্রায়ান্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কেনো? এজগতে দেখা না হলেও ওই জগতে তো আমাদের সাক্ষাত ঘটতোই। পিতা বলেছিলেন, প্রিয় পুত্র আমার! আমি তো তোমার ধর্মভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কাতেই কেঁদে কেঁদে মরতাম। ভাবতাম, ধর্মভ্রষ্ট হয়ে গেলে তোমাকে তো আমি হারিয়ে ফেলবো চিরকালের জন্য।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বললো, আপনারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।' একথার অর্থ— হজরত ইউসুফ আরো বললেন, স্বাগতম! স্বাগতম। এবার আপনারা চলুন নগরাভ্যন্তরে, যদি আল্লাহ্ এরকম ইচ্ছা করেন। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— শেষ হলো আপনাদের দুষ্কালের দিবস-রজনী। এখন থেকে আপনারা নিরাপদ। উল্লেখ্য যে, তখন রাজানুমতি ব্যতিরেকে কেউ নগরমধ্যে প্রবেশ করতে পারতো না।

একটি সন্দেহঃ উদ্‌খুলু (প্রবেশ করুন) শব্দটি আদেশসূচক। কিন্তু এর সঙ্গে এখানে যোগ করা হয়েছে 'ইনশাআল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়) কথাটি। এভাবে অভিপ্রায় ও আদেশের একত্র উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কারণ আদেশের মাধ্যমেই আদিষ্ট বিষয় অপরিহার্য হয়। এর সঙ্গে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় সংযুক্ত হলে আদেশজাত অপরিহার্যতা আর থাকে না। তা হলে এখানে ইন্ (যদি) শব্দটি বসানো হলো কেনো?

সন্দেহভঞ্জনঃ এখানে 'ইনশাআল্লাহ্' (যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন) কথাটির সম্পৃক্তি ঘটেছে নিরাপদে প্রবেশ করার সঙ্গে। কেবল প্রবেশ করার সঙ্গে নয়। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়— আপনারা শহরে প্রবেশ করুন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে আপনাদের এই প্রবেশ হবে নিরাপদ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'লা তাদ্‌খুলুন্নাল মাসজিদাল হারামা ইনশাআল্লহু আমিনীন (তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবিষ্ট হবে, আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় হলে নিরাপদে)।

কেউ কেউ বলেছেন, 'ইন' (যদি) শব্দটি এখানে শর্তপ্রকাশক শব্দ হিসেবে ক্রিয়ার আধাররূপে ইজ (যখন) অর্থে ব্যবহৃত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া আনতুমুল আ'লাউনা ইন কুনতুম মু'মিনুন' (তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ, যখন তোমরা হবে মুমিন)। এখানেও 'ইন' ব্যবহৃত হয়েছে 'ইজ' অর্থে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে বক্তব্যের মধ্যে কিছু অগ্রপশ্চাৎ বিদ্যমান। অর্থাৎ এখানে ইনশাআল্লাহ্ কথাটির সম্পর্ক ঘটেছে আগের আয়াতের 'সাওফা তাস্‌তাগফিরুলাকুম' কথাটির সঙ্গে। তাই আগের আয়াতের 'আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবো' কথাটির মূল রূপ হবে— 'ইনশাআল্লাহ্ আমি আমার প্রভুপালকের নিকটে তোমাদের জন্য করবো ক্ষমাপ্রার্থনা।'

 www.eelm.weebly.com

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا
تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي
مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَ
بَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○

❒ এবং ইউসুফ তাহার মাতা-পিতাকে উচ্চাসনে বসাইল এবং উহারা সকলে তাহার প্রতি সিজ্‌দায় লুটাইয়া পড়িল। সে বলিল, 'হে আমার পিতা! ইহাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার প্রতিপালক উহা সত্যে পরিণত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া এবং শয়তান আমার ও আমার ভ্রাতাদিগের সম্পর্ক নষ্ট করিবার পরও আপনাদিগকে মরু অঞ্চল হইতে এখানে আনিয়া দিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা তাহা নিপুণতার সহিত করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং ইউসুফ তার মাতাপিতাকে উচ্চাসনে বসালো এবং তারা সকলে তার প্রতি সেজদায় লুটিয়ে পড়লো।' এখানে 'রাফাআ' অর্থ উচ্চাসনে সমাসীন করা। 'ইউসুফের প্রতি সেজদায় লুটিয়ে পড়লো' কথাটির অর্থ— সসম্ভ্রমে তাঁর প্রতি মস্তক অবনত করলো। কিন্তু এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'খর্‌রু' শব্দটি। এর অর্থ— মৃত্তিকায় মস্তক স্থাপন করে সেজদা করা। তাই কেউ কেউ বলেছেন, যেভাবে আল্লাহ্‌কে সেজদা করা হয়, সেভাবেই হজরত ইউসুফের পিতা ও ভ্রাতাগণ তাঁকে সেজদা করেছিলেন। কিন্তু ওই সেজদার উদ্দেশ্য ছিলো হজরত ইউসুফের প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন। এভাবে সম্ভ্রম প্রদর্শন করাই ছিলো তখনকার শরিয়তের রীতি। এই রীতিটিকে আমাদের শরিয়ত রহিত করেছে। তাই শেষ উম্মতের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা সিদ্ধ নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ইউসুফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তাঁকে সামনে রেখে তাঁরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই সেজদাবনত হয়েছিলেন। তাই এখানে 'লাহূ' (তাঁর প্রতি) সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে। অর্থাৎ তাঁরা সেজদায় লুটিয়ে পড়েছিলেন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে, হজরত ইউসুফের উদ্দেশ্যে নয়।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যানুসারে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত ইউসুফ ছিলেন সেজদার উপলক্ষ আর লক্ষ্য ছিলেন আল্লাহ্। এবং তাঁকে উপলক্ষ স্থির করার নির্দেশটিও ছিলো আল্লাহ্র— যেমন আমাদের সেজদার উপলক্ষ বায়তুল্লাহ বা কাবা শরীফ কিন্তু লক্ষ্য আল্লাহ্। আর এই উপলক্ষ আল্লাহ্ই আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ফেরেশতারাও হজরত আদমকে সেজদা করেছিলেন এভাবে। তাঁদেরও সেজদার লক্ষ্য ছিলেন আল্লাহ্ এবং হজরত আদম ছিলেন উপলক্ষ মাত্র।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'লাহু' শব্দটির 'লা' হচ্ছে কারণ নির্দেশক আর 'হু' (তার) সর্বনামটি সম্পর্কিত হয়েছে হজরত ইউসুফের সঙ্গে। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— দীর্ঘ বিচ্ছেদ শেষে হজরত ইউসুফের সঙ্গে মিলনের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তারা সেজদাবনত হয়েছিলেন। এই ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক প্রকৃষ্ট। এখানে 'রাফাআ' শব্দটি 'খররু' শব্দের পূর্বে উদ্ধৃত হলেও আলোচ্য বাক্যের মর্মটি হবে এরকম— কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সকলে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং হজরত ইউসুফ তাঁর মাতাপিতাকে বসালেন সমুন্নত আসনে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার পিতা ! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার প্রতিপালক ওই স্বপ্নকে সত্যে প্রতিপন্ন করেছেন।' একথার অর্থ— বাল্যবেলায় আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, চন্দ্র-সূর্য ও এগারোটি নক্ষত্র আমাকে সেজদা করছে। সেই স্বপ্নই বাস্তবায়িত হলো আজ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এবং শয়তান আমার ও ভ্রাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করবার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।' একথার অর্থ— শয়তানই আমার ও আমার ভ্রাতাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলো। ফলে আমি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম কারাগারে। কিন্তু সে এবার পরাস্ত হয়েছে। তাইতো আমরা এভাবে মিলিত হতে পারলাম। আল্লাহ্ই আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে এনে এই মহামিলনের সুযোগ করে দিয়েছেন। এটা আমার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ।

লক্ষণীয় যে, হজরত ইউসুফ এখানে কারাগারের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অন্ধকূপের উল্লেখ করেননি। অথচ ওই অন্ধকূপের অবস্থানটি ছিলো কারাজীবন অপেক্ষা ভয়ঙ্কর এক অধ্যায়। এরকম করার কারণ হচ্ছে, হজরত ইউসুফ ভেবেছিলেন,অন্ধকূপের উল্লেখ করলে তাঁর ভাইয়েরা লজ্জিত হবেন ও অপমানবোধ করবেন। তাই তিনি তাঁদের সম্মুখে অন্ধকূপের কথা না বলে কেবল বলেছিলেন কারাগারের কথা। এটা ছিলো তাঁর স্বভাবগত শিষ্টাচারিতার চরম নিদর্শন। অথবা কেবল কারাগারের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন একারণে যে, তাঁর

www.eelm.weebly.com

অন্ধকূপ থেকে পরিত্রাণের পরের অধ্যায়টি ছিলো কলঙ্কময়। বহন করতে হয়েছিলো দাসত্ব ও অপবাদের বোঝা। কিন্তু কারাগার থেকে পরিত্রাণের পরের অধ্যায়টি ছিলো আলোকজ্জ্বল। লাভ হয়েছিলো রাজসিংহাসন। তাই পূর্বের কলঙ্কিত স্মৃতি অপেক্ষা পরের আলোকিত স্মৃতিই ছিলো উল্লেখযোগ্য। সে কারণেই তিনি আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে উল্লেখ করেছিলেন কেবল কারাগারের কথা।

'আলবাদউ' অর্থ চারণভূমি। মরু অঞ্চলেই এ ধরনের বিশাল চারণভূমি পরিদৃষ্ট হয়। তাই এখানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে মরু অঞ্চল। 'নাজ্গা' অর্থ— অনাসৃষ্টি। শয়তানই হজরত ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের মধ্যে এরকম অনাসৃষ্টি উৎপাদন করেছিলো। অর্থাৎ তাদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছিলো।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সঙ্গে করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' একথার অর্থ, হজরত ইউসুফ শেষে বললেন, আমার প্রতিপালক যেরকম অভিপ্রায় করেন, সেরকমভাবেই অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবস্থাপনা করেন সকল কিছুর। তাঁর নিকটে কঠিন বা অসম্ভব বলে কিছু নেই। কারণ তিনি তো অপার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার একক অধিকর্তা।

বাগবী লিখেছেন, এখানে 'লতীফ' শব্দটির অর্থ, মেহেরবান বা দয়ার্দ্র। বস্তুতঃ অতি নম্র ও শিষ্টাচারীশ্রেষ্ঠ পবিত্র সত্তাকে বলা যেতে পারে লতীফ। 'হুয়াল আ'লীম' অর্থ যিনি তাঁর যথাকর্তব্য সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত। আর 'হাকীম' অর্থ, প্রেক্ষিত ও সময়ানুসারে যিনি যথাযোগ্য ব্যবস্থাপনা গ্রহণে পূর্ণ সক্ষম।

বায়যাবী লিখেছেন, হজরত ইউসুফ তাঁর মাতা-পিতাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডার পরিদর্শন করালেন। হজরত ইয়াকুব এক স্থানে স্তূপিকৃত কাগজপত্র দেখে বললেন, এতো কাগজপত্র তোমার কাছে অথচ আমার নিকটে তো তুমি একটি পত্রও প্রেরণ করোনি। হজরত ইউসুফ বললেন, হজরত জিবরাইল আমাকে এরকমই পরামর্শ দিয়েছিলেন। পিতা বললেন, তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করোনি কেনো? পুত্র বললেন, আপনার সঙ্গেই তো তাঁর সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ঠ। আপনিই জিজ্ঞেস করুন না। হজরত ইয়াকুব হজরত জিবরাইলকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্ আমাকে এরকমই নির্দেশ করেছেন। যখন ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁকে চারণভূমিতে নিতে চেয়েছিলো তখন আপনি বলেছিলেন, 'আমি আশঙ্কা করি তোমরা তাঁর প্রতি অমনোযোগী হলে তাঁকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।' আপনি তখন আল্লাহ্র কথা স্মরণ না করে নেকড়ে বাঘের ভয় করেছিলেন।

বাগবী লিখেছেন, প্রিয় পুত্রের সান্নিধ্যে চব্বিশ বছর অতিবাহিত করার পর হজরত ইয়াকুব পরলোক গমন করলেন। ওই চব্বিশ বছর তাঁর জীবনে ছিলো কেবল অনাবিল সুখ। তাঁর মহাতিরোধান ঘটলো মিসরেই। অন্তিমযাত্রার সময়

www.eelm.weebly.com

প্রিয়পুত্র ইউসুফকে তিনি অসিয়ত করলেন, মহান পিতৃপুরুষগণের কবরস্থানে আমাকে সমাধিস্থ কোরো। হজরত ইউসুফ পিতৃআজ্ঞা পালন করলেন। পবিত্র মরদেহ সিরিয়ায় নিয়ে গিয়ে দাফন করলেন হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসহাকের কবরের পাশে। তারপর ফিরে এলেন মিসরে।

ইমাম আহমদ 'জুহুদ' গ্রন্থে লিখেছেন, মালেক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, অন্তিমকালে হজরত ইয়াকুব হয়ে পড়লেন চলচ্ছক্তিরহিত। পুত্রকে বললেন, হাতে কাপড় জড়িয়ে আমার পৃষ্ঠদেশে হস্ত স্থাপন করো। এই মর্মে অঙ্গীকার করো যে, আমাকে আমার পিতা ও পিতামহের অন্তিম বিশ্রামস্থলের পাশে সমাধিস্থ করবে। আমি পার্থিব কর্মকাণ্ডে তাঁদের অংশীদার ছিলাম। তাই পৃথিবী পরিত্যাগের পরেও তাঁদের সমাধিক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের সঙ্গে অবস্থান করতে চাই। বলা বাহুল্য, হজরত ইউসুফ তাঁর পিতার এই অন্তিম বাসনা পূরণ করেছিলেন। মহা তিরোধানের পর তাঁর কফিন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন বাইতুল মাকদিসে। যেদিন সেখানে পৌঁছলেন সেদিন হঠাৎ ইন্তেকাল করলেন ঈস। ঈস ছিলেন হজরত ইয়াকুবের জমজ সহোদর। দুই ভ্রাতাকে তিনি সমাধিস্থ করেছিলেন একই কবরে। উভয়ের বয়স হয়েছিলো তখন একশত সাতচল্লিশ বছর।

মহান পিতার মহাপ্রস্থান হজরত ইউসুফের চিন্তা চেতনাকে প্রবলভাবে নাড়া দিলো। তিনি ভাবতে শুরু করলেন পৃথিবীর জীবনের এইতো পরিণতি। স্বজন-বন্ধন ছিন্ন করে এভাবেই সকলকে চলে যেতে হয়। এ পৃথিবী তো চিরকালের নয়। উত্থান-পতন ভরা জীবনের শেষ অধ্যায় এখন। অনন্ত যাত্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন তিনি। প্রার্থনা জানালেন—

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১০১

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ○

❒ 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করিয়াছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়াছ। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে আত্মসমর্পণকারীর মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত কর।'

এখানে 'মিনাল মুল্‌ক' (রাজ্য) কথাটির 'মিন' অব্যয়টি আংশিক অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ তুমি আমাকে দান করেছো আংশিক বা অস্থায়ী রাজত্ব। হজরত ইউসুফ ছিলেন সত্য নবী। তাই তিনি জানতেন, চিরস্থায়ী ও পরিপূর্ণ রাজত্বের

www.eelm.weebly.com

অধিকারী কেবল আল্লাহ্। আল্লাহ্‌র বিশাল সৃষ্টির তুলনায় পৃথিবী অতি ক্ষুদ্র। আর মিসর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। তাই তাঁর বক্তব্যে উচ্চারিত হয়েছে 'মিনাল মুল্‌ক'। 'মিন তা'বীল' (ব্যাখ্যা) কথাটির মধ্যেও 'মিন' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে আংশিক অর্থ প্রকাশকরূপে। অর্থাৎ তুমি আমাকে দান করেছো স্বপ্নের ব্যাখ্যাবিষয়ক আংশিক শিক্ষা। হজরত ইউসুফ জ্ঞানী ছিলেন বলেই কথাটিকে প্রকাশ করেছিলেন এভাবে। তিনি এ বিষয়েও উত্তমরূপে অবগত ছিলেন যে, যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই কেবল স্বপ্নসহ সকল কিছুর ব্যাখ্যা সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল।

'ফাত্বির' অর্থ স্রষ্টা, উদ্ভাবনকারী। 'ওয়ালী' অর্থ দায়িত্বশীল, অভিভাবক, ব্যবস্থাপক, সাহায্যকারী। অথবা সেই সত্তা, যিনি ইহ-পরকালের নেয়ামত দাতা, ব্যবস্থাপক ও নিয়ন্ত্রক। অবিনশ্বরতার সংগে যিনি মিলিয়ে দেন নশ্বরতাকে। আর এখানে 'আস্‌সলিহীন' অর্থ নবীগণ। ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত ব্যক্তিগণই হচ্ছেন সালেহে কামেল (পরিপূর্ণরূপে ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত)। এই যোগ্যতা রয়েছে কেবল নবী-রসুলগণের। তাঁরা নিষ্পাপ। তাই প্রকৃত সলিহীন হচ্ছেন নবী-রসুলগণ।

কাতাদা বলেছেন, হজরত ইউসুফ ছাড়া অন্য কোনো নবী মৃত্যু প্রার্থনা করেননি। রসুল স. অন্তিমকালে দোয়া করেছিলেন— আল্লাহুম্মার রফীক্বিল্ আ'লা (হে আল্লাহ্! হে আমার সর্বোত্তম বন্ধু)। জননী আয়েশা বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, অন্তিমযাত্রার সময় সমুপস্থিত হলে নবীগণকে দুনিয়া ও আখেরাত, যে কোনো একটিকে বেছে নিতে বলা হয়। নবীগণ বেছে নেন আখেরাতকে। মহা প্রস্থানকালে আমি শুনতে পেলাম আমার প্রিয়তম রসুল স. বলছেন— মাআল্‌লাজীনা আ'নআমাল্লহু আ'লাইহিম মিনান্ নাবীয়্যীনা ওয়াস্ সিদ্দিক্বীনা ওয়াশ্ শুহাদাআ ওয়াস্‌সলিহীনা ওয়া হাসুনা উলায়িকা রফীক্বা (তাঁদের সঙ্গে যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ। আর তাঁরা বন্ধু হিসেবে সুন্দরতম)। রসুল স.কে এরকম বলতে শুনে আমি বুঝলাম তাঁকে দেয়া হয়েছিলো দুনিয়া ও আখেরাতের যে কোনো একটিকে গ্রহণ করবার অধিকার। বোখারী, মুসলিম, ইবনে সা'দ।

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলীঃ মাতা-পিতা ও পরিবারের অন্য সকল সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে পৃথিবীর প্রতি বিরাগভাজন হয়ে পড়লেন হজরত ইউসুফ। প্রার্থনা জানালেন, ইয়া ইলাহী! পবিত্র মিলনাকাঙ্খার পথে আর অন্তরায় কেনো? হাসান বসরী বলেছেন, এরপর তিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলেন মাত্র কয়েকটি বছর। কেউ কেউ বলেছেন, পিতার মৃত্যুর এক সপ্তাহ অথবা এক মাসের মধ্যেই তিনি পরকালে পাড়ি দিয়েছিলেন।

বাগবী লিখেছেন, পিতা-পুত্রের বিচ্ছেদকাল কতদিন ছিলো, সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতপৃথকতা পরিলক্ষিত হয়। কালাবী বলেছেন, বিচ্ছেদকাল ছিলো বাইশ বছর। কেউ কেউ বলেছেন, চল্লিশ বছর। হাসান বসরী বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

তিনি অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন সতের বছর বয়সে। এরপর আশি বছর ছিলেন নিরুদ্দেশ। পিতৃ-মিলনের পর জীবিত ছিলেন তেইশ বছর। এভাবে তাঁর পৃথিবীর বয়স হয়েছিলো একশত বিশ বছর। তওরাতে উল্লেখিত হয়েছে, তাঁর বয়স হয়েছিলো একশত দশ বছর।

জুলায়খাকে বিয়ে করে তিনি সংসারী হয়েছিলেন। জুলায়খার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলো তাঁর তিন সন্তান। দুই পুত্র এক কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম ছিলো ইফরাইম ও মাইশা। কন্যার নাম ছিলো রহমত। ইফরাইমের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হজরত মুসার বিশেষ সহচর হজরত ইউশা ইবনে নুন। হজরত আইয়ুবের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিলো রহমতের। এরকম বর্ণনাও এসেছে যে, পিতার মহাপ্রয়াণের পর হজরত ইউসুফ পৃথিবীতে ছিলেন ষাট বছর। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমতানুসারে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটেছিলো একশত বিশ বছর বয়সে। মিসরবাসীগণ মর্মর পাথরের কফিন প্রস্তুত করে সেই কফিনের ভিতরে রেখে তাঁকে সমাধিস্থ করেছিলো নীল নদের ঠিক মাঝখানে। ঘটনাটি ছিলো এরকম— তাঁর মহা তিরোধানের পর প্রতিটি মহল্লার লোকেরা আপনাপন মহল্লায় তাঁকে সমাধিস্থ করার জন্য শুরু করে দিলো প্রচণ্ড বিতণ্ডা। ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো রক্তপাতের পর্যায়ে। শেষে সর্বসম্মতিক্রমে স্থিরকৃত হলো যে, কোনো মহল্লাতেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হবে না। সমাধিস্থ করা হবে নীল নদের ঠিক মাঝখানে।

ইকরামা বলেছেন, প্রথমতঃ তাঁকে কবরস্থ করা হয়েছিলো নীল নদের দক্ষিণ পার্শ্বে। ফলে দক্ষিণ পার্শ্বের ভূমি হয়ে গেলো অসম্ভব রকমের উর্বর। আর অপর পাশের ভূমি হয়ে গেলো শুষ্ক, অনুর্বর। এভাবে এক পাশে উৎপন্ন হতে লাগলো প্রচুর ফল ও ফসল। আর অপর পাশে দেখা দিলো কেবল খরা ও অজন্মা। এ অবস্থা দেখে সকলে ঠিক করলো, তাঁকে স্থানান্তর করতে হবে। সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে তখন তাঁকে দক্ষিণ দিক থেকে উঠিয়ে এনে কবরস্থ করা হলো উত্তর দিকে। এবার দেখা গেলো নতুন কবরের দিকে শুরু হয়েছে ফল ও ফসলের বিপুল সমারোহ। আর পরিত্যক্ত কবরের দিকে দেখা দিয়েছে মরুভূমি। সেখানকার মৃত্তিকা হয়ে গিয়েছে নিষ্ফলা। অবস্থা বেগতিক দেখে মিসরবাসীরা এবার ঠিক করলো, তাঁকে সমাধিস্থ করতে হবে নীল নদের ঠিক মাঝখানে। তাই করা হলো। এবার দেখা গেলো নীল নদের উভয় পাশে উৎপাদিত হচ্ছে একই রকম ফল-মূল ও শস্য দানা। প্রায় চারশ' বছর পর মিসরে আবির্ভূত হলেন হজরত মুসা। তিনি নীল নদের মাঝখান থেকে হজরত ইউসুফের শ্বেত মর্মর নির্মিত কফিন উদ্ধার করে তাঁকে নিয়ে গিয়ে দাফন করলেন পিতৃপুরুষগণের কবরস্থানে।

ওরওয়া বিন যোবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে ইসহাক ও ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, আল্লাহ্পাক হজরত মুসাকে নির্দেশ দিলেন, ফেরাউনের কবল থেকে উদ্ধার করে বনী ইসরাইলদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলে যেতে হবে সিরিয়ার দিকে।

www.eelm.weebly.com

সঙ্গে করে নিতে হবে ইউসুফের কফিন। আর তাঁকে সমাহিত করতে হবে তাঁর পিতা-পিতামহের কবরস্থানে। কিন্তু তিনি জানতেন না তাঁর কবর কোথায়। একে ওকে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কেউ তাঁর সন্ধান দিতে পারলো না। শেষে জানলেন এক বৃদ্ধার কাছে রয়েছে এই সংবাদ। হজরত মুসা ওই বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি মিসর পরিত্যাগ কালে যদি বনী ইসরাইলদের সঙ্গে আমাকেও নিয়ে যান, তবে আমি হজরত ইউসুফের সমাধি কোথায় তা বলবো। হজরত মুসা বললেন, ঠিক আছে, আপনাকে আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। বৃদ্ধা তখন হজরত ইউসুফের সমাধির সংবাদ দিলেন। হজরত মুসা বনী ইসরাইলদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাত্রা শুরু করতে হবে চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। চন্দ্রোদয়ের সময় হলো। কিন্তু তখনও হজরত ইউসুফের কফিন সংগ্রহ করা যায়নি। তাই হজরত মুসা প্রার্থনা জানালেন, ইয়া ইলাহী! চন্দ্রোদয় বিলম্বিত করুন। আমিতো এখনো নবী ইউসুফের কফিন উদ্ধার করতে পারিনি। আল্লাহ্‌র হুকুমে চন্দ্র উদিত হলো বিলম্বে। হজরত মুসা তাঁর একান্ত সহচরগণের দ্বারা হজরত ইউসুফের কফিন নদীর মাঝখান থেকে তুলে আনলেন। এরপর কফিন, বৃদ্ধা ও বনী ইসরাইল জনতাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন সিরিয়া অভিমুখে। সেখানে তাঁকে দাফন করলেন হজরত ইসহাক ও হজরত ইব্রাহিমের সমাধির পাশে।

হজরত ইউসুফের পৃথিবী পরিত্যাগের পর মিসরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হলো আমালিকা বংশোদ্ভুত ফেরাউনদের শাসন। স্বৈরাচারী নৃপতিরা শুরু করলো প্রজা পীড়ন। সরে গেলো সত্য ধর্ম থেকে। এভাবে চারশ' বছর গত হওয়ার পর ফেরাউন, তার পারিষদবর্গ ও মিসরবাসীদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্‌পাক প্রেরণ করলেন হজরত মুসাকে। তাঁর সময়েই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো তৎকালীন ফেরাউন ও তার অনুসারীরা।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১০২

ذٰلِكَ مِنْ اَنۡۢبَآءِ الۡغَيۡبِ نُوۡحِيۡهِ اِلَيۡكَ‌ۚ وَمَا كُنۡتَ لَدَيۡهِمۡ اِذۡ اَجۡمَعُوۡۤا اَمۡرَهُمۡ وَهُمۡ يَمۡكُرُوۡنَ○

❑ ইহা অদৃশ্যলোকের সংবাদ— যাহা তোমাকে আমি ঐশীবাণী দ্বারা অবহিত করিতেছি; ষড়যন্ত্রকালে যখন উহারা মতৈক্যে পৌঁছিয়াছিল তখন তুমি উহাদিগের সংগে ছিলে না।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল মোহাম্মদ! এতক্ষণ ধরে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমি আপনাকে জানালাম নবী ইউসুফের জীবন-বৃত্তান্ত। সুদূর অতীতে ইউসুফের বিরুদ্ধে তাঁর ভাইয়েরা যে ষড়যন্ত্র

www.eelm.weebly.com

করেছিলো সে সময় এবং এই কাহিনীতে বিবৃত অন্যান্য ঘটনার সময় আপনি তো সেখানে ছিলেন না। কারো নিকট থেকে এই ইতিবৃত্তের আনুপূর্বিক বিবরণ জানবার কোনো সুযোগও আপনার নেই। তাই এই কাহিনীটি আপনাকে জানানো হলো প্রত্যাদেশরূপে। এতে করে এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, আপনি আমার বার্তাবাহক। আর এই সুন্দর ইতিবৃত্তটি কবি বা কাহিনীকারের কল্পিত কোনো উপাখ্যান নয়। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সন্দেহবিমুক্ত প্রত্যাদেশ।

বাগবী লিখেছেন, মদীনার ইহুদী অথবা মক্কার মুশরিকেরা একবার রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে হজরত ইউসুফের ইতিবৃত্ত জানতে চাইলো। তখন অবতীর্ণ হলো সুরা ইউসুফ। ইহুদীরা দেখলো, প্রত্যাদেশিত কাহিনীটি তাদের নিকটে রক্ষিত তওরাতের বিবরণের পূর্ণ অনুকূল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তারা ইসলাম গ্রহণ করলো না। প্রকৃষ্ট প্রমাণ দর্শন করেও ইসলাম গ্রহণ না করাতে রসুল স. মর্মাহত হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১০৩, ১০৪

وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

❐ তুমি যতই চাহ না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করিবার নহে।

❐ এবং তুমি তাহাদিগের নিকট কোন পারিশ্রমিক দাবী করিতেছ না। ইহা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ব্যতীত কিছু নয়।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! বিধর্মীদের আচরণ দেখে ব্যথিত হবেন না। আপনার একান্ত কামনা, তারা বিশ্বাসকে আশ্রয় করে পুণ্যময় জীবনের অধিকারী হোক। কিন্তু ইমান গ্রহণের যোগ্যতাই যে তাদের নেই। সুতরাং যতো মোজেজাই আপনি প্রদর্শন করুন না কেনো, কস্মিনকালেও তারা আপনার এই শুভ আহ্বানকে গ্রহণ করবে না। অসত্যকে তারা কিছুতেই পরিত্যাগ করতে চায় না। তাই আল্লাহ্‌ও চান, তারা অসত্যের উপরেই চিরস্থায়ী হোক। আপনি আপনার কর্তব্য পালন করে যান। অব্যাহত রাখুন কোরআনের প্রচার। আপনি তো কেবল আমারই পরিতোষকাঙ্ক্ষী। নবী ইউসুফের কাহিনী ও কোরআনের অন্যান্য ঘোষণা প্রচার করার জন্য আপনি তো কারো নিকটে পারিশ্রমিক দাবি করেন না। কোরআন তো বিশ্ববাসীদের জন্য সদুপদেশ। এই কোরআনকে যারা মান্য করবে তারাই বুদ্ধিমান। আর যারা মান্য করবে না, তারা মূর্খ।

www.eelm.weebly.com

وَكَأَيِّنْ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ○ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ○ أَفَأَمِنُوْا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

❐ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রহিয়াছে; তাহারা এই সব দেখে কিন্তু তাহারা এসবের প্রতি উদাসীন।

❐ তাহাদিগের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁহার শরীক করে।

❐ তবে কি তাহারা আল্লাহের সর্বগ্রাসী শাস্তি হইতে অথবা তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি হইতে নিরাপদ?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! দেখুন, আকাশমার্গ ও পৃথিবীতে সতত পরিদৃশ্যমান রয়েছে আমার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা ও একক সৃষ্টিশীলতার অসংখ্য প্রমাণ। মানুষ প্রতিনিয়ত এসকল কিছু অবলোকন করে যাচ্ছে। তদুপরি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাদেরকে অলৌকিক নিয়মে শোনানো হচ্ছে নবী ইউসুফ ও অন্যান্য নবী রসুলগণের কাহিনী। এ কাহিনীগুলোর মধ্যেও রয়েছে শতসহস্র সদুপদেশ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ দেখুন, এ সকল কিছু সম্পর্কে কেমন উদাসীন। এতো কিছু দেখে শুনে বুঝেও যথাকর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয় না। শিক্ষা গ্রহণ করে না আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য থেকে। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত অতীতকালের কাহিনী থেকে। এখানে 'কাআইয়েন' শব্দটির অর্থ, অধিকাংশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের অধিকাংশ আল্লাহ্য় বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁর সঙ্গে শরীক করে।' একথার অর্থ, হে আমার রসুল! দেখুন এসকল লোক আল্লাহ্র প্রতি এক ধরনের বিশ্বাস রাখে। কিন্তু তাদের ওই বিশ্বাসের সঙ্গে রয়েছে অংশীবাদিতা। তারা আল্লাহ্কেও ডাকে, আবার পূজা করে কল্পিত দেব-দেবীদের। তাদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন, আকাশ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কে? তারা বলবে, আল্লাহ্। আরো বলে দেখুন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন কে? তারা বলবে আল্লাহ্। এরকম বলা সত্ত্বেও তারা উপাসনা করবে বৃক্ষের, পাথরের, দেব-দেবীদের।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, অংশীবাদীরাও হজ করতো। হজের সময় বলতো, লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক (আমি উপস্থিত, হে প্রভু আমি উপস্থিত)। হজের ইহরাম পরে বৃত্তাকারে কাবা শরীফ প্রদক্ষিণের সময় বলতো, হে প্রভু আমি হাজির। আমি হাজির। তোমার কোনো অংশীদার নেই, ওই সকল দেব-দেবী ছাড়া, যাদেরকে তুমি তোমার অংশীদার করে নিয়েছো। তুমি তাদের (দেব-দেবীর) প্রভু। তারা তোমার প্রভু নয়।

আতা বলেছেন, অংশীবাদীরা এরকম শিরিকমিশ্রিত প্রার্থনা করতো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময়। কিন্তু বিপদের সময় তারা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ডাকতো না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যখন তারা জলযানে আরোহণ করে, তখন তারা পরিশুদ্ধ অন্তরে আহ্বান করে আল্লাহ্কে। আর যখন তিনি তাদেরকে নিরাপদে সমুদ্রতীরে পৌঁছে দেন, তখন তারা পুনরায় ফিরে যায় অংশীবাদিতায়।'

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'ইল্লা ওয়াহুম মুশরিকুন' (কিন্তু তারা শিরিক করে) কথাটির অর্থ হবে— তারা আল্লাহ্র বিধানের প্রতিকূলে পথভ্রষ্ট ধর্ম-নেতাদের বিধানানুসারে চলে। তাদেরকেই বসায় প্রভুপালনকর্তার আসনে। অথবা আল্লাহ্র সঙ্গে স্থাপন করে পিতা-পুত্র সম্পর্ক। বলে, আমরা আল্লাহ্র সন্তান। কিংবা তারা করে আগুনের উপাসনা। মুতাজিলারাও এরকম অংশী-বাদীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তারা বলে, মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা। কিন্তু তওহীদের বিশুদ্ধ বিশ্বাস হচ্ছে— আল্লাহপাকই একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্রষ্টা। সুফী সাধকগণই হচ্ছেন বিশুদ্ধ বিশ্বাসী। আর মুতাজিলারা অবশ্যই পথভ্রষ্ট।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তবে কি তারা আল্লাহ্র সর্বগ্রাসী শাস্তি থেকে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি থেকে নিরাপদ?' একথার অর্থ— ওই সকল অংশীবাদীরা মনে করেছে কী? তারা কি ভেবেছে, আল্লাহ্র সর্বগ্রাসী শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে না? তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামত কি অকস্মাৎ এসে পড়বে না? আল্লাহ্ তো যে কোনো সময় তাদেরকে শাস্তি দিতে সক্ষম। আর যে কোনো সময় তো এসে পড়তে পারে মহাপ্রলয়।

কাতাদা বলেছেন, এখানে 'গাশীয়্যা' অর্থ অবতীর্ণ বিপদ। জুহাক বলেছেন, আকাশের বিদ্যুৎ, অদৃশ্য অনাসৃষ্টি। 'বাগতাতান্' অর্থ আকস্মিক উপস্থিতি, যার কোনো পূর্বাভাস দেয়া হয় না, যা আগমনের নির্ধারিত সময় নেই এবং যা পূর্বধারণাবিমুক্ত। 'ওয়াহুম লা ইয়াশউরূন' অর্থ অজ্ঞাতসারে, অপ্রস্তুত অবস্থায়। 'আফাআমিনু' অর্থ তারা কি নিরাপদ? প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (ইস্তিফ্হামে ইনকারী)। অর্থাৎ আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের এরকম বিস্মৃতি নিরাপদ নয়।

 www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মানুষ পথেঘাটে, হাটেবাজারে কর্মব্যস্ত থাকবে, হঠাৎ এসে পড়বে কিয়ামত। ভয়ে আতঙ্কে তখন চিৎকার জুড়ে দিবে তারা। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বাজারে মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত থাকবে। বস্ত্র ব্যবসায়ীরা মাপজোখ করতে থাকবে বস্ত্র বিছিয়ে। সহসা শুরু হবে মহাপ্রলয়। কাপড় কাটতে ভুলে যাবে তারা। চুকে যাবে ক্রয়-বিক্রয়ের পাট। উল্লেখ্য যে, সুরা আ'রাফের তাফসীরে কিয়ামত সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১০৮

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ؕ وَ

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

❒ বল, 'ইহাই আমার পথ ঃ আল্লাহের প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি; আমি এবং আমার অনুসারিগণ সজ্ঞানবিশ্বাসী। আল্লাহ্ মহিমান্বিত, এবং যাহারা আল্লাহের শরীক করে আমি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল মোহাম্মদ! উদাসীন জনতাকে আপনি বলে দিন, এটাই আমার পথ ও মত। এই সত্যপথে ও মতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাই আল্লাহ্র প্রতি। মনে রেখো আমি ও আমার অনুসারীরা এই পথের আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বিশ্বাসী। অতএব তোমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। আল্লাহ্ মহিমান্বিত ও পবিত্র। অংশীবাদিতার আবিলতা থেকে চিরমুক্ত। তাই সেই পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করে যারা অংশীবাদী হয়, আমি তাদের অন্তর্গত নই।

এখানে 'সাবীলী' অর্থ পথ, মত বা পদ্ধতি। 'বাসীরাতিন' অর্থ দৃঢ় প্রতীতি বা আত্মজ্ঞান। একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে— আমি ও আমার অনুসারীগণ অন্য লোকের মতো আত্মজ্ঞানবিবর্জিত নই। অথবা 'বাসীরাত' অর্থ— বিবৃতি ও দিবালোকের মতো স্পষ্ট প্রমাণ। 'ওয়ামানিত্ তাবাআ'নী' অর্থ— আমার অনুসারীগণ। অর্থাৎ যারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আমার অনুগমন করে, তারাও আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানায়।

কালাবী ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, রসুল স. এর অনুসারীগণের প্রতি এই দায়িত্বটি অপরিহার্য যে, তারাও রসুল স. এর অনুসরণে মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকবে। সতত আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ পালনে থাকবে সদা সতর্ক। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, আমি ও আমার অনুসারীগণ দিব্যদৃষ্টি বা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আমার অনুসারীগণ' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর সহচরবৃন্দকে। তাঁরা ছিলেন হেদায়েতের নিশানবাহী, জ্ঞানের

www.eelm.weebly.com

ভাণ্ডার, বিশ্বাসীদের অগ্রনায়ক। ছিলেন আল্লাহ্‌র পথের সমর্পিতপ্রাণ সৈনিক। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, যারা রসুল স. এর অনুসরণ করতে চায়, তারা যেনো অনুসারী হয় বিগত বিশ্বাসীগণের। অর্থাৎ তারা যেনো মান্য করে চলে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শকে। এই উম্মতের মধ্যে সাহাবীগণ হচ্ছেন, সর্বোৎকৃষ্ট বক্ষের অধিকারী। তাঁদের জ্ঞানের গভীরতা ছিলো অথৈ। কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিলো না তাঁদের মধ্যে। রসুল স. এর বিশেষ প্রচার সহচর হিসেবে আল্লাহ্‌পাক তাঁদেরকে মনোনীত করেছেন। তাঁদের পথ ছিলো নির্ভুল গন্তব্যবিশিষ্ট পথ। অতএব তোমরা তাঁদের পুতপবিত্র আদর্শ গ্রহণ করো। হেদায়েতের যে আলোকবর্তিকা তাঁরা জ্বালিয়ে দিয়েছেন, পথ চলো সেই আলোকবর্তিকার আলোকে।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১০৯, ১১০, ১১১

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۗ أَفَلَمْ
يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ
الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ
بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي
الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ
يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

❑ তোমার পূর্বে জনপদবাসীদিগের অনেককে প্রত্যাদেশসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম; অবিশ্বাসীরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই এবং তাহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের কি পরিণাম হইয়াছিল তাহা কি দেখে নাই? যাহারা সাবধানী তাহাদিগের জন্য পরলোকই শ্রেয়; তোমরা বুঝ না?

❑ অবশেষে যখন রসূলগণ নিরাশ হইল এবং লোকে ভাবিল যে, রসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে তখন তাহাদিগের নিকট আমার সাহায্য আসিল। এইভাবে আমি যাহাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায়। অপরাধী সম্প্রদায় হইতে আমার শাস্তি রদ করা যায় না।

www.eelm.weebly.com

❑ উহাদিগের কাহিনীতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য আছে শিক্ষা। কুরআনের বাণী মিথ্যা রচনা নহে। কিন্তু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ইহা পূর্বগ্রন্থে যাহা আছে তাহার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ ও দয়া।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের অনেককে প্রত্যাদেশসহ প্রেরণ করেছিলাম।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে বলুন, ইতোপূর্বেও আমি অনেক জনপদে অনেককে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলাম। আপনাকে যেমন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে, তেমনি তাদেরকেও পরিচালনা করেছিলাম প্রত্যাদেশ সহকারে। আপনি যেমন আপনার সম্প্রদায়ের একজন মানুষ, তেমনি তারাও ছিলো তাদের সম্প্রদায়ভূত মানুষ। আপনি যেমন ফেরেশতা নন তেমনি তারাও ফেরেশতা ছিলো না। উল্লেখ্য যে, অংশীবাদীরা বলতো, আল্লাহ্ ফেরেশতাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন, মানুষকে নয়। তাদের একথার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

'নূহী ইলাইহিম' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, আপনি যেমন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ, তেমনি ওই সকল জনপদের নবীগণও ছিলেন প্রত্যাদিষ্ট। ফলে সাধারণ জনতার মধ্যে থেকেও তাঁরা ছিলেন মহিমান্বিত, আদর্শ পুরুষ। মহাপুরুষ। 'মিন্ আহলিল কুরা' অর্থ, জনপদবাসীগণের মধ্যে থেকে। অর্থাৎ ওই নবীগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন সুসভ্য সমাজের মধ্যে থেকে। মরুচারী অথবা অরণ্যবাসী তাঁরা ছিলেন না। ছিলেন না যাযাবরের মতো স্বেচ্ছাচারী।

হাসান বসরী বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্পাক কোনো জিনকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেননি। তেমনি নবী হিসেবে প্রেরণ করেননি মরুচারী যাযাবর স্বভাবের কোনো ব্যক্তিকে অথবা কোনো রমণীকে।

আমি বলি, এখানে 'রিজাল' অর্থ— অনেককে। 'অনেককে' কথাটিতে জিন ও মানুষ উভয়ের অন্তর্ভুক্তি সম্ভব। সুতরাং জিন সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ নবী হতে পারবে না, এরকম কোনো তথ্য আলোচ্য বাক্যে নেই। আল্লাহ্পাক স্বয়ং এক আয়াতে বলেছেন— পৃথিবীতে যদি ফেরেশতারা বিচরণ করতো, তবে আমি আকাশ থেকে ফেরেশতাকেই নবী হিসেবে প্রেরণ করতাম তাদের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'অবিশ্বাসীরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিলো তা কি দেখেনি? যারা সাবধানী তাদের জন্য পরলোকই শ্রেয়; তোমরা বুঝো না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার বিরুদ্ধবাদীদেরকে বলুন, তারা বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করে না কেনো? পূর্ববর্তী নবীগণকে যারা অস্বীকার করেছিলো, তাদের জনপদসমূহের ধ্বংসাবশেষ তো

www.eelm.weebly.com

এখনও বিদ্যমান। আল্লাহ্র গজবের ওই নিদর্শনসমূহ দেখে এখনও তারা সাবধান হয় না কেনো? গজব থেকে নিরাপত্তা লাভের নিমিত্তে এখনও আপনাকে নবী বলে স্বীকার করে না কেনো? হে আমার নবী! তাদের প্রত্যাখ্যানজনিত যাতনায় আপনি ব্যথিত হবেন না। মনে রাখবেন, যারা সাবধানী (মুত্তাকী) তাদের জন্য পরকালই শ্রেয়ঃ। আপনি তো এ বিষয়ে সম্যক অবগত। কিন্তু আপনার অনুসারীরা কি একথা অবগত নয়? অথবা আপনার সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কি একথা বোঝে? না বোঝে না?

পরের আয়াতে (১১০) বলা হয়েছে— 'অবশেষে যখন রসুলগণ নিরাশ হলো এবং লোকে ভাবলো যে, রসুলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে, তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য এলো। এভাবে আমি যাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায়। অপরাধী সম্প্রদায় থেকে আমার শাস্তি রদ করা যায় না।' একথার অর্থ— অতীতের উম্মতদেরকে ইমান গ্রহণের জন্য দীর্ঘ অবকাশ দেয়া হয়েছিলো। অনেক ক্ষেত্রে তারা ইমান আনার পুনঃ পুনঃ অঙ্গীকার করেও তা ভঙ্গ করেছিলো। শেষে নবীগণ তাদের ইমান আনয়নের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। আর তাদের বিরুদ্ধবাদীরা মনে করতে শুরু করেছিলো যে, ইমান না আনলে শাস্তি অবতীর্ণ হবে— একথা বলে আল্লাহ্ নবীগণকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছেন। এমতাবস্থায় যথাসময়ে অবতীর্ণ হলো আল্লাহ্র সাহায্য। আল্লাহ্ অবাধ্যদেরকে ধ্বংস করলেন এবং নবী ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকে উদ্ধার করলেন। এভাবে আল্লাহ্ যাকে উদ্ধার করতে ইচ্ছা করেন, সেই উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়। আর অপরাধী সম্প্রদায়ের জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়, সে শাস্তি কখনো রদ হয় না। রসুলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে— এরকম ধারণা করতো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। নবীগণ নন। তাঁদের নিরাশ হওয়ার কারণ ছিলো ভিন্ন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও যখন তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা ইমান আনলো না, তখনই তাঁরা তাদের ইমান আনয়নের ব্যাপারে হয়ে পড়েছিলেন নিরাশ। আল্লাহ্ তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করছেন না কেনো, সেকথা ভেবে তাঁরা নিরাশ হননি।

এখানে উল্লেখিত 'কুজিবু' শব্দটিকে জননী আয়েশা উচ্চারণ করতেন 'কুজ্জিবু'। কিন্তু কুজিবু উচ্চারণটিই প্রসিদ্ধ, যদিও জননী আয়েশা তা অনবহিত ছিলেন। এখানে কথাটির শব্দগত মর্ম ধর্তব্য নয়। প্রকৃত অর্থ হবে এরকম— রসুলগণ এই ভেবে নিরাশ হয়েছিলেন যে, বিরুদ্ধবাদীরা মনে হয়, কোনোদিনই ইমান আনবে না।

এরকমও অর্থ হতে পারে যে, নবীগণ ধারণা করেছিলেন, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি যে ভুল প্রমাণিত হলো। আমরা মনে করেছিলাম, খুব শীঘ্রই আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত

www.eelm.weebly.com

হবো। কিন্তু তা তো হলো না। অথবা এখানে 'জন্নু আন্নাহুম' (তারা ভাবলো নিশ্চয় তারা) কথাটির সর্বনাম সম্পৃক্ত হবে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— অবিশ্বাসীরা ভাবলো, নবীগণ আমাদেরকে যে ইমানের আহ্বান জানিয়েছেন এবং অমান্যকারীদের জন্য যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছেন— সেটা ভুল। আমাদেরকে তারা মিথ্যা কথা বলেছেন। সর্বনামটি নবীগণের বিশ্বাসী অনুসারীদের সঙ্গেও সম্পৃক্ত হতে পারে। অর্থাৎ বিশ্বাসীদের অন্তরে তখন এই ধারণার উদয় হয়েছিলো যে, নবীগণ আমাদের সাথে বিজয় ও সাহায্যের যে আশ্বাস দিয়েছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংস অনিবার্য, এরকম যে কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন, তা ভুল। বাস্তবতাবিবর্জিত। দীর্ঘদিন গত হলো, তবুও তো অবিশ্বাসীদের উপরে গজব অবতীর্ণ হলো না।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের মতে এখানে আয়াতের শব্দগত মর্মই গ্রহণীয়। অর্থাৎ নবীগণই আল্লাহ্‌র সাহায্য সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ছিলেন। নবীগণ মানুষ। তাই তাঁদের এই নৈরাশ্যকে মানবিক দুর্বলতা হিসেবে মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে নবীগণই আল্লাহ্‌র সাহায্য সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। মনে করেছিলেন, আমাদেরকে মনে হয় এতদিন ধরে অযথা আশ্বাসবাণী শোনানো হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস এ প্রসঙ্গে তেলাওয়াত করেছিলেন এই আয়াতটি— 'হাত্তা ইয়াকুলার্ রসুলু ওয়াল্লাজীনা আমানু মাআ'হু মাতা নাসরুল্লাহ্।' (এমনকি রসুল ও তাঁর সহচর বিশ্বাসীবৃন্দ বলে, আল্লাহ্‌র সাহায্য কবে আসবে)। অতএব জননী আয়েশা যেটাকে অস্বীকার করেছেন, সেটাই হবে আলোচ্য আয়াতের মর্ম। আর এই প্রকৃত মর্মটিকে অস্বীকার করতেন বলেই তিনি 'কুজিবু' কথাটিকে পাঠ করতেন কুজ্জিবু।

বায়যাবী লিখেছেন, বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যটি যদি সঠিক প্রমাণিত হয়, তবে এখানে 'জুন্ন' (ধারণা) শব্দটির মর্মার্থ হবে— অলীক ধারণা, যা মানুষের স্বভাবজাত। আল্লামা তিব্বী লিখেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। ইমাম বোখারীও তাঁর গ্রন্থে বর্ণনাটির উল্লেখ করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও বিশুদ্ধ কথা এই যে, এখানে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণীয় নয়, রূপক অর্থই গ্রহণযোগ্য। অবিশ্বাসীদেরকে দীর্ঘ অবকাশ প্রদান ও বিলম্বিত শাস্তির বিষয়টিকে এখানে উপমা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। 'কুজিবু' উচ্চারণটি কুফাবাসী আলেমগণের এবং 'কুজ্জিবু' উচ্চারণটি অন্যান্যদের। কাতাদাও এরকম মর্মার্থ গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো আলেম অর্থ করেছেন এভাবে— নবীগণ অবিশ্বাসীদের ইমান গ্রহণের বিষয়ে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন। একথা ভেবেও শঙ্কিত হয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য আগমনের বিলম্বহেতু বিশ্বাসীরাও যে দোদুল্যচিত্ত। তারাও না শেষে ইমানের পথ থেকে দূরে সরে যায়।

'মান্‌নাশাউ' অর্থ— নবী ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরবৃন্দ। এরকম অর্থ করার কারণ হচ্ছে, নবীগণ তাঁদের সাথীগণের পরিত্রাণকামী। একথা অচিন্তনীয় যে, তাঁরা অবিশ্বাসীদের পরিত্রাণ কামনা করেন।

www.eelm.weebly.com

'ওয়ালা ইউরাদ্দু' বা'সুনা আ'নিল্ কৃওমিল মুজ্‌রিমীন' অর্থ— অপরাধী সম্প্রদায় থেকে আমার শাস্তি রদ করা যায় না। এখানে বা'স্ অর্থ, শাস্তি বা আযাব।

আমি বলি, এখানে 'মান্নাশাউ' অর্থ— স্বল্পসংখ্যক ইমানদার। কারণ কিছু সংখ্যক বিশ্বাসীও অবিশ্বাসীদের সঙ্গে একত্রবাসের কারণে আল্লাহ্‌র আযাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। অন্য এক আয়াতেও এ কথার প্রমাণ রয়েছে। যেমন— 'আর ওই শাস্তিকে ভয় করো, যা কেবল জালেমদের জন্য আসবে না।'

শেষের আয়াতে (১১১) বলা হয়েছে— 'তাদের কাহিনীতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। কোরআনের বাণী মিথ্যা রচনা নয়। কিন্তু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এটা পূর্ব গ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ নির্দেশ ও দয়া।' এ কথার অর্থ— হজরত ইউসুফের বৃত্তান্তে রয়েছে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য প্রকৃষ্ট শিক্ষা। অন্ধকূপ, দাসত্ব, কারাগার ইত্যাদি কৃষ্ণ অধ্যায় অতিক্রম করে তিনি লাভ করেছিলেন মিসরের সিংহাসন। কী অসাধারণ সহিষ্ণুতা ছিলো তাঁর! হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা মানুষকে লাঞ্ছিত করে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা ও ধৈর্য করে মহিমান্বিত— এই অমূল্য উপদেশটির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেছিলো হজরত ইউসুফের জীবনে। এই সমুন্নত শিক্ষাটি সুস্থ বিবেকধারীদের নিকটে তাই এতো সমাদৃত। এই কাহিনীটি আবার বিবৃত হয়েছে পবিত্র কোরআনে। সুতরাং এটা কাল্পনিক কোনো উপাখ্যান নয়। বিশ্বাসীরা এটা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে। তারা এ কথাও স্বীকার করে যে, এই সর্বোত্তম কাহিনীটি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের পূর্ণ অনুকূল এবং এই কোরআন হচ্ছে সকল কিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ ও দয়া।

'ইউফ্‌তারা' অর্থ স্বরচিত, কাল্পনিক বা মিথ্যা। 'আল্লাজীনা বাইনা ইয়াদাইহি' অর্থ এটা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে যা আছে তার সমর্থন। অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুসৃতি। 'শাই' অর্থ প্রতিটি ধর্মীয় বাণী (সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ) মানব জীবনে যে বাণী নিতান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ কোরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস। উল্লেখ্য যে, যে বিধান হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, তা কোরআনের মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠিত। কারণ আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'আমি সকল রসুলকে কেবল আমার আদেশের অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি।' আরো এরশাদ করেছেন— 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো।' আরো বলেছেন— 'রসুল তোমাদেরকে যা করতে বলেছেন তা পালন করো, আর যা বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।' আবার ইজমা দ্বারা প্রমাণিত বিধানও প্রকারান্তরে কোরআন দ্বারা সাব্যস্ত। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন— 'হেদায়েত প্রকাশ পাওয়ার পর যে ব্যক্তি রসুলের বিরোধিতা করে এবং বিশ্বাসীগণের পথ ব্যতীত অন্য পথে চলে; তাকে আমি তার অভীষ্ট পথেই পরিচালনা করবো।' কিয়াসও কোরআনের

www.eelm.weebly.com

অনুকূল। অর্থাৎ কিয়াসকৃত বিধানও কোরআন দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন— 'হে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! উপদেশ গ্রহণ করো।'

কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সকলের উপকারের জন্য। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে— বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এই কোরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে তার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ ও দয়া। কোরআন থেকে উপকার গ্রহণের যোগ্যতা রয়েছে কেবল বিশ্বাসীদের। তাই এখানে 'সকলের জন্য' না বলে বলা হয়েছে 'বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য'।

শায়েখ আবুল মনসুর মাতুরিদি বলেছেন, হজরত ইউসুফ ও তাঁর ভ্রাতৃবর্গের কাহিনীতে রসুল স. এর জন্যও রয়েছে শিক্ষা। হজরত ইউসুফ এবং তাঁর ভ্রাতাগণ ছিলেন একই ধর্মভূত ও এক পিতার ঔরসজাত। অথচ তাঁর ভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে করেছিলো চরম দুর্ব্যবহার। কিন্তু হজরত ইউসুফ তাঁদের প্রতি প্রদর্শন করেছিলেন উত্তম শিষ্টাচার। ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তাদেরকে। এ সকল ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌পাক এখানে তাঁর প্রিয়তম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে এইমর্মে উপদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকেও তাঁর দুর্বিনীত স্বজাতির লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হবে। বারবার ক্ষমা করে দিতে হবে অবিশ্বাসী স্বজনদেরকে। কারণ তারা নির্বোধ।

ওয়াহাব বলেছেন, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহেও কোরআনের মতো বিশদভাবে হজরত ইউসুফের ইতিবৃত্ত উল্লেখিত হয়েছে।

সুরা রা'দ

এই সুরার আয়াতের সংখ্যা তেতাল্লিশ। আর রুকুর সংখ্যা ছয়। ত্রয়োদশ পারায় গ্রন্থিত এই সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَ

لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

❑ আলিফ্ লাম্ মীম্ রা; এইগুলি কুরআনের আয়াত; যাহা তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাই সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহাতে বিশ্বাস করে না।

আয়াতের শুরুতেই উল্লেখিত হয়েছে— আলিফ্ লাম্ মীম্ র। কোরআন মজীদের কোনো কোনো সুরার প্রথমে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজির উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর মর্ম রহস্যাচ্ছন্ন। এগুলোর প্রকৃত মর্ম জানেন কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর

www.eelm.weebly.com

রসুল। আর জানেন তাঁরা, যাঁরা জ্ঞানে সুগভীর (ওলামায়ে রসিখীন)। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানিও এ সকল বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজির রহস্য সম্পর্কে জানতেন। সুরা বাকারার শুরুতে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এগুলো কোরআনের আয়াত।'এখানে 'কিতাব' অর্থ কোরআন মজীদ। অথবা এই সুরা। আর 'তিলকা' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে এই কোরআনের অথবা এই সুরার এই আয়াতের দিকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যা তোমার প্রতিপালক থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা-ই সত্য।' এরকম অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারবে তখন, যখন ওয়াল্লাজী (এবং যা) কথাটির 'ওয়াও' (এবং) অব্যয়টিকে ধরা হবে সূচনামূলক, আর আল্লাজী (যা) কে ধরা হবে উদ্দেশ্য ও আলহাক্ব (সত্য) কে ধরা হবে বিধেয়। এমতাবস্থায় এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য থেকে হয়ে পড়বে পৃথক। তখন মর্ম দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্য। কিন্তু গ্রন্থকার বলছেন, এখানে 'আল কিতাব' অর্থ যদি 'সুরা' ধরা হয়, তবে ওয়াল্লাজী (এবং যা) কথাটির অর্থ হবে কোরআন। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়াবে— এই আয়াতটি এই সুরা এবং এই কোরআনের আয়াত। আর যদি 'আল কিতাব' ও 'আল্লাজী' উভয়টির অর্থ 'কোরআন' ধরে নেয়া হয়, তবে একটি বিশেষণ সম্মিলিত হবে অপর বিশেষণটির সঙ্গে। এমতাবস্থায় 'আলহাক্ব' হবে বিধেয় এবং ধরে নিতে হবে উদ্দেশ্য এখানে অনুক্ত।

একটি জটিলতাঃ 'আল হাক্ব' কথাটির সঙ্গে আলিফ লাম যুক্ত হওয়াতে প্রমাণিত হয় যে, কেবল কোরআনই হক বা সত্য। তাহলে প্রশ্ন জাগে, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস কি সত্য নয়?

জটিলতার নিরসনঃ এখানে 'উনজিলা' অর্থ— অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ যা অবতীর্ণ হয়েছে প্রকাশ্যরূপে, অথবা যা অবতীর্ণ হয়েছে প্রকাশ্য অর্থ ও অন্তর্নিহিত অর্থ সহকারে। এভাবে কোরআনের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বলিত হাদিস, ইজমা ও কিয়াসও হয়েছে কোরআনের নির্দেশের অন্তর্গত। তাই ইসলামের এই ত্রয়ীসূত্রও সত্য এবং অনুসরণীয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না।' একথার অর্থ— কোরআন মজীদ দিবালোক অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও সত্য হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ এতে আস্থাশীল নয়। কারণ অধিকাংশ লোক প্রবৃত্তিপরায়ণ ও অস্বচ্ছ চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন। বিভ্রান্তি তাদের সতত সহচর।

মুকাতিল বলেছেন, মক্কার মুশরিকেরা বলতো, কোরআন হচ্ছে মোহাম্মদের নিজস্ব রচনা। তাদের ওই অপকথনের প্রতিবাদ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে। পরবর্তী আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে আল্লাহ্‌র এককত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

www.eelm.weebly.com

اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ یَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ یُدَبِّرُ الْاَمْرَ یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۝ وَهُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِیْهَا رَوَاسِیَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِیْهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِی الَّیْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

❐ আল্লাহ্ই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত— তোমরা ইহা দেখিতেছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হইলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করিলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাহাতে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করিতে পার।

❐ তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ফল সৃষ্টি করিয়াছেন দুই প্রকারের। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত— তোমরা তা দেখছো।' এখানে 'আ'মাদুন' অর্থ স্তম্ভ। শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে 'ইমাদ' অথবা 'উমুদ'— যেমন 'ইহাব' এর বহুবচন 'আহাব' এবং 'আদীম' এর বহুবচন 'আদাম'। এখানে 'তোমরা তা দেখছো' বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। অথবা কথাটি 'স্তম্ভ ব্যতীত' বাক্যাংশটির বিশেষণ। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— তোমাদের সম্মুখে পরিদৃশ্যমান স্তম্ভবিহীন ওই অনন্ত অম্বর একথাই প্রমাণ করে যে, এরকম অসম্ভব কার্যের স্রষ্টা একজন রয়েছেনই। আর এই অলৌকিক সৃজনকর্ম যাঁর, তিনি মহাকুশলী।

প্রতিটি বস্তুর মৌল উপাদানসমূহ একই। কিন্তু তাদের বহিরঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন আকার, প্রকার ও রঙ। এই বহুধা বৈচিত্র্যও আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এক মহাক্ষমতাধর ও মহাকুশলী ছাড়া এই অবাক করা সৃষ্টিশৈলী উন্মোচন করতেন কে? সৃজনরহস্যের বহুবিচিত্র বিবর্তনই বা সতত সঞ্চারমান রাখতেন কে? শায়েখ আবু

www.eelm.weebly.com

আলী ইবনে সিনার অভিমতও এরকম। একথাও মনে রাখতে হবে যে, এই বিশাল সৃষ্টি অবয়ববিশিষ্ট। আর এর স্রষ্টা হচ্ছেন অবয়বের অতীত, আনুরূপ্যবিহীন। আল্লাহ্‌পাক তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিপ্রায় ও প্রতাপের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর এই বিশাল সৃষ্টিতে। প্রতিটি সৃষ্টিকে চিহ্নিত করেছেন পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যধারীরূপে। শিল্প যেমন শিল্পীর সমতুল নয়, তেমনি সৃষ্টিও নয় তার স্রষ্টার সমতুল বা সমকক্ষ। এই মহা সৃষ্টির সঙ্গে তার স্রষ্টা আল্লাহ্‌র তুলনা কিন্তু এরকমও নয়। কারণ সকল প্রকার তুলনা, উপমা ও দৃষ্টান্ত থেকে তিনি চিরমুক্ত ও চিরপবিত্র। তিনি আনুরূপ্যবিহীন।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে।' আল্লাহ্‌র আরশে সমাসীন হওয়ার ব্যাখ্যাটি একটি জটিল ব্যাখ্যা। সুরা ইউনুসের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করার অর্থ তাদেরকে নিজ নিজ কক্ষপথে চলতে বাধ্য করা। আল্লাহ্‌পাকই অন্য সকল সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। তাঁর নির্দেশে, নিয়মে ও নির্ধারিত সময়ে তারা আবর্তিত হয়। আর এই সুশৃঙ্খল আবর্তনের কারণেই অভ্যুদয় ঘটে দিবস ও রাত্রির।

'কুল্লুঁই ইয়াজ্‌রী' অর্থ প্রত্যেকেই পরিক্রমণরত। অর্থাৎ প্রত্যেকে পরিক্রমণ করে তাদের আপন আপন কক্ষ পথে। 'লি আজালিম্ মুসাম্মা' অর্থ নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রতিটি আবর্তন শেষ করার জন্য যে সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে, সে পর্যন্ত। অথবা যতদিন পৃথিবী ও আকাশের আয়ুষ্কাল, ততোদিন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌ই সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক। জীবন-মৃত্যু, উত্থান-পতন, সৃষ্টি-ধ্বংস, সকল কিছুর তিনি একক পরিকল্পক, ব্যবস্থাপক ও সিদ্ধান্তদাতা। এসকল কিছুর মধ্যে কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন।' একথার অর্থ তিনিই একমাত্র দলিল-প্রমাণ অবতীর্ণকারী। অথবা— তিনিই প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করেন ধারাবাহিক রীতিতে।

শেষে বলা হয়েছে— 'যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পারো।' একথার অর্থ—'হে মানুষ, এতক্ষণ ধরে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, গুণাবলী ও কার্যাবলীর বিবরণসমূহ উপস্থাপন করা হলো এ জন্যে যে, তোমরা যেনো অতঃপর এই বিশ্বাসে স্থিত হতে পারো— যিনি বিনা মৌল উপাদানে এরকম বিচিত্র ও রহস্যময় মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি

www.eelm.weebly.com

এসকল কিছু ধ্বংস করতেও সক্ষম। ধ্বংসের পর পুনরায় সৃষ্টি করাও তাঁর নিকটে অতি সহজ। আর তিনি এরকমই করবেন। আখেরাতে তোমাদেরকে হাজির হতেই হবে বিচারের জন্য। তখন তিনি পুণ্যবানদেরকে করবেন পুরস্কৃত। আর তিরস্কৃত করবেন পাপিষ্ঠদেরকে।

পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌ই ভূপৃষ্ঠকে করেছেন সমতল ও সম্প্রসারিত, যেনো মানুষ পৃথিবীতে চলাফেরা করতে পারে নির্বিঘ্নে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন।' এখানে 'রওয়াসি' অর্থ পর্বত, যা অচঞ্চল। যেমন বলা হয় 'রসিয়াশ শাই' (বস্তুটি সুস্থির হয়ে গেলো)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম স্থাপিত হয় আবু কুবাইস্ পাহাড়। 'আন্‌হারা' অর্থ— নদীসমূহ যা পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে প্রবাহিত হয়। আলোচ্য বাক্যটির কর্ম দু'টি একে অপরের সম্পূরক। তাই এখানে দু'টি কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে একই ক্রিয়ার অধীনে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং প্রত্যেক ফল সৃষ্টি করেছেন দুই প্রকারের।' একথার অর্থ— এই পৃথিবীতে তিনি সৃষ্টি করেছেন দুই প্রকারের ফল। ভালো ও মন্দ। উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— তিনি সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন জাতের ফল। আর ওই ফলগুলো দু'রকমের। অথবা এখানে 'দুই প্রকারের' বলে স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় ফলকেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। আল্লাহ্‌তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।' একথার অর্থ— তিনিই রাতের আঁধারে ঢেকে দেন দিনকে। আবার নিশীথের তমসাকে দূর করে দেন দিবসের উজ্জ্বলতা দ্বারা। এভাবে নিয়মিত চলতে থাকে দিবা-রাত্রির আবর্তন। পুনরাবর্তন।

শেষে বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।' একথার অর্থ— পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, ফল-মূল ও দিবস-রজনীর বিবর্তনের মধ্যে সতত প্রতিভাত হয়ে চলেছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নৈপুণ্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন। এসকল কিছুই হচ্ছে তাঁর অদ্বিতীয়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তিমত্তার পরিচায়ক। এসব নিখুঁত নিয়মানুবর্তিতা দেখে বুঝে নিতে হবে, এগুলোর প্রবর্তক ও নিয়ন্ত্রক কতোই না মহান। কিন্তু সবাই একথা বোঝে না। এই সরল রহস্যটি বুঝতে পারে কেবল চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ সম্প্রদায়।

www.eelm.weebly.com

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۗ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

❑ ভূমির বিভিন্ন অংশ পরস্পর সংলগ্ন; উহাতে আছে দ্রাক্ষা-কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ; উহাদিগকে দেওয়া হয় একই পানি; এবং ফলের হিসাবে উহাদিগের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ভূমির বিভিন্ন অংশ পরস্পর সংলগ্ন।' একথার অর্থ— ভূ-প্রকৃতি এক রকম নয়। তাই দেখা যায়, কোথাও কর্দমাক্ত জলাভূমি। কোথাও প্রস্তরময় প্রান্তর। কোথাও অরণ্য। আবার কোথাও দিগন্তবিস্তারী শস্যভূমি। কোথাও চিরহরিৎ বৃক্ষরাজি। আবার কোথাও পত্রপুষ্পহীন উদ্ভিদের সমাবেশ। এরকম বিচিত্র প্রকৃতির মৃত্তিকাখণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এই ধরিত্রী। মাটির এই রূপবৈচিত্রের পৃথক বৈশিষ্ট্য ও পরস্পরলগ্নতার মধ্যেও রয়েছে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র কুশলী নির্মাণের নিদর্শন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে আছে দ্রাক্ষা-কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ; তাদেরকে দেয়া হয় একই পানি; এবং ফলের হিসাবে তাদের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্টত্ব দিয়ে থাকি।' এখানে 'যার্উন্' হচ্ছে ধাতুমূল। তাই এর বহুবচনরূপী ব্যবহার নেই। 'সিন্ওয়ান' (একাধিক শিরবিশিষ্ট) হচ্ছে বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'সান্বু'। যেমন 'ক্বিন্ওয়ান' এর একবচন ক্বান্বু। কথাটির অর্থ একমূলে দুই বা ততোধিক কাণ্ড। হজরত ইবনে আব্বাসকে লক্ষ্য করে একবার রসুল স. বলেছিলেন, পিতৃব্য তার পিতার সানবু (কাণ্ড)। অর্থাৎ পিতামহ মূল এবং পিতা ও পিতৃব্য হচ্ছে ওই মূলের দু'টি কাণ্ড। 'গইরু সিন্ওয়ান' অর্থ এক শিরবিশিষ্ট বা এক কাণ্ডবিশিষ্ট। আর 'আল্উকুল' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে— বর্ণ, গন্ধ, পরিমাপ, আস্বাদ ও সুগন্ধিতে ফলগুলো একটি অপেক্ষা অন্যটি উৎকৃষ্টতর। হাসানের সূত্রে ইমাম তিরমিজি এবং বিশুদ্ধ সূত্রে হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, এই আয়াতে বর্ণিত ফলগুলো কোনোটি মিষ্টি এবং কোনোটি টক। এই হিসেবে একটি অপরটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য বাক্যে উল্লেখিত ফল-মূলের বৈচিত্র বিষয়ক বিবরণও আল্লাহ্তায়ালার অতুলনীয় সৃজনকৌশলের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতে করে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্পাকই এ সকল কিছুর এক্কক সৃজক ও নিয়ন্ত্রক। একই মাটি থেকে উৎপন্ন ফল-মূলের এই বিচিত্র সমারোহ এককভাবে কেবল তাঁরই মহিমা নির্দেশ করে। আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে এরকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন মুজাহিদ বলেছেন, একই জনকের ঔরসজাত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কত বিচিত্র। কেউ উত্তম। কেউ অধম। হাসান বলেছেন, প্রথমে পৃথিবী ছিলো একটি মাত্র মৃত্তিকাপিণ্ড। এরপর আল্লাহ্ তাঁর আনুরূপ্যবিহীন পবিত্র হস্তের মাধ্যমে মৃত্তিকাপিণ্ডটিকে করলেন খণ্ড বিখণ্ড ও সুবিস্তৃত। কিন্তু পরস্পরসংলগ্ন। ফলে দেখা গেলো কোথাও রয়েছে আদিগন্ত উন্মুক্ত প্রান্তর। কোথাও সুউচ্চ পর্বতমালা। কোথাও বিশাল সাগর, আবার কোথাও ধু ধু মরু-পাথার। এরপর প্রবাহিত করে দিলেন মৌসুমী বাতাস। সৃষ্টি করলেন মেঘপুঞ্জ। বৃষ্টিপাত হলো। কোথাও জন্ম নিলো শ্যামল উদ্ভিদ। কোথাও ফললো বৈচিত্রময় ফল ও ফসল। আবার কোথাও সৃষ্টি হলো লবনাক্ততা, অনুর্বরতা। একই বৃষ্টিপাতে সিক্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথক বৈচিত্র নিয়ে পরিদৃশ্যমান হলো এই পৃথিবী। মানুষের উপমাও এরকম। একই পিতা থেকে শুরু হয়েছে তাদের জন্মপ্রবাহ। সকলের উপরে বর্ষিত হয়ে চলেছে হেদায়েতের সমমাত্রিক বর্ষণ। কিন্তু সে বর্ষণে সিক্ত হচ্ছে কারো কারো হৃদয়। তাদের চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কোমলতা, আনুগত্যপ্রবণতা ও বিনয়। আবার কারো কারো অসিক্ত হৃদয়ে সৃষ্টি হচ্ছে ঔদাসিন্য, অনানুগত্য ও অবিনয়।

হাসান বলেছেন, আল্লাহ্র শপথ, কোরআন পাঠের অনুষ্ঠানে উপবেশনকারী যখন সেখান থেকে প্রস্থান করে, তখন হয় সে লাভবান, নতুবা হয় ক্ষতিগ্রস্ত। কল্যাণ অর্জন করতে পারলে হয় লাভবান। আর না করতে পারলে হয় ক্ষতির শিকার। যেমন আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন— 'আর আমি ধারাবাহিকভাবে কোরআন অবতীর্ণ করি, যা মুমিনদের জন্য নিরাময় ও করুণা এবং জালেমদের জন্য বৃদ্ধি করে কেবল অকল্যাণ।'

শেষে বলা হয়েছে—'অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।' একথার অর্থ— আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত অনন্যসাধারণ সৃজনশৈলীর প্রতি যদি কেউ জ্ঞানচক্ষু সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তবে সে আল্লাহ্পাকের একক অস্তিত্ব ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার নিদর্শন অবশ্যই অবলোকন করবে।

সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আল্লাহ্পাকের এই অনির্বচনীয় সৃজনমহিমা উপলব্ধি করতে অক্ষম। তাই তারা বিশ্বাসী হতে সক্ষম হয় না। এভাবে তারা আল্লাহ্র প্রতি অবিশ্বাসী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরকালকেও অস্বীকার করে বসে। তাই পরকালকে অস্বীকার করার শাস্তি সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে এভাবে—

www.eelm.weebly.com

وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

❒ যদি তুমি বিস্মিত হও তবে বিস্ময়ের বিষয় উহাদিগের কথা: 'মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নূতন জীবন লাভ করিব?' উহারাই উহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং উহাদিগেরই গলদেশে থাকিবে লৌহ-শৃংখল। উহারাই অগ্নিবাসী ও সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে বিস্ময়ের বিষয় তাদের কথা: মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করবো?' এখানে 'মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করবো?'— প্রশ্নটি 'ক্বওলুহুম' (তাদের কথা) উক্তিটির প্রতি-উক্তি। অথবা সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের বক্তব্য-বিষয়। তাদের বক্তব্যে রয়েছে পারলৌকিক জীবনের প্রতি অস্বীকৃতি। উত্থাপিত প্রশ্নটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ্তায়ালাই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার পর তিনি পুনরায় আর সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করতে পারবেন না। অথচ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি সহজতর। কারণ প্রথম সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত থাকে অভূতপূর্ব অভিপ্রায়, পরিকল্পনা ও পরিমাপ। অংশীবাদীরা একথা স্বীকারও করে। কিন্তু ধ্বংসের পর পুনরায় সৃষ্টি করাকে তারা মনে করে অসম্ভব। পথভ্রষ্ট দার্শনিকদের ধারণাও এরকম। এটা কি তাদের চরম মূর্খতা নয়?

আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে— অংশীবাদীদের সম্মুখে অলৌকিক নিদর্শনসমূহ দিবালোকের মতো পরিস্ফুট। বিভিন্ন দলিল প্রমাণাদির উপস্থিতি সত্ত্বেও তারা রসুল স. এর রেসালতকে অস্বীকার করে চলেছে। উপাসনা করে চলেছে দেব-দেবীদের, শুভাশুভের বোধ ও ক্ষমতা তাদের একেবারেই নেই। তাদের এসকল মূর্খজনোচিত কর্মকাণ্ড দেখে রসুল স. বিস্মিত হন। আর তারাও একথা ভেবে বিস্মিত হয় যে, আমাদেরকে আবার পুনর্জীবিত করা হবে কীভাবে?

এরপর বলা হয়েছে—'তারাই তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে।' একথার অর্থ— আখেরাতকে অস্বীকার করা, প্রকারান্তরে আল্লাহ্কে অস্বীকার করা। কারণ এতে করে আল্লাহ্তায়ালার অপার ক্ষমতার প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন করা হয়। আর যিনি অপার ক্ষমতার অধিকারী নন, তিনি তো প্রভুপালক ও উপাস্য হওয়ার যোগ্যও নন।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে—'এবং তাদের গলদেশে থাকবে লৌহশৃঙ্খল।' একথার অর্থ— অংশীবাদীদের গলদেশে রয়েছে ভ্রষ্টতার, অবিশ্বাসের অথবা পাপাসক্তির শিকল, যা থেকে নিষ্কৃতির কোনো সম্ভাবনাই তাদের নেই। অথবা নরকবাসের সময় তাদের কণ্ঠদেশে ঝুলিয়ে দেয়া হবে আগুনের শিকল। কিংবা পুনরুত্থান দিবসে তাদের গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে অনল-জিঞ্জির।

শেষে বলা হয়েছে—'তারাই অগ্নিবাসী ও সেখানে তারা স্থায়ী হবে।' এখানে 'হুম' হচ্ছে জমির ফসল (বিয়োজক সর্বনাম)। বাক্যের মধ্যভাগে শব্দটি বসানো হয়েছে একথা বুঝানোর জন্য যে, যারা কাফের বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, কেবল তারাই চিরকাল বসবাস করবে দোজখে। এটাই সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত। কিন্তু পথভ্রষ্ট মুতাজিলারা একথা মানে না। তাদের মতে পাপী বিশ্বাসীরাও চিরস্থায়ী দোজখবাসী হবে।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ৬

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَٰتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

❒ মংগলের পরিবর্তে উহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, যদিও উহাদিগের পূর্বে ইহার বহু দৃষ্টান্ত গত হইয়াছে। মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানেও কঠোর।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মংগলের পরিবর্তে তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদিও তাদের পূর্বে এরকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।' নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোনো কিছু কামনা করাকে আরবী ভাষায় বলে 'ইস্‌তি'জ্বাল'। 'সাইয়্যিআহ্' অর্থ শাস্তি। 'হাসানা' অর্থ মঙ্গল বা কল্যাণ। 'আলমাছুলাত' অর্থ ওইরূপ শাস্তি, যা দেয়া হয়েছিলো বিগত যুগের কাফেরদেরকে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এরকম— মক্কায় মুশরিকেরা ক্ষমা ও নিরাপত্তার বদলে চাইতো শাস্তি। উপহাসচ্ছলে তারা বলতো, হে আল্লাহ্! তোমার নবী ও তোমার কোরআন যদি সত্য হয়, তবে আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করো, অথবা অবতীর্ণ করো অন্য কোনো ভয়াবহ গজব। কিন্তু তারা একথা কেনো ভাবেনা যে, বিগত যুগের কাফেরদের উপর অনেক গজব আপতিত হয়েছে। এখনো সেসকল স্থানে রয়েছে গজবের চিহ্ন। তারা ওই সকল গজবের কথা শুনে অথবা গজবের চিহ্ন সমূহ পরিদর্শন করে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয় না কেনো? উল্লেখ্য যে 'মাছুলাতুন',

www.eelm.weebly.com

'মাছালাতুন', 'সাদুক্বাতুন' 'সাদাক্বাতুন'— এ সকল শব্দের মাধ্যমে সব ধরনের শাস্তিকে বুঝানো হয়। শাস্তি নির্ধারিত হয় অপরাধের নিরীখে। তাই 'কিসাস' (বদলা) কেও বলা হয় 'মিছাল' (দৃষ্টান্ত)। যেমন বলা হয় 'আমছালতুর্ রজুলা' (আমি লোকটির কিসাস গ্রহণ করেছি)।

এরপর বলা হয়েছে—'মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।' একথার অর্থ— আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে আত্মঅত্যাচার করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। উল্লেখ্য যে, এই ক্ষমা চিরস্থায়ী ক্ষমা নয়। এখানে ক্ষমা বা মাগফিরাতের অর্থ হচ্ছে অবকাশ। অর্থাৎ বিশ্বাসে, আচরণে ও কথায় পুনঃ পুনঃ সীমালংঘন সত্ত্বেও আল্লাহ্পাক তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তিদান করছেন না। তারা চাইলেও এই পৃথিবীতে চূড়ান্ত শাস্তিদান আল্লাহ্র অভিপ্রায় নয়। তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে সাময়িক অবকাশ।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানেও কঠোর।' একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক যেমন ক্ষমাশীল, তেমনি কঠোর শাস্তিদাতাও। তাঁর শাস্তি প্রতিরোধ করার সাধ্য কারো নেই। সুদ্দী বলেছেন, 'আপনার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল'— কথাটি অবতীর্ণ হয়েছে গোনাহ্গার মুমিনদের জন্য। তাদের জন্য কোরআন মজীদে যতো আয়াত এসেছে, সেগুলোর মধ্যে এই আয়াতটিই সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক। এই আশাব্যঞ্জকতার মাধ্যমে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, তওবা ব্যতিরেকেও মার্জনাপ্রাপ্তি সম্ভব। কারণ তওবাকারীর প্রতি 'সীমালংঘন' কথাটি প্রয়োগ করা যায় না। তওবাকারী তো নিষ্পাপ। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে সর্বোন্নত সূত্রে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, 'ইন্না রব্বাকা লাজূ মাগফিরাহ্' (তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল) এবং 'ইন্না রব্বাকা লাশাদীদ' (তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানেও কঠোর) — দু'টো উক্তিই বিশ্বাসীদের প্রতি প্রযোজ্য। তবে ক্ষমা ও শাস্তি— দু'টোই নির্ভর করে আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের উপর। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফাইয়াগফিরু লিমাঁইয়্যাশাউ ওয়া ইউ আ'জ্জিবু মাঁইয়্যাশাউ' (তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন)।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে মুরসালরূপে ইবনে আবী হাতেম, বায়হাকী ও ওয়াহেদী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যদি ক্ষমা ও নিষ্কৃতি না থাকতো, তবে কেউই জীবিত থাকতে পারতো না। আর তাঁর পক্ষ থেকে দণ্ডদানের হুঁশিয়ারী না থাকলে মানুষ কাজকর্ম সব বাদ দিয়ে বসে থাকতো কেবল তাঁর রহমতের আশায়।

www.eelm.weebly.com

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

❏ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা বলে, 'মুহম্মদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' তুমি তো কেবল সতর্ককারী, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথ প্রদর্শক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে তারা বলে, মোহাম্মদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তাঁর নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেনো?' একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা তাদের পছন্দমতো মোজেজা দেখতে চাইতো। তাই তারা বলতো, মোহাম্মদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তাঁর নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেনো? অর্থাৎ তারা যা চায়, সেরকম কিছু অবতীর্ণ হয় না কেনো?

শেষে বলা হয়েছে— 'তুমিতো কেবল সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথ প্রদর্শক।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! অংশীবাদীদের অসংগত উক্তিসমূহের প্রতি দৃকপাত করবেন না। আপনার দায়িত্ব কেবল বার্তা প্রচার করা। আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করা। তারা যে রকম চায়, সে রকম কোনো অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করা আপনার দায়িত্বভূত কোনো বিষয় নয়। আপনার পূর্ববর্তী প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিকটে বার্তাবাহক প্রেরিত হয়েছে। তারাও মানুষকে আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে সজাগ হতে বলেছিলেন। তাদের মতো আপনিও একজন সতর্ককারী। তারা ছিলেন তাদের সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য পথ-প্রদর্শক। আপনিও তেমনি আপনার সম্প্রদায়ের (বিশ্বমানবতার) পথ-প্রদর্শক। অবিশ্বাসীদের মনগড়া আবদারের প্রতি তারা কর্ণপাত করেননি, সুতরাং আপনিও অংশীবাদীদের অসংগত আবেদনে সাড়া দিবেন না।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'হাদ' অর্থ আল্লাহ্। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— প্রতিটি সম্প্রদায়ের হেদায়েতপ্রাপ্তি নিশ্চিত করেন আল্লাহ্, অথবা মানুষের হেদায়েতের যোগ্যতা সৃষ্টি করেন আল্লাহ্। যেমন তিনি এরশাদ করেন— 'ইয়াহ্‌দি মাঁইয়্যাশাউ ইলা সিরাতিম মুসতাক্বীম' (তিনি তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন)। ইকরামা বলেছেন, এখানে 'হাদ' অর্থ রসুল স.। এমতাবস্থায় আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— রসুল স. শুধু ভীতি প্রদর্শনকারী নন, তিনি প্রতিটি সম্প্রদায়ের পথ-প্রদর্শকও বটে।

শিয়া ও রাফেজীরা বলে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পথ-প্রদর্শক ছিলেন হজরত আলী। তাদের মতে আয়াতটির প্রকৃতরূপ এরকম— ওয়া লিকুল্লি ক্বওমিন হাদিন্

www.eelm.weebly.com

আলীউন্ (আলী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শক)। কোরআন সংকলনের সময় হজরত আলীর প্রতি বিদ্বেষবশতঃ হজরত ওসমান 'আলীউন্' কথাটি বাদ দিয়েছেন। এরকম অপবাদ দেয়ার পর তারা আরো বলে, আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন (নাউজুবিল্লাহ্)। কারণ আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'ওয়া ইন্না লাহু লা হাফিজূন' (আমিই কোরআনের সংরক্ষক)। উল্লেখ্য যে, রাফেজীদের এরকম অপবিশ্বাসকে মেনে নিলে হজরত আলী তো রসুল স. অপেক্ষা অধিক মর্যাদা লাভ করেন। তাদের মতানুসারে তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়— হে রসুল! আপনি তো ভীতিপ্রদর্শনকারী মাত্র। আর আলী হচ্ছে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পথ-প্রদর্শক। অর্থাৎ পথ প্রদর্শনের যোগ্যতা আপনার নেই, কারণ তা আলীর জন্য নির্ধারিত। এরকম হওয়া কি সম্ভব? কখনোই নয়। সুতরাং তাদের মতামত সর্বোতভাবে পরিত্যজ্য।

আল্লাহ্পাকের জ্ঞান ও শক্তিমত্তা অবিভাজ্য। তিনিই সকলের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। ওই নির্ধারণের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কারো নেই। অবিশ্বাসীদের সকল আবেদন তিনি পূরণ করতে সক্ষম। তাদেরকে হেদায়েত দান করাও তাঁর পক্ষে অতি সহজ। কিন্তু হেদায়েত লাভের উদ্দেশ্য তাদের একেবারেই নেই। তাই শত সহস্র অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করলেও তারা কখনোই ইমান আনবে না। তারা যা আদৌ চায় না, তা তাদের উপরে জোর করে চাপানো আল্লাহ্র অভিপ্রায় নয়। তাই তিনি রসুলগণকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, আপনি তো কেবল সতর্ককারী, আর আপনার মতো সতর্ককারী ও পথ-প্রদর্শক প্রেরণ করা হয়েছিলো অতীতের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ৮

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ وَكُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝

☐ স্ত্রীজাতির প্রত্যেকের গর্ভে যাহা আছে এবং জরায়ুতে যাহা কিছু পরিবর্তন ঘটে আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং তাঁহার বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— স্ত্রীজাতি তাদের গর্ভে যা ধারণ করে তার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা উত্তমরূপে অবগত। অর্থাৎ গর্ভস্থিত সন্তান ছেলে না মেয়ে, একজন না জময, পূর্ণ অবয়বধারী না বিকলাংগ এবং তার অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সম্পর্কে আল্লাহ্পাক সম্যক অবগত। আর তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুর একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ আছে, যা অলংঘনীয়।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'মা' মাসদারিয়া বা ধাতুগত অর্থ প্রকাশক। অথবা 'মা' শব্দটি এখানে সংযোজক। 'তামদাদু' শব্দটি এসেছে 'ইযদাদ' থেকে। এটি হচ্ছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালবাচক সকর্মক অথবা অকর্মক ক্রিয়ার রূপ। যেমন বলা হয়, 'ইযদাদাল কৃওমু আ'লা আশারাহ্' (দলটি দশ জনের অধিক সদস্যবিশিষ্ট)। আরো বলা হয় 'ওয়া নাযদাদু কাইলা বাঈর' (আমি একবার বেশী করে উট দিবো)। এখানকার এই ক্রিয়াটি যদি অকর্মক হয় তবে 'মা' অব্যয়টি হবে ধাতুগত অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ জরায়ুর হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে আল্লাহ্পাক সম্যক অবগত। আর হ্রাস-বৃদ্ধি অর্থ ভ্রূণের অবয়ব অথবা সংখ্যাগত হ্রাস-বৃদ্ধি। আর যদি ক্রিয়াটি এখানে সকর্মক হয় তবে 'মা' অব্যয়টি হবে সংযোজক ও ধাতুগত উভয় প্রকার অর্থ প্রকাশক।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, গর্ভকালীন সময়সীমা ছয় মাস। বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে কারো স্ত্রী যদি সন্তান প্রসব করে, তবে হজরত ওসমানের অভিমতানুসারে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে। কারণ সে ব্যভিচারিণী। হজরত ইবনে আব্বাস কিন্তু এই বিধানের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, এভাবে কোরআনের বিধানের মধ্যে বিতণ্ডার সৃষ্টি করলে এ বিতণ্ডা কখনো শেষ হবে না। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— সন্তানের গর্ভ ধারণ ও স্তন্য পান করানোর সময় সীমা ত্রিশ মাস। অন্যত্র এরশাদ করেন স্তন্য পান করানোর সময় সীমা দুই বছর। অর্থাৎ দুই বছর পর শিশুর দুগ্ধপান স্থগিত করতে হবে। উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলা যেতে পারে যে, দুধ পান করানোর সময়সীমা দুই বছর আর গর্ভধারণের সময়সীমা ছয়মাস। এইভাবে মোট তিরিশ মাস। হজরত ইবনে আব্বাসের এই ব্যাখ্যা শুনে হজরত ওসমান তাঁর অভিমতটি প্রত্যাহার করেছিলেন। আর এ ব্যাপারে কেউ কোনো উচ্চবাচ্যও করেননি। ফলে ঐকমত্যানুসারে স্থিরিকৃত হয়েছে যে, গর্ভধারণের ন্যূনতম সময়সীমা হচ্ছে ছয়মাস। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, ছয় মাসেও সন্তান ভূমিষ্ট হয় এবং সে অন্য শিশুদের মতো ভালোভাবে বেড়ে উঠে। জীবিতও থাকে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সীমা দুই বছর।

ইমাম বায়হাকী ও দারা কুতনী ইবনে মোবারকের পদ্ধতিতে ধারাবাহিক সূত্রে দাউদ বিন আবদুর রহমান ইবনে জুরাইজ, জুমিলা বিনতে সা'দ থেকে সুনান গ্রন্থে একটি হাদিস সংকলন করেছেন। হাদিসটি এই— উম্মত জননী হজরত আয়েশা বলেছেন, গর্ভধারণের সময়সীমা দু'বছরের অধিক হতেই পারে না। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, গর্ভধারণের সময়কাল দুই বছরের অধিক হয়ই না, যদিও অতিরিক্ত সময়টি একটি সরল গাছের ছায়ার মতো।

www.eelm.weebly.com

ইমাম মালেকের মতানুসারে ও ইমাম শাফেয়ীর এক বক্তব্যানুসারে গর্ভধারণের সর্বাধিক সময়-পরিসর চার বছর। আর এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকের অভিমত হচ্ছে, ওই সময়সীমা সর্বাধিক পাঁচ বছর। হান্নাত বিন সালমা বলেছেন, হরম বিন সানান মাতৃউদরে অবস্থান করেছিলেন চার বছর। তাই তাঁকে হরম বলে ডাকা হতো। হরম বলে বয়োবৃদ্ধকে।

ইমাম বায়হাকী বলেছেন, ওলিদ বিন মুসলিম একবার ইমাম মালেক বিন আনাসকে বললেন, জননী আয়েশা বলেছেন, গর্ভধারণের সময়সীমা দুই বছরের বেশী হতে পারে না এবং ওই দীর্ঘতম গর্ভধারণ একটি সরল বৃক্ষের ছায়া সদৃশ। একথা শুনে ইমাম মালেক বললেন, সুবহানাল্লহ্! কেউ কি এরকম কথা বলতে পারে! মোহাম্মদ উজলানের সহধর্মিণী ছিলেন আমার প্রতিবেশিনী। ছিলেন সত্যভাষিণী। তাঁর স্বামীও ছিলেন সত্যবাদী। আমার ওই প্রতিবেশিনী তিনবার গর্ভবতী হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিটি গর্ভবহনের সময়সীমা ছিলো চার বছর।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, জননী আয়েশার বর্ণনাটি কিয়াসসম্ভূত ছিলো না। কারণ এ ধরনের সমস্যায় কিয়াসের অবকাশ নেই। বরং কথাটি তিনি শুনেছিলেন রসুল স. থেকে। তাই হাদিসটি সর্বোন্নত পর্যায়ের। অর্থাৎ কথাটি জননী আয়েশার নয়, রসুল স. এর। আর একটি মারফু হাদিস রয়েছে, যা মোহাম্মদ বিন উজলানের সহধর্মিণীর উক্তির চেয়েও অধিক নির্ভরযোগ্য। হাদিসটি যদি সরাসরি রসুল স. এর বাণী হিসেবে প্রমাণিত হয়, তবে জননী আয়েশার কথাটিকে আর ভুল বলা যাবে না। আর ওলিদ বিন মুসলিমের বর্ণনা সত্য হলেও, ইমাম মালেকের উদ্ধৃত উক্তিটি গ্রহণযোগ্য মনে হলেও এবং তাঁর প্রতিবেশিনীর সাক্ষ্যটিকে গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেয়া হলেও ভুলের আশংকা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ দীর্ঘ চার বৎসর ধরে কোনো নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ থাকলে কী করে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব যে চার বৎসরের পুরোটা সময়ই সে গর্ভবতী ছিলো? গর্ভধারণ ছাড়াও তো দীর্ঘকাল ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে থাকতে পারে। এমতাবস্থায় ওই নারীর দুই বৎসর বা ততোধিক সময় ঋতুস্রাব বন্ধ ছিলো এবং তার অন্তঃসত্ত্বার সময়সীমা ছিলো দুই বৎসর অথবা দুই বৎসরের নিম্নে— এমনো তো বলা যেতে পারে। যদি বলা হয় গর্ভবতী নারী তার উদরাভ্যন্তরে চার বছর ধরে ভ্রূণের নড়াচড়া অনুভব করেছে, তবে এর জবাবস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, উদরাভ্যন্তরে কেবল ভ্রূণেরই আলোড়ন অনুমিত হয় না, আবদ্ধ বায়ুর আলোড়নও অনুমিত হতে পারে। একটি ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, এক রমণী নয় মাস যাবৎ তার উদরে কোনো কিছুর নড়াচড়া অনুভব করলো। বন্ধ হয়ে গেলো তার রজঃস্রাব। উদর স্ফীত হতে লাগলো ক্রমান্বয়ে। এক সময় উপস্থিত হলো

 www.eelm.weebly.com

প্রসবকাল। কিন্তু দেখা গেলো রমণীটি কেবল পানি নির্গমন করে চলেছে। এভাবে তার স্ফীত উদর স্বাভাবিক হয়ে এলো। কিন্তু কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো না। আরেকটি ঘটনা— এক লোক কয়েক বৎসর যাবৎ ছিলো নিরুদ্দেশ। তারপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দেখতে পেলো তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। হজরত ওমর ওই রমণীটিকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে চাইলেন। হজরত মুয়াজ তখন বললেন, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! শরিয়ত আপনাকে ওই রমণীটির প্রাণ সংহারের অধিকার দিয়েছে। কিন্তু উদরের সন্তান সংহারের অধিকার আপনাকে দেয়া হয়নি। তাই আমি বলি, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আপনি আপনার বিধান কার্যকর করুন। যথাসময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। কিন্তু সন্তানটিকে দেখে বোঝা যাচ্ছিলো, তার বয়স কয়েক বৎসর। তার সামনের পাটিতে দু'টি দাঁতও গজিয়েছিলো। রমণীটির স্বামী শিশুটিকে দেখে বলে উঠলো, কাবার প্রভুপালকের শপথ! এই শিশুটিতো আমারই ঔরসজাত শিশু। হজরত ওমর রমণীটিকে দণ্ডাদেশ থেকে অব্যাহতি দিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুই বৎসরের অধিক অন্তঃসত্ত্বার সময়সীমা হজরত ওমর কর্তৃক গৃহীত হয়েছিলো।

উপরে বর্ণিত ঘটনাটি একটি অনুক্ত প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হচ্ছে— হজরত ওমর কর্তৃক ঘোষিত দণ্ডাদেশটি রহিত হলো কেনো? জবাবে বলা যেতে পারে যে, ওই লোকটি তার স্ত্রীর প্রসবকৃত সন্তানকে নিজের ঔরসজাত বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলো। বলেছিলো, কাবার প্রভুপালকের শপথ এই শিশু আমারই ঔরসজাত। শরিয়তের বিধান হচ্ছে— শয্যা যার সন্তান তার। উপপতির মাধ্যমে কোনো রমণী যদি গর্ভধারণ করে থাকে তবুও ওই সন্তান তার স্বামীর বলে মেনে নেয়া হয়। আর এ ক্ষেত্রে স্বয়ং স্বামীই ওই সন্তানকে তার নিজের সন্তান বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ কারণেই হজরত ওমর দণ্ডাদেশটি রহিত করেছিলেন।

মাসআলা ঃ একই উদরে এক সঙ্গে কতজন শিশু জন্মলাভ করতে পারে, তার কোনো সীমারেখা নেই। কেউ কেউ বলেছেন, এক সঙ্গে চারটি শিশুর জন্মলাভের কথা জানা যায়। ইমাম আবু হানিফাও এরকম বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ইয়েমেনের একজন বয়োপ্রবীণ আমাকে বলেছেন যে, তাঁর স্ত্রী পাঁচ বার অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলো। প্রতিবারেই জন্ম নিয়েছিলো পাঁচটি করে শিশু সন্তান। আমি বলি, ভারতবর্ষের একটি বহুল প্রচারিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, ইউরোপের অধিবাসী জনৈক বিচারকের স্ত্রী একই সঙ্গে একশত শিশু সন্তান প্রসব করেছে এবং সকলেই জীবিত রয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, স্বনামধন্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, রজঃপাত হচ্ছে জরায়ুর কোপ। গর্ভস্থিত শিশুর উপর কুপিত জরায়ুর প্রভাব পড়লে শিশুর অনিষ্ট হয়। রজঃস্রাবের রক্ত হচ্ছে গর্ভস্থিত শিশু-ভ্রূণের খাদ্য। সেই রক্ত বেরিয়ে এলে

www.eelm.weebly.com

তার খাদ্য ঘাটতি তো দেখা দিবেই। গর্ভধারণের পর ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে বলেই শিশুর অবয়ব স্বাভাবিকভাবে পূর্ণত্ব লাভ করতে থাকে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'জরায়ুতে যা কিছু পরিবর্তন ঘটে আল্লাহ্ তা জানেন।' একথার অর্থ— গর্ভস্থিত শিশুর অবয়বগত ভারসাম্য যদি নষ্ট হয়, তবে আল্লাহ্ তা জানেন। আবার উত্তরোত্তর যদি তার সুসমঞ্জস প্রবৃদ্ধি ঘটে, তবু তা আল্লাহ্র জ্ঞানের অধীনেই ঘটে। কখনো কখনো এরকমও হয় যে, গর্ভবতী রমণীর ঋতুস্রাবের কারণে শিশুর প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে গর্ভকালীন সময়সীমা। প্রসবকাল অতিক্রম করার পরেও কখনো কখনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না। গর্ভাবস্থায় পাঁচ দিন ঋতুস্রাব হলেও দেখা যায় শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে নয় মাস পাঁচ দিনের মাথায়। মোট কথা, শিশুখাদ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে গর্ভকালীন সময়েরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। হাসান বসরী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'গইদুল আরহাম' বলে নয় মাসের কম গর্ভাবস্থার কথা বলা হয়েছে। আর 'যিয়াদাত' বলে বুঝানো হয়েছে নয় মাসের অধিক গর্ভাবস্থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'পরিবর্তন' বা হ্রাস-বৃদ্ধি বলে বুঝানো হয়েছে যথাক্রমে গর্ভপাত ও সুষম গর্ভকে।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ৯, ১০

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝

❐ যাহা অদৃশ্য ও যাহা দৃশ্যমান তিনি তাহা অবগত; তিনি মহান সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

❐ তোমাদিগের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে উহা প্রকাশ করে, রাত্রিতে যে আত্মগোপন করে এবং দিবসে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে তাহারা সমভাবে আল্লাহের জ্ঞানগোচর।

'গইব' অর্থ অদৃশ্য এবং 'শাহাদত' অর্থ দৃশ্যমান। সুরা জ্বিনের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। 'কাবীর' অর্থ সর্বোচ্চ। অর্থাৎ আল্লাহ্র তুলনায় সকল কিছুই গৌণ। আর তিনি সকল কিছুর উপরে পূর্ণ প্রভাবশীল। এভাবে প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— প্রকাশ্য, গোপন সকল কিছুই আল্লাহ্র জ্ঞানায়ত্ত্ব। আর তিনি সুমহান, সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাধারী।

পরের আয়াতের (১০) মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বাক্যাবলী এবং নিশিথের আত্মগোপন ও দিবসের প্রকাশ্য বিচরণ— সকল কিছুই আল্লাহ্র নিকটে সমভাবে জ্ঞানগোচর। এখানে 'মান আসার্‌র' অর্থ

www.eelm.weebly.com

যারা মনের কথা মনেই রেখে দেয়। আর 'মান জহারা' অর্থ যারা মনের কথা অপরের নিকটে প্রকাশ করে। 'মানহুয়া মুসতাখফিম' অর্থ যে অপরের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে। আর 'সারিবুম্ বিন্নাহার' অর্থ যে দিবাভাগে সর্বসমক্ষে বিচরণ করে। 'সুরুব' থেকে গঠিত হয়েছে 'সারাবা' অথবা 'সারিবুন্।' এর অর্থ আগমন করা, নিক্রান্ত হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, 'সারাবুন' অর্থ পথ এবং 'সারিবুন' অর্থ পথিক। কিত্‌বী বলেছেন, যারা দিনভর বিভিন্ন কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকে, তাদেরকে বলে সারিবুম বিন্নাহার।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মুস্‌তাখফিম' অর্থ ব্যভিচারী। আর 'সারিবুম্ বিন্নাহার' অর্থ গোপনে ব্যভিচারী হওয়া সত্ত্বেও যে নিজেকে জনসমক্ষে ভালো মানুষ হিসেবে জাহির করে।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ১১

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ○

❒ মানুষের জন্য তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে ; উহারা আল্লাহের আদেশে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে। আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না উহারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তাহা রদ করিবার কেহ নাই এবং তিনি ব্যতীত উহাদিগের কোন অভিভাবক নাই।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মানুষের জন্য তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহ্‌র আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে।' একথার অর্থ— প্রতিটি মানুষের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহ্‌পাক নিয়োজিত রেখেছেন ফেরেশতামণ্ডলীকে। তারা প্রহরী হিসেবে ওই মানুষটির সামনে ও পিছনে অবস্থান করে এবং আল্লাহ্‌পাকের অভিপ্রায়ানুসারে তাকে বিপদাপদ থেকে হেফাজত করে এবং লিখে রাখে তার কর্মকাণ্ডের বিবরণ।

এখানে 'মুয়াক্কিবাত্' (প্রহরী) শব্দটি হচ্ছে বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'মুয়াক্কিবাহ্'। বাগবী লিখেছেন, 'মুয়াক্কাবুন' এর বহুবচন হচ্ছে 'মুয়াক্কাবাতুন্'। আর বহুবচনের বহুবচন হচ্ছে 'মুয়াক্কিবাত'। যেমন, 'রিজালুন' শব্দটি বহুবচন।

www.eelm.weebly.com

আর 'রিজালাতুন্' হচ্ছে বহুবচনের বহুবচন। এভাবে এখানে 'মুয়াক্কিবাতুন' কথাটির অর্থ হবে ফেরেশতামণ্ডলী, যারা দিবসে ও নিশিথে গমনাগমন করে। এক দল আসে আরেক দল চলে যায়। তারা মানুষের আমলের খবরাখবর সংগ্রহ করে এবং তাদেরকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে।

জ্ঞাতব্য ঃ ইযালাতুল খিফা গ্রন্থে কেনানা আদুবী থেকে বর্ণিত হয়েছে হজরত ওসমান একবার মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! একজনের সঙ্গে সবসময় কত জন ফেরেশতা থাকে? তিনি স. বললেন, দু'জন। একজন থাকে ডানে আরেকজন থাকে বাঁয়ে। ডানের ফেরেশতাই নেতৃস্থানীয়। কেউ সৎকর্ম করলে সে লিখে নেয় দশটি পুণ্য। আর অসৎকর্ম করলে বাম পাশের ফেরেশতা নেতা ফেরেশতাকে বলে, আমি কি তার পাপ লিখে রাখবো? নেতা বলে, অপেক্ষা করো সে তওবা অথবা ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে। এভাবে তিনবার অনুমতি প্রার্থনার পর নেতা ফেরেশতা তাকে পাপ লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দেয় এবং বলে এতো বড়ই দুর্জন। আল্লাহ্ এর সাহচর্য থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। এ লোকের আল্লাহ্‌র ভয় ও লজ্জা কোনোটাই নেই। এই ফেরেশতাদ্বয় সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে— মানুষের বাকস্ফূরণের সাথে সাথে সতত প্রস্তুত লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা তা লিখে রাখে। আর দু'জন ফেরেশতা থাকে প্রত্যেকের সম্মুখে ও পশ্চাতে। এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'মানুষের জন্য তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে।' সম্মুখের ফেরেশতা অধিকার করে থাকে মানুষের ললাটদেশ। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যে মস্তক অবনত করে, ওই ফেরেশতা তাকে চির উন্নত শির করে দেয়। আর যে গর্বভরে মস্তক উন্নত করতে চায়, তাকে সে করে দেয় অবনমিত ও লাঞ্ছিত। ওষ্ঠদেশে রয়েছে দু'জন ফেরেশতা। তারা কেবল ওই ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চারিত দরূদ শরীফের হেফাজত করে। মুখমণ্ডলের হেফাজতের দায়িত্বে রয়েছে একজন ফেরেশতা। সে হেফাজত করে মুখমণ্ডলের, যাতে মুখগহ্বরে প্রবেশ না করতে পারে সাপ-বিচ্ছু অথবা ক্ষতিকর কোনো কিছু। চক্ষুদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে দু'জন ফেরেশতা। এভাবে সর্বমোট দশজন ফেরেশতা প্রতিটি মানুষের সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। তাদের দায়িত্ব পালনের নিয়মটি এরকম— রাতের দায়িত্ব শেষ করে দশজন চলে যায়। আসে দিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতারা। দিন শেষে তারা চলে গেলে নতুন দশজন এসে প্রহরায় নিয়োজিত হয়। এভাবে দিনে ও রাতে নতুন নতুন ফেরেশতার দল পালাক্রমে প্রতিটি মানুষের সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পন্ন করে চলে। অপর দিকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য দিবাভাগে আগমন করে ইবলিস স্বয়ং। আর রাত্রিভাগে আগমন করে তার বংশধরেরা।

---

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বিশুদ্ধসূত্রে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের নিকট দিবস রজনীর ফেরেশতারা পালাক্রমে গমনাগমন করে। ফজর ও আসর হচ্ছে তাদের গমনাগমনের সময়। রাতের ফেরেশতারা উষাকালে উড়ে যায় উর্ধ্বজগতের দিকে। আল্লাহ্পাক সর্বজ্ঞ। তবু তিনি প্রত্যাগত ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমার দাসদেরকে তোমরা কী অবস্থায় দেখে এলে? একদল বলে, আমরা গিয়েই তাকে নামাজরত অবস্থায় পেয়েছিলাম। আগমনের সময়ও দেখে এলাম নামাজ পাঠরত অবস্থায় (এভাবে নামাজী ও বে-নামাজী সম্পর্কে প্রহরী ফেরেশতারা তাদের আপনাপন সাক্ষ্য উপস্থিত করে)।

'মিম্বাইনি ইয়াদাইহি' অর্থ সম্মুখের প্রহরী। আর 'ওয়ামিন খলফিহি' অর্থ— এবং সম্মুখের দিক বাদে অন্যান্য দিকের প্রহরী। অর্থাৎ দক্ষিণের, বামের ও পশ্চাতের প্রহরী।

'তারা আল্লাহ্র আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে' কথাটির অর্থ— ওই সকল প্রহরী ফেরেশতা তাদের প্রহরাধীন মানুষটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করে তার নিয়তি বহির্ভূত বিপদাপদ থেকে। কিন্তু নিয়তি নির্ধারিত বিপদাপদের ক্ষেত্রে তারা সরে দাঁড়ায়।

মুজাহিদ বলেছেন, প্রতিটি মানুষের প্রহরায় রয়েছে একজন করে ফেরেশতা। সে সুপ্তি ও জাগরণে তার হেফাজত করে। সকল ক্ষতিকারক বিষয়াবলী থেকে তাকে বাঁচায়। বিপদাপদ আপতিত হলে বলে, সরে যাও। কিন্তু ওই বিপদ যদি তকদিরের নির্ধারণ হয়, তবে সেই বিপদ থেকে সে বাঁচাতে পারে না। কা'ব আহবার বলেছেন, আল্লাহ্র আদেশে ফেরেশতারা মানুষের হেফাজত করে। আহারে-বিহারে, এমনকি নগ্ন অবস্থাতেও তারা মানুষের রক্ষণাবেক্ষণে রত। এভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা হলে ইবলিসের দল মানুষকে ছিনিয়ে নিতো। 'রক্ষণাবেক্ষণ করে'— কথাটির অর্থ, মানুষের কার্যকলাপের সংরক্ষণ করে, এরকমও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে 'মুয়াক্কিবাত' কথাটির মর্মার্থ হবে— দক্ষিণে ও বামে নিয়োজিত ফেরেশতাদ্বয় মানুষের সৎ ও অসৎ আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করে। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যখন সাক্ষাৎকারী দল তার সাথে সাক্ষাৎ করে ডান ও বাম থেকে।' একথার অর্থ— ডান ও বাঁয়ের প্রহরী ফেরেশতারা রক্ষণাক্ষেণ করে মানুষের কার্যকলাপ।

'মিন্ আমরিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র আদেশে। দু'রকম অর্থ হতে পারে কথাটির— ১. ওই ফেরেশতারা একের পর এক গমনাগমন করে কেবল আল্লাহ্র নির্দেশে। ২. আল্লাহ্র নির্দেশেই তারা মানুষের হেফাজতের দায়িত্ব পালন করে। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যানুসারে কথাটি হবে 'মুয়াক্কিবাত' শব্দের বিশেষণ। আর দ্বিতীয়

www.eelm.weebly.com

ব্যাখ্যানুসারে কথাটি সম্পৃক্ত হবে 'ইয়াহ্ফাজুনাহু' (তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে) এর সঙ্গে। আমরিল্লাহ্ (আল্লাহ্র আদেশ) বলতে আল্লাহ্র শাস্তিকেও বুঝায়। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র আদেশে আল্লাহ্র বান্দাকে রক্ষা করে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে। তাদের জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে। মানুষের জন্য আবেদন জানায় অবকাশ প্রদানের জন্য অথবা শাস্তিকে শিথিল করার জন্য। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'মিন আমরিল্লাহ্' কথাটির অর্থ হবে 'বিআমরিল্লাহ্।' অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশের কারণেই তারা আল্লাহ্র বান্দাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'প্রহরী' অর্থ ওই প্রতিরক্ষাবাহিনী যারা রাজার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করে এবং বিশেষভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'তার রক্ষণাবেক্ষণ করে' কথাটির অর্থ ওই প্রহরী ফেরেশতারা রসুল স. এর রক্ষণাবেক্ষণ করে— এরকমও হওয়া সম্ভব। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়াবে— রসুল স. এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে কিছু সংখ্যক ফেরেশতাকে মনোনীত করা হয়েছে, যারা মানব ও দানবের দিক থেকে সম্ভাব্য সকল অনিষ্টের আড়াল হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ্ বিন জায়েদ বলেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আমের বিন তুফাইল এবং আরবাদ বিন রবীয়া সম্পর্কে। আবু সালেহের সূত্রে কালাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার আমের বিন তুফাইল আমেরী এবং আরবাদ বিন রবীয়া আমেরী রসুল স. এর পবিত্র দরবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। রসুল স. তখন সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে মসজিদে বসেছিলেন। এমতাবস্থায় আমেরীদ্বয় প্রবেশ করলো মসজিদে। আমের ছিলো অন্ধ, কিন্তু রূপবান। মানুষ তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। দরবারে উপস্থিত একজন বললেন, আমের বিন তুফাইল আসছে। রসুল স. বললেন, আসতে দাও। আল্লাহ্পাক যদি তার কল্যাণ চান, তবে তিনিই তাকে পথপ্রদর্শন করবেন। আমের উপস্থিত হয়ে বললো, মোহাম্মদ, আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই তবে কী পাবো? তিনি স. বললেন, অন্যান্য মুসলমান যে অধিকার পায় তুমিও তা পাবে। সুখে দুঃখে হবে তুমি সকল মুসলমানের সাথী। সে বললো, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার এই রাজ্যপাট যদি আমাকে দান করতে সম্মত হন, তাহলে আমি মুসলমান হতে পারি। তিনি স.বললেন, এ ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই। বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়-নির্ভর। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। সে বললো, তাহলে নগরবাসীর প্রশাসক হিসেবে আপনি থাকুন। আর বেদুঈন যাযাবরদের প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করুন আমাকে। তিনি স. বললেন, এরকমও সম্ভব নয়। সে বললো, তাহলে? রসুল স. বললেন, আমি

 www.eelm.weebly.com

তোমাকে ঘোড়ার লাগামগুলো দিতে পারবো। আর তুমি ঘোড়ায় আরোহণ করে জেহাদ করতে পারবে। সে বললো, আমার নিকট তো অনেক যুদ্ধাশ্ব রয়েছে। ঠিক আছে, আপনি একটু উঠুন। আপনার সঙ্গে একান্তে আলাপ করতে চাই। রসুল স. গাত্রোত্থান করলেন। আমেরের সঙ্গে নিরিবিলি কিছু সময় কাটালেন। আমের তার সাথী আরবাদকে আগেই বলে রেখেছিলো, মোহাম্মদ যখন আমার সঙ্গে আলাপে মগ্ন থাকবে তখন তুমি অতর্কিতে পিছন থেকে তাকে তলোয়ারের আঘাত করে শেষ করে দিবে। কথাবার্তা এক সময়ে কথাকাটাকাটির পর্যায়ে চলে গেলো। সুযোগ বুঝে আরবাদ গিয়ে দাঁড়ালো রসুল স. এর পশ্চাতে। ভাবলো, এই তো সুযোগ। কিন্তু খাপ থেকে কিছুতেই সে তার তলোয়ার বের করতে পারলো না। বার বার চেষ্টা করেও বিফল হলো। হঠাৎ পিছন দিকে তাকিয়ে রসুল স. তাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পারলেন। দুই হাত ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে সাহায্য প্রার্থনা করলেন আল্লাহ্তায়ালার নিকটে। বললেন, হে আমার প্রভুপালক! তুমি তো মুনতাক্বিম (প্রতিশোধ গ্রহণকারী)। সুতরাং তুমি আমার শত্রুকে আমার জিম্মায় ছেড়ে না দিয়ে সরাসরি প্রতিশোধ গ্রহণ করো। আকাশ ছিলো মেঘমুক্ত। তবুও অকস্মাৎ বজ্রপাত ঘটলো। আর সে বজ্র পড়লো আরবাদের মাথার উপর। বজ্রাহত হয়ে নিমেষের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো সে। ভয়ে পলায়ন করলো আমের। কিন্তু পালিয়ে যেতে যেতে বললো, অতি শীঘ্রই ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন অশ্ব ও রণকুশলী যুবক যোদ্ধাদের এনে আমি এই উপত্যকা ভরে ফেলবো। মোহাম্মদের বদ্দোয়ায় নিহত আরবাদের প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বো। রসুল স. বললেন, আল্লাহপাকের ইচ্ছায় আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা তোমাকে হতাশ করে দিবে। আমের দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলো এক সলুলী রমণীর গৃহে। সেখানে রাত্রি যাপনের পর অতি প্রত্যূষে সে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হলো। ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে অতিদ্রুত উপস্থিত হলো একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে। বিকট হুংকার ছেড়ে বললো, হে মৃত্যুর ফেরেশতা! এবার বেরিয়ে এসো। প্রত্যক্ষ করো আমার শৌর্যবীর্য। এরপর সে কিছু উত্তেজনাগন্ধী কবিতা আবৃত্তির পর বললো, শপথ লাত ও উজ্জার। আজ দ্বিপ্রহরের মধ্যে যদি মোহাম্মদ ও তার সঙ্গী মৃত্যুর ফেরেশতার কাছে পৌঁছে যেতে পারি, তবে আমি তাদের দু'জনকেই এই বর্শা দ্বারা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিবো। আল্লাহ্পাক অদৃশ্য জগৎ থেকে পাঠিয়ে দিলেন এক ফেরেশতাকে। ওই ফেরেশতা এসে তার পাখা দ্বারা একটি ঝাপটা মারলো আমেরের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে। তার উরুর উপর উদগত হলো অস্বাভাবিক একটি মাংশপিণ্ড। সম্বিত ফিরে পেয়ে সে দৌড় দিলো ওই সলুলী রমণীর গৃহের দিকে। কিন্তু

www.eelm.weebly.com

দৌড়াতে গিয়ে উরুর মাংশপিণ্ডটি দেখে বললো, এতো দেখছি উটের কুজের মতো একটি মাংশপিণ্ড। এর যন্ত্রণায় তো আর বাঁচি না। তার ইচ্ছে হলো, কমপক্ষে ওই রমণীর গৃহে উপস্থিত হওয়ার পর তার মৃত্যু হোক। সে কষ্টেসৃষ্টে পুনরায় তার ঘোড়ায় আরোহণ করলো। ঘোড়া ছুটছিলো দিশেহারার মতো। আর ওই ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো সে।

সা'লাবী বর্ণনা করেছেন, আরবাদ ধ্বংস হয়েছিলো বজ্রপাতে এবং আমের নিপাত হয়েছিলো প্লেগে। তাদের ওই ঘটনাই এই সুরার দশ ও এগারো আয়াতে বিবৃত হয়েছে এভাবে— 'তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে তারা সমভাবে আল্লাহ্র জ্ঞানগোচর। মানুষের জন্য তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহ্র আদেশে তাঁর (রসুল স. এর) রক্ষণাবেক্ষণ করে।' তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আরবাদ বিন কায়েস ও আমের বিন তুফাইল মদীনায় রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হলো। আমের বললো, মোহাম্মদ, আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই, তাহলে তুমি আমাকে কি দিবে? তিনি স. বললেন, অন্য মুসলমানরা যা পায় তুমিও তাই পাবে। আর সকল মুসলমানের যে কর্তব্য, তোমার উপরেও সেই কর্তব্য বর্তাবে। আমের বললো, তোমার ইন্তেকালের পর তোমার এই রাজত্বের অধিকারী কি আমি হতে পারবো? তিনি স. বললেন, না। তুমি অথবা তোমার সম্প্রদায়ের কেউই তা পাবে না। রসুল স. এর এমতো জবাব শুনে আমের ক্ষিপ্ত হলো। সে উঠে গিয়ে আরবাদের সঙ্গে গোপনে শলাপরামর্শ করে এলো। সে গোপনে আরবাদকে বললো, আমি মোহাম্মদকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিরিবিলি আলাপ শুরু করবো। ওই সময় তুমি সুযোগ বুঝে পিছন থেকে তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলবে। ফিরে এসে আমের বললো, মোহাম্মদ, আমি তোমার সঙ্গে একা একা কিছু কথা বলতে চাই। রসুল স. তার সঙ্গে উঠে বাইরে গেলেন এবং একা একা আলাপচারিতা শুরু করলেন তার সঙ্গে। খুনের নেশা পেয়ে বসলো আরবাদকে। সে তার কৃপান কোষমুক্ত করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তার হাত কেঁপে উঠলো অজানা আশংকায়। এমন সময় রসুল স. পিছনে তাকালেন। তার দুরভিসন্ধি আঁচ করতে পেরে তিনি স. সরে গেলেন সেখান থেকে। ধরা পড়ার ভয়ে আমের ও আরবাদ দ্রুত সেখান থেকে উধাও হয়ে গেলো। পথিমধ্যে তাবারকম নামক স্থানে পৌছলে আকস্মিক বজ্রপাতে মারা গেলো আরবাদ। তখন আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করলেন— 'স্ত্রী জাতির প্রত্যেকের গর্ভে' থেকে 'যদিও তিনি মহাশক্তিশালী' (আয়াত ৮-১৩) পর্যন্ত।

সা'লাবীর বর্ণনায় ওই ব্যক্তিদ্বয়ের একজনের নাম বলা হয়েছে আরবাদ বিন রবীয়া। আর তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে আরবাদ বিন কায়েসের কথা। সা'লাবীর বর্ণনায় বলা হয়েছে আমেরের মৃত্যু হয়েছিলো প্লেগে। আর তিবরানীর বর্ণনায়

 www.eelm.weebly.com

আমেরের মৃত্যুর উল্লেখ নেই। বর্ণনা দু'টোর মধ্যে আরেকটি পার্থক্য হচ্ছে — সা'লাবীর বর্ণনা দীর্ঘ এবং তিবরানীর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোনো সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ অশুভ কোনো কিছু ইচ্ছা করেন, তবে তা রদ করবার কেউ নেই এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক নেই।' একথার অর্থ— কোনো জাতিই সুদিনের মুখ দেখতে পায় না, যতক্ষণ না তারা সুদিন ফিরে পাওয়ার জন্য দুর্দিনে চেষ্টা সাধন না করে। আর কোনো জাতির প্রতি যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু আপতিত করতে চান, তবে তা প্রতিরোধ করার সাধ্যও কারো নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবকও নেই। হওয়া সম্ভবও নয়।

এখানে 'মা বিক্বওমিন্' অর্থ জাতির সুদিন বা শুভদিন। 'মা বিআনফুসিহিম' অর্থ তারা কল্যাণ কামনা না করে কামনা করে অকল্যাণের (অকল্যাণকে পরিবর্তনের চেষ্টা না করে)।

'ইজা আরাদাল্লহু বিক্বওমিন্' অর্থ চেষ্টা সাধনার পরেও যদি আল্লাহ্ তাদের প্রতি অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন, শাস্তি প্রদান করতে চান। 'ফালা মারাদ্দা লাহু' অর্থ তবে তা প্রতিরোধ করবার কেউ নেই। 'মারাদ্দুন' শব্দটি ধাতুমূল, তবে কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশক। 'মিঁউওয়াল' অর্থ বিপদ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা। আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্পাকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু সংঘটিত হয় না। হতে পারে না। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত। কিন্তু পথভ্রষ্ট মুতাজিলারা বলে এরকম হওয়া সম্ভব।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমার প্রিয়তম রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে কেউ যেনো তার সর্বনাশ ডেকে না আনে। আমার কোপ ও শাস্তি প্রতিরোধ করার সাধ্য কারো নেই।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ১২, ১৩

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۚ

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ۚ

❑ তিনিই তোমাদিগকে দেখান বিজলী যাহা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং তিনি সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ।

www.eelm.weebly.com

❐ বজ্র নির্ঘোষ ও ফেরেশতাগণ সভয়ে তাঁহার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত করেন; তথাপি উহারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে যদিও তিনি মহাশক্তিশালী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ই তোমাদেরকে দেখান বজ্র-বিদ্যুৎ এবং তিনিই আকাশে সঞ্চার করেন পুঞ্জীভূত মেঘ। উল্লেখ্য যে, বজ্র ও বৃষ্টির মধ্যে আশংকা ও আনন্দ দু'টোই রয়েছে। যেমন, বজ্রপতনের ফলে সম্ভাবনা রয়েছে মৃত্যুর। অতিবৃষ্টির কারণে কখনো কখনো দেখা দেয় ভূমিধস। আবার কখনো হয় ফসলের ক্ষতি। আবার পরিমিত বৃষ্টিপাতের মধ্যে রয়েছে দাবদাহ থেকে মুক্তির আনন্দ। ফল ও ফসলের অধিক ফলনের আশা। এখানে 'সাহাবাতুন' এর বহুবচন 'সাহাবুন্'। এর অর্থ বৃষ্টি। সাহাবুন্ ও সিহাবুন্ এর শাব্দিক অর্থ আকর্ষণ। যেহেতু শূন্য মার্গ থেকে বায়ুর আকর্ষণে বৃষ্টি ঝরে, তাই এর নাম 'সিহাব' বা বৃষ্টি। কামুস অভিধান রচয়িতা এরকম বলেছেন।

'ছাক্বিলাতুন' এর বহুবচন হচ্ছে 'ছিক্বাল'। এর অর্থ ঘন বা ভারী। অর্থাৎ পুঞ্জীভূত মেঘ অথবা বৃষ্টিভরা মেঘ।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'বজ্র নির্ঘোষ ও ফেরেশতাগণ সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে।' একথার অর্থ— ফেরেশতাগণ 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' বলে ঘোষণা করে আল্লাহ্র মহিমা ও পবিত্রতা। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি ও নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স.কে একবার বজ্রধ্বনি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ওটা হচ্ছে এক ফেরেশতা, মেঘমালা যার কর্তৃত্বাধীন। তার কাছে রয়েছে অগ্নি-যষ্টি, যদ্দারা সে মেঘমালা পরিচালনা করে।

জ্ঞাতব্যঃ তিরমিজি কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এবং আহমদ, তিরমিজি ও নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার কিছু সংখ্যক ইহুদী রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলো, রা'দ (বজ্রধ্বনি) কি? তিনি বললেন, মেঘমালা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদের মধ্যে একজন ফেরেশতা। আল্লাহ্র নির্দেশানুসারে সে মেঘমালা পরিচালনা করে। তারা বললো, শব্দ হয় কিসের? তিনি বললেন, ওদেরই শব্দ। হজরত জাবের থেকে ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মেঘমণ্ডলীর উপর এক ফেরেশতাকে কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। সে বিক্ষিপ্ত মেঘগুলোকে একত্রিত করে। তার হাতে রয়েছে একটি আগুনের লাঠি। যখন সে তার আগুনের লাঠিটি উত্তোলন করে তখনই বিদ্যুৎ চমকায়। যখন হুংকার দেয়, তখন ধ্বনিত হয় বজ্রনির্ঘোষ। আর যখন ওই লাঠি দ্বারা মেঘকে প্রহার করে, তখন হয় বজ্রপাত।

---

 www.eelm.weebly.com

'মিন্ খীফাতিহী' অর্থ সভয়ে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়ে। 'খীফাতিহী' এর 'হী' সর্বনামটি এখানে আল্লাহ্‌পাকের প্রতি নিবদ্ধ। কেউ কেউ বলেছেন, সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে ওই ফেরেশতামণ্ডলীর প্রতি, যারা আকাশের মেঘমালা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বজ্রধ্বনি শুনে পাঠ করতে হয়— সুবহানাল্লাজি ইউসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহি ওয়াল মালাইকাতু মিন খীফতিহী ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। বজ্রাহত ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করতে করতে মৃত্যুবরণ করলে তার মৃত্যু হবে ধর্মসম্মত। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের বজ্রের আওয়াজ শোনা মাত্র কথাবার্তা বন্ধ করে দিতেন এবং পাঠ করতেন— সুবহানা মাঁই ইউসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহি ওয়াল মালাইকাতু মিন খীফাতিহি। আর বলতেন, এটা পৃথিবীবাসীদের জন্য একটি হুঁশিয়ারী।

জুহাক সূত্রে জুয়াই বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রা'দ ফেরেশতা মেঘমালার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত। যেদিকে নির্দেশ দেয়া হয়, সেদিকেই সে মেঘ পরিচালনা করে। তার অঙ্গুরীয়ের ঢাল সাতসাগরের পানিতে ভরপুর। সে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করতে শুরু করলে আকাশের সকল ফেরেশতা সমস্বরে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা শুরু করে। তখনই শুরু হয় বৃষ্টি। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমার দাসেরা যদি আমার নির্দেশ মতো চলতো, তবে আমি তাদের রাতকে করতাম বর্ষণমুখর এবং দিনকে করতাম সূর্যকরোজ্জ্বল। প্রাত্যহিক কাজকর্মে তারা কোনো অসুবিধাই বোধ করতো না। বজ্রধ্বনির ভীতিও তাদেরকে আচ্ছাদিত করতো না। বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ। বায়যাবী আলোচ্য বাক্যটির তাফসীর করেছেন এভাবে, রা'দের গুরুগম্ভীর নাদ শুনে অন্য ফেরেশতারাও আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও প্রশংসা করতে থাকে। চিৎকার করে সকলে বলতে থাকে সুবহানাল্লহ্, ওয়াল হামদুলিল্লাহ্। এরকমও হতে পারে যে— রা'দ স্বয়ং তসবিহ্ পাঠে মগ্ন হয়। অর্থাৎ মেঘের গর্জনে ঘোষিত হয় আল্লাহ্‌র এককত্ব ও শক্তিমত্তা ও অনুকম্পা। আমি বলি, এই ব্যাখ্যাটি তখনই গ্রহণীয় হবে, যখন রা'দ বলতে কোনো একজন ফেরেশতা প্রমাণিত হবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা আঘাত করেন।' এখানে 'সওয়াইক্ব' অর্থ ধ্বংস সাধনকারী বিদ্যুৎ। অর্থাৎ বজ্রপাত, যা কারো উপরে নিপতিত হলে তাকে ভস্মীভূত করে দেয়।

এরপর বলা হয়েছে—'তথাপি তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে।' একথার অর্থ— মেঘ, বিদ্যুৎ ,বজ্র ইত্যাদি দেখেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আল্লাহ্‌র এককত্ব

www.eelm.weebly.com

ও অতুলনীয়-অবিভাজ্য ক্ষমতা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রসুলের সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। 'জ্বিদাল' অর্থ তুমুল বাকবিতণ্ডা। শব্দটি গঠিত হয়েছে, 'জ্বাদ্‌লুন্‌' থেকে। জ্বাদ্‌লুন্‌ অর্থ প্রাণ সংহার করা।

বাগবী লিখেছেন, মোহাম্মদ বিন আলী বাকের বলেছেন, বজ্রপাত বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের উপরে আপতিত হতে পারে কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র জিকিরে রত তাদের উপর আপতিত হয় না।

হজরত আনাস থেকে নাসায়ী ও বায্‌যার বর্ণনা করেছেন, মূর্খতার যুগে একবার রসুল স. তাঁর এক সহচরকে প্রেরণ করলেন এক গোত্রাধিপতির নিকটে। তিনি তাকে ইমানের প্রতি আহ্বান জানালেন। গোত্রাধিপতি বললো, তুমি যে পালনকর্তার প্রতি আমাকে আহ্বান জানাচ্ছো, সে কিসের তৈরী? লোহার, তামার, না সোনা-রূপার। একথা শুনে রসুল সহচর ফিরে এলেন। বিষয়টি গোচরে আনলেন তাঁর। তিনি স. তাঁকে পুনরায় প্রেরণ করলেন। একই কথা শুনে ফিরে আসার পর আবারও প্রেরণ করলেন তাঁকে। কিন্তু সে বার বার একই প্রশ্ন করতে লাগলো। তখন আল্লাহ্‌ তার উপর বজ্রপাত ঘটালেন। বজ্রাঘাতে মৃত্যু হলো তার। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো 'এবং তিনি বজ্রপাত ঘটান' থেকে আলোচ্য আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

বাগবী লিখেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো, আরবাদ বিন রবীয়া সম্পর্কে। সে রসুল স.কে জিজ্ঞেস করেছিলো, তোমার পালনকর্তা কোন বস্তু দ্বারা তৈরী? মোতি, ইয়াকুত না স্বর্ণ দ্বারা? একথা বলার কারণে বজ্রাঘাতে মৃত্যু ঘটেছিলো তার।

হাসান বসরীকে একবার আলোচ্য আয়াতের অবতরণের প্রেক্ষিত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আরবের পৌত্তলিকদের মধ্যে অসম্ভব গোঁড়া এক পৌত্তলিক ছিলো। তাকে আল্লাহ্‌র দিকে আমন্ত্রণ জানানোর দায়িত্ব দিয়ে রসুল স. তাঁর কয়েকজন সহচরকে পাঠালেন। সে সহচরবৃন্দকে বললো, তোমরা আমাকে মোহাম্মদের প্রভুপালকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছো। কিন্তু আগে বলো, সেই প্রভুপালক কোন বস্তু দ্বারা গঠিত— সোনা, চাঁদি, লোহা না তামা? তার এরকম অশালীন উক্তি শুনে সহচরবৃন্দ ফিরে এসে রসুল স.কে জানালেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! যে লোকের কাছে আপনি আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন, তার চেয়ে বড় কাফের মনে হয় আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় নাই। রসুল স. বললেন, পুনরায় গমন করো। তারা পুনরায় সেখানে গেলেন। এবারেও সে একই প্রশ্ন করে বসলো। আরো বললো, কী ভাবছো তোমরা? মোহাম্মদের আদেশে আমি এমন এক পালনকর্তাকে স্বীকার করবো, যে কোনো দিন আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেনি।

www.eelm.weebly.com

তার সঙ্গে তো আমার কোনো পরিচয়ই নেই। সহচরগণ আবার ফিরে এলেন। সব কথা শুনে রসুল স. তাঁদেরকে পুনরায় লোকটির কাছে পাঠালেন। সে আগের মতোই কথাবার্তা শুরু করে দিলো। সহসা শুরু হলো মেঘের সমারোহ। শুরু হলো গুরুগম্ভীর বজ্র-নিনাদ। হঠাৎ বজ্রপাত হলো লোকটির উপর। বজ্রানলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো সে। সহচরগণ হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন। যাত্রা করলেন রসুল স. এর দরবার অভিমুখে। রাস্তায় দেখা হলো আরো কয়েকজন রসুল সহচরদের সঙ্গে। তাঁরা রসুল স. এর দরবার থেকে ফিরে আসছিলেন। তাঁরা প্রত্যাগমনকারী দলটিকে দেখে বললেন, লোকটি তাহলে বজ্রাহত হয়েই মরলো। প্রত্যাগমনকারী সহচরবৃন্দ বললেন, তোমরা জানলে কি করে? তারা জবাব দিলেন, রসুল স. এর উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে 'আর তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার দ্বারা আঘাত করেন' (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

শেষে বলা হয়েছে— 'যদিও তিনি মহাশক্তিশালী।' বাগবী লিখেছেন, হাসান বসরী বাক্যটির অর্থ করেছেন এভাবে— আর তিনি দুর্দমনীয় প্রতিশোধপরায়ণ। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— আর তিনি প্রচণ্ড শক্তিশালী। আবু উবায়দা বলেছেন— কঠিন শাস্তি আরোপকারী। কেউ কেউ বলেছেন— মহাকুশলী, অপ্রতিরোধ্য। কামুস রচয়িতা লিখেছেন— অদৃশ্য চক্রান্তসহ কৌশলে কার্যসিদ্ধকারী। তবে এ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কৌশল বাস্তবায়নকারী, শক্তিমত্তার অধিকারী, কঠোর শাস্তিদানকারী, প্রতিশোধ প্রতিষ্ঠাকারী, অতুলনীয় শৌর্যের অধিকারী ইত্যাদি যে কোনো একটি অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'মিহাল' শব্দের 'মীম' বর্ণটি শব্দের মূল বর্ণ নয়। এমতো ক্ষেত্রে 'হাওল', 'হিলা' অথবা 'হাইলুলাহ্' ধাতুমূল থেকে শব্দটি বিধিবহির্ভূত নিয়মে গঠিত। তাই হজরত ইবনে আব্বাস এর অর্থ করেছেন— প্রচণ্ড শক্তিশালী। হজরত আলী অর্থ করেছেন— কঠিনভাবে আটককারী।

আলোচ্য আয়াতে রসুল স. এর বিরুদ্ধাচারীদের জঘন্য পরিণামের কথা উল্লেখিত হয়েছে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে এইমর্মে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা অংশীবাদী, মূর্খতার অন্ধকার গহ্বরে তোমরা আমূল প্রোথিত। আমার রসুল তোমাদেরকে আহ্বান জানিয়ে চলেছেন পবিত্র বিশ্বাসের দিকে। প্রকৃত ধর্মাদর্শের দিকে। অথচ তোমরা ক্রমাগত তাঁর বিরোধিতা করে চলেছো। কিন্তু মনে রেখো, তোমরা শত বিরোধিতা করলেও তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বিচ্যুতও করতে পারবে না তাঁকে তাঁর ধর্মমত থেকে। কারণ তোমাদের মতাদর্শ কল্পনানির্ভর। আর তাঁর মতাদর্শ বাস্তবোচিত।

www.eelm.weebly.com

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَىْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ○ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ○

❒ আল্লাহের প্রতি আহ্বানই বাস্তব; যাহারা তাঁহাকে ব্যতীত আহ্বান করে অপরকে তাহাদিগকে কোনই সাড়া দেয় না উহারা; তাহাদিগের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে তাহার মুখে পানি পৌঁছিবে এই আশায় তাহার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে এমন পানির দিকে যাহা তাহার মুখে পৌঁছিবার নহে। সত্য প্রত্যাখ্যান-কারীদিগের আহ্বান নিষ্ফল।

❒ ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আল্লাহের প্রতি সিজদাবনত থাকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সে সমস্ত এবং তাহাদিগের ছায়াগুলিও— সকাল ও সন্ধ্যায়।

'লাহু দা'ওয়াতুল হাক্ব' অর্থ আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানই বাস্তব। এই আহ্বান হচ্ছে সত্যের আহ্বান। এই চিরসত্য আহ্বানের প্রতি সাড়া দেয়া অপরিহার্য কর্তব্য। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, চিরসত্য এই দাওয়াত বা আহ্বানের দাবি হচ্ছে, আল্লাহ্ই একমাত্র উপাসনার্হ। সুতরাং উপাসনা করতে হবে কেবল তাঁর। আর সকল অভাব অভিযোগ পূরণের জন্য প্রার্থনার হস্ত উত্তোলন করতে হবে তাঁরই দিকে। বিশুদ্ধচিত্তে প্রার্থনা করাকেও দা'ওয়াতুল হাক্ব বলা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রার্থী হতে হবে কেবল তাঁরই সকাশে। এসকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পেক্ষাপটে 'হাক্ব' (সত্য) কথাটির মর্ম হবে ওই সকল বিষয়বস্তু, যা বাতিলের সম্পূর্ণ বিপরীত। এমনও বলা যায় যে, এখানে 'হাক্ব' অর্থ আল্লাহ্। তিনিই সত্য। সুতরাং তাঁর দিকের সকল আহ্বানই সত্য।

একটি সন্দেহঃ 'হক' অর্থ যদি আল্লাহ্ হয়, তাহলে দেখা যায় বাক্যটি অসম্পন্ন। আল্লাহ্পাকের আহ্বান তো আল্লাহ্পাকের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট থাকবে। এমতাবস্থায় এই আহ্বানের সঙ্গে অন্য কেউ সংশ্লিষ্ট থাকবে কি করে?

 www.eelm.weebly.com

সন্দেহভঞ্জনঃ এই বিষয়টি সন্দেহের অতীত যে, আল্লাহ্ই সত্য। কিন্তু আলোচ্য বাক্যে 'হাক্ব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান বুঝানোর জন্য। বাতিলের আহ্বান যেমন বাতিল, তেমনি হকের আহ্বানও হক। বাক্যটি স্বয়ং একটি দলিল। তাই এখানে বলা হয়েছে— আল্লাহ্র প্রতি আহ্বানই বাস্তব বা সত্য। বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, দাওয়াতে হাক্ব অর্থ তওহীদ (আল্লাহ্র এককত্বে বিশ্বাস)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, লাইলাহা ইল্লাল্লহ্ (আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নাই)— এ কথার সাক্ষ্য দেয়াই হচ্ছে দাওয়াতে হাক্ব। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তওহীদ এবং সত্যের প্রতি আহ্বান আল্লাহ্পাকের সঙ্গেই বিজড়িত।

আমের ও আরবাদকে যদি আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ বলে মেনে নেয়া হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— তারা কিছু বুঝে উঠবার আগেই আল্লাহ্পাকের অদৃশ্য সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হলো। আর তা বাস্তবায়িত হলো রসুল স. এর প্রার্থনার প্রেক্ষিতে। সত্যিকারের রসুল যদি তিনি না হতেন, তবে আল্লাহ্পাক কি তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করতেন? আর আয়াতটি যদি কোনো বিশেষ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত না করা হয়, তবে বুঝতে হবে সাধারণভাবে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে শাসানোর উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। তখন বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমরা আল্লাহ্র রসুলের সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হচ্ছো, কিন্তু জেনে রেখো, আল্লাহ্ মহাশক্তিশালী এবং তিনি তাঁর রসুলের আবেদন মঞ্জুরকারী। এমনও বলা যায় যে, তাদেরকে তিরস্কার বা শাসানোর উদ্দেশ্যে নয়, তাদের বিভ্রান্তি ও অপবিশ্বাস প্রকাশ করাই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা তাঁকে ব্যতীত আহ্বান করে অপরকে, তাদেরকে কোনোই সাড়া দেয় না তারা; তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে তার মুখে পানি পৌঁছাবে এই আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে এমন পানির দিকে যা তার মুখে পৌঁছবার নয়।' একথার অর্থ— অংশীবাদীরা আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে যে সকল দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করে তারা তো নিঃসাড়। সুতরাং তারা কীভাবে তাদের পূজকদের আবেদন পূরণ করবে? তাদের দৃষ্টান্তটি এরকম— পানির কাছে কেউ তার হস্ত প্রসারিত করলো, এমতাবস্থায় পানি কি আপনা আপনি তার মুখে প্রবেশ করবে?

'ওয়াল্লাজীনা ইয়াদউ'না মিন দুনিহী' অর্থ যারা তাঁকে ব্যতীত আহ্বান করে অপরকে। এখানে 'যারা' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। আর 'ইয়াদউ'না' (আহ্বান করে) কথাটির কর্মপদ এখানে উহ্য। ওই উহ্য কর্মপদ হচ্ছে প্রতিমা, দেব-দেবী ইত্যাদি। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, যারা আল্লাহ্কে ছেড়ে দেব-দেবীদেরকে ডাকে, তাদের পূজা করে এবং তাদের নিকট

www.eelm.weebly.com

প্রার্থনা জানায়। অথবা এখানে আল্লাজীনা (যারা) কথাটির মর্ম হবে— ওই সকল বস্তু, যাদেরকে পূজা করে কাফেরেরা। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— এই কাফেরেরা যে সকল দেব-দেবীর পূজা করে।

'লা ইয়াস্তাজীবুনা লাহুম বিশাইইন' অর্থ তারা তাদের ডাকে কোনো সাড়া দেয় না। অর্থাৎ ওই সকল জড় প্রতিমা কাফেরদের বিপদমুক্তি বা কল্যাণজনক কোনো আবেদন কবুল করতে পারে না। এখানে 'লা ইয়াস্তাজীবুনা' কথাটির অর্থ হবে লাইয়ুজীবুনা (কবুল করতে পারে না)।

এখানে 'ইল্লা কাবাসিত্বি কাফ্ফাইহি' (শুধুমাত্র তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে) একটি ব্যতিক্রমী বাক্য। কিন্তু যে কথার ব্যতিক্রম সে কথাটি এখানে উহ্য। আবার 'বাসিত্ব' শব্দটির সম্বন্ধপদও এখানে উহ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানির দিকে হাত বাড়ালেই কি হবে? আপনা আপনি কি তার মুখে পানি ঢুকবে?

'ওয়ামা হুয়া বিবালিগিহ' অর্থ যা তার মুখে পৌঁছবার নয়। অর্থাৎ পানি একটি নিস্প্রাণ পদার্থ। তাই তার নিকট হাজারো কাকুতি-মিনতি করলেও সে পিপাসিত ব্যক্তির মুখে প্রবেশ করবে না। অংশীবাদীদের দৃষ্টান্তও এরকম। তারা জড় প্রতিমার নিকট প্রার্থী হয়। কিন্তু সেগুলো অনুভূতি ও স্পন্দনহীন। তাই শোনার, বোঝার ও আবেদন মঞ্জুর করার কোনো যোগ্যতাই তাদের নেই। এরকম ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন মুজাহিদ ও আতা। হজরত আলী থেকেও এরকম ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক ভাষ্যকার কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন ভিন্নভাবে। বলেছেন, বিগ্রহবন্দনাকারীরা বিগ্রহগুলোর নিকটে বিভিন্ন আবেদন উপস্থিত করে। কিন্তু তাদের এমতো আবেদন নিষ্ফল। কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ— কোনো কিছু করার ক্ষমতা তাদের নেই। বিগ্রহপূজকদের দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির মতো— যে তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সে পানির নিকট গমন করলো। হস্ত প্রসারিত করে আঁজলা ভরে পানি তুলতে চাইলো। কিন্তু খালি হাতে পানি ধারণ করার সাধ্য তার নেই। সুতরাং সে কীভাবে পানি তুলে এনে পান করবে? আর বিগ্রহগুলোও তো নিস্প্রাণ। কারো লাভ অথবা ক্ষতি করার সামর্থ্য তাদের একবারেই নেই। তাই তাদের উপাসনা করা খালি হাতে পানি ধারণ বা সংরক্ষণ করার মতো। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম ব্যাখ্যা এসেছে। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অপরকে উপাস্য স্থির করার দৃষ্টান্তটি এরকম— কোনো পিপাসিত ব্যক্তি পানি পান করার উদ্দেশ্যে পানির মধ্যে তার হাত প্রবেশ করালো, কিন্তু আঁজলা তৈরী করলো না। সোজা আঙ্গুলে ঘি তোলার মতো যদি সে সোজা হাতে পানি তুলতে চায়, তবে কি সফল হবে?

 www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আহ্বান নিষ্ফল।' এখানে 'দ্বলাল' অর্থ ভ্রান্তি বা নিষ্ফলতা। জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আল্লাহ্‌র নিকটে যে প্রার্থনা জানায় তা পণ্ডশ্রম মাত্র। তাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতাই তাদের ও আল্লাহ্‌র মধ্যে অন্তরায়। সে অন্তরায় অভেদ্য।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আল্লাহ্‌র প্রতি সেজদাবনত থাকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সে সমস্ত এবং তাদের ছায়াগুলোও— সকাল ও সন্ধ্যায়। এখানে 'মান ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ত্বাওয়া' (আল্লাহ্‌র প্রতি সেজদাবনত থাকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে) কথাটির অর্থ— ফেরেশতাকুল ও বিশ্বাসবান মানুষ ও জ্বিন আনন্দিতচিত্তে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়।

'কারহান' অর্থ অবিশ্বাসী ও কপটচারী। তারাও ধর্মনিষ্ঠদের প্রভাবে বাধ্য হয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করে। অথবা বিপদ-মুসিবত তাদেরকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করায় যদিও তারা এ ব্যাপারে অপ্রসন্ন।

'ওয়া জিলালুহুম' অর্থ তাদের ছায়াসমূহ। ছায়া সব সময় তার মূলের অনুসারী। তাই সেজদাবনতদের ছায়াগুলোও সেজদাবনত হয়। এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে সেজদাবনত হওয়ার অর্থ হবে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ের বৃত্তে আশ্রয় গ্রহণ করা। নিজের ইচ্ছাকে অপসারিত করে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ানুসারে চলা। আর ছায়াগুলোর সেজদাবনত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌ই ছায়া প্রতিচ্ছায়াগুলোকে তাঁর ইচ্ছেমতো সংকুচিত অথবা প্রসারিত করেন। কখনো করেন প্রলম্বিত, কখনো সংকুচিত।

'আল্লাহ্‌র প্রতি সেজদাবনত থাকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে......' এই আয়াতটির মর্মার্থ এমনও হতে পারে যে, এখানে 'যা কিছু আছে' অর্থ হবে— ফেরেশতা ও ইমানদারদের যতো আত্মা আছে। আর 'তাদের ছায়াগুলো' অর্থ হবে— ফেরেশতা ও ইমানদারদের ব্যক্তিত্ব, অস্তিত্ব বা আকার। রসুল স. মানুষের প্রকাশ্য দিকটিকে অন্ধকারের সঙ্গে এবং অপ্রকাশ্য দিকটিকে আলোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি স. সেজদাবনত অবস্থায় দোয়া করতেন এভাবে— হে চিরঅমুখাপেক্ষী প্রভুপালক! আমার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দু'টো দিকই তোমাকে প্রণতি জানাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, এই ব্যাখ্যাটিই সুসঙ্গত। সূর্যালোক যেখানে পৌঁছতে পারে না, সেটাই তো ছায়া, যার নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্বহীন কোনো কিছু তো সেজদা করার যোগ্য নয়। অতএব বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ছায়া আলোছায়ার ছায়া নয়। বরং এই ছায়া হচ্ছে মানুষের একাংশের অস্তিত্ব, যা সেজদায় অংশ গ্রহণের যোগ্য।

www.eelm.weebly.com

'গুদুউয়্যি ওয়াল আসাল' এর শাব্দিক অর্থ সকাল-সন্ধ্যায়। আর মর্মার্থ, সব সময় (সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল— এভাবে সকল সময়)। 'আসাল' শব্দটি 'আসিল' এর বহুবচন। আসর মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়কে বলে আসাল।

নির্দেশনাঃ যাঁরা ১৫ সংখ্যক আয়াত আরবীতে পাঠ করেছেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সেজদা করে নিন।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ১৬

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

❒ বল, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক?' বল, 'তিনি আল্লাহ্।' বল, 'তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিয়াছ আল্লাহের পরিবর্তে অপরকে যাহারা নিজদিগের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নহে?' বল, 'অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক?' তবে কি তাহারা আল্লাহের এমন শরীক করিয়াছে যাহারা আল্লাহের সৃষ্টির মত সৃষ্টি করিয়াছে, যে-কারণে সৃষ্টি উহাদিগের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটাইয়াছে! বল, 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী।'

প্রথমে বলা হয়েছে, 'বলো, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক? বলো, আল্লাহ্।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জনতাকে প্রশ্ন করুন, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালনকর্তা কে? এই প্রশ্নটির উত্তর চিরন্তন। অর্থাৎ সত্যানুসারী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী নির্বিশেষে সকলেই একথা স্বীকার করে, আল্লাহই সকল কিছুর স্রষ্টা। সুতরাং কারো উত্তরের অপেক্ষা না করে হে আমার রসুল! সকলের পক্ষে আপনিই এই ইতিবাচক প্রশ্নটির উত্তরটি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিন। বলুন, আল্লাহ্। এভাবে আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রচার করলে বিশ্বাসীরা আল্লাহ্র নাম শুনে হবে আনন্দিত। আর অবিশ্বাসীরা পাবে শিক্ষা।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. একবার মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কে? তারা বললো, তুমিই বলো। তখন আল্লাহ্তায়ালা রসুল স.কে প্রত্যাদেশ করলেন, বলুন, আল্লাহ্।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে।' আলোচ্য বাক্যের সম্পর্ক রয়েছে একটি উহ্য বক্তব্যের সঙ্গে। সেই বক্তব্যটি সহযোগে মর্মার্থ দাঁড়াবে, কী বিস্ময়! তোমরা আল্লাহ্‌কে আকাশ পৃথিবীর পালনকর্তা বলে মানছো, অথচ প্রার্থী হচ্ছো গায়রুল্লাহর (আল্লাহ্ ছাড়া অপরের) নিকটে। এটা কি চরম মূর্খতা নয়?

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়।' একথার অর্থ— ভেবে দেখো, ওই মূর্তিগুলো কীভাবে উপাস্য হতে পারে। তোমাদের কোনো উপকার-অপকার তারা করবে কীভাবে, তারা নিজেরাও তো নিজেদের লাভ-ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। তারা কাউকে আক্রমণও করতে পারে না, আবার আক্রমণ প্রতিহত করার সাধ্যও তাদের নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক?' এখানে 'আ'মা' অর্থ অন্ধ। আর 'বাসীর' অর্থ চক্ষুষ্মান। 'জুলুমাত' অর্থ অন্ধকার এবং 'নূর ' অর্থ আলো। এখানে 'অন্ধ' অর্থ জ্ঞানান্ধ, অপরিণামদর্শী বা অদূরদর্শী। আর 'চক্ষুষ্মান' অর্থ দূরদর্শী, বিচক্ষণ। যারা চক্ষুষ্মান, তারা সহজেই বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্ ছাড়া উপাসনার্হ কেউ নেই। কিন্তু অন্ধরা এই সহজ ও চিরন্তন রহস্যটি বুঝতে অসমর্থ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, অন্ধ বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ওই সকল বাতিল উপাস্যকে, যারা তাদের উপাসকদের সম্পর্কে অজ্ঞ ও অক্ষম। আর চক্ষুষ্মান বলে বুঝানো হয়েছে ওই পবিত্র সত্তাকে যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।

'অন্ধকার ও আলো কি এক' কথাটির অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যান হচ্ছে অন্ধকার। আর সত্যানুসরণ হচ্ছে আলো। আলো অন্ধকার যেমন সমান নয়, তেমনি ইমান ও কুফরও এক কথা নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে কি তারা আল্লাহ্‌র এমন শরীক করেছে যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে।' এখানে 'আম' অব্যয়টি 'বাল' (বরং বা তবে) অর্থে ব্যবহৃত। আলোচ্য বাক্যটি একটি আজ্ঞাসূচক প্রশ্ন। এখানে 'শুরাকা' (শরীক)শব্দটির বিশেষণ হচ্ছে 'খলাকু' (সৃষ্টি করেছে)। অর্থাৎ যে বাতিল শরীকগুলো তারা নিজেরাই নির্মাণ করেছে। আবার সৃজন ও নির্মাণের মধ্যে যে চিরন্তন পার্থক্যরেখাটি রয়েছে, তারা তা অবলোকনও করতে পারেনি। অর্থাৎ তারা যে উপাস্যগুলোকে আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে শরীক করেছে, তারা সম্পূর্ণতই সৃজনক্ষমতারহিত। নির্মাণ ক্ষমতাও তাদের নেই। জীবন্ত কোনো সত্তাও তারা নয়। প্রকৃত অবস্থা যদি এই-ই হয়, তবে দিনের পর দিন অংশীবাদিতাকে তারা এভাবে আঁকড়ে ধরে রয়েছে কেনো? কেনো ঘটিয়ে চলেছে বিভ্রান্তি আর বিভ্রান্তি।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা।' একথার অর্থ— আল্লাহ্পাকই সকল সৃষ্টির একক স্রষ্টা। অবয়ব বিশিষ্ট, নিরাবয়ব, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ভালো-মন্দ— সকল কিছুই তিনি ইচ্ছেমতো সৃষ্টি করেন। তিনি সৃষ্টি করতে চাইলে সৃষ্টি আত্মপ্রকাশ করে। না চাইলে কোনো কিছুই প্রকাশিত হয় না। তাই ইবাদত গ্রহণের যোগ্যতা তিনি ছাড়া অন্য কারো নেই। মুতাজিলারা কতোইনা অজ্ঞ। তারা বলে মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা। একথা বলে তারাও অংশীবাদকে প্রশ্রয় দেয়। সুতরাং তারাও এক ধরনের অংশীবাদী। তাদের অংশীবাদিতা প্রকাশ্য (জলি) নয়। বরং খফি (সূক্ষ্ম) ও আখফা (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম)।

শেষে বলা হয়েছে— ওয়া হুয়াল ওয়াহিদুল কৃহ্হার (তিনি এক, পরাক্রমশালী)। 'ওয়াহিদ' অর্থ এক। অর্থাৎ আল্লাহ্ যেমন পালনকর্তা হিসেবে এক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী তেমনি উপাস্য হিসেবেও অদ্বিতীয় ও অবিভাজ্য। অস্তিত্বে, গুণাবলীতে ও কার্যাবলীতে তিনি এক ও অসমকক্ষ। এই বিশাল সৃষ্টি তাঁর নাম ও গুণাবলীর অতি দূরবর্তী প্রতিচ্ছবি ও একটি ঝলক মাত্র। ছায়া কখনো মূলের অংশ নয়। সর্বোপরি তিনি হচ্ছেন আনুরূপ্যবিহীন (বেমেছাল)। 'আল কৃহ্হার' অর্থ চির বিজয়ী। অর্থাৎ তাঁর প্রতিপক্ষ কেউ নেই। হতে পারে না। কীভাবে হবে? তিনি চিরবিদ্যমান, চিরঞ্জীব। আর সৃষ্টি অনস্তিত্ব-নির্ভর, পরিবর্তনপ্রবণ, ক্ষয়প্রবণ। সত্তাগতভাবে সৃষ্টির অস্তিত্ব সম্ভাব্য। আর তাঁর পবিত্র সত্তা অনিবার্য ও উদাহরণ রহিত। তাই তিনি অমুখাপেক্ষী ও অজেয়। আর সৃষ্টি মুখাপেক্ষী, অবনমিত ও চিরপরাজিত।

জ্ঞাতব্যঃ 'তবে কি তারা আল্লাহ্র এমন শরীক করেছে যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির মতো শিরিক করেছে'— এই আয়াতাংশের প্রেক্ষাপটে ইবনে জুরাইজের একটি বিবরণ রয়েছে। বিবরণটি বিভিন্ন সূত্রপরম্পরায় উপনীত হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীক ও হজরত মা'কাল বিন ইয়াসার পর্যন্ত। বিবরণটি এই— রসুল স. একবার আজ্ঞা করলেন, পিপিলিকার চলার গতির চেয়েও সূক্ষ্মভাবে শিরিক তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করে। আমি কি বলবো, কীভাবে তোমরা ওই সূক্ষ্ম শিরিক থেকে মুক্ত থাকতে পারবে? সহচরবৃন্দ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! দয়া করে বলুন। তিনি স. বললেন, প্রতিদিন তিন বার এই বলে দোয়া করবে— হে আমার আল্লাহ্! জ্ঞাতসারে শিরিক করা থেকে তোমার আশ্রয় যাচ্ঞা করি। আর অজ্ঞাত শিরিক থেকে তোমারই সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করি। জেনে রেখো, এটাও শিরিক— যদি কেউ বলে, আল্লাহ্ ও অমুকে আমাকে সাহায্য করেছে। আবার এটাও শিরিক, যদি কেউ বলে— অমুক লোক না থাকলে অমুকে আমাকে শেষ করে দিতো।

---

www.eelm.weebly.com

اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتۡ اَوۡدِیَۃٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحۡتَمَلَ السَّیۡلُ زَبَدًا رَّابِیًا ؕ وَ مِمَّا یُوۡقِدُوۡنَ عَلَیۡهِ فِی النَّارِ ابۡتِغَآءَ حِلۡیَۃٍ اَوۡ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثۡلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ یَضۡرِبُ اللّٰهُ الۡحَقَّ وَ الۡبَاطِلَ ۬ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَیَذۡهَبُ جُفَآءً ۚ وَ اَمَّا مَا یَنۡفَعُ النَّاسَ فَیَمۡكُثُ فِی الۡاَرۡضِ ؕ كَذٰلِكَ یَضۡرِبُ اللّٰهُ الۡاَمۡثَالَ ۟

❒ তিনি আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন, ফলে, উপত্যকাসমূহ উহাদিগের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তাহার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে, এইরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে তখন যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণ উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়। এইভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। যাহা আবর্জনা তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং যাহা মানুষের উপকারে আসে তাহা জমিতে থাকিয়া যায়। এইভাবে আল্লাহ্ উপমা দিয়া থাকেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে উপত্যকাসমূহ তাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরস্থিত আবর্জনা বহন করে।' 'ওয়াদি' অর্থ উপত্যকা। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে শব্দটির বহুবচন রূপ 'আওদিয়াহ্।' যে সকল নদী-নালা দিয়ে অত্যধিক পানি প্রবাহিত হয়, সেগুলোকেও আওদিয়াহ্ বলা যায়। পানি প্রবাহের বিষয়টি ওই সকল প্রণালী বা নদী-নালার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় রূপকভাবে। আবার সকল স্থানে সমান বৃষ্টিপাত হয় না। তাই বৃষ্টিতে সকল নদী সমান ভাবে প্লাবিত হয় না। তাই 'আওদিয়াহ্' শব্দটি এখানে উল্লেখিত হয়েছে অনির্দিষ্টবাচকরূপে।

'পরিমাণ আনুযায়ী প্লাবিত হয়' কথাটির অর্থ সকল নদী তো এক রকম নয়। কোনোটি ক্ষুদ্র, কোনোটি বৃহৎ। কোনোটি সংকীর্ণ, কোনোটি প্রশস্ত। আবার কোনোটি গভীর, কোনোটি অগভীর। তাই সেগুলো প্লাবিত হয় তাদের ধারণক্ষমতা অনুসারে।

www.eelm.weebly.com

'আসসাইলু' অর্থ প্লাবনের পানি, যা প্রবাহিত হয় তটিনীতরঙ্গরূপে। 'জাবাদান' অর্থ ফেনপুঞ্জ, ভাসমান আবর্জনা। 'রবিয়্যান' অর্থ স্বচ্ছ সলিল। অর্থাৎ প্লাবনের স্বচ্ছ পানি বহন করে ভাসমান আবর্জনা সমূহকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এইরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে তখন, যখন অলংকার বা তৈজসপত্র নির্মাণ উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়।' এখানে 'ইউক্বিদুনা' (উত্তপ্ত করে) কথাটির কর্তৃবাচক শব্দটি (মানুষ) উহ্য রয়েছে। অলংকার তৈজসপত্র ইত্যাদি উত্তপ্ত করে মানুষই— একথা সর্বজনবিদিত। তাই এখানে কর্তার উল্লেখ করা হয়নি। 'ইক্বাদ' অর্থ কোনো বস্তু গলানোর জন্য আগুনে উত্তপ্ত করা। 'মিম্মা' শব্দটির মিন (থেকে) অব্যয়টি এখানে উপক্রমণিকা হিসেবে ব্যবহৃত। অর্থাৎ মানুষ যে বস্তুগুলো গলানোর জন্য আগুনে উত্তপ্ত করে, সেগুলোতেও প্লাবনের পানির মতো ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়। ফলে পানির উপরিভাগে যেমন ফেনা বা আবর্জনা ভেসে ওঠে, তেমনি ফেনা বা আবর্জনা ভেসে ওঠে গলিত বস্তুর উপরিভাগে। 'মা ইউক্বিদূনা' অর্থ যা কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয় —সোনা, রূপা, লোহা, তামা বা অন্য ধাতব বস্তু। সব রকমের বিগলনযোগ্য ধাতব পদার্থই কথাটির অন্তর্ভুক্ত।

'ইবতিগাআ হিলইয়াতিন আও মাতাই'ন' অর্থ অলংকার বা অন্য কোনো তৈজসপত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে। যেমন সোনা, চাঁদি গলানো হয় অলংকার নির্মাণের জন্য। তামা, পিতল গলিয়ে ফেলা হয় বাসন-কোসন প্রস্তুত করার জন্য। আবার যুদ্ধপোকরণ, কৃষি উপকরণ, যানবাহন ইত্যাদির জন্য বিগলিত করা হয় লোহাকে।

'জাবাদুম মিছলুহু' অর্থ ওইরূপ আবর্জনা। অর্থাৎ বন্যার পানির উপরে যেরূপ আবর্জনা ভেসে ওঠে, সেরূপ ভেসে ওঠে গলিত পদার্থের উপরে আবর্জনা। এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন।' এ কথার অর্থ— উপরে বর্ণিত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যকে পরিস্ফুট করেন। আকাশের বৃষ্টি মাটিতে পতিত হয়ে যেমন প্লাবিত করে মাঠ-ঘাট, প্রান্তর ও নদী-নালা, তেমনি কোরআন মজীদ ও ইতোপূর্বের আকাশী পুস্তকগুলোর মাধ্যমে নভজ জ্ঞানের বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে ভরে তোলে মানুষের অন্তরের প্রান্তর। নদী ও নিম্নভূমিসমূহ যেমন তাদের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী প্লাবনের পানি ধারণ করে, তেমনি মানুষও তার যোগ্যতানুসারে ধারণ করে আকাশী জ্ঞানের প্লাবন। এ জ্ঞান অব্যয়, অক্ষয়, চিরন্তন, অনিঃশেষ। এ জ্ঞানের মাধ্যমে লাভ হয় পৃথিবী ও পরবর্তী

www.eelm.weebly.com

পৃথিবীর সমূহ কল্যাণ। মানবজাতি কতোভাবে যে এ জ্ঞানের দ্বারা উপকৃত হয় তার ইয়ত্তা নেই। অথবা আল্লাহ্‌র অপার জ্ঞান-ভাণ্ডারের তুলনা দেয়া যেতে পারে ধাতব পদার্থনিচয়ের সাথে। ধাতব পদার্থ গলিয়ে বিভিন্নভাবে মানুষ তার হৃদয়ের ও পার্থিবতার প্রয়োজন মেটায়। প্রস্তুত করে চিত্তরঞ্জক বহুবিধ অলংকার। নির্মাণ করে যুদ্ধাস্ত্র, যানবাহন, কৃষি সরঞ্জাম ইত্যাদি। পক্ষান্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জ্ঞান উদ্‌গত হয় প্রবৃত্তিপরায়ণ মস্তিষ্ক থেকে। তাদের জ্ঞান শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রভাবিত, অস্থির, অস্থায়ী ও সংশয়াকীর্ণ। পানির উপরিভাগে ভাসমান খড়কুটো, আবর্জনা ও ফেনার মতো, স্রোত যাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় এদিকে ওদিকে। এসকল বর্জ্য মানুষের কোনো উপকারেই আসে না। অথবা তাদের জ্ঞান উত্তাপে গলিত পদার্থনিচয়ের উপরে ভাসমান গাদ বা ফেনার মতো— যেগুলোকে অপসারণ করেই নির্মাণ করতে হয় নিখাদ অলংকার ও প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রাদি। এভাবে বর্ণিত দৃষ্টান্তদ্বয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, আসমানী কিতাবসমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান সত্য ও কল্যাণকর। আর প্রবৃত্তিপ্রসূত ও শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রভাবিত জ্ঞান অসত্য ও অকল্যাণকর। প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাক এভাবে সত্য ও অসত্যকে এখানে পরিস্ফুট করে দিয়েছেন।

শেষে বলা হয়েছে— 'যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ্ উপমা দিয়ে থাকেন।'

এখানে 'জুফায়ান' অর্থ ওই সকল বর্জ যা পানিতে ভাসমান ফেনার মতো অথবা উত্তপ্ত ও গলিত ধাতুর উপরের খাদ ও গাদের মতো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। তিন অক্ষর বিশিষ্ট 'জাফা' ও তিনের অধিক বর্ণ বিশিষ্ট 'আজফা' সমার্থক। 'জুফাআ' অর্থ বিক্ষিপ্ত। যেমন বলা হয় 'জ্বাফাআতির রীহু' (বায়ু বিক্ষিপ্ত)।

'যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়' অর্থ পানি ও ধাতু স্বস্থানে অবস্থান করে। মঙ্গলজনক জ্ঞানের উপমাও তেমনি। স্বস্থানে তা স্থির ও অচঞ্চল। তাই মানুষ মঙ্গলজনক জ্ঞান থেকে উপকৃত হতে পারে। এভাবে উপমা প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহ্ কঠিন ও জটিল বিষয়কে বোধগম্য করে তোলেন। কোনো কোনো বিজ্ঞজন বলেছেন, এখানে বিশ্বাসবানদের জন্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটি স্বস্তিদায়ক বিজ্ঞপ্তি। বিজ্ঞপ্তিটি হচ্ছে— অসত্য প্রকাশ্যতঃ উন্নত পরিলক্ষিত হলেও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও অপসারণযোগ্য। অচিরেই অসত্যের ভাসমান প্রভাব বিদূরিত হবে এবং চিরভাস্বর হয়ে উঠবে মহান সত্য, যার নাম ইসলাম।

www.eelm.weebly.com

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۚ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۟

❒ মংগল তাহাদিগের যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়। এবং যাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় না তাহাদিগের যদি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই থাকিত এবং তাহার সহিত সমপরিমাণ আরও থাকিত উহারা মুক্তিপণস্বরূপ তাহা দিত। উহাদিগের হিসাব হইবে কঠোর এবং জাহান্নাম হইবে উহাদিগের আবাস; উহা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।

আলোচ্য আয়াতে মর্মার্থ হচ্ছে— তাদের জন্যই কল্যাণ যারা তাদের প্রতিপালককে স্বীকার করেছে। কিন্তু যারা স্বীকার করেনি তাদের অবস্থা হবে কতোইনা শোচনীয়। পৃথিবীর সকল সম্পদের দ্বিগুণ সম্পদ যদি তাদের কাছে থাকে, তবুও তারা তা মুক্তিপণস্বরূপ প্রদান করে পুনরুত্থান দিবসের ভয়াবহ আযাব থেকে রক্ষা পেতে চাইবে। কিন্তু সে সুযোগ তারা পাবে না। তাদের হিসাব হবে অত্যন্ত কঠোর এবং জাহান্নাম হবে তাদের চিরকালীন আবাস। আর জাহান্নাম কতোইনা নিকৃষ্ট আবাস।

এখানে 'আলহুসনা' শব্দটি সাধারণ কর্মপদের বিশেষণ। অথবা বিশেষণ একটি অনুক্ত সন্নিহিত কর্মপদের। অর্থাৎ তারা আপন প্রতিপালকের ইসলামের আহ্বান মেনে নিয়েছে। যথানিয়মে কার্যকর করেছে তাঁর বিধানাবলী। অথবা যারা সাড়া দিয়েছে তাদের পালনকর্তার আহ্বানে।

'আল্লাজীনা লাম ইয়াসতাজীবু' অর্থ— যারা আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দেয়নি। অর্থাৎ যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এমতাবস্থায় 'লিল্লাজীনা' কথাটির 'লাম' (জন্য) অব্যয়টির সম্বন্ধ সূচিত হবে পূর্ববর্তী আয়াতের 'ইয়াদ্বরিবু' (বর্ণনা করেন) কথাটির সঙ্গে। তখন অর্থ হবে, আল্লাহ্‌পাক বিশ্বাসী অবিশ্বাসী উভয় দলের স্বরূপ দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্ণনা করেন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'লিল্লাজীনা ইয়াসতাজীবু' বাক্যটি পূর্বোল্লিখিত 'আল হুসনা' কথাটির বিধেয়। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— কল্যাণ, উত্তম প্রতিদান বা জান্নাত তাদের জন্য, যারা তাদের পালনকর্তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে 'আল্লাজীনা লাম ইয়াসতাজীবু' (যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি) বাক্যটি স্বস্থলে উদ্দেশ্য হবে। আর 'লাও আন্‌না লাহুম' কথাটি হবে বিধেয়।

www.eelm.weebly.com

'লাফ্‌তাদাও বিহী' অর্থ— মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়ে দিতো। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পৃথিবীর সকল সম্পদ এবং তার সমপরিমাণ সম্পদ যদি তাদের কাছে থাকতো, তবে নিষ্কৃতি পাওয়ার নিমিত্তে তারা মুক্তিপণরূপে সবকিছু দিয়ে দিতো।

'উলাইকা লাহুম সুউল হিসাব' অর্থ— তাদের জন্য কঠোর বা নিকৃষ্ট হিসাব। ইব্‌রাহিম নাখ্‌য়ী বলেছেন, কথাটির অর্থ, শেষ বিচারের দিনে অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের হিসাব সম্পন্ন হবে। তবে কোনো অপরাধীকেই মার্জনা করা হবে না।

'ওয়ামা'ওয়াহুম জাহান্নাম ওয়াবি'সাল মিহাদ' অর্থ— এবং জাহান্নাম হবে তাদের আবাস; তা কতোইনা নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে— তাদের বাসস্থান এবং পরিচ্ছদ হবে আগুনের। আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, বাসস্থান হিসেবে জাহান্নাম নিকৃষ্টতম।

সূরা রা'দ ঃ আয়াত ১৯, ২০, ২১, ২২

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۝ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝

❒ তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে যে ব্যক্তি তাহা সত্য বলিয়া জানে সে আর জ্ঞানান্ধ কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বোধশক্তিসম্পন্নরাই।

❒ যাহারা আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অংগীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভংগ করে না,

❒ এবং আল্লাহ্ যে-সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আদেশ করিয়াছেন যাহারা তাহা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাহাদিগের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে,

www.eelm.weebly.com

❒ এবং যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কষ্ট বরণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যাহারা ভাল দ্বারা মন্দের মোকাবিলা করে— ইহাদিগেরই জন্য শুভ পরিণাম—

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'হে আমার রসুল! আমার পক্ষ থেকে আপনার উপর অবতরিত বিষয়াবলীকে যে সত্য বলে জানে, তার সমতুল্য কি ওই ব্যক্তি যার অন্তর্চক্ষু অন্ধ? কেবল বোধশক্তিসম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম। এখানে অন্ধ অর্থ অদূরদর্শী, অন্তর্দৃষ্টিবিবর্জিত। এরকম অন্তর্দৃষ্টিহীন ব্যক্তি সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করতে সক্ষম নয়। এক বর্ণনায় এসেছে, এখানে উল্লেখিত প্রথমোক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন হজরত হামজা অথবা হজরত আম্মার। আর অন্ধ ব্যক্তি হচ্ছে আবু জেহেল।

'উলুল আলবাব' অর্থ বোধশক্তিসম্পন্ন। অর্থাৎ সুস্থ বিবেকসম্পন্ন, যারা তাদের বোধ ও বুদ্ধিকে অতিরিক্ত আবেগ ও ক্ষতিকর শৈথিল্য থেকে মুক্ত রাখে।

পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে।' একথার অর্থ— আত্মার জগতে আল্লাহ্ প্রশ্ন করেছিলেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? সকল রূহ সমস্বরে জবাব দিয়েছিলো, অবশ্যই— সেই অঙ্গীকার যারা পূর্ণ করে চলে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।' একথার অর্থ— এবং যারা আল্লাহ্র সঙ্গে এবং আল্লাহ্র বান্দাগণের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না।

আলোচ্য আয়াতে 'প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে' কথাটিতে বলা হয়েছে, কেবল আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করার কথা। আর 'প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না' কথাটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র বান্দাগণের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করার কথা।

এর পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন, যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে।' এখানে সকল নবী রসুল ও সকল আসমানি কিতাবের সঙ্গে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ এসকল বিষয় বিশ্বাসের বৃত্তভূত। আর বিশ্বাসবানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সহমর্মিতা ও শিষ্টাচারের সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়টিও ওই আদেশের অন্তর্ভূত। বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে, এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখতে। হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্পাক বলেছেন, আমিই আল্লাহ্। আমিই রহমান। আমিই রহমতের সৃজক। আমার রহমান নাম থেকে রহম

www.eelm.weebly.com

(অনুগ্রহ) শব্দটিও আমা কর্তৃক নির্বাচিত। যে একে জড়িয়ে রাখবে, আমিও তাকে আমার সঙ্গে জড়িয়ে রাখবো। আর যে একে ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো। আবু দাউদ। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর এই বিশাল সৃষ্টি সৃজনের পর দণ্ডায়মান হলো রহম (অনুগ্রহ বা দয়া)। জড়িয়ে ধরলো আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন কটিদেশ। আল্লাহ বললেন, কি বলতে চাও? রহম বললো, হে দয়াময়! এই স্থানটি তার, যে সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয়প্রার্থী হয়। আল্লাহ্ বললেন, তুমি কি এতে তুষ্ট নও যে, যে তোমাকে জড়িয়ে রাখবে, আমিও তাকে জড়িয়ে রাখবো আমার সঙ্গে। আর যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ করবে, আমিও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবো। একথা বলার পর রসুল স. উচ্চারণ করলেন, হে আমার পালনকর্তা অবশ্যই এতে আমি তুষ্ট। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ থেকে বাগবী, হাকেম ও মোহাম্মদ বিন নসর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিনটি বস্তু আশ্রয় গ্রহণ করবে আরশের নিচে— কোরআন মজীদ, আমানত ও আত্মীয়তার বন্ধন। কোরআন প্রত্যায়ন করবে আল্লাহ্র বান্দাকে বা সাক্ষী হবে আল্লাহ্র বান্দার পক্ষে। দু'টি দিক রয়েছে কোরআনের— প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। আর আত্মীয়তার বন্ধন ঘোষণা করবে, শোনো হে মানুষ! যে আমাকে অটুট রেখেছে, আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবেন। আর যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করেছে, আল্লাহ্ তার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবেন।

জ্ঞাতব্যঃ কোরআনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দিক দু'টো একে অপরের পরিপূরক, পরস্পরবিরোধী নয় (একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠের মতো)। অপ্রকাশ্য দিকটি আবার অনুধাবনের অতীতও নয়। তবে অপ্রকাশ্য দিকটি সাধারণবোধ্য নয়। যারা জ্ঞানে সুগভীর ও জ্ঞানপ্রবীন, তারাই কেবল অপ্রকাশ্য দিকটির মর্ম উদ্ধার করতে সক্ষম। বিষয়টি এরকম— যেমন হজরত মুসাকে বলা যেতে পারে আত্মা ও তার অনুসারী বনী ইসরাইলকে আত্মার শক্তি। এভাবে ফেরাউনকে কু-রিপু বললে, তার অনুসারী কিবতীদেরকে বলা যেতে পারে কু-রিপুর তাড়না। কিন্তু এরকম করলে তা হবে কোরআনের অর্থগত পরিবর্তন। বরং এরকম বলা যায় যে, বাতেন (অপ্রকাশ্য) অর্থ কোরআনের আত্মা। আর জাহের (প্রকাশ্য) অর্থ কোরআনের অবয়ব। যেমন নামাজের বাহ্যিক অর্থ নামাজের আনুষ্ঠানিকতা। আর অভ্যন্তরীণ অর্থ একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা ও পরিশুদ্ধতা। জাকাতও তেমনি প্রকাশ্য অর্থে দান খয়রাত। আর অপ্রকাশ্য অর্থে বিত্তহীনদের প্রতিপালনের মাধ্যমে অন্তর থেকে সম্পদের মোহ দূরীভূত করে দেয়া।

---

www.eelm.weebly.com

হজরত আনাস বিন মালেকের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, দীর্ঘায়ু ও জীবিকার প্রশস্ততা যদি কারো কাম্য হয়, তবে সে যেনো স্বজন-বন্ধন অটুট রাখে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু আইয়ুব আনসারী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর নিকটে এক বেদুঈন এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি আমাকে এমন বিষয়ের আজ্ঞা করুন, যা আমাকে স্বর্গের নিকটবর্তী করবে এবং দূরে সরিয়ে রাখবে দোজখ থেকে। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র ইবাদত কোরো। তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুর শরীক কোরো না। নামাজ পাঠ কোরো। জাকাত প্রদান কোরো। আর স্বজন বন্ধন বজায় রেখো। বাগবী।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ওই ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়, যে সমতা রক্ষা করে চলে। অর্থাৎ তার কোনো আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করলে, সেও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী সে-ই, যে তার সম্পর্ক রক্ষাকারী আত্মীয়ের সঙ্গে স্বউদ্যোগে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। বোখারী।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক লোক নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার শিষ্টাচারের উপরে সর্বাধিক অধিকার কার? রসুল স. বললেন, তোমার জননীর। সে বললো, তারপর? তিনি স. বললেন, জননীর। সে পুনরায় বললো, তারপর? তিনি স. বললেন, জননীর। সে আবার বললো, তারপর? তিনি স. বললেন, জনকের। অপর এক বর্ণনায় অতিরিক্ত সংযোজিত রয়েছে এই কথাটুকু— তিনি স. বললেন, তোমার জনকের পরে নৈকট্যের ক্রমানুসারে অন্যান্য আত্মীয়ের। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, পিতার পরলোকগমনের পর তার বন্ধু বান্ধবদেরকে মান্য করাও পিতৃমান্যতার অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা আপন আপন বংশের পরিচয় জেনে রেখো। একত্রে রেখো আত্মীয়স্বজনকে। রক্ত সম্পৃক্ত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার মধ্যে রয়েছে সম্প্রীতি, সম্পদগত স্বাচ্ছন্দ্য ও দীর্ঘায়ু। তিরমিজিও এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি বিরল।

শেষে বলা হয়েছে— 'ভয় করে তাদের প্রতিপালকের এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে।' একথার অর্থ, তারা আল্লাহ্‌র তিরস্কারের ভয়ে ভীত হয়। পাপ পুণ্যের কঠোর হিসাবকেও তারা ভয় করে চলে। তাই শেষ বিচারের আগেই তারা দৈনন্দিন জীবনের হিসাব মিলিয়ে দেখে। পাপাসক্তি ও পুণ্যকর্মের শৈথিল্যের কারণে নিজেকেই নিজে ধিক্কার দেয়।

 www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য কষ্টবরণ করে।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'কষ্টবরণ করে' অর্থ— তারা আল্লাহ্‌র বিধানের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে এবং বিপদাপদে অবলম্বন করে ধৈর্য। কোনো কোনো আলেমের মতে অপপ্রবৃত্তির প্রাবল্য থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার নামই হচ্ছে ধৈর্য বা সবর। সমধিক উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা হচ্ছে, অপপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করার নাম ধৈর্য। এই ব্যাখ্যাটি ধৈর্য সম্পর্কিত সকল ব্যাখ্যার সমাহার।

'প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য' কথাটির অর্থ— প্রদর্শন বা প্রচারপ্রবণতা, সম্মান, সম্পদ বা কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা অথবা অন্য কোনো পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়। ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে কেবল আল্লাহ্‌পাকের সন্তোষ সাধনার্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'নামাজ প্রতিষ্ঠা করে।' একথার অর্থ— তারা যথা-নিয়মে ও যথাসময়ে ফরজ নামাজসমূহ পাঠ করে এবং সাধ্যানুসারে পাঠ করে অন্যান্য নামাজ।

এরপর বলা হয়েছে— আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। একথার অর্থ— আমি তাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি, সেই সম্পদ তারা ফরজ জাকাত হিসেবে, ওয়াজিব ফিত্‌রা হিসেবে অথবা নফল খয়রাতরূপে ব্যয় করে। জাকাত ও ফিত্‌রা অত্যাবশ্যক। এরপরেও দরিদ্র জনসাধারণকে দান করা উচিত। সেকথাই এক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— ইন্নাফিল আমওয়ালি হাক্কান সিওয়ায্‌ যাকাত (জাকাত আদায়ের পরেও বিত্তশালীদের সম্পদে দরিদ্রদের দাবী রয়েছে)। তাই অভাবীদেরকে দান করা মোস্তাহাব (অভিপ্রেত)। এখানে 'ব্যয় করে' কথাটির মধ্যে ফরজ, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব— তিন ধরনের দানের কথাই রয়েছে।

প্রকাশ্য এবং গোপন দু'ভাবেই দান করা যায়। তবে জাকাত প্রকাশ্যে এবং নফল দান গোপনে করা উত্তম। প্রকাশ্য দান অন্যান্যদেরকে দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর গোপন দানে দূর হয় আত্মপ্রচারপ্রবণতা। তাছাড়া জাকাত অত্যাবশ্যক হয় কেবল বিত্তশালীদের উপরে। তাদের সংখ্যাও অল্প। প্রকৃত মুসলমানেরা বিভিন্নভাবে গোপনে গোপনে ক্রমাগত দান করতে থাকে। তাই প্রায়শঃই তাদের জমানো সম্পদের পরিমাণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেনা, যাতে জাকাত ফরজ হয়। যা ফরজ তা-ই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তাই এখানে প্রথমে গোপন ব্যয়ের পূর্বে বলা হয়েছে প্রকাশ্য ব্যয়ের কথা।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দের মোকাবিলা করে।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে— যারা পুণ্যকর্মের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় উৎকৃষ্ট কর্ম অপসারণ করে অনুৎকৃষ্ট কর্মকে।' হজরত আবু জর গিফারী থেকে বিশুদ্ধসূত্রে আহমদ কতৃর্ক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, পাপ সংঘটিত হওয়ার পরক্ষণেই তোমরা পুণ্য কর্মে রত হয়ো। পুণ্য পাপকে মিটিয়ে দেয়। মাওকুফ সূত্রে ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, দশটি পাপ করলে দশটি পুণ্যও কোরো। পাপের অপনোদন ঘটে পুণ্যের দ্বারা।

হজরত উকবা বিন আমের থেকে তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, চরম পর্যায়ের পাপীরা কষ্টদায়ক লৌহ আবেষ্টনীতে আবদ্ধ ব্যক্তির মতো। একটি পুণ্য কর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায় লৌহ আবেষ্টনীর একটি শিকল। আর একটি শিকল ভাঙে তখন, যখন সে আর একটি পুণ্য কর্ম করে ফেলে। এভাবে পুণ্য কর্ম করতে থাকলে সে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করবে লৌহ বেষ্টনী সদৃশ পাপের বর্ম থেকে।

ইবনে বীসান বলেছেন, পাপ অপসারিত হয় তওবার মাধ্যমে। তাই এখানে হাসানা (ভালো) অর্থ হবে তওবা। অপরিণত সূত্রে আতা থেকে আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা গোনাহ্ করে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে তওবা কোরো। গোপন গোনাহের তওবা করতে হবে গোপনে। আর প্রকাশ্য তওবা করতে হবে প্রকাশ্য পাপের জন্য।

কোনো কোনো বিদ্বজ্জনের মতে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে — অপকর্মের দ্বারা অপকর্ম প্রতিহত করা যাবে না, অপকর্ম প্রতিরোধ করতে হবে সৎকর্মের দ্বারা। সুদ্দী বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ— নির্বুদ্ধিতার বিরূদ্ধে নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন নয়, প্রদর্শন করতে হবে সহনশীলতা। তাঁর মতে 'সাইয়েআহ' অর্থ নির্বুদ্ধিতা বা মূর্খতা, আর 'হাসানা' অর্থ সহিষ্ণুতা। কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ হবে— যে অসদাচরণের বিনিময়ে সদাচরণ উপহার দেয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— যখন কোনো নির্বোধ তাকে সম্বোধন করে, তখন সে বলে, শুভাশীষ, শুভাশীষ। হাসান বলেছেন, উদ্ধৃত আয়াতাংশটির মর্মার্থ হবে— যে বঞ্চিত হয়েও বঞ্চনা করে না বঞ্চনাকারীকে। যে উৎপীড়িত হয়েও মার্জনা করে উৎপীড়ককে। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর সঙ্গে যে অটুট রাখে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক লোক রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি সুসম্পর্ক

 www.eelm.weebly.com

অক্ষুণ্ন রাখতে চাইলেও আমার কতিপয় আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। আমি তাদের মঙ্গল কামনা করি, কিন্তু তারা চায় আমার অমঙ্গল। তারা বাড়াবাড়ি করে, কিন্তু আমি প্রদর্শন করি সহিষ্ণুতা। তিনি স. বললেন, তুমি যদি সত্যি এরকম করে থাকো, তবে তো তুমি পানি ঢেলে চলেছো তপ্ত পাতিলে (তাদের উদ্দেশ্য তুমি অকৃতকার্য করে দিচ্ছো— তারা চলেছে ক্ষতির দিকে, আর তুমি অবস্থান নিয়েছো সফলতার সোপানে)। যতক্ষণ তুমি এরূপ করবে, ততক্ষণ তুমি পেতে থাকবে আল্লাহর সাহায্য।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক বলেছেন, এতক্ষণ ধরে বর্ণিত আটটি শুভ স্বভাব আটটি বেহেশতের প্রতীক। এই স্বভাব অষ্টক মানুষকে পরিচালিত করে আট বেহেশতের আটটি তোরণের দিকে।

তাই এর পর পরই বলা হয়েছে— উলায়িকা লাহুম উক্ববাদ্দার (এদেরই জন্য শুভপরিণাম বা পারলৌকিক আলয়)। 'উক্ববা' অর্থ শ্রমের বিনিময়। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'আক্বাবাহু' অর্থ সে তাকে বিনিময় দিয়েছে। পারিশ্রমিক থাকে শ্রমের নেপথ্যে। তাই বিনিময়কে বলে 'উক্ববা।' সে বিনিময় উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট, যাই হোক না কেনো। তবে সাধারণতঃ 'আক্বাবাহ্' 'উক্ববা' বা 'আক্বিবাত্' অর্থ করা হয় উৎকৃষ্ট বিনিময় বা পুণ্যফল। আর 'উক্ববাহ্' 'মু'ক্বিবাত' বা 'য়ীক্বাব' এর অর্থ করা হয় নিকৃষ্ট বিনিময় বা শাস্তি। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন— ১. খয়রুন্ ছওয়াবাঁও ওয়া খয়রুন উক্ববা (পুণ্য হবে উত্তম আর বিনিময় হবে উত্তম) ২. উলায়িকা লাহুম উক্ববাদ্দার (তাদের জন্য শুভ পরিণাম) ৩. নি'মা উক্ববাদ্দার (পারলৌকিক নিবাস কতোই না উত্তম) ৪. ওয়াল আক্বিবাতু লিল্ মুত্তাকীন (আল্লাহ-ভীরুদের জন্য রয়েছে উত্তম বিনিময়)। আবার নিকৃষ্ট বিনিময়ের কথা বলেছেন এভাবে— ১. ফাহাক্কা ইক্বাব (অতঃপর বাস্তব হলো শাস্তি) ২. শাদীদুল ইক্বাব (কঠোর শাস্তি) ৩. ওয়া ইন্ আক্বিবতুম ফাআক্বিবু বি মিছলি মা উক্বিবতুমবিহী (যদি তোমরা শাস্তি বিধান করো, তবে তেমনি দণ্ড দান করো, যেমন দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছো তোমরা) ৮. মান আক্বাবা বিমিছলি মা উক্বিবা বিহী (যে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, সে যেনো যেরূপ দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছে, সেরূপ করে)। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, 'আক্বিবাত' শব্দটি যদি কোনো বিশেষণ দ্বারা বিশেষণায়িত হয়, তবে তার অর্থ হবে শাস্তি। যেমন— 'সুম্মা কানা আক্বিবা-তুল্লাজীনা আসাউস্ সুআ.. (যারা অসৎকর্মে অভ্যস্ত, তাদের শাস্তি ছিলো...)। ফলকথা, আক্বিবাত শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

❒ স্থায়ী জান্নাত, উহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে এবং তাহাদিগের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদিগের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহারাও, এবং ফেরেশ্তাগণ তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইবে প্রত্যেক দ্বার দিয়া,

❒ এবং বলিবে, 'তোমরা কষ্ট বরণ করিয়াছ বলিয়া তোমাদিগের প্রতি শান্তি, কত ভাল এই পরিণাম।'

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে শুভপরিণামের কথা। সেই শুভপরিণাম কি তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে এই আয়াতের প্রথমে। বলা হয়েছে— 'স্থায়ী জান্নাত'। অর্থাৎ স্থায়ী আবাস জান্নাত। একথায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আখেরাতের আবাসই স্থায়ী আবাস। পৃথিবীর আবাস আসলে আবাস নয়, প্রবাস।

জ্ঞাতব্যঃ মুজাহিদ বলেছেন, হজরত ওমর মসজিদের মঞ্চে (মিম্বরে) দণ্ডায়মান হয়ে জান্নাতু আ'দনিন পাঠ করে জনতার উদ্দেশ্যে বলতেন, হে জনতা! তোমরা কি জানো আদন জান্নাত কী? আদন জান্নাতের প্রাসাদমালার তোরণসমূহের সংখ্যা দশ হাজার। প্রতিটি তোরণে স্বাগতম জানানোর উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে পাঁচশ' হাজার করে আয়তআখিঁনী হুর। নবী, সিদ্দীক ও শহীদ ছাড়া অন্য কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে, তারাও।' একথার অর্থ— ওই জান্নাতে প্রবেশ করবে পুণ্যবান ও পুণ্যবতী স্বামী-স্ত্রী, তাদের পুণ্যবান পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিরা।

এখানে 'মা লাহা' অর্থ ইমান— যৌথভাবে ইমান ও আমল নয়। কারণ অন্বয়ী ও সমন্বিত শব্দের মধ্যে পার্থক্য কিছুটা থাকবেই। তবে 'ওয়া আলহিক্বনি বিস্সলিহীন'— এই আয়াতের 'সলিহ্' অর্থ— ইমান ও আমল। আলোচ্য বাক্যের মর্ম হচ্ছে— জান্নাতবাসীর মনোতুষ্টির জন্য তাদের কোনো কোনো প্রিয়জনকে এমন কিছু মর্যাদা দেয়া হবে, যে যোগ্যতা তাদের ছিলো না। এভাবে

 www.eelm.weebly.com

স্বামী অথবা স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিরা লাভ করবে উন্নততর মর্যাদা। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, তাদেরকে অবশ্যই হতে হবে ইমানদার। 'সলাহা' দ্বারা সীমাবদ্ধ করার কারণে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ইমান ব্যতিরেকে পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য বংশগত সম্পর্ক মূল্যহীন। 'আবাইহিম' অর্থ তাদের পিতাগণ। এর মধ্যে তাদের মাতাগণও অন্তর্ভুক্ত।

একটি সংশয়ঃ বিশুদ্ধ সূত্র পরম্পরায় হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী, হাকেম, বায়হাকী এবং হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত মুসাওয়ার বিন মাখরিমা থেকে তিবরানী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে আমার বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া অন্য সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, সেদিন আমার বংশগত ও বৈবাহিক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়া অন্য সকল আত্মীয়তার সম্পর্ক বিলুপ্ত হবে। এখন কথা হচ্ছে, হাদিসে এরকম বলা হয়েছে, কিন্তু আলোচ্য আয়াতাংশে দেখা যাচ্ছে, মুমিনদের আত্মীয়রাও তাদের সঙ্গে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাহলে আত্মীয়তার বন্ধন আর ছিন্ন হলো কেমন করে?

সংশয়ের অপনোদনঃ মুমিনগণ রসুল স. এর আত্মিক সন্তান। আল্লাহ্পাক স্বয়ং এরশাদ করেছেন— বিশ্বাসীদের নিকটে তাদের আপন সত্তা অপেক্ষা নবী প্রিয়তম। আর তাঁর সহধর্মিণীবৃন্দ বিশ্বাসীদের জননী। ক্বারী উবাই ইবনে কা'ব এই আয়াতের শেষে পড়তেন 'ওয়াহুয়া আবুল্ লাহুম' (এবং রসুল স. তাদের পিতা)। আর এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে 'ইন্নামাল মু'মিনুনা ইখওয়াতুন' (বিশ্বাসবানেরা একে অপরের ভ্রাতা)।

সুরা কাওসারের ব্যাখ্যায় আমি উল্লেখ করেছি, একবার আস বিন ওয়াইল তার সঙ্গী সাথীদেরকে বললো, মোহাম্মদের কথা বাদ দাও। ওর তো বংশধারাই নেই। একথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক এরশাদ করলেন, 'ইন্না শানিআকা হুয়াল আবতার (হে আমার রসুল! নিশ্চয় আপনার শত্রুরাই বংশধারাহীন)। উল্লেখ্য যে, আস বিন ওয়াইলের দুই পুত্র ছিলো। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই তাঁরা মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁদের নাম ছিলো ওমর ও হিশাম। ফলে পিতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হলো ছিন্ন। তখন আসকে সকলে বলতে লাগলো নিঃসন্তান। ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হজরত ওমর ও হজরত হিশাম হয়ে গেলেন রসুল স. এর রূহানী আওলাদ। পৈতৃক সম্পদ থেকেও নিজেদেরকে মুক্ত রাখলেন তাঁরা। এই ঘটনাটির আলোকে উপরে বর্ণিত হাদিসদ্বয়ের অর্থ দাঁড়াবে এরকম— পুনরুত্থান দিবসে কেবল আমার রক্ত সম্পর্কীয় ও আত্মিক বংশ থাকবে অটুট। এছাড়া আর সকল বন্ধন হয়ে যাবে ছিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ সেদিন কেবল বিশ্বাসবানদের পারস্পরিক

www.eelm.weebly.com

সম্পর্ক অটুট থাকবে। এক আয়াতে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এভাবে— 'সেদিন পারস্পরিক বন্ধুত্ব পর্যবসিত হবে শত্রুতায়, আল্লাহ্ ভীরুগণের সম্পর্ক অটুট থাকবে। অন্যরা হয়ে যাবে একে অপরের শত্রু।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং ফেরেশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে।' একথার অর্থ— তখন স্বর্গোদ্যানের সিংহদ্বার দিয়ে অথবা প্রাসাদসমূহের প্রবেশদ্বার দিয়ে বিভিন্ন প্রকার উপঢৌকনসহ প্রবেশ করবে ফেরেশতারা। মুকাতিল বলেছেন, প্রতিদিন তিন বেলা উপহার নিয়ে হাজির হবে ফেরেশতামণ্ডলী। সেখানেও পৃথিবীর দিবস রজনীর মতো আবর্তিত হতে থাকবে দিন ও রাত।

পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'এবং বলবে, তোমরা কষ্টবরণ করেছো বলে তোমাদের প্রতি শান্তি, কতো ভালো এই পরিণাম।' একথার অর্থ— বিভিন্ন দরজা দিয়ে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী নিয়ে প্রবেশ করে ফেরেশতারা জানাবে সাদর সম্ভাষণ। বলবে, হে বেহেশতবাসী! পৃথিবীতে তোমরা পাপ থেকে নিবৃত্ত ছিলে, বিপদে আপদে ধৈর্যধারণ করেছিলে, আর জীবন যাপন করেছিলে আল্লাহ্‌র বিধানের অনুকূলে, তাই তোমাদেরকে আজ দেয়া হলো চিরসুখময় এই জান্নাত। দ্যাখো, তোমাদের এই পরিণাম কতোই না উত্তম।

হজরত আবু উমামা বাহেলী বলেছেন, স্বর্গাভ্যন্তরে পর্দাবৃত পালঙ্কে শুয়ে স্বর্গবাসীরা উপভোগ করবে অনাবিল শান্তি। দুই সারিতে দণ্ডায়মান থাকবে স্বর্গীয় পরিচারকবৃন্দ। তাদের সারির দৈর্ঘ্য হবে পালঙ্ক থেকে দরজা পর্যন্ত। গৃহদ্বারে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায় এসে দাঁড়াবে ফেরেশতাবৃন্দ। তাদের আগমন সংবাদ সারিবদ্ধ স্বর্গীয় পরিচারকদের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে পালঙ্কে শায়িত বেহেশতবাসীদের কাছে। সে অনুমতি দিলে সেই অনুমতি আবার সারিবদ্ধ পরিচারকদের মাধ্যমে পৌঁছবে ফেরেশতাদের কাছে। তখন প্রাসাদের বহির্দ্বার উন্মুক্ত করা হবে তাদের জন্য। আর তখনই তারা প্রবেশ করে সালাম জানিয়ে উপঢৌকনসমূহ পেশ করবে। তারপর করবে প্রত্যাগমন। বাগবী।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে দরিদ্র মুসলিম ও মুহাজিরবৃন্দ, যারা ইসলামী রাজ্যের সীমানা সুরক্ষিত রাখতো। দরিদ্র বিশ্বাসবানেরা অর্থাভাবে পৃথিবীতে অনেক পুণ্যকর্ম করতে পারে না। এভাবে তারা পুণ্যকর্মের তৃষ্ণা বুকে নিয়ে একসময় পৃথিবী পরিত্যাগ করে। তাই তাদেরকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে আজ্ঞা করবেন, যাও। তোমরা তাদের কাছে আমার সালাম পৌঁছাও। ফেরেশতারা নিবেদন করবে, হে আমাদের পালনকর্তা। আমরা

 www.eelm.weebly.com

আকাশবাসী। তুমি আমাদেরকে করেছো সম্মানিত, আমরা কি তাদের নিকট গমন করে তোমার সালাম পৌঁছাবো? আল্লাহ্ বলবেন, হ্যাঁ। তারা আমার প্রকৃত দাস। একনিষ্ঠভাবে পৃথিবীতে তারা আমার উপাসনা করেছে। আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করেনি। রক্ষা করেছে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা। তাদের দায়িত্বনিষ্ঠার কারণে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টজীব ছিলো নিরাপদ। তারা তাদের মনের অনেক আশাই পূর্ণ করতে পারেনি। এভাবে সাঙ্গ হয়েছে তাদের জীবন। ফেরেশতারা একথা শুনে গমন করবে ওই সকল মহাসম্মানিত বিশ্বাসবানদের কাছে। সেই অবস্থার কথাই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— 'এবং ফেরেশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দ্বার দিয়ে এবং বলবে, তোমরা কষ্টবরণ করেছো বলে তোমাদের প্রতি শান্তি, কতো উত্তম এই পরিণাম।'

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ২৫, ২৬

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ
اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ
وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوْا
بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ۝

❐ যাহারা আল্লাহের সহিত দৃঢ় অংগীকারে আবদ্ধ হইবার পর উহা ভংগ করে, যে-সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন তাহা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় তাহাদিগেরই জন্য আছে অভিশাপ এবং তাহাদিগেরই জন্য আছে মন্দ আবাস।

❐ আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা হ্রাস করেন; কিন্তু মানুষ পার্থিব জীবনে উল্লসিত অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী!

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা আত্মার জগতে 'আমি কি তোমাদের প্রভুপালক নই'— আল্লাহ্র এই প্রশ্নের জবাবে 'হ্যাঁ' বলে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলো, সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে পৃথিবীতে এসে আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে চলে, অবতরিত গ্রন্থসমূহের কোনোটিকে মানে আবার কোনোটিকে করে

www.eelm.weebly.com

অস্বীকার, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের মধ্যে নির্মাণ করে ব্যবধানের অনড় প্রাচীর, আল্লাহ্কে মানলে তাঁর রসুলকে মানে না, রসুলকে মানলে আল্লাহ্কে মানে না এবং যারা ছিন্ন করে আত্মীয়তার বন্ধন এবং যারা ঘটায় শস্যহানি, ক্ষতিসাধন করে পশুপালের, মানুষের, ক্রমাগত করে চলে লুণ্ঠন, রাহাজানী, অনাসৃষ্টি তারাই অভিশপ্ত এবং তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে নিকৃষ্টতম আবাস জাহান্নাম।

হজরত আবু বকর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সকল পাপের শাস্তি আখেরাতে নির্ধারিত রয়েছে, কিন্তু বিদ্রোহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার শাস্তি এই পৃথিবীতেই হয়। অন্য কোনো পাপ এ দু'টো পাপের মতো অতি শীঘ্র শাস্তিকে ডেকে আনে না। আহমদ, বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম, ইবনে হাব্বান।

হজরত যোবায়ের ইবনে মুতয়েম বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, স্বজন-বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বোখারী।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আউফা বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যাদের মধ্যে স্বজন-বন্ধন ছিন্নকারী রয়েছে, তাদের উপরে আল্লাহ্র অনুকম্পা বর্ষিত হয় না। ইমাম বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, উপকার করার পর কেউ খোঁটা দিলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না পিতামাতার অবাধ্য সন্তান ও নিরবচ্ছিন্ন মদ্যপ। নাসাঈ, দারেমী।

পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন; কিন্তু মানুষ পার্থিব জীবনে উল্লসিত। অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী! একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তাঁর ইচ্ছা মতো রিজিকের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটান। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অঢেল রিজিক পেলেও কৃতজ্ঞচিত্ত হয় না। আপাদমস্তক নিমজ্জিত থাকে পার্থিবতায়। অথচ তারা জানে না যে, পার্থিব জীবনোপকরণের প্রাচুর্য ক্ষণস্থায়ী। আর আখেরাতের জীবনোপকরণ চিরস্থায়ী। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীরা এই তত্ত্বটি জানে। তাই পার্থিব জীবনে জীবনোপকরণের স্বল্পতা দেখা দিলে, তারা হতোদ্যম এবং ধৈর্যচ্যুত হন না। উল্লেখ্য যে, কেউ যদি তার অঢেল সম্পদ পুণ্য পথে ব্যয় করে, তবে তা প্রশংসার্হ। কিন্তু অপব্যয় অথবা অসৎ পথে ব্যয় নিন্দার্হ। এরকম লোকের জন্য লাঞ্ছনা অনিবার্য।

www.eelm.weebly.com

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ۝

❐ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা বলে, 'মুহম্মদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল, 'আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাহাদিগকে তাঁহার পথ দেখান যাহারা তাঁহার অভিমুখী,

❐ 'যাহারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহের স্মরণে যাহাদিগের চিত্ত প্রশান্ত হয়। জানিয়া রাখ, আল্লাহের স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়;

❐ 'যাহারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে কল্যাণ এবং শুভ পরিণাম তাহাদিগেরই।'

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রসুল স. এর মাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন মোজেজা দর্শন করা সত্ত্বেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলতো, 'মোহাম্মদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তাঁর নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেনো?' অবজ্ঞা, আত্মম্ভরিতা ও মূর্খতাই ছিলো তাদের এমতো উক্তির ভিত্তি। প্রথমোক্ত আয়াতের শুরুতে একথাই উল্লেখ করা হয়েছে। শেষে বলা হয়েছে— বলো, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাদেরকে তাঁর পথ দেখান, যারা তাঁর অভিমুখী।' একথার অর্থ— 'হে আমার রসুল! আপনি বলুন, আল্লাহ্পাকের অসীম ভাণ্ডারে অলৌকিক নিদর্শনাবলী রয়েছে অনেক। কিন্তু কথা হচ্ছে, শত সহস্র নিদর্শন অবলোকন করলেও তোমরা কখনো সৎপথ প্রাপ্ত হবে না। কারণ অলৌকিক নিদর্শন দেখায় কেবল পথের দিশা। পথশেষের গন্তব্য পর্যন্ত উপনীত করায় না। গন্তব্যে উপনীত করান আল্লাহ্। তিনি যাকে ইচ্ছা সত্যপথের পরিব্রাজক করেন, আবার যাকে ইচ্ছা তাকে করেন বিভ্রান্ত। তোমরা বিভ্রান্ত পথের যাত্রী। সুপথ তোমরা চাও না। অতএব অলৌকিক নিদর্শন তোমাদের কি উপকারে আসবে? তিনি তো তাকেই তাঁর পথে পরিচালিত করেন, যারা তাঁকে চায়। অর্থাৎ যারা তাঁর অভিমুখী, তাদেরকেই তিনি জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। অলৌকিক নিদর্শন তারা চায় না, চায় ইমান।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌ অভিমুখী যারা তাদের হৃদয়ে বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হয়। সকল সন্দেহের হয় অবসান এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে তাদের হৃদয় হয় পরিতৃপ্ত। এখানে 'জিকির' অর্থ কোরআন মজীদ এবং 'ইত্‌মিনান' অর্থ ইমান। উল্লেখ্য যে, অপবিত্রতা ও অপবিশ্বাস হচ্ছে হৃদয়ের অস্বস্তি ও চাঞ্চল্য। আর হৃদয়ের প্রশান্তি বা পরিতৃপ্তি হচ্ছে ইমান। অথবা 'আল্লাহ্‌র স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়' কথাটির অর্থ হবে, আল্লাহ্‌র জিকিরে হৃদয় থেকে দূরীভূত হয় শয়তানের প্ররোচনা। এমতাবস্থায় জিকিরের অর্থ হবে আল্লাহ্‌র স্মরণ।

রসুল স. বলেছেন, মানুষের অন্তঃকরণে রয়েছে দুইটি প্রকোষ্ঠ। একটিতে থাকে ফেরেশতা এবং অপরটিতে থাকে শয়তান। অন্তরে জিকির উত্থিত হলে শয়তান পালিয়ে যায়। আর জিকির না থাকলে শয়তান অন্তরে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয় তার চিন্তা। এভাবেই সে মানুষকে প্ররোচিত করে। মুনসিফ গ্রন্থে আবদুল্লাহ্‌ বিন শাকীক থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মারফুরূপে প্রলম্বিত সূত্র সহযোগে বর্ণনা করেছেন বোখারী। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, শয়তান দলিত মথিত করতে থাকে মানুষের অন্তর। সে যখন জিকিরে রত হয়, তখন শয়তান পশ্চাদপসরণ করে। আর অমনযোগী হলে, শয়তান তার অন্তরে ঢেলে দেয় কুমন্ত্রণা। আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে, আল্লাহর জিকিরে চিত্ত প্রশান্ত হয়। যেমন সলিলাভ্যন্তরে প্রশান্তি লাভ করে মৎস্য, উন্মুক্ত আকাশে বিহঙ্গ এবং অরণ্যে অরণ্যবাসীরা। পক্ষান্তরে জিকির বিস্মৃত অন্তরে সৃষ্টি হয় অশান্তি, যেমন অশান্তি ভোগ করে পানির সাথে সম্পর্কচ্যুত মাছ, পানিতে নিমজ্জিত স্থলচর প্রাণী এবং পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি। এই বিষয়টি বিশুদ্ধচিত্ত সুফী সাধকগণের অনুসারীদের নিকটে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। সত্যনিষ্ঠ পীর মোর্শেদের খানকায়ে গমনাগমনকারীরা এর প্রত্যক্ষদর্শী। অতএব এখানে 'যারা বিশ্বাস করে' কথাটি মর্মার্থ হবে— ওই সকল সুফী দরবেশ, যাদের অন্তর পবিত্র ও জিকিরময়।

শেষে বলা হয়েছে— 'জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।' একথার অর্থ— পবিত্র হৃদয়বিশিষ্ট যারা তাদের চিত্ত প্রশান্ত হয় আল্লাহ্‌র স্মরণে। এ সম্পর্কে একটি সন্দেহ ও তার নিরসনের উল্লেখ করেছেন বাগবী। সন্দেহটি এরকম— এক আয়াতে বলা হয়েছে 'নিঃসন্দেহে বিশ্বাসবান তারাই, আল্লাহ্‌র জিকির করা হলে যাদের হৃদয় শঙ্কিত হয়।' আর এখানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌র স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়।' এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শঙ্কা ও স্বস্তির সহাবস্থান কি সম্ভব? নিরসনটি এরকম— শাস্তির বিষয় উল্লেখিত হলে বিশ্বাসীদের অন্তরে জেগে

www.eelm.weebly.com

ওঠে শঙ্কা। আর আল্লাহ্‌র অপার ক্ষমা ও দয়ার কথা মনে হলে অন্তরে আসে প্রশান্তি। ভয় ও প্রশান্তি পরস্পরবিরোধী দু'টো বিষয়। তাই এ দু'টো একই সঙ্গে হৃদয়ে অবস্থান গ্রহণ করতে পারে না। একটি এলে অপরটি অপসারিত হয়।

আমি বলি, প্রশান্তি ও ভীতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বৈপরীত্য নেই। প্রশান্তি সৃষ্টি হয় উন্‌স বা অনুরাগ থেকে। আর অনুরাগ বর্তমান থাকে ভয়ের সময়েও। এভাবে একই সময়ে হৃদয়ে সঞ্চারিত হতে থাকে ভয় ও আশা। হজরত আনাস বলেছেন, অন্তিম যাত্রার সময় এক যুবকের পাশে উপস্থিত হলেন রসুল স.। বললেন, তোমার মনের অবস্থা এখন কেমন? যুবক বললো, আমি আল্লাহ্‌র ক্ষমার আশা রাখি, আবার তাঁর ভয়ে আমি ভীতও। তিনি স. বললেন, পৃথিবী পরিত্যাগের প্রাক্কালে যার অন্তরের অবস্থা এরূপ হয়, আল্লাহ্ তাকে দান করেন তার কাম্য বস্তু এবং রক্ষা করেন ভয়সংকুলতা থেকে। তিরমিজি, ইবনে মাজা। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি দুর্লভ।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে, শুভপরিণাম তাদেরই।' হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'তুবা' শব্দটির অর্থ করেছেন আনন্দময় ও নয়নাভিরাম। ইকরামা অর্থ করেছেন, উত্তম পরিণতি। কাতাদা বলেছেন—কল্যাণকর পরিণতি। 'তুবা' শব্দটির এরকম অর্থ করা হয়েছে মূল ধাতু হিসেবে।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— একবার রসুল স. হজরত আবু বকরকে বললেন, তুমি কি জানো 'তুবা' কি? হজরত আবু বকর বললেন, আল্লাহ্ ও তার রসুলই সমধিক জ্ঞাত। তিনি স. বললেন, 'তুবা' হচ্ছে জান্নাতের একটি সুদীর্ঘ বৃক্ষ, যার পরিমাপ সম্পর্কে জানেন কেবল আল্লাহ। ওই বৃক্ষটির একটি শাখার নিচ দিয়ে সত্তর বছর ধরে এক অশ্বারোহী তার অশ্ব পরিচালনার পরেও সীমানা খুঁজে পাবে না। ইজালাতুল খাফা।

মুয়াম্মার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, কাতাদা বলেছেন, বন্ধুদের মঙ্গলজনক কিছু ঘটলে তোমরা বোলো, তুবালাকা (তোমার শুভ হোক)। ইব্রাহিম বলেছেন, 'শুভপরিণাম তাদেরই' অর্থ পুণ্যবান বিশ্বাসীরা কল্যাণ ও সম্মান লাভ করবে। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, কাফ্রী ভাষায় 'তুবা' অর্থ উদ্যান। হজরত আবু দারদা বলেছেন, তুবা হচ্ছে স্বর্গোদ্যানের একটি ছায়াময় বৃক্ষ, যার শীতল ছায়ায় অবস্থান গ্রহণ করবে স্বর্গবাসীরা। উবায়েদ ইবনে উমায়ের বলেছেন, রসুল স. এর বেহেশতের প্রাসাদ সন্নিহিত একটি সুশীতল ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষের নাম তুবা। ওই বৃক্ষ ছায়া দান করবে সকল বেহেশতবাসীর ভবনে। কৃষ্ণবর্ণ ছাড়া অন্য সকল বর্ণের ফুল ও ফলে ভরা থাকবে বৃক্ষটি। তার মূল থেকে প্রবহমান রয়েছে

www.eelm.weebly.com

দু'টি ঝরণা, যার পানি কর্পূরমিশ্রিত। মুকাতিল বলেছেন, ওই বৃক্ষের প্রতিটি পাতা ছায়াদান করবে একটি বিরাট দলকে। ফেরেশতারা ওই বৃক্ষের পাতায় পাতায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনায় বিভোর থাকবে।

হজরত উকবা বিন আবদুল্লাহ্ সালামী থেকে আহমদ, ইবনে হাব্বান, তিবরানী, ইবনে মারদুবিয়া এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, এক লোক একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসুল! বেহেশতে কি ফলমূল পাওয়া যাবে? তিনি স. বললেন, অবশ্যই। সেখানে তুবা নামক এক বৃক্ষ থাকবে, যা ফেরদাউস জান্নাতের সমান (সমগ্র ফেরদাউস জান্নাতে ছায়াদানকারী)। লোকটি বললো, পৃথিবীর কোনো গাছের সঙ্গে সেই গাছটির কোনো সাদৃশ্য আছে কি? রসুল স. বললেন, না। একটু পরেই বললেন, তুমি কি কখনো সিরিয়ায় গিয়েছো? সে বললো, না। তিনি স. বললেন, সেখানে রয়েছে আখরোট বৃক্ষ। আখরোট গাছ কিছুটা তুবা গাছের মতো। বৃক্ষটি এক কাণ্ডবিশিষ্ট, কিছুটা ঊর্ধ্বে ওঠার পর তার শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে। লোকটি বললো, গাছটি কতো বড়? তিনি স. বললেন, তোমার উটের পাল নিয়ে তুমি যদি ওই বৃক্ষটির গোড়া প্রদক্ষিণ করো, তবে তুমি বৃদ্ধ হয়ে গেলেও একবার প্রদক্ষিণ শেষ করতে পারবে না। লোকটি বললো, সেখানে আঙ্গুর পাওয়া যাবে কি? তিনি স. জবাব দিলেন, হ্যাঁ। লোকটি আবারো প্রশ্ন করলো, আঙ্গুরবীথির আকৃতি কেমন হবে? রসুল স. বললেন, প্রস্থ হবে একটি বৃহৎ দাঁড়কাকের এক মাসের উড়ন্ত পথের দূরত্বের সমান। এবার তবে অনুমান করো, দৈর্ঘ্য কতখানি হবে। লোকটি বললো, আর আঙ্গুরদানার আকৃতি? তিনি স. বললেন, বড় ছাগলের চামড়ানির্মিত মশকের সমান, যদ্দ্বারা তোমার পরিবার, বরং তোমার মহল্লার সকল লোক পরিতৃপ্ত হতে পারবে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, এক লোক রসুল স. এর নিকটে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তুবা কি? তিনি স. বললেন, বেহেশতের একটি বৃক্ষ, যার বিস্তৃতি একশ' বছর পথ চলার পরিসরের সমান। ওই বৃক্ষের তন্তু দ্বারা নির্মিত হবে বেহেশতবাসীদের পরিচ্ছদ।

মুয়াবিয়া বিন কুরবা তাঁর পিতার মারফু বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, রসুল স.বলেছেন, তুবা হচ্ছে জান্নাতের একটি উদ্ভিদ। যা আল্লাহ তাঁর আনুরূপ্যবিহীন হাতে রোপন করেছেন জান্নাতের জমিনে। বৃক্ষটিতে ফুৎকার করেছেন আপন প্রাণশক্তি। ওই বৃক্ষ থেকে প্রস্তুত করা হবে অলংকার ও পরিচ্ছদ। স্বর্গপ্রাচীরের বহির্দেশ থেকে নেত্রগোচর হবে বৃক্ষটির শাখা-প্রশাখা।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, তুবা বৃক্ষটির অবস্থান স্বর্গোদ্যানের মধ্যবর্তী স্থানে। একশ' বছর ঘোড়া ছুটালেও ওই গাছের ছায়া অতিক্রম করা যাবে না। প্রমাণরূপে তোমরা পাঠ করতে পারো— 'ওয়াজিল্লিম মামদুদিন' (আর দীর্ঘতম ছায়া)। বোখারী, মুসলিম। হাদিসটি বর্ণনা করার পর ইমাম আহমদ সংযোজন করেছেন এই কথাটুকু— তার পত্রপল্লব

www.eelm.weebly.com

আচ্ছাদিত করবে জান্নাত। নিহাদ বিন সিয়রি তাঁর জুহ্ গ্রন্থে এবং বাগবী তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, কা'বকে এই হাদিস শোনানো হলে তিনি বললেন, এ বাণী সত্য। ওই আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি মুসা নবীর উপরে তওরাত ও মোহাম্মদ নবীর উপরে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, যদি কোনো উষ্ট্রারোহী ব্যক্তি ওই বৃক্ষের চতুস্পার্শ্বে তিন চার বছর ক্রমাগত চলতে থাকে, তবু সে তার প্রদক্ষিণ শেষ করতে পারবে না। এভাবে সে যদি বৃদ্ধ হয়ে যায়, বাহন থেকে গড়িয়ে পড়ে, তবুও না। আল্লাহ্ নিজেই ওই বৃক্ষটি রোপন করেছেন। তার প্রতি ফুৎকার করেছেন তার রূহ। তার শাখা প্রশাখাগুলো দেখা যাবে জান্নাতের বাইরে থেকেও। জান্নাতের সব ক'টি প্রস্রবন প্রবাহিত হয়েছে ওই বৃক্ষটির পাদদেশ থেকে।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, তুবা হচ্ছে স্বর্গ-তরু। তাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলবেন, আমার বান্দারা যা চায়, তুমি তা বের করে দিয়ো তোমার অভ্যন্তর থেকে। জান্নাতবাসীদের অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষাভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসবে গদি সজ্জিত তেজী ঘোড়া। আবার কখনো বের হবে নাকে রশি ও পিঠে হাওদাশোভিত উট। পরিধেয় বসনও প্রস্তুত হবে ওই বৃক্ষ থেকে। বাগবী, ইবনে আবীদ্ দুনিয়া, ইবনে মোবারক।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, শাহাব বিন খাওশাব বলেছেন, তুবা হচ্ছে স্বর্গোদ্ভিদ। স্বর্গের সকল উদ্ভিদ উদ্‌গত হয়েছে ওই উদ্ভিদ থেকে। স্বর্গ-প্রাকারের বহির্দেশ থেকেও উদ্ভিদটি অক্ষিগোচর হয়।

'লাহুম হুসনু মাআব' অর্থ শুভ পরিণাম তাদেরই। অর্থাৎ জান্নাতের সুখ-সমাহার তো বিশ্বাসীদের জন্যই।

পৌত্তলিকদের বিরোধিতা, বচসা ও কুটতর্কের কারণে রসুল স. কখনো কখনো হয়ে পড়তেন বিমর্ষ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এমতাবস্থায় যথাকর্তব্য নির্দেশ করে অবতীর্ণ হয়েছে—

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ৩০

وَكَذٰلِكَ أَرْسَلْنٰكَ فِىٓ أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ الَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّى لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۝

❐ অতীতে যেমন পাঠাইয়াছিলাম সেইভাবে আমি তোমাকে পাঠাইয়াছি এক জাতির প্রতি যাহার পূর্বে বহু জাতি গত হইয়াছে, পাঠাইয়াছিলাম উহাদিগের নিকট আবৃত্তি করিবার জন্য যাহা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি। তথাপি

www.eelm.weebly.com

উহারা যিনি দয়াময় তাঁহাকে অস্বীকার করে। বল, 'তিনিই আমার প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তাঁহারই উপর আমি নির্ভর করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।'

চারটি বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে আলোচ্য আয়াত। প্রথমোক্ত দ্বিতীয় বাক্যের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! হতোদ্যম হবেন না। সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীরা এরকমই। আপনার পূর্বেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট আমি আমার বার্তাবাহক প্রেরণ করেছিলাম। আপনি যেমন মানুষকে আমার বাণী পাঠ করে শোনান, তেমনি তাঁরাও তাঁদের সম্প্রদায়কে শোনাতেন। তবুও তারা দয়াময় আল্লাহ্কে স্বীকার করতো না। আপনার সময়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো তাদেরই উত্তর সুরী। তাই তারাও আপনাকে অস্বীকার করে চলেছে। এতদ্সত্ত্বেও আপনি আপনার কাজ চালিয়ে যেতে থাকুন। প্রচার করতে থাকুন আমার বার্তা। আপনি তো আমার রসুল। এখানে 'রহমান' শব্দটির অর্থ অতীব দয়াময়। মানুষের নিকট নবী-রসুল প্রেরণই হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার দয়ার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা একথা বোঝে না। তাই তারা অস্বীকার করে অতীব দয়াময় আল্লাহ্কে। তাঁর নবী-রসুলগণকে।

বাগবী লিখেছেন, কাতাদা, মুকাতিল ও ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়। তাই আয়াতটি মাদানী। ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর ও আবু শায়েখ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দ শেষ পর্যন্ত মক্কার কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হতে সম্মত হলেন। কুরায়েশদের প্রতিনিধি হিসেবে এলো সহল বিন আমর। রসুল স. হজরত আলীকে আজ্ঞা করলেন, লিখো— বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম। কুরায়েশরা আপত্তি তুললো, আমরা তো আল্লাহ্কে রহমান বলে মানি না। আমরা শুধু জানি, ইয়ামামার মুসায়লামা ওই নামে পরিচিত। তোমরা কেবল লিখতে পারো— বি ইস্মিকা আল্লাহুম্মা (হে আল্লাহ্ তোমার নামে)। তাদের একথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— ওয়াহুম ইয়াক্ফুরূনা বির্ রহমান (তথাপি তারা যিনি দয়াময় তাকে অস্বীকার করে)। হুদায়বিয়ার এই ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সুরা ফাতাহের তাফসীরে।

বাগবী আরো লিখেছেন, সাধারণ তাফসীরবিদগণের অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। এই অভিমতটিই প্রসিদ্ধ। রসুল স. হাজরে আসওয়াদের সন্নিকটে দোয়া করতেন হে আল্লাহ! হে রহমান! বলে। আবু জেহেল একদিন একথা শুনতে পেয়ে তার সঙ্গী সাথীদেরকে বলেছিলো, দ্যাখো। মোহাম্মদ দুই উপাস্যের উপাসক। আমরা তো ইয়ামামাবাসী মুসায়লামা কাজ্জাবকে রহমান বলে জানি। আর কোনো রহমানকে তো আমরা চিনি না। মোহাম্মদ আবার কোন রহমানকে ডাকতে শুরু করলো। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে

 www.eelm.weebly.com

অবতীর্ণ হয়েছিলো— কুলিদ্ উল্লাহা আবিদ ওয়া রহমানা আয়্যামান তাদ্‌উ ফালাহুল আসমাউল হুসনা (আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্ ও রহমান বলে সর্বক্ষণ তাঁকে ডাকো, অনেক উত্তম নাম রয়েছে তাঁর)।

জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কার মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে। রসুল স. তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা রহমানকে সেজদা করো। তারা বলেছিলো, রহমান কি? তখন অবতীর্ণ হয়েছিলো আয়াতের শেষোক্ত বাক্য দু'টো

শেষোক্ত বাক্য দু'টো হচ্ছে— 'বলো তিনিই আমার প্রতিপালক! তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।' একথার অর্থ— হে রসুল! আপনি বলুন, যে রহমানকে তোমরা স্বীকার করতে চাও না, তিনিই আমার উপাস্য স্রষ্টা এবং কার্যনির্বাহক। তোমরা আমার শত্রু হয়ে দাঁড়ালেও তিনিই আমার একমাত্র বন্ধু ও সাহায্যকারী। তাই আমি কেবল তাঁরই প্রতি নির্ভরশীল। তিনিই আমাদের দান করবেন কল্যাণ। আমার প্রত্যাবর্তন তাই তাঁরই দিকে।

তিবরানী প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার মক্কার অংশীবাদীরা রসুল স.কে বললো, হে মোহাম্মদ! তুমি যা কিছু বলো, তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে তুমি আমাদেরকে আমাদের মৃত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দাও। আমরা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই। তারা তোমার দাবির পক্ষে কথা বলুক। আর পাহাড়গুলো এখান থেকে সরিয়ে দাও, যাতে আমাদের যাতায়াত সুগম হয়। তাদের এসকল কথাবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ৩১

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَا۟يْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِىَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○

❑ যদি কোন কুরআন দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা হইত, অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা হইত অথবা মৃতের সহিত কথা বলা যাইত তবুও উহারা উহাতে বিশ্বাস করিত না। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহের এখ্‌তিয়ারভুক্ত। তবে কি যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগের প্রত্যয় হয় নাই যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় সকলকে সৎপথে পরিচালিত করিতে পারিতেন। যাবৎ যাহা আল্লাহের প্রতিশ্রুত

তাহা না ঘটিবে তাবৎ , যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদিগের কর্মফলের জন্য তাহাদিগের বিপর্যয় ঘটিতেই থাকিবে, অথবা বিপর্যয় তাহাদিগের আশে-পাশে আপতিত হইতেই থাকিবে, আল্লাহ্ নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না।

ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, আতিয়া আওফি বলেছেন, একবার মক্কার মুশরিকেরা রসুল স.কে বললো, মোহাম্মদ! চার পাশের পাহাড়গুলোকে যদি অন্যত্র সরিয়ে দেয়া যেতো তাহলে দৃষ্টিগোচর হতো বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর। আমরা ওই প্রান্তরে তৈরী করতে পারতাম ফল ও ফসলের বাগান। অথবা বাদশাহ্ সুলায়মান তার সভাসদসহ যেভাবে সিংহাসনে বসে বাতাসে ভর করে উড়ে উড়ে চলতো, তুমিও আমাদের জন্য সে রকম কিছু একটা করো। কিংবা ঈসা নবী যেভাবে মৃতকে জীবিত করতো, তুমিও তেমনি আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে জীবিত করে দেখাও। তাদের এসকল কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

বাগবী লিখেছেন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কয়েকজন পৌত্তলিকদের সম্পর্কে। পৌত্তলিকদের ওই দলটিতে ছিলো আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ্ বিন উমাইয়া। এক লোকের মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ বিন উমাইয়া বলে পাঠালো, হে মোহাম্মদ! তুমি যদি আমাদেরকে তোমার অনুগত হিসেবে পেতে চাও, তবে কোরআনের দ্বারা মক্কার পাহাড়গুলোকে সরিয়ে দাও। আমরা পাবো বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। আর এখানে প্রবাহিত করে দাও একটি নদী। তাহলে আমরা ওই বিস্তীর্ণ সমভূমিতে করতে পারবো চাষাবাদ। তৈরী করতে পারবো ফসলের বাগান। দাউদ নবীর চেয়েও অধিক মর্যাদা সম্পন্ন বলে তুমি নিজেকে জাহির করো। আবার একথাও বলো যে, তার নির্দেশে পাহাড় গতিশীল হতো। আন্দোলিত হয়ে জিকির করতো তার সাথে। তবে তুমি পাহাড়গুলো সরাতে পারবে না কেনো? তুমি আরো বলো,নবী সুলায়মান তাঁর সিংহাসন নিয়ে পারিষদবর্গসহ বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়াতো। তুমিও আমাদেরকে সেরকম ব্যবস্থা করে দাও। আমরা সিরিয়ায় গিয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে ওই দিনই মক্কায় ফিরে আসি। ঈসা নবীর চেয়েও তুমি বড় বলে দাবী করো। ঈসা নবী তো মৃতকে জিন্দা করতো। তুমিও তেমনি জীবিত করো তোমার পূর্বপুরুষ কুসাইকে। অথবা অন্য কোনো মৃত পূর্বপুরুষকে। তুমি সত্য নবী কি না আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখি। মুশরিকদের এরকম কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। হজরত যোবায়ের বিন আওয়াম থেকে আবু ইয়ালীও এরকম বিবরণ এনেছেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যদি কোনো কোরআন দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা হতো অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা হতো অথবা মৃতের সঙ্গে কথা বলা যেতো, তবুও তারা এতে বিশ্বাস করতো না।' একথার অর্থ— যদি কোনো অবতারিত

 www.eelm.weebly.com

গ্রন্থ অথবা এই কোরআনের মাধ্যমে পর্বতমালাকে স্থানান্তরিত করা হতো, অথবা তাদের ইচ্ছামতো বিমানবিহারের ব্যবস্থা করে দেয়া যেতো, পৃথিবী বিদীর্ণ করে প্রবাহিত করা হতো স্রোতস্বিনী, তবুও তারা ইমান আনতো না। এখানে 'আল মাওতা' (মৃত) অর্থ কুরায়েশদের পূর্বপুরুষ কুসাই প্রমুখ।

আলোচ্য বাক্য শর্তযুক্ত। কিন্তু সে শর্তের জবাব এখানে অনুক্ত। যেনো বলা হচ্ছে— উপরে বর্ণিত মুশরিকদের প্রস্তাবগুলো যদি বাস্তবায়ন করতেই হয়, তবে সেগুলো তো কোরআনের মাধ্যমে করা অধিকতর সহজ। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক তা করেননি। অথবা মর্মার্থ হবে — সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যা চায়, তা কার্যকর করা হলেও তারা ইমান আনবে না। এ প্রসঙ্গে অপর একটি আয়াত উল্লেখ করা যায়। আয়াতটি হচ্ছে— 'যদি আমি তাদের নিকট ফেরেশতামণ্ডলী প্রেরণ করতাম, আর তারা বাক্যালাপ করতে পারতো মৃতদের সঙ্গে, তবু তারা ইমান আনতো না।'

কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অনুক্ত শর্তের জবাব উল্লেখিত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে এভাবে — 'তথাপি তারা যিনি দয়াময় তাঁকে অস্বীকার করে।' মধ্যবর্তী কথাগুলো সমালোচনামূলক। যেনো বলা হচ্ছে— কোরআনের মাধ্যমে যদি পাহাড়কে পরিচালনা করা হতো,তবু তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করতো, বিশ্বাসই করতো না। আল্লাহ্‌পাক সর্বজ্ঞ। তাই প্রত্যেকের সূচনা ও পরিণতি সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী যে কস্মিনকালেও ইমান আনবেনা, তা তিনি ভালো করেই জানেন। কারণ তাদের সূচনাস্থল (মাবদায়ে তায়ুন) হচ্ছে আল্লাহ্‌পাকের নাম আল মুদ্বিল্লু (পথভ্রষ্টকারী)।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্‌র এখতিয়ারভুক্ত।' এই বাক্যটির পূর্বেও কিছু কথা উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য কথাগুলোসহ আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্ সর্বশক্তিধর। তাই একথা ভাবা ঠিক নয় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চাহিদা পূরণ করতে তিনি অক্ষম। প্রকৃত কথা এই যে, তাদের চাহিদা পূরণ করার কোনো অভিপ্রায় তাঁর নেই। কারণ তিনি জানেন শত সহস্র অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করা হলেও তারা ইমান আনবে না। তাই তিনি তাদের চাহিদা পূরণ করেননি।

বাগবী লিখেছেন, সাহাবীগণ ভাবতে শুরু করেছিলেন, আল্লাহ্‌পাক যদি দয়া করে তাদের দাবিগুলো পূরণ করে দিতেন তবে কতোই না ভালো হতো। তারা সকলেই ইমানদার হয়ে যেতে পারতো। তাঁদের এ চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী বাক্যটি।

বলা হলো— 'তবে কি যারা বিশ্বাস করেছে, তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন।' একথার অর্থ— বিশ্বাসীগণ (সাহাবীগণ) কেনো আশায় আশায় আছে যে, অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করলেই তারা ইমান আনবে? তারা তো ইতোপূর্বে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, প্রস্তরখণ্ডের কথা বলার মতো বিস্ময়কর মোজেজা দর্শন করেছে। তৎসত্ত্বেও ইমান এনেছে কি? পাহাড় অপসারণ ও আকাশে উড্ডয়ন অপেক্ষা ওই মোজেজাদ্বয়

www.eelm.weebly.com

অধিকতর বিস্ময়কর নয় কি? বিশ্বাসীগণ তো এসকল কথা জানে। এ কথাও তো তারা জানে যে, মৃত ব্যক্তির কথা বলা অপেক্ষা পাথরের কথা বলা অধিকতর অভিভূত হওয়ার মতো বিষয়। এ সকল কিছু দেখে শুনে বুঝে তবে তারা কেনো এখনো ওই সকল চির-ভ্রষ্টদের হেদায়েতপ্রাপ্তির প্রত্যাশাকে লালন করে চলেছে। আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— বিশ্বাসীগণ ভাবছে, আল্লাহ্পাক তো যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে এক মুহূর্তে বানিয়ে দিতে পারেন ইমানদার। এই বিশ্বাস নিয়েই তারা আছে। এখনো নিরাশ হয়নি। অধিকাংশ তাফসীরবিদ লিখেছেন, এখানে 'লামইয়াইআসি' (প্রত্যয় হয়নি বা নিরাশ হয়নি) কথাটির অর্থ হবে 'লাম ইয়ালাম' (জানে না)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্পাক ইচ্ছে করলে সকলকে ইমানদার বানিয়ে দিতে পারেন।

কালাবী বলেছেন, নুখা গোত্রের আঞ্চলিক ভাষায় 'ইয়াইআসি' (নৈরাশ্য বা অপ্রত্যয়) শব্দটি জানা অর্থে প্রচলিত। কোনো কোনো তাফসীরবিদ মনে করেন শব্দটি হাওয়াজেন গোত্রে প্রচলিত ভাষার অন্তর্ভুক্ত। তারাও শব্দটিকে জানা অর্থে ব্যবহার করে। ফাররা কিন্তু একথা অস্বীকার করেছেন। বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছেন এভাবে— শব্দটিকে জানা অর্থে কেউই ব্যবহার করেননি। 'ইয়াইসতু' (আমি নিরাশ হইনি) এর অর্থ 'আলিমতু' (আমি জানি না)— এরকম কেউ বলেননি। তবে শব্দটি রূপকভাবে জানা অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ জ্ঞাত বিষয়ের পরিণাম কখনো কখনো নৈরাশ্যে পর্যবসিত হয়। তাই পরিণতির দিকে লক্ষ্য করে শব্দটিকে জানা অর্থে প্রয়োগ করা যেতে পারে। আর এ রীতিটি অপ্রচল নয়। মানুষ নিশ্চিত হলেই কেবল নিরাশ হয়। এখানে জানা অর্থে শব্দটি ব্যবহারের আরেকটি প্রমাণ বিদ্যমান। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি শব্দটি ব্যাখ্যা করেছেন 'ইয়াতাবাইয়্যানু' বলে। এর অর্থ— প্রকাশ্য, জলজ্যান্ত। আর জ্ঞাতব্য বিষয় তো প্রকাশ্যই হয়। এ কারণেই নিরাশ হওয়ার অর্থ অবগত হওয়া বা জানা বলা যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাবৎ যা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত তা না ঘটবে তাবৎ যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে তাদের কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, অথবা বিপদ তাদের আশে পাশে আপতিত হতেই থাকবে।' একথার অর্থ— যতক্ষণ মক্কা-বিজয় সুসম্পন্ন না হবে, অথবা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যু না ঘটবে কিংবা মহাপ্রলয় উপস্থিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের উপর বন্দীত্ব, দুর্ভিক্ষ, জীবন ও সম্পদহানি ইত্যাকার বিপদ আপদ আপতিত হবেই। এখানে 'ক্বরিয়াহ্' অর্থ বিপদ আপদ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ক্বরিয়াহ্' বলে ওই সেনাযুথকে, যা রসুল স. এর সাহায্যার্থে প্রেরিত হয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সেনাযুথ দ্বারা তারা সরাসরি আক্রান্ত না হলেও এ ধরনের অন্য কোনো বিপর্যয় তাদের জনপদের নিকটেই কোথাও এসে উপস্থিত হবে।

www.eelm.weebly.com

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'তাহুল্ল' এর শব্দরূপ হচ্ছে মধ্যম পুরুষে সম্বোধনসূচক। আর সম্বোধিত জন হচ্ছেন রসুলুল্লাহ্। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— হে রসুল! আপনি অবস্থান গ্রহণ করবেন তাদের জনপদের নিকটে। উল্লেখ্য যে, রসুল স. হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন মক্কার সন্নিকটে। এই ব্যাখ্যাও হজরত ইবনে আব্বাসের বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে। যদি তাই হয়, তবে ওয়াদাল্লহ্ (আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি) কথাটির অর্থ হবে— মক্কা বিজয়ের প্রতিশ্রুতি। আর সাধারণ অর্থে, আল্লাহ্র অঙ্গীকারের অর্থ হবে মৃত্যু অথবা মহাপ্রলয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না।' একথার অর্থ— নির্ধারিত সময়ে বিজয়ের যে অঙ্গীকার আল্লাহ্ করেন, তার ব্যতিক্রম কদাচ ঘটে না। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের বাণীতে অঙ্গীকার বিরুদ্ধতার প্রশ্রয় অসম্ভব।

পূর্ববর্তী উম্মতেরা তাদের নবী রসুলগণকে বিভিন্ন রকম বিদ্রূপবানে জর্জরিত করতো। তৎসত্ত্বেও আল্লাহ্ তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দিতেন না। সংশোধনের জন্য কিছুকাল অবকাশ দিতেন তাদেরকে। তারপর তাদের উপর আপতিত করতেন কঠোর, কঠোরতর শাস্তি। এসকল কথাই বিবৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ৩২, ৩৩, ৩৪

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝

❒ তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে এবং যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদিগকে কিছু অবকাশ দিয়াছিলাম, তাহার পর উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। কেমন ছিল আমার শাস্তি!

❒ তবে কি প্রত্যেক মানুষ যাহা করে তাহা যিনি লক্ষ্য করেন তিনি তাহাদিগের সমান যাহাদিগকে উহারা শরীক করে? অথচ উহারা আল্লাহের বহু শরীক করিয়াছে। বল, 'উহাদিগের পরিচয় দাও।' তোমরা কি পৃথিবীর এমন

কিছুর সংবাদ তাঁহাকে দিতে চাহ যাহা তিনি জানেন না? অথবা ইহা অসার উক্তি মাত্র? না, উহাদিগের ছলনা উহাদিগের নিকট শোভন প্রতীয়মান হয় এবং উহারা সৎপথ হইতে নিবৃত্ত হয়; আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথ প্রদর্শক নাই।

❒ উহাদিগের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি এবং পরলোকের শাস্তি তো আরো কঠোর। এবং আল্লাহের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার উহাদিগের কেহ নাই।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আমি জানি, আপনার সম্প্রদায়ের দুর্জনেরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে আপনার মনে কষ্ট দেয়। বিভিন্নভাবে আপনাকে করে জ্বালাতন। এতে করে আপনি বিষণ্ণ হবেন না। অবিশ্বাসীদের স্বভাবই এরকম। বিগত যুগের অবিশ্বাসীরাও তাদের প্রতি প্রেরিত নবী রসুলগণের সঙ্গে এরকম করতো। তাদের সত্যপোলব্ধি যাতে ঘটে, সেজন্য আমি তাদেরকে দীর্ঘ অবকাশও দিয়েছিলাম। তবুও তারা সত্যকে স্বীকার করেনি। তাই শেষে আমি তাদেরকে দিয়েছি কঠিন শাস্তি। সে শাস্তি ছিলো কতোইনা ভয়াবহ। অতএব হে আমার রসুল! নিশ্চিত জানবেন যে, আপনার শত্রুদেরকেও যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে।

এখানে 'আম্লায়তু' শব্দের ধাতুমূল আল-মালওয়াতু অর্থ— দীর্ঘকাল। রাত্রি-দিবসকে সাহায্য করে বলে, রাত্রিকে বলে মালওয়ান। দিবস-রাত্রিকে মাল্ওয়ান বলে না। শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, কাল। যেমন জনৈক কবির কবিতায় উল্লেখিত হয়েছে— 'নাহারুন ওয়া লাইলুন্ দাইমুন, মালাওহুমা' (দিবা-রাত্রির সময়চক্র নিয়ত গমনাগমন করে)। এখানে 'মালওয়ান' থেকে 'মালাও' কে কালচক্র হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে। তাই 'মালওয়ান' অর্থ দিবস-রজনী নয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি শাস্তি ব্যতিরেকেই দীর্ঘকাল জীবনযাপনের সুযোগ দিয়েছিলাম। তারপর দিয়েছিলাম শাস্তি।

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'তবে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে, তা যিনি লক্ষ্য করেন তিনি তাদের সমান, যাদেরকে তারা শরীক করে?' একথার অর্থ— কি ভেবেছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা? তারা কি মনে করে, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা, তিনি কি তাদের ওই জড় উপাস্যদের সমতুল?

এরপর বলা হয়েছে— 'অথচ তারা আল্লাহ্র বহু শরীক করেছে। বলো, তাদের পরিচয় দাও।' বাক্যটির সংযোগ রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'বিমা কাসাবাত্' (যা তারা অর্জন করেছে) কথাটির সঙ্গে। 'মা' অব্যয়টিকে এখানে ধাতুমূল হিসেবে গণ্য না করা হলে বাক্যটির সম্পৃক্তি ঘটবে একটি উহ্য বক্তব্যের

www.eelm.weebly.com

সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তারা আল্লাহ্পাককে এক মনে করে না। তাই তারা বহু উপাস্যকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করে। 'বলো, তাদের পরিচয় দাও' কথাটির অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অবাধ্যদের বলুন, ভেবে দেখো হে অদূরদর্শী জনতা! তোমাদের জড় প্রতিমাগুলি কি আল্লাহ্পাকের অংশীদার হওয়ার উপযুক্ত? উন্মোচিত করো তাদের প্রকৃত পরিচয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা কি পৃথিবীর এমন কিছু সংবাদ তাঁকে দিতে চাও, যা তিনি জানেন না।' একথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জনগোষ্ঠী! আল্লাহ্পাক সর্বজ্ঞ। সুতরাং তিনি একথা ভালো করেই জানেন যে, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তোমরা কি এরকম কোনো অস্তিত্বের সংবাদ জানো, যে উপাস্য হওয়ার উপযুক্ত। তোমরা কি এমন কিছু জানাতে চাও যা তিনি জানেন না?

এরপর বলা হয়েছে— 'অথবা এটা অসার উক্তি মাত্র ?' একথার অর্থ— নাকি তোমাদের সমূহ উক্তি ভিত্তিহীন, যেমন কাফ্রীদের নাম রাখা হয় কর্পূর। কোনো কোনো তাফসীরবিদ কথাটির অর্থ করেছেন— তোমাদের উক্তিগুলো সর্বৈব মিথ্যা, নয় কি ?

এরপর বলা হয়েছে— 'না, তাদের ছলনা তাদের নিকট শোভন প্রতীয়মান হয় এবং তারা সৎপথ থেকে নিবৃত্ত হয়।' একথার অর্থ— তারা পতিত হয়েছে শয়তানের প্রতারণায়। শয়তানই তাদের অপকীর্তিগুলোকে তাদের চোখে দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছে। শয়তানের চক্রান্তের গহ্বরে তারা আসত্তা প্রোথিত। তাই তারা সত্যভ্রষ্ট। শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।' একথার অর্থ— যারা বিভ্রমের অনুরাগী, আল্লাহ্ তাদের বিভ্রম চিরস্থায়ী করে দেন। এভাবে আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তাকে পথ প্রদর্শন করার সাধ্য কারো নেই।

এর পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'তাদের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি এবং পরকালের শাস্তি তো আরো কঠোর এবং আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করবার তাদের কেউ নেই।' একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য আখেরাতের চিরস্থায়ী শাস্তি তো রয়েছেই। তদুপরি রয়েছে পৃথিবীর সাময়িক শাস্তিসমূহ। তাই কখনো তাদেরকে নিহত হতে হয়। কখনো হতে হয় বন্দী। আবার কখনো বহন করতে হয় লাঞ্ছনাদায়ক করের ভার। অর্থাৎ জিযিয়া।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوا ۖ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ۝ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ۝

❒ সাবধানীদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার উপমা এইরূপঃ উহার পাদদেশ নদী প্রবাহিত উহার ফলসমূহ ও ছায়া চির-স্থায়ী। ইহা যাহারা সাবধানী তাহা তাহাদিগের কর্মফল, এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের কর্মফল অগ্নি।

❒ আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে আনন্দ পায়, কিন্তু কোন কোন দল উহার কতক অংশ অস্বীকার করে। বল, 'আমি তো আল্লাহের ইবাদত করিতে ও তাঁহার কোন শরীক না করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। আমি তাঁহারই প্রতি সকলকে আহ্বান করি এবং তাঁহারই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।'

❒ এবং এইভাবে আমি অবতীর্ণ করিয়াছি কুরআন, এক নির্দেশ, আরবী ভাষায়। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদিগের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহের বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকিবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বেহেশতে বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদের জন্য থাকবে চিরস্থায়ী সুখের উপকরণসমূহ। যেমন— পাদদেশে বয়ে চলবে নিরন্তর নির্ঝর। আরো থাকবে ফলমূলের অফুরন্ত সম্ভার ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তিদায়ক ছায়া। সাবধানীদেরকে এসকল কিছু প্রদান করার অংগীকার করেছেন আল্লাহ্ নিজে। এটা হবে তাদের সৎকর্মের প্রতিদান। অপরদিকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কর্মফলরূপে রয়েছে অন্তহীন আগুন।

হজরত ছাওবান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতবাসীরা গাছের ফল ছিঁড়লে সঙ্গে সঙ্গে শূন্য বৃন্তে পরিদৃশ্যমান হবে নতুন ফল। তিবরানী।

 www.eelm.weebly.com

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, শোয়াইব বিন জ্বায়হান বলেছেন, একবার আমি ও আবুল আলীয়া অতি প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বে ভ্রমণে বের হলাম। আবহাওয়া ছিলো বড়ই শান্তিদায়ক। আবুল আলীয়া বললেন, জান্নাতের ছায়া হবে এরকম। এরপর পাঠ করলেন— ওয়াজিল্লিম মামদুদ (সুদীর্ঘ ছায়া)।

পথভ্রষ্ট জুহমিয়া সম্প্রদায় বলে, জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ধ্বংসশীল। কিন্তু আলোচ্য আয়াত তাদের ধারণাটিকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে।

'উক্ববা' শব্দটির অর্থ প্রতিদান, প্রতিফল অথবা কর্মফল। 'প্রতিদান' (জ্বাযা) অর্থ গ্রহণ করা হলে বুঝতে হবে শব্দটি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে ব্যাঙ্গার্থে। অন্যত্রও এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— ১. 'হাল ছুউবিবাল কুফ্ফারু' (কাফেরদেরকে কি সওয়াব দেয়া হবে)। ২. 'ওয়াবাশ্শিরহু বি আজাবিল আলীম' (আর তাদেরকে শাস্তির সুসংবাদ দাও)।

পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ পায়।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! লক্ষ্য করুন, যে পবিত্র গ্রন্থ আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তা পাঠ করে অথবা তার আবৃত্তি শুনে আনন্দিত হয় আপনার সকল সহচর, বিশেষ করে ওই সকল ইহুদী ও খৃষ্টান যারা আপনার ধর্মমতকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে। যেমন— ইহুদী থেকে মুসলমান হয়ে যাওয়া হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, তাঁর সঙ্গী সাথীগণ এবং খৃষ্টান থেকে মুসলমান হয়ে যাওয়া আবিসিনিয়ার প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ। তারা সকলে একথা ভেবে অধিকতর উৎফুল্ল হয় যে, এই কোরআন ইতোপূর্বে অবতীর্ণ তওরাত ও ইঞ্জিলের সমর্থক।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু কোনো কোনো দল এর কতক অংশ অস্বীকার করে।' একথার অর্থ— কিন্তু যারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায় এবং ওই সকল ইহুদী ও খৃষ্টান যারা এখনো মুসলমান হয়নি তারা এই কোরআনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে অথবা অস্বীকার করে এর কোনো কোনো অংশকে। যেমন কা'ব বিন আশরাফ, উসাইয়েদ, আকিব প্রমুখ। এখানে 'কতক অংশ অস্বীকার করে' কথাটির অর্থ— ইহুদী-খৃষ্টানেরা অস্বীকার করে ওই সকল অংশ, যেগুলো তাদের শরিয়ত ও প্রবৃত্তির বিপরীত।

বাগবী লিখেছেন, কোরআন মজীদে 'রহমান' শব্দটির অধিক উল্লেখ না দেখে প্রথম দিকে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা কিছুটা নিরাশ হয়েছিলেন। কারণ তওরাতের বহু স্থানে শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। এদিকে কোরআন মজীদের সুরাসমূহ ক্রমাগত অবতীর্ণ হয়ে চললো। পরে দেখা গেলো 'রহমান' শব্দটি ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতসমূহে। তখন তিনি ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা আনন্দিত হলেন। তাঁদের ওই আনন্দকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'কিন্তু কোনো কোনো দল তার কতক অংশ অস্বীকার করে' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মক্কার পৌত্তলিকদেরকে। হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনকালে সন্ধিপত্রে লিখিত 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম' সম্পর্কে তারা আপত্তি তুললো। বললো, আমরা তো ইমামার রহমানকে (মুসায়লামা বিন কাজ্জাবকে) ছাড়া অন্য কাউকে 'রহমান' বলে জানিনা। তাই 'রহমান' কথাটি তুলে দিতে হবে। তখন অবতীর্ণ হয়— ওয়াহুম বি জিক্‌রির্‌ রহমানি হুম কাফিরূন (তারা রহমানের উল্লেখকে প্রত্যাখ্যানকারী)। আরো অবতীর্ণ হয়— ওয়াহুম ইয়াক্‌ফুরূনা বির্‌রহমানি (আর যারা রহমানকে অস্বীকার করে)। সুতরাং এখানে 'কতক অংশ' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, ওই পৌত্তলিকেরা 'আল্লাহ্'কে স্বীকার করে, কিন্তু অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র নাম (রহমান) কে।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, আমি তো আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে ও তাঁর কোনো শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি।' এখানকার বক্তব্যটি যাদেরকে লক্ষ্য করে বলতে বলা হয়েছে, তারা যদি ইহুদী-খৃষ্টান হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, আমার প্রতি অবতীর্ণ কোরআনের মাধ্যমে এইমর্মে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করবো। কাউকে বা কোনো কিছুকে তাঁর অংশীদার করবো না। এটাই সত্যধর্মসমূহের ভিত্তি। তোমরাও একথা অস্বীকার করতে পারবে না। শরিয়তের বিধিবিধান সংক্রান্ত কিছু অদল বদলের কথা স্বতন্ত্র। পূর্ববর্তী নবী-রসুলগণের শরিয়তে এরকম হেরফের ঘটেছে। কখনো কোনো কোনো বিধানকে স্থগিত করে তদস্থলে জারী করা হয়েছে নতুন বিধান। কোরআনের মাধ্যমেও এরকম কিছু করা হয়ে থাকলে তা দূষণীয় বলে গণ্য হবে কেনো? আর আলোচ্য বক্তব্যটি যদি সাধারণভাবে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি হয়, তবে মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে আমার রসুল ! আপনি সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে জানিয়ে দিন, আমাকে দেয়া হয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র উপাসনার আদেশ। আর সেই সঙ্গে কাউকে বা কোনো কিছুকে তাঁর সমকক্ষ না করার নির্দেশ। আর 'রহমান' হচ্ছে আল্লাহ্‌র এক নাম। তাই তাঁকে যদি 'রহমান' 'রহীম' ইত্যাদি গুণবাচক নামে ডাকা যায় তবে দোষের কিছু নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমি তাঁরই প্রতি সকলকে আহ্বান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।' এ কথার অর্থ— অতএব হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর দল! তোমরা ভালো করে শুনে নাও যে, আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য ও শিরিক থেকে মুক্ত থাকার জন্যই আমি সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকবো। এটাই আমার কর্তব্যকর্ম। আর আমাকে তো তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতের (৩৭) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি আপনার আপন ভাষা আরবীতে— যাতে ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়, ব্যবহারিক বিষয়, নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা সমূহ ইত্যাদি আপনি স্পষ্টভাবে বোঝেন ও অন্যকে সহজে বুঝাতে সক্ষম হন। কোরআনের এই জ্ঞান প্রাপ্তির পর যদি আপনি নিজের খেয়ালখুশী মতো চলেন, তবে এ কথাটি জেনে রাখবেন যে, যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যায়, তাদের কোনো অভিভাবক ও রক্ষক থাকে না। অবশ্য আপনি খেয়াল-খুশীর অনুসরণ তো করতেই পারবেন না। কারণ আপনি আমার রসুল। আপনার উম্মতেরা এরকম করবে। তাই আপনার মাধ্যমে তাদেরকে জানানো হলো এই সতর্ক সংকেত।

বর্ণিত হয়েছে, ইহুদীরা বলতো, মোহাম্মদ তো ঘোর সংসারী। সাধারণ মানুষের মতোই পরিবার পরিজনের অধিকর্তা। সুতরাং তিনি আবার নবী হবেন কীভাবে? তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ৩৮

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ○

❑ তোমার পূর্বেও অনেক রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়াছিলাম। আল্লাহের অনুমতি ব্যতীত কোন আয়াত উপস্থিত করা কোন রসূলের কাজ নহে। প্রত্যেক নির্ধারিত কালের জন্য এক কিতাব থাকে।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি ওই মূর্খদেরকে জানিয়ে দিন নবী-রসুল সংসারী হতে পারবে না, এরকম যুক্তির কোনো ভিত্তি নেই। ইতোপূর্বে অনেক নবী ও রসুল পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁদের স্ত্রী ছিলো। সন্তান-সন্ততিও ছিলো। আর এটাই আল্লাহ্‌তায়ালার চিরন্তন বিধান যে, নবী-রসুলগণ সংসারী হবেন। কিন্তু তাঁরা সাধারণ মানুষের মনোবৃত্তিধারী সংসারী নন। তাঁদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র বিধানানুকূল। হ্যাঁ, তাঁদের মাধ্যমে অনেক অলৌকিক নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে সকলের প্রকাশ ঘটান আল্লাহ্ স্বয়ং। তাঁরা নিজে নিজে ইচ্ছে মতো কোনো মোজেজা প্রদর্শন করতে পারেন না। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এ বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞ বলেই সময়ে অসময়ে মোজেজা প্রদর্শনের জন্য তাঁদেরকে বিব্রত করে তোলে। আল্লাহ্‌তায়ালা সবকিছুরর সূচনা, প্রবৃদ্ধি ও পরিণতির সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেই নির্ধারণ অনুসারে সকল কিছু পরিচালিত হয়। তাই যথাসময়ে সংঘটিত হয় জীবন,

www.eelm.weebly.com

মৃত্যু বিশ্বাসী হওয়া, না হওয়া ইত্যাদি। তেমনি কোরআনের আয়াতসমূহ ও অলৌকিক নিদর্শনসমূহ প্রকাশের জন্যও রয়েছে সুনির্দিষ্ট সময়। মানুষ কখনোই তা লংঘন করতে পারবে না। অগ্র-পশ্চাৎও ঘটাতে পারবে না।

'লি কুল্লি আজ্বালিন্ কিতাব' অর্থ প্রতিটি মুহূর্ত একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ। অর্থাৎ নবী-রসুলগণের যুগের চাহিদা অনুসারে শরিয়তের বিধানসমূহ প্রবর্তিত করা হয়। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাই বিধানসমূহেরও পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তন সাধন করেন আল্লাহ্ স্বয়ং। কখন কোথায় কীভাবে কোন বিধান তিনি পরিবর্তন করবেন, সে সকল কিছু তিনিই নির্ধারণ করে রেখেছেন। ওই নির্ধারণানুসারে যথাসময়ে সকল কিছু সম্পাদিত হয়। তাঁর এই অনড় নিয়ম বা নিয়তির বিপরীত কিছুই ঘটে না।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ৩৯

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ○

❒ আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা বাতিল করেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহা বহাল রাখেন এবং তাঁহারই নিকট আছে কিতাবের মূল।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা বাতিল করেন এবং যা ইচ্ছা তা বহাল রাখেন।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তাঁর ইচ্ছামত মানুষের অদৃষ্টলিপির কোনো কোনো অংশ মুছে ফেলেন, আর কোনো কোনো অংশ প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

হজরত ইবনে ওমর থেকে শিথিল সূত্রে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা বিলুপ্ত করেন। আবার যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। তবে চারটি বিষয় এর ব্যতিক্রম— সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য, জীবন, মৃত্যু। হজরত জাবের থেকে হজরত রবাবের মাধ্যমে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ কখনো রিজিকের সংকোচন ঘটান, আবার কখনো রিজিককে করেন প্রসারিত। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, একবার আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে রসুল স. বলেছিলেন, এরকম ঘটে থাকে প্রতি শবে কদরে। ওই রাতে আল্লাহ্ কারো মর্যাদা সমুন্নত করেন, কাউকে নিষ্কৃতি দান করেন নরক থেকে, আবার কাউকে প্রদান করেন জীবনোপকরণ। কিন্তু চারটি বিষয় এর ব্যতিক্রম— সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য, জীবন, মৃত্যু।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট মতপৃথকতা পরিলক্ষিত হয়। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্ যে সকল অপরিহার্য বিষয় ও বিধান রহিত করতে চান, তা রহিত করেন। ইচ্ছে মতো সেগুলোর রদবদল ঘটান। আবার কোনো কোনো গুলোকে রেখে দেন অবিকল। 'লিকুল্লি আজ্বালিন

www.eelm.weebly.com

কিতাব' (সব সময় বিধিলিপি অনুসারে) কথাটির মর্মার্থও তাই। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, লওহে মাহফুজ থেকে তিনি যা ইচ্ছা বিলুপ্ত করেন এবং যা ইচ্ছা বহাল রাখেন। বিলোপযোগ্য অদৃষ্টলিপিকে বলে প্রলম্বিত নিয়তি (কাযায়ে মুয়াল্লাক)। এমতো ক্ষেত্রে বিলুপ্ত বিষয়গুলোর স্থলে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নতুন সিদ্ধান্ত। সে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধও হতে পারে, আবার বিদ্যমান থাকতে পারে কেবল আল্লাহ্‌র জ্ঞানে। আর যেগুলো বিলোপযোগ্য নয় সেগুলোকে কখনোই বিলোপ করা হয় না। এ ধরনের অপরিবর্তনীয় অদৃষ্টলিপির নাম স্বতঃসিদ্ধ নিয়তি (কাযায়ে মুবরাম)।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা পরিবর্তন করেন এবং যা ইচ্ছা অপরিবর্তনীয় অবস্থায় রাখেন। চারটি বিষয়ে তিনি এরকম করেন না। সে চারটি বিষয় হচ্ছে— হায়াত, মউত, খোশনসীবী, বদনসীবী।

হজরত হোযায়ফা বিন উসাইয়েদ থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুরুষের শুক্রানু স্ত্রীগর্ভে অবস্থান গ্রহণের চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ দিন পর আগমন ঘটে এক ফেরেশতার। সে নিবেদন করে, হে আমার পালনকর্তা! পূর্ণাবয়বের দিকে অগ্রসরমান এই শিশুটি সৌভাগ্যশালী হবে, না হতভাগ্য। এভাবে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত জেনে নিয়ে সে ওই শিশুটির অদৃষ্টে সৌভাগ্যশালী অথবা হতভাগ্য লিখে দেয়। পুনরায় প্রশ্ন করে, পুরুষ হবে, না নারী? জবাবানুসারে সে এ বিষয়টিও লিপিবদ্ধ করে। তারপর লিপিবদ্ধ করে তার জীবন-মৃত্যু, কার্যকলাপ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি। এরপর তকদির মিশিয়ে দেয়া হয় তার সত্তার সঙ্গে। তাই তকদিরের বিপরীত কিছু ঘটেনা।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, সত্য পয়গম্বর রসুল স. বলেছেন, মাতৃজঠরে মানব শিশু বেড়ে ওঠে এভাবে— চল্লিশ দিন থাকে শুক্রানুরূপে। পরের চল্লিশ দিন থাকে জমাট রক্তের আকারে। এর পরের চল্লিশ দিন থাকে মাংশপিণ্ডরূপে। আল্লাহ্ ওই সময় জীবন, মৃত্যু, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য— এই চারটি বিষয়সহ এক ফেরেশতাকে প্রেরণ করেন। প্রেরিত ফেরেশতা আল্লাহ্‌র নির্দেশানুসারে এই চারটি বিষয় সুনির্ধারিত করে দেন। এরপর প্রাণ দান করা হয় তাকে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আল্লাহ্ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যকে অবলোপন করেন। অবলোপন করেন রিজিক ও হায়াতকেও। আবার ওগুলোর কিছু কিছু অংশ বহালও রাখেন। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর একবার কাবাগৃহ প্রদক্ষিণের সময় কাঁদতে কাঁদতে দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি যদি ভাগ্যবানদের তালিকায় আমার নাম লিখে

www.eelm.weebly.com

রাখো, তবে তা যথাস্থানে রেখে দাও। আর যদি হতভাগ্যদের তালিকায় আমার নাম থাকে, তবে তা বিলোপ করো। দয়া করে লিপিবদ্ধ করে দাও ভাগ্যবান ও ক্ষমাপ্রাপ্তগণের তালিকায়। নিঃসন্দেহে তুমি যা ইচ্ছা তা অবলোপন করো এবং যা ইচ্ছা স্থির রাখো। তোমার অধিকারেই সংরক্ষিত রয়েছে মূল গ্রন্থ। হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে।

কোনো কোনো সাহাবা-বাণী (আসার) থেকে এসেছে, হায়াত বাড়ানো, কমানো হয়। দৃষ্টান্তটি এরকম— এক লোকের তিরিশ বছর হায়াত আছে। এ সময় সে হঠাৎ কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলো। এমতো ক্ষেত্রে তার হায়াত তিরিশ বছর থেকে কমিয়ে তিন বৎসরে আনা হতে পারে। আবার এক লোকের হায়াত আছে তিন বছর। এমন সময় সে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিচ্ছিন্নকৃত কোনো আত্মীয়তার বন্ধন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলো। এমতাবস্থায় তার আয়ু তিন বৎসরের স্থলে তিরিশ বৎসর করা হতেও পারে। উদ্ধৃত সাহাবা-বাণীটি উল্লেখ করার পর বাগবী লিখেছেন, আবু দাউদের একটি বিবরণ। বিবরণটি এই— রসুল স. বলেছেন, এক লোকের অন্তিম সময় উপস্থিত। বাকী আছে কেবল রাত্রির তিনটি প্রহর। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাঁর অফুরন্ত মহিমা প্রকাশ করলেন। বাড়িয়ে দিলেন তার আয়ু। এ ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে অদৃষ্টলিপির কিছু কিছু অবলুপ্ত হয় এবং কিছু কিছু থাকে পূর্ববৎ।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত আলী রসুল স. সকাশে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, এই আয়াতের ব্যাখ্যা করে আমি তোমার নেত্রদ্বয়কে সুশীতল করে দিবো। একথা জেনে আগামী দিনের উম্মতেরও চক্ষুযুগল শীতল হয়ে যাবে। দান করো, মাতাপিতার প্রতি প্রদর্শন করো যথোপযুক্ত শিষ্টাচার। মনে রেখো, কল্যাণজনক কর্ম দুর্ভাগ্যকে অপসারণ করে সৌভাগ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করে।

আমি বলি, হজরত ওমর এবং হজরত ইবনে মাসউদ কতৃর্ক বর্ণিত হাদিসের অনুকূল একটি ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে মাকামাতে মোজাদ্দেদিয়া গ্রন্থে। ঘটনাটি এই— মোজাদ্দেদ তনয় মোহাম্মদ সাঈদ ও মোহাম্মদ মাসুমের ওস্তাদ ছিলেন মোল্লা তাহের লাহোরী। একবার হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি আত্মিক দৃষ্টিতে দেখলেন, তাঁর অদৃষ্টলিপিতে লেখা রয়েছে— দুর্ভাগা। তিনি তাঁর সন্তানদ্বয়কে একথা একান্তে বললেন। তাঁরা সম্মানার্হ শিক্ষকের এরকম পরিণতির কথা জানতে পেরে মনোক্ষুণ্ন হলেন। নিবেদন করলেন, হে পিতৃপ্রবর! আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করে আমাদের প্রিয় ওস্তাদজীর তকদির পরিবর্তন করে দিন। হজরত মোজাদ্দেদে

www.eelm.weebly.com

আলফেসানি বললেন, কী করে সম্ভব! লওহে মাহফুজেও যে একই কথা লেখা রয়েছে। মোহাম্মদ সাঈদ এবং মোহাম্মদ মাসুম তাঁদের অনুনয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। তিনি তখন বললেন, হ্যাঁ, বড় পীর আবদুল কাদের জিলানীর একটি কথা আমার মনে পড়েছে। তিনি বলেছেন, আমার দোয়ার মাধ্যমে অপরিবর্তনীয় তকদিরও পরিবর্তন করে দেয়া হয়। সুতরাং আমিও কায়মনোবাক্যে দোয়া করছি। হে আমার পরম করুণাপরবশ মাবুদ! হে আমার আল্লাহ্! তোমার অনুকম্পা অসীম। একজনের প্রার্থনা গ্রহণের মাধ্যমে সে অনুকম্পা তো নিঃশেষ হতে পারে না। সুতরাং আমিও এ ব্যাপারে আশাধারী। তোমার মহিমা সকাশে আমি আকুল মিনতি জানাই। দয়া করে আমার নিবেদন গ্রহণ করো। মোল্লা তাহেরের ললাট লিপি থেকে 'দুর্ভাগা' কথাটি মুছে দাও। তদস্থলে মুদ্রিত করো 'ভাগ্যবান', যেভাবে তুমি কবুল করে নিয়েছিলে আমার শ্রদ্ধার্হ পূর্বসূরী শায়েখ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানীর নিবেদন। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি বলেন, প্রার্থনা শেষে আমি দেখলাম, মোল্লা তাহেরের ললাট লিখন থেকে 'দুর্ভাগা' কথাটি মুছে ফেলা হলো। তদস্থলে মুদ্রিত হলো 'ভাগ্যবান'। আর এরকম করা আল্লাহ্পাকের নিকট অতি সহজ।

আমি বলি, মাকামাতে মোজাদ্দেদিয়ার এই ঘটনাটি পাঠ করে আমি এক বিরাট সমস্যায় পড়ে গেলাম। সমস্যাটি হচ্ছে— তকদিরের লিখন তো অপরিবর্তনীয়। কিন্তু এভাবে পরিবর্তন করা হলে তা আর অপরিবর্তনীয় থাকে কী করে? শেষে আত্মিক অনুপ্রেরণার মাধ্যমে আমার হৃদয়পটে সমস্যাটির সমাধান ভেসে উঠলো এভাবে — নিয়তি দু'ধরনের। একটি প্রলম্বিত— যা লিপিবদ্ধ রয়েছে সুরক্ষিত ফলকে (লওহে মাহফুজে)। আর একটি অপরিবর্তনীয়— যা বিদ্যমান রয়েছে আল্লাহ্র জ্ঞানে। যেহেতু লওহে মাহফুজে সকল কিছু সুসংরক্ষিত, তাই সেগুলোকে অপরিবর্তনীয় নিয়তি বলা যায়। ওই সকল লিপির কিছু কিছু অংশ পরিবর্তনশীল। কিন্তু সে পরিবর্তনশীলতার কথা লওহে মাহফুজে লেখা নেই। অলিপিবদ্ধরূপে সেগুলো সংরক্ষিত রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার অপার প্রজ্ঞায়। বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী এবং শায়েখ মোজাদ্দেদে আলফেসানির ঘটনা দু'টো এই ধরনের।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় জুহাক এবং কালাবী বলেছেন, কিরামান ও কাতেবিন নামে দুই লেখক ফেরেশতা মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। একজন লিখেন পাপ। অন্যজন লিখেন পুণ্য। মানুষের কিছু কিছু কথা ও কাজ আবার পাপ অথবা পুণ্য কোনোটার মধ্যেই পড়ে না। আল্লাহ্পাক সেগুলোকে অবলোপন করেন। বহাল রাখেন কেবল পাপ-পুণ্যের বিবরণ। কালাবী আর একটু বাড়িয়ে বলেছেন— আল্লাহ্পাক ওই অবলোপন সাধন করেন বৃহস্পতিবার রাতে।

আতিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জীবনভর পুণ্যকর্ম করা সত্ত্বেও শেষকালে যে বিপথগামী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার পূর্বের সকল পুণ্যকে আল্লাহ্ বিলোপ করে দেন। আর পুণ্যবান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার পুণ্যগুলোকে রাখেন সুপ্রতিষ্ঠিত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা এটাই।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস থেকে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষের অন্তঃকরণ আল্লাহ্র উদাহরণরহিত দুই আংগুলের মধ্যে। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন তেমনভাবে অন্তঃকরণগুলোর অবস্থান্তর ঘটান। এরপর রসুল স. দোয়া করলেন, হে অন্তঃকরণের বিবর্তনকারী আল্লাহ্! আমাদের অন্তঃকরণ-গুলোকে ভরে দাও তোমার আনুগত্যবোধ দিয়ে।

হাসান বলেছেন, মানুষের মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ মুছে দেন তার পার্থিব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড। আর যার মৃত্যু অত্যাসন্ন নয়, তার জীবনের রূপরেখা রাখেন অটুট। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত অবলোপন ও বহাল করার বিষয়টি এরকম।

ইকরামা বলেছেন, তওবার সুবাদে আল্লাহ্ তাঁর বান্দার পাপসমূহ অবলোপন করেন। পাপের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করেন পুণ্য। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন— উলায়িকা ইয়ুবাদ্দিলুল্লহু সায়্যিআতিহিম হাসানাত্ (আল্লাহ্ ওই সকল লোকের পাপসমূহ পুণ্যে রূপান্তরিত করেন)।

হজরত আবু জর গিফারী থেকে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেন, হাশরের ময়দানে এক লোকের বিচার শুরুর প্রাক্কালে আদেশ করা হবে, তার সগীরা (ছোট) গোনাহ্গুলো উপস্থিত করা হোক। কিন্তু তার কবীরা (বড়) গোনাহ্-গুলোকে রাখা হবে গোপন। বলা হবে, অমুক দিন তুমি কি এই অপকর্মটি করো নি? সে অবনত মস্তকে তার কৃত পাপের স্বীকৃতি দিবে এবং পাপাতঙ্কে আতংকিত হয়ে পড়বে। পরম করুণাময় আল্লাহ্ নির্দেশ করবেন, এ লোকের প্রত্যেক পাপের স্থলে পুণ্য লিখে দেয়া হোক। একথা শুনে লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠবে, আমার তো আরো অনেক পাপ আছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ পর্যন্ত বলে রসুল স. মৃদু হাসলেন। বিকশিত হলো তাঁর শ্বেতশুভ্র পবিত্র দন্তরাজি। গ্রন্থকার বলেন, যারা আল্লাহ্র প্রেমসাগরে নিমজ্জিত, এরকম কাণ্ড ঘটবে তাঁদের বেলায়। এরকম উন্নত মর্যাদাধারীরা হচ্ছেন পীর-দরবেশগণ।

সুদ্দী বলেছেন, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা বিলোপ করেন— কথাটির অর্থ, চন্দ্রিমা বিধৌত নিশি বিলোপ করেন। আর যা ইচ্ছা বহাল রাখেন— কথাটির অর্থ, নিশি শেষে উদ্ভাসন ঘটান দিবাকরের। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— আর আমি বিলোপ করে দেই রাত্রির চিহ্ন এবং প্রকাশ করি দিবসের নিদর্শন।

 www.eelm.weebly.com

রবী বিন আনাস বলেছেন, আলোচ্য বক্তব্যটি আত্মা সম্পর্কীয়। মানুষ নিদ্রিত হলে আল্লাহ্ তার আত্মা আপন অধিকারে নিয়ে নেন। ওই সময় তার মৃত্যু ঘটাতে চাইলে আত্মাকে আটক করেন। আর জীবিত রাখতে চাইলে ফিরিয়ে দেন সেই আত্মাকে। এক আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ মৃত্যুর সময় আত্মাগুলোকে আপন অধিকারভূত করেন। মৃত্যুর সময় উপস্থিত না হলে সেগুলোকে গ্রহণ করেন নিদ্রার সময়।' কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, প্রদর্শনপ্রবণ আমলগুলোকে আল্লাহ্পাক আমল লেখক ফেরেশতাদের দপ্তর থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। আর বিশুদ্ধ-উদ্দেশ্য-সম্বলিত কার্যকলাপগুলোকে বহাল রাখেন। কোনো কোনো ভাষ্যকার আবার বলেছেন, ধরিত্রীবাসী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে কোনো কোনো সম্প্রদায়কে আল্লাহ্পাক নিশ্চিহ্ন করে দেন। আবার কোনো কোনো সম্প্রদায়কে করেন সুপ্রতিষ্ঠিত।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তাঁর নিকট আছে কিতাবের মূল।' এখানে 'উম্মুল কিতাব' অর্থ কিতাবের মূল বা মূল গ্রন্থ। আর মর্মার্থ — আল্লাহ্র জ্ঞান। হজরত ইবনে আব্বাস একবার হজরত কা'বকে জিজ্ঞেস করলেন উম্মুল কিতাব অর্থ কি? তিনি বললেন, ইলমুল কিতাব। অর্থাৎ আল্লাহ্র জ্ঞান। ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্পাকের নিকটে রয়েছে দু'টি গ্রন্থ। একটির বিষয়বস্তু স্থায়ী ও অস্থায়ী। অর্থাৎ এই কিতাবের কিছু কিছু বিষয় মুছে ফেলা হয় এবং কিছু কিছু বিষয় বহাল রাখা হয়। অপর গ্রন্থটি হচ্ছে উম্মুল কিতাব বা মূল গ্রন্থ। এই গ্রন্থের কোনো কিছুই রূপান্তরিত হয় না।

বাগবী লিখেছেন, উম্মুল কিতাব হচ্ছে লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ফলক। ওই ফলকে লিপিবদ্ধ বিষয়ের রূপান্তর সাধিত হয় না। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে একটি সংরক্ষিত ফলক, যার ব্যাপ্তি পাঁচশত বছরের পথের দূরত্বের সমান। শ্বেত মুক্তায় নির্মিত ওই ফলকের দু'টি প্রান্ত আবার নির্মিত ইয়াকুত মর্মর দ্বারা। আল্লাহ্ ওই সংরক্ষিত ফলকটির প্রতি প্রতিদিন তিনশত তিরিশ বার দৃষ্টিপাত করেন। অভিপ্রায়ানুসারে সেখানকার কিছু কিছু বিবরণ অপসারিত করেন এবং কিছু কিছু রেখে দেন অবিকল পূর্বাবস্থায়।

ইসলামের বিজয় ও অবিশ্বাসীদের ধ্বংস সাধনের যে শুভসংবাদ আল্লাহ্পাক দিয়েছিলেন, তার বিলম্ব ঘটতে দেখে অবিশ্বাসীরা প্রায়শঃই রসুল স.কে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করতো। তাদের বিদ্রূপবাণে জর্জরিত রসুল স. তাই মাঝে মাঝে বিমর্ষ হয়ে পড়তেন। বিষণ্ণচিত্ত রসুলকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে তাই অবতীর্ণ হলো—

www.eelm.weebly.com

وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

❒ উহাদিগকে যে শাস্তির কথা বলি তাহার কিছু যদি তোমাকে দেখাইয়াই দিই অথবা যদি ইহার পূর্বে তোমার মৃত্যু ঘটাইয়াই দিই— তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।

❒ উহারা কি দেখে না যে আমি উহাদিগের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি? আল্লাহ্ আদেশ করেন, তাঁহার আদেশ রদ করিবার কেহ নাই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।

ইতোপূর্বে আল্লাহ্পাক শুভসংবাদবাহী এক আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন— 'তারা সমষ্টিগতভাবে পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে' সেদিকে ইঙ্গিত করে এখানে বলা হয়েছে 'তাদেরকে যে শাস্তির কথা বলি।' অর্থাৎ কাফেরদেরকে শাস্তি দিবো বলে যে অংগীকার আমি করেছি। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্পাক প্রদত্ত এই অংগীকারটি বাস্তবায়িত হয়েছিলো বদর যুদ্ধের সময়। তখন কেউ কেউ হয়েছিলো নিহত এবং কেউ কেউ হয়েছিলো বন্দী। অবশিষ্টরা কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছিলো।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তাদেরকে যে শাস্তির কথা বলি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দিই' এ কথার অর্থ, হে আমার রসুল! অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দিবো বলে যে অংগীকার আমি করেছি, তার কিছু কিছু আমি আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারি, অথবা তাদেরকে আমি শাস্তি দিতে পারি, আপনার মহাপ্রস্থানের পর। অর্থাৎ আমি কখন তাদেরকে শাস্তি দিবো সে ভাবনা আমার, আপনার নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কেবল আপনার কর্তব্যকর্মের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন। ধ্যান-জ্ঞান চিন্তা কেবল নিবদ্ধ রাখুন সত্যধর্ম প্রচারের দিকে। অবাধ্যদের প্রতি শাস্তি আপতিত হলো কিনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করবেন না। মনে রাখবেন, আপনি আমার প্রিয় বার্তাবাহক। সুতরাং আমার বার্তা প্রচার করাই আপনার মূল কর্তব্য। আর আমার কর্তব্য হচ্ছে,

www.eelm.weebly.com

বাধ্য-অবাধ্য নির্বিশেষে যথাসময়ে সকলের যথোপযুক্ত হিসাব গ্রহণ করা। একথা নিশ্চিত যে, শাস্তি তাদের হবেই। হয় পৃথিবীতে অথবা আখেরাতে। কিংবা পৃথিবী ও আখেরাত উভয় স্থানে।

পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে — 'তারা কি দেখে না যে আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে আনছি?' বাগবী লিখেছেন, 'আরদ্ব' অর্থ পৃথিবী। কিন্তু এখানে কথাটির অর্থ হবে দেশ বা অবিশ্বাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। আর সংকুচিত করার অর্থ মুসলমানদের ক্রমবর্দ্ধমান আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ধীরে ধীরে কোনঠাসা করে ফেলা। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ক্রমাগত প্রভাবহীন হয়ে পড়ছে। ইসলামের উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে আমি তাদেরকে দিন দিন দুর্বল করে ফেলছি। এ বিষয়টি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অনুধাবন করে না কেনো? একটু ভালো করে চিন্তা করলেই তো বুঝা যায় যে, তাদের আধিপত্য ক্রমশঃ খর্ব হতেই থাকবে। আর অব্যাহত থাকবে ইসলামের জয়যাত্রা। সুতরাং অবিশ্বাসীদের এখনো সত্যোপলব্ধি ঘটছে না কেনো? আলোচ্য বাক্যের এ রকম তাফসীর করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা এবং অধিকাংশ প্রখ্যাত তাফসীরবিদ।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে পৃথিবীকে চতুর্দিক থেকে সংকোচন করার অর্থ— ধ্বংস ও ধূলিসাৎ করা। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা দেখতে পাচ্ছে না কেনো, আমি তাদের বিভিন্ন জনপদ ধূলিসাৎ করে ফেলছি! ক্রমাগত উৎখাত করে চলছি তাদেরকে তাদের বসবাস থেকে? মুজাহিদ ও শা'বীও এ রকম ব্যাখ্যা করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করবার কেউ নেই।' এ কথার অর্থ— সমগ্র সৃষ্টিজগত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র কর্তৃত্বাধীন। তাঁর আদেশেই সকল কিছু চলে। তিনিই একমাত্র বিধান ও সিদ্ধান্তদাতা। এমন কেউই নেই যে তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। 'আক্বব্' অর্থ কাউকে বা কোনো কিছুকে পিছনে হটিয়ে দেয়া। আর যিনি এভাবে সকল কিছুকে পিছনে হটিয়ে দেন, তিনি হচ্ছেন 'মুয়াক্কিব্'। তাই এখানে বলা হয়েছে— লা মুয়াক্কিবা লিহুক্মিহী (তাঁর আদেশ রদ করবার কেউ নেই)। অর্থাৎ ইসলামকে বিজয়ী করবার যে সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছেন, সে সিদ্ধান্ত প্রতিরোধ করার সাধ্য কারো নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।' এ কথার অর্থ— সত্বর তিনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধবাদিতার জবাব দান করবেন। ফলে তাদের কেউ কেউ নিহত হবে। কেউ কেউ হবে বন্দী। আবার কেউ কেউ হবে দেশান্তরিত। এরপর হাশরের ময়দানে তিনি কঠোরভাবে গ্রহণ করবেন তাদের হিসাব।

রসুল স. এর অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার জন্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা প্রয়োগ করেছিলো বিভিন্ন কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্র। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়টির উল্লেখ করে রসুল স.কে দেয়া হয়েছে সান্ত্বনা ও সাহস।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ৪২, ৪৩

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝

❑ উহাদিগের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে তাহারাও চক্রান্ত করিয়াছিল কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহের এখ্তিয়ারে। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা করে তাহা তিনি জানেন এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ শীঘ্রই জানিবে শুভ পরিণাম কাহাদিগের জন্য।

❑ যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা বলে, 'তুমি আল্লাহের প্রেরিত নহ।' বল, 'আল্লাহ্ এবং যাহাদিগের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে তাহারা আমার ও তোমাদিগের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তারাও চক্রান্ত করেছিলো কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহ্র এখতিয়ারে।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার শত্রুরা যেভাবে আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে চলেছে, বিগত যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও তাদের নিকট প্রেরিত নবী-রসুলের বিরুদ্ধে এ রকম চক্রান্ত করেছিলো। এটা তাদের চিরন্তন স্বভাব। কিন্তু তারা তো জানে না যে, সকল শুভ ও অশুভের একমাত্র নিয়ন্ত্রক আল্লাহ্ স্বয়ং। তাঁর অনুমোদন ব্যতিরেকে কারো চক্রান্ত কখনোই কার্যকর হয় না। এখানে 'মকর' অর্থ চক্রান্ত, গোপন পরিকল্পনার মাধ্যমে কাউকে ক্লেশ দেয়া। কোনো কোনো আলেম বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্পাকই তাদের এবং অন্য সকলের চক্রান্তের স্রষ্টা। ভালো ও মন্দ উভয়ই তাঁর অধীন। লাভ ও ক্ষতির সৃজকও তিনি। তাই তাঁর অনুমোদন ব্যতিরেকে কারো চক্রান্ত ফলপ্রসূ হয় না।

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তা তিনি জানেন এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ শীঘ্রই জানবে শুভ পরিণাম কার জন্য।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক সর্বজ্ঞ। তাই সকলের প্রকাশ্য ও গোপন কার্যকলাপ সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর গোপন ব্যবস্থাপনা সতত সচল। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা দিকভ্রান্ত।

www.eelm.weebly.com

তাই সত্যপোলব্ধি তাদের ঘটছে না। কিন্তু হাশর প্রান্তরে যখন বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মানুষকে একত্র করা হবে তখন চিরতরে দূর হয়ে যাবে তাদের ভ্রান্তি। সীমাহীন শাস্তি দর্শনে তারা তখন হয়ে পড়বে বিহ্বল, চঞ্চল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। দেখবে, যে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধাচরণ তারা করেছিলো তারাই আজ চলে যাচ্ছে চির সুখময় বেহেশতের দিকে। এভাবে আল্লাহ্পাক চূড়ান্ত জবাব দিবেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চক্রান্তের।

পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে তারা বলে তুমি আল্লাহ্র প্রেরিত নও। বলো, আল্লাহ্ এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিকেরা অথবা মদীনার ইহুদীরা বলে, আপনি আমার রসুল নন। আপনি তাদেরকে বলুন, আমি যেহেতু আল্লাহ্র রসুল, তাই আল্লাহ্র সাক্ষ্যই আমার জন্য যথেষ্ট। আর রয়েছে ওই সকল লোকের সাক্ষ্য যারা আসমানী কিতাব সম্পর্কে প্রাজ্ঞ। যেমন, ইহুদী থেকে ধর্মান্তরিত বিজ্ঞ সাহাবী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ। সুতরাং এ বিষয়ে অজ্ঞ ও মূর্খ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সাক্ষ্যের কোনো মূল্যই নেই। কারণ তারা হিংসুক ও প্রবৃত্তিপরায়ণ। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এই সুরার সকল আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। শা'বী এবং আবুল বাসীর এই ব্যাখ্যাটির বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ছিলেন মদীনাবাসী। আর তিনি ইসলামও গ্রহণ করেছিলেন মদীনায়। সুতরাং মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরায় তাঁর সম্পর্কে অবতীর্ণ কোনো আয়াত সন্নিবেশিত থাকতে পারে না।

আমি বলি, এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হলেও এর মধ্যে ইহুদীদের সম্পর্কে উল্লেখ না থাকার তো কোনো যুক্তি নেই। বিষয়টি আসলে এরকম— আল্লাহ্পাক এখানে মক্কার অংশীবাদীদেরকে সম্বোধন করে বলছেন, মোহাম্মদের নবুয়ত সম্পর্কে যদি তোমরা দ্বিধান্বিত হও তবে, যারা ইহুদী তাদেরকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করে দেখতে পারো? তাদের মধ্যে যারা আসমানী কিতাব সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং সত্য কথা বলে, তারা নিশ্চয় মোহাম্মদের নবুয়তের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

হাসান ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'আল কিতাব' অর্থ সংরক্ষিত ফলক। আর 'ওয়ামান ইনদাহু ইলমুল কিতাব' অর্থ আল্লাহ্পাক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তাঁর সাক্ষ্যই যথেষ্ট যিনি উপাস্য হওয়ার উপযুক্ত। আর সংরক্ষিত ফলক সম্পর্কিত জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কারো নেই। মিথ্যাশ্রয়ীদেরকে তিনিই শাস্তি দান করবেন। সে মিথ্যাবাদী যে কেউ হোক না কেনো।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং হাসান 'মান্ ইনদাহু' কথাটিকে পাঠ করতেন 'মিন ইন্দিহী'। মুজাহিদও এই উচ্চারণরীতির সমর্থক।

www.eelm.weebly.com

সুরা ইব্‌রাহীম

সাত রুকু এবং বায়ান্ন আয়াত সম্বলিত এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কেবল আটাশ ও উনত্রিশ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। সুরা ইব্‌রাহীম অবতীর্ণ হয়েছে সুরা নূহ্‌ এর পরে।

সুরা ইব্‌রাহীম ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ۬ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ
اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَ
وَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ○ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ○

❒ আলিফ-লাম্-রা, এই কিতাব, ইহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি মানব জাতিকে তাহাদিগের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে, বাহির করিয়া নিতে পার অন্ধকার হইতে আলোকে, তাঁহার পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ।

❒ আল্লাহ্— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের জন্য,

❒ যাহারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহের পথ হইতে এবং আল্লাহের পথ বক্র করিতে চাহে; উহারাই ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে— আলিফ লাম রা। কোরআন মজীদের কোনো কোনো সুরার প্রথমে এ ধরনের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোকে বলে হরূফে মুকাত্তায়াত। এগুলোর মর্ম দুর্জ্ঞেয়। এ সকল অক্ষরের মর্ম জানেন কেবল আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর (ওলামায়ে রসিখীন) তাঁরাও এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকেন।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এই কোরআন আমি আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছি এ কারণে, যাতে আপনি আপনার পালনকর্তার অনুমতিক্রমে মানব জাতিকে বিভ্রান্তির অন্ধকার থেকে সত্যের উজ্জ্বল আলোয় নিয়ে আসতে পারেন। অর্থাৎ নিয়ে আসতে পারেন তাঁর পথে, যিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রশংসার্হ।

এখানে 'জুলুমাত্' অর্থ পথভ্রষ্টতার অন্ধকার। আর 'নূর' বা আলো অর্থ হেদায়েত, সুপথ। 'ইজন্' অর্থ সামর্থ্য। অর্থাৎ কোনো বিষয় কার্যকর করার সহজ পদ্ধতি প্রণয়ন। যেমন অতিথিকে গৃহস্বামী কর্তৃক গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রদান। এ রকম অনুমতি পেলে গৃহে প্রবেশ করা সহজতর হয়। বাধা-বিপত্তি আর থাকে না।

'তাঁর পথে' অর্থ আল্লাহর পথে, যে পথ গৌরবের, সাফল্যের। যে পথের যাত্রীরা হয় নন্দিত ও প্রশংসিত। স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্‌র পথের পথিক কখনো বিভ্রান্ত হয় না। বিপথে চলে না।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তা তাঁরই। কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।' মন্দ কোনো কিছুর অবতারণাকে বলে 'ওয়াইল'। বায়যাবী লিখেছেন, ওয়াইল এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'ওয়াল'। 'ওয়াল' অর্থ পরিত্রাণ। অতএব 'ওয়াইল' অর্থ হবে ধ্বংস। শব্দটি একটি ধাতুগত শব্দ। এরকম শব্দ থেকে অন্য কোনো শব্দের বুৎপত্তি ঘটে না। বায়যাবীর ব্যাখ্যার আলোকে বলতে হয়, শব্দটি তিরস্কার প্রকাশক। অর্থাৎ এর মাধ্যমে তিরস্কার করা হয়েছে ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে, যারা অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসতে সম্মত হয়নি।

এর পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'যারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষদেরকে নিবৃত্ত করে এবং আল্লাহর পথ বক্র করতে চায়; তারাই ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।' এখনে 'ইয়াস্‌তাহিব্বুনা' অর্থ ভালো মনে করে। কোনো কিছুকে সাগ্রহে গ্রহণ করাকে বলে 'ইস্‌তিহ্বাব'। অর্থাৎ কোনো কিছুকে প্রিয় জ্ঞান করা। 'ইহজীবন' অর্থ পার্থিব জীবনের আস্বাদ। 'আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে' অথ রসুল স. এর অনুসরণে প্রতিবন্ধকতা না করে। 'আল্লাহ্‌র পথ বক্র করতে চায়' অর্থ অহমিকাবশতঃ সত্য পথের আহ্বানের মধ্যে সন্ধান করে দোষত্রুটি। অথবা পশ্চাদপসারণ করে সত্য থেকে। অর্থাৎ বক্রপথে তারা আল্লাহ্‌কে পেতে চায়। কিন্তু তারা জানে না যে, আল্লাহ্‌পাকের প্রতি বৈমুখ্য তাদেরকে কখনোই সফল করতে পারবে না। এ রকমও বলা যায় যে, আল্লাহ্‌র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পার্থিবতায় মগ্ন হওয়ার অর্থ অবৈধ সম্পদ কামনা করা।

www.eelm.weebly.com

'তারাই ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে' কথাটির অর্থ তারা রয়েছে সত্য থেকে যোজন যোজন দূরে। পথভ্রষ্ট জনগোষ্ঠীকে সাধারণতঃ এভাবেই চিহ্নিত করতে হয়।

সূরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৪

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ○

❐ আমি প্রত্যেক রসুলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়া পাঠাইয়াছি তাহাদিগের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য; আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি প্রত্যেক রসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষি করে পাঠিয়েছি' এখানে উল্লেখিত 'ক্বাওমিহি' কথাটির অর্থ ওই জাতিগোষ্ঠী যাদের মধ্যে নবী রসুল জন্মগ্রহণ করেন। আবদ্ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, এখানে 'লিসানু ক্বওম' অর্থ জাতির ভাষা। অর্থাৎ প্রত্যেক নবী তাঁর মাতৃভাষায় কথা বলেন। রসুল স. কথা বলতেন আরবীতে। কারণ তাঁর সম্প্রদায়ের ভাষা ছিলো আরবী। তাঁর পূর্বে প্রেরিত নবী রসুলগণও তাঁদের স্ব স্ব জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলতেন। সত্য প্রচার সহজ ও ফলপ্রসূ করার জন্য আল্লাহ্পাকই এই নিয়মটি বেঁধে দিয়েছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্য' এ কথার অর্থ— যেনো নিজস্ব ভাষায় অবতীর্ণ প্রত্যাদেশসমূহ তিনি স. সম্প্রদায়ের লোকজনকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। 'বুঝতে পারছিনা' 'দুর্বোধ্য' 'অস্পষ্ট' ইত্যাদি বলে লোকেরা যেনো সত্যের আহ্বানকে এড়িয়ে যেতে না পারে। উল্লেখ্য যে, বিগত যুগের নবী-রসুলগণ আদিষ্ট হয়েছিলেন স্ব স্ব সম্প্রদায়ের হেদায়েতের জন্য। কিন্তু রসুল স. আবির্ভূত হয়েছেন বিশ্বমানবতাকে পথপ্রদর্শনের জন্য। স্বজাতিকে পথ প্রদর্শন ছিলো তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে ধাপে ধাপে তাঁর পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব সম্প্রসারিত করা হয়েছে। যেমন—১. 'আর আপনি আপনার নিকটস্থ আত্মীয়-স্বজনকে ভীতি প্রদর্শন করুন। ২. মক্কাবাসী ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ জনগণের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ....। ৩. সেই জাতিকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যাদের পিতৃ-

www.eelm.weebly.com

পুরুষগণকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি। প্রথমোক্ত আয়াতে আত্মীয়-স্বজন, দ্বিতীয় আয়াতে মক্কাবাসী ও মক্কাসন্নিহিত অঞ্চলগুলোর অধিবাসী এবং তৃতীয় আয়াতে সমগ্র আরব ও অনারব জনতাকে পথ প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। এভাবে ধাপে ধাপে সম্প্রসারিত হয়েছে রসুল স. এর কর্তব্যকর্মের সীমানা। বলা বাহুল্য যে, তিনি স. এই কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। তাই আমরা দেখি ধীরে ধীরে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে মক্কায়, মদীনায়, সমগ্র আরবে, সারা দুনিয়ায়। অনারবেরাও ক্রমান্বয়ে এই সত্য ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য কোরআনের বাণী-বৈভবকে নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করে নিয়েছেন। এই বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত করে রসুল স. বলেছেন, সকল সৎ ও অসৎ কর্মে মানবজাতি কুরায়েশদের অনুসারী। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও মুসলিম। হাদিসটির মর্মার্থ এ রকম— কুরায়েশরাই সর্বপ্রথম রসুল স. এর নবুয়তকে অস্বীকার করে। সুতরাং পরবর্তী সময়ে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদের অনুসারী। আবার কুরায়েশরাই সর্বপ্রথম রসুল স. এর প্রতি ইমান এনেছেন। তাই পরবর্তী সময়েই সকল ইমানদার তাঁদের অনুসারী। এভাবে ভালো ও মন্দ উভয় বিষয়ে সকল মানুষ কুরায়েশদের অনুসারী।

হজরত জারীরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো সৎ পদ্ধতির প্রচলন ঘটাবে, সে লাভ করবে তার অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব। অনুসারীদের সওয়াব এতে বিন্দু পরিমাণ কমবে না। আবার যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো অসৎ পদ্ধতি প্রচলন করবে, সে পাবে তার অনুসারীদের সমপরিমাণ পাপ। কিন্তু অনুসারীদের পাপও এতে করে বিন্দু পরিমাণ কমবে না। মুসলিম।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী শিথিল সূত্র সহযোগে ইবনে আসাকের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, হে মদীনাবাসী! জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে সকল মানুষ তোমাদের অনুগামী। এখানে 'মদীনাবাসী' অর্থ আনসার ও মুহাজির। অর্থাৎ সকল মানুষ আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণের অনুসারী। আর খেলাফতের ব্যাপারে আনসারগণও মুহাজিরগণের অনুসারী। উল্লেখ্য যে, উপরে বর্ণিত হাদিস দু'টোর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই।

হজরত আবু রাফে' কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পরিবারের প্রবীণতম ব্যক্তি যেমন, উম্মতগণের মধ্যে নবীও তেমনি। ইবনে নাজ্জার। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আপন উম্মতের মধ্যে

www.eelm.weebly.com

নবী-রসুলগণ গৃহবাসীদের মধ্যে গৃহকর্তার মতো। ইবনে হাব্বান তাঁর জুয়াফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেন, আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারেমী। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে কাসীর ইবনে কইস সূত্রে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেন, হে মদীনাবাসী! সকল লোক তোমাদের অনুগামী। ধর্মশিক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশের লোক তোমাদের কাছে আসে। তোমরা তাদের সঙ্গে শিষ্টাচার কোরো। সদুপদেশ দিয়ো। তিরমিজি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'কান্নাবিয়্যু ফী ক্বওমিহী' (যেমন নবী তাঁর স্বজাতির মধ্যে) কথাটির মধ্যে 'নবী' অর্থ শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.। হাদিসটির মর্মার্থ এরকম— সকল আসমানী কিতাব আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হতো। হজরত জিবরাইল সে সকল নভজ বাণীবৈভবকে নবীগণের মাতৃভাষায় অনুবাদ করে তাঁদেরকে জানাতেন। কালাবীর মাধ্যমে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত জিবরাইলের প্রতি প্রত্যাদেশ করা হতো আরবী ভাষায়। হজরত জিবরাইল সেগুলোকে অনুবাদ করে দিতেন নবীগণের মাতৃভাষায়।

ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, সুফিয়ান সওরী বলেছেন, সকল নবীর উপর প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছিলো আরবী ভাষায়। প্রচারের সুবিধার্থে নবীগণ তাঁদের নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করে নিয়েছিলেন সেই প্রত্যাদেশগুলোকে। তিনি আরো বলেছেন, হাশর প্রান্তরে কথাবার্তা হবে সুরিয়ানী ভাষায়। আর বেহেশতবাসীদের ভাষা হবে আরবী।

আমি বলি, 'কান্নাবিয়্যু ফী ক্বওমিহী' কথাটির অর্থ, রসুল স. এর এরকম মন্তব্য সংগত নয়। এরকম অর্থ গ্রহণ করলে বক্তব্যটি চলে যাবে লিতুবাইয়্যিনা লাহুম বিলিসানি ক্বওমিহী (স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি) কথাটির বিরুদ্ধে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন' এ কথার অর্থ— ভ্রান্তি ও পথপ্রাপ্তি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়-নির্ভর। অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি চিরমুক্ত, চির পবিত্র।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' এ কথার অর্থ— তিনি মহাপরাক্রান্ত। তাই তাঁর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সুযোগ কারো নেই। আর তিনি মহাপ্রজ্ঞাধিকারী। কাউকে পথভ্রষ্ট করা এবং কাউকে পথ প্রদর্শন করার বিষয়টি তাঁর অপার প্রজ্ঞাময়তার একটি রহস্যময় নিদর্শন।

www.eelm.weebly.com

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

❒ মূসাকে আমি আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, 'তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হইতে আলোতে আনয়ন কর এবং উহাদিগকে অতীতের ঘটনাসমূহ স্মরণ করাইয়া দাও।' ইহাতে তো নিদর্শন রহিয়াছে পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

❒ স্মরণ কর, মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ফিরাউনী সম্প্রদায়ের কবল হইতে, যাহারা তোমাদিগকে মর্মান্তিক শাস্তি দিত, তোমাদিগের পুত্রগণকে জবাই করিত ও তোমাদিগের নারীগণকে জীবিত রাখিত; এবং ইহাতে ছিল তোমাদিগের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এক মহা পরীক্ষা।

প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'আইয়্যামিল্লাহ্' কথাটির অর্থ আল্লাহ্পাকের নেয়ামতসমূহ। হজরত ইবনে আব্বাস, উবাই বিন কা'ব, মুজাহিদ এবং কাতাদা এ রকম বলেছেন। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ ওই সকল ইতিবৃত্ত , যা ঘটেছিলো আদ্, ছামুদ ও হজরত নুহের যুগে। প্রচলিত একটি প্রবাদ— অমুক ব্যক্তি আইয়্যামুল আরবের আলেম। এ কথার অর্থ, লোকটি আরববাসীদের যুদ্ধের ইতিহাস জানেন। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের প্রথমাংশের মর্মার্থ দাঁড়ায় এ রকম— হে আমার রসুল! আপনি আপনার স্বজাতিকে ওই সকল ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিন, যেগুলো সংঘটিত হয়েছিলো তাদের পূর্বসুরীদের জামানায়— কখনো অনুকম্পারূপে, আবার কখনো দুর্বিপাকরূপে। যেমন, নবী মুসার ঘটনা। তাঁকে আমি আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসো।

এরপর বলা হয়েছে—'এতে তো নিদর্শন রয়েছে পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।' একথার অর্থ— ওই সকল ঘটনাবলীর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্পাকের এককত্ব ও শক্তিমত্তার বিস্ময়কর নিদর্শন। যারা সহিষ্ণু ও

www.eelm.weebly.com

কৃতজ্ঞচিত্ত, তারাই কেবল ওই সকল ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম। এখানে 'স্বাব্বার' ও 'শাকূর' (ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ) শব্দ দু'টো উল্লেখের কারণে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বাসীদের জন্য এ দু'টো গুণের অধিকারী হওয়া অত্যন্ত জরুরী। বায়হাকী তার শো'বুল ইমান গ্রন্থে এবং ইবনে আবী হাতেম আবু জুবিয়ান সূত্রে উল্লেখ করেছেন, হজরত আলকামা ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, ধৈর্য হচ্ছে ইমানের অর্ধাংশ। আর দৃঢ় প্রত্যয় হচ্ছে পূর্ণ ইমান। আলা বিন বদরের সম্মুখে একথা বলার পর তিনি আরো বলেছেন, তুমি কি শোনোনি আল্লাহ্পাকের এই আয়াত— 'এতে তো নিদর্শন রয়েছে পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য' এবং 'অবশ্যই এতে রয়েছে মুমিনদের জন্য নিদর্শনাবলী।' উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের একটিতে ইমানদারদের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞচিত্তরূপে। আরেকটিতে সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে ইমানদাররূপে। এতে করে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ওই ব্যক্তিই মুমিন, যে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ।

হজরত আনাস থেকে বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, দু'টো বিষয়ের সমষ্টির নাম ইমান। একটি ধৈর্য ও অপরটি কৃতজ্ঞতা। তিবরানী তাঁর মুকারিমূল আখলাখ গ্রন্থে এবং আবু ইয়া'লী স্বয়ং উল্লেখ করেছেন সহনশীলতা ও বিনয়ের সমষ্টি হচ্ছে ইমান।

হজরত সুহাইব থেকে মুসলিম ও আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীদের সকল কিছুই বিস্ময়কর। তাদের সকল কাজ কল্যাণে ভরপুর। তারা সুখের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর দুঃখের সময় অবলম্বন করে সহিষ্ণুতাকে। এভাবে সুখ-দুঃখ সকল অবস্থায় তারা কল্যাণের মধ্যেই নিমজ্জিত থাকে।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেন, মুমিনদের অবস্থা দেখে অবাক মানতে হয়। বিপদের সময় তারা ধৈর্য ধারণ করে পুণ্যাভিলাষী হয়। আর সুখের সময় আল্লাহ্র প্রতি জানায় সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা। এভাবে আনন্দ ও বিষাদ উভয় অবস্থায় লাভ করে কেবল কল্যাণ আর কল্যাণ। এমন কি আহারের যে গ্রাস সে মুখে তুলে নেয়, তার জন্যও সে পুণ্য লাভ করে।

হজরত আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ একবার হজরত ঈসাকে বললেন, হে ঈসা! তোমার পরে আমি বিশেষ এক উম্মতের অভ্যুদয় ঘটাবো। কাংখিত বিষয় হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা করবে। আর প্রতিকূল অবস্থায় তারা পুণ্যের আশায়

www.eelm.weebly.com

ধৈর্যধারণকারী হবে। তারা বিপদ সহ্য করতে পারবে না, কিন্তু কী করা উচিত, তা বুঝতেও পারবে না। নবী ঈসা বললেন, 'সহ্য করতে পারবে না, আবার বুঝতেও পারবে না'— এটা কি করে সম্ভব? আল্লাহ্ বললেন, তখন আমার পক্ষ থেকে আমি তাদেরকে জ্ঞান দান করবো। বায়হাকী তাঁর শো'বুল ঈমান গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন ফেরাউনী সম্প্রদায়ের কবল থেকে, যারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দিতো, তোমাদের পুত্রগণকে জবাই করতো ও তোমাদের নারীগণকে জীবিত রাখতো; এবং এতে ছিলো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা।' এখানে 'অনুগ্রহ' (নি'মাত্) অর্থ বনী ইসরাইলকে প্রদত্ত অনুগ্রহরাশি। কিন্তু 'আ'জাব' (শাস্তি) অর্থ এখানে সন্তান হত্যা নয়। বরং এখানে 'আ'জাব' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে তাদের শ্রমভারাক্রান্ত ও বন্দীপ্রায় জীবনকে। কারণ 'ইয়ুজাব্বিহুনা' কথাটির সংযোগ রয়েছে 'ইয়াসুমুনা' কথাটির সঙ্গে। উল্লেখ্য যে, অন্বয় ও অন্বয়ী শব্দাবলীর মধ্যে বৈপরীত্য বিধেয়। তবে হ্যাঁ, সুরা বাকারা এবং সুরা আ'রাফে উল্লেখিত 'আ'জাব' শব্দের মাধ্যমে সন্তান হত্যাকে বুঝানো হয়েছে।

সুরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৭, ৮

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ○ وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ○

❒ স্মরণ কর, 'তোমাদিগের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, 'তোমরা কৃতজ্ঞ হইলে তোমাদিগকে অবশ্যই অধিক দিব আর অকৃতজ্ঞ হইলে অবশ্যই আমার শাস্তি হইবে কঠোর।'

❒ মূসা বলিয়াছিল, 'তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও— তথাপি আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি আরো স্মরণ করুন, আপনার পালনকর্তা নবী মুসাকে বলেছিলেন, আমার এই ঘোষণাটি

www.eelm.weebly.com

সকলকে জানিয়ে দাও— হে জনতা! তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই অত্যধিক দান করবো। আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর। এখানে 'তাআজ্জানা' অর্থ জ্ঞাপন, প্রজ্ঞাপন। এখানে বনী ইসরাইলকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে 'শাকার্তুম' (কৃতজ্ঞ হলে) এবং 'কাফার্তুম' (অকৃতজ্ঞ হলে)। কৃতজ্ঞতার অর্থ ইমান আনা ও রসুলের আজ্ঞানুসারে চলা। নেয়ামতের আধিক্য কৃতজ্ঞতাকে অপরিহার্য করে। নেয়ামতকেও করে প্রলম্বিত। আবার উজ্জ্বল করে অনর্জিত নেয়ামত প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুকূল পরিবেশ যাকে দেয়া হয়েছে, সে কখনো বঞ্চিত হয় না।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানকার বক্তব্যটি এ রকম— তোমরা যদি যথা আনুগত্যের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, তবে আমি তোমাদেরকে দান করবো অত্যধিক সওয়াব।

'ইন্না আ'জাবী লা শাদীদ্' অর্থ অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর। অর্থাৎ পৃথিবীতে আমি কেড়ে নিবো তোমাদের সুখের উপকরণসমূহ। আর আখেরাতেও প্রদান করবো কঠিন শাস্তি।

আলোচ্য আয়াতে কৃতজ্ঞতার পুরস্কার ও অকৃতজ্ঞতার শাস্তির বিষয়টি সুস্পষ্ট। তবে কৃতজ্ঞচিত্তদেরকে প্রচুর নেয়ামতের অধিকারী করে দেয়ার বিষয়টি যেমন অবশ্যম্ভাবী, শাস্তির বিষয়টি তেমন অবশ্যম্ভাবী নয়। অর্থাৎ শাস্তির বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় নির্ভর। তিনি অকৃতজ্ঞদেরকে ইহকালে, অথবা ইহ-পরকালে অথবা শুধু পরকালে শাস্তি দিবেন। কিংবা তাদেরকে মাফ করে দিবেন।

পরের আয়াতের (৮) মর্মার্থ হচ্ছে—নবী মুসা তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছিলেন, হে বনী ইসরাইল জনতা! তোমরা এবং পৃথিবীর সকল লোক কৃতঘ্ন হলেও আল্লাহ্‌র কোনো কিছু যাবে আসবে না। কারণ তিনি চির অমুখাপেক্ষী ও চির প্রশংসিত। তাঁর প্রকৃত প্রশংসা বর্ণনা করতে পারেন তিনি নিজে। তাছাড়া ফেরেশতাকুল নিরন্তর উচ্চারণ করে চলেছে তাঁর স্তবস্তুতি। সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি অণুপরমাণু অহরহ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সুতরাং হে নির্বোধ জনতা! মনে রেখো, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে তোমরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

www.eelm.weebly.com

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن
بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي
أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا
إِلَيْهِ مُرِيبٍ ○ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ
لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ
مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ○
قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَ
لَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ○

❒ 'তোমাদিগের নিকট কি সংবাদ আসে নাই তোমাদিগের পূর্ববর্তীদিগের, নূহের সম্প্রদায়ের, আদের ও সামূদদের এবং তাহাদিগের পরবর্তীদিগের? উহাদিগের বিষয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। উহাদিগের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদিগের রসূল আসিয়াছিল; উহারা তাহাদিগকে কথা বলিতে বাধা দিত এবং বলিত, 'যাহা সহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ তাহা আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সে-বিষয়ে যাহার প্রতি তোমরা আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ।'

❒ উহাদিগের রসূলগণ বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে? —যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদিগকে তাঁহার দিকে আহ্বান করেন তোমাদিগের পাপ মার্জনা করিবার জন্য এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদিগকে অবকাশ দিবার জন্য।' উহারা বলিত, 'তোমরা তো আমাদিগেরই মত মানুষ। আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ যাহাদিগের ইবাদত করিত তোমরা তাহাদিগের ইবাদত হইতে আমাদিগকে বিরত রাখিতে চাহ। অতএব তোমরা আমাদিগের নিকট কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর।'

www.eelm.weebly.com

❒ উহাদিগের রসূলগণ উহাদিগকে বলিত, 'সত্য বটে আমরা তোমাদিগেরই মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার দাসদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহের অনুমতি ব্যতীত তোমাদিগের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদিগের কাজ নহে। বিশ্বাসীগণের আল্লাহেরই উপর নির্ভর করা উচিত।

❒ 'আমরা আল্লাহের উপর নির্ভর করিব না কেন? তিনিই তো আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তোমরা আমাদিগকে যে ক্লেশ দিতেছ আমরা অবশ্যই তাহা ধৈর্যের সহিত সহ্য করিব এবং যাহারা নির্ভর করিতে চাহে আল্লাহেরই উপর তাহারা নির্ভর করুক।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমাদের নিকট কি সংবাদ আসেনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের, নুহের সম্প্রদায়ের, আদের ও ছামুদের এবং তাদের পরবর্তীদের?' এ কথার অর্থ— হজরত মুসা বলেছিলেন, হে বনী ইসরাইল জনতা! তোমরা কি জানো না বিগত যুগের অবাধ্য আদ, ছামুদ, নবী নুহ্, ইব্রাহিম, লুত, মাদিয়ানবাসী, আইকাবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়ের শোচনীয় পরিণতির কথা?

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।' বাক্যটি আপেক্ষিক। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ এই বাক্যটি পাঠ করার পর বলতেন, বংশলতিকার বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তা জানে না। ইমাম মালেকও বংশলতিকার বিবরণ প্রদান করা সমর্থন করেন না। অর্থাৎ হজরত আদম পর্যন্ত বংশপরম্পরা বর্ণনা করা তাঁর মনোপুত নয়। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, হজরত আদম পর্যন্ত রসুল স. এর বংশধারা বর্ণনা করাও ঠিক নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রসুল এসেছিলো; তারা তাদেরকে কথা বলতে বাধা দিতো'। এখানে 'আইদিইয়াহুম ফী আফওয়াহিহিম' কথাটির অর্থ তারা তাদের হস্তসমূহ স্থাপন করতো মুখে। অর্থাৎ তারা তাদের নবীগণকে কথা বলতে বাধা দিতো। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, নবীগণের কথা শুনে তারা রাগে তাদের হাতের আংগুল কামড়াতো। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়াআদ্দু আলাইকুমুল আযানিলু মিনাল গইদ্বি' (তোমাদের উপর রেগে গিয়ে তারা দাতে আংগুল কাটছিলো)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী-রসুলগণের মুখে আল্লাহ্র বাণী উচ্চারিত হতে শুনে ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবাক হয়েছিলো। শুরু করে দিয়েছিলো হাসি-ঠাট্টা। আর হাসি চাপা দেয়ার জন্য হাত দ্বারা মুখ ঢেকেছিলো। কালাবী বলেছেন, তারা ঠোটে আংগুল রেখে নবী-রসুলগণকে ইঙ্গিতে নিশ্চুপ থাকতে বলেছিলো। মুকাতিল বলেছেন, তারা তাদের হস্ত স্থাপন করতো নবীগণের মুখের উপর। কথা বলতে না দেয়াই ছিলো তাদের এমতো আচরণের উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায়

 www.eelm.weebly.com

'আফওয়াহিহিম' কথাটির 'হিম' (তাদের) সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে নবীগণের সঙ্গে। কোনো কোনো আলেম 'আইদি' শব্দটির অর্থ করেছেন— নবীগণের উপদেশাবলী, শরিয়তের বিধান, প্রত্যাদেশ। অর্থাৎ তারা নবী-রসুলগণ কর্তৃক প্রচারিত শরিয়তের বিধানাবলীকে মুখের উপর ফিরিয়ে দিতো। মুজাহিদ এবং কাতাদা এ রকম বলেছেন। যেমন প্রচলিত প্রবাদে বলা হয়, আমি তার কথা তার মুখে ফিরিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ তার কথা আমি গ্রহণ করিনি। কেউ কেউ বলেছেন, 'ফী আফওয়াহিহিম' কথাটির অর্থ তারা নিজ মুখে নবীগণের বিধানসমূহ অস্বীকার করেছিলো। নবীগণের সদুপদেশের কোনো মূল্যই তারা দেয়নি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বলতো যা সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছো তা আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সেই বিষয়ে যার প্রতি তোমরা আমাদেরকে আহ্বান করছো।'

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে—'তাদের রসুলগণ বলেছিলো, আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি কোনো সন্দেহ আছে? —যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।' এ কথার অর্থ— তাদের রসুলগণ তাদের সন্দেহের প্রত্যুত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করে বসেছিলেন, আমরা তো সেই এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলছি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী। স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি তো তাঁর নিঃসন্দিগ্ধ অস্তিত্ব সম্পর্কে সোচ্চার। বিষয়টি সন্দেহের অতীত। এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়টি সম্পর্কেও তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে চাও? উল্লেখ্য যে, এই প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন (ইসতেফহামে ইনকারী)।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে তাঁর দিকে আহ্বান করেন তোমাদের পাপ মার্জনা করবার জন্য' এ কথার অর্থ— হে অদূরদর্শী জনতা! আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণের জন্যই তোমাদেরকে তাঁর দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। পরম ক্ষমাপরবশ তিনি। তাই তিনি তোমাদেরকে ডাকছেন মার্জনা করবার জন্য। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'মিন্ জুনুবিকুম' কথাটির 'মিন্' অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— তোমাদের সকল পাপ ক্ষমা করার জন্যই তোমাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে। হজরত আমর বিন আস থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, ইসলামের স্বীকৃতি পূর্ববর্তী পাপরাশিকে বিলীন করে দেয়।

কেউ কেউ বলেছেন, 'মিন' অব্যয়টি এখানে আংশিক অর্থ প্রকাশক। যদি তাই হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে— তোমাদের কোনো কোনো পাপ ক্ষমা করার জন্য। কেন না ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ্র অধিকার খর্ব বিষয়ক পাপগুলো ক্ষমা করা হয়। কিন্তু মানুষের অধিকার খর্ব বিষয়ক পাপসমূহ ক্ষমা করা হয় না। জনৈক

বিজ্ঞজন মন্তব্য করেছেন, কোরআন মজীদে যে সকল স্থানে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে সাবধান করা হয়েছে, সে সকল স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে 'মিন' অব্যয়টি। কিন্তু মুমিনদের ক্ষেত্রে 'মিন' ব্যবহৃত হয়নি। এই পার্থক্যের কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, মার্জনার ভিত্তি হচ্ছে ইমান। ইমানদারদের এই ভিত্তি আগে থেকেই রয়েছে। তাই তাদের মার্জনার ভিত্তি হবে আনুগত্য ও পাপ থেকে বিরতি। অর্থাৎ আল্লাহ্র অনুগত হওয়া ও পাপ থেকে মুক্ত থাকাই তাদের ক্ষমার উপলক্ষ। মানুষের অধিকার খর্ব করার বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত। তাই মুমিনদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র অধিকার ও মানুষের অধিকার পরস্পরসম্পৃক্ত। কিন্তু নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের বিষয়টি এরকম নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দিবার জন্য' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যতদিন আয়ু নির্ধারণ করেছেন, ততদিন পর্যন্ত তোমরা পৃথিবীতে থাকতে পারবে। এর মধ্যে তোমরা ক্রমাগত সত্যপ্রত্যাখ্যান করে চললেও তোমাদেরকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন না। একথায় প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী জামানার অবাধ্য উম্মতকে ধ্বংস করা হয়েছিলো পরিবর্তনীয় অদৃষ্টলিপি অনুসারে। অর্থাৎ অদৃষ্টলিপিতে এরকম লেখা ছিলো যে, ইমান গ্রহণ করলে তারা বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত আয়ুষ্কাল অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবে। আর ইমান গ্রহণ না করলে সত্যপ্রত্যা-খ্যানপ্রবণতার চরম পর্যায়ে তাদের সকলকে একই সময়ে ধ্বংস করে দেয়া হবে। তাই হয়েছিলো। যথাসময়ে ইমান না আনার কারণে পূর্ববর্তী অবাধ্যদেরকে আল্লাহ্তায়ালা এক সঙ্গে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বলতো তোমরা তো আমাদেরই মতো মানুষ।' এ কথার অর্থ— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বলেছিলো, আমরা যেমন মানুষ তেমনি তোমরাও। মানুষ আবার কখনো মানুষের নবী হতে পারে না কি? তোমরা যদি অতিমানব হতে, অথবা হতে কোনো ফেরেশতা, তবে হয়তো আমরা তোমাদেরকে মান্য করতাম। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের এমতো মনোভাবের উল্লেখ করা হয়েছে অপর এক আয়াতে এভাবে— 'আল্লাহ্ যদি ইচ্ছে করতেন, তবে ফেরেশতাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করতেন।'

শেষে বলা হয়েছে— 'আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের উপাসনা করতো তোমরা তাদের উপাসনা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোনো অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করো।' একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আরো বলেছিলো, তোমাদের উদ্দেশ্য কি তা আমরা বুঝেছি। তোমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে

www.eelm.weebly.com

চাও। তারা যাদের উপাসনা করতো, তাদের উপাসনা থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিতে চাও। ঠিক আছে। আল্লাহ্‌র নবী যদি তোমরা হয়েই থাকো, তবে অলৌকিক কোনো কিছু করে দেখাও। অকাট্য প্রমাণ ছাড়া আমরা তোমাদেরকে বিশ্বাস করবো কেনো?

এর পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তাদের রসুলগণ তাদেরকে বলতো, সত্য বটে আমরা তোমাদেরই মতো মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন।' এ কথার অর্থ— তাদের রসুলগণ বলেছিলেন, এ কথা অবশ্যই সত্য যে, আমরাও তোমাদের মতো মানব সম্প্রদায়ভূত। কিন্তু আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুকম্পা করেন। নবুয়ত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুকম্পা। এই অনুকম্পা দান করে তিনি ধন্য করেন কোনো কোনো মানুষকে। এই নির্বাচন সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায় নির্ভর।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়। বিশ্বাসীগণের আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করা উচিত।' এ কথার অর্থ— অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের বিষয়টিও সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র অনুমোদন নির্ভর। অতএব শোনো হে অবিবেচক সম্প্রদায়! আমরা ইচ্ছে করলেই মোজেজা প্রদর্শন করতে পারি না। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসই আমাদের প্রধান অবলম্বন। আর আল্লাহ্‌র প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করাই বিশ্বাসীগণের মূল কর্তব্য। উল্লেখ্য যে, নবী-রসুলগণের একনিষ্ঠ অনুসারীদের এ কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন। অর্থাৎ কোনো ইমানদারই কখনো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রতি নির্ভরশীল হতে পারে না। এটাই ইমানের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। তাই ইমানদারেরা অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি সমর্পিত থাকে।

এর পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করবো না কেনো? তিনিই তো আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন।' এ কথার অর্থ— আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীল তো হবোই। তিনিই তো আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। দান করেছেন সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণের জ্ঞান।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা আমাদেরকে যে ক্লেশ দিচ্ছো আমরা অবশ্যই তা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করবো।' কথাটি একটি অনুক্ত শপথের প্রত্যুত্তর। নবীগণ প্রথমে আল্লাহ্ নির্ভরতার ঘোষণা দিয়েছেন। পরান্মুখ হয়েছেন সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের দিক থেকে। শেষে আলোচ্য বাক্য দ্বারা তাঁদের মনোভাবকে করেছেন অধিকতর সুদৃঢ়।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং যারা নির্ভর করতে চায় আল্লাহ্‌রই উপর তারা নির্ভর করুক।' এ কথার অর্থ— যারা আল্লাহ্ নির্ভরতার মতো সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে চায়, তারা যেনো নির্দ্বিধায় কেবল আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভরশীল হয়।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝

❒ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা উহাদিগের রসূলগণকে বলিয়াছিল, 'আমরা তোমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে অবশ্যই বহিষ্কৃত করিব, অথবা তোমাদিগকে আমাদিগের ধর্মাদর্শে ফিরিয়া আসিতেই হইবে।' অতঃপর রসূলগণকে তাহাদিগের প্রতিপালক প্রত্যাদেশ করিলেন, 'সীমালংঘনকারীদিগকে আমি অবশ্যই বিনাশ করিব।'

❒ উহাদিগের পরে আমি তোমাদিগকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করিবই; ইহা তাহাদিগের জন্য যাহারা ভয় রাখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির।'

❒ উহারা বিজয় কামনা করিল; প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হয়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের রসুলগণকে বলেছিলো, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে অবশ্যই বহিষ্কৃত করবো, অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতেই হবে।' এখানে 'আমাদের ধর্মে ফিরে আসতেই হবে' কথাটির অর্থ এরকম নয় যে, নবী-রসুলগণ পূর্বে কাফেরদের ধর্মাদর্শভূত ছিলেন। এরকম হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। নবুয়তপূর্ব জীবনেও কোনো নবী কাফের ছিলেন না। তাই এখানে ফিরে আসা অর্থ হবে ধর্মান্তরিত হওয়া। 'সত্য ধর্ম পরিত্যাগ করে অবিশ্বাসীদের ধর্মমতকে গ্রহণ করা' কথাটির ব্যাখ্যা এভাবে করা যায়— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা একথা বলেছিলো নবী ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করে। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে তাদের সম্বোধনটি প্রযোজ্য হবে নবীর সহচরবৃন্দের প্রতি। তাঁরা ইমান আনয়নের পূর্বে কাফেরদের ধর্মমতের অনুসারী ছিলেন। তাই 'তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতেই হবে' কথাটির অর্থ হবে— হে বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগকারীরা! তোমাদেরকে পূর্ব ধর্মে ফিরে আসতেই হবে। আবার এমনো হতে পারে যে— এখানে 'আও' (অথবা) শব্দটির অর্থ হবে 'ইল্লা' (ব্যতীত) কিংবা 'ইলাআন' (এমনকি) যদি তাই হয়, তবে তাদের হুমকিটি প্রযোজ্য হবে কেবল বহিষ্কারের ব্যাপারে এবং মর্মার্থ দাঁড়াবে— আমরা তোমাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দিবো, যদি না তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসো। অথবা মর্মার্থ হবে— এমনকি তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে, না হলে দেশ ছেড়ে চলে যাবে।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'অতঃপর রসুলগণকে তাদের প্রতিপালক প্রত্যাদেশ করলেন সীমালংঘনকারীদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করবো।'

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'তাদের পরে আমি তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করবোই' এ কথার অর্থ— আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে বিনাশ করার পর সেখানে বসবাস করতে দিবো নবীগণ ও তাঁদের অনুচরবর্গকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা তাদের জন্য যারা ভয় রাখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির।' এ কথার অর্থ— আমার এই অনুগ্রহসম্ভার কেবল তাদের ভাগ্যে জোটে, যারা বিশ্বাস রাখে পুনরুত্থান দিবসের প্রতি এবং আমার শাস্তির কথা স্মরণ করে যারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়। এখানে 'মাক্বামী' অর্থ পুনরুত্থান দিবসে বিচারের জন্য আল্লাহ্পাক সকাশে দণ্ডায়মান হওয়া। অপর এক আয়াতেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থে। যেমন— ওয়ালিমান খাফা মাক্বামা রব্বিহি জান্নাতান্ (আর তার প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়ে যে ভীত, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত)। অথবা 'মাক্বাম' অর্থ 'ক্বিয়াম'— কৃতকর্মের সংরক্ষণ। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— যারা কৃতকর্মের সংরক্ষণ করে। আর প্রতিটি কর্মের পর্যবেক্ষক আমিই। মুমিনেরা একথা বিশ্বাস করে বলেই আমার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, 'মাক্বাম' শব্দটি এখানে অতিরিক্ত হিসেবে প্রয়োগিত। এমতাবস্থায় অর্থ হবে—যে আমাকে ভয় করে।

এর পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে—'তারা বিজয় কামনা করলো' এ কথার অর্থ— নবীগণ তাঁদের শত্রুদের উপর বিজয়ের প্রার্থনা জানায়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে—'রব্বানাফ্তাহ্ বাইনানা ওয়া বাইনা ক্বওমিনা বিল হাক্ব (হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে আমাদের সম্প্রদায়ের উপরে বিজয়ী করে দাও)। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানকার 'ওয়াস্তাফ্তাহু' (বিজয় কামনা করলো) কথাটির সংযোগ রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত ১৩শ সংখ্যক আয়াতের 'আওহা' (প্রত্যাদেশ করলেন) কথাটির সঙ্গে। এভাবে 'ওয়াস্তাফ্তাহু' কথাটির 'হু' সর্বনামটি সম্পৃক্ত হয়েছে নবীগণের সঙ্গে। এ রকম তাফসীর করেছেন ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম। কাতাদা বলেছেন, নবীগণ যখন স্বসম্প্রদায়ের ইমান গ্রহণের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন, তখন তারা বিজয়প্রার্থী হয়েছিলেন এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। হজরত নুহ্ বলেছিলেন—'রব্বি লা তাজার্ আলাল্ আরদ্বি মিনাল কাফিরীনা দাইয়ারা'। হজরত মুসা দোয়া করেছিলেন—'রব্বানা লা আত্বমিস্

www.eelm.weebly.com

আ'লা আম্ওয়ালিহিম'। হজরত ইবনে আব্বাস ও মুকাতিল বলেছেন, 'ওয়াস্তাফ্তাহু' (তারা বিজয় কামনা করলো)। কথাটির 'হু' সর্বনামটি সংযুক্ত হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে। কারণ তারাও বিজয় কামনা করে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে—'আল্লহুম্মা ইন্‌কানা হাজা হুয়াল হাক্ক মিন্ ইন্দিকা ফাম্ত্বির আ'লাইনা হিজ্বারাতাম্ মিনাস্ সামায়ী (হে আল্লাহ্! এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে থাকে তবে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করো)। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'তারা' সর্বনামটি উভয় দিকের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ অনুসারী সহকারে নবী এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী উভয় দলই বিজয় কামনা করেছিলো। কারণ উভয় পক্ষই ছিলো পরস্পরের দৃষ্টিতে ধর্মদ্রোহী। তাই উভয় দলই চেয়েছিলো তাদের প্রতিপক্ষ যেনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কুল্লু হিজ্বিম বিমা লাদাইহিম ফারিহুন' (উভয় দলই আপনাপন মতবাদের প্রতি ছিলো প্রসন্ন)।

শেষে বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হয়।' এ কথার অর্থ— গর্বিত স্বৈরাচারীদের পরাজয় অবশম্ভাবী। আলোচ্য বাক্যটির সংযোগ রয়েছে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে। ওই উহ্য বাক্য সহকারে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— ধ্বংস হয়ে গেলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা, বিজয়ী হলো মুমিনগণ। তারা তখন বল্লো, দাম্ভিক ও স্বেচ্ছাচারীরা এভাবেই অসফল হয়। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'জাব্বার' অর্থ প্রতিপক্ষ এবং 'আ'নীদ্' অর্থ অহংকারী। 'তাজাব্বুর' অর্থ আত্মম্ভরিতা। আল্লাহ্পাক স্বয়ং 'জাব্বার'। কারণ তাঁর মধ্যে রয়েছে গর্ব করার যোগ্যতা। এ রকম যোগ্যতা কোনো সৃষ্টির নেই। অথবা 'জাব্বার' বলা যায় এমন লোককে, যার হৃদয়ে কোমলতার কণা মাত্র নেই। এ ধরনের লোকেরাই অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটায়। কিংবা 'জাব্বার' বলে ওই ব্যক্তিকে যে দম্ভবশতঃ অন্যের অধিকারগুলোকে নস্যাৎ করে দেয়। অপরের প্রতি মানুষের দায়-দায়িত্ব থাকে— একথা সে স্বীকারই করে না।

বাগবী লিখেছেন, ওই ব্যক্তি 'জাব্বার', যে নিজের চেয়ে অন্য কাউকে শ্রেষ্ঠ মনে করে না। শব্দটি এসেছে 'জাব্রিয়্যাতুন্' থেকে, যার অর্থ— সর্বোচ্চ সম্মান লাভের অভিলাষ। যেহেতু সর্বোচ্চ সম্মান লাভের যোগ্যতা মানুষের নেই, তাই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে এই বিশেষণটি মানায় না। তাই এই বিশেষণের দাবিদারেরা অভিসম্পাতগ্রস্ত ও বিনাশযোগ্য। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ওই মহান ব্যক্তিত্বের নাম জাব্বার, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁর নির্দেশ মতো চলতে বাধ্য করেন।

 www.eelm.weebly.com

'আ'নীদ্' অর্থ সত্যের বিরুদ্ধাচরণ, সত্যের অপলাপ। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, শব্দটির অর্থ সত্যের প্রতিপক্ষ হওয়া, প্রত্যক্ষভাবে সত্যের বিরোধিতা করা। হজরত ইবনে আব্বাস সত্যের বিরুদ্ধপক্ষকে আ'নীদ্ বলেছেন। মুকাতিল আ'নীদ্ বলেছেন, অহমিকামগ্নদেরকে। কাতাদা বলেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমার অস্বীকারকারীকে বলে আ'নীদ্।

সুরা ইব্‌রাহীম ঃ আয়াত ১৬, ১৭

مِنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ۙ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَ يَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۝

❒ উহাদিগের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রহিয়াছে এবং প্রত্যেককে পান করানো হইবে গলিত পুঁজ,

❒ যাহা সে অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করিবে এবং উহা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সর্বদিক হইতে তাহার নিকট আসিবে মৃত্যুযন্ত্রণা কিন্তু তাহার মৃত্যু ঘটিবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতেই থাকিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে—'তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে' মুকাতিল বলেছেন, এ কথার অর্থ— জাহান্নাম হবে তাদের মৃত্যুপরবর্তী ঠিকানা। এ রকমও বলা যেতে পারে যে— জাহান্নাম তাদের অতি সন্নিকটে। যেনো তারা পৃথিবীতে জাহান্নামের পাড়েই দণ্ডায়মান। মৃত্যুর পরেই তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে সেখানে। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, এখানে 'ওয়ারাআ' অর্থ আড়াল, অন্তরাল। শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক— সম্মুখে ও পশ্চাতে।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং প্রত্যেককে পান করানো হবে গলিত পুঁজ'। 'সদীদ্' অর্থ তরল বর্জ্য, যা নির্গত হবে নরকবাসীদের চামড়া ও পেট থেকে। ওই তরল পদার্থের মধ্যে মিশ্রিত থাকবে পুঁজ ও রক্ত। ওই পুঁজ ও রক্তকে এখানে বলা হয়েছে গলিত পুঁজ। মোহাম্মদ বিন কা'ব বলেছেন, ব্যভিচারীদের শরীর বিধৌত পানি জাহান্নামীদেরকে পান করানো হবে। বায়হাকী ও মুজাহিদ বলেছেন, রক্ত ও পুঁজ মিশ্রিত পানীয়ের নাম 'সদীদ্'। হজরত আবু উমামা থেকে স্বসূত্রে হাকেম, সিফাতুন্নার গ্রন্থে ইবনে আবিদ্‌দুন্‌ইয়া এবং বিশুদ্ধসূত্রে আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মুনজির, বায়হাকী ও বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, নরকবাসীদেরকে পান করতে দেয়া হবে 'সদীদ্'। তারা সেটার দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারবে না। তবু তাদেরকে সেটার নিকটবর্তী করা হবে। তারপর তাদেরকে যখন সদীদ্ পান করানো হবে তখন তাদের শরীর ফুলে উঠবে, মাথার চুল খসে পড়বে এবং নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে বেরিয়ে যাবে

www.eelm.weebly.com

পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন—'আর তারা পান করবে তপ্ত পানি, যা বিচ্ছিন্ন করে দিবে নাড়িভুঁড়ি। যদি তারা প্রার্থনা করে.........'।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে—'যা তারা অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করবে এবং তা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।' এ কথার অর্থ—চরম দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ওই গলিত পুঁজ পান করবে জাহান্নামবাসীরা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা তা পান করতে বাধ্য হবে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে পান করা হয়ে পড়বে প্রায় অসম্ভব। বার বার রুদ্ধ হয়ে যাবে কণ্ঠনালী। তাই তারা থেমে থেমে একটু একটু করে পান করতে থাকবে। তাদের ওই শাস্তি হবে অন্তহীন। কণ্ঠনালী দিয়ে সহজে পানীয় প্রবিষ্ট হওয়াকে বলে 'সাউগুন'। শব্দটি একটি মূল শব্দ। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'সাগাশ্ শারাবা সাওগান' (অতি সহজে পানীয় গলাধঃকরণ করেছে)। আলোচ্য বাক্যে শব্দটির পূর্বে বসানো হয়েছে 'লা ইয়াকাদু' (অতিকষ্টে)। অর্থাৎ জাহান্নামীরা 'সদীদ্' গিলবে অতিকষ্টে।

এরপর বলা হয়েছে—'সব দিক থেকে তার নিকট আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা' এ কথার অর্থ— শাস্তি এমন তীব্র আকার ধারণ করবে যে, মনে হবে যেনো সবদিক থেকে এগিয়ে আসছে বীভৎস মৃত্যু। 'কুল্লি মাকান' অর্থ দেহের সকল অংশ। অর্থাৎ দেহের প্রতিটি অংশে সে অনুভব করবে মৃত্যু যাতনা। ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, ইব্রাহিম তায়েমী বলেছেন, প্রতিটি লোমকূপে সে অনুভব করবে মৃত্যুর মর্মন্তুদ আঘাত।

এরপর বলা হয়েছে—'কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না' এ কথার অর্থ— মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে না। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, তার প্রশ্বাস আটকে থাকবে কণ্ঠনালীতে। নাক মুখ দিয়ে তা নির্গত হবে না। অথবা ভিতরেও প্রবেশ করবে না। ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, ফুজাইল ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে— কণ্ঠদেশে নিঃশ্বাস আবদ্ধ হয়ে থাকবে।

শেষে বলা হয়েছে—'এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে।' এ কথার অর্থ— বিরতিহীনভাবে শাস্তির পর শাস্তি আপতিত হবে তার উপর। পরবর্তী শাস্তি হবে পূর্ববর্তী শাস্তি অপেক্ষা অধিকতর বীভৎস। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে কঠোর শাস্তি অর্থ চিরস্থায়ী শাস্তি, যে শাস্তি থেকে কস্মিনকালেও তাদের নিষ্কৃতি নেই।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ১৫শ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত নবীগণের বিজয় কামনার সঙ্গে এই আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। এই আয়াতটি সম্পূর্ণ পৃথক একটি আয়াত। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে। তারা একবার রসুল স. এর অপপ্রার্থনার ফলে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত

www.eelm.weebly.com

হয়েছিলো। তারা বার বার আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষমুক্ত হতে পারছিলো না। ওই সময় আল্লাহ্ নরকবাসীদের গলিত পুঁজ গলাধঃকরণ সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ করেন (আয়াত ১৬, ১৭)।

সুরা ইব্‌রাহীম ঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ يَوْمٍ
عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَىْءٍ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ○
اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ
بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ (٢٠) وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ○

❒ যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদিগের কর্মের দৃষ্টান্ত ভস্ম, যাহা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়াইয়া লইয়া যায়। যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার কিছুই তাহারা তাহাদিগের কাজে লাগাইতে পারে না। ইহাই ঘোর বিভ্রান্তি।

❒ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনিতে পারেন,

❒ এবং ইহা আল্লাহ্‌র জন্য কঠিন নহে।

প্রথমে বলা হয়েছে—'যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের কর্মের দৃষ্টান্ত ভস্ম, যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়।' এখানে 'মাছাল' অর্থ বিরল উপমা, উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত।' আসুফ' অর্থ দুরন্ত বাতাস। দিবসের তীব্র গতিসম্পন্ন বাতাসকে এখানে বলা হয়েছে 'আসেফ'। ব্যবহার রীতিটি রূপক অর্থসম্পন্ন। যেমন বলা হয়—'নাহারুহু সয়িমুন্' (তার দিনটি রোজাদার), 'লাইলুহু নায়িমুন' (তার রাত্রিটি নিদ্রিত)। এ কথাগুলোর শাব্দিক অর্থ গ্রহণীয় নয়। কারণ দিন কখনো রোজাদার হয় না, আর রাত্রিও কখনো ঘুমায় না। কথা দু'টোর প্রকৃত অর্থ হবে যথাক্রমে— দিবসে সে রোজা রাখে, রাত্রিতে ঘুমায়। এরূপ শব্দ ব্যবহারের রীতিটি সর্বজনস্বীকৃত। এখানে 'আ'মাল' কথাটির অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পুণ্যকর্মসমূহ। কারণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও পৃথিবীতে দান খয়রাত, স্বজনদের উপকার, ক্রীতদাসমুক্তি

www.eelm.weebly.com

ইত্যাদি পুণ্য কর্মসমূহ করে। কিন্তু এ সকল পুণ্যকর্মের কোনো প্রতিদানই তারা পাবে না। কেননা এ সকল কর্ম তারা করে কেবল আত্মপ্রসাদ ও খ্যাতির জন্য। এগুলোর নেপথ্যে আল্লাহ্র বিধানের প্রতি সম্মান অথবা আল্লাহ্র পরিতোষ সাধনের উদ্দেশ্য তাদের থাকে না। বরং অংশীবাদীরা এ সকল পুণ্য করে তাদের দেব-দেবীদের পরিতোষ সাধনার্থে। তাদের ওই দেব-দেবীদের বিগ্রহগুলো জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছু তো নয়। ওগুলো আবার তাদের উপাসকদেরকে পুণ্যের প্রতিদান দিবে কীভাবে? তাই এখানে আল্লাহ্পাক তাদের পুণ্যকর্মগুলোকে তুলনা করেছেন ভস্মরাশির সঙ্গে, যা ঝড়ো বাতাসে প্রচণ্ড বেগে উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এরপর বলা হয়েছে—'যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না।' এ কথার অর্থ— তাদের পার্থিব অর্জন পরবর্তী পৃথিবীতে কোনো কাজেই আসবে না। সেখানে তারা না পাবে সওয়াব, না পাবে নিষ্কৃতি।

শেষে বলা হয়েছে—'এটাই ঘোর বিভ্রান্তি।' এ কথার অর্থ— তারা পুণ্যকর্ম ভেবে যে কাজগুলো করেছে, তার কোনো ভিত্তিই নেই। তাই তাদের সকল কিছু বরবাদ। তাদের পাপগুলো তো ভ্রান্তিই। কিন্তু পুণ্যকর্মগুলোও বিভ্রান্তি। সেদিকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে— এটাই ঘোর বিভ্রান্তি।

পরের আয়াতে (১৯) প্রথমে বলা হয়েছে—'তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন?' এখানে 'হাক্ব' অর্থ সত্য। আর মর্মার্থ হচ্ছে— নিপুণ কুশলতার সঙ্গে, যথাবিধি। এই বিশাল রহস্যময় গগন ও বৈচিত্রপূর্ণ ধরণী সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী। আর এ সকল কিছু মহা বিজ্ঞানময় স্রষ্টার একক অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এরপর বলা হয়েছে—'তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন।' এ কথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়! আল্লাহ্ এই মুহূর্তে তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নতুন কোনো সৃষ্টি, যারা হবে আল্লাহ্র একান্ত অনুগত।

পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে—'এবং এটা আল্লাহ্র জন্য কঠিন নয়।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক সর্বশক্তিধর। সুতরাং তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। এরূপ অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী যিনি, তিনিই তো একমাত্র উপাস্য হওয়ার যোগ্য। সুতরাং তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে। আশা করতে হবে তাঁর পুরস্কারের এবং ভয় করতে হবে তাঁর অসন্তোষের।

www.eelm.weebly.com

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۖ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ○

❒ সকলে আল্লাহের নিকট উপস্থিত হইবেই। তখন দুর্বলেরা যাহারা অহংকার করিত তাহাদিগকে বলিবে, 'আমরা তো তোমাদিগের অনুসারী ছিলাম; এখন তোমরা আল্লাহের শাস্তি হইতে আমাদিগকে কিছুমাত্র রক্ষা করিতে পারিবে?' উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্ আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিলে আমরাও তোমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিতাম। এখন আমাদিগের জন্য ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা। আমাদিগের কোন নিষ্কৃতি নাই।

প্রথমে বলা হয়েছে—'সকলে আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হবেই।' এ কথার অর্থ— মহাবিচারের দিন তারা সকলে আপনাপন সমাধি থেকে উত্থিত হয়ে বিচারানুষ্ঠানের জন্য আল্লাহ্তায়ালা সকাশে উপনীত হবেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তখন দুর্বলেরা যারা অহংকার করতো তাদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম; এখন তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি থেকে আমাদেরকে কি কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে? এ কথার অর্থ— তখন পৃথিবীতে যে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জ্ঞানে ও সম্পদে দুর্বল ছিলো তারা তাদের প্রতাপশালী ও অহংকারী নেতাদেরকে বলবে তোমরা তো তখন আমাদেরকে নবীগণের অনুসারী হতে নিষেধ করেছিলে। আমরা তখন তোমাদেরকে নেতা বলে মেনেছি। তোমাদের হুকুম মতোই জীবন যাপন করেছি। আর এই কঠিন শাস্তির সময়ে এখন আমাদের উপায় কী হবে? তোমরা কি আমাদের কোনো উপকার করতে পারবে? আল্লাহ্র শাস্তিকে কিঞ্চিত পরিমাণ লাঘব করবার সুযোগ কি তোমাদের আছে? নেই। এখানে 'মিন আ'জাবিল্লাহ্' (আল্লাহ্র শাস্তি থেকে) কথাটির 'মিন' অব্যয়টি বর্ণনামূলক। আর 'মিন শাইয়িন' (কিছু মাত্র) কথাটির 'মিন' অব্যয়টি আংশিক অর্থ প্রকাশক।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা বলবে আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম।' এ কথার অর্থ— নেতারা তখন বলবে আমরা নিজেরাই ছিলাম বিভ্রান্ত। তাই তোমাদেরকেও আমরা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছি। আমরা সৎপথের পথিক যদি হতাম, তবে

www.eelm.weebly.com

তোমাদেরকেও সৎপথেই পরিচালিত করতাম। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে এ রকম— আমরা তোমাদেরকে নিয়ে এসেছি নরকের উপকণ্ঠে। আমরা তো এখন নিরুপায়। শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় যদি আমাদের জানা থাকতো, তবে তোমাদেরকেও বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু সে সুযোগ আমাদের দেয়া হয়নি।

এরপর বলা হয়েছে— এখন আমাদের জন্য ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা। আমাদের কোনো নিষ্কৃতি নেই। এখানে 'মাহীস্' শব্দটি ক্রিয়ার আধার। এর শব্দমূল হচ্ছে 'হাইসুন্'। এর অর্থ পলায়নের উদ্দেশ্যে প্রস্থান। অথবা এর শব্দমূল হচ্ছে 'মাইস্'। যেমন শব্দমূল 'মাগিস'। আলোচ্য বাক্যটি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অহংকারী নেতৃবর্গের উক্তির অংশ। সম্মিলিতভাবে তাদের নেতা ও জনতার উক্তি। মুকাতিল বলেছেন, নরকবাসী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী পাঁচশত বৎসর ধরে পরিত্রাণের জন্য করুণ প্রার্থনা জানাতে থাকবে। কিন্তু তা ফলদায়ক হবে না। এর পরের পাঁচশত বৎসর ধরে অবলম্বন করবে ধৈর্য। কিন্তু তাতেও তাদের কোনো উপকার হবে না। তখনই তারা বলবে— ধৈর্যচ্যুতি ও ধৈর্যাবলম্বন দু'টোই আমাদের জন্য সমান। অনন্ত শাস্তি থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই।

হজরত কা'ব থেকে মারফু সূত্রে ইবনে আবী হাতেম, তিবরানী, এবং ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নরকবাসীরা একে অপরকে ডেকে বলবে, এসো আমরা ধৈর্য অবলম্বন করি। হয়তো আল্লাহ্ আমাদের উপর করুণাপরবশ হবেন। একথা বলে তারা পাঁচশত বছর ধরে ধৈর্যধারণ করে অবশেষে দেখবে সবই বৃথা। তখন তারা বলবে, আমাদের ধৈর্য ও ধৈর্যচ্যুতি সমার্থক।

মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী বলেছেন, আমার নিকটে এই মর্মে একটি হাদিস পৌঁছেছে যে, নরকবাসীরা নরকের প্রহরীকে বলবে, দয়া করে আপনার পালনকর্তাকে বলুন, তিনি যেনো অনুগ্রহ করে মাত্র একদিনের জন্য আমাদের নরক যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব করে দেন। প্রহরী বলবে, তোমাদের রসুলগণ কি তোমাদের নিকটে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ উপস্থিত হননি? নরকবাসীরা বলবে, হয়েছিলেন। প্রহরী বলবে, তাহলে তোমরা নিজেরাই দোয়া করো। কিন্তু অবিশ্বাসীদের দোয়া মূল্যহীন। একথা শুনে তারা নিরাশ হয়ে পড়বে। এরপর দোজখের অধিকর্তাকে বলবে, হে মালেক! আপনার পালনকর্তাকে বলুন, তিনি যেনো আমাদেরকে মৃত্যুদান করেন। কিন্তু দীর্ঘ আশি বছর যাবৎ দোজখের অধিকর্তা মালেক তাদের সঙ্গে কথাই বলবে না। সেখানকার বৎসর হবে তিনশত ষাট দিনেরই। তবে এক একটি দিন হবে হাজার বছরের সমান। এভাবে আশি বছর গত হওয়ার পর মালেক বলবে, তোমাদেরকে এখানেই থাকতে হবে। তখন তারা একেবারেই নিরাশ হয়ে যাবে। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে, শাস্তি যখন আমাদের লাঘব হবেই না, তখন আর কথা বলে কাজ কি। ধৈর্যাবলম্বনই উত্তম।

www.eelm.weebly.com

সম্ভবতঃ ধৈর্যের ফল কিছুটা শুভ হতেও পারে। আমরা পৃথিবীতে দেখেছিলাম, বিপদে একদল লোক ছিলো সহিষ্ণু। তারাই এখন সফলকাম। একথা বলে তারা একযোগে ধৈর্যধারণ করবে। শাস্তির মধ্যেও দীর্ঘকাল থাকবে অবিচল। কিন্তু কোনো লাভ হবে না। আবার তারা শুরু করবে কথোপকথন। এভাবে পালাক্রমে কখনো তারা হবে ধৈর্যবিচ্যুত। আবার কখনও হবে ধৈর্যধারী। শেষে চিৎকার করে বলবে, এখন আমাদের ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা। আমাদের কোনো নিষ্কৃতি নেই। এরপর ইবলিস দাঁড়িয়ে বলবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন। আর আমি যে প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম, বাস্তবে ঘটেছে তার বিপরীত। কিন্তু আমি তো তোমাদের উপরে কোনো বল প্রয়োগ করিনি। প্ররোচিত করেছিলাম মাত্র। আমার সে প্ররোচনাকেই সেদিন তোমরা মাথা পেতে নিয়েছিলে। অতএব আজ তোমরা আমাকে তিরস্কার কোরো না। তিরস্কার যদি করতেই হয়, তবে তিরস্কার করো নিজেদেরকে। ইবলিসের একথা শুনে লোকেরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধিক্কার দিতে থাকবে। তখন নেপথ্যে আওয়াজ উত্থিত হবে— আজ তোমরা যেরূপ আত্মগ্লানি অনুভব করছো, এর চেয়েও বেশী অপ্রিয়বোধ করেছি আমি তখন, যখন তোমাদেরকে ইমান আনতে বলা হয়েছিলো, অথচ তোমরা করেছিলে প্রত্যাখ্যান। এই আওয়াজ শুনে তারা চিৎকার করে বলবে, হে আল্লাহ্! নবীগণের আহ্বান ও তোমার অংগীকার যে সত্য, তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। রব্বানা আবসারনা ওয়া সামি'না ফারজি'না না'মাল্ সলিহান্ ইন্না মু'ক্বিনূন (এবার আমাদেরকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে দাও আমরা সেখানে কেবল পুণ্যকর্ম করবো, আমাদের এবার প্রকৃত প্রতীতি জন্মেছে)। আল্লাহ্পাক বলবেন— ওয়ালাও শি'না লাআতাইনা কুল্লা নাফ্সিন হুদাহা (যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে প্রত্যেককেই সুপথ প্রদর্শন করতাম)। তারা পুনরায় চিৎকার করে বলবে— 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা এবার তোমার আহ্বানে সাড়া দিবো, তোমার রসুলেরও অনুসরণ করবো। তুমি শুধু আমাদেরকে কিছুক্ষণের জন্য অবকাশ দাও।' আল্লাহ্ বলবেন— 'তোমরা কি শপথ করে এ রকম বলোনি যে আমাদের বিনাশ নেই?'তারা বলবে, হে আমাদের জীবনাধিপতি! তুমি আমাদেরকে এখান থেকে কিছুক্ষণের জন্য বের করে দাও। অতীতে আমরা পাপ করেছিলাম। এবার করবো পুণ্য। আল্লাহ্ বলবেন, 'পৃথিবীতে আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম দীর্ঘ জীবন। তখন কেউ কেউ উপদেশ গ্রহণ করেছিলে। তোমাদের নিকট কি ভীতি প্রদর্শনকারী প্রেরিত হয়নি?' এ কথার পর কিছু কালের জন্য কথোপকথন বন্ধ থাকবে। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, আমার বাণী কি তোমাদেরকে আবৃত্তি করে শোনানো হয়নি? তোমরা কি তা প্রত্যাখ্যান করোনি? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের প্রতি কি আর কখনো অনুকম্পাপরবশ হবে না? পুনরায় চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনাধিপতি! আমাদের উপর দুর্ভাগ্য প্রবল হয়েছিলো। তাই আমরা হয়েছিলাম বিভ্রান্ত। হে আমাদের পালয়িতা! আমাদেরকে

www.eelm.weebly.com

এখান থেকে বের করে দাও। পুনরায় আমরা যদি তোমার অবাধ্য হই, তবে অবশ্যই আমরা হবো আত্ম-অত্যাচারী। আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের জন্য এখানে নির্ধারণ করা হয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক বসবাস। সুতরাং তোমরা আর আমার সঙ্গে কথা বোলো না। এবার তারা হয়ে পড়বে পুরোপুরি নৈরাশ্যভারাক্রান্ত। এরপর থেকে তারা আর প্রার্থনাও জানাতে পারবে না। শুরু হবে তাদের অনন্ত রোদন। স্থায়ীভাবে রুদ্ধ করে দেয়া হবে দোজখের সকল দরজা।

সুরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ২২, ২৩

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ○

❐ যখন সব কিছুর মীমাংসা হইয়া যাইবে তখন শয়তান বলিবে, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি নাই। আমার তো তোমাদিগের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি কেবল তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করিও না, তোমরা নিজদিগেরই প্রতি দোষারোপ কর। আমি তোমাদিগের উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহি এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহ। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহের শরীক করিয়াছিলে তাহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। সীমালংঘনকারীদিগের জন্য তো মর্মন্তুদ শাস্তি আছেই।'

❐ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগকে দাখিল করা হইবে জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে তাহাদিগের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে; সেথায় তাহাদিগের অভিবাদন হইবে 'সালাম'।

বিচার কার্য সমাপনের পর বিশ্বাসীগণ চলে যাবে বেহেশতে। আর অবিশ্বাসীরা গমন করবে দোজখে। শয়তানকেও দোজখে প্রবেশ করানো হবে তখন। সে দোজখবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবে। সে কথাই আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে

www.eelm.weebly.com

এভাবে—'যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে.....।' মুকাতিল বলেছেন, শয়তানের জন্য দোজখে স্থাপন করা হবে একটি আগুনের মঞ্চ। দোজখবাসী জ্বিন ও মানুষ সেখানে সমবেত হবে। তখন শয়তান তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবে।

হজরত উকবা বিন আমের থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মারদুবিয়া, ইবনে আবী হাতেম, বাগবী, তিবরানী ও ইবনে মোবারক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, শেষ বিচারের দিন সকলের বিচার সমাপনের পর মুমিনগণ বলবে, আমাদের মহান বিচারক তো বিচার মীমাংসা করেই দিয়েছেন। এখন আমাদের প্রয়োজন একজন সুপারিশকারীর, যিনি আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন। কেউ কেউ বলবে, আমাদের সকলের পিতা আদমই সুপারিশ করতে পারেন। আল্লাহ্ তাঁকে তৈরী করেছেন স্বহস্তে। তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপও করেছেন। সকলে মিলে তখন উপস্থিত হবে আদমের নিকট। বলবে, আমাদের প্রভুপালনকর্তা আমাদের বিচার সমাপন করেছেন, এখন আপনি আমাদের জন্য তাঁর দরবারে সুপারিশ করুন। আদম বলবেন, তোমরা নুহের নিকটে যাও। সকলে তখন নুহ্ নবীর নিকটে যাবে। তিনি বলবেন, ইব্রাহিম এর কাছে যাও। লোকজন তাই করবে। তিনি সকলকে মুসার নিকটে যাওয়ার পরামর্শ দিবেন। সকলে তাঁর নিকটে গেলে তিনি তাদেরকে যেতে বলবেন ঈসার নিকটে। তখন সকলে সদলবলে উপস্থিত হবে ঈসার কাছে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদেরকে অক্ষরের অমুখাপেক্ষী (উম্মী) আরবী নবীর কাছে যেতে বলি। তিনি হচ্ছেন নবীকুলের গৌরব। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তিনিই তোমাদের আবেদন রক্ষা করতে পারবেন। এরপর সকলে উপস্থিত হবে আমার কাছে। আল্লাহ্ আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। তখন আমার সুপারিশ করার স্থানকে করা হবে সুরভিত, যে অতুলনীয় সুরভি ইতোপূর্বে কারো নাসিকারন্ধ্রে কোনো দিনও প্রবেশ করেনি। আমার আপাদমস্তক থেকে তখন উত্থিত হবে জ্যোতির জোয়ার। আমি আল্লাহ্ সকাশে শাফায়াত করবো। মহান করুণাময় আমার শাফায়াত গ্রহণ করবেন। ওই দৃশ্য দেখে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলাবলি করবে, বিশ্বাসীরা তো শাফায়াত পেয়ে গেলো, এখন আমাদের জন্য সুপারিশ করবে কে? আপন মনে তারা আরো বলবে আমাদের জন্য রয়েছে ইবলিস। সে-ই আমাদেরকে বিভ্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত করেছে। তারা সকলে তখন ইবলিসের কাছে গিয়ে বলবে, বিশ্বাসীরা তো সুপারিশকারী পেয়েছে, এবার তুমি গাত্রোত্থান করো। তুমিই আমাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিলে। এবার রক্ষা করো। ইবলিস উঠে দাঁড়াবে। তখন তার চতুর্দিকে এমনই দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে, যে দুর্গন্ধ এর আগে কেউ কোনো দিন পায়নি। ইবলিস সকলকে নিয়ে অগ্রসর হবে জাহান্নামের দিকে। সেখানে দোজখীদের উদ্দেশ্যে শুরু করবে বক্তৃতা।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সত্য প্রতিশ্রুতি। আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি।' একথার অর্থ— ইবলিস তার বক্তৃতায় বলবে, পুনরুত্থান ও প্রতিফল দিবসের যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ দিয়েছিলেন তা সত্য। আমি বলেছিলাম পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ এসব কিছুই নয়। তোমাদের দেব-দেবীরাই হবে তোমাদের সুপারিশকারী। আমার ওই প্রতিশ্রুতিটি ছিলো মিথ্যা। দেখতেই পাচ্ছো, আমি যা বলেছিলাম আজ তার বিপরীত ঘটনা ঘটে চলেছে।

এরপর বলা হয়েছে—'আমার তো তোমাদের উপর কোনো আধিপত্য ছিলো না'। একথার অর্থ— আমি তো তোমাদেরকে সত্যপ্রত্যাখ্যানের জন্য বল প্রয়োগ করিনি; পাপকর্ম করতে বাধ্য করিনি। অথবা এখানে 'সুলত্বান' কথাটির অর্থ হবে প্রমাণ। যদি তাই হয় তবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— আমি তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু সে আহ্বানের পক্ষে তো কোনো প্রমাণ পেশ করিনি। নবীগণের মতো স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করা ছিলো আমার সাধ্যের বাইরে।

এরপর বলা হয়েছে—'আমি কেবল তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ কোরো না, তোমাদের নিজেদেরই প্রতি দোষারোপ করো।' একথার অর্থ— আমি তো তোমাদেরকে অবাধ্যতার দিকে ডাক দিয়েছিলাম মাত্র। সেটা ছিলো আমার প্রতারণা। আর সে প্রতারণাও ছিলো দলিল-প্রমাণ বিবর্জিত। তবুও তো তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। প্রত্যাখ্যান করেছিলে নবী-রসুলগণের স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ সম্ভূত আহ্বান। সুতরাং এখন আমাকে আর দোষ দেয়া ঠিক হবে না। বরং এখন তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধিক্কার দিতে থাকো। মুতাজিলা সম্প্রদায় এই আয়াত থেকে প্রমাণ করে যে, বান্দারা নিজেরাই তাদের কর্মের স্রষ্টা। কিন্তু তাদের এই মতবাদটি ভ্রান্ত। প্রকৃত কথা হচ্ছে, অন্তরে অভিপ্রায় লালনের ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন। তার ওই অভিপ্রায় যখন আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের অনুমোদন লাভ করে, তখনই তার ভালো অথবা মন্দ অভিপ্রায়ের অনুকূল কর্ম আল্লাহ্ সৃষ্টি করে দেন। তাই সৃজন আল্লাহ্র এবং নির্মাণ মানুষের। অতএব মানুষ তার কর্মের নির্মাতা। আর তার কর্ম ও অন্য সকলের সকল প্রকার কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ্ স্বয়ং। আশায়েরা সম্প্রদায় তাই মানুষের অর্জনকে বলে 'কাস্ব'; অর্থাৎ সৃষ্টি আল্লাহ্র এবং অর্জন বান্দার।

এরপর বলা হয়েছে—'আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও।'

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে—'তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহ্‌র শরীক করেছিলে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' একথার অর্থ— তোমরা পৃথিবীতে আমাকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করেছিলে। আজ আমি তোমাদের সে ধারণাকে অস্বীকার করছি। এখানে 'বিমা' শব্দের 'মা' হচ্ছে ধাতুমূল। 'মিন্ ক্বলু' কথাটির 'মিন্' অব্যয়টি 'আশরক্‌তুমুনি (আমাকে শরীক করেছিলে) কথাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়াবে— পৃথিবীতে উপাসনায় ও আনুগত্যে তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করেছিলে। আজ তোমাদের ওই অপরাধপ্রবণতাকে আমি অস্বীকার করছি। তোমাদের সঙ্গে এখন আমার আর কোনো সংশ্রব নেই। অন্য এক আয়াতেও এ রকম কথা এসেছে। যেমন— আর বিচারের দিন সে তোমাদের অংশীবাদকে অস্বীকার করে বসবে। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে 'মা' (যা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'মান্' (যে) অর্থে। অন্যত্রও এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন—'ওয়া নাফ্‌সিঁও ওয়ামা সাওওয়াহা' এবং 'ওয়া সুবাহানা ইয়াস্‌খারাফুন্‌না'। এ দু'টো ক্ষেত্রেও 'মা' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে 'মান্' অর্থে। এমতাবস্থায় এখানকার 'মিন্' অব্যয়টি সম্পর্কযুক্ত হবে 'কাফার্‌তু' (আমি অস্বীকার করছি)— কথাটির সঙ্গে। এমতো বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— তোমরা যে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সঙ্গে আমার আনুগত্যের অংশীদারীত্ব নির্ণয় করেছো, আমার প্ররোচনানুসারে দেব-দেবীর পূজা করেছো, সেটাই তো ছিলো তোমাদের প্রারম্ভিক সত্যপ্রত্যাখ্যান। এভাবে শুরুতেই তোমরা হয়ে গিয়েছিলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আমাকেও দেয়া হয়েছিলো আদমকে সেজদা করার নির্দেশ। আমি তা মানিনি। তাই আমিও ছিলাম সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আমার সত্যপ্রত্যাখ্যানের প্রকৃতি তোমাদের মতো নয়। অতএব তোমাদের সঙ্গে আজ আর আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

শেষে বলা হয়েছে—'সীমালংঘনকারীদের জন্য তো মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।' এ উক্তিটি ইবলিসের, অথবা আল্লাহ্‌র। শ্রোতাদেরকে সচেতন করার মানসে এ ধরনের উক্তি ব্যবহৃত হয়। এরকম কথা শুনলে তারা আত্মবিশ্লেষণে লিপ্ত হয় এবং পরিণাম সম্পর্কে হয় সচেতন।

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে—'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে দাখিল করা হবে জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।' লক্ষণীয় যে, এখানে 'তাদেরকে দাখিল করা হবে জান্নাতে' বলা হয়েছে। এতে করে বোঝা যায় বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণগণ স্বেচ্ছায় জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। বরং তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে। তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য নিয়োজিত থাকবে একদল ফেরেশতা। তারাই সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বিশ্বাসীদেরকে প্রবেশ করাবে জান্নাতে।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম।' একথার অর্থ— জান্নাতবাসীরা একে অপরকে সালাম বিনিময় করবে। ফেরেশতারাও 'সালাম' বলে তাদেরকে অভিবাদন জানাবে। কেউ কেউ বলেছেন, ওই শুভ অভিবাদনের সূচনা হবে আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে।

সুরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ২৪, ২৫, ২৬

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝ تُؤْتِيٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝

❒ তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়া থাকেন? সৎবাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যাহার মূল সুদৃঢ় ও যাহার শাখা প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত,

❒ যে প্রত্যেক মৌসুমে তাহার ফলদান করে তাহার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন যাহাতে তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

❒ অসার বাক্যের তুলনা এক অসার বৃক্ষ যাহার মূল ভূপৃষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন, যাহার কোন স্থায়িত্ব নাই।

'দ্বরাবা মাছালান্' অর্থ দৃষ্টান্ত বা উপমা বর্ণনা করা। তুলনা করা। 'মাছাল' হচ্ছে ওই উক্তি, যা উপমা বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। 'কালিমাতান্ ত্বয়্যিবাতান্' অর্থ আল্লাহ্র এককত্ব প্রকাশক বাক্য, যা উচ্চারিত হয় বিশুদ্ধতার সঙ্গে। 'শাজ্বারাতিন্ ত্বয়্যিবাতিন' অর্থ শক্তিশালী, উন্নত, উৎকৃষ্ট ও ফলন্ত বৃক্ষ। এখানে আল্লাহ্র এককত্ব প্রকাশক বাক্য বা সৎবাক্যের তুলনা করা হয়েছে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সুউন্নত ও উৎকৃষ্ট ফলন্ত বৃক্ষের সঙ্গে। অথবা এখানকার 'আস্লুহা ছাবিতুন' (যার মূল সুদৃঢ়) বাক্যাংশটি 'মাছাল' (তুলনা) শব্দের বদল। অর্থাৎ ওই বৃক্ষের মূল মৃত্তিকাভ্যন্তরে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত। আর তার শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বদেশে সম্প্রসারিত ও বিস্তৃত। 'ফারউ'হা' অর্থ তার শাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত। শব্দটি এখানে নামপদ হিসেবে ব্যবহৃত। সম্বন্ধপদ হওয়ার জন্য এতে নিমজ্জনপ্রবণতা সুপ্রকট। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি কি দেখছেন না, আল্লাহ্ কতো সুচারুরূপে উপমা দিয়ে থাকেন? আল্লাহ্র

www.eelm.weebly.com

এককত্ব প্রকাশক পবিত্র বাক্যের তুলনা তিনি করেছেন সুউন্নত ও উৎকৃষ্টতম এক বৃক্ষের সঙ্গে, যা মাটির ভিতরে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং যার শাখা-প্রশাখাসমূহ অতি উন্নত ও সুবিস্তৃত।

পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'যে প্রত্যেক মৌসুমে তার ফল দান করে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।' এ কথার অর্থ— যে বৃক্ষ আল্লাহ্পাক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ফল প্রদান করে। কলেমায়ে ত্বইয়্যিবা বা পবিত্র বাক্যের অবস্থা এ রকমই। এই কলেমা ইমানদারের হৃদয়ে আমূল প্রোথিত থাকে। আর যখন তা মুখে উচ্চারিত হয়, তখন তা বিনা প্রতিবন্ধকতায় পৌঁছে যায় আল্লাহ্ সকাশে।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. বলেছেন, সুব্হানাল্লহ্ পাঠ করলে তা বিচারের দিনে ওজনের পাল্লার অর্ধাংশ পূরণ করবে। আলহামদু লিল্লাহ্ পাঠ করলে পাল্লা হবে পূর্ণ। আর লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ বিনা বাধায় পৌঁছে দিবে আল্লাহের দরবারে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বিশুদ্ধচিত্ততার সঙ্গে পঠিত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্‌র' জন্য আকাশ মার্গের সকল দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে ওই কলেমা পৌঁছে যায় আরশে। কবীরা গোনাহ্ থেকে যারা মুক্ত কেবল তাদের ক্ষেত্রে এরকম ঘটে। হজরত আনাস থেকে তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'উৎকৃষ্ট বৃক্ষ' বলে খর্জ্জুর বৃক্ষকে এবং 'অসার বৃক্ষ' (আয়াত ২৬) বলে বুঝানো হয়েছে মাকাল ফলের গাছকে

'হীন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ সময়। আর আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'হীন' শব্দটির অর্থ প্রত্যেক মৌসুমে বা সারা বছর। এ রকম বলেছেন মুজাহিদ ও ইকরামা। খেজুর গাছে সারা বছর ফল ধরে। তাই খেজুর গাছকে বলা হয়েছে উৎকৃষ্ট বৃক্ষ। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, কাতাদা এবং হাসান বসরী বলেছেন, 'হীন' অর্থ অর্ধ বৎসর। অর্থাৎ গুচ্ছ বের হওয়ার পর থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত সময়। হজরত ইবনে আব্বাসও এই অভিমতের প্রবক্তা। কারো কারো মতে এই সময়সীমা চার মাস— ফলবান হওয়ার পর থেকে পেকে ওঠার সময় পর্যন্ত। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, দুই মাস— খেজুর ভক্ষণের উপযোগী সময় থেকে সংগ্রহ করা সময় পর্যন্ত। রবী বিন আনাস বলেছেন, 'কুল্লাহীন' অর্থ প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা। কারণ খেজুর সর্বকালে, সকল ঋতুতে ও সকল সময়ে আহার করা যায়। সকাল-সন্ধ্যায়। সকল ঋতুতে। গুচ্ছ থেকে ছিঁড়ে, আহরিত অবস্থায়, অর্ধপক্ক অবস্থায় অর্থাৎ সকল অবস্থায় খেজুর ভক্ষণযোগ্য। বিশ্বাসবানগণের অবস্থাও এ রকম। তারা সকাল-সন্ধ্যায়, দিবা-

রাত্রির যে কোনো সময়ে— সকল অবস্থায় পুণ্যকর্মে ব্যাপৃত থাকে। তাদের ইমান ও পুণ্যকর্মের বরকত কখনো নিঃশেষ হয় না। সর্বক্ষণই তা উত্থানোন্মুখ।

হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, একবার রসুল স. তাঁর উপস্থিত সহচরবৃন্দকে বললেন, বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ চির হরিৎ। মুসলমানের মতো ওই বৃক্ষটির পাতা কখনো ঝরে পড়ে না। বলো দেখি সেটা কোন বৃক্ষ? আমার মনে হচ্ছিলো সবাই প্রান্তরস্থিত কোনো বৃক্ষের কথা ভাবছেন। আমার মনে হচ্ছিলো বৃক্ষটি খেজুর গাছই হবে। কিন্তু আমি বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলাম বলে সে কথা উচ্চারণ করলাম না। সকলে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনিই বলুন। তিনি স. বললেন, খর্জ্জুর বৃক্ষ। বাগবী লিখেছেন, একটি বৃক্ষ তার পূর্ণাবয়ব লাভ করে তিনটি বস্তুর সমন্বয়ে—মূল, কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা। তেমনি ইমানের পূর্ণরূপ প্রকাশ পায় তিনটি বিষয়ের সমাহারে—হৃদয়ের স্বীকৃতি, মুখের উচ্চারণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাস্তবায়ন।

আবু জুবিয়ানের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে জান্নাতের একটি বৃক্ষ। হজরত জাবের থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশুদ্ধচিত্ততার সঙ্গে 'সুব্‌হানাল্লহি ওয়া বিহামদিহি' বলে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।' শব্দার্থের চিত্র অংকনের নাম 'তাম্‌ছীল'। অননুভূত কোনো কিছুকে উদাহরণের মাধ্যমে বোধগম্য করাকেও বলে 'তাম্‌ছীল'। উপমা বা তুলনার মাধ্যমে কোনো কিছু হৃদয়ঙ্গম করা সহজতর হয়। ফলে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করা যায় অনায়াসে।

এর পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে—'অসার বাক্যের তুলনা এক অসার বৃক্ষ, যার মূল ভূপৃষ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন।' তওহীদ ও রেসালতের প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক বাক্যকে বলে অপবিত্র বা অসার বাক্য। কপটদের বাক্যও এ রকম। কারণ তারা মুখে ভালো কথা বললেও তাদের অন্তর থাকে আল্লাহ্‌পাকের সন্তোষ সাধনের উদ্দেশ্য থেকে শূন্য। আর অপবিত্র বা অসার বৃক্ষ বলে সেগুলোকে, যেগুলো নিষ্ফলা অথবা যেগুলোর ফল বিস্বাদযুক্ত, অকেজো। ওই অকেজো বৃক্ষগুলোর মূল মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত নয়। ওগুলোর শিকড় মাটির উপরেই ছড়ানো থাকে এবং সেগুলোকে অতি সহজে উৎপাটিত করা যায়। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটদের কথা ওই সকল আগাছার মতো।

শেষে বলা হয়েছে—'যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।' একথার অর্থ, ওই বৃক্ষগুলোর ভিত্তি দৃঢ় নয়। অনায়াসে সেগুলোকে উপড়ে ফেলা যায়। অসার বা অপবিত্র বাক্যও তেমনি উন্মূল, অনিকেত, অস্থায়ী। হাব্বান বিন শু'বার মাধ্যমে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আনাস ইবনে মালেক একবার

www.eelm.weebly.com

বললেন, অসার বৃক্ষ বলে শারবানাকে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, শারবানা কি? তিনি বললেন, মাকাল ফল। আমি বলি, উৎকৃষ্ট বৃক্ষের অন্তর্ভুক্ত যেমন খেজুর গাছ, তেমনি মাকাল ফলের গাছও অসার বৃক্ষের অর্ন্তভুক্ত। সুনির্দিষ্টরূপে খেজুর ও মাকাল গাছ যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও অসার গাছ নয়। হাদিস শরীফেও খেজুর ও মাকালের উল্লেখ এসেছে উপমা হিসেবে।

সুরা ইব্‌রাহীম ঃ আয়াত ২৭

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۚ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۟

❒ যাহারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাহাদিগকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবেন এবং যাহারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ্ উহাদিগকে বিভ্রান্তিতে রাখিবেন। আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

'ক্বওলিছ্ ছাবিত্' (শাশ্বত বাণী) কথাটির অর্থ, তওহীদের বাণী। অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্'। যারা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী তাদের হৃদয়ে এই বাণী চিরস্থায়ী হয়। আর আল্লাহ্‌পাকের নিকটে এর প্রতিদানও নির্ধারিত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ্‌তায়ালাই তাদেরকে ইহকাল ও পরকালের বিশ্বাসের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। তাই দেখা যায় প্রকৃত ইমানদারেরা পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হলেও ইমান থেকে এক চুলও এদিক ওদিক সরেন না। এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে নবী জাকারিয়া, ইহাহ্ইয়া ও জারজিসের জীবনে। হজরত শামউন ও আসহাবে উখদুদের ঘটনায়। আসহাবে উখদুদকে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো অগ্নি গহ্বরে। ওই মর্মান্তিক নির্দেশটি দিয়েছিলো ইয়েমেনের রাজা জুনাওয়াস্। রসুল স. এর প্রিয় সহচর হজরত খুবায়েব ও তাঁর সঙ্গীসাথীগণকে বীরে মাওনার অধিবাসীরা চক্রান্ত করে ডেকে নিয়ে গিয়ে শহীদ করে ফেলেছিলো। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তাঁরা বিশ্বাসচ্যুত হননি। পরকালের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ— এ বিশ্বাস ছিলো তাঁদের সত্তাসন্নিহিত। আল্লাহ্‌তায়ালা প্রকৃত ইমানদারকে কবরের সওয়াল জবাবের সময়ও ইমানের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। পক্ষান্তরে যারা সীমালংঘনকারী (কাফের ও মুনাফিক) তারা কখনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুস্থির থাকতে পারে না। তাদের বিভ্রান্তি অনিবার্য। এ কথাগুলোই আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশে বিবৃত হয়েছে এভাবে—'যারা শাশ্বতবাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ্ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন।'

www.eelm.weebly.com

হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে হাদিস শাস্ত্রের ইমাম ষষ্ঠক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কবরে প্রশ্ন করা হলে ইমানদারেরা সাক্ষ্য দেয়— আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর রসুল। ওই সময়েই বাস্তবায়িত হয় এই আয়াত 'যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।' অপর এক বর্ণনায় এসেছে, কবর জীবনের প্রশ্নোত্তর ও শাস্তির দিকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। কবরবাসীকে তখন জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার প্রভুপালক কে? বিশ্বাসীরা জবাব দিবে, আল্লাহ্ আমার প্রভুপালক এবং মোহাম্মদ আমার নবী। বোখারী, মুসলিম।

বর্ণিত হাদিসটি আবু দাউদ ও আহমদের বর্ণনায় এসেছে এভাবে— কবরবাসীর নিকট উপস্থিত হবে দু'জন ফেরেশতা। তারা তাকে উপবেশন করিয়ে বলবে, তোমার প্রভুপালয়িতা কে? সে বলবে, আল্লাহ্। ফেরেশতাদ্বয় বলবে, তোমার ধর্ম কি? সে বলবে, ইসলাম। ফেরেশতাদ্বয় পুনরায় জিজ্ঞেস করবে, যাকে তোমাদের নিকট রসুল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিলো তিনি কেমন ছিলেন? সে বলবে, তিনি তো ছিলেন আল্লাহ্র সত্য রসুল। তোমরা কি তা জানো না? আমি আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করেছি এবং তা মান্য করে চলেছি। আলোচ্য আয়াতে এভাবে বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার কথাই বলা হয়েছে। রসুল স. বলেছেন, এরপর আকাশ থেকে আওয়াজ আসবে— আমার বান্দা ঠিক কথা বলেছে। তার জন্য জান্নাতের শয্যা রচনা করো। পরিধান করাও জান্নাতের পরিচ্ছদ। তার দিকে উন্মুক্ত করে দাও জান্নাতের একটি বাতায়ন। রসুল স. আরো বলেছেন, ওই বাতায়ন বেয়ে বেহেশত থেকে আসতে থাকবে সুবাসিত বাতাস। তার দৃষ্টিসীমা জুড়ে পরিদৃশ্যমান হবে বেহেশত। এরপর রসুল স. বললেন, অবিশ্বাসীদের দুরবস্থার কথা। বললেন, ফেরেশতাদ্বয় এসে উঠিয়ে বসাবে অবিশ্বাসী কবরবাসীকে। জিজ্ঞেস করবে, তোমার প্রভুপ্রতিপালক কে? সে বলবে, হায় হায়! আমি তো জানি না। তারা বলবে, তোমার ধর্ম কি? সে বলবে, হায় হায়! তাও তো জানি না। তারা বলবে, তোমাদের নিকট একজন রসুল প্রেরণ করা হয়েছিলো তুমি কি তা জানো? সে বলবে, হায় হায়! জানি না জানি না। তখন আকাশ থেকে আওয়াজ উত্থিত হবে— তার কথা অসত্য। তার জন্য বিছিয়ে দাও আগুনের বিছানা। পরিয়ে দাও অনলের বসন। আর খুলে দাও নরকের দুয়ার। এরপর তার কবরে আসতে শুরু করবে দোজখের বহ্নি-বাতাস। আর তার কবর এমনভাবে সংকুচিত হবে যে, শরীরের এক পাশ মিশে যাবে অপর পাশের সঙ্গে। অন্ধ ও বধির এক ফেরেশতা এসে তখন তাকে শাস্তি দিতে শুরু করবে। তার হাতে

www.eelm.weebly.com

থাকবে লৌহদণ্ড, যার একটি আঘাতে পাহাড় হয়ে যাবে মাটি। ওই লৌহদণ্ড দিয়ে সে আঘাত করতে থাকবে কবরবাসীকে। তার মুহুর্মুহুঃ আর্তনাদ জ্বিন ও মানুষ ছাড়া প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকলেই শুনতে পাবে। লৌহদণ্ডের আঘাতে ওই কবরবাসী পরিণত হবে ধূলিকণায়। পুনরায় তাকে দেয়া হবে পূর্বের আকার। এভাবে পালাক্রমে চলতে থাকবে তার শাস্তি।

হজরত ওসমান জুন্নুরাইন একবার একজনকে সমাধিস্থ করার পর রসুল স. এর দরবারে এসে চুপচাপ বসে পড়লেন। রসুল স. বললেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য দোয়া করো। তাকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আবু দাউদ। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার পর তার গৃহগামী সঙ্গী-সাথীদের পায়ের আওয়াজ বিলীন হওয়ার আগেই দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসায়। জিজ্ঞেস করে, ওই ব্যক্তি (মোহাম্মদ) সম্পর্কে তুমি কিরূপ ধারণা রাখো? সে জবাব দেয়, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও রসুল। এরপর তাকে জান্নাত ও জাহান্নাম দু'টোই দেখানো হবে এবং তার জন্য নির্ধারণ করা হবে জান্নাত। মুনাফিক ও কাফেরকে এরকম জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, আমি তো কিছুই জানি না। তবে লোকে যা বলাবলি করতো, আমিও তাই বলতাম। ফেরেশতা বলে, না তুমি জানতে। তবু তুমি কোরআন পাঠ করোনি। একথা বলেই ফেরেশতা তাকে লোহার লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করবে। সে চিৎকার করতে থাকবে। মানুষ ও জ্বিন ছাড়া সকলেই শুনতে পায় সেই চিৎকার। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কবরস্থ ব্যক্তির নিকটে আসে কৃষ্ণবর্ণ ও নীল চক্ষুবিশিষ্ট দু'জন ফেরেশতা। তাদের নাম মুনকির ও নকির। তারা বলবে, তুমি ওই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে? সে বলবে তিনি ছিলেন আল্লাহ্র বান্দা ও রসুল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর রসুল। ফেরেশতাদ্বয় বলবে, আমি জানি তুমি এরূপ বলবে। এরপর তার কবরকে প্রশস্ত করা হবে সত্তর বর্গহাত। পুরো কবরকে করা হবে আলোকোদ্ভাসিত। তারপর বলা হবে, এবার নিদ্রাভিভূত হও। সে বলবে, আমি আমার পৃথিবীবাসী স্বজনদেরকে এ সংবাদটা দিয়ে আসি। তারা বলবে, নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও নতুন পরিণয়াবদ্ধ বরের মতো, যাকে তার জীবনসঙ্গিনী ছাড়া অন্য কেউ জাগাতে আসে না। সে ঘুমিয়ে পড়বে। অবশেষে এক সময়

www.eelm.weebly.com

তাকে জাগাবে তার পালনকর্তা আল্লাহ্। আর সে যদি কপটচারী হয়, তবে ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের জবাবে বলবে, জনগণ যা বলতো, আমিও তাই বলতাম। কিন্তু আসলে আমি তার সম্পর্কে কিছু জানি না। তারা বলবে, আমরা জানি, তুমি এরকমই বলবে। এরপর মাটিকে নির্দেশ দেয়া হবে, একত্র হও। সঙ্গে সঙ্গে মাটি তাকে এমন চাপ দিবে যে, তার পাঁজরের অস্থিগুলো ঢুকে পড়বে একে অপরের মধ্যে। এরকম শাস্তি চলতে থাকবে বিরতিহীনভাবে। শেষে পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্পাক তাকে শাস্তিরত অবস্থায় ওঠাবেন।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন।' একথার অর্থ, আল্লাহ্পাক কাউকে ইমান গ্রহণের সুযোগ দান করেন, কাউকে দান করেন না। কাউকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন বিশ্বাসে, কাউকে রাখেন না। তাঁর এই চিরস্বাধীন অভিপ্রায়কে প্রশ্নবিদ্ধ করার অধিকার কারো নেই।

হজরত আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, আল্লাহ্ প্রথম মানুষ আদমকে সৃষ্টি করার পর তাঁর দক্ষিণ স্কন্ধে হস্ত স্পর্শ করলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকার আকারে পরিদৃশ্যমান হলো তাঁর পরবর্তী শুভ্রবর্ণ বংশধরগণ। এরপর আল্লাহ্ তাঁর হাত রাখলেন আদমের বাম কাঁধে। বেরিয়ে এলো তাঁর কৃষ্ণবর্ণ বংশধরেরা। তারা অবস্থান গ্রহণ করলো বাম পাশে। ডান পাশের দলকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বললেন, এরা জান্নাতি। আর বাম পাশের দলকে লক্ষ্য করে বললেন, এরা জাহান্নামী। আর এদের সম্পর্কে আমি উদ্বিগ্ন নই।

হজরত উবাই বিন কা'ব থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে পৃথিবীবাসী ও আকাশবাসী সকলকেই শাস্তি দিতে পারেন। এরকম করলে তাঁকে অত্যাচারী বলা যাবে না। আবার ইচ্ছে করলে সকলকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। আর এমতাবস্থায় তাদের কৃতকর্মাপেক্ষা তাঁর অনুকম্পাই হবে প্রধান। মনে রেখো তকদীরে যার বিশ্বাস নেই, তার উহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণরৌপ্য দানও আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না। আরো মনে রেখো, তাঁর নিকট থেকে তোমাদের উপরে যা আপতিত হয়, তা প্রতিহত করার সাধ্য কারো নেই। আর যা তিনি প্রেরণ করবেন না, তা আনয়নের সামর্থ্যও কারো নেই। এই বিধানের বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে, তবে সে অবশ্যই হবে জাহান্নামী। আহমদ, ইবনে মাজা। হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত হুযায়ফা ও হজরত জায়েদ বিন সাবেত থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۝

❒ তুমি কি উহাদিগকে লক্ষ্য কর না যাহারা আল্লাহের অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বদলে উহা অস্বীকার করে এবং উহারা উহাদিগের সম্প্রদায়কে নামাইয়া আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে

❒ জাহান্নামে, যাহার মধ্যে উহারা প্রবেশ করিবে, কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল।

❒ এবং উহারা আল্লাহের সমকক্ষ উদ্ভাবন করে মানুষকে তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার জন্য। বল 'ভোগ করিয়া লও, পরিণামে অগ্নিই তোমাদিগের প্রত্যাবর্তনস্থল।'

প্রথমে বলা হয়েছে—'তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করো না, যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বদলে তা অস্বীকার করে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! অকৃতজ্ঞদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য কেমন, সেদিকে দৃষ্টিপাত করুন। আল্লাহ্পাকের দানের প্রতি তারা কৃতজ্ঞ নয়। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামত ছিনিয়ে নেন। তবু তারা নির্বিকার। তাদেরকে দেখে মনে হয় কৃতজ্ঞতার বদলে অকৃতজ্ঞতাই তাদের মনোপূত।

বোখারী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্র শপথ উল্লেখিত অকৃতজ্ঞরা ছিলো কুরায়েশ সম্প্রদায়ের। হজরত ওমর বলেছেন, তারা ছিলো কুরায়েশী। রসুল স. এর পবিত্র ব্যক্তিত্বই ছিলো তাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, আতা বিন ইয়াসার বলেছেন, বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকেরা এই আয়াতের লক্ষ্য। আল্লাহ্পাক তাদেরকে পবিত্র হেরেমের অধিবাসী করেছিলেন। দিয়েছিলেন নির্বিঘ্ন জীবন-যাপনের অবকাশ। সেখানে তাদের পানাহারের ব্যবস্থা ছিলো পর্যাপ্ত। হস্তিবাহিনীর আক্রমণ থেকে আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন। উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন জীবনোপকরণের বহুমুখী উপায়। বাণিজ্য ব্যাপদেশে তারা সহজে গমনাগমন করতে পারতো দূরদূরান্তের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে। এরপর পরম কৃপাপরবশ আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রেরণ করলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রসুলকে। তিনি তাদেরকে কোরআন আবৃত্তি করে শোনান। পবিত্র করেন তাদের ভিতর-বাহির। কোরআন ও

www.eelm.weebly.com

কোরআনানুগ প্রজ্ঞার আলোকে তাদেরকে আলোকিত করেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, হে মক্কাবাসী! ইসলাম গ্রহণ করো। তাহলে তোমরা হবে সকল মানুষের অনুসরণীয়। কিন্তু তারা রসুলের এই উদাত্ত আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলো। বিরুদ্ধে দাঁড়ালো সত্য রসুলের। এভাবে তারা কৃতজ্ঞতার বদলে হলো অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন। আল্লাহ্পাক তাই তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অপসারিত করলেন। শুরু হলো অকৃতজ্ঞতার শাস্তি। এলো দুর্ভিক্ষ। যুদ্ধ। বদর প্রান্তরে নিহত হলো অনেকে। কেউ কেউ হলো বন্দী। পলাতকদের জন্য নির্ধারিত হলো লাঞ্ছনাদায়ক জীবন। কুরায়েশ নেতৃবর্গ এভাবেই তাদের অনুসারীদেরকে নামিয়ে আনলো ধ্বংসের পটভূমিতে। তাই শেষে বলা হয়েছে—'এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে।'

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে—'জাহান্নামে, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট ওই আবাসস্থল।' একথার অর্থ— অবিশ্বাসী কুরায়েশ নেতা ও জনতা যে লাঞ্ছনাকর জীবন বেছে নিলো, তার পরিণামে তারা প্রবেশ করবে জাহান্নামে। আর জাহান্নাম কতোইনা নিকৃষ্ট আবাস। অবিশ্বাসী নেতা ও জনতা সকলেই হবে ওই জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী। এখানে 'জাহান্নাম' শব্দটি বর্ণনামূলক সংযোজন অথবা কর্মপদ হিসেবে ব্যবহৃত।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত ইবনে আব্বাস খলিফা হজরত ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! যারা অবিশ্বাস-বশতঃ আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজিকে পরিবর্তন করে ফেলেছে, তারা কে? তিনি বললেন, কুরায়েশ সম্প্রদায়ভূত দু'টি উন্নাসিক গোত্র—বনী মুগীরা ও বনী উমাইয়া। বদর যুদ্ধে আল্লাহ্ তাদের শক্তি খর্ব করে তোমাদেরকে নিরাপদ করেছেন। তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগের অবকাশ দেয়া হয়েছিলো। বাগবীও হজরত ওমরের এরকম উক্তি উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন সূত্রে। হজরত আলীরও অনুরূপ উক্তি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, তিবরানী, হাকেম ও ইবনে মারদুবিয়া।

আমি বলি, বনী উমাইয়াকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগের অবকাশ দেয়া হয়েছিলো। এমন কি হজরত আবু সুফিয়ান, হজরত মুয়াবিয়া, হজরত আমর বিন আস প্রমুখকে দেয়া হয়েছিলো রসুল স. এর বিশিষ্ট সহচর হবার মর্যাদা। কিন্তু পরবর্তী সময় এজিদ ও তার সঙ্গী-সাথীরা আল্লাহ্র এই অপার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলো। তারা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো রসুল পরিবারের শত্রু। এ কারণেই ইমাম হোসাইনকে শাহাদত বরণ করতে হয়েছিলো। মহাপাতক এজিদ ক্ষুণ্ন করেছিলো মক্কা-মদীনার সম্মান। রসুল স. এর

www.eelm.weebly.com

প্রিয় দৌহিত্র হজরত ইমাম হোসাইনের শাহাদত লাভের পর সে গর্বভরে পাঠ করেছিলো একটি কবিতা, যার অর্থ—তুমি যদি হতে আমার পূর্বসুরী, তবে দেখতে পেতে কীভাবে আমি বদর প্রান্তরে আমার পূর্বপুরুষদের নিহত হওয়ার প্রতিশোধ গ্রহণ করি। মোহাম্মদ ও বনী হাশেমের উপর সেই প্রতিশোধ যদি আমি গ্রহণ করতে না-ই পারি, তবে আমি আর জুন্দুব বংশদ্ভূত হয়েছি কেনো? সে শরাবকে হালাল করে দিয়েছিলো। শরাবের প্রশংসায় সে কবিতা পাঠ করতো এভাবে— মোহাম্মদের ধর্মে যদি মদ্য অবৈধ হয়, তবে আমি ঈসার ধর্মমতকে বৈধ বলে ভাববো। উল্লেখ্য যে, ইমাম হোসাইন শহীদ হওয়ার পর এজিদ ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা আনন্দ উল্লাসে অতিবাহিত করেছিলো দীর্ঘ একটি মাস। এভাবে তার আত্মপ্রসাদের এক হাজার মাস অতিবাহিত হতে পেরেছিলো। তারপর?

এর পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে—'এবং তারা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ উদ্ভাবন করে মানুষকে তার পথ থেকে বিভ্রান্ত করবার জন্য।' এখানে 'তারা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ উদ্ভাবন করে' কথাটির অর্থ মুশরিক নেতারা অসমকক্ষ আল্লাহ্‌র ইবাদতের সঙ্গে তাদের কল্পিত দেব-দেবীদের ইবাদতকে যুক্ত করে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই তারা এ রকম করে। লক্ষণীয় যে, এখানকার 'লিইয়ুদ্বিল্লু' (বিভ্রান্ত করবার জন্য) কথাটির 'লাম' অব্যয়টি হেতুবাচক নয়। কারণ নিজে বিভ্রান্ত হওয়া অথবা অপরকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে তারা শিরিক করতো না। কিন্তু উদ্দেশ্য যাই হোক, তাদের কার্যকলাপ অংশীবাদিতা বা শিরিক ছাড়া অন্য কিছুই ছিলো না। তাই এখানকার 'লাম' হবে পরিণতি প্রকাশক। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— মূর্তিপূজার পরিণতিতে তাদের নেতা ও জনতা হয়ে গিয়েছিলো পথভ্রষ্ট।

শেষে বলা হয়েছে—'বলো, ভোগ করে নাও, পরিণামে অগ্নিই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, মৃত্যু পর্যন্ত তোমাদেরকে যে অবকাশ দেয়া হয়েছে, সেই অবকাশের মধ্যে তোমরা পৃথিবীর সুখ-সম্ভোগ করে যেতে পারো। কিন্তু মনে রেখো তোমাদের অংশীবাদিতাকন্টকিত জীবনের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। জাহান্নামের আগুনই তোমাদের অবশেষ গন্তব্য। জুন্নুন মিসরী বলেছেন, 'তামাত্তাউ' অর্থ যতখানি সম্ভব প্রবৃত্তির আকাংখা পূরণে বিভোর থাকো। কথাটি অনুজ্ঞাসূচক হলেও আল্লাহ্ পাকের আদেশ নয়। বরং এর মধ্যে রয়েছে তিরস্কার ও শাস্তির সংকেত। সে শাস্তির কথা পরক্ষণেই উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— পরিণামে অগ্নিই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

www.eelm.weebly.com

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ۞ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۞ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۞

❒ আমার দাসদিগের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী তাহাদিগকে বল 'সালাত কায়েম করিতে এবং আমি তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করিতে— সেই দিনের পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকিবে না।

❒ তিনিই আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্বারা তোমাদিগের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি জল-যানকে তোমাদিগের অধীন করিয়াছেন যাহাতে উহা সমুদ্রে বিচরণ করে তাঁহার বিধানে এবং যিনি তোমাদিগের অধীন করিয়াছেন নদীসমূহকে।

❒ তিনি তোমাদিগের অধীন করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যাহারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদিগের অধীন করিয়াছেন রাত্রি ও দিবসকে।

প্রথমে বলা হয়েছে—'আমার দাসদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে বলো সালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে'। এখানে বিশ্বাসীগণকে বিশেষভাবে নামাজ পাঠ ও আল্লাহ্‌র পথে দান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর বিশেষভাবে 'ইবাদী' (আমার দাস) সম্বোধন করে তাদেরকে করা হয়েছে সম্মানিত। এভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বাসীরাই আল্লাহ্‌র প্রকৃত দাস বা আবদ্। আল্লাহ্‌র উপাস্য হওয়ার অধিকারকে তারাই সমুন্নত রাখে, পালন করে তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ।

আলোচ্য আয়াতে 'ক্বুল' (বলো) ক্রিয়াটির কর্ম কিন্তু 'সালাত কায়েম করো' নয়। বরং এই ক্রিয়াটির কর্মপদ এখানে উহ্য। তাই প্রকৃত অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে আমার রসুল! আপনি বিশ্বাসীদেরকে এই মর্মে আদেশ দিন যেনো তারা নামাজ পাঠ করে এবং দান করে। উল্লেখ্য যে, একটি অনুক্ত শর্তের প্রতিফলন ঘটেছে এখানকার 'ইয়ুক্বিমু' (কায়েম করতে) এবং 'ইয়ুন্‌ফিকু' (ব্যয়

www.eelm.weebly.com

করতে) কথা দু'টোর মধ্যে অর্থাৎ হে রসুল! আপনি যদি তাদেরকে আদেশ করেন, তবে তারা তা পালন করবে। এভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইমানদারগণ রসুল স. এর আদেশ পালনে বাধ্য। যারা প্রকৃত বিশ্বাসী বা মুমিন তারা কখনোই তাঁর আদেশের অন্যথা করবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'সেই দিনের পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না।' এ কথার অর্থ— নামাজ, দান-খয়রাত করতে হবে এই পৃথিবীতে। পৃথিবী পরিত্যাগের পর এ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। তখন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব কোনো কিছুর দ্বারা চিরকালীন সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে আর পরিবর্তন করা যাবে না।

একটি সংশয়ঃ একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, একজন বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী (মুত্তাকী) সুপারিশ করতে পারবেন। তাই পুনরুত্থান দিবসে কোনো কোনো বিশ্বাসী হবে অপর বিশ্বাসীদের সুপারিশকারী। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'বন্ধুরা আজ পরস্পর পরস্পরের শত্রু, তবে সাবধানীরা (মুত্তাকীরা) এর ব্যতিক্রম।' অর্থাৎ মুত্তাকীগণ একে অপরের শত্রু হবেন না। যদি তাই হয়, তবে এখানে একথা বলা হলো কেনো যে— যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না? বিষয়টির সমাধান কী?

সংশয়ের অপনোদনঃ তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যেই নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত প্রদানের আদেশ দেয়া হয়। বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য সম্বলিত নামাজ ও জাকাতের মাধ্যমে লাভ হয় তাকওয়া বা আল্লাহ্র ভয়জনিত সাবধানতা। যেখানে তাকওয়া নেই সেই বন্ধুত্বেরও কোনো মূল্য নেই। তাই যার নামাজ ও জাকাত নেই তার তাকওয়াও নেই। ফলে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বও নেই। আর যেখানে বন্ধুত্ব নেই সেখানে সুপারিশেরও কোনো অবকাশ নেই।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'তিনিই আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি জলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন যাতে তা সমুদ্রে বিচরণ করে তাঁর বিধানে এবং যিনি তোমাদের অধীন করেছেন নদীসমূহকে।' এখানে 'রিজিক' (জীবিকা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সাধারণ অর্থে। অর্থাৎ পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য ব্যবহারোপযোগী সামগ্রী— সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

এর পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদের অধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী'। একথার অর্থ— তিনিই মানুষের কল্যাণের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে নির্ধারিত কক্ষপথে পরিক্রমণ করান।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমাদের অধীন করেছেন রাত্রি ও দিবসকে।' কামুস অভিধানে রয়েছে, 'দাআবুন্' অর্থ চেষ্টা ও শ্রম। ধাতুগত অর্থ দ্রুত পরিচালনা করা। এখানে 'দাইবাইনি' অর্থ দিবা-রাত্রি। অর্থাৎ দিবস ও রজনী দ্রুত আবর্তিত হয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ সূর্য-চন্দ্র, দিবস ও রজনীকে তাঁর নির্ধারিত নিয়মের অনুবর্তী করে রেখেছেন। দিবস ও রজনীকে করেছেন মানুষের সেবক, যাতে করে দিবসের শ্রমজনিত শ্রান্তি রাতের মাধ্যমে বিদূরিত হয়।

সূরা ইব্‌রাহীম ঃ আয়াত ৩৪

وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۗ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ۝

❒ এবং তোমাদিগের যাহা প্রয়োজন তিনি তোমাদিগকে তাহা দিয়াছেন। তোমরা আল্লাহের অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় সীমালংঘনকারী, অকৃতজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়া আতাকুম্ মিন্ কুল্লি মা সাআল্তুমুহু' (এবং তোমাদের যা প্রয়োজন তিনি তোমাদেরকে তা দিয়েছেন)। এখানকার 'মিন্' অব্যয়টি আংশিক অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে দান করেছি তোমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কিঞ্চিত।

বায়যাবী লিখেছেন, সম্ভবতঃ আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে এ রকম—আমি তোমাদেরকে তোমাদের প্রয়োজনানুসারে দিয়েছি— তোমরা তা চাও অথবা না চাও। প্রাচুর্য প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় 'কুল' শব্দটি, যদিও এর শাব্দিক অর্থ সবকিছু বা সকল কিছু। যেমন, বলা হয়— অমুক ব্যক্তি সবকিছুই জানে। একথার প্রকৃত অর্থ হবে— অমুক ব্যক্তি অনেক কিছুই জানে। কোরআন মজীদেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— ফাতাহ্না আ'লাইহিম আব্ওয়াবা কুল্লা শাইইন (তাদের জন্য আমি প্রতিটি বস্তুর দ্বারসমূহ উন্মোচন করেছি)। অর্থাৎ তাদের জন্য আমি উন্মোচন করেছি অনেক কিছু।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।' একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজির সংখ্যা, প্রকার ও শ্রেণী গুণে শেষ করতে পারবে না। কারণ তাঁর অনুগ্রহসম্ভার সুবিপুল ও অসংখ্য। তোমরা সেগুলোর যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অক্ষম। তাই পরম করুণাময় আল্লাহ্ তোমাদের অক্ষমতাবোধকেই কৃতজ্ঞতা বলে গ্রহণ করে থাকেন। যাদের এই অক্ষমতাবোধ নেই তারা কৃতজ্ঞ নয়।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় সীমালংঘনকারী, অকৃতজ্ঞ।' একথার অর্থ— বিপদে পড়লেই মানুষ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। হয়ে যায় ধৈর্যচ্যুত। অকৃতজ্ঞ। তাদের তখন একথা মনে থাকে না যে, আল্লাহ্‌র সকল কার্যকলাপই রহস্যময়, প্রজ্ঞামিশ্রিত। ধৈর্য সম্বলিত বিপদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহ্‌ই একমাত্র দাতা ও করুণাপরবশ। সুখের সময় আবার মানুষ হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ। এভাবে তারা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সীমালংঘন করে। হয়ে যায় জালেম বা সীমালংঘনকারী। 'জুলুম' শব্দটির আভিধানিক অর্থ— কোনো কিছুকে অপাত্রে রাখা। বিপদে ধৈর্য কাম্য। অধৈর্য অনভিপ্রেত। তাই বিপদে অভিযোগ উত্থাপন করলে তা হবে অপাত্রে স্থাপনের মতো সীমালংঘন বা জুলুম। তাই এখানে সীমালংঘনের রূপক অর্থ হবে অধৈর্য। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, প্রকৃত অর্থে পাপীরা তাদের আপন আত্মার উপরে অত্যাচার করে। এভাবে তারা নিজেরাই সঞ্চয় করে ইহকাল ও পরকালের শাস্তির উপকরণসমূহ। এরকমও বলা যেতে পারে যে, মানুষ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করায় অধিকতর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়। এটাও আত্মার উপরে অত্যাচার। এভাবে অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি তার নিজস্ব অধিকারের উপর জুলুম করে। হাদিস শরীফে এসেছে, আল্লাহ্‌পাক বলেন, আমার এবং মানব-জ্বিনের সম্পর্কটি অদ্ভুত। আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি। অথচ তারা উপাসনা করে অন্যের। আমিই তাদেরকে জীবনোপকরণ দিয়েছি। অথচ তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অপরের। হজরত আবু দারদা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী ও হাকেম।

সুরা ইব্‌রাহীম ঃ আয়াত ৩৫, ৩৬

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۝ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

❒ স্মরণ কর, ইব্‌রাহীম বলিয়াছিল 'হে আমার প্রতিপালক! এই নগরকে নিরাপদ করিও এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হইতে দূরে রাখিও।

❒ 'হে আমার প্রতিপালক! এইসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করিবে সেই আমার দলভুক্ত কিন্তু কেহ আমার অবাধ্য হইলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, ইব্রাহিম বলেছিলো, হে আমার প্রতিপালক! এই নগরকে নিরাপদ কোরো।' এ কথার অর্থ, হে আমার রসুল! আপনার উর্ধ্বতন পিতৃ-পুরুষ নবী ইব্রাহিমের কথা স্মরণ করুন। তিনি এই মক্কা নগরীর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, হে আমার প্রভুপালক! এই মক্কাকে করে দিন শান্তিধাম। উল্লেখ্য যে, হজরত ইব্রাহিম মক্কায় আগমনের পূর্বে স্থানটি ছিলো লতা-গুল্মহীন পাহাড়বেষ্টিত একটি জনমানবহীন উপত্যকা। সেই বিজন উপত্যকায় দাঁড়িয়ে তিনি মক্কাকে নিরাপদ জনপদ বানিয়ে দেয়ার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রেখো।' এই প্রার্থনাংশটির মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নবীগণকে নিষ্পাপ রাখা হয় নিরাপদ পরিবেশে। সৃষ্টিগতভাবে সাধারণ মানুষের মতো তাঁদের অবয়ব ভূতচতুষ্টয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট। কিন্তু নবীগণ আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের আনুকূল্যবেষ্টিত। তাই তাঁরা পাপাচরণ থেকে সুরক্ষিত।

এখানে 'বানিন' অর্থ আপন ঔরসজাত সন্তান। সন্তানের সন্তান নয়। অর্থাৎ এখানে শব্দটির দ্বারা বংশ পরিচয় তুলে ধরা হয়নি, যেমন বংশ পরিচয় বিধৃত হয় বনী আদম, বনী ইসরাইল ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে। অতএব বুঝতে হবে 'আমার পুত্রগণকে' বলে হজরত ইব্রাহিম প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর পুত্র হজরত ইসহাক ও হজরত ইসমাইলের জন্য। তাঁদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য নয়। তাই দেখা যায় হজরত ইসমাইলের উত্তর পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ পৌত্তলিকতাকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সুফিয়ান বিন ওয়াইনার বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, হজরত ইসমাইলের বংশের কেউই পৌত্তলিক ছিলো না। তবে তারা পাথর প্রদক্ষিণ করতো এবং বলতো, কাবা শরীফ তো পাথরই। তাই আমরা পাথর দেখলে কাবা ভেবে প্রদক্ষিণ করি। দুররে মানসুর গ্রন্থে রয়েছে, সুফিয়ান বিন উয়াইনিয়াকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, হজরত ইসহাক ও হজরত ইসমাইলের বংশধরেরা কেউই পৌত্তলিক নয় আপনি এ রকম কথা বলেন কেনো? তিনি বললেন, হজরত ইব্রাহিম দোয়া করেছিলেন 'আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রেখো।' তখন মক্কাবাসীরা সকলেই ছিলো হজরত ইসমাইলের সন্তান-সন্ততি। তাঁরা সেখানে বসবাস শুরু করার পর মক্কার নিরাপত্তার জন্য তিনি দোয়া করেছিলেন। হজরত ইব্রাহিমের দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেছিলেন। অতএব হজরত ইব্রাহিম ও তাঁর দুই পুত্রের বংশধরেরা কখনোই মূর্তিপূজারী হতে পারেন না।

www.eelm.weebly.com

সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার ব্যাখ্যাটি কোরআন, সুন্নাহ্ ও এজমার বিপরীত। কোরআন মজীদে 'মুশরিক' বলে মক্কাবাসীদেরকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন 'ওয়া ক্বলাল্লাজীনা আশরাকু লাও শাআল্লহু মা আশরাক্না ওয়ালা আবাউনা ওয়ালা হার্রামনা মিন্দুনিহী শাইয়ুন' (যারা সমকক্ষ স্থির করেছে তারা বললো, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছে করতেন, তবে আমরা ও আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ শিরিক করতাম না। আর তিনি ব্যতীত আমরা কোনো কিছু নিষিদ্ধ করতাম না)। এ রকম আরো আয়াত রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মক্কাবাসী ও তাদের পিতৃ-পুরুষ পৌত্তলিক ছিলো।

পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! এই সব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সেই আমার দলভুক্ত। কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এখানে 'হুন্না' সর্বনামটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই প্রতিমাগুলোকে, যেগুলো ছিলো তাদের পূজকদের পথভ্রষ্টতার কারণ। 'যে আমার অনুসরণ করেছে' অর্থ যার সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে, যে সম্পর্ক পরকালেও ছিন্ন হবে না। এই সম্পর্ক হচ্ছে বিশ্বাসের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের কারণেই সে প্রবেশ করবে জান্নাতে। সুদ্দী বলেছেন, 'তুমিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' কথাটির অর্থ, সে আমাকে অমান্য করলেও তুমি তাকে ক্ষমা করে দিয়ো। তুমিতো গফুরুর রহীম। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ, সে যদি শিরিক ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে আমার অবাধ্য হয়, তবে তুমি তাকে মার্জনা করে দিয়ো। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ালু।

উল্লেখ্য যে, এখানকার 'আ'সানী' শব্দটির মধ্যে শিরিকও অন্তর্ভুক্ত। 'শিরিকের পাপ ক্ষমার অযোগ্য' এ কথা জানানোর আগে হজরত ইব্রাহিম এই দোয়া করেছিলেন। পরে যখন একথা জানলেন, তখন দোয়া করলেন 'ওয়ারযুক আহ্লাহু মিনাছ্ ছামারাতি মান্ আমানা মিন্হুম বিল্লাহ্'(আর এই নগরীর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্র উপর ইমান এনেছে, তাদেরকে ফল-মূল দ্বারা উপজীবিকার ব্যবস্থা কোরো)। এই দোয়ায় কেবল ইমানদারদের জন্য উপজীবিকা যাচ্ঞা করা হয়েছে। হজরত ইব্রাহিমের এই দোয়াটিও ছিলো অযথার্থ। কারণ পৃথিবীতে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলকেই আল্লাহ্পাক উপজীবিকা দান করেন। কিন্তু অংশীবাদীদেরকে তিনি পরকালে মার্জনা করবেন না। তাই তাঁর প্রতি পুনঃ-প্রত্যাদেশ হলো— 'আর যে অবিশ্বাস করবে, তাকে (এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত) জীবনোপভোগ করতে দিবো। অতঃপর তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাবো দোজখের দিকে।' এ কথার অর্থ— পার্থিব উপজীবিকা থেকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আমি বঞ্চিত করবো না, কিন্তু পরকালে তাদেরকে মার্জনা করা হবে না।

www.eelm.weebly.com

رَبَّنَآ إِنِّيٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ○

❒ 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদিগের কতককে বসবাস করাইলাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদিগের প্রতিপালক! এই জন্য যে উহারা যেন সালাত কায়েম করে। এখন তুমি কিছু লোকের অন্তর উহাদিগের প্রতি অনুরাগী করিয়া দাও এবং ফলাদি দ্বারা উহাদিগের জীবিকার ব্যবস্থা করিও, যাহাতে উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

এখানে 'আমার বংশধরদের কতককে' অর্থ হজরত ইসমাইল ও তাঁর বংশধরকে। তিনি ও তাঁর বংশধরেরাই বসবাস করতেন মক্কায়।

'ওয়াদিন্ গইরি জী জারই'ন্' অর্থ অনুর্বর উপত্যকা। পাহাড় বেষ্টিত একটি প্রস্তরময় ও অনুর্বর সমতল ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মক্কা নগরী। তাই এখানে বলা হয়েছে 'গইরি জী জারই'ন্' (চাষের অযোগ্য বা অনুর্বর)।

'তোমার পবিত্র গৃহের নিকট' অর্থ কাবা শরীফের নিকট, যে কাবা গৃহের অস্তিত্ব ছিলো হজরত নুহের মহাপ্লাবনের পূর্বেও। মক্কা বিজয়ের দিন রসুল স. ঘোষণা করেছেন, আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির সময় থেকে এই নগরীকে মহিমান্বিত করেছেন। তাই মহাপ্রলয় কাল পর্যন্ত এর মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে। এখানে যুদ্ধ বৈধ নয়। আজ কেবল আমার জন্য কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। এর আগে ও পরে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। সুতরাং এখানে যেমন যুদ্ধ করা যাবে না, তেমনি কর্তন করা যাবে না এখানকার বৃক্ষ, তাড়িয়ে দেয়া যাবে না এখানকার শিকার, আত্মসাৎ করা যাবে না পরিত্যক্ত বস্তু— কিন্তু হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে কোনো হারানো বস্তু নিজের কাছে রাখা যাবে। এখানকার কোনো তৃণও উচ্ছেদ করা যাবে না। এই ঘোষণা শুনে হজরত আব্বাস বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এখানকার এজখর নামক তৃণকে ব্যতিক্রম বলে ঘোষণা করুন। কারণ এই তৃণটি এখানকার অধিবাসীদের সাংসারিক কাজে লাগে। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে, এজখর এই নিষিদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত নয়। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

আমের বিন সাঈদের পদ্ধতিতে ওয়াকেদি ও ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিমের প্রথম পত্নী হজরত সারা ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর দ্বিতীয় পত্নী হজরত হাজেরা যখন জননী হলেন, তখন তাঁর অন্তরে জেগে উঠলো নারীসুলভ বিবমিষা। তিনি শপথ করে বসলেন, সপত্নীর নাক ও কান কেটে দিবেন, যাতে তার সৌন্দর্য খর্ব হয়। স্বামীর নিকটে হয়ে পড়ে অপ্রিয়। হজরত ইব্রাহিম বললেন, সত্যি কি তুমি তোমার শপথ পূরণ করতে চাও? হজরত সারা বললেন, তাতো চাই, কিন্তু কীভাবে করবো? হজরত ইব্রাহিম বললেন, তার কান দু'টো ফুটো করে দাও এবং তার খতনা করে দাও। হজরত সারা তাই করলেন। তখন হজরত হাজেরা তাঁর দুই কানে পরলেন দুল। এতে করে তাঁকে আরো বেশী সুন্দর দেখাতে লাগলো। হজরত সারা বললেন, এযে দেখছি আরো রূপসী হয়ে গেলো। এরপর থেকে হজরত হাজেরার উপস্থিতি একেবারেই অসহ্য হয়ে উঠলো হজরত সারার। হজরত ইব্রাহিম ঠিক করলেন, প্রিয় পত্নীকে তিনি এবার রেখে আসবেন দূরে কোথাও।

একদিন হজরত হাজেরা ও তার শিশু পুত্রকে নিয়ে তিনি চললেন মক্কা অভিমুখে। হজরত হাজেরার পরিধানে ছিলো মাটি পর্যন্ত প্রলম্বিত পরিচ্ছদ। তাই স্বামীর অনুগমনকালে দু'জনের পদচিহ্নই মুছে যাচ্ছিলো। পদচিহ্ন ধরে সপত্নী সারা যেনো তাঁর কাছে যেতে না পারে, সে কারণেই হজরত হাজেরা করেছিলেন এই পরিকল্পনাটি। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই বর্ণনাটি স্বসূত্রে উপস্থাপন করেছেন বাগবী ও বোখারী।

দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে তাঁরা উপস্থিত হলেন মক্কার বিজন উপত্যকায়, কাবা শরীফের পাশে। কিন্তু কাবা গৃহের অস্তিত্ব তখন ছিলো না। শিশু ইসমাইলকে কোলে নিয়ে সেখানেই বসে পড়লেন হজরত হাজেরা। স্তন্যদান করলেন শিশুকে। হজরত ইব্রাহিম সঙ্গে আনা ভুট্টাসহ একটি থলি ও এক মশক পানি রেখে দিলেন তাঁর পাশে। তারপর প্রস্থানোদ্যত হলেন। হজরত হাজেরা বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি চলে যাচ্ছেন কেনো? হজরত ইব্রাহিম জবাব দিলেন না। থামলেনও না। হজরত হাজেরা বলে উঠলেন, এটা কি আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত? হজরত ইব্রাহিম যেতে যেতে জবাব দিলেন, হ্যাঁ। হজরত হাজেরা বললেন, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত। স্বামীর গমনপথের দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে। নবীপ্রবর অদৃশ্য হয়ে গেলে হজরত হাজেরা দৃষ্টি ফেরালেন। দু'হাত তুলে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালয়িতা! আমি এখন আমার শিশু সন্তান নিয়ে তোমার মহিমান্বিত গৃহের অধিবাসী। প্রিয় পত্নী হাজেরাকে অত্যধিক ভালোবাসতেন হজরত ইব্রাহিম। তাই তিনি মাঝে মাঝে মক্কায় এসে স্ত্রী-পুত্রের খবরাখবর নিয়ে যেতেন। খাদ্য ও পানীয় শেষ হয়ে গেলো কয়েকদিনের মধ্যে।

শুকিয়ে যেতে লাগলো জননীর বুকের দুধ। মাতা ও পুত্র দু'জনেই হয়ে পড়লেন তৃষ্ণার্ত। এই প্রস্তরিত প্রান্তরে পাহাড়ে পানির চিহ্ন মাত্র নেই। হজরত হাজেরা একবার সাফা পাহাড়ে উঠলেন। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখলেন। কোথায় পানি? যেদিকে তাকান সেদিকে দেখেন দিকচক্রবালে একাকার হয়ে রয়েছে কেবল মরুভূমি ও আকাশ। আকাশ ও মরুভূমি। একরাশ নৈরাশ্য নিয়ে তিনি নেমে এলেন। চঞ্চল বিহ্বল পদে দ্রুত গিয়ে আরোহণ করলেন মারওয়া পাহাড়ের চূড়ায়। ঘুরে ঘুরে তাকালেন চতুর্দিকে। নেই। কোথাও কিছু নেই। উপায়হীনা জননী আবার এসে দাঁড়ালেন পিপাসার্ত পুত্রের নিকটে। ভেবে পেলেন না, কী করবেন। কোথায় যাবেন। কী করে বাঁচাবেন প্রিয়তম আত্মজকে। আবার তিনি দৌড় দিলেন সাফা পাহাড়ের দিকে। সেখানে থেকে আবার মারওয়ায়। এভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন তিনি। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হজরত হাজেরার অনুসরণেই হাজীগণকে সাফা ও মারওয়ায় সাতবার দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। আল্লাহ্ এভাবেই ওই মহীয়সী রমণীর স্মৃতি জীবন্ত করে রেখেছেন।

সপ্তম দৌড়ের পরে তিনি যখন মারওয়ায়, তখন শুনতে পেলেন একটি আওয়াজ। উৎকর্ণ হলেন তিনি। হঠাৎ দেখলেন, আবির্ভূত হয়েছেন এক ফেরেশতা। তিনি এক স্থানে পদাঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো জলোচ্ছ্বাস। হজরত হাজেরা দ্রুত নেমে গিয়ে সেই জলোচ্ছ্বাসের চারপাশে বাঁধ বেঁধে দিলেন। তারপর আঁজলা ভরে পানি তুলে ভরতে লাগলেন মশক। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র করুণা বর্ষিত হোক ইসমাইল-জননীর উপর। তিনি বাঁধ বেঁধে না দিলে ও আঁজলা ভরে পানি না ওঠালে জমজম হয়ে যেতো একটি স্রোতস্বিনী।

হজরত হাজেরা পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করলেন অলৌকিক কূপের পানি। দুগ্ধ পান করালেন প্রিয় পুত্রকে। ফেরেশতা বললেন, আপনি কোনোরূপ ক্ষতির আশংকা করবেন না। এখানেই রয়েছে আল্লাহ্র মহিমান্বিত গৃহ। আপনার স্বামী ও আপনার কোলের এই শিশু বিলীন গৃহকে পুনঃনির্মাণ করবেন। মনে রাখবেন আল্লাহ্র গৃহের পাশে যারা বসবাস করে, তারা নিরাপদ। উল্লেখ্য যে, কাবা গৃহের চিহ্ন হিসেবে তখন সেখানে ছিলো কেবল একটি উঁচু ভিটি। উপরের অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো হজরত নুহের মহাপ্লাবনের সময়।

বয়ে চলে সময়। মক্কার বিজন উপত্যকায় কেটে যায় আল্লাহ্র অতিথিদ্বয়ের নিরুদ্বিগ্ন জীবন। একদিন মক্কার কাছাকাছি এসে তাঁবু ফেললো জুরহাম গোত্রের একটি অভিযাত্রী দল। তারা এপথ দিয়ে কখনো কখনো যাতায়াত করতো। হঠাৎ তারা দেখলো আকাশে ওড়াউড়ি করছে এক ঝাঁক পাখি। এ দৃশ্য দেখে তারা

www.eelm.weebly.com

বুঝতে পারলো, নিশ্চয় নিকটে কোথাও পানি রয়েছে। কিন্তু বিস্মিত হলো এই ভেবে যে, ইতোপূর্বে তো এখানে কোনো পানির অস্তিত্ব ছিলো না। পানি সন্ধান করতে করতে তারা এসে পড়লো হজরত হাজেরার নিকটে । বললো, এই পানির সন্নিকটেই তারা বসবাস করতে চায়। হজরত হাজেরা তাদেরকে অনুমতি দিলেন। শর্ত আরোপ করলেন, এই পানির উপরে কারো কর্তৃত্ব থাকবে না। অভিযাত্রী দল তাঁর এ শর্ত মেনে নিলো। সেখানে গড়ে তুললো তাদের স্থায়ী আবাস। হজরত হাজেরা এরকমই চেয়েছিলেন। মনে-প্রাণে কামনা করেছিলেন, আল্লাহ্র ঘরের পাশে গড়ে উঠুক একটি জনপদ। আর তিনি হবেন এই পানির একক অধিকর্ত্রী। জুরহাম গোত্রের অন্য লোকেরাও একে একে এসে ঠাঁই নিলো এখানে। দিন দিন বেড়ে চললো মক্কাবাসীদের বংশধারা। ধীরে ধীরে বেড়ে উঠলেন হজরত ইসমাইল। আরবী হলো তাঁর মাতৃভাষা। কারণ জুরহাম গোত্রের ভাষা ছিলো আরবী। মানুষ পৃথিবীতে আসে আবার চলে যায়। হজরত হাজেরাও একদিন চলে গেলেন এই পৃথিবী ছেড়ে। যাবার আগে তিনি জুরহাম গোত্রের এক মেয়ের সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধ করে দিয়ে গেলেন প্রিয় পুত্রকে। শুরু হলো হজরত ইসমাইলের সংসার-জীবন। সুরা বাকারায় এই কাহিনীটির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'হে আমাদের প্রতিপালক! এজন্যে যে তারা যেনো সালাত কায়েম করে।' একথার অর্থ হজরত ইব্রাহিম আরো প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রতিপালক! এই অনুর্বর উপত্যকায় তোমার গৃহের সন্নিকটে আমি আমার পরিবার পরিজনকে রেখে যাচ্ছি এ জন্যই যে, তারা যেনো তোমার শূন্য গৃহে কেবল তোমার উদ্দেশ্যে নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। পূর্ববর্তী আয়াত থেকে বার বার উল্লেখিত হয়েছে 'রব্বানা' (হে আমার প্রতিপালক) শব্দটি। আর আলোচ্য বাক্যের শুরুতে 'রব্বানা' সম্বোধনটি উল্লেখিত হওয়ার কারণ হচ্ছে, হজরত ইব্রাহিম তাঁর বংশধরদের জন্য বিশেষভাবে এখানে আল্লাহ্র নিকট নামাজ প্রতিষ্ঠার সামর্থ্য প্রার্থনা করেছেন। বলেছেন, তিনি আল্লাহ্র গৃহ নামাজের মাধ্যমে আবাদ করার জন্যই তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ও প্রিয়তম পুত্রকে এখানে রেখে যাচ্ছেন। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'লিইয়ুক্বিমু' কথাটি অনুজ্ঞাসূচক। অর্থাৎ এর মাধ্যমে হজরত ইব্রাহিম পরোক্ষভাবে তাঁর সন্তানদেরকে নামাজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে নামাজ প্রতিষ্ঠায় সামর্থ্যও কামনা করেছেন আল্লাহ্র নিকটে।

এরপর বলা হয়েছে — 'এখন তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও।' এখানে 'মিনান্নাসি' কথাটি যদি 'মিন' অব্যয় ব্যতীত ব্যবহৃত হতো, তবে অর্থ হতো— সারা দুনিয়ার সকল মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, তাহলে ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক

www.eelm.weebly.com

সকলেই আল্লাহ্‌র ঘরে হজ করতে শুরু করতো। সেরকম করা হয়নি বলে কাবা গৃহের হজ করে কেবল মুসলমানেরা। এরপরের কথাটি 'তাহবী ইলাইহিম', যার অর্থ, দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হয়। সুদ্দী বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— কিছু লোকের মন যেনো তাঁর প্রতি অনুরাগী হয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং ফলাদি দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কোরো, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।' বলা বাহুল্য, হজরত ইব্রাহিমের এই দোয়া কবুল করা হয়েছে। তাই দেখা যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সকল ঋতুতে সকল প্রকার ফলমূল দ্বারা মহিমান্বিত ও মহাশান্তির আলয় মক্কা ভরপুর।

সুরা ইব্‌রাহীম : আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ ؕ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ○ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ○ رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ○ رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ○

❐ 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি তো জান যাহা আমরা গোপন করি ও যাহা আমরা প্রকাশ করি ; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহের নিকট গোপন থাকে না।

❐ প্রশংসা আল্লাহেরই প্রাপ্য, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইস্‌মাইল ও ইস্‌হাককে দান করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনিয়া থাকেন।

❐ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদিগের কতককেও। হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল কর।

❐ 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! যে-দিন হিসাব হইবে সেই দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং বিশ্বাসীগণকে ক্ষমা করিও।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো জানো যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি।' এ কথার অর্থ— হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সকল অবস্থাই তোমার জানা। আমরা যা যাচ্‌ঞা করি, তার চেয়েও তুমি অনেক বেশী দান করো আমাদেরকে। আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন কোনো প্রার্থনার অপেক্ষা না করেই।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস ও মুকাতিল বলেছেন, মক্কার পাহাড় পরিবেষ্টিত প্রস্তরিত উপত্যকায় প্রিয়তমা ভার্যা ও প্রাণাধিক পুত্রকে রেখে যাওয়ার সময় হজরত ইব্রাহিমের হৃদয়ে যে শোকোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিলো, সে শোকোচ্ছ্বাসই প্রতিধ্বনিত হয়েছে এখানকার 'নুখফী'(গোপন করি) এবং 'নু'লিন্'(প্রকাশ করি) শব্দ দু'টোর মাধ্যমে। কেউ কেউ মনে করেন, এখানে 'নুখফী' কথাটির অর্থ বিরহ-বেদনা এবং 'মা নু'লিন' অর্থ বিনয় বা নম্রতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোনো কিছুই আল্লাহ্র নিকট গোপন থাকে না।' একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক সত্তাগতভাবে সর্বজ্ঞ। তাই আকাশ ও পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির সকল কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। কেউ কেউ মনে করেন, উক্তিটি আল্লাহ্পাকের। আবার কেউ কেউ মনে করেন, হজরত ইব্রাহিমের ।

পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন।' একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম তাঁর প্রার্থনায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বললেন, আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা তিনিই আমাকে বৃদ্ধ বয়সে করেছেন দুই সন্তানের জনক। এটা তাঁর প্রবল পরাক্রমের বিরল বহিঃপ্রকাশ। প্রিয় পুত্র ইসমাইল ও ইসহাক তাঁরই মহান দান।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম নব্বই বছর বয়সে হজরত ইসমাইলের জনক হন। আর একশত বারো বছর বয়সে জনক হন হজরত ইসহাকের। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এক শত সতের বছর বয়সে হজরত ইব্রাহিমকে দেয়া হয়েছিলো হজরত ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন ।' এখানে 'শুনে থাকেন' অর্থ কবুল করেন বা কার্যকর করেন। যেমন বলা হয় 'সামিয়াল্ মালিকুল কালামা' (সম্রাট আমার কথা মেনে নিয়েছেন)। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ইব্রাহিমের সন্তান লাভ সম্পর্কিত প্রার্থনা আল্লাহ্ কবুল করেছিলেন।

এর পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী করো এবং আমার বংশধরদের কতককেও।' এখানে 'মুক্বীমাস্ সলাত' (সালাত কায়েমকারী করো) অর্থ— নামাজের শর্তাবলী, সময়, সীমারেখা, নিয়ম ইত্যাদিসহ একাগ্রচিত্তে নামাজ প্রতিষ্ঠার সামর্থ্য দান করো। 'ওয়া মিন্ জুর্রিয়্যাতী' অর্থ— এরকম সামর্থ্য দান করো আমার বংশধরদের অনেককে। এখানে 'মিন্' অব্যয়টি আংশিক অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ সামর্থ্য দান

করো আমার উত্তরপুরুষদের কাউকে কাউকে। সকলের জন্য তিনি এরকম দোয়া করেননি। কারণ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁকে জানানো হয়েছিলো যে, তাঁর পরবর্তী বংশধরদের কেউ কেউ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হবে। ইতোপূর্বে একবার তিনি তাঁর সকল অধঃস্তন পুরুষদের সম্পর্কে দোয়া করেছিলেন। জবাবে আল্লাহ্পাক বলেছিলেন — 'লাইয়ানামু আহ্দিজ জলিমীন' (আমার অনুগ্রহ সত্যপ্রত্যাখান-কারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

এরপর বলা হয়েছে— 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল কর।' এ কথার অর্থ— হে আমাদের প্রভুপালক! আমার ইবাদত কবুল করো।

হজরত আনাস থেকে তিরমিজি, হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে আবু ইয়ালী, হজরত নোমান বিন বশীর থেকে হাকেম এবং আহমদ, বোখারী, সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় ও ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দোয়া অর্থ ইবাদত। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, প্রার্থনা হচ্ছে উপাসনার নির্যাস।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং বিশ্বাসীগণকে ক্ষমা কোরো।' এখানে হজরত ইব্রাহিম তাঁর নিজের জন্য, তাঁর পিতা-মাতার জন্য এবং সকল ইমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তাঁর এই প্রার্থনাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন ইমানদার। কাফেরদের জন্য ইমানদারগণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন না। উল্লেখ্য যে, আজর তাঁর পিতা ছিলেন না, ছিলেন পিতৃব্য। তাঁর পিতার নাম ছিলো তারেখ। সুরা বাকারার তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আরবী ভাষায় 'আব্' (পিতা) শব্দটি পিতৃব্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু এখানে 'ওয়ালিদাইয়া' এর পরিবর্তে যদি 'আবাইয়া' কথাটি উল্লেখিত হতো, তবে তাঁর পিতৃব্যও এই ক্ষমা প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত বলে সন্দেহ করা যেতো। কিন্তু সে সন্দেহের অবকাশ এখানে নেই। আজর ছিলো পৌত্তলিক। সুতরাং সে হজরত ইব্রাহিমের ক্ষমা প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। আবার আজরকে হজরত ইব্রাহিমের পিতা ধরে নেয়া হলেও হজরত ইব্রাহিমকে অভিযুক্ত করা যাবে না। কেননা স্বয়ং আল্লাহ্ এ ব্যাপারে এরশাদ করেছেন— 'ওয়ামা কানাস্ তিগ্ফারু ইব্রাহীমা লিআবীহি ইল্লা আম্মাওয়িদাতিউ ওয়াদাহা ইয়্যাহু ফালাম্মা তাবাইয়্যানালাহু আন্নাহু আদুউল্ লিল্লাহি তাবার্রাআ মিন্হু' (ইব্রাহিম তার পিতার মার্জনার নিমিত্তে এজন্যই দোয়া করেছিলো যে, সে ছিলো তার নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু যখন তাকে জানানো হলো যে, তার পিতা আল্লাহ্র শত্রু, তখন সে নিবৃত্ত হলো)।

 www.eelm.weebly.com

'ইয়াওমা ইয়াকুমূল হিসাব্' অর্থ যেদিন হিসাব হবে, সেইদিন। 'ইয়াকুমু' অর্থ প্রকাশ পাওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কথাটি এসেছে ধনাত্মক 'ক্বিয়াম আলার্ রিজ্লি'থেকে। পায়ের উপরে দণ্ডায়মান হলে যেমন পরিপূর্ণ অবয়ব সুস্পষ্ট বা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি সুস্পষ্ট বা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে বিচারের দিবস। যেমন বলা হয়— 'ক্বামাতিল হারবু আলাস্ সাক্ব' (যুদ্ধ তার উরুদেশে দণ্ডায়মান)। অর্থাৎ যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। অথবা এখানে হিসাব শব্দের পূর্বে একটি সম্বন্ধ পদ উহ্য রয়েছে— এ রকমও বলা যেতে পারে। ওই উহ্য সম্বন্ধ পদটি হচ্ছে 'আহল'। এভাবে 'আহ্লুল হিসাব্' অর্থ হবে, হিসাব দাতা। তখন মর্মার্থ হবে— সে দিন হিসাবদাতাগণ দণ্ডায়মান হবে। যেমন বলা হয়— 'ওয়াস্আলিল্ ক্বরইয়াতা' (গ্রামকে জিজ্ঞেস করো)। এ কথার অর্থ— গ্রামবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করো। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে রূপকভাবে দণ্ডায়মান হওয়ার সম্বন্ধ করা হয়েছে হিসাবের সঙ্গে। অর্থাৎ সকল মানুষ দণ্ডায়মান হবে হিসাবের লক্ষ্যে।

সূরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৪২, ৪৩, ৪৪

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۬ؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ۙ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَ اَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ۝ وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَاۤ اَخِّرْنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْۤا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۝

❒ তুমি কখনও মনে করিও না যে, আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীরা যাহা করে সে বিষয়ে অনবধান, তবে তিনি উহাদিগকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিবেন যে দিন তাহাদিগের চক্ষু হইবে স্থির।

❒ হীনতায় আকাশের দিকে চাহিয়া উহারা ভীত-বিহ্বল চিত্তে ছুটাছুটি করিবে, উহাদিগের নিজদিগের প্রতি উহাদিগের দৃষ্টি থাকিবে না এবং উহাদিগের অন্তর হইবে বিকল।

❒ যে দিন তাহাদিগের শাস্তি আসিবে সেই দিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর, তখন সীমালংঘনকারীরা বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রসূলগণের অনুসরণ করিব।' তোমরা কি পূর্বে শপথ করিয়া বলিতে না যে, তোমাদিগের কোন পরজীবন নাই?

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি কখনো মনে কোরো না যে, আল্লাহ্ সীমালংঘন-কারীরা যা করে সে বিষয়ে অনবধান।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তো জানেন আমি সর্বজ্ঞ। এই ধারণার উপরেই আপনি প্রতিষ্ঠিত থাকুন। একথাও জেনে রাখুন যে, সীমালংঘনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। যথাসময়ে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন। এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে রসুল স.কে সম্বোধন করা হলেও এই সম্বোধনের লক্ষ্য সকল মানুষ, যারা ত্বরিৎ শাস্তি অবতীর্ণ না হতে দেখে আল্লাহ্র সর্বজ্ঞ হওয়া সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মধ্যে রয়েছে অত্যাচারিত জনতার জন্য সান্ত্বনা এবং অত্যাচারীদের জন্য শাস্তির হুমকি।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে তিনি তাদেরকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দিবেন, যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির।' একথার অর্থ— হিসাব দিবসের ভয়াবহতা দর্শনে নিষ্পলক হয়ে যাবে তাদের চোখ। অথবা সেদিন ভয়ে তাদের চোখের মনি বেরিয়ে আসবে কোটর থেকে।

পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'হীনতায় আকাশের দিকে চেয়ে তারা ভীত-বিহ্বল চিত্তে ছুটা ছুটি করবে, তাদের নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি থাকবে না।' মাথা তুলে সামনের দিকে যে তাকায় তাকে বলে 'মুক্বনিয়ী'। হাসান বলেছেন, বিচার দিবসে মানুষের দৃষ্টি থাকবে উর্ধ্বমুখী। অন্য কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করার ফুরসত তারা পাবে না। কাতাদা বলেছেন, তখন হিসাবের জন্য যাদেরকে নাম ধরে ডাকা হবে, তারা ভীত-বিহ্বল চিত্তে দৌড়াদৌড়ি করবে। মুজাহিদ বলেছেন, মানুষ তখন এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে হিসাব গ্রহণের দৃশ্যের প্রতি। নিরীহ ও নিষ্পলক নেত্রে যে দৃষ্টিপাত করে, তাকে বলে 'মুহ্ত্বিয়ীন'। অর্থাৎ ওই ব্যক্তিকে 'মুহ্ত্বিয়ীন' বলে, যে কৃপা প্রার্থনা করে অসহায় চোখের ভাষায়। উল্লেখ্য যে, ওই দিন নিজেদের প্রতিও মানুষ দৃষ্টিপাত করতে পারবে না। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— ওই ভয়াবহ বিচারের দিবসে অসহায় মানুষ উপরের দিকে তাকিয়ে ভয়ার্তচিত্তে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে। নিজেদের দিকে তাকাবার সুযোগও তাদের থাকবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের অন্তর হবে বিকল।' এখানে 'হাওয়া' অর্থ বিকল, উদাস বা হতাশ। অর্থাৎ বিচার দিবসের ভয়ংকর অবস্থা দেখে তারা নির্বোধের মতো চেয়ে থাকবে কেবল। যেমন নির্বোধদেরকে বলা হয় 'ক্বল্বুহু হাওয়া।' অর্থাৎ তার অন্তর বোধশূন্য। উল্লেখ্য যে, সেদিন যেহেতু তাদের অন্তর হবে বোধশূন্য, তেমনি তাদের মস্তিষ্কও হবে অচল। কাতাদা বলেছেন, তখন তাদের বক্ষদেশ থেকে তাদের অন্তর বের হয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু পারবে না।

www.eelm.weebly.com

আটকে যাবে কণ্ঠদেশে । না পারবে বের হতে, না পারবে নিচে নামতে। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, তখন তাদের অন্তঃকরণগুলো হবে বিহ্বল, চঞ্চল, হতাশ। তাই কোনোক্রমেই তারা স্বস্তি লাভ করতে পারবে না। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যস্থানকেও এ কারণেই বলে হাওয়া। বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হচ্ছে— তখন তাদের হৃদয় হবে বিচলিত, বিচ্যুত, ভীত, স্তব্ধ, হতাশাগ্রস্ত ও উর্ধ্বমুখী।

এর পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'যেদিন তাদের শাস্তি আসবে, সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক করো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! মৃত্যুর দিন যখন শাস্তি শুরু হবে অথবা এর পরের পর্যায়ের কবর, পুনরুত্থান কিংবা মহাবিচারের শাস্তি সম্পর্কে আপনি মানুষকে সতর্ক করুন। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে হুঁশিয়ার করে দিন মহাপ্রলয় দিবস সম্পর্কে, যখন সর্বগ্রাসী শাস্তির মাধ্যমে ধ্বংস করে ফেলা হবে সকল কিছুকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তখন সীমালংঘনকারীরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিবো এবং রসুলগণের অনুসরণ করবো।' একথার অর্থ— তখন যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন করে ও সত্যের সীমানা লংঘন করে আপন আত্মার উপর অত্যাচার করেছে, তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের উপর আপতিত এই পৃথিবীর শাস্তি পিছিয়ে দাও। অথবা আখেরাতের শাস্তি স্থগিত করো। পৃথিবীতে আর একবার আমাদেরকে সুযোগ দাও। অথবা আখেরাতের শাস্তি স্থগিত রেখে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও। আমরা আর ভুল করবো না। তোমার ও তোমার রসুলের আহ্বানের প্রতি আমরা অবশ্যই সাড়া দিবো। যথারীতি ইমান আনবো ও পুণ্যকর্মে ব্যাপৃত থাকবো। অপর একটি আয়াতেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের এমতো উক্তির উল্লেখ রয়েছে। যেমন— 'যদি তুমি আমাদেরকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও, তাহলে আমরা সত্যের স্বীকৃতি দিবো এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পরজীবন নেই!' একথার অর্থ— তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদেরকে তো অবকাশ দেয়া হয়েছিলোই । কিন্তু তোমরা তখন শপথ করে অবজ্ঞাভরে বলতে, পরকাল বলে কিছু নেই। তোমাদের ওই দম্ভোক্তি আজ কোথায়? এরকমও অর্থ হতে পারে যে, পৃথিবীতে তোমরা নির্মাণ করেছিলে বিরাট বিরাট অট্টালিকা। মৃত্যুর কথা তোমাদের মনেই ছিলো না। ভেবেছিলে, পৃথিবীবাসের পর আর কিছুই নেই। তোমাদের সেই অপবিশ্বাসের অস্তিত্ব আজ কোথায়?

www.eelm.weebly.com

এখানে 'যাওয়াল' অর্থ অন্তহীন পরকালের দিকে যাত্রা। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এই অনন্ত যাত্রাকে অস্বীকার করতো। শপথ করে বলতো, মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ— কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা দৃঢ় শপথ করে বলেছিলো, যারা মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ্ তাদেরকে আর জীবিত করবেন না।

সুরা ইব্‌রাহীম ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭

وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ○ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ○ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

❒ যদিও তোমরা বাস করিতে তাহাদিগের বাসভূমিতে যাহারা নিজদিগের প্রতি জুলুম করিয়াছিল এবং তাহাদিগের প্রতি আমি কি করিয়াছিলাম তাহাও তোমাদিগের নিকট সুবিদিত ছিল এবং তোমাদিগের নিকট আমি উহাদিগের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করিয়াছিলাম।

❒ উহারা ভীষণ চক্রান্ত করিয়াছিল কিন্তু আল্লাহের নিকট উহাদিগের চক্রান্ত রক্ষিত আছে, উহাদিগের চক্রান্ত এমন ছিল না, যাহাতে পর্বত টলিয়া যাইত।

❒ তুমি কখনও মনে করিও না যে আল্লাহ্ তাঁহার রসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, দণ্ড-বিধায়ক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যদিও তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে, যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো।' এ কথার অর্থ— হে পৃথিবীতে পুনঃপ্রত্যা-বর্তনকামী মানুষ! যে পৃথিবীতে নবী নুহের অবাধ্য সম্প্রদায় এবং আদ্ ও ছামুদ্ জাতির মতো সীমালংঘনকারীরা বসবাস করতো, তোমরা তো ছিলে সেই পৃথিবীরই অধিবাসী। অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। তাদের ওই শোচনীয় পরিণতির কথা জানতে পেরেও তোমরা সতর্ক হতে পারোনি কেনো? কেনো বুঝতে পারোনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কতো ভয়াবহ?

এরপর বলা হয়েছে — 'এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম, তাও তোমাদের নিকট সুবিদিত ছিলো এবং তোমাদের নিকট আমি দৃষ্টান্তও উপস্থিত করেছিলাম।' একথার অর্থ— আমি কি তখন আমার বার্তাবাহকগণের মাধ্যমে

www.eelm.weebly.com

অবাধ্যদের ভয়াবহ পরিণতির কথা জানাইনি? তোমাদেরকে কি বারবার সাবধান করে দেইনি? তবুও কেনো তোমরা জেনে-শুনে-বুঝে অবাধ্যদের অনুসরণ করেছিলে? এরকমও অর্থ হতে পারে যে— আমার প্রেরিত পুরুষগণের প্রচারের কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতির কথা ছিলো তোমাদের কাছে সুবিদিত। তবুও তোমরা সতর্ক হওনি কেনো? অথবা আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— তোমাদেরকে তখন সতর্ক করার জন্য কোরআনের মাধ্যমে আমি অবাধ্যদের বিভিন্ন শাস্তির কাহিনী দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করেছিলাম। তবুও তোমরা তখন সংশোধিত হওনি কেনো?

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'তারা ভীষণ চক্রান্ত করেছিলো' একথার অর্থ— মক্কার অংশীবাদীরা রসুল স. এর বিরুদ্ধে ভীষণ চক্রান্ত করেছিলো। তাঁকে করতে চেয়েছিলো দেশান্তরী, বন্দী, অথবা হত্যা। চক্রান্ত সফল করার জন্য তারা ব্যবহার করেছিলো তাদের সকল বুদ্ধি ও শক্তি। এভাবে অর্থ করলে পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে এই আয়াতের আর কোনো যোগসূত্র থাকে না। কিন্তু আমি বলি, আলোচ্য বাক্যের সংযোগ রয়েছে— পূর্ববর্তী আয়াতের 'সাকান্তুম' (তোমরা বাস করতে) কথাটির সঙ্গে। এভাবে 'মাকারূ' (তারা চক্রান্ত করেছিলো) কথাটির 'তারা' সর্বনামটি যুক্ত হয়েছে মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে। আর 'মাকরূহুম' (তাদের চক্রান্ত) কথাটির 'তাদের' সর্বনামটি যুক্ত হয়েছে আগের আয়াতের 'আল্লাজীনা জলামু' (যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো) কথাটির 'যারা' কথাটির সঙ্গে। এই 'যারা' অর্থ অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়গুলো। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— অতীতের অবাধ্যরা যেমন চক্রান্তপ্রবণ ছিলো, তেমনি চক্রান্ত শুরু করেছে এখন মক্কার মুশরিকেরা।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র নিকট তাদের চক্রান্ত রক্ষিত আছে।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ যথাসময়ে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে শাস্তি দিবেন। এরকমও বলা যেতে পারে যে— তাদের চক্রান্ত ও প্রতারণার শাস্তি দেয়ার নিমিত্তে আল্লাহ্পাকের নিকটে সংরক্ষিত রয়েছে এক গোপন পদ্ধতি, যার মাধ্যমে তাদের ষড়যন্ত্রগুলোকে করে দেয়া হবে নিষ্ক্রিয়, নিষ্ফল, অকেজো।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের চক্রান্ত এমন ছিলো না, যাতে পর্বত টলে যায়।' এখানে 'ইন্' অব্যয়টি না সূচক। 'লিতাযুলা' (টলে যেতো) কথাটির 'লাম' অব্যয়টি দৃঢ়তা প্রকাশক। এভাবে না সূচকতাকে করা হয়েছে সুদৃঢ়। ফলে অর্থ দাঁড়িয়েছে— পর্বত টলিয়ে দেয়া ছিলো অসম্ভব। এখানে 'জ্বিবাল' অর্থ পর্বত । এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— রসুল স. এর রেসালত, শরিয়ত ও অলৌকিক নিদর্শনাবলী অটল পর্বতসদৃশ। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শত সহস্র চক্রান্ত, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা সেই পাহাড়কে এক চুলও এদিক ওদিক সরাতে

www.eelm.weebly.com

পারবে না। অথবা এখানকার 'ইন্' অব্যয়টি 'ইন্না' (নিশ্চয়) অব্যয়ের সংক্ষিপ্তরূপ। একথা মেনে নিলে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— আল্লাহ্পাকের বিধান ও মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর নবুয়ত সুনিশ্চিত, চির অচঞ্চল গিরিরাজের মতো। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কুটকৌশলের মাধ্যমে সেই গিরিরাজের মূলোৎপাটন করতে চায়। কিন্তু তা যে অসম্ভব। মহাসত্য কি কখনো টলে?

হাসান বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ, চক্রান্তের মাধ্যমে তারা সত্যকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না। ইবনে জুরাইজ এখানে 'লিতাযুলা' কথাটিকে পাঠ করতেন 'লিতাযুলু'। 'ইন্' অব্যয়টি হ্রস্ব এবং 'লামে তাগীদ' এখানে দু'টি শব্দের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। এভাবে কথাটির মর্মার্থ হবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চক্রান্ত এমনই জঘন্য যে, পর্বত পর্যন্ত টলটলায়মান হয়। অর্থাৎ অংশীবাদিতার মতো কদর্যতম পাপের কারণে পর্বতও কম্পমান হয়। এরকম বক্তব্য এসেছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন— 'অবনমিত হয়েছে পর্বত শ্রেণী, কারণ, তারা বলছে আল্লাহ্র সন্তান-সন্ততির কথা।'

হজরত আলীর উক্তি উল্লেখ করে বাগবী লিখেছেন, একবার হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে বিতর্কে পরাস্ত হয়ে সম্রাট নমরুদ বললো, ঠিক আছে আমি আকাশে গিয়ে দেখবো সেখানে কে আছে। সে সংগ্রহ করলো চারটি শকুন-শাবক। সেগুলোকে পেলে পুষে বড় করে তুললো। এরপর নির্মাণ করলো একটি চার পায়া বিশিষ্ট কাঠের বাক্স। তার চার পায়ায় বেঁধে দিলো শকুন চারটিকে। একজনকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে পড়লো বাক্সটির মধ্যে। শকুনগুলোর উপরের দিকে ঝুলিয়ে রাখা হলো গোশতের চারটি বড় বড় টুকরা। গোশতের লোভে শকুনগুলো উঠতে শুরু করলো উপরের দিকে। গোশতের নাগাল তারা পায় না। কিন্তু তাদের ওড়াও ক্ষান্ত হয় না। এভাবে একদিন একরাত ওড়ার পর নমরুদ তার সঙ্গীকে বললো, উপরের ঢাকনা খুলে দেখো, আমরা আকাশে পৌঁছে গেলাম কিনা। সঙ্গীটি ঢাকনা খুলে উপরের দিকে তাকিয়ে বললো, না। আকাশ যতদূরে ছিলো, এখনো ততদূরে। নমরুদ বললো, নিচের দিকে তাকাও। সঙ্গীটি নিচের দিকে তাকিয়ে বললো, একটি বড় জলাশয়ের মতো পৃথিবী পরিদৃষ্ট হচ্ছে। নমরুদ বললো, ঠিক আছে আরো উপরে যাওয়া যাক। গোশতের লোভে শকুনগুলো বিরতিহীনভাবে উড়েই চললো। গত হলো আর একদিন। শকুনদের ওড়ার গতি হয়ে এলো শ্লথ। নমরুদ বললো, এবার উপরে নিচে তাকিয়ে দেখো, আমরা এখন কোথায়। সঙ্গীটি উপরে নিচে তাকিয়ে বললো, আকাশ যেমন ছিলো তেমনি আছে। আর পৃথিবীকে মনে হচ্ছে একটি কালো পিণ্ড। হঠাৎ আওয়াজ ভেসে এলো, হে দুরাচার! থামো। ইকরামা বলেছেন, সঙ্গীটির কাছে ছিলো তীর ধনুক। সে একটি তীর নিক্ষেপ করলো উপরের দিকে । একটু পরে ওই তীরটি ফিরে এলো তার কাছে। নমরুদ ও তার সঙ্গী দেখলো তীরটির অগ্রভাগ রক্তরঞ্জিত। নমরুদ বললো, আকাশের আল্লাহ্কে আমরা হত্যা করেছি। এবার ফিরে চলো

 www.eelm.weebly.com

পৃথিবীতে। গোশতের টুকরোগুলো এবার নিচের দিকে ঝুলিয়ে দাও। তাই করা হলো। শকুনগুলো এবার নামতে শুরু করলো নিচের দিকে। আমি বলি, বর্ণনাটি অসংগত ও অতিরঞ্জিত। প্রকৃত ঘটনা নিশ্চয় এরকম নয়।

এর পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'তুমি কখনো মনে কোরো না যে, আল্লাহ্ তাঁর রসুলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তো জানেন, আল্লাহ্ তাঁর রসুলগণকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আল্লাহ্ কোনো কিছু করতে বাধ্য নন। কিন্তু একথাও ঠিক যে, তিনি প্রতিশ্রুতি ভংগকারীও নন। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি একথা কখনো মনে করবেন না যে, রসুলগণকে সাহায্যের যে অংগীকার তিনি করেছেন, তা ভঙ্গ করবেন। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন আয়াতে এরকম সাহায্যের অংগীকার বিবৃত হয়েছে। যেমন— ১. 'আমি অবশ্যই আমার রসুলদেরকে সাহায্য করবো।' ২. 'আমি অবশ্যই সীমালংঘনকারীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবো। তদস্থলে আমি প্রতিষ্ঠিত করবো তোমাদেরকে।'

এখানে 'রসুলুহু' (তাঁর রসুলগণের প্রতি) কথাটির পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে 'ওয়ায়্দিহী' (প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি) কথাটি। এভাবে 'প্রতিশ্রুতি'কে করা হয়েছে অধিকতর গুরুত্ববহ এবং এতে করে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ কখনোই প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না। অন্য এক আয়াতে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন— 'ইন্নাল্লহা লা ইয়ুখ্লিফুল মীয়াদ' (নিশ্চয় আল্লাহ্ অংগীকার ভংগ করেন না)। এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, দণ্ড বিধায়ক।' একথার অর্থ— আল্লাহ্র মহাপরাক্রমের প্রতিপক্ষরূপে কোনো চক্রান্তকারীর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তিনিই সকল অপরাধীর দণ্ড-বিধায়ক, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। চক্রান্তকারীদেরও।

সুরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৪৮

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

❐ যে দিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হইয়া অন্য পৃথিবী হইবে এবং আকাশ-মণ্ডলীও এবং মানুষ উপস্থিত হইবে আল্লাহের সম্মুখে,— যিনি এক, পরাক্রমশালী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও।' এখানকার 'তুবাদ্দালু' (পরিবর্তিত হবে) কথাটির আগের আয়াতের 'ইন্তিক্বাম' (প্রতিশোধ) এর কর্মপদ। অর্থাৎ যেদিন সুসম্পন্ন হবে প্রতিশোধ গ্রহণের কর্মটি। অথবা মনে করতে হবে আলোচ্য আয়াতের শুরুতে অনুক্ত রয়েছে 'উজ্কুরু' (স্মরণ করো) সহকর্মপদটি।

www.eelm.weebly.com

পরিবর্তন দু'ধরনের। রূপগত পরিবর্তন ও গুণগত পরিবর্তন। একটি বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত অথবা নিশ্চিহ্ন করে তদস্থলে নতুন কোনো বস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করার নাম রূপগত পরিবর্তন। যেমন কেউ বললো— আমি দিরহামের পরিবর্তে দিনার গ্রহণ করলাম। এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— 'ওয়াবাদ্দালনা জুলুদাহুম জুলুদান গররহা' (আমি তাদের চামড়ার স্থলে নতুন চামড়া দান করেছি)। আর রূপগত পরিবর্তন হচ্ছে মূল বস্তু ঠিক রেখে তার অবস্থা বা অবয়বের পরিবর্তন সাধন। যেমন বলা হয়— 'বাদাল্‌তুল হালাকাতা বিলখাতায়ি' (আমি বালাটিকে অংগুরীয়তে পরিবর্তন করলাম)।

আবদুর রাজ্জাক, আবদ্ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম তাঁদের স্ব স্ব তাফসীরে এবং বিশুদ্ধসূত্রে বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, এই পৃথিবীর বদলে সৃষ্টি করা হবে একটি রৌপ্য-নির্মিত নিষ্কলুষ, নিষ্পাপ ও রক্তপাতহীন পৃথিবী। বায়হাকী কর্তৃক মারফূসূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। এভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কথাটি স্বয়ং রসুল স. এর। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের নয়।

আমি বলি, এক্ষেত্রে হজরত ইবনে মাসউদের উক্তিটিও মারফূ পর্যায়ের। কারণ মহাপ্রলয় সম্পর্কিত কোনো কথা সাহাবায়েকেরাম নিজেরা চিন্তাভাবনা করে বলতেন না। কারণ প্রসঙ্গটি বিশ্বাস্য বিষয়ের অন্তর্ভূত। সুতরাং পৃথিবী-পূর্ববর্তী ও পৃথিবী-পরবর্তী ঘটনাসমূহ, ফেরেশতামণ্ডলী, জান্নাত-জাহান্নাম অথবা ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য কোনো বিষয় সম্পর্কে সাহাবায়েকেরাম যদি কোনো কিছু বলেন, তবে বুঝতে হবে, তাঁরা বিষয়গুলো রসুল স. এর নিকট থেকে শুনেই বলেছেন। নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বলেননি। কিন্তু অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনার্থে অথবা অন্য কোনো কারণে তাঁরা রসুল স. এর সঙ্গে সরাসরি হাদিসগুলোর সম্পর্ক ঘটাননি। অতএব বুঝতে হবে হজরত ইবনে মাসউদের উপরে বর্ণিত বক্তব্যটি আসলে রসুল স. এর।

অপর এক সূত্রে ইবনে জারীর ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, ওই নতুন পৃথিবী হবে অভ্রসদৃশ। হজরত আবু আইয়ুব আনসারী থেকে আহমদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম এবং হজরত আনাস থেকে কেবল ইবনে জারীর মূলতবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বিচার দিবসের পৃথিবী হবে রৌপ্য-নির্মিত। আর ওই পৃথিবী হবে অপরাধবিমুক্ত। হজরত জায়েদ থেকে আবু হামজার পদ্ধতিতে ইবনে জারীর বলেছেন, তখন এই পৃথিবীর স্থলে দেয়া হবে একটি চাঁদির মতো শুভ্র পৃথিবী। ইবনে আবিদ্দুন্ইয়া তাঁর সিফাতুল জান্নাত গ্রন্থে লিখেছেন, তখনকার পৃথিবী হবে রূপার এবং আকাশ হবে সোনার।

 www.eelm.weebly.com

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, তখন পৃথিবী ও আকাশ দু'টোই হবে রূপার। আবদ্ বিন হুমাইদের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, এই পৃথিবী নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। সৃষ্টি করা হবে নুতন একটি পৃথিবী। এ পৃথিবীর সকল মানুষকে স্থানান্তরিত করা হবে ওই পৃথিবীতে। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সহল বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে ধূসর বর্ণের এক নতুন পৃথিবীতে সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে। পিষ্ট আটার মতো বর্ণবিশিষ্ট ওই পৃথিবী হবে সমতল। সেখানে বাড়ী-ঘরের কোনো চিহ্ন থাকবে না। আবু সালেহ থেকে সগীর সূত্রে কালাবীর মাধ্যমে বায়হাকী ও সুদ্দী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই পৃথিবীকে পরিবর্তন করা হবে। অর্থাৎ এর মধ্যে ঘটানো হবে সংযোজন ও বিয়োজন। মুছে ফেলা হবে পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, উপত্যকা ও তরুলতাসমূহ। ওকাজ মেলার চামড়ার মতো টেনে প্রশস্ত করা হবে ওই পৃথিবীকে। তারপর ওই পৃথিবী হবে শুভ্র অভ্রের মতো উজ্জ্বল, যার উপরে কোনো রক্তপাত অথবা অপরাধ সংঘটিত হয়নি। আর তখন বিলীন করে দেয়া হবে আকাশের চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রসমূহ।

হাকেম লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, বিচার দিবসের পৃথিবীকে চামড়ার মতো টেনে প্রশস্ত করা হবে। আর সেখানে একত্র করা হবে প্রাণীকুলকে। উত্তমসূত্রে হজরত জাবের থেকে হাকেম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিচারের দিন চামড়া টানার মতো করে পৃথিবীকে টেনে প্রশস্ত করা হবে। প্রতিটি মানুষ সেখানে পা রাখার জায়গা ব্যতীত অতিরিক্ত জায়গা পাবে না। প্রথমে ডাকা হবে আমাকে। আমি দণ্ডায়মান হয়ে বলবো, হে আমার প্রভুপালক! এই হচ্ছে জিব্রাইল। তখন জিব্রাইলের সঙ্গে প্রথমবারের মতো সাক্ষাত হবে আল্লাহ্র। আমি বলবো, এই জিব্রাইলকে আপনি আমার নিকট প্রেরণ করেছিলেন। জিব্রাইল নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ্ বলবেন, সে ঠিকই বলেছে। অতঃপর আল্লাহ্ আমাকে দান করবেন শাফায়াতের দায়িত্ব। ওই অমূল্য দায়িত্ব পেয়ে আমি বলবো, হে আমার পালনকর্তা! এটাই কি তবে সেই প্রশংসিত স্থান! সেই প্রশংসিত স্থানের চতুষ্পার্শ্বে তখন দাঁড়িয়ে থাকবে অসংখ্য সেবক।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিচার দিবস হবে একটি রুটি সদৃশ। স্বর্গবাসীদের আতিথেয়তার জন্য আল্লাহ্ তা স্বহস্তে প্রস্তুত করবেন, যেমন তোমরা রুটি প্রস্তুত করে থাকো ভ্রমণের প্রস্তুতিপর্বে। হাদিসের 'নুযুলান্ লি আহলিল্ জান্নাত' কথাটির অর্থ, স্বর্গবাসীদের আতিথেয়তার জন্য। আতিথেয়তা বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'নুযুলান্' শব্দটি। দরওয়ারদি বলেছেন, 'নুযুল' বলে ওই আহার্য বস্তুকে, যা অতিথি-আপ্যায়নের পূর্বে সৌজন্য হিসেবে পরিবেশন করা হয়। অর্থাৎ স্বর্গধামে প্রবেশের পূর্বে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে বা অতিথিশালায় অবস্থানের সময় পরিবেশন করা হবে পার্থিব রুটি । এভাবে একসময় তারা পৌঁছে যাবে স্বর্গে।

www.eelm.weebly.com

ইবনে মারজান তাঁর আল ইরশাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তখন ভূমিকে রূপান্তরিত করা হবে একটি রুটিতে। মুমিনগণ তাদের পায়ের নিম্নদেশ থেকে ওই রুটির টুকরা উঠিয়ে আহার করবেন। আর পান করবেন আবে কাউছার অথবা তাসনীমের স্বচ্ছ সলিল। ইবনে হাজার আসকালানী লিখেছেন, সুতরাং আশা করা যায় যে, হাশর প্রান্তরে বিশ্বাসীগণকে ক্ষুধার্ত থাকতে হবে না। কারণ তখন মৃত্তিকাকে দেয়া হবে আহার্যের রূপ। আর ওই আহার্য ভক্ষণ করবেন বিশ্বাসীগণ। এই অভিমতের পোষকতা রয়েছে ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের হাদিসে। হাদিসটি এই— পায়ের নিচের মাটি হবে শাদা রুটির মতো। বিশ্বাসীরা তা ওঠাবে ও ভক্ষণ করবে। মোহাম্মদ বিন কা'বও এরকম বলেছেন। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, তখন মাটি হবে শাদা রুটির মতো। বিশ্বাসীরা হিসাবপর্ব সমাপনের পূর্ব পর্যন্ত তা ভক্ষণ করতে পারবে। অপর এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু জাফরের উক্তিও এরকম।

খতিব বাগদাদীর বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, মহাবিচারের দিন মানুষ হবে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও বিবস্ত্র। তাদের ওই ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বিবস্ত্র অবস্থা হবে অভূতপূর্ব। তারা তখন হয়ে পড়বে ক্লান্ত ও অবসন্ন, যা ইতোপূর্বে তারা কখনো হয়নি। যারা পৃথিবীতে ক্ষুধার্তকে অন্নদান করেছিলো, আল্লাহ্ সেদিন তাদেরকে দান করবেন আহার্য। যারা তৃষ্ণার্তকে পানি পান করিয়েছিলো, আল্লাহ্ তখন পানি পান করাবেন তাদেরকে। যারা বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিয়েছিলো, আল্লাহ্ তাদেরকে দান করবেন বস্ত্র। কেবল আল্লাহ্র সন্তোষ সাধনার্থে পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীদের জন্য সেদিন আল্লাহ্ই হবেন যথেষ্ট।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, মোহাম্মদ বিন কা'ব বলেছেন, সেদিন আকাশসমূহ হয়ে যাবে স্বর্গোদ্যান আর মহাসাগরগুলো হয়ে যাবে নরকানল। ভূপৃষ্ঠও হবে রূপান্তরিত। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, বিচার দিবসে সমগ্র ভূখণ্ড পরিণত হবে অগ্নিতে। হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, মহাসাগরগুলো তখন হয়ে যাবে অথৈই আগুনের লেলিহান শিখা। হজরত ছাওবান থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার এক ইহুদী পণ্ডিত রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, যেদিন পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য এক পৃথিবী হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি স. বললেন, পুলসিরাতের পাশে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! যেদিন পৃথিবী পরিবর্তিত হবে, সেদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করবে? তিনি স. বললেন, পুলসিরাতের সন্নিকটে। বায়হাকী বলেছেন, পুলসিরাতের কথা বলা হয়েছে এখানে রূপকভাবে। কারণ সকল মানুষকে তখন পুলসিরাত অতিক্রম করার আদেশ দেয়া হবে। লক্ষণীয় যে, জননী আয়েশা ও হজরত ছাওবানের হাদিসদ্বয়ের প্রেক্ষিত এক। আরো একটি বিষয় এখানে সুস্পষ্ট যে, পরিবর্তিত পৃথিবীতে মানুষের স্থানান্তরের ঘটনাটি ঘটবে মহাপ্রলয়ের প্রাক্কালে।

www.eelm.weebly.com

'ওয়া হুমিলাতিল্ আরদ্বু ওয়াল জিবালু ফাদুক্কাতা দাক্কাতাঁও ওয়াহিদাহ্' এই আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে হজরত উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, তখন অবিশ্বাসীরা দেখবে পর্বতগুলো হয়ে গিয়েছে মাটির মতো সমতল। কিন্তু বিশ্বাসীরা এরকম দেখতে পাবে না। বায়হাকী। 'উজুহুইঁ ইয়াওমাইজিন্ আলাইহা গবারাহ্ তারহাক্বুহা ক্বতারাহ্' আয়াতের বক্তব্যও অনুরূপ। অর্থাৎ সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের মুখমণ্ডল হবে ধূলিধূসরিত, মলিন ও কৃষ্ণাভ।

পূর্ববর্তী জামানার আলেমগণের মধ্যে পরিবর্তিত পৃথিবীর ধরন সম্পর্কে মতপৃথকতা বিদ্যমান। ওই পরিবর্তন রূপগত হবে, না গুণগত— এই পৃথিবী সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে নতুন কোনো পৃথিবী সৃষ্টি করা হবে, না কেবল পরিবর্তন করা হবে অবস্থা, রঙ ও পরিবেশ, সে সম্পর্কে রয়েছে তাঁদের ঘোরতর মতানৈক্য। ইবনে আবী হামজা বলেছেন, বিচার দিবসের অবস্থানস্থল হবে সম্পূর্ণ নুতন। এই পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে চিরতরে। ইবনে হাজার লিখেছেন, রূপান্তরিত ও প্রসারিত পৃথিবী সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বৈসাদৃশ্য নেই। কারণ মহাপ্রলয়ের আওতায় রয়েছে এই পৃথিবী। বিচার দিবসের পৃথিবী হবে সম্পূর্ণ পৃথক। মহাপ্রলয় শুরু হলে এখানকার সকল লোককে স্থানান্তর করা হবে ওই পৃথক পৃথিবীতে। ইবনে হাজার আরো লিখেছেন, ওই হাদিসগুলোর মধ্যেও আসলে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, সেগুলোতে বর্ণিত হয়েছে রুটি, মৃত্তিকা ও অগ্নির কথা। কারণ ভূপৃষ্ঠের কিছু অংশ রুটি, কিছু অংশ মৃত্তিকা এবং জলমগ্ন অংশ অর্থাৎ মহাসাগরসমূহ অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। হজরত উবাই বিন কা'বের বক্তব্যেও একথার প্রমাণ রয়েছে।

আমি বলি, সেদিন বিশ্বাসীদের পদতলে থাকবে রুটি এবং সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের পদতলে থাকবে মৃত্তিকা ও অগ্নি। কুরতুবী লিখেছেন, আক্সাহ্ প্রণেতা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হাদিসগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করেছেন এভাবে— পৃথিবী ও আকাশ পরিবর্তিত হবে দু'বার। শিংগায় ফুৎকার প্রদানের পূর্বেই খসে পড়বে নক্ষত্ররাজি। আর চন্দ্রসূর্য হবে আলোকহীন। আকাশ হবে তাম্র বর্ণ। দেখা দিবে ভূমিধস। তুলার মতো উড়তে থাকবে পাহাড় পর্বতগুলো। সকল জলধি পরিণত হবে অগ্নিকুণ্ডে। প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে সারা পৃথিবী হয়ে পড়বে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। এমন সময় ফুৎকার দেয়া হবে শিংগায়। অবস্থা হয়ে পড়বে আরো অধিক ভয়াবহ। আকাশসমূহ দুমড়ে মুচড়ে করা হবে স্তুপীকৃত। প্রকাশিত হবে নতুন আকাশ। থেত্লে যাওয়া পৃথিবীকে টেনে প্রসারিত করা হবে আগের মতো। তখন ওই সুবিস্তৃত পৃথিবীতে কেবল পরিদৃষ্ট হবে মরদেহ ও সমাধি।

এরপর ধ্বনিত হবে শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকার। শুরু হবে দ্বিতীয় পর্বের পরিবর্তন। নতুন পৃথিবীতে সমবেত করা হবে সকল মানুষকে। আকাশও হবে সম্পূর্ণ নতুন। ওই নতুন পৃথিবী হবে রৌপ্য-নির্মিত, শুভ্র অভ্র সদৃশ— সেখানে কখনো ঘটেনি শোণিতপাত। সংঘটিত হয়নি কোনো অপরাধও। পুলসিরাত নামক

www.eelm.weebly.com

সেতুর প্রান্তদেশে উপনীত হবে সকলে। ওই সেতু স্থাপিত থাকবে জাহান্নামের উপর। জাহান্নামের অবস্থা হবে তখন বরফের চেয়েও বেশী হিমশীতল। হজরত আবদুল্লাহ্র বর্ণনায় এসেছে ভূপৃষ্ঠ তখন থাকবে উত্তপ্ত অবস্থায়। ফলে সকলে হয়ে পড়বে পিপাসিত। বিশ্বাসীরা তাদের আপনাপন নবীর হাউজে কাওসার থেকে পানি সংগ্রহ করে পান করবে এবং পরিতৃপ্ত হবে। লাভ করবে অপার করুণাপরবশ আল্লাহ্র আতিথ্য। তাদের পদতলের মাটিকে করে দেয়া হবে রুটির স্তূপ। ব্যঞ্জনের ব্যবস্থাও থাকবে । ব্যঞ্জন হবে ভাজা মাছ অথবা কোনো প্রাণীর ভুনা করা কলিজা। জান্নাত যাত্রীরা ওই উপাদেয় রুটি ও ব্যঞ্জন আহার করবে শান্তির সঙ্গে।

তিবরানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে ইবনে আদীর শিথিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তখন পৃথিবীর মসজিদগুলো ছাড়া অন্য সকল কিছুই হারিয়ে যাবে চিরতরে। একত্র করা হবে কেবল মসজিদগুলোকে।

আমি বলি, বর্ণনাটি যদি প্রামাণ্য হয়, তবে তার মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— মসজিদসমূহের জমিনগুলোকে মিশিয়ে দেয়া হবে জান্নাতের সঙ্গে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার প্রকোষ্ঠ ও মসজিদের মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের একটি উদ্যান। হাদিসটি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম, আহমদ ও নাসায়ী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহ্র সম্মুখে, যিনি এক, পরাক্রমশালী।' একথার অর্থ— আপনাপন কবর থেকে উত্থিত হয়ে পুরস্কার অথবা তিরস্কার লাভের নিমিত্তে বিচারের ময়দানে মহাপরাক্রমশালী ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র সম্মুখে তখন উপস্থিত হবে সকল মানুষ। এখানে 'ওয়াহিদ' অর্থ এক বা অদ্বিতীয়। আর 'কাহ্হার' অর্থ মহাপরাক্রমশালী। এখানে আল্লাহ্র এ দু'টো নামের উল্লেখ থাকায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, সেদিনের অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

সুরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৪৯, ৫০

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ۝

❒ সেই দিন তুমি অপরাধিগণকে দেখিবে হস্তপদ শৃংখলিত অবস্থায়,

❒ উহাদিগের জামা হইবে আল্কাত্রার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করিবে উহাদিগের মুখমণ্ডল;

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! সেদিন আপনি দেখবেন সকল অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদের হাত ও পা শৃংখলাবদ্ধ করা হয়েছে। সাঈদ ইবনে মানসুরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর ফারুক বলেছেন, সেদিন পুণ্যবানদেরকে পুণ্যবানদের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হবে জান্নাতে। আর জাহান্নামে মিলিয়ে দেয়া হবে অপরাধীদের সঙ্গে অপরাধীদেরকে। অথবা তাদেরকে মিলিয়ে দেয়া হবে শয়তানের সঙ্গে । 'শৃংখলিত' কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, তখন তাদের পৃথিবীতে সম্পাদিত অসৎ বিশ্বাস ও কর্মসমূহের সঙ্গে তাদেরকে করে দেয়া হবে চিরশৃংখলিত। এভাবে তারা হবে জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী অথবা তাদের হাত ও পা একত্র করে তাদের কাঁধের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে শিকল দিয়ে বেঁধে দেয়া হবে। এখানে উল্লেখিত 'আসফাদ্' শব্দটি 'সফ্দ' এর বহুবচন। এর অর্থ শিকলসমূহের বেড়ি।

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'তাদের জামা হবে আল্কাত্রার।' একথার অর্থ— দাহ্য পদার্থরূপে ব্যবহৃত আল্কাত্রার মতো ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের তরল ও দুর্গন্ধযুক্ত এক ধরনের বস্তু দ্বারা গঠিত হবে জাহান্নামীদের পোশাক। ঘা পাঁচড়ায় আক্রান্ত উটের গায়ে যে তেজস্ক্রিয় তরল পদার্থ মলম হিসেবে ব্যবহার করা হয়, জাহান্নামীদের গায়ে লেগে থাকবে সেরকমই ঘোর কালো ও তেজস্ক্রিয় পরিচ্ছদ। ক্বারী ইয়াকুব ও ইকরামা 'মিন্ক্বাত্বিরান্' কথাটিকে পড়তেন 'মিন্ ক্বিত্বরিন আসিন।' 'আসিন' অর্থ ফুটন্ত। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— ফুটন্ত বা গলিত তামা বা পিতল। অর্থাৎ জাহান্নামীদের গাত্রাবরণ হবে গলিত তামা বা পিতলের।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল।' মানুষের প্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে মুখমণ্ডলই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত, যেমন, অপ্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কলব্ বা হৃদয়।

এখানে বলা হয়েছে, জাহান্নামীদের মুখাবয়ব হবে অনলাচ্ছাদিত। তেমনি অন্যত্র বলা হয়েছে— ওয়াতাত্ত্বালিউ' আ'লাল আফ্য়িদাহ্ (আর তা প্রকট হবে তাদের অন্তঃকরণে)। তাই এরকম বলা যায় যে, যারা পৃথিবীতে তাদের জ্ঞান ও চিন্তার অশ্বে আরোহণ করে সত্যের শহরে উপনীত হয়নি, তাদের মুখমণ্ডল অনলাবৃত করে দেয়াই সমীচীন। অজ্ঞতার আগুনে তাদের অন্তর পরিপূর্ণ। আখেরাতে ধর্মবোধ-শূন্যতার ওই আগুনই আচ্ছাদন করবে তাদের মুখমণ্ডলকে।

www.eelm.weebly.com

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

❐ ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

❐ ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে তিনি একমাত্র ইলাহ্ এবং যাহাতে বোধশক্তিসম্পন্নেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এটা এজন্যে যে আল্লাহ্ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন।' এখানে কুল্‌লা নাফসিন্ (প্রত্যেকের কৃতকর্মের) বলে প্রত্যেক পাপীর কৃতকর্মের কথা বলা হয়েছে। আবার কথাটির মাধ্যমে পুণ্যবান-পাপী নির্বিশেষে সকল মানুষকেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। কারণ পাপীদের প্রতিফল যখন দেয়া হবে, তখন পুণ্যবানদেরও প্রতিফল দেয়া হবে নিশ্চয়। প্রথম ব্যাখ্যানুসারে 'লিইয়াজ্‌জিয়া' (প্রতিফল দিবেন) কথাটি সম্পৃক্ত হবে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'মুক্বার্‌রানীন' (হস্ত-পদ শৃংখলিত অবস্থায়) অথবা 'তাগ্‌শা' (অগ্নি আচ্ছাদন করে) কথাটির সঙ্গে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে কথাটি সম্পর্কিত হবে পরের আয়াতে উল্লেখিত 'বালাগুন' (এক বার্তা) কথাটির সঙ্গে। কারণ ওই বার্তার লক্ষ্যস্থল সকল মানুষ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।' আল্লামা সুয়ূতি বলেছেন, এ কথার অর্থ— সেদিন একজনের হিসাব গ্রহণের কারণে অন্যজনের হিসাব গ্রহণ বিলম্বিত হবে না। অনেক লোকের হিসাব নেয়া হবে এক মুহূর্তে। তিনি আরো লিখেছেন, পৃথিবীর অর্ধদিবস কাল সময়ের মধ্যেই আল্লাহ্পাক সকলের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করবেন। এক বর্ণনানুসারে ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, সাহাবায়েকেরাম বিশ্বাস করতেন পৃথিবীর অর্ধদিবস সময়ের মধ্যেই সকলের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হবে। তাঁরা এরকমও বলতেন যে, এরপর জান্নাতবাসীরা জান্নাতে গিয়ে কাইলুলা (দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম) করবে। একই সময়ে জাহান্নামীরা উপনীত হবে জাহান্নামে। আবু নাঈম ইবনে মুবারক।

 www.eelm.weebly.com

ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মুবারকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, ওই দিন দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই বেহেশত-বাসী বেহেশতে এবং দোজখবাসীরা দোজখে গিয়ে উপস্থিত হবে। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, বিচারের কাজ চলবে দুপুর পর্যন্ত। এরপর আল্লাহ্প্যাকের অনুগ্রহভাজনেরা মিলিত হবে বেহেশতের আয়তআখিনী হুরগণের সঙ্গে। আর আল্লাহ্র দুশমনেরা মিলিত হবে শয়তানের সঙ্গে। আমি বলি, হজরত সাহাবায়েকেরামের বর্ণিত বাণীসমূহের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সেদিনের অর্ধদিবস আখেরাতেরই অর্ধদিবস, দুনিয়ার নয়।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'এটা মানুষের জন্য এক বার্তা, যাতে এর দ্বারা তারা সতর্ক হয়।' একথার অর্থ— এই কোরআন অথবা এই সুরা কিংবা ইতোপূর্বে আলোচিত দোজখীদের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ মানুষের জন্য সতর্ক-বার্তা, যাতে তারা যথাসময়ে সতর্ক হয় এবং পদবিক্ষেপ করে সত্যের পথে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র ইলাহ্ এবং যাতে বোধশক্তিসম্পন্নেরা উপদেশ গ্রহণ করে।' এ কথার অর্থ— এই কোরআনের মাধ্যমে যেনো সকলে জানতে পারে যে, আল্লাহ্তায়ালাই একমাত্র উপাস্য। আর যারা বোধশক্তিসম্পন্ন, তারা যেনো এই কোরআনের মর্মস্পর্শী উপদেশসমূহ অনুধাবন করে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

এতক্ষণ ধরে আলোচিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সকল আকাশজ গ্রন্থ অবতরণের মূল উদ্দেশ্যসমূহ এক। আর সেগুলো হচ্ছে— ১. নবী-রসুলগণের মাধ্যমে মানব জাতিকে সতর্কীকরণ, যা আল্লাহ্পাকের নিকট সংরক্ষিত থাকবে দলিল হিসেবে। ২. মানুষের চিন্তা-চেতনাকে পূর্ণত্বদান। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্তায়ালার পরিচিতি লাভই হচ্ছে চিন্তা-চেতনার পূর্ণত্ব। ৩. সত্তা ও সত্তাসংশ্লিষ্ট কার্যকলাপ সমূহের পরিশুদ্ধি, যা অর্জিত হতে পারে কোরআনে বর্ণিত উপদেশামৃতের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, যাদের হৃদয় আল্লাহ্র স্মরণে ও ভয়ে পরিপূর্ণ, কথিত পরিশুদ্ধি অর্জন করতে পারেন কেবল তাঁরাই।

www.eelm.weebly.com

সুরা হিজর

সুরা হিজর অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কেবল ৮৭ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। সুরা ইউসুফের পরে অবতীর্ণ এই সুরায় রয়েছে ৬ রুকু ও ৯৯ আয়াত।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ

❒ আলিফ-লাম-রা, এইগুলি আয়াত মহাগ্রন্থের, সুস্পষ্ট কুরআনের।

প্রথমে উল্লেখিত আলিফ লাম র হচ্ছে হরুফে মুকাত্তায়াত বা বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি। এগুলোর মর্ম রহস্যাচ্ছন্ন। আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং অতি নগণ্য সংখ্যক রসুল-প্রেমিক এগুলোর রহস্য সম্পর্কে অবগত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এগুলো আয়াত মহাগ্রন্থের সুস্পষ্ট কোরআনের।' এখানে 'তিলকা' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে আলোচ্য সুরার প্রতি অথবা সুরার আয়াতসমূহের প্রতি। আর 'আলকিতাব' দ্বারা বুঝানো হয়েছে এই সুরাকে অথবা সম্পূর্ণ কোরআনকে। মহামর্যাদার প্রতীক হিসেবে এখানে 'কোরআন' শব্দটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তানভিন। এভাবে এখানে 'কোরআন' কথাটি হয়েছে 'কোরআনিন'। আর মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— এই কোরআন সুস্পষ্ট, বৈধ-অবৈধ ও সুপথ-বিপথের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণায়ক।

www.eelm.weebly.com

চতুর্দশ পারা

সুরা হিজর ঃ আয়াত ২

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ○

❒ কখনও কখনও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা চাহিবে যে, তাহারা মুসলিম হইলে ভাল হইত।

আলোচ্য আয়াতের অর্থ— মহাবিচারের দিবসে মুসলমানদের মহাসফলতা দেখে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তরে কখনো কখনো একথার উদয় হবে যে, হায়! পৃথিবীতে আমরাও যদি তাদের মতো ইমানদার হতাম, তাহলে কতই না ভালো হতো।

'রুব্বা' শব্দটি স্বল্পতাপ্রকাশক, কিন্তু এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আধিক্য প্রকাশার্থে। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন প্রায় সবসময়, অর্থাৎ যতক্ষণ হাশরের প্রান্তরে উপস্থিত থাকবে ততক্ষণ এই কামনাই করবে যে, পৃথিবীতে ইসলাম গ্রহণ করলে কতোই না উত্তম হতো। কিন্তু স্বল্পতা ও আধিক্য বিপরিতধর্মী। এরকমও বলা যায় যে— ওই সময় প্রায় সারাক্ষণ তারা এই চিন্তাই করতে থাকবে যে, পৃথিবীতে এক মুহূর্তের জন্যও যদি তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতো তবে কতো ভালোই না হতো। অথবা এখানে 'আধিক্য' কথাটির এরকম মর্মও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, এখানকার মতো ইসলামের প্রতি এরকম প্রবল আগ্রহ যদি পৃথিবীতে থাকতে তাদের অন্তরে উদয় হতো, তবে তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীই বা থাকতো কেমন করে? এসকল ব্যাখ্যা লক্ষ্য করলে মনে হয় 'রুব্বা' শব্দটির অর্থ এখানে 'স্বল্পতা' গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। বঙ্গানুবাদে তাই বলা হয়েছে কখনো কখনো। তাছাড়া কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা এখানকার 'রুবামা' কথাটি 'স্বল্পতা' অর্থেই গ্রহণ করেছেন। কারণ বিচারদিবসের ভয়াবহতা দর্শনে তারা তখন থাকবে অত্যধিক আতংকগ্রস্ত। তাই জ্ঞানের ক্রিয়া হবে রুদ্ধপ্রায়। ওই অবস্থায় হঠাৎ কখনো জ্ঞান কার্যকর হলে তাদের মনে হতে থাকবে যে, পৃথিবীতে ইসলাম গ্রহণ করলে কতো ভালোই না হতো।

www.eelm.weebly.com

'রুবামা' শব্দটির 'মা' অক্ষরটি পূর্ণতা প্রকাশক। একারণেই অক্ষরটি ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছে। নতুবা যের প্রদানকারী অব্যয় সংযুক্ত হতে পারে কেবল নামপদের সঙ্গে। লক্ষণীয় যে, অতীতকালবাচক ক্রিয়ার সঙ্গেই কেবল এরকম বর্ণের সংযোগ ঘটে। অথচ এখানে অক্ষরটির সংযোগ ঘটেছে বর্তমান ও ভবিষ্যত কালবাচক ক্রিয়ার সঙ্গে। এর কারণ হচ্ছে, পুনরুত্থান দিবসে বিচার কার্য সংঘটিত হবেই। বিষয়টি অতীতকালে সংঘটিত ঘটনার মতো স্থিরনিশ্চিত। অর্থাৎ মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, বিচারকার্য এসকল কিছু ঘটবেই ঘটবে।

ইবনে জারীর, ইবনে মুবারক ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত আনাস বলেছেন, যখন জাহান্নামে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপী বিশ্বাসীগণকে একত্র করা হবে, তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলবে, তোমরা না বিশ্বাসী। কিন্তু এখন যে দেখছি তোমাদের ও আমাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। তাদের একথা শুনে আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদেরকে বের করে আনবেন জাহান্নাম থেকে। হান্নাদ, সাঈদ ইবনে মানসুর ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সেদিন আল্লাহ্ পাপী বিশ্বাসীদের জন্য রসুল স. এর শাফায়াত মঞ্জুর করবেন। এভাবে তাদের অনেককে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে। শাফায়াতপর্ব শেষ হলে বর্ষণ করবেন বিশেষ করুণা। এভাবে নিষ্কৃতি দিবেন অনেক পাপীকে। পরিশেষে এমনও বলবেন, সকল গোনাহ্গার ইমানদারেরা বের হও। প্রবেশ করো জান্নাতে। এসকল দৃশ্য দেখে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আক্ষেপ করতে থাকবে, হায়! আমরা যদি মুসলমান হতাম, কতোই উত্তম হতো— আলোচ্য আয়াতে একথাই বলা হয়েছে।

তিবরানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত একটি বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত হাদিস বর্ণনা করেছেন এভাবে, রসুল স. একবার বললেন, আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোককে পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। তাদের জাহান্নামবাসের সময়সীমা হবে সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায় নির্ভর। অবিশ্বাসীরা তাদেরকে তখন তিরস্কার করে বলবে, ইমান এনেও তোমাদের তো কোনো কল্যাণ হলো না। এরপর আল্লাহ্ সকল ইমানদারকে সেখান থেকে বের করে আনবেন, একজন বিশ্বাসীও আর দোজখে থাকবে না। একথা বলে রসুল স. পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

তিবরানী, ইবনে আসেম ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু মুসা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র অভিপ্রায়ানুসারে চিরস্থায়ী নরকবাসীদের সঙ্গে নরকে প্রবেশ করবে কিছু সংখ্যক বিশ্বাসী। অবিশ্বাসীরা তাদেরকে দেখে বলবে, তোমরা কি মুসলমান ছিলে না? তারা বলবে ছিলামই তো। অবিশ্বাসীরা বলবে, তবে ইসলাম তো তোমাদের কোনো উপকারে এলো

 www.eelm.weebly.com

না। তোমরাও এখন আমাদের সঙ্গী। বিশ্বাসীরা বলবে, আমরা কিছু পাপ করেছিলাম তাই আমাদেরকে প্রবেশ করানো হয়েছে এখানে। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের এরকম কথা-বার্তা চলাকালে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদেশ দেয়া হবে, সকল বিশ্বাসীকে নরক থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হোক। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ কার্যকর করা হবে। তখন চিরস্থায়ী নরকবাসীরা বলবে, আমরা বিশ্বাসী হলে কতোই না ভালো হতো। আমাদেরকেও এভাবে দেয়া হতো পরিত্রাণ। এরপর রসুল স. আলোচ্য আয়াতটি আবৃত্তি করলেন। বাগবীর বর্ণনায় এই হাদিসের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে অতিরিক্ত এই কথাটুকু— আল্লাহ্ সকল বিশ্বাসীকে নরক থেকে বের করে আনবেন। ওই সময় 'মুসলমান হলে কতো ভালো হতো'— একথা বলে আক্ষেপ করতে থাকবে কাফেরেরা।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত আবু সাঈদ খুদরীকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে রসুলের প্রিয় সহচর! আপনি কি রসুল স.কে এই আয়াত সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বলেছেন, প্রাথমিক অবস্থায় কিছু সংখ্যক মুসলমানকেও অবিশ্বাসীদের সঙ্গে দোজখে প্রবেশ করানো হবে। তখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলবে, তোমরা তো পৃথিবীতে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করতে। তবে তোমরা এখন আমাদের মতো দোজখবাসী হলে কেনো? তাদের একথা শুনে আল্লাহ্ সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন। অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবীগণ ও ফেরেশতামণ্ডলী তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। তখন আল্লাহ্‌র বাসনানুসারে ওই সকল পাপী মুসলমানকে দোজখ থেকে বের করে আনা হবে। এই দৃশ্য দেখে অবিশ্বাসীরা আপন মনে বলে উঠবে, আহ্! আমরা যদি মুসলমান হতাম, তবে কতোই না উত্তম হতো, এরকম সুপারিশ আমাদের ভাগ্যেও ঘটতো।

দোজখ থেকে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত মুসলমানদের মুখমণ্ডল হবে কালাভ। তাদের ওই কালো মুখ দেখে বেহেশতবাসীরা তাদেরকে বলবে দোজখী। তারা তখন নিবেদন করবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের দোজখী নাম মুছে দিন। আদেশ দেয়া হবে, বেহেশতের নদীতে গোসল করো। তারা গোসল করবে। মুছে যাবে তাদের মুখাবয়বের কালো আভা। মিটে যাবে তাদের দোজখী নাম।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, কাফেরেরা মুসলমান হওয়ার অভিলাষ প্রকাশ করবে তখন, যখন পাপী মুসলমানদেরকে দোজখ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে বেহেশতের দিকে। হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, যারা পৃথিবীতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' কলেমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা দোজখে প্রবেশ করলেও একসময় নিষ্কৃতি পাবে।

www.eelm.weebly.com

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا أَهْلَكْنَا
مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝
وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝ لَوْ مَا تَأْتِينَا
بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ
مَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ۝

❒ উহারা যাহা করে করুক— খাইতে থাকুক, ভোগ করিতে থাকুক এবং আশা উহাদিগকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক— পরিণামে উহারা বুঝিবে।

❒ আমি কোন জনপদকে তাহার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হইলে ধ্বংস করি না।

❒ কোন জাতি তাহার নির্দিষ্ট কালকে ত্বরান্বিত করিতে পারে না, বিলম্বিতও করিতে পারে না।

❒ উহারা বলে, 'ওহে যাহার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে! তুমি তো নিশ্চয় উম্মাদ।

❒ তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগের নিকট ফেরেশতাগণকে উপস্থিত করিতেছ না কেন?'

❒ আমি ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করি হুকুম জারি করিবার জন্যই; ফেরেশতাগণ উপস্থিত হইলে উহারা অবকাশ পাইবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি পৃথিবীপূজক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ইমান আনয়নের আশা পরিত্যাগ করুন। আল্লাহ্ সকলের আদি-অন্তের সকল কিছুই জানেন। তাই তিনি আপনাকে জানাচ্ছেন যে, অদৃষ্টলিপি অনুসারে তারা চির অবিশ্বাসী। সুতরাং তাদের দিকে আর আপনি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। তাদের কর্মকাণ্ড, আহার-বিহার, ভোগ-সম্ভোগ ও কামনা-বাসনার প্রতি দৃকপাত মাত্র করবেন না। মোহগ্রস্ত অবস্থাতেই তাদেরকে দিনাতিপাত করতে দিন। একসময় তারা তাদের ভয়াবহ পরিণাম অবশ্যই দেখতে পাবে।

পরের আয়াতের (৪) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আরো শুনুন, কোনো জনপদের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আমি ধ্বংস করি না। আমার এই নির্ধারণ লিপিবদ্ধ রয়েছে সুরক্ষিত ফলকে (লওহে মাহফুজে)।

এর পরের আয়াতের (৫) মর্মার্থ হচ্ছে— শাস্তির নির্ধারিত সময়কে কেউ এগিয়ে আনতে পারে না। আবার পিছিয়েও দিতে পারে না।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতদ্বয়ের (৬,৭) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার শত্রুরা কি বলে, তা আমি জানি। হিংসাবশতঃ তারা উপহাসার্থে বলে, হে মোহাম্মাদ! তুমি বলো, তোমার উপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। উন্মাদ ছাড়া এরকম কথা কি কেউ বলে? নিশ্চয় তুমি উন্মাদ। তোমার কথা যদি সত্যই হয়ে থাকে তবে তোমার পক্ষের সাক্ষী হিসেবে ফেরেশতাদের আনছো না কেনো? অথবা এই যে আমরা ক্রমাগত তোমাকে অস্বীকার করে চলেছি, তার জন্য ফেরেশতাদেরকে ডেকে এনে আমাদেরকে শাস্তি দিতে পারছো না কেনো? যেমন তারা শাস্তি দিয়েছিলো বিগত যুগের অবাধ্য সম্প্রদায়গুলোকে। উল্লেখ্য যে, অপর এক আয়াতেও কাফেরদের এরকম কথার উল্লেখ রয়েছে। যেমন— 'তার স্বপক্ষে ফেরেশতামণ্ডলী অবতীর্ণ হয় না কেনো? তারা তো তার সঙ্গে হতে পারে ভীতি প্রদর্শনকারী।'

এর পরের আয়াতের (৮) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, আমি ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করি অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য, যে শাস্তি সুনির্ধারিত। আর যখন আমার আদেশে ফেরেশতারা শাস্তি কার্যকর করতে শুরু করে, তখন তাদের পরিত্রাণের সকল পথ হয়ে যায় রুদ্ধ।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৯, ১০, ১১, ১২

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ ○ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي
شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ○ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ○ كَذٰلِكَ
نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ○

❒ আমিই কুর্আন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই ইহার সংরক্ষণ করিব।

❒ তোমার পূর্বে আমি পূর্বের অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রসূল পাঠাইয়াছিলাম।

❒ তাহাদিগের নিকট আসে নাই এমন কোন রসূল যাহাকে উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত না।

❒ এইভাবে আমি অপরাধীদিগের অন্তরে বিদ্রূপ-প্রবণতা সঞ্চার করি,

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমিই অবতীর্ণ করেছি এই কোরআন। আর আমিই এর সংরক্ষক। কোরআন অস্বীকারকারীদের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই আয়াতে। এখানে 'সংরক্ষক' কথাটির অর্থ— এই কোরআন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, হ্রাস-বৃদ্ধি এবং সকল প্রকার বিকৃতি থেকে

চিরমুক্ত। কারণ আমি স্বয়ং এর সংরক্ষক। উল্লেখ্য যে, এ কারণেই শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে কোরআনের বাণী-বৈভব রয়েছে অবিকৃত। অথচ হতভাগা রাফেজীরা বলে, এই কোরআন ছিলো চল্লিশ পারা। তিরিশ পারা রেখে বাকী দশ পারা জ্বালিয়ে দিয়েছেন হজরত ওসমান। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, কোরআনের এই আয়াতের উপরে তাদের বিশ্বাস নেই। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে কোরআনের সংরক্ষক বলে তারা মানে না। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'লাহু' (এর বা তার) কথাটির 'হু' সর্বনাম রসুল স. এর সঙ্গে সম্বন্ধিত। অর্থাৎ এখানে রসুল স. এর সংরক্ষণ বা হেফাজতের কথা বলা হয়েছে। অপর এক আয়াতেও এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— ওয়াল্লহু ইয়া'সিমুকা মিনান্নাসি (আর আল্লাহ্ আপনাকে হিফাজত করেন মানুষের অকল্যাণ থেকে)।

পরের আয়াতের (১০) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার পূর্বেও আমি অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রসুল পাঠিয়েছিলাম। এখানে উল্লেখিত 'শীয়ায়্' শব্দটি 'শীয়াতুন' শব্দের বহুবচন। এক মতাদর্শে বিশ্বাসী দলকে বলে শীয়াহ্। 'শাআহু' অর্থ, সে তার অনুসরণ করেছে। হালকা জ্বালানীর সহায়তায় ভারী কোনো দাহ্য বস্তুকে দগ্ধ করার নাম 'শীয়ায়্।'

এর পরের আয়াতের (১১) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল ! অবিশ্বাসীদের অপমন্তব্য শুনে আপনি ব্যথিত হবেন না । সকল যুগের অবিশ্বাসীদের আচরণ এরকমই। আপনার পূর্বে আমি যাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, তাদেরকেও তারা এভাবেই বিদ্রূপবানে জর্জরিত করেছিলো। এভাবে এই আয়াতে রসুল স.কে শোনানো হয়েছে সান্ত্বনার বাণী।

এর পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে বিদ্রূপপ্রবণতা সঞ্চার করি।' একথার অর্থ— বিদ্রূপপ্রবণতা হচ্ছে সকল যুগের সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের স্বভাব। আর তাদের অন্তরে ওই বিদ্রূপপ্রবণতা সঞ্চার করি আমিই। উল্লেখ্য যে, এই আয়াত কদ্‌রিয়া সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে। তারা বলে, মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা। অথচ এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তরে বিদ্রূপপ্রবণতা সঞ্চার করেন আল্লাহ্ স্বয়ং।

'মুজরিমীন' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মক্কার পৌত্তলিকদেরকে। এখানকার 'নাস্‌লুকু' শব্দটি এসেছে 'সিল্‌ক' থেকে। এর অর্থ সঞ্চার করা, সঞ্চালন করা বা এক বস্তুর মধ্যে অপর কোনো বস্তু অনুপ্রবেশ করানো। যেমন, সূচের মধ্যে সুতা, আহত স্থানে প্রবিষ্ট বল্লমের অগ্রভাগ ইত্যাদি। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— এমনি করে আমি মক্কার মুশরিকদের অন্তরে পরিহাসপ্রবণতা সঞ্চারিত করেছি।

 www.eelm.weebly.com

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ○ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ○ لَقَالُوْآ اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ○

❒ ইহারা কুরআনে বিশ্বাস করিবে না এবং অতীতে পূর্ববর্তীগণেরও এই আচরণ ছিল।

❒ যদি উহাদিগের জন্য আকাশের এক দুয়ার খুলিয়া দিই এবং উহারা দিনের বেলা উহাতে আরোহণ করে,

❒ তবুও উহারা বলিবে, 'আমাদিগের দৃষ্টি মোহাবিষ্ট হইয়াছে; নতুবা আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল ! আপনি তাদেরকে যতই বোঝান না কেনো তারা বুঝবে না। কিছুতেই তারা স্বীকার করবে না কোরআনকে। এটাই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চিরন্তন আচরণ। আল্লাহ্ও তাই তাদের সঙ্গে এরকম আচরণই করেন। যেহেতু তারা অবিশ্বাসে অনড়, সেহেতু আল্লাহ্ তাদের অবিশ্বাসকে চিরস্থায়ী করে দেন।

পরের আয়াতদ্বয়ের (১৪, ১৫) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আমি যদি তাদেরকে আকাশের একটি দরজা উন্মুক্ত করে দেই এবং তারা প্রকাশ্য দিবালোকে সেখানে আরোহণ করে তবুও তারা বলবে, যাদুমন্ত্রের দ্বারা আমাদেরকে নজরবন্দী করা হয়েছে। আমরা এখন যাদুগ্রস্ত, মোহাবিষ্ট।

হাসান বলেছেন, 'তারা দিনের বেলা তাতে আরোহণ করে' কথাটির অর্থ হবে এখানে— যদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা প্রকাশ্য দিবালোকে আকাশমার্গে আরোহণ করে এবং প্রত্যক্ষ করে সেখানকার রহস্যাবলী। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'সুক্কিরাত' শব্দটির ধাতুমূল হচ্ছে 'সকর'। এর অর্থ, নদীর প্রবাহ রুদ্ধ করা। হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। হাসান বসরী বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ হবে, যাদুর প্রভাবে আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানো হয়েছে। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে, আমাদের চোখগুলো বসিয়ে দেয়া হয়েছে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে। কালাবী কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— আমাদের চক্ষুগুলোকে করে দেয়া হয়েছে দৃষ্টিহীন। কামুস গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'সুক্কিরাত আব্সারুনা' অর্থ— হরণ করা হয়েছে দর্শনশক্তি।

www.eelm.weebly.com

'আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়' কথাটির অর্থ মক্কার কাফেরেরা বলতো, মোহাম্মদ আমাদেরকে যাদুগ্রস্ত করেছে। উল্লেখ্য যে, তারা কোনো মোজেজা দেখলে এরকম বলতো। এখানকার 'ইন্না' এবং 'বার' শব্দ দু'টোর কারণে প্রমাণিত হয় যে, মক্কার কাফেরেরা কোরআনকে নিশ্চিত যাদু বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো। মনে করতো কোরআন তাদের চিন্তা-চেতনাকে মোহাবিষ্ট করে ফেলে।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ○ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ○ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ○

❒ আকাশে আমি রাশিচক্র সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে করিয়াছি সুশোভিত— দর্শকদিগের জন্য;

❒ প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হইতে আমি উহাকে রক্ষা করিয়া থাকি;

❒ আর কেহ চুরি করিয়া আকাশের সংবাদ জানিতে চাহিলে উহার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আকাশে আমি রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি।' 'বুরুজ' অর্থ রাশিচক্র । শব্দটির বুৎপত্তি ঘটেছে 'তাবার্‌রুজ' থেকে । এর অর্থ প্রকাশ পাওয়া। বলা হয় 'তাবার্‌রাজাতিল মারআতু' অর্থ, স্ত্রী লোকটির অভ্যুদয় ঘটেছে। তেমনি বৃহৎ নক্ষত্রের অভ্যুদয় বা উদয়কে বলে 'বুরুজ'। আতিয়া বলেছেন, আকাশমার্গে রয়েছে বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদ। তবে আলোচ্য বাক্যের 'বুরুজ' বা রাশিচক্র ওই রাশিচক্র নয়, যার অবতারণা করেছে ভারতীয় জ্যোতির্বিদেরা। তাদের রাশিচক্র তাদের নিজস্ব চিন্তা-গবেষণার ফসল। তাদের ধারণা, আকাশগুলো পরস্পরজড়িত। একটি অপরটির দ্বারা আবৃত। এভাবে নয়টি আকাশ সতত পরিক্রমণরত। এই নয় আকাশের পরিক্রমণের জন্য রয়েছে একটি বৃত্ত ও দু'টি প্রান্ত। অষ্টম আকাশটি আবার স্থির ও শূন্য, তার জন্য রয়েছে একটি কেন্দ্র ও দু'টি মেরু। সূর্যের অবস্থান ওই অষ্টম আকাশের বৃত্তে। বর্ণিত বৃত্ত দু'টো আবার পরস্পরবিচ্ছিন্ন। চারটি মেরুপ্রান্তের মধ্যখানে যদি একটি রেখা টানা যায়, তবে সৃষ্ট হবে চারটি উপবৃত্ত। ওই উপবৃত্ত চতুষ্টয়ে রয়েছে তিনটি করে রাশি। এ সকল অলীক মতবাদ শরিয়ত সমর্থিত নয়। আকাশসমূহের পরিক্রমণও শরিয়ত বিরোধী। আকাশ স্থির, কিন্তু নক্ষত্রপুঞ্জের পরিক্রমণ শরিয়তসমর্থিত। এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব পাঁচশত বছর পথের দূরত্বের সমান। আর শরিয়তের নির্ধারণ এই যে, আকাশের সংখ্যা সাতটি।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাকে করেছি সুশোভিত, দর্শকদের জন্য।' একথার অর্থ— বিশাল আকাশকে আমি করেছি নয়নাভিরাম, চন্দ্রসূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি তাকে রক্ষা করে থাকি।' একথার অর্থ— অভিশপ্ত শয়তানদের কবল থেকে আমি আকাশের রহস্য, ব্যবস্থাপনা ও আকাশবাসীদেরকে রক্ষা করি। সুরক্ষিত রাখি সেখানে তার অনধিকার প্রবেশ থেকে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইতোপূর্বে শয়তানেরা অবাধে আকাশে গমনাগমন করতে পারতো। আকাশে গিয়ে তারা ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনে এসে জ্যোতিষদেরকে জানাতো। হজরত ঈসা রুহুল্লাহ্র আবির্ভাবের পর উপরের তিনটি আকাশে তাদের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়া হলো। শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর আবির্ভাবের পর তাদের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেলো সকল আকাশ। তখন থেকে তাদের কেউ আকাশের দিকে যেতে চেষ্টা করলেই তাদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় উল্কাপিণ্ড। শয়তানের দল তখন তাদের নেতা ইবলিসকে জানায়, নিশ্চয় পৃথিবীতে নতুন কিছু ঘটেছে। ইবলিস বলে, খুঁজে দেখো, কোথায় কার আবির্ভাব ঘটেছে। তারা অনুসন্ধান করে দেখতে পায় মাটির পৃথিবীতে শুভাগমন ঘটেছে শেষ রসুলের। আর তিনি শুরু করেছেন কোরআনের প্রচার। শয়তানেরা তখন বলতে থাকে, আল্লাহ্র শপথ! পৃথিবীতে ঘটেছে অভিনব এক ঘটনা।

এর পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'আর কেউ চুরি করে আকাশের সংবাদ জানতে চাইলে তার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা।' এখানে 'শিহাব্' অর্থ প্রদীপ্ত শিখা, যা বিচ্ছুরিত হয় নক্ষত্র থেকে। ব্যাপারটি এরকম— শয়তানেরা একে অপরের কাঁধে ভর করে আকাশ পর্যন্ত উঠে যায়। চুপিসারে শুনতে চেষ্টা করে আকাশের ফেরেশতাদের আলাপচারিতা। কিন্তু তারা সফল হয় না। কারণ ফেরেশতারা তাদেরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারে আগুনের গোলা। ওই আগুনের গোলাকেই এখানে বলা হয়েছে প্রদীপ্ত শিখা। বলা বাহুল্য যে, ফেরেশতাদের ওই অগ্নিবান লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। ফলে শয়তানদের কেউ কেউ হয় ছিন্নহস্ত, দগ্ধমুখ অথবা ভগ্নপঞ্জর। ওই পঙ্গু, বিকলাংগ ও প্রায়োন্মাদ শয়তানেরা শেষে আশ্রয় গ্রহণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন অরণ্যে। পথিকদেরকে করে বিব্রত, বিভ্রান্ত। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যখন আকাশবাসী ফেরেশতাদের নিকটে কোনো বিষয়ের সমাধান দান করেন, তখন আল্লাহ্র অপার পরাক্রমের প্রভাবে তারা ডানা

ঝাপটাতে শুরু করে। ফলে ধ্বনিত হয় ঝম ঝম আওয়াজ। মনে হয় যেনো কোনো পাথুরে প্রান্তরে শত সহস্র লোহার শিকল আছড়ানো হচ্ছে। ফেরেশতাদের চঞ্চল বিহ্বল অবস্থা প্রশমিত হয়ে আসে এক সময়। বন্ধ হয়ে যায় ঝম ঝম আওয়াজ। কথাবার্তা শুরু হয় এভাবে— প্রশ্নঃ আমাদের পালনকর্তা কতো সুন্দর সমাধান দিলেন। নয় কি? উত্তরঃ তাঁর সকল সমাধান সত্য ও মহান। এরপর শুরু হয় মূল বিষয়ের আলাপ, শয়তান ঘাপটি মেরে সে কথা শোনে এবং সঙ্গে সঙ্গে তা জানিয়ে দেয় তার পদতলস্থিত শয়তানকে। সে জানিয়ে দেয় তার নিম্নস্থিত শয়তানকে। এভাবে শয়তানের সিঁড়ি বেয়ে আল্লাহ্‌র গোপন সিদ্ধান্তের সংবাদ চলে আসে ভূপৃষ্ঠে। ভূপৃষ্ঠের শয়তানেরা তখন যাদুকর ও গণৎকারকে বিষয়টি অবগত করায়। কখনো কখনো এমনো হয়, শয়তান প্রদত্ত সংবাদ পৃথিবীপৃষ্ঠে নেমে আসার আগেই নিক্ষিপ্ত হতে থাকে অগ্নিশর। তখন যাদুকর ও গণৎকারেরা পুরো তথ্য আর পায় না। যা পায় তার সঙ্গে তারা তখন স্বকপোলকল্পিত অনেক কিছু সংযোজন করে এবং তা প্রচার করে লোকসমক্ষে অলৌকিকত্বের দাবিদার হয়।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌র ফয়সালা জেনে নিয়ে ফেরেশতারা মেঘপুঞ্জের ঊর্ধ্বদেশে অবতরণ করে এবং নিজেদের মধ্যে সে বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে থাকে। শয়তান সে কথাগুলো আড়ি পেতে শুনতে চেষ্টা করে এবং যাদুকর ও গণৎকারের হৃদয়ে সে কথা প্রতিভাসিত করে দেয়। তারা তখন ওই সত্য সংবাদের সঙ্গে অনেক মিথ্যা সংযোজন করে প্রচার করে। বোখারীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে বাগবী ও বোখারীর বর্ণনাসূত্র পৃথক।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ১৯, ২০

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ ۝ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ۝

❒ পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করিয়াছি, এবং উহাতে পর্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছি; আমি পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করিয়াছি সুপরিমিতভাবে,

❒ এবং উহাতে জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছি তোমাদিগের জন্য আর তোমরা যাহাদিগের জীবিকাদাতা নহ তাহাদিগের জন্যও।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— প্রথমে আমি পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছি পানির উপরে। তারপর পৃথিবীর উপর পর্বতমালা স্থাপন করে দূর করে দিয়েছি

 www.eelm.weebly.com

দোদুল্যমানতা। ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠ হয়েছে সুস্থির। এরপর পৃথিবীতে অথবা পর্বতে কিংবা উভয় স্থানে প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করেছি সুপরিমিতরূপে।

এখানে 'মাওযুন' অর্থ সুপরিমিতরূপে। অর্থাৎ সৃষ্টির যথাযোগ্যতানুসারে। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— আমি পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছি তাদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যানুসারে। অথবা যথাপরিমাপ অনুযায়ী। যেমন— সোনা, রূপা, লোহা, তামা, সুরমা ইত্যাদি ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থসমূহ এবং পর্বতস্থিত ইয়াকুত, জবরজদ, ফিরোজা ইত্যাদি।

পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'এবং তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য।' একথার অর্থ— ওই পৃথিবী ও পর্বতেই আমি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছি জীবনোপকরণের। তোমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা— সব কিছুরই ব্যবস্থা করা হয়েছে পৃথিবীতে। এখানকার 'মায়ায়িশা' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'মায়িশাহ্'। এর অর্থ রিজিক, জীবিকা বা জীবনোপকরণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও তাদের জন্যও।' এ কথার অর্থ— পৃথিবীতে এমন অনেক প্রাণী আছে, যাদের জীবিকা সরবরাহের দায়িত্ব মানুষের উপরে নেই। আল্লাহ্ সেগুলোকে রিজিক দান করেন মানুষের মাধ্যম ছাড়াই। এই পৃথিবী থেকেই তারা সকলে রিজিকপ্রাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, কেবল বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন প্রাণীদের জন্য ব্যবহৃত হয় 'মান' (যে) কথাটি। যেমন মানুষ, ফেরেশতা, জ্বিন ইত্যাদি। কিন্তু এখানকার 'মান' কথাটি 'মা' (যার, যাদের) অর্থে ব্যবহৃত । যেমন এক আয়াতে এসেছে— ফামিনহুম মাঁইইয়ামশি আ'লা বাত্নিহী (তন্মধ্যে যেগুলো পেটের উপরে ভর দিয়ে চলে)। এখানেও 'মাঁইইয়ামশি' কথাটির 'মান' (যে) শব্দটি 'মা' (যাদের) এর অর্থ প্রকাশক।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'মান' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে শিশুসন্তান, চাকর-বাকর, অনুচর, দাস-দাসী ও গৃহপালিত পশুকে। অবিশ্বাসীরা মনে করে এগুলোর রিজিক তারাই দিয়ে থাকে। তাদের এমতো ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে আলোচ্য বাক্যে। কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরকম— হে মানুষ! তোমরা যাদের রিজিকদাতা মনে করো এবং যাদেরকে মনে করো না, তাদের সকলের জন্যই আমি এই পৃথিবীতে ও পৃথিবীর পর্বতসমূহে রিজিক সৃষ্টি করে রেখেছি।

www.eelm.weebly.com

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ○ وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ○ وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ○

❐ আমার নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি উহা প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ করিয়া থাকি।

❐ আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি এবং উহা তোমাদিগকে পান করিতে দিই; উহার ভাণ্ডার তোমাদিগের নিকট নাই।

❐ আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমার নিকটে আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার' একথার অর্থ— আমার সৃজনভাণ্ডার অফুরন্ত। তাই আমি করতে পারি প্রতিটি বস্তুর অসংখ্য সংস্করণ। এরকমও বলা যেতে পারে যে, অপরিমেয় ভাণ্ডারের কথা উল্লেখ করে এখানে উপমা দেয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র, অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাক্রমের। অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে যতো খুশী ততো ব্যয় করলেও ভাণ্ডার কখনো নিঃশেষ হয় না। তেমনি বিরামহীনভাবে সৃষ্টি করলেও আল্লাহ্‌র অফুরন্ত সৃজনভাণ্ডারে স্বল্পতা দেখা দেয় না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি তা প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।' একথার অর্থ— আমার অপার প্রজ্ঞাবলে সৃষ্টির যে অদৃষ্টলিপি আমি প্রস্তুত করেছি, সেই অদৃষ্টলিপি অনুসারে আমি সৃষ্টির অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করি।

আমি বলি, সম্ভবতঃ এখানকার 'ভাণ্ডার' কথাটির অর্থ সৃষ্টির আদি রূপ। অর্থাৎ এই সম্ভাব্য জগতের (দায়রায়ে এমকানের) আদি ও অদৃশ্য রূপরেখা, যার অস্তিত্ব রয়েছে আল্লাহ্‌র জ্ঞানে। আর এখানকার 'প্রয়োজনীয় পরিমাণে সরবরাহ করে থাকি' কথাটির অর্থ হবে— ওই আদি ও অদৃশ্য রূপরেখাকে আমি অস্তিত্বের জগতে প্রয়োজনানুসারে প্রতিভাত, প্রতিভাসিত অথবা প্রতিবিম্বিত করি। সুফী দার্শনিকগণের ভাষায় এ অবস্থার নাম অজুদে জিল্লি বা প্রতিবিম্বজ অস্তিত্ব। এই পরিদৃশ্যমান জগতের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌র অতুলনীয় জ্ঞানে রক্ষিত ওই নিরাবয়ব আদিরূপ। বাগবী লিখেছেন, ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, সকল সৃষ্টির

www.eelm.weebly.com

আদিরূপ আল্লাহ্‌র আরশে বিদ্যমান। 'আমার নিকটে আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার' কথাটির মর্মার্থ এরকমই। আমি বলি, ইমাম জাফর সাদেকের 'আরশে বিদ্যমান' কথাটির অর্থ— উপমার জগতে (আলমে মেসালে) বিদ্যমান। মানুষের চিন্তাশক্তির মূল কেন্দ্র যেমন মস্তিষ্ক, তেমনি এই বিশাল সৃষ্টির মূল কেন্দ্র হচ্ছে উপমার জগত। আর উপমার জগতের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আরশ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'খাযাইন্‌' বা ভাণ্ডার অর্থ বৃষ্টি। বৃষ্টি হচ্ছে সকল বস্তুর ভাণ্ডার। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— 'আর আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি পানি থেকে।' হাদিস শরীফে এসেছে, আকাশ থেকে বর্ষিত প্রতিটি বারি বিন্দুর সঙ্গে থাকে একজন করে ফেরেশতা । ওই বারি বিন্দুকে সে নির্দেশপ্রাপ্ত স্থানে পৌঁছে দেয়।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি।' একথার অর্থ— আমি জলবাহী মেঘ সঞ্চালনের জন্য বাতাসকে নির্দেশ দান করি। এখানে 'লাওয়াক্বিহ্‌' শব্দটি 'লাক্বিহাতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ পরিপূরক। রসুল স. 'মুলাক্বিহ্‌' বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। মাতৃগর্ভস্থিত উষ্ট্রশাবককে বলে 'মুলাক্বিহ্‌'। মাতা ব্যতীত এরকম শাবককে বিক্রয় করা নিষেধ। অথবা 'লাওয়াক্বিহ্‌' শব্দটি 'লকুহ্‌' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ দুগ্ধবতী উষ্ট্রী । যাই হোক না কেনো, এখানে 'লাওয়াক্বিহ্‌' অর্থ বৃষ্টিবাহী মেঘমালা সঞ্চালনকারী মৌসুমী বায়ু। বায়যাবী লিখেছেন, ঘনীভূত মেঘমালা বহনকারী বাতাসকে বলে 'লাওয়াক্বিহ্‌'। অপরপক্ষে 'আক্বিম' বা বন্ধ্যাবায়ু বলে ওই বাতাসকে যা বর্ষণযোগ্য মেঘ বহন করে না।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আল্লাহ্‌ বায়ু প্রেরণ করেন। বায়ু পানি উত্তোলন করে। ওই পানি সংরক্ষণ করে মেঘ এবং তা বাতাসের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শেষে উষ্ট্রীর দুগ্ধদানের মতো বৃষ্টি ঝরে পড়ে অঝোর ধারায়।

আবু উবাইদ বলেছেন, 'লাওয়াক্বিহ্‌' শব্দটির অর্থ, 'মালাক্বিহ্‌'। 'মালাক্বিহ্‌' এর একবচন হচ্ছে 'মালকাহাতুন'। এর অর্থ গর্ভসঞ্চারক বায়ু। বৃক্ষ ছড়িয়ে দেয় তার ফুলের রেণু। ফলে বৃক্ষসকল হয় অন্তঃসত্ত্বা। উবাইদ বিন উমায়ের বলেছেন, আল্লাহ্‌ প্রথমে পাঠিয়ে দেন সুসংবাদবাহী সমীরণ। সে সমীরণ পরিচ্ছন্ন করে ভূপৃষ্ঠকে। এরপর তিনি প্রেরণ করেন মেঘপুঞ্জবাহী মলয়। ফলে আকাশে ভেসে আসে মেঘের পরে মেঘ। এরপর আল্লাহ্‌ এমন এক বাতাস প্রবাহিত করেন, যা একত্র করে বিক্ষিপ্ত মেঘগুলোকে। তারপর ওই বাতাস মেঘগুলোকে স্তরে স্তরে সাজিয়েও দেয়। এরপর তিনি প্রেরণ করেন বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু। শুরু হয় বৃষ্টিপাত। সে বৃষ্টিতে ভিজে পৃথিবীর তরুরাজিতে জাগে পুষ্পের সম্ভার। যেনো অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যায় বৃক্ষকুল।

www.eelm.weebly.com

আবু বকর বিন আইয়াম বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত চার ধরনের বায়ু তাদের কর্তব্য শেষ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি বর্ষিত হয় না। পূবাল হাওয়ায় ভেসে আসে মেঘ। পানি ঘনীভূত হয় উত্তুরে বাতাসে। দক্ষিণা বাতাসে শুরু হয় বৃষ্টিপাত। আর পশ্চিমা বাতাস মেঘকে সঞ্চারিত করে এদিকে ওদিকে।

এক হাদিসে এসেছে, দক্ষিণা বাতাসকে বলে 'লাওয়াকি্হ্।' সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যে এসেছে, দক্ষিণা বাতাস প্রবাহিত হলে আংগুর সংগ্রহের হিড়িক পড়ে যায়। বন্ধ্যাবাতাস আনে শান্তি। কিন্তু ফল জন্মে না।

ইমাম শাফেয়ী ও তিবরানী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ঝঞ্ঝা বায়ু শুরু হলে রসুল স. হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ্! এই বাতাসকে করে দাও রহমত। শাস্তি নয়। হে আমার আল্লাহ্ ! এ সমীরণকে করে দাও করুণাবাহী। আযাব নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'রীহ্' অর্থ ওই বায়ু যা উল্লেখিত হয়েছে এই আয়াতে এভাবে— আরসালনা আ'লাইহিম রীহান্ সরসরান্ (আমি তাদের উপর ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করেছি) এবং এই আয়াতে— আরসালনা আ'লাইহিম রীহাল আক্বীম (আমি তাদের উপর বন্ধ্যা হাওয়া সঞ্চালন করেছি)। আর 'রীয়াহ্' অর্থ ওই বাতাস, যার উল্লেখ এসেছে এই আয়াতে— আরসালনার্ রীয়াহা লাওয়াক্বিহা (আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি) এবং এই আয়াতে— ওয়া ইয়ুর্‌সিলুর রীয়াহা মুবাশ্‌শিরাতি (আর সঞ্চারিত হয় সুসংবাদবাহী সমীরণ)।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর মেঘ থেকে বারি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করতে দেই।' এ কথার অর্থ— মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত ঘটাই আমিই। আর মেঘজ সলিলকে আমি তোমাদের জন্য করেছি পানোপযোগী। আরবী প্রবাদে বলা হয়— সাকাইতুর্ রজুলা মাআন আও লাবানান (আমি লোকটিকে পান করিয়েছি, দুধ অথবা পানি)। অর্থাৎ আমি লোকটিকে দুধ অথবা পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছি। আর 'আস্‌কাইতুর্ রজুলা' অর্থ আমি তাকে পানি দিয়েছি, যেনো সে তার ভূমি ও জন্তু-জানোয়ারদেরকে পান করায়।

শেষে বলা হয়েছে— 'তার ভাণ্ডার তোমাদের নিকটে নেই।' এ কথার অর্থ— জীবন-প্রদায়ক পানির অনন্ত ভাণ্ডারের মালিকও আমি। তোমরা নও। অথবা কূপ ও জলাশয়ে পানি সঞ্চয় করে রাখাও তোমাদের কর্ম নয়। সেটাও আমার অভিপ্রায়ভূত। আল্লাহ্‌পাকের সকল কিছুর মধ্যে যেমন রয়েছে মানুষের কল্যাণ, তেমনি কল্যাণ রয়েছে বৃষ্টিবর্ষণের মধ্যেও। এ সকল কিছু হচ্ছে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। পানির স্বভাব নিম্নগামী। উর্ধ্বারোহণের যোগ্যতা তার মধ্যে নেই । অথচ আল্লাহ্‌র কী অপার মহিমা! তিনি

 www.eelm.weebly.com

আকাশে প্রতিনিয়ত ভাসিয়ে চলেছেন জলবতী মেঘের ভেলা। এই বিস্ময়কর নিদর্শনটির মাধ্যমে একথাই কি প্রমাণিত হয় না যে, আল্লাহ্, কেবল আল্লাহ্ই মহাবিশ্বের একক নিয়ন্তা?

এর পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।' একথার অর্থ— হে মানুষ! আমিই তোমাদের অন্তরে আল্লাহ্-পরিচিতি দান করে ও শরীরে ভূতচতুষ্টয়কে ও আত্মাকে একত্র করে তোমাদেরকে দান করি জীবন। আবার এ সকল কিছুকে বিচ্ছিন্ন করে ঘটাই তোমাদের মৃত্যু।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী' একথার অর্থ— আমি চিরঞ্জীব। সদাবিদ্যমান। মৃত্যুর মাধ্যমে তোমাদের সাময়িক মালিকানা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আমার মালিকানা চিরস্থায়ী। উল্লেখ্য যে, সকল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। বাকী থাকবেন কেবল আল্লাহ্। তাই এখানে বলা হয়েছে— ওয়ানাহ্নুল্ ওয়ারিছুন। অর্থাৎ আমিই হবো তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী। এরকম বলা হয়েছে শব্দার্থে। কথাটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— চূড়ান্ত মালিকানা আমারই।

সূরা হিজর ঃ আয়াত ২৪, ২৫

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ○ وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۗ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

❒ তোমাদিগের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে আমি তাহাদিগকে জানি এবং তোমাদিগের পরে যাহারা আসিবে তাহাদিগকেও জানি।

❒ তোমার প্রতিপালকই উহাদিগকে একত্র সমবেত করিবেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে আমি তাদেরকে জানি এবং তোমাদের পরে যারা আসবে তাদেরকেও জানি।' একথার অর্থ— পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের সকল মানুষের সকল কিছু সম্পর্কে আমি সম্যক পরিজ্ঞাত। উল্লেখ্য যে, আগের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্র অতুলনীয় শক্তিমত্তার কথা। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে, তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞানের কথা। এভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি সর্বশক্তিধর ও সর্বজ্ঞ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'মুসতাক্দিমীন' অর্থ পূর্বসূরী। আর 'মুসতা'খিরীন' অর্থ উত্তরসূরী। শা'বী বলেছেন, শব্দ দু'টোর অর্থ— পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের সকল মানুষ। ইকরামা বলেছেন, 'মুসতাক্দিমীন' অর্থ যারা পিতৃপৃষ্ঠদেশ থেকে বহির্গত হয়েছে। অর্থাৎ যারা সৃষ্ট

www.eelm.weebly.com

হয়েছে। আর 'মুসতা'খিরীন' অর্থ যারা এখনো তাদের পিতৃপৃষ্ঠদেশ থেকে বহির্গত হয়নি। অর্থাৎ যারা এখনো সৃজিত হয়নি। মুজাহিদ বলেছেন, বিগত যুগের জাতিগোষ্ঠীগুলো 'মুসতাক্বদিমীন'। আর উম্মতে মোহাম্মদী হচ্ছে 'মুসতা'খিরীন'। হাসান বসরী বলেছেন, আনুগত্য ও কল্যাণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ও অনুগামী হচ্ছে যথাক্রমে 'মুসতাক্বদিমীন' ও মুসতা'খিরীন'।

কেউ কেউ বলেছেন, নামাজের জামাতের সামনের সারির লোকেরা 'মুসতাক্বদিমীন' এবং পেছনের সারির লোকেরা 'মুসতা'খিরীন'। ইবনে মারদুবিয়া বলেছেন, একবার দাউদ বিন সালেহ্ হজরত সহল বিন হানিফ আনসারীকে জিজ্ঞেস করলেন, মুসতাক্বদিমীন ও মুসতা'খিরীন শব্দ দু'টোর মাধ্যমে কি রণপ্রান্তরের পুরোগামী ও অনুগামী যোদ্ধাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে? তিনি জবাব দিলেন, না। শব্দ দু'টোর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, নামাজের জামাতের সম্মুখের ও পশ্চাতের মুসল্লিদেরকে । মুকাতিল বলেছেন, শব্দ দু'টোর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে সম্মুখবর্তী সৈনিক ও পশ্চাদ্‌বর্তী সৈনিকদেরকে। ইবনে উয়াইনিয়া বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'পূর্বগামী' ও 'পরগামী' বলে যারা ইতোমধ্যে মুসলমান হয়েছে তাদেরকে এবং যারা এখনো মুসলমান হয়নি তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আওজায়ী বলেছেন, ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামাজ পাঠকারীরা হচ্ছে মুসতাক্বদি-মীন। আর ওয়াক্তের শেষভাগে নামাজ পাঠকারীরা হচ্ছে মুসতা'খিরীন।

এক রূপবতী রমণী জামাতে নামাজ পাঠ করছিলেন। ইমাম ছিলেন রসুলপাক স. স্বয়ং। তখন ওই রমণীকে দেখে কিছু লোক সামনের সারিতে গিয়ে দাঁড়ালো। তার মধ্যে দু'একজন রুকুর সময় বগলের ফাঁক দিকে ওই রমণীটির প্রতি দৃষ্টিপাত করছিলো। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান ও হাকেম। হাকেম বলেছেন হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকই তাদেরকে সমবেত করবেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।' এ কথার অর্থ— তিনি পুনরুত্থান দিবসে সকল মানুষকে একত্র করবেন। পুরস্কৃত করবেন পুণ্যবানদেরকে। আর তিরস্কৃত করবেন পাপিষ্ঠদেরকে। অর্থাৎ মৃত্যুপরবর্তী পুনরুত্থান ও হিসাব নিকাশ সুনিশ্চিত।

হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি যেমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ্ তাকে পুনরুত্থিত করবেন তেমনি অবস্থায়।

এখানে 'হুয়া' (তিনি) সর্বনামটি একথাই প্রমাণ করে যে, পুনরুত্থান সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র ক্ষমতায়ত্ত ও দায়িত্বভূত। তিনি হাকীম (প্রজ্ঞাময়)। তাই তাঁর প্রতিটি কর্মই প্রজ্ঞামণ্ডিত। আর তিনি আলীম (সর্বজ্ঞ)। তাই তাঁর সকল সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ড মূর্খতা ও অজ্ঞতা থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র।

www.eelm.weebly.com

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○ وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ○

❒ আমি তো মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠন্ঠনে মৃত্তিকা হইতে,
❒ এবং ইহার পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি জিন্ অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ হইতে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি প্রগাঢ় কর্দমজাত বিশুষ্ক মৃত্তিকা থেকে। এখানে 'আল-ইনসান' অর্থ মানুষ । 'আল্' অব্যয়টি জাতিবাচক। এখানে 'আল ইনসান' এর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে সমগ্র মানবজাতিকে। হজরত আদমকে ইনসান বলা হয় একারণে যে— ১. শব্দটির ধাতুমূল হচ্ছে 'ইনস্'। এর অর্থ পরিদৃশ্যমান, দৃষ্টিগোচর । মানুষ দৃষ্টিগোচর, তাই মানুষকে বলে ইনসান। ২. 'ইনস্' শব্দের আরেকটি অর্থ— সৌহার্দ, সম্প্রীতি। মানুষ পারস্পরিক প্রীতি ও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ বলে তার নাম ইনসান। ৩. 'নিস্ইয়ান' থেকেও 'ইনসান' শব্দটি পরিগঠিত হয়ে থাকতে পারে। 'নিস্ইয়ান' অর্থ বিস্মৃতি। এই বিস্মৃতিপ্রবণতার কারণেই মানুষকে বলা হয় ইনসান।

'সল্সল্' অর্থ বিশুষ্ক মৃত্তিকা বা শুকনো ঠন্ঠনে মাটি। অর্থাৎ সেই মাটি, যা আগুনে না পোড়ানো সত্ত্বেও বাড়ি খেলে ঠন্ঠন্ আওয়াজে বেজে উঠে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই বিশুষ্ক কর্দমকে 'সল্সল্' বলে, যাতে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং যা ঠোকা দিলে টঙটঙ আওয়াজ করে। মুজাহিদ বলেছেন, দুর্গন্ধযুক্ত কর্দমকে বলে সল্সল্। যেমন আরবী ভাষায় বলা হয়— সল্সলাল লাহাম (গোশত দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছে)। 'হামা' অর্থ ওই মৃত্তিকা যা পানিতে অধিককাল নিমজ্জিত থাকার কারণে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। আর 'মাস্নূন' অর্থ আকৃতি বা অবয়ব। শব্দটি বুৎপত্তি লাভ করেছে 'সানান্তুল ওয়াজহা' থেকে। এভাবে মানুষের অবয়ব গঠনের প্রক্রিয়াটি এরকম— প্রথমে মাটি মেশানো হয় পানির সঙ্গে। কিছুকাল এভাবে রাখার পর তা পরিণত হয় প্রগাঢ় কর্দমে। অর্থাৎ পচাগলা মাটিতে। ওই পচাগলা মাটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিয়ে তাকে করা হয় 'সুলালাহ্'। এরপর ওই মাটির নির্যাস দিয়ে প্রস্তুত করা হয় মানুষের অবয়ব। এই অবয়বের নাম মাস্নূন। মাস্নূনকে ভালোভাবে শুকিয়ে নিলে তার নাম হয় সল্সল্।

মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, পুঁতিগন্ধময় পদার্থের নাম মাসনূন। যেমন বলা হয়— সানান্তুল হাজারা আলাল হাজারি (পাথরের উপরে পাথর চাপিয়ে দিয়ে আমি দুর্গন্ধ নিপাত করেছি)। আবু উবাইদা বলেছেন, 'মাসনূন' শব্দ গঠিত হয়েছে

www.eelm.weebly.com

'সাননুন' থেকে। সাননুন অর্থ প্রবাহিত করা । আর মাসনূন অর্থ প্রবাহিত। গলিত ধাতু যেমন বিভিন্ন রকমের ছাঁচে ঢেলে দেয়া হয়, তেমনি বিগলিত কর্দমকে নির্ধারিত ছাঁচে ঢেলে গঠন করা হয়েছে মানুষের আদিমূর্তি। তারপর ওই মূর্তিকে এমনভাবে শুকিয়ে নেয়া হয়েছে যে, তাতে ঠোকা দিলে ধ্বনিত হয় ঠন্‌ঠন্‌ শব্দ। ওই মূর্তিকে দীর্ঘকাল ধরে করা হয় অধিকতর মসৃণ ও সুন্দর। তারপর ওই মূর্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় আত্মাকে। আত্মপ্রকাশ করে পূর্ণ মানব।

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'এবং এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি জ্বিন অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ থেকে।' 'আলজ্বান' অর্থ জ্বিন। এখানকার 'আল' অব্যয়টিও জাতিবাচক। এভাবে 'আলজ্বান' কথাটির মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে সমগ্র জ্বিন জাতিকে। সকল মানুষ যেমন জাতিগত দিক থেকে প্রথম মানুষের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি সকল জ্বিনও গোষ্ঠীগত ধারাবাহিকতার দিক থেকে প্রথম জ্বিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এখানে বলা হয়েছে জ্বিন সৃষ্টি করা হয়েছে অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ থেকে। অর্থাৎ অগ্নিশিখা থেকে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ইনসান' বলে যেমন মানুষের প্রথম পিতা হজরত আদমকে বুঝানো হয়, তেমনি 'আলজ্বান' বলে বুঝানো হয় জ্বিনদের আদি পিতাকে। কাতাদা বলেছেন, 'আলজ্বান' অর্থ ইবলিস। এমনো বলা হয়েছে যে, জ্বিনদের আদি পিতা আলজ্বান। আর শয়তানদের আদি পিতা ইবলিস। জ্বিনদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান, আবার কেউ কেউ কাফের। তাদের মধ্যে রয়েছে জন্ম ও মৃত্যুর ধারাবাহিকতা। কেউ কেউ জন্মগ্রহণ করে, আবার কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু শয়তানেরা সকলেই কাফের। আর জন্মমৃত্যুর ধারাবাহিকতাও তাদের নেই । অর্থাৎ কেউ জন্মেও না, কেউ মরেও না। ইবলিস যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন তার সকল অনুসারীরাও মৃত্যুবরণ করবে।

ওয়াহাব বলেছেন, জ্বিনেরা মানুষের মতো পানাহার করে ও সন্তান-সন্ততির জন্ম দেয়। আবার কোনো কোনো জ্বিন বায়ুসদৃশ। তারা পানাহার করে না । তাদের বংশ বিস্তারও ঘটে না।

এখানে 'মিন্‌ক্বলু' অর্থ ইতোপূর্বে। অর্থাৎ জ্বিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের পূর্বে। 'আস্‌সামুন' অর্থ অত্যুষ্ণ বায়ু বা লু হাওয়া— যা লোমকূপ ভেদ করে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চায়। বাগবী লিখেছেন, 'আস্‌সামুন' অর্থ ওই তপ্ত বাতাস, যা লোমকূপের মধ্য দিয়ে দেহে প্রবেশ করে মানুষকে দুর্বল করে দেয়। কেউ কেউ বলেছেন, দিবাভাগের উত্তপ্ত হাওয়াকে বলে 'সামুম'। আর রাত্রিভাগের উত্তপ্ত হাওয়াকে বলে 'হারুর্'। কালাবীর বর্ণনায় এসেছে, আবু সালেহ্ বলেছেন, আকাশ ও ওজন স্তরের মধ্যবর্তী অংশের ধুম্রবিবর্জিত অগ্নির নাম 'সামুম'। এই 'সামুম' থেকেই সৃষ্টি হয় 'সাইক্বাহ্' (বজ্রধ্বনি বা বজ্রপাত)। আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ও নির্দেশানুসারে সেখান থেকে সৃষ্টি হয় বজ্র। কেউ কেউ বলেছেন, 'নারে সামুম'

www.eelm.weebly.com

অর্থ জাহান্নামের আগুন। জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইবলিস ফেরেশতাগণের একটি শাখার অন্তর্ভুক্ত। ওই শাখাগোত্রভূত-দেরকে বলে জ্বিন। তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা থেকে। অপর এক আয়াতে জ্বিনদেরকে প্রজ্জ্বলিত আগুন দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং মেনে নিতে হয় যে, অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি একই বস্তু। উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাগণের মূলগোত্র সৃষ্টি করা হয়েছে নূর বা আলোকপ্রভা থেকে।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ২৮, ২৯, ৩০, ৩১

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُۥ سٰجِدِينَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ السّٰجِدِينَ ۝

❒ স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে বলিলেন, 'আমি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মৃত্তিকা হইতে মানুষ সৃষ্টি করিতেছি;

❒ 'যখন আমি উহাকে সুঠাম করিব এবং উহাতে আমার রূহ্ সঞ্চার করিব তখন তোমরা উহার প্রতি সিজ্‌দাবনত হইও',

❒ তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সিজ্‌দা করিল,

❒ কিন্তু ইবলিস করিল না, সে সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে অস্বীকার করিল।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের (২৮, ২৯) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! ওই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আমি প্রগাঢ় কর্দমজাত বিশুষ্ক মৃত্তিকা থেকে মানুষ সৃষ্টি করবো। তার সুঠাম ও সুন্দর দেহ সৃজনের পর তাতে সঞ্চার করবো আমার সৃষ্ট আত্মাকে। এভাবে সৃজিত শ্রেষ্ঠ মানুষকে তোমরা তখন সেজদার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন কোরো।

এখানে 'নাফখুন' শব্দটির অর্থ শূন্য পাত্রে কোনো কিছু প্রবেশ করানো। এভাবে মানব-অবয়বের প্রতি রূহ বা আত্মা-সম্পাতের কথা বলা হয়েছে এখানে। রূহ বা মানবাত্মা দু'ধরনের— উর্ধ্বমুখী ও অধোমুখী। উর্ধ্বমুখী আত্মা অবয়বহীন, আকার ও প্রকারবিহীন। অতি সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে চর্মচক্ষু দ্বারা আত্মা-দর্শন সম্ভব নয়। এই আত্মার মূল অবস্থান আল্লাহ্‌র আরশের উপরে। উর্ধ্বমুখী আত্মা পাঁচটি— কলব্, রূহ, সের, খফি, আখফা। এগুলোকে বলে আলমে আমরের লতিফা পঞ্চক বা নির্বাহী জগতের সূক্ষ্মপঞ্চক। আর অধোমুখী আত্মা সৃষ্ট হয়েছে

www.eelm.weebly.com

আগুন, পানি, মাটি, বাতাস— এই ভূতচতুষ্টয় থেকে। মানবদেহও এই ভূতচতুষ্টয় থেকে সৃষ্ট। অধোমুখী আত্মাকে বলা হয় নফস বা প্রবৃত্তি। আল্লাহ্পাক এই আত্মাকে উর্ধ্বমুখী আত্মার আয়না হিসেবে মনোনীত করেছেন। দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্যকিরণ যেমন সূর্যের আলো ও উত্তাপ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তেমনি অধোমুখী আত্মা উর্ধ্বমুখী আত্মার প্রভাবে হয় জীবন্ত। হয় বোধ ও বুদ্ধির আকর। প্রাথমিক অবস্থায় উর্ধ্বমুখী আত্মার আলো প্রতিফলিত হয় মানুষের হৃৎপিণ্ডে। তারপর সেখান থেকে পৌঁছে যায় শিরা উপশিরায়, ধমনীর সকল শাখা-প্রশাখায়। এভাবে শরীরের সকল অংশ হয় উর্ধ্বমুখী আত্মার প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এই প্রক্রিয়াকে এখানে 'রূহ সঞ্চার করবো' কথাটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। শূন্যস্থান যেমন বায়ু দ্বারা পূর্ণ করা হয়, তেমনি আত্মা দ্বারা জীবন্ত ও পরিপূর্ণ করা হয় মানুষের জড়-অস্তিত্বকে।

'রূহী' অর্থ আমার রূহ বা আত্মা । মর্যাদা প্রদানার্থে মানবাত্মাকে এখানে আল্লাহ্ 'আমার আত্মা' বলে অভিহিত করেছেন। এভাবে 'আমার আত্মা' কথাটির অর্থ হবে মৌল কোনো কিছু ব্যতিরেকেই আমার বিশেষভাবে সৃষ্ট আত্মা। কেবল মানবাত্মার আয়নাতেই আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীর অত্যুজ্জ্বল বিকিরণ বা তাজাল্লি প্রতিবিম্বিত হতে পারে। এই অনন্য যোগ্যতার কারণেও আল্লাহ্পাক মানবাত্মাকে 'আমার আত্মা' বলে সম্বোধন করেছেন— এরকমও বলা যেতে পারে।

যে সকল উপাদানের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে মৃত্তিকা। তাই বলা হয়, মানুষ মৃত্তিকাজাত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দশটি উপাদানের দ্বারা। আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং এই ভূতচতুষ্টয়ের সমন্বয়ে গঠিত নফস। এই পাঁচটি উপাদানের সম্মিলিত নাম নিম্নমুখী আত্মা বা প্রবৃত্তি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উর্ধ্বমুখী আত্মার পাঁচটি অংশ। নির্বাহী জগতজাত সেই উপাদানগুলির নাম কলব, রূহ, সের, খফি, আখফা। এই দশটি উপাদানে গঠিত হওয়ার কারণে মানুষ আল্লাহ্র খলিফা বা প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। হয়েছে মারেফাত ও ইশ্কের আধার। আর এরূপ যোগ্যতাই তাকে করেছে আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন। এই নৈকট্যভাজনতা ও আল্লাহ্র প্রতিবিম্বিত নূরের বাহক হওয়ার কারণে প্রথম মানুষ হজরত আদমকে সেজদার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্পাক নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর ফেরেশতামণ্ডলীকে। হাদিস শরীফেও এসকল বিষয়ের আলোচনা এসেছে।

'ফাক্বাউ' অর্থ সেজদাবনত হয়ো। কথাটি অনুজ্ঞাসূচক। আর 'লাহু' শব্দের 'লাম' অব্যয়টি এখানে 'ইলা' (দিকে, প্রতি) অর্থে ব্যবহৃত। এভাবে মর্মার্থটি দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে বললেন, তোমরা আদমের দিকে বা প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রণিপাত কোরো, যেমন নামাজ পাঠকালে কাবার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। অর্থাৎ কাবাকে করা হয় কেবলা। আল্লাহ্পাকের অতুলনীয় জ্যোতিসম্পাতের

 www.eelm.weebly.com

সঙ্গে কাবা শরীফের বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। তেমনি হজরত আদমও আল্লাহ্‌র বিশেষ জ্যোতিসম্পাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই কাবাকে যেমন কেবলা বা লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করা হয়েছে, তেমনি হজরত আদমকে ওই সময় করা হয়েছিলো ফেরেশতামণ্ডলীর কেবলা বা লক্ষ্যস্থল।

এর পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সেজদা করলো।' উল্লেখ্য যে, হজরত আদম আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ নূরের বাহক— একথা বুঝতে পেরে সকল ফেরেশতা তাঁকে সেজদা করেছিলো। অথবা তারা সেজদা করেছিলো কেবল আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে।

'ফেরেশতাগণ সকলেই'— একথা বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'কুল্‌লুহুম আজমাউ'ন'। এখানে 'কুল্‌লু', 'হুম' এবং আজমাউ'ন'— তিনটি শব্দই বহুবচন-বোধক। ফেরেশতাদের কেউই তখন সেজদা থেকে বিরত থাকেনি— এ কথাটি অধিকতর নিশ্চিত করনার্থেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এই ত্রয়ী বহুবচনবোধক শব্দ। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানে 'আজমাউ'ন' এর স্থলে 'আজমাইন' প্রয়োগই ছিলো ব্যাকরণসম্মত। কিন্তু তা করা হয়নি। এর কারণ অবোধ্য। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

এর পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'কিন্তু ইবলিস করলো না, সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করলো।' উল্লেখ্য যে, ইবলিস ছিলো অদূরদর্শী। তাই সে আল্লাহ্‌র জ্যোতিসম্পাতপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হজরত আদমের বিশেষ মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি। এ কথারও গুরুত্ব দেয়নি যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ কখনো প্রজ্ঞাময়তার রহস্য থেকে মুক্ত নয়। তাই সকল ফেরেশতাকে সেজদাবনত দেখেও সে সেজদা করতে প্রবৃত্ত হয়নি।

ইবলিস ফেরেশতা ছিলো না। ছিলো জ্বিন। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কানা মিনাল্‌ জ্বিন্‌নি' (সে ছিলো জ্বিন সম্প্রদায়ভূত)। এ কারণে কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ব্যতিক্রম বোধক 'ইল্‌লা' শব্দটি বিকর্তিত। ব্যতিক্রম না হয়ে যদি মিলিত হতো, তবে বুঝা যেতো যে, সে ফেরেশতাদের সমগোত্রীয়। কিন্তু সে ফেরেশতা নয়। তাই এখানে 'ইল্‌লা' শব্দটির অর্থ হবে 'লাকিন্‌না' (কিন্তু)। বঙ্গানুবাদে অবশ্য এরকমই করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ইল্‌লা' ব্যতিক্রমী নয়, মিলিত। কারণ ইবলিস ছিলো ফেরেশতাদের একটি শাখাগোত্রভূত। ওই শাখাগোত্রের নাম জ্বিন। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— ব্যতিক্রম কেবল ইবলিস। সে সেজদা করেনি। সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে সে অস্বীকার করেছে।

www.eelm.weebly.com

قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ ۝ قَالَ لَمۡ أَكُن لِّأَسۡجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقۡتَهُۥ مِن صَلۡصَٰلٖ مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ ۝ قَالَ فَٱخۡرُجۡ مِنۡهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٞ ۝ وَإِنَّ عَلَيۡكَ ٱللَّعۡنَةَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ۝ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ۝ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ ۝ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡوَقۡتِ ٱلۡمَعۡلُومِ ۝

❒ আল্লাহ্ বলিলেন, 'হে ইবলিস! তোমার কী হইল যে তুমি সিজ্দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে না?'

❒ সে বলিল, 'আপনি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠন্ঠনে মৃত্তিকা হইতে যে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন আমি তাহাকে সিজ্দা করিবার নহি।'

❒ আল্লাহ্ বলিলেন, 'তবে তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, কারণ তুমি অভিশপ্ত;

❒ 'এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রহিল অভিশাপ'

❒ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।'

❒ আল্লাহ্ বলিলেন, 'যাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তুমি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইলে,

❒ অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ বললেন, হে ইবলিস! কেনো তুমি আদমকে সেজদা করলে না। আমার নির্দেশ যে অবশ্য মান্য, এ কথা জেনেও তুমি নির্দেশ লংঘন করলে কেনো?

পরের আয়াতে (৩৩) মর্মার্থ হচ্ছে— ইবলিস বললো, মাটি হচ্ছে সর্বনিম্ন পর্যায়ের পদার্থ। আদমকে তুমি বানিয়েছো শুষ্ক ও ঠন্ঠনে মাটি থেকে। আর আমাকে বানিয়েছো আগুন থেকে— যা মাটি অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদামণ্ডিত। সুতরাং অনলজাত আমি মৃত্তিকাজাত আদমকে সেজদা করতে যাবো কেনো?

এর পরের আয়াতের (৩৪) মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ বললেন, তবে তুমি বের হয়ে যাও এই স্বর্গোদ্যান থেকে। আজ থেকে তুমি কল্যাণচ্যুত, অভিশপ্ত।

www.eelm.weebly.com

'রজ্‌ম' শব্দের অর্থ প্রস্তরাঘাতে প্রাণ হরণ করা। অর্থাৎ পাথরের প্রহারে মেরে ফেলা। উল্লেখ্য যে, যারা আল্লাহ্‌র মহান দরবার থেকে বিতাড়িত হয়, তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলা যায়। কারণ তারা অভিশপ্ত। 'অভিশপ্ত' কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আর কখনো তুমি এই জান্নাতে ফিরে আসতে পারবে না। যদি আকাশের দিকে কখনো আসতে চেষ্টা করো, তবে তোমার দিকে ছুঁড়ে মারা হবে উল্কাপিণ্ড। যেভাবে প্রস্তর বর্ষণ করা হয়, সেভাবে তোমার উপর করা হবে উল্কাপাত। কারণ তুমি বিতাড়িত, অভিশপ্ত।

ইবলিসের যুক্তি ছিলো আগুন মাটি অপেক্ষা উত্তম। নির্দেশ লংঘনের বিরুদ্ধে তার এই যুক্তিটি ছিলো নিতান্তই অচল, অসংগত ও অসার। মৃৎমূর্তি, অগ্নিশিখা— সকল কিছুই সৃষ্টি হিসেবে সমগুরুত্বসম্পন্ন। এগুলোর কোনো কিছুর মধ্যেই কল্যাণ নেই। কল্যাণ রয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে। তাই যারা অনানুগত, তারা কল্যাণবঞ্চিত, বিতাড়িত ও অভিশপ্ত।

এর পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রইলো অভিশাপ।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক আরো বললেন, হে ইবলিস! মহাবিচারের দিবস পর্যন্ত তোমাকে অভিশাপ বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। বিচারকার্য সমাপনের পর তোমার উপরে আপতিত হবে পারলৌকিক অভিসম্পাতের বোঝা। ওই অভিসম্পাত হবে চিরস্থায়ী। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— হে ইবলিস! ইহজগতের অভিশাপ তোমার উপরে বলবৎ থাকবে মহাবিচারের দিবস পর্যন্ত। তারপর তোমার উপরে আপতিত হবে নতুনতর শাস্তি— যে শাস্তি তোমাকে ভুলিয়ে দেবে তোমার এখনকার অভিসম্পাতের স্মৃতি।

কেউ কেউ বলেছেন— 'কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রইলো অভিশাপ' কথাটির অর্থ এরকম নয় যে, কর্মফল দিবসের পরে ইবলিসের অভিশাপ শেষ হয়ে যাবে। বরং কথাটির অর্থ হবে, এই অভিশাপ বলবৎ থাকবে চিরস্থায়ীরূপে। বিচারদিবসের আগে ও পরে।

বাগবী লিখেছেন, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, সর্বত্রই ইবলিস অভিশপ্ত। জান্নাতবাসীরাও তাকে অভিসম্পাত দিবে। আমি বলি, শুধু তাই নয়, তার প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন স্বয়ং আল্লাহ্‌। তাই এখানে বলা হয়েছে, কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রইল অভিশাপ।

এর পরের আয়াতে(৩৬) বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।' একথার অর্থ— হে আমার পালনকর্তা! আমাকে যখন স্বর্গভ্রষ্ট করলে, তখন আমার একটি প্রার্থনা অন্ততঃ পূরণ করো। আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত দাও মৃত্যুহীন জীবন। উল্লেখ্য যে, তার এই প্রার্থনা ছিলো প্রতারণাপূর্ণ। সে ভেবেছিলো মৃত্যু আগমন করতে থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। এরপর আর কারো মৃত্যু হবে না। তাই প্রার্থিত অবকাশ পেলে সে হয়ে যাবে চিরঞ্জীব। আল্লাহ্‌ তার এই প্রতারণাপূর্ণ আবেদনও মঞ্জুর

www.eelm.weebly.com

করলেন। করুণাপরবশ হয়ে নয়, বরং বীতশ্রদ্ধ হয়ে। তাকে অবকাশ দিলেন এ কারণে, যাতে সুদীর্ঘ জীবন পেয়ে সে আরো অনেক পাপকর্ম করে অধিকতর ভয়াবহ গজবের শিকার হতে পারে।

পরের আয়াতদ্বয়ের (৩৭, ৩৮) মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ বললেন, তোমার প্রার্থনা গৃহীত হলো। ইসরাফিলের শিংগার ফুৎকার ধ্বনিত হওয়া পর্যন্ত তোমাকে দেয়া হলো অবকাশ। অর্থাৎ শিংগার প্রথম ফুৎকারের সময় যখন সমগ্র সৃষ্টি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, তখন তুমিও ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকার পর্যন্ত তোমাকে অবকাশ দেয়া হবে না। কেউ কেউ বলেছেন, শিংগার প্রথম ও দ্বিতীয় ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ের পরিসর হবে চল্লিশ বছর। ইবলিসের মৃত্যু ঘটবে ওই সময়।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৩৯, ৪০, ৪১

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ○ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ○ قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ○

❒ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যে আমার সর্বনাশ করিলে তাহার শপথ' আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে শোভন করিয়া তুলিব এবং আমি উহাদিগের সকলেরই সর্বনাশ সাধন করিব,

❒ 'তবে উহাদিগের মধ্যে তোমার নির্বাচিত দাসগণকে নহে।'

❒ আল্লাহ্ বলিলেন, ইহাই আমার নিকট পৌঁছিবার সরল পথ,

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ইবলিস বললো, হে আমার প্রতিপালক! অভিশাপ দিয়ে যে ক্ষতি তুমি আমার করলে, সেই ক্ষতির শপথ! আমি আদমের পরবর্তী বংশধরদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবো। তাদের দৃষ্টিতে আমি পৃথিবীকে করবো লোভনীয়। ফলে তারা পৃথিবীর প্রতি প্রলুব্ধ হবে এবং তোমার কথা ভুলে গিয়ে আমারই মতো হয়ে যাবে অভিসম্পাতগ্রস্ত। এখানে 'বিমা' শব্দের 'বি' অব্যয়টি শপথমূলক। আর 'মা' অব্যয়টি শব্দমূল।

পরের আয়াতের (৪০) মর্মার্থ হচ্ছে— ইবলিস বললো, তবে হ্যাঁ। তোমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদেরকে আমি পৃথিবীর প্রতি প্রলুব্ধ করতে পারবো না। আমি জানি যে, বিশুদ্ধচিত্তদের প্রতি আমার প্ররোচনা ও প্রলোভন কার্যকর হবে না।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বললেন, এটাই আমার নিকট পৌঁছবার সরল পথ।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। আমার প্রকৃত প্রেমিকেরা সরলপথের পথিক। তাই তুমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারো না। আমিই এই পথের সন্ধান তাদেরকে দিয়েছি। বক্রতামুক্ত এই পথের নামই সিরাতুল মুসতাক্বিম।

 www.eelm.weebly.com

মুজাহিদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ— এই সরল ও সত্য পথ পৌঁছেছে আল্লাহ্ পর্যন্ত। এই পথের পথিকদের তাই বিভ্রান্ত হওয়ার অবকাশ নেই। আখফাশ কথাটির অর্থ করেছেন এরকম— সত্যপথ প্রদর্শনের দায়িত্ব আমার। একথায় প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্পাক তাঁর মনোনীত দাসদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দেন না। কারণ তিনি তাঁদের প্রতি করুণাপরবশ। কাসায়ী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ইবলিসকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। যেমন, কেউ তার প্রতিপক্ষকে বলে, ভেবেছো কী? তোমার চলার পথ তো আমারই উপর দিয়ে। একথার অর্থ— নিশ্চিত জেনো, আমার হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই। যেমন, এক আয়াতে এসেছে— নিশ্চয় আপনার প্রভুপালক প্রতিটি ঘাঁটিতে বিদ্যমান।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৪২, ৪৩, ৪৪

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۝ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَٰبٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۝

❒ 'বিভ্রান্তদিগের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহারা ব্যতীত আমার দাসদিগের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকিবে না;

❒ 'অবশ্যই তোমার অনুসারীদিগের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হইবে জাহান্নাম;

❒ 'উহার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্পাক আরো বললেন, পথভ্রষ্টদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, তারা ব্যতীত আমার দাসগণের উপর তুমি কোনো প্রভাব খাটাতে পারবে না।

এখানে 'ইবাদী' (আমার দাসগণের) কথাটির মধ্যে সকল স্তরের ইমানদারগণ অন্তর্ভুক্ত। 'ইবাদ' বা দাসগণের সম্বন্ধ যদি বক্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়, অর্থাৎ 'আমার দাসগণ' বলে যদি কেবল ইমানদারদেরকে বুঝানো হয়, তবে মানিত্ তাবাআকা (যারা তোমার অনুসরণ করবে) বলে ইমানদারগণ থেকে তাদেরকে পৃথক করা ব্যাকরণসম্মতভাবে শুদ্ধ হবে না। বরং 'ইবাদী'র মধ্যে সকল মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার পর পথভ্রষ্টদেরকে পৃথক করলে তা হবে ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ। আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য এই যে, আল্লাহ্পাক বললেন, তোমাকে কেবল ক্ষমতা দেয়া হয়েছে পথভ্রষ্টদের উপর। মুমিনগণের উপর তোমার কোনো আধিপত্য কার্যকর হবে না। পূর্ববর্তী আয়াতে (৪০) ইবলিস নিজেই বলেছে 'তবে

তাদের মধ্যে তোমার নির্বাচিত দাসগণকে নয়।' আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌-তায়ালার অনুমোদন পেয়ে কথাটি হয়েছে অধিকতর দৃঢ় ও অকাট্য। অপর এক আয়াতেও কথাটি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— 'যারা বিশ্বাস করেছে তাদের উপর তার কোনো আধিপত্য নেই।' কারণ তারা নির্ভরশীল হয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র উপর। মোট কথা, আল্লাহপাক স্বয়ং তাঁর বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাগণকে সুরক্ষিত রাখেন। তাই তাদের উপর শয়তানের কর্তৃত্ব ফলপ্রসূ হয় না। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'ইল্লা' (ব্যতীত) অব্যয়টি বিকর্তিত ব্যতিক্রম। কিন্তু ব্যতিক্রমের মধ্যে ব্যতিক্রমকৃতদের অন্তর্ভুক্তি সিদ্ধ নয়। তাই বুঝতে হবে, এখানে 'ইবাদী' বলে আল্লাহ্‌তায়ালার বিশিষ্ট বান্দাগণকেই বুঝানো হয়েছে। আবার এরকম হওয়াও সম্ভব যে, এখানে 'ইল্লা' (ব্যতীত) অব্যয়টির অর্থ হবে 'লাকিন্‌না' (কিন্তু)। এরকম হলে ধরে নিতে হবে বাক্যটির বিধেয় এখানে অনুক্ত। এমতাবস্থায় মর্মার্থ দাঁড়াবে— কিন্তু যারা তোমার অনুসরণ করবে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জাহান্নামে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইবলিস বললো, আমি তাদের সকলের সর্বনাশ করবো, তোমার নির্বাচিত বান্দাগণ ছাড়া। তার ওই বক্তব্যের বিরোধিতা ঘোষিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে এভাবে— বিভ্রান্তদের উপরেও তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ যদি তওবা না করে এবং আমার দিকে প্রত্যাবর্তন অপেক্ষা তোমার অনুসারী হওয়াকেই উত্তম মনে করে, তবে তুমি তাদেরকে প্ররোচিত করতে পারো মাত্র। আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এটাই। অপর এক আয়াতেও কথাটির স্পষ্ট উল্লেখ এসেছে এভাবে— (বিচারের দিবসে ইবলিস স্বগোক্তি করবে) তোমাদের উপর আমার তো কোনো আধিপত্যই ছিলো না। আমি তো কেবল ডেকেছিলাম। আর তোমরা সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলে।

পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'অবশ্যই তোমার অনুসারীদের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম।' এখানে কেবল 'হুম' উল্লেখ করলেই ইবলিসের সকল অনুসারীকে বুঝানো হতো। কিন্তু কথাটিকে আরো অধিক গুরুত্ববহ ও সুনির্দিষ্ট করার জন্যই এরপরে বসানো হয়েছে 'আজমাঈন'। অর্থাৎ জাহান্নাম হবে ইবলিসের সকল অনুসারীর নির্ধারিত আবাস।

এর পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'তার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য আছে পৃথক পৃথক দল।'

হান্নাদ ইবনে মোবারক ও আহমদ 'জুহদ' গ্রন্থে এবং ইবনে জারীর ও ইবনে আবিদ্‌দুন্‌ইয়া 'সিফাতুন্‌নার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত আলী একবার তাঁর এক হাতের উপর অন্য হাত স্থাপন করে আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে রেখে বললেন, নরকের দরজাগুলো এরকম। অর্থাৎ একটি দরজার উপরে রয়েছে আরেকটি দরজা। এরকম স্তর রয়েছে সাতটি। প্রতিটি স্তরে রয়েছে একটি করে দরজা।

 www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, স্বর্গ সুবিস্তৃত। আর নরক একটির উপরে একটি। সিফাতুন্নার গ্রন্থে ইবনে জারীর ও ইবনে আবিদ্দুন্ইয়া উল্লেখ করেছেন, নরকের প্রথম স্তরের নাম জাহান্নাম। তার পরের স্তরগুলো যথাক্রমে— লাজা, হুতামাহ, সায়ীর, সাক্বার, জাহীম এবং হাবীয়াহ।

বাগবী আরো লিখেছেন, জুহাক বলেছেন, প্রথম স্তরে প্রবেশ করবে ওই সকল ইমানদার, যারা পাপী। কিছুকাল শাস্তিভোগের মাধ্যমে পাপক্ষয়ের পর তারা নিষ্কৃতি পাবে। দ্বিতীয় স্তরে প্রবিষ্ট হবে খৃষ্টান । তৃতীয় স্তরে ইহুদী। চতুর্থ স্তরে সাবাইয়া। পঞ্চম স্তরে অগ্নিপূজক। ষষ্ঠ স্তরে মূর্তিপূজক। সপ্তম ও সর্ব নিকৃষ্ট স্তরে থাকবে কপটচারী বা মুনাফিকেরা। এখানে খৃষ্টান অর্থ ওই সকল খৃষ্টান, যারা হজরত ঈসার মহাতিরোধানের পর শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে স্বীকার করেনি। আর ইহুদী অর্থ ওই সকল ইহুদী যারা হজরত মুসার মহাপ্রস্থানের পর হজরত ঈসাকে নবী বলে মানেনি এবং এরপর মানেনি মোহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্কে। সাবাইয়া হচ্ছে তারা, যারা নিজেদেরকে এক আল্লাহ্র বিশ্বাসী বলে দাবী করা সত্ত্বেও কোনো নবী রসুলের শরিয়ত মানে না। শোনা যায় তারা হজরত নুহের অনুসারী বলে দাবি করে থাকে। অগ্নিপূজারী ও মূর্তিপূজারীরা যথাক্রমে আগুন ও বিগ্রহের উপাসক। আর মুনাফিকেরা দৃশ্যতঃ বিশ্বাসী, কিন্তু প্রকৃত অর্থে অবিশ্বাসী। তাদের সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— ইন্নাল মুনাফিক্বীনা ফিদ্দারকিল আস্ফালি মিনান্নার' (মুনাফিকেরা অবস্থান করবে নরকের সর্বনিম্ন স্তরে)।

বাগবীর বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, দোজখের স্তর সাতটি । দরজাও সাতটি। তার মধ্যে একটি স্তর ওই লোকদের জন্য যারা আমার উম্মতের উপর অসিচালনা করেছে। কুরতুবী বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, সবচেয়ে লঘু শাস্তিসম্বলিত নরকের নাম জাহান্নাম। ওই নরক তার অধিবাসী ও অধিবাসিনীদের মুখাবয়ব বিবর্ণ করে দিবে ও ভক্ষণ করবে তাদের রক্তমাংস। তাই তার নাম জাহান্নাম। আমার বিশ্বাসী ও পাপী উম্মতেরা প্রবেশ করবে সেখানে।

নিকৃষ্টতম ও গভীরতম নরক হচ্ছে হাবীয়া । হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায্যার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, নরকের এমন একটি স্তর রয়েছে, যেখানে প্রবেশ করবে কেবল ওই সকল লোক, যারা পৃথিবীতে আল্লাহ্র আযাব-গজব সম্পর্কে ছিলো নির্ভয়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সাতটি স্তর রয়েছে দোজখের। সবচেয়ে বেশী শাস্তিসম্বলিত দোজখে প্রবেশ করানো হবে ওই সকল ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে যারা জেনে শুনে অবলীলাক্রমে চালিয়ে যায় তাদের অপকর্ম। খলিল বিন মাররাহ্ থেকে অসমর্থিত সূত্রে বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. কখনো 'তাবারাকাল্লাজী' ও 'হা মিম

সেজদা' সুরাদ্বয় পাঠ না করে শয্যাগ্রহণ করতেন না। বলতেন, হামিম সম্বলিত সুরা রয়েছে সাতটি। দোজখের স্তরও সাতটি— জাহান্নাম, হুতামাহ, লাজা, সাক্বার, সায়ীর, হাবীয়াহ্ ও জাহীম। হা মিম সম্বলিত সুরা সাতটি প্রতিফল দিবসে দোজখের সাতটি দরজায় দণ্ডায়মান হয়ে বলবে, হে আমার চির-অমুখাপেক্ষী পাক পরোয়ারদিগার। যে সকল বিশ্বাসী আমাকে নিয়মিত আবৃত্তি করেছে, আমি তাদেরকে কিছুতেই দোজখে প্রবেশ করতে দিবো না।

সা'লাবীর বর্ণনায় এসেছে, 'ওয়াইন্না জাহান্নামা লামাওই'দুহুম আজমাঈন' (৪৩) — এই আয়াতের আবৃত্তি শুনে উন্মাদের মতো ছুটে পালিয়েছিলেন হজরত সালমান ফারসী। তিনদিন তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। শেষে তাকে রসুল স. সকাশে হাজির করা হলো। তিনি স. আত্মগোপনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হজরত সালমান ফারসী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! যে আল্লাহ্ আপনাকে সত্য পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, 'অবশ্যই তোমার অনুসারীদের সকলের নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম'— এই আয়াতের আবৃত্তি শুনলে মনে হয় আমার হৃৎপিণ্ড বুঝি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাঁর এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ۝ ادْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ ۝ وَنَزَعْنَا
مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ۝

❒ 'সাবধানীরা থাকিবে প্রস্রবণ-বহুল জান্নাতে।'

❒ তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত উহাতে প্রবেশ কর।'

❒ 'আমি তাহাদিগের অন্তর হইতে ঈর্ষা দূর করিব; তাহারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখামুখী হইয়া আসনে অবস্থান করিবে,'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা মুত্তাক্বী বা সাবধানী, অর্থাৎ যারা শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়নি, তারা প্রবেশ করবে প্রস্রবণবিশিষ্ট জান্নাতে। প্রত্যেক জান্নাতীর জন্য সেখানে থাকবে একটি অথবা অনেক প্রস্রবণ।

পরের আয়াতের (৪৬) মর্মার্থ হচ্ছে— জান্নাতীদের ওই জান্নাতবাস হবে চিরস্থায়ী। কোনোদিন আর তাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে না। সেখানে কোনোদিন আর উপস্থিত হবে না রোগ, শোক, জরা অথবা বার্ধক্য। জান্নাতে প্রবেশের প্রাক্কালেই তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে, তোমরা চিরসুখময় জান্নাতে প্রবেশ করো চিরস্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে।

 www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'আমি তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করবো।' একথার অর্থ— পৃথিবীতে বিশ্বাসীরা মানবিক বৃত্তির প্রভাবে পারস্পরিক যে ঈর্ষা বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে পারেনি, সেই ঈর্ষা বিদ্বেষ আমি তাদের হৃদয় থেকে চিরদিনের জন্য অপসারিত করে দিবো তাদের জান্নাতে প্রবেশের প্রাক্কালেই। কারণ জান্নাত হবে ঈর্ষা বিদ্বেষের প্রভাব থেকে চিরমুক্ত। এখানকার বক্তব্যটি উপস্থাপন করা হয়েছে অতীতকালবোধক ক্রিয়া সহযোগে। বিষয়টি ভবিষ্যৎকালের হলেও স্বতঃসিদ্ধ ও সুনিশ্চিত। যেনো তা সংঘটিত হয়েছে। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালের ক্রিয়া।

আবু নাঈমের 'ফিতান' গ্রন্থে সাঈদ ইবনে মানসুর, ইবনে আবী শায়বা, তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য আমি, ওসমান, তালহা ও যোবায়ের। জান্নাতে প্রবেশের পূর্বক্ষণে আমাদের পারস্পরিক প্রতিহিংসা দূর করে দেয়া হবে। আমি বলি, সম্মানিত সাহাবী চতুষ্টয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিলো হজরত ওসমানের খেলাফতকালে। পরিণামে শহীদ হয়েছিলেন হজরত আলী। তৎপূর্বে জামাল যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন হজরত তালহা ও হজরত যোবায়ের।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ তাঁর 'জওয়াইদুজ জুহুদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আবদুল করিম বিন রশীদ বলেছেন, জান্নাতের তোরণে দাঁড়িয়ে পৃথিবীতে দ্বন্দ্বে লিপ্ত বিশ্বাসীরা রোষকষায়িত নেত্রে দৃষ্টিপাত করবেন একে অপরের প্রতি। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশের পর তাঁরা দেখবেন তাঁদের বক্ষদেশে বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র নেই। আল্লাহ্পাক তা অপসারিত করে তাঁদেরকে বেঁধে দিয়েছেন চিরস্থায়ী ভ্রাতৃত্ববন্ধনে।

'গিল্লুন' শব্দটির অর্থ বিষণ্ণতাও হতে পারে। অর্থাৎ নিম্নমর্যাদাধারী জান্নাতীরা আল্লাহ্তায়ালার অধিকতর নৈকট্যভাজন জান্নাতীদের মর্যাদা দেখে সেখানে বিষণ্ন বা বিমর্ষ হবেন না। আল্লাহ্তায়ালাই এমতো বিষণ্ণতার চির অবসান ঘটাবেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে।' হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ আলোচ্য বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সেখানে কেউ কাউকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। সবাই থাকবে মুখোমুখি। এরকম কতিপয় উক্তি উল্লেখ করে বাগবী বলেছেন, জান্নাতীরা তাদের সতীর্থদের সাক্ষাতাভিলাষী হবেন। তাঁদের পালংকই তাঁদেরকে পৌঁছে দিবে কাঙ্ক্ষিত জনের সম্মুখে। মুখোমুখি সাক্ষাত হবে তাদের। হবে আলাপন।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে— হজরত আলী বিন হোসাইন একবার বললেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরকে

www.eelm.weebly.com

লক্ষ্য করে। তখন অনেকেই প্রশ্ন করলো, তাঁদের মধ্যে কি পারস্পরিক সংক্ষোভ ছিলো? হজরত আলী বিন হোসাইন বললেন, মূর্খতার যুগে বনী তামীম, বনী আদী এবং বনী হাশেম গোত্রত্রয়ের মধ্যে ছিলো অন্তর্দ্বন্দ্ব। যখন গোত্রত্রয় ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলো, তখন অন্তর্দ্বন্দ্বের স্থলে প্রবাহিত হতে শুরু করলো প্রীতি ও প্রেমের পীযূষ ধারা। একদিন হজরত আবু বকর তাঁর কটিদেশে সামান্য বেদনা অনুভব করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলী একটি পট্টি যোগাড় করে সেঁক দিতে শুরু করলেন তাঁর কোমরে। সহমর্মিতার ওই অবাক দৃশ্য লক্ষ্য করে তখন অবতীর্ণ হলো ওই আয়াত। এই ঘটনাটি যদি আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— মূর্খতার যুগে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যে অন্তর্কলহ ছিলো, শেষ রসুলের উপস্থিতির মাধ্যমে তা অপসারণ করা হলো। ঈর্ষা বিদ্বেষের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হলো ভ্রাতৃসুলভ প্রেম ও ভালোবাসা। প্রতিষ্ঠিত হলো চিরস্থায়ী ঐক্য ও সাম্য।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৪৮, ৪৯, ৫০

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ○ نَبِّئْ عِبَادِيْ أَنِّيْ أَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○ وَأَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيْمُ ○

❒ সেথায় তাহাদিগকে অবসাদ স্পর্শ করিবে না এবং তাহারা সেথা হইতে বহিষ্কৃতও হইবে না।

❒ আমার দাসদিগকে বলিয়া দাও যে, আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❒ এবং আমার শাস্তি— সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি!

প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— 'সেথায় তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না।' এ কথার অর্থ— ক্লান্তি, শ্রান্তি, অবসাদ এসকল কিছু থেকে বেহেশতবাসীরা থাকবে মুক্ত। তাদের ওই নিরুপদ্রব জীবন হবে স্থায়ী। কারণ সময়ের প্রবাহ সেখানে নেই। সময়ের প্রবাহই তো মানুষকে করে তোলে অবসন্ন ও অবসাদগ্রস্ত। এ পৃথিবী ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত করা হবে সময়ের প্রবহমানতাকে। তাই বেহেশতে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে না। থাকবে কেবল বর্তমান। চিরবর্তমান। তাই বেহেশতবাসীদের সুখ ও শান্তি হবে অবসাদবিমুক্ত। আর বেহেশতবাসীরা সেখান থেকে আর কখনো বহিষ্কৃতও হবে না।

www.eelm.weebly.com

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, একবার একস্থানে কতিপয় সাহাবী জটলা করে হাসাহাসি করছিলেন। সহসা আবির্ভূত হলেন রসুল স. স্বয়ং। বললেন, তোমাদের সম্মুখে রয়েছে নরকের লেলিহান আশংকা। অথচ তোমরা হাস্যকৌতুকে মত্ত। সঙ্গে সঙ্গে হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে বললেন, হে সম্মানিত ভ্রাতা! আপনার মহান প্রভুপালক জানাচ্ছেন, আপনি তাঁর দাসগণকে তাঁর অনুকম্পা থেকে নিরাশ করছেন কেনো? তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

পরের আয়াতে (৪৯) বলা হলো— 'আমার দাসদেরকে বলে দাও যে, আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আমার বিশ্বাসী দাসদেরকে বলুন, আমি তাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ার্দ্র। আমি তো কঠোর ও দণ্ডদাতা কেবল অবিশ্বাসীদের জন্য।

ইবনে মারদুবিয়া কতিপয় সাহাবীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, একবার রসুল স. বনী শায়বার তোরণ দিয়ে এসে আমাদেরকে হাস্য-কৌতুক অবস্থায় দেখলেন। বললেন, আমি তোমাদেরকে আমোদ প্রমোদে মত্ত দেখছি কেনো? একথা বলেই তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। একটু পরেই পুনরাবির্ভূত হয়ে বললেন, শোনো, হাজরে আস্ওয়াদ পর্যন্ত না পৌঁছতেই ভ্রাতা জিবরাইল এসে আমাকে জানালেন, আল্লাহ্ জানিয়েছেন, আপনি আমার বিশ্বাসী বান্দাগণকে নির্মল আনন্দ থেকে নিরাশ করছেন কেনো? উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে বিশ্বাসীগণকে মার্জনার প্রতিশ্রুতি। আবার পরবর্তী আয়াতে ঘোষিত হয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তির কথা— যা নির্ধারিত রয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য। এখানকার 'গফুরুর রহীম' কথাটির অর্থ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, 'মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণ-বহুল জান্নাতে' (আয়াত ৪৫)। এতে করে বুঝা যায় যারা মুত্তাকী, সংযমী বা শিরিক থেকে মুক্ত, তাদের লঘু ও গুরু পাপরাশি আল্লাহ্ দয়া করে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ তিনি গফুরু ররহীম। যদি এরকম অর্থ করা না হয়, অর্থাৎ বিশ্বাসী ও সাবধানীদের কোনো পাপ যদি না-ই থাকে, তবে আল্লাহ্র ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শনের অবকাশই বা কোথায়।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, আমার স্পষ্ট মনে আছে, রসুল স. বলেছেন, মানুষ যদি আল্লাহ্র ক্ষমাশীলতার বৈরাট্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারতো, তবে তারা অপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হতো না। আর যদি শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে অনুমান করতে পারতো, তবে সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুমুখে পতিত হতো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

বিশ্বাসীরা যদি আল্লাহ্‌র শাস্তির কঠোরতা অনুধাবন করতে পারতো, তবে তারা জান্নাতের আশা আর করতো না। আর অবিশ্বাসীরা যদি আল্লাহ্‌র অপার কৃপা সম্পর্কে বুঝতে পারতো, তবে তারা জান্নাতপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করতো না।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, করুণা সৃষ্টির সময় আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন একশতটি রহমানি করুণা। তার মধ্যে নিরানব্বইটি নিজের কাছে রেখে বাকি একটি দান করেছেন সমগ্র সৃষ্টিকে। অবিশ্বাসীরা যদি ওই নিরানব্বইটি করুণার কথা জানতে পারতো, তবে বেহেশত লাভ করার ব্যাপারে নিরাশ হতো না। আর বিশ্বাসীরা যদি আল্লাহ্‌র শাস্তি-ভাণ্ডারের সন্ধান পেতো, তবে দোজখ সম্পর্কে নিঃশঙ্কচিত্ত হতো না।

হজরত সালমান ফারসী থেকে আহমদ ও মুসলিম এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ ও ইবনে মাজা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশত ও দোজখ সৃষ্টির দিনে আল্লাহ্ সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন একশতটি রহমতের। এক একটি রহমতের ব্যাপ্তি বেহেশত ও দোজখের মধ্যবর্তী ব্যবধানের সমান। ওই শত রহমতের একটি দেয়া হয়েছে এই পৃথিবীতে। ওই রহমতের কারণেই জননী ভালোবাসে তার আত্মজ-আত্মজাকে। পশু-পাখিদের স্নেহ মমতার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয় ওই রহমতের প্রভাব। আর বাকী নিরানব্বইটি রহমত তিনি রেখে দিয়েছেন নিজস্ব সংরক্ষণে। ওই সংরক্ষিত রহমত সহ একশত রহমতের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে তখন, যখন তাঁর রহমত ব্যতিরেকে মানুষের আর কোনো উপায় থাকবে না।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন কেবল তাঁর ক্ষমা ও দয়ার কথা। এর সঙ্গে তাঁর শাস্তির কথা একেবারেই উল্লেখ করেননি। শাস্তির প্রসংগ বিবৃত করেছেন পরবর্তী আয়াতে পৃথকরূপে। এতে করে বুঝা যায়, তাঁর আযাব ও গজব অপেক্ষা তাঁর রহমত ও ক্ষমা অধিকতর প্রবল।

এর পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'এবং আমার শাস্তি, সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি!' উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র অতি মর্মন্তুদ শাস্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে পরবর্তী পৃথিবীতে। আরো উল্লেখ্য যে, পরবর্তী পৃথিবীতে তাঁর রহমত ও গজবের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটলেও এই পৃথিবীতেও তার দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। সে কারণেই যুগে যুগে ধ্বংস হয় অবাধ্য আদ ও ছামুদ নরগোষ্ঠীভূত লোকেরা। আবার তাঁর একান্ত নৈকট্যভাজন হয় নবী-রসুলগণ ও তাঁদের অনুসারীরা। পরবর্তী আয়াতগুলোর মধ্যে বিবৃত হয়েছে আল্লাহ্‌র রহমত ও গজবের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত। যেমন—

www.eelm.weebly.com

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ۞ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ۚ قَالَ اِنَّا
مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ۞ قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۞ قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ
عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ۞ قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ
مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ۞

❐ এবং উহাদিগকে বল, 'ইব্‌রাহীমের অতিথিদিগের কথা,'

❐ যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'সালাম', তখন সে বলিয়াছিল, 'আমরা তোমাদিগকে ভয় করিতেছি।'

❐ উহারা বলিল, 'ভয় করিও না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের শুভসংবাদ দিতেছি।'

❐ সে বলিল, 'তোমরা কি আমাকে শুভ সংবাদ দিতেছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কী বিষয়ে শুভ সংবাদ দিতেছ?'

❐ উহারা বলিল, 'আমরা সত্য সংবাদ দিতেছি; সুতরাং তুমি হতাশ হইও না।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি মক্কাবাসীদেরকে নবী ইব্রাহিমের অতিথিবৃন্দ সম্পর্কে অবহিত করুন। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে ইতোপূর্বে আলোচিত ৪৯ ও ৫০ সংখ্যক আয়াতদ্বয়ের সঙ্গে। সেখানে বলা হয়েছিলো— আমার দাসদেরকে বলে দাও যে, আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু এবং আমার শাস্তি, অতি মর্মন্তুদ শাস্তি। একথার আলোকে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আমি আমার প্রিয় নবী ইব্রাহিমকে অতিবৃদ্ধ বয়সে দান করেছি পুত্র সন্তান, এটা আমার রহমতের একটি অনন্য নিদর্শন। আর আমার প্রিয় নবী লুতের অবমাননাকারীদেরকে করেছি নিশ্চিহ্ন। সেটা ছিলো আমার মর্মন্তুদ শাস্তির একটি দৃষ্টান্ত।

এখানকার 'দ্বইফ' শব্দটি একবচন ও বহুবচন দু'ভাবেই ব্যবহার্য। এর অর্থ অতিথি বা অতিথিবর্গ। এখানে কথাটির অর্থ হবে অতিথি ফেরেশতাবৃন্দ, যারা নিয়ে এসেছিলো হজরত ইব্রাহিমের পুত্রলাভের শুভসংবাদ এবং হজরত লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের ধ্বংসের বার্তা।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, সালাম। তখন সে বলেছিলো, আমি তোমাদেরকে ভয় পাচ্ছি।' উল্লেখ্য

www.eelm.weebly.com

যে, অতর্কিতে কয়েকজন অতিথি এসে পড়ায় হজরত ইব্রাহিম শংকিত হয়েছিলেন। অথবা তাঁর শংকাগ্রস্ত হওয়ার আরেকটি কারণ এই হতে পারে যে, আপ্যায়নের নিমিত্তে পরিবেশিত ভাজা গরুর গোশত তারা খেতে রাজি হয়নি। তাই তিনি মনে করেছিলেন এদের নিশ্চয় কোনো দুরভিসন্ধি রয়েছে। শত্রুগৃহে আহার্য ভক্ষণ না করাই ছিলো তখনকার রীতি। তাই পরিবেশিত আহার্যবস্তু ভক্ষণে তাদেরকে অনীহ দেখে ভীত হয়ে পড়েছিলেন হজরত ইব্রাহিম। বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে ভয় পাচ্ছি। এখানে 'ওয়াজল' শব্দটির অর্থ আসন্ন বিপদের ভয়ে ভীত হওয়া। শংকাগ্রস্ত হয়ে পড়া।

এর পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, ভয় কোরো না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের শুভসংবাদ দিচ্ছি।' একথার অর্থ— ফেরেশতারা তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র খলিল! ভীত হবেন না। আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের জনক হওয়ার সুসংবাদ দিচ্ছি। পরিণত বয়সে আপনার ওই সন্তান হবে অতি বিজ্ঞ ও সম্মানার্হ।

এর পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'সে বললো, তোমরা কি আমাকে শুভসংবাদ দিচ্ছো। আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কী বিষয়ে শুভসংবাদ দিচ্ছো?' একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম বললেন, হে আমার অতিথিবর্গ! আপনারা যে আমাকে এক অসম্ভব সংবাদ শোনাচ্ছেন। আমি বার্ধক্যকবলিত। আর আমার পত্নী সন্তান জন্মদানের বয়স পেরিয়েছে অনেক আগেই। তাই আপনাদের প্রদত্ত সুসংবাদ কি আদৌ কোনো শুভসংবাদ?

এর পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমরা সত্যসংবাদ দিচ্ছি; সুতরাং তুমি হতাশ হয়ো না।' একথার অর্থ— অতিথি ফেরেশতারা বললো, আমরা আপনাকে জানাচ্ছি আল্লাহ্‌প্রদত্ত সত্যসংবাদ, যা অন্যথা হবার নয়। কারণ আল্লাহ্‌র বিধান অকার্যকর করার সাধ্য কারো নেই। সুতরাং হে আল্লাহ্‌র বন্ধু! আপনি আল্লাহ্‌র বিধান-বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করবেন না। যে আল্লাহ্‌ যৌবনদীপ্ত দম্পতিকে সন্তান দান করতে সক্ষম, তিনি বার্ধক্যগ্রস্ত দম্পতিকেও নিশ্চয় সন্তান দিতে পূর্ণসক্ষম। উল্লেখ্য যে, হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র বিধান-বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করতে পারেন না। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী। ছিলেন খলিলুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র বন্ধু)। তাই তিনি একথা ভালো করেই জানতেন যে, আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিধর। তিনি কেবল বিস্মিত হয়েছিলেন একথা ভেবে যে, বিষয়টি আল্লাহ্‌র সাধারণ বিধানের প্রতিকূল। তাঁর প্রকৃত বিশ্বাস বিবৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে এভাবে—

 www.eelm.weebly.com

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ۝ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝ قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ۝ اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝

❒ সে বলিল, 'যাহারা পথভ্রষ্ট তাহারা ব্যতীত আর কে তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হইতে হতাশ হয়?'

❒ সে বলিল, 'হে ফেরেশতাগণ! তোমাদিগের আর বিশেষ কী কাজ আছে?'

❒ উহারা বলিল, 'আমাদিগকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছে—

❒ 'লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নহে, আমরা অবশ্যই ইহাদিগের সকলকে রক্ষা করিব,

❒ কিন্তু লূতের স্ত্রীকে নহে; আমরা জানিয়াছি যে, যাহারা ধ্বংস হইবে সে অবশ্যই তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত।'

প্রথমে উল্লেখিত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইব্রাহিম বললেন, যারা পথভ্রষ্ট, আল্লাহ্‌র অপার দয়া, জ্ঞান ও ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা ছাড়া আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হতে পারে কে? হে অতিথিবৃন্দ! আমিতো আল্লাহ্‌র খলিল। তাই আমি একথা ভালো করেই জানি যে, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে হতাশ হওয়া যেমন অপরাধ, তেমনি আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে নির্ভয় হওয়াও পাপ। আমিতো তোমাদের কথায় বিস্ময় প্রকাশ করেছি মাত্র। তাঁর সাধারণ বিধানের স্থলে তাঁরই ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার সংবাদ বিস্ময়কর নয় কি? আমার এই বিস্ময়কে তোমরা হতাশা ভাবলে কেনো?

পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে ফেরেশতাগণ! তোমাদের আর বিশেষ কী কাজ আছে?' এ কথার অর্থ— এতক্ষণের আলাপচারিতায় হজরত ইব্রাহিম বুঝলেন, অতিথিবৃন্দ আল্লাহ্‌র ফেরেশতা। তাঁরা এসেছেন তাঁকে সুসংবাদ জানাতে। নবীসুলভ প্রজ্ঞাবলে তিনি একথাও অনুমান করতে পারলেন যে, সুসংবাদ প্রদান ছাড়াও তাদের অন্য কোনো বিশেষ কাজ থাকতে পারে। তাই বললেন, হে ফেরেশতাগণ! আর কী কাজ করতে আদিষ্ট হয়েছো তোমরা?

এর পরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছে।' একথার অর্থ— এক অপরাধী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে আমাদেরকে। হে নবী! আপনি

www.eelm.weebly.com

নিশ্চিত থাকুন, আপনার ভাগিনেয় নবী লুতের একনিষ্ঠ অনুসারীরা এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, নবী লুতের পরিবারবর্গ ছাড়া সকল অবাধ্যদের বিনাশ সাধনার্থে আমরা প্রেরিত হয়েছি।

এর পরের আয়াতদ্বয়ের (৫৯, ৬০) মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরেশতারা আরো বললো, হে আল্লাহ্র খলিল! নবী লুত ও তাঁর পরিবারের সকলকে আমরা রক্ষা করবো। কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে রক্ষা করবো না। কারণ সে অবিশ্বাসিনী। তাই অন্যান্য অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সেও ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা তার ললাটলিখন। আমাদেরকে একথা জানানোও হয়েছে। সুতরাং তার ধ্বংস অনিবার্য।

এখানে উল্লেখিত 'তাক্বদীর' (ক্বদদারনা) শব্দটির অর্থ সমাধান। ফেরেশতাদের সঙ্গে কথাটি যুক্ত হওয়ার ফলে অর্থ দাঁড়িয়েছে— আমরা জেনে শুনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি বা সমাধান দিয়েছি যে, নবী লুতের অবিশ্বাসিনী স্ত্রীকে অবশ্যই অন্যান্য অবিশ্বাসীদের সঙ্গে ধ্বংস করা হবে। 'তাক্বদীর' শব্দটির আভিধানিক অর্থ অবশ্য এরকম— কোনো বস্তুকে অপর কোনো বস্তুর অনুকরণে নির্মাণ করা। উল্লেখ্য যে, তাক্বদীর সম্পূর্ণতই আল্লাহ্তায়ালার নিয়ন্ত্রণাধীন। ফেরেশতারা আল্লাহ্র নৈকট্য-ভাজন এবং তাক্বদীরের বাস্তবায়ন কর্মের সঙ্গে জড়িত। তাই এখানে তাক্বদীর কথাটি যুক্ত হয়েছে তাদের সঙ্গে।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ○ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ○ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ
بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ○ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ○ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ
بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ○

❐ ফেরেশতাগণ যখন লূত পরিবারের নিকট আসিল

❐ তখন লূত বলিল, 'তোমরা তো অপরিচিত লোক।'

❐ তাহারা বলিল, 'না, উহারা যে শাস্তি সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিল আমরা তোমার নিকট তাহাই লইয়া আসিয়াছি;

❐ 'আমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ লইয়া আসিয়াছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী;

❐ 'সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তুমি তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণ কর এবং তোমাদিগের মধ্যে কেহ যেন পিছন দিকে না চাহে; তোমাদিগকে যেথায় যাইতে বলা হইতেছে তোমরা সেথায় চলিয়া যাও।'

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের (৬১, ৬২) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইব্রাহিমের গৃহ থেকে অতিথি ফেরেশতাবৃন্দ উপস্থিত হলো সাদুমবাসীদের অঞ্চলে হজরত লুতের নিকটে। হজরত লুত দেখলেন, আগন্তুক অতিথিরা সৌম্যকান্ত, সুদর্শন। পথশ্রান্তির কোনো চিহ্ন তাদের অবয়বে নেই। চেহারা, বেশবাস সবকিছুই কী সুন্দর পরিপাটি। তাদের দেখে দূরদেশী মুসাফির বলে মনেই হয় না। আবার তারা স্থানীয়ও নয়। হলে তো চেনাই যেতো। তাই তিনি সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, আপনারা তো দেখছি একেবারে অপরিচিত। তাঁর কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো এক ধরনের আশংকা। আপন মনে ভাবলেন তিনি, এদের দ্বারা কি কোনো বিপদ ঘটতে পারে।

এর পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, না, তারা যে শাস্তি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলো, আমরা তোমার নিকট তাই নিয়ে এসেছি।' একথার অর্থ— ফেরেশতারা বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! বার বার আল্লাহ্‌র গজব সম্পর্কে সাবধান করা সত্ত্বেও আপনার সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আপনার সাবধানবাণীর প্রতি কর্ণপাত করেনি। সেই গজব নিয়েই আমরা আবির্ভূত হয়েছি।

এর পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'আমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী।' একথার অর্থ— তারা আরো বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা যা বললাম তা সত্য। এতে অণুপরিমাণ মিথ্যার সংমিশ্রণ নেই। অবাধ্যদের ধ্বংস সুনিশ্চিত।

এর পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি রাত্রির কোনো এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড় এবং তুমি তাদের পশ্চাদনুসরণ করো এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো পিছন দিকে না চায়। এখানে 'ক্বিত্বই'ম্ মিনাল্ লাইল' কথাটির অর্থ— রাতের কোনো এক সময়ে। কেউ কেউ বলেছেন, শেষ রাতে। এখানে হজরত লুতকে তাঁর পরিবারবর্গকে সামনে রেখে যাত্রা করতে বলা হয়েছে এ কারণে যে, তিনি যেনো তাদেরকে চোখের সামনে রেখে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সকলকে নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন।

'লা ইয়ালতাফিত্' অর্থ কেউ যেনো পিছনে না তাকায়। অর্থাৎ কেউ যেনো পিছনে তাকিয়ে অবাধ্যদের উপরে আপতিত ভয়াবহ শাস্তি অবলোকন না করে। এতে করে গজব কবলিত আত্মীয়স্বজনের জন্য অন্তরে মমতার উদ্রেক হতে পারে। সেই সূত্রে তারাও হতে পারে আল্লাহ্‌র আক্রোশ ও গজবের লক্ষ্যস্থল। কেউ কেউ বলেছেন, আত্মীয়স্বজনের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের কারণে যাত্রা বিলম্বিত যাতে না হয়, তাই বলা হয়েছে— তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো পিছনে না তাকায়। কেউ কেউ আবার বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ এরকম— রাতের একাংশে অত্যন্ত

দ্রুততার সঙ্গে সকলে যেনো গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। চলার পথে কেউ যেনো থমকে না দাঁড়ায়। অযথা পিছনে তাকিয়ে সময় ক্ষেপণ না করে। আসন্ন আযাব থেকে অতিদ্রুত পৃথক হয়ে যাওয়াই উত্তম।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে যেখানে যেতে বলা হচ্ছে, সেখানে চলে যাও।' একথার অর্থ—গজবের এলাকা ছেড়ে আল্লাহ্পাক যে স্থানে তোমাদেরকে চলে যেতে বলেছেন, সেখানেই তোমরা চলে যাও। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত লূত ও তাঁর পরিবারবর্গকে সিরিয়ায় চলে যেতে বলা হয়েছিলো। মুকাতিল বলেছেন, তাঁদেরকে চলে যেতে বলা হয়েছিলো জামার নামক স্থানে। কেউ কেউ বলেছেন, জর্দানে।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯

وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ○ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ○ قَالَ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِى فَلَا تَفْضَحُونِ ○ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ○

❒ আমি লূতকে প্রত্যাদেশ দ্বারা জানাইয়া দিলাম যে, প্রত্যূষে উহাদিগকে সমূলে বিনাশ করা হইবে।

❒ নগরবাসিগণ উল্লসিত হইয়া উপস্থিত হইল।

❒ লূত বলিল, 'উহারা আমার অতিথি; সুতরাং তোমরা আমাকে বে-ইজ্জত করিও না।'

❒ 'তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর ও আমাকে হেয় করিও না।'

প্রথমে উল্লেখিত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী হজরত লূতকে এইমর্মে প্রত্যাদেশ করলেন যে, সকাল হওয়ার আগেই আমি তোমার অবাধ্য ও পাপাসক্ত সম্প্রদায়কে সমূলে বিনাশ করবো। তাদের একজনকেও আস্ত রাখবো না। এখানে 'দাবির' অর্থ মূল বা শিকড়।

পরের আয়াতের (৬৭) মর্মার্থ হচ্ছে— শ্মশ্রু ও গুম্ফবিহীন অনিন্দ্যসুন্দর কিশোর অতিথিদের আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। উল্লসিত হলো নগরবাসী। তারা ছিলো সমকামী। বিকৃত কাম চরিতার্থ করার জন্য তারা একে একে সমবেত হলো হজরত লূতের গৃহাঙ্গনে।

এর পরের আয়াতের (৬৮) মর্মার্থ হচ্ছে— কামোন্মাদ নগরবাসীকে লক্ষ্য করে হজরত লূত বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! ক্ষান্ত হও। এরা আমার সম্মানিত মেহমান। তোমরা এদেরকে অবমাননা করে আমার মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত কোরো না।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতের (৬৯) মর্মার্থ হচ্ছে— তিনি আরো বললেন, হে আমার স্বজাতি! আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নির্লজ্জ অপকর্ম থেকে বিরত হও। পাপের শাস্তি নিশ্চিত। সুতরাং সংযত হও। সম্মানিত মেহমানগণের সম্মুখে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন কোরো না। এখানে 'লা তুখ্‌যুনি' অর্থ আমাকে হেয় প্রতিপন্ন কোরো না। শব্দটি এসেছে 'খিজ্‌ইয়ুন্' থেকে। এর অর্থ দুঃখ, ক্লেশ, লাঞ্ছনা অথবা যাতনা। কেউ কেউ বলেছেন, লজ্জা।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪

قَالُوٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝ لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ۝ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝

❐ উহারা বলিল, 'আমরা কি দুনিয়ার লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করি নাই ?'

❐ লূত বলিল, 'একান্তই যদি তোমরা কিছু করিতে চাহ তবে আমার এই কন্যাগণ রহিয়াছে।'

❐ তোমার জীবনের শপথ! উহারা মত্ততায় বিমূঢ় হইয়াছে।

❐ অতঃপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মহানাদ উহাদিগকে আঘাত করিল;

❐ এবং আমি নগরগুলিকে উল্‌টাইয়া দিলাম এবং উহাদিগের উপর কংকর বর্ষণ করিলাম।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— উদ্ধত সাদুমবাসীরা বললো, হে লুত! সারা দুনিয়ার লোককে তুমি আশ্রয় দিবে নাকি? এটা তোমার অনধিকার চর্চা। আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে দাও। তুমি থাকো তোমার কাজে। এভাবে যাকে তাকে আশ্রয় দিতে আমরা কি নিষেধ করিনি?

আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে উহ্য একটি ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই উহ্য ক্রিয়া সহযোগে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— পাপাচারীরা বললো, হে লুত! তোমার কথামতো আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করতে পারি না। কারণ ইতোপূর্বে তুমি কথা দিয়েছিলে আমাদের কোনো কাজে তুমি আর নাক গলাবে না। আমাদের প্রতিপক্ষ আর কাউকে তোমার গৃহে আশ্রয় দিবে না। তোমার অতিথিদের নিকটে আমাদের কিছু পাওনা আছে। আমরা তা আদায় করবোই । উল্লেখ্য যে, সমকাম ছাড়াও আরো একটি জঘন্য দোষ ছিলো সাদুমবাসীদের । তারা যত্রতত্র করতো ডাকাতি ও ছিনতাই। লুণ্ঠন করতো পথচারীদের সম্মান ও সম্পদ। হজরত লুত অনেক চেষ্টা করেও তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি ওই দোষ দু'টো থেকে।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৭১) বলা হয়েছে— 'লুত বললো, একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও, তবে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে।' একথার অর্থ— হজরত লুত বললেন, হে অবিমৃশ্য জনতা! বৈধ উপায়ে কাম চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হও। আমার কন্যাগণ রয়েছে। আরো রয়েছে আমার সম্প্রদায়ের কন্যাগণ। তোমরা তাদেরকে বিবাহ করে বাসনা পূর্ণ করতে পারো। এভাবে রক্ষা পেতে পারো আল্লাহ্র গজব থেকে।

এর পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'তোমার জীবনের শপথ! তারা মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে।' 'আসর' ও 'উমর ' শব্দ দু'টো সমার্থক। তবে লঘু শপথের বেলায় ব্যবহৃত হয় 'আসর'। শপথ প্রকাশার্থে আলোচ্য আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে এই শব্দটি। আবুল জাওজার মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুলের জীবনাপেক্ষা আর কোনো প্রিয় জীবন সৃষ্টি করেননি। তাঁর জীবন ব্যতীত অন্য কারো জীবনের শপথও করেননি। কারণ প্রিয়তম জনের শপথ করাই দস্তুর। 'ইয়া'মাহুন' অর্থ মত্ততায় মুহ্যমান বা বিমূঢ়। শ্রান্ত, ক্লান্ত বা অবসাদগ্রস্ত। অর্থাৎ সাদুমবাসীরা পাপোন্মত্ত। তাই তাদের কর্ণকুহরে কোনো সদুপদেশ প্রবেশ করেনি। এভাবে আলোচ্য আয়াতের সম্বোধিতজন হন শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.। সম্বোধনবচনটি ফেরেশতাগণেরও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে সম্বোধিতজন হবেন হজরত লুত। আর মর্মার্থ দাঁড়াবে— অতিথি ফেরেশতারা বললো, হে লুত! আপনার জীবনের শপথ! এই লোকগুলো কামের নেশায় উন্মত্ত। তাই আপনার উপদেশবাণী এদের কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হবে না। সুতরাং অরণ্যে রোদন করে কোনো লাভ নেই। আর এখানকার সম্বোধিতজন যদি রসুল স. হন, তবে মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— নবী লুত ও তাঁর অবাধ্য সম্প্রদায়ের কাহিনী বিবৃত করার পর আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুলকে জানাচ্ছেন, হে আমার প্রিয়তম ! আপনার জীবনের শপথ! প্রকৃতপক্ষে লুতের সম্প্রদায় ছিলো অবাধ্য ও উন্মত্ত। তাই নবী লুতের মর্মস্পর্শী বাণী তাদের শ্রুতিকে জাগ্রত করেনি। ফলে তাদের বোধোদয়ও ঘটেনি।

এর পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'অতঃপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মহানাদ তাদেরকে আঘাত করলো।' একথার অর্থ— বিকট, বীভৎস ও বিধ্বংসী আওয়াজে সূর্যোদয়কালে ধ্বংস হয়ে গেলো সাদুমবাসীরা। 'সাইহাতু' অর্থ মহানাদ বা বিকট বীভৎস বিধ্বংসী আওয়াজ। কেউ কেউ বলেছেন, ওই বিধ্বংসী মহাধ্বনি ছিলো হজরত জিবরাইলের। উল্লেখ্য যে, ওই মহানাদ শুরু হয়েছিলো অতি প্রত্যুষে এবং শেষ হয়েছিলো সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

এর পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'এবং আমি নগরগুলোকে উল্টিয়ে দিলাম।' একথার অর্থ— আমার নির্দেশে জিবরাইল ফেরেশতা সাদুমদের পুরো বসতি উর্ধ্বে উঠিয়ে উপুড় করে মৃত্তিকায় প্রোথিত করলো।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের উপর কংকর বর্ষণ করলাম।' একথার অর্থ— মাটিতে প্রোথিত ওই ওল্টানো জনপদগুলোর উপরে আমার নির্দেশে বর্ষিত হলো অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড। এভাবে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো তারা। সুরা হুদে কাহিনীটির পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। এখানে 'সিজ্জীল' অর্থ ওই মৃত্তিকা, যা রূপান্তরিত হয় কঠিন শিলায়। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে 'ফা' অব্যয়টি যুক্ত থাকার কারণে বোঝা যায়, ঘটনাটির ধারাবাহিকতা ছিলো এরকম— প্রথমতঃ মহানাদ, তারপর জনপথগুলোকে উল্টিয়ে ফেলা এবং শেষে প্রস্তর বর্ষণ।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৭৫, ৭৬, ৭৭

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ○ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ○ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ○

❒ অবশ্যই ইহাতে পর্যবেক্ষণ-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

❒ যে পথে লোক চলাচল করে তাহার পার্শ্বে উহাদিগের ধ্বংসস্তূপ এখনও বিদ্যমান।

❒ অবশ্যই ইহাতে বিশ্বাসীদিগের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— 'অবশ্যই এতে পর্যবেক্ষণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মুতাওয়াস্‌সিমীন' অর্থ পর্যবেক্ষণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বা দর্শক। মুজাহিদ বলেছেন, প্রত্যক্ষকারী বা সনাক্তকারী। কাতাদা বলেছেন, অনুধাবন ক্ষমতাসম্পন্ন। মুকাতিল বলেছেন, চিন্তাশীল। আমি বলি, 'ওসম' শব্দের অর্থ প্রভাব বিস্তার করা বা দাগ দেয়া । 'সিমাতুন' অর্থ, প্রভাব, আঁচড় বা দাগ। অর্থাৎ যারা বাহ্যিক আলামত বা চিহ্ন দেখে অভ্যন্তরীণ মর্ম ও পরিণতি অনুধাবন করতে সক্ষম, তারাই 'মুতাওয়াস্‌সিমীন' বা পর্যবেক্ষণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গের জন্যই নিদর্শন রয়েছে বর্ণিত ঘটনাবলীতে।

পরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'যে পথে লোক চলাচল করে, তার পাশে তাদের ধ্বংসস্তূপ এখনো বিদ্যমান।' একথার অর্থ— মৃত্তিকায় প্রোথিত ও প্রস্তরাবৃত অবাধ্য সাদুমদের জনপথগুলোর ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন সিরিয়া রাজ্যের গমনপথে এখনো বিদ্যমান। এখানে 'মুক্বীম' শব্দের অর্থ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত বা এখনো বিদ্যমান।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'অবশ্যই এতে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।' একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর শেষ রসুলকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছে তাদের জন্য সাদুমবাসীদের মর্মন্তুদ পরিণতির মধ্যে রয়েছে শিক্ষাপ্রদ ও জ্ঞানগর্ভ নিদর্শন।

সাদুমদের কাহিনীর ইতিটানা হয়েছে এখানেই। এরপর শুরু হয়েছে আসহাবে আইকা বা অরণ্যবাসীদের কথা। আরব উপদ্বীপের উত্তর পশ্চিম কোণে লোহিত সাগরের উপকূলে ছিলো মাদিয়ান নামক নগরী। বিস্তীর্ণ ঘন অরণ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলো মাদিয়ান। ওই অরণ্যের অধিবাসীদেরকেই বলা হতো আসহাবে আইকা বা অরণ্যবাসী।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৭৮, ৭৯

وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ۙ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۞

❒ শোয়াইব সম্প্রদায়ও তো ছিল সীমালংঘনকারী,

❒ সুতরাং আমি উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি, উহাদিগের উভয়েরই ধ্বংসস্তূপ তো প্রকাশ্য পথ-পার্শ্বে অবস্থিত।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— 'শোয়াইব সম্প্রদায় তো ছিলো সীমালংঘনকারী।' একথার অর্থ— নবী শোয়াইবের সম্প্রদায়ও ছিলো জালেম বা সীমালংঘনকারী। আল্লাহ্কে এবং আল্লাহ্র নবী শোয়াইবকে তারা বিশ্বাস করতো না। এখানে আসহাবে আইকা বলে বুঝানো হয়েছে হজরত শোয়াইবের স্বজাতিকে। গহনবনের অধিবাসী ছিলো তারা। ওই বনে জন্মাতো ধূপের গাছ।

পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'সুতরাং আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি।' একথার অর্থ— তাদের সীমালংঘনের যথোপযুক্ত শাস্তি আমি দিয়েছি। ওই মর্মন্তুদ শাস্তির প্রকৃতি ছিলো এরকম— দীর্ঘ সাত দিন যাবৎ তাদেরকে রাখা হয়েছিলো প্রচণ্ড উত্তপ্ত আবহাওয়ায়। সাত দিন পর আকাশে ভেসে এলো এক টুকরো মেঘ। অরণ্যবাসীরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো । বৃষ্টির আশায় আশ্রয় নিলো মেঘের ছায়ায়। অচিরেই শুরু হলো অগ্নিবৃষ্টি। সে অগ্নিবৃষ্টিতে পুড়ে ছারখার হয়ে গেলো তারা। ওই শাস্তিকে বলা হয় 'আজাবু ইয়াওমিজ্ জুল্লাহ্' বা ছায়া দিবসের শাস্তি।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'তাদের উভয়ের ধ্বংসস্তূপ তো প্রকাশ্য পথের পাশে অবস্থিত।' একথার অর্থ— সাদুম ও অরণ্যবাসীদের ধ্বংসস্তূপ দু'টো সিরিয়ার প্রবেশ পথের পাশে প্রকাশ্য স্থানে এখনো বিদ্যমান। এখানে 'হুমা' (উভয়েরই) সর্বনাম দ্বারা বুঝানো হয়েছে সাদুম ও অরণ্যবাসীদের গজবকবলিত জনপদের ধ্বংসাবশেষকে। কেউ কেউ বলেছেন, সর্বনামটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে মাদিয়ান ও অরণ্যবাসীদের জনপদকে। ওই দুই জনপদের অধিবাসীদের পথ-প্রদর্শনের নিমিত্তে প্রেরিত হয়েছিলেন হজরত শোয়াইব।

'ইমামিম্ মুবীন' অর্থ প্রকাশ্য পথের পাশে, যে পথ দিয়ে মক্কাবাসীরা বাণিজ্যব্যপদেশে সিরিয়া গমনাগমন করতো। এখানে 'প্রকাশ্য পথের পাশে' বলে মক্কাবাসীদেরকে ওই ধ্বংসস্তূপ দেখে শিক্ষাগ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যার অনুসরণ করা হয়, তাকে বলে ইমাম। শিল্পকর্মের নমুনাকেও ইমাম বলে। কারণ সেই নমুনার অনুকরণ করা হয়। এভাবে লওহে মাহফুজ, ভবন নির্মাণ কর্মীর পরিমাপক সুতা এবং মানুষের চলার পথকেও ইমাম বলা হয়। কারণ এগুলোও অনুসরণীয়।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪

وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا مِنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝ وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ۝ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ۝ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

❒ হিজরবাসিগণও রসূলদিগের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল;

❒ আমি উহাদিগকে আমার নিদর্শন দিয়াছিলাম কিন্তু উহারা তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল।

❒ উহারা নিশ্চিন্ত হইয়া পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিত।

❒ অতঃপর এক প্রভাতে মহানাদ উহাদিগকে আঘাত করিল।

❒ সুতরাং উহারা যাহা করিয়াছিল তাহা উহাদিগের কোন কাজে আসে নাই।

আলোচ্য আয়াতপঞ্চকের প্রথমটির মর্মার্থ হচ্ছে— হিজরবাসীরাও আমার প্রিয় নবী সালেহ্ ও অন্যান্য নবীকে অস্বীকার করেছিলো। এখানে 'আসহাবু হিজর' অর্থ মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী হিজর নামক এক পার্বত্য উপত্যকার অধিবাসী। হিজরবাসীদেরকে ছামুদ জাতিও বলা হয়।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছিলো।' একথার অর্থ— ওই হিজরবাসী বা ছামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা নবী সালেহের প্রতি অবতীর্ণ সহীফাসমূহ অস্বীকার করেছিলো। অথবা অবমাননা করেছিলো তাঁকে প্রদত্ত মোজেজার। উল্লেখ্য যে, হজরত সালেহ্‌কে মোজেজা হিসেবে দেয়া হয়েছিলো প্রস্তরাভ্যন্তরাগত একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী। আবির্ভূত হওয়ার পরক্ষণে উষ্ট্রীটি প্রসব করেছিলো তার শাবক।

এর পরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'তারা নিশ্চিন্ত হয়ে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করতো।' একথার অর্থ— ছামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো গৃহ নির্মাণ কার্যে অত্যন্ত পারদর্শী। পর্বতগাত্র খোদাই করে তারা সুদৃঢ়, নিরাপদ ও আরামদায়ক গৃহ নির্মাণ করতো। মনে করতো তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত। এই ভাবনা তাদেরকে করে তুলেছিলো নিশ্চিন্ত, দুর্বিনীত ও উদাসীন।

এর পরের আয়াতে (৮৩) বলা হয়েছে— 'অতঃপর এক প্রভাতে মহানাদ তাদেরকে আঘাত করলো।' একথার অর্থ— ছামুদ জাতি তাদের নবীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করলো। অকস্মাৎ এক সকালে ধ্বনিত হলো বিকট, বীভৎস ও বিধ্বংসী আওয়াজ।

এর পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তারা যা করেছিলো তা তাদের কোনো কাজে আসেনি।' একথার অর্থ — ওই বিরাট আওয়াজে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো তারা। তাদের নির্মাণশৈলী, সুদৃঢ় পর্বতাশ্রয় ও সহায় সম্পদ তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি।

সেই অবাধ্য ছামুদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের চিহ্ন এখনো বিদ্যমান। তাবুক অভিযানের সময় উষ্ট্রারোহী রসুল স. চাদরে মুখ ঢেকে অতি দ্রুত অতিক্রম করেছিলেন ওই স্থানটি। সহচরবৃন্দকে বলেছিলেন, সীমালংঘনকারীদের ধ্বংসপ্রাপ্ত বসতি অতিক্রম কোরো ক্রন্দনরত অবস্থায়। প্রার্থনা কোরো তোমাদের উপরে যেনো আবার ওইরূপ শাস্তি আপতিত না হয়।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৮৫, ৮৬

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ۝ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۝

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করি নাই। এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং তুমি পরম ঔদাসীন্যের সহিত উহাদিগকে উপেক্ষা কর।

❒ তোমার প্রতিপালকই মহা স্রষ্টা, মহা জ্ঞানী।

---

 www.eelm.weebly.com

প্রথমে উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি।' একথার অর্থ— আমি আমার সমগ্র সৃষ্টিকে যথাযথরূপে বিন্যস্ত করেছি। এই বিশাল কর্মকাণ্ডের কোনো কিছুই উদ্দেশ্যবিহীন নয়। এই মহাসৃষ্টিই তার স্রষ্টার অস্তিত্ব ও গুণবত্তার প্রমাণ। যারা অবিশ্বাসী, তাদেরকে এই বিশাল সৃষ্টির বহু বিচিত্র শৈলী ও রহস্যরাজির কথা বলে সহজেই বাকরুদ্ধ করে দেয়া যায়। তখন তাদের অজ্ঞতার অজুহাত আর খাটে না। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, এই মহাবিশ্ব আমি অযথা সৃষ্টি করিনি। এর সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য আমি বেঁধে দিয়েছি একটি সুন্দর নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানো যাবে না। অনিয়ম, অশ্লীলতা ও অবাধ্যতার অবকাশ নেই এখানে। কারণ তা আল্লাহ্র বিধানবিরুদ্ধ। এ কারণেই যুগে যুগে অবাধ্য ও অসুন্দর মনোবৃত্তির লোকদেরকে ধ্বংস করে সৃষ্টির মর্যাদা ও সৌন্দর্যকে অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। এই রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রবহমান থাকবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তুমি পরম ঔদাসীন্যের সঙ্গে তাদেরকে উপেক্ষা করো।' একথার অর্থ মহাপ্রলয় সুনিশ্চিত। তারপর অবশ্যই সংঘটিত হবে প্রতিফল প্রদান পর্ব। নবী ও তাঁর অনুসারীদেরকে দেয়া হবে পুরস্কার। আর তাঁদের বিরুদ্ধ পক্ষকে দেয়া হবে শাস্তি। অতএব, হে আমার রসুল! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি প্রতিশোধ-স্পৃহ হবেন না। তাদের প্রতি আন্তরিক ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা প্রদর্শনই আপনার জন্য শোভন।

পরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকই মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! স্মরণ করুন, আল্লাহ্ মহাস্রষ্টা। আপনাকে যেমন তিনি সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টি করেছেন আপনার শত্রুদেরকেও। আপনাকে যেমন তিনি প্রতিপালন করেন, তেমনি প্রতিপালন করেন তাদেরকেও। সকলের সকল কিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। আর তিনি মহাজ্ঞানী। তাই সকলের পাপ-পুণ্য সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে অবগত। যথাসময়ে তিনি সকলকে প্রদান করবেন যথা প্রতিফল। সুতরাং আপনি আপনার সকল বিষয় তাঁর প্রতি ন্যস্ত করে অচঞ্চল থাকুন।

আলোচ্য আয়াতের মর্ম এরকমও হতে পারে যে— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, আপনার প্রভুপালক মহাস্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী। তিনি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী ও ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সকল কিছুর স্রষ্টা এবং সকলের পালনকর্তা। আপনার জন্য কী শোভন এবং কী অশোভন— সে সম্পর্কে তিনি ভালো করেই জানেন। তাই তিনি আপনাকে জানাচ্ছেন, শত্রুদের অযৌক্তিক ও অসঙ্গত কথায় বিচলিত হবেন না। তাদেরকে উপেক্ষা করুন।

www.eelm.weebly.com

সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ছিলো ধনাঢ্য। সম্পদের বড়াই করা ছিলো তাদের স্বভাব। কিন্তু প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে আখেরাতের সম্পদ। পার্থিব বৈভব অবক্ষয়-প্রবণ। কিন্তু আখেরাতের সম্পদ চিরস্থায়ী। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে আখেরাতের সম্পদে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন অতুলনীয় ও অক্ষয় সম্পদ আল কোরআন। সে কথাই বিধৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে এভাবে—

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৮৭

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

❑ আমি তো তোমাকে দিয়াছি সুরা ফাতিহার সাত আয়াত যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়াছি মহা কুরআন।

'মাছনাতুন' শব্দের বহুবচন 'মাছানী'। এর অর্থ পুনঃপুনঃ পঠিত । 'সাবায়ে মাছানী' অর্থ সাত আয়াত যা পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয়। 'মাছনাতুন' শব্দটি ক্রিয়ার আধার। অথবা 'মাছানী' শব্দটি 'মুছনিয়াতুন' শব্দের বহুবচন। '

'মুছনিয়াতুন' হচ্ছে কর্তৃকারকের শব্দরূপ। এর অর্থ আবৃত্তিকারী। উভয় ক্ষেত্রেই মূল বিষয় 'আয়াত' অথবা 'সুরা' অনুক্ত।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর, হজরত আলী ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, পুনঃপুনঃ উচ্চার্য আয়াত সপ্তক হচ্ছে সুরা ফাতিহা। কাতাদা, হাসান বসরী, আতা এবং হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরও এরকম বলেছেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, সাতটি আয়াতের সমন্বয়ে গঠিত সুরা ফাতিহা হচ্ছে কোরআনের জননী। এই সুরা নামাজের মধ্যে বার বার আবৃত্তি করতে হয়। আর এটাই হচ্ছে মহান কোরআন। হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও কাতাদা বলেছেন, নামাজের প্রতি রাকাতে এই সুরা পাঠ করতে হয় বলে এর নাম মাছানী।

এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, সুরা ফাতিহার দু'টি অংশ। প্রথম অর্ধাংশে রয়েছে আল্লাহ্র প্রশংসা ও তাঁর গুণবত্তার বিবরণ। তাই এর সম্পর্ক আল্লাহ্র সঙ্গে। পরের অর্ধাংশ হচ্ছে বান্দার পক্ষ থেকে প্রার্থনা। তাই এর সম্পর্ক বান্দার সঙ্গে। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি সুরা ফাতিহাকে আমার ও আমার বান্দাগণের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি......। সুরা ফাতিহার তাফসীরে এই হাদিসের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

হোসাইন বিন ফজল 'মাছানী' নামকরণের আর একটি কারণ উল্লেখ করেছেন। কারণটি হচ্ছে— সুরা ফাতিহা অবতীর্ণ হয়েছে দু'বার। একবার মক্কায়। আরেক বার মদীনায়। প্রতিবার অবতীর্ণ হওয়ার সময় সত্তর হাজার করে

 www.eelm.weebly.com

ফেরেশতা উপস্থিত ছিলো। মুজাহিদ বলেছেন, 'মাছানী' অর্থ নির্বাচিত, পৃথকিত। আল্লাহ্তায়ালা শেষ রসুলের উম্মতের জন্য এই সুরাটিকে পৃথক করে রেখেছিলেন। পূর্ববর্তী কোনো উম্মতকেই এই সুরা দান করেননি। আবু জায়েদ বলখী বলেছেন, 'মাছানী' শব্দটি বুৎপত্তি লাভ করেছে 'মাছনা'তুল ইনানা' (আমি লাগাম ফিরিয়ে দিয়েছি) থেকে। এভাবে 'মাছানী' কথাটির মর্মার্থ হবে— সুরা ফাতিহা দুষ্কর্মশীলদেরকে অপকর্ম থেকে ফিরিয়ে দেয়। কেউ কেউ বলেছেন, 'মাছানী' শব্দটি এসেছে 'ছানা' থেকে। 'ছানা' অর্থ প্রশংসা, প্রশস্তি বা স্তব-স্তুতি । অর্থাৎ সুরা ফাতিহা আল্লাহ্র স্তব-স্তুতিতে ভরপুর।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'সাব্য়ান' অর্থ সাতটি সুরা। এখানে 'মিনাল মাছানী' কথাটির 'মিন' অব্যয়টি বর্ণনামূলক । আর সাতটি সুরা অর্থ সাতটি দীর্ঘ সুরা । প্রারম্ভিক সুরা হচ্ছে সুরা বাকারা। এভাবে পরপর সাতটি বৃহৎ সুরা। আর সুরা আন্ফাল ও তওবা এক্ষেত্রে একটি সুরা হিসেবে গণ্য। কেউ কেউ বলেছেন, সুরা তওবা একটি পৃথক সুরা। এভাবে বৃহৎ সুরা সপ্তকের শেষ সুরা হচ্ছে সুরা তওবা। কারো কারো মতে সুরা ইউনুস।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই সাতটি সুরায় রয়েছে সম্পদ বণ্টন বিষয়ক বিধান, অপরাধের দণ্ডবিধান, পাপ-পুণ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ের বিভিন্ন উদাহরণ।

জ্ঞাতব্যঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, 'সাব্য়া মাছানী' অর্থ কোরআনের প্রথমার্ধের সাতটি দীর্ঘ সুরা। হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সুফিয়ান সওরী প্রমুখও একথা বলেছেন। আমি বলি, সম্পূর্ণ কোরআন মজীদই 'মাছানী'। কারণ কোরআন মজীদে বিভিন্ন কাহিনী বারংবার উল্লেখিত হয়েছে।

হজরত আসাকের থেকে মোহাম্মদ বিন নসর উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে তওরাতের স্থলে দান করেছেন সাতটি দীর্ঘ সুরা। ইঞ্জিলের স্থলে দান করেছেন আলিফ লাম র সংযুক্ত সুরা থেকে ত্ব সীন সংযুক্ত সুরাসমূহ। আর যবুরের স্থলে দিয়েছেন ত্ব সীন সংযুক্ত সুরা থেকে হা মীম সংযুক্ত সুরাসমূহ। হা মীম সুরাগুলো আমাকে দেয়া হয়েছে অতিরিক্ত দান হিসেবে। আমার পূর্বে কোনো নবীকেই 'মুফাস্সলাত্ সুরাসমূহ দান করা হয়নি। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বিশেষ উপহার হিসেবে রসুল স.কে দেয়া হয়েছে দীর্ঘতর সাতটি সুরা। হজরত মুসাকে দান করা হয়েছিলো ছয়টি সুরা। তুর পাহাড় থেকে ফিরে এসে উম্মতকে বিভ্রান্ত হতে দেখে ক্ষোভবশতঃ তিনি নিক্ষেপ করেছিলেন তওরাতের ফলকগুলো। পুনঃউত্তোলনের সময় তিনি উঠিয়ে নিয়েছিলেন দু'টি সুরা। বাকী চারটি আর ওঠাননি।

www.eelm.weebly.com

এরকম বর্ণনাও এসেছে যে, কোরআন মজীদে হা মীম সহযোগে গ্রন্থিত হয়েছে সাতটি সুরা। ওই সাতটি সুরাই হচ্ছে 'সাব্‌য়া মাছানী' বা বাণী সপ্তক। স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ছাওবান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌ আমাকে তওরাতের স্থলে দিয়েছেন দীর্ঘ সাতটি সুরা। ইঞ্জিলের বদলে দিয়েছেন 'মিআইন' এবং যবুরের বদলে দিয়েছেন 'মাছানী'। আর মুফাস্‌-সালাত্‌কে দিয়েছেন অতিরিক্ত উপহার হিসেবে।

তাউস বলেছেন 'মাছানী' অর্থ সম্পূর্ণ কোরআন মজীদ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আল্লহু নায্‌যালা আহ্‌সানাল হাদীসি কিতাবাম্‌ মুতাশাবিহাম্‌ মাছানী' (আল্লাহ্‌ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী, নিরুপম সুসংগত গ্রন্থ)। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের 'মিন' অব্যয়টি আংশিক অর্থ প্রকাশক। সুতরাং 'সাবয়া' বা 'সাত' কথাটির অর্থ হবে এখানে— সাতটি সুরা।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে 'মাছানী' বলে বোঝানো হয়েছে সম্পূর্ণ কোরআন মজীদকে। আর 'সাব্‌য়া' কথাটির অর্থ হবে এখানে সাতটি খণ্ড। অর্থাৎ সম্পূর্ণ কোরআন হচ্ছে সাতটি খণ্ডের সম্মিলিত রূপ। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আয়াতের শেষ কথা 'ওয়াল কুরআনিল আ'জীম (এবং দিয়েছি মহা কোরআন) কথাটি সংযুক্ত হবে বিশেষণের পার্থক্যের কারণে।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৮৮, ৮৯

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ إِنِّىٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ۝

❒ আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের কতককে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়াছি তাহার প্রতি তুমি কখনও লক্ষ্য করিও না। এবং উহারা বিশ্বাসী না হওয়ার জন্য তুমি ক্ষোভ করিও না, তুমি বিশ্বাসীদিগের প্রতি বিনয়ী হইবে।

❒ এবং বল 'আমি তো কেবল এক প্রকাশ্য সতর্ককারী।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কতককে ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনো লক্ষ্য কোরো না।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মতো অক্ষয় ঐশ্বর্য আমি আপনাকে দান করেছি। এর তুলনায় পার্থিব ঐশ্বর্যের কোনো মূল্যই নেই। সুতরাং

www.eelm.weebly.com

বিভিন্ন শ্রেণীর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পার্থিব ভোগ-বিলাসের যে উপকরণসমূহ আমি দিয়েছি, তার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করবেন না। এখানে 'আয্ওয়াজ' অর্থ শ্রেণী। অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

ইসহাক ইবনে রহ্ওয়াইহ্ তাঁর মসনদে লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বলেছেন, কোরআনপ্রাপ্ত কেউ যদি ঐশ্বর্যশালীদেরকে উত্তম মনে করে, তবে বুঝতে হবে, সে ক্ষুদ্র অনুগ্রহকে বৃহৎ অনুগ্রহ ভেবে বিভ্রান্ত হয়েছে। কোরআনই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট অনুগ্রহ।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোরআন যার জন্য যথেষ্ট নয়, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূত নয়। এই হাদিসের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনিয়া বলেছেন, কোরআনের মতো নেয়ামত পাওয়ার পরেও যে ব্যক্তি পার্থিব ঐশ্বর্য থেকে বিমুখ হয়নি, সে আমার উম্মতের পর্যায়ভূত নয়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও বায়হাকী, হজরত সা'দ থেকে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম, হজরত আবু লুবাবা থেকে ইবনে মুনজিরের মাধ্যমে আবু দাউদ, হজরত ইবনে আব্বাস ও জননী আয়েশা থেকে হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, অসৎ লোকের সম্পদদৃষ্টে ঈর্ষান্বিত হয়ো না। তার জন্য রয়েছে মৃত্যুহীন হন্তারক। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, পৃথিবী প্রেমিকদের অঢেল বিত্ত-বৈভব দেখে লোভাতুর হয়ো না। তোমরা তো জানো না, মৃত্যুর পর তার কি অবস্থা ঘটবে। আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে তার মৃত্যুহীন হত্যাকারী। সে কি মৃত্যুবরণ করবে না ? ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বার নিকটে হাদিসটি পৌছানো হলে তিনি আবু দাউদ আনওয়ারকে প্রেরণ করে জানতে চাইলেন, মৃত্যুহীন হত্যাকারী আবার কে? আবদুল্লাহ্ ইবনে মরিয়ম জবাব দিলেন, মৃত্যুহীন হত্যাকারী হচ্ছে দোজখ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ, মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে মাজা এবং বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা নিম্নপর্যায়ের মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরো। উচ্চপর্যায়ের মানুষের দিকে দৃষ্টি দিয়ো না (তাহলে প্রাপ্ত নেয়ামতকে তুচ্ছ মনে হবে না)।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা বিশ্বাসী না হওয়ার জন্য তুমি ক্ষোভ কোরো না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! চিরভ্রষ্ট সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ইমান না আনার কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। পার্থিব বিত্ত-বৈভবের মধ্যেই তাদেরকে মগ্ন থাকতে দিন।

শেষে বলা হয়েছে— 'তুমি বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী হয়ো।' এখানে 'আখ্ফিদ্ব্ জানাহাকা' কথাটির শাব্দিক অর্থ ডানা বা বাহু অবনত কোরো। লিল্ মু'মিনীন্ অর্থ বিশ্বাসীদের প্রতি। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— বিনয়ী হয়ো বিশ্বাসীদের প্রতি। অর্থাৎ 'ডানা অবনত কোরো' কথাটির প্রকৃত অর্থ এখানে, বিনয়ী হয়ো।

পরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'এবং বলো, আমি তো কেবল এক প্রকাশ্য সতর্ককারী।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে বলে দিন, আমি বিভিন্ন দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে তোমাদেরকে একথা বুঝাতে চেয়েছি যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে শাস্তি অবধারিত। এভাবে তোমাদেরকে সতর্ককরণ ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্ব আমার নেই।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৯০, ৯১

كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ۝ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ۝

❐ তোমার প্রতি আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি যেভাবে অবতীর্ণ করিয়াছিলাম উহাদিগের প্রতি যাহারা এখন বিভিন্ন মতে বিভক্ত,

❐ যাহারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জন করে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার প্রতি আমি যেমন কোরআন অবতীর্ণ করেছি, তেমনি আপনার সময়ের মতানৈক্য জর্জরিতদের প্রতিও ইতোপূর্বে অবতীর্ণ করেছিলাম তওরাত ও ইঞ্জিল। আজ তারা কোরআনের কোনো কোনো অংশ মানতে চায়, আবার কোনো কোনো অংশ করতে চায় বর্জন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আলমুক্বতাসিমীন' অর্থ বিভিন্ন মতে বিভক্ত বা মতানৈক্যসৃষ্টিকারী। অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান। তিবরানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার এক লোক আলোচ্য আয়াতদ্বয় পাঠ করে রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলো, এখানে 'বিভিন্ন মতে বিভক্ত' বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? তিনি স. বললেন, ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে। লোকটি বললো, এখানে 'ইদ্বীন' কথাটির অর্থ কি? তিনি স. বললেন, কিছু অংশ বিশ্বাস করা এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করা।

'ইদ্বীন' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'ইদ্বাতুন'। 'ইদ্বাতুন' অর্থ টুকরা বা খণ্ড। যেমন বলা হয়— ইদ্বাশ্‌শাতা (ছাগলটিকে টুকরো টুকরো করা হয়েছে)। ইহুদী ও খৃষ্টানেরাও এভাবে কোরআন মজীদকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলেছিলো। একভাগের বিবরণ সম্পর্কে তারা বলতো, এগুলো তওরাত ও ইঞ্জিলের অনুরূপ। তাই আমরা এগুলো বিশ্বাস করি। অপরভাগের বিবরণসমূহকে তারা বলতো, এগুলো তওরাত ও ইঞ্জিলের বিরোধী। তাই আমরা এগুলো বিশ্বাস করি না। এমন বর্ণনাও এসেছে যে, তারা উপহাসচ্ছলে বলতো, সুরা বাকারা আমার। আবার কেউ বলতো, আমার সুরা হচ্ছে সুরা আলে ইমরান।

 www.eelm.weebly.com

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'আলমুক্বতাসিমীন' বলে বোঝানো হয়েছে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে। আর কোরআন বলে বুঝানো হয়েছে তাদের ধর্মগ্রন্থকে। তারা তা অধ্যয়ন করতো। কিন্তু মান্য করতো না।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'আলমুক্বতাসিমীন' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে যারা কোরআন সম্পর্কে বিভিন্ন কটুকাটব্য করতো। কেউ বলতো কোরআন হচ্ছে যাদুগ্রন্থ। কেউ বলতো কাব্যগ্রন্থ। কেউ বলতো উপাখ্যান। আবার কেউ কেউ বলতো, প্রাচীন ইতিবৃত্ত।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, রসুল স. এর প্রতি যারা অশোভন উক্তি করতো, তাদেরকেই এখানে 'আলমুক্বতাসিমীন' বলা হয়েছে। ওই হতভাগ্যদের কেউ কেউ তাঁকে বলতো, যাদুকর। কেউ বলতো, কবি। আবার কেউ বলতো কাহিনীকার।

মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, একবার হজের মৌসুমে ওলীদ বিন মুগীরা ষোলজন লোককে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসিয়ে দিলো এবং বললো, তোমরা কাউকে মোহাম্মদের কাছে ভিড়তে দিয়ো না। বিভিন্ন কথা বলে দর্শনার্থীদেরকে নিরস্ত্র কোরো। লোকগুলো তাই করলো। কেউ বললো, মোহাম্মদ তো পাগল। কেউ বললো, সে তো যাদুকর। কেউ বললো, সে তো কাহিনীকার মাত্র। কেউ আবার বললো, সে তো কবিতা রচয়িতা। ওলিদ বিন মুগীরা বসেছিলো কাবা প্রাঙ্গণে। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার? মোহাম্মদকে কেউ কেউ উম্মাদ বলছে। কেউ বলছে যাদুকর। কেউ আবার বলছে, কবি ও কাহিনী রচয়িতা। তুমি কী বলো? ওলীদ বললো, সবাই ঠিক কথা বলেছে।

এখন কথা হচ্ছে, আলমুক্বতাসিমীন আসলে কারা? তাদের উপরে তো শাস্তি আপতিত হয়েছিলো। ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে যদি আলমুক্বতাসিমীন ধরা হয়, তবে বলতে হয় বনী কুরায়জার নিধনপর্ব ও বনী নাজিরের বিতাড়নই ছিলো সেই শাস্তি। আর ওলীদ বিন মুগীরা ও মক্কার মুশরিকদেরকে যদি আলমুক্বতাসিমীন বলা হয়, তবে তাদের উপরে আপতিত শাস্তি হিসেবে ধরতে হয় বদর যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানিকে। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, 'আলমুক্বতাসিমীন' এর ধাতুমূল হচ্ছে কসম। কসম অর্থ শপথ। এভাবে 'আলমুক্বতাসিমীন' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— শপথকারী। আর শপথকারী হবে তারা, যারা গভীর নিশিথে হজরত সালেহ্কে হত্যা করবে বলে শপথ করেছিলো। যথোপযুক্ত শাস্তিও পেয়েছিলো তারা।

কোনো কোনো অভিধানবেত্তা লিখেছেন, এখানকার 'ইদ্বীন' শব্দটি 'ইদ্বাতুন' এর বহুবচন। এর ধাতুমূল হচ্ছে 'আদ্বহাতুন' । 'আদ্বহাতুন' অর্থ অপবাদ। যেমন, শাফাতুন্ এর ধাতুমূল হচ্ছে 'শাফ্হাতুন'। কামুস অভিধানে রয়েছে, 'ইদ্বাতুন' অর্থ মিথ্যা। হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে রসুল স. তাঁর প্রাণপ্রিয় সহচরবৃন্দের নিকট থেকে

www.eelm.weebly.com

বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, ওই বায়াতনামার একটি শর্ত ছিলো— ওয়ালা ইয়াদ্বিহু বা'দ্বুনী বা'দ্বান (কেউ যেনো কাউকে অপবাদ না দেয়)। অপর এক হাদিসে এসেছে— 'ইয়্যাকুম ওয়াল 'ইদ্বতা' (তোমরা অপবাদ প্রদান সম্পর্কে শংকিত হয়ো)। জামাখশারী বলেছেন, 'ইদ্বাতুন' শব্দটির ধাতুমূল 'ইদ্বহাতুন'। এর অর্থ, অপবাদ। নিহায়া।

কোনো কোনো অভিধানবিশারদ লিখেছেন, 'ইদ্বাতুন' অর্থ, যাদু। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'আল আয়দ্বুন' অর্থ যাদু। এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে— লায়ামাল্লহুল্ আদ্বিহাতা ওয়াল মুস্তা'দ্বিহাতা (যাদুকর ও যাদুকারিণীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত)।

এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'কামা আন্‌যালনা' (যেমন আমি অবতীর্ণ করেছি) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'ওয়া লাক্বদ্ আতাইনাকা' (এবং অবশ্যই দিয়েছি) কথাটির সঙ্গে আয়াত (৮৭)। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— আমি যেমন আপনার উপরে পুনঃপুনঃ উচ্চারণীয় বাণী সপ্তক ও মহাগ্রন্থ কোরআন দান করেছি, তেমনি ইহুদী-খৃষ্টানদের উপরেও অবতীর্ণ করেছি তওরাত ও ইঞ্জিল। এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, 'লা তামুদ্‌দান্না' থেকে বাক্যের শেষ পর্যন্ত (আয়াত ৮৮) অপ্রাসঙ্গিক। আর 'আল্‌লাজীনা জায়ালুল্ কুরআনা ই'দ্বীন' (যারা কোরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেছে) বাক্যটি হবে 'আলমুক্বতাসিমীনা' (বিভিন্ন মতে বিভক্ত) কথাটির বিশেষণ। আর 'বিভিন্ন মতে বিভক্ত' বলে হজরত সালেহের হত্যাকারীদেরকে বুঝানো হয়ে থাকলে 'আল্লাজীনা জায়ালুল কুরআনা' বাক্যটি হবে উদ্দেশ্য এবং পরবর্তী আয়াত হবে এর বিধেয়।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৯২, ৯৩

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ○ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

❒ সুতরাং, শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি উহাদিগের সকলকে প্রশ্ন করিবই

❒ সেই বিষয়ে যাহা উহারা করে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— সুতরাং হে আমার রসুল! শপথ আপনার প্রভুপালকের। আমি ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সকল কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবোই। জিজ্ঞাসাবাদ করবো সত্যপ্রত্যাখ্যান ও অন্যান্য পাপ সম্পর্কে। কোরআনকে বিভক্তিকরণ সম্পর্কে। কোরআন ও আমার রসুলের প্রতি নিক্ষিপ্ত কটুক্তিসমূহ সম্পর্কে। এভাবে যাচাই বাছাই করে আমি তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করবোই এবং এর জন্য শাস্তি প্রদানও করবো।

www.eelm.weebly.com

ইমাম বোখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে 'আম্মা কানু ইয়া'মালূন' (যা তারা করে) কথাটির মর্মার্থ — লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমার বিষয়ে তাদের অভিমত ও কর্তব্য কী, ছিলো তা আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করবো।

হজরত আনাস থেকে তিরমিজি, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে রসুল স.বলেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র বিষয়ে আমিও জিজ্ঞাসিত হবো।

হজরত আবু বুরদা থেকে মুসলিম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র বান্দারা চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারবে না। প্রথমে প্রশ্ন করা হবে আয়ুষ্কাল সম্পর্কে। বলা হবে, পৃথিবীর জীবন কীভাবে অতিবাহিত করেছো? দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে শরীর সম্পর্কে। বলা হবে শারীরিক শক্তি ব্যয় করেছো কোন পথে? তৃতীয় প্রশ্ন হবে জ্ঞান সম্পর্কীয়। বলা হবে, জ্ঞানানুসারে কর্ম করেছো কি না? ধন সম্পর্কে উত্থাপন করা হবে চতুর্থ প্রশ্নটি। বলা হবে, ধন-সম্পদ উপার্জন করেছিলে কোন পন্থায়। ব্যয়ই বা করেছো কোন পথে? হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিরমিজি ও ইবনে মারদুবিয়াও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা রাগেব ইসপাহানী তাঁর 'তারগীব' গ্রন্থে এবং তিবরানী তাঁর 'আওসাত' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা জ্ঞান বিতরণের বিষয়ে পারস্পরিক শুভেচ্ছাকে কার্যকর করো। জ্ঞান গোপন কোরো না। ধন-সম্পদ আত্মসাৎ অপেক্ষা জ্ঞান আত্মসাৎ অধিকতর অন্যায়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষ যেদিকেই যাকনা কেনো, আল্লাহ্ তার প্রতিটি পদবিক্ষেপের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

আল্লামা তিবরানী তাঁর 'আওসাত' গ্রন্থে হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে লিখেছেন, রসুল স. বলেন, জননেতার অন্তরে আল্লাহ্র ভয় থাকা অত্যাবশ্যক। মানুষের অধিকার সম্পর্কে তাকে সচেতন থাকতেই হবে। সে তার নেতৃত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। যথার্থ নেতৃত্বের কারণে সে পুণ্যলাভ করবে আর অযথার্থ নেতৃত্বের কারণে হবে অপরাধী। অনুগামীদের নামাজের ত্রুটির কারণেও দায়ী করা হবে তাকে।

আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' পুস্তকে হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে ইবনে আবী হাতেম একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদিসটি এই — রসুল স. একবার হজরত মুয়াজকে বললেন, হে মুয়াজ! বিচার দিবসে মানুষকে তার প্রতিটি কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এমনকি চোখে ব্যবহৃত সুরমা সম্পর্কেও।

www.eelm.weebly.com

হাসান বসরী থেকে বায়হাকী ও ইবনে আবিদ্‌দুন্‌ইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ভাষণদাতার বক্তব্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। হাদিসটির সূত্র অবিন্যস্ত। কারণ এর মধ্যে কোনো সাহাবীর নামোল্লেখ নেই। হাসান বসরী ছিলেন তাবেয়ী (এক বা একাধিক সাহাবীকে যাঁরা দেখেছেন)।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, আনফা' ইবনে আবদুল্লাহ্‌ কালাঈ' বলেছেন, জাহান্নামের উপরে রয়েছে সাতটি সেতু। প্রথম সেতুর নিকটেও আটক করা হবে সকলকে। বলা হবে, থামো। এখন নামাজ সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। যথার্থ জবাব যারা দিতে পারবে না, তারা এখানেই নিপাত যাবে। আর যারা কৃতকার্য হবে, তারা প্রথম সেতু অতিক্রম করে পৌঁছবে দ্বিতীয় সেতুর পাড়ে। সেখানে প্রশ্ন করা হবে আমানত সম্পর্কে। বলা হবে, আমানত রক্ষিত হয়েছে, না করা হয়েছে আত্মসাৎ? আমানত আত্মসাৎকারীরা আর অগ্রসর হতে পারবে না। সেতু অতিক্রম করে পরবর্তী সেতুর সন্নিকটে পৌঁছবে কেবল আমানতদারেরা। ওই তৃতীয় সেতু অতিক্রমের পূর্বে প্রশ্ন করা হবে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা না করা সম্পর্কে। সেখানে আত্মীয়তা অভিযোগ করবে, হে দয়াময় আল্লাহ্‌! আমাকে যারা সম্মিলিত রেখেছিলো, তুমিও তাদেরকে তোমার দয়ার সঙ্গে সম্মিলিত করো। আর পৃথক করে দাও তাদেরকে, যারা আমাকে করে দিয়েছিলো পৃথক।

ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, বিচার দিবসে আল্লাহ্‌ তাঁর দাসদের কার্যকলাপের হিসাব গ্রহণ করবেন। এমনও বলবেন, তুমি অমুক অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখে বাধা দাওনি কেনো? সে সময় আল্লাহ্‌ অন্তরে অনুপ্রেরণা সৃষ্টির মাধ্যমে যাকে সাহায্য করবেন, সে বলতে পারবে, হে আমার প্রভুপালক! আমিতো তোমার উপরে ভরসা করেছিলাম। তারা ছিলো উচ্ছৃঙ্খল। তাই তাদের প্রতি আমি অন্তরে পোষণ করতাম ভয় ও ঘৃণা।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত। দায়িত্বের প্রকৃতি ও পরিমাণানুসারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ জিজ্ঞাসিত হবে তার প্রতিপালনাধীন পরিবার সম্পর্কে। স্ত্রীও জিজ্ঞাসিত হবে তার স্বামী, সন্তান-সন্ততি ও তার সংসার সম্পর্কে। ক্রীতদাসকেও জিজ্ঞেস করা হবে তার মনিবের সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ে। হজরত আনাস থেকে ইবনে হাব্বান, আবু নাঈম ও তিবরানীও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা তিবরানী তাঁর 'আল কবীর' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত মিকদাদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, জনগণের নেতা হয় সে-ই, যে জনগণের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। সে তার অনুগামী জনতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অনুগামীরাও জিজ্ঞাসিত হবে তাদের নেতা সম্পর্কে।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দশজন লোকের নেতাও তার অধীনস্তদের সম্পর্কে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। এরকম হাদিস রয়েছে অনেক।

একটি সন্দেহঃ আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত জিজ্ঞাসাবাদ ও এতদ্‌সম্পর্কিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে একথা সুপ্রমাণিত যে, বিচার দিবসে প্রত্যেকে তার কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেই। কিন্তু এক আয়াতে বলা হয়েছে— আজ কোনো মানব-জ্বিনকে তার পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের বক্তব্য পরস্পরবিরোধী নয় কি?

সন্দেহের নিরসনঃ হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সেদিন এরকম প্রশ্ন করা হবে না যে, ওই কর্মটি তুমি করেছিলে কিনা? কারণ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। তিনি তো সকল কিছুই জানেন। তাই প্রশ্ন করা হবে, ওই অপকর্মটি তুমি কেনো করেছিলে?

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু তালহার মাধ্যমে বায়হাকী উল্লেখিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। জবাবদিহি সম্পর্কিত ওই হাদিসের প্রেক্ষিতে তিনি বলেছেন, প্রশ্ন হবে দুই ধরনের। ১. জ্ঞানার্জন ও অনুসন্ধিৎসা সম্পর্কিত। ২. হুমকি প্রদান অথবা অভিযুক্ত করবার জন্য। জ্ঞানার্জনের জন্য প্রশ্ন তো আল্লাহ্ করতেই পারেন না। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আজ কোনো মানুষ-জ্বিনকে তার পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। আর আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে দ্বিতীয় ক্রমিকে উল্লেখিত অভিযোগসূচক প্রশ্ন। এর মধ্যে রয়েছে মানুষের প্রতি আগাম হুঁশিয়ারী।

ইকরামার এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বিচার দিবস হবে দীর্ঘতম। সেখানে থাকবে অসংখ্য অবস্থান স্থল। থাকবে অসংখ্য পথ। দেখা যাবে কোনো পথে অথবা স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আবার কোনো স্থানে প্রশ্নই নেই। এভাবেই সামঞ্জস্য সাধন করতে হবে জবাবদিহি সম্পর্কিত পরস্পর বিরোধী বক্তব্যগুলোকে। আসল কথা হচ্ছে, স্থান কাল ও পাত্রভেদে তখনকার অবস্থা হবে বিভিন্ন রকম। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'আজ এমন দিন, কোনো লোক কিছু বলবে না।' আবার পরক্ষণেই বলা হয়েছে— বিচার দিবসে তোমরা বিতণ্ডা শুরু করে দিবে স্বীয় প্রভুপালকের সম্মুখে। হাকেমও বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেই।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৯৪

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○

❒ অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছ তাহা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং অংশীবাদীদিগকে উপেক্ষা কর।

---

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অতএব হে আমার রসুল! যে বিষয়ে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন, তা সরবে প্রচার করতে থাকুন। উপেক্ষা করুন অংশীবাদীদের বিরোধিতাকে। আমিই আপনার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধায়ক।

এখানে 'ইস্‌দায়্' অর্থ প্রকাশ করুন। একথা বলেছেন হজরত আব্বাস। এভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে ইমান ও ইসলামের আমন্ত্রণ উচ্চকিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইদা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রসুল স. প্রচারকার্য চালাতেন সংগোপনে। প্রকাশ্য প্রচারের নির্দেশপ্রাপ্তির পর তিনি স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দ অবতীর্ণ হলেন প্রকাশ্য প্রচারে। হজরত ইবনে আব্বাস এরকমও বলেছেন যে, 'ইস্‌দায়্ বিমা তু'মারু' অর্থ আমন্ত্রণ জানাতে থাকুন। জুহাক বলেছেন, কথাটির অর্থ সত্য ধর্মের কথা প্রকাশ্যে জানিয়ে দিন। আখফাশ বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে এরকম— কোরআন প্রচারের মাধ্যমে সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করুন। সিব্‌ওয়াইহ্ বলেছেন, মর্মার্থ হবে— আপনাকে যেমন আদেশ করা হয়েছে তদনুরূপ সমাধান দিন। 'সদ্‌উন্' শব্দটির আভিধানিক অর্থ— পৃথক করে দেয়া, চিরে দেয়া, আলাদা করা।

'অংশীবাদীদেরকে উপেক্ষা করুন' কথাটির অর্থ এখানে — অংশীবাদীদের পরওয়া করবেন না। কেউ কেউ বলেছেন, যুদ্ধবিষয়ক আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে আলোচ্য আয়াতটি রহিত হয়েছে।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৯৫

إِنَّا كَفَيْنَٰكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ○

❒ আমিই যথেষ্ট তোমার জন্য বিদ্রূপকারীদিগের বিরুদ্ধে,

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি বিদ্রূপকারীদের প্রতি দৃকপাত করবেন না। তাদের চেয়ে আপনাকেই আমি অধিক শক্তিশালী করেছি। আমি অবশ্যই তাদের মূলোৎপাটন করবো। তাদেরকে নিপাত করেই ছাড়বো।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে নির্ভয়ে তাঁর বাণী প্রচার করার আদেশ দিয়েছেন। বলেছেন, আপনি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ভয়ে ভীত হবেন না। আপনার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌ই আপনাকে সহায়তা করবেন। উল্লেখ্য যে, ওই সময় রসুল স. এর প্রতি বিদ্রূপকারী কুরায়েশ নেতাদের সংখ্যা ছিলো পনেরো। প্রধান নেতা ছিলো ওলীদ বিন মুগীরা মাখজুমী। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলো আস বিন উয়াইল সাহ্‌মী ও আস্‌ওয়াদ বিন মুত্তালিব বিন হারেছ, আসাদ বিন আবদুল উজ্‌জা। আসওয়াদের

 www.eelm.weebly.com

জন্য রসুল স. বদদোয়া করেছিলেন। বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি ওকে অন্ধ করে দাও। করে দাও নিঃসন্তান। চতুর্থ দুশমন ছিলো আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগুছ বিন ওয়াহাব বিন মন্নাফ বিন জুহ্‌বাহ্। পঞ্চম শত্রু হারেছ বিন কয়েস বিনত্ তুলালাহ্। একদিনের ঘটনা— রসুল স. এর প্রতি বিদ্রূপপ্রবণ শত্রুরা একদিন কাবা শরীফ তাওয়াফ করছিলো। কাবা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছিলেন রসুল স.। ওলীদ বিন মুগীরা তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেলো। এমন সময় আবির্ভূত হলেন হজরত জিবরাইল। রসুল স. এর পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ভ্রাতা মোহাম্মদ! লোকটি কেমন? তিনি স. বললেন, বড়ই মন্দ। হজরত জিবরাইল বললেন, আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে আপনার কাজ করে দেয়া হলো। বলেই তিনি ইঙ্গিত করলেন ওলীদের পাঁজরের দিকে। কয়েকদিন পরের ঘটনা। খাজায়ী গোত্রের এক লোক তার তীরে পালক বাঁধছিলো। মহামূল্যবান ইয়েমেনি উত্তরীয় পরিহিত অবস্থায় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো ওলীদ। তার লুঙ্গি ছিলো ভূলুণ্ঠিত। আর পদবিক্ষেপ ছিলো দর্পিত। হঠাৎ খাজায়ী লোকটির তীর জড়িয়ে গেলো তার ভূলুণ্ঠিত লুঙ্গির সঙ্গে। সে স্বজোরে পদাঘাত করে তীরটিকে দূরে নিক্ষেপ করলো। কিন্তু কেমন করে যেনো তীরের আঘাতে কেটে গেলো তার পাঁজর, যে পাঁজরের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন হজরত জিবরাইল। ওলীদের পাঁজরের জখম আর ভালো হলো না। জখমের ঘা বরং বাড়তে লাগলো দিন দিন। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করলো সে।

আরেক দিনের ঘটনা — রসুল স. এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো আস্ বিন ওয়াইল্। হজরত জিবরাইল উপস্থিত ছিলেন সেখানে। বললেন, ভ্রাতা মোহাম্মদ! এ লোকটি কেমন? রসুল স. বললেন, অসৎ। হজরত জিবরাইল ইঙ্গিত করলেন তার পদতলের দিকে। বললেন, এর সম্পর্কেও আপনাকে আর ভাবতে হবে না। কিছুদিন পর আস তার দুই পুত্রসহ উষ্ট্রারোহী হয়ে প্রমোদ ভ্রমণে বের হলো। মক্কার বাইরে এক স্থানে স্থগিত করলো তার যাত্রা। সেখানে একখানি কাপড়ের পুঁটলি দেখে ভাবলো, পুঁটলিটির উপরে পা রেখেই নেমে পড়া যাক। তাই করলো সে। পুঁটলিটির ভিতরে ছিলো কাঁটা। সেই কাঁটা বিঁধে গেলো তার পায়ে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো সে। বললো, মনে হয় কোনো বিষাক্ত প্রাণী আমাকে দংশন করেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বিষাক্ত প্রাণীর চিহ্ন দেখা গেলো না। পা ফুলতে লাগলো তার। শেষ পর্যন্ত ওই অবস্থাতেই তাকে প্রাণত্যাগ করতে হলো।

আসওয়াদ বিন মুত্তালিবের উপরেও এভাবে নেমে এসেছিলো অলৌকিক শাস্তি। একদিন তাকে দেখিয়ে হজরত জিবরাইল জানতে চাইলেন, ভ্রাতা মোহাম্মদ! এই লোকটি কী রকম? রসুল স. বললেন, অশুভ। হজরত জিবরাইল ইশারা করলেন তার চোখের দিকে এবং বললেন, ওর সম্পর্কে আপনাকে আর

www.eelm.weebly.com

দুশ্চিন্তা করতে হবে না। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত জিবরাইল ওই সময় তার চোখে নিক্ষেপ করেছিলেন একটি সবুজ রঙয়ের পাতা। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে শুরু হয়ে গিয়েছিলো অসহ্য যন্ত্রণা। যন্ত্রণার চোটে সে দেয়ালে মাথা ঠুকতো। এভাবে এক সময় সে হয়ে গেলো অন্ধ। অতিসত্বর মৃত্যুও ঘটলো তার।

কালাবী বর্ণনা করেছেন, একবার কয়েকজন অনুচরসহ আস্ওয়াদ বসেছিলো এক বৃক্ষমূলে। হঠাৎ হজরত জিবরাইল সেখানে উপস্থিত হয়ে তার মাথা ধরে সজোরে ঠুকতে শুরু করলেন বৃক্ষটির কাণ্ডে। কাঁটা দিয়ে প্রহার করতে থাকলেন তার মুখে। বিকট চিৎকার শুরু করে দিলো আসওয়াদ। সাহায্য চাইলো তার ক্রীতদাসের কাছে। ক্রীতদাস বললো, কই আমি তো কিছুই দেখছি না। আপনি তো নিজে নিজেই গাছে মাথা ঠুকছেন। সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, মোহাম্মদের আল্লাহ্ই আমাকে শেষ করে ফেললো। বলতে বলতেই জীবনাবসান ঘটলো তার।

রসুল স. এর পাশ দিয়ে একবার আস্ওয়াদ বিন আবদে ইয়াগুছ কোথাও যাচ্ছিলো। সে ছিলো রসুল স. এর মামাতো ভাই। প্রায়শঃই সে রসুল স. কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। হজরত জিবরাইল রসুল স. এর নিকট থেকে তার স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে জেনে নিলেন এবং বললেন, ওর সম্পর্কে আপনাকে আর চিন্তিত হতে হবে না। বলেই তিনি ইশারা করলেন আস্ওয়াদের উদরের দিকে। অল্পদিনের মধ্যেই সে আক্রান্ত হলো জলাতঙ্ক ব্যাধিতে। ওই রোগেই নির্বাপিত হলো তার জীবন প্রদীপ।

কালাবীর বর্ণনায় ঘটনাটি এসেছে এভাবে— একবার আস্ওয়াদ ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলো। বাইরে চলছিলো লু হাওয়ার দাপা-দাপি। ওই বিদঘুটে লু হাওয়ার সংস্পর্শে তার গায়ের চামড়া হয়ে গেলো হাবশীদের মতো কুচকুচে কালো। সে গৃহে ফিরে এলো। কিন্তু গৃহবাসীরা কেউই তাকে চিনতে পারলো না। তারা সকলে তাকে জোর করে বাড়ীর বাইরে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেলো তার আয়ু। মৃত্যুকালে সে-ও চিৎকার করে বলেছিলো, মোহাম্মদের পালনকর্তাই আমাকে হত্যা করলো।

হারেছ ইবনে কায়েস সম্পর্কেও একবার হজরত জিবরাইল জানতে চাইলেন। রসুল স. বললেন, সে দুর্হৃদ। হজরত জিবরাইল ইঙ্গিত করলেন তার মস্তকের দিকে এবং বললেন, আপনার কর্তব্য আমিই সমাধা করে দিলাম। কিছুদিন পরেই হারেছের নাক দিয়ে নির্গত হতে শুরু করলো গলিত পুঁজ। এই দুরারোগ্য রোগেই তার প্রাণ-বিয়োগ ঘটলো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হারেছ বিন কায়েস উদরস্থ করেছিলো লবণাক্ত মাছ। ফলে সে আক্রান্ত হয়েছিলো প্রাণঘাতি

 www.eelm.weebly.com

পিপাসায়। পানি পান করতে করতে অস্বাভাবিক আকারে পেট ফুলে গেলেও পিপাসা মিটতো না তার। এভাবে একদিন পেট ফেটে মারা গেলো সে। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'আমিই যথেষ্ট তোমার জন্য বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে' কথাটির বাস্তবায়ন ঘটেছিলো এভাবেই।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী, আবু নাঈম ও বায়হাকী লিখেছেন, ওলীদ বিন মুগীরা, আস্ বিন ওয়াইল, আদি বিন কায়েস, আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগুছ এবং আসওয়াদ বিন মুত্তালিব— কুরায়েশদের এই পাঁচ জন দলপতি সবচেয়ে বেশী উপহাস করতো রসুল স.কে। হজরত জিবরাইল একবার রসুল স.কে জানালেন, হে ভ্রাতঃ! আপনার পক্ষ থেকে এদের মূলোৎপাটন করবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে। একথা বলে তিনি তির্যক দৃষ্টিতে ওলীদের পাঁজরের দিকে তাকালেন। ওই তির্যক দৃষ্টিপাতের বাস্তব প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হলো এভাবে— এক লোক তার তীর মেরামত করছিলো। অতর্কিতে তীরটি বিদ্ধ হলো ওলীদের নিম্নাংশের পরিধেয় বস্ত্রে। নিচু হয়ে তীরটি না খুলে সে অহংকার বশতঃ সজোরে পা ঝাড়া দিলো। এতে করে তার পরিধেয় বস্ত্র তীরমুক্ত হলেও তার পাঁজরের একস্থানে তীরের অগ্রভাগের আঘাতে কেটে গেলো। ওই জখমই হলো তার কাল। কিছুদিনের মধ্যেই জীবনের মায়া ত্যাগ করতে হলো তাকে। আস বিন ওয়াইলের পায়ের তালুর প্রতি ক্রুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন হজরত জিবরাইল। ফলে একদিন তার পদতলে বিদ্ধ হলো একটি কাঁটা। ভয়ংকররূপে ফুলে উঠলো তার পা। এর ফলে অল্পদিনের মধ্যে সে মারা পড়লো। হজরত জিবরাইল সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন আদি বিন কায়েসের নাসিকার প্রতি। এর ফলে গলিত পুঁজ নির্গত হতে শুরু করলো তার নাক থেকে। ওই দুরারোগ্য রোগে সে নিপাত হয়ে গেলো। আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগুছের মস্তকের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন হজরত জিবরাইল। ফলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো এভাবে— একবার সে তার সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে বসেছিলো একটি গাছের গোড়ায়। হঠাৎ সে উঠে নিজে নিজেই গাছের সাথে ঠুকতে শুরু করলো তার মাথা। কাঁটার প্রহার পড়তে শুরু করলো তার মুখমণ্ডলে। এভাবেই অপমৃত্যু হলো তার। হজরত জিবরাইল রোষতপ্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন আসওয়াদ বিন মুত্তালিবের চোখে। ফলে সে হয়ে গিয়েছিলো অন্ধ। ওই অনারোগ্য অন্ধত্বই উপলক্ষ হয়েছিলো তার মৃত্যুর।

হজরত আনাস বিন মালেক থেকে বাযযার ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, একবার কয়েকজন লোক রসুল স. এর পাশ দিয়ে গমনকালে তাঁর দিকে কটাক্ষ করে বলতে শুরু করলো, এই সেই ব্যক্তি যে নিজেকে নবী বলে দাবি করে। তখন রসুল স. এর পাশে দণ্ডায়মান ছিলেন হজরত জিবরাইল। তিনি রাগত দৃষ্টি নিবদ্ধ

www.eelm.weebly.com

করলেন লোকগুলোর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের শরীরে দেখা দিলো নখরাঘাতের চিহ্ন। ওই দাগগুলোই পরিণত হলো ভয়াবহ ফোঁড়ায়। গলিত ফোঁড়াগুলো থেকে এমন দুর্গন্ধ নির্গত হতে শুরু করলো যে, কেউ আর তাদের কাছে তিষ্ঠাতে পারলো না। আলোচ্য আয়াত বাস্তবরূপ লাভ করেছিলো এভাবেই।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯

الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ○وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ○فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ○وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ○

❒ যাহারা আল্লাহের পাশে অপর ইলাহ্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে! এবং শীঘ্রই উহারা ইহার পরিণাম জানিতে পারিবে।

❒ আমি তো জানি, উহারা যাহা বলে তাহাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়;

❒ সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তুমি সিজদাকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হও;

❒ তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা আল্লাহ্র উপাসনার অংশীদার হিসেবে অপর কোনো উপাস্য প্রতিষ্ঠা করেছে, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে, তাদের ওই অপকর্মের পরিণাম কতো ভয়াবহ।

পরের আয়াতের (৯৭) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! আমি তো জানি অংশীবাদীদের অসংগত কথা শুনে আপনার হৃদয় ব্যথিত হয়।

এর পরের আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার মনোবেদনা প্রশমনার্থে আপনার প্রভুপালকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন। বিরুদ্ধবাদীদের কথায় কর্ণপাত মাত্র করবেন না। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, হে আমার রসুল! অংশীবাদীদের অংশীবাদিতা ও অবিশ্বাস বিমিশ্রিত উক্তি থেকে আল্লাহ্পাককে পবিত্র করুন। তৎসহ এই মর্মে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করুন যে, আল্লাহ্ আপনাকে প্রদর্শন করেছেন সত্যপথ। হজরত

 www.eelm.weebly.com

ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের 'প্রশংসা' এবং 'পবিত্রতা' কথা দু'টির অর্থ করেছেন নামাজ। কারণ নামাজের মাধ্যমেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নেমে আসে প্রশান্তি।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভূত হও।' একথার অর্থ— আপনি নামাজ পাঠকারীদের দলভূত হয়ে যান। এখানে 'সাজিদীন' অর্থ— বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শনকারী। জুহাক বলেছেন, নামাজ পাঠকারী। হজরত হুযাইফা বিন ইয়ামানের ভ্রাতা হজরত আবদুল আজিজের উক্তি উল্লেখ করে ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে জারীর বলেছেন, রসুল স. কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নামাজে নিমগ্ন হতেন।

সর্বশেষ আয়াতে (৯৯) বলা হয়েছে— 'তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করো।' এখানে 'ইয়াক্বীন' (নিশ্চিতি) অর্থ মৃত্যু, যা সুনিশ্চিত। 'জীবন অর্থই মৃত্যু' বাক্যটি স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই যতদিন জীবন থাকে, ততদিন ইবাদতে মগ্ন থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। এ সম্পর্কে কোরআন মজীদে হজরত ঈসার বক্তব্য উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— 'আওসানী বিস্সলাতি ওয়ায্ যাকাতি মা দুমতু হাইয়্যা (তিনি আমাকে আজ্ঞা করেছেন, যেনো আমি মৃত্যু পর্যন্ত নামাজ আদায় করি ও জাকাত প্রদান করি)।

হজরত যোবায়ের বিন নাজীর থেকে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমাকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে ও ব্যবসায়ী হতে নিষেধ করা হয়েছে। বরং বলা হয়েছে— সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভূত হও; তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করো।

হজরত ওমর বর্ণনা করেছেন, মাসআব বিন ওমায়েরকে একবার মেষচর্ম পরিহিত অবস্থায় আগমন করতে দেখে রসুলেপাক স. এরশাদ করলেন, দ্যাখো, দ্যাখো! আল্লাহ্ তার হৃদয়কে জ্যোতিস্নাত করে দিয়েছেন। আমি দেখেছি তার পিতা-মাতা তাকে কত উপাদেয় আহার্য ভক্ষণ করিয়েছে। তখন তার এক জোড়া পরিধেয় বস্ত্রের মূল্য ছিলো দুইশত দিরহাম। আর আজ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ভালোবাসা তাকে কি মনোহররূপেই না সাজিয়েছে, যা তোমরা প্রত্যক্ষ করছো।

সূরা নাহ্‌ল

সূরা নাহলের আয়াত সংখ্যা ১২৮। রুকুর সংখ্যা ১২। ১২৫টি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। শেষের তিন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। আতা বিন ইয়াসারের বক্তব্য উদ্ধৃত করে এরকম বলেছেন ইবনে ইসহাক ও ইবনে জারীর।

সূরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ

اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ○ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ

تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

❒ আল্লাহের আদেশ আসিবেই; সুতরাং উহা ত্বরান্বিত করিতে চাহিও না। তিনি মহিমান্বিত এবং উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।

❒ 'আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; সুতরাং আমাকে ভয় কর' এই মর্মে সতর্ক করিবার জন্য তিনি তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার দাসদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা ওহি-সহ ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করেন।

❒ তিনি যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'আতা আমরুল্লহ্।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র আদেশ বা বিধান এসেছে। অর্থাৎ সন্নিকটবর্তী হয়েছে। ইবনে আরাফা বলেন, যা অবশ্যম্ভাবী, আরবীভাষীরা তাকে বলে, হয়েই গিয়েছে। আল্লাহ্‌র বিধানের অন্যথা হয় না বলেই এখানে কথাটি অতীতকালবোধক ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, ঘটনাটি অতিশীঘ্র ঘটবেই । অর্থাৎ আল্লাহ্ মহাপ্রলয়ের যে বিধান স্থির করেছেন, তা অবশ্যই কার্যকর হবে।

 www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'ফালা তাসতা'জিলূহু।' একথার অর্থ— সুতরাং তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না। অর্থাৎ কিয়ামত বা মহাপ্রলয় ত্বরান্বিত করার জন্য দোয়া কোরো না। এরকম দোয়া নিষ্ফল। যথাসময়েই মহাপ্রলয় অনুষ্ঠিত হবে। এক মুহূর্তের জন্যও তার অগ্র-পশ্চাৎ ঘটবে না।

বাগবী লিখেছেন হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'ইক্বতারাবাতিস্ সাআতু' (কিয়ামত আসন্ন), তখন কিছু সংখ্যক অবিশ্বাসী বললো, মোহাম্মদ বলে থাকে, পশ্চাতের দিন সমাগত। ঠিক আছে, কিছুদিনের জন্য তোমরা তোমাদের বিরোধিতা বন্ধ রাখো, দেখি কি হয়। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর তারা দেখলো, কিছুই হচ্ছে না। তখন বলতে শুরু করলো, তুমি যার ভয় দেখাচ্ছো, তার তো কোনো নামগন্ধই নেই। তখন অবতীর্ণ হলো 'ইক্বতারবা লিন্নাসি হিসাবুহুম্' (মানুষের হিসাবের সময় অত্যাসন্ন)। এই আয়াত শুনে অবিশ্বাসীরা পুনরায় আতঙ্কগ্রস্ত হলো। ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো বড় কোনো বিপর্যয়ের। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরেও যখন কিছু ঘটলো না, তখন তারা বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদ, তুমি শুধু শুধু আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে চলেছো। আসলে কিছুই তো ঘটছে না। এরপর অবতীর্ণ হলো, 'এসে পড়েছে আল্লাহ্র বিধান' (এই এলো বলে)। অংশীবাদীরা আতংকিত হলো পুনরায়। বার বার তাকাতে লাগলো আকাশের দিকে। ভাবতে লাগলো, কখন যে কি হয়। তখন অবতীর্ণ হলো 'সুতরাং তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না।' এরপর জনজীবনে নেমে এলো স্বস্তি।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আতা আমরুল্লহ্' (আল্লাহ্র আদেশ আসবেই) অবতীর্ণ হলে সাহাবায়েকেরাম দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তখন অবতীর্ণ হলো 'ফালা তাস্তা'জ্বিলুহু' (সুতরাং তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না।)। এখানে 'ইস্তি'জ্বাল' কথাটির অর্থ যথাসময়ের পূর্বে কোনো কিছু আকাংখা করা। বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. তাঁর মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলীদ্বয় একত্র করে বললেন, আমাকে ও মহাপ্রলয়কে এভাবে জড়িত করে প্রেরণ করা হয়েছে। একথার অর্থ— মহাপ্রলয় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত থাকবে আমার নবুয়ত। আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না।

মস্তুরাদ বিন শাদ্দাদ সূত্রে তিরমিজি লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি ও কিয়ামত পরস্পরসম্পৃক্ত। তবে আমি আগে, কিয়ামত পরে। যেমন এই আঙ্গুল দু'টো। একথা বলে রসুল স. তাঁর পবিত্র অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয়কে একত্র করে দেখালেন।

বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর আবির্ভাব হচ্ছে মহাপ্রলয়ের পূর্বাভাস। এই তথ্যটি নিয়ে রসুল স. এর নিকটে অবতরণকালে আকাশচারী ফেরেশতারা হজরত জিবরাইলকে লক্ষ্য করে সমস্বরে বলে উঠেছিলো, আল্লাহু আকবার! এবার মহাপ্রলয় সমুপস্থিত।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'আমরুল্লহ্' কথাটির অর্থ, নিহত হওয়ার শাস্তি, যা কার্যকর হয়েছিলো নজর বিন হারেসের উপর। সে বলেছিলো, হে আল্লাহ্! কোরআন যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্যি সত্যি অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে আমার প্রতি আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করো। এভাবে নজর ও তার সঙ্গীরা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে শাস্তি পেতে চেয়েছিলো বলেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। উল্লেখ্য যে, নজর নিপাত হয়েছিলো বদর যুদ্ধে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি মহিমান্বিত এবং তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।' একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা মহীয়ান-গরিয়ান, মহামহিম, মহিমান্বিত, পবিত্রাতিপবিত্র। অংশীবাদীরা যেগুলোর উপাসনা করে, সে সকল বাতিল উপাস্য থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— অংশীবাদীদের অংশীবাদদুষ্ট অপকথন থেকে আল্লাহ্ অনেক অনেক উচ্চে।

মক্কার অংশীবাদীরা বলতো, এতো লোক থাকতে মোহাম্মদের উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো কেনো? আল্লাহ্ তো আমাদের নিকটে কোনো ফেরেশতাকেও প্রেরণ করতে পারতেন। তাদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াতটি (২)। বলা হয়েছে—

'আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই; সুতরাং আমাকে ভয় করো— এই মর্মে সতর্ক করবার জন্য তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী-সহ ফেরেশতা প্রেরণ করেন।' এখানে উল্লেখিত 'রূহ্' শব্দটির মর্মার্থ— ওহী (প্রত্যাদেশ) অথবা কোরআন। নিঃসাড় শরীর যেমন রূহ্ বা আত্মার মাধ্যমে সঞ্জীবিত হয়, তেমনি কোরআন দ্বারা জাগ্রত হয় মানুষের অবচেতন অন্তর। রসুলের প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয় ফেরেশতার মাধ্যমে। আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের মধ্য থেকে যাকে খুশী তাকে রসুল হিসেবে মনোনীত করেন। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর রসুলের মাধ্যমে মানুষকে একথাই জানিয়ে দিতে চান যে, 'আমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, সুতরাং আমাকে ভয় করো।'

এখানে 'আন্জিরু' অর্থ জানিয়ে দিন, হুঁশিয়ার করে দিন। 'নাজারত্তু হাজা' অর্থ আমি জেনেছি, অবগত হয়েছি। 'আন' অব্যয়টি এখানে বিবরণমূলক। তাই এখানকার বক্তব্য-বিষয়টি হবে এরকম— ফেরেশতার মাধ্যমে আমি আমার প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করি আমার বার্তাবাহকদের নিকটে এই উদ্দেশ্যে যে, তারা যেনো সর্বসমক্ষে সত্য ধর্মের বিশদ বিবরণ উন্মোচিত করেন। অথবা 'আন' অব্যয়টি এখানে ধাতুমূল। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে, এখানে একটি যের প্রদানকারী অব্যয় উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য অব্যয়সহ কথাটি দাঁড়াবে এরকম 'বিআন্ আনজিরু'। এভাবে 'আনজিরু' কথাটির অর্থ দাঁড়াবে ভীতি প্রদর্শন করুন,

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করে দিন। এভাবে মূল মর্মটি দাঁড়াবে এরকম— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদী ও অবাধ্যদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন। এই মর্মে সচেতন করে তুলুন যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যাদেশের সম্পর্ক দু'টি বিষয়ের সঙ্গে। ১. তওহীদ বা আল্লাহ্‌র এককত্ববোধকে জাগ্রত করা। এটাই প্রজ্ঞার সর্বোচ্চ পর্যায়। ২. তাক্বওয়া বা আল্লাহ্‌র ভীতিজনিত সাবধানতা। এই সাবধানতাই পূর্ণত্ব বা কামালিয়াত।

এর পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তিনি যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।' একথার অর্থ— অতুলনীয় দক্ষতা ও অনন্য নির্মাণ শৈলীর মাধ্যমে আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে দিয়েছেন সুসংগত ও নয়নাভিরাম রূপ। অনস্তিত্বকে অস্তিত্বদানের এই মহান কর্মকাণ্ড একথাই প্রমাণ করে যে, এই মহান নির্মাণের নির্মাতা অবশ্যই রয়েছেন, যিনি সকল কিছুর একক সৃজক, প্রাজ্ঞ-কুশলী ও সর্বশক্তিধর।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।' একথার অর্থ— এই মহাকাশ ও মহাপৃথিবীর কেউই আল্লাহ্‌র সমকক্ষ নয়। তাঁর অস্তিত্বে, গুণাবলীতে ও কার্যাবলীতে কারো কোনো অংশ মাত্র নেই। থাকতে পারে না। কারণ তিনি চির অমুখাপেক্ষী। আর সকল সৃষ্টি সকল বিষয়ে তাঁরই মুখাপেক্ষী।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৪

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝

❒ তিনি শুক্র হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; অথচ দেখ, সে প্রকাশ্যে বিতণ্ডা করে!

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল ! জেনে রাখুন, মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমি অনুল্লেখ্য শুক্রবিন্দু থেকে। তখন তো তার বোধ, বুদ্ধি, চলচ্ছক্তি— কোনোটিই ছিলো না। আমিই তো ঘটাই তার মানসিক ও শারীরিক প্রবৃদ্ধি ও পরিণতি। অথচ দেখুন, সে কেমন বিতণ্ডাপ্রবণ! স্বতঃসিদ্ধ বিষয়সমূহ সম্পর্কে সে প্রকাশ্যেই অসুন্দর তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এখানে 'খসীম' অর্থ কর্কশভাষী, বিতণ্ডা উপস্থিতকারী, ঝগড়াটে। 'খসীসুম মুবীন' অর্থ প্রকাশ্যে বিতণ্ডা উপস্থিতকারী। উল্লেখ্য যে, মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ— এ সকল স্বতঃসিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কুটতর্কের অবতারণা করতো। বলতো, মরে গেলে মানুষের সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যায়। সুতরাং পুনর্জীবন অসম্ভব। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র অপার জ্ঞান ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে প্রকাশ্য তর্কবিতর্ক শুরু করে দিতো।

www.eelm.weebly.com

আল্লামা বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উবাই বিন খলফ জামুহী সম্পর্কে। সে ছিলো পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী। একবার সে অনেক দিন পূর্বে মৃত প্রাণীর একটি অস্থি এনে বললো, এই হাড় নাকি আবার জীবিত হবে। অসম্ভব। তখন অবতীর্ণ হলো— 'ওয়া দ্বরাবা লানা মাছালাঁও ওয়া নাসিয়া খলক্বাহু' (আমার জন্য উপস্থাপন করে দৃষ্টান্ত, আর বিস্মৃত হয় নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে)।

আল্লামা সুদ্দী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতের সঙ্গে এই আয়াতটিও সম্পৃক্ত— 'আওয়ালাম ইয়ারাল ইনসানু আন্না খলাক্বনাহু মিন্ নুত্বফাহ্' (মানুষ কি দেখেনি, কীভাবে আমি তাকে শুক্র বিন্দু থেকে পরিগঠিত করেছি)।

একটি বিশেষ ঘটনাকে লক্ষ্য করে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলেও এর বিধানটি সাধারণ। পুনরুত্থান দিবসের প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই, তাদের সকলের উপরেই আলোচ্য আয়াতটি প্রযোজ্য। আলোচ্য আয়াতের অন্তর্নিহিত বক্তব্যটি এরকম— পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীরা কেনো একথা বোঝে না যে, তিনি প্রাণহীন শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন পূর্ণ ও পরিণত মানুষ। এটা যদি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়, তবে নিষ্প্রাণ অস্থি থেকে পুনরায় তিনি মানুষকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন না কেনো? প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি অবশ্যই সহজতর।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○ وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ○ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ؕ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ؕ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

❑ তিনি আন্‌আম সৃষ্টি করিয়াছেন; তোমাদিগের জন্য উহাতে শীত বস্ত্রের উপকরণ ও বহু উপকার রহিয়াছে এবং ইহা হইতে তোমরা আহার্য পাইয়া থাক।

❑ এবং তোমরা যখন গোধূলি লগ্নে উহাদিগকে চারণভূমি হইতে গৃহে লইয়া আস এবং প্রভাতে যখন উহাদিগকে চারণভূমিতে লইয়া যাও তখন তোমরা উহার সৌন্দর্য উপভোগ কর।

www.eelm.weebly.com

❒ এবং উহারা তোমাদিগের ভার বহন করিয়া লইয়া যায় দূর দেশে যেথায় প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছিতে পারিতে না। তোমাদিগের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

❒ তোমাদিগের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যাহা তোমরা অবগত নহ।

❒ সরল পথের নির্দেশ আল্লাহের দায়িত্ব, কিন্তু পথগুলির মধ্যে বক্রপথও আছে। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করিতে পারিতেন।

'আলআন্আম' অর্থ চতুষ্পদ জন্তু— গরু, ছাগল, মহিষ, উট ইত্যাদি গৃহপালিত পশু। 'লাকুম' অর্থ তোমাদের অভাব মোচনে, উপকারার্থে। সকল প্রকার উপকারই কথাটির অন্তর্ভুক্ত। এরপর দেয়া হয়েছে উপকারসমূহের বিবরণ। যেমন, 'দিফ্উন' (শীত-বস্ত্রের উপকরণ বা পশমী বস্ত্র), 'মানাফিউ' (বহু উপকার) ও 'তা'কুলূন' (আহার্য)। উল্লেখ্য যে, 'বহু উপকার' কথাটির মধ্যে কৃষি শিল্পে ও বাহনরূপে গৃহপালিত পশুর ব্যবহার ও আহার্যরূপে দুগ্ধ ও গোশতের ব্যবহার— সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর আমিষ জাতীয় খাদ্য এসকল পশু থেকে গৃহীত হয় বলে এখানে 'তা'কুলূনা' (তোমরা আহার্য পেয়ে থাকো) কথাটির পূর্বে বসানো হয়েছে 'মিনহা' (তা থেকে)। অন্যান্য হালাল প্রাণীর গোশত ভক্ষণ এরকম জরুরী কিছু নয়। সেগুলো হয় সৌখিন আহার, অথবা কোনো বিশেষ প্রতিষেধক। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এরকম— আল্লাহ্ হালাল পশুসমূহ সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারার্থে। মানুষ সেগুলো থেকে সংগ্রহ করে শীত-বস্ত্রের উপকরণ, দুগ্ধ, গোশত ও চামড়া। আবার সেগুলোকে ব্যবহার করে কৃষিকার্যে, ভার বহণের কাজে অথবা বাহনরূপে।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা যখন গোধূলী লগ্নে তাদেরকে চারণভূমি থেকে গৃহে নিয়ে আসো এবং প্রভাতে যখন চারণভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ করো।' একথার অর্থ— যখন সূর্য অস্তমিত হয়, গোধূলীর রক্তিমাভায় রঞ্জিত হয় দিনান্তের আকাশ, তখন রাখাল ও তার পশুপালের গৃহাগমনের দৃশ্য কতোইনা নয়নাভিরাম। তখন গোধূলীর রঙ লেগে পশুগুলোও হয়ে যায় সুচিত্রিত ও সুন্দর। এই পরিতৃপ্ত প্রত্যাবর্তন কতোইনা আনন্দদায়ক। আবার তাদের প্রত্যুষের আলো ঝলমল প্রান্তরের দিকে যাত্রার দৃশ্যটিও আনন্দের। হ্রেষা-ধ্বনি, হাম্বা-হাম্বা রব ও অন্যবিধ আওয়াজেও তখন

www.eelm.weebly.com

জীবন্ত হয়ে ওঠে রিজিক অনুসন্ধানের ছন্দময় অভিযাত্রাটি। হে মানুষ! উদয়াচল ও অস্তাচলের পশুপালের এই গমন ও প্রত্যাগমনের সৌন্দর্য তো পরিতৃপ্ত করে তোমাদেরকেই।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'এবং তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূরদেশে, যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত পৌঁছতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! দ্যাখো, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ কতোইনা করুণাপরবশ। কতোইনা দয়ার্দ্র। ভারবাহী পশুগুলো ব্যতিরেকে তোমরা কি দূরদেশে প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত পৌঁছতে পারতে? পারতে না।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ।' একথার অর্থ— হে মানুষ! আরো অনুধাবন করো, সৌন্দর্য পিপাসা প্রশমনার্থে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। আর তোমরা তো সেগুলোতে আরোহণও করো।

ঘোড়ার গোশত ভক্ষণ হারাম না মাকরূহ্ সে সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা এই আয়াত থেকেই প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। হেদায়া প্রণেতা লিখেছেন, এখানকার ৭ ও ৮ সংখ্যক আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর করুণা ও দয়ার কথা বিবৃত করেছেন। এই করুণার মধ্যে রয়েছে দু'টি বিষয়— বাহন ও সৌন্দর্য। লক্ষণীয় যে, বাহন অপেক্ষা আহার্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অশ্ব ও অশ্বসম্প্রদায়ভূত অশ্বতর ও গর্দভের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে প্রধানত ভারবহন ও শোভা-সৌন্দর্যের কথা। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, অশ্ব ও অশ্বসম্প্রদায়ভূত পশুগুলোকে গোশত ভক্ষণের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। যদি হতো, তবে গোশত ভক্ষণের প্রসংগটিই এখানে প্রধান আলোচ্য বিষয় হতো।

আমি বলি, ভেড়া, ছাগল, দুম্বা, মুরগী-হাঁস ইত্যাদি সহজলভ্য ও এগুলোর গোশত অধিকতর উপাদেয়। এগুলোর তুলনায় ঘোড়া, গাধা, খচ্চর যেমন সহজলভ্য নয়, তেমনি এগুলোর গোশতও উপাদেয় নয়। আবার এগুলো অন্য পশুর তুলনায় আরোহণের অধিক উপযোগী। বোঝা বহনের কাজেও এগুলো অধিকতর যোগ্য। আর হেদায়া প্রণেতার বক্তব্যও সঠিক নয়। কারণ ঘোড়া ও গাধার গোশত খাদ্য হিসেবে উপকারী। কিন্তু বাহন ও ভারবাহী হিসেবে ওগুলো আরো অধিক উপকারী, অন্য অনেক পশু দ্বারা যা সম্ভবই নয় । আরেকটি বিষয় প্রণিধাননীয় যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। তখন গাধার গোশত ভক্ষণ ছিলো বৈধ। গাধার গোশত অবৈধ হয়েছে ষষ্ঠ হিজরীতে খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে। আর সে সময় ঘোড়ার গোশত হারাম হওয়ার প্রমাণ উপস্থাপন করাও সহজ কাজ নয়। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে সুরা মায়িদায়।

 www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও।' একথার অর্থ— হে মানুষ! বিশ্বাসীদের জন্য বেহেশতে এবং অবিশ্বাসীদের জন্য দোজখে কী অকল্পনীয় স্বস্তি ও শাস্তির ব্যবস্থা করা রয়েছে তা তোমরা জানো না।

এর পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'সরল পথের নির্দেশ আল্লাহ্‌র দায়িত্ব।' এখানে 'আলা' (উপর) অব্যয়টি 'ইলা' (দিকে, পর্যন্ত) অর্থে ব্যবহৃত । অর্থাৎ সরলপথের গতি আল্লাহ্‌র দিকে। এই পথই আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছায়। আর সরল পথের নির্দেশ দান করেন আল্লাহ্ স্বয়ং। এর পাশাপাশি বক্র পথও রয়েছে। কিন্তু সে পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছায় না। এখানে 'কুস্‌দুস্ সাবীল' অর্থ সরল পথ। আর 'জায়িরুন' অর্থ বক্র। উল্লেখ্য যে, এখানে সরল পথের বিবরণ প্রদান করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। বক্র পথের কথা এসেছে এখানে প্রসংগত। সরল পথ হচ্ছে রসুল প্রদর্শিত পথ। আর বক্র পথ হচ্ছে বেদাত, কুফরী ও নফসানিয়াতের পথ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ সরল পথের নির্দেশ দান করেন। কিন্তু সকলকে এই পথের পথিক হবার সৌভাগ্য দান করেন না। কিন্তু তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে সবাইকে সঠিক গন্তব্যে পৌছাতে পারতেন। এই কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ইচ্ছাময়। ইচ্ছাপ্রয়োগের ব্যাপারে তিনি চিরমুক্ত, চিরপবিত্র।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১০, ১১

هُوَ الَّذِیٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ○ يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

❒ তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন; উহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে পানীয় এবং উহা হইতে জন্মায় উদ্ভিদ যাহাতে তোমরা পশু চারণ করিয়া থাক।

❒ তিনি তোমাদিগের জন্য উহার দ্বারা জন্মান শস্য, জায়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতে বিবৃত হচ্ছে আল্লাহ্র সৃজন-বিধানের ধারাবাহিকতার কথা। যেমন— আকাশে মেঘপুঞ্জের সমাবেশ। তারপর সেই মেঘপুঞ্জ থেকে বারি বর্ষণ। এভাবে মেটানো হয় প্রাণীকুলের পিপাসা। আর এই বৃষ্টিপাতের ফলে মাটিতে জন্মায় উদ্ভিদ ও তৃণ-গুল্ম। ওই তৃণ-গুল্ম-শোভিত প্রান্তরে চরে বেড়ায় গৃহপালিত পশুর পাল।

এখানে 'মিনহু শারাবুন' অর্থ পানীয় জল। ঝর্ণা, কূপ, সরোবর, নদী-নালা সব কিছুই ভরে ওঠে বৃষ্টির পানিতে। এই পানির দ্বারাই তৃষ্ণা নিবারণ করে প্রাণীকুল। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তাকে আমি ঝর্ণা পথে প্রবাহিত করেছি'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাকে ধরণীপৃষ্ঠে স্থান দিয়েছি।' 'মিনহু শাজারুন' কথাটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে, বৃক্ষকুলের জীবনও পানির উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টির পানি উদ্ভিদেরাও পান করে থাকে।

'তুসীমূনা' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে— তোমরা তোমাদের পশুপালকে চারণ করে থাকো। যেমন বলা হয়, 'সামাতিল্ মাশিয়াতু' অর্থ পশুপাল চরে। আর 'আসামাহা সাহিবুহা' অর্থ পশুপালের মনিব তা চরায় ।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদের জন্য তার দ্বারা জন্মান শস্য, জায়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল।' একথার অর্থ— বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মাটিতে জন্মলাভ করে শস্য, জয়তুন, খেজুর, আংগুর ও সকল প্রকার ফল। এভাবে হে মানুষ! তোমাদের পরম করুণাপরবশ আল্লাহ্ তোমাদের ও তোমাদের পশুপালের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেন।

'মিন কুল্লিছ ছামারাত' (সর্ব প্রকার ফল) কথাটির 'মিন' অব্যয় এখানে আংশিক অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ সম্ভাব্য জগতের ফলমূল সমূহের কিয়দংশ দেয়া হয়েছে এই পৃথিবীতে। ফলমূলের প্রকৃত ভাণ্ডার রয়েছে বেহেশতে। পৃথিবীর ফলমূল বেহেশতের সেই অতুলনীয় ফলমূলের নমুনামাত্র । আল্লাহ্পাক সকল প্রাণী সৃষ্টির পূর্বেই তাদের রিজিক প্রস্তুত করে রেখেছেন। পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য পশুপাখি আগমনের পূর্বেই তাই সৃষ্টি করা হয়েছে তৃণগুল্ম ও উদ্ভিদরাজি। এসকল কিছু নিয়েই মানুষ পরবর্তীতে তার নিজের এবং অন্য প্রাণীদের রিজিকের ব্যবস্থাপনাকে সম্প্রসারিত করেছে। মানুষের এমতো বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতাও আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ করুণা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এরপর বলা হয়েছে— 'অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।' একথার অর্থ, যারা চিন্তাশীল ও অনুসন্ধিৎসু, তারা সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব রক্ষার এই মহা আয়োজনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। অবাক হয়ে তারা দেখে, কীভাবে অঙ্কুরোদগম ঘটে একটি বীজের। তারপর কীভাবে প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকে তার মূলের, কাণ্ডের, শাখা-প্রশাখার ও পত্র-পল্লবের। অতি ক্ষুদ্র এই বৃক্ষই একদিন পরিণত হয় বিশাল মহীরুহে। এভাবেই বিভিন্ন মৌসুমে অরণ্যে বাগানে

 www.eelm.weebly.com

প্রান্তরে বিকশিত হয় ফল ও ফসলের বিপুল সমাহার। একই মাটিতে জন্মলাভ করে এবং একই আলো হাওয়া ও পানিতে পরিপুষ্ট হয়েও এ পৃথিবীর ফল ও ফসলের সমাহার স্বাদে গন্ধে ও বর্ণে কতো বিচিত্র, সচিত্র। আল্লাহর এই সৃজন নৈপুণ্যের মধ্যে রয়েছে চিন্তাশীল মানুষের জন্য বিশেষ নিদর্শন। তারা এই বিস্ময়কর সৃজনপ্রক্রিয়া থেকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারে যে, এ সকল কিছুর স্রষ্টা নিশ্চয়ই কেউ রয়েছেন। তিনিই তো এক, একক, দয়াময়, প্রেমময় ও পালনকর্তা আল্লাহ্।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ১২, ১৩

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝ وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ۝

❑ তিনিই তোমাদিগের অধীন করিয়াছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে; নক্ষত্ররাজিও অধীন হইয়াছে তাঁহারই বিধানে। অবশ্যই ইহাতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

❑ এবং তিনি তোমাদিগের অধীন করিয়াছেন বিবিধ প্রকার বস্তু যাহা তোমাদিগের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনিই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে' একথার অর্থ— হে মানুষ! পরম করুণাময় আল্লাহ্তায়ালাই তোমাদের কল্যাণের নিমিত্তে সৃষ্টি করেছেন দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্রকে। সৌরজগতের গ্রহ-নক্ষত্রসমূহের নিয়মিত বিবর্তনের ফলে পালাক্রমে পৃথিবীতে আসে দিন ও রাত। দিবা-রাত্রির এই বিবর্তনের মধ্যে মানুষের জন্য রয়েছে প্রভূত কল্যাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে।' এখানে 'বিআমরি' কথাটির 'আমর' অর্থ উদ্ভাবন, পরিমিতি নির্ধারণ অথবা আদেশ। প্রকৃতিবাদীরা মনে করে, উদ্ভিদ-জগতের সৃষ্টি হয় নক্ষত্রপুঞ্জের পরিক্রমণ ও রাশিচক্রের বিবর্তণের মাধ্যমে। তাদের ধারণা ভুল। তারা কি মনে করে, নক্ষত্রপুঞ্জ বা রাশিচক্র অস্তিত্ব ও গুণবত্তার দিক দিয়ে সম্ভাব্য জগতের (দায়রায়ে এমকানের) বৃত্তভূত নয়? তাদের ধারণা অলীক ও অবাস্তব। প্রকৃত কথা হচ্ছে, অন্য সকল সৃষ্টির মতো নক্ষত্রপুঞ্জসমূহও সত্তা ও গুণগত দিক থেকে সৃষ্ট ও অপূর্ণ। সকল সৃষ্টিই সেই স্বয়ম্ভু স্রষ্টার মুখাপেক্ষী। চির অমুখাপেক্ষী কেবল

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্। তিনিই সকল সৃষ্টির অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করেছেন। সুতরাং তাঁকে না মানলে চিন্তা-চেতনা আটকে পড়বে বিবর্তনবাদের ফাঁদে। এভাবে জ্ঞানের অনন্ত গতি হয়ে পড়বে অবরুদ্ধ। সুতরাং একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই মহাবিশ্বের সকল আবর্তন-বিবর্তনের একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক অবশ্যই রয়েছেন। তিনিই অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব । সৃষ্টির ভাঙাগড়া ও আবর্তন বিবর্তনের কারণ অবশ্যই রয়েছে। তিনি ওই কারণসমূহেরও স্রষ্টা। কারণগুলো কখনোই কোনো পরিণতির উদ্ভাবক নয়। সেগুলোও সৃষ্ট এবং সম্ভাব্য জগতের অন্তর্ভূত। সুতরাং যা নিজেই অনস্তিত্বজাত, তা অপরকে অস্তিত্ব প্রদান করবে কীভাবে?

এরপর বলা হয়েছে— 'অবশ্যই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।' একথার অর্থ— এই বিশাল সৃষ্টির নির্মাণশৈলী, নিয়মানুবর্তিতা ও বহুধাবিচিত্র প্রকাশ ও বিকাশের মধ্যে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'এবং তিনি তোমাদের অধীন করেছেন বিবিধ প্রকার বস্তু, যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন।' এখানে 'আলওয়ান' অর্থ রঙ বা বর্ণরাজি। মর্মার্থ— শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে মানুষ! আল্লাহ্ই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণীর বা প্রকারের বস্তু। ওই বস্তুগুলো তিনি তোমাদের কল্যাণের নিমিত্তেই সৃষ্টি করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে রয়েছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে।' একথার অর্থ— যারা সত্যান্বেষী ও সদুপদেশ অভিলাষী, তারা বহুধাবিচিত্র এই সৃষ্টির আকার প্রকার ও বিকাশ দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে, এগুলোর স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক ও পরিণতি-প্রদাতা নিশ্চয় কেউ রয়েছেন। তিনিই তো এক, অবিভাজ্য, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর স্রষ্টা আল্লাহ্।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ১৪

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

❐ তিনিই সমুদ্রকে অধীন করিয়াছেন যাহাতে তোমরা উহা হইতে তাজা মৎস্যাহার করিতে পার এবং যাহাতে উহা হইতে আহরণ করিতে পার রত্নাবলী যদ্দারা তোমরা অলংকৃত হও; এবং তোমরা দেখিতে পাও, উহার বুক চিরিয়া

www.eelm.weebly.com

জলযান চলাচল করে এবং ইহা এই জন্য যে তোমরা যেন তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর;

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনিই সমুদ্রকে অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মৎস্যাহার করতে পারো।' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! সাগরসমূহকে আল্লাহ্ এভাবে সৃষ্টি করেছেন, যেনো তোমরা তা থেকে লাভ করতে পারো প্রভূত কল্যাণ। যেমন আহার্য বস্তুরূপে তোমরা সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করতে পারো তাজা মৎস্য। উল্লেখ্য যে, সকল প্রকার গোশতের মধ্যে মাছের গোশতই মানুষের জন্য অধিক উপাদেয় ও উপকারী। মাছের গোশত ভক্ষণের সাথে সাথে পাকস্থলীতে মিলিয়ে যায়। তাই এতে করে পিপাসা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অন্য সকল প্রাণী ও পশুর গোশত উৎকট, নিরস ও অগ্নিউৎপাদক। এতে করে তৃষ্ণারও কোনো কারণ ঘটে না। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সমুদ্রের লবণাক্ত ভারী পানিতে আল্লাহ্ সৃষ্টি করে রেখেছেন সহজপাচ্য তাজা ও সুস্বাদু আমিষ জাতীয় আহার্য।

ইমাম মালেক এবং ইমাম সুফিয়ান সওরী এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, শরিয়তের পরিভাষায় মাছও গোশতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেউ যদি এইমর্মে শপথ করে যে, আমি গোশত ভক্ষণ করবো না এবং এরপর যদি সে মৎস্য আহার করে, তবে তার শপথ ভেঙে যাবে। হানাফীগণ বলেন, শপথের বেলায় সাধারণ্যে প্রচলিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হয়। সাধারণ জনতা কিন্তু মাছকে গোশত বলে না। এরপর লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্তায়ালা কাফেরদের সম্পর্কে 'শার্রাদ দাওয়াব্বি' বা চতুষ্পদ জন্তু কথাটি ব্যবহার করেছেন। এখন কেউ যদি এইমর্মে শপথ করে বসে যে, আমি চতুষ্পদ জন্তুর উপরে আরোহণ করবো না এবং এরপর যদি সে কোনো কাফেরের উপরে আরোহণ করে, তবে কি সে শপথ ভঙ্গকারী হবে?

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যাতে তা থেকে আহরণ করতে পারো রত্নাবলী যদ্দ্বারা তোমরা অলংকৃত হও' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের রমণীদেরকে তোমরা অলংকৃতা করার উদ্দেশ্যে সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করো মনিমুক্তা। এখানে 'তাল্বাসূনাহা' (অলংকৃত হও) কথাটি পুরুষদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও এর মর্মার্থ হবে— তোমাদের স্ত্রী-কন্যারা অলংকৃতা হয়। এখানে 'হিল্ইয়াতান্' অর্থ অলংকারপাতি।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং তোমরা দেখতে পাও তার বুক চিরে জলযান চলাচল করে' এখানে 'মাওয়াখিরা ফীহি' অর্থ— সাগরের বুক চিরে জলযান চলাচল করে। কাতাদা অর্থ করেছেন— চলাচলকারী। অর্থাৎ চলাচলকারী জলযানগুলো কোনোটি যায়, কোনোটি আসে। অথচ তখন বায়ু প্রবাহিত হয় একই দিকে। এতে করে বোঝা যায়, কোনো কোনো জলযান হয় পালবাহী এবং কোনোটি হয় পালহীন। এভাবে পরিদৃশ্যমান হয় সেগুলোর বিপরীতমুখী চলাচল।

হাসান কথাটির অর্থ করেছেন, ভর্তি অর্থাৎ জলযানভর্তি সমুদ্র। ফাররা এবং আখফাশ বলেছেন, কথাটির অর্থ পানি বিদীর্ণ করে ধাবমান জলযান। 'সখার' অর্থ পানি ভেদকারী। অথবা নৌকা ও জাহাজ চলার শব্দ। আবু উবায়দা বলেছেন, প্রবল বায়ু প্রবাহের ফলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকেই বলে 'সখার'। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ, যে তরণী চলে অগ্রভাগে পানি ভেদ করে ও বায়ু বিদীর্ণ করে। অর্থাৎ বায়ুর বিরুদ্ধে চলমান জলযান। এরকম অর্থ লিখেছেন কামুস রচয়িতা। কল্লোলিত শরীরের আওয়াজকে বলে 'সখারাস্ সাবিহু'। কারণ বাত্যাতাড়িত অর্ণবযান ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে সশব্দে অগ্রসর হয়। হাদিস শরিফে এসেছে— 'ইজা আরদা আহাদুকুমুল বাওলু ফাল ইয়াতাসখ্খারিররীহ্' (যদি তোমরা প্রস্রাব করার ইচ্ছা করো তাহলে বায়ু ছেদ করো)। অর্থাৎ বায়ু প্রবাহের অনুকূলে উপবেশন করো।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং এটা এজন্যে যে তোমরা যেনো তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো।' একথার অর্থ— তোমরা যেনো জলযান যোগে বিভিন্ন বন্দরে গমনাগমন করে করতে পারো সফল বেসাতি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা যেনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।' একথার অর্থ— তোমাদের সামনে রয়েছে তরঙ্গসংক্ষুব্ধ বিশাল সাগর। আল্লাহ্পাক তাঁর অপার কৃপাবশে ওই উত্তাল জলরাশিকে করে দিয়েছেন তোমাদের অধীন। আরো করেছেন উপার্জনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। সুতরাং হে মানুষ! অনুধাবন করতে সচেষ্ট হও যে, তোমাদের উপরে তাঁর অনুগ্রহ সমুদ্র অপেক্ষাও বিশাল। অতএব কৃতজ্ঞচিত্ত হও। প্রকাশ করো হৃদয়োৎসারিত কৃতজ্ঞতা।

আমি বলি, এতক্ষণ ধরে বর্ণিত আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহের কথা জেনে নেয়ার পর শোকরের মাকাম বা কৃতজ্ঞতার স্তরে উন্নীত হওয়ার অনুপ্রেরণা প্রদানার্থে শেষে এভাবে বলা হয়েছে — এবং তোমরা যেনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। বলা বাহুল্য যে, এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যেই রয়েছে ইহকালের প্রচুর কল্যাণ ও পরকালের প্রতুল পুণ্য। কৃতজ্ঞতা প্রকাশই হচ্ছে সকল কল্যাণের চাবিকাঠি।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ১৫

وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

❑ এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করিয়াছেন যাহাতে পৃথিবী তোমাদিগকে লইয়া এদিক-ওদিক ঢলিয়া না যায় এবং তিনি স্থাপন করিয়াছেন নদ-নদী ও পথ, যাহাতে তোমরা তোমাদিগের গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পার।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে এদিকে ওদিকে ঢলে না পড়ে।' একথার অর্থ— মহাশূন্যে ভাসমান এই মেদিনী অথৈ পাথারে ভাসমান তরণীতুল্য। ভারহীন তরণী যেমন এদিকে ওদিকে ঢুলতেই থাকে, এই ধরিত্রীও তেমনি এদিকে ওদিকে ঢলে পড়তো। কিন্তু তাকে সে সুযোগ আল্লাহ্তায়ালা দেননি। মানুষের স্বস্তি নিশ্চিতকরণার্থে তিনি ভূপৃষ্ঠে চাপিয়ে দিয়েছেন সুদৃঢ় ও সুবিশাল পর্বতমালা। এ যেনো কীলক, যা কেন্দ্রসম্পৃক্ত। এভাবে পৃথিবী-পৃষ্ঠে প্রোথিত পর্বতমালাই পৃথিবীকে করে রেখেছে অচঞ্চল ও মানুষের বাসোপযোগী। এতে করে বুঝা যায় মানুষ কতইনা অসহায়, আল্লাহ্ কতই না দয়ার্দ্র।

বাগবী লিখেছেন, পৃথিবীকে সৃষ্টি করার পর সে সভয়ে কাঁদতে শুরু করলো। ফেরেশতাগণ বললেন, ইয়া ইলাহি! এতো দেখছি তার পিঠে কাউকে থাকতেই দিবে না। আল্লাহ্ তখন ভারপদার্থরূপে ধরাপৃষ্ঠে স্থাপন করলেন পাহাড়-পর্বত। ফেরেশতারা তখন পর্যন্ত জানতো না, পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করা হয়েছে কী কারণে।

কাতাদার মাধ্যমে হোসাইন সূত্রে কায়েস বিন উব্বাদের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম। বক্তব্যটি এই— আল্লাহ্তায়ালা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। কিন্তু গোলাকৃতি হওয়ার কারণে তা আন্দোলিত হতে লাগলো। ফেরেশতারা বললো, এতো দেখছি অতি চঞ্চল। এতো তার পিঠে কাউকে রাখবেই না। রাত হলো। নিশি অবসানের পর এলো প্রত্যূষ। ফেরেশতারা বিস্ময়ের সাথে দেখলো, পৃথিবী পৃষ্ঠে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে গিরি-শ্রেণীসমূহ। তারা জানতেই পারলো না, এরকম করা হলো কেনো? বললো, হে পরোয়ারদিগার! আপনার সৃষ্টিজগতে পর্বতের চেয়েও কঠিন কোনো কিছু কি আছে? আল্লাহ্পাক বললেন, হ্যাঁ। লোহা পর্বতাপেক্ষা অধিকতর কঠিন। ফেরেশতারা পুনঃনিবেদন করলো, লোহার চেয়ে কঠিন কি? আল্লাহ্পাক বললেন আগুন। ফেরেশতারা বললো, আগুনের চেয়ে শক্তিশালী কে? তিনি বললেন, পানি। ফেরেশতারা বললো, তার চেয়ে অধিকতর বলশালী কে? তিনি বললেন, বাতাস। তারা বললো, বাতাস অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা রাখে কে? তিনি বললেন, পুরুষ মানুষ। তাদের শেষ প্রশ্নটি ছিলো এরকম, পুরুষের চেয়ে অধিক দৃঢ়তা কার? আল্লাহ্ বললেন, নারীর।

আমি বলি, এ ধরনের প্রশ্নের কোনো শেষ নেই। আল্লাহ্পাকই শক্তিধর। সৃষ্টি মূলতঃ অনস্তিত্ব নির্ভর। আল্লাহ্তায়ালার শক্তিমত্তার তুলনায় সমগ্র সৃষ্টি কিছুই নয়। তাঁর শক্তিমত্তার ছায়া-প্রতিচ্ছায়া যে সৃষ্টি ধারণ করে, অন্য সৃষ্টি অপেক্ষা সে-ই হয় অধিকতর শক্তিশালী। যদি সে ছায়া হাতির উপরে পড়ে, তবে হাতি হবে অন্য সকলের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। যদি পিপীলিকার উপরে পড়ে, তবে

www.eelm.weebly.com

পিপীলিকাই হবে অন্য সকলের চেয়ে শক্তিশালী। এভাবে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে, সৃষ্টির কেউই অপর অপেক্ষা সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে সৃষ্টির শক্তি হয় একে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অতএব একথা মানতে হবে যে, সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব কেবল আল্লাহ্‌র, অন্য কারো নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারো।' একথার অর্থ— পৃথিবীতে তোমাদের মনোস্কামনা পূরণার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে নদ-নদীসমূহ ও পথ। তাই জলপথ ও স্থলপথে তোমরা পৌঁছে যেতে পারো তোমাদের উদ্দিষ্ট গন্তব্যে।

সূরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১৬

وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝

❐ এবং তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন পথনির্ণায়ক চিহ্ন-সমূহ এবং উহারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন পথনির্ণায়ক চিহ্নসমূহ।' একথার অর্থ— তাঁর সৃজিত তরুরাজি, পর্বতমালা, গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলী, দুর্গ, প্রাসাদমালা মানুষের পথনির্দেশিকা। পথচারীরা এসকল কিছু দেখে খুঁজে নিতে পারে তাদের পথের নিশানা। আর এ সকল চিহ্নরাজি শরিয়তের বিধান বাস্তবায়নের নিমিত্তও। যেমন নামাজ-রোজার নির্দেশ কার্যকর করার জন্য সময় একটি নিমিত্ত। যেমন নিষিদ্ধ পানীয় নিমিত্ত হচ্ছে মত্ততার। এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বভাবসিদ্ধ ও জ্ঞানগত প্রমাণাদিও মানুষের চলার পথের দিশারী। যেমন নাড়ীর দ্রুত স্পন্দন প্রমাণ করে শরীরে জ্বরের উপস্থিতিকে। তেমনি এই মহাবিশ্বের উপস্থিতি একথা প্রমাণ করে যে, এর স্রষ্টা নিশ্চয় একজন রয়েছেন। এভাবে নবীগণের মোজেজাও প্রমাণ করে একজন সত্য নবীর নবুয়তকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়।' একথার অর্থ রাতের আঁধারে স্থলে অথবা জলে পথ হারিয়ে ফেললে নক্ষত্রের অবস্থান ও গতিবিধি লক্ষ্য করে পথিকেরা খুঁজে নিতে পারে তাদের পথের সন্ধান।

এখানে 'আন্‌নজমু' অর্থ সাধারণ নক্ষত্র। 'আ'লামাত' অর্থ নক্ষত্ররাজি। কতকগুলো তারার অবস্থান চিহ্নরূপে বিদ্যমান। আবার কতকগুলো তারা দেখায় পথের দিশা। সুদ্দী বলেছেন, 'আন্‌নজমু' অর্থ ধ্রুবতারা, সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষদ্বয় ও জুদী তারা। এগুলো দেখে মানুষ পথ চিনে নিতে পারে। নির্ণয় করতে পারে কেবলা। আমি বলি, এটা এ কারণে সম্ভব যে, ওই তারাগুলো ধ্রুবতারার নিকটবর্তী। এদের পরিক্রমণ গতিও অত্যন্ত শ্লথ। তাই এগুলোর অবস্থানস্থল

 www.eelm.weebly.com

থাকে প্রায় অপরিবর্তিত। আয়াতের শেষ কথা হচ্ছে 'ইয়াহ্তাদূন'। এর পূর্বের কর্তৃবাচক সর্বনামটি (হুম) কুরায়েশদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তারা ছিলো সাধারণতঃ বণিক। বাণিজ্যব্যপদেশে তাদেরকে রাতের বেলায় জলপথে অথবা স্থলপথে বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন করতে হতো। তখন আকাশের নক্ষত্র দেখেই তাদেরকে নির্ণয় করতে হতো তাদের গন্তব্য। উল্লেখ্য যে, এখানে 'আলামত বা চিহ্ন' কথাটির পরে 'আন্নজমু' বা নক্ষত্রের উল্লেখের মধ্যে একটি বিশেষ বক্তব্য রয়েছে। বক্তব্যটি এই— মানুষ যেহেতু আল্লাহ্র বিশেষ সৃষ্টি নক্ষত্রপুঞ্জের মাধ্যমে তাদের পথের দিশা পায়, সেজন্য আল্লাহ্র প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। মানুষের জন্য নিশীথের আকাশে তাঁর একি অবাক আয়োজন!

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ১৭

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

❑ সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তাহারই মত যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার মতো যে সৃষ্টি করে না?' একথার অর্থ— হে অংশীবাদী জনতা! জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আল্লাহ্র অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখার পরেও কি তোমরা তোমাদের নিষ্প্রাণ জড় প্রতিমাগুলোকে আঁকড়ে থাকবে? কী মনে করো তোমরা? যে মহান আল্লাহ্ একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৃজক, তিনি কি তাদের সমতুল, যাদের সৃষ্টি করার সামর্থ্য মাত্র নেই?

এখানে 'মান্ লা ইয়াখলুকু' বলে বুঝানো হয়েছে মুশরিকদের পূজিত জড় প্রতিমাগুলোকে। বিবেকবানকে বিবেকহীনের উপরে প্রাধান্য প্রদানার্থেই এখানে 'মা' (যারা) এর স্থলে বসানো হয়েছে 'মান' (যে) অব্যয়টি। অথবা এখানে 'মান' দ্বারা কেবল তাদের বিগ্রহগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। যেহেতু পৌত্তলিকেরা তাদের মনগড়া মাবুদগুলোকেই প্রকৃত মাবুদ বলে মনে করে। উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষার রীতি অনুসারে বিবেকবানের জন্য 'মান' এবং বিবেকহীনের জন্য 'মা' ব্যবহৃত হয়। 'আফামান' কথাটির 'আ' (কি) এখানে অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। আর 'ফা' (অতঃপর) কথাটি এর অনুগামী। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— এতক্ষণের আলোচনায় যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্তায়ালা অতুলনীয় সৃজক, মহাজ্ঞানী, করুণাপরবশ ও সর্বশক্তিধর, তবে কেনো আর জড়পদার্থের উপাসনা? হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমাদের জ্ঞান ও বিবেক বলে কিছুই কি আর অবশিষ্ট নেই? তোমরা এখনও কি মনে করো প্রস্তর মূর্তিগুলো ওই মহামহিম আল্লাহ্র সমতুল, যিনি সমগ্র সৃষ্টির একক স্রষ্টা ও পালনকর্তা?

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তবু কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?' একথার অর্থ দিবালোক অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল প্রমাণাদি উপস্থাপনের পরেও কি তোমাদের বোধোদয় ঘটবে না? মূর্খতার আঁধার বিবর থেকে এখনো কি তোমরা বেরিয়ে আসবে না সত্যের সমুদ্ভাসিত সাম্রাজ্যে?

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০, ২১

وَاِنۡ تَعُدُّوۡا نِعۡمَةَ اللّٰهِ لَا تُحۡصُوۡهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ○ وَ اللّٰهُ يَعۡلَمُ مَا تُسِرُّوۡنَ وَمَا تُعۡلِنُوۡنَ ○ وَالَّذِيۡنَ يَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ لَا يَخۡلُقُوۡنَ شَيۡـئًا وَّهُمۡ يُخۡلَقُوۡنَ ○ اَمۡوَاتٌ غَيۡرُ اَحۡيَآءٍ ۚ وَمَا يَشۡعُرُوۡنَ اَيَّانَ يُبۡعَثُوۡنَ ○

❒ তোমরা আল্লাহের অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❒ তোমরা যাহা গোপন রাখ এবং যাহা প্রকাশ কর আল্লাহ্ তাহা জানেন।

❒ উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাদিগকে আহ্বান করে তাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তাহাদিগকেই সৃষ্টি করা হয়।

❒ তাহারা অপ্রাণ, নির্জীব এবং পুনরুত্থান কবে হইবে সে বিষয়ে তাহাদিগের কোন চেতনা নাই।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।' একথার অর্থ— হে মানুষ! ভেবে দেখো কতো অসংখ্য নেয়ামত আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছেন। নেয়ামতের উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তো দূরের কথা, তোমরা তো তাঁর নেয়ামতের সংখ্যাও নির্ণয় করতে পারবে না। নেয়ামত দাতাই উপাসনা লাভের যোগ্য। তোমরা প্রতিনিয়ত তাঁর অসংখ্য নেয়ামত উপভোগ করছো, অথচ তাঁর ইবাদত থেকে রয়েছো বিমুখ। অতএব তোমাদের আশু কর্তব্য এই যে, এই মুহূর্তেই নিজেকে সমর্পণ করো। অক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদান করো । কেবল তাঁরই সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হও।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এ কথার অর্থ— একথা অতি নিশ্চিত যে, আল্লাহ্তায়ালা ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ালু। (গফুরুর রহীম)। প্রমাণ এই যে, প্রতিনিয়ত অবাধ্যতা প্রদর্শন সত্ত্বেও তিনি

www.eelm.weebly.com

তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করেননি। অকৃতজ্ঞতার কারণে তোমাদেরকে শাস্তিও দেননি। তবে এবার ভাবতে শুরু করো, তাঁর মহানুভবতা ও উদারতা কতো অবাধ, কতো অপার।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তোমরা যা গোপন রাখো এবং যা প্রকাশ করো আল্লাহ্ তা জানেন।' একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের হৃদয়ের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা-অকৃতজ্ঞতা, মনোযোগ-অমনোযোগ, সমর্পণেচ্ছা-আত্মম্ভরিতা, শুভ-অশুভ, উদারতা-অনুদারতা সবকিছুই আল্লাহ্ জানেন। আবার তোমাদের প্রকাশ্য কথাবার্তা ও কার্যকলাপ সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবগত। তাই যথাসময়ে যথোপযুক্ত প্রতিফল তিনি দিবেনই। হয় পুরস্কৃত করবেন। না হয় করবেন তিরস্কৃত।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাদেরকে আহ্বান করে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়।' একথার অর্থ— অংশীবাদীরা চিরঞ্জীব, সর্বশক্তিধর প্রকৃত স্রষ্টা আল্লাহ্র উপাসনা ত্যাগ করে জড়প্রতিমাগুলোর উপাসনা করে। কীভাবে করে? একটি তুচ্ছতম বস্তু সৃষ্টি করার ক্ষমতাও তো তাদের নেই। বরং তারা নিজেরাই আল্লাহ্তায়ালার অন্যান্য জড়সৃষ্টির মতো এক বা একাধিক সৃষ্টি। নির্জীব, নিশ্চেতন, নির্বিবেক।

এর পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তারা অপ্রাণ, নির্জীব এবং পুনরুত্থান কবে হবে, সে সম্পর্কে তাদের চেতনা নেই।' একথার অর্থ— ওই প্রতিমাগুলো জীবন্ত তো নয়ই। মৃতও নয়। জীবিতরাই মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু ওই প্রস্তর প্রতিমাগুলো তো কখনোই জীবন্ত ছিলো না। সব সময়ই সেগুলো জীবনের স্পন্দনচ্যুত। জীবনশেষের মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কবিবর্জিত। তাই তারা জীবন-মৃত্যুর জ্ঞান যেমন রাখে না, তেমনি অবশ্যম্ভাবী পুনরুত্থান সম্পর্কেও কোনো প্রকার বোধ তাদের নেই। সুতরাং তারা তাদের উপাসকদেরকে পুরস্কৃত করবে কিভাবে? কীভাবেই বা তাদেরকে অস্বীকারকারীদেরকে করবে তিরস্কৃত। সুতরাং অংশীবাদী জনতার কী হলো? তারা কি এখনো সত্য ধর্ম ইসলামকে স্বীকার করবে না?

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ২২, ২৩

إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ○ لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ○

❒ এক ইলাহ্, তিনিই তোমাদিগের ইলাহ্; সুতরাং যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের অন্তর সত্য-বিমুখ এবং তাহারা অহংকারী।

www.eelm.weebly.com

❐ ইহা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্ জানেন যাহা উহারা গোপন করে এবং যাহা উহারা প্রকাশ করে। তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এক ইলাহ্, তিনিই তোমাদের ইলাহ্।' একথার অর্থ জ্ঞান, বিবেক ও দলিল প্রমাণাদি দ্বারা এ বিষয়টি সুপ্রমাণিত যে, আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য উপাস্য। আর তিনিই তো তোমাদের আপনতম উপাস্য। কেউ বা কোনোকিছুই তাঁর সমকক্ষ নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ। একথার অর্থ— অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্র অসংখ্য অনুগ্রহ আস্বাদন করে। কিন্তু তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। তাই আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে বঞ্চিত করেছেন তত্ত্বজ্ঞান থেকে। ফলে তারা দূরদর্শিতাবিচ্যুত। সত্যবিমুখ। পরলোকের প্রতি বিশ্বাস তাদের নেই।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন ঘোর কৃষ্ণ, স্থূল ও অজ্ঞ অবস্থায়। তারপর তার প্রতি নিক্ষেপ করেছেন তাঁর জ্যোতির একটি ঝলক। যে ব্যক্তি সেই জ্যোতিসম্পাতে আলোকিত হয়েছে, সেই পায় হেদায়েত। তাই আমি বলি, আল্লাহ্র কলমের কালি শুকিয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন জ্ঞানে যাদের সুপথ পাওয়ার কথা তারা ঠিকই সুপথ পায়। আর যারা পথভ্রষ্ট হওয়ার কথা, সে ঠিকই পথভ্রষ্ট হয়। এই সমাধানটি অদৃষ্টলিপিতে লিপিবদ্ধ। কলম আর নতুন কিছু লিখবে না। আহমদ, তিরমিজি ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা অহংকারী।' একথার অর্থ— তারা সত্যকে ছেড়ে গ্রহণ করেছে অহমিকাকে। অবমাননা করেছে তাঁর বিপুল অনুগ্রহরাজির। দর্প ও অকৃতজ্ঞতাই তাদের নিত্য সহচর। তাই তারা আল্লাহ্কে উপাস্য হিসেবে এবং রসুলকে তাঁর বাণীবাহক হিসেবে মানতে নারাজ। যদি তারা আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো, তবে এমতো অনারোগ্য স্খলন তাদের ঘটতো না।

এর পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এটা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা মুশরিকদের অন্তরের অবিশ্বাস, অহংবোধ ও অপবিত্রতা সম্পর্কে ভালো করেই জানেন। তাদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডও তাঁর অজানা নয়। কারণ তিনি তো সর্বজ্ঞ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' রসুল স. এরশাদ করেছেন, ক্ষুদ্র পিপীলিকাবৎ অহংকারও যদি কারো থাকে, তবে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। একজন বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের মধ্যে অনেকেই তো চায় তার পোশাক-পরিচ্ছদ সুন্দর হোক। এটা কি

www.eelm.weebly.com

অহংকার? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ স্বয়ং সুন্দর। তাই তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। সুতরাং সুন্দর পরিচ্ছদাকাংখা অহমিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। চিত্তাকর্ষক পোশাক কখনও অহংকারপ্রকাশক নয়। বরং সত্যের প্রতিপক্ষে দাঁড়ানোর নাম অহংকার। মানুষের তুচ্ছ জ্ঞান থেকে উৎপত্তি হয় দম্ভের। এই হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে 'কিবরু মিম বাত্বরিল হাক্ব'। আলেমগণ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্নভাবে। 'নেহায়া' প্রণেতা লিখেছেন, 'বাত্বরিল হাক্ব' অর্থ আল্লাহ্র এককত্ব ও তাঁর ইবাদতকে বর্জনীয় মনে করা। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ সত্যের প্রতিপক্ষে গর্বিত হওয়া। সত্যকে সত্য মেনেও তা প্রত্যাখ্যান করা। কেউ কেউ আবার বলেছেন, সত্যকে মেনে না নেয়া। এ সকল ব্যাখ্যার আলোকে 'বাত্বরিল হাক্ব' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্পাকের ইবাদতের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করা। তাঁর অগণনীয় অনুগ্রহরাজিকে অধিকার মনে করা। এরকমও মনে করা যে, নেয়ামতসমূহ দান করতে তিনি বাধ্য।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসে অহংকারের বিপরীতে এসেছে ইমানের আলোচনা। কারণ ইমানদারগণ তাঁদের অস্তিত্ব ও অস্তিত্ব সম্পর্কিত সকল কিছুকেই মনে করেন আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তাই তাঁরা তাঁদের কৃতি ও সাফল্যে কখনোই গর্বিত হন না। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীরা তাদের অস্তিত্ব ও সফলতাকে মনে করে তাদের নিজস্ব কৃতিত্ব। এভাবে তারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয় আল্লাহ্কে। সুফী সাধকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত 'ফানা' শব্দটির মর্মার্থ এই যে, অস্তিত্বধারী হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে অস্তিত্বহীন বলে অনুভূত হওয়া। আপন সত্তা যে আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ বা দান ছাড়া কিছু নয়, তা সুনিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করা। অর্থাৎ একথা ভাবা যে, এ সত্তা আমার অধিকারাধীন নয়, আল্লাহ্র অধিকারাধীন। এভাবে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী হয়ে পড়া।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ২৪, ২৫

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ لِيَحْمِلُوْٓا
اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ
عِلْمٍ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ۝

❒ যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'তোমাদিগের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করিয়াছেন?' তখন উহারা বলে, 'সেকালের উপকথা!'

❒ ফলে কিয়ামত দিবসে উহারা পূর্ণমাত্রায় বহন করিবে উহাদিগের পাপভার এবং পাপভার তাহাদিগেরও যাহাদিগকে উহারা তাহাদিগের অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করিয়াছে। দেখ, উহারা যাহা বহন করিবে তাহা কত নিকৃষ্ট!

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পরলোকে অবিশ্বাসী দাম্ভিক অংশীবাদীদেরকে যখন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা জিজ্ঞেস করে, তোমাদের মধ্যে নাকি এক নবী আবির্ভূত হয়েছেন। তার উপরে নাকি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা সে সম্পর্কে জানতে চাই। বলোতো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর কী অবতীর্ণ করেছেন? এমতো প্রশ্নের জবাবে তারা বলে, 'সেকালের কিংবদন্তী'।

রসুল স. এর আবির্ভাবের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো দূর দুরান্তে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেকে রসুল স. এর সঙ্গে দেখা করতে আসতে শুরু করলো। বিরুদ্ধবাদী কুরায়েশেরা সৃষ্টি করলো বাধা। তারা রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে পাহারাদার রেখে দিলো। দূরের কেউ আগমন করলে প্রথমে দেখা হতো ওই প্রহরীদের সঙ্গে। আগন্তুকেরা জিজ্ঞেস করতে লাগলো, হে মক্কাবাসী। তোমাদের উপরে নাকি আল্লাহ্র বাণী অবতীর্ণ হয়েছে? কী অবতীর্ণ হয়েছে? তারা জবাব দিতে লাগলো, কী যে বলো তোমরা। ওগুলো আবার আল্লাহ্র বাণী না কি? ওগুলো তো প্রাচীন যুগের কল্পকাহিনী মাত্র।

এখানে 'আসাত্বিরুল আউয়ালীন' অর্থ সেকালের উপকথা বা কল্পকাহিনী। 'সত্বর' শব্দটি একবচন। এর অর্থ বইপুস্তক, মানুষ বা বৃক্ষের সারি। এর বহুবচন হচ্ছে 'আসত্বার' বা 'সুত্বুর'। বহুবচনের বহুবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয় 'আসাত্বীর'। অথবা 'উস্ত্বুরাতুন'।

পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'ফলে কিয়ামত দিবসে তারা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে তাদের পাপের ভার।' একথার অর্থ— আল্লাহ্র কালামকে 'সেকালের উপকথা' বলে যে মহাঅপরাধ তারা করে চলেছে, সেই অপরাধের শাস্তি আখেরাতে তাদেরকে পেতেই হবে। তারা নিজেরা বিভ্রান্ত। অপরকেও বিভ্রান্তকারী। তাই তাদের পাপের ভার হবে পূর্ণ ও অতি গুরুভার। ওই গুরুভার সেদিন তাদেরকে বহন করতে হবে পূর্ণ মাত্রায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতাহেতু বিভ্রান্ত করেছে।' একথার অর্থ— উভয় দলকেই সেদিন পাপের বোঝা বহন করতে হবে। যারা অন্যকে বিভ্রান্তকারী, তারা দ্বিগুণ এবং যারা বিভ্রান্তকারীদের কথা শুনে বিভ্রান্ত হয়েছে, তারা একগুণ। অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের নেতাদের পাপের বোঝা হবে দ্বিগুণ ভারী। আর একগুণ ভারী হবে অনুসারীদের পাপের বোঝা।

ইমাম আহমদ, মুসলিম ও সুনান রচয়িতাবর্গ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান জানায়, সে তার অনুসারীদের আমলের সমান পুণ্য পায়।

 www.eelm.weebly.com

এতে করে অবশ্য অনুসারীদের পুণ্য এতটুকুও কমে না। তেমনি অসৎপথের প্রতি আহ্বানকারীরা পায় তাদের অনুসারীদের আমলের সমতুল্য পাপ। অবশ্য এতে করে অনুসারীদের পাপও কমে না।

এখানে 'বিগাইরি ইল্‌ম' কথাটির অর্থ অজ্ঞতাবশতঃ। এরকম বলা হয়েছে একারণে যে, অবিশ্বাসীদের অগ্রণীরা তাদের অনুগামীদেরকে বিভ্রান্ত করে কোনো দলিল প্রমাণ ছাড়াই। অথবা কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— অজ্ঞতার কারণেই তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। বিভ্রান্তরা একথা বুঝতেই পারে না যে, কে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করছে। ভাবে, তাদের ধর্মনেতারা তো তাদেরকে ঠিকপথেই পরিচালিত করছে।

শেষে বলা হয়েছে— 'দেখ, তারা যা বহন করবে তা কতো নিকৃষ্ট।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এবার নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারলেন যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কতো নিকৃষ্ট। আর তারা যে পাপের ভার বইতে বাধ্য হবে তা আরো কতো নিকৃষ্ট।

সূরা নাহল ঃ আয়াত ২৬

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

❑ উহাদিগের পূর্ববর্তীগণও চক্রান্ত করিয়াছিল; আল্লাহ্ উহাদিগের চক্রান্তের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করিয়াছিলেন; ফলে, ইমারতের ছাদ উহাদিগের উপর ধ্বসিয়া পড়িল এবং উহাদিগের প্রতি শাস্তি আসিল এমন দিক হইতে যাহা ছিল উহাদিগের ধারণার অতীত।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি এবং বাগবী কর্তৃক বর্ণিত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহের উক্তিরূপে এসেছে, আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে দুরাচার নমরুদ বিন কিনআনের ঘটনা। সে আল্লাহ্পাক সম্পর্কে হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে প্রচণ্ড বচসায় লিপ্ত হয়েছিলো। দম্ভ প্রকাশার্থে নির্মাণ করেছিলো এক অত্যুচ্চ স্তম্ভ। ওই স্তম্ভের উচ্চতা ছিলো পনেরো হাজার হাত। কা'ব এবং মুকাতিল বলেছেন, উচ্চতা ছিলো দুই ফরসখ। হঠাৎ একদিন শুরু হলো প্রলয়ংকরী ঝড়। ওই তীব্র তুফান স্তম্ভটির একাংশ উড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিলো সাগরে। বাকী অংশ আপতিত হলো নগরবাসীদের উপরে। নগরবাসীরা ছিলো নমরুদের অনুসারী। বিধ্বস্ত স্তম্ভের আঘাতে তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। ওই ঘটনাটির দিকে লক্ষ্য করেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! আপনার সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যান-

কারীরা আপনার বিরুদ্ধে যেভাবে ক্রমাগত চক্রান্ত করে চলেছে, তাদের পূর্বসূরীরাও তাদের প্রতি প্রেরিত নবী রসুলগণের বিরুদ্ধে সেরকমই চক্রান্ত করতো, কিন্তু তাদের সে সকল চক্রান্ত আমি কখনো সফল হতে দেইনি। তাদের চক্রান্তের প্রাসাদের ভিত্তিমূলে যথাসময়ে আমি হেনেছিলাম প্রচণ্ড আঘাত। ফলে তাদের ষড়যন্ত্রের অট্টালিকা ধসে পড়েছিলো। তাদের উপরে আমার শাস্তি কার্যকর হয়েছিলো এমনভাবে, যা ছিলো তাদের ধারণার অতীত। এভাবে নমরুদের সুউচ্চ ইমারতও আমি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলাম এবং বিনাশ করেছিলাম তার অনুসারীদেরকে। সুতরাং, হে আমার রসুল! আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনার বিরুদ্ধবাদীদের কোনো চক্রান্ত কখনোই আমি সফল হতে দিবো না।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ২৭, ২৮, ২৯

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ ۖ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ۗ بَلٰىٓ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

❒ পরে, কিয়ামতের দিনে তিনি উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন এবং তিনি বলিবেন, 'কোথায় আমার সেই সমস্ত শরীক যাহাদিগের সম্বন্ধে তোমরা বিতণ্ডা করিতে?' যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল তাহারা বলিবে, আজ লাঞ্ছনা ও অমংগল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের—

❒ যাহাদিগের মৃত্যু ঘটায় ফেরেশতাগণ উহারা নিজদিগের প্রতি জুলুম করিতে থাকা অবস্থায়; অতঃপর উহারা আত্ম-সমর্পণ করিয়া বলিবে, 'আমরা কোন মন্দকর্ম করিতাম না।' হাঁ, তোমরা যাহা করিতে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

❒ সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজায় প্রবেশ কর সেথায় স্থায়ী হইবার জন্য। দেখ, অহংকারীদিগের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পরে, কিয়ামতের দিনে তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।' একথার অর্থ— চক্রান্তকারীদেরকে পৃথিবীতে যেমন লাঞ্ছিত করা হয়েছে, তেমনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে আখেরাতে। অপর এক আয়াতেও

www.eelm.weebly.com

এমতো লাঞ্ছনার কথা বলা হয়েছে। যেমন— 'রব্বানা ইন্নাকা মান্ তুদ্খিলীন্নারা ফাক্বদ আখযাইতাহু (হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি যাকে নরকে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে করবে লাঞ্ছিত)।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি বলবেন, কোথায় আমার সেই সমস্ত শরীক যাদের সম্বন্ধে তোমরা বিতণ্ডা করতে?' একথার অর্থ — আখেরাতের ওই লাঞ্ছনাগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, হে অংশীবাদীর দল! পৃথিবীতে যাদের উপাসনায় মগ্ন হয়ে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করেছিলে, তোমাদের সেই প্রস্তর প্রতিমাগুলো আজ কোথায়?

এরপর বলা হয়েছে— 'যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো তারা বলবে, আজ লাঞ্ছনা ও অমংগল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের।' একথার অর্থ— তখন নবী-রসুল ফেরেশতা ও বিশ্বাসীগণ নিজেদেরকে লাঞ্ছনামুক্ত দেখে হেদায়েতপ্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বলবেন, আল্লাহ্ দয়া করে পৃথিবীতে আমাদেরকে ইমান ও হেদায়েত দিয়েছিলেন বলে আজ আমরা সকল অকল্যাণ থেকে মুক্ত। আজ সকল লাঞ্ছনা ও অকল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য। এখানে 'আলইয়াওমা' (আজ) অর্থ হাশরের দিবস। 'আলখিজইয়ু' অর্থ লাঞ্ছনা বা ক্লেশ। আর 'আস্সূউ' অর্থ শাস্তি, তিরস্কার, অমঙ্গল বা অকল্যাণ।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'যাদের মৃত্যু ঘটায় ফেরেশতাগণ তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করতে থাকা অবস্থায়।' একথার অর্থ— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই আখেরাতে লাঞ্ছিত হবে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যারা প্রতিষ্ঠিত ছিলো অবিশ্বাসের উপর। ফেরেশতারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হিসেবেই তাদের জীবন হরণ করে। এ ধরনের হতভাগারা আত্মঅত্যাচারী বা নিজেদের উপরে জুলুমকারী একারণে যে, তারা তাদের সত্তাকে পৃথিবীর সাময়িক সম্ভোগের মধ্যে নিমজ্জিত রেখে আখেরাতে চিরস্থায়ী শাস্তির হাতে তুলে দেয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারপর তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে, আমরা কোনো মন্দ কর্ম করতাম না।' আত্মসমর্পণ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে 'সালাম' শব্দটি। 'সালাম' অর্থ 'ইসতিস্লাম' (সন্ধি বা শান্তির প্রস্তাব)। অর্থাৎ সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা তখন উপায়ন্তর না দেখে অনুগত হবে এবং চাইবে শান্তি বা সন্ধি। বলবে, আমরা পৃথিবীতে কোনো মন্দকর্ম করতাম না।

এরপর বলা হয়েছে— 'হ্যাঁ, তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত।' একথার অর্থ— তাদের অসময়ের শান্তি-প্রস্তাব শুনে ফেরেশতারা বলবে, এখন ওসব কথা বলে কোনো লাভ নেই। কারণ যথাসময়ে তোমরা তওবা করোনি। পৃথিবী পরিত্যাগ করেছো কুফরীর সঙ্গে। আল্লাহ্ উত্তমরূপে অবগত যে, পৃথিবীতে সত্যের বিরুদ্ধে কি দোর্দণ্ডপ্রতাপই না প্রদর্শন করতে তোমরা। এখন সংশোধনের সময় নয়। এখন তো প্রতিফল প্রদানের সময়।

www.eelm.weebly.com

ইকরামা বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটি ফেরেশতারা উচ্চারণ করেছিলো বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে। এরকমও হতে পারে যে, আলোচ্য উক্তিটি আল্লাহ্‌র, ফেরেশতাদের নয়।

এর পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজায় প্রবেশ করো সেখানে স্থায়ী হবার জন্য। দেখো অহংকারীদের আবাসস্থল কতো নিকৃষ্ট।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ অথবা ফেরেশতারা তখন একথাও বলবে যে— সুতরাং হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য নির্ধারিত নরকগমনের নির্ধারিত দরজা দিয়ে চিরকালের জন্য প্রবেশ করো নরকে। উল্লেখ্য যে, এখানে নরকগমনের নির্দেশটি হবে ক্ষণকালের জন্য। কিন্তু তাদের নরকবাস হবে চিরস্থায়ী। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'আবওয়াবা জাহান্নাম' (জাহান্নামের দরজা) কথাটির অর্থ হবে— নরকের শাস্তির বিভিন্ন প্রকার অথবা স্তর।

সুরা নাহল ঃ আয়াত ৩০, ৩১, ৩২

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

❒ এবং যাহারা সাবধানী ছিল তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমাদিগের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করিয়াছিলেন?' তাহারা বলিবে,'মহাকল্যাণ।' যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আছে এই দুনিয়ায় মংগল এবং পরলোক আরও উৎকৃষ্ট এবং সাবধানীদিগের আবাস স্থল কত উত্তম!

❒ উহা স্থায়ী জান্নাত যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে; উহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তাহারা যাহা কিছু কামনা করিবে উহাতে তাহাদিগের জন্য তাহাই থাকিবে। এইভাবেই আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন সাবধানীদিগকে,

❒ যাহাদিগের মৃত্যু ঘটায় ফেরেশতাগণ উহারা পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশ্‌তাগণ বলিবে, 'তোমাদিগের প্রতি শান্তি! তোমরা যাহা করিতে তাহার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।'

---

 www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং যারা সাবধানী ছিলো তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছিলেন? তারা বলবে, মহাকল্যাণ।' একথার অর্থ— যারা পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট হয়নি এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করার প্রয়াস পায়নি, বিচারদিবসে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের প্রভুপালক পৃথিবীতে তোমাদের জন্য কী অবতীর্ণ করেছিলেন? তারা বলবে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আছে এই দুনিয়ায় মঙ্গল এবং পরলোকে আরও উৎকৃষ্ট।' একথার অর্থ— পৃথিবীতে যারা কল্যাণকর্মে ব্রতী হয়, তারা কেবল পৃথিবীতেই কল্যাণ লাভ করেনা, কল্যাণ লাভ করে আখেরাতেও । বরং আখেরাতের কল্যাণ অধিকতর উৎকৃষ্ট।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'হাসানাতুন' (দুনিয়ার মঙ্গল) অর্থ পুণ্যকর্মের দশগুণ প্রতিদান। জুহাক বলেছেন, কথাটির অর্থ বিজয় ও সাহায্য। মুজাহিদ বলেছেন, অত্যুত্তম জীবনোপকরণ। আমি বলি, এখানে 'হাসানাতুন' অর্থ ওই বিশুদ্ধ জীবন, যা আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়। বিশুদ্ধচিত্ত জ্ঞানীগুণীদের নিকটেও যা সম্মানার্হ। অর্থাৎ পৃথিবীতে যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করে না, তাঁর স্মরণ ও নৈকট্য চিন্তায় সময় কাটায়, হালালকে হালাল বলে মানে ও গ্রহণ করে এবং হারামকে হারাম বলে জানে ও পরিত্যাগ করে, শরিয়ত বিগর্হিত নিয়মে কাউকে কষ্ট দেয় না এবং এমন নন্দিত কর্মে ব্যাপৃত থাকে, যার জন্য আখেরাতে রয়েছে পুরস্কার।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সাবধানীদের আবাসস্থল কতো উত্তম।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র ভয়ে যারা সতর্ক জীবনযাপন করে তাদের ইহলৌকিক আবাস অপেক্ষা আখেরাতের চিরনিরাপদ আবাস কতোইনা উত্তম। পৃথিবীর পুণ্যময় জীবনের বিনিময়ে তাদের আখেরাতের জীবন হবে কতোইনা মর্যাদামণ্ডিত। সেখানে তাদের মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকবে।

হাসান বলেছেন, 'দারুল মুত্তাক্বীন' (সাবধানীদের আবাসস্থল কতো উত্তম) —একথা বলে মুত্তাক্বী বা সাবধানীদের পৃথিবীর জীবনের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ সাবধানী ব্যক্তিবর্গ ইহজগতেই সংগ্রহ করেন পরজগতের পাথেয়। তবে অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এখানে 'দারুল মুত্তাক্বীন' বলে আখেরাতের অত্যুত্তম আবাসকেই বুঝানো হয়েছে।

পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'তা হবে স্থায়ী জান্নাত যাতে তারা প্রবেশ করবে; তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা যা কিছু কামনা করবে তাতে তাদের জন্য তা-ই থাকবে।' একথার অর্থ— মুত্তাক্বীগণ তখন প্রবেশ করবে

www.eelm.weebly.com

আদ্‌ন নামক স্থায়ী জান্নাতে। সেই জান্নাতের বৃক্ষরাজির নিম্নদেশ থেকে প্রবাহিত হতে থাকবে স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী। আর সেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে। অর্থাৎ সেখানে বিদ্যমান থাকবে তাদের কামনা বাসনার সকল সামগ্রী।

এখানে 'মা ইয়াশাঊনা' কথাটির অর্থ— চিত্তাকর্ষক সুখের সামগ্রীসমূহ, যা পাওয়া যাবে কামনা করার সঙ্গে সঙ্গে। কথাটির পূর্বে 'ফীহা' উল্লেখ থাকার বিশেষত্ব এই যে, মানুষের হৃদয়জ আশা-আকাঙ্খা প্রশমিত হবে কেবল জান্নাতে। পৃথিবীতে এরকম হবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'এভাবেই আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন সাবধানীদেরকে।' একথার অর্থ— যারা পৃথিবীতে নিজেদেরকে শিরিক ও কদর্য কার্যকলাপ থেকে মুক্ত রাখে তারাই মুত্তাক্বী বা সাবধানী। আর তাদেরকেই আল্লাহ্তায়ালা আখেরাতে এভাবে পুরস্কৃত করবেন।

এর পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'যাদের মৃত্যু ঘটায় ফেরেশতাগণ তারা পবিত্র থাকা অবস্থায়।' একথার অর্থ— মুত্তাক্বী বা সাবধানীরা পৃথিবী পরিত্যাগ করে ইমান সহকারে, পবিত্র অবস্থায়। অর্থাৎ মৃত্যুর ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করে শিরিক থেকে পবিত্র অবস্থায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফেরেশতাগণ বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ করো।' একথার অর্থ— জান কবজ করার সময় ফেরেশতারা ওই বিশুদ্ধচিত্ত ইমানদারদেরকে লক্ষ্য করে বলবে 'সালামুন আলাইকুম' (তোমাদের প্রতি শান্তি)! আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদেরকে দেয়া হলো চির নিরাপত্তা। তোমরা আর কখনো দুঃখ, ক্লেশ অথবা বিপদাপন্ন হবে না। এখন তোমরা তোমাদের পুণ্যকর্মের প্রতিদানস্বরূপ চিরসুখময় জান্নাতের দিকে গমন করো।

এখানে 'তৃয়্যিবীনা' কথাটির অর্থ কুফুরী, শিরিক ও অন্যান্য কার্যকলাপ থেকে মুক্ত, পুত পবিত্র। পূর্ববর্তী আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে, মৃত্যুর ফেরেশতারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যু ঘটায় তাদের আত্মোৎপীড়নরত অবস্থায়। অর্থাৎ অপবিত্র অবস্থায়। আর এখানে বলা হয়েছে, মৃত্যুর ফেরেশতারা মুত্তাক্বীগণের মৃত্যু ঘটায় পবিত্রাবস্থায়। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'তৃয়্যিবীনা' অর্থ পবিত্র কলেমা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও পুণ্যকর্মের অধিকারী। কেউ কেউ শব্দটির অর্থ করেছেন— আনন্দিত, উৎফুল্ল। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ কর্তৃক প্রদত্ত অভিবাদন শুনে মুত্তাক্বী বা সাবধানীরা হবে উৎফুল্লচিত্ত। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— ওই সকল আল্লাহ্ প্রেমিকেরা আল্লাহ্র সন্নিধানলাভের আশায় সারাক্ষণই আনমনা হয়ে থাকেন। কিন্তু তারা জানেন, পৃথিবীতে তাদের অভিলাষ চরিতার্থ হওয়া সম্ভব নয়। তারা যা চান, তা কেবল আখেরাতেই সম্ভব। কিন্তু মৃত্যুর তোরণ ছাড়া সেখানে

 www.eelm.weebly.com

ভ্রমণ সম্ভবই নয়। তাই তাঁরা মৃত্যুদূত ফেরেশতাকে দেখে ও তাঁর অভিবাদন শুনে উল্লসিত হন।

এখানকার 'সালামুন আলাইকুম' বাক্যটি ফেরেশতাগণের। অনেকের মতে ফেরেশতাগণ ওই অভিবাদন জানান আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে। তোমরা যা করতে তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ করো— একথাটিও ফেরেশতাদের। তাদের একথার অর্থ হবে— এতদিন ধরে যে পুণ্যকর্মসমূহ তোমরা করেছো, তার ফলে তোমাদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে জান্নাত। মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান ও হাশরের ময়দানের হিসাব-নিকাশ শেষে তোমরা অবশ্যই সেখানে প্রবেশ করবে। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে এরকম— মৃত্যুকালে ফেরেশতারা জানাবে শান্তি সম্ভাষণ। আর মহাবিচারের দিনের হিসাব-নিকাশ সমাপনান্তে তারা বলবে— তোমরা যা করতে তার ফলে এবার জান্নাতে প্রবেশ করো।

সূরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৩৩, ৩৪

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَٰئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ○

❒ উহারা শুধু প্রতীক্ষা করে উহাদিগের নিকট ফেরেশতা আসার অথবা তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আসার। উহাদিগের পূর্ববর্তীগণ এইরূপই করিত। আল্লাহ্ উহাদিগের প্রতি কোন জুলুম করেন নাই, কিন্তু উহারাই নিজদিগের প্রতি জুলুম করিত।

❒ সুতরাং উহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছিল উহাদিগেরই মন্দকর্মের শাস্তি এবং উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল তাহাই যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা শুধু প্রতীক্ষা করে তাদের নিকট ফেরেশতা আসার অথবা তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আসার।' একথায় প্রতীয়মান হয় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ফেরেশতা অথবা আল্লাহ্র শাস্তির জন্য প্রতীক্ষ্যমাণ। অর্থাৎ মৃত্যুর ফেরেশতা এলে তারা তড়িঘড়ি করে ইমান আনবে। অথবা ইমান আনবে তখন, যখন চাক্ষুষ করবে মহাপ্রলয় অথবা অন্য কোনো শাস্তি।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের পূর্ববর্তীগণও এরূপ করতো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার সময়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যেমন ফেরেশতা অথবা আল্লাহ্র আযাবের প্রতীক্ষায় বসে আছে, তেমনি তাদের পূর্বসূরীরাও ছিলো সন্দিগ্ধচিত্ত। তারাও অপেক্ষা করতো মৃত্যুর অথবা শাস্তির। অবশেষে তাদের উপরে শাস্তি নেমেই এসেছিলো। কিন্তু তখন সংশোধিত হওয়ার সুযোগ আর দেয়া হয়নি। অতএব হে আমার প্রিয় রসুল! আপনার প্রতিপক্ষরা ভেবেছে কী ? শাস্তি আপতিত হলে তারাও তো সংশোধনের সুযোগ পাবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি, কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করতো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনে রাখুন, ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ্ কোনো অত্যাচার করেননি। তারা নিজেরাই তাদের সত্তার উপরে অত্যাচার করে নিজেদেরকে সত্যবিমুখ করে রেখেছিলো। তাদের ক্রমাগত অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও সত্যপ্রত্যাখ্যানই আহ্বান জানিয়েছিলো আল্লাহ্র শাস্তিকে। তাই একথাটি স্বতঃসিদ্ধ যে, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করতো।

পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তাদের উপর আপতিত হয়েছিলো তাদেরই মন্দকর্মের শাস্তি এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিলো তা-ই যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো।' একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মন্দকর্মের কারণেই তাদের উপরে নেমে এসেছিলো শাস্তি, যে শাস্তির কথা শুনে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো।

এখানে 'সাইয়্যিআত' অর্থ শাস্তি। 'মা আ'মিলু' অর্থ অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা। এই অবিশ্বাস ও অবাধ্যতাকেই এখানে বলা হয়েছে 'মন্দকর্ম'। 'হাক্বাবিহিম' অর্থ আপতিত হয়েছিলো তাদের উপর অথবা পরিবেষ্টন করেছিলো তাদেরকে। 'মা' অব্যয়টি এখানে ধাতুমূল অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ ওই ঠাট্টা-বিদ্রূপের শাস্তিই তাদেরকে ঘিরে ফেলেছিলো। অথবা 'মা' অব্যয়টি এখানে সংযোজক। উল্লেখ্য যে, ওই সকল কাফের উপহাসচ্ছলে বলতো, 'আর আমরা যা বলি, তদ্দরুণ আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেয় না কেনো? তাদের এমতো অপকথনের পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের উপর নেমে এসেছিলো আল্লাহ্র গজব।

সুরা নাহল ঃ আয়াত ৩৫, ৩৬, ৩৭

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي

 www.eelm.weebly.com

كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ۚ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝ اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

❒ অংশীবাদীরা বলিবে, 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে আমাদিগের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অপর কোন কিছুর ইবাদত করিতাম না এবং তাঁহার অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধ করিতাম না।' উহাদিগের পূর্ববর্তীগণ এইরূপই করিত। রসূলদিগের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা।

❒ আল্লাহের ইবাদত করিবার ও তাগুতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসূল পাঠাইয়াছি। অতঃপর উহাদিগের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহাদিগের কতকের পথভ্রান্তি হইয়াছিল সংগতভাবেই। সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদিগের পরিণাম কি হইয়াছে?

❒ তুমি উহাদিগের পথ-প্রদর্শন করিতে আগ্রহী হইলেও আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন তাহাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিবেন না এবং উহাদিগের কোন সাহায্যকারীও নাই।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অংশীবাদীরা বলবে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অপর কোনো কিছুর ইবাদত করতাম না এবং তাঁর অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা কোনো কিছু নিষিদ্ধ করতাম না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! লক্ষ্য করুন, অংশীবাদীরা কীরূপ অযৌক্তিক ও অসংগত কথা বলে। তারা বলে, আল্লাহ্র অনুমোদন ব্যতিরেকে যখন কোনো কিছুই ঘটে না, তখন বুঝতে হবে আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ আল্লাহ্র অনুমোদনক্রমেই ঘটেছে। তাঁর অনুমোদন না থাকলে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা ও আমরা নিশ্চয় মূর্তিপূজা করতে পারতাম না। আর যে সকল বিষয়কে আমরা হারাম মনে করি, সেগুলোকেও হারাম বলতে পারতাম না। অতএব রসুল প্রেরণের কথা বলে আমাদেরকে বিব্রত করা হচ্ছে কেনো? কোরআনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিধি-বিধান আমাদের উপর প্রয়োগ করাই বা হচ্ছে কেনো? হে আমার প্রিয়তম রসুল! দেখুন, অংশীবাদীরা কতোই না অজ্ঞ। তারা আমার ইচ্ছা ও সন্তোষের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। একথা তো ঠিকই যে, আমার ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোনো কিছুই

www.eelm.weebly.com

সংঘটিত হয় না। কিন্তু আমি যে আমার নবী-রসুলগণের অনুসারীদের প্রতি পরিতুষ্ট এবং তাদের প্রতিপক্ষদের প্রতি অপরিতুষ্ট। সুতরাং নবী-রসুলগণের মাধ্যমে যে বিধি-বিধান আমি জারি করি তা মান্য করা অত্যাবশ্যক। আর অমান্য করা নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য। আমি বলেছি, শিরিক বা অংশীবাদ নিষিদ্ধ। অতএব তা পরিত্যাগ করতেই হবে। আর সমগ্র সৃষ্টির একক স্রষ্টা হিসেবে হালাল ও হারাম সম্পর্কিত বিধান জারী করার অধিকার কেবল আমার। সুতরাং স্বকপোলকল্পিত হালাল ও হারামের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হতেই হবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের পূর্ববর্তীগণ এরূপই করতো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল ! আপনার সম সময়ের অংশীবাদীরা যেভাবে কথা বলছে, বিগত যুগের অংশীবাদীরাও সেভাবে কথা বলতো। তারা যেভাবে শিরিক করে চলেছে, সেভাবেই শিরিকের মধ্যে আপাদমস্তক নিমজ্জিত থাকতো তাদের পূর্বসূরীরাও। আল্লাহ্তায়ালার বৈধকৃত বস্তুকে তারা যেমন এখন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তেমনি নিষিদ্ধ করতো তাদের পূর্বপুরুষেরাও।

এরপর বলা হয়েছে— 'রসুলগণের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল ! আমার সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করাই আপনার কর্তব্যকর্ম। আপনার পূর্বে প্রেরিত নবীগণের দায়িত্বও ছিলো এরকম; আমার বার্তাপ্রচার ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্ব আপনাদের নেই। এটাই আল্লাহ্তায়ালার চিরন্তন বিধান। প্রচার আপনাদের। আর হেদায়েত আমার। আমি যাকে হেদায়েত দিতে ইচ্ছা করি, সেই হেদায়েত পায়। নবী-রসুলগণকে আমি নির্বাচিত করেছি হেদায়েত প্রদানের মাধ্যমরূপে। তাই হেদায়েতকামীরা তাদের আপনাপন নবীর মাধ্যমে পেয়েছে আমার হেদায়েত ও সন্তোষ। মুক্ত হয়েছে শিরিক ও অন্যান্য মন্দ কর্মের আবিলতা থেকে। আর যারা হেদায়েত চায় না, নবী-রসুল প্রেরণের মাধ্যমে আমি তাদেরকে করেছি বিপদগ্রস্ত। এ ধরনের লোককে আমি হেদায়েত দিতে ইচ্ছা করিনি। মানুষের প্রতি প্রেরিত নবী-রসুলগণের হেদায়েতের বাণী উপাদেয় খাদ্য সদৃশ। সুস্থ সবল ব্যক্তিরা সেই উপাদেয় খাদ্যের মাধ্যমে হয় পরিপুষ্ট। আর অসুস্থ দুর্বলেরা হয় ব্যাধিগ্রস্ত। ওই ব্যাধিই তাদেরকে নিয়ে যায় মহাসর্বনাশের পথে।

পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র ইবাদত করবার ও তাগুতকে বর্জন করবার নির্দেশ প্রদানের জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসুল পাঠিয়েছি।' একথার অর্থ— পৃথিবীর প্রতিটি জাতির মধ্যে আমি আমার বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি। তাদেরকে বলেছি, তোমরা এই মর্মে মানুষকে নির্দেশ দাও যে, ইবাদত করতে হবে কেবল এক আল্লাহ্র। আর বর্জন করতে হবে শয়তান ও প্রবৃত্তির প্ররোচনাকে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের পথভ্রান্তি হয়েছিলো সংগতভাবেই।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ যাদেরকে সৎপথ দান করতে চেয়েছেন, তারাই হয়েছেন নবী-রসুলগণের অনুসারী। আর যাদেরকে পথ-প্রদর্শন করতে চাননি, অদৃষ্টলিপির নির্ধারণ অনুসারে তারা হয়ে গিয়েছে পথভ্রষ্ট। তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে অবিশ্বাসী অবস্থায়। নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে তাদের জনপদ।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছে?' একথার অর্থ— হে আমার রসুল ! আপনি অংশীবাদী কুরায়েশদেরকে বলুন, অংশীবাদিতার পরিণাম যে কতো ভয়াবহ তা যদি তোমরা জানতে চাও, তবে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো। আদ, ছামুদ, হজরত লুতের সম্প্রদায় ও অরণ্যবাসীদের জনপদগুলো একটু দেখে এসো। তাহলেই বুঝতে পারবে সত্যকে মিথ্যা বলার পরিণাম কতোই না মর্মন্তুদ।

ইতোপূর্বে বর্ণিত অংশীবাদীদের 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতাম না'— এই উক্তিটির প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ও সন্তোষ কখনো এক নয়। তাই গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা তাঁর অভিপ্রায়ের অনুকূল হলেও সম্মতি ও সন্তোষের অনুকূল নয়। তিনি ইমানদারদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং কাফেরদের প্রতি অসন্তুষ্ট। নবী-রসুলগণের মাধ্যমে আহ্বান জানানো হয় তাঁর সন্তোষের দিকে। যারা তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেয় না তারা জ্বলতে থাকে আল্লাহ্র অসন্তোষের বহ্নিতে। আখেরাতে তাদের শাস্তি অবধারিত। তদুপরি বাড়াবাড়ির কারণে পৃথিবীতেও তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়। যেমন শাস্তি দেয়া হয়েছিলো আদ, ছামুদ ও অন্যান্য অবাধ্য সম্প্রদায়গুলোকে।

এর পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'তুমি তাদের পথপ্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন না এবং তাদের কোনো সাহায্যকারীও নেই।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল ! আপনি তো চান, সকল মানুষ হেদায়েত লাভ করুক। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে পথচ্যুত করতে চান তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন না এবং তাদের জন্য তিনি কোনো সাহায্যকারীও রাখেননি। অতএব আপনি তাদেরকে সাহায্য করবেন কীভাবে? উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী আয়াতের 'তাদের কতকের পথভ্রান্তি হয়েছিলো সংগতভাবেই' এবং আলোচ্য আয়াতের 'আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন'— কথা দু'টোর মর্মার্থ এক।

'মা লাহুম্ মিন্‌নাসিরীন' কথাটির অর্থ তাদের কোনো সাহায্যকারীও নেই। অর্থাৎ আল্লাহ্র অভিপ্রায়ানুসারে যারা পথভ্রষ্ট তাদেরকে সহায়তা করার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ আল্লাহ্ তাঁর অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে চিরঅমুখাপেক্ষী,

www.eelm.weebly.com

চিরস্বাধীন। সুতরাং অবিশ্বাসীদের প্রতি তিনি যে শাস্তি অবতীর্ণ করেন, সে শাস্তি রহিত করার সাধ্য কারোই নেই। এভাবে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, হে আমার রসুল! আল্লাহ্ যার হেদায়েত চান না আপনি তাকে হেদায়েত করতে পারেন না।

আবুল আলীয়া সূত্রে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, এক পৌত্তলিক জনৈক মুসলমানের নিকটে কিছু ঋণ গ্রহণ করেছিলো। কিছুদিন পর লোকটি ঋণ পরিশোধের জন্য মুসলমান ব্যক্তির নিকটে গেলো। কথা প্রসঙ্গে মুসলমান লোকটি বললেন, আমি আল্লাহ্পাকের নিকটে এরূপ আশা রাখি। পৌত্তলিক বললো, মনে হচ্ছে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার বিষয়টিকে তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করো। কিন্তু আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তাকে আর জীবিত করেন না। তাদের এরকম কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৩৮, ৩৯

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ۝

❑ উহারা দৃঢ়তার সহিত আল্লাহের শপথ করিয়া বলে যে, 'যাহার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাহাকে পুনর্জীবিত করিবেন না।' ইহা সত্য নহে; তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবেনই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে—

❑ তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবেনই যে-বিষয়ে উহাদিগের মতানৈক্য ছিল তাহা উহাদিগকে স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য এবং যাহাতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা জানিতে পারে যে, উহারাই ছিল মিথ্যাবাদী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা দৃঢ়তার সঙ্গে আল্লাহ্র শপথ করে বলে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না।' আলোচ্য বাক্যের সম্পর্ক রয়েছে ৩৫ সংখ্যক আয়াতের 'ক্বলাল্ লাজীনা আশরাকু' (অংশীবাদীরা বলবে) বাক্যটির সঙ্গে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— অংশীবাদীরা বলে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অপর কোনো কিছুর ইবাদত করতাম না। তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে একথাও বলে যে, যার মৃত্যু হয়, আল্লাহ্ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না। অর্থাৎ তারা যেমন আল্লাহ্র এককত্বকে অস্বীকার করে, তেমনি অস্বীকার করে পুনরুত্থানকেও।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা সত্য নয় । তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।' একথার অর্থ— পুনরুত্থানের বিষয়ে আল্লাহ্‌র অংগীকার সত্য। আর তিনি তো কখনোই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। পুনরুত্থানের পরে হবে বিচার কার্য। এ বিষয়টিও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে অনবগত। তাই তারা মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, বিচার দিবস— এ সকল কিছুকে অস্বীকার করে। তাদের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদর্শিতা অবরুদ্ধ। তাই তারা জীবন-মৃত্যুর রহস্য অনুধাবন করতে পারে না। বিশ্বাস করতে পারে না যে, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্‌র পক্ষে মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, মহাবিচার, হিসাব নিকাশ, মিজান, পুলসিরাত, ইত্যাদি বিষয় কার্যকর করা অতি সহজ। আর তিনি এ সকল বিষয় কার্যকর করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই, যে বিষয়ে তাদের মতানৈক্য ছিলো তা তাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখাবার জন্য।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা মৃত্যুর পর বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের পুনরুত্থান অবশ্যই ঘটাবেন। মতানৈক্য নিরসনার্থে তিনি বিষয়টি সকলের প্রত্যক্ষগোচর করাবেন। আর এব্যাপারে তিনি তো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যাতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা জানতে পারে যে, তারাই ছিলো মিথ্যাবাদী।' একথার অর্থ— যথাসময়ে পুনরুত্থান ঘটিয়ে অংশীবাদীদের উক্তি যে মিথ্যা, তা তিনি প্রমাণও করবেন। অংশীবাদীরাও তখন জানতে পারবে যে, তারা ছিলো মিথ্যাবাদী।

এখানে 'তাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখাবার জন্য' কথাটির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে পুনরুত্থান ও বিচারানুষ্ঠানের যুক্তি এবং কারণ। সত্য-অসত্য কখনো এক নয়। তাই মৃত্যুর পর চিরদিনের জন্য সত্য ও মিথ্যাকে পৃথক করে দেয়ার কার্যটি সম্পন্ন করা হবে। অংশীবাদীরা চতুষ্পদ জন্তুতুল্য। তাই তারা বোঝে না যে, এই অস্থায়ী পৃথিবী হচ্ছে পরীক্ষাগার। চূড়ান্ত ফলাফল প্রদানের স্থান এটা নয়। চূড়ান্ত সমাধানের স্থান হচ্ছে আখেরাত। অথবা এরকম বলা যেতে পারে যে, 'তাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখাবার জন্য' এ কথাটির সংযোগ রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসুল পাঠিয়েছি' (আয়াত ৩৬) কথাটির সঙ্গে। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— সত্য ও মিথ্যাকে সুস্পষ্ট করে দেয়ার জন্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসুল প্রেরণ করেছি। তাঁরা আমার নির্দেশানুসারে আপনাপন সম্প্রদায়কে বলেন, অংশীবাদকে পরিহার করো। বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে এসো এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের পথে। সত্য ও মিথ্যা কখনো এক নয়। আল্লাহ্ কখনোই মানুষকে প্রতিমাপূজক হতে বলেন নি। একথাও কখনও বলেননি যে, তোমরা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল সাব্যস্ত করবে।

www.eelm.weebly.com

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○

❒ আমি কোন কিছু চাহিলে সে-বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি, 'হও' ফলে,উহা হইয়া যায়।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমরা অজ্ঞ, মূর্খ ও জ্ঞানান্ধ। তাই মনে করে থাকো মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু একথা কেনো অনুধাবন করতে চাও না যে, এ বিশাল সৃষ্টিকে আমি অস্তিত্ব দান করেছি কেবল আমার অভিপ্রায়ের মাধ্যমে, বিনা নমুনায় ও উপকরণে। আমি কেবল বলেছি 'হও'। অমনি সৃজিত হয়েছে এই মহাবিশ্ব। এভাবে প্রথমবার যদি আমি সৃষ্টি করতে পারি, তবে দ্বিতীয়বার পারবো না কেনো? এটাই আমার সৃজনায়নের রীতি যে, আমি কোনো কিছু চাইলে কেবল বলি 'হও'। সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়।

এখানে 'ইজা আরাদ্‌নাহু' কথাটির অর্থ যখন আমি কোনো কিছুকে অস্তিত্বে আনতে ইচ্ছা করি। সেটা প্রথমবার হোক অথবা দ্বিতীয়বার। কিংবা অসংখ্যবার। সুতরাং আমি যে পুনরুত্থান ঘটাতে পারি, একথাটা তোমরা বিশ্বাস করতে চাও না কেনো? মোট কথা, আল্লাহ্‌পাক এই বিশাল সৃষ্টিকে অস্তিত্বদান করেছেন আপন মহিমায়, অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল হয়ে নয়। কারণ তিনি চির অমুখাপেক্ষী। তাঁর ইচ্ছা চির অবাধ। সকল প্রকার ঔচিত্য ও বাধ্যবাধকতা থেকে তিনি চিরমুক্ত ও পবিত্র।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রতি অসত্যারোপ করেছে। এটা তার জন্য অত্যন্ত অশোভন। আমার বান্দা আমাকে গালি দিয়েছে। এটাও তার জন্য অসমীচীন। সে বলে, আল্লাহ্‌ আমাকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারবেন না। অথচ প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি অধিকতর সহজ। এটাই আমার প্রতি বান্দার অসত্যারোপ। আর তার গালি এরকম— সে বলে, আমার সন্তান-সন্ততি রয়েছে। অথচ আমি এক। একক। অমুখাপেক্ষী। আমি যেমন কারো পিতা নই, তেমনি নই কারো পুত্র। আমি আনুরূপ্যবিহীন।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে— তাদের গালি দেয়ার ধরন এরকম— তারা বলে, আমার সন্তান আছে। অথচ আমি পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততি গ্রহণ থেকে পবিত্র। বোখারী।

www.eelm.weebly.com

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

❒ যাহারা তাহাদিগের উপর অত্যাচার হইবার পর আল্লাহের পথে দেশত্যাগ করিয়াছে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দিব এবং পরলোকে তাহাদিগের পুরস্কার সমধিক। হায়, উহারা যদি ইহা জানিত!

❒ আল্লাহের পথে দেশত্যাগীরা ধৈর্যশীল ও তাহাদিগের প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা অত্যাচারিত হবার পর কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষ সাধনার্থে হিজরত করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে দান করবো উত্তম গৃহ এবং পরবর্তী পৃথিবীতে দান করবো ততোধিক উত্তম পুরস্কার। আল্লাহ্‌র পথে হিজরত বা দেশত্যাগের মধ্যে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ— একথা যদি হিজরতকারীরা জানতো, তবে তারা এর চেয়ে অধিক ক্লেশ ও যাতনা মাথা পেতে নিতে কুণ্ঠিত হতো না। আর যদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা একথা জানতো, তবে তারাও বন্ধ করে দিতো বিশ্বাসীদের প্রতি তাদের এই অকথ্য অত্যাচার। এখানে 'ফিল্লাহ' অর্থ আল্লাহ্‌র পথে বা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। 'জুলিমু' অর্থ অত্যাচারিত হবার পর।

হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে এবং দাউদ বিন হিন্দ থেকে আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু জনদল বিন সুহাইল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

মক্কার মুশরিকেরা তাঁকে বন্দী করে রেখেছিলো। ক্রমাগত অকথ্য উৎপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছিলো তাঁর উপর। হজরত কাতাদা সূত্রে ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও আবদ বিন হুমাইদ বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কিছু সংখ্যক সাহাবীকে লক্ষ্য করে। তাঁদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করতো মক্কার অংশীবাদীরা। পরে তাঁদের একদল হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে যান। আরেক দল যান মদীনায়। শেষ পর্যন্ত মদীনাই হয়ে ওঠে হিজরতকারীদের প্রধান কেন্দ্র। তাই মদীনাকে বলা হয় দারুল হিজরত বা দেশান্তরিতদের আবাস। মদীনার নিবেদিতপ্রাণ বিশ্বাসীরা হিজরতকারী বা মুহাজিরগণকে প্রেমময় আতিথ্য ও সকল প্রকারে সহায়তা করে 'আনসার' নামে ইতিহাস খ্যাত হয়ে রয়েছেন।

www.eelm.weebly.com

'দুনিয়ায় উত্তম আবাস দিবো' বলে এখানে মুহাজিরগণকে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত করার শুভসংবাদ দেয়া হয়েছে। বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর মুহাজিরগণের কাউকে কখনো কোনো কিছু দেয়ার সময় বলতেন, এটা নাও। আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। এটাতো সেই উপহার, যা পৃথিবীতে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য বাক্যাংশটির অর্থ হবে— আমি দুনিয়ায় তোমাদের সঙ্গে কল্যাণজনক সম্পর্ক রাখবো। আবার কেউ কেউ অর্থ করেছেন এভাবে— এ পৃথিবীতে আমি তোমাদেরকে দান করবো ইমান গ্রহণের সামর্থ্য ও পুণ্যপথের দিকনির্দেশনা।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র পথে দেশত্যাগীরা ধৈর্যশীল ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল।' এখানে 'সবারু' (ধৈর্যধারণ করেছে) ক্রিয়াটির কর্মপদ উহ্য। ওই উহ্য কর্মপদসহ কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে এরকম— আল্লাহ্র পথে দেশত্যাগীরা অবিশ্বাসীদের অত্যাচার, দেশত্যাগের বেদনা ও অন্যান্য বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে (বঙ্গানুবাদে এরকমই লেখা হয়েছে)।

'ইয়াতাওয়াক্কালূন' অর্থ 'তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল।' অর্থাৎ মুহাজিরগণ ধৈর্যধারণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুনিয়া-আখেরাতের সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্তায়ালার নিকটে সোপর্দ করে। সর্বাবস্থায় নির্ভরশীল হয় কেবল আল্লাহ্র উপর।

অবিশ্বাসীরা রসুল স.কে একবার বললো, মানুষ আবার কখনো আল্লাহ্র বাণীবাহক হতে পারে নাকি? অসম্ভব! আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে হেদায়েত করতেই চান তবে বাণীবাহকরূপে কোনো ফেরেশতাকেই তো পাঠাতে পারতেন। তাদের এহেন মূর্খজনোচিত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৪৩, ৪৪

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِؕ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

❒ তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ মানুষই প্রেরণ করিয়াছিলাম; তোমরা যদি না জান তবে কিতাবীদিগকে জিজ্ঞাসা কর।

❒ আমি মানুষ পাঠাইয়াছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ; তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছিল তাহা উহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য, যাহাতে উহারা চিন্তা করে।

---

 www.eelm.weebly.com

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, হে আমার রসুল! আপনি অজ্ঞ অংশীবাদীদেরকে জানিয়ে দিন, মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য প্রত্যাদেশসহ মানুষ নবী প্রেরণ করাই আমার রীতি। ইতোপূর্বে প্রেরিত সকল নবী-রসুল মানুষই ছিলেন। আর ছিলেন প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত। হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! আল্লাহ্তায়ালার এই চিরাচরিত বিধান সম্পর্কে যদি তোমাদের না জানা থাকে, তবে ইতোপূর্বে যাদের নিকট আকাশী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিলো, তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। তারা হচ্ছে ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়।

উল্লেখ্য যে, ইহুদী ও খৃষ্টান অর্থাৎ বনী ইসরাইলদের মধ্যে হজরত মুসা ও হজরত ঈসা সহ বহুসংখ্যক নবী প্রেরিত হয়েছিলেন। আরো পূর্বে প্রেরিত হয়েছিলেন হজরত ইব্রাহিম। তৎপূর্বে হজরত নূহ্। তাঁরা সকলেই ছিলেন মানুষ এবং আল্লাহ্র প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নবী।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, শরিয়তের জ্ঞান যার নেই তাকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে বিজ্ঞজনের নিকট থেকে, যিনি নির্ভরযোগ্য।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'আমি মানুষ পাঠিয়েছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ।' একথার অর্থ, আমি আমার মনোনীত বার্তাবাহকগণকে প্রেরণ করেছিলাম আসমানী কিতাব ও বহুসংখ্যক মোজেজা সহকারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি মানুষের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছিলো তা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবার জন্য।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার পূর্বসূরীগণের মতো আপনাকেও আমি দান করেছি আসমানী কিতাব। মানুষের হেদায়েতের জন্যই অবতীর্ণ করা হয়েছে এই কিতাব। এতে রয়েছে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি, শাস্তির হুঁশিয়ারী এবং অন্যান্য বৈধ অবৈধ বিধানাবলী। এসকল বিধানের সরল ও জটিল, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল দিক আপনি সুস্পষ্টরূপে মানুষকে বুঝিয়ে দিন। মানুষকে বুঝিয়ে দেবার জন্যই অবতীর্ণ করা হয়েছে এই মহাগ্রন্থটি। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে কোরআনের প্রকাশ্য দিক তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে এর অন্তর্নিহিত দিকটিও ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে রসুল স.কে।

শেষে বলা হয়েছে— 'যাতে তারা চিন্তা করে।' একথার অর্থ— কোরআন মজীদের নির্দেশসমূহের যথাযথ অর্থ গ্রহণ করতে হবে। চিন্তাভাবনা না করে কেবল শাব্দিক অর্থের অনুসরণ করলে চলবে না। যেমন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'তোমাদের শস্যক্ষেত্রে এসো।'

এখানে শস্যক্ষেত্র বলে বোঝানো হয়েছে রমণী-অঙ্গকে। পায়ুপথ বা অন্য কোনো অঙ্গকে নয়। কারণ শস্যক্ষেত্রে যেমন ফসল উৎপাদিত হয়, তেমনি যথাঅঙ্গে রতিক্রিয়া চরিতার্থ করলে পাওয়া যায় সন্তানরূপী ফসল। সুতরাং বিনা চিন্তায় স্থূল অর্থ গ্রহণ করলে চলবে না। এরকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে, যেমন— এক স্থানে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করছেন, 'তোমরা

অপেক্ষা করো তিন কুরু।' এখন চিন্তাভাবনা করে দেখতে হবে এই 'কুরু' অর্থ কী? তিন ঋতু না তিন পবিত্রাবস্থা (তিন হায়েজ, না তিন তুহুর)। উল্লেখ্য যে, উত্তম তালাক প্রদানের সময় হচ্ছে পবিত্রাবস্থায় তালাক প্রদান। এখন কেউ যদি তালাক দেয় তবে সেটা অবশ্যই হবে একটি ভগ্ন সময়কাল। অর্থাৎ দেখা যাবে, তখন হায়েজ অথবা তুহুরের কিছু অংশ অতীত হয়েছে এবং কিছু অংশ রয়েছে বাকী। এমতাবস্থায় 'তিন কুরু' অর্থ যদি তুহুর বা পবিত্রাবস্থা ধরা হয়, তবে কিছুতেই তিন পবিত্রাবস্থা মেলানো যাবে না। তিন পবিত্রাবস্থার সময়কাল হবে হয়তো বেশী, নয়তো কম। সুতরাং 'তিন কুরু' অর্থ এখানে 'তিন হায়েজ' গ্রহণ করাই যুক্তি সংগত ও সহজ। কারণ তালাক যখনই দেয়া হোক না কেনো, তিন হায়েজ অতিক্রান্ত হলেই পূর্ণ হবে তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দতকাল। এভাবে আল্লাহ্‌র দেয়া চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে মর্মোদ্ধার করতে হবে আল্লাহ্‌তায়ালার বিধানের। এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে— 'যাতে তারা চিন্তা করে'।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ۝ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

❒ যাহারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তাহারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত আছে যে, আল্লাহ্ উহাদিগকে ভূগর্ভে বিলীন করিবেন না? — অথবা এমন দিক হইতে শাস্তি আসিবে না যাহা উহাদিগের ধারণাতীত?

❒ অথবা চলাফেরা করিতে থাকাকালে তিনি উহাদিগকে বিধৃত করিবেন না? উহারা তো ইহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

❒ অথবা উহাদিগকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বিধৃত করিবেন না? তোমাদিগের প্রতিপালক তো অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

মক্কার মুশরিকেরা যখন রসুল স.কে উৎখাত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলো, তাদের পরামর্শ সভায় তাঁকে হত্যা, বন্দী এবং দেশান্তরের ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করেছিলো এবং যখন ইসলামের প্রচার প্রসারের কাজকে করে দিয়েছিলো অবরুদ্ধ প্রায়, তখন অবতীর্ণ হয়েছিলো আলোচ্য আয়াতত্রয়। রসুল স. এর শত্রুদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্‌পাক তখন এই মর্মে হুঁশিয়ারী অবতীর্ণ করলেন

www.eelm.weebly.com

যে— 'যারা কুকর্মে ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করবেন না? অথবা এমন দিক থেকে শাস্তি আসবে না, যা তাদের ধারণাতীত?' একথার অর্থ— মুশরিকেরা এ কথা বুঝতে পারে না কেনো যে আমি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। যে কোনো মুহূর্তে আমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি। তাদেরকে বিলীন করে দিতে পারি ভূগর্ভে। অন্য কোনোভাবেও বিনাশ করতে পারি তাদেরকে, যার সম্পর্কে ধারণা করার ক্ষমতাও তাদের নেই। আদ, ছামুদ ইত্যাদি অবাধ্য সম্প্রদায়কে তো আমি এভাবে অতর্কিতে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। সুতরাং আমার রসুলের বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্র করার পরেও তারা নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করছে কীভাবে?

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'অথবা চলাফেরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে বিধৃত করবেন না? তারা তো তা ব্যর্থ করতে পারবে না।' একথার অর্থ— ধনাঢ্য অংশীবাদীরা তো বাণিজ্য ব্যপদেশে বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রে গমনাগমন করে। তাদের ওই গমনাগমনকালেও তো আমি তাদেরকে পাকড়াও করতে পারি। যে কোনো সময়ে যে কোনো শাস্তি অবতীর্ণ করতে পারি। আমার ওই শাস্তিকে ব্যর্থ করার ক্ষমতাও তো তাদের নেই। সুতরাং তারা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে কী-ভাবে?

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'তাকুল্লুব' অর্থ বিরোধ। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, অগ্রগামী ও পশ্চাদ্গামী হওয়া। অর্থাৎ গমনাগমন বা চলাফেরা করা।

এর পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বিধৃত করবেন না?' এখানে 'তাখাওউফ' অর্থ কম করে ফেলা, সংকুচিত করা। এভাবে ক্রমান্বয়ে বিধৃত করা বা ঘিরে ফেলা। যেমন বলা হয় 'তাখাওয়াফুহুদ্ দাহ্রু' (কালচক্র ক্ষতিসাধন করেছে শরীরের ও সম্পদের)। বাগবী লিখেছেন, শব্দটির মর্মার্থ হবে বনী হুজাইল গোত্রের প্রবচনের অনুরূপ। অর্থাৎ কম করার অর্থ হবে এখানে কাউকে আজ, কাউকে কাল, কাউকে পরশু— এভাবে নিপাত করে ধীরে ধীরে সমস্ত সম্প্রদায়কে নিঃশেষ করে দেয়া। জুহাক ও কালাবী বলেছেন, 'তাখাওউফ' অর্থ ভীত-সন্ত্রস্ত, আতংকজনক। আমি বলি, এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— যখন কাউকে ধ্বংস করে দেয়া হবে, তখন তা অবলোকন করে আতংকিত হবে অন্যেরা। এরকম আতংকিত অবস্থায় নিধনক্রিয়া চলতেই থাকবে তাদের উপর। অথবা মর্মার্থটি হবে এরকম— প্রথমে

www.eelm.weebly.com

দেখানো হবে ভয়াবহ কোনো নিদর্শন। ফলে তারা হয়ে পড়বে ভীত-সন্ত্রস্ত। আর ওই ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করা হবে তাদেরকে। অবশেষে বিনাশ করা হবে সকলকে। যেমন করা হয়েছিলো ছামুদ সম্প্রদায়কে। আগাম নিদর্শন হিসেবে তারা আল্লাহ্পাকের রুদ্ররোষ প্রত্যক্ষ করেছিলো। প্রথম দিবসে তাদের মুখাবয়ব হয়ে গিয়েছিলো হরিদ্রাভ। রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিলো দ্বিতীয় দিবসে। আর তৃতীয় দিবসে হয়ে গিয়েছিলো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। এরপর তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছিলো চতুর্থ দিবসে। এসকল বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে আলোচ্য বাক্যে বলা হয়েছে, হে মক্কার অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! এরকম শাস্তিও তো আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে দিতে পারেন। সুতরাং তোমরা কীভাবে নিশ্চিন্ত হতে পারলে যে, আল্লাহ্র রোষ থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পারবে?

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমাদের প্রতিপালক তো অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু (রউফুর রহীম)।' একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা 'রউফ' এবং 'রহীম' বলেই ত্বরিৎ শাস্তি অবতীর্ণ করছেন না। আর এই বিলম্বের কারণেই অংশীবাদীরা আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে হয়েছে নির্ভয়, নিশংকচিত্ত। কিন্তু তারা জানে না, আল্লাহ্ প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারেও অত্যন্ত কঠোর। আর তাঁর প্রতিশোধজনিত শাস্তিকে ব্যাহত করার সাধ্য কারোই নেই।

উল্লেখ্য যে, ৪৫ সংখ্যক আয়াতের 'আফা আমিনা' (তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে তৎপূর্বে উল্লেখিত ৪৪ সংখ্যক আয়াতের 'আমি মানুষ পাঠিয়েছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ' কথাটির সঙ্গে। আর 'আফাআমিনা' এর 'ফা' অব্যয়টি এখানে পরম্পরা অর্থে ব্যবহৃত। এভাবে সম্মিলিতরূপে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— আমি মানুষকে সুপথে পরিচালিত করবার জন্য ইতোপূর্বে অনেক নবী-রসুল পাঠিয়েছি। তাদের বিরুদ্ধবাদীরা ওই সকল নবী-রসুলের বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলো। তাদের ওই হঠকারিতার যথোপযুক্ত শাস্তিও আমি দিয়েছি। বিভিন্নভাবে বিনাশ করেছি তাদেরকে। অতএব হে মক্কার মুশরিকেরা! তোমরা আমার শেষ রসুলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা থেকে বিরত হও। পূর্ববর্তী নবী-রসুলগণ ছিলেন আমার প্রিয়ভাজন। তেমনি শেষ রসুলও আমার প্রিয়। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে তোমাদের উপরেও নেমে আসবে তোমাদের পূর্বসূরীদের মতো লাঞ্ছনা ও ধ্বংস। আল্লাহ্তায়ালা দয়ার্দ্র বলেই তোমাদের হঠকারিতাকে সহ্য করে চলেছেন। কিন্তু একথাটিও তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত কঠোর।

www.eelm.weebly.com

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ
الشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ○ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ○ يَخَافُونَ
رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ○

❐ উহারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহের সৃষ্ট বস্তুর প্রতি যাহার ছায়া আল্লাহের প্রতি বিনীতভাবে সিজদাবনত থাকিয়া দক্ষিণে ও বামে ঢলিয়া পড়ে?

❐ আল্লাহ্কেই সিজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে যতকিছু জীবজন্তু আছে সেসমস্ত, এবং ফেরেশতাগণও; উহারা অহংকার করে না।

❐ উহারা ভয় করে উহাদিগের উপর পরাক্রমশালী উহাদিগের প্রতিপালককে এবং উহাদিগকে যাহা আদেশ করা হয় উহারা তাহা করে।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার শত্রুরা এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না কেনো যে, সৃষ্ট বস্তুসমূহের ছায়া, ঋতু পরিবর্তন ও সূর্য পরিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে পরিবর্তিত হয়। বিনয়াবনত ওই ছায়া-প্রতিচ্ছায়া কখনো হয় হ্রস্ব। কখনো দীর্ঘ। কখনো পতিত হয় দক্ষিণে। আবার কখনো বামে। এভাবেই তো সমগ্র সৃষ্টি প্রতিনিয়ত আজ্ঞা পালন করে চলেছে তাঁর। স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্যগতভাবে।

এখানে 'সুজ্জ্বাদান্' অর্থ সেজদাবনত হয়ে— স্বেচ্ছায় অথবা স্বভাবগতভাবে। যেমন বলা হয় 'ওয়া সাজ্বাদাল বাঈরু ইজা ত্বআ ত্বআ রাআসাহু লিইয়ারকাব' (আরোহী বহণের জন্য উট মস্তক অবনত করেছে)। আবার 'সাজ্বাদান্ নাখলাতু' (ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে খেজুর গাছ)। মোট কথা, ছায়া-প্রতিচ্ছায়ারাও আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায় ও বিধানের অনুগত। তাই একথা বলা যেতে পারে যে, ছায়া-প্রতিচ্ছায়াসমূহ সেজদার আকৃতিতে ভূপৃষ্ঠে ঢলে পড়ে। কখনো বামে কখনো দক্ষিণে। যেনো সেগুলো ভূলুণ্ঠিত হয়ে মহান আল্লাহ্তায়ালার দরবারে জানাচ্ছে তাদের ভক্তি ও বিনয়।

পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্কে সেজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে যতোকিছু জীবজন্তু আছে সে সমস্ত এবং ফেরেশতাগণও; তারা অহংকার করে না।' এখানে 'মা ফিস্সামাওয়াত্' বলে

www.eelm.weebly.com

বুঝানো হয়েছে আকাশের সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্র সমূহকে। আর 'মা ফিল আরদ্ব' বলে বুঝানো হয়েছে ভূপৃষ্টের সকল প্রাণীকুলকে। অথবা কথা দু'টোর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সকল প্রাণীকুলকে (মিন্‌দাব্বাত্‌কে)। উল্লেখ্য যে, সচল, সচেতন ও অবয়বধারী সৃষ্টিকে আরবীভাষীরা বলে থাকে 'দবীব' । স্বর্গের হোক অথবা মর্ত্যের।

'ওয়াল মালায়িকাতু' অর্থ এবং ফেরেশতাগণও। উল্লেখ্য যে, ফেরেশতারা সুনির্দিষ্টরূপে আকাশ অথবা পৃথিবীর প্রাণী নয়। তাদের কেউ কেউ দায়িত্বরত আকাশে। কেউ পৃথিবীতে। কেউ আরশে। সুতরাং তারা সম্পূর্ণ পৃথক একটি সৃষ্টি। এখানে 'ওয়াও' (এবং) সহযোগে তাই তাদেরকে একটি বিশেষ সৃষ্টি হিসাবে দেখানো হয়েছে। অন্যত্রও এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে—'তানায্‌যালুল মালায়িকাতু ওয়ার রূহ' (অবতীর্ণ হয় ফেরেশতামণ্ডলী ও জিবরাইল)। এখানে হজরত জিবরাইল ফেরেশতা সম্প্রদায়ভূত হলেও তাঁকে বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে 'ওয়াও'(এবং) সহযোগে পৃথকভাবে।

'সুজুদ' অর্থ আনুগত্য বা সমর্পণ। এই সমর্পণ হতে পারে দু'ভাবে। বাধ্যগতভাবে অথবা স্বেচ্ছায়। বাধ্যগত সমর্পণ আল্লাহ্‌তায়ালার একটি সাধারণ বিধান। সমগ্র সৃষ্টি, এমনকি কাফেরকুলও এই সাধারণ সমর্পণের অন্তর্ভুক্ত। জন্ম-মৃত্যু, অস্তিত্ব রক্ষা ইত্যাকার বিষয়ে আল্লাহ্‌র সাধারণ বিধানে সমর্পিত না হয়ে কারো কোনো উপায়ই নেই। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টির সেজদাবনত হওয়ার বিষয়টি সৃষ্টি-নৈপূণ্যের একটি অনিবার্য প্রকাশ। এই সমর্পণ-সৌন্দর্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে অসমর্থ। তবে আমি বলি, এখানে যে সেজদার কথা বলা হয়েছে, তা বাধ্যগত বা নিশ্চেতন সেজদা নয়। সমগ্রসৃষ্টি স্বেচ্ছাগত ও সচেতনভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি সেজদার মাধ্যমে তাদের ভক্তি ও প্রণতি জানায়। জড়-অজড়, মৌলিক-অমৌলিক সকল সৃষ্টিই তাদের আপনাপন প্রকৃতি অনুসারে অনুভূতিপ্রবণ। সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারণেই আমরা কোনো কোনো পদার্থকে অনুভূতিহীন বা নিশ্চেতন বলে থাকি। কিন্তু ধারণাটি ঠিক নয়। কোরআন মজীদের কোনো কোনো আয়াতেও আমার এই অভিমতটির সায় রয়েছে। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে আকাশ কড় কড় রবে আওয়াজ তুললো, এরকম করাই ছিলো তার জন্য শোভন। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, যারা কাফের, তারা ছাড়া আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্‌কে সেজদা করে। আল্লাহ্‌পাক সুরা হজের সেজদা-বিশিষ্ট আয়াতে ঘোষণা করেছেন— 'ওয়া কাছিরুম্‌ মিনান্‌ নাস' (মানবমণ্ডলীর মধ্যে অধিক সংখ্যক)। এখানে কাফেরদের ব্যতিক্রম হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা অহংকার করে না।' এ কথার অর্থ তারা অহংকার করেনা আল্লাহ্র ইবাদত করতে। একথাটির মধ্যেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পৃথক করা হয়েছে। কারণ তারা অহংকারী। আর সেজদাকারীরা নিরহংকার, নির্দর্পিত।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'তারা ভয় করে তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের প্রতিপালককে।' একথার অর্থ— ওই সকল সেজদাকারীরা তাদের মহান পরাক্রমশালী পালনকর্তাকে যথারীতি ভয় করে চলে। কারণ আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'হুয়াল ক্বাহিরু ফাওক্ব ইবাদিহী' (তিনি তাঁর বান্দাগণের উপরে মহাপ্রতাপশালী। অথবা আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে এরকম— তাঁকে যারা সেজদা করে তারা সদাসন্ত্রস্ত থাকে তাঁরই শাস্তির ভয়ে।

এরপরে বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে যে আদেশ করা হয়, তারা তা করে।' একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে ওই আদেশ প্রদান করেন, যে আদেশ প্রতিপালনের যোগ্যতা তাদের রয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে তিনি দান করেন প্রতিপালনসাধ্য আদেশ। এখানে আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আল্লাহ্তায়ালাকে সেজদা করে না। কারণ সেজদাকারীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ— অনহংকার, আল্লাহ্ ভীতি ও নির্দেশ প্রতিপালন তাদের মধ্যে নেই। এতদসত্ত্বেও যদি পূর্ববর্তী আয়াতের 'সেজদা করে' কথাটিকে বাধ্যগত সেজদারূপে গ্রহণ করে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল সৃষ্টিকে একত্র করা হয়, তবে 'অহংকার করে না', 'ভয় করে' ও 'যা আদেশ করা হয় তা করে'— এই কথাগুলো প্রযোজ্য হবে কেবল ফেরেশতাবৃন্দের উপর। কারণ এ সকল বৈশিষ্ট্য কেবল ফেরেশতাবৃন্দের মধ্যেই পূর্ণরূপে পরিদৃষ্ট হয়।

হজরত আবু জর গিফারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, আমি যা দেখি, তোমরা তা দেখো না। আমি যা শুনি, তোমরা তা শোনো না। শপথ ওই সুমহান সত্তার, যার আনুরূপ্যবিহীন হস্তে আমার জীবন, আকাশ মার্গের এমন চার আঙ্গুল পরিমান পরিসর নেই, যেখানে কোনো না কোনো ফেরেশতা সেজদারত অবস্থায় নেই। আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে তবে রোদন করতে বেশী, হাস্য করতে কম। রমণীসঙ্গের অভিলাষও উবে যেতো তোমাদের হৃদয় থেকে। উদাসী প্রান্তরে বুক ফাটিয়ে আল্লাহ্কে ডাকাই মনে হতো তখন অধিকতর উত্তম। এরপর হজরত আবু জর বলেছেন, হায়! আমি যদি বৃক্ষ হতাম। তাহলে আমাকে কেটে ফেলা হতো (হিসাব নিকাশ হতো না)। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, বাগবী।

নির্দেশনাঃ এই আয়াত যারা আরবীতে পাঠ করেছেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সেজদা করে নিবেন।

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ○ وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۚ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ○ وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ○ ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ○ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

❐ আল্লাহ্ বলিলেন, 'তোমরা দুই ইলাহ্ গ্রহণ করিও না; আমিই তো একমাত্র ইলাহ্। সুতরাং আমাকেই ভয় কর।

❐ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই, এবং তাঁহারই আনুগত্য করা শাশ্বত কর্তব্য। তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে ভয় করিবে?

❐ তোমরা যে সমস্ত অনুগ্রহ ভোগ কর তাহা তো আল্লাহেরই নিকট হইতে; আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদিগকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাহাকেই বিনীতভাবে আহ্বান কর।

❐ আবার যখন আল্লাহ্ তোমাদিগের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করেন তখন তোমাদিগের একদল উহাদিগের প্রতিপালকের শরীক করে;

❐ আমি উহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা অস্বীকার করিবার জন্য! সুতরাং ভোগ করিয়া লও, পরে জানিতে পারিবে।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বললেন, তোমরা দুই ইলাহ্ গ্রহণ কোরো না; আমিই তো একমাত্র ইলাহ্।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ বলেন, হে মানুষ! তোমরা এক আল্লাহ্র উপাসনা করো। দুই উপাস্যকে নির্ধারণ কোরো না। কারণ দুই উপাস্য হওয়া অসম্ভব। তাই তা নিষিদ্ধ। আল্লাহ্তায়ালাই একক উপাস্য। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্র এককত্বকে প্রমাণ করা হয়েছে। কারণ এককত্বই হচ্ছে উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং আমাকেই ভয় করো।' এখানে 'ইয়াছয়া' পদটি একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্মপদ। আর 'ফারহাবু' ক্রিয়ার কর্মপদ এখানে উহ্য। ওই উহ্য কর্মপদসহ বক্তব্যটি হতে পারতো এরকম— 'ফাইয়াছয়া ইরহাবু ফারহাবুন' (বিশেষভাবে আমাকেই ভয় করো, বস্তুতঃ আমাকেই ভয় করো)। বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্বহ করে তুলবার জন্যই এরূপ করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই।' একথার অর্থ— আকাশ ও পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক একমাত্র আল্লাহ্। এসকল কিছুকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারও কেবল তিনিই সংরক্ষণ করেন। তাই তাঁর পক্ষে জুলুম করার বিষয়টি অচিন্তনীয়। অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে তাকে বলে জুলুম। কিন্তু অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ ও সম্ভাবনা তাঁর নেই। কারণ অপর কোনো স্রষ্টাই যে নেই। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে মোতাজিলা সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধারণাটি অপসৃত হয়। তারা বলে, মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো স্রষ্টা নেই। অতএব মানুষ তার কর্মের নির্মাতা বটে, স্রষ্টা কদাচ নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাঁরই আনুগত্য করা শাশ্বত কর্তব্য।' একথার অর্থ— আনুগত্য গ্রহণের যোগ্যতা রয়েছে কেবল তাঁর । সুতরাং কেবল তাঁরই উপাসনা করতে হবে এবং ভয় করে চলতে হবে একমাত্র তাঁকে । উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাদের আনুগত্য সার্বক্ষণিক। সুতরাং মানুষের আনুগত্যও সার্বক্ষণিক হওয়া অত্যাবশ্যক। রসুল স. বলেছেন, স্রষ্টার অবাধ্যতার মধ্যে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। ইমরান, হাকিম বিন আমর গিফারী থেকে যথাসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও হাকেম।

হজরত আলী থেকে বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র আনুগত্য ব্যতিরেকে কারো আনুগত্য সিদ্ধ নয়। অনুগত হতে হবে আল্লাহ্র নির্দেশিত পুণ্যকর্ম সম্পাদনার্থে। আল্লাহ্র নির্দেশ বিরোধী কর্ম অনুসরণীয় নয়। প্রকৃত কথা হচ্ছে, আল্লাহ্পাকের অনুমতি ব্যতিরেকে কারো আনুগত্য সিদ্ধ নয়। কারণ তিনিই সকলের এবং সকল কিছুর একক অধিকর্তা। কর্তার অনুমতি ছাড়া যেমন তার অধীনস্থরা অর্থ ব্যয় করতে পারে না, তেমনি আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ ও অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর বান্দাগণ অন্য কারো আনুগত্য করতে পারে না।

কোনো কোনো ভাষ্যকার লিখেছেন, এখানে 'দ্বীন' কথাটির অর্থ বিনিময়, প্রতিদান বা প্রতিফল। যদি তাই হয়, তবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— প্রকৃত প্রতিদান ও প্রতিফল প্রদান একমাত্র তাঁরই কাজ। তিনিই বিশ্বাসীদেরকে প্রদান করবেন উত্তম প্রতিদান এবং অবিশ্বাসীদেরকে দিবেন উপযুক্ত শাস্তি।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'দ্বীন' শব্দটির অর্থ শাস্তি। যদি তাই হয় তবে আলোচ্য বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে চিরস্থায়ী দণ্ড দান করার যোগ্যতা রয়েছে কেবল তাঁরই।

'ওয়াসিবা' অর্থ ব্যাধিগ্রস্ত। যেমন বলা হয় ওয়াসিবা জায়েদ (জায়েদ ব্যাধিগ্রস্ত, ক্লিষ্ট)। অন্য আয়াতে আল্লাহ্পাক 'ওয়াসিব' শব্দটির মাধ্যমে তাঁর শাস্তির কথা বলেছেন। যেমন— 'ওয়া লাহুম আজাবুঁ ওয়াসিবা' (আর তাদের

www.eelm.weebly.com

জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি)। জননী আয়েশা বলেছেন, আনা ওয়াসব্তু রসুলাল্লহ্ (আমি রসুল স.কে ব্যথিত বা দুঃখিত দেখেছি)। নেহায়া গ্রন্থে রয়েছে— নিরন্তর দুঃখ-যাতনাকে বলে 'ওয়াসব'। আর পীড়িতকে বলে 'তাওসিব'। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'ওয়াসব' অর্থ ব্যাধি। 'আওসবাহুল্লহ্ অর্থ— আল্লাহ্ তাকে ব্যাধিগ্রস্ত করেছেন। 'ওয়াসবা আলাল আমর' অর্থ কারো আনুগত্যের ব্যবস্থাপনা করেছে। করেছে তত্ত্বাবধান।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে ভয় করবে?' একথার অর্থ— হে মানুষ! আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা অন্য কাউকে ভয় কোরো না। কারণ তিনি ছাড়া অন্য কারো উপকার কিংবা ক্ষতি করার সাধ্য নেই।

এর পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'তোমরা যে সমস্ত অনুগ্রহ ভোগ করো, তাতো আল্লাহ্রই নিকট থেকে'। একথার অর্থ— তোমাদের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তি আল্লাহ্তায়ালার করুণা বই অন্য কিছু নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁকেই বিনীতভাবে আহ্বান করো।' একথার অর্থ— আবার যখন তোমাদের উপরে নেমে আসে দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন, রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য বিপদাপদ, তখন তোমরা আল্লাহ্র কাছেই তো সাহায্যপ্রার্থী হও।

এর পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'আবার যখন আল্লাহ্ তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করেন, তখন তোমাদের একদল তাদের প্রতিপালকের শরীক করে।' একথার অর্থ— তিনিই একমাত্র দাতা। সুখ ও দুঃখ তাঁরই দান। তিনি দুঃখ দেন বটে, কিন্তু তা তো অপসারণও করেন। কিন্তু বিপদ অপসারণের পর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে বসে। বলে, তাদের বাতিল উপাস্যরাই তাদের বিপদ দূর করে দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে সাধারণভাবে সম্বোধন করা হয়েছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী-অংশীবাদী নির্বিশেষে সকল মানুষকে। কিন্তু এখানে 'মিনকুম' (তোমাদের একদল) কথাটির কারণে প্রতীয়মান হয় যে, এখানকার সম্বোধিত ব্যক্তিরা অবিশ্বাসী। এমতাবস্থায় কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— বিপদ অপসারণের পর অবিশ্বাসীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক অংশীবাদী হয়ে যায়। এতে করে বুঝা যায়, সকলেই অংশীবাদী হয় না, কেউ কেউ আবার ফিরে আসে সত্যের পথে। অপর এক আয়াতেও এরকম কথা এসেছে। যেমন— 'অতঃপর সাগরের ভয়াবহ ঝড়তুফান থেকে পরিত্রাণদানের পর আল্লাহ্ যখন তাদেরকে তটভূমিতে পৌঁছে দেন, তখন তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক গ্রহণ করে মধ্যম পন্থা।'

এর পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা অস্বীকার করবার জন্য' একথার অর্থ— আমিই অনুগ্রহ করে আপতিত বিপদ

 www.eelm.weebly.com

অপসারণ করি। অথচ বিপদমুক্তির পর কিছু সংখ্যক লোক আমার এই অনুগ্রহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনার্থেই আমার সঙ্গে অন্যকে শরীক করে। এখানে 'লিইয়াকফুরু' কথাটির 'লাম' অব্যয়টি পরিণতিসূচক। অর্থাৎ তাদের শিরিকের পরিণতি এই যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহকে তারা অগ্রাহ্য করে এবং অকৃতজ্ঞ হয়। উপাসনা শুরু করে অন্যের।

শেষে বলা হয়েছে— 'সুতরাং ভোগ করে নাও, পরে জানতে পারবে।' এখানে 'তামাত্তাউ' শব্দরূপটি অনুজ্ঞাসূচক। এভাবে এখানে অকৃতজ্ঞদেরকে শাসানো হয়েছে। 'ফা সাওফা তা'লামূন' অর্থ শীঘ্রই জানতে পারবে। একথাটিও সতর্ক সংকেত বা শাসনসূচক। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— ঠিক আছে। পৃথিবীর জীবনের যে হায়াত আমি তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছি, সেই সময়ের মধ্যেই তোমরা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকো। মৃত্যুর সময়, মহাপ্রলয়কালে অথবা মহাবিচারের দিবসে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারবে অকৃতজ্ঞতা ও অংশীবাদিতা কত মন্দ ও মর্মন্তুদ।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَٰهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ○ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَٰتِ سُبْحَٰنَهُۥ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ○ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ○ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ○ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ○

❒ আমি উহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দান করি উহারা তাহার এক অংশ নির্ধারিত করে তাহাদিগের জন্য যাহাদিগের সম্বন্ধে উহারা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহের, তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবেই।

❒ উহারা নির্ধারণ করে আল্লাহের জন্য কন্যাসন্তান; তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত! এবং উহারা স্থির করে নিজদিগের জন্য তাহাই যাহা উহারা কামনা করে!

❒ উহাদিগের কাহাকেও যখন কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাহার মুখমণ্ডল কাল হইয়া যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।

www.eelm.weebly.com

❒ উহাকে যে সংবাদ দেওয়া হয় তাহার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হইতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে উহাকে রাখিয়া দিবে, না মাটিতে পুঁতিয়া দিবে! সাবধান! উহারা যাহা সিদ্ধান্ত করে তাহা কত নিকৃষ্ট।

❒ যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের ধর্ম নিকৃষ্ট, কিন্তু আল্লাহের ধর্ম মহান এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করি, তারা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য যাদের সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না।' একথার অর্থ— রিজিক দান করি আমি। অথচ অংশীবাদীরা ওই রিজিকের একাংশ নির্ধারণ করে তাদের কল্পিত দেব-দেবীদের জন্য। অথচ তারা একথা বুঝতেই পারে না যে, ওই জড় প্রতিমাগুলো আসলে কিছুই নয়। উপাসনা লাভ করার যোগ্য তো নয়ই। কারো কোনো লাভ অথবা ক্ষতি করার সাধ্যও সেগুলোর নেই। কতোই না মূঢ় ও মূর্খ অংশীবাদীরা। না জেনে শুনেই তারা আল্লাহ্র দেয়া জীবনোপকরণ থেকে তাদের বাতিল উপাস্যগুলোর জন্য নির্ধারণ করে অর্ঘ্য, প্রসাদ ও বিভিন্ন রকমের ভোগ। কথাটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে— অংশীবাদীরা একথা জানেই না যে, ওই সকল প্রস্তর প্রতিমাগুলোর প্রাপ্য আসলে কী? মূর্তিগুলো নিজেরাই কি কিছু জানে বা বুঝে? ওগুলোতো নিঃশ্চেতন, নিষ্প্রাণ। অথচ তারা জীবন মৃত্যুর সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত। ওই পাষাণ-বিগ্রহগুলোর জন্যই নির্ধারণ করে আল্লাহ্র দেয়া জীবনোপকরণের এক অংশ।

এখানে 'মা রযাক্বনাহুম' অর্থ আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করি। অর্থাৎ আমি তাদেরকে দান করি যে সকল খাদ্যশস্য, গৃহ, গৃহপালিত পশু, ফলমূল ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, মক্কার অংশীবাদীরা তাদের খাদ্যশস্য দু'ভাগ করে বলতো এই ভাগটি আল্লাহ্র, আর এই ভাগটি আমাদের দেব-দেবীদের।

এরপর বলা হয়েছে— 'শপথ আল্লাহর! তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করো, সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবেই।' একথার অর্থ— আল্লাহ্র শপথ! তোমরা তোমাদের মিথ্যা উপাস্যদেরকে আল্লাহ্র অংশীদার সাব্যস্ত করেছো। নিঃসন্দেহে এ কাজ গর্হিততম। আর এ সম্পর্কে মহাবিচারের দিবসে তোমাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'তারা নির্ধারণ করে আল্লাহ্র জন্য কন্যা সন্তান, তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত। এবং তারা স্থির করে নিজেদের জন্য তা-ই যা তারা কামনা করে।' 'সুবহানআল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্ পবিত্র, মহিমান্বিত। এই আপ্তবাক্যটি ব্যবহৃত হয় বিস্ময় প্রকাশকালে । উল্লেখ্য যে, বনী খাজআ এবং বনী কেনানা বলতো, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। 'সুবহানআল্লহ,' বলে তাদের ওই

www.eelm.weebly.com

অপকথনের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কখনোই নয়। আল্লাহ্ চির অমুখাপেক্ষী। পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন থেকে তিনি সতত মুক্ত, পবিত্র ও মহিমান্বিত।

পরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— 'তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনোস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।' এখানে 'মুস্ওয়াদ্দা' অর্থ কালো, কুশ্রী, বিবর্ণ। আর 'কাজীম' অর্থ অসহনীয় মনোস্তাপ, যা ভিতরে ভিতরে অন্তরকে কুরে কুরে খায়, কিন্তু যা মুখে প্রকাশ করা যায় না। উল্লেখ্য যে, মক্কার অংশীবাদীরা কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণকে খুবই অবমাননাকর মনে করতো। তাই কন্যা সন্তানের জন্ম-সংবাদ তাদের মুখমণ্ডলকে বিবর্ণ ও অন্তরকে করতো অবহ ব্যথায় ক্লিষ্ট।

এর পরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'তাকে যে সংবাদ দেয়া হয় তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে।' একথার অর্থ— যখন তাদের মধ্যে কেউ তার স্ত্রীর কন্যা-সন্তান প্রসবের সংবাদ শোনে, তখন সে লজ্জায় ও গ্লানিতে মুখ ঢাকে। স্বজন-বান্ধবদের নিকট থেকে নিজেকে আত্মগোপন করে রাখে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে দিবে।' একথার অর্থ— সে তখন পড়ে যায় চরম দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে। ভাবে, কী করবে এখন। অপমানজনক অবস্থা মেনে নিয়ে সদ্যজাত শিশু কন্যাটিকে লালন-পালন করবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলে অপমানের অবসান ঘটাবে। এখানে 'ইয়াদুস্সু' অর্থ গোপন করবে, মৃত্তিকায় প্রোথিত করবে।

বাগবী লিখেছেন, বনী মুজার, বনী খাজায়া ও বনী তামীম গোত্রের লোকেরা তাদের সদ্যজাত শিশু কন্যাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলতো। তারা মনে করতো কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ দারিদ্রের লক্ষণ। কারণ লুণ্ঠন করে তারা উপার্জন করতে পারে না। কেবল গলগ্রহ হয়ে থাকে। আবার কোনো অকুলিনজন দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে মেয়েটিকে বিবাহের প্রস্তাবও দিয়ে দিতে পারে। নিঃসন্দেহে এ অবস্থা আরো বেশী অবমাননাকর। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ কন্যাসন্তানকে বাঁচিয়ে রেখে পশমী বস্ত্র পরিয়ে তাকে নিযুক্ত করতো পশুপাল চরানোর কাজে। আর মেরে ফেলতে চাইলে শিশু কন্যার ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাকে জনপদের বাইরে নিয়ে গিয়ে জীবন্ত কবর দিতো। তার মাকে বলতো, মেয়েকে সাজিয়ে গুছিয়ে দাও। মা তখন মেয়েটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিতো। অবুঝ শিশু খুশী হয়ে রওনা হতো পিতার সঙ্গে। পিতা তখন তার কন্যাকে নিয়ে রওনা দিতো দূরের কোনো অরণ্য অথবা জনমানবহীন প্রান্তরের দিকে। সেখানে সে আগেই খুঁড়ে রাখতো একটি গর্ত। ওই গর্তের পাড়ে গিয়ে পিতা বলতো,

www.eelm.weebly.com

দ্যাখোতো গর্তের মধ্যে কী দেখা যায়? অবুঝ শিশু কৌতূহল বশতঃ উঁকি দিতো গর্তের ভিতরের দিকে। ঠিক তখনই তার নিষ্ঠুর পিতা তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতো গর্তের ভিতরে। তারপর মাটি ও পাথর দিয়ে সেখানেই তাকে চাপা দিয়ে আসতো। কন্যার গগনবিদারী আর্তনাদ শুনে তার পাষাণ হৃদয় এতটুকুও কেঁপে উঠতো না।

ফরজ্দকের পিতামহ ছিলেন কোমল হৃদয়। তিনি এরকম মর্মবিদারক পরিকল্পনার কথা শুনতে পেলেই ছুটে যেতেন কন্যার পিতার বাড়ীতে। কয়েকটি উট পিতার হাতে তুলে দিয়ে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতেন তার মেয়েকে। ফরজ্দক ছিলেন প্রখ্যাত কবি। তিনি তাঁর কবিতায় এরকম ঘটনার উল্লেখ করে গর্ব প্রকাশ করতেন। যেমন, একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন, আমি এমন পিতার সন্তান, যিনি শিশু-কন্যাদের জীবন্ত কবর দেয়ার পরিকল্পনার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতেন। এভাবে তিনি রক্ষা করেছেন অনেক শিশু-কন্যার জীবন।

এরপর বলা হয়েছে— 'সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে, তা কত নিকৃষ্ট।' একথার অর্থ— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জঘন্য মনমানসিকতা ও কার্যকলাপ থেকে সাবধান। তাদের সংস্পর্শ পরিত্যাজ্য। কতোইনা ঘৃন্য তাদের মনোবৃত্তি। তারা নিজেরা কন্যাসন্তানের জনক হওয়াকে অবমাননাকর মনে করে, অথচ বলে, আল্লাহ্র কন্যাসন্তান রয়েছে। না। আল্লাহ্ এরকম নন। তিনি সন্তান-সন্ততি গ্রহণ থেকে চির অমুখাপেক্ষী, চিরপবিত্র। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বর্ণিত অপমানসিকতার বিবরণ এসেছে আর একটি আয়াতে এভাবে— 'আ লাকুমুজ্জাকারু ওয়া লাহুল উন্‌ছা' (তোমাদের হবে পুত্র সন্তান আর তার হবে কন্যা?)

এর পরের আয়াতে (৬০)বলা হয়েছে, 'যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের ধর্ম নিকৃষ্ট, কিন্তু আল্লাহ্র ধর্ম মহান এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' একথার অর্থ— যারা পরকালকে বিশ্বাস করে না, তাদের সহজাত প্রবৃত্তি অত্যন্ত মন্দ। তারা তাদের বংশবিস্তারের জন্য ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য পুত্র সন্তান চায়। আর কন্যাসন্তানের জন্মগ্রহণকে মনে করে অশুভ। তাই তাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়। সুতরাং তাদের স্বভাব ধর্ম যে অতি নিকৃষ্ট সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আল্লাহ্র অতুলনীয় স্বভাব অত্যন্ত মহান, সর্বোন্নত। তিনি চিরঞ্জীব, চির অমুখাপেক্ষী। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শক্তি, স্থিতি, পরাক্রম, প্রতাপ ইত্যাদি সকল প্রকার আনুরূপ্যবিহীন গুণের তিনি অধিকারী। তিনি মহামহিম। মহাপবিত্র। তাই তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'মাছালুস্ সুই' অর্থ দোজখ। আর 'মাছালুল আ'লা' অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ কলেমার সাক্ষ্য প্রদান।

www.eelm.weebly.com

'ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম' অর্থ— এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি আনুরূপ্যবিহীন পরাক্রমের অধিকারী। আর তাঁর সকল পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপ প্রজ্ঞাময়তামণ্ডিত।

সূরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৬১, ৬২

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۗ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ○

❑ আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাহাদিগের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকেন। অতঃপর যখন তাহাদিগের সময় আসে তখন তাহারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করিতে পারে না।

❑ যাহা তাহারা অপছন্দ করে তাহাই তাহারা আল্লাহের প্রতি আরোপ করে। তাহাদিগের জিহ্বা মিথ্যা দাবী করে যে মংগল তাহাদিগেরই জন্য। নিশ্চয়ই তাহাদিগের জন্য আছে অগ্নি, এবং তাহাদিগকেই সর্বাগ্রে উহাতে নিক্ষেপ করা হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাদের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না।' এখানে 'ইয়ূওয়াখিজু' অর্থ আশু শাস্তিপ্রদান। 'আন্নাস্' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়। 'জুলুম' অর্থ সীমালংঘন। এভাবে এখানে কেবল অবিশ্বাসী ও সীমালংঘনকারীদের শাস্তিদানের কথা বলা হয়েছে। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'আন্নাস' বলে বুঝানো হয়েছে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মানুষকে। আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যপ্রবাহ অবশ্য সেরকমই। তবে এখানে এরকম ধারণা করা সংগত নয় যে, নবী-রসুল ও পুণ্যবানেরাও আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য। সেরকম মনে করলে তাঁরাও তো সীমালংঘনকারীদের পর্যায়ভূত হন। কিন্তু তা অসম্ভব। তবে একথাও ঠিক যে, মানব জাতির এক বিশাল অংশ অবিশ্বাস ও অবাধ্যতায় নিমজ্জিত। অধিকাংশ মানুষ এরকম বলেই এখানে এভাবে সমগ্র মানবজাতির উল্লেখ এসেছে। সামগ্রিকতার উল্লেখের মাধ্যমে অধিকাংশকে

www.eelm.weebly.com

বোঝানো অশোভন কিংবা রীতিবিরুদ্ধ নয়। আমি বলি, 'কোনো জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না' কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, অধিকাংশ লোকের অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় গোটা জাতিকে। কিন্তু এরকম অর্থ গ্রহণ করাটাও ঠিক নয়। কারণ একের অপরাধের কারণে অন্যকে শাস্তি প্রদান আল্লাহ্তায়ালার বিধানসম্মত নয়। এক আয়াতে একথা পরিষ্কার করে বলেও দেয়া হয়েছে। যেমন— 'লা তাযিরু ওয়াজিরাতুন ইযরান উখরা (কোনো ভার বা বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না)। সুতরাং নিরপরাধকে কখনো অপরাধের শাস্তির অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়।

তাফসীরে মাদেরেকের ভাষ্যকার হজরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, তিনি 'দাববাহ' শব্দটির অর্থ করেছেন, পাপিষ্ঠ জীব। অথবা বিচরণশীল পাপী প্রাণী। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়ায়— বিশ্বাসীগণ ছাড়া সকল পাপী প্রাণী ধ্বংস হয়ে যেতো। অতএব বিশ্বাসীদেরকে ধ্বংসের অন্তর্ভুক্ত করা কিছুতেই সমীচীন নয়। তবে বিশ্বাসীরা যদি 'সৎকর্মের আদেশ অসৎকার্যের নিষেধ'— এই ফরজ দায়িত্বটি পালন না করে, যদি পাপীদের পাপকর্মের প্রতি মৌন সম্মতি জানায়, তবে তারাও শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে ইবনে মাজা ও তিরমিজি লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষকে অশ্লীল কার্য করতে দেখে যে প্রতিরোধের চেষ্টা করে না, সে-ও সাধারণভাবে পাপিষ্ঠদের প্রতি আপতিত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। হজরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে আবু দাউদও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা কোনো অবস্থাতেই শাস্তিযোগ্য নয়। তবে অত্যাচারী বিশ্বাসীরা অত্যাচারী অবিশ্বাসীদের সঙ্গে শাস্তির উপযোগী হয়ে যেতে পারে। কারণ তারা উভয়েই কল্যাণকামিতা পরিহার করে থাকে। আর কল্যাণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব মানুষের। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'খলাক্বা লাকুম মা ফিল আরদ্বি জামীয়া' (ভূপৃষ্ঠের সকল কিছু সৃজিত হয়েছে তোমাদের কল্যাণের জন্য)।

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে হজরত কাতাদা বলেছেন, হজরত নুহের যুগে এরকম ঘটেছিলো। যারা তাঁর নৌকায় আরোহণ করেছিলো কেবল তারাই রক্ষা পেয়েছিলো। আর যারা আরোহণ করেনি তারা লাভ করেছিলো সলিল সমাধি। বায়যাবী লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, অত্যাচারী ব্যক্তি কেবল নিজের ক্ষতি করে। তার উৎপীড়নের শাস্তি অন্য কারো উপরে পড়ে না। এরকম মন্তব্য করার পরক্ষণেই আবার তিনি বলেছেন, কেনো পড়বে না। আল্লাহ্র শপথ! অবশ্যই পড়ে। জালেমদের জুলুমের কারণে পক্ষীকুলও তাদের আপনাপন নীড়ে অভুক্তাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

 www.eelm.weebly.com

ইবনে আবী শায়বা, আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, মানুষের পাপের কারণে ঘুনে পোকাও তার কোটরে শাস্তি পেয়ে থাকে। কোনো কোনো ভাষ্যকার আবার আলোচ্য ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন, অবিশ্বাসীদেরকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেয়া হলে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যেতো। অবলুপ্ত হয়ে যেতো তাদের বংশপরম্পরা। এভাবে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো পৃথিবী থেকে। একারণেই হজরত নুহ ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সম্প্রদায়ের ধ্বংসের প্রার্থনা জানাননি, যতক্ষণ না তিনি একথা জানতে পেরেছিলেন যে, সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের পরবর্তী বংশধরেরাও হবে তাদের পিতৃপুরুষদের মতোই কাফের।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সময় আসে, তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করতে পারে না।' একথার অর্থ— তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন এ কারণে যে, যদি তারা তওবা করে। অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে ফিরে আসে সত্যের সীমানায়। কিন্তু তওবার এই সুযোগ যদি তারা গ্রহণ না করে, তবে নির্ধারিত অবকাশের মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপরে গজব অবতীর্ণ করা হয়। ওই গজবকে মুহূর্তকাল অগ্র-পশ্চাৎ করবার ক্ষমতা কারো নেই।

পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'যা তারা অপছন্দ করে, তা-ই তারা আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করে। তাদের জিহ্বা মিথ্যা দাবী করে যে মঙ্গল তাদেরই জন্য। নিশ্চয় তাদের জন্য আছে অগ্নি, এবং তাদেরকেই সর্বাগ্রে তাতে নিক্ষেপ করা হবে।'

এখানে 'মা' ইয়াকরাহুন' অর্থ তাদের নিজেদের কাছে যা ঘৃণ্য, অপছন্দনীয়। যেমন কন্যাসন্তান। যেমন রাজার জন্য অপছন্দীয় তার রাজত্বে অন্যের অংশীদারিত্ব। রাজত্ব কেনো, তুচ্ছ কোনো বস্তুর মালিকানার মধ্যে অন্যের অংশীদারিত্ব মানুষের জন্য সুখবর নয়। আর এখানে 'আল হুসনা' অর্থ বেহেশত। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলতো, মোহাম্মদের বক্তব্যানুসারে পুনরুত্থান যদি ঘটেই যায়, তবে আমরা থাকবো বেহেশতে। 'লা জারমা' অর্থ নিশ্চয়, অবশ্যই। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'লা জারমা' অর্থ— কেনো নয়।

আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাসের এরকম অর্থ করার কারণ হচ্ছে, 'লা' অর্থ না বা নয়। বক্তব্যের পূর্বে এভাবে 'লা' বসিয়ে অনড় কোনো ধারণাকে নাকচ করা হয়। মক্কার মুশরিকদের ধারণা ছিলো, পুনরুত্থান ঘটলে তারা বেহেশতেই যাবে, দোজখে নয়। এখানে আল্লাহ্তায়ালা তাদের ওই অপধারণাকে নাকচ করে দিয়ে জানাচ্ছেন, অবশ্যই নয়। তাদের জন্য রয়েছে দোজখের আগুন, বেহেশতের শান্তি নয়। এভাবে তাদের অপপরিণতির কথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে এখানে।

www.eelm.weebly.com

'মুফরাতুন' কথাটি 'ইফরাত' শব্দের কর্মপদরূপ। এর অর্থ নিক্ষেপ করা হবে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, এর অর্থ— নিক্ষেপ করা হবে নরকে। মর্মার্থ— নরকে নিক্ষেপ করে চিরতরে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে তাদের অহমিকা। অথবা সর্বাগ্রে তাদেরকে ফেলে দেয়া হবে জাহান্নামে। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— জাহান্নামে নিক্ষেপ করে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে তাদের দম্ভ। মুকাতিল বলেছেন, ছেড়ে দেয়া হবে নরকাভ্যন্তরে। কাতাদা বলেছেন, অতি দ্রুত প্রেরণ করা হবে দোজখে। ফাররা বলেছেন, সর্বপ্রথম প্রেরণ করা হবে অগ্নিকুণ্ডে। রসুল স. বলেছেন, 'আনা ফারাতুকুম' (আমি হবো তোমাদের অগ্রণী)। সর্বপ্রথম আমিই পৌঁছবো আবে কাওছারের নিকটে। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'মুফরাতুন' অর্থ— তাদেরকে সম্পর্কচ্যুত করা হবে পরিত্রাণ ও কৃপা থেকে। ঠেলে দেয়া হবে নরকাগ্নিতে।

উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এরকম— মক্কার মুশরিকেরা নিজেরা যা পছন্দ করে না, তাই আরোপ করে আল্লাহ্‌র উপর। যেমন কন্যা সন্তান তাদের পছন্দ নয়, অথচ তারা বলে আল্লাহ্‌র কন্যা আছে। তারা আরো দাবী করে, তারাই নাকি বেহেশতে যাবে। কখনোই নয়। তারা যাবে দোজখে। সর্বাগ্রে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে তাদেরকেই।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৬৩, ৬৪, ৬৫

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝

❒ শপথ আল্লাহের, আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু শয়তান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল; সুতরাং শয়তান আজ উহাদিগের অভিভাবক এবং উহাদিগেরই জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।

❒ আমি তো তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহারা এ-বিষয়ে মতভেদ করে তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ।

www.eelm.weebly.com

❑ আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্বারা তিনি ভূমিকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন, অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে যে-সম্প্রদায় কথা শোনে তাহাদিগের জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'শপথ আল্লাহ্র। আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রসুল প্রেরণ করেছি, কিন্তু শয়তান ওই সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিলো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার পূর্বেও আমি বহু মানবগোষ্ঠীর নিকট নবী-রসুল প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তাঁদেরকে অমান্য করেছিলো। শয়তান তাদের অপকর্মগুলোকেই তাদের চোখে সুন্দর হিসেবে প্রতিভাত করেছিলো। তাই তারা তাদের প্রেরিত নবী-রসুলগণকে মনে করেছিলো অপাংক্তেয়।

এখানে 'লাহুম' (তাদের দৃষ্টিতে) বলে বোঝানো হয়েছে ওই সকল মানব-গোষ্ঠীর অধিকাংশ লোককে। আর এখানকার 'আ'মাল' (কার্যকলাপ) কথাটির অর্থ তাদের কুফরী কার্যকলাপ, শিরিক ও নবী-রসুলগণের প্রতি অবজ্ঞা। এসকল অপকর্মকে শয়তানই তাদের নিকট শোভন করে দিয়েছিলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং শয়তান আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদেরই জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।' একথার অর্থ— শয়তান এখন যেমন তাদের অভিভাবক, তেমনি আখেরাতে হবে তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি। এখানে 'তাদের অভিভাবক' অর্থ মক্কার মুশরিকদের অভিভাবক। আয়াতের বক্তব্যপ্রবাহের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয়।

'ওয়ালী' অর্থ বন্ধু, সঙ্গী বা অভিভাবক। এখানে শয়তানকেই মক্কার সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের বন্ধু, সঙ্গী বা অভিভাবক বলা হয়েছে। এখানে 'ওয়ালীয়্যুহুম' এর 'হুম' (তাদের) সর্বনামটি এখানে সম্পৃক্ত হবে অতীতকালের সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের সঙ্গে। তখন মর্মার্থ দাঁড়াবে— অতীতের ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের দুষ্কর্মগুলোকে শয়তানই তাদের দৃষ্টিতে চিত্তাকর্ষকরূপে প্রদর্শন করেছিলো। এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে 'আজ' (ইয়াওমা) অর্থ বিচারদিবস ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যটির মর্মার্থ হবে— বিচারদিবসে শয়তানই হবে তাদের অভিভাবক। আর মর্মন্তুদ শাস্তি হবে এরকম— তাদেরকে বেঁধে ফেলা হবে শিকল দিয়ে। অথবা মর্মার্থ হবে— বিচারদিবসে শয়তানই হবে তাদের একমাত্র বন্ধু। আর কোনো বন্ধু সেখানে তাদের থাকবে না। কিন্তু শয়তান তখন নিজেরই কোনো উপকার করতে পারবে না। সুতরাং সে অপরের উপকার আর করবে কেমন করে? এমনও বলা যেতে পারে যে, যারা অতীতের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতো, তাদের অভিভাবক বা বন্ধু শয়তান। এমতাবস্থায় আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— অংশীবাদী কুরায়েশ গোত্র বিগত যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতোই। শয়তান তাদের সতীর্থ।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবার জন্য এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আল্লাহ্র এককত্ব, তাক্বদীর, মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, মহাবিচার ইত্যাদি বিষয়ে অজ্ঞ মানুষেরা যে সকল মতভেদে আকীর্ণ, সে সকল মতভেদ দূর করে সুস্থ, সঠিক ও সত্য ধারণা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই আমি আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছি এই কোরআন। আর এই কোরআন প্রতর্ক ও মতভেদ থেকে বেরিয়ে আসা বিশ্বাসীদের জন্য পথ-নির্দেশ ও রহমত।

এর পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্দারা তিনি ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে শুষ্ক ও নিষ্ফলা মৃত্তিকাকে করে তোলেন শস্যশ্যামল।

এরপর বলা হয়েছে— 'অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে যে সম্প্রদায় কথা শোনে, তাদের জন্য।' এ কথার অর্থ— অবশ্যই বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে বিশুষ্ক মৃত্তিকাকে ফল ও ফসল দ্বারা পুনর্জীবিত করার মধ্যে রয়েছে প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যাদের শ্রুতি, দৃষ্টি ও অনুধাবন শক্তি বিভ্রান্ত নয়, তারাই কেবল বুঝতে পারে এই নিদর্শনটির মর্ম। বুঝতে পারে শুকনো পানি যেমন বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে সঞ্জীবিত হয়, তেমনি পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়ের বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিরা হবে পুনর্জীবিত।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৬৬

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ○

❒ অবশ্যই আন্আমের মধ্যে তোমাদিগের জন্য শিক্ষা আছে। তোমাদিগকে পান করাই উহাদিগের উদরস্থিত গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ; যাহা পানকারীদিগের জন্য বিশুদ্ধ, সুস্বাদু।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'অবশ্যই আন্আমের মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা আছে।' একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্ট চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়। এখানে 'ইবরত' অর্থ এমন ধারণা, যা মানুষকে মূর্খতা থেকে নিয়ে যায় জ্ঞানের পথে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্ত-নিঃসৃত দুগ্ধ ; যা পানকারীদের জন্য বিশুদ্ধ, সুস্বাদু।' এ কথার অর্থ— হে

 www.eelm.weebly.com

মানুষ! একবার ভাবতে চেষ্টা করো, তোমাদের প্রতি আমার কতো দয়া। চতুষ্পদ জন্তুদের শরীরে থাকে রক্ত এবং উদরে থাকে গোময়। অথচ আমি তার মধ্য থেকে তোমাদের জন্য বের করে আনি বিশুদ্ধ, সুপেয় ও সুস্বাদু দুগ্ধ।

এখানে 'বুতুনিহী' (তাদের উদরস্থিত) কথাটির 'হী' (তার) সর্বনামটি পুংলিঙ্গ ও একবচনবোধক। এই সর্বনাম সম্পৃক্ত হবে 'আন্আম' (চতুষ্পদ জন্তু) কথাটির সঙ্গে। আর 'আন্আম' শব্দটি সমষ্টিবাচক হলেও শব্দ হিসেবে একবচন। সিবওয়াইহ্ বলেছেন, 'আফ্য়াল' শব্দরূপে গঠিত আখলাখ, আকরাম ইত্যাদি শব্দগুলো একবচনবোধক। তেমনি একবচন হিসেবে বিবেচিত 'আন্আম' শব্দটিও। ফাররা, আবু উবায়দা ও আখফাশও এরকম বলেছেন। আবার 'নাআম' ও 'আন্আম'— দু'টো শব্দই একবচন। শব্দ দু'টো পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যারা এ দু'টোর শব্দগত অর্থ গ্রহণ করেছেন, তারা এ দু'টোকে ধরে নিয়েছেন পুংলিঙ্গ ও একবচন। আর যারা মর্মগত অর্থ গ্রহণ করেছেন তারা ধরে নিয়েছেন স্ত্রীলিঙ্গ ও বহুবচন অর্থে।

'ফী বুতুনিহী' অর্থ তার বা তাদের উদরস্থিত। এখানে 'তার' বা 'তাদের' সর্বনামটি সম্পৃক্ত হয়েছে 'মিম্মা' কথাটির 'মা' অব্যয়ের সঙ্গে। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তার বা তাদের উদরে যা আছে। সকল পশু থেকে দুধ পাওয়া যায় না। তাই এখানে মর্মার্থ হবে— কিছু সংখ্যক পশুর উদরে। এমতো ক্ষেত্রে 'তার উদরে' কথাটির 'তার' সর্বনামটি হবে ঋণাত্মক এবং তা সম্পৃক্ত হবে ওই কিছু সংখ্যক দুগ্ধবতী পশুর সঙ্গে। আবার কারো কারো মতে আন্আমান অর্থ পশু। আর সে পশু হচ্ছে জিন্সে আন্আম বা এক শ্রেণীর পশু। যদি তাই হয়, তবে 'তার উদরে' কথাটির 'তার' সর্বনামটি সংশ্লিষ্ট হবে এক শ্রেণীর পশুর সঙ্গে।

'ফর্ছ' অর্থ ওই গলিত পদার্থ, যা সংশ্লিষ্ট থাকে নাড়িভুঁড়িতে। গোবররূপে যা বেরিয়ে আসে, তা কিন্তু 'ফরছ' নয়, বর্জ্য। 'খলিসন্' অর্থ বিশুদ্ধ। অর্থাৎ যা রক্ত ও পাকস্থলিস্থিত গলিত পদার্থের প্রভাব থেকে মুক্ত। অর্থাৎ দুগ্ধ। লক্ষণীয় যে, রক্ত ও পাকস্থলিস্থিত গলিত পদার্থ থেকে নিঃসৃত হলেও দুধের মধ্যে কিন্তু রক্তের রঙ অথবা ওই গলিত পদার্থের দুর্গন্ধ, কোনোটাই নেই।

'সাইগান' অর্থ সুপেয় বা সুস্বাদু, যা অনায়াসে গলাধঃকরণ করা যায়। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পশুরা ঘাস পাতা ইত্যাদি আহার করে। সেগুলো চলে যায় তাদের পাকস্থলিতে। সেখানে চলে পরিপাক কর্ম। পরিপাক ক্রিয়া সমাপনের পর খাদ্যের নির্যাস হয় ত্রিধাবিভক্ত। উপরের অংশ হয় রক্ত। মধ্যবর্তী অংশ হয় দুগ্ধ । আর তলদেশের অংশ হয় গোবর। অর্থাৎ দুগ্ধ বেরিয়ে আসে রক্ত ও গোবরের মাঝখান থেকে। দুগ্ধ নিঃসরণের এই কাজটি সম্পাদিত হয় যকৃতের তত্ত্বাবধানে। যকৃত রক্ত পরিচালন করে ধমনীতে এবং দুগ্ধ প্রবাহিত করে দুগ্ধাধারে বা ওলানে। আর গোবরকেও রাখে তার যথাস্থানে।

www.eelm.weebly.com

আল্লামা বায়যাবী বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যের মর্মার্থ এই হতে পারে যে, দুধের উপাদান থাকে রক্ত ও গোবরের মাঝামাঝি। উপরের অংশে থাকে রক্ত। আর নিচের অংশে থাকে বর্জ্য। পাকস্থলিতে জারিত খাদ্যের প্রথম অংশ টেনে নেয় যকৃত। বর্জ্য পড়ে থাকে তার নির্দিষ্ট স্থানে। অতঃপর জারিত খাদ্যের প্রথম অংশ পুনরায় পরিপাক হয়। পরের পরিপাককৃত পদার্থকে বলে কিমুস। দেহের যাবতীয় উপাদান এতে বিদ্যমান থাকে। জলীয় অংশই থাকে অধিক। এই জলীয় অংশকে বলে এখলাত। এরপর যকৃত তার পৃথকীকরণ শক্তির প্রভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ধমনীর মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয় বৃক্কে। অতঃপর এই মিশ্রণকে প্রয়োজনানুসারে পরিচালনা করে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। এভাবেই মহাপ্রাজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্‌র সুব্যবস্থাপনায় প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পায় তাদের প্রয়োজনীয় প্রাপ্য। পুরুষজাতীয় প্রাণীর স্বভাবে থাকে নমনীয়তার ও শীতলতার প্রাধান্য। তাই তাদের খাদ্যমিশ্রণ হয় প্রয়োজনাতিরিক্ত। স্ত্রীজাতীয় প্রাণীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অংশটুকু ভ্রূণের লালনপালনার্থে পরিচালিত হয় জরায়ুতে। সন্তান প্রসবের পর ওই অতিরিক্ত খাদ্য পরিচালিত হয় স্তনের দিকে । সেখানে তা জমা হয় দুধরূপে। তখন খাদ্যের নির্যাস পরিপাকতন্ত্র থেকে ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। এভাবে উৎপাদিত দুগ্ধ, তার পরিমাণ, রঙ, প্রবাহ ইত্যাদি একটি জটিল প্রক্রিয়া বটে। তবে এটা সুনিশ্চিত যে, এর নেপথ্যে রয়েছে মহাকুশলী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র ত্রুটিহীন তত্ত্বাবধান ও নিখুঁত ব্যবস্থাপনা। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ অনুসন্ধিৎসা ও বিনয়ী অভিনিবেশ সহকারে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করবে, সেই কেবল অবগত হতে পারবে এর অভিজ্ঞান। সে তখন মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌পাকের বিপুল অনুগ্রহ ও অকৃপণ দানের কথা স্বীকার না করেই পারবে না।

সূরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৬৭

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

❒ এবং খর্জুর বৃক্ষ ও আংগুর হইতে তোমরা মদ্য ও উত্তম খাদ্য লাভ করিয়া থাক; ইহাতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং খেজুর বৃক্ষ ও আংগুর থেকে তোমরা মদ্য ও উত্তম খাদ্য লাভ করে থাকো।' আলোচ্য বাক্যের পূর্বে একটি ক্রিয়া অনুক্ত রয়েছে। ওই ক্রিয়াটি হয়েছে 'নুসক্বী' (আমি পান করাই)। আর এখানে 'ছামারাত' অর্থ খেজুর ও আংগুরের নিংড়ানো রস। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— আমি তোমাদের পান করাই বা প্রদান করি খেজুর ও আংগুরের নিঃসৃত রস খাদ্য ও পানীয়রূপে। এর পরের 'খাদ্য লাভ করে থাকো' কথাটি একটি পৃথক

 www.eelm.weebly.com

বাক্য। অথবা 'খেজুর বৃক্ষ ও আংগুর থেকে' বাক্যটির সম্বন্ধ ঘটবে 'তাত্তাখিজুনা' (তোমরা খাদ্য লাভ করে থাকো) কথাটির সঙ্গে। 'সাকার' অর্থ নেশাজাত দ্রব্য। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'সাকারা' অর্থ— সে বেহুঁশ হয়েছে। জ্ঞান শব্দের বিপরী-তার্থক শব্দ হচ্ছে অজ্ঞান বা বেহুঁশ। 'সুকরুন' 'সুকুরুন' 'সাকরুন' 'সুকরামুন'— এই শব্দগুলো ধাতুমূল। 'সকুর' অর্থ মদ্য বা শরাব। ভুট্টাজাত রস, কসীস নিঃসৃত রস ইত্যাদি নেশাসঞ্চারক রসকেও বলা হয় সুকুর। এছাড়া 'সিরকা' ও খাদ্যকেও বলে সুকুর। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, খেজুরের রস থেকে যা প্রস্তুত করা হয়, তাকে বলে সাকার। শরীক বিন আব্দুল্লাহ্ বলেছেন, মদ্য বা নেশাসঞ্চারক সামগ্রী মোবাহ্ বা সিদ্ধ। যদি মদ্য নিষিদ্ধ হতো, তবে এখানে তা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহের তালিকায় স্থান পেতো না। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে— আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। তখন সকল প্রকার পানীয় ছিলো সিদ্ধ। মদ্য নিষিদ্ধ হয়েছে পরবর্তীতে মদীনায়, অন্য এক আয়াতের মাধ্যমে। আর সাহাবায়েকেরাম সকলেই সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়েছেন ওই নিষেধাজ্ঞাটি। তাই মদ্য হারাম হওয়ার বিষয়টি ঐকমত্যসম্মত।

বাগবী লিখেছেন, কারো কারো মতে 'সাকার' অর্থ সুরা। 'রিজক্বান হাসানা' অর্থ ফলের নির্যাস। ভুট্টা ও কিসমিস নিঃসৃত সিরকা। বিধানটি মদ্য হারাম হওয়ার পূর্বের। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে ওমর, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, হাসান ও মুজাহিদ। বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনাও পাওয়া গিয়েছে যে, 'সাকার' ওই ফল যা হারাম করে দেয়া হয়েছে। আর উত্তম খাদ্য বলে বুঝানো হয়েছে হালাল ফলসমূহকে। হজরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ফলের ওই সকল 'সিরকা' বা নির্যাসকেই হারাম করে দেয়া হয়েছে— যা 'সাকার'। আর যে সকল নির্যাসকে হালাল করা হয়েছে, সেগুলো হলো 'রিজক্বান হাসানা' (উত্তম খাদ্য বা উপজীবিকা)।

আবু উবাইদা বলেছেন, 'সাকার' অর্থ আহার্য বা খাদ্য। অপচয়কারীরা বলে— 'হাজা সাকারুললাকা' (এটা তোমার খাবার)। শা'বী বলেছেন 'সাকার' অর্থ পানীয়। আর উত্তম খাবার হচ্ছে উত্তম উপজীবিকা। আউফির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হিব্রু ভাষায় 'সাকার' অর্থ সিরকা, নির্যাস। জুহাক ও ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, হিব্রু ভাষায় মত্ততাসঞ্চারক পানীয় ও সিরকাকে বলে সাকার। ভুট্টা এবং কিসমিসের গাঢ় রস জ্বাল দিয়ে ঘনত্ব বাড়ানো হয়। ওই সকল রসের নাম সাকার। তবে সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আলোচ্য আয়াতটি রহিত বা মনসুখ হয়েছে।

বাগবী এক স্থানে লিখেছেন, মোট কথা মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে সর্বমোট চারটি আয়াত। আর আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। তখন সুরা পানের উপরে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিলো না। পরবর্তীতে

www.eelm.weebly.com

মদীনায় অবতীর্ণ হয় 'লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে মদ ও জুয়া সম্পর্কে'। কিছুদিন পর অবতীর্ণ হয় 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সুরান্মোত্ত অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না'। এরপর অবতীর্ণ হয় সুরা মায়িদার চূড়ান্ত আয়াতটি। ওই আয়াতের মাধ্যমে চিরকালের জন্য শরাবপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুরা বাকারার তাফসীরে এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।' একথার অর্থ— যারা সুস্থবিবেকসম্পন্ন তাদের চোখেই মহাকুশলী আল্লাহ্তায়ালার কার্যকলাপের নিদর্শনসমূহ সতত প্রতিভাত হয়।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৬৮, ৬৯

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّ
مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ۝ ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ
سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ
فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

❒ তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন 'গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাহাতে;

❒ ইহার পর প্রত্যেক ফল হইতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য যে পদ্ধতি সহজ করিয়াছেন তাহার অনুসরণ কর।' উহার উদর হইতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়; ইহাতে মানুষের জন্য আছে ব্যাধির প্রতিকার। অবশ্যই ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার প্রভুপালয়িতা মধুমক্ষিকাকে এই মর্মে অনুপ্রেরণা দান করেন যে, তোমরা তোমাদের আবাস নির্মাণ করো পর্বতমালায়, বৃক্ষশাখায় ও মানুষের গৃহের অলিন্দের ছাদে। উল্লেখ্য যে, ওহী বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় নবী রসুলগণের প্রতি। আর সাধারণ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর প্রতি যে কর্মস্পৃহা বা অনুপ্রেরণা প্রদত্ত হয়, তাকে বলে ইল্হাম। এখানকার 'ওহী' শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 'ইয়া'রিশূনা' অর্থ গৃহের ছাদের ছায়ায়। অথবা 'আরশ' শব্দটির অর্থ এখানে আংগুরের মালঞ্চ। শব্দটির আভিধানিক অর্থ ছাদ। 'মিনাল জিবাল' 'মিনাশ্ শাজার' এবং 'মিম্মা ইয়া'রিশূনা'— এ কথাগুলোতে যে 'মিন' ব্যবহৃত হয়েছে তা আংশিক অর্থ

www.eelm.weebly.com

প্রকাশক। অর্থাৎ মৌমাছিদেরকে মৌচাক নির্মাণের প্রেরণা দেয়া হয় কিছু সংখ্যক পাহাড়ে, কিছু সংখ্যক বৃক্ষে এবং কিছু সংখ্যক গৃহের ছাদের তলদেশে। লক্ষণীয় যে, মধুমক্ষিকাদের মধুচক্রকে এখানে আখ্যা দেয়া হয়েছে গৃহ বা নিবাস। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের বসতবাটিতে যেমন তাদের প্রয়োজন পূরণের বিভিন্ন স্থান ও ব্যবস্থা থাকে, তেমনি মৌমাছিদের মৌচাকেও থাকে দরজা-জানালা, ছাদ, বীজাগার, বিশ্রামাগার ও বিনোদন ব্যবস্থা। আরো থাকে আহার্যাধার, প্রজননাগার ও শিশু সদন। আর তাদের চাকের নির্মাণশৈলীও বিস্ময়কর। এরকম নিখুঁত ও সুন্দর শৈলীর প্রয়োগ মানুষের পক্ষেও অসম্ভব। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত নেই।

পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'এরপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য যে পদ্ধতি সহজ করেছেন তার অনুসরণ করো।' এখানকার 'আছ্ছামারাত' কথাটির 'আলিফ লাম' হচ্ছে জাতিবাচক। আর এখানকার 'কুল' (প্রত্যেক) শব্দটি সমষ্টিবাচক নয়। অর্থাৎ সকল বৃক্ষের সকল ফল ভক্ষণ করতে হবে, এমন নয়। বরং ভক্ষণ করতে হবে ওই সকল ফল, যা চিত্তাকর্ষক, সহজলভ্য ও মধু তৈরীর উপযোগী। এরকম ফল থেকেই শোষণ করে নিতে হবে রেণু বা নির্যাস।

'সুবুলা রব্বিকা' অর্থ— তোমার প্রভুপালক তোমার জন্য যে পদ্ধতি সহজ করেছেন সেই পদ্ধতিতে এবং স্বআবাসে প্রত্যাবর্তনও করবে ওই একই পদ্ধতিতে ও পথে। ভুল পথে নয়। অথবা কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— হে মধুমক্ষিকা সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্পাক প্রদর্শিত এমন পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করবে, যাতে করে তোমাদের সংগৃহীত নির্যাস পরিণত হয় পীযূষ-প্রবাহে।

'জুলুলান' অর্থ ওই পদ্ধতি, যা সহজ করে দিয়েছে তোমাদের প্রভুপালয়িতা। অথবা ওই পদ্ধতি, যা আল্লাহ্তায়ালার আনুগত্যমণ্ডিত। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্-তায়ালার আনুগত্যমণ্ডিত পদ্ধতি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সহজ পদ্ধতি। বর্ণিত হয়েছে, মৌমাছিদের নেত্রী হচ্ছে মক্ষীরাণী বা রাণী মৌমাছি। সে কোথাও যাত্রা করলে তার দলভূত মৌমাছিরা তাকে অবশ্যই অনুসরণ করে। এরপর সে যেখানে অবস্থান গ্রহণ করে, সেখানেই তার অনুসারীরা নির্মাণ করে একটি মধুচক্র।

এরপর বলা হয়েছে— 'তার উদর থেকে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়।' একথার অর্থ— তাদের উদর থেকে নির্গত হয় নিষ্কলুষ এক পানীয়, যা বিবিধ বর্ণের — লাল,শাদা, হলুদ ও সবুজ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে মানুষের জন্য আছে ব্যাধির প্রতিকার।' এখানে 'ফিহী' (তাতে, তার মধ্যে) কথাটির 'হী' (তার) সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে কোরআন

www.eelm.weebly.com

মজীদের সঙ্গে। অর্থাৎ কোরআন মজীদেই রয়েছে মানুষের জন্য ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু কথাটি সম্ভবতঃ ঠিক নয়। কারণ আলোচ্য বাক্যের ধারাক্রমানুসারে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কথিত সর্বনামটি এখানে সম্পৃক্ত হবে 'শারাবুন' (পানীয়) কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ পীযুষ বা মধুর মধ্যেই রয়েছে মানুষের ব্যাধির প্রতিষেধক। 'শিফাউন' শব্দটি এখানে অনির্দিষ্টবাচক। তাই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, কোনো কোনো সময়ের কোনো কোনো ব্যাধির একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে মধু।

একটি সংশয়ঃ প্রতিটি বস্তুই কোনো না কোনো রোগের প্রতিষেধক। জীবননাশক বিষও কোনো কোনো সময়ে কোনো কোনো পীড়ার নিরাময়করূপে ব্যবহৃত হয়। তাহলে প্রতিকার বা প্রতিষেধকরূপে মধুর বিশেষত্ব কোথায়?

সংশয় ভঞ্জনঃ এখানকার 'শিফাউন' শব্দটির তান্‌ভিন— বিভক্তিটি স্বাক্ষর বহন করে উৎকৃষ্টতার। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, প্রতিকাররূপে মধু উৎকৃষ্টতর। অর্থাৎ মধুর মধ্যে রয়েছে অধিকাংশ রোগের প্রতিকার।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, তোমরা দু'টো প্রতিষেধকই গ্রহণ কোরো— মধু ও কোরআন। প্রথমটি সকল দৈহিক রোগের নিরাময়ক। আর দ্বিতীয়টি প্রতিষেধক আত্মিক রোগের। বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা ও হাকেম। এই হাদিসের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মধুর রোগ নিরাময় ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, সর্ববিধ ব্যাধির বিনাশক হচ্ছে মধু। আর অন্তরের ব্যাধির নিরাময়ক হচ্ছে কোরআনপাক। সম্ভবতঃ হজরত ইবনে মাসউদ রসুল স. এর নিকট থেকে শুনেই এরকম বলেছেন।

বায়যাবী লিখেছেন, মধু এককভাবে কতকগুলো দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিষেধক। যেমন কফ জাতীয় রোগের জন্য মধু অত্যন্ত ফলদায়ক। কোনো কোনো ব্যাধির ক্ষেত্রে আবার মধু ব্যবহৃত হয় আনুষঙ্গিক অনুপান হিসেবে। যেমন মদক জাতীয় ঔষধের প্রধান উপকরণই হচ্ছে মধু ।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার এক লোক রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আমার ভাই উদরাময় রোগে আক্রান্ত। এখন আমি কী করবো? তিনি স. আজ্ঞা করলেন, মধু পান করাও। লোকটি তাই করলো। কিন্তু তাতে করে ব্যাধির কোনো উপশম হলো না। তখন সে পুনরায় পবিত্র সাহচর্যে হাজির হয়ে নিবেদন জানালো, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার কথামতো আমি আমার ভাইকে মধু পান করালাম। কিন্তু

 www.eelm.weebly.com

উপশমের বদলে তার রোগ গেলো আরো বেড়ে। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্পাকের বাণী সত্য এবং তোমার ভাইয়ের উদরাময় মিথ্যা। একথা শুনে লোকটি ফিরে গিয়ে তার ভাইকে পুনরায় মধু পান করালো। এবার সে লাভ করলো পূর্ণ নিরাময়। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, পেটের কোনো কোনো রোগের জন্য মধুই একমাত্র উপশমক। বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যে যদি কেউ কেবল মধু ব্যবহার করে, তবে সে যে কোনো ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লামা সুয়ূতি এরকম বলেছেন।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, কোরআন ও হাদিসের কোথাও একথা নেই যে, সব ধরনের মধু সব রকমের ব্যাধির নিরাময়ক। এক এক মৌসুমের মধুর বিশেষত্ব হয় এক এক রকমের। এই বিশেষত্ব নির্ভর করে ওই মৌসুমসমূহের ফুল ও ফলের উপর। কিন্তু সব ঋতুর মধুর মধ্যে রয়েছে ব্যাধির প্রতিকার। অথচ তা প্রস্তুত করা হয় বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রকমের ফুল-ফল থেকে। এই বিশেষত্বটি অন্য কোনো কিছুর মধ্যে নেই। অর্থাৎ মধুর প্রতিষেধক গুণটি একটি সাধারণ গুণ। অবশ্য কোন ব্যাধিতে কোন মধু অধিক উপকারী তা নির্ণয়সাপেক্ষ। আবার ঔষধ হিসাবে এর প্রয়োগপদ্ধতি ও পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল কিছুকে বিবেচনায় না এনে ঢালাওভাবে মধু ব্যবহার করা সঙ্গত নয়। এসকল নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে মধু ব্যবহার করে যদি সুফল না পাওয়া যায়, তবে মধু প্রতিষেধক নয়, একথা কীভাবে বলা যায়?

সকল মধু এক প্রকৃতির নয়। কোনো কোনো প্রকার মধুর মধ্যে রয়েছে অত্যধিক উত্তাপ। কোনোটাতে কম। কোনো কোনো মধু গেঁটে বাত, অর্ধাঙ্গ রোগ— এমনকি ধনুষ্টংকার রোগেও অব্যর্থ। আবার কোনো কোনো মধু এমন নয়। কফ জাতীয় রোগের জন্যও এক ধরনের মধু ফলপ্রসূ। ভেদ রোগের জন্যও মধু উপকারী। আবার মধু জোলাপ হিসেবেও মহা উপকারী। এভাবে অনুপযুক্ত নিষ্ক্রিয় উপাদানসমূহ দেহ থেকে বের করে দিলে সুস্থতা নিশ্চিত হয়। মোট কথা, মধু একাধারে আস্বাদ্য, শক্তি প্রদায়ক, আদর্শ খাদ্য ও উৎকৃষ্ট ঔষধ। মধুর মধ্যে যতো কল্যাণপ্রদ দিক আছে, অন্যকিছুর মধ্যে ততো নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'অবশ্যই এতে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।' একথার অর্থ— এই মধু নির্মাণের কলাকৌশলের মধ্যেও রয়েছে আল্লাহ্র এককত্ব, মহাকুশলতা ও মহাপরাক্রমের অনন্য নিদর্শন। যারা প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিমান তারাই কেবল এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে।

www.eelm.weebly.com

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

❐ আল্লাহ্ই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর তিনি তোমাদিগের মৃত্যু ঘটাইবেন এবং তোমাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও করা হইবে জরাগ্রস্ত; ফলে, উহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহারা সজ্ঞান থাকিবে না । আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! নিশ্চিতরূপে একথা বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ্তায়ালাই একমাত্র স্রষ্টা। তিনিই সৃষ্টি করেছেন এই মহাবিশ্বকে। তোমাদেরকে। আবার তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান। শিশুকালে, ভরা যৌবনে, মধ্য বয়সে অথবা বয়োবৃদ্ধ অবস্থায়। কাউকে কাউকে আবার করেন জরাগ্রস্ত। ফলে তার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পায়। জানা বিষয়ও সে তখন আর স্মরণ করতে পারে না। এসকল কিছু হচ্ছে তাঁর জ্ঞানের অপারতা ও শক্তির সর্বব্যাপিতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান

এখানে 'আরজালিল উমর' অর্থ জরাগ্রস্ত বা অথর্ব অবস্থা। কাতাদা বলেছেন, কতিপয় বৃদ্ধের আয়ুষ্কালকে বলে 'আরজালিল উমর'। হজরত আলী বলেছেন, 'আরজালিল উমর' বলে পঁচাত্তর বৎসর বয়ঃক্রমকে। কেউ কেউ বলেন, আশি বছরের বয়সকে। রসুল স. তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, হে আমার আল্লাহ্! বার্ধক্যজনিত অবসাদ ও জরা থেকে আমি পরিত্রাণপ্রার্থী। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. বলতেন, অথর্ব অবস্থায় উপনীত হওয়া থেকে আমি তোমার শরণপ্রার্থী। এ সকল বর্ণনা বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থের।

এখানে 'যা কিছু সে জানতো, সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকবে না' কথাটির অর্থ— ওই জরাগ্রস্তরা তখন তাদের জ্ঞাত বিষয়সমূহ হবে বিস্মৃত। হয়ে যাবে শিশু ও বুদ্ধি-জ্ঞানহীনদের মতো নির্বোধ। ইকরামা বলেছেন, যে সব সময় কোরআন মজীদ পাঠ করে, সে এরকম দুরবস্থায় পতিত হয় না। 'ইন্নাল্লহা আলীম' (নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ) অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা সকলের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে সম্যক অবগত। 'কৃদীর' অর্থ সর্বশক্তিমান। আর তিনি সর্বশক্তিমান বলেই কখনো কখনো ইচ্ছা মতো দুর্বলকে (জরাকবলিতকে) ছেড়ে দেন, আবার প্রাণহরণ করেন শক্তিশালী যুবকের।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জীবনের সকল অবস্থাই আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। আপনাআপনি কোনো কিছু ঘটে না। বিষয়টি যদি মানুষের স্বেচ্ছাধীন হতো তবে মানুষ নিশ্চয় জরাকে আহ্বান জানাতো না।

সূরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৭১

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○

□ আল্লাহ্ জীবনোপকরণে তোমাদিগের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। যাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহাদিগের অধীনস্থ দাস দাসীদিগকে নিজদিগের জীবনোপকরণ হইতে এমন কিছু দেয় না যাহাতে উহারা এ বিষয়ে তাহাদিগের সমান হইয়া যায়। তবে কি উহারা আল্লাহের অনুগ্রহ অস্বীকার করে?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ জীবনোপকরণে তোমাদের কাউকেও কারো উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালাই তোমাদের কারো কারো রিজিক করেন সম্প্রসারিত এবং কারো সংকুচিত। তাই কেউ কেউ হয় বিত্তশালী, আবার কেউ কেউ হয় বিত্তহীন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজেদের জীবনোপকরণ থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়।' একথার অর্থ— আমি যাদেরকে ধনে জনে সম্মানে শ্রেষ্ঠ করেছি, তারা ওই শ্রেষ্ঠত্ব তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে তাদেরকে নিজেদের সমান্তরাল করে নেয় না কেনো?

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে অংশীবাদীদের অংশীবাদিতার সমালোচনা করা হয়েছে। বক্তব্য বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে এরকম— অংশীবাদীরা আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তুকে উপাস্য স্থির করে। এভাবে সৃষ্টিকে করে দেয় স্রষ্টার সমকক্ষ। অথচ আল্লাহ্ চির অসমকক্ষ। অংশীবাদীরা কতোই না মূর্খ ও অবিবেচক! তারা নিজেরা সৃষ্ট হয়েও তাদের ধন-সম্পত্তি ও মর্যাদায় দরিদ্র ও দলিত জনগোষ্ঠীকে সমকক্ষ হওয়ার সুযোগ দেয় না। অথচ তাদের স্রষ্টার বেলায় তারা এরকমই করে। তাদের প্রস্তর প্রতিমাগুলোকে বানায় আল্লাহ্র অংশীদার।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতের অর্থ এরকমও হতে পারে যে, প্রভু-ভৃত্য সকলেরই রিজিক দাতা আল্লাহ্। প্রভু কখনোই তার ক্রীতদাস ক্রীতদাসীদের রিজিক দাতা নয়। অতএব বিত্তাধিকারীরা যেনো একথা মনে না করে যে, তারা তাদের অধীনস্থদের রিজিকের মালিক। সারাসৃষ্টির সকল জীবের রিজিক একমাত্র তিনিই দিয়ে থাকেন। এটা তাঁর এক অযাচিত অনুগ্রহ।

শেষে বলা হয়েছে— 'তবে কি তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করে?' একথার অর্থ—ওই সকল অংশীবাদীরা কী ধারণা করে? তারা তাদের পূজিত প্রতিমাগুলোকেও কি আল্লাহ্তায়ালার মতো অনুগ্রহপ্রদানকারী বলে ভাবে? আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে, আল্লাহ্তায়ালা একান্ত কৃপাপরবশ হয়ে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তাঁর এককত্ব ও একমাত্র উপাস্য হওয়া সম্পর্কে উপস্থাপন করেছেন বহুসংখ্যক প্রকৃষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন । এসকল কিছু তাঁর নিছক অনুগ্রহ। ওই সকল অংশীবাদীরা আল্লাহ্তায়ালার এমতো অনুগ্রহকে কি অস্বীকার করতে চায়?

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৭২

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۭ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۝

❒ এবং আল্লাহ্ তোমাদিগ হইতেই তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগের যুগল হইতে তোমাদিগের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করিয়াছেন। তবুও কি উহারা মিথ্যাতে বিশ্বাস করিবে এবং উহারা কি আল্লাহের অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?—

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন।' একথার অর্থ— হে মানুষ! ভাবতে চেষ্টা করো। আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে কতোভাবে অনুগৃহীত করেছেন। তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্বজাতি থেকে। যাতে তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক প্রেম, ভালোবাসা ও সৌহার্দ। তোমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও তো আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরই যুগল-বন্ধনের মাধ্যমে।

 www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'জয়ালা লাকুম মিন আনফুসিকুম আজ-ওয়াজা' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা আদি জননী হজরত হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন আদি জনক হজরত আদম থেকে। আর পরবর্তী মানবতার উৎসারণ ঘটিয়েছেন ওই জোড়া থেকেই।

'হাফাদাতুন' অর্থ সন্তানের সন্তান, চপল অনুচর। 'কামুস' অভিধানে রয়েছে— দ্রুত হস্তে যে কাজ করে তাকে বলে 'হাফাদাতুন'। শব্দটির অর্থ পরিচারক বা চাকরও হয়। আবার পুত্র -প্রপৌত্রও হয়। এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শেষোক্ত অর্থে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, 'হাফাদাতুন' অর্থ জামাতা। হজরত ইবনে মাসউদের আর এক বর্ণনায় এসেছে, শব্দটির অর্থ বধু। এমতাবস্থায় কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্পাক তোমাদের পত্নীদের মাধ্যমে তোমাদেরকে দান করেছেন পুত্র ও কন্যা, যাদেরকে বিবাহ দিয়ে তোমরা লাভ করো পুত্রবধু ও জামাতা। ইকরামা, হাসান ও জুহাক বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'হাফাদাতান' অর্থ অনুচর বা চাকর। মুজাহিদ বলেছেন, কাজের লোক। আতা বলেছেন, ওই সকল সন্তান, যারা নিয়োজিত থাকে সহায়তায় ও সেবায়। আমি বলি, বর্ণিত অর্থ সমূহের আলোকে দেখা যায় 'হাফাদাতুন' অর্থ পুত্র। বিশেষণগত তারতম্যের কারণে এখানে 'বানীন' শব্দটির সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে 'হাফাদাতুন' শব্দটির। অর্থাৎ 'বানীন' অর্থ বংশজাত সন্তান এবং 'হাফাদাতুন' অর্থ বংশের বাইরের সন্তান, যে নিয়োজিত থাকে সেবাকর্মে।

মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, 'বানীন' অর্থ অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং 'হাফাদাতুন' অর্থ প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান। কাতাদা বলেছেন, ওই সকল সন্তান-সন্ততি যারা সাহায্য সহযোগিতা করে অথবা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাধা করে । হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, আপন স্ত্রীর সন্তানেরাই হাফাদাতুন। আমি বলি, এরকম বলা হয় আভিধানিক অর্থানুসারে। আর শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে চাকর বা অনুচর। স্ত্রীর সন্তানদের দ্বারা মানুষ যে সকল কাজকর্ম করায়, আপন সন্তানদের দ্বারা তা করায় না। তাই স্ত্রীর সন্তানদেরকে বলা হয় 'হাফাদাতুন'। সব শেষে বায়যাবী শব্দটির একটি ভাবার্থ লিখেছেন। ভাবার্থটি হচ্ছে— কন্যা সন্তান। কারণ কন্যা সন্তানেরাই সংসারের কাজকর্ম করে বেশী।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন।' এখানে 'ত্বইয়্যেবাত' অর্থ উত্তম, আস্বাদ্য বা বৈধ। 'মিন' অব্যয়টি এখানে আংশিক অর্থ প্রকাশক। পার্থিব জীবনোপকরণসমূহ পারলৌকিক জীবনোপকরণের সামান্য নমুনা মাত্র। ওই সকল নেয়ামতের যৎসামান্য দেয়া হয়েছে এই পৃথিবীতে। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'মিনাত্ ত্বইয়্যেবাত'। অর্থাৎ কিছু কিছু জীবনোপকরণ তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে পৃথিবীর জীবনে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তবু কি তারা মিথ্যায় বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?' একথার অর্থ— তবু কি তারা তাদের মিথ্যা মাবুদগুলোর উপরে আস্থা রাখবে এবং অনুগ্রহপ্রদাতা হিসেবে সেগুলোকে মান্য করে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে একমাত্র অনুগ্রহ দাতা আল্লাহ্‌র প্রতি? রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, মানুষ, জ্বিন ও আমার মধ্যে আশ্চর্য সম্পর্ক বিদ্যমান। আমি তাদের স্রষ্টা অথচ তারা আরাধনা করে অন্যের। আমিই তাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি। অথচ তারা কৃতজ্ঞতা জানায় অন্যকে। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, এখানে 'বাত্বিলা' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে কল্পিত দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত মুশরিকদের বাহিরা, সায়েবা, হাম ইত্যাদি পশুগুলোকে। তারা ওগুলোর কোনো কোনোটির গোশত ভক্ষণ কারো কারো জন্য অথবা সকলের জন্য হারাম বলতো। আবার কোনো কোনোটির উপর আরোহণ করাকে বলতো নিষিদ্ধ। আবার আল্লাহ্ কর্তৃক হালালকে হারামও বলতো তারা। হারামকে বলতো হালাল। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'বাত্বিল' অর্থ শয়তান। আর 'নেয়ামত' অর্থ রসুলেপাক স.। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে, তবুও কি তারা শয়তানকে বিশ্বাস করবে এবং অস্বীকার করবে আমার রসুলকে?

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৭৩, ৭৪

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝ فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

❑ এবং উহারা কি ইবাদত করিবে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের যাহাদিগের, আকাশমণ্ডলী অথবা পৃথিবী হইতে কোন জীবনোপকরণ সরবরাহ করিবার শক্তি নাই! —এবং উহারা কিছুই করিতে সক্ষম নহে।

❑ সুতরাং আল্লাহের কোন সদৃশ স্থির করিও না। আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তারা কি ইবাদত করবে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের যাদের আকাশমণ্ডলী অথবা পৃথিবী থেকে কোনো জীবনোপকরণ সরবরাহ করবার শক্তি নেই।' একথার অর্থ— ওই সকল অংশীবাদীরা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে তাদের মিথ্যা উপাস্যগুলোর উপাসনা করবে কেনো, যারা আকাশ অথবা পৃথিবী

www.eelm.weebly.com

থেকে কোনো প্রকার উপজীবিকা সরবরাহ করতে পারে না। এখানে আকাশ থেকে উপজীবিকা প্রদানের অর্থ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করা। আর পৃথিবী থেকে উপজীবিকা দেয়ার অর্থ ফল, ফসল, সব্জি ইত্যাদি উৎপন্ন করা। আখনাস বলেছেন, এখানকার 'শাইয়ান' (কোনো) শব্দটি 'রিজ্ক্বান্' (রিজিক বা উপজীবিকা) কথাটির ব্যাখ্যা। এভাবে বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়িয়েছে এরকম— মিথ্যা উপাস্যগুলো তো কোনো কিছুরই মালিক নয়। স্বল্প বা অধিক কোনো প্রকার রিজিক প্রদানেও সমর্থ নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা কিছুই করতে সক্ষম নয়।' একথার অর্থ— ওই সকল নিঃসাড় দেব-দেবী কোনো কিছুরই অধিকারী নয়। অথবা অর্থ হবে— মূর্তিগুলোতো কোনো কিছুই করতে সক্ষম নয়। কিংবা মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— মূর্তিপূজকেরা সপ্রাণ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও কোনো কিছুর অধিকারী নয়। তাহলে অপ্রাণ প্রতিমাগুলো কোনো কিছুর অধিকার লাভ করবে কি করে? এরকম হওয়া তো সম্ভবই নয়।

পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং আল্লাহ্র কোনো সদৃশ স্থির কোরো না। আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানো না।' একথার অর্থ— সুতরাং হে মানুষ! তোমরা কাউকে অথবা কোনো কিছুকে আল্লাহ্সদৃশ মনে কোরো না। এটা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন। তোমরা তাঁর সমকক্ষ ও অংশীদাররূপে যে সকল উপাস্যকে দাঁড় করাও সেগুলোর অসারতা সম্পর্কেও তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত। কিন্তু তোমরা কোনটি সত্য ও কোনটি মিথ্যা, তাও জানো না।

আল্লাহ্পাকের কোনো সদৃশ বা সমকক্ষ স্থির করা নিষিদ্ধ একারণে যে, উপমা ও উপমেয় এর মধ্যে তুল্যতা বিদ্যমান। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা সকল প্রকার তুল্যতা ও সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। সুতরাং যিনি জ্ঞানাতীত ও দৃশ্যাতীত, তাঁকে জ্ঞানায়ত্ব করতে চাওয়া ও দৃশ্যমান কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করা একটি মিথ্যাচার নয় কি?

'আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানো না' কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে— 'আল্লাহ্তায়ালা সমগ্র সৃষ্টির সকল কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত। কিন্তু তোমরা এরকম নও। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে এরকম— তোমরা আল্লাহ্র যে সদৃশ বা সমকক্ষ দাঁড় করিয়েছো, তা যে মিথ্যা, সে সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে অবহিত। কিন্তু তোমরা এই তত্ত্বটি জানো না। যদি জানতে, তবে তোমাদের ওই অলীক উপাস্যগুলোকে কিছুতেই আর বিশ্বাস করতে পারতে না।

www.eelm.weebly.com

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

❒ আল্লাহ্ উপমা দিতেছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাহাকে তিনি নিজ হইতে উত্তম জীবনোপকরণ দান করিয়াছেন এবং সে উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; উহারা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহেরই প্রাপ্য; অথচ উহাদিগের অধিকাংশই ইহা জানে না।

এখানে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নিজের এবং অংশীবাদীদের দেব-দেবীদের মধ্যে একটি প্রতিতুলনা উপস্থাপন করেছেন। দেব-দেবীদের তুলনা করেছেন ক্রীতদাসের সঙ্গে, যে সম্পূর্ণরূপে অন্যের অধীন। নিজের ইচ্ছামত কোনো কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। আর নিজের তুলনা দিয়েছেন ওই স্বাধীন ব্যক্তির সঙ্গে, যাকে তিনি দিয়েছেন প্রচুর জীবনোপকরণ। তারপর এইমর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, ক্রীতদাস এবং স্বাধীন ধনাঢ্য ব্যক্তি কি সমান? কখনোই নয়। কারণ ক্রীতদাস সম্পূর্ণতঃই অন্যের অধীন। আর স্বাধীন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ থেকে প্রকাশ্য ও গোপনে ব্যয় করতে পারে। বরং মুশরিকদের তথাকথিত উপাস্যগুলোর অবস্থা তো আরো অধিক শোচনীয়। কারণ ইচ্ছাশক্তি রহিত হলেও ক্রীতদাসেরা জীবন্ত। কিন্তু তাদের প্রতিমাগুলোর জীবন বা মৃত্যু কোনোটাই নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ্তায়ালা তো স্বাধীন ও বিত্তশালী ব্যক্তি অপেক্ষাও অনেক উচ্চ। কারণ স্বাধীন ব্যক্তির ইচ্ছা ও ক্ষমতা কোনোটাই সর্বব্যাপী নয়। আর সে মৃত্যুহীনও নয়। কিন্তু আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, চিরবিদ্যমান, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর ও ইচ্ছাময়। যা কিছু তাই করার ক্ষমতা একমাত্র তিনিই রাখেন। আর তাঁর ধনসম্পদের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। অতএব একথা নির্বিবাদে স্বীকার করে নিতে হবে যে, আল্লাহ্তায়ালাই একমাত্র উপাস্য। অন্য কেউ বা কোনো কিছু উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে কখনোই তাঁর অংশীদার নয়। এ কথাগুলোই আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে—'আল্লাহ্ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোনো কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাকে তিনি নিজ থেকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারা কি একে অপরের সমান?'

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য; অথচ তাদের অধিকাংশই তা জানে না।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালাই সকল কিছুর একক মালিক ও একমাত্র দাতা। তাই তিনিই একমাত্র উপাস্য হওয়ার যোগ্য। আর সকল কৃতিত্ব, গৌরব ও প্রশংসা কেবল তাঁরই প্রাপ্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এই বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই তারা আল্লাহ্‌র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যের উপাসনায় লিপ্ত হয়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অন্যের।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে 'অপরের অধিকারভুক্ত দাস' বলে বুঝানো হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। তারা সম্পূর্ণরূপে তাদের প্রবৃত্তির ক্রীতদাস। তাই আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় এবং অন্যান্য পুণ্যকর্ম করার সামর্থ্যই দেননি। সে কারণেই তারা পুণ্যচ্যুত। আর 'তিনি নিজ থেকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাসসংস্থাপনকারীগণকে অর্থাৎ তাদেরকেই তিনি দিয়েছেন উত্তম জীবনোপকরণ এবং প্রকাশ্য ও গোপন ব্যয়ের অনুপ্রেরণা। সে কারণেই তারা পুণ্যবান। এভাবে প্রকৃষ্ট উপমার মাধ্যমে ইমানদার ও কাফেরকে সুচিহ্নিত করে এমতো প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে যে, পুণ্যচ্যুতরা কি পুণ্যবানদের সমতুল?

ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় এসেছে, আতা বলেছেন, এখানে 'অপরের অধিকারভুক্ত এক দাস' বলে বুঝানো হয়েছে আবু জেহেলকে এবং 'এমন এক ব্যক্তির যাকে তিনি নিজ থেকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দিককে।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৭৬

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۟

☐ আল্লাহ্ আরও উপমা দিতেছেন দুই ব্যক্তিরঃ উহাদিগের একজন মুক, কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তাহার প্রভুর ভারস্বরূপ, তাহাকে যেখানেই পাঠান হউক না কেন সে ভাল কিছুই করিয়া আসিতে পারে না; সে কি সমান হইবে ঐ ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে?

আলোচ্য আয়াতেও উপস্থাপন করা হয়েছে একটি জ্ঞানগর্ভ উপমা। নির্বাক, নির্বোধ ও অকর্মন্য ক্রীতদাস এবং সবাক, সক্ষম ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন স্বাধীন ব্যক্তির উপমা দিয়ে সুচিহ্নিত করা হয়েছে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদেরকে। অথবা

www.eelm.weebly.com

অংশীবাদীদের বাতিল উপাস্যসমূহ ও প্রকৃত উপাস্য আল্লাহ্‌কে। শেষে এই মর্মে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, তাহলে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা কি সমান? অথবা কি সমতুল অবিশ্বাসীদের নিঃসাড় প্রতিমা ও চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌?

এখানে 'আব্‌কামু' অর্থ জন্মাবধি মুক বা নির্বাক। বুদ্ধি ও বাকশক্তি রহিত। 'লা ইয়াক্বদিরু আলা শাইয়িন' অর্থ কোনো কিছুরই শক্তি রাখে না। অর্থাৎ কর্মক্ষমতা রহিত। 'কাল্‌লুন' অর্থ ভার বা বোঝা । 'মাওলা' অর্থ অভিভাবক বা প্রভু। 'লা ইয়া'তি বিখইর' অর্থ সে ভালো কিছু করে আসতে পারে না। এভাবে উপমা স্থাপন করা হয়েছে অবিশ্বাসীদের অথবা তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর। ওই জড় প্রতিমাগুলো মুক, শক্তিহীন ও কর্মক্ষমতারহিত। আর সেগুলো তাদের জন্য অযথা একটি বোঝাও বটে। কারণ সেগুলোর পরিচর্যা, স্থানান্তর, রক্ষণাবেক্ষণ— সকল কিছু তাদেরকেই করে দিতে হয়। এই কথাগুলো আলোচ্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে— 'আল্লাহ্‌ আরো উপমা দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির : তাদের একজন মুক, কোনো কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার প্রভুর ভারস্বরূপ; তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেনো, সে ভালো কিছুই করে আসতে পারে না; সে কি সমান হবে ওই ব্যক্তির, যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে?'

এখানে 'সিরাতুম্‌ মুসতাক্বীম' অর্থ সহজ সরল পথ, যা সুনিশ্চিত গন্তব্যাভিসারী। 'মাঁইইয়া'মুরু বিল আদ্‌লি' অর্থ যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয়। কথাটির মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর নিজের উপমা দিয়েছেন। কেউ কেউ আবার বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে। হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করে আতা বলেছেন, এখানে 'তাদের একজন মুক' কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে কাফেরদেরকে এবং মুমিনদেরকে বুঝানো হয়েছে 'যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয়' কথাটির মাধ্যমে।

আলোচ্য আয়াতের অবতরণের প্রেক্ষিত সম্পর্কে আতা বলেছেন, এখানে 'মুক' বলা হয়েছে উবাই বিন খালফ্‌কে আর 'যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয়' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত হামযা, হজরত ওসমান বিন আফফান এবং হজরত ওসমান বিন মা'জুনকে। মুকাতিল বলেছেন, রবীয়া গোত্রভূত হাসেম বিন আমর বিন হারেস ছিলো রসুল স. এর প্রাণের শত্রু। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তার সম্পর্কে। হজরত ইবনে আব্বাসের মন্তব্য উল্লেখ করে ইবনে জারীর বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে জনৈক কুরায়েশ ও তার ক্রীতদাস সম্পর্কে। আর 'আল্লাহ্‌ আরো উপমা দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির' এ কথা বলে বুঝানো হয়েছে হজরত ওসমান ও তাঁর ক্রীতদাস উসায়েদ সম্পর্কে। সে ছিলো ইসলামের ঘোর দুশমন। বিভিন্নভাবে সে মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করতো।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, একদল লোক ছিলো পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকারকারী। তারা এ নিয়ে প্রায়শঃই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো। বলতো, পুনরুত্থান যখন হবেই, তখন তাড়াতাড়ি হয় না কেনো? তখন তাদের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৭৭, ৭৮

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহেরই এবং কিয়ামতের ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায়, বরং উহা অপেক্ষাও সত্বর । আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❑ এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্গত করিয়াছেন তোমাদিগের মাতৃগর্ভ হইতে এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানিতে না। তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্রই।' একথার অর্থ— আকাশ ও পৃথিবীর সকল অদৃশ্য জ্ঞান (এলমে গায়েব) কেবলই আল্লাহ্র। এই অদৃশ্য জ্ঞান সম্পূর্ণতই তাঁর সত্তা সম্পৃক্ত। অবশ্য তিনি তাঁর প্রিয়ভাজনগণকে কখনো কখনো এ সম্পর্কে কিঞ্চিত অবহিত করে থাকেন । অর্থাৎ তিনি এই জ্ঞান সম্পর্কে যাকে যতটুকু জানান সে ততটুকুই জানে। সুরা জ্বিনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কিয়ামতের ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও সত্বর।' একথার অর্থ— মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান চোখের পলক ফেলার মতো একটি বিষয় অথবা চোখের পলক ফেলতে যে সময় লাগে, তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে তিনি তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম।

এখানে 'লামহুন' অর্থ চোখের পলক। কামুস অভিধানে এরকম বলা হয়েছে। আমি বলি, এভাবে উদ্ধৃত বক্তব্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— বজ্রপাতের ফলে মুহূর্তমধ্যে যেমন দৃষ্টি ঝলসে যায়, কিয়ামতের বিষয়টি সেরকমই। বায়যাবী

www.eelm.weebly.com

লিখেছেন, ‘লামহুন’ অর্থ চোখের উপরের পাতা ও নিচের পাতা মিলিত হওয়ার মুহূর্তে চোখ ঝলসে যাওয়া। চোখের পলকের চেয়েও কম সময় বুঝানোর জন্যই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেই অর্থে।

‘আও হুয়া আক্‌রাবু’ অর্থ বরং তা অপেক্ষাও সত্বর । অর্থাৎ চোখের পলক অপেক্ষাও অতি দ্রুত অনুষ্ঠিত হবে কিয়ামত। আল্লাহ্‌পাক তখন তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে মুহূর্তাপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে ধ্বংস করে দিবেন। আবার ‘কুন্‌’ (হও) বলার সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হবে পুনরুত্থান। সৃষ্টি পুনরায় ফিরে পাবে তার অস্তিত্ব।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।’ একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র ক্ষমতা সর্বত্রগামী। তিনি সর্বশক্তিধর। সৃষ্টির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব তাঁর সেই অপার ক্ষমতার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

পরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— ‘এবং আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়।’ একথার অর্থ— হে মানুষ! অনুধাবন করতে চেষ্ট করো, কীভাবে এই পৃথিবীতে এসেছো তোমরা। তোমরা তো তোমাদের মাতৃগর্ভে ছিলে শ্রুতি, দৃষ্টি ও বোধবিবর্জিত অবস্থায়। তারপর আমিই তোমাদেরকে দিয়েছি শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয়।

এখানে ‘আস্‌সামআ’ অর্থ ইস্‌মায়্‌ (জ্ঞানাহরণের উপকরণ)। শব্দটি জাতিবাচক ও বহুবচনবোধক। অর্থাৎ তোমরা প্রথমে আংশিক জ্ঞান লাভ করো অনুভূতির মাধ্যমে। পরে ওই অপরিণত অনুভূতি পরিণত হয় গভীর, গভীরতর বোধে।

শেষে বলা হয়েছে— ‘যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।’ একথার অর্থ— শ্রুতি, দৃষ্টি ও উপলব্ধির মাধ্যমে যে জ্ঞান আমি তোমাদেরকে দান করি, তা তোমাদের প্রতি আমার একটি অপার অনুগ্রহ। অতএব এটা তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক যে, তোমরা অবশ্যই এই দানের মর্যাদা রক্ষা করবে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে প্রকাশ্যে ও গোপনে।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৭৯

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ۖ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

❒ তাহারা কি লক্ষ্য করে না বিহংগের প্রতি যে আকাশের শূন্যগর্ভে সহজে বিচরণ করে? আল্লাহ্‌ই উহাদিগকে স্থির রাখেন। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে—'তারা কি লক্ষ্য করে না, বিহংগের প্রতি, যে আকাশের শূন্যগর্ভে সহজে বিচরণ করে? আল্লাহ্ই তাদেরকে স্থির রাখেন।' একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমরা আকাশের উড়ন্ত বিহঙ্গমকুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করো না কেনো? কেনো বুঝতে চেষ্টা করো না যে, তাদের শূন্যমার্গের ওই উড্ডয়নকে আমিই তো নির্বিঘ্ন রাখি। বলো, এই অসম্ভব বিষয়টি কি আমার অপার মহিমা ও ক্ষমতার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত নয়?

'মুসাখ্খরাত্' অর্থ ডানা বা পালক। আল্লাহ্পাকই পক্ষিকুলকে এই উড্ডয়নোপকরণ দু'টো দান করেছেন। তাই তারা উড়তে পারে আকাশমার্গে। 'জাওইস্ সামায়ি' অর্থ আকাশের শূন্যগর্ভ। হজরত কা'ব আহবারের উক্তি উল্লেখ করে বাগবী বলেছেন, পক্ষীকুল বারো মাইল উপরে আকাশে উড়তে সক্ষম। এর উপরে তারা উড়তে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।' উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বের আয়াতসমূহে বলা হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শী, গবেষক ও জ্ঞানবানদের কথা। বর্ণিত নিদর্শনাবলী থেকে তাদের উপকার প্রাপ্তির কথা। আর এখানে বলা হলো বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের কথা। বলা হলো, দ্যাখো হে বিশ্বাসীবৃন্দ! স্থূল ও ভারী দেহবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পাখিরা কীভাবে আকাশের শূন্যগর্ভে উড়াল দিতে সক্ষম। তাদেরকে এভাবে উড়বার শক্তি দিয়েছেন কে? মহাকুশলী ও মহাশক্তিধর আল্লাহ্ ছাড়া কি অন্য কেউ? তিনিই তো এভাবে ঘটিয়েছেন ভূচর ও খেচর প্রাণীসমূহের এক অবাক সমন্বয়। তাঁর প্রতি যারা একনিষ্ঠ বিশ্বাস রাখে, তারাই তো বুঝতে পারে এই বিস্ময়কর নিদর্শনটির প্রকৃত তত্ত্ব।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৮০, ৮১

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ○

www.eelm.weebly.com

❐ এবং আল্লাহ্ তোমাদিগের গৃহকে করেন তোমাদিগের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদিগের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন; তোমরা ভ্রমণকালে উহা সহজে বহন করিতে পার এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাইতে পার, এবং তিনি তোমাদিগের জন্য ব্যবস্থা করেন উহাদিগের পশম, লোম ও কেশ হইতে কিছু কালের জন্য ব্যবহার্য গৃহ-সামগ্রী।

❐ এবং আল্লাহ্ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে তিনি তোমাদিগের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদিগের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদিগের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের; উহা তোমাদিগকে তাপ হইতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদিগের জন্য বর্মের, উহা তোমাদিগকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এইভাবে তিনি তোমাদিগের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাহাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন; তোমরা ভ্রমণকালে তা সহজে বহন করতে পারো এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাতে পারো।' এখানে 'পশুচর্মের তাঁবু ' অর্থ পশুচর্ম নির্মিত তাঁবু বা পশমনির্মিত তাঁবু। পশম সব সময় চামড়ালগ্ন থাকে বলেই পশুচর্মকে পশম বলা যেতে পারে। 'ইয়াওমা জ'নিকুম' অর্থ তোমাদের ভ্রমণকালে বা প্রবাসজীবনে। আর 'ইয়াওমা ইক্বামাতিকুম' অর্থ স্বগৃহে বা আবাসস্থলে অবস্থানকালে। 'অবস্থানকালে সহজে খাটাতে পারো' কথাটির অর্থ ভ্রমণপথের কোথাও স্থাপন করতে পারো শিবির।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন তাদের পশম, লোম ও কেশ থেকে কিছুকালের জন্য ব্যবহার্য গৃহ-সামগ্রী।' 'সুফুন' অর্থ ভেড়া বা দুম্বার লোম। উট থেকে পাওয়া যায় নরম পশম। ছাগল থেকে পাওয়া যায় ওবাল্। এ সকল কিছুই হচ্ছে ব্যবহার্য গৃহ-সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত। আর ব্যবহার্য গৃহ-সামগ্রী বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'আছাছা' শব্দটি। শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হয় না। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'মাতায়্' অর্থ বাণিজ্যিক পণ্য। 'ইলাহীন্' অর্থ অস্থাবর সম্পত্তি, যে সম্পত্তির স্থায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের উপর।

পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন।' একথার অর্থ— বৃক্ষরাজি, পর্বতমালা ও গৃহসমূহের ছায়াঘন পরিবেশে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করি প্রখর সূর্যকিরণ থেকে। পর্বত গুহাসমূহেও তোমরা রচনা করতে পারো তোমাদের আশ্রয়স্থল। এখানকার 'আকনানা' শব্দটি কিন্নুন' এর বহুবচন। এর অর্থ আশ্রয়স্থল।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের, তা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের, তা তোমাদেরকে যুদ্ধ থেকে রক্ষা করে।' একথার অর্থ— শীতাতপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনিই তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন শীত অথবা তাপরোধক গাত্রাবরণ। আবার ব্যবস্থা করেন বর্মের, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর আঘাত থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ করো।' একথার অর্থ— হে মানুষ এতক্ষণ ধরে আলোচিত অনুগ্রহরাজি তোমাদের প্রতি আমার অপার দয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। এভাবেই আমি তোমাদের প্রতি আমার দানকে পূর্ণ করে দিয়েছি। এই পূর্ণতার অনন্য উপসংহার হচ্ছেন আমার শেষতম রসুল। তাঁকে আমি সজ্জিত করেছি অসংখ্য মোজেজা দ্বারা। তাঁর উপরে অবতীর্ণ করেছি মহাকল্যাণের আলোকবর্তিকা মহাগ্রন্থ আলকোরআন। উত্তরোত্তর সফলতা দান করেছি মানুষের একমাত্র আচরণীয় ধর্ম ইসলামকে। এরকম করেছি এজন্যে যে, মানুষ যেনো সহজে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে মহামানবতার ধর্ম ইসলামের চিরসুবাসিত সুশীতল ছায়াতলে। হতে পারে আত্মসমর্পিত ও বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী।

আতা খোরাসানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা তুলে ধরেছেন তৎকালীন আরবের প্রতিবেশ, যাতে করে তখনকার আরববাসীরা একথা বুঝে নিতে পারে যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ কতো বিপুল, কতো বিস্তৃত। লক্ষণীয় যে, এখানে দিগন্ত বিস্তৃত ধূ ধূ মরুভূমির কথা উল্লেখিত হয়নি। উল্লেখ করা হয়েছে পাহাড়-পর্বতের কথা। আবার তাদের অন্যতম প্রধান জীবিকার মাধ্যম ছিলো পশুপালন। তাই উল্লেখ করা হয়েছে, পশুর চামড়া, চামড়া নির্মিত তাঁবু, পশম ও এ সকল কিছুর দ্বারা নির্মিত বিভিন্ন সাংসারিক সামগ্রীর কথা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আর তিনি স্বর্গগিরি থেকে তুষারপাত ঘটান।' লক্ষণীয় যে, আকাশ থেকে বরফ পড়ার কথা এখানে বলা হয়নি। অথচ পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে তুষারপাত অপেক্ষা বরফপাত হয় বেশী। আরো উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'পরিধেয় বস্ত্রের, তা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে।' আরবের মানুষকে প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে আত্মরক্ষা করে চলতে হয়। তাই 'শীত থেকে' না বলে এখানে বলা হয়েছে 'তাপ থেকে'।

www.eelm.weebly.com

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُونَ ○

❒ অতঃপর উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্ট বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া।

❒ উহারা আল্লাহের অনুগ্রহ জ্ঞাত আছে; কিন্তু সেগুলি উহারা অস্বীকার করে এবং উহাদিগের অধিকাংশই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! মানুষের প্রতি আমার অনুগ্রহসমূহের স্পষ্ট বিবরণ প্রদানের পরও যদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সত্যধর্ম গ্রহণ করতে অনীহ হয়, তবে এ বিষয়ে আপনার করনীয় কিছুই নেই। আপনি আমার প্রিয়তম বাণীবাহক। সুতরাং আমার স্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করুন। অবিশ্বাসীদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে ব্যথিত হবেন না।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলো এক বেদুইন। রসুল স. তার সম্মুখে পাঠ করলেন 'এবং আল্লাহ্ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল।' বেদুইন বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন। রসুল স. পুনরায় পাঠ করলেন 'এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন; তোমরা ভ্রমণকালে তা সহজে বহন করতে পারো এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাতে পারো।' বেদুইন বললো, যথার্থ। এভাবে রসুল স. একে একে মানুষের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহরাজির বিবরণ সম্বলিত আয়াতগুলো পাঠ করলেন। প্রতিটি আয়াতের আবৃত্তি শেষে বেদুইন বলতে লাগলো, ঠিক ঠিক। ঠিকই বলেছেন আপনি। সবশেষে তিনি স. পাঠ করলেন 'এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ করো।' এই আয়াত শুনেই বেদুইন অতি দ্রুত প্রস্থান করলো সেখান থেকে। তখন অবতীর্ণ হলো 'অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেয়া।'

পরের আয়াতে (৮৩) বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ জ্ঞাত আছে, অতঃপর সেগুলো তারা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারী।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আমার অনুগ্রহের কথা ভালো করেই জানে, কিন্তু তা স্বীকার করে না। সুতরাং বলতে হয়, তারা জেনে শুনেই আমার একক উপাস্য হওয়ার বিষয়টি অমান্য করে। অন্যের

www.eelm.weebly.com

উপাসনা করে প্রমাণ করে যে, তাদের ওই মিথ্যা উপাস্যগুলোই অনুগ্রহদাতা। এভাবে লালন করে চলে অংশীবাদিতাকে। সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্র অনুগ্রহ' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর নবুয়তকে। যদি তাই হয়, তবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— হে আমার রসুল! তারা ভালো করেই জানে যে, আপনি আমার সত্য রসুল। কিন্তু একগুঁয়েমি, জিদ ও হঠকারিতার কারণে তারা আপনাকে অস্বীকার করে। আর তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী।

একটি সম্ভাব্য সন্দেহঃ অংশীবাদীরা পূর্ব থেকেই ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। অথচ এখানে বলা হয়েছে 'ছুম্মা ইয়ুনকিরুনা লাহা' (অতঃপর তারা সেগুলো অস্বীকার করে)। এতে করে কি একথাই প্রমাণিত হয় না যে, প্রথমে সত্যকে স্বীকার করার পরে তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে?

সন্দেহের অপনোদনঃ 'ছুম্মা' শব্দটি এখানে কালের দূরত্বকে প্রকাশ করেছে। কখনো কখনো আবার শ্রেণীভেদজনিত পার্থক্য প্রকাশের জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কোনো কিছু জানা সত্ত্বেও অস্বীকার করা অবাস্তব কিছু নয়। জানাও তো এক ধরনের স্বীকৃতি। এ কারণেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ছুম্মা' শব্দটি।

আল্লামা বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য সুরায় আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে প্রদত্ত যে সকল নেয়ামতের কথা বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অবশ্যই সেগুলোর কথা জানতো। কিন্তু সেগুলোর উল্লেখ করে যখনই তাদেরকে বলা হলো, তাহলে এবার নেয়ামতদাতাকে মানো, কার্যকর করো তাঁর বিধানাবলী, তখনই তারা অস্বীকার করে বসলো। বললো, আমরা তো এসকল কিছু পেয়েছি আমাদের পিতৃপুরুষগণের নিকট থেকে।

কালাবী বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজির কথা জানানোর পর যখন প্রশ্ন করা হলো, বলো এগুলো তোমাদেরকে কে দিয়েছেন? তারা বললো, আল্লাহ্। তবে এগুলো আমরা পেয়েছি আমাদের দেব-দেবীদের মধ্যস্থতায়। আউন বিন আবদুল্লাহ্ বলেছেন, নেয়ামতরাজিকে অস্বীকার করার অর্থ নেয়ামত প্রাপ্তির বাস্তব সম্পর্ককে প্রকাশ্য কার্যকরণ নীতি বা মাধ্যমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। যেমন বলা হয়— যদি এরূপ না হতো তবে ওইরূপ হতো না। যদি অমুকে ব্যবস্থা না নিতো তবে এগুলো পাওয়া যেতো না। এরকম ধারণা অংশীবাদিতার নামান্তর।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তাদের অধিকাংশই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।' একথার অর্থ— তাদের দলের সকল লোক অথবা অধিকাংশ লোক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এখানে অধিকাংশ বলার কারণ এই যে, সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জেনে শুনে সত্য প্রত্যাখ্যান করে না। তাদের কেউ কেউ

www.eelm.weebly.com

বোধ বুদ্ধিসম্পন্ন নয়। বিষয়টির মূল তত্ত্ব সম্পর্কে তারা অনবহিত। অথবা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিধারী। গভীরভাবে কোনো কিছু পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করার ক্ষমতা তারা রাখে না। আবার তাদের মধ্যে রয়েছে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা এবং উন্মাদ। তাদের উপরে বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং শরিয়তের দায়িত্ব বর্তায় না। এভাবে দেখলে বোঝা যায়, তাদের সকলেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী পদবাচ্য নয়। তবে অধিকাংশই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

সুরা নাহল ঃ আয়াত ৮৪, ৮৫, ৮৬

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ ۖ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

❐ যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক একজন সাক্ষী উত্থিত করিব সেদিন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে কৈফিয়ত দিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না এবং উহাদিগকে আল্লাহের সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হইবে না।

❐ যখন সীমালংঘনকারিগণ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উহাদিগের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং উহাদিগকে কোন বিরাম দেওয়া হইবে না।

❐ অংশীবাদিগণ, যাহাদিগকে আল্লাহের শরীক করিয়াছিল তাহাদিগকে যখন দেখিবে তখন তাহারা বলিবে; 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! ইহারাই তাহারা, যাহাদিগকে আমরা তোমার শরীক করিয়াছিলাম, যাহাদিগকে আমরা আহ্বান করিতাম তোমার পরিবর্তে;' অতঃপর, তদুত্তরে উহারা বলিবে, 'তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পুনরুত্থান দিবসে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নবী-রসুলগণকে ওই সকল সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী করবো। তারা তখন সত্য সাক্ষ্য উপস্থাপন করবে। ফলে অবিশ্বাসীরা তাদের পক্ষে কোনো কৈফিয়ত বা অজুহাতই খুঁজে পাবে না। তদুপরি এরকম কোনো সুযোগও তাদেরকে দেয়া হবে না। ফলে তারা আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তোষ লাভের কোনো উপায়ই আর পাবে না।

 www.eelm.weebly.com

এখানে 'শাহীদ' অর্থ সাক্ষী। অর্থাৎ নবী-রসুলগণ। 'কৈফিয়ত দেয়ার অনুমতি দেয়া হবে না' অর্থ অজুহাত উপস্থাপনের কোনো সুযোগই দেয়া হবে না। অর্থাৎ তাদের নিকট তখন অজুহাত পেশ করার কোনো কিছুই থাকবে না। অথবা অর্থ হবে এরকম— তাদেরকে তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগই দেয়া হবে না। তাই তারা তখন কিছুই বলতে পারবে না। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হবে— তারা তখন পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের অভিলাষ প্রকাশ করবে। কিন্তু অনুমতি দেয়া হবে না।

'ওয়ালা হুম ইউস্‌তা'তাবুন' কথাটির অর্থ তাদের তখন কোনো পুণ্যকর্ম করার সুযোগ থাকবে না। তাই এখানে বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের সুযোগ দেয়া হবে না।' মোট কথা, তখন আল্লাহ্‌পাকের সন্তোষলাভ হবে তাদের পক্ষে অসম্ভব।

পরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'যখন সীমালংঘনকারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোনো বিরাম দেয়া হবে না।' এ কথার অর্থ— ওই সকল সীমালংঘনকারীরা তখন প্রত্যক্ষ করবে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি। তাদেরকে প্রবেশও করানো হবে সেখানে। তারা চাইলেও তাদের শাস্তি তখন এতটুকুও লাঘব করা হবে না। আর শাস্তিও হবে বিরামহীন।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'অংশীবাদীরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক করেছিলো, তাদেরকে যখন দেখবে তখন বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! এরাই তারা, যাদেরকে আমরা তোমার শরীক করেছিলাম, যাদেরকে আমরা আহ্বান করতাম তোমার পরিবর্তে।' একথার অর্থ— মহাবিচারের দিন মূর্তিপূজকেরা তাদের উপাস্য প্রতিমাগুলোকে দেখতে পেয়ে উপায়ন্তর না দেখে বলবে, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! এরাই ছিলো আমাদের স্বেচ্ছানির্বাচিত উপাস্য। তোমাকে ত্যাগ করে আমরা এ সকলকে গ্রহণ করেছিলাম আমাদের প্রভুপ্রতিপালকরূপে। উল্লেখ্য যে, অংশীবাদীরা তখন এরকম বলতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ সত্যস্বীকৃতি দেয়া ছাড়া কোনো উপায়ন্তর তখন তাদের থাকবে না। অথবা তারা তখন এভাবে দোষ স্বীকার করবে এই আশায় যে, এতে করে যদি শাস্তি কিছুটা শিথিল হয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'অতঃপর তদুত্তরে তারা বলবে, তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।' এ কথার অর্থ— তখন তাদের পূজিত প্রতিমাগুলো হবে বাকশক্তিসম্পন্ন। বলবে, তোমরাই তো আমাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক নির্বাচিত করেছিলে। অথবা আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে এরকম— প্রস্তর মূর্তিগুলো তখন বলবে, তোমাদের দাবি মিথ্যা, তোমরা প্রকৃত অর্থে আমাদের উপাসনা কখনোই করোনি। তোমরা তো পূজা করেছিলে তোমাদের প্রবৃত্তির। আমরা কি কখনো

বলেছিলাম যে, তোমরা আমাদের পূজা অর্চনা করো? অপর এক আয়াতে একথার সমর্থন বিদ্যমান। যেমন— 'ইয়াকফুরুনা বি ইবাদাতিহিম' (অচিরেই প্রতিমাগুলো অংশীবাদীদের উপাস্য হওয়াকে অস্বীকার করবে)। কিংবা বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— মূর্তিগুলো বলবে, তোমরা মিথ্যা কথা বলছো। আমরা তো তোমাদেরকে এই মর্মে কখনোই উৎসাহিত করিনি যে, তোমরা আমাদের উপাসনা করো, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করো, অথবা এ রকমও বলিনি যে, আমাদের পূজা করতে তোমরা বাধ্য। অভিশপ্ত ইবলিস তখন বলবে, 'তোমাদের উপরে আমার পক্ষ থেকে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিলো না, তবে আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলাম। আর তোমরা সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে।'

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৮৭, ৮৮, ৮৯

وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ ِالسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ۝ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝

❑ সেই দিন তাহারা আল্লাহের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিবে এবং তাহারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করিত তাহা তাহাদিগের জন্য নিষ্ফল হইবে!

❑ আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করিব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণের ও আল্লাহের পথে বাধাদানকারীগণের; কারণ, তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করিত।

❑ সেই দিন আমি উত্থিত করিব প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাহাদিগেরই মধ্য হইতে তাহাদিগের বিষয়ে এক-একজন সাক্ষী এবং তোমাকে আমি আনিব সাক্ষীরূপে ইহাদিগের বিষয়ে। আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথ-নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিলাম।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অংশীবাদীরা তখন তাদের উপাস্যগুলোকে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে দেখে হতাশ হয়ে পড়বে। এভাবে তাদের মিথ্যা

 www.eelm.weebly.com

বিশ্বাস সম্পূর্ণ অপসারিত হতে দেখে তারা নিরুপায় হয়ে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে আল্লাহ্‌র নিকটে। কিন্তু তাদের তখনকার ওই উপায়হীন আত্মসমর্পণ হবে সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

পরের আয়াতে (৮৮) বলা হয়েছে— 'আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করবো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ও আল্লাহ্‌র পথে বাধাদানকারীদের; কারণ, তারাই অশান্তি সৃষ্টি করতো।' একথার অর্থ— যারা পৃথিবীতে ছিলো অবিশ্বাসী, অংশীবাদী ও সত্যধর্মের পথের অন্তরায়, আখেরাতে আমি তাদের শাস্তি ক্রমাগত বৃদ্ধিই করতে থাকবো। কারণ তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী।

এখানে 'আল্লাহ্‌র পথে বাধাদানকারী' অর্থ মানুষের ইসলাম গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতাসৃষ্টিকারী। অবিশ্বাসের দিকে উৎসাহ সৃষ্টিকারী। 'শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করবো' অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানের জন্য আমি তো তাদের শাস্তি দিবোই, তদুপরি আরো শাস্তি দিবো আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ 'আজাবান' (শাস্তি) কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— দোজখের বৃশ্চিকগুলো হবে দীর্ঘ খেজুর বৃক্ষের মতো লম্বা। হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে উন্নত সূত্রে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন ইবনে মারদুবিয়া। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, দোজখে থাকবে এক ধরনের সাপ। সেগুলোর আকৃতি হবে বৃহৎ উট সদৃশ। আর সেখানকার বৃশ্চিকগুলো হবে খচ্চর সদৃশ। তাদের একবার দংশনের যন্ত্রণা অনুভূত হতে থাকবে চল্লিশ বছর ধরে।

হজরত ইবনে আব্বাস ও মুকাতিল বলেছেন, আরশের নিম্নদেশ থেকে প্রবাহিত হতে থাকবে গলিত লোহা ও তামার পাঁচটি লাভাস্রোত। ভয়ংকর আগুনের মতো উত্তপ্ত ওই লাভা-নির্ঝরিণীতে নিক্ষিপ্ত ও নিমজ্জিত হবে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা। তারা কেউ অবগাহন করবে তিনটি লাভাস্রোতে। আর কেউ অবস্থান করবে দু'টিতে। এভাবে পালাক্রমে তাদের শাস্তি চলতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করা হবে এভাবে— কিছুকাল তাদেরকে দেয়া হবে অগ্নিশাস্তি। আবার শৈত্য-শাস্তি দেয়া হবে কিছুকাল। এভাবে কিছুটা স্বস্তির আশায় উত্তাপ থেকে শীতলতার দিকে, আবার শীতলতা থেকে উত্তাপের দিকে যেতে চাইবে তারা।

এখানকার 'অশান্তি সৃষ্টি করতো' কথাটির অর্থ হবে— তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়াতো।

এর পরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'সেদিন আমি উত্থিত করবো প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাদেরই মধ্য থেকে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী এবং তোমাকে আমি আনবো সাক্ষীরূপে তাদের বিষয়ে। আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করলাম।'

www.eelm.weebly.com

এখানে 'শাহীদ' অর্থ প্রত্যেক উম্মতের নবী। 'হাউলাই' অর্থ ইসলামী দল। 'তিবইয়ানান' অর্থ স্পষ্ট ব্যাখ্যা বা বলিষ্ঠ বিবরণ। 'লিকুল্লি শাই' অর্থ প্রত্যেক বিষয়ে— সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তারিতরূপে। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তোমাদের রসুল যা তোমাদেরকে দান করেছেন, তা গ্রহণ করো। আর যা বারণ করেছেন, তা পরিত্যাগ করো। আর যারা বিশ্বাসীদের পথ ব্যতীত অন্য পথাভিমুখী হয়, আমি তাদেরকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেই। হে দূরদর্শী! অনুধাবন করো।'

'হুদা' অর্থ বিপথ থেকে সুপথের দিকে পরিচালন। অর্থাৎ পথ-নির্দেশক। 'রহমাতান্' অর্থ সার্বজনীন কৃপা, করুণা বা দয়া। যে ব্যক্তি সংকীর্ণচিত্ত ও বিপথগামী, কেবল সে-ই বঞ্চিত হয় এই অযাচিত করুণা থেকে।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৯০

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

❐ আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের কথা। এখানে 'আদল' (ন্যায়পরায়ণতা) শব্দটির অর্থ— সমান্তরাল বা সমতুল অবস্থা। কোরআন মজীদের অন্যান্য আয়াতেও শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— 'আও আদলু জালিকা সিয়ামান্' (অথবা তার সমতুল রোজা), 'ওয়া আন্ তা'দিলু বাইনান নিসায়ি' (আর এই ললনাকুলের মধ্যে সমতা রক্ষা করো)। এই অর্থে ফিদিয়া ও বিনিময়কেও বলা হয় আদল। এভাবে আলোচ্য বাক্যের 'আদল' শব্দটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন ন্যায়পরায়ণতা রক্ষার জন্য বা সমান্তরাল অবস্থা বজায় রাখার জন্য— সততার বিনিময়ে সততা এবং অসততার বিনিময়ে অসততা দ্বারা। সুতরাং বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে হবে। কারো প্রতি পক্ষপাত করা যাবে না। সিদ্ধান্ত দিতে হবে আল্লাহ্তায়ালার বিধানের প্রেক্ষিতে।

'আদল' এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে 'ইহসান' (সদাচরণ) কথাটি। সমতা রক্ষা করার নাম যদি 'আদল' হয়, তবে ইহসানের অর্থ হবে এরকম— উত্তমের বিনিময়ে অত্যুত্তম এবং অনুত্তমের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত কম উত্তম। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা উত্তম আচরণের বিপরীতে

www.eelm.weebly.com

করো অধিকতর উত্তম আচরণ। আর নিকৃষ্ট আচরণের বদলা নাও অপেক্ষাকৃত কম নিকৃষ্ট আচরণের দ্বারা। এভাবে ন্যায়পরায়ণতা যদি হয় বাদী-বিবাদীর মধ্যে পক্ষপাত না করা, তবে সদাচরণ বলা যাবে আল্লাহ্পাকের বিধানানুসারে মীমাংসা করাকে।

আমি বলি, সত্যের উপরে দৃঢ় অবস্থান নেয়াকে বলে 'আদল।' জুলুম ও বক্রতার বিপরীত জ্ঞানের নামও 'আদল।' কামুস প্রণেতা লিখেছেন, ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে অত্যাচারের বিপরীত অবস্থা। স্বভাবজাত সারল্যের সুদৃঢ় রূপই হচ্ছে 'আদল।' কোনো কোনো বিদ্বজ্জন আদল বা ন্যায়পরায়ণতা বলেছেন মধ্যম পন্থাকে। অশোভন কোনো গুণকে আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কিত করা অথবা কাউকে বা কোনো কিছুকে তাঁর গুণবত্তার অংশীদার বা সমকক্ষ মনে করার নাম শিরিক। এই উভয় অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থার নাম তওহীদ বা আল্লাহ্র অদ্বিতীয়ত্ব। অর্থাৎ তিনি যেমন গুণবিবর্জিত নন, তেমনি সৃষ্টির কেউ বা কোনোকিছু তাঁর মতো নয়। তিনি আনুরূপ্যবিহীন। সুতরাং অংশীবিহীন। এক ও অবিভাজ্য। অস্তিত্বে, গুণাবলীতে ও কার্যকলাপে।

মানুষের সাফল্য ও সুষম অর্জনও নির্ভর করে এই ন্যায়পরায়ণতার উপরে। কারণ সে জড়পদার্থতুল্য নিষ্ক্রিয় যেমন নয়, তেমনি যা খুশী তাই করার ক্ষমতাও সে রাখে না। সে তার কর্মসম্পাদনকারী। কিন্তু তার কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ্। কারণ তিনিই সকল কিছুর একক স্রষ্টা। এভাবে সৃষ্টি আল্লাহ্র সঙ্গে এবং অর্জন তাঁর বান্দার সঙ্গে সম্বন্ধিত।

আল্লাহ্র অধিকার এবং তাঁর বান্দার অধিকার অক্ষুণ্ন থাকে— এরকম অবস্থায় অবস্থান গ্রহণের নামও ন্যায়পরায়ণতা। অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদতে এতো অধিক নিমজ্জিত হওয়া যাবে না, যাতে করে আল্লাহ্র বান্দাগণের অধিকার পরিত্যক্ত হয়। আবার পার্থিবতার প্রতি এতো বেশী ঝুঁকে পড়া যাবে না, যাতে করে আল্লাহ্র ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে। ন্যায়পরায়ণতার এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে আরো অনেক। যেমন কৃপণতা ও অপব্যয়িতার মধ্যবর্তী অবস্থার নাম দানশীলতা। অযথা আস্ফালন ও কাপুরুষতার মধ্যবর্তী অবস্থার নাম বীরত্ব। স্ত্রীসঙ্গ বর্জন ও ব্যভিচারের মধ্যবর্তী বৈধ যৌন চরিতার্থতার নাম পবিত্রতা।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তওহীদ বা এককত্ববাদ হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা এবং তা অত্যাবশ্যকরূপে পালন করা হচ্ছে ইহসান বা সদাচরণ। অপর এক সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যরূপে এসেছে বিশুদ্ধ তওহীদের নাম 'ইহসান।' রসুল স. এরশাদ করেছেন, তুমি তোমার প্রভুপ্রতিপালকের ইবাদত এমনভাবে করো যেনো তুমি তাঁকে দেখছো। যদি এরকম না হয়, তবে মনে কোরো তিনি তো তোমাকে দেখছেন। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

মুকাতিল বলেছেন, তওহীদ হচ্ছে 'আদল।' আর মানুষের সঙ্গে ঔদার্য ও শিষ্টাচার রক্ষার নাম 'ইহসান।' নফল কখনো ফরজের স্থলাভিষিক্ত নয়, কিন্তু তা ফরজের কিঞ্চিত ত্রুটিবিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তার ব্যয় গ্রহণ করবেন না, গ্রহণ করবেন না 'আদলকেও।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ তাঁর ফরজ, নফল কোনোটাই গ্রহণ করবেন না।

এরপর বলা হয়েছে— 'ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা অসৎকার্য ও সীমালংঘন।' আত্মীয়স্বজনকে দান করার অর্থ দরিদ্র আত্মীয়দের অভাব অভিযোগ পূরণ করা। 'ফাহ্শা' অর্থ অশ্লীলতা। সকল প্রকারের মন্দ কথা ও কার্যকলাপ অশ্লীলতার অন্তর্ভুক্ত।

হজরত আবুদল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন,'আলফাহ্শা' অর্থ ব্যভিচার এবং 'মুনকার' অর্থ ওই সকল অপকর্ম, শরিয়ত যে গুলোকে মন্দ বলে চিহ্নিত করেছে এবং সুস্থ বিবেকও যেগুলোকে মন্দ বলে জানে।

'আল বাগয়ি' অর্থ সীমালংঘন, আত্মম্ভরিতা। বায়যাবী লিখেছেন, 'ফাহ্শা' অর্থ যৌনোন্দ্রিয়ের যথেচ্ছব্যবহার বা ব্যভিচার। 'মুনকার' হচ্ছে ওই বিবেক বুদ্ধি বিবর্জিত অসৎকর্ম, যা ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় করা হয়। আর 'আল বাগয়ি' অর্থ আত্মগর্ব ও উন্নাসিকতা। মোট কথা ফাহ্শা, মুনকার ও বাগয়ি— এই তিনটি অসৎ স্বভাব সকল অসৎ কর্মের ভিত্তি। প্রতিটি অসুন্দর কর্ম এই তিনটির যে কোনো একটি থেকে উৎসারিত। একারণেই হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, কোরআন মজীদের এই আয়াতটি জামেয় (ব্যাপক অর্থবোধক)। হজরত ইবনে মাসউদের এই বক্তব্যটি সাঈদ বিন মানসুর লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'আল আদব' গ্রন্থে। 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন বায়হাকী। মোহাম্মদ বিন মানসুর থেকে উল্লেখ করেছেন বোখারী। আরো বর্ণনা করেছেন ইবনে মুনজির থেকে ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত। বোখারীর আদব অধ্যায়ে এবং আহমদ, ইবনে আবী হাতেম, তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতটিই ছিলো ওসমান ইবনে মাজউনের ইসলাম গ্রহণের উপলক্ষ।

বাগবী লিখেছেন, সুফিয়ান বিন উয়াইনিয়া বলেছেন, অন্তর ও বাহির এক হওয়ার নাম 'ইহসান।' বাহ্যিক অবস্থা অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ অবস্থা উত্তম হলে তাকে বলা হবে 'ইহসান।' আর অভ্যন্তরীণ অবস্থা অপেক্ষা বাহ্যিক অবস্থা বেশী প্রবল হলে তাকে বলা হয় 'ফাহ্শা' অথবা 'মুনকার।'

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।' একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে এ কারণেই উপদেশ দিয়ে থাকেন যে, তোমরা যেনো তা পালন করো। আঁকড়ে ধরো শুভকে এবং

www.eelm.weebly.com

পরিত্যাগ করো অশুভকে। এভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করে দাও সত্য ও মিথ্যার মধ্যে। বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত ছাড়া কোরআন মজীদে যদি আর কোনো আয়াত নাও থাকতো, তবুও কোরআন মজীদ সম্পর্কে বলা যেতো— তিব্ইয়ানান্ লি কুল্লি শাইইন ওয়া হুদাওঁ ওয়া রহমাতাঁও ওয়া বুশরা লিল মুসলিমীন (প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথ-নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করলাম)।

বাগবী লিখেছেন, আইয়ুবের বর্ণনাসূত্রে ইকরামার বক্তব্যরূপে এসেছে, রসুল স. একবার এই আয়াত ওলীদকে পাঠ করে শোনালেন। ওলীদ বললো, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। তুমি যা পড়লে তা আর একবার শোনাও। রসুল স. পুনরায় পাঠ করলেন। ওলীদ বলে উঠলো, আল্লাহ্র শপথ। এ যে দেখছি বিস্ময়কর অমিয় প্রবাহ। এই বাণীর শব্দ ও মর্ম অভূতপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত। এর বাইরের দিক অপার্থিব ফল ও ফসলে ভরা। আর এর ভেতরে রয়েছে অনন্ত সৌরভ।

সূরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৯১, ৯২, ৯৩

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ؕ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِىَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ؕ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ؕ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

❐ তোমরা আল্লাহের নামে অংগীকার করিলে অংগীকার পূর্ণ করিও এবং তোমরা আল্লাহ্কে তোমাদিগের জামিন করিয়া প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিবার পর উহা ভংগ করিও না। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা জানেন।

❐ অন্য দল অপেক্ষা শক্তিশালী হইবার উদ্দেশ্যে তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য তোমাদিগের শপথকে ব্যবহার করিয়া সেই নারীর মত হইও না, যে সুতা মজবুত হইবার পর উহা খুলিয়া ফেলিয়া তাহার সুতা কাটা নষ্ট করিয়া দেয়। আল্লাহ্ তো ইহা দ্বারা তোমাদিগকে কেবল পরীক্ষা করেন। তোমাদিগের যে-বিষয়ে মতভেদ আছে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাহা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন।

❐ ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যাহা কর সে-বিষয়ে অবশ্যই তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

এখান থেকে শুরু হয়েছে অঙ্গীকার বিষয়ক আলোচনা। 'আহদ' অর্থ অঙ্গীকার। প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার করলে অঙ্গীকার পূরণ কোরো এবং তোমরা আল্লাহ্কে তোমাদের জামীন করে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করবার পর তা ভঙ্গ কোরো না।'

হজরত বুরাইদা থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, সাহাবীগণ রসুল স. এর নিকটে বায়াতের যে অঙ্গীকার করেছিলেন, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে এখানে। বায়াতের অঙ্গীকারভঙ্গকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই আয়াতে। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'আহদ' অর্থ সাধারণ শপথ বা প্রতিজ্ঞা, যা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা বা ক্ষতিপূরণ অত্যাবশ্যক হয়। শা'বীও এরকম লিখেছেন। আল্লাহ্কে জামীন করে প্রতিজ্ঞা করার অর্থ এখানে বায়াতের শপথ করা অথবা সাধারণভাবে যে কোনো প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া। 'বা'দা তাওকীদিহা' অর্থ আল্লাহ্র নামে সুদৃঢ় অঙ্গীকার করার পর। 'কাফীলা' অর্থ বায়াতের সাক্ষী। কোনো কিছুর দায়িত্ব বহনকারী ও সংরক্ষণকারীকে বলে 'কাফীল।'

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তা জানেন।' এ কথার অর্থ— তোমরা তোমাদের কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো, না ভঙ্গ করো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ উত্তমরূপে অবহিত। মুজাহিদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে প্রাক ইসলামী যুগের শপথ সম্পর্কে।

পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— 'অন্য দল অপেক্ষা শক্তিশালী হবার উদ্দেশ্যে তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করবার জন্য তোমাদের শপথকে ব্যবহার করে ওই নারীর মতো হয়ো না, যে সুতা মজবুত হবার পর তা খুলে ফেলে তার সুতা কাটা বন্ধ করে দেয়।' এখানে 'গায্লাহা' অর্থ সুতা মজবুত করা। 'আনকাছা' অর্থ খুলে ফেলা বা টুকরো টুকরো করে দেয়া।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, আবু বকর বিন আবু হাফস্ বলেছেন, মক্কার সাঈদা আসাদিয়া নাম্নী এক উন্মাদিনী চুল ও খেজুর গাছের আঁশ সংগ্রহ করে ফিরতো। এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে ওই রমণীটির দৃষ্টান্ত।

 www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, রবতা বিনতে ওমর বিনতে সা'দ নাম্নী এক মস্তিষ্কবিকৃত মহিলা তার চরকায় প্রতিদিন দুপুর পর্যন্ত সুতা কেটে চলতো। দুপুরের পর আবার সেগুলো খুলে খুলে ফেলতো সে। ওই মহিলাকে আলোচ্য আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে শপথ ভঙ্গকারীদের উপমারূপে। বলা হয়েছে— প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রবঞ্চনা করবার উদ্দেশ্যে তোমরা শপথ কোরো না। যদি করো তবে তোমরা হবে ওই রমণীটির মতো, যে সুতা মজবুত করার পর আবার তা খুলে খুলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে। শপথ ভঙ্গ হওয়ার আশংকা থাকলে তোমরা শপথ কোরোই না। আর করে ফেললে অবশ্যই তা পূর্ণ কোরো।

এখানে 'দাখালা' অর্থ প্রবঞ্চনা, প্রতারণা বা ধোকা। আভিধানিক অর্থে একটি বস্তুর ক্ষতি করার মানসে তার মধ্যে আর একটি বস্তু প্রবেশ করানোকে বলে 'দাখাল।' এমতো ক্ষেত্রে 'দাখাল' বলা হবে প্রবিষ্ট বস্তুটিকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন,'দাখাল' ও 'দাগাল' সমার্থক। কথা দু'টোর প্রকাশ্য অর্থ অঙ্গীকারকারী, আর অন্তর্নিহিত অর্থ অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। 'আরবা' অর্থ সংখ্যা ও সম্পদ উভয় ক্ষেত্রে প্রাবল্য।

মুজাহিদ বলেছেন, মূর্খতার যুগে একটি গোত্র বা দল অপর একটি গোত্র বা দলের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগী হবে বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতো। পরে যখন দেখতো তাদের মিত্রশক্তির প্রতাপ তেমন যথেষ্ট নয়, তখন তারা প্রবঞ্চনা করে ওই মিত্রের শত্রুর সঙ্গে গিয়ে মিলতো। এভাবে ভঙ্গ করতো অঙ্গীকার। মুজাহিদের এই বক্তব্যের আলোকে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পরেও প্রবঞ্চনা করে তোমাদের মিত্রকে ত্যাগ করে তাদের শত্রুর সঙ্গে হাত মিলাও— এটা ঠিক নয়। তোমরা তো তাহলে ওই রমণীর মতোই হলে যে সুতা মজবুত করার পরে আবার তা খুলে ফেলে। অথবা মর্মার্থ হতে পারে এ রকম— শপথবাক্য উচ্চারণ করে এক দলের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হওয়ার পর তোমরা তোমাদের মিত্রশক্তির সামরিক ও সামাজিক পরাক্রমহীনতাকে তোমাদের শপথভঙ্গের অজুহাত হিসেবে দাঁড় কোরো না। উল্লেখ্য যে, সমরশক্তিকে প্রধান বিবেচ্য বিষয় করে এখানে শপথ ভঙ্গ করাকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পরে কুরায়েশেরা যখন দেখলো, মুসলমানদের চেয়ে তাদের শক্তি বেশী, তখন তারা দু'বছর যেতে না যেতে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে ফেললো। এরকম চুক্তিভঙ্গকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তো ইহা দ্বারা তোমাদেরকে কেবল পরীক্ষা করেন। তোমাদের যে বিষয়ে মতভেদ আছে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিবেন।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাকই এক দলকে অন্য দল অপেক্ষা অধিক শৌর্য বীর্য দান করেছেন। মানুষকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তিনি এরকম করেছেন। কেউ শপথ ভঙ্গ করে কিনা তা বাস্তব জগতে প্রকাশ করে দেয়াই এমতো পরীক্ষার উদ্দেশ্য। সম্মুখে প্রতিফল দিবস তো রয়েছেই। ওই দিন

www.eelm.weebly.com

তিনি স্পষ্ট করে দিবেন অঙ্গীকার রক্ষাকারী ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের পরিণতি। তখন অতি অবশ্যই পুরস্কৃত করা হবে শপথ রক্ষাকারীদেরকে এবং তিরস্কৃত করা হবে তাদেরকে, যারা শপথ ভঙ্গ করেছে।

এরপরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— 'ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যা করো সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সত্য ধর্ম ইসলামের অনুসারী করে দিতে পারতেন। তখন তোমরা সকলেই হতে অঙ্গীকার রক্ষাকারী। কিন্তু তিনি এরূপ করেন না। তিনি তোমাদের মধ্যে অনেককেই সৎপথ আঁকড়ে ধরবার সামর্থ্য দান করেন না। তাই তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। আবার কাউকে কাউকে দান করেন পুণ্য পথে চলবার সামর্থ্য। তাই তারা পুণ্যাভিসারী। এভাবেই তিনি একদলকে করেন পথভ্রষ্ট। আরেক দলকে করেন পথপ্রাপ্ত। আর প্রতিফল দিবসে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রশ্ন করা হবে তোমাদের পাপ ও পুণ্য প্রমাণার্থে এবং চিরস্থায়ী শাস্তি ও স্বস্তি প্রদানার্থে।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৯৪, ৯৫, ৯৬

وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَ
تَذُوقُوا السُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ○ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ○ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ
الَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

❑ পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য তোমরা তোমাদিগের শপথকে ব্যবহার করিও না; করিলে, পা স্থির হওয়ার পর পিছলাইয়া যাইবে এবং আল্লাহের পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিবে; তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।

❑ তোমরা আল্লাহের নামে কৃত অংগীকার স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করিও না। আল্লাহের নিকট যাহা আছে কেবল তাহাই তোমাদিগের জন্য উত্তম— যদি তোমরা জানিতে!

www.eelm.weebly.com

❑ তোমাদিগের নিকট যাহা আছে তাহা থাকিবে না এবং আল্লাহের নিকট যাহা আছে তাহা স্থায়ী। যাহারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে তাহাদিগের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করিবেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে প্রবঞ্চনাস্বরূপ কোরো না। শপথভঙ্গকে বানিয়ো না বিপর্যয়ের উপলক্ষ। তোমাদের অঙ্গীকারের উপরে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে। অথচ তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সৃষ্টি করবে যুদ্ধ-বিগ্রহের নতুন সুযোগ। এটা কি নিশ্চিন্ত জনসাধারণের সঙ্গে প্রবঞ্চনা নয়? এরকম প্রবঞ্চনায় নিপতিত হওয়ার অর্থ দৃঢ়পদ অবস্থা থেকে পা পিছলে পড়ে যাওয়া। এভাবে সত্যপথ থেকে সটকে পড়ার জন্য ও আল্লাহ্র পথে বিবিধ অন্তরায় সৃষ্টির জন্য তোমাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে। নিশ্চিত জেনো, তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মহাশাস্তি।

উল্লেখ্য যে, নিরাপদ অবস্থা থেকে কেউ যদি বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হয়, তবে তাকে বলে থাকে— লোকটির পা পিছলে গিয়েছে। অর্থাৎ স্খলিত হয়েছে তার পদবিক্ষেপ। আরো উল্লেখ্য যে, রসুল স. এর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকাই হচ্ছে দৃঢ়পদ থাকা বা পা স্থির রাখা। আর এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করাই হচ্ছে পদস্খলিত হওয়া। 'তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে' অর্থ পার্থিব জীবনে বিপদগ্রস্ত হবে বিভিন্নভাবে। আর 'মহাশাস্তি' (আ'জাবুন আজীম) অর্থ পরকালের শাস্তি।

পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার স্বল্পমূল্যে বিক্রয় কোরো না।' এ কথার অর্থ— রসুলের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পার্থিব লাভালাভের কারণে ভঙ্গ কোরো না। এতে করে তোমরা সাময়িকভাবে কিছু পার্থিব সুবিধা পাবে, কিন্তু চিরতরে হারিয়ে ফেলবে পরকালের অনন্ত কল্যাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র নিকটে যা আছে কেবল তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম— যদি তোমরা জানতে।' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! আল্লাহ্র নিকটে যা আছে তা-ই উত্তম। একথা যদি জানতে তবে কিছুতেই অংগীকার ভঙ্গ করতে পারতে না।

এর পরের আয়াতে (৯৬) বলা হয়েছে— 'তোমাদের নিকটে যা আছে তা থাকবে না এবং আল্লাহ্র নিকটে যা আছে তা স্থায়ী।' একথার অর্থ — হে উদাসীন মানুষ! ভেবে দেখো, তোমাদের কাছে যা আছে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে যে করুণার মহাসিন্ধু রয়েছে তা স্থায়ী ও অনিঃশেষ। পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত 'লা তাশতারু বি আহ্দিল্লাহ্' (আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার স্বল্পমূল্যে বিক্রয় কোরো না) কথাটির কারণ বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য বাক্যে।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু মুসা থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে হাকেম ও আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যে পার্থিব জীবনে মগ্ন, সে তার আখেরাতের ক্ষতিসাধন করে। আর যে আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট, সে ক্ষতি করে তার পার্থিব জীবনের। তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে ধ্বংসশীলতার উপরে অক্ষয়তাকে প্রাধান্য দেয়া। পরকালের প্রতি অনুরাগী হও। বিরাগী হও ইহকালের প্রতি।

শেষে বলা হয়েছে— 'যারা ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবেন।' একথার অর্থ— বিভিন্ন রকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও যারা ধৈর্যের সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালার বিধানানুসারে জীবন যাপন করবে, নিশ্চয় তাদেরকে তিনি দান করবেন তাদের কর্মের উৎকৃষ্ট পারিতোষিক। ওই পারিতোষিক হবে তাদের পুণ্যকর্মের যথাপ্রাপ্য অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী। সাতশত গুণ, অথবা ততোধিক, যেমন আল্লাহ্তায়ালা অভিপ্রায় করবেন। কেউ কেউ বলেছেন এখানে 'বি আহসানি মা কানু ইয়া'মালুন' কথাটির অর্থ হবে— তাদের ফরজ ও মোস্তাহাব আমলগুলো হবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভের মাধ্যম বা উপকরণ।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৯৭

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

❐ বিশ্বাসী হইয়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে-কেহ সৎকর্ম করিবে তাহাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদিগের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করিব।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ পুরুষ ও রমণীকে আমি দান করবো নন্দিত জীবন এবং তাদের পুণ্যকর্মের জন্য আমি তাদেরকে দান করবো শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এখানে দেখা যায়, অবিশ্বাসীরা যদি সৎকর্ম করেও, তবু তারা নন্দিত জীবন ও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাবে না। তবে, পাত্রভেদে অবিশ্বাসী সৎকর্মশীলদের শাস্তি হয়তো কিছুটা লাঘব করা হবে। উল্লেখ্য, যে সৎকর্ম আল্লাহ্র সন্তোষ সাধনের বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যসহ সম্পাদিত হয় না, তা আল্লাহ্তায়ালা গ্রহণ করেন না। আর যা তিনি গ্রহণই করেন না, তার পুরস্কার দিবেন কীভাবে? অবিশ্বাসীদের সৎকর্মের মধ্যে এরকম শুভ উদ্দেশ্য থাকেই না। তাদের উদ্দেশ্য থাকে প্রবৃত্তির তৃপ্তি, অথবা জনমনরঞ্জন, কিংবা খ্যাতি।

 www.eelm.weebly.com

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'হায়াতে তুইয়্যেবা' (আনন্দময় জীবন) অর্থ হালাল রিজিক। হাসান বলেছেন, কথাটির অর্থ 'ক্বানায়াত' (অল্পে তুষ্টি)। মুকাতিল বিন হাব্বান বলেছেন, আনুগত্যমণ্ডিত জীবন। আবু বকর ওয়াররাক বলেছেন, আনুগত্যে নিমগ্ন হওয়ার অর্থই পবিত্র বা নন্দিত জীবন লাভ করা। বায়যাবী বলেছেন, পবিত্র জীবন যাপন করার নামই 'হায়াতে তুইয়্যেবা।' বিত্তশালী যদি সে হয়, তবে তার জীবন হবে কৃতজ্ঞতার আলোকে আলোকিত। আর স্বল্পবিত্তাধিকারীদের জীবন হবে ধৈর্য ও অল্পেতুষ্টির সুবাসে সুবাসিত। এমতো জীবনযাপন অবিশ্বাসীদের জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা সুখে যেমন কৃতজ্ঞতার ধার ধারে না তেমনি বিপদে প্রকাশ করে অসহিষ্ণুতা ও অতুষ্টি । এ কারণেই বিশ্বাসীদের জীবন পবিত্র ও আনন্দময় এবং অবিশ্বাসীদের জীবন অপবিত্র ও আত্মার আনন্দচ্যুত। আমি বলি, 'ইন্না লাহু মাইশাতান দ্বনকান'(তার জন্য রয়েছে অনটন ক্লিষ্ট জীবন) — কথাটির মর্মার্থও এ রকম। আমি আরো বলি, মানুষ যখন আল্লাহ্কে ভালোবাসে, তখন তার কাছে সুখ দুঃখ হয়ে যায় এক বরাবর। আনন্দ ও বেদনা দু'টোই যেহেতু প্রিয়তম আল্লাহ্র দান, সেহেতু উভয় অবস্থাই তাদের নিকটে হয় সমান আস্বাদ্য। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. বলেছেন, মাহবুব (প্রেমাস্পদ) প্রদত্ত কষ্ট সুখ অপেক্ষা অধিক উপভোগ্য। কারণ, সুখের আস্বাদে প্রবৃত্তির অংশগ্রহণ রয়েছে, কিন্তু দুঃখের আস্বাদ গ্রহণ করতে প্রবৃত্তি অপারগ। তখন কেবল জাগ্রত থাকে মাহবুবের অভিপ্রায় ও সন্তোষ। আর প্রকৃত প্রেমিক তো আল্লাহ্রই অভিপ্রায়ানুসারী ও সন্তোষাকাঙ্খী। তাই প্রকৃত প্রেমিক যিনি, তিনিই বিপদ মুসিবতকেই অধিক উপভোগ করেন।

মওলানা রুমী তাঁর কবিতায় লিখেছেন—

আশেকম বর লুত্ফ ওয়া বর কহরত বেজাদ
আয় আজব মান আশেকম বর হর দুজেদ

নাখোশ আয্ বে খোশ বুয়াদ দর জানে মান
জাঁ ফেদায়ে ইয়ার দেলে রনজানে মান।

আমি বলি, 'হায়াতে তুইয়্যেবা' সম্পর্কে এরকমও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়ভাজনগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন— 'লাহুমুল বুশরা ফিল হায়াতিদ্ দুন্ইয়া' (তাদের জন্য পার্থিব জীবনে রয়েছে সুসংবাদ)। সুরা ইউনুসের তাফসীরে এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিখে দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদের অন্তরে দেয়া হয় ওই আনন্দ যা সে জান্নাতে লাভ করবে। 'তাদের জন্য পার্থিব জীবনে রয়েছে সুসংবাদ' কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিতই

www.eelm.weebly.com

রয়েছে। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, তোমরা কি আনন্দিত ? তারা বলবে, আনন্দিত না হওয়ার কোনো কারণই যে নেই। তুমি তো আমাদেরকে এমন নেয়ামত দান করেছো, যা আর কাউকে দাওনি। আল্লাহ্ বলবেন, এর চেয়ে বড় নেয়ামত তোমাদেরকে আজ দান করবো। তা হচ্ছে আমার সন্তোষ। আর কখনোই আমি তোমাদের উপরে অসন্তুষ্ট হবো না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। তিবরানী তাঁর 'আওসাত' পুস্তকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের থেকে। এই হাদিসের মর্মকে উপলক্ষ করে জনৈক সুফী কবি বলেছেন—

এমরোজ চুঁ জামাল তু বেপরদা জাহের আস্ত
দর হায়রতান কেহ্ ওয়াদায়ে ফরদ্ আবরায়ে চিসত্।

শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ মোজাদ্দেদী বলেছেন, পৃথিবীতে আনন্দময় জীবন যাপন করে, সে-ই, যে অভাবী। রাজা বাদশাহ্রা যদি এই তত্ত্বটি জানতো তবে তাদেরকে হিংসা করতো।

একটি জটিলতাঃ পৃথিবীতে আল্লাহ্ প্রেমিকেরা যদি এরকম আনন্দ লাভ করে তবে তাদের ইমানের অবস্থা আবার কী রকম? ইমান তো ভয় ও আশার মধ্যবর্তীতে।

জটিলতার নিরসনঃ আল্লাহ্ প্রেমিকদের হৃদয়ও আল্লাহ্তায়ালার ভয় থেকে শূন্য নয়। কারণ তাঁরা তো অবশ্যই ইমানদার। এই আল্লাহ্ ভীতির মধ্যেও তাঁরা প্রেমের আস্বাদ অনুভব করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে ঃ নবী-রসুলগণই সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্প্রেমিক। আর আল্লাহ্তায়ালার ভয়ও তাঁদের সর্বাপেক্ষা বেশী। এর কারণ, আল্লাহ্তায়ালার মর্যাদা ও মহত্ব তাদের অনুভবে সতত পরিদৃশ্যমান। রসুল স. বলেছেন, আমি আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি। তাই তাঁকে ভয়ও করি বেশী। সাহাবীগণের অবস্থাও ছিলো এরকম। তাঁদেরকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে বেহেশতের শুভসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণের প্রতি অত্যন্ত প্রীত, যখন তারা আপনার হস্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলো তরুতলে।' অন্যান্য আয়াতেও এরকম ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অথচ সাহাবীগণ আল্লাহ্র ভয়ে থাকতেন শংকিত। রসুল স. এবং তাঁর সম্মানিত সহচরবৃন্দের অবস্থা যদি এই হয়, তবে পরবর্তী সময়ের আল্লাহ্ প্রেমিকদের অবস্থা কি এর বিপরীত হতে পারে? প্রকৃত কথা হচ্ছে আল্লাহ্র ভালোবাসা ও আল্লাহ্র ভয় কখনো পরস্পর বিরোধী হতে পারে না। আল্লাহ্ প্রেমিকরাই প্রকৃত আল্লাহ্ভীরু। আর প্রকৃত আল্লাহ্ভীরুরাই প্রকৃত আল্লাহ্প্রেমিক।

 www.eelm.weebly.com

আনন্দময় বা পবিত্র জীবন কথাটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— 'হায়াতে ত্বইয়্যেবা' হচ্ছে ওই জীবন, যা কল্যাণ ও বরকতে ভরপুর। রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসবানদের ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। তাদের সবকিছুই শুভ ও সুন্দর। তারা সুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর দুঃখে ধারণ করে ধৈর্য। এভাবে সুখ ও দুঃখ উভয় অবস্থাই হয় তার জন্য কল্যাণকর। হজরত আনাস থেকে ইমাম আহমদ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর মসনদে। হজরত সুহাইব থেকে বর্ণনা করেছেন মুসলিম। ইমাম আহমদ ও ইবনে হাব্বান হজরত আনাস থেকে এবং বায়হাকী হজরত সাঈদ থেকে।

মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, 'হায়াতে ত্বইয়্যেবা' অর্থ জান্নাতী জীবন। আউফ বলেছেন, হাসান বসরীর অভিমতও এরকম। তিনি আরো বলেছেন, পার্থিব জীবন কখনোই জান্নাতী জীবনতুল্য পবিত্র ও আনন্দময় নয়।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৯৮

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

❒ যখন কুরআন পাঠ করিবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহের শরণ লইবে;

কোরআন মজীদ পাঠকালে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোরআন পাঠের পূর্বক্ষণে পাঠ করতে হবে 'আউজু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বনির রজীম' (বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহ্‌র শরণ যাচ্ঞা করি)। শয়তান মানুষের চিরন্তন শত্রু। সে কোরআন তেলাওয়াতের সময় তার নিজের পক্ষ থেকে কিছু কথা বা ধারণা প্রয়োগ করার চেষ্টা করে। নবী-রসুলগণের তেলাওয়াতেও সে এরকম অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকে না। তাই কোরআন তেলাওয়াতের আগে এভাবে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করা জরুরী।

এখানে 'যখন কোরআন পাঠ করবে' কথাটির অর্থ— যখন তোমরা কোরআন পাঠ করার ইচ্ছা করবে। বক্তব্যকে সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যেই এখানে অভিপ্রায়কে কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। সরাসরি বলা হয়েছে 'কোরআন পাঠ করবে'। এতে করে আর একটি কথা প্রমাণিত হয় যে, ইবাদতের কামনা অন্তরে জাগ্রত হলে তা বাস্তবায়ন করাই সমীচীন।

ইব্রাহিম নাখয়ী এবং ইবনে সিরীন আলোচ্য আয়াতের বিবরণভঙ্গির দিকে লক্ষ্য করে বলেছেন 'আউজু বিল্লাহ' দোয়াটি পড়তে হবে তেলাওয়াতের পর। তেলাওয়াতের শেষে 'আউজুবিল্লাহ্' পাঠের আর একটি উপকার এই যে, এতে করে ইবাদত লাভ করে অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা। শয়তানের অনিষ্ট থেকে এভাবে অন্যান্য সময়েও আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করা যায়।

www.eelm.weebly.com

বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, রসুল স. 'আউজু বিল্লাহ্' পড়তেন কোরআন পাঠের পূর্বে। বিদ্বজ্জন এ ব্যাপারে একমত। তাঁরা বলেন, এরকম করা সুন্নত। আতা বলেছেন, ওয়াজিব। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে আলোচ্য আয়াতখানি উপস্থাপন করেন। এখানকার 'ইসতাইজ' আমর বা অনুজ্ঞাসূচক শব্দরূপ। অনুজ্ঞা প্রতিপালন ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যক। তাই কোরআন পাঠের পূর্বে 'আউজুবিল্লাহ্' দোয়াটির মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যপ্রার্থী হওয়া ওয়াজিব। এ রকম ধারণা অসমীচীন যে, কেবল শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে আউজুবিল্লাহ্ পড়তে হবে। বরং দোয়া পাঠ করতে হবে এজন্য যে, আল্লাহ্র রসুল এরকম করেছেন। কিন্তু প্রমাণটি যেহেতু শিথিল, তাই একে ওয়াজিব বলা যায় না।

শাস্ত্রজ্ঞগণ কোরআন পাঠের পূর্বে 'আউজুবিল্লাহ্' পড়াকে ওয়াজিব বলেননি। কারণ অনেক সময় রসুল স. কোরআন পাঠের পূর্বে 'আউজুবিল্লাহ্' পড়া থেকে বিরত থেকেছেন। তাই তাঁরা বলেন, কোনো কোনো সময় কোরআন পাঠের পূর্বে এরকম দোয়া পাঠ থেকে বিরত থাকা সিদ্ধ। কারণ রসুল স. এরকম করেছেন। অনেক বিশুদ্ধ হাদিসের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয়েছে। বোখারী ও মুসলিমে উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. নিশীথের তৃতীয় যামে গাত্রোত্থান করলেন। পাঠ করলেন সুরা আল ইমরানের শেষ দশটি আয়াত। তারপর ওজু করলেন..........এভাবে হাদিসের শেষ পর্যন্ত। মুসলিমে রয়েছে, হজরত আনাস বলেন, একবার আমরা কয়েকজন উপস্থিত ছিলাম রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। হঠাৎ তিনি কেমন যেনো আনমনা হয়ে গেলেন। একটু পরেই তাঁর পবিত্র বদনে ফুটে উঠলো হাসির রেখা। আমরা নিবেদন জানালাম, হে আল্লাহর রসুল! আপনার মৃদুহাসির কারণ জানতে পারলে আমরা কৃতার্থ হই। তিনি স. বললেন, এক্ষুণি আমার উপর অবতীর্ণ হলো একটি সুরা। একথা বলে তিনি পাঠ করলেন— বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। ইন্না আ'ত্বইনা কাল কাউছার। ফাসল্লি লিরব্বিকা ওয়ানহার। ইন্না শানিয়াকা হুওয়াল আবতার। লক্ষণীয় যে, এখানে 'আউজুবিল্লাহ্' পাঠের কথা নেই। দেখা যাচ্ছে, তিনি এখানে তেলাওয়াত শুরু করেছেন 'বিসমিল্লাহ্' পাঠের পর।

মাসআলাঃ নামাজের প্রতি রাকাতে ক্বেরাতের (কোরআন পাঠের) পূর্বে আউজুবিল্লাহ্ পাঠ করার বিষয়টি বেশ বিতর্কিত। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ বলেছেন, আউজুবিল্লাহ্ পাঠ করতে হবে কেবল প্রথম রাকাতের ক্বেরাতের প্রারম্ভে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, প্রতি রাকাতের ক্বেরাতের পূর্বেই আউজুবিল্লাহ্ পাঠ করতে হবে। শায়েখ ইবনে হাজার লিখেছেন, হাসান, আতা ও

 www.eelm.weebly.com

ইবনে সিরীন বলেছেন, প্রতি রাকাতে আউজুবিল্লাহ্ পাঠ করা মোস্তাহাব। ইমাম মালেক বলেছেন, ফরজ নামাজে আউজুবিল্লাহ্ পাঠের প্রয়োজন নেই। ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের সমর্থনে বায়যাবী লিখেছেন, শর্তসাপেক্ষ বিধান যতবার কার্যকর করা হবে, ততবারই শর্তের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। সুতরাং যতবারই ক্বেরাত পাঠের প্রয়োজন হবে, ততবারই আউজুবিল্লাহ্ পড়তে হবে, সে ক্বেরাত যে রাকাতেই হোক না কেনো। ইমাম মালেক তাঁর অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে তিনি বলেছেন, আমি রসুল স. এর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেছি। নামাজ পাঠ করেছি আবু বকর, ওমর ও ওসমানের পশ্চাতে। তাঁরা সকলেই উচ্চস্বরে পঠনযোগ্য নামাজগুলোতে সুরা ফাতিহা দ্বারা ক্বেরাত শুরু করতেন। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক উল্লেখিত অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁরা সকলে নামাজ আরাম্ভ করতেন সুরা ফাতিহা দ্বারা।

বর্ণিত হাদিস সমূহ সম্পর্কে আমরা বলি, সশব্দে আউজুবিল্লাহ্ পাঠ না করাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁরা নীরবে আউজুবিল্লাহ্ পাঠ করেননি। আমাদের দলিল এই যে, রসুল স. প্রথম রাকাতে ছানা পাঠ করার পর আউজুবিল্লাহ্ পড়তেন। পরের রাকাতে এরকম করার কোনো প্রমাণ নেই। হজরত যোবায়ের ইবনে মুতয়েম সূত্রে ইবনে আনাসী ও ইবনে মাজা বলেছেন, রসুল স. যখন নামাজে নিমগ্ন হতেন তখন তিনবার পাঠ করতেন— 'আল্লাহু আকবার কাবীরা'। তিনবার বলতেন, 'আলহামদুলিল্লাহ্ কাছীরা'। এরপর তিনবার উচ্চারণ করতেন, 'সুবহানাল্লহি বুকরাতাঁও ওয়াআসিলা' এরপর বলতেন, আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম। ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান ও আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, 'মিনাশ শাইত্বনির রজীম' পাঠের পর তিনি স. উচ্চারণ করতেন, 'মিন্ নাফখিহী ওয়া নাফছিহী ওয়া হামজিহী' (আমি আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে এবং তার ফুৎকার, মন্ত্র ও কুমন্ত্রণা থেকে)। হাকেমও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম আহমদ, হাকেম ও সুনান প্রণেতাগণ লিখেছেন, রসুল স. যখন রাতের নামাজে দণ্ডায়মান হতেন, তখন তাকবীর উচ্চারণের পর পাঠ করতেন— সুবহানাকাল্লহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়াতাবারা কাসমুকা ওয়াতায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গইরুক। এরপর তিনবার পড়তেন— লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্। এরপর তিনবার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করার পর আবৃত্তি করতেন 'আউজু বিল্লাহিস্ সামিয়িল আলীম, মিনাশ শাইত্বনির রজীম মিন নাফখিহী ওয়া নাফছিহী ওয়া হামজিহী। হজরত আবু উমামা থেকে ইমাম

www.eelm.weebly.com

আহমদও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় আউজু বিল্লাহিস্ সামিয়িল আলীম এর স্থলে উল্লেখিত হয়েছে 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম'। কিন্তু তাঁর সূত্রপরম্পরাভূত কতিপয় বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখিত হয়নি।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে খুজাইমা ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. পাঠ করতেন, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাশ্ শাইত্বনির রজীম মিন হামজিহী ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফছিহী। ইমাম হাকেম ও বায়হাকীর বর্ণনায় সংযোজিত হয়েছে এই কথাটুকু— যখন তিনি নামাজে মগ্ন হতেন। হজরত আনাস থেকে ইমাম দারা কুতনীও এরকম লিখেছেন। কিন্তু তাঁর সূত্রপরম্পরাভূত বর্ণনাকারী হোসাইন বিন আলী বিন আসওয়াদ সম্পর্কে আলেমগণ সমালোচনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদের 'মারাসিল' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, হাসান বসরী বলেছেন, রসুল স. 'আউজুবিল্লাহ্' পড়তেন এভাবে— আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম।

দ্রষ্টব্যঃ হেদায়া প্রণেতা লিখেছেন,' আসতাইজ বিল্লাহ্' বলাই উত্তম। লক্ষণীয় যে, এরকম বলাই আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনার অনুকূল। আর 'আউজু বিল্লাহ্'ও এমতো নির্দেশনার নিকটবর্তী। আমি বলি, অধিকাংশ উচ্চারণ বিশারদ ও আইনবেত্তাগণের অভিমত এই যে, আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম দোয়াটিই সুবিদিত। এরকম আর কোনো দোয়া নেই। সা'লাবী এবং ওয়াহেদীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর সম্মুখে আবৃত্তি করলাম 'আউজু বিল্লাহিস্ সামিয়িল আলীম মিনাশ্ শাইত্বনির রজীম। রসুল স. বললেন, বলো, আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বনির রজীম। জিবরাইল ফেরেশতা আমাকে এরকমই শিক্ষা দিয়েছেন।

আবু আমর দানী তাঁর 'আত্‌তা'মীর' গ্রন্থে লিখেছেন, আমি রসুল স. কর্তৃক বর্ণিত 'আউজুবিল্লাহ্' দোয়াটি শিক্ষা করেছি। কোরআন পাঠের পূর্বে আমি এই দোয়াই পাঠ করি। উচ্চস্বরবিশিষ্ট নামাজে পাঠ করি সশব্দে। উচ্চারণ বিশারদগণের কেউ এর অন্যথা করেছেন— এরকম শুনিনি। সুরাসমূহের প্রারম্ভে এরকম পাঠ করা বিধেয়। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত। এর মধ্যেই রয়েছে কোরআন ও সন্নতের অনুসরণ।

উচ্চারণ বিশারদগণের অগ্রণী ক্বারী হামযা সুরা ফাতিহার পূর্বে আউজুবিল্লাহ্ পাঠ করতেন উচ্চকণ্ঠে। অবশিষ্ট ক্বারীগণ কোরআন পাঠের প্রারম্ভে পাঠ করতেন নিম্নকণ্ঠে। পূর্বসূরী ক্বারীগণের সিদ্ধান্তও এরকম। কিন্তু ক্বারী হামযার যে উচ্চারণপদ্ধতি খল্লাদ কর্তৃক সংকলিত হয়েছে, তাতে দেখা যায়, উচ্চকণ্ঠ ও নিম্নকণ্ঠ উভয় নিয়মই তাঁর নিকটে গ্রহণীয়। এটা নির্ভর করে সম্পূর্ণতই পাঠকের

www.eelm.weebly.com

অভিপ্রায়ের উপরে। সে যেমন উচ্চকণ্ঠে পাঠ করতে পারবে, তেমনি পাঠ করতে পারবে নিম্নকণ্ঠে। তবে এ সম্পর্কে অন্য কোনো ক্বারীর কোনো প্রকার অভিমতের সন্ধান পাওয়া যায় না।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৯৯, ১০০

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○

إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ ○

❒ উহার কোন আধিপত্য নাই তাহাদিগের উপর যাহারা বিশ্বাস করে ও তাহাদিগের প্রতিপালকেরই উপর নির্ভর করে।

❒ উহার আধিপত্য তো কেবল তাহাদিগেরই উপর যাহারা উহাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যাহারা আল্লাহের শরীক করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা ইমানদার ও আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল (মুতাওয়াক্কিল) তাদের উপরে শয়তান তার আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয় না। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালাই তাদের সংরক্ষক।

বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, যারা আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণরূপে নির্ভর করে, তাদের উপরে শয়তান স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তবে কখনো কখনো বিক্ষিপ্তভাবে তার সাময়িক প্রভাব পড়তেও পারে। তাই 'আউজুবিল্লাহ্‌' দোয়াটির মাধ্যমে তার প্রভাব থেকে মুক্তির চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী আয়াতের কারণ বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বাসীগণ এ কারণেই আল্লাহ্‌র শরন প্রার্থনা করবে যে, তারা সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌নির্ভর। তাদের কামনা বাসনা সবকিছুই আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণরূপে সমর্পিত। তাই রসুল স. এর পূর্ণ অনুসরণই তাদের কাম্য। যেহেতু রসুল স. আউজুবিল্লাহ্‌ দোয়া পাঠ করতেন, সেহেতু তারা তা পাঠ করেন। এতে করে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহ্‌নির্ভরতার নিদর্শন।

পরের আয়াতে (১০০) বলা হয়েছে — 'তার আধিপত্য তো কেবল তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহ্‌র শরীক করে।' একথার অর্থ, যারা শয়তানকে বন্ধু বলে জানে এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে বা কোনো কিছুকে শরীক করে, কেবল তাদের উপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, এরকম লোকের উপরেও কিন্তু শয়তান পরিপূর্ণ ও স্থায়ীরূপে প্রভাবশীল নয়। এক আয়াতে শয়তানের বক্তব্যরূপে বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে

www.eelm.weebly.com

এভাবে— 'মা কানা আলাইকুম মিন সুলতানিন ইল্লা আন দাউতুকুম' (তোমাদের উপরে আমার কোনো আধিপত্য ছিলো না। আমি তো তোমাদেরকে কেবল আহ্বান করেছিলাম। আর তোমরা তাতে সাড়া দিয়েছিলে)।

এখানে 'হুম বিহী' (যার সাথে) কথাটির 'হী' (যার) সর্বনামটি যুক্ত হবে আল্লাহ্র সঙ্গে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— যারা আল্লাহ্র সাথে অপরকে শরীক করে। সর্বনামটি শয়তানের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে অর্থ হবে— যারা শয়তানের সাথে মিলিত হয়ে আল্লাহের শরীক করে।

সুরা নাহ্লঃ আয়াত ১০১, ১০২

وَاِذَا بَدَّلْنَاۤ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُفْتَرٍ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝

❑ আমি যখন এক আয়াতের স্থলে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি তখন তাহারা বলে, 'তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।' আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করেন তাহা তিনিই ভাল জানেন; কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই জানে না।

❑ বল, 'তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে জিব্রাইল সত্যসহ কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছে যাহারা বিশ্বাসী তাহাদিগকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদিগের জন্য।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি যখন এক আয়াতের স্থলে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি, তখন তারা বলে, তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।' একথার অর্থ, হে আমার রসুল! দেখুন, অবিশ্বাসীদের বক্তব্য কতো জঘন্য। তারা আপনাকে অযথা দোষারোপ করে। আপনাকে কোরআনের বাণী অদল বদল করার অপবাদ দেয়। প্রকৃতপক্ষে আমি তো এ রকম করি। সময় ও প্রেক্ষিতের পরিবর্তনের কারণে কখনো কখনো কোনো কোনো আয়াতের স্থলে অন্য কোনো আয়াত উপস্থিত করি। এভাবে রহিত আয়াতের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় রহিতকারী আয়াত।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন, তা তিনিই ভালো জানেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।' এ কথার অর্থ— স্থান, কাল ও পাত্রভেদে

www.eelm.weebly.com

কখন কোন বিধান প্রবর্তন করা হবে, তা আল্লাহ্ই তো ভালো জানেন। কারণ তিনি মহাজ্ঞানী। একমাত্র বিধান দাতা। বিধানাবলীর রহিতকরণ, পরিবর্তন ও পুনঃপ্রচলনের রহস্য তো অন্য কারো জানার কথা নয়। তাই বাস্তব কথা এই যে, অংশীবাদীদের অধিকাংশই একথা জানে না। তাই তারা আল্লাহ্র রসুলকে অযথা অপবাদ দেয়।

এখানে 'মুফতার' অর্থ আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপকারী। বাগবী লিখেছেন, মক্কার অংশীবাদীরা বলতো, মোহাম্মদ তাদের সাথীদের সঙ্গে ঠাট্টা-মশকরা করে। আজ এক বিধান জারী করে, কাল আবার তা রহিত করে দেয়। এভাবে সে আল্লাহ্র সঙ্গেও প্রতারণা করে। 'আকছারুহুম লা ইয়া'লামুন' অর্থ অধিকাংশ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী এ কথা জানে না। যদি রহিতকরণের রহস্য সম্পর্কে জানতো, তবে অবশ্যই একথা বলতে বাধ্য হতো যে, এই কোরআন অবশ্যই আল্লাহ্র বাণী। মোহাম্মদ এই কোরআনের বাহক ও প্রচারক মাত্র। এই কোরআন অদল বদল করার অধিকার তাঁর নেই।

জনৈক কবি বলেছেন—

তাবারাকাল্লহ্, মা ওয়াহ্ইয়ুন বি মুকতাসাব
ওয়া নাবীয়্যুন আ'লা গইবিন বি মুত্তাহিম।

আল্লাহ্ মহান, প্রত্যাদেশ কখনো নয় অর্জিত ধন।
অদৃশ্যের বিষয়ে নবী কখনো অবিশ্বস্ত নন।

পরের আয়াতে (১০২) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে জিবরাইল সত্যসহ কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, যারা বিশ্বাসী তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এবং পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদস্বরূপ আত্মসমর্পণ-কারীদের জন্য।' এখানে 'রূহুল কুদুস্' (পবিত্র আত্মা) অর্থ হজরত জিবরাইল। 'নায্যালা' শব্দটির ধাতুমূল 'তানযীল'। তানযীল অর্থ ক্রমাগত অবতরণ করা। শব্দটির মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমাবতরণ যুক্তিযুক্ত। সুতরাং বুঝতে হবে, ক্রমাবতরণের প্রয়োজন না থাকলে সম্পূর্ণ কোরআন অবতীর্ণ হতো এক সাথে একবারে। 'আলহাক্ব' অর্থ সত্য। 'লিইউছাব্বিতাল্ লাজীনা আমানু' কথাটির অর্থ— কোরআন মজীদ এভাবে ক্রমে ক্রমে অবতরণ করার কারণ এই যে, এতে করে যেনো বিশ্বাসীদের বিশ্বাস হয় অধিকতর দৃঢ়। রহিত আয়াতের স্থলে নতুন আয়াত উপস্থিত হলে তারা তখন অনুধাবন করতে পারে যে, তাইতো! এরকম রহিতকরণই তো ছিলো সঙ্গত। এভাবে রহিতকরণের বিষয়টি তাদের কাছে হয়ে যায় আল্লাহ্র অপার প্রজ্ঞাময়তার একটি অনবদ্য নিদর্শন। তখন তাদের বিশ্বাসও হয়ে যায় অধিকতর বলিষ্ঠ।

আলোচ্য বক্তব্যটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে, রহিতকারী আয়াতের মাধ্যমে যাচাই করা হয় বিশ্বাসীদেরকে। তারা যখন বুঝতে পারে আল্লাহ্তায়ালার কোনো কর্মই প্রজ্ঞাবিহীন নয়, তখন তাদের ইমান হয়ে যায় অধিকতর

শক্তিসম্পন্ন। 'লিলমুসলিমীন' অর্থ বিনয়াবনত, আত্মসমর্পিত। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতি বিনয়াবনত, আত্মসমর্পিত। 'হুদান' অর্থ হেদায়েত বা পথ-নির্দেশ। এখানকার 'পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদস্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদের জন্য' কথাটির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ সর্বাবস্থায় আত্মসমর্পণ-কারীদের জন্যই। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য নয়।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১০৩, ১০৪

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

❐ আমি তো জানিই তাহারা বলে, 'মুহাম্মদকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ'। উহারা যাহার প্রতি ইহা আরোপ করে তাহার ভাষা তো আরবী নহে; কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা।

❐ যাহারা আল্লাহের নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তাহাদিগকে আল্লাহ্ পথ-নির্দেশ করেন না এবং তাহাদিগের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তো জানিই তারা বলে, মোহাম্মদকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ।' মক্কার মুশরিকেরা মিথ্যা অপবাদস্বরূপ বলতো, একজন লোক মোহাম্মদকে কোরআন শিখিয়ে দেয়। সেই লোকটি কে— সে সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। বাগবী এরকম লিখেছেন। শিথিল সূত্রে তাঁর মসনদে উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কায় অবস্থান করতো এক ভিনদেশী খৃষ্টান। সে ছিলো কর্মকার। নাম ছিলো বালআয। রসুল স. সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে তার কাছে যেতেন। মক্কার অংশীবাদীরা তাকে কেন্দ্র করেই এমতো অপপ্রচার চালাতো যে, ওই লোকটি মোহাম্মদকে কোরআন শিক্ষা দেয়। ইকরামা বলেছেন, বনী মুগীরার এক ক্রীতদাসের নাম ছিলো ইয়াঈশ। সে লেখাপড়া জানতো। রসুল স. তাকে কোরআন শিক্ষা দিতেন। অথচ, কুরায়েশরা বলতো, ইয়াঈশই মোহাম্মদকে কোরআন শিক্ষা দেয়। ফাররা বলেছেন, হুয়াইতাব বিন আবদুল উজ্জার এক ক্রীতদাস ছিলো আমেশ। অংশীবাদীরা বলতো, আমেশই মোহাম্মদের শিক্ষক। আমেশ অবশ্য পরে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। ইবনে ইসহাক বলেছেন, মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে এক সিরিয় খৃষ্টান ক্রীতদাসের সঙ্গে মাঝে মাঝে উপবেশন করতেন রসুল স.। তার নাম ছিলো জবর। জনৈক বনী হাজরামীর ক্রীতদাস ছিলো সে।

www.eelm.weebly.com

সে পুস্তক পাঠ করতে পারতো। আবদুল্লাহ্ বিন মুসলিম হাজরামী বলেছেন, ইয়েমেনবাসী দু'জন ক্রীতদাস ছিলো আমাদের। ইয়ামান ও জবর নামের ওই ক্রীতদাসদ্বয় ছিলো পরস্পরের ভ্রাতা। তলোয়ার তৈরী করতো তারা। ক্রীতদাস ভ্রাতৃদ্বয় আবার ইঞ্জিলও অধ্যয়ন করতো। রসুল স. তাদের পাশ দিয়ে গমনকালে কখনো কখনো দাঁড়িয়ে তাদের ইঞ্জিল আবৃত্তি শুনতেন। হোসাইন বিন আবদুল্লাহ্ থেকে ইবনে আবী হাতেমও এরকম বর্ণনা করেছেন। জুহাক বলেছেন, অংশীবাদীরা যখন রসুল স.কে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতো, তখন তিনি স. কখনো কখনো ওই ক্রীতদাস ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকটে বসতেন। তাদের ইঞ্জিল আবৃত্তি শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হতেন। অংশীবাদীরা তখন রটনা করতো, মোহাম্মদ তো ক্রীতদাসদ্বয়ের কাছ থেকে কোরআন শিক্ষা করে আমাদের শোনায়। তাদের ওই রটনার কথাই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— 'আমি তো জানিই তারা বলে, মোহাম্মদকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ।'

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যার প্রতি একথা আরোপ করে তার ভাষাতো আরবী নয়। কিন্তু কোরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা।' 'কামুস' অভিধানে রয়েছে 'লাহাজা' ও 'ইলতেহাজা' সমার্থক শব্দ। এর অর্থ ঝুঁকে পড়া বা ফিরে যাওয়া বা ইঙ্গিত করা। এভাবে বলা হয়েছে— তারা সত্য ও নির্ভরশীল কথাকে ওই লোকের বা লোক দু'টোর দিকে ফিরিয়ে দেয়।

যারা আরবী ভাষায় ভালোভাবে কথা বলতে পারে না, তাদেরকে বলে আজমী। কামুস অভিধানে রয়েছে, জাতি বা ব্যক্তি উভয় পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় 'আ'জামু' শব্দটি। যারা শ্রুতিশক্তিহীন ও আরবী কথনে অক্ষম, তাদেরকে বলে আজমী। এ কারণেই অনারবদেরকে বলা হয় আজমী, তারা আরবী ভাষায় বিশুদ্ধভাবে কথা বলতে পারলেও। কোনো কোনো অভিধানবেত্তা বলেছেন, 'উজমা' শব্দটি 'ইবানত' শব্দের বিপরীত। এক কথায় বিশুদ্ধ ও সাবলীল আরবী যে বলতে পারে না, সে-ই আজমী। 'ইয়জাম' শব্দটির অর্থও বধির। যেমন বলা হয়— ইস্‌তায়্‌জ্বামাতিদ্‌দার (গৃহ বধির হয়েছে) অর্থাৎ গৃহবাসীরা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছে। আমাদের কথার জবাব দেয়ার কেউ নেই।

'হাজা' অর্থ এই। অর্থাৎ এই কোরআন। 'মুবীন' অর্থ স্পষ্ট, সমুজ্জ্বল, বিশুদ্ধ। উল্লেখ্য যে, অংশীবাদীদের বর্ণিত অপবাদের জবাব দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে। প্রতিবাদের ধারা এখানে দু'রকম। ১. যে বা যাদের কাছ থেকে রসুল স. কোরআন শিক্ষা করেন বলে তারা অপবাদ রটাতো, সে লোকেরা তো ছিলো অনারব। তাই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে— হে মক্কাবাসী! তোমরা এমতো মিথ্যাচার করো কী করে? যাদেরকে তোমরা আমার রসুলের কোরআনের শিক্ষক বলো, তাদের ভাষা তো তিনি বোঝেনই না। তোমরাও তো তা বুঝতে

www.eelm.weebly.com

পারো না। অথচ কোরআন অবতীর্ণ হয়ে চলেছে বিশুদ্ধ ও সুললিত আরবী ভাষায়, যা আমার রসুল বোঝেন। তোমরাও বুঝতে পারো। এমতো সারগর্ভ ও শিল্প-সুষমামণ্ডিত আরবী বাণীর শিক্ষক কি হতে পারে কোনো অনারব? ২. কোরআনের শব্দ ও মর্ম উভয়টিই তার শ্রোতা ও পাঠককে হতবাক ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়। তাই কোরআন হচ্ছে 'মু'জেয' বা নিষ্ক্রিয়ক। সুতরাং কোরআন তুল্য অতুলনীয় বাণী রচনা করতে পারে কে? এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'এর অনুরূপ একটি সুরা আনো তো দেখি।' এই হুমকির মোকাবিলা কেউতো ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে করতে সক্ষম হয়নি। এতে করে কি প্রমাণিত হয়নি, কোরআন কোনো মানুষের রচনা হতেই পারে না। তাহলে তোমরা এমতো মিথ্যা অপবাদ দাও কেনো যে, মোহাম্মদ এক মানুষের কাছে কোরআন শিক্ষা করেন? আর একটি কথা এই যে, ওই অনারব লোক বা লোকেরা তো পাঠ করে ইঞ্জিল, যার ভাষা আরবী নয়। ভাবের দিক দিয়ে ইঞ্জিলও কোরআন সদৃশ। কিন্তু ওই অনারবেরা ইঞ্জিলকে আরবী ভাষায় প্রকাশই বা করবে কী করে। কারণ, কোরআনের ভাষাও তো মো'জেয(নিষ্ক্রিয়ক, অজেয় বা অক্ষমক)।

আবার এ বিষয়টিও প্রণিধাননীয় যে, আসমানী কিতাবের প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ও বিজ্ঞ ভাষ্যকার ব্যতিরেকে অন্য কেউ কি কোরআনের প্রকৃত মর্ম অন্যকে শিক্ষা দিতে পারে? ওই ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসদ্বয়ের কি সে যোগ্যতা আছে? তারা ভক্তিভরে হয়তো ইঞ্জিল অধ্যয়ন করে, কিন্তু তারা তো ইঞ্জিলের সুদক্ষ ভাষ্যকার নয়। ক্রীতদাসের পক্ষে এরকম দক্ষতা অর্জনও অসম্ভব। সুতরাং ভিন্ন ভাষাভাষী এরকম সরল ও অদক্ষ ক্রীতদাসের পক্ষে আরবীতে কোরআনের মতো সর্বোৎকৃষ্ট ভাষাশৈলীশোভিত বাণীসম্ভারের শিক্ষক হওয়া কি কস্মিনকালেও সম্ভব?

পরের আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, তাদেরকে আল্লাহ্ পথনির্দেশ করেন না। এবং তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।' এ কথার অর্থ, যারা কোরআনের মতো কালজয়ী নিদর্শন ও অন্যান্য নিদর্শনাবলীতে আস্থাশীল নয়, তাদেরকে আল্লাহ্ কখনোই সুপথে পরিচালিত করেন না। আর তাদের এমতো অপকর্মের জন্য রয়েছে মহাযন্ত্রণাদায়ক অবশ্যম্ভাবী শাস্তি।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১০৫

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ○

❐ যাহারা আল্লাহের নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তাহারা তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তাহারাই মিথ্যাবাদী।

---

 www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্‌র নিদর্শনে যারা বিশ্বাস করে না, তারাই কাফের বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তারাই মিথ্যার উদ্ভাবক এবং তারাই মিথ্যাবাদী। যারা ইমানদার তাঁরা কখনোই মিথ্যাবাদী নয়। অর্থাৎ যারা রসুল স. এর একনিষ্ঠ অনুচর তাঁরা কখনোই মিথ্যাচারী নয়। তাঁরা ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যবাদী। আলোচ্য আয়াতের অর্থ এরকমও হতে পারে যে— মক্কার অংশীবাদীরাই প্রকৃত মিথ্যাচারী। সুস্পষ্ট মোজেজা প্রকাশিত হবার পরও তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে অস্বীকার করে চলেছে। এরকম জঘন্য মিথ্যাচারিতা আর কী হতে পারে?

অথবা 'হুমুল কাজিবুন' কথাটির অর্থ হবে— তারা মিথ্যাচারিতায় অভ্যস্ত। ধর্ম অথবা শিষ্টাচার কোনো কিছুই তাদেরকে মিথ্যাচারিতা থেকে এতটুকুও টলাতে পারে না। অথবা অর্থ হবে — তারা বলে রসুল স.কে কেউ একজন কোরআন শিক্ষা দেয়। এমতো উক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, তারা চরম পর্যায়ের মিথ্যাবাদী।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হারাজ বলেছেন, আমি একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! মুমিন কি কখনো ব্যভিচার করতে পারে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। এরকম কখনো হয়েও যেতে পারে। আমি বললাম, অপহরণ? তিনি স. বললেন, কখনো কখনো এরকম হওয়াও বিচিত্র নয়। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, মিথ্যা কথা? তিনি স. বললেন, অসম্ভব। আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্‌র নিদর্শনে যাদের বিশ্বাস নেই, কেবল তারাই মিথ্যার উদ্ভাবক। তারাই মিথ্যাবাদী।'

ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু উমামা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, আত্মসাৎ ও মিথ্যা ছাড়া অন্যান্য অশোভন কর্ম বিশ্বাসীদের চরিত্রে ছায়াপাত করতেও পারে। ইমাম বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে। তাঁর শো'বুল ইমানে এবং ইমাম মালেকের একটি অপরিণত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, বিশ্বাসী ব্যক্তি কি ভীরু হতে পারে? তিনি স. বললেন, পারে। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, ব্যয়কুণ্ঠ? তিনি স. জবাব দিলেন, তাও হতে পারে। এরপর জিজ্ঞেস করা হলো, মিথ্যাবাদী? তিনি স. বললেন, কখনোই নয়। আমি বলি, এখানে বিশ্বাসী বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর মহান সাহচর্যধন্য বিশ্বাসীগণকে। পরবর্তী যুগের বিশ্বাসীরা এরকম নয়। সাহাবায়ে কেরামই প্রকৃত মুমিন। পরিপূর্ণরূপে ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যবাদী। এই অভিমতটি ঐকমত্যসঞ্জাত। একারণেই ত্রুটিহীনভাবে যে বর্ণনার সূত্রপরম্পরা সাহাবীগণ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার সমালোচনা করা হয় না। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, বর্ণিত হাদিসসমূহে উল্লেখিত মুমিন অর্থ মুমিনে কামেল (পরিপূর্ণ বিশ্বাসী)। অর্থাৎ বিশুদ্ধ পীর আউলিয়া, যাঁরা লাভ করেছেন ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্।

www.eelm.weebly.com

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

❐ কেহ তাহার বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করিলে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখিলে তাহার উপর আপতিত হইবে আল্লাহের ক্রোধ এবং তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি; তবে তাহার জন্য নহে যাহাকে সত্য প্রত্যাখ্যানে বাধ্য করা হয় কিন্তু তাহার চিত্ত বিশ্বাসে অবিচলিত।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ইমান আনয়নের পর কেউ যদি আবার কাফের হয়ে যায় এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানের জন্য উন্মুক্ত করে হৃদয়ের দরজা, তার উপরে অবশ্যই আপতিত হবে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রচণ্ড রোষ ও মর্মন্তুদ শাস্তি। কিন্তু বলপ্রয়োগের মাধ্যমে যদি কারো সত্যপ্রত্যাখ্যানসূচক মৌখিক স্বীকৃতি আদায় করা হয়, কিন্তু তার হৃদয়ে থাকে অক্ষয় ইমান, তবে তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা হবে না।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের উপলক্ষ ছিলেন হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার। মক্কার অংশীবাদীরা তাঁকে, তাঁর পিতা হজরত ইয়াসারকে, মাতা হজরত সুমাইয়াকে, হজরত সুহাইব, হজরত বেলাল, হজরত খুবাইব ও হজরত সালেমকে অবর্ণনীয় অত্যাচারে জর্জরিত করেছিলো। হজরত সুমাইয়ার দুই পা দু'টি উটের সঙ্গে বেঁধে উট দু'টোকে হাঁকিয়ে দিয়েছিলো বিপরীত দিকে। দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিলো তাঁর পবিত্র শরীর। মুসলমানদের মধ্যে প্রথম শহীদ হয়েছিলেন তিনি। এরপর তারা তাঁর স্বামী হজরত ইয়াসারকেও শহীদ করে দিয়েছিলো। এমতো মর্মবিদারক দৃশ্য দেখে তাঁদের পুত্র হজরত আম্মার মুখে উচ্চারণ করেছিলেন সত্যপ্রত্যাখ্যানসূচক উক্তি। ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে— কাতাদা বলেছেন, হজরত আম্মারকে বন্দী করা হলো। নিয়ে যাওয়া হলো বনী মুগীরার ঝর্ণার পাশে। অংশীবাদীরা তাঁকে ঝর্ণার পানিতে বার বার চুবাতে চুবাতে বললো, বল, মোহাম্মদকে পরিত্যাগ করবি কি না? বাঁচতে চাইলে এক্ষুণি তাকে অস্বীকার কর। উপায়ান্তর না দেখে অংশীবাদীরা যেমনটি চেয়েছিলো, তেমনি করে তিনি মৌখিকভাবে অস্বীকার করলেন রসুল স. কে। তাঁর ওই মৌখিক অস্বীকৃতি ছিলো তাঁর হৃদয়জ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। তখন একজন গিয়ে রসুল স. কে বললো, আম্মার আপনাকে অস্বীকার করেছে। তিনি স.

www.eelm.weebly.com

বললেন, কখনোই নয়। তার আপাদমস্তক বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত। তার হৃদয় ইমানে ভরপুর। ইমান মিশে আছে তার রক্ত ও অস্থি-মজ্জার সঙ্গে। ওদিকে মৌখিক অস্বীকৃতি শুনে অংশীবাদীরা ছেড়ে দিলো হজরত আম্মারকে। পাষণ্ডদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে রসুল স. সকাশে ছুটে গেলেন তিনি। তিনি স. বললেন, বলো কী অবস্থা তোমার? তিনি বললেন, অশুভ। আপনার প্রতি মৌখিক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছি আমি। দুশমনেরা যেভাবে চেয়েছিলো, সেভাবে আমি আপনার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছি অসমীচীন উক্তি। রসুল স. বললেন, সে সময় তোমার মনের অবস্থা কেমন ছিলো? তিনি বললেন, মনতো ছিলো ইমানের আনন্দে প্রশান্ত। রসুল স. বললেন, তাহলে আর চিন্তা কেনো। আবার যদি তারা তোমার উপর এরকম বল প্রয়োগ করে, তবে মৌখিকভাবে তুমিও এরকম উচ্চারণ কোরো। এতে করে তোমার কোনো দোষ হবে না। রসুল স. এর এমতো মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তৎক্ষণাৎ অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। সা'লাবী এবং ওয়াকেদীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হজরত ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. যখন মদীনায় হিজরত করার পরিকল্পনা করলেন, তখন অংশীবাদীরা বন্দী করলো হজরত বেলাল, হজরত খুবাইব ও হজরত আম্মারকে। অকথ্য অত্যাচার চালাতে লাগলো তাদের উপরে। তাদের ওই অবর্ণনীয় জুলুম থেকে বাঁচবার জন্য হজরত আম্মার মৌখিকভাবে প্রকাশ করলেন ইমান বিরোধী উক্তি। ফলে তারা তাঁকে ছেড়ে দিলো। তিনি তখন রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে সব ঘটনা খুলে বললেন। রসুল স. বললেন, সে সময় তোমার মনের অবস্থা ছিলো কেমন? তিনি বললেন, ইমানের প্রশান্তিতে প্রশান্ত। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। বাগবী লিখেছেন, ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতরণের উপলক্ষ ছিলেন কিছুসংখ্যক বন্দী সাহাবী। মক্কায় বন্দী ওই সকল সাহাবীর নিকট মদীনার কতিপয় মুসলমান এইমর্মে পত্র লিখলেন যে, সত্বর মদীনায় চলে এসো। অন্যথায় আমরা তোমাদেরকে আমাদের সমাজভূত করবো না। এরকম চিঠি পেয়ে মুসলমানদের একটি দল মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে পারলেন না। তার আগেই অংশীবাদীরা তাদেরকে ধরে ফেললো। তখন তাঁরা আত্মরক্ষার নিমিত্তে বাধ্য হয়ে তাদের মনের বিরুদ্ধে ইসলাম পরিত্যাগের ঘোষণা দিলেন।

বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, আমের বিন হাজরামীর ক্রীতদাস জিবর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তাঁর মনিব বল প্রয়োগ করেছিলো তাঁর উপর। তাই তিনি বাধ্য হয়ে উচ্চারণ করেছিলেন কুফরী বাক্য। বাগবী আরো লিখেছেন, পরবর্তী সময়ে তাঁর মনিবও ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন এবং জিবরকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করেছিলেন মদীনায়।

www.eelm.weebly.com

ইমানের মাধ্যমে অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করার অর্থ ধর্মের বিশ্বাসগত দিকটিকে নিরবচ্ছিন্ন রাখা। এতে করে আর একটি কথা প্রমাণিত হয় যে, হৃদয়ে সত্য উপলব্ধি ইমানের একটি অপরিহার্য স্তম্ভ। হৃদয়জ বিশ্বাস ব্যতীত কেবল মৌখিক সাক্ষ্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটে গ্রহণীয় নয়। অপরদিকে সত্যপ্রত্যাখ্যানের জন্য হৃদয় উন্মুখ রাখার অর্থ আন্তরিকতার সঙ্গে কুফরী বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকে স্বীকার করে নেয়া।

বলপ্রয়োগ কী: কাউকে তার মনের বিরুদ্ধে কিছু করতে বলা বা করতে বাধ্য করার নাম 'ইকরাহ্' বা বলপ্রয়োগ। বল প্রয়োগের অবস্থা হতে পারে দু'রকমের। ১. কাউকে তার মনের বিরুদ্ধে এমন কিছু করতে বলা, যা না করলে তাকে দৈহিক শাস্তি ভোগ করতে হবে। আবার করলে তার কোনো শাস্তি নেই। ২. এরকম শর্ত ছাড়াই তার হাত পা কর্তন করা অথবা হত্যা করা। প্রথম অবস্থায় যার উপরে বলপ্রয়োগ করা হয় তার ইচ্ছা অনিচ্ছা কার্যকর থাকে। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে মনের বিরুদ্ধে কাজ করে সে শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় সে সুযোগ নেই। উভয় অবস্থায় বলপ্রয়োগকারীর দণ্ড দানের ক্ষমতা থাকতে হবে। যার উপরে বলপ্রয়োগ করা হয়, তারও একথা জানতে হবে যে, বলপ্রয়োগকারী দণ্ডদান করতে সক্ষম। প্রথম প্রকারের বলপ্রয়োগ সাধারণতঃ প্রযোজ্য হয় ক্রয়-বিক্রয়, দায়-দেনা, বন্ধক ইত্যাদি ক্ষেত্রে। এমতাবস্থায় বল-প্রয়োগকারী কখনো যদি দুর্বল হয়ে পড়ে তবে তার আরোপিত চুক্তি বাতিল করে দেয়া সিদ্ধ। অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে তার চুক্তি বাতিল অথবা বহাল দু'টোই করতে পারে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ অসিদ্ধ। চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষ স্বেচ্ছায় মতৈক্যে উপনীত হওয়াই সমীচীন। যেমন আল্লাহ্‌পাক বলেন— 'ইল্লা আন্‌তাকুনা তিজ্বারাতীন আন তারদ্বিম মিনকুম' (হ্যাঁ, সেটা বাণিজ্যিক, তোমাদের মতৈক্যে)। অর্থাৎ যার উপরে বলপ্রয়োগ করা হয়, কৃত চুক্তিতে তার আন্তরিক সায় থাকে না। সে কারণেই ব্যবসা ও অন্যান্য লেনদেনের বেলায় বলপ্রয়োগ অসমীচীন।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, শেষোক্ত প্রকারের বলপ্রয়োগের কথা। এরকম বলপ্রয়োগের মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর আশংকা। অর্থাৎ এমতাবস্থায় বলপ্রয়োগকারীর কথা না শুনলে মৃত্যু অনিবার্য। তাই আলেমগণের ঐকমত্যোৎসারিত অভিমত এই যে, এমতোক্ষেত্রে যার উপর বলপ্রয়োগ করা হয়েছে সে কুফরী বাণী উচ্চারণ করতে পারবে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, তখনও অন্তরে থাকতে হবে ইমানের সুদৃঢ় ও প্রশান্ত উপস্থিতি। হজরত আম্মারের ঘটনা ও তাঁকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ আলোচ্য আয়াতটিই এর প্রমাণ। হজরত আম্মার তখন ছিলেন নিরুপায়। জীবনরক্ষার বিষয়টিই ছিলো তাঁর ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য। তাই মৌখিক স্বীকৃতির কারণে তাঁকে অমুসলমান হিসেবে গণ্য করা হয়নি। প্রয়োগ

www.eelm.weebly.com

করা হয়নি ধর্মত্যাগের দণ্ড। ঘটানো হয়নি বিবাহ বিচ্ছেদও। তবে এরকম সঙ্গিন অবস্থাতেও সত্যকে সমুন্নত রাখা অধিকতর উত্তম। কারণ এভাবে মৃত্যুবরণকারী শহীদ। হজরত আম্মারের মাতা-পিতা এরকমই করেছিলেন। এভাবে আরো জীবন দিয়েছিলেন হজরত খুবাইব, হজরত জায়েদ, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন তারেক প্রমুখ।

রসুল স. এর জীবনী রচনাকারীগণ এক যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনাকালে লিখেছেন, হজরত খুবাইবকে বধ করার পূর্বে তিনি দুই রাকাত নামাজ পড়েছিলেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেন, হজরত খুবাইবই প্রথমে মৃত্যুদণ্ডের পূর্বে নামাজ পাঠের প্রথার উদ্ভাবক। নামাজ পাঠ শেষ হলে তাঁকে বাঁধা হলো একটি তক্তার সঙ্গে। দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো মদীনামুখী করে। বলা হলো, ইসলাম পরিত্যাগ করো, তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। হজরত খুবাইব জবাব দিলেন, আল্লাহ্র শপথ! সারা বিশ্বের ধনসম্পদের বিনিময়েও তো আমি ইসলাম পরিত্যাগ করবো না। অংশীবাদীরা বললো, তুমি কি পছন্দ করো না যে, মোহাম্মদ তোমার স্থলাভিষিক্ত হোক, আর তুমি মুক্ত হয়ে ফিরে যাও স্বগৃহে। তিনি বললেন, আমি তো আমার প্রিয়তম রসুলের মহান চরণে কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার কষ্টও সহ্য করতে পারি না। তাঁর পায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হোক আর আমি মুক্ত হয়ে স্বগৃহে ফিরে যাই, এমতো কল্পনাও আমার পক্ষে অসম্ভব। তারা বললো, খুবাইব! ইসলাম পরিত্যাগ করো। নিষ্কৃতি পাবে। তিনি বললেন, কখনো নয়। তারা বললো, ইসলাম পরিত্যাগ না করলে আমরা তোমাকে হত্যা করবো। তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথে জীবনপাত তো সর্বোচ্চ সৌভাগ্য।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইমাম বোখারী বর্ণনা করেছেন, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার পূর্বক্ষণে হজরত খুবাইব কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। তার মধ্যে দু'টো কবিতা ছিলো এরকম—

যদি আমি মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করি, তবে আমার কোনোই পরোয়া নেই। আমি এতোটুকুও চিন্তা করবো না যে, কোন পাশে আমি পতিত হলাম। আমার এই জীবন দান কেবল আল্লাহ্র সন্তোষ সাধনার্থে। যদি আমার আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তবে আমার মরদেহের প্রতিটি অণুপরমাণুতে তিনি বরকত দান করবেন।

ইবনে উকবা বলেছেন, হজরত খুবাইব ও হজরত জায়েদ একই দিনে পান করেছিলেন শাহাদাতের অমিয় সুধা। দূরে মদীনায় উপবিষ্ট রসুল স. তখন উচ্চারণ করেছিলেন, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' (তোমাদের প্রতি শান্তি, কেবলই শান্তি)। তাঁর সহচরবৃন্দ স্বকর্ণে শুনেছিলেন শহীদদ্বয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরিত ওই অভিবাদনের পবিত্র উচ্চারণ।

অপরিণত সূত্রে হাসান বসরী থেকে ইবনে আবী শায়বার এক বর্ণনায় এবং আবদুর রাজ্জাকের তাফসীরে এসেছে, একবার দু'জন সাহাবীকে বন্দী করলো নবী নামের ভণ্ড মুসায়লামা। একজন একজন করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো তাদেরকে। প্রথম জনকে বললো, মোহাম্মদ সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? তিনি বললেন, তিনি তো আল্লাহ্র রসুল। মুসাইলামা বললো, আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? তিনি বললেন, তুমিও। এরপর মুসায়লামা দ্বিতীয় জনকে ডেকে এনে বললেন, বলো, মোহাম্মদ সম্পর্কে তোমার মনোভাব কী? তিনি বললেন, তিনি তো আল্লাহ্র বাণীবাহক। মুসাইলামা বললো, আর আমি? তিনি বললেন, আমি বোবা। মুসায়লামা এরকম প্রশ্ন করলো তিনবার। তিনিও তিনবার জবাব দিলেন, আমি বোবা। এরপর মুসায়লামা তাঁকে হত্যা করলো। সংবাদ পৌঁছে গেলো মদীনায়। রসুল স. প্রথম জন সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, সে তো আল্লাহ্তায়ালার অনুমোদনকে অবলম্বন করেছে। আর দ্বিতীয় জন সম্পর্কে বললেন, সে তো সমুন্নত করেছে সত্যকে। তার জন্য সাধুবাদ।

মাসআলাঃ যদি কোনো মুসলমানের সম্পদহানির জন্য কাউকে বলপ্রয়োগ করা হয়, তবে সে সম্পদহানি করতে পারবে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যেমন জীবন রক্ষার জন্য অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করতে পারে, এ বিষয়টিও তেমনি। এমতাবস্থায় যার সম্পদ নষ্ট করা হয়েছে, সে বলপ্রয়োগকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে, বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির নিকট থেকে নয়। কারণ এরকম অবস্থায় সে অস্ত্রধারীর হস্তধৃত অস্ত্রের মতো। ক্ষতিপূরণ তো অস্ত্রধারীর নিকট থেকেই আদায় করতে হয়। অস্ত্রের নিকট থেকে নয়।

মাসআলাঃ যদি বলপ্রয়োগের ফলে কেউ মদ অথবা মৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়, তবে তাতে দোষ নেই। ঐকমত্যানুসারে এরকম করা সিদ্ধ। যদি কেউ এমতাবস্থায় মদ ও মড়া ভক্ষণ না করে জীবন বিসর্জন দেয়, তবে তা সিদ্ধ নয়। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এরকম অবস্থায় হারাম বস্তু পান বা ভক্ষণ করা ওয়াজিব। প্রাণ বিসর্জন সিদ্ধ নয়। প্রাণ রক্ষার জন্য হালাল বস্তু ভক্ষণ যেমন ওয়াজিব, তেমনি ওয়াজিব হারাম ভক্ষণ। এমতাবস্থায় পানাহার না করে মৃত্যুবরণ করা পাপ। আর হারাম পানাহারের জন্য এমতো ক্ষেত্রে গোনাহ্গার হবে বল-প্রয়োগকারী। ইমাম ইউসুফ বলেন, এমতাবস্থায় হারাম ভক্ষণে অস্বীকৃত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করাতে পাপ নেই। বিশুদ্ধ সূত্রানুসারে ইমাম শাফেয়ীর মতও এরকম। তাঁর মতে এরূপ ক্ষেত্রে মদ্য পান ও পরিত্যাগ দু'টোই অনুমোদিত। কিন্তু তা মোবাহ্ (সিদ্ধ) নয়। কারণ মদ্যপান কোনোক্রমেই সিদ্ধ হতে পারে না। মদ্যপান যে হারাম, এই বিশ্বাসে দৃঢ় থেকে যদি সে প্রাণ বিসর্জন দেয়, তবে সে গোনাহ্গার হবে না।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আবু হানিফা বলেন, বিধানটি রুখসত বা শিথিল নয়, বরং শরিয়ত সমর্থিত। সঙ্গিন পরিস্থিতিতে মৃত জন্তুর গোশতও জবেহকৃত বস্তুর মতো বৈধ। কোরআনের বিধানে প্রতিকূল পরিস্থিতিকে ব্যতিক্রম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে— ইল্লা মাদ্বতুরির তুম ইলাইহি (কিন্তু তোমরা যখন নিরুপায় পরিস্থিতির শিকার হও)। এখানে নিরুপায় বা প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সাধারণ বা স্বাভাবিক পরিস্থিতি থেকে পৃথক করা হয়েছে। এটা সুস্পষ্ট যে, স্বাভাবিক অবস্থার নিষিদ্ধতা অস্বাভাবিক অবস্থায় সমর্থনযোগ্য। এটা রুখসত বা সহজসাধ্য আমল নয়। তবে হ্যাঁ, অপরের সম্পদ ভক্ষণের বিষয়টি আলাদা। বলপ্রয়োগ করা সত্ত্বেও যদি কেউ অন্যের সম্পদ ভক্ষণে অস্বীকৃত হওয়ার কারণে মৃত্যুবরণ করে তবে তাকে বলা হবে মাজুর বা অক্ষম। এটা ঐকমত্যসম্মত। কারণ অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপণ সর্বাবস্থায় অবৈধ। কেবল পানাহারের বিষয়টি রুখসত বা সহজসাধ্য বিধানভূত। কিন্তু পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতা দূরীভূত হলে রুখসতের বিধানটি বিলুপ্ত হবে। বিধানের মৌলকত্ব সর্বাবস্থায় অটুটই থাকে।

উল্লেখ্য যে, বল প্রয়োগের বিধানটিও অটুট। এমতাবস্থায় যেনো একই সঙ্গে একই বস্তু মোবাহ ও ফরজ। পুনরায় একই বস্তু আবার নিষিদ্ধও হয়ে যায়। তাই এমতোক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা একটি নীতি নির্ধারণ করেছেন। নীতিটি এরকম— যে সকল ব্যবহারিক বিধান শব্দনির্ভর, সে সকল বিধান বলপ্রয়োগের সময়ও কার্যকর থাকবে। এ ধরনের ব্যবহারিক বিধান দশটি। যেমন— বিবাহ, তালাক, তালাক প্রত্যাহার, ইলা (শপথ), ফাই, জেহার, ক্রীতদাস মুক্তি, হত্যাদণ্ডের ক্ষমা, সাধারণ শপথ ও মানত। এসকল বিধান শব্দনির্ভর। মনের সমর্থন নির্ভর নয়। মুখে উচ্চারণ করলেই এসকল বিধান কার্যকর হয়। যেমন মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হয় বিবাহ। মুখে ক্রীতদাস মুক্তির ঘোষণা দিলেই ক্রীতদাস মুক্ত হয়ে যায় ইত্যাদি। সুতরাং কেউ যদি বলপ্রয়োগের ফলে বাধ্য হয়ে মৌখিকভাবে বিবাহ, তালাক, ক্রীতদাস মুক্তি ও হত্যাদণ্ডের ক্ষমার স্বীকৃতি দেয়, তবুও তা কার্যকর হবে। ইমাম শা'বী, ইব্রাহিম নাখয়ী ও সুফিয়ান সওরীর অভিমতও এরকম।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, বলপ্রয়োগিত ব্যবহারিক বিধান কার্যকর করা যাবে না। উম্মতজননী আয়েশা বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, বাধ্যগত অবস্থায় তালাক ও ক্রীতদাস মুক্তির ঘোষণা কার্যকর হবে না। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, হাকেম, ইবনে জাওজী, আবু ইয়ালী ও বায়হাকী। সুফিয়া বিনতে ওসমানের পদ্ধতিতে শায়বা থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। হাকেম এই সূত্রপরম্পরাটিকে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এই সূত্রপরম্পরাসংযুক্ত মোহাম্মদ বিন উবাইদ মক্কীকে দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন আবু হাতেম রাজী।

www.eelm.weebly.com

ইবনে জাওজীর বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, 'আগ্‌লাক্ব' (অবরুদ্ধ) শব্দটির প্রকৃত অর্থ—'ইক্‌রাহ্‌' বা বলপ্রয়োগিত। যেমন, 'আগলাক্বতুল বাব্‌' অর্থ আমি দরজা বন্ধ করেছি। অবরোধকারী অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবদ্ধ করে রাখে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'আগলাক্ব' অর্থ প্রচণ্ড ক্রোধ। আবু দাউদের সুনান গ্রন্থে এরকম ব্যাখ্যা লক্ষ্য করা যায়। ইমাম আহমদও শব্দটিকে এই অর্থে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এরকম অর্থ অযথার্থ। ইবনে উসায়েদ এটাকে সমর্থন করেননি। বরং তিনি এর প্রতিবাদ করে বলেছেন, 'আগ্‌লাক্ব' অর্থ যদি ক্রোধ হয়, তবে কোনো তালাকই কার্যকর হবে না। কারণ তালাক সাধারণতঃ ক্রোধের অবস্থায় দেয়া হয়ে থাকে। হাসান বসরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌ তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জনা করে দিয়েছেন। আর বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তোমরা যা করতে বাধ্য হও, তাও ক্ষমা করে দিয়েছেন। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ইবনে জাওজী সূত্রে। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা মূল দাবিটি প্রমাণিত হয় না। কেবল এতোটুকুই প্রমাণিত হয় যে, বল প্রয়োগিত অবস্থায় যে পাপ সংঘটিত হয়, আল্লাহ্‌পাক তা উপেক্ষা করেন। কিন্তু এতে করে ব্যবহারিক জীবনে বিধান কার্যকর হবে না, এরকম কথাতো এখানে নেই। এই হাদিসের সমর্থক আর একটি হাদিস হজরত ছাওবান থেকে বর্ণনা করেছেন তিবরানী, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের উপর থেকে ভ্রমজনিত শাস্তি অপসারিত করা হয়েছে। ওই কর্মের শাস্তিও, যা আমার উম্মতেরা করে নিরুপায় হয়ে। হজরত আবু দারদা থেকেও অনুরূপ হাদিস এসেছে। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার হাদিস দু'টোর সূত্রপরম্পরাকে শিথিল বলেছেন। এই বিষয়ে উপরে বর্ণিত বিভিন্ন সূত্রের হাদিসকে আওজায়ীর উদ্ধৃতিতে হজরত ইবনে আব্বাসের সংশ্লিষ্টতায় উল্লেখ করেছেন ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, দারা কুতনী, বায়হাকী ও হাকেম। কিন্তু সূত্রপরম্পরা বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনাগুলোকে বলেছেন অদৃঢ়। এ সম্পর্কে হজরত আবু জর থেকে ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত সূত্রপ্রবাহভূত শহর বিন হাওশবও রয়েছেন। তাই সূত্রটি বিতর্কিত। হাদিসটিকে যদি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত বলে মেনে নেয়াও যায়, তবুও ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের সমর্থনে এই হাদিস থেকে দলিল গ্রহণ করলে তা হবে ভুল। 'ভুলক্রটির শাস্তি অপসারিত করা হয়েছে' এ কথার অর্থ কখনোই এরকম নয় যে, এই উম্মতের ভুলত্রুটি হবেই না। কারণ বিষয়টি বাস্তবোচিত নয়। বরং বলা যেতে পারে, কথাটির অর্থ হতে পারে তিন রকমের— ১. আখেরাতে তাদের ত্রুটিবিচ্যুতির হিসাব হবে না। কারণ আল্লাহ্‌পাক তা পূর্বাহ্নে মাফ করে দিয়েছেন। এটাই বিশুদ্ধ অর্থ। ২. ভুল-ভ্রান্তির সাধারণ অর্থ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু একথাটি ঠিক নয়।

www.eelm.weebly.com

৩.প্রায়োগিক ক্ষেত্রেও ভুলভ্রান্তিকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এটাও ঐকমত্যবিরোধী। অতএব সর্বসম্মত অভিমত এই যে, এই উম্মতের বিচ্যুতিজনিত আখেরাতের শাস্তিটুকুই কেবল রহিত করা হয়েছে। জাগতিক শাস্তির কথা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এরকম বলেছেন ইবনে হুম্মাম।

আল্লামা ইবনে জাওজী শাফেয়ী অভিমতের পোষকতায় হজরত ওমরের একটি সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেছেন এ রকম— তাঁর খেলাফতের সময় একদিন এক লোক আরোহণ করলো একটি পর্বত শিখরে। এর আগেই পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলো তার স্ত্রী। সে বললো, এক্ষুণি আমাকে তিন তালাক দাও। নয়তো আমি এখান থেকে পাথর গড়িয়ে দিয়ে তোমাকে বধ করবো। লোকটি তার স্ত্রীকে ধর্মের দোহাই দিয়ে, আল্লাহ্র ভীতি প্রদর্শন করে নিরস্ত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার স্ত্রী তার কথা কানেই তুললো না। বার বার বলতে লাগলো, হয় তালাক দাও, না হয় আমি তোমাকে হত্যা করবো। লোকটি তখন বাধ্য হয়ে তাকে তিন তালাক দিলো। পরে বিষয়টি হজরত ওমরের নিকটে উত্থাপিত হলে তিনি বললেন, তালাক হয়নি। তুমি তোমার স্ত্রীর নিকটে গমন করতে পারো।

ইমাম আবু হানিফাও তাঁর অভিমতের সমর্থনে কতকগুলো হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, উপহাসার্থে বলা হলেও— বিবাহ, তালাক এবং তালাক প্রত্যাহার। আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, আহমদ, হাকেম, দারা কুতনী। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তমসূত্রসম্বলিত এবং হাকেম বলেছেন, বিশুদ্ধসূত্রবিশিষ্ট। ইবনে জাওজী বলেছেন, হাদিসটির সূত্রপ্রবাহসংযুক্ত আতা বিন উজলান পরিত্যাজ্য বর্ণনাকারী হিসেবে চিহ্নিত। ইবনে হাজার লিখেছেন, ইবনে জাওজী এ ব্যাপারে প্রমাদমুক্ত নন। তিনি অবশ্য আতাকে আতা বিন উজলান ধরে নিয়েছেন। কিন্তু আতার পিতার নাম আবী রিবাহ্। আর আতা বিন আবী রিবাহ্ একজন বলিষ্ঠ বর্ণনাকারী হিসেবে সুপরিচিত। আবু দাউদের বর্ণনাতেও এ রকম বলা হয়েছে। হাকেমও এরকম বলেছেন। তবে এই সূত্রপ্রবাহভূত আবদুর রহমান বিন যোবায়ের সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম নাসাঈ তাঁকে পরিত্যক্ত বলেছেন। আবার অপরাপর বিদ্বজ্জন তাঁকে অভিহিত করেছেন বলিষ্ঠ বর্ণনাকারীরূপে। এমতো মতপ্রভেদের কারণে আমরা হাদিসটিকে বলি উত্তমসূত্রবিশিষ্ট।

একটি সন্দেহঃ শরিয়ত অনুসারে ব্যবহারিক বিষয়ে ব্যবহারকারীকে হতে হয় অধিকারসম্পন্ন। তাই উপহাসচ্ছলে কেউ তালাক প্রদান করলে তা কার্যকর হবে। কারণ বিষয়টি তার অধিকারভূত, যদিও সে তালাক কার্যকর করার ব্যাপারে সম্মত

www.eelm.weebly.com

না হয়। এমতো ক্ষেত্রে মনের কথা ধর্তব্য নয়। কিন্তু বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রটি ভিন্ন। কারণ বলপ্রয়োগের অবস্থায় তার নিজস্ব অধিকার বলে কিছু থাকে না। তাহলে বলপ্রয়োগিত অবস্থার তালাক উপহাসচ্ছলে প্রদত্ত তালাকের মতো কীভাবে হয়?

সন্দেহের অপনোদনঃ আমরা বলি, যার উপরে বলপ্রয়োগ করা হয়, সে তো অধিকারসম্পন্ন। অন্ততঃ মতামত ব্যক্ত করার অধিকার তো তার রয়েছে। উপহাসচ্ছলে তালাক প্রদাতার মতো সে-ও তার কথার পরিণাম সম্পর্কে জানে। আর সে এ কথাও ভালোভাবে জানে যে, বলপ্রয়োগকারীর বিরোধিতা তার জন্য বয়ে আনবে অসহ্য যন্ত্রণা। আবার তালাক দেয়ার ব্যাপারটিও তার জন্য কম দুঃখজনক নয়। এমতাবস্থায় জেনে শুনে তাকে যে কোনো একটি সিদ্ধান্ত বেছে নিতে হয়। তখন সে যে সিদ্ধান্তটিকে সহজ মনে করে, তাই করে। একারণেই বল প্রয়োগের তালাক অবশ্যই কার্যকর ।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, তালাকের বিধান অকার্যকর করার ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের কোনো সুযোগ নেই। একটি ঘটনার মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করে নেয়া যেতে পারে। ঘটনাটি এই— হজরত হুযায়ফা ও তাঁর পিতার নিকট থেকে অংগীকার গ্রহণ করেছিলো কাফেরেরা। রসুল স. তখন তাঁদেরকে বলেছিলেন, আমরা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে কৃত অংগীকার পূরণ করবো। সেই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্যও কামনা করবো। রসুল স. এর এমতো বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, স্বেচ্ছাকৃত ও বলপ্রয়োগিত শপথ সমগুরুত্ব-সম্পন্ন। অর্থাৎ শপথ যেভাবেই করা হোক না কেনো, তা কার্যকর করতে হবে। যে বিধান কেবল উচ্চারণনির্ভর, বলপ্রয়োগ তাকে অকার্যকর করতে পারে না। অবশ্য ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি এরকম নয়। এরকম চুক্তি কার্যকর করার জন্য বাক্য অথবা বাক্যের সমপর্যায়ের কিছু অত্যাবশ্যক। তদুপরি তা মনের সমর্থনপুষ্ট হওয়াও বাঞ্ছনীয়। বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু মনের সমর্থন ধর্তব্য নয়।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতের সমর্থনে আরো একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। হাদিসটি এই— হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কেবল জ্ঞানহীন ও উন্মাদের তালাক ব্যতীত অন্য সকল তালাক কার্যকর। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি কেবল ইকরামা বিন খালেদের মাধ্যমে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আমার নিকটে উপনীত হয়েছে। এদিকে আবার ইকরামা থেকে আতা বিন ওজলানের বর্ণনাসূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আতা বিন ওজলান একজন বিতর্কাহত বর্ণনাকারী। তাই তার সূত্রপরম্পরাকে অগ্রাহ্য ভেবে আমি তা পরিত্যাগ করেছি।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতের সমর্থনে রয়েছে সাফওয়ান বিন আসেমের বর্ণনাকৃত আরো একটি হাদিস। জনৈক সাহাবী থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন, এক লোক তার পত্নীর পাশে নিদ্রিত ছিলো। এমতাবস্থায় তার পত্নী একটি ছুরি তার কণ্ঠনালীতে রেখে বলে উঠলো, আমাকে তালাক দাও। নয়তো এক্ষুণি তোমাকে

www.eelm.weebly.com

জবাই করবো। লোকটি তাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিলো। কিন্তু তার পত্নী সেদিকে কর্ণপাতই করলো না। শেষে বাধ্য হয়ে লোকটি তাকে তিন তালাক দিলো। বিষয়টি রসুল স. সকাশে উত্থাপন করা হলে তিনি বললেন, তালাকের ব্যাপারে কোনো মধ্যাহ্ন বিশ্রাম নেই।

ইবনে জাওজীর বর্ণনায় এসেছে, ইমাম বোখারী বলেছেন, জবরদস্তিমূলক তালাকের ক্ষেত্রে সাফওয়ান বিন আসেমের হাদিসটি অগ্রাহ্য। ইবনে হুম্মামের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, চারটি বিষয় অবোধ্য, অসমাধ্য। এগুলো থেকে প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়। বিবাহ, তালাক, ক্রীতদাস মুক্তি ও সদ্‌কা— এই চারটি বিধান বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রেও কার্যকর হয়।

আমি বলি, প্রকাশ্যতঃ এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার দলিলপ্রমাণগুলো অধিকতর বলিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য। এসম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে যদি দ্বন্দ্ব পরিদৃষ্ট হয়, তবে অনিবার্যরূপে অগ্রসর হতে হবে কিয়াসের দিকে। আর কিয়াসের মাধ্যমেও একথা প্রমাণিত হয় যে, তালাক, দাসমুক্তি, ইত্যাদি জবরদস্তি অবস্থাতেও কার্যকর হবে। আল্লাহ্‌তায়ালাই সর্বজ্ঞ।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১০৭, ১০৮, ১০৯

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ○ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

❒ ইহা এই জন্য যে, তাহারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয় এবং এই জন্য যে আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে পথ-নির্দেশ করেন না।

❒ উহারাই তাহারা, আল্লাহ্ যাহাদিগের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারাই অনবধান।

❒ নিশ্চয়ই উহারা পরলোকে হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালা এ কারণে পথপ্রদর্শন করেন না যে, তারা আখেরাত অপেক্ষা দুনিয়াকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। আবার এ কারণেও সুপথ দেখান না যে, তাদেরকে পথ-নির্দেশ করা তাঁর অভিপ্রায় নয়। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের দু'টি কারণ তুলে ধরা হয়েছে। একটি প্রকাশ্য এবং

www.eelm.weebly.com

আর একটি অন্তর্নিহিত। প্রকাশ্য কারণটি হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকেই তারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্পাকের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে দেখেনি। আর অন্তর্নিহিত কারণটি হচ্ছে— আল্লাহ্পাকও চান না যে তারা পথপ্রাপ্ত হোক। এতে করে এ কথাটিও প্রমাণিত হয় যে, মানুষের অবস্থান সামর্থ্য ও বলপ্রয়োগের মাঝামাঝি। অর্থাৎ মানুষ তার কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীন যেমন নয়, তেমনি নয় পুরোপুরি বাধ্যগত।

পরের আয়াতে (১০৮) বলা হয়েছে— 'ওরাই তারা, আল্লাহ্ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই অনবধান।' একথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, অন্তর মোহরাঙ্কিত থাকার কারণেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সত্যকে সত্য বলে অনুধাবন করতে পারে না। আর মোহরাবদ্ধ শ্রুতির কারণে শুনতে পায় না সত্যের আহ্বান। আবার তাদের দৃষ্টি মোহরাচ্ছাদিত বলেই তারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর দর্শন থেকে রয়ে যায় চিরবঞ্চিত। সুতরাং তারা চিরউদাসীন, চিরভ্রষ্ট।

এর পরের আয়াতে (১০৯) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয়ই তারা পরলোকে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।' একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের জীবনকে করেছে বিশ্বাসবিহীন, পুণ্যকর্মহীন। এমতো অপকর্ম তাদের চিরস্থায়ী অগ্নিবাসকে অপরিহার্য করে তুলেছে। তারা অনুধাবন করতে পারেনি যে, বিশ্বাসহীন নিষ্ফলা জীবন কখনো আল্লাহ্র অসন্তোষ ও শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে না। পক্ষান্তরে বিশ্বাসীরা পাপী হলেও তাদের জীবন এরকম নয়। কারণ তারা সফলতার মূল অবলম্বন বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। এ কারণেই তাদের পরিত্রাণ অনিবার্য। দুনিয়ায় অথবা আখেরাতে তাদের কৃত পাপের শাস্তি যদি তারা পায়ও, তবে তাদের সে শাস্তি হবে সাময়িক। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতো চিরস্থায়ী নয়।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ১১০

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ○

❒ যাহারা নির্যাতিত হইবার পর দেশত্যাগ করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে তোমার প্রতিপালক এই সবের পর তাহাদিগের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু।

আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে 'ছুম্মা' (অনন্তর বা অতঃপর) শব্দটি। ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে কাফের মুশরিকদের প্রসঙ্গ। ইমানদারগণের প্রসঙ্গ

www.eelm.weebly.com

সম্পূর্ণ পৃথক ও বিপরীত। তাই 'ছুম্মা' শব্দটির মাধ্যমে এখানে প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'অনন্তর যারা নির্যাতিত হয়ে দেশত্যাগ করে, পরে জেহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, তোমার প্রতিপালক এই সবের পর তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু।'

এখানে 'ফাতিনু' কথাটির অর্থ নির্যাতিত, ইসলাম গ্রহণের কারণে চরমভাবে অত্যাচারিত। ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাতে কুবরা গ্রন্থে লিখেছেন, আমের বিন হাকেম বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের কারণে হজরত আম্মার বিন ইয়াসারকে অকথ্য ক্লেশ দেয়া হতো। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। জ্ঞান ফিরে পেলেও হারিয়ে ফেলতেন বোধশক্তি। ভেবে পেতেন না কী করবেন বা কী বলবেন। হজরত সুহাইব, হজরত আবু ফুকাইহা, হজরত বেলাল, হজরত আম্মার বিন ফুহাইর প্রমুখের অবস্থাও ছিলো তদ্রূপ।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ ছিলেন, আবু জেহেলের দুধভাই আয়াশ বিন আবী রবীয়া, আবু জানদাল বিন সুহাইল বিন আমর, ওলীদ বিন মুগীরা, সালমা বিন হিশাম এবং ওবায়দুল্লাহ্ বিন উসায়েদ সাক্বাফী। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের উপরে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হতো। অসহনীয় যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তাঁরা তখন এমন কথা উচ্চারণ করতেন, যাতে মুশরিকেরা খুশী হয়ে যেতো। একসময় আল্লাহ্তায়ালা তাঁদের উপরে বিশেষ করুণা বর্ষণ করলেন। তাঁরা হিজরত করে চলে গেলেন মদীনায়। সেখানে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন জেহাদে অংশগ্রহণ করলেন। বিভিন্ন প্রতিকূলতা অতিক্রম করলেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে। তখন ওই সকল সাহাবীদের প্রতি শুভসংবাদ জানিয়ে অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

হাসান বসরী ও ইকরামা বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবী সাররাহ সম্পর্কে। তিনি ছিলেন রসুল স. এর সচিব। কিন্তু হঠাৎ সে বিভ্রান্ত হয়ে রসুল স. এর পবিত্র সঙ্গ পরিত্যাগ করে। অন্যত্র গমন ক'রে গ্রহণ করে খৃষ্টধর্ম। মক্কা বিজয়ের পর রসুল স. ওই ধর্মত্যাগীকে হত্যার নির্দেশ জারী করেন। সে ছিলো আবার হজরত ওসমানের বৈপিত্রেয় ভাই। অবস্থা বেগতিক দেখে সে হজরত ওসমানের আশ্রয় যাচ্ঞা করে। হজরত ওসমান তার জন্য রসুল স. এর দরবারে সুপারিশ করেন। রসুল স. তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং হত্যার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেন। আবদুল্লাহ্ এবার মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেন। আজীবন তিনি ইসলামের প্রতি ছিলেন অকুণ্ঠ বিশ্বাসী।

ক্বারী ইবনে আমর এখানকার 'ফাতিনু' কথাটিকে পড়তেন 'ফাতানু'। এরকম উচ্চারণ করলে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য দাঁড়াবে এরকম— তারা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমানকে যাতনা দেয়ার পর পুনরায় ইমান গ্রহণ করে দেশত্যাগ

www.eelm.weebly.com

করেছিলো ও ধৈর্য ধারণ করেছিলো। এরকম অর্থের মাধ্যমে একথাই স্থিরীকৃত হয় যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিলেন আমের ও তাঁর ক্রীতদাস জিবর। জিবর ইসলাম গ্রহণ করলে আমের তাঁর উপরে অবর্ণনীয় অত্যাচার শুরু করেছিলো। অত্যাচারের মাত্রা এতো চরমে উঠলো যে, জিবর প্রকাশ্যে ধর্মত্যাগের ঘোষণা দিতে বাধ্য হলেন। কিছুদিন পর আমের নিজেই মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং জিবরকে সঙ্গে নিয়ে গমন করলেন মদীনায়। এরপর রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে ধন্য হয়ে অংশ গ্রহণ করলেন বিভিন্ন ধর্মযুদ্ধে। আল্লাহ্‌র পথে সহ্য করলেন অনেক ক্লেশ ও যাতনা।

'মিম বা'দিহা' অর্থ এই সবের পর। অর্থাৎ ইমান, হিজরত, জেহাদ ও ধৈর্য ধারণের পর তাদের উপরে অবশ্যই আপতিত হয়েছে পরিপূর্ণ ক্ষমা ও অশেষ দয়া।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১১১

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

❒ স্মরণ কর সেইদিনকে যেদিন আত্মসমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করিয়া আসিবে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

মহাবিচারের দিনে মানুষের দুর্ভাবনা ও পরিত্রাণ চিন্তা কতো প্রবল হবে, তার বিবরণ দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! সেই ভয়াবহ মহাদিবসের কথা স্মরণ করুন, যেদিন নিজের পরিত্রাণ চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা মানুষের মস্তিষ্কে ঠাঁই পাবে না। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী কেউই অপরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারবে না। সকলেই হবে ভীত; চিন্তিত। অবিশ্বাসীরা বলবে, হে আমাদের মহান প্রভুপালক! আমাদের সমাজপতিরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলো। আমরা বিনা বিচারে তাদের কথা মান্য করে মহাপরাধ করেছি। সুতরাং আমাদেরকে সংশোধনের সুযোগ দেয়া হোক। পুনরায় পৃথিবীতে পাঠানো হোক। এবার আর আমরা ভুল করবোই না। জীবন যাপন করবো তোমার আজ্ঞানুসারে। বিশ্বাসীরা বলবে, হে আমাদের সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর প্রভুপালক! আমরা নিরাপত্তা চাই। আমাদেরকে তুমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত কোরো না।

 www.eelm.weebly.com

ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, হজরত মুয়াজ বলেছেন, একবার রসুল স. এর নিকটে জানতে চাওয়া হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! মহাবিচারের দিন জাহান্নামকে কোথা থেকে আনা হবে? তিনি স. বললেন, পৃথিবীর সপ্তম স্তর থেকে। জাহান্নামের রয়েছে একহাজার লাগাম। প্রতিটি লাগাম ধরে টানবে এক হাজার করে ফেরেশতা। মানুষের অবস্থান থেকে এক হাজার বৎসর পথের সমদূরত্বে জাহান্নামকে আনা হলে সে একটি নিঃশ্বাস ছাড়বে। ওই নিঃশ্বাসের ভয়াবহ আওয়াজের প্রভাব থেকে নবী-রসুল ফেরেশতা কেউই বাদ যাবে না। সকলেই তখন নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাবে, ইয়া নাফসি! ইয়া নাফসি। হে আমার মহাদয়ার্দ্র প্রভুপালনকর্তা। বাঁচাও! বাঁচাও!'

বাগবী লিখেছেন, একবার হজরত ওমর হজরত কা'ব আহবারকে বললেন, আমাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করো। হজরত কা'ব বললেন, হে বিশ্বাসীগণের অগ্রনায়ক! যার আনুরূপ্যবিহীন হস্তে আমার জীবন, তাঁর শপথ! আপনি যদি সত্তর জন নবীর সমতুল্য পুণ্যকর্ম নিয়ে মহাবিচারের ময়দানে উপস্থিত হন, তবুও আপনি সেদিন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকবেন। আত্মপরিত্রাণ ছাড়া অন্য কোনো চিন্তাই তখন আপনার মাথায় ঢুকবে না। দোজখ তখন এমন ভাবে ফুঁসতে থাকবে যে, ফেরেশতা এবং মহামর্যাদাশালী নবী-রসুলগণও হাঁটুমুড়ে বসে কাতরস্বরে কেবলই উচ্চারণ করতে থাকবেন, ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী! এমনকি আল্লাহ্র বন্ধু হজরত ইব্রাহিমও তখন বলে উঠবেন, হে চিরঅমুখাপেক্ষী প্রভুপালনকর্তা! আমি আমার নিজের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। আল্লাহ্তায়ালাও সেদিনের মহাভয়াবহতার কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে— সেদিনকে যেদিন আত্মসমর্থনের যুক্তি করে আসবে প্রত্যেক ব্যক্তি....(আলোচ্য আয়াত)।

ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে জনগণ লিপ্ত হবে তীব্র বিতণ্ডায়। এমনকি দেহ ও আত্মার মধ্যেও তখন সম্পর্ক হবে অহিনকুল সদৃশ। আত্মা বলবে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমার তো হাত ছিলো না, যদ্দারা আমি কোনো কিছু করি। পা-ও ছিলো না, যদ্দারা চলি। ছিলো না চোখ, যদ্দারা দেখি (কাজেই আমার কোনো দোষ নেই, দেহই তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা পাপ কর্মসমূহ করেছে)। দেহ বলবে, হে আমার প্রভুপালক! তুমি তো আমাকে সৃষ্টি করে রেখেছিলে নিঃসাড়। তুমি আমার হাত, পা ও চোখ সৃষ্টি করলেও কোনো কিছু করবার, কোনো পথে চলবার ও কোনো কিছু দেখবার ক্ষমতা আমার ছিলো না। এরপর আত্মা এলো আলোর ছটার মতো। সঙ্গে সঙ্গে সচল হয়ে গেলো আমার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (কাজেই আমার কোনো দোষ নেই। সব দোষ ওই আত্মার)। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা দেহ ও আত্মার এই বিপদ সম্পর্কে সুন্দর একটি উপমা দান করেছেন। উপমাটি এই— এক অন্ধ ও এক খোঁড়া প্রবেশ করলো এক বাগানে। বাগানের গাছগুলো ছিলো ফলে ভরপুর। অন্ধ

www.eelm.weebly.com

চোখে দেখতে পায় না। আবার খোঁড়া গাছে উঠতে পারে না। শেষে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তারা ঠিক করলো অন্ধ লোকটি কাঁধে উঠিয়ে নিবে খোঁড়াকে, আর খোঁড়া লোকটি গাছ থেকে ফল পাড়বে। তাই করলো তারা। কিন্তু তাদের চুরি শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লো। দু'জনকেই সাব্যস্ত করা হলো চোর বলে এবং শাস্তি দেয়া হলো দু'জনকেই।

'তুজ্বাদিলু আন নাফসিহা' কথাটির 'নাফসিহা' অর্থ স্বীয় সত্তা। তাই এখানে 'প্রত্যেক ব্যক্তি' কথাটির অর্থ হবে প্রত্যেক সত্তাধারী। বস্তুর মূল ও সত্তার মূলকে বলে নফস। যা মূল নয়, তাকে বলা হয় গইর। অর্থাৎ সেদিন তারা সত্তার সমর্থনে বা আত্মসমর্থনে যুক্তি উপস্থাপন করবে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।' এখানে 'তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না' কথাটির অর্থ— তাদের পুণ্য কিছুমাত্র কম দেয়া হবে না। শাস্তিও দেয়া হবে না কিছুমাত্র বেশী।

সূরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১১২, ১১৩

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

❒ আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিতেছেন এক জনপদের যাহা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত; যেথায় আসিত সর্বদিক হইতে উহার প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর উহা আল্লাহের অনুগ্রহ অস্বীকার করিল; ফলে, তাহারা যাহা করিত তজ্জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে আস্বাদ গ্রহণ করাইলেন ক্ষুধা ও ভীতির।

❒ তাহাদিগের নিকট তো আসিয়াছিল এক রসূল তাহাদিগেরই মধ্য হইতে, কিন্তু তাহারা তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল; ফলে, সীমালংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাহাদিগকে গ্রাস করিল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্তায়ালা শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি জনপদের কথা বলছেন, যে জনপদের জীবনযাত্রা ছিলো স্বস্তিদায়ক। জনপদবাসীদেরকে দেয়া হয়েছিলো প্রচুর জীবনোপকরণ। বিভিন্ন স্থান থেকে

 www.eelm.weebly.com

তাদের জীবনোপকরণ আসতো। কিন্তু তারা আল্লাহ্তায়ালার এই বিশেষ অনুগ্রহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলো। হয়ে গেলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। কাফের। ফলে আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ স্থগিত করলেন। তারা হয়ে পড়লো দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ও ভীত।

এখানে 'ক্বরিয়া' অর্থ জনপদ। অর্থাৎ দৃষ্টান্তরূপে যে কোনো একটি জনপদ। অথবা অতীতের যে কোনো একটি জনপদ, যা মক্কার মতো। অর্থাৎ ওই জনপদের উপমাদৃষ্টে মক্কাবাসীরা যেনো শিক্ষা গ্রহণ করে। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'এক জনপদ' বলে বুঝানো হয়েছে মক্কা শহরকে। অর্থাৎ মক্কার জনপদের উপমা দৃষ্টে অপরাপর জনপদবাসীরা যেনো শিক্ষা গ্রহণ করে।

জ্ঞাতব্যঃ সুলাইম বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, উম্মত জননী হজরত হাফসা মক্কা থেকে মদীনার দিকে যাচ্ছিলেন। আমি ছিলাম তাঁর সহযাত্রী। পথিমধ্যে খবর পাওয়া গেলো হজরত ওসমান শহীদ হয়েছেন। এই দুঃসংবাদ পেয়ে জননী ফিরে চললেন মক্কায়। বললেন, তুমিও আমার সঙ্গে ফিরে চলো। যাঁর অধিকারে আমার জীবন, তাঁর পবিত্র সত্তার শপথ! এটা সেই জনপদ, আল্লাহ্ যার উল্লেখ করেছেন ক্বরিয়ার আয়াতে (আলোচ্য আয়াতে)। ইজালাতুল খাফা।

'আমিনাতান্' অর্থ নিরাপদ । অর্থাৎ বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নির্ভয়। 'মুত্বমাইন্নাতান্' অর্থ নিশ্চিন্ত। অর্থাৎ দুশ্চিন্তাহীন জীবনযাপন, যে জীবনে আর্থিক অসংগতি কিংবা শত্রুভীতি নেই। সারা আরবের মধ্যে কেবল মক্কা শহরই ছিলো এরকম নিরাপদ, নিশ্চিন্ত ও নির্বিঘ্ন। আরবের অন্যান্য জনপদগুলো এরকম ছিলো না। তাই তাদের অধিকাংশই ছিলো মরুচারী। লুণ্ঠনাশংকা ও খাদ্যাভাব তাদের লেগেই থাকতো।

'যেখানে আসতো সর্বদিক থেকে তার প্রচুর জীবনোপকরণ' কথাটির অর্থ জলপথে ও স্থলপথে চতুর্দিক থেকে মক্কায় সরবরাহ হতো জীবন যাপনের প্রচুর সামগ্রী।

'ফাকাফারাত্ বি আনউমিল্লাহ্' অর্থ তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহকে অস্বীকার করলো। অর্থাৎ জনপদবাসীরা আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে হয়ে গেলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এখানকার 'আনউম' শব্দটি 'নি'মাত' (নেয়ামত) শব্দের বহুবচন। যেমন 'দিরউন' এর বহুবচন 'আদরাউ' এবং 'বুউসুন্' এর বহুবচন 'আবউসুন'।

'লিবাসাল জুয়ি ওয়াল খওফি' কথাটির শাব্দিক অর্থ ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক। অর্থাৎ তাদেরকে পরানো হলো ক্ষুধা ও ভীতির পরিচ্ছদ। কিন্তু কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে— তাদেরকে আস্বাদন করানো হলো ক্ষুধা ও ভীতির লেবাস। 'লিবাস' বা পরিচ্ছদ বলে এখানে বুঝানো হয়েছে দুর্ভিক্ষের চিহ্নকে, যা বিবর্ণ মুখমণ্ডল ও শারীরিক দৌর্বল্যের আকারে প্রকাশ পায়।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. এর অপপ্রার্থনার ফলে মক্কাবাসীদের উপরে আপতিত হয়েছিলো একটানা সাত বৎসরের সুদীর্ঘ দুর্ভিক্ষ। জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসম্ভারের সরবরাহ নেমে এলো শূন্যের কোঠায়। অস্থি-ভস্ম, মৃত পশু, কুকুর, উটের পশম, রক্ত ইত্যাদি খেয়ে ও পান করে অতিকষ্টে কোনোক্রমে জীবন ধারণ করে চললো তারা। ক্ষুধার তাড়নায় তাদের দৃষ্টিশক্তিও হলো বিপর্যস্ত। বার বার তারা তাকাতে শুরু করলো আকাশের দিকে। কিন্তু দেখতে পেলো কেবল ধোঁয়া আর ধোঁয়া। এমতো সঙ্গিন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় তারা শরণাপন্ন হলো রসুল স. এর। বললো, মোহাম্মদ! তোমার শত্রুতা তো কেবল আমাদের সঙ্গে। অবলা নারী ও নিস্পাপ শিশুরা তো তোমার কোনো ক্ষতি করেনি। সুতরাং তুমি সদয় হও। তোমার স্বজনেরা যে মরতে বসেছে। রসুল স. দুর্ভিক্ষ অপসারণের জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে কায়মনো-বাক্যে মিনতি জানালেন। বলাবাহুল্য, তাঁর প্রার্থনা গৃহীত হলো। দুর্ভিক্ষ গুটিয়ে নিলো তার বীভৎস থাবা। উল্লেখ্য যে, তখন পর্যন্ত মক্কাবাসীদের অধিকাংশই ছিলো পৌত্তলিক।

আমি বলি, আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। মক্কাবাসীরা দীর্ঘ সাতটি বছর ধরে দুর্ভিক্ষাঘাতে জর্জরিত হয়েছিলো। বহিঃশত্রুর কোনো আক্রমণাশংকা তখন তাদের ছিলো না। রসুল স. এর মদীনায় হিজরতের কয়েক বছর পর থেকে মক্কাবাসীদের অন্তরে রসুল স. এর পক্ষ থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা প্রবল হতে শুরু করেছিলো। এমতাবস্থায় কিন্তু মদীনাকেই আলোচ্য আয়াতের অবতরণস্থল বলে মেনে নিতে হয়। নতুবা এখানে উল্লেখিত 'ক্বরিয়া' (জনপদ) বলে বুঝতে হয় মক্কা ব্যতীত অন্য কোনো জনপদকে। একথাও বলতে হয় যে, অন্য কোনো জনপদকেই আল্লাহ্পাক এখানে দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করেছেন, যেনো তাদের অশুভ পরিণাম দেখে মক্কাবাসীরা সাবধান হয়ে যেতে পারে। গ্রহণ করতে পারে সদুপদেশ।

পরের আয়াতে(১১৩) বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট তো এসেছিলো এক রসুল তাদেরই মধ্য থেকে, কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিলো; ফলে সীমালংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করলো।' লক্ষণীয় যে, দৃষ্টান্তরূপী জনপদ সংক্রান্ত আলোচনার ধারাবাহিকতায় এবার এসেছে মক্কাভূমির কথা। এখানকার 'হুম' (তারা) সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে মক্কাবাসীদের সঙ্গে। আর এখানকার 'রসুল' অর্থ রসুলেপাক স. স্বয়ং। আর 'শাস্তি' কথাটির অর্থ এখানে দুর্ভিক্ষ অথবা বদর যুদ্ধ। একথাটিও এখানে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। রসুল স. এর হিজরতের পরে। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'সীমালংঘন করা অবস্থায়' কথাটির সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'অনুগ্রহ অস্বীকার করলো' কথাটির সঙ্গে। এমতাবস্থায় এখানকার 'হুম'

www.eelm.weebly.com

(তারা, তাদেরকে) সর্বনামটি অবস্থা প্রকাশক হিসেবে গণ্য। যদি তাই হয়, তবে 'এক রসুল তাদের মধ্য থেকে' কথাটির অর্থ হবে এখানে— মক্কা ব্যতীত অন্য কোনো জনপদের এক রসুল, যিনি ছিলেন ওই জনপদবাসীর নবী।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১১৪, ১১৫

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

❐ আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তন্মধ্যে যাহা বৈধ ও পবিত্র তাহা তোমরা আহার কর এবং তোমরা যদি কেবল আল্লাহেরই ইবাদত কর তবে তাঁহার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

❐ আল্লাহ্ তো কেবল মড়া, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যাহা জবাইকালে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যের নাম লওয়া হইয়াছে তাহাই তোমাদিগের জন্য অবৈধ করিয়াছেন, কিন্তু কেহ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী না হইয়া অনন্যোপায় হইলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন, তার মধ্য থেকে তিনি যে খাদ্যবস্তুকে হালাল করেছেন, কেবল তা-ই আহার করো। আর যদি তোমরা একনিষ্ঠভাবে কেবল তাঁর ইবাদত করাকে শিরোধার্য ভেবে থাকো, তবে তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞচিত্ত হও।

এখানে 'কুলু' (আহার করো) সম্বোধনটি করা হয়েছে— বিশ্বাসীগণকে, যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানের নিগড় ছিন্ন করে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন ইসলামের সুশীতল ছায়ায়।

'নি'মাতাল্লহ' (আল্লাহর অনুগ্রহ) কথাটির অর্থ এখানে— রসুল স. এর নবুয়ত ও অন্যান্য ধর্মীয় কল্যাণ, যা তিনি দান করেছেন বিশ্বাসীগণকে। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয়ে (১১২, ১১৩) একটি অকৃতজ্ঞ জনপদবাসীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সত্যধর্ম গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে বিশ্বাসীগণকে লক্ষ্য করে দেয়া হয়েছে বৈধ ও পবিত্র আহার্য বস্তু ভক্ষণ এবং প্রদত্ত অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয় ও আলোচ্য আয়াতের সম্বোধিতজনেরা একই। পূর্বোক্ত আয়াত দু'টোতে ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মর্মন্তুদ পরিণতির কথা। সেই সঙ্গে সত্যধর্ম গ্রহণের প্রচ্ছন্ন নির্দেশ। আর আলোচ্য আয়াতে দেয়া হয়েছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও হালাল বস্তু ভক্ষণের আদেশ।

মক্কার অংশীবাদীরা বলতো, আমরা তো আল্লাহ্‌ই ইবাদত করি। তবে প্রতিমাগুলোর পূজা-অর্চনা করি এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্‌র নিকটে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। তাদের ওই অপকথনের দিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে 'তোমরা যদি কেবল আল্লাহ্‌রই ইবাদত করো।'

পরের আয়াতে (১১৫) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তো কেবল মড়া, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যা জবাইকালে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যের নাম নেয়া হয়েছে, তাই তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন, কিন্তু কেউ অন্যায়কারী বা সীমালংঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের গোশত এবং আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে অন্যের নামে জবাইকৃত পশু। কিন্তু হালাল খাদ্যের অভাবে যার জীবন সংকটাপন্ন, এমতো ব্যক্তি যদি কেবল জীবন রক্ষার্থে বর্ণিত হারাম ভক্ষণ করে, তবে তাকে অভিযুক্ত করা হবে না। কারণ সে অনন্যোপায়। এরকম অনন্যোপায় অবস্থা ক্ষমার্হ। আর আল্লাহ্‌তায়ালা তো পরম ক্ষমাপরবশ ও মহাদয়ার্দ্র।

সূরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا
حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى
اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ۝ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۖ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَعَلَى
الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ
كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ
ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

www.eelm.weebly.com

❒ তোমাদিগের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলিয়া আল্লাহের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিবার জন্য তোমরা বলিও না 'ইহা বৈধ এবং উহা অবৈধ।' যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিবে তাহারা সফলকাম হইবে না।

❒ উহাদিগের সুখ-সম্ভোগ সামান্য এবং উহাদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

❒ তোমার নিকট পূর্বে যাহা উল্লেখ করিয়াছি ইহুদীদিগের জন্য আমি তো কেবল তাহাই নিষিদ্ধ করিয়াছিলাম এবং আমি উহাদিগের উপর কোন জুলুম করি নাই, কিন্তু উহারাই জুলুম করিত উহাদিগের নিজদিগের প্রতি।

❒ যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কর্ম করে তাহারা পরে তওবা করিলে ও নিজদিগকে সংশোধন করিলে তাহাদিগের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মক্কায় অংশীবাদীরা নিজেদের ইচ্ছেমতো কোনো কোনো বস্তুকে হালাল, আবার কোনো কোনো বস্তুকে হারাম বলতো। যেমন এ সম্পর্কে এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে 'মা ফী বুতুনি হাজিহিল্ আনআমি খলিসাতুন লি জুকুরিনা' (এ পশুর উদরে যা কিছু আছে, তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য বৈধ)। তারা আরো বলতো— মানতের পশু, দেব-দেবীদের জন্য উৎসর্গীকৃত পশু অবৈধ। তারা আবার এরকমও বলে যে, এগুলোকে আল্লাহ্ই বৈধ-অবৈধ করেছেন। নিঃসন্দেহে অংশীবাদীদের এমতো বক্তব্য একটি চরম মিথ্যাচার। আর মিথ্যাচারীরা কখনো সাফল্য লাভ করে না। তাই এখানে উদ্ধৃত আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— 'তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করবার জন্য তোমরা বলো না এটা বৈধ, আর ওটা অবৈধ। যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে, তারা সফলকাম হবে না।'

উল্লেখ্য যে, সকল হারাম বস্তুর তালিকা কোরআন মজীদে দেয়া হয়নি। হাদিস শরীফেও অনেক হারাম বস্তুর কথা রয়েছে। আর সে সকল হারামের বিধান কোরআন বিরুদ্ধও নয়। বৈধ ও অবৈধ বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে সুরা মায়িদার তাফসীরে। প্রয়োজনবোধে যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এখানে 'লা তা'কুলু'(তোমরা বোলো না) কথাটির কর্মপদ হচ্ছে 'আলকাজিবু' (মিথ্যা আরোপ করে)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে এরকম— তোমরা মিথ্যা আরোপ করে আল্লাহ্র নামে এরকম বোলো না যে, 'এটা বৈধ, আর ওটা

www.eelm.weebly.com

অবৈধ।' এটা তোমাদের দলিল প্রমাণহীন রসনার অসত্যারোপ। সাবধান! এ রকম কখনোই বোলো না। এরকম যারা বলে তারা কখনোই কৃতকার্য হতে পারে না।

পরের আয়াতে (১১৭) বলা হয়েছে— 'তাদের সুখসম্ভোগ সামান্য এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।' একথার অর্থ— অংশীবাদীরা এই পৃথিবী উপভোগ করবে সামান্য কিছুদিনের জন্য। তারপর আসবে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। আর মৃত্যু পরবর্তী জীবনে তাদের জন্য রয়েছে বিরতিহীন, অনন্ত ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

এর পরের আয়াতে (১১৮) বলা হয়েছে— 'তোমার নিকটে পূর্বে যা উল্লেখ করেছি, ইহুদীদের জন্য আমি তো কেবল তাই নিষিদ্ধ করেছিলাম এবং আমি তাদের উপরে কোনো জুলুম করিনি, কিন্তু তারাই জুলুম করতো তাদের নিজেদের প্রতি' এখানে 'তোমার নিকটে ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি' কথাটি বলা হয়েছে আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ সুরা আনআমের ওই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে যেখানে বলা হয়েছে 'ওয়া আলাল্ লাজীনা হাদু হাররামনা কুল্লা জী জুফুর (আর ইহুদীদের প্রতি আমি অবৈধ করে দিয়েছি সকল নখরবিশিষ্ট প্রাণীকে)। আর এখানে 'আমি তাদের উপর কোনো জুলুম করিনি' কথাটির অর্থ ইহুদীদের প্রতি আমি জোর করে কোনো হারামের বিধান চাপিয়ে দেইনি। বরং তারাই বৈধ বস্তুকে নিজেদের জন্য হারাম বা অবৈধ করে নিয়েছিলো। তাই শাস্তিস্বরূপ তাদের স্বেচ্ছাকৃত হারামকে আমিও হারাম করে দিয়েছি। উল্লেখ্য যে, ক্ষতিকর কোনো কিছুকেই সাধারণতঃ আল্লাহ্তায়ালা অবৈধ বা নিষিদ্ধ করেন। আবার কখনো নিষিদ্ধ করেন শাস্তি প্রদানার্থে। ইহুদীদের প্রতি কতিপয় বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো শেষোক্ত কারণে। আলোচ্য আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, আমি তাদের উপরে কোনো জুলুম করিনি, কিন্তু তারাই জুলুম করতো তাদের নিজেদের প্রতি।

এরপরের আয়াতে (১১৯) বলা হয়েছে— 'যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দকর্ম করে তারা পরে তওবা করলে ও নিজেদের সংশোধন করলে তাদের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এ কথার অর্থ— যারা অন্যায় করার পর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়, অর্থাৎ তওবা ক'রে কৃত অন্যায়ের জন্য আল্লাহ্তায়ালার সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তাদেরকে তিনি অতি অবশ্যই ক্ষমা করেন। কারণ তিনি পরম ক্ষমাপরবশ ও মহাদয়ার্দ্র। এখানে 'আমিলুস সুআ' অর্থ সকল প্রকারের মন্দ বা অন্যায়। 'বি জ্বাহালাতিন' অর্থ অজ্ঞতাবশতঃ। 'গফুর' অর্থ ক্ষমাপরবশ এবং 'রহীম' অর্থ মহাদয়ার্দ্র।

 www.eelm.weebly.com

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبٰهُ وَهَدٰىهُ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○ وَاٰتَيْنٰهُ

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ ○ ثُمَّ أَوْحَيْنَا

إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

❐ ইব্‌রাহীম ছিল এক সম্প্রদায়ের প্রতীক; সে ছিল আল্লাহের অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না অংশীবাদিদিগের অন্তর্ভুক্ত;

❐ সে ছিল আল্লাহের অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ্ তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন সরল পথে।

❐ আমি তাহাকে দুনিয়ায় দিয়াছিলাম মংগল এবং পরকালেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্যতম।

❐ এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তুমি একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; ইব্‌রাহীম অংশীবাদিদিগের অন্তর্ভুক্ত নহে।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইব্রাহিম ছিলেন একটি জাতির মহান অধিনায়ক। অথবা এককভাবে একটি মহান জাতিতুল্য। ছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালার একান্ত অনুগত ও আন্তরিকভাবে ধর্মনিষ্ঠ। আল্লাহ্‌র যে অনুগ্রহ তিনি পেয়েছিলেন, তার জন্যও ছিলেন কৃতজ্ঞচিত্ত। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে মনোনীত করেছিলেন তাঁর প্রিয় নবী ও প্রিয়তম বন্ধুরূপে। আর তাঁকে পরিচালিত করেছিলেন সহজ, সরল ও নির্ভুল পথের দিকে।

'কামুস' অভিধান রচয়িতা লিখেছেন, এখানে 'উম্মত' অর্থ ওই ব্যক্তি, যিনি দুর্লভ গুণে গুণান্বিত, সত্যাশ্রয়ী ও সকল মিথ্যা ধর্মমতসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। যিনি অনুগত, একনিষ্ঠ ও প্রাজ্ঞ। এসকল বিরল গুণবত্তার কারণেই তিনি ছিলেন মানবজাতির মহান অধিনায়ক ও পথ প্রদর্শক। ছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে সতত সতর্ক।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম ছিলেন সকল শুভ আদর্শের মহান শিক্ষক। বিশ্বমানবতার মহান অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

'উম' অর্থ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা। অথবা যাবতীয় উদ্দিষ্ট। মুজাহিদ বলেছেন, তাঁর সময়ে তিনি একাই ছিলেন অসমকক্ষ মুমিন।

www.eelm.weebly.com

‘কানিতা’ অর্থ আল্লাহ্‌র অনুগত। ‘হানিফা’ অর্থ মিথ্যাবিমুখ, সত্যাশ্রয়ী। কোনো কোনো আলেম শব্দটির অর্থ করেছেন— সত্য ধর্মের প্রতি সুপ্রতিষ্ঠিত। কেউ কেউ বলেছেন, পবিত্রাচারী।

কুরায়েশ অংশীবাদীরা দাবি করতো, ‘আমরা ইব্রাহিমের ধর্মমতানুসারী’। তাদের ওই কথার প্রতিবাদস্বরূপ এখানে বলা হয়েছে, ‘সে ছিলো না অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।’ আর এখানকার ‘ইলা সিরাত্বিম মুসতাক্বীম’ কথাটির অর্থ— সরল পথের দিকে বা সরলপথে।

এর পরের আয়াতে (১২২) বলা হয়েছে— ‘আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল।’ এখানে ‘হাসানাতু’ কথাটির অর্থ নবুয়ত ও বিশুদ্ধ বন্ধুত্ব। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি রহ. বলেছেন, ‘হাসানাত’ অর্থ এখানে খুল্লত বা পবিত্র বন্ধুত্ব। বন্ধু তার বন্ধুর নিকটেই গোপন রহস্য উন্মোচন করে, অন্যের নিকটে নয়। তাই রসুল স. তাঁর নিজের ও বংশধরের জন্য ওই করুণা কামনা করেছিলেন, যা বর্ষিত হয়েছিলো হজরত ইব্রাহিম খলিলুল্লহ্ ও তাঁর বংশধরের উপর। রসুল স. এর ওই পবিত্র কামনাই প্রতিভাত হয়েছে নামাজে পঠনীয় দরূদ শরীফে এভাবে— আল্লাহুম্মা সল্লিআলা মোহাম্মাদিঁও ওয়া আলা আলি মোহাম্মাদ কামা সল্লাইতা আলা ইব্‌রহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।

‘খুল্লত’ অর্থ বন্ধুত্ব। আর ‘মাহবুবিয়াত’ অর্থ প্রেমানুরক্তি। প্রেমাসক্তি। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সুনিবিড় সম্পর্ক। হজরত ইব্রাহিম পেয়েছিলেন বন্ধুত্বের মর্যাদা এবং রসুল স. পেয়েছিলেন প্রেমাস্পদত্বের মহিমা। উল্লেখ্য যে, ‘খুল্লত’ অপেক্ষা ‘মাহবুবিয়াতের’ মর্যাদা অধিক। একথাটিও উল্লেখ্য যে, রসুল স. ‘খুল্লতের’ পথেই উপনীত হয়েছিলেন মাহবুবিয়াতের মূল কেন্দ্রে। ‘খুল্লত’ পর্যন্ত যাত্রা স্থগিত ছিলো তাঁর জন্য নিষিদ্ধ। আল্লাহ্‌পাক রসুল স. এর বিরল অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর মহাতিরোধানের এক হাজার বছর পর তাঁর এক মহান উম্মতকেও দান করেছিলেন খুল্লতের মর্যাদা। সেই বিরল ব্যক্তিত্বের নাম হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী রহ.। অবশ্য তাঁর এই মহান মর্যাদা ছিলো অনুসরণজাত। নবী-রসুলগণের মতো সরাসরি নয়। বিষয়টির মূলরূপ এরকম— যেমন কোনো প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সেনাধিনায়ক জয় করলেন কোনো দুর্গ অথবা নুতন কোনো অঞ্চল। এমতাবস্থায় তাঁর বিজয় প্রকৃত অর্থে সাম্রাজ্যের সম্রাট বা মূল সম্রাটের বিজয়। তেমনি হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির খুল্লতের মর্যাদা প্রকৃত অর্থে রসুল স. এর খুল্লতের প্রতিবিম্বাগত বা প্রতিফলিত প্রতিক্রিয়া বা প্রতিভাস।

 www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং পরকালেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম।' এখানে 'সলিহীন' (সৎকর্মপরায়ণগণ) অর্থ নবী-রসুলগণ, যারা নিষ্পাপ ও পরিপূর্ণ পুণ্যাধিকারী। যারা সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত, এরকম পূর্ণতা লাভ করতে পারেন কেবল তাঁরাই। আর তাঁরাই পরকালে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত। পাপ করার পর যারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হন, তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন হলেও এমতো পরিপূর্ণতা পর্যন্ত উপনীত হতে সক্ষম হন না। নিষ্পাপ নবীগণই তাই এরকম পরিপূর্ণতা লাভ করে ধন্য হয়েছেন। অন্য কারো ভাগ্যে এরকম জোটেনি। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হজরত ইব্রাহিমের অনন্য মর্যাদা লাভ হয়েছিলো তাঁর ওই প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে তিনি বলেছিলেন— আলহিক্বনি বিস্‌সলিহীন (আমাকে পূণ্যাত্মাগণের অন্তর্ভূত করো)।

এর পরের আয়াতে (১২৩) বলা হয়েছে— 'এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করো; ইব্রাহিম অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনাকে আমি এইমর্মে প্রত্যাদেশ করছি যে, আপনি আমার এককত্ব সম্পর্কীয় বিশ্বাস প্রচারের ক্ষেত্রে এবং শরিয়তের অন্যান্য বিধানাবলী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমার প্রিয় নবী ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শের আলোককে অধিকতর প্রোজ্জ্বল করে তুলুন। তিনি যেভাবে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ পাঠ করতেন, হজ করতেন ও শরিয়তের অন্যান্য বিধান পালন করতেন, আপনিও তেমনি করুন। তিনি যেমন ছিলেন অনুগত, একনিষ্ঠ, কৃতজ্ঞ ও অংশীবাদবিমুখ, আপনিও তেমন হোন। সমগ্র মানবতাকেও প্রদান করুন এই অনন্যসাধারণ শিক্ষা।

দ্রষ্টব্যঃ মাহবুবিয়াতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করা সত্ত্বেও রসুল স. খুল্লতের বরকতের অনুরাগী ছিলেন। কেন্দ্র যেমন তার বিস্তারকে ভালোবাসে, তেমনি রসুল স. ভালোবাসতেন খুল্লতকে। তিনি ছিলেন প্রেমের কেন্দ্র। আর খুল্লত ছিলো ওই কেন্দ্রের বিস্তার, বৃত্ত বা ব্যাপ্তি। ওই বৃত্তীয় অনুরাগের কারণেই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শের অনুসারী হতে বলেছেন। রসুল স. হজরত ইব্রাহিমকে অত্যধিক ভালোবাসতেন বলেই এমতো প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন। যেমন, হজরত ইব্রাহিমের পরের নবীগণের কেবলা ছিলো বায়তুল মাকদিস। কিন্তু হজরত ইব্রাহিমের ভালোবাসার কারণে তিনি মনেপ্রাণে চাইছিলেন কাবা শরীফকেই যেনো পুনরায় কেবলা করা হয়। কোরআন মজীদে একথা এসেছে এভাবে— 'আমি দেখছি, আপনার মুখমণ্ডল বার বার আকাশের দিকে নিবদ্ধ হয়।' অর্থাৎ হে আমার রসুল! কেবলা পরিবর্তনের প্রত্যাদেশের অপেক্ষায় আপনার দৃষ্টি বার বার আকাশের দিকে ধাবিত হয়।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে রসুল স.কে হজরত ইব্রাহিমের শরিয়তের অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিমের শরিয়তের রহিত নির্দেশগুলো বাদ দিয়ে অনুসরণ করতে হবে কেবল অরহিত নির্দেশগুলোর।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ১২৪

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

❒ শনিবার পালন তো কেবল তাহাদিগেরই জন্য বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল, যাহারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করিত; যে-বিষয়ে উহারা মতভেদ করিত তোমার প্রতিপালক তো অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে-বিষয়ে উহাদিগের বিচার মীমাংসা করিয়া দিবেন।

'জুয়িলাস্ সাব্তু' অর্থ সপ্তাহের বিশেষ দিবস পালন। অর্থাৎ বিশেষভাবে ইবাদত করার জন্য সপ্তাহের একটি বিশেষ দিবস উদযাপন। 'ইখতালাফুহু ফীহি' কথাটির অর্থ— যারা এসম্পর্কে মতভেদ করতো। কালাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত মুসা বনী ইসরাইল জনতাকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা দুনিয়ার সকল কাজকর্ম থেকে মুক্ত সাপ্তাহিক বিশেষ ইবাদতের দিন হিসেবে শুক্রবারকে গ্রহণ করো। বাকী ছয়দিন রাখো পার্থিব কাজকর্মের জন্য। বনী ইসরাইল জনতা বললো, আমরা সাপ্তাহিক বিশেষ দিন হিসেবে ওই দিনটি উদযাপন করতে চাই, ছয় দিন সৃষ্টি কর্ম সমাপনের পর যেদিন আল্লাহ্ বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। আর সেই দিন ছিলো শনিবার। আল্লাহ্পাক তাদের ইচ্ছাই পূরণ করলেন। শনিবারকেই করে দিলেন তাদের বিশেষ দিন। এরপর হজরত ঈসা তাঁর উম্মতকে সাপ্তাহিক বিশেষ দিন হিসেবে গ্রহণ করতে বললেন শুক্রবারকে। তারা বললো, আমরা এটা চাই না যে, আমাদের পরে সাপ্তাহিক এই ইবাদতোৎসব পালন করবে ইহুদীরা। বরং আমাদের জন্য সাপ্তাহিক বিশেষ দিন হিসেবে নির্ধারণ করা হোক রবিবারকে। তাই করা হলো। পরিশেষে শুক্রবারকে সাপ্তাহিক বিশেষ ইবাদতের দিন হিসেবে নির্ধারণ করা হলো মুসলমানদের জন্য। তাঁরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো এ ব্যাপারে কোনো প্রতর্কের অবতারণা করেননি। বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিয়েছিলেন শুক্রবারকে। ইহুদী ও খৃষ্টানদের এ সম্পর্কিত প্রতর্কের উল্লেখ করেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'শনিবার পালন তো কেবল তাদেরই জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিলো, যারা এ সম্পর্কে মতভেদ

www.eelm.weebly.com

করতো; যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো— তোমার প্রতিপালক তো অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের বিচার মীমাংসা করে দিবেন'।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, পৃথিবীতে আমার আবির্ভাব সকলের শেষে। কিন্তু বিচার দিবসে আমি থাকবো সর্বাগ্রে। আমার পূর্ববর্তী নবী ভ্রাতৃবৃন্দকে আসমানী কিতাব দেয়া হয়েছে আগে। আমাকে দেয়া হয়েছে সকলের শেষে। সাপ্তাহিক বিশেষ ইবাদতের দিনও পূর্ববর্তীগণের উপরে ফরজ করা হয়েছিলো। কিন্তু ইহুদী ও খৃষ্টানেরা তা গ্রহণ করেনি। কিন্তু আমি ও আমার উম্মত পরে এসে তা গ্রহণ করেছি। এদিক দিয়েও আমরা অগ্রগণ্য। আমাদের শুক্রবারের পরেই আসে ইহুদীদের শনিবার ও খৃষ্টানদের রবিবার। বাগবীর বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে এসেছে এই কথাটুকু— আল্লাহ্ বলেন, সপ্তবাসর তাদের জন্য, যারা মতবিরোধ করেছিলো। হাদিসটি আবার মুসলিম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত হুযায়ফা থেকে। তবে তাঁর বর্ণনায় রয়েছে অতিরিক্ত কিছু কথা। কথাটুকু হচ্ছে— আমি পৃথিবীর শেষতম নবী। কিন্তু মহাবিচারের দিবসে আমার মীমাংসা হবে সর্বাগ্রে।

কোনো কোনো আলেম আলোচ্য আয়াতটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— শনিবার দিবসের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদেরকে যারা এ নিয়ে মতবিরোধ করেছিলো। আর তারা ছিলো ইহুদী সম্প্রদায়। কেউ কেউ বলেছেন, দিন হিসেবে শনিবার শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্তায়ালা মহাবিশ্ব সৃজন সমাপন করেছেন শুক্রবারে। আর শনিবারে গ্রহণ করেছেন বিশ্রাম।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, রবিবারই হচ্ছে মহান দিবস। কারণ রবিবারেই শুরু হয়েছিলো মহাবিশ্বের সৃজনকর্ম। কোনো কোনো ভাষ্যকার আবার বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে— আল্লাহ্পাক শনিবার দিনকে ধার্য করেছিলেন অভিসম্পাত দিবস হিসেবে। কারণ ওই দিন সম্পর্কে ইহুদীরা মতোবিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। ওই দিন মৎস্য শিকার ছিলো নিষিদ্ধ। কিন্তু তাদের একদল ওই নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা করেনি। তারা মনে করতো শনিবারে মৎস্য শিকার বৈধ। আর একদল ছিলো অনুগত। তারা মনে করতো শনিবারের মৎস্য শিকার অবৈধ। এমতো মতোবিরোধের কারণে আল্লাহ্তায়ালা অবাধ্যদের চেহারা পরিবর্তিত করে দিয়েছিলেন। আলোচ্য আয়াতে সেই ঘটনার কথা ও এ সম্পর্কে মহাবিচারের দিবসের চূড়ান্ত মীমাংসার কথা বিবৃত হয়েছে।

'লি ইয়াহ্কুমু বাইনাহুম' কথাটির অর্থ মতোবিরোধজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে সেদিন করা হবে চূড়ান্ত মীমাংসা। এক পক্ষকে দেয়া হবে পুরস্কার। অন্য পক্ষকে দেয়া হবে শাস্তি।

www.eelm.weebly.com

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○

❑ তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং উহাদিগের সহিত আলোচনা কর সদ্ভাবে। তোমার প্রতিপালক, তাঁহার পথ ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল। আপনি কোরআন মজীদ ও হৃদয়স্পর্শী কথা ও বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে একমাত্র আচরণযোগ্য ধর্ম ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে থাকুন। এখানে 'আল হিকমত' অর্থ কোরআন মজীদ। নিঃসন্দেহে কোরআন হচ্ছে সমালোচনার অতীত একটি অভ্রান্ত গ্রন্থ। 'আল মাওয়িজাতিল হাসানা' অর্থ সদুপদেশ— যে উপদেশে থাকে পুরস্কারের আশা ও শাস্তির ভয়। অর্থাৎ যে উপদেশ মানলে শান্তি, না মানলে শাস্তি। কেউ আবার বলেছেন, কথাটির অর্থ হৃদয়স্পর্শী বাণী, যা উত্তম উপদেশে ভরপুর।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া জাদিলহুম বিল্লাতী হিয়া আহসান।' এ কথার অর্থ— এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করুন সদ্ভাবে, উত্তম পদ্ধতিতে, কেবল আল্লাহ্র সন্তোষ সাধনের উদ্দেশ্যে, তাঁর বাণীকে উচ্চকিত করার মানসে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে, তা-ও তিনি সবিশেষ অবহিত।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, কেবল সত্যপ্রচারই আপনার কর্তব্য কর্ম। কে আপনার আহ্বান গ্রহণ করে এবং কে করে না— তা দেখার দায়িত্ব আমার। আমি ভালো করেই জানি, কে সুপথ-প্রাপ্ত এবং কে নয়। কারণ আমি সর্বজ্ঞ এবং আমিই সকলের যথোপযুক্ত বিনিময়দাতা। আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছি পুরস্কার ও তিরস্কার— বাধ্য ও অবাধ্যদের জন্য।

www.eelm.weebly.com

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, উহুদ যুদ্ধের ময়দান থেকে সৈনিক সাহাবীগণ মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর দেখলেন, রসুল স. এর প্রিয় পিতৃব্য হজরত হামযা নেই। জনৈক সাহাবী বললেন, তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছিলো অমুক টিলার নিকটে। তিনি তখন বীর বিক্রমে শত্রুর মোকাবিলা করছিলেন এবং বলছিলেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসুলের সিংহ। হে আল্লাহ্! আমি তোমার সকাশে ওই বিষয়ের প্রতি অসন্তোষ জ্ঞাপন করছি, যা নিয়ে এসেছে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। আর মুসলমানদের জন্য আমি কামনা করি বিজয়। একথা শুনেই রসুল স. ছুটে গেলেন রণপ্রান্তরের দিকে। একস্থানে দেখলেন তাঁর প্রিয় পিতৃব্যের ভূলুণ্ঠিত শরীর। কাছে গিয়ে দেখলেন, তাঁর নাসিকা ও কর্ণ কর্তিত। পবিত্র অবয়ব দলিত, মথিত, বিবস্ত্র ও বিধ্বস্ত। তিনি স. ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, হায়! আমার প্রিয় পিতৃব্যকে আচ্ছাদিত করার জন্য কি কোনো বস্ত্র নেই? জনৈক আনসারী সাহাবী তাঁর ঊর্ধাঙ্গের বসন খুলে রসুল স. সকাশে উপস্থিত করলেন। তিনি স. বললেন, জাবের! এই বস্ত্রটি তোমার পিতার পক্ষ থেকে গৃহীত হলো। এ দিয়ে ঢেকে দাও আমার প্রিয় পিতৃব্যের শরীর। তারপর হজরত হামযার নিঃসাড় শরীরের দিকে তাকিয়ে তিনি স. বললেন, মহাসৌভাগ্যশালী পিতৃব্য আমার! আপনার প্রতি বর্ষিত হোক আল্লাহ্র অন্তহীন আশীস। আমি তো আপনাকে দেখেছি পুণ্যবান ও আত্মীয় স্বজনের লালন-পালনকারীরূপে। সুফিয়া যদি ব্যথিতা না হতেন, যদি না বেদনাহতা হতেন পুরনারীগণ, তাহলে আমি আপনার এই পার্থিব শরীরকে এভাবেই রেখে দিতাম। আপনাকে ভক্ষণ করতো প্রান্তরের পশু ও আকাশের পাখিরা। আর পুনরুত্থান দিবসে আপনি পুনরুত্থিত হতেন তাদের উদর থেকে। একটু পরে পুনরায় বললেন, হে আমার পিতৃচ্ছায়া! হে পিতৃতুল্য! আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। ভ্রাতা জিবরাইল এই মাত্র আমাকে জানালেন, সকল আকাশবাসীদের নিকটে ঘোষণা করা হয়েছে— আবদুল মুত্তালিব তনয় হামযা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের শার্দুল। এ ঘোষণার কথা শুনে আমি প্রসন্ন, পরিতৃপ্ত। আল্লাহ্ কুরায়েশদের উপরে আমাকে যখন আবার বিজয়ী করবেন, তখন আমি আপনার এই বিধ্বস্ত অবস্থার প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। শত্রুকুলের সত্তর জনের নাক ও কান কেটে দিবো আমি। রসুল স. এর এমতো উচ্চারণ শুনে উপস্থিত সাহাবীগণও সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরাও এ রকম করবো। কোনো আরববাসী কোনো দিন যা করতে পারেনি, তাই করবো আমরা। ইবনে সা'দ, ইবনে মুনজির, বায়হাকী ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেন, রসুল স. তাঁর কথা শেষ করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হলেন নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে—

www.eelm.weebly.com

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ○ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ○ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ○

❒ যদি তোমরা শাস্তি দাওই তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদিগের প্রতি করা হয়; তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করিলে ধৈর্যশীলদিগের জন্য উহাই তো উত্তম।

❒ ধৈর্য ধারণ করিও, তোমার ধৈর্য তো হইবে আল্লাহেরই সাহায্যে। উহাদিগের আচরণে দুঃখ করিও না এবং উহাদিগের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হইও না।

❒ আল্লাহ্ তাহাদিগেরই সঙ্গে আছেন যাহারা সাবধানতা অবলম্বন করে এবং যাহারা সৎকর্মপরায়ণ।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার প্রিয় পিতৃব্যের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে এমতো উত্তেজিত হবেন না, যাতে আপনার মতো মহানতম নবীর ন্যায়পরায়ণতা কিছু মাত্র লংঘিত হয়। যে আঘাত দিয়েছে তাকে প্রত্যাঘাত করাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু প্রত্যাঘাত হানতে হবে ততটুকু যতটুকু আঘাত সে করেছে। কিন্তু এমতো ক্ষেত্রে শত্রুকে ক্ষমা করা এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভার্থে ধৈর্য ধারণ করাই সর্বোত্তম। যারা ধৈর্য ধারণের মহান মর্যাদাকে উপলব্ধি করতে পারে, তাদের জন্য সর্বোত্তম অবস্থাই অধিকতর শোভন।

অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করার নাম 'উকুবত্' ও 'ইক্বাব'। এ রকম বলা হয়ে থাকে কেবল শাব্দিক সম্পর্কের কারণে। যেমন 'জ্বাযাউস্ সায়্যিআতি সায়্যিআতি মিছলুহা' (অন্যায়ের প্রতিশোধ সমতুল অন্যায়)। এভাবে এখানকার বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়িয়েছে এ রকম— প্রতিশোধ বা বদলা হতে হবে অন্যায়ের সমতুল। সীমাতিক্রম করা যাবে না। আর ধৈর্য ধারণ করার অর্থ, প্রতিশোধ গ্রহণ না করা, আল্লাহ্‌র অধিকতর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে বদলা নেয়া থেকে বিরত থাকা।

'লা হুয়া খইর' কথাটির অর্থ এখানে— প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। এখানে 'ইন্ আক্বাবতুম ফা আক্বিবু' কথাটির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে ক্ষমা ও উদারতার ইঙ্গিত। পরক্ষণে 'ওয়া লাইন-সাবারতুম' বলে সে কথা আবার

www.eelm.weebly.com

প্রকাশ্যে বলেও দেয়া হয়েছে। আর শেষে 'লিস্ সবিরীন' বলে ওই সকল লোকের প্রতি সাধুবাদ দেয়া হয়েছে যারা বিভিন্ন বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে।

পরের আয়াতে (১২৭) বলা হয়েছে— 'ধৈর্য ধারণ কোরো। তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহ্‌র সাহায্যে। তাদের আচরণে দুঃখ কোরো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না।' আল্লাহ্‌নির্ভরতা ও ধৈর্য ধারণের ক্ষেত্রে রসুলেপাক স. সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তাঁকে সম্বোধন করে এখানে বলা হয়েছে— ধৈর্য ধারণ কোরো। আপনার ধৈর্য তো সম্পূর্ণতই আল্লাহ্ প্রদত্ত। এখানে 'আস্‌বির' কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে— হে রসুল! যে কোনো ক্লেশকর অবস্থায় আপনার জন্য ধৈর্য ধারণই উত্তম। কারণ আপনাকে করা হয়েছে মহাসহিষ্ণু। 'ওয়ামা সাবারু ইল্লা বিল্লাহ্' অর্থ— হে রসুল! আপনার ধৈর্য নামের মহান গুণটি তো আল্লাহ্ প্রদত্ত। সুতরাং আপনার ধৈর্য ধারণের মতো মহান পুণ্যকর্মটি সম্পন্ন হবে আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ সহায়তায়।

'ওয়ালা তাহ্‌যান আলাইহিম' কথাটির অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পক্ষ থেকে আগত দুঃখ কষ্টের কারণে অথবা বিশ্বাসীদের উপরে আপতিত দুঃখ কষ্ট দেখে। আপনি ধৈর্যহারা হবেন না আর 'ওয়ালা তাকু ফী দ্বইক্বিম মিম্‌মা ইয়ামকুরুন' কথাটির অর্থ— অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যতো ষড়যন্ত্রই করুক না কেনো, আপনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে মনোকষ্টে পতিত হবেন না। আপনাকে বিজয়ী করা ও আপনার ষড়যন্ত্রপ্রবণ শত্রুকুলকে দণ্ড দান করার দায়িত্ব তো আমার।

'দ্বয়ক্বিন' অর্থ মনস্তাপে পতিত হওয়া বা মনোক্ষুণ্ন হওয়া। অর্থাৎ হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া। 'দ্বয়ক্বিন' ও 'দ্বিক্বুন' শব্দ দু'টো সমার্থক। আবু আমের বলেছেন, 'দ্বয়ক্বিন' অর্থ দুঃখ, আর দ্বিক্বুন অর্থ কষ্ট। আবু উবায়দা বলেছেন, 'দ্বয়ক্বিন' অর্থ আহার ও বাসস্থানের সংকট। আর 'দ্বিক্বুন' অর্থ হৃদয়ের সংকট, সংকীর্ণতা বা দুঃখবোধ। আবু কুতাইবা বলেছেন, 'দ্বয়ক্বিন' শব্দটি 'দ্বয়্যিকুন' এর সংক্ষেপিত রূপ।

এর পরের আয়াতে (১২৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা সাবধানতা অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।' এখানে 'মুহসিনুন' অর্থ সৎকর্মপরায়ণ।' 'ইত্তাক্বাও' অর্থ যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করা সত্ত্বেও তাঁকে ভয় করে। 'মুহসিনুন' এর অর্থ যারা সৃষ্টিকুলের সঙ্গে শিষ্টাচার প্রদর্শন করে— এ রকমও হতে পারে। আবার 'ইত্তাক্বাও' অর্থ হতে পারে এ রকম— যারা প্রতিশোধ গ্রহণে সীমাতিক্রম থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ সাবধানতা অবলম্বন করে। 'মুহসিনুন' অর্থ আবার এ রকমও হওয়া সম্ভব যে— যারা অপরকে মার্জনা করে।

এখানে 'আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন' কথাটির মর্মার্থ হবে— আল্লাহ্র অনুকম্পা, নৈকট্য, করুণা ও সাহায্য তাদের সঙ্গে আছে। অথবা আল্লাহ্পাক স্বয়ং সত্তাগতভাবে সঙ্গে আছেন আনুরূপ্যবিহীনভাবে। এই সঙ্গে থাকার বিষয়টি ধারণা ও কল্পনার অতীত। তাই তা বর্ণনারও অতীত।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতত্রয় অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. 'আমি বিজয়ী হলে তাদের সত্তর জনের নাক, কান কেটে দিবো' বলে যে শপথ করেন, তা ভেঙে ফেলেন এবং যথাবিধি শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারাও দেন। অবলম্বন করেন ধৈর্য।

আবদুল্লাহ্ বিন ইমাম আহমদ, নাসাঈ, ইবনে মুনজির, ইবনে হাব্বান, জিয়া ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, হজরত উবাই বিন কা'ব বলেছেন, উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন চৌষট্টিজন আনসার এবং ছয়জন মুহাজির। হজরত হামযা ছিলেন মুহাজির শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিপক্ষের সৈন্যরা সকল শহীদের নাক-কান কেটে নিয়েছিলো। আনসারগণ তখন বলেছিলেন, যদি আমরা কখনো সুযোগ পাই, তবে আমরাও তাদের সঙ্গে এ রকম করবো। কিছুকাল পর মক্কা বিজিত হলো। তখনই অবতীর্ণ হলো 'যদি তোমরা শাস্তি দাওই, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়; তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলগণের জন্য এটাই তো উত্তম।' রসুল স. তখন বললেন, আমি আমার প্রতিশোধ গ্রহণের অঙ্গীকার প্রত্যাহার করলাম। ধৈর্য ধারণ করলাম। মাত্র চারজন ব্যতীত অন্য সকলের উপর থেকে আমার প্রতিশোধ পরিকল্পনাকে গুটিয়ে নিলাম।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতত্রয় অবতীর্ণ হয়েছে উহুদ রণপ্রান্তরের শহীদগণকে উপলক্ষ করে। যুদ্ধ শেষে মুসলমানগণ লক্ষ্য করলেন সকল শহীদের নাক-কান কর্তন করা হয়েছে। চিরে দেয়া হয়েছে কারো কারো পেট। কেবল একজনকে দেখা গেলো অবিকৃত অবস্থায়। তিনি হচ্ছেন হজরত হানযালা বিন আবু আমের। কারণ তাঁর পিতা ছিলো শত্রুপক্ষে। সে-ই বুঝিয়ে শুনিয়ে তার সঙ্গীদের হাত থেকে অবিকৃত রাখতে পেরেছিলো পুত্রের লাশ। তখন মুসলমানেরা বলেছিলেন, আমরা সুযোগ পেলে তাদের নাক-কান এমনভাবে কাটবো, যা পূর্বে কেউ কোনোদিন করেনি। রসুল স. দাঁড়িয়েছিলেন তার প্রিয় পিতৃব্য হজরত হামযার পবিত্র মরদেহের পাশে। দুশমনেরা তাঁর নাক ও কান কেটে দিয়েছিলো। আরো কেটে দিয়েছিলো তাঁর পুরুষাঙ্গ। তাঁর উদরও ফেঁড়ে দিয়েছিলো তারা। উত্বা তনয়া হিনদা চিবিয়ে খেয়েছিলো তাঁর কলিজা। কিন্তু বাধ্য হয়ে তা আবার উগলে ফেলে দিয়েছিলো। রসুল স. এ কথা জানতে পেরে বলেছিলেন, হিনদা যদি ওই কলিজা উদরস্থ করতে পারতো, তবে সে দোজখে জ্বলতো না। কারণ আমার

www.eelm.weebly.com

প্রিয় পিতৃব্যকে আল্লাহ্তায়ালা এমন মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁর শরীরের কোনো অংশ দোজখে জ্বলবে না। ওই বেদনাবিধুর পরিবেশে শহীদ চাচাজানের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে তখন শোকাহত রসুল বলেছিলেন, হে আবদুস্ সাইব! আল্লাহ্পাকের বিশেষ অনুকম্পা বর্ষিত হোক আপনার উপর। আমি জানি, আপনি ছিলেন মহাপুণ্যবান ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ছিলেন অতি দয়ার্দ্র। আপনার শোকে বিধ্বস্ত আপনার আপনজনেরা যদি সহ্য করতে পারতো, তবে আমি আপনাকে এ অবস্থাতেই রেখে দিতাম। আর পুনরুত্থান দিবসে দেখতাম আপনার উত্থান ঘটছে বিভিন্ন পশু-পাখির উদর থেকে। আল্লাহ্র শপথ! ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে আল্লাহ্ যদি কখনো আমাকে বিজয় দান করেন, তবে আমি তাদের সত্তর জনের নাক ও কান এভাবেই কর্তন করবো। রসুল স. এর এমতো শপথ উচ্চারণের প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে— আলোচ্য আয়াতত্রয়। রসুল স. তখন তাঁর শপথ ভঙ্গ করেছিলেন এবং শপথের প্রায়শ্চিত্ত করে বলেছিলেন, আমি ধৈর্য ধারণ করলাম।

উপযোগঃ হজরত উবাই বিন কা'বের বর্ণিত বিবরণের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতত্রয় অবতীর্ণ হয়েছে মক্কা বিজয়ের সময়ে। আর হজরত আবু হোরায়রা, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আতা ইবনে ইয়াসারের বর্ণনাদৃষ্টে বোঝা যায়, আয়াতত্রয় অবতীর্ণ হয়েছিলো মদীনার সন্নিকটে উহুদ সমর প্রান্তরে। বর্ণনা দু'টোর সামঞ্জস্য বিধানার্থে ইবনে হিশার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতগুলো প্রথমে অবতীর্ণ হয় মক্কায়, তারপর উহুদ সমর প্রান্তরে এবং অবশেষে মক্কা-বিজয়ের সময়ে। আয়াতসমূহে বর্ণিত বিষয়বস্তুকে পুনঃপুনঃ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই এ রকম করা হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও জুহাক বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের নির্দেশ বলবত ছিলো সুরা তওবা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে রসুল স. এর প্রতি অগ্রিম যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণকে নিষিদ্ধ রাখা হয়েছিলো। নির্দেশ ছিলো, যারা আক্রমণোদ্যত হয়, কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা যাবে। কিন্তু যখন ইসলামের মহাবিজয় সুসম্পন্ন হলো এবং সুরা তওবার মাধ্যমে দেয়া হলো সাধারণভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতির অনুমতি, তখন রহিত হয়ে গেলো আলোচ্য আয়াত। কিন্তু নাখয়ী, সওরী, সুদ্দী, মুজাহিদ ও ইবনে সিরীনের মতে আলোচ্য আয়াতত্রয় রহিত নয়, বরং এখনো আলোচ্য আয়াতত্রয়ের বিধান একইরূপে কার্যকর। এখানে বর্ণিত বিধানটির সারমর্ম এই— উৎপীড়িত ব্যক্তি অথবা তার স্বজনেরা উৎপীড়কের প্রতি ততটুটু প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে, যতটুকু উৎপীড়ন সে করেছে। এ ব্যাপারে সীমাতিক্রম নিষিদ্ধ। তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া সর্বোত্তম।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, 'মুছলা' করা (নাক-কান কর্তন করা) সিদ্ধ নয়।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মাসুরা বিন জুনদুব বলেছেন, ভাষণ দানের জন্য রসুল স. যেখানে দাঁড়াতেন, সেখানে দানের প্রতি উৎসাহ না দিয়ে এবং নাক-কান কাটা যে নিষেধ, একথা না বলে সেখান থেকে অন্যত্র গমন করতেন না। উল্লেখ্য যে, নাক-কান কাটা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তনের নিষেধাজ্ঞার কথা বহুসংখ্যক হাদিসে বিদ্যমান।

ওয়াল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন— ওয়া সাল্লাল্লাহু আ'লা খইরি খলক্বিহি মোহাম্মাদিঁও ওয়া আলিহি ওয়া আস্হাবিহি আজ্মাঈন। আমিন।

ষষ্ঠ খণ্ড শেষ

www.eelm.weebly.com

পঞ্চদশ পারা

সূরা বানী ইসরাইল

এই সূরা অবতীর্ণ হয় সূরা কাসাসের পরে। এই সূরায় রয়েছে ১২ রুকু এবং ১১১ আয়াত। ৭৩ থেকে ৮০— এই আটটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এছাড়া অন্য সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

❑ পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাঁহার দাসকে তাঁহার নিদর্শন দেখাইবার জন্য রজনীযোগে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন মসজিদুল হারাম হইতে মসজিদুল আক্সায়, যাহার পরিবেশ তিনি করিয়াছিলেন আশিস-পূত; তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।

মহা রহস্যময় মেরাজের প্রারম্ভিক অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে 'সুবহানা'। একথার অর্থ— পবিত্র ও মহিমময় তিনি। 'সুবহান' অর্থ পবিত্র। অথবা— আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করি। কিংবা— তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করো। শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ইসমে মাছদার (নাম পদ) এবং এর প্রকৃত অর্থ— পবিত্রতাবোধ। কখনো কখনো শব্দটি আল্লাহ্‌র নাম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন— আল্লাহু সুবহান (আল্লাহ্ পবিত্র)। সুবহানা শব্দটি নামপদ হলেও কখনো কখনো ক্রিয়ার স্থলে শব্দটি ব্যবহার করা

www.eelm.weebly.com

হয়। সে সময় ক্রিয়া থাকে অনুল্লেখিত। এখানেও তেমনটি ঘটেছে। আর বক্তব্যের শুরুতেই শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে, এতদসংশ্লিষ্ট বক্তব্যটি সাধারণ কোনো বক্তব্য নয়। আর এ বক্তব্যে উল্লেখিত বিষয়াবলীর উপরে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কোনো প্রকার প্রভাব বা অধিকার নেই। বিস্ময় প্রকাশার্থেও শব্দটির ব্যবহার সুপ্রচল। যেমন— সুবহানাল্লহ্ (আল্লাহ্ কতোই না পবিত্র!)।

এরপর বলা হয়েছে— আল্লাজী আস্‌র বি আ'বদিহী। কথাটির অর্থ— যিনি তাঁর বান্দা বা দাসকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন। অর্থাৎ সেই মহাপবিত্র ও মহিমময় আল্লাহ্, যিনি তাঁর প্রিয়তম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রজনীযোগে এক বিস্ময়কর ভ্রমণে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'লাইলান' (রজনীযোগে)। 'ইসরা' কথাটির অর্থও রাত্রিকালিন ভ্রমণ। এতদ্‌সত্ত্বেও 'লাইলান' বা রাত্রির কথা অনির্দিষ্টবাচক রূপে উল্লেখ করে এখানে একথাটিই বোঝানো হয়েছে যে, ওই ভ্রমণ করানো হয়েছিলো রাতের কোনো এক সময়ে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'মিনাল মাসজিদিল হারামি ইলাল মাসজিদিল আক্বস' (মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বসায়)। অর্থাৎ কাবা শরীফের মসজিদের এলাকা থেকে বায়তুল মাকদিস মসজিদ পর্যন্ত।

হজরত আনাস রা. থেকে মালেক বিন স'সাহ্‌র মাধ্যমে ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি কাবা মসজিদের প্রাঙ্গণে তন্দ্রামগ্ন ছিলাম। এমন সময় জিবরাইল আমীন সেখানে বোরাক নিয়ে উপস্থিত হলেন। অপর বর্ণনায় এসেছে, আমি শুয়েছিলাম কাবা শরীফের হাতিমে। এমন সময় এলেন এক জ্যোতির্ময় আগন্তুক। (গ্রন্থকার বলেন) আমি সুরা ওয়ান্ নজ্‌মের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, রসুলেপাক স. তখন শায়িত ছিলেন তাঁর পিতৃব্য-পুত্রী হজরত উম্মে হানীর গৃহে। সেখান থেকেই তাঁকে মেরাজ করানো হয়। উল্লেখ্য যে, মক্কা শরীফের পুরো এলাকাই মসজিদে হারামের সীমানাভূত। আয়াতে 'মসজিদে হারাম থেকে' বলা হয়েছে সে কারণেই। অর্থাৎ হজরত উম্মে হানীর গৃহও মসজিদে হারামের অন্তর্ভূত।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হজরত আনাসের হাদিসে রয়েছে কাবা প্রাঙ্গণের কথা। আবার হজরত আনাস থেকে হজরত আবু জরের মাধ্যমে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি শুয়েছিলাম। সেখান থেকে কাবা গৃহের ছাদ ভেদ করে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। (গ্রন্থকার বলেন) আমি এই হাদিসটির ব্যাখ্যাও সুরা 'ওয়ান্ নজ্‌মের' তাফসীরে সন্নিবেশিত করেছি। যথাস্থানে তা দ্রষ্টব্য।

www.eelm.weebly.com

আল্লামা আবু ইয়ালী তাঁর 'মসনদে' এবং আল্লামা তিবরানী তাঁর 'আল কবীর' নামক পুস্তকে লিখেছেন, রসুলেপাক স. মে'রাজে রওয়ানা হয়েছিলেন হজরত উম্মে হানীর গৃহ থেকে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আবার ফিরেও এসেছিলেন এবং হজরত উম্মে হানিকে খুলে বলেছিলেন তাঁর সেই অলৌকিক ভ্রমণের কথা। বলেছিলেন, সকল পয়গম্বরকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছিলো। একসঙ্গে আমরা নামাজ পাঠ করেছি। আর ওই জামাতের ইমাম ছিলাম আমি। সকালে রসুল স. কাবা শরীফের প্রাঙ্গণে উপস্থিত জনতাকেও তাঁর অলৌকিক ভ্রমণের কথা জানালেন। একথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো সকলে। সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীরা তাঁর কথা তো অবিশ্বাস করলোই, তাদের সঙ্গে আবার অবিশ্বাস করে বসলো কোনো কোনো দুর্বলচিত্ত বিশ্বাসী। এভাবে তারা হয়ে গেলো ধর্মত্যাগী। কেউ কেউ দৌড়ে গেলো হজরত আবু বকর রা. এর বাড়ীতে। তাঁকে ডেকে বললো, শুনেছো, তোমার বন্ধু নাকি গত রাতে বায়তুল মাকদিসে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। এর পরেও কি তুমি তাকে বিশ্বাস করবে? হজরত আবু বকর বললেন, যদি তিনি একথা বলে থাকেন তবে তিনি ঠিকই বলেছেন। আমি তাঁর সকল কথা বিশ্বাস করি। এর চেয়েও তো বিস্ময়কর কথা আমি বিশ্বাস করি। হজরত জিবরাইল আল্লাহ্‌পাকের নিকট থেকে কোরআনের আয়াত নিয়ে তাঁর নিকটে আসেন, আবার ফিরে যান। আল্লাহ্‌তায়ালার মহান বাণী নিয়ে তাঁর ওই গমনাগমন তো আরো অধিক বিস্ময়কর । তৎসত্ত্বেও আমি তো তা মানি।

মক্কার কেউ কেউ বায়তুল মাকদিসে এক বা একাধিকবার গিয়েছিলো। তারা বায়তুল মাকদিসের বিবরণ জানতে চাইলো রসুল স. এর নিকটে। সহসা রসুল স. এর দৃষ্টির সম্মুখ থেকে উঠিয়ে নেয়া হলো দূরত্বের পর্দা। তিনি স্বচক্ষে বায়তুল মাকদিস দেখে দেখে তার আনুপূর্বিক বিবরণ উপস্থাপন করতে শুরু করলেন। প্রশ্নকারী ও তাদের সঙ্গীরা বায়তুল মাকদিস সম্পর্কে নিখুঁত বর্ণনা দিতে দেখে তাজ্জব হয়ে গেলো। বললো, ঠিকই তো বলেছেন। এবার বলুন তো দেখি, আমাদের যে কাফেলা মক্কার দিকে এগিয়ে আসছে, তা এখন কতদূরে, কী অবস্থায় রয়েছে? রসুল স. তাদের কাফেলার উটের সংখ্যা, উটের পিঠের মালপত্র— সবকিছু সম্পর্কে তাদেরকে জানালেন। তারপর বললেন, অমুক দিন সূর্যোদয়ের সময় তোমাদের কাফেলা মক্কায় পৌঁছবে। কাফেলার সামনে থাকবে মেটে রঙের একটি উট। নির্দিষ্ট দিনে ওই লোকেরা খুব ভোরে উঠে একটি পাহাড়ে উঠে কাফেলার অপেক্ষা করতে লাগলো। সবিস্ময়ে দেখলো, কাফেলা এগিয়ে আসছে। আর সামনে রয়েছে সেই মেটে রঙের উট। কিন্তু এই অলৌকিকত্ব দেখেও তারা ইমান আনলো না। বললো, এতো দেখছি প্রকাশ্য যাদু।

আমি বলি, মেরাজের ঘটনা ঘটেছিলো দু'বার। একবার হাতীম থেকে। আর একবার হজরত উম্মে হানীর গৃহ থেকে। সুতরাং বুঝতে হবে উভয় বর্ণনাই স্ব স্ব স্থানে সঠিক।

www.eelm.weebly.com

আল্লামা বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল বলেছেন, মেরাজ সংঘটিত হয়েছিলো হিজরতের এক বছর আগে। আলেমগণ বলেছেন, রসুল স. এর মেরাজ হয়েছিলো দু'বার। একবার রজব মাসে। আর একবার রমজান মাসে।

এখানে 'মাসজিদুল আক্বসা' অর্থ বায়তুল মাকদিসের মসজিদ। 'আক্বসা' অর্থ শেষ প্রান্তে বা শেষ সীমানায়। এরকম বলার কারণ হচ্ছে, তখন কাবা শরীফ ও বায়তুল মাকদিসের মধ্যে আর কোনো মসজিদ ছিলো না। উভয় মসজিদের দূরত্ব ছিলো অনেক। এক রাতের মধ্যে সেখানে গিয়ে আবার ফিরে আসা ছিলো অসম্ভব। তাই কুরায়েশ জনতা রসুল স. এর ওই অলৌকিক ভ্রমণকে বিশ্বাস করতে পারেনি।

আল্লামা বায়যাবী লিখেছেন, সূর্যের দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী দূরত্ব পৃথিবীর দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী দূরত্বের একশত ষাট গুণ বেশী। এতদ্‌সত্ত্বেও সূর্যের নিম্নপ্রান্ত উর্ধ্বপ্রান্তে একমুহূর্তে উঠে যায়। ইলমে কালামের (বিশ্বাস সম্বন্ধীয় বিষয়ের) একটি প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস এই যে, সকল দেহের মধ্যে 'ইরাজ' (বাহ্যিক প্রভাব) গ্রহণ করার যোগ্যতা রয়েছে। সুতরাং একথা কি করে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলের শরীরে সর্বাপেক্ষা অধিক গতি সঞ্চার করতে পারবেন না। সৃষ্টির মধ্যেই যদি অধিক গতিময় হওয়ার যোগ্যতা থাকে, তবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর ইচ্ছেমতো সবকিছুই সম্পাদন করতে নিশ্চয় সক্ষম। তবে বিষয়টি স্বাভাবিকতা-বিরোধী বলেই বিস্ময়কর। আর মোজেজা তো বিস্ময়েরই নামান্তর। যা বিস্ময়ের উদ্রেক করে না তা কি কখনো মোজেজা হতে পারে? কখনোই নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্‌লাজী বারকনা হাওলাহু' (যার পরিবেশ তিনি করেছেন আশীস-পূত)। এখানে 'বারাকা' বা 'বরকত' কথাটির অর্থ বরকতময়, কল্যাণময় বা আশীস-পূত। উল্লেখ্য যে, বায়তুল মাকদিসের সন্নিহিত অঞ্চল ছিলো স্রোতস্বিনী-সমৃদ্ধ ও শস্য-শ্যামল। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'যার পরিবেশ আমি করেছি বরকতময়'। মুজাহিদ বলেছেন, ওই স্থানকে বরকতময় বলা হয়েছে এ কারণে যে, সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন বহুসংখ্যক নবী। আর অনেক নবীর বসবাস ও ধর্মপ্রচারকেন্দ্রও ছিলো বায়তুল মাকদিস। সেখানে তাঁদের উপর দীর্ঘদিন ধরে অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ। আর কিয়ামত দিবসে মানুষের হাশরও শুরু হবে সেখান থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা' (আমি তাকে নিদর্শন দেখাবার জন্য)। উল্লেখ্য যে, মেরাজ রজনীতে প্রকাশিত হয়েছিলো আল্লাহ্‌তায়ালার অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন। যেমন মুহূর্তমধ্যে বায়তুল মাকদিস গমন। সেখানে সকল আম্বিয়ার সঙ্গে সাক্ষাত। তাঁদেরকে নিয়ে নামাজ আদায়।

www.eelm.weebly.com

তারপর রহস্যাচ্ছন্নতা ভেদ করে সকল আকাশ অতিক্রম, বেহেশত-দোজখ দর্শন, আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে একান্ত আলাপন ইত্যাদি। এরকম সময় ও সময়াতীত রহস্যের বহুমাত্রিক উন্মোচন সে রাতে রসুল স.কে দেখানো হয়েছিলো বলেই এখানে বলা হয়েছে 'আমি তাকে নিদর্শন দেখাবার জন্য'।

শেষে বলা হয়েছে— 'ইন্নাহু হুয়াস্ সামীউ'ল বাসীর' (তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা)। একথার মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা প্রিয় রসুলকে একথাই জানিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা বলেই আঁধার রাতেও তাঁর প্রিয়তম দাস রসুল স.কে পরিপূর্ণরূপে হেফাজত করেন। মেরাজ রজনীতেও বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে দিয়েছেন সুন্দর ও সুচারুরূপে, নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে।

বাগবী লিখেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, মেরাজ রজনীতে রসুল স. এর পবিত্র শরীরকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো তাঁর পবিত্র আত্মাকে। অর্থাৎ মেরাজ শারীরিকভাবে সংঘটিত হয়নি, সংঘটিত হয়েছিলো রূহানীভাবে। হজরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে ঘটনাটি এসেছে এভাবে— রসুল স.কে কাবা প্রাঙ্গণ থেকে মেরাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। ঘটনাটি ঘটেছিলো তাঁর প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির পূর্বে। তিনি সেখানে শায়িত ছিলেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি দেখলেন, তিনজন লোক এসে দাঁড়ালো তাঁর কাছে। প্রথম লোকটি বললো, এই ব্যক্তি কে? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। তৃতীয় ব্যক্তি বললো, যে সবচেয়ে উত্তম তাকেই নিয়ে চলো। একথা বলেই তারা প্রস্থান করলো। পরের রাতেও রসুল স. শুয়েছিলেন কাবা প্রাঙ্গণে। তাঁর চোখ ছিলো ঘুমন্ত। কিন্তু হৃদয় ছিলো জাগ্রত। নবী-রসুলগণের হৃদয়ের অবস্থা এরকমই। ঘুম আসে তাদের চোখে। হৃদয়ে নয়। ওই তিন লোক উপস্থিত হলো। কোনো কথা না বলে তারা রসুল স.কে উঠিয়ে নিয়ে গেলো জমজম কূপের পাশে। হজরত জিবরাইল তাঁর বক্ষদেশ চিরে ফেললেন। জমজমের পানিতে ধুয়ে ফেললেন তাঁর বক্ষাভ্যন্তর। তারপর সেখানে স্থাপন করলেন তাঁর উপযোগী ইমান ও এলেম। শেষে মিলিয়ে দিলেন তাঁর চিরে ফেলা বুককে। হজরত আনাস এভাবে মেরাজের পুরো ঘটনাটিই বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন, হজরত জিবরাইল রসুল স.কে বোরাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন প্রথম আসমানে। সেখানে তিনি স. দেখলেন দু'টি প্রবহমান নদী। হজরত জিবরাইল বললেন, এই নদী দু'টো পৃথিবীর ফোরাত ও নীল নদীর উৎস। রসুল স.কে নিয়ে পুনরায় উর্ধ্বারোহণ করলেন হজরত জিবরাইল। সেখানে দেখলেন, আর একটি অনিন্দ্যসুন্দর নদী। নদীটির পাশে রয়েছে মোতি ও জবরজদ পাথর নির্মিত বিশাল প্রাসাদ। রসুল স. নদীর পানিতে হাত দিলেন। দেখলেন তা মেশক আম্বরের সুবাসে ভরপুর। জিজ্ঞেস করলেন, ভ্রাতা জিবরাইল! এটা কি? হজরত জিবরাইল বললেন, হাউজে কাওছার। এই হাউজ আপনার জন্য নির্ধারিত। হজরত আনাস এরপর বললেন, রসুল স.কে নিয়ে যাওয়া হলো সপ্তম আসমানে। হজরত মুসা

www.eelm.weebly.com

তাঁর এই অত্যুচ্চ মর্যাদা দেখে বলে উঠলেন, আমি তো ভাবতেই পারিনি যে, আমার উপরে আর কেউ উঠতে পারে। রসুল স.কে আরো উপরে ওঠানো হলো। এবার তিনি পৌঁছলেন সিদ্‌রাতুল মুনতাহার সেই বৃক্ষের নিকটে। সেখান থেকে গমন করলেন আরো উর্ধ্বে— আল্লাহ্‌র সকাশে। তখন আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর নৈকট্য দাঁড়ালো এরকম— যেন ধনুকের দু'টি জ্যা। অথবা তদপেক্ষা নিকটে। আল্লাহ্‌পাক এগিয়ে আসলেন আরো নিকটে। হলো একান্ত আলাপন। আল্লাহ্ দান করলেন দিবা-রাতের পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ। ওই অনন্য উপহার নিয়ে তিনি ফিরে চললেন পৃথিবীর দিকে। প্রথমে দেখা হলো হজরত মুসার সঙ্গে। হজরত মুসা জিজ্ঞেস করলেন, কী উপহার পেয়েছেন? রসুল স. বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ। হজরত মুসা বললেন, আপনার উম্মত কিছুতেই পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারবে না। আপনি আল্লাহ্‌র কাছে আবার যান। নামাজ কমিয়ে আনুন। রসুল স. পুনরায় আল্লাহ্‌র সকাশে উপস্থিত হলেন। এভাবে হজরত মুসার পীড়াপীড়িতে কয়েকবার তাঁকে যেতে হলো আল্লাহ্ সকাশে। প্রতিবারই কিছু কিছু করে কমাতে কমাতে আল্লাহ্ চূড়ান্ত নির্দেশ দিলেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের। হজরত মুসা বললেন, হে সর্বশেষ রসুল! এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও আপনার উম্মতের জন্য হবে অত্যন্ত কঠিন। এ ব্যাপারে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমার উম্মতকে মাত্র দুই ওয়াক্ত নামাজ পড়তে বলা হয়েছিলো। তবুও তারা তা নিয়মিত পালন করতে পারেনি। আপনার উম্মত তো হবে সর্বাপেক্ষা দুর্বল। শারীরিক, মানসিক উভয় দিক দিয়েই আপনার উম্মত হবে পূর্ববর্তী সকল উম্মত অপেক্ষা অদৃঢ়। সুতরাং আপনি আবার যান। নামাজ আরো কমিয়ে আনুন। রসুল স. তাকালেন হজরত জিবরাইলের দিকে। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন পেলেন না। অথচ আগের বার গুলোতে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সমর্থক। আল্লাহ্ তখন তাঁর হৃদয়ে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করলেন যে, হে আমার প্রিয়তম রসুল! আমার বিধান অনড়। লওহে মাহফুজে আমি আমার বিধান সমূহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। আপনার উম্মতের জন্য লওহে মাহফুজে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের কথাই লেখা আছে। সেই বিধানই বহাল রইলো। আপনার আবেদনের সম্মানে তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করা হলো। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকেই পঞ্চাশ ওয়াক্তরূপে গণ্য করবো আমি। কারণ এটাও আমার অনড় বিধান যে, আমি প্রতিটি পুণ্যকর্মের বিনিময়কে কমপক্ষে দশগুণ বৃদ্ধি করে থাকি। রসুল স. তাঁর হৃদয়ে এই প্রত্যাদেশ পেয়ে হজরত মুসাকে লক্ষ্য করে বললেন, পাঁচওয়াক্ত নামাজই আমি গ্রহণ করলাম। পুনঃ পুনঃ একই আবেদন নিয়ে তাঁর কাছে যেতে আমার লজ্জা করে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রসুল স. জাগ্রত হলেন। দেখলেন, তিনি শুয়ে রয়েছেন কাবা শরীফের প্রাঙ্গণে। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, যখন তিনি স. জাগ্রত হলেন, তখন দেখলেন, তিনি শুয়ে রয়েছেন মসজিদুল হারামের চত্বরে। এতে করে বোঝা যায় রসুল স. এর মেরাজ হয়েছিলো রূহানীভাবে। সশরীরে নয়। কিন্তু সুবিদিত ও

www.eelm.weebly.com

যথাসূত্রসম্বলিত অনেক হাদিস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, রসুল স. এর মেরাজ হয়েছিলো সশরীরে; রূহানীভাবে নয়। আর একথার উপরেই সংঘটিত হয়েছে আলেমগণের ঐকমত্য। আলোচ্য আয়াতও একথা প্রমাণ করে। এখানে সুস্পষ্টরূপে বলে দেয়া হয়েছে যে, রাতের কোনো এক মুহূর্তে আল্লাহ্তায়ালা রসুল স.কে মসজিদুল হারাম থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন মসজিদুল আক্সায়। রসুল স. এর এই ভ্রমণ রূহানীভাবে বা স্বপ্নযোগে ঘটে থাকলে কুরায়েশ জনতা আর বিস্ময় প্রকাশ করবে কেনো? অস্বীকারই বা করতে যাবে কোন দুঃখে? স্বপ্নযোগে বিস্ময়কর কোনো ঘটনা দর্শন করা অস্বাভাবিক কিছু তো নয়। তাই প্রকৃত কথা হচ্ছে, মেরাজ হয়েছিলো জাগ্রত অবস্থায় ও সশরীরে। সে কারণেই সন্দেহবাদীরা বিষয়টি নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু করে দেয়। আল্লামা বাগবী বলেন, আমার শায়েখ ইমাম বলেছেন, বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদিস দু'টো ছাড়া আর কোনো হাদিস নেই, যদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মেরাজ ঘটেছিলো স্বপ্নযোগে। কিন্তু উক্ত হাদিসের সূত্রপরম্পরাভূত বর্ণনাকারী শরীক বিন আবদুল্লাহ্ নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত নন। তাই তার মাধ্যমে আগত হাদিস পরিত্যাজ্য। তাছাড়া ওই হাদিসে বলা হয়েছে, ওই মেরাজের ঘটনা ঘটেছিলো ওহী আগমনের পূর্বে। আর আলোচ্য আয়াতে যে মেরাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা ঘটেছিলো ওহী বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার বারো বছর পর। অর্থাৎ হিজরতের এক বছর আগে। আর এই মেরাজ সংঘটিত হয়েছিলো সশরীরেই। সুতরাং বুঝতে হবে, প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার আগে স্বপ্নযোগে যে মেরাজ হয়েছিলো.তা-ই বাস্তবে সশরীরে সংঘটিত হয়েছিলো প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার বারো বছর পর। যেমন ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে রসুল স.কে মক্কা বিজয় দেখানো হয়েছিলো স্বপ্নযোগে। তারপর অষ্টম হিজরীতে সে বিজয় তাঁকে দেয়া হয়েছিলো বাস্তবে।

বাগবী লিখেছেন, মেরাজ সমাপন করে যখন রসুল স. যীতুয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন বললেন, ভ্রাতা জিবরাইল! আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তো এই ঘটনা বিশ্বাস করবে না। হজরত জিবরাইল তখন বললেন, আবু বকর বিশ্বাস করবেন। কারণ তিনি সত্যবাদী।

হজরত ইবনে আব্বাস ও উম্মত জননী হজরত আয়েশা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স.বলেছেন, গভীর রাতের একাংশে মেরাজ সমাপনের পরদিন সকালে আমি বসে বসে ভাবছিলাম, মেরাজের কথা বললে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তো আমাকে অসত্যভাষী বলবে। কাবা প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে বসেছিলাম আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে। এমন সময় আবু জেহেল সেখান দিয়ে যেতে যেতে বিদ্রূপের স্বরে বললো, মোহাম্মদ! আবার নতুন কিছু পেলে নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ, বিগত রাতে আমাকে এক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। সে বললো, কোথায়? আমি বললাম, বায়তুল মাকদিসে। সে বললো, তারপর সকাল হতেই

www.eelm.weebly.com

মক্কায় ফিরে এলে, কেমন? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য না করে কেবল বললো, তুমি যা বললে, তা কি আমি লোকজনকে বলে দিবো? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে তখন চিৎকার করে বলতে শুরু করলো, হে কা'ব বিন লুয়াই সম্প্রদায়ের লোকেরা, এদিকে এসো। তার ডাক শুনে অনেকেই এগিয়ে এলো। আবু জেহেল বললো, মোহাম্মদ! তুমি আমাকে যা বলেছো, তা এবার সবার কাছে বলো। আমি বললাম, গতরাতে আমাকে এক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। লোকেরা বললো, কোথায়? আমি বললাম, বায়তুল মাকদিসে। তারা বললো, তারপর সেখান থেকে রাতের মধ্যেই ফিরে এলে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। একথা শুনেই কিছু লোক বিদ্রূপচ্ছলে হাততালি দিতে শুরু করলো। আবার কিছু লোক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে নিজ হাতে নিজেদের মস্তকের কেশ টানতে শুরু করলো। কেউ কেউ নতুন ইমান এনেছিলো। কিন্তু তারা ছিলো দুর্বলচিত্ত। তারাও একথা শুনে সরে গেলো ইমানের পথ থেকে। এক মুশরিক দৌড়ে গেলো হজরত আবু বকরের গৃহে। বললো, শুনেছো, তোমার সাথী কী বলে? সে নাকি কাল রাতে বায়তুল মাকদিসে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। আবু বকর বললো, তাই নাকি? সে বললো, হ্যাঁ। আবু বকর বললো, তিনি যদি এরকম বলে থাকেন, তবে ঠিকই বলেছেন। সে বললো, তুমি কি এরকম অবিশ্বাস্য কথাও বিশ্বাস করবে? আবু বকর বললো, আমি তো এর চেয়ে তাঁর আরো বেশী বিস্ময়কর কথা বিশ্বাস করি। তাঁর প্রতি আসমান থেকে প্রতিনিয়তই প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়ে চলেছে। আমি তো সেগুলোকেও সত্য বলে মানি। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কার কিছু সংখ্যক লোক বায়তুল মাকদিস দেখে এসেছিলো। তারা বললো, হে মোহাম্মদ! তুমি কি আমাদের কাছে বায়তুল মাকদিসের বিবরণ দিতে পারবে? রসুল স. বললেন, আমি একে একে বায়তুল মাকদিসের বিভিন্ন অংশের বিবরণ দিতে শুরু করলাম। সরিয়ে দেয়া হলো দূরত্বের পর্দা। মনে হলো আকীলের বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বায়তুল মাকদিস। আমি স্বচক্ষে তা দেখে দেখে বলতে লাগলাম। লোকেরা শুনে বললো, তোমার বর্ণনা সঠিক। এবার তবে আমাদের কাফেলা সম্পর্কে কিছু বলো। বায়তুল মাকদিস যাওয়া আসার পথে তুমি তাদেরকে কোথায় দেখে এসেছো? রসুল স. বললেন, আমি তোমাদের কাফেলাকে দেখেছি রওয়াহা নামক স্থানে। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিলো। হারানো উট খুঁজে ফিরছিলো তারা। সেখানে ছিলো তাদের একটি পানির মশক। আমার তেষ্টা পেয়েছিলো। তাই ওই মশক থেকে পানি ঢেলে পান করেছিলাম আমি। তারপর তা রেখে দিয়েছিলাম যথাস্থানে। কাফেলা ফিরে এলে কাফেলার লোকদেরকে তোমরা জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি যেখানে বললাম, সেখানে তাদের পানির পাত্রটি ছিলো কি না। লোকেরা বললো, এটি একটি নিদর্শন বটে, যা প্রণিধানযোগ্য। রসুল স. বললেন, আমি অমুক গোত্রের কাফেলারও সাক্ষাত পেয়েছিলাম। তাদের দু'জন লোক আরোহণ করেছিলো একটি উটে। জীমার

www.eelm.weebly.com

নামক স্থানে তাদের ওই উট আমাকে দেখে আওয়াজ করে উঠেছিলো। তাদের কাফেলা এলে ওই লোক দু'টোকে জিজ্ঞেস করে দেখো আমি ঠিক কথা বলেছি কিনা। লোকেরা একথা শুনে বললো, এটাও একটা চিহ্ন বটে, যা বিচার্য। লোকেরা পুনরায় বললো, এবার তবে আমাদের ওই কাফেলার উটগুলো সম্পর্কে কিছু বলো। রসুল স. বললেন, তানঈম নামক স্থানে আমি তোমাদের কাফেলার উটগুলোকে দেখেছি। লোকেরা বললো, কয়টি উট ছিলো সেখানে? সেগুলোর আকার আকৃতি কেমন ছিলো? আর সেগুলোর পিঠেই বা ছিলো কোন কোন পণ্যের বোঝা ? রসুল স. বললেন, তখন অতো কিছু তো আমি লক্ষ্য করিনি। তবুও বলছি, শোনো— আর একবার হারুরাহ নামক স্থানে সম্পূর্ণ কাফেলা একত্রে আমার সামনাসামনি হয়েছিলো। তখন আমি অমুক অমুক ব্যক্তিকে দেখেছি। কাফেলার সম্মুখভাগে ছিলো একটি মেটে রঙের উট। তার পিঠে ছিলো খেজুরের দুই পাতা বুননের মাদুরের বোঝা। অমুক দিন সূর্যোদয়ের সময় তোমাদের কাফেলা মক্কায় পৌঁছবে। অংশীবাদীরা বললো, এই নিদর্শনটিও যাচাইযোগ্য। নির্দিষ্ট তারিখে সূর্যোদয়ের সময় তারা সবিস্ময়ে দেখলো, সম্মুখভাগের মেটে উটটিসহ কাফেলা ফিরে এসেছে। কাফেলার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে তারা জানতে পারলো রসুল স. যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। এরপরেও অংশীবাদীরা রসুল স.কে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করলো না। বলতে লাগলো, আরে, এ যে দেখছি স্পষ্ট যাদু।

মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. একবার আমাদের সামনে বললেন, সেদিনের কথা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, আমি হাজরে আসওয়াদের নিকটে বসেছিলাম। অংশীবাদীরা আমাকে রাতের ভ্রমণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো। বায়তুল মাকদিস সম্পর্কেও জানতে চাইলো তারা। আমি তো বায়তুল মাকদিসের সবকিছু সেভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিনি। তাই অস্বস্তিবোধ করলাম। কিন্তু আল্লাহ্ আমার চোখের সামনে প্রতিভাসিত করলেন বায়তুল মাকদিস। এরপর তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলাম দেখে দেখে। ওই অলৌকিক ভ্রমণের সময় সকল নবী-রসুলের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটেছিলো আমার। নবী মুসাকে দেখেছিলাম নামাজ পাঠরত অবস্থায়। তিনি ছিলেন কৃশকায় ও কুঞ্চিত, ঘন কেশবিশিষ্ট। দেখলে মনে হয় তিনি যেনো শানুরাহ গোত্রের কেউ হবেন। তিনি দেখতে অনেকটা ওরওয়া বিন মাসউদ ছাক্বাফীর মতো। পিতা ইব্রাহিমকেও নামাজ পড়তে দেখেছিলাম তখন। তিনি ছিলেন আমার মতো দেখতে। নামাজের জামাতের আয়োজন করা হলো। সকল নবী সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। নামাজ সুসম্পন্ন হলো আমার ইমামতিতে। নামাজ শেষে জনৈক নবী একজনকে দেখিয়ে বললেন, হে আখেরী নবী! ইনি হচ্ছেন দোজখের প্রধান প্রহরী মালেক। এঁকে সালাম বলুন। আমি তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি সালাম বললেন প্রথমে।

www.eelm.weebly.com

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মেরাজ রজনীতে রসুল মুসার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো আমার। তিনি ছিলেন হালকা পাতলা ধরনের। দেখে মনে হয় যেনো শানুরাহ গোত্রভূত। রসুল ঈসার সঙ্গেও সাক্ষাত ঘটেছিলো তখন। তিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির সুঠামদেহী। শরীরের বর্ণ রক্তিমাভ। দেখে মনে হয় এইমাত্র তিনি গোসলখানা থেকে গোসল সেরে বেরিয়ে এলেন। রসুল ইব্রাহিমের দেখাও পেয়েছিলাম তখন। আমার সঙ্গেই তিনি সর্বদিকে সাদৃশ্য রাখেন। তখন আমার সামনে নিয়ে আসা হলো দু'টি পাত্র। একটিতে ছিলো দুধ। অন্যটিতে শরাব। আমাকে বলা হলো, পছন্দ মতো যে কোনো একটি গ্রহণ করুন। আমি দুধের পাত্রটি হাতে নিলাম এবং পাত্রের দুধটুকু নিঃশেষে পান করে ফেললাম। দুধ ও শরাব উপস্থাপনকারী বললো, আপনি গ্রহণ করেছেন স্বভাবসিদ্ধতাকে। অথবা বললেন, আপনি প্রতিষ্ঠিত হলেন স্বভাবধর্মে। যদি আপনি শরাবের পাত্র গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মত হয়ে যেতো পথভ্রষ্ট।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ২, ৩, ৪, ৫, ৬

وَاٰتَيۡنَا مُوۡسَى الۡكِتٰبَ وَجَعَلۡنٰهُ هُدًى لِّبَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ
اَلَّا تَتَّخِذُوۡا مِنۡ دُوۡنِىۡ وَكِيۡلًا ؕ ذُرِّيَّةَ مَنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوۡحٍ ؕ
اِنَّهٗ كَانَ عَبۡدًا شَكُوۡرًا ۚ وَقَضَيۡنَاۤ اِلٰى بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ فِى
الۡكِتٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِى الۡاَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ وَلَتَعۡلُنَّ عُلُوًّا كَبِيۡرًا ۝
فَاِذَا جَآءَ وَعۡدُ اُوۡلٰٮهُمَا بَعَثۡنَا عَلَيۡكُمۡ عِبَادًا لَّنَاۤ اُولِىۡ بَاۡسٍ
شَدِيۡدٍ فَجَاسُوۡا خِلٰلَ الدِّيَارِ ؕ وَكَانَ وَعۡدًا مَّفۡعُوۡلًا ۝ ثُمَّ
رَدَدۡنَا لَـكُمُ الۡكَرَّةَ عَلَيۡهِمۡ وَاَمۡدَدۡنٰكُمۡ بِاَمۡوَالٍ وَّبَنِيۡنَ وَجَعَلۡنٰكُمۡ
اَكۡثَرَ نَفِيۡرًا

❒ আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম ও উহাকে করিয়াছিলাম বনি ইস্‌রাঈলের জন্য পথ-নির্দেশক। আমি আদেশ করিয়াছিলাম, 'তোমরা আমা ব্যতীত অপর কাহাকেও কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করিও না।'

www.eelm.weebly.com

❒ 'তোমরাই তো তাহাদিগের বংশধর যাহাদিগকে আমি নূহের সহিত নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলাম; সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ দাস।'

❒ এবং আমি তওরাতে প্রত্যাদেশ দ্বারা বনি-ইস্‌রাঈলকে জানাইয়াছিলাম, 'নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দুই বার বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং তোমরা অতিশয় অহংকার-স্ফীত হইবে।'

❒ অতঃপর এই দুইয়ের প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হইল তখন আমি তোমাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম আমার দাসদিগকে, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী; উহারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ধ্বংস করিয়াছিল। শাস্তির প্রতিজ্ঞা কার্যকরী হইয়াই থাকে।

❒ অতঃপর আমি তোমাদিগকে পুনরায় উহাদিগের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলাম, তোমাদিগকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করিলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ করিলাম।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল ! শুনুন, আপনার প্রতি আমি যেমন কোরআন অবতীর্ণ করে চলেছি, তেমনি আপনার পূর্ববর্তী রসুল মুসার উপরেও তওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম। তাকে অথবা তার প্রতি অবতীর্ণ ওই তওরাতকে আমি বানিয়েছিলাম বনী ইসরাইলদের পথ-নির্দেশক। আর মুসার মাধ্যমে অথবা তওরাতের মাধ্যমে আমি তাদের প্রতি এই মর্মে নির্দেশ জারী করেছিলাম যে, তোমরা কেবল আমাকে তোমাদের প্রভুপালক ও কর্মবিধায়করূপে স্বীকার করো। অন্য কাউকে নয়।

পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তোমরাই তো তাদের বংশধর যাদেরকে আমি নুহের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম; সেতো ছিলো পরম কৃতজ্ঞ দাস।' বনী ইসরাইলকে লক্ষ্য করে এখানে তাদেরকে প্রদত্ত অনুগ্রহরাজির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— হে বনী ইসরাইল জনতা! স্মরণ করো, তোমাদের পূর্বপুরুষকে আমি নবী নুহের নৌকায় উঠিয়ে নিয়ে রক্ষা করেছিলাম। নবী নুহ ছিলো আমার পরম কৃতজ্ঞ বান্দা। তার সহ-আরোহীগণও। সুতরাং তোমরা আমার মনোনীত ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজির প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো না কেনো?

আবু ফাতেমার বর্ণনাসূত্রে ইবনে মারদুবিয়া উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নবী নুহ ছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি সতত কৃতজ্ঞ। ছোট বড় সকল কাজের শুরুতে ও শেষে তিনি উচ্চারণ করতেন বিসমিল্লাহ্ ও আলহামদুলিল্লাহ্। এ কারণেই তাঁর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে 'আবদান শাকুরা'— কৃতজ্ঞ দাস। হজরত সাঈদ ইবনে মাসউদ সাক্বাফী থেকে ইবনে জারীর ও তিবরানীও এরকম বর্ণনা

www.eelm.weebly.com

এনেছেন। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা সর্ববিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব ও অত্যাবশ্যকতা সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আর কৃতজ্ঞতার মহান দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন হজরত নুহকে।

এর পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তওরাতে প্রত্যাদেশ দ্বারা বনী ইসরাইলকে জানিয়েছিলাম, নিশ্চয় তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অতিশয় অহংকার স্ফীত হবে।'

এখানে 'আল কিতাব' অর্থ তওরাত। আর 'আল আরদ্ব' (পৃথিবীতে) অর্থ সিরিয়ায়। হজরত ইবনে আব্বাস এবং কাতাদা বলেছেন, এখানে 'ইলা' (প্রতি) শব্দটির অর্থ হবে 'আ'লা' (উপর)। আর 'কিতাব' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে লওহে মাহফুজকে। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আমি লওহে মাহফুজে এই সিদ্ধান্তটি চূড়ান্তরূপে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম যে, হে বনী ইসরাইল! তোমরা সিরিয়া অঞ্চলে দু দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। আর তোমরা হবে অত্যন্ত অহংকারী। বলা বাহুল্য, সেরকমই ঘটেছিলো। প্রথম বিপর্যয়টি ছিলো এরকম— তারা তওরাতের বিধান পরিত্যাগ করে নিষিদ্ধ বস্তুকে গ্রহণ করেছিলো এবং শহীদ করে দিয়েছিলো তাদের তৎকালীন নবী হজরত শা'ইয়া বিন মুজইয়াকে। দ্বিতীয় বিপর্যয় ছিলো— তারা হজরত জাকারিয়া ও হজরত ইয়াহ্‌ইয়াকে শহীদ করেছিলো এবং হজরত ঈসাকেও শহীদ করার উদ্যোগ নিয়েছিলো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার প্রথম বিপর্যয়টি ছিলো হজরত জাকারিয়ার শাহাদত এবং দ্বিতীয় বিপর্যয় ছিলো হজরত ইয়াহ্‌ইয়ার শাহাদত ও হজরত ঈসার প্রাণনাশের চেষ্টা। এখানে 'উলুওয়া' কথাটির অর্থ অবাধ্য হওয়া বা অহংকার-স্ফীত হওয়া। অর্থাৎ অবাধ্য ও অহংকারী হয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের বন্ধনকে ছিন্ন করা ও মানুষের প্রতি অত্যাচার করা।

এর পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর এই দুইয়ের নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হলো, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার দাসদেরকে, যারা ছিলো যুদ্ধে শক্তিশালী, তারা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করে সমস্ত কিছু ধ্বংস করেছিলো।' হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে 'ইবাদাল্‌ লানা' (আমার দাসদের) বলে বুঝানো হয়েছে নিনুয়া নামক স্থানের বাসিন্দা সাখারীব ও তার সঙ্গীদেরকে। তারা ছিলো অত্যন্ত দুর্ধর্ষ। হজরত কাতাদা বলেছেন, জালুত ও তার সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে 'আমার দাসদেরকে যারা ছিলো যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী।' উল্লেখ্য যে, দুর্ধর্ষ জালুতকে হত্যা করেছিলেন হজরত দাউদ। ইবনে ইসহাক বলেছেন, বখতে নসর ও তার বাহিনী বনী ইসরাইলদের ঘরে ঘরে ঢুকে সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছিলো। তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলো বাবেলে। ওই বখতে নসরকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার

www.eelm.weebly.com

দাসদের, যারা ছিলো অত্যন্ত বলশালী, তারা তোমাদের গৃহে গৃহে প্রবেশ করে তোমাদের সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছিলো। বাগবী লিখেছেন, এখানে বখতে নসরের কথা বলা হয়েছে— একথাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

এখানে 'জাসূ' অর্থ হত্যার জন্য গৃহে গৃহে প্রবেশ করা। জুজায বলেছেন, কোনো কিছুকে খুঁজে বের করার জন্য হন্যে হয়ে ফেরা। ফাররা বলেছেন, 'জাসূ' অর্থ তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঘরে ঘরে ঢুকে হত্যা করেছিলো।

শেষে বলা হয়েছে—'শাস্তির প্রতিজ্ঞা কার্যকরী হয়েই থাকে।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা কাউকে শাস্তি দিতে চাইলে তা অতি অবশ্যই কার্যকর হয়। যেমন তাদের উপর শাস্তি কার্যকর হয়েছিলো বখতে নসরের মাধ্যমে।

এর পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তোমাদেরকে পুনরায় তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম। তোমাদেরকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম।'

এখানে 'আল কাররাতা' অর্থ— সাম্রাজ্য বা ক্ষমতা। 'আলাইহিম' অর্থ ওই সকল লোকের উপর। অর্থাৎ যারা বনী ইসরাইলদেরকে হত্যা করেছিলো ও বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলো, পরবর্তী সময়ে তাদের উপরেই আবার আল্লাহ্‌পাক বিজয়ী করে দিয়েছিলেন বনী ইসরাইলকে। বায়যাবী লিখেছেন, ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে— ইরানের বাদশাহ গশতাসপ বিন লহরাসপের মৃত্যু হলে তার প্রপৌত্র বাহমন বিন ইস্ফান্দারিয়া ইরানের সিংহাসনে বসলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তার হৃদয়ে সৃষ্টি করে দিলেন বনী ইসরাইলদের প্রতি কিছুটা অনুরাগ। তিনি বনী ইসরাইলদেরকে মুক্ত করে পুনরায় সিরিয়ায় প্রেরণ করলেন। নবী দানিয়েলকে করে দিলেন তাদের নেতা। তারা সিরিয়াতে গিয়ে বখতে নসর বাদশাহর সেনা বাহিনীকে পরাজিত করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলো। ওদিকে আবার অত্যাচারী জালুতকে হত্যা করলেন হজরত দাউদ। বনী ইসরাইলদের আরেক শত্রুও নিপাত হলো এভাবে। ধীরে ধীরে তাদের সকল বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে লাগলো। বেড়ে গেলো জনসংখ্যা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্পদ। সেদিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে— 'তোমাদের ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম।'

এখানে 'নাফিরা' কথাটির অর্থ— ওই সকল লোক, যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শত্রুর মুখোমুখি হয়। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, 'নাফিরা' শব্দটি 'নাফার' এর বহুবচন। যেমন 'আবীদ' বহুবচন 'আবদ' এর। নাফার বলা হয় ওই দলকে যারা বহির্গত হয় দুশমনদের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ যে দল সংখ্যায় গরিষ্ঠ হওয়ার কারণে হয় শক্তিমান, অজেয়।

www.eelm.weebly.com

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا
جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ
كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ
أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ
حَصِيرًا ۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۔
وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

❐ তোমরা সৎকর্ম করিলে সৎকর্ম নিজদিগেরই জন্য করিবে এবং মন্দকর্ম করিলে তাহাও করিবে নিজদিগের জন্য। অতঃপর, পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে আমি আমার দাসদিগকে প্রেরণ করিলাম তোমাদিগের মুখ-মণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করিবার জন্য, প্রথমবার তাহারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করিয়াছিল পুনরায় সেই ভাবেই উহাতে প্রবেশ করিবার জন্য এবং তাহারা যাহা অধিকার করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিবার জন্য।

❐ সম্ভবতঃ তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের প্রতি দয়া করিবেন; কিন্তু তোমরা যদি তোমাদিগের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে তিনিও তাঁহার আচরণের পুনরাবৃত্তি করিবেন। জাহান্নামকে আমি করিয়াছি সত্য প্রত্যাখ্যান-কারীদিগের জন্য কারাগার।

❐ এই কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশ করে এবং সৎকর্ম পরায়ণ বিশ্বাসীদিগকে সুসংবাদ দেয় যে, তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

❐ এবং যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি মর্মন্তুদ শাস্তি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা সৎকর্ম করলে সৎকর্ম নিজেদেরই জন্য করবে এবং মন্দকর্ম করলে তা-ও করবে নিজেদের জন্য।' একথার অর্থ— হে মানুষ! অথবা হে বনী ইসরাইল জনতা ! তোমরা যদি আল্লাহ্‌র বিধানানুসারে

www.eelm.weebly.com

চলো, তবে তোমরাই লাভ করবে পুণ্য ও আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তোষ। আর যদি আল্লাহ্‌র বিধানবহির্ভূত জীবন যাপন করো, তবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তোমরাই। আল্লাহ্‌র এতে কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। কারণ তিনি চিরঅমুখাপেক্ষী।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আমি আমার দাসগণকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করবার জন্য, প্রথম বার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিলো পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করবার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিলো, তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবার জন্য।'

এখানে 'লিইয়াসূঊ উজুহাকুম' কথাটির অর্থ—তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করবার জন্য, যা সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হবে।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা পারস্যরাজ খরদুশ ও টাইটিসকে বনী ইসরাইলদের উপরে বিজয় দান করেছিলেন। তারা বীর বিক্রমে বনী ইসরাইলদের উপর চড়াও হয়েছিলো। তাদের কাউকে হত্যা করেছিলো। কাউকে করেছিলো বন্দী। আবার কাউকে বানিয়েছিলো ক্রীতদাস। এরকম ব্যাপক ধ্বংস তাদের উপরে নেমে এসেছিলো দু'বার।

'মা আলাও' অর্থ তারা যে স্থান অধিকার করেছিলো। অথবা যতদিন পর্যন্ত অধিকারে রেখেছিলো।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক সূত্রে বাগবী লিখেছেন, বনী ইসরাইলেরা অধিকাংশ সময় অপকর্মে লিপ্ত থাকতো। অবাধ্যতা ছিলো তাদের স্বভাব। তৎসত্ত্বেও আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের বহুভাবে অনুগৃহীত করেছিলেন। হজরত মুসার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা তাদেরকে এইমর্মে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, সংশোধিত না হলে তাদের উপরে নেমে আসবে আযাব। হজরত মুসার তিরোধানের পর যথাসময়ে দুর্বিনীত বনী ইসরাইলদের প্রতি ঠিকই আযাব নেমে এসেছিলো। তাদের এক রাজার নাম ছিলো সিদ্দীকাহ্‌। তখনকার নিয়ম ছিলো, মানুষকে সুপথে পরিচালনার জন্য তখনকার রাজাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌পাক রাখতেন তাঁর প্রেরিত কোনো নবীকে। ওই সকল নবীর উপরে কোনো আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হতো না। তাঁরা মানুষকে পথ-প্রদর্শন করতেন তওরাতের মাধ্যমে। সিদ্দীকাহ্'র সঙ্গে নবী হিসেবে ছিলেন হজরত শা'ইয়া বিন আমজীয়া। তিনি ছিলেন হজরত জাকারিয়া ও হজরত ইয়াহ্‌ইয়ার পূর্ববর্তী নবী। তিনি হজরত ঈসা আ. ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রচার করতেন। বলতেন, হে জেরুজালেমবাসী! শোনো, অচিরেই তোমাদের নিকটে আগমন করবেন দু'জন মহান রসুল। একজন হবেন অশ্বারোহী। আরেকজন হবেন উষ্ট্রারোহী।

www.eelm.weebly.com

বাদশাহ্ সিদ্দীকাহ্ ছিলেন ধর্মপ্রাণ। সুদীর্ঘ কাল ধরে তিনি বনী ইসরাইলদের শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে ব্যাবিলনের রাজা সাখারিব বনী ইসরাইলদের রাজ্য আক্রমণ করলো। ছয়লক্ষ পতাকা নিয়ে সে পৌছে গেলো বায়তুল মাকদিসের উপকণ্ঠে। বাদশাহ সিদ্দীকাহ্ তখন পায়ের ফোঁড়ায় দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিলেন। আল্লাহ্র নবী হজরত শা'ইয়া তাঁকে বললেন, হে ইসরাইলদের সম্রাট! ইরাকরাজ ছয়লক্ষ পতাকা নিয়ে উপনীত হয়েছে বায়তুল মাকদিসের উপকণ্ঠে। তার ভয়ে অনেকে পালিয়েছে। আপনিও হুঁশিয়ার থাকুন। বাদশাহ চিন্তিত হলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র নবী ! আমার ও ব্যাবিলনরাজের মধ্যে কী সিদ্ধান্ত হবে, সে সম্পর্কে আপনি কোনো প্রত্যাদেশ পেয়েছেন কি? হজরত শা'ইয়া বললেন, না। এমতো কথোপকথনের কিছুক্ষণ পরেই প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো। আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, হে শা'ইয়া! বাদশাহকে বলো, তাঁর অন্তিম সময় সন্নিকটে। সুতরাং সে যেনো যা অছিয়ত করবার তা করে নেয়। নির্ধারণ করে একজন প্রতিনিধি। হজরত শা'ইয়া বললেন, সম্রাট! আপনার সম্পর্কে প্রত্যাদেশ পেয়েছি। আল্লাহ্ জানাচ্ছেন, আপনার পরকাল যাত্রার সময় সমুপস্থিত। সুতরাং আপনার যদি কিছু অছিয়ত করার থাকে, তবে করে নিন। আপনার পরিবারের কাউকে যদি আপনার স্থলাভিষিক্ত করে যান, তবে তা-ও করতে পারেন। এ কথা শুনে বাদশাহ নামাজে দণ্ডায়মান হলেন। কেঁদে কেঁদে দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা আল্লাহ্! হে মহারাজাধিরাজ! হে সকল সৃষ্টির একমাত্র উপাস্য! তুমি সকল দোষত্রুটি থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। নিদ্রা বা তন্দ্রা তোমাকে কোনোকালে কখনোই স্পর্শ করে না। তুমি জানো, আমি বনী ইসরাইলদের সাম্রাজ্য শাসন করেছি ন্যায়ানুগতার সঙ্গে। আমার প্রকাশ্য ও গোপন সকল কিছুই তুমি জানো। তুমি আমার প্রতি তোমার বিশেষ রহমত বর্ষণ করো।

হজরত শা'ইয়ার নিকটে পুনঃ প্রত্যাদেশ হলো, হে আমার নবী! তুমি সিদ্দীকাহকে বলো, আমি তার প্রার্থনা গ্রহণ করেছি। আরো বলো, ব্যাবিলনরাজের হাত থেকে আমি তাকে ও তার রাজ্যকে রক্ষা করবো। আর আমি তার হায়াত বাড়িয়ে দেব আরো পনেরো বছর। হজরত শা'ইয়া বাদশাহকে প্রত্যাদেশিত শুভসংবাদটি জানালেন। শুভসংবাদ শ্রবণ করার সাথে সাথে বাদশাহ্র অন্তর থেকে শত্রুভীতি দূর হয়ে গেলো। তিনি সেজদাবনত হয়ে দোয়া করলেন, হে আমার দয়াময় আল্লাহ্! হে আমার মাতা ও পিতার উপাস্য! আমি কেবল তোমাকেই সেজদা করি। তোমাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জানি। সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা কেবলই তোমার। তুমি যাকে খুশী রাজ্য দান করো, আবার যাকে খুশী

www.eelm.weebly.com

করো রাজ্যহারা। সর্বজ্ঞ তুমি। সকলের প্রকাশ্য ও গোপন— সকল কিছুই তোমার জানা। তুমি প্রকাশ, তুমি গোপন। তুমি প্রথম, তুমিই শেষ। বিপর্যস্ত দাসের দোয়া তুমিই তো দয়া করে গ্রহণ করো। তুমি আমার দোয়া কবুল করেছো। পরমতম দয়ার্দ্র বলেই তুমি এমন করলে।

বাদশাহ সেজদা থেকে মাথা ওঠালেন। হজরত শা'ইয়ার প্রতি আবারো অবতীর্ণ হলো প্রত্যাদেশ। বলা হলো, হে নবী শা'ইয়া। তুমি বাদশাহকে জানিয়ে দাও, সে যেনো তার কোনো পরিচারককে দিয়ে ডুমুরের রস আনিয়ে তার ফোঁড়ায় লাগিয়ে দেয়। এরকম করলে সে নিরাময় লাভ করবে। হজরত শা'ইয়া প্রত্যাদেশের কথা বাদশাহকে জানালেন। বাদশাহ প্রত্যাদেশানুসারে তাঁর ফোঁড়ায় ডুমুরের রস লাগিয়ে নিরাময় লাভ করলেন। তারপর হজরত শা'ইয়াকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! দয়া করে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জেনে নিন, শত্রুদের কী পরিণতি হবে? বাদশাহর এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতে প্রত্যাদেশ হলো, হে আমার প্রিয় নবী! বাদশাহকে বলে দিন, সে শত্রুমুক্ত। আগামী কাল প্রত্যুষে ব্যাবিলনরাজের সকল সৈন্য মারা যাবে। বেঁচে থাকবে কেবল রাজা ও তার পরিবারের পাঁচজন মাত্র। তুমি তাদেরকে বন্দী কোরো।

পরদিন প্রত্যুষে বাদশাহ তার বিশেষ ঘোষকের মাধ্যমে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন যে, হে বনী ইসরাইল জনতা! তোমরা কে কোথায় আছো, দেখে যাও। আল্লাহ্‌ তাঁর দুশমনদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরপর বাদশাহ নিজে চললেন শহরের উপকণ্ঠের দিকে। তাঁকে অনুসরণ করলো পারিষদবর্গ ও বিপুল সংখ্যক জনতা। ইরাকী বাহিনীর অবস্থান স্থলে গিয়ে দেখলেন, মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে সৈন্যদের অসংখ্য মরদেহ। ব্যাবিলনরাজ সাখারীব ও তার পাঁচ সঙ্গীকে খুঁজতে লাগলো সকলে। কিন্তু তাদেরকে কোথাও পেলো না। আশে-পাশে তল্লাশী শুরু হলো। শেষে তাদেরকে পাওয়া গেলো এক পাহাড়ের গুহায়। বখতে নসরও ছিলো তাদের মধ্যে। তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আনা হলো বাদশাহর সামনে। তাদেরকে দেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বাদশাহ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হলেন। আসরের সময় পর্যন্ত সেজদায় পড়ে রইলেন তিনি। তারপর মাথা উঠিয়ে বললেন, হে ব্যাবিলনরাজ! দেখলে তো, মহান আল্লাহ্‌ তোমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করলেন। তিনি সর্বশক্তিধর। দেখলে তো তার প্রমাণ। ব্যাবিলনরাজ বললো, আমি আগেই জানতাম,আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। তোমাদের প্রতি বর্ষণ করবেন তাঁর বিশেষ দয়া। এ সংবাদ আমাকে দেয়া হয়েছিলো যাত্রা শুরুর পূর্বেই। কিন্তু ওই শুভপরামর্শদাতার কথা আমি মানিনি। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই আজ আমার এই দুর্দশা। এই শোচনীয় পরিণতির কথা জানতে পারলে আমি তো এদিকে অগ্রসরই হতাম না। বাদশাহ বললেন, সকল প্রশংসা ও কৃতিত্ব

www.eelm.weebly.com

কেবলই আল্লাহ্র। তিনি যাকে ধ্বংস করতে চান, সে অবশ্যই ধ্বংস হয়। তোমরা বেঁচে গিয়েছো বলে আবার একথা মনে কোরো না যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র। কখনোই নয়। দুনিয়ায় অধিক পাপ অর্জনের জন্য এবং সেই পাপের কারণে আখেরাতে আরো অধিক শাস্তি দানের জন্যই তোমাদেরকে আপাততঃ অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তোমরা এবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। তোমাদের দেশবাসীকে জানাবে আল্লাহ্র শাস্তি কতো ভয়াবহ। এটাই এখন তোমাদের কাজ। কাজটি জরুরী বিধায় তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলো। নতুবা তোমাদেরকে আমি এই মুহূর্তে হত্যা করতাম। হে ইরাকাধিপতি! একথাটিও উত্তমরূপে অবগত হও যে, তুমি ও তোমার সাথীদের রক্ত আল্লাহ্তায়ালার নিকটে কীট-পতঙ্গের রক্তের চেয়েও মূল্যহীন। এরপর বাদশাহ্র হুকুমে তাদের গলায় শিকল পরানো হলো এবং সত্তর দিন ধরে ঘোরানো হলো বায়তুল মাকদিস ও ইলইয়ার চার পাশে। প্রতিদিন তাদেরকে খেতে দেয়া হতো দু'টো করে যবের রুটি। এরকম অপমানের কারণে সাখারীব একদিন বাদশাহকে বললো, আপনি যে দুর্ব্যবহার আমার সঙ্গে করছেন, তার চেয়ে আমার মৃত্যুই ছিলো শ্রেয়ঃ। বাদশাহ সাখারীব ও তার সঙ্গীদেরকে বধ্যভূমিতে পাঠালেন। তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী হজরত শা'ইয়াকে প্রত্যাদেশ করলেন, বাদশাহ্কে বলো, সে যেনো সাখারীব ও তার অনুচরদেরকে মুক্তি দেয়। সম্মানের সঙ্গে তাদেরকে পাঠিয়ে দেয় তাদের স্বদেশে। তারা গিয়ে তাদের দেশবাসীকে ভয় দেখাবে। হজরত শা'ইয়া বাদশাহ্কে আল্লাহ্র এ নির্দেশ জানালেন। বাদশাহ্ নির্দেশ পালন করলেন। সসম্মানে তাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন ইরাকে।

সাখারীব ও তার সাথীরা দেশে ফিরে গিয়ে লোকদেরকে ডেকে সেনাবাহিনীর দুরবস্থার কথা জানালো। গণক ও জ্যোতির্বিদেরা বললো, মহামান্য সম্রাট! আমরা তো আগেই আপনাকে বায়তুল মাকদিস অভিযানে যেতে নিষেধ করেছিলাম। বলেছিলাম, তাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র নবী। নবীর কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ আসে। আর নবীর অনুসারীরা আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত । কিন্তু আপনি আমাদের কথায় কর্ণপাত করেননি।

এ ঘটনার পর সাখারীব বেঁচেছিলো মাত্র সাত বছর। মৃত্যুর পূর্বে সে তার প্রপৌত্র বখতে নসরকে তার স্থলাভিষিক্ত করে গেলো। বখতে নসরও ছিলো তার পিতামহের একনিষ্ঠ অনুসারী। সে রাজ্য শাসন করেছিলো সতেরো বছর।

ওদিকে বনী ইসরাইলদের বাদশাহ্র অন্তিম যাত্রার সময় হয়ে এলো। কিন্তু তার পরকালের যাত্রার আগেই রাজ্য জুড়ে দেখা দিলো বিশৃংখলা। ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হলো বনী ইসরাইলেরা। শুরু হয়ে গেলো অশান্তি, খুন, খুনের পর খুন। নবী শা'ইয়া তাদেরকে সদুপদেশ দান করলেন। কিন্তু তার কথার প্রতি

www.eelm.weebly.com

কেউ ভ্রূক্ষেপই করলো না। আল্লাহ্‌তায়ালা তখন তাঁকে এইমর্মে প্রত্যাদেশ করলেন, 'হে আমার নবী ! আপনি বিশৃংখল জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করুন। ওই বক্তৃতাই হবে আমার প্রত্যাদেশ। হজরত শা'ইয়া জনতার দিকে লক্ষ্য রেখে বললেন, হে আকাশ! শোন। হে পৃথিবী! অভিনিবেশী হও। আল্লাহ্ বনী ইসরাইলদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তিনি তাদেরকে অনুগৃহীত করেছেন তাদেরকে নির্বাচন করেছেন প্রিয়পাত্ররূপে। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর উপরে তাদেরকে দান করেছেন শ্রেষ্ঠত্ব। তারা ছিলো দিশেহারা মেষপালের মতো। ছিলো না তাদের কোনো সদুপদেশ দানকারী ও পথপ্রদর্শক। তারপর আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন নবী। এভাবে নবীর মাধ্যমে তাদেরকে একত্র করেছেন। ফলে অসুস্থজনেরা হয়েছে সুস্থ, বিচ্ছিন্ন জনেরা হয়েছে সম্মিলিত এবং দুর্বলেরা হয়েছে শক্তিমান। এরপরেও তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো না। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসা পরিত্যাগ করে শুরু করলো হানাহানি। এই অনৈক্যের বিষময় প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। অসহায় জনতা হলো আশ্রয়চ্যুত। রক্তরঞ্জিত হলো প্রশান্ত মৃত্তিকা। বলো হে আকাশ ও পৃথিবী! এ দুর্বিপাক চলবে আর কতোকাল? সময় হলে উষ্ট্র ফিরে আসে তার আরোহীর কাছে। চারণ ভূমি থেকে স্বআবাসে ফিরে আসে পশুর পাল। কিন্তু দেখো এই অপরিণামদর্শী বনী ইসরাইল জনতা কতোই না মূর্খ। তারা এতোটুকুও অনুধাবন করতে পারছে না যে, কেনো এই বিশৃংখলা, কেনো এই হানাহানি, রক্তপাত। হে নীলাকাশ! হে ধরিত্রী! তোমরা তাদেরকে ওই দৃষ্টান্তটির কথা বলো— একটি প্রান্তর ছিলো শস্যশূন্য। শুকনো ঘাস ছাড়া আর কিছুই ছিলো না সেখানে। ওই প্রান্তরের মালিক চতুষ্পার্শ্বে দেয়াল নির্মাণ করে প্রান্তরটিকে ঘিরে ফেললেন, প্রাচীরবেষ্টিত ওই প্রান্তরে নির্মাণ করলেন নয়নাভিরাম প্রাসাদ। খনন করলেন হ্রদ। রচনা করলেন বাগান। সে বাগানে রোপন করলেন যয়তুন, আনার, খেজুর ও আরো অনেক ফলের গাছ। আর বাগান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন একজন জ্ঞানী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে। যথাসময়ে গাছে গাছে দেখা দিলো ফুল ও মুকুল। কোনো কোনো ফুল ও মুকুল থেকে প্রকাশ পেলো ফল। আর কোনো কোনো ফুল ও মুকুল ঝরে পড়লো অকালে। বাগানের অধিবাসীরা বললো, এ গাছগুলো কোনো কাজের নয়। না হলে এগুলোতে মরা মুকুল ও ঝরা ফুল দেখা দিবে কেনো? এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় হচ্ছে, এসকল কিছু উচ্ছেদ করে ফেলা। সুতরাং ভেঙে ফেলো প্রাসাদ। ভরাট করে ফেলো জলময় হ্রদ। আর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দাও বৃক্ষগুলোকে। পূর্ববৎ শস্যশূন্য প্রান্তরই উত্তম। হে আসমান! হে জমিন! তাদেরকে বলে দাও, ওই সাজানো বাগানের দেয়ালই হচ্ছে সত্য ধর্ম। আর প্রাসাদ হচ্ছে শরিয়ত। হ্রদ বা

www.eelm.weebly.com

নহর হচ্ছে আসমানী কিতাব। আর বাগানের রক্ষক হচ্ছে আল্লাহ্‌র নবী এবং বাগানের বৃক্ষগুলো তো তোমরাই। মরা মুকুল ও ঝরা ফুল হচ্ছে তোমাদের মন্দ আমল, তোমাদের অপকর্মের পরিণাম। হে বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠী! আমি তো তোমাদের স্বেচ্ছাচারিতার পক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করি। উপস্থাপিত দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে সদুপদেশ প্রদান করলাম। তোমরা গাভী, বকরী ইত্যাদি জবাই করে আমার নৈকট্য অর্জন করতে চাও। কিন্তু মনে রেখো তোমাদের কোরবানীর গোশত আমার নিকটে পৌঁছে না। আমি তো পানাহার থেকে চিরমুক্ত। চিরপবিত্র । আমি কেবল বলি, হে উদাসীন জনতা! তাক্বওয়া (সাবধানতা) অবলম্বন করো। যে সকল হত্যা আমি হারাম করেছি, সেগুলো থেকে বিরত থাকো। এভাবে হালাল ও হারামের যথামান্যতার মাধ্যমে আমার প্রসন্নতা লাভে সচেষ্ট হও। কিন্তু তোমরা তো উন্নাসিক। রক্তলোলুপ। তোমাদের হস্ত ও বস্ত্র অবৈধ রক্তে রঞ্জিত। তোমরা আমার গৃহ নির্মাণ করো। নির্মিত গৃহ বা মসজিদের ভিতর ও বাহির পবিত্রও রাখো। কিন্তু তোমাদের অন্তর ও বাহির অপরিচ্ছন্ন, অপবিত্র। তোমরা মসজিদকে সাজিয়েছো সুন্দররূপে। কিন্তু জ্ঞান ও বিবেককে রেখেছো অসুন্দর আচ্ছাদনে। কী ভেবেছো তোমরা? আমি কি মসজিদে থাকি? আমি তো মসজিদ নির্মাণ করতে বলেছি এজন্যে যে, সেখানে সমুন্নত হবে আমার বিধানাবলী। সমুচ্চারিত হবে আমার স্মরণ। বিঘোষিত হবে আমার প্রশংসা ও পবিত্রতা।

তারা বলে, আমরা রোজা রাখি। কিন্তু আমাদের রোজা উপরে ওঠানো হয় না। আমরা নামাজ পড়ি। কিন্তু সে নামাজে নূর সৃষ্টি হয় না। আমরা দান করি। কিন্তু সে দান আমাদেরকে পবিত্র করে না। আমরা গর্দভের মতো চিৎকার করে প্রার্থনা জানাই এবং বাঘের মতো সশব্দে কাঁদাকাটি করি। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা ও রোদন গৃহীত হয় না। তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কী কারণে তাদের কার্যকলাপ, আবেদন ও রোদন আমার নিকটে পৌঁছে না। আমি কি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ ও পরমতম দয়ার্দ্র নই? কী করে তাদের রোজাকে আমি উপরে ওঠাবো? তারা রোজা রেখে মিথ্যা কথা বলে। নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করে। কী ভাবে তাদের নামাজে দেখা দিবে জ্যোতির উদ্ভাস? তাদের হৃদয় যে আমার শত্রু। সীমালংঘনকারীদের প্রতি তাদের রয়েছে আন্তরিক অনুরাগ। তাদের দানই বা তাদের পরিশুদ্ধ করবে কেনো? তারা তো দান করে অপরের আত্মসাৎকৃত সম্পদ। আমি তো দানের বিনিময় প্রদান করি কেবল তাদেরকেই, যারা বিশুদ্ধাচারী। তাদের প্রার্থনাই বা আমি কবুল করবো কেনো? তারা যে কপট। তাদের কথা ও কাজ যে সুসমঞ্জসপূর্ণ নয়। আমি তো প্রার্থনা গ্রহণ করবো কেবল তাদের, যারা

www.eelm.weebly.com

প্রশান্ত হৃদয়বিশিষ্ট ও বিনয়ী। তারা তো দরিদ্র ও অনাথকে প্রসন্ন করে না। তারা তো জানে না, অসহায় জনতার সন্তোষই আমার সন্তোষ।

তুমি দেখো তাদের উন্নাসিকতার নিদর্শন। আমার বার্তা যখন তাদের নিকটে পৌছানো হয়, তখন তারা বলে, এগুলো তো কল্পকাহিনী ও কিংবদন্তী। পুরুষানুক্রমে এ সকল কথা আমাদেরকে শোনানো হয়েছে। গণক ও পদ-রচয়িতাদের মতো এগুলো তো কতিপয় ছন্দোবদ্ধ পদ। ইচ্ছে করলে আমরাও এরকম ছন্দ নির্মাণ করতে পারি। শয়তানের পক্ষ থেকে আমরাও প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত। ইচ্ছে করলে আমরাও শয়তানের নিকট থেকে জেনে নিতে পারি অদৃশ্যের সংবাদ।

আমি তোমাদেরকে যখন সৃষ্টি করেছি, তখনই গ্রহণ করেছি মহাপ্রলয়ের সিদ্ধান্ত। এর মধ্যবর্তীতে অবকাশ দিয়েছি পার্থিব জীবন যাপনের। এই পার্থিবতা শেষে অবশ্যই আগমন করবে প্রতিশ্রুত কিয়ামত। তারা গায়েবের সংবাদ জানে বলে দাবি করে। তারা যদি তাদের দাবিতে সত্য হয়, তবে একথা বলতে পারে না কেনো যে, কিয়ামত কখন হবে? তাদের আস্ফালন তো সাময়িক। আর মহাপ্রলয় অবশ্যম্ভাবী। অংশীবাদীরা পছন্দ না করলেও আমার এ অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হবেই। আমার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুশলতা অবশ্যই একদিন প্রকাশিত হবে। আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রাক্কালে আমি এ সিদ্ধান্তটিও গ্রহণ করেছি যে, পৃথিবীতে আমি প্রবহমান করবো নবুয়তের ধারা। আর সাম্রাজ্যাধিকার দিবো সাধারণতঃ নিম্ন মর্যাদাধারীদেরকে। ফলে পৃথিবীতে সম্মানহীনেরাই পাবে সম্মান, অযোগ্যরাই লাভ করবে প্রভাব-প্রতিপত্তি। মূর্খ ও অজ্ঞরা পরিচিতি পাবে জ্ঞানী বলে। পৃথিবীর ওই সকল শাসক, জ্ঞানী ও বিত্তশালীকে প্রশ্ন করো, বলো, কখন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় ? কে ঘটাবে এমতো সর্ববিধ্বংসী ঘটনা। তার সাহায্যকারীই বা হবে কে?

আরো শোনো, আমি নবুয়তের ধারাক্রমের অন্তিমে প্রেরণ করবো এক অক্ষরের অমুখাপেক্ষী নবীকে। যিনি অহমিকাপ্রবণ হবেন না। রূঢ় আচরণবিশিষ্ট হবেন না। বাজারে শোরগোল করবেন না। হবেন না অশ্লীলভাষী। অসুন্দর কথা তিনি কখনই বলবেন না। আমি তাঁকে পরিচালিত করবো সহজ সরল পথে। দান করবো সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র। মহানুভবতা হবে তাঁর পরিচ্ছদ। শুভবোধ ও পুণ্য হবে তাঁর অভ্যন্তরীণ বৈভব। তিনি হবেন সাবধানী, সুবিবেচক, সত্যবাদী ও অঙ্গীকার রক্ষাকারী। ক্ষমা ও কল্যাণকামনা হবে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাব। ন্যায়পরায়ণতা হবে তাঁর জীবনাদর্শ। আমি সত্যকে বানাবো তাঁর শরিয়ত। পথপ্রদর্শনকে তাঁর অনুচর এবং ইসলামকে তাঁর ধর্ম। তাঁর পবিত্র নাম হবে আহমদ। আর তাঁর মাধ্যমে বিভ্রান্তকে দান করবো সুপথ। মূর্খদেরকে দান করবো জ্ঞান। আর অপ্রসিদ্ধজনকে

www.eelm.weebly.com

প্রদান করবো প্রসিদ্ধি। প্রাচুর্যে পরিণত করবো অনটনকে। বিত্তবৈভবে পরিণত করবো নিঃস্বতাকে। চিন্তাম্বিতদেরকে মিলিয়ে দিবো প্রশান্ত অন্তর বিশিষ্টদের সঙ্গে। সংরাগ-শূন্যদেরকে দান করবো ভালোবাসা। একতায় পরিণত করবো সকল অনৈক্যকে।

তাঁর উম্মতকে বানাবো আমি সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। তাদের অভ্যুদয় ঘটাবো কল্যাণের জন্য। তারা নির্দেশ করবে সকল শুভ ও শুভ্রকে। নিষিদ্ধ করবে সকল অশুভ ও মলিনতাকে। তারা আমাকে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় বলে জানবে। আমাকে বিশ্বাস করবে। তাদের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপকে পরিশুদ্ধ করবে কেবল আমার জন্য। তারা নামাজ পাঠ করবে বিনম্র ভঙ্গিতে। একাগ্রচিত্তে সমাপন করবে তাদের দণ্ডায়মানতা, রুকু ও সেজদা। জেহাদের প্রান্তরে তারা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়বে সারিবদ্ধ হয়ে। প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর উপর। কেবল আমার পরিতুষ্টি সাধনার্থে তারা বহির্গত হবে তাদের গৃহ থেকে। আমি তাদের অন্তরে ও মুখে প্রতিধ্বনিত করবো আমার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা, এককত্বের বাণী, পবিত্রতা ও প্রশংসার স্তোত্র। ফলে তাদের নির্জনতা ও সমাবেশস্থল ভরে উঠবে আমার স্মরণের মৌন ও মুখর আয়োজনে। গৃহে, পথযাত্রাকালে তারা উচ্চারণ করবে 'আল্লাহু আকবার'। হৃদয়ের গভীরে লালন করবে আমার পবিত্রতা, প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। উচ্চস্থানে আরোহণ করে তারা প্রক্ষালনের মাধ্যমে পবিত্র করবে তাদের মুখমণ্ডল, হাত, পা ও শরীর। পরিচ্ছদ পরিধান করবে কোমরের উপরে। তাদের রক্ত উৎসর্গীকৃত হবে কেবল আমার জন্য। আর তাদের বক্ষদেশ জাগ্রত থাকবে আমার আকাশজ বাণী বৈভবে। আমার ভয় তাদেরকে প্ররোচিত করবে নিশিজাগরণে। নিভৃত উপাসনায়। আর তাদের দিবাভাগ হবে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখর। রণপ্রান্তরে তারা হবে অজেয় শার্দুল সদৃশ। এ সকল কিছু হচ্ছে আমার অনন্য অনুকম্পা। আমি যাকে ইচ্ছা এমতো অনুকম্পা দানে ধন্য করি।

হজরত শা'ইয়া তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলো বনী ইসরাইল জনতা। একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর উপর। হজরত শা'ইয়া আত্মরক্ষার জন্য একদিকে দৌড় দিলেন। লোকেরা তাড়া করলো তাঁকে। পথিমধ্যে পড়লো একটি বৃক্ষ। বৃক্ষটি বললো, হে আল্লাহ্র নবী। আমার অভ্যন্তরে আত্মগোপন করুন। বৃক্ষটি দু'ফাক হয়ে গেলো। হজরত শা'ইয়া তার ভিতরে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দু'ফাঁক হওয়া গাছটি এক হয়ে গেলো। নবী শা'ইয়া বৃক্ষাভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর পরিধেয় বস্ত্রের একটি কোণা রয়ে গেলো বাইরে। সেখানে একটু পরেই এসে পড়লো উন্মত্ত জনতা। শয়তান ছিলো তাদের সঙ্গে। সে বললো, এই গাছের মধ্যেই সে আত্মগোপন করেছে। এই

www.eelm.weebly.com

দেখো তার কাপড়ের একাংশ। লোকেরা তখন একটি করাত এনে আড়াআড়িভাবে গাছটিকে চিরে ফেললো। গাছের সঙ্গে হজরত শা'ইয়ার পবিত্র শরীরও হয়ে গেলো দ্বিখণ্ডিত।

এরপর আল্লাহ্তায়ালা বনী ইসরাইলদের বাদশাহ বানালেন নাশিয়া বিন আমওয়াসকে। আর নবুয়ত দান করলেন আরমিয়া বিন হালাকিয়াকে। তিনি ছিলেন হজরত হারুন বিন ইমরানের বংশধর। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, তাঁর উপাধি ছিলো খিজির। আর নাম ছিলো আরমিয়া। একবার তিনি একস্থানে শুকনো ঘাসের উপরে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে উঠতেই দেখা গেলো শুষ্কতৃণ পরিণত হয়েছে সবুজ তৃণশয্যায়। তখন থেকে লোকসমক্ষে তিনি খিজির নামে খ্যাত হয়েছিলেন। নবী আরমিয়াকে দেয়া হলো বাদশাহ নাশিয়ার পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব।

কিছুকাল পরে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীকে প্রত্যাদেশ করলেন, হে আরমিয়া। বনী ইসরাইল জনতা ভ্রষ্টতার চরমে পৌঁছেছে। আমার নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার পরোয়াই তারা করে না। তুমি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করো। তাদেরকে প্রদত্ত আমার অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দাও। স্মরণ করিয়ে দাও আমার নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ। নবী আরমিয়া বললেন, হে আমার প্রভুপালক! তারা তো সংখ্যাগুরু। আর আমি একা। তারা শক্তিমান। আর আমি শক্তিহীন, নিঃসঙ্গ। সুতরাং তুমি আমাকে সাহায্য করো। আমি জানি তোমার সাহায্য ব্যতিরেকে আমি দীন, হীন, দুর্বল। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, হে আরমিয়া! তুমি কি জানোনা যে, সকল হৃদয় ও রসনা আমার কর্তৃত্বাধীন। আমার অভিপ্রায়ানুসারে আপতিত হয় সকলের হৃদয়। আমি তো তোমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। সুতরাং তুমি চিন্তিত কেনো? যাও, এবার কর্তব্যকর্মের দিকে ধাবিত হও।

হজরত আরমিয়া জনসমাবেশে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। কিন্তু কী বলবেন, কিছু ভেবে পেলেন না। সহসা তাঁর হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত হলো একটি প্রত্যাদেশিত ভাষণ। সে ভাষণ উঠে এলো রসনায় । সুন্দর, সুললিত ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় তিনি সদুপদেশ দিতে শুরু করলেন। বললেন আল্লাহ্র আনুগত্যের কথা। অবাধ্যতার কথা। আনুগত্যের পুরস্কার ও অবাধ্যতার শাস্তির কথা। সবশেষে আধ্যাত্মিক ঘোরের মধ্যে সরাসরি আল্লাহ্র জবানীতে বলে উঠলেন, আমার সম্মানের শপথ! আমি বনী ইসরাইলের বিপর্যয়কে প্রবল করে দিবো। তাদের কোনো বিজ্ঞজনই তখন আর পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাবে না। একজন নিষ্ঠুর ও নির্দয় রাজাকে আমি তাদের উপরে বিজয়ী করে দিবো। আর নির্মম আক্রমণের শংকায় আমি শংকাচ্ছাদিত করবো বনী ইসরাইলদেরকে। ইয়াফেছ গোত্রের জনপদ থেকে আগমন করবে তারা ।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য যে, বাবেলের অধিবাসীদেরকেই বলা হয় ইয়াফেছ। সম্ভবতঃ তারা ছিলো হজরত নুহের পুত্র ইয়াফেছের বংশধর। তাই তাদের নাম বনী ইয়াফেছ বা ইয়াফেছ। তখন তাদের রাজা ছিলো বখতে নসর।

বখতে নসর তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলো বায়তুল মাকদিস অভিমুখে। প্রায় বিনা বাধায় অধিকার করে বসলো বনী ইসরাইলদের সাম্রাজ্য। হত্যা করলো তাদের অনেককে। ধ্বংস করে দিলো বায়তুল মাকদিস মসজিদ। বখতে নসর তার সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিলো, ঢাল ভর্তি করে মাটি এনে ঢেকে দাও মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। সৈন্যেরা নির্দেশ পালন করলো। এরপর সে হুকুম দিলো, রাজ্যের সকল জনতাকে ধরে আনো। সৈন্যরা বেচেঁ যাওয়া বনী ইসরাইলের সকল নারী-পুরুষ ও বালক-বালিকাকে ধরে এনে হাজির করলো রাজার সামনে। রাজা ক্রীতদাস-দাসীরূপে বাছাই করে নিলো প্রায় ষাট হাজার বালক-বালিকাকে। তারপর গণিমতের মাল বন্টন করে দিলো সৈন্যদের মধ্যে। সৈন্যরা বললো, গণিমত আমরা চাই না। আমরা চাই গোলাম। মহামান্য সম্রাট! সকল গণিমত রেখে দিন আপনার ভাণ্ডারে। আর বালক বালিকা বন্টন করে দিন আমাদের মধ্যে। বখতে নসর তাই করলো। প্রত্যেক সৈন্য ভাগে পেলো চারজন করে গোলাম ও বাঁদী। শেষে বখতে নসর ঘোষণা করলো, বনী ইসরাইলের এক তৃতীয়াংশ জনতাকে হত্যা করো। এক তৃতীয়াংশ রেখে দাও এই শহরে। আর অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশকে নিয়ে চলো বাবেলে। হুকুম তামিল করা হলো। বাদশাহ নাশিয়াকেও বন্দী করেছিলো বখতে নসর। তাকে এবং এক তৃতীয়াংশ বনী ইসরাইল জনতা যার সংখ্যা ছিলো প্রায় সত্তর হাজার, সঙ্গে নিয়ে বিজয়ীর বেশে বখতে নসর প্রত্যাবর্তন করলো বাবেলে। এই ধ্বংসপর্বটি ছিলো বনী ইসরাইলদের প্রথম ধ্বংসপর্ব। আলোচ্য আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে 'এরপর ওই দু'টি প্রতিশ্রুতির প্রথমটি যখন এলো, তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার দাসদেরকে, যারা ছিলো অতিশয় শক্তিশালী'। এখানে 'দাসদেরকে প্রেরণ করলাম' অর্থ বখতে নসরকে তার বাহিনিসহ প্রেরণ করলাম।

বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হলো নির্বিঘ্নে। একদিন বখতে নসর দেখলো এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন। কিন্তু জাগ্রত হওয়ার পর সে আর তার স্বপ্নের বিবরণ মনে রাখতে পারলো না। বন্দী বনী ইসরাইলদের মধ্যে ছিলেন দানিয়েল, হানানিয়া, আযারিয়া ও মীশাইল। তাঁরা ছিলেন নবীর বংশধর। বখতে নসর একথা জানতো। তাই তাঁদেরকে ডেকে আনলো। বললো, তোমরা আমার স্বপ্নের কথা বর্ণনা করো। নবীজাদা চতুষ্টয় বললেন, আপনি আপনার স্বপ্নের বিবরণ দিন। আমরা তার ব্যাখ্যা বলে দিবো। বখতে নসর বললো, আমার তো স্মরণ নেই। তোমরাই আমার স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও। যদি না বলো তবে আমি

www.eelm.weebly.com

তোমাদের হাত তোমাদের স্কন্ধ থেকে পৃথক করে ফেলবো। নবীজাদাগণ বললেন, ঠিক আছে। তাহলে আমাদেরকে কিছু দিন সময় দিন। এই বলে তাঁরা রাজদরবার থেকে বেরিয়ে এলেন। আল্লাহ্তায়ালার দরবারে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা জানালেন। আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে সাহায্য করলেন। তাঁদের স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত করে দিলেন পুরো বিষয়টি। তাঁরা রাজদরবারে গমন করে রাজাকে বললেন, আপনি স্বপ্নে দেখেছিলেন একটি মূর্তি। মূর্তিটির পা ছিলো মাটির। হাঁটু ও উরুদেশ ছিলো তামার। উদর ছিলো রূপার। বক্ষদেশ সোনার। আর মস্তক ও স্কন্ধদেশ লোহার। বখতে নসর বললো, তোমরা ঠিকই বলেছো। তাঁরা বললেন, আপনি আরো দেখেছিলেন, অকস্মাৎ আকাশ থেকে পতিত হলো একটি পাথর। ওই পাথরের আঘাতে মূর্তিটি টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। আপনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। বখতে নসর বললো, তোমরা ঠিকই বলেছো। এবার তবে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলো। তাঁরা বললেন, বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অবস্থা দেখানো হয়েছে আপনাকে। মূর্তিটির মৃত্তিকা নির্মিত অংশের অর্থ দুর্বল সাম্রাজ্য। তাম্র নির্মিত অংশের অর্থ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী আর একটি সাম্রাজ্য। রৌপ্য নির্মিত অংশ হচ্ছে তদপেক্ষা অধিক সুন্দর ও দৃঢ় এক সাম্রাজ্যের প্রতীক। স্বর্ণ-নির্মিত অংশ হচ্ছে আর একটি সুবিন্যস্ত ও সুন্দর সাম্রাজ্য। আর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের অংশ হচ্ছে মূর্তিটির লৌহনির্মিত অংশ। এবার আকাশ থেকে পতিত ওই পাথরটির কথা বলি, ওই পাথরটি আল্লাহ্র গায়েবী শক্তির প্রতীক। আর প্রস্তর-প্রক্ষেপণের মাধ্যমে মূর্তিটি চুরমার হয়ে যাওয়ার অর্থ অবশেষে আল্লাহ্তায়ালার অদৃশ্য শক্তির আঘাতে সকল রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। টিকে থাকবে কেবল আল্লাহ্র সাম্রাজ্য।

বাবেলবাসীরা একদিন বখতে নসরের কাছে গিয়ে বললো, মহামান্য সম্রাট! বনী ইসরাইলী গোলামদের কারণে আমাদের কিছু সমস্যা হচ্ছে। তারা আমাদের গৃহসীমানায় বসবাস করে। প্রয়োজনীয় কর্ম তাদের দ্বারা সমাধা করতে হয় বলে তারা পেয়েছে পারিবারিক মেলামেশার সুযোগ। তারা সুদর্শন। তাই আমরা লক্ষ্য করছি, আমাদের স্ত্রীরা তাদের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমাদের আবেদন, তাদেরকে হয় হত্যা করে ফেলুন। না হয় তাড়িয়ে দিন। বখতে নসর বললো, এটা তোমাদের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। তোমরা নিজেরাই তাদেরকে হত্যা অথবা বিতাড়নের অধিকার সংরক্ষণ করো। কারণ তারা তোমাদের ক্রীতদাস। বন্দী বনী ইসরাইলেরা রাজার ঘোষণা শুনতে পেয়ে আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য কামনা করলেন। জানালেন প্রাণ রক্ষার আকুল আবেদন। বললেন, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমরা তো তোমার অবাধ্য নই। সুতরাং অন্যের পাপের কারণে আমরা শাস্তি পাবো কেনো? আমাদেরকে দান করো

www.eelm.weebly.com

তোমার বিশেষ রহমত। আল্লাহ্তায়ালা তাদের অশ্রুসিক্ত আবেদন গ্রহণ করলেন। অল্প কিছু সংখ্যক নিহত হলেও বেঁচে রইলো সংখ্যাগুরু অংশটি। ওই অংশে ছিলেন দানিয়েল, হানানিয়া, আযারিয়া ও মীশাইল।

অবশেষে বখতে নসরের ধ্বংসের সময় সমুপস্থিত হলো। দম্ভ প্রদর্শনের মাধ্যমে ধ্বংসকে ডেকে আনলো সে নিজেই। একদিন সে বন্দীদেরকে রাজ দরবারে হাজির করিয়ে বললো, বলো, যে স্থান আমি ধ্বংস করে এসেছি, সে স্থান কেমন? সে রাজ্যের অধিবাসীরাই বা কেমন? বনী ইসরাইলেরা জবাব দিলো, ওই দেশ তো সিরিয়া। নবী-রসুলগণের জন্মভূমি। সেখানকার বায়তুল মাকদিস হচ্ছে আল্লাহ্র ঘর। আর সেখানকার অধিবাসীরা নবী-রসুলগণের বংশধর। তারা বায়তুল মাকদিসের সেবকও। তারা হয়ে পড়েছিলো আল্লাহ্তায়ালার অবাধ্য। তাই আপনার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। সম্মান, প্রতিপত্তি— সব কিছুই আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বেচ্ছাচরণের কারণে আল্লাহ্ তাদের উপরে আপনাকে বিজয়ী করেন। কিন্তু বিজয়ীবাহিনী এ সম্পর্কে বেখবর। তারা মনে করে তারা বিজয় লাভ করেছে নিজেদের শক্তিবলে। একথা শুনে বখতে নসর অতুষ্ট হলো। বললো, তোমরা আমাকে এমন কৌশল শিখিয়ে দাও, যা রপ্ত করে আমি আকাশে আরোহণ করতে পারি। আমি আকাশে যারা আছে, তাদেরকে হত্যা করে সেখানেও আমার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবো। পৃথিবীর রাজত্ব আমি আর চাই না। বনী ইসরাইলেরা বললো, সম্রাট! এটা তো মানুষের ক্ষমতাবহির্ভূত। বখতে নসর বললো, আকাশে ওঠার উপায় তোমাদেরকে বলে দিতেই হবে। অন্যথায় আমি তোমাদেরকে হত্যা করবো। নিরুপায় বনী ইসরাইলেরা আল্লাহ্তায়ালার দরবারে উপস্থাপন করলো তাদের রোদনসিক্ত নিবেদন। আল্লাহ্পাক সদয় হলেন। একটি হন্তারক মশাকে প্রেরণ করলেন তিনি। মশাটি অবলীলায় বখতে নসরের নাকের মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়লো তার মস্তকে। তার উপর্যুপরি দংশনে জর্জরিত হতে হতে একসময় মৃত্যু ঘটলো তার।

মুক্ত হলো বনী ইসরাইল বন্দীরা। তারা ফিরে গেলো সিরিয়ায়। সেখানে গড়তে শুরু করলো নতুন বসতি। সংস্কার করলো বায়তুল মাকদিস। ধীরে ধীরে স্ফীত হতে লাগলো তাদের জনসংখ্যা। শ্রীবৃদ্ধি ঘটলো তাদের জনপদের। যারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিলো, তারাও জড়ো হলো এক জায়গায়।

সবকিছুই হলো। কিন্তু তওরাতের কোনো অনুলিপি কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। সাধারণ জনতার এ নিয়ে তেমন কোনো দুশ্চিন্তা না থাকলেও বিশেষ ব্যক্তিগণ এ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সবচেয়ে বেশী চিন্তাযুক্ত হলেন হজরত উযায়ের। তিনিও ছিলেন বাবেল বন্দীগণের মধ্যে। ছাড়া পেয়ে তিনিও আগমন করেছিলেন সিরিয়ায়। তওরাতের বিরহে তিনি একা একা বসে কাঁদতেন। কখনো

www.eelm.weebly.com

চলে যেতেন দূরে অরণ্যের দিকে। একদিন এক লোক তাকে বললেন, আপনি এতো কাঁদেন কেনো ? হজরত উযায়ের বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাবের জন্য। বখতে নসরের লোকেরা তওরাত পুড়িয়ে দিয়েছে। এখন তা উদ্ধার করি কী করে। তওরাত বিহনে দুনিয়া ও আখেরাতের কোনো কিছুই তো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। লোকটি বললো, আপনি যদি সত্যিই তওরাত চান, তবে তা অবশ্যই পাবেন। আমার পরামর্শ শুনুন। আগামীকাল আপনি রোজা রাখুন। পবিত্র পরিচ্ছদাবৃত হয়ে কাল এখানে আসুন। আমার দেখা পাবেন। তারপর যা বলার বলবো। পরদিন হজরত উযায়ের রোজা রেখে পাক সাফ পোশাক পরে নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলেন। একটু পরেই হাজির হলো লোকটি। তার হাতে ছিলো একটি পানির পাত্র। লোকটি আসলে ছিলো এক ফেরেশতা। আল্লাহ্‌তায়ালাই তাকে পাঠিয়েছিলেন। লোকটি তার পাত্র থেকে কিছু পানি পান করালেন হজরত উযায়েরকে। সঙ্গে সঙ্গে হজরত উযায়েরের বক্ষাভ্যন্তরে মুদ্রিত হয়ে গেলো সম্পূর্ণ তওরাত। তিনি ফিরে এলেন তাঁর জনপদে। বনী ইসরাইলদেরকে তওরাত পাঠ করে শুনালেন। মুগ্ধ হয়ে গেলো তারা। হজরত উযায়ের হলেন তাদের একান্ত প্রিয়ভাজন। পারস্পরিক প্রীতি ও ভালোবাসার এরকম প্রকাশ ইতোপূর্বে আর কখনো ঘটেনি। এভাবে অতিবাহিত হলো বেশ কিছুদিন। শেষ হয়ে এলো হজরত উযায়েরের পৃথিবীর আয়ু। নির্ধারিত ক্ষণে তিনি চলে গেলেন তাঁর প্রভুপালনকর্তার একান্ত সন্নিধানে।

আবারো বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো বনী ইসরাইল জনতা। ক্রমে ক্রমে বিচ্যুত হয়ে পড়তে লাগলো আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত ধর্মাদর্শ থেকে। নতুন নতুন নবী প্রেরণ করতে লাগলেন আল্লাহ্‌পাক। কিন্তু তারা নবীগণের সদুপদেশের প্রতি কর্ণপাত করলো না। উপরন্তু তাদেরকে বলতে লাগলো মিথ্যাবাদী, ভণ্ড ইত্যাদি। কোনো কোনো নবীকে আবার হত্যাও করে ফেললো তারা। শেষে এলেন হজরত জাকারিয়া, হজরত ইয়াহ্‌ইয়া ও হজরত ঈসা। কিন্তু তারা শত্রুতা শুরু করলো ওই ত্রয়ী নবীর সঙ্গেও। হজরত জাকারিয়া পৃথিবীর আয়ু শেষে প্রত্যাবর্তন করলেন তাঁর পরম প্রেমময় প্রভুপালকের সন্নিধানে। কেউ কেউ বলেছেন, বনী ইসরাইলেরা তাঁকেও শহীদ করে দিয়েছিলো।

হজরত ইয়াহ্‌ইয়াকেও শহীদ করে ফেললো দুর্বৃত্তরা। এরপর শূলে চড়াবার চেষ্টা করলো হজরত ঈসাকে। আল্লাহ্‌পাক তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নিলেন। তারপর তাদের উপরে আপতিত করলেন আযাব। বাবেলের নতুন রাজা খারদুশকে প্রবল করে দিলেন তাদের উপর। সে তার সেনাবাহিনী নিয়ে চড়াও হলো বনী ইসরাইলদের উপরে। বায়তুল মাকদিসের সন্নিকটে উপস্থিত হলো তারা। ইয়াবুরজাযান নামক এক সেনাপতি তার অধীনস্থ সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে

www.eelm.weebly.com

বললো, শোনো হে যোদ্ধৃবৃন্দ! আমি আমার প্রভুর নামে এই মর্মে শপথ করেছি যে, বায়তুল মাকদিস অধিকার করতে পারলে আমি সেখানকার সকল অধিবাসীকে হত্যা করবো। প্রবাহিত করবো রক্তের নদী। ক্ষান্ত হবো তখন, যখন হত্যা করার মতো আর কাউকে পাবো না। একথা বলে সে তার সেনাদলকে নিয়ে এগিয়ে গেলো বায়তুল মাকদিসের কোরবানী খানার দিকে। সবিস্ময়ে দেখলো, সেখান থেকে অনর্গল ধারায় নির্গত হচ্ছে রক্ত। সে জিজ্ঞেস করলো, এ রক্ত কার? এ রক্ত বন্ধ হয় না কেনো? বনী ইসরাইলেরা বললো আটশত বছর ধরে এখানে কোরবানী হয়ে আসছে। সকল কোরবানীই কবুল হয়েছে। কিন্তু কেনো যে এ কোরবানী আর কবুল হলো না। ইয়াবুরজাযান বললো, সত্যি করে বলো, আসল ঘটনা কী? বনী ইসরাইলদের সমাজপতিরা বললো, এখন আমরা রাজ্যহারা, প্রত্যাদেশ ও নবুয়তের ধারাও এখন রুদ্ধ। তাই মনে হয় আমাদের কোরবানী আর গৃহীত হচ্ছে না। সেনাপতি তাদের কথা বিশ্বাস করলো না। তাদের সাত শত সত্তর জন সমাজপতির প্রতি জারী করলো হত্যার নির্দেশ। সে নির্দেশ প্রতিপালিত হলো অল্পক্ষণের মধ্যে। তবুও কোরবানীগাহের রক্ত বন্ধ হচ্ছে না দেখতে পেয়ে পুনরায় হত্যার নির্দেশ দিলো তাদের সাতশত বালককে। সে নির্দেশও কার্যকর হলো। কিন্তু তবুও কোরবানীগাহের রক্তপ্রবাহ রইলো আগের মতো। সেনাপতি বললো, হে দুর্ভাগার দল! এখনো তোমাদের চৈতন্যোদয় ঘটছে না কেনো? কী ভেবেছো তোমরা? সত্য কথা না বলা পর্যন্ত আমি কি তোমাদেরকে ছেড়ে দিবো? সত্য উদঘাটন না হওয়া পর্যন্ত আমার এ নিধনপর্ব কখনো বন্ধ হবে না। তোমাদের শেষতম ব্যক্তিকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হবো না। সুতরাং এখনো সময় আছে। বাঁচতে যদি চাও, তবে এক্ষুণি সত্য ঘটনা জানাও। বনী ইসরাইলেরা আর সত্যকে গোপন রাখতে পারলো না। বললো, এই রক্ত এক নবীর। তিনি আমাদের ন্যায়ানুগ হতে বলতেন। মন্দ কর্ম করতে নিষেধ করতেন। বলতেন পুণ্যের প্রতিফল শান্তি। আর পাপের প্রতিফল শাস্তি। আমরা তাকে বিশ্বাস করিনি। মিথ্যাবাদী বলে গালমন্দ করেছি। প্রত্যাখ্যান করেছি তাঁর সরল পথের আহ্বানকে। শেষে তাকে হত্যাও করেছি আমরা। এই কোরবানীগাহেই আমরা ঘটিয়েছি এ হত্যাকাণ্ড। সেনাপতি ইয়াবুরজাযান বললো, কী নাম ছিলো তাঁর? তারা বললো, ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাকারিয়া। সেনাপতি বললো, এতক্ষণে তোমরা সত্য কথা বললে। এ কথা বলেই সে সেজদায় পতিত হলো। সেজদা থেকে মস্তক উত্তোলন করে বললো, হে সৈন্যদল! শহরের বাইরে চলে যাও। বন্ধ করে দাও শহরের সকল প্রবেশ পথ।

সৈন্যরা চলে গেলো। কোরবানীগাহের প্রবহমান রক্তের দিকে লক্ষ্য করে ইয়াবুরজাযান বললো, হে ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাকারিয়া! আপনাকে হত্যা করার জন্য

www.eelm.weebly.com

যে বিপদ বনী ইসরাইলদের প্রতি আপতিত হয়েছে এবং যে পরিমাণে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে— তার সকল কিছুই আমাদের স্রষ্টা জানেন। এখন আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তার হুকুমে গাত্রোত্থান করুন। নতুবা আপনার সম্প্রদায়ের কাউকে আমি জীবিত রাখবো না। একথা বলার পর সেনাপতি দেখলো, রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলো। বিস্ময়কর এই দৃশ্যটি দেখে সে হত্যা-পরিকল্পনা স্থগিত করতে মনস্থ করলো। বললো, বনী ইসরাইলেরা যে আল্লাহ্র উপরে ইমান এনেছে, আমিও তাঁর প্রতি ইমান আনলাম। আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে যে, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। এরপর সে বনী ইসরাইলদের উদ্দেশ্যে বললো, সম্রাট খারদুশ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমাদের এ মতো পরিমাণ হত্যা করতে, যাতে করে তোমাদের রক্তপ্রবাহ গিয়ে পৌঁছে শহরের উপকণ্ঠে অবস্থানরত সেনাছাউনির মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত। তাঁর নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা আমার নেই। তাই আমি বলি, তোমরা একটি বৃহৎ গর্ত খনন করো। তারপর তোমাদের সকল গৃহপালিত পশুকে জবাই করে ফেলে দাও গর্তটির মধ্যে। বনী ইসরাইলেরা তাই করলো। প্রবাহিত হলো রক্তের স্রোত। সে স্রোত গিয়ে পৌঁছলো সেনাশিবিরের মধ্যবর্তী স্থানে। এরপর নিহত লোকদের লাশ দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো গর্তটি, যাতে মনে হয় গর্তটি পূর্ণ করা হয়েছে কেবল মানুষের লাশে। সম্রাট খারদুশ তার বিশেষ সংবাদবাহককে পাঠিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করলো। সংবাদবাহক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গিয়ে তাকে জানালো, হ্যাঁ ! মানুষের লাশ দ্বারা পরিপূর্ণ একটি বিশাল গর্ত থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে সেনাশিবিরের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত। সম্রাট খারদুশ তার সৈন্যদেরকে নিয়ে হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন করলো বাবেলে।

এটাই সে ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি যার দিকে ইঙ্গিত করে অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'লাতুফসিদুন্না ফীল আরদ্বি মাররাতাইনি' (অবশ্যই তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এ ধরাধামে দু'বার) এভাবে বনী ইসরাইলদের প্রতি আপতিত বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছিলো বখতে নসরের মাধ্যমে। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি কার্যকর হয়েছিলো খারদুশের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, প্রথম বিপর্যয় অপেক্ষা দ্বিতীয় বিপর্যয়টি ছিলো অধিকতর মর্মন্তুদ। আরো উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিপর্যয়ের পর বনী ইসরাইলেরা আর মাথা তুলতে পারেনি কোনদিন। তাই সহজে সিরিয়া ও বায়তুল মাকদিস অধিকার করে নিয়েছিলো রোমান ও গ্রীকরা।

সময় গড়িয়ে চললো। মানবেতর জীবন যাপন সত্ত্বেও বংশবিস্তার ঘটে চললো বনী ইসরাইলদের। ব্যাপক বংশবৃদ্ধির ফলে অবশ্য তারা সামাজিক প্রতিপত্তি ফিরে পেলো কিছুটা। কিন্তু হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার আর সম্ভব হলো না। আল্লাহ্তায়ালা পুনরায় নানারকম নেয়ামত প্রদান করতে লাগলেন তাদেরকে। কিন্তু তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে হয়ে উঠলো উন্নাসিক, উচ্ছৃঙ্খল ও

www.eelm.weebly.com

স্বেচ্ছাচারী। এভাবে একসময় চলে গেলো আল্লাহ্তায়ালার বিধানের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। তখন আল্লাহ্পাক তাদের উপরে বিজয়ী করে দিলেন টিটাস ইবনে আস্ইয়ানাশ রুমীকে। রাজা টিটাস ধ্বংস করে দিলো তাদের জনপদ। বায়তুল মাকদিসের পবিত্র শহর থেকে বিতাড়িত করে দিলো দুর্বিনীত বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীকে। যারা থাকতে চাইলো, তাদের উপরে ধার্য করলো অপমানজনক কর। এভাবে নিজ ভূমিতে পরবাসী হয়ে গেলো তারা। তাদের এরকম অবমাননাকর অবস্থা বহাল রইলো ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের শাসনকাল পর্যন্ত। তিনিই বহুকাল পর বায়তুল মাকদিসের অবরুদ্ধ মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

কাতাদা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা প্রথমে রাজা জালুতকে বনী ইসরাইলদের উপরে বিজয়ী করে দিয়েছিলেন। সে বহুসংখ্যক বনী ইসরাইলকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো এবং প্রায় বিরান করে দিয়েছিলো তাদের জনপদ। হজরত দাউদ নবীর যুগে আবার তাদের ছন্নছাড়া জীবনে এসেছিলো স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য। হৃত রাজ্যের অধিকার পুনরায় ফিরে পেয়েছিলো তারা। কিন্তু ধীরে ধীরে আবারো তারা হয়ে উঠলো উন্নাসিক ও অবাধ্য। ফলে দ্বিতীয় বার আল্লাহ্ তাদের উপরে প্রবল করে দিলেন বখতে নসরকে। বখতে নসর তাদেরকে ঘিরে ফেললো। চালালো ব্যাপক গণহত্যা। বন্দীও করলো অনেককে। বনী ইসরাইলদের জনজীবনে পুনরায় নেমে এলো লাঞ্ছনা ও অপমান। শেষে এক সময় আল্লাহ্তায়ালা রক্ষা করলেন। দীর্ঘকাল লাঞ্ছিত ও অনিকেত জীবন যাপনের পর আবারো তারা লাভ করলো মুক্তির আস্বাদ। সম্মান, কর্তৃত্ব— সব কিছুই লাভ করলো তারা। কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে আবারো তারা হয়ে উঠলো দুর্বিনীত, দুঃশীল। অবশেষে আল্লাহ্পাক তাদেরকে শায়েস্তা করলেন আরবী নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর মাধ্যমে। তাদের উপরে অবমাননার এই ধারাক্রম কিয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'এবং যখন আপনার প্রভুপালক সংবাদ দিলেন যে, তাদের উপর সব সময় নেতৃত্ব করতে থাকবে কেউ না কেউ এবং তাদের এই শাস্তি ক্রমাগত চলতেই থাকবে।'

সুদ্দী লিখেছেন, একবার বনী ইসরাইলের এক লোক স্বপ্নে দেখলো, মরুবাসী এক এতিম বালক বায়তুল মাকদিস অধিকার করেছে। সে বাবেল শহরের এক বিধবার পুত্র। নাম বখতে নসর। উল্লেখ্য যে, ওই সময় বনী ইসরাইলদের মধ্যে অনেকে ছিলো সত্যবাদী। তাই তাদের স্বপ্ন সত্য হতো। স্বপ্ন দর্শনকারীও বুঝলো তার স্বপ্ন একদিন ফলবতী হবেই। তাই সে তার সঙ্গী সাথীদেরকে সঙ্গে নিয়ে চললো বাবেল শহরে। খুঁজতে খুঁজতে তারা উপস্থিত হলো বখতে নসরের বিধবা

www.eelm.weebly.com

মায়ের কাছে। একটু পরেই দেখলো, কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে এগিয়ে আসছে বালক বখতে নসর। সে ছিলো তখন কাঠুরিয়া। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রয় করে অত্যন্ত কষ্টে সৃষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতো নিজের ও বিধবা মায়ের। বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়েই বাজারের দিকে যাচ্ছিলো সে। বনী ইসরাইল পথিকেরা তাকিয়ে ছিলো তার গমন পথের দিকে। পরিশ্রান্ত বখতে নসর একটু জিরিয়ে নেয়ার জন্য থামলো। কাঠের বোঝাটি মাটিতে রেখে বসে পড়লো তার উপর। পথিকেরা এগিয়ে গেলো তার দিকে। কুশল বিনিময় করলো তার সঙ্গে। তারপর তাকে তিনটি দিরহাম দিয়ে বললো, যাও, এগুলো দিয়ে কিছু খাবার কিনে নিয়ে এসো। সবাই এক সঙ্গে বসে খাবো। বখতে নসর বাজার থেকে কিনে আনলো এক দিরহামের রুটি, এক দিরহামের গোশত এবং এক দিরহামের মদ। এরপর সকলে মিলে রুটি গোশত ভক্ষণের পর পান করলো মদ্য। পরপর তাদের এরকম পানাহার চললো তিন দিন। তারপর বনী ইসরাইল আগন্তুকেরা বললো, শোনো বখতে নসর! আমরা চাই তুমি আমাদেরকে নিরাপত্তা পত্র লিখে দাও। তুমি যদি কোনো দিন রাজা হও, তবে নিরাপত্তাপত্রটি আমাদের কাজে লাগবে। বখতে নসর বললো, তোমরা কি আমার সঙ্গে উপহাস করছো? তারা বললো, না, উপহাস নয়। এক সময় তুমি যদি রাজা হও, তবে অসুবিধা কোথায়? আর আমাদেরকে নিরাপত্তানামা দিতেই বা তুমি আপত্তি করছো কেনো? বখতে নসর আর কথা বাড়ালো না। তাদের চাহিদা মতো নিরাপত্তাপত্র লিখে দিলো সে। তারা বললো, তুমি রাজা হলে তোমার চারপাশে থাকবে অনেক গণ্যমান্য মানুষের ভিড়। তখন আমরা তোমার কাছে পৌঁছবো কেমন করে ? বখতে নসর বললো, তোমরা তখন একটি লম্বা লাঠির মাথায় নিরাপত্তাপত্রটি বেঁধে লাঠিটি উঁচু করে ধোরো। ওই উঁচু লাঠি আমার চোখে পড়লেই আমি চিনতে পারবো।

কাতাদা বর্ণনা করেছেন, বনী ইসরাইলদের তৎকালীন বাদশাহ সাহাবাইন হজরত ইয়াহ্ইয়া নবীকে খুবই শ্রদ্ধা করতো। একান্ত আপন মনে করতো তাঁকে। কিন্তু ঘটনাক্রমে বাদশাহ পড়ে গেলো এক মহাবিপাকে। তার এক স্ত্রীর আগের স্বামীর কন্যা অথবা তার এক ভগ্নিপুত্রীর প্রেমে পড়ে গেলো সে। হজরত ইবনে আব্বাস নির্দিষ্ট করে বলেছেন ভগ্নিপুত্রীর কথা। বাদশাহ কিছুতেই তার দিক থেকে মন ফিরাতে পারলো না। হজরত ইয়াহ্ইয়াকে ডেকে এ ব্যাপারে শরিয়তের বিধান কী, তা জানতে চাইলো। হজরত ইয়াহ্ইয়া স্পষ্ট জানালেন, এরকম বিবাহ আমাদের শরিয়তে হারাম। তাঁর এই অভিমতের কথা পৌঁছে গেলো মেয়েটির মায়ের কাছে। সে তখন উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কন্যাকে বাদশাহর হাতে তুলে দিয়ে বাদশাহর উপরে প্রভাব বিস্তার করাই ছিলো তার ইচ্ছা।

www.eelm.weebly.com

কিছুদিন পরের ঘটনা। বাদশাহ তার ওই ভগ্নিপুত্রীকে এক মদ্যপানের আসরে নিমন্ত্রণ জানালো। মেয়েটির মা তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে সুবাসিতা ও আভরণ শোভিতা করে বাদশাহর দরবারে প্রেরণ করলো। বার বার বলে দিলো, খবরদার! সহজে ধরা দিয়ো না। বাদশাহকে নিজ হাতে মদ্য পরিবেশন কোরো। তিনি যখন তোমাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হবেন, তখন বোলো, আমার একটি দাবি আপনাকে পূরণ করতেই হবে। অন্যথায় আপনার আহ্বানে আমি মন থেকে সাড়া দিতে পারবো না। বাদশাহ যখন তোমার দাবির কথা জানতে চাইবেন, তখন বোলো, ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাকারিয়ার ছিন্ন মস্তক চাই। যতক্ষণ আপনি তা বাসনে করে আমার সামনে উপস্থিত না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার অঙ্কশায়িনী হতে পারবো না। রাজ দরবারে মেয়েটি তার মায়ের নির্দেশ মতো সব কিছুই করলো। তার দাবির কথা শুনে চমকে উঠলো বাদশাহ। বললো, হতভাগী নারী! অন্য কিছু চাও। মেয়েটি বললো, অন্য কিছুই আমি চাই না। চাই ইয়াহ্ইয়ার কর্তিত মস্তক। বাদশাহ তখন তার ভগ্নিপুত্রীর প্রেমে আত্মহারা। তাই তার মনস্তুষ্টির জন্য হুকুম জারী করলো, এই মুহূর্তে ইয়াহ্ইয়ার মাথা কেটে এনে একটি পাত্রে করে আমার প্রিয়তমার সম্মুখে উপস্থাপন করা হোক। রাজ-নির্দেশ পালিত হলো। হজরত ইয়াহ্ইয়ার কর্তিত মস্তক একটি খোলা বাসনে করে আনা হলো বাদশাহ ও তার প্রিয়তমার সামনে। কর্তিত মস্তক থেকে তখনও ফিনকি দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিলো রক্ত। আর বার বার উচ্চারিত হচ্ছিলো, বাদশাহ! তোমার জন্য এ বিবাহ বৈধ নয়। দিন গেলো। রাত গেলো। পরদিন প্রত্যুষে বাদশাহ হুকুম দিলো, বন্ধ করো এর রক্ত ও আওয়াজ। মাটি নিক্ষেপ করো ছিন্ন মস্তকের উপর। সম্পূর্ণ প্রোথিত করে দাও মাটির নিচে। রাজ প্রাসাদ থেকে এবার ছিন্ন ও রক্তাক্ত পবিত্র মস্তকটি নিয়ে যাওয়া হলো দূরে বধ্যভূমিতে। কিন্তু তখনও নির্গত হতে লাগলো অবিরল রক্তস্রোত।

বখতে নসর তখন বাবেলরাজের প্রধান সেনাপতিরূপে শহরের উপকণ্ঠে তার সেনাবাহিনী নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। সন্ত্রস্ত শহরবাসীরা বন্ধ করে দিলো প্রবেশপথগুলো। দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলো সকলে। বখতে নসর ও তার সেনাবাহিনী নিরুপায় হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করাও অসম্ভব হয়ে পড়লো তাদের জন্য। খাদ্য সংকট দেখা দিলো। দেখা দিলো আরো অনেক আনুসঙ্গিক অসুবিধা। বখতে নসর অগত্যা ফিরে যেতে মনস্থ করলো। সেনাবাহিনীকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দান করতে যাবে, এমন সময় তার সঙ্গে দেখা করতে এলো এক বনী ইসরাইলী বৃদ্ধ। বললো, সেনাপতি! তুমি কি বিজয়ী না হয়েই ফিরে যেতে চাও? বখতে নসর বললো, হ্যাঁ। বৃদ্ধ বললো, আমি একটি উপায় বলে দিতে চাই। যদি আমার কথা মানো, তবে তোমার বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু আমার একটি কথা তোমাকে শুনতে হবে। যখন হত্যাকাণ্ড চালাতে বলবো তখন চালাবে। আর বন্ধ করতে বললে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করবে। বখতে নসর বললো, ঠিক আছে, তাই করবো। বৃদ্ধ বললো, তোমার সৈন্যদেরকে চারটি সমান অংশে ভাগ করে শহরের চারদিকে অবস্থান গ্রহণ করতে বলো এবং তাদেরকে নির্দেশ দাও, তারা যেনো সকলে একযোগে উপরের দিকে হাত উঠিয়ে বলে, আমরা ইয়াহ্ইয়া বিন জাকারিয়ার রক্তের বিনিময়ে তোমার কাছে বিজয় চাই। আশা করা যায়, তোমরা এরকম দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়বে সকল প্রাকার। বখতে নসর বৃদ্ধের পরামর্শ বাস্তবায়ন করলো। সৈন্যদের দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়লো প্রাকার। বৃদ্ধ বললো, সেনাপতি! সেনাদলকে সংযত হতে বলো। আর তুমি এসো আমার সঙ্গে। এই বলে বৃদ্ধ বখতে নসরকে নিয়ে গেলো বধ্যভূমিতে। সেখানে তখনো ফিনকি দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিলো হজরত ইয়াহ্ইয়ার শহীদি খুন। বৃদ্ধ বললো, তুমি গণহত্যা শুরুর নির্দেশ দানের পর লক্ষ্য রেখো এই রক্ত প্রবাহের দিকে। দেখবে গণহত্যার সময় এই রক্ত টগবগ করে ফুটছে। একসময় আবার বন্ধ হয়ে যাবে এই রক্তপ্রবাহ। তখন তুমি গণহত্যা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ো।

বখতে নসর গণহত্যার নির্দেশ দিলো। তার সৈন্যরা বনী ইসরাইলদের যাকে সামনে পেলো, তাকেই হত্যা করতে লাগলো। এ ভাবে সত্তর হাজার লোককে হত্যা করার পর বন্ধ হয়ে গেলো হজরত ইয়াহ্ইয়ার রক্তপ্রবাহ। বৃদ্ধ বললেন, সেনাধিনায়ক! এবার সকলকে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে বলো। কোনো নবীকে হত্যা করলে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হন্তারক ও হন্তারকের প্রতি যারা সন্তুষ্ট, তাদেরকে হত্যা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হন না। বখতে নসর হত্যাকাণ্ড বন্ধের নির্দেশ দিলো। সৈন্যরা তাদের তরবারী কোষাবদ্ধ করলো। ওই সময় বখতে নসরের সঙ্গে সাক্ষাত করলো ওই তিন ব্যক্তি যারা এক সময় তার নিকট থেকে নিরাপত্তাপত্র লিখে নিয়েছিলো। বখতে নসর তাদেরকে চিনতে পারলো এবং নিরাপত্তাপত্রের শর্ত অনুসারে তাদের ও তাদের পরিবার পরিজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলো। অবশেষে বখতে নসর বায়তুল মাকদিস মসজিদকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করলো। মৃত জীব-জন্তু ও আবর্জনা দিয়ে ভরে ফেললো বায়তুল মাকদিসের প্রাঙ্গণ। তারপর প্রত্যাবর্তন করলো বাবেলের দিকে। উল্লেখ্য যে, বায়তুল মাকদিসের শহর ধ্বংস করার ক্ষেত্রে রোমানরাও বখতে নসরকে প্রভূত সাহায্য করেছিলো। বখতে নসর বাবেলে প্রত্যাবর্তনের সময় বনী ইসরাইলদের কতিপয় সমাজপতিকে সঙ্গে নিয়ে গেলো। তাদের সঙ্গে আরো ছিলেন পরবর্তী সময়ের নবী হজরত দানিয়েল ও অন্য কয়েকজন নবী। তাঁরা তখন বালক। জালুতের মাথাও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো বখতে নসর।

www.eelm.weebly.com

ব্যাবেল পৌঁছে সকলে দেখতে পেলো রাজা সাহাবাইন আর নেই। জনতা তখন বখতে নসরকেই নির্বাচিত করলো তাদের রাজারূপে। বাবেলবাসীরা ছিলো অগ্নি উপাসক। বখতে নসরও ছিলো তাদের সম্প্রদায়ভূত। তৎসত্ত্বেও সে হজরত দানিয়েল ও তাঁর সঙ্গীদেরকে খুবই সম্মান করতো। বিষয়টিকে কেউ কেউ মেনে নিতে পারলো না। তারা একবার রাজাকে একান্তে পেয়ে বললো, মহামান্য রাজন! দানিয়েল ও তার সঙ্গীরা আপনার ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। তারা আমাদের জবাই করা পশুর গোশত ভক্ষণ করাকে বৈধ মনে করে না। রাজা তৎক্ষণাৎ হজরত দানিয়েল ও তাঁর সঙ্গীদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, এরা যা বললো, তা কি ঠিক ? হজরত দানিয়েল জবাব দিলেন, আমরা এক আল্লাহ্য় বিশ্বাসী। তাই যারা অংশীবাদী, তাদের জবাইকৃত পশুর গোশত আমাদের জন্য হারাম। বখতে নসর একথায় অপমানিত বোধ করলো খুব। নির্দেশ দিলো, এই মুহূর্তে একটি গর্ত খনন করে দানিয়েল ও তাঁর সতীর্থদেরকে ওই গর্তে ফেলে দাও। তারপর সেখানে ফেলে দাও একটি হিংস্র বাঘকে। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। গভীর গর্তে হজরত দানিয়েলের দল ও হিংস্র বাঘটিকে রেখে ফিরে এলো সকলে। হজরত দানিয়েলের সতীর্থদের সংখ্যা ছিলো ছয়জন।

কয়েকদিন পর কৌতূহলী লোকেরা গর্তটির কাছে গেলো। তারা ভেবেছিলো এ কয়দিনে নিশ্চয় বাঘটি হজরত দানিয়েল ও তাঁর দলের লোকদেরকে খেয়ে সাবাড় করেছে। কিন্তু গর্তের পাড়ে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো তারা। দেখলো হজরত দানিয়েল ও তাঁর সঙ্গীরা বহাল তবিয়তে উপবিষ্ট। আর তাঁদের সামনে বিশাল বাঘটি সামনের পা দু'টো মেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। তাদের সঙ্গে সপ্তম এক ব্যক্তিও উপস্থিত। সে আর কেউ নয়, বখতে নসর স্বয়ং।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্পাক বখতে নসরের চেহারা প্রতি বছর পরিবর্তন করে দিতেন। ওহাব বলেছেন, আল্লাহ্পাক বখতে নসরকে কোনো বছর শকুন আকারে, কোনো বছর ষাঁড় আকারে আবার কোনো বছর বাঘের আকারে রাখতেন। এভাবে তার আকৃতি পরিবর্তন করা হয়েছিলো সাত বছর ধরে। এই পরিবর্তন অবশ্য ছিলো তার শারীরিকভাবে। অন্তর কিন্তু বরাবরই ছিলো তার মানুষের মতো। শেষে আল্লাহ্পাক তাকে সাম্রাজ্যাধিকারী করেছিলো এবং শোনা যায় সে শেষ কালে আল্লাহ্র প্রতি ইমানও এনেছিলো। এ প্রসঙ্গে একবার ওহাবকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমি বখতে নসর সম্পর্কে আহলে কিতাবদেরকে বিভিন্ন মন্তব্য করতে শুনেছি। তাদের কেউ কেউ বলেছে, বখতে নসর ইমানসহ মৃত্যুবরণ করেছিলো। আবার কেউ কেউ বলেছে, সে তো আল্লাহ্র দুশমন। সে বায়তুল মাকদিস ধ্বংস করেছে। পুড়িয়ে দিয়েছে তওরাত। নবীদেরকে হত্যা করতেও সে কুণ্ঠিত হয়নি। সে ছিলো অভিশপ্ত। তাই তার তওবা কবুল করা হয়নি।

www.eelm.weebly.com

সুদ্দী বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যখন আকৃতি বিকৃত করার পর পুনরায় বখতে নসরকে আগের মতো চেহারা দিলেন, তখন তার স্বভাবে আচরণে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো। সে হজরত দানিয়েল ও তার সাথীদেরকে সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলো বিশেষভাবে। এরকম করতে দেখে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা হিংসা করতে লাগলো খুব। তারা ছিলো অগ্নি উপাসক। হিংসাবশতঃ তারা বখতে নসরকে বললো, দানিয়েল মদ্যপান করে। সুতরাং সে অতিমাত্রায় প্রস্রাব নিশ্চয়ই করে। উল্লেখ্য যে, অতি মাত্রায় প্রস্রাব করাকে তাদের সমাজে ঘৃণার চোখে দেখা হতো। বখতে নসর তাদের কথায় প্ররোচিত হলো। একদিন সে হজরত দানিয়েল আর তার সঙ্গীদের জন্য পাঠালো কিছু উত্তম আহার্য ও মদ। তাঁর বাড়ীর সামনে বসালো প্রহরী। তাকে বললো, খেয়াল রেখো, সর্ব প্রথম যে প্রস্রাব করতে বাইরে বেরোবে, তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে। সে যদি বলে আমি বখতে নসর তবু তার কথা বিশ্বাস করবে না। বলবে, তুমি মিথ্যাবাদী। যে প্রথমে বাইরে বের হবে, তাকেই তীর বিদ্ধ করার জন্য আমি নির্দেশপ্রাপ্ত। এই বলে সঙ্গে সঙ্গে তীর বিদ্ধ করবে তাকে। একথা বলেই বখতে নসর হজরত দানিয়েলের বাসভবনে হাজির হলো মেহমানরূপে। কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থানের পর বখতে নসরই বের হলো প্রথমে। প্রহরীকে বললো, আমি কিন্তু বখতে নসর। প্রহরী তার কথা বিশ্বাস করলো না। বললো, তুমি মিথ্যাবাদী। এই বলেই তীর নিক্ষেপ করলো সে। তীরবিদ্ধ বখতে নসরের মৃত্যু ঘটলো কিছুক্ষণের মধ্যেই।

বাগবী লিখেছেন, ঐতিহাসিকগণ হজরত ইয়াহ্‌ইয়ার শহীদ হওয়ার পর বখতে নসরের বায়তুল মাকদিস অভিযানের কথা লিখেননি। তাঁরা লিখেছেন বখতে নসর বায়তুল মাকদিস অভিযানে বের হয়েছিলো হজরত শা'ইয়াকে শহীদ করার পর। তখন বনী ইসরাইলদের নবী ছিলেন হজরত আরমিয়া। হজরত আরমিয়া ও হজরত ইয়াহ্‌ইয়ার আবির্ভাবকালের ব্যবধান ছিলো চারশ' একষট্টি বছর। আর তখন পারস্যরাজ বাহমানের পক্ষ থেকে বাবেল শাসন করতো কীরাশ। ওই সময় দ্বিতীয় বারের মতো বায়তুল মাকদিস পুনঃনির্মিত হয়। ওই পুনঃনির্মাণ সংঘটিত হয়েছিলো বখতে নসর কর্তৃক বায়তুল মাকদিস ধ্বংস হওয়ার সত্তর বছর পর। পুনঃনির্মাণের অষ্টাশি বছর পরে বায়তুল মাকদিসের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে শাহ্‌ সেকেন্দার। এরপর আনুমানিক তিনশত তেষট্টি বছর বিগত হলে জন্ম গ্রহণ করেন হজরত ইয়াহ্‌ইয়া। বাগবী আরো লিখেছেন, এ সম্পর্কে ইবনে ইসহাকের বর্ণনাটিই সমধিক শুদ্ধ।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি করো তবে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন।' এ কথার অর্থ— হে কিতাবধারীগণ! হে ইহুদী, হে খৃষ্টান! তোমরা যদি শেষ রসুলের প্রতি ইমান আনো এবং কোরআনের বিধানানুসারে নিজেদেরকে সংশোধিত করো, তবে

www.eelm.weebly.com

এমতো আশা করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন। আর যদি আখেরী রসুল ও কোরআনের বিরোধী হও, তবে তিনিও তোমাদের সঙ্গে পূর্ববৎ আচরণ করবেন। অর্থাৎ আগের মতো আবার তোমাদের উপরে নেমে আসবে আল্লাহ্র আযাব।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্তায়ালার এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন ইহুদী সম্প্রদায়ভূত হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, হজরত কাব আহবার ও তাঁর সঙ্গীসাথীগণ। ওদিকে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সাড়া দিলেন বাদশাহ নাজ্জাসী ও আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় আগত প্রতিনিধি দল। আর অঙ্গীকারা-নুসারে আল্লাহ্তায়ালা তাদের উপর বর্ষণ করলেন তাঁর বিশেষ রহমত। তাঁদের সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কিতাবীদের মধ্যে অবিচলিত একটি দল আছে, তারা রাত্রিকালে আল্লাহ্র আয়াত আবৃত্তি করে এবং সেজদা করে।' অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'রসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শ্রবণ করে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে, তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু বিগলিত দেখবে।' অপর পক্ষে যারা আল্লাহ্তায়ালার এই আহ্বানে সাড়া দেয়নি তাদের উপর নেমে এসেছিলো আল্লাহ্র শাস্তি। বিদ্বেষপ্রবণ ইহুদীরা রসুল স.কে শহীদ করে দেয়ার জন্য গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিলো। যাদু করেছিলো তাঁকে। আর একবার খাদ্যে বিষ মিশিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলো এ পৃথিবী থেকে। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে প্রতিশোধ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। রসুল স.ও যথারীতি এ নির্দেশ পালন করলেন। বনী কুরায়জার সকল পুরুষকে প্রদান করলেন মৃত্যুদণ্ড। আর বনী নাজীরকে করলেন দেশান্তর। তদুপরি তাদের উপর ধার্য করলেন অবমাননাকর জিযিয়া কর।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়াজাআ'ল্না জাহান্নামা লিল্ কাফিরীনা হাসীরা' অর্থাৎ জাহান্নামকে আমি করেছি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য কারাগার। ওই কারাগারে আমি তাদেরকে অনন্তকালের জন্য আবদ্ধ করে রাখবো। কস্মিনকালেও তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'হাসীরা' শব্দটির অর্থ বাসাত্ব (শয্যা বা বিছানা)। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— জাহান্নামকে আমি করেছি সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের শয্যা।

এর পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে — 'এই কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ পথ-নির্দেশ করে।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনুন এবং প্রচার করুন যে, নিঃসন্দেহে আপনার উপরে অবতীর্ণ এই কোরআন সত্যান্বেষীদেরকে প্রদান করে নির্ভুল পথের দিশা।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।' এ কথার অর্থ— যারা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ, তাদের জন্য এই কোরআন প্রদান করে জান্নাতের সুসংবাদ। ওই জান্নাতই হচ্ছে 'আজ্‌রান্ কাবীরা' বা মহা পুরস্কার।

এর পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'এবং যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি মর্মন্তুদ শাস্তি।' একথার অর্থ— যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য আমি পরকালে প্রস্তুত করে রেখেছি মহাযন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ১১, ১২

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ○ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

❑ মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেইভাবেই অকল্যাণ কামনা করে; মানুষ তো তাহার মনে যাহা আসে চিন্তা না করিয়া তাহার আশু রূপায়ণ কামনা করে।

❑ আমি রাত্রি ও দিবসকে করিয়াছি দুইটি নিদর্শন; রাত্রিকে করিয়াছি নিরালোক এবং দিবসকে করিয়াছি আলোকময়, যাহাতে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব স্থির করিতে পার; এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মানুষ ত্বরাপ্রবণ। তাই সে তার শুভ ও অশুভ সকল প্রকার অভিপ্রায়, চিন্তা ও প্রার্থনার অতিদ্রুত বাস্তবায়ন কামনা করে। এমতো চঞ্চলমতিত্বের কারণে স্বাভাবিকভাবেই তার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে। সে হয়ে পড়ে অদূরদর্শিতাচ্ছাদিত। কিন্তু আল্লাহ্ পরম ক্ষমাপরবশ ও মহাদয়ার্দ্র। সে কারণেই তাদের ত্বরাপ্রবণতাকে তিনি প্রশ্রয় দেন না। শুভ-পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের প্রার্থনাকে কখনো করেন বিলম্বিত। আবার কখনো করেন অগ্রাহ্য।

মানুষের অকল্যাণ কামনা আসে দু'টি পথে। কখনো সে ক্রোধবশতঃ অকল্যাণ কামনা করে নিজের পরিবারের ও সম্পদের। আবার কখনো সে প্রার্থনা করে এমন বস্তুর, যা তার জন্য চিত্তহারী কিন্তু প্রকৃতই সেটা তার জন্য অকল্যাণকর।

www.eelm.weebly.com

এরূপ কামনাকেই আয়াতে বলা হয়েছে অপপ্রার্থনা। কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে— সে কামনা করে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ। পরিত্রাণ কামনা করে পারলৌকিক শাস্তি থেকে। এরূপেই সে কামনা করে অকল্যাণও। তবে আল্লাহ্ মেহেরবান। তাই তাৎক্ষণিক সে সব প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করেন না। করলে দুর্দশাগ্রস্ত হতো তারা।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, স্বভাবতই মানুষ অসহিষ্ণু, অস্থির। তাই তারা দুঃখে ধৈর্যহারা হয় এবং সুখে হয় কৃতজ্ঞতা বিমুখ। প্রার্থনা করে চাঞ্চল্য সহকারে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'ইনসান' (মানুষ) কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে হজরত আদমকে। আর এখানে 'আশু রূপায়ণ কামনা করে' বলে বুঝানো হয়েছে তাঁর ওই অবস্থানের কথা, যখন তার শরীরে ঘটানো হয়েছিলো আত্মার সম্পাত। তাঁর নাভীমূল পর্যন্ত আত্মার ক্রিয়া শুরু হতে না হতেই তিনি তখন পুনঃপুনঃ উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিলেন। আর বার বার তাঁর ওই প্রচেষ্টা পর্যবসিত হচ্ছিলো নিষ্ফলতায়। হজরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তিটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর।

ওয়াকেদী তাঁর যুদ্ধবিষয়ক গ্রন্থে জননী আয়েশার এক মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এক বন্দীকে জননী আয়েশার নিকটে উপস্থিত করে বললেন, একে কড়া পাহারায় রাখতে হবে। এই বলে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। জননী আয়েশা বন্দীটির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখছিলেন। কিন্তু হঠাৎ এক আগন্তুক মহিলার সংগে কথা বলতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। সুযোগ পেয়ে লোকটি সটকে পড়লো সেখান থেকে। কিছুক্ষণ পর সেখানে হাজির হলেন রসুল স. স্বয়ং। বললেন, বন্দী লোকটিকে তো দেখছি না। জননী বললেন, কোথায় যে গেলো। রসুল স. কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্ তোমার হাত কেটে দিক! একথা বলেই তিনি বাইরে গিয়ে অপেক্ষমান সাহাবীগণকে বললেন, মালযামের পশ্চাৎভূমি থেকে শিগ্গীর লোকটিকে খুঁজে নিয়ে এসো। নির্দেশ শুনে অতি দ্রুত রওনা হলো অনুসন্ধানকারীরা। পলাতক লোকটি বেশী দূর যেতে পারেনি। তাই সহজেই ধরা পড়লো সে। পুনরায় তাকে বন্দী করে আনা হলো রসুল স. সকাশে। তাকে দেখে নিশ্চিন্ত মনে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে রসুল স. দেখলেন, তাঁর প্রিয়তম জীবন সঙ্গিনী একস্থানে বসে বার বার তাঁর হাত ওলোট পালট করে দেখছেন। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার ? জননী আয়েশা বললেন, আমি আপনার অপপ্রার্থনা কার্যকর হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুই হাত ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! আমিও তো মানুষ। সুতরাং ভুল, ক্রোধ এ সকল মানবিক বৃত্তি কখনো কখনো আমার স্বভাবেও ছায়াপাত করতে পারে। হে আমার

www.eelm.weebly.com

জীবনাধিকারী। আমি বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের জন্য যদি কখনো অপপ্রার্থনা প্রকাশ করি, তবে তুমি সে অপপ্রার্থনাকে তাদের জন্য শুভপ্রার্থনায় পরিণত করে দিয়ো। সে প্রার্থনাকে করে দিয়ো তাদের বিশুদ্ধচারিতার কারণ। আল্লাহ্তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে 'ইনসান' বলে বুঝানো হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। আর 'অকল্যাণ কামনা করে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে তাদের শাস্তি কামনাকে। উল্লেখ্য যে, মক্কার মুশরিকেরা আল্লাহ্র আযাবের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতো। যেমন, নজর বিন হারেছ বলতো, হে আল্লাহ্! মোহাম্মদের দল ও আমাদের দলের মধ্যে যে দল উত্তম, সেই দলকে তুমি বিজয়ী করো। আবার কখনো বলতো, হে আল্লাহ্! মোহাম্মদ এবং কোরআন যদি সত্য হয়, তবে তুমি আকাশ থেকে আমাদের উপরে প্রস্তর বর্ষণ করো। আল্লাহ্পাক অবশ্য তার এ অপপ্রার্থনাকে তাৎক্ষণিকভাবে কবুল করেননি। তাকে এবং তার মতো দুর্বৃত্তদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন পরে— বদর যুদ্ধের সময়।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আমি রাত্রি ও দিবসকে করেছি দু'টি নিদর্শন।' একথার অর্থ— রাত্রি ও দিবস হচ্ছে আমার অপার ক্ষমতা ও প্রজ্ঞাময়তার দু'টি বিশেষ নিদর্শন।

এরপর বলা হয়েছে— 'রাত্রিকে করেছি নিরালোক এবং দিবসকে করেছি আলোকময়।' একথার অর্থ— আমি রাতকে করেছি তমসাবৃত ও দিবসকে করেছি আলোকোজ্জ্বল। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, রাত্রি ও দিবসের কথা বলে এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে রাতের চন্দ্র ও দিবসের সূর্যের প্রতি। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— আমি রাতের চাঁদকে ক্ষয় করতে করতে নিঃশেষ করে ফেলি, আর দিবসকে রাখি সূর্যালোকে সমুদ্ভাসিত। তাই দিবসে পৃথিবীর সবকিছু হয় স্পষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান। এভাবে রাতের চাঁদ ও দিনের সূর্য হয়েছে আমার অতুলনীয় নিদর্শনের দু'টি বিশেষ প্রতীক। ক্বারী কাসায়ী বলেছেন, আরববাসীরা 'আব্সারান নাহার' বলে ওই সময়কে, যখন সকলবস্তু স্পষ্টরূপে অক্ষিগোচর হয় দিবাভাগে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রথমদিকে চন্দ্র ও সূর্যের আলো ছিলো সমান। তারপর আল্লাহ্তায়ালা সূর্যালোককে সত্তর ভাগে ভাগ করলেন। চন্দ্রালোককেও তেমনি ভাগ করলেন সত্তর ভাগে। তারপর চন্দ্রের উনসত্তর ভাগ আলোকে চিরদিনের জন্য মিলিয়ে দিলেন সূর্যালোকের সঙ্গে। এরপর আল্লাহ্র নির্দেশানুসারে চাঁদের উপর হজরত জিবরাইল তাঁর ডানাস্পর্শ করলেন তিন বার। ফলে চন্দ্রালোকের তেজস্বিতা গেলো উবে। থাকলো কেবল নরম ও স্নিগ্ধ আলো। একবার চন্দ্রপৃষ্ঠের কালো দাগ সম্পর্কে ইবনে কাওয়া কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে হজরত আলী বলেছিলেন, ওটি হচ্ছে আলোর তীব্রতা মুছে ফেলার দাগ।

www.eelm.weebly.com

জ্ঞাতব্যঃ ইমাম বায়হাকী তাঁর 'দালায়েল' পুস্তকে সায়ীদ মাকবরী সূত্রে লিখেছেন, একবার হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রসুল স.কে চন্দ্রপৃষ্ঠের কালো দাগ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। রসুল স. বললেন, সূর্য ও চন্দ্রের আলো ছিলো একই রকম। পরে চন্দ্রের তীক্ষ্ণ আলোককে নিষ্প্রভ করা হয়। সেই মুছে ফেলার দাগকেই তোমরা বলো চন্দ্রের কলঙ্ক। আল্লাহ্ এরশাদ করেন— 'ফামাহাওনা আয়াতাল লাইলি' (রাত্রিকে করেছি নিরালোক)।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা বর্ষসংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পারো।' একথার অর্থ— রাত্রি ও দিবসকে এরকম করেছি একারণে যে, রাতে যেনো তোমরা দূর করতে পারো দিবসের কর্মমুখরতাজনিত পরিশ্রান্তি। সৃষ্টি করতে পারো ইবাদতের সুখকর সুযোগ ও সময়। আর দিবসে পূর্ণোদ্যমে শুরু করতে পারো আয়-উপার্জন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। আবার রাত্রি-দিবসের এমতো বিবর্তনকে গণনা করতে পারো সপ্তাহ, মাস, বছর— বছরের পর বছর।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।' একথার অর্থ— এভাবে আমি প্রমাণ উপস্থাপন করি আমার একক সৃজনশীলতার— যাতে সত্যান্বেষণ ও সত্যাভিসার হয় অনাবিল, স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধ।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ১৩, ১৪

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

❐ প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তাহার গ্রীবালগ্ন করিয়াছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য বাহির করিব এক কিতাব, যাহা সে পাইবে উন্মুক্ত।

❐ আমি বলিব, 'তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি।' একথার অর্থ— আমি প্রত্যেকের অদৃষ্টলিপি বা তাকদীরকে করেছি তার কণ্ঠদেশের আবরণ বা গলার হার। সুতরাং মানুষ যেখানেই থাক না কেনো, তাকদীরের বিধান থেকে সে কোনোক্রমেই পৃথক হতে পারবে না।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস, কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, ভালো ও মন্দ মানুষের অস্তিত্বসম্পৃক্ত। আর তাকে ওই ভালো-মন্দ বা পুণ্য-পাপ সম্পর্কে জবাবদিহিও করতে হবে। হাসান বলেছেন, এখানে 'ত্বায়ের' কথাটির অর্থ কৃতকর্ম— কল্যাণ ও অকল্যাণ। তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, 'ত্বায়ের' অর্থ ওই পূর্বনির্ধারণ, যার বাস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ মানুষ তার তাকদীরের লিখন অনুসারে কর্ম অবশ্যই করবে এবং তার প্রতিফলও অবশ্যই পাবে। পুরস্কার অথবা তিরস্কার— যাই হোক না কেনো।

আবু উবাইদা এবং কুতাইবি বলেছেন , 'ত্বায়ের' অর্থ এখানে ভালো এবং মন্দ উভয় প্রকার ভাগ্যলিপি। আরববাসীরা বলে থাকে 'ত্বরা ছাহমু ফুলানিন বি কাযা' (অমুক ব্যক্তি ভাগ্যের দাস)।

উল্লেখ্য যে, গ্রীবাদেশ, কণ্ঠদেশ বা গলা এমন একটি অঙ্গ— যার মাধ্যমে সৌন্দর্য ও অপসৌন্দর্য উভয় অবস্থাই প্রকাশিত হয়। অচ্ছেদ্য, বা সার্বক্ষণিকরূপে সত্তাসংশ্লিষ্ট বিষয়কে আরববাসীরা গলার হার বলে থাকে। যেমন— নিন্দা বা প্রশংসা অমুক ব্যক্তির গলার হার। এভাবেই প্রতিটি মানুষের তাকদীরকে আল্লাহ্পাক তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছেন বা করেছেন কণ্ঠহার স্বরূপ।

মুজাহিদ বলেছেন, প্রতিটি মানবশিশুর কণ্ঠলগ্ন করে দেয়া হয় একটি লিখিত পত্র বা চিরকুট। ওই চিরকুটে লেখা থাকে 'পুণ্যবান' অথবা 'পাপিষ্ঠ।'

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করবো এক কিতাব যা সে পাবে উন্মুক্ত।' একথার অর্থ— মহাবিচারের দিনে আমি বের করবো প্রত্যেকের আমলনামা। ওই আমলনামা সে পাবে উন্মুক্ত অবস্থায়।

বাগবী লিখেছেন, সম্মানিত সাহাবীগণের বক্তব্যরূপে এসেছে, মানুষের আয়ু শেষ হয়ে গেলে আমল লেখক ফেরেশতাদেরকে বলা হয়— তার আমলনামা বন্ধ করে দাও। বিচারদিবসের আগে তার আমলনামা আর খোলা হবে না।

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'আমি বলবো, তুমি তোমার আমলনামা পাঠ করো; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।' একথার অর্থ— মহাবিচারের দিন মানুষকে বলা হবে, তোমার আমলনামা তুমিই পড়ো। নিজে নিজেই হিসাব করে দ্যাখো, তুমি কী? পাপী না পুণ্যবান?

এখানে 'হাসীব' অর্থ হিসাব গ্রহণকারী। অথবা এর মর্মার্থ 'যথেষ্ট'। অর্থাৎ তোমার সত্তাই তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। সে তখন সাক্ষ্য প্রদান করবে তোমারই বিরুদ্ধে। হজরত আনাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সকল আমলনামা সেদিন আরশের নিচে রাখা হবে (সকল মানুষকে একত্র করা হবে হাশরের ময়দানে) হঠাৎ প্রবাহিত হবে এক দমকা বাতাস। ওই বাতাসে আমলনামাগুলো উড়ে গিয়ে পড়বে মানুষের ডান অথবা বাম হাতে।

www.eelm.weebly.com

হাসান বসরী বলেছেন, যে ব্যক্তি আপন সত্তাকে তার নিজের হিসাব গ্রহণকারী বানিয়ে নিয়েছে, নিশ্চয় সে ন্যায়পরায়ণ। বাগবী ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, পৃথিবীর অক্ষরজ্ঞানহীনেরাও সেদিন তাদের আমলনামা পড়তে পারবে। ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, হাসান বলেছেন, *প্রত্যেকের গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে একটি করে মাল্য।* আমলনামা ভাঁজ করে ওই ফলকের মধ্যে রেখে দেয়া হয়। পুনরুত্থানের পর ওই আমলনামা তার সামনে উন্মোচন করা হবে এবং তাকে বলা হবে— তুমি তোমার কিতাব পাঠ করো; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।

হজরত আবু উমামা থেকে রাগেব ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষের সামনে যখন তার আমলনামা উন্মোচন করা হবে, তখন কেউ কেউ বলবে, আমি অমুক অমুক নেক কাজ করেছিলাম। সেগুলোর কথা তো এখানে নেই। আল্লাহ্তায়ালা বলবে, তুমি তো মানুষের গীবত (পরনিন্দা) করতে, তাই তোমার পুণ্যগুলোকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ১৫

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ۞

❒ যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজদিগেরই মংগলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে তাহারা তো পথভ্রষ্ট হইবে নিজদিগেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না। আমি রসূল না পাঠান পর্যন্ত কাহাকেও শাস্তি দেই না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে, তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য।' একথার অর্থ— মানুষ তার নিজের কল্যাণের জন্যই পুণ্যাভিসারী হয়, আর পথভ্রষ্টও হয় নিজের ধ্বংসের জন্য অর্থাৎ তার পুণ্য ও পাপের প্রতিফল ভোগ করে সে নিজে, অন্য কেউ নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কেউ কারো ভার বহণ করবে না।' উম্মত জননী হজরত আয়েশা থেকে শিথিল সূত্রে ইবনে আবদুল বার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার জননী হজরত খাদিজাতুল কোবরা রসুল স.কে মুশরিকদের অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শিশুদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জানতে চাইলেন, তারা জান্নাতী না জাহান্নামী? রসুল স. জবাব দিলেন, তারা তাদের পিতা-মাতার মাধ্যমে জন্মলাভ করে। সুতরাং তাদের পরিণতি হবে তাদের পিতা-মাতার

www.eelm.weebly.com

মতোই। কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় এরকম জিজ্ঞেস করলে তিনি স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালাই এ বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। ধীরে ধীরে ইসলামের প্রসার ঘটতে লাগলো। তখন আবার সম্মানার্হা খাদিজা এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন রসুল স. এর নিকটে। তখন অবতীর্ণ হলো 'ওয়ালা তাযিরু ওয়াযিরাতুন বিয্‌রা উখরা' (এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না)। এখানে 'বিযরুন' অর্থ পাপের ভার বা বোঝা। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— পাপের ভার বহন করবে পাপী নিজে, অন্য কেউ নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমি রসুল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না।' এ কথার অর্থ— আমি প্রথমে রসুল প্রেরণ করে উদাসীন মানুষকে সতর্ক করি। জানিয়ে দেই শরিয়তের বিধি-বিধান। আমার প্রেরিত রসুল ও তাঁর শরিয়তকে অস্বীকার করলেই কেবল অবাধ্যদের উপরে আপতিত হয় আমার শাস্তি। সুতরাং আমার চিরাচরিত বিধানই এই যে, রসুল প্রেরণ ব্যতিরেকে আমি কাউকে শাস্তি দেই না।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, কেবল জ্ঞান ও বিবেকের কারণে কারো প্রতি ইমান ও আমল অত্যাবশ্যক হয় না। সুতরাং কারো কাছে যদি নবী-রসুলগণের দাওয়াত বা আহ্বান না পৌঁছায় তবে সে শিরিক অথবা অন্যবিধ অপরাধ করলেও তার কোনো শাস্তি হবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরকম ব্যক্তি অবশ্যই শাস্তিযোগ্য হবে। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত বিচারকর্তা। মানুষ তার জ্ঞান ও বিবেককে কাজে লাগালে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। আর এই ইমান বা বিশ্বাস নবুয়ত, মোজেজা ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তি জ্ঞান ও বিবেক। সুতরাং একথাটি অবশ্য মাননীয় যে, নবী-রসুলগণের দাওয়াত না পেলেও মানুষের উপর এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। এই অত্যাবশ্যকতা লংঘিত হলে শাস্তি অনিবার্য। এই অভিমতের সমর্থনে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিস বিদ্যমান। যেমন—

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. একবার বললেন, মহাবিচারের দিন আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম! আদম উত্তরে বলবেন, এই যে আমি। হে আমার আল্লাহ্! সকল কল্যাণ তো তোমারই অধিকারে। আল্লাহ্ বলবেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে দোজখের অংশ বের করো। আদম বলবেন, কীভাবে? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। আল্লাহ্র এ নির্দেশ হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। শাস্তির ভয়ে তখন শিশুরা হয়ে যাবে বৃদ্ধ। আর গর্ভপাত ঘটবে গর্ভবতীদের। মানুষ তখন হয়ে পড়বে নেশাগ্রস্তদের মতো উদভ্রান্ত। অথচ তারা মাতাল নয়। আল্লাহ্র শাস্তির আশংকাতেই তারা হয়ে

www.eelm.weebly.com

পড়বে মাতালের মতো বাহ্যজ্ঞান শূন্য। উপস্থিত সাহাবীগণ একথা শুনে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমাদের মধ্য থেকে ওই পরিত্রান প্রাপ্ত ব্যক্তিটি কে হবেন? তিনি স. বললেন, তোমাদের জন্য শুভসংবাদ। তোমাদের মধ্যে জাহান্নামী হবে হাজারে একজন। আর ইয়াজুজ মাজুজেরা সকলেই। ইমাম আবু হানিফা এই হাদিসের প্রেক্ষিতেই বলেছেন, যার জ্ঞান ও বিবেক আছে তার উপরে তাওহীদ বা আল্লাহ্তায়ালার অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। ইয়াজুজ মাজুজদের প্রতি কোনো নবী প্রেরিত হবেন না, তারা অবস্থান করবে প্রাচীরবেষ্টিত অবস্থায়। অথচ বলা হয়েছে 'তারা সকলে জাহান্নামী'। সুতরাং তাওহীদ সকলের উপরে ফরজ— তার বা তাদের প্রতি নবী প্রেরিত হোন, অথবা নাই-ই হোন।

নবীগণের তিরোধান ও আবির্ভাব কালের মধ্যবর্তী সময়ের মানুষকে মহাবিচারের দিন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হবে। হজরত সাওবান থেকে বায্যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রসুল ঈসার তিরোধানের পরে ও আমার আবির্ভাবের আগের অনেক লোক ছিলো পথভ্রষ্ট। পুনরুত্থান দিবসে তারা তাদের পাপের বোঝা নিয়ে হাশরের প্রান্তরে উপস্থিত হবে। বলবে, হে আমাদের আল্লাহ্! আমরা কোনো রসুল পাইনি। যদি পেতাম, তবে তোমার নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ সম্পর্কে জানতে পারতাম এবং তার উপর আমল করতে পারতাম। আল্লাহ্ বলবেন ঠিক আছে। এখন যদি তোমাদেরকে কোনো নির্দেশ দেই, তবে তোমরা কি তা পালন করবে? তারা বলবে, অবশ্যই। আল্লাহ্ বলবেন, তবে দোজখে চলে যাও। এটাই আমার নির্দেশ। তারা নির্দেশানুসারে দোজখের দিকে যেতে থাকবে। কিন্তু দোজখের কাছাকাছি গিয়ে ভয়ে ফিরে আসবে। বলবে, হে আমাদের আল্লাহ্! দোজখের ভয়ে আমরা ভীত। আমরা তো কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করতে পারবো না। আল্লাহ্ বলবেন, অবশ্যই তোমরা দোজখে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়। এ পর্যন্ত বলার পর রসুল স. হাসলেন। একটু পরেই বললেন, যদি তারা প্রথম নির্দেশানুসারে দোজখে প্রবেশ করতো, তবে দোজখের আগুন তাদেরকে পোড়াতো না।

ইমাম আহমদ ও ইবনে রহ্ওয়াইহ্ রচিত গ্রন্থে এবং বায়হাকীর 'কিতাবুল ই'তিকাদ' গ্রন্থে হজরত আসওয়াদ বিন সারী থেকে বর্ণিত একটি বিশুদ্ধ-সূত্রসম্বলিত হাদিসে বলা হয়েছে রসুল স. একবার বললেন, মহাবিচারের দিন চারজন পথভ্রষ্ট লোক তাদের পথভ্রষ্টতার পক্ষে দলিল উপস্থাপন করবে। তাদের একজন হবে বধির, একজন বোকা, একজন অতিবৃদ্ধ, আর একজন হবে দুই নবীর মধ্যবর্তী নবীবিহীন সময়ের। বধির বলবে, হে আমার আল্লাহ্! আমাদের সময়ে তোমার এক নবী সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু আমি তা শুনতে পাইনি। কেউ আমাকে জোর করে শোনানোর চেষ্টাও করেনি।

www.eelm.weebly.com

বোকা লোকটি বলবে, আমিতো তখন ছিলাম পাগল। শিশু পশু সকলেই আমার গায়ে নিক্ষেপ করতো তাদের বিষ্ঠা। অতিবৃদ্ধ লোকটি বলবে। সত্য ধর্মের সংবাদ আমি পেয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু আমি তা ঠিক বুঝতে পারিনি। নবীবিহীন সময়ের লোকটি বলবে, আমিতো তোমার কোনো নবীর সাক্ষাতই পাইনি। আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, ঠিক আছে। এখন আমি সরাসরি হুকুম দিচ্ছি— তোমরা দোজখে চলে যাও। তারা দোজখের দিকে যেতে থাকবে। কিন্তু কাছে গিয়ে দোজখ দেখে ভয় পেয়ে ফিরে আসবে। এ পর্যন্ত বলার পর রসুল স. মন্তব্য করলেন, মোহাম্মদের জীবনাধিকারী সেই পবিত্র সত্তার শপথ! তারা যদি হুকুম তামিল করতো, তবে দোজখ হয়ে যেতো তাদের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক। হজরত আবু হোরায়রা থেকেও তিনজন বর্ণনাকারী এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে সংযোজিত হয়েছে এই কথাটুকু— তখন আল্লাহ্র এমতো হুকুম যে পালন করবে, দোযখের আগুন তাকে পোড়াবে না। আর যে হুকুম পালন করবে না তাকে জোর করে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে।

ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, আমাকে মুসলিম বিন ইয়াসার বলেছেন, মহাবিচারের দিনে বিচার শুরু হবে একজন অন্ধ, একজন বধির, একজন বোবার। আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, তোমরা আমার নির্দেশানুসারে আমল করোনি কেনো? তারা বলবে, আমরা তো ছিলাম অঙ্গহীন,পঙ্গু— শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডতুল্য। আল্লাহ্ বলবেন, এখন যদি তোমাদেরকে কোনো নির্দেশ দেই, তবে কি তোমরা তা পালন করবে? তারা বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলবেন, দোজখের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ো। এমতো নির্দেশ শুনে তারা চুপচাপ থাকবে। তখন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে দোজখে।

আমি বলি হানাফিগণের অভিমত এই যে, জ্ঞানবান মানুষের নিকট নবীগণের আহ্বান না পৌঁছলেও জ্ঞান ব্যবহার করে তাকে এক আল্লাহ্র উপর ইমান আনতে হবে। মুক্ত থাকতে হবে শিরিক থেকে। নতুবা তাকে শাস্তি পেতেই হবে। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে অংশীদার স্থাপনকারীদেরকে ক্ষমা করবেন না'। নবী বিহীন সময়ের লোকেরাও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ শিরিক সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ এবং ক্ষমার অযোগ্য। বিচার দিবসে সম্ভবতঃ তারা তাদের অজ্ঞতা ও অসহায়ত্বকে ওজর হিসেবে উত্থাপন করবে। কিন্তু আল্লাহ্ যথাবিধি পরীক্ষা করার পর তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেদিন মুশরিকেরাও তাদের কৃত শিরিককে অস্বীকার করে বসবে এবং তাদের পক্ষে সাক্ষী অনুসন্ধান করতে থাকবে। কিন্তু তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও সাক্ষ্য দিবে তাদের বিরুদ্ধে। এভাবে মহা অপরাধীরূপে প্রমাণিত হয়ে যাবে

www.eelm.weebly.com

তারা। আল্লাহ্ তখন তাদের যেভাবে ইচ্ছা শাস্তি দান করবেন। আর ওই শাস্তিদান হবে সম্পূর্ণতঃই ন্যায়ানুগ। কিন্তু একথাটিও প্রণিধাননীয় যে, মানুষ কখনো তার জ্ঞান ও তার বিবেকের মাধ্যমে শরিয়তের বিধি-বিধান রচনা করতে সক্ষম নয়। ব্যবহারিক বিষয়ের বিধি-বিধান প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানানো হয় কেবল নবী রসুলগণকে। তাই তাদের ধর্ম মত সম্পর্কে জানার সুযোগ না থাকলে শরিয়তের বিধি-বিধান পালন করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় শরিয়ত পালন না করার বিষয়টি ক্ষমার্হ। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ এ রকম নন যে, কোনো সম্প্রদায়কে তিনি পথ-প্রদর্শনের পর পুনরায় পথভ্রষ্ট করবেন। যতক্ষণ না তিনি ওই সকল বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা করেন, যেগুলো থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক।'

হানাফী অভিমতানুসারে তাফসীরে মাদারেক রচয়িতা আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— এখানে বলা হয়েছে পৃথিবীতে শাস্তিদানের কথা। অর্থাৎ 'আমি রসুল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না' বলে বুঝানো হয়েছে — নবী প্রেরণ ছাড়া শিরিকের অপরাধের জন্য পৃথিবীর কোনো সম্প্রদায়কে আমি সমূলে বিনাশ করি না। আমি বলি, 'এখানে শাস্তি দেই না' কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। কথাটিতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের শাস্তির কথা রয়েছে। অর্থাৎ এখানকার 'শাস্তি দেই না' কথাটি একটি সাধারণ ঘোষণা। কোনো বিশেষ কাল বা স্থান এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে না। সুতরাং নবী প্রেরণ ছাড়া দুনিয়াতেই যদি শাস্তি দেয়া না হয়, তবে আখেরাতে আবার শাস্তি দেয়া হবে কীভাবে? আর এখানে বলা হয়েছে কেবল আল্লাহ্পাকের বিধান লংঘন এবং অন্যবিধ পাপাচরণ সম্পর্কীয় শাস্তির কথা। শিরিক সম্পর্কীয় শাস্তির কথা আলোচ্য বাক্যের উদ্দেশ্য নয়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'রসূল' শব্দটিও জ্ঞান ও বিবেকের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সুবিবেচনাও মানুষের জন্য রসুল তুল্য। সুস্থ বিবেকই মানুষকে ভালো ও মন্দের পার্থক্য নির্দেশ করে। তাই বিবেক যাকে সত্য বলে মনে করে, তাকে পরিত্যাগ করা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই বিধানটি শিরিকসহ অন্যান্য সকল পাপকর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

দ্রষ্টব্যঃ আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকদের শিশু সন্তান এবং উন্মাদদের জন্য কোনো শাস্তি নেই। শিরিক অথবা অন্যান্য পাপের কারণে তারা শাস্তিযোগ্য নয়। কারণ তাদের প্রতি কোনো রসুল প্রেরিত হয় না। অর্থাৎ রসুলতুল্য বিবেকবুদ্ধির অধিকারী তারা নয়। তাছাড়া একজনের অপরাধের কারণে অন্যকে দায়ী করা হয় না। শিশুরাও তাই তাদের পিতামাতার অপরাধে

www.eelm.weebly.com

অপরাধী নয়। তাই বলা হয়েছে, 'কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না।' বিভিন্ন হাদিসেও বিষয়টিকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, খানাসা বিন মুয়াবিয়ার চাচা বর্ণনা করেছেন, একবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! জান্নাতী কারা? তিনি স. বললেন, নবী, শহীদ ও সদ্যজাত ওই সকল শিশু যাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ এরা হবেন বিনা হিসাবে জান্নাতবাসী)।

হজরত সামুরা বিন জুনদুব থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসের এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে— স্বপ্নযোগে রসুল স. দেখলেন, একজন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ শিশুদেরকে নিয়ে একটি বৃক্ষের ছায়ায় বসে আছেন। তিনি স. তাঁর সহচর জিবরাইল ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? জিবরাইল বললেন, ইনি হচ্ছেন নবী ইব্রাহীম। আর তাঁর সঙ্গের শিশুরা হচ্ছে মুসলমান ও মুশরিকদের শিশু সন্তান। এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, মুশরিকদের শিশুরাও? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। এই হাদিসের প্রেক্ষিতে কোনো কোনো আলেম তাই বলেছেন, যে সকল মুশরিক-সন্তান শিশুকালে মৃত্যুবরণ করবে, তারা হবে জান্নাতবাসীদের পরিচারক।

হজরত আনাস থেকে আবু দাউদ তায়ালাসী বর্ণনা করেছেন, শিশুকালে মৃত্যুবরণকারী মুশরিক সন্তানদের সম্পর্কে একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, তাদের তো কোনো খারাপ আমল নেই। তাই তারা জাহান্নামে যাবে না। আবার তাদের এমতো পুণ্যকর্মও নেই, যার জন্য তারা লাভ করবে জান্নাতের অধিকার। তাই তারা হবে জান্নাতের খাদেম।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সামুরাহ বলেছেন, আমরা একবার রসুল স. এর নিকটে অংশীবাদীদের শিশু সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি স. বললেন, তারা হবে বেহেশতবাসীদের খাদেম। অপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে।

একটি প্রশ্নঃ বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত কোনো হাদিসে অংশীবাদীদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। অর্থাৎ তিনি দৃঢ়ভাবে এরকম বলেননি যে, তারা বেহেশতী অথবা দোজখী। যেমন, হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স.কে অংশীবাদীদের অকাল প্রয়াত শিশু সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, এ বিষয়ে আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞাত। তিনিই জানেন, তাদেরকে তিনি কী করবেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে।

উত্তরঃ অংশীবাদীদের অকালপ্রয়াত শিশু-সন্তান সম্পর্কে বর্ণিত শিথিল-সূত্রবিশিষ্ট হাদিস দু'টো রহিত (মনসুখ) পদবাচ্য। হাদিস দু'টো রহিত হয়েছে সুরা ফাতাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে। ইতোপূর্বে রসুল স. দৃঢ়তার সঙ্গে কাউকে

www.eelm.weebly.com

বেহেশতী বলে স্বীকার করতেন না। বলতেন, আমি জানি না তোমাদের সঙ্গে সেদিন কীরূপ ব্যবহার করা হবে। আমার প্রতিই বা প্রদর্শন করা হবে কীরূপ আচরণ। তখন হজরত ওসমান বিন মাজউন ইন্তেকাল করলে সাহাবীগণের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে জান্নাতী বলেছিলেন। কিন্তু রসুল স. তাঁদের উক্তিকে তখন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এরপর অবতীর্ণ হলো সুরা ফাতাহ্। রসুল স. হলেন অত্যধিক আনন্দিত। তারপর থেকে তিনি স. নির্দিষ্ট করে অনেককে দিয়েছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ।

মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জননী আয়েশা বলেছেন, জনৈক আনসারী সাহাবীর এক শিশু সন্তানের মৃত্যু হলো। লোকেরা রসুল স.কে তার জানাযা পড়বার জন্য আমন্ত্রণ জানালো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! শিশুটির কতোইনা সৌভাগ্য! সে তো ছিলো বেহেশতের পাখির মতো। পাপ করবার বয়সই সে পায়নি। সুতরাং শুভ পরিণতি ছাড়া তার জন্য অন্য কোনো কিছু হওয়া কি সম্ভব? রসুল স. বললেন, শোনো আয়েশা! যিনি জান্নাত সৃষ্টি করেছেন তিনি জান্নাতের জন্য পিতৃপৃষ্ঠ থেকে কিছু মানুষও সৃষ্টি করেছেন। জাহান্নামও সৃষ্টি করেছেন তিনি। আর ওই জাহান্নামের জন্যও পিতৃপৃষ্ঠ থেকে সৃষ্টি করেছেন অনেককে। এই হাদিসে দেখা যায়, মুসলমানদের অকাল প্রয়াত শিশু সম্পর্কেও সুস্পষ্ট কোনো মন্তব্য করা হয়নি। সুতরাং এ সম্পর্কে নীরব থাকাই সমীচীন। এতদ্সত্ত্বেও সলফে সালেহীন এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, মুসলমানদের অকালমৃত শিশু সন্তানেরা জান্নাতী। এই ঐকমত্যের কথা ফাররা ও অন্যান্যের সূত্রে উল্লেখ করেছেন ইমাম আহমদ, ইবনে আবী যায়েদ, আবু ইয়া'লী প্রমুখ। ইমাম নববী ও ইমাম সুয়ূতির মন্তব্যও এরকম। মোট কথা, এ সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ ছিলো সুরা ফাতাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে, পরে নয়।

ইবনে হাব্বানের 'সহীহ্' নামক গ্রন্থে এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায্যারের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, এই উম্মত যতক্ষণ পর্যন্ত তাকদীরের বিষয়ে বিতর্কের অবতারণা না করবে এবং অকাল মৃত শিশুদের সম্পর্কে মন্তব্য না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মীয় বিষয়ে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে না। ইবনে হাব্বান বলেছেন, অকালমৃত শিশুদের সম্পর্কে হাদিসে উল্লেখিত মন্তব্য না করার নির্দেশটি প্রযোজ্য হবে কেবল অংশীবাদীদের অকালমৃত শিশুদের ক্ষেত্রে। মুসলমানদের শিশুদের ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু এই হাদিসটিও মনসুখ বা রহিত। অর্থাৎ সুরা ফাতাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের। ওই সময় রসুল স.কে অংশীবাদীদের অকালমৃত শিশুদের পরিণতি সম্পর্কে জানানো হয়নি।

অংশীবাদীদের অকাল মৃত শিশু সন্তান দোজখে যাবে?ঃ অংশীবাদীদের অকালমৃত শিশু সন্তান সম্পর্কেও বেশ কয়েকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

www.eelm.weebly.com

হজরত বারা বিন আজীব থেকে আবু ইয়ালী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. সকাশে মুসলমানদের অকালে ঝরে যাওয়া শিশুকুল সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা হলো। তিনি স. বললেন, তারা থাকবে তাদের জনকদের সঙ্গে। পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপন করা হলো মুশরিকদের অকালমৃত শিশুদের সম্পর্কে। তিনি স. বললেন, তারাও থাকবে তাদের জনকদের সঙ্গে।

আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! বিশ্বাসীদের অকাল প্রয়াত শিশুদের কী পরিণতি হবে? তিনি স. বললেন, তারা থাকবে তাদের আপন আপন জনয়িতার সঙ্গে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোনো পুণ্যকর্ম ছাড়াই? (তারা তো সে সুযোগও পায়নি)। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ এ ব্যাপারে সম্যক অবগত যে, বড় হলে তারা কী করতো? আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তা হলে অবিশ্বাসীদের অকালমৃত শিশুদের কী হবে? তিনি স. বললেন, আপন আপন জনয়িতার সঙ্গে থাকবে তারাও। আমি বললাম, কোনো পাপকর্ম ব্যতিরেকেই? (তারা সে বয়সে পৌঁছেইনি)। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ই ভালো জানেন, বড় হলে তারা কী করতো।

শিথিলসূত্রে আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে জননী আয়েশা বলেছেন, একবার অংশীবাদীদের অকালমৃত শিশুদের সম্পর্কে আলোচনা হলো। রসুল স. বললেন, আয়েশা! তুমি যদি চাও, তবে আমি দোজখে তাদের ঠিকানা দেখিয়ে দিতে পারি।

অপ্রসিদ্ধ ও বিপর্যস্ত সূত্রে আবদুল্লাহ্ বিন আহমদের 'ফাওয়াইদুল মসনদ' নামক গ্রন্থে এবং ইবনে আবী হাতেমের 'আস্সুন্নাহ্' পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, জননী খাদিজা একবার তাঁর ইসলামপূর্ব জীবনের অকালপ্রয়াত দু'জন শিশু সন্তান সম্পর্কে রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন। রসুল স. বললেন, তারা দুজনই দোজখী। জননী বিমর্ষ হলেন। রসুল স. তাঁর বিমর্ষ চেহারা দেখে বললেন, যদি তুমি তাদের পরিণতি স্বচক্ষে দর্শন করো, তবে তাদের প্রতি জাগবে তোমার বিবমিষা। জননী বললেন, আর আপনার পরলোকগত শিশুসন্তানেরা? রসুল স. বললেন, তারা জান্নাতী। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন—'যারা ইমান আনে, আর তাদের সন্তান-সন্ততি ইমানে তাদের অনুগামী হয়, আমি তাদের সঙ্গে মিলিত করবো তাদের সন্তান-সন্ততিকে।'

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে উত্তমসূত্রে আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জীবন্ত কবরস্থ শিশুকন্যা ও তাকে কবরস্থকারী উভয়েই জাহান্নামী। ভিন্নসূত্রে আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সালমা বিন কয়েস আশজায়ী বলেছেন, আমি ও আমার ভাই একবার রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললাম, আমাদের জননী মৃত্যুবরণ করেছেন মূর্খতার যুগে। তিনি ছিলেন অতিথি-পরায়ণা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারিণী। কিন্তু তিনি তার এক

www.eelm.weebly.com

অপ্রাপ্ত বয়স্কা বোনকে জীবন্ত কবর দিয়েছিলেন। রসুল স. বললেন, কবরদানকারিণী ও কবরস্থা উভয়েই জাহান্নামী। তবে কবরস্থা শিশুকন্যাটি যদি ইসলামী যুগ পেতো এবং মনে প্রাণে ইসলামকে গ্রহণ করতো, তবে সে হতো জান্নাতী।

উপরে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে বলা যেতে পারে, হাদিসে উল্লেখিত 'আলওয়াইদাহ্' কথাটির অর্থ হবে ধাত্রীমাতা। আর 'মাওউদাহ্' কথাটির অর্থ হবে প্রোথিতা শিশুর জন্মদাত্রী মাতা। এভাবে হাদিসটির প্রকৃত অর্থ হবে— মাটিতে জীবন্ত প্রোথিত শিশুকন্যার ধাত্রীমাতা যদি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলে, আর এভাবে তাকে হত্যা করার ব্যাপারে যদি তার জন্মদাত্রী মাতা সম্মত থাকে, তবে ধাত্রীমাতা ও জন্মদাত্রী মাতা উভয়েই হবে জাহান্নামী। এভাবে হাদিসে উল্লেখিত বিরোধাভাস দূরীভূত করা প্রয়োজন। এবার অবশিষ্ট রইল ওই সকল হাদিস, যেগুলোতে বলা হয়েছে, অংশীবাদীদের অকাল প্রয়াত শিশুসন্তানেরা জাহান্নামী। এই হাদিসগুলো ওই সকল হাদিসের মতো দৃঢ়সূত্রবদ্ধ নয়, যেগুলোতে বলা হয়েছে, অংশীবাদীদের শিশুসন্তানেরাও জান্নাতী। তাছাড়া মুশরিকদের শিশুদের দোজখী হওয়ার হাদিসগুলো কোরআন মজীদের বক্তব্যেরও বিরোধী। সুতরাং সেগুলো গ্রহণীয় নয়। আর এ সকল হাদিস বর্ণিত হয়েছে বিজ্ঞপ্তিরূপে এবং বিজ্ঞপ্তিরূপী বিবরণ নাসেখ বা রহিতকরণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ সেগুলো প্রবহমান বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নয়। সে কারণেই আমি ওই বিবরণগুলোকে রহিত বলি না, বলি শিথিল। অবশ্য এই অর্থে সেগুলোকে রহিত বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে দোজখী বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু রসুল স. এর সুপারিশে তিনি তাদেরকে নিষ্কৃতি দিবেন। হজরত আনাস থেকে ইবনে আবী শায়বা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে এরকমই বলা হয়েছে। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, মানুষের যে সকল শিশুসন্তান খেলাধূলার বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের জন্য আমি আমার প্রভুপালনকর্তার নিকটে প্রার্থনা করেছি। আর আমার প্রার্থনা গৃহীতও হয়েছে। তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, এই হাদিসের 'লাহী' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মানব শিশুকে। তারা তো খেলাধূলা করতেই ভালোবাসে। জ্ঞান, বিবেক ও দায়িত্ব বোধ বলে কিছু থাকে না।

আল্লামা সুয়ুতী লিখেছেন, অংশীবাদীদের অকাল প্রয়াত সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন রকম উক্তি করেছেন। কেউ কেউ তাদেরকে বলেছেন দোজখী। আবার কেউ কেউ বলেছেন বেহেশতী। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ঠিক বেহেশতী নয়— বরং বেহেশতীদের খাদেম। আমি বলি, শেষোক্ত অভিমত দু'টোর মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। কেননা বেহেশতীগণের খাদেম তো অবশ্যই

www.eelm.weebly.com

বেহেশতী। আমার মতে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করাই সমীচীন। এরকম ধারণা রাখাই উত্তম যে, তাদের বেহেশতী অথবা দোজখী হওয়া সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায় নির্ভর একটি বিষয়। এরকম অভিমত পোষণ করেন হাম্মাদ, ইবনে মোবারক, ইবনে রহ্ওয়াইহ্ এবং ইমাম শাফেয়ী। নাসাফী বলেছেন, ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এরকম।

এক বর্ণনায় এসেছে, মহাবিচার দিবসে রসুল স. এর পূর্ববর্তী জামানার মানুষকে যেভাবে পরীক্ষা করা হবে, মুশরিকদের শিশুসন্তানদেরকেও পরীক্ষা করা হবে সেভাবে। হজরত আনাস থেকে আবু ইয়ালী ও বায্যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিচার দিবসে চার প্রকার লোকের বিচার অনুষ্ঠিত হবে একসাথে। ওই চার প্রকার লোক হচ্ছে— ১. অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ২. উন্মাদ ৩. হজরত ঈসার আকাশ আরোহণের পর থেকে রসুল স. এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মানুষ এবং ৪. বয়োবৃদ্ধ। তারা সকলেই তখন তাদের নিজেদের পক্ষে বিভিন্ন অজুহাত দেখাতে থাকবে। আল্লাহ্ তখন দোজখের উপরিভাগের আগুনকে ডেকে আনবেন। তারপর ওই চার প্রকারের লোককে উদ্দেশ্য করে বলবেন, আমি পৃথিবীতে আমার বার্তাবাহকগণের মাধ্যমে আমার নির্দেশ প্রচার করেছিলাম। আর এখন তোমাদের সরাসরি নির্দেশ দিচ্ছি— এই আগুনে প্রবেশ করো। এ আদেশ শুনে দুর্ভাগারা বলবে, এই ভয়াবহ ও বীভৎস নরকাগ্নিতে আমরা কীভাবে প্রবেশ করতে পারি! আমরা তো এই লেলিহান শিখা থেকে পরিত্রাণার্থী। আমরা তো এখান থেকে পলায়ন করতে চাই। আর যারা সৌভাগ্যশালী, তারা কোনো উচ্চবাচ্য না করে আল্লাহ্র আদেশের সম্মান রক্ষার্থে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে আগুনে। আল্লাহ্ অবাধ্যদেরকে বলবেন, পৃথিবীতে প্রেরিত পুরুষগণের মাধ্যমে প্রচারিত আমার নির্দেশের কোনো তোয়াক্কাই তোমরা করোনি। এখনো লংঘন করলে আমার সরাসরি আদেশ। সুতরাং তোমরা চিরঅবাধ্য। তাই তোমাদের জন্য নির্ধারণ করা হলো চিরস্থায়ী অগ্নিবাস। এ কথা বলে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে। আর যারা আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলো, তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হবে বেহেশতে।

বায্যার ও মোহাম্মদ বিন ইয়াহ্ইয়া হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শেষ বিচারের দিন তিন ধরনের লোক বিভিন্ন অজুহাত তুলে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে ।১. হজরত ঈসার ধর্মাদর্শ বিকৃত হওয়ার পর থেকে রসুল স. এর মহা আবির্ভাবের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীরা। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমাদের কাছে তো তোমার কোনো নবী অথবা গ্রন্থ পৌঁছেনি। ২. মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীরা। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালয়িতা ! আমাদেরকে তো তুমি সুস্থ জ্ঞান ও বোধ দান করোনি। তাই আমরা পৃথিবীতে সত্য ও মিথ্যার

www.eelm.weebly.com

প্রভেদ বুঝতে পারিনি। ৩. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণকারী শিশুরা। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমরা তো পৃথিবীতে ভালো-মন্দ বুঝবার বয়সই পাইনি। তাদের এমতো ওজর আপত্তি উত্থাপনের পর সেখানে আনা হবে নরকাগ্নির একাংশকে। আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, এই অগ্নিতে প্রবেশ করো। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র এই আদেশ পালন করবে তারা, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ যাদের সম্পর্কে একথা জানেন যে, ওজর আপত্তিগুলো না থাকলে তারা দুনিয়ায় ইমান আনতো ও নেক আমল করতো। আর আদেশ পালনে বিরত থাকবে তারা, যাদের সম্পর্কে তিনি জানেন যে, ওজর আপত্তিগুলো না থাকলেও তারা কোনো কালেও বিশ্বাস স্থাপন করতো না। পুণ্যকর্মও করতো না।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে তিবরানী ও আবু নাঈম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে হিসাব নিকাশের জন্য একসাথে হাজির করা হবে রসুল ঈসার জামানার পর থেকে আমার জামানার পূর্ব পর্যন্ত কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী, শিশুকালে মৃত্যুবরণকারী ও পাগলদেরকে। তারা তাদের অসুবিধাগুলো তুলে ধরে তখন নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করবে। আল্লাহ্ বলবেন, ঠিক আছে, আগে যা হয়েছে, হয়েছে। এখন আমি যদি তোমাদেরকে কোনো হুকুম করি, তবে কি তোমরা তা তামিল করবে? তারা বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলবেন, যাও। দোজখে প্রবেশ করো। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছে আনা হবে দোজখাগ্নির একাংশকে। সেই ভয়ংকর আগুনের লেলিহান শিখা দেখে তাদের কেউ কেউ সভয়ে পিছিয়ে আসবে। আল্লাহ্ পুনরায় হুকুম করবেন। পুনরায় পশ্চাদপসরণ করবে তারা। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই আমি জানি যে, তোমরা চির অবাধ্য।

উপরে বর্ণিত হাদিসের উপরে ভিত্তি করে কেউ কেউ বলেছেন, এভাবে ইমানের পরীক্ষা নেয়ার পর আল্লাহ্পাক তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু এমতো অভিমত প্রকাশ্য প্রমাণের পরিপন্থী। কেননা জননী আয়েশা, হজরত আলী ও হজরত ওমর থেকে ইমাম আহমদ, আবু দাউদ এবং হাকেম বিশুদ্ধ সূত্রে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিন ধরনের লোকের উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে (শরিয়তের বিধান তাদের উপরে অত্যাবশ্যক নয়)। তারা হচ্ছে— ১. উন্মাদ, যতক্ষণ না তার মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসে। ২. নিদ্রাভিভূত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং ৩. শিশু, যতক্ষণ না সে বয়োপ্রাপ্ত হয়।

অন্যান্য হাদিস থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, পাপের বাসনা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অভিযুক্ত করা হবে না। প্রকৃত অবস্থা যদি এরকমই হয়, তবে যারা পাপ-পুণ্যবোধ বর্জিত, তাদেরকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে কীভাবে? সুরা বাকারার এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ কাউকে সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করেন না।' একারণেই এইমর্মে উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, জ্ঞানবান

www.eelm.weebly.com

ও প্রাপ্তবয়স্কদের উপরেই কেবল প্রযোজ্য হতে পারে আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ ও নিষেধ। সুতরাং বুঝতে হবে, পাগল ও শিশুর শাস্তির কথা এসেছে বর্ণনাকারীর অনবধানতাবশতঃ। আর যদি তাদের উপরে সে দিন দোজখে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়, তবে তারা তা সঙ্গে সঙ্গে পালনও করবে। কারণ তারা বোধ-বুদ্ধি বিবর্জিত। ভয়-ভীতির অনুভূতিশূন্য। কিন্তু হজরত ঈসার জামানার পর থেকে রসুল স. এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিষয়টি স্বতন্ত্র। তারা বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিলো। বিচার দিবসেও তেমনি তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানই করবে। কারণ সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতা তাদের সত্তাসন্নিবিষ্ট। তারা চিরভ্রষ্ট।

আল্লামা সুয়ূতী লিখেছেন, মুশরিকদের শিশু সন্তান সম্পর্কে এরকম বক্তব্যও এসেছে যে, তারা থাকবে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে। অর্থাৎ তারা জান্নাতী অথবা জাহান্নামী কোনোটাই হবে না। কেউ কেউ বলেছেন, তাদেরকে পরিণত করা হবে মৃত্তিকায়। কিন্তু এই অভিমতটি প্রমাণ সিদ্ধ নয়। তবে বিশ্বাসীদের শিশুসন্তানদের জান্নাতী হওয়া সম্পর্কে কোনো মতপৃথকতা নেই।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ১৬, ১৭

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنۢ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا ۝

❑ আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করিতে চাহি তখন উহার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদিগকে সৎকর্ম করিতে আদেশ করি, কিন্তু উহারা সেথায় অসৎকর্ম করে; অতঃপর উহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সংগত হইয়া যায় এবং আমি উহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।

❑ নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি! তোমার প্রতিপালকই তাঁহার দাসদিগের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি যখন কোনো জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকর্ম করতে আদেশ করি।' এখানে 'মুতরাফীন' অর্থ সমৃদ্ধিশালী বা প্রতাপশালী ব্যক্তি। আর এখানকার 'আমারনা' কথাটিকে

www.eelm.weebly.com

মুজাহিদ উচ্চারণ করতেন 'আম্‌মারনা'। তাঁর উচ্চারণানুসারে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়—আমি তাদেরকে বিজয়ী বা সুপ্রতিষ্ঠিত করি, অথবা বানিয়ে দেই তাদেরকে বিচারক বা শাসক। হাসান, কাতাদা ও ক্বারী ইয়াকুব কথাটিকে 'আমারনা'ই পড়েছেন। তাঁদের উচ্চারণানুযায়ী কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— যারা প্রাচুর্য ও আরাম আয়েশের মধ্যে রয়েছে, তাদেরকে আমি আমার নবী-রসুলগণের মাধ্যমে আমার আনুগত্য করার আদেশ দেই। এখানে 'আমারনা' বা আদেশ কথাটির পরে 'বিত্‌ত্বয়াত্‌' বা 'আনুগত্য' কথাটি উহ্য রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা সেখানে অসৎকর্ম করে।' লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি রসুল প্রেরণ না করা পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না।' আর এই আয়াতে বলা হচ্ছে— 'ফাসাক্ব ফীহা' (কিন্তু তারা সেখানে অসৎকর্ম করে)। এখানে 'ফিস্‌ক্বুন' অর্থ অনানুগত্য বা অবাধ্যতা বা অসৎকর্ম। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ওই সকল প্রতাপশালী সমাজপতিরা নিজেরা তো অসৎকর্ম করতোই, উপরন্তু তাদের অনুগামীদেরকেও পরিচালিত করতো পাপাচরণের দিকে। আরববাসীরা বলে 'আমারতুহু ফা জালাসা' (আমি তাকে হুকুম দিয়েছি, সে বসেছে)। এমতোক্ষেত্রে কথাটির শাব্দিক অর্থ ব্যবহার্য নয়। কেননা আল্লাহ্‌ কখনো পাপকর্মের আদেশ দেন না। এক আয়াতে তাই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌ কখনোই অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার আদেশ প্রদান করেন না।' তাই এখানে পরোক্ষভাবে এমতো বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে যে— আমি অসৎকর্মের উপকরণগুলো তাদের সম্মুখে উপস্থিত করি। দান করি সামাজিক প্রতিপত্তি ও আরাম-আয়েশ। তখন তারা গা ভাসিয়ে দেয় বিলাসিতা ও অহমিকায়। এভাবে লিপ্ত হয়ে পড়ে অসৎকর্মে। হয় অবাধ্য।

কোনো কোনো আলেম 'আমারনা' কথাটির অর্থ করেছেন— 'কাছছারনা' অর্থ আমি ওই বস্তুকে বেশী করে দিয়েছি। 'ফাআমুরা' অর্থ, অতঃপর তা বেশী হয়ে গেলো। হাদিস শরীফে এসেছে— 'খইরুল মালি সাক্‌কাতুন্‌ মা'বুরাতুন্‌ ওয়া মুহ্‌রাতুন্‌ মামূরাতুন'। এখানে 'সাক্‌কাতুন্‌' অর্থ খেজুর বৃক্ষের সারি। গাছের সারি। 'মাবুরাতুন' অর্থ সমান, সমতল বা শুদ্ধ। 'মুহ্‌রাতুন্‌' অর্থ অশ্বশাবক। আর 'মামুরাতুন' অর্থ অধিক সন্তান প্রসবিনী। এভাবে হাদিসটির অর্থ দাঁড়ায়—উত্তম সম্পদ হচ্ছে সমমাপের সারিবদ্ধ খেজুর গাছ এবং ওই অশ্বিনী অথবা নারী, যারা অধিক সংখ্যক শাবক অথবা সন্তানের জন্ম দেয়।

সম্রাট হেরাক্লিয়াসের দরবারে আবু সুফিয়ান বলেছিলো, 'লাক্বদ্‌ আমারা আমরাব্‌না আবী কাব্‌ছাতা'। কথাটির অর্থ— আবু কাবছাহ্‌র (আবদুল্লাহ্‌র) পুত্রের (মোহাম্মদের) কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে তার মর্যাদা।

www.eelm.weebly.com

এক লোক একবার রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, 'মালিইয়া আরা আম্‌রাকা ইয়ামুরু' (আমি দেখছি, আপনার প্রভাব-বলয় ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছে)। রসুল স. বললেন, 'ওয়াল্লহি লা ইয়া'মুরান্‌না আ'লা মা তারা' (আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা যা দেখছো, তা আরো অধিক বিস্তৃত হবে)।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, মূর্খতার যুগে আমরা বলতাম, 'ক্বদ্‌ আমারা বানু ফুলানিন্‌ ফুলানুন্‌' (অমুক অমুক গোত্রের জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে)। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'আমারা' (দীর্ঘস্বর আলিফ সহযোগে) ও 'আমারা' শব্দ দু'টো সমঅর্থসম্পন্ন। এ দু'টোর অর্থ— তার বংশ ও পশুপালের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে।

এক পরিভাষা অনুসারে 'উমিরা উমারাতান্‌' অর্থ— অমুক ব্যক্তিকে জননেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সম্ভবতঃ আলোচ্য আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থেই । যদি তাই হয়, তবে এখানে বক্তব্যবিষয়টি হবে এরকম— আমি ওই জনপদের আরামপ্রিয় লোকদেরকে বানিয়েছি সেখানকার জননেতা। এরপর 'মুত্‌রাফীনা' শব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে একারণে যে, জনতার উপর ওই সকল নেতারা অত্যধিক প্রভাবশালী হয়। নির্বুদ্ধিতা ও অসৎকর্মের ব্যাপারেও তারা হয়ে ওঠে অন্যাপেক্ষা অধিক দুর্বিনীত ও দৃঢ়।

এরপর বলা হয়েছে—'অতঃপর তার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সংগত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।' এ কথার অর্থ— পাপে নিমজ্জিত ওই জনপদের অধিবাসীকে আমি তখন ধ্বংস করে দেই। কারণ তারা তখন হয়ে যায় ধ্বংসের উপযোগী।

উম্মত জননী হজরত উম্মে হাবীবা থেকে বোখারী উল্লেখ করেছেন, উম্মত জননী হজরত জয়নব বিনতে জাহাশ বলেছেন, একবার রসুল স. ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় আমার কাছে এসে বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' (আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই)। আরববাসীদের জন্য দুঃসংবাদ। এরপর তিনি স. হাতের বৃদ্ধাংগুলি ও তর্জনী একত্র করে একটি বৃত্ত নির্মাণ করে বললেন, ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায় তাদের প্রাচীরের এতোটুকু অংশ ক্ষয় করতে সমর্থ হয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আরববাসীদের মধ্যে তো অনেক ভালো লোকও রয়েছে। তারাও কি বিনাশপ্রাপ্ত হবে? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। অসদাচরণ ও অপবিত্রতা যদি বৃদ্ধি পায়, তবে তো তারা বিনাশপ্রাপ্ত হবেই।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'নুহের পর আমি কতো মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি!' একথার অর্থ— আমি নবী নুহের তিরোধানের পরের যুগের অনেক অবাধ্য জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। যেমন, আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়।

www.eelm.weebly.com

কথাটির মাধ্যমে মক্কার মুশরিকদেরকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। যেনো বলা হয়েছে— হে মক্কার অংশীবাদী জনতা! অংশীবাদিতাকে পরিহার করে এখনো যদি তোমরা সত্যধর্ম ইসলামকে গ্রহণ না করো, তবে তোমাদেরকেও বিনাশ করা হবে। যেমন বিনাশ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের অংশীবাদীদেরকে।

এখানে 'ক্বরন্' অর্থ যুগ বা যামানা। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, আরববাসীরা বলে, হুয়া আ'লা ক্বারনী (সে আমার সমবয়সী বা একবয়সী)। এভাবে কোনো ক্বরন্ বা যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে— ওই যুগের সকল লোক শেষ হয়ে যাওয়া। একজনও অবশিষ্ট না থাকা। কামুস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার অর্থ— ওই সময়ের সকল মানুষের মৃত্যু হওয়া। একজনও বেঁচে না থাকা।

আমি বলি, 'ক্বরনে সাহাবা' শেষ হওয়ার অর্থ সকল সাহাবীর পরলোকগমন করা এবং 'ক্বরনে তাবেঈন' শেষ হওয়ার অর্থ পৃথিবীতে কোনো তাবেয়ী (যিনি এক বা একাধিক সাহাবীকে দেখেছেন), জীবিত না থাকা। কেউ কেউ বলেন, 'ক্বরনে' অর্থ কোনো যুগ বা কালের একটি নির্দিষ্ট সময়। ওই নির্দিষ্ট সময়ের পরিসর কতখানি সে সম্পর্কে বহু মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন দশ বছর, আবার কেউ কেউ বলেছেন, বিশ/তিরিশ/চল্লিশ/পঞ্চাশ/ষাট/সত্তর/আশি অথবা একশ' বিশ বছর। কামুস রচয়িতা এরকমই লিখেছেন।

মাফকুদুল খবর বা নিরুদ্দেশ ব্যক্তির জন্য অপেক্ষার সময়সীমা সম্পর্কে হানাফীগণ বলেছেন— নব্বই বছর। অর্থাৎ নিরুদ্দেশ ব্যক্তির জন্য এক 'ক্বরনে' বা নব্বই বছর অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, 'ক্বরন' অর্থ এক শতাব্দী। মোহাম্মদ বিন কাসেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন তাসতার মাজানী বলেছেন, রসুল স. আমার মাথায় হাত রেখে বলেছেন, এই ছেলেটি এক ক্বরন জীবিত থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন আমরা তার বয়সের হিসাব রাখছিলাম। শেষে দেখা গেলো, তিনি পরলোকগমন করলেন একশ' বছর বয়সে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকই তাঁর দাসদের পাপাচরণের সংবাদ রাখা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।' একথার অর্থ— মানুষ তার পাপকর্মকে গোপন রাখতে চায়। কিন্তু একথা কেনো বোঝেনা যে, আল্লাহ্তায়ালা সকলের ও সকল কিছুর আদি-অন্ত, প্রকাশ্য-গোপন সবকিছুই জানেন। কারণ তাঁর দর্শন ও পর্যবেক্ষণ সর্বত্রগামী। তিনি যে সর্বজ্ঞ।

www.eelm.weebly.com

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ
ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۝ وَمَنْ
اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ
سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ۝ كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ؕ
وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ۝ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ
عَلٰى بَعْضٍ ؕ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ۝ لَا تَجْعَلْ
مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ۝

❒ কেহ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করিলে আমি যাহাকে যাহা ইচ্ছা সত্বর দিয়া থাকি; পরে উহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেথায় সে প্রবেশ করিবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হইতে দূরীকৃত অবস্থায়।

❒ যাহারা বিশ্বাসী হইয়া পরলোক কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাহাদিগেরই চেষ্টা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

❒ তোমার প্রতিপালক তাঁহার দান দ্বারা ইহাদিগকে ও উহাদিগকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত।

❒ লক্ষ্য কর, আমি কীভাবে উহাদিগের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম, পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর ।

❒ আল্লাহের সহিত অপর কোন ইলাহ্ স্থির করিও না; করিলে, নিন্দিত ও নিঃসহায় হইয়া পড়িবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি।' একথার অর্থ— যারা পৃথিবী-পূজক, তাদের কাংখিত বস্তুসমূহ আমি এই পৃথিবীতেই কিছু কিছু দিয়ে থাকি। তাদের সকল আকাংখা তো আমি পূরণ করতে বাধ্য নই। সুতরাং যাকে যেভাবে যতটুকু দিতে আমি ইচ্ছা করি, সে সেভাবে ততটুকুই পায়। এখানে 'মা নাশাউ' অর্থ— যাকে যা ইচ্ছা। আর 'লিমান্ নুরীদু' অর্থ— আমি যাকে ইচ্ছা করি অর্থাৎ তাই বলে সবারই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা হয় না।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি, যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ থেকে দূরীভূত অবস্থায়।' একথার অর্থ— ওই সকল পৃথিবী-পূজকদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জাহান্নাম। সেখানে তাদেরকে প্রবেশ করাবো লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও রহমত-বঞ্চিত অবস্থায়।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাসী হয়ে পরলোক কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।' একথার অর্থ— যারা এক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী আল্লাহ্র প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসকে হৃদয়ে লালন করে তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ যথাপ্রতিপালনে সতত যত্নবান থাকে, তাদের চেষ্টাই হয় ফলপ্রসূ। আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে তাঁর প্রিয়ভাজন হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তাদের পুণ্য প্রচেষ্টার যথা বিনিময় দান করেন। এখানে 'মাশ্কুরা' বা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শোকর কথাটির অর্থ— তাদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা তাদের সৎকর্মসমূহের যথাবিনিময় বা সওয়াব দান করেন।

এর পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক তার দান দ্বারা এদেরকে ও ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনুন, পৃথিবীতে প্রদত্ত আমার রহমত সার্বজনীন। আমি পার্থিব কল্যাণ দান করি বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলকে। আমার পার্থিব ধনভাণ্ডার সকলের জন্য অবারিত। এখানে 'হাউলায়ি ওয়া হাউলায়ি মিন আত্বায়ি রব্বিক' অর্থ এদেরকে ও ওদেরকে অর্থাৎ সকলকে আল্লাহ্ দান করেন বা সাহায্য করেন। আর এখানে 'কুল্লা' শব্দটির অর্থ সকলকে। শব্দটির 'তান্ভীন' নেয়া হয়েছে সম্বন্ধ পদের পরিবর্তে এবং 'আতা' শব্দটি এখানে ধাতুমূল এবং এর অর্থ— 'আতিয়্যাহ্' (সাহায্য বা দান)।

এর পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'লক্ষ্য করো, আমি কীভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! পর্যবেক্ষণ করুন কীভাবে পৃথিবীতে আমি কখনো বিশ্বাসীদেরকে, আবার কখনো অবিশ্বাসীদের পরস্পরকে পরস্পরের উপরে উপজীবিকা, সৌন্দর্য ও সুস্থতায় প্রভাবশালী করে দেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর।' একথার অর্থ— আরো লক্ষ্য করুন হে আমার প্রিয়তম রসুল! আখেরাতের মর্যাদাই প্রকৃত মর্যাদা। পার্থিব অর্জন তো সাময়িক ও ভঙ্গুর। আর পরকালের প্রাপ্তি চিরস্থায়ী, অক্ষয়। সুতরাং পরকাল নিশ্চয় মর্যাদায় ও মহিমায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর।

এর পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র সঙ্গে অপর কোনো ইলাহ্ স্থির কোরোনা; করলে নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি সকল মানুষকে বলুন, তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে অপর কোনো

www.eelm.weebly.com

উপাস্যকে নির্বাচন কোরো না। যদি করো, তবে তোমরা হয়ে পড়বে লাঞ্ছিত ও সাহায্যহীন। উল্লেখ্য যে, এখানে রসুল স.কে সরাসরি সম্বোধন করে শিরিক না করার যে নির্দেশটি দেয়া হয়েছে, তা প্রযোজ্য হবে সকল মানুষের প্রতি। কারণ রসুল স. এর সঙ্গে শিরিকের সম্পর্ক চিরতিরোহিত। অর্থাৎ তাঁর পক্ষে শিরিক করা সম্ভবই নয়। এখানে 'ফাতাক্বউদা' একটি বাগধারা। এর অর্থ— করলে বা হয়ে গেলে। যেমন আরববাসীরা বলে 'শাহাজাশ্ শাফরাতা হাত্তা ক্বায়াদাতা কাআন্নাহা হারবাতুন' (সে তার অস্ত্রকে শানিত করেছে, ফলে তা হয়ে গিয়েছে ক্ষুদ্র বল্লমের মতো)। অথবা 'ফাতাক্বউদা' অর্থ এখানে অক্ষম বা নিরুপায় হয়ে যাওয়া। যেমন বলা হয় 'ক্বাআদা আনিশ্ শাই' (সে ওই বিষয়ে অক্ষম)।

'মাজমুমান' অর্থ ফেরেশতা ও মুমিনগণ কর্তৃক নিন্দিত। আর 'মাখজুলান' অর্থ সহায়হীন বা নিঃসহায়।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ২৩, ২৪, ২৫

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا
يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ
وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۝ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ
الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۝ رَبُّكُمْ
اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ۭ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ
غَفُوْرًا ۝

❑ তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। উহাদিগের এক জন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় থাকাকালে বার্ধক্যে উপনীত হইলেও উহাদিগকে বিরক্তিসূচক কিছু বলিও না এবং উহাদিগকে ভর্ৎসনাও করিও না; উহাদিগের সহিত বলিও সম্মানসূচক নম্র কথা ।

❑ অনুকম্পায় উহাদিগের প্রতি বিনয়াবনত থাকিও এবং বলিও, 'হে আমার প্রতিপালক' উহাদিগের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে উহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।'

www.eelm.weebly.com

❒ তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের অন্তরে যাহা আছে তাহা ভাল জানেন; তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হইলে যাহারা সতত আল্লাহ্ অভিমুখী আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি ক্ষমাশীল।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে।' শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে 'ক্বদ্বা'। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য বিষয়টি একটি অকাট্য বিধান— যা অবশ্যপালনীয়। এখানে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদত নিষিদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে পিতামাতার প্রতি উত্তম আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা, হাসান ও রবী বিন আনাস সে কারণেই এই নির্দেশটিকে বলেছেন কেত্য়ী (অকাট্য)। প্রত্যেক পিতা-মাতার মাধ্যমেই বাস্তব জগতে মানব-অস্তিত্ব পায়, আবার বেড়েও ওঠে তাঁদেরই প্রত্যক্ষ স্নেহসিক্ত লালন-পালনের মাধ্যমে। তাই তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রদর্শনকে করা হয়েছে অত্যাবশ্যক।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় থাকাকালে বার্ধক্যে উপনীত হলেও তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বোলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনাও কোরো না; তাদের সঙ্গে বোলো সম্মানসূচক নম্র কথা।' এখানে 'ইন্দাকা' অর্থ তোমাদের জীবদ্দশায় থাকাকালে, বা তোমাদের প্রতিপালনের দায়িত্বে বা রক্ষণাবেক্ষণে থাকাকালে। 'উফ' অর্থ অশোভন, শ্রুতিকটু বা বিরক্তিসূচক শব্দ । অথবা 'উফ' শব্দটি এখানে ক্রিয়াপদ। অর্থাৎ সংকীর্ণমনা হয়ে যাওয়া। আবু উবায়দা বলেছেন, 'উফ' এবং 'তুফ' এর আভিধানিক অর্থ— ওই ময়লা বা আবিলতা যা জমে থাকে আঙ্গুলের অগ্রভাগে। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'উফ' অর্থ নখ কেটে ফেলা। অর্থাৎ যে আঙ্গুলে ময়লা লেগেছে, সেই আঙ্গুলটি কর্তন করা। অথবা নখ বা আঙ্গুলের ময়লা। কিংবা ওই কাষ্ঠখণ্ড বা বংশদণ্ড, যা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে মাটি থেকে। 'কম' বা 'ন্যূন' অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ অবজ্ঞা, অবহেলা বা উপেক্ষাসূচক এতোটুকু কথাও তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি প্রয়োগ কোরো না, যা তাদের মনোক্ষুণ্ণতার কারণ হয়। এভাবে পিতা-মাতার প্রতি ন্যূনতম অসদাচরণকে হারাম করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তাদের প্রতি অধিক অসদাচরণ যে হারাম, তা বলাই বাহুল্য।

'লা তানহারহুমা' অর্থ তাদেরকে ভর্ৎসনাও কোরো না। আর 'ক্বওলান কারীমা' অর্থ সম্মানসূচক নম্র কথা বা ভক্তিমূলক বিনম্র আচরণ। ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, অপরাধী বালক যেমন রূঢ়স্বভাব বিশিষ্ট অভিভাবকের সামনে অবনত

www.eelm.weebly.com

মস্তকে কথা বলে, পিতামাতার সঙ্গে কথা বলতে হবে সেভাবে। মুজাহিদ বলেছেন, বার্ধক্যগ্রস্ত পিতা-মাতাকে ঘৃণা কোরো না। তোমাদের শিশুকালে তাঁরা যেমন তোমাদের মলমূত্র পরিষ্কার করে দেন, তেমনি করে প্রয়োজন হলে তোমরাও তাঁদের মলমূত্র পরিষ্কার করে দিয়ো এবং একাজে কোনো অনাগ্রহ ও ঘৃণা প্রকাশ কোরো না। আর তাদেরকে লক্ষ্য করে 'উহ্' 'আহ্'— এ ধরনের কোনো বিরক্তি উদ্রেককারী কথাও বোলো না।

পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো।' এখানকার 'ওয়াখ্ফিদ্ব্ জানাহাকা' হচ্ছে একটি আরবী বাগধারা। এর শাব্দিক অর্থ— তোমার ডানা অবনত করো। আর এখানে এর মর্মার্থ— বিনয়াবনত থেকো। হজরত ওরওয়াহ্ বিন যোবায়ের আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন এরকম— তাদের প্রতি বিনম্র হও এবং যত্নবান হও তাদের অভিপ্রায় পূরণে।

'মির্‌রহ্‌মাতি' অর্থ অনুকম্পায় বা অনুরাগবশতঃ। অর্থাৎ যে গভীর স্নেহমমতায় তারা তোমাদেরকে প্রতিপালন করেছেন, সেই স্নেহমমতার কথা মনে করে তোমরা তাদের প্রতি বিনম্র হয়ো। স্মরণ কোরো আজ যেমন তারা তোমাদের মুখাপেক্ষী, এরচেয়েও বেশী তাদের মুখাপেক্ষী ছিলে তোমরা শিশুকালে। এ কথা ভেবে তোমরা তাদের প্রতি প্রদর্শন কোরো শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বোলো, হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া করো, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।' এ কথার অর্থ— তোমরা তাঁদের জন্য দোয়া কোরো এভাবে, হে আমাদের প্রভুপালয়িতা! আমার বাল্যবেলায় আমার পিতামাতা যেভাবে আদরযত্নে আমাকে মানুষ করেছেন, তেমনি তুমি তাদের প্রতি তোমার বিশেষ রহমত বর্ষণ করো। পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে। বাগবী লিখেছেন, পিতামাতা যদি মুসলমান হন, তবেই কেবল তাঁদের জন্য এরকম দোয়া করা যাবে। মুসলমান না হলে তাদের জন্য এরকম দোয়া করা যাবে না। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'নবী ও বিশ্বাসীদের জন্য এটা অসমীচীন যে, তারা অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।' হজরত ইবনে আব্বাস অবশ্য বলেছেন, এই আয়াত দ্বারা আলোচ্য আয়াতটি রহিত হয়েছে।

বায়যাবী লিখেছেন, 'আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক'— এরকম দোয়া সকলের জন্য করা যায়। অতএব মুমিন ও কাফের উভয় প্রকার পিতামাতার জন্য দোয়া করা যাবে। অর্থাৎ এরকম বলা যাবে— হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার পিতামাতাকে ইসলাম গ্রহণ করার তৌফিক দান করো। আর নিঃসন্দেহে ইসলাম গ্রহণের তৌফিক বা যোগ্যতা আল্লাহ্‌র রহমত।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পিতা হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশের দরজা। এখন তোমরা ভেবে দেখো, জান্নাতের দরজা রক্ষা করবে, না নষ্ট করে ফেলবে। যথাসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা ও হাকেম। হাকেম হাদিসকে আরো বিশুদ্ধ আখ্যায়িত করেছেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পিতার প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতার উপরে আল্লাহ্র প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতা নির্ভরশীল। তিরমিজি, হাকেম।

হজরত ইবনে ওমর ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বায়যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দানের পর গ্রহিতাকে খোঁটাদানকারী, মদ্যপায়ী ও পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান কখনো বেহেশতে প্রবেশ করবে না। নাসাঈ ও দারেমী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তির নাসিকা ধূলিধূসরিত হোক, আমার নাম শুনেও যে দরুদ পাঠ করে না। আর ওই ব্যক্তির নাকও মৃত্তিকামর্থিত হোক, যে রমজান মাস পেয়েও নিজেকে পাপমুক্ত করতে পারলো না এবং ওই ব্যক্তির নাসারন্ধ্রও ধূলিমলিন হোক, যে তার পিতা-মাতার একজনকে অথবা উভয়কে পেয়েও তাদের সেবা-যত্ন করে বেহেশতে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করতে পারলো না। অন্য বর্ণনায় কথাটি এসেছে এভাবে— যার বৃদ্ধ পিতা-মাতা তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারলো না। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বাগবী, তিরমিজি ও হাকেম হাকেম হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার এক ব্যক্তি রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! জনক-জননীর প্রতি সন্তানের করনীয় কী? রসুল স. বললেন, তারাই তোমার বেহেশত এবং তারাই তোমার দোজখ। ইবনে মাজা। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধানানুসারে তার জনয়িতা-জনয়িত্রীর প্রতি প্রত্যুষে আনুগত্য প্রকাশ করে, তার জন্য বেহেশতের দু'টি দরজা খুলে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি তার জনয়িতা-জনয়িত্রী যে কোনো একজনের সঙ্গে এরকম করে, তার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় বেহেশতের একটি দরজা। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ সম্পর্কিত আল্লাহ্র বিধান লংঘন করে, তাদের দু'জনের সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করে, তার জন্য খুলে দেয়া হয় দোজখের দু'টি দরজা। আর তাদের যে কোনো একজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে দোজখের দরজা খুলে দেয়া হয় একটি। জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! যদি তার পিতা-মাতা তার হক নষ্ট করে? রসুল স. বললেন, হক নষ্ট করলেও। তার প্রতি জুলুম করলেও। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. বললেন, পিতা-মাতার বাধ্যগত সন্তান যদি তার পিতা-

www.eelm.weebly.com

মাতার মুখমণ্ডলের প্রতি মহব্বতের নজরে তাকায়, তবে তাকে দেয়া হয় একটি কবুল হওয়া হজের সওয়াব। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! যদি সে এভাবে প্রতিদিন একশত বার তাকায়? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। তবে আল্লাহ্পাক তার চেয়েও মহান ও পবিত্র। হজরত আবু বকর সিদ্দীক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার যে কোনো গোনাহ্ ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্য যারা, তাদেরকে তিনি মাফ করবেন না। এই অবাধ্যতার শাস্তি তাদেরকে দুনিয়াতেও দেয়া হবে। বায়হাকীও এই তিনটি হাদিস উল্লেখ করেছেন তাঁর শো'বুল ইমান নামক গ্রন্থে। আর এই ত্রয়ি হাদিসের প্রথমটি ইবনে আসাকেরের মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে।

শিথিলসূত্রে হজরত আবু বকরাহ্ থেকে তিবরানী ও হাকেম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষের যে কোনো পাপ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তার শাস্তি অথবা মার্জনা প্রলম্বিত করতে পারেন মহাবিচারের দিবস পর্যন্ত। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানদেরকে তিনি ক্ষমা করবেন না। পিতা-মাতার প্রতি দুর্ব্যবহারের শাস্তি পৃথিবী থেকেই দেয়া শুরু হয়। মৃত্যুর পূর্বেই।

এর পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা ভালো জানেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, তোমরা তোমাদের জনক-জননী সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করো তা-ও আল্লাহ্ জানেন। একথার মাধ্যমে মানুষকে এই মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যেনো তাদের পিতা-মাতাদের সম্পর্কে অন্তরে অন্তরেও উপেক্ষা অথবা অবহেলার ভাব লালন না করে। কথাটির অর্থ এরকম যে, হে মানুষ! সাবধান! তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি আচরণজনিত অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আল্লাহ্তায়ালা সম্যক অবগত। অতএব কেউ যদি আল্লাহ্পাকের পরিতোষ ও পুণ্যলাভের আশায় তার পিতা-মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করে, তবে আল্লাহ্পাক তার যথাবিনিময় দান করবেন। আর যদি পার্থিব লাভা-লাভের আশায়, অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কেউ তার পিতা-মাতার সঙ্গে বাহ্যিকভাবে শুভ আচরণ প্রদর্শন করে, তবে সে প্রতিফল পাবে তার নিয়ত অনুসারে।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হলে যারা সতত আল্লাহ্ অভিমুখী, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল।' একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমরা যদি সৎকর্মপরায়ণ হও এবং তোমাদের উদ্দেশ্য হয় সতত আল্লাহ্র পরিতোষাভিমুখী, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে মার্জনা করবেন। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, যারা শুভ উদ্দেশ্য বিশিষ্ট হৃদয়ের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অনবধানতাবশতঃ অকস্মাৎ যদি তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে কচিৎ কখনো শিষ্টাচার বিরোধী আচরণ করে ফেলে, তবে আল্লাহ্ তাদেরকে অভিযুক্ত করবেন

www.eelm.weebly.com

না। এরকমও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনাটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। আর এর মর্মার্থ হচ্ছে— কেউ যদি তার পিতা-মাতার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করার পর লজ্জা ও অনুতাপ সহকারে তওবা করে, তবে আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন। তাকে ক্ষমা করে দেন।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, এখানে 'আওয়াব' বলে বুঝানো হয়েছে ওই ব্যক্তিকে, যে পাপ করার পর যথাবিধি তওবা করে। এভাবে পুনঃপুনঃ পাপ করলেও প্রতিবারই সে আন্তরিকভাবে তওবা করে। তিনি আরো বলেছেন, কল্যাণের দিকে পুনঃপুনঃ ধাবিত ব্যক্তিকেই বলে 'আওয়াব'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আওয়াব' ওই ব্যক্তি, যে প্রতিটি বিপদ ও বিবর্তনের সময় আল্লাহ্ অভিমুখী হয়। তিনি আরো বলেছেন, 'আওয়াবিন' অর্থ আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনাকারী। কেননা আল্লাহ্পাক এক স্থানে পাহাড়কে লক্ষ্য করে বলেছেন— 'ইয়া জিবালু আওবিবী'(হে পর্বত! আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করো)। কাতাদা বলেছেন, 'আওয়াব' অর্থ নামাজী।

আউফ উকাইলী বলেছেন, 'আওয়াব' বলে চাশ্ত নামাজ পাঠকারীকে। হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বাগবী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. একবার কোবা মসজিদে চাশ্তের নামাজ পড়লেন। তারপর বেরিয়ে এসে বললেন, এটা হচ্ছে আওয়াবীনের নামাজ। আহমদ ও মুসলিম। আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন— আবদ ইবনে হুমাইদ এবং সিব্ওয়াইহ্। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে নামাজ পাঠ করে, তাকে রহমতের ফেরেশতারা পরিবেষ্টন করে রাখে। এই নামাজের নামই আওয়াবীন নামাজ।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ২৬, ২৭

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ○ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ○

❒ আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তাহার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও, এবং কিছুতেই অপব্যয় করিও না।

❒ যাহারা অপব্যয় করে তাহারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তাহার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য।' একথার অর্থ— আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, তাদের সঙ্গে করবে আপনজনোচিত ব্যবহার। অধিকাংশ তাফসীরকার এরকমই বলেছেন।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, উপার্জনে অক্ষম পুরুষ, বিধবা, এতিম, অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও অসহায় আত্মীয়-স্বজনের ভরণ পোষণ করা ধনী ব্যক্তির একটি অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। সূরা বাকারার 'ওয়া আ'লাল ওয়ারিছি মিছলু জালিকা' আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

বাগবী লিখেছেন, ইমাম জয়নুল আবেদীন বলেছেন, এখানে 'কুরবা' বা আত্মীয়-স্বজন বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর আত্মীয়-স্বজনকে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— তোমরা তোমাদের রসুলের আত্মীয়-স্বজনের যথাপ্রাপ্য পরিশোধ করো। অর্থাৎ তাদের প্রতি অন্তরে ও আচরণে লালন করো শ্রদ্ধা ও প্রদর্শন করো ভক্তি ও ভালোবাসা। ইবনে আবী হাতেম এবং সুদ্দীও এরকম বলেছেন।

তিবরানী প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, 'আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য' এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. তাঁর প্রিয় পুত্রী হজরত ফাতেমাকে ডেকে এনে দান করলেন খায়বরের একখণ্ড ভূমি (ফিদাক)। ইবনে মারদুবিয়াও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাছীর লিখেছেন, বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলে মেনে নেয়া কঠিন। কারণ বর্ণনাটি সঠিক হলে বলতে হয় আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। খায়বর বিজিত হয়েছিলো হিজরতের অনেক পরে। কিন্তু প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, এই আয়াতটির অবতরণস্থল মক্কা। আমি বলি, প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা এই যে, ফিদাক চেয়েছিলেন হজরত ফাতেমা স্বয়ং। কিন্তু রসুল স. তাঁর প্রিয় আত্মজার ওই আবেদন মনজুর করেননি। ওমর ইবনে আবদুল আজিজও এরকম বলেছেন, যদি রসুল স. তাঁর প্রিয় কন্যা হজরত ফাতেমাকে দান করতেন, তবে খোলাফায়ে রাশেদীন, বিশেষ করে হজরত আলী এ ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করতেন না। আল্লাহ্পাকই সমধিক পরিজ্ঞাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও।' সুরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং কিছুতেই অপব্যয় কোরো না।' একথার অর্থ— কিছুতেই তোমাদের অর্থ-সম্পদ পাপ পথে ব্যয় কোরো না। মুজাহিদ বলেছেন, যদি কেউ তার সহায়-সম্পত্তি পুণ্যপথে খরচ করে ফেলে, তবে তাকে অপচয় বলা যায় না। কিন্তু পাপপথে এক কপর্দক ব্যয় করলেও তা হবে অপচয় বা অপব্যয়। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, অসৎপথে অর্থ ব্যয়ের নামই অপচয়।

www.eelm.weebly.com

শো'বা বর্ণনা করেছেন, আমি একবার আবু ইসহাকের সঙ্গে কুফার এক রাস্তা অতিক্রম করছিলাম। একস্থানে দেখলাম চুন ও পাকা ইট নির্মিত একটি অতি মজবুত প্রাচীর। আবু ইসহাক পাকা প্রাচীরটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের অভিমতানুসারে এটা অপচয়। অনাবশ্যক অর্থ ব্যয়ই অপচয়।

পরের আয়াতে (২৭)বলা হয়েছে— 'যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই।' একথার অর্থ অপচয়কারীরা অযথার্থ কর্মের দিক দিয়ে শয়তানের মতোই। বাগবী লিখেছেন, যে ব্যক্তি ভিন্ন গোত্রের রীতিনীতি অনুসরণ করে সে ওই গোত্রভূতদের ভ্রাতৃতুল্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।' একথার অর্থ— শয়তান সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, আল্লাহ্র নেয়ামতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী। তাই তার আনুগত্য নিষিদ্ধ।

তাত্ত্বিকগণ বলেছেন, প্রাপ্ত নেয়ামত দাতার সন্তোষের অনুকূলে ব্যয় করাই কৃতজ্ঞতা। আর দাতার সন্তোষের বিপরীতে খরচ করার নাম অকৃতজ্ঞতা। এরকম খরচকারীরা অপব্যয়ী। আর অপব্যয়ীরা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ।

সাঈদ ইবনে মানসূরের বর্ণনায় এসেছে, আতা খোরাসানী বলেছেন, একবার এক জেহাদের প্রাক্কালে মুযাইনা গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধগমনের জন্য বাহন প্রার্থনা করলেন। রসুল স. বললেন, সেরকম কিছুতো এখন আমার কাছে নেই। লোকগুলো বিফলমনোরথ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলো। তাদের ধারণা হলো নিশ্চয় রসুল স. আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন। তাই তিনি আমাদেরকে বাহন দান করলেন না। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ২৮

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا

□ এবং তুমি নিজেই যখন তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সম্পদ লাভের প্রত্যাশায় উহার সন্ধানে থাক তখন উহাদিগকে যদি বিমুখই কর উহাদিগের সহিত নম্রভাবে কথা বলিও;

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আমার কাছে সম্পদ প্রাপ্তির প্রত্যাশা নিয়ে সময়াতিপাত করার সময় যদি কেউ আপনার নিকটে প্রার্থী হয়, তবে নম্রভাবে তাদের প্রার্থনাকে প্রত্যাখ্যান করবেন। তাহলে তারা মনোকষ্টে পতিত হবে না। এখানকার 'মাইসূরা' কথাটি এসেছে 'ইয়াসারাল আমরু' থেকে।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, এখানে 'নম্রভাবে কথা বোলো' অর্থ, হে আমার রসুল! বিনম্র বচনে তাদের সঙ্গে এই মর্মে অঙ্গীকার করুন যে, আল্লাহ্ যখন সঙ্গতি দান করবেন, তখন অবশ্যই আমি তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করবো। কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্পাক যেনো উদ্ভূত সমস্যার সহজ সমাধান দেন, এইমর্মে দোয়া করাই আলোচ্য নির্দেশনাটির লক্ষ্য। যেনো এখানে বলা হয়েছে, হে আমার রসুল! আপনি প্রার্থনা উপস্থাপন করুন এভাবে— আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের অভাব মোচন করুন। দয়া করে আমাদেরকে দান করুন প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ।

সাঈদ ইবনে মানসূরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাইয়্যার বিন আবীল হাকাম বলেছেন, একবার রসুল স. এর পবিত্র অঙ্গনে উপস্থিত হলো এক কাপড় বিক্রেতা। রসুল স. ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানবীর। তিনি কাপড়গুলো কিনে নিয়ে উপস্থিত লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। পরে যারা এলো, তারা আর কিছুই পেলো না। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ২৯, ৩০

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

❒ তুমি বদ্ধমুষ্টি হইও না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হইও না; হইলে, তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হইবে।

❒ তোমার প্রতিপালক যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা হ্রাস করেন; তিনি তাহার দাসদিগকে ভালভাবে জানেন ও দেখেন।

এখানকার 'ইয়াদাকা মাগলূলাতান ইলা উনুকিকা' কথাটি একটি আরবী বাগধারা। কথাটির শাব্দিক অর্থ— গ্রীবাদেশে হস্ত-আবদ্ধ করে রেখো না। আর প্রকৃত অর্থ— বদ্ধমুষ্টি বা কৃপণ হয়ো না। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি কৃপণ ও অমিতব্যয়ী কোনোটাই হবেন না। চলবেন এতোদুভয়ের মাঝামাঝি। এরকম সুসমঞ্জস অবস্থাই আপনার জন্য প্রশংসনীয় ও একান্ত শোভন। কার্পণ্য ও অমিতাচার মানুষকে যেমন নিন্দিত করে, তেমনি করে দেয় নিঃস্ব।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে মাসউদ এর উদ্ধৃতিতে ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবুদল্লাহ্ বলেছেন, একবার এক যুবক রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রসুল! আমার মা আপনার নিকটে খাদ্য, বস্ত্র ও কিছু নগদ অর্থ চেয়েছেন। রসুল স. বললেন, এখন যে আমার কাছে কিছুই নেই। যুবক বললো, আমার আম্মা বলে দিয়েছেন, কিছু না থাকলে আপনি যেনো আপনার গায়ের জামাটি দান করেন। রসুল স. তৎক্ষণাৎ তাঁর গায়ের জামাটি খুলে তাকে দিয়ে দিলেন। তারপর গৃহাঙ্গণে প্রবেশ করলেন অনাবৃত শরীরে। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। মিনহাল বিন আমর সূত্রে ইবনে আবী হাতেমও এরকম বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত আবু উমামা বলেছেন, রসুল স. তাঁর প্রিয়তমা ভার্যা হজরত আয়েশাকে একবার বললেন, হে আয়েশা! যা কিছু পাও, সঙ্গে সঙ্গে খরচ করে ফেলো। উম্মত-জননী আয়েশা বললেন, তাহলে তো একেবারে নিঃস্ব হয়ে যেতে হবে। তাঁদের এমতো কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

হজরত জাবের থেকে বাগবী লিখেছেন, একবার এক কিশোর রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার জননী আপনার কাছে একটি পরিধেয় বস্ত্র চেয়েছেন। রসুল স. বললেন, মনে হয় শীঘ্রই আমার কাছে কিছু কাপড় আসবে। সুতরাং তুমি পরে এসো। কিশোরটি চলে গেলো। একটু পরেই পুনরায় হাজির হয়ে বললো, আমার মা আপনার গায়ের জামাটিই দিতে বলেছেন। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে গায়ের জামাটি খুলে কিশোরটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে পরিধেয়হীন হওয়ার কারণে তিনি ঘরের মধ্যে আটকে রইলেন। নামাজের সময় হলো। হজরত বেলাল এসে আজান দিলেন। নামাজের জন্য মসজিদে সমবেত হলেন সাহাবীগণ। রসুল স. এর আগমন বিলম্বিত হচ্ছে দেখে কেউ কেউ অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলেন রসুল স. এর প্রকোষ্ঠে। দেখলেন, তিনি খালি গায়ে বসে আছেন। এই ঘটনাকে লক্ষ্য করে তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের অন্তর্নিহিত বক্তব্য এরকম, হে আমার রসুল! পুণ্যকর্মে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে আপনি ওই লোকের মতো হবেন না, যার হাত বাঁধা রয়েছে তার গ্রীবাদেশের সঙ্গে। অর্থাৎ যে ব্যয়কুণ্ঠ বা কৃপণ। আবার ওই ব্যক্তির মতোও হবেন না, যে সম্পূর্ণরূপে মুক্তহস্ত বা অপচয়কারী। অর্থাৎ যে অপচয় করার কারণে নিজের পরিবারবর্গের ও আত্মীয়-স্বজনের হক পরিপূরণ করতে ব্যর্থ হয়।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'বদ্ধমুষ্টি হয়ো না' বলে কার্পণ্যকে এবং 'একবারে মুক্তহস্ত হয়ো না ' বলে অতিরিক্ত ও অযথার্থ ব্যয়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এভাবে অবলম্বন করতে বলা হয়েছে মধ্যম পন্থাকে। অর্থাৎ দানশীলতাকে।

www.eelm.weebly.com

'ফা তাকুউদা মালুমা' অর্থ নিন্দিত হবে। অর্থাৎ যদি কার্পণ্য করো, তবে হবে দুর্নামের ভাগীদার। নিন্দনীয় হবে আল্লাহর সকাশে ও মানুষের নিকটে। আর 'মাহ্সূরা' অর্থ নিঃস্ব হবে। অর্থাৎ অপব্যয় বা অতিরিক্ত ব্যয় যদি করো তবে হয়ে পড়বে কপর্দকহীন। কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— কৃপণতা ও অমিতাচার দু'টোই পরিত্যাজ্য। লজ্জা ও অনুতাপই হচ্ছে এ দু'টোর পরিণতি। তাঁর অভিমতানুসারে লজ্জা ও অনুতাপের ব্যাপারটি সম্পৃক্ত হবে কৃপণতা ও অমিতাচার দু'টোর সঙ্গেই।

এ রকমও হতে পারে যে, এখানে 'মালূমান্' (নিন্দা) কথাটি সম্পৃক্ত হবে কৃপণতা ও সংকীর্ণচিত্ততার সঙ্গে। আর 'মাহ্সূরা' (নিঃস্বতা) কথাটি সম্পৃক্ত হবে অযথার্থ ব্যয় বা অপচয়ের সঙ্গে। এভাবে বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়াবে— সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রার্থীকে কিছু না দান করলে সে শুরু করবে নিন্দা। আর অপরিকল্পিত উপায়ে সবকিছু দান করে দিলে হতে হবে নিঃস্ব। আক্ষেপ ও লজ্জা ছাড়া তখন আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না।

পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার প্রভুপালক তাঁর ইচ্ছামতো মানুষসহ সকলপ্রাণীকে রিজিক দান করেন। আর ইচ্ছামতো তিনি কারো রিজিক বাড়িয়ে দেন। আবার কারো রিজিক দেন কমিয়ে। সুতরাং অর্থ ব্যয়কে সুসমঞ্জস করার নিমিত্তে কিছু সম্পদ হাতে রাখা হলে তা নিন্দার্হ নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি তাঁর দাসদেরকে ভালোভাবে জানেন ও দেখেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বান্দাগণের সকল অবস্থা উত্তমরূপে জানেন ও প্রত্যক্ষ করেন। তাই মানুষের যেভাবে কল্যাণ হয়, সেভাবেই তিনি বণ্টন করেন তাদের জীবনোপকরণ। আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এ রকমও হতে পারে— জীবিকার সংকোচন ও প্রসরণ ঘটে থাকে আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায় ও নির্দেশানুসারে। তিনি মানুষের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাই যথাসময়ে ও যথাবিধি তিনি পূরণ করেন সকলের জীবিকার প্রয়োজন। কিন্তু অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মানুষকে অবলম্বন করতে হবে মধ্যম পন্থা। এটা তাদের দায়িত্ব। অথবা আলোচ্য আয়াতের অর্থ এরকমও হতে পারে যে— হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্র বিধানানুসারে চলো। তিনি মানুষের জীবনোপকরণকে কখনো প্রসারিত করেন, আবার কখনো করেন সংকুচিত। সুতরাং তোমরাও অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে কৃপণ ও অপব্যয়ী কোনোটিই হয়ো না। অবস্থান গ্রহণ করো এতোদুভয়ের মধ্যবর্তীতে।

www.eelm.weebly.com

এরকমও হওয়া সম্ভব যে, আলোচ্য আয়াত পরবর্তী আয়াতের ভূমিকা বা মুখবন্ধস্বরপ। কারণ পরবর্তী আয়াতে দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দ্ব্যর্থহীনভাবে একথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্তায়ালাই সকলের রিজিক দিয়ে থাকেন। সুতরাং রিজিকের স্বল্পতার আশংকায় সন্তান হত্যা মহাপাপ।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩

وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ۝

❐ তোমাদিগের সন্তানদিগকে দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করিও না। উহাদিগকে ও তোমাদিগকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়া থাকি। উহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।

❐ অবৈধ যৌন-সংযোগের নিকটবর্তী হইও না, ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

❐ আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করিও না! কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হইলে তাহার উত্তারাধিকারীকে তো আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়াছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্য-প্রাপ্ত হইয়াছেই।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! সন্তান প্রতিপালন করতে গিয়ে তোমরা দরিদ্র হয়ে যাবে, এই আশংকায় তোমরা তোমাদের কন্যা-সন্তানদেরকে বধ কোরো না। কারণ তাদের জীবনোপকরণ প্রদানের অধিকার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব তোমাদের নয়, আমার। আমিই তাদেরকে ও তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করে থাকি। সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করে মহাপাপী হয়ো না।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সবচেয়ে বড় পাপ কী ? তিনি স. বললেন, কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করা, অথচ আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমি

www.eelm.weebly.com

জিজ্ঞেস করলাম তারপর? তিনি স. বললেন, দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করা। আমি পুনরায় বললাম তারপর? তিনি স. বললেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা। বোখারী , মুসলিম।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না, উহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।' আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে অবৈধ যৌন চরিতার্থতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, অবৈধ যৌনাচরণ একটি ঘৃণ্য, অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। এতে করে নৈতিক ও সমাজ জীবনে সৃষ্টি হয় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা।

হজরত বুরাইদা থেকে বায্যার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী বৃদ্ধ ব্যভিচারীকে অভিসম্পাত দেয়। আর দোজখে ব্যভিচারীর লজ্জাস্থান থেকে যে দুর্গন্ধ বের হবে, ওই দুর্গন্ধে অন্যান্য দোজখবাসীও কষ্ট পাবে। হজরত আনাস থেকে আল খারাবাতি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ব্যভিচারপরায়ণ ব্যক্তি মূর্তিপূজকের মতো।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ব্যভিচারকালে ইমান বের হয়ে ব্যভিচারীর মস্তকের উপরে ঝুলতে থাকে। ব্যভিচার থেকে বিরত হলে ইমান পুনরায় প্রবেশ করে তার ভিতরে। আবু দাউদ, তিরমিজি, বায়হাকী, হাকেম।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন তার ইমান থাকে না। তেমনি চোর চুরি করার সময় ও মদ্যপায়ী মদ্যপানের সময়ও ইমান তাদের মধ্যে থাকে না।

এর পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।'এখানে 'নাফস্' শব্দটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে মুসলমান এবং জিম্মিকে (জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রাপ্ত কাফেরকে)। আর এখানে 'যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে' কথাটির অর্থ শরিয়তসম্মত দণ্ডাজ্ঞা ব্যতিরেকে। যেমন, কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা), ব্যভিচার, রাষ্ট্রদ্রোহীতা, ধর্মদ্রোহীতা, সাহাবীগণকে গালমন্দ করা ইত্যাদি ব্যতিরেকে। অর্থাৎ শরিয়তসম্মত হত্যার দণ্ডাজ্ঞা কার্যকর করা নিষিদ্ধ নয়। যেমন ধর্মদ্রোহীতা সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে—'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে।' রাষ্ট্রদ্রোহীতা সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।' কিসাস সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'প্রাণের বদলে প্রাণ।'

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর রসুল' এ কথার সাক্ষ্য যে দেয়, তাকে হত্যা করা বৈধ নয়, যদি না সে হয় বিবাহিত ব্যভিচারী, হত্যাকারী ও ধর্মত্যাগী। বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ। উল্লেখ্য যে, এখানে 'ধর্মত্যাগী' অর্থ মুরতাদ হয়ে যাওয়া নয়। কারণ সে তো তখন আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' কলেমার সাক্ষ্যদাতা থাকে না। বরং এখানে 'ধর্মত্যাগী' অর্থ বেদাতী, যারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতকে পরিত্যাগ করেছে। বিদ্রোহ ঘোষণা করে হয়েছে রাফেজী, খারেজী ইত্যাদি।

হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিনে সর্বপ্রথম মীমাংসা করা হবে অযথার্থ রক্তপাতের। বোখারী, মুসলিম। হজরত বারা বিন আজীবের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কোনো মুমিনকে অবৈধভাবে হত্যার তুলনায় সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া তুচ্ছ। উত্তমসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা। বায়হাকী হাদিসটির সংগে অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন— যদি আকাশ ও পৃথিবীর সকল অধিবাসী একযোগে অবৈধভাবে কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করে, তবে আল্লাহ্ তাদের সকলকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

হজরত বুরাইদা থেকে নাসাঈ উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সারা পৃথিবী ধ্বংস হওয়া কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করার তুলনায় তুচ্ছ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মাজা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অর্ধেক কথা বলেও কোনো মুমিনের হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে, বিচার দিবসে তার দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে লিখা থাকবে 'আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত'। ইসপাহানী লিখেছেন, ইবনে ওয়াইনাহ্ 'অর্ধেক কথা'র ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সে 'উক্তুল্'(তাকে হত্যা করো) কথাটি পুরোপুরি উচ্চারণ করবে না, বলবে কেবল 'উক্'। হজরত ইবনে ওমর থেকে বায়হাকীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত মুয়াবিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকল পাপীকে ক্ষমা করে দিবেন, ওই ব্যক্তি ব্যতীত— যে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, অথবা কাউকে হত্যা করেছে ইচ্ছাকৃতভাবে। নাসাঈ বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। হজরত আবু দারদা থেকে আবু দাউদও এরকম হাদিস উল্লেখ করেছেন। আর ওই হাদিসের সূত্রপরম্পরাকে প্রত্যয়ন করেছেন ইবনে হাব্বান ও হাকেম।

হজরত আবু মুসা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সকাল হলেই ইবলিস তার বাহিনীকে ছেড়ে দেয় এবং বলে, আজ কোনো মুসলমানকে যে পথভ্রষ্ট করবে, আমি তার মস্তকে মুকুট পরাবো। দিবাবসানে তার বাহিনীর

www.eelm.weebly.com

সদস্যরা তাদের আপনাপন প্রতিবেদন পেশ করে। একজন বলে, আমি এক মুসলমানের পিছনে লেগেছিলাম। আমার প্ররোচনায় সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। ইবলিস বলে, হতে পারে সে হয়তো আবার বিবাহ করবে। দ্বিতীয় জন বলে, আজ আমি একজনকে তার পিতা-মাতার অবাধ্য করেছি। ইবলিস বলে, সে হয়তো আবার তার পিতা-মাতার বাধ্যগত হবে। তৃতীয় জন বলে, আমার কুমন্ত্রণার প্রভাবে আজ একজন মুসলমান মুশরিক হয়ে গিয়েছে। ইবলিস বলে, তোমার কর্ম উত্তম। চতুর্থজন বলে, আজ আমি একজনকে এমনভাবে প্ররোচিত করেছি যে, সে তার মুমিন ভ্রাতাকে হত্যা করেছে। ইবলিস বলে, তুমিই সর্বোত্তম। একথা বলে ইবলিস তার মস্তকে মুকুট পরিয়ে দেয়। ইবনে হাব্বান তাঁর 'সহীহ্' পুস্তকে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

শেষে বলা হয়েছে— 'কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেনো বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই।' এখানে 'ওয়ালী' অর্থ উত্তরাধিকারী, যে নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সকল কাজের জিম্মাদার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত। 'সুলত্বানা' অর্থ এখানে শক্তি এবং কিসাস গ্রহণের অধিকার।

'লা ইউস্‌রিফ্ ফীল্ ক্বত্‌লি' (হত্যার ব্যাপারে সে যেনো বাড়াবাড়ি না করে) কথাটির উদ্দেশ্য এখানে দু'টি— ১. উত্তরাধিকারী এক্ষেত্রে সীমালংঘন করতে পারবে না। অর্থাৎ যাকে হত্যার অধিকার তার নেই, তাকে সে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে না। স্মর্তব্য যে, জ্ঞানবানেরা কখনো এমন কাজ করে না, যা ইহকাল ও পরকালে ডেকে আনে ধ্বংস। ২. হজরত ইবনে আব্বাস এবং অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী কিসাসের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে পারবে না। অর্থাৎ হত্যাকারী ব্যতীত অন্য কাউকে হত্যা করতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, মূর্খতার যুগের মানুষ কেবল হত্যাকারীকে বধ করাকে যথেষ্ট মনে করতো না, হত্যাকারীর সম্মানিত কোনো নিকটজনকেও হত্যা করে বসতো।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হত্যাকারী একজন হলে কেবল একজনকে অর্থাৎ কেবল হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে। একজনের বদলে একটি দলকে হত্যা করা যাবে না। অথচ নিহত ব্যক্তির বদলে হত্যাকারীসহ তার আত্মীয়-স্বজনের একটি দলকে হত্যা করাই ছিলো মূর্খতার যুগের রীতি। কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে হত্যাকারীর উপরে কিসাস কার্যকর করা যাবে। অর্থাৎ তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে। কিন্তু তাকে মুছলাহ্ করা যাবে না (নাক, কান অথবা অন্য কোনো অঙ্গ-প্রতঙ্গ কর্তন করা যাবে না)।

ইন্নাহু কানা মান্‌সূরা (সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই) কথাটির অর্থ— অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে সাহায্যপ্রাপ্ত। দুনিয়ায় শরিয়তানুসারে তার হত্যাকারীর উপর কিসাস প্রয়োগ করা হয়। আর আখেরাতে

www.eelm.weebly.com

তাকে সাহায্য করা হয় তার পাপমোচন করে এবং তার হত্যাকারীকে দোজখে প্রবেশ করিয়ে। এরকম বলেছেন মুজাহিদ। কাতাদা বলেছেন, এখানে 'কানা' কথাটির সর্বনাম প্রযুক্ত হয়েছে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর সংগে। অর্থাৎ 'সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই।' কথাটির অর্থ এখানে— নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী তো সাহায্যপ্রাপ্ত অবশ্যই হয়েছে। শরিয়তানুসারে বিচারক তাকে সাহায্য করতে বাধ্য। কোনো কোনো তাফসীরকার আবার বলেছেন, এখানকার সর্বনামটি সংযুক্ত হবে হত্যাকারীর সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা কিসাস গ্রহণের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করতে পারবে না। এরকম অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ির হাত থেকে শরিয়ত তাকে সাহায্য করেছে। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'সে তো (হত্যাকারী তো) সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই'।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৩৪

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ○

❐ পিতৃহীন বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইও না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করিও; প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পিতৃহীন বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না।' একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! যতক্ষণ পর্যন্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক পিতৃহীন বা এতিম প্রাপ্তবয়স্ক না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তার সম্পত্তির যথাসংরক্ষণ নিশ্চিত কোরো। ব্যবসায়ে বা অন্য কোনো বৈধ উপায়ে তাদের সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা কোরো। আত্মসাৎ বা অপব্যবহারের অসদুদ্দেশ্য নিয়ে তাদের সম্পদ স্পর্শ কোরো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং প্রতিশ্রুতি পালন কোরো।' একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহ্র বিধানানুসারে জীবন-যাপন করবার জন্য তাঁর সঙ্গে যে অংগীকারে আবদ্ধ হয়েছো, সেই অংগীকার পূর্ণ কোরো এবং মানুষের সঙ্গে যদি কোনো বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে থাকো, তবে সে প্রতিজ্ঞাও অটুট রেখো।

শেষে বলা হয়েছে— 'প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবেই।' একথার অর্থ— অংগীকার পূরণ অত্যাবশ্যক। এই অত্যাবশ্যকতা যথানিয়মে প্রতিপালিত হয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কেবল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদেরকে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শাস্তিও তাদেরকে অবশ্যই দেয়া হবে।

www.eelm.weebly.com

অথবা মহাবিচারের দিবসে তাদেরকে তাদের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিরস্কৃত করা হবে। যেমন মৃত্তিকায় জীবন্ত প্রোথিত শিশুকন্যাকে প্রশ্ন করা হবে 'তোমাকে কোন অপরাধের জন্য হত্যা করা হয়েছে?' কিংবা এরকমও হওয়া সম্ভব যে, এখানকার 'আলআহ্‌দি' (প্রতিশ্রুতি) কথাটির পূর্বে 'চুক্তিনামা' বা 'চুক্তিপত্র' কথাটি উহ্য রয়েছে। যদি তাই হয়, তবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে— যে চুক্তিপত্রের মাধ্যমে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ হয়েছো, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেই।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৩৫, ৩৬

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ۔

❒ মাপিয়া দিবার সময় পূর্ণমাপে দিবে এবং ওজন করিবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, ইহাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।

❒ যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হইও না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়— উহাদিগের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মেপে দিবার সময় পূর্ণরূপে দিবে এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।' এখানে 'ক্বিস্‌ত্বাস্‌' শব্দটির অর্থ পাল্লা বা দাঁড়িপাল্লা। এটি আরবী ভাষায় আত্তীকৃত একটি রোমীয় শব্দ। আত্তীকৃত হওয়ার কারণে শব্দটিকে অনারব বলা যায় না। কেননা এ ধরনের কিছু কিছু অনারব শব্দকে আরবী ভাষা আত্মস্থ করেছে। ফলে ই'রাব, মারেফা, নাকেরাহ্‌ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসহ শব্দগুলো পেয়েছে আরবী ভাষার পরিপূর্ণরূপ। অধিকাংশ আলেম অবশ্য বলেছেন, 'ক্বিস্‌ত্বাস্‌' শব্দটি আরবী। এর উৎসারণ ঘটেছে 'ক্বিস্‌ত্ব' থেকে। 'ক্বিস্‌ত্ব' অর্থ আদল বা ন্যায়পরায়ণতা। আর এখানকার 'আল মুস্‌তাক্বীম' অর্থ ঠিক বা সঠিক।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট' (জালিকা খইরুউঁ ওয়াআহ্‌সানু তা'বীলা)। এখানে 'তা'বীলা' অর্থ পরিণাম বা পরিণতি।

পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনে রাখুন এবং প্রচার করুন, প্রত্যাদেশাগত ও বুদ্ধিগত প্রমাণ বিবর্জিত বিষয় অনুসরণযোগ্য নয়। তাই অনুমানের অনুসরণ নিষিদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

একটি প্রশ্নঃ এই আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, অনুমানভিত্তিক আমল সিদ্ধ নয়। তাহলে তো বলতে হয়, খবরে আহাদ (একক বর্ণনা) এবং কিয়াস (বুদ্ধিবৃত্তিক অনুমান) অননুসরণীয়। কারণ এ দু'টোর দ্বারা প্রত্যাদেশের (ওহীর) মতো অকাট্য ধারণা লাভ করা যায় না। অপ্রসিদ্ধ হাদিসও তো তাহলে পরিত্যাগ করতে হয়। কারণ এগুলো ধারণাকে অধিকতর বলিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন করতে পারে বটে, কিন্তু ওহীর মতো নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে না।

উত্তরঃ লক্ষণীয় যে, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে ভিত্তিহীন অনুমানের অনুসরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এভাবে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে বলিষ্ঠ বিশ্বাসের, সে বিশ্বাস প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশজাত অথবা অপ্রত্যক্ষ প্রমাণজাত (অপ্রসিদ্ধ হাদিস, একক বর্ণনা, এজমা, কিয়াস) —যাই হোক না কেনো। এভাবে 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— যে বিষয়ে তোমার আয়ত্তে কোরআন, হাদিস, এজমা ও কিয়াস সম্পর্কিত প্রমাণ নেই। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে অনুমানভিত্তিক অনুসরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে কেবল আকায়েদ বা বিশ্বাস্য বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ কেবল বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই ধারণা, খেয়াল, দোদুল্যমানতা ও অনিশ্চিতির অনুসরণ নিষিদ্ধ। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কেবল সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ প্রদান ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে। সুতরাং এ দু'টো ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে আলোচ্য বাক্যের নিষেধাজ্ঞাটি প্রযোজ্য নয়।

মুজাহিদ বলেছেন, রসুল স. এর মাধ্যমে আলোচ্য বাক্যে একথাই বলে দেয়া হয়েছে যে— হে মানুষ! তোমরা সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে কাউকে অভিযুক্ত কোরো না। স্বধারণা বা অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে দোষারোপ করতে যেয়ো না। কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য নির্দেশনাটির মর্মার্থ এই যে— তোমরা অদর্শিত, অশ্রুত ও অজানিত বিষয়াবলীকে দর্শিত, শ্রুত ও জানিতরূপে প্রকাশ কোরো না।

আমি বলি, যথাসূত্রে বর্ণিত খবরে আহাদ, যথার্থ কিয়াস অথবা দু'জন পুরুষ ও একজন নারীর সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কে মান্য করা ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক)। প্রত্যাদেশ বা কোরআন এবং এজমা বা ঐকমত্য একথাই বলে। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি দল কেনো বিদেশে গমন করে না।' আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'হে বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ! প্রজ্ঞাশ্রয়ী হও।' অন্য আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী নির্বাচন করো'। সুবিদিত হাদিসসমূহের মাধ্যমেও একথার প্রমাণ এসেছে যে, রসুল স. তাঁর কোনো কোনো সহচরকে ধর্মপ্রচার ব্যপদেশে অন্যত্র প্রেরণ করতেন। অতএব খবরে আহাদ অথবা কিয়াসকে সুনিশ্চিত বলা না গেলেও তা অনুসরণীয়। অর্থাৎ এগুলোর উপর আমল করা জরুরী। কোরআন মজীদে এরকমই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়— তাদের প্রত্যেকের নিকটে কৈফিয়ত তলব করা হবে।' একথার অর্থ— বর্ণিত অঙ্গ তিনটির আনুগত্য ও অনানুগত্য সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করা হবে। অথবা এই ত্রয়ী প্রত্যঙ্গকে এই মর্মে প্রশ্ন করা হবে যে, যার সঙ্গে তোমরা ছিলে সে তোমাদের দ্বারা কি কি কাজ করিয়েছে? কিংবা যে ব্যক্তি দেখা, শুনা ও জানার দাবি করে, তার চোখ, কান ও হৃদয়কে তার দাবির সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। চোখকে বলা হবে, সত্যিই কি সে দেখেছিলো? কানকে বলা হবে, সে শুনেছে বলে যে দাবি করে, তা কি সত্যি? আর হৃদয়কে বলা হবে, তার জানার দাবিটি সত্য না মিথ্যা?

হজরত শেকেল বিন হুমাইদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আমার এক নিবেদনের প্রেক্ষিতে আমার হাত ধরে বলেছিলেন, বলো, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার সকাশে পরিত্রাণ প্রার্থনা করি কর্ণ, নয়ন, রসনা ও হৃদয়ের পাপ থেকে। আরো পরিত্রাণ যাচ্ঞা করি বীর্য স্খলনজনিত পাপাচার থেকে। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই দোয়াটি স্মৃতিবদ্ধ করে নিয়েছি। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ, হাকেম ও বাগবী। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। হাদিসটির এক বর্ণনাকারী সাঈদ বলেছেন, এখানে বীর্য স্খলনজনিত পাপাচার থেকে পরিত্রাণ কামনার অর্থ অবৈধস্থানে বীর্যপাত ঘটানো থেকে রক্ষা পাওয়া।

মানুষ জ্ঞান আহরণ করে তার ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে। বিশেষ করে চোখ, কান ও হৃদয়ের মাধ্যমে। এগুলো হচ্ছে জ্ঞানাহরণের উপায়, উপকরণ বা পথ। পরিচ্ছন্ন ও পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে গেলে তাই দৃষ্টি, শ্রুতি ও উপলব্ধিজাত জ্ঞানের সম্মিলন একান্ত জরুরী।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۝ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝

www.eelm.weebly.com

❐ ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করিও না, তুমি তো কখনই পদভরে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিতে পারিবে না। এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত-প্রমাণ হইতে পারিবে না।

❐ এই সমস্তের মধ্যে যে-গুলি মন্দ সেই গুলি তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য।

❐ তোমার প্রতিপালক ওহির দ্বারা তোমাকে যে হিকমত দান করিয়াছেন এইগুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লাহের সহিত কোন ইলাহ্ স্থির করিও না, করিলে তুমি নিন্দিত ও আল্লাহের অনুগ্রহ হইতে দূরীকৃত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

❐ তোমাদিগের প্রতিপালক কি তোমাদিগের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করিয়াছেন এবং তিনি নিজে ফেরেশতাগণকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন? তোমরা তো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলিয়া থাক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ কোরো না; তুমি তো কখনোই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না।' একথার অর্থ— হে অহমিকাপ্রবণ মানুষ! অহমিকা পরিত্যাগ করো। গর্বোন্মত্ত পদবিক্ষেপ থেকে বিরত হও। কী ভেবেছো তোমরা? মনে করেছো কি যে, তোমাদের দর্পিত পদভারে মৃত্তিকা বিদীর্ণ হবে? এখানে 'মারাহান' অর্থ অহমিকাবশতঃ বা দম্ভভরে। 'মারাহুন' অর্থ প্রতাপপ্রকাশক অভিব্যক্তি বা পরাক্রমপ্রবণ পদবিক্ষেপ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং উচ্চতায় তুমি কখনো পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।' একথার অর্থ— হে অর্বাচীন মানুষ! অহংকারের বশবর্তী হয়ে যতোই তুমি বাড়তে চেষ্টা করো না কেনো, তুমি তো কখনোই পাহাড়ের মতো সুউচ্চ হতে পারবে না। তবে এ বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করোনা কেনো? কেনো হওনা অনুগত ও বিনয়াবনত?

হজরত আয়াজ বিন হাম্মাদ মাজাশিঈ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, আমরা যেনো একে অপরের প্রতি হই প্রীতিপ্রবণ ও অনহংকারী। যেনো সতত মুক্ত থাকি উন্নাসিকতা থেকে। মুসলিম।

হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন— অহংকার আমার উত্তরীয় এবং পরাক্রম আমার পরিধেয়। যে ব্যক্তি আমার এই একক পরিচ্ছদকে নিজের দিকে টানতে শুরু করবে, আমি তাকে দোজখে প্রবেশ করাবো। মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

হজরত সালমা ইবনে আকওয়ার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে মানুষ সারাক্ষণ দাম্ভিকতা প্রকাশ করে, তাকে আখ্যা দেয়া হয় 'জাব্বারীন' বা দর্পিত বলে। তারপর তার উপরে আপতিত হয় আযাব, যে আযাবের সে উপযোগী। তিরমিজি।

আমর বিন শোয়াইবের পিতামহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিন দাম্ভিকদেরকে পিপীলিকার মতো নিকৃষ্ট ও নগণ্য হিসেবে পুনরুত্থিত করা হবে। সেদিন তারা হবে লাঞ্ছনা ও অবমাননা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এভাবে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে সবচেয়ে বেশী দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট জাহান্নামের 'বুলাস্' নামক প্রকোষ্ঠে। সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে 'তুইয়্যানাতুল খাবাল' (দোজখীদের রক্ত ও পুজ)। তিরমিজি।

হজরত আসমা বিনতে উমায়েশ বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, ওই মানুষ মন্দ, যে তোষামদ প্রিয়, দাম্ভিক এবং মহান আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়। তিরমিজি, বায়হাকী।

একদিন হজরত ওমর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনতা! শোনো, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র জন্য যে বিনয়াবনত হয়, আল্লাহ্ তাকে মর্যাদায়িত করেন। তখন সে হয় নিজের দৃষ্টিতে নগণ্য, কিন্তু জনসাধারণের দৃষ্টিতে মহান। আর যে ব্যক্তি নিজেকে মর্যাদামণ্ডিত মনে করে, আল্লাহ্ তাকে অপমানিত করেন। ফলে সে হয় স্বদৃষ্টিতে সমুন্নত, কিন্তু জনতার দৃষ্টিতে কুকুর ও শুকর অপেক্ষা তুচ্ছ। আল্লাহ্‌তায়ালাই সর্বোত্তম পরিজ্ঞাতা।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস একবার বললেন, তওরাতের প্রথম পনেরো আয়াতের মধ্যেই রয়েছে আলোচ্য আয়াতের অনুকূল নির্দেশ। একথা বলার পর তিনি পাঠ করলেন— 'ওয়ালা তাজ্‌আ'ল মাআ'ল্লহি ইলাহান্ আখারা' (আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে উপাস্য সাব্যস্ত কোরো না)।

পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'এ সমস্তের মধ্যে যেগুলো মন্দ, সেগুলো তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য।' এখানে 'এ সমস্তের মধ্যে' কথাটির অর্থ— শরিয়তের এ সকল নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহের মধ্যে। উল্লেখ্য যে, শরিয়ত কোনো কোনো বিষয়কে বৈধ করেছে, আবার কোনো কোনো বিষয়কে করেছে অবৈধ। বৈধ বিষয়সমূহ শুভ। আর অবৈধ বিষয়সমূহ অশুভ বা মন্দ। মন্দ বিষয়গুলোই আল্লাহ্‌র নিকটে ঘৃণিত ও নিন্দিত।

এর পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক ওহীর দ্বারা তোমাকে যে হেকমত দান করেছেন, এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত।' কামুস রচয়িতা এখানকার 'হিকমত' কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— ন্যায়পরায়ণতা, জ্ঞান, সহিষ্ণুতা, বিনয়, নবুয়ত ও কিতাব (ইঞ্জিল, তওরাত, কোরআন ইত্যাদি)। আমি বলি, এখানকার 'হিকমত' কথাটির অর্থ ফলপ্রসূ বা উপকার প্রদায়ক জ্ঞান।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোনো ইলাহ্ স্থির কোরো না।' কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে এই কথাটি বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, তওহীদ বা আল্লাহ্‌র এককত্বে বিশ্বাসই হচ্ছে সত্য ধর্মের মূল ভিত্তি। বিশুদ্ধ তওহীদের উপরেই কেবল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে গ্রহণযোগ্য আমল। বরং সকল আমলের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিশুদ্ধ এককত্বের বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। সকল প্রজ্ঞাময়তা ও জ্ঞানের মূলও এই তওহীদ। শিরিক বা অংশীবাদিতা বিশ্বাসের মূল ভিত্তি এই তওহীদকে অপসারিত করে। তাই শিরিক সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও চিরস্থায়ী শাস্তির যোগ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'করলে তুমি নিন্দিত ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে দূরীকৃত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, তারা যেনো আল্লাহ্‌র সমকক্ষ বা অধীনস্থ হিসেবে কাউকে বা কোনোকিছুকে উপাস্য স্থির না করে। যদি কেউ এরকম করে, তবে সে একসময় নিজের কাছেই হয়ে পড়বে নিন্দিত। আর আল্লাহ্ ও সকল সৃষ্টির কাছেও সে হয়ে পড়বে তিরস্কারের যোগ্য। অবশেষে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বঞ্চিত অবস্থায় সে নিক্ষিপ্ত হবে চিরস্থায়ী অগ্নিকুণ্ডে। এখানে নিজের কাছে নিন্দিত ও আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত — এ দু'টো অবস্থাকে বোঝানো হয় যথাক্রমে 'মালুমান' ও 'মাদহুরান' কথা দু'টোর মাধ্যমে।

এর পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং তিনি নিজে ফেরেশতাগণকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরা তো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলে থাকো।' একথার অর্থ— হে মক্কার অংশীবাদীরা! তোমাদের মনোবৃত্তি ও বক্তব্য কতোই না জঘন্য। তোমরা চিরঞ্জীব, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর ও চির অমুখাপেক্ষী আল্লাহ্‌কে মানুষের জন্ম প্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চাও। এটা তো এক অতি ঘৃণ্য মিথ্যাচারিতা। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তিনি যেমন কারো দ্বারা জাত নন, তেমনি নন কারো জনক। এসকল বৈশিষ্ট্য তো নশ্বরতার বৃত্তভূত। আর তিনি অনশ্বর। হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! এর চেয়ে আরো অধিক মিথ্যা বলতেও তো তোমরা দ্বিধান্বিত হও না। পুত্র সন্তানের জনক বলে তোমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকো, আর মহাবিশ্বের মহান প্রভুপালনকর্তাকে বলো কন্যা সন্তানের জনক। আবার ফেরেশতাদেরকে বলো আল্লাহ্‌র কন্যা। অথচ তারা আমার এক নিষ্পাপ ও জ্যোতির্ময় সৃষ্টি— নারী-পুরুষ কোনোটাই তারা নয়। কী ভয়ানক তোমাদের বচন! চরমতম নির্বোধ ও দুর্ভাগা ছাড়া কারো মুখে কি এমতো অপবিত্র উচ্চারণ শোভন?

www.eelm.weebly.com

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ؕ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۝ قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ۝ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

❐ এই কুরআনে বহু নীতিবাক্য আমি বারবার বিবৃত করিয়াছি যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাতে উহাদিগের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

❐ বল, 'উহাদিগের কথামত যদি তাঁহার সহিত আরও ইলাহ্ থাকিত তবে তাহারা আরশ-অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উপায় অন্বেষণ করিত।

❐ তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং উহারা যাহা বলে তাহা হইতে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।

❐ সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু উহাদিগের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করিতে পার না; তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এই কোরআনে বহু নীতিবাক্য আমি বারবার বিবৃত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।' একথার অর্থ— এই মহাগ্রন্থ আল কোরআনে আমি বিভিন্ন উপদেশমূলক কাহিনী, শরিয়তের বিভিন্ন বিধান, বিভিন্ন হেকমত ও নানা রকম উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও প্রমাণ বার বার বিভিন্নভাবে উপস্থিত করেছি। মানুষ যাতে এ সকল কিছু অনুধাবন করে সৎপথ প্রাপ্ত হয়, সে কারণেই এই মহান আয়োজন। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, এই কোরআনে আমি হেদায়েতের উদ্দেশ্যে পুনঃপুনঃ বিভিন্ন নীতিবাক্য ও উপদেশ প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথবা এখানে 'হাজাল্ কুরআন' কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে 'ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা'—এই অপবিশ্বাসটি আমি বারংবার বাতিল বলে প্রমাণ করেছি। করেছি এজন্য যে, মানুষ যেনো এভাবে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের সাক্ষাৎ পায় এবং তা

www.eelm.weebly.com

অবলম্বন করে পথ-প্রাপ্ত হয়। এভাবে এখানকার 'কুরআন' কথাটির অর্থ হবে 'ক্বিরআত' বা পাঠ, বাণী অথবা বাক্য। এখানকার 'সর্‌রাফ্‌না' কথাটির অর্থ বার বার। কথাটি আধিক্য প্রকাশক। আর 'লিইয়াজ্‌জাক্‌কারু' অর্থ যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে । অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য যে ধারণা শোভনীয় নয়, তা থেকে মুক্তি লাভ করে আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর সঠিক অনুসরণ করে সফল হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।' এ কথার অর্থ— কিন্তু অর্বাচীন ও অবিমৃশ্য মানুষ আমার এই কল্যাণ প্রচেষ্টার প্রতি বিমুখ। আত্মহননের আনন্দেই তারা মগ্ন। এভাবে যতো আমি তাদেরকে কাছে ডাকি, ততোই তারা দূরে সরে যায়। কল্যাণের সঙ্গে রচনা করে দীর্ঘ, দীর্ঘতর ব্যবধান।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'বলো, তাদের কথামতো যদি তাঁর সঙ্গে আরো ইলাহ্ থাকতো, তবে তারা আরশ-অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার উপায় অন্বেষণ করতো।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে একথা বলুন যে, আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অথচ নির্বোধ অংশীবাদীরা এক আল্লাহ্‌র উপাসনা ছেড়ে বহু দেব-দেবীর উপাসনায় লিপ্ত। তারা একথা জানে না এবং মানে না যে, আল্লাহ্ একাধিক হওয়া সম্ভবই নয়। যদি এরকম হতো, তবে তো মহান আরশের একক অধিকর্তা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করতো— যেমন এক রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করে অন্য রাজার বিরুদ্ধে। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এমতো সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। আর এমতাবস্থায় একপক্ষ হতো বিজয়ী এবং অপর পক্ষ হতো পরাজিত। অথবা ধ্বংস হয়ে যেতো উভয় পক্ষই। যে এরকম জয়-পরাজয়ের মুখাপেক্ষী, সে কখনোই আল্লাহ্ হতে পারে না। কারণ দুর্বলতা ও পরাজয় প্রভুত্বের পরিপন্থী।

এর পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা অতুলনীয়রূপে পবিত্র ও মহিমান্বিত। সকল অক্ষমতা, অপারগতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত অপেক্ষা তিনি বহু উর্ধ্বে। সত্তা, গুণাবলী ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রেও তাঁর মর্যাদা জ্ঞানাতীতরূপে সমুচ্চ। অংশীবাদীদের বিশ্বাস অনুসারে সন্তান গ্রহণও তাঁর পক্ষে অসম্ভব। জন্মপ্রবাহ তো হচ্ছে অবক্ষয়প্রবণ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তিনি তো চির অধ্বংসী, চির অক্ষয়।

এর পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না।' এ কথার অর্থ— সাত আকাশ ও পৃথিবীসহ সকল কিছুই আল্লাহ্‌পাক যে অংশীবাদিতা থেকে পবিত্র ও

www.eelm.weebly.com

অপ্রতিদ্বন্দ্বিরূপে মহিমময়— একথা ঘোষণা করে। এই সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা থেকে সৃষ্টি জগতের কোনো কিছুই বিরত নয়। প্রতিটি সৃষ্টি তাদের স্ব স্ব ভাষায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করে চলেছে তাঁর প্রশংসা, পবিত্রতা এবং মহিমা।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমরা আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার অলৌকিকত্বকে বরকতময় বলে জানি। আর তোমরা এটাকে মনে করো ভীতিপ্রদ ব্যাপার। এক সফরে আমি ছিলাম রসুল স. এর সঙ্গী। হঠাৎ পানির সংকট দেখা দিলো। রসুল স. বললেন, সামান্য পানি যদি কারো কাছে থেকে থাকে তবে তা নিয়ে এসো। একটি পাত্র উপস্থিত করা হলো তাঁর সম্মুখে। তার মধ্যে ছিলো যৎসামান্য পানি। রসুল স. তাঁর পবিত্র হস্ত পাত্রের মধ্যে রেখে বললেন, হে বরকতময় পানি, বেরিয়ে এসো। বরকত তো আল্লাহ্র দিক থেকেই আসে। আমরা দেখলাম, এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রসুল স. এর পবিত্র আঙ্গুল থেকে নির্গত হতে শুরু করলো তীব্র পানির ধারা। আমরা সকলেই সেই পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলাম এবং ওই পানি দিয়ে আহার্যও প্রস্তুত করলাম। শুনতে পেলাম আহার্য বস্তু থেকে উত্থিত হচ্ছে 'সুবহানআল্লাহ্' 'সুবহানআল্লাহ্' আওয়াজ। বোখারী।

মুজাহিদ বলেছেন, জড়-অজড় সকল সৃষ্টি আল্লাহ্র তস্বী পাঠ করে। অর্থাৎ পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করে 'সুবহান আল্লাহি ওয়া বিহামদিহি'। ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, সপ্রাণ-নিস্প্রাণ সকল বস্তুই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে। এমন কি দরজার চৌকাঠ এবং ভেঙে পড়া ছাদের টুকরা পর্যন্ত বর্ণনা করে আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'শাইইন' অর্থ সকল জীবিত বস্তু। অর্থাৎ সকল জীবিত প্রাণী বর্ণনা করে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা। যেমন জ্বিন, মানুষ, ফেরেশতা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি। কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্র প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে প্রাণী ও অরণ্যানী। অর্থাৎ সকল প্রবৃদ্ধিপ্রবণ সৃষ্টি। ইকরামা বলেছেন, বৃক্ষকুল তস্বি পাঠ করে। কিন্তু বৃক্ষ থেকে নির্মিত কাষ্ঠখণ্ড তস্বি পাঠ করে না।

আমি বলি, ইকরামার অভিমতটি অযথার্থ। কেননা রসুল স. এর বিরহে মসজিদে নববীর একটি কাঠের খুঁটি শিশুদের মতো ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিলো। একথা বিশুদ্ধ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত। এক আয়াতে হজরত দাউদকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্পাক বলেছেন—'হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং হে বিহঙ্গকুল, তোমরাও।' হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডেকে জিজ্ঞেস করে তোমার উপর দিয়ে কি আল্লাহ্র নাম স্মরণ করতে করতে কোনো ব্যক্তি গমন করেছে? অন্য পাহাড় যদি বলে 'হ্যাঁ', তবে প্রশ্নকারী

www.eelm.weebly.com

পাহাড় আনন্দিত হয়। সুতরাং একথা নিঃসন্দিগ্ধ যে, প্রতিটি সৃষ্টবস্তু নিরন্তর তস্‌বী পাঠে রত। সমগ্র সৃষ্টি সম্ভাব্যের বৃত্তভূত ও ধ্বংসশীল। তাই তাকে অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য চিরঅবিনাশী ও চিরঅমুখাপেক্ষীর মুখাপেক্ষী হতেই হয়। আর নিরন্তর তসবী পাঠই হচ্ছে ওই মুখাপেক্ষিতার প্রমাণ। আল্লাহ্‌পাক সকল প্রকার শূন্যতা, ত্রুটি, বিনাশপ্রবণতা ও অবক্ষয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সকল প্রকার পূর্ণতা কেবল তাঁর মধ্যেই বিদ্যমান। সকল গুণের তিনিই আকর। সুতরাং সৃষ্টির পক্ষে সর্বক্ষণ তাঁর তস্‌বী পাঠ করাই স্বাভাবিক ও শোভন।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না।' একথার অর্থ— হে মানুষ! সৃষ্টিজগতের এই সার্বক্ষণিক তস্‌বী পাঠের বিষয় আমি করে রেখেছি প্রচ্ছন্ন, সর্বসাধারণের দৃষ্টি ও অনুভূতি থেকে সংগুপ্ত। তাই তা তোমাদের অনুধাবনের আওতাভূত নয়। উল্লেখ্য যে, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা এর ব্যতিক্রম। তারা বিষয়টি কিছুটা হলেও অনুধাবন করতে সক্ষম। কিন্তু তাদের নিকটেও বিষয়টির রহস্য সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত নয়। কীভাবে উন্মোচিত হবে? শিল্পের রহস্য শিল্পী ছাড়া অন্যের নিকটে যেমন পূর্ণরূপে উন্মোচিত নয়, তেমনি সৃষ্টির রহস্য স্রষ্টা ছাড়া কি করে অন্যরা পুরোপুরি বুঝবে? উল্লেখ্য যে, অংশীবাদীরা জ্ঞানান্ধ, অদূরদর্শী ও দর্পান্ধ। তাই তারা আলোচ্য বিষয়টি কিছুতেই অনুধাবন করতে পারে না।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, পশুদের মুখের উপরে আঘাত কোরো না। প্রতিটি সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করে। মায়মুন বিন মাহ্‌রান বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীক সকাশে একবার একটি কাক আনা হলো। কাকটির ডানা ছিলো গুটানো। তিনি তার ডানা দু'টো প্রসারিত করে দিয়ে বললেন, তসবীহ্ পাঠ বন্ধ না করা পর্যন্ত কোনো প্রাণীকে শিকার করা যায় না এবং কোনো বৃক্ষকেও কর্তন করা যায় না। জুহুরীও এরকম বর্ণনা এনেছেন। ইজালাতুল খাফা।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।' একথার অর্থ, আল্লাহ্ সহিষ্ণু— তাই তিনি পাপীকে শাস্তি প্রদানের জন্য ব্যতিব্যস্ত নন। আর তিনি ক্ষমাপরবশও— তাই কেউ কৃত পাপের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।

জুহুরী সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. মক্কার অংশীবাদীদেরকে পবিত্র কোরআন পাঠ করে শোনালেন এবং আহ্বান জানালেন সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি। কিন্তু তারা উপহাসচ্ছলে বললো— 'তুমি যার প্রতি আহ্বান করছো, সে বিষয়ে আমাদের হৃদয় পর্দাচ্ছাদিত, কর্ণ বধির এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে রয়েছে অন্তরাল।' তাদের এমতো পরিহাসের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

www.eelm.weebly.com

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ۝ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝

❑ তুমি যখন কুর্আন পাঠ কর তখন তোমার ও যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রাখিয়া দেই।

❑ আমি উহাদিগের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন উহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে এবং উহাদিগকে বধির করিয়াছি; 'তোমার প্রতিপালক এক', ইহা যখন তুমি কুর্আন হইতে আবৃত্তি কর তখন উহারা সরিয়া পড়ে।

❑ যখন উহারা কান পাতিয়া তোমার কথা শুনে তখন উহারা কেন কান পাতিয়া উহা শুনে তাহা আমি ভাল জানি, এবং ইহাও জানি গোপনে আলোচনাকালে সীমালংঘনকারীরা বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি যখন কোরআন পাঠ করেন, তখন আপনার ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে আমি স্থাপন করি একটি অনড় অন্তরায়। ফলে তারা কোরআনের মর্ম অনুধাবন করতে পারে না।

কাতাদা বলেছেন, এখানে 'হিজাব' (পর্দা বা অন্তরায়) কথাটির মাধ্যমে ওই পর্দার কথা বলা হয়েছে যা তারা উপহাসচ্ছলে বলেছিলো। বলেছিলো, 'তুমি যার প্রতি আহ্বান করছো, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর পর্দাচ্ছাদিত'। অর্থাৎ এখানকার হিজাব বা পর্দা হচ্ছে কোরআন অনুধাবনের অন্তরায়।

'মাস্তূরা' অর্থ প্রচ্ছন্ন বা গোপন। অর্থাৎ যা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। অথবা এমন পর্দা যা অনেক পর্দার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। অর্থাৎ পর্দার ভিতরের পর্দা, তার ভিতরের পর্দা— এরকম। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'মাস্তূরা' শব্দটি

www.eelm.weebly.com

কর্মপদ, যা কর্তৃপদের অর্থ প্রকাশক। এভাবে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'সাতীর' (গোপনকারী)। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কানা ওয়া'দুহূ মাতিয়্যা।' এখানে 'মাতিয়্যা' অর্থ আগমনকারী।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে হিজাব বলে ওই পর্দাকে বুঝানো হয়েছে, যা রাখা হতো রসুল স. এবং কাফেরদের মাঝখানে। ফলে তারা তাকে দেখতে পেতো না। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, যখন 'তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব্' আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন আবু লাহাবের স্ত্রী একটি প্রস্তর খণ্ড হাতে নিয়ে রসুল স.কে মারতে এলো। রসুল স. তখন একস্থানে হজরত আবু বকরের সঙ্গে বসেছিলেন। আবু লাহাবের স্ত্রী সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলো কেবল হজরত আবু বকরকে। রসুল স.কে সে দেখতেই পেলো না। হজরত আবু বকরকে লক্ষ্য করে সে বললো, তোমার সাথী কোথায়? আমি শুনতে পেলাম সে আমাদের দুর্নাম করেছে। হজরত আবু বকর বললেন, আল্লাহ্র কসম! তিনি তো কবিতা পাঠ করেন না। কবিতা রচনাও করেন না (তবে তিনি দুর্নাম করেন কীভাবে)। আবু লাহাবের স্ত্রী সেখান থেকে এই কথা বলতে বলতে প্রস্থান করলো যে, আমিতো এই পাথরটি নিক্ষেপ করে তার মাথা ফাটিয়ে দিতে এসেছিলাম। তার অন্তর্ধানের পর হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! সে তো আপনাকে দেখতে পায়নি। রসুল স. বললেন, একজন ফেরেশতা তার ও আমার মধ্যে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

আমি বলি, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের এই বর্ণনাটি বিশেষ একটি ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এরকম ঘটনা সচরাচর ঘটতো না। অর্থাৎ এরকম সবসময় হতো না যে, রসুল স. কোরআন তেলাওয়াত করতেন, অথচ তারা তাঁকে দেখতে পেতো না।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে—'আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি, যেনো তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে।' একথার অর্থ— আমি ওই সকল চিরভ্রষ্টদের অন্তরের উপর রেখে দিয়েছি এক অচ্ছেদ্য আবরণ। তাই তারা কোরআনের অন্তর্নিহিত বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে বধির করেছি।' একথার অর্থ— আমি তাদের শ্রুতিকে করেছি সত্যশ্রবণের ক্ষমতাবিবর্জিত। তাই তারা মনোযোগের সঙ্গে কোরআনের বাণী শুনতে পারে না। উল্লেখ্য যে, কোরআন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য উভয় দিক থেকে মোজেজা বা অলৌকিকত্ব। তাই কোরআনের উভয় দিক সম্পর্কে অবিশ্বাসীদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সে কারণেই তাদের হৃদয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় এবং কোরআনের মাঝখানে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। এভাবে তাদেরকে করা হয়েছে কোরআনের উচ্চারণ ও অনুধাবন থেকে বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক এক— একথা যখন তুমি কোরআন থেকে আবৃত্তি করো, তখন তারা সরে পড়ে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি যখন অংশীবাদীদের বাতিল উপাস্যসমূহকে অস্বীকারার্থে কোরআন থেকে পাঠ করেন আল্লাহ্র একক উপাস্য হওয়া সম্পর্কিত কোনো আয়াত, তখন তারা ঘৃণাভরে সেখান থেকে প্রস্থান করে।

'নুফূরা' অর্থ ঘৃণাভরে প্রস্থান করা বা সরে পড়া। শব্দটি সাধারণ কর্মপদ ও কারণ প্রকাশক কর্মপদ উভয়রূপে ব্যবহার্য। শব্দটি নাফির শব্দের বহুবচন। যেমন 'আক্বিদ' এর বহুবচন 'উকুদ্।'

এর পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'যখন তারা কান পেতে তোমার কথা শোনে, তখন তারা কেনো কান পেতে তা শোনে, তা আমি ভালো জানি।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! ওই সকল অবিশ্বাসীরা যে কৌতুক এবং বিদ্রূপপ্রবণ মানসিকতা নিয়ে আপনার কথা কান পেতে শোনে, তা আমি ভালো করেই জানি।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং এ-ও জানি, গোপনে আলোচনাকালে সীমালংঘনকারীরা বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছো।'

এখানে 'নাজ্ওয়া' শব্দটি ধাতুমূল এবং কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশক। শব্দটি 'নাজী' শব্দের বহুবচন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনার কোরআন পাঠ কান পেতে শোনার পিছনে তাদের কী দুরভিসন্ধি রয়েছে, তা আমার অজানা নয়। বক্তব্যটি এরকমও হতে পারে যে, যখন তারা এ সম্পর্কে কানাকানি করে, তখনকার গোপন আলাপচারিতার বিষয়বস্তুও আমার জ্ঞানবহির্ভূত নয়। অর্থাৎ তাদের তখনকার সকল গোপন কলাকৌশল,পরামর্শ বিনিময় ও ষড়যন্ত্রের কথাও আমি উত্তমরূপে অবগত। তারা তখন একে অপরকে বলে— তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত লোকের পাল্লায় পড়েছো।

'আজ্জলিমূনা' অর্থ সীমালংঘনকারী। অর্থাৎ ওলীদ বিন মুগীরা ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা। তারা রসুল স.কে যাদুগ্রস্ত বলতো। নিঃসন্দেহে এরকম অপকথন জুলুম বা সীমালংঘন ছাড়া অন্য কিছু নয়।

'মাসহূরা' অর্থ যাদুগ্রস্ত, যে যাদুর প্রভাবে বিবেক-বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মুজাহিদ 'মাসহূর' শব্দের অর্থ করেছেন— প্রতারিত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শব্দটি উৎকলিত হয়েছে 'মাসাহারাকা' থেকে। 'মা সাহারাকা' অর্থ— 'কোন বিষয়ে তোমাকে বিমুখ করেছে।' এভাবে 'মাসহূর' শব্দের অর্থ হবে— সত্য বিমুখ। আবু উবাইদ 'মাসহূর' শব্দের অর্থ করেছেন— যাদুকর। আর

www.eelm.weebly.com

'সাহার' শব্দের অর্থ করেছেন ফুস্‌ফুস্‌। অর্থাৎ তারা একে অপরকে লক্ষ্য করে গোপনে বলাবলি করে, এ লোক তো তোমাদের মতোই ফুস্‌ফুস্‌ বিশিষ্ট লোক। তোমাদের পানাহার ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই তার পানাহার ও শ্বাস-প্রশ্বাস।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২

انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
سَبِيلًا ۝ وَقَالُوٓا أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
خَلْقًا جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا
مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي
فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ
مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ
فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝

❒ দেখ, উহারা তোমার কী উপমা দেয়, উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং উহারা পথ পাইবে না।

❒ উহারা বলে, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলেও কি নূতন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হইব?'

❒ বল, 'তোমরা হইয়া যাও পাথর অথবা লৌহ,

❒ অথবা এমন কিছু যাহা তোমাদিগের ধারণায় খুবই কঠিন;' তাহারা বলিবে, 'কে আমাদিগকে পুনরুত্থিত করিবে?' বল, 'তিনিই যিনি তোমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছেন।' অতঃপর উহারা তোমার সম্মুখে মাথা নাড়িবে ও বলিবে, 'উহা কবে?' বল, 'হইবে সম্ভবতঃ শীঘ্রই,

❒ 'যেদিন তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন, এবং তোমরা প্রশংসার সহিত তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করিবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করিয়াছিলে।'

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে—'দেখো, তারা তোমার কী উপমা দেয়, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! দেখুন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আপনাকে কতো কিছু বলে সম্বোধন করে। কেউ বলে কবি। কেউ বলে যাদুকর। কেউ বলে যাদুগ্রস্ত। কেউ বলে গণক। আবার কেউ বলে উন্মাদ। এ সকল মিথ্যা কথা বলার কারণেই তারা চিরদিনের জন্য পথভ্রষ্ট হয়েছে। মিথ্যাচারীরাই এভাবে পথভ্রষ্ট হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা পথ পাবে না।' একথার অর্থ— তারা কখনোই সত্যপথের সন্ধান পাবে না। কারণ আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে করেছেন অবরুদ্ধ, পর্দাচ্ছাদিত। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, তারা আপনাকে ভর্ৎসনা করবার জন্য যুৎসই কোনো সম্বোধনও খুঁজে পায় না। তাই তারা একেক বার একেক কথা বলে। তাদের এমতো প্রমাণবিহীন সম্বোধন অন্ধের হাতড়িয়ে বেড়ানোর মতো। মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া ব্যক্তির মতো, যে তার কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করতে অক্ষম।

পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'তারা বলে, আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো?' এখানে 'রুফাত' অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া। 'ফাতাত' এবং 'হুতাম' শব্দ দু'টোর অর্থও এরকম। কামুস গ্রন্থে রয়েছে— রফাতা, ইয়ারফুতু (শব্দরূপ নাসারা, ইয়ানসুরু) অর্থ ভগ্ন, চূর্ণবিচূর্ণ। মুজাহিদ 'রুফাতা' শব্দটির অর্থ করেছেন— মাটি। জীবিত মানুষের অস্থি সুঠাম ও সজীব। আর মৃত মানুষের হাড় শুষ্ক ও ভঙ্গুর । দু'টো অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই অংশীবাদীরা বিশুষ্ক হাড়গোড় নিয়ে মাটিতে মিশে যাওয়া মানুষের পুনর্জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করতো। বলতো— আমাদের দেহ হাড়গোড়ে পরিণত ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো?

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লোহা'। এই আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা চলে গিয়েছে পরবর্তী আয়াতেও (৫১)। বলা হয়েছে— 'অথবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন।' এভাবে সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলে দিন, অস্বীকার করলেও পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর পর তোমরা পাথর, লোহা অথবা অকল্পনীয় কোনো কিছুতে পরিণত হয়ে গেলেও তোমাদের পুনরুত্থান ঘটানো হবে।

এরপর বলা হয়েছে — 'তারা বলবে, কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে? বলো, তিনিই যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার মুখে পুনরুত্থানের অনিবার্যতার কথা শুনে অংশীবাদীরা বলবে, কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে? আপনি বলবেন, তিনিই যিনি

www.eelm.weebly.com

তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির দ্বিতীয় সংস্করণ নিশ্চয় প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা সহজ। অর্থাৎ অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দানের তুলনায় রূপান্তরিত অস্তিত্বের পুনরুজ্জীবন নিশ্চয় অতিসহজ।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা তোমার সম্মুখে মাথা নাড়বে ও বলবে, উহা কবে? বলো, হবে সম্ভবতঃ শীঘ্রই।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার যথার্থ যুক্তি শুনে পুনরুত্থান দিবসকে তারা অস্বীকার করার আর কোনো উপায় খুঁজে পাবে না। তখন তারা বলবে, ঠিক আছে। না হয় মানলাম— কিয়ামত, হাশর, নশর এসব কথা ঠিক। কিন্তু তা কখন সংঘটিত হবে? এ পর্যন্ত কোনো লোককেই তো আমরা পুনরুত্থিত হতে দেখলাম না। হে আমার রসুল! তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি বলুন, হবে। নিশ্চয়ই হবে। আবার সেই মহাদিবস মনে হয় খুব বেশী দূরেও নয়। এখানে 'সম্ভবতঃ শীঘ্রই' কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান সংঘটিত হবে অত্যল্প সময়ের মধ্যে। অথবা অর্থ হতে পারে এরকম— প্রথম সৃষ্টি থেকে দ্বিতীয় সৃষ্টি খুব বেশী দূরেও তো নয়।

এর পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সঙ্গে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে তোমরা অল্পকালই অবস্থান করবে।'একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জনতাকে জানিয়ে দিন, আমার হুকুমে ইস্রাফিল ফেরেশতা সেদিন তোমাদের কবর থেকে হিসাবের জন্য হাশর প্রান্তরের দিকে আহ্বান জানাবে। তখন তোমরা নিরূপায় হয়ে আমার প্রশংসা বর্ণনা করতে করতে উপস্থিত হবে সেখানে। আর তোমাদের তখন মনে হবে তোমরা অল্প সময়ের জন্য পৃথিবীতে অথবা পৃথিবী ও কবরে অবস্থান করেছিলে। কাতাদা বলেছেন, মহাবিচারের দিবসের তুলনায় পৃথিবীর জীবনকালকে মনে হবে অত্যন্ত নগণ্য।

এখানে 'তোমরা প্রশংসার সঙ্গে তার আহ্বানে সাড়া দিবে' কথাটির অর্থ— তোমরা তখন বাস্তব অবস্থা স্বনয়নে অবলোকন করে অকুণ্ঠচিত্তে একথা স্বীকার করবে যে, আল্লাহ্ই সকল কিছুর একক স্রষ্টা ও পুনরুত্থানকারী। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, যেমন করে আল্লাহ্র একনিষ্ঠ আনুগত্যকারী তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করে, তোমরাও তেমনি প্রশংসা বচন উচ্চারণ করতে করতে উপস্থিত হবে হাশরের ময়দানে। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির লক্ষ্যস্থল ইমানদারগণ। তাঁরাই তখন আল্লাহ্র স্তব-স্তুতি করতে করতে অগ্রসর হবে বিচারের ময়দানের দিকে। কাফেরেরা আল্লাহ্র স্তব-স্তুতির কথা মুখেই আনবে না। কেবল উচ্চারণ করতে থাকবে 'হায় হায়' 'হায় হায়' এবং বলবে— 'হায়। এটা তো সেই ঘটনা, আল্লাহ্ যার কথা পূর্বাহ্নে জানিয়েছিলেন। রসুলগণ তো ঠিকই বলেছিলেন। আক্ষেপ! আমরা তো আল্লাহ্র বিধানের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছিলাম।' বিশ্বাসীগণ সমুত্থিত হবে একথা বলতে বলতে— হায়, হায়। কে আমাদেরকে স্বপ্নবিভোর নিদ্রাস্থল থেকে সমুত্থিত করলো।

www.eelm.weebly.com

খাত্তালী তাঁর 'আদদীবাজ' নামক গ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে জিবরাইল জানিয়েছেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমা মৃত্যুর সময়, কবর জীবনে এবং পুনরুত্থানকালে শান্তিপ্রদায়ক হবে। ভ্রাতা মোহাম্মদ! সেদিনের অবস্থা হবে আশ্চর্যজনক। বিশ্বাসীরা তাদের আপনাপন সমাধি থেকে মাথা ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াবে এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ও আলহামদুলিল্লাহ্' বলতে বলতে পা বাড়াবে হাশরের ময়দানের দিকে। তাদের চেহারা হবে তখন শুভ্র ও উজ্জ্বল। আর অবিশ্বাসীরা তখন বলবে, হায় আফসোস! আমি যথাকর্তব্য পালনে অবহেলা করেছি। তাদের মুখমণ্ডল তখন হবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

হজরত ইবনে ওমর থেকে তিবরানী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমায় প্রত্যয় স্থাপনকারী মৃত্যুকালে, কবরে ও পুনরুত্থান দিবসে থাকবে নিরাপদ। যেনো ওই দৃশ্যটি আমার চোখের সামনে— দ্বিতীয় শিঙ্গা-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসীরা তাদের স্ব স্ব সমাধি থেকে মাথা ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াচ্ছে আর বলছে 'আলহামদুলিল্লাহিল্ লাজী আযহাবা আন্নাল হাযানা'। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

কালাবীর বর্ণনায় এসেছে, যখন ইসলামের উন্মেষ ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে শুরু করলো, তখন অংশীবাদীরা সংখ্যালঘু মুসলমানের উপরে শুরু করে দিলো অকথ্য অত্যাচার। নির্যাতিত সহচরবৃন্দ রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে সংকট মুক্তির জন্য নিবেদন জানালো। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৫৩, ৫৪, ৫৫

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ

بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۞ رَبُّكُمْ

اَعْلَمُ بِكُمْ ؕ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ؕ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ

عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۞ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ

فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۞

❐ আমার দাসদিগকে যাহা উত্তম তাহা বলিতে বল। শয়তান উহাদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

www.eelm.weebly.com

❒ তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগকে ভালভাবে জানেন। ইচ্ছা করিলে তিনি তোমাদিগের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে শাস্তি দেন; আমি তোমাদিগকে উহাদিগের অভিভাবক করিয়া পাঠাই নাই।

❒ যাহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তাহাদিগকে তোমার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন। আমি তো নবীগণের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়াছি; দাউদকে আমি জবুর দিয়াছি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমার দাসদেরকে যা উত্তম তা বলতে বলো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার পার্শ্বচরগণকে ইসলাম প্রচার করতে বলুন নম্রতা, শুভমনোবৃত্তি ও হৃদয়স্পর্শী যুক্তির মাধ্যমে। পরিহার করতে বলুন উগ্রতা ও মূর্খজনোচিত বিতর্ক। হাসান বলেছেন, অংশীবাদীদেরকে বলতে হবে, আল্লাহ্ আপনাকে সোজা পথ প্রদর্শন করুন। উল্লেখ্য যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে জেহাদের অনুমতি প্রদানের পূর্বে।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। জনৈক অংশীবাদী তাঁকে গালি দিয়েছিলো। এই আয়াতের মাধ্যমে হজরত ওমরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তাকে ক্ষমা করার জন্য। কোনো কোনো আলেম বলেছেন এখানে 'যা উত্তম' বলে বুঝানো হয়েছে কলেমায়ে এখলাস ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্কে। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনাটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। অর্থাৎ এখানে সকল মুসলমানকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে— ওই কথা বলবে যা সর্বোত্তম এবং ওই আচরণ অবলম্বন করবে যা সর্বোন্নত।

এরপর বলা হয়েছে— 'শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।' একথার অর্থ— শয়তান মানুষে মানুষে শুরু করায় দ্বন্দ্ব-কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ। সে তো মানুষের নিশ্চিত শত্রু। কুপ্ররোচনায় মানুষকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাওয়াই তার কাজ। সুতরাং সতর্ক হতে হবে। কথা বলতে হবে সাবধানে। চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়হারক ভাষায়। যেনো শত্রু শয়তান প্ররোচিত করার কোনো ফাঁকফোকড় খুঁজে না পায়।

পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ভালোভাবে জানেন। ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেন।' ইবনে জুরাইজ বলেছেন, এই আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের 'যা উত্তম তা বলতে বলো' কথাটির ব্যাখ্যা। মধ্যবর্তী কথাগুলো ভিন্ন প্রসঙ্গের। এভাবে ব্যাখ্যা করলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি অবিশ্বাসীদেরকে বলুন 'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক

www.eelm.weebly.com

পরিজ্ঞাত।' আপনার একনিষ্ঠ অনুচরবর্গকেও এরকম বলতে নির্দেশ দিন। তাদেরকে গালিগালাজ করা ও তাদের মূর্খতাসুলভ কথাবার্তার জবাব দেয়াও ঠিক নয়। স্পষ্ট করে একথাও বলা ঠিক নয় যে, 'তোমরা দোজখী।' এতে করে কলহ বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া একথাও তো কারো জানা নেই যে, তারা জীবন সমাপন করবে কিসের উপরে? অবিশ্বাসে না বিশ্বাসে। এরকম হওয়াও তো সম্ভব যে, মৃত্যুর পূর্বে যে কোনো সময় তারা হয়ে যাবে ইমানদার। এ জ্ঞান তো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নেই।

কালাবী বলেছেন, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে বিশ্বাসীদেরকে। সেক্ষেত্রে মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্তায়ালা কোনো কিছু করতে বাধ্য নন। অভিপ্রায় ও ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি চিরস্বাধীন, চিরমুক্ত। সেকথাই এখানে দ্ব্যর্থহীনতার সঙ্গে জানিয়ে দেয়া হয়েছে এভাবে— ইচ্ছে করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, আবার ইচ্ছে করলে প্রদান করবেন শাস্তি। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে অংশীবাদীদের উপরে বিজয়ী করে দিবেন, অথবা ইচ্ছে করলে তোমাদের উপরে প্রবল করে দিবেন তাদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি আপনাদেরকে তাদের অভিভাবক করে পাঠাইনি।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি তো আপনাকে এবং আপনার অনুচরগণকে এমতো দায়িত্ব দান করিনি যে, আপনারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে জোর করে মুসলমান বানাবেন বা বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবেন। আপনি তো কেবল শুভসমাচার প্রদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী। পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তো আমার। সুতরাং আশ্রয় করুন বিনম্র বচন ও সুন্দর আচরণকে। সাথীদেরকেও এরকম নির্দেশ দিন। আর তাদের দিক থেকে আগত কষ্ট-বিপদকে মোকাবিলা করতে বলুন ধৈর্যের মাধ্যমে।

এর পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে, তাদেরকে তোমার প্রতিপালক ভালোভাবে জানেন।' একথার অর্থ— আকাশ ও পৃথিবীতে যারা বা যা কিছু আছে, তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। কারণ তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা ও পালনকর্তা। তিনি জানেন মানুষের মধ্যে কে নবুয়তের যোগ্য এবং কে যোগ্য বেলায়েতের। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানই বা কার অনড় অদৃষ্টলিপি।

মক্কার মুশরিকেরা বিস্মিত হয়ে বলতো, আবু তালেবের এতিম ভ্রাতুষ্পুত্র আবার নবী হতে পারে কীভাবে? কীভাবে বেলাল ও সুহাইবের মতো ক্রীতদাসেরা হতে পারে আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন। আর বেহেশত-দোজখ যদি থেকেই থাকে, তবে মক্কার অভিজাত কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ নারকী হবে কেনো? তাদের এমতো অপকথনের যথোপযুক্ত জবাব দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বলা হয়েছে,

www.eelm.weebly.com

বংশগত ও সম্পদগত আভিজাত্য মানুষের প্রকৃত যোগ্যতার মাপকাঠি নয়, যার কারণে চিরস্থায়ী কল্যাণ লাভ করা যায়। বরং মানুষের প্রকৃত যোগ্যতা সম্পর্কে জানেন কেবল আল্লাহ্। জানেন, কে সূচনাগত দিক থেকে চিরসৌভাগ্যশালী এবং কে চিরবঞ্চিত।

এরপর বলা হয়েছে—'আমি তো নবী-গণের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি।' একথার অর্থ স্বভাবগত ও প্রবৃত্তিগত দিক দিয়ে আমি আমার নবীগণকে মর্যাদায়িত করেছি এবং তাদের পার্থিব শরীরকেও করেছি পবিত্র ও নিষ্পাপ। তাই শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিভূ তাঁরাই। পার্থিব ধন-সম্পদ ও আভিজাত্য কখনোই শ্রেষ্ঠত্বের স্মারক নয়। আর আমি নবীগণের মধ্যেও মর্যাদার ন্যূনাধিক্য ঘটিয়েছি। কাউকে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি কারো কারো উপর। তাই সকলেই শ্রেষ্ঠ হলেও কেউ কেউ আবার অন্যাপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ।

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর ব্যপদেশে কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর কোনো কোনো নবীকে বিশেষভাবে মর্যাদায়িত করেছেন। যেমন হজরত ইব্রাহিমকে করেছেন খলিল(বন্ধু)। হজরত মুসার সঙ্গে করেছেন বাক্যালাপ। হজরত ঈসাকে সৃষ্টি করেছেন পিতা ব্যতিরেকে, কেবল 'কুন' (হও) আদেশের মাধ্যমে। আমি বলি, হজরত ঈসাকে আরো অনেক ফযীলত দান করেছেন আল্লাহ্তায়ালা। যেমন তাঁকে দিয়েছিলেন দুগ্ধপোষ্য শিশু অবস্থায় কথা বলার শক্তি। দিয়েছিলেন কিতাব ও হেকমত। তওরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞান। রূহুল কুদুসকে (হজরত জিবরাইলকে) করে দিয়েছিলেন তাঁর সাহায্যকারী। কাতাদা আরো বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত সুলায়মানকে দান করেছিলেন এক বিস্ময়কর সাম্রাজ্য। মানুষ-জ্বিন সকলেই ছিলো তাঁর আজ্ঞাবহ। জ্বিনদেরকে তিনি বন্দী করে রাখতে পারতেন। আর তিনি হজরত দাউদকেও দান করেছিলেন বিশেষ সম্মান। দিয়েছিলেন যবুর।

শেষে বলা হয়েছে— 'দাউদকে আমি যবুর দিয়েছি।' উল্লেখ্য যে, হজরত দাউদকেও আল্লাহ্তায়ালা বানিয়েছিলেন রাজ্যাধিকারী। কিন্তু সেকথা এখানে বলা হয়নি। বলা হয়েছে কেবল যবুর কিতাব প্রদানের কথা।

মক্কার অংশীবাদীরা পার্থিব বিত্ত-বৈভব ও সামাজিক নেতৃত্ব-কর্তৃত্বকেই মনে করতো প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব। এসকল কিছু রসুল স. এর ছিলো না বলেই তারা রসুল স.কে নবী বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত ছিলো। আলোচ্য আয়াতে শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাদের অপধারণাকে নাকচ করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে জ্ঞান ও হেকমতই হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। আর এই শ্রেষ্ঠত্ব তিনি দিয়েছেন তাঁর বার্তাবাহকগণকে। তাঁদের মধ্যে আবার কাউকে কাউকে দিয়েছেন বিশেষ ফযীলত। যেমন নবী দাউদকে দিয়েছেন যবুর নামের আকাশী গ্রন্থখানি। এভাবে পরোক্ষভাবে বলে দিয়েছেন যে, সর্বশেষের রসুল ও তাঁর উপরে অবতীর্ণ কোরআনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। আর সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের উম্মতেরাও সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। কেননা যবুর কিতাবে বলা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে— জমিনের উত্তরাধিকারী হবে 'আসহাবে সিলাহ' (বিশুদ্ধাচারী সহচর)। কোরআন মজীদ পূর্ববর্তী সকল কিতাবের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কারণ জ্ঞান, কল্যাণ ও অলৌকিকত্বের সমারোহ এই কিতাবে অধিক। আর যাঁর উপরে এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তিনিও আল্লাহ্তায়ালার সর্বাপেক্ষা অধিক নৈকট্যভাজন ও প্রিয়জন। তাই আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং বলেছেন— 'তৎপর সে হলো নিকটবর্তী, আরো নিকটতর, দুই ধনুকের জ্যা পরিমাণ নিকটে, বরং তদপেক্ষা কম।'

বাগবী লিখেছেন, যবুর অবশ্যই আল্লাহ্র কিতাব, যা অবতীর্ণ হয়েছিলো আল্লাহ্র প্রিয় নবী হজরত দাউদের উপরে। যবুর শরীফে ছিলো একশত পঞ্চাশটি সুরা। সবগুলো সুরাই ছিলো আল্লাহ্তায়ালার স্তব-স্তুতি ও প্রার্থনার ভাষায় ভরপুর। হালাল-হারাম, ফরজ-ওয়াজিব ইত্যাদি বিধানের আলোচনা সেখানে একেবারেই ছিলো না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ইসলামপূর্ব সময়ে কোনো কোনো লোক কোনো কোনো জ্বিনের পূজা করতো। ইসলাম আগমনের পর ওই সকল জ্বিন মুসলমান হয়ে গেলো। তবুও তাদের পূজকেরা তাদের পূজা-অর্চনা করেই যেতে লাগলো। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৫৬, ৫৭

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝

❒ বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ইলাহ্ মনে কর তাহাদিগকে আহ্বান কর; করিলে দেখিবে তোমাদিগের দুঃখ-দৈন্য দূর করিবার অথবা পরিবর্তন করিবার শক্তি উহাদিগের নাই।'

❒ উহারা যাহাদিগকে আহ্বান করে তাহাদিগের মধ্যে যাহারা নিকটতর তাহারাই তো তাহাদিগের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে, তাঁহার দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁহার শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল জ্বিন-পূজারীদের বলে দিন, তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদের পূজা করে, তাদের কারো

www.eelm.weebly.com

দুঃখ-দারিদ্র দূর করার অথবা কারো কোনো প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা নেই। তারাও তাদের পূজারীদের মতো সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর ও একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী।

পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তাদের মধ্যে যারা নিকটতর, তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে।' একথার অর্থ জ্বিনপূজকেরা যে সকল জ্বিনের পূজা করে, সে সকল জ্বিন তো এখন গ্রহণ করেছে মহান ধর্ম ইসলাম। এখন তো তারা ইমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্পাকের নৈকট্য ও পারিতোষ প্রত্যাশী। কোনো কোনো আলেম বলেন, 'ওয়াসীলাহ্' সীন সহযোগে (উপলক্ষ) হচ্ছে সুনির্দিষ্ট। আর ওয়াছীলাহ্ সদ্ সহযোগে (মিলিত) হচ্ছে সাধারণ। এই সাধারণ 'ওয়াসীলা'র অর্থ একে অপরের সঙ্গে মিলিত হওয়া। আর আলোচ্য বাক্যে উল্লেখিত 'ওয়াসীলা' অর্থ আবেগ বা অনুরুক্তির মাধ্যমে কোনো স্থানে বা অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া। 'ওয়াসীলা ইলাল্লহ্' এর অর্থ এলেম ও আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র পথের সুরক্ষা করা এবং কায়মনোবাক্যে শরিয়তের বিধান প্রতিপালনের ইচ্ছা ও চেষ্টা করা। এভাবে 'ওয়াসীলা ইলাল্লাহ্' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের উপায় অনুসন্ধান। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'ওয়াসীলা' ও 'ওয়া-সেলা' অর্থ বাদশাহ্র দরবারের বিশেষ মর্যাদা ও নৈকট্য। এভাবে 'ওয়াস্সালা ইলাল্লহি তাওয়াস্সালা' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— সে এমন আমল করেছে, যার দ্বারা সে পৌঁছে গিয়েছে আল্লাহ্র নৈকট্যভাজনতার স্তরে।'আইয়্যুহুম আক্বরাবু' অর্থ তাদের মধ্যে যারা নিকটতর। এভাবে সম্পূর্ণ বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তাদের মধ্যে যারা অধিকতর নৈকট্যভাজন, তারা আল্লাহ্তায়ালার আরো অধিক নৈকট্যলাভের 'ওয়াসীলা' বা উপায় অন্বেষণ করে। অতএব যারা নৈকট্যভাজন নয়, তাদের অবস্থা সহজে অনুমেয়। এরকম বলেছেন জুজায। কোনো কোনো তাফসীরকার আবার বলেছেন, এখানকার বক্তব্যটি হবে এরকম— তারা এমন ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধান করে, যারা আল্লাহ্তায়ালার সর্বাপেক্ষা অধিক নৈকট্যশীল। অথবা বক্তব্যটির মর্ম হতে পারে এরকম— তারা আল্লাহ্তায়ালার অধিকতর নৈকট্যকামী। অর্থাৎ আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের জন্য তারা উচ্চাশা পোষণকারী, একনিষ্ঠ আনুগত্যের মাধ্যমে অধিকতর নৈকট্যপ্রত্যাশী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।' একথার অর্থ— ওই সকল জ্বিন ইসলাম গ্রহণের কারণে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যলাভ করা সত্ত্বেও আরো অধিক নৈকট্য অর্জনের উপায় অনুসন্ধান তো করেই, তদুপরি তারা চায় আল্লাহ্র দয়া এবং ভয় করে তার শাস্তিকে। সুতরাং অংশীবাদীরা কোন যুক্তিতে তাদের উপাসনা করতে চায়?

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জ্বিনপূজক অংশীবাদীদেরকে জানিয়ে দিন, আল্লাহ্‌তায়ালা আনুরূপ্যবিহীন প্রতাপ ও পরাক্রমের অধিকারী। তাই তার প্রিয়ভাজন নবী-রসুলগণ ও ফেরেশতাকুলও তাঁকে ভয় করে থাকেন। তবে তোমরা তাঁকে ভয় করবে না কেনো?

বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য বক্তব্যের অর্থ— হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমরা ফেরেশতা, জ্বিন, মসীহ, উযায়ের— অনেককেই তো তোমাদের উপাস্য স্থির করে নিয়েছো। কিন্তু তারা কেউই তোমাদেরকে এরকম বলেননি। তারা তো সম্পূর্ণতই আমার উপর নির্ভরশীল। তারা যে আমার খাঁটি বান্দা। তারা তো চায় কেবল আমার নৈকট্য ও সন্তোষ।

হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন, হজরত ঈসা, তাঁর মহাসম্মানিতা জননী, হজরত উযায়ের, ফেরেশতাকুল, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা সকল কিছুই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য ওয়াসীলা অন্বেষণকারী, কেবল তাঁর দয়া প্রত্যাশা এবং কেবল তাঁর শাস্তিকে ভয়কারী। প্রকৃত অবস্থা যখন এই, তখন অংশীবাদীরা কীভাবে তাদেরকে তাদের প্রভুপ্রতিপালকরূপে গ্রহণ করে?

বাগবী লিখেছেন, একবার মক্কাবাসীরা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হলো। অবস্থা এতো সঙ্গীন হয়ে পড়লো যে, মৃত পশুর গোশত ভক্ষণ করেও ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবারণ করতে হলো তাদেরকে। নিরুপায় হয়ে তারা রসুল স. এর নিকটে হাজির হলো প্রার্থনার প্রস্তাব নিয়ে। তখন অবতীর্ণ হলো— 'আপনি অংশীবাদীদেরকে বলুন, আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে যে জ্বিনগুলোর ইবাদত তোমরা করো, তাদের কাছেই সাহায্যপ্রার্থী হও, তারা তো তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার শক্তি রাখে না।'

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৫৮

وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُورًا

□ এমন কোন জনপদ নাই যাহা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করিব না অথবা যাহাকে কঠোর শাস্তি দিব না; ইহা তো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এমন কোনো জনপদ নেই, যা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করবো না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দিবো না।' একথার অর্থ— মহাপ্রলয়ের দিন অথবা তৎপূর্বেই আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও স্বেচ্ছাচারীদের সকল জনপদ বিনাশ করবো। অথবা তাদেরকে প্রদান করবো কঠোর শাস্তি। মুকাতিল প্রমুখ বলেছেন, এখানে ধ্বংস করার অর্থ মেরে ফেলা।

www.eelm.weebly.com

অর্থাৎ ওই সকল জনপদের লোকদের মধ্যে যারা ইমানদার তাদের ঘটাবো সাধারণ মৃত্যু, আর যারা কাফের তাদের উপরে বারংবার আপতিত করবো বিভিন্ন রকমের গজব।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, যে সকল জনপদে সুদ ও অবৈধ যৌনাচারের ব্যাপক প্রচলন হয়, ওই সকল জনপদকে আল্লাহ্তায়ালা ধ্বংস করে দেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা তো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।' এখানে কিতাব অর্থ লওহে মাহফুজ। হজরত উবাদা ইবনে সামেত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ্ সৃষ্টি করলেন কলমকে। তারপর তাকে লক্ষ্য করে বললেন, লেখো। কলম বললো, কী লিখবো? আল্লাহ্ বললেন, তকদীর। কলম তখন আদি অন্তের সকল ঘটিতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করলো। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি। তিনি আরো বলেছেন, হাদিসটি দুস্প্রাপ্য।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী ও হাকেম এবং হজরত ইবনে যোবায়ের থেকে তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার মক্কাবাসীরা রসুল সকাশে হাজির হয়ে বললো, মোহাম্মদ! সত্যিই যদি তুমি নবী হয়ে থাকো তবে তার প্রমাণ স্বরূপ সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দাও এবং নিকটবর্তী অন্যান্য পাহাড়কে সরিয়ে মক্কাসংলগ্ন এলাকাকে করে দাও সমতলভূমি। আমরা ওই বিস্তীর্ণ সমভূমিতে আবাদ করবো ফল ও ফসল। তাদের এমতো আবদারের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে জানালেন, আপনি যেমন চান তেমনই হবে। যদি চান, তাদের বাসনা পূরণ না হোক, তবে তাই করবো আমি। আর যদি চান, তাদের অভিলাষ ফলবতী হোক, তবে তাও করবো। কিন্তু তাদের অভিলাষ বাস্তবায়নের পর যদি তারা ইমান না আনে, তবে তাদেরকে ধ্বংস করে দিবো পূর্ববর্তী যুগের অবাধ্যদের মতো। রসুল স. বললেন, হে আমার আল্লাহ্! তাদেরকে অবকাশ দেয়া হোক। তাদের বাসনা পূরণ না হওয়াই উত্তম। রসুল স. এর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৫৯, ৬০

وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ؕ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ۝ وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ ؕ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ۝

www.eelm.weebly.com

❐ পূর্ববর্তিগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হইতে বিরত রাখে। আমি স্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ সামূদের নিকট উষ্ট্রী পাঠাইয়াছিলাম, অতঃপর তাহারা উহার প্রতি জুলুম করিয়াছিল। আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।

❐ স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখাইয়াছি তাহা ও কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি উহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করি কিন্তু ইহা উহাদিগের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা থেকে বিরত রাখে।' একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা পূর্ববর্তী যুগের মুশরিকদের মতোই অবিমৃশ্য, উন্নাসিক ও গোঁয়ার। তাদের পূর্বসূরীরা তাদের নবী-রসুলগণের নিকটে বিভিন্ন মোজেজা দেখতে চেয়েছিলো। এরাও সেরকম চায়। তাদের পূর্বসূরীরা মোজেজা দেখেও ইমান আনেনি। তাই তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। এখন যদি আমি মোজেজার প্রকাশ ঘটাই তবে এরাও মোজেজার অবমাননা করবে। ফলে পূর্ববর্তীদের মতোই ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আমার আখেরী নবীর উম্মতকে ধ্বংস করা আমার অভিপ্রায় নয়। তাই এদের অপঅভিলাষ পূরণ করা থেকে আমি বিরত রইলাম।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি স্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ ছামুদের নিকট উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা তার উপর জুলুম করলো।' একথার অর্থ— ছামুদ সম্প্রদায় তাদের নবী হজরত সালেহের নিকটে চেয়েছিলো প্রস্তরাগত অলৌকিক উষ্ট্রী। আমি সে উষ্ট্রী তাদেরকে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা সে উষ্ট্রটিকে হত্যা করে ফেলেছিলো। এভাবে হয়েছিলো আত্মঅত্যাচারের অপরাধে অপরাধী। যথোপযুক্ত শাস্তিও তারা পেয়েছিলো এজন্যে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।' একথার অর্থ— মোজেজা বা নিদর্শন হচ্ছে ভয় প্রদর্শন করা। অর্থাৎ অলৌকিকত্ব দর্শনে ভীত হয়ে মানুষ যেনো সত্যধর্মে ফিরে আসে, আমি মোজেজার প্রকাশ ঘটাই সে উদ্দেশ্যেই। এরপরেও ভীত না হলে সমূলে বিনাশ করি তাদেরকে। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— হে আমার রসুল! আপনার সমকালীন ও অনাগত জনগোষ্ঠিকে ভীতি প্রদর্শনের জন্যই আমি কোরআনে সন্নিবেশিত করেছি পূর্ববর্তী যুগের মোজেজাসমূহের বিবরণ।

পরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! স্মরণ করুন, আমি আপনাকে পূর্বাহ্নেই এ কথা জানিয়ে দিয়েছি যে, আপনার বিরুদ্ধবাদীদের শাস্তি নিশ্চিত। আল্লাহ্‌তায়ালার মহা-

www.eelm.weebly.com

পরাক্রমের অভেদ্য বেষ্টনী দ্বারা তারা সতত পরিবেষ্টিত। এখানে 'আন্নাস্' (মানুষকে) কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মক্কার মুশরিকদেরকে। আর 'পরিবেষ্টন করে আছেন' অর্থ তাদেরকে অবধারিত আযাবের সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিবেষ্টন করে আছেন। এভাবে এখানে দেয়া হয়েছে বদর প্রান্তরের ধ্বংস হওয়ার সুসংবাদ। তাই হয়েছিলো। বদর যুদ্ধে তাদের অনেকে হয়েছিলো নিহত অথবা বন্দী। অবশিষ্টরা পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে এসেছিলো পালিয়ে। ওই ঘটনাটি সুনিশ্চিত ছিলো। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালের শব্দরূপ। অর্থাৎ যেনো তা ঘটেই গিয়েছে।

আবু ইয়ালীর বর্ণনায় হজরত উম্মে হানী থেকে এবং ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় হাসান বসরী সূত্রে এসেছে, রহস্যাচ্ছন্ন মেরাজের রাত্রি অবসান হলো। সকালে রসুল স. কুরায়েশদের এক সমাবেশে মেরাজের ঘটনা জানালেন। তারা রসুল স. এর কথা হেসে উড়িয়ে দিলো তারা। কেউ কেউ আবার বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করে, সত্যাসত্য যাচাই করে দেখলো। জানতে চাইলো বায়তুল মাকদিসের বিবরণ, তাদের মক্কাভিমুখী কাফেলার সংবাদ ইত্যাদি। রসুল স. তাদের সকল প্রশ্নের সঠিক জবাব দিলেন। বিস্মিত ও অভিভূত ওলীদ বিন মুগীরা তখন বলে উঠলো, এ লোক নিশ্চয় যাদুকর। তখন অবতীর্ণ হলো আয়াতের পরবর্তী বাক্যটি।

বলা হলো— 'আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কোরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য।' একথার অর্থ— আমি মেরাজের ঘটনাকে এবং দোজখের অভিশপ্ত 'যাক্কুম' বৃক্ষকে বানিয়েছি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য ফেৎনা বা পরীক্ষা। অর্থাৎ এ দু'টোকে যারা বিশ্বাস করে তারা ইমানদার। আর যারা অবিশ্বাস করে তারা কাফের।

উল্লেখ্য যে, মেরাজের ঘটনা প্রকাশ করার পর মক্কার অংশীবাদীরা তো অস্বীকার করেছিলোই, তাদের সতীর্থ হয়েছিলো কিছুসংখ্যক দুর্বল বিশ্বাসীও। এভাবে বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদের স্পষ্টরূপে পৃথক করা হয়েছিলো অবিশ্বাসীদের থেকে। এখানে 'রু'ইয়া' (দর্শন) কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর মেরাজ হয়েছিলো স্বপ্নের মাধ্যমে। বোখারীর বর্ণনায় তাই এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. এর মেরাজ হয়েছিলো রূহানীভাবে, সশরীরে নয়। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'রু'ইয়া' অর্থ চর্মচক্ষের দর্শন। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, হাসান বসরী, মাসরুক, কাতাদা, মুজাহিদ, ইকরামা, ইবনে জুরাইজ এবং অধিকাংশ আলেম এই অভিমতই পোষণ করেন। আরববাসীরা বলে 'রআইতু বিআইনী রু'ইয়াতান (আমি স্বচক্ষে দেখেছি)। এবং 'রুইয়ান' কথা দু'টোর অর্থও— আমি নিজ চোখে দেখেছি। 'রুইয়াত্' ও 'রুইয়া' শব্দ দু'টো সমার্থক। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, রসুল স. এর মেরাজ হয়েছিলো দু'বার— একবার রূহানীভাবে, আর একবার সশরীরে।

www.eelm.weebly.com

জ্ঞাতব্যঃ হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি হাকাম বিন আসের সন্তানদেরকে মিম্বরের উপরে বানরনৃত্য করতে দেখেছি। তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে 'আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কোরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষকে পরীক্ষা করবার জন্য'। এখানে হাকামের সন্তানদের ফেৎনা বা পরীক্ষার কথাই বলা হয়েছে। তার পুত্র মারওয়ান ও প্রপৌত্র আবদুল মালেক পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রক্ষমতা পেয়েছিলো। তাদের ওই ক্ষমতান্মোত্ততার দৃশ্যই রসুল স.কে স্বপ্নযোগে দেখানো হয়েছিলো। হজরত সহল ইবনে সা'দ, হজরত ইয়ালী ইবনে মুররাহ্, হজরত হোসাইন ইবনে আলী, উম্মত জননী হজরত আয়েশা এবং হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

হজরত ইমাম হোসাইন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একদিন সকালে রসুল স.কে চিন্তাক্লিষ্ট দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি স. বললেন, আমি দেখলাম আমার এই মিম্বরে বনী উমাইয়ারা পালাক্রমে উপবেশন করছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! চিন্তিত হবেন না। এটা তো দুনিয়া। দুনিয়াতেই তারা তাদের প্রাপ্য পেয়ে যাবে। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতের এই অংশটি— আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা ও কোরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। অতএব বুঝতে হবে, এখানকার 'ফেৎনা '(পরীক্ষা) কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে বনী উমাইয়ার শাসনকালের বিভিন্ন বেদাত, অশ্লীলতা ও বিশৃঙ্খলার কথা।

হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকে ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, রসুল স. একবার স্বপ্নে দেখলেন, বনী উমাইয়ারা বিসদৃশভাবে একের পর এক তাঁর মিম্বরে গমনাগমন করছে। এ স্বপ্ন দেখে তিনি স. বিমর্ষ হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতাংশ।

হজরত আমর বিন আস থেকে ইবনে আবী হাতেম, হজরত ইয়ালী বিন মাররাহ থেকে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া এবং হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে অবিন্যস্ত সূত্রে বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, একবার রসুল স. স্বপ্নে বনী উমাইয়াকে তার মিম্বরে একের পর এক আরোহণ করতে দেখলেন। ফলে তিনি হয়ে পড়লেন বিষণ্ন ও মনোক্ষুণ্ন। আল্লাহ্ তখন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানালেন, পরবর্তীতে তাদেরকে শাসন ক্ষমতা দেয়াই আল্লাহ্র ইচ্ছা। একথা জানতে পেরে তিনি স. স্বস্তিবোধ করলেন (কারণ তিনি স. ছিলেন আল্লাহ্র সিদ্ধান্তে সদাপ্রসন্ন)। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ের সকল হাদিস শিথিলসূত্রবিশিষ্ট।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'আররু'ইয়া' অর্থ ওই স্বপ্ন, যা রসুল স. দেখেছিলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদনের বছরে। দেখেছিলেন, তিনি স. তাঁর সহচরবৃন্দ সমভিব্যাহারে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করছেন। এই স্বপ্ন দেখার

www.eelm.weebly.com

পরই তিনি স. সাহাবীগণকে নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু হুদায়বিয়া থেকে সম্মুখে আর অগ্রসর হতে পারেননি। মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি সম্পাদনের পর তাঁকে মদীনায় ফিরে আসতে হয়েছিলো। ওই ঘটনাটি ছিলো কিছু সংখ্যক দুর্বলচিত্ত বিশ্বাসীদের জন্য একটি পরীক্ষা। পরের বছর তিনি ঠিকই মক্কায় গমন করতে পেরেছিলেন। আর তখন অবতীর্ণ হয়েছিলো— 'লাক্বদ্ সাদাক্বল্লাহু রসুলাহুর্‌রু'ইয়া বিলহাক্ব' (আল্লাহ্ তাঁর রসুলের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে দেখালেন)। বায়যাবী লিখেছেন, এই বর্ণনাটি গ্রহণ করলে একটি সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। সন্দেহটি এই— আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কিন্তু হুদায়বিয়ার ঘটনা ঘটেছিলো হিজরতের পরে। তবে একটি কথা মেনে নিলে সন্দেহ আর থাকে না। তা হচ্ছে— স্বপ্নটি তিনি মক্কাতেই দেখেছিলেন। কিন্তু বর্ণনা করেছিলেন হিজরতের পরে— মদীনায়। আমি বলি, একথাটিও ঠিক নয়। কারণ বায়যাবী এ কথাও লিখেছেন যে, আলোচ্য স্বপ্নের সম্পর্ক রয়েছে বদর যুদ্ধের সঙ্গে। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে— 'ওয়া ইজ ইউরিকাহুমুল্লহু ফী মানামিকা ক্বলীলা।' এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বদর প্রান্তরে বৃষ্টির জমানো পানিতে অবতরণ করলেন। বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, মুশরিকেরা কোন কোন স্থানে নিহত হবে। একথা বলে তিনি মুশরিক নেতাদের নাম ধরে ধরে তাদের নিহত হওয়ার স্থান দেখিয়ে দিতে লাগলেন। একথা যখন মুশরিক বাহিনীর লোকেরা শুনলো, তখন তারা এই নিয়ে উপহাস করতে লাগলো।

'শাজারাতাল মাল্‌উ'নাহ্' অর্থ অভিশপ্ত বৃক্ষ বা যাক্কুম বৃক্ষ। অর্থাৎ ওই বৃক্ষটি মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা। এ পরীক্ষার স্বরূপ রয়েছে দু'টি— ১. আবু জেহেল একবার বললো, হে মক্কাবাসী! শোনো, মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ তোমাদেরকে এমন আগুনের ভয় দেখায় যা পাথরকেও পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। কিন্তু সে আবার একথাও বলে যে, ওই অগ্নিকুণ্ডে থাকবে নাকি একটি বৃক্ষ। তা হলে বোঝো কী রকম উল্টাপাল্টা কথা সে বলে। নিঃসন্দেহে আবু জেহেলের এরকম মন্তব্য চরম পর্যায়ের মূর্খতার নিদর্শন ছাড়া অন্য কিছু নয়। পৃথিবীতেই এরকম অনেক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন সামান্দল নামক এক প্রকার পাখির পিঠের চামড়া আগুনে পোড়ে না। আবার উট পাখি ভক্ষণ করতে পারে উত্তপ্ত লৌহখণ্ড। এতে করে তার গলা,পাকস্থলি কোনোটাই জ্বলে না। যে আল্লাহ্ পৃথিবীতে এরকম নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি দোজখে দহনক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত কোনো বৃক্ষ সৃষ্টি করতে পারবেন না? তাফসীরে মাদারেক রচয়িতা লিখেছেন, তুর্কিস্তানের এক প্রকার ছোট প্রাণীর নাম সামান্দল। ওই প্রাণীটির চামড়া দিয়ে রুমাল বানানো হয়। রুমাল ময়লা হয়ে গেলে তা আগুনে ফেলে

www.eelm.weebly.com

দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। আর রুমালের ময়লা আগুনে পোড়ে। কিন্তু রুমাল পোড়ে না। বরং পরিষ্কার হয়ে যায়। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, সামান্দল আরবের এক শ্রেণীর পাখি; যা আগুনে পোড়ে না। পাখিটির বৈশিষ্ট্য হলো তার বাসস্থান অগ্নিতে। আগুন থেকে বের হলেই প্রাণত্যাগ করে। ২. ইবনে যাবআরী একবার বললো, মোহাম্মদ আমাদেরকে যাক্কুমের ভয় দেখায়। কিন্তু আমরা তো যাক্কুম বলি মাখন ও খেজুরকে। এছাড়া যাক্কুমের অন্য কোনো অর্থ আমাদের জানা নেই। এরকম বলে সে তার ক্রীতদাসীকে উচ্চ কণ্ঠে নির্দেশ দিলো— ইয়া জারিয়াতা তায়ালী যাক্কিমীনা (হে বাঁদী! আমার জন্য মাখন ও খেজুর নিয়ে এসো)। আবু জেহেলও তার সঙ্গে বলে উঠলো, হে মক্কাবাসী! তোমরা সকলে যাক্কুম ভক্ষণ করো। মোহাম্মদ তো তোমাদেরকে এই যাক্কুমেরই ভয় দেখায়। সুরা সাফ্ফাতে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

ইবনে আবী হাতেম এবং বায়হাকী আল্ বা'ছ নামক গ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন আল্লাহ্ অংশীবাদী কুরায়েশদেরকে যাক্কুমের ভয় দেখালেন, তখন আবু জেহেল তার অনুসারীদেরকে বললো, মোহাম্মদ তোমাদেরকে যাক্কুমের ভয় দেখায়। বলো দেখি যাক্কুম কী? লোকেরা বললো, আমরা তো জানি না। আবু জেহেল বললো, যাক্কুম হচ্ছে ইয়াসরেবের (মদীনার) উন্নতমানের খেজুর, যা মাখনের সঙ্গে মিলিয়ে খাওয়া হয়। অতএব ওই যাক্কুম যদি আমরা পাই, তাহলে তো আমরা তা বেশী বেশী করে খাবো। এরপর আবু জেহেল বললো, লানাতাযাক্কামান্নাহা তাযাক্কুমা (যাক্কুমের দ্বারা অবশ্যই আমি তাদেরকে তুষ্ট করবো)। এরপর অবতীর্ণ হয় ১. ওয়াশ্শাজারাতাল মাল্উ'নাতা ফীল্ কুরআন (আর কোরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ)। ২. ইন্নাশ্শাজারাতায্ যাক্কুমী ত্বআ'মূল্ আছীম (অবশ্যই যাক্কুম বৃক্ষ পাপীদের আহার্য)।

যাক্কুম বৃক্ষ অত্যন্ত ভয়ংকর। তাই এখানে ওই বৃক্ষকে বলা হয়েছে অভিশপ্ত বৃক্ষ। আর ওই বৃক্ষ হবে জাহান্নামের 'জাহীম' (অত্যুষ্ণ) এর মূল। আল্লাহ্র রহমত থেকে যারা সর্বাপেক্ষা অধিক দূরবর্তী, তাদের চিরস্থায়ী আবাস হবে ওই জাহীম। অথবা বলা যায় 'মাল্উ'নাতুন্' অর্থ ঘৃণ্য, ক্ষতিকর। এরকম ঘৃণ্য ও ক্ষতিকর বস্তু ভক্ষণকেই আরব দেশে বলা হয় মালউন বা অভিশপ্ত। কারো কারো মতে এখানে যাক্কুম কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে শয়তানকে অথবা আবু জেহেলকে কিংবা হাকাম বিন আসকে।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করি, কিন্তু তা তাদের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! পর্যবেক্ষণ করুন, আমি মুশরিকদেরকে ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে সত্যাভিমুখী করতে চাই। কিন্তু তারা চির অবাধ্য বলেই এতে করে তাদের অবাধ্যতা হয় আরো অধিক তীব্র।

www.eelm.weebly.com

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ قَالَ
ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ۝ قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ
عَلَيَّ ۡ لَىِٕنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ۝
قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاۗؤُكُمْ جَزَاۗءً
مَّوْفُوْرًا ۝ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ
عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَ
عِدْهُمْ ۭ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۝ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ
لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۭ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا

❒ স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাদিগকে বলিলাম, 'আদমের প্রতি নত হও,' তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই নত হইল। সে বলিয়াছিল, আমি কি তাহাকে সিজদা করিব যাহাকে আপনি কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?'

❒ সে বলিয়াছিল, 'বলুন, উহাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করিলেন, কেন? কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহা হইলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তাহার বংশধরগণকে সমূলে নষ্ট করিয়া ফেলিব।'

❒ আল্লাহ্ বলিলেন, 'যা, জাহান্নামই সম্যক শাস্তি তোর এবং তাহাদিগের যাহারা তোর অনুসরণ করিবে।

❒ 'তোর আহ্বানে উহাদিগের মধ্যে যাহাকে পারিস্ সত্যচ্যুত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা উহাদিগকে আক্রমণ কর এবং উহাদিগের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হইয়া যা, ও উহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দে,' শয়তান উহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় উহা ছলনা মাত্র।

❒ 'আমার দাসদিগের উপর তোর কোন ক্ষমতা নাই।' কর্মবিধায়ক হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার প্রথম পিতা আদম ও ইবলিসের কথা স্মরণ করুন। আমি আদমকে করেছি আমার বিশেষ

www.eelm.weebly.com

নৈকট্যভাজন ও প্রিয়ভাজন। তাই তাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য সেজদা করার নির্দেশ দিয়েছিলাম নেতৃস্থানীয় ফেরেশতাবৃন্দকে এবং ইবলিসকে। বলেছিলাম 'আদমের প্রতি প্রণতিপাত করো।' সকলেই নির্দেশ পালন করলো। কিন্তু ইবলিস করলো না। বরং দর্পভরে বললো, 'আদমকে আপনি সৃষ্টি করেছেন কর্দম থেকে। তাই তাকে আমি সেজদা করতে পারি না।'

লক্ষণীয় যে, কাদামাটি থেকে হজরত আদমের দেহাবয়ব গঠিত হওয়ার কারণে ইবলিস তাঁকে সেজদা করতে চায়নি। আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করা যে অত্যাবশ্যক, সে কথা তার মনেই ছিলো না। এই জঘন্য বিস্মৃতির কারণেই সে চিরঅভিশপ্ত। বাগবী লিখেছেন, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন আল্লাহ্ হজরত আদমকে সৃষ্টি করতে চাইলেন তখন এক ফেরেশতাকে নির্দেশ দিলেন, যাও, পৃথিবী থেকে মাটি নিয়ে এসো। নির্দেশ মোতাবেক পৃথিবী থেকে নিয়ে যাওয়া হলো এক মুঠো মাটি। ওই মাটি ছিলো মিষ্ট ও লবণাক্ত। ওই মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে হজরত আদম ও তাঁর বংশধরগণকে। সুতরাং মিষ্ট মাটি দ্বারা যে সৃষ্ট হয়েছে, সে হয়েছে সৌভাগ্যশালী, হেদায়েতপ্রাপ্ত— যদিও তার পিতা-মাতা কাফের হয়। আর যে সৃষ্ট হয়েছে লবণাক্ত মাটি থেকে, সে হয়েছে চিরদুর্ভাগা ও চিরভ্রষ্ট— যদিও তার পিতা হয় নবী।

হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, বায়হাকী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীর সকল স্থান থেকে কিছু কিছু করে মাটি একত্র করে মুঠোভর্তি মাটি নিয়ে যাওয়া হলো আল্লাহ্‌র সকাশে। ওই মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হলো তাঁকে। তাই তাঁর সন্তানেরা বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন স্বভাবের। কেউ কালো, কেউ শাদা, কেউ লাল, কেউ শ্যামলা। আবার কেউ ভালো, কেউ মন্দ, কেউ নম্র, কেউ কঠিন।

পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'সে বলেছিলো, বলুন, তাকে যে আপনি আমার উপরে মর্যাদা দান করলেন, কেনো? এ কথার অর্থ— ইবলিস তখন আমার নির্দেশ প্রতিপালন তো করেইনি, উপরন্তু আমাকে প্রশ্ন করেছিলো— আপনি আদমকে আমার চেয়ে বেশী মর্যাদা দান করলেন কেনো? কী উদ্দেশ্যে?

এরপর বলা হয়েছে— 'কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন, তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার বংশধরগণকে সমূলে নষ্ট করে ফেলবো। 'ইহ্তানাকাল জারাদুয্ যারআ' একটি আরবী বাগধারা। এর অর্থ— পঙ্গপাল খেয়ে ফেলেছে ক্ষেতের সমস্ত ফসল। আর একটি অর্থ— আমি তার

www.eelm.weebly.com

উপর প্রতিষ্ঠা করবো আমার পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব, যেদিকে ইচ্ছা করবো সেদিকেই টেনে নিয়ে যাবো তাকে। হানাকাদ্ দাব্বাতা' অর্থ ঘোড়ার নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে শক্ত করে— যেনো তার মালিক তাকে যেদিকে খুশী সেদিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'ইহ্তানাকা' অর্থ কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। আবার 'ইহ্তানাকাল জারাদুল আরদ্ব' অর্থও— পঙ্গপাল ভক্ষণ করেছে ক্ষেতের সমুদয় ফসল। এই অর্থেই আলোচ্য বাক্যের 'লাআহতানিকান্না জুর্রিয়্যাতাহু' কথাটির অর্থ করা হয়েছে 'তার বংশধরগণকে সমূলে নষ্ট করে ফেলবো।'

'ইল্লা ক্বলীলা' অর্থ অল্প কয়েকজন ব্যতীত। একথার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে নবী-রসুল ও পুণ্যবানগণকে, যাদেরকে আল্লাহ্তায়ালা শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপদে রেখেছেন। আলোচ্য বক্তব্যে ইবলিস নিজে স্বীকার করেছে যে, তাঁদেরকে সে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ নিজেও বলেছেন 'আমার বান্দাদেরকে প্রতারণা করার ব্যাপারে তোমার কোনো ক্ষমতাই নেই।'

বায়যাবী লিখেছেন, আদম সন্তানদেরকে প্রতারিত করা যায়— এরকম ধারণা ইবলিস সম্ভবতঃ লাভ করেছিলো ফেরেশতাদের কথোপকথন থেকে। যেমন হজরত আদম সৃষ্টির কথা ফেরেশতাদেরকে জানানো হলে তারা বলেছিলো, 'আপনি কী এমন এক জাতি সৃষ্টি করতে চান, যারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ঘটাবে?' অথবা হজরত আদমের সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখেই সে একথা বুঝতে পেরেছিলো যে, তাঁর মধ্যে থাকবে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও অন্যান্য অশোভন বৃত্তি। সুতরাং তাকে প্রতারণা করা হবে সহজ।

এর পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বললেন, যা। জাহান্নামই সম্যক শাস্তি তোর ও তাদের, যারা তোর অনুসরণ করবে।' একথার অর্থ, ধিক্কারের স্বরে আল্লাহ্ ইবলিসকে বললেন, যা যা তোর যা ইচ্ছা হয় কর। তবে একথা জেনে রাখিস দোজখই হবে তোর এবং তোর অনুসারীদের চিরকালীন আবাস। এটাই হচ্ছে তোর স্বেচ্ছাচারিতার শাস্তি। এখানকার 'মাউফূর' কথাটির অর্থ 'ওয়াফীর' বা পরিপূর্ণ। আরববাসীরা বলে 'ওয়াফ্ফির লিসাহিবিকা আরদ্বাহু (তোমার সাথীর পরিপূর্ণ সম্মান করো)।

এর পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'তোর আহ্বানে তাদের মধ্যে যাকে পারিস সত্যচ্যুত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর।' এখানে 'ইস্তাফযিয্' অর্থ প্ররোচিত করা, উত্তেজিত করা। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'ইসতাফায্যাহ্' অর্থ উচ্ছেদ করা, উপড়ে ফেলা বা গৃহচ্যুত করা। আর এখানকার 'বিসওতিকা' অর্থ পাপকর্মের প্রতি আহ্বান করা বা সত্যচ্যুত

www.eelm.weebly.com

করা। হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। উল্লেখ্য যে, যে পাপকর্মের প্রতি আহ্বান জানায়, সে অবশ্যই শয়তানের সতীর্থ।

আযহারী বলেছেন, 'ইসতাফযিয্ বিসওতিকা' কথাটির অর্থ নিজের দিকে ডাকা, পদস্খলিত করা। মুজাহিদ বলেছেন, 'সওতুন' অর্থ গানবাদ্য করা।

'আজ্বলিব্ আ'লাইহিম' কথাটির জ্বালাবা শব্দটির শব্দ রূপ নাসারা ইয়ানসুরু আর 'ইজতালাবা' হচ্ছে শব্দ রূপ ইফতিয়াল এর অর্থ কাউকে স্থানান্তর করে নিয়ে যাওয়া। এ রকম বলা হয়েছে 'কামুস' গ্রন্থে। হাদিস শরীফে 'লা জ্বালাবা' কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে— যে স্থানে প্রয়োজন, সে স্থান থেকে অন্যস্থানে শস্য স্থানান্তরিত করা জায়েয নয়। 'নেহায়া' রচয়িতা লিখেছেন, 'জ্বালাব' হয় দু'ধরনের— ১. জাকাত আদায়কারী কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বসে হুকুম চালাবে যেনো জাকাত প্রদাতারা তার অবস্থান স্থলে জাকাত এনে জমা করে— এরকম করা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। বরং শরিয়তের বিধান এই যে, জাকাত আদায়কারীরা জাকাত প্রদাতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জাকাত আদায় করবে। ২. ঘোড়দৌড়ের স্থানে এমন লোক নিযুক্ত করা, যার চিৎকারে ঘোড়া যেনো জোরে জোরে চলতে থাকে— এরকম করাও নিষেধ। 'কামুস' গ্রন্থে 'আজ্বলাবা আলাল ফারাস্' কথাটির অর্থ এভাবেই লেখা হয়েছে। আবার 'জ্বালাবাতাহ' শব্দটির অর্থ 'আওয়াজ' বা 'ধ্বনি'ও হয়। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে 'রয়াদা ফাজ্বালাবা' অর্থ প্রকম্পিত হওয়া এবং চিৎকার করা। এভাবে 'আজ্বলাবা আ'লাইহি' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— চিৎকার করে তাদেরকে প্ররোচিত করা বা উৎসাহিত করা। কুতাইবি বলেছেন, 'জ্বালাবুন' শব্দটি 'জ্বালবাতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ উচ্চ নাদ বা সমুচ্চ আওয়াজ। এরকমও বলা হয়েছে যে 'জ্বালাব্ ' অর্থ 'ইজতিমা' (একত্র হওয়া বা সমবেত হওয়া)। 'নেহায়া' গ্রন্থে রয়েছে 'আজ্বলাবা আ'লাইহি' অর্থ সমবেত হয়েছে। আর 'আজ্বলাবাহ্'অর্থ— তাকে সাহায্য করেছে। এভাবে এখানে 'তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর' কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তোর সকল প্রকার সৈন্য ও কৌশল একত্র করে তাদেরকে আক্রমণ কর।

আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— হে অভিশপ্ত ইবলিস! তুই তোর আহ্বানে যাদেরকে পারিস পথভ্রষ্ট কর, তোর সকল বুদ্ধি ও শক্তি দ্বারা তাদেরকে সরাসরি পাপের মধ্যে নিমজ্জিত কর, অথবা তাদেরকে পাপ কর্ম করতে সাহায্য কর।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, 'বি খইলিকা ওয়া রজিলিকা' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক সকল প্রকার

www.eelm.weebly.com

সৈন্যকে। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, জ্বিন ও মানুষের মধ্যে কেউ কেউ হয় শয়তানের বাহন ও প্রহরী। যে পাপের পক্ষ নেয়, সে-ও ইবলিস-বাহিনীর সদস্য। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে শয়তানের ওই সকল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের কথা বলা হয়েছে, যারা মানুষকে তার দিকে নিয়ে যেতে প্ররোচিত করে।

এরকমও হতে পারে যে, শাব্দিক অর্থ এখানে ধর্তব্য নয়। এখানে গ্রহণ করতে হবে মর্মার্থ। মর্মার্থটি হচ্ছে— হে ইবলিস্! যারা তোর মতো চিরদুর্ভাগা কেবল তাদের উপরেই তোর প্রভাব কার্যকর হবে। সুতরাং তাদের উপরেই তুই তোর সকল কৌশল ও শক্তি প্রয়োগ কর এবং তাদেরকেও তোর মতো সত্যবিচ্যুত করে দে। উল্লেখ্য যে, শয়তানকে এখানে তুলনা করা হয়েছে ওই নির্মম সেনাপতির সঙ্গে, যে তার শত্রুদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা ও তাদের প্রতিশ্রুতি দে। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা মাত্র।

মুজাহিদ, হাসান বসরী ও হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে 'শারীকহুম ফীল আমওয়াল' (ধনে শরীক হয়ে যা) অর্থ— তুই তাদের উপার্জন ও অর্থব্যয়ে অংশ গ্রহণ কর। অর্থাৎ তাদেরকে হারাম উপার্জন, সঞ্চয় ও খরচের প্রতি উৎসাহিত কর। আতা বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে সুদ ভক্ষণ, দেব-দেবীদের নামে পশু ছেড়ে দেয়া ইত্যাদিকে। হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম বলাকে। জুহাক বলেছেন, মুশরিকদের দেব-দেবীদের নামে ছেড়ে দেয়া পশুকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে 'শারীকহুম ফীল আমওয়াল।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'শারীকহুম ফীল আওলাদ' (সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা) বলে বুঝানো হয়েছে শিশু কন্যাকে জীবন্ত কবর দেয়াকে। জুহাক ও মুজাহিদ বলেছেন, ব্যভিচারজাত সন্তান-সন্ততিকে। হাসান ও কাতাদা বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে সন্তান-সন্ততির ইহুদী, খৃষ্টান, মূর্তিপূজক এবং অগ্নিপূজক হওয়াকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, অনেকে সন্তান-সন্ততিদের নাম রাখে শিরিক মিশ্রিত নিয়মে। যেমন— আবদুল হারেছ, আবদুশ শামস্, আবদুল উজ্জা ইত্যাদি। আলোচ্য বক্তব্যটির মাধ্যমে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, মানুষ যখন স্ত্রীসঙ্গম করতে উদ্যত হয়, তখন শয়তান বসে পড়ে তার পুরুষাঙ্গের উপর। এমতাবস্থায় 'বিসমিল্লাহ্' না বলে সঙ্গম শুরু করলে শয়তানও হয়ে যায় তার সঙ্গম-সঙ্গী। এভাবে শয়তানও বীর্যপাত করে তার স্ত্রীঅঙ্গে। এরকম মিলনের ফলে যে সন্তানের জন্ম হয়, সে সন্তানের মধ্যে থাকে শয়তানের অংশীদারিত্ব।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. একবার বললেন, কোনো কোনো মানুষ মাগরাব। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! মাগরাব কারা? তিনি স. বললেন, যার মধ্যে রয়েছে শয়তানের অংশীদারিত্ব।

'ওয়া ই'দহুম' অর্থ— এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। অর্থাৎ তাদেরকে এভাবে মিথ্যা আশ্বাস দে যে— দেব-দেবীরা সুপারিশ করবে, বাপ-দাদার ধর্মই মুক্তির পথ। অথবা তাদের অন্তরে, সৃষ্টি কর তওবার প্রতি অনীহা, কিয়ামত, বেহেশত, দোজখ ইত্যাদির প্রতি অবিশ্বাস ইত্যাদি।

একটি প্রশ্নঃ আলোচ্য আয়াতের 'সত্যচ্যুত কর', 'আক্রমণ কর', 'ধনে ও সন্তান সন্ততিতে শরীক হয়ে যা', 'প্রতিশ্রুতি দে'— কথাগুলো আদেশ সূচক। তাহলে কি বলা যায়, আল্লাহ্‌ এখানে শয়তানকে পাপকর্মসমূহ করবার আদেশ দিয়েছেন? কিন্তু আল্লাহ্‌ তো কখনো পাপকাজের আদেশ দেন না।

উত্তরঃ কথাগুলো আদেশসূচক ঠিকই। কিন্তু এখানে কথাগুলো বলা হয়েছে হুমকি প্রদর্শনার্থে। অথবা এখানে আদেশগুলোর মাধ্যমে এই মর্মে জানানো হয়েছে যে— ঠিক আছে। তুই যা করতে চাস করে নে। তোর এসকল অপকর্মের কারণে আমার সম্মান ও পরাক্রমের কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। আর এগুলোর কারণে তোর জন্য যথোপযুক্ত শাস্তি তো নির্ধারিত রয়েছেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র।' এখানে 'গুরুর' অর্থ ধোকা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা বা ছলনা। মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রদর্শন।

বাগবী লিখেছেন, সাহাবীগণের বক্তব্যসমূহে এসেছে, বিতাড়িত হওয়ার পর ইবলিস বললো, হে আল্লাহ্‌! আদমের কারণেই আজ আমার এই দুর্দশা। অতএব তুমি আমাকে এমন শক্তি দাও যাতে আমি আদম-সন্তানদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারি। আল্লাহ্‌ বললেন, তথাস্তু। ইবলিস বললো, আমি জানি যে, তোমার শক্তি ছাড়া আর কারো কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ্‌ বললেন, 'তোর আহ্বানে যাকে পারিস সত্যচ্যুত কর।' হজরত আদম বললেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি তো আমার ও আমার সন্তানদের উপরে ইবলিসকে প্রবল করে দিলে। এখন তোমার বিশেষ সাহায্য ব্যতিরেকে তো আমাদের উপায় নেই। আল্লাহ্‌ বললেন, তোমার সন্তান-সন্ততিদের হেফাজতের জন্য আমি প্রহরী নিয়োগ করবো। হজরত আদম বললেন, কীভাবে? আল্লাহ্‌ বললেন, তাদের পুণ্যকর্মগুলোকে আমি দশগুণ বাড়িয়ে দিবো। হজরত আদম বললেন, আর? আল্লাহ্‌ বললেন, মৃত্যু যন্ত্রণার পূর্ব পর্যন্ত আমি তাদের জন্য খুলে রেখে দিবো তওবার দরজা। হজরত আদম বললেন, আর? আল্লাহ্‌ বললেন, বলবো 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা আত্মঅত্যাচার করেছো, তারা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্‌ তোমাদের সমুদয় পাপ মোচন করবেন।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, ইবলিস বললো, হে আল্লাহ্‌! তুমি তো মানুষের মধ্যে প্রেরণ করবে নবী। তাদের উপরে অবতীর্ণ করবে কিতাব। আমার

www.eelm.weebly.com

কিতাব কি? আল্লাহ্ বললেন, কুপ্রবৃত্তিজাত কবিতা ও শ্লোক। ইবলিস বললো, আমার দলিল কি? আল্লাহ্ বললেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের অবৈধ চিত্রম। ইবলিস বললো, আমার পয়গম্বর কে? আল্লাহ্ বললেন, গণক। আমার বসবাস কোথায় হবে? আল্লাহ্ বললেন, গোসলখানায়— যেখানে মানুষ উলঙ্গ হয়ে গোসল করে। ইবলিস বললো, আমার বৈঠকখানা কোনটি? আল্লাহ্ বললেন, বাজার। ইবলিস বললেন, খাদ্য? আল্লাহ্ বললেন, বিসমিল্লাহ্ পাঠবিবর্জিত খাদ্য। ইবলিস বললো, পানীয়? আল্লাহ্ বললেন, মাদকদ্রব্য। ইবলিস বললো, প্রতারণার জাল বিছাবো কাদেরকে দিয়ে? আল্লাহ্ বললেন, রমণীদেরকে দিয়ে। ইবলিস বললো, আর আমার বিনোদনের সামগ্রী? আল্লাহ্ বললেন, কৌতুক।

এর পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'আমার দাসদের উপরে তোর কোনো ক্ষমতা নেই। কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।' একথার অর্থ— তবে হে ইবলিস! একথা উত্তমরূপে অবগত হও যে, আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দা যারা, তাদের উপরে তুই কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবি না। কারণ তারা সর্ববিষয়ে আমার মুখাপেক্ষী ও সর্বতোভাবে আমারই প্রতি নির্ভরশীল, সমর্পিত। তাই কর্মবিধায়করূপে আমিই তাদের জন্য যথেষ্ট।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ
إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ
مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ
الْإِنسَانُ كَفُورًا ۝ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ
أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ۝ أَمْ أَمِنتُمْ
أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ
الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۝

❒ তোমাদিগের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদিগের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন, যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার। তিনি তোমাদিগের প্রতি পরম দয়ালু।

www.eelm.weebly.com

❒ সমুদ্রে যখন তোমাদিগকে বিপদ স্পর্শ করে তখন কেবল তিনি ব্যতীত অপর যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান করিয়া থাক তাহারা তোমাদিগের মন হইতে সরিয়া যায়; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়াইয়া তোমাদিগকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ!

❒ তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে তিনি তোমাদিগকে স্থলে কোথাও ভূগর্ভস্থ করিবেন না অথবা তোমাদিগের উপর কংকর বর্ষণ করিবেন না? তখন তোমরা তোমাদিগের কোন কর্মবিধায়ক পাইবে না।

❒ অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে তিনি তোমাদিগকে আর একবার সমুদ্রে লইয়া যাইবেন না এবং তোমাদিগের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাইবেন না এবং তোমাদিগের সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য তোমাদিগকে নিমজ্জিত করিবেন না? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! আমিই তো তোমাদের সেই প্রভুপালনকর্তা, যে তোমাদের সমুদ্র যাত্রাকালে তোমাদের জলযানগুলোর গতি ও স্থিতি নির্বিঘ্ন রাখে। এভাবে সমুদ্র-বেসাতির মাধ্যমে তোমরা অনুসন্ধান করো আমার অনুগ্রহরূপী জীবনোপকরণ। আমি তো তোমাদের প্রতি পরম দয়ার্দ্র।

পরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন কেবল তিনি ব্যতীত অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাকো, তারা তোমাদের মন থেকে সরে যায়।' একথার অর্থ—সমুদ্র-ঝড় অথবা অন্য কোনো দুর্বিপাকে যখন তোমরা পতিত হও, তখন তো তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ডাকো না। তোমাদের স্মরণ-পট থেকে উবে যায় তোমাদের কল্পিত উপাস্যসমূহের স্মৃতি। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— ওই ঘোর বিপদে তোমাদের কাতর প্রার্থনা তো তোমাদের পূজিত দেব-দেবীগুলো শোনে না। শোনেন কেবল আল্লাহ্, যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।' একথার অর্থ— হে অবিমৃশ্য জনগোষ্ঠী! দুর্যোগ থেকে উদ্ধার করে আমি যখন তোমাদেরকে তটভূমিতে ফিরিয়ে আনি, তখন তোমরা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। তোমরা তো আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

এর পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছো যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না, অথবা তোমাদের উপর কংকর বর্ষণ করবেন না? তখন তোমরা তোমাদের কোনো কর্মবিধায়ক পাবে না।' একথার অর্থ— হে অকৃতজ্ঞ মানুষ! দুর্যোগ— দুর্বিপাক কি কেবল সমুদ্রেই আসে? স্থলভাগে কি বিপদ-মুসিবত নেমে আসতে পারে না? ঘূর্ণিঝড় , তুফান, ভূমিকম্প, ভূমিধস— এসকল বিপদেও তো তোমরা পতিত হতে পারো। পর্যুদস্ত

www.eelm.weebly.com

হয়ে যেতে পারো প্রস্তরবৃষ্টিতে। পারো না কি? আল্লাহ্ যদি তোমাদের উপর এরকম বিপদ অবতীর্ণ করতে চান, তবে তোমরা পালাবে কোথায়? তখন তো তোমরা তোমাদের কর্মবিধায়ক ও সাহায্যকারীরূপে কাউকেই খুঁজে পাবে না।

এর পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছো যে, তিনি তোমাদেরকে আর একবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাবেন না এবং তোমাদের সত্যপ্রত্যাখ্যান করার জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী পাবে না।' একথার অর্থ— তোমরা কি আর কখনো সমুদ্রযাত্রা করবে না? কীভাবে তোমরা নিশ্চিত হতে পারলে যে, আল্লাহ্ আর কখনো তোমাদেরকে সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না? আর ওই সমুদ্রযাত্রায় তোমাদেরকে প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে ফেলবেন না? আর অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তোমাদেরকে সমুদ্র-সমাধি দান করবেন না। যদি আল্লাহ্ এরকম করেন তবে কি তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবে?

হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'ক্বাস্বিফ্' কথাটির অর্থ করেছেন 'আসিফ' বা প্রবল ঘূর্ণিঝড়। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, শব্দটির অর্থ হবে এখানে— ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়া। অর্থাৎ 'ক্বাস্বিফ' বলা হয় তাকে, যে নিজস্ব শক্তিতে সকল কিছু ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। কুতাইবি বলেছেন, ওই ব্যক্তি কাসিফ যে লণ্ড-ভণ্ড করে দেয় অরণ্যের বৃক্ষরাজি।

'বিমা কাফারতুম' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যান করার জন্য বা অকৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য। আর 'তাবীআ'ন্' অর্থ সাহায্যকারী বা প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৭০

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

❑ আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি, স্থলে ও সমুদ্রে উহাদিগের চলাচলের বাহন দিয়াছি; উহাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করিয়াছি এবং আমি যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদিগের অনেকের উপর উহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।' একথার অর্থ— আমি মানুষকে দান করেছি বিশেষ বিশেষ মর্যাদা। যেমন, সর্বোত্তম অবয়ব, সুসংগত স্বভাব, বস্তুসমূহের পার্থক্য নির্ণয়ের জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেক-

www.eelm.weebly.com

বিবেচনা, ভাষা, লিপিকৌশল, বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, বস্তুসমূহের প্রতি কর্তৃত্ব, প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ ও পরার্থপরতা ইত্যাদি। মানুষকে আমি আরো দিয়েছি প্রেমময় হৃদয়, প্রত্যাদেশিত প্রজ্ঞা। তাই তারা জানতে পেরেছে আমার নৈকট্য ও প্রসন্নতা লাভের উপায়। হাকেম তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এবং দায়লামী হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হাত ও হাতের আংগুলের মাধ্যমে আহার করাও মানুষের প্রতি আল্লাহ্র একটি বিশেষ অনুগ্রহ।

এরপর বলা হয়েছে 'স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি।' একথার অর্থ— স্থলভাগে আমি মানুষের জন্য দিয়েছি আরোহণযোগ্য পশুকুল ও আমার দেয়া বুদ্ধির মাধ্যমে আবিষ্কৃত অন্যান্য বাহন। আর জলপথে বাহন স্বরূপ দিয়েছি নৌকা, জাহাজ ও অন্যান্য জলযান।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি।' একথার অর্থ আমি তাদেরকে দান করেছি পরিতৃপ্তিপ্রদায়ক অনেক অনেক পানাহারের সামগ্রী।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।' এখানে 'ফাদ্বলুন্' অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব অথবা, পুণ্য ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মর্যাদা। 'ফাদ্বলনাহুম' কথাটির 'হুম' সর্বনামটি এখানে সম্পৃক্ত হয়েছে 'আদম সন্তানদের ' সঙ্গে। কিন্তু এখানে 'আদম সন্তান' বলে বুঝানো হয়েছে কেবল ইমানদার ব্যক্তিগণকে। অন্য আয়াতেও সর্বনামকে এরকম বিশেষায়িত করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়াল মুত্বাল্লাক্বাতু ইয়াতারাব্বাসনা বি আনফুসিহিন্না।' এখানে 'মুত্বাল্লাক্বাতু' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তা রমণীকে। কিন্তু এর পূর্বের 'ওয়া বুউ'লাতুহুন্না আহাক্কু বিরদ্দিহিন্না' কথাটির 'হিন্না' সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে কেবল 'আল্মুত্বাল্লাক্বাতু' কথাটির সঙ্গে। এভাবে যাদেরকে তালাকে রজয়ী দেয়া হয়েছে তারাই হবে এখানে উদ্দেশ্য। আলোচ্য আয়াতেও তেমনি শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি সম্পৃক্ত হবে কেবল বিশ্বাসীদের সঙ্গে। কারণ অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্র নিকটে শ্রেষ্ঠ নয়— বরং স্বতন্ত্র ও নিকৃষ্ট।

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্তায়ালা সকল মানুষকে সকল সৃষ্টির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেননি। শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন কেবল কিছু সংখ্যক মানুষকে। আর এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃতি ও প্রকার সম্পর্কে আলেমগণের মতপ্রভেদও রয়েছে প্রচুর। কেউ কেউ বলেছেন, ফেরেশতাদের উপরে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়নি। সুতরাং ফেরেশতা ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টির চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ। কালাবী বলেছেন, অল্প কয়েকজন ফেরেশতা

www.eelm.weebly.com

ছাড়া অন্য সকল ফেরেশতার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ। আর ওই অল্প কয়েকজন ফেরেশতা হচ্ছে হজরত জিবরাইল, হজরত মিকাইল, হজরত আজরাইল এবং হজরত ইসরাফিল।

কোনো কোনো আলেম আবার 'কাছীর' (অনেকের) কথাটির অর্থ করেন 'কুল' (সকলের)। তাই তাঁরা বলেন, মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে সকল ফেরেশতার উপরে। এরকম অর্থ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে অপর একটি আয়াতেও। যেমন— ওয়া আকছারুহুম কাজিবূন। এখানে 'আক্ছারুহুম' বলে বোঝানো হয়েছে সকল মানুষকে। হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত একটি সর্বোন্নত হাদিসের মধ্যেও এই অভিমতের পোষকতা রয়েছে। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যখন আদম ও তাঁর বংশধরগণকে সৃষ্টি করতে চাইলেন, তখন ফেরেশতারা বললো, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তোমার এই নতুন সৃষ্টি অপূর্ব! তারা দুনিয়ায় পানাহার করবে, শয্যাসঙ্গিনী করবে তাদের স্ত্রীদেরকে, আরোহী হবে বিভিন্ন বাহনের উপর। তুমি তো তাদেরকে দান করেছো পৃথিবীর আরাম-আয়েশ। আর আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছো আখেরাত। আল্লাহ্ বললেন, এরা ওই সকল সৃষ্টির মতো নয়, যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি 'কুন' (হও) আদেশের মাধ্যমে। এদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি আমার আনুরূপ্যবিহীন অলৌকিক হাতে। আর তাদের প্রতি করেছি আমার আত্মার জ্যোতিসম্পাত। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমান নামক গ্রন্থে।

পর্যালোচনাঃ সাধারণ ইমানদার অর্থাৎ আল্লাহ্র ওলীগণ সাধারণ ফেরেশতা-দের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। গোনাহ্গার ইমানদারেরা এরকম শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন পাপমুক্তির পর— খাঁটি তওবার মাধ্যমে, শাস্তিভোগের পর অথবা আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমালাভের কারণে। অর্থাৎ পাপমুক্তির পর তারাও হয়ে যায় আল্লাহ্র ওলী এবং হয়ে যায় জান্নাতের যোগ্য। এভাবেই তারা হয় ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর নবী রসুলগণ হচ্ছেন বিশেষ মানুষ। এই বিশেষ মানুষেরা বিশেষ ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'ইন্নাল্লাজীনা আমানু ওয়া আ'মিলুস্সলিহাতি উলায়িকাহুম খইরুল বারিয়্যাহ্' (নিশ্চয় যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা সকল সৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মুমিনগণের নিকটে যে ফেরেশতারা থাকে তাদের চেয়ে তারা (মুমিনেরা) অধিক মর্যাদাশালী। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজার বর্ণনাতেও একথা এসেছে। এভাবে দেখা যায়, যারা ইমানদার, তারা সকল অবস্থায় ফেরেশতাদের চেয়ে অধিক সম্মানার্হ।

আহলে সুন্নতওয়াল জামাতের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, বিশেষ মানুষেরা সকল ফেরেশতাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এমনকি বিশেষ ফেরেশতাদের চেয়েও। কারণ চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কাম রয়েছে, কিন্তু জ্ঞান বা বিবেক নেই । আবার ফেরেশতারা কামপ্রবৃত্তিশূন্য, কিন্তু জ্ঞানবান। তাই স্বভাবগতভাবে তারা নিষ্পাপ।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু মানুষের অবস্থা চতুষ্পদ বা ফেরেশতা কারো মতোই নয়। তাদের কামপ্রবৃত্তি আছে বটে, কিন্তু জ্ঞান-বিবেকও আছে। এই জ্ঞান-বিবেকের সাহায্যেই মানুষকে তার নিজের কু-রিপু সমূহের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহন করতে হয়। আল্লাহ্‌র আনুগত্যকে আশ্রয় করে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয় আপন অন্ধকারের বিরুদ্ধে। তাই সে মুজাহিদ বা ধর্মযোদ্ধা। আর এই মুজাহিদেরা আল্লাহ্‌র জ্ঞানে জ্ঞানী এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যে সাহায্যমণ্ডিত। তাই তারা লাভ করেন কাংখিত বিজয়, যে মর্যাদা ফেরেশতাদের পক্ষে লাভ করার সুযোগই নেই। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— 'যারা আমার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো, অবশ্যই আল্লাহ্ রয়েছেন সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে।' আর যারা এভাবে আত্ম-অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুতুল্য। বরং তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাহলে এ ধরনের মানুষ সংশোধিত হওয়ার আগে ফেরেশতাদের চেয়ে অধিক মর্যাদামণ্ডিত হবে কীভাবে?

সূরা বানী ইসরাইল : আয়াত ৭১, ৭২

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍۭ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝ وَمَن كَانَ
فِى هَٰذِهِۦٓ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

❒ স্মরণ কর, সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে উহাদিগের নেতাসহ আহ্বান করিব। যাহাদিগের দক্ষিণ হস্তে তাহাদিগের আমলনামা দেওয়া হইবে তাহারা তাহাদিগের আমলনামা পাঠ করিবে এবং তাহাদিগের উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হইবে না।

❒ যে ইহলোকে অন্ধ পরলোকেও সে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ আহ্বান করবো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! ওই বিচারদিবসের কথা স্মরণ করুন, যখন আমি হিসাব গ্রহণের জন্য প্রত্যেক নরগোষ্ঠির নেতা ও জনতাকে হাশর প্রান্তরে সমবেত করবো।

মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, এখানে 'ইমাম' বা নেতা বলে বুঝানো হয়েছে নবী-রসুলগণকে। আবু সালেহ ও জুহাক বলেছেন, 'নেতা' বলে এখানে বুঝানো

www.eelm.weebly.com

হয়েছে ওই নরগোষ্ঠির প্রতি অবতীর্ণ কিতাব সমূহকে। হজরত আলী থেকে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীর প্রতিটি নর গোষ্ঠিকে সেদিন ওঠানো হবে তাদের আপনাপন নবী ও কিতাব সহকারে। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে নেতা দ্বারা বুঝানো হয়েছে ভালো-মন্দ সকল ধরনের নেতাকে, যারা মানুষকে ভালো পথ দেখায়, অথবা করে পথভ্রষ্ট। কোরআন মজীদে 'নেতা' বলে উভয় দলকে বোঝানোর আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন—১. 'এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা, তারা আমার নির্দেশানুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো।' ২. 'তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম, তারা মানুষকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করতো।'

কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে 'নেতা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে অংশীবাদীদের মিথ্যা উপাস্যসমূহকে। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, মানুষ তাদের আপনাপন নেতার অনুগত হয় সে নেতা ভালো হোক, অথবা মন্দ। হাসান ও আবুল আলীয়া বলেছেন, এখানে ইমাম বা অগ্রণী অর্থ মানুষের কৃতকর্মসমূহ যা তারা পূর্বাহ্নে প্রেরণ করে। কাতাদা বলেছেন, আয়াতের বক্তব্যভঙ্গির মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এখানে 'ইমাম' অর্থ আমলনামা। আমলনামাকেও কিতাব বলা হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া কুল্লা শাইইন আহসাইনাহু ফী ইমামিম মুবীন' (আমি প্রতিটি বিষয় এক সমুজ্জ্বল কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি)। এখানে 'ইমামমিম মুবীন' অর্থ আমলনামা। কারো কারো মতে এখানে ইমাম বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল শক্তিকে, যা মানুষকে শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ পথে অনুপ্রাণিত বা পরিচালিত করে। মোহাম্মদ বিন কা'ব বলেছেন, 'ইমাম' হচ্ছে 'উম্মু' (মা) এর বহুবচন। যেমন 'খুফ্ফুন' এর বহুবচন 'খিফাফ। তাই এখানকার অন্তর্নিহিত বক্তব্যটি হবে— সেদিন প্রত্যেককে ডাকা হবে তাদের নিজ নিজ মায়ের নাম ধরে। হজরত ঈসার পবিত্রা জননী হজরত মরিয়ম এবং ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের মহাসম্মানিতা মাতা হজরত ফাতেমার সম্মানেই সেদিন এরকম করা হবে। আবার জারজ সন্তানদেরকে লজ্জিত না করার উদ্দেশ্যটিও এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব।

'বি ইমামিহিম' অর্থ তাদের নেতা সহ। এতক্ষণের আলোচনায় কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— সেই বিচার দিবসে মানুষ সমবেত হবে নবী-রসুল অথবা অন্য কোনো

www.eelm.weebly.com

ভালো অথবা মন্দ নেতার সঙ্গে। অথবা হাজির হবে আমলনামা বা সহিফা সহকারে। এরকমও হতে পারে যে, তখন প্রত্যেককে ডাকা হবে তাদের স্ব স্ব নেতা অথবা মতবাদের নামোল্লেখ করে। যেমন বলা হবে— হে অমুকের অনুসারী, হে অমুক মতবাদের অনুগামী, হে অমুকের অনুরক্ত, হে অমুক গ্রন্থের ভক্ত, হে মরিয়ম তনয়, হে ফাতেমা-দুলাল ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাদের দক্ষিণ হস্তে তাদের আমলনামা দেয়া হবে, তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।' এখানে বলা হয়েছে কেবল ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তদের কথা। বলা হয়েছে, তখন আমলনামা হাতে পেয়ে তারা আনন্দিত চিত্তে তা পাঠ করতে থাকবে। আরো বলা হয়েছে, তাদের উপর সেদিন এতোটুকুও অন্যায় আচরণ করা হবে না। এখানে 'লা ইউজলামুনা ফাতিলা' অর্থ সামান্য পরিমাণ জুলুম। 'ফাতিল' অর্থ ওই চিকন তন্তু যা থাকে খেজুরের আঁটির ফাটলের মধ্যে। অথবা ওই ক্ষুদ্র ময়লা, যা মানুষ চিমটি দিয়ে ওঠায়। কথাটির মাধ্যমে এখানে বলা হয়েছে— সেদিন তাদেরকে সামান্য পরিমাণ সওয়াবও কম দেয়া হবে না। উল্লেখ্য যে, বাম হাতে আমলনামাপ্রাপ্তদের অবস্থা হবে এর বিপরীত।

পরের আয়াতে (৭২) আলোচিত হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথা। বলা হয়েছে— 'যে ইহজগতে অন্ধ, পরজগতেও সে হবে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।' একথার অর্থ— যে পৃথিবীতে সত্য পথ দেখতে পায় না, সে আখেরাতে পরিত্রাণের পথতো পাবেই না। অর্থাৎ এ জগতে হেদায়েত না পেলে ওই জগতে হেদায়েত প্রাপ্তি হবে অসম্ভব। তখন তওবা করা ও তা কবুল হওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। অতএব তওবা করলে করতে হবে এখনই, এখানেই। বক্তব্যটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— যে ব্যক্তি ইহকালে সত্যদর্শন থেকে অন্ধ, সে তো আখেরাতে হবে আরো অধিক অন্ধ।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন এখানে 'হাজিহী' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল পার্থিব নেয়ামতকে যেগুলোর বিবরণ দেয়া হয়েছে 'তোমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন' থেকে 'তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি' (আয়াত ৬৬ থেকে ৭০) পর্যন্ত। আর 'ফীল আখিরাতি' বলে বুঝানো হয়েছে আখেরাতের অবিনাশী নেয়ামতসমূহকে। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ হবে, দুনিয়ার

www.eelm.weebly.com

দৃষ্টিগ্রাহ্য নেয়ামতের যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ থেকে যারা অন্ধ হয়ে রইলো, তারা তো আখেরাতের অনাগত ও অদৃশ্য নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে হবে আরো অধিক অন্ধ। আর নিঃসন্দেহে তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের পথভ্রষ্ট।

কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে এখানে 'হাজিহী' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে পৃথিবীর জীবনকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহ্তায়ালার এককত্বের অসংখ্য নিদর্শন দেখেও তার বিবেকের চক্ষুকে সত্যদর্শন থেকে অন্ধ করে রেখেছে, সে নিশ্চয় আখেরাতে মুক্তির পথ দেখার ব্যাপারে আরো অধিক অন্ধ হয়ে থাকবে। নাজাতের রাস্তা তো তাকে তখন দেখানোই হবে না। কারণ সে চিরভ্রষ্ট। উল্লেখ্য যে, 'আম্‌মা' শব্দটি তুলনামূলক বিশেষণ। এখানে মর্মার্থ হবে তুলনামূলক বিশেষণ হিসাবে। অর্থাৎ নিরেট অন্ধ।

একটি প্রশ্নঃ এখানে আ'মা শব্দটি ছুলাছি মুজাররাদ (মূল তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ) এর ইস্‌মে তাফজীলের (তুলনামূলক বিশেষণে) শব্দরূপ। ইসমে তাফজীল 'আফয়ালুর' শব্দরূপে ওই সময় আসে, যখন তার অর্থের মধ্যে দেখা দেয় কোনো ক্রটি এবং যখন তার মধ্যে থাকে না কোনো রঙ বা আকার। উল্লেখ্য যে, অন্ধ হওয়া একটি দোষ, সুতরাং 'আ'মা' (অন্ধ) কথাটি এখানে তুলনামূলক বিশেষণের শব্দরূপ হতে পারে না। কারণ শব্দটির একমাত্র অর্থ— অন্ধ। তাই এখানে 'আ'মা' কথাটির অর্থ 'অধিক অন্ধ' বললে তা ঠিক হবে না। অতএব তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের (তুলনামূলক বিশেষণের) শব্দরূপ তৈরী করতে হলে আ'মা শব্দটির সঙ্গে বসাতে হবে 'আশাদদু' বা 'আকছার।' যেমন অধিক অন্ধ বুঝানো হলে আরবীতে বলা হয় 'আশাদ্‌দু উ'ম্‌ইয়ান'। কেবল 'আ'মা' নয়। তবে এখানে এরকম অর্থ করা হবে কেনো?

উত্তরঃ এখানকার অন্ধত্ব হচ্ছে অন্তর্চক্ষুর অন্ধত্ব বা বিবেকের অন্ধত্ব। এটি একটি অভ্যন্তরীণ ক্রটি। আর তুলনামূলক বিশেষণ হওয়ার পথের অন্তরায় হচ্ছে প্রকাশ্য ক্রটি । সুতরাং এখানে 'আ'মা' তুলনামূলক বিশেষণের শব্দরূপ হতে পারে। যেমন 'আহমাকু' (মূর্খতা) 'আবলাহু' (নির্বুদ্ধিতা), 'আজহালু' (বোধহীনতা) ইত্যাদি।

ইবনে মারদুবিয়া ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, ইবনে ইসহাক সূত্রে মোহাম্মদ বিন আবী মোহাম্মদ ইকরামা কর্তৃক উল্লেখিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার উমাইয়া বিন খালফ, আবু জেহেল বিন হিশাম ও অন্যান্য কুরায়েশ নেতারা রসুল স. সকাশে হাজির হয়ে বললো, মোহাম্মদ! তুমি আমাদের দেব-দেবীদের মূর্তিগুলোতে একটি বার শ্রদ্ধার সঙ্গে হাত বুলিয়ে

www.eelm.weebly.com

দাও, তাহলে আমরা সকলেই হয়ে যাবো তোমার অনুসারী। রসুল স. মনেপ্রাণে চাইতেন, তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করুক। তাই তাদের এই ছোট্ট আবদারটি শুনে কিছুটা হতচকিত হয়ে গেলেন। তখন অবতীর্ণ হলো —

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৭৩, ৭৪, ৭৫

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ۝ وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ۝ اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝

❒ আমি তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহা হইতে তোমার পদস্খলন ঘটাইবার জন্য উহারা চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াছে, যাহাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন কর; সফল হইলে উহারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত।

❒ আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখিলে তুমি উহাদিগের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকিয়াই পড়িতে।

❒ তুমি ঝুঁকিয়া পড়িলে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাইতাম; তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইতে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি, তা থেকে তোমার পদস্খলন ঘটাবার জন্য তারা চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে।' 'লুবাবুন নুকুল ফী আসবাবিন্‌নুযুল' প্রণেতা লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত সম্পর্কে একটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত বিবরণ রয়েছে। বিবরণটি এই— হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, একবার রসুল স. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করছিলেন। তখন কুরায়েশ নেতারা বললো, আমাদের মূর্তিগুলোকে সম্মান না প্রদর্শন করা পর্যন্ত আমরা তোমাকে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে দিবো না। রসুল স. ভাবলেন, প্রকাশ্যে তাদের আবদার রক্ষা করলে কী আর ক্ষতি। অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি একাগ্র বিশ্বাস তো রয়েছেই। রসুল স. এর এমতো মনোভাব লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনাটির শব্দবিন্যাস এরকম— রসুল স. ভাবলেন,

www.eelm.weebly.com

একবার তাদের কথা রক্ষা করলে দোষ কী? আমি তো অন্তরে তাদের প্রতিমাগুলোকে ঘৃণাই করি। এ রকম করলে তারা তো কোনোদিন আর হাজরে আসওয়াদ চুম্বনে বাধা সৃষ্টি করবে না। এরপর আমি তো বরাবরের মতো এগুলোকে ঘৃণা করতেই থাকবো। জুহুরী সূত্রে ইবনে আবী হাতেমও এরকম বর্ণনা করেছেন। যোবায়ের বিন নাফীর সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, কুরায়েশ নেতারা একবার বললো, মোহাম্মদ! আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তুমি যদি আমাদেরকে পথপ্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েই থাকো, তবে তোমার নিম্নশ্রেণীর সহচরদেরকে তাড়িয়ে দাও। ক্রীতদাস শ্রেণীর লোকদেরকে দূর করে দিলেই আমাদের পক্ষে তোমার ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব। রসুল স. তাদের এ প্রস্তাবে কিছুটা আকৃষ্ট হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী থেকে ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. একবার পাঠ করলেন সুরা নজম। পড়লেন— 'আফারআইতুমুল লাতা ওয়াল উয্‌যা' (তোমরা কি লাত ও উয্‌যা সম্পর্কে ভেবে দেখেছো)। শয়তান এর সঙ্গে যোগ করলো 'তিলকাল গারানীকুল উ'লা ওয়া ইন্‌না শাফাআতা হুন্‌না লা তুরতাজা' (ওই সকল বড় বড় প্রতিমার শাফায়াতের আশা করা যায়)। এই ঘটনার পর অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এরপর রসুল স. চিন্তা করতে লাগলেন, কী থেকে কী হয়ে গেলো! শয়তান কি তবে তাঁর মুখ থেকে এরকম শিরিকসম্ভূত বাক্য উচ্চারণ করিয়ে নিলো? তখন অবতীর্ণ হলো— 'ওয়ামা আরসালনা মিন্ ক্ববলিকা মির্ রসূলিন ওয়ালা নাবীয়্যিন ইল্লা ইজা তামান্না' (আমি আপনার পূর্বে যে সকল রসুল ও নবী প্রেরণ করেছি, তাদের কেউ যখন কোনো কিছু আকাঙ্খা করেছে....)।

বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতের অবতরণস্থল মক্কা। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অবতরণস্থান মদীনা। তাঁদের মতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এরকম— আউফির মাধ্যমে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সাক্বীফ গোত্রের লোকেরা একবার রসুল স. এর নিকটে আবেদন জানালো, আপনি আমাদেরকে এক বছরের অবকাশ দিন। লোকেরা আমাদের পূজিত প্রতিমাগুলোর নিকটে বিভিন্ন মানত করে। হাজির করে বিভিন্ন উপঢৌকন। মানতকারীরা উপঢৌকন ইত্যাদি রেখে ফিরে গেলেই আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো। রসুল স. তাদের প্রার্থিত অবকাশ বিবেচনা করবেন বলে মনস্থ করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। উল্লেখ্য যে, এই বর্ণনার সূত্র-শৃঙ্খল শিথিল। তাই তা অগ্রহণীয়।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, সাক্বীফ গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক একদিন রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, আমরা তিনটি শর্তে আপনার নিকটে বায়াত গ্রহণ করতে চাই। শর্ত তিনটি হচ্ছে— ১. আমরা নামাজের মধ্যে মস্তক অবনত করবো না। ২. আমাদের প্রতিমাগুলোকে আমরা নিজ হাতে ভাঙবো না। ৩. মানতকারী ও ভক্তরা আমাদের দেব-দেবীদের নামে যে ভোগ ও উপঢৌকন প্রদান করে, তা আমরা সম্ভোগ করবো এক বছর ধরে কিন্তু তাদের পূজা থেকে বিরত থাকবো। রসুল স. বললেন রুকু সেজদাবিহীন ধর্ম কল্যাণরহিত। অবশ্য তোমরা নিজ হাতে তোমাদের প্রতিমাগুলোকে ভাঙবে কিনা, তা তোমাদের নিজস্ব ব্যাপার। আর লাত ও উয্যাকে দেয়া উপঢৌকন ভোগ করার অনুমতি তো কিছুতেই দেয়া যায় না। তারা বললো, আমরা চাই, মানুষ একথা বলুক যে, আরববাসী হিসেবে আপনি আমাদেরকে এই বিশেষ সুবিধাগুলো দান করেছেন। অন্য লোক যদি এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে তবে আপনি একথা বললেই তো পারেন যে, আল্লাহ্র হুকুমেই আমি বনী সাক্বীফকে এই বিশেষ সুবিধাগুলো দিয়েছি। রসুল স. নিশ্চুপ রইলেন। আবদারকারীরা মনে করলো তাদের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। সেক্ষেত্রে আয়াতের মর্ম দাঁড়ায় এ রকম— ওই লোকগুলো আপনাকে প্রত্যাদিষ্ট বিধান বিধৃত স্বঅবস্থান থেকে অধঃপতন ঘটিয়ে বিপদগ্রস্ত করার উপক্রম করেছিলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন করো, সফল হলে তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো।' এখানে 'লিতাফতারিয়া আ'লাইনা' অর্থ হে আমার রসুল! যা আমি আপনাকে প্রত্যাদেশ করিনি, আপনি তা-ই বলুন। অর্থাৎ যাতে আপনি আমার সম্বন্ধে কিছু অসত্য উদ্ভাবন করেন। 'ইজাল্লাত্তাখাজ্তুকা খলীলা' অর্থ সফল হলে তারা আপনাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতো।

পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি তাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি আপনাকে স্বভাবগতভাবে সত্যের প্রতি অবিচল রেখেছি। এরকম না রাখলে আপনি ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতারণার দিকে কিছুটা হলেও আকৃষ্ট হতেন। কারণ আপনি স্বভাবগতভাবে সত্যাধিষ্ঠিত, অথচ সরল। আর এই সারল্যের কারণেই তাদের ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাবের দিকেই ছিলো আপনার মূল লক্ষ্য। তাই তাদের কঠিন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছুটা হলেও আপনি হয়ে পড়েছিলেন অনবধান।

উল্লেখ্য যে, রসুল স. সত্তাগতভাবেই ছিলেন সত্যের প্রতি সুদৃঢ়। ছিলেন বিশুদ্ধতম। তাই এখানে বলা হয়েছে 'প্রায় কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে।' অর্থাৎ কিছুটা ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা হয়তো ছিলো, কিন্তু পুরোপুরি কখনোই নয়।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— তুমি ঝুঁকে পড়লে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম; তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোনো সাহায্যকারী পেতে না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হলে, তা হতো একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আর ওই অপরাধের কারণে আপনাকে ইহকাল ও পরকালে আস্বাদন করতে হতো দ্বিগুণ শাস্তি। তখন আমার ওই শাস্তির বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারীও আপনি পেতেন না। কিন্তু হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন যে, কোনো প্রকার শাস্তির উদ্যোগ আপনার বিরুদ্ধে কখনোই নেয়া হবে না। কারণ আপনি আমার সত্য রসুল। আপনি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়ভাজন। আর প্রিয়ভাজনতা হচ্ছে শাস্তির পরিপন্থী। এখানে 'দ্বি'ফাল হায়াত' অর্থ পৃথিবীর শাস্তি। আর 'দ্বি'ফাল মামাত' অর্থ আখেরাতের শাস্তি। কোনো কোনো আলেম শব্দ দু'টোর অর্থ করেছেন যথাক্রমে— আখেরাতের আযাব ও কবরের আযাব।

বায়হাকী তাঁর দালায়েল নামক পুস্তকে এবং ইবনে আবী হাতেম, শহর বিন হাওশাব ও আবদুর রহমান বিন গানাম সূত্রে উল্লেখ করেছেন, ইহুদীরা একবার রসুল স.কে বললো, হে মোহাম্মদ! আপনি যদি সত্যি সত্যিই নবী হয়ে থাকেন, তবে সিরিয়ায় চলে যান। কারণ ওই স্থান হচ্ছে নবীদের বিচরণ ভূমি। আর ওই স্থানই হবে হাশরের প্রান্তর। রসুল স. তাদের কথা মেনে নিলেন এবং এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন সিরিয়া অভিমুখে। চলতে চলতে উপস্থিত হলেন তাবুক নামক স্থানে। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৭৬, ৭৭

وَإِن كَادُوا۟ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَٰفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝

❒ উহারা তোমাকে দেশ হইতে উৎখাত করিবার চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াছিল তোমাকে সেথা হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য; তাহা হইলে তোমার পর উহারাও সেথায় অল্পকালই টিকিয়া থাকিত।

❒ আমার রসূলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাহাদিগকে পাঠাইয়াছিলাম তাহাদিগের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাইবে না।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা তোমাকে দেশ থেকে উৎখাত করবার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিলো তোমাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করবার জন্য।' এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্‌তায়ালা রসুল স.কে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। হজরত জিবরাইল তখন তাকে বললেন, ভ্রাতা মোহাম্মদ! আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চান। এমতাবস্থায় নবীগণের দোয়া কবুল হয়। রসুল স. বললেন, আপনিই বলুন, আমি কী দোয়া করবো? হজরত জিবরাইল বললেন— 'বলুন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক, তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাও এবং যেখান থেকে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক, সেখান থেকে আমাকে বের কোরো এবং তোমার নিকট থেকে আমাকে দান কোরো সাহায্যকারী শক্তি।' (আয়াত ৮০)। এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো তাবুক থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে। কিন্তু এই বর্ণনাটি অপরিণত ও শিথিল। কিন্তু এর পক্ষে আর একটি অপরিণত বর্ণনাও রয়েছে। বর্ণনাটি এই— সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, মুশরিকেরা বললো, হে মোহাম্মদ! নবী-রসুলগণের প্রকৃত বিচরণভূমি তো সিরিয়া। সুতরাং আপনি মদীনায় পড়ে রয়েছেন কেনো? আপনার তো সিরিয়াতেই যাওয়া উচিত। রসুল স. একথা শুনে মদীনা পরিত্যাগ করে সিরিয়া গমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। ইবনে জারীরের আরেকটি অপরিণত বর্ণনায় মুশরিকদের স্থলে এসেছে ইহুদীদের কথা।

কালাবী সূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন ইহুদীদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে গেলো। তারা বললো, হে আবুল কাসেম! আপনি তো জানেনই, মদীনা নয়, সিরিয়াই হচ্ছে পবিত্র ভূমি। সেখানেই ছিলেন হজরত ইব্রাহিম ও অন্যান্য নবীগণ। আপনি যেহেতু নিজেকে নবী বলেন, সেহেতু আপনার জন্য সিরিয়া গমনই উত্তম। সিরিয়া গমন রসুল স. এর মনোপূত ছিলো না। কারণ তখনকার সিরিয়া ছিলো রোম সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। সুতরাং যুদ্ধ প্রস্তুতি ব্যতিরেকে সিরিয়া গমন ছিলো অসমীচীন। ইহুদীরা এ কথা বুঝতে পেরে বললো, অযথা আপনি যুদ্ধ বিগ্রহের আশংকা করবেন না। আল্লাহ্ নিশ্চয় আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন। কারণ আপনি তো আল্লাহ্‌র নবী। রসুল স. সিরিয়া অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। শিবির স্থাপন করলেন মদীনা থেকে তিন মাইল দূরের এক স্থানে। কেউ কেউ বলেছেন, জুলহুলাইফাতে। সেখানে সকলকে সমবেত করে তাবুক অভিমুখে যাত্রা করাই ছিলো তাঁর অভিপ্রায়। ওই অবস্থায় তাঁর উপরে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

www.eelm.weebly.com

মুজাহিদ ও কাতাদার বক্তব্যানুসারে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। আর এখানকার 'আল-আরদ্ব' (দেশ) কথাটির অর্থ— মক্কা। উল্লেখ্য যে, মক্কার মুশরিকেরাও রসুল স.কে দেশান্তরিত করতে চেয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ্ নিজেই সেই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করেছিলেন। দিয়েছিলেন হিজরতের নির্দেশ। আর ওই নির্দেশানুসারেই রসুল স. হিজরত করেছিলেন মদীনায়। বাগবী লিখেছেন, এই বক্তব্যটিই সমধিক শুদ্ধ। কারণ ইতোপূর্বের আয়াতগুলোতে মক্কাবাসীদের কথাই বলা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, এই আয়াত মুশরিক অথবা ইহুদী কারো সঙ্গেই বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। সাধারণভাবে সকল প্রকারের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে, 'তারা তোমাকে দেশ থেকে উৎখাত করবার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিলো'। বলাবাহুল্য যে, আল্লাহ্তায়ালা তাদের সেই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। বিশেষভাবে হেফাজত করেছিলেন তাঁর প্রিয়তম রসুলকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাহলে তোমার পর তারাও সেখানে অল্পকালই টিকে থাকতো।' একথার মাধ্যমে এটাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, রসুল স.কে বিতাড়িত করলে বিতাড়নকারীদের বিনাশ ছিলো অনিবার্য। তাই দেখা যায় রসুল স. এর মদীনাগমনের পর বদর প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের উপরে নেমে এসেছিলো গজব। আবার মদীনার ইহুদীরা তাঁকে বিতাড়ন ও হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো বলে তাদের উপরেও নেমে এসেছিলো চরম লাঞ্ছনা ও অপমান। বধ করা হয়েছিলো বনী কুরায়জাকে। আর বনী নাজিরকে দেয়া হয়েছিলো নির্বাসন। তারা আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো খায়বরে। কিন্তু সেখান থেকেও তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছিলো হজরত ওমরের খেলাফতের সময়। এভাবে সমগ্র আরবভূমি হয়েছিলো বিধর্মী বিবর্জিত। কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, মদীনা থেকে রসুলকে যদি বের করে দেয়া হতো, তবে মদীনাবাসীরাও উৎপাটিত হতো সমূলে। অবশ্য পরে এরকম কোনো ঘটনা আর ঘটেনি।

এর পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— আমার রসুলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিলো এইরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোনো পরিবর্তন পাবে না। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনুন, কোনো নবীকে যদি তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বহিষ্কার করে, তবে আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেই। এটাই আমার চিরন্তন নিয়ম। সুতরাং আপনাকে যদি আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা দেশান্তরিত করতো, তবে আমিও তাদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করতাম। কারণ আপনিও আমার প্রিয়ভাজন রসুল। এখানে 'তাহ্বীলা' কথাটির অর্থ— রদবদল করা বা পরিবর্তন করা।

www.eelm.weebly.com

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۚ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ۝ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝

❑ সূর্য হেলিয়া পড়িবার পর হইতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করিবে এবং কায়েম করিবে ফজরের সালাত। ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।

❑ এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করিবে; ইহা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রশংসিত স্থানে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সূর্য হেলে পড়বার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে।' নামাজ পাঠের সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আর আলোচ্য বাক্যে বলা হয়েছে দ্বিপ্রহরের পর থেকে রাত পর্যন্ত চার ওয়াক্ত নামাজের কথা। অর্থাৎ জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার কথা।

হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত ইবনে ওমর, হজরত জাবের এবং আতা, কাতাদা, হাসান বসরী ও অধিকাংশ তাবেয়ীর মতে এখানকার 'দুলুক' শব্দটির অর্থ সূর্য হেলে পড়া। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বলেছেন। হজরত ইবনে ওমর থেকে শিথিল সূত্রে ইবনে মারদুবিয়া ও বায্যার এই বর্ণনাটিকে বলেছেন সর্বোন্নত (মারফু)। রসুল স. এর এক পবিত্র বচন থেকেও একথা প্রমাণিত হয়। যেমন হজরত আবু মাসউদ আনসারী থেকে ইসহাক বিন রহওয়াইহ্ তাঁর মসনদে, ইবনে মারদুবিয়া তাঁর তাফসীরে এবং বায়হাকী তাঁর আল-মা'রিফাতে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন সূর্য হেলে পড়লো, তখন জিবরাইল আমার নিকটে এলেন এবং জোহরের নামাজ পড়ালেন।

'দালাকা' কথাটির শাব্দিক অর্থ মিলিত করা। দ্বিপ্রহরের পর যখন সূর্য হেলে পড়ে তখন সূর্যের দিকে তাকানো যায় না। আলোর প্রখরতার কারণে চোখ আপনাআপনি বন্ধ হয়ে আসে। তাই 'দুলুক' অর্থ জাওয়াল বা হেলে পড়া।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'দুলুক' অর্থ সূর্যাস্তের সময়।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বাগবী লিখেছেন, 'দুলুক' অর্থ সূর্যাস্ত। ইব্রাহিম নাখয়ী, মুকাতিল ইবনে হাব্বান, জুহাক ও সুদ্দী বলেছেন, দুলুক অর্থ একদিকে ঝুঁকে পড়া বা হেলে যাওয়া। দ্বিপ্রহরের পর এবং সন্ধ্যার পর সূর্য তো হেলেই যায়। এই দু'টি সময়ই হচ্ছে সূর্য হেলে যাওয়ার সময়। 'কামুস ' প্রণেতা বলেছেন, 'দালাকাতিশ শামসু দুলুকা' অর্থ সূর্য ডুবে গিয়েছে, হলুদ হয়ে গিয়েছে, আকাশ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। বায়যাবী লিখেছেন, শব্দটির গঠন প্রকৃতিই প্রকাশ করছে স্থানান্তরিত হওয়া বা স্থানান্তরের অর্থ। মালিশ করাকেও 'দুলুক' বলে। কারণ মালিশ করার সময় মালিশকারীর হাত এদিকে ওদিকে সরে যায়। যে শব্দের প্রথম অক্ষর 'দাল' এবং পরের অক্ষর 'লাম'— সেই শব্দে স্থানান্তরের অর্থ অবশ্যই প্রকাশ পায়। যেমন— দালাজা, দালাহা, দালাআ, দালাফা ইত্যাদি।

বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ আলেম শব্দটির প্রথমোক্ত অর্থটিকেই গ্রহণ করেছেন। একথাটিও প্রণিধানযোগ্য যে, 'দুলুকি'র অর্থ সূর্য হেলে পড়া ধরা হলে আলোচ্য আয়াতে এসে যায় চার ওয়াক্ত নামাজের কথা। বাকী এক ওয়াক্ত অর্থাৎ ফজরের কথাও এসেছে এর অব্যবহিত পরেই। এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় প্রসঙ্গও তাহলে আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভূত হয়ে যায়।

'রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত' অর্থ পশ্চিমাকাশের লাল রঙ উঠে যাওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ রাতের আঁধার ঘনবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। এখানে 'গাসাক্ব' অর্থ ঘনবদ্ধ। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, সন্ধ্যার অবসানের পর রাতের যে অন্ধকার শুরু হয়। তাকে বলে 'গাসাক্ব'।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত।' এখানে 'ওয়া কুরআনাল ফাজরি' বলে ফজরের নামাজ পাঠকেই বুঝানো হয়েছে। কোরআন পাঠ যেহেতু নামাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ তাই এখানে কোরআনের উল্লেখের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে নামাজকেই। কোরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে রুকু ও সেজদার মাধ্যমেও নামাজকে বুঝানো হয়েছে। 'ইন্‌নাস্‌ সলাতা কানাত্‌ আ'লাল মু'মিনীনা কিতাবাম মাউকুতা' (নিশ্চয় নামাজ নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে বিশ্বাসীদের জন্য ফরজ করা হয়েছে) — সুরা নিসার এই আয়াতের তাফসীরে আমি যথাস্থানে নামাজের ওয়াক্তসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।' একথার অর্থ ফজরের নামাজ ফেরেশতামণ্ডলীর দ্বারা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কারণ ওই সময় রাতের ফেরেশতা ও দিনের ফেরেশতাদের গমনাগমনের সময়। পরিলক্ষিত হওয়া বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'শুহুদ' বা প্রত্যক্ষগোচর শব্দটি। বলা হয়েছে— 'কানা মাশহুদা।'

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, একা নামাজ পড়া থেকে জামাতে নামাজ পড়ার মধ্যে রয়েছে পঁচিশগুণ বেশী পুণ্য। আর ফজরের নামাজের সময় সম্মিলিত হয় দিনের ও রাতের ফেরেশতারা। হাদিসটি বর্ণনা করার পর হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একথার প্রমাণ যদি তোমরা চাও, তবে পড়ো— 'এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত।'

বায়যাবী লিখেছেন, ফজরের নামাজ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওই সময় রাতের ঘোর অন্ধকার কেটে গিয়ে সকল কিছু হয় সমুদ্ভাসিত। মুছে যায় মৃত্যুর অনুজ নিদ্রার প্রভাব। ওই সময়ের সাক্ষ্য দেয় অন্ধকার ও আলো, নিদ্রা ও জাগরণ এবং ফেরেশতাদের একটি বৃহৎ দল। অথবা ওই সময় জামাতে উপস্থিত হতে পারে বহুসংখ্যক নামাজী। কিংবা কথাটির মাধ্যমে এই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, ওই সময়ের নামাজে উপস্থিত হওয়া উচিত সকলের।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে একই সঙ্গে বলা হয়েছে মাগরিব ও ফজর নামাজের কথা। এভাবে আলোচ্য আয়াতের পূর্ণ বক্তব্যের মধ্যে মাগরিবের নামাজকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সূর্যাস্ত থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত। আর ফজরের ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করা হয়েছে রাত্রি অবসানের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। আর সূর্যোদয়ের প্রভা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সময় তো বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হওয়ারই সময়।

পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে, এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! রাতের একাংশে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে আপনি তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠ করবেন। এটা হচ্ছে আপনার একটি অতিরিক্ত (নফল) কর্ম। এখানকার 'বিহী' সর্বনামটি পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত কোরআন বা নামাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কামুস প্রণেতা লিখেছেন, 'হাজাদা' ও 'হুজুদা' হচ্ছে তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ। বাবে তাফায়্যুল নিয়মে এখানে শব্দটি রূপান্তরিত হয়েছে 'তাহাজ্জুদা।' 'নিদ্রাভিভূত হওয়া' ও 'জাগ্রত হওয়া'— দুই অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এটি বিপরীতার্থক শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এভাবে 'তাহজিদা' 'হাজ্জাদা' শব্দ দু'টোর অর্থও নিদ্রামগ্ন হওয়া ও নিদ্রাভঙ্গ হওয়া। সুতরাং এ দু'টোও বিপরীতার্থক শব্দ।

বাবে ইফআলের নিয়মে 'আহজাদা' ও 'হাজজাদা'র মতো। এভাবে নিদ্রামগ্ন হওয়ার ব্যাপারটি একই সঙ্গে লাজেম (অকর্মক ক্রিয়া), আবার মুতাআদ্দিও (সকর্মক ক্রিয়া)। প্রকৃত কথা এই যে, 'জীম' অক্ষরের উপরে তাশদীদ যদি সলবে মা'খুজ বা ধাত্যর্থ বিলোপ করার জন্য ধরা হয়, তবে অর্থ হবে— ঘুমকে দূর করা বা জাগ্রত হওয়া। আর মুতাআদ্দি বা সকর্মক ক্রিয়া ধরা হলে অর্থ হবে নিদ্রাভিভূত হওয়া।

বাগবী লিখেছেন, 'তাহাজ্জুদ' যখন জাগ্রত হওয়াকেই বুঝায় তখন মনে করতে হবে নামাজ পাঠ করতে হবে নিদ্রাভঙ্গের পর। কারণ সারারাত জেগে জেগে নামাজ পড়াকে কখনো তাহাজ্জুদ বলে না। আমি বলি, তাহাজ্জুদ অর্থ নামাজের

www.eelm.weebly.com

জন্য নিদ্রা পরিত্যাগ করা। এই নিদ্রা পরিত্যাগ হতে পারে তিনভাবে— ১. সারারাত জেগে জেগে নামাজ পড়া। ২. রাতের প্রথমাংশে জেগে থেকে নামাজ পড়া, শেষাংশে ঘুমিয়ে যাওয়া। এবং ৩. রাতের প্রথমাংশে ঘুমিয়ে যাওয়া, তারপর শেষরাতে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়া। শেষের প্রকারটির সুনির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই। হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে রোজা রাখতাম। তিনি কখনোই রাতে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে (তারাবীর) নামাজ পড়াননি। রমজানের ২৪ তারিখের রাতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন। নামাজের মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে গেলো রাতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। পরের রাতে তিনি আর উঠলেনই না। তার পরের রাতে পুনরায় আমাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন। সেদিন নামাজে অতিবাহিত হলো প্রায় অর্ধরাত। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কতোইনা উত্তম হতো, যদি আপনি আমাদেরকে নিয়ে সারারাত নামাজ পড়তেন। তিনি স. বললেন, যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে জামাতে (ইশার) নামাজ পড়ে নিদ্রা যায়, তার আমলনামায় লিখে দেয়া হয় সারারাত নামাজ পড়ার সওয়াব। এর পরের রাতেও তিনি আর নামাজে এলেন না। তার পরের রাতে আবার অপেক্ষমান সাহাবীগণকে নিয়ে নামাজ শুরু করলেন। এভাবে নামাজ পড়তে পড়তে 'ফালাহ' এর সময় চলে যাবার উপক্রম হলো। বর্ণনাকারী হজরত আবু জরের একথা শুনে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ জিজ্ঞেস করলো, হজরত! ফালাহ আবার কী? তিনি বললেন, সেহেরী। পুনরায় বললেন, এর পরের রাতগুলোতে তিনি স. আর নামাজ পড়াননি। সুনান রচয়িতাবৃন্দ হাদিসটির বর্ণনাকারী। শব্দগত কিছু হেরফের সহ তিরমিজি কর্তৃকও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

সায়েব ইবনে ইয়াজিদ বর্ণনা করেছেন, হজরত উবাই ইবনে কা'ব এবং হজরত তামীমদারীকে হজরত ওমর এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, লোকদেরকে এগারো রাকাত নামাজ পড়াবে। তাঁরা যখন ইমামতি করতেন তখন এরকমই করতেন। কিন্তু তাঁদের নামাজের রাকাত হতো খুব দীর্ঘ। ফলে আমরা কেউ কেউ লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতাম। এভাবে নামাজ পড়তে পড়তে প্রায়শই ফজরের নামাজের সময় হয়ে যেতো। মুয়াত্তা। হজরত উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, আমাদের রমজান মাসের রাতের নামাজ দীর্ঘায়িত হতো। ফলে সেহেরীর আহার্য তৈরী করতে হতো অত্যন্ত দ্রুত। হজরত মালেক ইবনে আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ভোরের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখতেন (অর্থাৎ সফরে তিনি স. তাঁর বাহনের উপরে প্রায় ভোর পর্যন্ত নফল নামাজ পড়তেন)।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. ভ্রমণাবস্থায় তাঁর উটের উপরে নফল নামাজ পাঠ করতেন, উটের মুখ যেদিকেই থাকুক না কেনো। তখন তিনি স. রুকু ও সেজদা করতেন ইশারায়। বিতির নামাজও তিনি তাঁর বাহনের

www.eelm.weebly.com

উপরেই পড়তেন। কিন্তু ফরজ নামাজের সময় হলে উট থামিয়ে নিচে নেমে আসতেন এবং কেবলামুখী হয়ে নামাজ পাঠ করতেন ভূমিতে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রাতের প্রথম অংশেই নামাজ পড়ে নেয়া ভালো। কারণ ঘুম কখন ভাঙবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অবশ্য প্রথম রাতের চেয়ে শেষ রাতের তাহাজ্জুদ নামাজের সওয়াব অনেক বেশী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর প্রথম আসমানে আমাদের প্রভুপালনকর্তার আনুরূপ্যবিহীন অবতরণ ঘটে এবং বর্ষিত হয় তার বিশেষ রহমত।

আবদুর রহমান ইবনে আবদুর কারী বর্ণনা করেছেন, আমি একবার হজরত ওমরের সাথে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে গেলাম। দেখলাম অধিকাংশ লোক পৃথক পৃথক অবস্থানে দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠ করছে। আর একপাশে জামাত করে নামাজ পড়ছে কয়েকজন। হজরত ওমর বললেন, আমি যদি এদের সকলকে এক ইমামের পশ্চাতে একত্র করে দেই, তবে তা হবে অতি উত্তম। একথা বলে তিনি হজরত উবাই ইবনে কা'বকে সকলের ইমাম বানিয়ে দিলেন। আর একদিন আমি হজরত ওমরের সঙ্গে মসজিদে গিয়ে দেখলাম, সকলে এক ইমামের পিছনে নামাজ পড়ছে। হজরত ওমর বললেন, এটা হচ্ছে এক নতুন উত্তম রীতি। এভাবে রাতের প্রথম অংশে নামাজ পড়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়তেন। হজরত ওমর তাই বলতেন, তোমরা নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে যাও। তোমাদের এই নামাজের চেয়ে শেষ রাতের নামাজই উত্তম। বোখারী।

মাসআলাঃ প্রথম দিকে তাহাজ্জুদ নামাজও রসুল স. ও তার সাহাবীগণের উপরে ছিলো ফরজ। এই ফরজের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো সুরা মুজাম্মেলের এক আয়াতে এভাবে— 'হে বস্ত্রাবৃত! নিশীথে নামাজে দণ্ডায়মান থাকুন, কিয়দংশ ব্যতীত, অর্থাৎ অর্ধরাত্রি।' পরবর্তীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয় এবং তাহাজ্জুদ নামাজকে করা হয় নফল। নির্দেশ দেয়া হয়— 'ফাক্বরায়ু মা তাইয়াস্‌সারা মিন্‌হু' (কাজেই কোরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমার জন্য সহজ হয়, ততটুকু আবৃত্তি করো)।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পর তাহাজ্জুদ নামাজ উম্মতের জন্য নফল হয়ে যায়। কিন্তু রসুল স. এর উপরে তা ফরজ না নফল, সে বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে বিস্তর মতপৃথকতা রয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে রসুল স. এর উপরে তাহাজ্জুদ নামাজ যেমন ফরজ ছিলো, তেমনি পরেও তা ফরজ রয়ে গিয়েছে। জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স.

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, তিনটি বিষয় আমার উপরে ফরজ, কিন্তু তোমাদের উপরে সেগুলো সুন্নত। ওই তিনটি বিষয় হচ্ছে— বিতির, মেসওয়াক ও তাহাজ্জুদের নামাজ। এই বর্ণনার প্রেক্ষিতে বলতে হয়, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'নাফিলাতাল্ লাক' (আপনার জন্য অতিরিক্ত কর্তব্য) — কথাটির অর্থ হবে অতিরিক্ত ফরজ। অর্থাৎ যা অন্যের উপর ফরজ নয়। আমি বলি, তাহাজ্জুদের ফরজ দায়িত্ব রসুল স. এর উপর থেকেও প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাই তাহাজ্জুদ ছিলো তাঁর মোসতাহাব জাতীয় অতিরিক্ত একটি আমল। আয়াতের বিবরণভঙ্গিতেও একথা স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। কেননা 'নাফিলা' (অতিরিক্ত) শব্দটির অর্থ যদি অতিরিক্ত ফরজ হতো, তবে এখানে 'লাকা' এর স্থলে বসতো 'আলাইকা' (তোমার উপর)। অত্যাবশ্যকীয় কোনো কিছুর উপরে কখনো 'লাম ' ব্যবহৃত হয় না, ব্যবহৃত হয় 'আলা'।

একটি প্রশ্নঃ তাহাজ্জুদের নামাজ তো সকলের জন্যই নফল। তবুও তা আলোচ্য আয়াতে রসুল স. এর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো কেনো?

উত্তরঃ নফল দ্বারা পাপ মোচন হয়। তাই উম্মতের পাপমোচনের নিমিত্তে সাধারণভাবে সকলের জন্য নফল ইবাদতের অবকাশ রাখা হয়েছে। কিন্তু রসুল স. ছিলেন নিষ্পাপ। পাপের সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পৃক্ততাই তাঁর ছিলো না। এছাড়াও তাঁর পূর্বাপর সকল অনবধানতাকেও আল্লাহ্ অপসারিত করে দিয়েছেন। তাই তাঁর নফল পাপমোচনের নিমিত্ত নয়, বরং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম। সে কারণেই এখানে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধিজনিত এই আমলটিকে 'অতিরিক্ত কর্তব্য' আখ্যা দেয়া হয়েছে। এছাড়া হজরত মুগীরা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসের মাধ্যমেও রসুল স. এর জন্যও তাহাজ্জুদ নফল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। হাদিসটি এই— রসুল স. রাতের নামাজে এতো দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, এতে করে তাঁর পবিত্র পদযুগল ফুলে যেতো। তাঁকে একবার বলা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তো পূর্বাপর সকল অনবধানতাজনিত বিচ্যুতি থেকে পবিত্র। তিনি স. বললেন, আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞপরায়ণ বান্দা হবো না? তখন কিন্তু তিনি স. একথা বলেননি যে, তাহাজ্জুদ আমার উপরে ফরজ।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. ফরজ নামাজ ছাড়া অন্য সকল প্রকার নামাজ উটের পিঠে বসেই পড়তেন। এমনকি বিতিরও। নামাজ পাঠ কালে উট যেদিকেই চলুক না কেনো, তার প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। এই হাদিসের মাধ্যমেও বুঝা যায় যে, তাহাজ্জুদ নামাজ ছিলো রসুল স. এর জন্য নফল, ফরজ নয়।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ উম্মতের জন্য তাহাজ্জুদ নামাজ সুন্নত। তবে এই সুন্নত মোয়াক্কাদা না গায়ের মোয়াক্কাদা, সে বিষয়ে সমাধান পাওয়া মুশকিল। আমার নিকটে কিন্তু তাহাজ্জুদ নামাজ সুন্নতে মোয়াক্কাদা। কেননা রসুল স. এই নামাজ সব সময় অতি গুরুত্ব ও যত্নের সঙ্গে পাঠ করেছেন। হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর কাছে একবার এক লোক সম্পর্কে বলা হলো 'সে তো সারারাত ঘুমিয়েই কাটায়'। রসুল স. বললেন, শয়তান তার কানে প্রস্রাব করে দিয়েছে। বোখারী, মুসলিম। তাহাজ্জুদ যদি সুন্নতে মোয়াক্কাদা না হতো, তবে নিশ্চয় রসুল স. ওই ব্যক্তিকে এভাবে ভর্ৎসনা করতেন না। মোসতাহাব আমল পরিত্যাগকারী কখনোই তিরস্কারের পাত্র নয়।

রসুল স. এর তাহাজ্জুদঃ হজরত জায়েদ বিন খালেদ জুহনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর রাতের আমল স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছা জেগেছিলো আমার মনে। তাই আমি একরাতে তাঁর বহিরাঙ্গণের দরজায় হেলান দিয়ে বসে রইলাম। দেখলাম গভীর রাতে উঠে তিনি দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত নামাজ পড়লেন। এরপর দুই রাকাত নামাজ পড়লেন দীর্ঘক্ষণ ধরে। এরপর দু'রাকাত পড়লেন কিছুটা সংক্ষেপে। তারপর আবার দু'রাকাত পড়লেন আরো সংক্ষেপে। তারপরে আরো সংক্ষিপ্তভাবে পড়লেন দুই রাকাত। এরপর পড়লেন বিতির। এভাবে তিনি স. নামাজ পড়লেন মোট তেরো রাকাত। বাগবী এরকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মেশকাত রচয়িতা লিখেছেন, বিতির সহ সর্বমোট নামাজ ছিলো পনেরো রাকাত। মেশকাতের এই বর্ণনাটি নেয়া হয়েছে 'কিতাবুল হুমায়দী', মুয়াত্তায়ে মালেক, সুনানে আবু দাউদ ও জামিউল উসুল থেকে। এক্ষেত্রে বিতির নামাজ হবে এক রাকাত। আর বাগবীর বর্ণনায় বিতিরের রাকাত সংখ্যা হবে তিন। অর্থাৎ তাহাজ্জুদ দশ ও বিতির তিন।

জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. রমজানে ও অন্যান্য সকল মাসে রাতে এগারো রাকাতের বেশী নামাজ পড়তেন না। প্রথম চার রাকাতের দৈর্ঘ ও সৌন্দর্য ছিলো দেখবার মতো। পরের প্রলম্বিত চার রাকাতের আকৃতি-প্রকৃতিও ছিলো অতীব সুন্দর। এরপর তিনি পড়তেন তিন রাকাত। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি বিতিরের আগে কি একবার ঘুমিয়ে নেন? তিনি স. বললেন, আয়েশা! আমি ঘুমাই কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না। বোখারী ও মুসলিম।

জননী আয়েশা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রমজানের ভিতর ও বাইরে রসুল স. ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তীতে সর্বমোট নামাজ পড়তেন এগারো রাকাত। প্রতি দু'রাকাত অন্তর সালাম ফেরাতেন। সব শেষে পড়তেন এক রাকাত এবং সেজদা করতেন দু'টি। সেজদায় গিয়ে এত সময় ক্ষেপণ করতেন যে, ওই সময়ের মধ্যে কেউ ইচ্ছে করলে পঞ্চাশ আয়াত তেলাওয়াত করে নিতে পারতো। এরপর শুয়ে

www.eelm.weebly.com

পড়তেন। উঠতেন ফজরের আজানের শেষে। তারপর সংক্ষেপে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিয়ে পুনরায় ডান হাতে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন। জামাতের সময় হলে মোয়াজ্জিন খবর দিতো। তিনি স. উঠে চলে যেতেন মসজিদে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমরা ইচ্ছে করলে রসুল স. এর রাতের নামাজ পাঠ দেখতে পারতাম (রাতে তিনি শয্যাগ্রহণ করতেন, আবার নামাজও পড়তেন)। হজরত আনাস থেকে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. কখনো কখনো একাধারে রোজা রাখতেন। আমরা ভাবতাম এ মাসে মনে হয় তিনি আর রোজা ভঙ্গ করবেনই না। আবার কখনো কখনো রোজা রাখতেন না। আমরা ভাবতে শুরু করতাম, এ মাসে মনে হয় তিনি আর রোজাই রাখবেন না। নাসাঈ।

জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. রাতে নামাজ পড়তেন মোট তেরো রাকাত। বিতির ও ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ছিলো ওই তেরো রাকাতের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম।

মাসরুক বর্ণনা করেছেন, আমি একবার জননী আয়েশার নিকটে রসুল স. এর রাতের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ফজরের দু'রাকাত সুন্নত ছাড়া তাঁর রাতের নামাজ হতো কখনো সাত কখনো এগারো রাকাত। জননী আয়েশা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. গভীর রাতে উঠে নামাজ পড়তেন। প্রথম দুই রাকাত পড়তেন সংক্ষিপ্তরূপে। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে সর্বোন্নত সূত্রে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা যদি রাতে উঠে নামাজ পড়তে চাও, তবে প্রথমে দু'রাকাত নামাজ পড়ে নিবে সংক্ষিপ্তরূপে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর প্রকোষ্ঠে শুয়ে ছিলাম। দেখলাম, গভীর রাতে তিনি স. গাত্রোত্থান করলেন। মেসওয়াক করলেন। তারপর পাঠ করলেন 'ইন্না ফী খলক্বিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি' থেকে সুরার শেষ পর্যন্ত। তারপর ওজু করে নামাজে দণ্ডায়মান হলেন। দীর্ঘ কিয়াম, রুকু ও সেজদা সহকারে পাঠ করলেন দুই রাকাত নামাজ। এরপর শুয়ে পড়লেন তিনি। এমনভাবে নিদ্রাভিভূত হলেন যে, শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ হয়ে উঠলো ভারী। পুনরায় উঠে পড়লেন তিনি। পুনরায় নামাজ শুরু করলেন। তিনি স. এরকম করলেন মোট তিন বার। এভাবে রাকাতের সংখ্যা দাঁড়ালো ছয়। প্রতিবারই উঠে তিনি স. প্রথমে মেসওয়াক করলেন। ওজু করলেন এবং পাঠ করলেন উল্লেখিত আয়াত। সবশেষে বিতির পড়লেন তিন রাকাত। মুসলিম।

জননী আয়েশা বলেছেন, শেষের দিকে যখন রসুল স. এর পবিত্র শরীর হলো কিছু হৃষ্টপুষ্ট, তখন তিনি রাতের নামাজ পড়তে লাগলেন বসে বসে। বোখারী,

www.eelm.weebly.com

মুসলিম। হজরত হুজায়ফা বলেছেন, আমি রসুল স.কে তাঁর রাতের নামাজ পাঠ করতে দেখেছি। তিনি স. শয্যাত্যাগের পর তিন বার 'আল্লাহু আকবর' উচ্চারণ করলেন। তারপর পড়লেন— 'জুল মালাকুতি ওয়াল জাবারুতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল আ'জমাতি।' এরপর তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে পাঠ করলেন সুরা বাকারা। এরপর রুকুতে গিয়ে কাটালেন প্রায় কিয়ামের পরিমাণ সময়। রুকুতে বারংবার পাঠ করলেন 'লি রব্বিইয়াল হামদ'। এরপর রুকু থেকে উঠে সেজদায় গেলেন। সেজদা করলেন প্রায় কিয়ামের সমপরিমাণ দীর্ঘ। আর বারংবার পাঠ করলেন 'সুবহানা রব্বিইয়াল আ'লা।' এরপর মাথা ওঠালেন। এভাবে বসে থাকলেন প্রায় সেজদার সমপরিমাণ সময়। বার বার পড়তে থাকলেন 'রব্বিগ্‌ফিরলি।' এভাবে তিনি সুরা বাকারা, সুরা আল ইমরান, সুরা নিসা ও সুরা আন্‌আম সহকারে নামাজ আদায় করলেন মোট চার রাকাত। আবু দাউদ।

হজরত আবু জর গিফারী বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর রাতের নামাজ পাঠ দেখলাম। তিনি নামাজে একটি আয়াত পুনঃপুনঃ পাঠ করতে করতেই কাটিয়ে দিলেন সমস্ত রাত। আয়াত এই— ইন্ তুয়াজ্‌জিব্‌হুম ফা ইন্‌নাহুম ই'বাদুকা ওয়া ইন্ তাগ্‌ফিরলাহুম ফা ইন্‌নাকা আনতাল আ'যীযুল হাকীম (যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করো, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়)।

জনৈক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. ইশার নামাজ আদায়ের কিছুক্ষণ পরে শয্যাগ্রহণ করলেন। গভীর রাতে জেগে উঠলেন, আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পাঠ করলেন 'রব্বানা মা খলাক্বতা হাজা বাত্বিলা' থেকে 'ইন্‌নাকা লা তুখলিফুল মীয়াদ' পর্যন্ত। তারপর শয্যার দিকে হাত বাড়িয়ে মেসওয়াক গ্রহণ করলেন। মেসওয়াক করার পর ওজু সেরে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন নামাজে। আমার মতে তিনি স. নামাজ পড়লেন ওই পরিমাণ সময় ধরে, যে পরিমাণ সময় তিনি ব্যয় করেছিলেন নিদ্রায়। এরপর তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমালেন প্রায় একই পরিমাণ সময়। পুনরায় উঠে নামাজ শুরু করলেন তিনি স.। ফজর পর্যন্ত এরকম করলেন তিনি তিন বার। নাসাঈ।

জননী উম্মে সালমা বলেছেন, রসুল স. যে পরিমাণ সময় ঘুমাতেন, নামাজও পড়তেন সেই পরিমাণ সময় ধরে। আবার যতক্ষণ তিনি নামাজ পড়তেন, ঘুমাতেনও ঠিক ততক্ষণ। এভাবেই অতিবাহিত হতো তাঁর রাত্রি। জননী উম্মে সালমার নিকটে একবার রসুল স. এর কোরআন পাঠ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো। তিনি প্রতিটি শব্দের পৃথক ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে কোরআন পাঠ করে শোনালেন এবং বললেন, এভাবে। আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসাঈ।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।' এখানে 'মাকামাম্ মাহমূদা' অর্থ প্রশংসিত স্থান। পূর্বাপর সকল মানুষ ওই স্থানের প্রশংসায় হবে পঞ্চমুখ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে আবু দায়েলের মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. একবার বললেন, আল্লাহ্ নবী ইব্রাহিমকে বানিয়েছেন তাঁর খলিল (বন্ধু)। তোমাদের সাথীও আল্লাহ্র খলিল। তাঁকেই করা হয়েছে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ সম্মানার্হ। এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন—'আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে'। রসুল স. পুনরায় বললেন, আল্লাহ্ তাঁকে তখন উপবেশন করাবেন আরশের উপরে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেছেন, আল্লাহ্ তখন রসুল স.কে সমাসীন করবেন কুরসির উপরে। প্রথমোক্ত হাদিসের মাধ্যমে বুঝা যায় মাকামে মাহমুদ হচ্ছে আরশ। আর পরের হাদিসের মাধ্যমে জানা যায়, কুরসিই হচ্ছে মাকামে মাহমুদ। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, মাকামে মাহমুদ অর্থ মাকামে শাফায়াত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি, আহমদ ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মাকামে মাহমুদ হচ্ছে ওই স্থান যেখানে অধিষ্ঠিত হয়ে আমি শাফায়াত করবো আমার উম্মতের জন্য।

হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে মুসলমানেরা কঠোর হিসাবের ব্যবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়বে এবং আক্ষেপ করে বলতে থাকবে, হায়! আমরা যদি এখন কাউকে সুপারিশকারী হিসেবে পেতাম, তবে তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার নিকটে আমাদের জন্য সুপারিশ করাতে পারতাম। তারা ভেবে চিন্তে দেখবে নবী আদম হচ্ছেন সকলের আদি পিতা। অতএব তিনিই একাজের উপযুক্ত। নবী আদমের কাছে গিয়ে তখন তারা বলবে, আপনি আমাদের সকলের পিতা। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অলৌকিক হাতে সৃষ্টি করেছেন আপনাকে। পরম যত্নে স্থান দিয়েছেন জান্নাতে। সম্মানিত করেছেন ফেরেশতাদের সেজদার মাধ্যমে। শিখিয়েছেন সকল কিছুর নাম। সুতরাং আপনি আপনার প্রভুপালকের নিকটে সুপারিশ করে আমাদেরকে এ স্থান থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করুন। নবী আদমের তখন মনে পড়বে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের কথা। তাই তিনি বলবেন, আমি এই গুরুদায়িত্ব বহনের উপযোগী নই। তোমরা নুহের কাছে যাও। তিনিই মহাপ্লাবনের পরের প্রথম নবী। আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন পৃথিবীবাসীদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে। লোকেরা তখন উপস্থিত হবে নবী নুহের নিকটে। জানাবে তাদের অভিপ্রায়। তিনি বলবেন, অজ্ঞাতসারে আমি আমার এক কাফের পুত্রের জন্য দোয়া করেছিলাম। সে কথা স্মরণ করে আমি লজ্জিত। তোমরা বরং ইব্রাহিম

www.eelm.weebly.com

খলিলুল্লাহ্র নিকটে যাও। লোকেরা উপস্থিত হবে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ সকাশে। তাঁর তখন মনে পড়ে যাবে ওই তিনটি বচনের কথা যা প্রকাশ্যতঃ অসত্য। ওই তিনটি উক্তি হচ্ছে— ১. মিসরের বাদশাহ্র কাছে তিনি তাঁর স্ত্রী সারাকে বলেছিলেন তাঁর বোন। ২. অংশীবাদীদের মেলায় গমনের জন্য আহ্বান জানানো হলে তিনি বলেছিলেন, আমি অসুস্থ। ৩. তাদের মূর্তিগুলোকে ভাঙার পর একটি অক্ষত মূর্তিকে দেখিয়ে বলেছিলেন, একাজ করেছে ওই মূর্তিটি। ওই তিনটি কথা মনে পড়ার কারণে নবী ইব্রাহিম তখন লজ্জিত হবেন এবং বলবেন, হে জনতা! তোমরা রসুল মুসার কাছে গিয়ে ধর্ণা দাও। আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন। তাঁকে দান করেছেন তওরাত। জনতা তখন সমবেত হবে রসুল মুসা সকাশে। তিনি তাদের কথা শুনে বলবেন, এরকম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা আমার নেই। আমার আঘাতে নিহত হয়েছিলো এক কিবতী। সে কথা স্মরণ করে আমি এখন ব্রীড়াক্রান্ত। তোমরা বরং যাও ঈসা রূহুল্লাহ্র কাছে। তিনি আল্লাহ্র রসুল, রূহুল্লাহ্ ও কালিমাতুল্লাহ্। উদভ্রান্ত জনস্রোত তখন উপস্থিত হবে ঈসা রূহুল্লাহ্র নিকটে। তিনি বলবেন, হে জনতা! তোমরা ভুল করেছো। তোমাদের এখন যাওয়া উচিত শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফার কাছে। তিনিই এই মহান কর্তব্য পালনের পরিপূর্ণ যোগ্যতাধারী। আল্লাহ্ তাঁর পূর্বাপর সকল বিচ্যুতি অবলোপন করে দিয়েছেন। লোকেরা তখন আসবে আমার কাছে। আমি তখন মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রার্থনা জানাবো। অনুমতি পাওয়ার পর আমি ওই প্রশংসিত স্থানে গিয়ে সেজদাবনত হবো। আল্লাহ্ বলবেন, হে আমার প্রেমাস্পদ! মস্তক উত্তোলন করো। আজ তোমার প্রার্থনা কবুল করা হবে। আমি সেজদা থেকে মস্তক উত্তোলন করে বর্ণনা করবো আল্লাহ্র বিশেষ প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি— যেমন তিনি শিক্ষা দান করবেন। তারপর আমি শুরু করবো শাফায়াত। আল্লাহ্তায়ালা আমার জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে দিবেন। আমার শাফায়াত হবে ওই সীমানার ভিতরেই। আমার শাফায়াত গৃহীত হবে। এরপর যাদের জন্য আমার শাফায়াত গৃহীত হবে তাদেরকে দোজখ থেকে বের করে পৌঁছে দিবো জান্নাতে। পুনরায় আমি চাইবো ওই প্রশংসিত স্থান। পুনরায় আমাকে দেয়া হবে সেখানে প্রবেশের অধিকার। সেখানে প্রবেশ করে আল্লাহ্র দীদার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় লুটিয়ে পড়বো আমি। ওই অবস্থায় থাকবো ততক্ষণ, যতক্ষণ আল্লাহ্ চান। আল্লাহ্ বলবেন, প্রিয়তম মোহাম্মদ! মাথা ওঠাও। মনোবাসনা প্রকাশ করো। দাবি উত্থাপন করো। তোমার কামনা ও দাবি পূরণ করা হবে। আমি মাথা ওঠাবো এবং আল্লাহ্র প্রশিক্ষণানুযায়ী কেবল তাঁরই প্রশংসা ও প্রশস্তি বর্ণনায় মুখর হবো, যতক্ষণ তিনি চান। তারপর অনেক জাহান্নামবাসীদের জন্য সুপারিশ করবো। যাদের জন্য সুপারিশ করবো, তাদের জন্য ঘোষিত হবে নিষ্কৃতি

www.eelm.weebly.com

দানের আদেশ। আর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে এনে পৌঁছে দিবো বেহেশতে। তৃতীয়বারও ঘটবে এরকম শাফায়াতের ঘটনা। অবশেষে জাহান্নামে থাকবে কেবল তারা, যাদের জাহান্নামী হওয়ার বিষয়ে পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বলার পর রসুল স. তেলাওয়াত করলেন— আশা করা যায় তোমার প্রভুপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। এরপর তিনি স. উপস্থিত সহচরবর্গকে লক্ষ্য করে বললেন, এই হচ্ছে মাকামে মাহমুদের বিবরণ, যার অঙ্গীকার করেছেন তোমাদের প্রভুপালক তোমাদের নবীর সঙ্গে।

হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসেও শাফায়াতের কথা বলা হয়েছে। হাদিসটির বিবরণভঙ্গি এরকম— রসুল স. বলেন, আমি আমার প্রভুপালনকর্তার নিকটে শাফায়াতের মাকামে অনুপ্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করবো। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমার হৃদয়ে তখন প্রক্ষেপ করা হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিছু প্রশংসা প্রকাশক বাক্য, যে বাক্যগুলো এখন আমার স্মৃতিতে নেই। ওই বাক্যগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র স্তব-স্তুতি বর্ণনা করার পর আমি সেজদাবনত হবো। আল্লাহ্ বলবেন, হে আমার প্রিয়তম রসুল! মস্তক উত্তোলন করো, তোমার নিবেদন ও দাবি পূরণ করা হবে। কবুল করা হবে তোমার প্রার্থনা— শাফায়াত। আমি বলবো, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমার উম্মত। আমার উম্মত। আল্লাহ্ বলবেন, যার অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ইমান আছে তাকে নরক থেকে বের করে নিয়ে এসো। আমি তাঁর নির্দেশ প্রতিপালন করবো। পুনরায় তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পর সেজদায় লুটিয়ে পড়বো আমি। নির্দেশ হবে, যাদের অন্তরে সরিষার দানা অপেক্ষাও কম পরিমাণ ইমান রয়েছে, তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো। আমি তৎক্ষণাৎ এ নির্দেশ পালন করবো। এরপর রসুল স. এভাবে তৃতীয় ও চতুর্থবার শাফায়াতের কথা উল্লেখ করলেন। তারপর বললেন, শেষে আমি বলবো, হে আমার মহাদয়ার্দ্র প্রভুপালক! ওই সকল লোককে বের করার নির্দেশও আমাকে প্রদান করুন যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ উচ্চারণ করেছিলো। আল্লাহ্ বলবেন, আমার সম্মান, মহত্ত্ব, পরাক্রম ও প্রতাপের শপথ! যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলেছিলো, তাদেরকে আমি অবশ্যই নিষ্কৃতি দিবো।

আল্লামা সুয়ূতি লিখেছেন, বিদ্বজ্জনেরা বর্ণিত হাদিসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে গভীর সন্দেহ পোষণ করেছেন। কেননা এখানে প্রথমে বর্ণিত হয়েছে, বিচারের জন্য অপেক্ষমান জনতার দুঃখ কষ্টের কথা। শেষাংশে এসেছে শাফায়াত ও দোজখ থেকে পরিত্রাণের আলোচনা। বলাবাহুল্য যে, শাফায়াত ও দোজখ মুক্তি

www.eelm.weebly.com

তো শেষেই হবে। এর পূর্বে ঘটবে পুলসিরাত অতিক্রমের ঘটনা। পুলসিরাত অতিক্রম করতে গিয়ে অনেকেই পতিত হবে দোজখে। কিন্তু হজরত হুজায়ফা কর্তৃক বর্ণিত একটি যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসে পুলসিরাত অতিক্রমের কথা এসেছে শাফায়াতের পরে। আর হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, তখন প্রত্যেককে হুকুম দেয়া হবে, পৃথিবীতে যে যার ইবাদত করেছে সে তার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হও। এরপর পৃথক করে ফেলা হবে মুমিন ও মুনাফিকদেরকে। তারপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে পুলসিরাত। তারপর দেয়া হবে শাফায়াত এবং দোজখ থেকে বের করে আনার হুকুম। প্রত্যেকে তখন একত্র হবে তাদের নেতাদের পশ্চাতে। আর শাফায়াতের মাধ্যমে দোজখ মুক্তির ঘটনাটি ঘটবে সকলের শেষে। এই ধারাবাহিকতাটির উল্লেখ করেছেন কাযী আয়ায ও ইমাম নববী।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসসমূহের বিবরণ কিছুটা সংক্ষিপ্ত। প্রকৃত কথা এই যে, শাফায়াত হবে দু'বার। প্রথম বার হবে হাশরের প্রান্তরের কষ্টদায়ক অবস্থান থেকে মুক্তির লক্ষ্যে। দ্বিতীয়বার হবে দোজখ থেকে পরিত্রাণ প্রদানের জন্য। অন্যান্য হাদিসে এরকম বলা হয়েছে।

আমি আরো বলি, বর্ণিত হাদিসের 'ফী দারিহী' কথাটির অর্থ হবে জান্নাত। কেননা জান্নাতই হচ্ছে আল্লাহ্র দীদারের একমাত্র স্থান। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ্কে দেখে সেজদায় পতিত হওয়ার ঘটনাটি ঘটবে জান্নাতে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, লোকেরা তখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছুটাছুটি করতে থাকবে। আর প্রত্যেকে থাকবে তাদের আপনাপন নবীদের সঙ্গে এবং তাদেরকে তারা শাফায়াত করার জন্য নিবেদনও জানাবে। কিন্তু শাফায়াতের অধিকার পাবেন কেবল শেষ নবী মোহাম্মদ স.। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুলকে দণ্ডায়মান করিয়ে দিবেন মাকামে মাহমুদে বা প্রশংসিত স্থানে। অন্যান্য হাদিসে বিষয়টির বর্ণনা এসেছে এভাবে— সূর্য তখন নেমে আসবে অতি নিকটে। তার প্রচণ্ড উত্তাপে সৃষ্টি হবে মানুষের শরীর থেকে ঘামের স্রোত। ওই স্বেদস্রোতে মানুষের শরীর ডুবে যাবে তাদের কান পর্যন্ত। তখন তারা আদি পিতা আদমের নিকটে সমবেত হয়ে শাফায়াতের জন্য ফরিয়াদ জানাবে। বাবা আদম বলবেন, শাফায়াত করার অধিকার আমার নেই। সর্বশেষে উদভ্রান্ত জনতা উপস্থিত হবে রসুল স. সকাশে। আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তিনি শাফায়াত করবেন। জড়িয়ে ধরবেন জান্নাতের দরজা। আল্লাহ্ তখন তাঁর প্রিয়তম রসুলকে দাঁড় করাবেন মাকামে মাহমুদে। তাঁর ওই অভূতপূর্ব মর্যাদা অবলোকন করে সমবেত জনমণ্ডলী শতমুখে তাঁর প্রশংসা করতে থাকবে।

হজরত হুজায়ফা থেকে বাযযার ও বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ তখন সকল মানুষকে সমবেত করবেন এক বিশাল প্রান্তরে। আপনাপন পরিণতির ভাবনায় তখন সকলেই হয়ে পড়বে বাকরুদ্ধ। সর্বপ্রথম আহ্বান করা হবে

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদ! তিনি স. বলবেন, এই যে আমি। হে আমার প্রভুপালক! আমি তো লাভ করেছি তোমার সান্নিধ্যের কল্যাণ। সকল কল্যাণের অধিকারী কেবল তুমি। অকল্যাণ থেকে তুমি সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত। তুমি যাকে পথের সন্ধান দাও, সে-ই হয় পথপ্রাপ্ত। তোমার অপার প্রীতিপ্লাবিত এই দাস এখন তোমার সকাশে দণ্ডায়মান। তুমিই তোমার অসীম অনুগ্রহের কারণে তাকে দান করেছো মানব অস্তিত্ব। আর তার সততপ্রত্যাবর্তন তোমারই অভিমুখী। এভাবে সমগ্র সৃষ্টি তোমার দিকেই ধাবিত। অন্য কোনো দিকে পলায়নের সাধ্য কারো নেই। পলায়নকারীদেরও অনিবার্য গন্তব্য কেবলই তুমি। হে মহিমময় কাবাগৃহের একমাত্র অধিকর্তা! তুমি মহা কল্যাণময়। সকল কিছু অপেক্ষা সমুচ্চ। একথা বলে রসুল স. তাঁর শাফায়াতের দায়িত্ব পালন করবেন। অধিষ্ঠিত হবেন ওই মর্যাদায়, যার সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'আ'সা আঁই ইয়াব্‌আঁছাকা রব্বুকা মাক্বামাম মাহ্‌মূদা' (আশা করা যায় তোমার প্রভুপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।

হাসান বসরী সূত্রে তিরমিজি এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইবনে খুজাইমা ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি আদম সন্তানদের অগ্রণী। এটা আমার কোনো অহমিকা প্রকাশক উক্তি নয়। মহা বিচারের দিবসে আমার হাতেই থাকবে প্রশংসার পতাকা। আমার এই বক্তব্যটিও অহংকার মুক্ত। ওই দিন সকল আদম সন্তান সমবেত হবে আমার পতাকাতলে। সমাধিক্ষেত্র থেকে সর্বপ্রথম পুনরুত্থিতও হবো আমি। আমার এ কথার মধ্যেও অহংকারের লেশ মাত্র নেই। ওই দিন তিনটি বিষয় হবে সকলের আশংকার কারণ। বিপদগ্রস্ত জনতা শাফায়াতের আশায় তখন উপস্থিত হবে আদমের নিকটে। বলবে, আপনি আমাদের সকলের পিতা। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আদম বলবেন, আমার একটি বিভ্রমের কারণে আমাকে নামিয়ে দেয়া হয়েছিলো পৃথিবীতে। তোমরা বরং নুহের কাছে যাও। নবী নুহের কাছে যখন সকলে একত্র হবে, তখন তিনি বলবেন, আমার প্রার্থনার কারণে আল্লাহ্ মহাপ্লাবনের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিকে ধ্বংস করেছিলেন। তোমরা বরং ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্‌র কাছে যাও। লোকেরা তাই করবে। নবী ইব্রাহিম বলবেন, আমি এমন তিনটি কথা বলেছি, যা প্রকাশ্যতঃ অসত্য। সুতরাং তোমাদের অভিলাষ পূরণার্থে মুসা কলীমুল্লাহ্‌র নিকটে যাওয়াই উত্তম। কিংকর্তব্যবিমূঢ় জনতা তখন তাই করবে। তাদের নিবেদন শুনে মুসা কলীমুল্লাহ্ বলবেন, হত্যার উদ্দেশ্য না থাকা সত্ত্বেও আমার প্রহারে এক লোকের মৃত্যু ঘটেছিলো। অতএব তোমরা ঈসা রুহুল্লাহ্‌র কাছে যাও। মুসা কলিমুল্লাহ্‌র পরামর্শক্রমে তারা তখন উপস্থিত হবে ঈসা রুহুল্লাহ্ সকাশে। তাদের আবেদন শুনে তিনি বলবেন, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে আমার উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো।

www.eelm.weebly.com

সুতরাং তোমরা এবার যাও শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফার দরবারে। তখন বিশাল জনতা ছুটে আসবে আমার কাছে। আমি তখন জান্নাতের দরজায় করাঘাত করবো। প্রহরী ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে, কে? আমি বলবো, মোহাম্মদ। আমারই জন্য তখন খুলে দেয়া হবে জান্নাতের তোরণ। ফেরেশতাদের কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হবে, মারহাবা, মারহাবা। আমি সেজদাবনত হবো। আমার হৃদয়ে প্রক্ষেপিত হবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কতিপয় প্রশংসা ও পবিত্রতাপ্রকাশক বচন। হুকুম হবে, মাথা তোলো। চাও এবং দাবি জানাও। শাফায়াত করো। তোমার শাফায়াত মঞ্জুর করা হবে। প্রকাশ করো তোমার মনোবাসনা। শ্রবণ করা হবে। আল্লাহ্র সঙ্গে আমার ওই একান্ত আলাপনের স্থানটিই হচ্ছে মাকামে মাহমুদ। কুরতুবী বলেছেন, তিনটি আশংকা উদ্রেককারী বিষয়ের একটি হচ্ছে এই। আর দু'টি হচ্ছে— ১. দোজখকে রশি দিয়ে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে হাজির করানো হবে হাশর প্রান্তরে। ২. দোজখের ওই লেলিহান রূপ দেখে মানুষের ভয়ের কোনো সীমা পরিসীমা থাকবে না।

ইবনে খুজাইমা ও তিবরানীর একটি শুদ্ধসূত্রসম্বলিত বর্ণনায় এসেছে, হজরত সালমান বলেছেন, কিয়ামতের দিন সূর্যকে দেয়া হবে তার দশ বছরের সমান তাপ এবং তাকে আনা হবে মানুষের মাথার উপরে। লোকেরা তখন উপস্থিত হবে রসুল স. এর নিকটে। নিবেদন জানাবে শাফায়াতের। রসুল স. বলবেন, হ্যাঁ। আমি তোমাদের সঙ্গী হবো। একথা বলে তিনি জান্নাতের দরজার কড়া নাড়বেন। ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করা হবে, কে? তিনি বলবেন, মোহাম্মদ। দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। তিনি প্রবেশ করবেন। আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পতিত হবেন সেজদায়। নির্দেশ হবে, মাথা তোলো। অভিলাষ প্রকাশ করো, পূরণ করা হবে। শাফায়াত করো, কবুল করা হবে। এই শাফায়াতের মাকামই হচ্ছে 'মাকামে মাহমুদ'।

কুরতুবি বলেছেন, বর্ণনাটি অসম্পূর্ণ। কিন্তু ইবনে আবী হাতেম তাঁর 'আস্সুন্নাহ্' গ্রন্থে এবং তাঁর বর্ণনায় বিষয়টি বিশদভাবে এনেছেন। তাঁদের বর্ণনার শেষদিকে বলা হয়েছে, যাদের অন্তরে গম, যব অথবা সরিষার দানার সমপরিমাণ ইমান থাকবে, তাদের জন্য শাফায়াত করা হবে। শাফায়াতের ওই মাকামই হবে মাকামে মাহমুদ।

হজরত কা'ব ইবনে মালিক থেকে তিবরানী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ সকলকে পুনরুত্থিত করবেন। আমি ও আমার উম্মত থাকবো একটি উচ্চভূমিতে। আমার প্রভুপালনকর্তা আমাকে পরিধান করাবেন একটি সবুজ পোশাক। তারপর আমাকে শাফায়াতের অনুমতি দেয়া হবে। আমি তখন ওই সকল শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করতে থাকবো, যা তাঁর জন্য শোভন। ওই স্থানের নামই প্রশংসিত স্থান।

www.eelm.weebly.com

জ্ঞাতব্যঃ শাফায়াতে কোবরা বা মহান সুপারিশ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণসমৃদ্ধ অনেক হাদিসই রয়েছে। যেমন বায্যার, আবু আ'ওয়ানা, আবু ইয়ালী ও ইবনে হাব্বান হজরত আবু বকর সিদ্দিক থেকে, বোখারী-মুসলিম প্রমুখ হজরত আবু হোরায়রা থেকে, আহমদ ও আবু ইয়ালি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে, মুসলিম ও হাকেম হজরত হুজায়ফা ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং তিবরানী ইবনে মোবারক ও ইবনে জারীর হজরত উকবা বিন আমের থেকে। সুরা ইব্রাহিমের 'ওয়া কুলাশ শাইত্বনু লামা কুদ্বিইয়াল আমরু' আয়াতের তাফসীরে আমি বিষয়টির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছি। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে। কুরতুবী লিখেছেন, এটাই শাফায়াতে আম্মাহ্ (সাধারণ শাফায়াত), যার অধিকার দেয়া হয়েছে কেবল রসুল স.কে। এই হাদিসে আরো বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক নবীকে দেয়া হয় একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার। অন্য নবীগণ সেই দোয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেছেন। কিন্তু আমি তা আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছি। কুরতুবী শেষে বলেছেন, শাফায়াতের ফলে হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা থেকে পরিত্রাণ পাবে সকলে এবং সকলের হিসাব নিকাশের পর্বও সম্পন্ন হবে দ্রুত।

আমি বলি, এখানে যে দোয়া সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে তা হবে তৃতীয় শাফায়াতের দোয়া, যার মাধ্যমে পরিত্রাণ পাবে দোজখবাসী পাপী-বিশ্বাসীরা। রসুল স. হবেন তিনটি শাফায়াতের অধিকারী। ইবনে জারীরের তাফসীরে, তিবরানীর আল মুতাওয়ালাত, আবু ইয়ালীর মসনদে, বায়হাকীর বা'ছ গ্রন্থে, আবু মুসা মদিনীর আল মুতাওয়ালাত, আলী বিন মায়্বাদের আত্ত্বয়াত ওয়াল ইসইয়ান গ্রন্থে এবং আবু শায়েখের কিতাবুল উজমায় হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে রয়েছে শিঙ্গার জন্ম-বৃত্তান্ত, ফুৎকার, কিয়ামতের ভয়াবহতা, জান্নাত, জাহান্নাম, শাফায়াতের মাধ্যমে অনেক দোজখবাসীর নিষ্কৃতি ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ। সেখানে আরো বলা হয়েছে, দোজখ থেকে নিষ্কৃতি-প্রাপ্তদের স্কন্ধদেশে লেখা থাকবে 'রহমান কর্তৃক বিশেষ রহমতে মুক্তিপ্রাপ্ত।' আমি নিম্নে হাদিসটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করলাম।

হাশরের প্রান্তরে বিচারের জন্য সকলকে আটকে রাখা হবে। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া হবে না। মানুষ আহাজারি করতে থাকবে। একটা কিছু ফয়সালার জন্য হয়ে উঠবে অস্থির। তারা সুপারিশের নিবেদন জানাবে প্রথমে হজরত আদমের নিকটে। তিনি বলবেন, এ অধিকার আমার নেই। বিফল মনোরথ হয়ে মানুষ তখন ধর্ণা দিবে বিভিন্ন নবীর কাছে। কিন্তু সকলেই এ ব্যাপারে তাঁদের অপারগতা প্রকাশ করবেন। শেষে সকলে আসবে আমার কাছে। আমি তাদের

www.eelm.weebly.com

নিবেদন শ্রবণ করবো। আরশের সামনে গিয়ে সেজদায় পতিত হবো। আল্লাহ্তায়ালা সর্বজ্ঞ। তবু বলবেন, অভিলাষ প্রকাশ করো। আমি বলবো, হে আমার প্রভুপালনকর্তা। তুমি আমাকে শাফায়াতের অধিকার দান করবে বলে ওয়াদা করেছো। তোমার ওই বিশেষ অনুগ্রহের সূত্রে আজ আমার নিবেদন— বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্য আমার সুপারিশ কবুল করো। অতিদ্রুত সকলের বিচার মীমাংসা করে দাও। আল্লাহ্ বলবেন, তোমার সুপারিশ কবুল করলাম। এরপর শুরু হবে বিচার। হাদিস শরীফে এরপর দেয়া হয়েছে সকল পশু-পাখির বিচারের দীর্ঘ বিবরণ। তারপর উল্লেখ করা হয়েছে মানুষের বিভিন্ন প্রকার অনাচার অত্যাচারের বিচার-মীমাংসার কথা। এরপর সকলকে নির্দেশ দেয়া হবে প্রত্যেকে তাদের আপনাপন উপাস্যের সঙ্গে মিলিত হও। অংশীবাদীরা তখন মিলিত হবে তাদের বাতিল দেব-দেবীদের সঙ্গে। আর ইমানদারেরা হয়ে যাবে পৃথক। মুনাফিকেরাও থাকবে তাদের সঙ্গে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর আনুরূপ্যবিহীন কদম কিঞ্চিত উন্মোচন করবেন। বর্ণনাতীত সৌন্দর্য অবলোকন করে ইমানদারেরা লুটিয়ে পড়বে সেজদায়। কিন্তু মুনাফিকেরা সেজদা করতে পারবে না। শক্ত হয়ে যাবে তাদের সমস্ত শরীর। স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকবে তারা। এরপর দোজখের উপর প্রতিষ্ঠা করা হবে পুলসিরাত। সকলকে হুকুম দেয়া হবে, পুলসিরাত পার হও। কেউ কেউ ওই সেতু পার হবে বিনা বাধায়। কেউ কেউ কিছুটা বাধা প্রাপ্ত হবে। কিন্তু কষ্টে সৃষ্টে পৌঁছে যাবে ওপারে। কেউ কেউ তাদের শরীরে পাবে লোহার শিকলের আঘাত। ফলে তারা আহত হয়ে পড়ে যাবে দোজখের আগুনে। যারা পুলসিরাত অতিক্রম করবে তারা আবার হবে সুপারিশকারীর মুখাপেক্ষী। সুপারিশের প্রস্তাব নিয়ে তারা তখন গমন করবে নবী আদমের কাছে। তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের কথা স্মরণ করে বলবেন, আমি তোমাদের সুপারিশ করার উপযুক্ত নই। তোমরা নুহের কাছে যাও। লোকেরা যাবে নুহ নবীর কাছে। তিনিও জ্ঞাপন করবেন তাঁর অপারগতা। এরপর বিপদায়িত জনতা একে একে যাবে ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসা— এই নবীত্রয়ের নিকটে। তাঁরাও প্রকাশ করবেন তাঁদের অক্ষমতার কথা। শেষে সকলে আসবে আমার কাছে। আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পেয়েছি তিন ধরনের শাফায়াতের অধিকার। আল্লাহ্তায়ালা এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি তখন বেহেশতের কপাটের শিকল ধরে নাড়া দিবো। খুলে যাবে বেহেশতের দরজা। আল্লাহ্তায়ালার আনুরূপ্যহীন সন্দর্শন অক্ষিগোচর হতেই আমি পতিত হবো সেজদায়। আল্লাহ্ আমাকে দান করবেন তাঁর মর্যাদা ও মহত্ত্বের প্রশংসা প্রকাশের এক বিশেষ অনুমতি, যা ইতোপূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি ও পরবর্তীতেও আর কাউকে দেয়া হবে না। তারপর বলবেন, প্রিয়তম রসুল আমার! মস্তক উত্তোলন করো। সুপারিশ করো। তোমার সুপারিশ কবুল করা

www.eelm.weebly.com

হবে। যাচ্এগ্রা করো। অভিলাষ পূরণ করা হবে। আমি বলবো, হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালক! তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো। অপেক্ষমান জনতাকে দাও জান্নাতের প্রবেশাধিকার। মঞ্জুর করা হবে তাঁর সুপারিশ।

এরপর আলোচিত হয়েছে দোজখবাসীদের প্রসঙ্গ। বলা হয়েছে, বিপুল সংখ্যক লোক পতিত হবে দোজখে। বিভিন্ন রকমের শাস্তিতে নিপতিত হবে তারা। কারো শাস্তি হবে অল্প। কারো অধিক। আগুন কেবল জ্বালাতে থাকবে কারো কারো পায়ের গ্রন্থি। আগুনে দগ্ধ হতে থাকবে কারো কারো হাঁটু ও তার নিম্নাংশ, কারো কারো কোমর ও তার নিম্নভাগ। কারো কারো মুখ ছাড়া সমস্ত শরীরই থাকবে অনলাবৃত। আমি নিবেদন জানাবো, হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালক! আমার উম্মতের কোনো কোনো লোক এখনও অগ্নি-আক্রান্ত। আল্লাহ্ বলবেন, যাদেরকে চিনতে পারো, তাদেরকে বের করে নিয়ে এসো। আমি আমার পাপী উম্মতকে একে একে দোজখ থেকে বের করে নিয়ে আসবো। শেষে আমার কোনো উম্মতই আর দোজখে থাকবে না। এরপর আল্লাহ্ দিবেন শাফায়াতের সাধারণ অনুমতি। তখন নবী শহীদ ও অন্যান্য পুণ্যবানেরাও শাফায়াত করতে থাকবে। সবশেষে আল্লাহ্ আমাকে বলবেন, এক দীনার পরিমাণ ইমানও যাদের বক্ষদেশে রয়েছে, তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো। এরপর একে একে হুকুম দিবেন, তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো, যাদের অন্তরে রয়েছে দুই তৃতীয়াংশ, অর্ধেক, একচতুর্থাংশ, এক ক্বিরাত অথবা একটি শস্যদানাতুল্য ইমান। এভাবে অবশেষে এমন কোনো লোক আর দোজখে থাকবে না, যে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সামান্যতম ভালো কাজ করেছে। সকলের শেষে আল্লাহ্ বলবেন, শাফায়াতকারী তাদের শাফায়াতের কাজ শেষ করেছে। এখন রইলাম আমি। আমি তো আরহামুর রহিমীন। একথা বলে আল্লাহ্ তাঁর আনুরূপ্যবিহীন হাত দোজখে প্রবেশ করিয়ে বহুসংখ্যক দোজখীকে বের করে আনবেন। যাদের শরীর পুড়ে হয়ে গিয়েছিলো জলন্ত অঙ্গারের মতো।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, উপরে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন বর্ণনাখণ্ডকে একত্র করে। বর্ণনাসূত্রগুলোর মূল মাধ্যম মদীনা শরীফের প্রধান বিচারপতি ইসমাইল বিন রাফে। তাঁর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কারো কারো অনুযোগ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত বর্ণনাগুলোকে এককরূপে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে অনেক হাদিসকে বানিয়েছেন একটি হাদিস। হাফেজ আবু মুসা মাদানীও হাদিসটির বর্ণনাকারী। তাঁর বর্ণনাসূত্রভূত কোনো কোনো বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কেও রয়েছে অনেক অভিযোগ। কিন্তু যে সকল সূত্রে বর্ণনাগুলো সংকলিত হয়েছে, সে সকল সূত্র আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ইবনে আরাবী ও কুরতুবীও হাদিসটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।

www.eelm.weebly.com

ইবনে হাজারও এর সঠিকতার সমর্থক। কিন্তু বায়হাকী এর সূত্রপ্রবাহকে বলেছেন অশক্ত। সুয়ূতি লিখেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সালাম তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, কালাবী বলেছেন, জান্নাতীরা ও জাহান্নামীরা চলে যাবে তাদের আপন আপন আবাসে। তখন দেখা যাবে ইমানদারদের একটি দল দোজখের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে। তাদেরকে লক্ষ্য করে কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকেরা বলবে, আমরা তো ভোগ করছি কুফরী, শিরিক ও মুনাফিকির যথাশাস্তি। কিন্তু তোমাদের ইমান তো তোমাদের কোনো কাজেই এলো না। একথা শুনে তারা পরিত্রাণের জন্য চিৎকার জুড়ে দিবে। তাদের চিৎকারের আওয়াজ জান্নাতবাসীদের কানেও পৌঁছবে। তারা তখন অগ্নিদগ্ধ ইমানদারদের মুক্তির জন্য বাবা আদমের কাছে ধর্ণা দিবে। এরপর একে একে যাবে অন্য নবীদের কাছে। সকলেই তাঁদের অক্ষমতার কথা জানালে শেষে সকলে উপস্থিত হবে রসুল স. এর মহান সন্নিধানে। তিনি স. মহান প্রভুপালকের উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হবেন। নিবেদন জানাবেন, হে আমার প্রিয়তম আল্লাহ্! তোমার একদল পাপী বান্দা জাহান্নামের আগুনে দগ্ধমান। তারা পাপী হলেও তোমার এককত্ব সম্পর্কে তারা ছিলো নিঃসন্দিগ্ধ। তারা এখন অবিশ্বাসী, অংশীবাদী ও কপটচারীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শিকার। আল্লাহ্ বলবেন, আমার অতুলনীয় মর্যাদার শপথ! আমি তাদেরকে অবশ্যই দোজখ থেকে নিষ্কৃতি দিবো। ইবনে হাজার আরো লিখেছেন, এই বর্ণনাটি মেনে নিলে দরওয়ারদির ওই বর্ণনাটিকে পরিত্যাগ করতে হয়। কারণ দরওয়ারদির বর্ণনায় এসেছে, শাফায়াত করা হবে হাশর ময়দানের বিপদগ্রস্তদেরকে বিপদমুক্ত করার জন্য। আর ওই ঘটনা ঘটবে বেহেশত ও দোজখে মানুষের গমনের পূর্বে। তাই বলতে হয়, এখানকার এই বর্ণনাটি অদৃঢ়সূত্রসম্বলিত যা বিশুদ্ধ সূত্রবিশিষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী । অর্থাৎ শাফায়াত সংঘটিত হবে হাশরের ময়দানে। সুয়ূতি লিখেছেন, বর্ণনা দু'টো পরস্পরবিরোধী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে পরস্পরবিরোধিতার কিছু নেই। শাফায়াত একবার হবে হাশরের ময়দানে এবং পরবর্তীতে হবে সকলের বেহেশত ও দোজখে গমনের পর— এ কথা মেনে নিলেই এক্ষেত্রে বৈপরীত্য বলে আর কিছু থাকে না।

আমি বলি, মানুষ সুপারিশকারী অন্বেষণ করবে তিনবার। একবার হাশর-প্রান্তরের অসহ্য কষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্তে, দ্বিতীয়বার জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে এবং তৃতীয়বার দোজখ থেকে পাপী বিশ্বাসীদের মুক্তির লক্ষ্যে। এক হাদিসে পরিষ্কাররূপে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি আমার প্রভুপালকের সকাশে সুপারিশ করবো তিনবার। তিনি এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই এ ব্যাপারে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ নেই যে, শাফায়াত অনুষ্ঠিত হবে তিনবার।

www.eelm.weebly.com

আর মাকামে শাফায়াতের নামই হচ্ছে মাকামে মাহমুদ। অর্থাৎ শাফায়াত তিনবার অনুষ্ঠিত হলেও শাফায়াতের স্থান হবে একটিই। ওই স্থানটি মাকামে মাহমুদ বা প্রশংসিত স্থান।

মাসআলাঃ মুতাজিলা ও খারেজীরা শাফায়াতকে স্বীকার করে না। তারা বলে, কবীরা গোনাহকারী কেউ যদি তওবা ব্যতিরেকে মারা যায়, তবে চিরদিনের জন্য সে জাহান্নামী হবে। তার জন্য কোনো শাফায়াত করা হবে না। অথচ শাফায়াত সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলো 'সুবিদিত' পর্যায়ের।

হজরত ইবনে ওমর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার তেলাওয়াত করলেন, হজরত ইব্রাহিমের এই উক্তি— 'হে আমার প্রভুপালক! এ সকল প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত। কিন্তু কেউ অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' তারপর পাঠ করলেন হজরত ঈসার উক্তি 'তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করো তবে তো তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' এরপর দু'হাত উত্তোলন করে বললেন, আমার উম্মত। আমার উম্মত। তারপর কেঁদে ফেললেন। আল্লাহ্ তখন জিবরাইলকে বললেন, তুমি আমার রসুলের নিকটে গিয়ে বলো, আমি তার উম্মতের ব্যাপারে তাকে প্রসন্ন করবো।

'আলআওসাত' গ্রন্থে বায্যার এবং উত্তম সূত্রে হজরত আলী থেকে আবু নাঈম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য শাফায়াত করবো, আমার প্রভুপালক তখন আমাকে বলবেন, তুমি কি পরিতুষ্ট? আমি বলবো, হ্যাঁ।

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার প্রভুপালক আমাকে দু'টি বিষয়ের যে কোনো একটিকে বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছেন। একটি হচ্ছে— আমার অর্ধেক উম্মতকে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে— আমাকে দেয়া হবে শাফায়াতের সুযোগ। আমি শাফায়াতকেই গ্রহণ করেছি। সুতরাং আমি আমার সকল উম্মতের জন্য শাফায়াত করতে পারবো। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আমার শাফায়াত হবে তাদের জন্য, যারা শিরিকসহ মৃত্যুবরণ করেনি। হজরত আউফ বিন মালিক আশজায়ী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী ও তিবরানী। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। এই হাদিসটি আবার উত্তমসূত্র পরম্পরায় হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল এবং হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমদ, বায্যার ও তিবরানী। আর বিশুদ্ধ সূত্র

www.eelm.weebly.com

পরম্পরায় হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, তিবরানী ও বায়হাকী। এই বর্ণনার শেষে রয়েছে, রসুল স. আরো বললেন, তোমরা কি মনে করেছো আমার শাফায়াত হবে মুত্তাকীদের জন্য? না। আমার শাফায়াত হবে আমার পাপী উম্মতের জন্য।

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যারা কবীরা গোনাহ করেছে, তাদের জন্যই হবে আমার শাফায়াত। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস ইবনে মালেক থেকে আবু দাউদ, তিরমিজি, হাকেম ও বায়হাকী। আর হজরত আবদ বিন বাশীর থেকে তিবরানী ও আবু নাঈম। তিবরানী তাঁর আওসাত নামক পুস্তকে হজরত ইবনে ওমর থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন তিবরানী তাঁর 'কবীর' নামক পুস্তকে জননী উম্মে সালমা থেকে এবং তিরমিজি ও হাকেম হজরত জাবের থেকে। আবার কা'ব ইবনে উজরাত এবং তাউস্ সূত্রেও অনুরূপ হাদিস এসেছে। বায়হাকী লিখেছেন, হাদিসটির সূত্র পরম্পরা অপরিণত ও উত্তম। তাবেয়ীগণের যুগে হাদিসটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।

ইবনে আবী হাতেম তাঁর 'আস্সুন্নাহ্' গ্রন্থে হজরত আনাস থেকে সর্বোন্নত সূত্রে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি প্রতিনিয়ত আমার প্রভুপালকের কাছে শাফায়াত করতে থাকবো এবং তিনিও আমার শাফায়াত কবুল করতে থাকবেন। শেষে আমি নিবেদন করবো, হে আমার প্রভুপালনকর্তা। যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' কলেমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার জন্যও আমার শাফায়াত কবুল করে নাও। আল্লাহ্ আমার নিবেদন কবুল করবেন এবং বলবেন, হে আমার প্রিয়তম রসুল! এ অধিকার তোমার কিংবা অন্য কারো নেই। শপথ আমার কল্যাণের, পরাক্রমের এবং দয়ার! যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' বলেছে, তাদের কাউকে আমি দোজখে প্রবেশ করাবো না।

অপর এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি আমার উম্মতের অনুত্তম মানুষের জন্য হবো উত্তম মানুষ। আমার শাফায়াতের মাধ্যমে আমি তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবো। আর আমার উম্মতের মধ্যে যারা উত্তম তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে শাফায়াত ব্যতিরেকেই। হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার জীবনাধিকারী সেই পবিত্রতম সত্তার শপথ! পুনরুত্থান দিবসে আমি হবো সকল মানুষের অগ্রনায়ক। আমার এই উক্তি দাম্ভিকতামুক্ত। সেদিন সকল মানুষ সমবেত হবে আমারই পতাকা তলে। আমারই হাতে সেদিন থাকবে প্রশংসার পতাকা। আমি আমার অনুসরণকারীদেরকে নিয়ে জান্নাতের দরজার সামনে উপনীত হবো। বলবো, দরজা উন্মুক্ত করা হোক। প্রহরীরা বলবে, আপনি কে? আমি বলবো, মোহাম্মদ।

www.eelm.weebly.com

চতুর্দিক থেকে তখন ধ্বনিত হবে স্বাগতম, স্বাগতম। এরপর আমি হবো আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন দর্শনধন্য। সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আমি সেজদায় লুটিয়ে পড়বো। হুকুম হবে মস্তক উত্তোলন করো। দাবি উত্থাপন করো। গ্রহণ করা হবে। শাফায়াত করো। মঞ্জুর করা হবে। তখন আমার শাফায়াতে আল্লাহ্‌র রহমতে অনেক মানুষকে বের করে আনা হবে জাহান্নাম থেকে।

তিবরানী তাঁর 'আল আওসাত' গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি জাহান্নামের দরজায় গিয়ে করাঘাত করবো। আমার সম্মানে খুলে দেয়া হবে জাহান্নামের দরজা। আমি ভিতরে প্রবেশ করবো। বর্ণনা করবো আল্লাহ্‌র এমন স্তব-স্তুতি, যা ইতোপূর্বে আর কেউ কখনো করেননি। পরেও করবেন না। এরপর ওই সকল লোককে বের করে আনবো যারা বিশুদ্ধ অন্তরে অন্ততঃ একবার বলেছিলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' তখন কতিপয় কুরায়েশ আমার আত্মীয় বলে পরিচয় প্রদান করবে। কিন্তু আমি তাদেরকে সেখানেই রেখে আসবো।

সর্বোন্নত সূত্রে হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর শাফায়াতের মাধ্যমে যাদেরকে দোজখ থেকে বের করে এনে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে, জান্নাতবাসীরা তাদেরকে বলবে জাহান্নামী। হজরত জাবের থেকে সর্বোন্নত সূত্রে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, শাফায়াতের মাধ্যমে কিছুসংখ্যক লোককে দোজখ থেকে বের করে এনে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে সর্বোন্নতরূপে উত্তম সূত্র পরম্পরায় তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমাদের কেবলার অনুসারী লোকদের মধ্যে এতো অধিক সংখ্যক লোক দোজখে প্রবেশ করবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কারো পক্ষে তার সংখ্যা নিরুপণ সম্ভব নয়। আমাকে তখন প্রদান করা হবে শাফায়াতের অনুমতি। আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় ও সেজদারত অবস্থায় বর্ণনা করবো আল্লাহ্‌র অগণিত প্রশংসা ও পবিত্রতা। সেজদারত অবস্থায় আমাকে হুকুম করা হবে, মাথা তোলো। চাও, যা কিছু চাইতে ইচ্ছা করো। চাহিদা পূর্ণ করা হবে। শাফায়াত করো, তোমার শাফায়াত কবুল করা হবে।

ত্রুটিবিমুক্ত সূত্র পরম্পরায় হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে আহমদ ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, হে প্রিয় রসুল! আমার প্রেরিত নবী রসুলগণ আমার নিকটে কোনো না কোনো বিষয়ে বিশেষভাবে প্রার্থনা করেছে। আমি তাদের প্রার্থনা পূরণও করেছি। এবার তুমি প্রার্থনা করো। তোমার প্রার্থনাও আমি পূর্ণ করবো। আমি বললাম, মহাবিচারের দিবসে আমি আমার উম্মতের পরিত্রাণের জন্য শাফায়াত করবো। একথা শুনে

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! শাফায়াত কী? তিনি স. বললেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছে বলবো, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমাকে এখন দান করো ওই শাফায়াতের অধিকার, যা আমি রেখেছি তোমার হেফাজতে।

আল্লাহ্ বলবেন, হ্যাঁ। তারপর আমি শাফায়াত করবো। আর ওই শাফায়াতের পরে আল্লাহ্ আমার সকল উম্মতকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী, মুসলিম, হজরত আনাস এবং হজরত জাবের থেকে মুসলিম, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ এবং হজরত আব্দুর রহমান বিন আকীল থেকে বায়হাকী ও বায্‌যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য রয়েছে বিশেষভাবে গ্রহণীয় একটি দোয়া। ওই দোয়ার ব্যাপারে সকল নবী ব্যস্ততা প্রদর্শন করেছেন (এবং তা কবুলও করে নেয়া হয়েছে)। কিন্তু আমি ওই বিশেষভাবে গৃহীতব্য দোয়া রেখে দিয়েছি আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য। সুয়ূতি লিখেছেন, অর্থগত দিক থেকে হাদিসটি সুবিদিত।

হজরত ওমর ফারুক থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এই উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক হবে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তিপ্রাপ্ত। দাজ্জালের আবির্ভাব এবং পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়ের ব্যাপারে অবিশ্বাসী। কবরের আযাব ও শাফায়াতের প্রতিও তাদের আস্থা থাকবে না। দোজখীদেরকে দোজখ থেকে বের করার ব্যাপারেও হবে তারা সন্দিহান। আমার শাফায়াতে তারাও দোজখ থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

সাঈদ ইবনে মানসুর, বায়হাকী ও হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, যে ব্যক্তি শাফায়াতে বিশ্বাস করবে না তার শাফায়াত নসীব হবে না। আর যে ব্যক্তি রসুল স. এর হাউজে কাওছারকে স্বীকার করবে না, সে ব্যক্তিও হবে হাউজে কাওছারের পানি থেকে বঞ্চিত।

হজরত আনাস থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের দুই শ্রেণীর লোকের ভাগ্যে শাফায়াত ঘটবে না। তারা মারজিয়্যাহ ও কাদরিয়্যাহ্। মারজিয়্যারা বলে, আমল মূল্যহীন। যদি অন্তরে ইমান থাকে তবে মন্দ আমলের জন্য পরকালে কোনো শাস্তি হবে না। তাই যে মুমিন, সে যত পাপীই হোক না কেনো কখনোই দোজখে যাবে না। আর কাদরিয়্যাহ্ সম্প্রদায় বলে মানুষ নিজে তার আমলের স্রষ্টা। তকদীর বলে কিছু নেই।

শাবীব বিন আবী ফুজালাহ্ মাক্কী সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, একবার লোকেরা হজরত ইমরান বিন হোসাইনের সামনে শাফায়াতের আলোচনা করলো। এক লোক বললো, হে আবু নাজীদ! আপনি এমন কথা বলেন এবং করেন, যেগুলোর দলিল আমরা কোরআনে পাই না। তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, তুমি

www.eelm.weebly.com

কি কোরআন পড়েছো? লোকটি বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মাগরিবের নামাজ তিন রাকাত, ইশা চার রাকাত, ফজরের দুই রাকাত, জোহরের চার রাকাত, আসরের চার রাকাত— এ সব কথা কি কোরআনের কোথাও পেয়েছো? লোকটি বললো, না। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা এগুলো কার কাছ থেকে শিখলে? নিশ্চয় আমার কাছ থেকে। আর আমি শিখেছি রসুল স. এর কাছ থেকে। এবার বলো, চল্লিশ দিরহামের মধ্যে এক দিরহাম জাকাত দিতে হবে, উট ও বকরির জাকাত এভাবে এভাবে দিতে হবে— এসব কথা কি কোরআনে রয়েছে? লোকটি বললো, না। তিনি বললেন, তোমরা কোরআনে দেখেছো— 'ওয়াল ইয়াত্‌ত্বাও-ওয়াফু বিল বাইতিল্ আ'তিক্ব।' কিন্তু এসব কথা কি কোরআনের কোথাও দেখেছো যে— সাত বার তাওয়াফ করো, মাকামে ইব্রাহিমের কাছে দুই রাকাত নামাজ পড়ো? বলো, এগুলো কি তোমাদেরকে আমি শিক্ষা দেইনি? আর আমি কি এগুলো রসুল স. থেকে শিক্ষা করিনি? উপস্থিত লোকেরা তখন সকলেই বললো, আপনি যথার্থ বলেছেন। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা কি কোরআনের মধ্যে এ কথা পেয়েছো যে—গ্রাম থেকে আনা খাদ্যশস্য শহরে প্রবেশের পূর্বে পথিমধ্যে ক্রয় কোরো না, বলপ্রয়োগ, অননুমোদিত এবং তাওর নিষিদ্ধ? (কেউ যদি তার মেয়ের মোহরানা ধার্য না করে এই শর্তে বিবাহ দেয় যে, এর বদলে সে বিনা মোহরানায় বিবাহ করবে মেয়ের স্বামীর কোনো নিকটাত্মীয়াকে — এ ধরনের বিনা মোহরানায় কন্যা রদ বদল করার বিবাহকে বলে তাওর। এরকম বিবাহ শরিয়তসিদ্ধ নয়)। লোকেরা বললো, না। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাঁর পাককালামে আজ্ঞা করেছেন— 'রসুল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা করতে নিষেধ করেছেন, তা করতে বিরত থাকো।' অতএব হে জনতা! তোমরা একথা উত্তমরূপে অবগত হও যে, আমি রসুল স. এর নিকট থেকে এরকম অনেক জ্ঞান লাভ করেছি। কিন্তু তোমরা এগুলো জানো না।

বাগবী লিখেছেন, ইয়াজিদ বিন সুহাইব ফকীর বলেছেন, খারেজীদের মতবাদ আমাকে বিভ্রান্তিতে নিপতিত করেছিলো। কিন্তু হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্‌র কথা শুনে আমার ওই বিভ্রান্তির নিরসন হয়েছে। একবার একটি দলের সঙ্গে আমি হজে যাত্রা করলাম। মদীনার কাছাকাছি এক স্থানে সাক্ষাত পেলাম হজরত জাবেরের। তিনি শাফায়াতের মাধ্যমে দোজখীদের পরিত্রাণ সম্পর্কে রসুল স. এর একটি হাদিস বর্ণনা করলেন। আমি বললাম, হে রসুল স. এর প্রিয় সহচর! আপনি এরকম বলছেন কেনো? আল্লাহ্ তো স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছেন যে— 'নিঃসন্দেহে তিনি যাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সে হবে অপদস্থ এবং দোজখীরা যখন দোজখ থেকে বের হতে চাইবে, তখন তাকে দোজখের দিকেই ঠেলে দেয়া

www.eelm.weebly.com

হবে।' হজরত জাবের বললেন, হে যুবক! তুমি কি কোরআন পাঠ করো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি মাকামে মাহমুদের কথা পড়েছো, সেখানে অধিষ্ঠিত হবেন স্বয়ং আল্লাহ্‌র রসুল। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ কথাই তো আমি বলেছি। রসুলুল্লাহ্ ওই মাকামে অধিষ্ঠিত হয়ে শাফায়াত করবেন। আর তাঁর শাফায়াতের কারণে বহু সংখ্যক লোক দোজখ থেকে নিষ্কৃতি পাবে। এরপর হজরত জাবের বর্ণনা দিলেন পুলসিরাত সম্পর্কে। বললেন, কেউ কেউ পুলসিরাত অতিক্রম করে যাবে। কেউ কেউ প্রোথিত হবে দোজখে। ওই দোজখবাসীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আবার শাফায়াতের মাধ্যমে নিষ্কৃতি লাভ করবে।

নবী-রসুল ও অন্যান্যদের শাফায়াতঃ হজরত ওসমান থেকে সর্বোন্নতসূত্রে ইবনে মাজা ও বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচার দিবসে নবী-রসুলগণও শাফায়াত করবেন। তারপর শাফায়াত করবেন আলেমগণ ও শহীদগণ। বায্যারের বর্ণনায় এরপর এসেছে— মুয়াজ্জিন। হজরত ইবনে ওমর থেকে পরিণতসূত্রে দায়লামী উল্লেখ করেছেন, আলেমগণকে তখন বলা হবে, তোমাদের শিক্ষার্থীগণের জন্য শাফায়াত করো— যদিও তাদের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের মতো অসংখ্য হয়। সর্বোন্নতসূত্রে হজরত আবু দারদা থেকে আবু দাউদ ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শহীদ তার আপন পরিবারের সত্তরজনের জন্য শাফায়াত করতে পারবে। আহমদ ও তিবরানীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে। আর ইবনে মাজা হজরত মেকদাম বিন মা'দীকারাব থেকে, বায়হাকী হাসান বসরীর বর্ণনা থেকে, হাকেম, বায়হাকী ও হান্নাদ হজরত হারেস বিন কায়েস থেকে, আহমদ হজরত আবু বুরদা থেকে, হান্নাদ হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং যথাসূত্রে আহমদ, তিবরানী ও বায়হাকী হজরত আবু উমামা থেকে। তাঁদের বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের একজন মানুষের শাফায়াতে রবীয়া এবং মুজার গোত্রের চেয়েও অধিক সংখ্যক লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে। মোট কথা, বহু সংখ্যক হাদিস থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নবী-রসুলগণ ও আওলিয়া-আলেমগণও শাফায়াত করতে পারবেন।

একটি সন্দেহঃ যদি রসুল স. এর শাফায়াতের মাধ্যমে সকল পাপী উম্মত দোজখ থেকে পরিত্রাণ পায়, তবে নবী-রসুল ও অন্যান্যদের শাফায়াতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হবে কেনো? তাদের শাফায়াতের প্রকৃতি তাহলে কী রকম?

সন্দেহের নিরসনঃ সম্ভবতঃ নবী-রসুলগণের শাফায়াত নির্দিষ্ট থাকবে তাঁদের আপনাপন উম্মতের মধ্যে। কিন্তু রসুল স. এর শাফায়াত হবে সাধারণ ও ব্যাপক। অন্যান্য উম্মতেরাও তাঁর শাফায়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর নবী-রসুল ছাড়া অন্যান্য পুণ্যবানেরা সম্ভবতঃ রসুল স.কে তখন এই মর্মে নিবেদন জ্ঞাপন করবেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি দয়া করে অমুক অমুক লোকের জন্য শাফায়াত করুন।

www.eelm.weebly.com

বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার শাফায়াত হবে আমার উম্মতের কবীরা গোনাহকারীদের জন্য। এতে করে বুঝা যায়, ফেরেশতারা কবীরা গোনাহকারীদের জন্য শাফায়াত করবেন না। তবে হ্যাঁ, তারা সুপারিশ করবেন সগীরা গোনাহ মাফের জন্য এবং মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে, রসুল স. এর জন্য তাহাজ্জুদ নামাজ নফল হওয়ার কথা। তারপর দেয়া হয়েছে মাকামে মাহমুদ বা প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত হওয়ার শুভ সংবাদ। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাহাজ্জুদ নামাজের রয়েছে একটি বিশেষ ভূমিকা।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, বিধর্মীদের অত্যাচারে রসুল স. এর মক্কার জীবন হয়ে উঠলো দুর্বিষহ। তখন তাঁকে দেয়া হলো হিজরতের নির্দেশ। অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৮০, ৮১

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۔ وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۔

❒ বল, 'হে আমার প্রতিপালক, যেথায় গমন শুভ ও সন্তোষজনক তুমি আমাকে সেথায় লইয়া যাইও এবং যেথা হইতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক সেথা হইতে আমাকে বাহির করিও এবং তোমার নিকট হইতে আমাকে দান করিও সাহায্যকারী শক্তি।'

❒ এবং বল, 'সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে'; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, হে আমার প্রতিপালক, যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক, তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যেয়ো এবং যেখান থেকে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক সেখান থেকে আমাকে বের কোরো।' এখানে 'মুদ্খলা সিদ্ক্বি' অর্থ মদীনা এবং 'মুখরজা সিদ্ক্বি' অর্থ মক্কা। এরকম বলেছেন, হাসান ও কাতাদা। 'মুদ্খলা' এবং 'মুখরজা' হচ্ছে অধিকরণ কারক। প্রথমটি প্রবেশের স্থান ও পরেরটি প্রস্থানের । দু'টো শব্দই ধাতুমূল। সুতরাং আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— হে আমার রসুল! আপনি প্রার্থনা করুন এভাবে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমাকে মদীনাতে এমনই পরিবেশে প্রবেশ করাও যেনো আমার

www.eelm.weebly.com

সম্মুখে অনভিপ্রেত ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব না হয় এবং মক্কা থেকে এভাবে বের হয়ে যেতে দাও যেনো পিছনের কোনো ক্ষতিকর আকর্ষণ আর আমার অন্তরে অবশিষ্ট না থাকে। জুহাক আলোচ্য প্রার্থনার ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার আল্লাহ্! মক্কা থেকে আমার প্রস্থানকে করো নিরাপদ, যেনো অংশীবাদীরা আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে না পারে এবং আমার মদীনা-গমনকে করো সফল, যেনো সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় আমার ধর্মসম্মত নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'সেখানে নিয়ে যাও' কথাটির অর্থ নবুয়তের গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠভাবে প্রতিপালনের নিমিত্তে আমাকে সেখানে নিয়ে যাও। আর 'বের কোরো' অর্থ— যে স্থান আমার নবুয়তের কর্মকাণ্ড পরিচালনার কেন্দ্রভূমি হওয়ার উপযুক্ত নয়, সেখানে থেকে শুভ ও সন্তোষজনক অবস্থায় আমাকে বের করে নিয়ে যাও। অর্থাৎ যেখানে আমার ধর্মপ্রচারের কাজ শুভ ও সন্তোষজনক হয়, সেখানেই তুমি নিয়ে যাও আমাকে।

হাসান বলেছেন, এখানে 'মুদখলা সিদ্‌ক্ব' অর্থ জান্নাত এবং 'মুখরজা সিদ্‌ক্ব' অর্থ মক্কা। আমি বলি, 'মুদখলা সিদক্ব', অর্থ যদি 'জান্নাত' হয়, তবে 'মুখরজা সিদ্‌ক্ব' কে পৃথিবী বলাই হবে অধিক যুক্তিসঙ্গত। বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে— আমাকে কবরের মধ্যে প্রবেশ করাও শুভ ও সন্তোষজনক অবস্থায় এবং সেভাবেই পুনরুত্থিত কোরো মহাবিচার দিবসে। কেউ কেউ আবার কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— আমাকে প্রবেশ করাও তোমার আনুগত্যের মধ্যে এবং বের করে নিয়ে যাও অনানুগত্যের গণ্ডি থেকে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, প্রবেশ ও প্রস্থান উভয়ক্ষেত্রে 'সিদ্‌ক্ব' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে একথা বোঝাতে যে— আমার প্রবেশ ও প্রস্থান উভয় অবস্থাই যেনো হয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা জড়তা মুক্ত। উল্লেখ্য যে, দ্বিধাবিজড়িত কোনো কর্মই 'সিদ্‌ক্ব' (শুভ ও সন্তোষজনক) হয় না। অথবা এখানে বলা হয়েছে, গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ ও সেখান থেকে নির্গমনের কথা। প্রকৃত কথা হচ্ছে 'সিদ্‌ক্ব' ও 'কিজব' (সত্য ও মিথ্যা) হচ্ছে বক্তব্যের বিধেয় এর একটি বিশেষণ। বিধেয়-এর বিশেষণকে সত্য অথবা মিথ্যা যে কোনো একটি হতেই হয়। কিন্তু আদেশ, নিষেধ, প্রশ্নবোধক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সত্য ও মিথ্যার প্রসঙ্গ আসে পরোক্ষ অর্থে। এমতো ক্ষেত্রে কোনো বিজ্ঞপ্তিকে সত্য অথবা মিথ্যা বলার অবকাশ রয়েছে। যেমন— কেউ বললো, জায়েদ কি বাড়ীতে আছে? কথাটি যদিও প্রশ্নবোধক, তবু এর মধ্যে রয়েছে অনুসন্ধানের একটি ব্যাপার । অর্থাৎ প্রশ্নকারী যেনো একথা বলছে, জায়েদ গৃহাভ্যন্তরে আদৌ রয়েছে কি না, সে সম্পর্কে আমি জানি না, তাই জিজ্ঞেস করছি। তাই তার এই জিজ্ঞাসাই প্রকাশ করছে তার অজ্ঞতার কথা। এরকম উক্তির ক্ষেত্রে সত্য ও মিথ্যা উভয়টির অবকাশ রয়েছে। কিন্তু কখনো কখনো

www.eelm.weebly.com

আবার কর্ম ও ক্রিয়ার দিক থেকেও এরকম সত্য ও মিথ্যা উভয়টির ব্যবহার সুপ্রচল। তাই লড়াইয়ের ময়দানে সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে যদি কেউ যুদ্ধ করে, তবে তাকে আরববাসীরা বলে— হুয়া সদাক্বা ফীল্ ক্বিতাল (সে একজন যথার্থ যোদ্ধাই বটে)। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'রিজালুন্ সদাক্বু মা আ'হাদুল্লাহ্' (কিছু লোক এমন, যারা আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পরিপূর্ণরূপে কার্যকর করেছে)। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'সাদাক্বল্লহু রসুলাহুর্ রু'ইয়া (আল্লাহ্ তাঁর রসুলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন)।

এতক্ষণের আলোচনায় একথাই প্রমাণিত হলো যে, উত্তম, শ্রেষ্ঠ ও উন্নত যে কোনো কর্মকে বলে 'সিদ্ক্ব'। তাই কোনো কর্মকে শুভ ও সন্তোষজনক বুঝাতে ব্যবহৃত হয় এই শব্দটি। যেমন— ফী মাক্বআ'দি সিদ্ক্ব। লাহুম ক্বদামা সিদ্ক। ওয়াজ্আ'ল্লী লিসানা সিদ্ক্ব ইত্যাদি। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াতে পারে এরকম— আমার গমন ও নির্গমনকে এমনভাবে বাস্তবায়িত করো যেনো মানুষ তা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় এবং তাদের ওই প্রশংসা যেনো লাভ করে বাস্তবরূপ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমার নিকট থেকে আমাকে দান কোরো সাহায্যকারী শক্তি।' 'সুলত্বনান্ নাসীরা' অর্থ সাহায্যকারী শক্তি। মুজাহিদ কথাটির অর্থ করেছেন— স্পষ্ট দলিল। হাসান অর্থ করেছেন— আমাকে শক্তিশালী করো কোনো সাম্রাজ্যের উপরে যেখানে আমার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে বিরুদ্ধবাদীদের উপর। অর্থাৎ এমন বিজয়প্রদায়ক শক্তি, যার মাধ্যমে দ্বীন ইসলাম হয় স্থায়ী ও শক্তিশালী। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা প্রদান করেছিলেন পারস্য, রোম ও অন্যান্য সাম্রাজ্য বিজয়ের অঙ্গীকার। আর ওই বিজয় শুরু হয়েছিলো আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই।

কাতাদা বলেছেন, রসুল স. একথা সুনিশ্চিতরূপে জানতেন যে, আল্লাহ্র সাহায্যকারী শক্তি ব্যতীত ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও কোরআনের বিধান বাস্তবায়িত হতে পারে না। তাই তিনি এমতো সাহায্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।

আমি বলি, আল্লাহ্তায়ালাই তাঁর প্রিয় রসুলকে এই জ্ঞান দান করেছিলেন যে, আল্লাহ্র দ্বীন কেবল আল্লাহ্র বিশেষ সাহায্যের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই তিনি তাঁর রসুলকে এভাবে প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কুফরের উপর ইসলামের বিজয় প্রতিষ্ঠাই ছিলো রসুল স. এর অভিলাষ। তাই তিনি আল্লাহ্তায়ালা সকাশে সাহায্যকারী শক্তির নিবেদন জানিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য যে, আল্লাহ্পাক তাঁর এই নিবেদন কবুল করেছিলেন। কোরআন মজীদের অন্যান্য আয়াতেও এই বিজয়ের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'সকল দ্বীনের উপর তাকে

www.eelm.weebly.com

শ্রেষ্ঠত্বদানের জন্য।' আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দল বিজয়ী।' অন্য আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই।'

পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'এবং বলো, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হয়েই থাকে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! যখন মক্কা বিজিত হবে, তখন আপনি মক্কা নগরীতে প্রবেশের সময় এই বাক্যটি উচ্চারণ করবেন যে— সত্য ইসলাম, কোরআন অথবা বিশুদ্ধ ইবাদতের মৌসুম এসেই পড়েছে এবং অবলুপ্ত হয়েছে অংশীবাদিতা ও ধর্মদ্রোহিতা। কারণ অংশীবাদিতা ও ধর্মদ্রোহিতা হচ্ছে মিথ্যা। আর মিথ্যা তো অবলুপ্ত হয়েই থাকে। কেননা তা ভিত্তিহীন। এখানে 'যাহাকা' শব্দটির অর্থ— 'খারাজা' বা অবলুপ্ত হওয়া অথবা বের হয়ে যাওয়া। যেমন বলা হয়, 'যাহাকা রূহুহু' (তার প্রাণ বহির্গত হয়েছে)।

হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বিজয়ীর বেশে যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন কাবা প্রাঙ্গণে ছিলো তিনশত ষাটটি মূর্তি। রসুল স. এর হাতে ছিলো একটি কাষ্ঠ নির্মিত যষ্টি। তিনি ওই যষ্টির অগ্রভাগ দ্বারা মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা কখনোই পারে না নতুন কিছু সৃজন করতে এবং কোনো কিছুর পুনরাবৃত্তি ঘটাতে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি, নাসাঈ ও তিবরানী। ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন তাঁর আদ্‌দালায়েল নামক পুস্তকে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকীও অনুরূপ হাদিস এনেছেন।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৮২, ৮৩, ৮৪

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ۝ وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوْسًا ۝ قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ۝

❒ আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যাহা বিশ্বাসীদিগের জন্য উপশান্তি ও দয়া কিন্তু উহা সীমালংঘনকারীদিগের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

www.eelm.weebly.com

❐ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করিলে সে মুখ ফিরাইয়া লয় ও অহংকারে দূরে সরিয়া যায় এবং তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করিলে সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে।

❐ বল, 'প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকে এবং তোমার প্রতিপালক সম্যক অবগত আছেন চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি অবতীর্ণ করি কোরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য প্রশান্তি ও রহমত।' একথার অর্থ— আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতা ও মূর্খতাজনিত ব্যাধির উপশমকরূপে এবং হৃদয়ের অন্ধকার দূর করবার আলোকরূপে। এখানে 'মিনাল কুরআন' কথাটির 'মিন' বর্ণনামূলক। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'মিন' আংশিক অর্থ প্রকাশক। আবার কেউ বলেছেন বিবৃতিমূলক। অর্থাৎ এখানকার 'উপশম' কথাটির অর্থ হবে শারীরিক ব্যাধির উপশম। যেমন সুরা ফাতিহা ও কোরআনের কোনো কোনো অংশ দৈহিক ব্যাধির উপশমকরূপে ব্যবহৃত হয়। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা দু'টি আরোগ্যলাভের উপকরণকে গ্রহণ করো— মধু ও কোরআন। আর এখানকার রহমত বা দয়া কথাটির অর্থ হচ্ছে— যারা কোরআনকে মানে এবং কোরআনের বিধানানুযায়ী আমল করে, তারা লাভ করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু এই কোরআন সীমালংঘনকারীদের ক্ষতি বৃদ্ধিই করে।' একথার অর্থ— যারা কোরআন মানে না তাদের জন্য কোরআন ডেকে আনে ক্ষতি। কোরআনের প্রতি মিথ্যারোপ ও অস্বীকৃতিই এমতো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ, কোরআনের কোনো মজলিসে বসেও যারা সঠিক দিক নির্দেশনা লাভ করতে পারে না, তাদের জন্য কোরআন অবশ্যই ক্ষতিকর। তাই আল্লাহ্তায়ালা এখানে এমতো সিদ্ধান্ত দান করেছেন যে— কোরআন হচ্ছে বিশ্বাসীদের জন্য নিরাময়ক ও রহমত। আর অবিশ্বাসীদের জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ।

পরের আয়াতে (৮৩) বলা হয়েছে— 'মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে দূরে সরে যায়।' এ কথার অর্থ— মানুষকে যখন আমি দান করি দৈহিক সুস্থতা ও সম্পদের প্রাচুর্য, তখন তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যায়। মুখ ফিরিয়ে নেয় কোরআনের দিক নির্দেশনা থেকে। আর অহংকারবশতঃ দূরে সরে যায় সত্য ধর্মের সীমানা থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে।' এ কথার অর্থ— আর যখন আমি তাদের উপরে আপতিত করি বিপদ, রোগ, শোক ও দারিদ্র— তখন তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে একেবারে হতাশ হয়ে যায়।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'বলো, প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মানুষের নিকট এ কথা প্রচার করুন যে, প্রত্যেকেই তার নিজস্ব স্বভাবের অনুকারক। তাই যে স্বভাবগতভাবে কৃতজ্ঞ, সে আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামতের প্রতি প্রদর্শন করে যথাকৃতজ্ঞতা। আর যে সত্তাগতভাবে কৃতঘ্ন, সে আল্লাহ্র দানের প্রতি প্রদর্শন করে অকৃতজ্ঞতা ও অহংকার।

হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'শাকিলাতিহী' কথাটির অর্থ করেছেন— সত্তাগত অবস্থা, যার প্রতি সে আকৃষ্ট— পথ-প্রাপ্তির বাসনা অথবা পথ-ভ্রষ্টতার আকর্ষণ। কাতাদা ও হাসান কথাটির অর্থ করেছেন— উদ্দেশ্যের অনুসরণ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পৃথিবীপূজক, সে তার কর্মকাণ্ডকে প্রস্তুত করে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্য। আর যে ব্যক্তি পরকালপ্রেমিক, সে তার কৃতকর্মকে সজ্জিত করে পারলৌকিক সাফল্য লাভের নিমিত্তে। মুকাতিল বলেছেন, 'শাকিলাতিহী' কথাটির অর্থ স্বভাব বা প্রকৃতি। ফাররা বলেছেন, স্বভাবজ প্রবৃত্তি অনুসারেই মানুষ তার কর্ম-পরিকল্পনা রচনা করে। কুতাইবী বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে জন্মগত প্রকৃতিকে। উল্লেখ্য যে, 'শাকিলাতিহী' কথাটির বর্ণিত অর্থসমূহের মধ্যে মূলতঃ কোনো বিরোধ নেই। কারণ সকলেই প্রায় সমস্বরে বলেছেন, জন্মগত স্বভাব বা সত্তাগত প্রবৃত্তির কথা, যে প্রকৃতি আল্লাহ্তায়ালাই মানুষকে দিয়েছেন। এ কারণেই রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেককে সামর্থ্য দেয়া হয় তার জন্মগত প্রকৃতি অনুসারে। হজরত আলী ইবনে আবী তালেব থেকে সর্বোন্নতসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

হজরত আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমরা একবার রসুল স. এর পবিত্র দরবারে বসে আমাদের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। রসুল স. আমাদের কথা শুনে বললেন, পাহাড় তার আপন স্থান থেকে সরে গিয়েছে— একথাও বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু মানুষের স্বভাব পরিবর্তন হয়েছে, এ কথা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আহমদ।

জন্মগত প্রকৃতি বা স্বভাব কীঃ জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ একটি বিশেষ প্রকৃতি বা স্বভাব পেয়ে থাকে। ওই স্বভাব হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার কোনো একটি নাম বা গুণাবলীর প্রতিবিম্ব। যেমন, জন্মসূত্রে যার উপরে আল্লাহ্তায়ালার 'আলহাদী' (হেদায়েতকারী) নামের প্রভাব বা প্রতিবিম্ব পড়ে, সে হয় হেদায়েতের অনুগামী। আর যার উপরে জন্মলগ্নে পড়ে আল্লাহ্পাকের 'আলমুদ্বিল্লু' (গোমরাহ্কারী) নামের প্রতিচ্ছায়া সে হয় পথ-ভ্রষ্ট। আবার আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস এই চারটি

www.eelm.weebly.com

উপাদান থেকে সৃষ্টি হয়েছে মানুষের শরীর। এই চারটি উপাদানের মধ্যে রয়েছে আবার বৈপরীত্য। তাই মানুষের শরীর তৈরী করার সময়ে যে উপাদানটি প্রবল হয়, সেই উপাদানের প্রভাব পড়ে তার চরিত্রে। আবার মাটির মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্য। তাই কারো চরিত্র হয় নম্র, কারো কঠিন। আবার কারো গাত্রবর্ণ হয় লাল। কারো শাদা। আবার কারো কালো। হাদিস শরীফে যে স্বভাবের কথা উল্লেখিত হয়েছে, সেই স্বভাব এভাবে জন্মলগ্ন থেকেই হয়ে যায় সুনির্ধারিত। এটাই মানুষের জন্মগত প্রকৃতি বা স্বভাব।

কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, 'আ'লা শাকিলাতিহী' কথাটির অর্থ— মানুষ ওই পথেই চলে, যে পথ তার পছন্দ।

বায়যাবী লিখেছেন, যা মানুষের স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, সে তাকেই গ্রহণ করে। তাই কেউ কেউ হয়ে যায় পথ-ভ্রষ্ট। আবার কেউ হয়ে যায় পথ-প্রাপ্ত। অথবা মানুষ ওই পথে চলে, যে পথ তার আত্মার আকাংখার অনুকূল এবং চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'শাকিলাতিহী' অর্থ— আকৃতি, রূপ, অবস্থা, তুলনা— যা বাস্তবসম্মত। আর আকৃতি অর্থ এখানে অনুভূতি অথবা ধারণামূলক আকৃতি, লক্ষ্য, পথ, উদ্দেশ্য, উপায়, অভিমত।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তোমার প্রতিপালক সম্যক অবগত আছেন চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা সকলের অন্তরের ও বাহিরের সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি সর্বজ্ঞ। তাই তিনি অবশ্যই জানেন যে, কে সত্যাশ্রয়ী ও কে মিথ্যাচারী।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. এর সঙ্গে একদিন আমি একটি শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। রসুল স. এর হাতে ছিলো একটি খেজুরের ডাল। তিনি স. ওই খেজুরের ডালটি মাটিতে লাগিয়ে লাগিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। পথে দেখা হলো একদল ইহুদীর সঙ্গে। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো এ লোকের কাছে রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হোক। একজন বললো, না। এভাবে প্রশ্ন করলে সে হয়তো এমন উত্তর দিবে, যা তোমাদের মনোপুত হবে না। আরেকজন বললো, আমি অবশ্যই এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করবো। এ কথা বলেই সে এগিয়ে এসে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে বসলো। রসুল স. কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। আমি বুঝতে পারলাম ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। দেখলাম, একটু পরেই ওহীর প্রভাব অন্তর্হিত হলো। তখন রসুল স. পাঠ করলেন নিম্নের আয়াত—

www.eelm.weebly.com

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۖ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ۝ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۖ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ۝

❑ তোমাকে উহারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, 'রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদিগকে সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হইয়াছে।'

❑ ইচ্ছা করিলে আমি তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহা অবশ্যই প্রত্যাহার করিতে পারিতাম; তাহা হইলে এ বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পাইতে না।

❑ ইহা প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতিপালকের দয়া; তোমার প্রতি আছে তাঁহার মহা অনুগ্রহ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! ইহুদীরা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে আপনাকে বিপাকে ফেলতে চায়। আপনি তাদেরকে বলে দিন, রূহ সৃষ্টি করা হয়েছে সরাসরি আল্লাহ্‌র 'কুন' (হও) আদেশের মাধ্যমে। অন্যান্য সৃষ্টি যেমন আল্লাহ্‌তায়ালার পরোক্ষ আদেশে একটিকে অবলম্বন করে অপরটি গড়ে উঠে, রূহকে সেভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। প্রশ্নকারীদের চাহিদা অনুযায়ী এখানে এভাবে উত্তরের অবতারণা করা হয়েছে। এভাবে এখানে কেবল একথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, রূহ অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয় নয়। রূহের পূর্ণ রহস্য এখানে উন্মোচন করা হয়নি। কারণ বিষয়টি সর্বসাধারণের জ্ঞানানুগত নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।' এ কথার অর্থ—সাধারণ মানুষকে রূহ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিত ধারণা দেয়া হয়েছে। তাই রূহের রহস্য সকলের বোধগম্য নয়। জ্ঞানার্জনের প্রচলিত পথ ও পদ্ধতি এক্ষেত্রে অচল। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রূহের রহস্য সূক্ষ্মতর অনুভূতির মাধ্যমে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারলেও, তা তাঁরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। কারণ এ রহস্য ভাষার অতীত। সে কারণেই 'মা রব্বুল আ'লামীন' (বিশ্বসমূহের

www.eelm.weebly.com

প্রভুপালনকর্তা কি রকম) —— ফেরাউনের এ কথার জবাব হজরত মুসা যথাযথভাবে দিতে পারেননি। কারণ ভাষা আল্লাহ্তায়ালার হকিকত বা তত্ত্ব ধারণ করতে অক্ষম। হজরত মুসা তাই তার জবাবে আল্লাহ্তায়ালার কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কথা মাত্র উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এই আয়াতের মাধ্যমে কেউ যেনো একথা বুঝে না নেন যে, রূহ সম্পর্কিত জ্ঞান ও রহস্য রসুল স. এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আউলিয়া কেরামের অজানা ছিলো। বরং প্রকৃত কথা এই যে, নবী-রসুলগণ ও বিশেষ মর্যাদাধারী আউলিয়া এ জ্ঞান লাভ করেন অনুপ্রেরণা ও আত্মিক দর্শনের (ইলহাম ও মুকাশাফার) মাধ্যমে। এ জ্ঞান আত্মজ্ঞান বা এলমে হুজুরীর অন্তর্ভুক্ত। অর্জিত জ্ঞান বা এলমে হুসুলীর মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। হৃদয়জ শ্রুতি ও দৃষ্টির মাধ্যমেই এমতো রহস্য সঞ্চারক জ্ঞান উপলব্ধ হতে পারে। শরীর সংলগ্ন কর্ণ ও চক্ষুর মাধ্যমে এই জ্ঞান আয়ত্ত করা যায় না। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দাগণ নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এভাবে সে বাঁধা পড়ে আমার ভালোবাসার বন্ধনে। ফলে আমি হই তার কান, যার দ্বারা সে শ্রবণ করে এবং হই তার চক্ষু, যার দ্বারা সে দেখে।

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই রূহের তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত। আরবাবে ইনকেশাফ গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, রূহে সুফ্লা একটি—— যাকে বলা হয় নফস। আর উলুবি আরওয়াহ্ বা উর্ধ্ব জগতের রূহ হচ্ছে পাঁচটি—— কলব, রূহ, সের, খফি, আখফা। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আবার সত্তাগত ও গুণগত পার্থক্য। তাই এগুলোর বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকম। যেনো একটির সঙ্গে অপরটির কোনো সম্পর্কই নেই। কিন্তু কোনো কোনো আধ্যাত্মিক সাধক এগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। ফলে এগুলোকে তারা আল্লাহ্র সঙ্গে মিশ্রিত করে ফেলে। তাই তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে উঠে—— আমি তিরিশ বছর যাবত্ রূহের ইবাদত করে এসেছি। তারপর আল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছেন রূহের হকিকত। ফলে আমি বুঝেছি রূহ সম্ভাব্য জগতের বৃত্তভূত ও ধ্বংসশীল। এমতাবস্থায় তাই কেউ কেউ বলে উঠেছেন—— 'লা উহিব্বুল আফিলীন' (যা অস্ত যায় তা আমি ভালোবাসি না)।

একটি প্রশ্নঃ ইকরামা থেকে অপরিণত সূত্রে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এই আয়াত তাঁর সহচরবৃন্দের সম্মুখে পাঠ করলে তাঁরা বলেছিলেন, রূহ আসলে কী? এই আয়াতের সম্বোধিত জন কি কেবল আপনি না আমরাও? রসুল স. বলেছিলেন, এখানে আমিসহ সকল মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। সাহাবীগণ বলেছিলেন, আশ্চর্য! একসময় তো আপনি বলতেন—— 'ওয়া মা ইয়্যুতাল হিকমাতা ফাক্বদ্ উতিয়্যা খইরান্ কাছীরা' (যাকে হিকমত দান করা হয়েছে, তাকে দান করা হয়েছে অধিক কল্যাণ)। আবার একসময় আপনি একথাও বলেছেন যে,

www.eelm.weebly.com

রূহ সম্পর্কে আমার জানা নেই। তাহলে হেকমত ও অধিক কল্যাণ কাকে বলে? তাঁদের একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিলো এই আয়াত— 'ওয়ালাও আন্না মা ফীল আরদ্বি মিন শাজারাতিন্ আক্বলাম্' (ভূপৃষ্ঠে যতো বৃক্ষ বিদ্যমান, সবগুলোই যদি হয় লেখনী)। এ সকল বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, রূহের হকিকত সম্পর্কে রসুল স. জানতেন না। তা হলে কীভাবে বলা যায় যে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ রূহের হকিকত সম্পর্কে জানেন?

উত্তরঃ উপরের বর্ণনাটিকে যদি সঠিক মনে করা হয়, তবে একথা না বলে উপায় নেই যে, আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স. সহ সকল সাহাবীকে। অর্থাৎ সকলকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে, 'এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে'। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলতে আমরা বাধ্য যে, আল্লাহ্তায়ালার সীমাহীন জ্ঞানের তুলনায় নবী-রসুলগণ ও ফেরেশতাগণের জ্ঞান নিতান্তই নগণ্য। সে কারণেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে। আর 'ওয়ালাও আন্না মা ফিল আরদ্বি মিন শাজারাতিন আক্বলাম্'— এই আয়াতের মাধ্যমে একথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না যে, নবী-রসুলগণ ও আল্লাহ্র বিশেষ নৈকট্যভাজন আউলিয়াগণকে যে হেকমত ও কল্যাণ দান করা হয়েছে, রূহ সম্পর্কিত জ্ঞান তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তাদেরকে প্রদত্ত হেকমত ও কল্যাণ আল্লাহ্র অপার জ্ঞানের তুলনায় সামান্য হলেও তা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পূর্ণতার পরিচায়ক। সিদ্ধপুরুষ বা কামেল ইনসান এই পূর্ণতার বহির্ভূত নন।

জ্ঞাতব্যঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ও অবতীর্ণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে যা বলা হলো তাতে করে বুঝা যায় যে, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বললো এভাবে— মোহাম্মদ আমাদের সামনেই বড় হয়েছে। আমরা তাই ভালো করেই জানি যে, সে সত্যবাদী ও আমানত সংরক্ষণকারী। কিন্তু এখন তো সে বলে, তার উপরে নাকি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়। ব্যাপারটা একটু যাচাই করে দেখা দরকার। মদীনার ইহুদীদের কাছে কাউকে পাঠিয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হোক। তারা তো আহলে কিতাব। দেখা যাক, তারা মোহাম্মদ সম্পর্কে কী মন্তব্য করে। এই সিদ্ধান্তে সকলে সম্মত হলো। কয়েকজনকে তারা পাঠিয়ে দিলো মদীনায়। তারা ইহুদীদেরকে রসুল স. সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। ইহুদীরা বললো, তোমরা গিয়ে মোহাম্মদের কাছে তিনটি প্রশ্ন কোরো। যদি সে তিনটি প্রশ্নের উত্তরই দিয়ে দেয়,

www.eelm.weebly.com

অথবা যদি একটিরও জবাব না দেয় তবে নিশ্চিত জেনো, সে নবী নয়। আর যদি দু'টি প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং একটি প্রশ্নের জবাব না দেয়, তাহলে বুঝবে, সে সত্য নবী। প্রশ্ন তিনটি হচ্ছে— ১. ওই যুবক কে, যে পালিয়ে গিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিলো? ২. ওই ব্যক্তি কে, যে পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিলো? ৩. রূহ কী? কুরায়েশেরা মদীনা থেকে ফিরে এসে রসুল স. সকাশে প্রশ্ন তিনটি উপস্থাপন করলো। রসুল স. বললেন, আমি আগামীকাল তোমাদের প্রশ্নগুলোর জবাব দিব। এ কথা বলার সময় তিনি স. ইনশাআল্লাহ্ বলেননি। তাই প্রত্যাদেশ হলো বিলম্বিত। মুজাহিদ বলেছেন, তখন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছিলো বারো দিন পর। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে পনের দিন পর। ইকরামা বলেছেন, চল্লিশ দিন পর। কুরায়েশেরা বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদ আমাদের কাছে আগামীকাল জবাব দিবে বলে অঙ্গীকার করেছিলো। কিন্তু এতদিন গত হওয়ার পরেও সে কিছুই বলতে পারলো না। এই নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপও শুরু করে দিলো। রসুল স. ব্যথিত হলেন। কিছুদিন পর অবতীর্ণ হলো— 'কখনোই তুমি এমন বোলো না যে আমি আগামীকাল করবো, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে— একথা না বলে।' (সুরা কাহ্ফ আয়াত ঃ ২৩, ২৪)। এরপর প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো— 'তুমি কি মনে করো না যে, গুহা ও রক্বীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর? (সুরা কাহ্ফঃ আয়াত ৯)। দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো— 'তারা তোমাকে জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।' (সুরা কাহ্ফঃ আয়াত ৮৩)। এরপর তৃতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। বলা হলো— বলো, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। তিরমিজি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন সংক্ষেপে।

ইবনে কাছীর বর্ণিত হাদিস দু'টোর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করতে পৌনঃপুনিক অবতীর্ণের অভিমতকেই পছন্দ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজারও এরকমই করেছেন। অতিরিক্ত হিসেবে তিনি এতটুকু লিখেছেন, ইহুদীদের প্রশ্ন করার সময় রসুল স. কিছুক্ষণ নীরব ছিলেন এই আশায় যে, সম্ভবতঃ এ সম্পর্কে আরো কিছু প্রত্যাদেশ করা হবে। আর আলোচ্য আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত ও স্থান সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস দু'টো যদি মিলানোর চেষ্টা না করা হয়, তবে তো যে কোনো একটিকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়ে পড়বে অত্যাবশ্যক। আবার এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, বিশুদ্ধ হাদিস ষষ্ঠকের বর্ণনাই অধিকতর প্রাধান্যপ্রাপ্তির উপযুক্ত। এ ছাড়া বোখারীর বর্ণনা অধিকতর প্রাধান্য পাওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, ইহুদীদের সরাসরি প্রশ্ন করার সময় তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বাগবীর বর্ণনায় একথা নেই যে,

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। আবার বাগবী হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে এই উক্তিটিকেও সম্পর্কিত করেছেন যে, যে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, সেই রূহের উদ্দেশ্য ছিলো হজরত জিবরাইল। অর্থাৎ হজরত জিবরাইলকে ইহুদীরা রূহ বলতো, আর ওই রূহ বা জিবরাইল সম্পর্কে তারা রসুল স.কে প্রশ্ন করে বসেছিলো। হাসান এবং কাতাদাও এ কথার সমর্থক।

আমি বলি, আবদ ইবনে হুমাইদ ও আবু শায়েখ কর্তৃক বর্ণিত জুহাকের উক্তিরূপে এবং হজরত আলীর উক্তিরূপে বাগবী লিখেছেন, রূহ হচ্ছে সত্তর হাজার মুখমণ্ডল বিশিষ্ট এক ফেরেশতা, যার প্রতিটি মুখমণ্ডলে রয়েছে সত্তর হাজার করে মুখ। ওই মুখগুলো দিয়ে সে প্রতিনিয়ত বর্ণনা করে আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা। মুজাহিদ বলেছেন, রূহ আল্লাহ্তায়ালার এক অবাক সৃষ্টি। তার আকৃতি মানুষের মতো। কিন্তু সে মানুষ বা ফেরেশতা কোনোটাই নয়। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আরশ ব্যতীত রূহের চেয়ে বৃহৎ কোনো মাখলুক আল্লাহ্ আর সৃষ্টি করেননি। যদি সে চায়, তবে সাত আসমান ও সপ্তস্তর বিশিষ্ট জমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুকে সে একটি লোকমা বানিয়ে গিলে-ফেলতে পারে। তার দৈহিক গঠন ফেরেশতাদের মতো এবং মুখাবয়ব মানুষের মতো। মহাবিচারের দিবসে সে দণ্ডায়মান হবে আরশের ডানপাশে এবং হবে আল্লাহ্তায়ালার সত্তর হাজার পর্দার অধিক নিকটবর্তী। আর যারা আল্লাহ্র এককত্বে বিশ্বাস করে, তাদের জন্য সে শাফায়াতও করবে। ফেরেশতাদের সঙ্গে তার রয়েছে নূরের আড়াল। ওই আড়াল না থাকলে আকাশবাসীরা তার জ্যোতিতে ভস্মীভূত হয়ে যেতো। আবদ্ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, ইকরামা বলেছেন, রূহ ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং এমন কোনো ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না যার সঙ্গে সে থাকে না।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'রূহ' অর্থ আল কোরআন এবং 'মিন আমরি রব্বি' (প্রভুপালকের আদেশ ঘটিত) কথাটির অর্থ এখানে— 'মিন্ ওয়াহ্ ইল্লাহ্' (আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ ঘটিত)। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে 'রূহ' অর্থ হজরত ঈসা। যদি তাই হয়, তবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— ইহুদীরা যেমন মনে করে, হজরত ঈসা সে রকম নন। আর তাঁর পবিত্রা জননীকে তারা অপবাদ দেয়, কিন্তু তিনিও সে রকম নন। আবার খৃষ্টানেরা হজরত ঈসাকে বলে আল্লাহ্র পুত্র, সে কথাও ঠিক নয়। বরং তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে জনক ব্যতিরেকে, সরাসরি আল্লাহ্র 'কুন' (হও) আদেশের মাধ্যমে।

পরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'ইচ্ছা করলে আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম; তাহলে এ বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোনো কর্মবিধায়ক পেতে না।' এ কথার অর্থ— হে আমার

www.eelm.weebly.com

রসুল! এ কথা তো আপনি নিশ্চিতরূপে অবগত যে, যদি আমি চাইতাম, তবে মানুষের স্মৃতিপট থেকে এবং গ্রন্থিত অনুলিপি থেকে কোরআনকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতাম। এরকম করলে আমার নিকট থেকে পুনরায় কোরআনকে ফেরত নেয়ার সাধ্য তো কারো থাকতো না।

এর পরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— 'এটা প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতিপালকের দয়া।' এ কথার অর্থ হতে পারে দু'রকম— ১. আল্লাহ্‌র দয়া যদি হয়, তবে তিনিই কেবল কোরআনকে ফেরত নিতে পারেন। ২. 'ইসতেসনায়ে মুনকাতি' (বিকর্তিত ব্যতিক্রমী)। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালাই নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে এই কোরআনকে আপনার ও কোরআন স্মৃতিবদ্ধকারীদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন। রেখে দিয়েছেন কোরআনের অনুলিপির মধ্যেও। উল্লেখ্য যে, কোরআন সম্পর্কে এখানে আল্লাহ্‌তায়ালার দু'টি অনুগ্রহের কথা বর্ণিত হয়েছে। ১. কোরআনকে অবতীর্ণ করা ২. পুস্তকাকারে এবং মানুষের স্মৃতিপটে কোরআনকে সংরক্ষণ করা।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতি আছে তাঁর মহা অনুগ্রহ।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার প্রতি রয়েছে আমার বিশাল অনুগ্রহ। আপনাকে আমি বানিয়েছি আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক। আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছি মহাগ্রন্থ আল কোরআন। সে কোরআনকে আবার সংরক্ষিত রেখেছি আপনার হৃদয়ে এবং পুস্তকাকারে। দিয়েছি এই মহাকল্যাণের প্রচারের নির্দেশ। দিয়েছি মাকামে মাহমুদ ও হাউজে কাউসার।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, মহাপ্রলয়ের পূর্বে কোরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। সুতরাং কোরআন উঠিয়ে নেয়ার পূর্বেই তোমরা তা পাঠ করো (অনুধাবন করো এবং তার উপরে আমল করো)। এক লোক বললো, পুস্তকে লিপিবদ্ধ কোরআনের বাণী উঠিয়ে নেয়া সম্ভব। কিন্তু স্মৃতি থেকে কোরআনকে উঠিয়ে নেয়া হবে কীভাবে? তিনি বললেন, মানুষ রাতে নিদ্রামগ্ন হবে। তারপর জাগ্রত হয়ে দেখবে তার আর কোনো কিছুই মনে নেই। এরপর কোরআনের অনুলিপি খুঁজে দেখলে সেখানেও কোরআনের কোনো বাণী লিপিবদ্ধ দেখতে পাবে না। শেষে তারা মত্ত হয়ে পড়বে কাব্যচর্চায়।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস বলেছেন, কিয়ামত আগমনের কিছুদিন আগে কোরআন যেখান থেকে এসেছিলো সেখানেই চলে যাবে। তখন মধুমক্ষিকার গুঞ্জনের মতো আরশের চতুষ্পার্শ্বে ধ্বনিত হতে থাকবে গুণ গুণ আওয়াজ। আল্লাহ্ বলবেন, কী হলো? কোরআন বলবে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমাকে তো পাঠ করা হয়, কিন্তু কেউ আমার উপরে আমল করে না। এরকম বর্ণনা করেছেন বাগবী।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ মানুষের অন্তর থেকে কোরআনকে ছিনিয়ে নিবেন। বরং আলেমদেরকেই উঠিয়ে নিবেন দুনিয়া থেকে। আর যখন কোনো আলেম থাকবে না, তখন মানুষ নিজেরাই হবে নিজেদের মূর্খতার অগ্রনায়ক। তখন না জেনেশুনে যে ফতওয়া দিবে, সে হবে পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্ট করবে অন্যকেও।

আহমদ ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত জিয়াদ ইবনে লবীদ বলেছেন, একবার রসুল স. প্রসঙ্গক্রমে বললেন, এক সময় এলেম চলে যেতে থাকবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কীভাবে? আমরা তো কোরআন পড়বো এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও কোরআন শিক্ষা দিবো। তারা শিক্ষা দিবে তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে কোরআনের চর্চা। তিনি স. বললেন, জিয়াদ! তোমার জন্য তোমার মা রোদন করুক। আমি মনে করতাম, তুমি মদীনার একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। ইহুদী ও খৃষ্টানেরা কি তাদের আপনাপন ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করে না? কিন্তু তারা তওরাত ও ইঞ্জিল অনুসারে আমল করে কি? তিরমিজিও এই হাদিসটির বর্ণনাকারী। আর দারেমী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু উমামা থেকে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, এলেম শিক্ষা করো এবং অন্যকে শিক্ষা দাও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত এলেম। কেননা আমি চিরদিন তোমাদের মধ্যে থাকবো না। মনে রেখো, একদিন এলেম উঠে যাবে। প্রসারিত হবে বিশৃংখলা। তখন উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে দেখা দিবে প্রচণ্ড মতপৃথকতা। কিন্তু সে মতপার্থক্যের মীমাংসা করার জন্য কাউকে পাওয়া যাবে না। দারেমী, দারা কুতনী।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, আলেম সম্প্রদায়কে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে এলেম উঠিয়ে নেয়া হবে। এরকম হবে না যে, কারো স্মৃতিপট থেকে কোরআন মুছে দেয়া হবে। উল্লেখ্য যে, হজরত জিয়াদের বর্ণনানুসারে এলেম অনুযায়ী আমল না করার অর্থ হবে এলেম উঠিয়ে নেয়া। অর্থাৎ আমল করার যোগ্যতাই তখন অবলুপ্ত হয়ে যাবে। উপরে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে যে পরস্পরবিরোধীতা রয়েছে, তা নিরসনার্থে বলা যেতে পারে যে, প্রথমে উঠিয়ে নেয়া হবে এলেম অনুযায়ী আমল করার যোগ্যতা। তারপর উঠিয়ে নেয়া হবে আলেমদেরকে। এভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমে ক্রমে অবলুপ্ত হবে এলেম।

সাঈদ অথবা ইকরামার মধ্যস্থতায় ইবনে জারীর এবং ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একদল ইহুদী একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আমরা কীভাবে আপনার আনুগত্য

www.eelm.weebly.com

করতে পারি, আপনি তো আমাদের কেবলাকেও ত্যাগ করেছেন। আর আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার সঙ্গেও আমরা আমাদের তওরাতের কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছি না। সুতরাং আপনি এমন কিতাব আনুন, যা আমাদের বোধগম্য হয়। নতুবা আপনি যেমন বলে চলেছেন, সেরকম তো আমরাও বলতে পারি। তাদের একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৮৮, ৮৯

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۝

❒ বল,'যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় ও তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ কুরআন আনয়ন করিতে পারিবে না।'

❒ আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সত্য প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত আর সমস্ত কিছুই অস্বীকার করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, আরববাসী কবি ও অলংকার শাস্ত্রবিদসহ সকল মানুষ ও জ্বিন সম্মিলিতভাবে কোরআনের মতো জ্ঞানগর্ভ ও শিল্পসুষমামণ্ডিত কোনো বাণী রচনা করতে চাইলেও সফল হবে না। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো তখন, যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলেছিলো—ইচ্ছে করলে আমরাও এরকম রচনা করতে পারি। আল্লাহ্তায়ালা আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাদের ওই অপকথনের প্রতিবাদ উপস্থাপন করেছেন। আর কোরআনের এটাও একটি মোজেজা যে, কোরআনের অনুরূপ কোনো বাণী কোনোদিনও কেউ রচনা করতে পারেনি। পারবেও না।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে মানুষ ও জ্বিনের কথা। ফেরেশতাদের উল্লেখ এখানে আসেনি। সম্ভবতঃ এর কারণ এই যে, ফেরেশতারা যদি কোরআনের মতো কোনো বাণী রচনা করতে সক্ষম হয়েও থাকে, তবুও তা

www.eelm.weebly.com

মানুষ ও জ্বিনের জন্য মোজেজা হয়েই থাকবে। মোজেজা হওয়ার ব্যাপারে এক্ষেত্রে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না। একথাটিও প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআন অবতীর্ণ হয় ফেরেশতার মাধ্যমে। এ ব্যাপারে মানুষ ও জ্বিন কখনোই মধ্যস্থ নয়। আমি বলি, কোরআনের অনুরূপ রচনার আমন্ত্রণের অর্থ হচ্ছে— নিজে রচনা করে উপস্থিত করো, যাতে প্রত্যাদেশের কোনো নাম গন্ধ থাকবে না। আর একটি কথা এই যে, ফেরেশতারা তো আল্লাহ্‌র বাণীর অনুরূপ কোনো বাণী রচনা করার চিন্তাই করতে পারে না। এরকম চিন্তা করতে পারে কেবল তারা যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আর ফেরেশতারা কখনোই সত্যপ্রত্যাখ্যান করে না। কারণ তারা মাসুম বা নিষ্পাপ। এরকম হতে পারে যে, এই আয়াতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের একটি বাক্য। বাক্যটি এই— 'তাহলে এ বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোনো কর্মবিধায়ক পেতে না।'

পরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'আমি মানুষের জন্য এই কোরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।' এখানে 'সর্‌রাফনা' অর্থ বিশদভাবে। অর্থাৎ বিভিন্নভাবে, সুস্পষ্টরূপে ও গুরুত্বসহকারে বার বার। 'মিনকুল্লি মাছালিন' কথাটির অর্থ বিভিন্ন উপমার দ্বারা। অর্থাৎ বিধানাবলীর বিবরণ, শান্তি ও শাস্তির অংগীকার ইত্যাদি বিষয়ে বুঝবার জন্য বিভিন্ন উপমার সাহায্যে। 'মাছালা' অর্থ সদুপদেশও হয়। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— এই কোরআনে আমি উপস্থাপন করেছি বিভিন্ন সৌন্দর্যমণ্ডিত সদুপদেশ ও অনেক হৃদয়স্পর্শী বিবরণ। এগুলো যেনো কোরআনের বিভিন্ন উপমা।

শেষে বলা হয়েছে— 'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সত্যপ্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত আর সমস্ত কিছুই অস্বীকার করে।' একথার অর্থ— কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কোরআন মজীদের এ সকল সদুপদেশের প্রতি দৃকপাত করে না। এভাবে তারা হয়ে যায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

ইকরামার মধ্যস্থতায় বাগবী লিখেছেন, একবার হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উতবা বিন রবীয়া, শায়বা বিন রবীয়া, আবু সুফিয়ান বিন হারব, আবদুদ্দার গোত্রের এক লোক (বাগবীর মন্তব্যানুসারে নজর বিন হারেছ), আবুল বুখতারী, আসওয়াদ বিন মুত্তালিব, জাম্‌য়া বিন আসওয়াদ, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আবু জেহেল বিন হিশাম, আবদুল্লাহ্ বিন আবু উমাইয়া, উমাইয়া বিন খালফ, আস বিন ওয়ায়েল, নাবী বিন হাজ্জাজ, মাযবাহ্ বিন হাজ্জাজ এবং আরো কতিপয় লোক সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর কাবাগৃহের পশ্চাতে সমবেত হয়ে রসুল স. এর বিষয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ বিনিময় শুরু করলো। একজন বললো, মোহাম্মদকে এই সমাবেশে ডেকে আনা হোক। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে

www.eelm.weebly.com

নিরসন করা হোক তার ও আমাদের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যাবলী। তার এ কথায় সকলেই একমত হলো। একজনকে লক্ষ্য করে বলা হলো, তুমিই যাও। মোহাম্মদকে গিয়ে বলো, গোত্রপতিগণ তোমার সঙ্গে কথা-বার্তা বলার জন্য অপেক্ষমান।

রসুল স. তাদের এমতো প্রস্তাব জানতে পেরে ভাবলেন, এবার হয়তো গোত্রপতিদের বোধোদয় ঘটেছে। তিনি স. সব সময় চাইতেন, তারা হেদায়েত-প্রাপ্ত হোক। তাই তিনি কালবিলম্ব না করে হাজির হলেন তাদের সমাবেশস্থলে। গোত্রপতিরা নানাভাবে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলো। একজন বললো, দেখো মোহাম্মদ! তোমার ও আমাদের মধ্যে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হওয়া খুবই দুঃখজনক। তুমি যা বলো তা আমাদের নিকটে খুবই বিরক্তিকর। কোনো আরববাসী এ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এরকম আচরণ করেনি। তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে মন্দ বলো। তাদের মতাদর্শকে অস্বীকার করো। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে বলো নির্বোধ। নিন্দা করো তাদের উপাস্যদের। এভাবে তুমি আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছো অনৈক্য। বংশপরম্পরায় যে ধর্মমতকে আমরা একান্ত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে প্রতিপালন করে চলেছি, সেই ধর্মমতের বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়িয়েছো কোরআন ও ইসলাম নিয়ে। কেনো তুমি এভাবে ধর্মদ্রোহী হয়ে উঠলে। কী চাও তুমি? ধন-সম্পদ? প্রতিপত্তি? রাজত্ব? যদি এসব কিছু চাও, তবে তা স্পষ্ট করে বলো। আমরা তোমাকে দান করবো অঢেল সম্পদ। বানাবো আমাদের অধিনায়ক অথবা রাজা। আর যদি কোনো দুষ্ট জ্বিনের প্রভাবে তুমি এরকম করে থাকো, তবে (গণক অথবা ওঝার মাধ্যমে) তোমার উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য আমরা আমাদের সম্পদ ব্যয় করতেও প্রস্তুত। রসুল স. বললেন, তোমাদের ধারণা অযথার্থ। কোরআন প্রচারের মাধ্যমে আমি ঐশ্বর্য অন্বেষণ করি না। সম্মান, নেতৃত্ব, রাজত্ব— কোনো কিছুই আমি চাই না। আল্লাহ্ তো আমাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন তাঁর বাণীবাহকরূপে। দান করেছেন একটি কিতাব। নির্দেশ করেছেন একথা প্রচার করতে যে, এই কিতাবের অনুসারীদের জন্য রয়েছে জান্নাতের শুভ সংবাদ। আর দুঃসংবাদ রয়েছে তাদের জন্য, যারা একে অস্বীকার করে। তাই এভাবে শুভসংবাদ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন করাই আমার কর্তব্য কর্ম। আর আমি তো একথা তোমাদেরকে বার বার বলে চলেছি। সুতরাং হে আমার সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ! এই কোরআনকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করো। যদি এরকম করো, তবে লাভ করবে পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। আর যদি প্রত্যাখ্যান করো, তবে আমি আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ করবো। আমার ও তোমাদের বিষয়ে মীমাংসা করবেন আল্লাহ্ স্বয়ং।

www.eelm.weebly.com

গোত্রপতিদের একজন বললো, মোহাম্মদ, আমরা তো তোমার সম্মুখে একটি উত্তম প্রস্তাব উপস্থাপন করেছি। তুমি যদি এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে না চাও, তবে তোমার দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করো। তুমি তো জানো, আমাদের এই মক্কা নগরী পর্বত বেষ্টিত ও সংকীর্ণ। ইয়েমেন ও সিরিয়াবাসীদের মতো আমরা সম্পদশালীও নই। সুতরাং তুমি তোমার প্রভুপালকের কাছে এইমর্মে প্রার্থনা জানাও, যেনো তিনি আমাদের জনপদের চতুম্পার্শ্বের পাহাড়গুলোকে সরিয়ে দেন। প্রসারিত করে দেন আমাদের বসবাসের পরিসর। আর সিরিয়া ও ইরাকের মতো আমাদের দেশের মধ্য দিয়েও যেনো প্রবাহিত করে দেন জলবতী নদী। সেই সঙ্গে আমাদের মৃত পূর্ব পুরুষদেরকে করে দেন জীবিত। সত্যবাদী কুসাই বিন কিলাবও যেনো থাকেন ওই পুনর্জীবিতদের মধ্যে। আমরা তাদের নিকটে তোমার দাবির সত্যাসত্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো। যদি তারা তোমাকে সত্য পয়গম্বর বলে বিশ্বাস করে, তবে আমরাও তোমাকে সত্য বলে মানবো।

রসুল স. বললেন, আমাকে তো এজন্যে প্রেরণ করা হয়নি। যে বার্তা প্রচারের নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে, তাতো তোমাদের নিকটে আমি পৌঁছে দিয়েছি। এখন তোমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, কী চাও তোমরা? চিরন্তন সৌভাগ্য, না চিরস্থায়ী শাস্তি। আমি তো বাণীবাহক মাত্র। তারা বললো, আমাদের প্রস্তাব যদি তুমি মেনে না নাও, তবে অন্ততঃ এ রকম করো যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করাও একজন ফেরেশতাকে, যে তোমার নবুয়তকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিবে এবং দূর করে দিবে তোমার দারিদ্র। রসুল স. বললেন, না। আল্লাহ্ আমাকে এ জন্য প্রেরণ করেননি। আমি তো বলেছি, আমি শুভসংবাদ প্রদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী। তারা বললো, তা হলে তুমি আমাদের উপরে আকাশকে পতিত করাও। কারণ তুমি বলো, তোমার প্রভুপালক সর্বশক্তিধর। রসুল স. বললেন, এটা সম্পূর্ণতঃই আমার আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন একটি বিষয়। তিনি যদি চান তবে অবশ্যই এরকম করতে পারেন। গোত্রপতিদের একজন উত্তেজিত হয়ে বললো, অতো কথার দরকার নেই। তোমার আল্লাহ্ ও তার ফেরেশতারা আমাদের সামনে এসে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো না। একথা শুনে রসুল স. উঠে দাঁড়ালেন। যাত্রা করলেন গৃহাভিমুখে। তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো তাঁর ফুফু আতেকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহ্ বিন আবী উমাইয়া। রসুল স. এর সঙ্গে পথ চলতে চলতে সে বললো, মোহাম্মদ, গোত্রপতিগণ তোমার নিকটে কয়েকটি দাবি উত্থাপন করলো। কিন্তু তুমি সেগুলোর কোনো তোয়াক্কাই করলে না। শেষে তারা বললো, তুমি যে শাস্তির ভয় দেখাও, দ্রুত সে শাস্তি নিয়ে এসো। কিন্তু সে শাস্তিও তুমি আনতে পারলে না। এখন আমি বলছি, এই মুহূর্তে তুমি আমার চোখের সামনে সিঁড়ি বেয়ে আকাশে উঠে যাও। সেখানে থেকে নিয়ে এসো একটি কিতাব। আর ওই কিতাবের সঙ্গে নিয়ে এসো চারজন ফেরেশতা। তারা তোমার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করুক। তবে আমার মনে হয়, এরকম করলেও হয়তো আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারবো না। তার একথা শুনে রসুল স. ব্যথিত হলেন। চিন্তাক্লিষ্ট মনে ফিরে এলেন স্বগৃহে। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত চতুষ্টয়।

www.eelm.weebly.com

অজ্ঞাতনামা এক মিসরবাসী জ্ঞান প্রবীণের মধ্যস্থতায় ইবনে জারীর ও ইবনে ইসহাক ইকরামা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নিম্নের আয়াত চতুষ্টয় অবতীর্ণ হয়েছে জননী উম্মে সালমার ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ বিন উমাইয়া সম্পর্কে। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে সাঈদ ইবনে মানসুরও এ রকম বলেছেন। 'লুবাবুন্ নুকুল' রচয়িতা লিখেছেন, বর্ণনাটি অপরিণত, কিন্তু বিশুদ্ধ।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ۙ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۙ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۙ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ ۚ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ○

❒ এবং উহারা বলে,'কখনই তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিব না যতক্ষণ না তুমি আমাদিগের জন্য ভূমি হইতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করিবে,

❒ 'অথবা তোমার খর্জুরের অথবা আংগুরের এক বাগান হইবে যাহার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করিয়া দিবে নদী-নালা',

❒ 'অথবা তুমি যেমন বলিয়া থাক, তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া আমাদিগের উপর ফেলিবে, অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণকে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিবে',

❒ 'অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হইবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করিবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণ আমরা কখনও বিশ্বাস করিব না যতক্ষণ তুমি আমাদিগের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ না করিবে যাহা আমরা পাঠ করিব।' বল, 'পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রসূল।'

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! অংশীবাদীরা কীরূপ সত্যদ্রোহী। কোরআন যে একটি অলৌকিক গ্রন্থ, তার প্রমাণ সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও তারা আপনাকে আরো অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করতে বলে। বলে, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য মৃত্তিকা বিদীর্ণ করে একটি প্রস্রবণের উৎসারণ ঘটাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাকে নবী বলে বিশ্বাস করবো না।

পরের আয়াতে (৯১) বলা হয়েছে— 'অথবা যতক্ষণ না তুমি হবে এক খেজুর বা আঙ্গুরের বাগানের অধিকারী, যার মধ্যে মাঝে মাঝে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দিবে নদী-নালা।'

এর পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— 'অথবা তুমি যেমন বলে থাকো, তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপরে ফেলবে।' এ কথার অর্থ— অথবা হে মোহাম্মদ! তুমি বলো, কোরআন না মানলে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের উপর আকাশ আপতিত করবেন— তাই করো তুমি। আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপরে ফেলে দাও। এখানকার 'কিসাফুন' শব্দটির অর্থ খণ্ড-বিখণ্ড করে। শব্দটি 'কাসিফাতুন' এর বহুবচন। যেমন 'ক্বিত্বাউন' শব্দটি 'ক্বিত্বআতুন ' এর বহুবচন।

এরপর বলা হয়েছে— 'অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'ক্বাবীলা' শব্দটির অর্থ 'কাফীলা'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে এরকম— অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদেরকে সাক্ষ্যদাতারূপে উপস্থিত করো আমাদের সামনে। তারাই সাক্ষ্য দিক যে, তোমার দাবি সত্য। তারাই বহন করুক সকল দায়-দায়িত্ব। কাতাদা বলেছেন, 'ক্বাবীলা' অর্থ সামনাসামনি। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণকে নিয়ে এসো আমাদের সামনে। ফাররা বলেছেন, আরববাসীরা বলে, লাক্বীতু ফুলানান ক্বাবীলান্ ওয়া ক্বুবুলান' (আমি অমুক ব্যক্তির সামনাসামনি হয়েছিলাম)। এমতাবস্থায় 'ওয়াল মালায়িকাতি' থেকে 'ক্বাবীলান' হবে হাল বা অবস্থা জ্ঞাপক। 'ক্বাবীলান' শব্দটি 'ক্বাবীলাতুন' এর বহুবচন। কথাটি ব্যবহৃত হয় শ্রেণী বা প্রকার বোঝাতে। তাই বক্তব্যটি দাঁড়াবে— বিভিন্ন শ্রেণীর বা রকমের ফেরেশতাগণকে হাজির করাও।

এর পরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— 'অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে। কিন্তু তোমার আকাশারোহণ আমরা কখনো বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ তুমি আমাদের উপর এক কিতাব অবতীর্ণ না করবে, যা আমরা পাঠ করবো।' উদ্ধৃত বক্তব্যটি ছিলো কুরায়েশ নেতা আবদুল্লাহ্ বিন উমাইয়ার। 'যুখরুফ' অর্থ সাজ-সজ্জা। এখানে কথাটির অর্থ

www.eelm.weebly.com

হবে— স্বর্ণ-নির্মিত গৃহ। 'কিতাবান্ নাক্বরাউহু' অর্থ একটি কিতাব যার মধ্যে থাকবে তোমার নবুয়তের স্বীকৃতি, যা স্বচক্ষে দেখে পাঠ করবো আমরা এবং সরাসরি আমাদের প্রতি তোমার আনুগত্য করার নির্দেশ।

শেষে বলা হয়েছে— 'বলো, পবিত্র মহান প্রতিপালক! আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রসুল।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কুরায়েশ গোত্রাধিনায়কদেরকে বিস্ময় প্রকাশার্থে বলে দিন, আমার মহিমময় প্রভুপালনকর্তা পবিত্রাতিপবিত্র। আমি তো কেবল একজন মানুষ। তোমরা যা করতে বলো, তা মানুষের সাধ্য বহির্ভূত। আর আমি একজন সত্য রসুলও। কোনো রসুল কখনো স্বশক্তিতে কোনো মোজেজা প্রদর্শন করেন না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাঁর রসুলের মাধ্যমে তিনি এর চেয়েও অধিক অলৌকিকত্ব প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছা প্রয়োগের ব্যাপারে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র, চিরঅমুখাপেক্ষী। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ইচ্ছামতো মোজেজা প্রকাশ করা তাঁর নিয়ম নয়। কারণ ইমান আনার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই তারা মোজেজার অভিলাষী হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী কুরায়েশদের দাবির জবাব দেয়া হয়েছে অতি সংক্ষেপে। কারণ তারা মূর্খ ও চিরভ্রষ্ট। ইমান তাদের অদৃষ্টেই নেই। তাই অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে— ১. 'যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও অবতীর্ণ করতাম।' ২. 'যদি ওদের জন্য আকাশের দুয়ার খুলে দেই।' ৩. 'কিছু যদি হয়ে যায় (কোরআনের মাধ্যমে যদি পাহাড় চলতে থাকে অথবা যদি পৃথিবীকে গুঁটিয়ে নেয়া হয় এবং মৃতকে জীবিত করার পর তারা কথা বলে), তবুও তারা ইমান আনবে না; সকল কাজের এখতিয়ার আল্লাহ্‌র হাতে।'

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ
اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ○ قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ
لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ○ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاۢ
بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا ○ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ
فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ

www.eelm.weebly.com

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا مَاْوٰىهُمْ
جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ○ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا

❒ 'আল্লাহ্ কি মানুষকে রসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন,' উহাদিগের এই উক্তিই বিশ্বাস স্থাপন হইতে লোকদিগকে বিরত রাখে, যখন উহাদিগের নিকট আসে পথ-নির্দেশ।

❒ বল, 'ফেরেশতাগণ যদি নিশ্চিন্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিত তবে আমি আকাশ হইতে ফেরেশতাই উহাদিগের নিকট রসূল করিয়া পাঠাইতাম।'

❒ বল, 'আমার ও তোমাদিগের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট; তিনি তো তাঁহার দাসদিগকে সবিশেষ জানেন ও দেখেন।'

❒ আল্লাহ্ যাহাদিগকে পথ-নির্দেশ করেন তাহারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাহাদিগকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও উহাদিগের অভিভাবক পাইবে না, কিয়ামতের দিন আমি উহাদিগকে সমবেত করিব উহাদিগের মুখে-ভর দিয়া-চলা অবস্থায় অন্ধ, মুক ও বধির করিয়া। উহাদিগের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই উহা স্তিমিত হইবে আমি তখন উহাদিগের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করিয়া দিব।

❒ ইহাই উহাদিগের প্রতিফল, কারণ উহারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছিল ও বলিয়াছিল, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলেও কি নূতন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হইব?'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! দেখুন অংশীবাদী কুরায়েশেরা কতোই না অজ্ঞ ও উন্নাসিক। তাদের প্রতি রসুলরূপে প্রেরিত হয়েছেন আপনি। আর আপনার উপর অবতীর্ণ হয়ে চলেছে আল কোরআন। এমতাবস্থায় তাদের দায়িত্ব ছিলো আপনাকে ও কোরআনকে নির্বিবাদে মেনে চলা। কিন্তু তা না করে তারা উল্টো প্রশ্ন করে বসে, আল্লাহ্ মানুষকে কি রসুল করে পাঠিয়েছেন! এরকম অপকথনের কারণে তারা অবশ্যই হয়েছে পথভ্রষ্ট। আরো হয়েছে অন্যের হেদায়েতের পথের প্রতিবন্ধক। কিন্তু তারা এই সহজ কথাটি কেনো বোঝে না যে, সমগোত্রীয় না হলে উপকার আদান-প্রদান বিঘ্নিত হয়। তাইতো মানুষের হেদায়েতের জন্য রসুল হিসেবে প্রেরণ করি মানুষকে।

পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'বলো, ফেরেশতাগণ যদি নিশ্চিন্তে পৃথিবীতে বিচরণ করতো, তবে আমি আকাশ থেকে ফেরেশতাকেই তাদের জন্য

www.eelm.weebly.com

রসুল করে পাঠাতাম। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে একথা উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করুন যে, পৃথিবীতে বাস করে মানুষ, ফেরেশতা নয়। ফেরেশতা যদি এখানে বসবাস করতো তবে তো তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য ফেরেশতাকেই পাঠাতাম।

এর পরের আয়াতে (৯৬) বলা হয়েছে— 'বলো, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল অর্বাচীনদেরকে বলুন, আমার রেসালতের পক্ষে আল্লাহ্র সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনিই উত্তমরূপে অবগত যে, আমি তার রসুল কিনা। তোমাদের অস্বীকৃতিতে আমার কিইবা এসে যায়। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, আমি বার্তাবাহকের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করেছি, তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি আল্লাহ্র পয়গাম। অথচ তোমরা স্পষ্টরূপে সত্য প্রকাশিত হবার পরও আমার বিরোধিতা করে চলেছো। ঠিক আছে, আল্লাহ্ই এ ব্যাপারে আমার ও তোমাদের বিষয়ে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত দান করবেন। যথাসময়ে পুণ্য প্রদান করবেন সত্যাধিষ্ঠিতদেরকে, আর শাস্তি দান করবেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তো তাঁর দাসদেরকে সবিশেষ জানেন ও দেখেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা যিনি সত্যের বাণী পৌঁছাচ্ছেন এবং যাদেরকে বাণী পৌঁছানো হচ্ছে উভয়ের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। সকলেই তাঁর অতুলনীয় পর্যবেক্ষণ ও অবহিতির আওতাভূত। যথাসময়ে অবশ্যই উভয়ের জন্য নির্ধারণ করা হবে সাফল্য ও বৈফল্য। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে রসুল স.কে দেয়া হয়েছে সান্ত্বনা, আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দেয়া হয়েছে শাস্তির হুমকি।

এর পরের আয়াতে (৯৭) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাদেরকে পথনির্দেশ করেন, তারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনোই তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকে তাদের অভিভাবক পাবে না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনে রাখুন, আল্লাহ্ হেদায়েত না করা পর্যন্ত কেউ হেদায়েত পায় না। আর যাদেরকে তিনি হেদায়েত করতে চান না তারা অবশ্যই হয় পথভ্রষ্ট। আল্লাহ্ ছাড়া অভিভাবক ও সাহায্যকারী কেউ নেই। আর একথা সুনিশ্চিত যে, পথভ্রষ্টরা আল্লাহ্র সাহায্যচ্যুত।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করবো তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ, মুক ও বধির করে।'

www.eelm.weebly.com

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! কিয়ামতের দিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা মুখে ভর দিয়ে চলবে কীভাবে? তিনি স. বললেন, যে আল্লাহ্ তাদেরকে এখন পায়ের সাহায্যে চলাফেরা করাচ্ছেন, তিনি কি তখন তাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চালিত করতে পারবেন না? বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হাশরের প্রান্তরে মানুষ উপনীত হবে তিন রকম অবস্থায়। কেউ থাকবে বাহনে আরোহণ করে। কেউ থাকবে পায়ের উপরে দণ্ডায়মান হয়ে। আবার কেউ চলবে মুখে ভর করে। এক লোক জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! মুখে ভর দিয়ে চলা আবার কীরকম? তিনি স. বললেন, যিনি মানুষকে পৃথিবীতে পায়ে ভর করে চালিয়েছেন, তিনি নিশ্চয় মুখে ভর করে চালাতে সক্ষম। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি উত্তমসূত্রবিশিষ্ট। হজরত মুয়াবিয়া বিন জুনদুব থেকেও এরকম একটি বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, তোমাদের হাশর হবে বাহনারোহী হওয়া অবস্থায়, পায়ের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং মুখে ভর করে দাঁড়ানো অবস্থায়।

হজরত আবু জর সূত্রে নাসাঈ, হাকেম ও বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিন মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে তিনটি দলে বিভক্ত করে। এক দল থাকবে পানাহারে পরিতৃপ্ত, বস্ত্র পরিহিত ও বাহনে আরোহণ করা অবস্থায়। আরেক দল চলবে পায়ে হেঁটে, দৌড়ে এবং অন্য আরেক দলকে মুখে ভর দিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় ফেরেশতারা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলবে।

'অন্ধ, মুক ও বধির করে' কথাটির মর্মার্থ হবে এরকম— সে দিন এমন কোনো দৃশ্য তারা দেখতে পাবে না, যাতে করে তাদের চক্ষু জুড়িয়ে যায়। এমন কোনো কথাও তখন তারা বলতে পারবে না, যা হবে গ্রহণযোগ্য এবং শ্রুতিসুখকর কোনো সংবাদও সেদিন তাদের কর্ণগোচর হবে না। কেননা পৃথিবীতে তারা সত্য দর্শন থেকে তাদের চোখকে বন্ধ করে রেখেছিলো। সত্যবাণী শ্রবণ করা থেকে শ্রুতিকে করে রেখেছিলো বধির। আর তাদের রসনা ছিলো সত্যের বাণী উচ্চারণ করা থেকে মুক। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এভাবেই আলোচ্য বাক্যটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ সে দিন তারা পরিত্রাণপ্রদায়ক কোনো দৃশ্য, আশাব্যঞ্জক কোনো বাণী এবং আনন্দপ্রকাশক কোনো ধ্বনি দেখা, শোনা ও উচ্চারণ করা থেকে হবে বঞ্চিত। এর বিপরীত সকল কিছুই তারা দেখবে, শুনবে ও উচ্চারণ করবে। তাই কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে— ১. পাপিষ্ঠরা দোজখ দেখবে। ২. সেখানে ধ্বংসকেই আহ্বান করা হবে। ৩. তারা

www.eelm.weebly.com

তখন শুনবে রোষজাত শব্দ ও হুমকি। ৪. সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমরা তো সবকিছু দেখলাম ও শুনলাম। এখন আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও, আমরা পুণ্যকর্ম করবো।

কিন্তু কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, প্রকৃত অর্থেই সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হবে অন্ধ, বধির ও মুক। তবে দোজখের সামনাসামনি হলে তারা পুনরায় ফিরে পাবে তাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তি।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, হিসাব গ্রহণ শেষে যখন তাদেরকে দোজখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে তখন অন্তর্হিত হয়ে যাবে তাদের দৃষ্টিক্ষমতা, বাকক্ষমতা ও শ্রবণক্ষমতা।

সাঈদ ইবনে মানসুর ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, মোহাম্মদ বিন কা'ব বলেছেন, দোজখের মধ্যে দোজখীরা কথা বলতে পারবে মাত্র পাঁচবার। আর প্রতিবারই তাদের প্রশ্ন ও আবেদন-নিবেদনের জবাব দান করবেন আল্লাহ্ স্বয়ং। যেমন— ১. দোজখী বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা তুমি দুই দুইবার আমাদের প্রাণ হরণ করার পরে পুনরায় প্রাণ দান করেছো। আমরা স্বীকার করছি আমাদের অপরাধ। এখন এখান থেকে আমাদের নিষ্ক্রমণের কোনো উপায় রয়েছে কি? আল্লাহ্ বলবেন— তোমাদের এই শাস্তি তো এই জন্য যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ডাকা হতো, তখন তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে (সুরা মু'মিনূন)। ২. দোজখীরা বলবে, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমরা সবকিছু দেখেছি ও শুনেছি। এখন আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন। আমরা নেককাজ করবো এবং নিশ্চয় হবো বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ বলবেন— তবে শাস্তি আস্বাদন করো। কারণ, আজকের এই সাক্ষাতের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে, আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়েছি (সুরা সাজদা)। ৩. দোজখীরা নিবেদন করবে— হে আমাদের প্রভুপালয়িতা! আমাদেরকে কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও। আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিবো এবং রসুলগণের অনুসরণ করবো। উত্তরে আল্লাহ্ ঘোষণা করবেন— তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? (সুরা ইবরাহীম)। ৪. জাহান্নামীরা কাকুতি-মিনতি করে বলবে— হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদেরকে এই নরক থেকে নিষ্কৃতি দাও। আমরা যে কাজ করে এখানে এসেছি, এখন থেকে তার বিপরীত কাজ করবো। আল্লাহ্ জানাবেন— আমি কি তোমাদেরকে পৃথিবীর আয়ুষ্কাল দেইনি? একথার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণকারীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। ৫. এরপর নরকবাসীরা আর্তনাদ করে বলবে— হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিলো এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে

www.eelm.weebly.com

আমাদের প্রভুপালয়িতা। এই অসহ্য আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো। এরপর আমরা যদি পুনরায় সত্যপ্রত্যাখ্যান করি, তবে তো আমরা অবশ্যই হবো সীমালংঘনকারী। আল্লাহ্ তখন তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন এভাবে— 'ওর মধ্যে থেকে অপদস্থ হও। আমার সঙ্গে কথা বোলো না'— এরপর থেকে দোজখবাসীরা আর কথা বলবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই তা স্তিমিত হবে, আমি তখন তাদের জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করে দিবো।' এ কথার অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চিরস্থায়ী আবাস হচ্ছে জাহান্নাম। যখন জাহান্নামের আগুনে তাদের চর্ম-অস্থি-মাংস জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যাবে এবং অগ্নিশিখা হয়ে যাবে কিছুটা স্তিমিত, তখন তাদের শরীরে পুনরায় স্থাপন করা হবে চর্ম, অস্থি ও মাংস। আর অগ্নিশিখাকেও করে দেয়া হবে অধিকতর উত্তপ্ত। এভাবেই পালাক্রমে চলতে থাকবে তাদের অনন্ত শাস্তি। আর এভাবেই পুনঃপুনঃ তাদেরকে একবার করা হবে মৃতপ্রায়, আর একবার করা হবে পুনর্জীবিত। কেননা তারা ছিলো পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী। পরবর্তী আয়াতে (৯৮) সে কথাই স্পষ্টাক্ষরে বলে দেয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে— 'এটাই তাদের প্রতিফল, কারণ তারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছিলো ও বলেছিলো, আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো?'

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৯৯, ১০০

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَأَبَى الظّٰلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۝ قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۝

❒ উহারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উহাদিগের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে ক্ষমতাবান? তিনি উহাদিগের জন্য স্থির করিয়াছেন এক নির্দিষ্ট কাল, যাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তথাপি সীমা লংঘনকারীগণ সত্যপ্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত সবই অস্বীকার করে।

www.eelm.weebly.com

❑ বল, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হইতে তবুও তোমরা 'ব্যয় হইয়া যাইবে' এই আশংকায় উহা ধরিয়া রাখিতে; মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।"

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান?'

একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সুবিশাল আকাশ ও বিশাল পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না কেনো? আকৃতিগত দিক থেকে এই দু'টি বিশাল ও রহস্যময় সৃষ্টির তুলনায় মানুষ সৃষ্টি তো একটি নগণ্য বিষয়। যে আল্লাহ্ পূর্বদৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে আকাশ ও ভূবন সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ্ কি মানুষের মতো একটি ক্ষুদ্র সৃষ্টিকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারবেন না? প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টিতো আরো সহজ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন এক নির্দিষ্টকাল, যাতে কোনো সন্দেহ নেই।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন একটি নির্দিষ্ট সময়। এতে সন্দেহ মাত্র নেই। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'আজ্বালা' (নির্দিষ্টকাল বা সময়) বলে বুঝানো হয়েছে মৃত্যুর সময়কে। আবার কেউ বলেছেন, এখানে নির্দিষ্টকাল বা সময় অর্থ কিয়ামত বা মহাপ্রলয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তথাপি সীমালংঘনকারীরা সত্যপ্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত সবই অস্বীকার করে।' এখানে 'জলিমুন' অর্থ সীমালংঘনকারীরা। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে এ কথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই সীমালংঘনকারী। তারা কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করে। অথচ তাদের এমতো আচরণ সম্পূর্ণ নিরর্থক।

পরের আয়াতে (১০০) বলা হয়েছে— 'বলো, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হতে, তবুও তোমরা ব্যয় হয়ে যাবে এই আশংকায় তা ধরে রাখতে। মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।' এখানে 'দয়ার ভাণ্ডার' অর্থ রিজিক ও অন্যান্য নেয়ামতের ভাণ্ডার। 'ব্যয় হয়ে যাবে এই আশংকায়'— কথাটির অর্থ সম্পদ ব্যয় হয়ে গেলে নিঃস্ব হয়ে যাবে এই ভয়ে। 'ক্বাতূরা' অর্থ কার্পণ্য, সংকীর্ণচিত্ততা। উল্লেখ্য যে, মানুষ তার সঞ্চয় পুরোপুরি বিলিয়ে দিতে ভয় পায়। কারণ সে প্রকৃত অর্থে ধনী বা সম্পদশালী নয়। প্রকৃত সম্পদশালী হচ্ছেন আল্লাহ্। তিনিই সকল সম্পদের স্রষ্টা। তিনি যত দান করেন, ততই বা ততোধিক সম্পদ সৃষ্টিও করতে পারেন তিনি। কারণ তিনিই সকল কিছুর একক স্রষ্টা এবং সকল গ্রহীতার একমাত্র দাতা । তাঁর ধনভাণ্ডার অনিঃশেষ। কিন্তু মানুষ কিছুতেই

www.eelm.weebly.com

তাঁর মতো নয়। প্রকৃত অর্থে সে দাতাও নয়। বরং গ্রহীতা। তাই সে অতিশয় কৃপণ। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হতে, তবুও তোমরা স্বভাবগত কৃপণতার ফলে সম্পদ কমে যাওয়ার আশংকায় তা ধরে রাখতে চাইতে। কারণ তোমরা অতিশয় কৃপণ।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْئَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ۝ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ۝ فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ۝ وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ۝

❒ তুমি বনি ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, আমি মুসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়াছিলাম; যখন সে তাহাদিগের নিকট আসিয়াছিল ফেরাউন তাহাকে বলিয়াছিল 'হে মূসা! আমি তো মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত।'

❒ মূসা বলিয়াছিল, 'তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করিয়াছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। হে ফেরাউন ! আমি তো দেখিতেছি তুমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছ।'

❒ অতঃপর ফেরাউন তাহাদিগকে দেশ হইতে উচ্ছেদ করিবার সংকল্প করিল; তখন আমি ফেরাউন ও তাহার সংগীগণ সকলকে নিমজ্জিত করিলাম।

❒ ইহার পর আমি বনি ইসরাঈলকে বলিলাম, 'তোমরা এই দেশে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হইবে তখন তোমাদিগের সকলকে আমি একত্রিত করিয়া উপস্থিত করিব।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি বনী ইসরাইলকে জিজ্ঞেস করে দেখো, আমি মুসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! স্মরণ করুন, আমি নবী মুসাকে দিয়েছিলাম নয়টি স্পষ্ট মোজেজা।

www.eelm.weebly.com

হজরত মুসাকে প্রদত্ত নয়টি মোজেজা নির্ধারণ নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস ও জুহাক বলেছেন, ওই নয়টি মোজেজা ছিলো—১. অলৌকিক লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া। ২. হাত বগলে রেখে বের করে আনলে তা শুভ্র ও আলোকজ্জ্বল হওয়া। ৩. জিহ্বার জড়তা দূর হওয়া। ৪. লাঠির আঘাতে সমুদ্র-সলিল দ্বিধাবিভক্ত হওয়া। ৫. প্লাবন । ৬. পঙ্গপালের আক্রমণ। ৭. ব্যাঙের আযাব। ৮. রক্তের আযাব। ৯. যষ্টির আঘাতে প্রস্তর থেকে সলিলধারা নির্গত হওয়া। ইকরামা, মুজাহিদ ও আতা নয়টি মোজেজার তালিকা প্রণয়ন করেছেন এভাবে— প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত, লাঠি, শুভ্র ও আলোকজ্জ্বল হাত, দুর্ভিক্ষ ও অজন্মা। এছাড়া আরো নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিলো হজরত মুসার মাধ্যমে। যেমন এক কিবতী দম্পতি রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, সকালে হয়ে গিয়েছিলো পাথর। আর এক মহিলাও রুটি তৈরী করতে করতে পরিণত হয়েছিলো পাথরে। সম্ভবতঃ হজরত মুসার বদদোয়ার কারণেই এরকম ঘটেছিলো। তাই এই ঘটনা দু'টোসহ সমুদ্র-সলিল বিভক্ত হওয়া ও তুর পাহাড় বনী ইসরাইলদের মাথার উপরে তুলে ধরাকেও মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী নয়টি নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হজরত সাফওয়ান ইবনে আস্‌সাল বর্ণনা করেছেন, একবার এক ইহুদী অন্য এক ইহুদীকে বললো, চলো, মক্কা থেকে সদ্য আগত ওই নবীর কাছে যাই। সঙ্গী ইহুদীটি বললো, নবী নবী বোলো না। এ কথা তার কানে গেলে তার চার জোড়া চোখ হয়ে যাবে। দু'জনে উপস্থিত হলো রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। জানতে চাইলো, মুসা নবীর নয়টি নিদর্শন সম্পর্কে। রসুল স. বললেন, তাঁর নয়টি নিদর্শন ছিলো এরকম— ১. আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরিক কোরো না ২. চুরি কোরো না ৩. কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা, বিদ্রোহ অথবা অন্য কোনো অপবাদ দিয়ে বিচারকের কাছে নিয়ে যেয়ো না ৪. ব্যভিচার কোরো না ৫. অবৈধভাবে রক্তপাত ঘটিয়ো না ৬. যাদু কোরো না ৭. সুদ খেয়ো না ৮. সাধ্বী রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ো না এবং ৯. জেহাদ থেকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন কোরো না। আরো শোনো, তোমাদের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ ছিলো শনিবারের সম্মান রক্ষা করা। একথা শুনেই ইহুদীদ্বয় রসুল স.এর হস্ত ও পবিত্র পদযুগল চুম্বন করলো। আবেগে আকুল হয়ে বলে উঠলো, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি— আপনি সত্যিকারের রসুল। তিনি স. বললেন, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করছো না কেনো? তারা বললো, হজরত দাউদ তাঁর প্রভুপ্রতিপালকের কাছে এই মর্মে দোয়া করেছিলেন, যেনো পরবর্তী সময়ের সকল নবী-রসুল তাঁর বংশ থেকেই আবির্ভূত হয়। তাই এই বিশ্বাসটি আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে যে, তাঁর বংশ ছাড়া অন্য কোনো বংশ থেকে কোনো নবী আবির্ভূত হবেন না। আমরা যদি আপনার অনুসরন করি তাহলে সম্প্রদায়ের লোকেরা বধ করবে আমাদেরকে। আবু দাউদ,

www.eelm.weebly.com

নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম। বর্ণনাটিকে উত্তমসূত্রবিশিষ্ট এবং বিশুদ্ধসূত্রবিশিষ্ট বলেছেন যথাক্রমে তিরমিজি ও হাকেম। হাকেম আরো মন্তব্য করেছেন, বর্ণনাটির সূত্র পরম্পরাকে ক্রটিযুক্ত বলার কোনো অবকাশ নেই। বাগবীর বর্ণনায় ঘটনাটি এসেছে এভাবে— একবার এক ইহুদী তার সঙ্গীকে বললো, চলো ওই নবীর কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করি। সঙ্গীটি বললো, খবরদার! তাকে নবী বোলো না। একথা শুনতে পেলেই সে হয়ে যাবে চার চক্ষুবিশিষ্ট। একথা বলেই তারা হাজির হলো রসুল স. এর দরবারে। বললো, নয়টি জ্বলন্ত নিদর্শন সম্পর্কে আপনি কী জানেন? এর পরের বিবরণ পূর্বের বর্ণনার অনুরূপ। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে যে নয়টি নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে, তা বর্ণিত বর্ণনা দু'টোতে উল্লেখিত নয়টি নিদর্শন নয়। বরং ইহুদীদেরকে সদুপদেশ প্রদান করার নিমিত্তেই রসুল স. তাদেরকে ওরকমভাবে জবাব দিয়েছিলেন। তাছাড়া শনিবারের মৎস্য শিকারের নিষেধাজ্ঞাও নয়টি নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখন সে তাদের নিকটে এসেছিলো; ফেরাউন তাকে বলেছিলো, হে মুসা! তুমি তো যাদুগ্রস্ত।' এখানে 'ফাস্আল' শব্দটির দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে হজরত মুসাকে। 'সুনান' গ্রন্থে সাঈদ ইবনে মানসুর এবং 'আজজুহুদ' গ্রন্থে ইমাম আহমদ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. 'ফাসআল' কথাটিকে অতীতকালবোধক শব্দরূপে পড়তেন 'ফাসাআলা'। অথবা এখানকার সম্বোধনটি করা হয়েছে রসুল স. এর প্রতি— এরকমও বলা যেতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনি বনী ইসরাইলদেরকে ওই ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করুন, যা সংঘটিত হয়েছিলো ফেরাউন ও নবী মুসার মধ্যে। আর ওই নয়টি নিদর্শন সম্পর্কেও তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। এতে করে মক্কার মুশরিকেরা আপনার নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারবে। এছাড়া আপনি নিজেও এভাবে সান্ত্বনা পেতে পারবেন যে, বনী ইসরাইলেরা আপনাকে সত্য নবী হিসেবে জেনেও কেবল বিদ্বেষবশতঃ আপনাকে অস্বীকার করে চলেছে। পূর্ববর্তী উম্মতেরাও তাদের আপনাপন নবীকে এভাবে সত্য জেনেও প্রত্যাখ্যান করেছিলো। এটাও হবে আপনার আর একটি সান্ত্বনা। কিংবা কথাটিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় যে— হে আমার রসুল! বনী ইসরাইলদের নিকটে জিজ্ঞেস করে ওই নয়টি নিদর্শন সম্পর্কে জেনে নিন, যাতে করে আপনি তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। এরকম ব্যাখ্যাকে মেনে নিলে বলতে হয়, এখানকার 'ইজ জ্বাআহুম' (যখন তাদের নিকট এলো) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে 'আয়াতিনা' (নিদর্শনসমূহ) কথাটির সঙ্গে। এভাবে এর পরের বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— ফেরাউনকে যখন হজরত মুসা সত্য ধর্মের প্রতি

www.eelm.weebly.com

আহ্বান জানালেন, তখন সে গর্বভরে বললো, হে মুসা! তুমি যে এক অসম্ভব দাবি করে বসলে। সুস্থ-মস্তিষ্কধারী কোনো ব্যক্তি কখনো এভাবে কথা বলতে পারে না। আমি তো দেখছি, তুমি মানসিক ভারসাম্যহীন, যাদুগ্রস্ত। কালাবী বলেছেন, 'মাসহুরা' অর্থ সত্যত্যাগী হওয়া। ফার্‌রা এবং আবু উবায়দা বলেছেন, শব্দটির অর্থ— যাদুকর। মোহাম্মদ বিন জারীর বলেছেন, যাদুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। যদি তাই হয়, তবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে মুসা তোমাকে যাদু শিখিয়ে দেয়া হয়েছে, তাই তুমি এরকম উদ্ভট কথা বলে বেড়াচ্ছো। এসব যাদুর প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়।

পরের আয়াতে (১০২) বলা হয়েছে— 'মুসা বলেছিলো, তুমি অবশ্যই অবগত আছো যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। হে ফেরাউন! আমি তো দেখছি তুমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছো।'

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফেরাউন ভালোভাবেই জানতো যে হজরত মুসা যা বলেন, তা ঠিকই বলেন। কিন্তু দম্ভ ও বিদ্বেষবশতঃ সে তাঁকে অস্বীকার করতো। কোরআন মজীদেও একথার প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করেন— 'তারা নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা বিশ্বাস করে।'

এখানকার 'বাসাইর' শব্দটি 'বাসীরত' এর বহুবচন। এর অর্থ প্রত্যক্ষ বা দৃষ্টিগ্রাহ্য। শব্দটির মাধ্যমে এখানে স্পষ্ট নিদর্শন সমূহকে বলা হয়েছে— প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

'মাছবূরা' অর্থ অভিশপ্ত। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— ধ্বংসপ্রাপ্ত। কাতাদা বলেছেন— ধ্বংসকৃত। ফার্‌রা বলেছেন, আরববাসীরা বলে— 'মা ছাবরাকা আন হাজা' (কোন্ বিষয় তোমাকে এ কর্ম থেকে বিরত রেখেছে)। এমতাবস্থায় 'মাছবূরা' অর্থ হবে— জন্মগতভাবে খারাপ স্বভাববিশিষ্ট শক্তি। ফেরাউনের স্বভাব ছিলো এরকম। তাই সে হজরত মুসাকেও খারাপ ভেবেছিলো। যে নিজে মন্দ, সে অন্যকে ভালো ভাবতে পারে না। পক্ষান্তরে হজরত মুসা জন্মগতভাবে ছিলেন পুণ্যবান। তাই তাঁর বক্তব্য ছিলো সুসঙ্গত, সুন্দর ও কল্যাণকর।

এর পরের আয়াতে (১০৩) বলা হয়েছে— 'অতঃপর ফেরাউন তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবার সংকল্প করলো, তখন আমি ফেরাউন ও তার সঙ্গীগণ সকলকে নিমজ্জিত করলাম।'

www.eelm.weebly.com

'আই ইয়াস্তাফিয্যাহুম' অর্থ উচ্ছেদ করবার সংকল্প করলো। অর্থাৎ ফেরাউন হুকুম দিলো— মুসা ও তাঁর সম্প্রদায়কে উৎখাত করো। 'আলআরদ্ব' কথাটির অর্থ এখানে মিসর রাজ্য। সমগ্র মিসর থেকেই বনী ইসরাইলদের হত্যা অথবা বহিষ্কারের মাধ্যমে সমূলে উৎপাটিত করবার সংকল্প করেছিলো ফেরাউন। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তার ওই ঘৃণ্য অভিলাষ পূরণ করার সুযোগ দেননি। তাকে এবং তার সকল অনুসারীকে দান করেছিলেন সলিল-সমাধি। তাই শেষে বলা হয়েছে— আমি ফেরাউন ও তার সকল অনুসারীকে নিমজ্জিত করলাম। করলাম সমূলে উৎপাটিত।

শেষোক্ত আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে— 'এরপর আমি বনী ইসরাইলকে বললাম, তোমরা এই দেশে বসবাস করো এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্রিত করে উপস্থিত করবো।' একথার অর্থ— এরপর আমি বনী ইসরাইলদেরকে ওই দেশেই প্রতিষ্ঠিত করলাম, যেখান থেকে ফেরাউন তাদেরকে উৎখাত করতে চেয়েছিলো এবং আমার প্রিয় নবী মুসার মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দিলাম, তোমরা এই দেশেই বসবাস করো। আর মহাপ্রলয়ের পর মহাবিচারের দিবসে হাশর প্রান্তরে আমি তোমাদেরকে ও তোমাদের শত্রুদেরকে হিসাব গ্রহণের জন্য অবশ্যই একত্র করবো।

এখানে'আলআখিরাতি' অর্থ দ্বিতীয়বার বা কিয়ামতের পর।

'লাফীফা' অর্থ একত্রিত করে, সম্মিলিতভাবে। উল্লেখ্য যে, মহাবিচারের দিবসে পাপী-পুণ্যবান সকল মানুষকে এক স্থানে সমবেত করা হবে। তারপর বিচারের মাধ্যমে চিরদিনের জন্য পৃথক করে ফেলা হবে পুণ্যবান ও পাপীদেরকে। কালাবী বলেছেন, এখানে কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি অর্থ হজরত ঈসার আসমান থেকে অবতরণ। যদি তাই হয়, তবে 'জি'নাবিকুম লাফীফা' কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— এদিক ওদিক চতুর্দিক থেকে তখন বিভিন্ন সম্প্রদায় আগমন করবে।

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ
نَذِيْرًا ۘ وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ
تَنْزِيْلًا ۝ قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْلَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ
مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۙ وَّيَقُوْلُوْنَ

www.eelm.weebly.com

سُبۡحٰنَ رَبِّنَآ اِنۡ كَانَ وَعۡدُ رَبِّنَا لَمَفۡعُوۡلًا ۝ وَيَخِرُّوۡنَ لِلۡاَذۡقَانِ يَبۡكُوۡنَ وَيَزِيۡدُهُمۡ خُشُوۡعًا ۝ (السجدة . ১০৫-১০৯)

☐ আমি সত্য-সহই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং উহা সত্যসহই অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি।

☐ আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি খণ্ড খণ্ডভাবে যাহাতে তুমি উহা মানুষের নিকট পাঠ করিতে পার ক্রমে ক্রমে; এবং আমি উহা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করিয়াছি।

☐ বল, 'তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর, যাহাদিগকে ইহার পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগের নিকট যখন ইহা পাঠ করা হয় তখনই তাহারা সিজদায় লুটাইয়া পড়ে

☐ ও বলে; আমাদিগের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদিগের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হইয়াই থাকে।

☐ এবং তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে এবং ইহা উহাদিগের বিনয় বৃদ্ধি করে।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আমি আপনার উপরে কোরআন অবতীর্ণ করেছি সত্য সহকারে এবং অবশ্যই সত্য পদ্ধতিতে। আর আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি কেবল জান্নাতের ও আমার সন্তুষ্টির শুভ সংবাদদাতা এবং জাহান্নাম ও আমার অসন্তুষ্টির ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে। মনে রাখবেন, কাউকে জোর করে হেদায়েত করা আপনার কাজ নয়।

এখানে 'হাক্ব' (সত্য) শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে দু'বার। প্রথমটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে প্রজ্ঞা, উপযোগিতা ও প্রয়োজনের কথা। আর দ্বিতীয়টির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে কোরআনের অভ্যন্তরীণ ও চিরন্তন মহাসত্যের কথা। কোনো কোনো তাফসীরকার আবার 'সত্য' কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি সর্বোচ্চ সতর্কতা সহকারে, অসংখ্য ফেরেশতাদের অতন্দ্র প্রহরার মাধ্যমে, যাতে করে শয়তানের কুমন্ত্রণার দূরবর্তী কোনো প্রভাবও না থাকে।

পরের আয়াতে (১০৬) বলা হয়েছে— 'আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি খণ্ডখণ্ড ভাবে যাতে তুমি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পারো ক্রমে ক্রমে এবং আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি

www.eelm.weebly.com

আপনার প্রতি একযোগে কোরআন অবতীর্ণ করিনি, অবতীর্ণ করেছি বিরতি সহকারে কিছু কিছু করে, বিশ বছর ধরে। এরকম করার কারণ এই যে, এতে আপনি ধীরে ধীরে মানুষের কাছে এর খণ্ড খণ্ড পাঠ বোধগম্য করে তুলতে পারেন। আর কোরআন স্মৃতিবদ্ধ করার কাজও এতে করে সহজ হয়। উল্লেখ্য যে, হেরা গিরিগহ্বরে রসুল স. এর নিকটে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয় সুরা আলাকের পাঁচটি আয়াত। অতঃপর তিন বছর ওহী বন্ধ থাকে। এই তিন বছর বাদ দিলে রসুল স. এর মহাতিরোধান পর্যন্ত ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়সীমা বিশ বছরই হয়।

এখানে 'ফারাক্বনাহূ' অর্থ অল্প অল্প করে, খণ্ড খণ্ড ভাবে বিরতি সহকারে। হাসান বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ— সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণ করে। 'মুকছিন' অর্থ ক্রমে ক্রমে, অবকাশ সহকারে।

এর পরের আয়াতে (১০৭) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা কোরআনে বিশ্বাস করো অথবা বিশ্বাস না করো, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এই কোরআন পাঠ করা হয়, তখনই তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জনতাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিন যে, তোমাদের বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাসের কারণে কোরআনের কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। কোরআন তো স্বয়ংসম্পূর্ণ মুখাপেক্ষিতারহিত আল্লাহ্‌র কালাম। আনুরূপ্যবিহীন এই বাণীর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করলে লাভবান হবে তোমরাই। বিশ্বাস না করলে তোমরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। এতে করে কোরআনের কোনো কিছু যাবে আসবে না। তোমরা কোরআনকে প্রত্যাখ্যান করলেও নিশ্চিতরূপে জেনে রেখো যে, অনেক মানুষ কোরআনের উপরে ইমান আনবে। তারাই প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী। তারা আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করলে ভক্তিভরে সেজদাবনত হয়।

এখানে 'যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে পূর্ববর্তী জামানার আহলে কিতাবের সত্যাশ্রয়ী আলেমগণকে। তাঁরা আল্লাহ্‌র কালামের মর্যাদা সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। তাই তাঁরা পেয়েছিলেন সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণায়ক জ্ঞান। শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কেও তারা পূর্ববর্তী কিতাবের মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের জ্ঞানীগণ রসুল স. এর নবুয়তের সংবাদ জানার সঙ্গে সঙ্গে ইমান এনেছিলেন। ওই সকল সত্যান্বেষী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, হজরত জায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল, হজরত সালমান ফারসী, হজরত আবু জর গিফারী প্রমুখ।

এ রকমও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাসানো হয়নি। বরং এখানে রসুল স.কে এইমর্মে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে— হে আমার প্রিয় রসুল! ওই সকল মূর্খদের ব্যাপারে

www.eelm.weebly.com

আপনি চিন্তান্বিত হবেন না। কেনো হবেন? তারা তো চিরভ্রষ্ট। আরো দেখুন, তারা ইমান আনেনি সত্য। কিন্তু যারা জ্ঞানী তারাতো ইমান এনেছে। সুতরাং আপনি চিরভ্রষ্টদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করবেন না।

'তাদের নিকট যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখনই তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে' কথাটির অর্থ— কোরআনে বিঘোষিত আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে এবং কোরআনের মতো মহাকল্যাণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তারা ভূলুণ্ঠিত হয়ে জানায় সেজদা। হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন।

এর পরের আয়াতে (১০৮) বলা হয়েছে— 'এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই থাকে।' একথার অর্থ— এবং ওই সকল সেজদাকারী একথাও বলে যে, হে আমাদের প্রভুপালক! প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা থেকে তুমি পবিত্র, মহান । পূর্ববর্তী নবী রসুলগণের মাধ্যমে তুমি শেষ রসুল প্রেরণ ও কোরআন অবতরণের শুভ সংবাদ দিয়েছিলে। তোমার সেই পবিত্র প্রতিশ্রুতি আজ পূর্ণ হলো।

শেষোক্ত আয়াতে (১০৯) বলা হয়েছে— 'এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।' উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী আয়াতের (১০৭) মতো এই আয়াতেও ব্যবহৃত হয়েছে 'ইয়াখিররূনা' কথাটি। দু'টো শব্দের অর্থই— সেজদায় লুটিয়ে পড়া। কিন্তু সেজদায় লুটিয়ে পড়ার কারণ এখানে ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমোক্ত সেজদা ছিলো কৃতজ্ঞতাপ্রকাশক। আর দ্বিতীয় সেজদা হচ্ছে কোরআন পাঠের প্রতিক্রিয়াপ্রকাশক। অর্থাৎ কোরআনের বাণী শ্রবণের ফলে পাঠক ও শ্রোতার অন্তরে প্রবলতর হয় বিশ্বাস, জ্ঞান ও বিনয়।

নির্দেশনাঃ এই আয়াত যাঁরা আরবীতে পাঠ করেছেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সেজদা করে নিবেন।

মাসআলাঃ কোরআনের বাণী শ্রবণের সময় ক্রন্দন করা মোস্তাহাব। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র ভয়ে যে কাঁদে, সে কখনো দোজখে প্রবেশ করবে না, দুগ্ধ স্তনে প্রবেশ করলেও (স্তন থেকে বের হয়ে আসা দুধের যেমন স্তনে পুনঃ প্রবেশ অসম্ভব, আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারীরও তেমনি দোজখে প্রবেশ অসম্ভব) এবং আল্লাহ্র পথে যে ধূলি ধূসরিত হয়েছে, জাহান্নামের ধোঁয়া তার নাকে প্রবেশ করবে না (আল্লাহ্র রাস্তার ধূলা যার শরীরে লেগেছে, তার নাসিকারন্ধ্রে কখনো প্রবেশ করবে না জাহান্নামের ধুম্র)। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বাগবী ও হাকেম। হাকেম বলেছেন হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। বায়হাকী কর্তৃকও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনাটি এরকম— আল্লাহ্ দুই শ্রেণীর চোখের জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিয়েছেন— ১. ওই

www.eelm.weebly.com

চোখ যা আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদন করে ২. ওই নয়ন, যা রাতভর জাগ্রত থেকে হেফাজত করে ইসলাম ও মুসলমানকে। হজরত হাকিম বিন হিশাম বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে একথা বলতে শুনেছি যে, তিন ধরনের চোখের জন্য দোজখাগ্নি নিষিদ্ধ— ১. ওই অক্ষিযুগল, যা আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদনার্ত হয় ২. ওই অক্ষিযুগল, যা জাগ্রত থাকে আল্লাহ্‌র পথে ৩. ওই যুগল নয়ন, যা বিরত থাকে আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত দৃশ্যসমূহ দর্শন থেকে।

হজরত আবু রায়হানা থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই চোখের প্রতি আগুন হারাম, যে চোখ আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করে, ওই চোখের প্রতিও, যে চোখ জাগে আল্লাহ্‌র রাস্তায় এবং ওই চোখের প্রতিও, যে চোখ আল্লাহ্ কর্তৃক হারাম ঘোষিত বস্তু দর্শন থেকে থাকে বিরত। এই হাদিসটি তিবরানী লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর আল কবির গ্রন্থে এবং মন্তব্য করেছেন, বর্ণনাটি যথাসূত্রসম্ভূত।

হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে বিশ্বাসীর নয়ন থেকে আল্লাহ্‌র ভয়ে অশ্রুনির্গত হয় এবং সে অশ্রুর পরিমাণ যদি মক্ষিকার মস্তকের মতো যৎকিঞ্চিতও হয়, তবুও তার জন্য আল্লাহ্ হারাম করে দিয়েছেন দোজখের অগ্নিকে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজা, ইবনে মারদুবিয়া প্রমুখ উল্লেখ করেছেন, রসুল স. একদিন নামাজ সমাপনের পর দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! হে রহমান! অংশীবাদীরা একথা শুনতে পেয়ে বললো, দেখো, দেখো। মোহাম্মদ আমাদেরকে একাধিক উপাস্যের উপাসনা নিষেধ করে। এখন আবার সে-ই দুই উপাস্যকে ডাকছে। একবার বলছে আল্লাহ্, আরেক বার বলছে রহমান। তাদের এমতো অপবচনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ১১০, ১১১

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۭ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۝

❒ বল, "তোমরা 'আল্লাহ্' নামে আহ্বান কর বা 'রহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর তাঁহার সকল নামই তো সুন্দর। সালাতে স্বর উচ্চ করিও না এবং অতিশয় ক্ষীণও করিও না, এই দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।"

www.eelm.weebly.com

❑ বল, 'প্রশংসা আল্লাহেরই যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার সার্বভৌমিকত্বে কোন অংশী নাই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না যে কারণে তাঁহার অভিভাবকের প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা আল্লাহ্ নামে আহ্বান করো বা রহমান নামে আহ্বান করো, তাঁর সকল নামই সুন্দর।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি সকলকে একথা জানিয়ে দিন যে, আল্লাহ্তায়ালার অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। 'রহমান' নামটিও ওই সুন্দর নামসমূহের একটি । সুতরাং 'রহমান' নামে তাকে সম্বোধন করাতে দোষের কিছু নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, মক্কাবাসের সময় রসুল স. একদিন নামাজ পাঠের সময় সেজদাবনত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! হে রহমান! আবু জেহেল একথা শুনে বললো, দেখো, মোহাম্মদ একাধিক মাবুদকে ডাকতে নিষেধ করে। অথচ সে নিজেই দুই মাবুদের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। তার একথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। এখানে পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্তায়ালার জাত বা সত্তা একক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু তাঁর আরো অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। ওই সুন্দর নামসমূহের যে কোনো একটি অথবা একাধিক নাম ধরে তাঁকে ডাকা যেতে পারে। এতে আপত্তির কিছুই নেই।

এখানে 'আও' (অথবা) শব্দটির মাধ্যমে এইমর্মে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্কে আল্লাহ্ অথবা রহমান কিংবা তাঁর অন্য যে কোনো এক বা একাধিক নাম ধরে আহ্বান করার অনুমতি রয়েছে। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, ইহুদীরা একবার রসুল স.কে 'রহমান' উচ্চারণ করতে শুনে বলেছিলো, তওরাত শরীফের বহু স্থানে তো এই নামের উল্লেখ রয়েছে। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। এমতাবস্থায় আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্র সকল নামই অত্যুত্তম। এ সকল নামের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর সিফাতে জালাল ও সিফাতে জামালের। একথাও প্রকাশ পায় যে, তিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি ও ক্ষয়-ক্ষতি থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র ও চির অমুখাপেক্ষী। স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্র সুন্দর নামাবলী বা আসমাউল হুসনা সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছি সুরা আ'রাফের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সালাতে স্বর উচ্চ কোরো না এবং অতিশয় ক্ষীণও কোরো না, এই দু'য়ের মধ্যপথ অবলম্বন করো।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! নামাজে আপনি যখন কোরআন পাঠ করেন, তখন এতো উচ্চস্বরে পড়বেন না, যাতে দূরবর্তী মুশরিকেরা শুনতে পায়, আবার এতো নিম্নস্বরে পড়বেন না যাতে আপনার অনুগামী নামাজীরা শুনতে না পায়। আপনি বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পথকে গ্রহণ করুন। পরিহার করুন বাহুল্য ও ন্যূনতাকে।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'আস্‌সালাত' বলে বুঝানো হয়েছে রাতের নামাজসমূহকে। অর্থাৎ মাগরিব, ইশা, ও তাহাজ্জুদকে। কেননা দিনের নামাজে— জোহর ও আসরে সর্বসম্মতিক্রমে কোরআন পাঠ করতে হয় ন্যূনতম আওয়াজে। উম্মতের সকল প্রখ্যাত আলেমও এই নিয়ম অনুসরণ করে এসেছেন। আলোচ্য বাক্যের অর্থ এরকমও হতে পারে যে— হে আমার রসুল! আপনি দিনের নামাজে এবং অংশীবাদীরা শুনতে পায় এমন স্থানে কেরাত পাঠ করুন ন্যূনতম শব্দে এবং রাতের নামাজে কেরাত পাঠ করুন সশব্দে।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে বোখারীর পদ্ধতিতে আবু বশীরের মধ্যস্থতায় বাগবী উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. যখন মক্কায় ছিলেন, তখন নামাজ পড়তেন উচ্চস্বরে। মুশরিকেরা তা শুনতো এবং কোরআন অবতীর্ণকারী এবং যার উপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে উভয়ের প্রতি গালি বর্ষণ করতো। তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন— 'এবং নামাজে স্বর উচ্চ কোরো না এবং অতিশয় ক্ষীণও কোরো না, এই দুই এর মধ্যবর্তী করো।' এর অর্থ— হে আমার রসুল ! আপনি এতো উচ্চকণ্ঠে নামাজ পাঠ করবেন না, যাতে মুশরিকেরা শুনে গালমন্দ করার সুযোগ পায়, আবার, এমন নিম্নকণ্ঠও হবেন না যাতে আপনার সাথীরাও শুনতে না পায়। আপনি বরং মধ্যম কণ্ঠে কোরআন পাঠ করুন যাতে মুশরিকেরা না শোনে এবং আপনার সাথীরা শোনে। বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'সালাত' বা নামাজ কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে দোয়া বা প্রার্থনাকে। জননী আয়েশা, ইব্রাহিম নাখয়ী, মুজাহিদ ও মাকহুল এই অভিমতের প্রবক্তা। বোখারী লিখেছেন, জননী আয়েশা আলোচ্য আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে দোয়া সম্পর্কে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীরও এরকম লিখেছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত বর্ণনাই অধিকতর দৃঢ়সূত্রসম্বলিত। ইমাম নববীও এমতের সমর্থক। শায়েখ ইবনে হাজার আবার উভয় বর্ণনার সামঞ্জস্য সাধনার্থে লিখেছেন, সম্ভবতঃ নামাজের অভ্যন্তরে পঠিত দোয়া সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন, রসুল স. কাবা প্রাঙ্গণে নামাজ পাঠকালে উচ্চকণ্ঠে দোয়া করতেন। তখন অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। আমি বলি, সামঞ্জস্য সাধনের এমতো প্রচেষ্টা আমার মনঃপুত নয়। কারণ নামাজের অভ্যন্তরে পাঠযোগ্য দোয়াগুলো, যেমন— দোয়া মাছুরা ইত্যাদি ফরজ, নফল সকল নামাজেই পাঠ করতে হয় ন্যূনতম কণ্ঠে। কেবল দোয়া কুনুত সম্পর্কে উচ্চস্বরে ও নিম্নস্বরে পড়ার ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। তাছাড়া দোয়া সম্পর্কে এক আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে— 'তোমরা তোমাদের প্রভুপালককে ডাকো বিনীতভাবে, নিম্নস্বরে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না।' এতে করে প্রমাণিত হয় যে, নামাজের ভিতরের ও বাইরের

www.eelm.weebly.com

সকল দোয়া পাঠ করতে হবে নিম্নকণ্ঠে। অতএব এক্ষেত্রে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা না করাই উত্তম। সামঞ্জস্যের বিষয়টিকে যদি একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয় তবে বলা যেতে পারে যে, জননী আয়েশা ও হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় উল্লেখিত দোয়ার অর্থ সুরা ফাতিহা। কারণ সুরা ফাতিহার শেষাংশ (ইহ্‌দিনাস সিরাত্বল মুসতাক্বীম থেকে শেষ পর্যন্ত) তো দোয়াই।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে আরো দু'টো বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু বর্ণনা দু'টো বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত বর্ণনার পরিপন্থী। (যেমন— ১. ইবনে জারীর ও হাকেম লিখেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, 'আল্লাহুম্মার হামনী' (হে আল্লাহ্! আমার প্রতি রহম করো) —এই দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে— 'সালাতে স্বর উচ্চ কোরো না এবং অতিশয় উচ্চ কোরো না।' ২. বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ বলেছেন, বনী তামীম গোত্রের এক লোক রসুল স. এর সালামের জবাবে অত্যন্ত উচ্চস্বরে বলতো, হে আল্লাহ্ আমাদেরকে সম্পদ ও সন্তানদান করো। তার ওই কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতাংশটি। — এই বর্ণনা দু'টো গ্রহণীয় নয়।

তিরমিজির মাধ্যমে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন রিবাহ্ আনসারী বলেছেন, রসুল স. একবার আবু বকরকে বললেন, আমি সেদিন দেখলাম, তুমি নিঃশব্দে কোরআন পাঠ করছো। আবু বকর বললেন, আমি যাকে শোনাতে চাই তিনি তো নিম্নস্বরের পাঠও শোনেন। রসুল স. বললেন, আওয়াজ আর একটু উচ্চ কোরো। এরপর তিনি স. ওমরকে বললেন, আর তুমি তো কোরআন পাঠের ব্যাপারে উচ্চকণ্ঠ। ওমর বললেন, ঘুমন্ত মানুষকে জাগ্রত করা এবং শয়তান বিতাড়নই আমার উদ্দেশ্য। রসুল স. বললেন, আর একটু নিম্নকণ্ঠ হয়ো। হজরত আবু কাতাদা থেকে আবু দাউদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। আমি সুরা আ'রাফের যথাস্থানে উচ্চস্বর ও নিম্নস্বরে কোরআন পাঠ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি।

রসুল স. এর ক্বেরাতের স্বরূপঃ হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. কোরআন পাঠ করতেন কখনো উচ্চস্বরে, আবার কখনো নিম্নস্বরে। আবু দাউদ।

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তাঁর প্রকোষ্ঠে কোরআন পাঠ করলে গৃহবাসীরা সে পাঠ শুনতে পেতেন। আবু দাউদ।

জননী উম্মে সালমা রসুল স. এর মতো করে কোরআন পাঠ করে শুনিয়েছেন। তাঁর পাঠ শুনে বোঝা যেতো, রসুল স. পাঠ করতেন থেমে থেমে, প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ।

হজরত উম্মে হানী বর্ণনা করেছেন, আমি নিজ গৃহ থেকে শুনতে পেতাম রসুল স. এর কোরআন পাঠের আওয়াজ। তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস বলেছেন, আমি জননী আয়েশাকে একবার রসুল স. এর ক্বেরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বললাম, হে উম্মত জননী! রসুল স. কীভাবে কোরআন পাঠ করতেন? উচ্চ আওয়াজে, না নিম্নকণ্ঠে? জননী বললেন, দু'ভাবেই। কখনো উচ্চ কণ্ঠে, আবার কখনো অনুচ্চ আওয়াজে। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ, উত্তম ও দুর্লভ।

শেষ আয়াতে (১১১) বলা হয়েছে— 'বলো, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো অংশী নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করো।' এখানে 'আলমুল্‌ক' অর্থ সার্বভৌমত্ব, নিরঙ্কুশ প্রভুপালকত্ব। 'মুজিল্‌লাতুন' অর্থ দুর্দশাগ্রস্ত। আর 'ওয়ালী' অর্থ অভিভাবক বা সাহায্যকারী। এভাবে আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টরূপে আল্লাহ্‌র সন্তান গ্রহণ, অন্য কারো সাহায্য গ্রহণ ও প্রভুপালকত্বের ব্যাপারে অন্য কারো অংশীদারিত্বকে নাকচ করে দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় একথাটি সুপ্রমাণিত হয়েছে যে, যেহেতু তিনি অসহায়ত্ব, দুর্দশা ও সন্তান কিংবা অভিভাবকত্ব গ্রহণ থেকে চিরপবিত্র ও চিরঅমুখাপেক্ষী, তাই তিনিই একমাত্র প্রশংসার পাত্র, অন্য কেউ নয়।

ইমাম আহমদ তাঁর মসনদে তিবরানীর উত্তম সূত্র পরম্পরায় হজরত মুয়াজ জুহ্‌নী থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের নাম 'আয়াতে ইজ্জত' (মহাসম্মানিত আয়াত)। এই আয়াতের মাধ্যমে সকলকে এই মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, বান্দা যতো বেশী আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করুক এবং ইবাদত করুক না কেনো, তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সে আল্লাহ্‌র যথার্থ ও উপযুক্ত প্রশংসা ও ইবাদত করতে অক্ষম।

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে ওই সকল লোককে সর্বপ্রথম জান্নাতের দিকে আহ্বান করা হবে, যারা সুখ দুঃখ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র অত্যধিক প্রশংসা বর্ণনা করে। তিবরানী, বায়হাকী, হাকেম।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হামদ ও শোকর (প্রশংসা বর্ণনা ও কৃতজ্ঞতা) হচ্ছে ইবাদতের সর্বোচ্চ শিখর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশস্তি বর্ণনা করে না, সে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে না। বায়হাকী ও আবদুর রাজ্জাক কর্তৃকও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সর্বোৎকৃষ্ট দোয়া হচ্ছে, আলহামদু লিল্লাহ্ আর সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির হচ্ছে— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

www.eelm.weebly.com

হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র কাছে চারটি বাক্য সব চেয়ে বেশী প্রিয়— ১. লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ২. সুবহানাল্লহ্ ৩. আলহামদুলিল্লাহ্ এবং ৪. আল্লাহু আকবর। এইবাক্য চতুষ্টয় যে কোনো খান থেকে শুরু করা যায় (ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অত্যাবশ্যক নয়)। বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম ও আহমদ। বাগবী এই প্রসঙ্গে উপরে বর্ণিত চারটি হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে। তাঁর নিকট থেকে আবার তিবরানী উল্লেখ করেছেন, মহাবিচারের দিবসে ওই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান হবে, যে অত্যধিক পরিমাণে বর্ণনা করে আল্লাহ্‌র স্তব-স্তুতি।

হজরত আবু জর গিফারী বলেছেন, বান্দার 'সুবহানাল্লাহ্' ও 'আলহামদুলিল্লাহ্' পাঠ আল্লাহ্‌র নিকটে খুবই প্রিয়। আহমদ, মুসলিম।

হজরত আনাস বলেছেন, আবদুল মুত্তালিবের পৌত্রের মুখে সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়— আলহামদুলিল্লাহিল্ লাজী লাম ইয়াত্তাখিজু ওয়ালাদা (প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি)। এই হাদিসটি ইবনে সুন্নী বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি' নামক গ্রন্থে। আর আমর বিন শোয়াইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আবার আমর বিন শোয়াইবের পিতামহ থেকে আপন আপন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন আবুদর রাজ্জাক ও ইবনে আবী শায়বাও।

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন ওয়াসল্লাল্লাহু আ'লা খইরি খলকিহী মোহাম্মদিউঁ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন। আমিন। সূরা বানী ইসরাইলের তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ ৩রা রমজান, ১২০৩ হিজরী সনে।

সূরা কাহ্‌ফ

সুরা কাহ্‌ফ অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কিন্তু ১১০ আয়াত ও ১২ রুকু সম্বলিত এই সুরার ২৮ সংখ্যক এবং ৮৩ থেকে ১০১ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। আর সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে সুরা গাশিয়া'র পরে।

জনৈক মিসরী শায়েখের বরাত দিয়ে ইকরামা সূত্রে ইসহাকের মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কুরায়েশ গোত্রাধিনায়কেরা একবার নজর বিন হারেছ এবং উকবা বিন আবী মুয়ীতকে মদীনার ইহুদী আলেমদের কাছে পাঠালো। তাদেরকে বলে দিলো, তোমরা ইহুদী পণ্ডিতদেরকে মোহাম্মদ ও তার কথাবার্তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে দেখো। তারা গ্রন্থধারী। তাই তারা মোহাম্মদ সম্পর্কে সঠিক তথ্য বলতে পারবে। তারা যা বলে তা শুনে এসে তোমরা আমাদেরকে জানিয়ো। নজর ও উকবা পৌঁছে গেলো

www.eelm.weebly.com

মদীনায়। রসুল স. সম্পর্কে সব কথা তারা খুলে বললো ইহুদী পণ্ডিতদের নিকট। পণ্ডিতেরা বললো, তোমরা তাকে এই তিনটি প্রশ্ন কোরো। প্রশ্ন তিনটির জবাব দিতে পারলে, মনে করবে তিনি সত্য নবী। আর জবাব দিতে না পারলে মনে করবে, সে ভণ্ড। প্রশ্ন তিনটি এই— ১. অতীত যুগের ওই সকল যুবক কারা, যারা পৃথিবীতে ঘটিয়েছিলো একটি অসাধারণ ঘটনা। ২. ওই ব্যক্তির পরিচয় কী, যে পরিভ্রমণ করেছিলো পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত। ৩. রূহ কী ?

নজর ও উকবা ফিরে এলো মক্কায়। গোত্রাধিনায়কদের বললো, এবার তবে মোহাম্মদের সঙ্গে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হয়েই যাক। তোমরা তাঁকে এই তিনটি প্রশ্ন করে দেখো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হলেন রসুল স. স্বয়ং। তারা তখন একে একে রসুল স.কে বর্ণিত প্রশ্ন তিনটি করলো। রসুল স. বললেন, তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিবো আমি আগামীকাল। কিন্তু একথার সঙ্গে তিনি স. ইনশা আল্লাহ্ (আল্লাহ্ যদি চান) কথাটি উচ্চারণ করলেন না। পরিণতি হলো এই যে, একাধারে পনেরো দিন পর্যন্ত হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হলেন না। অবতীর্ণ হলো না কোনো প্রত্যাদেশও। রসুল স. বড়ই পেরেশান হয়ে পড়লেন। অংশীবাদিরা করতে লাগলো নানা রকম অপমন্তব্য। এমতাবস্থায় সুরা কাহ্ফ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন হজরত জিবরাইল। এতে সন্নিবেশিত করা হলো অংশীবাদিদের প্রশ্নত্রয়ের উত্তর। সেই সঙ্গে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা হলো অংশীবাদিদেরকে।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ
عِوَجًا ۞ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ
الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا
مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۙ وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۞
مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ
اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى
اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۞

www.eelm.weebly.com

❐ প্রশংসা আল্লাহেরই যিনি তাঁহার দাসের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং ইহাতে তিনি অসংগতি রাখেন নাই;

❐ ইহাকে করিয়াছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁহার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিবার জন্য এবং বিশ্বাসিগণ, যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদিগকে এই সুসংবাদ দিবার জন্য যে তাহাদিগের জন্য আছে উত্তম পুরস্কার,

❐ যাহাতে তাহারা হইবে চিরস্থায়ী,

❐ এবং সতর্ক করিবার জন্য উহাদিগকে যাহারা বলে যে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন,

❐ এই বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই এবং উহাদিগের পিতৃপুরুষদিগেরও ছিল না। উহাদিগের মুখ-নিঃসৃত বাক্য কী উদ্ভট! উহারা তো কেবল মিথ্যাই বলে।

❐ উহারা এই বাণী বিশ্বাস না করিলে উহাদিগের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্ম-বিনাশী হইয়া পড়িবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি তাঁর দাসের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।' একথার অর্থ— সেই আল্লাহ্‌র জন্য সকল প্রশংসা, যিনি তাঁর প্রিয়তম বান্দা ও রসুলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন কোরআন মজীদ। বলাবাহুল্য যে, বিশ্বমানবতার পথ প্রদর্শনার্থে রসুল স. এর প্রতি অবতীর্ণ এই আল কোরআন হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুদান। এতে রয়েছে কল্যাণ। কেবলই কল্যাণ। পৃথিবীর এবং পরবর্তী পৃথিবীর। তাই এই মহাকল্যাণের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্তায়ালা এখানে নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন। এভাবে তাঁর বান্দাদেরকেও তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করতে উৎসাহিত করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং এতে তিনি অসঙ্গতি রাখেননি।' এখানে 'ইওয়াজা' অর্থ অসঙ্গতি বা বক্রতা। অর্থগত অসঙ্গতির জন্য শব্দটির 'আইন' অক্ষরটি হয় যেরযুক্ত। আর বাহ্যিক অসঙ্গতির জন্য 'আইন' অক্ষরটি হয় যবরযুক্ত। যেমন বলা হয়— ফী রাইহী ইওয়াজ (তার মতামতই অসঙ্গতিপূর্ণ)। ফী আসহু আ'ওয়াজ (তার লাঠিটি অসঙ্গতিপূর্ণ বা বক্র)। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায় এরকম— কোরআন মজীদের বিবরণ প্রবাহের মধ্যে অনিষ্টকর কিছু নেই। অসম্পূর্ণতা, বিপত্তি অথবা মতভেদজনিত কোনো কিছুও এর মধ্যে নেই। এর বক্তব্য বিষয় চিরন্তন, প্রজ্ঞাময় ও যুক্তিসিদ্ধ। হজরত ইবনে আব্বাস বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্‌র বাণী বা কোরআন অবিনাশী, কারণ তা সৃষ্ট নয়।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত।' হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ এই কোরআনকে করেছেন সংযত, সংহত ও নমনীয়। এর বিধান সমূহকে করেছেন সহজ— কাঠিন্য ও তারল্য বিবর্জিত। ফার্রা বাক্যটির মর্মার্থ করেছেন এভাবে— এই কোরআন সকল আসমানী কিতাবের বিশুদ্ধতার সাক্ষী এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের কোনো কোনো বিধানকে রহিতকারী। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা অর্থ করেছেন এরকম— এই কোরআন মানুষের বিভ্রমসমূহের সংশোধক।

উল্লেখ্য যে, সুসংগত হওয়া ও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয় দু'টোকে পূর্ববর্তী আয়াতে এবং আলোচ্য বাক্যে দু'টি পৃথক শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এভাবে নস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে কোরআনের সঙ্গতিহীনতা ও অচিরন্তনতার সকল সম্ভাবনাকে। একই সঙ্গে এখানকার বক্তব্য বিষয়টিকে করে তোলা হয়েছে চরম গুরুত্ববহ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করবার জন্য এবং বিশ্বাসীগণও যারা সৎকর্ম করে, তাদেরকে এই সুসংবাদ দিবার জন্য যে, তাদের জন্য আছে উত্তম পুরস্কার।'

এর পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'যাতে তারা হবে চিরস্থায়ী।' একথার অর্থ— এই কোরআনের মাধ্যমে দোজখের স্থায়ী শাস্তি সম্পর্কে অবিশ্বাসীদেরকে করা হয়েছে সতর্ক এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীগণকে দেয়া হয়েছে উত্তম পুরস্কাররূপী চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ।

এর পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এবং সতর্ক করবার জন্য তাদেরকে, যারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' উল্লেখ্য যে, 'আল্লাহ্র সন্তান রয়েছে' এরকম উক্তি একটি জঘন্যতম সত্যপ্রত্যাখ্যানজনিত উক্তি। তাই এখানে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এরকম অপবিত্র উক্তি উচ্চারণকারীদের সম্পর্কে। বলা হয়েছে, তাদেরকে সতর্ক করাও কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার আর একটি উদ্দেশ্য।

এর পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'এই বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিলো না। তাদের মুখনিঃসৃত বাক্য কী উদ্ভট! তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে।' একথার অর্থ— আল্লাহ্র সন্তান রয়েছে, এরকম যারা বলে, তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা না জেনে না বুঝে অন্যের অন্ধ অনুকারক হয়ে নিতান্ত মূর্খতা ও খামখেয়ালি বশতঃ এরকম সাংঘাতিক কথা বলে থাকে। আর তাদের অংশীবাদী পূর্বসূরীরাও ছিলো তাদেরই মতো জ্ঞানহীন। তাই নিঃসন্দেহে অংশীবাদীদের পূর্বসূরী-উত্তরসূরী সকলেই মিথ্যাবাদী।

www.eelm.weebly.com

একটি প্রশ্নঃ অজ্ঞতাজনিত অপরাধ ক্ষমার্হ। সুতরাং অজ্ঞতাবশতঃ 'আল্লাহ্‌র সন্তান রয়েছে' এরকম কথা যদি কেউ বলে, তবে তাকে শাস্তিযোগ্য মনে করা হবে কেনো?

উত্তরঃ অজ্ঞতাজনিত অবস্থা হতে পারে দু'রকমের। ১. যার অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু যার সম্পর্কে জানা নেই। ২. যার অস্তিত্ব নেই এবং যার সম্পর্কে কোনো কিছু জানাও নেই। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ক্ষমার্হ হলেও হতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রের অজ্ঞতাজনিত উক্তি ক্ষমার অযোগ্য। কারণ এমতাবস্থায় অসম্ভব কোনো কিছু সম্ভব বলে ঘোষণা করা হয়। আল্লাহ্‌তায়ালার অংশীদার হওয়া অসম্ভব। অথচ অংশীবাদীরা বলে 'আল্লাহ্‌র সন্তান রয়েছে।' নিঃসন্দেহে এমতো উক্তি উদ্ভট, অযৌক্তিক ও দুঃসাহসিক।

বাক্য উচ্চারিত হয় মুখ থেকেই। তাই 'তাদের কথা বা বাক্য কী উদ্ভট' এরকম বললেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু এখানে শুধু 'বাক্য' না বলে বলা হয়েছে 'মুখ-নিঃসৃত বাক্য।' চরমতম জঘন্য ও ভিন্ন বাক্যাবলীও অংশীবাদীরা অবলীলাক্রমে বলে যায়। তাদের ওই মূর্খজনোচিত দুঃসাহসিকতাকে সুচিহ্নিত করার জন্যই এখানে বলা হয়েছে 'মুখ-নিঃসৃত বাক্য।' এরকম অপবচন অবশ্যই সত্যবিবর্জিত। তাই শেষে বলা হয়েছে— 'তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে।'

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রবীয়ার দুই পুত্র উত্‌বা ও শায়বা, আবু জেহেল বিন হিশাম, নজর বিন হারেছ, আ'স বিন ওয়ায়েল, আসওয়াদ বিন মুত্তালিব এবং আবুল বুখতারী মদীনার ইহুদী পণ্ডিতদের পরামর্শক্রমে রসুল স. এর সঙ্গে একদিন প্রচণ্ড বচসায় লিপ্ত হলো। রসুল স. তাদের কথায় মর্মাহত হলেন। তখন তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে আল্লাহ্‌তায়ালা অবতীর্ণ করলেন আলোচ্য আয়াত ষষ্ঠকের শেষোক্তটি।

তাই শেষোক্ত আয়াতে (৬) বলা হয়েছে — 'তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্ম-বিনাশী হয়ে পড়বে।' এখানে 'আসাফা' অর্থ দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে প্রিয়জনের বিরহ-কাতরতা সহ্য করতে না পেরে তিলে তিলে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার অবস্থাকে। প্রতিবেশী ও নিকটজনের পুনঃ পুনঃ সত্যপ্রত্যাখ্যানের ফলে রসুল স. এরও সেরকম শোচনীয় অবস্থা হয়েছিলো। কারণ তাদের ইসলাম গ্রহণ ছিলো তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তা ও কামনা। এই উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্য তাঁর শুভ প্রচেষ্টার কোনো অন্ত ছিলো না। অথচ তাদের ঘৃণ্য প্রত্যাখ্যানের আঘাতে তাঁর কোমল ও পবিত্র হৃদয় বার বার হচ্ছিলো রক্তাক্ত ও ক্ষতার্ত। তাঁর ওই অপরিসীম মনোবেদনা প্রশমনার্থে তাই আল্লাহ্‌তায়ালা অবতীর্ণ করেছেন আলোচ্য আয়াত। যেনো বলেছেন— হে আমার প্রিয়তম রসুল! কারো

www.eelm.weebly.com

সত্যপ্রত্যাখ্যানের দায়-দায়িত্ব বহন তো আপনার কর্তব্যভূত নয়। সুতরাং তাদেরকে অযথা ভালোবেসে আপনি দুঃখ পাবেন কেনো? তারা তো আপনার দয়া ও ভালোবাসা গ্রহণের যোগ্যতারহিত। সুতরাং আত্ম-বিনাশন প্রবৃত্তিকে পরিহার করুন। আপনি তো আমার প্রিয়তম রসুল। আমিও তো আপনার প্রতি সতত প্রসন্ন।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

❒ পৃথিবীর উপর যাহা কিছু আছে আমি সেই গুলিকে উহার শোভা করিয়াছি মানুষকে এই পরীক্ষা করিবার জন্য যে, উহাদিগের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।

❒ উহার উপর যাহা কিছু আছে তাহা অবশ্যই আমি উদ্ভিদ-শূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করিব।

❒ তুমি মনে কর না যে, গুহা ও রকিমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে, আমি সেগুলোকে তার শোভা করেছি।' একথার অর্থ— মানুষ, উদ্ভিদরাজি, প্রাণীকুল ইত্যাদি দিয়ে আমি সাজিয়ে দিয়েছি পৃথিবীকে।

প্রশ্ন হতে পারে— পৃথিবীতে তো সর্প, ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংস্রপ্রাণীও বাস করে। তাছাড়া শয়তানও বিচরণ করে পৃথিবীতে। এগুলোকেও কি পৃথিবীর শোভা বলা যায়? একথার অর্থ— সকল সৃষ্টি আল্লাহ্তায়ালার সত্তা ও নাম-গুণাবলীর প্রমাণ। সুতরাং সুন্দর অসুন্দর নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল কিছু পৃথিবীর শোভাবর্ধনের উপকরণ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'মা আ'লালআরদ্বি' (পৃথিবীর উপরে যা কিছু আছে) বলে বুঝানো হয়েছে কেবল মানুষকে। কোনো কোনো কোরআন-ভাষ্যকারের মতে কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে কেবল জ্ঞানী ও পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গকে। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য পৃথিবীর শ্যামল সবুজ বৃক্ষরাজি, যেগুলো বাতাসে আন্দোলিত হয়। অন্য এক আয়াতে এরকমই বলা হয়েছে। যেমন— 'অতঃপর ভূমি যখন তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়।' কারো কারো মতে প্রাসাদ, বাগ-বাগিচা, মূল্যবান তৈজসপত্র— এগুলোই হচ্ছে পৃথিবীর শোভা।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, সৌন্দর্যের সামগ্রিকতাই আলোচ্য বাক্যের উদ্দেশ্য। একথা তো অনস্বীকার্য যে, অসুন্দরের অস্তিত্ব না থাকলে সুন্দরও হয়ে পড়তো মূল্যহীন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পৃথিবীর সকল কিছুই সুন্দর।

এরপর বলা হয়েছে— 'মানুষকে এই পরীক্ষা করবার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।' একথার অর্থ— পৃথিবীর এই শোভাবর্ধনের মাধ্যমে আমি এটাই পরীক্ষা করতে চাই যে, কে আমার সৃষ্ট এই সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে আমার কথা ভুলে যায় এবং কে আমাকে স্মরণ করে সকৃতজ্ঞচিত্তে। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর সৌন্দর্য উপভোগ করা এবং এর মাধ্যমে বৈধ পন্থায় নিজের ও অন্যের প্রয়োজন মেটানোতে দোষের কিছু নেই। লোভের বশবর্তী হয়ে বিত্তবৈভবকে কুক্ষিগত করা এবং আল্লাহ্‌র স্মরণচ্যুত হওয়াটাই দোষের। রসুল স. বলেছেন, দুনিয়া চিত্তাকর্ষক ও লোভ উদ্রেককারী। আল্লাহ্ তোমাদের বংশপরম্পরাকে ক্রমাগত পৃথিবীতে প্রেরণ করেন পরীক্ষা করবার জন্য— কে কর্মে উত্তম, কে নয়।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'এর উপর যা কিছু আছে, তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করবো।' একথার অর্থ— কিয়ামতের দিন আমি পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিবো। সৃষ্টি করবো নতুন এক পৃথিবী, যেখানে থাকবেনা কোনো বৃক্ষ অথবা অন্য কোনো শোভাবর্ধনের উপকরণ।

এর পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তুমি মনে কোরো না যে, গুহা ও রক্বীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কি মনে করেন কেবল গুহা ও রক্বীমবাসীদের ঘটনাই আমার বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহের অন্যতম? কখনোই নয়। বরং আমার অগণিত নিদর্শনরাজির মধ্যে গুহাবাসীদের ঘটনাও একটি নিদর্শন। আমার নিদর্শনাবলীর সংখ্যা অজস্র, অসংখ্য। লক্ষ্য করুন, সকল বিস্ময়ের এক সময় অবসান হয়। সকল কিছুর অবশেষ প্রত্যাবর্তন ঘটে আমার দিকেই। সুতরাং আমার দিকে সকল কিছুর প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিই সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময় উদ্রেককারী নিদর্শন নয় কি?

'কাহ্ফ' অর্থ পর্বত-গহ্বর। কিন্তু 'রক্বীম' অর্থ কি— সে সম্পর্কে রয়েছে নানা কথা। তবে এ প্রসঙ্গে হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের উক্তিটিই অধিকতর উত্তম। তিনি বলেন, রক্বীম হচ্ছে একটি দস্তা অথবা প্রস্তরনির্মিত ফলক। ওই ফলকে খোদাই করা ছিলো গুহাবাসীদের (আসহাবে কাহ্ফের) নাম ও ঘটনার সার-সংক্ষেপ। এই অভিমতটিকে গ্রহণ করা হলে বলতে হয়, রক্বীম শব্দটি উৎকলিত হয়েছে 'রকুম' থেকে— যার অর্থ লিপিবদ্ধ করা, মুদ্রিত করা বা খোদাই করা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রক্বীম ওই মরুদ্যানের নাম, যেখানে

www.eelm.weebly.com

অবস্থিত ছিলো আসহাবে কাহ্ফের গুহা। যদি তাই হয় তবে বলতে হয়, শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে 'রকুমাতুল ওয়াদি' (মরুদ্যানের প্রান্ত) থেকে । হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, রক্বীম একটি জনপদের নাম। সেখানেই আবির্ভূত হয়েছিলো আসহাবে কাহ্ফ বা গুহাবাসীরা। কেউ কেউ আবার বলেছেন, ওই পর্বতের নাম রক্বীম যার গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলো ওই গুহাবাসীরা। এসকল উক্তির মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, গুহাবাসী ও রক্বীমবাসীরা একই। আর গুহা ও রক্বীম একই স্থানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কোনো কোনো আলেমের মতে গুহাবাসী ও রক্বীমবাসীদের ঘটনা দু'টো পৃথক।

হজরত নোমান বিন বশীর থেকে আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে মুনজির, তিবরানী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রক্বীমবাসীরা ছিলো তিনজন। তারা প্রবেশ করেছিলো একটি পর্বত গহ্বরে।

সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে ইমাম আহমদ ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, অতীত যুগের তিন বন্ধু আয়-উপার্জনের উদ্দেশ্যে দূরদেশে রওনা হলো। পথিমধ্যে এক স্থানে শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা আশ্রয় গ্রহণ করলো নিকটবর্তী এক পর্বত গুহায়। তারা গুহায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় পাথর গড়িয়ে পড়লো গুহামুখে। বন্ধ হয়ে গেলো তাদের বহির্গমনের পথ। অনেক চেষ্টা করেও তারা সেটিকে সরাতে পারলো না। তখন এক বন্ধু বললো, আল্লাহ্র বিশেষ সাহায্য ছাড়া এখন আমাদের কোনো উপায় নেই। সুতরাং এসো আমরা একে একে আমাদের জীবনের কোনো একটি পুণ্যকর্মের কথা স্মরণ করে আল্লাহ্র কাছে মুক্তি প্রার্থনা করি। নিশ্চয় আল্লাহ্ রহম করবেন। একজন হাত তুলে বললো, হে আমার আল্লাহ্! আমি একদিন আমার পারিবারিক কর্ম সম্পাদনের জন্য তিন জন শ্রমিক নিযুক্ত করলাম। তাদের মধ্যে একজন কাজ শুরু করলো অর্ধেক দিন গত হওয়ার পর। কিন্তু সে কাজ করলো অন্য দুজনের সমান। আমি তাকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিলাম। যে দু'জন সারাদিন কাজ করেছিলো, তাদের একজন মনে করলো, পরে কাজ শুরু করা শ্রমিককে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিয়ে আমি ঠিক কাজ করিনি। তাই সে তার পারিশ্রমিক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাগ করে চলে গেলো। আমি তার ফেলে দেয়া পারিশ্রমিকের অর্থ এক স্থানে জমা করে রাখলাম। কিছু দিন পর ওই অর্থ দিয়ে আমি কিনলাম একটি বকরীর মাদী বাচ্চা। বাচ্চাটি ক্রমে বড় হলো। তার বংশবৃদ্ধি হতে লাগলো ক্রমে ক্রমে। এভাবে হয়ে গেলো অনেক ছাগল। দীর্ঘদিন পর ওই শ্রমিকটি ফিরে এলো। সে তখন হয়ে গিয়েছিলো বৃদ্ধ ও দুর্বল। আমি তাকে চিনতে পারলাম না। সে বললো, আপনার কাছে আমার কিছু পাওনা আছে। তার সব কথা শুনে আমি

www.eelm.weebly.com

তাকে চিনতে পারলাম এবং সকল ছাগল দিয়ে বিদায় করলাম তাকে। হে আমার দয়াময় প্রভুপ্রতিপালক! আমি তো একাজ করেছি কেবল তোমার সন্তোষ সাধনার্থে। আমার এ পুণ্যকর্মের অসিলায় তুমি আমাদের বন্ধ পথকে উন্মুক্ত করে দাও। দোয়া শেষ হলে দেখা গেলো গুহামুখের পাথরটি কিছু সরে গেলো। দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো বাইরের আলো।

দ্বিতীয় বন্ধু তার প্রার্থনায় বললো, হে আমার আল্লাহ্! এক সময় আমাদের এলাকায় দেখা দিলো চরম খাদ্যাভাব। একদিন এক রমণী আমার নিকটে সাহায্য প্রার্থিনী হলো। আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হলাম। বললাম, সাহায্য দিতে পারি, কিন্তু বিনিময়ে আমার অভিলাষ পূর্ণ করতে হবে। রমণীটি আমার প্রস্তাবে অসম্মত হয়ে চলে গেলো। নিরুপায় হয়ে পুনরায় সে এলো। আমি পুনরায় আমার অভিলাষের কথা জানালাম। কিন্তু এবারও সে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তার স্বামীর নিকটে গিয়ে সবকিছু খুলে বললো। তার স্বামী বললো, কী করবে, বাচ্চাদেরকে তো বাঁচাতে হবে। ক্ষুধার তাড়নায় তারা ছটফট করছে। সুতরাং তুমি তার প্রস্তাব মেনে নাও। অসহায় রমণী তার ছোট ছোট সন্তান-সন্ততিকে বাঁচাবার জন্য শেষে এসে ধরা দিলো আমার কাছে। আমি তার বস্ত্র উন্মোচন করতে গিয়ে দেখলাম, সে থর থর করে কাঁপছে। বললাম, কাঁপছো কেনো? সে বললো, আল্লাহ্র ভয়ে। আমি সচকিত হয়ে বললাম, কী আশ্চর্য! তুমি দুঃসময়েও আল্লাহ্র ভয়ে কাঁপছো, আর আমি সুসময়ে কেমন নির্বিকার। আল্লাহ্র ভয়ে তো আমারই বেশী করে কাঁপতে থাকা উচিত। একথা বলে আমি বিরত রইলাম অসৎকর্ম থেকে। প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে সসম্মানে বিদায় করলাম তাকে। হে আমার পরম করুণাপরবশ প্রভুপালনকর্তা! আমিতো তোমারই প্রসন্নতা কামনায় পাপকর্ম থেকে বিরত হয়েছিলাম সেদিন। সুতরাং ওই পুণ্যকর্মটিকে উপলক্ষ করে আজ আমাদের পরিত্রাণ দাও। প্রার্থনা শেষ হলো। দেখা গেলো পাথরটি আরো খানিকটা সরে গিয়েছে। গুহাভ্যন্তর ভরে গিয়েছে বাইরের আলোয়। সে আলোয় স্পষ্ট রূপে নেত্র গোচর হলো নিজেদের চেহারা।

তৃতীয়জন হাত তুলে বললো, হে আমার জীবনাধিকারী আল্লাহ্! আমি তো ছিলাম একসময় অনেক ছাগলের মালিক। আমার বৃদ্ধ মাতা ও পিতা তখন বেঁচেছিলেন। আমি তাদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করে পানাহার করিয়ে বেরিয়ে যেতাম ছাগলের পাল নিয়ে। ফিরে এসে আবার তাদের কাজকর্ম সেরে তাদেরকে নিজ হাতে পানাহার করাতাম আমি। একদিন আমার কিছু ছাগল হারিয়ে গেলো। হারানো ছাগল খুঁজে বের করতে বিলম্ব হয়ে গেলো অনেক। ফিরে এসে দেখি আমার অসহায় জনক-জননী না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি পাত্রভর্তি দুধ নিয়ে তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলাম সারারাত। ভাবলাম, তাঁদের

www.eelm.weebly.com

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই যেনো আমি তাদেরকে দুধ পান করাতে পারি। তাঁরা জাগ্রত হলেন সকালে। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে দুধ পান করালাম। হে আমার প্রভুপালক! আমার ওই নেক আমলটি যদি তোমার মনোপুত হয়ে থাকে, তবে তুমি তার অসিলায় আমাদেরকে এখান থেকে মুক্তি দান করো। দোয়া সমাপ্ত হলো। গুহা-মুখের পাথরটি সরে গেলো পুরোপুরি। তিন বন্ধু গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন সকৃতজ্ঞচিত্তে। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ১০, ১১, ১২

اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا

❑ যখন যুবকেরা গুহায় আশ্রয় লইল তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি নিজ হইতে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদিগের জন্য আমাদিগের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।'

❑ অতঃপর আমি উহাদিগকে গুহায় কয়েক বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখিলাম,

❑ পরে আমি উহাদিগকে জাগরিত করিলাম জানিবার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন্‌টি উহাদিগের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারে।

এখান থেকে শুরু হয়েছে আসহাবে কাহফ বা গুহাবাসীদের কাহিনী। প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইজ্আওয়াল ফিতইয়াতু ইলাল কাহ্ফি' (যখন যুবকেরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলো)। বাগবী লিখেছেন, ওই গুহাটি ছিলো বিজলুস পাহাড়ে। আর গুহাটির নাম ছিলো জীরম।

এরপর বলা হয়েছে— 'তখন তারা বলেছিলো, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করো।' এখানে অনুগ্রহ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে 'রহমত' শব্দটি। 'রহমত' হচ্ছে একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সৎপথ প্রাপ্তি, ক্ষমা, জীবনোপকরণের প্রাচুর্য, সর্বাত্মক নিরাপত্তা— সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করো।' একথার অর্থ ওই গুহানিবাসী যুবকেরা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! সত্যপ্রত্যাখ্যানের আগ্রাসন থেকে আমাদের বিশ্বাসকে

www.eelm.weebly.com

সুরক্ষার কোনো প্রকৃষ্ট পথ আমাদেরকে দেখিয়ে দাও। এমতো মর্মার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, এখানকার 'আমরিনা' শব্দটির অর্থ অবিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে বিশ্বাসের উপরে দৃঢ়পদ থাকা। অথবা আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— আমাদেরকে সকল কর্মে এবং সকল অবস্থায় সত্যাধিষ্ঠিত রাখো।

'রআইতু মিনকা রশাদা' একটি আরবী বাগধারা। এর অর্থ— আমি তোমাকে সত্যাধিষ্ঠিত অবস্থায় দর্শন করেছি। 'কামুস' গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। 'রশাদা' বাবে নাসারা এবং বাবে সামিয়া দু'দিক থেকেই আসে। শব্দটির ধাতুমূল তিনটি, যেমন— 'রুশদুন' 'রশ্‌দুন' এবং 'রশাদুন'। 'রশাদা' অর্থ হেদায়েতপ্রাপ্ত বা সুপথপ্রাপ্ত। বাবে ইসতিফআল 'রাশাদা' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এবং এর অর্থ 'সৎপথ অন্বেষণকারী' ও হয়। আর আল্লাহ্‌র নাম 'রশীদ' ব্যবহৃত হয় 'হাদী' (হেদায়েত বা পথের দিশাদানকারী) অর্থে।

বাগবী লিখেছেন, আসহাবে কাহ্‌ফ পর্বত-গহ্বরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন কেনো— সে সম্পর্কে বিদ্বজ্জণ অনেক কথা বলেছেন। মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, তখন সমগ্র খৃষ্টসাম্রাজ্যে ঘটে গিয়েছিলো ধর্ম-বিপর্যয়। মূর্তি-পূজার প্রসার ঘটেছিলো ব্যাপকভাবে। দেব-দেবীর নামে কোরবানী, মান্নত ইত্যাদি অংশীবাদিতা ছড়িয়ে পড়েছিলো যত্রতত্র। তাদের রাজাও হয়ে গিয়েছিলো অবাধ্য ও ধর্ম-ভ্রষ্ট। এমতো অনাসৃষ্টির মধ্যেও কিছু সংখ্যক লোক ছিলো বিশুদ্ধ-চিত্ত বিশ্বাসী। এক আল্লাহ্ ছাড়া তারা অন্য কারো উপাসনা করতো না। তখনকার রোম সম্রাট দাকিয়ানুস ছিলো ঘোর প্রতিমাপূজক। সে এক আল্লাহ্‌র উপাসকদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করতো। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদেরকে সে নিজেই যাচাই বাছাই করে দেখতো। এভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তৌহিদবাদী কাউকে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে ফেলতো সে। ফলে জনমনে সৃষ্টি হলো আতংক। বিশ্বাসীরা যে যেখানে পারলো আত্মগোপন করে রইলো, অথবা করলো দেশ ত্যাগ। বিশ্বাসীদেরকে সে কেবল হত্যা করেই ক্ষান্ত হতো না, হত্যার পর তাদের শরীরকে টুকরো টুকরো করে ঝুলিয়ে দিতো শহরের দেয়ালে দেয়ালে অথবা গৃহের দরজায়। এক অঞ্চলে ছিলো আটজন ইমানদারের একটি ক্ষুদ্র দল। তারা সকলেই ছিলো বিত্তশালী পিতার পুত্র। ছিল সত্য ধর্মের অনুরাগী। ছিলো বড়ই ইবাদতপ্রিয়। সম্রাটের নিষ্ঠুরতা দেখে শংকিত হয়ে পড়লো তারা। কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানালো— আকাশ ও পৃথিবীর একক স্রষ্টা হে আমাদের প্রিয় প্রভুপালনকর্তা! তুমি ব্যতীত আমরা কখনোই অন্য কারো ইবাদত করবো না। আমরা একথা জানি ও সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি যে, যারা তোমার উপাসনা থেকে বিমুখ, তারা সীমালংঘনকারী। হে আমাদের আপনতম প্রভুপালক!

www.eelm.weebly.com

তুমি তোমার বিশ্বাসী দাসবর্গকে উদ্ভূত অনাসৃষ্টি থেকে রক্ষা করো। দূর করে দাও ধর্মদ্রোহিতা, যেনো তারা প্রকাশ্যে তোমার ইবাদত বন্দেগী করতে বাধাগ্রস্ত না হয়। তারা সকলে একটি উপাসনাগৃহে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে বার বার এই প্রার্থনাটি উচ্চারণ করতে লাগলো। রাজ-কর্মচারীরা এ দৃশ্য দেখে তাদেরকে ঘিরে ফেললো এবং বন্দী করে নিয়ে গেলো সম্রাট দাকিয়ানুসের দরবারে। বললো, রাজন! আপনি তো আপনার পরমপূজনীয় দেব-দেবীদের মনোতুষ্টির জন্য একত্ববাদীদের হত্যা করেন। অথচ আপনার আমীর ওমরাহগণের পুত্র এই সকল যুবক আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করে না। এখন এদের ব্যাপারে আপনি কী করবেন করুন। সম্রাট বললো, হে ধর্মভ্রষ্ট যুবকবৃন্দ! তোমাদের পিতাগণ এ রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজপুরুষ। আর তারা সকলে দেব-দেবীর উপাসক। পরমপূজনীয় দেব-মূর্তি সমূহের উদ্দেশ্যে তারা কোরবানীও করে। কিন্তু তোমরা এভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠলে কেনো? কেনো পরিত্যাগ করলে বিগ্রহবন্দনা ও তাদের উদ্দেশ্যে পশু বলি দেয়ার প্রথাকে? কেনো পরিত্যাগ করলে তোমাদের পিতৃপুরুষদের আচরণ ও বেশভূষাকে? হে অবিমৃশ্য তরুণের দল! আমি তোমাদেরকে শেষ সুযোগ দিচ্ছি, এখন থেকে তোমরা অবশ্যই হবে বিগ্রহ-পূজারী। যদি এরকম না হও, তবে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই হত্যা করবো। যুবকদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন মাকসালমীনা। তিনি বললেন, সমগ্র আকাশ যার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় মুখর, আমরা সেই একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র উপাসনা করি। সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা কেবল তাঁর। আমরা শরণ যাচ্ঞা করি কেবল তাঁরই নিকটে এটাই আমাদের ধর্ম। সুতরাং দেব-দেবীদের উপাসনা আমাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। মাকসালমীনার সঙ্গীসাথীরাও এরকম স্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করলো। সম্রাট হুকুম দিলো, এই মুহূর্তে এই ধর্মদ্রোহীদের শরীর থেকে রাজকীয় পরিচ্ছদ খুলে নেয়া হোক। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। সম্রাট বললো, হে যুথবদ্ধ বিভ্রান্ত যুবক! তোমরা অবশ্যই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতে চাই না। গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবার জন্য আমি তোমাদেরকে কিছুকাল অবকাশ দিতে চাই। এরপর সম্রাটের নির্দেশে ফিরিয়ে দেয়া হলো তাদের রাজকীয় পরিচ্ছদ। সম্রাট বললো, আমি এখন গমন করবো অন্য এক অঞ্চলের দিকে। কিছুদিন পর পুনরায় এখানে এসে দেখবো, তোমরা সংশোধিত হলে কিনা। সম্রাটের চলে যাওয়ার পর আট যুবক নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে ঠিক করলো, সম্রাটের পুনরাগমনের পূর্বেই এই স্থান ত্যাগ করতে হবে। প্রত্যেকে তখন আপন আপন গৃহ থেকে কিছু মুদ্রা নিয়ে এলো। ওই মুদ্রাসমূহের কিছু অংশ বণ্টন করে দিলো দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে। অবশিষ্ট

www.eelm.weebly.com

মুদ্রাগুলো নিয়ে তারা গিয়ে আশ্রয় নিলো শহরের অনতিদূরের বিজ্‌লুস পর্বতের একটি নিভৃত গুহায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, এই গোপন গহ্বরে আমরা একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন হবো। সম্রাটের আগমনের সংবাদ পেলে আমরা আবার গিয়ে দাঁড়াবো তার সম্মুখে। সে যা করতে পারে করবে আমরা তার বিষয়ে মোটেই চিন্তিত হবো না। একটি কুকুর তাদেরকে ভালোবাসতো খুব। সে-ও সঙ্গ নিলো তাদের। যুবকেরা পর্বত-গহ্বরে প্রবেশ করে নিমগ্ন হলো ইবাদত বন্দেগীতে। হজরত কা'ব আহ্বারের বর্ণনায় এসেছে, পথিমধ্যে একটি কুকুর তাদের পিছু নিলো। তারা কয়েকবার কুকুরটিকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো। কুকুরটি বলে উঠলো, হে আল্লাহ্‌প্রেমিকগণ! আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না। আমি আল্লাহ্‌প্রেমিকগণকে ভালোবাসি। তোমরা পর্বত গহ্বরে নিদ্রামগ্ন হলে আমিই হবো তোমাদের প্রহরী।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, ওই যুবকেরা ছিলো সাতজন। পথিমধ্যে তাদের দেখা হলো একজন রাখালের সঙ্গে। তার সঙ্গে ছিলো একটি কুকুর। ওই রাখাল ও তার কুকুরটিও যুবকদের সঙ্গী হলো। এভাবে আটজন মিলে গুহায় গিয়ে শুরু করলো আল্লাহ্‌র নিরবচ্ছিন্ন উপাসনা।

যুবকগণের একজনের নাম ছিলো তামলিখা। তিনি ছিলেন সাহসী ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বাধিকারী। তিনি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করে মাঝে মাঝে শহরে গিয়ে সকলের জন্য আহার্য সামগ্রী ক্রয় করে আনতেন এবং জেনে আসতেন শহরবাসীরা তাদের সম্পর্কে কোনো আলাপ আলোচনা করে কিনা। এভাবে অতিবাহিত হলো দীর্ঘকাল। তারপর একদিন সম্রাট দাকিয়ানুস ওই শহরে ফিরে এলো। শহরের প্রধান ব্যক্তিবর্গকে এইমর্মে আদেশ দিলো যে, সবাইকে দেবতার নামে কোরবানী করতে হবে। সশংকিত শহরবাসীরা সম্রাটের আজ্ঞা পালনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত ভিখারীর বেশে তামলিখাও তখন ছিলেন শহরাভ্যন্তরে। খাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি স্বচক্ষে দেখে এলেন সবকিছু। গুহায় ফিরে এসে সাথীদেরকে বললেন, জালেম সম্রাট আবার ফিরে এসেছে। সে ও তার পারিষদবর্গ আমাদের খোঁজ করছে। একথা শুনে সকলে সেজদায় পতিত হলেন। রোদনসিক্ত নয়নে যাচ্‌এগ্রা করলেন আল্লাহ্‌র শরণ এবং পরিত্রাণ চাইলেন উদ্ভূত বিপর্যয় থেকে। তামলিখা বললেন, সাথীবৃন্দ! মস্তক উত্তোলন করো। আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হও। পানাহার করো। সকলে মস্তক উত্তোলন করলেন। সকলের চোখ থেকে তখনও নির্গত হচ্ছিলো অশ্রুর ধারা। তখন সূর্য অস্তমিত প্রায়। পানাহার পর্বের পর শুরু হলো তাদের পরামর্শ বিনিময়। কথাবার্তা বলার সময়েই আল্লাহ্ তাদের উপর অবতীর্ণ করলেন ঘনঘোর নিদ্রা।

www.eelm.weebly.com

ঘুমিয়ে পড়লেন সকলে। কুকুরটি ছিলো তখন গুহামুখে সম্মুখের পা প্রসারিত অবস্থায়। সেও ঘুমিয়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। ওদিকে সম্রাট ও তার লোকজন অনেক তালাশ করলো তাদেরকে। কিন্তু কেউই সম্রাটকে তাদের সন্ধান দিতে পারলো না। সম্রাট বললো, ধর্মদ্রোহী যুবকগুলো তো আমাকে পেরেশান করে ফেললো। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম। তারা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করলে আমি তো তাদেরকে কিছু বলতাম না। শহরের গণ্যমান্য লোকেরা বললো, সম্রাট অযথার্থ পাত্রে তার অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। কিন্তু তারা তো অবাধ্য। সংশোধিত হওয়ার অভিপ্রায় থাকলে তারা এভাবে উধাও হয়ে যেতো না। তাদের কথা শুনে সম্রাট হয়ে উঠলো রোষতপ্ত। সে তৎক্ষণাৎ ডেকে আনলো যুবকগণের পিতৃবর্গকে। বললো, বলো, তোমাদের সন্তানেরা কোথায়? কী দুঃসাহস তাদের! যুবকগণের পিতারা বললো, মহামান্য রাজন! আমরা তো আপনার অবাধ্য নই। সুতরাং আপনি তাদের অবাধ্যতার কারণে আমাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন না। আর তারা তো পালিয়ে যাওয়ার আগে আরেক কাণ্ড ঘটিয়েছে। আমাদের অনেক ধন-সম্পদ তারা দান করে গিয়েছে অভাবগ্রস্ত জনসাধারণকে। একথা শুনে সম্রাট তাদেরকে ছেড়ে দিলো এবং বিজ্‌লুস পাহাড়ের দিকে প্রেরণ করলো একটি অনুসন্ধানী দলকে। নির্দেশ দিলো, তাদেরকে খুঁজে পাও আর না পাও, পাহাড়ের সবগুলো গুহার প্রবেশমুখ বন্ধ করে দিয়ে এসো।

কিন্তু আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ছিলো অন্যরকম। তিনি আসহাবে কাহ্‌ফকে মর্যাদায়িত করতে চেয়েছিলেন। অনাগত মানবতার জন্য তাদেরকে করতে চেয়েছিলেন তাঁর অপার পরাক্রমের এক বিশেষ নিদর্শন। আর ওই নিদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে একথাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। শতাব্দির পর শতাব্দি মৃতবৎ পড়ে থাকার পর যেমন করে তারা পুনরায় জাগ্রত হয়েছিলেন, তেমনি করে মহাপ্রলয়ের পর পুনরুত্থিত হবে সকল মানুষ। সম্রাট দাকিয়ানুস চেয়েছিলো যে গুহায় তারা প্রবেশ করে থাকুক না কেনো, সে গুহাই যেনো হয় তাদের কবর। বন্ধ গুহায় যেনো তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অতিষ্ঠ হয়ে ধুঁকে ধুঁকে প্রাণ ত্যাগ করে। সম্রাটের লোকেরা ভেবেছিলো, আসহাবে কাহ্‌ফ জাগ্রত এবং গুহার মুখ বন্ধ করা সম্পর্কে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে রেখেছিলেন মহানিদ্রায় আধনামে। তাদের রূহসমূহ রেখে দিয়েছিলেন আপন তত্ত্বাবধানে। কুকুরটিও হয়ে গিয়েছিলো তাদেরই মতো নিদ্রিত অথবা মৃতবৎ। কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমে তাদের সকলের শরীর কখনো এপাশে, আবার কখনো ওপাশে স্থাপিত হতো। এভাবেই মৃত্তিকার স্থায়ী আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা হয়েছিলো তাদের শরীরকে।

www.eelm.weebly.com

সম্রাট দাকিয়ানুসের পরিবারের দু'জন সদস্য ছিলো ইমানদার। কিন্তু তারা তাদের ইমানকে প্রকাশ করতো না। তাদের একজনের নাম ছিলো ইয়ানদুরুস এবং অপরজনের নাম ছিলো আইয়াশ। তারা দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করলো, আসহাবে কাহ্ফের এই বিস্ময়কর ঘটনার স্মৃতি অক্ষয় করে রাখতে হবে। আগামী পৃথিবীর বিশ্বাসবানেরা যেনো এ কাহিনী জেনে অভিভূত হয়। একথা ভেবে তারা একটি প্রস্তর ফলকে খোদাই করলো আসহাবে কাহ্ফের নাম, বংশপরিচয় এবং আল্লাহ্র পথে হিজরতের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। তারপর তারা প্রস্তর ফলকটিকে মাটিতে পুঁতে রাখলো। বয়ে যায় রহস্যময় সময়। শেষ হয়ে যায় সম্রাট দাকিয়ানুসের জামানা। আসহাবে কাহ্ফের বিস্ময়কর নিদ্রা তবুও ভঙ্গ হয় না।

উবায়েদ ইবনে উমায়ের বর্ণনা করেছেন, আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা ছিলো একাধিক। প্রথমে তারা ছিলো সৌখিন যুবক। মূর্তিপূজক ছিলো তারা। গলায় ছিলো তাদের মূল্যবান হার ও হাতে ছিলো চুরি। একটি শিকারী কুকুর ছিলো তাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। একদিন তারা সঙ্গে কয়েকটি মূর্তি নিয়ে সেজেগুজে ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা হলো একটি বার্ষিক মেলায়। কিন্তু আল্লাহ্ নিতান্ত অনুগ্রহপরবশ হয়ে তাদের হৃদয়ে দান করলেন ইমান। তাদের মধ্যে একজন আবার ছিলো মন্ত্রী। সেও মনে মনে হয়ে গেলো ইমানদার। কিন্তু তারা কেউ তাদের ইমানের কথা মুখে প্রকাশ করলো না। মনে মনে সকলেই ভাবলো, কাফেরদের সঙ্গ পরিত্যাগ না করলে আল্লাহ্র আযাব এসে পড়তে পারে। একথা ভেবেই তারা একে অন্যকে ছেড়ে পৃথক হয়ে গেলো। দূরত্ব বজায় রেখে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো একে অপরকে। একদিন তাদের একজন বসেছিলো একটি নির্জন বৃক্ষের ছায়ায়। আর একজন দূর থেকে তাকে দেখে ভাবলো, আমার মতো সে-ও তো মনে মনে ইমানদার হয়ে যেতে পারে। সে এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসে পড়লো। কিন্তু মুখে কিছু বললো না। দূর থেকে দু'জনকে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে গেলো আরেকজন। এভাবে তারা সকলেই একত্র হলো ওই বৃক্ষটির নিচে। একজন সাহস করে বললো, কী ব্যাপার? তোমরা এভাবে এখানে সমবেত হলে কেনো? কেউ কোনো জবাব দিলো না। সকলে উচ্চারণ করলো একই প্রশ্ন। কিন্তু কেউ জবাব দিলো না। এরপর তারা জোড়ায় জোড়ায় পৃথক হয়ে ভয়ে ভয়ে পরস্পরের নিকট প্রকাশ করলো তাদের ইমানকে। এভাবে প্রথমে জোড়ায় জোড়ায় এবং পরে সমবেতভাবে সকলেই বুঝতে পারলো তাদের অন্তরের পরিচয়। নিকটেই ছিলো একটি পাহাড়। ওই পাহাড়ের নির্জনতম একটি গহ্বরে তারা মগ্ন হলো আল্লাহ্র ইবাদতে। একটি শিকারী কুকুরও তাদের সঙ্গ নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলো গুহামুখে। একসময়ে ঘুমিয়ে পড়লো সকলে। তাদের আত্মীয় স্বজনেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদেরকে পেলো না। আল্লাহ্ স্বয়ং

www.eelm.weebly.com

তাদেরকে আড়াল করে নিলেন জনপদবাসীদের দৃষ্টি থেকে। জনপদবাসীরা তখন হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া ওই যুবকদের নাম ও বংশপরিচয় খোদাই করলো একটি ফলকে। তাতে লেখা হলো অমুক বাদশাহ্র শাসনকালে অমুক অমুক রাজপুরুষের পুত্র অমুক তারিখ থেকে নিখোঁজ। অনেক অনুসন্ধান করেও তাদের সম্পর্কে কিছু জানা গেলো না ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলকটি রেখে দেয়া হলো মুসাফিরখানায়। ওদিকে পর্বতের এক গোপন গহ্বরে আসহাবে কাহ্ফ ও তাদের কুকুর গভীর নিদ্রায় মগ্ন। পৃথিবীতে বয়ে চললো দিবস-যামিনীর নিয়মিত আবর্তন-বিবর্তন। একে একে মৃত্যুবরণ করলো সেই জামানার বাদশাহ্ ও প্রজাসাধারণ। শুরু হলো নতুন জামানা। শেষ হলো শতাব্দী। শতাব্দীর পর শতাব্দী। এভাবে সুদীর্ঘ তিন শত নয় বছর পর জেগে উঠলো আসহাবে কাহ্ফ।

ওহাব বিন মুনাববাহ্, বর্ণনা করেছেন, হজরত ঈসার এক হাওয়ারী (সাহাবী) ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে একবার গেলেন আসহাবে কাহ্ফের শহরে। শহরের প্রবেশ দ্বারে পৌঁছতেই একজন বললো, শহরাভ্যন্তরে প্রবেশ করার পূর্বে এখানকার এই মূর্তিটিকে সেজদা করে নিতে হয়। হাওয়ারী লোকটির কথা মান্য করলেন না। শহরে না ঢুকে তিনি গেলেন নিকটবর্তী একটি হাম্মামখানায়। সেখানে মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে গ্রহণ করলেন হাম্মামখানার তত্ত্বাবধায়কের চাকুরী। কয়েকদিনের মধ্যেই হাম্মামখানার মালিক টের পেলো, তার আয়-উপার্জন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং সে তার নতুন কর্মচারীর উপরে খুবই প্রসন্ন হলো। স্থানীয় কয়েকজন যুবকের সঙ্গে পরিচয় হলো হাওয়ারীর। হৃদ্যতাও গড়ে উঠলো তাদের মধ্যে। হাওয়ারী তাদেরকে আসমান জমিনের বিষয়ে বিভিন্ন কথা শোনালেন। যুবকেরা আকৃষ্ট হলো। এভাবে একসময় তারা গ্রহণ করলো খৃষ্টান ধর্মমত। হাওয়ারী হাম্মামখানার মালিকের সঙ্গে শুরুতেই এই শর্ত করে নিয়েছিলো যে, রাতে তাকে কোনো ব্যাপারে ডাকা যাবে না। কারণ রাতে তাকে বিশেষভাবে নামাজে লিপ্ত থাকতে হয়। একদিন ঘটলো একটি অনভিপ্রেত ঘটনা। সন্ধ্যার পর এক মহিলাকে নিয়ে সেখানে হাজির হলো সেখানকার এক রাজপুত্র। হাওয়ারী বললেন, আপনি রাজপুত্র হয়ে কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই রমণীকে এখানে এনেছেন? রাজপুত্র লজ্জিত হয়ে ফিরে গেলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পুনরায় মহিলাকে নিয়ে হাজির হলো সেখানে। এবার সে হাওয়ারীর কথায় ভ্রুক্ষেপ মাত্র করলো না। দু'জনেই প্রবেশ করলো হাম্মামখানায়। এর মধ্যে কীভাবে যেনো রাজার কাছে সংবাদ পৌঁছলো, হাম্মামখানার মালিক রাজপুত্রকে হত্যা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবার থেকে ছুটে এলো সিপাই-শান্ত্রী। তারা আসার আগেই ভয়ে পালিয়ে গেলো হাম্মামখানার মালিক। সিপাইরা বললো, কর্মচারী কোথায়? তার সাথে নাকি কয়েকজন যুবক থাকে। তারাই বা কোথায়? খোঁজ করে দেখা গেলো নব্য

www.eelm.weebly.com

খৃষ্টান যুবকদের সঙ্গে নিয়ে হাওয়ারী উধাও হয়েছে। ওদিকে হাওয়ারীর সঙ্গী যুবকেরা আর একজন খৃষ্টান যুবককে নিয়ে পৌছলো একটি পর্বতের গুহায়। তাদের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটি কুকুরও গিয়ে উপস্থিত হলো। সকলে মিলে ঠিক করলো, রাতটা ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে গুহাতেই কাটিয়ে দেয়া যাক। সকালে নেয়া যাবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত। তারা আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন হলো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হলো তারা। মাটিতে পড়ে রইলো মৃত মানুষের মতো। ওদিকে রাজা স্বয়ং তার লোকজন নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে উপস্থিত হলো ওই গুহাটির নিকটে। সকলেই বুঝতে পারলো পলাতকেরা এই গুহার মধ্যেই রয়েছে। রাজার লোকজন গুহায় প্রবেশ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলো সকলে। গুহামধ্যে প্রবেশ করার সাহস কারো হলো না। রাজার এক সঙ্গী বললো, মহামান্য রাজন! আপনি তো তাদেরকে হত্যাই করতে চান। রাজা বললো, হ্যাঁ। সঙ্গীটি বললো, তাহলে এখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে গুহামুখটি বন্ধ করে দিন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় অতিষ্ঠ হয়ে তারা অবরুদ্ধ গুহাতে অবশ্যই মারা পড়বে। আপনার উদ্দেশ্য সাধনের এটাই প্রকৃষ্ট উপায়।

ওহাব আরো বর্ণনা করেছেন, আসহাবে কাহফ দীর্ঘদিন ধরে নিদ্রাভিভূত হয়ে রইলেন অবরুদ্ধ গুহায়। কেটে গেলো যুগের পর যুগ। শতাব্দির পর শতাব্দি। তারপর একদিন এক রাখাল তার ছাগল ও মেষগুলো চরাতে চরাতে উপস্থিত হলো গুহাটির সন্নিকটে। সহসা শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে সে গুহামুখে দাঁড়িয়ে দেখলো তার পথ রোধ করে আছে দীর্ঘ দিনের পুরনো একটি প্রাচীর। প্রাচীরটিতে ধাক্কা ধাক্কি করতেই ধসে পড়লো তার একাংশ। সেই ভগ্ন অংশ গলিয়ে সে প্রবেশ করলো ভিতরে। সারারাত ধরে চললো তুমুল বর্ষণ। ঘুম থেকে জেগে উঠলেন আসহাবে কাহ্ফ। একরাত্রি ঘুমিয়েছেন এরকম মনে হলো তাদের।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক লিখেছেন, তখন চলছিলো রাজা বিদুসীসের রাজত্ব। তিনি ছিলেন পুণ্যবান। কিন্তু তাঁর শাসনকালের আটষট্টি বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর প্রজাসাধারণ বিভক্ত হলো দুইভাগে— মুমিন ও কাফের। মুমিনেরা বিশ্বাস করতো আল্লাহ্কে এবং কিয়ামতকে। কিন্তু আল্লাহ্ ও কিয়ামতের প্রতি কাফেরদের কোনো আস্থা রইলো না। রাজা বিদুসীস তাদের এমতো পদস্খলন দেখে ব্যথিত হলেন। অনেক কাকুতি মিনতি করে তাদের হেদায়েতের জন্য প্রার্থনা জানালেন আল্লাহ্তায়ালার মহান দরবারে। কিন্তু তাঁর প্রার্থনা কবুল করা হলো না। দিন দিন কাফেরদের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগলো। শারীরিকভাবে নয়, কিয়ামত হবে রূহানীভাবে— এই ছিলো তাদের বিশ্বাস। এ কথা ভেবেই তারা গা ভাসিয়ে দিলো ভোগ-বিলাসের সর্বনাশা স্রোতে। একদিন বিদুসীস পুণ্যবানদেরকে

www.eelm.weebly.com

ডেকে মানুষের হেদায়েতের ব্যাপারে পরামর্শ বিনিময় করলেন। তাদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলতে গিয়ে বিদুসীস সবিস্ময়ে দেখলেন, প্রকাশ্যতঃ মুমিন মনে হলেও ভিতরে ভিতরে তারা কাফের। কিয়ামতের প্রতি তাদেরও কোনো আস্থা নেই এবং তারাও মনে প্রাণে চায় যে, হাওয়ারীগণের ধর্ম ও মতাদর্শ থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিক। বিদুসীস মনের দুঃখে পরামর্শ সভা থেকে প্রস্থান করলেন। ফিরে এলেন তাঁর নিজস্ব প্রকোষ্ঠে। বন্ধ করে দিলেন সকল দরজা ও জানালা। রাজকীয় পরিচ্ছদ খুলে ফেলে পরিধান করলেন কম্বলের পোশাক। এক কোনে ছাই বিছিয়ে বসে পড়লেন তার উপর। দিনরাত রোদনার্ত কণ্ঠে দোয়া করতে লাগলেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি প্রজাসাধারণের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে অধিক অবগত। দয়া করে তুমি তাদের অন্তরে শুভবোধ জাগ্রত করে দাও। প্রকাশ করো কোনো বিরল নিদর্শন, যার মাধ্যমে অপনোদিত হয় তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস। হে আমার পরম করুণাপরবশ প্রভুপালক! তোমার রোদনরত বান্দা বিদুসীসের প্রার্থনা মঞ্জুর করো। তোমার বান্দাদের ধ্বংস হওয়া তুমিও তো পছন্দ করো না। আল্লাহ্পাক এবার বিদুসীসের করুণ প্রার্থনা কবুল করলেন। আসহাবে কাহফের অবরুদ্ধ গুহার নিকটে বসবাসকারী এক লোকের অন্তরে এই চিন্তার উদয় হলো যে, গুহামুখের প্রাচীরটি ভেঙে দিয়ে গুহাটিকে সহজেই তো ছাগল ও মেষের থাকার ব্যবস্থা করা যায়। লোকটির নাম ছিলো আওলিয়াস। সে দু'জন শ্রমিক নিয়ে ভেঙে ফেললো গুহামুখের প্রাচীর। গুহায় প্রবেশ করেই সে দেখলো আসহাবে কাহফের সকলে জেগে উঠে বসেছেন। সকলেই বেশ হাসিখুসি। মনে হচ্ছিলো গতরাতে ঘুমানোর পর স্বাভাবিকভাবে তারা জেগে উঠেছেন। অভ্যাস অনুযায়ী সকলে নামাজ পাঠ করলেন। তারপর তাদের মনে হলো রাজা দাকিয়ানুসের কথা। মনে হলো, রাজার লোকেরা নিশ্চয় আমাদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাঁদের আরো মনে হলো গত রাতের ঘুম ছিলো কিছুটা প্রলম্বিত। তাই তাঁরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম আমরা? কেউ বললেন, একদিন একরাত্রি। আবার কেউ বললেন, না তার চেয়েও কম। এভাবে কথা-বার্তা বলতে বলতে শেষে সকলে একযোগে বলে উঠলেন, আল্লাহ্ই জানেন, কতোকাল ঘুমিয়েছিলাম আমরা। তাদের একজনের নাম ছিলো তামলিখা। তাঁর কাছে জমা ছিলো সকলের অর্থকড়ি। তাই তাঁকে উদ্দেশ্য করে একজন বললেন, যাও শহরের বাজারে গিয়ে কিছু আহার্য দ্রব্য ক্রয় করে নিয়ে এসো। সেই সঙ্গে জেনে এসো, আমাদের সম্পর্কে কে কী আলোচনা করছে। তামলিখা বললেন, আমরা তো রাজার এলাকার মধ্যেই। রাজার লোকদের কোনো ক্রুর দৃষ্টি হয়তো আমাদেরকে অনুসন্ধান করে ফিরছে। কিন্তু আমরা তো কেবল আল্লাহ্র সাহায্যপ্রার্থী। সুতরাং তোমরা চিন্তিত হয়ো না। তাদের আর একজনের নাম ছিলো মুলসালমিনা। তিনি

www.eelm.weebly.com

বললেন, বন্ধুগণ! আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত। সুতরাং মৃত্যুভয়ে ভীত হওয়া আমাদের জন্য শোভন নয়। আমাদের তো কেবল একটিই ভয়, দুশমনদের অত্যাচারে আমরা যেনো ঈমানহারা হয়ে না যাই। সুতরাং হে তামলিখা! ছদ্মবেশ ধারণ করে তুমি শহরাভ্যন্তরে যাও। কিনে নিয়ে এসো একটু বেশী আহার্য সামগ্রী। সাবধান! বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কর্মসম্পাদন কোরো। তোমার গতিবিধি অনুসরণ করে কেউ যেনো আবার আমাদের এই আত্মগোপনের স্থানে এসে না পড়ে। তামলিখা প্রস্তুত হলেন। শরীর থেকে খুলে ফেললেন মূল্যবান পোশাক। তারপর ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে কিছু মুদ্রা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন গুহামুখের দিকে। সবিস্ময়ে দেখলেন, গুহার প্রবেশ পথে রয়েছে একটি ভগ্ন প্রাচীর। কিন্তু তিনি আর পিছনে ফিরলেন না। দুঃস্থ মানুষের মতো ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলেন শহরে। কেউ তাঁকে চিনে ফেলে কিনা, একথা ভেবে তিনি সভয়ে এদিকে ওদিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। তিনি একথা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না যে, ইতোমধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে সুদীর্ঘ তিনশত বছর। শহরের প্রবেশ পথে পৌঁছে তিনি দেখলেন, সেখানে মূর্তিটূর্তি কিছুই নেই। যতোই ভিতরে প্রবেশ করেন, ততোই তাঁর মনে হয়, এ শহর কি সেই শহর! শহরের লোকজনদের চেহারা সুরত কথা-বার্তা সবকিছুই কেমন অচেনা। একবার তাঁর মনে হলো, তবে কী ভুল রাস্তায় এলাম? তবে কি যা দেখছি তা স্বপ্ন? এরকম নানা কথা ভাবতে ভাবতে তিনি উপস্থিত হলেন বাজারে। দেখলেন, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কেউ কেউ হজরত ঈসার নামে কসম খাচ্ছে। একটি প্রাচীরে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। ভাবলেন, কী বিস্ময়! গতকালই আমরা দেখে গেলাম এই শহরে হজরত ঈসা ইবনে মরিয়মের নাম উচ্চারণ করার মতো কেউই ছিলো না। অথচ আজ তাঁর নামে কসম, কথা-বার্তা সবই চলেছে। তবে কি এটা অন্য কোনো শহর! এক যুবককে তিনি সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন, এই শহরের নাম কি? যুবকটির উত্তর শুনে আরো বেশী অবাক হয়ে গেলেন তিনি। নাম তো ঠিকই আছে। কিন্তু এ শহর এতো অচেনা কেনো? এই অচেনা পরিবেশ থেকে মনে হয় এক্ষুণি বেরিয়ে যাওয়া উচিত। তার আগে কিছু খাবার কেনা দরকার। তিনি এগিয়ে গেলেন একটি রুটির দোকানের দিকে। আস্তিন থেকে কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রা বের করে রুটিওয়ালাকে দিয়ে বললেন, আমাকে কয়েকটা রুটি দিন। রুটিওয়ালা মুদ্রা হাতে নিয়ে তাজ্জব হয়ে গেলো। উল্টেপাল্টে দেখে মুদ্রাগুলো দিলো পাশের দোকানদারকে। সেও অবাক হয়ে দেখতে লাগলো মুদ্রাগুলোকে। তারপর সে সেগুলোকে দিলো পাশের আর এক দোকানীকে। তারপর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, সম্ভবতঃ এই লোকটি গুপ্তধন পেয়েছে। মুদ্রাগুলোতো বহুকাল পূর্বের। তাদের কথা-বার্তা শুনে তামলিখা ভীত হলেন। ভাবলেন, লোকগুলো মনে হয় তাঁকে চিনে ফেলেছে।

www.eelm.weebly.com

এক্ষুণি তারা হয়তো তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে যাবে রাজা দাকিয়ানুসের দরবারে। দোকানীদের কথা-বার্তা শুনে সেখানে আরো লোক জড় হলো। তারা তামলিখাকে চিনতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই চিনতে পারলো না। তামলিখা ভীত হয়ে বললেন, তোমরা আমার মুদ্রাগুলো নিয়ে নিলে, খাবারও দিলে না। ঠিক আছে। এখন আমাকে দয়া করে যেতে দাও। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছো? তবে তুমি যে-ই হও না কেনো, তুমি নিশ্চয় গুপ্তধন পেয়েছো। সুতরাং আমাদের কাছ থেকে তুমি তা গোপন রাখতে পারবে না। এক্ষুণি আমাদেরকে মৃত্তিকায় প্রোথিত ওই গুপ্তধনভাণ্ডারের কাছে নিয়ে চলো। আমাদেরকেও ওই সম্পদের ভাগ দিতে হবে। নতুবা আমরা তোমাকে বিচারকের হাতে সোপর্দ করবো। বিচারক তো তোমাকে মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারেন। ভীত বিহ্বল তামলিখা হতবাক হয়ে গেলেন। লোকেরা তাঁর শরীরের চাদর তাঁর গলায় পেঁচিয়ে তাঁকে নিয়ে গেলো শহরের এক গলিতে। গলির লোকেরা বললো, কি ব্যাপার? একে এভাবে গ্রেপ্তার করেছো কেনো? তারা বললো, এ লোকের কাছে রয়েছে প্রাচীনকালের ধনভাণ্ডার। লোকজনের মুখে মুখে একথা ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। ছোট-বড় সকলে ভিড় জমালো তামলিখাকে কেন্দ্র করে। অনেকে বললো, এ লোক তো আমাদের শহরের বাসিন্দাই নয়। আমরা কেউই তো তাকে চিনতে পারছি না। তামলিখা নিশ্চুপ। তখন তাঁর অন্তরে বার বার কেবল একথার উদয় হচ্ছিলো যে, নিশ্চয় অল্পক্ষণের মধ্যে এসে পড়বেন তাঁর পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা। তারা তো এই শহরের গণ্যমান্য লোক। সুতরাং তারা তাঁকে নিশ্চয় এদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারবে। দু'জন সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন ওই শহরের স্বনামধন্য বিচারকর্তা। তাঁদের এক জনের নাম আরইউস এবং আরেক জনের নাম আস্তিউস। তামলিখাকে শেষে তাঁদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। যাবার সময় পিতা ও ভ্রাতাদেরকে দেখার উদ্দেশ্যে তিনি বার বার এদিকে ওদিকে তাকালেন। আর তাঁর ওই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে লোকেরা ভাবলো, তিনি পাগল। এই নিয়ে তারা যথেষ্ট হাসিতামাশাও করলো। তামলিখা কেঁদে ফেললেন। আকাশের দিকে মুখ উত্তোলন করে বললেন, হে আমার আল্লাহ্! হে আকাশ ও পৃথিবীর চিরঅমুখাপেক্ষী সৃজয়িতা! আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করে দাও ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায়। তোমার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী হিসেবে অবতীর্ণ করো তোমার প্রিয়ভাজন ফেরেশতা জিবরাইলকে। অথবা আমার পরিত্রাণার্থে প্রেরণ করো অন্য কোনো অদৃশ্য শরণ। প্রার্থনা শেষে তিনি মনে মনে ভাবলেন, হায়! বন্ধুবর্গ যদি এখন আমার সঙ্গে থাকতো। আমরা তো এইমর্মে অংগীকার করেছিলাম যে, জীবনে মরণে আমরা কেউ কারো কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবো না। বিচারকদ্বয়ের সামনে হাজির হয়ে তামলিখা কিছুটা প্রকৃস্থিত হলেন। দেখলেন, দাকিয়ানুস নয়,

www.eelm.weebly.com

তিনি এখন মুখোমুখি হয়েছেন দু'জন অচেনা বিচারকের । মহামান্য বিচারক আরইউস ও আস্তিউস মুদ্রাগুলো নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। প্রশ্ন করলেন, হে অচেনা ব্যক্তি! আপনি কোথায় পেয়েছেন এই গুপ্ত ধনভাণ্ডার? তামলিখা বললেন, এই মুদ্রাগুলো কোনো গুপ্ত ধনভাণ্ডারের নয়। এই শহরের টাকশাল থেকেই এগুলো তৈরী হয়েছে। আর এগুলো আমি সংগ্রহ করেছি আমার পিতার নিকট থেকে। কিন্তু এখন যে আমি কোনো কিছুই বুঝতে পারছি না। কি বলবো, তাও ভেবে পাচ্ছি না। বিচারকদ্বয়ের একজন বললেন, আপনার পরিচয়? তামলিখা বললেন, আমি এই শহরেরই অধিবাসী। আরেক জন বিচারপতি বললেন, পিতৃপরিচয়? এখানে এমন কেউ কি রয়েছে যে আপনাকে চেনে? তামলিখা তাঁর পিতার নাম বললেন। কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের দিকে লক্ষ্য করে পরিচিত কাউকেই দেখতে পেলেন না। বিচারপতি বললেন, আপনার বচন অসত্য। তামলিখা তাঁর মস্তক কিঞ্চিত আন্দোলিত করলেন। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলেন না। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের একজন বললো, লোকটি মনে হয় উন্মাদ। আরেক জন বললো, না, ছাড়া পাওয়ার জন্য উন্মাদের ভান করছে। বিচারপতি তামলিখার দিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করে বললেন, আপনি কি মনে করেন, আপনাকে আমরা ছেড়ে দিবো? একথাও কি আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে, মুদ্রাগুলো আপনি পেয়েছেন আপনার পিতার নিকট থেকে? মুদ্রাগুলোতে রয়েছে তিনশতাধিক বছরের পূর্বের সিলমোহর। আপনি যুবক। আর আমরা বয়োপ্রবীণ। আর আমাদের স্কন্ধে অর্পিত হয়েছে ন্যায় বিচারের ভার। এখানকার গুপ্ত ধনভাণ্ডারের অধিকারী ব্যক্তিগতভাবে কেউ হতে পারে না। সুতরাং সত্য প্রকাশ না করা পর্যন্ত আপনাকে বন্দী করে রাখাই ন্যায়সংগত বলে মনে হয়। তামলিখা এবার মুখ খুললেন। বললেন, মহামান্য বিচারপতি! একটি প্রশ্ন রয়েছে আমার। প্রশ্নটির উত্তর পেলে আমিও আপনাকে সব কথা খুলে বলবো। আমি জানতে চাই রাজা দাকিয়ানুস এখন কোথায়? উপস্থিত লোকেরা বললো, সেতো বহুকাল পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে। এখন পৃথিবীতে এ নামে অন্য কোনো রাজা বাদশাহ্ নেই। তামলিখা বললেন, তাহলে নিশ্চয় পথ ভুলে আপনাদের দেশে এসেছি। এখানে কে আমার কথা বিশ্বাস করবে? প্রকৃত ঘটনা শুনুন— আমরা কয়েকজন যুবক ছিলাম সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত। রাজা দাকিয়ানুস আমাদেরকে মূর্তি পূজার নির্দেশ দিলো। আমরা তার কথা মানতে চাইনি। তাই গতকাল সন্ধ্যায় আমরা পালিয়ে গিয়েছিলাম এবং অনতিদূরের এক পর্বত গহ্বরে আত্মগোপন করেছিলাম। সেখানে কখন যেনো আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে জেগে উঠে খাদ্য বস্তু ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশে শহরে এসে এভাবে ধরা পড়ে গেলাম

www.eelm.weebly.com

আপনাদের কাছে। আমার কথা সত্য কি না, তা যদি প্রমাণ করতে চান, তবে এক্ষুণি আপনারা চলুন বিজলুস পাহাড়ের ওই গুহায়। দেখবেন, আমার সঙ্গীগণ সেখানে আমার জন্য অপেক্ষমান। তামলিখার কথা শুনে আরইউস, আস্‌তিউস এবং শহরের সকল লোক তামলিখার সঙ্গে চললো বিজলুস পাহাড় অভিমুখে। ওদিকে তামলিখার সঙ্গীগণ তামলিখার ফিরতে দেরী দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, তামলিখা নিশ্চয় দাকিয়ানুসের লোকদের কাছে ধরা পড়েছে। একথা ভাবতে ভাবতে তাঁরা শুনতে পেলেন অনেক লোকের শোরগোল ও ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। ভাবলেন, নিশ্চয় দাকিয়ানুসের লোকেরা এবার আমাদেরকে বন্দী করতে এসেছে। আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভের নিমিত্তে তখন সকলে নামাজে দণ্ডায়মান হলেন। আল্লাহ্ সকাশে আবেদন জানালেন নিরাপত্তার।

বিচারপতি আরইউসের নেতৃত্বে শহরবাসীরা উপস্থিত হলেন গুহামুখে। প্রথমে গুহায় প্রবেশ করলেন তামলিখা। সাথীদেরকে সংক্ষেপে সবকিছু খুলে বললেন। তখন সকলে বুঝতে পারলেন যে, তারা আল্লাহ্‌র হুকুমে দীর্ঘ তিন শত বছরের বেশী ঘুমিয়েছিলেন। এখন আবার তাঁর হুকুমেই তাঁরা জেগে উঠেছেন। আর আল্লাহ্ তাঁদেরকে করতে চান কিয়ামত ও হাশরের (মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের) একটি নিদর্শন। নিদ্রা মৃত্যুতুল্য। তিনশত বছর ধরে কেউ নিদ্রাভিভূত থাকে না। মৃত্যুর পরে কেউ যেমন পুনর্জীবিত হয় না, তেমনি তিনশত বছরের মৃত্যুতুল্য নিদ্রার পর জাগ্রত হওয়াও অসম্ভব। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা থাকলে সবই হয়। কিয়ামতও অনুষ্ঠিত হবে আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছায়। সুতরাং তা সত্য। আর আসহাবে কাহফের এই ঘটনাটি সেই কিয়ামতের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তামলিখার পর গুহায় প্রবেশ করলেন বিচারপতি আরইউস। তিনি দেখতে পেলেন প্রবেশমুখের পাশেই একটি তামার সিন্দুক। তিনি সিন্দুকটি খুলতে নির্দেশ দিলেন একজনকে। সকলের সামনে সিন্দুকটি খোলা হলো। দেখা গেলো, তার মধ্যে রয়েছে দুটি দস্তার ফলক। ফলক দু'টোতে লেখা রয়েছে— এখানে আত্মগোপন করে রয়েছেন আটজন পুণ্যবান যুবক। তাদের নাম মাকসালসীনা, মাখশালমীণা, তামলিখা, মারতুনাস, বাশারতুনাস, বীরবুছ, দাইউমাস এবং ইয়াতুনমাস। অত্যাচারী রাজা দাকিয়ানুস তাদেরকে জোর করে মূর্তিপূজক বানাতে চেয়েছিলো। তাই তাঁরা পালিয়ে এসে আত্মগোপন করেছে এই গুহায়। পরে রাজনির্দেশে গুহামুখে নির্মিত হয় প্রাচীর। চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে পুণ্যবান গুহাবাসীরা। আমরা তাদের কয়েকজন শুভাকাঙ্খী তাদের এই কাহিনী খোদাই করে রাখলাম, যেনো আগামী পৃথিবীর মানুষ তাদের আত্মত্যাগের এই ঘটনা জানতে পারে। বিচারপতি আরইউস ও অন্যান্যরা বিস্মিত হলো। আল্লাহ্‌তায়ালার এই বিরল নিদর্শন স্বচক্ষে দর্শন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো

www.eelm.weebly.com

তাঁরই দরবারে। এরপর আরইউস ও তাঁর সঙ্গীরা গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন পরম পুণ্যবান যুবকগণের দিকে। তাঁদের অবয়ব ছিলো জ্যোতিস্নাত। পোশাক পরিচ্ছদও ছিলো নতুন ও ঝকঝকে। তিনশত নয় বছরের সময়ের পরিসর তাঁদের উপরে কোনো প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারেনি।

আরইউস এবার দূত মারফত একটি পত্র প্রেরণ করলেন রাজা বিদুসীসের নিকটে। লিখলেন, মহামান্য রাজন! আল্লাহ্তায়ালার এক অভূতপূর্ব নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে এখানে। অতি শীঘ্র আগমন করুন এবং স্বচক্ষে দর্শন করুন তিনশত নয় বছর পূর্বের কয়েকজন পুণ্যবান যুবককে। রাজা বিদুসীস ছিলেন বিশ্বাসী ও পুণ্যপ্রবণ। পত্র পেয়ে তিনি আর কালবিলম্ব করলেন না। উপস্থিত হলেন আসহাবে কাহফের গুহায়। স্বচক্ষে তাঁদেরকে দেখে আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করলেন। বললেন, হে আমার আল্লাহ্! হে আকাশ ও পৃথিবীর নিরঙ্কুশ অধিকর্তা। আমি তোমারই উপাসনা করি। শরণ প্রার্থনা করি তোমারই সকাশে। তুমি পবিত্রতম। মহামহিম। আমার পুণ্যবান পিতা পিতামহের মতো এই অযোগ্য দাসের প্রতিও দয়া করে তুমি জারী রেখেছো তোমার সতত অনুগ্রহের নিরর্গল প্রবাহ।

দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো আসহাবে কাহফের বিস্ময়কর কাহিনী। দলে দলে লোক এসে দেখে যেতে লাগলো তাঁদেরকে। রাজা বিদুসীসকে পেয়ে আসহাবে কাহফ খুশী হলেন খুব। আলিঙ্গন করলেন তাঁকে। মাটিতে বসেই কিছুক্ষণ বাক্যালাপ করলেন রাজা বিদুসীসের সঙ্গে। তারপর বললেন, পুণ্যমতি সম্রাট! এবার বিদায়। আপনার উপরে বর্ষিত হোক আল্লাহ্র বিশেষ কৃপা ও নিরাপত্তা। আল্লাহ্ আপনার সাম্রাজ্যকে অসৎ মানুষ ও জ্বিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। ফী আমানিল্লাহ্। বিদুসীসকে গুহামুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন আসহাবে কাহফ। পুনরায় ফিরে এলেন স্বস্থানে। আল্লাহ্র প্রতি বিশেষভাবে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ইন্তেকাল করলেন তাঁরা। রাজা তাঁদের স্মরণে উড়িয়ে দিলেন অনেক নিশান। তারপর তাঁদেরকে শুইয়ে দিলেন পৃথক পৃথক আটটি স্বর্ণ নির্মিত তক্তায়। এভাবে তাঁদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের পর রাজা বিদুসীস ফিরে এলেন তাঁর মহলে। রাতে স্বপ্ন দেখলেন আসহাবে কাহফকে। তাঁরা বললেন, প্রিয় বিদুসীস! পৃথিবীর জীবন শেষে মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করাই নিয়ম। কিয়ামত শেষে মাটি থেকেই পুনরুত্থিত হবো আমরা। তুমি আমাদেরকে স্বর্ণাবদ্ধ করেছো কেনো? রাজা জেগে উঠে আপন কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত হলেন। এবার তিনি নির্মাণ করিয়ে নিলেন সার নামক একপ্রকার গাছের তক্তানির্মিত সিন্দুক। ওই সিন্দুকগুলোতে আসহাবে কাহফের পবিত্র মরদেহ রক্ষা করে সেগুলোকে প্রোথিত করলেন মৃত্তিকায়। এভাবে আল্লাহ্ তাঁদেরকে চিরদিনের জন্য আড়াল করে দিলেন জনদৃষ্টি থেকে। রাজা বিদুসীস

www.eelm.weebly.com

সেখানে বানিয়ে দিলেন একটি মসজিদ। নির্দেশ দিলেন আল্লাহ্তায়ালার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সকলে যেনো প্রতিবছর অন্ততঃ একবার উপস্থিত হয় সেখানে।

এক বর্ণনায় এসেছে, তামলিখাকে বাজার থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো রাজার কাছে। রাজা বললেন, তুমি কে? তামলিখা বললেন, আমি এই শহরেরই বাসিন্দা। অমুক মহল্লায় আমার বাড়ী। আমি গতকাল বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। আজ সকালে এসেছি। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তামলিখার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু কেউই তাকে চিনতে পারলো না। রাজার হঠাৎ মনে পড়লো রাষ্ট্রীয় মহাফিজ খানায় নাকি এমন কয়েকজন যুবকের বিবরণ আছে, যাদেরকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর পাওয়া যায়নি। রাজনির্দেশে তৎক্ষণাৎ কথিত ফলক আনা হলো। রাজা পড়ে দেখলেন, সেখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে তামলিখা ও আরো কয়েকজনের নাম। তামলিখা বললেন, অন্য নামগুলো আমার সঙ্গীদের। তারা এক পর্বত গুহায় আমার জন্য প্রতীক্ষমান। তাদেরকে দেখতে চাইলে চলুন আমার সঙ্গে। রাজা তামলিখার সঙ্গে উপস্থিত হলেন আসহাবে কাহফের গুহার সম্মুখে। তামলিখা বললেন, রাজন! প্রথমে আমাকে প্রবেশ করতে দিন। নতুবা তারা ভয় পেয়ে যাবে। একথা বলেই তামলিখা গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে সকলকে সম্ভাষণ জানালেন। পরক্ষণেই আল্লাহ্ তাঁদেরকে দান করলেন মৃত্যু। আর সেই সঙ্গে তাঁদেরকে অদৃশ্য করে দিলেন লোকচক্ষু থেকে। ওই গুহাবাসীদের কাহিনীই শুরু হয়েছে আলোচ্য আয়াত থেকে।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম।' একথার অর্থ— জালেম রাজার অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে যখন ওই পুণ্যবান যুবকেরা পর্বতগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করলো, তখন আমি তাদের উপরে অবতীর্ণ করলাম গভীর, গভীরতর নিদ্রা। ফলে তারা হয়ে গেলো পার্থিব অনুভূতি ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এভাবে অতিবাহিত হয়ে গেলো অনেক কয়টি বছর। এখানে 'সিনীনা' শব্দটির পরে বসানো হয়েছে 'আদাদা'। এভাবে বোঝানো হয়েছে অতিক্রান্ত বছরের সংখ্যা অনেক, অল্প নয়। আর এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, অধিক সংখ্যাই গণনাযোগ্য, অল্পসংখ্যা নয়।

এর পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'পরে আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম জানবার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোনটি তাদের অবস্থিতি কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।' এখানে 'আলহিযবাইনি' অর্থ দুই দল। আর 'আমাদান' অর্থ অবস্থিতিকাল। আর এখানে 'এলেম' অর্থ বর্তমানের ওই জ্ঞান যা সম্পৃক্ত ভবিষ্যতের সাথে।

www.eelm.weebly.com

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ۝ وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا۟ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ۝ هٰۤؤُلَاۤءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝

❑ আমি তোমার নিকট উহাদিগের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করিতেছিঃ উহারা ছিল কয়েকজন যুবক, উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল এবং আমি উহাদিগের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলাম,

❑ এবং আমি উহাদিগের চিত্ত দৃঢ় করিয়া দিলাম; উহারা যখন উঠিয়া দাঁড়াইল তখন বলিল, 'আমাদিগের প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক; আমরা কখনই তাঁহার পরিবর্তে অন্য কোন ইলাহ্কে আহ্বান করিব না; যদি করিয়া বসি, তবে উহা অতিশয় গর্হিত হইবে;

❑ আমাদিগেরই এই স্বজাতিগণ, তাঁহার পরিবর্তে অনেক ইলাহ্ গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা এই সমস্ত ইলাহ্ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তাহা অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে?'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আমি আপনার নিকটে আসহাবে কাহফের কাহিনী যথাযথরূপে বিবৃত করছি। তারা ছিলো কতিপয় ইমানদার যুবক। আমি তাদের পুণ্যকর্ম করবার সামর্থ্য বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম। এখানে 'আল-হাক্ব' অর্থ যথাযথরূপে। আর এখানকার 'ফিত্ইয়াতুন্' (যুবক) শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'ফাতিউন্'। যেমন, 'সাবিয়্যাতুন্' এর একবচন হচ্ছে 'সাবিউন্'। আর 'আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম' কথাটির অর্থ— আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম হাকিকী ইমান (প্রকৃত বিশ্বাস)। উল্লেখ্য যে, হাকিকী ইমান লাভ হয় কুপ্রবৃত্তি বিনাশনের (ফানায়ে নফসের) পর।

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম' একথার অর্থ— ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন, ধন-দৌলত ইত্যাদি পরিত্যাগ করেছিলো তারা কেবল ইমান রক্ষার জন্য। তাই আমি তাদেরকে করে দিলাম

www.eelm.weebly.com

বিশুদ্ধ চিত্ত ও ধৈর্যশীল। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্তায়ালা আসহাবে কাহফের হৃদয় থেকে পার্থিব মোহ-মমতা চিরদিনের জন্য অপসারিত করে দিয়েছিলেন। তাই তাঁরা উন্নীত হয়েছিলেন আত্মবিনাশনের স্তরে (ফানায়ে কলবের মাকামে)। সে কারনেই তাঁদের হৃদয়ে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস, ভয় ও ভালোবাসা ছাড়া অন্য কিছু আর অবশিষ্ট ছিলো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যখন উঠে দাঁড়ালো তখন বললো, আমাদের প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। আমরা কখনোই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোনো ইলাহ্কে আহ্বান করবো না; যদি করি, তবে তা হবে অতিশয় গর্হিত।' একথার অর্থ— অত্যাচারী রাজা দাকিয়ানুস মূর্তিপূজার প্রতি বিমুখ আসহাবে কাহফকে যখন তিরস্কার করলো, তখন তাঁরা দণ্ডায়মান হলেন এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে বললেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যিনি একক সৃজয়িতা, তিনিই আমাদের প্রভুপালনকর্তা। আমরা কখনোই তাঁর পরিবর্তে অন্য কারো উপাসনা করবো না। যদি করি, তবে তা হবে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গর্হিত। এখানে 'শাত্বাত্বা' অর্থ অতিশয় গর্হিত, সত্যের সীমালংঘন।

এর পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'আমাদেরই এ স্বজাতিগণ, তাঁর পরিবর্তে অনেক ইলাহ্ গ্রহণ করেছে। তারা এ সমস্ত ইলাহ্ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেনো?' একথার অর্থ— দৃঢ়চেতা ওই যুবকগণ আরো বললো, আমাদের সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক আল্লাহ্র ইবাদত পরিত্যাগ করে হয়ে গিয়েছে অংশীবাদী। পূজা পার্বণ শুরু করে দিয়েছে কল্পিত দেব-দেবীদের। অথচ তাদের এমতো অপকর্মের পক্ষে স্পষ্ট কোনো প্রমাণই নেই। প্রমাণহীন বিষয় যে পরিত্যাজ্য, সে কথাও তো তারা বোঝে না। বুঝলেও বিশ্বাস করতে চায় না। কারণ তারা অজ্ঞ ও মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।

শেষে বলা হয়েছে— 'যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী আর কে?' একথার অর্থ— যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী ও কার্যকলাপের সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার বানায়, 'আল্লাহ্র সন্তান রয়েছে', 'দেব-দেবীরা আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করবে'— এরকম মিথ্যার যারা উদ্ভাবক, তারাই সর্বাপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী। সীমালংঘনের ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে অধিক অগ্রণী আর কে?

যুবকদের অংশীবাদিতা প্রত্যাখ্যান ও এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসজ্ঞাপক বক্তব্য শোনা সত্ত্বেও রাজা দাকিয়ানুস উত্তেজিত হলো না। বললো, তোমরা তরুণ। স্বভাবগত চঞ্চলমতিত্বের কারণে বিভ্রান্ত হওয়া তোমাদের জন্য বিচিত্র কিছু নয়। তাই বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখবার জন্য তোমাদেরকে কিছুকাল অবকাশ দেয়া হলো। আশা করি, তোমাদের বোধোদয় ঘটবে। একথা বলে রাজা চলে গেলো অন্য এক অঞ্চলের দিকে। তার চলে যাবার পর যুবকবৃন্দ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয়ের জন্য নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় শুরু করলো। একজন বললো—

www.eelm.weebly.com

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ۝ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا

❑ তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হইলে উহাদিগ হইতে ও উহারা আল্লাহের পরিবর্তে যাহাদিগের ইবাদত করে তাহাদিগ হইতে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের জন্য তাঁহার দয়া বিস্তার করিবেন এবং তিনি তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

❑ দেখিলে দেখিতে— উহারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কালে উহাদিগের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া আছে এবং অস্তকালে উহাদিগকে অতিক্রম করিতেছে বাম পার্শ্ব দিয়া, এই সমস্ত আল্লাহের নিদর্শন। আল্লাহ্ যাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাহার কোন পথ-প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাইবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যুবক বললেন, আমরা তো এক আল্লাহ্র প্রতি বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী। সুতরাং যারা অংশীবাদী, তাদের সঙ্গে আমাদের সংশ্রব ছিন্ন করা একান্ত প্রয়োজন। তাই হে বন্ধুবর্গ! আমার পরামর্শ শ্রবণ করো। আশ্রয় গ্রহণ করো পর্বতের কোনো গোপন গুহায়। পরিত্যাগ করো বিষণ্নতা। নিশ্চিত জেনো, তোমাদের প্রভুপালক তোমাদের প্রতি তাঁর বিশেষ দয়া বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে করবেন সফল। উল্লেখ্য যে, আসহাবে কাহফের সম্প্রদায়ের লোকেরা মূর্তিপূজকদের মতো মূর্তিপূজা করতো বটে, কিন্তু একই সঙ্গে তারা আল্লাহ্র ইবাদতও করতো। তাই এখানে 'ইল্লাল্লহ্' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ 'তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে'। অথবা এরকমও হতে পারে যে— এখানকার 'মা ইয়া'বুদুনা ইল্লাল্লহ্' হতে পারে আল্লাহ্র উক্তি— যা ওই যুবকের বক্তব্যের মধ্যে উদ্ধৃত হয়েছে। যদি তাই হয়, তবে এখানকার 'মা' হবে না বাচক। এবং 'ইয়া'বুদুনা' এর সর্বনাম সম্পর্কিত হবে আসহাবে কাহ্ফের প্রতি। তখন কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— আসহাবে কাহফ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করতো না।

www.eelm.weebly.com

'ইলাল কাহ্‌ফি' অর্থ গুহার আশ্রয় গ্রহণ করো। অর্থাৎ পর্বত গহ্বরে এমনভাবে আত্মগোপন করো যেনো অংশীবাদীরা তোমাদের সন্ধান না পায়।

এখানকার 'মির্‌ফাক্বা' শব্দটি 'ইসমে আলা' (করণ কারক) অর্থাৎ ওই মাধ্যম বা ব্যবস্থা যার দ্বারা উপকার লাভ হয়। উল্লেখ্য যে, আসহাবে কাহফ ছিলেন দৃঢ়চিত্ত বিশ্বাসী। তাই তাঁদের কথা তাঁদের এক সাথীর মুখ দিয়ে দৃঢ় আশাব্যঞ্জকরূপে উচ্চারিত হতে পেরেছে এভাবে—'তোমাদের প্রভুপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করবার ব্যবস্থা করবেন।'

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'দেখলে দেখতে— তারা গুহার প্রশস্ত চত্তরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলে আছে এবং অস্তকালে তাদেরকে অতিক্রম করছে বাম পাশ দিয়ে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আসহাবে কাহফের ওই গুহার নিকটে গেলে দেখতে পেতেন গুহাটি অবস্থিত রয়েছে একটি প্রশস্ত চত্বরে। সেখানে উদয়কালে সূর্য হেলে পড়ে দক্ষিণে এবং অস্তকালে হেলে যায় বামে। এখানে 'তাযাওয়ারু' অর্থ হেলে যাওয়া বা ঝুঁকে পড়া। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'যাওরুন' থেকে। 'জাতাল ইয়ামীন' অর্থ দক্ষিণ পাশে। আর 'জাতাশ্‌ শিমাল' অর্থ বাম পাশে। অর্থাৎ গুহাটির ডানে ও বামে।

'তাক্বরিদ্ব' অর্থ অতিক্রম করা। আর 'ফাজ্‌ওয়াতিন' অর্থ প্রশস্ত চত্বর বা বিস্তৃত স্থান।

ইবনে কুতাইবা লিখেছেন, গুহাটির মুখ ছিলো সপ্তর্ষিমণ্ডলীর দিকে। পূর্ব পশ্চিমে প্রলম্বিত বিষুব রেখায়। তাই উদয়ের সময় সূর্য হেলে থাকতো ডান পাশে। আর অস্তমিত হওয়ার সময়ে ঝুঁকে পড়তো বাম পাশে। ফলে গুহার দু'পাশেই পুরোপুরি সূর্য-কিরণ পতিত হতো। তাই পচন, দুর্গন্ধ, বাতাসের স্বল্পতা — এ সকল কিছু ঘটতো না। আবার আসহাবে কাহফের শরীরেও সরাসরি সূর্যের আলো পড়তে পারতো না। এভাবে তাদের শরীরকে রক্ষা করা হতো প্রখর রোদ থেকে। সেই সঙ্গে তাদের পরিধেয় বস্ত্রও রক্ষা পেতো মালিন্য থেকে।

কোনো কোনো আলেম ইবনে কুতাইবার এমতো ভৌগোলিক ব্যাখ্যাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেননি। তাঁরা বলেছেন, বিষয়টি মূলতঃ ছিলো আল্লাহ্‌র অপার পরাক্রমের বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তী বাক্যে তাই বলা হয়েছে— 'এ সবই আল্লাহ্‌র নিদর্শন।' এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে আসহাবে কাহফের পরিচয় ও তাদের অবস্থান স্থলের যথাযথ বিবরণ প্রদানের মাধ্যমে প্রকারান্তরে একথাই প্রমাণ করা হয়েছে যে, এই কোরআন আল্লাহ্‌তায়ালার সত্যবাণী। না হলে আসহাবে কাহফের এরকম নিখুঁত বর্ণনা এখানে এভাবে উপস্থাপিত হতে পারতো না।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনোই তাঁর কোনো পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এই তত্ত্বটি আপনার জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, পথ-প্রাপ্তি ও পথ-ভ্রষ্টতা সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় নির্ভর। তিনি যাকে চান, তাকে করেন পথপ্রাপ্ত। আর পথভ্রষ্ট করতে চান যাকে, সে অবশ্যই হয় পথচ্যুত। আর যারা পথচ্যুত, তারা কখনো পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পায় না।

আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রকারান্তরে আসহাবে কাহফের প্রশংসা করা হয়েছে। এইমর্মে সতর্কও করে দেয়া হয়েছে যে, আসহাবে কাহফের এই ঘটনাসহ আরো অনেক নিদর্শন রয়েছে আল্লাহ্‌র । কিন্তু ওই সকল নিদর্শনের মাধ্যমে হেদায়েত লাভ করতে পারে কেবল তারা, যাদেরকে তিনি দিয়েছেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সুবিবেচনা।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ
الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ۗ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ
لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۔ وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ
لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوْا لَبِثْنَا
يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۗ فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ
بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ۝ اِنَّهُمْ اِنْ
يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا
اِذًا اَبَدًا ۝ وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ

www.eelm.weebly.com

وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا
ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۖ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى
اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ۝ سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ
كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَ
يَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا
يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۖ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۖ وَّلَا تَسْتَفْتِ
فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ۝

❐ তুমি মনে করিতে, উহারা জাগ্রত কিন্তু উহারা ছিল নিদ্রিত। আমি উহাদিগকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাইতাম দক্ষিণে ও বামে এবং উহাদিগের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দুইটি গুহাদ্বারে প্রসারিত করিয়া। তাকাইয়া উহাদিগকে দেখিলে তুমি পিছন ফিরিয়া পলায়ন করিতে ও উহাদিগের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়িতে;

❐ এবং এই ভাবেই আমি উহাদিগকে জাগরিত করিলাম যাহাতে উহারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। উহাদিগের একজন বলিল, 'তোমরা কত কাল অবস্থান করিয়াছ।' কেহ কেহ বলিল, 'একদিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ।' কেহ কেহ বলিল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করিয়াছ তাহা তোমাদিগের প্রতিপালকই ভাল জানেন। এখন তোমাদিগের একজনকে তোমাদিগের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম ও উহা হইতে যেন কিছু খাদ্য লইয়া আসে তোমাদিগের জন্য; সে যেন বিচক্ষণতার সহিত কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদিগের সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু জানিতে না দেয়।'

❐ 'উহারা যদি তোমাদিগের বিষয় জানিতে পারে তবে তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিবে অথবা তোমাদিগকে উহাদিগের ধর্মে ফিরাইয়া লইবে এবং সে ক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করিবে না।'

❐ এবং এই ভাবে আমি মানুষকে উহাদিগের বিষয় জানাইয়া দিলাম যাহাতে তাহারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহের প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নাই। যখন তাহারা তাহাদিগের কর্তব্য বিষয়ে নিজদিগের মধ্যে বিতর্ক করিতেছিল

www.eelm.weebly.com

তখন অনেকে বলিল, 'উহাদিগের উপর সৌধ নির্মাণ কর।' উহাদিগের প্রতিপালক উহাদিগের বিষয় ভাল জানেন। তাহাদিগের কর্তব্য বিষয়ে যাহাদিগের মত প্রবল হইল তাহারা বলিল, 'আমরা তো নিশ্চয়ই উহাদিগের উপর মসজিদ নির্মাণ করিব।'

❐ অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ বলিবে, 'উহারা ছিল তিন জন, উহাদিগের চতুর্থটি ছিল উহাদিগের কুকুর। 'এবং কেহ কেহ বলে, 'উহারা ছিল পাঁচজন, উহাদিগের ষষ্ঠটি ছিল উহাদিগের কুকুর।' আবার কেহ কেহ বলে, 'উহারা ছিল সাত জন, উহাদিগের অষ্টমটি ছিল উহাদিগের কুকুর।' বল, 'আমার প্রতিপালকই উহাদিগের সংখ্যা ভাল জানেন; উহাদিগের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি উহাদিগের বিষয়ে বিতর্ক করিও না এবং ইহাদিগের কাহাকেও উহাদিগের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিও না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি মনে করতে, তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিলো নিদ্রিত।' এখানকার 'আইক্বাজ' শব্দটি 'ইয়াক্বীজুন' এর বহুবচন এবং রুক্বুদুন' বহুবচন 'রক্বিদ্' এর। যেমন— 'কুউদুন' বহুবচন 'ক্বাইদ' এর। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আসহাবে কাহফকে দেখলে আপনি মনে করতেন, তারা বুঝি জেগেই আছে। কিন্তু না, তারা ছিলো নিদ্রিত। ঘুমের ঘোরে কখনো কখনো পার্শ্ব পরিবর্তন করতো মাত্র।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডানে ও বামে।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, আসহাবে কাহফ ঘুমের মধ্যেই মাঝে মাঝে পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন। মাটি যাতে তাদের শরীরকে ভক্ষণ না করতে পারে, সেজন্যই আল্লাহ্ করে দিয়েছিলেন ওই বিশেষ ব্যবস্থা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, তারা পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন আশুরার দিবসে। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, তাঁরা পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন বছরে মাত্র একবার।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের কুকুর ছিলো সম্মুখের পা দু'টি গুহা-দ্বারে প্রসারিত করে।' মুজাহিদ ও জুহাক বলেছেন, 'ওয়াসীদ্' অর্থ গুহার আঙ্গিনা বা উঠোন। আতা বলেছেন, 'দহলিজ'বা বহির্বাটি। সুদ্দী বলেছেন, শব্দটির অর্থ দরজা। ইকরামার এক বর্ণনানুসারে হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমত এরকম। অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন, আসহাবে কাহফের সঙ্গী জন্তুটি ছিলো কুকুর। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বাঘ। কেননা প্রত্যেক হিংস্র প্রাণীকেই বলা হয় 'কালব'। রসুল স. উত্বা ইবনে আবু লাহাবকে বদদোয়া দিয়েছিলেন একথা বলে যে, হে আমার আল্লাহ্! আপনার কোনো 'কালবকে' (হিংস্র জন্তুকে) তার উপরে বিজয়ী করে দিন। এর কিছুদিন পরে একটি বাঘ উতবাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেললো। কিন্তু অধিকতর প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, জন্তুটি ছিলো কুকুরই। ইবনে

www.eelm.weebly.com

জুরাইজ আবার শেষোক্ত অভিমতের সমর্থক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সেটি ছিলো একটি বৃহদাকৃতির কুকুর। এক বর্ণনায় এসেছে, কুকুরটি ছিলো মাঝারী ধরনের। মুকাতিল বলেছেন, সেটির রঙ ছিলো হলুদ। কুরতুবী বলেছেন, গাঢ় হলুদ। কালাবী বলেছেন, তার লোম ছিলো ধুনিত পশম অথবা তুলার ন্যায়। কেউ কেউ বলেছেন, কুকুরটি ছিলো প্রস্তরের মতো ধূসর।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কুকুরটির নাম ছিলো কিতমীর। হজরত আলী বলেছেন, নাম ছিলো তার রাইয়্যান। আওজায়ী বলেছেন, তাকুর। সুদ্দী বলেছেন, ছাত্তর। কা'ব বলেছেন, সাহ্‌বা।

খালেদ বিন মাদান বলেছেন, আসহাবে কাহফের কুকুর ও বালআম বাউরের গাধা ব্যতীত অন্য কোনো চতুষ্পদ জন্তু বেহেশতে প্রবেশ করবে না। সুদ্দী বলেছেন, আসহাবে কাহফ যখন পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন, তখন কুকুরটিও পার্শ্ব পরিবর্তন করতো। তাঁরা ডান কাত হয়ে শুলে কুকুরটিও শুয়ে পড়তো ডান কাত হয়ে। আবার যখন তাঁরা বাম কাত হতেন, তখন কুকুরটিও বাম কাত হয়ে শুয়ে থাকতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাকিয়ে তাদেরকে দেখলে তুমি পিছনে ফিরে পলায়ন করতে ও তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! নিদ্রিত আসহাবে কাহফকে দেখলে যে কেউ ভয় পেয়ে যেতো। আপনিও নিশ্চয় ভয় পেতেন। ভয়ে ও আতংকে পলায়ন করতেন সেখান থেকে। কারণ ওই স্থানটি ছিলো ভয়াবহ রকমের নির্জন।

কালাবী বলেছেন, আসহাবে কাহফের চক্ষু ছিলো জাগ্রত মানুষের মতো খোলা। দেখলে মনে হতো এক্ষুণি তারা হয়তো কথা বলে উঠবেন। আর তাদের চোখের দৃষ্টি ছিলো ভয়ংকর। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের মাথার চুল হয়ে গিয়েছিলো অস্বাভাবিক রকমের লম্বা এবং হাতের নখও হয়ে গিয়েছিলো অতি দীর্ঘ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, তাদেরকে দেখে ভয় লাগতো বলেই কোনো মানুষজন সেখানে যেতো না। তাছাড়া অতি নিভৃত একটি পর্বত গুহায় প্রবেশ করা নিঃসন্দেহে ভীতিপ্রদ ব্যাপার। এই অভিমতটিই যথার্থ বলে মনে হয়।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি আমীর মুয়াবিয়ার সাহায্যার্থে রোমের জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলাম। পথিমধ্যে পড়লো আসহাবে কাহফের সেই ঐতিহাসিক গুহা। মুয়াবিয়া বললেন, গুহামুখের প্রাচীর ভেঙে দেয়া হলে আমরা আসহাবে কাহফকে দেখতে পেতাম। আমি বললাম, তারা তো ছিলেন আপনার চেয়েও উত্তম। এ কথা বলে তাকে নিবৃত্ত করা হলো। বলা হলো, আল্লাহ্‌ এরশাদ করেছেন—

www.eelm.weebly.com

লাবিত্ব ত্বালায়াত্ আ'লাইহিম লাওয়াল্লাইতা মিনহুম ফিরারা (তাকাইয়া উহাদিগকে দেখিলে তুমি পিছন ফিরিয়া পলায়ন করিতে)। মুয়াবিয়া তবু আমার কথা শুনলেন না। কিছু লোককে গুহার খবর নিতে পাঠালেন। তারা গুহায় প্রবেশ করলো। কিন্তু সেখানকার বিষাক্ত হাওয়া সহ্য করতে না পেরে প্রাণ ত্যাগ করলো অল্পক্ষণের মধ্যে। বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'এবং এভাবেই আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম' এ কথার অর্থ— যেভাবে আমি ওই গুহাবাসীদের সুদীর্ঘ সময়ের নিদ্রাকে আমার অতুলনীয় শক্তিমত্তার একটি বিশেষ নিদর্শন করেছিলাম, সেভাবে আর একটি বিশেষ নিদর্শন প্রকাশার্থে সেই মৃত্যুসদৃশ নিদ্রা থেকে আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে।' একথার অর্থ— আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম এ কারণে যে, যেনো তারা পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে আমার এই বিরল নিদর্শনটির প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হয়। একথা যেনো স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, যিনি শতাব্দির পর শতাব্দি পড়ে থাকা মৃতবৎ মানুষকে জাগ্রত করতে পারেন। তিনি অবশ্যই মহাপ্রলয়ের পর পুনরুত্থিত করতেও সক্ষম। এভাবে তাদের বিশ্বাস যেনো হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিশিষ্ট। আলোচ্য বাক্যের এমতো ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, এখানকার 'লিইয়াতাসাআলু' (তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে) কথাটির 'লাম' কারণ প্রকাশক। অর্থাৎ পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়ার কারণেই তাদেরকে জাগ্রত করা হয়েছিলো। কিন্তু বাগবী লিখেছেন, এখানকার এই 'লাম'টি পরিণতি প্রকাশক। তিনি এ কথাও লিখেছেন যে, তাঁদেরকে জাগ্রত করার পরিণাম এই হলো যে, তারা নিজেদের মধ্যে শুরু করে দিলো জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু প্রকৃত কথা হলো, কেবল জিজ্ঞাসাবাদই তাঁদের জাগ্রত হওয়ার উদ্দেশ্য ছিলো না। উদ্দেশ্য ছিলো বিরল নিদর্শনটির তত্ত্বোদ্ধার।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের একজন বললো, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছো? কেউ কেউ বললো, একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ।' একথার অর্থ— জেগে ওঠার পর তাঁদের মনে হলো, তাঁদের নিদ্রা ছিলো স্বাভাবিক নিদ্রার চেয়ে কিছুটা গভীর ও প্রলম্বিত। কিন্তু তার সময় সীমা সম্পর্কে তাঁরা আন্দাজ করতে পারলেন না। তাই বিষয়টি স্পষ্ট করে নেয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করলেন তাঁরা। প্রথমে একজন বললেন, বলতে পারো, কতক্ষণ ধরে আমরা ঘুমিয়েছি? আরেকজন জবাব দিলেন, মনে হয় একদিন অথবা

www.eelm.weebly.com

একদিনের কিছু অংশ। এক বর্ণনায় এসেছে, জেগে উঠে তাঁরা বুঝতে পারলেন নামাজের সময় উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই আক্ষেপ প্রকাশার্থে তাঁরা নিজেদের মধ্যে শুরু করে দিলেন এমতো বাক্যালাপ। উল্লেখ্য যে, তাঁরা গুহায় প্রবেশ করেছিলেন সকালে এবং জাগ্রত হয়েছিলেন সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে। তাই তাঁদের একজন বলেছিলেন, পুরো একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। বলা বাহুল্য যে, তাদের মন্তব্য ছিলো অনুমাননির্ভর। এরকম অনুমাননির্ভর মন্তব্য গ্রহণীয় নয়। কথা বলা উচিত সুনিশ্চিত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে। অথবা বলা উচিত আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

এরপর বলা হয়েছে— 'কেউ কেউ বললো, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছো, তা তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন।' একথার অর্থ— তাঁদের আর একজন সঙ্গী বার বার তাকাচ্ছিলেন তাদের লম্বা লম্বা চুল ও বড় বড় নখগুলোর দিকে। তাই তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন যে, তাঁদের নিদ্রা ছিলো বহুকালের। কিন্তু কতকালের, তা জানার কোনো উপায় ছিলো না। তাই তিনি বললেন, বন্ধুবর্গ! আমাদের এখানকার নিদ্রাভিভূত অবস্থা ও অবস্থানের প্রকৃত জ্ঞান রাখেন কেবল আল্লাহ্। এক বর্ণনায় এসেছে, মাকসালমীনা ছিলেন তাঁদের দলপতি। সঙ্গীগণের বিতর্ক প্রশমনার্থে তিনিই তখন বলে উঠেছিলেন— তোমাদের নিদ্রার অবস্থা, অবস্থান ও পরিসর সম্পর্কে আল্লাহ্ই সমধিক পরিজ্ঞাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ করো।' এ কথার অর্থ— যিনি 'আল্লাহ্র প্রকৃত তত্ত্ব অবগত'— একথা বলে বিতর্কের অবসান ঘটালেন, তিনি অথবা তাঁদের অন্য একজন বললেন, সঙ্গে করে যে মুদ্রাগুলো আমরা নিয়ে এসেছি, সেই মুদ্রাগুলো থেকে কিছু মুদ্রাসহ আমাদের মধ্যে যে কোনো একজনকে খাদ্য ক্রয়ের জন্য নগরে প্রেরণ করা হোক। উল্লেখ্য যে, তিন শতাব্দি পূর্বে যখন তারা বেরিয়ে এসেছিলেন, তখন নগরীর নাম ছিলো আফসুম। তাই তাঁদের মুদ্রাগুলোতে অংকিত ছিলো ওই নাম ও তৎকালীন রাজার নাম। নগরীটি তখন ছিলো মূর্তিপূজক জনগোষ্ঠী প্রভাবিত। পরে ধীরে ধীরে নগরবাসীরা হয়ে যায় এক আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী। নগরীর নামও তখন পরিবর্তিত হয়ে যায়। আফসুমের বদলে নতুন নামকরণ করা হয় তারতুশ। আসহাবে কাহফের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার সময়ে ওই নামই বহাল ছিলো। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে আরেকটি কথা প্রমাণিত হয় যে, জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন মাফিক কিছু পাথেয় অথবা কিছু অর্থ-বিত্ত সঞ্চয় রাখা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্ নির্ভরতা বিরোধী নয়। বরং এরকম করাই আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীলগণের স্বভাব।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে—'সে যেনো দেখে কোন খাদ্য উত্তম এবং তা থেকে যেনো কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য; সে যেনো বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করে ও কিছুতেই যেনো তোমাদের সম্বন্ধে কাউকে কিছু জানতে না দেয়।' একথার অর্থ— আমাদের প্রেরিত খাদ্য সংগ্রাহকের দায়িত্ব হবে হালাল ও উত্তম খাদ্য সংগ্রহ করা এবং এমন বিচক্ষণতার সঙ্গে কর্মসম্পাদন করা যেনো আমাদের আত্মগোপনের বিষয়টি প্রকাশ না হয়।

জুহাক বলেছেন, এখানকার 'আয্‌কা' শব্দটির অর্থ পবিত্র। মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, সর্বোত্তম। ইকরামা বলেছেন, অধিক পরিমাণ। কেননা জাকাত শব্দটির অর্থ প্রাচুর্য, প্রবৃদ্ধি। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'আয্‌কা' শব্দটির অর্থ সস্তা।

এর পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'তারা যদি তোমাদের বিষয়ে জানতে পারে, তবে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনোই সাফল্যলাভ করতে পারবে না।' একথার অর্থ— খাদ্য সংগ্রাহক বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সঙ্গে কার্যসম্পাদন না করলে আমরা সেখানকার বিগ্রহপূজারী রাজা অথবা জনতার কাছে ধরা পড়ে যাবো। তখন তারা আমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলবেই অথবা বলপূর্বক করবে ধর্মান্তরিত। আর এরকম হলে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমরা কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আসহাবে কাহফ সত্যধর্ম গ্রহণের পূর্বে ছিলেন বিগ্রহপূজকদের ধর্মানুসারী। তাই এখানে বলা হয়েছে 'তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে'। কথাটির অর্থ এরকম হতে পারে যে— তারা তোমাদেরকে জবরদস্তি করে তাদের অপবিত্র ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত করবে। এই মর্মার্থটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, এখানকার 'আও ইউয়ীদু' কথাটির অর্থ 'ফিরিয়ে নিবে' না হয়ে হবে 'অন্তর্ভুক্ত করে নিবে।'

এর পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'এবং এভাবে আমি মানুষকে তাদের বিষয়ে জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোনো সন্দেহ নেই।' একথার অর্থ— এভাবে আমি আসহাবে কাহফের ঘটনাটি ধীরে ধীরে জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিলাম, যাতে করে মানুষ মৃত্যুপরবর্তী কবরের জীবন ও কিয়ামত সম্পর্কে অবলোকন করতে পারে একটি প্রত্যক্ষ নিদর্শন। যেনো একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে জীবনদান এবং কিয়ামত সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, তা সত্য।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিলো তখন অনেকে বললো, তাদের উপর সৌধ নির্মাণ করো। তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয় ভালো জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো তারা বললো, 'আমরা তো নিশ্চয়ই তাদের উপর মসজিদ নির্মাণ করবো।'

আমি বলি, এখানকার 'নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিলো' কথাটির অর্থ— যে সময় আসহাবে কাহফ জাগ্রত হলেন, সেই সময়ের মানুষ ধর্মের মৌলিক কিছু বিষয়ে প্রায়শই বাদানুবাদ করতো। ইকরামা বলেছেন, তারা তর্কবিতর্ক করতো মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান সম্পর্কে। কেউ কেউ বলতো কিয়ামত, হাশর, নশর ইত্যাদি হবে রূহানীভাবে। আর প্রকৃত বিশ্বাসীরা বলতো শরীরসহ রূহানীভাবে অথবা রূহ্‌সহ শারীরিকভাবে। আসহাবে কাহফের ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা কথাটির প্রমাণ দিয়েছেন।

এরকমও হতে পারে যে— তাদের মতভেদ দেখা দিয়েছিলো আসহাবে কাহফকে কেন্দ্র করে। জাগ্রত হওয়ার পর যখন তাঁদের মৃত্যু ঘটলো, তখন কেউ কেউ বলতে শুরু করলো, মৃত্যু তাদের হয়নি, আগের মতো পুনরায় তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন মাত্র। আবার কেউ কেউ বললো, ইতোপূর্বে তারা দীর্ঘকাল ধরে ঘুমিয়ে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু এখন তাঁরা সত্যিকার অর্থেই পৃথিবী পরিত্যাগ করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আসহাবে কাহফের পরলোক গমনের পর বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে শুরু হয়ে গেলো প্রচণ্ড বচসা। বিশ্বাসীরা বললো, আমরা এখানে মসজিদ নির্মাণ করবো। কারণ তাঁরা ছিলেন আমাদের পূর্বসূরী। অবিশ্বাসীরা বললো, মসজিদ নয়, এখানে নির্মাণ করতে হবে একটি স্মৃতি সৌধ। তাঁদের পুণ্যময় স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখার নিমিত্তে এরকমই করা উচিত। কারণ তাঁরা ছিলেন আমাদের ধর্মমতানুসারী।

এখানে বিতণ্ডা উপস্থিতকারী দল দু'টোর বক্তব্যের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার বক্তব্য সংযোজিত হয়েছে এভাবে— 'তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয় ভালো জানেন।' এভাবে উভয়দলের বক্তব্যকে এখানে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যেনো বলে দেয়া হয়েছে— হে অবিশ্বাসীর দল! আসহাবে কাহফ কখনো তোমাদের দলভূত হতে পারে না। কারণ তারা ছিলো এক আল্লাহ্‌র উপাসক। আর হে বিশ্বাসীর দল! তোমাদেরও একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে তারা তোমাদের মতো সাধারণ পর্যায়ের বিশ্বাসবান। না, কখনোই তা নয়। তারা আমার একান্ত প্রিয়ভাজন। সুতরাং তাদের মর্যাদা তোমাদের চেয়ে অনেক উচ্চে।

উল্লেখ্য যে, সামাজিকভাবে আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজনগণও সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণভাবে জীবন-যাপন করেন। কিন্তু আত্মিক উৎকর্ষতার দিক থেকে তাঁরা সর্ব

www.eelm.weebly.com

সাধারণের কাতারভুক্ত নন। সুতরাং তাঁরা বাহ্যিকভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা সত্ত্বেও আত্মিক দিক থেকে স্বতন্ত্র ও পৃথক। মাওলানা রুমী তাই বলেছেন—

হরকেসে দর জানে খোদ সুদ ইয়ারেমান
হরকেসে দর জানে খোদ সুদ ইয়ারেমান
ওয়াজদারুনে মান নাজুমতে ইসরারে মান।

অর্থঃ কেউ কেউ স্বধারণার বশবর্তী হয়ে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়, কিন্তু সে তো আমার অভ্যন্তরীণ রহস্য অনুসন্ধান করতে চায় না।

এরকমও হতে পারে যে, বিতণ্ডাকারীরা আসহাবে কাহফের অবস্থা ও অবস্থানের বিষয়ে যখন ঐকমত্যাগত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না, তখন তারা একথা বলতে বাধ্য হলো যে 'তাঁদের প্রতিপালক তাঁদের বিষয়ে ভালো জানেন।' যদি তাই হয়, তবে বলতে হয়, আলোচ্য উক্তিটি ছিলো বিতণ্ডাকারীদের, আল্লাহ্‌র নয়।

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আউলিয়া কেরামের মাজারের পাশে নামাজ পাঠের জন্য মসজিদ বানানো জায়েয। তাদের মাজার থেকে বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে ওই সকল মসজিদে নামাজ পাঠ করার মধ্যে দোষের কিছুই নেই। কিন্তু আমার উস্তাদ (শাহ্‌ওলিউল্লাহ্‌ দেহলবী) এর মতে এরকম করা মাকরূহ। তাঁর অভিমতের সমর্থনে রয়েছে নিম্নে বর্ণিত হাদিসসমূহ—

মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আবুল হিয়াজ আসাদী বর্ণনা করেছেন, আমাকে হজরত আলী বলেছেন, রসুল স. আমাকে যা করতে বলেছেন, আমি তো তোমাকে তা-ই করতে বলবো। সুতরাং মূর্তি দেখতে পেলেই তা ধ্বংস করে দেবে এবং উঁচু কোনো সমাধি দেখতে পেলে তা সমতল না করে ছাড়বে না। হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে ও ইমারত নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।

জননী আয়েশা ও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, অন্তিম যাত্রার সময় রসুল স. পীড়িত হলেন। মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে লাগলেন তিনি। রোগ যন্ত্রণার প্রকোপে একবার তিনি স. চাদর দিয়ে মুখ ঢাকছিলেন, আরেকবার তা সরিয়ে ফেলছিলেন। ওই অবস্থায় তিনি বললেন, ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপরে আল্লাহ্‌র অভিশাপ, তারা তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিলো। জননী আয়েশা আরো বলেছেন, রসুল স. তার উম্মতের জন্য ইহুদী ও খৃষ্টানদের অনুসরণ নিষিদ্ধ করেছেন।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে কবর পাকা করা, উঁচু করা ও কবরের উপর আড়ম্বরপূর্ণ ইমারত নির্মাণ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, কবরের নিকটে মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ। রসুল স. কবরকে মসজিদ বানাতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু তিনি স. কবরের পাশে মসজিদ বানাতে নিষেধ করেননি। আর ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে তিনি অভিশপ্ত বলেছেন একারণে যে, তারা কবরকে সেজদা করতে শুরু করেছিলো। একথা সন্দেহাতীতরূপে সত্য যে, কবরকে সেজদা করা হারাম। হজরত আবু মুরছাদ গুনুবী থেকে মুসলিম কর্তৃক সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা কবরের উপরে উপবেশন কোরো না এবং কবরের দিকে মুখ করে নামাজও পাঠ কোরো না।

এর পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে কেউ কেউ বলে, তারা ছিলো তিন জন, তাদের চতুর্থটি ছিলো তাদের কুকুর। এবং কেউ কেউ বলে, তারা ছিলো পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিলো তাদের কুকুর। আবার কেউ কেউ বলে, তারা ছিলো সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিলো তাদের কুকুর।'

উল্লেখ্য যে, রসুল স. এর সময়ে আসহাবে কাহফের সংখ্যা নিয়ে শুরু হয়েছিলো তুমুল বিতর্ক। কেউ কেউ বলতো, তারা ছিলো তিনজন এবং তাদের সঙ্গে ছিলো একটি কুকুর। কেউ কেউ বলতো, পাঁচজন ছিলো তারা। আর কুকুরটি ছিলো ষষ্ঠ। কেউ কেউ আবার বলতো, না; মোটমাট তারা ছিলো আটজন— সাতজন যুবক ও একটি কুকুর। বলা বাহুল্য যে, এসকল মন্তব্য ছিলো সম্পূর্ণতই অনুমান নির্ভর। তাদের মতামতের পক্ষে কারো কাছেই কোনো প্রমাণ ছিলো না।

বাগবী লিখেছেন, নাজরানে বাস করতো ইয়াকুবিয়া ও নাসতুরিয়া সম্প্রদায়ের খৃষ্টানেরা। ওই সম্প্রদায়ভূত সাইয়েদ ও আকেব একবার রসুল স. এর দরবারে আসহাবে কাহফ সম্পর্কে আলোচনা তুললো। সাইয়েদ বললো, তারা ছিলো তিনজন এবং তাদের চতুর্থটি ছিলো তাদের কুকুর। আকেব বললো, না। তারা ছিলো পাঁচজন এবং তাদের ষষ্ঠটি ছিলো তাদের কুকুর। আলোচ্য আয়াতাংশে ওই দু'জনের উক্তিই উল্লেখ করা হয়েছে।

'রজমুন' অর্থ তীর নিক্ষেপ করা। 'আলগইব' অর্থ অদৃশ্য। এভাবে এখানে বলা হয়েছে, আসহাবে কাহফ সম্পর্কে খৃষ্টানদের বর্ণিত উক্তি শূন্যে তীর নিক্ষেপ করা বা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো। এভাবে অনুমানের মাধ্যমে সত্যোদ্ধার করা যায় না। উল্লেখ্য যে আসহাবে কাহফ সম্পর্কে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানেরাও অনুমানের ভিত্তিতে তাঁদের সংখ্যা নিরূপণ করতে শুরু করে দিলেন। সে কথাই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— 'আবার কেউ কেউ বলে, তারা ছিলো সাতজন আর অষ্টমটি ছিলো তাদের কুকুর।

www.eelm.weebly.com

'ওয়া ছামিনুহুম কালবুহুম' (অষ্টমটি ছিলো তাদের কুকুর) কথাটি এখানে গুণবাচক, যা 'সাব্‌আতুন' (সাত) এর সিফাত বা বৈশিষ্ট্য। সিফাত সবসময় তার মওসুফের (বিশেষ্যের) সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। এভাবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— অষ্টমটি ছিলো তাদের কুকুর।

কোনো কোনো আলেম ধারণা করেন, এখানে 'ওয়া ছামিনুহুম কালবুহুম' কথাটির 'ওয়া' (এবং) অব্যয়টি বস্তুবাচক। আরববাসীদের রীতি হচ্ছে তাঁরা সাত সংখ্যা গণনা পর্যন্ত কোনো সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করেন না। সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করেন আট সংখ্যা থেকে। যেমন — এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত এবং আট। কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে— আত্তাইবুনা, আলআবিদূনা, আলহামিদূনা, আস্‌সা-ইহুনা, আর্‌রকিউনা, আস্‌সাজিদূনা, আলআমিরূনা বিল মা'রূফ ওয়ান্‌ নাহুনা আনিল মুনকার। এখানে অষ্টম কথাটির (ওয়ান্‌নাহুনা আনিল মুনকার) কথাটির পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে 'ওয়াও' বা এবং। অন্যত্র উল্লেখিত হয়েছে— মুসলিমাতুন-মু'মিনাতুন-ক্বানিতাতুন-তাইবাতুন-আবিদাতুন-ছাইহাতুন-সায়্যিবাতিঁওয়া আব্‌কারা। এখানে শেষোক্ত (অষ্টম) শব্দটির পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে 'ওয়াও' বা এবং।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা ভালো জানেন; তাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানেন।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল বচসাপ্রবণ খৃষ্টানদেরকে বলুন, আসহাবে কাহফের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে তোমাদের সম্প্রদায়ের অল্প কয়েকজন মাত্র। আর মুসলমানদেরও কেউ কেউ আমার মাধ্যমে তাদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে অবগত।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি ওই স্বল্প সংখ্যক লোকদের মধ্যে একজন, যে আসহাবে কাহফের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত। তাঁরা ছিলেন সাতজন। বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন ইবনে জারীর, ফারইয়াবী প্রমুখ। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তাঁরা ছিলেন সাতজন এবং তাঁদের অষ্টমটি ছিলো তাঁদের কুকুর।

বায়যাবী লিখেছেন, আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে তিন রকম উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয় প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে একথা বলে যে, 'অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে কেউ কেউ বলবে।' কিন্তু শেষোক্ত উক্তিটিকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। সুতরাং 'তারা ছিলো সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিলো তাদের 'কুকুর' এই উক্তিটিই যথার্থ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই সাতজন আসহাবে কাহফের নাম হচ্ছে— মাকসালমীনা, তামলিখা, মারতুনাস, সানুনাস, সারিনুনাস,

www.eelm.weebly.com

জুনায়াস, কাআস্ ও তাতীয়ুনাস। শেষোক্তজন ছিলেন রাখাল। তিনি তাঁদের দলভুক্ত হয়েছিলেন পরে। যথাযথসূত্রে তিবরানী তাঁর আওতাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, শায়েখ ইবনে হাজার তাঁর শরহে বোখারী পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, বর্ণিত নামগুলো সম্পর্কে রয়েছে অনেক মতভেদ। সুতরাং তা সর্বজনগ্রাহ্য নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক কোরো না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আসহাবে কাহফের সংখ্যা নিরূপণের প্রসংগটিকে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করবেন না। কোথাও এ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বিভিন্ন রকম মন্তব্য শুনেও এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সমাধান দেয়ার ব্যাপারে ব্যগ্র হবেন না। বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যাবশ্যকীয় কিছু নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক পরিহার্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের কাউকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ কোরো না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আসহাবে কাহফের সংখ্যা ও তাদের কাহিনী সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে আপনাকে যতটুকু জানানো হলো তাই-ই যথেষ্ট। আর এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে অন্য কেউই বেশী জানে না। সুতরাং অন্য কাউকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিরর্থক। তাছাড়া স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে নির্জবাব করে দেয়াও আপনার কাজ নয়। অযথা কাউকে বিব্রত করাও আপনার মহান মর্যাদার পক্ষে শোভন নয়।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. একবার 'ইনশাআল্লাহ্ ' না বলেই কোনো এক বিষয়ে অঙ্গীকার করেছিলেন। ফলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁর নিকটে কোনো প্রত্যাদেশ এলো না। প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো চল্লিশ দিন পর এভাবে—

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْیٴٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۙ اِلَّآ اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ ۫ وَ
اذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِیْتَ وَقُلْ عَسٰٓی اَنْ یَّهْدِیَنِ رَبِّیْ لِاَقْرَبَ
مِنْ هٰذَا رَشَدًا ۞ وَلَبِثُوْا فِیْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِیْنَ وَازْدَادُوْا
تِسْعًا ۞ قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

www.eelm.weebly.com

أَبۡصِرۡ بِهِۦ وَأَسۡمِعۡۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيّٖ وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ
أَحَدٗا ۝ وَٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَۖ لَا مُبَدِّلَ
لِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلۡتَحَدٗا ۝ وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ
ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ
وَلَا تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَا تُطِعۡ
مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا ۝

❒ কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলিও না, "আমি উহা আগামী কাল করিব,

❒ 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে' এই কথা না বলিয়া।" যদি ভুলিয়া যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করিও ও বলিও, 'সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে গুহাবাসীর বিবরণ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করিবেন।'

❒ উহারা উহাদিগের গুহায় ছিল তিনশত বৎসর, আরও নয় বৎসর।

❒ তুমি বল, 'তাহারা কত কাল ছিল তাহা আল্লাহ্ই ভাল জানেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁহারই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা। তিনি ব্যতীত উহাদিগের অন্য কোন অভিভাবক নাই। তিনি কাহাকেও নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না।

❒ তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব আবৃত্তি কর। তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করিবার কেহই নাই। তুমি কখনই তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাইবে না।

❒ তুমি নিজকে রাখিবে উহাদিগেরই সংসর্গে যাহারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে উহাদিগের প্রতিপালককে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করিয়া উহাদিগ হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইও না। যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, যে তাহার খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে ও যাহার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তাহার আনুগত্য করিও না।

www.eelm.weebly.com

এখানকার প্রথমোক্ত আয়াতের বক্তব্য প্রলম্বিত হয়েছে পরবর্তী আয়াত (২৪) পর্যন্ত। বলা হয়েছে 'কখনোই তুমি কোনো বিষয়ে বোলো না, আমি এটা করবো আগামীকাল, 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে' এ কথা না বলে।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! 'ইনশাআল্লাহ্' উচ্চারণ ব্যতিরেকে আপনি এরকম কখনো বলবেন না যে, আমি এই বিষয় সম্পর্কে আগামীকাল বলবো অথবা এই কাজ আগামীকাল করবো।

ইবনে মুনজির মুজাহিদ সূত্রে বলেছেন, মদীনার ইহুদীরা মক্কার কুরায়েশদের প্রেরিত দূতকে বলেছিলো, তোমরা নবুয়তের দাবি উত্থাপনকারী লোকটিকে রূহ, আসহাবে কাহ্ফ ও জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে দেখো। কুরায়েশেরা তাই করলো। রসুল স. বললেন, আমি আগামীকাল তোমাদের প্রশ্নের জবাব দিবো। কিন্তু এ কথা বলার সময় তিনি 'ইনশাআল্লাহ্' উচ্চারণ করলেন না। রসুল স. ভেবেছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করে তিনি কুরায়েশদের প্রশ্নের জবাব দিবেন। কিন্তু পরদিন কোনো প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো না। এভাবে দশ দিন অপেক্ষা করেও কোনো প্রত্যাদেশ না পেয়ে তিনি স. অস্থির হয়ে পড়লেন। এদিকে কুরায়েশেরা বলতে শুরু করলো, তুমি মিথ্যাবাদী। এমতাবস্থায় দশদিন পর অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। এই সুরার প্রারম্ভে এ প্রসঙ্গে আমি ইবনে জারীরের একটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি। আর সুরা বানী ইসরাইলের 'ওয়া ইয়াসআলুনাকা আ'নির্‌রূহ্' আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশেও আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ওই দুই স্থানেও রসুল স.কে 'ইনশাআল্লাহ্' উচ্চারণ ব্যতিরেকে কোনো অঙ্গীকার করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব এ কথা অনস্বীকার্য যে, দৃঢ়ভাবে কোনো কথা বলা বা কাজ করার ইচ্ছা করলে সেই ইচ্ছার সঙ্গে ইনশাআল্লাহ্ বলে আল্লাহ্র ইচ্ছাকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি ভুলে যাও, তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কোরো।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি যদি ইনশাআল্লাহ্ ছাড়া কোনো কথা বা কাজের ঘোষণা দেন, তবে আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসার বর্ণনা এবং ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করবেন। অথবা এমতো অনবধনতার কারণে আল্লাহ্র বিরাগভাজনতার কথা স্মরণ করে অনুতপ্ত হবেন। কিংবা এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্কে স্মরণ করবেন যেনো তিনি আপনার বিস্মৃতিপ্রবণতাকে দূর করে দেন এবং আপনার স্মরণশক্তিকে করে দেন প্রখর।

ইকরামা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে এই মর্মে সদুপদেশ দেয়া হয়েছে, যখন তোমরা রাগান্বিত হও তখন আল্লাহ্কে স্মরণ কোরো। ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, ইঞ্জিল শরীফে উল্লেখিত হয়েছে— হে আদম সন্তান! তোমরা

www.eelm.weebly.com

রোষ প্রভাবিত হলে আমাকে স্মরণ কোরো (তাহলে রোষ প্রশমিত হবে)। এরকম করলে আমার রোষতপ্ত অবস্থায়ও আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো (ক্ষমা করবো তোমাদের অপারগতাকে)। জুহাক এবং সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনাটি নামাজের হুকুমের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে— 'নামাজের মধ্যে যখন তোমরা কোনো করণীয় আমলের কথা ভুলে যাও, তবে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কোরো'। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— নামাজ পাঠের কথা যদি তোমরা ভুলে যাও, তবে স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নামাজ আদায় করে নিয়ো। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যে ব্যক্তি নামাজ পড়তে ভুলে যায়, সে যেনো স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আদায় করে নেয়। বাগবী, বোখারী, মুসলিম, আহমদ, তিরমিজি। নাসাঈর বর্ণনায় বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— বিস্মৃতি অথবা নিদ্রার কারণে যদি কারো নামাজ যথাসময়ে পঠিত না হয়, তবে তার কর্তব্যকর্ম হচ্ছে, স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তার বাদ পড়ে যাওয়া নামাজ আদায় করে নেবে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, যে ব্যক্তি বিতির নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে যায় অথবা বিতির পড়তে ভুলে যায়, সে যেনো ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে অথবা স্মৃতি জাগ্রত হওয়ার পরক্ষণেই তার পরিত্যক্ত নামাজ পাঠ করে নেয়। আহমদ এবং হাকেম একে বিশুদ্ধ বলেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মুজাহিদ ও হাসান বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকম— ইনশাআল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলে, পরে যখনই স্মরণ হবে, তখনই ইনশাআল্লাহ্ বলে নিতে হবে। এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই বলেছেন, ভুলে যাওয়া 'ইনশাআল্লাহ্'র কথা এক বছর পরেও স্মরণ হলে 'ইনশাআল্লাহ্' পড়ে নেয়া জায়েয, যদি এর মধ্যে অঙ্গীকৃত কথার বিপরীত কিছু না করা হয়। এই অভিমতের সমর্থনে ইবনে মারদুবিয়াও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে একটি বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দশদিন অথবা চল্লিশ দিন পরে আল্লাহ্ কর্তৃক স্মরণ করিয়ে দেয়া মাত্র রসুল স. 'ইনশাআল্লাহ্' পড়ে নিয়েছিলেন।

প্রখ্যাত ফেকাহ্‌বিদগণের অভিমত আবার হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতের বিপরীত। তাঁদের মতে অভিন্ন কোনো বাক্যের পরের অংশ যদি প্রথমাংশের বক্তব্যের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করে, তাহলে বাক্যটি পৃথকভাবে উচ্চারণ করা যাবে না। অর্থাৎ বাক্যটিকে উচ্চারণ করতে হবে সম্মিলিতভাবে। যেমন কোনো ঘরের মধ্যে জায়েদ বললো, ওমরের কাছে আমার এতো টাকা পাওনা আছে। তারপর ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে বললো, কিন্তু ওমর যদি এর বদলে আমাকে

www.eelm.weebly.com

অমুক বস্তু দিয়ে দেয়.....। অথবা সে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার দুই ঘণ্টা পর কিংবা তার গোলাম আজাদ করার তিন ঘণ্টা পর কোনো শর্ত আরোপ করে তালাক ও আজাদ করাকে অকার্যকর করে দিলো। এরকম বিলম্বিত শর্ত সংযোজন অসিদ্ধ। কারণ জায়েদ আবার পরের দিন অন্য কোনো শর্তও আরোপ করতে পারে। এভাবে কখনোই বোঝা যাবে না যে, তার কোন কথাটা সত্য— আগেরটা, না পরেরটা। এ সম্পর্কে এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। ঘটনাটি এই— ... খলিফা আল মনসুরকে একজন লোক এইমর্মে সংবাদ দিলো যে, ইমাম আবু হানিফা আপনার পিতামহ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বিপরীত ফতওয়া দিয়ে থাকেন। বলে থাকেন ইনশাআল্লাহ্ বলতে হবে উচ্চারিত বাক্যের সঙ্গে সম্মিলিতরূপে। পরে ইনশাআল্লাহ্ বললে তা গ্রহণীয় হবে না। একথা শুনে খলিফা আল মনসুর ইমাম আবু হানিফাকে ডেকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। ইমাম আবু হানিফা বললেন, হজরত ইবনে আব্বাসের ফতওয়াতো আপনারও বিরুদ্ধে যায়। আপনি প্রজা সাধারণের নিকট থেকে আনুগত্যের অংগীকার গ্রহণ করেন। অঙ্গীকার করে যদি তারা আপনার দরবার ত্যাগ করার পর ইনশাআল্লাহ্ (যদি আল্লাহ্ চান) বলে, তবে কি তা গ্রহণযোগ্য হবে? খলিফা আল মনসুরের নিকট বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেলো। তিনি ইমাম আবু হানিফার অভিমতকেই গ্রহণ করলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে উস্কানিদাতাকে বের করে দিলেন দরবার থেকে।

এখন বাকী রইল আর একটি কথা। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, রসুল স. ইনশাআল্লাহ্ বলেছিলেন অনেক পরে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। কিন্তু কথাটির মাধ্যমে এটা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না যে, তিনি ইনশাআল্লাহ্ বলেছিলেন তাঁর দশদিন বা চল্লিশদিন পূর্বের বাক্যের সংযোজকরূপে। বরং একথা বলাই যুক্তি সঙ্গত যে, তিনি স. তখন ইনশাআল্লাহ্ বলেছিলেন এই অর্থে— ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ্ বলার এই হুকুম তিনি অবশ্যই পালন করে যাবেন।

সুফিয়ানে কেরাম আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এক সারগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের মতে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরূপ— যখন তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল কিছুর কথা ভুলে যাও, তখন আল্লাহ্র কথা স্মরণ কোরো বিশুদ্ধ অন্তরে। তাঁরা আরো বলেন গাইরুল্লাহ্র স্মরণ থেকে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিশুদ্ধ হৃদয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করা যায় না। কারণ মানুষের হৃদয় একটিই। সুতরাং একথা কিছুতেই বলা যায় না যে, হৃদয়ে একই সঙ্গে জাগ্রত থাকবে আল্লাহ্ এবং গাইরুল্লাহ্র স্মরণ। হৃদয়কে যদি আল্লাহ্র ভালোবাসায়

www.eelm.weebly.com

সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করা যায়, তাহলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও রঞ্জিত হবে আল্লাহ্র ভালোবাসা ও স্মরণে। এই অবস্থার নাম আত্মবিনাশন বা ফানায়ে কলব। এই ফানায়ে কলব অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সুফিয়ানে কেরাম কাউকে তওহীদপন্থী বা এক আল্লাহ্র ইবাদতকারী মনে করেন না। আমি বলি, সুফিয়ানে কেরামের ব্যাখ্যাই কোরআন মজীদের স্পষ্ট বর্ণনা ও আরবী ব্যাকরণ এবং অভিধানের অনুকূল। দেখুন, এখানে প্রথমে বলা হয়েছে, 'যদি ভুলে যাও'। তারপর বলা হয়েছে 'তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কোরো'। এভাবে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, বিস্মরণ ও স্মরণ বিপরীত ধর্মী দু'টি বিষয়। এ দু'টোর একত্রায়ন হওয়া সম্ভবই নয়। সুতরাং এ দু'টো ক্রিয়ার একটিকে পরোক্ষ অর্থে এবং আরেকটিকে প্রত্যক্ষ অর্থে গ্রহণ করতে হবে, যেনো কোনো অবাস্তব অর্থ গ্রহণ করতে না হয়। সুতরাং এ কথা মানতেই হবে যে, এ ক্ষেত্রে সুফিয়ানে কেরামের বক্তব্য বাস্তবচিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বোলো, সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে গুহাবাসীর বিবরণ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! ইনশাআল্লাহ্ বলা অথবা আল্লাহ্র কোনো হুকুম পালনের কথা যদি আপনি কখনো ভুলে যান, তবে আপনি তসবিহ্ পাঠ করবেন, ইসতেগফার করবেন এবং একথা বলবেন যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ্ আমাকে এমন কিছুর দিকে পথ-নির্দেশ করবেন, যা হবে বিস্মৃত বাক্য অথবা কর্ম অপেক্ষা উত্তম। এখানে 'আক্বরাবু' এবং 'রাশাদা' কথা দু'টোর মাধ্যমে সেই উত্তমতর পথ-নির্দেশের কথাই বলা হয়েছে।

কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, অবশেষে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রসুলকে কুরায়েশদের প্রশ্নের জবাবরূপে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আসহাবে কাহফের ঘটনা জানালেন। সবশেষে একথাটিও জানিয়ে দিলেন যে, আসহাবে কাহফের ঘটনার চেয়েও অনেক উত্তম ও বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী আল্লাহ্ তাঁর নবী-রসুলগণকে দান করেছেন। আর বিশেষ করে শেষ রসুলকে দান করেছেন অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক বিস্ময়কর তত্ত্ব ও তথ্যাবলী। কোনো কোনো আলেম আবার লিখেছেন, এখানে আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে এবং রসুলের মাধ্যমে সকল বিশ্বাসীকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ইনশাআল্লাহ্ বলা ভুলে গেলে যখনই একথা স্মরণ হবে, তখনই ইনশাআল্লাহ্ বলে নিতে হবে। ভুলের জন্য হতে হবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত। এমতো আশাও অন্তরে পোষণ করতে হবে যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ্ আমাদেরকে আমাদের বিস্মৃত বিষয় অপেক্ষা অধিকতর উত্তম কোনো কল্যাণ দান করবেন। লজ্জা ও অনুতাপের বিনিময়ে দান করবেন তাঁর বিশেষ নৈকট্য।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'তারা তাদের গুহায় ছিলো তিনশত বছর, আরো অধিক নয় বছর ।' উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে একাদশ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছিলো 'অতঃপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম।' তারপর এই আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হলো যে, আসহাবে কাহফ পর্বত গহ্বরে নিদ্রাভিভূত হয়েছিলেন তিনশত নয় বছর।

খৃষ্টানেরা বলতো, আসহাবে কাহফ গুহায় নিদ্রিত অবস্থায় কাটিয়েছিলেন তিনশত নয় বছর। তাদের অভিমতটিই আলোচ্য আয়াতে অবিকল উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতের (২৬) শুরুতে এভাবে— 'তুমি বলো, তারা কতকাল ছিলো তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন।' এরকম না হলে আলোচ্য আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতের উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে কিছুতেই সামঞ্জস্য সাধিত হয় না।

আমি বলি, প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই সঠিক। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত উক্তি খৃষ্টানদের নয়, আল্লাহ্র। আর পরবর্তী আয়াতে উদ্ধৃত বাক্যটির উদ্দেশ্য হবে এখানে এরকম— আসহাবে কাহফ তাদের গুহায় তিনশত নয় বছর ঘুমিয়েছিলেন। এই তথ্যটিই সকলকে মেনে নিতে হবে। কারণ এটা প্রত্যা-দেশিত। এরপরেও যদি কেউ এ নিয়ে বিবাদ উপস্থিত করে, তবে হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে একথা জানিয়ে দিন যে, তারা কতকাল ছিলো তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। সুতরাং অযথা বিবাদ বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়ার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, ইহুদী ও খৃষ্টানেরা মনে করতো, আসহাবে কাহফ গুহায় প্রবেশ করার সময় থেকে রসুল স. এর জামানা পর্যন্ত অতিবাহিত হয়েছে তিনশত নয় বছর। তাদের ওই অপধারণাকেই পরবর্তী আয়াতে নাকচ করে দেয়া হয়েছে এভাবে— 'তারা কতকাল ছিলো তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন।'

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মারদুবিয়া এবং জুহাক সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, প্রথমে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো এভাবে— 'তারা তাদের গুহায় ছিলো তিনশত বছর।' সাহাবীগণ তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কথাটির প্রকৃত অর্থ কী? তিন বছর না তিন মাস। তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয় বর্তমানরূপে। অর্থাৎ 'আরো নয় বছর' কথাটি যুক্ত হয়ে।

এ সম্পর্কে কালাবী বলেছেন, আলোচ্য আয়াত শুনে নাজরানের খৃষ্টানেরা বলেছিলো, আমরা জানতাম তিন শ' বছরের কথা। অতিরিক্ত নয় বছরের কথা আমরা জানতাম না। তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

এর পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'তুমি বলো, তারা কতকাল ছিলো তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন।' বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, সৌর বৎসরের হিসেবে আসহাবে কাহফ নিদ্রিত ছিলেন তিনশত বছর। আর চান্দ্র

www.eelm.weebly.com

বৎসরের হিসেবে তিনশত নয় বছর। একশত সৌর বৎসর অতিবাহিত হলে চান্দ্র বৎসর অতিবাহিত হয় একশত তিন বৎসর। এই হিসেবে তিনশত সৌর বৎসর হয় তিনশত নয় চান্দ্র বৎসর। অতএব বুঝতে হবে, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে চান্দ্র বৎসরের হিসাব।

এরপর বলা হয়েছে— 'আকাশ ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁর-ই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। তাই তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কিছু জানেন। সেই সঙ্গে তিনি সকল কিছু দেখেন ও শোনেন। কেননা তিনিই প্রকৃত অর্থে সর্বোত্তম শ্রোতা ও দ্রষ্টা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি ব্যতীত তাদের অন্য কোনো অভিভাবক নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না।' একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালাই সমগ্র সৃষ্টির একক ও অবিসংবাদিত অভিভাবক। সকল কিছুর উপরে তাঁর কর্তৃত্ব ও অধিকার নিরঙ্কুশ। তাঁর এই নিরঙ্কুশতার মধ্যে অন্য কারো কোনো প্রকার অংশীদারিত্ব নেই। হওয়া সম্ভবও নয়।

রসুল স. প্রথমে আসহাবে কাহফের বিষয়ে কিছুই জানতেন না। তাঁকে বিষয়টি জানানো হয়েছিলো প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। ফলে এ সম্পর্কিত আয়াতগুলো হয়ে গেলো তাঁর ও কোরআনের একটি মোজেজা। তাই কোরআনের অন্যান্য আয়াতের মতো এতদসংক্রান্ত আয়াতগুলোকেও অনুরাগ ভরে আবৃত্তি করার নির্দেশ দেয়া হলো। পরবর্তী আয়াতে ঘটেছে সেই নির্দেশের প্রতিফলন।

এর পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদৃষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব আবৃত্তি করো। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করবার কেউই নেই।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ এই মহাগ্রন্থ আপনি আন্তরিক অনুরাগ ভরে পাঠ করুন এবং এর নির্দেশানুসারে জীবন-যাপন করুন। আর ওই সকল লোকের কথায় ভ্রূক্ষেপ করবেন না, যারা কোরআনের মধ্যে সন্দেহের অনুপ্রবেশ ঘটাতে চায় অথবা পরিবর্তন করতে চায় এর বাণী ও মর্ম। নিশ্চিত জানবেন, শত সহস্র কৌশল ও ক্ষমতা প্রয়োগ করেও একক অথবা সম্মিলিতভাবে কেউ কোনো দিনও আল্লাহ্র এই চিরন্তন বাণীকে কিছুমাত্র পরিবর্তন করতে পারবে না। কারণ এই কোরআন হচ্ছে মহানিসর্গের একক স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালার আনুরূপ্যবিহীন বাণী। আর আল্লাহ্র বাণী অপরিবর্তনীয়। 'তার বাক্য পরিবর্তন করবার কেউই নেই' কথাটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে— এই কোরআনে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তি সম্পর্কে যে বিবরণ দেয়া হয়েছে, সেই শাস্তি পরিবর্তন করবার কেউই নেই। সুতরাং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আখেরাতে অথবা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে শাস্তি ভোগ করতে হবেই।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি কখনোই তাঁকে ব্যতীত অন্য কোনো আশ্রয় পাবে না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোথাও কারো কোনো আশ্রয়স্থল নেই। সুতরাং এই মুহূর্তে তোমরা আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশাদিকে সর্বান্তকরণে কবুল করে নাও।

এর পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'তুমি নিজেকে রাখবে তাদেরই সংসর্গে, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।' এখানে 'ওয়াস্বির নাফসাকা' কথাটির অর্থ— নিজেকে আবদ্ধ রাখবেন। 'বিলগাদাতি ওয়ালআশিয়্যি' অর্থ সকাল ও সন্ধ্যায়। অর্থাৎ সকল সময়। 'ইউরিদূনা' অর্থ ইবাদতের উদ্দেশ্যে বা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে। আর এখানকার 'ওয়াজহাহু' শব্দটির 'ওয়াজহুন' হচ্ছে অতিরিক্ত। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'ওয়া ইয়াব্ক্বা ওয়াজহু রব্বিকা'। এখানকার 'ওয়াজহু' শব্দটিও অতিরিক্ত। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি নিজেকে ওই সকল লোকের সংসর্গে আবদ্ধ রাখবেন, যারা সকল সময় দুনিয়া ও আখেরাতের কোনো ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে কেবল আল্লাহ্র পরিতোষ লাভার্থে আল্লাহ্র স্মরণে মগ্ন থাকে।

বাগবী লিখেছেন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উয়াইনা বিন হোসাইন ফাজরীকে কেন্দ্র করে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সে একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলো। তখন কতিপয় নিঃস্ব সাহাবী বসেছিলেন তাঁর নিকটে। হজরত সালমান ফারসীও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। ছোট একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে উপবিষ্ট ছিলেন তিনি। উয়াইনা বললো, মোহাম্মদ! এদের ঘামের গন্ধে কি আপনার কষ্ট হয় না? আমি তো মুজার গোত্রের সরদার। আমি ইসলাম গ্রহণ করলে আমার গোত্রের সকল লোক আমাকে অনুসরণ করবে। কিন্তু আমিতো এরকম নোংরা লোকের পাশে বসতে পারবো না। যদি আপনি এদেরকে অন্যত্র গমনের নির্দেশ দেন, তবেই কেবল আমার পক্ষে আপনার সান্নিধ্যে উপবেশন করা সম্ভব। তার এমতো অপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

কাতাদা বলেছেন 'যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে' বলে এখানে বোঝানো হয়েছে আসহাবে সুফ্ফাকে। সর্বহারা ছিলেন তাঁরা। রসুল স. তাঁদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মসজিদের বারান্দার এক কোণে। তাঁদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে সাতশত পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। ওই নিঃস্ব সাহাবীবৃন্দ সারাক্ষণ জিকির আযকারের মাধ্যমে সময় কাটাতেন। এক ওয়াক্তের নামাজ শেষে প্রতীক্ষা করতেন পরবর্তী ওয়াক্তের নামাজের। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল

www.eelm.weebly.com

স. বলেছিলেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন পুণ্যবান লোক সৃষ্টি করেছেন, যাদের সংসর্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে। এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি সুরা আনআমের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না।' একথার অর্থ— এবং হে আমার রসুল! সম্পদশালীদেরকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে আপনি আপনার আল্লাহ্‌ অন্তপ্রাণ নিঃস্ব সহচরবৃন্দদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না। বিত্তহীন পুণ্যবানদের চেয়ে পুণ্যবিবর্জিত বিত্তশালীদেরকে প্রদান করবেন না অধিক গুরুত্ব।

এরপর বলা হয়েছে— 'যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে, তুমি তার আনুগত্য কোরো না।'

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যে দেয়া হয়েছে উয়াইনার বিবরণ। বলা হয়েছে, হে আমার রসুল! আমি উয়াইনার চিত্তকে আমার স্মরণ থেকে বঞ্চিত করেছি। সে তার প্রবৃত্তিজাত খেয়ালের অনুসারী এবং তার কার্যকলাপ সীমালংঘনের দায়ে দুষ্ট। অতএব আপনি তার কথায় আকৃষ্ট হবেন না। কিন্তু ইবনে মারদুবিয়া ও জুহাকের বর্ণনায় এসেছে আলোচ্য বাক্যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে উমাইয়া বিন খালফ জামুহীর। সে একবার রসুল স.কে বলেছিলো, মোহাম্মদ! তোমার দরিদ্র সহচরদের দূর করে দিয়ে তদস্থলে বসাও মক্কার নেতৃবৃন্দকে। বলা বাহুল্য যে, তার এরকম গর্হিত বক্তব্য আল্লাহ্‌ পছন্দ করেননি। সে কথা জানিয়ে দেয়ার জন্যই তিনি অবতীর্ণ করেছেন আলোচ্য আয়াত। ইবনে বুরাইদার বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন হজরত সালমান ফারসী। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো উয়াইনা। বললো, আমরা যারা অভিজাত, তারা আপনার নিকটে উপবেশন করার অভিলাষী। তাই আপনি ওই অনভিজাতদের তাড়িয়ে দিন। তখন অবতীর্ণ হলো— যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি .... । আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, অভিজাত নেতৃবৃন্দের আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে হবে দু'টি কারণে। ১. তাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ প্রাপ্তির ন্যূনতম অনুরাগও তাদের হৃদয়ে নেই। ২. তারা অনুসরণ করে তাদের প্রবৃত্তির এবং তাদের কার্যকলাপ অতিক্রম করে শরিয়তের সীমানা। উল্লেখ্য যে, পার্থিব প্রতাপ ও বংশমর্যাদার অহংকার দূর না করা পর্যন্ত আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রসুলের নৈকট্য লাভ করা যায় না। সুতরাং যাদের কলব আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল এবং যারা নফসের একনিষ্ঠ অনুসারী, তাদের অনুসরণ নিষিদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

মুতাজিলারা বলে, আল্লাহ্ কেবল শুভকর্মের স্রষ্টা, মন্দ কর্মের নয়। কিন্তু এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, 'যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি'। এতে করে বুঝা যায়, আল্লাহ্তায়ালা শুভ-অশুভ সকল কর্মের একক সৃজয়িতা। এরকম না বলা হলে একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে এবং তা অবশ্যই হবে স্পষ্টতঃ অংশীবাদিতা বা শিরিক। তাই বিশুদ্ধ বিশ্বাস বহনকারী আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলেন, একাধিক সৃজকের অস্তিত্ব যেহেতু অসম্ভব, তাই একথা মেনে নিতেই হবে যে, আল্লাহ্তায়ালা ভালো ও মন্দ সকল কাজের একক স্রষ্টা।

লক্ষণীয় যে, পরক্ষণেই আবার বলা হয়েছে, 'যে তার খেয়াল খুশির অনুসরণ করে'। এতে করে বুঝা যায়, বান্দাগণ তাদের কর্মের নির্মাতা। তারা জড় পদার্থতুল্য নয়। তাই বলতে হয়, সৃজন আল্লাহ্র, কিন্তু নির্মাণ মানুষের। তাই তারা পুরোপুরি অকর্মণ্য যেমন নয়, তেমনি নয় সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারা আপনাপন কর্মের জন্য সে কারণেই দায়ী। কেননা সৃষ্টি আল্লাহ্র হলেও অর্জন বান্দার।

'ফুরূত্বা' অর্থ দ্বিয়্যাআ (বিনষ্ট) অর্থাৎ ধ্বংস করা বা নষ্ট করা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যারা আল্লাহ্র স্মরণে অমনোযোগী এবং যারা প্রবৃত্তির অনুসারী, তাদের কার্যকলাপ নিষ্ফল (ফুরূত্বা)। কেউ কেউ বলেছেন এখানে ফুরূত্বা শব্দটির অর্থ লজ্জাজনক। মুকাতিল এবং আখফাস বলেছেন, সীমাতিক্রম। কেউ কেউ বলেছেন, বাতিল বা বরবাদ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সত্যের বিপরীত। ফার্‌রা অর্থ করেছেন, পরিত্যক্ত। বায়যাবী লিখেছেন, সত্যকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী। যে অশ্ব অন্য সকল অশ্বকে পিছনে ফেলে অতি দ্রুত অগ্রসর হয়, তাকে বলে 'ফারাসুন ফুরুত্বুন'। আর 'ফারাত্বুন' বলা হয় সম্মুখবর্তী তাঁবু ও সকল অগ্রণীকে। এই 'ফারাত্বুন' থেকেই পরিগঠিত হয়েছে 'ফুরূত্বা'।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ২৯, ৩০, ৩১

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا

يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ

مُرْتَفَقًا ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ

www.eelm.weebly.com

اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۗ نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۚ

❒ বল, 'সত্য তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত; সুতরাং যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যাহার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।' আমি সীমা লঙ্ঘনকারীদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি অগ্নি, যাহার বেষ্টনী উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিবে। উহারা পানীয় চাহিলে উহাদিগকে দেওয়া হইবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যাহা উহাদিগের মুখমণ্ডল বিদগ্ধ করিবে, ইহা নিকৃষ্ট পানীয় ও অগ্নি কত নিকৃষ্ট আশ্রয়।

❒ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি তাহাদিগকে পুরস্কৃত করি, যে সৎকর্ম করে আমি তাহার শ্রমফল নষ্ট করি না;

❒ উহাদিগরেই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় উহাদিগকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হইবে, উহারা পরিধান করিবে সূক্ষ্ম ও স্থূল রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাসীন হইবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জনতাকে জানিয়ে দিন, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যা আসে, তা-ই চিরন্তন সত্য। মানুষের খেয়ালখুশিজাত কোনো চিন্তা বা দর্শন কখনো চিরন্তন সত্য নয়। সুতরাং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ কোরআন এবং আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রেরিত রসুল সত্য।

এরপর বলা হয়েছে— সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।' একথার অর্থ— অতএব মানুষ কী করবে, তা তারা নিজেরাই নির্ধারণ করুক। সত্য গ্রহণ করুক, অথবা করুক প্রত্যাখ্যান। আল্লাহ্‌র এতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কারণ কোনো বিষয়েই তিনি তাঁর সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে উয়াইনার অপপ্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সে রসুল স.কে এইমর্মে প্রস্তাব দিয়েছিলো, নিঃস্ব ও নোংরা লোকগুলোকে তাড়িয়ে দিলে আমি ও আমার গোত্রের লোকেরা আপনার বিশেষ

www.eelm.weebly.com

সান্নিধ্য ও ইসলাম গ্রহণ করতে পারি। তার ওই কথাকে প্রত্যাখ্যান করে এখানে স্পষ্টরূপে বলে দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণের বেলায় এরকম শর্ত করার অধিকার কারো নেই। ইসলামে অনুপ্রবেশ করতে হবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, স্বেচ্ছায়, শর্তবিহীনভাবে। যে এরকম করবে সে উপকৃত হবে। আর যে করবে না, সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি সীমালংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে।' ছোট ছোট কুড়ে ঘর ও তাঁবুর চতুষ্পার্শ্বে যে বেড়া দেয়া হয়, তাকে বলে 'সুরাদিক্ব'। নেহায়া প্রণেতা লিখেছেন, 'সুরাদিক্ব' বলে সকল প্রকার বেষ্টনীকে। শব্দটি মু'রাব (রূপান্তরক্ষম) এবং মুফরাদ (একবচন)। আরবীতে প্রথম দুই অক্ষরের পর আলিফ এবং আলিফের পর আবার দুই অক্ষর— এরকম শব্দ আরবী ভাষায় নেই। তাই শব্দটিকে রূপান্তরক্ষম একবচন শব্দ বলা হয়েছে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, শব্দটি 'সুরদাক্ব' এর বহুবচন।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, তিরমিজি ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, দোজখের বেষ্টনী বা প্রাচীর হবে চারটি। প্রতিটি প্রাচীর পুরু হবে দুই শত চল্লিশ বছরের পথের দূরত্বের সমান।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দোজখের প্রাচীরগুলো হবে আগুনের। কালাবী বলেছেন, ওই প্রাচীর বা বেড়াগুলো আসলে আগুনের প্রলেপ যা চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে রাখবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বেড়াগুলো হবে ধুম্র নির্মিত। এ সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'চলো তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে'।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়; যা তাদের মুখমণ্ডল বিদগ্ধ করবে।' হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, তিরমিজি, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হাব্বান, হাকেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দোজখীদের পানীয় হবে উত্তপ্ত তেলের গাদের মতো। ওই পানীয় মুখের কাছে নিলে খসে পড়বে মুখের চামড়া।

হজরত আবু উমামা থেকে আহমদ, তিরমিজি, নাসায়ী, হাকেম, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মুনজির, ইবনে আবীদ্ দুনইয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. দোজখীদের পানীয় সম্পর্কে বলেছেন, ওই উত্তপ্ত পানীয় তাদের সামনে নেয়া হলে তারা খুবই বিব্রত বোধ করবে। নিরুপায় হয়ে যখন মুখের কাছে আনবে, তখন মুখমণ্ডল ও মাথার চামড়া জ্বলে পুড়ে পড়ে যাবে। আর

www.eelm.weebly.com

তা পান করার সঙ্গে সঙ্গে নাড়িভুঁড়ি গলে বেরিয়ে যাবে পশ্চাদ্দার দিয়ে। আল্লাহ্ তাই এরশাদ করেছেন— 'তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল বিদগ্ধ করবে।'

ইবনে তালহার পদ্ধতিতে ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জাহান্নামীদের পানীয় হবে যয়তুন তেলের গাছের মতো কালো। তাঁর উক্তিরূপে আবার বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জাহান্নামীদের পানীয় হবে গাঢ়, যয়তুন তেলের তলানীর মতো। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়' বলে বুঝানো হয়েছে রক্ত ও পুঁজকে। অর্থাৎ নরকবাসীদের পানীয় হবে রক্ত ও পুঁজ, যা গলিত ধাতুর মতো।

হজরত ইবনে মাসউদকে একবার নরকবাসীদের পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি কিছু সোনা ও রূপা চেয়ে নিয়ে আগুনের উত্তাপে সেগুলোকে তরল করে ফেললেন এবং বললেন, নরকবাসীদের পানীয় হবে এরকম— গলিত ধাতুর মতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওই পানীয় কত নিকৃষ্ট পানীয় ও অগ্নি কতো নিকৃষ্ট আশ্রয়।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নিকৃষ্ট আশ্রয় বা আবাস বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'মুরতাফাক্বা' শব্দটি। মুজাহিদ বলেছেন, 'মুরতাফাক্বা' অর্থ সমাবেশ স্থল। আতা বলেছেন, আবাসস্থল। আর কুতাইবি বলেছেন, বৈঠকস্থল। 'ইরতিফাক্ব' অর্থ কনুই সোজা করে হাতের উপরে আরামে মুখ রাখা। তাই অভিধানগত ব্যাখ্যা হবে— এরকম আরামের স্থান, যেখানে কনুই সোজা রেখে আরামে হাতে মুখ বা মাথা রেখে বসা যায়। স্মর্তব্য যে, নরক কখনো আরামের স্থান নয়। কিন্তু স্বর্গকে আশ্রয়স্থল বললে নরককেও আশ্রয়স্থল বলতে হয় এবং স্বর্গ হচ্ছে উৎকৃষ্ট আশ্রয়স্থল। আর নরক নিকৃষ্ট। তাই এখানে বলা হয়েছে— অগ্নি কতো নিকৃষ্ট আশ্রয়।

পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি; যে সৎকর্ম করে আমি তার শ্রমফল নষ্ট করি না।'

শেষোক্ত আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'তাদের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।' এখানে 'আদনিন' অর্থ স্থায়ী বা স্থির। যেমন বলা হয়—'আদানাল মাউ বিল মাকানি' (পানি অমুক স্থানে গিয়ে স্থির হয়েছে)। এভাবে 'জান্নাতু আদনিন' বলে বুঝানো হয়েছে বিশ্বাসীদের ওই চিরস্থির বা চিরস্থায়ী আবাসস্থল বেহেশতকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে।' 'সিওয়ারুন' অর্থ কংকন। এর বহুবচন হচ্ছে 'আস্ওয়ারুন' বা 'আস্বিরাতুন'। আর বহুবচনের বহুবচন হচ্ছে 'আস্বীরাতুন'। শব্দটি এখানে এভাবেই উল্লেখিত

www.eelm.weebly.com

হয়েছে। লক্ষণীয় যে, 'আস্‌বিরাতুন' এবং 'জাহাব' (স্বর্ণ) শব্দ দু'টোকে এখানে বলা হচ্ছে নাকেরা বা অনির্দিষ্টবাচক। এমতো শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ওই স্বর্ণকংকনের সৌন্দর্য ও অলংকরণ হবে নয়নায়ত্তের অতীত। সৌন্দর্য চেতনারও ঊর্ধ্বে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিবরানী তাঁর আওসাত পুস্তকে এবং বায়হাকী উত্তম সূত্রপরম্পরায় উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অপেক্ষাকৃত কম উত্তম কোনো জান্নাতবাসীর আভরণের ওজন হবে সমগ্র পৃথিবীর সকল গহনাপত্রের চেয়ে বেশী।

আবু শায়েখ তাঁর 'আলউজমা' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, আল্লাহ্‌র এক ফেরেশতা তার জন্মলগ্ন থেকে নির্মাণ করে চলেছে জান্নাতবাসীদের অলংকার। তার এই নির্মাণকার্য চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। ওই অলংকার সমূহের যে কোনো একটি পৃথিবীতে আনা হলে তার জ্যোতিতে সূর্যকিরণ হয়ে যাবে নিষ্প্রভ ও বিবর্ণ।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও স্থূল রেশমের সবুজ বস্ত্র এবং সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কতো সুন্দর পুরস্কার ও কতো সুন্দর আশ্রয়স্থল।'

ইবনুস্‌ সুন্নী ও আবু নাঈম 'তিববুন্‌ নববী' নামক পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. পছন্দ করতেন সবুজ রঙ। এখানে 'সুন্‌দুস্‌' অর্থ পাতলা রেশমী বস্ত্র। আর 'ইস্‌তাবরাক্ব' অর্থ মোটা বা পুরু রেশমী পরিচ্ছদ। 'বাগবী লিখেছেন, জান্নাতীদের পোশাক স্থূল বা মোটা হওয়ার অর্থ সেগুলো বানানো হবে অত্যন্ত ঘনবদ্ধ ও মজবুতভাবে। ওমর হারবী বলেছেন, 'সুনদুস্‌' অর্থ ডোরা ডোরা দাগ কাটা পোশাক।

হজরত ইবনে ওমর থেকে উত্তম সূত্র পরম্পরায় নাসাঈ, আবু দাউদ, বায্‌যার ও বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, একবার জনৈক ব্যক্তি রসুল স. এর মহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! দয়া করে বলুন, জান্নাতীদের পোশাক কী ধরনের হবে— বুনানো, না সরাসরি আল্লাহ্‌র হুকুমে সৃষ্ট। লোকটির কথা শুনে এক ব্যক্তির হাসি পেলো। তিনি স. বললেন, এক অনবগত যদি এক অবগতকে প্রশ্ন করে, তবে কি তা হাস্যকর হয়? জান্নাতের পোশাক প্রস্তুতকৃত অবস্থায় নির্গত হবে জান্নাতের ফল থেকে। আবু ইয়ালী এবং তিবরানী আবুল খায়ের মুরছাদ বিন আবদুল্লাহর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের বলেছেন, জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে উদ্‌গত রেশম নিয়ে প্রস্তুত করা হবে জান্নাতীদের পোশাক।

www.eelm.weebly.com

এখানকার 'আলআরায়িকা' শব্দটি 'আল-আরীকাতুন' এর বহুবচন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, চতুর্দিক আবৃত হওয়া সত্ত্বেও শয়ন স্থানে যদি মশারী না থাকে অথবা শয্যা থাকা সত্ত্বেও যদি শয্যার বেষ্টনী না থাকে, তবে তাকে 'আরায়িকা' বলা যায় না। 'আরীকাহ' বলে পর্দাবিশিষ্ট মশারীকে। বায়যাবী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, বেহেশতের মশারী হবে মোতি ও ইয়াকুতের। এখানে বেহেশতের ওই মহামূল্যবান মশারীবিশিষ্ট শয্যাকেই বলা হয়েছে সুসজ্জিত আসন।

'ছাওয়াব' অর্থ এখানে সুন্দর পুরস্কার। আর 'মুরতাফাক্ব' অর্থ উত্তম আশ্রয়স্থল। 'উত্তম আশ্রয়স্থল' কথাটির মাধ্যমেও এখানে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, জান্নাতীদের আসন হবে কতোইনা সুন্দর ও সুসজ্জিত।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ
أَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ○ كِلْتَا
الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ○
وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ
مَالًا وَّأَعَزُّ نَفَرًا ○ وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ قَالَ مَآ
أَظُنُّ أَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ أَبَدًا ○

❒ তুমি উহাদিগের নিকট পেশ কর একটি উপমা, দুই ব্যক্তির উপমাঃ উহাদিগের একজনকে আমি দিয়াছিলাম দুইটি দ্রাক্ষা উদ্যান এবং এই দুইটিকে আমি খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলাম ও এই দুইয়ের মধ্যবর্তীস্থানকে করিয়াছিলাম শস্যক্ষেত্র।

❒ উভয় উদ্যানই ফলদান করিত এবং ইহাতে কোন ত্রুটি করিত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করিয়াছিলাম নহর।

❒ এবং তাহার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তাহার বন্ধুকে বলিল, 'ধন-সম্পদে আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী।'

www.eelm.weebly.com

❑ এইভাবে নিজের প্রতি জুলুম করিয়া সে তাহার উদ্যানে প্রবেশ করিল, সে বলিল, 'আমি মনে করি না যে ইহা কখনও ধ্বংস হইয়া যাইবে;

বাগবী লিখেছেন, বনী মাখজুম গোত্রের দুই ভাই ছিলো মক্কার অধিবাসী। এক ভাই ছিলো মুমিন এবং অন্যজন ছিলো কাফের। মুমিন ভাইয়ের নাম ছিলো আবু সালমা আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল আসওয়াদ। আর কাফের ভাইয়ের নাম ছিলো আসওয়াদ বিন আবদুল আসওয়াদ। ওই দুই ভাইয়ের ঘটনাই বিবৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে । কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, উয়াইনা এবং হজরত সালমান ফারসীর অবস্থা বুঝাবার জন্য আলোচ্য আয়াতসমূহে উপমাস্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে বিগত যুগের বনী ইসরাইলের দুই ভ্রাতার কাহিনী। তাদের একজনের নাম হজরত ইবনে আব্বাসের মতানুযায়ী ইয়াহুদা এবং মুজাহিদের উক্তি অনুযায়ী তামলিখা। আর দ্বিতীয় জনের নাম ছিলো কাতরুস। ওহাব বলেছেন, কাতফর। প্রথম জন ছিলেন বিশ্বাসী এবং দ্বিতীয় জন ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। সুরা ওয়াস্ সাফফাতের তাফসীরেও এই দুই ভ্রাতার বিবরণ দেয়া হয়েছে। মুআম্মার আতা খোরাসানীর বিবরণানুসারে তাদের ঘটনাটি ছিলো নিম্নরূপ—

দুই পুত্র রেখে এক লোক পরলোকগমন করলো। তার পরিত্যক্ত সম্পদ ছিলো আট হাজার দীনার। পুত্রদ্বয় ওই অর্থ সমানভাবে ভাগ করে নিলো। একভাই তার সম্পদের এক হাজার দীনার দিয়ে ক্রয় করলো এক খণ্ড জমি। আর এক ভাই এক হাজার দীনার দান করে দিলো দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে। বললো, হে আমার আল্লাহ্! আমার ভাই এক হাজার দীনার দিয়ে পৃথিবীর ভূমি ক্রয় করেছে, আর আমি এক হাজার দীনারের মাধ্যমে ক্রয় করলাম বেহেশতের জমিন। এরপর প্রথম ভাই আরো এক হাজার দীনার ব্যয় করে নির্মাণ করলো একটি বাড়ী। দ্বিতীয় ভাই তখন আরো এক হাজার দীনার বণ্টন করে দিলো দুঃস্থ জনসাধারণের মধ্যে এবং দোয়া করলো, হে আমার পালনকর্তা! আমার ভাই এক হাজার দীনার দিয়ে বাড়ী তৈরী করলো পৃথিবীতে। আর আমি আমার এক হাজার দিনার দিয়ে বাড়ী ক্রয় করলাম জান্নাতে। এরপর পুনরায় একহাজার দীনার খরচ করে প্রথম জন বিয়ে করলো। তখন দ্বিতীয় জন আল্লাহ্র পথে হাজার দীনার খরচ করে প্রার্থনা করলো, হে আল্লাহ্! আমার এবারের অর্থের বিনিময়ে তুমি জান্নাতবাসিনী কোনো মহিলার সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়ে দিয়ো। তারপর প্রথম জন পুনরায় একহাজার দীনার খরচ করে ক্রয় করলো দাস-দাসী ও তৈজসপত্র। দ্বিতীয় জন তখন এক হাজার দীনার দান করে দিয়ে প্রার্থনা জানালো, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! এই এক হাজারের বিনিময়ে আমি আবেদন জানালাম জান্নাতের পরিচারক-পরিচারিকা ও আসবাবপত্রের ।

www.eelm.weebly.com

কিছুদিন পরের ঘটনা। প্রথম জন পার্থিব বিষয়ে উন্নতি করলো খুব। দ্বিতীয় জন হয়ে পড়লো নিঃস্ব। উপায়ন্তর না দেখে সে তার সম্পদশালী ভাইয়ের বাড়ীর কাছে এক রাস্তায় বসে পড়লো। যাতায়াতের পথে বসে থাকা ভাইটিকে চিনতে পারলো তার ধনী ভাই। বললো, কী ব্যাপার। তুমি এখানে এভাবে বসে রয়েছো কেনো? দরিদ্র ভাই বললো, আমি এখন নিঃস্ব। তোমার কাছে এসেছি সাহায্যের আশা নিয়ে। ধনী ভাই বললো, উত্তরাধিকার সূত্রে তুমি আমি দুজনেই তো সমান সম্পদ পেয়েছিলাম। সেগুলো দিয়ে কী করলে? দরিদ্র ভাই তখন খুলে বললো সকল ঘটনা। ধনী ভাই বললো, তুমি স্বেচ্ছায় পথে বসেছো। সুতরাং তোমাকে আমি কিছুই দিবো না। এর কিছু দিন পরে দু'জনেই তারা মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তখন তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো—'ফাক্ববালা বা'দুহুম আ'লা বা'দ্বিই ইয়া তাসাআলুন (জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হলো)।

এক বর্ণনায় এসেছে, তখন ধনী ভাই তার গরীব ভাইটিকে অন্দরমহলে নিয়ে গেলো এবং তার সম্পদরাজি দেখালো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। ওই দুই ভাইয়ের কাহিনীই প্রথমোক্ত আয়াতে শুরু করা হয়েছে এভাবে— 'তুমি তাদের নিকট পেশ করো একটি উপমা, দুই ব্যক্তির উপমাঃ তাদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম দু'টি দ্রাক্ষা উদ্যান এবং এই দু'টিকে আমি খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম ও এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র।'

এখানকার 'ওয়াদ্বরিব লাহুম' কথাটির 'হুম' সর্বনাম মুমিন ও কাফের উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। 'মাছালা' অর্থ এখানে উপমা। আর 'রজুলাইনি' (দুই ব্যক্তির) বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ওই দুই ভাইয়ের কথা যারা রসুল স. এর সময়ে জীবিত ছিলো, অথবা বিগত যুগের বনী ইসরাইলের উপরে বর্ণিত দুই ভাইয়ের কথা। এখানে কাউকেই সুনির্দিষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ নিরেট কাহিনী বর্ণনা করা আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। বরং উপমার মাধ্যমে সদুপদেশ উপস্থাপন করাই এখানে মূল উদ্দেশ্য।

'তাদের একজনকে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে কাফের ব্যক্তিটিকে। অর্থাৎ তাকেই আল্লাহ্ দিয়েছিলেন দু'টি আঙুরের বাগান। বাগান দু'টো পরিবেষ্টিত ছিলো খেজুরের বাগান দ্বারা। আর খেজুর বৃক্ষবেষ্টিত আঙ্গুরের বাগান দু'টোর মাঝখানে আবার ছিলো শস্যক্ষেত্র। আর 'ওয়াজায়ালনা বাইনাহুমা' কথাটির মাধ্যমে এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, দুই বাগানের মধ্যবর্তী ভূমি পতিত ছিলো না, ছিলো শস্যময়।

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'উভয় উদ্যানই ফলদান করতো এবং এতে কোনো ক্রটি করতো না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর।' একথার অর্থ— বাগান দু'টো ছিলো ফলে ভরপুর। কোনো মওসুমে বেশী

www.eelm.weebly.com

এবং কোনো মওসুমে কম উৎপাদন— এধরনের কোনো দোষ ছিলো না বাগান দু'টোতে। আর বাগান দু'টোর ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে প্রবহমান করে দেয়া হয়েছিলো নহর বা ঝর্ণা। ফলে বাগানের বৃক্ষ ও ক্ষেত্রের শস্যসম্ভার সব সময় থাকতো সতেজ।

এর পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিলো।' 'ছামারুন' অর্থ প্রচুর ধনসম্পদ। শব্দটি 'ছামারাতুন্' এর বহুবচন। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'ছামারাতুন' অর্থ বৃক্ষের ফল অথবা বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ। 'ছামারাতুন' ও 'ছামুরাতুন' একবচনবোধক। এ দু'টোর বহুবচন হচ্ছে 'ছামারুন' এবং 'ছিমারুন'। তার বহুবচন হচ্ছে 'ইছমারুন।' স্বর্ণ, রৌপ্য, গৃহপালিত পশু, সন্তান-সন্ততি— এসকল কিছুকেও বলা হয় 'ছামারাতুন' বা সম্পদ।

আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ সম্পর্কে কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ওই ব্যক্তির নিকটে বর্ণিত বাগান দু'টো ছাড়াও অন্যান্য ধন-সম্পদ ছিলো। 'ছামুরা মালুহু' অর্থ তার সম্পদ অত্যধিক। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'ছামারুন' অর্থ স্বর্ণ ও রৌপ্য। বাগবী লিখেছেন, 'ছামারুন' শব্দটি 'ছামারাতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ বৃক্ষের ভক্ষণযোগ্য ফল। শব্দটিকে যদি 'ছামারু' পড়া হয়, তবে অর্থ হবে ক্রমান্বয়ে অর্জিত বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে অভাবী মুমিন ভাইকে বললো, ধন-সম্পদে আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমার চেয়ে শক্তিশালী।' একথার অর্থ— বাগানের কাফের মালিক একদিন কথাপ্রসঙ্গে তার নিঃস্ব মুমিন ভাইকে বললো, আমি বিত্ত-বৈভবের দিক থেকে তোমার চেয়ে যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি শ্রেষ্ঠ দাস-দাসীর মালিকানার দিক থেকেও। এখানে 'নাফারুন' শব্দটির অর্থ দাস-দাসী বা পরিচারক-পরিচারিকা। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ সন্তান। কেননা তার মুমিন বন্ধু তার আলোচ্য কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলো 'তুমি যখন ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমা অপেক্ষা কম দেখলে' (আয়াত ৩৯)।

শেষোক্ত আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'এভাবে নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করলো, সে বললো, আমি মনে করি না যে, এই বাগান ও সম্পদ কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে।' একথার অর্থ— আল্লাহ্র কথা বিস্মৃত হওয়া এবং অতিরিক্ত আত্মপ্রসাদের কারণে বাগানের মালিক অহংকারী হয়ে পড়লো এবং সে তার নয়নাভিরাম বাগানে প্রবেশ করে দর্পিত কণ্ঠে বললো, এই মনোমুগ্ধকর উদ্যান ও সঞ্চিত স্বর্ণ রৌপ্য আমার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে— এরকম কথা আমার মনেই আসে না। উল্লেখ্য যে, বাগানের মালিকের আলোচ্য উক্তির অর্থ এরকম নয় যে, সে মনে করেছিলো সে চির অমর ও সঞ্চিত ধনসম্পদের চির

www.eelm.weebly.com

অধিকর্তা। বরং তার কথার উদ্দেশ্য ছিলো এরকম— যতদিন আমি বাঁচি ততদিন আমার ধনসম্পদ থাকবে আমারই অধিকারে, এগুলো আমার হাতছাড়া হবে বলে মনে হয় না। তার উক্তির এরকম অর্থ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ মুমিনদের মতো কাফেরেরাও এ ব্যাপারে স্থিরনিশ্চিত যে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ক্ষমতা-মদমত্ততা ও সম্পদলিপ্সার কারণে তারা মৃত্যু সম্পর্কে থাকে উদাসীন। তাই তাদের কখনো কখনো মনে হয়, তারা ও তাদের বিত্ত-বৈভব বুঝি বা চিরন্তন।

সূরা কাহ্‌ফ ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭, ৩৮

وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۞ قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ۞ لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّىْٓ اَحَدًا ۞

❒ 'আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হইবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে আমি তো নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাইব।'

❒ তদুত্তরে তাহার ভাই তাহাকে বলিল, 'তুমি কি তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হইতে এবং তাহার পর পূর্ণাংগ করিয়াছেন মনুষ্য আকৃতিতে?'

❒ কিন্তু আমি বলি, 'আল্লাহ্‌ই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করি না।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আত্মপ্রসাদে আপাদমস্তক নিমজ্জিত ওই দর্পিত উদ্যানাধিকারী একথাও বললো, আমি মনে করিনা যে মহাপ্রলয় কখনো সংঘটিত হবে। তোমরা যেমন মনে করো সেরকম কিছু যদি হয়েই যায়, মহাপ্রলয়ের পর যদি আমি পুনরুত্থিত হই-ই, তবে নিশ্চয় আমি বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা হবো অধিক মর্যাদামণ্ডিত।

এখানে 'মুনকালাবা' অর্থ প্রত্যাবর্তনের স্থান, পরিণাম। বিত্তশালীরা সাধারণতঃ মনে করে থাকে তাদের ধন-সম্পদসমূহ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রমাণ। তাই তারা

www.eelm.weebly.com

সাধারণতঃ এই ধারণার বশবর্তী হয় যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্ যেমন ধনসম্পদ দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন, তেমনি সম্মানিত করবেন আখেরাতেও। আলোচ্য আয়াতের উক্তিতে উদ্যানাধিকারীর এমতো মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'তদুত্তরে তার ভাই তাকে বললো, তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র থেকে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে?'

মানুষের শরীর যে সকল উপাদান দ্বারা পরিগঠিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে মৃত্তিকার ভূমিকাই প্রধান। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে।' এরকমও হতে পারে যে— প্রথম মানুষের অবয়ব সৃষ্টি করা হয়েছিলো মাটি দ্বারা। তাই এখানে বলা হয়েছে মৃত্তিকা থেকে মানুষ সৃষ্টি করার কথা। মাটির মানুষ থেকে আবার সৃষ্টি হয় শুক্র। তাই এখানে মাটির পর উল্লেখ এসেছে শুক্রের। উল্লেখ্য যে, শুক্র হচ্ছে মনুষ্য অবয়বের নিকটবর্তী বা প্রত্যক্ষ উপাদান।

'সাওয়াকা ' অর্থ সঠিকাকৃতিসম্পন্ন মানুষ। আর 'রজুলা' অর্থ পূর্ণাঙ্গ মানুষ। এভাবে 'ছুম্মা' সাওয়াকা রজুলা' কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে।

কিয়ামত অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহ্র অপার পরাক্রম ও শক্তিমত্তাকে অস্বীকার করা। প্রকারান্তরে আল্লাহ্কেই অস্বীকার করা অথচ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি তো দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম। কারণ, প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি অধিকতর সহজ। তাই এখানে প্রথম সৃষ্টির বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণরূপে উপস্থাপন করে বিশ্বাসবান বন্ধুটি তার অবিশ্বাসী বন্ধুটিকে বলেছেন— তুমি কি অস্বীকার করছো সেই আনুরূপ্যবিহীন শক্তিমত্তার অধিকারী আল্লাহ্কে যিনি তোমাকে প্রথমে মাটি ও পরে শুক্র থেকে সৃষ্টি করে ক্রমান্বয়ে পরিপূর্ণ মনুষ্য আকৃতি পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন?

এর পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'কিন্তু আমি বলি আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরীক করি না।' বাগবী লিখেছেন, ক্বারী কাসায়ী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যবিন্যাসের মধ্যে কিছুটা অগ্র-পশ্চাৎ ঘটেছে। অর্থাৎ 'লাকিন্না হুওয়াল্লহু রব্বী' কথাটির বিশুদ্ধ বিন্যাস হবে 'লাকিন্নাল্লহা হুয়া রব্বী'। আমি বলি, এরকম বলার কোনো কারণই এখানে নেই। তবে বলা যেতে পারে 'লাকিন্না' কথাটির আলিফ এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত।

www.eelm.weebly.com

وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ۝ فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ۝ اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ۝ وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ۝ وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۝ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ؕ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ۝

❒ তুমি যখন ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমা অপেক্ষা কম দেখিলে তখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তুমি কেন বলিলে না, 'আল্লাহ্ যাহা চাহিয়াছেন তাহাই হইয়াছে, আল্লাহের সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নাই।'

❒ 'সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ হইতে অগ্নি বর্ষণ করিবেন যাহার ফলে উহা উদ্ভিদ শূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হইবে।'

❒ 'অথবা উহার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইবে এবং তুমি কখনও উহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না।'

❒ 'তাহার ধন-সম্পদ ধ্বংস হইয়া গেল এবং সে উহাতে যাহা ব্যয় করিয়াছিল তাহার জন্য হাতে হাত রাখিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল যখন উহা ধ্বংস হইয়া গেলো।' সে বলিতে লাগিল, 'হায়, আমি যদি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের শরীক না করিতাম।'

❒ এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাকে সাহায্য করিবার কোন লোক জন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হইল না।

❒ এই ক্ষেত্রে সাহায্য করিবার অধিকার আল্লাহেরই, যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বিশ্বাসবান লোকটি বললো, ধনে ও সন্তানে তুমি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তুমি অহংকারী হয়ে পড়লে। অস্বীকার করলে আল্লাহ্‌কে, কিয়ামতকে। অথচ তোমার বিপুল ফলের সম্ভার শোভিত বাগানে প্রবেশের পর তোমার বলা উচিত ছিলো, আল্লাহ্ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে তিনি এই বাগানকে ফলবান রাখবেন। অথবা ইচ্ছে করলে তিনি এ বাগান ধ্বংস করে দিবেন। কিন্তু তুমি তো এরকম বললে না।

বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমানে হজরত আনাস থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোনো কিছু দেখে পছন্দ হলে কেউ যদি বলে 'মাশাআল্লহু লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্' তবে আর কোনো ক্ষতি হবে না (পড়বে না কোনো কুদৃষ্টির প্রভাব এবং হবে না কোনো দুর্ঘটনা)। ইবনুস্ সুন্নীর বর্ণনায় স্পষ্টভাবে এসেছে, ওই বস্তুর উপর কোনো অশুভ দৃষ্টি পড়বেই না।

বাগবী লিখেছেন, হিশাম বিন ওরওয়া বর্ণনা করেছেন, ওরওয়া বিস্ময়কর ও সুন্দর কোনো কিছু দেখলে অথবা কোনো বাগানে প্রবেশ করলে বলতেন, মাশাআল্লহু লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্।

পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ থেকে অগ্নি বর্ষণ করবেন, যার ফলে ওই উদ্যান উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হবে।' একথার অর্থ বিশ্বাসবান লোকটি আরো বললো, শোনো হে দর্পিত উদ্যানাধিকারী! এমনোতো হতে পারে যে, আল্লাহ্ আমাকে তোমার বাগানের চেয়েও উত্তম কোনো কিছু দান করবেন এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানের শাস্তিরূপে তোমার বাগিচায় আকাশ থেকে আপদ বর্ষণ করবেন। ফলে তা হয়ে যাবে উদ্ভিদশূন্য এক বিরান মৃত্তিকাখণ্ড।

কাতাদা বলেছেন, এখানকার 'হুস্‌বান' শব্দটির অর্থ বিপর্যয়রূপ শাস্তি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আগুন। কুতাইবী বলেছেন, পাথরের ঝড় এবং বায়যাবী বলেছেন বজ্রপাত। বায়যাবী আরো বলেছেন, 'হুস্‌বান' শব্দটি 'হুসবানাতুন' এর বহুবচন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শব্দটি ধাতুমূল এবং এর অর্থ হিসাব। আর এই হিসাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাপের সমপরিমাণ শাস্তি অথবা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত আযাব।

'সঈদান যালাক্বা' অর্থ উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকা। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ— বালুকাময় ধূধূ মরুভূমি।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'অথবা তার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনো তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।' একথার অর্থ— অথবা অকস্মাৎ পানির স্তর নেমে যাবে অনেক নিচে। জলবতী ঝর্ণাগুলো তখন শুকিয়ে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। তুমিও তখন ভূগর্ভে অন্তর্হিত ওই পানির স্তরকে টেনে তোলার কোনো উপায় খুঁজে পাবে না।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'তার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলো এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিলো তার জন্যে হাতে হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগলো, যখন তা ধ্বংস হয়ে গেলো।' একথার অর্থ— অবশেষে তাই হলো। ধ্বংস হয়ে গেলো তার ধন-সম্পদ ও ফলের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ বাগান। ফলে কেবল আক্ষেপ করা ব্যতীত তার আর কোনো উপায় রইলো না।

এখানে 'উহীত্বা' অর্থ বিজয়ী হওয়া, প্রাধান্য বা প্রভাব বিস্তার করা অথবা ধ্বংস করে দেয়া। আক্রমণকারী তার হাতের কাছে যা পায় তার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে অথবা তা ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ্‌র আযাবকে এখানে এই অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে।

'ইউক্বাল্লিবু কাফ্‌ফাইহি' অর্থ হাতে হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগলো। অর্থাৎ সম্পদ হারানোর দুঃখে মুহ্যমান হয়ে নিজের হাত উল্টিয়ে অথবা হাতের উল্টো পিঠ কামড়াতে কামড়াতে আফসোস করতে লাগলো।

এরপর বলা হয়েছে—'সে বলতে লাগলো, হায়, আমি যদি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরীক না করতাম।' একথার অর্থ— নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখে সে বললো, অথবা কবরে, কিয়ামতের দিনে কিংবা মহাবিচারের দিবসে কৃত অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সে বলবে, হায়, আমি যদি কাউকে আমার প্রভুপালনকর্তার শরীক না করতাম, তবে কতোই না উত্তম হতো।

এর পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাকে সাহায্য করবার কোনো লোকজন ছিলো না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হলো না।' একথার অর্থ— পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর বিপদ থেকে পরিত্রাণ দিতে পারেন কেবল আল্লাহ্। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ওই বাগিচার মালিক সে কথা মানেনি। তাই সে সাহায্যকারী হিসেবে কাউকে পায়নি। নিজের পক্ষ থেকেও প্রতিকারের কোনো চেষ্টা করতে সমর্থ হয়নি।

শেষোক্ত আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— এক্ষেত্রে সাহায্য করবার অধিকার আল্লাহ্‌রই, যিনি সত্য।' একথার অর্থ— পুনরুত্থান দিবসে যখন বিচারের জন্য সকলকে একত্র করা হবে, তখন সাহায্য করার অধিকার থাকবে কেবল আল্লাহ্‌র, যিনি সত্য ও শাশ্বত। ক্বারী হামজা ও ক্বারী কাসায়ী এখানকার 'আলওয়ালাইয়াতু' শব্দটিকে পড়েছেন 'আলবিলাইয়াতু' (ওয়াও অক্ষরের নিচে যের সহযোগে)। এরকম উচ্চারণ করলে কথাটির অর্থ হয়— বিজয়ের জন্য সহায়তা। আর জমহুরের ক্বেরাত হচ্ছে— 'আলওয়ালাইয়াতু' (ওয়াও অক্ষরের উপরে যবর সহযোগে)। এরকম উচ্চারণ করলে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়— বন্ধুত্ব বা সাহায্য। এখানে অবশ্য এই উচ্চারণটিই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

'আল্লহু ওয়ালিয়্যুল লাজীনা আমানূ' (আল্লাহ্ মুমিনগণের অভিভাবক) এই আয়াতে বেলায়েতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বিবৃত হয়েছে আল্লাহ্র অভিভাবকত্ব, বন্ধুত্ব এবং সাহায্যের কথা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'ওয়ালাইয়াতু' অর্থ প্রভুত্ব, রাজত্ব বা নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব।

এরকমও হতে পারে যে, আলোচ্য বাক্যটি ধ্বংস হয়ে যাওয়া ওই বাগানের মালিকের । সে অবশেষে তার বিশ্বাসবান ভাইয়ের সদুপোদেশ ও আল্লাহ্র অপার পরাক্রম দর্শনে সত্যপোলব্ধি করতে পেরেছিলো। তওবা করেছিলো সত্য-প্রত্যাখ্যান থেকে। একথাও ভালোভাবে বুঝেছিলো যে, যারা শিরিক করে তারা কখনো সফল হয় না। লজ্জা ও অনুতাপের সঙ্গে সে তাই উচ্চারণ করেছিলো 'হায়, আমি যদি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরীক না করতাম।' সাথে সাথে একথাও উচ্চারণ করেছিলো যে 'এক্ষেত্রে সাহায্য করবার অধিকার আল্লাহ্র, যিনি সত্য।' এভাবে পরিণামে সে হয়ে গিয়েছিলো ইমানদার।

শেষে বলা হয়েছে— 'পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।' একথার অর্থ— তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে পুণ্যবানদেরকে পুরস্কার প্রদান করেন এবং এককভাবে তিনিই নির্ধারণ করেন সকলের পরিণাম।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۞ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۞

❒ উহাদিগের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনেরঃ ইহা পানির ন্যায় যাহা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদ্দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া উদ্‌গত হয়, অতঃপর উহা বিশুষ্ক হইয়া এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস উহাকে উড়াইয়া লইয়া যায়। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

❒ ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং সৎকর্ম, যাহার ফল স্থায়ী, উহা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছালাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি মানুষের নিকট নশ্বর পার্থিবতার উপমা উপস্থাপন করুন এভাবে— পৃথিবীর জীবন হচ্ছে আকাশ থেকে বর্ষিত বৃষ্টির মতো। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত ওই বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে ভূমি থেকে উদ্গত হয় ঘনসন্নিবিষ্ট তৃণগুল্ম ও বৃক্ষরাজি। এরপর ঘটতে থাকে সেগুলোর প্রবৃদ্ধি। শেষে এক সময় সেগুলো হয়ে যায় বিশুষ্ক ও চূর্ণ-বিচূর্ণ। মৃত্তিকার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত ওই মৃত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তৃণরাজি ও বৃক্ষের স্তুপকে সহজেই উড়িয়ে নিয়ে যায় দমকা বাতাস। হজরত আবু উবায়দা এরকম বলেছেন। এতে করে কি অতি সহজে একথা প্রমাণিত হয় না যে— আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান?

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং সৎকর্ম, যার ফল স্থায়ী, তা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছালাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট।' একথার অর্থ— বিত্ত-বৈভব ও সন্তান-সন্ততি ওয়াইনা ও তার মতো লোকদের জন্য পার্থিব জীবনের গর্ব-প্রদর্শক সৌন্দর্য। অথচ তারা জানে না, অচিরেই এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ নশ্বরতাই পার্থিবতার পরিণাম। অপর পক্ষে পুণ্যকর্মসমূহ হচ্ছে আখেরাতের স্থায়ী সম্পদ, যার কোনো বিনাশ নেই। আল্লাহ্র নিকটে এগুলোই পুরস্কার প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এবং অভিলাষ পরিপূরণের জন্যও এগুলো সর্বোৎকৃষ্ট।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের ফসল এবং পুণ্যকর্মসমূহ হচ্ছে আখেরাতের ফসল। আর আল্লাহ্ কোনো কোনো লোককে উভয় প্রকার ফসল দানে ধন্য করেন। হজরত ইবনে আব্বাস, ইকরামা ও মুজাহিদ বলেছেন, 'বাক্বীইয়াতুস্ সলিহাত' (স্থায়ী পুণ্যকর্ম) হচ্ছে— সুবহানআল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন তোমরা 'বাক্বীইয়াতুস্ সলিহাত' অধিকসংখ্যক পাঠ করো। সহচরবৃন্দ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! 'বাক্বীইয়াতুস্-সলিহাত' কী? তিনি স. বললেন—সুবহানআল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহুআকবার এবং লা হাওলা ওয়ালা ক্বুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্।

হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, তোমরা লা হাওলা ওয়ালা ক্বুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্ অত্যধিক পরিমাণে পাঠ কোরো। এর মাধ্যমে রুদ্ধ হয়ে যায় নিরানব্বই প্রকার বিপর্যয়। তন্মধ্যে সর্বনিম্নমানের বিপর্যয় হচ্ছে দুশ্চিন্তা। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন উকাইলী। তিনি হজরত নোমান বিন বাশীর থেকেও এ প্রসংগে একটি সুপরিণত হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি এই—

www.eelm.weebly.com

সুবহান আল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার—ই হচ্ছে বাক্বীইয়াতুস্ সলিহাত। তিবরানী এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত সা'দ বিন উবাদা থেকে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সর্বোত্তম বাক্য হচ্ছে সুবহানআল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্ এবং লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। জনৈক সাহাবী থেকেও ইবনে জারীর এরকম হাদিস এনেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সুবহানআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ্ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বলা আমার নিকটে ওই সকল বস্তু অপেক্ষা প্রিয়, সেগুলোর উপরে সূর্য কিরণ পতিত হয়। মুসলিম, তিরমিজি।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, মাসরুক ও ইব্রাহিম নাখয়ীর মতে 'বাক্বীইয়াতুস্ সলিহাত' হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। হজরত ইবনে আব্বাসেরও এরকম একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অপর এক বর্ণনানুসারে তাঁর অভিমত হচ্ছে— বাক্বীইয়াতুস সলিহাত অর্থ পূণ্যকর্মসমূহ। কাতাদাও এরকম বলেছেন।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ৪৭, ৪৮, ৪৯

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ
مِنْهُمْ أَحَدًا ۝ وَعُرِضُوا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا
خَلَقْنٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝ وَوُضِعَ
الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يٰوَيْلَتَنَا
مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصٰهَا وَوَجَدُوا
مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

❒ স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করিব উন্মূলিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখিবে একটি শূন্য প্রান্তর; সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করিব এবং উহাদিগের কাহাকেও অব্যাহতি দিব না,

www.eelm.weebly.com

❒ এবং উহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হইবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হইবে, তোমাদিগকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলাম সেইভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ; অথচ তোমরা মনে করিতে যে তোমাদিগের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি উপস্থিত করিব না।

❒ এবং সেই দিন উপস্থিত করা হইবে আমলনামা এবং উহাতে যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহার কারণে তুমি অপরাধীগণকে দেখিবে আতংকগ্রস্ত এবং উহারা বলিবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদিগের। ইহা কেমন গ্রন্থ। উহা তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না বরং উহা সমস্ত হিসাব রাখিয়াছে।' উহারা উহাদিগের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাইবে; তোমার প্রতিপালক কাহারও প্রতি জুলুম করেন না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! স্মরণ করুন, সেই মহাপ্রলয় দিবসের মহাবিপর্যয়ের কথা। সেদিন আমি পর্বতসমূহকে করবো ভিত্তি বিবর্জিত। তখন আপনি পৃথিবীকে দেখতে পাবেন একটি সুবিশাল শূন্য প্রান্তররূপে। তারপর আসবে মহাবিচারের দিবস। ন্যায় বিচার সমাপনের জন্য আমি তখন ওই সুবিশাল প্রান্তরে সকল মানুষকে সমবেত করবো। অব্যাহতি কাউকেই দিবো না।

'ওয়া তারাল আরদ্ব বারিযাতান' অর্থ পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর। ইবনে আবী হাতেম ও কাতাদা এরকম বলেছেন। কিন্তু আতা বলেছেন, এখানে 'বারিযাতান' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, ভূগর্ভস্থিত সকল কিছু তখন বের হয়ে আসবে। সুতরাং কেউই তখন থাকতে পারবে না তাদের সমাধির অভ্যন্তরে।

উল্লেখ্য যে, এখানে 'মানুষকে আমি একত্র করবো' এবং 'তাদের কাউকেও অব্যাহতি দিবো না' কথা দু'টোর মাধ্যমে সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়, তখন কবর থেকে না উঠিয়ে কাউকেই ছেড়ে দেয়া হবে না।

পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে।' এখানে 'উরিদ্বু' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, বাদশাহর সামনে যেমন সেনাসমাবেশ ঘটানো হয়, তেমনি আল্লাহ্ সমীপে জনসমাবেশ ঘটানো হবে মহাবিচারের দিবসে। তবে কথিত সেনাসমাবেশের উদ্দেশ্য থাকে পরিচিতি বিনিময় , কিন্তু হাশর প্রান্তরের সমাবেশের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্র নির্দেশের বাস্তবায়ন। আর 'সফ্ফা' অর্থ সারিবদ্ধভাবে। ওই সারিসন্নিবেশন এমন হবে যে, সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার বেলায় কেউ কারো অন্তরায় হবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বলা হবে, তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম, সেইভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছো।' একথার অর্থ—

www.eelm.weebly.com

সেখানে সারিবদ্ধভাবে সকলকে দাঁড় করিয়ে ঘোষণা করা হবে, জন্মের সময় যেমন তোমরা ছিলে নগ্ন, নিঃস্ব ও খতনাবিহীন, তেমনি অবস্থায় আজ এখানে তোমাদেরকে উপস্থিত করানো হয়েছে।

বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজি তাদের আপনাপন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. একবার তাঁর ভাষণে বললেন, হে জনতা! অবগত হও, কিয়ামতের পর তোমাদেরকে তোমাদের সমাধি থেকে ওঠানো হবে নগ্ন, নিঃস্ব ও খতনাবিহীন অবস্থায়। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন— 'যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো' (সূরা আম্বিয়া)। তারপর সর্বপ্রথম বস্ত্রাবৃত করানো হবে নবী ইব্রাহিমকে।

জননী আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে তোমাদেরকে উত্তোলিত করা হবে খালি গায়ে, খালি পায়ে ও খতনাহীন অবস্থায়। জননী আয়েশা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! পুরুষ-নারী সকলেরই তখন একই অবস্থা হবে? তারা কি একে অপরের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না? রসুল স. বললেন, আয়েশা! ওই সময় তো অত্যন্ত ভয়াবহ (অন্যের দিকে তাকাবার মনোবৃত্তি ও ফুরসত কোনোকিছুই তখন কারো থাকবে না)। তিবরানী তাঁর 'আলআওসাত' গ্রন্থে যথাসূত্র পরম্পরায় জননী উম্মে সালমা থেকেও এরকম একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটিতে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে, জননী উম্মে সালমা বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! তা হলে তো বিষয়টি খুবই অসুন্দর। সবাই একে অপরের দিকে তাকাবে। রসুল স. বললেন, সবাই তো থাকবে তখন অনিশ্চিত পরিণাম চিন্তায় অস্থির। জননী বললেন, কী নিয়ে তখন ব্যস্ত থাকবে মানুষ। রসুল স. বললেন, ব্যস্ত থাকবে আপনাপন আমলনামা নিয়ে। সেখানে পিপীলিকা ও শস্যদানার মতো ক্ষুদ্র আমলগুলোও লিপিবদ্ধ থাকবে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকীও এরকম হাদিস উল্লেখ করেছেন। এই হাদিসের শেষেও বলা হয়েছে, রসুল স. বললেন, আরে সেদিন তো সকলেই ব্যস্ত থাকবে নিজেকে নিয়ে। হজরত সহল বিন সা'দ থেকে তিরমিজিও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম হোসাইন থেকে সুপরিণত সূত্রে বর্ণিত এক হাদিসের শেষাংশেও বলা হয়েছে, রসুল স. তাঁর এক সহধর্মিণীর প্রশ্নের জবাবে বললেন, তখন ভয়ে ও আতংকে সকলের দৃষ্টি থাকবে উর্ধ্বমুখী। একথা বলার সময় রসুল স. তাঁর দৃষ্টি উপরের দিকে করে দেখালেন।

তিবরানী ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, জননী সাওদা বলেছেন, রসুল স. একবার বললেন, পুনরুত্থান দিবসে মানুষ উঠবে নগ্ন শরীর, নগ্ন পা ও খতনাবিবর্জিত অবস্থায়। ঘামের পানিতে ডুবে যাবে কারো মুখ, কারো কানের

www.eelm.weebly.com

লতি। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! তাহলে তো ব্যাপারটি হবে অত্যন্ত মন্দ। একে অন্যকে দেখবে। রসুল স. বললেন, তখন তো পরিণাম চিন্তায় সকলে থাকবে ভীতসন্ত্রস্ত। অন্যের প্রতি তাকাবার ফুরসত কেউ পাবে না।

কুরতুবী লিখেছেন, কেউ কেউ বলেন, কোনো কোনো হাদিসে বলা হয়েছে, মৃত ব্যক্তিরা কাফনের কাপড় পরে একে অপরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করবে। আবার উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহে দেখা গেলো কিয়ামতের পরে কবরবাসীরা পুনরুত্থিত হবে উলঙ্গ অবস্থায়। এরকম বৈসাদৃশ্যের কারণ তাহলে কী? এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, এখানে বৈসাদৃশ্যের কিছু নেই। দু'টো বক্তব্যই সত্য। কবরবাসীরা তাদের কবর জীবনে কাফন পরে থাকবে ঠিকই, কিন্তু তারা পুনরুত্থিত হবে উলঙ্গ অবস্থায়। তবে নিম্নে বর্ণিত হাদিসগুলো উলঙ্গ অবস্থায় পুনরুত্থানের বিপরীত। যেমন—

আবু দাউদ, হাকেম, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরীর পরলোকগমনের সময় যখন উপস্থিত হলো, তখন তিনি নতুন বস্ত্র চেয়ে নিয়ে পরিধান করলেন এবং বললেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, যে বস্ত্র পরিধান অবস্থায় মৃত্যু ঘটবে, পুনরুত্থানও হবে ওই বস্ত্র পরিহিত অবস্থায়। উত্তমসূত্র পরম্পরায় ইবনে আবীদ্‌ দুন্‌ইয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল তার প্রয়াত মাতাকে নতুন কাপড় পরিয়ে দাফন করলেন এবং উপস্থিত জনতাকে বললেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে নতুন পরিচ্ছদে আবৃত করে দাফন কোরো। কেননা ওই কাপড় পরিহিত অবস্থায় তাকে ওঠানো হবে হাশরের ময়দানে। সাঈদ ইবনে মনসুর তাঁর সুনানে লিখেছেন, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে উত্তম বস্ত্রের কাফন দিবে। কেননা ওই কাফনে জড়িত করেই তাকে ওঠানো হবে।

কুরতুবী লিখেছেন, কোনে কোনো আলেম বর্ণিত হাদিস সমূহের বাহ্যিক বিবরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। মনে করেছেন নির্দেশনাটি সাধারণ। কিন্তু কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, নির্দেশনাটি কেবল শহীদগণের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। শহীদগণকে তাঁদের শাহাদাতের সময়ের বস্ত্রসহই দাফন করতে বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ সম্মানিত সাহাবী হজরত আবু সাঈদ বিষয়টিকে সাধারণ নির্দেশনা মনে করেছিলেন। তাই তাঁর মাতাকে পরিয়েছিলেন নতুন কাফনের কাপড় এবং অন্যদেরকেও দিয়েছিলেন এমতো নির্দেশনা। বায়হাকী আবার এ সম্পর্কিত বিবরণসমূহের সামঞ্জস্য সাধনার্থে মন্তব্য করেছেন, সেদিন কাউকে কাউকে বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় এবং কাউকে কাউকে বস্ত্রবিবর্জিত অবস্থায় ওঠানো হবে। আমি বলি, এমতো ব্যাখ্যাই উত্তম। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করলেই এ সম্পর্কে উদ্ভূত দ্বন্দ্বের চিরপরিসমাপ্তি ঘটে। যেমন—

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি উপস্থিত করবো না।' একথায় পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি উপস্থাপন করা হয়েছে কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে, যারা কিয়ামত ও হাশর বিশ্বাস করে না। অতএব বলা যেতে পারে, কাফেরদেরকেই সেদিন ওঠানো হবে বস্ত্রবিবর্জিত অবস্থায়। এখানে 'মাওই'দা অর্থ প্রতিশ্রুত ক্ষণ বা হাশরের সময়। আর 'বাল' (অথচ) দ্বারা এখানে ঘটানো হয়েছে প্রসঙ্গান্তর। অর্থাৎ 'বাল' শব্দটির মাধ্যমে এখানে বলা হয়েছে তাদের কিয়ামতের প্রতি অবিশ্বাসের কথা।

উল্লেখ্য যে, রসুল স. বলেছেন, সেদিন তাদের দৃষ্টি থাকবে উর্ধ্বমুখী। আর আল্লাহ্তায়ালা এক আয়াতে বলেছেন— 'সেদিন তাদের প্রত্যেকের অবস্থা হবে এমন গুরুতর, যা তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।' আল্লাহ্র রসুলের বাণীর মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, ভয়ে ও আতংকে সেদিন উদভ্রান্ত সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের দৃষ্টি হবে উর্ধ্বমুখী। পুণ্যবান বিশ্বাসীদের অবস্থা এরকম হবে না। এর পরেও কিন্তু আর একটি সমস্যা রয়েই যায়। সমস্যাটি এই— হাদিস শরীফে এ-ও বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম বস্ত্র পরিধান করানো হবে নবী ইব্রাহিমকে। তাহলে কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বস্ত্রবিবর্জিত অবস্থায় উত্থিত হবে— একথা কীভাবে বলা যেতে পারে? এই প্রশ্নটির উত্তরে বলা যায়— পুণ্যবানদেরকে বস্ত্র পরিধান করানো হবে কবরের জগতে, পুনরুত্থানের পূর্বে। অর্থাৎ বিশেষ সম্মান প্রদর্শনার্থে কবরে বিশ্বাসীদেরকে পরানো হবে নতুন পরিধেয়। আর সর্বপ্রথম নতুন পরিচ্ছদে আবৃত করা হবে নবী ইব্রাহিমকে। অবশ্য এমতো উত্তর পুরোপুরি দুর্বলতামুক্ত নয়।

কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, 'মৃত্যুকালীন পোশাকে পুনরুত্থান করা হবে'—হাদিস শরীফের এই বক্তব্যটির অর্থ হবে— মৃত্যুকালীন আমলের অবস্থার উপরে ঘটবে মৃত ব্যক্তির পুনরুত্থান। কারণ আমলকেও কোরআন মজীদের এক স্থানে পোশাক বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন— 'ওয়ালিবাসুত্ তাক্বওয়া জালিকা খইর' (আর সংযমীদের গাত্রাবরণ, তা হবে উত্তম)।

এর পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'এবং সেই দিন উপস্থিত করা হবে আমলনামা।' এখানকার 'আলকিতাব' কথাটির অর্থ পাপ-পুণ্যের বিবরণ বিশিষ্ট কিতাব বা আমলনামা। আর এখানকার 'আলিফ লাম' হচ্ছে জিনসী বা জাতিবাচক। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— এবং সেদিন আমলনামা দেয়া হবে পুণ্যবানদের ডান হাতে, পাপীদের বাম হাতে অথবা তা রেখে দেয়া হবে মীযানে কিংবা উপস্থিত করা হবে আল্লাহ্ সকাশে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে, তার কারণে তুমি অপরাধীগণকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে, এটা কেমন গ্রন্থ, এ গ্রন্থ যে ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না; বরং এ গ্রন্থ যে সমস্ত হিসাব রেখেছে।'

এখানে 'আলমুজরিমীনা' অর্থ অপরাধীগণ, যাদেরকে আমলনামা দেয়া হবে বাম হাতে। 'মিম্মা ফীহ্' অর্থ ওই সকল পাপ যা লেখা থাকবে তাদের আমলনামায়। 'লাওয়াইলাতানা' কথাটির 'ওয়াইলুন' শব্দের অর্থ ধ্বংস, বিপর্যয় বা আতংক। অর্থাৎ তারা সেদিন হয়ে পড়বে আতংকগ্রস্ত।

'মালি হাজাল কিতাব' অর্থ— এ কেমন গ্রন্থ? উল্লেখ্য যে, বাক্যটি প্রশ্নাকৃতির হলেও আসলে তা প্রশ্ন নয়। বরং এ রকম প্রশ্ন করে পাপিষ্ঠরা সেদিন প্রকাশ করবে বিস্ময়।

'লা ইউগদিরু সগিরাতাঁও ওয়ালা কাবীরাতান্' অর্থ ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না। বাক্যটির ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সগিরাতুন' অর্থ অনাবশ্যক হাসি এবং 'কাবীরাতুন' অর্থ অট্টহাসি। হজরত ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানকার 'সগিরাতুন' অর্থ পর নারীকে স্পর্শ করা বা চুম্বন করা। আর 'কাবীরাতুন' অর্থ অবৈধ যৌনচরিতার্থতা। আমি সুরা নিসার একটি আয়াতের তাফসীরে ছোট ও বড় পাপ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেছি। আয়াতটি এই— 'তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরু, তা থেকে বিরত থাকলে আমি লঘু পাপসমূহকে মোচন করবো'।

'ইল্লা আহসাহা' অর্থ 'সমস্ত হিসাব রেখেছে।' অর্থাৎ এই আমলনামা লঘু গুরু সকল পাপের হিসাব লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। হজরত সহল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা ছোট ছোট পাপ থেকেও বিরত থেকো। ছোট গোনাহগুলো এরকম— যেনো পথযাত্রীরা এক স্থানে যাত্রা স্থগিত রেখে ছোট ছোট কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ করলো। পরে সে-গুলোকে একত্র করে আগুন জ্বালিয়ে ওই আগুনের তাপে প্রস্তুত করলো তাদের আহার্য। বাগবী লিখেছেন, ছোট পাপ গুলোকে ছোট মনে করে অবহেলা করলে ক্রমে ক্রমে তা সংখ্যাগতভাবে হয়ে যায় বিপুল। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সা'দ ইবনে উবাদা বলেছেন, হুনায়েন যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তন কালে আমরা যাত্রা স্থগিত করলাম তৃণলতাহীন ও পানিবিহীন এক বিরান উপত্যকায়। রসুল স. বললেন, তোমরা যা কিছু পাও নিয়ে এসো। আমরা তুচ্ছ ও অনুল্লেখ্য বস্তু সমূহ যে যা পেলাম এনে একত্র করলাম। দেখা গেলো তুচ্ছ বস্তুসমূহ পরিণত হয়েছে একটি বিশাল স্তুপে। তিনি স. তখন বললেন, এভাবেই মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ ধারণ করে বিশাল আকার। সুতরাং হে আমার সহচরবৃন্দ! তোমাদের উচিত আল্লাহ্কে ভয় করা এবং বড় বড় গোনাহ পরিত্যাগ করার সাথে সাথে ছোট ছোট গোনাহ সমূহকেও পরিত্যাগ করা।

www.eelm.weebly.com

জননী আয়েশা থেকে নাসাঈ, ইবনে মাজা ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, যে পাপগুলোকে তুচ্ছ মনে করা হয়, তোমরা সে সকল পাপকে পরিহার কোরো। কেননা মহাবিচারের দিবসে তুচ্ছ পাপসমূহেরও সন্ধান করা হবে।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত আনাস উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা অনেকেই ছোট পাপকে মনে করো কেশ অপেক্ষা তুচ্ছ। কিন্তু রসুল স. এর সময়ে আমরা এগুলোকে বিধ্বংসী অপরাধ বলে গণ্য করতাম। যথাযথ সূত্র পরম্পরায় ইমাম আহমদও এরকম বর্ণনা করেছেন।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করেন না।' একথার অর্থ— বিনা পাপে কারো পাপ লেখা হয় না। আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি কারো প্রাপ্য মন্দ বিনিময়ের বৃদ্ধি ঘটাবেন। এমতো অন্যায় থেকে তিনি সতত পবিত্র।

রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে জনগণ সম্মুখীন হবে তিনটি পদ্ধতিতে। দু'টো পদ্ধতি হবে প্রশ্নোত্তর ও ওজর আপত্তি উপস্থাপনের সুযোগ সম্বলিত। তৃতীয়টি হবে, উড়ন্ত আমলনামা, কেউ তা গ্রহণ করবে ডান হাতে, আবার কেউ বাম হাতে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে, তিরমিজি হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং বায়হাকী অপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে। হাকেম ও তিরমিজি বলেছেন, প্রথম বিষয়টি হবে বাদানুবাদ সম্পর্কিত। অর্থাৎ বান্দারা তখন শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করবে বিভিন্ন প্রকার অনুযোগ এবং এমতো দুরাশাও করবে যে, এভাবে হয়তো সে লাভ করতে পারবে পরিত্রাণ। দ্বিতীয় বিষয়টি অনুষ্ঠিত হবে হজরত আদম ও অন্যান্য নবী রসুলগণের সামনে। তাঁদের সামনেই অপরাধীদেরকে প্রমাণ করা হবে শাস্তির উপযোগীরূপে। এরপর তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে দোজখে। আর তৃতীয় বিষয়টি অনুষ্ঠিত হবে কেবল পাপী বিশ্বাসীগণকে কেন্দ্র করে। আল্লাহ্ তাদেরকে গোপনে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং কৃত পাপের জন্য করবেন তিরস্কার। তারা হবে লজ্জিত ও মর্মাহত। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করে দিবেন এবং প্রসন্ন হবেন তাদের প্রতি।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহাবিচারের দিবসে প্রথমে সকল আমলনামা জমা করা হবে আরশের নিচে। তারপর প্রবল এক বাতাসে সেগুলো উড়ে এসে পড়বে বিচারের জন্য অপেক্ষমানদের ডান অথবা বাম হাতে। আমলনামার শুরুতে লেখা থাকবে— আমলনামা পড়ো, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাবের জন্য যথেষ্ট। কাতাদা বলেছেন, দুনিয়ার নিরক্ষর ব্যক্তিরাও তখন পড়তে সক্ষম হবে তাদের আমলনামা।

www.eelm.weebly.com

وَاِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلٰٓئِكَةِ اسۡجُدُوۡا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوۡۤا اِلَّاۤ اِبۡلِيۡسَ ؕ كَانَ مِنَ
الۡجِنِّ فَفَسَقَ عَنۡ اَمۡرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوۡنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗۤ اَوۡلِيَآءَ
مِنۡ دُوۡنِىۡ وَهُمۡ لَـكُمۡ عَدُوٌّ ؕ بِئۡسَ لِلظّٰلِمِيۡنَ بَدَلًا ۝ مَاۤ اَشۡهَدْتُّهُمۡ
خَلۡقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَلَا خَلۡقَ اَنۡفُسِهِمۡ وَمَا كُنۡتُ مُتَّخِذَ
الۡمُضِلِّيۡنَ عَضُدًا ۝ وَيَوۡمَ يَقُوۡلُ نَادُوۡا شُرَكَآءِىَ الَّذِيۡنَ زَعَمۡتُمۡ
فَدَعَوۡهُمۡ فَلَمۡ يَسۡتَجِيۡبُوۡا لَهُمۡ وَجَعَلۡنَا بَيۡنَهُمۡ مَّوۡبِقًا ۝ وَرَاَ الۡمُجۡرِمُوۡنَ
النَّارَ فَظَنُّوۡۤا اَنَّهُمۡ مُّوَاقِعُوۡهَا وَلَمۡ يَجِدُوۡا عَنۡهَا مَصۡرِفًا ۝

❒ এবং স্মরণ কর আমি যখন ফেরেশতাগণকে বলিয়াছিলাম, 'আদমের প্রতি নত হও; তখন সকলেই নত হইল ইবলিস ব্যতীত; সে জিনদিগের একজন, সে তাহার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে উহাকে এবং উহার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতেছ? উহারা তো তোমাদিগের শত্রু। সীমালংঘনকারিগণ যে আল্লাহের পরিবর্তে অন্যদিগকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিয়াছে উহা কত নিকৃষ্ট!

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি উহাদিগকে ডাকি নাই এবং উহাদিগের সৃজনকালেও নহে, এবং আমি বিভ্রান্তকারীদিগের সাহায্য গ্রহণ করিবার নহি।

❒ এবং সেই দিনের কথা স্মরণ কর যেদিন তিনি বলিবেন, 'তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক মনে করিতে তাহাদিগকে আহ্বান কর।' উহারা তখন তাহাদিগকে আহ্বান করিবে কিন্তু তাহারা উহাদিগের আহ্বানে সাড়া দিবে না এবং উহাদিগের উভয়ের মধ্যস্থলে রাখিয়া দিব এক ধ্বংস-গহ্বর।

❒ অপরাধীরা আগুন দেখিয়া বুঝিবে যে উহারা তথায় পতিত হইতেছে এবং উহারা উহা হইতে কোন পরিত্রাণ স্থল পাইবে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং স্মরণ করো, আমি যখন ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম, আদমের প্রতি নত হও; তখন সকলেই নত হলো ইবলিস ব্যতীত।' পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উপক্রমণিকা

www.eelm.weebly.com

অথবা উপসংহাররূপে হজরত আদমের প্রতি ফেরেশতাদের নত হওয়া ও ইবলিসের নত হতে অস্বীকার করার প্রসংগটি উল্লেখ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে অহংকারী এক উদ্যানাধিকারীর প্রসঙ্গ ধরে অহংকার ও সত্যপ্রত্যাখ্যানের অপপরিণতি সম্পর্কে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা করার পর আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অহংকার ও অবাধ্যতা হচ্ছে ইবলিসের স্বভাব। সুতরাং তা পরিহার্য। এরকমও বলা যায় যে, এতোক্ষণ ধরে পৃথিবীর প্রতি মোহগ্রস্তদের স্বভাব ও পরিণাম সম্পর্কে আলোকপাত করবার পর আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, প্রতারক পৃথিবীর প্রতি অতি আসক্তির কারণ হচ্ছে প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতা ও ইবলিসের ধোকা। প্রথমে বলে দেয়া হয়েছে, ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং সৎকর্মের ফল স্থায়ী। তারপর দেয়া হয়েছে মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান দিবসের বিবরণ। তারপর এসেছে ইবলিসের অপকর্ম ও নিন্দাবাদ। এভাবে প্রচ্ছন্নরূপে এই সদুপদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, ইবলিসের কাম্য পার্থিবতা নিন্দিত এবং আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় আখেরাত নন্দিত। এভাবে কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে আলোচ্য বিষয়টি আলোচিত হয়েছে সদুপদেশদানের ভিন্ন ভিন্ন অনুসঙ্গরূপে। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞাময়তার এক বিশেষ নিদর্শন।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে জ্বিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো।' একথার অর্থ— ইবলিস ফেরেশতা ছিলো না, ছিলো জ্বিন। তাই সে ফেরেশতাদের মতো আল্লাহ্‌র নির্দেশের অনুগত হলো না। লংঘন করলো তাঁর আদেশ।

এখানে 'আমরি' শব্দটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, ফেরেশতাদের সঙ্গে ইবলিসও ছিলো সেজদার নির্দেশ প্রাপ্ত। 'ফাফাসাক্বা' কথাটির 'ফা' এখানে কারণ প্রকাশক। অর্থাৎ জ্বিন সম্প্রদায়ভূত হওয়ার কারণেই সে আদমকে সেজদা করতে অস্বীকৃত হয়েছিলো। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র সতত অনুগত। অনানুগত্য তাদের স্বভাবেই নেই। কিন্তু ইবলিসের স্বভাব এরকম নয়। তাই সে অমান্য করতে পেরেছিলো আল্লাহ্‌র আদেশ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইবলিস ছিলো ফেরেশতাদেরই একটি শাখা গোত্রভূত। ওই গোত্রটির নাম জ্বিন। তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে। হাসান বসরী বলেছেন, জ্বিনেরা ফেরেশতা সম্প্রদায়ভূত নয়। তারা একটি আলাদা সম্প্রদায়। বাবা আদম যেমন সকল মানুষের মূল, তেমনি সকল জ্বিনের মূল ইবলিস। আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন—

www.eelm.weebly.com

'আমি জ্বিন ও মানুষকে আমার ইবাদতের উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।' এই আয়াত এবং সুরা রহমান ও সুরা জ্বিনের আয়াত থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের মতো জ্বিনদের মধ্যেও রয়েছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, পুণ্যবান-পাপী। পুণ্যবান জ্বিনেরা ইবলিসের অনুসারী নয়। কিন্তু এই অভিমতটি কীভাবে মেনে নেয়া যায়? কারণ পরবর্তী বাক্যে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবলিসের বংশধরেরা সকলেই তার অনুসারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছো? তারা তো তোমাদের শত্রু।' আলোচ্য প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে মানুষ! আমিই তোমাদের একমাত্র স্রষ্টা, পালনকর্তা ও অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ইবলিস ও তার বংশধরকে বন্ধু অথবা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারো না। তারা তো তোমাদের চিরশত্রু। আর চিরশত্রু কখনো বন্ধু হয় না।

এরপর বলা হয়েছে— 'সীমালংঘনকারীদের এই বিনিময় কত নিকৃষ্ট।' এ কথার অর্থ— সীমালংঘনকারীরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে ইবলিস ও তার বংশধরের সঙ্গে। ওই বন্ধুত্ব ও তার বিনিময় কতই না অপকৃষ্ট।

বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদের বর্ণনায় এসেছে, শা'বী বলেছেন, একবার আমি এক স্থানে বসেছিলাম। এমন সময় এক দিনমজুর এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, শয়তানের সহধর্মিণী আছে কি? আমি বললাম, জানি না। একটু পরেই আমার মনে পড়লো 'তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে ও তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে?' এই আয়াত মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝলাম, শয়তানের সহধর্মিণী অবশ্যই আছে। কারণ স্ত্রী ছাড়া কখনো সন্তান হয় না। তাছাড়া আর এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র সন্তান কোথা থেকে হবে, যখন তার স্ত্রী নেই।' এ কথা মনে পড়ার সাথে সাথে আমি প্রশ্নকারীকে বললাম, হ্যাঁ ইবলিসের স্ত্রী আছে।

কাতাদা বলেছেন, মানুষের মতো ইবলিসেরও সন্তান-সন্ততি হয়। কেউ কেউ বলেছেন, সে তার নিজের নিঃশ্বাস তার পশ্চাদ্দারে প্রবেশ করিয়ে দেয়। ফলে সৃষ্টি হয় ডিম্ব এবং ওই ডিম্বগুলো ফেটে বের হয় বিভিন্ন ধরনের শয়তান। মুজাহিদ বলেছেন, ওই বিভিন্ন ধরনের শয়তানগুলোর নাম— লাকীন, ওয়ালহান্, হাফাফ, মুর্‌রাহ্, যালনাবুর, আউর, মাতুস, ইয়াছুর এবং দাসিম। ওয়ালহান্ গোত্রীয় শয়তানেরা কুমন্ত্রণা দেয়, ওজু, গোসল ও নামাজের মধ্যে। আর ইবলিস নিজেই মুর্‌রাহ্। কারণ তার ডাক নাম আবু মুর্‌রাহ্। যালনাবুর বাজারের মধ্যে ক্রেতা-

www.eelm.weebly.com

বিক্রেতাকে মিথ্যা শপথের প্রতি প্ররোচিত করে। পণ্যাধিকারীকে দিয়ে তার পণ্যের মিথ্যা প্রশংসা করিয়ে নেয়। আউর উৎসাহ দেয় অবৈধ যৌনচরিতার্থতার দিকে। ফুৎকার দেয় পুরুষাঙ্গে ও রমণীদের নিতম্বে। মাতুস মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় মিথ্যা গুজব। স্বজন-বিয়োগের শোকে মুখে আঘাত করা, পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করা ইত্যাদির মাধ্যমে বিলাপ প্রকাশের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে ইয়াছুর। গৃহে প্রবেশকালে গৃহকর্তাকে গৃহবাসীদের প্রতি সালাম করা থেকে এবং আল্লাহ্র জিকির করা থেকে বিরত রাখে দাসিম। আর তার দৃষ্টিতে সৃষ্টি করে বিভ্রম। ফলে সে দেখতে পায় গৃহসামগ্রীসমূহ অবিন্যস্ত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। এরকম ভুল দর্শনের কারণে সে ক্রোধান্বিত হয় অথবা প্রদর্শন করে কড়া মেজাজ। আর বিসমিল্লাহ্ উচ্চারণ ব্যতিরেকে যে আহার করে, সেও আহার করে তার সঙ্গে। আ'মাস বলেছেন, একবার গৃহে প্রবেশকালে আমি সালাম বলতে ভুলে গেলাম। দেখলাম, আমার ওজুর বদনা যথাস্থানে নেই। অন্য স্থানে সেটিকে দেখতে পেয়ে আমি গৃহিনীর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলাম। চিৎকার করে বললাম, এক্ষুণি বদনাটা সরাও। একটু পরে সম্বিত ফিরে পেয়েই আমি বললাম, আরে এটাতো দাসিম। হজরত উবাই ইবনে কা'ব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ওয়ালহান শয়তান ওজুর মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে। তোমরা পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার সন্দেহের প্রভাব থেকে রক্ষা পাও। তিরমিজি, ইবনে মাজা। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য। হাদিস বিশারদগণের দৃষ্টিতে এর সূত্রপরম্পরা সুদৃঢ় নয়।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওসমান বিন আবীল আস একবার রসুল স. এর সুমহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! শয়তান আমার নামাজে এবং কেরাতে অনুপ্রবেশ করে এবং নামাজকে করে সন্দেহায়িত (মনে থাকে না কয় রাকাত পড়লাম)। রসুল স. বললেন, ওই শয়তানের নাম খানযাব। ওর প্রভাব অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র কাছে পরিত্রাণ চেয়ো (আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বনির রজীম পাঠ কোরো) এবং বাম দিকে তিন তিন বার থু ফেলো। হজরত ওসমান বর্ণনা করেছেন, এরপর থেকে আমি তাই করতাম। এভাবে আল্লাহ্ আমাকে তার প্রভাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। মুসলিম।

হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স.বলেছেন, ইবলিস তার আসন পাতে পানির উপর। তারপর সেখান থেকে তাঁর সতীর্থদেরকে পাঠায় স্থলভাগের দিকে। তাদের মধ্যে যারা ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে পারে, তারাই হয় ইবলিসের প্রিয়ভাজন। বিভিন্ন জন এসে তার নিকটে বিভিন্ন রকমের অপকর্মের বিবরণ দেয়। তখন সে তাদেরকে বলে, তুমি কিছুই করোনি। কিন্তু কেউ যদি বলে, আমি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছি, তখন সে বলে, তুমি উত্তম

www.eelm.weebly.com

কাজ করেছো। তারপর সে তাকে কাছে টেনে নেয়। আ'মাস বলেছেন, আমার মনে হয় বর্ণনাকারী শেষে একথাও বলেছেন, তারপর ইবলিস তাকে জড়িয়ে ধরে। মুসলিম।

পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি কালে আমি তাদেরকে ডাকিনি এবং তাদের সৃজনকালেও নয়।' এ কথার অর্থ— আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী অথবা অন্য কোনো সৃষ্টিকে অস্তিত্বায়িত করার সময় আমি তাদেরকে এরকম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন করিনি যাতে তারা হয়ে যায় ইবাদত ও আনুগত্য গ্রহণের উপযোগী। কারণ সৃষ্টি কখনোই উপাস্য হতে পারে না। উপাস্য হতে পারেন কেবল আল্লাহ্ যিনি সকল কিছুর একক স্রষ্টা ও পালনকর্তা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি বিভ্রান্তকারীদের সাহায্য গ্রহণ করবার নই।' এ কথার অর্থ— আর আমি এমতো শক্তিহীন নই যে, সৃজনকালে পথভ্রষ্টকারীদেরকে আমি আমার সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করবো।

এখানে 'আল্‌মুদ্বিল্‌লীন' অর্থ বিভ্রান্তকারী বা পথ-ভ্রষ্টকারী অর্থাৎ শয়তান 'আ'দ্বুদা' অর্থ সাহায্যকারী।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'মা আশ্‌হাদ্‌তুহুম' এর 'হুম' সর্বনামটি শয়তানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সম্পর্কিত মুশরিকদের সঙ্গে। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায় এরকম— আমি ওই মুশরিকদেরকে এমন কোনো অদৃশ্য জ্ঞান দান করিনি যাতে করে তারা বলতে পারে, আমি বা আমরা ইসলাম গ্রহণ করলে আমাদের গোত্রের সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করবে। এরকম দাবি ভিত্তিহীন। তাই আমার রসুল তাদের কথার কোনো গুরুত্ব প্রদান করেননি। তাদের দ্বারা ধর্মের কোনো সাহায্য হোক সে ইচ্ছাও প্রকাশ করেননি। আমিও এ ধরনের বিভ্রান্তদেরকে ধর্মের সাহায্যকারীরূপে কবুল করি না।

কালাবী বলেছেন, এখানকার 'হুম' সর্বনামটি সম্পর্কিত হবে ফেরেশতাদের সঙ্গে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— আমি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির সঙ্গে ফেরেশতাদেরকে আমার সৃষ্টিকর্মের অংশীদার করিনি। সুতরাং তোমরা কেনো তাদের পূজা করবে? কেনো বলবে, 'ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা'? এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয় এখানকার 'এবং আমি বিভ্রান্তকারীদের সাহায্য গ্রহণ করবার নই' বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। এমতাবস্থায় পূর্ণ বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— আমি এই বিশাল সৃষ্টি সৃজনকালে শয়তানের সহযোগিতা যেমন নেইনি, তেমনি সাহায্য নেইনি ফেরেশতাদেরও।

এর পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'এবং সেই দিনের কথা স্মরণ করো যে দিন তিনি বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে

www.eelm.weebly.com

আহ্বান করো। তারা তখন তাদেরকে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না এবং তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দিবে ধ্বংস গহ্বর।'

এখানে 'যাআ'মতুম' অর্থ তোমরা মনে করতে। অর্থাৎ তোমরা একথা ধারণা করতে যে, তোমাদের পূজ্য প্রতিমাগুলো আমার নিকটে সুপারিশ করে শাস্তি থেকে তোমাদের বাঁচাবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে শয়তান ও তার বংশধরকে।

'ফাদাআওহুম' অর্থ তাদেরকে আহ্বান করো। অর্থাৎ তাদেরকে আহ্বান করো সুপারিশ করার জন্য। 'ফালাম ইয়াসতাজীবু' অর্থ কিন্তু তারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না, সুপারিশ করবে না। 'ওয়া জাআ'লনা বাইনাহুম মাওবিক্বা' অর্থ এবং উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দিবো এক ধ্বংসগহ্বর। ধ্বংসগহ্বর বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'মাওবিক্বা' শব্দটি। এরকম বলেছেন আতা ও জুহাক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মাওবিক্ব' হচ্ছে দোজখের একটি উপত্যকা। মুজাহিদ বলেছেন উত্তপ্ত পানির সরোবর। ইকরামা বলেছেন, অগ্নি-সমুদ্র, যেখানে সতত প্রবাহিত হয় আগুন। আর ওই অনলসাগরের পাড়ের কাছে রয়েছে খচ্চরের আকৃতিবিশিষ্ট বিষধর সাপ। ইবনে আরাবী বলেছেন, দুটি বস্তুর মধ্যস্থিত প্রতিবন্ধককে বলে 'মাওবিক্ব'।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'মাওবিক্ব' শব্দটি ধাতুমূল। ফার্‌রা বলেছেন 'বাইনা' অর্থ সম্পর্ক বা মিল। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় অংশীবাদী ও তাদের উপাস্য সমূহের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিলো, সেই সম্পর্ককে আখেরাতে পরিণত করে দেয়া হবে ধ্বংসগহ্বরে। এ ধরনের বক্তব্য অন্য আয়াতেও এসেছে। যেমন— 'লাক্বদ্ তাক্বাত্ত্বআ বাইনাকুম' (তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আজ হয়ে গিয়েছে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন)।

শেষোক্ত আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে যে, তারা সেখানে পতিত হচ্ছে এবং তারা তা থেকে কোনো পরিত্রাণ স্থল পাবে না।'

এখানে 'আলমুজরিমূনা' বা অপরাধীগণ বলে বুঝানো হয়েছে অংশীবাদীদেরকে। 'ফাজন্নু' অর্থ বুঝবে বা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে। 'মুয়া'কিউ'হা' অর্থ পতিত হচ্ছে বা হবে।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যারূপে বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে বিচারের অপেক্ষায় দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। তারা জাহান্নাম দেখতে পাবে এবং জাহান্নামের চল্লিশ বছরের পথের দূরত্বে অবস্থান করেও বুঝতে পারবে, জাহান্নামের শাস্তি অনিবার্য।

'মাসরিফা' অর্থ পরিত্রাণ স্থল। শব্দটি ধাতুমূল এবং ইসমে জরফ (অধিকরণ কারক)। অর্থাৎ কোনো স্থান যেখানে তারা আশ্রয় পেতে পারে। এভাবে স্পষ্টাক্ষরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিত্রাণকে নাকচ করা হয়েছে। বলা হয়েছে — 'তারা ওই জাহান্নাম থেকে কোনো পরিত্রাণ স্থল পাবে না।'

www.eelm.weebly.com

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۭ وَكَانَ
الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَاۗءَهُمُ
الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ
الْعَذَابُ قُبُلًا ۝ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ
وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا
اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ۝ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ
عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ۭ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰي قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ
يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۭ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ
يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ۝ وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ۭ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا
كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۭ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ
دُوْنِهٖ مَوْىِٕلًا ۝ وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا
لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ۝

❑ আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।

❑ যখন উহাদিগের নিকট পথ-নির্দেশ আসে তখন উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের অবস্থা উহাদিগের কখন হইবে অথবা কখন উপস্থিত হইবে বিবিধ শাস্তি এই প্রতীক্ষাই উহাদিগকে বিশ্বাস স্থাপন হইতে ও উহাদিগের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা হইতে উহাদিগকে বিরত রাখে।

www.eelm.weebly.com

❐ আমি কেবল সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপেই রসূলগণকে পাঠাইয়া থাকি, কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যা অবলম্বনে বিতণ্ডা করে উহা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যদ্দ্বারা উহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে সেই সমস্তকে উহারা বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।

❐ কোন ব্যক্তিকে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করাইয়া দেওয়ার পর সে যদি উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং তাহার কৃতকর্মসমূহ ভুলিয়া যায় তবে তাহার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? আমি উহাদিগের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন উহারা কুরআন বুঝিতে না পারে এবং উহাদিগকে বধির করিয়াছি; তুমি উহাদিগকে সৎপথে আহ্বান করিলেও উহারা কখনও সৎপথে আসিবে না।

❐ এবং তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়াবান, উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য তিনি উহাদিগকে শাস্তি দিতে চাহিলে তিনি উহাদিগের শাস্তি ত্বরান্বিত করিতেন; কিন্তু উহাদিগের জন্য রহিয়াছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, যাহা হইতে উহাদিগের পরিত্রাণ নাই।

❐ ঐ সব জনপদ— উহাদিগের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম যখন উহারা সীমালংঘন করিয়াছিল এবং উহাদিগের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করিয়াছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।

প্রথমোক্ত আয়াতের 'আল ইনসান' (মানুষ) দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে নজর বিন হারেছকে। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। কালাবী বলেছেন, উবাই বিন খালফকে। কেউ কেউ বলেছেন, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মানুষকে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকেই এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে 'আল ইনসান' কথাটির মাধ্যমে। যেমন ৫৬ সংখ্যক আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে 'কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যা অবলম্বনে বিতণ্ডা করে'।

হজরত আলী বলেছেন, এক রাতে রসুল স. আমার ও ফাতেমার কাছে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ বা অন্য কোনো নফল) পড়ো না? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! যার অধিকারে আমাদের জীবন, তিনি আমাদেরকে যখন চান জাগ্রত করে দেন। একথা শুনে তিনি স. ফিরে যেতে যেতে আবৃত্তি করলেন 'মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।'

পরের আয়াতে (৫৫)বলা হয়েছে—'যখন তাদের নিকট পথনির্দেশ আসে তখন তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা তাদের কখন হবে অথবা কখন উপস্থিত হবে বিবিধ শাস্তি। এই প্রতীক্ষাই তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন থেকে ও তাদের প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা থেকে তাদেরকে বিরত রাখে।'

www.eelm.weebly.com

এখানে 'আল হুদা' বা 'পথনির্দেশ' দ্বারা বুঝানো হয়েছে কোরআন অথবা ইসলামকে। কিংবা রসুল স. এর পবিত্র উপস্থিতিকে। 'সুন্নাতুল আউয়ালীন' অর্থ আল্লাহ্র আযাবের পূর্বে প্রবর্তিত রীতি, যা প্রয়োগ করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিলো অতীত যুগের কাফেরদেরকে। 'ক্বুবুলা' অর্থ কখন সামনাসামনি হবে। অর্থাৎ কখন উপস্থিত হবে। বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। মুজাহিদ বলেছেন, কখন হঠাৎ আসবে। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— যখন তাদের নিকট পথ-নির্দেশরূপে কোরআন, ইসলাম অথবা আল্লাহ্র রসুলকে প্রেরণ করা হয়, তখন তারা সে পথনির্দেশকে অস্বীকার করে। দম্ভভরে প্রতীক্ষা করতে থাকে শাস্তির, যেমন শাস্তি আপতিত হয়েছিলো পূর্ববর্তী জামানার অবাধ্যদের উপর। তাদের ওই প্রতীক্ষাই তাদেরকে বিরত রাখে ইমান আনা থেকে এবং যথাসময়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা থেকে।

এর পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'আমি কেবল সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারীরূপেই রসুলগণকে প্রেরণ করে থাকি।' একথার অর্থ— বিশ্বাসবানদেরকে বেহেশতের শুভ প্রজ্ঞাপন প্রদান ও অবিশ্বাসীদেরকে দোজখাগ্নি থেকে সতর্ককরণের উদ্দেশ্যেই আমি প্রেরণ করি আমার বার্তাবাহকগণকে। তাঁদেরকে আমি এমতো দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেইনি যে, অবিশ্বাসীদের আবদার অনুসারে স্বেচ্ছায় ও স্বক্ষমতায় কোনো অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করতে পারবে। অথবা এ উদ্দেশ্যেও তাদেরকে প্রেরণ করিনি যে, স্বেচ্ছায় ও স্বশক্তিতে তাঁরা কাউকে করতে পারবে হেদায়েত বা পথপ্রাপ্ত।

এরপর বলা হয়েছে — 'কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যা অবলম্বনে বিতণ্ডা করে তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দিবার জন্য।' নিঃসন্দেহে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যাশ্রয়ী ও কূটতর্কপ্রবণ। তাই তারা বিভিন্ন কথা বলে সত্যের প্রতিরোধ করতে চায়। যেমন কখনো বলে 'আল্লাহ্ কি তবে মানুষকেই রসুল করে পাঠালেন।' কখনো বলে 'তুমিতো আমাদের মতই মানুষ বৈ অন্য কিছু নও'। কখনো আবার বলে 'যদি আল্লাহ চাইতেন তবে আমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য ফেরেশতা অবতীর্ণ করতেন'। আবার কখনো কখনো বলে 'এই কোরআন এই দুই জনপদের (মক্কা ও তায়েফের) কোনো খ্যাতিমান লোকের উপর অবতীর্ণ হলো না কেনো' ইত্যাদি। এভাবে বিতর্কের অবতারণা করে তারা সত্যের প্রকাশকে ব্যর্থ করে দিতে চায়।

'লিইউদহিদু' অর্থ এখানে ব্যর্থ করে দিবার জন্য। অর্থাৎ এভাবে প্রতর্কবিদ্ধ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়ে সত্যোচ্চারণকে স্তব্ধ করে দিবার জন্য।

এরপর বলা হয়েছে— এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যদ্দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেই সমস্তকে তারা বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে থাকে।' এখানে আয়াত অর্থ সকল নিদর্শন যা সন্নিবেশিত হয়েছে কোরআনে। 'হুযুওয়া' অর্থ

www.eelm.weebly.com

বিদ্রূপের বিষয়। উল্লেখ্য যে, মক্কার অংশীবাদীরা কোরআনের বচনবৈভবকে নিয়ে বিভিন্নভাবে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। যেমন কখনো বলতো 'আমরাও ইচ্ছে করলে এরকম বাক্য রচনা করতে পারি।' কখনো বলতো 'নিশ্চয় কোনো মানুষ তাকে কোরআন শিখিয়ে দেয়।' আবার কখনো বলতো 'এগুলো তো অতীত যুগের উপাখ্যান ভিন্ন অন্য কিছু নয়।' আযাবের বিবরণ বিশিষ্ট আয়াত সম্পর্কে বলতো 'আমাদের মন্তব্যের কারণে তাহলে আল্লাহ্ আযাব অবতীর্ণ করেন না কেনো?' দোজখীদের খাদ্য যাক্কুম সম্পর্কে বলতো 'যাক্কুম তো বলা হয় উন্নতমানের খেজুর ও মাখনকে।'

এর পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'কোনো ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর সে যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্ম সমূহ ভুলে যায়, তবে তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে?' একথার অর্থ— যার প্রতি কোরআনের আহবান পৌঁছানো হয়। স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় আল্লাহ্র বিভিন্ন নিদর্শনাবলী। উন্মোচন করে দেয়া হয় এর রচনা শৈলী ও বক্তব্যভঙ্গির অলৌকিকত্বকে, সে যদি জেনে শুনে বুঝেও এ সকল কিছুকে প্রত্যাখ্যান করে, ভুলে যায় দায়বদ্ধতার কথা তবে তার চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী হতে পারে আর কে?

এরপর বলা হয়েছ— 'আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেনো তারা কোরআন বুঝতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি; তুমি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করলেও তারা কখনো সৎপথে আসবে না।'

এখানে 'ইন্না জায়া'লনা' কথাটির মাধ্যমে এ কথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কৃতকর্ম সমূহের বিস্মৃতিই হচ্ছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর আচ্ছাদিত হওয়ার কারণ। আর বিদ্রূপ করার কারণেই তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে কোরআনের অন্তর্নিহিত জ্ঞান থেকে। আর একথা স্পষ্ট করে বলেই দেয়া হয়েছে যে 'আমি তাদের অন্তরে আবরণ দিয়েছি, যেনো তারা কোরআন বুঝতে না পারে। আলোচ্য আয়াতে 'আয়াতি' বা আল্লাহর নিদর্শন দ্বারা বুঝানো হয়েছে কোরআনকে। তাই আলোচ্য বাক্যে 'হু' সর্বনামটি বসেছে কোরআনেরই সর্বনামরূপে।

'ওয়াক্বরা' অর্থ ভার। এখানে বলা হয়েছে 'এবং' তাদেরকে বধির করেছি।' অর্থাৎ সত্য বচনের অন্তর্নিহিত ধ্বনি শ্রবণ থেকে আমি তাদেরকে রেখেছি বঞ্চিত। এভাবে চিরভ্রষ্টদের সম্পর্কে দেয়া হয়েছে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তটি হচ্ছে— চিরভ্রষ্ট যারা, তারা প্রকৃত অন্তরানুভূতি ও শ্রুতিশক্তিহীন। সুতরাং তারা কস্মিনকালেও ইমান আনবে না। তাই শেষে বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করলেও তারা কখনো সৎপথে আসবে না।

এর পরের আয়াতে(৫৮) বলা হয়েছে— 'এবং তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়াবান, তাদের কৃতকর্মের জন্য তিনি শাস্তি দিতে চাইলে তিনি তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, যা থেকে

www.eelm.weebly.com

তাদের পরিত্রাণ নেই।' এখানে 'আল গফুর' অর্থ অত্যধিক ক্ষমাপরায়ণ। 'জুর্‌রহ্‌মাতি' অর্থ পরম দয়ার্দ্র। মক্কার অংশীবাদীরা রসুল স.কে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করতো। তৎসত্ত্বেও আল্লাহ্ তাদের প্রতি তাৎক্ষণিক শাস্তি অবতীর্ণ করেননি। এটাই ছিলো তাঁর অত্যধিক ক্ষমাপরায়ণতা ও পরম দয়ার নিদর্শন। তাই এখানে বলা হয়েছে 'তাদের কৃতকর্মের জন্য তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতে চাইলে তিনি শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন।' কিন্তু তিনি তা করেননি।

'প্রতিশ্রুত মুহূর্ত' কথাটির অর্থ এখানে পৃথিবীতে বদর যুদ্ধের দিন অথবা আখেরাতে মহা বিচারের দিবসে। অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে শাস্তি না দেয়া হলেও পৃথিবীতে বদর প্রান্তরে এবং আখেরাতে হাশরের ময়দানে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবেই।

এর পরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'ওইসব জনপদ— তাদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম যখন তারা সীমালংঘন করেছিলো এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।' একথার অর্থ— নবী নূহের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়, অবাধ্য আদ ও ছামুদ জাতিসহ অন্যান্য অবিশ্বাসীদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। কারণ তারা সীমালংঘন করেছিলো। প্রত্যাখ্যান করেছিলো আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীবাহকগণকে। প্রতিটি জনপদবাসীর মূলোৎপাটনের জন্য আমি নির্ধারণ করেছিলাম নির্দিষ্ট সময়। ওই সময়কে কিঞ্চিত অগ্র-পশ্চাত করবার ক্ষমতা কারো ছিলো না।

এখানে 'আল কুরা' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে নবী নূহের সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী জনতা এবং আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়ের মতো অন্যান্য অবাধ্য জনগোষ্ঠীকে। 'লাম্‌মা জলামূ' অর্থ সীমা লংঘন করেছিলো। আর 'লিমাহ্‌লিকিহিম' অর্থ তাদের ধ্বংসের জন্য।

সূরা কাহ্‌ফ ঃ আয়াত ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ
حُقُبًا ۝ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي
الْبَحْرِ سَرَبًا ۝ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ
سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ۝ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ
الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي

www.eelm.weebly.com

الْبَحْرِ عَجَبًا ۝ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا
فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ
لَّدُنَّا عِلْمًا ۝ قَالَ لَهٗ مُوسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا
عُلِّمْتَ رُشْدًا ۝ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ
عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ۝ قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا
وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ۝ قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ
حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

❒ স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন মূসা তাহার সংগীকে বলিয়াছিল, 'দুই সমুদ্রের মধ্যস্থলে না পৌঁছিয়া আমি থামিব না— আমি যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকিব।'

❒ উহারা যখন উভয়ের সংগমস্থলে পৌঁছিল উহারা নিজদিগের মাছের কথা ভুলিয়া গেল; উহা সুড়ংগের মত পথ করিয়া সমদ্রে নামিয়া গেল।

❒ যখন উহারা আরো অগ্রসর হইল মূসা তাহার সংগীকে বলিল, 'আমাদিগের প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো আমাদিগের এই সফরে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।'

❒ সে বলিল, 'আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করিতেছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম? শয়তানই উহার কথা বলিতে আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল; মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করিয়া নামিয়া গেল সমুদ্রে।'

❒ মূসা বলিল, 'আমরা তো এই স্থানটিরই অনুসন্ধান করিতেছিলাম।' অতঃপর উহারা নিজদিগের পদচিহ্ন ধরিয়া ফিরিয়া চলিল।

❒ অতঃপর উহারা সাক্ষাৎ পাইল আমার দাসদিগের মধ্যে এক জনের যাহাকে আমি আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ দান করিয়াছিলাম ও আমার নিকট হইতে দিয়াছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।

❒ মূসা তাহাকে বলিল, 'সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হইয়াছে তাহা হইতে আমাকে শিক্ষা দিবেন— এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করিব কি?'

www.eelm.weebly.com

❐ সে বলিল, 'তুমি কিছুতেই আমার সংগে ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবে না,'

❐ 'যে বিষয় তোমার জ্ঞানায়ত্ত নহে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করিবে কেমন করিয়া?'

❐ মূসা বলিল, 'আল্লাহ্ চাহিলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করিব না।'

❐ সে বলিল, 'আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ কর-ই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিও না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! ওই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন নবী মুসা তাঁর সঙ্গী ইউশাকে তার এক ভ্রমণকালে বলেছিলো, আমাদের গন্তব্য দুই সমুদ্রের মিলনস্থল। যুগ যুগ ধরে যদি পথ চলতে হয়, তবুও সেখানে আমাদেরকে পৌঁছতেই হবে।

হজরত মুসার পিতার নাম ছিলো ইমরান। বিশুদ্ধ হাদিসে এরকমই বলা হয়েছে। 'ফাতা' (সঙ্গী) বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ইউশা ইবনে নুন ইবনে ইফরাইম ইবনে ইউসুফ আ. কে। আমি বলি, সম্ভবতঃ ইউশার পিতা নুন ইফরাইমের বংশদ্ভূত ছিলেন, সরাসরি পুত্র ছিলেন না। কেননা ইফরাইমের জামানা ছিলো নুনের জামানার অনেক পূর্বে।

'লা আবরাহু' অর্থ চলতেই থাকবো। 'মাজমাআ'ল বাহরাইন' অর্থ দুই সমুদ্রের মিলনস্থল। কাতাদা বলেছেন, পারস্য সাগর ও রোম সাগরের সঙ্গমস্থল (বর্তমানে যাকে বলা হয় শাতিল আরব)। মোহাম্মদ বিন কা'ব বলেছেন, স্থানটি তানজাহ্। হজরত উবাই ইবনে কা'বের মতে আফ্রিকা সাগর।

'হুক্বুবা' অর্থ যুগ যুগ ধরে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'হুক্বুবা' বলে আশি বছর অথবা এর চেয়ে কিছু বেশী সময়কে। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'হুক্বুবা' অর্থ সুদীর্ঘকাল। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, 'হুক্বুবা' অর্থ আশি বছর। কেউ কেউ বলেছেন 'হুক্বুবা' বলে সত্তর বছর সময়কে।

বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, সা'ঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আমি একবার ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, নাওফ বুকালীর ধারণা খিজিরের সঙ্গী মুসা বনী ইসরাইলদের নবী মুসা নন। তিনি বললেন, সে অসত্যভাষী। উবাই বিন কা'ব বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, একদিন বনী ইসরাইলের এক সমাবেশে নবী মুসা বক্তৃতা প্রদানের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হলেন। একলোক বললো, হে আল্লাহ্র নবী! বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী কে? মুসা কলিমুল্লাহ্ বললেন, আমি। তাঁর এমতো জবাব আল্লাহ্র পছন্দ হলো না। আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করলেন, তোমার চেয়ে অধিকজ্ঞানী একজন আছে। তাকে পাওয়া যাবে দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে। নবী মুসা বললেন, কীভাবে আমি তার সাক্ষাৎ পাবো? আল্লাহ্ জানালেন, একটি ভাজা মাছ সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করো। যেখানে মাছটিকে

www.eelm.weebly.com

নিজে নিজে সমুদ্রসলিলে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখবে, সেখানেই সাক্ষাৎ পাবে তার। নবী মুসা একটি ভাজা মাছ নিয়ে সমুদ্র সৈকত ধরে রওনা হলেন। সহযাত্রীরূপে সঙ্গে ছিলেন ইউশা ইবনে নূন। একটানা পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তাঁরা। ক্লান্তি নিবারণের জন্য একস্থানে পাথরে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। ঘুমিয়েও গেলেন একসময়। ওই সময় ভাজা মাছটি নিজে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়লো সাগরে। পানির মধ্যে তার গতিপথ হয়ে গেলো সুড়ঙ্গের মতো। ইউশা হঠাৎ জেগে উঠেছিলেন। এরকম অদ্ভুত দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। পুনরায় নিদ্রাভিভূত হলেন। দু'জনে যখন জাগলেন তখন দিবাবসানের খুব বেশী দেরী নেই। পথ চললেন সূর্যাস্ত পর্যন্ত। রাতের বিশ্রাম শেষে পুনরায় শুরু হলো পথ চলা। শ্রান্তি নিবারণের জন্য একস্থানে থেমে মুসা বললেন, ইউশা! কিছু আহারের বন্দোবস্ত করো। উল্লেখ্য, মাছ সমুদ্রে চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করেননি। ইউশার মাছ চলে যাওয়ার ঘটনাটি মনেই ছিলো না। হঠাৎ মনে পড়তেই বললেন, সঙ্গের ভাজা মাছটি তো নেই। গতকাল দ্বিপ্রহরের পর যেখানে আমরা শুয়েছিলাম, সেখানেই মাছটি লাফিয়ে পড়েছে সাগরে। আমি তখন হঠাৎ জেগে উঠেছিলাম। আপনি ছিলেন নিদ্রাভিভূত। মুসা বললেন, আরে ওই স্থানটিই তো আমাদের গন্তব্যস্থল। ফিরে চললেন তাঁরা। একসময় উপস্থিত হলেন নির্দিষ্ট স্থানে। দেখলেন, সেখানে আপাদমস্তক চাদরাবৃত হয়ে শুয়ে আছেন খিজির। মুসা তাঁকে সালাম বললেন। খিজির চাদর থেকে মুখ বের করে জিজ্ঞেস করলেন, এ অঞ্চলে আবার সালামের প্রচলন আছে নাকি? মুসা বললেন, আমি মুসা। খিজির বললেন, বনী ইসরাইলের মুসা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি আপনার কাছেই এসেছি। উদ্দেশ্য— আল্লাহ্ আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, সেই জ্ঞান থেকে কিছু আহরণ করা। খিজির বললেন, কিন্তু আপনি তো আমার সঙ্গে থাকতে পছন্দ করবেন না। আমাকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, সে জ্ঞান আপনাকে দেয়া হয়নি, আবার আপনাকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, সে জ্ঞান আমার নেই। মুসা বললেন, ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলরূপে পাবেন। খিজির বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে আমি যাই কিছু করি না কেনো আপনি সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না। মুসা তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তারপর তাঁরা দু'জনে একদিকে যাত্রা করলেন। চলতে চলতে উপস্থিত হলেন এক নদীর কিনারায়। দেখলেন পারাপারের জন্য ঘাটে বাঁধা রয়েছে একটি নৌকা। নৌকার মাঝি খিজিরকে চিনতো। তাই সে বিনা ভাড়ায় খিজির ও তাঁর সঙ্গীকে নদী পার করে দিলো। তীরে নামার আগে খিজির একটি পেরেক ঠুকে নৌকার তলা ফুটো করে দিলেন। তারপর নেমে পড়লেন তটভূমিতে। মূসাও অনুসরণ করলেন তাঁকে। কিন্তু তিনি সহসা বলে উঠলেন, আপনি তো আজব লোক! লোকটা বিনা ভাড়ায় আমাদেরকে পার করলো, আর আপনি তার ক্ষতি করলেন। এক্ষুণি তার নৌকা ডুবে যাবে। এভাবে একটা ভালো লোকের আয় উপার্জন বন্ধ করা কি ঠিক হলো? খিজির বললেন, আমি তো আগেই বলেছিলাম, আপনি আমার সঙ্গে থাকতে

www.eelm.weebly.com

পারবেন না। মুসা বললেন, সত্যিই আমার ভুল হয়েছে। আর এভাবে আপনাকে প্রশ্ন করবো না। খিজির এবার তাকালেন নৌকাটির দিকে। একটি চড়ুই পাখি হঠাৎ এসে বসলো নৌকায়। একটু পরে পাখিটি নদীর পানি পান করলো। খিজির বললেন, দেখুন পাখিটির দিকে। চঞ্চু দ্বারা সে যতটুকু পানি পান করলো, আপনার ও আমার জ্ঞান ততটুকুই। আর আল্লাহ্‌র জ্ঞান সীমাহীন সমুদ্রের মতো। আমরা যতই সেখান থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করি না কেনো, আল্লাহ্‌র জ্ঞান তাতে করে একটুও কমে না। পথ চলা শুরু হলো পুনরায়। একস্থানে তাঁরা দেখলেন, কয়েকটি বালক খেলাধুলায় মত্ত। খিজির ওই বালকদের মধ্যে একজনকে ধরে ফেললেন। তারপর নিজ হাতে ছিন্ন করলেন তার মস্তক। মুসা চিৎকার করে বললেন, কী করলেন আপনি! একটি নিষ্পাপ বালকের জীবন সংহার করলেন! খিজির বললেন, আবার? কী চুক্তি ছিলো আমাদের মধ্যে? মুসা আত্মসংবরণ করলেন। বললেন, ভুল হয়েছে। ঠিক আছে, আর এরকম করবো না। আবার যদি এরকম করি তবে আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন।

পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন তাঁরা। চলতে চলতে পৌঁছলেন এক গ্রামে। দু'জনেই তখন ক্ষুধার্ত। গ্রামবাসীদের নিকট কিছু খাবার চাইলেন খিজির। গ্রামবাসীরা কেউই তাঁর আবেদনে সাড়া দিলো না। তাঁরা দেখতে পেলেন, অদূরেই একটি গৃহের প্রাচীর ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। খিজির এগিয়ে গিয়ে প্রাচীরটি যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন। মুসা বললেন, গ্রামবাসীরা মেহমানদারী করলো না। আপনিও বিনা মজুরীতে একজনের প্রাচীর ঠিক করে দিলেন। এদিকে আমরা ক্ষুধার্ত। আপনার এমতো রহস্যময় আচরণের কারণ কী? খিজির তখন একে একে তাঁর কাজের রহস্য ভেদ করলেন। তারপর বললেন, এবার বুঝলেন তো, কোন কাজের কী রহস্য। এবার বিদায়। এ পর্যন্ত বলে রসুল স. মন্তব্য করলেন, মুসা যদি ধৈর্য ধরে তাঁর সাথে থাকতে পারতেন, তবে দেখতে পেতেন আরো অনেক রহস্যময় কার্যকলাপ, লাভ করতে পারতেন আরো বেশী জ্ঞান। আল্লাহ্‌ও সেগুলো আমাকে জানিয়ে দিতেন।

ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম তাঁদের স্ব স্ব তাফসীরে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস উল্লেখ করেছেন, একবার নবী মুসা তাঁর প্রভুপালনকর্তার নিকটে নিবেদন করলেন, হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালক। তোমার বান্দাগণেরে মধ্যে তোমার নিকটে সর্বাপেক্ষা প্রিয়ভাজন কে? আল্লাহ্‌ বললেন, যে আমাকে অধিক স্মরণ করে। নবী মুসা জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার আল্লাহ্‌! তোমার বান্দাগণের মধ্যে তোমার কাছে সর্বোত্তম কে? আল্লাহ্‌ বললেন, যে তার প্রবৃত্তির অনুসারী নয় এবং যে সিদ্ধান্ত দান করে সত্যের অনুকূলে। নবী মুসা

www.eelm.weebly.com

বললেন, আর সর্বাপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ? আল্লাহ্ বললেন, ওই ব্যক্তি যে নিজের জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে নেয় অন্যের জ্ঞান। নবী মুসা বললেন, হে আমার জীবনাধিকারী আল্লাহ্! বর্তমানে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞান যদি কারো থাকে তবে তার সন্ধান আমাকে দাও। আল্লাহ্ বললেন, হ্যাঁ, আছে। তার নাম খিজির। নবী মুসা বললেন, আমি তাকে কোথায় খুঁজে পাবো? আল্লাহ্ বললেন, সাগর পাড়ে পাথরের কাছে। মুসা বললেন, কীভাবে তাকে পাবো? আল্লাহ্ বললেন, একটি মাছ ভেজে নিয়ে রওয়ানা হয়ো। যেখানে ওই মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই পেয়ে যাবে তাকে। মুসা তখন একটি মাছ ভেজে নিলেন। তারপর একটি থলিতে ভাজা মাছটি পুরে নিয়ে একজন খাদেম সহকারে যাত্রা করলেন সাগরের পাড় ধরে। খাদেমকে বললেন, মাছটির প্রতি খেয়াল রেখো। কোথাও মাছটি হারিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানিয়ো।

পরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— 'তারা যখন উভয়ের সঙ্গমস্থলে পৌছলো, তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলো; মাছটি সুড়ঙ্গের মতো পথ করে সমুদ্রে নেমে গেলো।' একথার অর্থ— হজরত মুসা ও তাঁর সহচর ইউশা যখন দুই সমুদ্রের সন্ধিস্থলের নিকটে পৌছলেন, তখন দু'জনেই ভুলে গেলেন থলির মধ্যে রাখা ভর্জিত মৎস্যটির কথা। ইত্যবসরে মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং পানিতে সুড়ঙ্গ তৈরী করে সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে নেমে গেলো সমুদ্রের গভীরে।

সুফিয়ান বলেছেন, কেউ কেউ ধারণা করেন, ওই পাথরের নিকটেই ছিলো আবে হায়াতের (সঞ্জিবনী সলিলের) প্রস্রবণ। ওই আবে হায়াতের স্পর্শেই ভাজা মাছটি জীবিত হয়ে উঠেছিলো এবং নেমে গিয়েছিলো সমুদ্রের পানিতে। কালাবী বলেছেন, ইউশা ইবনে নুন ওই সঞ্জিবনী সলিল দ্বারা ওজু করে লবন ছিটিয়ে দিয়েছিলেন মাছটির উপরে। ফলে মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রাভ্যন্তরে চলে যায়। মাছটির নিঃশ্বাসে সমুদ্রের পানি সরে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছিলো পথ বা সুড়ঙ্গ।

'তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলো' কথাটির অর্থ— সমুদ্রতীরস্থিত ওই পাথরটির নিকটে গিয়ে হজরত মুসা মাছটির কথা বিস্মৃত হলেন এবং হজরত ইউশা মাছটির জীবিত হওয়া ও সমুদ্রাভ্যন্তরে চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখেও হজরত মুসাকে তা জানাতে ভুলে গেলেন।

বাগবী লিখেছেন, মাছটি ছিলো হজরত ইউশার জিম্মায়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ভুলে গিয়েছিলেন মাছটি জীবিত হওয়া ও সমুদ্রে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু যেহেতু মাছটি ছিলো উভয়ের পাথেয়, তাই এখানে বলা হয়েছে 'তারা দু'জনেই নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলো।'

www.eelm.weebly.com

'মাছটি সুড়ঙ্গের মতো পথ করে সমুদ্রে নেমে গেলো' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্‌র হুকুমে মাছটি সমুদ্রবক্ষ ভেদ করে তৈরী করলো একটি সুড়ঙ্গের মতো পথ, আর ওই পথ ধরে সে নেমে গেলো সমুদ্রের গভীরে। এখানে 'সারাবা' অর্থ চলার পথ। যেমন বলা হয়— 'সারিবুম বিন্‌নাহার' (দিনে চলাচলকারী)। কোনো কোনো অভিধানবিশারদ লিখেছেন, 'সারাবা' অর্থ লম্বিতভাবে বিদীর্ণ করা বা চিরে ফেলা। অর্থাৎ মাছটি পানি চিরে চিরে প্রস্তুত করে নিয়েছিলো তার প্রলম্বিত পথ। একটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, মৎস্যটি যখন সমুদ্রসলিলে প্রবেশ করলো, তখন আল্লাহ্ তার গমন পথের চতুষ্পার্শ্বের তরঙ্গসমূহকে থামিয়ে দিলেন। ফলে নির্মিত হলো একটি সুড়ঙ্গসদৃশ সুদীর্ঘ পথ।

এর পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'যখন তারা আরো অগ্রসর হলো, মুসা তার সঙ্গীকে বললো, আমাদের প্রাতঃরাশ আনো, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' এ কথার অর্থ— হজরত মুসা ও তাঁর সঙ্গী হজরত ইউশা একদিন এক রাত্রি এবং পরের দিন দুপুর পর্যন্ত পথ চললেন। অতিক্রম করে গেলেন দুই সমুদ্রের সন্ধিস্থল। তারপর ক্লান্ত হয়ে একস্থানে থেমে হজরত মুসা তাঁর সঙ্গীকে বললেন, আমরা এখন ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। সুতরাং আমাদের আহার্য উপস্থিত করো। উল্লেখ্য যে, দুই সমুদ্রের মিলনস্থলের পথটি অতিক্রম করে যাবার পর থেকেই হজরত মুসা ও হজরত ইউশা অনুভব করলেন ক্লান্তি ও ক্ষুধা। ক্ষুধা নিবারণার্থে তখন তাঁদের ভর্জিত মৎসটির কথা মনে পড়ে যায়। তারপর তাঁরা সেখান থেকে ফিরে আসেন পাথরটির নিকটে। বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরাসম্বলিত হাদিসে এসেছে, গন্তব্যস্থল অতিক্রম না করা পর্যন্ত হজরত মুসা শ্রান্তি ও ক্ষুধা অনুভব করেননি।

এর পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'সে বললো, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই তার কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিলো।' একথার অর্থ— হজরত ইউশা তখন বললেন, মাছটি তো নেই। দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে প্রস্তরখণ্ডের নিকটে আমরা যখন বিশ্রাম করছিলাম, তখনই সেটি জীবিত হয়ে সাগরাভ্যন্তরে চলে যায়। অথচ আশ্চর্য। সেটির সাগর গমনের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেও আমি আপনাকে তা জানাতে ভুলে গিয়েছি। নিশ্চয় শয়তানের প্রভাবেই ঘটেছে আমার এমতো বিস্মৃতি। আপনি কি এটা লক্ষ্য করেছেন?

'আস্‌সখ্‌রাতি' অর্থ ওই শিলাখণ্ড, যেখানে আমরা বিশ্রাম করেছিলাম বা শুয়েছিলাম। হাকাম বিন যিয়াদ সূত্রে বাগবী লিখেছেন, শিলাখণ্ডটি ছিলো পীত সমুদ্রের পশ্চাদ্‌ভাগে।

www.eelm.weebly.com

'নাসীতুল্ হূতা' অর্থ আমি মাছের কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম অথবা আমি মৎস্যটি হারিয়ে ফেলেছি কিংবা ছেড়ে এসেছি। বাগবী লিখেছেন, মাছটি সমুদ্রগমনের সময়েই হজরত ইউশা হজরত মুসাকে ঘটনাটি জানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হজরত মুসা তখন ছিলেন নিদ্রিত। যখন তিনি জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা বিস্মৃত হলেন ঘটনাটি। দু'জনে পথ চলতে শুরু করলেন পুনরায়। দ্বিপ্রহরের সময় একস্থানে থেমে নামাজ পাঠ করলেন তাঁরা। তারপর হজরত মুসা যখন খাদ্য উপস্থিত করার কথা বললেন, তখন ইউশার মনে পড়লো সমুদ্রগামী মৎস্যটির কথা।

'ইল্লাশ্ শাইত্বনু' অর্থ শয়তানই ভুলিয়ে দিয়েছে আমাকে। বায়যাবী লিখেছেন, হজরত ইউশা তখন আল্লাহ্র অপার পরাক্রমের এক বিরল নিদর্শন দেখে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সকল মনোযোগ বিলিন হয়ে গিয়েছিলো আল্লাহ্র অপার কুদরতের মাধ্যমে। তাই তিনি ভুলে গিয়েছিলেন ভাজা মাছটির কথা। কিন্তু বিনয় ও আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ তিনি ওই ভুলকে সম্পৃক্ত করে দিলেন নিজের সঙ্গে। আর এক্ষেত্রে ঔদাসিন্যের ভাবটিকে সম্পর্কিত করেছিলেন শয়তানের সঙ্গে।

এরপর বলা হয়েছে— 'মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নেমে গেলো সমুদ্রে।' এখানে 'আ'জাবা' (আশ্চর্যজনকভাবে) কথাটির মওসুফ (বিশেষ্য) রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ত মওসুফ সহকারে কথাটি দাঁড়াবে এরকম— 'সাবীলান্ আ'জাবা (ধরেছিলো আশ্চর্যজনক পথ) অথবা 'ইত্তাখাজান আ'জাবা (ধরেছিলো আশ্চর্যজনকভাবে)।' কেউ কেউ বলেছেন, 'আ'জাবান কথাটি বলেছিলেন হজরত মুসা। ইউশা যখন হজরত মুসাকে মাছটির সমুদ্রগমনের কথা জানালেন তখন হজরত মুসা বললেন, 'আ'জাবান' (আশ্চর্যতো)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'ইত্তাখাজা' শব্দটির সর্বনাম সম্পৃক্ত হবে হজরত মুসার সঙ্গে। অর্থাৎ ভর্জিত মৎস্যের সমুদ্রাভ্যন্তরে গমনের বিষয়টি সম্পর্কেই হজরত মুসা বলেছিলেন আশ্চর্যতো?

এরপরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, আমরা তো এই স্থানটিই অনুসন্ধান করছিলাম।' একথার অর্থ— হজরত মুসা তখন বললেন, হে ইউশা! ওই স্থানটিই তো আমাদের গন্তব্য। সেখানেই দেখা হবে আল্লাহ্র সেই জ্ঞানী বান্দা খিজিরের সঙ্গে। একথা বলেই তাঁরা দু'জনে তাঁদের পদচিহ্ন দেখে দেখে ফিরে গেলেন ওই নির্ধারিত স্থানে।

এরপরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেলো আমার দাসদের মধ্যে একজনের।' এখানে 'দাসদের মধ্যে একজন' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত খিজিরকে। এরকম বলেছেন জমহুর উলামা। বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত হাদিসসমূহে এরকমই বর্ণিত হয়েছে। খিজির ছিলো তাঁর উপাধি। আসল নাম ছিলো বলইয়ান বিন মালাকান অথবা আলইয়াসা কিংবা ইলইয়াস। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হিসাম ইবনে মুনাব্বাহ্ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিনি

www.eelm.weebly.com

কোনো শুষ্ক ভূমিতে বসে পড়লে সেখানে জন্ম নিতো সবুজ তৃণ ও উদ্ভিদ। তাই তাঁকে বলা হয় খিজির। মুজাহিদ বলেছেন, যে স্থানে খিজির নামাজ পড়তেন তার চতুষ্পার্শ্বে দেখা দিতো সবুজের সমারোহ। বাগবী তাঁকে ইসরাইল বংশভূত বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন রাজপুত্র, কিন্তু সংসার বিরাগী। আমি বলি, তিনি ইসরাইল বংশভূত ছিলেন না। ইসরাইলী হলে হজরত মুসার আনুগত্য করা তাঁর জন্য হতো অত্যাবশ্যক। কারণ হজরত মুসা ছিলেন বনী ইসরাইলের পয়গম্বর। তাছাড়া বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, প্রথম সাক্ষাতের সময় হজরত মুসা তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন, আমি মুসা। হজরত খিজির বলেছিলেন, বনী ইসরাইলের মুসা? হজরত মুসা বলেছিলেন, হ্যাঁ। এই কথোপকথনের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইসরাইল বংশভূত নন।

এক বর্ণনায় এসেছে, নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে হজরত মুসা দেখলেন, এক লোক আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত অবস্থায় চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছেন। বস্ত্রের কিছু অংশ রয়েছে তাঁর মস্তকের নিচে এবং কিছু অংশ তাঁর পায়ের গোড়ালীর নিচে। অপর এক বর্ণনায় এ কথাও এসেছে যে, ওই সময় হজরত খিজির সমুদ্রবক্ষে একটি সবুজ জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পাঠ করছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাকে আমি আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমার নিকট থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।' এ কথার অর্থ— যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে দান করেছি প্রত্যাদেশ বা নবুয়ত এবং আমার নিকট থেকে দিয়েছি সাধনালব্ধ জ্ঞানের অতীত এক বিশেষ ধরনের জ্ঞান। উল্লেখ্য যে, এই বিশেষ ধরনের জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর রহস্য সম্পর্কীয় জ্ঞান।

বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ আলেম হজরত খিজিরকে নবী বলে মনে করেন না। আমি বলি, এক্ষেত্রে আলেমগণের অভিমতসমূহ বেশ জটিল। নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ হয় প্রত্যাদেশ বা ওহী, যা নিঃসন্দিগ্ধ ও অবশ্য অনুসরণীয়। আর আউলিয়াগণের প্রতি অবতীর্ণ হয় ইলহাম বা অনুপ্রেরণা, যা সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ যেমন নয়, তেমনি নয় অবশ্য অনুসরণীয়। তাঁকে যদি নবী মেনে না নেয়া হয় তবে একথার জবাব কী হতে পারে যে— ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে হজরত খিজির একটি বালককে হত্যা করেছিলেন, এ ধরনের আমল প্রত্যাদেশ ছাড়া কী করে সম্ভব?

এর পরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'মুসা তাকে বললো, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন, এই শর্তে আমি আপনাকে অনুসরণ করবো কি?' উল্লেখ্য যে, সৌজন্য ও শিষ্টাচারিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে হজরত মুসা এভাবে এখানে হজরত খিজিরের সঙ্গলাভের অনুমতি প্রার্থনা করেছেন।

www.eelm.weebly.com

'রুশ্‌দা' অর্থ সত্যপথের দিশা। 'রুশ্‌দা' এবং 'রাশ্‌দা' শব্দ দু'টো সমার্থক। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, সাধারণভাবে উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নপর্যায়ের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও কোনো এক বা একাধিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারে। এমতো ক্ষেত্রে উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যদি ওই বিশেষ জ্ঞান অর্জনের জন্য তাঁর চেয়ে নিম্নজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির শরণাপন্ন হন, তবে তাতে করে তাঁর মর্যাদাহানি ঘটে না। বরং এভাবে বিভিন্ন জনের নিকট থেকে বিশেষ বিশেষ জ্ঞান সংগ্রহ করাই প্রকৃত জ্ঞানীর স্বভাব। ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, নবী মুসা আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞেস করলেন, সবচেয়ে বড় আলেম কে? আল্লাহ্‌ বললেন, ওই ব্যক্তি, যে অন্যের নিকট থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করে নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে নেয়। উত্তম সূত্র সহযোগে হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি ও ইবনে মাজা এবং হজরত আলী থেকে ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রজ্ঞা হচ্ছে বিশ্বাসীদের হারানো ধন। সুতরাং যেখানে তা পাওয়া যায়, বিশ্বাসীরা যেনো সেখান থেকেই তা সংগ্রহ করে। এটা তাদের অধিকার। দরূদে ইব্রাহিমে রসুল স. ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর হজরত ইব্রাহিম ও তাঁর পরিবারবর্গের মতো যে রহমত কামনা করা হয়েছে, সেই রহমতও হারানো ধন সদৃশ।

বাগবী লিখেছেন, অন্যান্য হাদিসে এসেছে, হজরত মুসা যখন হজরত খিজিরের সঙ্গ কামনা করলেন, তখন হজরত খিজির বললেন, জ্ঞান শিক্ষার জন্য তওরাতই যথেষ্ট। আর পুণ্য কর্মের জন্য বনী ইসরাইলের পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব পালনই যথেষ্ট। দু'টোই আপনার রয়েছে। সুতরাং আমার সঙ্গলাভের প্রয়োজন কী? হজরত মুসা বললেন, আল্লাহ্‌ আমাকে এরকম নির্দেশ করেছেন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ প্রাপ্ত হলেও নিজেকে শিক্ষার্থীরূপে উপস্থিত করাই জ্ঞান চর্চার একটি আদব। আর ওই আদব প্রদর্শনার্থেই হজরত মুসা অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন এভাবে— সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন, এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করতে পারি কি?

এরপরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'সে বললো, তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না।' উল্লেখ্য যে, হজরত খিজির এ কথা বলেছিলেন বেশ জোর দিয়ে। বক্তব্যকে জোর প্রদানের জন্যই তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইন্‌না' (সুনিশ্চিত) এবং 'লান'(কিছুতেই না) শব্দদ্বয়।

এরপরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'যে বিষয় তোমার জ্ঞানায়ত্ব নয়, সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করবে কেমন করে? আলোচ্য উক্তিটিও হজরত খিজিরের। এখানে 'খুবরা' শব্দটির অর্থ 'ইলম' (জ্ঞান, সংবাদ বা বিজ্ঞপ্তি)। হজরত খিজির

www.eelm.weebly.com

নিশ্চিত জানতেন, অচিরেই এমন কিছু কাজ তাঁকে করতে হবে, যা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ও মন্দ। নবী ও রসুলগণের শরিয়তে প্রকাশ্য দিকটি অবশ্য পালনীয়। তাই প্রকাশ্য দৃষ্টিতে যা শরিয়ত বিরুদ্ধ, তার বিরুদ্ধাচরণ তো তাঁরা করবেনই। হজরত খিজির কথাটি ভালোভাবেই জানতেন। তাই তিনি বলেছিলেন, হে মুসা! আপনি তো রসুল। আপনি তো সাধারণ মানুষের সংশোধন'কর্মে জড়িত, কিন্তু বাহ্যিক কর্মকাণ্ডসমূহেরও অন্তর্নিহিত একটি রহস্য রয়েছে। সে রহস্য আপনার জানা নেই। আমি প্রধানতঃ বিচরণ করি ওই রহস্যের জগতেই। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমার আচরণ ও কর্মসমূহ আপনার নিকটে আশোভন ও অন্যায় মনে হতেই পারে। তাই আমি বলি, সেরকম কিছু ঘটলে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কীভাবে?

আমি বলি, সর্বসাধারণের জন্য আইন বা বিধান এক রকমই হয়। বিভিন্ন জনের জন্য বিভিন্ন আইন প্রণীত হলে মানুষের সমাজ সংসার বলে আর কিছু থাকে না। তাই ভালো ও মন্দের ধারণা ও বিধান সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বজন প্রযোজ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শরিয়ত হচ্ছে এরকম সর্বজন প্রযোজ্য বিধানাবলীর সমষ্টি। আর সর্বসাধারণের সংশোধনের দায়িত্ব যেহেতু নবী ও রসুলগণকে পালন করতে হয়, সেহেতু প্রত্যাদেশের মাধ্যমে শরিয়তের বিধিবিধান জানানো হয় তাঁদেরকেই। ওই শরিয়তানুসারে যেমন তারা নিজেরা পরিচালিত হন, তেমনি পরিচালিত করেন আপামর জনসাধারণকে। তাই শরিয়তের প্রতি অসঙ্গতিপূর্ণ রহস্যময়তা অথবা অরহস্যময়তার তাঁরা বিরোধিতা করেন। এটা নবী রসুলগণের একটি স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। হজরত খিজির ছিলেন অন্তর্নিহিত এক রহস্যময় জগতের নায়ক। জনসম্পৃক্ততা ও সর্বসাধারণের সংশোধনকর্ম তাঁর দায়িত্বভূত বিষয় নয়। তাই তাঁর আচরণ ও কর্মকাণ্ড সর্বজনগ্রাহ্য না হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, হজরত মুসা তাঁর আপাতঃ বিসদৃশ কর্মকাণ্ড সহ্য করতে পারবেন না। ফলে তাঁর সাহচর্য্যের মাধ্যমে হজরত মুসার উপকার লাভেরও সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি হজরত মুসাকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন একথা বলে যে, —যা আপনার জ্ঞানায়ত্ব নয়, তা আপনি সহ্য করবেন কীভাবে? এ কারণেই কামেল সূফীগণ বলেন, মুরীদের যদি তাঁর পীর সম্পর্কে এমতো বিশ্বাস থাকে যে, তিনি একজন প্রকৃত আল্লাহ্‌র পরিচয়ধন্য ব্যক্তিত্ব, তবে পীরের আপাতঃ বিসদৃশ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকাই হবে তার জন্য সমীচীন। যদি সে এরকম করতে না পারে, তবে বর্তমান পীরের প্রতি উত্তম ধারণা রেখে অন্য কোনো পীরের নিকটে গমন করাই হবে তার কর্তব্য।

www.eelm.weebly.com

একটি প্রশ্নঃ শরিয়তে মোহাম্মদী সকল মানুষের উপরে সমভাবে প্রযোজ্য। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না বলে এই শরিয়তের মধ্যে আর কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন অথবা সংযোজন-বিয়োজনের কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং কোনো পীরকে শরিয়ত বিরোধী কিছু বলতে বা করতে দেখেও তাকে কামেল আরেফ বা আল্লাহ্‌র পরিচয়ধন্য ব্যক্তিত্ব মনে করা যেতে পারে কীভাবে?

উত্তরঃ নিঃসন্দেহে শরিয়ত বিরোধী কিছু করার অধিকার কারোই নেই। ইলহাম বা অনুপ্রেরণা অনুসারে একটি বালক হত্যা করা হজরত খিজিরের জন্য সিদ্ধ ছিলো বটে কিন্তু এই উম্মতের কারো জন্যই তা সিদ্ধ নয়। আর কামালিয়াতের নাম করে এরকম কর্ম কেউ করেনও না। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, মতপৃথকতাজনিত মাসআলার দু'টি দিক সতত বিদ্যমান— ইতিবাচক ও নেতিবাচক। আর প্রতিটি দিকের নিশ্চয় কোনো না কোনো কারণও রয়েছে। সুতরাং মুজতাহিদ ইমামগণের মতপার্থক্য জনিত মাসআলাগুলোকে যেমন শরিয়ত বিরোধী বলা যায় না, তেমনি আল্লাহ্‌র পরিচয়প্রাপ্ত অলি-আল্লাহ্‌গণের ব্যাখ্যাসমূহকেও শরিয়তের পরিপন্থীরূপে সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কখনো কখনো আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসুলের প্রশস্তিসূচক সামা বা সংগীতাদি নিয়ে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁদের সকল কাজ শরিয়ত সম্মত হওয়ার পরেও এমতো কিছু বিসদৃশ আচরণের কারণে তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করা ঠিক নয়। বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই চূড়ান্ত কোনো মাপ-কাঠি নয়। যেমন কেউ যদি কাচের গ্লাসে মদের রঙ বিশিষ্ট শরবত পান করে, তবে একথা বলা যাবে না যে, ওই লোকটি মদ্যপায়ী। পূর্ববর্তী জামানার কোনো কোনো সুফী এ ধরনের আমল করতেন এই উদ্দেশ্যে যে, সর্বসাধারণ যেনো এভাবে তাঁদেরকে ভুল বুঝে দূরে সরে যায় এবং তাঁদের জিকির-ফিকির ও ইবাদত বন্দেগী যেনো হয় নিরুপদ্রব। তাদের এমতো আমলকে শরিয়ত বিরোধী বলা যায় কি?

কামেল পীরগণের মাধ্যমে সগীরা গোনাহ্ প্রকাশ পাওয়াও একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তাঁরা এসকল অনুল্লেখ্য স্খলন থেকে মুক্ত থাকার জন্য চেষ্টা ও সতর্কতাও তো অবলম্বন করেন। এর পরেও তাঁদের ছিদ্রান্বেষণ করার হেতু কীভাবে থাকতে পারে? তাঁরা তো নবী নন, যে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হতে পারবেন। সুতরাং প্রকৃত মুরীদের কর্তব্য হচ্ছে, সে তাঁর পীর মোর্শেদের এমতো কর্মের অনুসরণ থেকে বিরত থাকবে, কিন্তু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে না এবং এই সন্দেহটিকেও প্রশ্রয় দিবে না যে, তিনি আরেফে কামেল নন।

www.eelm.weebly.com

বিশ্ববিশ্রুত কতিপয় সুফী সাধকগণের কোনো কোনো উক্তি আপাতঃদৃষ্টিতে শরিয়তের পরিপন্থী বলে মনে হয়। যেমন, শায়েখ ইবনে আরাবী, ইবনে সাবঈন, ইবনে ফারেজ প্রমুখ। তাঁদের ওই সকল উক্তি কাশ্‌ফ বা আত্মিক দর্শনজাত। আলেমগণের উচিত ওই সকল উক্তিসমূহকে শরিয়তের অনুকূলে ব্যাখ্যা করা, তাঁদের প্রতি অসৎধারণাকে প্রশ্রয় না দেয়া। আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'একথা শোনার পর মুমিন পুরুষ ও নারী কেনো নিজেদের বিষয়ে সৎধারণা করেনি' (সূরা নূর)। সুতরাং তাঁদের উক্তিসমূহকে শরিয়তের অনুকূলে ব্যাখ্যা না করা গেলে এমতো ধারণা রাখতে হবে যে, তাঁদের ওই উক্তিগুলো ছিলো আধ্যাত্মিক মত্ততাজাত। আর মত্ততা তো একটি উপেক্ষণীয় বিষয়। ফকীহ্‌গণ বলেন, বৈধ আহার্য বা পানীয়ের মাধ্যমেও যদি কারো মত্ততা উদ্ভূত হয় এবং ওই মত্ত অবস্থায় যদি কেউ তালাক দেয়, তবে তা শুদ্ধ হবে না। যদি তাই হয়, তবে প্রেমসাগরে সতত সন্তরণরত আল্লাহ্‌র অলীগণের প্রেমোন্মত্ততাকে কীভাবে দূষণীয় বলা যায়? প্রায়শঃ এরকম ঘটে থাকে যে, পাঠক ও শ্রোতা তাঁদের বক্তব্যের মর্মার্থই অনুধাবন করতে পারে না। তাঁদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য থাকে এক রকম, আর পাঠক ও শ্রোতা বুঝে ফেলে অন্য রকম। একথাতো অনস্বীকার্য যে, সুসংগত ও যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণ ছাড়া বোধ্য ও অবোধ্য কোনো বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায় না। এর মধ্যে আবার অবোধ্য বিষয়সমূহ অধিকতর সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর। যেমন, আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত বিষয়। এসকল বিষয়ের জ্ঞান ও প্রতিক্রিয়া প্রকৃত আল্লাহ্ প্রেমিকের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। তিনি তখন বিষয়টিকে প্রকাশ করতে চান, কিন্তু উপযুক্ত কোনো ভাষা খুঁজে পান না। কারণ ভাষা ওই অসীম ও অতুলনীয় জ্ঞান ধারণ করতে অক্ষম। তাই আল্লাহ্‌র পরিচয়ধন্য ব্যক্তি তখন তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করেন রূপকভাবে। অপূর্ণাঙ্গ তুলনা প্রয়োগ করা ছাড়া তখন তাঁর বক্তব্য প্রকাশের আর কোনো উপায় থাকে না। সুতরাং তাঁদের রূপকাশ্রয়ী বক্তব্যকে শাব্দিক বা আভিধানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা বৈধ নয়। এরকমও বলা ঠিক নয় যে, তাঁদের বক্তব্য বা বিশ্বাস আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকায়েদের বিপরীত। লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বাণী সম্ভারের মধ্যেও অবোধ্য বিষয়াবলীর অনেক রূপকাশ্রয়ী বক্তব্য এসেছে। যেমন— 'আর্‌রহমানু আ'লাল আরশিস্ তাওয়া' (রহমান আরশের উপরে সমাসীন)। 'ইয়াদুল্লাহি ফাওক্বা আইদিহিম' (আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর)। এগুলো হচ্ছে কোরআনের আয়াত। কোরআনের কোনো আয়াতকে অস্বীকার করলে হয়ে যেতে হয় কাফের। আবার এ ধরনের আয়াতের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করলেও কাফের হয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। কারণ আল্লাহ্ অবয়বাতীত, স্থানাতীত, কালাতীত ও দৃষ্টান্তাতীত। সুতরাং কোনো স্থানে সমাসীন হওয়া অথবা কারো হাতের উপর হাত রাখা থেকে তিনি চিরমুক্ত, চির পবিত্র। তাই আল্লাহ্‌র ওলীগণের মারেফাত সম্পর্কিত অবোধ্য বিষয়াবলীর বিবরণ ও এরকম উক্তিগুলো প্রত্যাখ্যানযোগ্য যেমন নয়, তেমনি সেগুলোর শাব্দিক বা প্রকাশ্য অর্থও নয় গ্রহণীয়।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোনো আদেশ আমি অমান্য করবো না।' উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে হজরত মুসা নিজের উপরে আস্থাশীল ছিলেন না। তাই তিনি বলেছিলেন, 'ইনশাআল্লাহ্' বা আল্লাহ্ চাইলে। পরবর্তী সময়ে তাঁর এমতো আস্থাহীনতাই পরিগ্রহ করেছিলো বাস্তবরূপ। আরো উল্লেখ্য যে, হজরত মুসা যদি ওই রহস্যময় পুরুষের কার্যকলাপ দৃষ্টে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে পারতেন, তবে তিনি নিশ্চয় লাভ করতে পারতেন অনেক রহস্যাচ্ছন্ন জ্ঞান। আর জ্ঞানার্জনের জন্যই হজরত খিজিরের নিকটে তাঁকে গমন করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন আল্লাহ্ স্বয়ং।

শেষোক্ত আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'সে বললো, আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ করো-ই তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন কোরো না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি।' এ কথার অর্থ— হজরত খিজির বললেন, হে বনী ইসরাইলের নবী! আপনি যদি আমার অনুসরণ করতেই চান, তবে নিরবে আমার অনুসরণ করবেন। আমি যা কিছুই করি না কেনো, সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আমি স্বেচ্ছায় আপনাকে কিছু বলি। উল্লেখ্য যে, সন্দেহের বাতিক ও প্রশ্নপ্রবণতা গোপন বিষয়ের জ্ঞানার্জনের অন্তরায়।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪

فَانْطَلَقَا ۜ حَتّٰىٓ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝ فَانْطَلَقَا ۜ حَتّٰىٓ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۙ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۖ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا

❒ অতঃপর উহারা যাত্রা করিল, পরে যখন উহারা নৌকায় আরোহণ করিল তখন সে উহাতে ছিদ্র করিয়া দিল। মূসা বলিল, 'আপনি কি আরোহীদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্য উহাতে ছিদ্র করিলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করিলেন।'

www.eelm.weebly.com

❑ সে বলিল 'আমি কি বলি নাই যে তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করিতে পারিবে না?'

❑ মূসা বলিল, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করিবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করিবেন না।'

❑ অতঃপর উহারা চলিতে লাগিল, চলিতে চলিতে উহাদিগের সহিত এক বালকের সাক্ষাৎ হইলে সে উহাকে হত্যা করিল। তখন মূসা বলিল, 'আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করিলেন হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করিলেন।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত মুসাকে নিয়ে হজরত খিজির তাঁর যাত্রা শুরু করলেন। চলতে চলতে উপস্থিত হলেন বিশালাকায় একটি নদীর কিনারে। দেখলেন, মাঝি ও একদল যাত্রীসহ নৌকাটি ছাড়বো ছাড়বো করছে। তাঁরাও নৌকায় উঠলেন। নদীর অপর পাড়ে পৌঁছে যাত্রীদল নেমে গেলে হজরত খিজির নৌকা থেকে নামার সময় নৌকার তলদেশের একাংশ ফুটো করে দিলেন। হজরত মুসা ওই দৃশ্য দেখে আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, এ আপনি কী করলেন! এই নৌকার আরোহীরা তো নদীবক্ষে নিমজ্জিত হবে। না, না। এটাতো গুরুতর অন্যায়।

বাগবী লিখেছেন, তাঁরা দু'জনে যখন নৌকায় উঠলেন, তখন আরোহীরা বললো, এই লোক দু'টো মনে হয় অপহারক। এদেরকে নৌকা থেকে ফেলে দাও। চালক ছিলো নৌকার মালিক নিজেই। সে বললো, না, না। এঁদের চেহারা তো নবীগণের মতো। কিন্তু হজরত উবাই ইবনে কা'ব কর্তৃক ইতোপূর্বে বর্ণিত যথাসূত্রসম্বলিত বোখারী, মুসলিমে উল্লেখিত এক হাদিসে এসেছে, হজরত মুসা ও হজরত খিজির নৌকার নিকটবর্তী হলেন। নৌকার মালিক হজরত খিজিরকে চিনতে পারলেন এবং তাঁদেরকে ডেকে তাঁর নৌকায় উঠিয়ে নিলেন। একথাও ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, পারাপারের পর হজরত খিজির একটি পেরেক দ্বারা নৌকাটির তলদেশ ছিদ্র করে দিলেন।

'লাক্বদ্ জি'তা শাইআন ইমরা' অর্থ আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। বাগবী লিখেছেন, 'ইমরান' অর্থ গুরুতর বা কঠিন। যেমন 'আমিরল আমরু' অর্থ বিষয়টি বড়ই কঠিনরূপ ধারণ করলো। কুতাইবি বলেছেন, 'ইমরান' অর্থ বিস্ময়কর। বাগবী লিখেছেন, নৌকাটি ছিদ্র করার পর হজরত খিজির একটি বড় সীসার পাত ছিদ্রস্থানটিতে লাগিয়ে দিলেন। ফলে নৌকার ভিতরে আর পানি প্রবেশ করতে পারলো না। জালালউদ্দিন মাহাল্লী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, ছিদ্র করে দেয়া সত্ত্বেও নৌকাটিতে পানি প্রবেশ করেনি। এটা ছিলো হজরত খিজিরের মোজেজা।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে—'সে বললো, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না?

এর পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।' একথার অর্থ— আপত্তি উত্থাপনের পরে হজরত মুসা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন একটি বড় ছিদ্র করে দেয়া সত্ত্বেও সেই ছিদ্র দিয়ে নৌকার অভ্যন্তরে কোনো পানি প্রবেশ করছে না। তখন তিনি লজ্জিত হয়ে বললেন, আমার ভুল হয়েছে। সর্বান্তঃকরণে আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমাকে এব্যাপারে আর অভিযুক্ত করবেন না। আরোপ করবেন না কোনো কঠোরতা।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, এখানকার 'ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না' কথাটির অর্থ হবে— হে জ্ঞানী প্রবর! আপনার নির্দেশ লংঘন করে আমি যে ভুল করেছি, সেকারণে আপনি আমাকে অপরাধী বিবেচনা করবেন না। হজরত উবাই ইবনে কা'ব কর্তৃক বর্ণিত যথাসূত্রবিশিষ্ট হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, নবী মুসার তখনকার প্রথম শর্ত ভঙ্গটি ছিলো ভুলের কারণে। দ্বিতীয় শর্ত ভঙ্গটিও ছিলো ভ্রমজনিত। কিন্তু তৃতীয়টি ছিলো ইচ্ছাকৃত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসা ভুলবশতঃ তখন শর্ত ভঙ্গ করেননি। করেছিলেন তার অন্যায়বিরোধী স্বভাবগত বিদ্বেষের কারণে।

শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা চলতে লাগলো, চলতে চলতে তাদের সঙ্গে এক বালকের সাক্ষাত হলে সে তাকে হত্যা করলো।' মুফাস্‌সিরগণ লিখেছেন, হজরত খিজির যে বালকটিকে হত্যা করেছিলেন, সেই বালকটি ছিলো সুন্দর ও মিষ্টভাষী। সুদ্দী বলেছেন, বালকদের দলমধ্যে সে-ই ছিলো সবচেয়ে সুন্দর ও লাবণ্যময়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হজরত খিজির বালকটিকে ছুরি দিয়ে জবাই করেছিলেন। যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসে একথাও এসেছে যে, তার মস্তক শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিলো। আবার এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, পাথর মেরে তার মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়েছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, দেয়ালে বার বার আঘাত করে তার মাথা থেতলে ফেলা হয়েছিলো। আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত খিজির তাঁর তিন আঙ্গুলের ইশারায় বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস এবং অধিকাংশ মুফাস্‌সির বলেছেন, বালকটি ছিলো অপ্রাপ্তবয়স্ক। আলোচ্য আয়াতে তাই তাকে বলা হয়েছে 'গুলাম'। প্রাপ্তবয়স্ককে কখনো গুলাম বলা হয় না। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসা তখন আতঙ্কে ও ক্রোধে বলে উঠেছিলেন, আপনিতো এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন। এতে করে বুঝা যায় বালকটি অপ্রাপ্তবয়স্কই ছিলো। নতুবা হজরত মুসা তাকে 'নিষ্পাপ জীবন' বলতেন না।

www.eelm.weebly.com

হাসান বলেছেন, সে ছিলো একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। কালাবী বলেছেন, একজন নওজোয়ান, যে তার পিতা-মাতার আশ্রয়ে অকর্মণ্য জীবন যাপন করতো। রাস্তায় ঘুরাফেরা ছাড়া সে আর কোনো কিছুই করতো না। জুহাক বলেছেন, বালকটি ছিলো কলহপ্রবণ। তার উগ্র আচরণে তার মাতাপিতাও কষ্ট পেতো।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, খিজির যে বালকটিকে হত্যা করেছিলো, সে ছিলো জন্মগতভাবে কাফের। সে বেঁচে থাকলে তার জনক জননীকেও কাফের বানিয়ে ছাড়তো। উল্লেখ্য যে, হজরত খিজির বালকটিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে ফেলেছিলেন। 'ফাক্বতালাহ্' শব্দটিতে সংযোজিত 'ফা' অক্ষরটির মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয়।

এরপর বলা হয়েছে— তখন মুসা বললো, আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনিতো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন! এখানে 'যাকিয়্যাতান' শব্দটিকে কোনো কোনো ক্বারী উচ্চারণ করেছেন 'যাকিয়াতান'। কিন্তু কুফাবাসী আলেম ও ক্বারী ইবনে আমের 'যাকিয়্যাতান'ই পড়েছেন। ক্বারী কাসায়ী এবং ফার্‌রা বলেছেন শব্দ দু'টো সমার্থক। এখানে এই উচ্চারণটিই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আবু আমর বিন আলা বলেছেন, যে জীবনে কখনোই কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়নি, সেই জীবনকেই বলে 'নাফ্‌সান্ যাকিয়াতান' বা নিষ্পাপ জীবন। অপরাধ করার পরে যদি কেউ খাঁটি নিয়তে তওবা করে নেয়, তবে তাকে 'যাকিয়াতান' বলা যায়।

'বিগইরি নাফ্‌সিন' অর্থ সে এমন কোনো আচরণ করেনি, যার কারণে হত্যা করা যায়। অর্থাৎ সে কাউকে হত্যা করেনি অথবা ধর্মচ্যুতও হয়নি। তাই এখানে বলা হয়েছে— 'হত্যার অপরাধ (কাউকে হত্যা অথবা ধর্মচ্যুত) ছাড়াই।'

'নুকরা' অর্থ ওই সকল কাজ যা শরিয়তের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ। কাতাদা বলেছেন, 'নুকরা' অর্থ মন্দ। মন্দ বোঝাতে ৭১ সংখ্যক আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইমরা' শব্দটি। আর আলোচ্য আয়াতের মন্দ বা গুরুতর অন্যায় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে 'নুকরা'। উল্লেখ্য যে, 'ইমরা' অপেক্ষা 'নুকরা' অধিকতর মন্দ অর্থপ্রকাশক। অর্থাৎ 'ইমরা' অর্থ যদি মন্দ হয়, তবে 'নুকরা' অর্থ হবে অত্যধিক মন্দ। এক্ষেত্রে অপরাধের তারতম্যানুসারে শব্দ ব্যবহার হয়েছে। নৌকা ছিদ্র করার ব্যাপারটি অবশ্যই অন্যায় ছিলো, কিন্তু হত্যা কাণ্ডটি ছিলো তদপেক্ষা অধিক গুরুতর অন্যায়। তাই প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইমরা' এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে 'নুকরা'। কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'ইমরা' শব্দটিই অধিকতর অন্যায় অর্থপ্রকাশক। কারণ ওই ভাঙা নৌকায় চড়লে অনেক আরোহীর একসঙ্গে সলিল সমাধি হওয়ার আশংকা ছিলো। আর হত্যাকাণ্ডটি ছিলো মাত্র একজনের মৃত্যুর কারণ। সে কারণেই প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইমরা' এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে 'নুকরা'।

www.eelm.weebly.com

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ
عَنْ شَيْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ۝ فَانْطَلَقَا
حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَيَاۤ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۣاسْتَطْعَمَاۤ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا
فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ قَالَ لَوْ شِئْتَ
لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ۝ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ سَاُنَبِّئُكَ
بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ۝ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ
يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ
كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ۝ وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَاۤ
اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۝ فَاَرَدْنَاۤ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ
زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ۝ وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي
الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ
اَنْ يَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا
فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ۝

www.eelm.weebly.com

❒ সে বলিল, 'আমি কি বলি নাই যে তুমি আমার সংগে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না?

❒ মূসা বলিল, 'ইহার পর, যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে আপনি আমাকে সংগে রাখিবেন না; আমার ওজর-আপত্তির চূড়ান্ত হইয়াছে।'

❒ অতঃপর উহারা চলিতে লাগিল; চলিতে চলিতে উহারা এক জনপদের অধিবাসীদিগের নিকট পৌঁছিয়া তাহাদিগের নিকট খাদ্য চাহিল; কিন্তু তাহারা উহাদিগের আতিথেয়তা করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর তথায় উহারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখিতে পাইল এবং মূসার সংগী উহাকে সুদৃঢ় করিয়া দিল। মূসা বলিল, 'আপনি তো ইচ্ছা করিলে ইহার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন।'

❒ মূসার সংগী বলিল, 'এইখানে তোমার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হইল; যে-বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করিতে পার নাই আমি তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি;

❒ নৌকাটির ব্যাপারে— ইহা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির উহারা সমূদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করিত; আমি ইচ্ছা করিলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করিতে' কারণ উহাদিগের সম্মুখে ছিল এক রাজা যে বলপ্রয়োগে নৌকা সকল ছিনাইয়া লইত।

❒ 'আর কিশোরটি, তাহার পিতামাতা ছিল বিশ্বাসী— আমি আশংকা করিলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও সত্য-প্রত্যাখ্যান দ্বারা উহাদিগকে বিব্রত করিবে।

❒ 'অতঃপর আমি চাহিলাম যে উহাদিগের প্রতিপালক যেন উহাদিগকে উহার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হইবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর।

❒ 'আর ঐ প্রাচীরটি— ইহা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, ইহার নিম্ন দেশে ছিল উহাদিগের গুপ্তধন এবং উহাদিগের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি; সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হইয়া ইচ্ছা করিলেন যে উহারা বয়োপ্রাপ্ত হউক এবং উহারা উহাদিগের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ হইতে কিছু করি নাই; ইহাই, তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য-ধারণে অপারগ হইয়াছিলে তাহার ব্যাখ্যা।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি কি বলিনি যে তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না?' আলোচ্য বক্তব্যটি হজরত খিজিরের। লক্ষণীয় যে, তাঁর বক্তব্যে পুর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার নিমিত্তে ভর্ৎসনার স্বর সুপ্রকট। 'লাকা' শব্দটি তিনি তাঁর বক্তব্যে ব্যবহার করেছেন এ কারণেই।

পরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'এরপর যদি আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আমার ওজর-আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে।' হজরত মুসা পরপর দুইবার কথা দিয়েও তাঁর কথা রাখতে পারেননি। তাই তিনি এবার এরকম করে বললেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার ভ্রাতা মুসা ও আমার উপরে আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করুন। তিনি যদি নীরবে খিজিরের অনুসরণ করতেন, তবে অবলোকন করতে পারতেন আরো অনেক বিস্ময়কর ঘটনাবলী। কিন্তু তিনি তাঁর কথা রাখতে পারেননি বলেই লজ্জিত হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন— এরপর যদি আমি আপনাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করি, তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আমার ওজর আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে। ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার ভ্রাতা মুসার প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন। তিনি খিজিরকে কথা দিয়েও তা রাখতে পারেন নি। যদি পারতেন, তবে দেখতে পেতেন আরো অনেক আশ্চর্যজনক বিষয়।

এর পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা চলতে লাগলো; চলতে চলতে তারা জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছে তাদের নিকট খাদ্য চাইলো; কিন্তু তারা তাদের আতিথিয়েতা করতে অস্বীকার করলো।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই জনপদটির নাম ছিলো ইন্তাকিয়াহ্। ইবনে সিরীন বলেছেন, আইকাহ্। কেউ কেউ বলেছেন, বুরকাহ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী লিখেছেন, জনপদটি ছিলো স্পেনের একটি জনপদ।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে বাগবী লিখেছেন, ওই জনপদবাসীরা ছিলো কৃপণ। তাই তারা হজরত খিজির ও হজরত মুসার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলো। অতিথি সৎকারের জন্য তারা আগ্রহী ছিলো না মোটেও। কাতাদা বলেছেন, ওই জনপদের লোকেরা ছিলো খুব মন্দ স্বভাবের। মেহমানদের আনা গোনা তারা মোটেও পছন্দ করতো না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী উল্লেখ করেছেন, হজরত খিজির ও হজরত মুসা প্রথমে খাদ্য চেয়েছিলেন সেখানকার পুরুষদের কাছে। কিন্তু তারা তাঁদের আবেদনে কর্ণপাত করেনি। শেষে তাঁরা এক ভদ্র মহিলার কাছে খাবার চেয়েছিলেন। তিনিই খাদ্য প্রদান করেছিলেন তাঁদেরকে। তাঁরা তখন ওই ভদ্র মহিলার জন্য দোয়া করেছিলেন এবং বদ্দোয়া করেছিলেন সেখানকার পুরুষদের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তথায় তারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলো এবং মুসার সঙ্গী তাকে সুদৃঢ় করে দিলো।' এ কথার অর্থ— পানাহার সমাপনের পর হজরত খিজির ও হজরত মুসা পুনরায় পথ চলতে শুরু করলেন। অল্প কয়েক পা সামনে যেতেই দেখলেন একটি বাড়ীর প্রাচীর ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। একটু পরেই নির্ঘাত প্রাচীরটি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। হজরত খিজির একটু এগিয়ে গিয়ে প্রাচীরটিকে সোজা করে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত উবাই বিন কা'ব থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, খিজির প্রাচীরটিকে সোজা করে দিয়েছিলেন হাতের ইশারায়। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, স্পর্শ করা মাত্র দেয়ালটি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত খিজির ওই প্রাচীরটিকে ভেঙে নতুন একটি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সুদ্দী বলেছেন, ভিত্তি নির্মাণ করে তিনি গেঁথেছিলেন প্রাচীর।

এরপর বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, আপনি তো ইচ্ছে করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।' হজরত মুসার এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, হজরত খিজিরের প্রাচীর পুনঃস্থাপনের কাজটি ছিলো শ্রমসাধ্য। অর্থাৎ বেশ পরিশ্রম করে তিনি প্রাচীরটি পুনঃনির্মাণ করে দিয়েছিলেন। যদি তিনি মোজেজার মাধ্যমে হাতের ইশারায় এরকম করতেন, তাহলে হজরত মুসা নিশ্চয় তাঁকে পারিশ্রমিক গ্রহণের কথা বলতেন না।

এর পরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'মুসার সঙ্গী বললো, এখানে তোমার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো।' একথার অর্থ— হজরত মুসা পারিশ্রমিকের কথা তুলেছিলেন যুক্তিসিদ্ধতার আলোকে, অন্যায়ের প্রতি তাঁর প্রতিবাদমুখর হওয়ার স্বভাবজ বৈশিষ্ট্যের কারণে। কিন্তু যে কারণেই হোক এতে করে তাঁর নিশ্চুপ থাকার অঙ্গীকার তো অবশ্যই ভঙ্গ হয়েছিলো। তৃতীয়বারে তিনি একথাও বলেছিলেন, 'এরপর যদি আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না।' তাই পারিশ্রমিকের কথা উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হজরত খিজির বললেন, এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো। এবার বিদায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'যে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারোনি, আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।' একথার অর্থ— হে বনী ইসরাইলের সম্মানিত পয়গম্বর! আপনার দৃষ্টিতে আমার কার্যকলাপসমূহ শরিয়তবিরোধী বলে মনে হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা শরিয়তবিরোধী নয়। কারণ এই বিশ্ব সংসার সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকে সতত সচল রয়েছে এক গোপন ও গভীর ব্যবস্থাপনা। আমি সেই ব্যবস্থাপনার এক নগণ্য প্রতিচ্ছন্দক মাত্র। বাগবী লিখেছেন, কতিপয় তাফসীরকারের মতে হজরত মুসা তখন হজরত খিজিরের পরিধেয় বস্ত্র আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং বলেছিলেন, হে রহস্যময় পুরুষ! আপনি তবে অনুগ্রহ করে এবার আপনার কৃতকর্মসমূহের রহস্য উন্মোচন করুন।

পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'নৌকাটির ব্যাপারে— এটা ছিলো কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির, তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করতো। আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে। কারণ, সম্মুখে ছিলো এক রাজা। যে

www.eelm.weebly.com

বলপ্রয়োগে নৌকাসকল ছিনিয়ে নিতো।' একথার অর্থ— হজরত খিজির বললেন, প্রথমে শুনুন নৌকার ব্যাপারটি। নৌকাটি ছিলো কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা ওই নৌকা নিয়ে সমুদ্রে লোক পারাপার করে। এভাবে নির্বাহ করে তাদের জীবিকা। এখানে রয়েছে এক অত্যাচারী রাজা। নতুন নৌকা দেখলেই ছিনিয়ে নেয়া তার অভ্যাস। তাই রাজার লোকেরা যেখানে পায় সেখান থেকেই নতুন নৌকা ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। একটু পরেই সেখানে এসে পড়তো রাজার লোকেরা। তাই আমি নৌকাটিকে ছিদ্র করে দিলাম, রাজার লোকেরা নৌকাটিকে ক্রটিযুক্ত দেখে অন্যত্র চলে যাবে। ছিদ্রটিও সামান্য। তাই নৌকার মাঝিরা সহজেই সেটিকে মেরামত করে নিয়ে কাজে লাগাতে পারবে। তাদের জীবিকা অর্জনও বিঘ্নিত হবে না। এটাই ছিলো আমার নৌকা ছিদ্র করার কারণ।

হজরত কা'ব বলেছেন, নৌকাটি ছিলো দশজন দরিদ্র সহোদর ভ্রাতার। তার মধ্যে পাঁচজন ছিলো পঙ্গু। বাকি পাঁচজন নৌকাটির মাধ্যমে আয় উপার্জন করে সংসার চালাতো। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনীয় কিছু সম্পদের অধিকারী হলেও তাকে 'মিসকিন' বা দরিদ্র বলা যায়, যদি উদ্বৃত্ত কিছু না থাকে। সেকারণেই নৌকার মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে এখানে মিসকিন বলা হয়েছে।

'ওয়ারআ' শব্দটির অর্থ সম্মুখে। যেমন, 'মিন ওয়ারইহিম জাহান্নাম' এই আয়াতে 'ওয়ারআ' বলে বুঝানো হয়েছে সম্মুখে। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ পশ্চাতে। প্রথমোক্ত অর্থটি গ্রহণ করলে বলতে হয়, তাদের সম্মুখে ছিলো এক রাজা। আর শেষোক্ত অর্থটি গ্রহণ করলে বলতে হয় তাদের পশ্চাতে ছিলো এক রাজা এবং বক্তব্যটি দাঁড়াতো এরকম— প্রত্যাবর্তনের সময় অত্যাচারী রাজার এলাকা দিয়ে ওই মাঝিদেরকে নৌকা নিয়ে যেতে হতো। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতটিই সঠিক। বঙ্গানুবাদে সে রকমই অর্থ করা হয়েছে।

হজরত ইবনে আব্বাস 'ওয়ারআহুম' কথাটির স্থলে পড়তেন 'আমামাহুম' (সামনা সামনি)।

'কুল্লা সাফীনাতিন' অর্থ ক্রটিমুক্ত নৌকাসকল। অর্থাৎ জালেম রাজার লোকেরা নিখুঁত নৌকা দেখলেই তা ছিনিয়ে নিতো। তাই হজরত খিজির নৌকাটি খুঁতযুক্ত করে দিয়েছিলেন, যাতে রাজার লোকেরা নৌকাটি নিতে আগ্রহী না হয়। ওই রাজার নাম ছিলো জালীদী বিন কারকার। মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, সুলাহ্ বিন জালীদ ইয়্দী। শোয়াইব বলেছেন, হাদ্দাদ বিন বাদাদ। বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত খিজির মাঝিদের নিকটে নৌকা ভাঙার কারণ বর্ণনা করেছিলেন। তাই তারা এ ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করেনি। একটু পরেই সেখানে রাজার লোকেরা এসেছিলো এবং নৌকাটিকে ছিদ্রযুক্ত দেখতে পেয়ে যথারীতি

www.eelm.weebly.com

ফিরেও গিয়েছিলো। তারা চলে যাবার পর অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকাটিকে মেরামত করে নিয়েছিলো তারা। কেউ কেউ বলেছেন, আলকাতরা দিয়ে তারা ছিদ্রস্থানটিকে পালিশ করে নিয়েছিলো। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ছিদ্রস্থানটি তারা ঢেকে দিয়েছিলো সীসা দিয়ে। কিন্তু বর্ণনাটি কোরআনের আয়াতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ মাঝিদের কাছে নৌকা ভাঙার কারণ বর্ণনা করলে হজরত মুসা নিশ্চয়ই এরকম বলতেন না যে, 'আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।' প্রকৃত কথা হচ্ছে, হজরত খিজির তাঁর কার্যকলাপের রহস্য উন্মোচন করেছিলেন, সকল ঘটনার শেষে, বিদায়ের প্রাক্কালে।

এর পরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে— 'আর কিশোরটি, তার পিতা-মাতা ছিলো বিশ্বাসী— আমি আশংকা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও সত্যপ্রত্যাখ্যান দ্বারা তাদেরকে বিব্রত করবে।' একথার অর্থ— হজরত খিজির আরো বললেন, এবার শুনুন ওই কিশোরটির কথা, যাকে আমি হত্যা করেছিলাম। সে ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও ভবিষ্যতে সে হয়ে উঠতো আরো বেশী উন্নাসিক। তার জন্য বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়তো তার পুণ্যবান পিতা-মাতা। সে তো বল প্রয়োগের মাধ্যমে তার পিতা-মাতাকেও বানিয়ে ফেলতো কাফের। অথবা সন্তান-বাৎসল্যের প্রভাবে তার স্নেহপ্রবণ পিতামাতার কাফের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো প্রবল।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হজরত খিজির তখন বলেছিলেন, আমার মনে এই মর্মে আশংকা হয়েছিলো যে, পুত্র-বাৎসল্যের কারণে তার পিতামাতা যেনো শেষ পর্যন্ত কাফের না হয়ে যায়। এমতো আশংকার কারণেই আমি হত্যা করেছিলাম কিশোরটিকে। উল্লেখ্য যে, হজরত খিজিরের ওই আশংকাটি বিবেকপ্রসূত কোনো আশংকা মাত্র ছিলো না। বরং ওই আশংকা তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত করে দেয়া হয়েছিলো প্রত্যাদেশের মাধ্যমে এবং হত্যাকাণ্ডটিও ছিলো প্রত্যাদেশায়িত।

জায়েদ ইবনে হুরমুজ সূত্রে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, নাজাদাহ্ খারেজী একবার পত্রের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের নিকটে জানতে চাইলো, হজরত খিজির বালকটিকে হত্যা করেছিলেন কোন বিধানের বলে? রসুল স. তো অকারণ শিশু হত্যাকে নিষিদ্ধ করেছেন। তবে কি ইতোপূর্বে এরকম করা বৈধ ছিলো? হজরত ইবনে আব্বাস তাঁর প্রশ্নের উত্তরে লিখলেন, তুমি যদি নিশ্চিত হতে পারো যে, তোমার সন্তান ভবিষ্যতে তোমার ইমানের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করবে, তবে তুমিও তোমার বালক-সন্তানকে হত্যা করতে পারবে। কিন্তু ওহী বা প্রত্যাদেশ ছাড়া এরকম নিশ্চিত জ্ঞান কারো পক্ষে কখনোই লাভ করার সুযোগ আর নেই। রসুল স. এর মহাতিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে সে পথ রুদ্ধ হয়ে

www.eelm.weebly.com

গিয়েছে। এখন আর আগাম আশংকা বা অনুমানের কারণে কোনো বালককে হত্যা করা বৈধ নয়। ইলহাম অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমেও এরকম আমল সিদ্ধ হতে পারে না। হজরত খিজির হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছিলেন আল্লাহ্‌র নির্দেশে ওহীর মাধ্যমে। আর তিনি রসুল স. এর শরিয়তের আওতাভূতও নন। তাই রসুল স. এর নিষেধাজ্ঞা তাঁর উপরে কার্যকর নয়।

একটি প্রশ্নঃ যে জ্ঞান বাস্তব রূপ লাভ করে না, সে জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যেতে পারে কী ভাবে? আল্লাহ্‌ জানতেন যে, ওই কিশোরটি তার পিতামাতার ইমানের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করবে। কিন্তু তাকে তো বাঁচতেই দেয়া হলো না। সুতরাং তার অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের বিষয়টি প্রকাশিতও হলো না। হজরত খিজির তার আগেই তাকে হত্য করে ফেললেন। এতে করে কি একথা প্রমাণিত হলো না যে, আল্লাহ্‌র জ্ঞান কাল্পনিক একটি বিষয়, যা বাস্তবায়নযোগ্যও কিছু নয়?

উত্তরঃ সৃষ্টির জ্ঞান জানিত বিষয়ের বাস্তবায়নের মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ বাস্তব জগতে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ সে সম্পর্কে কোনো ধারণা লাভ করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র জ্ঞান এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ বাস্তব জগতে যা কিছু প্রকাশিত হয়, তা আল্লাহ্‌র অপার ও আনুরূপ্যবিহীন জ্ঞানের অনুগত। আল্লাহ্‌র জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং আমরা যে সকল জ্ঞান অর্জন করি তা আল্লাহ্‌র ওই চির অমুখাপেক্ষী জ্ঞানের অনুগত বা বাধ্যগত।

আমি বলি, এরকম উত্তর প্রদানের প্রয়োজন আসলে নেই। কারণ এর দ্বারা উদ্ভূত সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় না। জ্ঞান অনুগত হোক অথবা না হোক সর্বাবস্থায় জ্ঞান ও জানিত বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং জ্ঞানের প্রকাশ না ঘটলে সাদৃশ্যের সুযোগই বা আসবে কোত্থেকে? সমস্যাই বা সৃষ্টি হবে কেমন করে? হজরত খিজিরের মাধ্যমে নিহত কিশোরটি তো প্রাপ্তবয়স্ক হলোই না। তার দ্বারা প্রকাশিতও হলো না অবাধ্যতা ও সত্যপ্রত্যাখ্যানজনিত কোনো অপরাধ। সুতরাং যার কোনো অস্তিত্বই নেই, তার সঙ্গে জ্ঞানের কোনো বিশুদ্ধ সম্পর্ক হওয়া কীভাবে সম্ভব? তাই এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হচ্ছে— শর্ত ও সম্পর্কই এখানে মূল বিবেচ্য বিষয়। তাই শর্ত ও প্রতিফলের মধ্যে প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হলেই সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ সম্ভব। সুতরাং শর্ত যদি অসম্ভব হয় এবং প্রতিফল যদি প্রকাশ না-ও পায়, তবুও তা জ্ঞান লাভের কোনো অন্তরায় হতে পারে না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যদি আকাশ এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য থাকতো তাহালে উভয় স্থানে বিশৃংখলা দেখা দিতো।' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা যদি একাধিক হতো, তবে অবশ্যই আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতো। এমতোক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার একাধিকত্ব যেমন সম্ভব নয়, তেমনি অন্য কারো দ্বারা আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস হওয়াও সম্ভব নয়। অথচ এখানে এক

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও আকাশ পৃথিবীর ধ্বংস না হওয়ার সম্পর্কটি ঠিকই আছে এবং এটি একটি প্রকৃষ্ট জ্ঞান নয় কি? আবার দেখুন, এক স্থানে বলা হয়েছে— 'যখন সূর্য উঠবে তখন দিন হবে।' এক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় সম্বন্ধটি অটুট। এখন যদি সূর্য উদিত হওয়ার শর্তটি প্রকাশিত হয় তবে তার প্রতিফলরূপে দিবসও অস্তিত্বশীল হবে। আর যদি কখনোই উদিত না হয় তখন দিবসও কখনোই অস্তিত্বশীল হবে না। সুতরাং বুঝা গেলো বাস্তব জগতে অস্তিত্বশীল হওয়া না হওয়ার উপরে জ্ঞান নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ যা অস্তিত্বশীল হয় না, তাকে জ্ঞান বলা যায় না— এরকম কথা কিছুতেই বলা যেতে পারে না।

একটি নতুন প্রশ্ন ও তার সমাধান ঃ দু'টি বস্তুর মধ্যে যদি প্রয়োজনীয় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তাহলে একটি বস্তুর অস্তিত্ব হবে অপর বস্তুটির পূর্ণত্বের কারণ। যেমন সূর্যোদয় দিবস হওয়ার কারণ। অথবা বস্তু দু'টো হবে তৃতীয় কোনো কারণের মুখাপেক্ষী। ওই কারণটি তখন হবে কারণের কারণ বা কারণের উৎস। ওই উৎসই বস্তু দু'টোর মধ্যে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়। যেমন দু'টো ইট তেরসাভাবে একটিকে অপরটির উপরে নির্ভরশীল করে দেয়া হলো। এভাবে দণ্ডায়মান ইট দু'টোর মধ্য থেকে যদি একটিকে সরিয়ে নেয়া হয় তবে অপর ইটটিও আর যথাস্থানে দণ্ডায়মান থাকতে পারবে না। লক্ষণীয় যে, ইট দু'টো কিন্তু নিজেরা একত্র হতে অথবা পরস্পরকে নির্ভর করে দণ্ডায়মান হতে সক্ষম হয়নি। তাদেরকে দণ্ডায়মান করিয়ে দিয়েছিলো কোনো রাজমিস্ত্রী বা নির্মাতা। এখন যে কিশোরটিকে হজরত খিজির হত্যা করেছিলেন, তার বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করা যাক। তার বেঁচে থাকা ও জুলুম করার বিষয়টি ছিলো পরস্পরকে নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা ইট দু'টোর মতো। আর এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বা সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন আল্লাহ্‌। ওই সম্পর্কের কারণেই সে বেঁচে থাকলে কুফরী ও সীমালংঘন ছাড়া বেঁচে থাকতে পারতো না।

বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তাসাউফপন্থীগণের জ্ঞানের মাপকাঠিতে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। তাঁরা বলেন, দৃশ্যমান সকল সৃষ্টি অস্তিত্বশীল হয় প্রকাশ্য অবয়ব ধারণের পূর্বেই। সৃষ্ট বস্তুসমূহের ওই অপ্রকাশ্য অস্তিত্বকে বলে 'হাকায়েকে ইমকানিয়াহ' (সম্ভাব্য তত্ত্ব) এবং 'আ'ইয়ানে ছাবেতাহ' বা স্থিতির মৌল। আর ওই আ'ইয়ানে ছাবেতা হচ্ছে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর প্রতিবিম্ব বা ছায়া। আবার ওই ছায়ার উৎস বা মূল হচ্ছে আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণাবলী। আল্লাহ্‌র সিফাত আবার বিভিন্ন রকমের। যেমন, হেদায়েত করা ও পথভ্রষ্ট করা দু'টোই আল্লাহ্‌র সিফাত। তাই আল্লাহ্‌র এক নাম 'আল হাদী' এবং আর এক নাম 'আল মুদ্বিল্লু'। এভাবে যার অস্তিত্বে মূল প্রতিবিম্ব বা আ'ইয়ানে ছাবেতার উপরে আল হাদী নামের বৈশিষ্ট্য পরিচিহ্নিত হয়, সে পায় হেদায়েত। আর যার আ'ইয়ানে

www.eelm.weebly.com

ছাবেতার প্রতি পতিত হয় 'আল মুদ্বিল্লু' নামের প্রতিক্রিয়া, সে হয়ে যায় গোমরাহ্ ও পথভ্রষ্ট। এভাবে বহির্জগত হয় অন্তর্জগতের প্রতিবিম্ব বা অনুগত। তাই সকল অবহিত ও দর্শিত বিষয়সমূহকে বলা হয় আল্লাহ্র জ্ঞানের মতো। অর্থাৎ আল্লাহ্র জ্ঞানই মূল এবং সমগ্র সৃষ্টি ওই জ্ঞানের অনুসৃতি মাত্র। সুতরাং যার 'মাবদায়ে তা'য়ুন' (সূচনাস্থল) আল্লাহ্র 'আল মুদ্বিল্লু' নামের প্রতিবিম্ব-প্রভাবিত, পথভ্রষ্ট হতে সে বাধ্য। আর যার মাবদায়ে তা'য়ুন আল্লাহ্র 'আল হাদী' নামের প্রতিবিম্ব-প্রভাবিত, হেদায়েত লাভও তার জন্য অনিবার্য। এ কারণেই রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেকের জন্য ওই পথকে সহজ করে দেয়া হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সৃষ্টিগতভাবে পুণ্যবান, তার জন্য পুণ্যকর্মসমূহকে করে দেয়া হয় সহজ। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট, পাপ কর্মসমূহকে করে দেয়া হয় তার জন্য সহজ। হজরত আলী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম।

হজরত খিজির কর্তৃক নিহত বালকটির 'মাবদায়ে তা'য়ুন' ছিলো সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ্র 'আল্মুদ্বিল্লু' নামের প্রতিবিম্ব-পরিচিহ্নিত। তাই বেঁচে থাকলে সে কোনো দিনও পথপ্রাপ্ত হতো না। অতএব মৃত্যুই ছিলো তার জন্য কল্যাণকর এবং তার মাতাপিতার জন্যও মঙ্গলজনক। তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত দান আল্লাহ্র অনুগ্রহ বই অন্য কিছু নয়। কিন্তু এরকম অনুগ্রহ করতে আল্লাহ্ কখনো বাধ্য নন। যদি বাধ্য হতেন (যেমন মোতাজিলারা বলে), তাহলে তো সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে আল্লাহ্ বালক বয়সে মৃত্যুদান করতেন। সুতরাং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সম্পূর্ণতই তাঁরই অভিপ্রায়নির্ভর। তিনি ইচ্ছে করলে, কাউকে কল্যাণ দান করবেন। ইচ্ছে না করলে করবেন না। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

এর পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি চাইলাম যে তাদের প্রতিপালক যেন তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন।' এখানে 'ফাআরদনা' (আমি ইচ্ছা করলাম) শব্দটি বহুবচনবোধক। হজরত খিজির তার ইচ্ছাকে এখানে আল্লাহ্র ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র ইচ্ছার সম্পর্ক তাঁর কাজের সঙ্গে হতে পারে, হজরত খিজিরের সঙ্গে নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র ইচ্ছা ও কাজ কখনো হজরত খিজিরের ইচ্ছার অনুকূল নয়। হজরত খিজিরের ইচ্ছায় আল্লাহ্র কাজ সম্পাদিত হয় না। তাই এখানে হজরত খিজির এরাদা করলেন বা ইচ্ছা করলেন কথাটির ধাত্যর্থ বিঘ্নিত হয়ে গৃহীত হবে রূপকার্থে। সে কারণেই এখানে 'আমি চাইলাম' কথাটির অর্থ হবে 'আমি মনে মনে নিবেদন করলাম বা প্রার্থনা জানালাম।'

প্রথম সন্তানকে ধ্বংস করে তদস্থলে দ্বিতীয় সন্তানকে সৃষ্টি করা একটি বৃহৎ পরিবর্তন। তাই এখানে বলা হয়েছে 'ইউব্দিলা হুমা' (তার পরিবর্তে)। উল্লেখ্য যে, প্রথম সন্তানকে অপসারিত করা হয়েছিলো হজরত খিজিরের মাধ্যমে। কিন্তু পরের সন্তান সৃষ্টি করার কাজটি ছিলো স্থলাভিষিক্ত করণ। এক্ষেত্রে হজরত

www.eelm.weebly.com

খিজিরের কোনো ভূমিকা ছিলো না। তাই 'ইউব্দিলা' ক্রিয়াটির সম্পর্ক ঘটেছে কেবল আল্লাহ্‌র সঙ্গে। আর 'ইউব্দিলা' এর স্থলে 'ইউবাদ্দিলা'ও একটি প্রসিদ্ধ পাঠ (ক্বেরাত)। কেননা 'ইবদাল' ও 'তাবদীল' শব্দ দু'টো সমার্থসম্পন্ন। বাগবী লিখেছেন, 'তাবদীল' শব্দটি একটি সাধারণ শব্দ। আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত উভয় প্রকার পরিবর্তনকে বলে 'তাবদীল'। আর 'ইবদাল' বলে বস্তুর অস্তিত্বগত পরিবর্তনকে। বাগবীর এই অভিমতটি ঠিক নয়। ঠিক হলে ভিন্ন পাঠটি এতো প্রসিদ্ধ হতো না। পাঠভিন্নতার কারণে তখন অর্থের মধ্যেও পার্থক্য সূচিত হতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর।' এখানে 'রুহ্‌মা' কথাটির অর্থ রহমত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'রহিমা' থেকে। তাই তাঁরা শব্দটির অর্থ করেছেন নৈকট্য। কাতাদা বলেছেন, শব্দটির অর্থ রক্তের সম্পর্ক রক্ষাকারী, পিতা-মাতার একান্ত অনুগত ও সেবক।

বাগবী লিখেছেন, কালাবী বলেছেন, আল্লাহ্ নিহত বালকটির পরিবর্তে তার পিতা-মাতাকে দিয়েছিলেন একটি কন্যাসন্তান। পরবর্তী সময়ে ওই কন্যার পানি গ্রহণ করেছিলেন জনৈক নবী এবং তিনি হয়েছিলেন আর এক নবীর জননী, যিনি পথ প্রদর্শন করেছিলেন একটি বৃহৎ সম্প্রদায়কে। জাফর বিন মোহাম্মদ বলেছেন, ওই পুণ্যময়ী কন্যার বংশে জন্ম নিয়েছিলেন সত্তরজন নবী।

ইবনে জুরাইজ বলেছেন, নিহত পুত্রের পরিবর্তে আল্লাহ্ ওই দম্পতিকে দিয়েছিলেন একজন নেককার সন্তান। ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, আতিয়া বলেছেন, আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছিলেন এক পুণ্যময়ী সন্ততি, যিনি পরবর্তীতে হয়েছিলেন একজন পয়গম্বরের জনয়িত্রী। হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম অভিমত পোষণ করেন। ভিন্ন সূত্রে ইবনে মুনজির ইউসুফ বিন ওমরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ মৃত বালকের পরিবর্তে ওই দম্পতিকে দান করেছিলেন এক পুণ্যময়ী আত্মজা, যার বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অনেক নবী। বোখারী তাঁর ইতিহাসে এবং তিরমিজি ও হাকেম হজরত আবু দারদা থেকে সুপরিণত সূত্রে এরকমই বর্ণনা করেছেন। আর হাকেম বর্ণনাটির সূত্রপরম্পরাকে বিশুদ্ধ বলেই আখ্যা দিয়েছেন।

মাত্‌রাফ বলেছেন, প্রথম সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তার পিতামাতা খুবই খুশী হয়েছিলেন। কিন্তু বালক বয়সে তাকে যখন হত্যা করা হলো, তখন তারা হয়ে পড়েছিলেন শোকাকুল। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। তাই আল্লাহ্ তাদের গৃহ আলোকিত করে প্রেরণ করেছিলেন এক পুণ্যময়ী কন্যা। অতএব বিশ্বাসবানগণের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি সতত সন্তুষ্ট থাকা। এমতো বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ্‌র সকল সিদ্ধান্তই কল্যাণকর।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, অভিপ্রেত ও অনভিপ্রেত উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র গোপন সিদ্ধান্তকে ভয় করে চলাই প্রকৃত বিশ্বাসীদের স্বভাব। সুতরাং সর্বাবস্থায় রাখতে হবে তাঁর রহমতের প্রত্যাশা। আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে কেবল তাঁরই নিকটে। তাঁর সকল সিদ্ধান্তের প্রতি প্রদর্শন করতে হবে অনুযোগ-অভিযোগহীন সন্তোষ।

শেষোক্ত আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'আর ওই প্রাচীরটি, ওটি ছিলো নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, তার নিম্নদেশে ছিলো তাদের গুপ্তধন।'

বাগবী লিখেছেন, ওই দুই পিতৃহীন কিশোরের নাম ছিলো ইসরাম এবং সরীম। হজরত ইকরামা এখানকার 'কান্‌জুন' শব্দটির অর্থ করেছেন মাল বা সম্পদ। হজরত আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ওই প্রাচীরের নিচে ছিলো সোনা ও রূপার ভাণ্ডার। হাদিসটি বোখারী উল্লেখ করেছেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে। হাকেমও হাদিসটির বর্ণনাকারী এবং তিনি বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলেও আখ্যা দিয়েছেন। হজরত আবু দারদার বিবরণ উল্লেখ করে তিবরানী লিখেছেন, ওই সময়ের গুপ্ত সম্পদ ছিলো হালাল এবং হারাম ছিলো গণিমতের মাল। কিন্তু আমাদের জন্য গণিমত হালাল ও গুপ্তধন হারাম।

আমি বলি, জাকাত প্রদান ব্যতিরেকে সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা আমাদের শরিয়তে নিষিদ্ধ। তাই আমাদের জন্য গুপ্তধন হারাম। আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন— 'যারা সোনা রূপা সঞ্চয় করে রাখে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয়, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।'

হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, যে সম্পদের জাকাত দেয়া হয়, তা গুপ্তধন নয়, যদিও তা মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। আর জাকাতবিহীন সম্পদ গুপ্তধন তুল্য, মাটিতে পুঁতে রাখা না হলেও। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ওই জনপদবাসীদের উপরে জাকাত ফরজ ছিলো না। হজরত আবু দারদা বলেছেন, গুপ্তধন হিসেবে মাটিতে সম্পদ পুঁতে রাখা ছিলো তাদের জন্য হালাল। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের উদ্ধৃতি সহকারে বাগবী লিখেছেন, ওই গুপ্তধন রাখা হয়েছিলো সহীফার আকৃতিতে। সুতরাং বলা যেতে পারে ওই গুপ্তধন ছিলো এলেমের খনি। বিশুদ্ধসূত্র পরম্পরায় হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই গুপ্তধন স্বর্ণ- রৌপ্যের ছিলো না, ছিলো এলেমের। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, রবী বিন আনাসও এরকম বলেছেন। ভিন্নসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, গুপ্তধনরূপে মাটিতে প্রোথিত ছিলো একটি স্বর্ণের তখতা। ওই তখতায় লেখা ছিলো— কী আশ্চর্য! যে মৃত্যুকে জানে, সে কীভাবে উল্লসিত হয়। কী আশ্চর্য! যে তকদীরকে মানে, সে কীভাবে বিমর্ষ ও নিরানন্দ হয়। কী বিস্ময়! রিজিক সুনির্ধারিত, একথা যে বিশ্বাস করে সে কীভাবে রিজিকের চিন্তায় পেরেশান হয়ে

www.eelm.weebly.com

পড়ে। কী বিস্ময়! আখেরাতের প্রতি যে আস্থাশীল, সে কীভাবে হয় দায়িত্ববোধ বিবর্জিত এবং কিয়ামতের প্রতি যার প্রত্যয় রয়েছে, সে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে পরিতৃপ্তই বা হয় কী করে! আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর প্রেরিত রসুল। তখতার অপর পৃষ্ঠায় লেখা ছিলো— আমিই আল্লাহ্। আমি এক। আমার কোনো শরীক নেই। আমি ভালো ও মন্দ উভয়ের সৃষ্টিকর্তা। ওই ব্যক্তির অবস্থা কতোই না কল্যাণকর, যার মাধ্যমে আমি প্রসারিত করেছি শুভ ও মহত্তর কর্মকাণ্ড সমূহকে। শিথিলসূত্র পরম্পরায় সুপরিণতরূপে হজরত আবু জর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায্যার। ইবনে মারদুবিয়াও হজরত আলী থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, বর্ণনাটি সুপরিণত। কিন্তু খারাবিতী তাঁর কামউল হিরস গ্রন্থে লিখেছেন, বর্ণনাটি আসলে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি।

জুজায বলেছেন, 'কান্‌জ' শব্দটি যদি এখানে সম্বন্ধপদ মুক্ত রূপে উল্লেখ করা হতো, তবে এর অর্থ কেবল ধনসম্পদের ভাণ্ডারই হতো, আর শব্দটিকে যদি সম্বন্ধপদ যুক্ত রূপে উল্লেখ হতো তবে তার অর্থান্তর ঘটতো অবশ্যই। যেমন 'কান্‌জুল ইল্‌ম' অর্থ জ্ঞান-ভাণ্ডার। আলোচ্য বাক্যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অবিচ্ছিন্নরূপে (কান্‌জুললাহুমা)। অতএব বুঝতে হবে, ওই গুপ্ত ভাণ্ডারটি একই সঙ্গে ছিলো পার্থিব ও পারলৌকিক সম্পদের ভাণ্ডার। অর্থাৎ স্বর্ণের পাতে লিপিবদ্ধ ছিলো দুর্লভ জ্ঞানের বিবরণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের পিতা ছিলো সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি।' কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ওই ব্যক্তির নাম ছিলো কাশাহ্। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কিশোরদ্বয়ের পিতা পুণ্যবান ছিলেন বলেই আল্লাহ্ তাদের সম্পদ রক্ষার নিমিত্তে পতনোন্মুখ প্রাচীরটি ঠিক করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন হজরত খিজিরকে। মোহাম্মদ বিন মুনকাদার বলেছেন, যে পুণ্যবান, আল্লাহ্ তার সন্তান, সন্তানের সন্তান, গোত্র ও সঙ্গীসাথীদেরকেও হেফাজত করেন। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, নামাজ পাঠের প্রাক্কালে আমার সন্তান-সন্ততিদের কথা মনে পড়ে। তখন আমি নামাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দেই (যেনো নামাজের কারণে হেফাজতে থাকে আমার সন্তানেরা)।

এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, ওই পুণ্যবান লোকটি পিতৃহীন কিশোরদ্বয়ের পিতা ছিলেন না, ছিলেন সপ্তমতম পূর্বপুরুষ। একথায় প্রতীয়মান হয় যে, পুণ্যের প্রতিক্রিয়া প্রবহমান থাকে অধঃস্তন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত। সোলায়মান বিন সালিম সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, পুণ্যবানদের পুণ্যের প্রভাব প্রবহমান থাকে পরবর্তী সাত শতাব্দির উত্তর পুরুষগণের মধ্যে। আর পাপিষ্ঠদের পাপের প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে পরবর্তী সাত শতাব্দির বংশধরদের মধ্যে।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখিত আয়াতে প্রতীয়মান হয় যে— প্রত্যেক মুসলমান পুণ্যবানদের জন্য অত্যাবশ্যক যে— স্বীয় সন্তান-সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা। কিন্তু শর্ত হচ্ছে— তারা যেন আল্লাহ্ দ্রোহী ও কাফের না হয়। যদি তারা কাফের ও আল্লাহ্দ্রোহী হয়, তবে কঠিন শাস্তির যোগ্য হবে। অপরাপর সাধারণ জনগণ থেকে তাদের সন্তান-সন্ততির উপর আরোপ করতে হবে অধিক কঠোরতা। ভবিষ্যতে অবিশ্বাসী হয়ে যাওয়া; এবং তার প্রতিক্রিয়া পিতা মাতার উপর আপতিত হওয়ার আশংকাতেইতো হজরত খিজির হত্যা করেছিলেন ছেলেটিকে। সে কথারই পোষকতা হচ্ছে আলোচ্য আয়াতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়োপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক।'

'আশাদ্দু' অর্থ এখানে পুরোপুরি বোধশক্তিসম্পন্ন। মানুষ পুরোপুরি শক্তিসম্পন্ন হয় আঠারো বছর বয়সে। আর তার বিবেক-বুদ্ধি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয় পঁচিশ বছর বয়সে, এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। এই পরিপূর্ণতাকে বলে 'কামালে রুশদ।' পঁচিশ বছর বয়সে যদি কেউ কামালে রুশদ পর্যন্ত উপনীত না হয়, তবে পরবর্তী জীবনে তা আশা করা বৃথা। কেননা আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন— 'তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে'। (সুরা নিসা)। আমি বলি, মানুষ কামালে রুশদ (পূর্ণ বিচক্ষণতা) পর্যন্ত পৌঁছে চল্লিশ বছর বয়সে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন— 'ক্রমে সে পূর্ণশক্তি প্রাপ্ত হয় এবং উপনীত হয় চল্লিশ বছর বয়সে।' (সূরা আহ্কাফ)।

বায়যাবী লিখেছেন, হজরত খিজির নৌকা ছিদ্র করার কাজটির সঙ্গে তাঁর নিজের ইচ্ছাকে সম্পৃক্ত করেছেন। বলেছেন, 'আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ক্রটিযুক্ত করতে।' বালক হত্যা সম্পর্কে বলেছেন, 'অতঃপর আমি চাইলাম যে তাদের প্রতিপালক যেনো তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন।' এভাবে তিনি আল্লাহ্র ইচ্ছার সঙ্গে নিজের কাজকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আর প্রাচীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বলেছেন, 'সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়োপ্রাপ্ত হোক।' এভাবে দেখা যায় তিনি প্রথম কাজটিকে সরাসরি নিজের ইচ্ছার সঙ্গে, দ্বিতীয় কাজটি আল্লাহ্র ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে এবং তৃতীয় কাজটি সরাসরি আল্লাহ্র ইচ্ছার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনটি কাজই ছিলো কল্যাণকর। কিন্তু প্রথমটিতে কল্যাণের প্রসঙ্গটি ছিলো আপেক্ষিক, তৃতীয়টি ছিলো সরাসরি মঙ্গলজনক এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে মিশ্রিত ছিলো ভালো ও মন্দ দু'টোই। এভাবে তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছাকে কখনো করেছেন মাধ্যমযুক্ত, কখনো করেছেন মাধ্যম ও মাধ্যমবিহীনতার মিশ্রণ, আবার

www.eelm.weebly.com

কখনো করেছেন সম্পূর্ণরূপে মাধ্যম বিবর্জিত। এতে করে বুঝা যায়, আল্লাহ্‌র পরিচয়প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হাল বা অবস্থা বিভিন্ন রকমের হয়। কখনো তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় মধ্যস্থতার প্রতি, কখনো মধ্যস্থতা ও মধ্যস্থতাহীনতার মিশ্রণের প্রতি, আবার কখনো সম্পূর্ণরূপে মধ্যস্থতা বিবর্জিত অবস্থার প্রতি।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি নিজ থেকে কিছু করিনি। এটাই, তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য-ধারণে অপারগ হয়েছিলে তার ব্যাখ্যা।'

বাগবী লিখেছেন, বিদায় বেলায় হজরত মুসা বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। হজরত খিজির বললেন, অপরের নিকটে জ্ঞান প্রদর্শনের জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করবেন না। জ্ঞান অন্বেষণ করবেন জ্ঞানানুযায়ী আমল করবার জন্য। বায়যাবী লিখেছেন, নিজের জ্ঞান সম্পর্কে অহংকার না করা, কোনো কিছু পছন্দ না হলে তা অস্বীকার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে না পড়া, এমতো ধারণা রাখা যে, ওই অপছন্দনীয় বিষয়ের ভিতরেও কোনো না কোনো সূক্ষ্ম বাস্তবতা নিহিত থাকতে পারে— এসকল কিছু হচ্ছে বর্ণিত ঘটনাবলীর শিক্ষা।

আমি বলি, শিক্ষক যদি আলেম, মুত্তাকী ও ধর্মপ্রাণ হয়, আর তার মতবাদ যদি অবিশুদ্ধ হয়, তবে তার কথাকে তাৎক্ষণিকভাবে অস্বীকার করা অনুচিত। শিক্ষকের প্রতি হওয়া উচিত সতত শ্রদ্ধাবনত। কথা-বার্তা ও আচরণকে করা উচিত মার্জিত ও শোভন। ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আদব সহকারে তাঁকে সচেতন করা এবং ত্রুটি গুরুতর না হলে তা উপেক্ষা করাই সমীচীন। যদি তাঁর মাধ্যমে বার বার দোষ প্রকাশিত হতে থাকে, তবে সসম্ভ্রমে তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করাই ছাত্রের কর্তব্য। হজরত মুসা ও হজরত খিজিরের ঘটনার মধ্যে রয়েছে এই সকল শিক্ষা।

হজরত খিজির জীবিত না মৃতঃ বাগবী লিখেছেন, এ সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন রকম মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত খিজির ও হজরত ইলিয়াস এখনো জীবিত। প্রতিবছর হজের সময়ে দু'জনের দেখা-সাক্ষাত হয়। হজরত খিজির পান করেছেন আবে হায়াত। আবে হায়াতের সন্ধানে সম্রাট জুলকারনাইন যখন অভিযান শুরু করেন, তখন হজরত খিজির ছিলেন তাঁর সঙ্গে। বরাবর এক হাত আগে তিনি পথ চলেছিলেন। এভাবে পথ চলতে চলতে একসময় হজরত খিজির পৌঁছে গিয়েছিলেন আবে হায়াতের ঝর্ণার কাছে। ওই আবে হায়াত বা সঞ্জিবনী সলিলে তিনি অবগাহন করেছিলেন এবং তা পান করে আল্লাহ্‌র শোকরও আদায় করেছিলেন। কিন্তু সম্রাট জুলকারনাইন পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং ফিরে এসেছিলেন নিরাশ হয়ে। অধিকাংশ আলেম মনে করেন, অন্য সকল সৃষ্টির মতো হজরত খিজিরও স্বাভাবিকভাবে পরলোকগমন করেছেন। কেননা আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন— 'আপনার পূর্বে আমি কোনো মানুষকে চিরদিন অবশিষ্ট রাখিনি।' বর্ণিত হয়েছে, একবার ইশার নামাজের পর রসুল স. বললেন, এখন থেকে একশত বছর পরে বর্তমান পৃথিবীর সকল মানুষ পরলোকগমন করবে। হেসনি হাসীন রচয়িতা তাঁর আত্‌তাযীয়া গ্রন্থে হাদিসটি

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ করেছেন। হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর উপস্থিত হলেন এক অপরিচিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রু বিশিষ্ট, স্থূলকায় ও সুদর্শন। কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রুবিসর্জন করলেন তিনি। তারপর সাহাবীগণের দিকে তাকিয়ে বললেন, মুসিবতের সান্ত্বনা, হৃত সম্পদের বিনিময় এবং প্রস্থানিত ব্যক্তিত্বের স্থলাভিষিক্তি রয়েছে কেবল আল্লাহ্র নিকটে। সুতরাং তাঁর দিকেই সকলে প্রত্যাবর্তনোদ্যত হও। তিনি তো দেখছেন, তোমরা কীরূপ বিপদগ্রস্ত। প্রতীক্ষা করো, এ শোক কখনো দূর হবার নয়। একথা বলেই তিনি চলে গেলেন। হজরত আবু বকর ও হজরত আলী বললেন, ইনি হজরত খিজির।

হজরত খিজিরের সঙ্গে বিভিন্ন আউলিয়ার সাক্ষাত ও ফয়েজ লাভের ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। সুতরাং বলা যেতে পারে, তিনি এখনো জীবিত। কিন্তু তিনি যদি জীবিতই থাকতেন, তবে রসুল স. এর মহিমময় সাহচর্য গ্রহণ করলেন না কেনো? রসুল স. তো সকলের জন্য প্রেরিত বার্তা-বাহক। তাহলে হজরত খিজির এর ব্যতিক্রম হন কী করে? কীভাবে তিনি রসুল স. এর মহান সংসর্গ থেকে বিরত থাকতে পারেন? আর রসুল স. তো স্পষ্ট করেই বলেছেন, আমার যুগে নবী মুসাও যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসারী হওয়া ভিন্ন তাঁর কোনো উপায় থাকতো না। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আহমদ ও বায়হাকী। স্মরণ করা যেতে পারে যে, হজরত ঈসার পুনরাবির্ভাব ঘটলে তিনিও হবেন উম্মতে মোহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত। রসুল স. এর বিশিষ্ট প্রতিনিধি ইমাম মেহেদীর পশ্চাতে তিনি নামাজও আদায় করবেন। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

উল্লেখ্য যে, এ প্রসঙ্গে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির একটি বিস্ময়কর বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেছেন— আমার নিকটে যখন হজরত খিজির জীবিত না মৃত সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন আমি আল্লাহ্র প্রতি পরিপূর্ণরূপে মনোনিবেশ করলাম এবং প্রার্থনা করলাম একটি সুষ্ঠু সমাধান। এরপর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখলাম আমার সামনে দণ্ডায়মান হজরত খিজির। আমি তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন আমি ও ইলিয়াস উভয়েই মৃত। তবে আল্লাহ্ আমাদের রূহকে এমনভাবে শক্তি দান করেছেন যে, আমরা পার্থিব দেহ বিশিষ্টদের মতো পথ-ভ্রষ্টকে পথের সন্ধান ও বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে পারি, যদি আল্লাহ্ তা চান। যারা ইলমে লাদুন্নী প্রাপ্ত, তাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের বিশেষ মৈত্রী। আর আমরা আল্লাহ্র হুকুমে কুতুবে মাদারের সাহায্যকারী। কুতুবে মাদার হচ্ছেন মাদারে আলম। তাঁর অস্তিত্বের বরকতে সুসম্পন্ন হয় মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনা। তিনি অবস্থান করেন ইয়েমেন দেশে। আর তিনি শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী। আমরা তাঁকে সাহায্য করি বলে আমাদেরকেও ইমাম শাফেয়ীর মাজহাব অনুসারে নামাজ পড়তে হয়।

www.eelm.weebly.com

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ط قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ○
اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ○ فَاَتْبَعَ
سَبَبًا ○ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ
حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ط قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ
وَاِمَّاۤ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ○ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ
ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ○ وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨالْحُسْنٰى وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ○ ثُمَّ اَتْبَعَ
سَبَبًا ○ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ
نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ○ كَذٰلِكَ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ
خُبْرًا ○ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ○ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ
مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ○ قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ
اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ
خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ○ قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ
رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ○ اٰتُوْنِىْ زُبَرَ
الْحَدِيْدِ ط حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ط حَتّٰۤى
اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ○

www.eelm.weebly.com

❒ উহারা তোমাকে জুল-কারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল,'আমি তোমাদিগের নিকট তাহার বিষয় বর্ণনা করিব।'

❒ আমি তাহাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়াছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করিয়াছিলাম।

❒ সে এক পথ অবলম্বন করিল।

❒ চলিতে চলিতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌছিল তখন সে সূর্যকে এক পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন করিতে দেখিল এবং সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখিতে পাইল। আমি বলিলাম, 'হে জুল্‌কারনাইন! তুমি ইহাদিগকে শাস্তি দিতে পার অথবা ইহাদিগকে সদয়ভাবে গ্রহণ করিতে পার।'

❒ সে বলিল, 'যে-কেহ সীমা লংঘন করিবে আমি তাহাকে শাস্তি দিব, অতঃপর সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে এবং তিনি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।'

❒ 'তবে যে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তাহার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তাহার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলিব।'

❒ আবার সে এক পথ ধরিল,

❒ চলিতে চলিতে যখন যে সূর্যোদয়স্থলে পৌছিল তখন সে দেখিল উহা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হইতেছে যাহাদিগের জন্য সূর্য তাপ হইতে আত্মরক্ষার কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করি নাই;

❒ প্রকৃত ঘটনা ইহাই তাহার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।

❒ আবার সে এক পথ ধরিল,

❒ চলিতে চলিতে সে যখন পর্বতপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌছিল তখন তথায় সে এক সম্প্রদায়কে পাইল যাহারা তাহার কথা একেবারেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

❒ উহারা বলিল, 'হে জুল্‌কারনাইন। ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে, আমরা কি তোমাকে কর দিব এই শর্তে যে তুমি আমাদিগের ও উহাদিগের মধ্যে এক প্রাচীর গড়িয়া দিবে?'

❒ সে বলিল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন তাহাই উৎকৃষ্ট; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদিগের ও উহাদিগের মধ্যস্থলে এক মজবুত প্রাচীর গড়িয়া দিব।'

❒ 'তোমরা আমার নিকট লৌহ পিণ্ড সমূহ আনয়ন কর' অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকাস্থান পূর্ণ হইয়া যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হইল তখন সে বলিল, তোমরা হাপরে দম দিতে থাক।' যখন উহা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইল তখন সে বলিল, 'তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর আমি উহা ঢালিয়া দিই ইহার উপর।'

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিক অথবা মদীনার ইহুদীরা আপনার নবুয়তের সত্যতা যাচাই করার জন্য আপনাকে জুল-কারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি তাদেরকে বলুন, আমি তোমাদের নিকট তাঁর বিষয়ে বর্ণনা করবো।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো আলেম বলেছেন, জুল-কারনাইনের আসল নাম ছিলো মারযুবান বিন মারযিয়্যাহ্। তিনি ছিলেন গ্রীস দেশীয় এবং ছিলেন হজরত নুহের বংশধর। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন রোমের অধিবাসী এবং তাঁর নাম ছিলো সেকেন্দার বিন কিবলিস বিন ফিলকাওস। আমার মতে শেষোক্ত উক্তিটি অধিকতর বিশুদ্ধ। শীরাজী তাঁর আলআলকাব গ্রন্থে এবং ইবনে ইসহাক, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম তাঁদের আপনাপন বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ইতিহাস বিশারদ; তাঁর মতে জুল-কারনাইন ছিলো রোমীয়। তিনি ছিলেন তাঁর বৃদ্ধ পিতার একমাত্র সন্তান। তাঁর আর এক নাম ছিলো সেকেন্দার। ইবনে মুনজির উল্লেখ করেছেন, কাতাদা বলেছেন, সেকেন্দার ও জুল-কারনাইন একই ব্যক্তি।

বাগবী লিখেছেন, জুল-কারনাইন নবী ছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে রয়েছে বিস্তর মতপ্রভেদ। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন নবী। আবু তুফাইল বর্ণনা করেছেন, হজরত আলীকে একবার তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তিনি নবী অথবা বাদশাহ্ কোনোটাই ছিলেন না। ছিলেন পুণ্যবান। তিনি আল্লাহ্কে ভালোবাসতেন এবং আল্লাহ্ও ভালোবাসতেন তাঁকে। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ অন্তর বিশিষ্ট এবং আল্লাহ্র সতত অনুগত। আল্লাহ্ তাঁকে দান করেছিলেন কল্যাণ।

ইবনে মারদুবিয়া সালেম বিন আবীল জাআ'দ সূত্রে উল্লেখ করেছেন, হজরত আলীর নিকটে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, জুল-কারনাইন কি নবী ছিলেন? তিনি বললেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, জুল-কারনাইন ছিলেন আল্লাহ্র একান্ত অনুগত এক বান্দা। আল্লাহ্ তাঁর বিশুদ্ধচিত্ততার যথাযথ বিনিময় দান করেছেন। বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত ওমর একবার শুনলেন, একলোক আরেক লোককে জুল-কারনাইন বলে ডাকছে। তিনি তখন বললেন, তোমরা পয়গম্বরের নামে নাম রেখেও সন্তুষ্ট হতে পারলে না। এখন আবার নিজেদের নাম রাখতে শুরু করছো ফেরেশতাদের নামে। অধিকাংশ আলেমের ধারণা জুল-কারনাইন ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মপ্রাণ রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর নামকরণ প্রসঙ্গে বাগবী উল্লেখ করেছেন বেশ কয়েকটি অভিমত। যেমন— ১. পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অর্থাৎ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। ২. তিনি ছিলেন রোম ও পারস্য রাজ্যের সম্রাট। ৩. আলো ও অন্ধকার দু'দিকেই ভ্রমণ

www.eelm.weebly.com

করেছিলেন তিনি (সম্ভবতঃ একথার উদ্দেশ্য হচ্ছে আফ্রিকার সুদান রাজ্য ও রোম)। ৪. তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি আঁকড়ে ধরে রয়েছেন সূর্যের দুই প্রান্ত। ৫. তাঁর মস্তকে ছিলো শিঙসদৃশ অতীব সুন্দর দু'টি কেশ গুচ্ছ। ৬. জুলকারনাইন অর্থ দুই শিঙ বিশিষ্ট। ওই শিঙ দু'টোকে তিনি ঢেকে রাখতেন পাগড়ি দিয়ে। ইউনুস ইবনে ওবাইদ সূত্রে ইবনে আবদুল হাকাম এবং কাতাদা সূত্রে শীরাজী এরকম বিবরণ উপস্থাপন করেছেন।

আবু তুফাইলের বর্ণনায় এসেছে, জুল-কারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে হজরত আলী বলেছিলেন, তিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র ভয় প্রদর্শন করতেন। একবার তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর মাথার ডানপাশে আঘাত করলো। ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে পুনরায় জীবিত করে দিলেন। তিনিও পুনরায় আল্লাহ্‌কে ভয় করার উপদেশ দিতে লাগলেন। এবার তাঁর গোত্রের লোকেরা আঘাত করলো তাঁর মাথার বাম পাশে। এর ফলে পুনরায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে পুনরায় জীবিত করে দিলেন। ওই দুই আঘাতের কারণে তাঁর মাথার ডান ও বাম দিক শিঙ এর মতো উঁচু হয়ে উঠেছিলো।

আজজুহুদ গ্রন্থে আহমদ এবং আল উজমা গ্রন্থে ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখ আবুল ওরাকা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত আলীকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো জুল-কারনাইনের শিঙ দু'টো কেমন ছিলো? তিনি বললেন, তোমরা কি মনে করেছো শিঙ দু'টো ছিলো সোনা অথবা রূপার? না, এমন নয়। তিনি ছিলেন একজন নবী। আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য। তিনি যথারীতি মানুষকে আহ্বান জানাতেন আল্লাহ্‌র পথে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা একবার তাঁর মস্তকের বাম পাশে আঘাত করলো। ফলে তিনি প্রাণ হারালেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে জীবন দান করলেন এবং মানুষকে পুনরায় সত্য পথের দিকে আহ্বান জানানোর নির্দেশ দিলেন। তিনিও যথারীতি নির্দেশ প্রতিপালন করে চললেন। এবার তাঁর গোত্রের লোকেরা আঘাত করলো মস্তকের ডান পাশে। ফলে তিনি পরলোক গমন করলেন। আল্লাহ্ তাঁর নাম রেখেছিলেন জুলকারনাইন।

অতঃপর আল্লাহ্‌পাক পরের আয়াতাংশে রসুল স. কে আজ্ঞা করলেন— 'হে নবী! আপনি বলুন; তার ইতিবৃত্ত থেকে কিছু অংশ আমি আবৃত্তি করছি।'

এর পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'আমি পৃথিবীতে তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম।' বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, মেঘমালাকে তাঁর অধীন করে দেয়া হয়েছিলো। তিনি ইচ্ছে করলে মেঘের উপরে আরোহণ করে ভ্রমণ করতে পারতেন। তাঁর জন্য আলোককে প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিলো। অর্থাৎ

www.eelm.weebly.com

রজনীও ছিলো তাঁর জন্য দিবসের মতো আলোকময়। 'পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম' কথাটির মর্মার্থ এরকমই। অর্থাৎ পৃথিবীতে তাঁর পরিভ্রমণ ছিলো অত্যন্ত সহজ। তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছিলো পৃথিবীর সকল পথ। ফলে দিবস-রজনী অথবা ঋতুবিবর্তন তাঁর চলার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা রচনা করতে পারতো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলাম।' একথার অর্থ— আমি তাকে দান করেছিলাম তার অভিলাষ ও উদ্দেশ্য পূরণের সকল পন্থা ও মাধ্যম। অর্থাৎ তার প্রয়োজন সমূহ আমি কখনো অপূর্ণ রাখতাম না। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, যুদ্ধ ও বিজয়ের জন্য যা কিছু প্রয়োজন হয়, তার সকল কিছুই আমি দান করেছিলাম তাঁকে। কেউ কেউ আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ করেছেন এরকম— আমি পৃথিবীর দুই প্রান্তকে করে দিয়েছিলাম তাঁর নিকটবর্তী। বাগবী ও হাসান বসরী এখানকার 'সাবাবান' কথাটির অর্থ করেছেন 'বালাগান'। অর্থাৎ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর সকল উপকরণ আমি দান করেছিলাম তাকে।

এর পরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'ফাআত্‌বাআ' সাবাবান' (সে এক পথ অবলম্বন করলো)। একথার মর্মার্থ— অতঃপর উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য তিনি যাত্রা শুরু করলেন এবং পৌঁছেও গেলেন। যেমন বলা হয়— 'মাযিল্‌তু ইত্তাবা'তুহূ হাত্তা আতবা'তুহূ' (আমি সর্বদাই তার অনুসরণ করেছি, এমন কি তার নিকটে পৌঁছেও গিয়েছি)। এরকম অর্থ বর্ণনা করেছেন রুমী, আল আসমায়ী থেকে। 'সাবাবান' কথাটির অর্থ এখানে পথ। অর্থাৎ পশ্চিম দিকের পথ। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন অবস্থানস্থল, মঞ্জিল।

এর পরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'চলতে চলতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছালো, তখন সে সূর্যকে এক পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন করতে দেখলো এবং সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলো।'

এখানে 'হামিয়াতিন' অর্থ পঙ্কিল, কর্দমাক্ত। বাগবী লিখেছেন, একবার হজরত মুয়াবিয়া হজরত কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কীভাবে অস্তমিত হয়? তওরাতে তোমরা এ সম্পর্কে কোনো কিছু দেখেছো নাকি? তিনি বললেন, তওরাতে লেখা রয়েছে, সূর্য অস্তমিত হয় পানি ও কাদার মধ্যে। বায়যাবী লিখেছেন, সম্ভবতঃ জুল-কারনাইন পৌঁছে গিয়েছিলেন কোনো মহাসাগরের পাড়ে এবং সূর্যকে অস্তমিত হতে দেখেছিলেন মহাসাগরের অগাধ জলরাশির মধ্যে। তাঁর ওই দৃষ্টিকোনকেই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে এভাবে— সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্তগমন করতে দেখলো। কুতাইবিও এরকম বলেছেন।

www.eelm.weebly.com

'সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলো'— এ সম্পর্কে বায়যাবী লিখেছেন, ওই মহাসমুদ্রের পাড়ে বাস করতো চামড়ার পোশাক পরিহিত একদল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। জোয়ারের সময় সমুদ্র থেকে যে সকল মৃত মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণী তটভূমিতে এসে আটকে যেতো, সেগুলোকেই ভক্ষণ করতো তারা।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি বললাম, হে জুল-কারনাইন! তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পারো অথবা এদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারো।' একথার অর্থ— আমি প্রত্যাদেশ করলাম, হে জুল-কারনাইন! তুমি ওই সম্প্রদায়কে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাও। যদি তারা তোমার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাদেরকে শাস্তি দাও। আর যদি তোমার আহ্বানকে গ্রহণ করে তারা ইমানদার হয়ে যায়, তবে তাদের প্রতি প্রদর্শন করো সদয় আচরণ। তাদেরকে শিক্ষা দাও আল্লাহ্‌র বিধান।

এখানে 'ইম্‌মা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'তাকসীম' (ভেদ) এর জন্য। প্রত্যাখ্যানের জন্য নয়। যেমন এই আয়াতে 'আও' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তাকসীমের (বিভেদ সৃষ্টির লক্ষে) জন্য— ইন্‌নামা জাযাউ ল্লাজীনা ইউহারি-বূনাল্‌লহা ওয়া রসুলাহু ওয়া ইয়াসআ'ওনা ফীল আরদ্বি ফাসাদান আঁইয়্যুক্বত্‌তালূ আও ইউসাল্‌লাবু আও তুক্বাত্‌ত্বাআ' আইদীহিম ওয়া আরজুলুহুম মিন খিলাফিন আও ইউন্‌ফাও মিনাল আরদ্বি (বিভিন্ন অবস্থার জন্য বিভিন্ন রকম বিধান; যদি তারা তওবা করে নেয়, তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করো; আর যদি তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানের উপর অনড় থাকে, তাহলে তাদেরকে শাস্তি দান করো)।

কোনো কোনো আলেম মনে করেন, এখানে 'ইম্‌মা' পদটি বিয়োজক অব্যয়। এক্ষেত্রে বক্তব্য বিষয়ে কর্তার ইচ্ছার স্বাধীনতা সন্নিহিত থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ্ জুলকারনাইনকে এখানে এই স্বাধীনতা দিয়েছেন যে তিনি ওই সম্প্রদায়ের লোককে হত্যা করতে পারবেন অথবা দিতে পারবেন সত্য ধর্মের দাওয়াত। কেউ কেউ বলেছেন, জুল-কারনাইনকে এখানে এই মর্মে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, তিনি তাদেরকে হত্যা করবেন অথবা করবেন বন্দী। হত্যা অপেক্ষা বন্দীত্বতো উত্তম। তাই শেষে বলা হয়েছে— অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারো।

এর পরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— 'সে বললো, যে কেউ সীমালংঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দিবো, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র নির্দেশ পাওয়ার পর জুল-কারনাইন তাদেরকে সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান জানালেন এবং বললেন, আমার এই আহ্বান যে গ্রহণ করবে না, সে সীমালংঘনকারী। আমি তাকে শাস্তি দিবো। কারণ সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। আর মৃত্যুদণ্ডের পরেও তাদের রক্ষা নেই। মৃত্যু-উত্তর জীবনে পুনরায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সরাসরি শুরু হবে কঠিনতর শাস্তি।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৮৮) বলা হয়েছে— 'তবে যে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলবো।' এখানে 'ইউস্‌রা' শব্দটির অর্থ সহজ বা নম্র। মুজাহিদ বলেছেন শব্দটির অর্থ উত্তম। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ জুল-কারনাইনকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের প্রতি নম্র আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এরকম নির্দেশ সাধারণতঃ নবীদেরকে দেয়া হয়ে থাকে। সুতরাং তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নবী।

বাগবী লিখেছেন, প্রকৃত কথা এই যে তিনি নবী ছিলেন না। আলোচ্য আয়াত সমূহের নির্দেশগুলো তাঁকে প্রত্যাদেশ বা ওহীর মাধ্যমে দেয়া হয়নি। দেয়া হয়েছিলো ইলহামের মাধ্যমে। যেমন আল্লাহ্‌র অলীগণকে দেয়া হয়ে থাকে। আমি বলি, সম্ভবতঃ তিনি কোনো নবীর মাধ্যমে আলোচ্য আয়াত সমূহের প্রত্যাদেশগুলো পেয়েছিলেন। অথবা কোনো নবী প্রত্যাদেশগুলোর দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে নির্বাচন করেছিলেন প্রতিনিধিরূপে। এভাবে তাঁকে নবীর প্রতিনিধি স্বরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিলো সত্য ধর্ম প্রচারের।

এর পরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'আবার সে এক পথ ধরলো।' একথার অর্থ জুলকারনাইন এবার যাত্রা করলেন অন্য এক রাজ্যের দিকে।

এর পরের আয়াতে (৯০) বলা হয়েছে— 'চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয়স্থলে পৌঁছলো, তখন সে দেখলো তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে, যাদের জন্য সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোনো অন্তরায় আমি সৃষ্টি করিনি।' একথার অর্থ— জুলকারনাইন এবার পথ চলতে শুরু করলেন পূর্ব দিকে। চলতে চলতে পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে পৌঁছে তিনি দেখতে পেলেন এক জনপদ। বিস্ময়ের সঙ্গে আরো দেখলেন জনপদবাসীদের শরীর ও সূর্যের মধ্যে কোনো আড়াল নেই। অর্থাৎ তাদের ঘরবাড়ী যেমন নেই, তেমনি নেই কোনো পোশাক আশাক। সভ্য সমাজের সঙ্গে তারা সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত।

এর পরের আয়াতে (৯১)বলা হয়েছে — 'প্রকৃত ঘটনা এটাই'। একথার অর্থ— জুল-কারনাইনের পশ্চিম ও পূর্বের এই অভিযানের মধ্যেই বিবৃত হয়েছে প্রকৃত কাহিনী। অর্থাৎ এজগতে তার কর্তৃত্ব বিস্তৃত করে দেয়া হয়েছিলো পৃথিবীর উভয় প্রান্ত পর্যন্ত। অথবা কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— তিনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের অধিবাসীদের সঙ্গে একই রকম আচরণ করেছিলেন। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দিয়েছিলেন শাস্তি এবং বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের সঙ্গে করেছিলেন সদয় আচরণ। এটাই হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা। আবার কথাটির মর্মার্থ এরকম হওয়া সম্ভব যে— পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে জুল-কারনাইন যেভাবে সূর্যকে পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখেছিলেন, সে রকমই কর্দমাক্ত জলধি থেকে পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে সূর্যকে উদিত হতেও দেখেছিলেন তিনি। কিংবা মর্মার্থ হবে—

www.eelm.weebly.com

পৃথিবীর পশ্চিমপ্রান্তবাসীদের জন্য যেমন সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোনো অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি, তেমনি অন্তরাল সৃষ্টি করিনি পূর্বপ্রান্তবাসীদের জন্যও। এটাই হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।' একথার অর্থ— কেবল আমিই জানি জুল-কারনাইনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা। তার সেনাসংখ্যা, সমরাস্ত্র, ধনসম্পদ, তার জ্ঞানের পরিধি ইত্যাদি সম্পর্কে অন্য কেউই কোনো কিছু জানে না। জানি শুধু আমি।

এখানে 'আহাত্বনা' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে জুল-কারনাইনের বিপুল সংখ্যক সৈন্য, বিশাল সমরসম্ভার ও সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের কথা।

এর পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— 'আর সে এক পথ ধরলো।' একথার অর্থ— জুল-কারনাইন এবার ধরলো নতুন এক পথ। চলতে শুরু করলো দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

পরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— 'চলতে চলতে সে যখন পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছলো, তখন তথায় সে এক সম্প্রদায়কে পেলো, যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিলো না।' এ কথার অর্থ— পথ চলতে চলতে জুলকারনাইন এবার এসে পৌঁছলেন দু'টি বৃহৎ পর্বতের মধ্যস্থলে। সেখানে দেখলেন অনেক লোকের বসবাস। কিন্তু তাদের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করা হয়ে পড়লো কঠিন। কারণ তাদের ভাষা দুর্বোধ্য।

সুদ্‌দা ও সাদ্‌দা শব্দ দু'টো সমার্থক। এর অর্থ প্রাচীর বা প্রতিবন্ধক। ইকরামা বলেছেন, মানব নির্মিত প্রতিবন্ধককে বলে সাদ্‌দা এবং সুদ্‌দা বলে প্রাকৃতিক অন্তরায়কে। এখানে 'সাদ্‌দাইনি' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে দুই বৃহৎ পর্বতের মধ্যবর্তী ওই স্থানকে, যেখানে তিনি ইয়াজুজ-মাজুজের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করে দিয়েছিলেন একটি সুবৃহৎ প্রাচীর। উল্লেখ যে, ওই সুবৃহৎ প্রাচীরটি নির্মিত হয়েছিলো আর্মিনিয়া ও আজারবাইজানে। ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস এরকমই বলেছেন। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন মন্তব্য করেছেন, তুরস্কের শেষ প্রান্তে রয়েছে দু'টি বৃহৎ পর্বতমালা। ওই পর্বতমালার অপর পাশে রয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজদের বসবাস। আলোচ্য আয়াতে ওই পর্বতমালার কথাই বলা হয়েছে। এই মন্তব্যটি উল্লেখ করেছেন সাঈদ ইবনে মানসুর তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে এবং ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম তাঁদের আপনাপন তাফসীরে।

'মিনদূনিহিমা' অর্থ দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে। 'লা ইয়াফ্‌কুহুনা ক্বওলা' অর্থ যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিলো না। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাদের কথা অন্য অঞ্চলের লোক বুঝতো না। তারাও বুঝতো না অন্য এলাকার লোকের ভাষা।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৯৪) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে জুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে।' একথার অর্থ— ওই এলাকার লোকেরা প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের আগমনে আনন্দিত হলো এবং আবেদন জানালো; হে মহামান্য জুল-কারনাইন! আমরা তো দীর্ঘদিন ধরে পর্বতমালার ওপার থেকে আসা দুর্ধর্ষ ইয়াজুজ ও মাজুজের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। মাঝে মাঝেই তারা এদিকে এসে হত্যাকাণ্ড ঘটায়। সম্পদ ধ্বংস করে। আমাদের ক্ষেতের ফসলাদিও নষ্ট করে চলে যায়।

কালাবী বলেছেন, ইয়াজুজ মাজুজেরা আসতো বসন্তকালে। এ পারের অধিবাসীদের ফলমূল তরি-তরকারী খেয়ে ও নিয়ে আবার ফিরে যেতো। ফলে এপারের অধিবাসীদেরকে বড়ই দুর্ভোগ পোহাতে হতো। কেউ কেউ বলেছেন, তারা মানুষও খেতো।

ইয়াজুজ ও মাজুজ শব্দ দু'টো অনারবী। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দ দু'টো আরবী। আরববাসীরা বলে থাকে 'আজুজ জুলমু।' অর্থাৎ আসরাউ' (দ্রুতগতিসম্পন্ন)। বাগবী লিখেছেন, ইয়াজুজ ও মাজুজ শব্দ দু'টোর উৎকলন ঘটেছে 'আজীজুন্ নার' থেকে। আজীজুন্ নার অর্থ অগ্নিকুণ্ড, অগ্নি-দহন; ক্ষতিগ্রস্ততা। ইয়াজুজ মাজুজেরা ছিলো অসংখ্য। তাই তাদেরকে তুলনা করা হয়েছে আগুনের ঝলক, অগ্নিকুণ্ড এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সঙ্গে।

বাগবী আরো লিখেছেন, তারা হজরত নুহের পুত্র ইয়াফেসের বংশধর। জুহাক বলেছেন, তারা তুর্কী বংশোদ্ভূত। সুদ্দী বলেছেন, তুর্কী ইয়াজুজের একটি সেনাদল ছিলো ওই এলাকায়। জুল-কারনাইন সেখানে পৌঁছলে তারা ওই দুই পর্বতমালার ওপারে সরে যায়। সকল তুর্কী তাদেরই বংশধর। কাতাদা বলেছেন, ইয়াজুজদের শাখা গোত্র ছিলো বাইশটি। জুল-কারনাইন যখন সেখানে প্রাচীর নির্মাণ করলেন, তখন একটি গোত্র রইল এপারে। আর ওপারে আটকা পড়ে গেলো অবশিষ্ট একুশটি গোত্র। এপারের গোত্রটি তুর্কী। কেননা ইয়াজুজদের মূল জনগোষ্ঠী এদেরকে ত্যাগ করেছিলো। এভাবে পরিত্যক্ত হওয়ার কারণেই এদের নাম হয়েছে তুর্কী।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হজরত নুহের ছিলো তিন পুত্র— শাম, হাম, ইয়াফেস। আরব, পারস্য ও রোমের অধিবাসীরা শামের বংশধর। আবিসিনিয়া, জুনাজ ও নাওবার অধিবাসীরা হচ্ছে হামের বংশধর। আর ইয়াফেসের বংশধরেরা হচ্ছে তুর্কী, খুরজ, সআলিয়াহ্ ও ইয়াজুজ-মাজুজ।

আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে ইয়াজুজ মাজুজদের সংখ্যা দশগুণ বেশী। সুপরিণতসূত্রে হজরত হুজায়ফা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ইয়াজুজ ও মাজুজ ভিন্ন ভিন্ন

www.eelm.weebly.com

দু'টো সম্প্রদায়। তাদের সংখ্যা চার লক্ষ। তারাও বাবা আদমের বংশভূত। ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মরে না, যতক্ষণ না তাদের বংশের একহাজার সন্তান অস্ত্রধারণের উপযোগী হয়। তারা পৃথিবীর অনাবাদী অঞ্চলের দিকে ছড়িয়ে পড়বে।

আমি বলি, সম্ভবতঃ হাদিসটির মর্মার্থ এই— যখন সম্রাট জুল-কারনাইন প্রাচীর নির্মাণ করলেন তখন তাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো দু'টো দল। একটি ওপারের এবং আরেকটি এপারের। এরপরে তাদের সংখ্যা কতো বৃদ্ধি পেয়েছে, তা অননুমানীয়। কারণ হাদিসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, তাদের বংশের একহাজার সন্তান যৌবনে পদার্পন না করা পর্যন্ত তাদের কারো মৃত্যু হয় না। কিয়ামতের প্রাক্কালে তারা ওই প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে পৃথিবীর সমভূমিতে। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

বাগবী লিখেছেন, ইয়াজুজ মাজুজেরা তিনভাগে বিভক্ত। এক শ্রেণীর ইয়াজুজ মাজুজ আরজ বৃক্ষের সমান লম্বা। অর্থাৎ তাদের উচ্চতা একশত বিশ হাত। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা দৈর্ঘ্য প্রস্থে সমান। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য একশত ত্রিশ হাত। প্রস্থও তাই। তাদের আঘাতে পাহাড় স্বস্থানে স্থির থাকতে পারে না। তৃতীয় শ্রেণীর ইয়াজুজ মাজুজেরা তাদের একটি কান বিছিয়ে দেয় এবং আরেকটি কান নড়া চড়া করতে থাকে। কিয়ামতের পূর্বক্ষণে তারা বের হয়ে এসে ঘোড়া, শুকর এবং বন্য জন্তুসমূহ খেয়ে ফেলবে। মৃত জীবিত কোনো কিছু বাছ বিচার করবে না। তাদের অগ্রবর্তী দল যখন সিরিয়ায় পৌঁছবে, তখন পশ্চাদ্‌বর্তী দল থাকবে খোরাসানে। তারা পান করবে সকল নদী ও মৃত সাগরের পানি। বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, তাদের কারো কারো উচ্চতা হবে এক বিঘত এবং প্রস্থ হবে এক হাত। আবার কেউ কেউ হবে এর চেয়ে অধিক লম্বা।

হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, আদম সন্তানগণের মধ্যে তারা এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। কথিত আছে, একদিন স্বপ্নে হজরত আদমের বীর্য স্খলিত হলো। আর ওই স্খলিত বীর্য থেকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করলেন ইয়াজুজ মাজুজকে। সুতরাং পিতৃসম্পর্কের দিক থেকে তারা আমাদের ভাই কিন্তু মাতৃ সম্পর্কের দিক থেকে তারা আমাদের কেউ নয়। ওয়াহাব ইবনে মুনাববাহ্ সূত্রে বাগবী লিখেছেন, জুল-কারনাইন ছিলেন রোম দেশের অধিবাসী। জনৈক বৃদ্ধের একমাত্র সন্তান ছিলেন তিনি। যৌবন কালেই তিনি হয়ে ওঠেন পুণ্যবান। ওই সময় আল্লাহ্ তাকে বললেন, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এমন এক সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে আমি তোমাকে প্রেরণ করবো। তাদের মধ্যে একটি গোত্র থাকবে পৃথিবীর পশ্চিমতম প্রান্তে। আরেকটি গোত্র থাকবে পূর্বতম প্রান্তে। পশ্চিমতম প্রান্তের লোকদেরকে বলা হবে নাসেক। আর পূর্বতম প্রান্তের অধিবাসীদের নাম হবে মানসাক। আরো দু'টো গোত্র থাকবে তাদের। একটি সর্বাপেক্ষা উত্তরে। আরেকটি সর্বাপেক্ষা দক্ষিণে।

www.eelm.weebly.com

উত্তরের লোকদের নাম হাবিল। আর দক্ষিণের লোকদের নাম কাবিল। তাদের অবশিষ্ট শাখা গোত্রসমূহ থাকবে পৃথিবীর মধ্যভাগে জ্বিন ও মানুষের সঙ্গে। জুল-কারনাইন বললেন, এরপরে আমি কোন্ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবো? আর কথা বলবো তাদের সঙ্গে কোন ভাষায়? আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবো প্রবল পরাক্রান্তরূপে। তোমার ভাষাকেও করবো ব্যাপকভাবে প্রসারিত। কোনো কিছু তোমাকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারবে না। আমি তোমাকে পরিধান করাবো আতঙ্ক প্রকাশক পরিচ্ছদ। ফলে কেউ তোমার অন্তরায় সৃষ্টি করতে সাহস পাবে না। আলো ও অন্ধকারকে করে দিবো তোমার সহযোগী। আলো তোমাকে পথ দেখাবে এবং অন্ধকার অবস্থান করবে তোমার পশ্চাতে। এরপর জুল-কারনাইন শুরু করলেন তাঁর অভিযান। প্রথমে যাত্রা করলেন সূর্যাস্তের দিকে। চলতে চলতে গিয়ে পৌঁছলেন নাসেকদের কাছে। সেখানে কিছুকাল তিনি আল্লাহ্‌র ইবাদত করলেন। তারপর তাদেরকে আমন্ত্রণ জানালেন সত্য ধর্মের দিকে। কেউ কেউ তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো। আর কেউ কেউ হয়ে উঠলো বিদ্রোহী। জুল-কারনাইন তাদের উপরে অন্ধকারকে প্রবল করে দিলেন। অন্ধকার প্রকাশ করে দিলো তাদের শরীর ও গৃহের অভ্যন্তরভাগ। শেষে তারাও গ্রহণ করলো সত্যধর্মের আমন্ত্রণ। জুল-কারনাইন তখন তাদেরকে নিয়ে গঠন করলেন এক সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী। তারপর ওই সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন উত্তরতম প্রান্তের হাবিলদের নিকটে। সেখানেও একই নিয়মে বাস্তবায়ন করলেন তাঁর পরিকল্পনা। তারপর নাসেক ও হাবিলদের দ্বারা গঠিত সেনাদলকে নিয়ে তিনি গমন করলেন পূর্বতম প্রান্তের অধিবাসী মানসাকদের নিকটে। এখানেও তিনি পূর্বোক্ত নিয়মে গঠন করলেন সমরকর্মীর একটি দল। তারপর সকলকে নিয়ে হাজির হলেন সর্বদক্ষিণের কাবিলদের কাছে। সেখানেও তিনি গঠন করলেন একটি সেনাবাহিনী। তারপর সকলকে নিয়ে উপস্থিত হলেন পৃথিবীর মধ্যভাগে সেখান থেকে গিয়ে পৌঁছলেন তুরস্কের পূর্বসীমানায়। সেখানে বসবাস করতো একদল বিশ্বাসী পুণ্যবান। তারা বললো, হে জুল-কারনাইন! এখানকার এই দুই পর্বতমালার মধ্যবর্তী প্রবেশ পথটির দিকে লক্ষ্য করুন। এই পথ দিয়ে চতুষ্পদ জন্তুর মতো হিংস্র একদল মানুষ মাঝে মাঝে এসে আমাদের উপরে আক্রমণ চালায়। তাদের দাঁত হিংস্র প্রাণীর মতো সুতীক্ষ্ণ। তারা সাপ ও বিচ্ছু ধরে খায়। ঘোড়া, গাধা ও অন্যান্য বন্য পশুকেও চিরে ফেঁড়ে খেয়ে ফেলে। তাদের বংশ বৃদ্ধি হয় অত্যন্ত দ্রুত। তাই তাদের জনসংখ্যা অত্যধিক। হে মহামান্য সম্রাট! আপনি তাদের আক্রমণ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। এই প্রবেশ পথটিতে নির্মাণ করে দিন একটি সুদৃঢ় প্রাচীর। নির্মাণ ব্যয় জোগান দিবো আমরা। জুল-কারনাইন বললেন, আমার প্রভুপালনকর্তা আমাকে দান করেছেন বিপুল বিক্রম ও অঢেল সম্পদ। সুতরাং তোমাদেরকে নির্মাণ ব্যয় নিয়ে ভাবতে হবে না। তোমরা শুধু

www.eelm.weebly.com

পাথর, লোহা ও তামা সংগ্রহের কাজে শ্রমদান কোরো। তার আগে আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু জেনে নেয়ার চেষ্টা করি। একথা বলে জুল-কারনাইন সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন। প্রবেশ করলেন ইয়াজুজ মাজুজদের এলাকায়। দেখতে পেলেন, সেখানকার মানুষ সকলেই সমমাপের। তাদের সকলের শরীরের দৈর্ঘ্য সমতল ভূমির মানুষের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক। তাদের দাঁত হিংস্র প্রাণীর মতো সরু ও ধারালো। সমস্ত শরীরে রয়েছে ঘন ও মোটা পশম। ওই পশমের মাধ্যমেই তারা শরীরকে রক্ষা করে প্রচণ্ড গরম ও তীব্র শীতের প্রভাব থেকে। তাদের কান দু'টো বৃহদাকৃতির। অত্যধিক তাপ ও শৈত্যের সময় তারা একটি কান মাটিতে বিছিয়ে দেয় এবং অন্য কান দ্বারা আবৃত করে তাদের শরীর। যেখানেই তারা সমবেত হয়, সেখানেই লিপ্ত হয়ে পড়ে যৌনকর্মে। এসকল কিছু দেখে জুল-কারনাইন ফিরে এলেন এবং সেখানে সমবেত জনতাকে বললেন, এবার শুরু করতে হবে প্রাচীর নির্মাণের কাজ। প্রথমে মাটি খনন করতে হবে পানির স্তর পর্যন্ত। তারপর ওই বিশাল ও গভীর গহ্বর পূরণ করে দিতে হবে পাথরের টুকরা দিয়ে। তারপর ওই ভিত্তির উপর বিগলিত তামা ও অন্যান্য মালমসলা দিয়ে নির্মাণ করতে হবে সুদৃশ্য, সুগঠিত ও সুদীর্ঘ প্রাচীর। জুল-কারনাইনের পরিকল্পনা অনুসারে এক সময় শেষ হলো প্রাচীর নির্মাণের কাজ। প্রাচীরটি দেখে মনে হতে লাগলো, যেনো আর একটি দুর্ভেদ্য পর্বত জেগে উঠেছে মৃত্তিকাভ্যন্তর থেকে। বায়যাবী লিখেছেন, বর্ণিত কাহিনীটির মধ্যে রয়েছে বনী ইসরাইলদের অতিরঞ্জন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা কি তোমাকে কর দিবো এই শর্তে যে, তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দিবে?' একথার অর্থ— সেখানকার অত্যাচারিত জনসাধারণ এইমর্মে আবেদন জানালো যে, হে মহামান্য জুল-কারনাইন! ইয়াজুজ-মাজুজদের প্রবেশ পথে একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্মাণ করে আমাদেরকে রক্ষা করুন। এর জন্য আমরা সকলে কর দিতে প্রস্তুত। আপনি সেই কর দয়া করে গ্রহণ করবেন কি?

এখানে 'খারাজ' অর্থ কর, পারিশ্রমিক, বিনিময়। 'খারাজ' ও 'খিরাজ' শব্দ দু'টো সমার্থক। আবু ওমর বলেছেন, 'খারাজ' আদায় করা অত্যাবশ্যক। আর 'খারাজ' বলে ওই বস্তু বা সম্পদকে যা দেয়া হয় মনোরঞ্জনার্থে। কেউ কেউ বলেছেন, 'খারাজ' অর্থ ভূমি কর। আর 'খিরাজ' হচ্ছে ব্যক্তিগত কর বা চাঁদা। আরববাসীরা বলেন, 'আদ্দিরাজা র'সাকা ওয়া খিরাজা মাদীনাতাক (ব্যক্তিগত কর ও পৌরকর আদায় কর)। কেউ কেউ বলেছেন, যে কর ভূমির উপর আরোপ করা অনিবার্য হয় অথবা যা আদায় করা হয় ব্যক্তিগতভাবে, তাকে বলে খিরাজ। আর 'খারজান' হচ্ছে ধাতুমূল।

'সাদদান' অর্থ মজবুত বা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। এখানে অর্থ হবে— ওই প্রাচীর যা ভেদ করা ইয়াজুজ-মাজুজদের জন্য হবে অসম্ভব।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'সে বললো আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তা-ই উৎকৃষ্ট; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য করো, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে এক মজবুত প্রাচীর গড়ে দিবো।'

এখনে 'মা মাক্কান্নী' কথাটির মাধ্যমে সম্রাট জুল-কারনাইন এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে— আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন বিপুল বৈভব। সুতরাং বৈভবগত কোনো সমস্যা এখানে নেই। আর আমাকে প্রদত্ত আল্লাহ্র করুণাসঞ্জাত বিত্তবৈভব নিশ্চয় তোমাদের পরিশ্রমার্জিত বৈভব অপেক্ষা উত্তম। 'কুওয়াতু' অর্থ এখানে শ্রম, শ্রমিক অথবা শ্রমোপকরণ।

পরের আয়াতে (৯৬) বলা হয়েছে— 'তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ড সমূহ আনয়ন করো।' এখনে 'যুবারাল হাদীদ' অর্থ লৌহপিণ্ড বা বড় বড় লোহার টুকরা। 'যুবুর' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'যুবরাতুন'। উল্লেখ্য যে, সম্রাটের নির্দেশানুসারে লোকেরা সেখানে এনে জমা করলো বিপুল সংখ্যক লৌহপিণ্ড, কয়লা ও কাঠ। এরপর তাঁর নির্দেশে সেগুলোকে সন্নিবেশিত করা হলো ধাপে ধাপে স্তরে স্তরে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকস্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহ স্তুপ দুই পর্বতের সমান হলো তখন সে বললো, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাকো। যখন তা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হলো তখন সে বললো, তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন করো, আমি তা ঢেলে দেই নির্মীয়মাণ প্রাচীরের উপর।'

'সদাফাইনি' অর্থ দুই প্রান্তর। 'সদ্ফুন' অর্থ ঝুঁকে যাওয়া বা আকৃষ্ট হওয়া। 'তাসাদিফ' অর্থ সামনাসামনি হওয়া। 'উফরিগ' অর্থ ফেলে দেওয়া, বইয়ে দেওয়া, ভাগ করে দেয়া বা ঢেলে দেয়া। 'ক্বিত্বরান' অর্থ গলিত তামা। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— তারপর যখন লৌহপিণ্ডের মাধ্যমে নির্মিত প্রাকার দুই প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হলো, তখন জুল-কারনাইন বললেন, এবার তোমরা এর উপরে কাষ্ঠখণ্ড একত্র করে সেগুলোতে আগুন জালিয়ে দাও এবং বিভিন্ন স্থানে হাঁপর স্থাপন করে সেগুলোতে সকলে মিলে দম দিতে থাকো। সকলে তাই করলো। বিশাল লোহার দেয়ালটি হয়ে গেলো আগুনের মতো লাল ও উত্তপ্ত। তখন তিনি বললেন, এবার তোমরা নিয়ে এসো বিগলিত তাম্র। আর ওই তরল তাম্রকে ঢেলে দাও প্রাচীরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত, যেভাবে আমি ঢেলে দিতে বলি। উল্লেখ্য যে, এভাবে সম্রাট জুল-কারনাইনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নির্মিত হলো একটি বিশালাকায় পর্বত-সদৃশ সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর। বাগবী লিখেছেন প্রাচীরটির উচ্চতা ছিলো একশত হাত, প্রশস্ততা পঞ্চাশ হাত এবং দৈর্ঘ্য এক ফারসাখ।

www.eelm.weebly.com

فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ۝ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ۝ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ۝ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ۝ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا

❒ ইহার পর ইয়াজুজ্ মাজুজ্ উহা অতিক্রম করিতে পারিল না, বা ভেদ করিতে পারিল না।

❒ জুল্-কারনাইন বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে তখন তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।'

❒ সেই দিন আমি উহাদিগকে ছাড়িয়া দিব দলের পর দলে, তরংগের আকারে এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। অতঃপর আমি উহাদিগের সকলকেই একত্রিত করিব।

❒ এবং সেই দিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করিব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের নিকট,

❒ যাহাদিগের চক্ষু ছিল অন্ধ আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যাহারা শুনিতেও ছিল অপারগ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই অনতিক্রম্য প্রাচীরের ওপারে ইয়াজুজ-মাজুজেরা চিরদিনের জন্য আটকা পড়ে গেলো। ওই প্রাচীর পার হওয়া অথবা ভেদ করার সাধ্য আর তাদের হলো না।

পরের আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'জুলকারনাইন বললো, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি প্রাচীরটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন।' একথার অর্থ— সম্রাট জুলকারনাইন তখন উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বললেন, এটা হচ্ছে আমার প্রভুপালনকর্তার একটি অনবদ্য অনুগ্রহ। তাঁর বিশেষ প্রশ্রয়, অনুমোদন ও সাহায্যের দ্বারাই আজ সফলভাবে সমাপ্ত হলো এই মহত্তর নির্মাণ কর্মটি। সুতরাং তাঁর প্রতি প্রকাশ করো আন্তরিক

www.eelm.weebly.com

কৃতজ্ঞতা। আর একটি বিষয়ও ভালো করে জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন, ততদিন এই প্রাচীর অটুট থাকবে। তারপর তাঁর প্রতিশ্রুত সময়ে একদিন অবশ্যই ভেঙে পড়বে এই সুদৃঢ় প্রতিবন্ধকটি। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তখন এই ভেঙে পড়া প্রাচীরটি অতিক্রম করে সমভূমিতে নেমে আসবে ইয়াজুজ মাজুজের সংহারপ্রবণ বিশাল জনস্রোত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।' একথার অর্থ— জুলকারনাইন আরো বললেন, একথাও ভালো করে জেনে নাও হে নির্মাণসফল ও আত্মতৃপ্ত জনতা! কিয়ামত আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত একটি বিষয়। সুতরাং যথাসময়ে তা সংঘটিত হবেই। কারণ তাঁর প্রতিশ্রুতি চিরায়ত, চিরন্তন।

বাগবী লিখেছেন, জুলকারনাইনের কর্মমুখর জীবনে এরপর নেমে এলো যবনিকা। রহস্যময় এক অন্ধকারে প্রবেশ করে পুনরায় ফিরে এলেন তিনি। এরপর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন জুর নামক এক শহরে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, জুলকারনাইনের বয়স তখন হয়েছিলো ত্রিশ বছরের কিছু বেশী।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে সুপরিণত সূত্রে বাগবী আরো লিখেছেন, ইয়াজুজ মাজুজেরা প্রতিদিন ওই প্রাচীরটিকে কেটে ফেলতে চেষ্টা করে। আঘাতে আঘাতে খোদাই করে ফেলে প্রাচীরের বিভিন্ন অংশ। দিনান্তে তাদের নেতা তাদের পরিশ্রান্ত জনতাকে বলে এবার ক্ষান্ত হও। বাকী কাজটুকু আমরা সেরে ফেলবো আগামীকাল। পরদিন তারা এসে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে প্রাচীরটি পূর্ববৎ নিটোল ও অটল। তবুও তারা পূর্ণোদ্দমে শুরু করে প্রাচীর ভঙ্গের কাজ। সন্ধ্যায় আবার ফিরে যায়। পরদিন এসে দেখে প্রাচীরটি আগের মতোই নিচ্ছিদ্র ও নিখুঁত। প্রতিদিনই এরকম হতে থাকে। কিন্তু তাদের চেষ্টাও চলতে থাকে বিরামহীনভাবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী এক সময় ফিরে যাবার আগে তাদের সর্দার বলবে, আজ এ পর্যন্তই থাক, ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল বাকী কাজটুকু সমাপ্ত করবো। ইনশাআল্লাহ্ বলার কারণে পরদিন এসে তারা দেখবে তারা যেভাবে আগের দিন প্রাচীরটিকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রেখে গিয়েছিলো, সেভাবেই প্রাচীরটি দাঁড়িয়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে উল্লসিত হয়ে পড়বে তারা। এভাবে উপর্যুপরি প্রচেষ্টা তাদের সফল হবে। এক সময় প্রাচীরটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে তারা দলে দলে নেমে আসবে সমভূমিতে। নিঃশেষ করে ফেলবে সকল জলাশয়, ঝর্ণা, হ্রদ, কূপ ও নদীর পানি। তাদের ভয়ে মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করবে অর্গলবদ্ধ গৃহে অথবা দুর্গে। আসমানের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে তারা। আল্লাহ্ তাদের তীরে রক্ত মাখিয়ে দিবেন। রক্তমাখা পতিত তীর দেখে তারা বলবে, আমরা এখন পৃথিবীবাসী ও আকাশবাসী সকলের উপরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি। আল্লাহ্ তখন তাদের ঘাড়ের উপরে সৃষ্টি করে দিবেন যন্ত্রণা ও মৃত্যুপ্রদায়ক এক ধরনের ফোঁড়া। যখন ফোঁড়াগুলো পরিণত হবে, তখনই ঘটবে তাদের মৃত্যু।

www.eelm.weebly.com

হজরত নাওয়াস ইবনে সামআন থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তখন সকাল। রসুল স. শুরু করলেন দাজ্জালের আলোচনা। তাঁর কণ্ঠস্বর হয়ে যাচ্ছিলো ক্রমশঃ নিম্নগামী। বার বার তিনি প্রস্থানোদ্যত হতে চেষ্টা করছিলেন। তাঁর আচরণ দেখে আমাদের মনে হলো দাজ্জাল হয়তো অতি নিকটে কোথাও বিদ্যমান। আমরা আতংকিত হলাম। তিনি স. বললেন, কী হলো তোমাদের? আমরা বললাম হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমরা দাজ্জালের আলোচনা শুনলাম। সবিস্ময়ে ও সভয়ে লক্ষ্য করলাম একবার আপনার কণ্ঠস্বর পৌঁছে যাচ্ছে উচ্চ গ্রামে, একবার আপনি হয়ে পড়ছেন নিম্নকণ্ঠ। আপনার এমতো অবস্থা দেখে আমাদের মনে হচ্ছে দাজ্জাল হয়তো আশে পাশে কোথাও রয়েছে। রসুল স. বললেন, আরো একটি বিষয় রয়েছে, যা দাজ্জাল অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ। দাজ্জাল যদি আমার উপস্থিতিতে আবির্ভূত হয়, তবে আমি স্বয়ং তার মোকাবিলা করবো। আর আমি চলে যাওয়ার পর যদি সে আসে, তবে তোমাদেরকেই নিতে হবে মোকাবিলার দায়িত্ব। অবশ্য আল্লাহ্ তখন আমার পক্ষ থেকেই প্রকৃত বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা করবেন। দাজ্জাল হবে অবিন্যস্ত কেশবিশিষ্ট এক যুবক। তার এক চোখ হবে বিস্ফোরিত। মনে হবে চক্ষুটি বুঝি এই মুহূর্তে বেরিয়ে আসবে কোটর থেকে। আমার মতে আবদুল উজ্জা বিন কাতানের সঙ্গে রয়েছে তার অবয়বগত সাদৃশ্য। তার সঙ্গে সাক্ষাত ঘটলে পাঠ করে নিতে হবে সুরা কাহফের প্রথম দিককার কয়েকটি আয়াত। তার আবির্ভাব স্থল হবে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তীতে। তার ডান ও বামের অনেক কিছুই সে ধ্বংস করে ফেলতে থাকবে। হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! বিশ্বাসের উপরে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্যকর্ম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! পৃথিবীতে সে কতদিন থাকবে? তিনি স. বললেন, চল্লিশ দিন। কিন্তু প্রথম দিনটি হবে এক বৎসরের সমান। পরের দিনটি হবে এক মাসের সমান। তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের সমান। বাকী দিনগুলো হবে এখনকার দিনগুলোর মতো। আমরা বললাম, বছরের সমান দিনটিতে কি আমরা এখনকার একদিনের মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বো? তিনি স. বললেন, না। অনুমানে ওয়াক্ত নির্ধারণ করে নিয়ে নিয়মিত সব ওয়াক্তের নামাজ পড়তে হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র বাণীপ্রচারক! সে চলাচল করবে কীভাবে? তিনি স. বললেন, বৃষ্টির সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় যেভাবে চলে। সে যাকে দেখবে, তাকে তার উপর ইমান আনতে বলবে। এক জনপদের লোকেরা তাকে মানবে। সে মেঘকে বলবে, বৃষ্টি বর্ষণ করো। মেঘ তখন বৃষ্টি বর্ষণ করবে। মাটিকে হুকুম দিবে, উদ্ভিদের অঙ্কুরোদগম ঘটাও। মাটিও তার নির্দেশ পালন করবে। তার উপর যারা ইমান আনবে তাদের উটগুলো চারণভূমি থেকে ফিরে আসবে পরিতৃপ্ত অবস্থায়। উটগুলোর থাকবে উঁচু কুঁজ। উটনীগুলোর ওলান হবে

www.eelm.weebly.com

দুধে পরিপূর্ণ। এরপর সে গমন করবে আর একটি জনপদে। কিন্তু সেখানকার লোকেরা তার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করবে। কিন্তু দাজ্জাল সেখান থেকে চলে যাবার পর তারা হবে দুর্ভিক্ষকবলিত ও নিঃস্ব। এরপর সে ফিরে আসবে সেই উৎসন্ন জনপদে। সেখানে গিয়ে সে মাটিকে হুকুম দিবে, তোমার অভ্যন্তরের সকল সম্পদ বের করে দাও। মাটি তার হুকুম তামিল করবে। তখন সে ডাকবে এক যুবককে। তারপর তাকে দ্বিখণ্ডিত করে খণ্ড দু'টোকে রেখে দিবে তীরের দূরত্বের দুই প্রান্তে। তারপর সে ওই যুবকের নাম ধরে ডাকবে। তৎক্ষণাৎ তার শরীরের খণ্ড দু'টো একত্র হবে এবং সে হয়ে যাবে জীবিত। এরপর আকাশ থেকে অবতরণ করবেন ঈসা ইবনে মরিয়ম। দামেস্কের পূর্বপ্রান্তে শাদা মিনারের উপরে দুই ফেরেশতার কাঁধে ভর করে অবনত মস্তকে নেমে আসবেন তিনি। তাঁর শরীরের স্বেদবিন্দু চমকাতে থাকবে মোতির মতো। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে তাঁর নিঃশ্বাসের সৌরভ। তিনি নেমেই দাজ্জালকে খুঁজতে থাকবেন। খুঁজতে খুঁজতে তাকে পেয়ে যাবেন ফিলিস্তিনের লুদ নামক স্থানে এবং তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করে ফেলবেন। তখন দাজ্জালের বিশৃংখলা থেকে মুক্ত হবে মানবতা। এভাবে তিনি দূর করে দিবেন মানুষের বিষণ্নতা ও মলিনতা। সকলকে সুসংবাদ দান করবেন জান্নাতের। ওই সময় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁকে জানানো হবে জুলকারনাইনের প্রাচীরের মাধ্যমে এতদিন যাদেরকে আটকে রাখা হয়েছিলো, তারা প্রাচীর ভেঙে প্রবল বেগে মানুষের জনপদ সমূহের দিকে ছুটে আসছে। তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করো। ঈসা ইবনে মরিয়ম তাই করবেন। ইত্যবসরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে ইয়াজুজ মাজুজের দল। তাদের অগ্রগামী দলটি নিঃশেষে পান করে ফেলবে মৃত সাগরের পানি। পশ্চাতবর্তী দল সেখানে পৌঁছে শুষ্ক সাগর দেখে মন্তব্য করবে, মনে হয় এখানে আগে পানি ছিলো। ওদিকে হজরত ঈসা তাঁর পর্বতাশ্রয়ের জীবনে খাদ্য সংকটে পতিত হবেন। খাদ্য সামগ্রী হয়ে পড়বে মহার্ঘ। তখন স্বর্ণমুদ্রার চেয়েও অধিক মূল্যবান হবে গরু বা ষাঁড়ের রান। ইয়াজুজ-মাজুজের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে তিনি তখন তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা জানাবেন। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে। আল্লাহ্ ইয়াজুজ-মাজুজের ঘাড়ে সৃষ্টি করে দিবেন অসংখ্য কীটবিশিষ্ট এক ধরনের ঘা। ওই ঘায়ের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে মৃত্যুমুখে পতিত হবে সকল ইয়াজুজ-মাজুজ। ঈসা রূহুল্লাহ্ তখন নেমে আসবেন তুর পর্বতমালা থেকে। দেখবেন, সারা পৃথিবী আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজদের মরদেহে। তিনি তখন তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে আল্লাহ্‌র সাহায্যার্থী হবেন। প্রার্থনা করবেন, হে আমাদের আল্লাহ্! উটের মতো গলদেশবিশিষ্ট বৃহদাকৃতির অসংখ্য পাখি প্রেরণ করো। তাঁর ওই প্রার্থনাও কবুল করা হবে।

www.eelm.weebly.com

ত্রাণকর্মীরূপে ওই পাখিরা ইয়াজুজ-মাজুজদের লাশগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে ফেলে দিবে অজ্ঞাত স্থানে। তারপর আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ানুসারে শুরু হবে তুমুল বৃষ্টি। কোনো তাঁবু বা গৃহের ছাদই সে বৃষ্টিকে ঠেকাতে পারবে না। বৃষ্টি পৃথিবীর সকল স্থান ধুয়ে মুছে সাফ করে দিবে। পৃথিবীতে নতুন করে দেখা দিবে ফল ও ফসলের বিপুল সমারোহ। পৃথিবীর সকল উৎপাদন হবে বরকতময়। ফল-মূল এত বড় হবে যে একটি আনার খাদ্যের প্রয়োজন মিটাতে পারবে একটি গোত্রের এবং তার খোসা ছায়াদান করতে পারবে একটি দলকে। বহু মানুষ পান করে পরিতৃপ্ত হতে পারবে একটি উটের দুধ। এভাবে একটি গাভীর দুধ পরিতৃপ্ত করতে পারবে একটি গোত্রকে এবং একটি ছাগলের দুধ পরিতৃপ্ত করতে পারবে একটি শাখা গোত্রকে। কিছুকাল কেটে যাবে এভাবে। তারপর আল্লাহ্ প্রবাহিত করে দিবেন এক প্রকার সুবাসিত বাতাস। ওই বাতাস স্পর্শ করবে প্রত্যেকের বুকের পাঁজর। রূহে ওই বাতাসের আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে পরলোকগমন করবে মুমিনেরা। এভাবে সমস্ত পৃথিবী হয়ে যাবে মুমিনশূন্য। বেঁচে থাকবে কেবল কাফেরেরা। তারা গাধার মতো চিৎকার করবে এবং নিজেদের মধ্যে শুরু করবে বিরতিহীন যুদ্ধ। এর কিছুদিন পরেই শুরু হবে মহাপ্রলয়।

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, পানিবিহীন মৃত সাগরের পাড়ে এসে ইয়াজুজ-মাজুজদের পশ্চাতবর্তী দলটি বলবে, এখানে হয়তো কখনো পানির অস্তিত্ব ছিলো। এরপর তারা পৌঁছবে খামর পর্যন্ত। বাইতুল মাকদিসের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম খামর। সেখানে পৌঁছে তারা বলবে, আমরা তো পৃথিবীবাসীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। এসো, এবার আমরা আকাশবাসীদেরকে হত্যা করি। একথা বলেই তারা আকাশের দিকে তাদের ছোট্ট ছোট্ট তীর নিক্ষেপ করতে থাকবে। আল্লাহ্ তাদের তীরগুলোকে রক্তরঞ্জিত করে দিবেন। মাটিতে পতিত রক্তরঞ্জিত তীরগুলো দেখে তারা খুব খুশি হয়ে যাবে।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, বিশাল আকৃতির পক্ষিকুল ইয়াজুজ-মাজুজদের লাশগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করবে বিভিন্ন গহ্বর ও গুহায়। মুসলমানেরা তাদের পরিত্যক্ত তীর, তুন ও ধনুকগুলো জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করবে সাত বছর ধরে। হাদিসটি বর্ণনার পর বাগবী লিখেছেন, ইয়াজুজ-মাজুজ সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছে নিঃশেষে পান করে ফেলবে সাগরের সকল পানি ও খেয়ে ফেলবে সকল প্রাণী। গাছ, কাঠ, মানুষ সকলকেই খেয়ে ফেলবে তারা। কিন্তু তারা মক্কা মদীনা ও বাইতুল মাকদিসে পৌঁছতে পারবে না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইয়াজুজ-মাজুজ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর পুনরায় পালন করা যাবে হজ ও ওমরা।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৯৯) বলা হয়েছে— 'সেইদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিবো দলের পর দলে তরঙ্গের আকারে।' কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ইয়াজুজ-মাজুজদের প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসার সময়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে, তারা ওই প্রাচীর ভেঙে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মতো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। সংখ্যায় অসংখ্য বলেই তারা বিশৃংখলভাবে একে অপরকে ঠেলে ফেলে অগ্রসর হতে থাকবে সামনের দিকে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এরকম ঘটনা ঘটবে কবর থেকে পুনরুত্থানের সময়ও। অর্থাৎ তখন সকল কবরবাসী তরঙ্গের আকারে পুনরুত্থিত হবে। জ্বিনেরাও থাকবে ওই মহা তরঙ্গের মধ্যে। পরবর্তী বাক্যটির কারণেই এরকম তাফসীরের অবকাশ বিদ্যমান। এরপর বলা হয়েছে— 'এবং শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্রিত করবো।' একথার অর্থ— ইসরাফিল ফেরেশতার দ্বিতীয় ফুৎকারের পর সকল সমাধি বিদীর্ণ করে উত্থিত হবে সকল মানুষ। আমি তখন তাদেরকে হিসাব গ্রহণের নিমিত্তে সমবেত করবো সমতল হাশর প্রান্তরে।

এর পরের আয়াতে (১০০) বলা হয়েছে— 'এবং সেই দিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করবো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট।

এর পরের আয়াতে (১০১)বলা হয়েছে— 'যাদের চক্ষু ছিলো অন্ধ আমার নিদর্শনের প্রতি।' এখানে 'গিত্বআন' শব্দটির অর্থ কোনো কিছুকে আচ্ছন্নকারী বা আবৃতকারী, অন্তরাল। আর এখানে 'জিকরি' অর্থ ওই সকল নিদর্শন যা বিবেচিত হয় আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও গুণাবলীর প্রমাণরূপে। অর্থাৎ যাদের চোখ ছিলো ওই সকল প্রমাণ দর্শন থেকে অন্ধ— মূর্খতা, বিরূপ মনোভাব ও তাচ্ছিল্যপ্রবণতা দ্বারা আবৃত। এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যারা শুনতেও ছিলো অপারগ।' একথার অর্থ— এবং যাদের শ্রুতি ছিলো সত্য উচ্চারণ ও সত্যের আহ্বান শুনতে অনভ্যস্ত ও অক্ষম। এভাবে পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— সত্যদর্শন ও সত্যশ্রবণ থেকে যাদের চক্ষু ও কর্ণ অন্ধ ও বধির, সেই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সামনে মহাবিচারের দিবসে আমি উপস্থিত করবো জ্বলন্ত জাহান্নামকে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্তায়ালাই রসুল স. এর দুশমনদের ললাটে লিখে দিয়েছেন চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্য। তাই তারা রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন। তাদের মাবদায়ে তা'য়ুন (সূচনা স্থল) ছিলো আল্লাহ্র গুণবাচক নাম 'আলমুদ্বিল্লু' (পথভ্রষ্টকারী)। সুতরাং সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাই তাদের হেদায়েত প্রাপ্তি ছিলো অসম্ভব। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ হচ্ছে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর প্রতিবিম্ব অথবা প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব। সুতরাং যে

www.eelm.weebly.com

তাঁর সূচনালগ্নে আল্লাহ্‌র 'আলহাদী' (হেদায়েত দানকারী) নামের প্রতিবিম্ব ধারণ করেছে, সেই পেয়েছে হেদায়েত। আর যে তার উৎসলগ্নে ধারণ করেছে আল্লাহ্‌র 'আল মুদ্বিল্লু' (গোমরাহ্‌কারী) নামের প্রতিচ্ছায়া, সে অবশ্যই হয়েছে পথভ্রষ্ট। সুতরাং প্রথমোক্ত ব্যক্তিবর্গের যেমন পথভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব, তেমনি শেষোক্ত ব্যক্তিদের পথপ্রাপ্ত হওয়াও একটি অসম্ভব ব্যাপার। এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে আমি বিষয়টিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছি।

সূরা কাহ্‌ফ : আয়াত ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْٓ اَوْلِيَآءَ
اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ○ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ
اَعْمَالًا ○ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ
اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ
لِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ○ ذٰلِكَ
جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِىْ وَرُسُلِىْ هُزُوًا ○

❑ যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা কি মনে করে যে তাহারা আমার পরিবর্তে আমার দাসদিগকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিবে? আমি সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদিগের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি জাহান্নাম।

❑ বল, 'আমি কি তোমাদিগকে সংবাদ দিব তাহাদিগের যাহারা কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত?

❑ উহারাই তাহারা, পার্থিব জীবনে যাহাদিগের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তাহারা মনে করে যে তাহারা সৎকর্ম করিতেছে,

❑ 'উহারাই তাহারা, যাহারা অস্বীকার করে উহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁহার সহিত উহাদিগের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে, উহাদিগের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়, সুতরাং কিয়ামতের দিন উহাদিগের কোন গুরুত্ব রাখিব না।

❑ 'জাহান্নাম, —ইহাই উহাদিগের প্রতিফল, যেহেতু উহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে গ্রহণ করিয়াছে বিদ্রূপের বিষয় স্বরূপ।'

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার দাসদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে?' এখানে 'আমার দাসদেরকে' বলে বোঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা বলে ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা অথবা যারা বলে নবী ঈসা ও নবী উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে ওই শয়তানকে, অংশীবাদীরা যার উপাসনা করে। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে অংশীবাদীদের দ্বারা পূজিত দেব-দেবীদের প্রতিমাসমূহ। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— ইন্নাল্লাজীনা তাদ্উ'না মিন্দূনিল্লাহি ইবাদুন আমছালুকুম। এখানেও 'ইবাদুন' বলে বোঝানো হয়েছে দেব-মূর্তিগুলোকে।

'আউলিয়াআ' অর্থ অভিভাবক, সুপারিশকারী অথবা শাফায়াতকারী। আলোচ্য বাক্যটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মিথ্যা ও কাল্পনিক উপাস্যসমূহের অভিভাবক ও সুপারিশকারী হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের কাল্পনিক ও মিথ্যা উপাস্যসমূহকে অভিভাবক ও বন্ধু মনে করে। কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে তাদের বন্ধু নয়, তাদের শত্রু। মহাবিচারের দিবসে তাদের পূজিত শয়তান ও দেবতারাও তাদেরকে অস্বীকার করবে এবং অভিসম্পাত বর্ষণ করবে একে অপরের প্রতি।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম।' এখানে 'নুযুলা' অর্থ অবতীর্ণ হওয়ার স্থান অথবা অতিথিগণের আহার্য। আলোচ্য বাক্যে কাফেরদের জন্য এভাবে অতিথি সৎকার বা অভ্যর্থনার কথা বলা হয়েছে উপহাসচ্ছলে। বিদ্রূপের স্বরে বলা হয়েছে— 'আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম।'

পরের আয়াতে (১০৩) বলা হয়েছে— 'বলো, আমি কি তোমাদের সংবাদ দিবো তাদের, যারা কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত?' হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত' কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে ইহুদী ও খৃষ্টানকে, যারা নিজেদেরকে সত্যাধিষ্ঠিত বলে মনে করে অথচ তাদের শরিয়ত রহিত। কেউ কেউ বলেছেন, সংসারত্যাগী খৃষ্টান পুরোহিতেরাই আলোচ্য কথাটির উদ্দেশ্য, যারা সাধনার বশবর্তী হয়ে মনে করে তারা পথপ্রাপ্ত, অথচ তারা অস্বীকার করে শেষ রসুলের শরিয়তকে। নিঃসন্দেহে তাদের সকল পরিশ্রম ও সাধনা পর্যবসিত হবে ব্যর্থতায়। হজরত আলী বলেছেন, 'বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত' বলে এখানে বোঝানো হয়েছে খারেজীদেরকে, যারা রসুল স. এর সাহাবীগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে মনে করে বৈধ। কেবল খারেজীদের

www.eelm.weebly.com

ক্ষেত্রেই হজরত আলীর উক্তিটি সীমাবদ্ধ নয়। সত্যাধিষ্ঠিত আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সকল বিরুদ্ধবাদী দল-উপদলগুলোও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন— মোতাজিলা, শিয়া (বর্তমান জামানার কাদিয়ানী, মওদুদী) ইত্যাদি।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যারা মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান দিবসে অবিশ্বাসী এবং যারা পার্থিবতার পূজক, তারাই আলোচ্য আয়াতের 'বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত' কথাটির লক্ষ্য। যেদিকে তারা দুনিয়ার কোনো লাভ দেখতে পায়, সেদিকেই তারা পরিচালিত করে তাদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ডকে। তারা মনে করে, এই পৃথিবীর পরে আর কোনো কিছুই নেই। বলে, আখেরাতের আশায় যারা পার্থিব ক্ষতিকে মেনে নেয়, তারা নির্বোধ।

এর পরের আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে— 'ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে তারা সৎকর্ম করেছে।'

এর পরের আয়াতে (১০৫) বলা হয়েছে— 'ওরাই তারা, যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের বিষয়।' একথার অর্থ— ওই সকল লোকই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, যারা পৃথিবীকে পরবর্তী পৃথিবীর উপরে প্রাধ্যান্য দেয়, উদাসীন থাকে মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান সম্পর্কে এবং অস্বীকার করে মহাবিচারের দিনের বিচারানুষ্ঠানকে। রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তিই সত্যাশ্রয়ী ও সচেতন যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে এবং যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করেছে মৃত্যু-উত্তর জীবনের জন্য। আর ওই ব্যক্তি মিথ্যাচারী ও নির্বোধ, যে স্বপ্রবৃত্তির অনুসারী এবং আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী। যথাসূত্রপরম্পরায় হজরত আনাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য যদি ইহুদী ও খৃষ্টান হয়, তবে এখানে নিদর্শনাবলী অস্বীকার করার অর্থ হবে— তারা পুনরুত্থান দিবসকে স্বীকার করলেও ওই সময়ের ঘটিতব্য বিষয়াবলী সম্পর্কে প্রদান করে মনগড়া ব্যাখ্যা। যেমন তারা মনে করে সেখানে তাদের কোনো আযাব হবে না। হলেও তা হবে কেবল চল্লিশ দিনের জন্য। নিঃসন্দেহে এমতো ধারণা ও উক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার নামান্তর।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফলে, তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়, সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের কোনো গুরুত্ব রাখবো না।' এখানে 'আ'মালুহুম' অর্থ ওই সকল কর্ম, যা তারা করেছিলো দুনিয়া অর্জনের জন্য। অথবা ওই সকল আমল, যা তারা করেছিলো পুণ্য অর্জনের জন্য। কিন্তু সেগুলোর দ্বারা তারা কোনো পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। কারণ পুণ্যকর্ম কবুল হওয়ার মূল শর্তই হচ্ছে ইমান। কিন্তু তারা ছিলো বেইমান। আর এখানকার 'ওয়ায্‌না' শব্দটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ সেদিন তাদেরকে কোনো প্রকার গুরুত্ব প্রদান করবেন না। অর্থাৎ তাদের আমলগুলোকে তিনি গণনযোগ্য বলে মনেই করবেন না।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে কোনো কোনো স্থূলকায় লোকের ওজন মশার ডানার সমানও হবে না। তার প্রমাণ হচ্ছে— 'ফালা নুক্বীমু লাহুম ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ওয়াযনা' (সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের কোনো গুরুত্ব রাখবো না)। বোখারী, মুসলিম।

আবু নাঈম ও আজরী আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে উপস্থাপন করেছেন হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস। হাদিসটি এই—রসুল স. বলেছেন, শক্তিশালী দেহবিশিষ্ট কোনো কোনো লোককে মহাবিচারের দিবসে মীযানের এক পাল্লায় রাখা হবে, কিন্তু তাদের ওজন যবের একটি দানার পরিমাণও হবে না। ফেরেশতারা এরকম সত্তর হাজার ব্যক্তিকে এক ধাক্কায় ফেলে দিবেন। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— এ ধরনের লোকের আমল ওজনই করা হবে না। বিনা বিচারেই তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে নরকাগ্নিতে। অথবা অর্থ হবে— যে আমলগুলোকে তারা আমল বলে মনে করে সে আমলগুলোকে মীযানে তুলে দিলে দেখা যাবে, সেগুলোর কোনো ওজনই নেই।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, বিচারের দিবসে মানুষ তাদের আপনাপন আমল নিয়ে হাজির হবে। কারো কারো দৃষ্টিতে তাদের পুণ্যকর্মসমূহকে মনে হবে টিহামা পাহাড় সদৃশ। কিন্তু মীযানের পাল্লায় তুলে দিলে দেখা যাবে সেগুলো ওজনহীন। ওই দৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এখানে বলা হয়েছে— সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের কোনো গুরুত্ব রাখবো না।

সুয়ূতী লিখেছেন, সেদিন ইমানদারদের আমল ওজন করা হবে, না শুধু ওজন করা হবে কাফেরদের আমল— সে সম্পর্কে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সেদিন বিচার অনুষ্ঠিত হবে কেবল ইমানদারদের, কাফেরদের নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সেদিন ওজন করা হবে সকলের আমল। প্রথমোক্ত দল তাদের অভিমতের সপক্ষে উপস্থাপন করেন আলোচ্য আয়াতের এই অংশটি 'সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের কোনো গুরুত্ব রাখবো না।' শেষোক্ত দলটির অভিমত হচ্ছে, আমল ওজন করা হবে না— আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকম নয়। বরং মর্মার্থ হবে— তাদের আমল গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে— এবং যাদের পাল্লা হাল্‌কা হবে, তারা নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে (সুরা মু'মিনুন)। কিন্তু কুরতুবীর কথা উল্লেখ করে সুয়ূতী বলেছেন, সেদিন সকলের আমল ওজন করার প্রয়োজন হবে না। যে বিশ্বাসবানেরা বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে এবং যে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বিনা

www.eelm.weebly.com

হিসাবে দোজখে প্রবেশ করবে, তাদের আমলের কোনো ওজন হবে না। হিসাবই যাদের নেই, তাদের আমলের আবার ওজন করার প্রয়োজন পড়বে কেনো? এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'পাপিষ্ঠদেরকে তাদের চেহারা দেখে চেনা যাবে'। সুয়ূতী আরো বলেছেন, এই প্রসঙ্গে কুরতুবীর অভিমতটিই যথার্থ। আর এতে করে উদ্ভূত মতবিরোধেরও নিরসন হয়। সুতরাং একথাই বলা যুক্তিযুক্ত যে, বিনা হিসাবের জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে বাদ দিয়ে অনুষ্ঠিত হবে অবশিষ্ট ইমানদার ও কাফেরদের বিচার। তাদের জন্যই প্রতিষ্ঠিত করা হবে মীযান।

আমি বলি, যে কাফেরদের কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তারা হচ্ছে মুনাফিক ও আহলে কিতাব। হিসাব-নিকাশের পূর্বে মুনাফিকেরা মিশে থাকবে ইমানদারদের দলে। আর কাফেরেরা থাকবে আলাদা অবস্থানে। মুশরিকদের সঙ্গে তারা থাকবে না।

শেষোক্ত আয়াতে (১০৬) বলা হয়েছে— 'জাহান্নাম, এটাই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসুলগণকে গ্রহণ করেছে বিদ্রূপের বিষয়স্বরূপ।' এখানে 'জালিকা' অর্থ এটাই। 'বিমা কাফারূ'(সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে) কথাটির দ্বিতীয় অক্ষর 'মা' হচ্ছে মায়ে মাসদারী (ধাতুমূল) এবং প্রথম অক্ষর 'বা' হচ্ছে কারণ প্রকাশক। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— সত্যপ্রত্যাখ্যান, আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি অস্বীকৃতি এবং আমার বার্তাবাহকগণের প্রতি বিদ্রূপ করার কারণে ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতিফল হবে জাহান্নাম। 'হুযুওয়ান' বলে ওই ব্যক্তি বা বস্তুকে যাকে বানানো হয় বিদ্রূপের পাত্র বা বিদ্রূপের বিষয়।

সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ১০৭, ১০৮

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝

❒ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য আছে ফিরদাউসের উদ্যান,

❒ সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে; ইহার পরিবর্তে অন্য স্থান কামনা করিবে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে ফেরদাউসের উদ্যান।' এখানে 'কানাত্লাহুম' কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, আল্লাহ্র পূর্ব সিদ্ধান্ত বা অঙ্গীকারানুসারে বিশ্বাসী ও

www.eelm.weebly.com

সৎকর্মপরায়ণগণের চিরস্থায়ী ঠিকানা নির্ণীত হয়েছে ফেরদাউস নামক বেহেশতের উদ্যান। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা কালে ফেরদাউস জান্নাত চেয়ো। ফেরদাউসই হচ্ছে জান্নাতের কেন্দ্র। অন্যান্য জান্নাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ওই জান্নাতের উপরে রয়েছে আল্লাহ্‌র আরশ এবং সেখান থেকে জান্নাতের স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হয়।

হজরত উবাদা ইবনে ছামেত থেকে তিরমিজি ও হাকেম এবং হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, একশতটি স্তর রয়েছে জান্নাতের। প্রতিটি স্তরের মধ্যবর্তী ব্যবধান আকাশ ও পৃথিবীর অন্তর্বর্তী দূরত্বের সমান। আর জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে ফেরদাউস। সেখান থেকেই অন্যান্য বেহেশতের দিকে প্রবাহিত হয় চারটি নহর। আর ফেরদাউসের উপরে রয়েছে আল্লাহ্‌র আরশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ সকাশে জান্নাতুল ফেরদাউস যাচ্ঞা কোরো।

হজরত ইরবাজ ইবনে সারিয়াহ্ থেকে বায্যার এবং হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে তিবরানী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, প্রার্থনার সময় তোমরা জান্নাতুল ফেরদাউসের প্রার্থী হয়ো। কারণ ওই জান্নাত সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। হজরত আবু উমামার বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসীরা আরশের আওয়াজ শুনতে পাবে (মাঝখানে কোনো অন্তরায় থাকবে না)।

বাগবী লিখেছেন, হজরত কা'ব বলেছেন জান্নাতুল ফেরদাউস অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কোনো জান্নাত নেই। ওই জান্নাতে প্রবেশ করবে সৎকর্মের নির্দেশদাতা ও অসৎকর্মের প্রতিরোধকারী। মুকাতিল বলেছেন, ফেরদাউস হচ্ছে জান্নাতের উচ্চভূমি ও সর্বাধিক কল্যাণ বিশিষ্ট। হজরত আবু মুসা থেকে আহমদ তায়ালাসি ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন— ফেরদাউসে রয়েছে চারটি বেহেশত। তন্মধ্যে দু'টি বেহেশত স্বর্ণের। সেখানকার অট্টালিকা ও অন্যান্য সামগ্রীও স্বর্ণের। বাকী দু'টো বেহেশত ও তাদের উপকরণসমূহ রৌপ্যনির্মিত।

আমি বলি, উপরে বর্ণিত হাদিস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লেখিত চারটি বেহেশতের নাম ফেরদাউস। কিন্তু একথা ঠিক নয়। কারণ তৎপূর্বে বর্ণিত হয়েছে ফেরদাউস একটি বিশেষ জান্নাতের নাম। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, চারটি জান্নাতুল ফেরদাউসের কথা এসেছে বর্ণনাকারীর ভুলে। অথবা 'ফেরদাউস' এর শাব্দিক অর্থই এখানে উদ্দেশ্য। হজরত কা'ব বলেছেন, আভিধানিক অর্থে ফেরদাউস বলা হয় দ্রাক্ষা কাননকে। ইকরামা বলেছেন, আবিসিনীয় ভাষায় ঘনবদ্ধ অরণ্যকে বলে ফেরদাউস। জুজায বলেছেন, শব্দটি রোমীয়। কিন্তু

www.eelm.weebly.com

বিদেশী ভাষার এই শব্দটি আরবীতেও ব্যবহৃত হয়। জুহাক বলেছেন, ঘন ঘন বৃক্ষবিশিষ্ট বাগানকে বলে ফেরদাউস। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফেরদাউস বলা হয় সকল কান্তিময় কাননকে। কেউ কেউ বলেছেন, বিভিন্ন রকমের ফল ও ফসলের বাগানকে বলা হয় ফেরদাউস। এর বহুবচন হচ্ছে ফারাদীস।

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত সকল অর্থই সন্নিবেশিত রয়েছে হাদিসে উল্লেখিত ফেরদাউস এর মধ্যে। সকল কিছু নিয়েই ফেরদাউস হয়েছে জান্নাতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম। আলোচ্য আয়াতে ফেরদাউসের শাব্দিক অর্থই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সাধারণভাবে সকল ইমানদার হবে ওই জান্নাতের অধিবাসী। আর ফেরদাউস যদি কোনো বিশেষ জান্নাত হয়, তবে তার অধিবাসী হবে বিশেষ শ্রেণীর ইমানদারগণ। হজরত আনাস থেকে বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর আনুরূপ্যবিহীন অলৌকিক হস্তে সৃষ্টি করেছেন ফেরদাউস। মদ্যপায়ী ও মুশরিকদের জন্য ওই জান্নাত হারাম।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হারেছ বিন নওফেল থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর আপন হাতে নির্মাণ করেছেন তিনটি বস্তুকে— ১. বাবা আদম ২. মহাগ্রন্থ তওরাত এবং ৩. ফেরদাউস। ফেরদাউস সৃষ্টির প্রাক্কালে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, আমার মর্যাদা ও মহত্ত্বের শপথ! এই জান্নাতে কখনোই প্রবেশ করবে না নিয়মিত মদ্যপায়ী ও দাইয়ুস। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! দাইয়ুস কি? তিনি স. বললেন ওই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীকে মন্দকর্মে প্ররোচিত করে।

পরের আয়াতে (১০৮) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা স্থায়ী হবে; এর পরিবর্তে অন্য স্থান কামনা করবে না।' একথার অর্থ— বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলগণ হবে জান্নাতুল ফেরদাউসের চিরস্থায়ী অধিবাসী। অন্যত্র বসবাসের চিন্তা তারা কখনোই করবে না। কারণ এর চেয়ে উত্তম স্থান আর নেই।

হাকেম প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার কুরায়েশদের প্রেরিত দূত মদীনায় গিয়ে সেখানকার ইহুদীদেরকে বললো, আমাদেরকে কিছু প্রশ্ন বলে দাও। আমরা ফিরে গিয়ে ওই প্রশ্নসমূহের মাধ্যমে মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্কে পরীক্ষা করবো। ইহুদীরা বললো, আপনারা তাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। দূত মক্কা ফিরে আসার পর কুরায়েশ গোত্র প্রধানেরা তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তখন অবতীর্ণ হলো 'তারা আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে রূহ সম্পর্কে। আপনি বলুন রূহ হচ্ছে আমার প্রতিপালকের একটি আদেশ। আর তোমরা অত্যল্প জ্ঞানই প্রদত্ত হয়েছো'। ইহুদীদের নিকটে এই সংবাদ পৌঁছলে তারা বলতে লাগলো, আমাদেরকে দেয়া হয়েছে তওরাত। তাই আমরা পেয়েছি বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার ও প্রভূত কল্যাণ। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

www.eelm.weebly.com

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۝ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۝

❐ বল, 'আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে— সাহায্যার্থে ইহার মত আরেকটি সমুদ্র আনিলেও।'

❐ বল, 'আমি তো তোমাদিগের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদিগের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। সুতরাং যে তাহার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তাহার প্রতিপালকের ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল অজ্ঞ, অবিমৃশ্য ও উন্নাসিক ইহুদীদেরকে বলে দিন, আমার প্রভুপালনকর্তার প্রজ্ঞা ও বাণী তো অনন্ত। কোনো ভাষা সে আনুরূপ্যবিহীন বচন প্রকাশ করে শেষ করতে পারে না। সমুদ্রসমূহের পানিকে যদি তোমরা কালি বানাও এবং সেই কালি দিয়ে আল্লাহ্র বাণী লিখতে শুরু করো, তবে দেখবে সে কালি নিঃশেষ হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্র বাণী অনিঃশেষ। কারণ কালি তো এক সময় শেষ হয়, কিন্তু আল্লাহ্র বাণী অন্তহীন। এভাবে যত সমুদ্রই তোমরা একত্র করো না কেনো, শেষ পর্যন্ত সবই শেষ হবে, কিন্তু আল্লাহ্র বচনবৈভব রয়ে যাবে আগের মতোই অক্ষয় ও অশেষ।

এখানে 'মাদাদ' অর্থ ওই বস্তু যার দ্বারা অন্য কোনো বস্তুর সহায়তা হয়। যেমন প্রদীপের জন্য তেল ও কলমের জন্য কালি। আর এর আভিধানিক অর্থ আধিক্য, নিরবচ্ছিন্নতা। আমি বলি, সাত সমুদ্রের পানি এবং তার সঙ্গে আরো অনেক সমুদ্রের পানি সংযোগ করে সেগুলো যদি কালিতে পরিণত করা হয় এবং সেই কালি দিয়ে আল্লাহ্র কালাম লিপিবদ্ধ করা শুরু হয় তবে দেখা যাবে এক সময় কালি নিঃশেষ হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্র বাণী রয়ে গিয়েছে পূর্ববৎ অনিঃশেষ। কেননা সসীম কখনো অসীমকে আয়ত্ত করতে পারে না।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইহুদীরা একবার রসুল স.কে বললো, আপনি তো নিজেই বলেন, আমাদেরকে প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাব দেয়া হয়েছে। আর একথা আপনার কিতাবেই লেখা আছে যে, যাকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাকে দান করা হয়েছে প্রভূত কল্যাণ। তাহলে আপনার সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্ব কোথায়? তাদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এভাবে তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র বচনরূপী কল্যাণ অন্তহীন। সকল সমুদ্রের পানি কালি বানালেও সে আনুরূপ্যবিহীন, অক্ষয় ও অনন্ত বাণীর অক্ষরায়ণ কখনো সমাপ্ত হবার নয়। সুতরাং হে অজ্ঞ ইহুদীকুল! তোমরা আল্লাহ্‌র বাণীর অনন্ত ধারাবাহিকতা ও অসীমতাকে মান্য করো। প্রসারিত করো বিশ্বাসের বলয়। তওরাতকে যেমন মান্য করছো, তেমনি মান্য করো কোরআনকে। তওরাত যাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁকে যেমন বিশ্বাস করেছো, তেমনি বিশ্বাস করো তাঁকে, যাঁর উপরে অবতীর্ণ হয়েছে কোরআন। এ পথেই রয়েছে প্রকৃত ও প্রভূত কল্যাণ। সকল দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের অবসান।

পরের আয়াতে (১১০) বলা হয়েছে— 'বলো, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ধ্বনিত হয়েছে বিশ্বাসের মূল বাণী এবং নবী রসুলগণের প্রকৃত মর্যাদার কথা। নবী রসুলগণ একই সঙ্গে মানুষ ও নবী। কারণ তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ হয় ওহী বা প্রত্যাদেশ। এখানেও তেমনি প্রত্যাদেশে বলা হয়েছে, হে আমার রসুল! আপনি পৃথিবীবাসীদের নিকটে আপনার প্রকৃত পরিচয় উন্মোচন করুন এভাবে— হে মনুষ্য সমাজ! উত্তমরূপে অবগত হও যে, আমিও তোমাদের মতো মনুষ্য সম্প্রদায়ভূত। কিন্তু আমাকে বিশেষায়িত করা হয়েছে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। সেই নিঃসন্দিগ্ধ নির্দেশানুসারেই আমি করে চলেছি সত্যের প্রচার, যার মূল মর্ম হচ্ছে তোমাদের ও আমার আল্লাহ্ এক, একক, অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য ও আনুরূপ্যবিহীন। তাঁর সত্তা, গুণাবলী, কার্যাবলী কোনো কিছুতেই কারো কোনো প্রকার অংশীদারিত্ব নেই। ফলকথা, রসুল স.কে বিনয় নম্রতা শিক্ষা দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

আমি বলি, আলোচ্য নির্দেশনাটির মাধ্যমে একটি বৃহৎ বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে, যে বিশৃঙ্খলার মধ্যে এখনো নিমজ্জিত রয়েছে অজ্ঞ, অবিবেচক ও উন্নাসিক খৃষ্টানেরা। হজরত ঈসা জন্মান্ধকে দৃষ্টি দান করতেন। কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করতেন। মৃতকেও করতেন পুনর্জীবিত। তাঁর এ সফল অলৌকিকত্ব দেখে খৃষ্টানেরা হয়ে গেলো বিপথগামী। কেউ তাঁকে বললো আল্লাহ্‌র পুত্র। কেউ বললো তিনি আল্লাহ্‌র অংশ। শেষতম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.কেও আল্লাহ্ দান করেছেন অনেক অলৌকিকত্ব। এতে করে অতি মুগ্ধ ও অপরিণামদর্শী

www.eelm.weebly.com

অনেকের স্খলনের সম্ভাবনাও ছিলো প্রচুর। তাই আল্লাহ্ দয়া করে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে সে সম্ভাবনার মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন। তাঁর প্রিয়তম রসুলকে বলতে বলেছেন— বলুন, হে আমার প্রিয়ভাজন বচনবাহক! হে জনতা! শোনো আমি কিন্তু মানুষ। তবে বিশিষ্ট মানুষ। প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই আমাকে করা হয়েছে অসাধারণ ও অগ্রণী। আর এই সত্যটি প্রচারের আদেশ আমাকে দেয়া হয়েছে যে, বিশ্বসমূহের পালনকর্তা আল্লাহ্ এক। তাঁর কোনো শরীক নেই।

সবশেষে বলা হয়েছে— 'সুতরাং যে আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেনো সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।'

এখানে 'ইয়ারজু' অর্থ আল্লাহ্ সকাশে যেতে যে-ভীত হয় এবং যে চায় তাঁর দীদার ও সওয়াব। বাগবী লিখেছেন, 'রিজা' অর্থ ভয় ও আশা দু'টোই। জনৈক কবি তাঁর এক কবিতায় শব্দটিকে দু'বার, দুই অর্থে উল্লেখ করেছেন। যেমন—

ফালা কুল্লা মা তারজু মিনাল খইরি কায়িনুন
ওয়ালা কুললু মা তারজু মিনাশ্শাররি ওয়াক্বি'

অর্থঃ আকাংখিত কল্যাণ পরিপূরিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, আবার এ বিষয়েও তুমি নিশ্চিত নও যে, তুমি যা আশংকা করছো, তা বাস্তবায়িত হবেই।

'আমালান সলিহান' অর্থ সে যেনো সৎকর্ম করে। 'ওয়ালা ইউশরিক' অর্থ তার প্রভুপালকের ইবাদতে যেনো সে অন্য কাউকে শরীক না করে। অর্থাৎ সে যেনো ইবাদত না করে জনপ্রদর্শন ও জনমনোরঞ্জনের জন্য। আল্লাহ্র সন্তোষার্থেই যেনো সম্পাদিত হয় তার ইবাদতসমূহ।

ইবনে আবীদ্ দুন্ইয়া তাঁর কিতাবুল ইখলাসে এবং ইবনে আবী হাতেম তাঁর তাউসে লিখেছেন, রসুল স. এর কাছে এক ব্যক্তি একবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমি আল্লাহ্র তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই হজ করি। সাথে সাথে আবার এ খেয়ালও করি যে, আমার এই আমল সকলে দেখুক। রসুল স. নিশ্চুপ রইলেন। তখন অবতীর্ণ হলো— 'সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেনো সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।' হাদিসটি অপরিণত বা অবিন্যস্ত (মুরসাল) সূত্রসম্বলিত। হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে বর্ণনাটিকে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি বলে মন্তব্য করেছেন এবং সূত্রবিচার করেছেন বোখারী ও মুসলিমের সূত্রানুসারে।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, এক মুসলমান জেহাদ করতো, সাথে সাথে এটাও পছন্দ করতো যে, মানুষ তার সাহস ও আত্মত্যাগ দেখুক। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতাংশটি।

www.eelm.weebly.com

ইবনে আসাকের ও আবু নাঈমের বর্ণনায় কালাবীর মাধ্যমে আবু সালেহ সূত্রে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, জুনদুব বিন জুহায়ের নামাজ, রোজা, ও সদকা-খয়রাত সবই করতেন। লোকেরা তাঁর আমলগুলো সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি তা শুনে খুশী হতেন খুব। আমলের পরিমাণও দিতেন বাড়িয়ে। তাঁর সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

একটি প্রশ্নঃ ১. হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একবার আমি রসুল স.কে বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! একবার নামাজ পাঠকালে এক লোকের আগমন ঘটলো। আমার অন্তর তখন এ কারণে আনন্দিত হলো যে, সে আমার নামাজ দেখেছে। রসুল স. বললেন, হে আবু হোরায়রা! তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। একগুণ গোপনীয়তার জন্য আর একগুণ প্রকাশ হয়ে যাওয়ার জন্য। তিরমিজি। ২. হজরত আবু জর গিফারী থেকে মুসলিম উল্লেখ করেছেন, রসুল স.কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! যদি কোনো লোক পুণ্যকর্ম করে, আর লোকেরা তার প্রশংসাও করে, তবে কি তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে। তিনি স. বললেন, এটা তো বিশ্বাসীগণের জন্য পার্থিব শুভসমাচার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে— এই হাদিস দু'টো কি আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়?

উত্তরঃ এক্ষেত্রে পরিপন্থী হওয়া অথবা দ্বন্দ্ব সন্দেহের অবকাশ আসলে নেই। আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে ইবাদত করতে হবে সম্পূর্ণ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। লোক দেখানো লোক-প্রশংসা কখনোই ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংমিশ্রিত করা যাবে না। করলে তা হবে শিরিকে খফি (গোপন শিরিক) বা রিয়া (অহংকার)। আর মূল উদ্দেশ্য ঠিক রাখা সত্ত্বেও যদি অন্যেরা তা দেখে ফেলে সে কাজের সুনাম বর্ণনা করে, তবে তা শিরিকে খফি হবে না। কারণ এমতো ক্ষেত্রে কারো প্রশংসা বা কারো নিকট থেকে কিছু প্রাপ্তির আশা মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়নি। ইবাদত সম্পাদিত হয়েছে বিশুদ্ধ নিয়ত সহকারেই। তাই এমতো ক্ষেত্রে সুনাম বা সুখ্যাতি হবে পার্থিব সুসংবাদ বা অতিরিক্ত পাওনা। তাই হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব— একটি গোপনীয়তার জন্য, আর একটি প্রকাশ হয়ে পড়ার জন্য। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

হজরত জুনদুব থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে শোনানোর জন্য পুণ্যকর্ম করে, আল্লাহ্ তাকে জনশ্রুতির সঙ্গেই রেখে দেন। আর যে লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করে তাকেও রেখে দেন লোকচক্ষুর সঙ্গে (তাকে ও তার আমল গ্রহণ করেন না)।

হজরত মাহমুদ বিন লবীদ থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের বিষয়ে আমি সবচেয়ে বেশী ভয় পাই ছোট শিরিককে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ছোটো শিরিক কী? তিনি স. বললেন, রিয়া

www.eelm.weebly.com

(অহংবোধ)। বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমানে এর সঙ্গে আরো উল্লেখ করেছেন, যখন আল্লাহ্ আমলের বিনিময় প্রদান করবেন, তখন তাদেরকে বলবেন, তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর জন্য তোমরা আমল করেছিলে। গিয়ে দেখো, তাদের নিকট থেকে কোনো বিনিময় পাও কিনা। হজরত আবু হোরায়রাকে একবার কিছু লোক জিজ্ঞেস করলো, ছোট শিরিক কী? তিনি বললেন, আত্মম্ভরিতা। ইবনে মারদুবিয়া হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর তারগীব ওয়াত্তারহীব গ্রন্থে।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমি শিরিক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। যে ব্যক্তি তার কোনো পুণ্য কর্মে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি তাকে ওই শরীকের সঙ্গেই রেখে দিই। ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, আমি ওই ব্যক্তির প্রতি ক্ষুব্ধ, যে শিরিক করে। আমি তাকে তার সঙ্গেই রাখি, যার সন্তোষের জন্য সে আমল করে। মুসলিম। হজরত আবু সাঈদ বিন ফুজালার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, হাশরের ময়দানে আল্লাহ্র নির্দেশে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যে ব্যক্তি তার নেক আমলের মধ্যে আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক করেছে, সে যেনো ওই শরীকের কাছে তার বিনিময় চেয়ে নেয়। আল্লাহ্ শিরিক থেকে পূর্ণরূপে পবিত্র। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, জনশ্রুত হওয়ার নিমিত্তে যে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তাকে রেখে দেন ওই জনশ্রুতির সঙ্গে। আল্লাহ্ তাকে করবেন অপমানিত, অপদস্থ ও হীন। আহমদ, বায়হাকী।

হজরত শাদ্দাদ বিন আওস বর্ণনা করেন, আমি স্বকর্ণে রসুল স.কে বলতে শুনেছি— যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করে সে শিরিক করে। যে ব্যক্তি প্রদর্শনের নিমিত্তে রোজা রাখে, সে শিরিক করে। আর যে ব্যক্তি জনগণ-প্রদর্শন নিমিত্তে দান খয়রাত করে সে শিরিক করে।

হজরত আনাস থেকে ইমাম আহমদ উল্লেখ করেছেন, মহাবিচারের দিবসে কোনো কোনো লোক অপমানজনক আমলনামা নিয়ে উপস্থিত হবে। আল্লাহ্ বলবেন, এগুলো নিক্ষেপ করো, ওগুলো কবুল করো (কিছু আমল নিক্ষেপ করো এবং কিছু আমল গ্রহণ করো)। আমল লেখক ফেরেশতারা বলবে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তোমার মহাসম্মানের শপথ! সে যা করেছে আমরা তো তা-ই লিপিবদ্ধ করেছি। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা জানো না, সে এই এই আমলগুলো করেছিলো অন্যের উদ্দেশ্যে। আমি তো গ্রহণ করি কেবল ওই আমল যা বিশুদ্ধ নিয়তে কেবল আমার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়।

www.eelm.weebly.com

তিবরানীর আল আওসাতে, ইস্পাহানীর তারগীব এবং শহর বিন আতিয়া সূত্রে বায্যার ও দারাকুতনীর বর্ণনায় এসেছে, মহাবিচারের দিন কিছু লোকের আমলনামা হবে পর্বত পরিমাণ পুণ্যে পরিপূর্ণ। আল্লাহ্ তাদেরকে একে একে বলবেন, লোকে তোমাকে নামাজী বলবে, এই উদ্দেশ্যে তুমি অমুক দিন নামাজ পড়েছিলে। আমি আল্লাহ্। আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। সকল আমল আমার পরিতোষার্থে সম্পাদিত হওয়া অত্যাবশ্যক। তারপর বলবেন, লোকে তোমাকে রোজাদার বলবে, এই উদ্দেশ্যে তুমি অমুক দিন রোজা পালন করেছিলে। আমিই আল্লাহ্। আমি ছাড়া উপাস্য কেউ নেই। আমল সমূহ আমার তুষ্টি সাধনার্থে সম্পন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এভাবে আল্লাহ্ একে একে তার সকল আমল প্রত্যাখ্যান করবেন। ফেরেশতা তাকে বলবে, তুমি তাহলে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য আমল করতে।

হজরত শাদ্দাদ বিন আওস বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ হাশর প্রান্তরে যখন সকলকে সমবেত করবেন তখন এক ঘোষক উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করবে, আল্লাহ্ বলেন, আমি শিরিক থেকে সতত পবিত্র। পৃথিবীতে যে তার পুণ্য কর্মে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার করেছে, আমি আজ তাকে যুক্ত করবো ওই অসত্য অংশীদারের সঙ্গে। আজ আমি গ্রহণ করবো কেবল তাদের কর্ম, যারা তা সম্পাদন করেছে কেবল আমারই জন্য। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইস্পাহানী।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হিসাব গ্রহণের দিন আল্লাহ্ বলবেন, যে ব্যক্তি অন্য কারো মনোরঞ্জনার্থে পুণ্যকর্ম করেছে আমি তাকে সম্পৃক্ত করবো ওই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সঙ্গেই। আরো বলবেন, অবনত হও, অসত্য অংশীদার আজ তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে সুফীসাধকগণের ব্যাখ্যাঃ 'যে তার প্রভুপালকের সাহায্য কামনা করে' অর্থ যে কামনা করে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য ও সন্দর্শন, সে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় ওই অবস্থায় যে অবস্থার কথা কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে 'ক্বাবা ক্বাওসাইনি আও আদ্না' (দুই ধনুকের জ্যা'র মতো নিকটে অথবা তদপেক্ষা আরো নিকটে)। এরকম অবস্থায় পৌঁছতে গেলে প্রথমে বিলীন বা ফানা করতে হবে তার প্রবৃত্তি। কারণ নফসের ফানা হওয়ার পরেই করা সম্ভব বিশুদ্ধ ইবাদত, যা আল্লাহ্ কর্তৃক যথাসমাদরে গৃহীত হয়। আর 'সে যেনো তার প্রভুপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' কথাটির অর্থ সে যেনো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে আন্তরিক ভালোবাসার সম্পর্ক না রাখে। এরকম অবস্থা অর্জন করতে গেলে অন্তরে জাগ্রত রাখতে হবে সার্বক্ষণিক জিকির। এই জিকির ও ভালোবাসাই বিশুদ্ধ ইবাদতের ভিত্তি।

www.eelm.weebly.com

একটি প্রশ্নঃ মানুষের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক তো নবী-আউলিয়াগণও রক্ষা করেন। তাহলে 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো সঙ্গে ভালোবাসা না রাখে' কথাটির অর্থ কী?

জবাবঃ কলবের ফানা হওয়ার পরেও শরিয়তের দায়িত্ব মানুষের স্কন্ধে থেকেই যায়। তাই বান্দার অধিকার রক্ষা করার জন্য অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না। আর আল্লাহ্র জন্যই আল্লাহ্র বান্দাগণের প্রতি মায়ামমতা ভালোবাসা রাখতে হয়। কিন্তু ভালোবাসার মূল সম্পর্ক তো আল্লাহ্র সঙ্গেই। অন্য সকল সম্পর্ক তো আনুসঙ্গিক ও দায়িত্বনির্ভর একটি ব্যাপার।

উপযোগঃ হজরত আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সুরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত যে মুখস্ত করবে, আল্লাহ্ তাকে দাজ্জালের ফেত্না থেকে রক্ষা করবেন। আহমদ, আবু দাউদ, মুসলিম, নাসাঈ। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, সুরা কাহফের প্রথম তিন আয়াত যে নিয়মিত পড়বে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে থাকবে মুক্ত। তিনি বর্ণনাটিকে আখ্যা দিয়েছেন উত্তমসূত্রসম্বলিত। আহমদ, মুসলিম ও নাসাঈর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরা কাহফের শেষ দশটি আয়াত নিয়মিত পাঠ করবে, সে নিরাপদ থাকবে দাজ্জালের বিশৃংখলা থেকে।

হজরত আনাস থেকে সহল বিন মুয়াজ উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সুরা কাহফের প্রথম ও শেষ আয়াত যে পাঠ করবে তার আপাদমস্তক হবে জ্যোতির্ময় এবং যে সম্পূর্ণ সুরা কাহফ পাঠ করবে, তার জন্য পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত হবে নূর। বায়হাকী, ইবনে সুন্নী তাঁর আমালুল ইওম ওয়াল লাইল গ্রন্থে এবং ইমাম আহমদের মসনদে এসেছে, যে ব্যক্তি শয়নকালে সুরা কাহফ পাঠ করবে তার শয্যা থেকে মক্কা শরীফ পর্যন্ত জ্বল জ্বল করতে থাকবে একটি স্বর্ণ সদৃশ নূর। আর ওই নূরের মধ্যে ফেরেশতারা সমবেত হয়ে তার জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহ্র রহমত প্রার্থনা করতে থাকবে। ইবনে মারদুরিয়াও হাদিসটির বর্ণনাকারী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. জানিয়েছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন সুরা কাহফ পাঠ করে, পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত তার জন্য চমকাতে থাকে একটি নূর। হাকেম, বায়হাকী। বায়হাকীর শো'বুল ইমানে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে— রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন সুরা কাহফ পাঠ করে, তার নিকট থেকে কাবা শরীফ পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যায় একটি জ্বল জ্বলে নূর।

হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, এক ব্যক্তি রাতে সুরা কাহফ পাঠ করছিলো। তাই তার উপরে ছায়াপাত করেছিলো একটি নূরানী মেঘ। মেঘটি আবর্তিত হচ্ছিলো চক্রাকারে এবং ক্রমশঃ তা নেমে আসছিলো নিচে। নিকটেই

www.eelm.weebly.com

বাঁধা ছিলো একটি ঘোড়া। অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখে ঘোড়াটি চিৎকার করতে শুরু করলো। তিনি তাঁর তেলাওয়াত বন্ধ করলেন। ঘোড়াটিও নিশ্চুপ হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ থেমে পুনরায় তেলওয়াত শুরু করলেন তিনি। ঘোড়াটিও তখন চিৎকার করতে শুরু করলো। পরদিন সকালে তিনি রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বিবৃত করলেন। রসুল স. বললেন, ওই মেঘটি ছিলো প্রশান্তিপ্রদায়ক নূর (নূরে সাকিনা), যা অবতীর্ণ হয়েছিলো কোরআন তেলাওয়াতের কারণে। বোখারী, মুসলিম।

'বিহামদিহি ওয়া আওনিহি'। আল্লাহ্র সাহায্যে সুরা কাহফের তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ, ৫ই জিলহজ মঙ্গলবার ১২০২ হিজরী সনে।

সূরা মার্য়াম

সুরা মার্য়াম অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। এই সুরায় রয়েছে ৬টি রুকু ও ৯৮টি আয়াত। সম্পূর্ণ সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হলেও ৫৮ ও ৭১ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায় এবং সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে সুরা ফাতিরের পরে।

সূরা মার্য়াম ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

كٓهٰيٰعٓصٓ ○ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّآ ○ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ
نِدَآءً خَفِيًّا ○ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ
شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ○ وَاِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ
وَّرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ○ يَّرِثُنِيْ وَ
يَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ○

❑ কাফ্-হা-ইয়া-আঈন্-সদ;

❑ ইহা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁহার দাস জাকারিয়ার প্রতি,

www.eelm.weebly.com

❒ যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়াছিল নিভৃতে,

❒ সে বলিয়াছিল, 'আমার অস্থি দুর্বল হইয়াছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হইয়াছে; হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করিয়া আমি কখনও ব্যর্থকাম হই নাই।

❒ 'আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্ররা দ্বীনকে ধ্বংস করিয়া দিবে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সুতরাং তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী,

❒ যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করিবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করিবে ইয়াকুবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাহাকে করিও সন্তোষভাজন।

প্রথম আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি— কাফ হা ইয়া আঈন সদ। কোরআন মজীদের অনেক সুরার প্রথমে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি পরিদৃশ্যমান হয়। এগুলোর মর্ম রহস্যাচ্ছন্ন। আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও যারা জ্ঞানে সুগভীর (ওলামায়ে রসিখীন), তারাই কেবল এমতো বর্ণনাসমূহের রহস্য ভেদ করতে সক্ষম।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'এটা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর দাস জাকারিয়ার প্রতি।' প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লেখিত বিচ্ছিন্ন বর্ণসমূহের মর্মার্থ যদি কোরআন অথবা এই সুরা হয়, তবে তা হবে উদ্দেশ্য আর 'তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ' হবে বিধেয়। অথবা বলা যেতে পারে উদ্দেশ্য এখানে অনুক্ত এবং ওই অনুক্ত উদ্দেশ্যটি হচ্ছে হাজা (এটি)। অর্থাৎ হাজা জিকর। কিংবা বলা যেতে পারে 'তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ' কথাটি এখানে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় এখানে অনুক্ত। আর রহমত (অনুগ্রহ) কথাটি এখানে জিকরু (বিবরণ) এর কর্মপদ এবং 'তাঁর বান্দা জাকারিয়ার প্রতি' এর স্থলাভিষিক্ত।

এর পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিলো নিভৃতে।' একথার অর্থ— যখন নবী জাকারিয়া তাঁর নির্জন প্রকোষ্ঠে রাত্রিকালে গোপনে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, চুপি চুপি দোয়া করা সুন্নত। এরকম দোয়ার মধ্যে থাকে একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা।

এর পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'সে বলেছিলো, আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে'। এখানে 'ওয়াহানাল আ'জমু' অর্থ আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে। অর্থাৎ আমি এখন বার্ধক্যকবলিত ও দুর্বল। উল্লেখ্য, অস্থি হচ্ছে শরীরের ভিত্তি। তাই অস্থি দুর্বল হলে শরীরও দুর্বল হয়। 'আল আ'জমু' এখানে ইসমে জিনস (নামপদ)। 'ওয়াশ্তায়ালার্ র'সু শাইবান' অর্থ বার্ধক্যে আমার মস্তক হয়েছে শুভ্রোজ্জ্বল, শ্বেতশুভ্রপক্ককেশবিশিষ্ট।

www.eelm.weebly.com

হজরত জাকারিয়ার বয়স তখন কতো হয়েছিলো, সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক বলেছেন, ষাট বছর। ইবনে আবী হাতেম ও সুফিয়ান সওরী বলেছেন, সত্তর বছর। ভিন্ন বর্ণনানুসারে আবদুর রাজ্জাক ও ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, একশত দশ বছর এবং তাঁর সহধর্মিণীর বয়স তখন ছিলো আটানব্বই বছর।

এরপর বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি।' একথার অর্থ— হজরত জাকারিয়া তাঁর প্রার্থনায় বললেন, হে আমার পরম দয়াপরবশ প্রভুপালনকর্তা! আমার বিগত জীবনের কোনো প্রার্থনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি। তুমি দয়া করে আমার সকল দোয়াই কবুল করে নিয়েছো। তাই আমি দৃঢ় আশা পোষণ করি যে, আমার এখনকার এই প্রার্থনাও তুমি কবুল করে নিবে। কারণ প্রকৃত ও একমাত্র দাতা কখনো অনুগত ও মুখাপেক্ষী প্রার্থীকে বিমুখ করেন না।

এখানে 'দুআ'ইকা' (আপনাকে আহ্বান করে) কথাটির শেষের অক্ষর 'কাফ' এর সম্বন্ধ ঘটেছে দোয়া করার সঙ্গে। অর্থাৎ এই 'কাফ' হচ্ছে এখানে দোয়ার কর্ম। আবার এরকমও হতে পারে যে, সর্বনামরূপী 'কাফ' হবে এখানে 'দোয়া' শব্দটির কর্তা। এভাবে দোয়া করা কর্মটির সম্বন্ধ ঘটবে তার কর্তার সঙ্গে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— হে আমার আল্লাহ্! পূর্বাহ্নে তুমি আমাকে দিয়েছো ইমান। আমি তোমার ওই দান সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছি। তোমার ওই অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করে আমি ব্যর্থ ও দুর্ভাগা হইনি। এখন সেই ইমানের অনুকূলেই আমি আমার প্রার্থনাকে উপস্থাপন করলাম এই আশায় যে, এবারও আমি বিফল মনোরথ হবো না।

এর পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্ররা দ্বীনকে ধ্বংস করে দিবে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সুতরাং তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে দান করো উত্তরাধিকারী।' এখানে আমার স্বগোত্ররা অর্থ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বা এ ধরনের বংশীয় উত্তরপুরুষেরা, যারা হবে আমার স্থলাভিষিক্ত। এভাবে হজরত জাকারিয়ার আলোচ্য বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— আমার আশংকা হয় আমার ভ্রাতৃবংশের উত্তরপুরুষেরা আমার পরলোকগমনের পর স্বাভাবিক নিয়মে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে, কিন্তু তারা সত্যধর্ম প্রচারের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে অনীহ হবে, অথবা হবে অনুপযুক্ত। এভাবে ইয়াকুব বংশে যে নবুয়তের নেয়ামত দান করেছো তার পুরুষানুক্রমিক প্রচার হবে বিঘ্নিত, বিকৃত। সুতরাং হে আমার প্রভুপালনকর্তা। আমি চাই তুমি আমাকে দান করো

www.eelm.weebly.com

এক উপযুক্ত পুত্র সন্তান, যে হতে পারবে নবুয়তের শিক্ষার যথার্থ প্রচারক। প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আমার স্ত্রী যদিও বন্ধ্যা, কিন্তু তুমিতো সর্বশক্তিধর। অসম্ভব বলে কোনো কিছুই তো তোমার নিকটে নেই।

এর পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকুব বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে কোরো সন্তোষভাজন।' এখানে 'উত্তরাধিকারিত্ব করবে' বলে পার্থিব ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারিত্বের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে নবুয়তের এলেমের উত্তরাধিকারিত্বের কথা। কারণ নবী-রসুলগণের পার্থিব উত্তরাধিকারী কেউ হয় না। বিত্ত-বৈভব জমা করে রেখে যাওয়া তাঁদের জন্য নিষিদ্ধ।

রসুল স. জানিয়েছেন, আলেমগণই নবী-রসুলগণের উত্তরাধিকারী। কারণ তারা ধন-সম্পদ রেখে যায় না। রেখে যায় জ্ঞান। প্রত্যাদেশিত ওই জ্ঞান যে অর্জন করে, সে-ই পায় সর্বোচ্চ উত্তরাধিকার। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা। দারেমী বলেছেন, হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কাছীর বিন কায়েস। আর তিরমিজি বলেছেন কায়েস বিন কাছীর।

নবীনন্দিনী হজরত ফাতেমা যখন খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দীকের নিকটে উত্তরাধিকারী হিসাবে একটি বাগান দাবি করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর দাবিকে গ্রহণ করেননি। আর ঐকমত্যাগত সিদ্ধান্ত এই যে, অন্যান্য নবীর মতো রসুল স. এরও মীরাছ বা উত্তরাধিকার বলে কিছু নেই।

জননী আয়েশা থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আমার পিতার নিকটে উত্তরাধিকারের দাবি নিয়ে উপস্থিত হলেন নবী তনয়া ফাতেমা ও নবী-পিতৃব্য আব্বাস। আমার পিতা তখন বললেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আমি কোনো মীরাছ রেখে যাবো না। যদি এরকম কিছু রেখে যাই তবে তা হবে সর্বসাধারণের জন্য দান। বোখারীর বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর উম্মত জননীগণ তাঁদের দাবী উপস্থাপনের জন্য খলিফার দরবারে প্রেরণ করলেন হজরত ওসমানকে। খলিফা বললেন, রসুল স. কি একথা বলেননি— আমার মীরাছ নেই। যদি থাকে তবে তা হবে সদকা।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, মালিক বিন আওস বলেছেন, আমি একবার খলিফা হজরত ওমরের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর বিশেষ দারোয়ান ইয়ারফা এসে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! হজরত ওসমান, হজরত আবদুর

www.eelm.weebly.com

রহ্মান, হজরত যোবায়ের ও হজরত সা'দ আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চান। হজরত ওমর বললেন, আসতে বলো। একটু পরেই দরবারে প্রবেশ করলেন সাক্ষাতপ্রার্থী সাহাবীবৃন্দ। ইয়ারফা পুনরায় এসে বললেন, হজরত আলী ও হজরত আব্বাসও এসেছেন। হজরত ওমর বললেন, তাঁদেরকেও ডেকে আনো। তাঁরাও সেখানে এলেন অল্পক্ষণের মধ্যে। হজরত আব্বাস হজরত আলীকে দেখিয়ে বললেন, তার ও আমার মধ্যে উদ্ভূত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত জটিলতার সমাধান করে দিন। হজরত ওমর তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে উপস্থিত সাহাবীবৃন্দের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদেরকে ওই আল্লাহ্র কসম দিয়ে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, যাঁর হুকুমে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে জমিন ও আসমান। আপনারা কি জানেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি কোনো উত্তরাধিকার রেখে যাবো না। যদি দেখো, কোনো সম্পদ রেখে গিয়েছি, তবে মনে করবে তা উত্তরাধিকার নয়। দুঃস্থ মুসলমানদের জন্য দান। উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, নিঃসন্দেহে রসুল স. এরকম বলেছেন। হজরত আলী এবং হজরত আব্বাসও একথার স্বীকৃতি দিলেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আমার কোনো পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করবে না। সংসারিক ব্যয় নির্বাহের পর আমি যদি কিছু ছেড়ে যাই, তবে তা হবে খয়রাত। উল্লেখ্য যে, হজরত হুজায়ফা বিন ইয়ামন, হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম এবং হজরত আবু দারদা থেকেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

শিয়া সম্প্রদায় এই হাদিসটিকে অস্বীকার করে। অথচ মোহাম্মদ বিন ইয়াকুব কালিনী তাঁর 'জামে' পুস্তকে আবু আবদুল্লাহ্, ইমাম জাফর সাদেক সূত্রে এই মর্মে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নবী-রসুলগণ মীরাছরূপে কোনো দীনার দিরহাম রেখে যাননি, রেখে গিয়েছেন তাঁদের বাণী।

উপরে বর্ণিত হাদিসের আলোকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াতে উত্তরাধিকারিত্ব বলে পার্থিব কোনো সম্পদের উত্তরাধিকারিত্বের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে নবুয়তের উত্তরাধিকারিত্বের কথা। আর হজরত জাকারিয়াও এমতো আশংকা করেননি যে, তাঁর পুত্রসন্তান না থাকলে তাঁর পার্থিব সম্পত্তির অধিকারী হবে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রেরা।

'ওয়াজআ'লহু রব্বি রদ্বীয়্যাহ্' অর্থ তাকে কোরো তোমার সন্তোষভাজন। এখানে 'রদ্বীয়্যাহ্' অর্থ মারদ্বীয়্যাহ্' বা আল্লাহ্র সন্তোষপ্রাপ্ত। অথবা সন্তুষ্ট। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! সে যেনো সুখে-দুঃখে থাকে তোমার প্রতি পরিতুষ্ট।

www.eelm.weebly.com

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ﴿اسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ
سَمِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ
مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ
خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئًا ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ؕ
قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝

❑ তিনি বলিলেন, 'হে জাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি তাহার নাম হইবে ইয়াহ্ইয়া; এই নামে পূর্বে আমি কাহারও নামকরণ করি নাই।'

❑ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত।

❑ তিনি বলিলেন 'এইরূপই হইবে।' তোমার প্রতিপালক বলিলেন, 'ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।'

❑ জাকারিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' তিনি বলিলেন, তোমার নিদর্শন এই যে তুমি সুস্থাবস্থায় কাহারও সহিত তিন দিন বাক্যালাপ করিবে না'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ বললেন, হে জাকারিয়া! তোমার প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করলাম এবং এই মর্মে শুভসংবাদ দান করলাম যে, অচিরেই তোমার পত্নী গর্ভধারণ করবে এবং যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হবে তোমার এক পুত্র সন্তান। তার নাম রাখতে হবে ইয়াহ্ইয়া। তার পূর্বে এরকম নাম আর কারো ছিলো না।

কাতাদা এবং কালাবী 'সামীয়্যান' কথাটির অর্থ করেছেন— এই নামে এবং স্পষ্ট করে বলেছেন, ইতোপূর্বে অন্য কারো নাম ইয়াহ্ইয়া ছিলো না। এভাবে আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, অসাধারণ ও অভূতপূর্ব নাম বিশেষ মর্যাদা প্রকাশক।

www.eelm.weebly.com

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও আতা 'সামীয়্যান' শব্দটির অর্থ করেছেন 'শাবীহাহ্' (তুল্য), মাছালুন (অনুরূপ)। যেমন এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— 'হাল তা'লামু লাহু সামীয়্যাহ্' (তৎতুল্য তুমি জানো?)। এখানে 'সামীয়্যা' অর্থ 'মাছালুন' (অনুরূপ) বা 'মুশাবাহ্' (সদৃশ)। এমতাবস্থায় বাগবীর উক্তি অনুসারে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— পাপাকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকার বিষয়ে হজরত ইয়াহ্ইয়ার মতো ইতোপূর্বে আর কেউ ছিলো না। আমি বলি, সম্ভবতঃ এখানে শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, হজরত ইয়াহ্ইয়া হবেন অতুলনীয় এক বিশেষ ফযীলতের অধিকারী, যা তার পূর্বে আর কেউ পাননি। অর্থাৎ তিনি হবেন পয়গম্বরকুলের মধ্যে এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। তবে একথার অর্থ এই নয় যে, সামগ্রিক বিচারে তিনি তাঁর পূর্বসূরীগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হজরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ ও হজরত মুসা কলিমুল্লাহ্র মতো অসাধারণ নবী আর্বিভূত হয়েছিলেন তাঁর পূর্বে। নিঃসন্দেহে তাঁরা ছিলেন হজরত ইয়াহ্ইয়ার তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তির অনুসরণে আলী ইবনে আবী তালহা উল্লেখ করেছেন, 'এই নামে পূর্বে আমি কারো নামকরণ করিনি' কথাটির অর্থ হবে— ইতোপূর্বে কোনো বন্ধ্যা নারীই হজরত ইয়াহ্ইয়ার মতো ফযীলত প্রাপ্ত কোনো সন্তানের জন্ম দান করেননি। এই ব্যাখ্যাটি যথাযথ নয়। কারণ হজরত ইব্রাহিমের সহধর্মিণী হজরত সারাও ছিলেন বন্ধ্যা। তিনিও বৃদ্ধ বয়সে হয়েছিলেন হজরত ইসহাকের জননী। আর হজরত ইয়াহ্ইয়া যে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ— সে রকম কোনো প্রমাণও নেই।

বায়যাবী লিখেছেন, ইয়াহ্ইয়া' শব্দটি অনারব। যদি আরবী হয়, তবে শব্দটি উৎসারিত হয়েছে কোনো ক্রিয়াবাচক শব্দ থেকে। যেমন— 'ইয়াঈশু', 'ইউআ'ম্মারু'। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর কারণে তাঁর মায়ের উদরে সৃষ্টি হয়েছিলো প্রাণের উন্মেষ, তাই তাঁর নাম ইয়াহ্ইয়া। অথবা তাঁর মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে উঠেছিলো আল্লাহ্র ধর্মাদর্শ, তাই তার নাম ইয়াহ্ইয়া বা সঞ্জীবক।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'সে বললো হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত।' এখানে 'আন্না' অর্থ কেমন করে। কথাটি কোনো অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন নয়। বরং কৌতূহল ও বিস্ময় নিবারণের আকাংখা প্রকাশক। অর্থাৎ 'কেমন করে' কথাটির মাধ্যমে হজরত জাকারিয়া বিষয়টির স্বরূপ জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। বলতে চেয়েছিলেন— হে আমার আল্লাহ্! পুত্রসন্তান আমাদের হবে

www.eelm.weebly.com

কীভাবে? আমাদেরকে যুবক-যুবতী করে দেয়া হবে, না এরকম বৃদ্ধাবস্থায়ই আমরা হবো পুত্রসন্তানের জনক ও জননী? এভাবে হজরত জাকারিয়া আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত প্রকাশের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল নিবারণ করতে চেয়েছিলেন মাত্র। আল্লাহ্র অপার ক্ষমতার প্রতি কোনোপ্রকার সন্দেহ প্রকাশ করেননি। কেনো করবেন? তিনি যে নবী।

'ইতিয়্যান' শব্দটির প্রকৃতরূপ ছিলো 'উতুওবুন।' 'উতুওবুন' শব্দটির অর্থ অবাধ্য। এখানে শব্দটির অর্থ হবে বিদ্রোহী। অর্থাৎ অতি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে আমার অস্থিসমূহ আমার অননুগত। উল্লেখ্য, বয়স বেশী হলে শরীর স্বশাসনে থাকে না। কাতাদা বলেছেন, এখানে কথাটির মাধ্যমে শরীরের অস্থি-দৌর্বল্যের কথাই প্রকাশ করা হয়েছে। 'আ'তী' বলা হয় ওই বৃদ্ধকে, যার অস্থিসমূহ নিরস ও নির্জীব। 'আ'তা শাইখ' অর্থ ওই বৃদ্ধের বয়স পৌঁছে গিয়েছে শেষ সীমানায়।

এর পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, এরকমই হবে। তোমার প্রতিপালক বললেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য, আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ অথবা তাঁর শুভসংবাদপ্রদাতা কোনো ফেরেশতা বললেন, হে নবী জাকারিয়া! আল্লাহ্ যেরকম প্রত্যাদেশ করেছেন, সেরকমই ঘটবে। এরপর আল্লাহ্ বললেন, এরকম করা আমার জন্য অত্যন্ত সহজ। তোমারও তো একসময় অস্তিত্ব ছিলো না। এভাবেই আমি কখনো সরাসরি, আবার কখনো আমার সৃষ্ট কোনো মাধ্যমের দ্বারা অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করি।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— জাকারিয়া বললো, 'হে আমার প্রতিপালক আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বললেন তোমার নির্দশন এই যে, তুমি সুস্থাবস্থায় কারো সাথে তিনদিন বাক্যালাপ করবে না'। একথার অর্থ, হজরত জাকারিয়া বললেন, হে আমার প্রভুপালক! আমার পুত্রসন্তান জন্মের একটি নিদর্শন আমাকে দাও। আল্লাহ্ অথবা শুভসংবাদপ্রদাতা ফেরেশতা বললেন, একদিন হঠাৎ দেখবে কোনো রোগ-ব্যাধি না হওয়া সত্ত্বেও তুমি একাধারে তিন দিন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারছো না। সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে এই ঘটনাটির বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'তিনদিন বাক্যালাপ করতে পারবে না' অর্থ শারীরিক সুস্থতা ও বাকশক্তি থাকা সত্ত্বেও তুমি তিনদিন মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারবে না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'সাবীয়্যা' অর্থ ধারাবাহিকভাবে বা একাধারে। কিন্তু প্রথমোক্ত অর্থটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝ وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ۝ وَّبَرًّاۢ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝

❑ অতঃপর সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আসিল ও ইঙ্গিতে তাহাদিগকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে বলিল।

❑ আমি বলিলাম, 'হে ইয়াহ্‌ইয়া! এই কিতাব দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর।' আমি তাহাকে শৈশবেই দান করিয়াছিলাম জ্ঞান,

❑ এবং আমার নিকট হইতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল সাবধানী,

❑ পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, অবাধ্য ছিলো না।

❑ তাহার প্রতি ছিলো শান্তি যে দিন সে জন্ম লাভ করে ও শান্তি থাকিবে যেদিন তাহার মৃত্যু হইবে ও যেদিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলো। হজরত জাকারিয়া বুঝলেন, তিনি তাঁর রসনা সঞ্চালন করতে পারছেন না। আপন প্রকোষ্ঠ ছেড়ে বাইরে এলেন তিনি। সমবেত জনতাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, তোমরা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।

এখানে 'আলমিহরাব' অর্থ কক্ষ, প্রকোষ্ঠ। শাব্দিক অর্থ লড়াই করার স্থান। মসজিদই হচ্ছে শয়তানের সঙ্গে লড়াই করার প্রকৃষ্ট স্থান। তাই শব্দটির অর্থ মসজিদও হতে পারে। 'কামুস' প্রণেতা লিখেছেন, শব্দটির অর্থ বালাখানা, প্রকোষ্ঠ বা কক্ষের উৎকৃষ্ট অংশ। অথবা বাদশাহ'র নির্জন প্রকোষ্ঠ।

বাগবী লিখেছেন, লোকেরা মসজিদের বাইরে অপেক্ষমান ছিলো। মসজিদ ছিলো অর্গলবদ্ধ। হজরত জাকারিয়া ছিলেন মসজিদের অভ্যন্তরে। তিনি হঠাৎ দরজা খুলে বাইরে এলেন। লোকেরা সবিস্ময়ে দেখলো হজরত জাকারিয়ার চেহারা স্বাভাবিক নয়। তারা তাঁর এরকম হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলো। তিনি তখন ইশারায় সবাইকে সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করার

www.eelm.weebly.com

নির্দেশ দিলেন। এখানে 'আওহা' অর্থ ইঙ্গিতে নির্দেশ দিলেন। মুজাহিদ বলেছেন, নিদের্শটি তিনি লিখে দিয়েছিলেন মাটির উপর। 'সাব্বিহু' অর্থ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করো।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আমি বললাম হে ইয়াহ্‌ইয়া! এই কিতাব দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করো। আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান।' একথার অর্থ— যথাসময়ে হজরত ইয়াহ্‌ইয়া জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি যখন কিছুটা বড় হলেন, তখন আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করলেন, হে ইয়াহ্‌ইয়া! এই হচ্ছে তওরাত কিতাব। তুমি এই কিতাব দৃঢ়তার সঙ্গে ধারণ করো।

মাহাল্লী বলেছেন, হজরত ইয়াহ্‌ইয়ার বয়স দুই বছর হলে তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছিলো আলোচ্য বাক্যটি। এখানে 'কিতাব' শব্দটির অর্থ তওরাত। 'কুওয়াত' অর্থ দৃঢ়তার সঙ্গে বা দৃঢ় প্রচেষ্টার সঙ্গে। অথবা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সামর্থ্য বা তওফিক প্রার্থনার সঙ্গে। 'আলহুক্‌মা' অর্থ হেকমত, প্রজ্ঞা, জ্ঞান। এভাবে 'আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— আমি তাকে তিন বছর বয়সে দিয়েছিলাম তওরাত পাঠের ও অনুধাবনের যোগ্যতা। উল্লেখ্য যে, এই আয়াতের প্রতি দৃষ্টি রেখেই বলা হয়, যে কোরআন পাঠ করেছে, সে হয়ে গিয়েছে হজরত ইয়াহ্‌ইয়ার এই অলৌকিকত্বের সাক্ষী। এক বর্ণনায় এসেছে, সমবয়সী শিশুরা তাঁকে খেলাধূলার জন্য আহ্বান জানাতো। তিনি জবাব দিতেন, আমাকে খেলাধূলার জন্য প্রেরণ করা হয়নি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'আলহুক্‌মা' কথাটির অর্থ হবে— নবুয়ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁকে নবী বানিয়েছিলেন তাঁর শিশুকালেই।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'এবং আমার নিকট থেকে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিলো সাবধানী'। একথার অর্থ— আমি তাঁকে আরো দিয়েছিলাম আমার পক্ষ থেকে রহমত ও পবিত্রতা। এখানে রহমত প্রদানের অর্থ হতে পারে দু'রকমের— ১. তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ করা হয়েছিলো আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতে, অথবা ২. তাঁর হৃদয়ে সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিলো তাঁর জনক-জননীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। পরবর্তী আয়াতে অবশ্য সে কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'হানানা' অর্থ রহমত, রিজিক, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়, সম্ভ্রম, মাহাত্ম্য অথবা বরকত। কামুস প্রণেতা লিখেছেন, 'হানানা'র অনুরূপ শব্দ 'সাহাবান'। এভাবে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়— রহমত, রিজিক, ভয়, সম্ভ্রম, মাহাত্ম্য ও হৃদয়ের কোমলতা। 'হানানা' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম 'আল হান্নান' থেকে। শব্দটি তাঁর 'আররহীম' নামের নিকটবর্তী অর্থবোধক।

www.eelm.weebly.com

'যাকাতাহ্' অর্থ পাপ থেকে পবিত্র হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, আনুগত্য ও বিশুদ্ধচিত্ততা। কাতাদা ও জুহাক বলেছেন, পুণ্যকর্ম। কালাবী বলেছেন, শব্দটির অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি বিশেষ নেয়ামত, যা ইয়াহ্ইয়ারূপে দান করা হয়েছিলো তাঁর পিতা-মাতাকে।

'ওয়াকানা তাক্বিয়্যা' অর্থ— এবং সে ছিলো সাবধানী বা সংযমী। অর্থাৎ তিনি কখনো গোনাহ্ তো করেনইনি, গোনাহ্র ধারণাও তাঁর হৃদয়ে কখনো উদিত হতে পারেনি।

এর পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'পিতামাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলো না।' কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'জাব্বারান' অর্থ ওই ব্যক্তি, যে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অন্যকে আঘাত করে এবং হত্যাকাণ্ড ঘটায়। এভাবে এখানে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, হজরত ইয়াহ্ইয়া কখনোই সেরকম নিষ্ঠুর, উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলেন না।

এর পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'তাঁর প্রতি ছিলো শান্তি যে দিন সে জন্মলাভ করে ও শান্তি থাকবে যে দিন তার মৃত্যু হবে ও যে দিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।'

'সালামুন আলাইহি' কথাটির মাধ্যমে এখানে এরকমই বলা হয়েছে যে, দুঃখ ক্লেশ সকল অবস্থায় হজরত ইয়াহ্ইয়া ছিলেন ও থাকবেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিরাপদ। এটা হচ্ছে জুমলায়ে মুতারিজাহ্ (প্রসঙ্গান্তর)।

'তার প্রতি ছিলো শান্তি যেদিন সে জন্মলাভ করে' কথাটির অর্থ— প্রতিটি নবজাতককে শয়তান স্পর্শ করে। সেই স্পর্শ থেকে তাঁকে রাখা হয়েছিলো নিরাপদ। 'শান্তি থাকবে যে দিন তার মৃত্যু হবে' কথাটির অর্থ পরলোকগমনের সময়ও তাঁর ঈমানকে রাখা হবে নিরাপদ। আর 'যেদিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে' কথাটির অর্থ— কবর থেকে পুনরুত্থানের পরেও তাঁকে মুক্ত রাখা হবে আল্লাহ্র অসন্তোষ ও দোজখের আযাব থেকে।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, মানুষের জন্য এই তিনটি অবস্থাই বিস্ময়কর— ১. মাতৃ-উদর থেকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর। ২. কবরের জগতে প্রবেশ করার পর। ৩. পুনর্জীবিত হয়ে হাশরের প্রান্তরে উপস্থিত হওয়ার সময়। এই তিনটি অবস্থাতেই হজরত ইয়াহ্ইয়া ছিলেন ও থাকবেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত।

www.eelm.weebly.com

এখানে জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান— এই তিনটির সঙ্গে উহ্য রয়েছে একটি ক্রিয়ার আধার, যার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে 'আলাইহি' শব্দটি।

একটি সন্দেহঃ কুফাবাসী আলেমগণ বলেন, 'জরফে মুসতাকার' সম্পর্কিত হয় বিশেষণবাচক শব্দরূপের সঙ্গে। যেমন, মুসতাকাররুন আলাইহি অথবা হাসিলুন আলাইহি। কিন্তু বসরাবাসী আলেমগণ বলেন, জরফে মুসতাকারের সম্পর্ক ঘটে উহ্য ক্রিয়াবাচক শব্দরূপের সঙ্গে। যেমন— 'ইসতাক্বাররা আলাইহি' অথবা 'হাসালা আলাইহি'। এখন অতীতকালবোধক শব্দরূপের সঙ্গে যদি 'ইয়াওমা' কথাটি সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করা হয়, তাহলে তাঁর জন্মের সঙ্গে ওই মর্মার্থ হবে যথাযথ। অর্থাৎ জন্মের সময় তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভ করেছিলেন পূর্ণ নিরাপত্তা। কিন্তু মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয় দু'টো এখানে উল্লেখিত হয়েছে ভবিষ্যতকালবাচক শব্দরূপে। সুতরাং অতীতকালবোধক ও ভবিষ্যতকালবোধক শব্দরূপগুলোকে এখানে কীভাবে 'আলাইহি' কথাটির মাধ্যমে যুক্ত করা যেতে পারে? কুফাবাসী আলেমদের কথা মেনে নিলে বলতে হয়, এখানকার উহ্য বিশেষণবাচক শব্দরূপটি ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমানকালের অর্থে। যদি তাই হয়, 'মুসতাকার আলাইহি'র সম্পর্ক শুদ্ধ হবে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বেলায়। কিন্তু জন্মের সঙ্গে এরকম সম্পর্ক আর থাকবে না। কারণ এখানকার 'জন্মলাভ করে' শব্দরূপটি অতীতকালবোধক।

সন্দেহের অপনোদন ঃ ব্যাকরণবিশারদগণ বলেছেন, ক্রিয়ার আধারের উপর কার্যকর হয় কেবল অর্থবোধক কার্যরীতি। অর্থাৎ শুধুমাত্র ধাতুগত অর্থ কার্যকর হয়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক ঘটে না। এ কারণেই 'হাজা যায়দুন ক্বইমান'(এইতো যায়েদ দণ্ডায়মান) বাক্যে কোনো একটি নির্দিষ্টকাল বুঝায় না। সুতরাং বলতে হয় কুফাবাসী আলেমগণের 'মুসতাক্বাররুন' এবং বসরাবাসী আলেমগণের 'ইসতাক্বার্‌রা' শব্দদ্বয়ের ব্যবহৃত ব্যাকরণনীতি পরোক্ষ। সুতরাং তাদের কথিত বিশেষণবাচক ও ক্রিয়াবাচক শব্দরূপের সংযুক্তির কথাটি যদি আমরা মেনেও নেই, তবুও 'আলাইহি' কথাটি এখানে হয়ে যাবে বিশেষ কোনো সময়ের সম্পর্ক থেকে মুক্ত। কেননা এখানে ক্রিয়ার আধার হয়ে গিয়েছে বিশেষণের স্থলাভিষিক্ত। এভাবে ক্রিয়াটি প্রভাব বিস্তার করেছে জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান— সাধারণভাবে তিনটি অবস্থার উপরেই। কোনো বিশেষ সময়ের উপরে নয়।

www.eelm.weebly.com

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۚ فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝ قَالَتْ إِنِّيْٓ أَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝ قَالَ إِنَّمَآ أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِأَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ۝ قَالَتْ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝

❑ বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লেখিত মরিয়মের কথা, যখন সে তাহার পরিবারবর্গ হইতে পৃথক হইয়া নিরালায় পূর্ব দিকে একস্থানে আশ্রয় লইল,

❑ অতঃপর উহাদিগ হইতে নিজকে আড়াল করিবার জন্য সে পর্দা করিল। অতঃপর আমি তাহার নিকট আমার রূহকে পাঠাইলাম, সে তাহার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্ম-প্রকাশ করিল।

❑ মরিয়ম বলিল, 'তুমি যদি আল্লাহ্কে ভয় কর তবে আমি তোমা হইতে দয়াময়ের শরণ লইতেছি।'

❑ সে বলিল, 'আমি তো কেবল তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করিবার জন্য ।'

❑ মরিয়ম বলিল, 'কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই ও আমি ব্যভিচারিণীও নহি?'

❑ সে বলিল, 'এই রূপই হইবে।' তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন, 'ইহা আমার জন্য সহজ-সাধ্য এবং আমি উহাকে এই জন্য সৃষ্টি করিব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হইতে এক অনুগ্রহ; উহা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।'

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বর্ণনা করো এই কিতাবে উল্লেখিত মরিয়মের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে একস্থানে আশ্রয় নিলো।' এখানে 'আলকিতাব' (এই কিতাব) অর্থ আল কোরআন। আর 'মারয়াম' কথাটির দ্বারা এখানে শুরু করা হয়েছে হজরত ঈসার পবিত্রা জননী হজরত মরিয়মের কাহিনী।

'ইজিন্‌তাবাজাত' অর্থ পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন, দূরে গিয়েছিলেন। 'নাব্‌জুন' অর্থ নিক্ষেপ করা। অর্থাৎ নিক্ষেপিত বস্তুর দূরে গমন করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। এমতো ব্যাখ্যার আলোকে এখানকার 'ইন্‌তাবাজাত' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— হজরত মরিয়ম তাঁর পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। 'মাকানা শারক্বিয়্যা' অর্থ আশ্রয় নিলেন জনপদের পূর্বদিকের একস্থানে। এভাবে সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়— অবস্থা এমন অসহনীয় হয়ে উঠলো যে, হজরত মরিয়ম তাঁর পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে গেলেন এবং আশ্রয় গ্রহণ করলেন পূর্ব দিকের এক নিরালা স্থানে। তখন ছিলো শীতকাল। তাই তিনি তখন পূর্ব দিকে পতিত সকালের রোদে চুল আঁচড়াতে বসেছিলেন। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, ঋতুবতী অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার গোসল সমাপনের জন্য তিনি তখন তাঁর পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে কোনো এক নির্জনস্থানে গমন করেছিলেন। কারো কারো ধারণা, তিনি এভাবে পূর্বদিকের একস্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন একাগ্রচিত্ত উপাসনা সম্পাদনার্থে। হাসান বলেছেন, এ কারণে খৃষ্টানেরা পূর্বদিকে মুখ করে ইবাদত করে।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করবার জন্য সে পর্দা করলো।' হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'হিজাবা' শব্দটির অর্থ করেছেন পর্দা। কেউ কেউ বলেছেন, দেয়ালের আড়াল। মুকাতিল বলেছেন, পাহাড়ের আড়াল। ইকরামা বলেছেন, হজরত মরিয়ম থাকতেন মসজিদের এক প্রকোষ্ঠে। ঋতুস্রাবকালে তিনি সেখান থেকে বের হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতেন তাঁর খালার গৃহে। ঋতুবতী অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার পর পুনরায় চলে যেতেন মসজিদে। একদিন একান্ত নির্জনে গোসল করার সময় বাবরী চুল বিশিষ্ট মধ্যমদেহী এক যুবকের বেশে সেখানে হাজির হলেন হজরত জিবরাইল। সে কথাই পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে এভাবে—

'অতঃপর আমি তাঁর নিকট আমার রূহ্‌কে পাঠালাম, সে তাঁর নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলো।' এখানে 'রূহ' অর্থ হজরত জিবরাইল। 'আমার রূহ' বলে এখানে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে সম্মানিত করেছেন। এরকম সম্বন্ধ সম্মান অথবা অসম্মানের কারণ হয়। যেমন 'বাদশার ছেলে' সম্মানার্হ, 'নাপিতের ছেলে' ঘৃণার্হ। 'সবিয়্যা' অর্থ পূর্ণ মানবাকৃতিকে, পূর্ণাঙ্গ যুবকের আকারে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে রূহ দ্বারা বুঝানো হয়েছে হজরত ঈসা রূহুল্লাহ্‌কে, যিনি মানবাকৃতিতে এসেছিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত তাফসীরটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'মরিয়ম বললো, তুমি যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করো তবে আমি তোমার নিকট থেকে দয়াময়ের শরণ গ্রহণ করছি।' একথার অর্থ— হজরত মরিয়ম বললেন, হে অচেনা আগন্তুক! আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ্‌ভীরু যদি হও, তবে আর অগ্রসর হয়ো না। আমি তোমার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র শরণ যাচ্‌ঞা করি। হজরত মরিয়ম যখন হজরত জিবরাইলকে তাঁর দিকে আগমনোদ্যত দেখলেন, তখন তাঁকে মানব মনে করেই একথা বলেছিলেন। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— তুমি আল্লাহ্‌ভীরু হও আর না হও, সর্বাবস্থায় আমি তোমার আগমন থেকে আল্লাহ্‌র নিকটে পরিত্রাণ প্রার্থনা করি। এরকম হওয়াও সম্ভব যে, এখানকার 'ইন্' অব্যয়টি যদি শর্তসাপেক্ষ হয় তবে সে ক্ষেত্রে তার পরিণতিকে মনে করতে হবে উহ্য।। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— তুমি আল্লাহ্‌ভীরু নও। তাই তোমার ক্ষতি থেকে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থিনী।

এর পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি তো কেবল তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করবার জন্য।' একথার অর্থ— হজরত জিবরাইল বললেন, হে পবিত্রা রমণী! আমি মানুষ নই; ফেরেশতা। আপনাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করবার জন্য আল্লাহ্ আমাকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আপনি আমাকে ভয় পাবেন না। এখানে 'যাকিয়্যা' অর্থ পবিত্র, নিষ্পাপ, কল্যাণময়। অর্থাৎ যার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস ধ্বনিত হয় শুভ প্রচেষ্টার দিকে, নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ যাত্রার দিকে। এদিকে লক্ষ্য রেখে সুফী সম্প্রদায় বলেন, যে ব্যক্তির দুই দিন এক রকম (পরের দিন আগের দিন অপেক্ষা উন্নত নয়) সে ক্ষতিগ্রস্ত।

এর পরের আয়াতে (২০)বলা হয়েছে— 'মরিয়ম বললো, কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি ও আমি ব্যভিচারিণীও নই?' এখানে 'ইয়ামসাসনী' 'মাস'(স্পর্শ) শব্দটি ব্যবহৃত হয় বিবাহিত স্বামী স্ত্রীর মিলনের ক্ষেত্রে। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে 'মাস' শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। বরং ব্যবহৃত হয় অশ্লীলকর্মে। একথাটি তাই পৃথকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— আমি ব্যভিচারিণীও নই। এভাবে হজরত মরিয়মের উদ্ধৃত বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— বিবাহের মাধ্যমে কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। ব্যভিচারের সঙ্গেও আমি সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুতা। সুতরাং হে আল্লাহ্ প্রেরিত দূত! আমি জননী হবো কীভাবে।

শেষোক্ত আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'সে বললো, এরকমই হবে। তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ সাধ্য।' একথার অর্থ— হজরত জিবরাইল বললেন, হে সৌভাগ্যশালিনী! এরকম করাই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়। পুরুষের সঙ্গ ব্যতিরেকেই আল্লাহ্ আপনাকে এক পবিত্র পুত্রের জননী করতে চান। আল্লাহ্ একথাও বলেছেন, এরকম করা আমার জন্য অত্যন্ত সহজ।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাকে এজন্য সৃষ্টি করবো, যেনো সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট থেকে এক অনুগ্রহ; এটাতো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।' এখানে 'আয়াতাল্ লিন্নাস' অর্থ মানুষের জন্য এক নিদর্শন। 'ওয়া রহমাতান' অর্থ আমার নিকট থেকে এক অনুগ্রহ। 'ওয়া কানা আমরাম মাক্বদ্বিয়্যা' অর্থ এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। অর্থাৎ আপনি যে এক পবিত্র পুত্রের পবিত্র জননী হবেন, সে কথা লওহে মাহফুজে সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সূরা মার্‌য়াম ঃ আয়াত ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ۝ فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ۝ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝ وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۝ فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ۝

❒ অতঃপর সে গর্ভে সন্তান ধারণ করিল ও তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলিয়া গেল;

❒ প্রসব-বেদনা তাহাকে এক খর্জুর-বৃক্ষ তলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিল। সে বলিল, 'হায়, ইহার পূর্বে আমি যদি মরিয়া যাইতাম ও লোকের স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতাম।'

❒ ফেরেশতা তাহার নিম্ন পার্শ্ব হইতে আহ্বান করিয়া তাহাকে বলিল যে, 'তুমি দুঃখ করিও না, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করিয়াছেন;'

❒ 'তুমি তোমার দিকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, উহা তোমাকে সুপক্ক তাজা খর্জুর দান করিবে।'

www.eelm.weebly.com

❑ 'সুতরাং, আহার কর, পান কর ও চক্ষু জুড়াও। মানুষের মধ্যে কাহাকেও যদি তুমি দেখ তখন বলিও, 'আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতাবলম্বনের মানত করিয়াছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সহিত বাক্যালাপ করিব না।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে গর্ভে সন্তান ধারণ করলো ও তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলো।' আলোচ্য বক্তব্যটি একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। ওই উহ্য ক্রিয়াসহ বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— হজরত জিবরাইলের কথায় হজরত মরিয়মের হৃদয় প্রশান্ত হলো। হজরত জিবরাইল ফুৎকার দিলেন তাঁর পরিধেয় বস্ত্রের স্কন্ধদেশ সংলগ্ন অংশে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ফুৎকার দিয়েছিলেন হজরত মরিয়মের জামার হাতে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তিনি ফুৎকার দিয়েছিলেন তাঁর মুখে। কারো কারো মত হচ্ছে, হজরত জিবরাইল ফুৎকার দিয়েছিলেন দূর থেকে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, যেভাবেই ফুৎকার দেয়া হোক না কেনো, ওই ফুৎকারের ফলেই হজরত মরিয়ম গর্ভবতী হলেন এবং ওই অবস্থায় সকলের অগোচরে চলে গেলেন দূরের এক নির্জন জায়গায়।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মানুষের অপবাদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বাইতুল মাকদিসের সীমানার বাইরের এক উপত্যকায়। বাগবী বলেন, তাঁর গর্ভধারণের সময় সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতপৃথকতা রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের ঘটনা ঘটেছিলো এক ঘন্টার মধ্যে। কেউ কেউ বলেছেন, সাধারণ নিয়মে নয় মাস মাতৃ-উদরে অবস্থান করার পরে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন হজরত ঈসা। কেউ কেউ বলেছেন আট মাসের কথা। আবার কেউ কেউ বলেছেন ছয় মাস। মুকাতিল বিন সুলায়মান বলেছেন, তিনি গর্ভবতী হয়েছেন এক ঘণ্টার মধ্যে। দ্বিতীয় ঘন্টায় মাতৃ-জঠরে গঠিত হয়েছিলো হজরত ঈসার অবয়ব। আর তৃতীয় ঘন্টায় সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন হজরত ঈসা। ওই সময়ে হজরত মরিয়মের বয়স হয়েছিলো দশ বছর এবং গর্ভবতী হওয়ার পূর্বে তিনি ঋতুগ্রস্ত হয়েছিলেন মাত্র দুইবার।

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'প্রসব-বেদনা তাকে এক খর্জুর বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলো।' এখানে 'আজাআ' শব্দটি বাবে ইফ্‌য়ালের রীতিতে অতীতকালবোধক। মূল শব্দ 'জাআ'। এর সঙ্গে 'হামযা' অক্ষরটি সংযোজন করে শব্দটিকে বানানো হয়েছে তিন অক্ষরবিশিষ্ট সকর্মক ক্রিয়া। কিন্তু শব্দটির অর্থ এখানে কেবল আশ্রয় গ্রহণ করা নয়, আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়া।

www.eelm.weebly.com

'মাখাদু' (প্রসব-বেদনা) শব্দটি এখানে ধাতুমূল। বক্তব্যকে পূর্ণ করার জন্য শব্দটিকে অন্য শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন— 'মাখাদ্বতিল মারআ'তু' (মহিলার পেট থেকে বাচ্চাটি বের হওয়ার জন্য নড়াচড়া করলো)। 'মাখাদু' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে পরোক্ষার্থে। অর্থাৎ প্রসব বেদনার কারণেই তিনি উপস্থিত হলেন দূরের নির্জনে একটি শুকনো খেজুর গাছের আড়ালে। 'জিজইন নাখলাতে' অর্থ শাখাহীন গাছের ছায়ায় বা আড়ালে। আবু রওকের বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, হজরত মরিয়ম এমন একটি খেজুর গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, যা ছিলো পত্র-পল্লবহীন, বিশুষ্ক।

বায়যাবী লিখেছেন, ওই বিশুষ্ক বৃক্ষের নিকটে যাওয়ার অনুপ্রেরণা আল্লাহ্ই তাঁর হৃদয়ে ঢেলে দিয়েছিলেন। ওই শুকনো খেজুর গাছ থেকে তাজা ও পাকা খেজুর বের করার অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে হজরত মরিয়মের ভয়-ভীতি-আশংকা দূর করাই ছিলো আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা। আর রমণীকুলের জন্য খেজুর একটি আকর্ষণীয় আহার্যও বটে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, হায়, এর পূর্বে আমি যদি মরে যেতাম ও লোকের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম।' লোকলজ্জার ভয়ে হজরত মরিয়ম এভাবে তখন মৃত্যু কামনা করেছিলেন।

'নিসইয়ান' অর্থ সর্বপ্রকার বিস্মৃতি— ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, স্মৃতি দৌর্বল্যজনিত অথবা আলস্যজাত। ইচ্ছাকৃত ভুল নিন্দার্হ। তাই আল্লাহ্ বলেছেন— 'তবে শাস্তি আস্বাদন করো, কারণ অদ্যকার এই সাক্ষাতকারের কথা তোমরা ভুলে গিয়েছিলে'(সুরা সেজদা)। অনিচ্ছাকৃত ভুল ক্ষমার্হ। তাই রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের অনিচ্ছাকৃত বিস্মৃতিকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আবার ভুলের সম্পর্ক যদি আল্লাহ্র সঙ্গে করা হয়, তবে তার অর্থ হবে পরিত্যাগ করা বা ছেড়ে দেয়া। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন— 'নাসুল্লহা ফানাসিয়াহুম'(তারা আল্লাহ্কে ভুলে গিয়েছে, তাই আল্লাহ্ও তাদেরকে পরিত্যাগ করেছেন)।

আরবী পরিভাষানুসারে 'নাসিউন' অর্থ বিস্মৃত বস্তু। যেমন 'নিক্বদুন' বলা হয় ওই বস্তুকে যা ভেঙে ফেলা হয়েছে। 'নিসইউন' এর প্রচলিত অর্থ— ভ্রূক্ষেপ অথবা মনোযোগের অযোগ্য কোনো কিছু। শব্দটির প্রথম অক্ষর 'নূন' যবর সহযোগে পড়লেও শব্দটির কোনো অর্থান্তর ঘটে না। যেমন 'উইত্রুন 'ওয়াত্রুন' এবং 'হিব্সুন' 'হাব্সুন'। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটিকে পড়তে হবে যবর সহযোগে। তাহলে তা হবে ধাতুগত কর্মকারকের অর্থ প্রকাশক। আলোচ্য আয়াতে 'নিসইউন' বা 'নাসিউন' এর মর্মার্থ হবে ধাতুগত অর্থে। তবে প্রচলিত অর্থ গ্রহণের সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিলো। তাই এখানে শব্দটিকে প্রকাশ করা হয়েছে 'মানসিয়্যান' রূপে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— লোকের স্মৃতি থেকে যদি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, 'নাসউন' অর্থ নিক্ষেপিত, পরিত্যক্ত, তুচ্ছ হওয়ার কারণে অনুল্লেখ্য। আর 'মানসিয়্যান' অর্থ স্মৃতিচ্যুত বা স্মৃতিপট থেকে বিলুপ্ত। কাতাদা বলেছেন, 'নাসইয়ান' অর্থ আলোচনার অযোগ্য ও অজ্ঞতা। ইকরামা, জুহাক ও মুজাহিদ বলেছেন, মৃত বস্তু যা ফেলে দেয়া হয়েছে তাই 'নাস্ইয়ান'। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'কুনতু নাসইয়ান' কথাটির অর্থ হবে— আমি যদি জন্মগ্রহণই না করতাম।

একটি প্রশ্নঃ মৃত্যুকামনা নিষিদ্ধ। ইতোপূর্বে সুরা বাকারার তাফসীরে এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনাও করা হয়েছে। তাহলে হজরত মরিয়ম এভাবে মৃত্যুকামনা করেছিলেন কেনো?

উত্তরঃ বনী ইসরাইলদের শরিয়তে মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ হয়েছিলো অনেক পরে। আর আলোচ্য ঘটনাটি ঘটেছিলো সেই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ার অনেক পূর্বে। অথবা চরম লজ্জার চাপে পিষ্ট হয়ে অসহনীয় মুহূর্তে তাঁর মুখ থেকে অকস্মাৎ বের হয়ে এসেছিলো 'আমি যদি মরে যেতাম' কথাটি। কিংবা হজরত মরিয়ম তখন স্বীয় ধর্মাদর্শের অধঃপতনের চিন্তায় চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন। ধর্ম রক্ষার্থেই তিনি উচ্চারণ করেছিলেন ঈদৃশ বচন। লজ্জা ও অপমান থেকে রক্ষা পেতে মানুষ প্রায়শই ছলনা অথবা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফলে সে হয়ে পড়ে পাপী। ওই পাপ বা ফেত্না থেকে আত্মরক্ষার কারণেই হজরত মরিয়ম হয়তো তখন মৃত্যু কামনা করে থাকবেন। এরকম সঙ্গীন পরিস্থিতিতে মৃত্যু কামনা সিদ্ধ। সুরা বাকারার তাফসীরে আমি এ কথাটিও লিখে দিয়েছি । যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এর পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'ফেরেশতা তার নিম্ন পার্শ্ব থেকে আহ্বান করে তাকে বললো, তুমি দুঃখ কোরো না।' হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা, জুহাক ও সুদ্দী বলেছেন, হজরত মরিয়ম তখন ছিলেন একটি টিলার উপরিভাগের দিকে। আর হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়েছিলেন টিলাটির পাদদেশে, নিম্নভূমির দিকে। তাই এখানে বলা হয়েছে 'ফেরেশতা তার নিম্ন পার্শ্ব থেকে আহ্বান করে তাকে বললো'। সকল অবস্থায় এখানকার 'তাহ্তিহা' কথাটির 'হা' সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে হজরত মরিয়মের সঙ্গে। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সর্বনামটির সম্পৃক্তি ঘটেছে 'নাখ্লাহ্' (খর্জুর বৃক্ষ) এর সঙ্গে। মুজাহিদ এবং হাসান বলেছেন, হজরত ঈসা যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তখন হজরত জিবরাইল বলেছিলেন, 'দুঃখ কোরো না'।

'আল্লা তাহজানি' অর্থ দুঃখ কোরো না। অর্থাৎ সঙ্গে পানাহার না থাকার জন্য এবং লোকলজ্জার ভয়ে দুঃখ বোধ কোরো না।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করেছেন।' 'সারিয়্যা' অর্থ ছোট জলাধার বা নালা। তিবরানী তাঁর 'মুয়াজ্জামে সগীর' পুস্তকে সুপরিণত সূত্রে হজরত বারা বিন আজীব থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন। তিবরানী আবার একথাও বলেছেন যে, আবু ইসহাকের বর্ণনা থেকে আবু সানান ব্যতীত অন্য কেউ এর সূত্রপরম্পরাকে সুপরিণত বলেননি। ইবনে আদী তাঁর 'আত্তাকামূল' পুস্তকে লিখেছেন, মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া এই সূত্র প্রবাহটিকে বলেছেন বিপর্যস্ত। আর ইবনে মুঈন, নাসাঈ ও ইবনুল মাদিনী সূত্রটিকে আখ্যা দিয়েছেন শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। হজরত বারা থেকে বর্ণিত এই হাদিসটিকে বিপর্যস্ত সূত্রবিশিষ্ট বলে বোখারীও মন্তব্য করেছেন। কারণ এর প্রথম দিককার এক বর্ণনাকারী অপরিচিত। আর আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর ও ইবনে মারদুবিয়া তাঁদের আপনাপন তাফসীরে এই বর্ণনাটি বলেছেন অপরিণত। হাকেমও তাঁর মুসতাদরাকে বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং মুসলিমের শর্তানুসারে একে আখ্যা দিয়েছেন বিশুদ্ধ সূত্রবিশিষ্ট বলে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে তিবরানী ও 'হুলিয়া' রচয়িতা আবু নাঈম লিখেছেন আল্লাহ্ তখন সেখানে প্রবাহিত করে দিলেন একটি ঝর্ণা, যাতে হজরত ঈসার জননী সেই ঝর্ণার পানি দিয়ে তাঁর পিপাসা নিবৃত্ত করতে পারেন। এই বর্ণনার মধ্যে আইয়ুব বিন নাহিক নামের এক অনুপযুক্ত বর্ণনাকারী রয়েছেন। তাঁকে অনুপযুক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন আবু জারআ ও ইবনে আবী হাতেম।

কোনো কোনো আলেম এখানকার 'তাহতাকি' কথাটির অর্থ করেছেন তোমার নির্দেশে। অর্থাৎ ওই ঝর্ণাটিকে করে দেয়া হলো তোমার নির্দেশের অধীন। তোমার নির্দেশেই ঝর্ণাটি হবে কখনো প্রবহমান, কখনো রুদ্ধ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নহর বা ঝর্ণাটি প্রবাহিত হয়েছিলো হজরত জিবরাইল অথবা সদ্যজাত হজরত ঈসার চরণাঘাতে। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, সেখানে আগে থেকেই ছিলো একটি মৃত ঝর্ণা। হজরত মরিয়মের কারণে সেই মৃত নহরটিকেই আল্লাহ্ জলবতী করে দিয়েছিলেন। আর সেখানকার বৃক্ষটিকে করে দিয়েছিলেন সবুজ ও ফলবান। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'সারিয়্যা' অর্থ অধিনায়ক। শব্দটি সংকলিত হয়েছে 'সারু' থেকে। শব্দটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে মানুষের মহান অধিনায়ক হজরত ঈসাকে। হাসান বসরী বলেছেন, আল্লাহ্র শপথ! হজরত ঈসা অবশ্যই ছিলেন মানব-সর্দার, মহিমময় নৃনায়ক।

এর পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'তুমি তোমার দিকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, ওই কাণ্ড তোমাকে সুপক্ক তাজা খেজুর দান করবে।' এখানে 'হুজ্জী ইলাইকি' অর্থ নাড়া দাও, ঝাঁকি দাও বা দোলা দাও। 'বিজিজ্ই' (তোমার দিকে) শব্দটির 'বা' অক্ষরটি এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। আর 'রুত্বাবান জ্বানিয়্যা' অর্থ সুপক্ক তাজা খেজুর । উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র আলোচ্য নির্দেশ পেয়ে হজরত মরিয়ম শুকনো খেজুর গাছটি ধরে নাড়া দিয়েছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ গাছটি হয়ে গিয়েছিলো সবুজ পত্রপল্লববিশিষ্ট ও ফলবান । আর তাজা ও পাকা খেজুর ঝরে পড়েছিলো তাঁর আহার্যরূপে।

www.eelm.weebly.com

শেষোক্ত আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'সুতরাং আহার করো, পান করো ও চক্ষু জুড়াও।' একথার অর্থ— হে মহাপুণ্যবতী মরিয়ম! তোমার পানাহারের আয়োজন করা হলো আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। সুতরাং বৃক্ষ থেকে পতিত খেজুর এবং প্রবহমান ঝর্ণার পানি পান করে তুমি পরিতৃপ্ত হও। আর এই নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে চোখ জুড়াও। পরিত্যাগ করো বিষণ্ণতা।

এখানকার 'ক্বররি' (জুড়াও) শব্দটি এসেছে 'ক্বরার' থেকে। মনোরম দৃশ্য চোখকে করে পরিতৃপ্ত। এমতাবস্থায় দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট হয়ই না। তাই বলা হয়—'ক্বাররল্লহু আইনাকা' (আল্লাহ্ তোমার দৃষ্টিকে পরিচ্ছন্ন রাখুন)। 'ক্বররল্লাহু ফুআদাকা' (আল্লাহ্ তোমার অন্তরকে অনিন্দিত রাখুন, যেনো তা অন্যদিকে আকৃষ্ট না হয়)। এভাবেই এখানকার 'আক্বাররল্লহু আইনাহু' কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— চক্ষু জুড়াও। অথবা এখানকার 'ক্বররা' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে ক্বুর্রাতন্ থেকে। উল্লেখ্য যে, আনন্দাশ্রু চোখকে শীতল করে। কারণ তা শীতল ও শান্তিদায়ক। আর বেদনাশ্রু হয় তপ্ত। তাই প্রিয়জনকে বলা হয় 'কুররতুল আ'ইনি' (চোখের শান্তি)। আর দুঃখ বিপদজনিত অশ্রুপাতকে বলে 'সানাখাতুল আইনি'।

এরপর বলা হয়েছে— 'মানুষের মধ্যে কাউকে যদি তুমি দেখ, তখন বোলো, আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোনো মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করবো না।'

এখানে 'সওমান' শব্দটির ধাতুগত অর্থ পানাহার থেকে বিরত থাকা। এখানে মর্মার্থ হবে বাক্যালাপ থেকে বিরত থাকা। তাই শব্দটির অর্থ হবে মৌনতাবলম্বনের মানত। সুদ্দী বলেছেন, এরকম মানত বনী ইসরাইলদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। এরকম মানত করলে তারা রোজাদারের মতো সারাদিন পানাহার করতো না,আবার কারো সঙ্গে কথাবার্তাও বলতো না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আল্লাহ্পাক হজরত মরিয়মকে বাক্যালাপ করতে বলেছিলেন ইশারায়। কারণ মুখের কথায় সৃষ্টি হয় বিতণ্ডার। তাছাড়া এভাবে শিশু ঈসাকে কথা বলার সুযোগ দেয়াও ছিলো একটি উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, তখন লোকজনের কথার জবাব দিয়েছিলেন শিশু ঈসা স্বয়ং। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, আলোচ্য উক্তিটি মুখে উচ্চারণের অনুমতি তাঁকে দেয়া হয়েছিলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। তারপর দেয়া হয়েছিলো মৌনতাবলম্বনের নির্দেশ। এক বর্ণনায় এসেছে মৌনতাবলম্বনের সময় হজরত মরিয়ম ফেরেশতার সঙ্গে কথা বলতেন, মানুষের সঙ্গে বলতেন না।

www.eelm.weebly.com

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ۝
يٰۤاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ۝
فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝
قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ۝ وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا
اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ وَّبَرًّا
بِوَالِدَتِىْ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا ۝ وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ
وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ۝

❒ অতঃপর সে সন্তানকে লইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইল; উহারা বলিল, 'হে মরিয়ম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিয়াছ।'

❒ 'হে হারুন-ভগ্নি! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী।'

❒ অতঃপর মরিয়ম ইংগিতে সন্তানকে দেখাইল। উহারা বলিল, 'যে কোলের শিশু তাহার সহিত আমরা কেমন করিয়া কথা বলিব?'

❒ সে বলিল, 'আমি তো আল্লাহের দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন, আমাকে নবী করিয়াছেন'

❒ 'যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে আশিস-ভাজন করিয়াছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যত দিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও জাকাত আদায় করিতে ও আমার মাতার প্রতি অনুগত থাকিতে,'

❒ 'এবং তিনি আমাকে করেন নাই উদ্ধত ও হতভাগ্য;

❒ আমার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি ও শান্তি থাকিবে যেদিন আমার মৃত্যু হইবে ও যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুত্থিত হইব।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে তার সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকটে উপস্থিত হলো।' এক বর্ণনায় এসেছে, সন্তান জন্মদানের পরপরই হজরত মরিয়ম শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে তাঁর আপন জনপদে ফিরে গিয়েছিলেন। কালাবীর

www.eelm.weebly.com

বর্ণনায় এসেছে, ইউসুফ নাজ্জার বলেছেন, সদ্যজাত শিশুপুত্রকে নিয়ে হজরত মরিয়ম আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন একটি গুহায়। চল্লিশ দিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর লোকালয়ে। পথে যেতে যেতে শিশু ঈসা তাঁর জননীকে বলেছিলেন, শ্রদ্ধার্হ জনয়িত্রী আমার! একটি সুসংবাদ শ্রবণ করো। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও মসীহ্‌। হজরত মরিয়মের জনপদের লোকেরা ছিলো ধর্মভীরু। তারা তাপসী হিসেবে হজরত মরিয়মকেও শ্রদ্ধা করতো খুব। তাই তাঁর কোলে সন্তান দেখে তারা মর্মাহত হলো এবং কেঁদেই ফেললো।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে মরিয়ম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছো।'

'ফার্‌ইউল জালদি' অর্থ চামড়া চিরে ফেলা। কবি সাহাবী হজরত হাস্‌সান বলেছিলেন 'লাআফরিইয়ান্‌নাহুম' (আমি অবশ্যই তার চামড়া খুলে ফেলবো)। অর্থাৎ কঠিন নিন্দা ও বিদ্রূপ করবো। কোরআন মজীদের অনেক স্থানে 'ইফতারা' শব্দটি মিথ্যাচার, শিরিক ও জুলুম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— ১. 'ওয়ামান আজলামু মিম মানিফ্‌তারা আলাল্লহিল কাজিবা' (আল্লাহ্‌ সম্পর্কে যে মিথ্যা বলে, তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে)। ২. 'ওয়া মাঁইউশরিক বিল্লাহি ফাকাদিফ্‌তারা ইছমান আজীমা' (যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করে, সে খুব বড় পাপাচারী)। মানুষ যখন সদুপদেশ গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে এবং হয়ে ওঠে আনুগত্য বিমুখ, তখনই তার দ্বারা সংঘটিত হয় শিরিক। তাই এখানে বলা হয়েছে 'ইফতারা'।

কোনো কোনো আলেম এখানকার 'ফারিয়্যা' শব্দটির অর্থ করেছেন বড়ই আশ্চর্যজনক। যেমন রসুল স. হজরত ওমর সম্পর্কে একবার বলেছিলেন— 'ফালাম আরা আবক্বারিয়্যা ইয়াফরী ফিরাইয়্যা' (আমি ওমরের মতো আশ্চর্যজনক আমলকারী কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি)।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'হে হারুন-ভগ্নি! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলো না এবং তোমার মাতাও ছিলো না ব্যভিচারিণী।' হজরত মরিয়ম ছিলেন হজরত মুসার ভ্রাতা হজরত হারুনের বংশদ্ভুতা। তাই এখানে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে 'হারুনের ভগ্নি' বলে। যেমন তামীম গোত্রভূতদেরকে বলা হয় তামীমের ভাই। ইবনে আবী হাতেম এই ব্যাখ্যাটিকে আলী বীন আবী তালহার সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। কালাবী বলেছেন, হজরত মরিয়মের এক সৎভাইয়ের নাম ছিলো হারুন। তিনি ছিলেন পুণ্যবান ও ধর্মপ্রাণ। বাগবী লিখেছেন, হজরত মুগীরা ইবনে শো'বা বর্ণনা করেছেন, একবার আমি গেলাম নাজরানে। সেখানকার লোকেরা আমাকে দেখে বললো, তোমরা কোরআনে পড়ো 'হে হারুন-ভগ্নি!' অথচ হজরত হারুনের জামানা ছিলো হজরত ঈসার জামানার

www.eelm.weebly.com

অনেক পূর্বে। আমি মদীনায় ফিরে এসে একথা রসুল স.কে জানালাম। তিনি স. বললেন, তখনকার লোকেরা তাদের সন্তানের নাম রাখতো তাদের পূর্বসূরী কোনো নবী অথবা কোনো পুণ্যবান ব্যক্তির নামে। মুসলিম।

বাগবী একথাও লিখেছেন যে, কাতাদা প্রমুখ বলেছেন, বনী ইসরাইলদের মধ্যে এক মহাপুণ্যবান ব্যক্তির নাম ছিলো হারুন। তার পরলোকগমনের পর তাঁর জানাযায় হাজির হয়েছিলেন চব্বিশ হাজার লোক। তাদের সকলের নাম ছিলো হারুন। হজরত মরিয়মও ছিলেন মহাপুণ্যবতী। তাই লোকেরা তাঁকে সম্বোধন করেছিলো হারুনের ভগ্নি বলে। তিনি যে হারুনের আপন বোন ছিলেন তা নয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই'। শয়তানের মতো স্বভাবসম্পন্ন বলেই এখানে অপব্যয়কারীদেরকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে। এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, শয়তান তাদের আপন ভাই। কাতাদা থেকে আবদ ইবনে হুমাইদ এবং আবদুর রাজ্জাকও এরকম বর্ণনা করেছেন। এরকমও হতে পারে যে, তারা পরোক্ষার্থে অথবা উপহাসচ্ছলে এরকম বলেছিলো। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে আবী হাতেম এরকমই বর্ণনা করেছেন। আসলে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত সম্পূর্ণ বাক্যই তিরস্কারমূলক। কেননা পুণ্যবানদের পুণ্যরহিত সন্তান-সন্ততিরা হয় অধিক নিন্দিত।

এমনও বলা হয়েছে— ইসরাইলীয় এক ব্যক্তি ছিলো বড়ই দুষ্ট প্রকৃতির। তার নামও ছিলো হারুন। ওই দুষ্ট লোকের বোন বলে তখন জনসমক্ষে নিন্দিত করা হয়েছিলো হজরত মরিয়মকে ।

এর পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'অতঃপর মরিয়ম ইঙ্গিতে সন্তানকে দেখালো। তারা বললো, যে কোলের শিশু তার সঙ্গে আমরা কেমন করে কথা বলবো?' হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, হজরত মরিয়মের নিকটে বিনা পিতায় সন্তান জন্ম লাভের পক্ষে কোনো প্রমাণ ছিলো না। তাই তিনি তাঁর দোলনার শিশুকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যেনো ওই শিশুর অলৌকিক বচনে লোকেরা হতচকিত হয়ে আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের প্রতি ঈমান আনয়ন করে। এক বর্ণনায় এসেছে, মহাপুণ্যবতী মরিয়ম যখন তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশুর সঙ্গে সকলকে কথা বলার ইঙ্গিত দিলেন, তখন লোকেরা ক্রোধান্বিত হয়ে বললো, শিশুর সঙ্গে আমরা কথা বলবো কেমন করে? তুমি কি আমাদের সঙ্গে উপহাস করতে চাও?

এখানে 'মান কানা' কথাটির 'কানা' অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। অন্যত্রও এরূপ শব্দব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'হাল কুনতু ইল্লা বাশারার রসুলা।' অথবা 'কানা' শব্দটি এখানে পূর্ণতাপ্রকাশক। কিংবা স্থায়িত্বজ্ঞাপক।

www.eelm.weebly.com

'মাহ্দি' অর্থ মায়ের কোল, অথবা দোলনা। এভাবে লোকদের উদ্ধৃত কথার মর্মার্থ দাঁড়ায়— কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কি কখনো দোলনার বা মায়ের কোলের শিশুর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে বাক্যবিনিময় করতে পারে? 'ফিল মাহ্দি' কথাটির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, শিশুটি ছিলো কোলের অথবা দোলনার অবুঝ এক শিশু, কথা বলার যোগ্যতাই যার সৃষ্টি হয়নি।

সুদ্দী বলেছেন, লোকদের কথা শুনে শিশু নবী দুগ্ধপান বন্ধ করলেন এবং তাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে লাগলেন। অপর বর্ণনায় এসেছে, যখনই মহাপুণ্যবতী জনয়িত্রী তাঁর পবিত্র পুত্রের দিকে ইশারা করলেন, তখনই তিনি দুগ্ধপান বন্ধ করে কিছুটা বামে সরে গেলেন এবং ডান হাত দিয়ে জনতার দিকে ইশারা করে কথা বলতে শুরু করলেন।

এর পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি তো আল্লাহ্র দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন।' লোকেরা শিশু নবীর জন্মকে খারাপ নজরে দেখেছিলো। তাই তিনি প্রথমেই দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন— আমি তো আল্লাহ্র দাস। অর্থাৎ আমি তো অবশ্যই আল্লাহ্র বান্দাগণের মধ্যে এক মহাসম্মানিত বান্দা। কারণ আমি কিতাবধারী এক নবী।

ওহাব বলেছেন, লোকদের সঙ্গে হজরত মরিয়মের কথোপকথনের সময় সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত জাকারিয়া। শিশু নবীর দিকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, তুমি যদি নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে থাকো, তবে তুমি নিজে নিজেই তোমার প্রমাণ উপস্থাপন করো। এরপর হজরত ঈসা কথা বলতে শুরু করলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো চল্লিশ দিন। মুকাতিল বলেছেন, তিনি জন্মগ্রহণ করার পরক্ষণেই তাঁর বান্দা হওয়ার কথা প্রকাশ করেছিলেন। মানুষ যেনো তাঁকে উপাস্য বলে স্থির না করে, তাই তিনি বলেছিলেন আমি তো আল্লাহ্র দাস।

এখানে 'আলকিতাব' অর্থ তওরাত শরীফ। হাসান এরকম বলেছেন। মাতৃজঠরে অবস্থানের সময়েই আল্লাহ্ তাঁকে তওরাতের জ্ঞান দান করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেম বলেন, এখানে 'আল কিতাব' অর্থ ইঞ্জিল শরীফ। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই তাঁকে ইঞ্জিল শরীফ দান করা হয়েছিলো। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, এখানে 'তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন' কথাটির অর্থ হবে আল্লাহ্ আমাকে কিতাব দান করবেন। আর 'আমাকে নবী করেছেন' কথাটির মর্মার্থ হবে— তিনি আমাকে নবী বানাবেন। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত ঈসাকে তখন দেয়া হয়েছিলো লওহে মাহফুজে লিখিত সংবাদ। এমতাবস্থায় কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— লওহে মাহফুজের নির্ধারণানুসারে আমি নবী। যেমন রসুল স.কে 'আপনি কখন থেকে নবী'— এরকম প্রশ্ন করা হলে তিনি স. বলেছিলেন, তখন থেকে, যখন বাবা আদম ছিলেন রূহ ও শরীরের মধ্যবর্তী স্থানে (অর্থাৎ যখন তাঁকে সৃষ্টিই করা হয়নি)। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে সা'দ ও আবু নাঈম, হজরত মায়সারা বিন সা'দ আবিল জুদআ থেকে এবং তিবরানী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'যেখানেই আমি থাকিনা কেনো, তিনি আমাকে আশিস-ভাজন করেছেন।' একথার অর্থ— আমি আকাশে অথবা পৃথিবীতে, যেখানেই থাকি না কেনো, সেখানেই আমি আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন। হজরত ঈসার এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, আকাশের ফেরেশতা ও পৃথিবীর মানুষ— সকলের জন্যেই তাঁর উপস্থিতি কল্যাণকর। এখানে ব্যবহৃত 'মুবারাকান' কথাটির মাধ্যমে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা কথাটির মাধ্যমে তাঁর উপস্থিতি যে অত্যধিক বরকতময়, সে কথাই বলে দেয়া হয়েছে। যেমন, দোয়ার মধ্যে বলা হয়— আল্লাহুম্মা বারিক ফীআত্বাইক' (হে আল্লাহ্! তোমার দান বৃদ্ধি করো)। কিংবা 'মুবারাকান' কথাটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বকে। ওই মহত্ত্বের কারণেই তিনি বিবেচিত হয়েছেন অন্যদের বরকত বা কল্যাণ লাভের মাধ্যমরূপে। যেমন বলা হয়, এই উপকারটি এসেছে অমুক ব্যক্তির বরকতে। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, তিনি অন্যদেরকে উপকার পৌছান— এ কথা বুঝাতেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'মুবারাকান'। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে, তিনি মানবতার উত্তম শিক্ষক। আতা বলেছেন, মানুষকে আল্লাহ্র এককত্ব ও উপাসনার দিকে আহ্বানকারী। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— আল্লাহ্ আমাকে ওই সকল লোকের জন্য কল্যাণপ্রদায়করূপে প্রেরণ করেছেন, যারা হবে আমার অনুগত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন আমি জীবিত থাকি, ততদিন সালাত ও জাকাত আদায় করতে ও আমার মাতার প্রতি অনুগত থাকতে।'

বাগবী বলেছেন এখানে এই সন্দেহটির উদ্রেক হতে পারে যে, হজরত ঈসার নিকটে কখনোই কোনো পুঞ্জীভূত সম্পদ ছিলো না, তাহলে তাঁকে জাকাত আদায় করতে বলা হবে কেনো? এর উত্তরে অনেকে বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য হবে এরকম— যদি আমার কাছে কখনো সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়, তখন জাকাত আদায়ের জন্য আমি নির্দেশপ্রাপ্ত। কেউ কেউ বলেন, এখানে জাকাত বলে মালের জাকাতের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে অধিকতর পুণ্যকর্ম করার কথা। কেউ কেউ আবার বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হবে এরকম— আল্লাহ্ আমাকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, আমি যেনো তোমাদেরকে নামাজ পাঠ করার এবং জাকাত আদায় করার কথা বলি।

এর পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত ও হতভাগ্য' একথার অর্থ— যে সকল হতভাগ্য লোক তাদের মাতা-পিতার সঙ্গে উদ্ধত আচরণ করে, আল্লাহ্ আমাকে সেভাবে সৃষ্টি করেননি। তাই আমি উদ্ধত যেমন নই, তেমনি নই হতভাগ্যও।

www.eelm.weebly.com

শেষোক্ত আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'আমার প্রতি ছিলো শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি ও শান্তি থাকবে যেদিন আমার মৃত্যু হবে ও যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুত্থিত হবো।' একথার অর্থ— আমার জন্ম শান্তিময়, মৃত্যু শান্তিময় এবং পুনরুত্থানও হবে শান্তিময়। তাই আল্লাহ্ আমাকে জন্মকালে রক্ষা করেছেন শয়তানের স্পর্শ ও প্রভাব থেকে। এভাবে তিনি আমার মৃত্যু ও মৃত্যু-উত্তর কবরের আযাব ও কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকেও রাখবেন নিরাপদ। আর আখেরাতেও নিরাপদ রাখবেন তাঁর অপরিতোষ ও জাহান্নামের আগুন থেকে। উল্লেখ্য যে, হজরত ঈসার একথায় প্রমাণিত হয় যে, তাঁকে যারা বিশ্বাস করে ভালোবাসে ও অনুসরণ করে, তাদের জীবন, মৃত্যু, মৃত্যুপরবর্তী পুনরুত্থানও হবে শান্তিময়। আর যারা তাঁকে শত্রুতাবশতঃ প্রত্যাখ্যান করবে তাদের উপর নেমে আসবে অশান্তি ও অভিসম্পাত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ওয়াস্‌সালামু আ'লা মানিত্ তাবায়াল হুদা'(এবং শান্তি তাদের উপর যারা হেদায়েতের পথ অনুসরণ করেছে)। কথাটির মধ্যে এই বক্তব্যটিও নিহিত রয়েছে যে, যারা হেদায়েতের পথে চলবে না, তাদের উপরে পতিত হবে অশান্তি ও অভিশাপ।

বাগবী বলেছেন, শিশু নবীর কথা শুনে জনতা হতবাক হয়ে গেলো এবং একথা বুঝতে বাধ্য হলো যে, হজরত মরিয়ম নিষ্কলুষ ও মহাপুণ্যবতী। এরপর থেকে কথা বলার বয়সে না পৌঁছানো পর্যন্ত হজরত ঈসা আর কথা বলেননি।

সূরা মার্‌য়াম ঃ আয়াত ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ○ مَا كَانَ
لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهٗ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ
فَيَكُوْنُ ○ وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○
فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ
يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○ اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ
الْيَوْمَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُ
وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ
عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ○

www.eelm.weebly.com

❒ এই-ই মরিয়ম-তনয় ঈসা। আমি বলিলাম সত্য কথা, যে-বিষয়ে উহারা বিতর্ক করে।

❒ সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহের কাজ নহে, তিনি পবিত্র, মহিমময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।

❒ আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক ও তোমাদিগের প্রতিপালক, সুতরাং তাঁহার ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ।

❒ অতঃপর দলগুলি নিজদিগের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করিল; সুতরাং দুর্ভোগ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের মহা দিবস আগমন কালে।

❒ উহারা যেদিন আমার নিকট আসিবে সেই দিন উহারা কত স্পষ্ট শুনিবে ও দেখিবে। কিন্তু সীমালংঘনকারীগণ আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

❒ উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে, যখন সকল সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে। এখন উহারা অনবধান এবং উহারা বিশ্বাস করিবে না।

❒ চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী আমি, পৃথিবীর ও তাহার উপর যাহারা আছে তাহাদিগের এবং উহারা আমারই নিকট প্রত্যানীত হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মরিয়ম-তনয় নবী ঈসার যে ঘটনা আমি আপনাকে জানালাম, এটাই তার সত্যিকারের পরিচয়। অথচ এই সত্যি কথা না মেনে খৃষ্টান ও ইহুদীরা অযথার্থ বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে হজরত ঈসা সম্পর্কে ইহুদী ও খৃষ্টানদের অপবিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ইহুদীরা তাঁকে বলে ব্যভিচারিণীর পুত্র। আর খৃষ্টানেরা বলে, তিনি আল্লাহ্র পুত্র। অথচ উভয় দলই মিথ্যাবাদী।

এর পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্র কাজ নয়, তিনি পবিত্র, মহিমময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।' একথার অর্থ — আল্লাহ্ চির অমুখাপেক্ষী। তাই তিনি স্ত্রী ও সন্তানের মুখাপেক্ষী কখনোই নন। তিনি স্রষ্টা, জন্মদাতা নন। তিনি পবিত্র, মহিমময়। তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলে, কেবল বলেন 'হও' — তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।

এর পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তাঁর ইবাদত করো, এটাই সরল পথ।' এখানে 'ইন্নাল্লহা রব্বি ওয়া রব্বুকুম' কথাটির মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালাই যে সকলের ও সকল কিছুর প্রভুপালনকর্তা, এই বিশ্বাসটিকে দৃঢ়বদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং 'তাঁর ইবাদত করো' কথাটির মাধ্যমে মান্য করতে বলা হয়েছে তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাকে। এভাবে বিশ্বাস ও কর্মকে সংশোধন করাই হচ্ছে সরলপথ। তাই শেষে বলা হয়েছে— 'এটাই সরল পথ'।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'অতঃপর দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করলো।' এখানে 'আল আহযাব' (দলগুলো) বলে বুঝানো হয়েছে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে, অথবা খৃষ্টানদের তিনটি দল— নাস্তুরীয়া, ইয়াকুবিয়া ও মালাকাইয়াহ্‌কে। নাস্তুরিয়ারা বলে, ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র। ইয়াকুবিয়ারা বলে, ঈসা স্বয়ং আল্লাহ্ এবং মানবরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করার পর পুনরায় তিনি আকাশে উঠে গিয়েছেন। আর মালাকাইয়ারা বলতো ঈসা আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসুল।

এখানে 'মিম্ বাইনিহিম' (নিজেদের মধ্যে) কথাটির 'মিন্' অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— হজরত ঈসার সহচরবর্গ সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। অথবা মতভেদ দেখা দিলো হজরত ঈসার মর্যাদা ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং দুর্ভোগ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মহাদিবস আগমনকালে।' এখানকার 'ওয়াইলুন' শব্দটি ধাতুমূল। এর অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। কথাটি জুমলায়ে ফেলিয়ার (ক্রিয়াবাচক বাক্য) স্থলাভিষিক্ত এবং সঙ্গত কারণেই কথাটি এখানে উদ্দেশ্য বা মুবতাদা। সেকারণে এই ক্রিয়াটি স্থায়ী। কোনো নির্দিষ্ট কালের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা প্রকাশিত হবে পরে— মহাদিবস বা কিয়ামতের সময়। এখানে 'ইয়াওমিন আজীম' (মহাদিবস) অর্থ কিয়ামতের দিবস। আর 'মাশহাদি' এখানে ধাতুমূলের অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ যেদিন গ্রহণ করা হবে হিসাব এবং দেয়া হবে পুরস্কার ও শাস্তি। অথবা কথাটি জরফে জামান (কালাধিকরণ কারক)। অর্থাৎ শুহুদের বা সাক্ষ্যদানের সময়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কিয়ামতের দিন অথবা মহাবিচারের দিবসে হবে চরম দুর্ভোগের মুখোমুখি, যখন ফেরেশতাগণ, নবীগণ ও তাদের নিজেদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের সাক্ষ্য প্রদান করবে।

এর পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'তারা যে দিন আমার নিকট আসবে, সেদিন কতো স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে।' এখানে 'কতো স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে' ক্রিয়া দু'টো বিস্ময়প্রকাশক, কিন্তু আল্লাহ্ সকল প্রকার বিস্ময়বোধ থেকে পবিত্র। তাই প্রসিদ্ধ তাফসীরকারগণ আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন— তাদের অবস্থা বিস্ময়ের উপযোগী। কারণ তারা দুনিয়ায় চোখ থাকতেও অন্ধ এবং কান থাকতেও বধির। তাই তারা দেখতে পায় না সত্যের স্বরূপ এবং শুনতে পায় না সত্যের আহ্বান। কিন্তু কিয়ামতের দিন সত্যের আহ্বান তারা যেমন স্পষ্টভাবে শুনবে, তেমনি স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারবে সত্যের স্বরূপ। কিন্তু এমতো

www.eelm.weebly.com

সঠিক দর্শন ও শ্রবণ সেদিন তাদের কোনো উপকারে আসবে না। অথবা বিস্ময় প্রকাশক ক্রিয়ার মাধ্যমে এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সতর্ক করে ভয় দেখানোই উদ্দেশ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মহাবিচারের দিবসে তারা প্রত্যক্ষ করবে তিরস্কার ও শাস্তি এবং শুনবে চিরহতাশার বাণী— যে কথা তাদেরকে পূর্বাহ্নেই জানানো হয়েছিলো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার ক্রিয়া দু'টি (দেখা ও শোনা) বিস্ময়প্রকাশক নয়। বরং নির্দেশ প্রকাশক। অর্থাৎ রসুল স.কে এখানে এইমর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হে আমার রসুল! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সত্যপ্রত্যাখ্যানের স্বরূপ দেখিয়ে দিন এবং শুনিয়ে দিন তাদের অপপরিণতির কথা, যা সুনির্ধারিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু সীমালংঘনকারীগণ আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।' এখানে 'সীমালংঘন' কথাটির উল্লেখ করে এ কথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, পৃথিবীতে তারা তাদের দৃষ্টি ও শ্রুতিকে যথাযথরূপে ব্যবহার করেনি। বরং এ সম্পর্কে উদাসীন থেকে পড়ে রয়েছে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।

এর পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে, যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে।' উল্লেখ্য যে, সকলের হিসাব-নিকাশ সমাপনের পর একদল চলে যাবে জান্নাতে এবং আরেক দল চলে যাবে দোজখে। তারপর জবাই করা হবে মৃত্যুকে। ফলে জান্নাতবাসী ও দোজখবাসী কেউই আর মৃত্যুবরণ করবে না। তাই ওই দিবস হবে বড়ই পরিতাপের, যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। সেই চূড়ান্ত পরিণতির কথাই আলোচ্য বাক্যে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— হে আমার রসুল! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ওই পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিন, যখন দান করা হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হাশর প্রান্তরে মৃত্যুকে হাজির করা হবে ভেড়ার আকৃতিতে। এক আহ্বানকারী তখন জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে, তোমরা কি একে চিনতে পারছো? জান্নাতবাসীরা বলবে হ্যাঁ, এতো মৃত্যু। এরপর সকলের সামনে ভেড়ার আকৃতি বিশিষ্ট মৃত্যুকে জবাই করা হবে। আহ্বানকারী বলবে, হে জান্নাতবাসী! জান্নাত হচ্ছে তোমাদের চিরস্থায়ী আবাস, তোমরা আর কখনো মৃত্যুমুখে পতিত হবে না। এরপর আহ্বানকারী দোজখবাসীদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের দোজখবাসও চিরস্থায়ী এবং তোমরাও অমর। এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন

www.eelm.weebly.com

'তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপ দিবস সম্বন্ধে, যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে।' বোখারী ও মুসলিম। হজরত ইবনে ওমর ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হজরত ইবনে ওমরের হাদিসটিতে আবৃত্তি করার প্রসঙ্গটি নেই।

হজরত আনাস থেকে আবু ইয়ালী, বায্যার ও তিবরানী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাকেম ও ইবনে হাব্বানও এরকম হাদিস উল্লেখ করেছেন। এ হাদিসটিতেও আবৃত্তি করার উল্লেখ নেই।

'পরিতাপের দিবস' সম্পর্কে বায়যাবী লিখেছেন, ওই দিন সকলেই পরিতাপ বা আক্ষেপ করতে থাকবে। পাপিষ্ঠরা আক্ষেপ করতে থাকবে পাপের কারণে এবং পুণ্যবানেরা আক্ষেপ করতে থাকবে পুণ্যকর্ম কম করার কারণে।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে তিবরানী ও আবু ইয়ালী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, জান্নাতবাসীরা দুঃখ প্রকাশ করতে থাকবে ওই সময়ের জন্য, যে সময় তারা অতিবাহিত করেছিলো আল্লাহ্র স্মরণবিচ্যুত অবস্থায়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, পরলোকগত সকলেই অনুতপ্ত হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কীভাবে? তিনি স. বললেন, পুণ্যবানেরা অনুতপ্ত হবে এই ভেবে যে, হায় আরো অধিক পুণ্যকর্ম করলাম না কেনো? আর পাপিষ্ঠরা অনুতাপানলে দগ্ধ হতে থাকবে একথা ভেবে যে, হায়! কেনো বিরত থাকতে পারলাম না পাপ কর্ম থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এখন তারা অনবধান এবং তারা বিশ্বাস করবে না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! দেখুন, এখনো তারা পাপমগ্ন, এখনো অজ্ঞ ও অসতর্ক পরকালের ভয়াবহ আযাব সম্পর্কে। তাদের উদাসীনতা অনড়। তাই আপনি চাইলেও তারা আপনার কথা বিশ্বাস করবে না।

শেষোক্ত আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী আমি, পৃথিবীর ও তার উপরে যারা আছে তাদের এবং তারা আমারই নিকট প্রত্যানীত হবে।' একথার অর্থ— পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীরা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমিই হবো সব কিছুর চূড়ান্ত মালিক। শেষ পর্যন্ত সকলকে ফিরে আসতে হবে আমার নিকটেই। আমি তখন প্রত্যেকের কর্মফল অনুসারে কাউকে করবো পুরস্কৃত এবং কাউকে করবো তিরস্কৃত।

এখানে 'মান' শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে সকল সৃষ্টিকে। অথবা বিবেকবান ও বিবেকহীন সকল প্রাণীকে। এভাবে বলা হয়েছে, চূড়ান্ত মালিকানা কেবল আল্লাহ্র, অন্য কারো নয়। আর সকলের অবশেষ প্রত্যাবর্তন কেবল আল্লাহ্র নিকটেই।

www.eelm.weebly.com

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ○ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ
يٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ○ يٰاَبَتِ
اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا
سَوِيًّا ○ يٰاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ○
يٰاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ
لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ○

❒ বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লেখিত ইব্‌রাহীমের কথা; সে ছিল সত্যবাদী ও নবী।

❒ যখন সে তাহার পিতাকে বলিল, 'হে আমার পিতা! যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না তুমি তাহার ইবাদত কর কেন?

❒ 'হে আমার পিতা! আমার নিকট তো আসিয়াছে জ্ঞান যাহা তোমার নিকট আসে নাই, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাইব।'

❒ 'হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করিও না। শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য।'

❒ 'হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করিবে এবং তুমি শয়তানের সাথী হইয়া পড়িবে।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বর্ণনা করো, এই কিতাবে উল্লেখিত ইব্রাহিমের কথা; সে ছিলো সত্যবাদী ও নবী।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এই কোরআনে বর্ণিত নবী ইব্রাহিমের কথা জনসমক্ষে প্রচার করুন, যিনি ছিলেন সত্যবাদী।

এখানে 'সিদ্‌দীক্ব' কথাটির অর্থ সত্যবাদী। এখন কথা হচ্ছে, সত্যবাদী বলে কাকে? এসম্পর্কে বিভিন্ন আলেম বিভিন্ন কথা বলেছেন, যেমন— ১. অত্যন্ত সত্যপরায়ণ। ২. যিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। ৩. যিনি সত্য উচ্চারণে সতত অভ্যস্ত, যার কারণে তার নিকট থেকে কখনো মিথ্যা প্রকাশিত হতে পারে না। ৪. যার বিশ্বাস, বাক্য ও কর্ম সম্পূর্ণরূপে সত্যের অনুকূল। ৫. যিনি আল্লাহ্,

www.eelm.weebly.com

পূর্ববর্তী নবী-রসুল, ফেরেশতা, কিয়ামত ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়াবলীকে সত্য বলে জানেন এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাকে জানেন শুভ ও অশুভরূপে। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যিনি সতত অনুগত।

আমি বলি, অত্যধিক সত্যপরায়ণতার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, বিশ্বাস্য বিষয়সমূহকে তিনি বিস্তারিতভাবে জানেন। বাগবীর বর্ণনানুসারে বাহ্যত একথাই অনুমিত হয়। রসুল স. কর্তৃক আনীত ধর্মাদর্শ, আকায়েদ ও আমলের প্রতি বিশ্বাস রাখা সকল মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যক, যদিও রসুল স. এর কোনো একটি আদর্শকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যেতে হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রকৃত বিশ্বাসীরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সকল কথা মেনে নেয় এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়। যাদের এই উদ্যোগ সফল হয়, তাঁরাই পুণ্যবান বা সলিহীন। কিন্তু তাঁরা সিদ্দীক নন। সিদ্দীকিয়াত বা সত্যবাদিতার মর্যাদা এর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। প্রচণ্ড ইমানী শক্তি ব্যতিরেকে ওই স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। নবী-রসুলগণ ওই প্রচণ্ডতম ইমানী শক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভ করেন সরাসরি, মাধ্যম বিবর্জিতরূপে। আর উম্মতেরা তা লাভ করেন তাঁদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অর্থাৎ সামগ্রিক আনুগত্যের মাধ্যমে। তাঁরা যখন কামালাতে নবুয়তের নূরে নিমগ্ন হন, তখন উত্তরাধিকারিত্বের সূত্রে তাঁদের উপরেও বর্ষিত হয় আল্লাহ্‌র সত্তাগত বিচ্ছুরণ (জাতি তাজাল্লি)। আর ওই সময়েই তাঁরা উন্নীত হতে পারেন সত্যবাদিতার স্তরে। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ও রসুলের একনিষ্ঠ অনুসারীরা, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন, সেই সকল সিদ্দীক, শহীদ ও সলিহীনের সঙ্গী হবে' (সুরা নিসা)। এই আয়াতে স্পষ্টরূপে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহধন্য, ব্যক্তিগণ চার শ্রেণীর— নবী, সিদ্দীক, শহীদ, সলিহীন। আরো সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তাঁদের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসীরাও হবেন তাঁদের সঙ্গী। সুরা নিসার তাফসীরে যথাস্থানে বিষয়টির বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর সুরা ওয়াকিয়ায় সিদ্দীক সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'ছুল্লাতুম মিনাল আউয়ালীন ওয়া কুলীলুম্ মিনাল আখিরীন' (বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে)। এই আয়াতের ব্যাখ্যাও যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করা হবে ইনশাআল্লাহ্তায়ালা।

নবী-রসুলগণের পরে শেষ রসুল স. এর সাহাবীগণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ সিদ্দীক পর্যায়ভূত। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। আর তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠজন ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক। রসুল স. স্বয়ং তাঁকে সিদ্দীক আখ্যা দিয়েছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেমগণ এ বিষয়ে একমত। হজরত আবু বকর স্বয়ং বলেছেন, আমিই সিদ্দীকে আকবর (সত্যবাদী শ্রেষ্ঠ)। আমার পরে যে সত্যবাদী শ্রেষ্ঠ বলে নিজেকে জাহির করবে, সে মিথ্যাবাদী।

www.eelm.weebly.com

এখানকার 'নাবিউন' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'নবুওয়াত' থেকে। এর অর্থ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যাঁকে নির্বাচন করা হয়েছে তাঁর বাণী প্রচারকরূপে। নবুওয়াত কথাটির শাব্দিক অর্থ টিলা, মাটি ঠেলে ওঠা উঁচু অংশ। অথবা শব্দটি সংগৃহীত হয়েছে 'নাবাউন' (সংবাদ) থেকে অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যিনি সত্য ধর্মের সংবাদ পরিজ্ঞাত, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যাকে দেয়া হয় সত্যের সংবাদ।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'যখন সে তার পিতাকে বললো, হে আমার পিতা! যে শোনে না, দেখে না, এবং তোমার কোনো কাজে আসে না তুমি তার ইবাদত করো কেনো?' একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতাকে বললেন, হে আমার জনয়িতা! যে আপনার প্রার্থনা ও আকুতি শুনতে পায় না, দেখতে পায় না আপনার উপাসনা ও অন্যান্য অবস্থা এবং যে আপনার উপকার করার সামর্থ্যও রাখে না, সেই জড় প্রতিমাগুলোর উপাসনা আপনি করেন কেনো?

লক্ষণীয় যে, হজরত ইব্রাহিম এখানে তাঁর পিতাকে সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন নিতান্ত আদব ও সম্মানের সঙ্গে। কঠোর কণ্ঠে তাকে সরাসরি গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করেননি। পরোক্ষভাবে একথাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, প্রতিমাপূজা করা বুদ্ধিবিরোধী একটি অসংগত আচরণ। উপাসনা তো করা উচিত ওই পবিত্র সত্তার, যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী। যিনি সুখ ও দুঃখের মালিক। সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা ও সর্বশক্তিধর। যিনি তাঁর উপাসকদের কল্যাণ দান করতে ও তাদের ক্ষতি প্রতিরোধ করতে সক্ষম। জীবন মৃত্যু, জীবিকা দান করা না করা এবং শাস্তি ও স্বস্তির নির্ধারণ যার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। এভাবে নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলো কেবল নয়, সপ্রাণ সৃষ্টিকুলের কেউ অথবা কোনো কিছুই উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, যদিও তাদের মধ্যে কারো কারো রয়েছে শ্রুতি, দৃষ্টি, অনুভূতি, বাকশক্তি এবং উপকার প্রদানের সাময়িক স্বাধীনতা। কারণ তারাও তাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য সেই চির অমুখাপেক্ষী আনুরূপ্যবিহীন স্রষ্টা ও প্রভুপালনকর্তার মুখাপেক্ষী। বিশুদ্ধ বিবেক তাই কখনোই গায়রুল্লাহ্র উপাসনাকে সমর্থন করে না। ফেরেশতা ও পয়গম্বরের মতো মহা সম্মানার্হ সৃষ্টিও তাই উপাস্য হওয়ার যোগ্যতারহিত।

এর পরের আয়াতে(৪৩) বলা হয়েছে— 'হে আমার পিতা! আমার নিকট তো এসেছে জ্ঞান যা তোমার নিকট আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাবো।' এ কথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম বললেন, হে আমার জনক! লক্ষ্য করুন, আমার নিকট এসেছে আল্লাহ্র সত্তা, গুণবত্তা ও তাঁর

www.eelm.weebly.com

আজ্ঞা-নিষেধাজ্ঞাসমূহের জ্ঞান। এই জ্ঞাম আপনার নিকটে নেই। সুতরাং আপনি আমাকে অনুসরণ করে এই জ্ঞান ও যথার্থ পথনির্দেশনাকে গ্রহণ করুন। পথ-প্রদর্শকরূপে মান্য করুন আমাকে। আমি আপনাকে প্রদর্শন করবো সরলতার পথ। লক্ষণীয় যে, এখানেও হজরত ইব্রাহিম সরাসরি নিজেকে জ্ঞানী এবং তাঁর পিতাকে অজ্ঞ বলে আখ্যা দেননি। বরং তিনি অত্যন্ত নম্র ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর প্রিয় পিতাকে আহ্বান জানিয়েছেন আল্লাহ্র প্রদত্ত জ্ঞান ও আল্লাহ্ প্রদত্ত সরল পথের দিকে।

এর পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত কোরো না। শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য।' একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম বললেন, হে আমার জনক! শয়তানই আপনাকে প্রতিমা পূজার প্রতি প্ররোচিত করেছে। তাই প্রতিমার উপাসনা মূলতঃ শয়তানেরই উপাসনা। শয়তান কখনো কারো আরাধ্য হতে পারে না। সুতরাং আপনি শয়তানের উপাসনা করবেন না। কারণ সে আল্লাহ্র অবাধ্য। অবাধ্য ও অবাধ্যদের অনুসারীরা কখনোই আল্লাহ্র নৈকট্য, ভালোবাসা ও পরিতোষ লাভ করতে পারে না।

শেষের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি শয়তানের সাথী হয়ে পড়বে।' একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম আরো বললেন, হে আমার পিতৃপ্রবর! আপনি যদি প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ না করেন, তবে আমি আশংকা করি পৃথিবীতে অথবা পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী উভয় স্থানে আপনি হবেন আল্লাহ্র শাস্তিগ্রস্ত। হয়ে যাবেন শয়তানের চিরসাথী। কেননা আল্লাহ্ পরম দয়াপরবশ বিশ্বাসীদের প্রতি। কিন্তু অবিশ্বাসীদের প্রতি তিনি অত্যন্ত নির্মম, কঠোর। অতএব আপনি তাঁর প্রতি আনয়ন করুন বিশুদ্ধ বিশ্বাস।

বায়যাবী লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে কেবল শয়তানের অবাধ্য হওয়ার কথা। তার অন্য কোনো পাপের কথা পূর্ববর্তী আয়াতে যেমন আসেনি, তেমনি আসেনি আলোচ্য আয়াতেও। সম্ভবতঃ এর কারণ এই যে, অবাধ্যাচরণই সকল অপরাধের মূল। অন্য সকল অপরাধই অবাধ্যতার অন্তর্গত। অথবা শয়তানের অবাধ্যতার কথা প্রকাশ করে তার সাথী বা অনুসারী হতে এখানে নিষেধ করা হয়েছে এই মর্মে যে, শয়তান কেবল আল্লাহ্র অবাধ্য নয়, একই সঙ্গে তোমাদের প্রথম পিতা আদমেরও শত্রু। সুতরাং তার অনুসরণ মানুষের জন্য শোভন হতে পারে কীরূপে?

www.eelm.weebly.com

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِیْ یٰۤاِبْرٰهِیْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِیْ مَلِیًّا ○ قَالَ سَلٰمٌ عَلَیْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّیْ اِنَّهٗ كَانَ بِیْ حَفِیًّا ○ وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّیْ عَسٰۤی اَلَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّیْ شَقِیًّا ○ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا یَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِیًّا ○ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیًّا ○

❒ পিতা বলিল, 'হে ইব্‌রাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হইতে বিমুখ হইতেছ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করিবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যাও।'

❒ ইব্‌রাহীম বলিল, তোমার নিকট হইতে বিদায়। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।

❒ 'আমি তোমাদিগ হইতে ও তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগের ইবাদত কর তাহাদিগ হইতে পৃথক হইতেছি; আমি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করি; আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া আমি ব্যর্থকাম হইব না।'

❒ অতঃপর সে যখন তাহাদিগ হইতে ও তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগের ইবাদত করিত সেই সকল হইতে পৃথক হইয়া গেল তখন আমি তাহাকে দান করিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করিলাম।

❒ এবং তাহাদিগকে আমি দান করিলাম আমার অনুগ্রহ ও তাহদিগকে দিলাম সমুচ্চ যশ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পিতা বললো, হে ইব্রাহিম! তুমি কি আমার দেব-দেবী থেকে বিমুখ হচ্ছো?' একথার অর্থ— বিস্ময় ও ক্রোধের সঙ্গে পিতা বললো, আমার পরম আরাধ্য দেব-দেবী সম্পর্কে তুমি এরকম কটূক্তি করলে কোন সাহসে? তবে কি তুমি তাদেরকে অস্বীকার করো? লক্ষণীয় যে, হজরত ইব্রাহিম এতক্ষণ ধরে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করে এসেছেন 'হে আমার পিতা'— এরকম

www.eelm.weebly.com

সম্মানজনক সম্বোধনের মাধ্যমে। কিন্তু তাঁর পিতা 'হে আমার পুত্র'— এরকম স্নেহ-বাৎসল্যভরা কণ্ঠে কথা বলেননি। তাচ্ছিল্য, ঘৃণা ও উত্তেজনার সুরে সরাসরি বলেছেন, 'হে ইব্রাহিম'। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানে জ্ঞানী ও আল্লাহ্র প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসস্থাপনকারীগণই প্রকৃত জ্ঞানী, আর সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীরা প্রকৃত অর্থেই অজ্ঞ।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে আমি প্রস্তরের আঘাতে তোমার প্রাণনাশ করবোই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাও।' কালাবী, মুকাতিল ও জুহাক 'লাআরজুমান্নাকা' কথাটির অর্থ করেছেন— আমি তোমাকে গালি দিবো, কঠোর ভাষায় আক্রমণ করবো, বকা-ঝকা করে বের করে দিবো। এরকম অর্থ করা হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতানুসারে। হাসান কথাটির অর্থ করেছেন— আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করবো।

কালাবীর মতে 'ওয়াহ্জুরনী মালিয়্যা' কথাটির অর্থে— আমার নিকট থেকে চিরতরে পৃথক হয়ে যাও। মুজাহিদ ও ইকরামা 'মালিয়্যা' শব্দটির অর্থ করেছেন, সুদীর্ঘ সময়। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, সকল সময়, চিরদিন। 'মালী' কথাটির শাব্দিক অর্থ অবস্থান করা। যেমন বলা হয় 'তাম্লাইতু হীনা' (আমি কিছুকাল অবস্থান করেছি)। 'মালাওয়ান' অর্থ দিবস-রজনী। কাতাদা ও আতা বলেছেন, 'তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাও' কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে তুমি চিরদিনের জন্য আমার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো। কোনোদিন আর এমুখো হয়ো না।

এর পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'ইব্রাহিম বললো, তোমার নিকট থেকে বিদায়। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।' এখানে বিদায় সম্ভাষণ জানানো হয়েছে 'সালামুন আলাইকা' কথাটির মাধ্যমে। বিশ্বাসী, জ্ঞানী ও প্রতিভাধর ব্যক্তিবর্গ মূর্খতার বিপরীতে এভাবেই শিষ্টাচার প্রদর্শন করে থাকেন। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশও এরকম। যেমন— 'তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে সালাম।' 'সালামুন আলাইকা' বলার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে, আমার পক্ষ থেকে আপনার কোনো অনিষ্ট হবার আশংকা নেই। আপনি আমার সঙ্গে যত রূঢ় আচরণই করুন না কেনো, আমি ক্রমাগত আপনার জন্য আমার প্রভুপালনকর্তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো।

www.eelm.weebly.com

অধিকাংশ তাফসীরবিশারদ 'আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো' সম্পর্কে বলেছেন, কথাটির অর্থ এরকম নয় যে, আপনি যা কিছুই করুন না কেনো, আমি আল্লাহ্‌র কাছে আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। বরং অর্থ হবে এরকম— আমি আমার প্রভুপালকের নিকটে এইমর্মে প্রার্থনা জানাবো যে, তিনি যেনো দয়া করে আপনাকে তওবা করার সুযোগ দান করেন এবং প্রদান করেন ইসলাম গ্রহণের তৌফিক, যা হবে আপনার ক্ষমার কারণ। উল্লেখ্য যে, বিধর্মীদের জন্য ইসলাম গ্রহণের তৌফিক চেয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করা যায়।

আমি বলি, বর্ণিত ব্যাখ্যাটি ভুল। কারণ আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন— তোমাদের জন্য ইব্রাহিম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ (সুরা মুমতাহিনা)। এই আয়াতে হজরত ইব্রাহিমের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং শেষে একথাও জানানো হয়েছে যে, অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়ে তোমরা নবী ইব্রাহিমের অনুসরণ কোরো না, যদিও তাদের জন্য ইমানের তৌফিক বা সামর্থ্য চেয়ে দোয়া করা যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে, এখানে হজরত ইব্রাহিমের অনুসরণের নির্দেশ দেয়ার পরে তাঁর দোয়া করার ব্যাপারটি আবার ব্যতিক্রমরূপে চিহ্নিত করা হলো কেনো? এর উত্তরে বলতে হয়, হজরত ইব্রাহিমের তখনো পর্যন্ত একথা জানা ছিলো না যে, মুশরিকদের জন্য প্রার্থনা অবৈধ। বিষয়টি সম্পর্কে যখন তাঁকে জানানো হলো, তখন তিনি বিরত রইলেন ক্ষমা প্রার্থনা থেকে এবং চিরদিনের জন্য তাঁর পিতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটালেন। রসুল স.ও তাঁর প্রিয় পিতৃব্য আবু তালেবকে একবার বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আপনার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতেই থাকবো, যতক্ষণ না এ সম্পর্কে আমাকে নিষেধ করা হয়। এরপর অবতীর্ণ হলো— 'নবী ও বিশ্বাসীদের জন্য মুশরিকদের ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনা অশোভন' (সুরা তওবা)। যথাস্থানে এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, নবী-রসুলগণের বিশেষ দোয়া কবুল করা হয়। হজরত ইব্রাহিমও তাঁর পিতার ইমান গ্রহণের তৌফিক প্রার্থনা করলে তা পূরণ করা হতো। কিন্তু তাঁর পিতা আজরের তকদীরে ইমান ছিলোই না। তাই হজরত ইব্রাহিমকে তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা থেকে বিরত রাখা হয়েছিলো, যেমন বিরত রাখা হয়েছিলো রসুল স.কে তাঁর পিতৃব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা থেকে।

কালাবী বলেছেন, 'হাফিয়্যা' কথাটির অর্থ— তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। তিনি আমার প্রার্থনা সম্পর্কে জ্ঞাত ও তিনি তা গ্রহণও করে থাকেন। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ— তিনি আমাকে কবুল হওয়ার যোগ্য প্রার্থনায় অভ্যস্ত করেছেন, তাই আমার দোয়া ও বদ্‌দোয়া দু'টোই গৃহীত হয়।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'আমি তোমাদের নিকট থেকে ও তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত করো, তাদের নিকট থেকে পৃথক হচ্ছি।' মুকাতিল বলেছেন, একথা বলে হজরত ইব্রাহিম তাঁর আপন পরিবার ও ওই জনপদের সকল মুশরিকদের নিকট থেকে চলে গিয়েছিলেন অনেক দূরে এক অংশীবাদিতামুক্ত স্থানে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করি; আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহ্বান করে আমি ব্যর্থকাম হবো না।' একথার অর্থ— হে মুশরিক সম্প্রদায়! দেব-দেবীদের উপাসনা করে তোমরা যেমন বরবাদ হয়ে গিয়েছো, সেরকম বরবাদ আমি কস্মিনকালেও হবো না। কারণ আমি এক ও অংশীবিহীন আল্লাহ্র উপাসক, যিনি চির অক্ষয়, চির অমুখাপেক্ষী। উল্লেখ্য যে, এখানে কেবল বিনয় প্রকাশার্থে হজরত ইব্রাহিম তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাসকে 'আশা করি' কথাটির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। সুতরাং এরকম ধারণা এখানে অসঙ্গত যে, তিনি তাঁর সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। তাঁর এমতো বিনয়াবনত উচ্চারণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, দোয়া কবুল করা এবং পুণ্যপ্রদান করার বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র দয়া ও অভিপ্রায়নির্ভর। এরকম করতে তিনি বাধ্য নন। সীমাবদ্ধতা ও বাধ্যতার অধীন তিনি কখনোই নন। আরো একটি কথা এখানে প্রমাণিত হয় যে, শুভ সমাপ্তির উপরেই নির্ভর করে প্রকৃত পরিণতি এবং ভবিষ্যতে কি হবে, তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না।

এর পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে যখন তাদের নিকট থেকে ও তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত করতো, সেই সকল থেকে পৃথক হয়ে গেলো, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম।' একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইব্রাহিমের হিজরতের সিদ্ধান্তে প্রসন্ন হলেন। হজরত ইব্রাহিম তাঁর কাফের আত্মীয় স্বজনকে ছেড়ে চলে গেলেন সিরিয়ায়। সেখানে আল্লাহ্ তাঁর বংশে দান করলেন দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে এবং দু'জনকেই তিনি করলেন তাঁর প্রিয়ভাজন নবী।

বায়যাবী লিখেছেন, হজরত ইব্রাহিমের বংশে অনেক নবী আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু হজরত ইসহাক ও হজরত ইয়াকুব ছিলেন ওই সকল নবী-রসুলের স্বনামধন্য পূর্বসূরী। তাঁর প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইলের কথা এখানে সম্ভবতঃ একারণে উল্লেখ করা হয়নি যে, তাঁর আলোচনা উল্লেখিত হবে পৃথকরূপে অনন্যসাধারণ বিবরণে। কারণ তাঁর বংশে সুদীর্ঘকাল পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন শেষতম, পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠতম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.।

শেষের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে আমি দান করলাম আমার অনুগ্রহ।' একথার অর্থ— আমি ওই তিনজনকেই দান করেছিলাম আমার অফুরন্ত রহমত। কালাবী বলেছেন, এখানে 'রহমত' (অনুগ্রহ) কথাটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে সম্মান ও সম্পদবিশিষ্ট সন্তানকে। কেউ কেউ বলেছেন, কিতাব ও নবুয়তকে।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'ও তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ যশ।' 'লিসানা সিদ্ক্ব' অর্থ এখানে সমুচ্চ যশ। যে যশ ও সাধুবাদ রসনা সহযোগে উচ্চারিত হয়, সেই সুনাম বা সুখ্যাতির কথাই বলা হয়েছে কথাটির মাধ্যমে। সমুচ্চ যশ অর্থ ওই খ্যাতিমানতা যা সকল মতাদর্শের লোকেরা যুগে যুগে প্রশংসাচ্ছলে উচ্চারণ করে থাকে। হজরত ইব্রাহিমও আল্লাহ্‌র নিকটে এরকম যশ প্রার্থী হয়েছিলেন। তাঁর ওই প্রার্থনার কথা এক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— 'আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী করো' (সুরা শুআরা)। বলা বাহুল্য যে, আল্লাহ্‌পাক তাঁর এই দোয়া কবুল করেছিলেন।

সূরা মার্‌য়াম ঃ আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ○ وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ○ وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ○ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ○ وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ○

❒ এই কিতাবে উল্লেখিত মূসার কথা বর্ণনা কর, সে ছিল বিশুদ্ধচিত্ত এবং সে ছিল রসূল, নবী।

❒ তাহাকে আমি আহ্বান করিয়াছিলাম তূর্ পর্বতের দক্ষিণ দিক হইতে এবং আমি গূঢ়তত্ত্ব আলোচনা-রত অবস্থায় তাহাকে নিকটবর্তী করিয়াছিলাম।

❒ আমি নিজ অনুগ্রহে তাহাকে দিলাম তাহার ভ্রাতা হারুনকে নবীরূপে।

❒ এই কিতাবে উল্লেখিত ইস্‌মাইলের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী, এবং সে ছিল রসূল, নবী;

❒ সে তাহার পরিজনবর্গকে সালাত ও জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত ও সে ছিল তাহার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি এই কোরআনে উল্লেখিত মুসার কথা মানুষকে জানিয়ে দিন, তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধচিত্ত নবী ও রসুল।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'মুখলিসান' অর্থ বিশুদ্ধচিত্ত। অর্থাৎ তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ অভিমুখী, অন্যের আকর্ষণ থেকে তাঁর হৃদয় ছিলো সতত মুক্ত। আল্লাহ্ কর্তৃক বিশেষভাবে নির্বাচিত বলেই তিনি হতে পেরেছিলেন এরকম বিশুদ্ধ ও পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী।

'রসুলান নাবীয়্যা' অর্থ রসুল ও নবী। উল্লেখ্য যে, নবী অপেক্ষা রসুল অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। তাই এখানে প্রথমে 'রসুলান' উল্লেখ করার পর উল্লেখ করা হয়েছে 'নাবীয়্যান' শব্দটি। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ যাঁকে ইচ্ছা করেন তাঁকেই দান করেন নবী ও রসুলের মতো মহা সম্মানিত পদমর্যাদা। হজরত মুসাও ছিলেন তেমনি এক মহা সম্মানিত নবী ও রসুল।

এর পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'তাকে আমি আহ্বান করেছিলাম তুর পর্বতের দক্ষিণ দিক থেকে।' মিসর ও মাদায়েনের মধ্যবর্তী এক পাহাড়ের নাম তুর। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ওই পাহাড়ের আরেকটি নাম জোবায়ের। হজরত মুসা তখন মাদায়েন থেকে যাচ্ছিলেন মিসরের দিকে। ডান পাশে ছিলো তুর পাহাড়। যখন সেখানে রাত্রি হলো, তখন তিনি দূর থেকে দেখলেন তুর পাহাড়ে জ্বলছে একটি আগুন। তিনি সেদিকে রওনা দিলেন। আগুনের কাছাকাছি হতেই শুনতে পেলেন— হে মুসা! নিশ্চয় আমিই আল্লাহ্, যিনি মহা বিশ্বের প্রভুপ্রতিপালক। হজরত মুসা সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গেলেন ওই অলৌকিক আগুনের দিকে। সেই সময়ের কথাই আলোচ্য আয়াতের শুরুতে বিবৃত হয়েছে এভাবে— তাকে আমি আহ্বান করেছিলাম তুর পর্বতের দক্ষিণ দিক থেকে।

এখানকার 'আইমান' কথাটির অর্থ 'দক্ষিণ দিক থেকে' না হয়ে 'বরকতময় দিক থেকে'ও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তাকে আমি আহ্বান করেছিলাম তুর পর্বতের বরকতময় দিক থেকে, যেদিক থেকে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন আল্লাহ্র কালাম।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি গূঢ় তত্ত্ব আলোচনারত অবস্থায় তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম।' একথার অর্থ— আমি তখন তার সঙ্গে করেছিলাম নিগূঢ় তত্ত্বালোচনা এবং দান করেছিলাম আনুরূপ্যবিহীন এক নৈকট্য।

এর পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভ্রাতা হারুনকে নবীরূপে।' হজরত হারুন ছিলেন হজরত মুসার অগ্রজ। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের অর্থ এরকম হতে পারে না যে, হজরত মুসার কারণে আল্লাহ্ তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। বরং প্রকৃত কথা এই যে, হজরত মুসা তাঁর নবুয়ত লাভের জন্য দোয়া করেছিলেন। আর সে দোয়া কবুল করে নিয়েছিলেন

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্পাক। এটা ছিলো তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ। তাই এখানে বলা হয়েছে— আমি নিজ অনুগ্রহে হারুনকে করলাম নবী এবং তার একান্ত সঙ্গী। বাগবী লিখেছেন, একারণে হজরত হারুনের এক নাম 'হিবাতুল্লাহ্' (আল্লাহ্র দান)।

এর পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'এই কিতাবে উল্লেখিত ইসমাইলের কথা বর্ণনা করো, সে ছিলো প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিলো রসুল, নবী।' হজরত ইসমাইল ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের প্রিয় পুত্র এবং শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর পূর্ব পুরুষ, আর ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সততা ও নিষ্ঠার এক পরম পরাকাষ্ঠা। মুজাহিদ বলেছেন, তিনি তাঁর অঙ্গীকারসমূহ প্রতিপালন করেছিলেন নিখুঁতভাবে।

মুকাতিল বলেছেন, হজরত ইসমাইল একবার এক ব্যক্তির সঙ্গে এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকবো। ওই ব্যক্তি ফিরে এলো তিনদিন পর। কালাবীর বর্ণনানুসারে এক বছর পর। ফিরে এসে ওই লোকটি দেখলো হজরত ইসমাইল তখনো সেখানে তার জন্যে অপেক্ষমান। হজরত ইব্রাহিম যখন প্রিয়পুত্রকে কোরবানী করবার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখনো তিনি ছিলেন তাঁর প্রতিজ্ঞাপালনে অনড় ও অবিচল। বলেছিলেন— 'ইনশাআল্লাহ্, আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভূত হিসেবে দেখবেন।'

বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, শরিয়ত-প্রবর্তক হওয়া সকল নবীর বৈশিষ্ট্য নয়। হজরত ইসমাইল ছিলেন রসুল। তৎসত্ত্বেও তিনি ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের শরিয়তের অনুসারী। একইভাবে তাঁর অপর সন্তানও ছিলেন তাঁরই শরিয়তের অনুগামী।

শেষের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতো ও সে ছিলো তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।' বিশ্বাসীগণের দায়িত্ব হচ্ছে প্রথমে নিজেকে সংশোধন করা। তারপর সংশোধন করা পরিবার পরিজনকে। তারপর অন্যান্য নিকটজনকে। তাই হজরত ইসমাইল তাঁর পরিজনবর্গকে নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন। আল্লাহ্র নির্দেশও এরকম। বিভিন্ন আয়াতে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— ১. এবং তুমি তোমার পরিজন ও নিকটবর্তীদেরকে ভয় প্রদর্শন করো। ২. তোমার পরিজনদেরকে নামাজের আদেশ দাও। ৩. দোজখ থেকে নিজে বাঁচো এবং পরিবার পরিজনদেরকে বাঁচাও। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'আহল' (পরিজনবর্গ) কথাটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে সমস্ত উম্মতকে। কারণ নবী-রসুলগণ তাঁদের আপন আপন উম্মতের পিতাসদৃশ।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে নামাজ ও জাকাত দ্বারা ওই শরিয়তকেই বোঝানো হয়েছে, যার বাস্তবায়ন ফরজ ছিলো হজরত ইসমাইলের উপরে এবং একই সঙ্গে যা ছিলো হজরত ইব্রাহিমেরও ফরজ দায়িত্বভূত। উল্লেখ্য যে, শারীরিক ইবাদতের মধ্যে নামাজ এবং সম্পদগত ইবাদতের মধ্যে জাকাতই সর্বোত্তম। তাই বিশেষভাবে এখানে এ দু'টোর উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ দু'টোর মাধ্যমেই বোঝানো হয়েছে সমগ্র শরিয়তকে।

'মারদ্বিয়্যা' অর্থ সন্তোষভাজন। হজরত ইসমাইল ছিলেন আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার প্রতি সতত অনুগত ও সুদৃঢ়। তাই তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন। সেকথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে— 'সে ছিলো তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।'

সূরা মার্‌য়াম ঃ আয়াত ৫৬, ৫৭, ৫৮

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۝ وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۗ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۫ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآئِيْلَ ۫ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ؕ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ۝ (السجدة)

❑ এই কিতাবে উল্লেখিত ইদ্‌রীসের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল সত্যবাদী, নবী;

❑ এবং আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম উচ্চ মর্যাদা।

❑ নবীদিগের মধ্যে যাহাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করিয়াছেন ইহারাই তাহারা, আদমের ও যাহাদিগকে তিনি নূহের সহিত নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন তাহাদিগের বংশোদ্ভূত, ইবরাহীম ও ইসরাইলের বংশোদ্ভূত ও যাহাদিগকে তিনি পথ-নির্দেশ করিয়াছিলেন ও মনোনীত করিয়াছিলেন তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত; তাহাদিগের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্ত হইলে তাহারা সিজদায় লুটাইয়া পড়িত ও ক্রন্দন করিত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এই কোরআনে বর্ণিত নবী ইদ্রিসের কথা আপনি জনসমক্ষে প্রচার করুন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও নবী। হজরত ইদ্রিস ছিলেন হজরত নুহের প্রপিতামহ এবং হজরত শীশের

www.eelm.weebly.com

দৌহিত্র। তাঁর আরেক নাম ছিলো আখনুখ। তিনি অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছে ইদ্রিস। বায়যাবী লিখেছেন, 'ইদ্রিস' শব্দটি অনারব। যদি তাই হয় তবে আরবী রীতিতে দরস (পাঠ বা অধ্যয়ন) থেকে শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে— একথা বলার কোনো মানে হয় না। তবে এরকম হতে পারে যে, যে ভাষা থেকে ইদ্রিস নামটি সংগৃহীত হয়েছে, সে ভাষাতেও হয়তো শব্দটির অর্থ পাঠক বা অধ্যয়নশীল। কিন্তু শব্দটি আরবী অর্থেরও অনুকূল।

আল্লাহ্‌পাক হজরত ইদ্রিসের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন তিরিশ খানা সহীফা বা আকাশী পুস্তিকা। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইদ্রিসই প্রথম কলম দ্বারা লেখার প্রচলন করেন এবং আবিষ্কার করেন সেলাই করা কাপড় পরিধানের প্রথা। এর পূর্বে মানুষ চামড়ার পোশাক পরিধান করতো। আবার তিনিই প্রথম নির্মাণ করেছিলেন যুদ্ধাস্ত্র এবং তা দিয়ে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামও করেছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যা ও অংক শাস্ত্রেরও আবিষ্কারক ছিলেন তিনি।

এর পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাকে দান করেছিলাম উচ্চ মর্যাদা।' কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'মাকানান আলিয়্যা' (উচ্চ মর্যাদা) কথাটির অর্থ নবুয়ত ও আল্লাহ্‌র বিশেষ নৈকট্য। কেউ কেউ বলেছেন, জান্নাত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, চতুর্থ অথবা ষষ্ঠ আসমান। হজরত আনাস বিন মালিক, হজরত মালিক বিন সা'সাআহ্ থেকে উল্লেখ করেছেন, মেরাজ রজনীতে রসুল স. হজরত ইদ্রিসকে দেখেছিলেন চতুর্থ আসমানে। সুরা বানী ইসরাইল ও সুরা আন্‌নাজম-এর তাফসীরে হাদিসটির উল্লেখ রয়েছে।

হজরত ইদ্রিসের আকাশারোহণের ঘটনাঃ হজরত কা'ব আহবার প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, একদিন হজরত ইদ্রিস প্রখর রোদের মধ্যে সারাদিন পথ চললেন। শেষে ক্লান্ত হয়ে বললেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! একদিন পথ চলতেই আমি এতো ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু যে দিন সকলে পাঁচশত বছরের পথ অতিক্রম করতে বাধ্য হবে, সেদিন তাদের কি দূরবস্থাই না হবে। তাই তোমার সকাশে আমার প্রার্থনা— তুমি সূর্যের উত্তাপকে কিছুটা স্তিমিত করে দাও। পরদিন সকালে সূর্য পরিচালনাকারী ফেরেশতা অনুভব করলো সূর্যের উত্তাপ অনেকটা স্তিমিত। সে আল্লাহ্ সকাশে জিজ্ঞেস করলো, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! সূর্যের উত্তাপ স্তিমিত হওয়ার কারণ কি। আল্লাহ্ বললেন, আমি এরকম করেছি আমার প্রিয়বান্দা ইদ্রিসের প্রার্থনার কারণে। ফেরেশতা বললো, হে পরোয়ারদিগার! তুমি তাকে আমার বন্ধু করে দাও। আল্লাহ্ বন্ধুত্বের অনুমতি দিলেন। ফেরেশতা উপস্থিত হলো হজরত ইদ্রিসের নিকটে। হজরত ইদ্রিস তাঁর পরিচয় পেয়ে

www.eelm.weebly.com

বললেন, আমি জানি আপনি মহাসম্মানিত এক ফেরেশতা। মৃত্যুর ফেরেশতা আজরাইলও আপনাকে সমীহ করেন। তাই আমি বলি, আপনি তার নিকট আমার জন্য এইমর্মে সুপারিশ করুন যেনো তিনি আমার মৃত্যুর সময় কিছুটা পিছিয়ে দেন। আর বর্ধিত আয়ু পেয়ে আমি যেনো আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি এবং করতে পারি আরো অধিক ইবাদত। ফেরেশতা বললো, মৃত্যুর সময়তো সুর্নিধারিত। তবুও আমি মৃত্যুর ফেরেশতার নিকট আপনার আবেদনটি উত্থাপন করবো। এরপরে সূর্যের ফেরেশতা হজরত ইদ্রিসকে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে গেলো। সূর্যের কাছাকাছি একস্থানে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে সে উপস্থিত হলো মৃত্যুর ফেরেশতার কাছে। বললো, আদম সন্তানদের মধ্যে একজন বন্ধু রয়েছেন আমার। তিনি আমাকে তার মৃত্যুর সময় কিছুটা পিছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আপনার কাছে সুপারিশ করতে বলেছেন। মৃত্যুর ফেরেশতা বললো, এরকম করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে আমি কেবল তাঁর মৃত্যুলগ্নের কথা পূর্বাহ্নে জানিয়ে দিতে পারি। এতে করে তিনি মৃত্যুর জন্য যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবেন। একথা বলে মৃত্যুর ফেরেশতা তার দপ্তর খুলে বসলো। তারপর বললো, আপনি এমন এক লোকের কথা বলছেন, যার মৃত্যুর কোনো তারিখ আমার দপ্তরে নেই। তার মৃত্যু পৃথিবীতে হবে না। হবে আকাশে। সুতরাং আপনি গিয়ে দেখুন, তিনি আর জীবিত নেই। সূর্যের ফেরেশতা তখন হজরত ইদ্রিসের নিকটে গিয়ে দেখলো, সত্যিই তিনি মৃত।

ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, আকাশে হজরত ইদ্রিস জীবিত অবস্থায় রয়েছেন না মৃত অবস্থায় — সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্নরকম মন্তব্য করেছেন। একদল বলেছেন, তিনি আকাশে জীবিত অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর মতো মৃত্যুহীন জীবনপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন চারজন। তন্মধ্যে দু'জন রয়েছেন আকাশে এবং অবশিষ্ট দু'জন রয়েছেন পৃথিবীতে। আকাশের অমর নবীদ্বয়ের নাম হজরত ইদ্রিস ও হজরত ঈসা। আর পৃথিবীর অমর নবীযুগল হচ্ছেন হজরত খিজির ও হজরত ইলিয়াস। ওয়াহাব আরো বলেছেন, হজরত ইদ্রিস ছিলেন অত্যধিক ইবাদত গুজার। তখনকার বিশ্বাসীগণের সম্মিলিত ইবাদতের সমান ইবাদত করতেন তিনি একাই। ফেরেশতারা একথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলো। কৌতূহলী হয়ে আল্লাহ্‌র অনুমতি সাপেক্ষে মৃত্যুর ফেরেশতা হজরত ইদ্রিসের সঙ্গে সাক্ষাত করলো। হজরত ইদ্রিস নিয়মিত রোজা রাখতেন। তাই ইফতারের সময় তিনি মানবরূপী ফেরেশতা মেহমানকে যথারীতি ইফতার করতে বললেন। কিন্তু মেহমান তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলো না। পরপর তিনদিন এরকম ঘটলো। শেষে হজরত ইদ্রিস জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রিয় অতিথি! আপনার পরিচয় দিন। সে বললো, আমি

www.eelm.weebly.com

মৃত্যুর ফেরেশতা। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমি আপনার সঙ্গলাভের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত। হজরত ইদ্রিস বললেন, তবে আমার একটি কাজ করে দিন। অতিথি বললো, কি কাজ? হজরত ইদ্রিস বললেন, আমার প্রাণ হরণ করুন। আল্লাহ্র হুকুমে মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁর জান কবজ করলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আল্লাহ্র হুকুমে তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠলেন। অতিথি বললো, এরকম ঘটলো কেনো? হজরত ইদ্রিস বললেন, আমি মৃত্যুর আস্বাদ পেতে চেয়েছিলাম। মৃত্যুবরণ করা আমার উদ্দেশ্য ছিলো না। আল্লাহ্ আমার ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। এখন আমি যথাসময়ে মৃত্যুবরণ করার যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবো। কারণ মৃত্যুর স্মৃতি আমার স্মরণপটে থাকবে সদা জাগরূক। এখন আপনি আরো একটি কাজ করে দিন আমার। আমাকে নিয়ে চলুন আকাশে। দেখিয়ে দিন বেহেশত ও দোজখ। মৃত্যুর ফেরেশতা এবারও অনুমতি পেলো। হজরত ইদ্রিসকে নিয়ে প্রথমে গেলো দোজখের দ্বারপ্রান্তে। হজরত ইদ্রিস বললেন, দোজখের প্রধান প্রহরীকে বলে দরজা খোলার ব্যবস্থা করুন। তাই করা হলো। হজরত ইদ্রিস ভালো করে দেখে নিলেন দোজখের অভ্যন্তর ভাগ। তারপর বললেন, দোজখ তো দেখা হলো। এবার আমাকে নিয়ে চলুন বেহেশতে। মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁকে নিয়ে উপস্থিত হলো বেহেশতে। আল্লাহ্র নির্দেশে ও তাঁর অনুরোধে বেহেশতের দরজাও খুলে দেয়া হলো। হজরত ইদ্রিস ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন, বেহেশতের অপরূপ রূপ। মৃত্যুর ফেরেশতা বললো, এবার ফিরে চলুন। হজরত ইদ্রিস একটি বৃক্ষের ডাল আঁকড়ে ধরে বললেন, আমি এখান থেকে কোথাও যাবো না। আল্লাহ্র নির্দেশে তখন সেখানে উপস্থিত হলো আর একজন ফেরেশতা। বললো, আপনি ফিরে যেতে রাজি হচ্ছেন না কেনো? হজরত ইদ্রিস বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন, সকলকেই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমি তা আস্বাদন করেছি। আল্লাহ্ আরো বলেছেন, সকলকেই দেখানো হবে দোজখ। তা-ও অবলোকন করেছি আমি। একথাও তিনি বলেছেন, বেহেশতে প্রবেশকারীরা আর কখনো বহিষ্কৃত হবে না। আমি তো সেই জান্নাতেই প্রবেশ করেছি। সুতরাং আমি এখান থেকে বের হবো কেনো? আল্লাহ্ তখন মৃত্যুর ফেরেশতাকে জানালেন, আমার অনুমতিক্রমেই তো সে বেহেশতে প্রবেশ করেছে। সেখান থেকে বের হতে হলে আমার অনুমতিক্রমেই তা হবে। তোমাদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আর কোনো চেষ্টা কোরো না। এভাবেই হজরত ইদ্রিস লাভ করেছেন এক ব্যতিক্রমী উচ্চ মর্যাদা। তাঁর ওই মর্যাদার কথাই বিবৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— নবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেছেন, এরাই তারা, আদমের ও যাদেরকে তিনি নুহের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলেন তাদের বংশভূত, ইব্রাহিম ও ইসমাইলের বংশভূত ও যাদেরকে তিনি পথ-নির্দেশ করেছিলেন ও মনোনীত করেছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত।' এখানে উলায়িকা (যাদেরকে) বলে বোঝানো হয়েছে হজরত ইদ্রিস থেকে হজরত জাকারিয়া পর্যন্ত প্রেরিত নবীগণকে। আর এখানকার 'পুরস্কৃত করেছেন' কথাটির অর্থ দান করেছেন দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। 'আদমের বংশভূত' বলে এখানে বোঝানো হয়েছে হজরত ইদ্রিসের মতো সৌভাগ্যবান নবীগণকে। আর নুহের সঙ্গে নৌকায় আরোহীগণ বলে এখানে বোঝানো হয়েছে তাঁর বংশভূত হজরত ইব্রাহিম, হজরত ইসমাইল প্রমুখ নবীগণকে। আর 'ইব্রাহিম ও ইসমাইলের বংশভূত' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত ইসমাইল, হজরত ইসহাক ও তাঁদের বংশীয় নবীগণকে। উল্লেখ্য যে, ইসরাইল বা ইয়াকুবের বংশভূত নবীগণের মধ্যে ছিলেন হজরত মুসা, হজরত হারুন, হজরত জাকারিয়া, হজরত ইয়াহ্ইয়া, হজরত ঈসা প্রমুখ। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, কন্যাসন্তানও বংশভূতদের অন্তর্ভুক্ত। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'মিন্ জুররিয়্যাতি' কথাটি। 'ওয়াজ্তাবাইনা' (মনোনীত করেছিলাম) কথাটির অর্থ— তাঁদেরকে মনোনীত করেছিলেন নবুয়তের পদমর্যাদা প্রদানের জন্য এবং পথ-নির্দেশ করবার জন্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্ত হলে তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়তো ও ক্রন্দন করতো।' উল্লেখ্য যে, এটাই হচ্ছে অভিজাত, উচ্চমর্যাদাবিশিষ্ট ও আল্লাহ্র বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের স্বভাববৈশিষ্ট্য। এখানে 'সুজ্জ্বাদান' শব্দটি 'সাজ্বিদ' এর বহুবচন। আর 'বুকিয়্যান' শব্দটি 'বাকী' এর বহুবচন। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়িয়েছে— ওই সকল আল্লাহ্র মনোনীত ও প্রিয়ভাজন নবী রসুলগণ পরম করুণাপরবশ আল্লাহ্র কথামৃত শুনতে পেলে আল্লাহ্র রহমতের আশায় সেজদায় লুটিয়ে পড়তেন এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে ক্রন্দন করতেন।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে ইবনে মাজা, ইসহাক, ইবনে রহ্ওয়াইহ্ ও বায্যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, কোরআন পড়ো এবং কাঁদো। কান্না না এলে কান্নার ভান করো।

নির্দেশনাঃ এই আয়াত যাঁরা আরবীতে পাঠ করেছেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সেজদা করে নিবেন।

www.eelm.weebly.com

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ۝ جَنّٰتِ عَدْنِ نِ الَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَأْتِيًّا ۝ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا إِلَّا سَلٰمًا ۚ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝

❒ উহাদিগের পরে আসিল অপদার্থ পরবর্তীগণ, তাহারা সালাত নষ্ট করিল ও লালসা-পরবশ হইল। সুতরাং উহারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে।

❒ কিন্তু উহারা নহে যাহারা তওবা করিয়াছে, বিশ্বাস করিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে। উহারা তো জান্নাতে প্রবেশ করিবে। উহাদিগের প্রতি কোন জুলুম করা হইবে না।

❒ ইহা স্থায়ী জান্নাত, অদৃশ্য বিষয়; যাহার প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁহার দাসদিগকে দিয়াছেন। তাঁহার প্রতিশ্রুত বিষয় আসিয়াই থাকে।

❒ সেথায় তাহারা শান্তি ব্যতীত কোন অসার বাক্য শুনিবে না এবং সেথায় সকাল-সন্ধ্যা তাহাদিগের জন্য থাকিবে জীবনোপকরণ।

❒ এই-ই জান্নাত, যাহার অধিকারী করিব আমার দাসদিগের মধ্যে সাবধানীদিগকে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তাদের পরে এলো অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা সালাত নষ্ট করলো ও লালসাপরবশ হলো।' একথার অর্থ— ওই সকল নবী-রসুলগণের মহাপ্রস্থানের পর তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হলো অযোগ্য ও অপদার্থরা। তারা ছেড়ে দিলো নামাজ এবং হয়ে উঠলো লালসাপরায়ণ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তারা নামাজকে করতো বিলম্বিত। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, তারা জোহরের নামাজ আদায় করতো আসরের সময় এবং আসরের নামাজ আদায় করতো সন্ধ্যায়। আমি বলি, মাকরূহ

www.eelm.weebly.com

বা নিন্দিত পদ্ধতিতে নামাজ পাঠ করা এবং নামাজের আদব ও সুন্নতসমূহকে পরিত্যাগ করাও নামাজ নষ্ট করার সামিল। মোট কথা, তারা আল্লাহ্র আনুগত্যের অবমাননা করে অনুসারী হয়ে পড়েছিলো তাদের অপপ্রবৃত্তির ।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।' এখানে 'গাই' অর্থ নিক্ষেপ করা। বাগবী লিখেছেন, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ বলেছেন, জাহান্নামের একটি ভয়াবহ উপত্যকার নাম 'গাই'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই ভয়ংকর উপত্যকা থেকে জাহান্নাম নিজেই পরিত্রাণ প্রার্থনা করে। ওই উপত্যকাটি প্রস্তুত রাখা হয়েছে ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, সুদ ভক্ষণকারী, সুদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শনকারী, পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্য ও মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানকারীদের জন্য। সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মারদুবিয়া। বাগবী লিখেছেন, আতা বলেছেন, 'গাই' হচ্ছে জাহান্নামের একটি উপত্যকা । যেখানে পানির পরিবর্তে প্রবাহিত হয় পুঁজ ও রক্তের স্রোত। হজরত কা'ব বলেছেন, জাহান্নামের এক প্রজ্জ্বলিত প্রান্তরে অবস্থিত একটি গভীর গহ্বরের নাম 'গাই'। একটি ভয়ংকর কূপও রয়েছে সেখানে। কূপটির নাম বাহীম। জাহান্নামের আগুন যখন কিছুটা নিস্তেজ হয়, তখন উন্মুক্ত করা হয় ওই কূপের মুখ। ফলে, সঙ্গে সঙ্গে জাহান্নাম হয়ে যায় পূর্ববৎ উত্তপ্ত ও জ্বলন্ত। বাগবী আরো লিখেছেন, জাকারিয়া বিন আবু মরিয়ম খাজায়ীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু উমামা বাহেলী বলেছেন, দোজখের তটদেশ থেকে তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছতে বিশালাকৃতির বোঝাবিশিষ্ট স্থূলকায় দশটি উটের সমপরিমাণ ওজনবিশিষ্ট একটি পাথরের পতনের সময় লাগে সত্তর বছর। একথা শুনে আবদুর রহমান বিন খালেদ বিন ওলিদের এক মুক্ত ক্রীতদাস জিজ্ঞেস করলেন, এর নিচেও কি কিছু রয়েছে? হজরত আবু উমামা বললেন, হ্যাঁ। সর্বনিম্নে রয়েছে 'গাই' এবং 'আছাম'।

বিভিন্ন সূত্রে ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, সাঈদ ইবনে মনসুর, হান্নাদ, ফারইয়ানী, হাকেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'গাই' হচ্ছে দোজখের একটি উপত্যকা অথবা একটি নহরের নাম। এক বর্ণনায় এসেছে, ওই উপত্যকা অতীব গভীর ও বিস্বাদময়। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, দোজখের এক অত্যুষ্ণ নহরের নাম 'গাই'। প্রবৃত্তিপূজককে নিক্ষেপ করা হবে সেখানে।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা বিন আজীব বলেছেন, গাই নরকের একটি গভীর ও দুর্গন্ধময় উপত্যকা। সুপরিণত সূত্রে হজরত বারা বিন আজীব থেকে তিবরানী ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দশ আউকিয়া ওজনের একটি পাথর দোজখের পাড় থেকে দোজখাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করা হলে সত্তর বছরেও ওই পাথর তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছবে না। তলদেশের নিচে

www.eelm.weebly.com

আবার রয়েছে 'গাই' ও 'আছাম'। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! 'গাই' ও 'আছাম' আবার কী? তিনি স. বললেন, জাহান্নামের অতলে অবস্থিত দু'টি নদী, যার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে নরকবাসীদের পুঁজ ও রক্ত। ওই নদীকেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'গাই'। আর 'আছামা'র কথা অন্য এক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— 'মাঁই ইয়াফআ'ল জালিকা ইয়ালক্বা আছামা।'

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'গাই' এর শাব্দিক অর্থ—পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহী। এরকম অর্থ করলে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তারা হারিয়ে ফেলবে জান্নাতের পথ। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, পুণ্যবানদেরকে বলা হয় 'রাশাদ' এবং পাপিষ্ঠদেরকে বলা হয় 'গাই'। তাই জুহাক আলোচ্য বাক্যটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— তারা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, 'গাই' অর্থ ধ্বংস। কেউ কেউ বলেছেন, ব্যর্থতা। সবগুলো অর্থই মন্দ। কোনো কোনো বিদ্বান আবার এখানকার মুজাফ (সম্বন্ধ পদ) কে উহ্য মনে করেন এবং বলেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণে পরকালে তারা পাবে তাদের কুকর্মের যথোপযুক্ত শাস্তি।

পরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা নয়, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে। তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।' একথার অর্থ— যারা নামাজ বিনষ্ট করা এবং পৃথিবীর প্রতি লোভাতুর হওয়ার অপরাধ থেকে বিশুদ্ধ অন্তরে তওবা করবে, অবিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে স্থিত হবে বিশুদ্ধ বিশ্বাসে এবং ওই বিশ্বাসানুসারে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করবে, তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে। আর তাদের অধিকারও খর্ব করা হবে না। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিশুদ্ধ তওবা সহকারে ইমান আনলে পূর্বের পাপ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। রসুল স. বলেছেন, ইসলাম অতীতের পাপ বিলুপ্ত করে দেয়। হজরত আমর ইবনে আস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

আয়াতের শুরুতে 'কিন্তু তারা নয়'— এরকম উল্লেখ থাকার কারণে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, শাস্তি হবে কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপিষ্ঠদের জন্য। তওবাকারী ও ইমান আনয়নকারীদের জন্য রয়েছে কেবল জান্নাতের শুভ সমাচার। আমি বলি, কেবল ইমান আনয়নকারীদেরকে এখানে শাস্তি থেকে পৃথক করা হয়নি। পৃথক করা হয়েছে ইমানদার ও সৎকর্মশীলদেরকে। তাই বলা হয়েছে, 'বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে'। অতএব পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত শাস্তি আপতিত হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে। সেই সঙ্গে পাপিষ্ঠ বিশ্বাসীদের উপরেও। ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে তাই বলা হয়েছে দোজখের 'গাই' নামক গহ্বরে নিপতিত হবে ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী ইত্যাদি কবীরা গোনাহকারীরা।'

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— এটা স্থায়ী জান্নাত; অদৃশ্য বিষয়; যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁর দাসদেরকে দিয়েছেন।' এখানে 'আদন্' শব্দটি একটি মূল শব্দ। এর অর্থ অবস্থান বা অবস্থিতি। অথবা এটি একটি জান্নাতের নাম। কিংবা জান্নাতের একটি বিশেষ অংশ। 'অদৃশ্য বিষয়' বলে এখানে অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অঙ্গীকার দেয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাঁর প্রতিশ্রুত বিষয় এসেই থাকে।' এখানে 'মাতিয়্যা' শব্দটি ইসমে জরফ (অধিকরণ কারক)। এভাবে উদ্ধৃত বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়— যারা জান্নাত-গমনের যোগ্য, তারা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অথবা 'মাতিয়্যা' কথাটি এখানে কর্মকারক। কিন্তু কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। উদ্ধৃত অর্থ দু'টোর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন আরবী পরিভাষায় বলা হয়— আমার উপর পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হয়েছে এবং আমি পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেছি। দু'টো বাক্যই সমার্থক।

এর পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা শান্তি ব্যতীত কোনো অসার বাক্য শুনবে না।' একথার অর্থ বেহেশতবাসীরা কোনো অসুন্দর ও চটুল কথা শুনবে না। শুনবে কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে শান্তি সম্ভাষণ। অথবা তারা শুনবে কেবল ওই সকল বচন, যা দোষত্রুটি মুক্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সেখানে সকাল সন্ধ্যায় তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ।' অর্থাৎ সেখানকার পানাহার হবে অতীব আনন্দদায়ক। হাসান বসরী বলেছেন, সকাল সন্ধ্যায় পর্যাপ্ত আহারের আয়োজন দেখলে আরববাসীরা অত্যধিক আনন্দিত হয়। তাই এখানে বলা হয়েছে— সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ। সাঈদ ইবনে মনসুর এবং ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস এ প্রসঙ্গে বলেছেন, দুনিয়ায় যেমন পানাহারের সামগ্রী পাওয়া যায়, সেখানেও তেমনি পাওয়া যাবে। ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, জুহাক বলেছেন, রাত দিনের প্রয়োজনীয় পানাহারের সামগ্রী তারা সেখানে পাবে। ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে ওলীদ বিন মুসলিম বলেছেন, আমি জুহায়ের ইবনে মোহাম্মদের নিকটে এই বাক্যটির ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলাম। তিনি জবাবে বলেছিলেন, সেখানকার পরিবেশ তো হবে সতত জ্যোতির্ময়। রাত দিন অনুভূত হবে পর্দা ফেলে দেয়া ও অপসারণের কারণে।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু কেলাবাহ ও হজরত হাসান থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! বেহেশতে রাত আসবে কীভাবে? তিনি স. বললেন, সেখানে তো থাকবে কেবল নূর। তাই সকাল সন্ধ্যা হয়ে যাবে একাকার। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কেবল নামাজের সময়গুলোতে হাজির করা হবে বিস্ময়কর উপঢৌকন। আর ফেরেশতারাও জানাতে থাকবে শান্তি-সম্ভাষণ।

এর পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'এই-ই জান্নাত, যার অধিকারী করবো আমার দাসদের মধ্যে সাবধানীদেরকে।' এখানে 'নুরিছু' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, জান্নাত হচ্ছে তাক্বওয়া বা সাবধানতার ফসল। আর পরলোকগত ব্যক্তিদের উত্তর পুরুষেরা যেভাবে তাদের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে তেমনি জান্নাতের স্বাভাবিক অধিকার লাভ করবে মুত্তাক্বীরা।

এখানে মুত্তাক্বীগণকে বেহেশতের সরাসরি মালিক না বলে 'উত্তরাধিকারী' বলার কারণ এই যে, উত্তরাধিকারিত্ব একটি শক্তিশালী ও অনড় মালিকানা। মৃতব্যক্তি নিজেও সে মালিকানা ফিরিয়ে নিতে পারে না। পৃথিবীর কোনো মানুষ এবং কোনো বিধানও পারে না উত্তরাধিকারীর অধিকার ক্ষুণ্ন করতে। তাকে অধিকারচ্যুত করা কোনোক্রমে ও কখনোই সম্ভব নয়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বেহেশতবাসীদের বেহেশতের কোনো কোনো অংশের মালিকানা হবে উত্তরাধিকার সদৃশ। ওই অংশগুলোর মালিক হতো দোজখবাসীরা, যদি তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী না হতো। দোজখ গমনের কারণে ওই সকল অংশের মালিক হবে জান্নাতীরা। তাই এখানে উত্থাপিত হয়েছে উত্তরাধিকারিত্বের প্রসঙ্গ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মাজা ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত যথাসূত্রসম্বলিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের বাসস্থান হবে দু'টি। একটি জান্নাতে, আর একটি জাহান্নামে। যে দোজখে যায়, তার জান্নাতের বাসস্থানের মালিক হয় কোনো এক জান্নাতী। অন্য এক আয়াতেও একথা ধ্বনিত হয়েছে এভাবে— 'উলায়িকা হুমুল ওয়ারিছুন'।

হজরত আনাস থেকে ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, উত্তরাধিকারিত্বের হক যে নষ্ট করবে, তার জান্নাতের কিছু অংশ আল্লাহ্ দিয়ে দিবেন ওই বঞ্চিত ব্যক্তিকে।

একবার রসুল স. হজরত জিবরাইলের প্রতি অনুযোগ উত্থাপন করে বললেন, ভ্রাতা জিবরাইল! আপনি নিয়মিত আসেন না কেনো? তাঁর এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ۝

❒ জিবরাইল বলিল, 'আমি তোমার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না; যাহা আমাদিগের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে ও যাহা এই দুই-এর অন্তর্বর্তী তাহা তাঁহারই এবং তোমার প্রতিপালক ভুলিবার নহেন।'

❒ তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবীর ও তাহাদিগের অন্তর্বর্তী যাহা কিছু, তাহার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহার ইবাদতে ধৈর্যশীল হও। তুমি কি তাঁহার সমগুণসম্পন্ন কাহাকেও জান?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'জিবরাইল বললো, আমি তোমার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না'। কিছু কিছু করে থেমে থেমে অবতীর্ণ হওয়াকে বলে 'তানায্‌যুলু'। বাবে তাফায়্‌যুলের রীতিতে কথাটির অর্থ কেবল অবতরণ (নুযুল)ও হয়। আর 'তানযীলুন' অর্থ অল্প অল্প করে অবতরণ। সুতরাং 'তানায্‌যালু' কথাটির অর্থ হবে বিরতি সহকারে অবতরণ। আবার কখনো কখনো 'তানযীলুন' শব্দটির অর্থ হয় কেবলই অবতরণ। এখানেও তাই 'তানায্‌যালু' এর শব্দার্থ করা হয়েছে— অবতরণ।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, একবার হজরত জিবরাইল রসুল স. সকাশে আবির্ভূত হয়েছিলেন চল্লিশ দিন পর। হজরত আনাস থেকে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স.কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! কোন্ স্থান আল্লাহ্‌র সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং কোন স্থান সর্বাপেক্ষা অপ্রিয়? তিনি স. বললেন, জানি না। জিবরাইলের কাছ থেকে জেনে নিয়ে জানাবো। কিন্তু হজরত জিবরাইল আসতে দেরী করলেন অনেক। বিলম্বিত আবির্ভাবের কারণে তিনি স. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার দেরী দেখে ভাবছিলাম, আল্লাহ্ হয়তো আমার প্রতি বিরাগভাজন হয়েছেন। হজরত জিবরাইল তখন বললেন, আমি আপনার প্রভুপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না।

www.eelm.weebly.com

আবু নাঈম তাঁর দালায়েল পুস্তকে এবং ইবনে ইসহাক হজরত ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ করেছেন, কুরায়েশ গোত্রপতিরা একবার রসুল স.কে আসহাবে কাহফ, জুলকারনাইন ও রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে বসলো। রসুল স. বললেন, তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিবো আমি আগামীকাল। তিনি স. ভেবেছিলেন, ইতোমধ্যে হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হবেন। তখন তাঁর কাছ থেকে প্রশ্নগুলোর জবাব জেনে নেয়া যাবে। কিন্তু পনেরো দিন পর্যন্ত হজরত জিবরাইল এলেন না। তারপর তিনি আবির্ভূত হতেই রসুল স. বিলম্বিত আগমনের হেতু জানতে চাইলেন তাঁর নিকটে ।

বাগবী লিখেছেন, জুহাক, ইকরামা, মুকাতিল, ও কালাবী বলেছেন, যখন মক্কাবাসীরা রসুল স. সকাশে আসহাবে কাহফ, জুলকারনাইন ও রূহ সম্পর্কে জানতে চাইলো, তখন তিনি স. বললেন, আগামীকাল আমি তোমাদেরকে এ সম্পর্কে জ্ঞাত করবো। একথা বলার সময় তিনি স. ইনশাআল্লাহ্ (আল্লাহ্ যদি চান) উচ্চারণ করলেন না। ফলে দীর্ঘকাল যাবত হজরত জিবরাইলের আগমন ঘটলো না। রসুল স. দিনাতিপাত করতে লাগলেন বিষণ্নচিত্তে। দীর্ঘ বিরতির পর তিনি এলে রসুল স. বললেন, দীর্ঘ বিরতি দেখে আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। এতো বিলম্ব করলেন কেনো? হজরত জিবরাইল বললেন, ভ্রাতা মোহাম্মদ! আমিও ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম আপনার সন্দর্শনাকাংখায়। কিন্তু আল্লাহ্র আদেশ ব্যতীত আমি তো আগমন করতে পারি না। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত এবং সুরা 'ওয়াদ্‌দ্বোহা'র এই আয়াতগুলো— 'প্রত্যুষের শপথ! শপথ নিশীথের, যখন তার অন্ধকার প্রগাঢ় হয়— আপনার প্রভুপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি।'

এরপর বলা হয়েছে— 'যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে ও যা এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী তা তাঁরই এবং তোমার প্রতিপালক ভুলবার নন।' এখানে 'যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে অতীত ও ভবিষ্যতের সকল কিছুকে। 'মা খলাফুনা' কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে অতীতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও বিবর্তিত কার্যাবলী। আর 'মা বাইনা জালিকা' (এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী) বলে বুঝানো হয়েছে সমসাময়িকতাকে, বর্তমানের বিষয়াবলীকে। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, 'মা বাইনা আইদীনা' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মৃত্তিকাকে, যখন আমরা তার উপরে অবতরণ করতে চাই। আর 'খলাফুনা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে আকাশকে, যখন আমরা সেখান থেকে অবতরণের ইচ্ছা করি ও অবতরণ করি। আর 'মা বাইনা জালিকা' কথাটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে মধ্যবর্তী শূন্যতা ও বিস্তৃতিকে।

www.eelm.weebly.com

'তোমার প্রভুপালক ভুলবার নয়' কথাটির অর্থ এখানে এরকম— আপনার প্রভুপালক আপনার কথা ভুলে যাবেন, প্রত্যাদেশ প্রেরণ করবেন না, আমাকে আপনার নিকট পাঠাবেন না— এই চিন্তাগুলো ঠিক নয়। বরং আমাকে বিলম্বে প্রেরণের মধ্যেও রয়েছে তাঁর অপার প্রজ্ঞাময়তার এক বিশিষ্ট নিদর্শন। তিনিই সর্ববিষয়ের সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক পরিজ্ঞাতা।

পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবীর ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে, তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যশীল হও।' আল্লাহ্ যে বিস্মৃতিপ্রবণতা থেকে পবিত্র সেকথার প্রমাণ হিসেবেই এখানে বলা হয়েছে আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর একক ও অংশীবিহীন প্রভুপালকত্বের কথা। অর্থাৎ যিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রভুপালনকর্তা, তিনি নিশ্চয় কখনোই ভুলবার নন। আর এখানে 'ফা'বুদ্হু ' ও 'ওয়াস্‌ত্বাবির' কথা দু'টোর মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। এভাবে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তো জানলেন, আপনার উপরে আপনার প্রভুপালকের রহমত ও বরকত কত অবাধ, অপার, অন্তহীন। সুতরাং কিছুতেই তিনি আপনার কথা ভুলতে পারেন না। এরকম বিস্মৃতি তাঁর মহান ও অতুলনীয় মর্যাদার অনুকূল নয়। সুতরাং আপনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে পরিপূর্ণ নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে তাঁর ইবাদতে মনোনিবেশ করুন। প্রত্যাদেশ আগমনে বিলম্ব হওয়ার কারণে চিন্তাক্লিষ্ট হবেন না। ভ্রূক্ষেপ করবেন না অংশীবাদীদের কটু বাক্যের প্রতি।

'সবরুন' শব্দের পরে 'আলা' ব্যবহৃত হওয়াই আরবী ভাষার রীতি। কিন্তু এখানে 'ইসত্বাবির' কথাটির পর এসেছে 'লাম'। এরূপ শব্দ ব্যবহারের মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে— হে আমার রসুল! আপনি ইবাদত সম্পাদন করুন অনুরাগরঞ্জিত ও আস্বাদ্যরূপে, বিষাদায়িত বা চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে নয়। এ কারণেই রসুল স. এর ইবাদত ছিলো আস্বাদায়িত, প্রমিত, নমিত ও শান্তিদায়ক। তিনি স. স্বয়ং বলেছেন, নামাজকে করে দেয়া হয়েছে আমার চোখের শান্তি। অথবা বক্তব্যটির মর্মার্থ হতে পারে এরকম— হে আমার রসুল! ওই সকল অংশীবাদীদের বিদ্রূপ ও উপহাসকে আপনি উপেক্ষা করুন, সর্বাবস্থায় থাকুন ধৈর্যশীল ও অচঞ্চল, যেনো আপনার ইবাদতের নিমগ্নতা থাকে অটুট। এমতাবস্থায় এখানকার 'লি ইবাদাতিহী' কথাটির প্রথম অক্ষর লাম হবে লামে আজলিয়াহ্ (হেতুবাচক)।

শেষে বলা হয়েছে— 'তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকে জানো?' হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'সামিয়্যান' কথাটির অর্থ করেছেন এমন উপমেয় যা উপাস্য বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। কালাবী বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ

www.eelm.weebly.com

হবে— হে আমার রসুল! আপনি কি আল্লাহ্ ছাড়া এমন কাউকে পেয়েছেন, যার নাম আল্লাহ্। অংশীবাদীরা তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোকে বলতো মাবুদ বা উপাস্য। আল্লাহ্তায়ালার সত্তা ও গুণাবলী তাদের উপরে আরোপ করতো না। কারণ জড়প্রতিমা কখনোই আল্লাহ্র সমান্তরাল কোনো সত্তা বা গুণাবলী বিশিষ্ট নয়। তাই আল্লাহ্কে তারা আল্লাহ্ই বলতো। কিন্তু আল্লাহ্র ইবাদতে অংশপ্রদান করতো তাদের দেব-দেবীদের। তাই আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুলকে এই নির্দেশনা দিয়েছেন যে, হে আমার রসুল! তারা যখন আল্লাহ্র সমান্তরাল হিসেবে কাউকে দাঁড় করাতে পারে না, তখন আপনি তাদের কথার মূল্য দিবেন কেনো? তারা যা কিছু বলুক, আপনি নিমগ্ন থাকুন আপনার ইবাদতে।

সূরা মার্য়াম ঃ আয়াত ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০

وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۝ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ۝ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝

❑ মানুষ বলে, 'আমার মৃত্যু হইলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হইব।'

❑ মানুষ কি স্মরণ করে না যে আমি তাহাকে পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি যখন সে কিছু ছিল না?

❑ সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি তো উহাদিগকে শয়তানগণসহ একত্রে সমবেত করিবই ও পরে নতজানু অবস্থায় আমি উহাদিগকে জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করিবই।

❑ অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাহাকে টানিয়া বাহির করিবই।

❑ এবং আমি তো উহাদিগের মধ্যে যাহারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাহাদিগের বিষয় ভাল জানি।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী মানুষেরা বলে, আমরা আবার মৃত্যুর পর আপনাপন সমাধি থেকে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়ে সমুত্থিত হবো নাকি? মরার পর কেউ কি আবার জীবিত হয়?

এখানে 'মানুষ' (আল ইনসান) অর্থ মনুষ্য জাতি (আলিফ লাম জিনসী)। অথবা কোনো নির্দিষ্ট মানুষ (আলিফ লাম আহদি)। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'আল ইনসান' বলে বুঝানো হয়েছে উবাই ইবনে খালফ জামুহীকে। সে ছিলো কিয়ামতে অবিশ্বাসী। এক বর্ণনায় এসেছে, সে একবার একটি শুষ্ক অস্থি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বললো, মোহাম্মদ বলে, মানুষ মরার পর আবার জীবিত হয়ে উঠবে। আমিও কি তবে মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে উঠবো? তার বক্তব্যটিই আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে।

এখানে 'উখরাজু' অর্থ পুনরুত্থিত হবো। 'হাইয়্যা' অর্থ জীবিত অবস্থায়। আর এখানে 'লাসাওফা' কথাটি বসানো হয়েছে কেবল গুরুত্ব প্রকাশার্থে। বর্তমান কাল বা অবস্থা বুঝানো এখানে উদ্দেশ্য নয়।

পরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছু ছিলো না।' একথার অর্থ— ওই সকল মানুষ একথা বোঝে না কেনো যে, তাদের তো একসময় কোনো প্রকার অস্তিত্বই ছিলো না। অস্তিত্ব প্রদান তো অসম্ভব ও অচিন্তনীয় একটি বিষয়। সেই অস্তিত্ব যিনি দিতে পারেন, তিনি কি অস্তিত্বপ্রাপ্ত কোনো কিছুর রূপান্তর ঘটাতে পারবেন না? জীবন দেয়ার পর তিনি যে জীবনকে মৃত্যুতে রূপান্তরিত করেছেন, সেই মৃত্যুকে পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না? কেনো পারবেন না? দ্বিতীয় সৃষ্টি তো প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা সহজতর।

এর পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে—'সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি তো তাদেরকে শয়তানদেরসহ সমবেত করবোই ও পরে নতজানু অবস্থায় আমি তাদেরকে জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবোই।'

এখানে 'ওয়াশ্ শাইয়াত্বীনা' কথাটি মাফউলে মায়াহু (সহ কর্মপদ) এবং কথাটি এখানে সম্মিলিত হয়েছে 'হুম' (তাদেরকে) সর্বনামটির সঙ্গে। বাগবী লিখেছেন, পুনরুত্থানের সময় প্রত্যেক কাফেরকে এক একটি শয়তানের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হবে। এভাবে তাদেরকে উপস্থিত করা হবে হাশরের প্রান্তরে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'জিছিয়্যা' অর্থ দলে দলে। শব্দটি 'জাছওয়াহ্' এর বহুবচন। হাসান ও জুহাক বলেছেন, 'জাছ' এর বহুবচন 'জাছিয়্যা'। এর অর্থ নতজানু হয়ে, হাঁটুর উপরে দণ্ডায়মান অবস্থায়। সুদ্দী অর্থ করেছেন— সংকীর্ণ স্থানের কারণে হাঁটুর উপর দাঁড় করিয়ে।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, সেদিন ভালো-মন্দ সকলকেই জাহান্নামের চতুর্দিকে একত্রিত করা হবে। পুণ্যবানদেরকে এভাবে জাহান্নাম দর্শন করানো হবে এই উদ্দেশ্যে যেনো তারা বুঝতে পারে কত ভয়ংকর শাস্তি থেকে আল্লাহ্ তাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। আবার পাপিষ্ঠদের দেখানো হবে তাদের আক্ষেপ ও দুঃখকে আরো বেশী বাড়িয়ে দেয়ার জন্য। এরপর পুণ্যবানেরা সেখান থেকে চলে যাবে জান্নাতে। আর পাপিষ্ঠদেরকে ঠেলে ফেলে দেয়া হবে জাহান্নামের গভীরে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবেতাহ থেকে আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার বললেন, ওই দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসছে, তোমরা আল কারামে (দোজখের পাড়ে) নতজানু হয়ে বসে আছো। একথার পর বর্ণনাকারী পাঠ করলেন— 'এবং পরে নতজানু অবস্থায় আমি তাদেরকে দোজখের চতুর্দিকে উপস্থিত করবোই।'

শায়েখ ইবনে হাজার বলেছেন, হাদিসে উল্লেখিত 'আল কারাম' কথাটির অর্থ দোজখের উঁচু পাড় যেখানে সমবেত করা হবে উম্মতে মোহাম্মদীকে। আর এখানে 'ছুম্মা' (পরে) শব্দটি সন্নিবেশিত হওয়ার কারণে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, হাশর প্রান্তরে সকলকে একত্র করার বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সকলকে সমবেত করা হবে দোজখের কিনারায়। কেননা ইতোপূর্বে হাশরের প্রান্তরে বিচারের অপেক্ষায় সবাইকে দাঁড়িয়ে কাটাতে হবে দীর্ঘকাল।

এর পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাকে টেনে বের করবোই।'

'কুল্লি শীআতিন' অর্থ প্রত্যেক দলের মধ্যে। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর উম্মতের মধ্য থেকে আমি অবাধ্যদেরকে পৃথক করে ফেলবো। শীআহ্ অর্থ সাহায্যকারী, অনুগামী। এই শব্দটি একবচন-বহুবচন, পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ সকল ক্ষেত্রে একইরূপে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি সংকলিত হয়েছে 'শাআ' ইয়াশিউ' শব্দরূপ 'দ্বরাবা ইয়াদ্বরিবু' থেকে এভাবে— শাইআন শাইয়াআন— শুয়ুআন- মুশাআ'ন— 'শাইয়ূআ'তান। শাআ' অর্থ প্রসারিত, বিস্তৃত, প্রসিদ্ধ। কামুস গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। আমি বলি, 'মুত্তাবিয়ীনা' (অনুগামী) ও 'আনসার' (সাহায্যকারী) কে শীআ'হ্ বলার কারণ এই যে, শুয়ুউ এবং বিস্তৃত হওয়া এখানে হয়ে পড়ে অপরিহার্য। আর এরকম ছড়িয়ে পড়া অনুগামীদের কারণে তাদের অধিনায়ক হয় অধিকতর শক্তিমত্তার অধিকারী। 'শাআ'ল ক্বওম' অর্থ সম্প্রদায়ের লোকেরা ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ তাদের সংখ্যা হয়ে গিয়েছে বিপুল। 'শাইয়্যা'তুন নারা বিল হাত্বাব' অর্থ আমি আগুনে কাঠ ফেলে দিয়ে আগুনকে করে দিয়েছি অধিকতর তেজস্কর।

www.eelm.weebly.com

'ই'তিয়্যা' অর্থ অবাধ্য, অবাধ্যচারিতায় সীমাতিক্রম, অথবা আনুগত্যবিমুখ। এরকম অর্থ করা হয়েছে 'কামুস' নামক অভিধানে। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ইতিয়্যা' অর্থ এখানে দুঃসাহসী। মুজাহিদ বলেছেন, পাপাচারী।

এর পরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তো তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য, তাদের বিষয়ে ভালো জানি।' এখানে আয়াতের শুরুতে 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটি বসানোর কারণে প্রতীয়মান হয় যে, দোজখীদেরকে প্রথমে দোজখের চতুর্দিকে সমবেত করা হবে, তারপর সকল দলের মধ্য থেকে বাছাই করা হবে বড় বড় অপরাধীদেরকে। তারপর আল্লাহ্ নির্ধারণ করবেন কাকে কাকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে। প্রশ্ন জাগে, এ বিষয়ে যদি আল্লাহ্পাক পূর্বাহ্নে না জানেন তবে তাদেরকে তিনি দোজখের চতুর্দিকে একত্র করবেন কী করে? কেমন করেই বা নির্ধারণ করবেন বড় বড় অপরাধী আসলে কে? এর জবাবে বলা যায়— ১. 'ছুম্মা' শব্দটি এখানে কালবিভাজনের জন্য ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যের অগ্র-পশ্চাৎ নির্ধারণের জন্য। অন্য আয়াতেও 'ছুম্মা' শব্দটি এমতো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— 'ছুম্মা কানা মিনাল্ লাজীনা আমানু'। অথবা ২. এখানে জানার অর্থ শাস্তি প্রদান করা। কেননা শাস্তিই তো হবে জানার পরিণতি। প্রকাশ থাকে যে, তাদের শাস্তিদান শুরু হবে দোজখের চতুর্দিকে তাদেরকে একত্র করার পরেই। আগে নয়। 'ছুম্মা' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থেই।

একটি প্রশ্নঃ আ'লামু' (আমি ভালো জানি) কথাটি এখানে ইসমে তাফজীল (তুলনামূলক বিশেষণ)। তাহলে কি কে দোজখে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য, তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানবে?

উত্তরঃ ১. এখানে 'আ'লামু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'আ'লীমুন' (আমি সর্বজ্ঞ) অর্থে। অর্থাৎ আমিই কেবল জানি কে দোজখে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য। ২. এরকমও হতে পারে যে, আমল লেখক ফেরেশতারাও এখানে উল্লেখিত 'জানি' কথাটির অন্তর্ভুক্ত। তারাও একথা অবগত, কে পাপী কে পুণ্যবান, কে সৌভাগ্যশালী কে হতভাগ্য। দোজখে প্রবেশের অধিকতর উপযুক্ত কে? কিন্তু আল্লাহ্র জ্ঞান অবশ্যই এরকম নয় । তিনি সকলের ও সকল কিছুর প্রকাশ্য গোপন অতীত-ভবিষ্যত সবকিছুই পরিজ্ঞাত। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। আমল লেখক ফেরেশতা কেবল মানুষের প্রকাশ্য আচরণ ও অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। পূর্ণ, পরিণত ও সর্বত্রগামী জ্ঞানের অধিকারী তারা কিছুতেই নয়।

পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত 'মিন কুললি শীআতিন' (প্রত্যেক দলের মধ্যে) কথাটির মধ্যে যদি মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সকলকেই অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় তবে ওই আয়াতেরই 'আশাদ্দু' শব্দের মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হবে, আল্লাহ্

www.eelm.weebly.com

অধিকাংশ পাপী বিশ্বাসীকে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু বাগবী প্রমুখ 'কুললি শীআতিন' কথাটির মাধ্যমে কেবল কাফেরদেরকেই বুঝিয়েছেন। অবশ্য আয়াতের বক্তব্যপ্রবাহ একথাই নির্দেশ করে। এভাবে পূর্বের আয়াত ও এই আয়াতের মিলিত অর্থ দাঁড়াবে— আমি কাফেরদের প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে অপরাধের তারতম্যানুসারে তাদেরকে প্রথমে পৃথক করে ফেলবো, তারপর তাদেরকে একে একে নিক্ষেপ করবো দোজখে। প্রথমে নিক্ষেপ করবো বড় বড় অপরাধীদেরকে। পরে প্রবেশ করাবো অপেক্ষাকৃত কম পাপিষ্ঠদেরকে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, সকল মানুষের বিচার সম্পন্ন হওয়ার পর ধারাবাহিকভাবে প্রথমে বড় তারপর ছোট তারপর তদপেক্ষা ছোট পাপীদেরকে দোজখের জন্য বাছাই করা হবে। হান্নাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত আহওয়াসের উক্তিও প্রায় এরকম।

সূরা মারইয়াম ঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩,

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ اٰمَنُوٓا ۙ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّأَحْسَنُ نَدِيًّا ۝

❒ এবং তোমাদিগের প্রত্যেকেই উহা অতিক্রম করিবে; ইহা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।

❒ পরে আমি সাবধানীদিগকে উদ্ধার করিব এবং সীমালংঘনকারীদিগকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রাখিয়া দিব।

❒ উহাদিগের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত আবৃত্ত হইলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বিশ্বাসীদিগকে বলে, 'দুই দলের মধ্যে কোন্‌টি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসাবে কোন্‌টি উত্তম?'

প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।' একথার অর্থ— এরপর দোজখের জন্য বাছাইকৃত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে অতি অবশ্যই দোজখে প্রবেশ করানো হবে। কারণ এটাই আল্লাহ্‌র অবধারিত সিদ্ধান্ত। এখানকার

www.eelm.weebly.com

'হাত্‌মা' শব্দটি একটি গুণবাচক মূল শব্দ। এভাবে এখানে সুস্পষ্টরূপে বলে দেয়া হয়েছে যে, দোজখের উপযুক্তদেরকে দোজখে প্রবেশ করানোর বিষয়টিকে আল্লাহ্‌পাক তাঁর নিজের জন্য অনিবার্য করে নিয়েছেন। সুতরাং এর কোনো অন্যথা হবার নয়।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে — 'পরে আমি সাবধানীদেরকে উদ্ধার করবো এবং সীমালংঘনকারীদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিবো। একথার অর্থ— প্রথমাবস্থায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে পাপী বিশ্বাসীদেরকেও দোজখে প্রবেশ করানো হবে। তারপর কিছুকাল শাস্তি দিয়ে অথবা না দিয়ে পাপী বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করা হবে সেখান থেকে। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও অংশীবাদী অবিশ্বাসীদেরকে কস্মিনকালেও উদ্ধার করা হবে না। ওই সকল সীমালংঘনকারীকে নতজানু অবস্থায় অনন্তকাল রাখা হবে দোজখের অভ্যন্তরে।

'জিছিয়্যা' অর্থ সবাইকে। অর্থাৎ দোজখের মধ্যে সকল সীমালংঘনকারীকে নতজানু অবস্থায় শাস্তি প্রদান করা হবে। পূর্ববর্তী আয়াতে (৭১) উল্লেখিত হয়েছে 'উরূদ' (অতিক্রম) শব্দটি। অর্থাৎ সকলকেই সেদিন পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে। পুলসিরাত হচ্ছে দোজখের উপরে স্থাপিত একটি সেতু।

পথভ্রষ্ট মারজিয়াহ্‌ সম্প্রদায় বলে, গোনাহ্‌ কখনোই ইমানের ক্ষতি করতে পারে না। তাই ইমানদারেরা পাপ করলেও কখনো দোজখে প্রবেশ করবে না। তারা আরো বলে, 'উরূদ' শব্দটির অর্থ অতিক্রম করা বা প্রবেশ করা নয়, দোজখের কিনারায় উপস্থিত হওয়া। কথাটির মাধ্যমে কেবল বলা হয়েছে দোজখ দর্শনের কথা। বিচারের দিনে পুণ্যবান ও পাপী সকলেই তো একস্থানে থাকবে। আর জাহান্নাম থাকবে বিচারস্থলের নিকটেই। তাই সকলেই তখন দোজখকে দেখতে পাবে। মারজিয়াহ্‌রা আরো বলে, দোজখে যারা প্রবেশ করবে, তারা আর কখনো সেখান থেকে বের হতে পারবে না। তাই পাপী হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাসীদেরকে কখনোই দোজখে প্রবেশ করানো হবে না। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন— 'যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্বাহ্নে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে, তাদেরকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে, তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না' (সুরা আম্বিয়া)। সুতরাং হিসাবের স্থানে উপস্থিত করার পর সেখান থেকেই আল্লাহ্‌তায়ালা পুণ্যবান ও পাপী সকল বিশ্বাসীকে জান্নাত গমনের নির্দেশ দিবেন এবং অবিশ্বাসীদেরকে প্রবেশ করাবেন দোজখে। আর 'উরূদ' শব্দের অর্থ যে নিকটবর্তী হওয়া বা কিনারায় উপস্থিত হওয়া, সে সম্পর্কেও অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে। যেমন— 'ওয়া লাম্মা ওয়ারাদা মাআ মাদ্‌ইয়ান' (যখন মুসা মাদায়েনের কূপের নিকটে অবতরণ করলেন)। এখানে 'উরূদ' শব্দটির মাধ্যমে একথা বলা হয়নি যে, হজরত মুসা ওই কূপের মধ্যে প্রবেশ করলেন। বরং বলা হয়েছে, তিনি

www.eelm.weebly.com

উপনীত হলেন ওই কূপের কিনারায়। রসুল স. এর পবিত্র বাণীতেও একথার সমর্থন রয়েছে। গ্রহণযোগ্য সূত্র পরম্পরায় হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে আহমদ, আবু ইয়ালী ও তিবরানী কর্তৃক উল্লেখিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় অধিনায়কের নির্দেশ ছাড়াই জেহাদের সময় মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রহরী নিযুক্ত হবে, সে স্বচক্ষে কখনো দোজখ দেখতে পাবে না। কিন্তু মারজিয়াহ্‌দের এই অভিমত গ্রহণ করলে যে আল্লাহ্‌পাককে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বলতে হয়। কিন্তু তা কি কখনো সম্ভব? 'ওয়া ইম্ মিনকুম ইল্লা ওয়ারিদুহা' (এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে) এই আয়াতে উচ্চারিত হয়েছে আল্লাহ্‌র শপথ। আর কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ এ বিষয়ে একমত যে, এই বাক্যটি একটি অঙ্গীকার প্রকাশক বাক্য। আর আল্লাহ্ কখনোই অঙ্গীকার ভঙ্গকারী নন।

মারজিয়াহ্‌দের ভ্রম অপনোদনঃ আমরা বলি নিঃসন্দেহে 'উরূদ' শব্দটির পরোক্ষ অর্থ ঝুঁকে যাওয়া, দেখা, প্রান্তদেশে পৌঁছে যাওয়া এবং উপস্থিত হওয়া। কিন্তু শব্দটির প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ প্রবেশ করা। বিশেষ কোনো অত্যাবশ্যক কারণ ছাড়া পরোক্ষ অর্থ গ্রহণীয় নয়। আর এখানে সেরকম কোনো কারণের অস্তিত্ব নেই। আর এখানকার বক্তব্য-ভঙ্গিও পরোক্ষ অর্থ গ্রহণের বিপক্ষে। কারণ পরক্ষণেই বলা হয়েছে, 'পরে আমি সাবধানীদেরকে উদ্ধার করবো।' একথায় বোঝা যায় 'উরূদ' শব্দটির মাধ্যমে দোজখে প্রবেশ করানোর কথাই বলা হয়েছে। সেকারণেই পরবর্তী বাক্যে এসেছে উদ্ধারের কথা। যে দোজখে প্রবেশ করেনি তাকে উদ্ধার করার অবকাশ কোথায়। আর মারজিয়াহ্‌রা তাদের অভিমতের স্বপক্ষে যে হাদিসটি উপস্থাপন করেছে, সেই হাদিসটিও তাদের পক্ষের কোনো প্রমাণ নয়। কারণ দোজখে প্রবেশ করা না করার কোনো সম্পর্ক ওই হাদিসের বক্তব্যভূত নয়।

এখন আলোচনা করা যেতে পারে 'উলাইকা আনহা' মুবআ'দুন' (তাদেরকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে) —এই আয়াত সম্পর্কে। এই আয়াতের অর্থ এরকম তো হতে পারে যে— পাপী বিশ্বাসীদেরকে দোজখ থেকে তুলে আনার পর চিরদিনের জন্য তাদেরকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে। আর তখন তারা দোজখের কোনো আওয়াজও শুনতে পাবে না। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, দোজখের আগুন তাদের জন্য করে দেয়া হবে শীতল। তাই তারা তখন দোজখাগ্নির ভয়ংকর শব্দ শুনতে পাবে না।

হান্নাদ, তিবরানী ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, খালেদ বিন মাআদ বলেছেন, জান্নাতে পৌঁছে যাওয়ার পর দোজখ থেকে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত ওই জান্নাতীরা নিবেদন করবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমি তো এইমর্মে অঙ্গীকার করেছিলে যে,

www.eelm.weebly.com

আমাদেরকে অবশ্যই দোজখে প্রবেশ করানো হবে। আল্লাহ্ বলবেন, হ্যাঁ। এরকম অঙ্গীকার আমি করেছিলাম। সেই অঙ্গীকারানুসারেই তো তোমাদেরকে দোজখে প্রবেশ করানো হয়েছিলো। কিন্তু দোজখের আগুনকে তোমাদের জন্য করে দেয়া হয়েছিলো শীতল। তাই তোমরা দোজখাগ্নির শাস্তি অনুভব করতে পারোনি। হজরত ইয়ালী বিন উমাইয়া থেকে ইবনে আদী ও তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, পুলসিরাত অতিক্রমকালে দোজখের আগুন বিশ্বাসীগণকে বলবে, আমার উপর দিয়ে দ্রুত চলে যাও। তোমাদের নূর আমার দহনশক্তিকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হচ্ছে, 'উরূদ' শব্দটির অর্থ প্রবেশ করা, যদিও তা অতিক্রমের আকারে হয়। এর প্রমাণ রয়েছে ইমাম আহমদ, হাকেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত আবু সুমাইয়ার বক্তব্যে। তিনি বলেছেন, 'উরূদ' শব্দটির সুনির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতপৃথকতা দেখা দিয়েছে। কেউ বলেছেন, বিশ্বাসীরা কখনোই দোজখে প্রবেশ করবে না। আবার কেউ বলেছেন, সকলকেই একবার দোজখে প্রবেশ করতে হবে। তারপর শিরিক বিমুক্তদেরকে আল্লাহ্তায়ালা পরিত্রাণ দান করবেন। একবার আমি হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে এই মতানৈক্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। তিনি তাঁর দুই আঙ্গুল তাঁর কানের কাছে নিয়ে বললেন, এই কান বধির হয়ে যাবে, যদি না আমি রসুল স.কে একথা বলতে শুনি যে, পুণ্যবান পাপী নির্বিশেষে সকলকেই দোজখে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু বিশ্বাসীদের জন্য দোজখের আগুন হয়ে যাবে ঠাণ্ডা। তাই তারা দোজখ অতিক্রম করবে নিরাপদে, যেমন অগ্নিকুণ্ডে নিরাপদে ছিলেন হজরত ইব্রাহিম। দোজখ তখন চিৎকার করে বলবে— 'পরে আমি সাবধানীদেরকে উদ্ধার করবো এবং সীমালংঘনকারীদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিবো।'

ইবনে উয়াইনিয়া সূত্রে আমর বিন দিনার থেকে বাগবী লিখেছেন, নাফে বিন আযরক একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে বললেন, 'উরূদ' শব্দটির অর্থ প্রবেশ করা নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, এক আয়াতে বলা হয়েছে— ইন্নাকুম ওয়া মা তা'বুদুনা মিন দুনিল্লাহি হাসবু জাহান্নামা আনতুম লাহা ওয়ারিদূন (তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করো তারা জাহান্নামের ইন্ধন, তোমরা সকলে তাতে প্রবেশ করবে (সুরা আম্বিয়া)। এই আয়াতে 'উরূদ' শব্দটি কি প্রবেশ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি? প্রকৃত কথা হচ্ছে, তুমি আমি সকলেই দোজখে প্রবেশ করবো। কিন্তু আমি আশা রাখি আল্লাহ্ আমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করবেন। কিন্তু মনে হয় তোমাকে উদ্ধার করবেন না। কারণ তুমি প্রবেশ করাটাকেই অস্বীকার করছো।

www.eelm.weebly.com

সাঈদ ইবনে মনসুর, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মুজাহিদ বলেছেন, একবার 'উরূদ' শব্দের অর্থ নিয়ে নাফে বিন আযরক হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। হজরত ইবনে আব্বাস উপরে বর্ণিত আয়াত আবৃত্তি করার পর বললেন, এবার বলো, সকলে দোজখে প্রবেশ করবে কি করবে না? পুনরায় তিনি আবৃত্তি করলেন— ইয়াক্বদিমু কওমাহু ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ফাআওরাদা হুমুন্ নার (সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং সে তাদেরকে নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করবে, যেখানে তারা প্রবেশ করবে তা কতো নিকৃষ্ট স্থান)। সুরা হুদের এই আয়াত তেলাওয়াত করার পর তিনি পুনরায় নাফেকে বললেন, এবার বলো, তারা কি দোজখে আপন আপন সম্প্রদায়কে নিয়ে প্রবেশ করবে, না করবে না? প্রকৃত কথা হচ্ছে, আমরা সকলেই সেখানে প্রবেশ করবো। এখন তুমিই বলো, সেখান থেকে বের হতে চাও, না চাও না?

আওফী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে' এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, পুণ্যবান ও পাপী সকলেই তখন দোজখে প্রবেশ করবে। তোমরা কি অবগত যে, 'উরূদ' অর্থ 'দুখুল' বা প্রবেশ করা? অন্যান্য আয়াতেও 'উরূদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থে। যেমন— ১. সে ওদেরকে নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করবে, যেখানে তারা প্রবেশ করবে তা কতো নিকৃষ্ট স্থান (সুরা হুদ)। ২. এবং অপরাধীদেরকে পিপাসিত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবো (আয়াত ৮৬)।

হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদকে একবার 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে'— এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, এখানকার 'উরূদ' শব্দটির অর্থ প্রবেশ করা। ইকরামা সূত্রে বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, দোজখে প্রবেশ করা ব্যতীত কেউই বাঁচতে পারবে না।

ইমাম আহমদ, তিরমিজি, বায়হাকী ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, সকলে দোজখে অবতরণ করবে। এরপর কৃতকর্মের ভিত্তিতে কাউকে কাউকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসা হবে। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা বের হয়ে আসবে বিদ্যুৎ গতিতে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা বের হবে বাতাসের গতিতে। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা বোঝা বিশিষ্ট উটের গতিতে, পঞ্চম শ্রেণীর লোকেরা মানুষের দৌড়ানোর গতিতে এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর লোকেরা মানুষের সাধারণ চলার গতিতে।

www.eelm.weebly.com

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, সকল মানুষ পুলসিরাতে অবস্থান গ্রহণ করবে। তারপর নিজ নিজ আমলের শক্তি অনুসারে অতিক্রম করবে ওই সেতু। কেউ অতিক্রম করবে বিদ্যুৎ গতিতে, আবার কেউ অতিক্রম করবে দ্রুতগামী উটের গতিতে। কেউ দৌড়ে পার হবে, আবার কেউ পার হবে শ্লথ পদবিক্ষেপে। সর্বশেষ অতিক্রমকারী ব্যক্তি ওই সেতু পার হয়ে যাবে তার পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুলের উপর ভর করে করে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যার তিনটি শিশু সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে, তাকেও প্রবেশ করতে হবে দোজখে, যেহেতু এ বিষয়ে আল্লাহ্ অঙ্গীকার করেছেন। এরপর বর্ণনাকারী আবৃত্তি করলেন, 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে।' হজরত আবদুল্লাহ্ বিন বশীর আনসারী থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন— যার তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে, সে স্থায়ীভাবে দোজখে প্রবেশ করবে না। প্রবেশ করবে কেবল পুলসিরাত অতিক্রম করার সময়।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, গানীম বিন কায়েস বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত কা'বের উপস্থিতিতে লোকদের মধ্যে দোজখে প্রবেশ করা না করা সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলো। হজরত কা'ব বললেন, তখন আগুন সকলের গতিরোধ করবে— পুণ্যবান, পাপী সকলের। ঘোষিত হবে— হে দোজখ, তোমার সঙ্গীদেরকে আটকাও এবং আমার বন্ধুদেরকে ছেড়ে দাও। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যারা দোজখের উপযুক্ত তারা দোজখে পতিত হবে। মানুষ যেমন করে তার আপন সন্তানকে চিনতে পারে, তেমনি করে দোজখ চিনতে পারবে তার অধিবাসীদেরকে। আর ইমানদারেরা সেখান থেকে চলে যাবে অবলীলায়।

সুয়ূতী লিখেছেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হচ্ছে, 'উরূদ' অর্থ প্রবেশ করা। কুরতুবীও এই অর্থটিকে প্রাধান্য প্রদান করেছেন এবং প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন হজরত জাবের ও অন্যদের বর্ণিত হাদিস। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের কোনো কোনো আলেম 'উরূদ' শব্দের অর্থ করেছেন অতিক্রম করা। ইমাম নববীও এই অর্থটিকে পছন্দ করেছেন এবং প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে পুলসিরাত অতিক্রম করার কথা। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসেও

www.eelm.weebly.com

একথার প্রমাণ রয়েছে। আমি বলি, পুলসিরাত অতিক্রম করার অর্থই প্রবেশ করা। কারণ প্রবেশ করার অর্থ এরকম নয় যে, আগুনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হবে। জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করাই হচ্ছে এখানে প্রবেশ করা। অর্থাৎ প্রবেশ করা ও অতিক্রম করা এখানে সমার্থক। কারণ ওই প্রবেশ হবে অতিক্রমাকারে। এটাই বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে সামঞ্জস্য সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা।

যদি এমতো সন্দেহ করা হয় যে, বায়হাকীর বর্ণনায় তো হাসান বসরীর উক্তিরূপে এসেছে, 'উরূদ' অর্থ প্রবেশ নয়, দোজখের উপর দিয়ে অতিক্রম করা এবং অতিক্রম করা ও প্রবেশ করা কখনো এক নয়। তবুও আমি বলবো, হজরত হাসানের বক্তব্যানুসারে প্রবেশ করার অর্থ আগুনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা বা পৌঁছে যাওয়া। তাই যদি হয়, তবে বলতেই হয় প্রবেশ ও অতিক্রম পৃথক দু'টি বিষয়। কিন্তু সাধারণ অর্থে প্রবেশ করার মধ্যে অতিক্রম করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। আর বিশেষ অর্থ অপেক্ষা এক্ষেত্রে সাধারণ অর্থই সর্বজনগ্রাহ্য।

হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, জননী হাফসা বলেছেন, একবার রসুল স. বললেন, আমি দৃঢ় আশা রাখি যারা বদর যুদ্ধে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আমার সঙ্গে ছিলো, তারা কখনো দোজখে প্রবেশ করবে না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আল্লাহ্ কি বলেননি 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে।' রসুল স. বললেন, হাফসা, তুমি কি আল্লাহ্‌র এই ঘোষণা শোনোনি— 'পরে আমি সাবধানীদেরকে উদ্ধার করবো এবং সীমালংঘনকারীদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রাখবো।' রসুল স. এর এই জবাবের মাধ্যমেও একথা প্রমাণিত হয় যে, দোজখাভ্যন্তরে প্রবেশ না করা অর্থ সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান না করা।

সুয়ূতী লিখেছেন, অধিকাংশ সলফে সলিহীন দোজখাভ্যন্তরে পতিত হওয়াকেই ভয় করতেন। কেননা তা নিঃসন্দেহে ভয়ংকর একটি বিষয়, যদিও এখানে বলা হয়েছে, 'পরে আমি সাবধানীদেরকে উদ্ধার করবো।' কিন্তু একথার কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, ওই উদ্ধার পুলসিরাত অতিক্রমকালে হবে, না দোজখাভ্যন্তরে পতিত হওয়ার পর। এই অনিশ্চয়তাই ওই সকল সাধুপুরুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখতো।

আজ্‌জুহদ গ্রন্থে ইমাম আহমদ এবং হজরত হাযেম বিন আবী হাযেম থেকে হান্নাদ, বায়হাকী, সাঈদ ইবনে মনসুর ও হাকেম উল্লেখ করেছেন, একবার হজরত আবদুল্লাহ্ বিন রহ্ওয়াহা কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাঁদছেন কেনো? তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি দোজখে প্রবেশ

www.eelm.weebly.com

করবো। কিন্তু আমাকে একথা নির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি যে, সেখান থেকে আমি উদ্ধার পাবো কিনা। আবু ইসহাক সূত্রে হান্নাদ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত আবু মায়সারাহ্ রাতে শয্যা গ্রহণকালে বলে উঠলেন, আমার জননী যদি আমাকে জন্মদান না করতেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, কেনো, কী হয়েছে? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তো আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন আমি অবশ্যই দোজখে প্রবেশ করবো। কিন্তু একথা নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, আমি তখন উদ্ধারপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো কিনা?

ইমাম আহমদ তাঁর আজ্‌জুহুদ গ্রন্থে লিখেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, এক লোক তার ভাইকে বললো, তুমি কি একথা জানো, সেদিন সকলকেই দোজখে প্রবেশ করতে হবে? তার ভাই জবাব দিলো, হ্যাঁ। লোকটি বললো, একথাও কি সুনিশ্চিতরূপে জানো যে, সেখান থেকে তুমি বের হয়ে আসতে পারবে? তার ভাই বললো, না। লোকটি বললো, তাহলে তুমি কীভাবে হাসো? একথা শুনে তার ভাই বিমর্ষ হয়ে গেলো। অবশিষ্ট জীবনে তাকে আর হাসতে দেখা যায়নি।

এর পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত আবৃত্ত হলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, দুইদলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসেবে কোনটি উত্তম?' একথার অর্থ— আমার রসুলের মাধ্যমে আমার স্পষ্ট আয়াত তাদের বোধগম্যরূপে আবৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও, অথবা তাঁর মাধ্যমে আমার অলৌকিক নিদর্শনরাজি দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়া সত্ত্বেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা দরিদ্র ও মলিন পরিচ্ছদাবৃত বিশ্বাসীদেরকে বলে, দেখো, তোমাদের দল ও আমাদের দলের মধ্যে কতো পার্থক্য। তোমরা নিঃসম্বল, আমরা বিত্তশালী। তোমাদের শরীর ও পরিচ্ছদ অবিন্যস্ত ও অসুন্দর। আর আমরা সুবিন্যস্ত ও পরিপাটি। এবার তবে বলো, কোন দল মর্যাদায় অধিক শ্রেষ্ঠ এবং কোন দলের সমাবেশ অধিকতর উত্তম?

এখানে 'মাক্বাম' অর্থ অবস্থান বা মর্যাদা। আর 'নাদি' অর্থ মজলিস বা সমাবেশ। উল্লেখ্য যে, মক্কার মুশরিকেরা যখন যুক্তি ও বুদ্ধির মাধ্যমে ইসলামের ক্রমপ্রসরমানতাকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলো, তখন তারা সাহাবীগণকে বলতে শুরু করলো, দেখো তোমরা পার্থিব জীবনেই বিপদগ্রস্ত, আর আমরা প্রতাপশালী ও বিত্তাধিকারী। আল্লাহ্ই তো এভাবে আমাদের অবস্থান নির্ধারণ করেছেন। অতএব ভেবে দেখো, শ্রেষ্ঠ কারা? সর্বোত্তম সমাবেশই বা কাদের। আল্লাহ্তায়ালা তাদের এমতো ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতাকে সহ্য করলেন না। অবতীর্ণ করলেন নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ۝ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ۗ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ۝ وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝

❐ উহাদিগের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি— যাহারা উহাদিগের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল।

❐ বল, 'যাহারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাহাদিগকে প্রচুর ঢিল দিবেন যতক্ষণ না তাহারা প্রত্যক্ষ করিবে তাহা যে বিষয়ে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইতেছে, উহা শাস্তি হউক অথবা কিয়ামতই হউক। অতঃপর তাহারা জানিতে পারিবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দলেবলে দুর্বল।

❐ এবং যাহারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাহাদিগের পথনির্দেশে বৃদ্ধি দান করেন এবং সৎকর্ম, যাহার ফল স্থায়ী, উহা তোমার প্রতিপালকের পুরস্কার-প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ ও প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরূপ মন্তব্য শুনে বিচলিত হবেন না। যে কোনো সময় আমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। তাদের চেয়ে অধিক সম্পদ ও প্রতাপের অধিকারী অনেক জনগোষ্ঠীকে তো ইতোপূর্বে আমি বিনাশ করেছি।

যুগসমূহ পরস্পর মিলিত হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক যুগের মানুষকে বলা হয় 'ক্বারনিন'। এখানেও এই শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে অতীত যুগের অবাধ্য জনগোষ্ঠীকে। বাগবী লিখেছেন, এখানকার 'আছাছান' শব্দটির অর্থ— সম্পদ। মুকাতিল বলেছেন, পোশাক পরিচ্ছদ। কামুস প্রণেতা লিখেছেন, গৃহ-সামগ্রী বা তৈজসপত্র। এক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে জাতিবাচকরূপে। জাতিবাচক বিশেষ্যের কখনো একবচন হয় না। 'সম্পদ' অর্থ গ্রহণ করলে আবার শব্দটির একবচন হবে 'আছাছাতুন'। আর এখানকার 'রী'ইয়া' শব্দটি এসেছে 'রূইয়াত'

www.eelm.weebly.com

থেকে। এর অর্থ দৃশ্যতঃ বা বাহ্যতঃ। অর্থাৎ বাহ্যতঃ আড়ম্বরপূর্ণ বা শ্রেষ্ঠ। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, শব্দটির অর্থ সতেজতা। অর্থাৎ সম্পদগত প্রাচুর্য।

পরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— 'বলো, যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদের প্রচুর ঢিল দিবেন' এখানকার 'ফালইয়ামদুদ্' কথাটি নির্দেশসূচক। কিন্তু তা ব্যবহৃত হয়েছে বিধেয় এর অর্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— মানুষ বিভ্রান্তিতে যতবেশী জড়িত, আল্লাহ্ ততবেশী অবকাশ দান করেন তাদেরকে। বিধেয়রূপে কথাটি উপস্থাপনের মধ্যে এখানে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে দীর্ঘ অবকাশ দান করবেন এজন্য যে, তারা যেনো কোনো অজুহাত দেখাতে না পারে। যেনো না বলতে পারে সংশোধনের সুযোগ আমাদেরকে দেয়া হয়নি। এক আয়াতে বিষয়টি পরিষ্কাররূপে বিবৃত হয়েছে এভাবে— 'আমি কি তোমাদের এতো দীর্ঘজীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে' (সুরা ফাতির)।

এরপর বলা হয়েছে— 'যতক্ষণ না তারা প্রত্যক্ষ করবে তা, যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে, তা শাস্তি হোক অথবা কিয়ামতই হোক।' এখানে 'শাস্তি' দ্বারা উদ্দেশ্য হত্যা অথবা বন্দিত্ব। আর 'আস্সাআত্' দ্বারা বুঝানো হয়েছে কিয়ামত বা আখেরাতের দুর্ভোগকে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আমি তাদেরকে ওই সময় পর্যন্ত সংশোধনের অথবা অধিকতর শাস্তির উপযোগী হওয়ার অবকাশ দান করবো, যতক্ষণ না তাদের উপরে আপতিত করি মুসলমানদের হাতে নিহত অথবা বন্দী হওয়ার শাস্তি, কিংবা মৃত্যু পরবর্তী আযাব।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা জানতে পারবে কে নিকৃষ্ট ও কে দলে বলে দুর্বল।' এখানে 'জুনদা' অর্থ সৈন্য, সাহায্যকারী। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সাহায্যকারী শয়তান। আর বিশ্বাসীদের সাহায্যকারী ফেরেশতা। আলোচ্য বাক্যের দ্বারা 'দুই দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিশ হিসেবে কোনটি উত্তম' সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের এ কথাকে প্রতিহত করা হয়েছে।

এর পরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'এবং যারা সৎ পথে চলে আল্লাহ্ তাদের পথনির্দেশে বৃদ্ধি দান করেন।' একথার অর্থ— এবং যারা সৎ পথের পথিক আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে দান করেন অধিক হেদায়েত। দান করেন তাঁর নৈকট্য ও সন্তোষ। সুতরাং বিশ্বাসীরা পার্থিব প্রতাপ ও সম্পদে দুর্বল হওয়ার অর্থ

www.eelm.weebly.com

এই নয় যে, তারা আল্লাহ্ থেকে দূরবর্তী। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রভাব ও সম্পদও নয় আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন হওয়ার কোনো আলামত। বরং সম্পদের স্বল্পতার কারণেই বিশ্বাসীরা পায় অধিক নির্ভুল পথনির্দেশনা। আর সম্পদের প্রাচুর্য অবিশ্বাসীদেরকে করে তোলে অধিকতর ভ্রষ্ট। দীর্ঘ অবকাশের ফলে তাদের ওই পথভ্রষ্টতা হয় অনড়, অবিচল ও নিরাময়ের অযোগ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সৎকর্ম, যার ফল স্থায়ী, তা তোমার প্রতিপালকের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ ও প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।' এখানে 'আলবাকীয়্যাতুস সলিহাত' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই সকল পুণ্যকর্মকে যার বিনিময় হয় নিরবচ্ছিন্ন। অর্থাৎ কাফেরদের সম্পদগত উপকার যেমন অপূর্ণ, তেমনি ধ্বংসশীলও বটে। কিন্তু ইমানদারদের পুণ্যকর্ম ও সওয়াব স্থায়ী ও উত্তম।

এখানকার 'খইর' শব্দটি তুলনামূলক বিশেষণের শব্দরূপ। তাই মনে হতে পারে, সম্ভবতঃ অবিশ্বাসীরাও আল্লাহ্র নিকট থেকে কিছুটা উপকার লাভ করবে। লাভ করবে বিশ্বাসীদের চেয়ে কিছুটা কম শুভপরিণতি। কিন্তু এই ধারণাটি ঠিক নয়। কারণ এখানকার তুলনাটি সমান্তরালবোধক নয়। এখানে কেবল 'খইর' বা শ্রেষ্ঠত্বকে তুলনা করা হয়েছে পুরস্কার ও প্রতিদানের শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে। যেমন বলা হয়— গ্রীষ্মের মওসুম শীতের মওসুম থেকে অনেক বেশী উষ্ণ। একথার অর্থ— শীতকালে যেমন শীত বেশী হয়, তেমনি গ্রীষ্মের উত্তাপ হয় শীতকালের চেয়ে বেশী।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত খাব্বাব বর্ণনা করেছেন, আমি লোহার জিনিষ পত্র তৈরী করতাম। একবার আস ইবনে ওয়ায়েল আমার কাছ থেকে কিছু কাজ করিয়ে নিলো। কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পারিশ্রমিক দিলো না। প্রাপ্য পারিশ্রমিক সংগ্রহের জন্য আমি একদিন তার কাছে গেলাম। সে বললো, আল্লাহ্র কসম মোহাম্মদের আল্লাহ্কে অস্বীকার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করবো না। আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ, তুমি মরে গিয়ে দ্বিতীয় বার বেঁচে না ওঠা পর্যন্ত আমি এরকম কথা বলবো না। সে বললো, সত্যি কি মৃত্যুর পর আমাকে জীবিত করা হবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বললো, তাহলে তো সেখানে আমার ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি সবকিছুই থাকবে। ঠিক আছে, সেখানেই আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করবো। তার একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

www.eelm.weebly.com

أَفَرَءَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۝ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ۝ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُۥ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝ وَنَرِثُهُۥ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝

❐ তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ উহাকে, যে আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে 'আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হইবেই।'

❐ সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে অথবা দয়াময়ের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছে?

❐ ইহা সত্য নহে, তাহারা যাহা বলে আমি তাহা লিখিয়া রাখিব এবং তাহাদিগের শাস্তি বৃদ্ধি করিতে থাকিব।

❐ সে যাহা বলে তাহা থাকিবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসিবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

❐ তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করে এই জন্যে যাহাতে উহারা তাহাদিগের সহায় হয়।

❐ না, এই ধারণা অবাস্তব, উহারা তাহাদিগের ইবাদত অস্বীকার করিবে এবং তাহাদিগের বিরোধী হইয়া যাইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি কি হতভাগ্য আস ইবনে ওয়ায়েলের কথা শুনেছেন? সে আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, মৃত্যু-উত্তর জীবনে তাকে নাকি তার ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে।

বাগবী লিখেছেন, 'উলদা' এবং 'ওয়ালাদা' শব্দ দু'টো সমার্থক। এর অর্থ সন্তান-সন্ততি। এরকম সমার্থক শব্দের আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন 'উরবুন' 'আরাবু', 'উজমুন', 'আজামুন'। কেউ কেউ বলেছেন, 'উলদুন' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে, 'ওয়ালাদুন'। যেমন 'উসদুন' এর একবচন 'আসাদুন।'

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'আত্ত্বলাআ'ল গইবা' (সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে)। এখানে 'ইলা' (দিকে) শব্দটি রয়েছে উহ্য। যেমন 'আত্ত্বলাআ'ল জাবাল' অর্থ পাহাড়ের দিকে গমন করো। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— সে কি অদৃশ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছে? হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— সে কি লওহে মাহফুজ দেখে নিয়েছে? মুজাহিদ অর্থ করেছেন— সে কি গায়েবের এলেম হাসিল করেছে, যে পরকালে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রাপ্তির আশা করছে?

এরপর বলা হয়েছে— 'অথবা দয়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে?' একথার অর্থ— সে কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমার প্রবক্তা হয়েছে? কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন— সে কি প্রয়োজনীয় পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছে? কালাবী অর্থ করেছেন, আল্লাহ্ কি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ?

এর পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'এটা সত্য নয়, তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখবো এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকবো।'

একটি প্রশ্নঃ সত্যপ্রত্যাখ্যানজনিত উক্তি এবং পাপবচন উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তো মন্দ আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা তা লিখে নেয়। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে— মানুষের উচ্চারিত কথা লিপিবদ্ধ করবার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই আছে (সুরা কাহফ)। কিন্তু এই আয়াতে 'আমি তা লিখে রাখবো' এরকম বলা হলো কেনো?

উত্তরঃ এখানে 'লিখে রাখবো' কথাটির অর্থ হবে সংরক্ষণ করবো, অথবা প্রকাশ করবো, কিংবা এমতো অপকথনের প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

আমল-লেখক ফেরেশতারা মানুষের কর্মকাণ্ডের বিবরণ লিখে রাখে। একাজ তারা করে আল্লাহ্র নির্দেশেই। তাই এখানে আল্লাহ্তায়ালা লিপিবদ্ধ করার কর্মটিকে সম্পৃক্ত করেছেন নিজের সঙ্গে। আর 'তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকবো' কথাটির অর্থ হবে এখানে এরকম— তারা তো সৃষ্টিলগ্ন থেকেই শাস্তিযোগ্য বলে নির্ধারিত। তদুপরি তাদেরকে আমি আরো অধিক শাস্তি প্রদান করবো, তাদের এমতো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপজনিত উক্তির কারণে।

এর পরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে— 'সে যা বলে তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।' একথার অর্থ— তার মৃত্যুর পরে তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মালিকানা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবে। সকল কিছুর প্রকৃত মালিক তো আমি। আর মহাবিচারের দিবসে তাকে আমার নিকটে আসতে হবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করে এজন্যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়।' এখানে 'ইত্তাখাজু' কথাটির সর্বনাম সম্পৃক্ত হয়েছে মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে। আর 'আলিহাতান' কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, তাদের ওই সকল ইলাহ্ বা প্রতিমাগুলোকে, যার আরাধনা তারা করতো। তারা বিশ্বাস করতো আল্লাহ্তায়ালার দরবারে তাদের ওই সকল প্রতিমাগুলো সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে। আলোচ্য আয়াতে তাদের ওই অপবিশ্বাসটিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

এর পরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'না, এই ধারণা অবাস্তব, তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে।' একথার অর্থ— কখনোই নয়। তাদের ধারণা বাস্তববিবর্জিত। মহাবিচারের ময়দানে তাদের বাতিল উপাস্যগুলো তাদেরকে অস্বীকার করবে। বলবে, এরা আমাদের উপাসনা করতো না। প্রকৃতপক্ষে তারা উপাসনা করতো স্বপ্রবৃত্তির ও শয়তানের। আমরা তাদের অপবিত্র ক্রিয়াকর্ম থেকে মুক্ত। কথাটির উদ্দেশ্য এরকমও হতে পারে যে— ওই দিন তারা তাদের অংশীবাদিতার বিষয়টিকে অস্বীকার করবে। বলবে, শপথ করে বলছি, আমরা কখনোই অংশীবাদী ছিলাম না।

এরপরে বলা হয়েছে— 'ওয়া ইয়াকুনুনা আলাইহিম দ্বিদ্দা ' (এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে)।

'দ্বিদ্দা' অর্থ অপমান, অসম্মান, অবজ্ঞা। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে— প্রতিমাগুলো সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হয়ে আল্লাহ্র দরবারে তাদের সম্মান বৃদ্ধি করবে, সে কারণেই অংশীবাদীরা তাদের উপাসনা করে। আলোচ্য আয়াতে তাই তাদের ওই অপবিশ্বাসকে নাকচ করা হয়েছে, 'দ্বিদ্দা' (অসম্মান) শব্দটির মাধ্যমে । অথবা 'দ্বিদ্দা' শব্দটির দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে শত্রু হওয়া বা বিরোধী হওয়াকে। অর্থাৎ তাদের বাতিল উপাস্যগুলো সেদিন হবে তাদের ঘোর বিরুদ্ধপক্ষ। এরকমও হতে পারে যে, সেদিন নিরুপায় হয়ে অংশীবাদীরা হয়ে যাবে তাদের বাতিল উপাস্যসমূহের বিরুদ্ধে। বলবে আমরা কখনোই নিশ্চিত মুশরিক ছিলাম না।

'দ্বিদ্দা' শব্দটি একক বা সম্মিলিত অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ সে দিন সকল অংশীবাদী একজোট হয়ে অস্বীকার করবে তাদের উপাস্যগুলোকে। হজরত আলী থেকে আবু দাউদ, নাসাঈ এবং হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে হাব্বান উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেদিন তারা সকলে তাদের উপাস্যগুলোর বিরোধী হওয়ার ব্যাপারে হয়ে যাবে একটি বাহুর মতো। অর্থাৎ এ ব্যাপারে তারা সেদিন হবে অটুট ও ঐকমত্যভূত। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, বহুবচনরূপেও 'দ্বিদ্দা' শব্দটি প্রয়োগ করা যায়। যেমন প্রয়োগ করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যে।

www.eelm.weebly.com

أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ○ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ○ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ○ وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ○ لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ○

❐ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের নিকট শয়তান পাঠাইয়াছি উহাদিগের মন্দ কর্মে বিশেষভাবে উৎসাহ দান করিবার জন্য।

❐ সুতরাং তাহাদিগের বিষয়ে তাড়াতাড়ি করিও না। আমি তো গণনা করিতেছি উহাদিগের নির্ধারিত কাল,

❐ যে দিন দয়াময়ের নিকট সাবধানীদিগকে সম্মানিত অতিথিরূপে সমবেত করিব,

❐ এবং অপরাধীদিগকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে খেদাইয়া লইয়া যাইব।

❐ যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে সে ব্যতীত অন্য কাহারও সুপারিশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট শয়তান প্রেরণ করেছি। ওই শয়তানেরা তো তাদেরকে পাপকর্মে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে।

আলোচ্য আয়াত উপস্থাপিত হয়েছে বিস্ময়সূচক এবং অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্নের আকারে। রসুল স.কে বিস্মিত করাই এরকম বক্তব্যভঙ্গির উদ্দেশ্য। এভাবেই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে ওই সকল লোকের প্রকৃত অবস্থা, সত্য স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার পরেও যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানে থাকে অবিচল।

বাগবী লিখেছেন, অন্য একটি আয়াতের বক্তব্যও আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের পরিপূরক। ইবলিসকে লক্ষ্য করে সেখানে আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমার আহ্বানের দ্বারা তাদের মধ্যে যাকে পারো পদস্খলিত করো' (সুরা বানী ইসরাইল)। অথবা এখানকার 'আরসালনা' কথাটির অর্থ ছেড়ে দেয়া বা মুক্ত করে দেয়া। অর্থাৎ আমি শয়তানকে ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ছেড়ে দিয়ে রেখেছি। যেমন বলা হয় — 'আরসালতুল্ বায়ীর' (আমি উটকে উন্মুক্ত করে দিয়েছি, ছেড়ে দিয়েছি)।

www.eelm.weebly.com

'আয্‌যুন' অর্থ প্রলুব্ধ করা, অনুপ্রাণিত করা, উৎসাহ দান করা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি শয়তানকে ছেড়ে দিয়েছি মিথ্যা কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহ দানের জন্য।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তাদের বিষয়ে তাড়াতাড়ি কোরো না। আমি তো গণনা করছি তাদের নির্ধারিত কাল। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! সুতরাং তাদের উপরে শাস্তি আপতিত হওয়ার ব্যাপারে আপনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে দোয়া করবেন না। আমি তো তাদের শাস্তির দিন-ক্ষণ নির্ধারিত করেই রেখেছি। নির্দিষ্ট করে দিয়েছি তাদের আয়ু। যথাসময়ে সে শাস্তি বাস্তবায়িত হবেই।

এর পরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'যে দিন দয়াময়ের নিকট সাবধানীদেরকে সম্মানিত অতিথিরূপে সমবেত করবো।'

এখানে 'ইলার রহমান' (দয়াময়ের নিকটে) কথাটির অর্থ ওই সম্মানিত স্থান, যেখানে পরিদৃশ্যমান হয় আল্লাহ্‌র উপাস্য হওয়ার (উলুহিয়াতের) তাজাল্লী বা বিচ্ছুরণ। আর এখানকার 'ওয়াফ্‌দান' শব্দটি 'ওয়াফিদ্‌' এর বহুবচন। এভাবে আলোচ্য আয়াতে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— সম্রাটের দরবারে যেমন অতিথিবৃন্দকে উপস্থিত করানো হয় পুরস্কৃত ও সম্মানিত করবার জন্য, তেমনি আল্লাহ্‌র দরবারে মুত্তাকী বা সাবধানীদেরকেও সমবেত করানো হবে সম্মানিত অতিথিরূপে।

আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আহমদ তাঁর যাওয়াইদুল মসনদ গ্রন্থে এবং হাকেম, বায়হাকী, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে হজরত আলী বলেছেন, হে জনতা! উত্তমরূপে অবগত হও। মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না, নিয়ে যাওয়া হবে না পদব্রজে, বরং তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে বেহেশতে উটের পিঠে আরোহণ করিয়ে। আল্লাহ্‌র কোনো সৃষ্টিই সেরকম উট কখনো দেখেনি। ওই উটগুলোর হাওদা হবে স্বর্ণনির্মিত এবং সেগুলোর নাসারন্ধ্রের রশি হবে জবরজদের। ওই উটের পিঠে সওয়ার হয়ে মুত্তাকীরা গিয়ে করাঘাত করবে বেহেশতের দরজায়।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তাদেরকে পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না। নিয়ে যাওয়া হবে স্বর্ণের হাওদা ও ইয়াকুতের জ্বিন বিশিষ্ট উটে চড়িয়ে। তারা যদি চায়, তবে তাদের ওই বাহনগুলোকে তারা উড়িয়েও নিয়ে যেতে পারবে।

তালহা বিন আবী তালহার পদ্ধতিতে বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সাবধানীদেরকে তখন দয়াময়ের দরবারে নিয়ে যাওয়া হবে বাহনে

www.eelm.weebly.com

উঠিয়ে। আর 'এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে খেদিয়ে নিয়ে যাবো' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অবাধ্য ও পাপিষ্ঠদেরকে তখন দোজখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে পিপাসিত অবস্থায়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু তালহা সূত্রে ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন। এখানে 'ওয়াফ্‌দান' অর্থ উটের উপরে আরোহণ করা।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, ওমর ইবনে কায়েস মালায়ী বর্ণনা করেছেন, কবর থেকে মুমিন ব্যক্তিকে যখন ওঠানো হবে, তখন তার আমল পবিত্র ও সুবাসিত পরিচ্ছদাবৃত হয়ে সুন্দর আকৃতিতে তার সামনে উপস্থিত হবে এবং বলবে, আমাকে চিনতে পারছেন? মুমিন ব্যক্তি বলবে, না। কিন্তু তুমি সুন্দর ও পবিত্র। আমল বলবে, পৃথিবীতেও আমি এরকম ছিলাম। আমি আপনার পুণ্যকর্ম। পৃথিবীতে দীর্ঘদিন ধরে আমি আপনার উপরে সওয়ার হয়েছিলাম। এখন আপনি আমার উপরে সওয়ার হয়ে যান। এপর্যন্ত বলার পর বর্ণনাকারী পাঠ করলেন 'যে দিন দয়াময়ের নিকট সাবধানীদেরকে সম্মানিত অতিথিরূপে সমবেত করবো।' বর্ণনাকারী পুনরায় বললেন, অবিশ্বাসীদের আমল তাদের সম্মুখে উপস্থিত হবে অসুন্দর আকৃতিতে, দুর্গন্ধিত অবস্থায়। বলবে, আমাকে চিনতে পারছো? সে বলবে, না। কিন্তু তুমি তো কুৎসিত ও দুর্গন্ধযুক্ত। তার আমল বলবে, আমি দুনিয়াতেও এরকম ছিলাম। আমি তোমার মন্দ আমল। দুনিয়াতে দীর্ঘদিন ধরে তুমি আমার ঘাড়ে চড়েছিলে। এখন আমি তোমার ঘাড়ে চড়বো। এপর্যন্ত বলার পর বর্ণনাকারী পাঠ করলেন, 'তারা নিজের বোঝা নিজের পিঠের উপর উঠিয়ে নেবে।'

এর পরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে 'এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে খেদিয়ে নিয়ে যাবো।' এখানে 'মুজ্‌রিমীন' (অপরাধীদেরকে) বলে বোঝানো হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। বাগবী লিখেছেন, এখানকার 'বিরদা' শব্দটির অর্থ পায়ে হাঁটিয়ে। কেউ কেউ বলেছেন, তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হবে ভয়ানক পিপাসিত। অত্যধিক পিপাসার ফলে প্রাণ হবে ওষ্ঠাগত। গলা যাবে শুকিয়ে। উল্লেখ্য যে, পানির উপরে অবতরণকারী দলকে বলে 'বিরদা'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শব্দটির অর্থ হবে তৃষিত।

আমি বলি, পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা দু'টি দলের হাশরের কথা বর্ণনা করেছেন। ১. সাবধানীগণ। নবী ও আল্লাহ্‌র পরিচয়ধন্য ব্যক্তিবর্গ থাকবেন ওই দলে। ২.'মুজ্‌রিমীন'। পুণ্যবান-পাপী এবং সাধারণ শ্রেণীর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথা এখানে উল্লেখিত হয়নি। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কোনো কোনো লোককে সেদিন ওঠানো হবে নগ্নপদ অবস্থায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হবে পুণ্যবান ও কেউ কেউ হবে পাপী। সুরা বানী ইসরাইলের

www.eelm.weebly.com

তাফসীরে এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। হজরত আবু জর কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, হাশরের ময়দানে উপস্থিত লোকেরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিনটি দলে— বাহনারোহী দল, পায়ে হেঁটে চলা দল এবং মুখের উপর ভর করে চলা দল। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে— লোকদের হাশর হবে তিন রকমের। কেউ কেউ হবে উৎফুল্ল, আর কেউ কেউ হবে ভীতসন্ত্রস্ত। কোনো কোনো উটের আরোহী হবে দু'জন, কোনো কোনো উটের আরোহী হবে তিনজন অথবা দশজন। সেখানে তাদের সাথে থাকবে আগুন। যেদিকেই তারা চলুক না কেনো, ওই আগুনও চলবে তাদের সাথে সাথে। শায়েখ ইবনে হাজার বলেছেন, 'রগিবীন' ও 'রহিবীন' শ্রেণীর লোকেরা হবে প্রথমোক্ত প্রকারের। আর উটের উপর দু'জন, তিনজন এবং দশজন আরোহণের কথা হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, কেবল একজন আরোহণের কথা বলা হয়নি। তাই ইশারা ইঙ্গিতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, উটের পিঠের একজন আরোহীরা হবেন আবরার (বিশেষ পুণ্যবান) শ্রেণীর।

বায়হাকী লিখেছেন, 'রগিবীন' শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে আবরার বা নেককারগণকে। 'রাহিবীন' দ্বারা বোঝানো হয়েছে ওই সকল লোককে, যারা অবস্থান করবে আশা নিরাশার মধ্যে। আর আগুন যাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে, তারা হবে কাফের। হালিমীও এ হাদিসের এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন এতটুকু— আবরার ও মুত্তাকীদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জান্নাত থেকে আনা হবে উট। অন্যান্য পুণ্যবানকেও নিয়ে যাওয়ার জন্য উটের ব্যবস্থা থাকবে। উটগুলোকে ওই সময়েই সৃষ্টি করা হবে। সুয়ূতী বলেছেন, এই কথাটিই অধিকতর যথার্থ। যারা পাপী বিশ্বাসী তাদের জন্য জান্নাত থেকে উট আনা হবে, এধারণাটি ঠিক নয়। তবে হিসাবের সময় তাদের মধ্যে যারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে, তাদের জন্য উট আনার ব্যাপারটি অযৌক্তিক নয়। এরপর অবশিষ্ট থাকবে কেবল তারা, যাদের জন্য নির্ধারিত হবে দোজখের শাস্তি। দোজখের দিকে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে পায়ে হাঁটিয়ে। শুরু থেকেই তারা হবে বাহনবিবর্জিত। অথবা হাশর প্রান্তরে তারা যেতে থাকবে সওয়ারীতে আরোহণ করে। কিন্তু প্রান্তরের নিকটবর্তী যখন হবে, তখন তারা চলবে পায়ে হেঁটে। আর যারা আগে থেকেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও অংশীবাদী, তারা বরাবরই চলবে মুখের উপর ভর করে। তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা কোনো সময়েই করা হবে না।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেদিন নবী-রসুলগণকে সওয়ারীতে আরোহণ করানো হবে। এভাবে

www.eelm.weebly.com

তাঁরা পৌঁছবেন হাশরের ময়দানে। নবী সালেহ্‌কে তাঁর কবর থেকে ওঠানো হবে তাঁর উষ্ট্রারোহী অবস্থায়। আমাকে ওঠানো হবে আমার বোরাকে আরোহণ করিয়ে। আমার প্রিয় দৌহিত্রদ্বয়কে ওঠানো হবে জান্নাত থেকে নিয়ে আসা দু'টি উটের উপর। বেলালও হবে সেদিন উষ্ট্রারোহী। উটে চড়ে সে আযান দিবে। ঘোষণা করবে— আশহাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্। যখন আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ্ বলবে, তখন সকল বিশ্বাসী একযোগে তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। খাঁটি বিশ্বাসীদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে এবং যারা খাঁটি নয়, তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

হালিমী ও গাজ্জালী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, যাদেরকে সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়ে নেয়া হবে, তাদেরকে কবর থেকে ওঠানো হবে সওয়ারী অবস্থাতেই। কিন্তু ইসমাইলী অন্যান্য হাদিসের সামঞ্জস্য সাধনার্থে তাঁদের একথাকে স্বীকার করতে চাননি। বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজির এক যথাসূত্রসম্বলিত বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার রসুল স. ভাষণ দানের জন্য দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন, হে জনতা! তোমাদেরকে আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত করানো হবে খালি গায়ে খালি পায়ে এবং খতনা বিহীন অবস্থায়। এরপর তিনি পাঠ করলেন — 'যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করবো' (সুরা আম্বিয়া)। তারপর তিনি স. বললেন, সর্বপ্রথম পোশাক পরিধান করানো হবে পিতা ইব্রাহিমকে। জননী আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম, জননী সাওদা , জননী উম্মে সালমা, হজরত সহল ইবনে সা'দ, হজরত হাসান ইবনে আলী থেকে তিবরানী এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বায্যারও এরকম বর্ণনা এনেছেন। কিন্তু তাঁদের বর্ণনায় উদ্ধৃত আয়াতটি পাঠ করার কথা এবং হজরত ইব্রাহিমকে সর্বপ্রথম পোশাক পরিধানের কথাটি নেই। আছে আর একটি কথা— উম্মত-জননীগণের মধ্যে একজন তখন বললেন, হায়! কি লজ্জার কথা, তখন একে অপরকে দেখবে। রসুল স. বললেন, সেদিন অপরের দিকে দৃষ্টিপাত করার মনোবৃত্তি ও সুযোগ কারোরই থাকবে না। সকলেই থাকবে আপনাপন পরিণতির চিন্তায় নিমগ্ন।

এর পরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না।' একথার অর্থ— যারা শাফায়াত করার যোগ্য সেদিন কেবল তারাই শাফায়াত করতে

www.eelm.weebly.com

পারবে, অন্য কেউ নয়। আল্লাহ্ বলেছেন— 'তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করবো।' আরো বলেছেন— 'তিনি বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ধিত করেন' (সুরা শূরা)। এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাদের ভ্রাতাদের জন্য তাদের শাফায়াত আল্লাহ্ কবুল করবেন। একথা বর্ণনা করেছেন ইবনে সালেহ।

এখানকার 'আহ্দা' শব্দটির অর্থ অনুমতি বা সম্মতিও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— যারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাফায়াতের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত কেবল তারাই সেদিন শাফায়াত করতে পারবে, অন্য কেউ নয়। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কে সে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে' (সুরা বাকারা)। আরববাসীরা বলে— প্রশাসক এক লোককে এরকম করার অনুমতি দিয়েছে (আহাদাল আমীরু ইলা ফুলানিন্ বিকাজা)।

কোনো কোনো আলেম মনে করেন 'যারা দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে' কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমায় দৃঢ় বিশ্বাসী। আর এখানকার 'মান' কথাটির পূর্বে 'শাফায়াত' কথাটি উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য শব্দটি সহযোগে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমায় বিশ্বাসী প্রত্যেককে শাফায়াতকারী বলা যায়। আর আল্লাহ্ তো সকল বিশ্বাসীকে ক্ষমা করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। যেমন— ১. 'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে' (সুরা যিলযাল)। ২. 'আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন' (সুরা যুমার)। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র উপর তাঁর বান্দাদের এই হক রয়েছে যে, যারা অংশীবাদী নয়, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে। শাফায়াত বা সুপারিশ সম্পর্কে অন্য একটি আয়াতের বক্তব্য এরকম— 'তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি প্রসন্ন' (সুরা আম্বিয়া)।

কোনো কোনো আলেমের ধারণা এখানকার 'লা ইয়ামলিকুনা' কথাটির সর্বনাম সম্পর্কিত হবে পূর্ববর্তী আয়াতের 'আলমুজরিমীনা' (অপরাধীদেরকে) কথাটির সঙ্গে। আর এখানকার 'শাফায়া'তা' কথাটির উদ্দেশ্য হবে শাফায়াতপ্রাপ্ত হওয়া। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়াবে— অপরাধীরা শাফায়াতপ্রাপ্ত হবে না। শাফায়াতপ্রাপ্ত হবে কেবল বিশ্বাসীরা, আল্লাহ্ যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

www.eelm.weebly.com

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۝ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ۝ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۝ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۝ اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۝ لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۝

❐ তাহারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।'

❐ তোমরা তো এক অদ্ভুত কথা সৃষ্টি করিয়াছ।

❐ হয় তো আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, পৃথিবী বিদীর্ণ হইবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে,

❐ তাহারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করাতে।

❐ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নহে!

❐ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হইবে না দাসরূপে।

❐ তাঁহার জ্ঞান তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে এবং তিনি তাহাদিগকে বিশেষভাবে গণনা করিয়াছেন,

❐ এবং কিয়ামতের দিবসে উহাদিগের সকলেই তাঁহার নিকট আসিবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া ক্বালুত্ তাখাজার্ রহ্মানু ওয়ালাদা' (তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন)। এখানে 'তারা বলে' (ক্বালু) একথা উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে ইহুদী-খৃষ্টান ও ওই সকল অংশীবাদীকে যারা বলে, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। তাদের অংশীবাদিতার বিষয়টি সর্বজনবিদিত। তাই তাদের কথা স্পষ্ট উল্লেখ না করে 'তারা বলে'— একথার মাধ্যমে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে কেবল তাদের অপকর্মের কথা।

পরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'লাক্বদ্ জি'তুম শাইয়্যান ইদ্দা' (তোমরা তো এক অদ্ভুত কথা সৃষ্টি করেছো)। হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'ইদ্দা' শব্দটির অর্থ করেছেন— ঘৃণিত, জঘন্য। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন—

www.eelm.weebly.com

অত্যধিক মন্দ। যেমন বলা হয়— 'আদানী আমরুন' (অমুক কথা বা ঘটনা আমাকে পীড়া দিয়েছে)। এটি একটি আরবী বাগধারা। বাগবী লিখেছেন, 'ইদ্দুন' অর্থ আকস্মিক দুর্ঘটনা।

এর পরের আয়াতদ্বয়ে (৯০, ৯১) বলা হয়েছে—'হয়তো আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী বিদীর্ণ হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করাতে।' কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'হাদ্দুন' অর্থ খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া। কোনো কোনো আলেম আয়াতদ্বয়ের অর্থ করেছেন— 'আল্লাহ্‌র সন্তান রয়েছে'— এমতো জঘন্য উক্তির কারণে যে কোনো সময় আকাশ ভেঙে পড়তে পারে, ধসে পড়তে পারে মৃত্তিকা এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে পর্বতরাজি। হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত কা'ব বলেছেন, জ্বিন ও মানুষ ছাড়া আকাশ-পৃথিবী ও পর্বতমালাসহ সমগ্র সৃষ্টি আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের উচ্চারণে ভীত হয়ে পড়েছিলো। স্থানচ্যুত হবার উপক্রম করেছিলো সকলেই। ফেরেশতারা হয়ে পড়েছিলো প্রচণ্ড রোষতপ্ত। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিলো নরকের লেলিহান আগুন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার সহিষ্ণুতা অন্তহীন। যদি তা না হতো, তবে আলোচ্য আয়াতদ্বয় উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যেতো সমগ্র সৃষ্টি।

এর পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— 'সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়।' এখানে 'শোভন নয়' কথাটির অর্থ হতে পারে দু'রকম— ১. বৈধ নয় এবং ২. সম্ভব নয়। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌র সন্তান হওয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে অবৈধ অথবা অসম্ভব। এরকম কলঙ্ক ও ত্রুটি থেকে তিনি চিরমুক্ত, চিরপবিত্র ও চির অমুখাপেক্ষী।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে আল্লাহ্‌র স্থলে 'রহমান' শব্দটি বসিয়ে এই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালাই একমাত্র দাতা, আর সমগ্র সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী ও গ্রহীতা। অথবা সকলেই আল্লাহ্‌র দয়া বা অনুগ্রহপ্রাপ্ত। এভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, অমুখাপেক্ষী অনুগ্রহদাতা ও মুখাপেক্ষী অনুগ্রহগ্রহীতা সমশ্রেণীভূত নয়। কিন্তু পিতা ও তার সন্তানকে সমশ্রেণী বা সমজাতিভূত হতেই হয়। একারণেই আল্লাহ্‌র সন্তান হওয়া একটি অসম্ভব ব্যাপার । এরকম অংশীবাদী ধারণা থেকে তিনি সতত পবিত্র।

এর পরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবে না দাসরূপে।' একথার অর্থ— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির একক অধিকর্তা আল্লাহ্। সকলেই এবং সকল কিছুই তাঁর অধীন। সুতরাং তাঁর সকাশে একদিন সকলকেই অসহায় দাসরূপে উপস্থিত হতে হবে। 'প্রভুপালকত্ব ও দাসত্ব'— এটাই তাঁর ও তাঁর সৃষ্টির স্থায়ী সম্পর্ক। কিন্তু কোনো পিতা তার সন্তানের মালিক বা প্রভুপালক নয়। ধরা যাক, কেউ তার সন্তানের মালিক হলো ক্রয়সূত্রে, উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা

www.eelm.weebly.com

দানসূত্রে। কিন্তু যখনই তার সন্তানের উপর তার মালিকানা প্রযুক্ত হবে, তখনই তো তার সন্তান হয়ে যাবে স্বাধীন। কারণ সন্তান কখনোই ক্রীতদাস বা দাস নয়। সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্র সন্তান একটি অবাস্তব ও অসম্ভব ব্যাপার। কোনো সৃষ্টিই তাঁর সন্তান নয়, বরং দাস। আর তিনি একাই সকল কিছুর একক ও অংশীবিহীন প্রভুপালক ও মালিক। তাই দাসরূপে ছাড়া অন্য কোনোরূপে আল্লাহ্র সকাশে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না।

এর পরের আয়াতে (৯৪) বলা হয়েছে— 'তাঁর জ্ঞান তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্র জ্ঞান আনুরূপ্যবিহীনরূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাই মানুষের ও সমগ্র সৃষ্টির অনস্তিত্ব-স্থায়িত্ব, আদি-অন্ত, প্রকাশ্য-গোপন, রিজিক, হায়াত সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ব।

শেষোক্ত আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'এবং কিয়ামতের দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।' এ কথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে হাশরের প্রান্তরে কোনো আপনজন বা সঙ্গী-সাথীকে নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। সেখানে সকলের উপস্থিতি হবে নির্বৈভব, নির্বস্ত্র ও নিঃসঙ্গরূপে।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ থেকে ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর আমার হৃদয়ে মক্কাবাসী কিছু বন্ধুর স্মৃতি জাগ্রত হলো। যেমন শাইবা ইবনে রবীয়া, উত্বা ইবনে রবীয়া, উমাইয়া ইবনে খালফ প্রমুখ। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সূরা মার্য়ামঃ আয়াত ৯৬, ৯৭, ৯৮

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ○ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا ○ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ○

❑ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে দয়াময় তাহাদিগের জন্য সৃষ্টি করিবেন ভালবাসা।

❑ আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি যাহাতে তুমি উহা দ্বারা সাবধানীদিগকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার।

www.eelm.weebly.com

❑ তাহাদিগের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি! তুমি কি তাহাদিগের কাহাকেও দেখিতে পাও অথবা তাহাদিগের ক্ষীণতম শব্দও শুনিতে পাও?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! যারা আমাকে ও আপনাকে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমি তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দেবো ভালোবাসার বন্ধন অথবা এমন কিছু লোক সৃষ্টি করবো যারা তাদেরকে ভালোবাসবে।

কামুস প্রণেতা বলেছেন, এখানকার 'বুদ্দা' শব্দটির অর্থ ভালোবাসা। বুদ্দুন ও বিদাদুন অর্থ— প্রেম ও প্রেমিক। অর্থাৎ একই সঙ্গে শব্দটি ধাতুমূল ও কর্তৃবাচক। অধিক ভালোবাসে যে, তাকে যেমন 'ওয়াদীদ্' বলা হয়, তেমনি বলা হয় 'উদ্'। অর্থাৎ শব্দটি উদ্দেশ্যমূলকও বটে। উল্লেখ্য যে, এই আয়াতে রয়েছে হজরত আবদুর রহমানের জন্য সান্ত্বনার বাণী। আর এই অঙ্গীকারও রয়েছে যে, আল্লাহ্তায়ালা প্রেম-ভালোবাসা কাফেরদেরকে না দিয়ে দিয়েছেন ইমানদার-দেরকে। তাদেরকে বানিয়েছেন পারস্পরিক বন্ধু।

তিবরানী তাঁর আল আওসাত পুস্তকে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আলী সম্পর্কে। এরশাদ করেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ব্যতীত সকল বিশ্বাসী ও সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আমি প্রেম-বন্ধন সৃষ্টি করে দিবো। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি যার মওলা, আলীও তার মওলা। এখানে 'মওলা' অর্থ বন্ধু। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আহমদ ও ইবনে মাজা হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে, আহমদ হজরত বুরাইদা থেকে এবং তিরমিজি ও নাসাঈ হজরত জায়েদ বিন আরকাম থেকে।

রসুল স. আরো বলেছেন, আলীর স্মরণ ও ভালোবাসা হচ্ছে ইবাদত। মাসনাদুল ফেরদাউস রচয়িতা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন জননী আয়েশা থেকে। রসুল স. একথাও বলেছেন যে, আল্লাহ্ যখন তাঁর কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরাইলকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো। জিবরাইল তখন তাকে ভালোবাসে এবং আকাশবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দেয়, আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাসো। আকাশবাসীরাও তখন তাকে ভালোবাসতে থাকে। এভাবে ওই ব্যক্তি হয়ে যায় পৃথিবীবাসীদেরও প্রিয়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

আমি বলি, সম্ভবতঃ হাদিসটির মর্মার্থ হবে এরকম— বান্দা আল্লাহ্কে মহব্বত করলে, পরিণামে আল্লাহ্ও তাকে মহব্বত করেন। তাই এক হাদিসে বলা হয়েছে—আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা নিরবচ্ছিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে লাভ করে আমার নৈকট্য। আমিও তখন তাকে মহব্বত করতে থাকি।

পরের আয়াতে (৯৭) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি এই কোরআন দ্বারা সাবধানীদেরকে সুসংবাদ দিতে পারো এবং বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো।'

www.eelm.weebly.com

এখানে 'বিলিসানিকা' কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! আমি এই কোরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি। 'বি' শব্দটির অর্থ এখানে 'আলা' (উপর), অথবা আমি এই কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি সহজভাবে। আমি বলি 'বিলিসানিকা' কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, আমি কোরআনকে সহজবোধ্য করে দিয়েছি আপনার উম্মতের জন্য আপনার ভাষায় (অন্য ভাষায় অবতীর্ণ হলে আপনার আরবীভাষী স্বজাতিদের বুঝতে অসুবিধা হতো)।

'লুদ্‌দা' শব্দটির অর্থ— বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়, যারা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরেও সত্যকে গ্রহণ করে না, বরং অবতারণা করে বিভিন্ন প্রকার কুটতর্কের, এমনকি নরকপ্রিয় উন্নাসিকেরা বিরুদ্ধাচরণ করতেও পিছ পা হয় না। শব্দটির বহুবচন হচ্ছে 'আলাদ্'। মুজাহিদ বলেছেন, 'আলাদ্' বলে তাদেরকে, যারা কখনো সহজসরল পথ পছন্দ করে না। আবু উবাইদা বলেছেন, মিথ্যার অনুরাগী ও সত্যের বিরোধী ব্যক্তিদেরকে বলে 'আলাদ্'।

আয়াতের শেষে একথাটি পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে যে, সাবধানীদেরকে সুসংবাদ এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সতর্ক করাই কোরআন অবতরণের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি শুভসংবাদ প্রদান ও সতর্ককরণের কাজটিকেই আপনার কর্তব্যকর্মের অন্তর্ভূত রাখুন। অবিশ্বাসীদের অপআচরণ ও অস্বীকৃতিতে মনোক্ষুণ্ন হবেন না। কারণ আপনাকে কষ্ট প্রদান আমার এই কোরআন অবতরণ করার উদ্দেশ্য নয়।

সর্বশেষ আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'তাদের পূর্বে আমি কতো মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি! তুমি কি তাদের কাউকেও দেখতে পাও অথবা তাদের ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও?'

এখানে 'হাল তুহিস্‌সু' কথাটির অর্থ আপনি কি তাদের কাউকে দেখেন? অথবা ওই সকল বিনাশপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর কারো উপস্থিতি কি আপনার নেত্রগোচর হয়? আর 'রিকযা' অর্থ এখানে ক্ষীণতম শব্দ বা গোপন আওয়াজ। শব্দটির আকৃতিই গোপনত্ববোধক। যেমন বলা হয়, 'রাকাযার্ রামহা' (বর্শার অগ্রভাগ মৃত্তিকায় প্রোথিত হয়েছে)।' রিকায' অর্থ মাটিতে পুঁতে রাখা সম্পদ বা গুপ্তধন।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে রসুল স.কে শুভ ও সতর্ক বার্তা প্রচারের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনার শত্রু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতো অনেক মানব গোষ্ঠীকে আমি ইতোপূর্বে ধ্বংস করেছি। আপনি কি ওই ধ্বংস প্রাপ্তদের কাউকে দেখতে পান অথবা শুনতে পান কি তাদের ক্ষীণতম কোনো কথা বা চলাচলের আওয়াজ?

আলহামদুলিল্লাহ্। মহান আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় সুরা মারয়ামের তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ ৫ই সফর রবিবার ১২০৩ হিজরীতে।

www.eelm.weebly.com

সূরা ত্বাহা

৮ রুকু এবং ১৩৫ আয়াত সম্বলিত এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ১,২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

طٰهٰ ○ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ○ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ

يَّخْشٰى ○ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ○ اَلرَّحْمٰنُ

عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ○ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا

بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ○ وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ

اَخْفٰى ○ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ○

❒ ত্বা'হা,

❒ তোমাকে ক্লেশ দিবার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করি নাই।

❒ ইহা যাহারা ভয় করে কেবল তাহাদিগের উপদেশার্থে,

❒ যিনি সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা তাঁহার নিকট হইতে অবতীর্ণ,

❒ দয়াময় আরশে সমাসীন।

❒ যাহা আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে, এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তাহা তাঁহারই।

❒ তুমি উচ্চকণ্ঠে যাহাই বল না কেন আল্লাহ্ তো যাহা গুপ্ত ও অব্যক্ত তাহা জানেন।

❒ আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁহারই,

---

প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে দু'টি অক্ষর— ত্ব এবং হা। কোরআন মজীদের অনেক সুরার প্রথমে এরকম বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি রয়েছে। এরকম অক্ষর সন্নিবেশনকে বলা হয় 'হরূফে মুক্বাত্তায়াত'। সুরা বাকারার শুরুতে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ত্ব হা আল্লাহ্‌র নাম। এখানে এই নামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র শপথ উচ্চারিত হয়েছে। যদি তাই হয়, তবে ত্ব হা কথাটির অর্থ হবে ত্ব হা এর শপথ। যেমন রসুল স. একবার বলেছিলেন, হা মিম এর শপথ! ওই অবিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করা হবে না, তারা বিজয়ীও হতে পারবে না। হজরত বারা বিন আজীব থেকে আবু দাউদ তিরমিজি, নাসাঈ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এই শপথ উচ্চারণ করেছিলেন খন্দকের যুদ্ধের সময় রাত্রিকালে।

মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, ত্ব হা অর্থ মাটিকে পদদলিত করা। অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। হজরত আলী থেকে ইবনে মারদুবিয়া তাঁর তাফসীরে এবং বায্যার হজরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন সুরা মুজাম্মেলের 'হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি! রাতের কিছু অংশে নামাজের জন্যে দণ্ডায়মান হও' —এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. প্রায় সারারাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পবিত্র চরণযুগল ফুলে যেতো। তিনি স. তখন কখনো ডান পায়ে এবং কখনো বাম পায়ে ভর করে দাঁড়াতে শুরু করলেন। এমতাবস্থায় হজরত জিবরাইল অবতীর্ণ হলেন এবং বললেন, ত্ব হা (হে মোহাম্মদ!) আপনার পদযুগল মাটির উপর স্থিরভাবে রাখুন। মুজাহিদ, আতা ও জুহাক বলেছেন, ত্ব হা অর্থ হে পুরুষপ্রবর। কাতাদা বলেছেন, সুরিয়ানী ভাষায় কথাটির অর্থ হে পুরুষ। কালাবী বলেছেন, কবীলায়ে উকলের পরিভাষায় ত্ব হা অর্থ হে মানুষ। উপসংহার হিসেবে বলতে হয়, এখানে ত্ব হা কথাটির মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। তাই কেউ কেউ বলেছেন, ত্ব হা হচ্ছে রসুল স. এর একটি নাম। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে কথাটির দ্বারা এখানে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কেই।

বাগবী লিখেছেন, কালাবী বলেছেন, যখন মক্কায় রসুল স. এর উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হতে শুরু করলো, তখন তিনি স. প্রায় সমস্ত রাত্রি নামাজ পাঠের মাধ্যমে অতিবাহিত করতে শুরু করলেন। যখন কষ্ট হতো তখন তিনি স. একেক পায়ের উপর একেক বার অধিক ভর করে দাঁড়াতেন। তখন অবতীর্ণ হলো—

'তোমাকে ক্লেশ দিবার জন্য আমি তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! নামাজ পাঠ করতে করতে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, সে জন্য আমি আপনার উপরে কোরআন অবতীর্ণ করিনি।

কামুস রচয়িতা লিখেছেন, এখানে 'শিক্বা' অর্থ ক্লেশ। জওহরী লিখেছেন, 'শাক্বাওয়াত্' (ক্লেশ) কথাটি 'সায়াদাত্ (স্বস্তি) এর বিপরীতার্থক। স্বস্তি যেমন দুই রকম— ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, ক্লেশও তেমনি দুই ধরনের— দুনিয়ার

www.eelm.weebly.com

ও আখেরাতের। দুনিয়ার স্বস্তি আবার তিন রকম— আর্থিক, দৈহিক ও বাহ্যিক। ক্লেশেরও রয়েছে এই তিনটি প্রকার। পার্থিব দৈহিক অবসাদ, দৌর্বল্য বা ক্লেশকেই বলে দৈহিক বা জিসমানী ক্লেশ। আলোচ্য আয়াতে এই ক্লেশের কথাই বলা হয়েছে। কামুস প্রণেতার মতে 'তাশাক্বকা' (ক্লেশ) কথাটি এসেছে 'শিক্বাউন' থেকে। আর জওহরী বলেছেন, 'শাক্বাওয়াতুন' থেকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'তায়াব্' (কষ্টকর) শব্দটির পরিবর্তেও 'শিক্বা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বায়যাবী লিখেছেন, এরকম শব্দব্যবহার ঘটে সাধারণভাবে। যেমন— হুয়াআশ্‌ক্বু মিন রবিদ্বিল মুহরি, সায়্যিদুল ক্বওমি আশক্বাহুম — এরকম আরো অনেক প্রসিদ্ধ প্রবচন রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে 'তাত্‌য়াব্' এর পরিবর্তে 'তাশক্বা' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে এই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, রসুল স. এর উপরে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে তাঁকে সৌভাগ্যশালী করার জন্য, ক্লেশ প্রদানের জন্য নয়।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর উপরে যখন ওহী অবতীর্ণ হতে শুরু করলো, তখন তিনি পায়ের পাতার উপরে ভর করে প্রায় সমস্ত রাত ধরে নামাজ পাঠ করতে শুরু করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো— 'আপনাকে ক্লেশ দিবার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি'।

আবদ্ ইবনে হুমাইদের বর্ণনায় এসেছে, রবী বিন আনাস বলেছেন, দীর্ঘক্ষণ ধরে নামাজ পাঠকালে রসুল স. কষ্টের কারণে কখনো কখনো এক পায়ের উপরে অধিক ভর করে দাঁড়াতেন। অপর পায়ে ভর দিতেন হাল্‌কাভাবে। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, রসুল স.কে দীর্ঘক্ষণ ধরে নামাজে মগ্ন থাকতে দেখে অবিশ্বাসীরা বলতে শুরু করলো, কষ্ট দেয়ার নিমিত্তেই মোহাম্মদের উপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের ওই অপকথনের বিরুদ্ধে তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। সম্ভবতঃ ওই অবিশ্বাসীরা বলতে চেয়েছিলো, দেখো হে মোহাম্মদ! তুমি তোমার পিতা, পিতামহের ধর্মাদর্শকে পরিত্যাগ করেছো বলেই তোমাকে এভাবে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তাদের ওই অপবিত্র উক্তি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে। এই ব্যাখ্যাটির সমর্থনে রয়েছে আওফী কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের একটি উক্তি রয়েছে। তিনি বলেছেন, অংশীবাদীরা তখন বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদ তার প্রভুপালকের কারণে এমতো দুর্ভাগ্যকে বরণ করে নিয়েছে।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে, হে আমার রসুল! আপনার প্রতি আমি এই কোরআনকে এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি কষ্টে পতিত হবেন এবং এই দুশ্চিন্তায় নিপতিত হবেন যে ইসলাম দিবালোকের মতো সত্য হওয়া সত্ত্বেও কেনো আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাসী হয় না। হে আমার প্রিয় রসুল! আপনার দায়িত্বতো কেবল সত্য ধর্মের প্রচার । কে ইমান আনলো না আনলো— এমতো দুশ্চিন্তা আপনার দায়িত্বভূত নয়।

এর পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এটা যারা ভয় করে কেবল তাদের উপদেশার্থে।' এখানে 'মাঁই ইয়াখশা' বলে বোঝানো হয়েছে ওই সকল ব্যক্তিকে যাদের অন্তরে রয়েছে ভয় ও নম্রতা। এ ধরনের ব্যক্তিকে ভয় দেখালে তারা উপকৃত হয়। অথবা বুঝানো হয়েছে এমন ব্যক্তিদেরকে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন যে, এদেরকে শাস্তির ভয় দেখালে তারা ভীত হবে। অর্থাৎ আগে থেকেই ভয়ভীতি না থাকলেও যারা আল্লাহ্র শাস্তির কথা শুনলে ভয় পেয়ে যায় তাদেরকে উপদেশ প্রদানার্থেই অবতীর্ণ হয়েছে এই কোরআন।

এর পরের আয়াতে (৪)বলা হয়েছে— 'যিনি সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এটা তাঁর নিকট থেকে অবতীর্ণ।' প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে 'তানযীলা' (অবতীর্ণ)। দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে 'আন্যালনা'। অর্থ আমরা অবতীর্ণ করেছি। কথাটি বহুবচনবোধক উত্তম পুরুষের শব্দরূপ। আর এখানে আল্লাহ্র সত্তাকে নির্দেশ করা হয়েছে নামপুরুষের মাধ্যমে। এভাবে সত্তাকে (আল্লাহ্) উল্লেখ না করায় বাক্যটি হয়েছে উন্নততর সুষমামণ্ডিত, অলৌকিকত্বমণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশক। এভাবে বলা হয়েছে—এই কোরআন সেই সত্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ, যিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশ-মণ্ডলী। বক্তব্যের এমতো উপস্থাপনের মাধ্যমে এখানে নির্ণয় করা হয়েছে একটি ধারাবাহিকতা— আল্লাহ্র কার্যকলাপ, গুণাবলী ও সত্তা। অথবা সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলী। সৃষ্টি হিসেবে প্রথমে উল্লেখ এসেছে পৃথিবীর, কারণ পৃথিবী আমাদের সর্বাধিক নিকটে। তারপর উল্লেখ করা হয়েছে দূরবর্তী সৃষ্টি আকাশের । আর পরবর্তী আয়াতসমূহে এসেছে অন্যান্য সৃষ্টির উল্লেখ।

এখানকার 'আলউ'লা' শব্দটি 'আলউলইয়া' শব্দের বহুবচন। 'উলইয়া' আবার 'আয়্‌লা' শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ।

এর পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'দয়াময় আরশে সমাসীন।' এই আয়াতটি রহস্যাচ্ছন্ন আয়াতের (আয়াতে মুতাশাবিহাতের) অন্তর্ভুক্ত। বিষয়টি জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত। আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী, কার্যকলাপ যেরকম আনুরূপ্যবিহীন, তাঁর আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টিও তদ্রূপ। এরকম আনুরূপ্যবিহীন বিষয় অতি দুর্বোধ্য ও জটিল। সুরা ইউনুসের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'যা আছে আকাশ-মণ্ডলীতে, পৃথিবীতে, এই দু'য়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে, তা তাঁরই।' একথার অর্থ— আকাশের চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র, পৃথিবীর নদ-নদী-পাহাড়-অরণ্য এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী মানুষ-ফেরেশতা-শয়তান, বজ্র-বিদ্যুৎ-মেঘ, এবং ভূগর্ভে যা কিছু আছে সকল কিছুর স্রষ্টা, পালনকর্তা ও মালিক হচ্ছেন এক ও অংশীবিহীন আল্লাহ্।

'তাহ্তাছ ছারা' অর্থ ভূগর্ভে যা কিছু আছে। 'ছারা' কথাটির অর্থ আসলে অনির্ণেয় ও অনির্ধারিত। এক হাদিসে এসেছে— একটি পিপাসিত কুকুর 'ছারা' পান করছিলো। শুকনো মাটির উপর পানির ছিটা দিলে তাকে বলে 'ছারাত্ তুরাব'। 'ভূগর্ভ'ও কম রহস্যপূর্ণ নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, পৃথিবী রয়েছে একটি মাছের উপর। মাছটি রয়েছে সমুদ্রের উপর। আর ওই মাছের মাথা ও লেজ মিলিত হয়েছে আরশের নিচে। সমুদ্রটি রয়েছে একটি নীল রঙের প্রস্তরময় মরুভূমির উপরে। হজরত লোকমানের কাহিনীর মধ্যে ওই প্রস্তরময় মরুভূমির কথা উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে— 'ফাতাকুন ফী সাখ্রাতিন্' (এতে হয়ে যাও প্রস্তর)। প্রস্তরময় মরুভূমি রয়েছে আবার একটি ষাঁড়ের শিঙের উপর। আর ষাঁড়টি দণ্ডায়মান রয়েছে 'ছারা' এর উপর। আর 'ছারা'র নিচে কি আছে, তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানেন না। ষাঁড়টি রয়েছে মুখ খোলা অবস্থায়। যখন আল্লাহ্ সকল সমুদ্রকে মিলিয়ে একটি সমুদ্রে পরিণত করবেন, তখন ওই ষাঁড় তার হা করা মুখ দিয়ে সমুদ্রের সকল পানি নিঃশেষে পান করে ফেলবে। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত।

এর পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে — 'তুমি উচ্চ কণ্ঠে যা-ই বলো না কেনো, আল্লাহ্ তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত তা জানেন।' বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যের মূল মর্ম এরকম— হে আমার রসুল! আপনার জিকির ও প্রার্থনা উচ্চ কণ্ঠ সম্বলিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি তো সুপ্ত-গুপ্ত সকল কিছুই জানি। গুপ্তের গুপ্ত বিষয়াবলীও আমার অজানা নেই। আমার মতে বক্তব্যটির মর্মার্থ হবে এরকম— হে আমার রসুল! আপনি উচ্চকণ্ঠে-নিম্নকণ্ঠে, গোপনে যেভাবেই আমাকে স্মরণ করুন না কেনো, আমি তা কবুল করবো এবং তার যথাবিনিময়ও প্রদান করবো। এখানে 'ইনতাজ্হার বিলক্বওলি' (উচ্চকণ্ঠে যা-ই বলুন না কেনো) কথাটির পরে উহ্য রয়েছে 'আওতুখাফিত্ বিহী' (অথবা যা কিছু বলুন গোপনে)। অন্য আয়াতেও এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'সারাবীলা তাক্বীকুমুল্ হাররা' (পাজামা তোমাদেরকে রক্ষা করে গরম থেকে)। এখানে উহ্য রয়েছে 'ওয়াল বারদা' (এবং ঠাণ্ডা থেকে) কথাটি। কেননা পোশাক কেবল মানুষকে গরম থেকেই রক্ষা করে না, রক্ষা করে ঠাণ্ডা থেকেও।

www.eelm.weebly.com

'সির' এবং 'আখফা' শব্দদ্বয়ের পর্যালোচনাঃ বাগবী লিখেছেন, হাসান বলেছেন 'সির' হচ্ছে ওই গোপন কথা, যা মানুষ গোপনে অন্যের কাছে বলে। আর 'আখফা' হচ্ছে ওই গুপ্ত কথা, যা মানুষ তার হৃদয়েই লুকিয়ে রাখে। হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'সির' হচ্ছে ওই গোপন কথা যা মানুষ মনে রাখে। আর 'আখফা' হচ্ছে ওই কথা যা আল্লাহ্ ভবিষ্যতে তার অন্তরে সৃষ্টি করে দেন। মানুষ বর্তমান গোপনকে জানে কিন্তু ভবিষ্যতের গোপন সম্পর্কে কিছুই জানে না। আর আল্লাহ্ মানুষের মনের অতীত বর্তমান ভবিষ্যত সব কিছুই জানেন। অর্থাৎ ভবিষ্যতে মানুষ যে কথা প্রকাশ না করে মনে মনে রাখবে, সে কথাও তিনি জানেন।

আলী ইবনে তালহার বর্ণনায় এসেছে, যে কথা মানুষ মনের মধ্যে গোপন রাখে, তা হচ্ছে 'সির'। আর অন্তরের যে গোপন কথা মানুষ নিজেই জানে না, তাকে বলে 'আখফা'। মুজাহিদ বলেছেন, 'সির' হচ্ছে ওই কর্ম যা মানুষ গোপন রাখে। আর 'আখফা' হচ্ছে অন্তরের কুমন্ত্রণা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হৃদয়ের গোপন ও দৃঢ় সংকল্পের নাম 'সির'। আর 'আখফা' হচ্ছে ওই অদৃঢ় ও অনিচ্ছাকৃত খেয়াল, যা হৃদয়ে কখনো কখনো উদিত হয়। জায়েদ ইবনে আসলাম 'আখফা' কথাটিকে মনে করেন অতীতকালবোধক। এর সঙ্গে তিনি যুক্ত করেন 'জানেন' কথাটি। এভাবেই তিনি 'আখফা' শব্দটির অর্থ করেন মানুষের হৃদয়ের অতীতের গোপন কথা, যা সে কাউকে জানায়নি। বলা বাহুল্য যে, এরকম অতীতায়িত গোপনীয়তা সম্পর্কেও আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

সুফী সাধকগণ বলেন, 'সির ও 'আখফা' মানবদেহের অভ্যন্তরভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পাঁচটি লতিফার অন্তর্ভুক্ত মূলের মৌল। ওই লতিফা পঞ্চকের মূল রয়েছে আল্লাহ্র আরশের উপরে সূক্ষ্মজগতে। অবশ্য মানবদেহে ওই পাঁচটি লতিফার প্রভাব, প্রতিক্রিয়া অথবা বিচ্ছুরণ অনুভূত হয়। ওই লতিফা পঞ্চকের নাম— কলব, রূহ, সির, খফি, আখফা। বেলায়েতে আদমের তাজাল্লী বা বিচ্ছুরণ পতিত হয় কলবে, রূহে পতিত হয় বেলায়েতে নুহের জ্যোতিচ্ছটা। এই রূহ লতিফাই আবার বেলায়েতে ইব্রাহিমের নূর পতনের স্থান। বেলায়েতে মুসাবীর তাজাল্লী পতিত হয় সির লতিফায়। খফি লতিফায় জ্যোতিসম্পাত ঘটে বেলায়েতে ঈসাবীর। আর বেলায়েতে মোহাম্মদীর তাজাল্লী বর্ষিত হয় আখফায়।

শেষোক্ত আয়াতে (৮)বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই।' এ বাক্যটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও সিদ্ধান্তমূলক। সুরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত বর্ণিত আয়াতগুলোর উপসংহার টানা হয়েছে এখানে। বিবৃত হয়েছে আল্লাহ্র জাত, সিফাত ও আফআলের পরিচয়। এভাবে এই সিদ্ধান্তটি ঘোষিত হয়েছে যে— আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং সর্বোত্তম নামসমূহ কেবলই তাঁর। কারণ তিনি পরিপূর্ণ, অক্ষয় ও

www.eelm.weebly.com

আনুরূপ্যবিহীন গুণসমূহের অধিকারী। এরকম গুণরাজি অন্য কারো মধ্যে অথবা কোনো কিছুর মধ্যে একেবারেই নেই। তিনি যেমন অন্য কারো মতো নন, তেমনি তাঁর গুণবত্তা ও কার্যাবলীও অন্য কারো বৈশিষ্ট্য ও কর্মের মতো নয়। সেকারণেই আসমাউল হুসনা বা সর্বোত্তম নামসমূহ কেবলই তাঁর। সূরা আ'রাফের 'ওয়ালিল্লাহিল আসমাউল হুসনা'— এই আয়াতের তাফসীরে আমি এসম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছি। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۘ اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ
اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝
فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ۝ اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ
الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ۝ اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ
لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۝

❒ মূসার বৃত্তান্ত তোমার নিকট পৌঁছিয়াছে কি?

❒ সে যখন আগুন দেখিল তখন পরিবারবর্গকে বলিল, 'তোমরা থাক আমি আগুন দেখিয়াছি। সম্ভবতঃ আমি তোমাদিগের জন্য উহা হইতে কিছু আগুন আনিতে পারিব অথবা আমি উহার নিকটে কোন পথপ্রদর্শক পাইব।'

❒ অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট আসিল তখন আহ্বান করিয়া বলা হইল, হে মূসা!

❒ আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার পাদুকা খুলিয়া ফেল, কারণ, তুমি পবিত্র 'তোয়া' উপত্যকায় রহিয়াছ।

❒ এবং আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি অতএব যাহা প্রত্যাদেশ করা হইতেছে তুমি তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।

❒ আমিই আল্লাহ্, আমা ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।

প্রথমেই বলা হয়েছে — মূসার বৃত্তান্ত তোমার নিকটে পৌঁছেছে কি? বাক্যটি এখানে উপস্থিত হয়েছে একটি স্বীকৃতিসূচক জিজ্ঞাসারূপে। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! নবী মুসার কাহিনী অবশ্যই আপনাকে জানানো হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য যে, হজরত মুসার সঙ্গে শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর অনেক মিল রয়েছে। হজরত মুসা সত্য ধর্মের প্রচার ব্যপদেশে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। মুখোমুখি হয়েছেন অনেক প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার। কারণ তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রসুল। সর্বশেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. ছিলেন তাঁর চেয়ে আরো অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। তাই তাঁকেও সহ্য করতে হবে অনেক বিরূপতা ও তিক্ততাকে। সে কারণে তাঁর নবুয়তের দায়িত্ব লাভের প্রথম দিকেই জানানো হয়েছে হজরত মুসার বৃত্তান্ত। এভাবে এই ইঙ্গিতটি দেয়া হয়েছে যে — হে আমার রসুল! শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সত্যধর্মের পতাকাকে সমুন্নত রাখবেন। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে অব্যাহত রাখবেন সত্যধর্মের প্রচার। আপনার পূর্বসূরী নবী মুসাও ছিলেন সহিষ্ণু, নির্ভীক ও অজেয়। আপনাকেও সেরকম হতে হবে। বরং আপনাকে হতে হবে তদপেক্ষা অধিক অটল ও সফল।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'সে যখন আগুন দেখলো, তখন তাঁর পরিবারবর্গকে বললো, তোমরা এখানে থাকো, আমি আগুন দেখেছি।' বাগবী লিখেছেন, হজরত শোয়াইবের কন্যাকে বিবাহ করে হজরত মুসা দীর্ঘ বার বছর কাটিয়ে দিলেন তাঁর শ্বশুরালয়ে। তারপর একদিন মাতা ও ভাইবোনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন মিসর অভিমুখে। তখন ছিলো শীতকাল। প্রধান সড়ক পথে সিরিয়ার সম্রাটের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশংকা ছিলো। তাই তিনি তাঁর পরিবারবর্গসহ ধরলেন অপ্রচলিত পথ। পথিমধ্যে এক স্থানে যাত্রা স্থগিত করলেন তিনি। সেখান থেকে তুর পর্বত ছিলো দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। একে তো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তার উপর ঘনঘোর অন্ধকার রাত্রি। প্রসব বেদনা অনুভব করলেন তাঁর স্ত্রী। প্রয়োজন দেখা দিলো আগুনের। তিনি চকমকি পাথর ঘসে আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সফল হলেন না। হঠাৎ দেখতে পেলেন তুর পর্বতের দিকে কোথাও আগুন জ্বলছে।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুসা ছিলেন অত্যন্ত আত্মসচেতন ব্যক্তি। তাই তিনি তাঁর স্ত্রী ও পরিবারবর্গকে নিয়ে পথ চলতেন রাত্রি বেলায়। এভাবে পথ চলতে চলতে এক ঘন অন্ধকার রাতে পথ হারিয়ে ফেললেন তিনি। ঘোর শীতকাল ছিলো তখন। তিনি চকমকি পাথর ঘষে ঘষে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু হিম পাথর থেকে কিছুতেই আগুন নির্গত হলো না। হঠাৎ তুর পাহাড়ের দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেলেন সেখানে এক স্থানে জ্বলছে আগুন।

পরিবারবর্গের প্রতি হজরত মুসার সম্বোধনটি এখানে বহুবচনবোধক। তাই এখানে বলা হয়েছে 'তোমরা এখানে থাকো আমি আগুন দেখেছি।' তাঁর স্ত্রী ছিলেন নবীতনয়া। তাই এরকম হতে পারে যে, কথাটি তিনি বলেছিলেন কেবল তাঁর স্ত্রীকে। কিন্তু শিষ্টাচারবশতঃ তাঁর সম্বোধনটি ছিলো বহুবচনের। 'তুমি ' না বলে বলেছিলেন 'তোমরা'। অথবা তিনি তখন কথাটি বলেছিলেন তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের অন্য সদস্যদের লক্ষ্য করে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'সম্ভবতঃ আমি তোমাদিগের জন্য সেখান থেকে কিছু আগুন আনতে পারবো, অথবা আমি ওই আগুনের নিকট কোনো পথ-প্রদর্শক পাবো।'

'আনাসতু' কথাটির অর্থ এখানে— আমি আগুন দেখছি। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে একটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কোনো কোনো অভিধান বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ওইরূপ দ্রষ্টব্যকে 'ইনাস' বলে, যার প্রতি সৃষ্টি হয় অনুরাগ এবং যার মাধ্যমে দূরীভূত হয় ভয়।

'ক্বাবাসিন' অর্থ অগ্নিস্ফুলিংগ। কামুস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, অধিক আগুন থেকে উদগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিংগকে বলা হয় 'ক্বাবাসিন।'

'হুদান' অর্থ পথ-প্রদর্শক। হজরত মুসা এখানে বলতে চেয়েছেন, সম্ভবতঃ ওই আগুনের কাছে গেলে পথের সন্ধানকারী কাউকে পাবো। অথবা 'হুদান' অর্থ ধর্মের পথ-প্রদর্শক। এই অর্থেও শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আদৌ সেখানে কোনো পথ-প্রদর্শক পাওয়া যাবে কিনা, সে সম্পর্কে হজরত মুসা নির্দ্বিধ ছিলেন না। তাই হজরত মুসা এখানে দৃঢ়তাব্যঞ্জক কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করেননি। সাধারণভাবে কেবল বলেছেন 'অথবা আমি সেখানে কোনো পথ-প্রদর্শক পাবো।' এখানে 'আ'লান্ নার' কথাটির অর্থ আগুনের নিকটে।

এর পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট এলো, তখন আহ্বান করে বলা হলো, হে মুসা!' বাগবী লিখেছেন, হজরত মুসা আগুনের নিকটে উপনীত হলেন। দেখলেন, সেখানে সম্পূর্ণ সবুজ একটি বৃক্ষকে ঘিরে জ্বলজ্বল করছে শাদা রঙের এক অলৌকিক আগুন। বৃক্ষটি পুড়ছে না। কোনো প্রকার ধুম্রও নির্গত হচ্ছে না সেখান থেকে। বৃক্ষের সবুজ ও আগুনের শুভ্রতা দু'টোই পরিদৃশ্যমান হচ্ছে একই সঙ্গে সম্মিলিত ও পৃথকরূপে। একটির সঙ্গে অন্যটি মিশছে না।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, বৃক্ষটির রঙ ছিলো গন্ধম বর্ণের সবুজ। কাতাদা, মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, বৃক্ষটি ছিলো উসাজ বৃক্ষ। ওয়াহাব বলেছেন, আলীক। কেউ কেউ বলেছেন দ্রাক্ষাকুঞ্জ। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, হজরত মুসা ওই আগুনকে ভেবেছিলেন পৃথিবীর আগুন। কিন্তু তা পৃথিবীর আগুন ছিলো না, ছিলো নূর। কিন্তু হজরত মুসার ধারণানুসারে এখানে বলা হয়েছে 'নার' (আগুন)। অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, ওই নূর ছিলো আল্লাহ্‌র নূর। হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত ইকরামা প্রমুখের অভিমত এরকমই। কিন্তু হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ওই আগুনকে আগুনই বলেছেন, নূর নয়। আরো বলেছেন, ওই আগুনই ছিলো আল্লাহ্‌র পর্দা। যেমন হজরত আবু মুসা আশআ'রীর বর্ণনায়

www.eelm.weebly.com

এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র পর্দা হচ্ছে আগুন। ওই পর্দা উন্মোচিত হলে তার সৌন্দর্যচ্ছটার প্রভাবে সমগ্র সৃষ্টি ঝলসে যাবে এবং তা পরিব্যাপ্ত হবে সৃষ্টির সম্পূর্ণ সীমানা পর্যন্ত। বাগবীর বর্ণনায় হাদিসটি পরিবেশিত হয়েছে এভাবেই। কিন্তু মুসলিম ও ইবনে মাজার বর্ণনায় 'নার' এর পরিবর্তে এসেছে 'নূর'। অর্থাৎ তাঁর পর্দা হচ্ছে নূর। আমি বলি, নূর ও নার মূলতঃ এক। 'নূর' হচ্ছে অতিসূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ আগুন, যা জ্বালায় না।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুসা সেখানে উপস্থিত হলেন কিছু শুষ্ক তৃণ নিয়ে। আগুনের কাছে যখন গেলেন, তখন ওই আগুন দূরে সরতে শুরু করলো। তিনি কিছুটা পিছিয়ে এলেন। তখন আগুন তাঁর নিকটে চলে এলো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি তখন সেখানে স্থাণুর মতো দণ্ডায়মান হলেন। শুনতে পেলেন ফেরেশতাদের মুহুর্মুহু সুবহানআল্লাহ্ সুবহানআল্লাহ্ উচ্চারণ। সাকিনা বা প্রশান্তিপ্রবাহ পরিবেষ্টন করে ফেললো তাঁকে। তিনি শুনতে পেলেন অলৌকিক আহ্বান— হে মুসা! বাগবী লিখেছেন, ওহাব বলেছেন, তখন আওয়াজ ভেসে আসতে শুরু করলো শাদা আগুনে ঘেরা সবুজ বৃক্ষটি থেকে।

এর পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আমিই তোমার প্রতিপালক।' হজরত মুসা বুঝতে পারছিলেন না, কে কথা বলছে এমন করে। তাই তিনি বললেন, আমি তোমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু তুমি কোথায়? উত্তর ধ্বনিত হলো— আমি তোমার উপরে, সঙ্গে, সামনে ও পশ্চাতে। আমি তোমার এতো নিকটে যে তুমিও তোমার অতো নিকটে নও। হজরত মুসা তখন নিশ্চিত হলেন, এ বাণী বিশ্বসমূহের প্রতিপালকের। কারণ তিনি ছাড়া শ্রুতির অতীত থেকে কেউ এভাবে কথা বলতে পারে না। এ বাণীতে রয়েছে আনুরূপ্যবিহীনতার রঞ্জন।

বায়যাবী লিখেছেন, যখন হজরত মুসা আহ্বান শুনতে পেলেন, তখন বললেন, কে তুমি? জবাব এলো, আমি আল্লাহ্। শয়তান তখন এইমর্মে কুমন্ত্রণা দিলো যে, না, একথা আল্লাহ্‌র নয়, শয়তানের। কিন্তু সে কুমন্ত্রণা ছিলো অত্যন্ত ক্ষীণ ও প্রভাবহীন। তাই তিনি বুঝতে পারলেন, নিঃসন্দেহে এ কথা আল্লাহ্‌র। কারণ, আমি তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছি সমগ্র অস্তিত্ব ও সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে। শয়তান কখনো এভাবে দিকের অতীত থেকে কথা বলতে পারে না। তার কথা অধিকার করতে পারে কেবল শ্রুতির সড়ক। সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অস্তিত্বের মাধ্যমে তার কথা কখনো শ্রুত হতে পারে না। বর্ণিত ব্যাখ্যাটির মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে, সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র কালাম হজরত মুসার উপরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিলো রূহানীভাবে। তারপর তা প্রভাব বিস্তার করেছিলো ও পরিবেষ্টন করে নিয়েছিলো তাঁর পার্থিব অস্তিত্বকে। তাই তিনি আল্লাহ্‌র কথা শুনতে পাচ্ছিলেন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব তোমার পাদুকা খুলে ফেলো, কারণ তুমি পবিত্র তোয়া উপত্যকায় রয়েছো।'

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, নগ্নপায়ে পবিত্র ভূমিতে গমন করতে হয় আদব বা সম্মান প্রদর্শনার্থে। বাগবী লিখেছেন, এর কারণ বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে মাসউদের একটি বর্ণনায় এভাবে— তাঁর পাদুকা ছিলো মৃতগর্দভের চামড়া নির্মিত। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁর পাদুকা ছিলো কাঁচা চামড়ার। ইকরামা ও মুজাহিদ বলেছেন, ওই পবিত্র ভূমির বরকত থেকে তার পদযুগল যেনো বঞ্চিত না হয়, সে কারণেই তাঁকে দেয়া হয়েছিলো জুতা খুলে ফেলার নির্দেশ। উল্লেখ্য যে, নির্দেশপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হজরত মুসা তাঁর জুতা খুলে ফেলে নিক্ষেপ করেছিলেন দূরের মরুভূমিতে।

ওই উপত্যকার নাম ছিলো তোয়া। জুতা খুলে ফেলার নির্দেশের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় যে, উপত্যকাটি ছিলো পবিত্র। জুহাক বলেছেন, উপত্যকাটি ছিলো নির্জন এবং তুর পর্বতের মতোই দীর্ঘ।

কেউ কেউ বলেছেন, 'তোয়া' শব্দটি একটি মূল শব্দ। শব্দটির মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ মেহেরবানীর মাধ্যমে তাঁকে পৌছিয়েছিলেন ওই পবিত্র উপত্যকায়। হজরত মুসা আপন চেষ্টায় সেখানে পৌছতে পারতেন না। কারণ পথ ছিলো অতি দীর্ঘ। উল্লেখ্য যে, 'মুক্বাদ্দাসা ' শব্দটির এক অর্থ— দূরবর্তী। সুফী সাধকগণ বলেন, কলবের উরুজ বা উর্ধ্বারোহণ হয় আরশের উপর পর্যন্ত। কেউ যদি আপন চেষ্টায় সেখানে পৌছতে চেষ্টা করে, তবে তার সময় লাগবে পঞ্চাশ হাজার বছর। কেননা পৃথিবী থেকে আরশের দূরত্ব পঞ্চাশ হাজার বছরের পথের দূরত্বের সমান। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফী ইয়াওমিন কানা মিক্বদারুহু খমসীনা আলফা সানাতিন' (একদিন, তার পরিমাণ হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার বৎসর)। কিন্তু পীর মোর্শেদের তাওয়াজ্জোহের ফলে ইজতেবার পথে (বাঞ্ছিত ব্যক্তির পথে) আধ্যাত্মিক পথের পথিক সেখানে পৌছতে পারে এক লহমায়। আল্লামা রুমী তাই বলেছেন—

সায়েরে যাহেদ হর শব রোয রাহ
সায়েরে আরেফ হরদমে তা তখতে শাহ্।

অর্থঃ সাধক ওই শাহী দরবারে পৌছতে পারে অতি কঠোর সাধনার মাধ্যমে। আর যারা আরেফ (আল্লাহ্র পরিচয় ধন্য), তারা সেখানে পৌছায় প্রতিটি প্রশ্বাসে।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি; অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করো। এখানে 'আমি তোমাকে মনোনীত করেছি' কথাটির অর্থ— আমি তোমাকে স্ব-উদ্যোগে নির্বাচিত করেছি আমার বচনবাহকরূপে।

এর পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে—'আমিই আল্লাহ্, আমা ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। অতএব আমার ইবাদত করো।' আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে বিশুদ্ধ তওহীদ গ্রহণ ও পরিশুদ্ধ ইবাদত সম্পাদনের নির্দেশ। আল্লাহ্ সরাসরি এখানে বলেছেন, আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। একথা বিশ্বাসের নামই বিশুদ্ধ তওহীদ। আর কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইবাদত করার নাম হচ্ছে পরিশুদ্ধ বা বিশুদ্ধ ইবাদত।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো।' সাধারণভাবে প্রথমে বিশুদ্ধ ইবাদত সম্পাদনের নির্দেশ দেয়ার পর পরই এভাবে দেয়া হয়েছে নামাজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ। কেননা নামাজই সর্বোত্তম ইবাদত। রসুল স. বলেছেন, নামাজ ধর্মের স্তম্ভ। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আবু নাঈম ও বায়হাকী হজরত ওমর থেকে। মসনদুল ফিরদাউস গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আলী থেকে।

হজরত আনাস থেকে ইবনে আসাকের কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, নামাজ হচ্ছে ইমানের নূর। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, একবার আমি রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সর্বোত্তম আমল কী? তিনি স. বললেন, নামাজ। বোখারী, মুসলিম।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, নামাজ পরিত্যাগ করা সত্য প্রত্যাখ্যান সদৃশ। ইমাম আহমদ ও সুনান রচয়িতাবৃন্দ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন হজরত বুরাইদা থেকে। আহমদ, দারেমী ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বলেছেন, একবার রসুল স. নামাজের প্রসঙ্গ তুললেন এবং বললেন, যে নামাজের যত্ন করবে, তার জন্য নামাজ কিয়ামতের দিন হবে নূর, প্রমাণ ও পরিত্রাণের পরিলক্ষ্য। যে এরকম করবে না সে সেখানে এসকল কিছুই পাবে না। সে সেখানে সঙ্গী হবে কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সাক্বীক বলেছেন, নামাজ পরিত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোনো আমল পরিত্যাগকে সাহাবীগণ কুফরী মনে করতেন না। এই বর্ণনাটির পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আহমদ বলেছেন, যে স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করে, সে কাফের।

www.eelm.weebly.com

নামাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি পুণ্যকর্ম। সেকারণেও নামাজকে সর্বোত্তম ইবাদত বলা হয়ে থাকতে পারে। রোজাও উত্তম ইবাদতভূত। কারণ এর মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তির প্রভাব পর্যুদস্ত হয়। জাকাতও উত্তম। জাকাতের মাধ্যমে উপকৃত হয় দুঃস্থ জনতা। হজ দ্বারা সম্মান করা হয় আল্লাহ্‌র গৃহকে। তাই হজও একটি উত্তম ইবাদত।

'লি জিকরী' (আমার স্মরণার্থে) একথা বলে এখানে নির্দেশ করা হয়েছে নামাজের উদ্দেশ্যকে। আল্লাহ্‌র স্মরণ প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে নামাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। নামাজ সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র জিকির। এই স্মরণে নিমগ্ন হয় নামাজীর অন্তর ও বাহির। অনেকে কথাটির মর্মার্থ করেছেন এরকম— আমি পূর্ববর্তী সকল কিতাবে নামাজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছি। এখনো দিলাম। সুতরাং আমার পূর্বাপর নির্দেশ স্মরণার্থে তোমরাও নামাজ প্রতিষ্ঠিত করো। কেউ কেউ আবার অর্থ করেছেন — তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাকে স্মরণ যদি করো, তবে আমিও আমার রহমত ও সন্তোষের সঙ্গে তোমাদেরকে স্মরণ করবো। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌ বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার অনুরূপ। তাদের প্রতিটি নিশ্বাস প্রশ্বাসে আমি তাদের সঙ্গী, যদি তারা একাকী মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদেরকে স্মরণ করি আপন অস্তিত্বের মধ্যে। আর দলগতভাবে যদি আমার স্মরণমুখর হয় তবে আমি তাদেরকে স্মরণ করি তদপেক্ষা উত্তম দলের মধ্যে (ফেরেশতাদের দলমধ্যে)। উল্লেখ্য যে, এখানে কেবল নামাজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য আয়াতে দেয়া হয়েছে বিস্তারিত নির্দেশ। যেমন— 'আক্বিমিস সলাতা লিদুলূকিশ শামসি ইলা গসাক্বিল লাইলি ওয়া ক্বুরআনাল ফাজ্‌রি'। হজরত জিবরাইল নিজে ইমাম হয়ে রসুল স.কে শিক্ষা দিয়েছিলেন কী নিয়মে কোন সময়ে নামাজ পাঠ করতে হয়।

কোনো কোনো আলেম 'আমার স্মরণার্থে নামাজ কায়েম করো' কথাটির মর্মার্থ করেছেন এভাবে— নামাজ কায়েম করো, যখন নামাজের স্মরণ হয়। হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাজের কথা ভুলে যায় অথবা ঘুমের কারণে যার নামাজের সময় শেষ হয়ে যায়, যখন মনে পড়বে অথবা যখন তার ঘুম ভাঙবে তখন সে যেনো তার নামাজ আদায় করে নেয়। কেননা, আল্লাহ্‌ বলেছেন— আমার স্মরণার্থে নামাজ প্রতিষ্ঠা করো। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে নামাজের ক্ষতিপূরণ হয় না। হজরত আবু কাতাদা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নিদ্রা ও বিস্মৃতি কোনো অপরাধ নয়। জাগ্রত অবস্থায় ও সচেতনভাবে নামাজ পরিত্যাগ করা অপরাধ। সুতরাং বিস্মৃত ও নিদ্রিত ব্যক্তি তার বাদ পড়ে যাওয়া নামাজ সম্পাদন করতে পারবে তখন, যখন তার স্মৃতি জাগ্রত হয় ও ঘুম ভাঙে। কেননা আল্লাহ্‌ নির্দেশ করেছেন— আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো।

www.eelm.weebly.com

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۝ فَلَا
يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ۝ وَمَا تِلْكَ
بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ۝ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ
غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ۝ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ ۝ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا
هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۝ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ۝
وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً
أُخْرَىٰ ۝ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ۝ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝

❒ কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি ইহার সংঘটন মুহূর্ত গোপন রাখিতে চাহি যাহাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে।

❒ সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে উহাতে বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হইলে তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে।

❒ হে মূসা। তোমার দক্ষিণ হস্তে উহা কি?

❒ সে বলিল, 'উহা আমার লাঠি, আমি ইহাতে ভর দিই এবং ইহা দ্বারা আঘাত করিয়া আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলিয়া থাকি এবং ইহা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।

❒ আল্লাহ্ বলিলেন, 'হে মূসা! তুমি ইহা নিক্ষেপ কর।'

❒ অতঃপর সে উহা নিক্ষেপ করিল, সংগে সংগে উহা সাপ হইয়া ছুটিতে লাগিল,

❒ তিনি বলিলেন 'তুমি ইহাকে ধর, ভয় করিও না, আমি ইহাকে ইহার পূর্বরূপে ফিরাইয়া দিব।

❒ এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ইহা বাহির হইয়া আসিবে নির্মল উজ্জ্বল হইয়া অপর এক নিদর্শন স্বরূপ।

❒ ইহা এই জন্য যে আমি তোমাকে দেখাইব আমার মহা নিদর্শনগুলির কিছু।

❒ ফিরাউনের নিকট যাও সে সীমালংঘন করিয়াছে।

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি এর সংঘটন-মুহূর্ত গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে।' এখানে বিবৃত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত ইবাদতের কারণ। অথবা এখানে মানুষকে সতর্ক করণার্থে উল্লেখ করা হয়েছে কিয়ামত ও কর্মফল লাভের কথা।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের শুরুতে অনুক্ত রয়েছে সংযোজক অব্যয় 'ওয়াও' (এবং)। ওই অনুক্ত শব্দটিসহ বাক্যটি উপস্থাপিত হতে পারে এভাবে— ওয়া ইন্নাস্ সাআ'তা অতিয়াতিন (অবশ্যই মহাপ্রলয় ঘটিতব্য)।

আখ্‌ফাশ বলেছেন, এখানে 'আকাদু' শব্দটির অর্থ— 'উরীদু'(আমি চাই)। বাগবী লিখেছেন, শব্দটি এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। এর অর্থ— আমি কিয়ামতের নির্ধারিত সময় প্রকাশ করবো না। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতাও এরকম বলেছেন। কিয়ামত কখন হবে— এই নিয়ে মানুষ বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাই এর সঠিক দিন-ক্ষণ গোপন রাখার ঘোষণা দিয়ে মানুষকে অনুগৃহীত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র জ্ঞানে কিয়ামতের সময় সুনির্ধারিত। সে কারণে এক স্থানে বলা হয়েছে— হয়তো আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী বিদীর্ণ হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তারা দয়াময়ের সন্তান আরোপ করাতে (সুরা মারয়াম)। মোটকথা এই বিশ্বাসটি এখানে অত্যাবশ্যক যে, কিয়ামত বা মহাপ্রলয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তার সংঘটিত হওয়ার সঠিক দিন-তারিখ আল্লাহ্ দয়া করে গোপন রাখতে চান একারণেই যে, মানুষ যেনো ভীতসন্ত্রস্ত হয় এবং পুণ্যকর্মে লজ্জিত হয়ে কিয়ামতের জন্য থাকে সতত প্রস্তুত। আমি বলি, আলোচ্য বাক্যের মধ্যে সম্ভবতঃ এই ইঙ্গিতটি রয়েছে যে, ইমান ও আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধ ইবাদত এমন এক মর্যাদার ব্যাপার, যা বেহেশত, দোজখ অথবা কিয়ামতের উপর নির্ভরশীল নয়। সওয়াব ও আযাব হবে মানুষের আসল পরিণতি। এই পরিণতি যদি সামনে না-ও থাকতো, তবুও প্রকৃত ইমান ও ইবাদতের মর্যাদা ও সৌন্দর্য এতটুকুও ক্ষুণ্ন হতো না। প্রকৃত ইমান ও বিশুদ্ধ ইবাদতের এমতো বৈশিষ্ট্য না থাকলে দোজখ ও কিয়ামতের ভয় ও বেহেশতের আশা দেখিয়ে মানুষকে ইমানদার বানানো যেতো না এবং তাদের ইবাদতকেও রাখা যেতো না বিশুদ্ধ। তাই প্রকৃত ইমানদারেরা ইবাদত করে আল্লাহ্‌র সন্তোষ সাধনার্থে, কোনো কিছুর ভয়ে বা আশায় নয়। রসুল স. একবার হজরত সুহাইব সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, সে খুব উত্তম বান্দা। দোজখের শাস্তির কথা না জানানো হলেও সে কখনো আল্লাহ্‌র অবাধ্য হতো না। রাবেয়া বসরী বলেছেন, জান্নাতকে জ্বালিয়ে দাও এবং নিভিয়ে দাও জাহান্নামকে। তাহলে মানুষ আতংক ও লালসা ছাড়া কেবল আল্লাহ্‌র জন্য ইবাদত করতে পারবে।

www.eelm.weebly.com

অধিকাংশ তাফসীরকার এখানকার 'আমি এর সংঘটন মুহূর্ত গোপন রাখতে চাই।' কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি আমার নিজের নিকটেও এই তত্ত্বটি গোপন রাখবো। গোপনীয়তাকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্যই এখানে এরকম বক্তব্যভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে। এই মর্মার্থটি সমর্থনযোগ্য। কারণ এক ক্বেরাতে 'উখ্‌ফিহা' (গোপন রাখতে চাই) —কথাটির পরে উচ্চারিত হয়েছে 'ফাকাইফা উজ্‌হিরুহালাকুম'। কিন্তু এ ক্বেরাতটি বিরল। কোনো বিষয়ের গোপনীয়তাকে অত্যধিক গুরুত্বের সঙ্গে রক্ষা করতে চাইলে আরববাসীরা বলে থাকে 'কাতামতু সির্‌রাকা মিন নাফসি (আমি তোমার গোপন তত্ত্ব নিজের কাছ থেকেও গোপন রাখবো)। কিয়ামত সংঘটনের সময় গোপনে রাখার মধ্যে তাই মানুষের জন্য রয়েছে কল্যাণ। কারণ এতে করে তারা এই মর্মে চিন্তিত থাকবে যে, কখন জানি কিয়ামত সংঘটিত হয়, আর আমি ধ্বংস হয়ে যাই পুণ্যবিহীন অবস্থায়। সুতরাং পাপমুক্তি এবং পুণ্যাভিলাষই হোক আমার সার্বক্ষণিক সাধনা।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'উখফিয়া' এর মধ্যে 'হামযা' ব্যবহৃত হয়েছে সলবে মাখুজ (ধাত্যর্থ বিনাশনার্থে)। এভাবে 'উখফিয়া' কথাটির অর্থ হয় উজহিরাহা (আমি কিয়ামতকে প্রকাশ করবো, এই বিষয়টি সুদূর প্রসারী নয়)। আরবী অভিধানানুসারে 'আখফাহু' কথাটির অর্থ লুকিয়ে রাখা যেমন হয়, তেমনি হয় প্রকাশ করা। বায়যাবী লিখেছেন, 'হামযা'র উপরে যবর দিয়ে 'উখফিয়া'কে 'আখফিয়া' পড়লেও এরকম অর্থ হয়। বাগবী লিখেছেন, শব্দটির 'হামযা' 'যবর' সহযোগে পড়লে অর্থ হয়— আমি প্রকাশ করে দিবো। যেমন বলা হয়— 'আখফাইতুহু' আমি তাকে প্রকাশ করে দিয়েছি। শব্দটি তিন অক্ষর বিশিষ্ট বলে অর্থ হয় প্রকাশ করা এবং তিনের অধিক অক্ষরবিশিষ্ট হলে অর্থ হয় গোপন রাখা। 'নেহায়া' গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে।

একটি প্রশ্নঃ শব্দটি তিন অক্ষর বিশিষ্ট (খাফাআ) হলে প্রকাশ করা, আর 'ইখফা' হলে ধাত্যর্থ নাশ অর্থে হয় গোপন করা । আবার প্রসিদ্ধ ক্বেরাত অনুসারে অর্থ দাঁড়ায় প্রকাশ করা। এটা আবার কী করে সম্ভব? 'ইখফা ' অর্থ তো প্রকাশ না করাই হওয়া উচিত ছিলো।

উত্তরঃ আমি বলি, তিন অক্ষর বিশিষ্ট 'খাফা' প্রকাশ করা ও গোপন রাখা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং প্রসিদ্ধ ক্বেরাত অনুসারে প্রকাশ না করার যে অর্থ নেয়া হয়েছে, সেখানে কিন্তু শব্দটি তিন অক্ষর থেকে বৃদ্ধি করে সংযোজিত করা হয়েছে 'হামযা'। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে গোপন করা। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে 'খাফা'— 'ইয়াখফি'। যেমন 'রামা' 'ইয়ারমী'(দ্বরাবা থেকে)। এভাবে 'খাফইয়া' এবং 'খুফইয়া' এর অর্থ দাঁড়ায় প্রকাশ করা। 'ইখতাফা' এর অর্থও এরকম।

www.eelm.weebly.com

আবার 'খফিয়া' 'ইয়াখফা'। যেমন 'রব্বিইয়া'— 'ইয়ারব্বা' (সামিয়া থেকে)। মূল শব্দ 'খফিন' হচ্ছে কর্তৃকারক। খফিয়্যুন হচ্ছে সিফাতে মুশাব্বাহ। 'খফিয়্যুন' অর্থ প্রকাশ না করা। সুতরাং 'দ্বরাবা' থেকে আগত 'খফা' এর সঙ্গে 'হামযায়ে কলব' যোগ করলে তখন তার অর্থ হবে গোপন করা, অর্থাৎ প্রকাশ না করা। কেননা 'খফা' অর্থ প্রকাশ করা। আর 'সামিয়া' থেকে উদ্ভূত 'খফিয়া' এর সঙ্গে 'হামযা' যুক্ত করলে শব্দটির অর্থ হবে প্রকাশ হতে না দেয়া বা গোপন করা।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেনো তোমাকে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।' প্রকাশ্যতঃ মনে হয়, এখানে অবিশ্বাসীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেনো তারা হজরত মুসাকে কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র স্মরণার্থে নামাজ প্রতিষ্ঠা থেকে বাধা না দেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানকার নির্দেশটি প্রযোজ্য হবে হজরত মুসার প্রতি এভাবে— হে নবী মুসা! তুমি প্রবৃত্তিতাড়িত অবিশ্বাসীদের কথায় কিছুতেই প্রভাবিত হয়ো না। যদি হও, তবে তুমিও তাদের মতো পরকালে আক্ষেপ করতে থাকবে।

আলোচ্য আয়াতের মধ্যে এই ইঙ্গিতটিও নিহিত রয়েছে যে, শুভ স্বভাববিশিষ্ট যারা, তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌কে এবং পরকালকে। আর নামাজ প্রতিষ্ঠাও হয় তাদের স্বভাবসম্ভূত কর্ম। সত্যপ্রত্যাখ্যান হয় তাদের সুন্দর স্বভাবের পরিপন্থী। অপরপক্ষে সত্যপ্রত্যাখ্যান ও বক্রতা হয় অবিশ্বাসীদের স্বভাব সন্নিহিত। তাই সত্যের স্বীকৃতি প্রদান হয়ে যায় তাদের স্বভাবের পরিপন্থী একটি বিষয়।

'নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে' কথাটির অর্থ এখানে— তারা অনুগামী হয় তাদের লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনার। চায় কেবল পার্থিব সাফল্য। পরকাল ও পরকালের শাস্তি সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অসচেতন।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'হে মুসা! তোমার দক্ষিণ হস্তে ওটা কী? দৃশ্যতঃ সাধারণ মনে হলেও প্রশ্নটি কিন্তু সাধারণ কোনো প্রশ্ন নয়। এটা হচ্ছে বিস্ময়কর ও ভয়ংকর এক মোজেজার উপক্রমণিকা বা ভূমিকা। সাধারণ একটি লাঠি হবে আল্লাহ্‌র অপার অলৌকিকত্বের প্রকাশস্থল। তাই প্রস্তুতিপর্বের মানসিকতাকে সুতীক্ষ্ণ ও সচেতন করার নিমিত্তে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও এভাবে প্রশ্ন করেছেন— হে মুসা! বলো, তোমার হাতে ওটা কী?

এর পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'সে বললো, এটা আমার লাঠি, আমি এতে ভর দেই এবং এর আঘাতে আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলে থাকি এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।'

www.eelm.weebly.com

হজরত মুসার ওই লাঠির নাম ছিলো তাবআহ্। বাগবী লিখেছেন লাঠিটির উপরের অংশে ছিলো দু'টি শাখা এবং নিম্নপ্রান্তে ছিলো ছয়টি জোড়া।

'আমি এতে ভর দেই' অর্থ আমি যখন উঁচু কোনো স্থানে আরোহণ করি তখন লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে উঠি, আবার ক্লান্ত হয়ে পড়লেও এতে ভর দিয়ে দাঁড়াই। 'এর আঘাতে আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলে থাকি' অর্থ আমি আমার ছাগল ভেড়াগুলোকে এই লাঠি দিয়ে গাছ থেকে পাতা পেড়ে দেই। আর 'এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে' অর্থ এই লাঠিতে আমি আমার পানাহারের সামগ্রী বেঁধে নিয়ে দূরের চারণভূমিতে যাতায়াত করি, এর দুটি প্রান্তে কাপড় বেঁধে কখনো কখনো প্রখর রৌদ্রে ছায়ার ব্যবস্থা করি, কূপ থেকে পানি ওঠানোর সময় রশি খাটো হলে লাঠির সঙ্গে বেঁধে পানি ওঠানোর কাজকে করি সহজ, আবার কখনো হিংস্র প্রাণীর আক্রমণও প্রতিহত করি এর মাধ্যমে।

কোনো কোনো আল্লাহ্ প্রেমিক বলেছেন, আল্লাহ্‌র প্রশ্নের উত্তরে 'এটা আমার লাঠি' বলাই যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু হজরত মুসা তার সঙ্গে লাঠির বিভিন্ন উপকারিতার কথা বলে তাঁর বক্তব্যকে করেছেন প্রলম্বিত। প্রিয়তম জনের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতা প্রেমিকগণের একটি চিরাচরিত স্বভাব। হজরত মুসাও তাই প্রেমাতিশয্যবশতঃ তাঁর বক্তব্য দীর্ঘ করে চলেছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর স্মরণ হলো মহাবিশ্বের মহাপ্রভুপালকের প্রশ্নের জবাব যথাযথ ও সংযমশোভিত হওয়া সমীচীন, তখন তিনি তাঁর বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করে ফেললেন এভাবে—'এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।' আদব প্রদর্শনার্থেই তিনি তখন উচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করলেন এভাবে। অন্যান্য কাজের বিস্তারিত ফিরিস্তি আর দিলেন না।

এর পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বললেন, হে মুসা! লাঠিটি নিক্ষেপ করো।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ বললেন, হে মুসা! এবার লাঠিতে ভর দেয়ার কথা ভুলে যাও। পরিপূর্ণরূপে আশ্রয় করো আমাকে। লাঠিটি মাটিতে ফেলে দাও। ওহাব বলেছেন, নির্দেশটি পেয়ে হজরত মুসা মনে করেছিলেন হয়তো জুতার মতো লাঠিটিও দূরে ছুঁড়ে ফেলার হুকুম দেয়া হয়েছে। অথচ লাঠিটি কেবল মাটিতে ফেলে দেয়াই ছিলো আল্লাহ্‌র নির্দেশ। পরক্ষণেই হজরত মুসা তা বুঝতে পারলেন এবং হাতের লাঠি ছেড়ে দিলেন মাটিতে।

এর পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে তা নিক্ষেপ করলো, সঙ্গে সঙ্গে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগলো।' এই সাপের উল্লেখ অন্য আয়াতে এসেছে এভাবে— 'কাআন্নাহা জ্বান্নুন'। 'জ্বান্নুন' বলে ছোট সাপকে, যা অতি দ্রুত নড়াচড়া করতে পারে। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফাইজা হিইয়া ছা'বানুন'। 'ছা'বানুন' বলে অজগরকে। সাপের মধ্যে অজগরই সর্ববৃহৎ। কিন্তু তা

www.eelm.weebly.com

নড়াচড়া করে অত্যন্ত শ্লথ গতিতে। আলোচ্য আয়াতে আবার সাপকে বলা হয়েছে 'হাইয়্যাতুন'। ছোট বড় পুরুষ নারী— সব ধরনের সাপকেই 'হাইয়্যাতুন' বলা যায়। একই সঙ্গে একই সাপের 'জ্বান্নুন' ও 'ছা'বানুন' (ছোট ও বড়) হওয়ার ব্যাপারটি বেশ বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু সমস্যাটি অসমাধাননীয় নয়। ব্যাপারটি ছিলো এরকম— মাটিতে লাঠিটি নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে তা পরিণত হলো লাঠির মাপসম্পন্ন একটি ছোট সাপে। তারপর তা বাড়তে বাড়তে হয়ে গেলো বিরাট অজগর।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আসলে ওই সাপটি অজগর সাপ ছিলো, কিন্তু তা ছিলো ছোট সাপের মতো অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন। তাই বলা হয়েছে— 'কাআন্নাহা জ্বান্নুন' (ছোট সাপের মতো)। ছোট সাপের মতো ও ছোট সাপ নিশ্চয় এক কথা নয়। আবার অন্য স্থানে এসেছে— 'ইজা হিয়্যা ছু'বানুম মুবীন' (হঠাৎ সেটি হয়ে গেলো আজদাহা)। এভাবে বক্তব্য দু'টোকে সম্মিলিত করলে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মাটিতে লাঠি নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে তা পরিণত হলো একটি ছোট সাপে। তারপর তা বাড়তে বাড়তে হয়ে গেলো বৃহদাকৃতির একটি অজগর। সাধারণতঃ অজগর হয় ধীরগতিসম্পন্ন, কিন্তু ওই অলৌকিক অজগরটি ছিলো অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হজরত মুসা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, তাঁর নিক্ষিপ্ত লাঠিটিই পরিণত হয়েছে বিশাল অজগরে। লাঠির উপরের অংশের শাখা দু'টো হয়ে গিয়েছে সাপটির বিরাট চোয়াল। যে স্থানে হাত রেখে তিনি লাঠিটিকে ধরেন সেই স্থানটি হয়েছে তার গর্দান। মাথাটিও বৃহৎ ও কেশবিশিষ্ট। চোখ দু'টো জ্বল জ্বল করছে আগুনের মতো। সাপটি প্রবল আক্রোশে মাঝে মাঝে দাঁতে দাঁত ঘষছে। শোনা যাচ্ছে দন্তঘর্ষণের বিকট আওয়াজ। কখনো কখনো সে গিলে ফেলছে বড় বড় পাথর। আবার কখনো খণ্ড বিখণ্ড করে চিবিয়ে খাচ্ছে গাছপালা। এরকম ভয়ংকর দৃশ্য দেখে হজরত মুসা পালিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হলো প্রিয়তম প্রভুপালকের কথা। লজ্জিত হয়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

এর পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে—'তিনি বললেন, তুমি একে ধরো, ভয় কোরো না, আমি একে এর পূর্বের রূপে ফিরিয়ে দিবো।' এখানে 'সীরাতাহাল উলা' অর্থ পূর্বরূপে। 'সীরাতুন্' কথাটি এসেছে 'ফি'লাতুন' এর ওজনে। এর পরোক্ষ অর্থ পদ্ধতি, রূপ, অবস্থা। এভাবে কথাটি দাঁড়িয়েছে— আমি লাঠিটি ফিরিয়ে দিবো পূর্বরূপে, পূর্ব পদ্ধতিতে অথবা পূর্বাবস্থায়।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, হজরত মুসা তখন ছিলেন পশমী পরিচ্ছদাবৃত অবস্থায়। যখন নির্দেশ করা হলো 'খুজহা' (সাপটিকে ধরো) তখন তিনি তাঁর পরিধেয় বস্ত্র হাতে পেঁচিয়ে নিলেন। পুনঃ নির্দেশ ঘোষিত হলো, হস্ত উন্মোচন করো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পরিধেয় বস্ত্রের ভিতর থেকে তাঁর হাত বের করলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, যখন হজরত মুসা পরিধেয় বস্ত্রে তাঁর হাত পেঁচিয়ে নিলেন, তখন কোনো এক ফেরেশতা বললেন, ভ্রাতা মুসা! আপনি ভীত হচ্ছেন কেনো? আল্লাহ্ যদি চান যে, সাপটি আপনাকে দংশন করুক, তবে কি পরিধেয় বস্ত্র সে দংশন ঠেকাতে পারবে? হজরত মুসা বললেন, না। কিন্তু আমি যে আতংকিত। একথা বলার পর হজরত মুসা সাহস করে এগিয়ে গেলেন এবং হাত দিলেন সাপের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে সাপটি পরিণত হলো লাঠিতে।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, এভাবে পূর্বাহ্নেই আল্লাহ্ হজরত মুসাকে মোজেজাটি দেখিয়ে দিলেন, যাতে পরবর্তী সময়ে ফেরাউনের দরবারে তিনি স্বাভাবিক সাহসের সঙ্গে মোজেজাটি প্রদর্শন করতে পারেন। নিজেই যেনো না হয়ে যান ভীত, সন্ত্রস্ত।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসা সফরের সময় তাঁর লাঠিতে খাবার দাবার বেঁধে নিয়ে যাত্রা শুরু করতেন। পথ চলার সময় লাঠিটি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাও বলতো। ওই লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করলে তাঁর সারা দিনের খাবার বের হয়ে আসতো। আর পুঁতে রাখলে তা থেকে উৎসারিত হতো পানির প্রস্রবণ। হাতে উঠিয়ে নিলে আবার তা হয়ে যেতো পূর্ববৎ সাধারণ লাঠি। কোনো ফল খেতে ইচ্ছে করলে লাঠিটিকে তিনি সম্পূর্ণ খাড়া করে মাটিতে প্রোথিত করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। ওই কিছুক্ষণের মধ্যেই লাঠিটি পরিণত হতো সবুজ পাতা ও সুপক্ক ফল বিশিষ্ট একটি বৃক্ষে। কূপ থেকে পানি তুলতে চাইলে তিনি লাঠিটি ধরে রাখতেন কূপের উপর। তখন লাঠিটি বাড়তে বাড়তে মিলিত হতো কূপের পানির সঙ্গে। লাঠিটির দু'মাথা তখন হয়ে যেতো পানি পরিপূর্ণ দু'টি সুরাহী। আবার রাতে ওই অলৌকিক লাঠি থেকে প্রদীপের মতো ঠিকরে পড়তো আলো। প্রহরীর দায়িত্বও পালন করতো যষ্টিটি। পালন করতো নিরাপত্তার দায়িত্বও। প্রতিপক্ষের কেউ আক্রমণ করতে এলে সেটি নিজেই লড়াই করে তাকে হটিয়ে দিতো।

এর পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, হাতটি বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অপর এক নিদর্শনস্বরূপ।' এখানে 'ইয়াদ' অর্থ দক্ষিণ হস্ত। বাগবী লিখেছেন, 'জ্বানাহ্' অর্থ এখানে বাম

www.eelm.weebly.com

বগল। তিনি 'ইলা' শব্দের অর্থ এখানে 'মধ্যে' না করে করেছেন দিকে। এরকম বলেছেন মুজাহিদ। তাঁর অর্থানুসারে বক্তব্যটি দাঁড়ায় এরকম— তুমি তোমার ডান হাত তোমার বাম বগলের দিকে নিয়ে যাও। বাহু থেকে বগলের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত স্থানকে বলে 'জ্বানাহ্'। বায়যাবী লিখেছেন, আসলে 'জ্বানাহ্' বলা হয় পাখির ডানাকে। মানুষের ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয় রূপকার্থে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, বক্ষ পিঞ্জরকে বলে 'জ্বাওয়ানেহ্'। এর একবচন হচ্ছে 'জ্বানিহাতুন'। আর 'জ্বানাহুন' হচ্ছে বাহু, হাত, বগল।

'তাখরুজ' অর্থ বের হবে। 'সূইন' অর্থ মন্দ কোনো কিছু, অসুখ, কুষ্ঠরোগ অথবা এই জাতীয় কোনো ব্যাধি। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে মুসা! তোমার ডান হাত তোমার বাম বগলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাও, তারপর তা বের করে আনো। দেখবে তোমার ওই হাত হয়ে গিয়েছে নির্মল, উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়। হাতের ওই শুভ্রোজ্জ্বলতা কিন্তু শ্বেত-কুষ্ঠ অথবা ওই জাতীয় কোনো রোগের চিহ্ন নয়। ওটি হবে একটি মোজেজা বা নিদর্শন। লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া প্রথম নিদর্শন। আর দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে— ওই শুভ্রোজ্জ্বল নিরোগ হাত। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসা তাঁর ডান হাত বাম বগলে রেখে বের করে আনলে ওই হাত থেকে বিচ্ছুরিত হতো নূর। আর ওই নূর জ্বল জ্বল করতো চন্দ্র, সূর্যের মতো।

এখানে 'আয়াতান উখরা' অর্থ অপর এক নিদর্শনস্বরূপ। এভাবে এখানে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, হজরত মুসার নবুয়তের একটি প্রমাণ যষ্টির সর্পরূপ ধারণ এবং অপর একটি নিদর্শন হচ্ছে নিরোগ শুভ্রোজ্জ্বল হাত।

এর পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্যে যে, আমি তোমাকে দেখাবো আমার মহানিদর্শনগুলোর কিছু।' একথার অর্থ— হে আমার নবী মুসা! আমি আমার মহানিদর্শনগুলোর কিছু কিছু তোমাকে এভাবে দেখাবো, যেমন এখন দেখালাম লাঠি ও হাতের মোজেজা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসার সবচেয়ে বড় মোজেজা ছিলো শুভ্রোজ্জ্বল হাত।

শেষের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'ফেরাউনের নিকটে যাও, সে সীমালংঘন করেছে।' একথার অর্থ— হে আমার বাণীবাহক! ফেরাউন উপনীত হয়েছে সীমালংঘনের চরমতম পর্যায়ে। প্রভুপ্রতিপালক বলে ঘোষণা করেছে নিজেকে। তাই তুমি তার নিকটে গিয়ে আমার বাণী প্রচার করো। তাকে আহ্বান জানাও সত্য ধর্মের প্রতি।

www.eelm.weebly.com

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ○ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ○ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن
لِّسَانِي ○ يَفْقَهُوا قَوْلِي ○ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ○ هَارُونَ
أَخِي ○ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ○ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ○ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ○
وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ○ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ○

❒ মূসা বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দাও।
❒ এবং আমার কর্ম সহজ করিয়া দাও।
❒ আমার জিহ্বার জড়তা দূর করিয়া দাও।
❒ যাহাতে উহারা আমার কথা বুঝিতে পারে।
❒ আমার স্বজনবর্গের মধ্য হইতে আমার জন্য করিয়া দাও একজন সাহায্যকারী,
❒ আমার ভ্রাতা হারুনকে
❒ তাহার দ্বারা আমার শক্তি বৃদ্ধি কর।
❒ ও তাহাকে আমার কর্মে অংশী কর।
❒ যাহাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে পারি প্রচুর।
❒ এবং তোমাকে স্মরণ করিতে পারি অধিক।
❒ তুমি তো আমাদিগের সম্যক দ্রষ্টা।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রভুপালনকর্তা! প্রবল প্রতাপশালী ফেরাউনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য তুমি আমাকে অটল ও অবিচল মন-মানসিকতা দাও। মারেফতের নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দাও আমার বক্ষদেশকে। দাও নির্ভিকতা, আত্মিক শক্তি ও সাহস, যাতে করে তার প্রতাপ ও পরাক্রম আমার উপরে দূরবর্তী কোনো প্রভাবও বিস্তার করতে সক্ষম না হয়।

হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, হজরত মুসা এখানে এটাই বলতে চেয়েছেন যে, হে আমার প্রভুপালক! আমি যেনো তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই ভয় না করি। বক্ষ প্রশস্ত হওয়ার (শরহে সুদুরের) প্রার্থনা তিনি জানিয়েছেন একারণেই।

পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও।' একথার অর্থ— এবং আমার কর্মসূচীর বাস্তবায়ন সহজ করে দাও, যেনো আমি সত্যধর্ম প্রচারের দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করতে পারি। সকল প্রতিবন্ধকতা যেনো অতিক্রম করতে পারি অনায়াসে। দাও সাহস ও সহিষ্ণুতা ও সফলতা।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতদ্বয়ে (২৭, ২৮) বলা হয়েছে— 'আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও; যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।'

বাগবী লিখেছেন, জোতিষীরা ফেরাউনকে বলেছিলো ইসরাইলী বংশভূত এক মহাপুরুষ আপনাকে ও আপনার সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে ফেলবে। ফেরাউন তাই নির্দেশ জারী করেছিলো, বনী ইসরাইলের সদ্যজাত সকল শিশুকে হত্যা করতে হবে। তার ওই নির্দেশের ফলে শত শত শিশুর প্রাণ বধ করা হলো। কিন্তু লোক চক্ষুর অন্তরালে হজরত মুসার মাতা তাঁর সদ্যজাত শিশুপুত্রকে একটি সিন্দুকের মধ্যে পুরে নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে গিয়ে ঠেকলো নীল নদের তীরবর্তী ফেরাউনের এক বালাখানায়। ফেরাউন দম্পতি তাঁকে তুলে নিলো। তারা ছিলো নিঃসন্তান। শিশু মুসাকে দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে গেলো। ঠিক করলো, এই সুন্দর শিশুটিকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করা হবে। সেই থেকে আল্লাহ্র প্রিয় পয়গম্বর প্রতিপালিত হতে লাগলেন আল্লাহ্র দুশমনের গৃহে। একদিন ফেরাউন তাঁকে আদর করে কোলে নিলো। অমনি শিশু মুসা চপেটাঘাত করলেন তার গণ্ডদেশে এবং টান মারলেন তার দাড়ি ধরে। ফেরাউন হলো স্তম্ভিত ও ভীত। স্ত্রী আছিয়াকে বললো আমার মনে হয় এই শিশুটিই আমার কথিত শত্রু। সুতরাং একে হত্যা করাই উত্তম। আছিয়া বললেন, এতো দুগ্ধপোষ্য এক শিশু। ভালো মন্দ বুঝবার জ্ঞান কি এর হয়েছে?

অপর বর্ণনায় এসেছে, ফেরাউন তার পালিত পুত্রের দুগ্ধধাত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলো মুসার আপন মাতাকে। দুগ্ধপানের বয়স শেষ হয়ে যাওয়ার পর হজরত মুসাকে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে আনলো ফেরাউন। সে ও তার স্ত্রী আছিয়া পুত্র স্নেহে প্রতিপালন করতে লাগলো শিশু নবীকে। একদিন খেলাচ্ছলে হজরত মুসা তাঁর হাতের যষ্টি দিয়ে আঘাত করলেন ফেরাউনের মাথায়। ফেরাউন ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করতে মনস্থ করলো। সম্রাজ্ঞী আছিয়া বললেন, মহামান্য সম্রাট! আপনি অযথা ক্রোধান্বিত হচ্ছেন। এই শিশুতো অবুঝ। আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনি তাকে পরীক্ষা করে দেখুন। এ কথা বলে সম্রাজ্ঞী আছিয়া দু'টো পাত্র আনালেন। একটিতে ছিলো মনিমুক্তা এবং অপরটিতে ছিলো টুকরো টুকরো অঙ্গার। পাত্র দু'টো শিশু মুসার নিকটে আনতেই তিনি মনিমুক্তার পাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু হজরত জিবরাইল তাঁর হাত ফিরিয়ে দিলেন অঙ্গারের পাত্রটির দিকে। শিশু মুসা তখন সেখান থেকে একটি অঙ্গারের টুকরা তুলে মুখে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জিব পুড়ে ঝলসে গেলো। তখন থেকেই তাঁর জিহ্বায় দেখা দিলো জড়তা।

আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে মুনজির ও ইবনে হাতেমের বর্ণনায় এসেছে হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, একদিন শিশু মুসা ফেরাউনের দাড়ি ধরে টান মারলেন। ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যার হুকুম দিলো। আছিয়া

www.eelm.weebly.com

বললেন, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? মনিমুক্তা ও আগুনের মধ্যে পার্থক্য করার বয়সই তো এর হয়নি। এতো নিতান্তই এক অপগণ্ড শিশু। ফেরাউন তখন আগুন ও মনিমুক্তা ভর্তি দু'টো পাত্র নিয়ে এসে স্থাপন করলো শিশু মুসার সামনে। তিনি মনিমুক্তার পাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু হজরত জিবরাইল তাঁর হাত ঠেলে নিয়ে গেলেন আগুনের পাত্রের দিকে। শিশু মুসা তখন এক টুকরা আগুন নিয়ে নিজের মুখে পুরে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জিহ্বা পুড়ে গেলো এবং তখন থেকেই জড়তা সৃষ্টি হলো তাঁর রসনায়।

হজরত মুসার রসনার জড়তা কি সম্পূর্ণ দূর হয়ে গিয়েছিলোঃ এ কথার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন বক্তব্য এসেছে। কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ বলেছেন— 'হে মুসা! তুমি যা চেয়েছো তা তোমাকে দেয়া হলো' (আয়াত ৩৬)। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, হজরত মুসার জিহ্বার জড়তা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছিলো। আবার কেউ কেউ বলেন, এক আয়াতে বলা হয়েছে, হজরত মুসা, হজরত হারুন সম্পর্কে বলেছিলেন— 'সে আমার চেয়েও স্পষ্টভাষী।' আর এক আয়াতে বলা হয়েছে, ফেরাউন বলেছিলো— 'এই নিচ লোকের চেয়ে আমি উত্তম। সে তো স্পষ্টভাবে কথাও বলতে পারে না।' এতে করে বোঝা যায়, হজরত মুসার জিহ্বার আড়ষ্টতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়নি। তাছাড়া হজরত মুসা আল্লাহ্র নিকটে তাঁর জিহ্বার জড়তা পূর্ণরূপে দূর করার আবেদনও জানাননি। কেবল বলেছেন— 'যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।' অর্থাৎ তিনি কেবল এতটুকুই চেয়েছিলেন, মানুষ যেনো তাঁর কথা কোনোক্রমে বুঝে নিতে পারে।

এর পরের আয়াতদ্বয়ে (২৯, ৩০) বলা হয়েছে— 'আমার স্বজনবর্গের মধ্য থেকে আমার জন্য করে দাও একজন সাহায্যকারী, আমার ভ্রাতা হারুনকে।' এখানকার 'ওয়াযীরা' অর্থ— উযির, মন্ত্রণাদাতা, সাহায্যকারী। শব্দটি সংকলিত হয়েছে 'বিয্রুন' থেকে। আবার 'ওয়াযরু জাবালিন্' (পর্বতাশ্রয়) থেকেও শব্দটি উৎসারিত হয়ে থাকতে পারে। সম্রাট যেমন তার মন্ত্রীর সাহায্য নিয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন, হজরত মুসাও তেমনি বিচক্ষণ মন্ত্রণাদাতা হিসেবে রেসালতের মহান কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য চেয়েছিলেন হজরত হারুনকে। মাওয়াযিরাত্ বা পারস্পরিক সাহায্যের বিষয়টি এরকমই। কোনো কোনো অভিধান বিশারদ বলেন, 'ওয়াযীর' শব্দটির প্রকৃতরূপ ছিলো 'আযীর'। 'আয্রুন' থেকে বিশেষণবাচক শব্দরূপ হিসেবে গঠিত হয়েছে 'আযীরুন'। 'আযার' অর্থ শক্তি। যেমন, 'আযীরু ক্বওমী' অর্থ সম্প্রদায়গত শক্তি। এভাবে 'আযীরুন ' অর্থ 'মাযুর'। যেমন, 'আশীরুন অর্থ— মাআ'শীরুন, জালাসুন অর্থ মাজালিসুন ইত্যাদি। এভাবে 'ওয়াও' অক্ষরটিকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে বসানো হয়েছে 'হামযা'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— শক্তি সঞ্চারক সঙ্গীরূপে আমার স্বজনবর্গের মধ্য থেকে আমাকে দাও আমার ভ্রাতা হারুনকে।

www.eelm.weebly.com

শেষের পাঁচ আয়াতে (৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫) বলা হয়েছে-- 'তার দ্বারা আমার শক্তি বৃদ্ধি করো ও তাকে আমার কর্মে অংশী কর; যাতে আমরা তোমার প্রচুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি এবং তোমাকে স্মরণ করতে পারি অধিক। তুমি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।' একথার অর্থ— ভ্রাতা হারুনের দ্বারা আমার সত্যধর্ম প্রচারের মহান কর্মকাণ্ডকে করো অধিকতর প্রবল এবং তাকে করো আমার সার্বক্ষণিক সতীর্থ ও অংশীদার; যাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমার কথা প্রতুল উচ্চারণ করে ধন্য হই এবং করতে পারি তোমার অত্যধিক স্মরণ। তুমি তো আমাদের প্রকাশ্য-গোপন, আদি-অন্ত সকল কিছুর আনুরূপ্যবিহীন দ্রষ্টা।

কামুস প্রণেতা লিখেছেন, 'আযরী' অর্থ সুদৃঢ় বা সুসংহত। কালাবী বলেছেন, 'নুসাব্বিহাকা' অর্থ পবিত্রতার ঘোষণা, বর্ণনা বা উচ্চারণ দ্বারা। আর 'বাসীরা' অর্থ দ্রষ্টা।

সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯

قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ۝ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى ۝ اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى ۝ اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ؕ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ ۝

❐ তিনি বলিলেন, 'হে মূসা! তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা তোমাকে দেওয়া হইল।

❐ এবং আমি তো তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করিয়াছিলাম।

❐ যখন আমি তোমার মাতার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছিলাম যাহা ছিল নির্দেশ করিবার,

❐ এইমর্মে যে, তুমি মূসাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, অতঃপর উহা নীল দরিয়ায় ভাসাইয়া দাও যাহাতে দরিয়া উহাকে তীরে ঠেলিয়া দেয়, উহাকে আমার শত্রু ও উহার শত্রু লইয়া যাইবে। আমি আমার নিকট হইতে মানুষের মনে তোমার প্রতি ভালবাসা সঞ্চারিত করিয়াছিলাম, যাহাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের (৩৬, ৩৭) মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ বললেন, হে মুসা! তুমি যা কামনা করেছিলে, তা তোমাকে দান করা হলো এবং তোমাকে তো আমি ইতোপূর্বেও একবার এমতো অনুগ্রহ করেছিলাম। এখানকার 'সুউলুন' (কামনা বা চাহিদা) কথাটি এসেছে 'ফুউ'লুন' এর ওজনে 'মাসউলুন' এর অর্থরূপে। যেমন 'খুবরুন' অর্থ 'মাখবুরুন' এবং 'উকুলুন' অর্থ 'মা'কুলুন'।

এর পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'যখন আমি তোমার মাতার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছিলাম, যা ছিলো নির্দেশ করবার।' এখানে 'ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দান' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে 'আওহাইনা' শব্দটি। এর মর্মার্থ হচ্ছে— ইলহাম বা অনুপ্রেরণা, যা হজরত মুসার জননী পেয়েছিলেন স্বপ্নযোগে, অথবা ওই সময়ের কোনো নবীর জবানীতে অথবা ফেরেশতার মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁকে প্রত্যাদেশ করা হয়েছিলো, একথা মেনে নিলেও বুঝতে হবে যে, ওই প্রত্যাদেশ নবুয়তের পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।

জ্ঞাতব্যঃ ওহী এবং শরিয়তবিশিষ্ট নবুয়ত পেয়ে থাকেন কেবল নবী-রসুলগণ। আর তাঁরা সকলেই হন পুরুষ। এভাবে নবুয়ত ও রেসালতের ধারাক্রম সমাপ্ত হয়েছে শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. পর্যন্ত। অবশ্য ওহী বা প্রত্যাদেশবিহীন নবুয়তের পূর্ণতার ধারাবাহিকতা ইলহামের পদ্ধতিতে অথবা ফেরেশতাদের কথোপকথনের মাধ্যমে অদ্যাবধি প্রবহমাণ। এই প্রবহমাণতা নবুয়তের উত্তরাধিকারিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সরাসরি নবুয়তের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। আর এর জন্য পুরুষ হওয়াও কোনো শর্ত নয়। যেমন হজরত মরিয়মের সঙ্গে ফেরেশতা কথা বলেছিলো। আবার ওলীআল্লাহ্গণ প্রত্যাদেশের প্রতিবিম্বরূপে ইলহামও পেয়ে থাকেন। এ ধরনের কামালিয়াত লাভ হয় আপন আপন নবীগণের পরিপূর্ণ অনুসরণের সূত্রে। শায়েখ মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী তাঁর ফতুহাতে মক্কীয়া গ্রন্থে লিখেছেন, শরিয়তবিশিষ্ট প্রকৃত নবুয়তের ধারাবাহিকতা বিলুপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু নবুয়তের উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতা রুদ্ধ হয়নি। তাই এই উম্মতের কেউ কেউ নবুয়তের উত্তরাধিকারীরূপে ধন্য হয়ে থাকেন। তাঁরা নবী নন, কিন্তু নবীর উত্তরাধিকারী বা যথার্থ প্রতিনিধি। নবী-রসুলগণ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত ও শরিয়তের বিধানের প্রবক্তা, ওলীআল্লাহ্গণ তা নন। কারণ তাঁরা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ও শরিয়তের বিধানের প্রবক্তা কোনোটাই নন। রসুল স. তাই বলেছেন, নবুয়ত ও রেসালতের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে আমার নিকটে এসে। সুতরাং আমার পরে আর কোনো নবী নেই। শায়েখ মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী আরো লিখেছেন, নবী-রসুলগণই

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্র সরাসরি নৈকট্যভাজন। তাঁদের সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে, আ'ইনাই ইয়াশরাবু বিহাল মুক্বাররাবুন (এটা একটি প্রস্রবণ, যা থেকে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে (সুরা মুতাফ্ফিফীন)। আমি বলি, 'মুকার্‌রবীন' বলে পরোক্ষ অর্থে ওলীআল্লাহ্গণকে বুঝানো হয়ে থাকে। কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁরাও আল্লাহ্র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হন ইলহামের মাধ্যমে। আমি সুরা নিসা ও সুরা ওয়াকিয়ার তাফসীরে এ ধরনের সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তাঁদের ইলহামকে রসুল স. বলেছেন তাহদিছ্। জননী আয়েশা ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইমাম আহমদ, বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও আবু নাঈম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে কেউ কেউ ছিলো মুহাদ্দাছ (কথোপকথনকারী)। আমার উম্মতের মধ্যেও কেউ কেউ সেরকম হবে, যেমন ওমর।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, অতীতের কোনো কোনো ইসরাইল বংশভূত সাধুপুরুষের সঙ্গে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কথা বলা হতো, কিন্তু তাঁরা নবী ছিলেন না। আমার উম্মতের মধ্যে যদি কেউ এরূপ হয়, তবে সে হবে ওমর। তিনি স. আরো বলেছেন, আমার পরে যদি কেউ নবী হতো, তবে সে হতো ওমর ইবনে খাত্তাব। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান ও হাকেম, হজরত উকবা ইবনে আমের থেকে, তিবরানী হজরত আসমা ইবনে মালেক ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এবং ইবনে আসাকের হজরত ইবনে ওমর থেকে।

শায়েখ শো'য়রাবী তাঁর এক গ্রন্থে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, ইলহাম কি কোনো মাধ্যম ব্যতীত হতে পারে? এরপর নিজেই তার উত্তরে বলেছেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্তগণ অদৃশ্য যোগাযোগের মাধ্যমে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইলহাম লাভ করেন। এই যোগাযোগ সম্পর্কে ফেরেশতারাও অবগত নয়। স্বাভাবিকভাবে মানুষ এই অদৃশ্য যোগসূত্রকে অস্বীকার করে থাকে। তাই হজরত খিজিরের এ ধরনের অদৃশ্য জ্ঞানসূত্রকে তাৎক্ষণিকভাবে অস্বীকার করে বসেছিলেন হজরত মুসা।

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, নবী-রসুলগণ ফেরেশতাদেরকে দেখতে পান স্বচক্ষে। আর নবী-রসুল যারা নন, তাঁরা ফেরেশতাদেরকে দেখেন না বটে, কিন্তু অনুভব করতে পারেন তাদের প্রভাব ও উপস্থিতি। আবার ফেরেশতাদের মাধ্যমেও কখনো কখনো ইলহাম হয়। আবার কখনো কখনো ইলহাম হয় তাদের মাধ্যম ছাড়া, সরাসরি। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সরাসরি প্রক্ষিপ্ত এধরনের ইলহামই সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ। এ ধরনের ইলহাম নবী-রসুলগণও পেয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের ইলহাম ওহীর পর্যায়ভূত, কিন্তু

www.eelm.weebly.com

ওলীআল্লাহ্গণের ইলহাম কেবলই ইলহাম, ওহীর পর্যায়ভূত তা কখনোই নয়। শায়েখ আরো বলেছেন, আবুল মাওয়াহিব শাযালী বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি বলে, আমার হৃদয় আমার প্রভুপালকের পক্ষ থেকে আমার সঙ্গে কথা বলেছে, তাহলে ওই ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা বৈধ নয়। কেননা তার একথার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, ইলহামের মাধ্যমে আমার অন্তর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কথা বলেছে। এ ধরনের ইলহামও ওহীর মতো মর্যাদাসম্পন্ন এবং সর্বসাধারণের জন্য অনুসরণীয় নয়। আবার কেউ যদি বলে, আমার প্রভুপালক আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, যেমন তিনি কথা বলেছিলেন হজরত মুসার সঙ্গে— তবে তা হবে প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

আমি বলি, কখনো কখনো ওলীগণের চোখেও ফেরেশতারা দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন হজরত মরিয়ম হজরত জিবরাইলকে দেখেছিলেন এবং সাহাবীগণ ফেরেশতাদেরকে দেখেছিলেন বদর যুদ্ধের সময়।

'মা ইউহা' (অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ) কথাটির অর্থ হতে পারে দু'রকম। একটি হচ্ছে ওই ইলহাম, যা বিবৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ওই ইলহাম, যা বুদ্ধি ও বোধের অতীত। শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এই দুই অর্থেই।

এর পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'এইমর্মে যে, তুমি মুসাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখো, অতঃপর তা নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, যাতে দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেয়, তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু নিয়ে যাবে।'

'ফাল্ইউলক্বিহী' (তাকে ঠেলে দিবে) কথাটি এখানে নির্দেশসূচক। কিন্তু এখানে শব্দটি বিধেয়রূপে প্রয়োগিত। অর্থাৎ দরিয়া তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটি এখানে নির্দেশসূচকরূপেই ব্যবহৃত। অর্থাৎ আল্লাহ্ দরিয়াকে এইমর্মে হুকুম দিয়েছেন যে, সে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তীরে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, দরিয়া বা নদী তো বিবেকসম্পন্ন নয়। সুতরাং তা আল্লাহ্র নির্দেশ কার্যকর করবে কীভাবে? কিন্তু এখানকার নির্দেশটি হচ্ছে 'কুন' বা 'হও' নির্দেশের আওতাভূত। সুতরাং এই আমল বা নির্দেশ প্রতিপালন করার জন্য বিবেকসম্পন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক নয়। বায়যাবী লিখেছেন, সিন্দুকটিকে কিনারায় পৌঁছে দেয়ার নির্দেশটি নদীর উপর ছিলো অবশ্যপালনীয়। কেননা আল্লাহ্ তাকে তখন দিয়েছিলেন ভালোমন্দ বুঝবার ক্ষমতা। তাই সে বুঝেছিলো, এ নির্দেশপালন তার জন্য অত্যাবশ্যক।

সত্যাশ্রয়ী সুফী সাধকগণ বলেন, জড় বস্তু আমাদের দৃষ্টিতে বুদ্ধি-বিবেকহীন। তাই আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। তারাও আমাদের কথা বুঝতে পারে না। কিন্তু তারা আল্লাহ্র নির্দেশাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত ও সতত অনুগত। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে সরাসরি নির্দেশ দিতে পারেন। কোরআন মজীদে এরকম দৃষ্টান্ত

www.eelm.weebly.com

রয়েছে অনেক। যেমন ১. 'এবং মৃত্তিকা তার আপন প্রভুপালয়িতার নির্দেশ মান্য করেছে এবং এটা ছিলো তার জন্য অত্যাবশ্যক'। ২. (আকাশ ও পৃথিবী) বললো, 'আমরা অনুগত হয়ে আগমন করলাম'। রসুল স. বলেছেন, এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডেকে বলে, তোমার উপর দিয়ে এমন কোনো লোক কি অতিক্রম করেছে, যে আল্লাহ্র জিকির করে। আল্লামা রুমী বলেছেনঃ

খাক ও বাদ আব আতশ বান্দাহ্ আনদ
পেশে তো মুরদাহ্ ওয়া বরহক জিন্দাহ্ আনদ

অর্থঃ আগুন পানি মাটি বাতাস আল্লাহ্র বান্দা, তোমার কাছে তারা নিষ্প্রাণ হলেও আল্লাহ্র কাছে জীবিত।

'আমার শত্রু ও তার শত্রু'— একথা বলে বুঝানো হয়েছে, ফেরাউন আল্লাহ্র শত্রু এবং হজরত মুসা আ. এরও শত্রু। তবে একথা ঠিক যে, যখন হজরত মুসাকে সিন্দুকে করে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং যতদিন পর্যন্ত হজরত মুসা ফেরাউনের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, ততদিন পর্যন্ত ফেরাউন তাঁর শত্রু ছিলো না। তাই এখানে 'শত্রু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দু'বার। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— ফেরাউন যেহেতু মুশরিক, তাই সে আল্লাহ্র শত্রু এবং যেহেতু পরবর্তীতে সে হজরত মুসার প্রতিপক্ষ হবে, তাই সে হজরত মুসার ভবিষ্যতের শত্রু। এভাবে দু'বার 'শত্রু' শব্দটি উল্লেখ না করা হলে বর্তমান ও ভবিষ্যত সব একাকার হয়ে যেতো এবং বক্তব্যটিও যথাযথ হতো না। এরকমও হতে পারে যে, ফেরাউন যে সত্য ধর্মের নিশ্চিত শত্রু, এ কথাটিকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্য এখানে পুনঃ পুনঃ 'শত্রু' কথাটি উল্লেখ হয়েছে। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে এরকম বক্তব্যের মাধ্যমে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। কথাটিকে আবার এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়— আগে থেকেই সে আল্লাহ্র ও হজরত মুসার শত্রু ছিলো। আল্লাহ্র শত্রু ছিলো এ কারণে যে, সে ছিলো অংশীবাদী। আর হজরত মুসার শত্রু ছিলো এ কারণে যে, জ্যোতিষীদের কথা শুনে সে হজরত মুসাকে হত্যা করার জন্য আগে থেকেই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলো। 'বনী ইসরাইল বংশদ্ভূত একজন হবে আপনার ও আপনার সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ'— জ্যোতিষীদের একথায় বিশ্বাস করে সে হুকুম জারী করেছিলো, বনী ইসরাইলদের সকল নবজাতককে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরক্ষণেই হত্যা করে ফেলতে হবে। রাজকর্মচারীরা তার এই হুকুম বাস্তবায়নও করেছিলো। বনী ইসরাইলের অসংখ্য শিশু সন্তানকে হত্যা করেছিলো তারা। কিন্তু হজরত মুসাকে চিনতে না পারার কারণে তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি। যদি চিনতে পারতো তবে অবশ্যই তারা তাঁকে হত্যা করতো। সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো যে, ফেরাউন আগে থেকেই ছিলো হজরত মুসার দুশমন।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য বাক্যে চারটি স্থানে উল্লেখিত হয়েছে কর্মপদীয় সর্বনাম এবং পাঁচটি স্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে সম্বন্ধপদীয় সর্বনাম। এই সর্বনামগুলো হজরত মুসার সঙ্গে সম্পর্কিত। এরকম হতে পারে যে, এখানকার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্বনামটি (তা, যাতে, তাকে) সর্বনামত্রয় সম্পর্কিত হয়েছে 'সিন্দুক' এর সঙ্গে। কিন্তু একথা মেনে নিলে বক্তব্যটি হয়ে পড়ে বাধাগ্রস্ত ও ধারাক্রমচ্ছিন্ন। নীল দরিয়ায় যাকে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং যাকে দরিয়ার ঢেউ তীরে ঠেলে দিয়েছিলো, তাতো সিন্দুকই ছিলো। কিন্তু ওই সিন্দুকের মধ্যে ছিলেন হজরত মুসা। সুতরাং এখানকার সর্বনামগুলো সিন্দুকের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হয়ে সম্পৃক্ত হবে হজরত মুসার সঙ্গে এবং উদ্ধৃত বক্তব্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— মুসাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখো, তারপর মুসাকে বহনকারী ওই সিন্দুক নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, যাতে দরিয়ার ঢেউ হজরত মুসাকে বহনকারী সিন্দুকটিকে তটভূমি পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যায়, তখন সিন্দুকটি খুলে তার মধ্য থেকে নবজাতক মুসাকে নিয়ে যাবে ফেরাউন। সে আমি ও মুসা— দু'জনেরই শত্রু।

বাগবী লিখেছেন, নবীমাতা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলহাম পেয়ে একটি সিন্দুক জোগাড় করলেন এবং ওই সিন্দুকে ধুনাতুলা বিছিয়ে তার উপর শুইয়ে দিলেন প্রাণপ্রিয় আত্মজকে। তারপর সিন্দুকের ঝাঁপ বন্ধ করে সিন্দুকটি ভাসিয়ে দিলেন নীল নদের পানিতে। সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে চললো। নদী থেকে একটি খাল খনন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো ফেরাউনের রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে। ভাসতে ভাসতে সিন্দুকটি ওই খাল বেয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে ঠেকলো রাজপ্রাসাদের ঘাটে। পরিচারক-পরিচারিকাপরিবেষ্টিত হয়ে তখন ওই ঘাটে উপবিষ্ট ছিলেন সম্রাজ্ঞী আছিয়া। ঘাটে লেগে থাকা সিন্দুকটির প্রতি প্রথম দৃষ্টি পতিত হলো তাঁর। পরিচারক-পরিচারিকাদেরকে নির্দেশ দিলেন সিন্দুকটি তুলে আনো। তারা সিন্দুকটি তুলে এনে স্থাপন করলো সম্রাজ্ঞী আছিয়ার সামনে। সিন্দুকটির ঝাঁপ খোলা হতেই তিনি দেখলেন, অভ্যন্তরে শায়িত রয়েছে অপরূপ এক শিশু। শিশুটিকে দেখেই তিনি বিমোহিত হয়ে গেলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা শিশুটির জন্য এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিলেন সম্রাজ্ঞীর অন্তরে।

এরপরে বলা হয়েছে— 'আমি আমার নিকট থেকে মানুষের মনে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চারিত করেছিলাম।' এ কথার অর্থ— আমি মানুষের মনে তোমার জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম প্রেম। অথবা— আমার প্রেম-ভালোবাসা আমি ঢেলে দিয়েছিলাম তোমার উপর। তাই মানুষও তোমাকে দেখলে না ভালোবেসে পারতো না। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, সৃষ্টিকুলের দৃষ্টিতেও তোমাকে করেছি

www.eelm.weebly.com

প্রিয়ভাজন। ইকরামা বলেছেন, শিশু মুসাকে যে দেখতো, সে-ই তাঁকে ভালোবাসতে বাধ্য হতো। কাতাদা বলেছেন, হজরত মুসার আঁখিযুগল ছিলো বিস্ময়কর সৌন্দর্যের আকর। তাই যে তাঁকে দেখতো, সে তাঁকে ভালো না বেসে পারতো না।

আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে— আমি আমার পক্ষ থেকে ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম তোমার হৃদয়ে। সে ভালোবাসা ক্রমশঃ হলো প্রবল, প্রবলতর। তাই তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্র অন্যান্য মানুষও হয়ে গেলো তোমার প্রেমিক।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেছেন, হজরত মুসা কলিমুল্লাহ্‌র মাবদায়ে তায়্যুন (সূচনাস্থল) ছিলো প্রেমিকত্বের (মোহেব্বিয়াতের) মূল কেন্দ্র। তাই তিনি সকল প্রেমিকের (মোহেব্বের) নেতা। আর শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর মাবদায়ে তায়্যুন ছিলো মাহবুবিয়াতের (প্রেমাস্পদত্বের) মূল কেন্দ্র। তাই তিনি প্রেমাস্পদগণের (মাহবুবগণের) অধিনায়ক।

সুফীসাধকগণের অন্তর্দৃষ্টিতে মহব্বতের একটি বৃত্ত ও ওই বৃত্তের কেন্দ্র পরিদৃষ্ট হয়। আরো পরিদৃশ্যমান হয় যে, ওই কেন্দ্রেরও রয়েছে আরেকটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কেন্দ্র। ওই বৃত্তের বিস্তৃতি হচ্ছে খুল্লাতের (বন্ধুত্বের) মাকাম। ওই মাকাম হজরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্‌র মাবদায়ে তায়্যুন। আর কেন্দ্রটি মাবদায়ে তায়্যুন হজরত মুসা কলিমুল্লাহ্‌র। আর কেন্দ্রের কেন্দ্রটি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর। এভাবে সূচিত হয়েছে মহব্বতের তিনটি পৃথক উৎসারণ— মাহবুবিয়াত, মোহেব্বিয়াত, খুল্লাত (প্রেমাস্পদত্ব, প্রেমিকত্ব, বন্ধুত্ব)। এভাবেই রসুল স. হয়েছেন মহাপ্রেমাস্পদ, হজরত মুসা হয়েছেন মহাপ্রেমিক এবং হজরত ইব্রাহিম হয়েছেন মহাবন্ধু। রসুল স. এর উম্মতের মধ্যে অতি নগণ্যসংখ্যক ব্যক্তি প্রেমের উত্তরাধিকার সূত্রে উপনীত হয়েছেন প্রেমাস্পদত্বের স্তরে। সুতরাং তাঁরাও প্রেমাস্পদরূপে আখ্যায়িত। আমি বলি, নিঃসন্দেহে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি ছিলেন এই দুর্লভ মর্যাদার অধিকারী। অর্থাৎ প্রেমাধিকারের সূত্রে তিনিও আল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদ।

শেষে বলা হয়েছে— 'যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।' একথার অর্থ— শত্রুমিত্র সকলেই আমার বান্দা। যাকে যেভাবে খুশী আমি আমার অভিপ্রায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে নির্বাচন করি। শত্রুকুলের মাধ্যমে নিশ্চিত করি আমার প্রিয়ভাজনের সংরক্ষণ ও প্রতিপালন। এভাবে আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আমি মুসাকে ফেরাউনের গৃহে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করলাম। সুতরাং শত্রুর ঘরে আমার মিত্রের প্রতিপালন অবশ্যই হবে।

www.eelm.weebly.com

اِذْ تَمْشِيْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ؕ فَرَجَعْنٰكَ
اِلٰٓى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ؕ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ
الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ۬ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ۬ ثُمَّ جِئْتَ
عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ○ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ○ اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ
بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ○ اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ○ فَقُوْلَا
لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ○ قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ
يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ○ قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى ○
فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۬ۙ وَلَا
تُعَذِّبْهُمْ ؕ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ؕ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ
الْهُدٰى ○ اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ○

❑ যখন তোমার ভগ্নি আসিয়া বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে বলিয়া দিব কে এই শিশুর ভার লইবে? তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরাইয়া দিলাম যাহাতে তাহার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না পায়; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হইতে মুক্তি দিই, আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করিয়াছি। অতঃপর তুমি কয়েক বৎসর মাদ্‌য়ানবাসীদিগের মধ্যে ছিলে, হে মূসা! ইহার পরে তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইলে।

❑ এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি।

❑ তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ যাত্রা কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করিও না,

❑ তোমরা দুইজন ফিরাউনের নিকট যাও, সে সীমালংঘন করিয়াছে।

❑ তোমরা তাহার সহিত নম্র কথা বলিবে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা ভয় করিবে।

www.eelm.weebly.com

❑ তাহারা বলিল, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক' আমরা আশংকা করি সে আমাদিগকে যাওয়া মাত্রই শাস্তি দিবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমা লংঘন করিবে।'

❑ তিনি বলিলেন 'তোমরা ভয় করিও না, আমি তো তোমাদিগের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।'

❑ সুতরাং তোমরা তাহার নিকট যাও এবং বল, 'আমরা তোমার প্রতিপালকের রসূল, সুতরাং আমাদিগের সহিত বনি ইস্রাঈলকে যাইতে দাও এবং তাহাদিগকে কষ্ট দিও না, আমরা তো আনিয়াছি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে নিদর্শন এবং যাহারা সৎপথ অনুসরণ করে তাহাদিগের প্রতি শান্তি।

❑ আমাদিগের প্রতি ওহি প্রেরণ করা হইয়াছে, যে-ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয় শাস্তি তাহার জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যখন তোমার ভগ্নি এসে বললো, আমি কি তোমাদেরকে বলে দিবো, কে এই শিশুর ভার নিবে? তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না পায়।' ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে— সম্রাজ্ঞী কর্তৃক উদ্ধারকৃত নবজাতক মুসাকে দেখে ফেরাউনও মুগ্ধ হয়ে গেলো। সে তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিলো, এই শিশুর দুগ্ধদাত্রী নিযুক্ত করা হোক। রাজকর্মচারীরা নির্দেশটি প্রচার করলো। আগ্রহী মহিলারা জড় হলো নির্দিষ্ট স্থানে। হজরত মুসার বোন দূর থেকে লক্ষ্য রাখছিলেন সিন্দুকটির গতিবিধির দিকে। তিনিও দুগ্ধদানকর্মে আগ্রহী মহিলাদের সমাবেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মহিলারা একে একে অনেকেই শিশু মুসাকে দুধ পান করানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু শিশু মুসা কারোরই দুধ পান করলেন না। তাঁর বোন তখন বললেন, দুগ্ধদাত্রী হিসেবে এক মহিলার সন্ধান আমি দিতে পারি। মনে হয় শিশুটির প্রতিপালনের ভার গ্রহণের জন্য ওই মহিলাটিই সর্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। রাজকর্মচারীরা তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়ে ডেকে আনলেন তাঁর মাকে। মায়ের কোলে গিয়েই শিশু মুসা দুধ পান করতে শুরু করলেন। এই দৃশ্য দেখে সকলেই আশ্বস্ত হলো। সেই থেকে আপন জননীর ক্রোড়ে রাজ ব্যবস্থায় বেড়ে উঠতে লাগলেন হজরত মুসা। জননীও তাঁর প্রাণাধিক পুত্রকে এভাবে নিজের কাছে পেয়ে স্বস্তি ফিরে পেলেন। জুড়িয়ে গেলো তাঁর চোখ। এ সকল কথাই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে 'ওয়ালা তাহ্যান্' অর্থ সে যেনো দুঃখ না পায়। অর্থাৎ হজরত মুসার জননী যেনো তাঁর বুকের মানিককে হারিয়ে শোকাকুলা না হন, তাই আমি এভাবে আমার বিশেষ প্রজ্ঞাময়তার নিদর্শনরূপে আপন মায়ের বুকে ফিরিয়ে দিলাম তার শিশু পুত্রকে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে মনোপীড়া থেকে মুক্তি দেই।' এই ঘটনাটি ঘটেছিলো আরো পরে। হজরত মুসা তখন কিশোর অথবা যুবক। একদিন তিনি দেখলেন, এক কিবতী এক বনী ইসরাইলকে অন্যায়ভাবে প্রহার করছে। এই অন্যায় তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি অত্যাচারী কিবতীকে ঘুষি মেরে বসলেন। তাঁর এক ঘুষি খেয়েই কিবতীটি মরে গেলো। হজরত মুসা তাকে হত্যা করতে চাননি। অত্যাচার থেকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু হঠাৎ তাকে এভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখে তিনি আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হলেন। আল্লাহ্ তাঁর এই অনবধানতা ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু ফেরাউনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণের দুশ্চিন্তাও তখন তাঁকে পেয়ে বসেছিলো। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ মিসর ছেড়ে চলে গেলেন মাদায়েনের দিকে, ফেরাউনের সাম্রাজ্যের বাইরে। এই ঘটনাটিই আলোচ্য বক্তব্যে স্থান পেয়েছে এভাবে— এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে মনোপীড়া থেকে মুক্তি দেই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই সময় হজরত মুসার বয়স ছিলো বারো বছর। হজরত কা'ব আহবারও এরকম বলেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া ফাতান্নাকা ফুতূনা' (আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি)। এখানে 'ফুতূনুন' কথাটি এসেছে 'কুউ'দুন্' এর শব্দরূপে। এটি একটি মূল শব্দ এবং শব্দটি বহুবচন। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির মর্মার্থ করেছেন— আমি তোমাকে খুব-ই পরীক্ষা করেছি। জুহাক বলেছেন, আমি তোমাকে যাচাই করেছি খুব। 'ফুতূনুন' শব্দটিকে শব্দমূল এবং কর্মপদ মেনে নিলে কথাটির মর্মার্থ এরকমই হয়। 'আমি তোমাকে বারংবার পরীক্ষা করেছি'— কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে। এরকম অর্থ করলে 'ফুতূনুন' কে বলতে হয় 'ফাতানুন' (পরীক্ষা)। অথবা শব্দটিকে ধরতে হয় 'ফিত্‌নাতুন' এর বহুবচন। আর এমতোক্ষেত্রে শব্দটির শেষ অক্ষর 'তা' কে করে নিতে হবে দৃষ্টিগ্রাহ্য। যেমন, 'হাজ্‌রাতুন' এর বহুবচন 'হাজুরুন' এবং 'বাদরাতুন' এর বহুবচন 'বুদুরুন'।

মুজাহিদ কথাটির অর্থ করেছেন— আমি তাঁকে খাঁটি বানিয়ে নিয়েছি। অর্থাৎ বহু বিপদ-মুসিবতের মাধ্যমে করেছি পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'ফুতূনুন' শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে হজরত মুসার বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টের কথা। অবশেষে আল্লাহ্ তাঁর ওই দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটিয়েছিলেন। তাঁর ওই দুঃখ-কষ্টসমূহ ছিলো এরকম— ১. যে বছর বনী ইসরাইলের সকল নবজাতককে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সেই

www.eelm.weebly.com

বছরেই। ২. তাঁকে সিন্দুকে পুরে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিলো অনিশ্চিতির দিকে। ৩. আপন জননী ছাড়া তিনি অন্য কোনো দুগ্ধদাত্রীর দুধ পান করতে চাননি। ৪. ফেরাউন তাঁকে কোলে নিলে তিনি তার দাড়ি ধরে সজোরে টান দিয়েছিলেন। ফলে ফেরাউন তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলো। কিন্তু সে নিরস্ত হয়েছিলো সম্রাজ্ঞী আছিয়ার সুপারিশে আগুন ও মনিমুক্তা ভর্তি দু'টো পাত্রের পরীক্ষার মাধ্যমে। ৫.অত্যাচারী কিবতীকে অনিচ্ছাকৃত হত্যার পর তাঁকে দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছিলো সুদূর মাদায়েনে। আমি বলি, আগুনে পুড়িয়ে স্বর্ণকে যেমন বিশুদ্ধ করা হয়, তেমনি করে বিভিন্ন বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে বিশুদ্ধ করে নিয়েছিলেন। স্বজন-বন্ধন ছিন্ন করে কপর্দকহীনভাবে দূর দেশে চলে যাওয়া, সারা পথ ধরে বন্দী হওয়ার ভয়-ভীতি, অচেনা দেশে গিয়ে প্রথমে শ্রমিকরূপে জীবন-যাপন— এ ধরনের অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিলো তাঁকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তুমি কয়েক বৎসর মাদিয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে'। একথার অর্থ— মাদিয়ানে গিয়ে তুমি হয়ে গিয়েছিলে পুরো-দস্তুর শ্রমিক। নবী শোয়েবের কন্যাকে পরে তুমি বিবাহ করতে পেরেছিলে বটে, কিন্তু স্ত্রীর নগদ মোহরানা পরিশোধ করতে পারোনি। ফলে শ্বশুরালয়ে তোমাকে বেছে নিতে হয়েছিলো বকরি চরানোর কাজ। এভাবে সেখানে তোমাকে কাটাতে হয়েছিলো সুদীর্ঘ দশটি বছর। ওয়াহাব বলেছেন, হজরত মুসা হজরত শোয়েবের গৃহে ছিলেন আটাশ বছর। প্রথম দশ বছর শ্রম দিয়ে পরিশোধ করেছিলেন স্ত্রীর মোহরানা। সেখানে থাকতেই তিনি হয়েছিলেন সন্তান-সন্ততির জনক।

এরপর বলা হয়েছে— 'এরপরে তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে, হে মুসা'! একথার অর্থ— বহু বছর মাদায়েনে বসবাস শেষে মিসরে প্রত্যাবর্তনের পথে আজ এই ঘনঘোর অন্ধকার রজনীতে আমার বিশেষ ইঙ্গিতে ও ইচ্ছায় প্রত্যাদেশ প্রদানের জন্য তুর পাহাড়ের এই পবিত্র উপত্যকায় তোমাকে এভাবে একাকী উপস্থিত করা হলো হে মুসা! মোহাম্মদ বিন কা'ব কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— হে মুসা! নবুয়তের দায়িত্বদানের নির্ধারিত সময়ে পরিণত বয়সে আমার ইশারায় আজ এখানে তুমি উপস্থিত হলে। উল্লেখ্য যে, সাধারণতঃ চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত ব্যক্তিবর্গকে নবুয়তের দায়িত্ব দান করেন। সুতরাং এখানে 'নির্ধারিত সময়ে' কথাটির অর্থ হতে পারে— হজরত মুসার চল্লিশ বছর বয়সে। আবদুর রহমান ইবনে কায়সান এরকমই বলেছেন। অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা 'নির্ধারিত সময়ে' কথাটির অর্থ করেছেন— নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞানে হজরত মুসার নবুয়তপ্রাপ্তির যে

www.eelm.weebly.com

সময় নির্ধারিত ছিলো, সেই সময়ে, চল্লিশ বছর বয়সে। এই অভিমতটি অংশতঃ মোহাম্মদ বিন কা'বের বর্ণনার সহায়ক।

লক্ষণীয় যে, এখানে বক্তব্যের শেষে 'ইয়া মুসা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এমতো সম্বোধন একান্ত অন্তরঙ্গতার পরিচায়ক এবং গভীরতর প্রেমানুভূতির প্রকাশ। রসুল স. বলেছেন, প্রিয়জনের কথাই প্রেমিকের কণ্ঠে বার বার উচ্চারিত হয়। মাসনাদুল ফিরদাউস রচয়িতা বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন জননী আয়েশা থেকে।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি।' একথার অর্থ— হে আমার নবী! এভাবেই আমি বিশেষ প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তোমাকে মনোনীত করে নিয়েছি আমার প্রিয়জন ও বচনবাহকরূপে, যেনো তোমার অন্তর ও বাহির আমি ছাড়া অন্য কারো প্রতি নিবদ্ধ না হয়। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— এভাবেই আমি তোমাকে সমুন্নত চরিত্রের অধিকারী করেছি। করেছি আমার নৈকট্যভাজন এবং আমার বার্তাবহনের উপযুক্ত পাত্র।

এর পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ যাত্রা করো।' একথার অর্থ— হে নবীপ্রবর! তোমার প্রার্থনার ফলে তোমার ভ্রাতা হারুনকেও করলাম আমার নবী ও তোমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। এখন তোমরা দু'জনে তোমাকে প্রদত্ত আমার মোজেজাসমূহ সহকারে সত্যধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মিসরের সম্রাটের দরবারে গমন করো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'নিদর্শন' বলে বুঝানো হয়েছে ওই নয়টি মোজেজার কথা, যেগুলো আল্লাহ্ নবুয়তের প্রমাণরূপে প্রদান করেছিলেন হজরত মুসাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য কোরো না।' 'তানিয়া' অর্থ শৈথিল্য। 'ফাতা' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'দানা' এর ওজনে। উল্লেখ্য, 'তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ যাত্রা করো'— একথায় বুঝানো হয়েছে, হে মুসা তুমি মিসরের দিকে যাত্রা করো, আর ওদিকে হারুনের প্রতিও প্রত্যাদেশ করা হয়েছে— তুমি মুসাকে অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হও। এভাবে নবীভ্রাতৃদ্বয় অগ্রসর হলেন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। হজরত হারুন একদিনের পথ অতিক্রম করতেই দেখতে পেলেন হজরত মুসা এগিয়ে আসছেন। বহুদিন পর এভাবে যখন ভ্রাতৃমিলন ঘটলো, তখন তাঁরা দু'জনেই নবুয়তপ্রাপ্ত। যৌথভাবে তাঁদের স্কন্ধে তখন অর্পিত হয়েছে সত্যধর্ম প্রচারের গুরু দায়িত্ব।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'তোমরা দুজনে ফেরাউনের নিকটে যাও, সে সীমালংঘন করেছে।' পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে 'তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ যাত্রা করো'। আবার আলোচ্য আয়াতেও সেই হুকুমের পুনরাবৃত্তি করা হলো। এতে করে বুঝা যায়, হজরত মুসা বুঝেছিলেন এক জনের পর একজন যেতে হবে ফেরাউনের কাছে। এই প্রথম হুকুম অনুসারে প্রথমে ফেরাউনের নিকটে গিয়েছিলেন হজরত মুসা একাকী। সেকারণেই পরে হুকুম দেয়া হয়েছিলো, এভাবে একজনের পর একজন নয়, একসঙ্গে দু'জনকে যেতে হবে ফেরাউনের কাছে। কারণ সে সীমালংঘন করেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে— একথা বলা যায় না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, প্রথম নির্দেশটি ছিলো সাধারণ। আর পরের নির্দেশটি ছিলো শর্তযুক্ত। শর্তটি হলো, ফেরাউনের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে হবে নম্রভাবে। পরের আয়াত দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয়।

এর পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'তোমরা তার সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলবে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।' একথার অর্থ— হে নবী ভ্রাতৃদ্বয়! তোমরা ফেরাউনকে সত্যের দিকে আহ্বান জানিয়ো নম্র ও কোমল ভাষায়। তোমাদের উত্তম আচরণে সে মুগ্ধ হয়ে যেতেও পারে। যদি সে বুঝতে পারে তোমরা সত্যিসত্যিই সত্য পয়গম্বর, তাহলে সে হয়তো সত্যকে স্বীকার করে নিবে। যদি তা না-ও নেয়, তবে অন্ততঃ ভীত হয়ে পড়বে সে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্তায়ালা সর্বজ্ঞ। তাই ফেরাউন যে সত্যের পথে ফিরে আসবে না, তা তিনি ভালো করেই জানেন। তবুও এখানে 'হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' বলা হয়েছে হজরত মুসা ও হজরত হারূনের জ্ঞানানুসারে। সত্য ধর্মের দাওয়াত দিতে হয় নম্রতার সঙ্গে আশাধারী হয়ে, নৈরাশ্যের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে নয়— এরকম শিক্ষা প্রদান করাই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য। তাই এখানকার বক্তব্যভঙ্গিটি এরকম।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ফাকুলা লাহু কৃওলাল লাইয়েনা' অর্থ— বাক্যালাপের সময় কঠোর ভাষা ব্যবহার কোরো না। ইকরামা ও সুদ্দী বলেছেন, কথাটির অর্থ— সরাসরি তাকে তার নাম ধরে সম্বোধন কোরো না, সম্বোধন কোরো উপাধি ধরে। উল্লেখ্য, ফেরাউনের উপাধি ছিলো আবুল আব্বাস, অথবা আবুল ওয়ালিদ। মুকাতিল বলেছেন, নম্র কথায় দ্বীনের দাওয়াত প্রদানের নির্দেশের দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন— বলো, তোমার কি এ বিষয়ে আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হবে? আর আমি তোমাকে তোমার প্রভুপালকের পথে পরিচালিত করি, যাতে তুমি তাঁকে ভয় করো (সুরা নাযিয়াত)। এছাড়া

www.eelm.weebly.com

নম্রভাবে কথা বলতে বলার অন্য কারণও ছিলো। কড়া কথা বললে প্রথমেই ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে যেতো, নবী ভ্রাতৃদ্বয়ের বক্তব্য বুঝবার চেষ্টা সে একেবারেই করতো না। কঠোরতার প্রতিক্রিয়া কঠোরতাই হয়। নম্রতার প্রতিক্রিয়া হয় নম্র। তাই তাঁদেরকে দেয়া হয়েছিলো নম্র কথা বলার নির্দেশ। কেউ কেউ আবার বলেছেন, ফেরাউন হজরত মুসাকে লালন পালন করেছিলো। তাই এ ব্যাপারে হজরত মুসার উপরে ছিলো তার অধিকার। সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য নির্দেশ হজরত মুসা পালন করেছিলেন এভাবে— তিনি বলেছিলেন, হে সম্রাট! আমরা যে আল্লাহ্‌র নবী, তিনিই সকল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা। আর তিনি মানুষের প্রতি অত্যধিক ক্ষমাপরবশ ও সকলের প্রয়োজন ও প্রার্থনা পূরণকারী। তুমি যদি তাঁকে মেনে নাও, তবে তোমার স্বাস্থ্য ও সাম্রাজ্য হবে পূর্ণরূপে নিরাপদ। মৃত্যু পর্যন্ত কেউ আর তোমাকে রাজক্ষমতা থেকে টলাতে পারবে না। মৃত্যু পর্যন্ত তুমি থাকবে নওজোয়ান। নারী সম্ভোগ ও পানাহারের আস্বাদ থাকবে অটুট। আর মৃত্যুর পর পাবে চিরস্থায়ী সুখের আলয় বেহেশত। হজরত মুসার এরকম জ্ঞানগর্ভ ও কোমল সদুপদেশ শুনে ফেরাউন কিছুটা নরম হয়ে গেলো। কিন্তু তার অভ্যাস ছিলো, তার প্রধান মন্ত্রণাদাতা হামানের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় ছাড়া সে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো না । হামান সেখানে উপস্থিত ছিলো না বলে সে হজরত মুসার কথায় সাড়া দিলো না। কিন্তু প্রত্যাখ্যানসূচক কিছু বললো না। পরে একান্তে হামানকে সে খুলে বললো সব। হামান বললো, মহামান্য সম্রাট! আমি ভাবতাম আপনি প্রকৃতই জ্ঞানী। কিন্তু এখন তো সে পরিচয় আর পাচ্ছি না। আপনাকে সারাদেশের লোক শ্রেষ্ঠ প্রভুপালক বলে মানে। আপনার উপাসনাও করে অকুণ্ঠচিত্তে। আর আপনি তাদের প্রভুপালক হয়ে উপাসনা করতে চান মুসা-হারুনের আল্লাহ্‌র। কেনো? এভাবে প্রভুপালকত্বের সম্মান আপনি পরিত্যাগ করতে যাবেন কোন দুঃখে?

এর পরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমরা আশংকা করি, সে আমাদেরকে যাওয়া মাত্রই শাস্তি দিবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করবে।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'সে আমাদেরকে যাওয়া মাত্রই শাস্তি দিবে' কথাটির অর্থ— সে আমাদের মোজেজা সমূহ প্রকাশের পূর্বেই আমাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। অথবা প্রদান করবে অন্য কোনো গুরুতর শাস্তি। আরবী পরিভাষানুসারে 'ফারাত্বা আলাইহি' অর্থ শাস্তি প্রদানের জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়া। শব্দটির প্রকৃত অর্থ সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। 'ফারিতুন' অর্থ অগ্রগামী।

'অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করবে' কথাটির অর্থ— আমাদের কথা শুনে সে হয়তো হয়ে উঠবে আরো বেশী উদ্ধত ও অবাধ্য। হয়তো বনী ইসরাইলের উপরে বাড়িয়ে দিবে তার অত্যাচারের মাত্রা।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, ভয় কোরো না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।' একথার অর্থ— হে নবী ভ্রাতৃদ্বয়। শংকিত হয়ো না। আমার বিশেষ নিরাপত্তা ও সাহায্য তোমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আর আমি সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা। তোমাদের কোনো কিছুই আমার দর্শন ও শ্রবণ বহির্ভূত নয়। সুতরাং তোমরা নির্ভয়ে সত্যের আহ্বান জানাতে থাকো। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— ফেরাউন ও তোমাদের সকল কার্যকলাপ ও বাক্যালাপ আমি দেখি ও শুনি। কারণ আমি তো সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা। সুতরাং হে নবী ভ্রাতৃদ্বয়! তোমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। যখন যে রকম সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখন সে রকম সাহায্যই তোমরা পাবে। মনে রেখো, আমার পক্ষ থেকে তোমরা সতত সাহায্যপ্রাপ্ত। ফেরাউন তোমাদের কিছুই করতে পারবে না।

এর পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা তার নিকট যাও এবং বলো, আমরা তোমার প্রতিপালকের রসুল, সুতরাং আমাদের সঙ্গে বনী ইসরাইলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না।'

এখানে 'আমরা তোমার প্রতিপালকের রসুল' কথাটির অর্থ— হে মিসরাধিপতি! আমরা দু'জন মিসরবাসী কিবতী ও এখানকার বনী ইসরাইল উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্র রসুল।

'আমাদের সঙ্গে বনী ইসরাইলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না' অর্থ— আমাদের সঙ্গে তাদেরকে চলে যেতে দাও তাদের পিতৃপুরুষের দেশ সিরিয়ায়। মুক্ত করে দাও তাদেরকে প্রায়-বন্দী মানবেতর জীবন থেকে। তোমার উপাসনা করতে তাদেরকে বাধ্য কোরো না। তাদেরকে নিয়োজিত হতে দাও এক আল্লাহ্র আরাধনায়। তাদেরকে আর কষ্ট দিয়ো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা তো এনেছি তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে নিদর্শন।' হজরত মুসা দু'টি নিদর্শন নিয়ে হাজির হয়েছিলেন ফেরাউনের দরবারে— একটি হচ্ছে লাঠির সর্পাকৃতি ধারণ এবং অপরটি শুভ্রোজ্জ্বল হাত। কিন্তু এখানে 'নিদর্শনদ্বয়' না বলে বলা হয়েছে কেবল 'নিদর্শন'। এর কারণ হচ্ছে, নবুয়তের নিদর্শনের কথা প্রকাশ করাই এখানে উদ্দেশ্য। নিদর্শনের সংখ্যা জানানো উদ্দেশ্য নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যারা সৎপথ অনুসরণ করে তাদের প্রতি শান্তি।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ বলছেন, যারা সৎপথের অনুসারী তাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীতে ও আখেরাতে শান্তি— আমার পক্ষ থেকে, আমার ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে এবং আমার জান্নাতের পরিচারক-পরিচারিকাদের পক্ষ থেকে।

শেষোক্ত আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'আমাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, শাস্তি তার জন্য।' এখানে 'আলআ'জাবা' বা শাস্তি অর্থ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের শাস্তি।

www.eelm.weebly.com

'মান কাজ্জাবা'(মিথ্যা আরোপ করে) অর্থ— যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষগণকে। 'তাওয়াল্লা' অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেয়। অর্থাৎ অমান্য করে আল্লাহ্র বিধানাবলীকে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 'আমরা তোমার প্রতিপালকের রসুল'। আর এই আয়াতে বলা হলো 'যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়, শাস্তি তার জন্য।' এতে করে বোঝা যায়, এই কথাটি পূর্ববর্তী আয়াতের উদ্ধৃত কথাটির পরিপূরক। এভাবে বক্তব্য দু'টির মিলিত অর্থ দাঁড়ায়—হে মিসরের নৃপতি! আমরা দু'জন তোমার ও আমাদের প্রভুপালনকর্তার রসুল। আমাদের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করলে ও প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমাদের প্রতি অর্পিত বিধানাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানে তোমার উপরে আপতিত হবে শাস্তি।

সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ○ قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ
ثُمَّ هَدٰى ○ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ○ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ
كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ○ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ
سَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۗ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى
كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ○

❒ ফিরাউন বলিল 'হে মূসা! কে তোমাদিগের প্রতিপালক?

❒ মূসা বলিল, 'আমাদিগের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাহার যোগ্য আকৃতি দান করিয়াছেন ও তাহার প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়াছেন।'

❒ ফিরাউন বলিল, 'তাহা হইলে অতীত যুগের লোকদিগের অবস্থা কী?'

❒ মূসা বলিল, 'ইহার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট এক কিতাবে আছে; আমার প্রতিপালক ভুল করেন না ও তিনি ভুলিয়াও যান না।

❒ 'যিনি তোমাদিগের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বিছানা এবং উহাতে করিয়া দিয়াছেন তোমাদিগের চলিবার পথ, তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন এবং উহা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন।'

❒ তোমরা আহার কর ও তোমাদিগের আনয়াম চরাও; অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদিগের জন্য।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে—'ফেরাউন বললো, হে মুসা! কে তোমাদের প্রতিপালক?' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র নির্দেশানুসারে নবী ভ্রাতৃদ্বয় উপস্থিত হলেন ফেরাউনের দরবারে এবং যেভাবে তাঁরা আদিষ্ট হয়েছিলেন, সেভাবে উপস্থাপন করলেন তাঁদের বক্তব্য। তাঁদের কথা শুনে ফেরাউন দৃষ্টিনিবদ্ধ করলো হজরত মুসার প্রতি। কারণ তিনি তার গৃহেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তাছাড়া ফেরাউন একথা বুঝতে পেরেছিলো যে, দু'জনেই নবুয়তের দাবিদার হলেও হজরত মুসা হচ্ছেন প্রধান মুখপাত্র। আর তাঁর সঙ্গী ও ভ্রাতা হচ্ছেন তাঁর উপদেষ্টা বা মন্ত্রণাদাতা। 'প্রতিপালকের রসুল'— একথাটি তাকে বিস্মিত করেছিলো। তাই সে বললো, হে মুসা! তোমাদের প্রতিপালক আবার কে?

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন ও তার প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন।' একথার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, যে একক ও অংশীবিহীন স্রষ্টা, সকল সৃষ্টির যথাযথ অবয়ব সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেই পবিত্রাতিপবিত্র সত্তাই আমাদের প্রভুপালনকর্তা।

হাসান ও কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন উত্তম উপাদান দ্বারা। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে প্রদর্শন করেছেন কল্যাণের পথ। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে দান করেছেন যথাযথ আকৃতি। তাই সৃষ্ট বস্তুসমূহ তাদের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যসহ বিদ্যমান। তাই মানুষ অন্যান্য প্রাণীর আকৃতিবিশিষ্ট নয়। অন্যান্য প্রাণী ও বস্তুও একে অপরের মতো নয়।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে 'খাল্‌ক্ব' শব্দটির মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকুলকে পুরুষ ও নারী এই দু'ভাবে বিভক্ত করে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে স্বাভাবিক প্রজনন ক্রিয়ার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে চলেছে আল্লাহ্‌র পৃথক পৃথক সৃষ্টি— মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি।

কোনো কোনো আলেম মনে করেন, আলোচ্য আয়াতের 'আকৃতিদান' এবং 'প্রকৃতি নির্ধারণ'— এই দু'টি কর্মকে অগ্র-পশ্চাৎরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকুলকে ওই সকল বস্তু দান করেছেন, যা তাদের প্রয়োজন ছিলো। আর নির্ধারণ করেছেন ওই সকল বস্তু, যা তাদের প্রয়োজন হবে। উদ্দিষ্ট বস্তুলাভের উপায়ও তিনি তাদেরকে বলে দিয়েছেন, যেনো সেই উপায় অবলম্বন করে তারা পৌঁছে যেতে পারে তাদের পূর্ণতায়। বায়যাবী লিখেছেন, ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। ব্যাখ্যাটি জড়-অজড় সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বশক্তিধর, একক স্রষ্টা, অসমকক্ষ দাতা, চিরঅমুখাপেক্ষী এবং সৃষ্টিকুল যে তাদের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব রক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী— সে কথা অপ্রচ্ছন্নভাবে আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে। ফেরাউন একথা বুঝতে পারলো। তাই সে ঘুরিয়ে নিলো তার বক্তব্যের মোড়।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী?' একথার অর্থ— ফেরাউন বললো, বুঝলাম। তোমাদের কথাই যদি ঠিক হয়, তাহলে বিগত যুগের লোকদের কি উপায় হবে? তারা তো তোমাদের প্রভুপালনকর্তাকে স্বীকার করেনি। মূর্তিপূজাকেই তারা সত্য বলে জেনেছে। কী হবে তাহলে তাদের পরিণতি?

এর পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট এক কিতাবে আছে; আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং তিনি বিস্মৃতও হন না।' একথার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, আদি ও অন্তের সকলের ও সকল কিছুর জ্ঞান আমার পালনকর্তা লওহে মাহ্ফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আর তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের কোনো কিছুর ভুল ও বিস্মরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

এখানে 'দ্বলাল' অর্থ অবস্থানের বিস্মৃতি। আর 'নিস্ইয়ান' অর্থ অস্তিত্বের বিস্মরণ এখানে শব্দ দু'টো ব্যবহারের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কোনো কিছুর অস্তিত্ব ও তার অবস্থিতি সম্পর্কে বিস্মৃত হওয়া আল্লাহ্র পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এরকম বিস্মরণ থেকে তিনি সতত পবিত্র।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'ভুল করেন না' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্র নিকটে তাঁর কোনো সৃষ্টিই অদৃশ্য নয় এবং তিনিও তাঁর কোনো সৃষ্টি থেকে জ্ঞানগত দিক থেকে অনুপস্থিত নন। আর 'ভুলেও যান না' কথাটির অর্থ— সৃষ্টিকুলের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, আদি-অন্ত কোনো কিছু তিনি ভুলে যান না। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— তিনি প্রত্যেকের কর্মকাণ্ডসমূহ সম্পর্কে যেহেতু উত্তমরূপে অবগত, তাই তিনি যথাসময়ে প্রত্যেককে দান করবেন যথাবিনিময়। উত্তমকর্মের বিনিময়ে স্বস্তি এবং মন্দকর্মের বিনিময়ে শাস্তি।

এর পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলবার পথ।

'সুলূক' অর্থ পথ পরিক্রমণ। লাজেম (অকর্মক) ও মুতাআদ্দী (সকর্মক) উভয়রূপে ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয়। এক আয়াতে এসেছে— 'লিতাস্লুকু মিনহা সুবুলান ফিজাজা' (যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পারো প্রশস্ত পথে)। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'সালাকাল মাকানা সুলুকা' অর্থ— সে এ স্থানে চলেছে এবং 'সালাকাহু গইরুহু' অর্থ— অন্য কেউ তাকে চালিয়েছে। প্রথমটি লাজেমের উদাহরণ এবং দ্বিতীয়টি উদাহরণ মুতাআদ্দীর। আলোচ্য আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে মুতাআদ্দীরূপে । 'সুবুলান' (চলার পথ) শব্দটি এখানে জরফ (ক্রিয়ার আধার)। কিন্তু এখানে শব্দটি পরোক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়েছে মাফউলে বিহী

www.eelm.weebly.com

(সহকর্মকারক) রূপে। যেমন পরোক্ষার্থে প্রবহমানতার সম্পর্ক করা হয় নদী বা স্রোতস্বিনীর সঙ্গে। বলা হয়—নদী প্রবাহিত হচ্ছে। অথচ নদী কখনো প্রবাহিত হয় না, প্রবাহিত হয় নদীর পানি। নদী তো আসলে পানির ধারক, যার মধ্য দিয়ে স্রোত বয়ে চলে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্ সমভূমিতে ও উচ্চভূমিতে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পথ, যে পথ দিয়ে তোমরা চলো। এভাবে গমন করো পৃথিবীর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সুগম করে দিয়েছেন পৃথিবীর পথ। আমি বলি, উক্তিটি যথার্থ।

বাগবী লিখেছেন, 'সালাকা' অর্থ এক বস্তুকে অন্য বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়া, চালিয়ে দেয়া। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ জমিনের উপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছেন পথ, যে পথে তোমরা পরিভ্রমণ করো। যেমন এক আয়াতে এসেছে—'মা সালাকাকুম ফী সাক্বার (কোন বস্তু তোমাদেরকে দোজখে প্রবেশ করিয়েছে)।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন।' এখানে 'আযওয়াজান' অর্থ বিভিন্ন প্রকারের, বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন স্তরের জুটি। 'মাআন' অর্থ বৃষ্টি। 'শাত্তা' অর্থ বিচিত্র। শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'শাতীতুন'। যেমন মারীদুন শব্দটির বহুবচন 'মারাদা'। বহুধা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ। সেগুলোর উপকারিতাও বহুবিধ। কোনো কোনোটি উপকারে লাগে মানুষের। কোনো কোনোটি পশুর।

এর পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'তোমরা আহার করো ও তোমাদের পশুপাল চরাও।' এখানকার 'আরআ'ও' (চরাও) শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'রাআ' থেকে। শব্দটি লাজেম ও মুতাআদ্দী উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন— চরো ও চরাও। আরববাসীরা বলে— 'রআইতুল ক্বওম'(আমি আমার গোত্রের নিরাপত্তা বিধান করেছি)। আরো বলে, 'ফারাআ'ত'(অতঃপর তারা নিরাপদ হয়ে গিয়েছে)। এখানে শব্দটির মাধ্যমে পশুপাল চরানোর কথাই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে— চরাও। বাক্যটি এখানে নির্দেশসূচক। অর্থাৎ পশুপালের গোশত আহার করা এবং তাদেরকে চরানো— কোনোটাই তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ্র নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, আগের আয়াতের 'আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন' পর্যন্ত ছিলো হজরত মুসার উক্তি। তারপর থেকে আলোচ্য আয়াতের শেষ পর্যন্ত উল্লেখিত বক্তব্যটি আল্লাহ্র। আল্লাহ্ এই বক্তব্যটি উপস্থাপন করেছেন মক্কাবাসীদেরকে লক্ষ্য করে। কিন্তু অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, ৫২ সংখ্যক আয়াতে 'মুসা বললো' থেকে আলোচ্য আয়াতের শেষ পর্যন্ত বক্তব্যটি হজরত মুসার। এভাবে বক্তব্যটির মূলরূপ দাঁড়ায় এরকম— হজরত

www.eelm.weebly.com

মুসা বললেন, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যার ফলে মাটিতে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ। ওই উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত ফুল, ফল ও ফসল আহার্যরূপে ব্যবহৃত হয় মানুষের এবং পশুর। সুতরাং হে মানুষ! তোমরা ওই আহার্য খাও এবং পশুদেরকে খাওয়াও। আর এই সুন্দর ব্যবস্থাপনা যিনি করেছেন, সেই আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

এরপর বলা হয়েছে— 'অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে, বিবেকসম্পন্নদের জন্য।' একথার অর্থ— পৃথিবীকে সমতল করে পথযাত্রাকে সুগম করার মধ্যে, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মধ্যে এবং ওই বৃষ্টিপাতের দ্বারা মৃত্তিকায় বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ উৎপন্ন করার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র অপার প্রজ্ঞা, পরাক্রম ও সদা বিদ্যমানতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এসকল নিদর্শনের মাধ্যমে কেবল বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিরাই বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ্ই সকল কিছুর একক স্রষ্টা ও পালয়িতা। সৃষ্টির প্রতিপালনের এমতো কুশলী ও নিখুঁত মহা আয়োজনের রহস্যময়তা ধরা পড়ে কেবল তাঁদেরই বোধে, চিন্তায় ও দর্শনে।

এখানে 'উলিন নুহা' অর্থ বিবেকসম্পন্নগণ। 'আন্নুহা' শব্দটি 'নুহ্ইয়াতুন্' এর বহুবচন। 'নুহ্ইয়াতুন্' অর্থ বিবেক, যে বিবেক মানুষকে বিরত রাখে ভুল মত ও পথ থেকে।

সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ○ وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا
فَكَذَّبَ وَاَبٰى ○ قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ○ فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ
مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَاۤ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ○ قَالَ
مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ○ فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ
ثُمَّ اَتٰى ○

❑ মৃত্তিকা হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, উহাতেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিব এবং উহা হইতে পুনর্বার তোমাদিগকে বাহির করিব।

❑ আমি তো ফিরাউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করিয়াছে ও অমান্য করিয়াছে।

❑ সে বলিল, 'হে মূসা! তুমি কি তোমার যাদু দ্বারা আমাদিগকে আমাদিগের দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবার জন্য আমাদিগের নিকট আসিয়াছ?

www.eelm.weebly.com

❒ আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করিব ইহার অনুরূপ যাদু, সুতরাং আমাদিগের ও তোমার মধ্যে নির্ধারণ কর এক দিন ও এক মধ্যবর্তী স্থান যাহার ব্যতিক্রম আমরাও করিব না এবং তুমিও করিবে না।'

❒ মূসা বলিল, 'তোমাদিগের নির্ধারিত দিন উৎসবের দিন এবং সেই দিন পূর্বাহ্নে জনগণ সমবেত হইবে।'

❒ অতঃপর ফিরাউন উঠিয়া গেল এবং পরে তাহার যাদুকরদিগকে জমা করিল ও ইহার পর উপস্থিত হইল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃজন করেছি। মৃত্যুর পর আবার ওই মৃত্তিকাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিবো এবং পুনরুত্থান দিবসে পুনরায় তোমাদেরকে বের করবো ওই মৃত্তিকা থেকেই।

মানুষের আদি পিতা হজরত আদমকে নির্মাণ করা হয়েছিলো মাটি দ্বারা। অন্য মানুষকে এভাবে সরাসরি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়নি। মাটি দ্বারা তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পরোক্ষভাবে, শুক্রাণুর মাধ্যমে। আর মানবদেহে শুক্রাণুর সৃষ্টি হয় মৃত্তিকাজাত আহার্য ভক্ষণের মাধ্যমে। বাগবী লিখেছেন, আতা বলেছেন, যে শুক্রকণার মাধ্যমে মানুষের সৃষ্টি হয়, ওই শুক্রকণার সঙ্গে ফেরেশতা মিশিয়ে দেয় সমাধিস্থলের মাটি। এভাবে শুক্রকণিকা ও সমাধিস্থলের মৃত্তিকাসহযোগে পরিগঠিত মানুষের শরীর। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নবজাতকের নাভীমূলে অবশ্যই ওই মাটি থাকে, যে মাটি দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়। আবার আয়ু শেষে মৃত্যুর পর যে মাটি দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো সেই মাটিতেই তাকে দাফন করা হয়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন খতিব বাগদাদী এবং বলেছেন হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য। ইবনে জাওজী আবার হাদিসটিকে 'মউজু' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু শায়েখ মীরজা মোহাম্মদ হারেছী বদখশানী বলেছেন, হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এরকম সমঅর্থসম্পন্ন হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং বলতে হয়, হাদিসটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। তা ছাড়া আরেকটি বর্ণনার মাধ্যমেও খতিব বাগদাদী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটির সত্যতা প্রমাণিত হয়। বর্ণনাটি এই— আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী তাঁর বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থের 'কিতাবুল জানায়েয' অধ্যায়ে লিখেছেন, মোহাম্মদ বিন সিরীন বলেছেন, এ ব্যাপারে যদি আমি কসম খেয়ে বলি, তবে আমার কসম মিথ্যা হবে না, আর এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহও নেই যে, আল্লাহ্তায়ালা রসুল স., হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরকে একই মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।

www.eelm.weebly.com

ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আমাকে বলেছেন, তোমার কল্যাণ হোক। তোমাকে আমার খামির থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তোমার পিতা আকাশের ফেরেশতাদের সঙ্গে উড্ডয়ন করে।

'মসনদুল ফেরদাউস' গ্রন্থে দায়লামী ও ইবনে নাজ্জারের বর্ণনায় এসেছে, ওই ক্রীতদাস-দাসীর মুক্তকারীর খামীর আমার মাটির অংশ। সম্ভবতঃ রসুল স. একথা বলেছিলেন কোনো এক গোলাম আযাদকারী ব্যক্তি সম্পর্কে। এভাবে আতা খোরাসানীর তাফসীর এবং উপরোল্লিখিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় যে, কোনো কোনো মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে নবী-রসুলগণের খামীর থেকে। সুফী সাধকগণের পরিভাষায় এ বিষয়টিকে বলা হয়, 'ইসালাতুত্‌তীনাতু' (মৃত্তিকা মিশ্রিত)। শুধু তাই নয়, কাউকে কাউকে আবার সৃষ্টি করা হয়েছে শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর খামীর থেকে। সুফী সাধকগণ এমতো সৃজনকে বলেন 'ইসালাতে কুবরা'(বৃহৎ মিশ্রণ)।

আমি বলি, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্নেই বিষয়টি আল্লাহ্ কর্তৃক সুনির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ কাকে পৃথিবীর কোন অংশের কোন মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করা হবে, তা আল্লাহ্ পূর্বাহ্নেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই মানুষে মানুষে পরিদৃষ্ট হয় যোগ্যতা ও ক্ষমতার পার্থক্য। এ কারণেই নবী ও রসুলগণের জন্মভূমি ও সমাধিক্ষেত্র সন্নিহিত অঞ্চলের মৃত্তিকায় অন্যান্য অঞ্চলের মৃত্তিকা অপেক্ষা বর্ষিত হয় অধিকতর নূর, বরকত ও তাজাল্লী। এভাবে নবীর মৃত্তিকার খামীর বা অবশিষ্টাংশ থেকে যারা সৃষ্ট হন, তাদের জন্মস্থল ও সমাধিভূমি সংলগ্ন অঞ্চলের মৃত্তিকাও বিশেষ নূর, বরকত ও তাজাল্লী দ্বারা সমৃদ্ধ হয় এবং এভাবেই নবীগণের খামীরের বরকত, যারা নবী নন, প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যেও। খেজুরের বৃক্ষ সম্পর্কিত একটি হাদিসেও এই ইঙ্গিতটি রয়েছে। যেমন রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা তোমাদের ফুফুর (খেজুর গাছের) সম্মান কোরো। কেননা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের প্রথম পিতা হজরত আদমের খামীর থেকে। আল্লাহ্‌র নিকটে খেজুর বৃক্ষের চেয়ে অন্য কোনো বৃক্ষ প্রিয় নয়। খেজুর বৃক্ষের নিচেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহাপুণ্যবতী মরিয়ম বিনতে ইমরানের পুত্র। তোমরা তোমাদের সহধর্মিণী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে পাকা খেজুর খাওয়াও। না পেলে কাঁচাও খাওয়াতে পারো। 'মুসনাদ' গ্রন্থে আবু ইয়া'লী, 'আত্‌তিব্ব' গ্রন্থে আবু নাঈম, 'ইতিহাস' গ্রন্থে বোখারী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেম, উকাইলী, ইবনে আদী, ইবনে সিরীন এবং ইবনে মারদুবিয়া হজরত আলী থেকে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, খেজুর, আনার এবং আঙ্গুর গাছ সৃজিত হয়েছে পিতা আদমের মৃত্তিকার অবশিষ্টাংশ থেকে।

www.eelm.weebly.com

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী তাঁর মকতুবাত শরীফের তৃতীয় খণ্ডের ৯৯ সংখ্যক মকতুবে 'ইসালাতে কুবরা'র দাবি করেছেন। বলেছেন, আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে রসুল স. এর মৃত্তিকার অবশিষ্টাংশ থেকে। দুঃখের বিষয়, অজ্ঞতা ও হঠকারিতাবশতঃ কেউ কেউ হজরতের বিশুদ্ধ কাশফজাত এই প্রজ্ঞাপনটির ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেছে। আল্লাহ্পাকই অধিক পরিজ্ঞাত।

'তারাতান' অর্থ পুনর্বার। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— পুনরুত্থান দিবসে তোমাদের সমাধিস্থিত অস্থিচূর্ণসমূহ ও মাটিতে মিশে যাওয়া অংশসমূহ একত্র করে আমি পুনরায় সৃষ্টি করবো তোমাদের পূর্ণ অবয়ব এবং সেই অবয়বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করবো রূহকে। এভাবে তোমাদের সকলকে দান করবো পুনর্জীবন।

পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'আমি তো ফেরাউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম, কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে ও অমান্য করেছে।' এখানে 'আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম' কথাটির অর্থ— নবী মুসাকে যে নয়টি মোজেজা আমি দিয়েছিলাম, তার সব কয়টিই আমি তাকে দেখিয়েছিলাম। আর 'কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে ও অমান্য করেছে' কথাটির অর্থ— কিন্তু ফেরাউন ওই অভূতপূর্ব দুর্লভ নিদর্শনসমূহ দেখেও ইমান আনেনি। বরং সত্য নবী মুসাকে বলেছে মিথ্যাবাদী ও যাদুকর। অস্বীকার করেছে তাঁর আনুগত্যকে।

এর পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে মুসা! তুমি কি তোমার যাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দিবার জন্য আমাদের নিকটে এসেছো?' এ কথার অর্থ— ফেরাউন বললো, হে মুসা! তোমার মতলব কী? তুমি কি এ সকল ভেলকিবাজি দেখিয়ে আমাদেরকে ভীত ও বিতাড়িত করে এদেশে তোমার রাজত্ব কায়েম করতে চাও?

এর পরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— 'আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করবো এর অনুরূপ যাদু, সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে নির্ধারণ করো এক দিন ও এক মধ্যবর্তী স্থান, যার ব্যতিক্রম আমরাও করবো না এবং তুমিও করবে না।' এ কথার মাধ্যমে ফেরাউন হজরত মুসার মোজেজাসমূহকে প্রতিহত করবার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। আস্ফালন করেছে এই বলে যে,

www.eelm.weebly.com

তোমার যাদুর মোকাবিলা আমরা করবোই করবো। তারিখ ও স্থান ঠিক করো। নির্ধারিত দিনে এক উন্মুক্ত স্থানে তোমার ও আমাদের মধ্যে যাদুর প্রতিযোগিতা হবে। ওই প্রতিযোগিতা থেকে আমরা পিছপা হবো না, তুমিও পিছপা হতে পারবে না।

এখানে 'মাওই'দা' শব্দটি 'ওয়াদা' বা অঙ্গীকার প্রকাশক। শব্দটি সময়সম্পৃক্ত অথবা স্থানসম্পৃক্ত নয়। কারণ বিরোধিতার সম্পর্ক সকল ক্ষেত্রে অঙ্গীকার বা প্রতিযোগিতার সঙ্গে হয়, সময় বা স্থানের সঙ্গে হয় না।

'মাকানান সুওয়ান' অর্থাৎ মধ্যবর্তী স্থান। অর্থাৎ তোমার ও আমাদের দল থাকবে সমদূরত্বে। এরকম অর্থ করেছেন কাতাদা ও মুজাহিদ। এক বর্ণনানুসারে হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতও এরকম। কালাবী বলেছেন, শব্দটির অর্থ —এখানে নয়, অন্য কোনো স্থানে।

এর পরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, তোমাদের নির্ধারিত দিন উৎসবের দিন এবং সেই দিন পূর্বাহ্নে জনগণ সমবেত হবে।' এখানে 'মাওইদা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে স্থান প্রকাশকরূপে। এভাবে বলা হয়েছে— হজরত মুসা বললেন, ঠিক আছে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে তোমাদের উৎসবের স্থানে, উৎসবের নির্দিষ্ট দিনে, যাতে সর্বজনসমক্ষে বিষয়টি সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিত হয়।

মুজাহিদ, কাতাদা, মুকাতিল ও সুদ্দী বলেছেন, মিসরবাসী সকলে একটি বাৎসরিক উৎসবে সমবেত হতো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ওই উৎসব চলতো নয় দিন ধরে। হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, উৎসব শুরু হতো মহররমের দশ তারিখ থেকে।

'দুহা' অর্থ চাশতের সময়। অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের পূর্বে। ওই সময় সকল কিছু সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। তাই হজরত মুসা বলেছিলেন, ওই সময়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

এর পরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'অতঃপর ফেরাউন উঠে গেলো, পরে তার যাদুকরদেরকে জমা করলো ও এরপর উপস্থিত হলো।' একথার অর্থ— ফেরাউন হজরত মুসার সঙ্গে এভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে রাজদরবার থেকে প্রস্থান করলো। রাষ্ট্রীয় ফরমান জারী করে ও বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করে দেশের বড় বড় যাদুকরদেরকে একত্র করলো সে। তারপর বাৎসরিক উৎসবের দিনে পারিষদবর্গ ও যাদুকরদেরকে নিয়ে নিশ্চিত জয়ের আশায় উপস্থিত হলো নির্ধারিত স্থানে।

www.eelm.weebly.com

قَالَ لَهُمْ مُّوسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ
افْتَرٰى ○ فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ○ قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ
اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ○ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ
ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ○ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ
نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ○ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ
سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ○ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ○ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ
الْاَعْلٰى ○ وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۗ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۗ وَلَا يُفْلِحُ
السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ○ فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ○

❒ মূসা উহাদিগকে বলিল, 'দুর্ভোগ তোমাদিগের! তোমরা আল্লাহের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিও না। করিলে, তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করিবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সেই ব্যর্থ হইয়াছে।'

❒ উহারা নিজদিগের মধ্যে আলোচনা করিল এবং উহারা গোপনে পরামর্শ করিল।

❒ উহারা বলিল, 'এই দুই জন অবশ্যই যাদুকর, তাহারা চাহে তাহাদিগের যাদু দ্বারা তোমাদিগকে তোমাদিগের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে এবং তোমাদিগের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাশ করিতে।'

❒ 'অতএব তোমরা তোমাদিগের যাদুক্রিয়া সংহত কর, তারপর সারিবদ্ধ হইয়া উপস্থিত হও এবং আজ যে জয়ী হইবে সেই সফল হইবে।'

❒ উহারা বলিল, হে মূসা! 'হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।'

❒ মূসা বলিল, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।' উহাদিগের যাদু-প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হইল উহাদিগের দড়ি ও লাঠিগুলি ছুটাছুটি করিতেছে।

❒ মূসা তাহার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করিল।

www.eelm.weebly.com

❒ আমি বলিলাম, 'ভয় করিও না, তুমিই প্রবল।

❒ 'তোমার দক্ষিণ হস্তে যাহা আছে তাহা নিক্ষেপ কর, ইহা উহারা যাহা করিয়াছে তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে, উহারা যাহা করিয়াছে তাহা তো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর যেথায়ই আসুক, সফল হইবে না।

❒ অতঃপর যাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হইল ও বলিল, 'আমরা হারুন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম।'

'ক্বলা লাহুম মূসা' অর্থ— ফেরাউন ও তার সঙ্গী যাদুকরদের প্রতি লক্ষ্য করে হজরত মুসা বললেন। বাগবী লিখেছেন, কথাটির অর্থ— কেবল যাদুকরদেরকে লক্ষ্য করে হজরত মুসা বললেন। ফেরাউন ওই যাদুকরদেরকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এনে একত্র করেছিলো। তাদের সংখ্যা ছিলো বায়াত্তর জন। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিলো একটি করে লাঠি ও একটি করে রশি। হজরত কা'ব বলেছেন, তাদের সংখ্যা ছিলো চার শত। কেউ কেউ বলেছেন, বারো হাজার, বরং এর চেয়েও বেশী।

'ওয়াইলাকুম' অর্থ সমূলে ধ্বংস করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য করেছেন। অথবা তোমরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছো। কিংবা তোমাদের ধ্বংস হোক, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করো। যাদুকরদের প্রতি এটা ছিলো হজরত মুসার সাবধান বাণী। একথার মাধ্যমে হজরত মুসা তাদেরকে একথাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, হে যাদুকরের দল! তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক কোরো না। 'ইসহাতুন' এবং 'ছাহ্‌তুন' শব্দ দু'টো সমার্থক। নজদবাসী ও বনী তামীম শব্দটিকে উচ্চারণ করে আস্‌হাত। হেজাজবাসীরা বলে 'সাহ্‌তুন'। মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, এখানকার 'ইউস্‌হিতাকুম' কথাটির অর্থ আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধ্বংস করবেন। কাতাদা বলেছেন, তিনি তোমাদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করবেন। 'বিআ'জাবিন্' (শাস্তি দ্বারা) কথাটির তান্‌ভিন কঠোরতা প্রকাশক। অর্থাৎ কঠিন শাস্তি দ্বারা। আর 'খবা' অর্থ ব্যর্থ বা বিফল হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাস্তবে ফেরাউনের এই অপচেষ্টা ব্যর্থই হয়েছিলো।

পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো এবং তারা গোপনে পরামর্শ করলো।' এখানে 'তারা' অর্থ ফেরাউন, তার পারিষদবর্গ ও সমবেত যাদুকরেরা। হজরত মুসার কথা শুনে তারা কিছুটা ঘাবড়ে গেলো। তারা মোকাবিলা করা সঙ্গত হবে কিনা সে সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলো। মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, হজরত মুসার কথা শুনে যাদুকরেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, এ তো কোনো যাদুকরের কথা নয়।

www.eelm.weebly.com

'নাজ্ওয়া' অর্থ গোপন পরামর্শ। শব্দটি নামপদ। অথবা শব্দটি 'নাজ্বাইতুহূ' কথাটির ধাতুমূল। 'নাজ্বাইতু' অর্থ আমি তার সঙ্গে গোপনে কথা বলেছি। 'নাজ্ওয়াহ্' শব্দটি সংকলিত হয়েছে 'নাজ্ওয়াতুন' থেকে। 'নাজ্ওয়াতুন' অর্থ ওই ঠেলে উঠা টিলা, যা অমসৃণ উচ্চতার কারণে বিসদৃশ মনে হয়। কেউ কেউ আবার বলেন, 'নাজ্ওয়াতুন' শব্দটি উৎকলিত হয়েছে 'নাজ্বাতুন' থেকে। 'নাজ্বাত' অর্থ মুক্তি পাওয়া বা রেহাই পাওয়া। অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে এমন গোপন পরামর্শ করা, যার মাধ্যমে সবাই বেঁচে যেতে পারে। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— যাদুকরেরা নিজেদের মধ্যে গোপনে এই পরামর্শ করলো যে, প্রতিযোগিতায় হজরত মুসা যদি জিতে যান, তবে আমরা তাঁর আনুগত্যকে স্বীকার করে নিবো। কিন্তু একথা তারা বাইরে প্রকাশ করলো না।

এর পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, এই দু'জন অবশ্যই যাদুকর, তারা চায় তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাশ করতে।' একথার অর্থ— ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের আলোচনায় বিভিন্ন মন্তব্য স্থান পেলেও শেষ পর্যন্ত তারা সকলে একমত হয়ে গেলো। তখন ফেরাউন অথবা তার জনৈক মুখপাত্র তাদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করলো, হে যাদুকরের দল! এই দু'জন তোমাদের মতোই যাদুকর। তারা তোমাদেরকে যাদু দ্বারা পরাস্ত করতে চায় এবং এভাবে তারা আমাদের সকলকে করতে চায় দেশান্তরিত। চায় আমাদের উন্নত ও উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার বিনাশ। উল্লেখ্য যে, ফেরাউন, তার পারিষদবর্গের ও যাদুকরদের মতপার্থক্যের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সুরা মু'মিনুনে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

'ইন হাজানি লাসাহিরানি' কথাটির 'ইন্' শব্দটি মুখাফ্ফাফাহ্(সংক্ষিপ্তরূপ)। আর 'লাসাহিরানি' এর 'লাম' অক্ষরটি পার্থক্য প্রকাশক। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— নিঃসন্দেহে এই দুই ব্যক্তি যাদুকর। অথবা 'ইন' শব্দটি এখানে না বোধক। যদি তাই হয়, তবে এখানকার 'লাম' অক্ষরটির অর্থ হবে ইল্লা (ব্যতীত)। অর্থাৎ এ দু'জন যাদুকর ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

আবু ওমরের ক্বেরাতে 'ইন' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে 'ইন্না' রূপে (নূন অক্ষরে তাশদীদ্ সহকারে)। আর 'হাজানি লাসাহিরানি' কথাটি উচ্চারিত হয়েছে 'হাজাইনি লাসাহিরানি' রূপে। কিন্তু আবু ওমর ছাড়া অন্য সকলেই 'হাজানি'-ই পড়েছেন।

উল্লেখ্য যে, 'ইন্' এর স্থলে 'ইন্না' বলা হলে তা হবে সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী। 'ইন্না' এর 'এছেম' (নামপদটি) যবর বিশিষ্ট হয়, পেশযুক্ত হয় না। এ

www.eelm.weebly.com

সম্পর্কে হিশাম বিন ওরওয়া তাঁর পিতার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, এটা হচ্ছে লেখকের ভুল। কিন্তু আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, কোরআনের লিপি নির্ভুল। কেউ কেউ বলেছেন, এই উচ্চারণটি আবুল হারেছ, খাছআম এবং কেনানা গোত্রের পরিভাষার অনুরূপ। তাদের পরিভাষা অনুসারে 'তাছনিয়াহ্' (দ্বিবচন) 'সাকিন'— সর্বাবস্থায় যবরযুক্তই হবে। তাই তারা এ সকল ক্ষেত্রে উচ্চারণ করে 'আলিফ্'। যেমন — 'মারারতু বির্‌রজুলিন', 'রআইতুর রজুলান', 'আতানিয়ার্ রজুলান'। এগুলোর প্রতিটিতেই তাছনিয়াকে পড়া হয়েছে 'আলিফ্' সহযোগে। আবার তারা বলে থাকে— 'কাসারতু ইয়াদাহু' এবং 'রকিব্‌তু আলাহু'। 'ইয়াদাইহি' এবং 'আলাইহি'— এরকম বলে না। প্রসিদ্ধ নামষষ্ঠকের (পিতা, ভাই ইত্যাদির) সর্বনামের ক্ষেত্রেও তারা 'আলিফ্' সংযোজন করে। যেমন প্রখ্যাত এক কবি বলেছেন—

ইন্‌না আবাহা ওয়া আবা আবাহা
ক্বদ বালাগা ফীল মাজদি গাইয়াতাহা।

লক্ষণীয় যে, এখানেও পরের 'আবাহ' এসেছে 'আলিফ' সহযোগে। কথাটি এখানে 'আবীহা'রূপে আসেনি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'ইন্‌না' শব্দটির নামপদের অভিজাত সর্বনাম অনুক্ত রয়েছে। ওই অনুক্ত সর্বনাম সহযোগে এখানকার বিধেয়টির মূলরূপ দাঁড়াবে এরকম— 'ইন্‌নাহু হাজানি লাসাহিরানি'। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইন্‌না নাআ'ম' অর্থে। একবার এক বেদুইন হজরত ইবনে যোবায়েরের নিকটে কিছু চাইলো। কিন্তু তিনি তাকে কিছু দিলেন না। তখন সে বললো, 'লাআ'নাল্লহু নাক্বাতান্ হামালাত্‌নী ইলাইকা' (ওই উটনীর উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ যে আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছে)। হজরত ইবনে যোবায়ের বললেন, 'ইন্‌না ওয়া সাহিবাহা' (উটনীর মালিকের প্রতিও)।

'ইয়াজ্‌হাবা বিত্বরীক্বাতিকুমুল মুছলা' অর্থ— তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাশ করতে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'ত্বরীকা' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মিসরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে। ত্বরীকাতিল ক্বওম' অর্থ গোত্র প্রধানগণ। শা'বী বলেছেন, হজরত আলী এই কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সে চায় সর্বসাধারণ তার প্রতি আকৃষ্ট হোক। কাতাদা বলেছেন, তখন বনী ইসরাইলের জনসংখ্যা ছিলো অন্যান্য গোত্রের চেয়ে অনেক বেশী। সম্পদও তাদের কম ছিলো না। তাই এখানে 'ত্বরীকাতিকুমুল মুছলা' কথাটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে বনী ইসরাইলকে। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— নবুয়তের দাবি উত্থাপনকারী এই দুই ব্যক্তি বনী ইসরাইল

www.eelm.weebly.com

বংশদ্ভুতদেরকে নিয়ে অন্যত্র গমন করতে চায়। ইতোপূর্বে হজরত মুসা উচ্চারণ করেছিলেন 'আমাদের সঙ্গে বনী ইসরাইলকে যেতে দাও' (আয়াত ৪৭)। একথার দিকে লক্ষ্য রেখে ফেরাউন এরকম বলেছিলো।

কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ সাধারণভাবে 'ত্বরীকাতিকুমুল মুছলা' কথাটির অর্থ করেছেন— ওই ধর্মমত, যার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলো ফেরাউন ও তার অনুসারীরা। এক আয়াতে এসেছে— 'আমার ভয় হচ্ছে, এই ব্যক্তি তোমাদের ধর্মাদর্শকে পরিবর্তন করে ফেলবে।' সুতরাং আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে মিসরবাসী! বনী ইসরাইল বংশদ্ভুত এই দুই যাদুকর চায় তোমাদের উৎকৃষ্ট ধর্মাদর্শের অস্তিত্ব বিনাশ করতে।

এর পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'অতএব তোমরা তোমাদের যাদুক্রিয়া সংহত করো, তারপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও এবং আজ যে জয়ী হবে সে-ই সফল হবে।' একথার অর্থ— ফেরাউন আরো বললো, হে যাদুকরেরা! তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও। সংহত করো তোমাদের যাদুক্রিয়াকে। তারপর ময়দানে অবতীর্ণ হও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে, সুশৃংখলরূপে সারিবদ্ধ হয়ে, যেনো দর্শকদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় তোমাদের দৃঢ়তা ও প্রতাপ। আজ জয় যার, সফলতা তার।

এখানে 'আজমিউ' অর্থ ঐক্যবদ্ধ হও, হও সংহত। আর 'সাফ্ফান্' অর্থ সারিবদ্ধ হওয়া। উল্লেখ্য যে, মানুষ, বৃক্ষ অথবা অন্য কোনো কিছুর সারিবদ্ধ হওয়াকে বলে 'সাফ্ফুন'। মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, অন্য আয়াতেও শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— 'যারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধ হয়ে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন' (সুরা সাফ্ফা)। কিন্তু ইবনে উবায়দা বলেছেন, শব্দটির অর্থ একত্রিত হওয়ার স্থান। একারণেই জায়নামাজকে বলে 'সাফ্'। এরকম অর্থ করলে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— তোমরা সকলে নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হও।

এর পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে মুসা! হয় তুমি নিক্ষেপ করো, অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।' একথার অর্থ— যাদুকরেরা উন্মুক্ত প্রান্তরে নির্ধারিত স্থানে সমবেত হলো। বিজয়ের আশায় ও আতিশয্যে উদ্বেলিত ছিলো তারা। তাই সৌজন্য প্রকাশার্থে বললো, হে মুসা! আপনিই প্রথমে আপনার যাদুর ক্ষমতা প্রদর্শন করুন, নতুবা আমাদেরকে প্রথমে সুযোগ দিন।

উল্লেখ্য যে, হজরত মুসা ছিলেন, নিশ্চিত ও নির্বিকার। তাই তিনি চেয়েছিলেন, যাদুকরেরাই প্রথমে তাদের ক্ষমতা দেখাক। তারপর তিনি তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করবেন। আর তখনই প্রমাণ হয়ে যাবে সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ। উপস্থিত জনমণ্ডলী স্বচক্ষে দেখবে, কীভাবে সত্য বিজয়ী হয় এবং কীভাবে পরাস্ত হয় মিথ্যা। তাই তাদের সৌজন্যের বিনিময়ে হজরত মুসাও সৌজন্য প্রদর্শন করলেন।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, বরং তোমরাই নিক্ষেপ করো। তাদের যাদুর প্রভাবে অকস্মাৎ মুসার মনে হলো তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে।' একথার অর্থ হজরত মুসা বললেন, ঠিক আছে। তোমরাই প্রথমে শুরু করো। যাদুকরেরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতের লাঠি ও দড়িগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করলো। সমবেত জনতা দেখতে পেলো নিক্ষিপ্ত লাঠি ও দড়িগুলো সারা প্রান্তর জুড়ে সাপের মতো দৌড়াদৌড়ি করছে। হজরত মুসাও এরকম দেখতে পেলেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, যাদুকরেরা উপস্থিত জনতাকে নজরবন্দী করলো। ফলে সকলে দেখতে পেলো প্রায় এক মাইল পরিসর জুড়ে অসংখ্য সাপ ছুটাছুটি করছে। হজরত মুসাও দেখতে পেলেন এই বীভৎস দৃশ্যটি।

এর পরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'মুসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করলো।' এখানে 'ওয়াজসুন' অর্থ মৃদু শব্দ, ধীর পদবিক্ষেপের আওয়াজ। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'ওয়াজসুন' অর্থ ওই আওয়াজের আতংক, যা শ্রুত হয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা প্রবিষ্ট হয় অন্তরে। উল্লেখ্য যে, মানবিক বৃত্তির স্বাভাবিক নিয়মে ওই বীভৎস দৃশ্য দেখে হজরত মুসার হৃদয়ে উদ্রেক হয়েছিলো সাময়িক ভয়। মুকাতিল বলেছেন, যাদুর ভীতিপ্রদ প্রকাশ দেখে হজরত মুসা আসলে শংকিত হননি। তিনি শংকিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, এই যাদুকে সত্য মনে করে উপস্থিত মানুষেরা যেনো প্রকৃত মোজেজাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু না করে। এভাবে যেনো ভণ্ডুল না হয়ে যায় সত্য প্রতিষ্ঠার এই মহা আয়োজন।

এর পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'আমি বললাম, ভয় কোরো না, তুমিই প্রবল।' হজরত মুসাকে নির্ভিক করে তুলবার জন্য অবতারণা করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যের। বলা হয়েছে— ভয় কোরো না। কেনো করবে! তুমি যে আমার রসুল! রেসালত ও মোজেজা প্রদান করে বিরুদ্ধবাদীদের উপর আমিই তোমাকে করে দিয়েছি প্রবল, বিজয়ী। আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এটাই।

'ইন্নাকা আনতাল আ'লা' অর্থ তুমিই প্রবল। কথাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে ভয় না করার কারণ। অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্য কথাটিকে উপস্থাপন করা হয়েছে কোনো প্রকার সংযোজক অব্যয় ব্যতিরেকেই। ব্যবহৃত হয়েছে দু'টি নিশ্চয়তাপ্রকাশক শব্দ— 'ইন্না' এবং 'আ'লা।' প্রয়োগ করা হয়েছে ইসমে তাফজীলের শব্দরূপ আ'লা।

এর পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'তোমার দক্ষিণ হস্তে যা আছে তা নিক্ষেপ করো, তা তারা যা করেছে, তা গ্রাস করে ফেলবে, তারা যা করেছে, তাতো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না।'

www.eelm.weebly.com

এখানে 'তোমার দক্ষিণ হস্তে যা আছে' বলে বোঝানো হয়েছে হজরত মুসার অলৌকিক লাঠিকে। স্পষ্ট করে এখানে 'লাঠি নিক্ষেপ করো'— এরকম বলা হয়নি। যাদুকরদের লাঠি ও রশিকে হীন করে দেখানোর জন্যই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এরকম পরোক্ষ বাকভঙ্গি। আর 'নিক্ষেপ করো' কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, তোমার নিক্ষিপ্ত যষ্টি বিশাল অজগর হয়ে যাদুকরদের সকল যাদু গ্রাস করে ফেলবে। যা যাদু, তা কখনোই সত্য মোজেজার সামনে টিকে থাকতে পারে না। তাই পরক্ষণেই বলা হয়েছে— তারা যা করেছে তাতো কেবল যাদুকরের কৌশল। এরকম কৌশল কখনোই সফল হবে না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যাদুকরেরা পৃথিবীর কোনো স্থানেই সফলকাম হতে পারে না। তাই এখানে বলা হয়েছে— যেখানেই তারা যাক না কেনো, সফল হবে না। কেউ কেউ এখানকার 'আতা' কথাটির অর্থ করেছেন চক্রান্ত । অর্থাৎ যেখান থেকেই তারা চক্রান্ত চালাক না কেনো, সফল হতে পারবে না। হজরত জুনদুব বিন আবদুল্লাহ্ বাজালী থেকে ইবনে আবী হাতেম ও তিরমিজি বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যাদুকরকে যেখানে পাবে তাকে সেখানেই হত্যা করবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন—'যাদুকর যেখানেই আসুক সফল হবে না।'

শেষোক্ত আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যাদুকরেরা সেজদাবনত হলো ও বললো, আমরা হারূন ও মুসার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।' একথার অর্থ— হঠাৎ হজরত মুসা তার হাতের লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। সাথে সাথে তা হয়ে গেলো একটি বিরাট অজগর সাপ। সাপটি যাদুর সকল উপকরণ অবলীলায় গলাধঃকরণ করতে লাগলো। চৈতন্যোদয় হলো যাদুকরদের। তারা বুঝতে পারলো, হজরত মুসার এই অলৌকিক কাণ্ড যাদু নয়। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রদর্শিত এক বিস্ময়কর মোজেজা। অভিভূত হয়ে গেলো তারা। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে গেলো তাদের মস্তক। তাই সেজদাবনত হতে বাধ্য হলো তারা। এভাবে সেজদার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর তারা বললো, হারূন ও মুসা যাঁর বাণীবাহক, তাঁর প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

উল্লেখ্য যে, এখানে হজরত মুসার পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে হজরত হারূনের নাম। কিন্তু সুরা শূআরা ও সুরা আ'রাফে উল্লেখিত এই কাহিনীটির বিবরণে হজরত মুসার নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে হজরত হারূনের পূর্বে। এতে করে বুঝা যায়, নামের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এখানে মূল বিবেচ্য বিষয় নয়। তাঁদের দু'জনকে আল্লাহ্‌র রসুল বলে স্বীকৃতি প্রদান করার বিষয়টিই এখানে মুখ্য।

www.eelm.weebly.com

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ
اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۫ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ
عَذَابًا وَّاَبْقٰى ○ قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا
فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ۚ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○ اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ
لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○ اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ
رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ○ وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا
قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ○ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ○

❒ ফিরাউন বলিল, 'কী, আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা মূসাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে! দেখিতেছি, এতো তোমাদিগের প্রধান, সে তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে। সুতরাং আমি তো তোমাদিগের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিবই এবং আমি তোমাদিগকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করিবই এবং তোমরা অবশ্যই জানিতে পারিবে আমাদিগের মধ্যে কাহার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।'

❒ যাদুকরেরা বলিল, 'আমাদিগের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে তাহার উপর এবং যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিব না, সুতরাং তুমি কর যাহা তুমি করিতে চাহ। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যাহা করিবার করিতে পার।'

❒ আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি যাহাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদিগের অপরাধ এবং তুমি আমাদিগকে যে যাদু করিতে বাধ্য করিয়াছ তাহা; আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।

❒ যে তাহার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হইয়া উপস্থিত হইবে তাহার জন্য তো আছে জাহান্নাম, সেথায় সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।

❒ এবং যাহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে বিশ্বাসী হইয়া ও সৎকর্ম করিয়া, উহাদিগের জন্য আছে সুউচ্চ মর্যাদা।

❒ স্থায়ী জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং এই পুরস্কার তাহাদিগেরই যাহারা পবিত্র।

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, কী, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বে তোমরা মুসাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে! দেখছি, এতো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে।' এখানে 'ইমান' (আমানতুম) কথাটির পর 'বা' অক্ষরটি প্রয়োগ জরুরী ছিলো। কিন্তু তা না করে এখানে বসানো হয়েছে 'লাম'। এর কারণস্বরূপ বলতে হয় যে, 'আমানতুম' কথাটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে মান্য করা বা আনুগত্য করার ধারণা। আর আনুগত্যের পরে 'লাম'ই বসে, 'বা' বসে না। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— ফেরাউন বললো, কী, এতো বড় স্পর্ধা তোমাদের! আমি তোমাদেরকে এখানে আনলাম। এতো বড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করলাম। অথচ তোমরা আমার অনুমতি না নিয়েই মুসা ও হারুনকে মেনে নিলে!

'দেখছি, এতো তোমাদের প্রধান' কথাটির অর্থ— ফেরাউন আরো বললো, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, ওরা দু'জন আসলে নবী টবি কিছু নয়, ওরা হচ্ছে মস্ত যাদুকর। যাদুর বলেই ওরা দু'জন তোমাদের উপরে বিজয়ী হয়েছে। অথবা 'কাবীরুন' শব্দটির অর্থ এখানে ওস্তাদ, গুরু, দলনেতা বা প্রধান। 'সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে' কথাটির অর্থ— আসলে ভিতরে ভিতরে তোমরা এক জোট, মুসাই তোমাদের গুরু। তার নিকট থেকে তোমরা যাদু শিক্ষা করেছো। তারপর এখানে এসেছো পাতানো খেলা দেখাতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং আমি তো তোমাদের হস্ত-পদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করবোই এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবোই।' এখানে 'মিন্‌খিলাফিন' অর্থ বিপরীত দিক থেকে। অর্থাৎ ডান হাত, বাম পা। 'খিলাফ' অর্থ বিপরীত। 'ফী জুজূইন্ নাখলি' অর্থ খেজুর গাছের কাণ্ডে। খেজুরগাছ হয় দীর্ঘাকৃতির ও শাখা-প্রশাখাবিহীন। খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করলে দূরের মানুষও দৃশ্যটি দেখতে পাবে। এভাবে মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করাই ছিলো ফেরাউনের ইচ্ছা। তাই সে বলেছিলো— 'আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবোই'।

এরপরে বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে, আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।' একথার অর্থ— তারপর হে বিদ্রোহী যাদুকরেরা! তোমরা ভালো করেই একথা বুঝতে পারবে যে, কার শাস্তি কঠিনতর ও দীর্ঘস্থায়ী — মুসা-হারুনের, না আমার।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'যাদুকরেরা বললো, আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিবো না, সুতরাং তুমি করো, যা তুমি করতে চাও।'

'মা আনতা কৃাদ্বিন' অর্থ যা তুমি করতে চাও। কথাটি 'ইকৃদ্বি' (করো) এর কর্মপদ। কিন্তু যদি 'কৃদ্বা' শব্দটির অর্থ এখানে সিদ্ধান্তমূলক এবং নির্দেশপ্রকাশক হয়, তবে 'মাআনতা' পদদ্বয়টি এখানে কর্মপদ হবে না। কেননা এখনে 'কৃদ্বা' এর কর্মপদের উপর 'বা' অক্ষরটি যুক্ত করার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু তা করা হয়নি।

www.eelm.weebly.com

সুতরাং 'মা আনতা কৃদ্বিন' কথাটি এখানে হবে একটি সুনির্দিষ্ট কর্ম এবং অর্থ দাঁড়াবে— তুমি যা ইচ্ছা হয়, তাই করো।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যা করবার করতে পারো।' 'তাক্বদ্বী' অর্থ যা করবার করতে পারো। 'আল হায়াতাদ্ দুন্ইয়া' অর্থ পার্থিব জীবনে। কথাটি মাফউলে ফীহ্ (সন্নিহিত কর্মপদ), জরফে জামান (কালাধিকরণ কারক)। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— যাদুকরেরা আরো বললো, তুমি দুনিয়ার রাজা। এই দুনিয়ায় তুমি তোমার হুকুম চালাতে পারো। সুতরাং তুমি যা কিছু করতে চাও, করে ফেলো। কিন্তু মনে রেখো, দুনিয়া ধ্বংসশীল। তাই তোমার সাম্রাজ্য ও প্রতাপ অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এরপর ফেরাউন তওবাকারী যাদুকরদেরকে হাত পা কেটে ক্রুশবিদ্ধ করেছিলো। এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম। কেউ কেউ বলেছেন, সে এরকম করতে পারেনি। কেননা আল্লাহ্ এক স্থানে বলেছেন, তোমরা দু'জন এবং তোমাদের অনুসারীগণ সকলেই বিজয়ী।

এর পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করছো, তা।' এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, ফেরাউন তো তাদেরকে যাদু করতে বাধ্য করেনি। বরং ইতোপূর্বে এক স্থানে উল্লেখিত হয়েছে— তারা নিজেরাই ফেরাউনের সম্মানের শপথ করে বলেছিলো, আমরা অবশ্যই বিজয়ী হবো। সুতরাং এখানে 'তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছো'— এরকম বলা হলো কেনো? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, বাগবী লিখেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, যাদুবিদ্যার চর্চা অব্যাহত রাখার মানসে ফেরাউন কোনো কোনো লোককে যাদু শিখতে বাধ্য করতো। তাই এখানে যাদুকরেরা এরকম বলেছে। মুকাতিল বলেছেন, যাদুকরদের সংখ্যা ছিলো বায়াত্তর জন। তার মধ্যে দু'জন ছিলো কিবতী এবং অবশিষ্ট সত্তরজন ছিলো ইসরাইলী। আর ফেরাউন ইসরাইলীদেরকেই যাদু শিখতে বাধ্য করেছিলো।

আবদুল আজিজ ইবনে আবান বলেছেন, প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ফেরাউন যাদুকরদের ডেকে বলেছিলো, মুসা যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন তোমরা আমার সঙ্গে গিয়ে তাকে দেখে এসো। একদিন হজরত মুসা যখন ঘুমিয়ে ছিলেন তখন সে যাদুকরদেরকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। সকলে সবিস্ময়ে দেখলো হজরত মুসা নিদ্রিত, কিন্তু তাঁর লাঠি অতন্দ্র প্রহরীর মতো তাঁকে পাহারা দিচ্ছে। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে যাদুকরেরা ফেরাউনকে বললো, এ লোক যাদুকর নয়। কারণ যাদুকরেরা ঘুমিয়ে পড়লে তাদের যাদুও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর লাঠিকে দেখছি সদা-সতর্ক প্রহরীর মতো তাঁকে পাহারা দিচ্ছে। এটা কখনো যাদু হতে পারে না। সুতরাং এ লোকের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়। ফেরাউন তাদের কথায় কর্ণপাত করলো না। রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে বললো, তোমাদেরকে

www.eelm.weebly.com

তার মোকাবিলা করতেই হবে। এভাবে তাদেরকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করা হয়েছিলো বলেই তারা বলেছিলো— তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছো।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌ই শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।' কথাটির মাধ্যমে এটাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে— আল্লাহ্ যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী, তাই তিনি তাঁর অস্থায়ী সৃষ্টির কর্মকাণ্ডের যথাবিনিময় প্রদান করবেন। বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদেরকে করবেন পুরস্কৃত এবং অবিশ্বাসী ও পাপিষ্ঠদেরকে প্রদান করবেন কঠোর শাস্তি। মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, ফেরাউন বলেছিলো, 'তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী' (আয়াত ৭১)। তার একথার বিপরীতে তাই তওবাকারী যাদুকরেরা বলে দিয়েছিলো— আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।

এর পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য তো আছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।' একথার অর্থ— 'এবং যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে অবশ্যই গমন করবে জাহান্নামে। ভোগ করবে চিরস্থায়ী শাস্তি। সেখানে তার মৃত্যুও ঘটবে না, কিন্তু জীবিত থাকা সত্ত্বেও সে সেখানে পাবে না ন্যূনতম স্বস্তি। এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকবে অনন্তকাল ধরে।

এর পরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— 'এবং যারা তাঁর নিকটে উপস্থিত হবে বিশ্বাসী হয়ে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা।' একথার অর্থ— এবং যারা মৃত্যুবরণ করবে বিশ্বাস ও সৎকর্ম সহকারে, তারা গমন করবে চির সুখের উদ্যান জান্নাতে। লাভ করবে সমুচ্চ মর্যাদা।

শেষোক্ত আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদেরই, যারা পবিত্র।' একথার অর্থ— ইমানদারদের ওই জান্নাত হবে চিরস্থায়ী, যার পাদদেশে সতত প্রবহমান থাকবে জলবতী নদী। সেখানেই চিরকাল বসবাস করবে তারা। যারা পবিত্র, ওই পুরস্কার জুটবে তাদেরই ভাগ্যে।

কালাবী বলেছেন, এখানে 'পবিত্র' বলা হয়েছে তাকে, যারা তাদের নফসের জাকাত দিয়ে দিয়েছে এবং অন্তরের অন্তস্থল থেকে বলেছে— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা ও ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত একটি যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সেখানে নিম্ন মর্যাদাধারী ব্যক্তিরা উচ্চ মর্যাদাধারী ব্যক্তিদেরকে এমনভাবে দেখবে, যেমন তোমরা দেখে থাকো আকাশের সমুজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি। আর আবুবকর ও ওমর হবে ওই উচ্চ মর্যাদাধারীদের অন্তর্ভূত। এই হাদিসটি আবার তিবরানী বর্ণনা করেছেন হজরত জাবীর ইবনে সামুরা থেকে, ইবনে আসাকের হজরত ইবনে ওমর ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং ইমাম

www.eelm.weebly.com

আহমদ হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। বোখারী ও মুসলিমও হাদিসটির বর্ণনাকারী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে সুপরিণতসূত্রে তিরমিজি কর্তৃক হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে— রসুল স. বলেছেন, আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম প্রান্তে তোমরা যেমন উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহকে দেখতে পাও, তেমনিভাবে বেহেশতের নিম্নমর্যাদাধারীরা উচ্চ মর্যাদাধারীদেরকে দেখতে পাবে। উচ্চ মর্যাদাধারীরাও হবে আবার বিভিন্ন স্তরের। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তাহলে তো নবী রসুলগণের মর্যাদা নিশ্চয় হবে এর চেয়ে আরো অনেক উর্ধ্বে। তিনি স. বললেন, অবশ্যই । শপথ ওই সত্তার, যার অলৌকিক অধিকারে রয়েছে আমার জীবন! যারা আল্লাহ্‌র উপরে ও নবী-রসুলগণের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে, তারাও সেখানে হবে তাঁদের সাথী। মোটকথা, আল্লাহ্‌ই যে শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী, তার কারণ ঘোষিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতত্রয়ে (৭৪, ৭৫, ৭৬)। অথবা আয়াতগুলি যাদুকরদের সংলাপের পরিসমাপ্তি। কিংবা আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে যাদুকরদের উক্তির স্বীকৃতি।

সূরা ত্বাহা : আয়াত ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ
يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ○ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ
ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ○ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ ○ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ قَدْ
أَنجَيْنَٰكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَٰعَدْنَٰكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ
ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ○ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا۟ فِيهِ فَيَحِلَّ
عَلَيْكُمْ غَضَبِى ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدْ هَوَىٰ ○ وَإِنِّى لَغَفَّارٌ
لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ○

❒ আমি অবশ্যই মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম এই মর্মে, আমার দাসদিগকে লইয়া রজনীযোগে বহির্গত হও এবং উহাদিগের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়া এক শুষ্ক পথ নির্মাণ কর। পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তোমাকে ধরিয়া ফেলা হইবে— এই আশংকা করিও না এবং ভয়ও করিও না।

❒ অতঃপর ফিরাউন তাহার সৈন্যবাহিনীসহ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলে সমুদ্র উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করিল।

www.eelm.weebly.com

❒ এবং ফিরাউন তাহার সম্প্রদায়কে পথ ভ্রষ্ট করিয়াছিল, সৎপথ দেখায় নাই।

❒ হে বনি ইসরাঈল! আমি তো তোমাদিগকে তোমাদিগের শত্রু হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, আমি তোমাদিগকে তওরাত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং তোমাদিগের নিকট মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করিয়াছিলাম,

❒ বলিয়াছিলাম, তোমাদিগকে যাহা দান করিলাম তাহা হইতে ভাল ভাল বস্তু আহার কর। এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন করিও না, করিলে, তোমাদিগের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যাহার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হইয়া যায়।

❒ এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তাহার প্রতি যে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বহুদিন ধরে ফেরাউন বনী ইসরাইলদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিলো। আল্লাহ্ তাদেরকে ওই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে চাইলেন। তাই তাদের রসুল হজরত মুসার নিকটে এইমর্মে প্রত্যাদেশ করলেন যে, রাত্রিকালে তুমি বনী ইসরাইল জনতাকে নিয়ে মিসর ছেড়ে চলে যাও। পথিমধ্যে যখন সমুদ্র পড়বে তখন তোমার হাতের লাঠি দিয়ে সমুদ্র তরঙ্গে আঘাত করো। এভাবে সমুদ্রের অভ্যন্তরে নির্মাণ করো শুষ্ক পথ। ফেরাউনের লোকেরা তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তোমাদেরকে ধরে ফেলবে, এমতো আশংকা কোরো না। নির্বিঘ্নে সমুদ্রভ্যন্তরের বিশুষ্ক পথ দিয়ে সমুদ্রের অপর পাড়ে চলে যাও। ডুবে যাওয়ার ভয় কোরো না।

'ফাদ্বরিব্ লাহুম ত্বরীক্বা' অর্থ পথ ঠিক করে দাও। পরিভাষা অনুসারে কথাটি 'সাহম' থেকে সংকলিত হয়েছে বলা যেতে পারে। যেমন আরববাসীরা বলে— দ্বরবা লাহু মিম্ মালিহী সাহ্মা (সে তার সম্পদের মধ্যে একটি উপায় বা পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে)। অথবা কথাটির অর্থ হবে— তাদের জন্য পথ নির্মাণ করো। যেমন আরববাসীরা বলে— দ্বরাবাল লাবান (সে ইট নির্মাণ করেছে)। আমি বলি, এখানে 'ইদ্বরিব্' শব্দটির উদ্দেশ্য লাঠি দ্বারা আঘাত করা-ও হতে পারে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তুমি তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রতরঙ্গে আঘাত করো, তাহলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে নির্মিত হবে শুষ্ক পথ।

'দ্বারকান' অর্থ পশ্চাদ্ধাবন করা, পিছনে পিছনে অনুসরণ করে ধরে ফেলা। আর 'লা ইয়াখশা' অর্থ ভয় কোরো না। অর্থাৎ সমুদ্রভ্যন্তরের পথ দিয়ে গমনকালে ডুবে যাবে, এমতো আশংকা কোরো নো। বলা বাহুল্য যে, হজরত মুসা আল্লাহ্র এই প্রত্যাদেশ পালন করলেন। গোপনে সকল বনী ইসরাইলকে জানিয়ে দিলেন যে, অমুক রাতে সকলকে মিসর ছেড়ে আমার সঙ্গে যাত্রা করতে হবে। নির্ধারিত

www.eelm.weebly.com

রাতে হজরত মুসা তাঁর সকল অনুসারীকে নিয়ে যাত্রা করলেন সিরিয়ার দিকে। পথিমধ্যে পড়লো উত্তাল সাগর। তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন সাগরের পানিতে । তৎক্ষণাৎ সাগর চিরে সৃষ্টি হয়ে গেলো শুষ্ক পথ। বনী ইসরাইল ছিলো বারোটি গোত্রে বিভক্ত। তাই প্রতিটি গোত্রের জন্য একটি করে রাস্তা তৈরী হয়ে গেলো সাগরের ভিতর।

পরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'অতঃপর ফেরাউন তার সেনাবাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করলো।' একথার অর্থ— পরদিন সকালে ফেরাউন সংবাদ পেলো বনী ইসরাইলেরা রাত্রের অন্ধকারে উধাও হয়ে গিয়েছে। তার মনে পড়লো হজরত মুসা বলেছিলেন, 'আমাদের সঙ্গে বনী ইসরাইলকে যেতে দাও'। সে নিশ্চিত হলো, নিশ্চয় তারা তাদের পিতৃভূমি সিরিয়ার পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। যে করেই হোক তাদেরকে ধরে আনতে হবে। অল্প সময়ের মধ্যে সে তার বিশাল বাহিনী নিয়ে যাত্রা করলো সিরিয়ার পথে। অনেক পথ অতিক্রম করার পর সে তার লোকদেরকে নিয়ে উপস্থিত হলো সমুদ্রের কিনারায়। অবাক হয়ে দেখলো সমুদ্রের পানি দু'পাশে সরে গিয়ে সাগরের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত সৃষ্টি করে দিয়েছে শুষ্ক পথ। এরকম বারোটি পথ ধরে ওই দূরে চলে যাচ্ছে বনী ইসরাইলেরা। সে-ও তার লোকজন নিয়ে ওই পথগুলোর মধ্য দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চললো তাদেরকে ধরবার জন্য। বনী ইসরাইলেরা যখন সাগরের অপর পাড়ে গিয়ে উঠেছে, তখন অকস্মাৎ ভেঙে পড়লো পানির দেয়ালগুলো। একাকার হয়ে গেলো সমুদ্রের উত্তাল সলিল। মাঝপথে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হলো ফেরাউন ও তার লোকেরা।

এর পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'এবং ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিলো, সৎপথ দেখায়নি।' একথার অর্থ— নিঃসন্দেহে ফেরাউন ছিলো পথভ্রষ্ট। তার সম্প্রদায়কেও সে পথভ্রষ্ট করেছিলো। সত্যের পথ ছেড়ে ধরেছিলো অংশীবাদিতার পথ। লোকদেরকে বলেছিলো 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রভুপালনকর্তা।' আরো বলেছিলো, আমি তোমাদেরকে সঠিকপথ ভিন্ন অন্য কোনো পথ প্রদর্শন করিনি। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তার ওই উক্তিকে মিথ্যা প্রমাণ করা হয়েছে। শেষে বলা হয়েছে— 'সৎপথ দেখায়নি।' অর্থাৎ সে তার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌র মনোনীত পথে পরিচালিত করেনি। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে— সদলবলে সমুদ্রভ্যন্তরের পথে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে তার সম্প্রদায়কে ভুল পথ-নির্দেশনা দিয়েছিলো, সঠিক পথ প্রদর্শন করেনি। ফলে সে ও তার সম্প্রদায় লাভ করেছিলো সলিল সমাধি।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে— 'হে বনী ইসরাইল! আমি তো তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু থেকে উদ্ধার করেছিলাম; আমি তোমাদেরকে তওরাত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তুর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে।' এখানে 'হে বনী ইসরাইল' বলে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স. এর সমসাময়িক মদীনাবাসী ইহুদীদেরকে। অর্থাৎ তাদেরকে লক্ষ্য করেই তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে তাদেরকে। কিন্তু এই অভিমতটি মেনে নিলে এক অনপনেয় জটিলতার সৃষ্টি হয়। কারণ আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। মক্কায় কোনো ইহুদী বাস করতো না। তাহলে এখানে ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হবে কেনো? অতএব এ কথা বলাই সমীচীন যে, এখানে 'হে বনী ইসরাইল বলে' ফেরাউনের খপ্পর থেকে উদ্ধারপ্রাপ্তদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আর সেই সম্বোধনটিই অবিকল উদ্ধৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। যদি তাই হয়, তবে বলতে হবে, আলোচ্য বাক্যের শুরুতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে 'কুলনা' (ফেরাউন ও তার লোকদেরকে সলিল সমাধিদানের পর আমি তাদেরকে বলেছিলাম) কথাটি।

'জ্বানিবাত্ তুরিল আইমান' অর্থ— তুর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে। এখানে 'জ্বানিবা' শব্দটি মাফউলে ফীহ (সন্নিহিত কর্মপদ), জরফে মাকান (আধারাধিকরণ কারক)। অর্থাৎ স্থানবাচক কর্মপদ। আর এখানে 'আলআইমান' (দক্ষিণ পার্শ্বে) শব্দটি 'জ্বানিবা' এর সিফাত বা বিশেষণ। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, পর্বতের ডান বাম বলে কিছু থাকে না। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে 'তুর পর্বতের দক্ষিণ পাশে' অর্থ হজরত মুসার গমনপথের ডান দিকে। আর এখানকার 'প্রতিশ্রুতি' কথাটির অর্থ হজরত মুসার সঙ্গে বাক্যালাপের এবং তওরাত শরীফ প্রদানের অঙ্গীকার। ওই অঙ্গীকারের সঙ্গে হজরত মুসার প্রতি এই নির্দেশটিও ছিলো যে, তুর পর্বতে তোমাকে আসতে হবে তোমার সম্প্রদায়ের সত্তর জন নেতাকে নিয়ে। তাই এখানে 'তুমি' না বলে বলা হয়েছে 'তোমাদেরকে।' কারণ তারাও ছিলো ওই প্রতিশ্রুতিভূত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের নিকট 'মান্না' ও 'সালওয়া' প্রেরণ করেছিলাম।' এ কথার অর্থ— ওই প্রতিশ্রুত সময়ে আমি তোমাদেরকে অনায়াস আহার্যরূপে প্রদান করেছিলাম 'মান্না' ও 'সালওয়া'।

এর পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'বলেছিলাম, তোমাদেরকে যা দান করলাম, তা থেকে ভালো ভালো বস্তু আহার করো।' এখানকার 'মিন্ ত্বয়্যিবাত্' কথাটির 'মিন্' বর্ণনামূলক, অথবা আংশিক অর্থ প্রকাশক। 'ত্বয়্যিবাত্' অর্থ ভালো ভালো বস্তু, সুস্বাদু ও হালাল খাদ্যদ্রব্য। উল্লেখ্য যে, মান্না ও সালওয়া হালাল তো ছিলোই, সুস্বাদুও ছিলো। 'রযাক্বনাকুম' অর্থ রিজিক হিসেবে তোমাদেরকে যা দান করলাম। উল্লেখ্য যে, সমগ্র সৃষ্টির সকল রিজিক আল্লাহ্ই দিয়ে থাকেন। তবু এখানে 'রিজিক হিসেবে যা দান করলাম' এ কথা বলে আল্লাহ্ নিজেকে রিজিক

www.eelm.weebly.com

দাতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মান্না ও সালওয়া যে বিশেষ ও শ্রেষ্ঠ রিজিক, সে কথা বোঝানোর উদ্দেশ্যেই কথাটি তিনি এখানে এভাবে স্পষ্ট করে একথা উল্লেখ করে দিয়েছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন কোরো না, করলে, তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত, সে তো ধ্বংস হয়ে যায়।' একথার অর্থ— এবং আহার্যরূপে আমার দেয়া এই নেয়ামতের অপব্যবহার কোরো না। অপচয় কোরো না। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ কোরো না। অকৃতজ্ঞ হয়ো না এবং শরিয়তের বিধান লংঘন কোরো না। যদি করো, তবে তোমরা হবে আমার অনিবার্য ক্রোধের লক্ষ্যস্থল। আর যার উপরে আমার ক্রোধ অনিবার্য হয়, তার ধ্বংস সুনিশ্চিত।

'ইয়াহ্লিল' অর্থ অবধারিত হওয়া। ক্বারী আ'মাশ ও ক্বারী কুসাই শব্দটিকে পড়তেন— 'ইয়াহ্লুল'। শব্দটি এসেছে 'হুলুল' থেকে। এর অর্থ অবতীর্ণ হওয়া বা পতিত হওয়া। 'হাওয়া' অর্থ ধ্বংস হয়ে যাওয়া, অগ্নিতে নিপতিত হওয়া। এভাবে শেষ বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— যার উপর আমার গজব অবধারিত হয়, সেতো ধ্বংস হয়ে যায়, নিপতিত হয় অগ্নিকুণ্ডে।

এর পরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে।' এখানে 'তাবা' অর্থ যে তওবা করে, অংশীবাদিতা ও অন্যান্য বৃহৎ পাপ থেকে ইমানের পথে ফিরে আসে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে। 'আমানা' অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলগণ কর্তৃক আনীত বিধানাবলীর উপরে ইমান আনে বা বিশ্বাস স্থাপন করে। 'আ'মিলা সলিহান' অর্থ সৎকর্ম করে। আর 'ইহ্তাদা' অর্থ সৎপথে অবিচলিত থাকে। অবশ্য আলেমগণ এই শেষোক্ত কথাটির বিভিন্ন রকম অর্থ করেছেন। যেমন, আতা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ— সে যেনো একথা মনে রাখে যে, আমি ইমান ও হেদায়েত পেয়েছি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে ও দয়ায়। কাতাদা ও সুফিয়ান সওরী অর্থ করেছেন— শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত সে যেনো প্রতিষ্ঠিত থাকে ইসলামের উপর। শা'বী, মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, এখানে 'ইহ্তাদা' কথাটির অর্থ— সে যেনো একথা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবশ্যই আমি আমার বিশ্বাস ও পুণ্য কর্মের যথাপুরস্কার লাভ করবো। জায়েদ বিন আসলাম বলেছেন, কথাটির অর্থ— তার আমল যেনো হয় তার অর্জিত এলেমের অনুকূল। জুহাক বলেছেন, সে যেনো আমৃত্যু অধিষ্ঠিত থাকে হেদায়েতের উপর। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, সে যেনো সতত দণ্ডায়মান থাকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আদর্শের উপর। আমি বলি, কথাটির মর্মার্থ হবে— সে যেনো আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য থাকে সদা তৎপর। মুহুর্মুহু যেনো উড়াল দিতে থাকে মহব্বত ও মারেফাতের রহস্যময় ও অন্তহীন আকাশে, যার স্বরূপ অবর্ণনীয়।

www.eelm.weebly.com

وَمَآ اَعۡجَلَكَ عَنۡ قَوۡمِكَ يٰمُوۡسٰى ○ قَالَ هُمۡ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىۡ وَعَجِلۡتُ
اِلَيۡكَ رَبِّ لِتَرۡضٰى ○ قَالَ فَاِنَّا قَدۡ فَتَنَّا قَوۡمَكَ مِنۡۢ بَعۡدِكَ وَ
اَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ○ فَرَجَعَ مُوۡسٰۤى اِلٰى قَوۡمِهٖ غَضۡبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ
يٰقَوۡمِ اَلَمۡ يَعِدۡكُمۡ رَبُّكُمۡ وَعۡدًا حَسَنًا ۚ اَفَطَالَ عَلَيۡكُمُ الۡعَهۡدُ اَمۡ اَرَدۡتُّمۡ اَنۡ
يَّحِلَّ عَلَيۡكُمۡ غَضَبٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ فَاَخۡلَفۡتُمۡ مَّوۡعِدِىۡ ○ قَالُوۡا مَآ اَخۡلَفۡنَا
مَوۡعِدَكَ بِمَلۡكِنَا وَلٰـكِنَّا حُمِّلۡنَاۤ اَوۡزَارًا مِّنۡ زِيۡنَةِ الۡقَوۡمِ فَقَذَفۡنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلۡقَى
السَّامِرِىُّ ○ فَاَخۡرَجَ لَهُمۡ عِجۡلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوۡا هٰذَاۤ اِلٰهُكُمۡ وَاِلٰهُ مُوۡسٰى ۙ فَنَسِىَ
اَفَلَا يَرَوۡنَ اَلَّا يَرۡجِعُ اِلَيۡهِمۡ قَوۡلًا ۙ وَّلَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ ضَرًّا وَّلَا نَفۡعًا ○

❒ হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলিয়া তোমাকে ত্বরা করিতে বাধ্য করিল কিসে?

❒ সে বলিল, 'এই তো উহারা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি ত্বরায় তোমার নিকট আসিলাম, তুমি সন্তুষ্ট হইবে এই জন্য।'

❒ তিনি বলিলেন, 'আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করিয়াছি তোমার চলিয়া আসার পর এবং সামেরী উহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে।'

❒ অতঃপর মূসা তাহার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া। সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদিগের প্রতিপালক কি তোমাদিগকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নাই? তবে কি প্রতিশ্রুত কাল তোমাদিগের নিকট সুদীর্ঘ হইয়াছে না তোমরা চাহিয়াছ তোমাদিগের প্রতি অবধারিত হউক তোমাদিগের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভংগ করিলে?'

❒ উহারা বলিল, 'আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভংগ করি নাই তবে আমাদিগের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা উহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করে।

www.eelm.weebly.com

❐ 'অতঃপর সে উহাদিগের জন্য গড়িল এক গো-বৎস, এক অবয়ব, যাহা গরুর শব্দ করিত; উহারা বলিল, 'ইহা তোমাদিগের ইলাহ্ এবং মূসারও ইলাহ্ কিন্তু মূসা ভুলিয়া গিয়াছে।

❐ তবে কি উহারা ভাবিয়া দেখে না যে উহা তাহাদিগের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাহাদিগের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করিবার ক্ষমতাও রাখে না?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত মুসা যখন আল্লাহ্‌র সন্নিধান, একান্ত আলাপন ও তওরাত প্রদানের প্রতিশ্রুতি ও অনুমতি পেলেন, তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের সত্তর জন নেতাকে নিয়ে যাত্রা করলেন তুর পর্বতের দিকে। যতই সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকলেন, ততই তাঁর উপরে প্রবল হতে থাকলো পবিত্র প্রেমের পরিপ্লাবন ও উদ্বেলন। আল্লাহ্‌র মহব্বতে দেওয়ানা হয়ে একসময় তিনি সঙ্গী সাথীদেরকে পিছনে ফেলে দ্রুত ছুটে গেলেন কাঙ্খিত উপত্যকায়। তখন আল্লাহ্ প্রশ্ন করলেন, হে আমার মুসা! তুমি তোমার সঙ্গীদেরকে ফেলে এভাবে আগে চলে এলে কেনো?

আমি বলি, প্রশ্নটির মাধ্যমে এখানে দ্রুত ছুটে আসার কারণ জানতে চাওয়া হয়নি। ভর্ৎসনা জানানোও প্রশ্নটির উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রেমপথের একটি চিরন্তন আকুতি এখানে উত্থাপিত হয়েছে প্রশ্নাকারে। 'কেবল তোমার জন্য'— এরকম প্রেমাপ্লুত উচ্চারণ শুনবার জন্যই প্রেমাস্পদ তার প্রেমিককে বলে 'কেনো এলে?' এখানকার প্রশ্নটিও সেরকম। কিন্তু হজরত মুসা আল্লাহ্‌র মহান প্রেমিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন মহান রসুলের দায়িত্বপ্রাপ্তও বটেন। তাই সঙ্গী সাথীদেরকে ফেলে আসা দায়িত্বের দিক থেকে নিশ্চয় একটি স্খলনও। তাই প্রশ্নটিতে মিশ্রিত হয়েছে নিকটজনোচিত মৃদু উষ্মাও। সেকারণেই হজরত মুসা প্রশ্নটির জবাব দিয়েছেন ভারসাম্যমূলকভাবে, প্রেমানুরাগ ও দায়িত্ববোধের অভিধায়।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'সে বললো, এই তো তারা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি ত্বরায় তোমার নিকটে এলাম, তুমি সন্তুষ্ট হবে এজন্যে।' একথার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, আমার সঙ্গীসাথীরা তো আমার পিছনে পিছনে আসছে। আর হে আমার প্রেমাস্পদ, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি পরিতুষ্ট হবে বলেই তো আমি এতো দ্রুত তোমার কাছে এলাম। উল্লেখ্য যে, 'ওরা আমার পশ্চাতে'— একথা হজরত মুসা বলেছিলেন অনুমান করে।

আর এখানে 'তোমার কাছে এলাম' কথাটির অর্থ— আমি এলাম তোমার প্রতিশ্রুত, অনুমোদিত ও নির্দেশিত স্থানে।

'লিতারদ্বা' অর্থ তুমি সন্তুষ্ট হবে বলে। কেউ কেউ বলেছেন, অঙ্গীকার পূরণ ও নির্দেশ বাস্তবায়নে তৎপর হলে আল্লাহ্ খুশী হবেন— এই ছিলো হজরত মুসার ধারণা। তাই তিনি এখানে বলেছেন— 'লিতারদ্বা' (তুমি সন্তুষ্ট হবে, এজন্যে)।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি তোমার চলে আসার পর।' এখানে 'ফাতান্না' অর্থ পরীক্ষা করেছি। 'ফাতান' অর্থ পরীক্ষা করা। হজরত মুসা তুর পর্বতে আগমনের পর সামেরী নামের এক লোক বনী ইসরাইলের অধিকাংশ লোককে মূর্তিপূজক বানিয়ে দিয়েছিলো। তাদের ওই পথভ্রষ্টতাকেই এখানে বলা হয়েছে 'ফাতান্না' বা পরীক্ষা করেছি।

এখানে 'ফাইন্না' শব্দটির 'ফা' অক্ষরটি কারণপ্রকাশক। অর্থাৎ এর পরবর্তী বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের কারণ। সুতরাং এখানে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে মুসা! তোমার দ্রুত এখানে চলে আসার কারণে তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তোমার এভাবে চলে আসাই হয়ে গিয়েছে তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে— হজরত মুসা যদি দ্রুত না এসে স্বাভাবিক গতিতে সম্প্রদায়ের নেতাদেরকে সঙ্গে করে তুর পর্বতে আসতেন, তবে কি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা পথভ্রষ্ট হতো না? এর উত্তরে আমি বলি, নবী-রসুলগণের প্রধান দায়িত্ব দু'টি। একটি হচ্ছে— মানুষকে আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্মের বিধানাবলী শিক্ষা দান এবং তার বাস্তবায়ন। আর অপরটি হচ্ছে— আত্মিক আকর্ষণের দ্বারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে পরিচালনা এবং তাদের অন্তর্জগতে ইমান ও মারেফাতের নূর নিক্ষেপ। এ দু'টো দায়িত্বের পরিপূর্ণ সমন্বয় ঘটলে সর্বসমক্ষে ফুটে ওঠে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য। কিন্তু দ্বিতীয় ফরজ দায়িত্বটি পরিপূর্ণরূপে পালিত হতে পারে তখনই, যখন তাঁরা সৃষ্টিকুলের প্রতি পরিপূর্ণরূপে মনোনিবদ্ধ করেন। কিন্তু তুর পর্বতে দ্রুত গমনের সময় হজরত মুসা ছিলেন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র প্রেমানুরাগে মগ্ন। তাই তখন তাঁর আত্মিক তাওয়াজ্জোহ্ তাঁর উম্মতের প্রতি পরিপূর্ণরূপে ছিলো না। একারণেই তারা হয়ে পড়েছিলো পথচ্যুত। সুফী-সাধকগণের অনেকেই কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রেমে পরিপূর্ণরূপে নিমজ্জিত হওয়াকেই (বেলায়েতকেই) সর্বোচ্চ সিদ্ধি বলে মনে করে থাকেন। তাঁরা বলেন, বেলায়েত আল্লাহ্‌মুখী এবং নবুয়ত মখলুকমুখী। তাই বেলায়েত নবুয়ত অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রহঃ) বলেছেন, নবুয়ত সর্বাবস্থায় বেলায়েত থেকে উত্তম— সে বেলায়েত নবী, ওলীআল্লাহ্, ফেরেশতা যে কারো হোক না কেনো। কেননা বেলায়েত হচ্ছে তাজাল্লিয়ে সেফাতের (আল্লাহ্‌র গুণবত্তার জ্যোতিসম্পাতের) নাম। আর নবুয়ত হচ্ছে তাজাল্লিয়ে জাত (আল্লাহ্‌র সত্তাগত জ্যোতিসম্পাত)। তিনি আরো বলেন, নবুয়ত ও বেলায়েত উভয়ের রয়েছে দুইটি দিক— উর্ধ্বারোহণ ও অবরোহণ। উর্ধ্বারোহণ আল্লাহ্‌মুখী এবং অবরোহণ মখলুকমুখী। নবী ও ওলীগণ উর্ধ্বারোহণের সময় নূর আহরণ করেন এবং তা বিতরণ করেন অবরোহণকালে। তাই মখলুক উপকৃত হতে পারে তাঁদের

www.eelm.weebly.com

অবরোহনের সময়। তবে উর্ধ্বারোহণের সময় ওলীগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে তাজাল্লিয়ে সেফাতের প্রতি, তাজাল্লিয়ে জাত পর্যন্ত তাঁরা পৌছতে সক্ষম হন না। ফলে অবরোহণের সময় তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টির প্রতি মনোনিবদ্ধ করতে পারেন না। কারণ তখনও তাঁদের উর্ধ্বারোহণের প্রভাব কিছু না কিছু থেকেই যায়। কিন্তু নবীগণের অবরোহণ এরকম নয়। অবরোহণের পর তাঁরা সৃষ্টির প্রতি পরিপূর্ণরূপে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারেন। তাই বাহ্যত মনে হয় তাঁরা সাধারণ মানুষের মতো আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত। এমতো অবস্থা হয় তাঁদের জন্য অসহনীয়। কিন্তু তখন তাঁদের করার কিছুই আর থাকে না। কারণ তাঁরা যে নবী। মানুষের কাণ্ডারী ও পথপ্রদর্শক। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে— সৃষ্টির প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হন না। কেনো হবেন? তাঁরা যে আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন। তাই বলা যেতে পারে, সৃষ্টির প্রতি সম্পূর্ণরূপে মনোনিবদ্ধ করার সময়ও তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবদ্ধকারী। কেননা তাঁরা স্বেচ্ছায় নয়, মখলুকের প্রতি মনোনিবদ্ধ করেছেন আল্লাহ্‌র নির্দেশে। তাই তাঁদের এমতো অবরোহণকে বলে আল্লাহ্‌র হুকুমে ও ইচ্ছায় অবরোহণ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাবর্তন (সায়ের মিনাল্লাহ্ বিল্লাহ্)। উল্লেখ্য যে, এই প্রসঙ্গটি আমি সুরা আলাম নাশরাহ্ এর তাফসীরে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরকম হতে পারে যে— আল্লাহ্ তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করলেন। একান্তে বাক্যালাপ করলেন তাঁর প্রেমিক শ্রেষ্ঠ হজরত মুসার সঙ্গে। তারপর দান করলেন তওরাত। শেষে বললেন— হে মুসা! এবার তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে ফিরে যাও। তোমার অবর্তমানে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম। কিন্তু তারা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি, হয়ে গিয়েছে পদস্খলিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।' উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ যেমন পথ-প্রদর্শন করেন, তেমনি করেন পথভ্রষ্ট। তিনিই ভালো ও মন্দ উভয় কর্মের স্রষ্টা। সৃজনের অধিকার ও ক্ষমতা তিনি ছাড়া অন্য কারোই নেই। তাই বলতে হয়, বনী ইসরাইলদের মধ্যে পথভ্রষ্টতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন তিনিই। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি।' কিন্তু আল্লাহ্ পথভ্রষ্টতার স্রষ্টা হলেও এর বাস্তবায়নের মাধ্যম ও কারণ ছিলো সামেরী। তাই সে কথা শেষে বলা হয়েছে এভাবে 'সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।'

বাগবী লিখেছেন, বনী ইসরাইলের সংখ্যা ছিলো ছয় লক্ষ। বারো হাজার ব্যতীত তাদের বাকী সকলেই গো-বৎসের মূর্তি পূজা করে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। আর ওই মূর্তিপূজা তাদেরকে শিখিয়েছিলো সামেরী। কামুস রচয়িতা

www.eelm.weebly.com

লিখেছেন, সামেরী ছিলো সামেরা গোত্রভূত। সে ছিলো কিরমান অঞ্চলের লোক। অথবা বনী ইসরাইলের কোনো নেতা। বায়যাবী লিখেছেন, বনী ইসরাইলের একটি গোত্রের নাম ছিলো সামেরা। সামেরী ছিলো ওই গোত্রসম্পৃক্ত। মুসা বিন তিফির ছিলো তার আসল নাম। সে ছিলো মহাকপট।

এর পরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'অতঃপর মুসা তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেলো ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে।' একথার অর্থ— তুর পর্বতে চল্লিশ দিন অবস্থানের পর আল্লাহ্‌র কথোপকথন ধন্য হজরত মুসা আল্লাহ্ প্রদত্ত তওরাত কিতাব নিয়ে যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে জ্ঞাত হলেন, তখন তিনি রোষ ও ক্ষোভ সহকারে প্রত্যাবর্তন করলেন তাদের কাছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতকাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা চেয়েছো তোমাদের প্রতি অবধারিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে?' এখানে 'উত্তম প্রতিশ্রুতি' অর্থ তওরাত কিতাব প্রদানের অঙ্গীকার— যা ছিলো হেদায়েত ও নূর। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— সম্প্রদায়ের লোকদেরকে গো-বৎসের মূর্তি পূজায় লিপ্ত দেখে হজরত মুসা তাদেরকে বললেন, কিছুদিন আগেই তো তোমরা ছিলে এক আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস স্থাপনকারী। ছিলে কেবল তাঁরই বিশুদ্ধ ও একনিষ্ঠ উপাসক। এই বিশ্বাসে ও কর্মে আজীবন প্রতিষ্ঠিত থাকার অঙ্গীকারও তোমরা আমার সঙ্গে করেছিলে। আমি কি খুব বেশীদিন তোমাদের কাছ থেকে পৃথক ছিলাম? আর তা যদি থাকিও, বিশুদ্ধ এককত্বকে ছেড়ে দিয়ে অংশীবাদিতাকে তোমরা গ্রহণ করবে কোন যুক্তিতে? সত্যকে পরিত্যাগ করে কেউ কি মিথ্যার আশ্রয় যাচনা করতে পারে। তোমরা না অঙ্গীকারাবদ্ধ। তবে তোমাদের এই অঙ্গীকার ভঙ্গের উদ্দেশ্য কী? তোমরা কি চাও, আল্লাহ্‌র গজব তোমাদের উপরে অবধারিত হোক? অংশীবাদীরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র গজব কবলিত।

এর পরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি।' একথার অর্থ — লোকেরা বললো, হে আমাদের রসুল! আপনার সঙ্গে আল্লাহ্‌র এককত্বে সুদৃঢ় থাকার যে অঙ্গীকার আমরা করেছিলাম, সে অঙ্গীকার আমরা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। এখানে 'মালকিনা' অর্থ স্বেচ্ছায় করিনি। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'মালাকুন;' 'মিলকুন' ও 'মুলকুন' শব্দত্রয় সমঅর্থসম্পন্ন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরীক্ষায় নিপতিত হলে মানুষ সাধারণতঃ আপন অভিপ্রায়ের উপরে অটল থাকতে পারে না। তাই তারা তখন বলেছিলো— আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে আমাদের উপরে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা তা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করে।' উল্লেখ্য যে, কিবতীরা বনী ইসরাইলদের নিকটে বিভিন্ন অলংকারপত্র গচ্ছিত রাখতো। রাতের অন্ধকারে মিসর ছেড়ে চলে আসার সময়ে তারা আর সেগুলোকে প্রত্যর্পণ করতে পারেনি। সঙ্গে করে নিয়ে আসা সে সমস্ত অলংকারকেই বনী ইসরাইলেরা তখন বলেছিলো 'অলংকারের বোঝা।' 'যীনাতুল ক্বওমী' বলে এখানে ওই অলংকারগুলোর কথা বলা হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম এরকমই বর্ণনা করেছেন। বাগবী লিখেছেন, বনী ইসরাইলেরা ওই অলংকারগুলোকে 'চাপিয়ে দেয়া বোঝা' একারণেই বলেছিলো যে, তারা ওগুলো নিয়েছিলো কর্জরূপে, যা আর ফেরত দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কারণ ওই অলংকারের মালিকদের সকলেরই ঘটেছিলো সলিল সমাধি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফেরাউন ও তাহার বাহিনীর সমুদ্রনিমজ্জনের পর সমুদ্র তাদের সকল অলংকার নিক্ষেপ করেছিলো বেলাভূমিতে। বনী ইসরাইলেরা সেই অলংকারগুলো কুড়িয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু এরকম কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ তাদের শরিয়তে বৈধ ছিলো না। তাই তারা অলংকারগুলোকে বলেছিলো বোঝা।

'ফাক্বাজাফ্নাহা' অর্থ আমরা নিক্ষেপ করেছি। অর্থাৎ নিক্ষেপ করেছি একটি গর্তে। বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, সামেরীর পরামর্শক্রমেই তারা একটি গর্ত খুঁড়ে সেগুলোকে নিক্ষেপ করেছিলো তার মধ্যে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো—অলংকারগুলো এভাবেই থাকুক। হজরত মুসা তূর পর্বত থেকে ফিরে এসে এর যা কিছু একটি বিহিত করবেন।

বিশ্বাসভাজন হওয়ার অপচেষ্টায় সামেরীও তার অলংকারগুলো নিক্ষেপ করেছিলো ওই গর্তের মধ্যে। তাই এখানে বলা হয়েছে—'অনুরূপভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করে'। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত হারূন একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে সবাইকে হুকুম দিয়েছিলেন তোমাদের কাছে রক্ষিত স্বর্ণালংকারগুলো এই আগুনে নিক্ষেপ করো। সকলেই তাঁর নির্দেশ পালন করলো। শেষে সামেরী নিক্ষেপ করলো এক মুঠো মাটি। ওই মাটি ছিলো হজরত জিবরাইলের ঘোড়ার পদস্পর্শধন্য। কাতাদা বলেছেন, ওই মাটিটুকু সামেরী লুকিয়ে রেখেছিলো তার পাগড়ির ভাঁজের মধ্যে।

পরের আয়াতে (৮৮) বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে তাদের জন্য গড়লো এক গো-বৎস, এক অবয়ব, যা গরুর শব্দ করতো, তারা বললো, এটা তোমাদের ইলাহ্ এবং মুসারও ইলাহ্, কিন্তু মুসা ভুলে গিয়েছে।' একথার অর্থ— তারপর ওই আগুনে পোড়া অলংকারগুলো গলিয়ে সামেরী নির্মাণ করলো একটি গো-

www.eelm.weebly.com

বৎসের মূর্তি। আর ওই গো-বৎস মূর্তিটি থেকে নির্গত হতে শুরু করলো গরুর মতো হাম্বা হাম্বা আওয়াজ। তখন সামেরী ও তার ভক্তরা বলতে শুরু করলো, এটাই তোমাদের আল্লাহ্ এবং মুসারও আল্লাহ্। কিন্তু মুসা এর কথা ভুলে গিয়ে তুর পর্বতে চলে গিয়েছে।

এর পরের আয়াতে(৮৯) বলা হয়েছে— 'তবে কি তারা ভেবে দেখেনা যে, ওই মূর্তিটি তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোনো ক্ষতি অথবা উপকার করবার ক্ষমতাও রাখে না?' এখানে উদ্ধৃত প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। প্রশ্নটির মাধ্যমে সামেরী ও তার অনুসারীদের অপবিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। বলা হয়েছে— নির্বোধেরা একথা কেনো অনুধাবন করতে পারে না যে, গো-বৎস মূর্তি কখনোই উপাস্য হতে পারে না? কেনো একথা বোঝে না যে, নিঃসাড় ওই মূর্তিটি কারো ক্ষতি অথবা উপকার করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন?

'আল্লা ইয়ারজ্বিউ' ইলাইহিম ক্বওলান' অর্থ— তা তাদের কথায় সাড়া দেয় না। এখানে 'আল্লা ইয়ারজিউ' কথাটির 'আল্লা ' শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'আন্না'। এই অব্যয়টির বিশেষ্য এখানে উহ্য রয়েছে। অব্যয়টিকে এখানে বসানো হয়েছে সংক্ষিপ্তরূপে। পূর্ণরূপটি ছিলো 'আন্নাহু'। অর্থাৎ 'আন্' এখানে 'নাসেবাহ্ মাস্দারিয়াহ্' (জবরপ্রদানকারী ধাতুমূল) নয়। তাই এরপর বসানো হয়েছে 'ইয়ারজ্বিউ'। আর 'ক্বওলান্' অর্থ ওই মূর্তিটি কথা বলতে পারে না। তার উপাসকদের কথার জবাবও দিতে পারে না। মূর্তিটিতো তার উপাসকদের চেয়েও অধিকতর অক্ষম। তাই এখানে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, নির্বোধেরা তবুও তাকে উপাস্য বলে মেনে নেয় কেনো?

'লা ইয়াম্লিকু লাহুম দ্বর্রাঁও লা নাফআ' অর্থ তাদের কোনো ক্ষতি অথবা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না। অর্থাৎ গো-বৎস মূর্তিটি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন। বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, সামেরী যখন গো-বৎস মূর্তিটি নির্মাণ করতে শুরু করলো, তখন হজরত হারুন সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, কি করছো? সামেরী বললো, আমি এমন জিনিস তৈরী করছি যা কল্যাণকর হবে, অকল্যাণকর কোনো কিছু আমি করবো না। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন। হজরত হারুন দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! এর মনোস্কামনা পূর্ণ করো। তাঁর এই দোয়া কবুল হয়ে গেলো। সামেরী গো-বৎস মূর্তিটি নির্মাণের পর সেটির মুখে লাগিয়ে দিলো হজরত জিবরাইলের অশ্বের পদস্পর্শধন্য সেই মাটিটুকু। তারপর বললো, আওয়াজসর্বস্ব বাছুর হয়ে যাও। তাই হলো। বাছুরটির মুখ থেকে নির্গত হতে শুরু করলো জীবিত বাছুরের মতো হাম্বা হাম্বা শব্দ। বস্তুতঃপক্ষে এটা ছিলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বনী ইসরাইলদের প্রতি আপতিত একটি পরীক্ষা।

www.eelm.weebly.com

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ
فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْۤا اَمْرِيْ ○ قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا
مُوْسٰى ○ قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْۤا ○ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ؕ اَفَعَصَيْتَ
اَمْرِيْ ○ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ
فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ○ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ○
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَ
كَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ○ قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ
لَا مِسَاسَ ۪ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰۤى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ؕ
لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ○ اِنَّمَاۤ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ
وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ○

❒ হারুন উহাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছিল 'হে আমার সম্প্রদায়! ইহা দ্বারা তো কেবল তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। তোমাদিগের প্রতিপালক দয়াময়, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মানিয়া চল।'

❒ উহারা বলিয়াছিল, 'আমাদিগের নিকট মূসা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আমরা ইহার পূজা হইতে কিছুতেই বিরত হইব না।'

❒ মূসা বলিল, 'হে হারুন! তুমি যখন দেখিলে উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করিল

❒ আমার অনুসরণ করা হইতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করিলে?'

❒ হারুন বলিল, 'হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করিও না; আমি আশংকা করিয়াছিলাম যে, তুমি বলিবে 'তুমি বনি ইসরাঈলদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ ও তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হও নাই।'

www.eelm.weebly.com

❒ মূসা বলিল, 'হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কী?

❒ সে বলিল, 'আমি দেখিয়াছিলাম যাহা উহারা দেখে নাই, অতঃপর আমি জিবরাঈলের পদচিহ্ন হইতে একমুষ্টি ধূলা লইয়াছিলাম এবং আমি উহা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম এবং আমার মন আমার জন্য শোভন করিয়াছিল এইরূপ করা।'

❒ মূসা বলিল, 'দূর হও, তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি বলিবে 'আমি অস্পৃশ্য' এবং তোমার জন্য রহিল এক নির্দিষ্ট কাল যাহার ব্যতিক্রম হইবে না এবং তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর যাহার পূজায় তুমি রত ছিলে, আমরা উহাকে জ্বালাইয়া দিবই অতঃপর উহাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করিবই।'

❒ তোমাদিগের ইলাহ্ তো কেবল আল্লাহ্ই যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, সর্ববিষয় তাঁহার জ্ঞানায়ত্ত;

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সামেরীর এমতো কুকর্ম দেখে হজরত হারূন হজরত মুসার প্রত্যাবর্তণের আগেই তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এই মর্মে সাবধান করলেন যে, হে আমার সম্প্রদায়! এটা দ্বারা কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। সুতরাং তোমরা ভুল কোরো না। প্রকৃত প্রভুপালকতো তিনিই, যাঁর দয়ায় তোমরা বেঁচে আছো এবং জীবনোপকরণ পেয়ে চলেছো। গো-বৎস মূর্তিটি তো তোমাদের চেয়েও নিম্নস্তরের এক সৃষ্টি। সুতরাং যদি তোমরা তোমাদের বিশ্বাসকে নিরাপদ রাখতে চাও, তবে আমার প্রদর্শিত পথে চলো এবং আমি যে আল্লাহ্র ইবাদত করতে বলি সেই আল্লাহ্কে মেনে নাও।

পরের আয়াতে (৯১) বলা হয়েছে— 'তারা বলেছিলো, আমাদের নিকট মুসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এ পূজা থেকে কিছুতেই বিরত হবো না।' একথা বলে অধিকাংশ লোক মেনে নিলো সামেরীকে। হজরত হারূন তাঁর বারো হাজার একনিষ্ঠ অনুসারীকে নিয়ে তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। এর কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরে এলেন হজরত মুসা। দূর থেকে তিনি শুনতে পেলেন হৈ হট্টগোলের আওয়াজ। তাঁর সঙ্গী নেতৃবৃন্দ বললো, মনে হয় নতুন কোনো ফেৎনা ছড়িয়ে পড়েছে। কাছাকাছি আসতেই হজরত মুসা দেখলেন, একটি গো-বৎস মূর্তির চার পাশে অনেক লোক নাচানাচি করছে। ইতোমধ্যে সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত হারূন। রোষান্বিত নবী তখন ডান হাত দিয়ে হজরত হারূনের মস্তকের কেশগুচ্ছ ধরলেন এবং বাম হাত দিয়ে ধরলেন তাঁর শ্মশ্রু।

এর পরের আয়াতদ্বয়ে (৯২, ৯৩) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, হে হারূন! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করলো আমার অনুসরণ করা থেকে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?' একথার অর্থ— রোষতপ্ত নবী তখন বললেন, হে হারূন! স্বচক্ষে মূর্তিপূজা করতে

www.eelm.weebly.com

দেখেও তুমি তাদেরকে নিবৃত্ত করলে না কেনো? কেনো সরে গেলে আমার আনুগত্য থেকে? তবে তুমিও কি আমার আদেশ লংঘনকারী? আমাকে তো তুমি বিষয়টি জানাতে পারতে। কেনো জানালে না?

এর পরের আয়াতে (৯৪) বলা হয়েছে— 'হারুন বললো, হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরে আকর্ষণ কোরো না; আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, তুমি বনী ইসরাইলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো ও তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হওনি।' একথার অর্থ— হজরত হারুন বললেন, হে আমার সহোদর! আমার মাথার চুল ও দাড়ি ছেড়ে দাও। আমি তাদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করিনি, এমতো সন্দেহকে প্রশ্রয় দিয়ো না। তুমি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলে, আমি যেনো তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করি। সে চেষ্টা আমি অবশ্যই করেছিলাম। তবে তা করেছিলাম কোমলতার সঙ্গে, কঠোরতার সঙ্গে নয়। কঠোরতা প্রদর্শন করলে পরিস্থিতি হয়ে পড়তো আরো অধিক সঙ্গিন। যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতো আমার অনুসারী ও সামেরীর অনুসারীদের মধ্যে। ঘটতো অনেক রক্তপাত। আমি রক্তপাত ঘটাতে চাইনি। নম্রতার মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম তাদেরকে। যদি রক্তপাত ঘটাতাম, তবে তুমিই শেষে বলতে, তুমি বনী ইসরাইলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো ও তুমি আমার নির্দেশ পালনে যত্নবান হওনি। 'ইয়াব্‌না উম্‌মা' অর্থ হে আমার সহোদর। অর্থাৎ হে আমার মায়ের পেটের ভাই। হজরত মুসার ক্রোধ প্রশমিত করবার জন্য হজরত হারুন এভাবে সম্বোধন করেছিলেন তাঁকে। সরাসরি 'হে ভাই' না বলে বলেছিলেন 'হে আমার সহোদর ।' কেউ কেউ বলেছেন, হজরত মুসা ও হজরত হারুন ছিলেন এক মায়ের সন্তান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁরা ছিলেন এক পিতা ও এক মাতার সন্তান।

এর পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কী?' একথার অর্থ— হজরত হারুনের কথা শুনে হজরত মুসা আত্মসংবরণ করলেন। জানতে পারলেন, সামেরীই এই অপকর্মটির হোতা। তাই তিনি এবার দৃষ্টিপাত করলেন সামেরীর দিকে। বললেন, হে সামেরী! তুমি এরকম করলে কেনো?

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'খত্ববুন,' অর্থ আহ্বান। শব্দটির মাধ্যমে সামেরীর নিকটে জানতে চাওয়া হয়েছে, তোমার এমতো কর্মের উদ্দেশ্য কি? কে তোমাকে এরকম করতে উদ্বুদ্ধ করলো? 'নিহায়াহ্' রচয়িতা লিখেছেন 'খত্ববা' অর্থ অবস্থা এবং ব্যাপার বা কারণ। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— তোমার ব্যাপার কী? যে সম্পর্কে সম্বোধন করা হয়, তার অবস্থা বা কারণকেও 'খত্ববা' বলা হয়। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'খত্ববা' অর্থ বৃহৎ বা ক্ষুদ্র উভয় কর্মের উদ্দেশ্য বা কারণ।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৯৬) বলা হয়েছে— ' সে বললো, আমি দেখেছিলাম, যা তারা দেখেনি, অতঃপর আমি জিবরাইলের পদচিহ্ন থেকে এক মুষ্টি ধুলা নিয়েছিলাম এবং আমি নিক্ষেপ করেছিলাম এবং আমার মন আমার জন্য শোভন করেছিলো এইরূপ করা।' 'কৃবদ্বাতুন' অর্থ এক মুষ্টি। এখানে শব্দটির অর্থ হবে এক মুঠো ধুলো বা মাটি। 'আছরির রসুল' অর্থ আল্লাহ্র দূতের অর্থাৎ হজরত জিবরাইলের অশ্বের পদচিহ্ন থেকে। 'ফানাবাজতুহা' অর্থ নিক্ষেপ করেছিলাম। অর্থাৎ ওই এক মুঠো মাটি আমি নিক্ষেপ করেছিলাম গো-বৎস মূর্তিটির মুখে।

কেউ কেউ বলেছেন, যে বছর ব্যাপকভাবে বনী ইসরাইলদের নবজাতকদেরকে হত্যা করা হয়, সামেরী জন্মগ্রহণ করেছিলো ওই বছরেই। জন্মের পর পরই তার মা তাকে রেখে এসেছিলো একটি গুহায়। আল্লাহ্ হজরত জিবরাইলকে দিয়েছিলেন তার লালন পালনের ভার। তাকে দিয়ে পরবর্তীতে বনী ইসরাইলদেরকে পরীক্ষা করাই ছিলো আল্লাহ্র ইচ্ছা। তাই তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিলো। হজরত জিবরাইলের তত্ত্বাবধানে বড় হয়ে উঠেছিলো বলেই সে হজরত জিবরাইলকে চিনতো। সে লক্ষ্য করেছিলো, হজরত জিবরাইলের অশ্বের পায়ের ছোঁয়ার মধ্যে রয়েছে সঞ্জিবনী শক্তি। তাই সে তার সংগ্রহে রেখে দিয়েছিলো তাঁর অশ্বের পদচিহ্নের কিছু মাটি। ওই মাটিটুকুই সে নিক্ষেপ করেছিলো গো-বৎস মূর্তিটির মুখে।

'আমার মন আমার জন্য শোভন করেছিলো এইরূপ করা' কথাটির অর্থ— আমার মনে হয়েছিলো গো-বৎস মূর্তি নির্মাণ করে তার মুখে ওই মাটিটুকু নিক্ষেপের মাধ্যমে মূর্তিটির মধ্যে জীবনের চিহ্ন ফুটিয়ে তোলা একটি অত্যুত্তম কর্ম।

এর পরের আয়াতে (৯৭) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, দূর হও, তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটাই রইলো যে, তুমি বলবে, আমি অস্পৃশ্য এবং তোমার জন্য রইলো এক নির্দিষ্ট কাল যার ব্যতিক্রম হবে না।' এ কথার অর্থ— হজরত মুসা সামেরীকে এইমর্মে অভিসম্পাত করলেন যে, পৃথিবীতে তোমার জন্য এই শাস্তি স্থিরিকৃত হলো মানুষ দেখলেই তুমি বলতে থাকবে 'আমি অস্পৃশ্য', 'আমাকে ছুঁয়ো না', 'আমার নিকটে এসো না। আমি বলি, হজরত মুসার অভিশাপে তার অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিলো জনাতঙ্ক। তাই সে জনমানবহীন অরণ্য ও মরুপ্রান্তরে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতো । ওই অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়।

বাগবী লিখেছেন, হজরত মুসা নির্দেশ জারী করেছিলেন, তার সাথে কেউ মেলামেশা কোরো না। হজরত ইবনে আব্বাস 'লা মিসাসা' (আমি অস্পৃশ্য) কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, ওই ঘটনার পর থেকে সামেরী মানুষ দেখলেই বলতো, খবরদার! আমাকে কেউ স্পর্শ কোরো না। আমি অস্পৃশ্য।

www.eelm.weebly.com

'তোমার জন্য রইলো এক নির্দিষ্ট কাল যার ব্যতিক্রম হবে না' কথাটির অর্থ এখানে— দুনিয়ার শাস্তির মাধ্যমেও তোমার পাপ মোচন হবে না, আখেরাতেও রয়েছে তোমার জন্য সুদীর্ঘকালের সুনির্দিষ্ট শাস্তি। অর্থাৎ অনন্ত শাস্তি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য করো, যার পূজায় তুমি রত ছিলে, আমরা সেটিকে জ্বালিয়ে দিবোই, অতঃপর সেটিকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবোই'। একথার অর্থ— এবং হে সামেরী! তুমি দেখতে থাকো, তোমার পূজিত মূর্তিটিকে আমরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করবো। তারপর ওই চূর্ণ-বিচূর্ণ ভস্মগুলোকে নিক্ষেপ করবো সাগরে। উল্লেখ্য যে, নির্বোধদেরকে সচেতন করে তুলবার জন্য হজরত মুসা এরকমই করেছিলেন।

শেষোক্ত আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'তোমাদের ইলাহ্ তো কেবল আল্লাহ্ই, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই, সর্ববিষয় তাঁর জ্ঞানায়ত্ব'। একথার অর্থ—আল্লাহ্ই তোমাদের উপাসনা লাভের একক অধিকারী। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। সৃষ্টির কেউ বা কোনো কিছু তাঁর সমকক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা অংশীদার হতে পারে না। গো-বৎস মূর্তিটিও নয়।

সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ۝ مَنْ اَعْرَضَ
عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ؕ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ۝ يَّوْمَ يُنْفَخُ
فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝ يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا
عَشْرًا ۝ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ۝

❒ পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহার সংবাদ আমি এইভাবে তোমার নিকট বিবৃত করিব এবং আমি আমার নিকট হইতে তোমাকে দান করিয়াছি কুরআন,

❒ ইহা হইতে যে বিমুখ হইবে সে কিয়ামতের দিনে মহা পাপভার বহন করিবে।

❒ উহাতে উহারা স্থায়ী হইবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা উহাদিগের জন্য হইবে কত মন্দ।

❒ যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেইদিন আমি অপরাধিগণকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করিব।

www.eelm.weebly.com

❒ উহারা নিজদিগের মধ্যে চুপিচুপি বলাবলি করিবে 'তোমরা পৃথিবীতে মাত্র দশ দিন অবস্থান করিয়াছিলে।'

❒ উহারা কি বলিবে তাহা আমি ভাল জানি, উহাদিগের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল সে বলিবে 'তোমরা মাত্র এক দিন অবস্থান করিয়াছিলে।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পূর্বে যা ঘটেছে, তার সংবাদ আমি এভাবে তোমার নিকট বিবৃত করবো এবং আমি আমার নিকট থেকে তোমাকে দান করেছি কোরআন'। রসুল স. কে লক্ষ্য করে এখানে বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! এই হলো নবী মুসা ও তার সম্প্রদায়ের একটি কাহিনী। অতীত যুগের এরকম আরো অনেক উপদেশপূর্ণ বৃত্তান্ত এই কোরআনের মাধ্যমে আমি আপনাকে অবহিত করে চলেছি, যেনো এগুলো হয় আপনার নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ, মোজেজা ও আপনার উম্মতের বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের জন্য সদুপদেশ ও সচেতনতা। আর এই কোরআন আমি দান করেছি আপনাকেই।

এখানে 'জিকরা' শব্দটির অর্থ কোরআন মজীদ, অথবা সদুপদেশ, যা গ্রহণযোগ্য। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, এখানে 'জিকরা' কথাটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে রসুল স. সম্পর্কিত আলোচনা, তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম বর্ণনা, যা চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। এই অভিমতটি গ্রহণ করলে শেষ বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আমি আমার পক্ষ থেকে আপনাকে দান করেছি প্রবহমান প্রসিদ্ধি ও মহিমা। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আমি আপনার জিকিরকে আমার জিকিরের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছি— কলেমায়, আজানে, ইকামতে, তাশাহ্হুদে এবং ধর্মসম্পর্কিত অন্যান্য আলোচনায়।

এর পরের আয়াতে (১০০) বলা হয়েছে— 'এ থেকে যে বিমুখ হবে, সে কিয়ামতের দিনে মহাপাপভার বহন করবে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার প্রতি আমি যে কোরআন অবতীর্ণ করেছি, সেই কোরআন থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নিবে, কথা ও কাজে কোরআনের বিধান যে মান্য করবে না, মহা বিচারের দিবসে সে বহন করবে বিশাল পাপের বোঝা।

এখানকার 'আনহু' কথাটির 'হু' সর্বনামটি আল্লাহ্র সঙ্গে অথবা পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে উল্লেখিত 'জিক্রা' কথাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায় এরকম— যে বিমুখ হবে আমার স্মরণ থেকে, অথবা (হে রসুল) আপনার মহিমা থেকে।

'বিযরা' অর্থ পাপের বোঝা বা ভার। এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'ওয়াফদা'। যেমন সুরা মারয়ামের এক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে— 'ইয়াওমা নাহ্শুরুল মুত্তাক্বীনা ইলার রহমানি ওয়াফদা' (যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে সমবেত করা হবে সম্মানিত অতিথিরূপে)। এই আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে আমি হজরত আমর বিন কায়েস মালায়ী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেছি,

www.eelm.weebly.com

যেখানে বলা হয়েছে, কাফেরের সমাধির অভ্যন্তরে তার পাপকর্মগুলো হাজির হবে অত্যন্ত দূর্গন্ধযুক্ত বীভৎস আকৃতিতে এবং তাকে বলবে, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো? সে উত্তর দিবে, না। শুধু এতটুকুই জানি যে, তুমি অত্যন্ত কুৎসিৎ আকৃতি বিশিষ্ট ও দুর্গন্ধময়। আকৃতিটি বলবে, আমি দুনিয়াতেও এরকম ছিলাম। আমি তোমার মন্দ আমল। দুনিয়ায় তুমি দীর্ঘকাল ধরে আমার উপরে সওয়ার হয়ে ছিলে, এখন আমি তোমার উপর সওয়ার হবো। শেষে রয়েছে এ কথাটি— রসুল স. পাঠ করলেন— তারা তাদের পৃষ্ঠদেশে নিজেদের পাপ বহন করবে (সুরা আনআম)।

পাপকে এখানে বলা হয়েছে বোঝা বা ভার। ঘাড়ে বা পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে চলা অত্যন্ত কষ্টকর। ভারী পাপের বোঝা নিয়ে সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপিষ্ঠরাও এরকম অসহ্য কষ্টের মধ্যে পড়বে। ওই দুর্বহ ও অসহ কষ্ট থেকে তারা সেদিন কেউই নিষ্কৃতিও পাবে না।

আলোচ্য আয়াতের অর্থ এরকমও হতে পারে যে— যে ব্যক্তি আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল ও আল্লাহ্র কোরআন থেকে বিমুখ হবে, কিয়ামতের দিন তার কাঁধে উঠিয়ে দেয়া হবে ওই সকল সম্পদের বোঝা, যা তারা পৃথিবীতে অবৈধ উপায়ে উপার্জন করেছিলো। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ কোরো না। যদি করো, তবে মহা বিচারের দিবসে ওই সম্পদ তোমার উপরে চেপে বসবে। আমি সেদিন যেনো তোমাদের কাউকে গাভী ও উটের মতো চিৎকার করে কাঁদতে না শুনি। আবু হুমাইদ সাঈদী সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে দখলে রাখবে, কিয়ামতের দিন তার উপরে চাপিয়ে দেয়া হবে সপ্তস্তর বিশিষ্ট মৃত্তিকার বোঝা। হজরত হাকাম বিন হারেছ সালমী থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের চলার পথের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী পরিমাণ জমি অবৈধভাবে দখল করবে, মহাবিচারের দিবসে তাকে উপস্থিত হতে হবে সাত তবক জমিনের বোঝা নিয়ে।

হজরত ইয়া'লী বিন মুররাহ্ থেকে ইমাম আহমদ ও তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অপরের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার স্কন্ধে ঝুলিয়ে দিবেন সাত তবক জমিনের বোঝা। সকল মানুষের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে ওভাবেই রাখা হবে। হজরত আনাস থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি কারো কনিষ্ঠা অঙ্গুলী পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে ভোগ

www.eelm.weebly.com

করবে, হাশরের প্রান্তরে সে উপস্থিত হবে সশুন্তর বিশিষ্ট বোঝা ঘাড়ে নিয়ে। হজরত আবু মালেক আশআরী থেকে ইমাম আহমদ এবং তিবরানীও এরকম হাদিস উল্লেখ করেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইমাম আহমদ, বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একদিন বক্তৃতা দানের জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং গনিমতের মাল আত্মসাতের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। শেষে বললেন, সে দিন আমি যেনো কাউকে ভারী বোঝাবাহী উটের মতো অসহায় অবস্থায় না দেখি। এরকমও যেনো বলতে না শুনি যে, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমাকে সাহায্য করুন। এরকম কথা শুনলে আমি জবাবে বলবো, এখন তোমাদের জন্য আমি কিছুই করতে পারবো না। আমি তো এ সম্পর্কে তোমাদেরকে পূর্বাহ্নেই অবহিত করেছিলাম। এই হাদিসে বোঝাবাহী অশ্ব ও ছাগলের উল্লেখও এসেছে। হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে আবু ইয়া'লী ও বাযযারও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। জাকাতের মাল আত্মসাতের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে হাদিস বর্ননা করেছেন ইমাম আহমদ হজরত সা'দ বিন উবাদা থেকে, বায্যার হজরত ইবনে ওমর, হজরত আয়েশা থেকে এবং তিবরানী হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত উবাদা ইবনে সামেত এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে।

আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' পুস্তকে এবং তিবরানী শিথিল সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘর-বাড়ি বানায়, কিয়ামতের দিন তাকে বহন করতে হবে ওই অতিরিক্ত ঘর-বাড়ির বোঝা। হজরত আনাস থেকে উত্তমসূত্রে আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার এক আনসারীর নির্মাণাধীন বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে হাত দিয়ে নিজের মাথার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, যে অট্টালিকা এর চেয়ে অতিরিক্ত হবে, কিয়ামতের দিন সেই অট্টালিকা তার মালিকের জন্য ডেকে আনবে বিপদ। বাড়ির মালিক রসুল স. এর এই মন্তব্য শুনতে পাওয়ার সাথে সাথে অট্টালিকাটি গুঁড়িয়ে দিলেন। হজরত ওয়াসেলাহ্ বিন আসকা থেকে তিবরানীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

মুনজারী বলেছেন, বর্ণিত হাদিসের অনুরূপ হাদিস তিবরানীর আলআওসাত গ্রন্থেও রয়েছে। হাদিসটি এই— হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার এক কূপের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। কূপটির পানি ওঠানো হচ্ছিলো। তাই দেখে তিনি স. বললেন, এই কূপের মালিক যদি কূপের হক আদায় না করে, তবে তাকে বিচার দিবসে এই কূপের বোঝা বহন করতে হবে।

এর পরের আয়াতে (১০১) বলা হয়েছে— 'তাতে তারা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্য হবে কতো মন্দ।'

এর পরের আয়াতে (১০২) বলা হয়েছে— 'যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করবো।'

www.eelm.weebly.com

হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক বেদুইন এসে একবার রসুল স. কে শিঙ্গা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি স. বললেন, শিঙ্গা হচ্ছে শিঙের মতো, যার মধ্যে ফুৎকার দেয়া হবে। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, হাকেম,বায়হাকী, ইবনে মোবারক। হাদিসটিকে উত্তমসূত্রবিশিষ্ট এবং যথাসূত্রসম্বলিত বলেছেন যথাক্রমে নাসাঈ ও হাকেম। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে মুসাদ্দাদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

এখানে 'যুরক্বা' কথাটির অর্থ নীলচক্ষুবিশিষ্ট। চক্ষুগোলকের কালো বর্ণের সঙ্গে নীলবর্ণের আভা পরিদৃষ্ট হলে তাকে বলে 'যুরক্বা'। রোমবাসীদের চক্ষু ছিলো এরকম। তারা ছিলো আরবদের দুশমন। তাই আরববাসীরা তাদেরকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। কিয়ামতের দিন কাফেরদের চেহারা হবে কালো এবং চক্ষু হবে নীল বর্ণের। কোরআনের কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, শব্দটির অর্থ দৃষ্টিহীন বা অন্ধ। কিয়ামতের দিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্ধ হওয়ার কথা অন্য আয়াতেও এসেছে। যেমন— 'কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে অন্ধ করে ওঠাবো।' কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ তৃষিত নয়ন।

এর পরের আয়াতে (১০৩) বলা হয়েছে— 'তারা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি বলাবলি করবে, তোমরা পৃথিবীতে মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে।'

সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হবে ভীতসন্ত্রস্ত। তাই তারা চুপি চুপি একে অপরকে বলবে, তোমরা দুনিয়ায় তো ছিলে মাত্র দশ রাত্রি বা দশ দিন। অর্থাৎ অতি দ্রুত শেষ হয়ে গিয়েছে তোমাদের পৃথিবীর জীবন। তারা তখন বুঝতে পারবে, পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাতের জীবন অনন্ত। তাই তারা এরকম মন্তব্য করবে। অথবা অসহনীয় কষ্টের কারণে তাদের তখন মনে হবে, হায় আক্ষেপ! পৃথিবীর সামান্য কয়েকদিনের জীবন আমরা স্বেচ্ছাচারিতা এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূরণের জন্য ব্যয় করেছি, আখেরাতের সাফল্যের জন্য কিছুই করিনি।

কোনো কোনো কোরআন ভাষ্যকার বলেছেন, তখন তারা তাদের কবরের জীবনকে দশ দিন বলে উল্লেখ করবে। কেউ কেউ বলেছেন, শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকারের সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ফুৎকারের পর সকল মানুষ পুনরুত্থিত হবে তাদের আপন আপন সমাধি থেকে। এই দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ বছর। ওই চল্লিশ বছর কারো কোনো অস্তিত্ব থাকবে না বলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরও আযাব হবে না। আর ওই সময়ের কথা মনে করেই হাশরের ময়দানে তারা বলবে, তোমরা তো ওই সময় অস্তিত্বহীনতার আরামে ছিলে মাত্র দশ দিন।

শেষোক্ত আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে— 'তারা কি বলবে তা আমি ভালো জানি, তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিলো সে বলবে, তোমরা তো মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।'

www.eelm.weebly.com

'আমছালুহুম ত্বরীক্বাতান্' অর্থ তাদের মধ্যে যে জ্ঞানী ও সৎপথ প্রাপ্ত। ওই জ্ঞানী ও সৎকর্মশীলেরা তখন বলবে, তোমরা পৃথিবীতে মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে। নিঃসন্দেহে জ্ঞানবানেরাই তখন এরকম কথা বলতে পারবে। আল্লাহ্পাকও তাদেরকে জ্ঞানবান ও সৎপথপ্রাপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ আখেরাতের অনন্ত জীবনের তুলনায় পৃথিবীর জীবনের পরিসর নিতান্ত নগণ্য।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, সাক্বাফী গোত্রের এক লোক একবার রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলো, কিয়ামতের দিন পৃথিবীর পাহাড় পর্বতগুলোর কী অবস্থা হবে? তার ওই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত। বাগবী লিখেছেন, কেউ কেউ বলেছেন, কারো কোনো প্রশ্নের কারণে নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। অবতীর্ণ হয়েছে এভাবে— হে আমার রসুল! কেউ যদি আপনাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তবে আপনি বলবেন, আমার প্রভুপালক ওগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে দিবেন।

সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ○ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ○ لَا تَرٰى فِيْهَا
عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا ○ يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ
لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ○ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ
الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ○ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ○
وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ○ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ
الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ○

❒ উহারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'আমার প্রতিপালক উহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবেন।'

❒ অতঃপর তিনি ভূমিকে মসৃণ সমতল ভূমিতে পরিণত করিবেন।

❒ যাহাতে তুমি উঁচু-নীচু দেখিবে না।

❒ সেই দিন উহারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করিবে, এই ব্যাপারে এদিক ওদিক করিতে পারিবে না। দয়াময়ের নিকট সকল শব্দ ক্ষীণ হইয়া যাইবে, সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনিবে না।

❒ দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন ও যাহার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হইবেন সে ব্যতীত কাহারও সুপারিশ সেই দিন কোন কাজে আসিবে না।

www.eelm.weebly.com

❐ তাহাদিগের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত কিন্তু উহারা জ্ঞান দ্বারা তাহার জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে না।

❐ চিরঞ্জীব, অনাদি, স্বাধিষ্ঠ, বিশ্বধাতার নিকট সকলেই হইবে অধোবদন এবং সে-ই ব্যর্থ হইবে যে জুলুমের ভার বহন করিবে।

❐ এবং যে বিশ্বাসী হইয়া সৎকর্ম করে তাহার আশংকা নাই অবিচার ও ক্ষতির।

ইবনে জুরাইজ্ সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, একবার কুরায়েশরা রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলো, হে মোহাম্মদ! কিয়ামতের দিন আপনার প্রভুপ্রতিপালক এই পাহাড়গুলোর কী করবেন? তাদের একথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতটি এভাবে— 'তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, আমার প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন ।'

প্রকৃত কথা হচ্ছে, কারো কোনো জিজ্ঞাসার জবাবরূপে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। বরং এখানে প্রশ্নাকারে জানিয়ে দেয়া হয়েছে পর্বতসমূহের পরিণতির কথা। কেননা এখানে 'কুল' শব্দটির প্রথমে যুক্ত করা হয়েছে 'ফা' অক্ষরটি (ফাকুল)। সুতরাং বুঝতে হবে 'ফা' অক্ষরটি এখানে বসেছে একটি উহ্য শর্তের পরিণতি হিসেবে। তাই কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! যদি লোকেরা আপনাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে , তবে আপনি এই উত্তর দিবেন। প্রশ্নাকারে শিক্ষাদানের এমতো দৃষ্টান্ত অন্য আয়াতেও পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু ওই আয়াতগুলোতে কোনো শর্ত উহ্য নেই এবং উল্লেখিতও নেই। তাই সেখানে 'কুল' এর প্রথমে 'ফা' অক্ষরটি উল্লেখ করা হয়নি। যেমন—১. 'ওয়া ইয়াস আলুনাকা আ'নিল মাহীদ্বি কুল হুয়া আজা'। ২. 'ইয়াসআলুদনাকা আ'নিল খমরি ওয়াল মাইসিরি কুল ফীহিমা ইছমুন কাবীর'। ৩. 'ইয়াসআলুনাকা আ'নিল আনফালি কুলিল আনফালু লিল্লাহ্।

'ইয়ানসিফুহা' অর্থ ওগুলোকে সমূলে উৎপাটন করা হবে এবং বিক্ষিপ্ত করা হবে বালুকণার মতো। 'নাসফুন' অর্থ মূলোচ্ছেদ বা মূলোৎপাটন। 'হা' সর্বনামটি এখানে মাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যদিও 'মাটি থেকে উৎপাটন করা হবে' এরকম কথা এখানে আসেনি। কিন্তু একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, পাহাড়-পর্বতসমূহ মাটির উপরেই দণ্ডায়মান।

পরের আয়াতদ্বয়ে (১০৬, ১০৭) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি ভূমিকে মসৃণ সমতলভূমিতে পরিণত করবেন। যাতে তুমি উঁচু-নীচু দেখবে না।'

www.eelm.weebly.com

'ক্বাআ'ন্' অর্থ মসৃণ মৃত্তিকা, যেখানে কোনো পাহাড়-পর্বত নেই। আর 'সফ্সফা' অর্থ সমতল ভূমি। এরকম অর্থ করা হয়েছে কামুস গ্রন্থে। 'ইওয়াজা' অর্থ আঁকাবাকা। আর 'আমতা' অর্থ উঁচু-নীচু।

এর পরের আয়াতে (১০৮) বলা হয়েছে— 'সেই দিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এ ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে পারবে না। দয়াময়ের নিকট সকল শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে, সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছু শুনবে না।'

এখানে 'আহ্বানকারী' বলে বোঝানো হয়েছে হজরত ইসরাফিলকে। তিনিই হাশরের মাঠে সকলকে একত্র হওয়ার আহ্বান জানাবেন। বায়তুল মাকদিস প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে বলবেন, হে বিকৃত ও অবিকৃত অস্থি! হে ছিন্ন ভিন্ন ও অপসৃত চর্ম! হে বিস্রস্ত কুন্তলরাশি! তোমাদেরকে আল্লাহ্ বিচারের ময়দানে একত্র হতে নির্দেশ দিচ্ছেন। জায়েদ বিন জাবের শাফেয়ী সূত্রে ইবনে আসাকের এরকম বর্ণনা করেছেন।

'লা ই'ওয়াজা লাহু' অর্থ তারা তখন আহ্বানকারীর ঘোষণার এদিকে ওদিকে যেতে পারবে না। অর্থাৎ তার আহ্বানে অতিদ্রুত সাড়া না দিয়ে পারবে না।

'ওয়া খশাআ'তিল আসওয়াতু লির্রহমান' অর্থ দয়াময় আল্লাহ্র ভয়ে তখন সকলের আওয়াজ হয়ে যাবে ক্ষীণ। 'ফালা তাসমাউ' বলে এখানে এই আয়াতের সকল শ্রোতাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে— হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত শ্রোতা! তুমি সেদিন ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কিছুই শুনবে না। 'ফালা তাসমাউ' কথাটির 'ফা' এখানে কারণ প্রকাশক।

'হামসান' অর্থ মৃদু গুঞ্জন বা মৃদু আওয়াজ— যেমন উটের ধীর পদক্ষেপের ধ্বনি। বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, 'হাসমুন' অর্থ নিচুস্বরে কথা বলা। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শব্দটির অর্থ উচ্চারণ ছাড়াই কেবল ঠোঁট নাড়াচাড়া করা। আবু তালহা সূত্রে ইবনে আবী জারুদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ক্বাআন' সমতল ভূমি, 'সফসফান' অর্থ উদ্ভিদবিহীন মসৃণ প্রান্তর, 'ইওয়াজুন' অর্থ উপত্যকা, 'আস্তা' অর্থ টিলা।, 'খশাআ'তিল আস্ওয়াত' অর্থ আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাওয়া এবং 'হামসান' অর্থ নিম্ন কণ্ঠের আওয়াজ। অন্য বর্ণনায় এসেছে, কথাটির অর্থ উঁচু নিচু নয় এমন স্থান। আর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'হামসান' অর্থ পদশব্দ। অর্থাৎ হাশর প্রান্তরের দিকে গমনকারী মানুষের পায়ের আওয়াজ।

এর পরের আয়াতে (১০৯) বলা হয়েছে— 'দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, সে ব্যতীত কারো সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না।'

www.eelm.weebly.com

এখানে 'মান' শব্দটি রফা; (পেশ) এর স্থানে রয়েছে এবং 'শাফায়াত' শব্দটির 'মোজাফ' (সম্বন্ধপদ) এখানে উহ্য। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— সে দিন কারো কোনো সুপারিশ উপকারে আসবে না। তবে যে ব্যক্তি সেদিন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাফায়াতের অনুমতি প্রাপ্ত হবে সে অবশ্যই শাফায়াত করতে পারবে। অথবা 'মান' শব্দটি এখানে রয়েছে নছব (যবরের) স্থানে। যদি তাই হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে— সেদিন কারো জন্য কারো সুপারিশ কাজে আসবে না ওই ব্যক্তির সুপারিশ ব্যতীত, যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুপারিশের অনুমতি প্রাপ্ত।

'ওয়া রদ্বিয়া লাহু ক্বওলান্' অর্থ যার সুপারিশ আল্লাহ্ পছন্দ করবেন। অর্থাৎ যার সুপারিশ আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য, মূল্যবান ও সম্মানার্হ বলে মনে হবে; তাকেই তিনি সেদিন দান করবেন সুপারিশ করবার অধিকার এবং তার সুপারিশ তিনি পছন্দও করবেন। কথাটির উদ্দেশ্য এরকমও হতে পারে— পাপী বিশ্বাসীদের জন্য তিনি সুপারিশ করাকে পছন্দ করবেন। প্রথমোক্ত অর্থটি গ্রাহ্য হবে ওই সময়, যখন 'মান' শব্দটিকে পেশের স্থানে মনে করা হবে। আর 'মান' শব্দটি যবরের স্থানে ধরা হলে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে পরের অর্থটি।

এর পরের আয়াতে (১১০) বলা হয়েছে— 'তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত, কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁর জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না। এ কথার অর্থ— সুপারিশকারীও সুপারিশপ্রাপ্তদের পূর্বাপর সকল অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। অর্থাৎ তাদের দুনিয়ার জীবন ও কবরের জীবন সম্পর্কে তিনি সবিশেষ জ্ঞাত। কিন্তু আল্লাহ্র এই অপার ও আনুরূপ্যবিহীন জ্ঞানকে জ্ঞানায়ত্ত করার ক্ষমতা সুপারিশকারী ও সুপারিশপ্রাপ্ত কারোই নেই।

এর পরের আয়াতে (১১১) বলা হয়েছে— 'চিরঞ্জীব, অনাদি, স্বাধিষ্ঠ, বিশ্বধাতার নিকটে সকলেই হবে অধোবদন।'

এখানে 'আ'নাতি' অর্থ অধোবদন, অক্ষম, অসহায় হওয়া— যেমন সম্রাটের সামনে অসহায় ও অবনত মস্তক হয় বন্দী। 'আ'ন' 'ইয়া'নূ', 'আ'না' বাবে নাসারা হতে, অর্থ পরিশ্রান্ত হওয়া। 'তাআ'ন্না' অর্থ ভারবহণ করা বা কষ্ট সহ্য করা। বাগবী লিখেছেন, 'আ'নী' অর্থ বন্দী (বাবে নাসারা) থেকে 'ইয়া'নু', 'আ'না।'

'আলহাইয়্যু' অর্থ চিরঞ্জীব, মৃত্যু যাকে কখনো স্পর্শ করতে পারে না। উল্লেখ্য যে, মৃত্যু যাকে গ্রাস করতে পারে, সে তো অনস্তিত্বজাত, সম্ভাব্য । অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য বা চির বিদ্যমান নয়। অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব হচ্ছেন কেবল আল্লাহ্, যিনি চিরঞ্জীব।

'আলক্বাইয়্যুম' অর্থ চিরস্থায়ী, অনাদি, স্বাধিষ্ঠ, সকল সৃষ্টির একক ও অসমকক্ষ ব্যবস্থাপক, রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। আর এখানকার উজূহ্ অর্থ চেহারা বা বদন। সকল মানুষের চেহারাই এখানে এই শব্দটির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সকল মানুষকে সেদিন আল্লাহ্ সকাশে অধোবদন হয়ে দাঁড়াতে হবে। অথবা এখানে

www.eelm.weebly.com

শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে কেবল পাপিষ্ঠদের মুখমণ্ডলকে। যদি তাই হয়, তবে এখানে কথাটি দাঁড়াবে—সকল পাপীকে সেদিন আল্লাহ্‌সকাশে দণ্ডায়মান হতে হবে অধোবদন হয়ে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে জুলুমের ভার গ্রহণ করবে।' এখানে 'জুলুম' শব্দের অর্থ শিরিক। কথাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সে দিন সে-ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার করেছে।

তলক ইবনে হাবীব বলেছেন, 'ই'না' অর্থ সেজদা করা। যদি তাই হবে তবে সম্পূর্ণ বাক্যটির মর্মার্থ হবে— সকল অবয়ব চিরঞ্জীব, অনাদি ও স্বাধিষ্ঠ প্রভুপালককে সেজদা করে। যে এরূপ না করে অংশীবাদিতাকে প্রশ্রয় দেয়, সে ব্যর্থ।

এর পরের আয়াতে (১১২) বলা হয়েছে— 'এবং যে বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করে, তার আশংকা নেই অবিচারের ও ক্ষতির।' এখানে 'মিনাস্ সলিহাত্' (সৎকর্ম করে) কথাটির 'মিন' আংশিক অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ যে সৎকর্ম সমূহের মধ্যে ফরজ দায়িত্বগুলো পালন করে। অথবা 'মিন' এখানে উদ্দেশ্যমূলক। যদি তাই হয়, তবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— যে সৎকর্ম করে বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যে।

'ওয়াহুয়া মু'মিনুন' (সে বিশ্বাসী হয়ে) কথাটি এখানে অবস্থা প্রকাশক। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— যে ইমানদার অবস্থায় সৎকর্ম করে। উল্লেখ্য যে, ইমান বা বিশ্বাসই হচ্ছে সকল পুণ্যকর্ম গৃহীত হওয়ার অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।

'ফালা ইয়াখাফু' (আশংকা নেই) কথাটির 'জাযা'(পরিণতি পদ) এখানে উহ্য। আর'ফা' হচ্ছে কারণ প্রকাশক। ওই উহ্য 'জাযা' হচ্ছে নির্ভয়তা। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— বিশ্বাসী হয়ে যে সৎকর্ম করবে, সে সেদিন হবে সার্থক। কারণ তার হক নষ্ট হওয়ার আশংকা তখন থাকবে না। সে হবে নির্ভয়। অথবা 'আশংকা নেই' কথাটি এখানে বিধেয় এবং 'হুয়া' সর্বনামটি এখানে উদ্দেশ্য। মূল উদ্দেশ্য এখানে উহ্য। সুতরাং তারা ভয় করবে না। অর্থাৎ তাদের পুণ্যের মধ্যে কোনো অবিচার বা জুলুমের মিশ্রণের আশংকা থাকবে না। 'ওয়ালা হাদ্বমা' অর্থ ভয় থাকবে না কোনো ক্ষতির। অর্থাৎ আশংকা থাকবে না সওয়াব কম হওয়ার। হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। হাসান কথাটির তাফসীর করেছেন এভাবে— সে দিন তাদের সওয়াব কম হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না এবং এ ভয়-ও থাকবে না যে, অন্যের পাপের ভার তাদের উপরে চাপানো হবে। জুহাক বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হবে এরকম— তারা করেনি এমন কোনো পাপের মধ্যে তাদের আটকে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না এবং পুণ্যকর্ম ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনাও হয়ে যাবে তিরোহিত।

www.eelm.weebly.com

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ○ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ○ وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ○

❐ এইরূপেই আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় এবং উহাতে বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি সতর্কবাণী যাহাতে উহারা ভয় করে অথবা ইহা হয় উহাদিগের জন্য উপদেশ।

❐ আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধীশ্বর। তোমার প্রতি আল্লাহের ওহি সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করিও না এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর।'

❐ আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করিয়াছিলাম কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল; আমি তাহাকে সংকল্পে দৃঢ় পাই নাই।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এই কোরআনের মাধ্যমে অতীত যুগের উম্মতের ঘটনাবলী আমি আপনাকে জানাচ্ছি এবং এই কোরআন আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করে চলেছি আপনার মাতৃভাষায়। আর এই কোরআনের মাধ্যমেই আমি বিবৃত করছি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের বিশদ বিবরণ। ওই বিবরণে রয়েছে সাবধানীদের জন্য সতর্কবাণী, সদুপদেশ ও সওয়াব প্রদানের অঙ্গীকার এবং অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তি প্রদানের দুঃসংবাদ।

এখানে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে (তাক্বওয়া অবলম্বন করে) তাদের জন্য কোরআনে বিবৃত করা হয়েছে সতর্কবাণী। এর কারণ , সতর্কবাণীকে মান্য করে তারাই, যাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র ভয়। আর যাদের মধ্যে এরকম ভয় নেই তাদের জন্যও কোরআন উপকারী। কারণ, এর মাধ্যমে তারা কিছু সদুপদেশ তো শুনতে পায়, যদিও তারা পূর্ণ তাক্বওয়ার স্তরে পৌঁছতে সক্ষম না হয়। এই সতর্কবাণী ও সদুপদেশের সম্পর্ক করা হয়েছে কোরআনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ সতর্ককারী ও সদুপদেশ দাতা তো আল্লাহ্। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'আও ইউহ্‌দিছু' কথাটির

www.eelm.weebly.com

'আও'(অথবা) শব্দটির অর্থ হবে 'ওয়াও' (এবং)। এরকম অর্থ করা হলে আলোচ্য বাক্যের মর্ম আরো অধিক স্পষ্ট হয়ে যায় এবং বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যেনো তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং কোরআন হয় তাদের জন্য সদুপদেশ।

এর পরের আয়াতে (১১৪) বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধীশ্বর।' এখানে 'ফাতায়ালাল্লহু' (আল্লাহ্ অতি মহান) কথাটির মাধ্যমে এখানে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণবত্তা যেরকম উপমাবিহীন, তেমনি তাঁর কালামও অন্য সকল কালামের (কথার) সাদৃশ্য থেকে মুক্ত ও পবিত্র। সুতরাং তা অংশীবাদীদের শিরিকমিশ্রিত উক্তি থেকে অতি অবশ্যই পবিত্র। আমি বলি, বরং এখানে বলা হয়েছে— সৃষ্টি তাঁর সম্পর্কে যা বর্ণনা করে, তার চেয়েও তিনি অধিক পবিত্র ও মর্যাদামণ্ডিত। তাই তাঁর সম্পর্কে যে যেভাবে যতোবেশী বর্ণনা করুক না কেনো তাঁর সত্তা ও গুণবত্তার যথাযথ ও পরিপূর্ণ বর্ণনা কিছুতেই করতে পারবে না। সে কারণেই তাঁর স্তব-স্তুতির প্রকাশকারীরা একথা বলতে বাধ্য হয় যে— হে আল্লাহ্! আমি তোমার প্রশংসা করে কখনো শেষ করতে পারবো না। তুমি তদ্রূপ, যেরূপ তুমি তোমার নিজের প্রশংসা করেছো।

'আল-মালিকুল হাকু' অর্থ প্রকৃত অধীশ্বর, যাঁর সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী এবং যাঁর গুণবত্তাসমূহ তাঁরই সত্তা নির্ভর, অন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। তাই তাঁর প্রতাপ, পরাক্রম, কর্তৃত্ব অবক্ষয়ের অতীত, বিবর্তনবিহীন ও শাশ্বত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী সম্পন্ন হবার পূর্বে কোরআন পাঠে তুমি ত্বরা কোরো না এবং বোলো, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন করো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমা থেকে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ জিবরাইলকে প্রথমে সম্পূর্ণ আবৃত্তি করতে দিন, প্রথমে সম্পূর্ণ করতে দিন বিশেষ কোনো বক্তব্যের সম্পূর্ণ বাক্যগুলোকে। বিরত থাকুন আংশিক শ্রবণ, পাঠ ও প্রচার থেকে। এ ব্যাপারে ত্বরাপ্রবণতাকে কখনো প্রশ্রয় দিবেন না। বলুন, হে আমার প্রভুপালক, আমার জ্ঞান সম্প্রসারিত করে দিন। উল্লেখ্য যে, রসুল স. প্রেমাতিশয্যবশতঃ আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী শ্রবণ, সংরক্ষণ, পাঠ ও প্রচারের ব্যাপারে ত্বরাপ্রবণ হয়ে পড়তেন। তাই আলোচ্য আয়াতে তাঁকে এভাবে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'ব্যস্ততাহেতু আপনার রসনাকে অধিক সঞ্চালন করবেন না।'

মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! প্রত্যাদেশিত বাণীর উদ্দেশ্য ও অর্থ যতোক্ষণ আপনার নিকটে সুস্পষ্ট না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আপনি তা লিপিবদ্ধ করাবেন না এবং আপনার সহচরবৃন্দের

www.eelm.weebly.com

সম্মুখে আবৃত্তি করবেন না। আংশিক অনুধাবন ও তার প্রচার সুসংগত নয়। তাই আপনি এই মর্মে প্রার্থনা করুন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমার জ্ঞানসীমা প্রসারিত করে দিন।

এর পরের আয়াতে (১১৫) বলা হয়েছে—'আমি তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিলো, আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।' একথার অর্থ— আমি আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, ওই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। কিন্তু সে আমার নির্দেশ বিস্মৃত হয়েছিলো। গমন করেছিলো নিষিদ্ধ বৃক্ষটির কাছে। আমি তাকে দৃঢ় সংকল্পকরূপে প্রত্যক্ষ করিনি।

এখানে 'আ'যমা' অর্থ দৃঢ় সংকল্প। 'সংকল্প' অর্থে শব্দটি কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— ১. 'অতঃপর তুমি সংকল্প করলে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করবে'— সুরা আলে ইমরান। ২. 'নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহের সংকল্প কোরো না'। ৩. 'আর যদি তারা তালাকের ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ হয়'। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'আ'যামা আ'লাইহ্' অর্থ সে এই কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। 'সিদ্ধান্ত নিয়েছে' এবং 'চেষ্টা চালাচ্ছে' উভয় অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। নিহায়াহ্ গ্রন্থে রয়েছে, 'আ'যমা' অর্থ প্রচেষ্টা, ধৈর্য। আমি বলি, কথাটির মর্মার্থ— কোনো কাজের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলে তা বাস্তবায়নের জোর চেষ্টা চালাতে হবে এবং প্রতিকূলতায় ধারণ করতে হবে ধৈর্য।

কোনো কোনো কোরআন ভাষ্যকার বলেছেন, এখানকার 'লাম নাজিদ্ লাহু আ'যমা' কথাটির অর্থ— আমি আদমের হৃদয়ে অবাধ্যতার অপবিত্রতা দর্শন করিনি, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিলো, অঙ্গীকার পালনে হয়ে পড়েছিলো অক্ষম।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে জায়েদ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন— 'তুমি ও তোমার স্ত্রীর শত্রু ইবলিস' আল্লাহ্র এই সাবধানবাণীটি হজরত আদম ভুলে গিয়েছিলেন। ওই সময় ইবলিসের শত্রুতা ও আল্লাহ্র সতর্কতা কোনো কিছুই মনে ছিলো না তাঁর। কাজী আয়ায তাঁর আশ্শিফা গ্রন্থে লিখেছেন, ' কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিলো' একথা বলে আল্লাহ্ নিজেই আলোচ্য আয়াতে হজরত আদমের অনিচ্ছাকৃত ভুলকে গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছেন। প্রকাশ করেছেন হজরত আদমের প্রতি তাঁর স্নেহসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি।

কাশশাফ রচয়িতা ও বায়যাবী লিখেছেন, এখানকার 'লাক্বদ্ আ'হিদ্না' (ইতোপূর্বে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম) কথাটির সম্পর্ক ঘটেছে 'সর্‌রাফনা' (আমি বর্ণনা করেছি) কথাটির সঙ্গে। এভাবে এখানে এই তথ্যটি ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সদুপদেশ প্রদানের পরেও কৃত অঙ্গীকারের কথা ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু

www.eelm.weebly.com

নয়। এরকম বিস্মৃতিপ্রবণতা একটি চিরাচরিত মানবিক বৃত্তি। যেমন ইতোপূর্বে আমি আমার নবী আদমকে একটি নির্দেশ দান করেছিলাম। কিন্তু বিস্মৃতিবশতঃ সে তা পালন করতে অক্ষম হয়েছিলো।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পিতা আদমকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্ তাঁর পৃষ্ঠদেশে হস্তস্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কিয়ামত পর্যন্ত সৃজিতব্য সকল মানুষ বের হয়ে এলো। আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেকের চোখের মাঝে সৃষ্টি করলেন একটি নূরের চমক। তারপর তাদেরকে উপস্থিত করলেন হজরত আদমের সামনে। পিতা আদম বললেন, হে আমার প্রভুপালক, এরা কারা? আল্লাহ্ বললেন, এরা তোমার অনাগত বংশধর। পিতা একজনের চোখে নূরের চমক দেখে অভিভূত হলেন। বললেন, হে আমার প্রভুপালক! এই লোকটি কে? আল্লাহ্ বললেন, দাউদ। তিনি বললেন, হে আমার আল্লাহ, আপনি তার পৃথিবীর আয়ু কতদিন নির্ধারণ করেছেন? আল্লাহ্ বললেন, ষাট বছর। তিনি বললেন, আমার আয়ু থেকে তাকে চল্লিশ বছর দিয়ে দিন। পৃথিবীর জীবন শেষে পরলোকগমনের সময় মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখে তিনি বললেন, এখনই এলে কেনো? আমার তো আরো চল্লিশ বছর আয়ু রয়েছে। মৃত্যুর ফেরেশতা বললেন, আপনি কি ওই চল্লিশ বছর আয়ু আপনার অধস্তন পুরুষ দাউদকে দেন নি? ঘটনাটি ছিলো অনেক দিন আগের। তাই তিনি কথাটি ভুলেই গিয়েছিলেন। সেকারণেই অবলীলায় বলে ফেললেন, না। তিনি এমতো বিস্মৃতি থেকে মুক্ত ছিলেন না বলেই তাঁর উত্তর পুরুষেরা এরকম ভুল করে বসে।

কোনো কোনো তাত্ত্বিক বলেছেন, কাশ্শাফ রচয়িতা ও বায়যাবীর বর্ণিত তথ্যটি ভুল। আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক 'সর্‌রাফনা' (আমি বর্ণনা করেছি) কথাটির সঙ্গে হলে একথাও বলতে হয় যে, 'কা'জালিকা' (এরূপ) কথাটির সম্পর্কও হবে 'সর্‌রাফনা' এর সঙ্গে এবং কা'জালিকা সর্‌রাফনা' এর সংযোগ হবে 'কাজালিকা নাক্বুদ্দা আলাইকা' এর সঙ্গে। আর কা'জালিকা নাক্বুদ্দা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে হজরত মুসার কাহিনীর প্রতি। সুতরাং হজরত আদম ও হজরত মুসার কাহিনীর সঙ্গে একটি সম্পর্ক বা সাদৃশ্য হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু হজরত আদমের কাহিনীতে এসেছে বিস্মৃতি প্রবণতা ও অঙ্গীকার পালনে অক্ষম হওয়ার কথা। হজরত মুসার কাহিনীতে এরকম কিছু নেই। বরং 'ওয়াহাল্ আতাকা হাদীছু মুসা' (মুসার বৃত্তান্ত তোমার নিকটে পৌঁছেছে কি) কথাটির সঙ্গে এখানকার 'স্মরণ করো, যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমের প্রতি নত হও' বাক্যটির একটি সম্পর্ক বা সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ উভয় ঘটনাই অতীত যুগের। আল্লাহ্পাকই প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত।

www.eelm.weebly.com

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ○ فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا
عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ○ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَ
لَا تَعْرَىٰ ○ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ○ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَٰنُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ
هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ○ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا
سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ○

❒ স্মরণ কর, যখন ফেরেশ্‌তাগণকে বলিলাম,'আদমের প্রতি নত হও,' তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই নত হইল, সে অমান্য করিল।

❒ অতঃপর আমি বলিলাম, ' হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদিগকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়া না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ কষ্ট পাইবে।'

❒ তোমার জন্য ইহাই রহিল যে তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হইবে না ও নগ্নও হইবে না;

❒ এবং সেথায় পিপাসার্ত হইবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হইবে না।

❒ অতঃপর শয়তান তাহাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলিল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?'

❒ অতঃপর তাহারা উহার ফল ভক্ষণ করিল; তখন তাহাদিগের লজ্জাস্থান তাহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা উদ্যানের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। আদম তাহার প্রতিপালকের অবাধ্য হইল, ফলে সে পথভ্রষ্ট হইল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! সেই সময়ের কথা শুনুন, যখন আমি ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম, আদমকে সেজদা করো; ইবলিস ব্যতীত তখন সকলেই তাকে সেজদা করলো। কেবল ইবলিস করলো না। সে হয়ে গেলো বিদ্রোহী। এখানে 'ওয়া ইজ কুল্‌না' বলে হজরত আদমের বিস্মৃতির কাহিনীর প্রতি রসুল স. এর মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। আর এখানে 'আবা' (সে অমান্য করলো) বাক্যটি সন্নিবেশিত করা হয়েছে পৃথকরূপে। ইবলিসের বিদ্রোহী হওয়ার বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণরূপে চিহ্নিত করার জন্যই এখানে এরকম করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১১৭) বলা হয়েছে— অতঃপর আমি বললাম, হে আদম! এ তোমার এবং তোমার স্ত্রীর শত্রু, সে যেনো কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখকষ্ট পাবে।' এখানে 'ফাকুল্‌না' (অতঃপর আমি বললাম) কথাটির পূর্বে রয়েছে একটি উহ্য বক্তব্য। বক্তব্যটি হচ্ছে— আমি আদম ও তার স্ত্রীকে জান্নাতে প্রবেশ করালাম। এভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে— আমি আদম ও তার সহধর্মিণীকে জান্নাতে বসবাস করতে বললাম। তারপর তাদেরকে বললাম, ইবলিস কিন্তু তোমার ও তোমার সহধর্মিণীর শত্রু। সুতরাং তার সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিতে যদি তার এই অপপরিকল্পনাটি সফল হয়, তবে তোমরা চিরসুখময় এই বসবাস হারিয়ে ফেলবে। পতিত হবে দুঃখকষ্টে।

'জান্নাত থেকে বের করে না দেয়' কথাটি একই সঙ্গে ইবলিসের প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং আদমদম্পতির প্রতি সতর্কবাণী। সতর্কবাণীটি এই— সে যেনো তোমাদের জান্নাতচ্যুতির কারণ না হয়। অর্থাৎ তার প্রতারণা যদি সফল হয়, তবে আল্লাহ্‌ই তোমাদের দু'জনকে জান্নাতহারা করবেন।

এখানকার 'ফালা ইউখরিজান্নাকুমা মিনাল্‌জান্‌নাত' (জান্নাত থেকে বের করে না দেয়) কথাটির প্রথম অক্ষর 'ফা' কারণ প্রকাশক। আলোচ্য আয়াতের শেষ কথাটি হচ্ছে— 'ফাতাশক্বা।' কথাটির অর্থ— তোমরা দুঃখকষ্ট পাবে। অর্থাৎ তোমাদেরকে তাহলে চলে যেতে হবে পৃথিবীতে। সেখানকার জীবনযাত্রা হবে কঠিন। জান্নাতের মতো অনায়াস আহার্য সেখানে মিলবে না। চাষবাস করতে হবে। বীজ বুনতে হবে। ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সশ্রম ও সযত্ন শস্যায়নের। কাটাই মাড়াই শেষে আবার ছাড়িয়ে নিতে হবে শস্যের খোসা। তারপর রান্নাবান্না। অতঃপর আহার্য গ্রহণ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হজরত আদমের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিলো একটি লাল ষাঁড়। তিনি ওই ষাঁড়টির দ্বারা জমি চাষ করতেন। চাষবাস করার সময় তাঁর শরীর হয়ে উঠতো ঘর্মাক্ত। কপাল থেকে ঝরতো স্বেদবিন্দু। ওই পরিশ্রমের দিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে— তোমরা দুঃখকষ্ট পাবে। চাষবাস করতেন হজরত আদম একা। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, তোমরা দুঃখকষ্ট পাবে। এভাবে দু'জনকে দুঃখকষ্টের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হচ্ছে, স্বামী দুঃখ পেলে স্ত্রীও দুঃখ পায়। তাই এখানে 'তুমি' না বলে বলা হয়েছে 'তোমরা'। আবার বাক্যের শুরুতে সম্বোধন করা হয়েছে 'হে আদম'। জীবনোপকরণ সংগ্রহের দায়িত্ব প্রধানতঃ পুরুষের। তাই এখানে এককভাবে সম্বোধন করা হয়েছে কেবল হজরত আদমকে।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতদ্বয়ে (১১৮, ১১৯) বলা হয়েছে— 'তোমার জন্য এটাই রইলো যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না ও নগ্নও হবে না; এবং সেখানে পিপাসার্ত হবে না ও রৌদ্রক্লিষ্টও হবে না।'

এখানে 'লাইয়াদ্বহা' অর্থ রৌদ্রক্লিষ্টও হবে না। এরকম বলা হয়েছে একারণে যে, সেখানে রৌদ্র বলে কিছু নেই। রয়েছে কেবল সুনিবিড়, সুবিস্তৃত, সুশোভিত ও সুউজ্জ্বল ছায়া। এভাবে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— সকল সুখের উপকরণ রয়েছে জান্নাতে। রয়েছে ক্ষুধার খাদ্য, পিপাসার পানি, শরীরাচ্ছাদনের বস্ত্র এবং সুবিস্তৃত ও সুশীতল ছায়া। শ্রম, ঘাম কোনো কিছুই সেখানে নেই। আর সেখানকার সুখ চিরকালীন।

এর পরের আয়াতে (১২০) বলা হয়েছে— 'অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো; সে বললো, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিবো অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?' একথার অর্থ— ইবলিস সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো। একসময় সে সুযোগ পেয়েও গেলো। আদম দম্পতিকে সে এইমর্মে কুমন্ত্রণা দিলো যে, আমি তোমাদের সুহৃদ। তাই অতি সংগোপনে আমি তোমাদেরকে জানাতে চাই এক অনন্ত জীবনপ্রদায়ক বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের সংবাদ। তোমরা কি শুনবে?

এর পরের আয়াতে (১২১) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা তার ফল ভক্ষণ করলো; তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা উদ্যানের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো। আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হলো, ফলে সে পথভ্রষ্ট হলো ।' এখানে 'ওয়ারাক্বিল জান্নাত' অর্থ নিষিদ্ধ বৃক্ষের পাতা বা ফল। আর 'আ'সা আদামু রব্বাহু ফাগাওয়া' অর্থ ফলে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেলো, হারিয়ে ফেললো পথ। উল্লেখ্য যে, শয়তানের কুমন্ত্রণায় অক্ষয় জীবনের আশায় আদমদম্পতি ভক্ষণ করেছিলেন ওই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল, কিন্তু ওই বৃক্ষই ছিলো তাঁদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কারণ। এরকমও বলা যেতে পারে যে, ইবলিসের কুমন্ত্রণার প্রভাবে তাঁরা বিস্মৃত হলেন আল্লাহ্‌র সতর্কবাণী। তাই স্খলিত হলেন সুখের পথ থেকে।

ইবনে আরাবী এখানকার 'গাওয়া' শব্দটির অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন— তাঁদের সুখের জীবনে ঘটলো এক রহস্যময় উপপ্লব। জীবনের গতি নির্ধারিত হলো নিরাপদ অবস্থা থেকে উপদ্রুততার দিকে, আনন্দ থেকে বেদনার দিকে। ইবনে কুতাইবা বলেছেন, আল্লাহ্‌র কালামের প্রতিধ্বনিরূপে এরকম পাঠ করা

www.eelm.weebly.com

যাবে যে 'আ'সা আদামু রব্বাহু' (আদম তাঁর প্রতিপালকের অবাধ্য হলো)। কিন্তু সরাসরি কেউ তাঁকে স্বেচ্ছাচারী বা অবাধ্য বলতে পারবে না। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন নবী। তাছাড়া যে ক্রমাগত আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে চলে, তাকে বলা হয় 'আ'স'(অবাধ্য)। কিন্তু বিস্মৃতি বা অনবধনতার কারণে কোনো সময় কারো দ্বারা যদি আল্লাহ্‌র কোনো একটি আদেশ লংঘিত হয়, তবে তাকে অবাধ্য বলা যায় না। কেননা ঘটনাক্রমে কেউ যদি কাপড় সেলাই করে, তবে তাকে দর্জি বলা হয় না, পেশাগতভাবে যে নিয়মিত কাপড় সেলাই করতে অভ্যস্ত, তাকেই কেবল দর্জি বলা যায়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, একবার আল্লাহ্‌র সামনে নবী আদম ও নবী মুসার মৃদু বিতর্ক অনুষ্ঠিত হলো। ওই বিতর্কে বিজয়ী হলেন নবী আদম। নবী মুসা বললেন, আপনি আমাদের সকলের পিতা। আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর আপন অলৌকিক হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মধ্যে ঘটিয়েছেন আত্মার সম্পাত। ফেরেশতাদের সেজদার মাধ্যমে আপনাকে করেছেন সম্মানিত। আর আপনাকে তিনি রেখেছিলেন জান্নাতে। এরপরেও আপনি ভুল করলেন কেনো? আপনার জন্যই তো আমরা জান্নাত থেকে পতিত হয়েছি পৃথিবীতে। পিতা আদম বললেন, তুমি তো মুসা কলীমুল্লাহ্। আল্লাহ্ তোমার সঙ্গে করেছেন একান্ত আলাপন। বানিয়েছেন রসুল। দিয়েছেন তওরাত। এখন বলো, তওরাত লিপিবদ্ধ হয়েছে কবে? নবী মুসা বললেন, আপনার সৃষ্টির চল্লিশ বছর আগে। আদম বললেন, আমার ভুল করার কথাটি তওরাতে লিপিবদ্ধ ছিলো? মুসা বললেন, হ্যাঁ। আদম বললেন, এরপরেও তুমি আমাকে দোষারোপ করছো কেনো? আমার দ্বারা যা কিছু সংঘটিত হওয়ার, তাতো আল্লাহ্ আমার সৃষ্টির চল্লিশ বৎসর পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। শেষে রসুল স. বললেন, এইভাবে আদম মুসার উপরে বিজয়ী হয়ে গেলেন।

বাগবীর বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— মুসা বললেন, আপনি আমাদের সকলের পিতৃপুরুষ । অথচ আপনার কারণেই আমরা বেহেশতচ্যুত হয়েছি। আদম বললেন, আল্লাহ্ তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন। তাঁর অলৌকিক হস্তলিখিত তওরাত তোমাকে দান করেছেন। তবু কি তুমি ওই কর্মের জন্য আমাকে অভিযুক্ত করতে চাও, যা নির্ধারিত হয়েছিলো আমার অস্তিত্বলাভের চল্লিশ বৎসর পূর্বে? একথা বলেই আদম বিজয়ী হলেন মুসার উপর।

একটি প্রশ্নঃ ভুলে যাওয়া একটি স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তি। তাহলে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য হজরত আদমকে এখানে অবাধ্য বলে অভিযুক্ত করা হলো কেনো?

www.eelm.weebly.com

উত্তরঃ এই উম্মতের ভুল উপেক্ষণীয় ও ক্ষমার্হ। কিন্তু এই নিয়মটি পূর্ববর্তীগণের জন্য প্রযোজ্য ছিলো না। হজরত ওমর ও হজরত সাওবান থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের বিস্মৃতি ও বলপ্রয়োগিত কর্ম ক্ষমার্হ। এই হাদিসে এরকম বলা হয়নি যে, অন্যান্য উম্মতের ভুলত্রুটি ক্ষমার্হ। বলা হয়েছে কেবল এই উম্মতের কথা। তবে পাগল ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের অপরাধ ক্ষমার্হ হওয়ার বিষয়টি সার্বজনীন। তাই সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিকৃতমস্তিস্কদের, জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত নিদ্রিতদের এবং বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিচ্যুতি ক্ষমার্হ। আমি সুরা বাকারার 'রব্বানা লা তুআখিজনা ইন্নাসীনা আও আখত্ব'না'— এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছি, বিস্মৃতিজনিত বিচ্যুতি অভিযোগের আওতায় পড়ে না। কিন্তু পাপ হচ্ছে বিষসদৃশ। ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত যেভাবেই বিষপান করা হোক না কেনো, বিষের প্রতিক্রিয়া হবেই। তাই জ্ঞানতঃ ও ভুলবশতঃ সকল পাপের পরিণাম অবশ্যই ভোগ করতে হবে, যদি না আল্লাহ্ তা মাফ করে দেন, স্বেচ্ছায় অথবা তওবার মাধ্যমে।

কালাবী বলেছেন, আল্লাহ্র হুকুমের পরিপন্থী সকল প্রকার ভুলের কারণে বনী ইসরাইলদেরকে শাস্তি দেয়া হতো। শাস্তিস্বরূপ বিশেষ কোনো খাদ্যবস্তুকে তাদের জন্য করে দেয়া হতো হারাম। আমি বলি, একারণেই হজরত আদমের ভুলের জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো এবং বঞ্চিত করা হয়েছিলো জান্নাতের সুখ শান্তি থেকে। উত্থাপিত প্রশ্নের অপর একটি উত্তর এরকমও হতে পারে যে, সাধারণ পুণ্যবানদের পুণ্য আল্লাহ্র বিশেষ সন্নিধানভাজনদের জন্য গোনাহ্ সদৃশ। তাই সাধারণ ভুলের জন্য সাধারণ পুণ্যবানদেরকে আখেরাতে কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না এবং এজন্য দোজখের আযাবও তাদের ভোগ করতে হবে না। বিশেষ সন্নিধানভাজনগণও আখেরাতের আযাব থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকবেন। কিন্তু পৃথিবীতে তাঁদের ভুল তাঁদের অন্তরে সৃষ্টি করে এক ধরনের আচ্ছন্নতা। ফলে, আল্লাহ্র সঙ্গে তাঁদের নৈকট্যের সম্পর্ক হয় কিছুটা বিপর্যস্ত। রসুল স. বলেছেন, আমার হৃদয়ও আচ্ছাদিত হয় এবং আমি প্রতিদিন একশতবার আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ।

মাদারেক রচয়িতা লিখেছেন, নবী- রসুলগণ ইচ্ছে করলে বেঁচে থাকতে পারতেন— এরকম ভুলের জন্যও অভিযুক্ত হবেন। উল্লেখ্য যে, এই অভিমতের প্রেক্ষিতে কোনো কোনো আলেম বলেন, নবুয়তের দায়িত্বলাভের পূর্বে নবীগণের দ্বারা সগীরা গোনাহ্ সংঘটিত হতেও পারে।

www.eelm.weebly.com

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ○ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ○ وَ
مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ○
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ○ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا
فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ○ وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ
بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ○ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ
مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ○

❒ ইহার পর তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন, তাহার প্রতি ক্ষমাপরবশ হইলেন ও তাহাকে পথ নির্দেশ করিলেন।

❒ তিনি বলিলেন, 'তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে একই সংগে জান্নাত হইতে নামিয়া যাও। পরে আমার পক্ষ হইতে তোমাদিগের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসিলে যে আমার পথানুসরণ করিবে সে বিপথগামী হইবে না ও দুঃখ কষ্ট পাইবে না।

❒ 'যে আমার স্মরণে বিমুখ তাহার জীবনের ভোগ সম্ভার হইবে সংকুচিত এবং আমি তাহাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করিব অন্ধ অবস্থায়।'

❒ সে বলিবে, ' হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করিলে? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান।'

❒ তিনি বলিবেন,'তুমি এইরূপই ছিলে; আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট আসিয়াছিল কিন্তু তুমি উহা বর্জন করিয়াছিলে এবং সেইভাবেই আজ তোমাকে বর্জন করা হইল।

❒ এবং এই ভাবেই আমি প্রতিফল দিই তাহাকে যে বাড়াবাড়ি করে ও তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর, অধিক স্থায়ী।

❒ আমি ইহাদিগের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি কত মানবগোষ্ঠী যাহাদিগের বাসভূমিতে ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে, ইহা কি তাহাদিগকে সৎপথ দেখাইল না? অবশ্যই ইহাতে বিবেকসম্পন্নদিগের জন্য আছে নিদর্শন।

www.eelm.weebly.com

'ইজতাবাহু' কথাটি এসেছে 'জাবইয়ুন' থেকে। শব্দটির অর্থ একত্র করা। যেমন— 'জাবায়াল খারাজা' অর্থ সে কর একত্র করেছে। 'ইজতাবা' অর্থ নিজের কাছে একত্র করা বা নিয়ে আসা। মর্মার্থ হচ্ছে— গ্রহণ করা, নির্বাচন করা, নিকটবর্তী করা, মনোনীত করা। অর্থাৎ তারপর আল্লাহ্ হজরত আদমকে তওবার প্রতি অনুপ্রাণিত করলেন। সেই অনুপ্রাণানুসারে তিনি যখন তওবা করলেন, তখন আল্লাহ্ তাকে গ্রহণ করলেন এবং মনোনীত করলেন অধিকতর নৈকট্যভাজনরূপে।

'তাবা আ'লাইহি' অর্থ আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। 'হাদা' অর্থ তাঁকে পথনির্দেশ করলেন। হজরত আদম তখন দোয়া করলেন 'রব্বানা জালামনা আন্‌ফুসানা'—হে আমার পালনকর্তা। আমি স্বীয় সত্তার উপর পীড়ন করেছি। শেষে আল্লাহ্ তাঁকে ও তাঁর সহধর্মিণীকে পথ প্রদর্শন করলেন অধিকতর নৈকট্যভাজনতার দিকে। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— এরপর আল্লাহ্ হজরত আদমকে করলেন অধিকতর নিকটবর্তী ও মনোনীত। তাঁর প্রতি হলেন ক্ষমাপরবশ এবং তাঁকে দান করলেন পথনির্দেশনা— অক্ষয় কল্যাণের দিকে।

পরের আয়াতে (১২৩) বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে একই সঙ্গে জান্নাত থেকে নেমে যাও।' এখানে হজরত আদম, হজরত হাওয়া এবং তাঁদের অনাগত বংশধরকে একযোগে 'তোমরা ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এটাও অবধারিত ছিলো যে, পৃথিবীতে তাঁদের ব্যাপক বংশ বিস্তার ঘটবে এবং তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সন্তানেরা সৃষ্টি করবে অনেক মত ও পথ। পার্থিব অর্জন নিয়েও তাদের মধ্যে উপস্থিত হবে অনেক বিতণ্ডা ও যুদ্ধ। কেউ হবে বিশ্বাসী, কেউ অবিশ্বাসী, কেউ অংশীবাদী, কেউ কপট। তাই হজরত আদম ও হজরত হাওয়ার মধ্যে কোনো শত্রুতা না থাকলেও তাঁদের ভবিষ্যত বংশধরদের দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে বলা হয়েছে— তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে একই সঙ্গে জান্নাত থেকে নেমে যাও।

এরপর বলা হয়েছে— 'পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ এলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখকষ্ট পাবে না।'

বাগবী লিখেছেন, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন পড়বে এবং কোরআনের নির্দেশানুযায়ী চলবে, আল্লাহ্ তাকে দুনিয়ায় গোমরাহী থেকে বাঁচিয়ে সোজা রাস্তায় পরিচালিত করবেন এবং কিয়ামতের দিন হিসাবের ভয়াবহতা থেকেও রক্ষা করবেন। কারণ আল্লাহ্ স্বয়ং এরশাদ করেছেন— 'যে আমার পথ অনুসরণ

www.eelm.weebly.com

করবে, সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখকষ্ট পাবে না।' শা'বীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোরআনের বিধান অনুসারীকে আল্লাহ্ পৃথিবীর পথভ্রষ্টতা থেকে এবং পরবর্তী পৃথিবীর হতভাগ্যতা থেকে নিরাপদ রাখবেন। এরপর হজরত ইবনে আব্বাস পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

এর পরের আয়াতে (১২৪) বলা হয়েছে— 'যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবনের ভোগসম্ভার হবে সংকুচিত।' এখানে 'আমার স্মরণে বিমুখ' কথাটির অর্থ যে আমার ওই সকল বিধানাবলী থেকে বিমুখ, যা আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, বিমুখ ওই আহ্বানকারী থেকে, যে আমার স্মরণের দিকে আহ্বান করে। 'দ্বান্‌কান' অর্থ সংকুচিত। 'মায়ী'শাতান দ্বান্‌কান' অর্থ জীবনের ভোগসম্ভার হবে সংকুচিত। অর্থাৎ জীবন হয়ে পড়বে দুর্বিষহ, দুরূহ ও সংকটাকীর্ণ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, 'মায়ী'শাতান দ্বান্‌কান' অর্থ কবরের আযাব। উত্তমসূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বায্‌যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'মায়ী'শাতান দ্বান্‌কান' হচ্ছে কবরের আযাব। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, মাটি কবরস্থ ব্যক্তিকে এমনভাবে চাপ দিবে যে, তার পাঁজরের এক পাশের হাড় অপর পাশে ঢুকে পড়বে। কোনো কোনো হাদিসগ্রন্থে সুপরিণতসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কোনো কোনো কবরবাসীর কবর এতো সংকীর্ণ হয়ে পড়বে যে, তাদের দুই পাঁজরের হাড় পরস্পরকে ভেদ করে যাবে। পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত এভাবেই শাস্তি দেয়া হবে তাদেরকে। তিবরানী তাঁর সুনান গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এরকম বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

হাসান বলেছেন 'মায়ী'শাতান দ্বানকান' কথাটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে দোজখের যাক্কুম, 'দরি' এবং 'গেসলিন'। ইকরামা বলেছেন, কথাটির অর্থ হারাম রিজিক। জুহাক বলেছেন, অবৈধ উপার্জন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মন্দ স্বভাব। আমি বলি, উপরে বর্ণিত সকল অর্থই 'মায়ী'শাতান দ্বান্‌কান' কথাটির উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যার কারণে দোজখ অবধারিত হয় তা-ই হচ্ছে 'মায়ী'শাতান দ্বান্‌কান'। এক আয়াতে এসেছে— 'এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় কোনো সংকীর্ণ অবস্থানে নিক্ষেপ করা হবে' (সুরা ফুরক্বান)।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বান্দাকে যে সম্পদই দেয়া হোক না কেনো, সে যদি তা আয় ও ব্যয়ের ব্যাপারে তাক্বওয়া অবলম্বন না করে, তবে তা হয়ে পড়ে কল্যাণহীন। ওই কল্যাণহীনতাকেই বলে 'মায়ী'শাতান দ্বান্‌কান'। তাদের মধ্যে যারা কৃপণ তারা ধারণা করে সম্পদ একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

কথাটির অর্থ— আমি তার কাছ থেকে পরিতৃপ্তি ছিনিয়ে নেই। তাই সে কোনোক্রমেই পরিতুষ্ট হতে পারে না। এ দু'টো উক্তির মূল কথা হচ্ছে— যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, সে হয়ে পড়ে স্বেচ্ছাচারী। পার্থিব সম্পদ আহরণ করাই হয় তার মূল লক্ষ্য। সম্পদবৃদ্ধির চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে সে এবং সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারে হয়ে পড়ে ভীতসন্ত্রস্ত। বিশ্বাসীগণের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের সার্বক্ষণিক মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে আখেরাতের প্রতি। তাই আল্লাহ্ তাকে যা কিছু দান করুন না কেনো, তাতেই সে হয় পরিতুষ্ট ও কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসাই হয় তার জীবনাদর্শ। তাই তার জীবন যাত্রা হয় স্বচ্ছন্দ ও পবিত্র।

আমি বলি, কেবল অবিশ্বাসীই যে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখ হয় তা নয়। পৃথিবীর প্রতি আকৃষ্ট সাধারণ বিশ্বাসীরাও হয় আল্লাহ্‌র স্মরণের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত। তাই অবিশ্বাসীদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র স্মরণ বিমুখ বিশ্বাসীরাও আলোচ্য আয়াতের 'যে আমার স্মরণবিমুখ' কথাটির অন্তর্ভুক্ত। সেকারণেই মুসলমান— অমুসলমান নির্বিশেষে পৃথিবীপূজকেরা সম্পদ ঘাটতির আশংকায় সদাশংকিত থাকে। পার্থিব ধনসম্পদকেই তারা তাদের জীবনের উদ্দেশ্যরূপে নির্ধারণ করে। এরকম লোকেরই জীবনযাত্রা হয় অস্বস্তিকর ও সংকুচিত। আর 'মায়ী'শাতান দ্বান্‌কান' কথাটির অর্থ যদি করা হয় পার্থিব সংকট, তাহলে এর মধ্যে কাফের ও ফাসেকদের কোনো প্রবেশাধিকারই থাকবে না। কারণ পৃথিবীতে নবী, ওলী ও পুণ্যবানেরাই অন্যাপেক্ষা অধিক বিপদগ্রস্ত হন। রসুল স. বলেছেন, সবচেয়ে কঠিন বিপদ ও পরীক্ষায় আক্রান্ত হন নবী রসুলগণ। তারপরে তারা, যারা অন্যাপেক্ষা উত্তম। তারপর তারা যারা অন্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ধর্মনিষ্ঠতার তারতম্যানুসারে একে অন্যের চেয়ে অধিক বিপদে পতিত হয়। তাই যে যত ধর্মপ্রাণ, তার বিপদ তত বেশী। আহমদ, বোখারী, তিরমিজি ও ইবনে মাজা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত সা'দ থেকে এবং তিবরানী হজরত হুযায়ফা থেকে।

ইমাম বোখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে জননী আয়েশা থেকে উত্তমসূত্রে বর্ণিত একটি হাদিসে উল্লেখ করেছেন, পৃথিবীতে কঠোর বিপদের সম্মুখীন হন নবী রসুলগণ এবং আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজনগণ।

আমি বলি, উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দু'ভাবে দেয়া যেতে পারে— ১. এখানে যে জীবনযাত্রা সংকুচিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ— পার্থিব সম্পদের স্বল্পতা। আর এরকম অবস্থা কেবল অবিশ্বাসীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। যেমন এক আয়াতে এসেছে— 'যে কুফরী করবে, তাকেও আমি কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিবো; তারপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য

www.eelm.weebly.com

করবো।' (সূরা বাকারা)। সুতরাং কথাটির অর্থ হবে— যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ তাকে আমি পৃথিবীতে সামান্যই জীবিকা দান করবো। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর বিপুল সম্পদও অতি সামান্য। কারণ তা অস্থায়ী ও অবক্ষয়প্রবণ। ২. বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলেরই পার্থিব জীবন দুঃখময়। অর্থাৎ প্রকৃত সুখ থেকে এখানে উভয় দলই বঞ্চিত। এক আয়াতে এসেছে— 'হে মানুষ! তুমি তোমার প্রভুপালকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যে কঠোর সাধনা করে থাকো.........'(সূরা ইনসিকাক)। উল্লেখ্য যে, বিপদাপদের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের পাপক্ষয় হয় এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এই মর্যাদার কথাই ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসে এসেছে। এই বিপদ পৃথিবীতে সাধারণতঃ প্রকাশিত হয় জীবিকার সংকটের আকারে। বিশ্বাসীরা এমতো সংকটগ্রস্ত হলে লাভ করতে পারেন আল্লাহ্‌র প্রতি অধিকতর আকর্ষণ ও বক্ষাভ্যন্তরের প্রশস্ততা। কিন্তু অবিশ্বাসীদের এমতো সংকট পরকালের শাস্তির একটি দূরবর্তী নিদর্শন ছাড়া অন্য কিছু নয়। কারণ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা কোনোটাই তাদের নেই। তাই তাদের বিপদাপদ আস্বাদ্য নয়, তিক্ত।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইবনে মাজা, আবদুর রাজ্জাক ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সবচেয়ে বেশী বিপদগ্রস্ত হন আম্বিয়াগণ। তারপর অন্যান্য পুণ্যবানগণ। তাঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ এমন দারিদ্রে নিপতিত হন যে, পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া তাঁদের আর কিছুই থাকে না। সেই পরিধেয় বস্ত্রও আবার হয় উকুনে উকুনে ভরা। কিন্তু এতো বিপদগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা এতো আনন্দিত থাকেন যে, সম্পদ পেলেও তাঁরা সেরকম আনন্দ পান না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবো অন্ধ অবস্থায়।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'আ'মা' অর্থ দৃষ্টির অন্ধত্ব। মুজাহিদ বলেছেন, প্রমাণগত অন্ধত্ব। অর্থাৎ সেদিন তার স্বপক্ষে থাকবে না কোনো প্রমাণ। অবশ্য পরবর্তী আয়াতে হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতটিই স্বীকৃতি পেয়েছে।

এর পরের আয়াতে (১২৫)বলা হয়েছে— 'সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেনো আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান।' এখানকার 'আ'মা' কথাটিকে যদি দৃষ্টির অন্ধত্ব ধরা হয়, তবে 'আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান' কথাটির অর্থ হবে— আমি তো পৃথিবীতে ছিলাম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। সেখানে আমার স্বপক্ষে অংশীবাদিতার প্রমাণও ছিলো। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে পৃথিবীতেও তাদের অংশীবাদিতার কোনো প্রমাণ নেই। যেমন এক আয়াতে বলা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে— 'যে আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে আহ্বান করে, যে বিষয়ে তাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যার কাছে শিরিকের কোনো দলিল দুনিয়াতেই নেই, সে অন্ধ, তার কাছে আখেরাতেও কোনো দলিল থাকবে না, সেখানেও তারা হবে অন্ধ।' সুতরাং এ কথাটি সুপ্রমাণিত যে, হজরত ইবনে আব্বাসকৃত অর্থটিই সঠিক। অর্থাৎ এখানকার 'অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে' কথাটির অর্থ হবে— আমাকে উত্থিত করলো চোখের দৃষ্টিবিবর্জিত অবস্থায়।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলো, এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'সেদিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করবো' (আয়াত ১০২) । আবার অন্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করবো তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ করে' (সুরা বানী ইসরাইল)। এই আয়াত দু'টোর অর্থ কি? হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, কিয়ামতের দিন তারা এক অবস্থায় হবে নীল বা কটা চক্ষুবিশিষ্ট এবং অন্য অবস্থায় হবে দৃষ্টিশক্তিবিবর্জিত।

এর পরের আয়াতে (১২৬) বলা হয়েছে— 'তিনি বলবেন, তুমি এইরূপই ছিলে; আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিলো, কিন্তু তুমি তা বর্জন করেছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে বর্জন করা হলো'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ বলবেন, পৃথিবীতেও তুমি এরকম অন্ধই ছিলে। আমার সতত পরিদৃশ্যমান নিদর্শনাবলী, অথবা প্রেরিত পুরুষগণের প্রতি অবতীর্ণ মোজেজাসমূহ তোমার কাছে এসেছিলো। কিন্তু তুমি তা দেখেও দেখোনি। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলে অন্য দিকে। অন্ধ যেমন দ্রষ্টব্য বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে, তেমনি তুমি বর্জন করেছিলে আমার নিদর্শনাবলীকে। তাই তোমাকেও এখন দোজখে নিক্ষেপ করে বর্জন করা হবে।

এর পরের আয়াতে (১২৭) বলা হয়েছে— 'এবং এভাবেই আমি প্রতিফল দেই তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরকালের শাস্তিতো অবশ্যই কঠোরতর, অধিক স্থায়ী'। এখানে 'আস্রফা' অর্থ সীমাতিক্রম, স্বেচ্ছাচরণ, বৈমুখ্য। 'লাম ইউমিনু বিআয়াতি রব্বিহী' অর্থ প্রভুপালকের নিদর্শনে আস্থা রাখে না, মান্য করে না। আর 'আশাদ্দু ওয়া আব্ক্বা' অর্থ তাদের পরকালের শাস্তি হবে অবশ্যই অধিক কঠিন ও অধিক স্থায়ী।

www.eelm.weebly.com

শেষের আয়াতে (১২৮) বলা হয়েছে— 'আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কতো মানবগোষ্ঠী, যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে, এটা কি তাদেরকে সৎপথ দেখালো না? অবশ্যই এতে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন।' এখানে 'কাম আহ্লাকনা' কথাটির 'কাম' হচ্ছে বিজ্ঞপ্তিপ্রদায়ক। এর মাধ্যমে এই সংবাদটি প্রদান করা হয়েছে যে— ইতোপূর্বে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি অনেক মানবগোষ্ঠীকে। আর 'এটা কি তাদেরকে সৎপথ দেখালো না' কথাটির উদ্দেশ্য এখানে হতে পারে দু'রকম— ১. এই কোরআন যারা শুনছে, সেই মক্কার অংশীবাদীরাও কি বিনাশপ্রাপ্ত ওই মানবগোষ্ঠীর ঘটনা থেকে হেদায়েত লাভ করতে পারলো না? অথচ ওই বিনাশপ্রাপ্তদের স্থলাভিষিক্ত এখন তারা। ২. ওই মানবগোষ্ঠী তাদের আপনাপন জনপদে নির্বিঘ্নে বিচরণ করতো, হঠাৎ ওই অবস্থায় আমি তাদেরকে ধ্বংস করে ফেললাম, হেদায়েত লাভের সুযোগ আর তারা পেলো না।

সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ১২৯, ১৩০

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ۝ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝

❐ তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকিলে ও এক কাল নির্ধারিত না হইলে অবশ্যম্ভাবী হইত আশু শাস্তি।

❐ সুতরাং, উহারা যাহা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও দিবাভাগে যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইতে পার।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আমার পূর্ব নির্ধারণ এই যে, আমি আপনার উম্মতের অবাধ্যদেরকে এই পৃথিবীতে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি প্রদান করবো না, তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিবো না তাদের পূর্বসূরীদের মতো। কারণ, আপনি বিশ্বসমূহের জন্য আমার পক্ষ থেকে রহমত। আপনার সম্মানের কারণে আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত এটাই। যদি আমার এরকম সিদ্ধান্ত না থাকতো, তবে অবশ্যই আমি আপনার শত্রুদেরকে এখানে সমূলে উৎপাটন করতাম। তবে আখেরাতে তাদের শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (১৩০) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তারা যা বলে, সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো রাত্রিকালে ও দিবাভাগে, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো।'

'ফাসবির্' অর্থ ধৈর্যধারণ করো। অর্থাৎ হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীরা আপনাকে কথায় ও আচরণে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়। আপনি ওই কষ্টে ধৈর্যধারণ করুন, 'ওয়া সাব্বিহ্' অর্থ পবিত্রতা বর্ণনা করুন। অর্থাৎ নামাজ প্রতিষ্ঠা করুন। 'বিহামদি রব্বিকা।' অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আল্লাহ্র মহিমা বর্ণনা করুন যিনি আপনাকে নামাজ ও তসবিহ্ পাঠের সুযোগ ও যোগ্যতা দান করেছেন। একথার মধ্যে এই ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে যে, ইবাদত করতে পারলে বান্দা যেনো আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা ভুলে না যায়। কারণ ইবাদতের তৌফিক দিয়েছেন তিনিই। আর তাঁর সাহায্যেই সুসম্পন্ন হয়েছে ইবাদত। সুরা ফাতিহায়ও এরকম বলা হয়েছে। যেমন 'আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।' আর এখানে 'সাব্বিহ্' (পবিত্রতা বর্ণনা করো) কথাটির পরেই এসেছে 'বিহামদি রব্বিকা' (মহিমা ঘোষণা করো তোমার প্রভুপালকের)। এতে করে প্রমাণিত হয়, নামাজের মধ্যে সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। রসুল স. বলেছেন, সুরা ফাতিহা ব্যতীত নামাজ হয় না। বোখারী, মুসলিম, আহমদ। আর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে নামাজের মধ্যে সুরা ফাতিহা পড়েনি, তার নামাজ হয়নি। পবিত্রতা ঘোষণা করা এবং প্রশংসা বর্ণনা করার কথা এখানে বলা হয়েছে সংক্ষেপে। কিন্তু রসুল স. এর পবিত্র বাণী এই সংক্ষিপ্ততাকে বিস্তৃত করে দিয়েছে। এভাবে এই মর্মার্থটি দাঁড়িয়েছে যে, এখানে পবিত্রতা বর্ণনা করার অর্থ সুরা ফাতিহা পাঠ করা।

'সূর্যোদয়ের পূর্বে' কথাটির অর্থ এখানে ফজরের নামাজ। আর 'সূর্যাস্তের পূর্বে' কথাটির অর্থ আসরের নামাজ। কেউ কেউ বলেছেন, 'সূর্যাস্তের পূর্বে' কথাটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে বিগত দিনের দুই ওয়াক্তের নামাজ জোহর ও আসরকে।

'ওয়া মিন আনাইল্ লাইলি' কথাটির অর্থ মাগরিব ও ইশার নামাজ। 'আনাআ' শব্দটির অর্থ সময়। শব্দটি 'ইন্না' শব্দের বহুবচন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'রাত্রিকালে' কথাটির অর্থ রাতের প্রথমাংশে। আমি বলি, এর দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাজও উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব। কেননা এখানে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে সরাসরি এবং তাহাজ্জুদ ছিলো তাঁর উপরে ওয়াজিব।

'ওয়া আত্বরাফান্ নাহার' অর্থ দিবাভাগে। কথাটির সম্পর্ক রয়েছে, 'সূর্যাস্তের পূর্বে' কথাটির সঙ্গে। এভাবে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে ফজর ও আসরের নামাজের। অধিক গুরুত্ব প্রদান করাই এমতো পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, ফজর ও আসর অতিরিক্ত গুরুত্ব পাওয়ার উপযোগী। ঘুম ভেঙে ফজরের নামাজ আদায় করা কষ্টকর এবং আসরের নামাজের সময় মানুষ লিপ্ত থাকে পার্থিব

www.eelm.weebly.com

কাজে। তাই এভাবে এখানে এই দুই ওয়াক্ত নামাজের প্রতি অধিক তাগিদ দেয়া হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তোমরা নামাজের হেফাজত করো, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের।' এখানে মধ্যবর্তী নামাজ বলে আসরের নামাজকে বুঝানো হয়েছে, যদিও 'নামাজের হেফাজত করো' কথাটির মধ্যে আসরের নামাজও অন্তর্ভুক্ত।

এরকমও হতে পারে যে, 'দিবাভাগে' বলে এখানে বোঝানো হয়েছে জোহরের নামাজের কথা আর 'রাত্রিকালে' বলে বুঝানো হয়েছে এশার নামাজকে। কেননা জোহরের সময় হয় দিবসের দ্বিতীয় ভাগে, দিবসের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'দিবাভাগে' বলে বুঝানো হয়েছে জোহর ও মাগরিবকে। কারণ দিবসের দ্বিতীয় ভাগের শুরুতেই হয় জোহরের নামাজের সময়। এদিক থেকে জোহরকে বলা যেতে পারে দিবসের দুই অংশের মিলনস্থল। আর মাগরিবের নামাজের সময় হয় দিবাবসানের পর। অথবা 'দিবাভাগের' কথাটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে দিনের বিভিন্ন অংশকে এবং 'পবিত্রতা বর্ণনা করো' কথাটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে নফল নামাজকে।

'লায়াল্লাকা তারদ্বা' অর্থ উল্লেখিত সময়ে নামাজ পাঠ করো, তাহলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পুণ্য অর্জন করতে পারবে এবং তাতে করে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হবে— যেনো তোমাদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করে নেন। কেউ কেউ বলেছেন, 'সন্তুষ্ট হতে পারো' কথাটির অর্থ এখানে— যেনো লাভ করতে পারো শাফায়াতের অধিকার, যা হবে তোমার প্রসন্নতার কারণ। অর্থাৎ আশা করা যায় যে, তুমি শাফায়াতের অধিকার পেয়ে খুশী হয়ে যাবে। এই খুশী হওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে অপর এক আয়াতে এভাবে— 'অচিরেই তোমার প্রভুপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে'। (সুরা দ্বোহা)। বোখারী, মুসলিম, সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, হজরত জারীর বিন আবদিল্লাহ্ বলেছেন, আমরা একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। আকাশে ছিলো চতুর্দশীর চাঁদ। সেদিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি স. বললেন, যেভাবে তোমরা চাঁদ দেখছো সেভাবেই তোমরা দেখতে পাবে তোমাদের প্রভুপালনকর্তাকে। এখন যেমন কোনো আড়াল নেই, তখনো তেমনি কোনো আড়াল থাকবে না। সুতরাং তোমাদের সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামাজ যেনো কখনো বাদ না পড়ে। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন— 'এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রভুপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।'

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মারদুবিয়া, বায্যার এবং আবু ইয়া'লীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু রাফে' বলেছেন, একবার রসুল স. এর নিকটে একজন মেহমান উপস্থিত হলো। তিনি স. আমাকে এক ইহুদীর কাছে বাকীতে আটা ক্রয় করার জন্য পাঠালেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে— এতো এতো পরিমাণ আটা।

www.eelm.weebly.com

অথবা তিনি স. তখন আমাকে বলতে বলেছিলেন, আমাকে রজবের চন্দ্রোদয়ের সময় পর্যন্ত আটা ধার দাও। আমি ওই ইহুদীর কাছে গিয়ে একথাই বললাম। ইহুদী বললো, আমি কোনো কিছু বন্ধক না রেখে আটা দিতে পারবো না। আমি ফিরে এসে রসুল স.কে সব কথা জানালাম। তিনি স. বললেন, সে আমার হাত ক্রয় করে ফেলতো, অথবা বললেন, সে যদি বাকীতে বিক্রি করতো, তবে আমি তো অবশ্যই তার মূল্য পরিশোধ করতাম। আমি আকাশ ও পৃথিবী উভয় স্থানে 'আমীন' (বিশ্বস্ত) বলে প্রসিদ্ধ। যাও, আমার লৌহবর্মটি নিয়ে পুনরায় তার কাছে যাও। আমি সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে না হতেই অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۙ
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ○ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ
عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ○ وَقَالُوا۟ لَوْلَا
يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ○ وَلَوْ أَنَّآ
أَهْلَكْنَٰهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِۦ لَقَالُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا
فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ○ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا۟
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَٰبُ ٱلصِّرَٰطِ ٱلسَّوِىِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ○

❐ আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের কতককে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়াছি তাহার প্রতি তুমি কখনও লক্ষ্য করিও না। তোমার প্রতিপালক-প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।

❐ এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও উহাতে অবিচলিত থাক; আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাহি না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং শুভ পরিণাম তো সাবধানীদিগের জন্য।

❐ উহারা বলে, 'সে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে আমাদিগের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন?' উহাদিগের নিকট কি আসে নাই সুস্পষ্ট প্রমাণ যাহা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে?

www.eelm.weebly.com

❐ যদি আমি উহাদিগকে ইতিপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করিতাম তবে উহারা বলিত, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করিলে না কেন? করিলে, আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবার পূর্বে তোমার নিদর্শন মানিয়া চলিতাম।

❐ বল, 'প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করিতেছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অতঃপর তোমরা জানিতে পারিবে কাহারা রহিয়াছে সরল পথে এবং কাহারা সৎপথ অবলম্বন করিয়াছে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কতককে তাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনো লক্ষ্য কোরো না। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।'

এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে কাউকে কাউকে দিয়েছি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকারের ভোগবিলাসের উপকরণ। ওই সকল উপকরণের দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করাই আমার উদ্দেশ্য। সুতরাং আপনিতো তাদের ওই সকল অবক্ষয়প্রবণ ধনসম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হবেনই না, আপনার অনুসারীরাও যেনো আকৃষ্ট না হয়। যেনো এরকম মনে না করে যে, আমরাও যদি এগুলো পেতাম। আপনাকে আমি দান করেছি নবুয়ত, হেদায়েত, হালাল রিজিক, জান্নাত ও আমার নৈকট্য। আপনার একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকে আমি নবুয়ত ছাড়া অন্য নেয়ামতগুলো দান করবো। এগুলোই আপনার ও আপনার অনুসারীদের জন্য আমার পক্ষ থেকে প্রদত্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ। এগুলোই চিরস্থায়ী।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, আল্লাহ্‌প্রদত্ত জীবনোপকরণ দ্বারা যদি কারো হৃদয় প্রশান্ত না হয়, তবে তাকে পৃথিবীতে ফেলতে হয় দীর্ঘশ্বাস। আর যে অন্যের বিত্ত-বৈভবের প্রতি লালসাপরায়ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, মনে করে এগুলোই আসল প্রাপ্তি (ইমান, হেদায়েত, সওয়াব, জান্নাত কিছু নয়), তার সকল সৎকর্ম বিনষ্ট হয়। তার জন্য আখেরাতে রয়েছে অশেষ আযাব।

পরের আয়াতে (১৩২) বলা হয়েছে— 'এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও তাতে অবিচলিত থাকো; আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং শুভ পরিণাম তো সাবধানীদের জন্য'। একথার অর্থ— এবং হে আমার রসুল! আপনার পরিবারবর্গ ও আপনাকে যারা সত্য নবী বলে মান্য করে, তাদেরকে সম্পদের লোভ পরিহার করে নামাজ প্রতিষ্ঠার আদেশ দিন এবং এই আদর্শের উপরে

www.eelm.weebly.com

সকলকে অটল থাকতে বলুন। আমি চাই না যে, আপনি নিজে নিজে আপনার ও অন্যদের জীবনোপকরণ সৃষ্টি করুন। এ দায়িত্ব আপনার কিংবা অন্য কারো নয়। সকলকে রিজিক দিয়ে থাকি আমিই। সুতরাং রিজিকের জন্য অযথা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে সকলের উচিত নামাজ প্রতিষ্ঠায় নিমগ্ন হওয়া এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে সকল অন্যায় থেকে সাবধান হয়ে যাওয়া। এরকম সাবধানতা (তাক্বওয়া) অবলম্বন যারা করে, তাদের জন্যই অপেক্ষমান শুভপরিণাম।

'ওয়াল আক্বিবাতু লিত্ তাক্বওয়া' অর্থ 'শুভ পরিণাম তো সাবধানীদের জন্য'। পুণ্য কর্মের পরিণাম শুভ এবং পাপের পরিণাম অশুভ। অশুভ পরিণাম বুঝাতে ব্যবহৃত হয় 'ইক্বাব' শব্দটি। 'ইক্বাব' বলা হয় ওই আযাবকে, যা আসে মন্দ কর্ম সম্পাদনের পর। হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! যারা আপনাকে জানে, মানে, আপনার প্রদর্শিত পথে চলে এবং আমাকে ভয় করে তাদের পরিণতি শুভ।

সাঈদ ইবনে মনসুর তাঁর সুনানে, তিবরানী তাঁর আল আওসাতে, আবু নাঈম তাঁর হুলিয়ায় এবং বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমানে বর্ণনা করেছেন, সংসারে দুঃখ কষ্ট দেখা দিলে রসুল স. তাঁর পরিবারবর্গকে নামাজ পাঠের নির্দেশ দিতেন এবং তেলাওয়াত করতেন আলোচ্য আয়াত।

এর পরের আয়াতে (১৩৩) বলা হয়েছে—'তারা বলে, সে তার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমাদের নিকট কোনো নিদর্শন আনয়ন করে না কেনো? তাদের নিকট কি আসেনি সুস্পষ্ট প্রমাণ যা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে?' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, মোহাম্মদ তার নবুয়তের স্বপক্ষে কোনো মোজেজা প্রদর্শন করে না কেনো? আপনি তাদেরকে বলুন, এই তো সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেজা। এই তো অক্ষয় কোরআন। এই কোরআন কি তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়নি? এই কোরআন কি পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের *প্রত্যয়নকারী এবং পূর্বের সকল মোজেজার স্বীকৃতি প্রদানকারী নয়?*

উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী নবী রসুলগণের মাধ্যমে জ্ঞানগত ও কর্মগত অনেক অলৌকিকত্ব প্রকাশিত হতো, ওই সময়ের মানুষ সেগুলোর মোকাবিলা করতে পারতো না। কিন্তু ওই সকল মোজেজার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ছিলো একটি বিশেষ কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু কোরআনের মোজেজা চিরকালীন। কারণ এর ভিত্তি হচ্ছে প্রজ্ঞা ও রহস্যময়তা, যা অনিঃশেষ। আরো উল্লেখ্য যে, প্রজ্ঞা বা এলেম হচ্ছে সকল আমলের (কর্মের) ভিত্তি। তাই প্রজ্ঞাগত মোজেজা নিশ্চয় কর্মগত মোজেজা অপেক্ষা উত্তম ও অধিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। সেকারণেই যে নবীর

www.eelm.weebly.com

মাধ্যমে প্রজ্ঞাগত মোজেজা প্রকশিত হয়, তিনি কর্মগত মোজেজাসম্পন্ন নবী অপেক্ষা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। কোরআন হচ্ছে অন্তহীন জ্ঞানের এক রহস্যময় ভাণ্ডার। আলোচ্য আয়াতে এই অমূল্য তত্ত্ব ও তথ্যটির প্রতিই সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

'তাদের নিকট কি আসেনি সুস্পষ্ট প্রমাণ যা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে?' এই প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। প্রশ্নাকারে উত্থাপিত বাক্যটির অর্থ— হে আমার রসুল! এখন পর্যন্ত অংশীবাদীরা আপনাকে চিনতে পারছেনা কেনো? আপনি অক্ষরের অমুখাপেক্ষী। পৃথিবীর কোনো ভাষার লিখিত অক্ষরের সঙ্গে আপনাকে সম্পৃক্ত করা হয়নি, পৃথিবীর সকল শিক্ষক থেকে আপনাকে রাখা হয়েছে মুক্ত ও পবিত্র। এতদসত্ত্বেও আপনার রসনায় উচ্চারিত হয়ে চলেছে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানভাণ্ডার আল কোরআনের আয়াতসমূহ। এটা কি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অলৌকিকত্ব নয়? এই অনন্য অলৌকিকতা যাঁর মাধ্যমে বিস্তৃত ও বিকশিত হয়ে চলেছে, তিনি কি অতি অবশ্যই আল্লাহ্‌র সত্য বচনবাহক নন? কোন যুক্তিতে, সাহসে ও ধৃষ্টতায় এখনো তারা আঁকড়ে ধরে রয়েছে অবিশ্বাসকে, অসত্যকে?

উল্লেখ্য, আলোচ্য বক্তব্যটির মধ্যে এই ইঙ্গিতটিও প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, কোরআন হচ্ছে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সম্মিলনকারী ও প্রত্যয়নকারী। পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের এই বৈশিষ্ট্যটি নেই। তাই সেগুলো ছিলো সাক্ষ্যনির্ভর। কিন্তু কোরআন স্বতঃসিদ্ধ ও স্বপ্রমাণিত। কারণ এই মহান গ্রন্থ রচনায় মানবরচিত বিদ্যার কোনোই প্রবেশাধিকার নেই। তাই এই কোরআনই হচ্ছে রসুল স. এর নবুয়তের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আর এভাবে একথাটিও সুপ্রমাণিত যে, তিনি স. ছিলেন অক্ষরের অমুখাপেক্ষী (উম্মী)।

আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাটিও বলা হয়ে থাকতে পারে যে, বিগত যুগের উম্মতেরা তাদের নবীগণের নিকটে বিভিন্ন রকম মোজেজা দেখতে চেয়েছিলো। তাদেরকে তাদের কাংখিত মোজেজা দেখানো হয়েছিলোও। কিন্তু তারা সে সকল মোজেজার সম্মান রক্ষা করেনি। ইমান আনেনি। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এই বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে— মক্কার মুশরিকেরা কোরআনে বর্ণিত ওই সকল কাহিনীর মূল শিক্ষাকে মান্য করতে চায়না কেনো? তাদের কাংখিত মোজেজা প্রকাশিত হওয়ার পর ওজর আপত্তি ও অবকাশের সুযোগ তো আর থাকতে পারে না। একথা জেনেও তারা বার বার মোজেজা মোজেজা করে কেনো?

এর পরের আয়াতে(১৩৪) বলা হয়েছে— 'যদি আমি তাদেরকে ইতোপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তবে তারা বলতো, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট একজন রসুল প্রেরণ করলে না কেনো? করলে, আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার পূর্বে তোমার নিদর্শন মেনে চলতাম।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি যদি আপনাকে মক্কায় প্রেরণ করার আগেই অংশীবাদিতার কারণে আপনার সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দান করতাম, তবে

www.eelm.weebly.com

মহাবিচারের দিবসে তারা বলতো, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তোমার কোনো সতর্ককারী রসুল প্রেরণের আগেই আমাদেরকে এভাবে শাস্তি দিলে কেনো? রসুল প্রেরণ করলে আমরা তো তাঁকে অবশ্যই মান্য করতাম। তাহলে পৃথিবীর শাস্তি ও আজকের এই আখেরাতে অসহনীয় শাস্তি আমরা পেতাম না।

সর্বশেষ আয়াতে (১৩৫) বলা হয়েছে— 'বলো' প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা করো। অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কারা রয়েছে সরল পথে এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে?' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনাকে প্রত্যাখ্যানকারী জনতাকে আপনি জানিয়ে দিন, সত্যকে যখন তোমরা স্বীকার করতেই চাও না, তখন পরিণামের প্রতীক্ষায় থাকো। এমতো প্রতীক্ষা করতে হবে তোমাদের সকলকেই। তারপর এক সময় তোমরাও বুঝতে পারবে সরল পথ ও সৎপথ অবলম্বনকারী ছিলো কারা? কিন্তু তখন তোমাদের তো প্রত্যাবর্তনের পথ আর খোলা থাকবে না।

অংশীবাদীরা বলতো, আমরা প্রতীক্ষায় আছি। এক সময় মোহাম্মদও তো হারিয়ে যাবে কালক্রমে। তখন মানুষ আবার আমাদেরকেই অনুসরণ করতে শুরু করবে। তাদের ওই কথিত প্রতীক্ষার সূত্র ধরেই আলোচ্য আয়াতে এসেছে এমতো বক্তব্য। এখানে 'অতঃপর তোমরা জানতে পারবে' কথাটির অর্থ শেষে তোমরা সত্যোপলব্ধি করতে পারবে মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানকালে।'সরল পথ' অর্থ যে পথ চলে গিয়েছে জান্নাতের দিকে। 'সৎপথ' অর্থ যে পথ সকল ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত। এভাবে 'সরল পথ' ও 'সৎপথ' কথা দু'টোর মিলিত অর্থ দাঁড়ায়— চিরস্থায়ী শান্তির পথ।

হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে এবং বায়হাকী বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে এবং বাগবী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে সুরা বাকারার প্রথমাংশ, ত্বহা, ত্ব সিন মিম সম্বলিত সুরা সমূহ, হা মিম সম্বলিত সুরা সমূহ নবী মুসার তওরাত থেকে দান করা হয়েছে এবং সুরা ফাতিহা ও সুরা বাকারার শেষাংশ বিশেষভাবে দান করা হয়েছে আরশের নিম্নদেশ থেকে। আর অতিরিক্ত হিসেবে দান করা হয়েছে সুরা মুফাস্সিলাত। হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে এবং তিবরানী ও ইবনে মাজা হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র ইসমে আজম ধরে প্রার্থনা জানালে আল্লাহ্ তা কবুল করে নেন। আর ওই ইসমে আজম রয়েছে তিনটি সুরায়— সুরা বাকারায়, সুরা আলে ইমরানে এবং সুরা ত্বহা'য়।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। তাঁরই বিশেষ অনুগ্রহে সুরা ত্বহা'র তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ ৮ই রবিউস্সানি, ১২০৩ হিজরী সনে। ফালহামদু কুবলা লাহু ওয়াল হামদু বা'দালাহু।

www.eelm.weebly.com

সপ্তদশ পারা

আমি তোমারই প্রশংসা করি হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তা! তুমি ছাড়া উপাস্য কেউই নেই। আমি মান্য করি তোমার পবিত্রতাকে। আমি চাই তোমার সাহায্য ও ক্ষমা। আমি সাক্ষ্য দেই, তুমিই সকল সাম্রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর। তুমি যাকে চাও, তাকেই দান করো কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও রাজত্ব। আবার যাকে চাও, ছিনিয়ে নাও তার এমতো অধিকার। যাকে ইচ্ছা, তাকে সম্মানিত করো তুমি, আবার যাকে ইচ্ছা করো অপদস্থ। তোমার অধিকারেই রয়েছে সকল কল্যাণ। সকল কিছুর উপরে তোমার অপার ক্ষমতা সতত বিদ্যমান। তুমি আমার, আকাশ-পৃথিবীর এবং সমগ্র সৃষ্টির এক, অবিভাজ্য ও অংশীবিহীন মালিক।

আমি তোমার অফুরন্ত রহমত কামনা করি তোমার বচনবাহক ও প্রেমাস্পদ মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা স. এর প্রতি, যিনি আমাদের অধিনায়ক ও অভিভাবক। আরো রহমত কামনা করি সকল নবী রসুল ও সকল পুণ্যবানগণের প্রতি। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

সূরা আম্বিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরায় রয়েছে ৭টি রুকু এবং ১১২টি আয়াত। সুরা আম্বিয়া অবতীর্ণ হয়েছে সুরা ইব্‌রাহীমের পরে।

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۝ مَا يَاْتِيْهِمْ
مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝ قٰلَ
رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؗ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۭ
بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚۖ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۝

❑ মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু উহারা উদাসীনতায় মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।

www.eelm.weebly.com

❒ যখনই উহাদিগের নিকট উহাদিগের প্রতিপালকের কোন নূতন উপদেশ আসে উহারা উহা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে,

❒ উহাদিগের অন্তর থাকে অমনোযোগী। সীমালংঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে 'এতো তোমাদিগেরই মত একজন মানুষ, তবুও কি তোমরা দেখিয়া শুনিয়া যাদুর কবলে পড়িবে?'

❒ রসূল বলিল, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

❒ উহারা ইহাও বলে 'এই সমস্ত অলীক কল্পনা। হয় সে ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে, না হয় সে একজন কবি। অতএব সে আনয়ন করুক আমাদিগের নিকট এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হইয়াছিল পূর্ববর্তীগণ।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন।' এখানে 'মানুষের' অর্থ সকল মানুষের। অথবা সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর। প্রথমোক্ত অর্থ হবে 'লিন্নাস' কথাটির 'লাম'কে আলিফ লাম জিনসী (জাতিবাচক লাম) ধরলে। আর 'লাম'কে আলিফ লাম আহদী (সীমিত) ধরলে গৃহীত হবে শেষোক্ত অর্থটি। পরের বাক্যের দিকে লক্ষ্য করলে অবশ্য শেষের অর্থটিকেই গ্রহণ করতে হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।' একথার অর্থ— কিন্তু অপরিণামদর্শী মানুষ পৃথিবীর ভোগ বিলাসে মগ্ন হয়ে গিয়েছে। ফলে তারা পরিণাম দিবসের প্রতি হয়ে পড়েছে উদাসীন ও বিমুখ।

এখানে 'উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে 'কথাটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আখেরাতের হিসাব নিকাশ সম্পর্কে উদাসীন থাকার কারণেই মানুষ সংলিপ্ত হয়ে পড়ে পার্থিবতায়। অর্থাৎ যে আল্লাহ্র স্মরণে লিপ্ত নয়, পরকালের কথা তার স্মৃতিপটে উদিত হয় না। আর যদি এখানকার 'আন্নাস' (মানুষ) শব্দটি নিপাতনী 'লাম' এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে এখানকার 'তারা' (হুম) সর্বনামটিকে কোনো কোনো মানুষের অর্থাৎ কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করতে হবে। এরকম বাকরীতি অসঙ্গত নয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ওয়াল মুতাল্লাক্বাতু ইয়াতারাব্বাস্না বি আনফুসিহিন্না ছালাছাতা কুরূইন ওয়া বুয়ুলাতুহুন্না আহাক্কু বি রদ্দিহিন্না। এখানে 'আল মুতাল্লাক্বাতু' শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত । কিন্তু এখানকার 'বুয়ুলাতিহিন্না' এর 'হিন্না' সর্বনামটি 'মুতাল্লাক্বাতু' কথাটির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তার সঙ্গে যুক্ত, যার তালাকে রজয়ী হয়েছে।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোনো নতুন উপদেশ আসে, তারা তা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে।'

www.eelm.weebly.com

এখানে 'মিন জিকরিন' (নতুন উপদেশ) কথাটির 'মিন' অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। যে উপদেশ মানুষকে উদাসীনতা থেকে সচকিত করে দেয়, তাকেই বলে 'জিকির'। 'মুহ্‌দাছিন' অর্থ সদ্য অবতীর্ণ বা নতুন করে অবতীর্ণ। এর মানে আবার এই নয় যে, আল্লাহ্‌র কালাম নতুন। এরকম হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। তাঁর বাণী অনাদি, অনন্ত, অধ্বংসী ও চিরন্তন। সুতরাং তা নতুনত্বের কলংক থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। সেই চিরন্তন কালাম থেকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে নতুন নতুন নির্দেশ জারী করা হয়। এরকম নতুন করে জারী করা উপদেশকেই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে 'মুহ্‌দাছিন' কথাটির মাধ্যমে। সুতরাং মোতাজিলাদের মতবাদ অতি অবশ্য পরিত্যাজ্য। কারণ তারা আল্লাহ্‌র বাণীকে ক্বদীম বা চিরন্তন বলে স্বীকার করতে চায় না।

'ওয়াহুম ইয়ালআ'বুন' অর্থ— ওই সদ্য অবতীর্ণ উপদেশকে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীরা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে, নিতান্ত গুরুত্বহীনভাবে। তাই তারা কোরআনকে নিয়ে উপহাস করার ধৃষ্টতাও দেখায়।

এর পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী।' একথার অর্থ— কোরআনের নির্দেশনার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণের ব্যাপারে তাদের অন্তর থাকে উদাসীন। আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতির চিন্তা তাদের হৃদয়ে জাগ্রত হয় না। আবু বকর ওয়ার্‌রাক বলেছেন, কথাটির অর্থ— তাদের অন্তর থাকে পার্থিব ভোগবিলাসের আনন্দে মত্ত, তাই সেখানে আখেরাতের চিন্তা উদিত হয় না।

এরপর বলা হয়েছে— 'সীমালংঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে।' গোপন কথা গোপনেই বলা হয়। ওই গোপনীয়তাকে বোঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'নাজ্‌ওয়া' শব্দটি। কিন্তু কথা হচ্ছে এর পূর্বে আবার 'আসাররু'(গোপনে) শব্দটি বসানো হলো কেনো? এমতো প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে— শব্দটির মাধ্যমে গোপনীয়তার সঙ্গে অধিক সতর্কতা অবলম্বনের কথাও হয়তো এখানে বলা হয়েছে। অথবা বোঝানো হয়েছে, তাদের কথা ও বাক্যালাপের স্থান দু'টোই ছিলো গোপনীয়।

'আসাররু ' শব্দটির 'ওয়াও' অক্ষরটি এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। অথবা এর সর্বনাম বহুবচনের এবং আল্‌লাজীনা তা থেকে প্রতিস্থাপিত অথবা এর পূর্বে উদ্দেশ্য হিসেবে 'হাউলায়ি' (তারা) কথাটি উহ্য রয়েছে। আর 'আল্‌লাজীনা জলামু' (সীমালংঘনকারীগণ) এর পূর্বে উদ্দেশ্যরূপে অনুক্ত রয়েছে 'হুম' (তারা)। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— ওই সকল সীমালংঘনকারীরা গোপন স্থানে অত্যন্ত সঙ্গোপনে পরামর্শ করে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এ তো তোমাদেরই মতো মানুষ। তবুও কি তোমরা দেখেশুনে যাদুর কবলে পড়বে?' মক্কার অংশীবাদীরা মনে করতো, মানুষ কখনো মানুষের নবী হতে পারে না। যিনি নবী প্রেরণ করেন, নবীকে হতে হবে তাঁর সমগোত্রীয়। ফেরেশতাকে তারা মনে করতো আল্লাহ্র সমগোত্রীয়। তাই তারা বলতো, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। আর এরকম বিশ্বাস রাখতো যে, নবী হতে পারে কেবল ফেরেশতা, মানুষ নয়। কিন্তু ফেরেশতারা তো কখনোই আল্লাহ্র সমগোত্রীয় বা সমজাতীয় নয়। তারা আল্লাহ্র এক বিশেষ সৃষ্টি। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন তাদের ও অন্যান্য সৃষ্টির একক, অসমকক্ষ ও অংশীবিহীন স্রষ্টা। অপর দিকে ফেরেশতারা আবার মানুষের সমজাতীয় ও সমগোত্রীও নয়। এই দুই সৃষ্টির স্বভাববৈচিত্র পৃথক। মিলের চেয়ে অমিলই তাদের মধ্যে বেশী। তাই ফেরেশতাকে মানুষের নবী বানানো হলে মানুষ তাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারতো না। উপকার প্রদান ও আহরণ সমজাতীয়দের মধ্যেই হওয়া সম্ভব। তাই আল্লাহ্ মানুষকেই নির্বাচিত করেছেন মানুষের নবী হিসেবে। কিন্তু মক্কার অংশীবাদীরা একথা বিশ্বাস করতে চাইতো না। তাই তারা একে অপরকে বলতো, মোহাম্মদ তো তোমাদের মতো মানুষ। তাকে তোমরা নবী বলে মানতে যাবে কেনো?

উল্লেখ্য যে, এরকম কথা বলেও তারা স্বস্তি পেতো না। কারণ চোখের সামনেই দেখতো একে একে অবতীর্ণ হয়ে চলেছে কোরআনের অলৌকিক বাণী বৈভব, যা তাদের চিন্তা, বুদ্ধি ও প্রতাপকে অকার্যকর করে দেয়। অন্যান্য মোজেজা সমূহও তাদেরকে করে দেয় হতবাক। এ সকল কিছুকে স্বীকার করতে গেলে রসুল স. কে নবী বলে তাদেরকে মানতেই হয়। কিন্তু তারা তা মানতে রাজি নয়। অথচ এমতো সুস্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত ও প্রমাণসম্মত কোনোকিছুই তাদের নেই। তাই তারা সোজাসুজি মোজেজা সমূহকে বলে যাদু। একে অপরকে সাবধান করে দেয় একথা বলে, মোহাম্মদ তোমাদের মতোই তো একজন মানুষ। আর তার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে যাদু। সুতরাং সাবধান হও। বাপ-দাদার ধর্ম রক্ষা করো। দেখেশুনে যাদুকরের পাল্লায় পোড়ো না। একথাই আলোচ্য বাক্যের শেষাংশে প্রশ্নকারে উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে— তবুও কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর কবলে পড়বে?

এর পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'রসুল স.বললো, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' একথার অর্থ রসুল স. তাদের মূর্খতার পর্দা উন্মোচন করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে এভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, দ্যাখো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা প্রকাশ্যে গোপনে যা কিছুই বলো ও করো না কেনো, আল্লাহ্র অভিপ্রায় ও পরিকল্পনাকে তোমরা প্রতিহত করতে পারবে না। তাঁর বিরুদ্ধে গেলে তোমরা অক্ষম ও পর্যুদস্ত হবেই। তিনি যে সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'তারা এ-ও বলে, এ সমস্ত অলীক কল্পনা, হয় সে উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি। একথার অর্থ— ওই সকল অংশীবাদীরা একথাও বলে যে, এই কোরআন একটি অলীক কল্পনাসম্ভূত বাণীর সমাহার ছাড়া কিছুই নয়। অথবা স্বপ্নের মাধ্যমে পাওয়া কোনো কাল্পনিক বৃত্তান্ত। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসা প্রত্যাদেশ এগুলো কিছুতেই নয়। এরকম বলেও তারা স্বস্তি পেতো না। কারণ দিবালোকের মতো দেখতো কোরআনের উপদেশমালা, রচনাশৈলী ও বক্তব্য-বৈভব অত্যন্ত উচ্চমানের, এক কথায় অতুলনীয়। তাই তারাই তাদের পূর্বোক্ত মন্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে বলতো, না কাল্পনিক কাহিনী ঠিক নয়। কোরআন হচ্ছে মোহাম্মদের নিজের রচিত একটি উচ্চমানের কবিতা সংকলন। ওহী বা প্রত্যাদেশ কিছুতেই নয়।

বাগবী লিখেছেন, মক্কার অংশীবাদীরা কোরআন সম্পর্কে এক এক জন এক এক কথা বলতো। কেউ বলতো কোরআন হচ্ছে বিক্ষিপ্ত ও বিস্রস্ত স্বপ্নবৃত্তান্তের সমাহার। কেউ বলতো ভিত্তিহীন কাহিনী, আবার কেউ বলতো কবিতা। উল্লেখ্য যে, 'অলীক কল্পনা' ও 'কবিতা'র মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অলীক কল্পনার অবতারকেরা তাদের বক্তব্যকে জনসমক্ষে সত্য বলে উপস্থাপন করতে চায়। এটাও চায় যে, মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করুক। আর কবিতার উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে মুগ্ধ করা, উদ্দীপিত করা, আন্দোলিত করা, অভিভূত করা ও আনন্দ দান করা। বিশ্বাস করা না করা এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। আবার কবিতা লেখা হয় যে কোনো বিষয়ে। বিষয়ের চেয়ে প্রকরণ বা রচনাশৈলিই এখানে প্রধান বিবেচ্য। কিন্তু কোরআনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার পৃথকীকরণ, মহাজীবনের সফলতার দিকে মানুষকে পথপ্রদর্শন এবং ভালো ও মন্দের পরিণতি সম্পর্কে সচকিত করণ, জীবনের সর্বক্ষেত্রের কর্তব্য নির্ধারণ। অর্থাৎ মানুষের মূল ও আনুসঙ্গিক সকল সমস্যা ও সমাধানের ব্যবস্থা রয়েছে কেবল কোরআনে। কবিতা, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদিতে এসবের কোনো কিছুই নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব সে আনয়ন করুক আমাদের নিকটে এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিলো পূর্ববর্তীগণ।' একথার অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আরো বলে, হজরত সালেহ্ নিয়ে এসেছিলেন অলৌকিক উষ্ট্রী, হজরত মুসার ছিলো অলৌকিক যষ্টি ও শুভ্রোজ্জ্বল হাত, আর হজরত ঈসা জীবিত করতেন মৃতকে। নিরাময় করতেন জন্মান্ধকে, কুষ্ঠ রোগগ্রস্তকে। এখন মোহাম্মদ যদি তাদের মতো নবী হয়েই থাকে, তবে তাদের মতো অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করে না কেনো?

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, মক্কার মুশরিকেরা একবার রসুল স.কে বললো, তুমি যদি তোমার দাবিতে সত্য হও, তবে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দাও। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে আবির্ভূত হলেন হজরত জিবরাইল। বললেন, ভ্রাতা মোহাম্মদ! আপনি চাইলে আল্লাহ্ সাফা

www.eelm.weebly.com

পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিবেন। কিন্তু তারপর যদি তারা ইমান না আনে, তবে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। সময়ক্ষেপণ করা হবে না। এখন আপনিই বলুন, আপনি কী চান? মোজেজা, না আপনার সম্প্রদায়ের জন্য অবকাশ? রসুল স. বললেন, আমি আমার সম্প্রদায়ের বোধোদয়ের জন্য অবকাশই চাই। তাঁর একথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ○ وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا
نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا
لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ○ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ
نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ○ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

❑ ইহাদিগের পূর্বে যে সব জনপদ আমি ধ্বংস করিয়াছি উহার অধিবাসীরা বিশ্বাস করিত না; তবে কি ইহারা বিশ্বাস করিবে?

❑ তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ মানুষই পাঠাইয়াছিলাম; তোমরা যদি না জান তবে কিতাবীদিগকে জিজ্ঞাসা কর।

❑ এবং আমি তাহাদিগকে এমন দেহবিশিষ্ট করি নাই যে তাহারা আহার্য ভক্ষণ করিত না; তাহারা চিরস্থায়ীও ছিল না।

❑ অতঃপর আমি তাহাদিগের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিলাম,— যথা, আমি উহাদিগকে ও যাহাদিগকে ইচ্ছা রক্ষা করিয়াছিলাম এবং সীমালংঘন-কারীদিগকে করিয়াছিলাম ধ্বংস।

❑ আমি তো তোমাদিগের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি কিতাব যাহাতে আছে তোমাদিগের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এদের পূর্বে যে সব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, তার অধিবাসীরা বিশ্বাস করতো না; তবে কি এরা বিশ্বাস করবে?' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! ইতোপূর্বের অবাধ্য সম্প্রদায়েরা তাদের কাংখিত মোজেজা দর্শন করেও ইমান আনেনি, ফলে আমি তাদেরকে ও তাদের জনপদগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছি। এখন আপনার সম্প্রদায়ের অবাধ্যদের প্রস্তাবানুসারে যদি আমি মোজেজার প্রকাশ ঘটাই, তবে কি তারা বিশ্বাস করবে?

www.eelm.weebly.com

এখানে 'মিন ক্বুরইয়াতিন' কথাটির 'মিন' অতিরিক্ত হিসেবে সংযুক্ত। 'ক্বুরইয়াতিন' অর্থ জনপদ। 'আহ্লাকনাহা' অর্থ আমি তা ধ্বংস করেছি। কথাটি 'ক্বুরইয়াতিন' শব্দের সিফাত বা বিশেষণ।

'তবে কি তারা বিশ্বাস করবে'— এ প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। মক্কার মুশরিকেরা যে মোজেজা দেখলে ইমান আনবে না, তার নিশ্চিতি প্রকাশার্থেই এখানে উত্থাপিত হয়েছে এই প্রশ্নটি। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— অতীত যুগের অবিশ্বাসীরা যখন মোজেজা দেখেও ইমান আনেনি, তখন হে আমার রসুল! আপনার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসীরাও নিশ্চয় ইমান আনবে না। কারণ তাদের চেয়েও এরা সত্যপ্রত্যাখ্যানে অধিকতর অনড়। আপনি নিশ্চয় চান না, এরা তাদের পূর্বসূরীদের মতো ধ্বংস হয়ে যাক।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম, তোমরা যদি না জানো তবে কিতাবীদেরকে জিজ্ঞেস করো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার পূর্বে আমি মানুষকেই নবী মনোনীত করে তাদেরকে প্রত্যাদেশসহ মানুষকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। ফেরেশতাকে নয়। আমার এই চিরন্তন বিধানটির কথা আপনি অংশীবাদীদেরকে জানিয়ে দিন এবং বলুন, তোমাদের যদি এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে, তবে তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের জিজ্ঞেস করে এ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জেনে নিতে পারো।

উল্লেখ্য যে, মক্কার মুশরিকেরা বাণিজ্য ব্যপদেশে মদীনার ইহুদী ও সিরিয়ার খৃষ্টানদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো। তাদের নিকট থেকে তারা রসুল স. সম্পর্কে পরামর্শও গ্রহণ করতো। নবুয়ত, কিতাব, কিয়ামত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তাদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চাও ছিলো। তাই এখানে মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, মানুষের নবী হিসেবে মানুষকেই যে প্রেরণ করা হয়, একথা যদি তোমরা বিশ্বাস না করো, তবে কিতাবীদের কাছে জেনে নাও। এরকমও হতে পারে যে— সুবিদিত বিষয়ে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের কথা গ্রাহ্য। ইহুদী ও খৃষ্টানদের নিকট মানুষের নবী রসুল হওয়ার বিষয়টি সুবিদিত। তাই এখানে মুশরিকদেরকে তাদের নিকটে জিজ্ঞেস করে এ ব্যাপারে নিঃসন্দিগ্ধ হতে বলা হয়েছে।

এর পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা আহার্য ভক্ষণ করতো না; তারা চিরস্থায়ীও ছিলো না।' একথার অর্থ— আমি ওই সকল নবী রসুলকে এমতো বৈশিষ্ট্য দান করিনি যে, তারা ফেরেশতাদের মতো পানাহার না করেও জীবনযাপন করবে এবং পৃথিবীতে চিরকাল থাকতে পারবে।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'জ্বাসাদা' অর্থ দেহ। শব্দটি জাতিবাচক বিশেষ্য। একবচন বহুবচন সকল ক্ষেত্রেই শব্দটি সমভাবে প্রযোজ্য। এখানে শব্দটির প্রকৃত অর্থ হবে দেহ বিশিষ্ট। 'বিশিষ্ট' শব্দটি এখানে উহ্য। 'জ্বাসাদ্' বলা হয় রঙিন দেহকে। এর শাব্দিক অর্থ— সম্মিলিত করা বা জুড়ে দেয়া।

'তারা আহার্য ভক্ষণ করতো না' কথাটি এখানে 'দেহ বিশিষ্ট' কথাটির সিফাত বা বিশেষণ। অথবা এটি একটি পৃথক বাক্য— অবিশ্বাসীদের একটি প্রশ্নের উত্তর। তাদের ওই প্রশ্নটি ছিলো— এ কেমন রসুল? এ আবার আমাদের মতো খাওয়া-দাওয়া করে কেনো? আর 'তারা চিরস্থায়ীও ছিলো না' কথাটির অর্থ, ওই সকল নবী রসুলদের কেউই চিরকাল পৃথিবীতে বসবাস করেননি। যে অবয়বের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল আহার্যের উপর, তা অবশ্যই হবে রূপান্তরশীল বস্তু। অবশ্যই অস্থায়ী যা, তা ধ্বংসশীল । তাই নির্ধারিত হায়াত শেষে মহাপ্রস্থান ঘটেছে তাঁদের সকলের।

এর পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম,— যথা, আমি তাদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং সীমালংঘনকারীদেরকে করেছিলাম ধ্বংস।' একথার অর্থ— আমি আমার বার্তাবাহকগণকে সাহায্যদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা পূর্ণ করেছি। তাদেরকে এবং তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকে আমার গজব থেকে রক্ষা করেছি। রক্ষা করেছি তাদেরকেও, যাদের পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা ইমান আনবে। আর আমার ও আমার নবী রসুলগণের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছিলো, বিনাশ সাধন করেছি সেই সকল সীমালংঘনকারীদেরকে।

এর পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব, যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তোমাদেরই আলোচনা, তোমাদেরই মাহাত্ম্য। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?' এখানে 'জিকর' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে— হে কুরায়েশ জনতা! আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ এই কোরআনে তোমাদের আলোচনাই করেছি। প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের সম্প্রদায়ভূত এক রসুলের মাধ্যমে তোমাদেরকে দান করেছি উপদেশ, আর একে অবতীর্ণও করেছি তোমাদের ভাষায়, যেনো তোমরা বুঝতে পারো এবং মান্য করতে পারো। এতো কিছু করা সত্ত্বেও তোমাদের কি সত্যোপলব্ধি ঘটবে না? অথবা 'জিকর' শব্দটি দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্র স্মরণ ও ধর্ম সংক্রান্ত অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সমূহের আলোচনাকে।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'জিকর' শব্দটির অর্থ উত্তম স্মরণ, খ্যাতিমানতা, উপদেশ অথবা ওই উত্তম আচরণ, যার মাধ্যমে অর্জিত হয় উত্তম স্মরণ। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে শব্দটির অর্থ হবে আলোচনা। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, কোনো

www.eelm.weebly.com

কিছু স্মৃতিচারণের নাম 'জিকর' ও 'তাজকিরা'। আরো অর্থ রয়েছে শব্দটির। যেমন— স্মরণ, আলোচনা, প্রচলন, খ্যাতি, প্রশংসা, উপদেশ, নামাজ, দোয়া এবং ওই কিতাব যার মধ্যে ঋণ ও সম্পদের হিসাব থাকে।

'আফালা তা'ক্বিলূন' অর্থ— তবুও কি তোমরা বুঝবে না? এখানকার হামযাহ্ অক্ষরটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এইভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— তোমরা কি ওই সকল আলোচনা বুঝতে পারো না, যার অবতারণা করা হয়েছে তোমাদেরকে লক্ষ্য করে?

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ○ فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ○ لَا تَرْكُضُوْا وَ ارْجِعُوْآ اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ ○ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○ فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ○

❒ আমি ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ, যাহার অধিবাসীরা ছিল সীমালংঘনকারী এবং তাহাদিগের পরে সৃষ্টি করিয়াছি অপর জাতি।

❒ অতঃপর যখন উহারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখনই উহারা জনপদ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল।

❒ উহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'পলায়ন করিও না এবং ফিরিয়া আইস তোমাদিগের ভোগ-সম্ভারের নিকট ও তোমাদিগের আবাসগৃহে যাহাতে এ বিষয়ে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।'

❒ উহারা বলিল, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদিগের! আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী।'

❒ আমি উহাদিগকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি-সদৃশ না করা পর্যন্ত উহাদিগের এই আর্তনাদ স্তব্ধ হয় নাই।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি ধ্বংস করেছি কতো জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিলো সীমালংঘনকারী এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অপর জাতি।

এখানে 'আহাস্‌সু' অর্থ যখন তারা স্বচক্ষে অবলোকন করলো, 'কাসামুন' অর্থ ভেঙে ফেলা। মর্মার্থ— অধিকাংশ ধ্বংস করে ফেলা। 'ক্বরইয়াতান' অর্থ

www.eelm.weebly.com

অধিকাংশ জনপদ। 'কানাত্ জলিমাতান' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যান ও পাপে জর্জরিত করেছে নিজেদেরকে। 'আন্শা'না' অর্থ আমি উত্তরাধিকার করেছি। 'বা'দাহা' অর্থ ওই জনপদকে ধ্বংস করার পর।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো, তখনই তারা জনপদ থেকে পলায়ন করতে লাগলো'। এখানে 'আহাস্সূ' অর্থ প্রত্যক্ষ করলো। 'বা'সানা' অর্থ আমার শাস্তির কঠোরতা। আর 'ইয়ারকুদুন' অর্থ ঘোড়ার পায়ের নাল পায়ে লাগিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাওয়া। এরকমও বলা যায় যে— তারা যখন আল্লাহ্র ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন অশ্বের মতো ক্ষিপ্রগতিতে পালিয়ে যেতে শুরু করলো। ক্ষিপ্র ও তীব্র গতিতে পলায়ন বুঝানোর জন্যই এখানে শব্দটি এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— তাদেরকে বলা হয়েছিলো, পলায়ন কোরো না এবং ফিরে এসো তোমাদের ভোগ-সম্ভারের নিকট ও তোমাদের আবাসগৃহে, যাতে এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।' একথার অর্থ— দ্রুতবেগে পলায়নরতদেরকে তখন কোনো ফেরেশতা অথবা কোনো বিশ্বাসবান বললেন, পালাচ্ছো কেনো? ফিরে এসো। ফিরে এসো তোমাদের ধন-সম্পদের নিকটে ও তোমাদের আবাসগৃহে। হয়তো শাস্তিদানের পূর্বে তোমাদেরকে দেয়া হবে জিজ্ঞাসাবাদের অবকাশ। এখানে 'উত্‌রিফ্‌তুম' অর্থ ফিরে এসো তোমাদের ভোগ-সম্ভারের নিকটে। খলিল বলেছেন, নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত ব্যক্তিকেই সাধারণতঃ এভাবে ফিরে আসতে বলা হয়।

'হয়তো এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে' কথাটির অর্থ ফিরে এলে হয়তো তোমাদেরকে তোমাদের সম্পত্তির আয়-ব্যয় সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করা হতে পারে। এরকমও অর্থ হতে পারে— তোমরা ফিরে গিয়ে আবার দরবার বসাও। সম্ভবতঃ তোমাদের পরিচারক-পরিচারিকারা পূর্বের মতোই বলবে, বলুন, কি হুকুম? কিংবা অর্থ হবে— সম্ভবতঃ তোমাদের লোকেরা তোমাদের বৈঠকে এসে তাদের আপনাপন বিপদাপদের কথা জানাবে। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— তোমাদের কাছে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, নতুবা তোমাদেরকে দেয়া হবে আযাব। উল্লেখ্য যে, শাস্তিদানের পূর্বেই সাধারণতঃ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে এক ধরনের হুমকি।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে নবীগণের হত্যা সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বাগবী লিখেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হুজুরার বাসিন্দাদের সম্পর্কে। ইয়েমেনের একটি জনপদের নাম ছিলো

www.eelm.weebly.com

হুজুরা। আরববাসীরাই সেখানে বসবাস করতো। তাদেরকে পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ একজন নবী প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র এককত্বের উপরে বিশ্বাসস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বললো এবং শেষে হত্যা করলো। শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্ তাদের উপর চড়াও করে দিলেন বখতে নসরকে। বখতে নসর তাদের কাউকে কাউকে করলো হত্যা এবং কাউকে কাউকে করলো বন্দী। অবস্থা বেগতিক দেখে অবশিষ্টরা পালাতে শুরু করলো। এক ফেরেশতা ঘোষণা করলো, পালিও না। পরিবারবর্গ ও ধনসম্পদের কাছে ফিরে যাও। সম্ভবতঃ তোমাদের কাছে কিছু চাওয়া যেতে পারে। কাতাদা কথাটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সম্ভবতঃ তোমাদের কাছে কিছু পার্থিব ধনসম্পদ চাওয়া হতে পারে। ইচ্ছে করলে দিয়ো, না হয় দিয়ো না। তোমরা তো সম্পদশালী ও প্রভাবশালী। পরের ঘটনাটি ছিলো এরকম— বখতে নসর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো এবং যাকে পেলো তাকেই হত্যা করে ফেললো। তখন ঊর্ধ্বদেশ থেকে ঘোষণা শোনা গেলো— এ হচ্ছে নবীনিধনের বদলা। এই ঘোষণা শুনে কেউ কেউ অনুতপ্ত হলো। বখতে নসরের কাছে স্বীকার করলো তাদের অপরাধ। কিন্তু বখতে নসর তাদের কাউকেই বেঁচে থাকার সুযোগ দিলো না। কেউ কেউ বলেছেন, ওই ঘোষণাকারী তখন বলেছিলো— পালিয়ে গেলে লাভ হবে না, বরং ঘরে ফিরে যাও। সম্ভবতঃ তোমাদের কাছে ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু সম্পদ চাওয়া হতে পারে। সুতরাং সম্পদ প্রদান করে জীবন বাঁচাও। তখন আকাশ থেকে পুনঃ ঘোষিত হলো, এটা হচ্ছে নবীহত্যার প্রতিশোধ।

এর পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী।' একথার অর্থ— ওই সকল নবী হন্তারকেরা বললো, হায়, একি দুর্ভোগ! আমরা যে সত্যি সত্যিই সীমালংঘন করেছি। স্বেচ্ছায় ডেকে এনেছি মৃত্যুকে। যেনো বা বলেছি, এসো, এসো হে মৃত্যু! আমরা তোমার জন্যই অপেক্ষমান।

এর পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নিসদৃশ না করা পর্যন্ত তাদের ওই আর্তনাদ স্তব্ধ হয়নি।' একথার অর্থ— ওই সকল সীমালংঘনকারীকে আমি করেছিলাম কর্তিত শস্য সদৃশ উন্মুল এবং নির্বাপিত অগ্নিশিখার মতো অস্তিত্বহীন। অবশেষে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো তাদের আহাজারি ও আর্তনাদ।

www.eelm.weebly.com

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ○ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۖ إِنْ كُنَّا فَٰعِلِينَ ○ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ○ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ○ يُسَبِّحُونَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ○

❒ আকাশ ও পৃথিবী এবং যাহা উহাদিগের অন্তর্বর্তী তাহা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।

❒ আমি যদি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করিতে চাহিতাম তবে আমি আমার নিকট যাহা আছে তাহা লইয়াই উহা করিতাম; আমি তাহা করি নাই।

❒ কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে উহা মিথ্যাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। দুর্ভোগ তোমাদিগের! তোমরা যাহা বলিতেছ তাহার জন্য।

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা তাঁহারই; তাঁহার সান্নিধ্যে যাহারা আছে তাহারা তাঁহার ইবাদত করিতে অহংকার করে না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না।

❒ তাহারা দিবা-রাত্রি তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তাহারা শৈথিল্য করে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আকাশ ও পৃথিবী এবং যা এর মধ্যবর্তী, তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।' একথার অর্থ— আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে, তা আমি অহেতুক বা ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। এ সকল কিছু সৃষ্টি করেছি এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। যারা জ্ঞানান্বেষী, তাদের জন্য আমার এই সুবিশাল সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে অন্তহীন জ্ঞান ও বিস্ময়। রয়েছে মানুষের মহাজীবনকে অর্থবহ ও পূর্ণ করে তুলবার জন্য অসংখ্য উপকরণ। সুতরাং কেউ যেনো এগুলোর বাহ্যিক সৌন্দর্য ও অবস্থা নিয়ে মেতে না থাকে। মহাসৃষ্টির অন্তর্নিহিত রহস্য ভেদ করে পরিচয় লাভ করার চেষ্টা করে মহাস্রষ্টার। শানিত ও সুশোভিত করে তার প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টিকে।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'আমি যদি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম, তবে আমি আমার নিকটে যা আছে, তা নিয়েই তা করতাম; আমি তা করিনি।'

আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'লাহ্ওয়ান' শব্দটির শাব্দিক অর্থ নারী। নারীই হচ্ছে চিত্তবিনোদনের প্রধান উপকরণ। হাসান ও কাতাদার মতে 'লাহ্ওয়ান' অর্থ সম্ভোগ। নারীই হচ্ছে সম্ভোগের ক্ষেত্র। কালাবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শব্দটির অর্থ সন্তান-সন্ততি। সন্তান-সন্ততিও চিত্তবিনোদনের অন্যতম উপকরণ। সুদ্দীও এরকম বলেছেন। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আমি যদি আমার মনোরঞ্জনের জন্য কিছু করি তবে তো তা হবে আমারই সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলীর সমান্তরাল, আনুরূপ্যবিহীন। সৃষ্টি জগত তো আমার সমান্তরাল, সমকক্ষ, অনুরূপ কোনোটাই নয়। নারীসঙ্গ, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির মাধ্যমে বিনোদন করা তো সৃষ্টি জগতের স্বভাব। তাদের জোড়া আছে। সন্তান-সন্ততি আছে। আছে পরনির্ভরশীলতা, মুখাপেক্ষিতা, পানাহারের প্রয়োজন, নিদ্রা-তন্দ্রা, স্মৃতি-বিস্মৃতি, আছে জীবন-মৃত্যু, উত্থান-পতন। কিন্তু আমি এসকল কিছু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। আমি এক, অদ্বিতীয়, অংশীবিহীন, আনুরূপ্যহীন, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। তাই আমি সৃষ্টির মতো চিত্তবিনোদনের মুখাপেক্ষিতা ও প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সে কারণেই নিছক বিনোদন আমার এই মহাসৃষ্টির অস্তিত্বায়নের উদ্দেশ্য হতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতের মাধ্যমে খৃষ্টানদের অপবিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। তারা বলে ঈসা মসীহ আল্লাহ্র পুত্র এবং তাঁর মাতা আল্লাহ্র স্ত্রী (আল্লাহ্ রক্ষা করুন)।

'ইন কুন্‌না ফায়িলীন' অর্থ আমি তা করিনি। এখানে 'ইন' হচ্ছে শরতিয়া (শর্তসাপেক্ষ অব্যয়)। পূর্ববর্তী বাক্যে যা বলা হয়েছে, তা নাকচ করে দেয়া হয়েছে এই কথাটির মাধ্যমে। তাই প্রসঙ্গটি এখানে পুনরুল্লেখিত হয়নি। হজরত কাতাদা, ইবনে জারীর ও মুকাতিলের মতে এখানকার 'ইন' হচ্ছে না বোধক। অর্থাৎ আমি এরূপ করি না। সুতরাং এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের পরিণতি স্বরূপ।

এর পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়'। আলোচ্য আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের ধারাবাহিকতা। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— ক্রীড়াচ্ছলে নয়, মিথ্যাকে সত্যের আঘাতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়াই আমার প্রত্যাদেশের মূল উদ্দেশ্য। এখানে 'সত্য' অর্থ ওই আয়াত যা আল্লাহ্র স্ত্রী-পুত্র পরিজন হওয়ার ধারণা থেকে পবিত্র করে দেয়।

www.eelm.weebly.com

'কুজফুন' অর্থ আঘাত হানা। আর 'বাতিল' বা মিথ্যা হচ্ছে অবিশ্বাস ও মিথ্যাচার এবং আল্লাহ্‌র স্ত্রী-পুত্রপরিজন হওয়ার ধারণা। 'ইয়াদমাগু' অর্থ ধ্বংস করা, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া। পরোক্ষার্থে মিথ্যাকে ধ্বংস করে তদস্থলে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা। 'কুজফুন' শব্দটির মাধ্যমে একথাই প্রকাশ পায় যে, যার দ্বারা আঘাত করা হচ্ছে, তা অত্যন্ত শক্তিশালী, ভারী ও পূর্ণ। 'যাহিকুন' অর্থ এমনভাবে ধ্বংস করা যাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর আর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে 'যাহাকাল বাতিলু' অর্থ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। যেমন বলা হয় 'যাহাকাশ্ শাইউ' অর্থ ওই বস্তু ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, 'যাহাকু' অর্থ জীবন বের হয়ে যাওয়া।

এরপর বলা হয়েছে— 'দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছো তার জন্য।' একথাটি বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে লক্ষ্য করে। 'ওয়াইলুন' অর্থ দুর্ভোগ। 'মিম্মা তাসিফূন' অর্থ যে সকল অশোভন ও অংশীবাদিতাপূর্ণ কথা তোমরা বলো তার জন্য তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

এর পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই; তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা তাঁর ইবাদত করতে অহংকার করে না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না।' একথার অর্থ— আকাশমার্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর সৃষ্টি ও তাঁর অধীনস্থ। আল্লাহ্‌র সমকক্ষ হওয়া ও অংশী হওয়ার যোগ্যতা কোনো সৃষ্টির নেই। তাই তাদের কারোই আল্লাহ্‌র স্ত্রী-পুত্র পরিজন হওয়ার অধিকার ও যোগ্যতা নেই। আর যে সকল ফেরেশতা, নবী ও পুণ্যবান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ও প্রিয়ভাজন, তাঁরাও আল্লাহ্‌র বান্দা। তাঁরাও আল্লাহ্‌র অহংকারমুক্ত উপাসনায় নিরত। আর নৈকট্যভাজন ফেরেশতাদের তো এ ব্যাপারে ক্লান্তি-শ্রান্তি বলে কিছুই নেই। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আনুরূপ্যবিহীন। তাই তাঁর সন্নিধান ও নৈকট্যের ধারণাটিও আনুরূপ্যবিহীন। অর্থাৎ তা আমাদের নৈকট্যের ধারণার অতীত।

'তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে' বলে আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্ত মানুষ ও ফেরেশতাদেরকে এখানে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, তাদের মধ্যে অনেকেই আকাশ অথবা পৃথিবীর কোনো স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। যেমন আরশবহনকারী ফেরেশতা।

'ইস্‌তিহ্‌সার' কথাটির অর্থ— ক্লান্তি বোধ করে না। সার্বক্ষণিক ইবাদতে মগ্ন থাকা যেমন অসহনীয় তেমনি দুঃসাধ্য। কাজেই নৈকট্যভাজন ফেরেশতাদের অবসাদগ্রস্ত হওয়াই ছিলো সমীচীন। কিন্তু আদতেই ক্লান্তি বোধ করে না তারা।

www.eelm.weebly.com

বরং উপভোগ করে ইবাদতের আস্বাদ। তাই তারা নিয়ত নিমজ্জিত থাকে তাঁর আরাধনায়। আরাধনাশূন্য অবস্থায় থাকা তাদের জন্য অসম্ভব। তাই এখানে বলা হয়েছে— তারা তাঁর ইবাদত করতে অহংকার করে না ও ক্লান্তিও বোধ করে না।

এর পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য করে না।' হজরত কা'ব আহ্‌রার বলেছেন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেমন মানুষের জীবন ধারণের জন্য অনিবার্য, তেমনি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনাও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে যেমন মানুষ ক্লান্ত হয় না, তেমনি 'তসবিহ্‌' পাঠেও ক্লান্তি বোধ করে না কোনো ফেরেশতা।

'লা ইয়াফতুরুন' অর্থ শৈথিল্য প্রদর্শন করে না। অর্থাৎ তাদের অন্তর্জগতে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হয় আল্লাহ্‌র জিকির। স্থলভাগের প্রাণী যেমন বাতাস থেকে এবং জলভাগের প্রাণী যেমন পানি থেকে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে তাদের আপনাপন জীবন রক্ষা করে, তেমনি আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন ও নৈকট্যভাজন মানুষ ও ফেরেশতাও আল্লাহ্‌র জিকির দ্বারা রক্ষা করেন তাঁদের অস্তিত্ব। এটাই তাঁদের 'হায়াতে তইয়েবা' বা পবিত্র জীবন। উল্লেখ্য যে, এই জিকির হচ্ছে জিকরে খফি (গোপন জিকির)।

এরকম নিরবচ্ছিন্ন জিকির সম্পন্ন মানুষের সকল ক্রিয়াকলাপই পরোক্ষার্থে আল্লাহ্‌র ক্রিয়াকলাপ। কারণ তাঁরা আল্লাহ্‌র সতত অনুগত। তাঁরা পানাহার করেন ইবাদতের শক্তি গ্রহণের মানসে। বিবাহ করেন রসুল স. এর আদর্শের অনুসরণে। এর মধ্যে রসুল স. এর উম্মতের সংখ্যাবৃদ্ধিও থাকে তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য। কারণ রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা বিবাহ করো। মহাবিচারের দিবসে আমি যেনো আমার উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য উৎফুল্ল হতে পারি। এ ধরনের মানুষের জাগতিক প্রয়োজন ও কর্মকাণ্ড, নিদ্রা-তন্দ্রা তাঁদের অন্তরকে আল্লাহ্‌র জিকির থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। তাই তাঁদের মাধ্যমে কোনো অপরাধও সংঘটিত হয় না। তকদিরের অনড় লিখনের কারণে যদি এরকম কোনো স্খলন হয়েই যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁরা হন লজ্জিত ও অনুতপ্ত। ফলে তাঁদের কৃত অপরাধকে আল্লাহ্‌তায়ালা পরিণত করে দেন পুণ্যে। প্রকৃতপক্ষে এরকম গোপন জিকিরের অধিকারীরাই জ্ঞানী বা আলেম। 'আলেমগণের নিদ্রা ইবাদত' এই হাদিসটি প্রযোজ্য হতে পারে কেবল এ রকম ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেই। আর আলোচ্য আয়াতের 'শৈথিল্য প্রদর্শন করে না' কথাটিও প্রয়োগ করা যেতে পারে কেবল তাঁদেরই বেলায়।

www.eelm.weebly.com

أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ○ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ
لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ○ لَا يُسْأَلُ عَمَّا
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ○ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ۖ قُلْ هَاتُوا
بُرْهَانَكُمْ ۖ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ۙ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ○ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ
إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ○

❒ উহারা মৃত্তিকা হইতে তৈরি যে সব দেবতা গ্রহণ করিয়াছে সেইগুলি কি মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম?

❒ যদি আল্লাহ্ ব্যতীত বহু ইলাহ্ থাকিত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তবে উভয়ই ধ্বংস হইয়া যাইত। কিন্তু উহারা যাহা বলে তাহা হইতে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।

❒ তিনি যাহা করেন সে বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইবে না, বরং উহাদিগকেই প্রশ্ন করা হইবে।

❒ উহারা কি তাঁহাকে ব্যতীত বহু ইলাহ্ গ্রহণ করিয়াছে? বল, 'তোমরা তোমাদিগের প্রমাণ উপস্থিত কর। ইহাই, আমার সঙ্গে যাহারা আছে তাহাদিগের জন্য উপদেশ এবং ইহাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদিগের জন্য।' কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, ফলে উহারা মুখ ফিরাইয়া লয়।

❒ আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রসূল প্রেরণ করি নাই তাহার প্রতি এই প্রত্যাদেশ ব্যতীত, 'আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; সুতরাং আমারই ইবাদত কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা মৃত্তিকা থেকে তৈরী যেসব দেবতা গ্রহণ করেছে সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? এ কথার অর্থ— আল্লাহ্র এককত্বের পক্ষে অসংখ্য দলিল প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এবং নবী রসুলের মাধ্যমে অংশীবাদিতার ভয়াবহ কুফল সম্পর্কে বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও মুশরিকেরা মাটি অথবা ইট পাথর ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের তৈরী মূর্তিগুলোকে তাদের

www.eelm.weebly.com

উপাস্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে। কেনো এরকম করেছে তারা? ওই জড়প্রতিমাগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে পারে?

ইতোপূর্বের ভাষ্যসহ আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এরকম— তারা রসুল স. সম্পর্কে গোপন পরামর্শ সভায় বলে, সে তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তার অলৌকিক কর্মকাণ্ডসমূহ যাদু। আর কোরআন তো অলীক কল্পনা। তাও নয়, বরং কোরআন হচ্ছে মোহাম্মদের নিজের রচনা। সে একজন উচ্চ স্তরের কবি। এভাবে আল্লাহ্র কালাম ও আল্লাহ্র রসুলকে বিভিন্ন প্রকার অপমন্তব্য করেই তারা ক্ষান্ত হয় না, তার সঙ্গে আবার জড়প্রতিমার পূজাও করে। কিন্তু উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা কি তাদের আছে? উপাস্য যিনি হন তিনি তো হন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর, জীবনোপকরণ দাতা, জীবন ও মৃত্যু প্রদাতা। এসকল মূর্তির কি সে সকল যোগ্যতা বা ক্ষমতা আছে?

উল্লেখ্য যে, অংশীবাদীরা কেবল জড়প্রতিমার পূজাই করে না, তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ করে নক্ষত্র ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা। তাদের ওই সকল বাতিল উপাস্যসমূহও আলোচ্য আয়াতের 'দেবতা গ্রহণ করেছে' কথাটির অন্তর্ভুক্ত।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'যদি আল্লাহ্ ব্যতীত বহু ইলাহ্ থাকতো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেতো।' উল্লেখ্য যে, একাধিক আল্লাহ্র ধারণা একটি অবাস্তব ও অসম্ভব ব্যাপার। তবু যুক্তির খাতিরে যদি একাধিক আল্লাহ্র অস্তিত্ব ধরে নেয়া যায়, তবে সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব তো আর থাকে না। কারণ একাধিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে মতপার্থক্য, অভিপ্রায়গত ও শক্তিগত তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। এমতো ক্ষেত্রে সৃষ্টির ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় আর থাকে না। সুতরাং এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয়, অংশীবিহীন ও আনুরূপ্যহীন।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা যা বলে তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।' এখানে 'সুবহানা' (পবিত্র ও মহান) কর্মটি একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্ম। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করি। তিনি মহান আরশের অধিপতি। আর স্বীকার করি যে, অংশীবাদীদের অংশীবাদিতাপূর্ণ অপমন্তব্য (আল্লাহ্র স্ত্রী-পুত্র পরিজন রয়েছে ইত্যাদি) থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। উল্লেখ্য, আরশ হচ্ছে মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু, শরীরের মধ্যে মস্তিষ্কতুল্য। এভাবে 'আরশের অধিপতি' কথাটির অর্থ দাঁড়ায় সমগ্র সৃষ্টির একক অধিপতি।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'তিনি যা করেন, সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না, বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর ও ইচ্ছাময়। সৃষ্টির সকল কিছুই সম্পাদিত হয় তাঁর একক অভিপ্রায়ে ও কর্তৃত্বে। সুতরাং তাঁর কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারে কে? আর সৃষ্টি অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব সকল বিষয়ে সম্পূর্ণতই তাঁর মুখাপেক্ষী। তারা কেউই প্রকৃত অর্থে কোনো কিছুর মালিক নয়। আল্লাহ্র একক মালিকানাধীন সাম্রাজ্যে বিচরণ করে তারা। বিনা অনুমতিতে এভাবে বিচরণ করা বা অবস্থান করার অধিকারও তাদের নেই। তাই একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্ই সকলকে তাদের আনুগত্য অনানুগত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। কিন্তু তারা আল্লাহ্র কোনো ব্যাপারেই কোনো প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের অংশীবাদিতার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমেও তাদেরকে এই হুমকিটি দেয়া হলো যে, যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই তুলতে পারবে না, তারা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্যকে শরীক করতে যায় কোন সাহসে, কোন যুক্তিতে, কোন ধৃষ্টতায়?

এর পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'তারা কি তাঁকে ব্যতীত বহু ইলাহ্ গ্রহণ করেছে?' ইতোপূর্বে বলা হয়েছিলো 'তারা মৃত্তিকা থেকে যে সব দেবতা গ্রহণ করেছে' (আয়াত ২১)। এখানেও আবার একই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হলো। অংশীবাদিতার জঘন্য স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য এবং বিষয়টিকে চরম ঘৃণ্য বলে প্রমাণ করবার জন্য প্রসঙ্গটির পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে। প্রথম প্রশ্নটি করা হয়েছে বুদ্ধিগত দিক থেকে এভাবে— 'সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে পারে?' পরের প্রশ্নটি করা হয়েছে প্রত্যাদেশিত বিদ্যার দিক থেকে। অর্থাৎ বলা হয়েছে— পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবেও তো বহু উপাস্যের কথা নেই। এভাবে অংশীবাদিতার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত হয়েছে আকলি ও নকলি দলিল।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! অংশীবাদিদেরকে বলুন, তোমরা তোমাদের অংশীবাদিতার পক্ষে উপস্থিত করো জ্ঞানগত ও প্রবহমান বিদ্যাগত প্রমাণ। উভয় প্রকার প্রমাণই তো তোমাদের বিপক্ষে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটাই আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং এটাই উপদেশ ছিলো আমার পূর্ববর্তীদের জন্য।' একথার অর্থ— কোরআন, ইঞ্জিল ও তওরাতই আমার উম্মতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত উপদেশামৃত। অতীত যুগের উম্মতদেরকেও এরকম উপদেশই দেয়া হয়েছিলো। এই তিনটি কিতাবেরই তওহীদ সম্পর্কিত নির্দেশনা এক, আর সেই নির্দেশনা হচ্ছে— আল্লাহ্ অংশীহীন, তিনি ছাড়া উপাস্য আর কেউই নেই। এই নির্দেশনাটি একটি শাশ্বত নির্দেশনা। পূর্বাপর সকলের জন্য এই নির্দেশনাটি সাধারণ।

www.eelm.weebly.com

আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'জিকরু মাম্ মায়ীয়া' কথাটির অর্থ কোরআন এবং 'জিকরু মান ক্বলী' অর্থ তওরাত ও ইঞ্জিল। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রকারান্তরে অংশীবাদীদেরকে এই প্রশ্নটি করতে বলা হয়েছে যে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, বলো হে অবিমৃশ্য জনতা! কোরআন, তওরাত, ইঞ্জিল ও পূর্ববর্তী আকাশী পুস্তিকাগুলোর কোন স্থানে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপাসনাকে বৈধ বলা হয়েছে?

একটি প্রশ্নঃ মক্কার মুশরিকেরা তো কোরআন, তওরাত, ইঞ্জিল কোনোটাই মানতো না। সুতরাং আসমানী কিতাবসমূহে শিরিকের অনুমতি আছে কি নেই সে কথা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে কেনো? যারা কোরআনই মানে না, তাদের কাছে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবই বা গ্রহণযোগ্য হবে কেনো?

উত্তরঃ মক্কার মুশরিকেরা বিদ্বেষবশতঃ কোরআনকে স্বীকার করতো না। কিন্তু কোরআনের অলৌকিকত্ব তাদের সামনে অস্পষ্ট তো ছিলো না। আর কোরআন যেহেতু পূর্বের আসমানী কিতাবসমূহের প্রত্যয়নকারী, সুতরাং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহও যে সত্য, তাও তাদের কাছে অস্পষ্ট ছিলো না। তাই সুস্পষ্ট বিষয়ের প্রমাণ উপস্থাপন করা অসঙ্গত ও যুক্তিবিবর্জিত কিছু নয়। এখানে এভাবে তাদেরকে এই শাশ্বত বিশ্বাসটির প্রতিটি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলা হয়েছে যে, শিরিক শয়তান ও প্রবৃত্তিতাড়িতদের আবিষ্কৃত একটি নতুন প্রথা, যা অসত্য ও অপবিত্র। আর তওহীদ হচ্ছে চিরন্তন, নিষ্কলুষ ও অক্ষয় বিশ্বাসের নাম, যা সকল যুগের প্রত্যাদেশিত গ্রন্থ সমূহে একই ভঙ্গিতে প্রচার করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।' এ কথার অর্থ— সত্য এভাবে সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তাকে মান্য করতে হয়, সে কথা তারা জানে না ও মানে না। সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকে তারা স্বীকার করতেও চায় না। মুখ ফিরিয়ে নেয় আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রদর্শিত পথ থেকে।

এর পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'আমি তোমার পূর্বে এমন কোনো রসুল প্রেরণ করিনি, তার প্রতি এই প্রত্যাদেশ ব্যতীত, আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, সুতরাং আমারই ইবাদত করো।' একথার অর্থ— তওহীদের শাশ্বত বিশ্বাসটি কেবল আমি কোরআনেই উল্লেখ করিনি, পূর্ববর্তী সকল নবী রসুলগণের মাধ্যমেও বারংবার একথা প্রচার করেছি। তাদেরকেও একথা বলতে বলেছি যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, সুতরাং তোমরা কেবল আমার ইবাদত করো।

www.eelm.weebly.com

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۭ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ۝ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ۝ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ۭ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ۝

❒ উহারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি পবিত্র, মহান! তাহারা তো তাঁহার সম্মানিত দাস।

❒ তাহারা আগে বাড়িয়া কথা বলে না; তাহারা তো তাঁহার আদেশ অনুসারেই কাজ করিয়া থাকে।

❒ তাহাদিগের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। তাহারা সুপারিশ করে শুধু উহাদিগের জন্য যাহাদিগের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তাহারা তাঁহার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।

❒ তাহাদিগের মধ্যে যে বলিবে, 'আমিই ইলাহ্ তিনি ব্যতীত,' তাহাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম; এই ভাবেই আমি সীমালংঘনকারীদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র, মহান। তাঁরা তো তাঁর সম্মানিত দাস।' বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বনী খাজাআ সম্পর্কে। তারা বলতো, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। তাদের ওই অপকথন নাকচ করে দিয়ে এখানে বলা হয়েছে— না, ফেরেশতারা আল্লাহ্র সন্তান-সন্ততি কিছু নয়। তারা হচ্ছেন আল্লাহ্তায়ালার সম্মানিত বান্দা। আর আল্লাহ্ও তাদের পিতা নন, বরং স্রষ্টা ও প্রভুপালনকর্তা।

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তারা আগ বাড়িয়ে কথা বলে না, তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে।' একথার অর্থ— ওই সকল সম্মানিত ফেরেশতা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিছু বলে না। সর্বাবস্থায় তারা আল্লাহ্র অভিপ্রায় ও আদেশের পূর্ণ অনুগত। তাদের সকল কাজ আল্লাহ্র নির্দেশেই সম্পাদিত হয়।

এর পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত।' একথার অর্থ— ফেরেশতাদের কোনো আচরণ ও কর্মই আল্লাহ্র নিকটে গোপন নয়। তিনি তাদের অতীত-ভবিষ্যত , প্রকাশ্য-গোপন সবকিছুই জানেন। তাই তারা আল্লাহ্র ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত ও সদা সংযত।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।' একথার অর্থ আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন মহত্ত্ব ও পরাক্রমের প্রভাবে ওই সকল ফেরেশতা সদা সন্ত্রস্ত থাকে। আর ভয়ে ভয়ে কেবল তাদের পক্ষেই সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রসন্ন। উল্লেখ্য, সম্মান প্রকাশক ভীতিকেই বলে 'খশইয়াতুন'। আল্লাহ্‌র প্রতি ফেরেশতাদের ভীতি এই শ্রেণীর। যারা প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী, তাঁরাও আল্লাহ্‌কে এভাবে ভয় ও সমীহ করে চলেন। তাই 'খশইয়াতুন' শব্দটি তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ইশফাক্ব' শব্দের অর্থও ভয় করা, ভীত হওয়া। যদি শব্দটির পরে 'মিন' উল্লেখিত হয়, তবে উদ্দেশ্য হয় কাউকে ভয় করা। আর যদি শব্দটির পরে 'মিন' এর পরিবর্তে আ'লা উল্লেখ করা হয়, তবে ক্ষতি বা দুঃখ-কষ্টের আশংকায় কাউকে ভয় করা বুঝায়।

এর পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'তাদের মধ্যে যে বলবে আমিই ইলাহ্ তিনি ব্যতীত, তাকে আমি প্রতিফল দিবো জাহান্নাম, এভাবে আমি সীমালংঘনকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।' একথার অর্থ— ফেরেশতা অথবা অন্য কেউ যদি নিজেকে আল্লাহ্ বলে দাবি করে বসে, তবে আমি তাকে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। যারা সত্য বিশ্বাসের সীমালংঘন করে, তাদের জন্য আমি এরকম শাস্তিই নির্ধারণ করি।

এভাবে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একাধিক আল্লাহ্‌র অপধারণাটিকে নাকচ করা হয়েছে। নতুবা এরকম কখনোই হতে পারে না যে, ফেরেশতা কিংবা আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন কেউ নিজেকে আল্লাহ্ বলে দাবি করবে। এক আয়াতে খৃষ্টানদের ইবনুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র পুত্র) হওয়ার ধারণাটিকেও নাকচ করা হয়েছে এভাবে— 'মসীহ আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতারাও নয় এবং কেউ তাঁর বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করলে তিনি তাদের সকলকে তাঁর নিকট একত্র করবেন' (সূরা নিসা)।

কাতাদা বলেছেন, হজরত আদমকে সেজদা করার নির্দেশ যে ফেরেশতাগণকে দেয়া হয়েছিলো, ইবলিসও ছিলো তাদের মধ্যে। কিন্তু সে হয়ে গিয়েছিলো অবাধ্য ও অহংকারী। পরবর্তীতে সে তার ইবাদত করার জন্য আদম সন্তানকে আহ্বান জানাতে থাকে। আলোচ্য আয়াতে 'তাদের মধ্যে যে বলবে আমিই আল্লাহ্' কথাটি উদ্ধৃত হয়েছে ইবলিসের উক্তি হিসেবেই। কিন্তু কথা হচ্ছে— ফেরেশতারা কখনোই এরকম অপবিত্র উক্তি উচ্চারণ করতে পারে না। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। তাই কাতাদার বক্তব্যটি মেনে নিলে বলতে হয়, একটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে বিজড়িত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়।

www.eelm.weebly.com

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

❐ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশিয়া ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম; এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে; তবুও কি উহারা বিশ্বাস করিবে না?

❐ এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছি সুদৃঢ় পর্বত যাহাতে পৃথিবী উহাদিগকে লইয়া এদিক ওদিক ঢলিয়া না যায় এবং আমি উহাতে করিয়া দিয়াছি প্রশস্ত পথ যাহাতে উহারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারে।

❐ এবং আকাশকে করিয়াছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু উহারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

❐ আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিলো ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি তাদেরকে পৃথক করে দিলাম'।

এখানে 'আস্‌সামাওয়াত' অর্থ সম্মিলিত আকাশসমূহ। আর 'আরদ্ব' অর্থ সম্পূর্ণ পৃথিবী। হজরত ইবনে আব্বাস, আতা ও কাতাদা বলেছেন, প্রথমাবস্থায় সকল আকাশ ও সমস্ত পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলো। তারপর তার অভ্যন্তরে বাতাস প্রবেশ করিয়ে আকাশ মার্গ ও পৃথিবীকে আলাদা করা হয়েছে তাই এখানে বলা হয়েছে— অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম।

'রত্‌ক্বুন্' অর্থ বন্ধ করা, একীভূত করা। আর ফাতক্বুন অর্থ পৃথক করা। হজরত কা'ব বলেছেন, আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছিলেন স্তরে স্তরে সম্মিলিতরূপে সাজিয়ে। তারপর বাতাস সৃষ্টি করে তার অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ

www.eelm.weebly.com

করিয়ে আকাশ ও পৃথিবীকে রাখা হয় দূর ব্যবধানে। মুজাহিদ ও সুদ্দী বলেছেন, প্রথম আকাশ ও পৃথিবী ছিলো এক স্তর বিশিষ্ট ও মিলিত। তারপর আল্লাহ্ একটি আকাশকে পরিণত করলেন সাতটি আকাশে। পৃথিবীকেও করলেন সাত স্তর বিশিষ্ট। ইকরামা ও আতিয়া বলেছেন, প্রথমাবস্থায় আকাশ মার্গ ছিলো অভেদ্য। তাই বৃষ্টিপাত হতো না। আর পৃথিবীও ছিলো অচ্ছেদ্য। তাই পৃথিবীতে জন্ম নিতো না কোনো উদ্ভিদ। আল্লাহ্ তাদের ওই অনমনীয় অবস্থা দূর করে দিলেন। ফলে শুরু হলো বৃষ্টিপাত। পৃথিবীতেও অংকুরোদগম ঘটলো উদ্ভিদরাজির।

'আস্‌সামাওয়াত' শব্দটি বহুবচন। শব্দটির দ্বারা একত্রে আকাশ-পৃথিবীও বুঝায়, যখন এ দু'টো মিলিত ছিলো। আবার আকাশের অনেক স্তর রয়েছে বলেও এভাবে আকাশকে বহুবচনবোধক শব্দরূপের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, বৃষ্টিকে সৃষ্টি করা হয়েছে পরে। তাই পৃথিবীতে বৃক্ষের বিস্তার ঘটেছিলো আকাশ ও পৃথিবীর পৃথকীকরণের অনেক পরে। নতুন ও পুরাতন সকল সৃষ্টির উন্মেষ ঘটান আল্লাহ্ই। মানুষ কখনোই কোনো কিছুর সৃজয়িতা নয়, আবিষ্কারক অথবা নির্মাতা মাত্র। আল্লাহ্পাক প্রথমে আকাশ-পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন একত্রে। তারপর বাতাস সৃষ্টি করে প্রবেশ করিয়েছিলেন তার অভ্যন্তরভাগে। তারপর সৃষ্টি করেছেন বৃষ্টি, উদ্ভিদ ইত্যাদি। এভাবে তিনি তাঁর মহা সৃষ্টিকে তাঁর অভিপ্রায় ও পরিকল্পনানুসারে বিন্যস্ত করেছেন। ইকরামা ও আতিয়ার উপরে বর্ণিত বর্ণনাটি পরিপুষ্টি লাভ করেছে পরবর্তী বাক্যে এভাবে— 'এবং প্রাণবান সকল কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে।' একথার অর্থ— আকাশ ও পৃথিবী পৃথক করবার পর আমি সৃষ্টি করলাম পানি। আর পানি থেকে সৃষ্টি করলাম প্রাণীসমূহকে।

একটি প্রশ্ন ঃ উদ্ভিদ, তৃণগুল্ম— এগুলোর সৃষ্টি তো পানি থেকেই হয়। কিন্তু মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী তো সৃষ্টি হয় শুক্রকণা থেকে। তাহলে এরকম বলা যায় কি করে যে, প্রাণবান সকল কিছুকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

উত্তর ঃ কথাটি প্রকাশ করা হয়েছে পরোক্ষার্থে। পানি ছাড়া কোনো প্রাণীই জীবন ধারণ করতে পারে না। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বলা হয়েছে পানি দ্বারা সকল কিছু সৃষ্টি হওয়ার কথা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ।' একথায় বুঝা যায়, যেনো ত্বরাপ্রবণতার উপকরণ দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে 'বাক্বা' (স্থায়িত্ব) কথাটি উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য কথাটিসহ আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— আমি মানুষের স্থায়িত্ব বা অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টি নির্ভরশীল করেছি পানির উপর। কিংবা বলা যায়, পানির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আর্দ্রতা। সেই আর্দ্রতা তো শুক্র কণার মধ্যেও

www.eelm.weebly.com

রয়েছে। সুতরাং শুক্রকণাও পানির অন্তর্ভুক্ত। আবুল আ'লীয়া বলেছেন, অধিকাংশ তাফসীরকার আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন এভাবে— প্রতিটি প্রাণবান অস্তিত্ব পানি দ্বারা সৃষ্ট। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি বস্তুকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমি বলি, এখানে পানি দ্বারা শুক্রকণাকেই বুঝানো হয়েছে। এরকম বক্তব্য এসেছে অন্য আয়াতেও। যেমন— 'ওয়াল্লহু খলাক্বা কুল্লা দাব্বাতিম্ মিম্ মায়ি' (এবং আল্লাহ্ প্রতিটি চতুষ্পদ জন্তুকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন)। উপরে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে 'শাইইন' (সকল কিছু) কথাটি। এই 'সকল কিছু' অর্থ মানুষ ও অধিকাংশ জীবজন্তু। অর্থাৎ অধিকাংশ প্রাণবান সৃষ্টির উৎস পানি। অধিকাংশকে সামগ্রিক অর্থে প্রকাশ করা ও গ্রহণ করার রীতিটি সুপ্রচলিত। যেমন এক হাদিসে এসেছে— তোমাদের প্রত্যেকে তার অধীনস্তদের জিম্মাদার।

এরপরে বলা হয়েছে— 'তবুও কি তারা বিশ্বাস করে না' (আফালা ইউ'মিনূন)? এই প্রশ্নটি অস্বীকৃতি জ্ঞাপক এবং এখানকার 'ফা' অক্ষরটি পরিণতি প্রকাশক। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে — আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর চিরন্তন নিদর্শনের এতো স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ প্রকাশিত হওয়ার পরেও কি তারা ইমান আনবে না?

এর পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক ওদিক ঢলে না যায়। আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ, যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে।' এখানে 'রওয়াসিয়া' অর্থ সুদৃঢ় পর্বত। শব্দটি এসেছে 'রাসা' থেকে। এর অর্থ— 'ছাবাত' (প্রতিষ্ঠিত)।

'আন তামীদা বিহিম' অর্থ এদিক ওদিক চলে না যায়। 'মা' (লা) কথাটি রয়েছে এখানে অনুক্ত। এভাবে বুঝানো হয়েছে, পৃথিবী যাতে এদিক ওদিকে ঢলে না পড়ে, সে কারণেই পৃথিবীর উপরে স্থাপন করা হয়েছে সুদৃঢ় পর্বত।

'ওয়া জায়ালনা ফীহা ফিজাজান সুবুলান' অর্থ আমি পৃথিবীর পাহাড়ে ও সমতলভূমিতে সৃষ্টি করে দিয়েছি বহুরকমের পথ— জনপথ, সড়ক, গিরিপথ। 'লায়াল্লাহুম ইয়াহ্তাদূন' অর্থ যাতে তারা ওই সকল পথ ধরে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যেতে পারে।

এর পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।' একথার অর্থ— আমি আকাশকে বিনা স্তম্ভে ছাদরূপে প্রতিষ্ঠিত রেখেছি, যা নিখুঁত ও

www.eelm.weebly.com

অটুট, কিয়ামত পর্যন্ত সুরক্ষিত। শয়তানের গমনাগমনও সেখানে নিষিদ্ধ। নক্ষত্র, নীহারিকাসহ আরো অনেক কিছু দিয়ে আমি আকাশকে করে রেখেছি রহস্যময় ও অসংখ্য নিদর্শনে ভরপুর। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ওই সকল নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না, রহস্য উদ্ধার করতে চায় না। ঔদাসীন্যবশতঃ মুখ ফিরিয়ে নেয়।

এর পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।' রাত্রি-দিবস, সূর্য-চন্দ্র এসকল কিছু হচ্ছে আল্লাহ্র এককত্ব, প্রতিপালকত্ব ও অপার প্রজ্ঞা-পরাক্রমের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আলোচ্য আয়াতে এই অনন্যসাধারণ প্রমাণগুলির প্রতিই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্ই এগুলোর একক স্রষ্টা। 'ফী ফালাকিঁ ইয়্যাস্‌বাহূন' অর্থ প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। 'ফালাকুন' অর্থ কক্ষপথ। শব্দটির বহুবচন 'আফলাকুন'। গোলাকার বৃত্তকে আরবী ভাষায় বলে 'ফালাক'। উল্লেখ্য যে, নক্ষত্রসমূহ গোলাকার কক্ষপথে বৃত্তাকারে সতত ঘূর্ণায়মান। কাতাদা বলেছেন, 'ফালাকুন' অর্থ আকাশ, যার মধ্যে নক্ষত্রপুঞ্জ বিদ্যমান এবং প্রতিটি নক্ষত্র তাদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। কালাবী বলেছেন, আকাশের বৃত্তাকৃতিকে বলে 'ফালাক'। কেউ কেউ বলেছেন, আকাশের নিচের ঢেউয়ের মতো স্থানকে বলে 'ফালাক', যার মধ্যে চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রসমূহ বিচরণ করে।

আমি বলি, 'ফালাকুন' অর্থ আকাশ-ই। আর পৃথিবীর আকাশেই পরিক্রমণ করে গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ। এখানকার 'ফালাকিন' শব্দটির তান্‌ভিন একথাই প্রকাশ করছে যে, প্রতিটি নক্ষত্র পরিক্রমণ করে তাদের আপনাপন কক্ষপথ। প্রত্যেকের রয়েছে সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ। কিন্তু আরবী ভাষার রীতি অনুসারে একবচনরূপে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ফালাক'। যেমন আরববাসীরা বলে, সর্দার তাদের সকলকে পোশাক পরিয়েছে। কথাটির অর্থ— সর্দার তাদের প্রত্যেককে এক একটি পোশাক পরিয়েছে।

'ইয়াসবাহুন' অর্থ বিচরণ করে। অর্থাৎ মাছ যেমন পানিতে দ্রুত ও স্বাভাবিকভাবে বিচরণ করে, তেমনি স্বাভাবিক নিয়মের গতিতে আকাশের কক্ষপথে বিচরণ করে নক্ষত্রসমূহ।

আবু জাও সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, রসুল স.কে যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর মহাপ্রস্থানের সংবাদ জানানো হলো, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমার পরে আমার উম্মতের তত্ত্বাবধায়ক কে হবে? তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

www.eelm.weebly.com

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ○

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ○

❒ আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করি নাই, সুতরাং তোমার মৃত্যু হইলে উহারা কি চিরজীবি হইবে?

❒ জীব মাত্রই মরণশীল; আমি তোমাদিগকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার পূর্বেও আমি অনেক মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের কাউকেই চিরকাল পৃথিবীতে রাখিনি। নির্দিষ্ট হায়াত শেষে সকলকেই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে— এটাই আমার চিরন্তন বিধান। আপনার শত্রুরা আপনার মহাপ্রস্থানের অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু নিজেদের মৃত্যু সম্পর্কে তারা উদাসীন। কী ভেবেছে তারা? মৃত্যু কি তাদের হবে না?

'খুল্দ' অর্থ অনন্তজীবন, মৃত্যুহীন জীবন। বাগবী লিখেছেন, মক্কার মুশরিকেরা বলতো, মোহাম্মদ তো আর চিরদিন বেঁচে থাকবে না। তারপর আমাদের রাজত্ব। তাদের একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তাদের অপবিত্র ধারণাকে শেষে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে এভাবে— তারা কি চিরজীবি হবে?

এর পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'জীব মাত্রই মরণশীল; আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।' একথার অর্থ— জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যুবরণ করতে হবে, এটা আমার অনড় বিধান। আমি তো তোমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠাই মন্দ ও ভালো দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করবার জন্য। পরীক্ষার নির্ধারিত সময় শেষ হলে তোমাদেরকে দান করি মৃত্যু। ওই মৃত্যুর মাধ্যমে তোমরা সকলেই প্রত্যানীত হবে আমার নিকটে।

এখানে 'বিশ্‌শাররি ওয়াল খইরি' অর্থ মন্দ ও ভালো। অর্থাৎ কঠোরতা-নম্রতা, সুস্থতা-অসুস্থতা, স্বচ্ছলতা-দারিদ্র,অনুকূলতা-প্রতিকূলতা, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি। এসকল কিছুর মাধ্যমে পৃথিবীতে আমি পরীক্ষা করি তোমাদেরকে, যেনো সর্বসমক্ষে এ বিষয়টি প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়ে যায় যে, কে কৃতজ্ঞ, কে অকৃতজ্ঞ, কে ধৈর্যশীল এবং কে ধৈর্যচ্যুত।

'ওয়া ইলাইনা তুরজ্বাউ'ন' অর্থ আমারই নিকটে তোমরা প্রত্যানীত হবে। অর্থাৎ যখন তোমরা আমার সকাশে উপস্থিত হবে, তখন আমি তোমাদেরকে যথাপ্রতিফল প্রদান করবো— কৃতজ্ঞতা ও সহিষ্ণুতার জন্য স্বস্তি এবং অকৃতজ্ঞতা ও ধৈর্যহীনতার জন্য শাস্তি।

www.eelm.weebly.com

সুদ্দী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন— একবার আবু জেহেল ও আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে রসুল স. কোথাও গমন করছিলেন। তাঁকে দেখে আবু জেহেল হাসতে শুরু করলো। তাচ্ছিল্যের স্বরে আবু সুফিয়ানকে বললো, এই দেখো, বনী আব্দে মান্নাফের নবী। আবু সুফিয়ান এ কথায় খুব রাগান্বিত হলো। বললো, আব্দে মান্নাফ গোত্রের কেউ নবী হলে তোমার হিংসা লাগে কেনো। রসুল স. তাদের আলোচনা শুনে ফেললেন। ফিরে এসে আবু জেহেলকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার মনে হচ্ছে, তোমার চাচার উপরে যে মুসিবত নেমে এসেছিলো সেই মুসিবত তোমার উপরে পতিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি ক্ষান্ত হবে না। একথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۭ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ
اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○ خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۭ
سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ○ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ○ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَ
لَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○ بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا
يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ
فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

❑ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা যখন তোমাকে দেখে তখন উহারা তোমাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে। উহারা বলে, 'একি সেই যে তোমাদিগের দেব-দেবীগুলির সমালোচনা করে?' উহারাই তো 'রহমান' এর উল্লেখের বিরোধিতা করে।

❑ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ, শীঘ্রই আমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাইব, সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করিতে বলিও না।

❑ এবং উহারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল এই প্রতিজ্ঞা কখন পূর্ণ হইবে?'

www.eelm.weebly.com

❐ হায়, যদি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেই সময়ের কথা জানিত যখন উহারা উহাদিগের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে অগ্নি প্রতিরোধ করিতে পারিবে না এবং উহাদিগকে সাহায্য করাও হইবে না।

❐ বস্তুতঃ উহা উহাদিগের উপর আসিবে অতর্কিতভাবে এবং উহাদিগকে হতবুদ্ধি করিয়া দিবে; ফলে, উহারা উহা রোধ করিতে পারিবে না এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না।

❐ তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছিল; পরিণামে তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছিল তাহা বিদ্রূপকারীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মক্কার অংশীবাদীরা আপনার প্রতি তাচ্ছিল্য ভরে দৃষ্টিপাত করে। আপনাকে বানায় তাদের বিদ্রূপের পাত্র। বলে, দেখো, এই হচ্ছে সেই লোক, যে তোমাদের দেব-দেবীদের প্রতিমাগুলোর নিন্দা করে।

এখানে 'হুয়ওয়ান' অর্থ বিদ্রূপের পাত্র। আর এখানকার 'ইয়াজকুরু' (স্মরণ করে) কথাটির অর্থ নিন্দা বা সমালোচনা করে । উল্লেখ্য যে, শত্রুকে স্মরণ করা হয় নিন্দা-সমালোচনার সঙ্গেই, আর বন্ধুকে স্মরণ করা হয় প্রশংসা ও ভালোবাসার সঙ্গে। তাই পাত্রভেদে 'জিকির' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় বিপরীতার্থক। যেমন— 'ফুলানুন ইয়াজকুরু ফুলানান' অর্থ অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির সমালোচনা করে এবং 'ফুলানুন ইয়াজকুরুল্লহ' অর্থ অমুক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জিকির করে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উত্তম গুণাবলী বর্ণনা করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারাই তো 'রহমান' এর উল্লেখের বিরোধিতা করে।' একথার অর্থ— অথচ বিদ্রূপের পাত্র তারাই। কারণ তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, মিথ্যাশ্রয়ী। তারা অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র এককত্বকে, অংশীবিহীন হওয়াকে, কিতাব অবতীর্ণ হওয়াকে এবং রসুল প্রেরণ করাকে। অথবা তারা অস্বীকার করে কোরআনকে এবং বলে, আল্লাহ্‌কে 'রহমান' বলা ঠিক নয়। আমরা তো ইয়ামামার মুসায়লামা ব্যতীত অন্য কোনো রহমানকে চিনি না ইত্যাদি।

এর পরের আয়াতে (৩৭)বলা হয়েছে— 'মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ।' একথার অর্থ— চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা মানুষের একটি স্বভাবজ বৃত্তি। তাই তাদের পক্ষে সুস্থির, সহিষ্ণু ও শান্ত হওয়া কঠিন। এসকল মহৎ গুণাবলী থেকে চাঞ্চল্য প্রবণতার কারণেই তারা বার বার স্খলিত হয়ে পড়ে। তাই তাদের এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করে এখানে বলা হয়েছে— মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ।

www.eelm.weebly.com

মানুষের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে তাদের স্বভাবের প্রবলতম বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে। তাই লোকে বলে, অমুক ব্যক্তি রাগী, অমুক ব্যক্তি দানশীল ইত্যাদি। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, যখন হজরত আদমের মস্তক ও চোখের মধ্যবর্তী স্থানে আত্মার সম্পাত ঘটানো হলো, তখন তৎক্ষণাৎ তিনি দৃষ্টিপাত করলেন জান্নাতের ফলভরা বৃক্ষের দিকে। যখন আত্মা প্রক্ষেপিত হলো উদরে, তখন তাঁর হৃদয়ে জাগলো ওই ফল ভক্ষণের বাসনা। আর যখন আত্মার প্রভাব পতিত হলো তাঁর পায়ে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওই ফল সংগ্রহের জন্য উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু উঠতে যেয়েও পারলেন না। পড়ে গেলেন। তাঁর ওই ব্যতিব্যস্ততার দিকে লক্ষ্য করেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ'। বলা বাহুল্য যে, তাঁর ওই ত্বরাপ্রবণতার প্রভাবই বংশানুক্রমে মানুষের মধ্যে এখনো প্রবহমান। এই ত্বরাপ্রবণতা নিয়ন্ত্রণ না করা হলে মানুষ ধাবিত হয় অবিশ্বাসের দিকে। শত উপদেশও তখন আর তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

আমি বলি, সাফী ও সুফীগণ বলেন, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর প্রতিবিম্ব ও ছায়া। আর সৃষ্টির উৎসারণ ঘটেছে আল্লাহ্‌র বিভিন্ন গুণাবলী থেকে। সে সকল গুণ আবার পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তাই তাঁর নাম কখনো রহীম (দয়ালু) আবার কখনো কাহ্‌হার (অত্যন্ত কঠোর)। 'সবুর' (ধৈর্যশীল) এবং 'সারিউল হিসাব' (দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী) তাঁর পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দু'টো নাম। এই 'সারিউল হিসাব' থেকেই উৎসারিত হয়েছে মানুষের ত্বরাপ্রবণতা। সেদিকে লক্ষ্য করেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে—'মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ।'

একটি প্রশ্নঃ ত্বরাপ্রবণতা যখন আল্লাহ্‌র গুণ থেকে সমাগত, তবে নিশ্চয়ই তা উত্তম। কিন্তু আয়াত দৃষ্টে একথাই মনে হয় যে, ত্বরাপ্রবণতা উত্তম স্বভাব নয়। আরেকটি কথা হচ্ছে, এই স্বভাবটি যদি জন্মগত হয় তবে তা দূর করা তো একটি অসম্ভব ব্যাপার। আর যা অসম্ভব, তাকে পরিবর্তন করার কথাই বা উঠবে কেনো?

উত্তরঃ সত্তাগতভাবে ত্বরাপ্রবণতা মন্দ কিছু নয়। তবে এক্ষেত্রে সীমালংঘন ও অযথার্থ স্থানে এর ব্যবহার অবশ্যই নিন্দনীয়। আল্লাহ্‌তায়ালা নবী রসুলগণের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন— 'তাঁরা সৎকাজের প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়।' ত্বরাপ্রবণতার এরকম ব্যাপার প্রশংসার্হ। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ততা ও অযথার্থতাকে পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে, যা অসম্ভব কিছু নয়। কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত আদমকে সৃষ্টি

www.eelm.weebly.com

করেছেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে। শুক্রবারে দিনের শেষাংশে শুরু করে সূর্যাস্তের আগেই সম্পন্ন হয়েছিলো তাঁর সৃষ্টি। অন্য সকল কিছু সৃষ্টি করা হয়েছিলো তার আগের দিন। হজরত আদমের ললাটদেশের সঙ্গে যখন রূহকে সম্পৃক্ত করা হলো তখন তিনি নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমাকে সূর্যাস্তের পূর্বেই সম্পূর্ণতা দান করুন। মুজাহিদও এরকম বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো একবারে। আর অন্যান্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয় ধারাবাহিকভাবে, ধাপে ধাপে— শুক্রবিন্দু, জমাটরক্ত, গোশতের টুকরা, এভাবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'আজাল' শব্দটির অর্থ গলিত মাটি, কর্দম বা মাটির খামির। কামুস গ্রন্থেও এরকম বলা হয়েছে। জনৈক কবি বলেছেন—

ওয়ান্ নাবউ' ফিস্সাখরাতিস্ সাম্মায়ি মামবাতুহু
ওয়ান্ নাখলু তানবুতু মিম্ মাইন্ ওয়ামিন আ'জাল

অর্থঃ নাবা বৃক্ষ অংকুরিত হয় নিবিড় পাথর থেকে, কিন্তু খর্জুর বৃক্ষ জন্ম নেয় পানি ও কাদামাটি থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাবো, সুতরাং— তোমরা আমাকে ত্বরা করতে বোলো না।' এখানকার 'নিদর্শনাবলী' কথাটির অর্থ দুনিয়া ও আখেরাতের আযাব। অর্থাৎ বদর যুদ্ধ ও জাহান্নাম। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিকেরা বলে, মোহাম্মদ যা কিছু বলছে তা যদি সত্য হয় তবে তুমি আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করো। কারণ আমরা তাকে মানি না। আপনি তাদেরকে বলুন, যে শাস্তি তোমরা চাও, তা যথাসময়ে অবশ্যই প্রকাশিত হবে। সুতরাং এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে কোনো লাভ নেই। উল্লেখ্য যে, মুশরিকেরা মনে করতো তাদের উপরে কখনোই আযাব আসবে না। আর যদি আসে তবে তা দ্রুতই আসা উচিত। এক বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে নজর বিন হারেসকে লক্ষ্য করে। 'পাথর বর্ষণ করো' এরকম কথা বলেছিলো সে-ই।

এর পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'এবং তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো, এই প্রতিজ্ঞা কখন পূর্ণ হবে?' একথার অর্থ— রসুল স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করে তারা আরো বলে, তোমরা বার বার বলো তোমাদের কথা না মানলে আযাব আসবে। যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তবে বলো, কখন আসবে আযাব?

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— ' হায়, যদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সেই সময়ের কথা জানতো, যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবে না।' একথার অর্থ— অংশীবাদীরা ওই সময়ের কথা জানে না, যখন তাদেরকে অগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টন করা হবে। সেই অগ্নি নির্বাপন হবে তাদের ক্ষমতাবহির্ভূত। আর তখন তাদের কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না। যদি তারা ওই ভয়াবহ পরিণতির কথা জানতো, তবে কিছুতেই তারা আযাব আগমনের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতো না। 'পাথর বর্ষণ করো' এরকম কথাও উচ্চারণ করতো না।

এর পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ তা তাদের উপর আসবে অতর্কিতভাবে এবং তাদেরকে হতবুদ্ধি করে দেবে; ফলে তারা তা রোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।'

এখানে 'তা'তীহিম' (তা তাদের উপর আসবে) কর্তৃবাচক সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত হবে পূর্ববর্তী আয়াতের 'নার' (অগ্নি) কথাটির সঙ্গে, অথবা তৎপূর্ববর্তী 'ওয়া'দু' (প্রতিজ্ঞা) কথাটির সঙ্গে, কিংবা আগের আয়াতের 'হীনা' (সেই সময়ের কথা) এর সঙ্গে। অর্থগত দিক থেকে 'ওয়া'দু' হচ্ছে নির্ধারিত সময় এবং 'হীনা' হচ্ছে সময়। তাই স্ত্রীলিংগ বাচক সর্বনাম তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে।

'বাগ্‌তাতান' অর্থ অতর্কিতভাবে, অকস্মাৎ, হঠাৎ, সহসা। আগের আয়াতে বলা হয়েছিলো 'ওয়ালা হুম ইউনসরুন' (তাদেরকে সাহায্য করাও হবে না)। আর এখানে বলা হলো 'ওয়ালা হুম ইউনজরুন' (তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না)। দু'টো বাক্যেই 'হুম' (তাদেরকে) সর্বনামটি এসেছে ক্রিয়ার পূর্বে। এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, সেদিন কেবল তাদেরকেই সাহায্য করা হবে না এবং অবকাশ দেয়া হবে না। পাপী বিশ্বাসীদের বেলায় এরকম অবস্থা ঘটবে না। নবী- রসুল, আউলিয়া, সলিহীন ও ফেরেশতাদের সুপারিশজনিত সাহায্য তারা পাবে। অবকাশও পাবে। আর পাবে ক্ষমার ঔদার্য।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'তোমার পূর্বে অনেক রসুলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিলো; পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিলো, তা বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিলো।' আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দকে সান্ত্বনার বাণী শোনানো হয়েছে এবং সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে দেয়া হয়েছে দোজখের দুঃসংবাদ। আরো বলা হয়েছে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ এখন যেমন তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে, তেমনি করে সেদিন তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে অগ্নি। সেটাই হবে তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের পরিণাম।

www.eelm.weebly.com

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ
اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ
مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ○ بَلْ مَتَّعْنَا هٰؤُلَآءِ وَ اٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ
اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ○
قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ ۖ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ○ وَلَئِنْ
مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○

❒ বল 'রহমান' হইতে কে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে রাত্রিতে ও দিবসে? 'তবুও উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

❒ তবে কি আমা ব্যতীত উহাদিগের এমন কতগুলি দেব-দেবী আছে যাহারা উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে? ইহারা তো নিজদিগকেই সাহায্য করিতে পারে না এবং আমার বিরুদ্ধে উহাদিগের সাহায্যকারীও থাকিবে না।

❒ বস্তুতঃ আমিই উহাদিগকে এবং উহাদিগের পিতৃ পুরুষদিগকে ভোগ-সম্ভার দিয়াছিলাম এবং উহাদিগের আয়ুষ্কালও হইয়াছিল দীর্ঘ। উহারা কি দেখিতেছে না যে আমি উহাদিগের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি। তবুও কি উহারা বিজয়ী হইবে?

❒ বল, 'আমি তো কেবল প্রত্যাদেশ দ্বারাই তোমাদিগকে সতর্ক করি,' কিন্তু যাহারা বধির তাহাদিগকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তাহারা সতর্কবাণী শুনে না।

❒ তোমার প্রতিপালকের শাস্তির কিছুমাত্রও উহাদিগকে স্পর্শ করিলে উহারা বলিয়া উঠিবেই, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদিগের, আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, রহমান থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে রাত্রিতে ও দিবসে?' হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির তাফসীর করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আল্লাহ্ যদি তোমাদেরকে শাস্তি দিতে চান, তবে কে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে? অথবা অর্থ হবে— আল্লাহ্র আযাব যদি তোমাদের উপরে আপতিত হয়, তবে তোমাদেরকে রক্ষা করবে কে? অর্থাৎ আল্লাহ্র রহমত ছাড়া আল্লাহ্র শাস্তি থেকে উদ্ধার প্রাপ্তির কোনো উপায়ই নেই।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তবুও কি তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।' একথার অর্থ— তাদেরকে আল্লাহ্র ভয় দেখাও। কিন্তু তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন তো নিরর্থক। তারা যে আল্লাহ্র আদেশ ও উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অথবা অর্থ হবে— রহমান সম্পর্কে তাদের অন্তরে তো কোনো চিন্তা -ভাবনাই নেই। তাহলে তারা তাঁকে ভয়ই বা পাবে কেমন করে?

পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'তবে কি আমা ব্যতীত তাদের এমন দেব-দেবী আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তারা তো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারে না এবং আমার বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যকারীও থাকবে না।' এখানে 'তামনাউ'হুম' অর্থ— এমন উপাস্য যে আমার শাস্তি থেকে তাদেরকে বাঁচাতে পারবে। 'তারা তো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারে না।' অর্থ ওই সকল তথাকথিত দেব-দেবীর তো আত্মরক্ষা করারও ক্ষমতা নেই। তাদের শরীরে মাছি বসলে সে মাছি তাড়াবার ক্ষমতাও তো তাদের নেই। আর 'আমার বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যকারীও থাকবে না' অর্থ সেদিন নবী, ওলী ও ফেরেশতাদের সুপারিশের সাহায্য পাবে কেবল গোনাহ্গার ইমানদারেরা, অংশীবাদীরা এরকম সাহায্য কিছুতেই পাবে না।

হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— ওই সকল দেব-দেবীও তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। বরং তাদেরকেও শাস্তি দেয়া হবে তখন। এরকম কথা উচ্চারিত হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে— ' এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যে সকল দেবদেবীর উপাসনা তোমরা করো সকলকেই করা হবে জাহান্নামের জ্বালানী।' মুজাহিদ এখানকার 'ইউস্হাবুন' কথাটির অর্থ করেছেন 'ইউনসারুন।' অর্থাৎ তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরকে সুপারিশ করার জন্য কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না এবং অন্য কোনো ভাবেও সাহায্য করা হবে না।

এর পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ আমিই তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলাম এবং তাদের আয়ুষ্কালও হয়েছিলো দীর্ঘ।' একথার অর্থ— পূর্ববর্তী যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আমি দিয়েছিলাম ভোগ-সম্ভারের বিভিন্ন উপকরণ। তাদেরকে দীর্ঘ হায়াতও আমি দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা মনে করতো তাদের পূজিত প্রতিমাগুলোই তাদেরকে দিয়েছে দীর্ঘ জীবন ও সম্পদ। এরকমও বলা যেতে পারে যে— দীর্ঘ জীবন ও প্রতুল বৈভবকে তারা মনে করতো এটা তাদের অধিকার। আর তাদের জীবন ও সম্পদ কখনো শেষ হবে না। কিন্তু তা নয়। সেটা ছিলো সত্যোপলব্ধির জন্য আমার পক্ষ থেকে প্রদত্ত অবকাশ।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'ওরা কি দেখছে না যে, 'আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে আনছি। তবুও কি ওরা বিজয়ী হবে?' এখানে 'আল আরদ্ব' অর্থ কাফেরের দেশ, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী-অধিকৃত ভূমি। 'নানকুসুহা' কথাটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে, আমি তাদের অধিকৃত ভূমি ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের অধিকারে দিয়ে দিচ্ছি। মুসলমানদের সাম্রাজ্য হচ্ছে বিস্তৃত আর তাদের রাজ্য হচ্ছে ক্রমশঃ সংকুচিত। এমতাবস্থায় আমার রসুলের বিরুদ্ধে তারা বিজয়ী হওয়ার আশা করে কেনো?

এর পরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'বলো' আমি তো কেবল প্রত্যাদেশ দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি; কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা সতর্কবাণী শোনে না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদের বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা একথা বুঝতে পারছো না কেনো যে, আমি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ভয় দেখাচ্ছি না। আমি যা কিছু বলছি, তা আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ, যা নিঃসন্দিগ্ধ। সুতরাং তোমরা এ প্রত্যাদেশ অমান্য কোরো না। কিন্তু হে আমার নবী! এভাবে তাদেরকে বুঝিয়েই বা কি করবেন। তারা যে বধির। সত্যের সংবাদ তাদের শ্রুতিকে সচকিত করেই না।

এরপরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের শাস্তির কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা বলে উঠবেই, হায় দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী।' হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'নাফখাতুন' এর অর্থ করেছেন— কিছুমাত্র। কেউ কেউ অর্থ করেছেন— সামান্য কিছু। ইবনে জারীর বলেছেন, শব্দটির অর্থ একটি অংশ। যেমন বলা হয়— 'নাফাখা ফুলানুন লি ফুলানিন্।' (অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তিকে তার নিজের সম্পদের একটি অংশ দিয়েছে)। কেউ কেউ বলেছেন, মারা, আঘাত করা। যেমন— 'নাফাখাতিদ্ দাব্বাতু বি রিজলিহা' (ঘোড়া তার পায়ের দ্বারা আঘাত করেছে)। অবশ্য 'নাফাখাতুন' এর শাব্দিক অর্থ সুবাসিত বাতাসের প্রবল প্রবাহ।

'মাস্সুন' অর্থ ছুঁয়ে যাওয়া সামান্য প্রলেপ। এর মধ্যে 'তা' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে কথাটিকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য (মাস্সাত)। এভাবে 'মাস্সাতহুম নাফখাতুন' কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে— বড় ধরনের আযাব প্রকাশিত হওয়ার আগে যদি সেই শাস্তির কিছুমাত্রও তাদের স্পর্শ করে, তবু তারা সঙ্গে সঙ্গে বলে বসবে হায় কপাল! আমরা তো সীমালংঘনকারীই ছিলাম।

www.eelm.weebly.com

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ○ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ○ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ○ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ۖ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ○

❒ এবং কিয়ামত-দিবসে আমি স্থাপন করিব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কাহারও প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও উহা আমি উপস্থিত করিব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।

❒ আমি তো মূসা ও হারুনকে দিয়াছিলাম ফুরকান, আলো ও উপদেশ, সাবধানীদিগের জন্য—

❒ যাহারা না দেখিয়াও তোমাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামত সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত।

❒ ইহা কল্যাণময় উপদেশ; আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি। তবুও কি তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করবো ন্যায়বিচারের মানদণ্ড।' এখানে 'আল কি্সত' অর্থ মানদণ্ড। এর পূর্বে 'ন্যায় বিচারের' কথাটি উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য কথাটি সহ-ই এখানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'ন্যায়বিচারের মানদণ্ড।' অথবা 'মানদণ্ড' অর্থই ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। 'কি্সত' শব্দটি হচ্ছে শব্দমূল।

'লিইয়াওমাল কি্য়ামাহ্' (কিয়ামতের দিবসে) কথাটির 'লাম' অব্যয়টির অর্থ এখানে 'ফী' (তে)। অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসেতে বা কিয়ামতের দিবসে। অথবা 'ইয়াওমা' (দিবসে) কথাটির পূর্বে 'বিনিময় প্রদানের জন্য' কিংবা 'কিয়ামত-বাসীদের জন্য' কথাটি এখানে রয়েছে উহ্য। এভাবে সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— আমি কিয়ামত দিবসে কিয়ামতবাসীদের জন্য অথবা তাদেরকে বিনিময় প্রদানের জন্য স্থাপন করবো ন্যায়বিচারের মানদণ্ড।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'মানদণ্ড' দ্বারা এখানে পাল্লা, নিক্তি বা অন্য কোনো ধরনের পরিমাপক যন্ত্র স্থাপনের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সকলের হিসাব নিকাশ ও আমলের বিনিময় প্রদানের কথা। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইমামগণের অভিমত কিন্তু এরকম নয়। তাঁদের মতে অবশ্যই সেদিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড পাল্লার আকৃতিতে স্থাপন করা হবে। ইবনে মোবারক তাঁর আজ্‌জুহুদ এবং আজরী তাঁর আশ্‌শরিয়ত গ্রন্থে হজরত সালমান কর্তৃক অপরিণত সূত্রবিশিষ্ট এক হাদিসে লিখেছেন, মীযানের (পাল্লার) মুখ হবে একটি এবং বাহু হবে দুটি। ইবনে হাব্বান তাঁর তাফসীরে কালাবী সূত্রে এরকমই বলেছেন। আরো বলেছেন আবু সালেহ্ হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে। ইবনে মারদুবিয়া তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন মীযানের দুটি পাল্লার মতো করে।

বায়হাকী হজরত ইবনে ওমরের একটি বর্ণনার সঙ্গে হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে জিবরাইলের শেষাংশ যুক্ত করে বলেছেন, জিবরাইল জিজ্ঞেস করলেন, ইমান কী? রসুল স. বললেন, ইমান হচ্ছে— আল্লাহ্, ফেরেশতা, নবী-রসুল, জান্নাত, জাহান্নাম ও মীযানকে বিশ্বাস করা। আরো বিশ্বাস করা যে— পুনরুত্থান সত্য ও তকদীর সত্য। জিবরাইল বললেন, এগুলো মানলেই কি আমি ইমানদার হয়ে যাবো? তিনি স. বললেন হ্যাঁ। জিবরাইল বললেন, আপনি সত্য বলেছেন।

হাকেম তাঁর মুসতাদ রাকে মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে এবং সঠিক আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, হজরত সালমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন মীযান প্রতিষ্ঠিত হবে। ওই মীযানে আকাশ ও পৃথিবীরও সংকুলান হবে।

তিরমিজি ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক উত্তম আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, হজরত আ'মাস বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! দয়া করে কিয়ামতের দিন আমার জন্য শাফায়াত করবেন। তিনি স. বললেন, করবো। আমি বললাম, তখন কোথায় পাবো আপনাকে? তিনি স. বললেন, প্রথমে খুঁজে দেখবে মীযানের কাছে। আমি বললাম, সেখানে যদি না পাই? তিনি স. বললেন, তাহলে খুঁজবে পুলসিরাত অথবা হাউজের কাছে। তখন ওই তিন স্থান ছাড়া অন্য কোথাও আমি থাকবো না।

হাকেম, বায়হাকী ও আজরীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! মহাবিচারের দিবসে আপনারা (পুরুষেরা) কি তাদের আপনাপন স্ত্রীদের কথা মনে রাখবেন?

www.eelm.weebly.com

রসুল স. বললেন, তিনটি স্থানে কেউ কারো কথা মনে রাখতে পারবে না। ১. ওই স্থান, যেখানে প্রতিষ্ঠা করা হবে মীযান, যতক্ষণ না তার মাধ্যমে পাপ-পুণ্যের ওজন শেষ হয়। ২.পুলসিরাতের স্থানে, যতক্ষণ না কেউ পুলসিরাত পার হয় এবং ৩. ওই স্থানে, যেখানে আমলনামা পিছন থেকে উড়ে এসে পড়বে সকলের ডান অথবা বাম হাতে, যতক্ষণ না কেউ তার আমলনামা হাতে পায়। এরকম আরো অনেক হাদিস রয়েছে, যেখানে মীযান বা পাল্লার কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। সুরা আল 'ক্বারিয়া'হ্'র তাফসীরে আমি এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছি।

বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত দাউদ একবার আবেদন করলেন, হে আমার আল্লাহ্! আমাকে মীযান দেখিয়ে দিন। আল্লাহ্পাক তাঁর আবেদন গ্রহণ করলেন। মীযান দেখিয়ে দিলেন তাঁকে। তিনি দেখলেন, মীযানের বাহু দু'টি বিশাল— পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে হজরত দাউদ বেহুঁশ হয়ে গেলেন। হুঁশ ফিরে পাওয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার আল্লাহ! এমন কে আছে যে তার পুণ্য দিয়ে এই বিশাল পাল্লার এক বাহু পূর্ণ করবে? আল্লাহ্ বললেন, হে আমার প্রিয় নবী! আমি কারো প্রতি প্রসন্ন হলে তার একটি খেজুর দানের কারণেই আমি পূর্ণ করে দিবো তার নেকির পাল্লা।

'মাওয়াযীনা' শব্দটি বহুবচন। এখানে শব্দটির বহুবচনরূপে প্রয়োগ করার কারণ স্বরূপ নাসাফী তাঁর 'বাহ্রুল কালাম' গ্রন্থে লিখেছেন, ১. প্রত্যেক মীযান হবে পৃথক পৃথক। ২. অথবা বহুবচনকেই এখানে একবচনের অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। এরকম শব্দরূপ ব্যবহার করা হয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন— 'ফানাদাত্হুল মালাইকাতু'। এখানে 'মালাইকাতু' বহুবচন হলেও এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে কেবল হজরত জিবরাইলকে। আবার— 'ইয়া আইয়্যুহার রসূলু কুলু মিনাত ত্বইয়েবাত', এখানেও 'আররসূলু' বহুবচন হওয়া সত্ত্বেও এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে কেবল রসুল স.কে। ৩. কিংবা মীযানের প্রত্যেক অংশকে মীযান ধরে নিয়ে সম্পূর্ণ মীযানকে এখানে বলা হয়েছে 'আল মাওয়াযীনা'। যেমন 'সারাবিলুন' বহুবচন হলেও এর দ্বারা বুঝানো হয় পাজামা বা সেলওয়ারকে। এর একবচন হচ্ছে 'সারাবিলাতুন'। আর পাজামার প্রতিটি অংশকে বলে 'সারাবিলাহ্'। আর সকল অংশকে একত্রে বলা হয় 'সারাবিলুন'।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না'। একথার অর্থ— কাউকে সেদিন তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হবে না। পুণ্য বা পাপ কোনো ক্ষেত্রেই ঘটানো হবে না কোনো সংযোজন অথবা বিয়োজন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করবো'। একথার অর্থ— ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পুণ্য অথবা পাপও সেদিন ওজনের জন্য উপস্থিত করবো আমি।

www.eelm.weebly.com

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহাবিচারের দিনে প্রত্যেকের প্রতিটি পুণ্য ও পাপ ওজন করা হবে। পাপাপেক্ষা পুণ্য যদি কারো একটিও বেশী হয়, তবে তাকে প্রবেশ করানো হবে বেহেশতে। আর কারো পুণ্যাপেক্ষা পাপ একটি বেশী হলেও তাকে প্রবেশ করানো হবে দোজখে। তিনি একথাও বলেছেন যে, শস্যদানা পরিমাণ পুণ্য অথবা পাপ বেশী হওয়ার কারণেই মীযানের পাল্লা ভারী অথবা হাল্‌কা হবে। আর যার পুণ্য পাপ সমান হবে, তাকে রাখা হবে আ'রাফে, অথবা পুলসিরাতের নিকটে।

এরপর বলা হয়েছে— 'হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।' সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'হাসিবীন' অর্থ মুহ্‌সিয়ীন' (গণনার অন্তর্ভুক্তকারী)। 'হাসাবুন' অর্থ পরিমাপ করা। হজরত ইবনে আব্বাস শব্দটির অর্থ করেছেন, অবগত ব্যক্তি, স্মরণকারী ব্যক্তি, যে তার গণনা বা পরিমাপ সম্পর্কে নিশ্চিত, সম্যক জ্ঞাত। এভাবে শব্দটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌র চেয়ে অন্য কারো জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতা অধিক নয়।

এর পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'আমি তো মুসা ও হারুনকে দিয়েছিলাম ফুরক্বান, আলো ও উপদেশ, সাবধানীদের জন্য—' এখানে 'আল ফুরক্বান' অর্থ তওরাত শরীফ, যা ছিলো সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যনির্দেশক।

'দীয়াআন' অর্থ নূর, আলো, জ্যোতি। অর্থাৎ মূর্খতা ও অবিশ্বাসের অন্ধকারে যে দিশাহারা, তার জন্য তওরাত ছিলো পথের আলো। 'জিক্‌রাল লিল মুত্তাক্বীন' অর্থ সাবধানীদের জন্য উপদেশ, হেদায়েত, স্মারক। অথবা শরিয়তের বিধান। উল্লেখ্য যে, তওরাতের বৈশিষ্ট্য ছিলো তিনটি— সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য, আলো ও উপদেশ।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে 'ফুরক্বান' অর্থ শত্রুর উপরে বিজয়। আল্লাহ্ বদর-বিজয়কে বলেছেন 'ইয়াওমুল ফুরক্বান'। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সমুদ্রের পানি পৃথক করে দিয়ে তার মধ্য দিয়ে হজরত মুসা, হজরত হারুন ও তাঁদের অনুসারীদের জন্য সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিলো পথ। ওই পথকেই এখানে বলা হয়েছে 'ফুরক্বান'। এই অভিমতানুসারে 'দ্বিয়াআন' ও জিকরান' কথা দুটোর অর্থ হবে তওরাত, যে তওরাতের আলোকে পথপ্রদর্শন করা হয়েছিলো বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীকে।

এর পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'যারা না দেখেও তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামত সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত।' এখানে বর্ণনা করা হয়েছে মুত্তাকী বা সাবধানীদের দু'টি বৈশিষ্ট্য— ১. না দেখে আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং ২. কিয়ামতের ভাবনায় ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া। যারা সাবধানী নয়, তাদের এই বৈশিষ্ট্য দু'টো নেই।

এর পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'এটা কল্যাণময় উপদেশ; আমি এটা অবতীর্ণ করেছি। তবু কি তোমরা একে অস্বীকার করো?' এখানে 'হাজা'

www.eelm.weebly.com

(এটা) অর্থ এই কোরআন। 'জিক্‌রুম্‌ মুবারাকুন' অর্থ মহাকল্যাণময় নির্দেশনা বা উপদেশ। এখানকার 'অবতীর্ণ করেছি' কথাটির অর্থ— অবতীর্ণ করেছি মোহাম্মদের উপর। আর এখানকার 'আনতুম' (তোমরা) শব্দটির মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে মক্কাবাসীদেরকে।

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্নরূপে। এভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে— হে মক্কাবাসী! মহাকল্যাণময় উপদেশরূপে তোমাদের সম্প্রদায়ভূত এক সর্বোন্নত চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপরে আমিই অবতীর্ণ করেছি এই কোরআন। সুতরাং একে অস্বীকার কোরো না।

সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭,

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ○ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ
وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ○ قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا
لَهَا عٰبِدِيْنَ ○ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○
قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ○ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ
الشّٰهِدِيْنَ ○ وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ○

❑ আমি তো ইহার পূর্বে ইব্‌রাহীমকে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দিয়াছিলাম এবং আমি তাহার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।

❑ যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, 'এই যে মূর্তিগুলি, যাহাদিগের পূজায় তোমরা রত রহিয়াছ, এইগুলি কী?'

❑ উহারা বলিল, 'আমরা আমাদিগের পিতৃপুরুষগণকে ইহাদিগের পূজা করিতে দেখিয়াছি।'

❑ সে বলিল, 'তোমরা নিজেরা তো রহিয়াছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে, তোমাদিগের পিতৃপুরুষগণও ছিল।'

❑ উহারা বলিল,'তুমি কি আমাদিগের নিকট সত্য আনিয়াছ, না তুমি কৌতুক করিতেছ?'

www.eelm.weebly.com

❐ সে বলিল, 'না, তোমাদিগের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিতেছি।'

❐ 'শপথ আল্লাহের, তোমরা চলিয়া গেলে আমি তোমাদিগের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করিব।'

'রুশ্‌দ' অর্থ তওহীদ বা আল্লাহ্‌র এককত্বে বিশ্বাস, মূর্তিপূজা থেকে বৈমুখ্য। শব্দটির সম্পর্ক হজরত ইব্রাহিমের নামের সঙ্গে হওয়ার কারণে একথাই প্রমাণিত হয় যে, তওহীদের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যুচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন । আর 'মিন ক্বব্‌লু' (এর পূর্বে) অর্থ হজরত মুসা ও হজরত হারুনের পূর্বে। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— মোহাম্মদের উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হচ্ছে। এভাবে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি কোনো নতুন বিষয় নয়। এটা আমার চিরন্তন বিধান। মানুষের সংশোধনের নিমিত্তে আমি এভাবে যুগে যুগে আমার মনোনীত বার্তাবাহকগণের উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করে থাকি। যেমন মুসা ও হারুনের অনেক পূর্বে আমি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেছিলাম ইব্রাহিমের উপরে। তাকে দিয়েছিলাম ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান এবং আমি তার অবস্থা সম্পর্কে ছিলাম সম্যক জ্ঞাত।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'এরপূর্বে' কথাটির অর্থ হবে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বে। অর্থাৎ ওই সময়ে যখন তিনি অতিক্রম করছিলেন শৈশবকাল এবং যখন তিনি গুহা থেকে বের হয়ে এসে নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিলেন— নিশ্চয় আমি আমার মুখ ফিরালাম আকাশ, পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার প্রতি.........। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— আমি তো প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় পৌঁছানোর পূর্বেই ইব্রাহিমকে দিয়েছিলাম নবুয়তের জ্ঞান, যেমন জ্ঞান দান করেছিলাম ঈসাকে। কোরআনে আমি সেকথা বলেছি এভাবে— আমি তাকে শৈশবেই জ্ঞান দান করেছিলাম (সুরা মারয়াম) অথবা মর্মার্থ হবে — নবুয়তের দায়িত্বদানের পূর্বে আমি ইব্রাহিমকে দিয়েছিলাম রুশদ্‌ (ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান)।

'আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।' অর্থ আমি একথা ভালো করেই জানতাম যে, ইব্রাহিম ছিলো হেদায়েত ও নবুয়তের দায়িত্ব বহনের যোগ্য, কেননা তার মাবদায়ে তায়্যুন (সূচনাস্থল) ছিলো আমার 'হাদী' ও 'আলীম' নাম। তাই তার উপরে সতত বিচ্ছুরিত হতো হেদায়েত ও এলেমের নূর।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললো, এই যে মূর্তিগুলো, যাদের পূজায় তোমরা রত, এগুলো কী?'

www.eelm.weebly.com

একথার অর্থ— মূর্তিপূজক পিতা ও তার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে হজরত ইব্রাহিম একবার অবজ্ঞাভরে বললেন, এই মূর্তিগুলো তো প্রাণহীন, অসার। তবুও তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এগুলোকে পূজো করে চলেছো কেনো?

এর পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে—'ওরা বললো, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এদের পূজা করতে দেখেছি।' একথার অর্থ— মূর্তিপূজকেরা হজরত ইব্রাহিমের কথায় হতচকিত হয়ে গেলো। তাই যুক্তিসংগত কোনো উত্তর না দিতে পেরে কেবল বললো, আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এরকমই করতে দেখেছি।

এর পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে—'সে বললো, তোমরা নিজেরা তো রয়েছো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে, তোমাদের পিতৃপুরুষগণও ছিলো।' একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম বললেন, তোমরা বিভ্রান্ত। তোমাদের পূর্বপুরুষগণও তাই। প্রতিমা কি কখনো কারো কল্যাণ অথবা অকল্যাণ করতে পারে?

এর পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছো, না তুমি কৌতুক করছো? এ কথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিমের কথা শুনে তারা হয়ে পড়লো বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ। বললো, তুমি আমাদের সম্মানিত পিতৃপুরুষগণকে দোষারোপ করছো কেনো? তাদের বিরুদ্ধাচরণ করার পরেও কি তুমি মনে করো তুমিই সত্য? না এটা তোমার কৌতুক।

এর পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'সে বললো, না, তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি।' এখানে 'ফাত্বরাহুন্না' (যিনি এদেরকে সৃষ্টি করেছেন) কথাটির অর্থ পূর্ব দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে এদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন। কথাটির পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, 'তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক।' হজরত ইব্রাহিম তাঁর বক্তব্য এভাবে উপস্থাপন করেছেন এ কারণে যে, তারা সম্রাট নমরুদকে প্রতিপালকরূপে জানতো। আর নমরুদ বলতো, আমিও জীবনদান করি ও মৃত্যু ঘটাই। মূর্তিপূজকদের এই ধারণা প্রতিহত করার জন্যই তাই হজরত ইব্রাহিম তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এভাবে— তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। যিনি এগুলোকে অস্তিত্বায়িত করেছেন। আর আমি এই সত্যবাণীর সাক্ষ্যদাতা। আর এখানে 'বাল' শব্দটির দ্বারা একথাই প্রকাশ পেয়েছে যে, আমি কোনো কৌতুক করছি না। সত্য সাক্ষ্য প্রদান করছি। আর দ্যাখো আকাশ ও পৃথিবী নিজেরাই তাদের সৃষ্টিকর্তার সাক্ষ্যদাতা, যিনি অংশীবিহীন এবং যিনি একমাত্র মাবুদ (উপাস্য) হওয়ার যোগ্য। আমিও এভাবে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর আন্তরিক ও মৌখিক সাক্ষ্য দেই।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'শপথ আল্লাহ্‌র, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করবো।' এখানে 'কাইদা' অর্থ কৌশলগত ব্যবস্থা। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'তাল্লহি' কথাটির 'তা' অক্ষরটি শপথের অর্থ প্রকাশক। 'আল্লাহ্‌র শপথ' একথা বোঝানোর জন্য সাধারণত ব্যবহৃত হয় 'ওয়াল্লহ্‌' কিন্তু 'ওয়াও' অক্ষরটি বিস্ময়কর কোনো শপথ প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। একই সঙ্গে শপথ ও বিস্ময় প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় 'তা' অক্ষরটি। তাই এখানে ওয়াল্লহ্‌ না বলে বলা হয়েছে তাল্লহ্‌। উল্লেখ্য যে, তখন রাজত্ব ছিলো নমরুদের। মূর্তিপূজা ও মূর্তিপূজকদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলো সে। তাই তার রাজত্বে মূর্তি উচ্ছেদ করা ছিলো একটি বিস্ময়কর ও দুঃসাহসিক কর্ম। সে কারণেই এখানে বিস্ময় প্রকাশক শপথবাক্য উচ্চারণের পর ব্যবহৃত হয়েছে 'কাইদা' শব্দটি। আর এখানে 'মুদবিরীন' অর্থ তোমরা চলে গেলে। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— শপথ আল্লাহ্‌র, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে কৌশলগত কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন অবশ্যই করবো।

বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম একথা বলেছিলেন নিম্নকণ্ঠে। উপস্থিত জনতার মধ্যে মাত্র একজন এ কথা শুনেছিলো, সে-ই সকলকে জানিয়ে দিয়েছিলো যে, ইব্রাহিম কিন্তু আমাদের প্রতিমাগুলো সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছে। আমি একথা স্বকর্ণে শুনেছি।

সুদ্দী লিখেছেন, নমরুদের শহরের লোকেরা একটি বাৎসরিক মেলা বসাতো। মেলা থেকে ফিরে এসে প্রতিমাগুলোকে প্রণতি জানানোর পর তারা প্রবেশ করতো আপনাপন গৃহে। বছরের শেষে যখন মেলার সময় হলো, তখন তাঁর পিতা তাঁকে বললো, চলো মেলায় যাই। আমাদের সমাবেশে আন্তরিকতার সঙ্গে ওঠা বসা করো। দেখবে, আমাদের প্রথা, মতাদর্শ ও নিয়ম সবকিছু সুন্দর। হজরত ইব্রাহিম তার কথামতো তার সাথে কিছু পথ অতিক্রম করলেন। তারপর হঠাৎ মাটিতে বসে পড়ে বললেন, আমার শরীর ঠিক নেই। তিনি এমনভাব দেখালেন, যাতে করে মনে হতে লাগলো, তিনি তাঁর পায়ে ব্যথা পেয়েছেন। তাঁর পিতা অগত্যা তাঁকে ছেড়েই মেলায় চলে গেলো। এভাবে সকল সমর্থ লোক মেলায় চলে গেলো। সম্প্রদায়ের অচল ও অথর্ব লোকদেরকে হজরত ইব্রাহিম প্রতিমাপূজা যে নিষ্ফল ও অসত্য, সে কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন। তারা কেবল শুনে গেলো। কোনো উচ্চ বাচ্য করলো না। এরপর হজরত ইব্রাহিম গেলেন তাদের প্রধান পূজা মণ্ডপে। দেখলেন, একটি বিশাল আকৃতির প্রতিমার আশে পাশে স্থাপন করা হয়েছে আরো অনেক বিভিন্ন আকৃতির প্রতিমা। সেগুলোর সামনে রাখা হয়েছে অনেক রকম খাদ্য সামগ্রী। মেলায় গমনকারীরা যাবার আগে সেগুলো রেখে গিয়েছে প্রতিমাগুলোর আশীর্বাদ লাভের আশায়। মেলা থেকে ফিরে এসে

www.eelm.weebly.com

খাদ্যদ্রব্যগুলো তারা নিজ নিজ ঘরে নিয়ে যাবে, এটাই ছিলো তাদের পরিকল্পনা এবং এটাই ছিলো তাদের প্রথা। হজরত ইব্রাহিম প্রতিমাগুলোকে লক্ষ্য করে বিদ্রূপের স্বরে বললেন, কী ব্যাপার? খাবারগুলো খাচ্ছো না কেনো? কী হলো? কথা বলছো না কেনো? এরপর তিনি মূর্তিগুলোকে ভাঙতে শুরু করলেন এবং বললেন, শপথ আল্লাহ্র, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করবো।

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ○ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ○ قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ○ قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ○ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ○ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ○

❒ অতঃপর সে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল মূর্তিগুলিকে, উহাদিগের প্রধানটি ব্যতীত; যাহাতে উহারা ইহার শরণাগত হয়।

❒ উহারা বলিল, 'আমাদিগের দেবতাগুলির প্রতি এইরূপ করিল কে? সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী।

❒ কেহ কেহ বলিল, 'এক যুবককে উহাদিগের সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি; তাহাকে বলা হয় ইব্‌রাহীম।'

❒ উহারা বলিল, 'তাহাকে উপস্থিত কর লোক সম্মুখে, যাহাতে উহারা সাক্ষ্য দিতে পারে।'

❒ উহারা বলিল, 'হে ইব্‌রাহীম তুমিই কি আমাদিগের দেবতাগুলির প্রতি এইরূপ করিয়াছ?'

❒ সে বলিল, 'ইহাদিগের এই প্রধানই তো ইহা করিয়াছে। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ না, যদি ইহারা কথা বলিতে পারে।'

❒ তখন উহারা মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিল এবং একে অপরকে বলিতে লাগিল, 'তোমরাই তো সীমালংঘনকারী?'

www.eelm.weebly.com

❑ অতঃপর উহাদিগের মস্তক অবনত হইয়া গেল এবং উহারা বলিল, 'তুমি তো ভালই জান যে ইহারা কথা বলে না।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলো মূর্তিগুলোকে, তাদের প্রধানটি ব্যতীত, যাতে তারা তার শরণাগত হয়।' এখানকার 'জুজাজান' (চূর্ণ বিচূর্ণ) শব্দটি সংকলিত হয়েছে 'জাজ্জুন' থেকে। এর অর্থ কর্তন করা। কোনো কোনো অভিধানবেত্তা বলেছেন, 'জুজাজান' শব্দরূপটি বহুবচনের। এর কোনো একবচন হয় না। 'কাবীরুন' শব্দটির অর্থ এখানে প্রধান প্রতিমা। হজরত ইব্রাহিম ওই প্রতিমাটিকে ভাঙেননি। আর অন্যান্য প্রতিমাকে যে কুঠার দিয়ে তিনি ভেঙেছিলেন, সেই কুঠারটি তিনি ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন প্রধান প্রতিমাটির স্কন্ধে। প্রতিমাপূজকেরা তাদের প্রতিমাগুলোকে মনে করতো জাগ্রত ও জ্ঞানসম্পন্ন। তাই এখানে 'ফাজ্বায়ালাহুম' কথাটির সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনবোধক ও পুংলিংগ বাচক সর্বনামরূপে।

'যাতে তারা তার শরণাগত হয়' কথাটির অর্থ— হজরত ইব্রাহিম জানতেন, 'ভগ্ন প্রতিমাগুলোকে দেখলে লোকেরা প্রথমে তাঁর কাছেই ছুটে আসবে। কারণ তারা জানে তিনি মূর্তি-উপাসনার বিরোধী। তাই একাজ কেবল তাঁর দ্বারাই হওয়া সম্ভব। তারা এলে তিনি তাদেরকে তখন বলতে পারবেন, দেখো, তোমাদের উপাস্যরাও কতো অসহায়। একজন মানুষের মোকাবিলাও তারা করতে পারে না। এদিকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে— 'যাতে তারা তাঁর (ইব্রাহিমের) শরণাগত হয়।' অথবা এখানকার 'এর শরণাগত হয়' কথাটির অর্থ হবে— তারা যেনো শরণপ্রার্থী হয় প্রধান প্রতিমাটির। যেনো তাকেই জিজ্ঞেস করে জেনে নেয় প্রকৃত ঘটনা কি। কিন্তু তাদের প্রধান প্রতিমা অবশ্যই কোনো জবাব দিতে পারবে না। তখন তারা নিজেরাই অপদস্থ হবে। কিংবা 'শরণাগত হয়' কথাটির অর্থ হবে এখানে— তারা যেনো আল্লাহ্র শরণাগত হয়। অর্থাৎ প্রতিমাগুলোর অক্ষমতার কথা ভালোভাবে বুঝতে পেরে তারা যেনো ফিরে আসে আল্লাহ্র দিকে।

এর পরের আয়াতে(৫৯) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমাদের দেবতাগুলোর প্রতি এরূপ করলো কে? সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী।' এখানে 'মান ফায়ালা' (এরূপ করলো কে) কথাটির 'মান' শব্দটি প্রশ্নবোধক এবং এটি 'মাউসুলাও' (যোজক অব্যয়) হতে পারে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যে এরূপ করেছে, সে সীমালংঘনকারী। কেননা সে আমাদের উপাস্যসমূহের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছে। অথবা তাদেরকে ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। কিংবা এমতো গর্হিত অপরাধ করে সে নিজেই নিজের উপরে জুলুম করেছে। প্রশস্ত করেছে তার ধ্বংসের পথ।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'কেউ কেউ বললো, এক যুবককে এদের সমালোচনা করতে শুনেছি, তাকে বলা হয় ইব্রাহিম।'

এর পরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, তাকে উপস্থিত করো লোক সম্মুখে, যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে।' একথার অর্থ— এ সংবাদ পৌছে গেলো সম্রাট নমরুদের দরবারে। তখন সে ও তার পারিষদেরা বললো, যদি ইব্রাহিম এ কাজ করে থাকে, তবে তাকে সকলের সামনে এনে উপস্থিত করো। আর এ ব্যাপারে যারা জানে, তাদেরকে উপস্থিত করো সাক্ষী হিসেবে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কাতাদা, হাসান ও সুদ্দী। কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, এখানে 'লোকসম্মুখে' কথাটির অর্থ গোত্রনেতা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সম্মুখে। মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, এখানকার 'যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে' কথাটির অর্থ— আমি ওই বিদ্রোহী যুবককে কীরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করতে পারি তা যেনো সকলে এসে স্বচক্ষে দেখে যেতে পারে।

এর পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে ইব্রাহিম! তুমিই কি আমাদের দেবতাগুলোর প্রতি এরূপ করেছো?'

এর পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'সে বললো, এদের এই প্রধানই তো এটা করেছে। এদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো না, যদি এরা কথা বলতে পারে।' প্রধান মূর্তিটির উপরে হজরত ইব্রাহিমের ক্রোধ ও ঘৃণা ছিলো সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ লোকেরা তাকেই সম্মান করতো সবচেয়ে বেশী। তাই তিনি ক্ষোভ প্রকাশার্থে বলেছিলেন, 'এই প্রধান মূর্তিটিই তো এরকম করেছে'। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে— এভাবেই তিনি বিদ্রূপের সঙ্গে মূর্তি ভেঙে ফেলার কথা স্বীকার করেছিলেন। যেমন, এক লোকের সুন্দর হস্তলিপি অন্য এক লোক অধিকার করলো এবং বললো, এ লেখা কি আপনার? সুন্দর হস্তলিপির অধিকারী ব্যক্তিটি তখন বিদ্রূপের স্বরে জবাব দিলো, না আপনার। এটা এক ধরনের পরোক্ষ স্বীকারোক্তি। 'এই প্রধানইতো এটা করেছে'— হজরত ইব্রাহিমের এ উক্তিটি ছিলো সে ধরনের। কিংবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, মূর্তিপূজারীদের অপবিশ্বাস ছিলো প্রধান মূর্তির সামনে অন্য মূর্তিগুলোর উপাসনা করলে প্রধান মূর্তিটি অসন্তুষ্ট হয়। তাই হজরত ইব্রাহিম তাদের বিশ্বাসের অনুকূলে বলেছিলেন, এই প্রধানই তো (অসন্তুষ্ট হয়ে) এ রকম করেছে।

www.eelm.weebly.com

কুতাইবী বলেছেন, অর্থগত দিক থেকে এই কথাটি পরবর্তী বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়—প্রধান মূর্তিটিকেই জিজ্ঞেস করে দেখো না, যদি সে কথা বলতে পারে, তবে বুঝবে সে এরকম করতেও পারে। আর যদি সে কথা বলতে না পারে, তবে বুঝবে সে এরকম করার ক্ষমতা রাখে না। এভাবে হজরত ইব্রাহিম মূর্তির অক্ষমতা প্রকাশের মাধ্যমে নিজের মূর্তি ভাঙার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু কুতাইবীর এই ব্যাখ্যাটি ভুল। কেননা ক্বারী কাসায়ী বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের আলোচ্য বক্তব্যের মধ্যে তাঁর মূর্তি ভাঙার স্বীকৃতি নেই। এর পরেও যদি পরোক্ষ স্বীকৃতির কথা বলা হয়, তবে বক্তব্যটি হয়ে পড়বে স্ববিরোধী একবার না, আরেকবার হ্যাঁ। একই বক্তব্যের মধ্যে এভাবে 'হাঁ' ও 'না' এর সমন্বয়ন শুদ্ধ নয়। এছাড়া হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিস থেকেও একথা প্রমাণিত হয় যে, 'ফায়ালাহু' কথাটির পরে কোনো যতি চিহ্ন নেই। বরং এখানে কথাটির ধারাবাহিক সম্পর্ক রয়েছে কাবীরুহুম' (এই প্রধানই) এর সঙ্গে।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, নবী ইব্রাহিম তিন বার এরকম কথা বলেছিলেন, যা দৃশ্যতঃ অসত্য মনে হলেও অসত্য নয়। দু'বার বলেছিলেন এরকম— 'ইন্নি সাক্বীম' (আমি অসুস্থ) এবং 'বাল ফায়ালাহু কাবীরুহুম' (এদের এই প্রধানই তো এটা করেছে)। তৃতীয় ঘটনাটি ছিলো এরকম— একবার তিনি তাঁর সহধর্মিণী সারাকে নিয়ে এক অত্যাচারী সম্রাটের রাজ্য অতিক্রম করছিলেন। কে যেনো সম্রাটের কানে সংবাদ পৌঁছালো, আপনার রাজ্য অতিক্রম করছে এক মরুচারী অভিযাত্রিক। তার সঙ্গে রয়েছে এক অনিন্দ্য সুন্দর রমণী। সম্রাট তৎক্ষণাৎ তার বিশেষ বাহিনী পাঠিয়ে নবী ইব্রাহিম ও তাঁর স্ত্রীকে দরবারে নিয়ে এলো। সম্রাট বললো, পথিক! রমণীটি কে? তিনি বললেন, আমার বোন। পরে স্ত্রীকে একান্তে বললেন, তুমি আমার স্ত্রী একথা জানলে সম্রাট তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতো। এখন তোমাকে ডেকে যদি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তবে তুমিও এরকম উত্তর দিয়ো। মুসলমান হিসেবে আমরা তো ভ্রাতা-ভগ্নিই। আর এখন সারা পৃথিবীতে ইমানদার কেবল তুমি ও আমি। সম্রাট সারাকে ডেকে নিয়ে গেলো। নিরুপায় নবী নামাজে দণ্ডায়মান হলেন। সম্রাট অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হলো তাঁর দিকে। কিন্তু তাকে অদৃশ্য ব্যবস্থাপনায় আটকে রাখা হলো। মাটিতে পড়ে গেলো সে। অনেক চেষ্টা করেও দাঁড়াতে পারলো না। কাকুতি মিনতি করে আবেদন জানালো, আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করো। আমি আর তোমার দিকে অগ্রসর হবো না। সারা দোয়া করলেন। সে ভালো হয়ে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু পুনরায় অগ্রসর হলো অসৎ কামনা নিয়ে। কিন্তু একটু অগ্রসর হতেই পুনরায় পড়ে গেলো মাটিতে। আবারো প্রতিজ্ঞা করলো, এবার আর ভুল হবে না। আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে আমাকে ভালো করে দাও। সারা পুনরায় দোয়া করলেন। দোয়া কবুলও হলো। সম্রাট

www.eelm.weebly.com

ভালো হয়ে উঠে দাঁড়ালো। প্রতিহারীকে ডেকে বললো, তুমি কাকে এনেছো আমার সামনে। এতো মানুষ নয়, জ্বিন। তারপর সম্রাট সারার সেবিকা হিসেবে দান করলেন বিবি হাজেরাকে এবং সসম্মানে নবী ইব্রাহিমের সঙ্গে চলে যাবার অনুমতি দিলেন। বিবি সারা বিবি হাজেরাকে নিয়ে নামাজরত নবীর কাছে পৌঁছলেন। তিনি ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর? বিবি সারা বললেন, উত্তম। সম্রাটতো উপঢৌকনরূপে সেবিকা হাজেরাকেও দান করেছেন। এ পর্যন্ত বলে হজরত আবু হোরায়রা উচ্চারণ করলেন, হে আকাশী সলিলের সন্তান (হে বিশুদ্ধ বংশের দাবিদার), এই হাজেরাই হচ্ছেন তোমাদের মহাসম্মানিতা জননী। বোখারী, মুসলিম।

এই হাদিসের মাধ্যমে এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অবজ্ঞাভরে হলেও হজরত ইব্রাহিম তিন বার অসত্য উচ্চারণ করেছিলেন, অথবা প্রত্যক্ষভাবে শাব্দিক অর্থ তো অসত্যকেই প্রমাণ করে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই একথা স্পষ্ট হয় যে, তাঁর উপরে বর্ণিত উক্তি তিনটির একটিও অসত্য নয়। কারণ প্রতিটি বক্তব্যের অর্থ থাকে দু'টি— প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত। হজরত ইব্রাহিম তাঁর বক্তব্য বুঝাতে চেয়েছিলেন অন্তর্নিহিত অর্থে। আর শ্রোতা বা শ্রোতৃবৃন্দ তা বুঝেছিলো প্রকাশ্য অর্থে। এতে করে শ্রোতৃবর্গের বোধের অগভীরতাই প্রকাশ পায়, আর প্রকাশ পায় হজরত ইব্রাহিমের জ্ঞানের গভীরতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। সঙ্গীন পরিস্থিতিতে এভাবে আত্মরক্ষা শরিয়তের দৃষ্টিতে দূষণীয় কিছু নয়।

এর পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখলো এবং একে অপরকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলো, তোমরাই তো সীমালংঘনকারী।' একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিমের কথায় চেতনা ফিরে পেলো তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা। বুঝতে পারলো নিশ্চেতন প্রতিমার উপাসনা ঠিক নয়। ইব্রাহিম যা বলছে, সেটাই ঠিক। তাই তারা পরস্পরকে দোষারোপ করতে লাগলো এই বলে যে, তোমরাই সীমালংঘনকারী।

এর পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তাদের মস্তক অবনত হয়ে গেলো এবং তারা বললো,তুমি তো ভালোই জানো যে, এরা কথা বলতে পারে না।' একথার অর্থ— কিছুক্ষণের জন্য তাঁর সম্প্রদায় শুভবুদ্ধিকে আশ্রয় করে রইলো। কিন্তু দীর্ঘদিনের লালিত অপবিশ্বাসের কাছেই শেষে নতি স্বীকার করলো তারা। গভীর নিদ্রামগ্ন ব্যক্তি হঠাৎ জাগ্রত হলেও যেমন পরক্ষণে ডুবে যায় নিদ্রার অতলে, তেমনি তারা সাময়িক বিশ্বাসের জাগরণের ছোঁয়া পেয়েও পুনরায় ডুবে গেলো অবিশ্বাসের অতল তলে। কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ করে বললো, হে ইব্রাহিম! এভাবে কথা বলছো কেনো? তুমি তো জানোই, তারা কথা বলতে পারে না। অযথা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে বলছো কেনো?

www.eelm.weebly.com

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ○ اُفٍّ لَّكُمْ
وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا
اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ○ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى
اِبْرٰهِيْمَ ○ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ○ وَنَجَّيْنٰهُ وَ
لُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ○ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ؕ وَ
يَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ○ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ
بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا
عٰبِدِيْنَ ○ وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ
تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ○ وَاَدْخَلْنٰهُ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ
اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

❒ ইব্‌রাহীম বলিল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহের পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যাহা তোমাদিগের কোন উপকার করিতে পারে না, ক্ষতিও করিতে পারে না?'

❒ 'ধিক্ তোমাদিগকে এবং আল্লাহের পরিবর্তে তোমরা যাহাদিগের ইবাদত কর তাহাদিগকে! তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?'

❒ উহারা বলিল, 'তবে উহাকে পোড়াইয়া দাও, সাহায্য কর তোমাদিগের দেবতাগুলিকে, তোমরা যদি কিছু করিতে চাহ।'

❒ আমি বলিলাম, 'হে অগ্নি! তুমি ইব্‌রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হইয়া যাও।'

❒ উহারা ইব্‌রাহীমের বিরুদ্ধে এক ফন্দি আঁটিতে চাহিল। কিন্তু আমি উহাদিগকে করিয়া দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

www.eelm.weebly.com

❐ এবং আমি তাহাকে ও লূতকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলাম সেই দেশে যেথায় আমি কল্যাণ রাখিয়াছি বিশ্ববাসীর জন্য।

❐ এবং আমি ইব্রাহীমকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক, আরও দান করিয়াছিলাম ইয়াকূব এবং প্রত্যেককেই করিয়াছিলাম সৎকর্মপরায়ণ;

❐ এবং তাহাদিগকে করিয়াছিলাম নেতা; তাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করিত; তাহাদিগকে প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম সৎকর্ম করিতে, সালাত কায়েম করিতে এবং জাকাত প্রদান করিতে; তাহারা আমারই ইবাদত করিত।

❐ এবং লূতকে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এমন এক জনপদ হইতে যাহার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কর্মে; উহারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী।

❐ এবং তাহাকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করিয়াছিলাম; সে ছিল সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইব্রাহিম বললেন, যে প্রতিমাগুলোর উপাসনা তোমরা করো, সেগুলো তো তোমাদের উপকার বা ক্ষতি কোনোটাই করতে পারে না। অথচ তোমরা জানো এবং এখন ভালো করে জানলে যে, এগুলো মিথ্যা। আক্ষেপ! শত আক্ষেপ! যে আল্লাহ্ আমার, তোমাদের ও সকলের সৃজয়িতা ও পালনকর্তা! সেই আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা এভাবে আটকে রয়েছো ঘৃণ্য অংশীবাদিতায়।

পরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত করো তাদেরকে।' এখানে 'উফ্ফিন' অর্থ ধিক, অথবা এ ধরনের কোনো ঘৃণা প্রকাশক শব্দ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ঘৃণিত, দুর্গন্ধযুক্ত অথবা দুঃখজনক কোনো কিছু অনুভবের পর আপনাআপনি যে শব্দ উচ্চারিত হয় সেই শব্দই হচ্ছে 'উফ্'। রসুল স. একবার দুর্গন্ধ পেয়ে উচ্চারণ করে উঠেছিলেন 'উফ্', 'উফ্' এবং একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কাপড় চেপে ধরেছিলেন তাঁর নাসিকায়। বায়যাবী লিখেছেন, 'উফ্ফিন' অর্থ অপগন্ধ অথবা এ ধরনের নিন্দনীয় কোনো কিছু।

এর পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, তবে একে পুড়িয়ে দাও, সাহায্য করো তোমাদের দেবতাগুলোকে, তোমরা যদি কিছু করতে চাও।' একথা বলেছিলো হানুন নামক এক লোক। আল্লাহ্ তাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করে দিয়েছিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে মাটিতে দেবে যেতেই থাকবে। কেউ কেউ বলেছেন, একথা বলেছিলো নমরুদ নিজে। অন্য সকলে ছিলো তার একথার সমর্থক। তাই এখানে বলা হয়েছে 'ওরা বললো'।

www.eelm.weebly.com

তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, হজরত ইব্রাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বন্দী করে রাখা হলো একটি প্রকোষ্ঠে। চারিদিকে গড়ে তোলা হলো দুর্ভেদ্য বেষ্টনী। কূছী নামক গ্রামে খনন করা হলো একটি বিরাট গর্ত। সেখানে একত্র করা হলো ভারী জাতীয় এক ধরনের কাঠ। আনন্দে উৎফুল্ল হলো অংশীবাদীরা। তাদের উদ্দীপনা এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে, পীড়িত ব্যক্তিরা মানত করতে লাগলো, আমি আরোগ্য লাভ করলে ওই অগ্নিকুণ্ডে কিছু কাঠ দিবো। মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ মানত করলো, আমার অমুক বাসনা পূর্ণ হলে আমিও ওই অগ্নিকুণ্ডে দান করবো কিছু জ্বালানী। কেউ কেউ অছিয়ত করলো, কাজ শেষ হওয়ার আগেই যদি আমি মৃত্যুবরণ করি, তবে তোমরা আমার নামে ওই অগ্নিকুণ্ডের জন্য কিছু কাঠ দান কোরো। মহিলাদের কেউ কেউ চরকা ঘুরিয়ে তার পারিশ্রমিক দ্বারা কাঠ ক্রয় করে পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাঠগুলো ফেলে দিতে শুরু করলো ওই গহ্বরে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, বিপুল উৎসাহে নমরুদের লোকেরা এক মাস ধরে বিভিন্ন স্থান থেকে কাঠ এনে স্তূপীকৃত করলো নির্ধারিত স্থানে। তারপর চার দিক থেকে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো কাঠগুলোতে। ক্রমে ক্রমে ভয়ংকর হয়ে উঠলো অগ্নিকুণ্ডটি। আগুনের শিখা উঠে গেলো অনেক উপরে। পালিয়ে গেলো আশেপাশের পক্ষীকুল। সাত দিন ধরে এভাবে জ্বলে ওঠার পর নমরুদ ঠিক করলো এবার ইব্রাহিমকে ফেলে দিতে হবে ওই বহ্নিমান অগ্নিকুণ্ডে। কিন্তু তারা কেউ বুঝে উঠতে পারলো না, কীভাবে ইব্রাহিমকে ওই জ্বলন্ত হুতাশনে নিক্ষেপ করা যায়। ওই আগুনের কাছাকাছি যাওয়া যে দুষ্কর। তখন মানুষের বেশ ধরে ইবলিস এসে বললো চড়ক বানানোর কথা। বললো, চড়কের এক প্রান্তে ইব্রাহিমকে বেঁধে দূর থেকে তাকে আগুনে ফেলে দেয়া যায়। ইবলিসের বুদ্ধি তাদের মনোপুত হলো। একটি উঁচু অট্টালিকার উপরে চড়ক প্রতিষ্ঠা করলো তারা। তারপর হজরত ইব্রাহিমকে বসিয়ে দিলো তার এক প্রান্তে। আহাজারি করে উঠলো আকাশ ও পৃথিবীর ফেরেশতাকুল। মানুষ ও জ্বিন ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টি চিৎকার করে প্রার্থনা জানালো, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! ইব্রাহিম তোমার খলিল (বন্ধু)। দেখো শত্রুরা তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছে। বর্তমান পৃথিবীতে তিনি ছাড়া তোমার উপাসক আর কেউ নেই। তুমি আমাদেরকে অনুমতি দাও, আমরা সকলে তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রসর হই। আল্লাহ্ বললেন, ইব্রাহিম আমার খলিল। আমিই তার মাবুদ। আমি ছাড়া তার অন্য কোনো উপাস্য নেই। যদি আমার বন্ধুতোমাদের কারো কাছ থেকে সাহায্য চায়, তবে তোমরা তাকে সাহায্য করতে পারবে। এই অনুমতি তোমাদের সকলকেই দেয়া হলো। কিন্তু সে যদি আমি ছাড়া অন্য কারো শরণ প্রার্থী না হয়, তবে আমিই হবো তার সরাসরি পরিত্রাতা। আমি জানি, সে আমার কে। আর সে-ও জানে, আমি তার কি। সুতরাং তোমরা আমাদের দু'জনের মাঝে আড়াল সৃষ্টি কোরো না।

www.eelm.weebly.com

চড়ক আন্দোলিত করা হলো। পানির দায়িত্ববাহী ফেরেশতা ছুটে এসে বললো, হে খলিলুল্লাহ্! আপনি অনুমতি দিলে আমি এখনই অগাধ জলরাশি এনে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে নিভিয়ে দিতে পারি। বাতাস পরিচালনাকারী ফেরেশতা এসে বললো, অনুমতি দিন হে আল্লাহ্র বন্ধু, আমি এক্ষুণি তুফান এনে উড়িয়ে নিয়ে যাই এই জ্বলন্ত হুতাশনকে। হজরত ইব্রাহিম বললেন, না। তোমরা কেনো এগিয়ে আসতে চাইছো? আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আমি তাঁর। তিনি আমার।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের জন্য হজরত ইব্রাহিমকে চড়কের এক প্রান্তে বেঁধে ফেলা হলো, তখন তিনি উচ্চারণ করলেন— 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা লাকাল হামদু ওয়া লাকাল মুলকু লা শারীকা লাক।' চড়কটি ঘুরিয়ে হজরত ইব্রাহিমকে নিক্ষেপ করা হলো লেলিহান অনলে। সঙ্গে সঙ্গে হজরত জিবরাইল এসে বললেন, ভ্রাতা ইব্রাহিম অনুমতি দিন। আমি সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। হজরত ইব্রাহিম বললেন, আপনার সাহায্য আমি চাই না। জিবরাইল বললো, তাহলে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, কেনো? তিনি তো আমাকে দেখছেন।

হজরত কা'ব আহবার বর্ণনা করেছেন, তখন আল্লাহ্র সকল সৃষ্টি হজরত ইব্রাহিমকে সাহায্য করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলো। কেবল গিরগিটি ছিলো তাঁর বিরুদ্ধে। সে আরো ফুৎকার দিচ্ছিলো যাতে করে আগুন অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হয়।

হজরত উম্মে শুরাইক থেকে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. গিরগিটিকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছেন এবং বলেছেন, গিরগিটি নবী ইব্রাহিমের জন্য প্রস্তুতকৃত অগ্নিকুণ্ডকে ফুৎকার দিয়ে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করেছিলো।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সুপরিণতসূত্রে বোখারী, মুসলিম ও তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে। কাবাগৃহের মধ্যে গিরগিটি দেখতে পেলেও তাকে হত্যা কোরো। হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. গিরগিটিকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছেন এবং তাকে বলেছেন, ফাসেকের বাচ্চা। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত আর এক হাদিসে এসেছে, বর্শার প্রথম আঘাতে যে গিরগিটিকে হত্যা করতে পারবে, তাকে দেয়া হবে এক শত পুণ্য। দ্বিতীয় আঘাতে হত্যা করলে পুণ্য হবে কম, আর তৃতীয় আঘাতে হত্যা করলে আরো কম।

এর পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'আমি বললাম, হে অগ্নি! তুমি ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ যদি তখন 'শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও' না বলে কেবল বলতেন 'শীতল হয়ে যাও', তবে শীতলতার কারণে হজরত ইব্রাহিমকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে

www.eelm.weebly.com

হতো। কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, 'সালামান' (নিরাপদ, শান্তিদায়ক) শব্দটি এখানে 'কুনী' (হয়ে যাও) এর বিধেয় নয়। বরং শব্দটি এখানে একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্মপদ। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— আমি ইব্রাহিমকে পরিপূর্ণরূপে নিরাপদ রেখেছিলাম।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, ওই দিন পৃথিবীর সকল আগুন নিভে গিয়েছিলো। আগুন দ্বারা সে দিন কেউ উপকার লাভ করতে পারেনি। আল্লাহ্ যদি তখন 'আ'লা ইবরাহীম' (ইব্রাহিমের জন্য) না বলতেন, তবে চিরদিনের জন্য সকল আগুন শীতল হয়ে যেতো। আমি বলি, তখন ওই অগ্নিকুণ্ডের রূপ ও বৈশিষ্ট্য ঠিকই ছিলো। কিন্তু তা হজরত ইব্রাহিমের উপরে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি। অর্থাৎ তখন আগুনের দহণ ক্ষমতা থাকলেও সে হজরত ইব্রাহিমের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। 'আলা ইব্রাহিম' কথাটির মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয়।

সুদ্দী বলেছেন, ফেরেশতারা তখন হজরত ইব্রাহিমের দুই বাহু ধরে মাটিতে বসিয়ে দিলেন। হজরত ইব্রাহিম দেখলেন, বয়ে যাচ্ছে সুমিষ্ট সলিলের একটি অলৌকিক ঝর্ণা। আর চার পাশে ফুটে রয়েছে রক্তিম বর্ণের পুষ্প। হজরত কা'ব বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিমের দেহের কোনো অংশেই আগুন তার দাহিকা শক্তি প্রয়োগ করতে পারেনি। কেবল পুড়িয়ে দিতে পেরেছিলো তাঁর বন্ধনের রশিগুলো। বর্ণনাকারীগণ বলেছেন, ওই প্রজ্জ্বলিত অনলকুণ্ডের অভ্যন্তরে হজরত ইব্রাহিম ছিলেন সাত দিন। মিনহাল বিন আমর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিম বলেছেন, আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক আরাম ও শান্তিদায়ক সময় ছিলো ওই সাতদিন।

ইবনে ইয়াসার বলেছেন, আল্লাহ্ তখন মানুষের আকারে ছায়াপ্রদায়ক ফেরেশতাকে পাঠালেন হজরত ইব্রাহিমের কাছে। ওই ফেরেশতা হলো তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আর আল্লাহ্র নির্দেশে হজরত জিবরাইল নিয়ে গেলেন একটি বেহেশতি পোশাক ও একটি সিংহাসন। তিনি পোশাকটি হজরত ইব্রাহিমকে পরিয়ে দিলেন। তারপর তাঁকে বসালেন ওই সিংহাসনে। শেষে তাঁর কাছে উপবেশন করে বললেন, আল্লাহ্ আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা কি জানো যে, আমার বন্ধুকে পোড়ানোর ক্ষমতা আগুনের নেই। কয়েকদিন পর নমরুদ একটি উঁচু দালানে উঠে দেখলো, একটি সুদৃশ্য কুসুমকাননে সুশোভিত সিংহাসনোপরি বসে রয়েছেন হজরত ইব্রাহিম। তাঁর পাশে বসে আছে এক অচেনা লোক। তাঁদের চারিদিকে কেবল আগুন আর আগুন। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে নমরুদ চিৎকার করে বলে উঠলো, ইব্রাহিম! তোমার মাবুদ অনেক বড়। তার ক্ষমতা এতদূর যে, সে হয়ে গিয়েছে তোমার ও আগুনের মাঝখানের পর্দা। আমি তো সেরকমই

www.eelm.weebly.com

দেখছি। এবার বলো, তুমি কি ওখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবে? হজরত ইব্রাহিম বললেন হ্যাঁ। নমরুদ বললো, ওখানে থাকলে আগুন তোমাকে ভস্মীভূত করে ফেলবে, এ রকম আশংকা কি তোমার নেই? হজরত ইব্রাহিম বললেন, না। নমরুদ বললো, তাহলে বের হয়ে এসো। হজরত ইব্রাহিম উঠে দাঁড়ালেন এবং সেখান থেকে বের হয়ে এলেন ধীর পদক্ষেপে। নমরুদ বললো, ওই লোকটি কে, যে তোমার কাছে বসেছিলো? হজরত ইব্রাহিম বললেন, ছায়াপ্রদায়ক ফেরেশতা। আমার প্রভুপালক আমার কষ্ট দূর করবার জন্য তাকে পাঠিয়েছিলেন। নমরুদ বললো, আমি তার জন্য কিছু কোরবানী করতে চাই। কেননা আমি তার ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ ও অভিভূত। আমি তার নামে চার হাজার গাভী কোরবানী করবো। হজরত ইব্রাহিম বললেন, অংশীবাদিতা পরিত্যাগ করে আমার একনিষ্ঠ অনুসারী না হওয়া পর্যন্ত আমার প্রভুপালক তোমার কোনো কোরবানীই কবুল করবেন না। নমরুদ বললো, রাজসিংহাসন আমি পরিত্যাগ করতে পারবো না। কিন্তু কোরবানী অবশ্য করবো। একথা বলে সে তার কথামত চার হাজার গাভী কোরবানী করলো। এরপর থেকে সে হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে আর কোনো বিতণ্ডা করলো না। অংশীবাদীদের শত্রুতা থেকে হজরত ইব্রাহিম হয়ে গেলেন নিরাপদ।

শোয়াইব জাবায়ী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিমকে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো, তখন তিনি ছিলেন মাত্র ষোল বৎসরের যুবক।

এর পরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'তারা ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে এক ফন্দি আঁটতে চাইল। কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।' এখানকার 'কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত' কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, ওই ঘটনার পর সারা দেশের জিনিসপত্র হয়ে উঠলো মহার্ঘ। এভাবে তাদেরকে করা হলো সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ তখন পাঠালেন মশক বাহিনী। তারা নমরুদের শরীরের গোশত খেয়ে শেষ করলো। শেষে একটি মশা ঢুকে গেলো তার মস্তকাভ্যন্তরে। এর ফলে মৃত্যু হলো তার।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে আসা অক্ষত নবীকে দেখে কতিপয় লোক তাঁর প্রতি ইমান আনলো। কিন্তু নমরুদের ভয়ে তারা সেকথা প্রকাশ করলো না। হজরত ইব্রাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র লুত ও তাঁর পিতৃব্যপুত্রী সারাও ইমান আনলেন তখন। এরপর তিনি লুত ও সারাকে নিয়ে দেশ ত্যাগ করলেন। তাঁর ওই দেশত্যাগ ছিলো কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষ সাধনের জন্য এবং শান্তির সঙ্গে একনিষ্ঠ ইবাদতের জন্য। তিনি তখন বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি আমার প্রভুপালকের দিকে হিজরতকারী। আর লুতের ইমান আনার কথা বিবৃত হয়েছে এক আয়াতে এভাবে— 'ফাআমানা লাহু লূত্ব' (লুত তার প্রতি ইমান এনেছিলো)।

www.eelm.weebly.com

দেশত্যাগের পর তিনি প্রথমে উপস্থিত হলেন হারান নামক স্থানে। কিছুকাল সেখানে বসবাসের পর চলে গেলেন মিসরে। মিসরে কিছুদিন থাকার পর সিরিয়ায় চলে গেলেন তিনি। বসতিস্থাপন করলেন ফিলিস্তিনের সাবা এলাকায়। সাদুমবাসীদের জনপদ ছিলো সেখান থেকে চব্বিশ ঘণ্টার দূরত্বে। সাদুমবাসীরাও ছিলো অংশীবাদী। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্ হজরত লুতকে নবুয়ত দান করলেন। আল্লাহ্র হুকুম পেয়ে তিনি তখন চলে গেলেন সাদুমবাসীদের জনপদে।

এর পরের আয়াতে (৭১) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাকে ও লুতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই দেশে, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য।' এখানে 'কল্যাণ' অর্থ বৃক্ষরাজি ও ফল ফসলের আধিক্য। আর একটি কল্যাণ হচ্ছে, সেখানকার মাটি ছিলো বহু সংখ্যক নবী ও রসুলের আবির্ভাবের স্থল। হজরত উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, সেখানে ছিলো সুপেয় পানীয়। বায়তুল মাকদিসের নিম্নভূমিতে ছিলো একটি প্রবহমান স্রোতস্বিনী। সে দিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে— 'সেই দেশে, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য।'

কাতাদা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর একবার হজরত কা'বকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সিরিয়া ছেড়ে মদীনায় আসতে চাও না কেনো? মদীনা তো রসুল স. এর হিজরতের স্থান এবং এখানেই রয়েছে তাঁর পবিত্র সমাধি। হজরত কা'ব বললেন, হে বিশ্বাসীদের অধিনায়ক! আমি তওরাত কিতাবে পাঠ করেছি, সিরিয়ার ভূমি আল্লাহ্র ধনভাণ্ডার, তাঁর বিশেষ বান্দাগণেরও আবির্ভাব স্থল।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, ভবিষ্যতের মানুষ হচ্ছে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা। তখন বান্দারা হিজরত করবে পিতা ইব্রাহিমের হিজরতের স্থানে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি হজরত ইব্রাহিমের হিজরতের স্থানে সুস্থির হবে, সে হবে পৃথিবীবাসীদের মধ্যে অধিকতর মর্যাদামণ্ডিত, অন্যত্র থাকবে কেবল অনুত্তম লোকেরা। তাদের বসবাসের মৃত্তিকা, তাদেরকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিবে। আল্লাহ্ তাদেরকে ঘৃণা করবেন। তারা বানর ও শূকরের সঙ্গী হয়ে একটি আগুনের তাড়া খেয়ে ফিরবে। রাত্র-দিন ওই আগুন ছুটবে তাদের পিছু পিছু। আবু দাউদ।

হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত থেকে আহমদ ও তিরমিজি বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার বললেন, সিরিয়ার জন্য সুসংবাদ। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রহমতের বাণীবাহক! এর কারণ? তিনি স. বললেন আল্লাহ্র রহমতের ফেরেশতা সেখানকার অধিবাসীদের উপরে ছায়া বিস্তার করবে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে তিরমিজি বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স.

www.eelm.weebly.com

বলেছেন একটি আগুন বের হবে হাজরে মাউতের (ইয়েমেনের) দিক থেকে। অথবা বলেছেন, হাজরে মাউত থেকে একটি আগুন মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর? তিনি স. বললেন, তখন তোমাদের উপরে সিরিয়া গমন করা হয়ে পড়বে অত্যাবশ্যক।

আহমদ ও আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু জাওয়ালাহ্ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, ওই সময় সন্নিকটে, যখন তোমাদের তিনটি বাহিনী সমবেত হবে তিনটি স্থানে— একটি সিরিয়ায়, একটি ইয়েমেনে এবং একটি ইরাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র বচনবাহক ! ওই সময় আমি যদি জীবিত থাকি, তবে কী করবো? তিনি স. বললেন, তোমার কর্তব্য হবে সিরিয়ায় গমন করা ও সেখানে স্থিত হওয়া। আল্লাহ্র পৃথিবীতে সিরিয়ার মৃত্তিকাই অধিকতর সম্মানার্হ। যারা সজ্জন, তারাই কেবল গমন করতে পারবে সেখানে। যদি তোমরা সেখানে যেতে না পারো , তবে ইয়েমেনে গমন করা হবে তোমাদের কর্তব্য। আল্লাহ্ আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন সিরিয়া ও সিরিয়াবাসীর। শুরাইহ্ বিন উবায়েদ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে উবায়েদ বলেছেন, একবার হজরত আলীর সম্মুখে সিরিয়ার প্রসঙ্গ আলোচিত হলো। উপস্থিত লোকেরা বললো, হে বিশ্বাসীদের অধিনায়ক! সিরিয়াবাসীদেরকে অভিসম্পাত দিন। তিনি বললেন, না। আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, সিরিয়ায় সবসময় থাকে চল্লিশ জন আবদাল। তাদের কোনো একজনের ইন্তেকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ অন্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। ওই আবদালগনের বরকতে বৃষ্টি হয়। তাদের কারণেই শত্রুদের উপরে দান করা হয় বিজয়। আর তাদের জন্যই সেখানকার অধিবাসীদের উপর থেকে প্রত্যাহৃত হয় আযাব। আহমদ।

হজরত ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি একবার দেখলাম আমার মস্তকের নিম্নদেশ থেকে উত্থিত হলো একটি আলোর স্তম্ভ। ওই অত্যুজ্জ্বল আলোকস্তম্ভটি বিস্তৃত হলো সিরিয়া পর্যন্ত। বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর দালায়েল নামক পুস্তকে।

এর পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'এবং আমি ইব্রাহিমকে দান করেছিলাম ইসহাক, আরো দান করেছিরাম ইয়াকুব'।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'আফিয়্যাতুন' শব্দটির মতো 'নাফিলাতুন' শব্দটিও একটি মূল শব্দ। এখানে নাফিলাতুন' (আরও) এর পূর্বে ক্রিয়ার উল্লেখ নেই। কিন্তু 'ওয়াহাব্না' শব্দের অর্থও দান করা। তাই শব্দটি এখানে 'ওয়াহাব্না' এর কর্মপদ। মুজাহিদ ও আতা বলেছেন, 'নাফিলাতুন' অর্থ আতীয়্যাতুন (দান)। হজরত ইসহাক এবং হজরত ইয়াকুব দু'জনেই ছিলেন আল্লাহ্র দান। তাই

www.eelm.weebly.com

এখানে 'নাফিলাতুন' শব্দটি এই দু'জনের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত হবে। হাসান ও জুহাক বলেছেন, 'নাফিলাতুন' অর্থ ফজল বা অনুগ্রহ। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— 'এবং আমি আমার অনুগ্রহরূপে ইব্রাহিমকে দান করেছি তার পুত্র ইসহাক ও প্রপৌত্র ইয়াকুবকে।' এমতাবস্থায় 'নাফিলাতুন' ব্যবহৃত হবে দান করার কারণরূপে।

হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত উবাই ইবনে কা'ব, ইবনে জায়েদ এবং কাতাদা বলেছেন, এখানে 'নাফিলাতুন' (আরো) শব্দটি প্রযোজ্য হবে কেবল হজরত ইয়াকুবের ক্ষেত্রে। হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ্র দরবারে পুত্র প্রার্থনা করেছিলেন। বলেছিলেন— 'হে আমার প্রভুপালক! আমাকে দান করুন এক পুণ্যবান সন্তান। আল্লাহ্ সে প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন। আর হজরত ইয়াকুবকে দান করেছিলেন বিনা প্রার্থনায়। তাই এই দানটি ছিলো অতিরিক্ত। সে কথা বুঝাতেই অতিরিক্ত বা 'আরো' কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে কেবল হজরত ইয়াকুবের ক্ষেত্রে। বর্ণনাটি সুসমঞ্জস ও অশিথিল।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং প্রত্যেককেই করেছিলাম সৎকর্মপরায়ণ।' একথার অর্থ— আমি ইব্রাহিম, লুত, ইসহাক, ইয়াকুব প্রত্যেকের হৃদয়কে করে দিয়েছিলাম অংশীবাদিতা থেকে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। মন্দ স্বভাব ও আচরণ থেকে মুক্ত। সজ্জিত করেছিলাম তাদেরকে অত্যুত্তম গুণাবলীর দ্বারা। তাই তারা হতে পেরেছিলো ধর্মের প্রতি একান্ত নিষ্ঠাবান ও উপাসনাপ্রবণ।

এর পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করতো, তাদেরকে প্রত্যাদেশ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং জাকাত প্রদান করতে, তারা আমারই ইবাদত করতো।'

এখানে 'খইরাত' অর্থ সৎকর্ম। সাধারণভাবে সকল পুণ্য কর্মই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে শব্দটিকে একবার সাধারণভাবে উল্লেখ করার পর পুনরায় বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে নামাজ ও জাকাতের সঙ্গে। কারণ এ দু'টো পুণ্য কর্ম অত্যুত্তম। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আমি তাদেরকে করেছিলাম সত্য পথের অধিনায়ক। আমার নির্দেশে তারা মানুষকে পথ দেখাতো। আর আমি তাদেরকে প্রত্যাদেশ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করতে এবং জাকাত দিতে। তারা আমার সকল নির্দেশই যথাযথরূপে পালন করতো।

এর পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'এবং লুতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিলো অশ্লীল কর্মে, তারা ছিলো এক মন্দ সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী।' একথার

www.eelm.weebly.com

অর্থ— আমি লূতকে দিয়েছিলাম আমার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান, নবী সুলভ প্রজ্ঞা ও সুসিদ্ধান্তে উপনীত হবার যোগ্যতা। আর আমি তাকে উদ্ধার করেছিলাম অত্যন্ত অশ্লীল, ঘৃণ্য ও সত্যত্যাগী এক সম্প্রদায়ের জনপদ থেকে।

এর পরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— 'এবং তাকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম; সে ছিলো সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত।' এখানে 'ওয়াদ্‌খালনাহু ফী রহমাতিনা' অর্থ আমার রহমতপ্রাপ্ত, অনুগ্রহভাজন অথবা জান্নাতের অধিকারী। আমি বলি, আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যহীন গুণাবলীর জ্যোতিস্নাত হয়েছিলেন বলেই হয়তো এখানে হজরত লূতকে বলা হয়েছে 'অনুগ্রহভাজন'। সুফী সাধকগণের মতে আত্মবিনাশনের পর আল্লাহ্‌র গুণাবলীর সঙ্গে চিরস্থায়ী যিনি হন, তাকেই আখ্যা দেয়া যায় 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহভাজন' বলে। আর 'আস্‌সলিহীন' অর্থ সৎকর্মপরায়ণগণ, আল্লাহ্‌ যাদের জন্য পূর্বাহ্নেই মঙ্গল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— এবং আমি লূতকে স্থায়ীভাবে রঞ্জিত করেছি আমার আনুরূপ্যহীন গুণরাজির অন্তহীন জ্যোতি-সম্পাতে। তাই সে আমার অনুগ্রহভাজন। আর পূর্বাহ্নে যাদের জন্য আমি নির্ধারণ করে রেখেছি কল্যাণ, সে ছিলো তাদের দলভূত।

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৭৬, ৭৭

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ○ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ○

❒ স্মরণ কর নূহকে; পূর্বে সে যখন আহ্বান করিয়াছিল তখন আমি সাড়া দিয়াছিলাম তাহার আহ্বানে এবং তাহাকে ও তাহার পরিজনবর্গকে মহা সংকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

❒ এবং আমি তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যাহারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিয়াছিল; উহারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এই জন্য উহাদিগের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি আরো স্মরণ করুন নবী নূহের বৃত্তান্ত। লূতের মতো তাকেও আমি করেছিলাম আমার অনুগ্রহভাজন। দীর্ঘকাল ধরে স্বজাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক সময় সে

www.eelm.weebly.com

আমার নিকটে পরিত্রাণপ্রার্থী হয়েছিলো। আমি তার প্রার্থনা গ্রহণ করেছিলাম। গজবরূপে অবতীর্ণ করেছিলাম মহাপ্লাবন। সে প্লাবনে নিমজ্জিত হয়েছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। কেবল তাকে ও তার পরিবারবর্গকে আমি তখন উদ্ধার করেছিলাম এক বিশাল নৌকার আরোহী করে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম ' অর্থ— তাকে মুক্ত করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপবাদ ও অত্যাচার থেকে। উল্লেখ্য যে, হজরত নুহের পৃথিবীর আয়ুষ্কাল ছিলো অন্যান্য নবীগণের আয়ুষ্কালের চেয়ে অনেক বেশী। তাই অন্য নবী রসুলগণের চেয়ে তাঁকেই দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছিলো বেশী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাঁর সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসীরা তাঁকে রাস্তাঘাটে দেখতে পেলেই প্রচণ্ড প্রহার করতো। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন। মনে হতো হয়তো তিনি আর নেই। লোকেরা তখন তাঁকে একটি চাটাইয়ে জড়িয়ে তাঁর বাড়ীতে ফেলে আসতো। জ্ঞান ফিরে পেলে নির্যাতিত নবী আবার তাদের মঙ্গল কামনা করেই আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা জানাতেন। দয়াল নবী পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করতেন সত্যপ্রচারের।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, ওবায়েদ বিন ওমর লাইছী বলেছেন, আমি অবগত হয়েছি যে, অবাধ্যরা প্রবল আক্রোশে হজরত নুহের গলা টিপে ধরতো। ফলে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন তিনি। যখন হুঁশ ফিরে আসতো তখন দোয়া করতেন, হে আমার দয়াময় প্রভুপালক! তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তারা যে অবুঝ।

পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিলো; তারা ছিলো এক মন্দ সম্প্রদায়। এই জন্য তাদের সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।' 'ওয়া নাসারনাহু' অর্থ— এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম। অর্থাৎ আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম বলেই সে বিরুদ্ধবাদীর উপরে বিজয়ী হয়েছিলো। আর 'বিআয়াতিনা' অর্থ নিদর্শনাবলী, যেগুলো ছিলো হজরত নুহের নবুয়তের প্রমাণ।

বায়যাবী লিখেছেন, 'সত্যপ্রত্যাখ্যান' ও 'মন্দ স্বভাব' এ দু'টো মহাপাপ এক সঙ্গে হলে আল্লাহ্র গজব নেমে আসে। সম্ভবত হজরত নুহের সম্প্রদায়ের অবাধ্যরা একই সঙ্গে অংশীবাদিতা ও অমানবিকতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো বলেই তাদের উপরে নেমে এসেছিলো ভয়ংকর গজব।

www.eelm.weebly.com

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَ
كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ۝ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ز
وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ۝ وَعَلَّمْنٰهُ
صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ۝
وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ
وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ ۝ وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ
عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ۝

❒ এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলাইমানের কথা যখন তাহারা বিচার করিতেছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; উহাতে রাত্রিকালে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির মেষ; আমি দেখিতেছিলাম তাহাদিগের বিচার।

❒ এবং আমি সুলাইমানকে এ বিষয়ের মীমাংসা জানাইয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগের প্রত্যেককে আমি দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আমি পর্বত ও বিহংগকুলের জন্য নিয়ম করিয়া দিয়াছিলাম যেন উহারা দাউদের সংগে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; আমিই ছিলাম এই সমস্তের কর্তা।

❒ আমি তাহাকে তোমাদিগের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়াছিলাম, যাহাতে উহা তোমাদিগের যুদ্ধে তোমাদিগকে রক্ষা করে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হইবে না?

❒ এবং সুলাইমানের বশীভূত করিয়া দিয়াছিলাম উদ্দাম বায়ুকে; উহা তাহার আদেশক্রমে প্রবাহিত হইত সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রাখিয়াছি; প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত।

❒ এবং শয়তানদিগের মধ্যে কতক তাহার জন্য ডুবুরির কাজ করিত, ইহা ব্যতীত অন্য কাজও করিত; আমি উহাদিগের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতাম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং স্মরণ করো দাউদ ও সুলায়মানের কথা যখন তারা বিচার করেছিলো শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে।' হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে আব্বাস ও অধিকাংশ কোরআন-ভাষ্যকার বলেছেন, ওই শস্যক্ষেত্রটি ছিলো

www.eelm.weebly.com

একটি ফলবান দ্রাক্ষা-কানন। আর 'তারা বিচার করছিলো ' অর্থ হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মান দু'জনেই ছিলেন ওই মোকদ্দমার যৌথ বিচারক। কাতাদা বলেছেন, শস্যক্ষেত্রটি একটি ফসলের ক্ষেত্রই ছিলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাতে রাত্রিকালে ঢুকে পড়েছিলো সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তির মেষ।' মোকদ্দমাটি ছিলো এরকম— সাধারণতঃ পশুপাল চরানো হয় বিস্তীর্ণ চারণভূমিতে দিনের বেলায়। কিন্তু এক রাখালের মেষপাল তার অজান্তেই রাত্রিকালে ঢুকে পড়লো এক লোকের আঙ্গুরের বাগানে এবং নষ্ট করে ফেললো অনেক আঙ্গুর। কিছু ভক্ষণ করলো, কিছু করলো তছনছ।

এখানকার 'নাফাশাত্ ফিহী' অর্থ রাত্রিকালে ঢুকে পড়েছিলো। এরকম বলা হয়েছে কামুস গ্রন্থে। 'নিহায়াহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে 'নাফাশাতিস্ সায়িমাত' অর্থ বিচরণকারী পশু রাতে চড়াও হলো রাখালহীনভাবে। এভাবে দিনে চড়াও হওয়া পশুকে বলে 'হালিমাতিস্ সায়িমাত্'। 'নাফাশা' এর শাব্দিক অর্থ মেলে যাওয়া, উন্মুক্ত হওয়া বা বিস্তৃত হয়ে পড়া। ধুনিত পশমকেও তাই বলা হয় 'ইহ্নুন্ মানফুশ।' আল্লাহ্পাক এক আয়াতে বলেছেন— 'কাল ই'হনিল মানফুশ।'

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি দেখছিলাম তার বিচার।' এখানে 'তাদের বিচার' অর্থ বিচারক হজরত দাউদ, হজরত সুলায়মান, মামলার বাদী-বিবাদী ও উপস্থিত দর্শকদের সম্মিলিত বিচার সভা। ফাররা বলেছেন,কথাটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে কেবল হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মানকে। কারণ বহুবচন বোধক শব্দের দ্বারা দ্বিবচন বুঝানোতেও কোনো দোষ নেই। আর এরকম শব্দ ব্যবহার সচরাচর হয়েই চলেছে। কোরআন মজীদের অন্যত্রও এর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যেমন— যদি মৃত ব্যক্তির দুই ভাই হয়, তবে তারা পাবে এক ষষ্ঠাংশ।' আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, উদ্ধৃত আয়াতের 'কয়েকজন ভাই' কথাটির অর্থ কমপক্ষে দুই ভাই।

পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'এবং আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা জানিয়ে দিয়েছিলাম।' আলোচ্য বাক্যের কিছু কথা রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ত কথা সহ আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— আমি সুলায়মানকে ওই মামলার সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলাম। তাই দাউদ সুলায়মানের অভিমত বহাল রেখে তার নিজের অভিমত প্রত্যাহার করে নিয়েছিলো।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর নবী দাউদের জন্য কিতাবুল্লাহ্ পাঠ সহজ করে দিয়েছিলেন। কাউকে ঘোড়ার জিন মজবুত করে বাঁধবার হুকুম দিয়ে তিনি যবুর তেলাওয়াত শুরু করতেন এবং জিন বাঁধা শেষ হওয়ার আগেই তা সম্পূর্ণ পাঠ করে ফেলতেন। আর তিনি সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করতেন আপন হাতের উপার্জনের দ্বারা।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, উদ্ধৃত হাদিসের 'কোরআন' শব্দটির অর্থ হবে যবুর। হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদার উক্তিরূপে বাগবী একথাই উল্লেখ করেছেন।

বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা এবং জুহুরী বর্ণনা করেছেন, দু'জন লোক বিচারপ্রার্থী হয়ে হজরত দাউদের কাছে গেলো। তাদের একজন ছিলো বাগানের মালিক, আর একজন ছিলো মেষপালের মালিক। বাগানের মালিক বললো, এ লোকের মেষপাল রাতের বেলা আমার বাগানে চড়াও হয়ে সব ফসল নষ্ট করে ফেলেছে। হজরত দাউদ সিদ্ধান্ত দিলেন, ফসলহানির ক্ষতিপূরণরূপে বাগানের মালিক পাবে মেষপালের মালিকের সবগুলো মেষ। বাদী-বিবাদী সম্রাট ও নবী হজরত দাউদের একথা মেনে নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলো। পথি মধ্যে দেখা হলো সম্রাটপুত্র সুলায়মানের সঙ্গে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী সিদ্ধান্ত দেয়া হলো তোমাদেরকে? তারা প্রদত্ত সিদ্ধান্তের কথা জানালো। সম্রাটপুত্র সুলায়মান বললেন, তোমাদের মামলা আমার কাছে উপস্থাপন করা হলে রায় হতো অন্যরকম। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি তখন বলেছিলেন, আমি যদি এই মামলার রায় দিতাম, তবে তা হতো উভয়ের জন্য কল্যাণকর। একথা হজরত দাউদের কানে পৌঁছলো। তিনি তখন বাদী বিবাদী ও প্রিয় পুত্রকে কাছে ডাকলেন এবং বললেন, তুমিই তাহলে সিদ্ধান্ত দান করো।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত দাউদ তখন তাঁর নবুয়ত ও পিতৃত্বের দোহাই দিয়ে বললেন, তুমিই বলো, কোন সিদ্ধান্ত হবে দু'জনের জন্যই কল্যাণকর। নবীপুত্র বললেন, সাময়িকভাবে দু'জনের মালিকানা একে অপরকে দিয়ে দেয়া হোক। বাগানের মালিক মেষপাল ও তাদের যে শাবক জন্ম নিবে, তাদের দ্বারা উপকার গ্রহণ করতে থাকুক। আর মেষপালের মালিক পরিচর্যা করতে থাকুক বাগানের। বাগান যখন আগের মতো ফল-ফসলে ভরে যাবে, তখন বাগান ও মেষপালের মালিকানা তারা হস্তান্তর করুক একে অপরকে। এভাবে বাগানের মালিক ফিরে পাক তার বাগান এবং মেষপালের মালিক ফিরে পাক তার মেষপাল। হজরত দাউদ সিদ্ধান্তটি খুবই পছন্দ করলেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে তদস্থলে বলবৎ করলেন প্রিয় পুত্রের অধিকতর বিজ্ঞজনোচিত সিদ্ধান্ত। ইবনে আবী শায়বা তাঁর আল মুসান্নিফে এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মুনজির ও ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বর্ণনা করেছেন। বায়যাবী লিখেছেন, হজরত দাউদের সিদ্ধান্তটি ইমাম আবু হানিফার সিদ্ধান্তের মতো। এরকম সিদ্ধান্ত তিনি প্রদান করেছেন অপরাধী গোলামের ক্ষেত্রে। আর হজরত সুলায়মানের অভিমত ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের মতো। তিনি বলেন, মালিকের বিরাগভাজন ক্রীতদাস যদি অন্য কারো সম্পদ নষ্ট করে, তবে তাকে ধরে এনে উপার্জন করাতে হবে। আর এভাবে আসল প্রাপ্য আদায় হয়ে গেলে তাকে প্রত্যার্পণ করতে হবে মূল মালিকের কাছে।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, ইমাম আবু হানিফার অভিমত হজরত দাউদের অভিমতের মতো নয়। কারণ তাঁর অভিমতের রয়েছে দুটি দিক— ১. মালিক তাঁর ক্রীতদাসের দ্বারা ক্ষতিকৃত সম্পদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিবে, অথবা ২. যার ক্ষতি করা হয়েছে, সে ক্রীতদাসকে ততক্ষণ পর্যন্ত আটকে রেখে উপার্জন করাবে, যতক্ষণ না তার বিনষ্ট সম্পদের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

জাস্‌সাস বলেছেন, মেষপালের মালিককে বাগানের ক্ষতিপূরণ করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো এজন্য যে, সে তার মেষগুলোকে বেঁধে রাখেনি। এক বর্ণনায় এসেছে, শেষ রসুলের শরিয়তে এই নির্দেশটি রহিত হয়েছে। বরং ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেছেন, যদি কারো গৃহপালিত পশু রাতের বেলায় কারো ফসল নষ্ট করে, তবে ক্ষতির পরিমাণ অনুসারে পশুপালকের মালিকের উপর ক্ষতিপূরণ করার দায়িত্ব হবে অত্যাবশ্যক। আর যদি তা দিনের বেলায় হয়, তবে পশুপালের মালিকের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না। আমি বলি, সম্ভবত হজরত দাউদের যুগে বিনষ্ট ফসলের মূল্য এবং মেষপালের মূল্য ছিলো সমান। তাই তিনি মেষপাল প্রদান করতে বলেছিলেন বাগানের মালিককে।

সাধারণ নিয়ম এই যে, দিনের বেলা ক্ষেতের মালিক তার ক্ষেতে পাহারার ব্যবস্থা করে। পশুপালও চরে থাকে দিনের বেলায়। তাই দিনের বেলায় কারো পশু কারো ফসল নষ্ট করলে তার দায়িত্ব পশুর মালিকের উপর বর্তায় না। কিন্তু রাতের বেলা ফসল নষ্ট করলে তার দায় বহন করতে হবে পশুর মালিককে। কারণ সে তার পশুকে বেঁধে রাখেনি। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ছুটে যাওয়া পশু যদি দিনে অথবা রাতে কারো ফসলের ক্ষতি করে, তবে ওই পশুর মালিকের উপরে কোনো ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না। কেননা রসুল স. বলেছেন, ছুটন্ত পশু যদি কাউকে জখম করে, তবে তার ক্ষতিপূরণ নেই। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ ও সুনান রচয়িতাবৃন্দের বর্ণনায় এই হাদিসটি উল্লেখিত হয়েছে। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, হাদিসে উল্লেখিত 'উজামাউ' শব্দটির অর্থ ছুটন্ত পশু। জমহুর হারাম বিন সা'দ বিন মাহীসাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণ করেছেন, হজরত বারা বিন আজীবের উট একবার একজনের বাগানে ঢুকে ফসলের ক্ষতি করলো। রসুল স.কে একথা জানানো হলে তিনি বললেন, দিনের বেলায় ক্ষেতের ফসলের সংরক্ষণ মালিকের দায়িত্বভূত। আর রাতের বেলার দায়িত্ব পশুর মালিকের। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী, সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়, দারাকুতনী, ইবনে হাব্বান, হাকেম ও বায়হাকীও হাদিসটির বর্ণনাকারী। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আমি আমার অভিমতের সপক্ষে এই হাদিসটি প্রমাণ রূপে উপস্থাপন করি। উল্লেখ্য যে, হাদিসটি মুত্তাসিল (অছিন্ন সূত্র) পর্যায়ভূত এবং এর বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, হাদিসটির বর্ণনার ভিত্তি হচ্ছেন জুহুরী। অবশ্য তাঁর ভাষা ও অন্যান্য বর্ণনাপরম্পরায় ভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুয়াত্তার বর্ণনাতো ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছেই। কিন্তু জুহুরী সূত্রে লাইছের বর্ণনায় 'আমার পিতা মাহীসা থেকে' কথাটির উল্লেখ নেই। মালেক সূত্রে মাআন বিন ঈসার বর্ণনায় আবার তাঁর পিতামহ মাহীসার নাম এসেছে। এদিকে আবার জুহুরী সূত্রে মুয়াম্মারের বর্ণনায় এসেছে— হারাম থেকে, তাঁর পিতা থেকে। কিন্তু এই সূত্রপ্রবাহটির অনুসরণ কেউই করেননি। আবু দাউদ এবং ইবনে হাব্বানের বিবরণও এ রকম। কিন্তু আওযায়ী, ইসমাইল বিন উমাইয়া এবং আব্দুল্লাহ্ বিন ঈসা জুহুরীর যে হাদিস উল্লেখ করেছেন, তার সূত্র প্রবাহ শুরু হয়েছে — হজরত বারা বিন আজীব থেকে।

আমি বলি, ইবনে জাওজী তাঁর তাহ্কিকুত তা'লীক গ্রন্থে ইমাম আহমদের পদ্ধতিতে এরকম বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হারাম এই হাদিসটি হজরত বারা বিন আজীব থেকে স্বকর্ণে শোনেননি। ইবনে হাজামের অনুসরণে আবদুল হক এরকমই বলেছেন। জুহুরী সূত্রে মোহাম্মদ বিন আবী হাফসার পদ্ধতিতে নাসাঈও এরকম বর্ণনা করেছেন। জুহুরী বলেছেন, আবু উসামা বিন সহল আমাকে বলেছেন, হজরত বারা বিন আজীবের উষ্ট্রী....।

ইবনে জিবের বর্ণনায় এসেছে, জুহুরী বলেছেন, আমার কাছে হজরত বারা বিন আজীবের ওই ছুটন্ত উটটির কথা পৌঁছেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তিনজন ইমামই হজরত বারা বিন আজীবের ছুটন্ত উট সম্পর্কিত হাদিসটিকে একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত করেছেন এবং এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তটি কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমরা বলি, সাধারণ বিষয়ও বিশেষ বিধানের মতো শরিয়ত সম্মত অকাট্য দলিল। যতক্ষন পর্যন্ত সাধারণ ও বিশেষ একই সময়ে প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সাধারণ বিধানকে বিশেষ বিধান বলা যায় না। আর যদি একই সঙ্গে সংঘটিত না হয়, তাহলেও দু'টোর একটিকে রহিত হয়েছে বলা যেতে পারে। আর যদি এক্ষেত্রে পূর্বাপর অথবা মিলিত কোনোটাই প্রমাণিত না হয়, তবে বিষয়টি হবে অসমাধ্য। আর এরকম অসমাধ্য বা সন্দেহজনক অবস্থায় ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত দেয়া যায় না। এছাড়া পরস্পরবিরোধী বর্ণনা নিষ্পত্তি না করা গেলে কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। আর কিয়াস এর ক্ষেত্র এখানে ক্ষতিপূরণ প্রবর্তন না করারই পক্ষে। কেননা এ ক্ষেত্রে চতুষ্পদ প্রাণীর মালিকের কোনো অপরাধ নেই। মালিকতো সেখানে উপস্থিত ছিলো না এবং তার চতুষ্পদ প্রাণী ছিলো উন্মুক্ত। সে তার পশুকে ছেড়ে দেয়নি, তাড়িয়ে দেয়নি এবং টেনে হিঁছড়ে নিয়েও যায় নি। কিন্তু কথা হচ্ছে, ক্ষতিকর ক্রিয়ায় সম্পর্কতো কারণের সঙ্গে ছিন্ন হয়ে যায় না। তাই আমি বলি, যদি কোনো ব্যক্তি তার পশু ছেড়ে দিয়ে রাখে, তারপর ওই পশু যদি কারও ক্ষতি করে, তবে ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব বর্তাবে ওই পশুর মালিকের উপরে, কারণ সে-ই তো তার পশুটিকে ছেড়ে দিয়ে রেখেছিলো।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ যদি ঘোড়ার মালিক তার ঘোড়ায় সওয়ার হয় অথবা সেটিকে লাগাম ধরে নিয়ে যায়, কিংবা সেটিকে পিছন থেকে তাড়া করে— এমতাবস্থায় ঘোড়াটি যদি কাউকে লাথি মারে, পদদলিত করে, গুঁতো দেয়, আঘাত করে, এলোপাতাড়ি চলে, কারো কাছ থেকে ধাক্কা খায় অথবা সরাসরি কাউকে ধাক্কা দেয় এবং ওই স্থান যদি ঘোড়াওয়ালার হয় অথবা কোনো চুক্তির মাধ্যমে ওই জমি তার অধীনে থাকে, তবে ঘোড়াওয়ালার প্রতি ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব বর্তাবে কেবল প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে । অবশিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে তার উপরে ক্ষতিপূরণের কোনো দায়িত্ব বর্তাবে না। কেননা আরোহী অবস্থায় ঘোড়ায় সকল ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে সে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। অবশিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে সে তার ঘোড়ার সঙ্গে এরকম সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। কেননা এসকল ক্ষেত্রে এখানে রয়েছে একটি ব্যবধান। তবে পরোক্ষ ক্ষেত্রগুলোতেও কারো কোনো ক্ষতি হওয়া যদি ঘোড়াওয়ালার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে তার উপর ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব অবশ্যই বর্তাবে, যদি তা সুপ্রমাণিত হয়। কিন্তু ওই স্থানটি যদি ঘোড়ার মালিকের নিজস্ব বা অধিকৃত বা তার কর্তৃত্বাধীন না হয়; সেখানে যদি তার চলার অনুমতি থাকে, অবস্থানের অনুমতি না থাকে, যেমন রাজপথ— চলা ও দাঁড়ানো দু'টোরই অধিকার সেখানে সকলের রয়েছে, যেমন কোনো জঙ্গল অথবা হাট, যেখানে রয়েছে সর্বসাধারণের চলার এবং দাঁড়ানোর অধিকার— এমতো ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত সকল অবস্থায় ক্ষতিপূরণ প্রযোজ্য হবে, চাই সে সওয়ার হোক, লাগাম ধরে চলতে থাকুক অথবা পিছন থেকে তার ঘোড়াকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকুক। কিন্তু এমতাবস্থায়ও যদি তার ঘোড়া কাউকে লাথি মারে অথবা লেজের আঘাতে কারো ক্ষতি করে, তবে ঘোড়ার মালিককে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা সর্বসাধারণের চলার পথে কারোর ক্ষতির উদ্দেশ্য না নিয়ে তারও গমনাগমনের অধিকার রয়েছে অন্য সকলের মতো। কিন্তু দেখতে হবে, তার ঘোড়া যেনো কাউকে পদদলিত না করে। কেননা এরকম অধিকার তার নেই। তবে চলার পথে লেজের আঘাত এবং লাথি মারা থেকে মানুষকে নিরাপদ রাখা অশ্বারোহীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সুতরাং চলতে চলতে তার ঘোড়া যদি কাউকে লাথি মারে অথবা লেজের আঘাতে কারো ক্ষতি করে, তবে ওই অশ্বারোহীকে এ ব্যাপারে দায়ী করা যায় না। কেবল ক্ষতিপূরণ প্রযোজ্য হতে পারে তখন, যখন সে সর্বসাধারণের চলার পথে তার ঘোড়াকে থামিয়ে রাখে এবং ওই থামা অবস্থায় ঘোড়া যদি কাউকে লাথি মারে অথবা লেজের দ্বারা আঘাত করে।

ইমাম মালেক বলেছেন, ঘোড়ার আরোহী অথবা লাগামধারী অথবা তাড়াকারী যদি তার ঘোড়াকে না মারে অথবা উত্তেজিত না করে, তবে ওই ঘোড়ার মালিককে কোনোপ্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু যদি সে তার ঘোড়াকে

www.eelm.weebly.com

আঘাত করে অথবা আতংকিত করে, তবে ওই আহত ও আতঙ্কিত ঘোড়া কারো ক্ষতি করলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাই হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, অতর্কিতে ছুটে যাওয়া ঘোড়া কারো ক্ষতি করলে ওই ঘোড়ার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, পশু যদি তার মুখ, পা অথবা লেজ দ্বারা কাউকে কষ্ট দেয়, তবে ওই পশুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সে ক্ষতির কারণ সৃষ্টি করুক অথবা না করুক— ঘোড়ায় আরোহণ করে থাকুক, তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাক অথবা না যাক।

ইমাম আহমদ বলেছেন, অশ্বারোহী ব্যক্তির অশ্ব মুখ অথবা সামনের পা দ্বারা যদি কারো ক্ষতি করে, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু যদি তার অশ্ব কাউকে লাথি মারে, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা রসুল স. বলেছেন, লাথির কোনো বদলা নেই। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারা কুতনী।

জ্ঞাতব্যঃ মুজাহিদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত শস্যক্ষেত্র সম্পর্কিত সিদ্ধান্তটি হজরত সুলায়মান দিয়েছিলেন আপোষরফার ভিত্তিতে। আর হজরত দাউদের সিদ্ধান্তটি ছিলো নির্দেশনির্ভর। আর একথাও অনস্বীকার্য যে, নির্দেশ নির্ভরতা অপেক্ষা আপোষ উত্তম। এরকমও বলা যায়, হজরত দাউদ এবং হজরত সুলায়মান উভয়ের সিদ্ধান্তের ভিত্তি ছিলো ওহী। কিন্তু হজরত সুলায়মানের ফয়সালাটি ছিলো রহিতকারী (নাসেখ) এবং হজরত দাউদের সিদ্ধান্ত ছিলো রহিত (মনসুখ)। অবশ্য এরকম বলে ওই শ্রেণীর লোকেরা, যারা মনে করে নবী রসুলগণের জন্য ইজতেহাদের (চিন্তা ভাবনার) মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্ত দান বৈধ নয়, কেননা তাঁদের নিকটে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়। তাই তাঁদের ইজতেহাদের প্রয়োজনই নেই। ইজতেহাদের মধ্যে রয়েছে ভুলের সম্ভাবনা। কিন্তু নবী রসুলদের ভুল হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, এখানে পিতা পুত্র উভয়েরই সিদ্ধান্ত ছিলো ইজতেহাদ নির্ভর। হজরত দাউদের ইজতেহাদ ছিলো ভুল এবং হজরত সুলায়মানের ইজতেহাদ ছিলো সঠিক। তাই এখানে আল্লাহ্ হজরত সুলায়মানের বিচারের প্রশংসা করেছেন। সুতরাং এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, নবী রসুলগণের ইজতেহাদে ভুল হতে পারে। কিন্তু তাঁরা ভুলের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন না। ভুলের পরক্ষণেই তাঁদের কাছে ঘটানো হয় সত্যের উদ্ভাবন। তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাঁদের ভুল প্রত্যাহার করে নেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তাদের প্রত্যেককে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।' হাসান বলেছেন, এই বাক্যটি অবতীর্ণ না হলে বিচারকগণ ধ্বংস হয়ে যেতো।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু আল্লাহ্ এখানে তাঁদের ভুল ও শুদ্ধ উভয় ইজতেহাদী সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন। হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মান দু'জনের সম্পর্কেই বলেছেন— আমি তাদের প্রত্যেককে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।

প্রকাশ্যতঃ আলোচ্য আয়াতাংশের মাধ্যমে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, মুজতাহিদগণের ইজতেহাদের ভিত্তি শুদ্ধতার উপরেই হয়। সুতরাং তাঁদের কোনো সিদ্ধান্তকেই ভুল বলা যায় না। তাই এখানে হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মান দু'জনেরই প্রশংসা করা হয়েছে। জাহ্রিয়্যা সম্প্রদায় এরকমই বলে থাকে। কিন্তু তাদের এ অভিমতটি ভুল। কারণ, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে কেবল এতোটুকুই বোঝা যায় যে, আল্লাহ্পাক তাঁদের দু'জনকেই দান করেছিলেন বিচার মীমাংসা করার যোগ্যতা ও জ্ঞান। কিন্তু একথা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁদের উভয়ের মীমাংসাই ছিলো সঠিক। বরং 'আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা জানিয়ে দিয়েছিলাম' বাক্যটির মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত সুলায়মানের মীমাংসাটি ছিলো সঠিক এবং হজরত দাউদের সিদ্ধান্তটিই ছিলো ভুল।

হজরত আমর বিন আস বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, সঠিক ইজতেহাদ করলে বিচারক পাবে দ্বিগুণ সওয়াব এবং ভুল হলে পাবে একগুণ। বোখারী, মুসলিম, আহমদ ও সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মুজতাহিদের ফয়সালা কখনো কখনো ভুলও হতে পারে। আবার কখনো কখনো হতে পারে সঠিক। কিন্তু একই সঙ্গে তা ভুল ও শুদ্ধ হতে পারে না। হয় ভুল হবে, না হয় হবে সঠিক। ভুল হলে তিনি সওয়াব পাবেন একগুণ, আর সঠিক হলে দ্বিগুণ। কারণ তাঁরা দু'জনেই সত্যোদ্ধারের চেষ্টা করেছেন এবং উভয়ের চেষ্টা ছিলো শুদ্ধ। সত্য অন্বেষণ একটি ইবাদত। এই ইবাদত সম্পাদনের সময়ে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলে মুজতাহিদ একগুণ সওয়াব পাবেন। আর সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে পাবেন দ্বিগুণ— এক গুণ সত্যোদ্ধারের প্রচেষ্টা চালানোর জন্য এবং আর একগুণ সত্য উদঘাটনের জন্য। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. এর নিকট থেকে এই ঘটনাটি শুনেছি— এক স্থানে বসবাস ছিলো দুই রমণীর। তাদের দু'জনেরই ছিলো দুগ্ধপোষ্য শিশু। একদিন একটি বাঘ এসে একটি শিশুকে ধরে নিয়ে গেলো। তখন তাদের একজন অপর জনকে ডেকে বলতে লাগলো 'তোমার বাচ্চাকে বাঘে নিয়ে গিয়েছে' আর এই দেখ আমার বাচ্চা নিরাপদ। অপর রমণীটি একথা অস্বীকার করলো। বললো বাঘে নিয়ে গিয়েছে তোমার বাচ্চাকে। এই যে এখানে শুয়ে রয়েছে, এ বাচ্চাটিই তো আমার। তুমুল বিবাদ শুরু হলো দু'জনের মধ্যে। তখন তারা বিবাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে হাজির

www.eelm.weebly.com

হলো হজরত দাউদের দরবারে। হজরত দাউদ অপেক্ষাকৃত বয়স্কা রমণীকে দান করলেন ওই শিশুর অধিকার। ফেরার পথে হজরত সুলায়মানের সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গেলো। হজরত সুলায়মান তাদের সব কথা শুনে বললেন, কে আছো, একটি ছুরি নিয়ে এসো। দু'জনেই যখন শিশুটির দাবিদার, তখন শিশুটিকে দু'টুকরো করে দু'জনকেই ভাগ করে দেই। একথা শুনতেই অপেক্ষাকৃত কম বয়স্কা রমণীটি বলে উঠলো, আপনার উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক! আমার সঙ্গিনীটিকেই শিশুটি দিয়ে দিন। হজরত সুলায়মান তখন তারই বুকে শিশুটিকে ফিরিয়ে দিলেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলের জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলাম, যেনো তারা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।' এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্‌র জিকির করতে করতে যখন হজরত দাউদ শ্রান্ত হয়ে পড়তেন, তখন পাহাড়-পর্বত তসবিহ্ পাঠ করতে শুরু করতো। তাদের ওই তস্‌বিহ্ পাঠ শুনে শ্রান্তি দূর হয়ে যেতো হজরত দাউদের। পুনরায় তিনি শুরু করে দিতেন আল্লাহ্‌র জিকির। পশু পাখিরাও তাঁর সঙ্গে আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল হয়ে যেতো।

এখানে 'ওয়াত্‌তুইরা' কথাটির সম্পর্ক ঘটেছে 'পর্বত' কথাটির সঙ্গে। কারণ পাখিদের কণ্ঠ থেকে কোনো না কোনো প্রকার আওয়াজ উচ্চারিত হয়েই থাকে। কিন্তু পর্বত নির্বাক। তাই পর্বতের তস্‌বিহ্ পাঠ খুবই আশ্চর্যজনক। তাই এখানে 'ঘোষণা করে' কথাটির পূর্বে বসেছে 'পর্বত' শব্দটি।

ওয়াহাব বলেছেন, হজরত দাউদের তস্‌বিহ্ পাঠের জবাবে পাহাড় পর্বতও আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করতো। এরকম করতো পাখিরাও। কাতাদা বলেছেন, হজরত দাউদ যখন নামাজ পাঠ করতেন, তখন পাহাড়-পর্বতও তাঁর সাথে নামাজ পাঠ করতো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত দাউদ পাহাড় ও বৃক্ষের তসবিহ্ পাঠ বুঝতে পারতেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ইউসাব্বিহ্‌না' শব্দটি এসেছে 'সাব্‌হাত' থেকে। এর অর্থ ভাসমান হয়ে চলা। হজরত দাউদ যখন পথ চলতেন, তখন পাহাড়ও চলতো তাঁর সাথে সাথে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমিই ছিলাম এ সমস্তের কর্তা।' একথার অর্থ— নবী দাউদকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান আমি দান করেছিলাম, তাঁর বশীভূত করে দিয়েছিলাম পর্বতকে— এসকল কিছুর অধিকর্তা আমিই।

এর পরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না?' এখানে 'লাবুস' অর্থ পরিধেয়। এখানে শব্দটির অর্থ লৌহ বর্ম। কাতাদা বলেছেন, ইতোপূর্বে লৌহবর্ম ছিলো তিনটি স্তর

www.eelm.weebly.com

বিশিষ্ট। সর্বপ্রথম তিনি লৌহবর্ম নির্মাণে আধুনিকতা আনেন। এর সঙ্গে এমন কড়া জুড়ে দেন, যাতে করে বর্মবাহীরা সহজে তা পরিধান করতে পারতো। ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন স্বহস্তের উপার্জনের দ্বারা। আর এখানকার 'লাকুম' (তোমাদের জন্য) কথাটির অর্থ মক্কার কুরায়েশদের জন্য। 'লিতুহ্‌সিনাকুম' অর্থ যাতে ওই লৌহবর্ম যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। সুদ্দী বলেছেন, কথাটির অর্থ যা তোমাদেরকে রক্ষা করে অস্ত্রের আঘাত থেকে। 'তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না' কথাটির অর্থ হে মক্কাবাসী! যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য এরকম নিরাপত্তাপ্রদায়ক ব্যবস্থা তো আমিই তোমাদেরকে করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না কেনো? এটি একটি প্রশ্নাকৃতির আদেশ।

এর পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'এবং সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম উদ্দাম বায়ুকে।' ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, 'আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলের জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলাম যেনো তারা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।' আর এখানে বলা হলো 'সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম উদ্দাম বায়ুকে।' এ দু'টো কাজ আল্লাহ্‌রই। কিন্তু 'নিয়ম করে দিয়েছিলাম' এবং 'বশীভূত করে দিয়েছিলাম' কথা দু'টোর মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য রয়েছে। তাই কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞ বলেন, হজরত দাউদের সঙ্গে পর্বত ও বিহঙ্গকুলের পবিত্রতা বর্ণনা তাঁর সরাসরি নির্দেশে হতো না। হতো আল্লাহ্‌র নির্দেশে। তাই বলা হয়েছে 'দাউদের সঙ্গে।' কিন্তু উদ্দাম বাতাস পরিচালিত হতো সরাসরি হজরত সুলায়মানের নির্দেশে। সেকারণেই তাঁর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'বশীভূত করে দিয়েছিলাম।' হজরত দাউদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'মাআ' দাউদা' (দাউদের সঙ্গে) এবং হজরত সুলায়মানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'লিসুলায়মান' (সুলায়মানের জন্য)।

'আ'সিফাতান' অর্থ উদ্দাম, তেজোদ্দীপ্ত। উল্লেখ্য যে, তীব্র গতিসম্পন্ন বাতাস হজরত সুলায়মানকে তাঁর সৈন্যসহ অতিদ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতো। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে, গুদুউবুহা শাহরুঁ ওয়া রওয়াহুহা শাহ্‌রুন্ (প্রাতঃভ্রমণ ছিলো একমাসের ও সান্ধ্যভ্রমণ ছিলো একমাসের পথের দূরুত্ব)। অর্থাৎ দিবসের প্রথমার্ধে নিয়ে যেতো এক মাসের পথের দূরত্বে এবং শেষার্ধে আর এক মাসের পথের দূরত্বে। কিন্তু এতো তীব্রগতিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও ওই বাতাসকে ঝড় বা তুফান মনে হতো না। মনে হতো যেনো স্বাভাবিকভাবে বয়ে যাচ্ছে মন্দ সমীরণ। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত সুলায়মানের অভিপ্রায়ানুসারে বাতাস তার গতিবিধি পাল্টাতো। কখনো বয়ে যেতো জোরে। কখনো ধীরে।

www.eelm.weebly.com

এরপরে বলা হয়েছে— 'সে তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হতো সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি।' কোনো কোনো আলেম মনে করেন, এখানে 'সেই দেশের দিকে' কথাটির অর্থ— সিরিয়ার দিকে। অর্থাৎ হজরত সুলায়মান তাঁর আবাসভূমি থেকে দিবসের প্রথমভাগে বাতাসে ভর করে চলে যেতেন সিরিয়ায় এবং শেষভাগে এভাবে ফিরে আসতেন স্বআবাসে। এভাবেই তিনি তাঁর কর্মস্থল ও সিরিয়ার মধ্যে যাতায়াত করতেন। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ইলা' (দিকে) শব্দটি তার আসল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'মধ্যে' অর্থে নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত।' একথার অর্থ— আমি সকল কিছুর আদি-অন্তের জ্ঞানসম্পন্ন। তাই আমি আমার অতুলনীয় প্রজ্ঞাময়তার অনুকূলে যখন যা ইচ্ছা তখন তাই করি। বায়ুকে সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছি এজন্য যেনো সে হয় আমার প্রতি অধিকতর মনোযোগী ও কৃতজ্ঞ।

ওহাব বলেছেন, হজরত সুলায়মানের সমাবেশের উপরে পাখিরা ছায়া প্রদান করতো। জ্বিনেরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। এমতাবস্থায় তিনি স্বশরীরে উপস্থিত হতেন সেখানে। তিনি ছিলেন বীরপুরুষ ও প্রচণ্ড প্রতাপশালী। পৃথিবীর কোনো অঞ্চলে কোনো রাজার সন্ধান পেলে তৎক্ষণাৎ তিনি বাতাসে ভর করে সসৈন্যে উপস্থিত হতেন সেখানে এবং সেই রাজাকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করতেন। বর্ণনাকারী আরো বলেছেন, কোথাও যুদ্ধযাত্রার পরিকল্পনা করলে তাঁর জন্য দরবারের সিংহাসনের আকৃতিতে বিছানো হতো একটি বিশাল সিংহাসন। একাংশে তাঁর জন্যে নির্মাণ করা হতো তাঁবু। অন্য অংশে একত্র করা হতো সৈন্য, অস্ত্রসস্ত্র, রসদসম্ভার ও পশুপাল। এভাবে সকলে একত্র হয়ে গেলে ওই বিশাল সিংহাসনের নিচে বাতাস এসে উঠিয়ে নিতো শূন্যমার্গে। ওই উদ্দাম বাতাসের গতিবেগ হয়ে যেতো শ্লথ ও স্বাভাবিক। তাই সিংহাসনটি বাগান বা অরণ্যের উপর দিয়ে উড়ে গেলেও বৃক্ষের পাতা নড়তো না এতটুকুও। উড়তো না কোনো ধূলোবালি। পশু, পাখি কারোই কোনো কষ্ট হতো না। এভাবে চলে একদিনের অর্ধাংশে অতিক্রান্ত হয়ে যেতো এক মাসের দূরত্বের পথ। অপর অর্ধাংশেও তিনি একইরকম দূরত্ব অতিক্রম করতে পারতেন।

ওহাব আরো বলেছেন, দজলা নদীর উপকূলে হজরত সুলায়মানের একজন মানুষ অথবা জ্বিন সাথী লিখে রেখেছিলো— আমরা এখানে অবতরণ করেছিলাম। কিন্তু নিশিযাপন করিনি। সকালের আগেই চলে গিয়েছিলাম ইসতেখার নামক অঞ্চলে। দুপুরে আবার এখানেই এসে গ্রহণ করেছিলাম দ্বিপ্রহরিক বিশ্রাম। ইনশাআল্লাহ্ কাল আবার আমরা যাত্রা করবো এবং রাত্রি যাপন করবো সিরিয়ায়।

www.eelm.weebly.com

মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, জ্বিনেরা স্বর্ণ ও রেশমের তন্তু দ্বারা বুনেছিলো একটি বিশাল বিছানা। তার আয়তন ছিলো এক বর্গ ফারসাখ (৩ X ৩ = ৯ বর্গ মাইল)। ওই বিছানার মধ্যস্থলে তাঁর জন্য প্রস্তুত রাখা হতো স্বর্ণ নির্মিত একটি আসন। ওই আসনে তিনি উপবেশন করতেন। আর তাঁর চারপাশে বসানো হতো আরো অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত কেদারা। পক্ষিকুল তাদের পক্ষ বিস্তার করে ছায়া প্রদান করতো সকলকে। বাতাস হজরত সুলায়মান তাঁর লোকজন, রসদসম্ভারসহ সকল কিছুকে নিয়ে উড়ে চলে যেতেন এবং পরিভ্রমণ করতেন সকাল থেকে সন্ধ্যায় এক মাসের পথ। আর এক মাসের পথ অতিক্রম করতেন সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, হজরত সুলায়মানের দরবারে বসানো হতো ছয়লক্ষ কেদারা। প্রথম সারিতে বসতো মানুষ এবং পরের সারিগুলোতে বসতো জ্বিন। বিহঙ্গকুল ডানা মেলে ছায়া দিতো তাদের উপর এবং বাতাস তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে চলতো।

হাসান বর্ণনা করেছেন, হজরত সুলায়মান একদিন তাঁর অশ্ব পরিদর্শন করতে গিয়ে আসরের নামাজ পাঠের কথা ভুলে গেলেন। নামাজের সময় চলে যাওয়ার পর তাঁর হুঁশ হলো। তিনি তখন দুঃখে, ক্ষোভে ও ক্রোধে তাঁর সকল অশ্বগুলোকে হত্যা করে ফেললেন। আল্লাহ্ তখন তাকে দান করলেন তদপেক্ষা উত্তম বাহন— সুনিয়ন্ত্রিত উদ্দাম বাতাস। ওই বাতাস তাঁকে অতিদ্রুত পৌছে দিতো তাঁর গন্তব্য স্থানে। ফলে তিনি সকালে রওনা হয়ে ইসতেখারে পৌছে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন দুপুরের। পরদিন সকালে আবার রওনা হয়ে দুপুরে বিশ্রাম নিতেন বাবেলে।

ইবনে জায়েদ বর্ণনা করেছেন, তাঁর একটি এক হাজার পায়া বিশিষ্ট আসন ছিলো। ওই বিশাল আসনে তাঁর সঙ্গে মানুষ ও জ্বিনেরা উপবেশন করতো। আবার এক হাজার জ্বিন ওই পায়াগুলো ধরে আসনটিকে উর্ধ্বে তুলে ধরতো। তখন বাতাস এসে আসনটিকে উড়িয়ে নিয়ে চলতো দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। এরমধ্যেই অতিক্রম হয়ে যেতো একমাসের দূরত্বের পথ। দ্বিপ্রহরের পর আবার যাত্রা করতেন তিনি। সন্ধ্যায় এমনস্থানে অবতরণ করতেন, যার ব্যবধানও হতো এক মাসের পথের দূরত্বের সমান। মানুষ বুঝতেই পারতো না কিভাবে তিনি এতো সৈন্যসামন্তসহ অতর্কিতে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গিয়ে উপনীত হন।

এক বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত সুলায়মান ইরাক থেকে রওনা হলেন সকালে। এক অচেনা মরুভূমিতে পৌছলেন দুপুর বেলায়। তারপর সেখান থেকে বলখে গিয়ে আদায় করলেন আসরের নামাজ। সেখান থেকে গেলেন তুর্কিস্তানে এবং তুর্কিস্তান থেকে চীনে। সেখান থেকে কান্দাহার। কান্দাহার থেকে মাকরান। মাকরান থেকে কেরমান। তারপর সেখান থেকে ফারেস। সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করে সকালে রওনা হয়ে দুপুরে পৌছলেন কাসকার নামক স্থানে। সন্ধ্যায়

www.eelm.weebly.com

ফিরে এলেন কর্মস্থলে। তাঁর প্রধান বসবাস ছিলো দাম্মার নামক শহরে। সেখান থেকে একবার ইরাক যাত্রার প্রাক্কালে তিনি জ্বিনদেরকে নির্দেশ দিলেন, একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্মাণ করো। জ্বিনেরা তখন বিভিন্ন বর্ণের পাথর দ্বারা নির্মাণ করলো নয়নাভিরাম অট্টালিকা।

এরপরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'এবং শয়তানদের মধ্যে কেউ কেউ তার জন্য ডুবুরীর কাজ করতো, এছাড়া অন্য কাজও করতো; আমি তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম।' একথার অর্থ— নবী সুলায়মানের পক্ষে কোনো কোনো জ্বিন সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছে সেখান থেকে মনিমুক্তা তুলে নিয়ে আসতো। এছাড়া জ্বিনেরা অন্যান্য কাজও করতো— নির্মাণ করতো বিভিন্ন আকৃতির ইমারত, বড় বড় হাউজ, বিশাল আকৃতির ডেকচি, শিল্প সুষমামণ্ডিত ভাস্কর্য ইত্যাদি। আর আমি ওই জ্বিনগুলোর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম, যেনো তারা আমার প্রিয় নবীর উপর অবাধ্য না হয়। জুজায বলেছেন, 'আমি তাদের উপর সতর্ক সৃষ্টি রাখতাম' কথাটির অর্থ আমি তাদেরকে রাখতাম আমার সতর্ক পর্যবেক্ষণের সামনে, যেনো তারা নির্মিত বস্তুগুলোকে আবার ধ্বংস না করে ফেলে।

বাগবী লিখেছেন, যখন হজরত সুলায়মান কোনো জ্বিনকে কোনো মানুষের সাথে কাজে পাঠাতেন, তখন ওই মানুষকে বলে দিতেন, এক কাজ শেষ করলে সঙ্গে সঙ্গে ওকে অন্য কাজে লাগিয়ে দিয়ো। না হলে সে তার নির্মিতি ধ্বংস করে ফেলবে। উল্লেখ্য যে, জ্বিনদেরকে দিয়ে এক কাজ শেষ করার পর অন্য কাজ না করালে আবার তাদের আগের কাজ ধ্বংস করে দেয়।

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৮৩, ৮৪

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝
فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ
رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ۝

❒ এবং স্মরণ কর আইয়ুবের কথা, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পড়িয়াছি, তুমি তো দয়ালুদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু!'

❒ তখন আমি তাহার ডাকে সাড়া দিলাম এবং আমার নিকট হইতে দয়া ও ইবাদতকারীদিগের জন্য উপদেশ স্বরূপ তাহার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করিয়া দিলাম, তাহাকে তাহার পরিবার-পরিজন ফিরাইয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগের সঙ্গে তাহাদিগের মত আরো দিয়াছিলাম।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এবার শুনুন নবী আইয়ুবের কাহিনী, বিপদগ্রস্ত অবস্থায় সে আমার নিকটে প্রার্থনা জানিয়েছিলো, আমি দুঃখকষ্টে নিপতিত হয়েছি, আমাকে পরিত্রাণ দাও, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বোত্তম দয়ালু।

ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ বর্ণনা করেছেন, হজরত আইয়ুব ছিলেন রোম দেশের অধিবাসী। তাঁর উর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর বংশধারা মিলিত হয়েছে এভাবে— আইয়ুব ইবনে আহ্‌রাস ইবনে রাযেখ ইবনে রোম ইবনে ঈ'স ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম। আর তাঁর মাতা ছিলেন হজরত লুত বিন হারানের বংশোদ্ভূতা। হজরত আইয়ুব ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী ও পুণ্যবান। আল্লাহ্ তাঁর জন্য পৃথিবীকে প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁকে দেয়া হয়েছিলো একটি বিশাল প্রান্তর ও একটি পাহাড়ের মালিকানা। তাঁর মালিকানায় আরো ছিলো অনেক উট, গাভী, ষাঁড়, মহিষ, মেষ, ছাগল, ঘোড়া ও গাধা। এছাড়া চাষাবাদের জন্য ছিলো পাঁচ জোড়া ষাঁড়। সেগুলোর প্রতিটি জোড়া দেখাশুনা করার জন্য ছিলো একজন করে খাদেম। ওই ক্রীতদাস খাদেমদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিও ছিলো। প্রতি জোড়া ষাঁড়ের কৃষি উপকরণ বহনের জন্য ছিলো একটি করে গাধা। প্রতিটি গাধার শাবকও ছিলো। কোনোটির দু'টি, কোনোটির তিনটি, কোনোটির চারটি এবং কোনোটির পাঁচটি। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে দান করেছিলেন পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততি। তিনি ছিলেন নেককার, পরহেজগার, দরিদ্র-দরদী, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানকারী, এতিম ও বিধবাদের পরিচর্যাকারী ও অতিথিপরায়ণ। সম্বলহারা মুসাফিরকেও তিনি অর্থ দান করতেন। এসকল নেয়ামতের কারণে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন এবং নিরবচ্ছিন্নরূপে আদায় করে যেতেন আল্লাহ্‌র হক। আল্লাহ্ তাঁকে বিতাড়িত শয়তানের হাত থেকে নিরাপদে রেখেছিলেন। শয়তান সাধারণতঃ বিত্তশালী ও অভিজাতদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন রাখে। কিন্তু তিনি ছিলেন শয়তানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তিনজন বিশিষ্ট উম্মত ছিলো তাঁর— ইয়াকীন, ইয়ালিদ এবং সাফের। ইয়াকীন ছিলো ইয়েমেনের অধিবাসী। আর ইয়ালিদ ছিলো তাঁর প্রতিবেশী। তাঁরা তিনজনই ছিলো মধ্যবয়সী মানুষ। ওই সময় ইবলিসের ছিলো প্রচণ্ড দৌরাত্ম্য। আকাশ পর্যন্ত ছিলো তার গমনাগমন। আকাশের যে কোনো স্থানে সে অবস্থান করতে পারতো। হজরত ঈসার আবির্ভাবের পরে তার আকাশগমনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর আবির্ভাবের পরে তাকে করা হয়েছে আরো বেশী নিয়ন্ত্রিত।

www.eelm.weebly.com

হজরত আইয়ুব অধিকাংশ সময় আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা ও জিকিরে মগ্ন থাকতে ভালোবাসতেন। একবারের ঘটনা — তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে আল্লাহ্‌র জিকির ও প্রশংসা বর্ণনা করলেন। ফেরেশতারা তখন সম্মিলিতভাবে তাঁর উপরে বিশেষ রহমত বর্ষণের জন্য দোয়া করলো। এই দৃশ্য দেখে ইবলিস ক্রোধ ও হিংসায় জ্বলে উঠলো। সোজা উঠে গেলো আকাশে। আল্লাহ্‌র কাছে নিবেদন করলো, হে আমার স্রষ্টা! আমি তোমার বান্দা আইয়ুবকে পরীক্ষা করে দেখেছি। সে কিন্তু তোমার খাঁটি বান্দা নয়। তুমি তাকে পার্থিব সুখ সম্পদ দান করেছো বলেই সে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততি দান করেছো বলেই বর্ণনা করে তোমার প্রশংসা। তুমি যদি তাঁর নিকট থেকে এসকল নেয়ামত ছিনিয়ে নাও তবে দেখবে, সে আর তোমার ইবাদত বন্দেগী করছে না। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হলো, অবশ্যই আইয়ুব আমার খাঁটি বান্দা। যাও, তার সম্পদের উপর তোমাকে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা দেয়া হলো। তুমি শত চেষ্টা করলেও তাঁকে আমার ভালোবাসা থেকে পৃথক করতে পারবে না। ইবলিস আকাশ থেকে জমিনে নেমে এলো। তার অনুসারীদেরকে একত্র করে বললো, আমাকে আইয়ুবের সম্পদের উপরে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমি পূর্ণরূপে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করবো এবং তার উপরে আপতিত হবে কঠিন মুসিবত। তখন তার ধৈর্যধারণ করা হয়ে পড়বে অসম্ভব। এখন তোমরা বলো, এ ব্যাপারে তোমরা আমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারবে? এক শয়তান বললো, আমি আগুনের গোলা হয়ে যেতে পারি। তখন আমার গমন পথের সবকিছুকে আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারি। ইবলিস বললো, ঠিক আছে, আইয়ুবের উটের পাল যখন চারণভূমিতে বিচরণ করবে তুমি সেগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম কোরো। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই শয়তানটি হয়ে গেলো একটি গোলাকার অগ্নিকুণ্ড। হজরত আইয়ুবের উটের পাল তখন ছিলো চারণভূমিতে। সে আর দেরী না করে ওই উটের পালকে দ্রুতবেগে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ে গেলো। ইবলিস তখন একটি উটে চড়ে উট চালক রূপে গিয়ে উপস্থিত হলো হজরত আইয়ুবের বহির্বাটিতে। হজরত আইয়ুব তখন নামাজ পাঠ করছিলেন। উট চালকরূপী শয়তান বললো, হে গৃহস্বামী! আপনার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। আপনার রাখাল ও উটের পাল আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে। হজরত আইয়ুব বলে উঠলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। তিনিই আমাকে ওগুলো দান করেছিলেন, আবার তিনিই এখন তা প্রত্যাহার করে নিলেন। এমনিতেই তো ওগুলো ছিলো ধ্বংসশীল। ইবলিস বললো, আপনার প্রভুপালকই আকাশ থেকে আগুন পাঠিয়ে ওগুলো ভস্মীভূত করে দিয়েছেন। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলো চতুর্দিকে। বিস্মিত হলো সকলে। কেউ কেউ বললো, এতো দিন ধরে আইয়ুব আসলে কারো উপাসনাই করতো না। বরং

www.eelm.weebly.com

প্রতারণায় লিপ্ত ছিলো সে এতোদিন ধরে। কেউ বললো, আল্লাহ্ই এই আগুন পাঠিয়েছেন যেনো আইয়ুবের দুশমনেরা আনন্দিত হয় এবং ব্যথিত হয় বন্ধুবর্গ। কেউ কেউ আবার বললো, আইয়ুবের প্রভুপালক যদি শক্তিমান হতো, তবে তার উটের পালগুলোকে রক্ষা করতে পারতো। হজরত আইয়ুব এ সকল কিছুই শুনলেন। তারপর বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্! যিনি দিয়েছেন, তিনিই তো তা ফিরিয়ে নিয়েছেন। সর্বাবস্থায় তিনিই প্রশংসার যোগ্য। আমি মাতৃউদর থেকে পৃথিবীতে এসেছিলাম নগ্ন হয়ে। সেভাবেই পৃথিবী পরিত্যাগ করবো এবং সেভাবেই আবার পুনরুত্থিত হবো। আল্লাহ্প্রদত্ত বিপদ উপেক্ষা করার অধিকার ও ক্ষমতা কারোরই নেই। বিপদে হা-হুতাশ করা অনুচিত। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা-ই করতে সক্ষম। তিনিই আমাদের সকলের একক সৃজয়িতা ও পালনকর্তা। সুতরাং হে মানুষ! অধিকতর কল্যাণকর সিদ্ধান্ত তো ছিলো শহীদ হওয়া। কিন্তু এখনো তো আমি বর্তমান। তাই মনে হচ্ছে আল্লাহ্ হয়তো আমাকে মন্দই ভেবেছেন। তাই ভস্মীভূত করেছেন আমার উটের পালকে, কিন্তু আমাকে রেখেছেন অক্ষত। হজরত আইয়ুবের এরকম মনোভাব ও কথোপকথন শুনে ইবলিস অপদস্থ ও হতাশ হয়ে গেলো। বিমর্ষ বদনে সে ফিরে গেলো তার সাথীদের কাছে। তাদেরকে বললো, আশ্চর্য! আইয়ুবকে তো আমি হতোদ্যম করতে পারলাম না। এক শয়তান বলে উঠলো, বিকট আওয়াজ সৃষ্টি করতে পারি আমি। ওই আওয়াজ তুললে শেষ হয়ে যাবে আইয়ুবের সকল মেষ, বকরী ও সেগুলোর রাখাল। ইবলিস বললো, তবে এক্ষুণি যাও, চিৎকার করে আইয়ুবের সকল ছাগল, মেষ ও তাদের রাখালকে মেরে ফেলো। হুকুম পেয়ে সে ছুটে গেলো অন্য চারণভূমিতে বিচরণরত রাখাল ও তাদের মেষ ও বকরীর পালের নিকটে। বিকট আওয়াজ তুললো সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে মরে গেলো সকল মেষ, ছাগল ও তাদের রাখাল। তখন ইবলিশ রাখালের বেশে হাজির হলো আল্লাহ্র জিকিররত হজরত আইয়ুবের কাছে। বললো, গিয়ে দেখুন আপনার মেষ ও ছাগল সব মরে পড়ে আছে। হজরত আইয়ুব আগের মতোই উত্তর দিলেন, আলহামদুলিল্লাহ্! আমার কোনো অনুযোগ নেই। ইবলিস বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেলো তার সঙ্গী-সাথীদের কাছে। বললো, আইয়ুবকে তো কাবু করতে পারলাম না। এবার বলো কি করা যায়। এক শয়তান বললো, আমি ইচ্ছে করলে প্রচণ্ড ঝড় হয়ে সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি। ইবলিস বললো, তবে তাই করো। তার চাষাবাদের জন্য ব্যবহৃত ষাঁড় ও ক্ষেতের ফসল উড়িয়ে নিয়ে যাও। শয়তানটি তাই করলো। প্রচণ্ড তুফান হয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলো হজরত আইয়ুবের ক্ষেতের ফসল ও ষাঁড়গুলো। পড়ে রইলো শূন্য মাঠ। এবার ইবলিস ক্ষেতের ব্যবস্থাপকের বেশ ধরে হজরত আইয়ুবের নিকটে গিয়ে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা জানালো। হজরত আইয়ুব তবুও

www.eelm.weebly.com

নির্বিকার। আগের মতো একই জবাব দিয়ে তিনি নামাজ পাঠে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর অতুলনীয় সহিষ্ণুতা দেখে ক্ষোভে দুঃখে জর্জরিত হতে লাগলো ইবলিস। সে পুনরায় উঠে গেলো আকাশে। বললো, হে আল্লাহ্! আইয়ুব ভালো করে একথা জানে যে, তুমি তার পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততিকে যেহেতু অক্ষত রেখেছো, সেহেতু তাদের জীবিকার ব্যবস্থাও তুমি করবে। এবার তুমি আমাকে কর্তৃত্ব দান করো তার সন্তান-সন্ততিদের উপর। দেখবে সে আর ধৈর্য রাখতে পারবে না। তাকে বলা হলো, যাও, এ ক্ষমতাও তোমাকে দেয়া হলো। আকাশ থেকে ফিরে এসে ইবলিস দেখলো, হজরত আইয়ুবের সন্তান-সন্ততিরা একটি প্রাসাদের অভ্যন্তরে বিদ্যাভ্যাস করছে। সে প্রচণ্ড আঘাতে ধসিয়ে দিলো প্রাসাদটি। ছাদ চাপা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করলো নিষ্পাপ বালক-বালিকারা। এবার সে ধারণ করলো শিক্ষকের বেশ। মুখে হাতে শরীরে রক্ত লাগিয়ে নিয়ে নামাজপাঠরত হজরত আইয়ুবের কাছে গিয়ে বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে বললো, আপনি এখানে কি করছেন? গিয়ে দেখুন, আপনার আদরের ছেলে মেয়েদের অবস্থা। ছাদ ধসে পড়ে কী হাল হয়েছে তাদের। কারো নাড়ি ভুঁড়ি বের হয়ে গিয়েছে। কারো বের হয়েছে মাথার ঘিলু। ওই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখলে আপনি আর স্থির থাকতে পারবেন না। এবার হজরত আয়ুবের হৃদয় বিগলিত হলো। তিনি কেঁদে ফেললেন। এক মুঠো মাটি মাথায় রেখে বললেন, আক্ষেপ! আমাকে যদি সৃষ্টিই না করা হতো। ইবলিস এবার খুশী হলো। হজরত আইয়ুবকে ধৈর্যহারা হতে দেখে হৃষ্টচিত্তে সে উঠে গেলো আকাশে। হজরত আইয়ুব পরক্ষণেই সম্বিত ফিরে পেলেন। নিজের উক্তির জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন মহান আল্লাহ্র দরবারে। সে ক্ষমাপ্রার্থনা সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেলো আল্লাহ্ সকাশে। ইবলিস যথাস্থানে উত্থিত হওয়ার আগেই এভাবে ক্ষমাপ্রাপ্তির ঘটনা ঘটতে দেখে ইবলিস অপদস্থ হলো আর একবার। বললো, হে আল্লাহ্! তুমি তো আইয়ুবকে এখনো সুস্থ রেখেছো। সে তাই বিশ্বাস করে, শারীরিক সুস্থতার কারণে তুমি তাকে পুনরায় দান করবে ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই সে এখনো তোমার কথা মনে রেখেছে। তুমি আমাকে এবার তার শারীরিক সুস্থতায় হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দাও। দেখবে, তোমার প্রতি সে হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ বিমুখ। জবাবে তাকে জানানো হলো, যাও, এ ক্ষমতাও তোমাকে দেয়া হলো। কিন্তু তার হৃদয় ও রসনার উপরে তোমার কোনো প্রভাব খাটবে না। ইবলিস খুশী হলো খুব। আকাশ থেকে নেমে সোজা হজরত আইয়ুবের গৃহে গিয়ে দেখলো, তিনি সেজদাবনত। সেজদা থেকে মাথা ওঠাতে না ওঠাতেই ইবলিস তার নাসিকায় দিলো এক অশুভ ফুৎকার। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আইয়ুবের সারা শরীরে জ্বালা পোড়া শুরু হয়ে গেলো। শরীরের বিভিন্ন স্থানে দেখা দিলো

www.eelm.weebly.com

ফোসকা। তিনি সেগুলো চুলকাতে শুরু করলেন। চুলকাতে চুলকাতে খসে পড়লো হাতের নখ। এরপর তিনি সেগুলো চুলকাতে শুরু করলেন অমসৃণ চটের সাহায্যে। সে চটও টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়লো। তারপর তিনি তাঁর শরীরের ক্ষত স্থানগুলো চুলকাতে শুরু করলেন ভগ্ন মৃৎপাত্রের টুকরো দিয়ে। আবার কখনো প্রস্তরখণ্ড দিয়ে। খসে খসে যেতে লাগলো শরীরের গোশত। সমস্ত শরীর থেকে নির্গত হতে লাগলো দুর্গন্ধ। প্রতিবেশীরা তখন তাঁকে গ্রাম থেকে বের করে দিলো। দূরে একটি ঝুপড়ি নির্মাণ করে দিলো তাঁর জন্য। সম্পর্কচ্ছেদ করলো সকলে। তখন তাঁর সঙ্গে রইলো কেবল তাঁর সাধ্বী ও পতিঅন্তঃপ্রাণা সহধর্মিণী রহমত বিনতে আফরাইম ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো রহিমা এবং তিনি ছিলেন হজরত ইউসুফের কন্যা। তিনি ওই ঝুপড়ির মধ্যে দিনের পর দিন নীরবে সেবা করে যেতে লাগলেন তাঁর স্বামীর। প্রথম দিকে ইয়াকিন, ইয়ালিব ও সাফের শিথিল সম্পর্ক রক্ষা করলেও শেষে তারাও সম্পর্কচ্ছেদ করলো হজরত আইয়ুবের সঙ্গে। তারা হজরত আইয়ুবের ধর্ম ত্যাগ করলো না, কিন্তু একথা মনে করতে শুরু করলো যে, নিশ্চয় কোনো গোনাহ্‌র কারণে তাঁকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তাই তারা সম্পর্কচ্ছেদের পূর্বে বললো, এ হচ্ছে পাপের শাস্তি। সুতরাং আপনি তওবা করুন।

এক বর্ণনাকারীর বর্ণনায় এসেছে, ওই বসতিতে ছিলো একজন যুবক ইমানদার। তিনি হজরত আইয়ুব সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার অপমন্তব্য শুনতে পেয়ে বসতির সকলকে সমবেত করে বললেন, হে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ! গুরুজন হওয়ার কারণে আপনারা বিভিন্ন মন্তব্য করার অধিকার রাখেন। কিন্তু আপনারা পুণ্যবান আইয়ুব সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য করে চলেছেন, তা অযথার্থ। তাঁর প্রতি আপনাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি আপনাদের প্রতিও রয়েছে তাঁর অধিকার। তাঁর প্রতি আপনাদের কিছু দায়িত্বও তো রয়েছে। অথচ সে দায়িত্ব পালন না করে আপনারা তাঁকে ক্রমাগত অসম্মান করে চলেছেন। আপনারা কি একথা জানেন না যে, তিনি আল্লাহ্‌র নবী ও পুণ্যবান? আপনারা কি তাঁকে কখনো কোনো প্রকার অন্যায় করতে দেখেছেন? তবে এখন ভালো করে জেনে নিন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌র নির্বাচিত বান্দা। এ যুগের সকল মানুষের চেয়ে তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার অধিকতর প্রিয়ভাজন। প্রিয় পয়গম্বরের প্রতি আল্লাহ্ কখনো অপ্রসন্ন হন না। প্রদত্ত সম্মান কখনো ছিনিয়েও নেন না। আপনারা ভাবছেন, আল্লাহ্ তাঁকে অপমানিত করেছেন। কখনোই নয়। তিনি তাঁর প্রিয় পয়গম্বর, সিদ্দীক, শহীদ ও পুণ্যবানগণকে এভাবেই বিভিন্ন দুঃখকষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। এমতো পরীক্ষার মাধ্যমে একথা কখনো প্রমাণিত হয় না যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন। বরং এই দুঃখকষ্টই হয় তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির

www.eelm.weebly.com

এক একটি দুর্লভ কারণ। আরো ভেবে দেখুন, তিনি আপনাদের স্বজন, ভ্রাতৃতুল্য। সুতরাং নবী হিসেবে আপনারা যদি তাঁকে না-ও মানেন, তবে তিনি যে আপনাদের স্বজন ও সুহৃদ, সে কথা কি আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন? বিবেকবানেরা কি কখনো বিপদের সময় তাদের বন্ধুকে পরিত্যাগ করে? তিরস্কার করে? অভিসম্পাত দেয়? তিনি তো এখন রোগাক্লিষ্ট ও বেদনাহত। এমতো অবস্থায় তিনি কি হতে পারেন আপনাদের দোষারোপের পাত্র? অথচ তাঁর কোনো দোষের কথা আপনাদের জানাও নেই। অতএব হে শ্রদ্ধার্হ গুরুজনগণ! আপনারা আপনাদের অপউক্তি প্রত্যাহার করুন। সংশোধন করুন আপনাদের মনোবৃত্তি ও আচরণ। প্রদর্শন করুন সহমর্মিতা ও ভালোবাসা। অশ্রুপাত করুন তাঁর বেদনায় ও বিরহে। আপনারা আপনাদের বিবেককে প্রশ্ন করে দেখুন, এরকমই জবাব মিলবে। হে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিত্ববৃন্দ! আল্লাহ্‌র মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পুনঃপুনঃ আলোচনা করুন। স্মরণ করুন মৃত্যুকে। এ পৃথিবীর মায়াতো একদিন সকলকেই ছিন্ন করতে হবে। আপনাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ্‌র কোনো কোনো বান্দা সহৃদয়, জ্ঞানী, স্পষ্টভাষী ও বাগ্মী। কিন্তু আল্লাহ্‌র ভয় তাঁদেরকে নিশ্চুপ করে রেখেছে। তাঁরা আল্লাহ্‌র পরাক্রমের কথা স্মরণ করে শিহরিত হন। হয়ে যান হুঁশহীন ও অনুভূতিহারা। আল্লাহ্‌র রোষতপ্ত মহিমা বা জালালিয়াত অবলোকন করেই তাঁরা এরকম হন। নিজেকে তখন তাঁদের মনে হয় সর্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী। এধরনের ব্যক্তিবর্গই প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানবান ও আল্লাহ্ প্রদত্ত মর্যাদায় মর্যাদায়িত।

অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে প্রদত্ত যুবক ইমানদারের ভাষণ দূরের ঝুপড়িতে থেকেও শুনতে পেলেন হজরত আইয়ুব। বললেন, আল্লাহ্ কখন কাকে কীভাবে যে তাঁর বিশেষ রহমত ও হেকমত প্রদানে ধন্য করেন, তা বোঝা যায় না। যাকে তিনি দয়া করে দান করেন বিশেষ প্রজ্ঞা, তাঁর রসনা থেকেই নিঃসৃত হয় অভিজ্ঞানের অমিয় প্রবাহ। বয়স একটি গৌণ ব্যাপার। আল্লাহ্ কাউকে কাউকে বাল্যবেলাতেই প্রদান করেন দুর্লভ জ্ঞান। তারা তাই বুঝতে পারে সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের অধিকার রয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র।

এই ঘটনার পর থেকে হজরত আইয়ুব পৃথিবীবাসীদের দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কায়মনোবাক্যে নিরত হলেন আল্লাহ্‌র আরাধনায়। নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমি তো জানি না তুমি আমাকে কিসের জন্য সৃষ্টি করেছো! হায়! তুমি যদি আমাকে অস্তিত্বায়িতই না করতে। আক্ষেপ! আমি যদি জানতে পারতাম, কী আমার অপরাধ। প্রিয় প্রভুপালক আমার! আমি কী এমন করেছি, যার জন্য তুমি আমার উপরে আপতিত করেছো তোমার বৈমুখ্য। পাপী যদি হই, তবে তুমি তো আমাকে মৃত্যুদান করতে পারতে। আমি নিশ্চিন্তে মিলিত হতাম আমার পিতৃপুরুষগণের সঙ্গে। মৃত্যুই কি এখন আমার জন্য অধিক

www.eelm.weebly.com

উপযুক্ত নয়? হে আমার আপনতম সৃজয়িতা! আমি কি পথিকদের জন্য বিশ্রামাগার এবং পিতৃহীন অসহায়দের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করে দেই নি? দুঃস্থ জনতার তত্ত্বাবধানে ও বৈধব্যগ্রস্তাদের দেখা শুনা কি আমি করিনি? হে আমার দয়াময় প্রভুপালক! আমি তো তোমারই দাস। তুমি যদি আমাকে নিরাময় করো, তবে তা হবে তোমার একান্ত দয়া। কিন্তু আমাকে দুঃখকষ্ট দেয়ার অধিকারও তোমার রয়েছে। তুমি তো আমাকে বানিয়েছো বহ্নিমান বেদনার নিদর্শন। বিশাল পর্বতও তো এ বেদনা বহন করতে পারবে না। আমি তো রক্তমাংসে গড়া দুর্বল মানুষ। বলো, কীভাবে আমি এতো দুঃখ সহ্য করি। দলিত মথিত, ছিন্ন ভিন্ন তৃণগুচ্ছের মতো এই শরীর নিয়ে বলো, আমি এখন কোথায় যাই। কেবল প্রার্থনা করি, তুমি আমার হৃদয় ও রসনাকে সচল, সজীব ও জাগ্রত রাখো। আমি যেনো তোমার ভালোবাসা, নিবেদন ও স্মরণ দ্বারা নিরবচ্ছিন্নভাবে ভরে রাখতে পারি আমার হৃদয় ও রসনা। এটাই এখন আমার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উপহার। তুমি আমাকে দেখো। কিন্তু আমি তো তোমাকে দেখি না। তুমি আমার কথা শোনো, কিন্তু আমি তো তোমার কথা শুনি না। আমার প্রতি রয়েছে তোমার সার্বক্ষণিক দৃষ্টিপাত। কিন্তু আমি তো তোমাকে দেখি না। তোমার নৈকট্য আনুরূপ্যবিহীন। তাই হৃদয়ে সর্বক্ষণ যেনো পাই তোমার নৈকট্যের অপার্থিব সৌরভ। রসনায় যেনো পাই যথার্থ নিবেদনের ভাষা। প্রার্থনায় সস্মিত উচ্চারণ।

ওদিকে যুবক ইমানদারের বক্তৃতা শুনে বসতির লোকেরা অনুতাপজর্জরিত মনে সকলে জড়ো হলো হজরত আইয়ুবের ঝুপড়িতে। গিয়ে দেখলো হজরত আইয়ুব তাঁর দীর্ঘ প্রার্থনা শুরু করেছেন। প্রার্থনা শেষে দেখা গেলো উর্ধ্বাকাশে ছায়া বিস্তার করেছে একখণ্ড মেঘ। কেউ কেউ ধারণা করলো, এ আবার আযাবের কোনো মেঘ নয় তো? কিন্তু তাদের ধারণা চূর্ণ করে দিয়ে মেঘ থেকে আওয়াজ উত্থিত হলো— হে আইয়ুব! আল্লাহ্ ঘোষণা করছেন, আমি তোমার সমীপবর্তী। আর আমার এই সামীপ্য তোমার সার্বক্ষণিক সহচর। ওঠো, প্রকাশ করো তোমার বাসনা ও বিচ্ছেদের কথা। শোনো আমার সঙ্গে কারো বাদ-প্রতিবাদ চলে না। কারণ আমি চির অসমকক্ষ ও চির অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হে আমার প্রিয়ভাজন আইয়ুব! তোমার প্রবৃত্তি কি মনে করে, স্বেচ্ছায় সে তার উদ্দেশ্যে উপনীত হতে পারবে? কোথায় তুমি ছিলে সেদিন, যেদিন আমি সৃষ্টি করেছিলাম আকাশ ও পৃথিবী? বিস্তৃত ও বাসযোগ্য করে তুলেছিলাম পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ। তুমি কি জানো, কোন উপকরণ দিয়ে কীভাবে আমি সৃষ্টি করেছি এই মহাবিশ্বকে? পানি কি তোমার নির্দেশে পৃথিবীর মৃত্তিকাকে উপরে ঠেলে তুলেছে? তোমার প্রজ্ঞা কি করতে পেরেছে মৃত্তিকাকে পানির আচ্ছাদন? তখন তুমি ছিলে কোথায়, যখন আমি আকাশকে বহু উঁচুতে স্থাপন করেছিলাম উদ্দাম বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কায়, যে আকাশ কোনো রশির সাহায্যে ঝুলন্ত নয়, অথবা স্থাপিত নয় কোনো স্তম্ভের উপর। তুমি কি তোমার ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এমতো বিন্যাস নির্মাণ করতে পারো? আমি

www.eelm.weebly.com

আকাশকে ভাসিয়ে দিয়েছি আলোয়। সেখানে পরিচালিত করেছি অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জকে। বলো তোমার অঙ্গুলি হেলনে কি দিবস-বিভাবরী বিবর্তিত হয়? যখন আমি মৃত্তিকা ছেদন করে সৃষ্টি করেছি তরঙ্গবিক্ষুব্ধ মহাসাগর, বলতো, কোথায় ছিলে তুমি তখন? তোমার পরিকল্পনায় কি উদ্বেলিত হয় জলধি তরঙ্গ? কে থামিয়ে রেখেছে ওই বিক্ষুব্ধতাকে? মৃত্তিকার প্রাচীর দিয়ে আমিই তো ঠেকিয়েছি সেই উন্মত্ত তরঙ্গের আঘাত-প্রত্যাঘাত। আর স্থলভাগকে অচঞ্চল করেছি তার পৃষ্ঠদেশে পর্বতমালার পেরেক গেঁথে। ছিলে কোথায় তখন তুমি বলো? তুমি কি জানো, ভারসাম্যের কোন্ পরিমাপ দিয়ে আমি সুস্থির করে রেখেছি মৃত্তিকাস্থিত পাহাড়গুলোকে। এ সকল কিছুর তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপনা ও নিয়মায়ন কি তোমার পক্ষে সম্ভব? বলো, হে আমার প্রিয় নবী! মেঘপুঞ্জ কীভাবে সৃষ্টি হয়? কীভাবে আকাশে উত্থিত হয় বায়বীয় জলাধার? কীভাবে ঝরে মন্দ-মধুর ও ক্ষিপ্ত-ক্ষিপ্র বৃষ্টিপাত? বলো, বরফ সৃষ্টি হয় কেমন করে? পর্বতায়নের উৎস কোথায়? কীভাবে দিবসের বক্ষে রাত্রি এবং রাত্রির বক্ষে দিবস প্রতিনিয়ত আশ্রয়ায়িত হয়? বলো, বাতাসই বা আসে কোথা থেকে? বৃক্ষরাজি কথা বলে কোন অচেনা ভাষায়? কে সৃষ্টি করেছে মানুষ, বিবেক, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা? কে সৃষ্টি করেছে শ্রুতি ও দৃষ্টির অদৃশ্য আচ্ছাদন? ফেরেশতারা কার কর্তৃত্বাগত? কে তার সর্বত্রগামী শক্তিমত্তা দিয়ে চির পরাভূত করে রেখেছে সমগ্র সৃষ্টিকে? আর কে দান করে সকলকে রহস্যময় জীবনোপকরণ?

হজরত আইয়ুব নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালক! তুমি আমার পরিচয় আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছো। আমি নির্বাক, ভীত ও অভিভূত। আমি বুঝেছি, আমি কেউ নই, কোনো কিছুই নই। আমার রসনা রুদ্ধ। বুদ্ধি অবদমিত। হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তা! তোমার অপার প্রজ্ঞাময়তা ও অনির্ণেয় শক্তিমত্তা প্রকাশ পেয়েছে তোমার বক্তব্যে। তোমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে আমি যা ধারণা করতে সক্ষম, তার চেয়েও তুমি অনেক বড়, মহিমময়। কোনো সৃষ্টি তোমাকে উপেক্ষা করতে পারে না। কোনো কিছু তোমার কাছ থেকে থাকতে পারে না গোপন। হে মহাবিশ্বের মহা অধিকর্তা! পীড়ার তীব্রতা আমাকে নিরুপায় করে ফেলেছে। রোগ যন্ত্রণা আপনাআপনি ভাষা পেয়েছে আমার রসনায়। হায় আক্ষেপ! যদি মৃত্তিকা বিদীর্ণ হতো, আর আমি প্রোথিত হতে পারতাম মৃত্তিকাভ্যন্তরে, তবে হয়তো আমি তোমার মর্যাদার সান্নিধ্যে এরকম কথা উচ্চারণ করতে পারতাম না। নির্মাণ করতে পারতাম না তোমার অপ্রসন্নতার ন্যূনতম কোনো কারণ। মৃত্যুও তো এর চেয়ে উত্তম। অন্তরঙ্গ প্রার্থনা উপস্থিত করাই ছিলো আমার ব্যাকুল প্রাণের একান্ত উদ্দেশ্য। তাই কখনো আমি আর্তনাদ করে উঠেছি, যাতে তুমি আমার নিবেদন কবুল করে নাও। আবার কখনো নিশ্চুপ থেকেছি, যেনো আমার উপরে আপতিত

www.eelm.weebly.com

হয় তোমার দয়া। হে আমার প্রভুসৃজয়িতা! যা বলার আমি তাতো বলেছিই। আর কখনো এমতো অনুযোগ তোমার পবিত্র দরবারে উপস্থাপন করবো না। এই আমি হাত রাখলাম আমার মুখে। জিহ্বা সংলিপ্ত করলাম দন্তরাজিতে। আর মুখমণ্ডলে মাখলাম মৃত্তিকা। আজ কেবল আমি পরিত্রাণার্থী। প্রতীক্ষমান তোমার প্রবলতম রহমতের। সুতরাং আমাকে আশ্রয় দাও। ক্ষমা করো। তোমারই সকাশে আমি আজ একাগ্রচিত্ত প্রার্থী। সাহায্যার্থী। আমার সকল নির্ভরতা এখন তুমি। আমার উদ্দেশ্য সফল করো। বাঁচাও। মাফ করে দাও। তোমার প্রসন্নতাবিরোধী কোনো কিছু আমি আর কোনোদিনই করবো না।

আল্লাহ্ বললেন, আমি সর্বজ্ঞ। আমি জানি তুমি কে। কী। তুমি তো আমারই মনোনীত নবী। আর আমার রহমত আমার গজব অপেক্ষা প্রবল। তুমি ক্ষমা প্রাপ্ত। রহমতপ্রাপ্ত। পৃথিবীর সকল আকর্ষণ থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করেছি। আর তোমাকে করেছি সকল বিপদগ্রস্তদের জন্য উপদেশ। তোমাকে দেখে যেনো সকলে বুঝে নেয়, ধৈর্যশীলতাই হচ্ছে সম্মান লাভের সোপান। এবার তোমার পায়ের গোড়ালী দ্বারা মাটিতে আঘাত করো। দেখবে সেখান থেকে উৎসারিত হচ্ছে স্বচ্ছ ও সুপেয় সলিল। ওই সলিল পান করো। স্নান করো ওই অলৌকিক জলস্রোতে। এরমধ্যে রয়েছে তোমার নিরাময়। নিরাময়ের পর তোমার সঙ্গীদের পক্ষ থেকে কোরবানী করো। ক্ষমা প্রার্থনা করো তাদের জন্য। তারাই তোমার সম্পর্কে আমার বিরাগভাজন হয়েছে। অসৎ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমাকে পরিত্যাগ করেছে।

হজরত আইয়ুব তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন। তীব্র তেজে উত্থিত হলো পানির প্রস্রবন। সকৃতজ্ঞ চিত্তে তিনি ওই পানি পান করলেন এবং তাতে অবগাহনও করলেন। দূর হয়ে গেলো সকল দুঃখ-কষ্ট রোগ-যন্ত্রণা। ইত্যবসরে তাঁর সহধর্মিণী উপস্থিত হলেন সেখানে। প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনের জন্য যেখানে তাঁকে রেখে গিয়েছিলেন, সেখানে এসে খুঁজতে থাকলেন তাঁকে। পেলেন না। কাছাকাছি এক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! এখানে যে পীড়িত লোকটি পড়ে ছিলো, তার সম্পর্কে তুমি কি কিছু জানো? ওই সুস্থ ও সুঠাম ব্যক্তিটিই ছিলেন নিরাময় প্রাপ্ত হজরত আইয়ুব। তিনি বললেন, হ্যাঁ। চিনবো না কেনো? একথা বলে তিনি মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, দেখো তো ভালো করে। মৃদু হাসি দেখেই তাঁকে চিনতে পারলেন তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণী। আনন্দে আলিঙ্গন করলেন আল্লাহ্র নবীকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমার জীবনাধিকারী সেই পবিত্র সত্তার শপথ! হজরত রহিমা হজরত আইয়ুবকে ততক্ষণ পর্যন্ত জড়িয়ে ধরে ছিলেন, যতক্ষণ না হজরত আইয়ুবের ধ্বংস হয়ে

www.eelm.weebly.com

যাওয়া সন্তান-সন্ততি ও পশুপাল পুনর্জীবিত হয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছিলো। উপরে বর্ণিত কাহিনীর দিকে লক্ষ্য রেখেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এখানে 'দুররুন' অর্থ দুঃখকষ্ট— দৈহিক, বৈত্তিক অথবা সম্ভ্রমিক।

কামুস রচয়িতা লিখেছেন, শব্দটিকে 'দ্বররুন' ও 'দুররুন' দু'ভাবেই উচ্চারণ করা যায়। শব্দটি একটি মূল শব্দ। 'দুররুন' বললে শব্দটি হয় বিশেষ্যবাচক। বায়যাবী লিখেছেন, দুঃখকষ্ট প্রসঙ্গে 'দ্বররুন' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। সে দুঃখকষ্ট শারীরিকও হতে পারে, অথবা সম্পদগত। আর 'দুররুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয় কেবল শারীরিক দুঃখকষ্টের ক্ষেত্রে। যেমন কোনো অসুস্থ ব্যক্তি, অথবা দৈহিক দুর্বলতাগ্রস্ত কোনো লোক।

দুঃখ কষ্টের কাল ও প্রার্থনার সময়ঃ বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস থেকে সুপরিণত সূত্রে জুহরী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, হজরত আইয়ুব দুঃখকষ্ট ভোগ করেছিলেন আঠারো বছর ধরে। ওহাব ইবনে মুনাববাহ্ বলেছেন, পূর্ণ তিন বছর এর এক দিনও বেশী নয়। হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, সাত বছর। এক বর্ণনায় এসেছে সাত বছর সাত মাস সাত দিন। হাসান বসরী বলেছেন, তিনি সাত বছর সাত মাস পীড়িত হয়ে পড়ে ছিলেন বনী ইসরাইল জনপদের পাশের এক জঙ্গলে। তাঁর শরীর ছিলো কীটের বিচরণভূমি। ওই সময় হজরত রহিমা ছাড়া তাঁর কাছে কেউ থাকতো না। হজরত রহিমা তাঁর আহার্য সংগ্রহ করে আনতেন এবং একান্ত দরদ দিয়ে সেবাযত্ন করতেন। অসহনীয় রোগযন্ত্রণা নিয়েও হজরত আইয়ুব আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা করতেন। ওই সময় হজরত রহিমাও অংশগ্রহণ করতেন তাঁর সঙ্গে। ইবলিস ওই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠতো এবং তার সকল সঙ্গীসাথীদেরকে একত্র করে বলতো, আল্লাহ্র এই বান্দা তো আমাকে একেবারে অক্ষম করে দিলো। তাঁর সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়ে গেলেও সে ধৈর্যধারণ করেছিলো। এখনও তো দেখছি সে প্রকাশ করে চলেছে অধিকতর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। একদিন সে সকলকে এভাবে সমবেত করে বললো, এখন তোমরাই বলো, কীভাবে সাহায্য করতে পারো আমাকে? সঙ্গীরা বললো, আপনি আদমকে জান্নাত থেকে বের করে এনেছিলেন কীভাবে? ইবলিস বললো, আমি তার স্ত্রীকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছিলাম। সাথীরা বললো, তাহলে এখনো তো আপনি সেরকম কিছু করতে পারেন। চেষ্টা করে দেখুন না। সে তার স্ত্রীর বিপরীত কিছু করতে পারবে না। আর তার স্ত্রী ব্যতীত তার কাছে কেউ যায়ও না। ইবলিস বললো, ঠিক বলেছো তোমরা। এরপর সে এক পুরুষের আকৃতিতে উপস্থিত হলো হজরত রহিমার সামনে। বললো, হে আল্লাহ্র দাসী! তোমার স্বামী কোথায়? তিনি বললেন, ঝুপড়ির মধ্যে। তিনি তো কঠিন রোগে আক্রান্ত। সারা শরীরে তাঁর ফোঁড়া। তাই সারাক্ষণ শরীর চুলকাতে হয়। আর সেখানে সারাক্ষণ বিচরণ করে

www.eelm.weebly.com

অসংখ্য কীট। ইবলিস একথা শুনে মনে মনে প্রীত হলো। খুঁজে পেলো ধৈর্যহীনতার গন্ধ। আশা পোষণ করলো, এই ধৈর্যহীনতার সূত্র ধরে হয়তো তাকে কাবু করা যাবে। সে তখন বলতে শুরু করলো, হায় কতো কিছু ছিলো তোমার স্বামীর। ক্ষেত, খামার, পশুপাল, সুদৃশ্য বসতবাটী, আর শরীর ভরা যৌবন। কি নিদারুণ অদৃষ্ট! আজ যে সেগুলোর কোনো কিছুই নেই। কে জানে আর কখনো শেষ হবে কিনা এই ঘোর দুঃখের অমানিশা।

হাসানের বর্ণনায় এসেছে, ইবলিসের কথাগুলো শুনে পতি অন্তঃপ্রাণা রহিমা আর্তনাদ করে উঠলেন। শয়তান তাঁর আর্তনাদ শুনে বুঝতে পারলো, এই রমণীর ধৈর্য এখন টলটলায়মান। সে আশাধারী হয়ে একটি বকরির বাচ্চা পুণ্যবতী রহিমাকে এনে দিয়ে বললো, আইয়ুবকে বলো, সে যেনো এই বাচ্চাটি গায়রুল্লাহ্‌র নামে জবাই করে। এরকম করলেই সে সুস্থ হয়ে যাবে। স্বামীর সুস্থতার কথা শুনে হজরত রহিমা আশান্বিত হলেন। স্বামীর কাছে পৌঁছানোর আগেই দূর থেকে বলতে শুরু করলেন আমি তো বুঝতে পারছি না, আর কতদিন আপনার প্রভুপালক আপনাকে দুঃখকষ্টে রাখবেন। কোথায় গেলো আপনার সম্পদ, সন্তানাদি, বন্ধুবান্ধব, সুদর্শন অবয়ব ও সুঠাম দেহ? সুতরাং আমার কথা শুনুন। এই বকরির বাচ্চাটিকে গায়রুল্লাহ্‌র নামে জবাই করুন। আপনার দুঃখ কষ্ট আর থাকবে না। আপনি হয়ে যাবেন সবল ও সুস্থ। হজরত আইয়ুব বললেন, বুঝতে পেরেছি আল্লাহ্‌র দুশমন ইবলিস তোমার কাছে এসেছিলো। তোমার উপরে সে প্রভাব বিস্তার করেছে। তোমার অকল্যাণ হোক। বলো, সম্পদ, সন্তানাদি, পশুপাল তোমাকে কে দিয়েছিলো? তাঁর স্ত্রী বললেন, আল্লাহ্। হজরত আইয়ুব বললেন, কতোদিন ধরে আমরা সেগুলো ভোগ করেছি? রহিমা বললেন, আশি বছর ধরে। হজরত আইয়ুব বললেন, দুঃখকষ্ট চলছে কতোদিন ধরে? রহিমা বললেন, সাত বছরের অধিক কাল। হজরত আইয়ুব বললেন, যেহেতু সুখ ছিলো আশি বছর, সেহেতু দুঃখও তো আশি বছর হওয়াই সমীচীন। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ যদি আমাকে আরোগ্য দান করেন, তবে আমি তোমাকে আশিটি বেত্রাঘাত করবো। তুমি আমাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে কোরবানী করতে বলো। যাও, তোমার আনীত আহার্যদ্রব্য আজ থেকে আমার জন্য হারাম। এখন থেকে তুমি ও আমি পৃথক। আমাকে আর তোমার মুখ দেখিয়ো না। এভাবে হজরত আইয়ুব তাঁর স্ত্রীকে বের করে দিলেন। বিরহবিধুরা পুণ্যবতী রহিমা অবনতমস্তকে প্রস্থান করলেন সেখান থেকে। হজরত আইয়ুব হয়ে পড়লেন নিঃসঙ্গ। তিনি দেখলেন, পানাহারের ব্যবস্থা, সেবাযত্ন করার লোক, বন্ধু-বান্ধব কোনো কিছুই তাঁর নেই। তিনি তখন সেজদায় লুটিয়ে পড়ে বললেন, হে আমার প্রভুপালক! আমি দুঃখকষ্টে পড়েছি, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে উপস্থাপিত প্রার্থনায় হজরত আইয়ুব সোজাসুজি আল্লাহ্র কাছে কিছু চাননি। কেবল তাঁর দূরবস্থার কথা বলেছেন এভাবে— আমি দুঃখকষ্টে পড়েছি। তারপর অকুণ্ঠচিত্তে আল্লাহ্র দয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন এভাবে— তুমিতো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

এর পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং আমার নিকট থেকে দয়া ও ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ তার দুঃখকষ্ট দূরীভূত করে দিলাম।'

হজরত আইয়ুবকে তখন নির্দেশ দেয়া হলো, পায়ের গোড়ালী দিয়ে মাটিতে আঘাত করো। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। সহসা সেখান থেকে উদ্গত হলো একটি উচ্ছলিত ঝর্ণা। পুনঃ নির্দেশ দেয়া হলো, গোসল করো। তিনি ওই পানিতে গোসল করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রোগমুক্ত হয়ে গেলো তার শরীরের বহিরাবরণ। সম্মুখে অগ্রসর হলেন তিনি। চল্লিশ কদম যেতেই পুনঃনির্দেশ ঘোষিত হলো, পায়ের গোড়া দিয়ে মাটিতে আঘাত করো। এ নির্দেশটিও তিনি যথারীতি পালন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে উদ্গিরিত হলো শীতলসলিলবিশিষ্ট আর একটি নহর। আদেশ ঘোষিত হলো, পান করো। তিনি ওই ঝর্ণার পানি পান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে গেলো তাঁর শরীরের অভ্যন্তর ভাগ। তিনি পরিণত হলেন সুন্দর অবয়বধারী ও সুঠাম দেহবিশিষ্ট এক যুবকে। উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করলেন তিনি। ডানে বামে দৃষ্টিপাত করে হয়ে গেলেন অভিভূত। সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁর পুনর্জীবনপ্রাপ্ত সন্তান-সন্ততিকে, প্রাসাদ, ক্ষেতখামার, ফসল, পশুপাল সবকিছুকে আল্লাহ্ করে দিয়েছেন দ্বিগুণ। ঝর্ণার পানি তখনো ছিটকে পড়ছিলো তাঁর বক্ষের উপর। তিনি দেখলেন আর এক বিস্ময়। পানির প্রতিটি ফোঁটা হয়ে যাচ্ছে এককেটি স্বর্ণের ফড়িঙ। ফড়িঙগুলোকে ধরবার জন্য হস্ত প্রসারিত করলেন তিনি। আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করলেন, আইয়ুব! আমি কি তোমাকে বিত্তশালী করিনি? তিনি বললেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! অবশ্যই। কিন্তু এ যে তোমার অতিরিক্ত দান। এরকম অতিরিক্ত দান থেকে মুখ ফিরায় কে? দাতা তো তুমিই। তোমার দান থেকে বিমুখ হওয়া কি শোভন? হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, নবী আইয়ুব তখন গোসল করেছিলেন নগ্ন হয়ে। আর সোনার ফড়িঙগুলো ওই সময় পতিত হচ্ছিলো তাঁর উপরে। তিনি সেগুলোকে ধরে ধরে পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে ভরে রাখতে শুরু করলেন। ঘোষিত হলো— আইয়ুব! তোমাকে তো আমি অনেক দিয়েছি। তবুও এগুলো সংগ্রহ করছো কেনো? হজরত আইয়ুব বললেন, তোমার মাহাত্ম্যের শপথ! তুমি আমাকে অবশ্যই অনেক দিয়েছো। কিন্তু তুমি এখন যা দান করছো সেই দান থেকে আমিতো অমুখাপেক্ষী হতে পারি না।

www.eelm.weebly.com

হাসান বর্ণনা করেছেন, নিরাময় লাভের পর হজরত আইয়ুব গিয়ে বসলেন একটি উঁচু স্থানে। ওদিকে তাঁর পুণ্যবতী সহধর্মিণী অনেক দূরে চলে যেতে গিয়েও পারলেন না। ভাবলেন, আল্লাহ্‌র নবীর আহার্যের ব্যবস্থা করবে কে? সেবাশুশ্রূষা করতেই বা কে এগিয়ে আসবে? অরণ্যের হিংস্র প্রাণীরা যদি আক্রমণ করে বসে? এসকল কিছু ভেবে তিনি পুনরায় ফিরে গেলেন ওই ঝুপড়ির দিকে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলেন তিনি নেই। ঝুপড়িটিরও কোনো চিহ্ন নেই। কেমন যেনো পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে সব। কোনো কিছু বুঝতে না পেরে তিনি অশ্রুপাত করতে লাগলেন অঝোর ধারায়। নিকটেই উঁচু টিলায় উপবিষ্ট হজরত আইয়ুব সব কিছু দেখছিলেন। তাঁর পরনে তখন শোভা পাচ্ছে অতিসুন্দর একটি পোশাক। আর নিজেও তখন সুন্দর ও সুঠামদেহী এক যুবক। হজরত রহিমা তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কিন্তু চিনতে পারলেন না। ভয়ে কোনো প্রশ্নও করতে পারলেন না। হজরত আইয়ুব তখন তাঁকে কাছে ডাকলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র দাসী! কী চাও তুমি? কাঁদছো কেনো? হজরত রহিমা বললেন, আমি এখানে একজন পীড়িত ব্যক্তিকে রেখে গিয়েছিলাম। তিনি আমার স্বামী। আমি তাঁকেই খুঁজছি। হজরত আইয়ুব জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্বামী তাহলে নিহত হয়েছেন? হজরত রহিমা একথা শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। হজরত আইয়ুব বললেন, তাকে দেখলে কি তুমি চিনতে পারবে? হজরত রহিমা বলবেন, কেউ কি তার স্বামীকে না চিনে পারে? একথা বলে তিনি ভয়ে ভয়ে হজরত আইয়ুবের দিকে একবার ভালোভাবে দৃষ্টিপাত করলেন। বললেন, তিনি যখন সুস্থ ছিলেন, তখন তাঁর চেহারা ছিলো আপনার মতো। হজরত আইয়ুব বললেন, আমিই তো আইয়ুব। তুমি আমাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে কোরবানী করার পরামর্শ দিয়েছিলে। কিন্তু সে শয়তানী প্ররোচণার দিকে আমি ভ্রূক্ষেপও করিনি। আমি আল্লাহ্‌র কাছে নিরাময় চেয়েছিলাম। তিনি আমার প্রার্থনা কবুল করেছেন। এই দেখো, আমি এখন কেমন সুস্থ ও সবল।

ওহাব বর্ণনা করেছেন, হজরত আইয়ুব বেশ কয়েক বছর ধরে দুঃখ যাতনা ভোগ করেছিলেন। ইবলিস প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো তাঁর ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি, ক্ষেতখামার ও শরীরের উপর। কিন্তু এতো কিছু করেও সে যখন হজরত আইয়ুবকে আল্লাহ্‌র জিকির থেকে টলাতে পারলো না, তখন সে সুন্দর একটি ঘোড়ায় চড়ে দেখা করলো তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীর সঙ্গে। সে-ও ধারণ করলো আকর্ষণীয় রূপ। সে প্রথমে দাঁড়িয়ে রইলো বিবি রহিমার গমনপথের পাশে। কিছুক্ষণ পর তাঁকে আসতে দেখে বললো, তুমিই কি আইয়ুবের হতভাগিনী স্ত্রী? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইবলিস বললো, তুমি কি আমাকে চেনো? তিনি বললেন, না। ইবলিস বললো, আমি পৃথিবীর দেবতা। আমিই আইয়ুবকে পীড়িত করে রেখেছি।

www.eelm.weebly.com

কারণ সে আমাকে ছেড়ে আকাশের আল্লাহ্‌র উপাসনা করে যাচ্ছিলো। আমি তার প্রতি খুবই অপ্রসন্ন। এখনও সময় আছে, সে যদি আমাকে মাত্র একবার সেজদা করে, তবে আমি ফিরিয়ে দিবো তার হারিয়ে যাওয়া সম্পদ ও সন্তানাদি। ওগুলো আমার কাছেই জমা আছে। ওই দ্যাখো, একথা বলে সে পাশের মরুভূমির দিকে বিবি রহিমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি দেখলেন, সেখানে চরে বেড়াচ্ছে হজরত আইয়ুবের পশুপাল, আর দাঁড়িয়ে আছে মৃত সন্তান-সন্ততিরা। ওহাব আরো বর্ণনা করেছেন, একথাও আমার নিকটে এসেছে যে, ইবলিস তখন বলেছিলো, তোমার স্বামী যদি আহার গ্রহণের সময় বিস্‌মিল্লাহ্ না বলে, তবে তাকে সুস্থ করে দেয়া হবে।

কোনো কোনো গ্রন্থে রয়েছে, ইবলিস বললো, হে আইয়ুব পত্নী! তুমি যদি আমাকে একবার সেজদা করো, তবে আমি তোমার স্বামীকে সুস্থ করে দিবো। ফিরিয়ে দিবো ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। হজরত রহিমা পীড়িত স্বামীর কাছে এসে একথা জানালেন। হজরত আইয়ুব বললেন, তুমি তো পড়েছো আল্লাহ্‌র দুশমনের পাল্লায়। আমিও শপথ করছি, আল্লাহ্ আমাকে সুস্থ করে দিলে আমি তোমাকে একশত বেত্রাঘাত করবো। হজরত আইয়ুব এরকম বলেও স্বস্তি পেলেন না। তিনি আশংকা করলেন, ইবলিস যদি এভাবে তাঁর স্ত্রীকে ইমানহারা করে দেয়। এই আশংকার কারণেই তিনি সেজদাবনত হয়ে বলে উঠলেন, হে আমার প্রভুপালক! আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি, তুমি তো দয়াবানগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। আল্লাহ্ তখন পুণ্যবতী ও সেবাপরায়ণা রহিমার কারণে হজরত আইয়ুবকে সুস্থ করে দিলেন এবং তাঁকে জানিয়ে দিলেন, তার প্রতি কঠোর হয়ো না। একশত ছোট ডাল একত্র করে একবার মৃদু আঘাত করো তার শরীরে। এরকম করলেই তোমার শপথ পূর্ণ হয়ে যাবে। তুমিও তখন আর শপথভঙ্গের দায়ে দায়ী হবে না।

অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, ইবলিস একটি বাক্সে কিছু ঔষধপত্র ভর্তি করে চিকিৎসকের বেশে বিবি রহিমার গমনপথে এসে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ পর তিনি সেখানে এসে অচেনা চিকিৎসককে দেখতে পেয়ে বললেন, আপনিতো মনে হয় চিকিৎসক। আমার স্বামী অসুস্থ। আপনি তাকে সুস্থ করে দিতে পারবেন? ইবলিস বললো, তা পারবো। তবে সুস্থ হওয়ার পর তাকে একথা স্বীকার করতে হবে যে, আমিই তাকে সুস্থ করে দিয়েছি। বিবি রহিমা স্বামীর কাছে গিয়ে একথা জানালেন। হজরত আইয়ুব বললেন, লোকটি ইবলিস। সে তোমাকে ধোকা দিয়েছে। আমি শপথ করলাম, সুস্থ হলে আমি তোমাকে একশত বেত্রাঘাত করবো।

www.eelm.weebly.com

ওহাব ও অন্যান্যের বর্ণনায় এসেছে, পতিপ্রাণা রহিমা শ্রমের বিনিময়ে যা উপার্জন করতেন, তাই দিয়ে তাঁদের দুজনের গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা চলতো । এই নিয়ে লোকেরা নানা কথা বলতে শুরু করলো। তিনি ছোঁয়াচে রোগীর কাছে থাকেন, তাই তার দ্বারা কাজ করানো ঠিক নয়— এরকম মন্তব্য করতে শুরু করলো অনেকে। অবস্থা এমন পর্যায়ে দাঁড়ালো যে, শেষে কেউ আর তাঁকে কাজ দিতে চাইলো না। সবাই তাঁকে দেখলেই দূরে সরে যায়। নিরুপায় রহিমা তাই একদিন তাঁর কেশ কর্তন করে তার বিনিময়ে সংগ্রহ করে আনলেন একটি রুটি। হজরত আইয়ুব জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাথার চুল কী হলো? রহিমা খুলে বললেন সব। হজরত আইয়ুব তৎক্ষণাৎ সেজদায় লুটিয়ে পড়ে বললেন, হে আমার প্রভুপালয়িতা! আমি পড়েছি ঘোর দুঃখকষ্টের মধ্যে। আর তুমি তো দয়ার্দ্র-চিত্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক দয়াময়। কেউ কেউ বলেছেন, যখন তাঁর ক্ষতস্থানগুলোর কীট চড়াও হলো তাঁর বক্ষাভ্যন্তরে ও রসনায়, তাঁর জিকির বন্ধ হয়ে যায় কিনা, এই আশংকাতেই তিনি তখন ওরকম করে বলেছিলেন।

হাবিব বিন সাবেত বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের এই বক্তব্যটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন তখন, যখন তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছিলো তিনটি ঘটনা— ১. একদিন তাঁর দু'জন সুহৃদ এসে দেখলো, তাঁর সারা শরীর রক্তাক্ত, চোখ দু'টিও নষ্ট হওয়ার পথে। তখন তারা বললো, আল্লাহ্‌র কাছে তোমার কোনো মর্যাদা থাকলে তোমার এ অবস্থা কখনো হতো না। ২. উপায়ন্তর না দেখে তাঁর স্ত্রী নিজের মাথার চুলের বিনিময়ে সংগ্রহ করে আনলেন কিছু খাদ্য। ৩. ইবলিস বললো, আমি তাকে নিরাময় করে দিতে পারি কিন্তু তাকে বলতে হবে, আমিই তার আরোগ্যদাতা ।

এরকমও বলা হয়েছে যে, ইবলিস একদিন হজরত আইয়ুবকে এই মর্মে কুমন্ত্রণা দিলো যে, তোমার স্ত্রী অসতী, তাই মানুষ শাস্তিস্বরূপ তার চুল কেটে নিয়েছে। হজরত আইয়ুব তখন উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, আমি তোমাকে দান করবো একশত বেত্রদণ্ড। তারপর তিনি পেশ করেছিলেন তাঁর দুঃখ কষ্টের কথা।

আলেমগণ বলেন, 'আমি দুঃখ কষ্টে পড়েছি' কথাটির অর্থ হবে এখানে— মানুষের অবজ্ঞা ও আনন্দ আমাকে ফেলে দিয়েছে অধিকতর দুঃখকষ্টের মধ্যে। এক বর্ণনায় এসেছে, আরোগ্য লাভের পর একবার আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী আইয়ুবকে জিজ্ঞেস করা হলো, রোগ ভোগকালে আপনি সবচেয়ে বেশী কষ্ট পেতেন কখন? তিনি বললেন, যখন শত্রুরা আমার দুর্দশা দেখে আনন্দিত হতো।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, একদিন হজরত আইয়ুব দেখলেন, ক্ষতস্থানের একটি পোকা মাটিতে পড়ে গেলো। তিনি সেটিকে উঠিয়ে পুনঃ স্থাপন করলেন তাঁর উরুদেশে। বললেন, আল্লাহ্ আমার শরীরে রেখেছেন তোমার আহার। তুমি

www.eelm.weebly.com

চলে যাচ্ছো কেনো? একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পোকাটি দংশন করতে শুরু করলো দ্বিগুণ শক্তিতে। হজরত আইয়ুব সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলেন— হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমি দুঃখকষ্টে নিপতিত হয়েছি।

একটি রহস্যঃ হজরত আইয়ুব ছিলেন সাবেরশ্রেষ্ঠ। অথচ আলোচ্য আয়াতে দেখা যাচ্ছে, তিনি তাঁর দুঃখকষ্টের কথা বলে ধৈর্যহারার পরিচয় দিচ্ছেন। এরকম ধৈর্যচ্যুতিপ্রকাশক বক্তব্য এসেছে অন্য আয়াতেও। যেমন— শয়তান তো আমাকে ফেলেছে কষ্ট ও যন্ত্রণায় (সুরা সোয়াদ)। এর রহস্য কী?

রহস্যভেদঃ এগুলো তাঁর কোনো অভিযোগ ছিলো না। তাই তাঁর এমতো বক্তব্যে ধৈর্যভঙ্গের কোনো প্রভাব নেই। বরং ওগুলো ছিলো তাঁর প্রার্থনা। তাই এখানে বলা হয়েছে— আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। অর্থাৎ তার দোয়া কবুল করলাম। আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর বান্দা দুঃখকষ্টের কথা জানাবেই। প্রিয়তমজনকে নিজের দুঃখকষ্টের কথা জানানোতে কোনো দোষ নেই। এরকম বক্তব্য অভিযোগ নয়, বরং আপনজনোচিত অনুযোগ। এরকম অনুযোগের কথা বিবৃত হয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন— 'আমি আল্লাহ্‌র কাছে আমার অভ্যন্তরীণ কষ্ট ও দুশ্চিন্তার অনুযোগ করি।'

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে এবং তার দুঃখবেদনার কথা অপর কাউকে না জানিয়ে কেবল জানায় আল্লাহ্‌কে, সে ধৈর্যহীন নয়। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে রসুল স. এর পীড়িতাবস্থায় হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে বললেন, কেমন আছেন? তিনি স. বললেন, চিন্তাযুক্ত ও অস্থির। আমি বলি, ইবনে জওজীও এরকম বর্ণনা এনেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে, যেখানে বলা হয়েছে, জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে রোগগ্রস্ত রসুলকে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে সালাম প্রেরণ করেছেন এবং জিজ্ঞেস করতে বলেছেন, আপনি কেমন আছেন?

এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স.কে রোগযন্ত্রণায় কাতর হতে দেখে একসময় জননী আয়েশা বলে উঠলেন, হায় আমার মাথা! রসুল স. বললেন, আয়েশা! তোমার মাথা, না আমার মাথা? আমার মস্তক যে যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। ইবনে ইসহাক ও ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, জান্নাতুল বাকী কবরস্থান থেকে ফিরে এসে শয্যাগ্রহণ করলেন আল্লাহ্‌র রসুল। আমার তখন প্রচণ্ড মাথা ধরেছিলো। তাই বললাম, হায় আমার মাথা! তিনি বললেন, আয়েশা! আমার মাথাও যে যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের সঙ্গে তাদের মতো আরো দিয়েছিলাম।'

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্পাক হজরত আইয়ুবের মৃত পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততিকে পুনর্জীবিত করে দিয়েছিলেন, না তাদের মতো অবিকল অন্যান্য পরিজন ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে যথেষ্ট মতপ্রভেদ রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত ইবনে মাসউদ, কাতাদা, হাসান, এবং অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, আল্লাহ্পাক তাঁর মৃত পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততিকেই পুনরায় জীবিত করে দিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে আরো সমসংখ্যক পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততিও দিয়েছিলেন। আলোচ্য বাক্যের প্রকাশ্য ব্যাখ্যা এরকমই।

হাসান বলেছেন, মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করা হয়নি। বরং তাঁকে দেয়া হয়েছিলো পূর্ববর্তীদের সমসংখ্যক নতুন পরিবার পরিজন। জুহাকের এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর স্ত্রীকে পুনরায় যৌবনবতী করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর উদর থেকেই জন্মগ্রহণ করেছিলো ছাব্বিশটি সন্তান। ওহাব বলেছেন, জন্মগ্রহণ করেছিলো সাত কন্যা ও তিন পুত্র। ইবনে ইয়াসার বলেছেন, সাত পুত্র ও সাত কন্যার কথা।

সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে এসেছে, হজরত আইয়ুবের শস্যক্ষেত্র ছিলো দু'টি— একটি গমের, আর একটি যবের। আল্লাহ্র হুকুমে দু'জন ফেরেশতা ওই বিরান শস্যক্ষেত্র দু'টোর একটিতে স্বর্ণের বৃষ্টি বর্ষণ করলো এবং আরেকটিতে করলো রৌপ্যের বৃষ্টিপাত।

এক বর্ণনায় এসেছে, তখন হজরত আইয়ুবের কাছে এক ফেরেশতা এসে বললো, অভূতপূর্ব ধৈর্যাবলম্বনের কারণে আল্লাহ্ আপনাকে সালাম প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেন, বাইরে বেরিয়ে শস্যাগারের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে। নির্দেশানুসারে তিনি গৃহের বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, শস্যাগারের উপরে উড়ছে স্বর্ণের ফড়িঙ। হজরত আইয়ুব একটি উড়ন্ত ও ছুটন্ত ফড়িঙকে ধরে ফেললেন। ফেরেশতা বললো, এরকম অনেক ফড়িঙতো আপনার শস্যাগার পরিপূর্ণ করেছে। ওগুলোই কি যথেষ্ট ছিলো না? হজরত আইয়ুব বললেন, এতো আমার প্রভুপালক প্রদত্ত বরকত। আমি তাঁর বরকতের প্রতি আকৃষ্ট হবো না কেনো?

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর পরিবার পরিজন ও পশুপালকে পুনর্জীবিত করেননি। বরং নতুন করে তাঁদের অনুরূপ পরিবার পরিজন তাঁকে দান করেছিলেন। ইকরামা বলেছেন, হজরত আইয়ুবকে বলা হয়েছিলো, তোমার মৃত সন্তান-সন্ততিকে তুমি পাবে আখেরাতে। তবে তুমি যদি চাও, তবে আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই ফিরিয়ে দিবো। আর যদি না চাও, তবে আমি তোমাকে দান করবো সমসংখ্যক ও সমআকৃতি বিশিষ্ট নতুন সন্তান-সন্ততি। এই বর্ণনাটিকে গ্রাহ্য করা হলে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— আমি আইয়ুবের মৃত সন্তান-সন্ততি রেখে দিয়েছিলাম আখেরাতের জন্য এবং তাদের অনুরূপ সন্তান-সন্ততি তাকে দিয়েছিলাম দুনিয়ায়। এখানে 'আহল' শব্দটির অর্থ হবে সন্তান-সন্ততি।

www.eelm.weebly.com

وَإِسْمٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِينَ ○ وَأَدْخَلْنٰهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصّٰلِحِينَ ○

❑ এবং স্মরণ কর ইসমাইল, ইদরীস ও জুল-কিফল এর কথা, তাহাদিগের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল।

❑ এবং তাহাদিগকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করিয়াছিলাম; তাহারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এবার শুনুন, ইসমাইল, ইদ্রিস ও জুলকিফলের বৃত্তান্ত। তারা প্রত্যেকেই ছিলো ধৈর্যাবলম্বী।

জুলকিফল পয়গম্বর ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতপৃথকতা রয়েছে। আতা বলেছেন, বনী ইসরাইলের এক পয়গম্বরকে একবার এই মর্মে প্রত্যাদেশ করা হলো যে, তোমার পরলোক গমনের সময় আসন্ন। সুতরাং তোমার স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করো। লোকজনকে ডেকে বলো, রাতে নামাজ পাঠ, দিনে রোজা পালন, মানুষের মোকাদ্দমার যথামীমাংসা, ক্রোধমুক্ত জীবন— এসকল কিছু করতে যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে সে-ই হবে তোমার পরবর্তী প্রতিনিধি। তিনি তাই করলেন। তাঁর ঘোষণা শুনে জনসমাবেশের মধ্য থেকে এক যুবক উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, উল্লেখিত বিষয়ে আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ হলাম। যুবকের বক্তব্য শুনে সকলে আশ্বস্ত হলো। ওই যুবকের নাম জুলকিফল। আল্লাহ্পাক তাঁকে নবুয়ত দান করেছিলেন।

মুজাহিদ বলেছেন, নবী আল ইয়াসা যখন বয়োবৃদ্ধ হলেন, তখন নির্বাচন করতে চাইলেন তাঁর স্থলাভিষিক্তজনকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, জীবদ্দশায় তাকে দায়িত্ব দিয়ে তিনি দেখবেন, তাঁর অনুসারীগণের সঙ্গে সে কেমন ব্যবহার করে। একথা ভেবে তিনি তাঁর অনুসারীগণকে একত্র করলেন। বললেন, আমার তিনটি কথা পালনের অঙ্গীকার যে করবে, তার উপরে আমি আমার কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে অবসর গ্রহণ করবো— ১. দিবসের রোজা ২. নিশীথের নামাজ এবং ৩. বিচার সালিশের রোষবিবর্জিত মীমাংসা। একথা শুনে উঠে দাঁড়ালো এক ক্ষীণকায় ব্যক্তি। বললো, এ বিষয়ে আমি অঙ্গীকার করতে আগ্রহী। কিন্তু হজরত ইয়াসা তাকে পছন্দ করলেন না। কিছুদিন পর তিনি এক জনসমাবেশে পুনরায় উত্থাপন করলেন তাঁর এই প্রস্তাব। সেদিনও উঠে দাঁড়ালো ওই ক্ষীণকায় যুবকটিই। বললো, আমি প্রস্তুত। হজরত আল ইয়াসা এবার তাঁর কথা গ্রহণ করলেন।

www.eelm.weebly.com

দায়িত্ব প্রদান করলেন প্রতিনিধিত্বের। একদিনের ঘটনা। দ্বিপ্রহরিক বিশ্রাম গ্রহণের জন্য তিনি সবে মাত্র তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছেন, সাথে সাথে দরজায় কে যেনো করাঘাত করলো। মানুষের বেশধারী ওই আগন্তুক ছিলো ইবলিস। ভিতর থেকে প্রতিনিধি জিজ্ঞেস করলেন কে? ইবলিস বললো, আমি এক মজলুম বৃদ্ধ। প্রতিনিধি দরজা খুলে বাইরে এলেন। বৃদ্ধ বললো, আমার ও আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়েছে। এই বলে সে তার কাল্পনিক বিবাদ বিসংবাদের দীর্ঘ ফিরিস্তি দিতে শুরু করলো। ফলে অতিক্রান্ত হলো তাঁর বিশ্রামের সময়। প্রতিনিধি বললেন, তোমার কথা শুনতে শুনতে তো অনেক সময় অতিক্রান্ত হলো। ঠিক আছে কাল সন্ধ্যায় এসো, তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করবো। বৃদ্ধ চলে গেলো। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় সে আর এলো না। প্রতিনিধি এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করে তাঁকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু সমাবেশের কোনো স্থানে তাকে দেখা গেলো না। পরদিনও বিচারের জন্য এলো না সে। এলো দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামের সময়। আগের মতো বাইরের দরজায় খট্ খট্ আওয়াজ তুললো। প্রতিনিধি দরজা খুলে বাইরে এলেন এবং বললেন, আমি যখন মজলিসে বসি তখন তুমি আসো না কেনো? বৃদ্ধ বললো, লোকগুলো খুব খারাপ। আপনি এজলাসে বসলে তাঁরা বলে, আমরা তোমার প্রাপ্য দিয়ে দিবো। আর আপনি যখন এজলাস ছেড়ে চলে আসেন তখন বলে, যাও আমরা তোমাকে কিছুই দিবো না। প্রতিনিধি বললেন, এখন যাও, আগামী দিন বিচারের সময় উপস্থিত হয়ো। এভাবে বৃদ্ধের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে সেদিনও বিশ্রামের সময় চলে যাবার উপক্রম হলো। পরদিন বিচারস্থলে উপস্থিত হয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে বৃদ্ধটিকে খুঁজলেন তিনি। কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পেলেন না। উল্লেখ্য যে, ওই প্রতিনিধি সারারাত নামাজ পড়তেন এবং সারা দিন রোজা রাখতেন। সামান্য সময়ের জন্য নিদ্রা যেতেন কেবল দুপুরের সময়। পরপর দু'দিন বিশ্রাম বিঘ্নিত হওয়ার কারণে সেদিন তিনি তাঁর এজলাসে বসেই তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। তাই তৃতীয় দিবসে তিনি তাঁর গৃহপরিচারককে নির্দেশ দিলেন, আমার চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। এখন আমার নিদ্রা ও বিশ্রামের সময়। এসময় কাউকে তুমি আমার ঘরের কাছে আসতে দিয়ো না। একথা বলে তিনি তাঁর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করলেন। তখন এলো ওই বৃদ্ধ। কিন্তু পরিচারক তাকে কাছে ভিড়তে দিলো না। নিরুপায় হয়ে সে ফিরে যাচ্ছিলো। হঠাৎ দেখলো আলো বাতাস আসার জন্য ঘরের দেয়ালে রয়েছে একটি ছিদ্রপথ। পরিচারকের অগোচরে গোপন ওই ছিদ্র পথ দিয়ে একসময় সে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। দেখলো, প্রতিনিধি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাঁকে জাগিয়ে তুলবার জন্য সে তখন দরজার ভিতরে দিক থেকে খট্ খট্ আওয়াজ তুললো। ঘুম ভেঙে গেলো প্রতিনিধির।

www.eelm.weebly.com

তিনি তাঁর পরিচারককে জোরে ডেকে বললেন; তোমাকে কি বলিনি এখানে কাউকে আসতে দিয়ো না। বাইরে থেকে চিৎকার করে পরিচারক বললো, এদিক থেকে তো কেউ যায়নি। দেখুন না, দরজা তো এখনো বন্ধ। প্রতিনিধি দেখলেন, সত্যিই তাই। দরজা বন্ধ। অথচ ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই রহস্যময় বৃদ্ধ। সে বললো, বিচারপ্রার্থীরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর আপনি ঘুমাবেন? প্রতিনিধি এবার তাকে চিনতে পেরে বললেন, হে আল্লাহ্‌র দুশমন! তুমিতো ইবলিস। ইবলিস বললো, আপনি তো আমাকে পরাস্ত করলেন। আপনাকে ক্রোধান্ধ করবার জন্য আমি এতো কিছু করলাম, কিন্তু আমার সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে গেলো। সত্যিই আপনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। উল্লেখ্য যে, ওই যুবক প্রতিনিধি ছিলেন জুলকিফল। তিনি তাঁর দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করেছিলেন।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, একদিন ইবলিস মানুষের বেশে জুলকিফলের কাছে এসে বললো, এক লোক আমার কাছে ঋণী। কিন্তু সে তার ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে টালবাহানা শুরু করে দিয়েছে। দয়া করে আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আমার প্রাপ্য আদায় করে দিন। জুলকিফল তার সাথে সাথে চললেন। চলতে চলতে উপস্থিত হলেন এক বাজারে। তারপর লোকটিকে আর কোথাও খুঁজে পেলেন না। এক বর্ণনায় এসেছে, বাজারে গিয়ে ইবলিস হজরত জুলকিফলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। বললো, যার কাছে আমি টাকা পাই, তাকে তো দেখছি না।

কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, পৃথিবী ত্যাগের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত জুলকিফল তাঁর কৃত অঙ্গীকারের উপর সুদৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। রাতে নামাজ পড়তেন একশত রাকাত। দিনে রাখতেন রোজা। আর বিচার মীমাংসা করতেন যথাযথরূপে, ক্রোধ-বিবর্জিত অবস্থায়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হজরত জুলকিফল ছিলেন নবী। কোরআনের বিবরণ এরকম। কিন্তু তিনি কোন যুগে কোন জনপদে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা জানা যায় না। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত জাকারিয়ার আরেক নাম জুলকিফল। হজরত আবু মুসা বলেছেন, তিনি নবী ছিলেন না, ছিলেন একজন পুণ্যবান।

পরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম; তারা ছিলো সৎকর্মপরায়ণ।' এখানে 'অনুগ্রহভাজন করেছিলাম' কথাটির অর্থ তাদেরকে আমি করেছিলাম আমার নৈকট্যভাজন ও জান্নাতের অধিকারী। আর 'তারা ছিলো সৎকর্মপরায়ণ' কথাটির অর্থ, তারা ছিলো ওই সকল লোকের অন্তর্ভূত, যাদেরকে রক্ষা করা হয় সকল প্রকার বিপথগামিতা ও পাপাচার থেকে।

www.eelm.weebly.com

وَ ذَا النُّوۡنِ اِذۡ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنۡ لَّنۡ نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ فَنَادٰی فِی الظُّلُمٰتِ اَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنۡتَ سُبۡحٰنَكَ ٭ۖ اِنِّیۡ كُنۡتُ مِنَ الظّٰلِمِیۡنَ ○

فَاسۡتَجَبۡنَا لَهٗ ۙ وَ نَجَّیۡنٰهُ مِنَ الۡغَمِّ ؕ وَ كَذٰلِكَ نُـۨجِی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ○

❐ এবং স্মরণ কর জুন-নূন এর কথা যখন সে ক্রোধভরে বাহির হইয়া গিয়াছিল এবং মনে করিয়াছিল আমি তাহাকে সংকটে ফেলিব না, অতঃপর সে অন্ধকার হইতে আহ্বান করিয়াছিল, 'তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী।'

❐ তখন আমি তাহার ডাকে সাড়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম দুশ্চিন্তা হইতে এবং এই ভাবেই আমি বিশ্বাসীদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকি।

এখানে 'জুননূন' অর্থ হজরত ইউনুস ইবনে মাত্তা। তিনি বেশ কিছুদিন মাছের পেটে ছিলেন তাঁকে মৎস্যওয়ালাও বলা হয়।

আওফীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস ও জুহাক বলেছেন, হজরত ইউনুস তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবাস করতেন ফিলিস্তিনে। সেখানে বসবাস করতো তাদের বারোটি গোত্র। একবার এক অত্যাচারী রাজা তাদের জনপদের উপরে চড়াও হলো এবং বন্দী করে নিয়ে গেলো তাদের সাড়ে নয়টি গোত্রকে। অবশিষ্ট রইলো আড়াইটি গোত্র। আল্লাহ্ তখন নবী শা'ইয়ার কাছে প্রত্যাদেশ করলেন, তুমি সম্রাট হারকীয়ার কাছে যাও এবং বলো, সে যেনো তার রাজ্যের কোনো একজন শক্তিশালী নবীকে ওই অত্যাচারী রাজার কাছে পাঠিয়ে দেয়। আর ওই নবী যেনো বলে, বন্দী বনী ইসরাইলদেরকে মুক্ত করে দাও। ওই রাজার অন্তরে আমি বন্দীমুক্তির ধারণা সৃষ্টি করে দেবো। প্রত্যাদেশানুসারে হজরত শা'ইয়া সম্রাটের দরবারে গিয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ জানালো। পাঁচজন নবী ছিলেন তখন তার রাজ্যে। আল্লাহ্র নির্দেশ শুনে সম্রাট হজরত শা'ইয়াকে বললো, হে আল্লাহর নবী! আপনি কী বলেন? কাকে পাঠাবো? হজরত শা'ইয়া বললেন, নবী ইউনুসকে পাঠালেই ভালো হয়। তিনি শক্তিশালী ও আমানতদার। সম্রাট হজরত ইউনুসকে তার দরবারে ডেকে আনলো এবং ফিলিস্তিন গমনের প্রস্তাব উত্থাপন করলো। হজরত ইউনুস বললেন, আল্লাহ্ কি আমাকেই নির্দিষ্ট করে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন? সম্রাট বললো, না। হজরত ইউনুস বললেন, তাহলে আমার

www.eelm.weebly.com

দাবি হচ্ছে, অন্য কোনো শক্তিমান পয়গম্বরকে প্রেরণ করা হোক। কিন্তু দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ হজরত ইউনুসের এ কথা মানলো না। সকলে মিলে তাঁকেই পীড়াপীড়ি করতে লাগলো ফিলিস্তিন গমনের জন্য। হজরত ইউনুস তখন সম্রাট ও পারিষদবর্গের উপরে রাগান্বিত হয়ে অন্য এক অঞ্চলের দিকে যাত্রা করলেন। চলতে চলতে উপস্থিত হলেন এক সমুদ্রের কিনারায়। দেখলেন, যাত্রীবাহী এক নৌকা যাত্রার জন্য অপেক্ষমান। তিনি ওই নৌকায় উঠে বসলেন।

ওরওয়া বিন যোবায়ের, সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং বিদ্বানগণের একটি দলের অভিমত হচ্ছে, হজরত ইউনুস আল্লাহ্‌র প্রতি অভিমান করে তাঁর জনপদ ছেড়ে অন্যত্র রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর অভিমানের কারণ ছিলো এই— ক্রমাগত তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনকে সত্যধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়ে আসছিলেন। তাদেরকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছিলেন এই বলে, আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের উপরে আপতিত হবে আল্লাহ্‌র আযাব। কিন্তু তারা তাঁর কথায় ভ্রূক্ষেপ করলো না। তাই যথাসময়ে একদিন দেখা গেলো আযাবের আলামত। ওই আলামত দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা কায়মনোবাক্যে তওবা করলো এবং পরিত্রাণপ্রার্থী হলো। আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করলেন এবং প্রত্যাহার করে নিলেন তাঁর আযাব। এমতো পরিস্থিতিতে হজরত ইউনুসের মনে হলো, এবার হয়তো লোকেরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলবে। একথা ভেবে তিনি তখন লজ্জায় ও অভিমানে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তখন হজরত ইউনুসের সম্প্রদায়ের মধ্যে মিথ্যাবাদীকে হত্যা করার রেওয়াজ ছিলো। তাই হজরত ইউনুসের আশংকা হলো, কথিত আযাব যখন এলো না, তখন লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে হত্যা করে ফেলবে।

এখানে 'মুগাদ্বিবাত' (ক্রোধ) শব্দটি বাবে মুফাইলার শব্দরূপ। শব্দটি এখানে উভয় দিকের সম্পৃক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়নি। বরং ব্যবহৃত হয়েছে 'মুসাফিরাত' এবং 'মুয়াক্বিবাত' এর মতো তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দরূপে। অর্থাৎ এখানে 'মুগাদ্বিবান' কথাটির অর্থ হবে ক্রোধে অথবা ক্রোধভরে।

হাসান বলেছেন, আল্লাহ্ হজরত ইউনুসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মানুষকে সত্য ধর্মে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানাও এবং বলো, এই আমন্ত্রণ গ্রহণ না করলে আল্লাহ্‌র শাস্তি অনিবার্য। হজরত ইউনুস বললেন, হে আমার প্রভুপালক! যখন তোমার শাস্তি নেমে আসবে, তখন আমাকে যথাপ্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে প্রস্থানের সুযোগ দিয়ো। আল্লাহ্ বললেন, বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রস্থান করতে হবে অতি দ্রুত। হজরত ইউনুস নিবেদন করলেন, আমার যেনো অন্ততঃ

www.eelm.weebly.com

জুতা পরিধানের অবকাশ থাকে। কিন্তু এ অনুমতি তাঁকে দেয়া হলো না। তাই তিনি হলেন অভিমানাহত। এক সময় আল্লাহ্‌র শাস্তির নিদর্শন প্রকাশ পেতে শুরু করলো। অভিমানাহত নবী তখন অতি দ্রুত প্রস্থান করলেন সেখান থেকে। ওহাব বলেছেন, হজরত ইউনুস ছিলেন পুণ্যবান। তাঁর উপরে যখন নবুয়তের ভার অর্পণ করা হলো, তখন তিনি ভয়ে ও আনন্দে হয়ে পড়লেন অভিভূত। এতো বড় বোঝা স্কন্ধে নিয়ে তিনি সুস্থির হতে পারলেন না। তাই আল্লাহ্ তাঁর প্রতি আর উলুল আজম পয়গম্বরের দায়িত্ব প্রদান করলেন না। সেকারণেই আল্লাহ্ রসুল স.কে সম্বোধন করে বলেছেন— আপনি উলুল আজম পয়গম্বরের মতো ধৈর্য অবলম্বন করুন। মৎস্যওয়ালার মতো হবেন না। উল্লেখ্য যে, উপরে বর্ণিত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আলোচ্য আয়াতের প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে আমার রসুল! আরো শুনুন মৎস্যওয়ালা জুন্‌নূনের ইতিবৃত্ত, যখন সে ক্রোধভরে তাঁর জনপদ থেকে অন্যত্র গমন করেছিলো।'

এরপর বলা হয়েছে, 'এবং মনে করেছিলো আমি তাকে সংকটে ফেলবো না।' এখানে ক্বদরত্ অর্থ সংকট। অন্য আয়াতেও শব্দটি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'আল্লাহু ইয়াব্‌সুত্বুর রিযক্বা লিমাঁইয়াশাউ ওয়া ইয়াক্বদির (আল্লাহ্ যাকে চান তার রিজিক প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে চান তার রিজিককে করেন সংকীর্ণ)। আতা এবং অধিকাংশ আলেম শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে। কিন্তু মুজাহিদ, জুহাক, কালাবী ও আওফীর বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ক্বদ্‌রুন্' শব্দটির অর্থ আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ হজরত ইউনুসের ধারণা হয়েছিলো, আল্লাহ্ তাঁকে সংকটে ফেলবেন না।' 'তাক্বদীর' এবং 'ক্বদর' শব্দ দু'টো সমার্থক। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— 'নাহ্‌নু ক্বদ্দারনা বাইনা কুমুল মাওতা '(আমি তোমাদের মাঝে মৃত্যুকে নির্ধারণ করেছি)।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ— ইউনুস ভেবেছিলো, আমি হয়তো তাকে বিপদে ফেলবো না। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার বক্তব্যটি গ্রহণ করতে হবে পরোক্ষার্থে। অর্থাৎ এখানে আল্লাহ্ হজরত ইউনুসকে এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন, যে আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষা না করে দেশবাসীদেরকে ছেড়ে অন্যত্র গমন করে এবং ধারণা করে, আল্লাহ্ তাকে সংকটগ্রস্ত করবেন না।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, বাক্যটি প্রশ্নবোধক। কিন্তু এখানকার প্রশ্নচিহ্নপ্রদায়ক অব্যয়টি উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য অব্যয়সহ এখানকার প্রশ্নটি হবে একটি অস্বীকৃতি জ্ঞাপক প্রশ্ন। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— ইউনুস কি একথা ভেবে নিয়েছে যে, আমি তার উপরে আমার শক্তি প্রয়োগ করতে পারি?

www.eelm.weebly.com

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'মনে করেছিলো' কথাটি দৃঢ় বিশ্বাসসূচক নয়। বরং এটা ছিলো শয়তানের একটি নেপথ্য প্রভাবজাত ধারণা, যা হজরত ইউনুসের উপরে সাময়িকভাবে ছায়াপাত করেছিলো। বিশ্বাস ও ধারণা নিশ্চয় এক কথা নয়। তাই এখানে 'দৃঢ় বিশ্বাস করেছিলো' না বলে বলা হয়েছে 'ধারণা করেছিলো'।

হাসান বলেছেন, আমি এ বিষয়ে যা জেনেছি তা হচ্ছে, হজরত ইউনুস যখন অভিমানাহত হয়ে অন্যত্র যাত্রা করলেন, তখন শয়তান, আল্লাহ্ এবং তাঁর মাঝে অনড় ব্যবধান রচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করলো। কিন্তু হজরত ইউনুস ছিলেন প্রকৃত অর্থে পুণ্যবান ও উপাসনাপ্রিয়। তাই আল্লাহ্ তাঁকে শয়তানের পরিকল্পনার আওতা থেকে মুক্ত করে প্রবেশ করালেন মাছের উদরে। এভাবে দীর্ঘ চল্লিশ দিন ধরে হজরত ইউনুস মৎস্য-উদরে সময়াতিপাত করতে বাধ্য হলেন। আতা বলেছেন, তিনি মাছের পেটে ছিলেন সাত দিন। কেউ কেউ বলেছেন তিন দিন। এরকমও বলা হয়েছে যে, মাছ তাকে উদরে ধারণ করে নিয়ে গিয়েছিলো ছয় হাজার বছরের দূরত্বে। অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, মাছটি তাঁকে নিয়ে নিমজ্জিত হয়েছিলো পৃথিবীর সপ্তম স্তরের তলদেশ পর্যন্ত। ওই অবস্থায় তিনি আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত করেছিলেন অনুতাপজর্জরিত গভীর, গভীরতর প্রার্থনা।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে অন্ধকার থেকে আহবান করেছিলো, তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, তুমি পবিত্র, মহান! আমিতো সীমালংঘন-কারী।'এখানে 'অন্ধকার' অর্থ রাতের অন্ধকার, সমুদ্রাভ্যন্তরের অন্ধকার অথবা মৎস্য-উদরের তমসা। ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে— অপেক্ষমান নৌকায় উঠে বসলেন অভিমানাহত নবী। নৌকা চলতে শুরু করলো। কিন্তু মাঝ দরিয়ায় গিয়ে আর অগ্রসর হতে পারলো না। এক স্থানে ঘুরতে থাকলো চক্রাকারে। যাত্রীরা বললো, নিশ্চয় এ নৌকায় কোনো অপরাধী রয়েছে। নবী বললেন, আমিই অপরাধী। আমাকে তোমরা সমুদ্রে নিক্ষেপ করো। কিন্তু তাঁর একথা কেউ মানলো না। বললো, লটারী করা হোক। তাই করা হলো। লটারীতে উঠলো হজরত ইউনুসের নাম। তখন সকলে মিলে তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দিলো। অথবা তিনি নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন উত্তাল তরঙ্গে। মুখব্যাদান করে ছিলো বিশালাকৃতির একটি মাছ। সমুদ্রে পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাছটি তাঁকে গিলে ফেললো।

'তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই; তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী' কথাটির অর্থ— মৎস্য-উদরের ঘোর অন্ধকার থেকে হজরত ইউনুস আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলেন, হে আমার পরম প্রভুপ্রতিপালক! আমি আমার সত্তার অন্তঃস্থল থেকে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করছি, তুমি ব্যতীত উপাস্য

www.eelm.weebly.com

আর কেউই নেই, তুমি পবিত্রতম, মহানতম। আর আমি? আমিতো তোমার আনুরূপ্যবিহীন মর্যাদাকে লক্ষ্য করে প্রদর্শন করেছি বোধহীনদের মতো অভিমান, ক্ষোভ। নিশ্চয় এটা তোমা প্রদত্ত অধিকারের সীমালংঘন।

সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ ওই মৎস্যকে তখন নির্দেশ দিলেন, ইউনুসকে গলাধঃকরণ করো। কিন্তু সাবধান! তার গাত্রচর্ম ও অস্থিতে যেনো লাগে না কোনো আঁচড় অথবা আঘাত। বলা বাহুল্য, মৎস্য তাই করলো। উদরে আল্লাহ্র নবীকে নিয়ে চলে গেলো অনেক গভীরে। রহস্যময় অন্ধকারে বসে হজরত শুনতে পেলেন চতুর্দিক থেকে ধ্বনিত হচ্ছে তসবীহ্ পাঠের আওয়াজ। বিস্মিত হলেন তিনি। দরিয়ার অচেনা তলদেশে এভাবে মুহুর্মুহু আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছে কারা? প্রত্যাদেশ হলো, এ আওয়াজ সমুদ্রবাসী প্রাণীদের। হজরত ইউনুসও তখন তসবীহ্ পাঠ শুরু করলেন সকলের সঙ্গে। সেখানকার ফেরেশতারা নতুন কণ্ঠের উচ্চারণ শুনে বিস্মিত হলো। বললো, হে আমাদের সৃজয়িতা। আমরা তো পৃথিবীবাসীর মতো ক্ষীণকণ্ঠে তসবীহ্ পাঠ শুনছি সাগরের অতলে। এক বর্ণনায় এসেছে, ফেরেশতারা তখন বললো, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমরা চেনা কণ্ঠের আওয়াজ শুনছি অচেনা জায়গায়। আল্লাহ্ বললেন, এ হচ্ছে আমার বান্দা ইউনুসের আওয়াজ। সে আমার প্রতি প্রকাশ করেছিলো তার ক্ষোভ-অভিমান। তাই আমি তাকে বন্দী করেছি মৎস্য-উদরে। ফেরেশতারা বললো, এতো তোমার সেই প্রিয়ভাজন দাস, যার অসিলায় প্রতিদিন কিছু লোকের পুণ্যকর্ম তোমার দরবারে উপনীত হতো। আল্লাহ্ বললেন, তোমরা ঠিকই বলেছো। তখন ফেরেশতারা হজরত ইউনুসের পক্ষে সুপারিশ করতে শুরু করলো। মাছের প্রতি প্রত্যাদেশ হলো, ইউনুসকে উগরে দাও। মৎস্য সমুদ্রোপকূলে উপনীত হয়ে উগরে দিলো হজরত ইউনুসকে।

পরের আয়াতে (৮৮) বলা হয়েছে— 'তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা থেকে এবং এভাবেই আমি বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করে থাকি।' একথার অর্থ— আমি তখন আমার প্রিয়ভাজন নবীর প্রার্থনায় সাড়া না দিয়ে পারিনি, যদিও সর্বপ্রকার অপারগতা থেকে আমি চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। আমি তার বিশুদ্ধ প্রার্থনা কবুল করলাম। নির্বাপিত করে দিলাম তার মনোবেদনার আগুন। তার মতো লজ্জা ও অনুতাপানলে দগ্ধীভূত বিশ্বাসীদেরকেও আমি এভাবে পরিত্রাণ দানে ধন্য করে থাকি।

রসুল স. বলেছেন, নবী জুন্নূনের ওই সময়ের দোয়া ছিলো 'লাইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ্জলিমীন'। এই দোয়া সহযোগে কেউ যদি তার প্রার্থনা আল্লাহ্র দরবারে পেশ করে, তবে তার সে প্রার্থনা কবুল করা হয়। আহমদ, তিরমিজি, হাকেম। সিহাহ্ পুস্তকসমূহে হাদিসটি এসেছে হজরত সা'দ

www.eelm.weebly.com

ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে। হাকেমের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— রসুল স. একবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ওই দোয়াটির কথা জানাবো, যা পাঠ করলে আল্লাহ্ অবশ্যই দূর করে দেন ওই দোয়া পাঠকারীর মুসিবত? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! অবশ্যই বলুন। তিনি স. বললেন— সেই দোয়াটি হচ্ছে— 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ্জলিমীন'। ইবনে জারীরের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— আল্লাহ্র যে নাম উচ্চারণ করলে দোয়া কবুল করা হয় এবং মনোস্কামনা পূর্ণ করা হয়, সেই নাম রয়েছে জুন্নূন নবীর দোয়ায়। আর সে দোয়া হচ্ছে— 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ্জলিমীন'। আমি সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে লিখেছি, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর চেয়ে 'লা ইলাহা ইল্লা হুয়া' এবং 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা' দোয়ার মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। কারণ পরের দোয়া দু'টো নির্দেশ করে চিরঅদৃশ্য এক সত্তাকে। 'আল্লাহ্' নামের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে তাঁর সকল গুণাবলী। কিন্তু 'হুয়া' (তিনি) এবং 'ইল্লা আন্তা' (তুমি ব্যতীত) সর্বনাম দু'টো নির্দেশ করে কেবল জাত বা সত্তাকে। আবার 'তুমি' সম্বোধন 'তিনি' এর চেয়ে অধিকতর পূর্ণ, পরিণত ও যথাযথ।

হজরত ইউনুসকে পয়গম্বর বানানো হয়েছিলো কখনঃ বাগবী লিখেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মৎস্য-উদর থেকে মুক্তি লাভের পর হজরত ইউনুসকে পয়গম্বর করা হয়েছিলো। কেননা সুরা আস্সফ্ফাতে প্রথমে এসেছে— 'ফানাজ্বাইনাহু বিল আ'রায়ি ওয়া হুয়া সাক্বীম' (আমি তাকে পরিত্রাণ দিয়েছিলাম ঝাউ বনের নিকট, আর সে ছিলো পীড়িত), তারপর এসেছে— 'ওয়া আরসালনা ইলা মিয়াতি আলফিন্ আও ইয়াযিদুন' (অতঃপর আমি তাকে একলক্ষ অথবা তার ইপ্সিত সংখ্যকের জন্য প্রেরণ করেছিলাম)। এভাবে প্রমাণিত হয় যেন প্রথমে মৎস্য তাঁকে বেলাভূমিতে উগরে দিয়েছিলো, তারপর এক লক্ষ অথবা ততোধিক মানুষকে হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্ তাঁকে দান করেছিলেন নবুয়ত।

আমি বলি, দলিলটি দুর্বল। কেননা দুর্ঘটনার বিবরণের মধ্যবর্তীতে সংযোজক অব্যয় 'ওয়াও' (এবং) ঘটনার ক্রমধারার পরিচায়ক নয়। এখানে শুধু নির্ণয় করা হয়েছে পূর্বাপর সম্পর্কটি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মৎস্যের গিলে ফেলা ও উগরে দেয়ার আগে থেকেই হজরত ইউনুস ছিলেন আল্লাহ্র রসুল। কেননা আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'ওয়া ইন্না ইউনুসা লা মিনাল মুরসালীনা ইজ আবিক্বা ইলাল ফুলকিল মাশহুন' (এবং ইউনুস রসুল ছিলো যখন সে পরিপূর্ণ কিশতির দিকে ধাবিত হলো)।

www.eelm.weebly.com

وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۢ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَأَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ۗ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۝

❑ এবং স্মরণ কর জাকারিয়ার কথা, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নিঃসন্তান রাখিও না, তুমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

❑ অতঃপর আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তাহার জন্য তাহার স্ত্রীকে করিয়াছিলাম বন্ধ্যাত্বমুক্ত। তাহারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করিত, তাহারা আমাকে ডাকিত আশা ও ভীতির সহিত এবং তাহারা ছিল আমার নিকট বিনীত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আরো শুনুন নবী জাকারিয়ার ইতিকাহিনী। সে তার প্রার্থনায় বলেছিলো, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমি তো নিঃসন্তান। আমি চাই, আমার পরলোক গমনের পর আমার সন্তান হোক তোমার মনোনীত ধর্মের একনিষ্ঠ প্রচারক। সুতরাং আমার স্থলাভিষিক্তরূপে আমাকে দান করো এক পুণ্যবান সন্তান। তুমিইতো সকল কিছুর চূড়ান্ত মালিক।

এখানে 'খইরুন ওয়ারিছীন' কথাটির মর্মার্থ— সকল কিছুই ধ্বংসশীল, আর চিরস্থায়ী ও চিরন্তন কেবল আল্লাহ্, যিনি সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বোর্ধ্ব।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তার আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে করেছিলাম বন্ধ্যাত্বমুক্ত।' একথার অর্থ, আমি জাকারিয়ার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলাম। তাঁর বন্ধ্যা স্ত্রীকে করে দিয়েছিলাম সন্তান জন্মদানের উপযোগী। এভাবে আমি তাকে দিয়েছিলাম এক পুণ্যবান পুত্র। তার নাম ছিলো ইয়াহ্ইয়া।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতো, তারা আমাকে ডাকতো আশা ও ভীতির সঙ্গে এবং তারা ছিলো আমার নিকট বিনীত।' এখানে 'রগাবাত্' অর্থ কামনা। অর্থাৎ আল্লাহ্র সঙ্গে মিলনের, নৈকট্য লাভের, পুণ্যার্জনের, দোয়া কবুল হওয়ার অথবা আনুগত্যের কামনা বা অনুরাগ। হজরত

www.eelm.weebly.com

আনাস থেকে ইমাম আহমদ, নাসাঈ, হাকেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে— নামাজকে আমার জন্য করে দেয়া হয়েছে চোখের শান্তি। আর এখানকার 'খওফুন্' শব্দটির অর্থ ভীতি— আল্লাহ্ থেকে পৃথক হওয়ার, পাপপ্রবণতার শাস্তি অথবা আল্লাহ্র অপ্রসন্নতার।

'তারা ছিলো আমার নিকট বিনীত' কথাটির অর্থ— তারা আমাকে ভয় করে আমার কাছে তাদের প্রার্থনা উপস্থিত করতো। মুজাহিদ বলেছেন, অন্তরের অন্তঃস্থলে অবস্থিত ভয়কে বলে খুশু। শব্দটির বহুবচন 'খশিয়ীন'। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— তারা আমার অতুলনীয় মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারতো। তাই প্রকাশ করতো চরমতম বিনয়। কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন— তারা ছিলো বিনয়াবনতার শিখরারোহী।

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৯১, ৯২, ৯৩

وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ○ وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ○

❑ এবং স্মরণ কর সেই নারীকে যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল, অতঃপর তাহার মধ্যে আমি আমার রূহ্ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে ও তাহার পুত্রকে করিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন।

❑ এই যে তোমাদিগের জাতি— ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদিগের প্রতিপালক, অতএব আমার ইবাদত কর।

❑ কিন্তু মানুষ নিজদিগের কার্যকলাপ দ্বারা মতাদর্শ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যানীত হইবে আমার নিকট।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এবার শুনুন ওই কুমারী ও পূতপবিত্রা রমণীর কথা, যে ছিলো নিষ্কলংক। আমি আমার প্রেরিত দূত জিবরাইলের মাধ্যমে তার প্রতি রূহ্ ফুৎকার করে দিয়েছিলাম। ওই ফুৎকারের ফলে মরিয়ম নাম্নী ওই সাধ্বী রমণীর উদর থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলো আমার রসুল ঈসা। এভাবে আমি ঈসা ও তাঁর মাতাকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ওই নিদর্শন ছিলো আমার অপার পরাক্রমের এক বিরল দৃষ্টান্ত। আমিতো সর্বশক্তিধর। আমি মানুষ সৃষ্টি করতে পারি বিনা পিতায় ও বিনা

www.eelm.weebly.com

মাতায়— যেমন আদম। তেমনি বিনা পিতায় কেবল মাতার মাধ্যমে— যেমন ঈসা। এখানে 'মির রূহিনা' (আমার রূহ হতে) কথাটির অর্থ হবে আমার নির্দেশিত রূহ। কিন্তু এখানে হজরত ঈসাকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যেই সরাসরি বলা হয়েছে আমার রূহ্। আর 'রূহ' অর্থ এখানে হজরত ঈসা। অথবা এখানে 'রূহিনা' শব্দটির পূর্বে উহ্য রয়েছে একটি সম্বন্ধ পদ। ওই সম্বন্ধ পদটি সহ কথাটির মর্মার্থ হবে— আমা কর্তৃক প্রেরিত রূহ। অর্থাৎ হজরত জিবরাইল। আর এখানে 'মির রূহিনা' কথাটির 'মিন' অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত।

পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— 'এই যে তোমাদের জাতি, এটা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার ইবাদত করো।'

এখানে 'উম্মাতান্' অর্থ জাতি। শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে 'উম্মুন্' থেকে। 'উম্মুন' অর্থ ইচ্ছা করা, একই উদ্দেশ্যে ঐকবদ্ধ হওয়া, অথবা একই ধর্মাদর্শের উপরে একত্র হওয়া। এরকম বলা হয়েছে কামুস গ্রন্থে। এভাবে কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সকল দলের ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে বলে 'উম্মাত' বা জাতি। এরকম একত্রায়নের নাম ইসলাম বা আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম। উল্লেখ্য যে, সকল যুগে নবী রসুলগণ একই মতাদর্শের উপরেই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের সকলের ধর্মাদর্শ এক। তাই এখানে বলা হয়েছে 'এটা তো একই জাতি'। সুতরাং আল্লাহ্‌র নিকটে তাঁর মনোনীত ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণীয় নয়। অন্য এক আয়াতে বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— 'কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করলে, তার ধর্ম কখনো কবুল করা হবে না।' এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— তোমরা আমার নবী রসুলগণের অনুসরণ করে যে দলগুলো সৃষ্টি করেছো, সে দলগুলো মূলতঃ এক, একই জাতি। আর আমিই তোমাদের স্রষ্টা ও প্রভুপালনকর্তা। অতএব তোমরা কেবল আমার ইবাদত করো।

এর পরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— 'কিন্তু মানুষ নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা মতাদর্শ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই প্রত্যানীত হবে আমার নিকট।' একথার অর্থ— কিন্তু মানুষ আমার সত্যধর্মের পাশাপাশি নির্মাণ করেছে বহুবিধ বাতিল পথ ও মত। এভাবে তারা হয়ে পড়েছে শতধাবিচ্ছিন্ন। কিন্তু তারা কি জানে না, অবশেষে সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে আমার নিকটে? তখন তো আমি অবশ্যই তাদেরকে যথোপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করবো। আমার মনোনীত ধর্মের অনুসারীদেরকে প্রদান করবো পুরস্কার। আর বাতিল ধর্মাবলম্বীদেরকে দিবো শাস্তি।

www.eelm.weebly.com

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ○
وَ حَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○ حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَ
مَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ○ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ
شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاؕ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا
بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ
اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ○ لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَاؕ وَكُلٌّ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ○ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ○

❒ সুতরাং কেহ বিশ্বাসী হইয়া সৎকর্ম করিলে তাহার কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হইবে না এবং আমি উহা লিখিয়া রাখি।

❒ ইহা সম্ভব নহে যে, যে-জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি তাহার অধিবাসীবৃন্দ ফিরিয়া আসিবে,

❒ যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং উহারা প্রতি উচ্চভূমি হইতে ছুটিয়া আসিবে।

❒ অমোঘ প্রতিশ্রুতকাল আসন্ন হইলে অবিশ্বাসীদিগের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে, উহারা বলিবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদিগের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, আমরা সীমালংঘনকারীই ছিলাম।'

❒ তোমরা এবং আল্লাহের পরিবর্তে তোমরা যাহাদিগের ইবাদত কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরাই উহাতে প্রবেশ করিবে।

❒ যদি উহারা ইলাহ্-ই হইত তবে উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিত না; উহাদিগের সকলেই উহাতে স্থায়ী হইবে,

❒ সেথায় অংশীবাদীরা করিবে চীৎকার এবং সেথায় উহারা কিছুই শুনিতে পাইবে না;

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সুতরাং কেউ আমার উপর, আমার রসুলের উপর এবং আমার রসুল কর্তৃক প্রবর্তিত শরিয়তের উপর ইমান আনবে,

www.eelm.weebly.com

তাদের পুণ্যকর্ম ও শুভপ্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করা হবে না। আমি আমার পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমল লেখক ফেরেশতাগণের মাধ্যমে তাদের সকল কর্মকাণ্ডের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখি।

পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'এটা সম্ভব নয় যে, যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীবৃন্দ ফিরে আসবে।' এখানে 'হারামুন' অর্থ অসম্ভব, যা ধারণা বা কল্পনা করা যায় না। 'আহ্লাকনাহা' অর্থ ধ্বংস করেছি অথবা ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছি। অর্থাৎ যে জনপদের অধিবাসীকে আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরূপে পাই, তাদের সকল সৎকর্ম অবশ্য ধ্বংস করে দেই। অথবা এখানে 'হারামুন' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, ওই জনপদবাসীদের তওবার সুযোগ লাভ অসম্ভব, কিংবা পৃথিবীতে তাদের পুনর্জীবন প্রাপ্তি অসম্ভব, বা শাস্তি প্রদানের জন্য পুনরুত্থান দিবসে তাদের পুনরুত্থিত না হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের অধিবাসীদের পুনর্জীবন প্রাপ্তি, তওবা, ইমান আনার সুযোগ, বিচারের ময়দানে উপস্থিত না হওয়া কোনোটাই সম্ভব নয়।

এখানে 'লা ইয়ারজ্বিউন' কথাটির 'লা' অতিরিক্ত। হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন এভাবে— যে জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের পৃথিবীতে ফিরে আসা আর সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদেরকে দেখানো হয়েছে শাস্তির ভয় এবং বিশ্বাসীদেরকে প্রচ্ছন্নভাবে দেয়া হয়েছে পুণ্যের অঙ্গীকার।

এর পরের আয়াতে (৯৬) বলা হয়েছে— 'যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তারা প্রতি উচ্চভূমি থেকে ছুটে আসবে।' উল্লেখ্য যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ দু'টি দুর্ধর্ষ জনগোষ্ঠীর নাম। কিয়ামতের কিছুদিন পূর্বে তাদেরকে বন্দী অবস্থা থেকে ছেড়ে দেয়া হবে। তখন তারা ভয়ংকর রূপ নিয়ে পঙ্গপালের মতো দলে দলে পার্বত্য অঞ্চল থেকে সমভূমিতে নেমে আসবে। হজরত নুআস ইবনে সামআনের হাদিসে এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে। আমি ওই হাদিসটি সুরা কাহফের তাফসীরে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেছি। আর এখানে 'উচ্চভূমি' কথাটি একারণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা তখন সমভূমিতে নেমে আসবে তাদের পার্বত্য আবাস থেকে।

এখানে 'ওয়া হুম' (এবং তারা) কথাটির 'হুম' (তারা) সর্বনামটি ইয়াজুজ মাজুজের স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, সর্বনামটি এখানে সমভূমির মানুষের স্থলাভিষিক্ত। আর 'ছুটে আসবে' কথাটির অর্থ হবে— মানুষেরা তখন তাদের আপনাপন সমাধিক্ষেত্র থেকে অতিদ্রুত পুনরুত্থিত হবে। মুজাহিদের ক্বেরাতে এখানকার 'হাদাবিন' (উচ্চ ভূমি থেকে) কথাটির স্থলে এসেছে 'ক্বাবরিনা' (কবর)। তার ক্বেরাতকে মান্য করলে কথাটির

www.eelm.weebly.com

অর্থ হবে— কবর থেকে ছুটে আসবে। অন্য এক আয়াতেও এরকম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন— (যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে) তখনই তারা কবর থেকে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে (সুরা ইয়াসিন)।

হজরত হুযায়ফা বিন আসাদ গিফারী বর্ণনা করেছেন, আমরা কয়েকজন নিজেদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা বলছিলাম। এমন সময় রসুল স. সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, কোন প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলে তোমরা? আমরা বললাম, কিয়ামত সম্পর্কে। তিনি স. বললেন, যতদিন পর্যন্ত দশটি নিদর্শনের প্রকাশ না ঘটবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। ওই দশটি নিদর্শন হচ্ছে— ধূম্রকুণ্ডলীর উদ্‌গীরন, দাজ্জালের আবির্ভাব, দাব্বাতুল আরদ্বের অভ্যুদয়, পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়, রসুল ঈসার অবতরণ, ইয়াজুজ মাজুজের নিষ্ক্রমণ, তিনটি স্থানের ভূমিধস— পূর্বে, পশ্চিমে ও আরব ভূখণ্ডে। সর্বশেষ নিদর্শনটির কথা তিনি স. বললেন এভাবে— ইয়েমেন থেকে বের হবে একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ড, ওই অগ্নিকুণ্ডটি মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে হাশরের প্রান্তরে। এক বর্ণনায় এসেছে, একটি আগুন তখন এডেনের একটি কূপ থেকে বের হয়ে লোকদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে হাশরের ময়দানে। অপর এক বর্ণনায় ওই ঝোড়ো বাতাসকেও রসুল স. দশটি নিদর্শনের মধ্যে গণ্য করেছেন, যা মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করবে সমুদ্রে।

এর পরের আয়াতে (৯৭) বলা হয়েছে— 'অমোঘ প্রতিশ্রুতকাল আসন্ন হলে অবিশ্বাসীদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে'। একথার অর্থ— ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাবের পরে দেখা দিবে কিয়ামতের অন্যান্য আলামত। নির্ধারিত প্রলয় হয়ে পড়বে অত্যাসন্ন। শুরুতেই কিয়ামতের ভয়াবহ রূপ দেখে ভয়ে, আতংকে ও দুশ্চিন্তায় অবিশ্বাসীদের চক্ষু হয়ে যাবে স্থির। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে তারা। হজরত হুযায়ফা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে রসুল স. বলেছেন, ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাবের পর উষ্ট্রশাবক বাহন হিসেবে উপযুক্ত হওয়ার আগেই শুরু হয়ে যাবে মহাপ্রলয়।

এরপর বলা হয়েছে— তারা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, আমরা সীমালংঘনকারীই ছিলাম।' একথার অর্থ— আতংকিত অবিশ্বাসীরা তখন বলবে, হায়, একি দুর্ভোগ! আমরা তো সত্য ধর্ম সম্পর্কে এতোদিন ছিলাম উদাসীন। না, না, আমরা তো ছিলাম আসলে আত্মঅত্যাচারী, সীমালংঘনকারী, স্বেচ্ছাচারী। হঠকারিতা ও উন্নাসিকতার কারণে এক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে আমরা গ্রহণ করেছিলাম বহুতর উপাস্যকে।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা করো, সেগুলোতো জাহান্নামের ইন্ধন।' একথার অর্থ— হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমরা এবং তোমাদের পরমপূজনীয় প্রতিমাগুলো অবশ্যই হবে জাহান্নামের ইন্ধন। এখানে 'মা তা'বুদূন' (তোমরা যাদের ইবাদত করো) কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে সামেরী কর্তৃক নির্মিত গো-বৎস মূর্তি, দেব-দেবীদের প্রতিমা ইত্যাদি নিষ্প্রাণ বস্তুসমূহকে। উপাস্যরূপে পূজিত সপ্রাণ সৃষ্টিসমূহও একথার অন্তর্ভুক্ত। যেমন—শয়তান, শয়তান প্রভাবিত মানুষ, যেমন ফেরাউন, নমরুদ ইত্যাদি। অর্থাৎ নিষ্প্রাণ প্রতিমা ও তাদের পূজকদেরকে যেমন জাহান্নামের ইন্ধন করা হবে, তেমনি জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে ফেরাউন, নমরুদ ও তাদের অনুসারীদেরকে। এভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা সুবিবেচক, জ্ঞানী, তারা কখনো নিজেদেরকে পূজনীয় বলে দাবি করে না। সুতরাং তারা এখানকার 'তোমরা যাদের উপাসনা করো' কথাটির অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন হজরত ঈসা, হজরত উযায়ের এবং ফেরেশতামণ্ডলী, যাদেরকে অংশীবাদীরা আল্লাহ্‌র কন্যা বলে বিশ্বাস করতো। উল্লেখ্য যে, একজনের পাপের কারণে অন্যজনকে অভিযুক্ত করা যায় না।

আর এখানকার 'মা তা'বুদুন' এর 'মা' সাধারণ অর্থবোধক। এরকম বলেছেন অধিকাংশ তাফসীরকার ও অভিধানবেত্তাগণ। অর্থাৎ সপ্রাণ ও অপ্রাণ সকলকিছুই কথাটির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং 'তোমরা যাদের ইবাদত করো' কথাটি এখানে বিশেষায়িত হওয়া প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বায়যাবী একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। ইবনে যাবআরী আলোচ্য আয়াত শুনে একবার জিজ্ঞেস করলেন, যে সকল পুণ্যবান ব্যক্তিত্বকে অংশীবাদীরা আল্লাহ্‌জ্ঞানে উপাসনা করে, তারাও কি 'তোমরা যাদের ইবাদত করো, সেগুলোতো জাহান্নামের ইন্ধন' কথাটির অন্তর্ভুক্ত? রসুল স. বললেন, না। আবু দাউদ, ইবনে মুনজির, ইবনে মারদুবিয়া এবং তিবরানীও হাদিসটির বর্ণনাকারী।

'হাসাবু জাহান্নাম' অর্থ জাহান্নামের ইন্ধন বা জ্বালানী, যার দ্বারা জাহান্নামের আগুনকে করা হবে আরো অধিক প্রজ্জ্বলিত। 'হাসাবাহু' অর্থ পাথর বর্ষণ করা হবে। আর 'হাসাবাহু' অর্থ প্রস্তরখণ্ড। এরকম বলেছেন জুহাক। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, ইয়েমেনী ভাষায় হাসাব্‌ অর্থ জ্বালানী কাঠ। ইকরামা বলেছেন, শব্দটি আবিসিনীয়। এর অর্থ— জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত কাষ্ঠখণ্ড। বাগবী বলেছেন, হজরত আলী এখানকার 'হাসাব' শব্দটির অর্থ করেছেন 'হাত্বাব' (ইন্ধন)।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে 'তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে' (আনতুম লাহা ওয়ারিদূন)। এখানকার 'লাহা' শব্দের 'লাম' অক্ষরটি বিশেষত্ব প্রকাশক। তাই 'তোমরা' বলে এখানে বোঝানো হয়েছে মুশরিক জনগোষ্ঠীকে। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— হে মুশরিক জনসাধারণ! তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তোমাদের পূজিত প্রতিমাগুলোকে নিয়ে।

এর পরের আয়াতে (৯৯) বলা হয়েছে— 'যদি তারা ইলাহ্-ই হতো, তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো না; তাদের সকলেই তাতে স্থায়ী হবে'। একথার অর্থ অংশীবাদীদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করার পর তাদেরকে তিরস্কার করা হবে এই বলে, দেখো এখন তোমাদের উপাস্যগুলোর অবস্থা। প্রকৃত উপাস্য যদি তারা হতো, তবে এভাবে তারা কখনোই দোজখে প্রবেশ করতো না। এভাবে তাদের সকলকে বানানো হবে দোজখের চিরস্থায়ী অধিবাসী।

এর পরের আয়াতে (১০০) বলা হয়েছে— 'সেখানে অংশীবাদীরা করবে চিৎকার এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না।' এখানে 'যাফীর' অর্থ শ্বাসরুদ্ধকর আর্তনাদ বা চিৎকার। ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, দোজখের মধ্যে যারা আর্তনাদ করতে থাকবে তাদেরকে বন্দী করা হবে লোহার সিন্দুকে। তারপর পেরেক মেরে দেয়া হবে ভালো করে। এরপরে সিন্দুকটিকে আরেকটি লোহার মজবুত সিন্দুকের মধ্যে ভরে ফেলা হবে এবং পেরেক মেরে পুনরায় বন্ধ করা হবে সেটিকেও। তখন তাদের মনে হবে আমাকে ছাড়া আর কাউকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ কেউ তখন কারো আর্তনাদ আর শুনতে পাবে না। এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর হজরত ইবনে মাসউদ পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত। বাগবী তাঁর বর্ণনায় লোহার সিন্দুক ও লোহার পেরেকের স্থলে উল্লেখ করেছেন আগুনের সিন্দুক ও আগুনের পেরেকের কথা।

হাকেম প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত করো সেগুলোতো জাহান্নামের ইন্ধন' যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন অংশীবাদীরা বললো, উপাসনাতো ঈসা, উযায়ের ও ফেরেশতাদেরও করা হয়। তাহলে কি তারাও দোজখে প্রবেশ করবে? তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ○ لَا يَسْمَعُونَ
حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ○ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ
الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ○ يَوْمَ نَطْوِي
السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا
فَاعِلِينَ ○ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا
عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ○ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ○

❐ যাহাদিগের জন্য আমার নিকট হইতে পূর্ব হইতে কল্যাণ নির্ধারিত রহিয়াছে তাহাদিগকে উহা হইতে দূরে রাখা হইবে।

❐ তাহারা উহার ক্ষীণতম শব্দও শুনিবে না এবং সেথায় তাহারা তাহাদিগের মন যাহা চাহে চিরকাল উহা ভোগ করিবে।

❐ মহা ভীতি তাহাদিগকে বিষাদ-ক্লিষ্ট করিবে না এবং ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবে এই বলিয়া, 'এই তোমাদিগের সেই দিন যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।'

❐ সেই দিন আকাশমণ্ডলীকে গুটাইয়া ফেলিব যে ভাবে গুটান হয় লিখিত দফতর; যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করিবই।

❐ আমি 'উপদেশের' পর কিতাবে লিখিয়া দিয়াছি যে আমার যোগ্যতাসম্পন্ন দাসগণ পৃথিবীর অধিকারী হইবে।

❐ ইহাতে রহিয়াছে বাণী সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা ইবাদত করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমার নিকট থেকে যাদের জন্য পূর্বাহ্নে নির্ধারিত রয়েছে মর্যাদা, নৈকট্য, উত্তম স্বভাব, সৌভাগ্য, আনুগত্য, জান্নাত ইত্যাকার কল্যাণ, তাদেরকে রাখা হবে দোজখ থেকে অনেক দূরে। জুনায়েদ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সৃষ্টির সূচনালগ্নে যারা আমার কল্যাণ লাভ করেছে, তারা অবশেষে আমার বেলায়েত অথবা নৈকট্য লাভ করে ধন্য হবে এবং তাদেরকে রাখা হবে অসন্তোষ থেকে দূরে।

www.eelm.weebly.com

ইবনে মারদুবিয়া এবং আলমুখতার গ্রন্থে জীয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার আবদুল্লাহ্ ইবনে যাবআরী রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, 'মোহাম্মদ! তুমি কি দাবি করো, 'তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা করো সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন'— এ আয়াত তোমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। ইবনে যাবআরী বললো, উপাসনা তো চন্দ্র, সূর্য, ফেরেশতা এবং উযায়ের-ঈসারও করা হয়। তবে তারা কি সকলেই আমাদের পূজিত প্রতিমাগুলোর সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ করবে? তখন তার ওই অপকথনকে প্রত্যাখ্যান করে অবতীর্ণ হলো— 'যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব থেকে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে, তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখা হবে।'

বাগবী লিখেছেন, একবার কাবাগৃহের প্রাঙ্গণে রসুল স. এর সঙ্গে সাক্ষাত ঘটলো কতিপয় কুরায়েশ গোত্রপতির। রসুল স. এর সঙ্গে কথা বলার জন্য তাদের মধ্য থেকে এগিয়ে এলো নজর বিন হারেছ। তিনি স. তাকে আলোচ্য সুরার ৯৮, ৯৯ ও ১০০ সংখ্যক আয়াত পড়ে শোনালেন। নজর বিন হারেছ নিশ্চুপ হয়ে গেলো। ইত্যবসরে সেখানে উপস্থিত হলো ইবনে যাবআরী। ওলিদ ইবনে মুগীরা তখন রসুল স. এর আবৃত্তিকৃত আয়াত তিনটির উল্লেখ করলো। ইবনে যাবআরী বললো, মোহাম্মদ তুমি কি সত্যি সত্যি এরকম বলেছো? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। ইবনে যাবআরী বললো, ইহুদীরা উযায়েরের, খৃষ্টানেরা ঈসার এবং আইলাহ্ গোত্রের লোকেরা কি ফেরেশতাদের উপাসনা করে না? রসুল স. বললেন, না। তারা তো পূজা করে শয়তানের। একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— 'যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব থেকে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে, তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখা হবে।' আর ইবনে যাবআরী সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো— 'মা দ্বরাবুহু লাকা ইল্লা জ্বাদালান্ বালহুম ক্বওমুন খসিমূন' (তারা তার দৃষ্টান্ত আরোপ করছে শুধুমাত্র কলহ করার জন্য। তারাতো কলহপ্রবণ সম্প্রদায়)। ওয়াহেদীও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনা এনেছেন।

উসুলে কিতাবের কোনো কোনো অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে, রসুল স. তখন ইবনে যাবআরীকে বললেন, তোমরা তোমাদের মাতৃভাষা সম্পর্কে কতোই না অজ্ঞ। তোমরা কি একথাও জানো না যে 'তোমরা যাদের ইবাদত করো' বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে 'মা তা'বুদূন'। আর 'মা' ব্যবহৃত হয় কেবল অচেতন বস্তু সম্পর্কে (ঈসা, উযায়ের ও ফেরেশতা তো অচেতন কোনো সৃষ্টি নয়। সুতরাং জাহান্নামের ইন্ধন তাঁরা হবেন কীভাবে)। হাদিসগ্রন্থসমূহে কিন্তু এরকম বলা হয়নি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'ইন্নাল্লাজীনা' (যাদের জন্য) কথাটির অর্থ হবে 'ইল্লাল্লাজীনা' (তারা ব্যতীত)। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। কারণ ১. আরবী ভাষায় কখনো 'ইন্না' ইসতেসনা (ব্যতিক্রমী) অর্থে আসে না।

www.eelm.weebly.com

২. কোনো কোনো লোক ইসতেসনা মুনফাসিল (বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমী) কে বৈধ বললেও সাধারণভাবে এর ব্যবহার ঘটে যোগাযোগের ক্ষেত্রে। আর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার যে কারণ আমি বর্ণনা করেছি, তা হচ্ছে নিষ্পত্তিমূলক প্রমাণ। সে কারণেই অধিকাংশ আলেম আলোচ্য আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতা থেকে পৃথক বলে গণ্য করেছেন। অবশ্য হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা দ্বারা আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য, পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে মনে হয়। কিন্তু সাধারণ সাহাবীগণের অভিমত এর বিপরীত। ইমাম আবু হানিফার মতে ওই বাক্যই পৃথক বাক্য, যা যতিচিহ্নের পরে নতুন করে শুরু হয় এবং যা বর্ণিত হয় সময়ের ব্যবধানে। আর নাসেখ-মনসুখের (রহিতকারী ও রহিতের) নিয়মও এখানে প্রযোজ্য হবে না। কারণ আলোচ্য আয়াত বিজ্ঞপ্তিমূলক, নির্দেশপ্রকাশক নয়। এক নির্দেশকে রহিত করে তদস্থলে অন্য নির্দেশ আরোপ করা যায়, কিন্তু কোনো বিজ্ঞপ্তিকে অন্য বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রহিত করা যায় না। কেননা এরকম করলে পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিটি হয়ে যায় মিথ্যা।

আবু দাউদ, ইবনে আবী হাতেম ও সা'লাবীর বর্ণনায় এবং ইবনে মারদুবিয়ার তাফসীরে এসেছে, একবার হজরত আলী বক্তৃতা প্রদান করলেন। বক্তৃতার মধ্যে আলোচ্য আয়াত আবৃত্তি করার পর বললেন, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের জন্য পূর্বাহ্নে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে কল্যাণ। হজরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, তালহা, যোবায়ের, সা'দ, আবদুর রহমান বিন আউফ এবং আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্‌ও এ দলের অন্তর্ভূত। বক্তৃতা শেষে নামাজের জন্য ইকামত দেয়া হলো।

পরের আয়াতে (১০২) বলা হয়েছে— 'তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং সেখানে তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে।' একথার অর্থ— যাদের জন্যে পূর্বাহ্নে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে, তারা দোজখ থেকে এতো দূরে থাকবে যে, সেখানকার আর্তনাদ ও কোলাহলের ক্ষীণতম আওয়াজও তারা শুনতে পাবে না। আর সেখানে তাদের মন যা চাইবে, চিরকাল তারা তা-ই সম্ভোগ করতে পারবে। এখানে 'ফীমা' শব্দটিকে 'খলিদূন' শব্দটির পূর্বে ব্যবহার করে ওই সকল জান্নাতবাসীদের বিশেষত্ব ও গুরুত্বকে প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সুফীসাধকগণের মনে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও দীদার ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। তাই জান্নাতেও তাঁরা আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন নৈকট্য ও দর্শনের আনন্দই চিরকাল উপভোগ করতে থাকবেন।

এর পরের আয়াতে (১০৩) বলা হয়েছে— 'মহাভীতি তাদেরকে বিষাদক্লিষ্ট করবে না'। এখানে 'ফাযাউ'ল আকবার' (মহাভীতি) অর্থ কিয়ামতের সময়ের শিঙ্গার শেষ ফুৎকার। হজরত ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে বাগবী এরকম লিখেছেন। কেননা শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের সময় সকলেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে।

www.eelm.weebly.com

সুতরাং তখন আর কারো ভয়ভীতির অবকাশ থাকবে না। এক আয়াতে সে কথা বলা হয়েছে এভাবে— 'এবং যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হবে' (সুরা যুমার)।

আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাসের 'শেষ ফুৎকার' কথাটির অর্থ হবে ওই ফুৎকার, যা ধ্বনিত হবে পৃথিবীর অন্তিম সময়ে। অর্থাৎ প্রথম ফুৎকার। কেউ কেউ বলেছেন, যে ফুৎকারের ফলে পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হবে, সেই ফুৎকারকেই এখানে বলা হয়েছে মহাভীতি। এই উক্তি ও আমার উক্তির মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। কেননা শিঙ্গার প্রথম আওয়াজেই সকলে মূর্ছিত হবে ও মৃত্যুবরণ করবে। কুরতুবীও এই অভিমতটিকে সমর্থন করেছেন। এর কারণ হচ্ছে, অধিকাংশ হাদিসে কেবল দু'বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার কথা বলা হয়েছে। একটি ধ্বংসের ফুৎকার, আরেকটি পুনরুত্থানের। ইবনে আরাবী বলেছেন, ফুৎকার দেয়া হবে *তিনটি— ১. মহাভীতির ফুৎকার ২. মৃত্যুর ফুৎকার ৩. পুনরুত্থানের ফুৎকার।* আমি বলি এই অভিমতটিই যথার্থ।

ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে, তিবরানী, আবু ইয়া'লী, বায়হাকী, আবু মুসা মাদিনী, আলী বিন সাঈদ এবং আবু শায়েখ তাঁদের আপন আপন গ্রন্থে এবং আব্দ ইবনে হুমাইদের বর্ণনায় হজরত আবু হোরায়রা থেকে একটি দীর্ঘ হাদিস এসেছে। ওই হাদিসে রয়েছে তিনটি ফুৎকারের কথা— ভীতির, মৃত্যুর ও পুনরুত্থানের। ওই হাদিসে উল্লেখিত 'ফাযাউ' (ভীতি) শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যা আমরা করেছি সুরা আন্ নমলের তাফসীরে।

হাসান বলেছেন, মহাভীতি প্রকাশিত হবে তখন, যখন মানুষকে দোজখের দিকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়া হবে। ইবনে জারীর বলেছেন, মৃত্যুকে যখন জবাই করা হবে এবং যখন ঘোষিত হবে। হে দোজখবাসী, দোজখের মধ্যে তোমরা চিরদিন থাকবে মৃত্যুহীন অবস্থায় তখন দেখা দিবে মহাভীতি। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও জুহাক বলেছেন, কোনো কোনো দোজখীকে নিষ্কৃতি প্রদানের পর যখন দোজখের প্রবেশপথ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হবে, তখনই প্রকাশ পাবে মহাভীতি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে একথা বলে, এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিলো।' একথার অর্থ— জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতের দিকে প্রবেশ করতে শুরু করবে, তখন জান্নাতের দরজায় ফেরেশতারা তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে এবং বলবে, আজ সেই দিন, যে দিন সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে — 'সেদিন আকাশমণ্ডলী গুটিয়ে ফেলবো যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দপ্তর।' একথার অর্থ— কিয়ামতের দিন আমি আকাশসমূহকে ভাঁজ করে ফেলবো, যেভাবে লেখার জন্য ভাঁজ করা হয় কাগজকে। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও অধিকাংশ আলেম বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— অনেক লেখার পর যেভাবে কাগজকে ভাঁজ করে রাখা হয়, সেভাবে আমি সেদিন আকাশসমূহকে ভাঁজ করে ফেলবো। এখানে 'সিজিল্লি' অর্থ কাগজ। সুদ্দী বলেছেন, ওই ফেরেশতার নাম সিজিল্লি, যে মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করে। আর এখানকার 'লিলকুতুব' (লিখিত দপ্তর) কথাটির 'লাম' অক্ষরটি একটি বাড়তি সংযোজন। যেমন 'রাদিফা লাকুম' কথাটির 'লাম' অতিরিক্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সিজিল্লি ফেরেশতা যেভাবে আমলনামাকে গুটিয়ে নেয়, সেভাবে আমি সেদিন গুটিয়ে নিবো আকাশগুলোকে। এরকমও বলা যায় যে, রসুল স. এর একজন ওহী লেখক সাহাবীর নাম ছিলো সিজিল্লি।

কামুস প্রণেতা লিখেছেন, লিখিত অঙ্গীকারনামাকে বলে কুতুবুস্‌সিজ্‌জিল। এর বহুবচন সাজালাত। আবিসিনীয় ভাষায় সিজিল বলা হয় লেখককে। রসুল স. এর একজন লেখকের নামও ছিলো সিজিল। আর সিজিল একটি ফেরেশতারও নাম, যে হিসাব কিতাব লেখে। এরকমও বলা হয়েছে, যে পাথরের উপরে কিছু লিখে রাখা হয়, সেই পাথরকে বলে সিজল্লুন। আর সাধারণভাবে সকল মুদ্রিত বস্তুকেও সিজিল বলা যায়।

এরপরে বলা হয়েছে— 'যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেই ভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো।' এ কথার অর্থ— যে ভাবে আমি আমার অপার পরাক্রমের নিদর্শনরূপে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সকল কিছু ধ্বংস করার পর আমি সে ভাবেই সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করবো। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় সৃষ্টি আমার মহা পরাক্রমের বেষ্টনীভূত। কেউ কেউ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— প্রথমবারের সৃষ্টি যেমন আমার কুদরতের অধীনে প্রকাশিত হয়েছিলো, তেমনিভাবে দ্বিতীয়বারের সৃষ্টিও অন্তর্ভুক্ত হবে আমার মহা সৃজনীশক্তির। অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টি যেহেতু সম্ভব হয়েছে, সেহেতু পরের সৃষ্টি অবশ্যই সম্ভব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দ্বিতীয় সৃষ্টি কি প্রথম সৃষ্টির অনুরূপ হবে, না হবে ভিন্নতর? এমতো প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় সৃষ্টি হবে অবিকল সমআকৃতিবিশিষ্ট ও সমগুণসম্পন্ন। সত্তাগত দিক থেকেও উভয় সৃষ্টি হবে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার ভাষণদানের জন্য দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন, হে জনতা! তোমরা খালি গায়ে খালি পায়ে কবর থেকে উঠে আল্লাহ্‌র সকাশে

www.eelm.weebly.com

উপস্থিত হবে। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন— 'যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো।' এরপর তিনি স. বললেন, তখন সর্বপ্রথম পোশাক পরিধান করানো হবে পিতা ইব্রাহিমকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবোই।' একথার অর্থ— প্রতিশ্রুতি পালনকে আমি আমার অবশ্যকর্তব্য বলে নির্ধারণ করেছি, যদিও আমি বাধ্যতা ও ঔচিত্য থেকে মুক্ত ও পবিত্র। সুতরাং পুণ্যবানদেরকে পুরস্কৃত এবং পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান আমি করবোই।

এর পরের আয়াতে (১০৫) বলা হয়েছে— 'আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন দাসগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে।' হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'যাবুর' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে সকল আসমানী কিতাবকে। আর 'জিক্‌র' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে লওহে মাহ্‌ফুজকে। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আমি লওহে মাহফুজে মুদ্রিত করার পর অবতারিত আসমানী কিতাবসমূহে একথা লিখে দিয়েছি যে, ইমান ও পুণ্যকর্মে যারা যোগ্য, আমার সেই সকল বান্দাকে আমি অধিকারী করবো জান্নাতের জমিনের।

শা'বী বলেছেন, এখানে 'যাবুর' শব্দটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে হজরত দাউদের উপর অবতীর্ণ যবুর কিতাবকে এবং 'জিক্‌র' দ্বারা বুঝানো হয়েছে কোরআন পাককে।

একটি প্রশ্নঃ এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র যোগ্যতাসম্পন্ন দাসগণকে জান্নাতের জমিনের অধিকারী করে দেয়ার কথা। তাহলে গোনাহ্‌গার ইমানদারেরা কি জান্নাতে প্রবেশ করবে না?

উত্তরঃ পাপী বিশ্বাসীরা পাপমোচনের পর পুণ্যবান বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই তখন তাদেরকে মিলিয়ে দেয়া হবে পুণ্যবান বিশ্বাসীদের সঙ্গে জান্নাতে।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে ইবাদিয়াস্ সলিহূন' (যোগ্যতাসম্পন্ন দাসগণ) বলে বোঝানো হয়েছে উম্মতে মোহাম্মদীকে। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা প্রবেশ করে বলবে, প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির, আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো (সুরা যুমার)। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'আল আরদ্ব' (পৃথিবী) অর্থ 'আরদ্ব মুকাদ্দাসা' বা পবিত্রভূমি। আর 'যোগ্যতাসম্পন্ন দাস' কথাটির অর্থ ওই সকল লোক, পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত অধিকার করার ব্যাপারে যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আল আরদ্ব' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সাম্রাজ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমার যোগ্যতাসম্পন্ন দাসেরা অধিকার করে নিবে কাফেরদের রাজ্য। এটা ছিলো একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী। এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর অর্থ ইসলাম বিজয়ী হবে এবং মুসলমানেরা অধিকার করে নেবে কাফেরদের দেশ। আমি বলি, এখানে 'আল আরদ্ব' কথাটির অর্থ হবে সমগ্র ভূখণ্ড।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মেকদাদ বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, সমগ্র পৃথিবীর সকল গৃহে আল্লাহ্ ইসলামের বাণী পৌঁছাবেন। আর ইসলামের মাধ্যমে সম্মানী ব্যক্তিরা তো সম্মানার্হ হবেই, সম্বলহীনেরাও হবে ইসলামের আভিজাত্যে অলংকৃত। অথবা বাধ্যতামূলকভাবে হলেও অপদস্থতার সঙ্গে সকলকে মেনে নিতে হবে ইসলামের বিজয়কে। হজরত মেকদাদ বলেছেন, আমি বলি, ওই সকল মানুষ হবে আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের অনুসারী।

এর পরের আয়াতে (১০৬) বলা হয়েছে— 'এতে রয়েছে বাণী সেই সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ইবাদত করে।' এ কথার অর্থ— নিশ্চয় এই কোরআনে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তার সকল কিছুই জান্নাতে পৌঁছানোর বাণী বা নির্দেশনা, ওই সকল বিশ্বাসীদের জন্য, যারা বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্র ইবাদতে সমর্পিত হয়। অর্থাৎ গন্তব্যাভিসারী মুসাফিরদের পাথেয় যেরূপ, জান্নাতের পথযাত্রীদের জন্যও কোরআন সেরূপ অমূল্য অবলম্বন। অথবা 'বালাগান্' (বাণী) শব্দটির অর্থ এখানে— সাফল্যের মাধ্যম। অর্থাৎ এই কোরআনের উপদেশাবলীকে যে বিশ্বাসে ও কর্মে মান্য করে চলবে, সে অবশ্যই পৌঁছে যাবে তার কাংখিত গন্তব্যে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'যারা ইবাদত করে' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ধর্মজ্ঞান সম্পন্ন বিদ্বজ্জনকে। হজরত কা'ব আহ্বার বলেছেন, কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে ওই সকল উম্মতকে, যারা যথানিয়মে সম্পন্ন করে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ও রমজান মাসের রোজা।

সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ
وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ وَاِنْ
اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ○ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ
يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ○ وَاِنْ اَدْرِيْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○ قٰلَ
رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ○

❒ আমি তো তোমাকে বিশ্ব-জগতের প্রতি কেবল আশিসরূপেই প্রেরণ করিয়াছি।

www.eelm.weebly.com

❒ বল 'আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদিগের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্, সুতরাং তোমরা হইয়া যাও আত্মসমর্পণকারী।'

❒ তবে উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে তুমি বলিও, 'আমি তোমাদিগকে যথাযথভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছি এবং আমি জানি না তোমাদিগকে যে-বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে তাহা আসন্ন না দূরস্থিত।

❒ তিনি জানেন যাহা কথায় ব্যক্ত এবং যাহা তোমরা গোপন কর।

❒ 'আমি জানি না হয়ত এই অবকাশ তোমাদিগের জন্য এক পরীক্ষা এবং জীবনোপভোগ কিছুকালের জন্য।'

❒ রসূল বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি ন্যায়ের সহিত ফয়সালা করিয়া দিও, আমাদিগের প্রতিপালক তো দয়াময়, তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র সাহায্যস্থল তিনিই।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রহমাতাল্লিল আ'লামীন (আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল আশিসরূপেই প্রেরণ করেছি)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি তো আপনাকে রহমতরূপে প্রেরণ করেছি জ্বিন ও ইনসানের জন্য। অথবা— আপনিই জগতবাসীদের জন্য রহমতপ্রাপ্তির কারণ বা মাধ্যম, কিংবা— আপনি জ্বিন ও মানুষকে দয়া করতে চান, তাই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি তাদের পথপ্রদর্শক রূপে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাকেম এবং অপরিণতসূত্রে আবু সালেহের মাধ্যমে ইবনে সা'দ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি রহমতের দূত। বোখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে রহমতরূপে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের সম্পৃক্তি রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত 'বাণী' (কোরআন) কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ কোরআন যেহেতু জান্নাতের পাথেয়, সেহেতু যার উপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি অবশ্যই রহমত বা আশিস। এভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, আমার রেসালত মানুষের সৌভাগ্য লাভের কারণ এবং মানুষের ইহ-পরকালকে অর্থবহ করবার মাধ্যম বা নিশ্চয়তা। সুতরাং রহমতরূপী এই অনন্য ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে যারা অস্বীকার করে, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করে। রহমত বিতরণ, প্রদান বা বর্ষণের মধ্যে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। তারতম্য ঘটে যায় কেবল গ্রহীতার দিক থেকে, দাতার দিক থেকে নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল পৃথিবী বাসীদের জন্য রসুল স. হচ্ছেন রহমত। তাই পৃথিবীতে পূর্ববর্তী জামানার মতো সর্বগ্রাসী কোনো আযাব আসে না। সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না কোনো

www.eelm.weebly.com

জনপদ, বিকৃত হয় না কারো আকৃতি। এতদসত্ত্বেও দেখা যায়, রসুল স. এর সময় ও পরবর্তীতে কাফেরদের উপরে নেমে এসেছিলো পরাজয়, বন্দিত্ব অথবা নিধনের আযাব। এরকম হওয়ার কারণ হচ্ছে, অবিশ্বাসীরা কিছুতেই রসুল স. এর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় নিতে সম্মত হয়নি। আল্লাহ্র এই বিশেষ আশিসকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। সুতরাং এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, রসুল স. বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল পৃথিবীবাসীর জন্য রহমত নন।

পরের আয়াতে (১০৮) বলা হয়েছে; 'বলো, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্, সুতরাং তোমরা হয়ে যাও আত্মসমর্পণকারী।'

কোরআনে কেবল আল্লাহ্র একমাত্র উপাস্য হওয়ার কথা বর্ণিত হয় নি, বর্ণিত হয়েছে আরো অনেক কিছু। যেমন— বিভিন্ন বিধান, অতীত যুগের অনেক সম্প্রদায়ের কাহিনী, নবী-রসুলগণের ইতিবৃত্ত, চির স্বস্তি ও চির শাস্তির অঙ্গীকার, বেহেশত-দোজখ, হিসাব-কিতাব ও মহাপ্রলয়ের অনিবার্যতা। আরো বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী ও কার্যকলাপের প্রসঙ্গ, জ্ঞান ও কর্মের বিভিন্নমুখী আলোচনা, জীবন-মৃত্যুর তত্ত্ব, তথ্য ও নির্দেশনা ইত্যাদি। সুতরাং একথা কীভাবে বলা যেতে পারে যে, কোরআনে কেবল 'তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্' এই কথাটি প্রত্যাদেশ করা হয়? এর জবাবে বলা যায়, প্রত্যাদেশের মূল ভিত্তি হচ্ছে তওহীদ বা আল্লাহ্র এককত্ব। অন্যান্য বিষয়াবলী এই তওহীদেরই সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তৃত শাখা প্রশাখা। সুতরাং কোরআনে কেবল তওহীদের প্রত্যাদেশ করা হয়, এমতো উক্তি অসঙ্গত নয়। অথবা এখানকার বক্তব্যটি এরকম— আল্লাহ্র ইবাদত বিষয়ক যে প্রত্যাদেশ আমার কাছে আসে, তার মূল মর্ম হচ্ছে— তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য।

একটি প্রশ্নঃ তওহীদই যদি ওহী বা প্রত্যাদেশের মূলমর্ম হয়, তবে রেসালতের প্রয়োজন আর অবশিষ্ট থাকে কীভাবে? তাছাড়া তওহীদের মূলমর্ম জেনে নেয়ার পর প্রত্যাদেশের প্রয়োজনই বা আর থাকে কোথায়?

উত্তরঃ তওহীদের বার্তাতো অবশ্যই প্রচারযোগ্য একটি বিষয়। রেসালত তো ওই প্রচারেরই নাম। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন প্রচার ব্যতিরেকে তওহীদের বাণী মানুষের কাছে কীভাবে পৌছানো সম্ভব? তওহীদের মতো রেসালতও ধর্মের একটি অপরিহার্য ভিত্তি।

'সুতরাং তোমরা হয়ে যাও আত্মসমর্পণকারী।' কথাটির অর্থ তোমরা আল্লাহ্কে বিশুদ্ধচিত্ততার সঙ্গে মান্য করো এবং কেবল তাঁর ইবাদতে রত হও। বাস্তবায়িত করো প্রত্যাদেশের উদ্দেশ্যকে। নিজেকে প্রস্তুত করো আল্লাহ্র রহমত লাভের যোগ্য গ্রহীতারূপে।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (১০৯) বলা হয়েছে— 'তবে তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে তুমি বোলো আমি তোমাদেরকে যথাযথভাবে সতর্ক করে দিয়েছি।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এভাবে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে পরিপূর্ণরূপে সত্য উদঘাটনের পরেও তারা যদি আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি তাদেরকে বলুন, আমি কিন্তু আমার দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করেছি। সময় থাকতে তোমাদের সকলকে সতর্ক করে দিয়েছি।

'যথাযথরূপে সতর্ক করে দিয়েছি' কথাটির উদ্দেশ্য এখানে— আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশরূপে অবতীর্ণ হয়েছে, তার কোনো কিছুই আমি তোমাদের কাছে গোপন রাখিনি। একথার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট শিয়াদের মতবাদ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তারা বলে, ইমামগণ তাদের বিশিষ্ট সঙ্গীসাথীদেরকে শরিয়তের নির্দেশাদি সঙ্গোপনে শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, দেয়ালেরও কান আছে। অথবা উদ্ধৃত বাক্যের উদ্দেশ্য এরকমও হতে পারে যে, সত্যধর্ম সম্পর্কে যা কিছু আমাকে জানানো হয়েছে, তার সকল কিছু আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি। কিংবা উদ্দেশ্য হতে পারে এরকম— সুস্পষ্টরূপে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি আল্লাহ্‌র আহকাম, কিছুই গোপন করিনি। কেউ কেউ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি এই সত্য ধর্মের বচনাবলীকে সুদৃঢ় প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছি। সকল কিছুই উপস্থাপন করেছি দলিল প্রমাণ সহকারে।

এরপরে বলা হয়েছে— 'এবং আমি জানি না তোমাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা আসন্ন না দূরস্থিত।' এ কথার অর্থ— ইসলামের বিজয়, কিয়ামত, হাশর-নশর এ সকল কিছু অবশ্যই সংঘটিত হবে। বিষয়টি নিঃসন্দিগ্ধ। কিন্তু তা কখন সংঘটিত হবে তা আমি তোমাদেরকে জানাতে পারবো না। হয়তো তা অত্যাসন্ন, অথবা দূরবর্তী।

এর পরের আয়াতে (১১০) বলা হয়েছে— 'তিনি জানেন যা কথায় ব্যক্ত এবং যা তোমরা গোপন করো।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ সকলের এবং সকল কিছুর প্রকাশ্য ও গোপন সম্পর্কে সম্যক অবগত। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। সুতরাং যথাসময়ে তোমাদের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলরূপে তিনি তোমাদের জন্য নির্ধারণ করবেন চিরন্তন স্বস্তি, অথবা চিরস্থায়ী শাস্তি। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে বিশুদ্ধচিত্ততা অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে বিশ্বাসীদেরকে এবং হুমকি দেয়া হয়েছে কপট, অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদেরকে।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (১১১) বলা হয়েছে— 'আমি জানি না হয়তো এই অবকাশ তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং জীবনোপভোগ কিছুকালের জন্য।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ক্রমাগত সত্যপ্রত্যাখ্যান করে চলেছো। অথচ এখনো তোমরা রয়েছো আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্ত। আমি জানি না তোমাদেরকে এভাবে অবকাশ দেয়া হচ্ছে কেনো। হয়তো এটা তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা। এমতো অবকাশ প্রদানের মাধ্যমে মনে হয় তোমাদেরকে করা হচ্ছে আরো কঠিন শাস্তির উপযুক্ত। কিংবা শাস্তি বিলম্বিত করে তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে সংশোধনের সুযোগ। এখন তোমরা বিশুদ্ধ তওবার মাধ্যমে সত্যধর্মের আশ্রয়ে ফিরে আসবে কি না; তা তোমরা জানো, আমি জানি না। তবে একথাটিও তোমরা ভালো করে জেনে রাখো যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত অবকাশ চিরকালীন নয়। এই জীবনোপভোগ মাত্র কিছুকালের জন্য।

জালালউদ্দিন মাহাল্লী লিখেছেন, এখানকার 'লাআল্লা' কথাটি সর্বত্র ব্যবহৃত হয় আকাংখা প্রকাশের ক্ষেত্রে। ফেত্না বা পরীক্ষার সঙ্গে শব্দটির সম্পৃক্তি অসঙ্গত। তাই এই অসঙ্গতি দূরীকরণার্থে আলোচ্য আয়াত শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, 'মাতাউ'ন ইলা হীন' (এবং জীবনোপভোগ কিছুকালের জন্য)।

সর্বশেষ আয়াতে (১১২) বলা হয়েছে— 'রসুল বলেছিলো, হে আমার প্রতিপালক, তুমি ন্যায়ের সঙ্গে ফয়সালা করে দিয়ো, আমাদের প্রতিপালকতো দয়াময়, তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র সাহায্যস্থল তিনিই।' প্রকাশ থাকে যে, ন্যায়ের সঙ্গে ফয়সালা করার অর্থ, অবিশ্বাসীদের শাস্তিদান করা এবং বিশ্বাসীদেরকে অত্যাচারিত অবস্থা থেকে মুক্ত করা। এখানে 'আর্রহ্মান' অর্থ দয়াময় বা রহমতবর্ষণকারী। 'আলমুসতাআন' অর্থ ওই সত্তা, যার শরণ প্রার্থনা করা হয়। 'আ'লা মা তাসিফূন' (তোমরা যা বলছো) অর্থ হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়! 'মোহাম্মদের কথা সত্য হলে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করো'— এ ধরনের অপবিত্র ও ভয়াবহ উক্তি যারা করো, অথবা 'আল্লাহ্র সন্তান রয়েছে', 'মোহাম্মদ যাদুকর', 'কোরআন মজীদ কবিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়'— এরকম কথা যারা বলো।

'সে বিষয়ে একমাত্র সাহায্যস্থল তিনিই' কথাটির অর্থ তোমাদের ওই সকল অপবচন থেকে আমি আল্লাহ্র শরণ প্রার্থনা করি। অংশীবাদিতাসম্ভূত ওই সকল উক্তি থেকে আমার প্রভুপালনকর্তা সতত মুক্ত ও পবিত্র। তিনি রহমান, রহীম ও

www.eelm.weebly.com

সাহায্যদাতা। তাই আমি কেবল তাঁরই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি। বলাবাহুল্য যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত রসুল স. এর বিশেষ প্রার্থনা আল্লাহ্ কবুল করে নিয়েছিলেন। রসুল স. ও তাঁর অনুসারীদেরকে কিছুকাল পরে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন বদর প্রান্তরে। ফলে শোচনীয়রূপে পরাজিত হয়েছিলো অংশীবাদীরা। আর মুসলমানেরা পেয়েছিলো কাংখিত বিজয়।

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন। ওয়া সল্লাল্লাহু তায়ালা আ'লা খইরি খলক্বিহি মুহাম্মাদ। সুরা আম্বিয়ার তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ ২৫শে জমাদিউস্ সানি মঙ্গলবার, ১২০৩ হিজরীতে।

সপ্তম খণ্ড শেষ

www.eelm.weebly.com

সপ্তদশ পারা

সূরা হাজ্জ্ব : আয়াত ১, ২, ৩, ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِيْمٌ ۝ يَوْمَ
تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ
حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ
شَدِيْدٌ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ
شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ۝ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ
اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝

❒ হে মানুষ! ভয় কর তোমাদিগের প্রতিপালককে, কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার।

❒ যেদিন তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিবে সেদিন দেখিতে পাইবে প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হইবে তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিবে, মানুষকে দেখিবে মাতাল-সদৃশ, যদিও উহারা নেশাগ্রস্ত নহে। বস্তুতঃ আল্লাহের শাস্তি কঠিন।

❒ মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের।

www.eelm.weebly.com

❐ শয়তান সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে; যে-কেহ তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিবে সে তাহাকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং তাহাকে পরিচালিত করিবে প্রজ্বলিত অগ্নির শাস্তির দিকে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! ভয় করো তোমাদের প্রতিপালককে'। তারপর বলা হয়েছে— 'কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার'। এভাবে পাশাপাশি সন্নিবেশিত বাক্য দু'টোর মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে উদাসীন ও অসচেতন মানুষ! সাবধান হও। স্মরণ করো মহাপ্রলয়ের পূর্বের অবশ্যম্ভাবী ভূপ্রকম্পনের কথা। অতিভয়ংকর সেই নিদর্শনের কথা স্মরণ করে সতর্ক হও। আশ্রয় করো তাক্বওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতিকে। জীবনযাপন করো আল্লাহ্‌র বিধানানুসারে। হও মুত্তাক্বী বা সাবধানী। মনে রেখো, তাক্বওয়া ব্যতিরেকে ওই ভয়াবহ গজব থেকে রক্ষা পাওয়ার সাধ্য কারো থাকবে না।

আলকামা ও শা'বী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ভূপ্রকম্পন সংঘটিত হবে কিয়ামতের পূর্বে। আর তা হবে কিয়ামতেরই একটি আলামত। জালালউদ্দিন মাহাল্লী লিখেছেন, ভূপ্রকম্পন হবে পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়ের পূর্বে। ইবনে আরাবী এবং কুরতুবী শেষোক্ত অভিমতটিকেই পছন্দ করেছেন।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে'। এ কথার অর্থ— যখন ওই ভয়ংকর ভূকম্পন শুরু হবে তখন স্তন্যদানরতা রমণী ভয়ে আতংকে ভুলে যাবে তার কোলের শিশুকে। দুগ্ধদান বন্ধ করে দিবে সাথে সাথে। আর গর্ভপাত ঘটবে গর্ভবতীদের।

হাসান বলেছেন, সেদিন স্তন্যদাত্রী তার দুগ্ধদানরত শিশুকে পৃথক করে দিতেও ভুলে যাবে এবং গর্ভধারিণীদের ঘটবে অসম্পূর্ণ গর্ভস্খলন।

এরপর বলা হয়েছে— 'মানুষকে দেখবে মাতালসদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র শাস্তি অত্যন্ত কঠিন'। এই বাক্যটির ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হাসান বসরী বলেছেন, শরাবাসক্ত লোকেরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যেমন অপ্রকৃতিস্থ ও উন্মাতাল হয়, ভয়াবহ ভূকম্পন দৃষ্টে তখনকার মানুষও হবে সেরকম। কারণ আল্লাহ্‌র আযাব সুকঠিন। তাঁর আযাব দর্শনে স্বাভাবিক থাকার ক্ষমতা কারো থাকবে না।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানকার 'তারা' (তুমি দেখবে) শব্দটি একবচনের শব্দরূপ। এর বহুবচন হচ্ছে 'তারাওনা'। কিয়ামত প্রত্যক্ষ করবে তো সকলেই। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনার্থক একবচন। সেদিন একজনের দৃষ্টিতে অন্যজন হবে মাতালসদৃশ। নিজের অবস্থা কেউ দেখবে না। কিন্তু ভয়ে আতংকে নিজেকে মনে হবে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ।

www.eelm.weebly.com

যারা ভূকম্পনকে কিয়ামতের পূর্বের একটি আলামত বলে মনে করেন, তাঁরা আলোচ্য আয়াত উপস্থাপন করেন তাঁদের অভিমতের প্রমাণরূপে। বলেন, কিয়ামতের পরে স্তন্যদাত্রী, গর্ভবতী বলে কেউই থাকবে না। তখন তো প্রত্যেকে পুনরুত্থিত হবে তাদের আপন আপন কবর থেকে । সুতরাং ভূকম্পন সংঘটিত হবে কিয়ামতের পূর্বে, যা প্রত্যক্ষ করবে তৎকালীন স্তন্যদাত্রী ও গর্ভবতীরা, ওই সময়ের মানুষেরা।

আমি বলি, পূর্বের আয়াতে 'হে মানুষ' বলে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স. এর যুগের মানুষদেরকে। পরবর্তীকালের সকল মানুষও এই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেবল ভূকম্পনের সময়ের মানুষ 'ভয় করো তোমাদের প্রতিপালককে'— এই সাবধানবাণীর লক্ষ্য হতে পারে না। আর ভূকম্পন দর্শনকারীরা তো সাবধান হওয়ার সুযোগও পাবে না। সুতরাং বুঝতে হবে এখানকার সাবধানবাণীটি সার্বজনীন। অর্থাৎ সকল মানুষকে এখানে সাবধান করার জন্য উপমাস্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে স্তন্যদাত্রী ও গর্ভবতী প্রসঙ্গ। স্তন্যদান করতে ভুলে যাওয়া , গর্ভপাত হওয়া— এরকম ঘটনা যে ঘটবেই সে কথা বলা আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। ভীতি প্রদর্শন করাই মূল উদ্দেশ্য। হজরত ইবনে আব্বাস তাই বলেছেন, ভূপ্রকম্পন হবে হজরত ইস্রাফিলের শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুৎকারের পর, যখন সকল মানুষ পুনরুত্থিত হবে তাদের নিজ নিজ সমাধি থেকে। উল্লেখ্য, এরকম উপমার উল্লেখ এসেছে অন্য আয়াতেও। যেমন— 'ইয়াওমা ইয়াজ্‌আ'লুল বিলদানু শীবা' অর্থাৎ 'সেদিন বালককে করে দিবে বৃদ্ধ'। এখানে শিশুর বৃদ্ধ হওয়ার উপমা প্রয়োগ করে মহাপ্রলয়ের ভয়াবহতার স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কেবল। অর্থাৎ জানিয়ে দেয়া হয়েছে— দুশ্চিন্তা ও ভয়ে শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো ভয়াবহ অবস্থা ঘটবে সেদিন। অতএব তোমরা এই মুহূর্তে সাবধান হয়ে যাও। এমতো তাফসীর হাদিস দ্বারাও সুসমর্থিত। যেমন— ইমাম আহমদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, হজরত ইমরান বলেছেন, আমরা একবার রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তখন অবতীর্ণ হলো 'ইয়া আইয়্যুহান্ নাসুত্তাকু থেকে আ'জাবাল্লাহি শাদীদ্' পর্যন্ত(আয়াত ১ ও ২)। রসুল স. বললেন, তোমরা কি জানো, সেদিন কোন দিন? আমরা নিবেদন করলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই অধিক অবগত। তিনি স. বললেন, যখন পিতা আদমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমার বংশধরদের মধ্য হতে জাহান্নামীদেরকে পাঠিয়ে দাও'।

www.eelm.weebly.com

আল্লামা বাগবী লিখেছেন, হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয় বনী মুস্তালিকের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ের এক রাতে। রসুল স. যখন আয়াত দু'টো পাঠ করে শোনালেন, তখন আমরা সকলেই ক্রন্দন শুরু করলাম। এভাবে আমরা আর কখনো কাঁদিনি। ভোর হলো। কিন্তু কেউ তার ঘোড়ার জিন খুললো না। রান্নাবান্নার ব্যবস্থাও করলো না। সকলে যেনো শোকে পাথর। রসুল স. বললেন, তোমরা কি জানো, ওই দিবস কোন দিবস? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ সেদিন বাবা আদমকে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমার বংশদ্ভুতদের মধ্যে যারা জাহান্নামী, তাদেরকে পাঠিয়ে দাও জাহান্নামে। আদম বলবেন, কতজনকে? আল্লাহ্ বলবেন, শতকরা নিরানব্বই জনকে। বাকি একজনকে পাঠিয়ে দাও জান্নাতে। একথা শুনে আমরা পুনরায় কাঁদতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর কান্নার আবেগ প্রশমিত করে বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! এরপরেও কি মুক্তির আশা করা যায়? তিনি স. বললেন, তোমরা সাধুবাদ গ্রহণ করো আমার। অবলম্বন করো সরল সঠিক মধ্যম পথ। তোমাদের সাথে আছে আরো দু'টি বিশাল সৃষ্টি। তারা ইয়াজুজ ও মাজুজ। তাদের সংখ্যা হবে মানুষের চেয়ে বেশী। আর আমি অবশ্যই আশা রাখি, জান্নাতবাসীদের একতৃতীয়াংশ হবে তোমরা। আমরা আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলাম 'আল্লাহু আকবার'। তিনি স. পুনরায় বললেন, বরং তোমরা হবে অর্ধেকাংশ। পুনরায় আমরা উচ্চারণ করলাম আল্লাহু আকবার। তিনি স. এবার বললেন, জান্নাতবাসীদের মধ্যে আমার উম্মত হবে দুই তৃতীয়াংশ। জান্নাতীদের কাতার হবে একশত কুড়িটি। তন্মধ্যে আশিটি কাতার থাকবে আমার উম্মতের। আর তখন কাফেরদের সংখ্যাধিক্যের তুলনায় ইমানদারদের সংখ্যা হবে নিতান্ত নগণ্য— যেনো বৃহদাকার উষ্ট্রীর শরীরের একটি ক্ষুদ্র তিলচিহ্ন। অথবা এক বর্ণের অশ্বের পায়ে অন্য বর্ণের একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন। কিংবা শাদা ও কালো কোনো গাভীর পশ্চাদাংশের একটি কৃষ্ণকায় বা শ্বেতবর্ণ পশম। তিনি স. পুনরায় বললেন, আরো শোনো, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। ওমর ইবনে খাত্তাব বিস্মিত হয়ে বললো, সত্তর হাজার! তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আবার তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রবেশ করবে একহাজার জন করে। উককাশা ইবনে মুহসীন দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসুলল্লুহ্! দোয়া করুন, আমিও যেনো তাদের দলভূত হই। রসুল স. বললেন, তুমি তাদের দলভূত। এরপর জনৈক আনসারী দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার জন্য এমতো প্রার্থনা করুন। তিনি স. বললেন, এ ব্যাপারে উককাশা তোমার অগ্রগামী।

www.eelm.weebly.com

যারা কিয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হবে বলেন, তাঁরা উপরে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে বলেন, হাদিসের বিবরণের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় না যে, ভূকম্পন ও জাহান্নামীদের পৃথক করার ঘটনা একই সময়ে ঘটবে। জাহান্নামীদের পৃথকীকরণও একটি ভয়ানক ঘটনা। রসুল স. এখানে ভূকম্পনের মতো ভয়াবহ একটি ঘটনা বর্ণনা করতে যেয়ে ওই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন মাত্র। আমি বলি, তাঁদের এমতো বক্তব্য অসমর্থনীয়। কারণ হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত বিশুদ্ধসূত্র সম্বলিত হাদিসে বর্ণনাটি এসেছে আরো স্পষ্টরূপে। যেমন— আল্লাহ্ তখন বলবেন, আদম! তিনি বলবেন, হে আমার প্রভুপালক! এই যে আমি। সকল কল্যাণের অধিকারী কেবল তুমি। আল্লাহ্ বলবেন, দোজখীদেরকে পৃথক করে ফেলো। আদম বলবেন, কতোজনকে? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনকে। এরপর রসুল স. বললেন, ওই সময় শিশুরা হয়ে যাবে বৃদ্ধ। গর্ভপাত ঘটবে গর্ভিণীদের। আর মানুষ হবে মাতাল সদৃশ, মদ্যপান ব্যতিরেকেই। কারণ আল্লাহ্র শাস্তি সুকঠিন। আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! কে থাকবে ওই হাজারে একজনের মধ্যে? তিনি স. বললেন, দোজখীদের হাজারে একজন হবে তোমাদের মধ্য থেকে। বাকী নয় শত নিরানব্বই জন হবে ইয়াজুজ মাজুজ। যার আনুরূপ্যহীন হস্তে আমার জীবন, সেই মহাপবিত্র সত্তার শপথ! আমি আশা রাখি, জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে তোমরা। আমরা সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করলাম 'আল্লাহু আকবার'। তিনি স. বললেন, না, এক তৃতীয়াংশ। আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্বের নামে পুনরায় আমরা আনন্দধ্বনি উচ্চারণ করলাম। তিনি স. বললেন, অর্ধাংশ। আমরা বললাম, আল্লাহু আকবার। তিনি স. এবার বললেন, দোজখীদের তুলনায় তোমরা হবে গাভীর চামড়ার একটি কালো অথবা শাদা পশম সদৃশ, অনুল্লেখ্যপ্রায়।

সারকথা বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে— শিশুর বৃদ্ধে পরিণত হওয়া, গর্ভবতীদের গর্ভপাত হওয়া, আর জাহান্নামীদের পৃথকীকরণ ঘটবে একই সময়ে। বরং ভূপ্রকম্পনের পূর্বেই কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে সকল মানুষ।

এর পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে'। একথার অর্থ— কোনো কোনো বিতর্কপ্রবণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীর অবিভাজ্যতা ও আনুরূপ্যহীনতা সম্পর্কে তর্ক জুড়ে দেয়। উল্লেখ্য, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে নজর বিন হারেছ সম্পর্কে। সে ছিলো বিতণ্ডাপরায়ণ ও বাক্যবাগীশ। সে বলতো, পুনরুত্থান অসম্ভব, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা, কোরআন অতীতকালের উপাখ্যান ইত্যাদি। আবী মালেক থেকে এরকম বর্ণনা করেন ইবনে আবী হাতেম।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের'। একথার অর্থ— এবং ওই সকল বচসাপ্রবণ লোকেরা বিতর্ককালে অথবা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করে অভিশপ্ত শয়তানের। এখানকার শয়তান কথাটির মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে জ্বিন ও মানব উভয় সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে। আর এখানকার 'মারীদ্' অর্থ অকল্যাণ বা অমঙ্গলমগ্ন, বিদ্রোহী, অভিসম্পাতগ্রস্ত।

এর পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তার সম্পর্কে এই নিয়ম করে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শাস্তির দিকে'। একথার অর্থ— শয়তান তার কর্তৃত্বাগতদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং পরিচালিত করবে দোজখাগ্নির লেলিহান শাস্তির দিকে। আল্লাহ্‌র বিধান এরকমই।

জুজায বলেছেন, এখানে 'আল্লাহি' কথাটির 'হি' (সে) সর্বনামটির সম্বন্ধ ঘটেছে শয়তানের সঙ্গে। আর 'তাওয়াল্‌লা' কথাটির অর্থ এখানে বন্ধুত্ব করেছে, ভালোবেসেছে বা অনুগত হয়েছে।

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ৫, ৬

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ
تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ
مَّنْ يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى
الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ
مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ○ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ
وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

www.eelm.weebly.com

❐ হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান কর— আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা হইতে, তাহার পর শুক্র হইতে, তাহার পর রক্তপিণ্ড হইতে, তাহার পর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট অথবা অসম্পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড হইতে। তোমাদিগের নিকট আমার শক্তির পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত করিবার জন্য; আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রাখিয়া দিই, তাহার পর আমি তোমাদিগকে শিশুরূপে বাহির করি, পরে যাহাতে তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও। তোমাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও মৃত্যু ঘটে এবং তোমাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও করা হয় জরাগ্রস্ত, যাহার ফলে উহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহারা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর উহাতে আমি বারি বর্ষণ করিলে উহা শস্য-শ্যামলা হইয়া আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ;

❐ ইহাই তো প্রমাণ যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান করো— আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে। একথার অর্থ— হে সন্দেহ ও অবিশ্বাসমগ্ন মানুষ! তোমাদের জন্মসূত্র, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রতি তোমরা তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণসুলভ দৃষ্টি সম্পাত করো না কেনো? এরকম করলে বিষয়টির প্রকৃত রূপ বুঝতে সমর্থ হবে তোমরা। মৃত্তিকা, শুক্রকণা, রক্তপিণ্ড— এভাবে স্তরান্তরিত করা হয়েছে তোমাদেরকে।

এখানে 'খলাক্বনাকুম' অর্থ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। কথাটির দ্বারা গর্ভপাতের মাধ্যমে ভূমিষ্ঠ হওয়া অপরিণত শিশুদেরকেও উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ সৃষ্টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র। 'মিন তুরাব' অর্থ মৃত্তিকা থেকে। অর্থাৎ মৃত্তিকা থেকে তোমাদের আদি পুরুষ আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সরাসরি, আর তোমাদেরকে পরোক্ষভাবে। পানাহারকৃত খাদ্যবস্তু থেকে সৃষ্টি হয় বীর্যের। আর খাদ্যবস্তুতো মাটিতেই উৎপন্ন হয়। তাই পরোক্ষভাবে মাটি এবং প্রত্যক্ষভাবে শুক্রের কথা বলা হয়েছে আলোচ্য বাক্যে। 'মিন নুত্বফাতিন' অর্থ শুক্র থেকে। আর 'মিন আলাকাতিন' অর্থ রক্তপিণ্ড থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড থেকে'। এখানে 'মুদ্বগাহ্' অর্থ গোশতপিণ্ড। প্রকৃত অর্থ— কোনো বস্তুর ওই অংশ, যা চর্ব্য। 'মুখাল্লাক্বাতিন' ও 'গইরি মুখাল্লাক্বাতিন'অর্থ যথাক্রমে পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শব্দ দু'টোর অর্থ পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট

www.eelm.weebly.com

ও অপূর্ণাবয়ববিশিষ্ট গোশতের টুকরা। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— আকৃতিবিশিষ্ট ও আকৃতিহীন। অর্থাৎ যার আকার দান করা হয়েছে এবং যার আকার এখনো দেয়া হয়নি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মাতৃউদরে পূর্ণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যে শিশুর জন্ম হয়, তাকে বলে 'মুখাললাক্বাতিন' আরো পূর্ণ সময়ের আগে ভূমিষ্ঠ শিশুকে বলে 'গইরি মুখাল্লাক্বাতিন'। আর অপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারী নবজাতককে বলা হয় 'গইরি মুখাল্লাক্বাতিন'। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, সুস্থ অবস্থায় সুষ্ঠু অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ জন্মলাভকারী শিশুকে বলে 'মুখাল্লাক্বাতিন'। আর অপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গধারী নবজাতককে বলা হয় 'গইরি মুখাল্লাক্বাতিন'। উল্লেখ্য, মাতৃজঠরে আকার ধারণের সময় মানবশিশুর পরিমাণ ও আকারগত পার্থক্য সূচিত হতে থাকে। এভাবে তাদের কেউ হয় সুন্দর ও নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট। আবার কেউ সেরকম হয় না। তাই কেউ কেউ বলেছেন, এ ধরনের শিশুকেই এখানে 'অপূর্ণাকৃতি' বলা হয়েছে— গর্ভপাত হয়ে যাওয়া শিশুকে নয়। কারণ এমতোক্ষেত্রে পূর্ণ-অপূর্ণ কোনো আকৃতিই তার থাকে না।

আলকামা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, মাতৃউদরে গোশতপিণ্ডের আকার ধারণের পর, একজন ফেরেশতা সেটিকে ধারণ করে বলে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তোমার এ সৃষ্টি কি অবধারিত? প্রশ্নের জবাব না সূচক হলে সে ওই গোশতপিণ্ডের গর্ভপাত ঘটায়। আর জবাব হ্যাঁ সূচক হলে ফেরেশতা নিবেদন করে, পুত্র, না কন্যা? হতভাগ্য, না সৌভাগ্যশালী? হায়াত, কর্ম, রিজিক কীরকম হবে ইত্যাদি। তখন তাকে বলা হবে সবকিছু লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে। দেখে নাও। ওই ফেরেশতা তখন লওহে মাহফুজ থেকে ওই শিশুর সকল বিবরণের অনুলিপি করে নিজের কাছে রেখে দেয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের নিকট আমার শক্তির পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত করবার জন্য'। একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের অধ্যায়ান্তর ও ক্রমবিকাশের মাধ্যমে আমি প্রকাশ করেছি আমার অপার ক্ষমতা ও সৃজনশীলতার নিদর্শন, যেনো এমন নিদর্শন দেখে তোমরা একথা বুঝতে সমর্থ হও যে, পুনরুত্থান অনিবার্য। প্রথম সৃষ্টি যার দ্বারা সম্ভব, পরবর্তী সংস্করণ তো তাঁর জন্য অবশ্যই সম্ভব ও অধিকতর সহজ।

কোনো কোনো আলেম এখানকার 'লিনুবাইয়্যেনা লাকুম' কথাটির মর্মার্থ করেছেন এরকম— আমি তোমাদের নিকট স্পষ্টরূপে বিবৃত করেছি তোমাদের হকিকত। নির্দেশ করেছি তোমাদের কর্তব্যাকর্তব্যকে। তোমাদেরকেই নির্ধারণ করেছি আমার নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের ক্ষেত্ররূপে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি'। একথার অর্থ— আমি মানবশিশুকে যতদিন মাতৃগর্ভে রাখতে চাই ততদিন সে সেখানে থাকে। অর্থাৎ ততদিন পর্যন্ত মাতৃগর্ভ তাকে প্রসব করে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি'। 'ছুম্মা নুখরিজুকুম' অর্থ তারপর আমি বের করি। 'ত্বিফলান' অর্থ শিশুরূপে।

এরপর বলা হয়েছে——— 'পরে যাতে তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও'। এখানকার 'আশুদ্দা' 'শাদীদ'এর বহুবচন। যেমন 'নি'মাত' এর বহুবচন 'আনউম'। এমতাবস্থায় আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— এভাবে তোমরা উপনীত হও আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত জ্ঞানগত ও অবয়বগত পূর্ণতায় ও পরিণতিতে। আলেমগণ বলেন, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও দৈহিক পূর্ণত্ব ও পরিণতি ঘটে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে যার ফলে তারা যা কিছু জানতো সে সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না'। এ কথার অর্থ— ওই পরিণত বয়সে পৌঁছানোর পর আমি কারো কারো মৃত্যু ঘটাই, কাউকে উপনীত হতে দেই অধিকতর পরিণত বয়সে, আবার কাউকে নিয়ে যাই বার্ধ্যকের শেষ প্রান্তে অথর্ব অবস্থায়। তখন সে হয়ে পড়ে স্মৃতিশক্তিহীন। জানা বিষয়ও তখন আর তার স্মৃতিপটে উদিত হয় না। উল্লেখ্য, 'লি কাইলান' কথাটির 'লাম' পরিণতি প্রকাশক। এভাবে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, শিশুরা যেমন জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তিহীন তেমনি অতিবৃদ্ধরাও। অতিবার্ধক্যজনিত বিস্মরণ তাদেরকে শিশুদের সমতুল করে দেয়।

হজরত ইকরামা বলেছেন, নিয়মিত কোরআন পাঠকারীরা এরকম বিস্মরণগ্রস্ত হন না। উল্লেখ্য অতি প্রবীণদের এ রকম বিস্মরণও পুনরুত্থানের পক্ষের একটি দলিল। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, স্মরণ-বিস্মরণের এরকম আবর্তন যিনি ঘটাতে সক্ষম, তিনি সকলের পুনরুত্থান ঘটাতে অবশ্যই সক্ষম।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি ভূমিকে দেখো শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ'। 'হামিদাতান' অর্থ শুষ্ক, মৃত। 'ইহতাজ্‌জাত' অর্থ আন্দোলিত হয়। 'রবাত' অর্থ উন্মোচিত, স্ফীত। মুবররাদ বলেছেন, শব্দটির অর্থ নুয়ে পড়া, মৃত্তিকাভিমুখী হওয়া। এই অবস্থাকে স্ফীত হওয়া বলা যায় রূপকার্থে। প্রকৃত অর্থ এখানে রয়েছে সংগুপ্ত। 'মিনকুল্‌লি যাওজ্বিন্' (প্রতি জোড়ায়) কথাটির

www.eelm.weebly.com

'মিন' এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। আর 'বাহীজিন' অর্থ নয়নাভিরাম। কামুস প্রণেতা লিখেছেন, 'বাহিজ্বাতুন' অর্থ আনন্দজনক। বাবে কারুমা হিসেবে ব্যবহৃত এখানকার শব্দরূপটি বিশেষণবাচক। আবার বাবে সামিয়া থেকে সিদ্ধ হলে এর অর্থ দাঁড়ায়— আনন্দিত হলো।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'এটা এই জন্য যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান'। এখানে 'জালিকা' (এটা) দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিষয়াবলীর প্রতি। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— মৃত শুক্র থেকে জীবনের অস্তিত্বায়ন এবং নিঃসাড় মৃত্তিকা থেকে নয়নাভিরাম উদ্ভিদরাজির উদ্ভাবন ঘটান আল্লাহ্ই। কারণ তিনি মহাশক্তিধর, একমাত্র সৃজক। তিনি সত্য। মৃতকে জীবন দানকারী। সকলে ও সকল কিছুই তাঁর কর্তৃত্বাগত। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯, ১০

وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝ ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ لَهٗ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

❒ কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং কবরে যাহারা আছে তাহাদিগকে আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করিবেন।

❒ মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাহাদিগের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।

❒ সে বিতণ্ডা করে দম্ভভরে লোকদিগকে আল্লাহের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য। তাহার জন্য লাঞ্ছনা আছে ইহলোকে, এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাহাকে আস্বাদ করাইব দহন যন্ত্রণা।

❒ সেদিন তাহাকে বলা হইবে 'ইহা তোমার কৃতকর্মেরই ফল, কারণ আল্লাহ্ দাসদিগের প্রতি জুলুম করেন না'।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কিয়ামত সংঘটনের ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালা দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। তাই কিয়ামত অবধারিত। তাঁর অভিপ্রায়ের অন্যথা হয় না। আর কবরবাসীদের পুনরুত্থানও অনিবার্য। বিচারানুষ্ঠান হবে পুনরুত্থানের পরে। তখন বিশ্বাসীরা হবে পুরস্কৃত এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হবে তিরস্কৃত। এরকম না করা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। সত্য-মিথ্যা, পুণ্য-পাপ, ভালো-মন্দ কখনো এক হতে পারে না। অন্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে— 'আমি কি অনুগতদেরকে পাপীদের মতো করে দিবো? এটা তোমাদের কেমন সিদ্ধান্ত!'

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে; তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব'। এখানে 'জ্ঞান' দ্বারা বুঝানো হয়েছে তিন ধরনের জ্ঞানকে— ১. ইলমে বদহী (সত্তাসঞ্জাত জ্ঞান) ২. ইলমে নকলী (প্রত্যাদেশিত জ্ঞান) এবং ৩. ইলমে নজরী (গবেষণালব্ধ জ্ঞান)। আর 'দীপ্তিমান কিতাব' বলে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত কোনো আকাশী গ্রন্থকে।

এর পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'সে বিতণ্ডা করে দম্ভভরে লোকদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে ভ্রষ্ট করবার জন্য'। এখানকার 'ইত্বফ' শব্দটির অর্থ প্রান্ত। 'ইত্বফুন' অর্থ দুই প্রান্ত— দক্ষিণ ও বাম। মুখ ফিরানোর সময় মানুষ শরীরের যে অংশকে ঘুরিয়ে নেয়, তাকে বলে 'ইত্বফ'। মুজাহিদ বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ— যখন তাকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানানো হয়, তখন সে অবজ্ঞা ও অহমিকাভরে পার্শ্ব পরিবর্তন করে, ঘাড় ঘুরিয়ে নেয়। ইবনে আতীয়া, ইবনে জায়েদ এবং জুরাইজ এরকম বলেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তার জন্য লাঞ্ছনা আছে ইহলোকে এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাকে আস্বাদন করাবো দহন যন্ত্রণা'। এখানে 'লাঞ্ছনা' (খিজয়ুন) বলে বুঝানো হয়েছে হত্যা ও বন্দীত্বকে। বদর যুদ্ধের সময় এই লাঞ্ছনায় নিপতিত হয়েছিলো মক্কার মুশরিকেরা। নিহত হয়েছিলো নজর বিন হারেছ সহ সত্তর জন এবং আরো সত্তর জন হয়েছিলো বন্দী। জালালউদ্দিন মাহাল্লী বলেছেন, আবু জেহেলকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। আবু জেহেলও লাঞ্ছিত ও নিহত হয়েছিলো বদর যুদ্ধে। আর এখানকার 'হারীক্ব' শব্দটির অর্থ 'মুহরিকুন' বা দহনকারী।

এর পরের (১০) আয়াতে বলা হয়েছে— 'সেদিন তাকে বলা হবে এটা তোমার কৃতকর্মের ফল, কারণ আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না'। একথার অর্থ— পরজগতে যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, তখন

www.eelm.weebly.com

তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের কৃতকর্মের পরিণামেই আজ তোমরা আস্বাদন করছো এই শাস্তি। আল্লাহ্ এ শাস্তি অযথার্থরূপে তোমাদের প্রতি আপতিত করেননি। কারণ তিনি ন্যায় বিচারক।

উল্লেখ্য, 'জুলুম করেন না' অর্থ 'ন্যায় বিচার করেন'। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'লা ইউহিব্বুল্লহুল জাহ্‌রা' (আল্লাহ্ ভালোবাসেন না) অর্থ অপ্রিয় বা ঘৃণ্য জানেন)।

বোখারী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দূরদূরান্তরের কিছু লোক মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করতো। তারপর তাদের স্ত্রীর পুত্রসন্তান ও ঘোড়ার বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করলে বলতো, মোহাম্মদের ধর্ম উত্তম। আর এরকম কিছু না ঘটলে বলতো, তার ধর্ম উত্তম নয়। তাদের এরকম অপকথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত—

সূরা হাজ্জ্ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ۣاطْمَاَنَّ
بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ۣانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ
ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۝ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا
لَا يَنْفَعُهٗ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝ يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗٓ اَقْرَبُ مِنْ
نَّفْعِهٖ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝

☐ মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহের ইবাদত করে দ্বিধার সহিত; তাহার মংগল হইলে তাহাতে তাহার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটিলে সে তাহার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহলোকে ও পরলোকে; ইহাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

www.eelm.weebly.com

❒ উহারা আল্লাহের পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা উহাদিগের কোন অপকার করিতে পারে না, উপকারও করিতে পারে না; ইহাই চরম বিভ্রান্তি!

❒ উহারা ডাকে এমন কিছুকে যাহার ক্ষতিই উহার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এই সহচর!

❒ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কোনো কোনো মানুষ দৃশ্যতঃ ইমানদার হলেও প্রকৃত ইমানদার নয়। তারা মুনাফিক বা কপটচারী। তারা ইবাদত করে দ্বিধা-সন্দেহের সঙ্গে। তারা একবার থাকে ইমানদারদের সঙ্গে, আর একবার সঙ্গ নেয় কাফেরদের। পার্থিব উপকার পেলে হয় হৃষ্টচিত্ত। আর বিষণ্ন হয় বিপর্যয়ে। যুদ্ধের সময় তারা অবস্থান নেয় মুসলিম সেনাদলের পশ্চাতে। মুসলমানদের বিজয় দেখলে সোৎসাহে হয় অগ্রগামী। আবার পরাজয়ের আলামত দেখলে পশ্চাদপসরণ করে। এ ধরনের লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত— দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে । তাদের এমতো ক্ষতি সুস্পষ্টও।

ইবনে আবী হাতেম সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল বেদুঈন সম্পর্কে যারা মদীনায় এসে মুসলমান হতো এবং সেখানেই বসবাস শুরু করে দিতো। ওই বসবাস স্বস্তিকর হলে তারা বলতো, এই ধর্মের মাধ্যমে আমাদের অনেক উপকার হয়েছে। লাভ হয়েছে পুত্র সন্তান, অশ্বশাবক। আর অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হলে বলতো, এই ধর্ম গ্রহণ করে আমাদের তো উপকারই হলো না। পুত্রের বদলে পেলাম কন্যা। আবার ঘোড়াগুলোও তো কোনো শাবক প্রসব করলো না। এরকম বলে তারা ধর্ম ত্যাগ করতো। তাদের এমতো অবস্থাকেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'ইবাদত করে দ্বিধার সঙ্গে'।

আতীয়ার মাধ্যমে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, মদীনার এক ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করলো। এরপর থেকে তার দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে লোপ পেতে শুরু করলো। কিছুদিন পর তার এক সন্তানও মৃত্যুমুখে পতিত হলো। বিনষ্ট হলো কিছু সম্পদও। সে তখন ধারণা করতে লাগলো ইসলাম গ্রহণের কারণেই সে হয়ে পড়েছে বিপদকবলিত। রসুল স. এর মহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে সে বললো, আমার (ইসলাম গ্রহণের) অঙ্গীকার ফিরিয়ে দিন। তিনি স. বললেন, ইসলাম ফিরিয়ে দেয়া যায় না। সে বললো, আমি তো এই ধর্মে কোনো কল্যাণ দেখতে পাচ্ছি না। আমার চোখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে। এক ছেলেও মারা গেলো। রসুল স. বললেন, ইসলাম মানুষের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দেয়, যেমন আগুন দূর করে সোনা, রূপা ও লোহার ময়লা।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'সে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা তার কোনো অপকার করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না; এটাই চরম বিভ্রান্তি!' একথার অর্থ— সে এমন কিছুর উপাসনা করে, যার উপাসনা করা না করা সমার্থক। অর্থাৎ তার পূজা না করলেও সে যেমন কারো অপকার করতে পারে না, তেমনি পূজা করলেও করতে পারে না তার পূজকের কোনো উপকার। আল্লাহ্‌কে ছেড়ে এভাবে গাইরুল্লাহ্‌র ইবাদত করা এক চরম পথভ্রষ্টতা বই অন্য কিছু নয়। এখানে 'দ্বলালুল বায়ীদ' অর্থ চরম বিভ্রান্তি বা পথভ্রষ্টতা। 'দ্বলাল' অর্থ পথ ভুলে যাওয়া, পথ না পাওয়া বা সঠিক পথ থেকে দূরে সরে পড়া। যেমন বলা হয়— 'দ্বল্লা ফিত্ তীহ্ (সে অরণ্যে বা মরুভূমিতে পথ হারিয়েছে)।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'সে ডাকে এমন কিছুকে যার ক্ষতিই তার উপকার অপেক্ষা নিকটতর'। একথার অর্থ— অংশীবাদীরা যার উপাসনা করে, তার উপাসনার অপকার তাদের কাল্পনিক উপকার প্রাপ্তির চেয়ে অধিক নিকটবর্তী। এখানে 'নাফা' (উপকার) শব্দটির অর্থ সুপারিশের আশা। অর্থাৎ তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলো তাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করবে— এমতো আশা। যা পাওয়া অসম্ভব, আরববাসীরা তাকে বলে বা'দ। বলে— অমুক বস্তু দুস্প্রাপ্য, দূরবর্তী। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'জালিকা রজউ'ন বায়ীদুন্। (এটার প্রত্যাবর্তন দুরূহ)। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— প্রতিমা পূজাজাত কল্যাণ অসম্ভব। প্রতিমা পূজার কুফল অবশ্যম্ভাবী।

এরপর বলা হয়েছে— 'কতো নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং কতো নিকৃষ্ট এই সহচর'। এখানে 'মাওলা' অর্থ বন্ধু, অভিভাবক। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে শব্দটির অর্থ হবে উপাস্য। আর 'আশীর ' অর্থ বন্ধু, সঙ্গী, সহচর অর্থাৎ প্রতিমা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'ইয়াদ্‌উ' (তারা ডাকে) শব্দটি পূর্ববর্তী আয়াতের প্রথমে উদ্ধৃত 'ইয়াদ্‌উ' (তারা ডাকে) এর তাগিদ ও পুনরুক্তি। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে পরের বাক্য শুরু হয়েছে 'লামান' (এমন কিছুকে) থেকে। কথাটি একটি সংগুপ্ত শপথের প্রতিধ্বনি এবং 'মান' হচ্ছে যোজক অব্যয়। এভাবে মিলিত হয়ে কথাটি হয়েছে উদ্দেশ্য, আর বিধেয় হয়েছে 'লাবি'সাল মাওলা' (নিকৃষ্ট অভিভাবক)। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'লিমান' এর 'লাম' ইয়াদ্‌উ' এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। যদি তাই হয়, তবে এখানকার 'ইয়াদ্‌উ' কথাটির অর্থ 'ডাকে' না হয়ে হবে 'ধারণা করে'।

এর পরের আয়াতে (১৪)বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ্

www.eelm.weebly.com

যা ইচ্ছা তা-ই করেন'। একথার অর্থ— বিশ্বাসীদেরকে পুরস্কৃত করা এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করাই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায়ের বাস্তবায়ন অনিবার্য। এর প্রতিরোধ করার সাধ্য কারোই নেই।

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ১৫, ১৬, ১৭

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ
اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ۝ وَ
كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ۝ اِنَّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٔيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ
وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

❒ যে-কেহ মনে করে, আল্লাহ্ রসূলকে কখনই ইহলোকে ও পরলোকে সাহায্য করিবেন না সে গৃহের ছাদে রশি ঝুলাইয়া নিজকে ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করুক; অতঃপর দেখুক তাহার প্রক্রিয়া তাহার আক্রোশের হেতু দূর করে কি না।

❒ এইভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে অবতীর্ণ করিয়াছি কুরআন; এবং স্মরণ রাখিও, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন।

❒ যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে, যাহারা সাবেয়ীন, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক এবং যাহারা অংশীবাদী হইয়াছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীতে তাঁর রসুলকে নিশ্চয় সাহায্য করবেন— তাঁর প্রতি বিদ্বিষ্ট কেউ যদি একথা বিশ্বাস না করে তবে সে আকাশের দিকে একটি দীর্ঘ রশি ঝুলিয়ে দিক, আর সেই রশি ধরে আকাশে উঠে গিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিক প্রত্যাদেশের শৃঙ্খল। তারপর দেখুক তার এমতো প্রচেষ্টা তার বিদ্বেষ ও রোষের কারণ বিদূরিত করে কি না। উল্লেখ্য, ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই নবী-রসুলগণ আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যপ্রাপ্ত হন। তাঁদেরকে এমতো সাহায্য থেকে বিচ্যুত করার সাধ্য কারোরই নেই। যারা এমতো প্রচেষ্টা করে, ব্যর্থতার গ্লানি ও নিষ্ফল আক্রোশ তাদের জন্য অবধারিত।

www.eelm.weebly.com

'ইয়াক্‌তা' অর্থ গলা টিপে ধরুক, সম্পর্ক ছিন্ন করুক। 'কৃতায়া' অর্থ সে তার গলা চেপে ধরেছে। আর 'মুখান্‌নাক' অর্থ ওই লোক যে তার নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস গমনাগমনের পথসংযোগ কর্তন করে। মর্মার্থ— ক্ষোভে দুঃখে দাঁতে দাঁত ঘষে। শেষে আত্মাহুতি দেয় হিংসার আগুনে। তাই হিংসুক ব্যক্তিকে বলা হয়— সহ্য করতে পারো করো, না হয় মরো। এখানকার বক্তব্যভঙ্গি এরকমই। তাই এই আয়াত হচ্ছে আমরে তা'জীয্‌ (অজেয় আদেশ)।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে 'আকাশ' বলে বুঝানো হয়েছে পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে। এভাবে বলা হয়েছে— যারা রসুল স. এর প্রতি প্রত্যাদেশিত সাহায্যপ্রবাহের অবসান চায় তারা যেনো কোনো রশির সাহায্যে নিকটবর্তী আকাশে উঠে যায় এবং বিচ্ছিন্ন করে দেয় প্রত্যাদেশপ্রবাহ।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে গাত্‌ফান ও আসাদ গোত্রদ্বয় সম্পর্কে। গোত্র দু'টো ইহুদীদের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের অঙ্গীকারে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলো। রসুল স. তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। তারা বললো, আপনার আহ্বানে সাড়া দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আমরা মনে করি আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করবেন না। আবার এরকম করলে ইহুদীদের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিভঙ্গের দায় পড়বে আমাদেরই উপর। তারা আমাদেরকে পরিত্যাগ করবে। তখন আমাদের দাঁড়াবার কোনো জায়গা থাকবে না। তাদের এমতো অপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

মুজাহিদ বলেছেন, 'নসর' অর্থ রিজিক বা জীবনোপকরণ। যেমন আরববাসীরা বলে— 'মান নাসারনী নাসারাহুল্লহ্' (যে আমাকে দিবে, তাকে দিবেন আল্লাহ্)। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, 'আরদ্বি মানসুরা' অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত ভূমি। অর্থাৎ বৃষ্টিসিক্ত জমিন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এখানকার 'ইয়ানসুরাহু' কর্মপদীয় সর্বনামটি 'মান'এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে এবং মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ ধারণা করে এবং বলে, মুসলমান হলে আল্লাহ্ তাদেরকে জীবনোপকরণ প্রদান করবেন না, তারা যেনো তাদের গৃহের ছাদে রশি বেঁধে সেই রশির ফাঁসে নিজেদেরকে ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করে। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে এরকম— তারা যেনো একটি ঝুলন্ত রশির সাহায্যে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে উঠে যায় এবং সেখান থেকে নিয়ে আসে তাদের রিজিক।

এখানকার 'ফাল ইয়ানজুর' অর্থ গলা টিপে ধরা, পথ অতিক্রম অথবা রশি ঝুলানোর ইচ্ছা পোষণের পর গভীরভাবে পরিস্থিতি অনুধাবন করা।

'অতঃপর দেখুক তার প্রচেষ্টা তার আক্রোশের হেতু দূর করে কিনা' কথাটি এখানে নেতিবাচক অর্থ প্রকাশক। তাই এর প্রকৃত অর্থ হবে— হিংসুকদের হিংসা

www.eelm.weebly.com

ও ক্রোধ যেমন রসুল স. এবং বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ্‌র সাহায্যচ্যুত করতে পারবে না, তেমনি তাদের কুপ্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রও রুখতে পারবে না আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ও বিধানকে। উল্লেখ্য, হিংসুকদের ষড়যন্ত্র ও কুপ্রচেষ্টাকে এখানে বলা হয়েছে 'কাইদা'।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে এই কোরআন অবতীর্ণ করেছি; আর স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন'। একথার অর্থ— যে ভাবে এই কোরআনে আমি আমার আনুরূপ্যবিহীন এককত্ব, কিয়ামত, প্রত্যাদেশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি ঘোষণা করেছি সেভাবেই আমি এর মাধ্যমে বিধৃত করেছি কোরআন ও আমার রসুলের রেসালতের প্রমাণ।

'আয়াতিম্ বাইয়্যিনাতিন্' অর্থ সুস্পষ্ট আয়াত বা নিদর্শন। উল্লেখ্য, কোরআন মজীদে রয়েছে দুই ধরনের আয়াত — মুহকাম ও মুতাশাবিহাত (সুস্পষ্ট ও রহস্যাচ্ছন্ন)। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, এখানে তাহলে 'সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে' বলে এক ধরনের আয়াতের কথা বলা হলো কেনো? এর জবাবে বলা যেতে পারে— 'বাইয়্যিনাত' শব্দটির মৎকৃত অর্থ গ্রহণ করলে এমতো প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ আর থাকে না। আমি বলি, মুতাশাবিহাত আয়াতের অর্থ রহস্যাচ্ছন্ন, কিন্তু তা মোজেজারূপে মুহকামাত আয়াতের মতোই প্রকাশ্যে পরিদৃশ্যমান। তাই মুতাশাবিহাতও এক অর্থে সুস্পষ্ট। তাই বলা যায়, এভাবে এখানকার 'সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে' কথাটির মধ্যে সংকুলান ঘটেছে সুস্পষ্ট ও রহস্যাচ্ছন্ন উভয় প্রকার আয়াতের।

'ওয়া আন্নাল্লহা ইয়াহ্‌দী মাঁইয়ুরীদ' অর্থ 'আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন'। কথাটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্বের বাক্যের 'আনযাল্‌নাহু' (আমি অবতীর্ণ করেছি) কথাটির সঙ্গে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের আর একটি অর্থ দাঁড়াবে— আমি এই কোরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষের সংশোধনার্থে। এ কারণেও যে, এর মাধ্যমে আমি যাকে খুশি তাকে পথপ্রদর্শন করবো, অথবা প্রতিষ্ঠিত রাখবো হেদায়েতের পথে।

এর পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করেছে এবং যারা ইহুদী হয়েছে, যারা সাবেয়ীন, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক এবং যারা অংশীবাদী হয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন'। একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্‌তায়ালা বিশ্বাসী ও ইহুদী-সাবেয়ীন-খৃষ্টান-অগ্নিপূজক-মূর্তিপূজক ইত্যাদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে চিরদিনের জন্য পৃথক করে দিবেন। বিশ্বাসীদেরকে ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে প্রবেশ করাবেন যথাক্রমে জান্নাতে ও জাহান্নামে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করেন'। একথার অর্থ— বিশ্বাসীদের অন্তর-বাহির এবং অবিশ্বাসীদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অবস্থা আল্লাহ্তায়ালার আদিঅন্তহীন ও আনুরূপ্যবিহীন প্রত্যক্ষগোচরতার অধীন। সুতরাং সত্য ও মিথ্যা সংমিশ্রিত হবে— এমতো আশংকার অবকাশ মাত্র নেই।

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۩ ○ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ○ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ○ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ○ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ○

❒ তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্কে সিজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, —সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হইয়াছে শাস্তি। আল্লাহ্ যাহাকে হেয় করেন তাহাকে কেহ সম্মানিত করিতে পারে না, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

❒ এই দুইটি দল, ইহারা তাহাদিগের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে; যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে আগুনের পোশাক; তাহাদিগের মাথার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি

❒ যাহাতে উহাদিগের চর্ম এবং উহাদিগের উদরে যাহা আছে তাহা গলিয়া যাইবে,

❒ এবং উহাদিগের জন্য থাকিবে লৌহ মুদ্গর।

www.eelm.weebly.com

❒ যখনই উহারা যন্ত্রণা-কাতর হইয়া জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে উহাতে; উহাদিগকে বলা হইবে 'আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ্কে সেজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে— সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা জীবজন্তু এবং সেজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল। দেখুন, আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়স্থিত চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র-বৃক্ষ-পর্বত-প্রাণীকুল তাদের স্ব স্ব নিয়মে আল্লাহ্র প্রতি সেজদাবনত হয়। মানুষ ও জ্বিনদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তারাও আল্লাহ্কে সেজদা করে।

'মান' শব্দটি ব্যবহৃত হয় কেবল বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টির জন্য। তাই বুঝতে হবে এখানকার 'আকাশমণ্ডলীতে' কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে আকাশের ফেরেশতাকুল, আর 'পৃথিবীতে' কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে পৃথিবীবাসী বিশ্বাসী মানুষ ও জ্বিনের কথা। অবশ্য 'মান' বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য। তবে আয়াতের পরবর্তী বক্তব্য থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, 'মান' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে কেবল বিশ্বাসীগণের ক্ষেত্রে। কারণ পরবর্তী আয়াতে উক্ত হয়েছে— 'আর অধিকাংশের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি'। কথাটির দ্বারা পৃথক করা হয়েছে অবিশ্বাসীদেরকে। এহেতুই 'যারা পৃথিবীবাসী' কথার দ্বারা বুঝানো হয়েছে শুধুমাত্র বিশ্বাসীদেরকে।

'মান' (যা কিছু, যে কেউ) আবার কখনো কখনো বিবেকবান— বিবেকহীন নির্বিশেষে সকলের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই এখানে 'যা কিছু' এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র ইত্যাদিকে। বায়যাবী লিখেছেন, 'মান' বিবেকসম্পন্ন ও বিবেকবিহীন উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। অথবা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিবেকহীন অপেক্ষা বিবেকবানকে অধিক গুরুত্ব প্রদানার্থে। অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞ বলেন, কেবল বাকশক্তিহীনের ক্ষেত্রে 'মান' প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু বাকশক্তিহীন ও বাকশক্তিসম্পন্নদের যৌথ উল্লেখের ক্ষেত্রে এমতো প্রয়োগ সিদ্ধ। সুতরাং এখানে শব্দটি যদি যৌথ উল্লেখের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে ধরা হয়, তবে বুঝতে হবে, মানুষ-ফেরেশতা-জ্বিন এখানে সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-পর্বত ইত্যাদির তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে বিশেষ ও সাধারণের তুলনার মতোই এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে মানুষ- ফেরেশতা-জ্বিন ও সূর্য-চন্দ্রসহ অন্যান্য সৃষ্টিকে। আর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রই মানুষের কাছে অধিক পরিচিত। তাছাড়া বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় সেজদার সঙ্গে ওগুলোর সম্পর্কই নেই।

www.eelm.weebly.com

প্রথম যুগের সাধুপুরুষবর্গ ও হাদিসশাস্ত্রবিদগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেজদার কথা, বাধ্যগত সেজদার কথা এখানে বলা হয়নি। আর সূর্য-চন্দ্রসহ সকল সৃষ্টি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিরন্তর আল্লাহ্‌কে সেজদা করে চলে। কারণ সেগুলোরও রয়েছে তাদের আপনাপন সত্তানুগ চেতনা ও জ্ঞান। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— ১. 'ক্বলাতা আতাইনা ত্বইয়ীন' তারা (চন্দ্র-সূর্য) বললো, আমরা এসেছি অনুগত হয়ে ২. প্রস্তরদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন— 'ইন্না মিনহা লামা ইয়াহ্বিত্বু মিন খশ্ইয়াতিল্লাহ্' (অবশ্যই তার মধ্যে কিছু স্থানচ্যুত হয় আল্লাহ্‌র ভয়ে) ৩. 'ওয়া ইম্‌মিন্ শাইইন ইল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদিহী ওয়া লাকিল্‌লা তাফ্‌ক্বহুনা তাস্‌বিহাহুম' (সকল বস্তুই তাঁর স্তুতিবাদ করে, কিন্তু তোমরা বোঝোনা তাদের স্তুতিবাদ)। রসুল স. বলেন, এক পাহাড় অপর পাহাড়কে ডেকে বলে, তোমার উপরে কি এমন লোকের আগমন ঘটেছে, যে আল্লাহ্‌র জিকির করে? হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী। বাগবী লিখেছেন, বর্ণিত তাফসীর অত্যুত্তম। এমতো ব্যাখ্যা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি'। 'অনেকে' (কাছীর) শব্দটি এখানে উল্লেখিত হয়েছে দু'বার। শেষের উল্লেখটি অধিকতর দৃঢ়তা ও আধিক্য প্রকাশক। এমতো উল্লেখের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কাফের বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কস্মিনকালেও সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তাদের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'মান ফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মান ফিল আরদ্বি'কথাটির 'মান' (যা কিছু) ব্যাপক অর্থে প্রয়োগিত। আর 'সেজদা' শব্দটির উদ্দেশ্য আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মের আনুগত্য। আল্লাহ্‌র এমতো নির্ধারণের অন্যথা করার ক্ষমতা কারোই নেই। কারণ সকল কিছু সর্ববিষয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী ও কর্তৃত্বাগত। এভাবে সকলেই এবং সকল কিছুই হয়েছে তাঁর চিরদুর্জেয় অস্তিত্ব ও গুণবত্তার প্রমাণ।

'সেজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে' কথাটি এখানে উদ্দেশ্য আর এর বিধেয় রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ত বিধেয়টি এরকম— অধিকাংশ বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর দরবারে রয়েছে পুণ্য। এরকমও বলা যায় যে, 'মানুষের মধ্যে 'অনেকে' কথাটি একটি লুপ্ত ক্রিয়ার কর্তা। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— বিশ্বাসীদের অধিকাংশই মাটিতে ললাটদেশ স্থাপন করে। সেজদা করে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে । যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেনো, উভয় অবস্থায় 'সেজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে' এবং 'আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি' হবে সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি বাক্য।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো ফকীহ্ বলেন, দ্ব্যর্থবোধক শব্দের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা সিদ্ধ। এভাবে এক এক ব্যাখ্যা হবে এক এক উদ্দেশ্যের পরিপূরক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, এখানকার 'কাছীরুম্ মিনান্নাস্' (মানুষের মধ্যে অনেকে) এর সম্পর্ক ঘটেছে পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে। আর সেজদার অর্থ এখানে দু'রকম— ১. মাটিতে ললাট স্থাপন করা। ২. স্বভাবগতভাবে আনুগত্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিয়মাধীনে থাকা। এখানে সেজদার উভয় অর্থই প্রযোজ্য। মানুষের সঙ্গে সেজদার সম্পর্ক করা হলে গ্রহণ করতে হবে প্রথমোক্ত অর্থটি। আর অন্যান্য সৃষ্টিকে ধরা হলে গ্রহণীয় হবে দ্বিতীয় অর্থটি। এমতাবস্থায়ও 'কাছীরুন হাক্কা আ'লাইহিল আ'জাব' (আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি) হবে সম্পূর্ণ পৃথক একটি বাক্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাকে হেয় করেন কেউ তাকে সম্মানিত করতে পারে না'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আরো শুনুন, আল্লাহ্ যাকে অপদস্থ করেন, তাকে মর্যাদায়িত করার সাধ্য কারোই নেই।

এরপর বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায় সতত স্বাধীন, চিরমুক্ত ও চিরপবিত্র। তাই তিনি যা খুশি তা-ই করতে সক্ষম। কাউকে গৌরবান্বিত ও লাঞ্ছিত করার বিষয়টিও সম্পূর্ণতঃই তাঁর অভিপ্রায়নির্ভর।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'এই দু'টি দল, তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে'। এখানে দু'টি দল বলে বোঝানো হয়েছে বিশ্বাসীদেরকে এবং ইতোপূর্বে একত্রে উল্লেখিত ইহুদী-খৃষ্টান-সাবেয়ী-অংশীবাদী ও অগ্নিপূজককে। কারণ ইমানদারদের সঙ্গে ওই সকল কাফেরদের রয়েছে আল্লাহ্র সত্তা-গুণাবলী সম্পর্কে প্রলম্বিত বিতর্ক।

হজরত আবুজর গিফারী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত হামযা-হজরত আবু উবাইদা-হজরত আলী এবং উত্‌বা, শায়বা ও ওলীদ সম্পর্কে। উল্লেখ্য, প্রথমোক্ত তিন জন ছিলেন ইমানদার, আর পরের তিন জন ছিলো কাফের। এই হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, এখানে দু'টি দল বলে বোঝানো হয়েছে মক্কার বিশ্বাসী ও অংশীবাদীদেরকে। বর্ণিত পাঁচ শ্রেণীর অবশিষ্ট চারটি শ্রেণীকে নয়।

বোখারী ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে হজরত আলী বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বদর যুদ্ধের সময়ের মুসলিম বাহিনী ও মুশরিকবাহিনীকে লক্ষ্য করে। হাকেমের ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, এই আয়াত

www.eelm.weebly.com

অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল লোককে লক্ষ্য করে, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। এক পক্ষে ছিলাম হামযা, উবাইদা ও আমি। অপর পক্ষে শায়বা উত্বা ও ওলীদ।

কায়েস ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে বিতর্ক করার সময় আমিই প্রথম হাঁটু মুড়ে দয়াল দাতা আল্লাহ্র আনুরূপ্যহীন সকাশে উপবেশন করবো।

কায়েস বর্ণনা করেছেন, জঙ্গে বদরে যারা মুখোমুখি হয়েছিলো, তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তখন একপক্ষে ছিলেন হজরত হামযা, হজরত আলী ও হজরত উবায়দা। আর অপর পক্ষে ছিলো উত্বা, শায়বা ও ওলীদ।

সম্মুখ সমরে হজরত হামযা ও হজরত আলীঃ মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধ শুরু হলো এভাবে— প্রথমে মুশরিকবাহিনীর দিক থেকে এগিয়ে এলো উত্বা, শায়বা ও ওলীদ— এই তিন জন। তারা উচ্চকণ্ঠে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানালো। এদিক থেকে এগিয়ে গেলেন আনসারী তিন যুবক— আউফ, মুয়াজ ও মুয়াওবিজ। তাঁদের পিতার নাম ছিলো হারেছ এবং মাতার নাম আফরা। মুশরিকদের তিন যোদ্ধা বললো, তোমরা কারা? মুসলিম বীরেরা বললেন, আমরা আনসারী, বংশপরিচিতি ও আভিজাত্যে তোমাদের সমতুল। মুশরিকদের ত্রয়ী যোদ্ধার একজন চিৎকার করে বললো, মোহাম্মদ! আমাদের স্বজাতির বীরদেরকে প্রেরণ করো। অকুলীনেরা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের যোগ্য নয়। রসুল স. উচ্চকণ্ঠে বললেন, আবু উবায়দা ইবনে হারেছ, হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও আলী ইবনে আবী তালেব অগ্রসর হও। নির্দেশ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্রয়ী বীর এগিয়ে গেলেন সামনে। প্রতিপক্ষরা বললো, তোমরা কারা? ত্রয়ী বীর তাঁদের পরিচয় জ্ঞাপন করলেন। প্রতিপক্ষরা বললো, হ্যাঁ, তোমরা সম্মানিত, আমাদের সমপর্যায়ভূত। হজরত আবু উবায়দা ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি মুখোমুখি হলেন উত্বার। শায়বার সামনে দাঁড়ালেন হজরত হামযা। আর হজরত আলী প্রতিপক্ষ হলেন ওলীদের। সংঘর্ষ শুরু হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই হজরত হামযা ও হজরত আলী বধ করলেন তাঁদের শত্রুদ্বয়কে। কিন্তু প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে লাগলো হজরত উবায়দা এবং উত্বার মধ্যে। জয়-পরাজয়ের কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। তখন হজরত আলী ও হজরত হামযা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন উত্বার উপর। অল্পক্ষণের মধ্যেই বধ করলেন তাকে। হজরত আবু উবায়দা মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর উরুদেশে। অনর্গল রক্ত ঝরছিলো সেখান থেকে। তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হলো রসুল স. এর মহান সাহচর্যে। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র

www.eelm.weebly.com

রসুল! আমি কি শহীদ নই? রসুল স. বললেন, অবশ্যই। তিনি পুনরায় বললেন, আবু তালেব বেঁচে থাকলে দেখতেন আমিই তাঁর কবিতার প্রতিভূ হবার সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য। তিনি যথার্থই বলেছেন—

কাজাব্‌তুম ওয়া বাইতুল্লাহি ইউব্‌জা মুহম্মদ
ওয়া লাম্‌মালা জআন দুনাহু ওয়া নুনাসিলু
ওয়ানুস্‌লিমুহু হাত্তা নুসাররিউ' হাউলাহু
ওয়া নাজহালু আন্‌ আব্‌নাইনা ওয়া হালাইলু

অর্থঃ কাবার কসম! তোমরা মিথ্যাবাদী। আমি মোহাম্মদের পক্ষ অবলম্বন করে দৃঢ় ও যথার্থ অবস্থান থেকে যদি তোমাদের দিকে বর্শা ও তীর নিক্ষেপ না করি, তবে তোমরা তো তাকে পরাস্ত করবে। জেনে রাখো, পরিবারবর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে শব হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তাকে তোমাদের অধিকারভূত হতে দিবো না।

হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে আউফি, ইবনে জারীর এবং হজরত কাতাদার উক্তিরূপে ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে মুসলমান ও আহলে কিতাব সম্পর্কে। কিতাবীরা বলতো, আমরা তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্‌র অধিক নৈকট্যভাজন। আমাদের কিতাব ও আমাদের নবীও তোমাদের কিতাব ও তোমাদের নবী অপেক্ষা অগ্রগামী। মুসলমানেরা বলতো, না, আল্লাহ্‌র অধিক নৈকট্যধারী আমরা। আমরা আমাদের নবীসহ পূর্বতন সকল নবীকে বিশ্বাস করি। সত্য বলে মানি আমাদের কিতাবসহ পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে। আর তোমরা একথাও জানো যে, আমাদের নবী ও কিতাব সত্য। কিন্তু হিংসাবশত তোমরা একথা স্বীকার করো না। এভাবে উভয় দলের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা লেগেই থাকতো। মুজাহিদ এবং আতা ইবনে রেবাহ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'এই দু'টি দল' বলে বুঝানো হয়েছে সকল মুসলমানকে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'যারা বিশ্বাস করেছে এবং যারা ইহুদী হয়েছে'—এই আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে ছয় শ্রেণীর মানুষের কথা। তার মধ্যে এক শ্রেণী জান্নাতী এবং বাকি পাঁচ শ্রেণী জাহান্নামী। এভাবে নির্ধারিত হয়েছে জান্নাতী ও জাহান্নামী— দু'টি দল। এতে করে বুঝা যায় শ্রেণীগত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও জাহান্নামীরা মূলতঃ একটি দল। অবশ্য শেষোক্ত ব্যাখ্যা দু'টো করা হয়েছে শাব্দিক বিশ্লেষণের ব্যাপক পটভূমিকায়, অবতরণের প্রেক্ষাপটে নয়। তাফসীর শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এরকম ব্যাখ্যাও সিদ্ধ। এমতো ব্যাখ্যার ফলে একথাও

www.eelm.weebly.com

প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ কোনো বিশেষ প্রেক্ষিতের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। নির্দেশনাটি এখানে সাধারণ।

ইকরামা বলেছেন, পারস্পরিক বিতর্কে লিপ্ত হবে জান্নাত ও জাহান্নাম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, বেহেশত ও দোজখ বিতর্কে লিপ্ত হবে । দোজখ বলবে, আমিই উত্তম। কারণ অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীদের শায়েস্তার জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বেহেশত বলবে, দ্যাখো আমার কী রকম মর্যাদা। দুর্বল, সৎ ও নিঃসম্বলেরা ছাড়া অন্য কেউ আমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ্ বেহেশতকে বলবেন, তুমি আমার রহমতের প্রতিভূ। আমার বান্দাদের কাউকে রহমত প্রদান করতে চাইলে তোমাকেই দান করবো আমি। আর দোজখকে বলবেন, তুমি আমার গজবের বিকাশ। যাকে আমি শাস্তি দিতে চাই, সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে তোমার মাধ্যমেই। শেষে বলবেন, তোমাদের দু'জনকেই পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে। এরপর আল্লাহ্ দোজখে স্থাপন করবেন তাঁর আনুরূপ্যবিহীন কুদরতী কদম। বলবেন, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। থেমে যাবে দোজখের ক্রমপ্রসরমান লেলিহানতা। পরিতৃপ্ত দোজখকে তখন বলা হবে, আল্লাহ্ কারো প্রতি জুলুম করেন না। (নিরপরাধকে শাস্তি দেন না এবং বেহেশত পূর্ণ করার জন্য অস্তিত্ব দান করেন না নতুন কোনো সৃষ্টিকে)।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক'। একথার অর্থ— প্রতর্কপ্রবণতার মাধ্যমে যারা সত্যের প্রতি বৈমুখ্য প্রদর্শন করে, তাদেরকে পরজগতে অবশ্যই পরিধান করানো হবে অগ্নিনির্মিত পরিধেয়। পূর্ববর্তী আয়াতে (১৭) যে ফয়সালার কথা বলা হয়েছে, এটাই হবে সেই ফয়সালা বা মীমাংসা।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, দোজখীদের পরানো হবে উত্তপ্ত তাম্র নির্মিত পোশাক। আর ওই উত্তাপ হবে অভূতপূর্ব।

কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, দোজখীদেরকে পরানো হবে আগুনের পারা (পোশাক বিশেষ)। হজরত মুয়াবিয়া থেকে সর্বোত্তম সূত্রে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যারা দুনিয়ায় রেশমী পোশাক পরিধান করবে, পুনরুত্থান দিবসে তাদেরকে পরানো হবে আগুনের পরিচ্ছদ। হজরত আনাস থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বায্যার, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ আগুনের পোশাক পরিধান করানো হবে শয়তানকে। পোশাকটিকে সে দুই ভ্রূর উপর রাখতে চেষ্টা করবে। তার অনুসারীরা ওই পোশাক ধরে টানতে টানতে চলতে থাকবে তার পশ্চাতে। সে

www.eelm.weebly.com

তখন আর্তনাদ করে বার বার মৃত্যুকে ডাকবে। এভাবে সে ও তার সকল অনুসারী উপস্থিত হবে নরকাগ্নিতে। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, মৃত্যুকে নয়, আহ্বান করো ধ্বংসাত্মক, মর্মবিদারক ও অফুরন্ত শাস্তিকে।

আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ বলেছেন, নরকবাসীদেরকে পোশাক পরানো হবে, কিন্তু পরিচ্ছদাবৃত হওয়া অপেক্ষা বস্ত্রবিবর্জিত অবস্থাই হবে তাদের জন্য উত্তম। পুনর্জীবিতও করা হবে। কিন্তু সে জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই হবে সমধিক অভিপ্রেত।

হজরত আবু মালেক আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মৃত স্বজনের জন্য মাতমকারীরা তওবা ব্যতিরেকে মৃত্যুমুখে পতিত হলে পুনরুত্থানের পর তাদেরকে পরানো হবে তপ্ত আলকাতরার পোশাক। তলোয়ারের মরিচায় তৈরী জামা থাকবে তাদের দেহে। ইবনে মাজার বিবরণীতে হাদিসটি এসেছে এভাবে— মৃত আত্মীয়ের জন্য বিলাপকারিণীরা যদি তওবা করার পূর্বেই মারা যায়, তবে পুনরুত্থান দিবসে তাদেরকে পরানো হবে জমাট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সম্বলিত আলকাতরার পোশাক।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি'। এখানে 'হামীম' অর্থ ফুটন্ত পানি।

এর পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'যাতে তাদের চর্ম এবং তাদের উদরে যা আছে তা গলে যাবে'। একথার অর্থ—ওই ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়ার ফলে তাদের গাত্রচর্ম ও গাত্রভ্যন্তরের অস্থি-গোশত নাড়িভুঁড়ি সকল কিছু গলে গলে পড়বে। এভাবে সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শরীরের বহিরাবরণ ও অভ্যন্তর উভয় অংশই দগ্ধীভূত হতে থাকবে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে উত্তম সূত্রে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেদিন ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে তাদের মাথার উপর। ওই পানি প্রবেশ করবে তাদের উদরেও এবং তার ফলে অভ্যন্তরস্থিত সবকিছু দগ্ধীভূত হয়ে বেরিয়ে যাবে পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে। এরকম শাস্তি চলতে থাকবে পুনঃ পুনঃ। এখানকার 'ইউস্হারু' কথাটির মাধ্যমে সেকথাই প্রকাশ পায়।

এর পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'এবং তাদের জন্য থাকবে লৌহ মুদ্গর'। এখানকার 'মাক্বামিউ' শব্দটি 'মাক্বমাআতুন' এর বহুবচন। শব্দটির অর্থ ওই হাতিয়ার বা অস্ত্র, যার আঘাতে কোনো কিছুকে করা হয় চূর্ণবিচূর্ণ। লাইছ বলেছেন, 'মাক্বমাআতুন' বলা হয় বড় হাতুড়ি, মুদ্গর বা গদাকে। বাগবী লিখেছেন, শব্দটি এসেছে 'ক্বমআতুন রসাহু' থেকে। ক্বমআতুন অর্থ আমি প্রচণ্ড আঘাত হেনেছি।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নরকবাসীদেরকে হাতুড়ি দিয়ে বার বার প্রহার করা হবে। তখন তারা আর্তনাদ করতে করতে ডাকতে থাকবে মৃত্যুকে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আবু ইয়ালী, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কল্পনাতীত ওজনবিশিষ্ট হবে ওই হাতুড়ি। সকল মানুষ ও জ্বিন মিলেও ওই হাতুড়িটি উত্তোলন করতে পারবে না। হাতুড়িটির একটি আঘাতেই ধূলিসাৎ হবে পর্বতরাজি।

শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— 'যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তার মধ্যে'। উল্লেখ্য, অসম্ভব জেনেও বারবার দোজখ থেকে বের হওয়ার জন্য উদ্যোগী হবে তারা। কিন্তু প্রতিবারই তাদেরকে ঠেলে দেয়া হবে অনলাভ্যন্তরে। আলোচ্য বাক্যের অর্থ এরকমই।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সূত্রে ফুজাইল ইবনে আয়াজ বলেছেন, আল্লাহ্র শপথ! দোজখীরা দোজখ থেকে বের হওয়ার কল্পনাও করতে পারবে না। কেননা তাদেরকে সেখানে বেঁধে রাখা হবে মজবুতভাবে। মাঝে মাঝে জ্বলন্ত হুতাশন তাদেরকে উত্থিত করবে উপরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে আবার ফেরেশতাদের লোহার হাতুড়ির আঘাতে নিম্নে পতিত হবে তারা।

আমি বলি, অগ্নিতরঙ্গ যখন তাদেরকে উপরে ওঠাবে, তখন তারা মনে করবে এবার সম্ভবতঃ আমরা নিক্ষিপ্ত হবো বাইরে। কিন্তু পরক্ষণেই পড়বে হাতুড়ির বাড়ি। আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এটাই।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, আবু সালেহ বলেছেন, কাফেরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে তারা অতি দ্রুত পতিত হতে থাকবে তলদেশের দিকে। বলবে, আমাদেরকে কেউ বাধা দিয়ো না। তলদেশে উপনীত হওয়ার পর বীভৎস অগ্নিশিখা তাদেরকে উত্তোলন করতে থাকবে উপরের দিকে। তখন তাদের হাড়ের সঙ্গে গোশত-চামড়া কোনো কিছুই থাকবে না। সবকিছু ভস্মীভূত হবে আগুনে। এভাবে কেবল কংকাল উপরে এলে তাদের উপর পড়বে ফেরেশতাদের বিশালাকৃতির হাতুড়ির আঘাত। সে আঘাতে পুনরায় নিম্নগামী হতে হতে পৌঁছবে তলদেশ পর্যন্ত। ক্রমাগত চলতেই থাকবে এমতো শাস্তির পুনরাবৃত্তি। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার অতিরিক্ত সংযোজনটুকু এরকম— এভাবে তাদের উর্ধ্বারোহণ ঘটবে সত্তর বছর ধরে। আবার তাদের অবরোহণের সময়সীমাও হবে সত্তর বছরের।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে বলা হবে, আস্বাদ করো দহন যন্ত্রণা'। এখানকার 'আলহারীক্ব' অর্থ দহন যন্ত্রণা। শব্দটি সদৃশ্য বিশেষণ, যা কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশক। এভাবে 'মুহরিক্ব' শব্দটির অর্থ হবে— দহন যন্ত্রণা দানকারী। যেমন 'আ'লীম' অর্থ 'মু'লিম'। 'ওয়াজীয়ুন' অর্থ মাউজিয়ুন। জুজায বলেছেন, এতক্ষণ ধরে উল্লেখিত দুই দলের মধ্যে একটি দলের পরিণতির কথা আলোচিত হলো। পরবর্তী আয়াত থেকে শুরু হবে অপর দলটির বিবরণ।

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ২৩, ২৪, ২৫

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ
فِيهَا حَرِيرٌ ۝ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ
الْحَمِيدِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ
بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

❒ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত সেথায় তাহাদিগকে অলংকৃত করা হইবে স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেথায় তাহাদিগের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের।

❒ তাহাদিগকে সৎবাক্যের অনুগামী করা হইয়াছিল এবং তাহারা পরিচালিত হইয়াছিল আল্লাহের পথে;

❒ যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে ও মানুষকে আল্লাহের পথে বাধা দেয় এবং যে মসজিদুল-হারামকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য করিয়াছি সমান তাহা হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, তাহাদিগকে আমি আস্বাদ গ্রহণ করাইব মর্মন্তুদ শাস্তির এবং যে সীমালংঘন করিয়া মসজিদুল-হারামে পাপ কার্য করিতে ইচ্ছা করে তাহাকেও।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত'। একথার অর্থ— যারা ইমানদার ও সৎকর্মশীল তাদেরকে আল্লাহ্ এমন স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করাবেন, যেখানে থাকবে জলবতী নদী। উল্লেখ্য, এখানে আল্লাহ্ নিজে তাঁদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন বলেছেন। এভাবে ইমানদারগণকে এখানে করা হয়েছে সম্মানিত। তদুপরি, বাক্যের শুরুতে নিশ্চয়তা প্রকাশক শব্দ 'ইন্‌না' ব্যবহার করে বক্তব্যটিকে করা হয়েছে অধিকতর গুরুত্ববহ ও মর্যাদামণ্ডিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা'। আল্লামা কুরতুবী লিখেছেন, কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, প্রত্যেক বেহেশতবাসীকে তিনটি করে কঙ্কন পরানো হবে— স্বর্ণের, রৌপ্যের ও মুক্তার।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিরমিজি, হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আলোচ্য আয়াত আবৃত্তি করে বললেন, জান্নাতীদের মাথায় থাকবে মুক্তানির্মিত মুকুট। ওই মুক্তার সামান্য ঝলকে আলোকিত হবে প্রাচ্য-প্রতীচ্য।

তিবরানীর 'আওসাত' গ্রন্থে এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে উত্তম সূত্রে বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সর্বনিম্ন মর্যাদাধারী জান্নাতীর অলংকারও হবে পৃথিবীবাসীদের সকল অলংকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আবু শায়েখ তাঁর 'আলউজমা' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশে এক ফেরেশতা তার সৃষ্টিলগ্ন থেকে জান্নাতীদের অলংকার নির্মাণ করে চলেছে। কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে তার এমতো নির্মাণ। ওই আভরণসম্ভারের যে কোনো একটি পৃথিবীতে নিয়ে এলে সূর্যকিরণও হয়ে পড়বে নিষ্প্রভ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তখন বিশ্বাসীর হাত ও পায়ের ওই পর্যন্ত অলংকারপত্র পৌছবে যে পর্যন্ত এখন পৌছানো হয় তার ওজুর পানি।

'আজ্‌জুহুদ' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, ইমরান ইবনে খালেদ সূত্রে জনৈক তাবেয়ীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাহাবায়ে কেরাম বলতেন, স্বর্ণালংকার পরিধানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে পৃথিবীতে তা পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্ তাকে অলংকৃত করবেন তার জান্নাতবাসকালে। আর মদ্যপানের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে তা পরিহার করে, তাকে তখন পান করানো হবে শারাবান তহুরা। হজরত উকবা ইবনে আমের থেকে নাসাঈ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. স্বর্ণালংকার ও রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন, যদি তোমরা বেহেশতের স্বর্ণালংকার ও রেশমী বস্ত্র চাও তবে এখানে তা পরিহার করো।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে খাত্তাব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে পুরুষ রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, বেহেশতে সে তা পরিধান করতে পারবে না।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের'। হজরত জাবেরের মাধ্যমে বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরায় আবু ইয়ালী, বায্যার ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত মুরছাদ বলেছেন, জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে প্রস্তুত করা হবে রেশমী তন্তু। তাই দিয়ে নির্মাণ করা হবে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ। ত্রুটিবিমুক্ত সূত্র পরম্পরায় নাসাঈ, তায়ালাসী, বায্যার ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, জান্নাতের বৃক্ষের ফল ফেটে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে জান্নাতীদের পরিধেয় বস্ত্র।

ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, বিশ্বাসীদের জন্য সেখানে প্রস্তুত রাখা হবে সত্তর কক্ষ বিশিষ্ট একটি শূন্যগর্ভ মুক্তা। শূন্যগর্ভ মোতির মধ্যবর্তী এক স্থানের বৃক্ষ থেকে বেরিয়ে আসবে তাদের পোশাক। তারা তাদের আঙুল দিয়ে সেখান থেকে এক একবার আনবে সত্তর জোড়া পরিধেয়। প্রতি জোড়া বস্ত্রে থাকবে জমরুদ ও মুক্তার মালা।

জান্নাতীদের অলংকার ও পোশাকঃ বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত হুযায়ফা বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে এরকম আজ্ঞা করতে শুনেছি, তোমরা রেশমী বস্ত্র পরিধান কোরো না, পানাহার কোরো না সোনা-রূপা নির্মিত পাত্রে। এগুলো কাফেরদের জন্য রাখা হয়েছে দুনিয়ায়, আর তোমাদের জন্য আখেরাতে। হজরত ওমর থেকে বোখারী-মুসলিম কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. জানিয়েছেন, যে পুরুষ এখানে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে এমতো বস্ত্রসম্ভার থেকে বঞ্চিত হবে পরজগতে। হজরত আনাস এবং হজরত যোবায়ের থেকেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে নাসাঈ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে পুরুষ দুনিয়ায় রেশমী পরিচ্ছদ পরিধান করবে, সে আখেরাতে রেশমী বস্ত্র পাবে না। মদ্যপায়ীরাও সেখানে পাবে না পবিত্র শরাব। আর সোনা-রূপার পাত্রে পানাহারকারীও সেখানে বঞ্চিত হবে এমতো তৈজসপত্র থেকে।

যথাসূত্র পরম্পরায় তায়ালাসী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে নাসাঈ, ইবনে জান ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে এখানে রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করবে সে সেখানে তা পাবে না, যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে।

হজরত আবু উমামা থেকে ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে বেহেশতের তুবা বৃক্ষের কাছে। ওই বৃক্ষের ফল ফেটে তখন বেরিয়ে আসবে তোমাদের রঙ বেরঙের পোশাক। পোশাকগুলি হবে গুলে লালার মতো নয়নাভিরাম। বরং তদপেক্ষা অধিক সুন্দর।

www.eelm.weebly.com

হজরত কা'ব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, দুনিয়ায় কেউ জান্নাতের পোশাক পরিধান করলে তার প্রতি দৃষ্টিপাতকারীরা হয়ে যাবে বেহুঁশ। সাবুনী তাঁর 'আল মাতীন' গ্রন্থে লিখেছেন, বেহেশতী পোশাক থেকে প্রতি মুহূর্তে বিচ্ছুরিত হতে থাকবে সত্তর রকমের রঙ। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, জান্নাতীরা লাভ করবে অনন্ত শান্তি। চির যুবক হবে তারা। তাদের পোশাক পরিচ্ছদও কখনো পুরনো হবে না।

পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে,— 'তাদেরকে সৎবাক্যের অনুগামী করা হয়েছিলো এবং তারা পরিচালিত হয়েছিলো আল্লাহ্‌র পথে'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'সৎবাক্য' কথাটির অর্থ পবিত্র কলেমা— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্। জান্নাতীরা সকলেই এই পবিত্র বাণীর অনুগামী। আল্লামা সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'সৎবাক্য' (তয়্যিবি মিনাল্ ক্বওলি) অর্থ কোরআন মজীদ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'অনুগামী করা হয়েছিলো' কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে 'অনুগামী করা হবে'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— জান্নাতে তাদেরকে পবিত্র বাণীর অনুগামী করা হবে। অর্থাৎ জান্নাতীরা তখন উচ্চারণ করবে— 'আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাজী সাদাক্বনা ওয়াদাহু'।

'সিরাত্বিল হামীদ' অর্থ আল্লাহ্‌র পথ। অর্থাৎ ইসলাম। 'হামীদ' আল্লাহ্‌র এক মহান নাম। এর অর্থ মহাপ্রশংসার্হ। 'সিরাত্বিল হামীদ' অর্থ জান্নাতের পথ— এরকমও বলা যায়। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— পরকালে তাদেরকে দেয়া হবে জান্নাত গমনের সুযোগ।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে ও মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় এবং যে মসজিদুল হারামকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত, সকলের জন্য করেছি সমান, তা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে, তাদেরকে আমি আস্বাদ গ্রহণ করাবো মর্মন্তুদ শাস্তির এবং যে সীমালংঘন করে মসজিদুল হারামে পাপ কর্ম করতে ইচ্ছা করে তাকেও'। একথার অর্থ— যারা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ও বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ্‌র পথে যেতে দেয় না এবং যে কাবাগৃহকে আমি স্থানীয়-অস্থানীয়, সকলের জন্য করেছি নিরাপদ তীর্থস্থল, সেই কাবা দর্শন থেকে যারা নিবৃত্ত করে তীর্থযাত্রীদেরকে, তাদেরকে আমি আস্বাদ গ্রহণ করাবো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির। শাস্তিদান করবো তাকেও, যে সীমালংঘনপূর্বক ওই পবিত্র মসজিদে পাপকর্ম করতে চায়।

www.eelm.weebly.com

মসজিদুল হারাম বা মহাসম্মানিত মসজিদঃ ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মসজিদুল হারাম অর্থ কাবা মসজিদের প্রাঙ্গণ। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, সমগ্র মক্কা শহর মসজিদুল হারামের অন্তর্ভূত। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে— সুবহানাল্ লাজী আস্‌রা বি আ'ব্‌দিহী লাইলাম্ মিনাল মাসজিদিল হারাম.....। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর মহারহস্যময় মেরাজ শুরু হয়েছিলো তাঁর পিতৃব্যপুত্রী হজরত উম্মে হানির বাসভবন থেকে। অতএব, তাঁর বাসভবনও হেরেমের অন্তর্গত। কিন্তু তা কাবার অন্তর্গত নয়। আর আলোচ্য আয়াতের মসজিদুল হারাম অর্থ মসজিদ প্রাঙ্গণ, সমগ্র মক্কা নয়। কেননা বলা হয়েছে 'আমি স্থানীয় ও বহিরাগত, সকলের জন্য করেছি সমান'। কারো বসতবাটিতে এমতো সার্বজনীয় অধিকার স্বীকৃত নয়। আবার অন্য এক আয়াতে উল্লেখিত মসজিদুল হারাম অর্থ সমগ্র হেরেম শরীফের পরিসর। সে কথা ইমাম শাফেয়ীও স্বীকার করেন। আয়াতখানি এই—'ইন্নামাল মুশরিকূনা নাজাসুন ফালা ইয়াক্বরাবুল মাসজিদাল হারামা বা'দা আ'মিহিম হাজা'। ইমাম শাফেয়ী একথাও বলেন, সমগ্র হেরেম শরীফের সীমানায় মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, শুধু মসজিদ প্রাঙ্গণে নয়।

এখানে 'আ'কিফ্' অর্থ স্থানীয়। আর 'আলবাদ ' অর্থ মুসাফির বা বহিরাগত। 'কামুস' প্রণেতা লিখেছেন, 'বাদ্উন্' 'বাদাওয়াতুন্' 'বাদাতুন' 'বাদীয়াত'— শব্দগুলোর মাধ্যমে বোঝানো হয় গ্রামবাসী, অরণ্যচারী, মরুচারী, যাযাবর ইত্যাদি অ-শহুরে মানুষকে। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে—সকলেই হেরেম শরীফে প্রবেশের সম-অধিকার প্রাপ্ত। সেখান থেকে কেউ কাউকে বহিষ্কার করতে পারবে না। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, কাতাদা ও ইবনে জায়েদের অভিমত এরকমই। আবদুর রহমান ইবনে ছাবেতের বর্ণনায় এসেছে, হজযাত্রীরা যখন মক্কায় আগমন করে, তখন মক্কাবাসীদের তাদের আপনাপন আবাসের উপরে অগ্রাধিকার থাকে না। হজরত ওমর হজের মওসুমে মক্কাবাসীকে আপনাপন গৃহের দরজা বন্ধ রাখতে নিষেধ করতেন। এরকম বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন বাগবী।

আমি বলি, আবদুর রহমান ইবনে আবদে হামিদ হজরত ওমরের এই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন হজরত নাফে' হজরত ইবনে ওমরের মাধ্যমে। 'ইজালাতুল খাফা' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, একবার মারওয়া পাহাড়ের কাছে এক লোক হজরত ওমরকে বললো, হে আমিরুল মুমিনীন! আমার জন্য একটি বিশেষ স্থান নির্ধারণ করে দিন। হজরত ওমর তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাকে পশ্চাতে রেখে যেতে যেতে বললেন, এ স্থান হচ্ছে আল্লাহ্‌র হেরেম। এখানে মুকিম মুসাফির সকলের অধিকার সমান।

www.eelm.weebly.com

মনসুর থেকে মুয়াম্মার সূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, হজরত ওমর তখন ঘোষণা করেছিলেন, হে মক্কাবাসী! তোমরা কেউ তোমাদের ঘরের দরজা বন্ধ কোরো না। হজযাত্রীরা যেখানে খুশী সেখানে অবস্থান করতে পারবে।

ইবনে জুরাইজ সূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, আতা হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে ঘোড়া প্রবেশ করাতে নিষেধ করতেন। আর আমার নিকট এরকম কথাও পৌঁছেছে, হজরত ওমর মক্কার গৃহসমূহের দরজা অর্গলবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন, হজযাত্রীগণ যেনো গৃহাঙ্গণে অবস্থান নেয়ার সুযোগ পায়। উল্লেখ্য, হজের মওসুমে হজরত সুহাইল সর্ব প্রথম তাঁর গৃহের দরজা অর্গলবদ্ধ করেছিলেন এবং এর জন্য হজরত ওমর সকাশে উপযুক্ত কৈফিয়তও দিয়েছিলেন।

কিন্তু বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর জেলখানা নির্মাণের জন্য সেখানে চার হাজার দীনার দিয়ে এক খণ্ড বাসগৃহ ক্রয় করেছিলেন। ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, তিনি ক্রয় করেছিলেন উম্মত-জননী হজরত সাওদার প্রকোষ্ঠ। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত হাকিম ইবনে হাজাম বিক্রয় করে দিয়েছিলেন দারুন্নাদওয়া (সভাকক্ষ)। একথাও সত্য, মসজিদের সীমানা সম্প্রসারণার্থে হজরত ওমর ক্রয় করেছিলেন কয়েকটি বাসগৃহ। হজরত ওসমানও এরকম করেছিলেন। তখন সেখানে বহুসংখ্যক সাহাবীও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। এসকল তথ্যের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, হেরেমের সীমানাভূত জমিন ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ।

আমি বলি, এ সকল ক্রয়-বিক্রয় ছিলো গৃহ বা ভবনের ক্রয়-বিক্রয়, জমিনের নয়। হেরেমের জমিন ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। ইমাম আবু হানিফা এবং সুদৃঢ় বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, মক্কার জমিন বিক্রয় করা এবং সেখানকার ঘরবাড়ি ভাড়া দেয়া জায়েয নয়। কারণ ওই শহরের জমিন ওয়াকফ বা মুক্ত। সেখানে কারো ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত নয়। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— ছুম্মা মাহিল্লুহা ইলা বাইতিল আতীক্ব (অতঃপর উহা সম্প্রসারিত হলো মুক্ত গৃহ পর্যন্ত)। সুতরাং বায়তুল আতীক্ব অর্থ হেরেমের পুরো সীমানা। কোরবানীও সিদ্ধ কেবল হেরেমের সীমানার মধ্যেই। কেউ কেউ বলেন, একথার অর্থ ওই সকল স্থান, যা কাবার সন্নিকটবর্তী। কিন্তু এরকম মন্তব্য স্বকপোলকল্পিত, তাই অগ্রহনীয়। ইমাম মালেকও এরকম বলেন। কিন্তু তাঁর অভিমতের ভিত্তি ভিন্ন। তিনি বলেন, মক্কাবিজিত হয়েছে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে। এভাবে দখলে আনা ভূমি ওয়াকফ্ বলে বিবেচিত হয়। আর ওয়াক্ফ জমিন কেনাবেচা করা যায় না।

www.eelm.weebly.com

ইমাম শাফেয়ী বলেন, মক্কার বাসভবন বিক্রয় করা অথবা ভাড়া দেয়া জায়েয। কারণ বাসভবনের উপরে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত। হাসান বসরী, তাউস, আমর ইবনে দীনার এবং আলেমগণের বিশিষ্ট এক দল এরকম অভিমতই পোষণ করেন। আর ইমাম শাফেয়ীর মতে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'মাসজিদিল হারাম' অর্থ কাবা মসজিদ এবং এখানকার বক্তব্যটি হবে— আমি সকল মানুষের জন্য কাবাকে নামাজের কেবলা নির্ধারণ করে দিয়েছি। এ বিষয়ে স্থানীয় ও বহিরাগত সমান। সেখানে সকলের নামাজ, তাওয়াফ ও অন্যান্য ইবাদতের ফযীলত একই রকম। আর মক্কা আবাদ করার উদ্দেশ্য— সেখানে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। নবী ইব্রাহিমের উক্তিরূপে এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার কিছু সন্তানকে তোমার মহাসম্মানিতগৃহের পাশে অনুর্বর উপত্যাকার ভূমিতে অধিবাসী করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা, তা শুধু নামাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে'।

আমি বলি, কেবল কাবাগৃহে মুকিম ও মুসাফিরের অধিকার সমান নয়, অন্য সকল মসজিদের ক্ষেত্রেও এরকম সার্বজনীন অধিকার স্বীকৃত। সেগুলোতেও স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের ইবাদতের ফযীলত সমান। আবার সর্বসাধারণের দৃষ্টিতেও সকল মসজিদ একইরূপ সম্মানার্হ। বাগবী লিখেছেন, আলেমগণের একটি দলের অভিমতও ইমাম শাফেয়ীর অভিমত সদৃশ। আমি বলি, এরকম কোনো বর্ণনা তো পাওয়া যায় না। বরং মুজাহিদের বর্ণনা ইমাম আবু হানিফার অভিমতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইব্রাহিম ইবনে মুহাজিরের মাধ্যমে ইমাম তাহাবী বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, মক্কাভূমি প্রত্যেকের জন্য বৈধ। সেখানকার ভূমি বিক্রয় করা, ভাড়া দেয়া কোনোটাই সিদ্ধ নয়।

মক্কার জমিন ক্রয় বিক্রয় প্রসঙ্গ ঃ মুজাহিদ সূত্রে ইব্রাহিম ইবনে মুহাজিরের মাধ্যমে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন, মক্কার বসতবাটি বিক্রয় করা অথবা ভাড়া দেয়া কোনোটাই জায়েয নয়। এমতো উক্তির সমর্থন রয়েছে ইমাম মোহাম্মদের কিতাবুল আছারে। সেখানে বলা হয়েছে, নাজিহি সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে জিয়াদের মাধ্যমে ইমাম আবু হানিফা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুলুল্লাহ স. এরশাদ করেন, আল্লাহ্ মক্কাকে করেছেন মহাসম্মানিত। মক্কার ভূমি বিক্রয় ও এর বিক্রয়মূল্য ভক্ষণ করা হারাম। আবার স্বসূত্রে ইমাম জাওজী তাঁর আত্‌তাহক্বীক্বী গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা সূত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন একটি সুপরিণত বিবরণ। বিবরণটি এই— মক্কা মহাসম্মানিত, মক্কার জমিন মর্যাদায়িত, মক্কার গৃহসমূহ ভাড়া দেয়াও হারাম। ইমাম দারাকুতনী লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা বর্ণিত এই হাদিসটির সুপরিণত

www.eelm.weebly.com

(মারফু) হওয়ার ব্যাপারটি নিঃসন্দিগ্ধ নয়। বর্ণনাটি প্রকৃতপক্ষে পরিণত (মাওকুফ) শ্রেণীর। কিন্তু তাঁর এমতো ধারণাপ্রসূত মন্তব্য ইমাম আবু হানিফার নির্ভরযোগ্যতার প্রতি এক ধরনের অস্বীকৃতি বটে। অথচ কে না জানে তিনি সেকাহ্ (বলিষ্ঠ বা নির্ভরযোগ্য)। আর এমতো ব্যক্তিত্ব যদি কোনো বিবরণকে সুপরিণত বলেন, তবে তাকে সুপরিণত বলে মেনে নেয়াই দস্তুর। ইমাম মোহাম্মদও হাদিসটিকে বর্ণিত সূত্রপরম্পরায় সুপরিণতরূপে উপস্থাপন করেছেন। বর্ণনাটি এরকম—রসুল স. বলেন, যে মক্কার বাসগৃহ ভাড়া দিয়ে তার অর্থ কিঞ্চিত পরিমাণ ভক্ষণ করলো, সে ভক্ষণ করলো আগুন।

স্বসূত্রে দারাকুতনী ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম ইবনে মুহাজির সূত্রে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেন, মক্কা মোয়াজ্জমা মোবাহ্ (মক্কার ভূমি ও বসতবাটিসমূহে সকলের অধিকার সমান)। মক্কার জমিন বিক্রয় করা যাবে না। বাসগৃহসমূহও ভাড়া দেয়া যাবে না। আমি বলি, ইয়াহইয়া ও ইমাম নাসাঈ ইসমাইলকে দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে অভিহিত করেছেন। আর তার পিতা ইব্রাহিমকে দুর্বল বলেছেন ইমাম বোখারী। আর আবু হাতেম বলেছেন তার হাদিস পরিত্যজ্য (মুনকারুল হাদিস)। ইবনুল মদিনী ও নাসাঈ বলেছেন, তাঁর বিবরণ অদৃঢ়। কিন্তু সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আহমদ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন ও মাহদী তাঁকে করেছেন ত্রুটিমুক্তদের দলভূত। ইমাম আবু বকর বায়হাকী বলেছেন, প্রকৃত কথা এই যে, হাদিসটি পরিণত, সুপরিণত নয়।

স্বসূত্রে ইবনে জাওজী বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ মক্কাভূমিকে সম্মানিত করেছেন। তাই এখানকার জায়গা বিক্রয় ও বাসগৃহ ভাড়া দেয়া সিদ্ধ নয়। বর্ণনাটি অপরিণত (মুরসাল)। কারণ এখানে কোনো সাহাবীর নামোল্লেখ নেই। আর আমাদের নিকট অপরিণত শ্রেণীর হাদিসও দলিলরূপে গ্রাহ্য।

বাসগৃহসমূহের মালিকানা ঃ আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেন— আল্লাজীনা উখরিজু মিন দিয়ারিহিম (যারা বহিষ্কৃত হয়েছে তাদের দেশ থেকে)। রসুল স. মক্কা বিজয়ের পর ঘোষণা করেছিলেন, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করবে সে নিরাপদ। এভাবে কোরআন মজীদ ও হাদিস শরীফে ব্যক্তি বিশেষকে গৃহের মালিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া যে সকল সাহাবী হিজরত করেছিলেন তাঁদেরকেও কোরআন মজীদে মজলুম (নিগৃহীত) বলা হয়েছে। যদি তাঁরা সেখানকার বাসগৃহের মালিক না হতেন তবে তাঁদেরকেও মজলুম বলা হতো না। স্বগৃহ থেকে উচ্ছেদ হয়েছিলেন বলেই তো তাঁরা মজলুম।

www.eelm.weebly.com

এর জবাবে বলা যায়, তাঁরা সেখানকার জমিনের মালিক ছিলেন না। ছিলেন তাঁদের আপনাপন বসতবাটির নির্মাতা। তাই বুঝতে হবে তাঁদের মালিকানার সম্পর্ক ছিলো তাঁদের নিজ নিজ নির্মাণকর্মের সঙ্গে, সেখানকার জমিনের সঙ্গে নয়। যেমন বলা হয় মসজিদে নববী, মসজিদে ওমর ইত্যাদি। এমতোক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের নাম জড়িত হয় প্রতিষ্ঠাতা বা নির্মাতা হিসেবে, ব্যক্তি মালিক হিসেবে নয়। আর স্বহস্তনির্মিত আবাস থেকে কাউকে উৎখাত করাকেও জুলুম বলা যায়, সে সেখানকার জমির মালিক না হলেও। তাই মক্কাবাসীদের বিতাড়নকে জুলুম বলা হয়েছে। লক্ষণীয়, মসজিদে হারাম থেকে তাড়িয়ে দেয়াকেও জুলুম বলা হয়েছে। অথচ মসজিদ কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। মুহাজিরগণও ছিলেন কাবা মসজিদে ইবাদত বন্দেগী করার হকদার। কিন্তু তাদের সে অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছিলো। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'তা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে'।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত উমামা ইবনে যায়েদ বলেছেন, হজের সময় আমি রসুল স. সকাশে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আগামীকাল আপনি কোথায় যাত্রাবিরতি করবেন? তিনি স. বললেন, আমরা কি সে স্থান পেরিয়ে এসেছি? ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল আমরা যাত্রা স্থগিত করবো বনী কেনানার বসতির নিকটে। তারপর বললেন, কোনো কাফের কোনো মুসলমানের উত্তরাধিকারী নয়। কোনো মুসলমানও নয় কোনো কাফেরের ওয়ারিশ। ইবনে জাওজীর বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— হজরত উমামা বর্ণনা করেছেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! আপনি কি আপনার বাসভবনে অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন? তিনি স. বললেন, আকীল তো কোনো ঘর খালি রাখেনি। ইমাম জুহুরী বলেছেন, আবু তালেব তনয় হজরত আলী ও হজরত জাফর ইসলাম গ্রহণ করে রসুল স. এর সঙ্গে বসবাস করতেন মদীনায়। আর তাঁদের ভ্রাতা মক্কাবিজয় পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাই ওয়ারিশ হয়েছিলেন তাঁর পিতা আবু তালেবের সম্পত্তির। কাফের ও মুসলমানের পারস্পরিক উত্তরাধিকারিত্ব নেই। তাই রসুল স. তখন 'আকীল তো কোনো ঘর খালি রাখেনি' এরকম বলেছিলেন। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. তখন যে বাসগৃহ বা জমিনের কথা বলেছিলেন, তার প্রকৃত অধিকারী ছিলো হাশেম ইবনে আবদুল মান্নাফ। তার মৃত্যুর পরে ওই সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন রসুল স. এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব। মৃত্যুকালে তিনি ওই বসতবাটি ও তৎসংলগ্ন জমিন বণ্টন করে দেন তাঁর পুত্রগণের মধ্যে। আর রসুল স. তাঁর অংশ লাভ করেন তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ সূত্রে। ওই পিত্রালয়েই ভূমিষ্ঠ হন তিনি। পরিণত বয়সে তিনি স. মদীনায় হিজরত করলে তাঁর বসতবাটিটি দখলে চলে যায় আবু

www.eelm.weebly.com

তালেবপুত্র তালিব ও আকীলের। কারণ তখন পর্যন্ত তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেননি। পরে বদর যুদ্ধে তালিব নিহত হলে বসতবাটিটি আকীলের একক অধিকারভূত হয়। তিনি তখন সম্পূর্ণ বাড়ি বিক্রয় করেন অন্য লোকের কাছে।

ফাকেহানীর বর্ণনায় এসেছে, আকীল ওই বাসগৃহ বিক্রয় করেননি। তাঁর পরলোকগমনের পর ওই বাড়ির অধিকার পেয়েছিলেন তাঁর সন্তানেরা। পরবর্তীতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ভাই মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ওই বাড়ী ক্রয় করে একলক্ষ দীনারের বিনিময়ে। এ সম্পর্কে বলতে হয় যে, আকীল যদি কাফের থাকা অবস্থায় ওই বাড়ী বিক্রয় করে থাকেন, তবে তাতো ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী বৈধ হবে না। কিন্তু আমি বলি, বিবরণটির মর্মার্থ এরকম— ওই বাড়ী বিক্রয়ের পূর্বে ছিলো আকীলের অধিকারভূত। আর বিক্রয়ের পরে সে অধিকার পেয়েছিলো ওই বাড়ীর ক্রেতা। অর্থাৎ ওই বাড়ী কখনো জনমানব শূন্য ছিলো না। তাই রসুল স. বলেছিলেন, আকীল তো কোনো ঘর খালি রাখেনি। আর রসুল স. এর এমতো উক্তি শ্রবণ করে বর্ণনাকারী নিজে থেকে মন্তব্য করেছেন। আকীল হয়েছেন আবু তালেবের ওয়ারিশ। আরো বলেছেন, অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের এবং বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের উত্তরাধিকারী নয়। তাছাড়া মনে হয় এমতো মন্তব্যের সম্পর্ক অন্য কোনো ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত, আকীলের ঘটনার সঙ্গে এর কোনো সংশ্রব নেই। বর্ণনাকারী সমপ্রকৃতির দু'টো ঘটনাকে এভাবে গুলিয়ে ফেলেছেন। অতএব, একথা নিশ্চিত যে, এই হাদিসের মাধ্যমে মক্কার বাসগৃহের উপর কারো ব্যক্তি মালিকানা প্রমাণিত হয় না। প্রমাণিত হয় কেবল নির্মাণজনিত অধিকার। বসবাসের অনুমতি ও ব্যক্তিমালিকানা নিশ্চয় এক কথা নয়। তাছাড়া মক্কার মর্যাদাপ্রকাশক হাদিসসমূহে সেখানকার জমিন বিক্রয় করা ও ভাড়া দেয়া সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরকম নিষিদ্ধতা ইঙ্গিতময়তা অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়। তাই বর্ণনা দু'টোকে সমগুরুত্বসম্পন্ন মনে করা হলেও এক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানার নিষিদ্ধতার কথাটি মেনে নিতে হবে। কারণ হালাল ও হারামের মধ্যে শেষোক্তটিই অগ্রগণ্য। অর্থাৎ হালাল হারাম সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে হারামের বিধানই অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। রীতিটি সুস্বীকৃত। এমতো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মক্কার জমিন ও বাসগৃহ বিক্রয় মাকরূহে তাহরিমা (প্রায় হারাম)। পুরোপুরি হারাম— একথা তিনি বলেননি। আর সম্ভবতঃ রসুল স. এর পিতার সূত্রে প্রাপ্ত ঘর দখল করে নিয়েছিলো আকীল। এরকম বেদখল অবস্থা সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেন, কোনো কাফের কোনো মুসলমানের সম্পত্তি দখল করে নিলে ওই সম্পত্তিতে মুসলমানের মালিকানা আর থাকে না। ইমাম শাফেয়ী আবার এমতো অভিমতের প্রবক্তা নন।

www.eelm.weebly.com

আর একটি কথা, আকীল যদি রসুল স. এর উত্তরাধিকার দখল করে নেয়, তবে 'মুমিন কাফেরের এবং কাফের মুমিনের ওয়ারিশ নয়' কথাটির কোনো অর্থই আর অবশিষ্ট থাকে না। আবার সম্পূর্ণ বাসভবন যদি আবু তালেবের হয়, তবে রসুল স. এর উত্তরাধিকার সেখানে থাকেই না। সন্তানের বর্তমানে ভ্রাতুষ্পুত্রের ওয়ারিশ হওয়ার বিধানই যে নেই। তাই বলতে হয় 'আকীল তো কোনো ঘর খালি রাখেনি' কথাটির অর্থ হবে— ঘরগুলো তো জনমানব শূন্য নয়। খালি না পেলে আমরা উঠবো কোথায়? কারণ ঘর যারই হোক রসুল স. সেখানে গৃহকর্তার অনুমতিক্রমে অবশ্যই অবস্থান গ্রহণ করতে পারতেন। ওয়ারিশ হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন নিশ্চয় সেক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতো না।

শেষে বলা হয়েছে, — 'ওয়ামাঁয়্যুরিদ্ ফীহি বি ইলহাদিম্ বি জুল্মিন্ নুজিক্বহু মিন আ'জাবিন আলীম' অর্থ— এবং যে সীমালংঘন করে মসজিদুল হারামে পাপ কার্য করতে ইচ্ছা করে, তাকেও আমি আস্বাদন করাবো ব্যথাদায়ক শাস্তি'। এখানে 'ফীহি' (সেখানে) সর্বনামটি সম্বন্ধিত হবে সমগ্র হেরেম অথবা কেবল কাবা মসজিদের সঙ্গে। আর এখানকার 'ইলহাদ' (পাপকার্য) কর্মপদ হওয়ার কারণে রয়েছে সম্বন্ধপদের স্থানে। শব্দটির পূর্বের 'বি' এখানে অতিরিক্ত অব্যয়রূপে সংযোজিত । যেমন— 'তুমবিতু বিদ্দুহ্নি'। এখানেও 'বি' অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। কেননা ইন্‌বাত নিজেই এখানে মুতাআদ্দি (সকর্মকক্রিয়া) । কবি আ'মাশের এক কবিতায় বলা হয়েছে— দ্বমিনাত্ বি রিজক্বিন ইয়ালিনা আরমাহনা। এখানেও 'বি' সংযুক্ত হয়েছে অতিরিক্তরূপে। আবার আলোচ্য আয়াতের 'বিজুলমিন' (সীমালংঘন) এর সম্পর্ক ঘটেছে 'ইউরিদ' (ইচ্ছা করে) এর সঙ্গে।

হেরেম শরীফে পাপকার্য ও তার পরিণাম : হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট তিন শ্রেণীর লোক সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট— ১. হেরেমের অভ্যন্তরের ধর্মদ্রোহী ২. ইসলামের অভ্যন্তরে মূর্খতার যুগের রীতিনীতির প্রচলনকারী ৩. অন্যায় হত্যার সংকল্পক।

রযীনের স্বরচিত গ্রন্থে, বায়হাকীর আলমুদখালে এবং উম্মত জননী হজরত আয়েশা থেকে তিরমিজি ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ছয় প্রকার লোকের উপর রয়েছে আল্লাহ্‌র ও আমার অভিসম্পাত। আর আবেদন গ্রাহ্য নবীগণেরও। ওই লোকেরা হচ্ছে— ১. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের সঙ্গে তার নিজের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন করে ২. যে তাকদীর অস্বীকার করে

www.eelm.weebly.com

৩. বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী এবং আল্লাহ্ কর্তৃক লাঞ্ছিত ও সম্মানিতদেরকে করে যথাক্রমে সম্মানিত ও অপমানিত ৪. হেরেম শরীফের সম্মানহানিকে যে মনে করে হালাল ৫. আমার বংশধর ও নিকটজনকে বধ করা আল্লাহ্ কর্তৃক হারাম জেনেও যে এরকম করাকে মনে করে বৈধ এবং ৬. যে পরিত্যাগ করে আমার প্রদর্শিত পথ। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। সুপরিণতরূপে হজরত আলী থেকেও তিনি অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। উপরে বর্ণিত হাদিসদ্বয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে ও বাইরে সকল অবস্থায় সীমালংঘন ও অন্যান্য পাপকর্ম হারাম।

'ইলহাদ' শব্দটির আসল অর্থ বক্রতা, একগুঁয়েমি, হঠকারিতা, একদেশদর্শিতা, পদস্খলন। মুজাহিদ ও কাতাদার মতে শব্দটির অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যান ও অংশীবাদিতা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ইলহাদ অর্থ বচনগত ও কর্মগত উভয় প্রকার নিষিদ্ধ কর্মে বিজড়িত ব্যক্তি সকল। পরিচারকের প্রতি কটুবাক্যবর্ষণও এর অন্তর্ভূত।

আতা বলেছেন, ইলহাদ বলে ইহ্রামবিহীন অবস্থায় হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করাকে এবং সেখানে হেরেমের মর্যাদাবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়াকে, যেমন— শিকার করা, বৃক্ষকর্তন ইত্যাদি।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হেরেমাভ্যন্তরের পাপকর্ম হচ্ছে— যে তোমাকে বধ করেনি তাকে বধ করা, যে তোমার উপর জুলুম করেনি তার উপরে জুলুম করা। জুহাকের অভিমতও এরকম। মুজাহিদ বলেছেন, মক্কায় পাপকার্যের শাস্তি অন্যান্য স্থানে সম্পাদিত পাপকার্যের শাস্তি অপেক্ষা অধিক। যেমন, অন্যস্থানের পুণ্যকর্মের বিনিময় অপেক্ষা মক্কায় সম্পাদিত পুণ্যকর্মের বিনিময় বেশী।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, হেরেমের বাইরে কোথাও পাপকার্যের সংকল্প করলেও পাপ হবে না। যতক্ষণ না তা কার্যকর হয়। কিন্তু হেরেমের অভ্যন্তরে কাউকে হত্যার ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাবেন, যাকে হত্যা করতে চাওয়া হয়, সে এডেনের মতো দূরবর্তী স্থানে থাকলেও। অর্থাৎ মক্কাভ্যন্তরের পাপসংকল্প সংঘটিত পাপকর্মের মতোই। সুদ্দী বলেছেন, কিন্তু সে যদি তৎক্ষণাৎ তওবা করে ফেলে, তবে তাকে আর অভিযুক্ত করা হবে না।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমরের তাঁবু ছিলো দু'টি— একটি হেরেমের ভিতরে, অপরটি বাইরে। পরিবার পরিজন অথবা পরিচারক

www.eelm.weebly.com

পরিচারিকাকে শাসন করতে চাইলে তিনি গমন করতেন হেরেমের বাইরের তাঁবুতে। লোকেরা এরকম করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, আমরা কথা প্রসঙ্গে বলি 'কাল্লা ওয়াল্লাহ্' (আল্লাহ্র শপথ কক্ষনো নয়) বালা ওয়াল্লাহি (আল্লাহ্র শপথ হ্যাঁ) এসকল কথাও হেরেমের মধ্যে ইলহাদের অন্তর্ভূত।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ২৬, ২৭, ২৮

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ○ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ○ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ○

❒ এবং স্মরণ কর যখন আমি ইবরাহীমের জন্য স্থির করিয়া দিয়াছিলাম কাবা গৃহের স্থান, তখন বলিয়াছিলাম, 'আমার সহিত কোন শরীক স্থির করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখিও তাহাদিগের জন্য যাহারা তওয়াফ করে এবং যাহারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকূ করে ও সিজ্দা করে।

❒ এবং মানুষের নিকট হজ-এর ঘোষণা করিয়া দাও উহারা তোমার নিকট আসিবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উষ্ট্রের পিঠে, উহারা আসিবে দূর দূরান্তর পথ অতিক্রম করিয়া,

❒ যাহাতে উহারা উহাদিগের কল্যাণ লাভ করে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলিতে স্মরণ করে আল্লাহের নাম, উহাদিগকে তিনি যে জীবনোপকরণ দিয়াছেন আনয়াম হইতে, তাহার জবহ্কালে সুতরাং তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং আহার করাও দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং স্মরণ করো আমি ইব্রাহিমের জন্য স্থির করে দিয়েছিলাম কাবা গৃহের স্থান'। এ কথার অর্থ—হে আমার রসুল! স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন আমি আমার নবী ইব্রাহিমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম কাবাগৃহের স্থান। জুজাযও এরকম অর্থ করেছেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'লি ইব্রাহীম' কথাটির 'লি' অতিরিক্তরূপে সংযুক্ত। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে — যখন আমি ইব্রাহিমকে পবিত্র কাবার স্থানে অবস্থান করিয়েছিলাম।

www.eelm.weebly.com

কামুস নামক অভিধানগ্রন্থে রয়েছে 'বাওয়ানাহু মানজিলা' এবং 'ফিল মানজিল' অর্থ তাকে জায়গা করে দেয়া। আর 'আলমাবআতু মানজিলিন্' অর্থ অবতরণস্থল বা অবস্থানস্থল। বর্ণিত হয়েছে, হজরত নুহের মহাপ্লাবনের সময় 'কাবা' কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। বহুকাল গত হবার পর হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ্র নির্দেশে মক্কা গমন করেন ও কাবাগৃহ নির্মাণের নির্দেশ পান। কিন্তু তিনি কাবাগৃহ ঠিক কোথায় ছিলো তা ঠাহর করতে পারছিলেন না। তখন আল্লাহ্র হুকুমে শুরু হলো প্রবল বাতাস। সে বাতাসে উড়ে গেলো বিলুপ্ত কাবার উপরের ধূলোবালি। ভিত্তির চিহ্ন প্রকাশিত হলো। সেই ভিত্তির উপরেই পুনঃনির্মিত হলো কাবা। এরকম বলেছেন বাগবী।

বায়হাকীর দালায়েলে এবং ইবনে আবী হাতেমের মাধ্যমে সুদ্দীর বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ তখন সেখানে ঘটালেন রিহে খুজুজ্ (ঘূর্ণিঝড়)। ওই রিহে খুজুজের ছিলো দু'টি ডানা ও একটি মস্তক। আর তার আকার ছিলো সাপের মতো। ওই অদ্ভুদাকৃতির বায়ু মাটি সরিয়ে ফেলে কাবার বিলুপ্ত ভিত্তিচিহ্ন উন্মোচন করে দেয়। কালাবীর উক্তিরূপে বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্পাক তখন সেখানে প্রেরণ করলেন এক প্রকার বায়ুপ্রবাহ। প্রবাহটি এক স্থানে স্থির হয়ে বললো, ইব্রাহিম! এই এখানে কাবা। এখানেই নির্মাণ কার্য শুরু করো। তখন হজরত ইব্রাহিম সেখানেই শুরু করলেন তাঁর নির্মাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তখন বলেছিলাম আমার সঙ্গে কোনো শরীক স্থির কোরো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য যারা তওয়াফ করে এবং যারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকু করে ও সেজদা করে'। এখানকার 'বাওয়ানা' শব্দটির মধ্যে রয়েছে 'বলেছিলাম' কথাটি। আর 'বলেছিলাম' অর্থ এখানে— নির্দেশ দিয়েছিলাম। সে নির্দেশ এরকম— প্রতিমা অথবা অন্য কাউকে, কোনো কিছুকে আমার সত্তা-গুণাবলী এবং কার্যাবলীর অংশীদার নির্ধারণ কোরো না। আর নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী, রুকু-সেজদাকারী এবং তাওয়াফকারীদের জন্য এই কাবাকে পবিত্র রেখো।

এখানে 'আমার গৃহ' বলে কাবাগৃহকে সম্মানিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ্র গৃহ বলে সম্বোধিত হওয়ার কারণেই কাবা শরীফ হয়েছে আল্লাহ্র নূরের বিশেষ অবতরণ স্থল।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি রহ. বলেছেন, কাবা দৃশ্যতঃ আকৃতিবিশিষ্ট হলেও আকারাতীত এবং তা আনুরূপ্যবিহীনতার রঙে রঞ্জিত। তাই স্থান বা পরিসর এক্ষেত্রে গণনাযোগ্য কিছু নয়। তাই কাবা গৃহের দেয়াল, ছাদ, উর্ধ্ব ও অধঃ সীমানা— এসব কিছু কাবা নয়। এসকল কিছুকে অন্যত্র সরিয়ে নিলেও কাবা কাবাই থাকে। তার কোনো মর্যাদাহানি ঘটে না। আর কাবার দেয়াল ছাদ

www.eelm.weebly.com

অন্যত্র স্থাপন করলে সে স্থান কাবা হয়ে যায় না। তাই কাবা হচ্ছে চিররহস্যময় ও আকার প্রকারবিহীন এক কেন্দ্র, যেখানে সতত সন্নিপাত ঘটে আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন জ্যোতিচ্ছটার।

দণ্ডায়মানতা, রুকু ও সেজদা করার অর্থ নামাজ— এই তিন অবস্থা হচ্ছে নামাজের অঙ্গ। আর প্রত্যেক অঙ্গের জন্য পবিত্রতা অবধারিত। তাই এই তিন অবস্থাকে এখানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শরিয়তের বিচারে সেজদা ব্যতীত শুধু রুকু ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়। তাই এখানে রুকু ও সেজদার মধ্যে কোনো সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয়নি। বলা হয়েছে 'রুক্কাইস্ সুজুদ'। শিয়া পন্থীরা বলে, নামাজের মধ্যে শুধু কপাল স্থাপনের স্থানটুকু পবিত্র হলেই যথেষ্ট।

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'এবং মানুষের জন্য হজের ঘোষণা করে দাও'। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনাসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন হজরত ইব্রাহিমকে হজের ঘোষণা করতে বলা হলো তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! দূরদূরান্তরের মানুষ কীভাবে আমার আওয়াজ শুনবে? আল্লাহ্তায়ালা বললেন, তোমার দায়িত্ব ঘোষণা দেয়া, পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। হজরত ইব্রাহিম তখন বর্তমানে 'মাকামে ইব্রাহিম' নামে পরিচিত প্রস্তরখণ্ডটির উপরে দাঁড়ালেন। পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে গেলো প্রস্তরখণ্ডটি। হজরত ইব্রাহিম তাঁর দুই কানে হাতের অঙ্গুলি স্থাপন করে দক্ষিণে, বামে ও পুব দিকে মুখ করে উচ্চকণ্ঠে বললেন, শোনো হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রভুপালনকর্তা তাঁর গৃহ সৃজন করেছেন। আর ওই গৃহের হজ তোমাদের উপরে ফরজ করে দিয়েছেন। তখন কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের সকল মানুষ তাদের আপনাপন পিতৃপুরুষের পৃষ্ঠদেশ অথবা তাদের জননীদের উদর থেকে বলে উঠলো, লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক (হে আমার প্রভুপালয়িতা! এই তো আমি, এই তো আমি)। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, সর্বপ্রথম 'এই তো আমি' বলেছিলো ইয়েমেনবাসীরা। তাই হজযাত্রীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা অনেক। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইব্রাহিম হজের ঘোষণা দিয়েছিলেন আবু কুবায়েস পাহাড়ে উঠে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, আয়াতে উল্লেখিত আন্নাস (মানব সকল) থেকে সম্বোধ্য হবেন কেবলার অনুসারীগণ।

বাগবী লিখেছেন, হাসান বলেছেন, 'মানুষের জন্য হজের ঘোষণা করে দাও' বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। হজরত ইব্রাহিমকে এখানে সম্বোধন করা হয়নি। সম্বোধন করা হয়েছে রসুলপাক স.কে । এভাবে তাঁকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে— হে আমার রসুল! আপনার বিদায় হজ উপলক্ষে সকল মানুষকে হজ করতে বলুন।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করলেন, হে জনতা! তোমাদের উপর হজ ফরজ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা হজ পালন করো। মুসলিম, আহমদ, নাসাঈ। দারেমী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে'। কথাটি পরবর্তী ঘটিতব্য বিষয়ের বর্ণনা। কারণ পরক্ষণেই উল্লেখ এসেছে উটের। সুতরাং আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না যে, বাহনের সুবন্দোবস্ত ব্যতিরেকে হজ ফরজ। আর একথা দাউদ জাহেরী ও তাঁর সমমনা আলেমগণের অভিমতের পক্ষের কোনো দলিলও নয়। তাঁরা এবং মালেকী মতাবলম্বীগণের নিকটে বাহনবিহীন ব্যক্তির উপরেও হজ ফরজ। সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে যথাস্থানে আমি হজের বাহন ও পাথেয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি।

মাসআলা ঃ পদব্রজে হজ করা উত্তম কিনা, সে সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য এসেছে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, যারা পদব্রজে গমন করতে সক্ষম তাদের জন্য পদব্রজে হজ সমাধা করাই উত্তম। কেননা আলোচ্য আয়াতে বাহনের পূর্বে পদব্রজের উল্লেখ এসেছে। পায়ে হেঁটে হজ করা শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর। তাই এমতো হজযাত্রায় প্রকাশ পায় নম্রতা ও বিনয়বনতা। কেউ যদি পায়ে হেঁটে হজ পালন করার মানত করে তবে তাকে সেভাবেই হজ করতে হবে— এরকম সাব্যস্ত করে দিয়েছেন রসুল স. স্বয়ং। আরো বলেছেন, সে এরকম না করতে পারলে তার উপরে ওয়াজিব হবে একটি কোরবানী। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, পায়ে হেঁটে হজ করাই উত্তম। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যানবাহনে আরোহণ করে হজ পালন করাই উত্তম। কারণ পদযাত্রা ক্লেশকর বলে মূল ইবাদতে শৈথিল্য অথবা ত্রুটি দেখা দিতে পারে। তাছাড়া ইসলামে বৈরাগ্যের প্রশ্রয় নেই।

'ওয়া আলা কুল্লি দ্বমিরিন্' অর্থ সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উটের পিঠে। 'দ্বমিরিন্' এর শাব্দিক অর্থ কৃশকায়। এরকম উটই দূরগামী ও দীর্ঘ সফরের উপযোগী। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, হজযাত্রায় অনীহদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতাংশ। পরে আবার তাদেরকে পথ খরচ সঙ্গে নেয়ার এবং হজের সফরে ব্যবসা করার অনুমতিও দিয়েছেন আল্লাহ্।

'ইয়াতীনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন্ আমীক্' অর্থ তারা দূরদূরান্তরের পথ অতিক্রম করে। পূর্বের বাক্যের 'দ্বমিরিন্' পুংলিঙ্গ হলেও অর্থগত দিক থেকে শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক। 'কুল্লি (সর্বপ্রকার) শব্দটি তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। আর সে কারণেই 'ইয়াতীনা' শব্দরূপটিও হয়েছে স্ত্রীলিঙ্গবাচক।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'যাতে তারা তাদের কল্যাণ লাভ করে'। এখানকার 'মানাফিয়া' শব্দটির অর্থ পার্থিব ও ধর্মীয় কল্যাণ, যা অর্জিত হয় হজের মাধ্যমে। ইমাম মোহাম্মদ বাকের এবং সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, শব্দটির অর্থ ক্ষমা করার স্থান পর্যন্ত উপনীত হওয়া।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য হজ করে ও হজ সম্পাদনকালে অশ্লীলতা ও পাপ থেকে মুক্ত থাকে সে প্রত্যাবর্তন করে সদ্যজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে। বোখারী, মুসলিম। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'মানাফিয়া' অর্থ বেসাতি। ইবনে জায়েদের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসেরও এমতো অভিমত প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন, শব্দটির অর্থ বাণিজ্য কেন্দ্র বা বাজার। মুজাহিদ বলেছেন, 'বাণিজ্য'ও শব্দটির একটি অর্থ। সামগ্রিক অর্থ— ওই সকল জাগতিক ও ধর্মীয় কাজ, যা আল্লাহ্পাক পছন্দ করেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং নির্দিষ্ট দিনগুলিতে স্মরণ করে আল্লাহ্র নাম'। একথার অর্থ— এবং কোরবানীর জন্য নির্ধারিত দিনগুলোতে কোরবানীর পশু জবাইকালে তারা যেনো স্মরণ ও উচ্চারণ করে আল্লাহ্র নাম। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র নাম স্মরণ করার কথা বলে এখানে কোরবানী করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে— জবেহের মাধ্যমে হোক, অথবা হোক নহরের মাধ্যমে। আরো উল্লেখ্য, আল্লাহ্র নাম স্মরণ ও উচ্চারণ ব্যতিরেকে জবাইকৃত পশুর গোশত ভক্ষণ হালাল নয়। একথার মাধ্যমে এই বিষয়টিও প্রমাণ হয়ে যায় যে, আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্র নাম স্মরণ অত্যাবশ্যক।

'আইয়ামে মা'লুমাত' অর্থ নির্দিষ্ট দিনগুলি। অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেন, কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে জিলহজ মাসের দশ দিনকে। 'মা'লুমাত' বলে ওই দিবসগুলো গণনা ও বিবেচনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে। কেননা ওই দিবসগুলো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হজও এসে হয়ে যায়। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আইয়ামে মা'লুমাত' বলে বুঝানো হয়েছে আরাফার কোরবানীর দিবস এবং আইয়ামে তাশরিককে। মুকাতিল কেবল আইয়ামে তাশরিককে (তকবীর পাঠের দিবসসমূহকে)ই আইয়ামে মা'লুমাত বলেছেন। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, এখানে 'নির্দিষ্ট দিনগুলির' অর্থ কোরবানীর দিন ও তার পরের তিনদিন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে তিনি যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন আনয়াম থেকে, তার জবেহকালে'। এখানে 'আনয়াম' অর্থ ওয়াজিব মোস্তাহাব সকল প্রকার কোরবানীর পশু যা প্রেরণ করা হয় কাবাগৃহের দিকে। উল্লেখ্য, এখানে ওয়াজিব

www.eelm.weebly.com

ও মোস্তাহাব কোরবানীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্দেশ করা হয়নি। সাধারণভাবে সকল প্রকার কোরবানীর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আর সে সময় আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সতর্ক করা হয়েছে এই বলে যে 'স্মরণ করো আল্লাহ্‌র নাম'।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'দমুল ইহসার' ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে কোরবানী করতে হবে কোরবানীর দিন ও তার পরের তিন দিন। উল্লেখ্য, ইহ্‌রাম পরিহিত হজযাত্রী পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হলে তাকে হজের সংকল্প স্থগিত রেখে সেখানেই কোরবানীর পশু জবাই করতে হয়। এরকম কোরবানীকেই বলে 'দমুল ইহসার'।

আমরা বলি, সর্বসম্মত অভিমতানুসারে 'আইয়ামে মা'লূমাত' হচ্ছে হজের সময়ের কোরবানীর দিবসসমূহ। এর বিপরীত অভিমতের পরিপোষক আমরা নই। অবশ্য এ ব্যাপারে হজরত আলী ও হজরত ইবনে আব্বাসের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। আমাদের মতে নফল, মানত ও কাফফারার কোরবানী ওই নির্দিষ্ট দিনগুলোতে হওয়া জরুরী নয়। কেননা বিশুদ্ধ বর্ণনা পরম্পরায় প্রমাণিত হয় যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির বছরে রসুল স. ওমরা করার উদ্দেশ্যে জিলকদ মাসে মক্কাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলো সত্তরটি কোরবানীর উট। মক্কা পর্যন্ত পৌঁছতে না পেরে তিনি ওই উটগুলো জিলকদ মাসেই হুদায়বিয়ায় কোরবানী করেছিলেন। জিলহজ মাসের কোরবানীর নির্দিষ্ট দিবসসমূহের অপেক্ষা করেননি। সুতরাং নফল কোরবানী জিলকদ মাসেও জায়েয। আবার মানত করলে নফল ইবাদত হয়ে যায় ওয়াজিব। আর এ ধরনের ওয়াজিব কোরবানীও কোরবানীর নির্দিষ্ট দিন ছাড়া অন্য সময় করা যায়। অনুরূপ হেরেমের অভ্যন্তরে শিকার করার কাফফারা ও অন্যান্য পাপের কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যে সকল কোরবানী করতে হয়, সে সকল কোরবানীও কোরবানীর নির্দিষ্ট দিনসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নয়। অন্যত্র আল্লাহ্‌পাক কাফফারার কোরবানী সম্পর্কে বলেছেন 'হাদিয়্যান বালিগাল কা'বাতি'। সেখানে কোরবানীর নির্দিষ্ট দিনের কথা উল্লেখই করেননি। স্মর্তব্য, আল্লাহ্‌র কিতাব যদি কোনোকিছুকে সুনির্দিষ্ট করে না দেয়, তবে কেউই তা সুনির্দিষ্ট করে নেয়ার বা দেয়ার অধিকার রাখে না। তাই আমরা নফল, মানত, কাফফারা ইত্যাকার কোরবানীকে হজের সময়ের কোরবানীর নির্দিষ্ট দিনসমূহের অন্তর্ভূত বলার পক্ষপাতি নই। তবে তামাত্তু ও কিরান প্রকৃতির হজের কোরবানী আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 'নির্দিষ্ট দিবসে'র সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। অন্য সময় এ ধরনের কোরবানী সিদ্ধ নয়। বরং ইমাম আবু হানিফা বলেন, অবরোধের কারণে স্থগিত কোরবানীও 'নির্দিষ্ট দিবসসমূহে'র অন্তর্গত। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ আবার এ বিষয়ে বিপরীত মত পোষণ করেন। সুরা বাকারার তাফসীরে যথাস্থানে আমি এ সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছি। প্রয়োজনবোধে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা তা থেকে আহার করো'। আলেমগণের ঐকমত্যাগত অভিমত এই যে, এখানে 'আহার করো' বলে নিজের কোরবানী করা পশুর গোশত আহার করা যে মোস্তাহাব (অভিপ্রেত) সে কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কথাটি অত্যাবশ্যক কোনো আদেশ নয়। ইমাম শাফেয়ী কেবল বলেছেন, কথাটি বলা হয়েছে বৈধ (মোবাহ) প্রমাণার্থে, মোস্তাহাব বা ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক) অর্থে নয়। আলেমগণ আরো বলেন, মূর্খতার যুগের মানুষ মনে করতো, নিজের কোরবানী করা পশুর গোশত ভক্ষণ নিজের জন্য অবৈধ। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে তাদের ওই ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। অনুমতি দেয়া হয়েছে গোশত ভক্ষণের ।

মাসআলা ঃ আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে নফল কোরবানীর গোশত ভক্ষণ কোরবানী দাতার জন্য জায়েয। এর প্রমাণ রয়েছে বিদায় হজের বিবরণসমৃদ্ধ হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে। সেখানে বলা হয়েছে, হজরত আলী কিছুসংখ্যক উট এনেছিলেন ইয়েমেন থেকে। আর রসুল স. সঙ্গে নিয়েছিলেন আরো একশত উট। রসুল স. নিজ হাতে জবাই করলেন তেষট্টিটি। তারপর তাঁর নির্দেশে অবশিষ্টগুলো জবাই করলেন হজরত আলী। এরপর তিনি স. প্রতিটি উট থেকে কিছু কিছু গোশত নিয়ে একত্র করতে নির্দেশ দিলেন। তারপর নির্দেশ দিলেন রান্নার। রান্না শেষে ওই গোশত থেকে রসুল স. নিজে আহার করলেন। হজরত আলীও হলেন তাঁর আহার সঙ্গী। তাঁরা দু'জনে ওই গোশতের শুরুয়াও পান করলেন। মুসলিম। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, নিজের নফল কোরবানীর গোশত ভক্ষণ করা মোস্তাহাব। তাই রসুল স. সবগুলো উট থেকে কিছু কিছু গোশত নিয়েছিলেন। মোস্তাহাব না হলে দুই একটি উট থেকে গোশত নেয়াই ছিলো যথেষ্ট।

মাসআলা ঃ হজের কোনো ত্রুটির কারণে যে কোরবানী ওয়াজিব হয়, অথবা যা স্থিরীকৃত হয় ইহ্রাম অবস্থায় শিকারজনিত কাফ্ফারারূপে, তার গোশত ভক্ষণ কোরবানী দাতার জন্য নাজায়েয। কাফ্ফারার কোরবানী হচ্ছে বধকৃত কোরবানীর বদলা। এক আয়াতে বলা হয়েছে — ফাজ্বামাউ মিছ্লু মা ক্বাতালা মিনান্নায়ামে' (চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে যে যা বধ করেছে, বস্তুতঃ এটাই তার বিনিময়)। এই আয়াতে বলা হয়েছে আকৃতি-প্রকৃতিগত সাদৃশ্য অথবা মূল্যমানগত সাদৃশ্যের কথা। সুরা মায়েদার যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইহ্রাম অবস্থায় শিকারকৃত পশুর গোশত শিকারীর জন্য হালাল নয়। তাই তার কাফ্ফারা বা বদলা পশুর গোশতও তার জন্য নাজায়েয। অর্থাৎ মূল যেহেতু হারাম, সেহেতু তার বদলাও হারাম। রসুল স. বলেছেন, ইহুদীদের উপরে আল্লাহ্র অভিসম্পাত।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্ তাদের জন্য চর্বি হারাম করেছিলেন। কিন্তু তারা চর্বি গলিয়ে বিক্রয় করতো এবং ভক্ষণ করতো ওই চর্বির বিক্রিত অর্থ। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। মানতের কোরবানী সম্পর্কেও একই হুকুম। কেবল ইমাম মালেকের মতে হালাল হলেও অন্য সকল ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, মানত পূরণকারী ব্যক্তি তার মানতের পশুর গোশত ভক্ষণ করতে পারবে না।

হজ পালনকালে বিভিন্ন অপরাধের কারণে যে কোরবানী ওয়াজিব হয়, তার গোশত খাওয়াও কোরবানী দাতার জন্য অসিদ্ধ। এই অভিমতটিও ইমামগণের ঐকমত্যসঞ্জাত। হজ ভঙ্গ করার জন্য যে কোরবানী অত্যাবশ্যক হয়, তার বিধানও অনুরূপ।

ইসহাকের অভিমত ও এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমতরূপে এসেছে, মানতের কোরবানী এবং শিকারের বদলারূপে কাফ্ফারার কোরবানীর গোশত ছাড়া অন্য সকল প্রকার কোরবানীর গোশত কোরবানীদাতা ভক্ষণ করতে পারবে। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেন, মানতের এবং সকল প্রকার অপরাধের কাফ্ফারার কোরবানীর গোশত কোরবানীদাতার জন্য অসিদ্ধ। শিকারজনিত কাফ্ফারার কোরবানীর গোশত সিদ্ধ নয়। কারণ বিধানগতভাবে সকল প্রকার কাফ্ফারাই কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ বা বদলা)। সকল কাফ্ফারা প্রাপ্য হকদারের। আর কোরবানীদাতা তো হক পরিশোধকারী।

মানতের কোরবানী কোনো অপরাধের কাফ্ফারা নয়। কিন্তু মানতকে ইহ্রাম অবস্থায় শিকারের কাফ্ফারার সঙ্গে তুলনা করা যায়। এরকমও বলা যায় যে, মানতের কোরবানীও হকদারকে পুরোপুরি পরিশোধ করা অত্যাবশ্যক। তাই এমতোক্ষেত্রেও মানত পূরণকারী তার কোরবানীর পশুর গোশত খেতে পারবে না।

মাসআলাঃ সাধারণ কোরবানীর গোশত কোরবানীদাতা খেতে পারবে। অভিমতটি ঐকমত্যোৎসারিত। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোরবানী হচ্ছে আনুগত্যের প্রকাশ। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, কোরবানীর গোশত তোমরা নিজে খাও এবং অপরকে খাওয়াও। প্রয়োজনবোধে জমাও করতে পারো। হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরায় হজরত সালমা ইবনে আকওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য আলেমও এমতো বৈধতার প্রবক্তা। ওয়াজিব, নফল, মাসনুন, মোস্তাহাব— এসকল কোরবানীর ক্ষেত্রে এ বৈধতা প্রযোজ্য।

মাসআলা ঃ তামাত্তু ও কিরান প্রকৃতির হজযাত্রীদের কোরবানীর গোশত কোরবানীদাতারা খেতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতদ্বৈধতা

www.eelm.weebly.com

রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মতে এমতো কোরবানীর গোশত কোরবানীদাতার জন্য সিদ্ধ। কারণ এ ধরনের কোরবানী অবশ্যই ইবাদত ও আনুগত্যের প্রকাশ। ইতোপূর্বে আমি হজরত জাবেরের হাদিসে উল্লেখ করেছি রসুল স. প্রতিটি জবেহকৃত উট থেকে কিছু কিছু করে গোশত নিয়ে পাক করিয়ে খেয়েছিলেন। ওই গোশতের শুরুয়াও পান করেছিলেন। হজরত আলীকেও করে নিয়েছিলেন তাঁর ওই পানাহারের অংশীদার।

ইবনে জাওজী তাঁর সুনান পুস্তকে আবদুর রহমান ইবনে আবী হাতেম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, রসুল স. একবার আমাকে আজ্ঞা করলেন, তামাত্তু কোরবানীর গোশতগুলো খেয়ে নাও। আমি তাই করলাম। তারপর যা কিছু অবশিষ্ট রইলো, তা খয়রাত করে দিলাম। এই হাদিসের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, তামাত্তু কোরবানীর গোশত খাওয়া সর্বৈবরূপে বৈধ।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, তামাত্তু ও কিরান জাতীয় কোরবানীর গোশত ভক্ষণ কোরবানী দাতার জন্য অসিদ্ধ। বরং কোনো কোনো ওয়াজিব কোরবানীর গোশত এরকমও অসিদ্ধ, চাই তা মানতের কারণে ওয়াজিব হোক, অথবা অন্য কোনো কারণে। তিনি তাঁর অভিমতের সমর্থনে তিনটি হাদিস উপস্থাপন করেছেন— ১. ওই হাদিস যা হুদায়বিয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন হজরত নাজিয়া খাজায়ী। ২. হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। ৩. হজরত ইবনে তালহা বর্ণিত হাদিস। আমি সুরা বাকারার যথাস্থানে হাদিসগুলোর উল্লেখ করে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও লিপিবদ্ধ করেছি। তাছাড়া আলোচ্য আয়াতে প্রকাশ্যে বলা হয়েছে 'আহার করো'। অতএব কোরবানীর গোশত ভক্ষণ বৈধ— চাই সে কোরবানী ওয়াজিব হোক, যেমন তামাত্তু ও কিরান, অথবা হোক নফল। এখানে ওয়াজিব-নফলের ভেদাভেদ রাখা হয়নি। কেবল ঐকমত্যসম্ভূত বলেই মানতের কোরবানীকে এই বৈধতা থেকে আলাদা করা হয়েছে। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, মানতের কোরবানীর জায়েয নাজায়েযের মাসআলা হজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো বিষয় নয়। তবে ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকারের কাফ্‌ফারার কোরবানী হজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু ওই ধরনের কাফ্‌ফারার কথা বলাও আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতের 'আহার করো' নির্দেশটি দেয়া হয়েছে কেবল ওই সকল হজযাত্রীকে যারা সম্পূর্ণরূপে শরিয়তানুগত, যারা তাদের হজকে রাখে নিষ্কলুষ। ত্রুটিযুক্তদের সঙ্গে এই আয়াতের কোনো সম্পর্কই নেই।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আহার করাও দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে'। এখানে 'আল বায়িসা' অর্থ অভাবগ্রস্ত। আর 'বাউসুন' অর্থ অত্যন্ত অভাবী।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ২৯

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ○

☐ অতঃপর তাহারা যেন তাহাদিগের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাহাদিগের মানত পূর্ণ করে এবং তওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা যেনো তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে'। একথার অর্থ— তারপর তারা যেনো মস্তক মুণ্ডন করে, হাত-পায়ের নখ কাটে এবং পরিষ্কার করে ফেলে বগল ও নাভির নিচের পশম। তাফসীরকারগণ বলেছেন, আরাফাতের অবস্থান শেষে মুজদালিফা হয়ে মিনায় ফিরে আসার পর ইহ্রাম মুক্ত হয়ে বর্ণিত কাজগুলো করা যাবে। কিন্তু স্ত্রী-সহবাস তখনো বন্ধ থাকবে। স্ত্রী-গমন সিদ্ধ হবে তাওয়াফে জিয়ারতের পর।

এখানে 'কুদ্বা' অর্থ আদায় করা, সুসম্পন্ন করা, পূর্ণ করা। যেমন বলা হয়— কুদ্বা দাইয়ানাহু (সে তার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে)। এক আয়াতে এসেছে— ওয়া ইজা কুদ্বাইতুম মানাসিকাকুম (আর যখন তুমি হজের আরকান সমূহ আদায় করবে)। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— কুদ্বাহুন্না সাব্আ' সামাওয়াত (তাকে পরিণত করে দিয়েছেন সাতটি আকাশে)। উল্লেখ্য, কোনো কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার পর তা থেকে অবসর নেয়া হয়। এখানেও তেমনি হজ থেকে অবসর নেয়ার জন্য বলা হয়েছে দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করার কথা।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার 'তাফাছা' অর্থ হজের রোকনসমূহ। যেমন— মস্তক মুণ্ডন, নখ কর্তন, বগল ও নাভির নিচের পশম উৎপাটন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'তাফাছা' অর্থ কংকর নিক্ষেপণ। জুজায বলেছেন, শব্দটি আমি জানতে পেরেছি কোরআনের মাধ্যমেই। আরবী ভাষায় শব্দটি সুপ্রচল নয়।

মাসআলা ঃ কিরান হাজীদের জন্য কংকর নিক্ষেপ, কোরবানী, মস্তক মুণ্ডন এবং তাওয়াফ ধারাবাহিকভাবে করা ওয়াজিব। এখানে 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটি প্রয়োগের কারণে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মস্তক মুণ্ডন ও তাওয়াফ সম্পন্ন করতে হবে কোরবানী করার পর। এটাই ইমাম আবু হানিফার অভিমতের অনুকূল দলিল। কংকর নিক্ষেপণ এবং কিরান হাজীদের জন্য কোরবানী ও মস্তক মুণ্ডনের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা (প্রথমে কোরবানী, পরে মস্তক মুণ্ডন) ওয়াজিব।

www.eelm.weebly.com

সাঈদ ইবনে যোবায়ের, কাতাদা, হাসান ও ইব্রাহিম নাখয়ী এরকমই বলেছেন। সুতরাং কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ভুলক্রমে এই ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে তবে ক্ষতিপূরণস্বরূপ একটি পশু কোরবানী করা তার উপরে হয়ে পড়বে ওয়াজিব। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে হজের রোকনসমূহের তারতীব (ধারাবাহিকতা) খর্ব করা হলে (ক্ষতিপূরণের) কোরবানী ওয়াজিব হবে। ইবনে আবী শায়বা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন অপরিণত সূত্রপরম্পরায়। আর এমতো পরিস্থিতিতে অপরিণত হাদিসও সুপরিণত হাদিসের সমতুল। কারণ বিষয়টি ক্ষতিপূরণ বিষয়ক। এ ধরনের শাস্তিমূলক বিধান হজরত ইবনে আব্বাস নিশ্চয় রসুল স. এর কাছ থেকে না শুনে বলেননি।

একটি সন্দেহ ঃ বর্ণিত হাদিসটির সূত্রসংযুক্ত এক বর্ণনাকারী ইব্রাহিম ইবনে মুহাজিরের হাদিস পরিত্যাজ্য বলেছেন আবী হাতেম। আর ইবনে মদিনী ও নাসাঈর নিকট তিনি শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন। ইবনে মদিনী বলেছেন, তার বর্ণনাকৃত হাদিস শিথিল সূত্রবিশিষ্ট হাদিসের অন্তর্ভূত করা হয়েছে।

সন্দেহের নিরসন ঃ ইব্রাহিম ইবনে মুহাজির ছিলেন একজন মহামর্যাদাসম্পন্ন তাবেয়ী। ইমাম মুসলিমও তাঁর বর্ণনার আনুকূল্যকে মান্য করেছেন। তাছাড়া তাঁকে ক্রটিমুক্ত বর্ণনাকারীদের অন্তর্গত করেছেন সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আহমদ ও তিরমিজি। উপরন্তু ভিন্ন সূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, ইব্রাহিম ইবনে মুহাজির যার সূত্রপরাম্পরাভূত নয়। ইমাম তাহাবী লিখেছেন, আমি হাদিসটি শুনেছি ওয়াহাব থেকে, তিনি শুনেছেন আইয়্যুব থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে এবং তিনি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

ইমাম আহমদ বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে তরতীব ভেঙে ফেললেই কেবল কোরবানী ওয়াজিব হবে। ভুলবশতঃ অথবা নিরুপায় হয়ে করলে হবে না। তাঁর এই অভিমতটির কথা আছরামও বর্ণনা করেছেন। ইমাম বোখারীর মাধ্যমেও একথা অবগত হওয়া যায়। অভিমতটি আমারও মনঃপুত। কারণ ইমাম শাফেয়ীসহ অধিকাংশ আলেম বলেছেন, তরতীব রক্ষা করা সুন্নত, ওয়াজিব নয়।

ইমাম মালেক বলেন, কোরবানী ও কংকর নিক্ষেপের পূর্বে মস্তক মুণ্ডন সিদ্ধ নয়। এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এরকম। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. কে একবার কোরবানী, কংকর নিক্ষেপণ ও মস্তক মুণ্ডনের ধারাবাহিকতা রক্ষার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, এতে কোনো ক্ষতি নেই। বোখারী ও মুসলিম। বোখারীর বর্ণনায় আরো এসেছে, রসুল স.কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো কোরবানীর দিবসে মিনায়। তিনি স. তখন বলেছিলেন, কোনো ক্ষতি নেই। এক লোক বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল!

www.eelm.weebly.com

আমি তো কোরবানী করার আগে মুণ্ডিতমস্তক হয়েছি। তিনি স. বলেছিলেন, অসুবিধে নেই। এখন কোরবানী করে নাও। বোখারীর অপর এক বর্ণনায় এসেছে, এক লোক রসুল স. এর মহান সংস্পর্শে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি কংকর নিক্ষেপের আগেই জিয়ারত (তাওয়াফে জিয়ারত) করেছি। তিনি স. বললেন, বিপত্তির কিছু নেই। তিনি পুনরায় বললেন, আর আমি তো কংকর নিক্ষেপের পূর্বে কোরবানীও করে ফেলেছি। তিনি স. বললেন, তাতেও কোনো অসুবিধে নেই।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, এক লোক রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! আমি কংকর নিক্ষেপের আগেই কাবা তাওয়াফ করে ফেলেছি। তিনি স.বললেন, ঠিক আছে। এবার কংকর নিক্ষেপণ সমাধা করো। ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, কোরবানীর পূর্বে তাওয়াফ করার বিষয়ে রসুল স. সকাশে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন হজরত আলী স্বয়ং। ইমাম শাফেয়ী বলেন, তরতীব রক্ষা করা যদি ওয়াজিব হতো, তবে রসুল স. নিশ্চয় তাঁকে পুনরায় হজের আরকানসমূহ পুনরায় ধারাবাহিকভাবে সম্পাদনের নির্দেশ দিতেন। কারণ তখনও কোরবানীর দিবস অবশিষ্ট ছিলো। অথবা দিতেন তরতীব ভঙ্গ করার ক্ষতিপূরণের (কোরবানীর) নির্দেশ। কিন্তু তিনি স. এরকম করেননি। আর ওই জনসমাবেশটি ছিলো তৎকালীন মুসলমানদের সর্ববৃহৎ সমাবেশ। সকলেই ছিলেন তখন হজের যথাযথ বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হতে একান্ত আগ্রহী। সুতরাং কোনো বর্ণনাতেই যেহেতু এ ব্যাপারে পুনরায় রোকনসমূহ ধারাবাহিকভাবে পালন অথবা কোরবানীর নির্দেশ আসেনি এবং কেউই এ সম্পর্কে কোনো আলোচনার সূত্রপাত করেননি, সেহেতু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, তরতীব ওয়াজিব নয়। ওয়াজিব হলে রসুল স. অবশ্যই তা জানাতেন। অতএব, একথা বলতেও আর কোনো বাধা নেই যে, বর্ণিত বিষয়ে তরতীব ইচ্ছাকৃতভাবে লংঘন করলেও কোরবানী ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, উপরোক্ত ঘটনাবলীর একজন প্রধান বর্ণনাকারী হচ্ছেন হজরত ইবনে আব্বাস। তাঁর নিকট থেকে আবার বিপরীতধর্মী বক্তব্যও এসেছে। তিনি বলেছেন, হজের আরকান প্রতিপালনে তরতীব ভঙ্গ করলে কোরবানী দিতে হবে। এখন কথা হচ্ছে বর্ণনাকারীর বক্তব্য যদি তাঁর বর্ণনাকৃত বিষয়ের বিপরীত হয়, তবে তাঁর বর্ণনাও হয়ে যায় ত্রুটিযুক্ত, স্ববিরোধী। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটি সেরকম নয়। এখানে স্ব স্ব স্থানে তাঁর বর্ণনা ও অভিমত সঠিক। অভিমতটিও আবার সুপরিণত বর্ণনার সমতুল। সুতরাং বুঝতে হবে তাঁর আগের বর্ণনা পরের কোনো এক বর্ণনা দ্বারা রহিত হয়েছে। আর সেই রহিতকারী বর্ণনার প্রেক্ষিতেই তিনি সরাসরি তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, হজের আরকান পালনে তরতীব ভঙ্গ করলে কোরবানী দিতে হবে। সমস্যাটিকে এভাবে গ্রহণ করলে ইমাম শাফেয়ীর মতামতকেও ভুল বলা যায় না। কারণ তাঁর বিচারে

www.eelm.weebly.com

বর্ণনাকারীর অভিমতবিরোধী বর্ণনা ত্রুটিপূর্ণ নয়। বরং ইমাম আবু হানিফার মতে এমতাবস্থার বর্ণনা ত্রুটিপূর্ণ, যদি বর্ণনাকারীর অভিমত সুপরিণত পর্যায়ের হয়। এরকম অভিমত হয় তাঁর ইতোপূর্বের বর্ণনার রহিতকারী। কিন্তু এখানকার বিষয়টি সেরকম নয়। অর্থাৎ এখানে তাঁর অভিমত পরিণত পর্যায়ের, সুপরিণত পর্যায়ের নয়।

আমি বলি, দৃশ্যতঃ পরস্পরবিরোধী হাদিসের কোনো একটিও পরিহরণীয় নয়। বরং এ ধরনের বৈপরীত্যের সমন্বয়ন আবশ্যক। তাই আমার অভিমত হচ্ছে, সুপরিণত হাদিসের পর্যায়ভূত ও উত্তমসূত্র বিশিষ্টতার মর্যাদাপ্রাপ্ত হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতটিকে প্রয়োগ করতে হবে ইচ্ছাকৃত তরতীব ভঙ্গের ক্ষেত্রে। আর ইমাম শাফেয়ীর মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়টিকে প্রয়োগ করতে হবে অনিচ্ছাকৃত বা ভুলবশতঃ তরতীব ভঙ্গের বেলায়। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে তরতীব ভঙ্গ করলে কোরবানী ওয়াজিব হবে, কিন্তু ভুলবশতঃ এরকম করলে হবে না। যেমন ইমাম আবু হানিফা বলেন, পরিত্যক্ত নামাজের ওয়াক্তের তরতীব রক্ষা করা এবং নিয়ত করা ওয়াজিব। কিন্তু এমতোক্ষেত্রে ভুলবশতঃ তরতীব ভঙ্গ হলে দোষের কিছু নেই। আবার রোজা সম্পর্কে তিনি বলেন, ভুলবশতঃ পানাহার করলে রোজা ভাঙে না। ইচ্ছাকৃতভাবে করলে ভাঙে। হজের আরকানের তরতীব রক্ষার ব্যাপারটিকেও এরকম মনে করতে হবে।

মাসআলা ঃ মস্তক মুণ্ডন ইহ্রামের জন্য ওয়াজিব, কিন্তু তা হজের কোনো রোকন নয়। অর্থাৎ হজের সঙ্গে মস্তক মুণ্ডনের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। তাই ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম আহমদ এবং কোনো কোনো মালেকী মতাবলম্বী আলেম বলেন, কাজটি মোবাহ্ (অনুমোদিত)। একটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর সঙ্গেও এমতো অভিমতের সম্পর্কায়ন করা হয়েছে। কিন্তু আমার দলিল হচ্ছে আলোচ্য আয়াত। এখানে স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করার কথা। আর 'তাফাছা' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মস্তক মুণ্ডনকে। আর এখানকার বক্তব্যটিও নির্দেশসূচকতার মতো। সুতরাং মস্তক মুণ্ডন হজের একটি আবশ্যকীয় রোকন (ওয়াজিব)। আর এখানে এমতো সন্দেহ ও উত্থাপিত হতে পারে না যে, তাহলে নির্দেশটিকে ফরজ বলা যাবে না কেনো? এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে— আয়াতের নির্দেশনা এখানে স্পষ্ট হলেও ব্যাখ্যাগত দিক থেকে নির্দেশটি অকাট্য নয়, বরং সম্ভাব্য। অতএব, মস্তক মুণ্ডন হজের রোকন হিসেবে ওয়াজিব বলে অভিহিত হতে পারে, এর অধিক নয়।

ইমাম শাফেয়ী মস্তক মুণ্ডনকে এ কারণে হজের রোকন বলে গণ্য করেছেন যে, এর মাধ্যমে ইহ্রামের বিধান শেষ হয়ে যায়। আর ইহ্রাম হচ্ছে হজের সরাসরি রোকন। তাই সরাসরি রোকনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়ও রোকন বলে গণ্য। যেমন

www.eelm.weebly.com

তাঁর মতে সালাম (উচ্চারণের মাধ্যমে নামাজ শেষ করা) নামাজের রোকন। কেননা সালাম উচ্চারণের ফলে নামাজের রোকনসমূহের সমাপ্তি ঘটে। আমাদের মতে মস্তক মুণ্ডন হজের শর্ত বা রোকন হোক আর না হোক, কোনো অবস্থাতেই তা এমন শর্ত বা রোকন নয়, যার মাধ্যমে ইহ্‌রামের পরিসমাপ্তি ঘটে। আর আমাদের মতে 'সালাম'ও নামাজের রোকন নয়। ইহ্‌রামের সঙ্গে তুলনীয়ও নয়। কেননা রসুল স. সালামকে নামাজের তাহ্‌রীমার (পার্থিব কর্মের নিষিদ্ধতার) সমাপ্তি সাব্যস্ত করেছেন। তিনি স. বলেছেন, তাকবির (প্রথম আল্লাহ্‌ আকবার ধ্বনি) নামাজের তাহ্‌রীমা (নিষিদ্ধতা আরোপক) আর সালাম নামাজের তাহ্‌লীল (নিষিদ্ধতা বিলোপক)। অর্থাৎ নামাজ শুরু হয় 'আল্লাহ্‌ আকবার' সহযোগে, আর শেষ হয় 'সালাম' দ্বারা। সালামের আগেও অবশ্য নামাজ বিনষ্টক বাক্য ও আচরণ দ্বারা নামাজ শেষ বা ভঙ্গ হয়ে যেতে পারে, তাহ্‌রীমাকে শর্ত বা রোকন বলা হলেও কিন্তু হজের ইহ্‌রাম এরকম নয়। নিষিদ্ধ কোনো কাজ করা সত্ত্বেও হজের ইহ্‌রাম ভঙ্গ হয় না। লক্ষ্য করুন ইহ্‌রাম অবস্থায় আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রীগমন করলেও ইহ্‌রাম বিনষ্ট হয় না। ইহ্‌রাম বলবৎ থাকে কিন্তু হজ পণ্ড হয়ে যায়। অর্থাৎ পরের বছরে ওই হজের কাজা আদায় করে নিতে হবে। ব্যাপারটা এরকম নয় যে, হজ ঠিক থাকবে। অথচ ইহ্‌রাম বাতিল হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ মস্তক মুণ্ডনের সময় শুরু হয় কোরবানীর দিন সুবহে সাদেক থেকে। অধিকাংশ আলেম এরকম বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সময় শুরু হয় অর্ধরাত্রির পর থেকে। হজরত ওরওয়া ইবনে মুফরিছ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে (ফজরের) নামাজ মুজদালিফায় পড়েছে এবং তার আগের দিনে অথবা রাতে আরাফায় অবস্থান করেছে তার হজ পূর্ণ হয়েছে এবং সে দূর করেছে তার অপবিত্রতা (হয়েছে মুণ্ডিত মস্তক)। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি সকল হাদিসবেত্তাগণের শর্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু বোখারী ও মুসলিম হাদিসটিকে গ্রহণ করেননি। কারণ হাদিসটি ছিলো তাঁদের নির্বাচনবিধির মূলনীতির পরিপন্থী। হজরত ওরওয়া ইবনে মুফরিছ থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কেবল শো'বা। আমি আবার হজরত ওরওয়া ইবনে মুফরিছের নামের স্থলে পেয়েছি হজরত ওরওয়া ইবনে যোবায়েরের নাম। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ সহ অধিকাংশ আলেমের মতে মস্তক মুণ্ডনের শেষ সময়সীমা বলে কিছু নেই। কিন্তু এই বিষয়টি বিতর্কমণ্ডিত যে, মস্তক মুণ্ডনের স্থান কি হেরেম শরীফের ভিতরে হতেই হবে, না বাইরে হলেও চলবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম জোফার হেরেম শরীফকে মস্তক মুণ্ডনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়

www.eelm.weebly.com

স্থান বলে মনে করেন না। ইমাম আবু হানিফা বলেন, মস্তক মুণ্ডনের রয়েছে দু'টি দিক— ১. মস্তক মুণ্ডন ইহ্‌রাম ভঙ্গ হওয়ার মাধ্যম ২. মস্তক মুণ্ডন আরকানে হজের অন্তর্ভূত একটি ওয়াজিব রোকন। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে বিষয়টি কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এবং শেষোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুণ্ডনকর্মের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ তা সম্পাদিত হতে হবে হেরেম শরীফের সীমানার মধ্যেই। কারণ তা হজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি ইবাদত যার মধ্যে কিয়াসের (তুলনামূলকতার) অবকাশ মাত্র নেই। সুতরাং বিষয়টি শরিয়ত প্রবর্তক রসুল স. এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়াই সমীচীন। আর তাঁর সাব্যস্তানুসারে মস্তক মুণ্ডনের সময় হচ্ছে কোরবানীর দিন এবং স্থান হেরেমের অভ্যন্তর। প্রথমোক্ত অবস্থায় অবশ্য কিয়াসের অবকাশ রয়েছে। তবে একথা ঠিক যে, নির্দিষ্ট সময় ও স্থান ছাড়া অন্য কোনো সময়ে ও স্থানে মস্তক মুণ্ডন করলেও ইহ্‌রাম মুক্ত হওয়া যাবে। কিন্তু তা শরিয়তের পরিপন্থী হওয়ার কারণে গণ্য হবে বাতিল বলে। তাই ক্ষতিপূরণস্বরূপ একটি কোরবানী হবে ওয়াজিব। ইমাম আবু ইউসুফ বর্ণিত হাদিসকে দলিলরূপে গ্রহণ করে অভিমত প্রকাশ করেছেন, কেউ কোরবানী করার আগেই মস্তক মুণ্ডন করলে কোনো অসুবিধে হবে না, কিন্তু তাকে দিতে হবে ক্ষতিপূরণের কোরবানী।

আমরা বলি, হাদিসটির ব্যাখ্যা এরকম— তখনও কোরবানীর দিবস বাকি ছিলো, বাকি ছিলো মস্তকমুণ্ডনের সময়ও। তাই রসুল স. কোরবানীর আগে মস্তক মুণ্ডনকারীকে বলেছিলেন, কোনো অসুবিধে নেই। এখন কোরবানী করে নাও।

এখন অবশিষ্ট রইলো আর একটি প্রসঙ্গ। তা হচ্ছে— রসুল স. হুদায়বিয়ায় কোরবানী ও মস্তক মুণ্ডন করেছিলেন। এ সম্পর্কে ইমাম আজম আবু হানিফা বলেছেন, রসুল স. তখন হয়েছিলেন বাধাগ্রস্ত। তাই নিরুপায় অবস্থায় তাঁকে হুদায়বিয়াতেই কোরবানী ও মস্তক মুণ্ডন করতে হয়েছিলো। তিনি আরো বলেছেন, এরকম পরিস্থিতিতে মস্তক মুণ্ডন ওয়াজিব নয়। আমি বলি, কাউকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে এভাবে ঠেকিয়ে রাখলে, তাকে বলতে হবে অপারগ (মাজুর)। এরকম অপারগতা স্বাভাবিক পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনীয় নয়। অপারগ ব্যক্তি যেখানে সম্ভব হবে সেখানেই কোরবানী ও মস্তক মুণ্ডন করতে পারবে।

আমরা হেরেমের অভ্যন্তরে মস্তক মুণ্ডনের যে শর্ত আরোপ করেছি, সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী বাক্যের (এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের) তাফসীরে আরো ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া সুরা আল ফাতাহের ২৭ সংখ্যক আয়াতেও মস্তকমুণ্ডন ও চুল কর্তনের স্থানরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে হেরেম শরীফের অভ্যন্তরভাগকে। যেমন— 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে— কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে, কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে'।

www.eelm.weebly.com

ইসলামের প্রথম যুগের সাধুপুরুষগণের রীতি ছিলো, তাঁরা সব সময় হেরেমের অভ্যন্তরভাগে মস্তক মুণ্ডন করতেন। কারণ রসুল স. স্বয়ং এরকম করতেন। তাঁর অনুসৃত আদর্শই প্রতিপালিত হয়ে চলেছে, সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনের যুগে এবং তাঁদের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে। ওমরার সময় মস্তক মুণ্ডন করতেন মারওয়ার নিকট আর হজের সময় মুণ্ডন করতেন মীনাতে। মীনা ও মারওয়া হেরেমের সীমানাভূত।

মাসআলা ঃ মস্তক মুণ্ডন ও কেশ কর্তনের সীমা-পরিসর সম্পর্কেও ইমামগণের মতপৃথকতা রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা মাথার এক চতুর্থাংশের চুল কামিয়ে ফেলা অথবা কর্তন করাকেই যথেষ্ট মনে করেন। ইমাম শাফেয়ীর মতে একটি অথবা তিনটি চুল কামানো অথবা কর্তন করাই যথেষ্ট। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেন, মুণ্ডন অথবা কর্তন করতে হবে সমস্ত মাথার চুল।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'তারা যেনো তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে', —এই নির্দেশনানুসারে মস্তক মুণ্ডন ইত্যাদি ওয়াজিব। কিন্তু আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, অপরিচ্ছন্নতা সম্পূর্ণ দূর করা আবশ্যক বটে, কিন্তু অত্যাবশ্যক নয়। কেননা এমতোক্ষেত্রে হ্রাস (কছর) করার অনুমতি রয়েছে। আর এরকম হ্রাসের পরিসর সুনির্দিষ্ট নয়। তাই একটি অথবা তিনটি চুল মুণ্ডন অথবা কর্তনের মাধ্যমেও কাজটি সম্পন্ন করা যায়।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আরববাসীগণ একটি অথবা তিনটি কেশ কর্তন করাকে মুণ্ডন বলে গণ্য করেন না। তাই মস্তক মুণ্ডন অথবা কেশ কর্তনের একটি সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সে কারণেই বলা যেতে পারে কর্তন করতে হবে মস্তকের এক চতুর্থাংশ অংশের চুল। কারণ এক চতুর্থাংশকে সমস্ত অংশের স্থলাভিষিক্ত করার দৃষ্টান্ত রয়েছে এই কোরআন মজীদের তাফসীরেই। ওজুর সময় মস্তকের চারভাগের এক ভাগ প্রোক্ষনকেই করা হয়েছে সমস্ত মস্তক প্রোক্ষনতুল্য। সুরা মায়েদার যথাস্থানে বিষয়টির উপর ইতোপূর্বে ব্যাপক ভাবে আলোচনাও করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, যেহেতু ওজুর সময় মস্তকের চার ভাগের এক ভাগ মসেহ করা সম্পূর্ণ মস্তক মসেহ করার স্থলাভিসিক্ত, তাই তিনি মস্তক মুণ্ডনের ব্যাপারেও তেমনি বলেন। ইমাম মালেক এবং ইমাম মোহাম্মদ ওজুর সময় এক চতুর্থাংশ মস্তক মসেহ করাকে যথেষ্ট মনে করেন না। তিনি বলেন, সমস্ত মাথা মসেহ করতে হবে। তাই তারা মস্তক মুণ্ডনের ক্ষেত্রে বলেন, সমস্ত মাথার চুল মুণ্ডন অথবা কর্তন করা ওয়াজিব। উল্লেখ্য, সাহাবায়ে কেরাম এরকমই করতেন। পরবর্তী সময়ের মুসলমানেরাও এরকম আমল করে চলেছেন।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ আলেমগণের ঐকমত্যসম্ভূত অভিমত এই যে, কর্তন অপেক্ষা মুণ্ডন উত্তম। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. তখন দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! মস্তক মুণ্ডনকারীদের উপর রহম করো। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! দয়া করে বলুন, কেশকর্তনকারীদের প্রতিও। তিনি স. পুনরায় বললেন, হে আল্লাহ্! রহমত বর্ষণ করো মুণ্ডিত মস্তকদের উপর। সাহাবীগণ আবারো বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! অনুগ্রহ করে বলুন কেশকর্তনকারীদের উপরেও। তিনি স. এবারেও বললেন, হে আমার আল্লাহ্! দয়া বর্ষণ করো মস্তক মুণ্ডনকারীদের প্রতি। সাহাবীগণ বললেন, কেশকর্তনকারীদের প্রতিও। তিনি স. এবার বললেন, হ্যাঁ, কেশকর্তনকারীদের প্রতিও। এক বর্ণনায় এসেছে, 'কেশকর্তনকারীদের প্রতিও' এরকম বলেছিলেন তিনি চতুর্থবার। হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। উভয় হাদিস বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

এরপর বলা হয়েছে, 'তাদের মানত পূর্ণ করে'। আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনা হচ্ছে 'এবং তাদের মানত পূর্ণ করে'। কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, মানত পূর্ণ করার দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে হজের সময়ের সকল ওয়াজিব আমলসমূহকে— মানত করুক অথবা না করুক। অর্থাৎ সে আমল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত হোক অথবা মানতের মাধ্যমে নিজের উপরে ওয়াজিব করে নেয়া হোক। কিন্তু অধিকাংশ আলেম বলেন, এখানে বলা হয়েছে ওই সকল আমল সম্পাদনের কথা, যা মানুষ মানত করার মাধ্যমে নিজেই নিজের উপরে ওয়াজিব করে নেয়।

মানতের প্রকারভেদ ঃ মানত দুই প্রকার। ১. শর্তহীন মানত— যেমন কেউ প্রতিজ্ঞা করলো, আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে দুই রাকাত নামাজ পড়বো। ২. শর্ত সাপেক্ষ মানত— যেমন কেউ বললো, যদি আমার এই অভিলাষ পরিপূরিত হয় তবে আমি একটি রোজা প্রতিপালন করবো। এমতোক্ষেত্রে শর্ত আবার দুই ধরনের— ১. অভিপ্রেত ২. অনভিপ্রেত। অভিপ্রেত বা পছন্দনীয় শর্তের দৃষ্টান্ত এরকম— আল্লাহ্পাক আমাকে রোগমুক্ত করলে আমি চারটি রোজা পালন করবো। আর অনভিপ্রেত বা অপছন্দনীয় শর্তের দৃষ্টান্ত হচ্ছে— কেউ বললো, যায়েদের সঙ্গে যদি আমি কথা বলি, তবে এক মাস ধরে রোজা রাখা হবে আমার উপরে ওয়াজিব।

শরিয়ত যাকে অত্যাবশ্যক বলে নির্ধারণ করেনি সেরকম কোনো কিছুকে নিজের উপরে অত্যাবশ্যক করে নেয়ার নাম মানত। শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত ওয়াজিব কেউ নিজের উপরে ওয়াজিব করে নিতে চাইলেও তা মানত বলে গণ্য

www.eelm.weebly.com

হবে না। বরং তা হবে এক ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশক বাক্য। যেমন কেউ বললো, আল্লাহ্ যদি আমাকে নিরাময় করেন, তবে আমি সারা রমজান মাস রোজা রাখবো, অথবা সারা বছর ধরে জোহরের নামাজ পড়বো। বলাবাহুল্য যে, রমজানের রোজা, জোহরের নামাজ ইত্যাদি আগে থেকেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অত্যাবশ্যক। সুতরাং এরকম কথাকে মানত বলা যাবে না। আবার এরকম শপথকেও মানত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, যার মাধ্যমে শরিয়ত পরিবর্তনের উপক্রম হয়। শরিয়তের বিধানাবলী চুল পরিমাণ এদিক ওদিক করার অধিকার কারো নেই। এমতোক্ষেত্রে পরিবর্তন, পরিযোজন, পরিবিয়োজন অসিদ্ধ ও নিষিদ্ধ। যেমন কেউ বললো, আল্লাহ্ যদি আমাকে বিপদমুক্ত করে দেন, তবে আমি আমার সম্পদের জাকাত দিবো এক পঞ্চমাংশ হারে। অথবা বললো, তাহলে আমি জোহরের চার রাকাত নামাজ পাঠ করবো ছয় রাকাত করে। কিংবা বললো, নতুন নতুন ওজু দ্বারা পাঠ করবো প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, অথবা জামাত ছাড়া কোনো নামাজই পড়বো না। এরকম মানতের বাস্তবায়ন নিষিদ্ধ। কারণ জাকাত হচ্ছে জমানো সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং জোহরের নামাজ চার রাকাত ফরজ। আর নতুন ওজু ছাড়াও নামাজ পাঠ সিদ্ধ (যদি পূর্বের ওজু অটুট থাকে)। আবার জামাত ছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে নামাজ পাঠের অনুমতি রয়েছে। এ সকল কিছু হচ্ছে শরিয়তের অপরিবর্তনীয় বিধান। সুতরাং কারো প্রতিজ্ঞা, শপথ বা মানত এগুলোর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হতে পারে না। তাই এ ধরনের শরিয়তবিরুদ্ধ মানতকারীর উপরে ওয়াজিব হবে কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ। অবশ্য এমতো ক্ষতিপূরণের বিশেষ কোনো পদ্ধতি শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হয়নি। অথচ মানত পুরা করা ওয়াজিব। তবে ক্ষতিপূরণরূপে কোরবানী করা একটি সুপ্রসিদ্ধ আমল। যেমন কেউ মানত করলো, আমি হজ করবো পদব্রজে। এরপর যদি সে কোনো বাহনে আরোহণ করে তার হজ সম্পন্ন করে তবে কাফফারা স্বরূপ তাকে দিতে হবে একটি কোরবানী।

উপরে বর্ণিত বিষয়াবলীর মধ্যে আবার একটি অসুবিধা বিদ্যমান। যেমন, অন্যান্য মানত পূরণ না করা গেলেও 'জাকাত দিবো এক পঞ্চমাংশ'— এই মানতটি শরিয়ত সম্মতভাবে পূরণ করা সম্ভব। এমতোক্ষেত্রে চল্লিশ ভাগের একভাগ জাকাত হিসেবে আদায় করার পর অবশিষ্ট অংশ পরিপূরিত হতে পারে মানত হিসেবে। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

যে আমল শরিয়ত ওয়াজিব করে দেয়নি, নিজের উপর সে ধরনের ওয়াজিব করে নেয়া আমল তিন ধরনের— ১. ওই সকল কাজ, যা পুণ্যার্জক। ২. ওই সকল কাজ, যা পাপার্জক। ৩. ওই সকল কাজ যা পাপপুণ্যের সম্পর্কবিবর্জিত

www.eelm.weebly.com

(মোবাহ)। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, প্রথমোক্ত প্রকার মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর আলোচ্য আয়াতকেই তাঁরা গণ্য করেন তাঁদের এমতো অভিমতের প্রমাণরূপে।

আলোচ্য বাক্যে উদ্ধৃত মানত ফরজে আইন (অবধারিত ফরজ), না ওয়াজিবে জন্নী (অনুমান ভিত্তিক ওয়াজিব) সে সম্পর্কে আলেমগণ মতপ্রভেদ ঘটিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফার নিকট একটি গ্রহণযোগ্য বিধান এই যে, সাধারণ নির্দেশনা দ্বারা কখনো সুস্পষ্ট ফরজ প্রমাণিত হয় না। আর আলোচ্য বক্তব্যটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। এখানে ঢালাওভাবে বলা হয়েছে— 'এবং তাদের মানত পূর্ণ করে'। কিন্তু পাপার্জক আমলের মানত পূর্ণ করা নাজায়েয। তাই বলতে হয়, আলোচ্য নির্দেশনা থেকে মানত সম্পর্কীয় সঠিক ধারণা লাভ করা যায় বটে, কিন্তু এই হুকুমটি ফরজ নয়, ওয়াজিব।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ইমাম আবু হানিফার নীতিমালা অনুসারেই এখানকার নির্দেশনাটি অকাট্য ফরজ। কারণ মানত পূরণ করার কথা এখানে সাধারণভাবে বলা হলেও মানতের বিধানটি এজমা বা ঐকমত্যসম্মত। আর পুণ্যার্জক আমলের মানত যদি শর্তহীন এবং তা পূরণ করা সাধ্যাতীত না হয়, তবে তা পালন করা ফরজ। এমতাবস্থায় মানত পরিত্যাগ করে কাফ্ফারা আদায় করা সর্বসম্মত অভিমতানুসারে নাজায়েয। কারো কারো মতে এমতোক্ষেত্রে শপথভঙ্গ করে শপথভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করা যাবে এবং তা যদি শর্তযুক্ত মানত হয়, আর শর্ত যদি উপস্থিত থাকে, তবে ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানিফা এবং অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে— এমতাবস্থার বিধান হবে শর্তহীন মানতের মতো। যেনো শর্তযুক্ত মানতের অর্থ এই যে, শর্ত উপস্থিতির সময় আল্লাহ্ই এরূপ কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা পরলোকগমনের সাতদিন পূর্বে তাঁর বর্ণিত অভিমত প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, শর্তসাপেক্ষ মানতের ক্ষেত্রে মানতকারীর এই স্বাধীনতা রয়েছে যে, সে তার মানত পূর্ণ করবে, অথবা প্রদান করবে কসমের কাফ্ফারার মতো কাফ্ফারা। ইমাম মোহাম্মদও এরকম বলেছেন।

যদি কেউ মানত করে, আল্লাহ্ আমাকে এই পীড়া থেকে মুক্তি দিলে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশরূপে একটি হজ পালন করবো, অথবা সারা বছর রোজা রাখবো, তবে তার এমতো স্বাধীনতা রয়েছে— সে হজও করতে পারবে অথবা দিতে পারবে শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণের মতো ক্ষতিপূরণ। আর রোজার মানত পূরণের বেলায় অপারগ হলে (ফিদিয়া দিতে অসমর্থ হলে) সারা বছর ধরে রোজা পালন করবে। অথবা রোজা রাখবে মাত্র তিন দিন। কেননা অপারগদের কসমের কাফ্ফারা হচ্ছে তিন দিন রোজা পালন।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আবু হানিফার প্রথমোক্ত অভিমতই হচ্ছে তাঁর প্রকাশ্য মাজহাব, যা বর্ণিত হয়েছে ইমাম মোহাম্মদের গ্রন্থ ষষ্ঠকের যে কোনো একটিতে। আর তাঁর দ্বিতীয় অভিমত, যাতে দেয়া হয়েছে কসমভঙ্গের কাফ্‌ফারার মতো কাফ্‌ফারা প্রদানের অবকাশ, তা বর্ণিত হয়েছে উক্ত গ্রন্থ ষষ্ঠক বহির্ভূত অন্য একটি গ্রন্থে। আলোচ্য আয়াত তাঁর প্রথমোক্ত অভিমতের প্রমাণ। বিভিন্ন হাদিস দ্বারাও অভিমতটি পরিপুষ্ট। আর তাঁর দ্বিতীয় অভিমতটি পরিপুষ্টি লাভ করেছে মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদিসের মাধ্যমে। হাদিসটির প্রথম বর্ণনাকারী হজরত উকবা ইবনে আমের। তিনি বলেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, কসমের কাফ্‌ফারাই মানতের কাফ্‌ফারা। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, কাফ্‌ফারা আদায় করলে মানত রহিত হয়ে যায়। এই হাদিস আবার অন্য হাদিসের সঙ্গে দৃশ্যতঃ বিপরীত বক্তব্য প্রকাশক। তাই উভয় হাদিসের সমন্বয়নার্থে আমরা বলি, কাফ্‌ফারা শর্তহীন মানতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু শর্তযুক্ত মানতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ শর্ত বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত শর্তযুক্ত মানত তো মানতই নয়। কসমের ব্যাপারটাও এরকম। ভঙ্গ না করা পর্যন্ত কসমের কাফ্‌ফারা প্রদানের প্রশ্নই তো ওঠে না। কিন্তু শর্তহীন মানতের মধ্যে এরকম ভঙ্গ হওয়া না হওয়ার কোনো অবকাশই নেই। তাই সেখানে কাফ্‌ফারার সুযোগও অনুপস্থিত।

হেদায়া রচয়িতা ও বিশিষ্ট হানাফী মতাবলম্বীগণ বলেছেন, মানত পূরণ ও কাফ্‌ফারা আদায়ের স্বাধীনতা লাভ হতে পারে কেবল অহেতুক মানতের ক্ষেত্রে। কেননা অযথার্থ মানতকারী তো শর্ত উপস্থিতির দাবিই করতে পারে না। তাই তার ওয়াজিব মানতের সংকল্পই উৎপন্ন হয় না। আর কোনো মানুষই কামনা করে না যে, সকল সময় তার উপরে ইবাদত অত্যাবশ্যক থাকুক, সে ইবাদত যতোই পুণ্য-উপার্জক হোক না কেনো। ইবাদত পরিত্যক্ত হওয়ার সার্বক্ষণিক দুঃশ্চিন্তা অবশ্যই পরিহরণীয়। তাই একটি যথাসূত্রসম্বলিত বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. মানত করতে নিষেধ করেছেন। একথাও বলেছেন যে, মানত কল্যাণার্জনের মাধ্যম নয়। বিশেষ করে কঠিন ইবাদতের অঙ্গীকার অবশ্যই কল্যাণহীন। যেমন— হজ্জ প্রতিপালনের মানত, সারা বছর রোজা রাখার মানত ইত্যাদি।

অবশিষ্ট রইলো সংশয়যুক্ত মানত প্রসঙ্গে। এর বিধান শর্তহীন মানতের মতো। অর্থাৎ কৃত মানত পূর্ণ করতেই হবে। কাফ্‌ফারার মাধ্যমে এ ধরনের মানত প্রত্যাহৃত হবে না। কারণ শর্তযুক্ত নিয়ত অবশ্যই মানত সাব্যস্ত হওয়ার দাবি রাখে। মোটকথা শর্তহীন ও প্রত্যাহৃত মানত পূর্ণ করা অত্যাবশ্যক। আর অহেতুক মানত পূরণ করা না করা মানতকারীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার। হয় পূরণ করবে, অথবা দিবে ক্ষতিপূরণ। ইমাম আহমদও এরকম বলেন। হেদায়া রচয়িতা

www.eelm.weebly.com

এসকল কিছুর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। প্রকাশ্যতঃ ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এরকম। কিন্তু কোনো কোনো বর্ণনায় তাঁর আরো দু'টো অভিমত পরিলক্ষিত হয়— ১. অনভিপ্রেত মানতের কাফ্ফারা দেয়া অত্যাবশ্যক (কাফ্ফারা দ্বারা মানত প্রত্যাহৃত হয় না)। ২. যথাকৃত মানত পূরণই অত্যাবশ্যক।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফার মতে মানতরূপে ওই সকল আমল ওয়াজিব, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাব্যস্ত করা হয়েছে ওয়াজিব হিসেবে। যেমন— নামাজ, হজ, আল্লাহ্‌র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় ইত্যাদি। এসকল মানত অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। অথবা দিতে হবে ক্ষতিপূরণ। কেননা আল্লাহ্পাক এগুলোকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষা, জানাযায় সহগমন ইত্যাদিকে আল্লাহ্ ওয়াজিব করেননি। তাই এগুলো সওয়াবের কাজ হলেও মানতের যোগ্য নয়। মিনহাজ গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতরূপে এসেছে, সকল প্রকার ইবাদতের মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদিও তা আল্লাহ্ কর্তৃক অত্যাবশ্যকরূপে নির্ধারিত ইবাদতের অনুরূপ না হয়। যেমন— পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অনুগমন, প্রারম্ভে সালাম প্রদান ইত্যাদি।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতের উপরে কিছু জটিলতার উৎপত্তি হয়। যেমন— ইতেকাফের মানতের ক্ষেত্রে ইতেকাফ আদায় করা আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে ওয়াজিব। অথচ ইতেকাফ আল্লাহ্ কর্তৃক সাব্যস্তকৃত ওয়াজিব সমূহের তালিকাভূত নয়। যদি বলা হয়, রোজা ইতেকাফের জন্য একটি আবশ্যকীয় শর্ত, আর রমজানের রোজা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওয়াজিব এবং মানতের রোজা ও ইতেকাফের রোজা সমপ্রকৃতির— তবে তার জবাব এই যে, ইতেকাফ রোজা ছাড়াও হতে পারে। আর ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত— একথা মেনে নিলেও আল্লাহ্ কর্তৃক অবশ্যপালনীয় হুকুম সমূহের সঙ্গে ইতেকাফের তো কোনো মিল নেই। কিন্তু মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব, তা যে কোনো ইবাদতের হোকনা কেনো। আর তা অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে ইসলাম ও এখলাস (বিশুদ্ধ সংকল্প) সহযোগে। প্রত্যেক ইবাদত কবুলের শর্তই হচ্ছে ইসলাম ও এখলাস— তা ইবাদতের উদ্দেশ্য বা সহায়ক— যাই হোক না কেনো। যেমন ইবাদতের উদ্দেশ্য ইসলামে দৃঢ় হওয়া এবং যেমন ওজু হচ্ছে নামাজের সহায়ক। আর ইসলাম ও এখলাস তো অবধারিতরূপে ফরজ। তাছাড়া মানতের ওয়াজিব ইতেকাফ যদি রমজানের রোজার অনুগামী করা হয়, তবে তখন নফল রোজা রাখার তো কোনো অবকাশই পাওয়া যাবে না। ফরজ রোজার উপস্থিতিতে নফল রোজার অস্তিত্ব যে অসম্ভব। এটাই হচ্ছে ইমাম আবু হানিফার অভিমত জনিত জটিলতার বিবরণ।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা : ইবাদতনির্ভর মানত ও কসমের কাফ্ফারা কি ওয়াজিব? এ সম্পর্কে ইমামগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন— কেউ যদি 'রোগমুক্ত হলে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখবো' এরকম মানত করার পর সুস্থ হয়, তারপর নির্ধারিত তারিখে রোজা পালন না করতে পারে, তবে অধিকাংশের ঐকমত্যানুসারে অন্য তারিখে হলেও তাকে মানতের রোজা পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে কাফ্ফারাও দিতে হবে কিনা সে সম্পর্কে মতপার্থক্য বিদ্যমান। ইমাম সুফিয়ান সওরী বলেছেন, তার জন্য মানতের কাজা ও কাফ্ফারা দু'টোই ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যদি কসমের নিয়ত না করে এবং মানতের শব্দই কেবল মুখে উচ্চারণ করে, তবে সে মানতের নিয়ত করুক আর না করুক, সর্বাবস্থায় মানতের কাজা আদায় করা তার উপরে ওয়াজিব, কিন্তু কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। আর যদি কেবল কসমের নিয়ত করে, মানতের নিয়ত না করে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, মানতের কাজা ওয়াজিব হবে না। আবার যদি কসমের নিয়ত করে, মানতের নিয়ত না করে, মানতের ব্যাপারে অন্তরে কোনো নিয়তের উৎপত্তিই না হয়, অথবা কসমের সঙ্গে মানতেরও নিয়ত করে, তবে মানতের কাজা ও কসমের কাফ্ফারা দু'টোই হবে ওয়াজিব।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, যদি কেউ কসমের নিয়ত করে এবং মানতের নিয়ত না করে, তবে তার উপর ওয়াজিব হবে কেবল কাফ্ফারা, মানতের কাজা ওয়াজিব হবে না। কেননা সে মানতের রূপক অর্থ গ্রহণ করেছে এবং নিয়ত করেছে কসমের। আর যদি সে মানতের নিয়ত করে, কসমের নিয়ত না করে তবে তার উপর ওয়াজিব হবে কাজা, কাফ্ফারা নয়। কেননা সে এমতোক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে মানতের প্রকৃত অর্থ। আর সে যদি মানত ও কসম— দু'টোরই নিয়ত করে, তথাপিও তাকে আদায় করতে হবে মানতের কাজা, কাফ্ফারা দিতে হবে না। কেননা প্রকৃত অর্থের উপস্থিতিতে রূপক অর্থ অস্তিত্বহীন। অর্থাৎ হকিকত ও মাজায কখনো সমান্তরালরূপে উপস্থিত হতে পারে না। সেহেতু মাজায্ অপেক্ষা হকিকত অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সুফিয়ান সওরী তাঁর অভিমত প্রত্যয়নার্থে বলেন, 'মানত' শব্দটি নিয়তের মুখাপেক্ষী নয়। মানতের নিয়ত না করেও যদি মুখে মানতের কথা উচ্চারণ করে তবু মানত বিলোপিত হয় না। কারণ, মানত একটি সম্ভাব্য বিষয়। আর সম্ভাবনাময় বাক্য ব্যবহার করলেও তত্ত্বার্থ বিলোপ হয় না । মানতের অবস্থা বিবাহবিচ্ছেদ ও গোলাম স্বাধীন হওয়ার মতোন। রসুল স. বলেছেন, তিনটি বিষয় এমন, যা সজ্ঞানে অথবা কৌতুকবশতঃ উভয় অবস্থায় কার্যকর হয়— বিবাহ, তালাক ও দাসমুক্তি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন

www.eelm.weebly.com

আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজা। হজরত আবু জর গিফারী থেকে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পরিহাসচ্ছলে তালাক উচ্চারণ করবে, তার তালাক কার্যকর হবে। আর যে ঠাট্টা করেও দাসমুক্তির কথা বলবে, তার কথাও কার্যকর হবে। ইবনে আদী তাঁর 'আলকামিল' গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিনটি বিষয়ে পরিহাস-কৌতুক চলে না (পরিহাসচ্ছলে বললেও তা কার্যকর হয়)। বিষয় তিনটি হচ্ছে— তালাক, গোলাম আজাদ ও শাদী। পরিণত সূত্রে আবদুর রাজ্জাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমর এবং হজরত আলী বলেছেন, তিনটি বিষয়ে খেল তামাশার কোনো অবকাশ নেই— বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও দাস-দাসী মুক্তির ঘোষণা। অপর এক বর্ণনায় এসেছে চারটি বিষয়ের কথা। চতুর্থটি হচ্ছে মানত। আর কসম হচ্ছে মানতের সতীর্থ অথবা অনুগামী। অর্থাৎ অর্থগত দিক থেকে মানত হচ্ছে কসম। কেননা যে বিষয় শরিয়তের বিধানানুসারে হারাম নয়, তাকে কসমকারীরা নিজেদের উপর হারাম করে নেয়। এভাবে যা হারাম নয়, তা হারাম করে নেয়াই কসম। আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন— 'হে আমার নবী! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন আপনি তা নিষিদ্ধ করেছেন কেনো? আপনি আপনার স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি চাইছেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ্ আপনাদের শপথ থেকে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেছেন' (সুরা তাহরীম)। এতক্ষণের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, মানত কসম বা শপথ হওয়ার জন্য নিয়তের মুখাপেক্ষী নয়। মানতের মধ্যেই রয়েছে শপথের অর্থ। তাই নিয়ত না করলেও কসম রহিত হবে না। বিষয়টি এরকম— যেমন কেউ তার পিতা-মাতা অথবা সন্তান-সন্ততিকে ক্রয় করে নিলো, এমতো ক্রয় সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে তার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি মুক্ত হয়ে যাবে— সে তাদেরকে মুক্তিদানের নিয়ত করুক অথবা না করুক।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, হারাম নয় এমন কোনো কিছুকে হারাম করে নেয়া সকল ক্ষেত্রে কসম নয়। যেমন— তালাকের পর স্ত্রী, মুক্ত করে দেয়ার পর ক্রীতদাসী, বিক্রয়ের পর বিক্রিত বস্তুও হারাম হয়ে যায়, অথচ পূর্বে তা হারাম ছিলো না। সুতরাং এরকম করা হারাম নয়। কিন্তু যদি স্বেচ্ছায় হারামের নিয়ত করা হয়, তবে হারাম নয় এমন কিছুও হারাম বলে গণ্য হবে। যেমন একবার মধু, রসুল স. তাঁর নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন এবং সেক্ষেত্রে কসমের নিয়ত করেছিলেন। সুরা তাহরীমের উপরোল্লিখিত আয়াতে সে ধরনের কসমের কথাই বলা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতের কসম হচ্ছে সাংকল্পিক, আবশ্যিক হারাম নয়। সুতরাং যে পর্যন্ত কসমের নিয়ত করবে না, সে পর্যন্ত তা মানতই হবে—

www.eelm.weebly.com

মানতের নিয়ত করুক আর না করুক। কেননা এটাই প্রকৃত অর্থ। আর প্রকৃত অর্থ কখনো নিয়তের মুখাপেক্ষী নয়। আর মানতকে পরিত্যাগ করে কসমের নিয়ত করলে, তখন তা কসমই হবে। অর্থাৎ মানতের রূপক অর্থ কসম। আর রূপক অর্থ কসমের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

পরিচ্ছেদ ঃ

পাপযুক্ত মানত, তার হুকুম ও প্রকার ঃ পাপযুক্ত মানত দুই প্রকার ঃ ১. এরূপ মানত যার কোনো একটি দিকও পাপমুক্ত নয়— যেমন মদ্যপান, অবৈধ যৌনচরিতার্থতা ইত্যাদি। এরকম কসম সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরূপ মানতে কসমের নিয়ত থাকলে কসম ধর্তব্য হবে এবং কসম ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। আর কসমের নিয়ত না থাকলে মানত ধর্তব্য হবে না। বরং তা গণ্য হবে 'অনর্থক শপথ' বা বেহুদা কসম হিসেবে। আলোচ্য আয়াতেও এ ধরনের মানত পূর্ণ করার কথা বলা হয়নি। আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমতও এরকম। কারণ আল্লাহ্পাক কখনো অশ্লীলতা ও পাপকর্মের নির্দেশ প্রদান করেন না। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। কিন্তু ইমাম আহমদ বলেছেন, এরকম মানত ধর্তব্য। এমতাবস্থায়ও কাফ্ফারা আদায় করা আবশ্যক— কসমের নিয়ত থাক আর না থাক। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, অধিকাংশ হানাফী আলেম এই অভিমতকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম তাহাবী লিখেছেন, যদি কেউ তার মানতকে পাপকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে, বলে আমি মানত করছি, আমার এই কাজ সফল হলে আমি যায়েদকে হত্যা করবো— তবে তা কসম বলে গণ্য হবে এবং তা ভেঙে ফেলে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।

আমি বলি, ইমাম তাহাবীর এমতো বক্তব্যের কারণ এরকম— শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ অসম্ভব হলে প্রত্যাবর্তন করতে হবে রূপক অর্থের দিকে। রসুল স. বলেছেন, পাপকর্মের মানত হয় না। আর পাপসম্পৃক্ত ক্ষতিপূরণই শপথ ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ। এই হাদিসের উদ্দেশ্যও এরকম। ইমাম আবু হানিফার নিকট এই হাদিসে শপথভঙ্গের যে ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য ওই কাফ্ফারা, যা নিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ পাপসংশ্লিষ্ট মানত জায়েযই নয়। তবু এ ধরনের অসিদ্ধ মানতের সঙ্গে যদি কেউ কসমের নিয়ত করে তবে পরিশোধ্য হবে কেবল ক্ষতিপূরণ।

২. পাপযুক্ত মানতের আর একটি অবস্থা এরকম— যে বিষয়ে মানত করা হয়েছে, তা গোনাহ্, কিন্তু মানতের কিছু অংশ আবার পাপ থেকে পবিত্র, এবং তা ইবাদতও। যেমন— ঈদুল ফিতরের দিন রোজা পালনের এবং সূর্যোদয়কালে

www.eelm.weebly.com

নামাজ পাঠের মানত। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এরকম মানত ধর্তব্য। এমতোক্ষেত্রে মানতকারীকে ঈদের দিন রোজা না রেখে অন্য যে কোনো দিন রোজা রাখতে হবে। ক্ষতিপূরণ অত্যাবশ্যক হবে না। আর ওই মানতকারী যদি ঈদের দিন রোজা রাখে, তবু তার মানত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু নিষিদ্ধ দিবসে রোজা রাখার পাপও তার অবশ্যই হবে। মানতের সঙ্গে এমতো নিষিদ্ধতার কোনো সম্পর্ক নেই। আর যদি সে মানত ত্যাগ করে শপথের নিয়ত করে তবে তার উপরে অত্যাবশ্যক হবে শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ। আবার যদি মানত পরিত্যাগ না করে, মানতের নিয়ত না করে নিয়ত করে কেবল শপথের, তবে অত্যাবশ্যক হবে মানতের কাজা এবং শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ— দু'টোই, যেমন হয়ে থাকে ইবাদত সম্পর্কিত মানতের বেলায়।

ইমাম আহমদ বলেন, যদি ওই ব্যক্তি ঈদের দিন রোজা না রেখে অন্য দিন রোজা রাখে, তবে তার উপরে অত্যাবশ্যক হবে শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণও। কেবল রোজা রাখলে চলবে না। ভিন্ন বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, ঈদের দিন রোজা রাখলে মানত পূর্ণ হয়ে যাবে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, পাপযুক্ত মানত শেষোক্ত প্রকারের অন্তর্ভূত নয়, যেমন পাপমুক্ত মানত অন্তর্গত নয় প্রথমোক্ত প্রকারের। দু'টোর মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই। এটাও পাপ, ওটাও পাপ। মানুষ নিজে থেকে পাপ গ্রহণ করতে চাইলেও, তার এমতো ইচ্ছার পরিপূরণ অত্যাবশ্যক নয়।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর বর্ণিত অভিমতকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে — ১. যা অস্তিত্বগত পাপ, তা সর্বাবস্থায় পাপ। ২. যা অস্তিত্বগতভাবে পাপ নয়, অর্থাৎ যা অন্য কোনো কারণবশতঃ রূপান্তরিত হয় হালাল অথবা হারামে। যেমন রোজা সত্তাগতভাবে নিষিদ্ধ নয়, বরং তা ইবাদত। কিন্তু তা ঈদের দিবসে পালন করা পাপ। অর্থাৎ তা পাপে পরিণত হয়েছে ঈদের দিনের কারণে। তাই ঈদের দিন রোজা রাখার মানত করলে তা ধর্তব্য হবে এবং নিষিদ্ধতার কারণে তা ঈদের দিন সম্পাদন করা যাবে না। এমতাবস্থায় মানতের রোজা পালন করতে হবে ঈদ ছাড়া অন্য কোনো দিনে। আর যদি সে ঈদের দিনেই রোজা রাখে তবে তার মানত পূরণ হবে যা পূরণের দায়িত্ব সে গ্রহণ করেছিলো। এ বিষয়ে ইমামগণের মতপ্রভেদ বিভিন্ন নীতিমালার উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইমাম আবু হানিফা বলেন, শরিয়তসম্মত কর্ম পালন করতে যদি নিষেধ করা হয়, তবে ওই কর্মসমূহ হয় সত্তাগতভাবে ত্রুটি সংযুক্ত, ফলে তাতে সত্তাগতভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় শরিয়তের বিধান। আর ইমাম শাফেয়ী বলেন, শরিয়তের বিধান পালনে যদি অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়, তবে সত্তাগতভাবে ওই আমল হয়ে যায় শরিয়তের পরিপন্থী।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আহমদ বলেন, রোজা ইবাদত, সে কারণেই রোজার মানত গৃহীতব্য বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু তা পাপসংশ্লিষ্ট বলে ধর্তব্য হবে না। তাই ঈদের দিন রোজা রাখলে মানত আদায় হবে না। কেননা তা পাপসংশ্লিষ্ট। আবার প্রকৃত সময়ে পালন করা হারাম এরকম অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে শরিয়তে। যেমন ঋতুবতী নারীর উপরে রমজান মাসে রোজা পালন হারাম। ঋতুকালীন বাদ পড়ে যাওয়া রোজা তাকে পালন করতে হয় অন্য কোনো সময়ে।

৩. অনুমোদিত (মোবাহ্) কাজ পরিত্যাগ করার মানত ধর্তব্য নয়। তবে যদি এমতোক্ষেত্রে কসম করে, তবে কসম ভঙ্গ করার কারণে দিতে হবে কাফ্ফারা। ইমাম শাফেয়ী বলেন, সর্বাবস্থায় মানত হবে না। তবে এমতো মানতকারীর উপরে শপথের বিধান অবশ্যই বর্তাবে সে শপথের নিয়ত করুক, অথবা না করুক। আর শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ করাও হবে তার উপরে অত্যাবশ্যক। এটাই ইমাম শাফেয়ীর প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমতই। আর আমিও একথা বলতে চেয়েছি যে, যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য অনির্ণেয় হয়, তবে গ্রহণ করতে হবে রূপক অর্থ। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে কসম বা শপথকে। কেননা যা ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যক নয়, তা নির্ধারণ করা তাহরিমী মোবাহ্ (নিষিদ্ধ অনুমোদন)। আমি বলি, এই প্রমাণ তিনিই উপস্থাপন করেছেন, যিনি তাহরিমী মোবাহ্ কসমের প্রবক্তা।

আনুসাঙ্গিক হাদিসসমূহ ঃ জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদতের মানত করে, সে যেনো তা পূর্ণ করে, আর অবাধ্যতার মানতকারী যেনো তা পূর্ণ না করে। বোখারী। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যা আল্লাহ্র পরিতোষ কামনার উদ্দেশ্যসম্বলিত, তা-ই মানত বলে বিবেচিত। উল্লেখ্য, একথা বলা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে ব্যক্তি মানত করেছিলো রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে বলে। আহমদ। বায়হাকী আবার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন অন্য একটি ঘটনা সম্পর্কে। আবু দাউদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন রসুল স. এর এমতো উক্তি ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ ইবাদত বিষয়ক মানত সকল অবস্থায় গ্রাহ্য— ওই ইবাদত আল্লাহ্ কর্তৃক বিধিবদ্ধ ওয়াজিব হোক (যেমন নামাজ, রোজা ইত্যাদি), অথবা না হোক (যেমন পীড়িত ব্যক্তির সেবা-শুশ্রুষা ইত্যাদি)।

হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পাপায়িত মানত পূর্ণ করা জায়েয নয়। ওই মানতও সিদ্ধ নয়, যা স্বাধিকার বহির্ভূত (যেমন জায়েদ মানত করলো আমি ওমরের ক্রীতদাসকে মুক্ত করে

www.eelm.weebly.com

দিবো)। মুসলিম। আবু দাউদ আমর ইবনে শোয়াইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতামহ থেকে সুপরিণত সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, স্বাধিকার বহির্ভূত বিষয়ে মানত কোরো না। ইবনে হুম্মাম এই হাদিসের প্রেক্ষিতে লিখেছেন, বিষয়টি এরকম : যেমন কেউ বললো, আমি যদি এ কাজ করতে পারি তবে এক হাজার দিরহাম দান করে দিবো, অথচ তার নিকটে একশত দিরহামের বেশী নেই। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এমতাবস্থায় তাকে ওই একশত দিরহামই দান করতে হবে। অধিকার বহির্ভূত বিষয়ে মানত সাব্যস্ত হবে না। আবার কেউ যদি অন্যের কোনো পশুর দিকে ইঙ্গিত করে বলে, ওই পশুটিকে আমি কোরবানীর জন্য বায়তুল্লাহ্ শরীফে প্রেরণ করবো, তবে এমতো মানত পূর্ণ করা তার উপরে অত্যাবশ্যক হবে না।

হজরত উকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানতের ক্ষতিপূরণই শপথ ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ। মুসলিম। তিবরানীর বর্ণনায় হাদিসটি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— মানতই কসম। আর মানতের কাফ্ফারাই কসমের কাফ্ফারা। এই হাদিসটিও ব্যাপক অর্থবহ। অর্থাৎ সকল প্রকার মানতই এই হাদিসের বক্তব্যভূত।

মাসআলা : কসমের নিয়ত করুক আর না করুক কসমের কাফ্ফারা প্রদান করা ওয়াজিব, এরকম ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে— ১. মানত পূর্ণ করতে অক্ষম হলে, পাপযুক্ত হওয়ার কারণে অথবা অন্য কোনো কারণেঃ যেমন প্রতিদিন রোজা রাখার মানত, কিংবা ২. মানত পূরণ করতে সক্ষম বটে, কিন্তু নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার ক্ষতিপূরণ আদায়ে সমর্থ হয়নি— এ কারণে যে, তার উপরে মানত পরিত্যাগ করা মোবাহ্ (অনুমোদিত) ছিলো, অথবা মানত তো করেছে বটে, কিন্তু কী মানত করেছে, তা নির্দিষ্ট করেনিঃ যেমন বলেছিলো, আল্লাহ্ আমার এই সমস্যার সমাধান করে দিলে আমি আল্লাহ্র নামে মানত প্রদান করবো ইত্যাদি।

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মানত করা সত্ত্বেও কী মানত করেছে তা নির্দিষ্ট করেনি, তার ক্ষতিপূরণ হবে শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণের অনুরূপ। আর মানত করেছে কিন্তু তার সঙ্গে সংমিশ্রিত করেছে পাপ, তবে তার ক্ষতিপূরণও হবে শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণের মতো। আর যে লোক অসিদ্ধ বিষয়ে মানত করে, তার কাফ্ফারাও হবে কসমের কাফ্ফারা তুল্য। এবং যদি সে ইবাদত সম্পর্কিত মানত করে, তবে তাকে মানতই পূর্ণ করতে হবে। আবু দাউদ, ইবনে মাজা। কোনো কোনো হাদিসবেত্তা বর্ণিত হাদিসকে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি বলে সাব্যস্ত করেছেন। হাদিসটি অবশ্য ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসসমূহের পর্যালোচনা।

www.eelm.weebly.com

ইবাদতনির্ভর মানতের বিবরণ : ইবাদতনির্ভর মানত যে করে এবং তা পূরণ করার সামর্থ্যও যার আছে, তাকে মানতই পূর্ণ করতে হবে। কাফ্ফারা দিলে চলবে না। কেননা হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসুল স. বিধান দিয়েছেন, পাপযুক্ত মানত বৈধ নয় এবং তার ক্ষতিপূরণ হচ্ছে শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ। নাসাঈ, হাকেম, বায়হাকী।

এই হাদিসের মাধ্যমে 'এরকম মানতের বেলায় কসমের কাফ্ফারার মতো কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব'— ইমাম আহমদের এমতো অভিমতটি প্রমাণিত হয়ে যায়। তবে এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহভূত মোহাম্মদ ইবনে যোবায়ের হানযালা বর্ণনাকারী হিসেবে শক্তিশালী নন। তাঁর উর্ধ্বতন বর্ণনাকারীদের মধ্যেও বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে অসামঞ্জস্য রয়েছে। আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতা যোবায়েরের সূত্রে। হাফেজ ইবনে হাজার কর্তৃক আবার ভিন্ন সূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, যে সূত্রটি বিশুদ্ধ, কিন্তু অবিন্যস্ত। আহমদ, বায়হাকী ও সুনান রচয়িতাবৃন্দ জুহুরী সূত্রে আবু সালমার বরাত দিয়ে হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সূত্রপরম্পরা কর্তিত। আবু সালামা থেকে জুহুরীর হাদিস শোনার ব্যাপারটি প্রমাণিত নয়। দু'জনের মধ্যে সংযোজ্য বর্ণনাকারীর নাম সেখানে বাদ পড়েছে।

আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা, সুলায়মান ইবনে বেলালের বর্ণনাক্রমে মুসা ইবনে উকবা ও মোহাম্মদ ইবনে আতিকের বরাত দিয়ে জুহুরী থেকে, সুলায়মান আরকাম থেকে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীর থেকে, আবু সালমা থেকে জননী আয়েশা কর্তৃক এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ লিখেছেন, সুলায়মান ইবনে আরকাম হাদিস পরিত্যাজক। ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীরের অধিকাংশ শিষ্য তাঁর বিরোধিতা করেছেন এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীরের বরাত দিয়ে মোহাম্মদ ইবনে যোবায়ের হানজালার বর্ণনাক্রমে তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইমরান থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এর সূত্রপরম্পরা প্রথমোক্ত হাদিসটির সূত্রপরম্পরার মতো।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীর সূত্রে মুয়াম্মার এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইয়াহ্ইয়া আবু সালমা এবং বনী হানাফিয়ার আরো একজন লোকের বরাত দিয়ে অপরিণতরূপে হাদিসটিকে রসুল স. এর নির্দেশ বলে সাব্যস্ত করেছেন। হাকেম বলেছেন, বনী হানাফিয়ার ওই লোকটির নাম মোহাম্মদ ইবনে যোবায়ের এবং একথাও বলেছেন যে, তাঁকে বনী হানাফিয়ার অন্তর্ভূত মনে করা ভুল। বরং তিনি ছিলেন বনী হানজালার অন্তর্ভূত।

www.eelm.weebly.com

অপর আর একটি সূত্রে সুপরিণতরূপে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে জননী আয়েশার মাধ্যমে। দারাকুতনি, আবু দাউদ, তিরমিজি এবং নাসাঈ গালেব ইবনে আবদুল্লাহিল জাওজীর বর্ণনাক্রমে, তিনি আতা থেকে এবং তিনি জননী আয়েশা থেকে। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পাপযুক্ত মানত নিজের উপরে ওয়াজিব করে নিবে, তার উপরে ওয়াজিব হবে শপথভঙ্গের কাফ্ফারার মতো কাফ্ফারা। গালেব ইবনে আবদুল্লাহ্ আবার হাদিস ত্যাজক।

ভিন্ন একটি সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে কুরাইবের মাধ্যমে আবু দাউদও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি উত্তম সূত্রসম্বলিত। কিন্তু এই সূত্রপরম্পরাভূত রয়েছেন আবার প্রতর্কাহত বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া।

ইমাম নববী লিখেছেন, লা নাজরা ফি মাঈ'সাতিন্ ওয়া কাফ্ফারাতুহু কাফ্ফারাতু ইয়ামীন অর্থাৎ পাপকর্মে কোনো মানত হয় না। তার প্রায়শ্চিত্ত শপথের প্রায়শ্চিত্ত সদৃশ — এই হাদিসটি শিথিলসূত্র বিশিষ্ট। হাদিসবেত্তাগণ এ ব্যাপারে একমত। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, এরকম মন্তব্য অসঙ্গত। ইমাম তাহাবী ও আবু আলী ইবনে সাস্কান্ হাদিসটিকে আখ্যা দিয়েছেন 'যথাসূত্রসম্বলিত' বলে। আমি বলি, আল্লামা সুয়ূতী তাঁর জামে' সগীর গ্রন্থে হাদিসটির বিশুদ্ধ হওয়ার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা পাপযুক্ত মানতের (যা সত্তাগতভাবে হারাম) কাফ্ফারাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেননি। সাব্যস্ত করেছেন 'অযথার্থ উক্তি' বলে। আর তিনি এই অভিমতটি ব্যক্ত করেছেন হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বর্ণিত একটি হাদিস থেকে। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, মানত দুই প্রকার— ১. অনুগত এবং ২. অননুগত। অনুগত মানত করা হয় আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। তাই তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে পাপযুক্ত মানত করা হয় শয়তানের উদ্দেশ্যে। তাই তা পূর্ণ করা অনুচিত। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবে— কাফ্ফারা তো ওই সময় পূর্ণ করা সম্ভব, যখন মানত পূর্ণ করা হয় ওয়াজিব। এমতোক্ষেত্রে কাফ্ফারা আদায় করলে মানত পূর্ণ না করার পাপ মোচন হয়। আর যদি মানত পূর্ণ করা ওয়াজিবই না হয়, তবে তার কাফ্ফারা কীভাবে ওয়াজিব হবে? কিন্তু এমতো ব্যাখ্যা নসের (কোরআন ও হাদিসের) উদ্দেশ্যের প্রতিকূল। তাই তা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে হবে এভাবে— পাপযুক্ত মানত পূর্ণ না করা যেমন ওয়াজিব, তেমনি ওয়াজিব তার বিপরীত করা ও কাফ্ফারা প্রদান করা, যেনো আল্লাহ্র নামের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে।

হজরত ছাবেত ইবনে জুহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর জামানায় এক লোক মানত করলো, সে বুয়াতাহ্ নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে উট কোরবানী

www.eelm.weebly.com

করবে। রসুল স. সকাশে একথা বলতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মূর্খতার যুগে ওই স্থানে কি কোনো প্রতিমা ছিলো, যাকে তোমরা পূজা করতে? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, না। তিনি স. তখন লোকটিকে বললেন, তবে তুমি তোমার মানত পূর্ণ করো। নিশ্চয় পাপ সম্পৃক্ত মানত পূর্ণ করা জায়েয নয়। ওই বিষয়ের মানতও বিশুদ্ধ নয়, যা মানতকারীর অধিকার বহির্ভূত। যথাসূত্রসম্বলিত এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ।

আমর ইবনে শোয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন এভাবে— একবার এক রমণী নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমি মানত করেছি আমি আপনার মাথার উপর দফ (বাদ্যযন্ত্রবিশেষ) বাজাবো। তিনি স. বললেন, তুমি তোমার মানত পূর্ণ করো। আবু দাউদ। এক বর্ণনায় এসেছে, রমণীটি তখন বললো, আমি অমুক অমুক স্থানে উট কোরবানী করবো বলে মানত করেছি। রসুল স. বললেন, ইসলামপূর্ব সময়ে কি ওই সকল স্থানে মূর্তিপূজা করা হতো? রমণী জবাব দিলো, না। তিনি স. বললেন, মূর্খতার যুগে কি সেখানে কোনো মেলা বসতো? সে বললো, না। তিনি স. তখন বললেন, তা হলে তুমি তোমার মানত পূর্ণ করতে পারো। আমি বলি, রসুল স. এর এই নির্দেশটি অবশ্যপালনীয় নয়। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। আর এমতো ঐকমত্যকে মেনে নিলে এ সম্পর্কিত হাদিসসমূহের মধ্যে আর বৈসাদৃশ্য থাকে না। কারণ রসুল স. তো একথা বলেই দিয়েছেন যে, ওই মানতই মানতরূপে গণ্য যার উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জন। আর একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, যে মানত এরকম নয়, তা পূর্ণ করা ওয়াজিবও নয়। তাই আমি বলি, এখানে কথাটি এসেছে বৈধতা প্রকাশের জন্য। অর্থাৎ পাপ পরিত্যাগ যখন অত্যাবশ্যক, তখন পাপযুক্ত মানত পূর্ণ করাও নাজায়েয।

মাসআলাঃ অনুগত মানতকে শর্তায়িত করার বিষয়টি এরকম— এক লোক অনুগত মানত করেছে, কিন্তু সে তার ওই মানতের সঙ্গে কিছু শর্ত অথবা কোনো বিশেষত্ব সংযুক্ত করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে— তার সংযুক্ত শর্তগুলো গ্রহণীয় কিনা? শর্তগুলো যদি আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনের ও সওয়াব লাভের মাধ্যম হয়, তবে মানত পূরণ করতে হবে তৎসংশ্লিষ্ট শর্ত ও বৈশিষ্ট্য সহযোগে। এমতোক্ষেত্রে শর্তসমূহকে উপেক্ষা করা যাবে না। আর শর্তগুলো যদি আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ ও সওয়াব অর্জনের সহায়ক না হয় তবে সেগুলো পালন করা যাবে না। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, এমতাবস্থায় যদি কৃত মানতে আল্লাহ্র সন্তোষ ও সওয়াব বিরোধী কোনো শর্তই না থাকে, তা হলে কী হবে? উত্তরে বলা যেতে পারে, এরকম মাসআলায় ওই রকম মতপ্রভেদই দেখা দিবে, যা সাধারণতঃ দেখা যায় বৈধ

www.eelm.weebly.com

মানতের ক্ষেত্রে। যেমন— কেউ বললো 'আমি বাজারে নামাজ পড়বো' 'শনিবার দিন নামাজ পড়বো', 'রোজা রাখবো, কিন্তু বসবো না', 'রোজা অবস্থায় কথা বলবো না', অথবা 'গাছের ছায়ায় যাবো না', কিংবা মানত করলো 'আমি এই টাকা দান করবো এই শহরের অমুক গরীবকে'— এসকল অবস্থায় তার উপর রোজা রাখা, নামাজ পড়া, যে কোনো স্থানের মিসকিনকে টাকা দান করা হবে ওয়াজিব। শর্তাবলী এমতোক্ষেত্রে রহিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিন ছাড়া যে কোনো দিনে সে নামাজ পড়তে পারবে। যে কোনো স্থানে রোজা রাখতে পারবে। নিশ্চুপ থাকা, দণ্ডায়মান না হওয়া, ছায়ায় না যাওয়া ইত্যাদি শর্তপালন করা তখন তার জন্য জরুরী কিছু হবে না। আর যে কোনো শহরের গরীবকে টাকা দান করলেও তার চলবে। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার ভাষণদানকালে দেখতে পেলেন এক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সেখানে উপবিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দ বললেন, লোকটির নাম আবু ইসরাইল। সে দাঁড়িয়ে থাকার মানত করেছে। আরো মানত করেছে, রোজা অবস্থায় সে কোনো প্রকার ছায়ায় গমন করবে না এবং কারো সঙ্গে কথা বলবে না। রসুল স. বললেন, তাকে বলে দাও, সে যেনো তার মানতের রোজা পালন করে কিন্তু দণ্ডায়মান হওয়া, কথা না বলা, ছায়ায় না যাওয়া ইত্যাদি পরিত্যাগ করে। বোখারী। লক্ষণীয়, এই হাদিসে শর্ত পরিত্যাগের কথা আছে। কিন্তু তার জন্য কাফ্ফারা প্রদানের নির্দেশনা নেই। কিন্তু কেউ যদি পর পর তিন দিন রোজা রাখার এবং দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার নিয়ত করে, তবে তাকে পর পর তিন দিনই রোজা রাখতে হবে। আবার বসে নামাজ পড়লেও তার মানত পুরা হবে না। কারণ বসে নামাজ পড়ার মান দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার মানের অর্ধেক। হাদিস শরীফে এরকমই বলা হয়েছে। হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসহযোগে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন আহমদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা। ইবনে মাজা আবার এককভাবে বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে। আর তিবরানী বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সাইব এবং হজরত মুতলব ইবনে আবী ওয়াদিয়াহ্ থেকে। আর আহমদ ও আবু দাউদ হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে এবং মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ হজরত ইবনে ওমর থেকে। উল্লেখ্য, পরস্পরসংলগ্ন রোজা আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয়। তাই বিভিন্ন প্রকার কাফ্ফারার ক্ষেত্রে পরস্পর সংলগ্ন রোজা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মাসআলা ঃ দণ্ডায়মান অথবা উপবেশনের শর্তযুক্ত মানতের নামাজ পাঠের বিবরণ— যদি কেউ কেবল নামাজ পাঠের মানত করে, দাঁড়িয়ে অথবা বসে

www.eelm.weebly.com

নামাজ পড়ার শর্ত না করে, তবে তার জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠ করা হবে ওয়াজিব। কেননা নামাজ দাঁড়িয়েই পড়তে হয়। আর যদি সে বসে নামাজ পড়ার মানত করে, তবে সে দাঁড়িয়ে অথবা বসে যে কোনো ভাবেই নামাজ পাঠ করুক না কেনো, তার মানত পূর্ণ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ চিৎ অথবা কাত হয়ে নামাজ পাঠের মানত— যদি কেউ চিৎ অথবা কাত হয়ে নামাজ পাঠ করার মানত করে, তবে তাকে নামাজ পাঠ করতে হবে দাঁড়িয়ে অথবা বসে। কেননা অপারগ অবস্থা ব্যতীত শায়িত অবস্থায় নামাজ পাঠ করা শরিয়ত সমর্থিত নয়। তবে উপবিষ্ট অবস্থার নামাজ সর্বাবস্থায় বৈধ। শায়িত অবস্থায় কেবল ওই পীড়িত ব্যক্তি নামাজ পাঠ করতে পারবে, যে উপবিষ্ট অবস্থায় নামাজ পাঠ করতে অক্ষম। এরূপ পীড়িত ব্যক্তি যদি শায়িত অবস্থায় নামাজ পাঠের মানত করে, তবে সে শায়িত অবস্থায় তা পাঠ করতে পারবে। কিন্তু মানত পুরা করার পূর্বে যদি সে বসে নামাজ পড়ার সামর্থ্য ফিরে পায়, তবে তাকে নামাজ পড়তে হবে দাঁড়িয়ে, আর দাঁড়াতে সমর্থ না হলে বসে।

মাসআলাঃ কাবা শরীফে নামাজ পাঠ করার মানত— ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, এরকম মানতকারী যে কোনো স্থানে নামাজ পাঠ করলেও তার মানত পুরা হয়ে যাবে। ইমাম জোফার ও ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, কেউ যদি বায়তুল মাকদিসে নামাজ পাঠ করার মানত করে এবং কাবা শরীফ ও মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করে নেয়, তবে তার মানত পুরা হয়ে যাবে। আবার মসজিদে নববীতে নামাজ পাঠের মানতকারী যদি কাবা শরীফে নামাজ পড়ে তবুও তার মানত পূর্ণ হবে। কিন্তু এমতাবস্থায় মসজিদে নববী ও কাবা শরীফ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে নামাজ পড়লে তার মানত পুরা হবে না। আর যে ব্যক্তি কাবার অভ্যন্তরে নামাজ পাঠ করার মানত করবে, সে কাবা ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে নামাজ পাঠ করলে তার মানত পুরা হবে না। তাকে মানত আদায় করতে হবে কাবার অভ্যন্তরে।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, মক্কা বিজয়ের সময় এক লোক রসুল স. এর নিকটে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি মানত করেছি আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে মক্কা বিজয় দান করেন, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আমি বায়তুল মাকদিসে দুই রাকাত নামাজ পাঠ করবো। রসুল স. বললেন, এখানেই পড়ে নাও। লোকটি তার নিবেদনের পুনরুক্তি করলো। রসুল স.ও পুনরায় বললেন, এখানে পড়লেই চলবে। সে পুনরায় একই কথা বললো। তখন রসুল স. বললেন, তোমার ইচ্ছা। আবু দাউদ, তাহাবী, দারেমী।

www.eelm.weebly.com

কাবা, মসজিদে নববী ও বসতবাটি সংলগ্ন মসজিদে নামাজ পাঠের সওয়াবঃ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম জোফার বলেন, আমরা বলি, বায়তুল মাকদিসে নামাজ পাঠ করার মানতকারী যদি কাবায় নামাজ পড়ে, তবে তা জায়েয। কারণ উপরে বর্ণিত হাদিসে একথার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি কাবায় নামাজ পড়ার মানত করবে, তার জন্য বায়তুল মাকদিসে অথবা মসজিদে নববীতে নামাজ পাঠ করলে কীভাবে তা যথেষ্ট মনে করা যেতে পারে? কারণ রসুল স. বলেছেন, স্বগৃহের নামাজের রয়েছে একটি পুণ্য, পাড়ার মসজিদের পঁচিশটি, জামে মসজিদের পাঁচশতটি, মসজিদে আকসার এক হাজার, আমার মসজিদের পঞ্চাশ হাজার এবং কাবা শরীফের এক লক্ষ। হজরত আনাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার মসজিদের এক নামাজ কাবা ব্যতীত অন্য স্থানের এক হাজার নামাজ অপেক্ষা উত্তম। হজরত আবু হোরায়রা, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, হজরত আয়েশা, হজরত মায়মুনা এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন ইমাম তাহাবী। তিনি আবার হজরত আতা ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে এরকমও বর্ণনা করেছেন যে, রসুল স. বলেছেন, আমার এই মসজিদের এক নামাজ কাবা ব্যতীত অন্য মসজিদের এক হাজার নামাজ অপেক্ষা উত্তম এবং কাবার এক নামাজ এই মসজিদের নামাজ অপেক্ষা একলক্ষ গুণ উত্তম। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের একটি পরিণত বর্ণনায় এবং হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌র সুপরিণত বর্ণনায়ও এরকম কথা এসেছে।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বর্ণিত হাদিসসমূহে বলা হয়েছে কেবল ফরজ নামাজের কথা। সুতরাং উল্লেখিত সওয়াবের তারতম্য প্রযোজ্য হবে কেবল ফরজ নামাজের বেলায়। নফল নামাজের বেলায় এ নিয়ম প্রযোজ্য নহে। কারণ নফল নামাজ পাঠের স্থান হিসেবে আপনগৃহই সর্বোত্তম। হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বোখারী এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ফরজ ব্যতীত অন্যান্য নামাজ স্বগৃহেই সর্বোত্তম।

হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত থেকে আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষের আপনাপন ঘরের নামাজ আমার এই মসজিদের নামাজ অপেক্ষা উত্তম, যদি তা ফরজ নামাজ না হয়। হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সা'দ থেকে সুপরিণত সূত্রে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার নিকটে নিজের ঘরের নামাজ মসজিদে নামাজ পাঠ অপেক্ষা অধিকতর পছন্দনীয়।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ অসুস্থতা থেকে সুস্থ হওয়া, সফর থেকে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি শর্তযুক্ত রোজার মানতের বিবরণ— যদি কোনো পীড়িত ব্যক্তি অথবা কোনো মুসাফির 'আমি সুস্থ হলে' অথবা 'সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে' এরকম শর্ত সহযোগে এক মাস রোজা রাখার মানত করে, তবে শর্ত পূরণ হওয়ার পরেই কেবল মানত পূরণ করা তার উপরে ওয়াজিব হবে। শর্ত পূরণের পূর্বে এরকম করলে তার মানত পূরণ হবে না। এমতাবস্থায়, শর্ত পূরণ হওয়ার পর পুনরায় তাকে এক মাস রোজা রাখতে হবে। কেননা শর্ত এখানে মানত পূরণের প্রতিবন্ধক। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী শর্ত পূরণের পূর্বেও রোজা রাখলে মানত পূরণ হবে বলে মনে করেন। কারণ তাঁর মতে শর্ত এখানে মানত পূরণের প্রতিবন্ধক নয়। যেমন— বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও যদি কেউ তার সম্পদের জাকাত প্রদান করে, তবে তার জাকাত আদায় হয়ে যায়।

মাসআলাঃ সময় ও কালের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানতের বিবরণ— যদি কেউ বলে 'আল্লাহ্ আমাকে এই মোকদ্দমায় বিজয়ী করলে আমি তাঁর নামে রজবের পূর্ণ এক মাস রোজা রাখবো' অথবা 'আগামী বৎসর হজ করবো' তবে নির্ধারিত সময় আগমনের পূর্বেও সে তার মানত পূর্ণ করতে পারবে। অর্থাৎ রজব মাস আসার পূর্বের যে কোনো মাসে সে রোজা রাখতে পারবে। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ বলেন, এরকম সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানত শর্তযুক্ত মানতের মতো। তাই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আদায় করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। শায়েখাইন বলেন, সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানত শর্তযুক্ত মানতের মতো নয়। এরকম মানত শর্তবিযুক্ত। সময়ের সঙ্গে তার এরকম সম্পর্ক ঘটিয়ে দেয়া হয়েছে মাত্র। যেমন, যদি কেউ বাজারে নামাজ পাঠ করার মানত করে, তবে যে কোনো জায়গায় নামাজ পড়লেও তার মানত পূর্ণ হয়ে যাবে। তেমনি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সময়সম্পৃক্ত মানত পূরণ করা যায়। আবার নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও এরকম রোজা ও হজ আদায় করার মধ্যে দোষের কিছু নেই।

ইমাম জোফার বলেন, যে সময়ের সঙ্গে মানতকে সম্পৃক্ত করা হয়, সেই সময় যদি শরিয়তের দৃষ্টিতে অধিকতর মর্যাদামণ্ডিত হয়, তবে ওই সময় আগমনের পূর্বের অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাপূর্ণ সময়ে মানত পুরা করলে তা আদায় হবে না। নির্ধারিত সময়ের আগমন ঘটলে পুনরায় তা আদায় করতে হবে। আর যদি নির্ধারিত সময় ও তার পূর্বের সময়ের মধ্যে মর্যাদাগত কোনো তারতম্য না থাকে, তবে নির্ধারিত সময় আগমনের আগেও মানত পূরণ করা যাবে। আমার মতে এ অভিমতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এর উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কেউ আরাফার দিবসে, অথবা আশুরার দিনে, কিংবা মহররম মাসে রোজা রাখার মানত

www.eelm.weebly.com

করলো। এমতাবস্থায় মানতকারী নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তার মানত পূর্ণ করলে তা শুদ্ধ হবে না। কারণ বর্ণিত দিবসসমূহ তাদের পূর্ববর্তী দিবসসমূহের তুলনায় অধিকতর ফযীলতময়। এভাবে কেউ যদি মধ্যরাত্রিতে নামাজ পড়ার মানত করে, তবে রাত্রি আগমনের আগের দিন অথবা পরবর্তী দিনে নামাজ পড়লে মানত পূরণ হবে না। কারণ মধ্যরাত্রি দিবস অপেক্ষা অধিকতর ফযীলতপূর্ণ। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, কখন কার মৃত্যু হয় তা বলা যায় না— এই আশংকায় কেউ যদি মধ্যরাত্রি আগমনের পূর্বেই নামাজ পড়ে নেয়, তবু কি তার মানত শুদ্ধ হবে না? এর উত্তরে আমরা বলতে চাই, এমতোক্ষেত্রে আমল করতে হয় সাধারণ জ্ঞানানুসারে। মানতকারী যদি মৃত্যুরোগাক্রান্ত না হয় অথবা সহসা মৃত্যুর কোনো চিহ্ন তার মধ্যে বর্তমান না থাকে, তবে মানতের আমল অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাপূর্ণ সময়ে নিয়ে আসার কোনো কারণ থাকতে পারে না। রসুল স. বলেছেন, আমি আল্লাহ্র নিকট এমতো সওয়াবের আশা রাখি যে, আরাফার দিবসের রোজা হয়ে যাবে বিগত ও আগামী বৎসরের পাপের ক্ষতিপূরণ। আর আশুরার রোজা হচ্ছে বিগত বৎসরের গোনাহের কাফ্ফারা। হাদিসটি হজরত আবু কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন মুসলিম, ইবনে হাব্বান, তিরমিজি ও ইবনে মাজা। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও ইবনে মাজা কর্তৃক এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি কাতাদা ইবনে নোমান থেকেও এরকম বর্ণনা করেছেন। এইমর্মে তিবরানী কর্তৃক আরো হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম, হজরত সহল ইবনে সা'দ ও হজরত ইবনে ওমর থেকে এবং আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে জননী আয়েশা থেকে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হজরত আনাস প্রমুখ সাহাবীগণের নিকট থেকেও এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

রসুল স. একবার বললেন, ওই দিবসসমূহে (আইয়ামে তাশরীকের দিবসসমূহে) পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা আল্লাহ্র নিকটে অধিকতর প্রিয়। একথা শুনে উপস্থিত সহচরবৃন্দ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আল্লাহ্র পথে জেহাদ করাও কি ওই দিবসসমূহের পুণ্যকর্ম অপেক্ষা আল্লাহ্র নিকটে অধিকতর প্রিয় নয়? তিনি স. বললেন, না। তবে ওই জেহাদ স্বতন্ত্র যে জেহাদে নিজের জীবন ও সম্পদ নিয়ে কেউ প্রত্যাবর্তন করতে না পারে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে আবু দাউদের মাধ্যমে। রসুল স. আরো বলেছেন, জিলহজ মাসের প্রথম দশদিনের ইবাদত অপেক্ষা অন্য কোনো দিনের ইবাদত আল্লাহ্র নিকটে অধিকতর প্রিয় নয়। ওই দিবসসমূহের এক দিবসের রোজা অন্য দিবসসমূহের এক বৎসর রোজার সমতুল। আর ওই সময়ের একটি রাত শবে কদর তুল্য। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা। অবশ্য হাদিসটি শিথিল সূত্র বিশিষ্ট।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. বলেছেন, রমজান মাসের পর সবচেয়ে উত্তম রোজা আল্লাহ্র মাসের অর্থাৎ মহররমের। আর ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ রাতের নামাজ। এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইমাম মুসলিম ও সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়। মারো রদ্ইয়ানী তদীয় মসনদে এবং তিবরানী তদীয় জুনদুবে।

মাসআলাঃ পদব্রজে হজ করার বিবরণ— পদব্রজে হজ সম্পাদনের মানতকারী পদব্রজে অথবা বাহনারোহী হয়ে উভয় অবস্থায় হজ করতে পারবে। মাবসুত গ্রন্থে এরকম অভিমত ব্যক্ত হয়েছে ইমাম আবু হানিফা থেকে। তাঁর কথার মর্মার্থ হচ্ছে— এমতাবস্থায় মানতকারীর উপরে পদব্রজে হজ যাত্রা করা ওয়াজিব নয়। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে অনুগত মানতের সঙ্গে এমতো শর্ত সংযোজন করা হলে, তা পূরণ করা আবশ্যিক নয়। ইমাম আবু হানিফা তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন এই নীতিমালার আলোকেই।

কুদুরী গ্রন্থেও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে ইমাম সাহেবের অভিমতে বলা হয়েছে পদব্রজে গমন করার কথা, আরোহী অবস্থায় নয়। আর এরকম সম্পর্কহীনতা বলবৎ থাকে তাওয়াফে জিয়ারত পর্যন্ত।

পদব্রজে হজ যাত্রা করলে কোথা থেকে যাত্রা শুরু করতে হবে, সে ব্যাপারে মতপ্রভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, পদব্রজে যাত্রা করতে হবে মিকাত থেকে। কেননা মিকাত থেকেই হজ শুরু হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, পদব্রজে হজ যাত্রার অর্থ নিজের বসতবাটী থেকে পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করা। অবশ্য পথিমধ্যে যে কোনো স্থান থেকে পদব্রজে যাত্রার নিয়ত করা যায়। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, কুদুরী গ্রন্থের অভিমতে এই ইঙ্গিতটি রয়েছে যে, মানতের কারণে পদব্রজে যাত্রা হবে ওয়াজিব। তাহাবী বলেছেন, এটাই ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদের অভিমত।

যারা যানবাহনে হজ করতে যাওয়াকে পদব্রজে হজে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম বলেন তাদের দলিল সুস্পষ্ট। তারা বলেন, হজই এখানে মূল উদ্দেশ্য। আর পদব্রজে হজ গমন উত্তমতার পরিপন্থী। কারণ আল্লাহ্তায়ালা সক্ষমতাকে হজের একটি শর্ত নিরূপণ করে দিয়েছেন। সুতরাং যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারাও সক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। তাই যানবাহনে হজ গমন করাই উত্তম। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, কেউ পদব্রজে হজযাত্রার মানত করলে যদি তা তার পক্ষে সহনীয় হয়, তবে পদব্রজে গমনই উত্তম। কিন্তু এরকম করা ওয়াজিব নয়। কেননা আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে এরকম করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়নি।

পদব্রজে হজ করার মানতের ক্ষেত্রেও যানবাহনে গমন করা যে উত্তম, সে কথা হাদিস শরীফের মাধ্যমেও প্রমাণিত। হজরত আনাস ইবনে মালেকের বর্ণনায়

www.eelm.weebly.com

এসেছে, এক বৃদ্ধ তার দুই পাশে দুই ছেলের উপর ভর দিয়ে চলছিলো। রসুল স. সেদিকে লক্ষ্য করে উপস্থিত সহচরবৃন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটির কি হয়েছে? তাঁরা বললেন, সে পদব্রজে হজ করার মানত করেছে। রসুল স. বলেন, এভাবে সে নিজেই নিজেকে কষ্ট দিয়ে চলেছে। অথচ আল্লাহ্‌র নিকটে এরকম কষ্ট নিরর্থক। রসুল স. তখন ওই বৃদ্ধকে ডেকে যানবাহনে গমন করতে নির্দেশ দিলেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসুল স. তখন তাকে বললেন, তোমার এমতো মানত ও শ্রমের প্রয়োজন আল্লাহ্‌র নেই। মুসলিম।

হজরত উকবা ইবনে আমের জুহনী বর্ণনা করেছেন, আমার ভগ্নি পদব্রজে কাবাগৃহে গমনের মানত করলো এবং এ সম্পর্কিত বিধান জিজ্ঞেস করার জন্য প্রেরণ করলো রসুল স. এর নিকটে। আমার কথা শুনে তিনি স. বললেন, এটা তার ইচ্ছা। পদব্রজে অথবা যানবাহনে যেভাবে খুশী সে হজযাত্রা করতে পারে। বোখারী , মুসলিম।

মানত করলে পদব্রজে যাওয়া হজযাত্রা করাকে যারা আবশ্যিক মনে করেন তাদের দলিল এরকম— যেহেতু মানত পূরণ আবশ্যিক, তাই এমতো মানতকারীকে পদব্রজেই হজ যাত্রা করতে হবে। এরপর অবশিষ্ট থাকে কেবল শরিয়তের প্রমাণাদি। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এমতো মানতকারীর জন্য তাওয়াফে জিয়ারত পদব্রজে করা ওয়াজিব। কারণ এই ইবাদতটি একটি মূল ইবাদত। তাই মানতকারী পদব্রজে তাওয়াফের মানত করতে পারে। আর মানত পূরণ করা তার জন্য অত্যাবশ্যকও হয়ে যায়।

এবার দৃকপাত করা যেতে পারে পদব্রজে হজে গমনকারী বৃদ্ধের বিবরণের প্রতি। রসুল স. তাকে যানবাহনে গমনের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এরকম নির্দেশ দিয়েছিলেন একারণে যে, সে ছিলো অসামর্থক। আর হজরত উকবার ভগ্নির ঘটনাটিও ছিলো এরকম। অর্থাৎ সামর্থ্যহীনতা ছিলো তার ক্ষেত্রেও। আবু দাউদের বর্ণনায় বিষয়টির অধিকতর সুস্পষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। অতএব এসকল হাদিস সমূহের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় না যে, পদব্রজে হজযাত্রা মানতকারীর জন্য পদব্রজে গমন ওয়াজিব নয়। বরং এতে করে এতটুকুই কেবল প্রমাণ হয়ে যায় যে, ওজর বা অক্ষমতার কারণে পদব্রজে হজযাত্রার মানতকারী যানবাহনে আরোহণ করে হজ করতে যেতে পারবে।

মাসআলাঃ পদব্রজে হজের মানত করে ওজর অথবা ওজর ছাড়া যানবাহনে হজ করার বিবরণ— আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, পদব্রজে হজের মানতকারী যদি কোনো কারণ বা কারণ ছাড়া বাহনারোহী হয়ে হজ করে, তবে পুনরায় পদব্রজে হজ করা তার উপরে ওয়াজিব নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার

www.eelm.weebly.com

অভিমতানুসারে এরকম বলাই উচিত ছিলো যে, এ ধরনের মানতকারীর উপরে পুনরায় পদব্রজে হজ করা ওয়াজিব— যেমন, একাধারে রোজা রাখার মানত অথবা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার মানতের ক্ষেত্রে পুনরায় রোজা ও নামাজ আদায় করা ওয়াজিব হয়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, এই নিয়মটি এখানে প্রযোজ্য নয়। কারণ, বাহনারোহী হয়ে হজ যাত্রা করার অনুমতি হাদিস শরীফে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে কিয়াস বা তুলনামূলক অনুমানের অবকাশ নেই।

একটি প্রশ্নঃ উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে কেবল এতটুকু প্রমাণ হয় যে, পদব্রজে হজগমনের মানতকারী কেবল শারীরিকভাবে অসমর্থ হলেই যানবাহনযোগে হজ যাত্রা করতে পারবে। তাহলে যারা শারীরিকভাবে সমর্থ তাদের জন্য পদব্রজে গমন করেই মানত পূর্ণ করা উচিত নয় কি?

উত্তরঃ হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বলেছেন, রসুল স. যখনই আমাদেরকে উপদেশ দিতেন তখনই বলতেন দান করতে এবং মুছলা (মৃত বা নিহত ব্যক্তির নাক কান কর্তন) না করতে। আর একথাও বলতেন যে, পদব্রজে হজযাত্রার মানত করাও মুছলা করার মতো। তাই যে এরকম মানত করে সে যেনো একটি কোরবানী দেয় এবং যানবাহনযোগে হজে যায়। হাকেম তার 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত।

এখন একথা প্রণিধাননীয় যে, ক্ষেত্রসাধারনের উপরেই শরিয়তের অধিকাংশ বিধান নির্ভরশীল। আর যানবাহন ছাড়া অধিকাংশ মানুষের পক্ষে হজ যাত্রা সম্ভব নয়। তাই আলেমগণ বলেছেন, পাথেয় ও যানবাহন হজের আবশ্যকীয় উপকরণ। এসব ছাড়া হজযাত্রা সাধারণতঃ সম্ভবই নয়। সে কারণেই আমরা যানবাহনযোগে হজযাত্রার সমীচীনতার প্রবক্তা। হজরত ইমরান ইবনে হোসাইনের উপরোক্ত হাদিসে এই অভিমতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। আরো একটি কথা এই যে, শরিয়তসম্মত কোনো কারণ অথবা কারণ ব্যতিরেকে যদি ওয়াজিব পরিত্যক্ত হয়, তবে তা পুনরায় আদায় করতে হয়। এখন দেখতে হবে পদব্রজে গমন হজের মূল উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত কিনা। যদি তা মূল উদ্দেশ্যভূত হয় তবে তা পরিত্যক্ত হলে পুনরায় আদায় করতে হবে। আর একে মূল উদ্দেশ্যভূত করার অধিকার রয়েছে কেবল শরিয়ত প্রণেতার। এমতোক্ষেত্রে বিচার বিবেচনা বা তুলনা অনুমানের অবকাশ নেই। যেমন, নামাজের মধ্যস্থিত এক বা একাধিক ওয়াজিব পরিত্যক্ত হলে সোহ্ সেজদার মাধ্যমে তা সংশোধন করার কথা বলেছেন শরিয়ত প্রণেতা স্বয়ং। তাই ওয়াজিব পরিত্যক্ত হলে নামাজ পুনরায় পাঠ করতে হয় না। এই নিয়মটির অনুকূলে তাই আমরা বলি, একাধারে রোজা রাখার মানতকারী রোজার

www.eelm.weebly.com

বিরতিহীনতা এবং দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠের মানতকারী যদি নামাজের দণ্ডায়মানতা পরিত্যাগ করে তবে তাদেরকে পুনরায় মানত অনুসারে রোজা ও নামাজ পড়তে হবে। কারণ এক্ষেত্রে শরিয়ত প্রবর্তক রসুল স. 'সোহ্ সেজদা' ধরনের কোনো সংশোধক আমল নির্ধারণ করে দেননি। আবার পদব্রজে মানতকারীর জন্য রসুল স. স্বয়ং যানবাহনে হজযাত্রা করতে বলেছেন এবং পদব্রজে যাত্রা পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে সংশোধক হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন একটি কোরবানী। পুনরায় হজ করার কথা বলেননি। সুতরাং এক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত অজুহাত অথবা অজুহাতহীনতার প্রশ্ন অবান্তর। মুজদালিফায় অবস্থান করা না করার বিষয়টি অবশ্য স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে— বিনা ওজরে মুজদালিফায় অবস্থান না করা অবৈধ। আর শরিয়তসম্মত ওজর থাকলে বৈধ। তবে উভয় অবস্থায় একটি কোরবানী হবে ওয়াজিব।

মাসআলা : পদব্রজে মানতকারী যানবাহনযোগে হজ করলে তার উপরে কোরবানী কি ওয়াজিব ? প্রশ্নটির জবাব এরকম— হ্যাঁ। এরকম মানত ভঙ্গকারীর উপরে একটি কোরবানী ওয়াজিব। মানত ওজরবশতঃ ভঙ্গ করা হোক অথবা ওজর ছাড়া। ইমাম আবু হানিফা এবং সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ) বলেছেন, এমতোক্ষেত্রে মানতকারীকে কমপক্ষে কোরবানী করতে হবে একটি ছাগল। আর যদি মানতের সঙ্গে সে কসমও করে থাকে, তবে শপথভঙ্গের জন্য কাফ্ফারা প্রদান করাও হবে তার উপরে আবশ্যিক। ইমাম তাহাবীও এমতো অভিমতের সমর্থক। কিন্তু কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এমতোক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কেবল শপথভঙ্গের, কোরবানী করার প্রয়োজন নেই।

'পদব্রজে হজের মানতকারী যদি যানবাহনযোগে হজে যায় তবে তাকে কোরবানী দিতে হবে' একথা বলা হয়েছে হজরত উকবা ইবনে আমেরের ভগ্নি সম্পর্কিত হাদিসে। আবু দাউদের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— রসুল স. তাঁকে বাহনসহযোগে হজ করতে বললেন। আরো বললেন একটি কোরবানী দিতে। এরকম বর্ণনা দিয়েছেন কেবল আবু দাউদ। আর আবু দাউদের বর্ণনা হাদিসবেত্তাগণের নিকটে গ্রহণযোগ্য। আবার বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে সংক্ষিপ্তরূপে। সেখানে কোরবানী করার কথাটি নেই। কিন্তু এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, আবু দাউদের বর্ণনায় অতিরিক্ত কথাটি বর্জনীয়। কারণ বলিষ্ঠ বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনা অবশ্যই গ্রহণীয়। যেহেতু তাঁর বর্ণনায় কোরবানী করার কথা রয়েছে, আর কোরবানী হয় কমপক্ষে ছাগল, তাই ইমাম আবু হানিফার 'ছাগল কোরবানী করতে হবে' কথাটি বিশুদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

আমরা বলি বর্ণিত কোরবানীর জন্য হাদিসে ব্যবহৃত হয়েছে 'বুদনাহ' শব্দটি। উল্লেখ্য, বুদনাহ্ বলা হয় উট অথবা গরু-মহিষকে। কামুস রচয়িতার মতে বুদনাহ বলতে বোঝায় কেবল উট। অর্থাৎ ছাগলকে বুদনাহ বলা হয় না। তাহাবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত উকবা ইবনে আমের জানিয়েছেন, তাঁর ভগ্নির প্রতি রসুল স. এর নির্দেশ ছিলো দু'টি— বাহনযোগে যাত্রা করবে এবং বুদনাহ কোরবানী দিবে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ কর্তৃক যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সেই হাদিসেও এসেছে বুদনাহ্ কোরবানীর নির্দেশ। বর্ণনাটি এরকম— হজরত উকবার ভগ্নি পদব্রজে হজযাত্রার মানত করলেন, কিন্তু পদব্রজে গমনের সামর্থ্য তার ছিলো না। তখন রসুল স. হজরত উকবাকে বললেন, তোমার বোনের পদব্রজে হজযাত্রার প্রয়োজন আল্লাহ্‌র নেই। সে যাত্রা করবে বাহনোপরি সওয়ার হয়ে এবং দিবে একটি কোরবানী। আমি বলি, হাদিসটি উত্তম সূত্রসম্বলিত। এর সূত্রপরম্পরা এরকমঃ আবু দাউদ—ঈসা ইবনে ইব্রাহিম—আবদুল আযীয ইবনে মুসলিম—মাতরাল ওয়ারাক—ইকরামা—হজরত ইবনে আব্বাস। শেষোক্ত দু'জন ছাড়া অবশিষ্ট বর্ণনাকারীরা তাঁদের বর্ণনার শুরুতে উল্লেখ করেছেন 'শুনেছি' শব্দটি।

সূত্রপরম্পরাগত সন্দেহ ঃ বর্ণনাকারী হিসেবে আবদুল আযীয ইবনে মুসলিম অপ্রসিদ্ধ। আর ইবনে সা'দ মাতরাল ওয়ারাককে চিহ্নিত করেছেন দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে— এমতো সন্দেহের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, ইমাম জাহাবী আবদুল আযীযকে বলেছেন প্রসিদ্ধ। সুতরাং ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিতে অপ্রসিদ্ধ হলেও তিনি তা নন। আর মাতরাল ওয়ারাক মুসলিম শরীফের বর্ণনাকারীগণের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। সুতরাং তিনি দুর্বল নন। ইমাম জাহাবী বলেছেন, তিনি বলিষ্ঠ। অবশ্য ইমাম আহমদ ও ইবনে মুঈনের মতে তিনি দুর্বল। কিন্তু তাঁরা এরকম বলেছেন; তিনি আতা থেকে বর্ণনা করেছেন বলে। কিন্তু বর্ণিত হাদিসটি মাতার বর্ণনা করেছেন সরাসরি ইকরামা সূত্রে।

ইবনে হুমাম বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা এক্ষেত্রে ছাগল কোরবানীকে যথেষ্ট মনে করেছেন, উট কোরবানীর কথা বলেননি। এরকম বলেছেন তিনি একারণে যে, তাঁর সূত্রভূত বর্ণনাকারী শক্তিমান। 'বুদনাহ্'র বর্ণনাকারী তত্তুল্য শক্তিমান নয়।

আমি বলি, সাধারণ কোরবানী সম্পর্কিত হাদিসকে সুনির্দিষ্ট কোরবানী সম্পর্কিত হাদিসের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করবার অবকাশ থাকবে তখন, যখন উভয় হাদিসের মধ্যে দেখা দিবে পরস্পরবিরুদ্ধতা। কিন্তু এখানে সেরকম কিছু নেই। উভয় বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য কেবল এতটুকু— একটি

www.eelm.weebly.com

নির্দেশনা সাধারণ এবং অপরটি সুনির্দিষ্ট। আর উভয় বর্ণনা আবার একটি ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই সাধারণ নির্দেশনাকে এখানে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেয়া যাবে। হজরত আলী এবং কোনো কোনো সাহাবী অবশ্য বলেছেন, এখানে বিশেষভাবে 'বুদনাহ্'র কথাই বলা হয়েছে। সাহাবীগণের বক্তব্য যদিও পরিণতসূত্রবিশিষ্ট হাদিসের মর্যাদা রাখে, কিন্তু তাঁরা এখানে নির্দেশনাটিকে তাঁদের নিজেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেননি। যদি করতেন, তবে বর্ণনাটি সুপরিণত সূত্রবিশিষ্ট হাদিসের মর্যাদাও লাভ করতো। ইমাম শাফেয়ী সা'দ ইবনে আবী ওরুবাহের মাধ্যমে কাতাদা থেকে হাসানের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী একবার পদব্রজে হজযাত্রার কসমকারী এক লোক সম্পর্কে বলেছিলেন, সে যদি পদব্রজে যেতে অক্ষম হয়, তবে যাত্রা করবে বাহনারোহী হয়ে এবং কোরবানী দিবে একটি বুদনাহ্।

বিশুদ্ধ সূত্রসহযোগে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন 'পদব্রজে কাবাগৃহে গমনের মানতকারীর করণীয় কী'— হজরত আলীর নিকটে একবার এমতো প্রশ্ন উত্থাপন করলে তিনি বললেন, পদব্রজেই যাবে। অসমর্থ হলে যাবে বাহনে সওয়ার হয়ে এবং কোরবানী দিবে একটি উট। এরকম বক্তব্য এসেছে হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা এবং হাসান বসরী থেকেও।

মাসআলা ঃ 'হজ' ও 'ওমরা'র উল্লেখবিহীন পদব্রজে কাবাগৃহে গমন সম্পর্কিত মানতের বিবরণ— এরকম মানতকারীর জন্য মুসতাহাসান (সমীচীন) হিসেবে পদব্রজে হজ ও ওমরা প্রতিপালন করা আবশ্যক। কিন্তু বুদ্ধিগত সিদ্ধান্ত বলে, এরকম মানতকারীর উপর হজ, ওমরা কোনোটাই ওয়াজিব হয় না। কাবাগৃহে গমনের উদ্দেশ্য হয় সাধারণতঃ হজ বা ওমরা পালন। তাই এমতোক্ষেত্রে হজ বা ওমরা করাকে 'সমীচীন' বলা হয়েছে। আর যদি কেউ পদব্রজে হেরেম পর্যন্ত যাওয়ার মানত করে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে তার উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। কারণ হেরেম পর্যন্ত যাওয়ার উদ্দেশ্য সাধারণতঃ হজ ও ওমরা করা নয়। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, সতর্কতা অবলম্বনার্থে এরকম মানতকারীর জন্য হজ অথবা ওমরা করা প্রয়োজন। তবে কেউ যদি সাফা, মারওয়া, আরাফা, মুজদালিফা, মিনা অথবা মাকামে ইব্রাহিমে গমনের মানত করে তবে ইমামগণের ঐকমত্যানুসারে তার উপরে কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ পদব্রজে যাওয়ার কথা যদি উচ্চারণ না করে, বরং বের হওয়া অথবা কাবাগৃহ পর্যন্ত সফর করার কথা বলে এবং এ সম্পর্কে মানতও করে, তবুও তার

www.eelm.weebly.com

উপরে কোনোকিছু ওয়াজিব হবে না। প্রকৃত কথা হচ্ছে বিষয়টির ভিত্তি হচ্ছে সাধারণ জ্ঞাতব্যের উপর। সাধারণ ধারণানুসারে কোনো শব্দ যদি ইবাদতবোধক মানত হয়, তবে ওই ইবাদত ওয়াজিব হবে, নতুবা হবে না।

যদি কেউ বলে, আল্লাহ্র গৃহে যাওয়া আমার উপর ওয়াজিব এবং এরকম কথা বলার সময় যদি উদ্দেশ্য করে মদীনার মসজিদ অথবা বায়তুল মাকদিসের তবে তার উপরেও কোনোকিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা প্রতিটি মসজিদই কথাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

মাসআলা ঃ কোনো ইবাদত মানত করলে ওই ইবাদত সংশ্লিষ্ট করণীয়সমূহ পালন করাও ওয়াজিব হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কেউ ওজু ছাড়া এবং কোরআন পাঠ ব্যতিরেকে দু'রাকাত নামাজ পাঠ করার মানত করলেও তাকে নামাজ পাঠ করতে হবে ওজু ও কোরআন আবৃত্তি সহযোগে। আবার কেউ এক অথবা তিন রাকাত নামাজের মানত করলেও তাকে নামাজ পাঠ করতে হবে দুই রাকাত। এক রাকাতের স্থলে দুই রাকাত এবং তিন রাকাতের স্থলে দুই দুই করে চার রাকাত। ইমাম মোহাম্মদ বলেন, ওজুবিহীন নামাজ পাঠের মানত জায়েযই নয়। কারণ ওজু ছাড়া নামাজ ইবাদত রূপে গণ্যই নয়। তবে কোরআন পাঠবিহীন নামাজ কখনো কখনো ইবাদত রূপে গণ্য হতে পারে। যেমন— এমতো মূর্খের নামাজ, যে কোরআনের কোনো আয়াতই স্মৃতিস্থ করতে পারে না। অন্য তিন ক্ষেত্রে তাঁর অভিমত ইমাম আবু হানিফার অভিমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইমাম জোফার বলেন, কেউ তিন রাকাত নামাজ পাঠের মানত করলে তার উপর ওয়াজিব হবে দুই রাকাত নামাজ। আর ওজু বিহীন ও কোরআন পাঠবিহীন নামাজ যেমন নামাজ নয়, তেমনি এক রাকাত নামাজও নামাজ নয়। সুতরাং এধরনের মানতই বিশুদ্ধ নয়। কিন্তু আমরা বলে থাকি, কোনো বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ওই সকল উপকরণ পরিপূরণও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, যে গুলোর উপরে বিষয়টি নির্ভরশীল।

মাসআলা ঃ পদব্রজে হজের মানতের বিপরীত আমল করে কোরবানী দিলে কি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে? ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে, এমতাবস্থায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ কেউ পদব্রজে হজ যাত্রার মানত করার পর ওজরবশতঃ অথবা ওজর ছাড়াই যানবাহনযোগে যদি হজে যায় এবং একটি কোরবানী দেয়, তবে তাকে কাফ্ফারারূপে আর কিছু দিতে হবে না। তবে এরকম মানতকারী যদি কসমের নিয়তও করে, তাহলে তার উপরে কাফ্ফারা প্রদান করা হবে অত্যাবশ্যক। উল্লেখ্য, এই মাসআলাটি ইতোপূর্বে উল্লেখিত প্রকৃত মানত ভঙ্গ করার মাসআলার মতো মতদ্বৈততাদীর্ণ।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ ইতেকাফের মানত করলে ইতেকাফকালে রোজা রাখা ওয়াজিব কিনা?— এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেন, এরকম মানতকারীর উপর রোজা ওয়াজিব। কারণ তাদের মতে রোজাবিহীন ইতেকাফ বিশুদ্ধ নয়। কিন্তু ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, শুধু ইতেকাফের মানতকারীর উপরে রোজা ওয়াজিব নয়। তাঁদের মতে রোজা ইতেকাফের শর্তভূত নয়। আর ইতেকাফ এক রাত্রির জন্য হতে পারে। কমপক্ষে হতে পারে এক ঘণ্টার জন্যও। এক বর্ণনায় অবশ্য ইমাম আহমদের অভিমত এসেছে ইমাম মালেকের অনুকূলে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা বলেন, ওয়াজিব ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত, নফল ইতেকাফের জন্য নয়। ইমাম মোহাম্মদের অভিমতও এরকম।

ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত হওয়ার কথা এসেছে দারাকুতনী—সুয়াইদ ইবনে আবদুল আযিয—সুফিয়ান ইবনে হোসাইন—জুহুরী—ওরওয়াহ্— এই সূত্রে। হাদিসটি এই— জননী আয়েশা বলেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, রোজা ব্যতিরেকে ইতেকাফ হবে না। দারাকুতনী বলেন, এই বর্ণনাপরম্পরাভূত এক বর্ণনাকারীর নাম সুয়াইদ সম্পর্কহীন। আর ইমাম আহমদ বলেন, সুয়াইদ পরিত্যক্ত। বোখারী বলেন, সুয়াইদের বর্ণনায় কিছু কথা আছে। ইয়াহ্ইয়া বলেন, সে অপদার্থ। ইমাম আহমদ বলেন, দুর্বল বর্ণনাকারী। ইবনে হাব্বান বলেন, অপরাপর বর্ণনায় সুফিয়ান যোগ্য বর্ণনাকারীরূপে বিবেচিত হয়েছেন। কিন্তু জুহুরীর বর্ণনায় তারতম্য ঘটান। আমি বলি, ইমাম জাহাবী তাঁকে অত্যন্ত সৎ ও প্রসিদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন আর মুসলিমও গ্রহণ করেছেন তাঁর বর্ণনাকে। ইবনে হুম্মাম তাঁর 'আল কামাল' গ্রন্থে লিখেছেন, হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, আমি সুফিয়ান সম্পর্কে হোসাইনের নিকটে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি তাঁর সম্পর্কে উত্তম মন্তব্যই করেছেন। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, সুফিয়ানের বর্ণনা সঠিক, কিন্তু কেবল জুহুরীর বর্ণনা যে ত্রুটিমুক্ত একথা তিনি বলেননি। আর বর্ণিত হাদিস তিনি যেহেতু জুহুরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তাই তা সঠিক নয়। জুহুরী থেকে এরকম অযথার্থ বর্ণনা করেছেন সুবীদ এবং সুফিয়ানও।

এসম্পর্কে আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু দাউদ—আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক—জুহুরী—ওরওয়াহ্— এই সূত্রে। হাদিসটি এই— জননী আয়েশা জানিয়েছেন, রসুল স. এর রীতি (সুন্নত) এই যে, ইতেকাফ পালনকারী কোনো পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে যাবে না, কারো জানাজায় অংশ গ্রহণ করবে না, আপন স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না এবং তাঁদের কারো সঙ্গে সহবাসও করবে না। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোনো প্রয়োজনে ইতেকাফ স্থল পরিত্যাগ করবে না। আর রোজা ছাড়া ইতেকাফও হবে না। আর তাঁর ইতেকাফ স্থল হবে কেবল মসজিদ, যেখানে নামাজের জামাত হয়।

www.eelm.weebly.com

একটি সন্দেহ ঃ আবু দাউদ ছাড়া অন্য কেউই বর্ণিত হাদিসে 'সুন্নত' (রসুল স. এর রীতি) শব্দটির উল্লেখ করেননি, যার ফলে ধরে নেয়া যায় হাদিসটি পরিণত। আবার দারাকুতনীও এই হাদিসের সূত্রভূত আবদুর রহমানকে চিহ্নিত করেছেন দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে।

সন্দেহভঞ্জন ঃ এই হাদিসকে 'সুপরিণত' শ্রেণীভুক্ত করতে গেলে তা হবে অতিরঞ্জিত। তবে বলিষ্ঠ বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনাও গ্রহণীয়। আর আবদুর রহমান হচ্ছেন বলিষ্ঠ বর্ণনাকারী। অবশ্য তিনি কাদরিয়া সম্প্রদায়ভূত। আবু দাউদও এরকম বলেছেন। ইবনে মুঈনও তাঁকে বলিষ্ঠ বলে মানেন। ইমাম আহমদ তাঁকে চিহ্নিত করেছেন শুদ্ধ বর্ণনাকারীরূপে। আবার মুসলিমও তাঁর বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন।

আমি বলি, এই হাদিস বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত হলেও প্রামাণ্য নয়। কেননা হাদিসে এসেছে 'সুন্নত' শব্দটি। কাফ্ফারা প্রসঙ্গেও তো হাদিসটি বর্ণিত হয়ে থাকতে পারে। ইতেকাফের জন্য রোজা যে সুন্নত, সে ব্যাপারে তো কোনো মতোবিরোধ নেই। মতোবিরোধ রয়েছে শর্ত হওয়ার ব্যাপারে। ইমাম আবু হানিফা ইতেকাফের জন্য রোজাকে শর্তরূপে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আলোচ্য হাদিসে শর্ত হওয়ার প্রমাণ নেই। প্রমাণ রয়েছে কেবল সুন্নতের।

ইবনে জাওজী তাঁর 'আততাহ্কীক' গ্রন্থে দারাকুতনীর বরাত দিয়ে জুহুরীর বর্ণনাসূত্রে সা'দ, ইবনে মুসাইয়্যেব ও ওরওয়াহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেন, রসুল স. রমজানের শেষ দশদিন ইতেকাফ করতেন এবং ইতেকাফকারীর জন্য সুন্নত হচ্ছে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে বের না হওয়া, কারো জানাজার সঙ্গে গমন না করা, কোনো রোগীকে দেখতে না যাওয়া, স্ত্রীকে স্পর্শ না করা এবং স্ত্রী সহবাস না করা। নিয়মিত নামাজের জামাত হয় এমন স্থান ছাড়া অন্যত্র ইতেকাফ হয় না। আর রসুল স. ইতেকাফ্কারীকে রোজা রাখতে বলতেন।

ইবনে জাওজী এই হাদিসের সূত্রপরম্পরাগত বিশুদ্ধতাকে মেনে নেননি। কেননা এর সূত্রসংযুক্ত ইব্রাহিম ইবনে মুহসারকে ইবনে আদী বলেছেন হাদিস বেত্তাগণের নিকট সে অস্বীকৃত। দারাকুতনী বলেছেন, এই হাদিসের বক্তব্যটি রসুল স. এর বক্তব্য নয়, বক্তব্যটি জুহুরীর, যিনি বক্তব্যটিকে হাদিস বলেই জেনেছেন। এটা তাঁর ভ্রান্তি।

আবু দাউদ আবদুর রহমান ইবনে বুদাইল সূত্রে আমর ইবনে দিনারের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, মূর্খতার যুগে হজরত ওমর এই মর্মে মানত করেছিলেন যে, তিনি কাবা শরীফে একদিন একরাত ইতেকাফ করবেন। পরবর্তীতে ইসলামী যুগে তিনি এ সম্পর্কে রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলে তিনি স. বললেন, ইতেকাফ করে নাও। রোজাও রাখো। নাসাঈর বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— রসুল স.

www.eelm.weebly.com

তখন তাঁকে নির্দেশ দিলেন ইতেকাফ করতে ও রোজা রাখতে। এই বর্ণনা সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন, এর সূত্রসংযুক্ত আবদুর রহমান ইবনে বুদাইল একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। আবার হজরত ইবনে ওমর থেকে নাফে কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে রোজার উল্লেখ নেই। এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ। দারাকুতনী বলেছেন, আমি আবু বকর নিশাপূরীকে বলতে শুনেছি, হাদিসটি অসমর্থিত। কেননা আমর বিন দিনারের কোনো নির্ভরযোগ্য ছাত্রই তার নাম উল্লেখ করেন নি। না ইবনে জুরাইজ, ইবনে উয়াইনা, না হাম্মাদ ইবনে সালমা। অবশ্য ইবনে হুম্মাম তাঁকে বলিষ্ঠ বলেছেন। একথাও বলেছেন যে, ইবনে মুঈন হাদিস শাস্ত্রে তাঁকে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে হাব্বানও তাঁকে করেছেন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত। আমি বলি, ইমাম জাহাবী সুফিয়ানের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কিছুই বলেননি। বর্ণিত হাদিসে ইতেকাফের সঙ্গে রোজা রাখার নির্দেশ হজরত ওমরকে দেয়া হয়েছিলো বলে যদি ধরেও নেয়া হয়, তবুও বলা যেতে পারে— হজরত ওমর হয়তো রোজাসহ ইতেকাফের মানত করেছিলেন। তাই তাঁকে দু'টোই করতে বলা হয়েছিলো। কিন্তু বর্ণনাকারী উল্লেখ করেছেন কেবল ইতেকাফের মানতের কথা। অধিকাংশ বর্ণনায় অবশ্য বলা হয়েছে কেবল ইতেকাফের মানতের কথা, রোজাসহ ইতেকাফের মানতের কথা সেগুলোতেও আসেনি।

স্বসূত্রে দারাকুতনী সাঈদ ইবনে বশীরের মাধ্যমে নাফেয়ের বরাত দিয়ে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর মূর্খতার যুগে ইতেকাফ করার এবং রোজা রাখার মানত করেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এ সম্পর্কে রসুল স. এর নিকটে জানতে চেয়েছিলেন। রসুল স. তখন বলেছিলেন, কৃত মানত পূর্ণ করো। শায়েখ আবদুল হক বলেছেন, সাঈদ ইবনে বশীর এই হাদিসের অসম্পৃক্ত বর্ণনাকারী। ইবনে জাওজী, ইয়াহ্ইয়া এবং ইবনে নুমাইর বলেছেন, সাঈদ একজন অনভিপ্রেত ব্যক্তি। আমরা বলি, হাফেজ ইবনে হাজার তাঁকে বলেছেন বিতর্কাহত। জাহাবী লিখেছেন, কাতাদার ছাত্র সাঈদ ইবনে বশীরকে নির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন শো'বা। বোখারী বলেছেন, তাঁর স্মৃতিশক্তি সমালোচনাহত। এরকমও বলা হয়েছে যে, তিনি কাদরিয়া সম্প্রদায়ভূত। আমি বলি, ইবনে বুদাইল অপেক্ষা সাঈদ অধিক দুর্বল নন। একথার প্রমাণস্বরূপ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, ইতেকাফকারীর জন্য রোজা অত্যাবশ্যক নয়। যদি না সে রোজা ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের উপরে ওয়াজিব করে নেয়। হাকেমও এরকম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। ইবনে জাওজীও এই বর্ণনার মধ্যে দূষণীয় কিছু দেখেননি।

www.eelm.weebly.com

বোখারী বলেন, ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত নয়। তিনি তাঁর অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেন এই হাদিসটি— হজরত ওমর একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি মূর্খতার যুগে মানত করেছিলাম, এক রাত্রি মসজিদুল হারামে ইতেকাফ করবো। রসুল স. বললেন, মানত পূর্ণ করো। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিসে দেখা যায়, হজরত ওমর মানত করেছিলেন রাত্রিকালীন ইতেকাফের। আর রাতে তো রোজা রাখার হুকুমই নেই। আবার মুসলিমের এক বর্ণনায় 'রাত্রি'র স্থলে এসেছে 'দিনে'র কথা। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে শো'বা থেকে ওবায়দুল্লাহ্‌র বর্ণনা সূত্রে। এখন বর্ণিত হাদিসদ্বয়ের রাত ও দিনের দ্বন্দ্ব নিরসনার্থে বলা যেতে পারে 'রাত' অর্থ পূর্ণ দিবস ও রাত্রি। আর 'দিন' অর্থ পূর্ণরাত্রি ও দিবস। অর্থাৎ একরাত একদিন। 'দিন' শব্দসম্বলিত বর্ণনাটি বিরল। অথচ অধিকতর সঠিক বলে মনে করা হলেও এক কথায় বলার অবকাশ রয়েছে যে, হজরত ওমর দিনের ইতেকাফের কথাই বলেছিলেন, তবুও রসুল স. তাঁকে রোজা রাখার কথা বলেননি কেবল বলেছিলেন, মানত পূর্ণ করো। এতে করে বুঝা যায়, ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত নয়।

রাত্রিকালীন ইতেকাফ যে রোজাবিহীন হয় তার স্বপক্ষে বর্ণিত হয়েছে এই হাদিসটি— হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আনীস একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! আলহামদুলিল্লাহ আমি মরুবাসী । আমি সেখানকার মসজিদে নামাজও পড়ি। আমি ওই মসজিদে অবস্থানের অনুমতি পেতে পারি কি? রসুল স. বললেন, তিরিশ তারিখের রাতে সেখানে অবস্থান গ্রহণ কোরো। পরবর্তীতে লোকেরা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আনীসের পুত্রকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার পিতা তারপর কী করলেন? তিনি বললেন, আমার পিতা ওই মসজিদে প্রবেশ করতেন আছরের পরে। আর সেখান থেকে বের হতেন ফজরের পর। মসজিদের বাইরে তাঁর ঘোড়া বাঁধা থাকতো। তিনি ওই ঘোড়ায় চড়ে চলে যেতেন তাঁর বসতবাটিতে। আবু দাউদ। এই বিবরণটির মাধ্যমে স্পষ্ট হলো যে, কেবল রাত্রিকালীন ইতেকাফও জায়েয। যদি কেউ বলেন, আমরা একে ইতেকাফ বলতে পারি না। তবে তার উত্তরে আমরা বলবো, এতে দোষেরও কিছু নেই। পারিভাষিক মতবিরোধের অবকাশও এখানে অনুপস্থিত। একে ইতেকাফ না বললেও এতটুকু তো স্বীকার করতে হবে যে, ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করাও ইবাদত। আর মানতের কারণে মোস্তাহাব ইবাদতও ওয়াজিব হয়ে যায়।

মাসআলা ঃ রমজান মাসে ইতেকাফের মানত— এরকম মানত করলে তা রমজান মাসেই বাস্তবায়ন করতে হবে। এই ইতেকাফ অন্য মাসে করলে হবে না। কেননা অন্য কোনো মাসের ইবাদতে রমজানের ইবাদতের তুল্য সওয়াব নেই।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. বলেছেন, রমজানে নফল পুণ্যকর্ম অন্যান্য মাসের ফরজ পুণ্যকর্মের মতো। আর যে ব্যক্তি রমজান মাসে একটি ফরজ পালন করে সে পায় অন্য মাসে ওই ফরজের সত্তর গুণ অধিক পালনের সওয়াব। এই দীর্ঘ হাদিসটি হজরত সালমান ফারসী থেকে বর্ণনা করেছেন বায়হাকী ।

সাধারণভাবে রমজানে ইতেকাফের মানত করলে যে কোনো রমজান মাসে তা আদায় করা যাবে। কিন্তু কোনো এক রমজানের কথা নির্দিষ্ট করে যদি কেউ উল্লেখ করে, তবে তাকে ওই রমজানেই তা সম্পাদন করতে হবে। ইবনে হুম্মাম বলেন, কিন্তু এই অভিমত ওই বিধানের মতো নয়, যেখানে বলা হয়েছে, যে শর্তের মাধ্যমে এক ইবাদতের মর্যাদা অন্য ইবাদতের উপরে প্রমাণিত হয় না, সে শর্ত পরিপূরণ অবশ্যপালনীয় নয়। বলা বাহুল্য যে, এক রমজান অন্য রমজানের তুলনায় অধিকতর শ্রেষ্ঠ নয়। তাই ইতেকাফের জন্য কেউ যদি প্রথম রমজানকে নির্দিষ্ট করে, তবে যত দ্রুত সম্ভব তাকে তা সম্পাদন করতে হবে। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন, 'ইউসারিউনা ফীল খইরতি ওয়াহুম লাহা সাবিকুন' (আর তারা যথাশীঘ্র করে পুণ্যকর্ম। আর সেজন্য তারা অগ্রসূরী।)। আবার কেউ যদি পরবর্তী বছর সমূহের কোনো এক রমজানকে নির্দিষ্ট করে নেয়, তবু তার জন্য সামনে যে রমজান পড়বে সেই রমজানেই মানত পুরা করে নেয়া প্রয়োজন। কারণ জীবন অতি অনিশ্চিত।

মাসআলা ঃ যদি কেউ কোনো রমজানে ইতেকাফের মানত করার পর যদি তা পালন না করে, তবে তাকে অন্য সময়ে হলেও ওই মানত পূর্ণ করতে হবে। আর ওই ইতেকাফ অবশ্যই করতে হবে রোজা সহযোগে। কারণ তার মানত পূরণের নির্ধারিত সময় ছিলো রমজান। এটাই ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মোহাম্মদের অভিমত। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু ইউসুফের অভিমতও এরকম। অন্য বর্ণনানুসারে তাঁর মত হচ্ছে— এমতাবস্থায় ওই লোককে আর ইতেকাফ করতে হবে না। যেহেতু মানত পরিপূরণের নির্ধারিত সময় বিগত হয়েছে, তাই তার ক্ষতিপূরণ করা অসম্ভব। ইমাম জোফারের মতও এরকম। এর কারণরূপে বলা যেতে পারে, রমজানের ইতেকাফ সর্বোত্তম। এমতো ইতেকাফের ক্ষতিপূরণ অন্য মাসে সম্ভব নয়। যেমন কেউ দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠের মানত করার পর বসে নামাজ পড়লে তার মানত পুরা হবে না। মানত পূর্ণ করা এমতোক্ষেত্রে অসম্ভব, তাই তা পরিহরণীয়।

আমরা বলি, যুক্তিটি ঠিক নয়। কারণ রমজান গত হয়ে গেলে ফিরে পাওয়া অসম্ভব, কিন্তু ইতেকাফ করাতো অসম্ভব নয়। তাই এরকম মানতকারী ব্যক্তি যদি রমজানের পরেও ইতেকাফ করে, তবুও তার ইতেকাফের মানত পুরা হবে। কিন্তু রমজানের ফযীলত সে পাবে না। এখন অবশিষ্ট রইলো আর একটি কথা। তা

www.eelm.weebly.com

হচ্ছে— পরবর্তী রমজান পর্যন্ত ইতেকাফকে বিলম্বিত করা যাবে কিনা। এরকম করাও ঠিক নয়। কারণ পরবর্তী রমজান পর্যন্ত বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা কারোরই নেই। বিষয়টিকে দেখতে হবে কাজা নামাজ ও রোজা আদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে। ওয়াক্ত মতো নামাজ এবং রমজানের রোজা ফরজ। এই ফরজ বাদ পড়ে গেলে পরবর্তীতে তার কাজা আদায় করে নেয়া যায়। এতে করে সঠিক সময়ে নামাজ রোজা আদায়ের ফযীলতের ক্ষতিপূরণ হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু ফরজ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ তো সম্ভব। দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠের মানতকারীর বসে নামাজ পাঠ করার বিষয়টি এরকম নয়। কারণ পুনরায় দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠ করা সম্ভব। এভাবে বসে নামাজ পাঠ করার ভুলের ক্ষতিপূরণও সম্ভব।

সন্দেহ ও সন্দেহভঞ্জন ঃ রমজানে ইতেকাফের মানত করার পর যথাসময়ে তা পালন না করলে পরবর্তী রমজানেই তো তার কাজা আদায় করা উচিত। কিন্তু ততোদিন বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা নেই বলেই যত দ্রুত সম্ভব অন্য মাসে রোজাসহ মানত পুরা করার কথা বলা হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে মানতকারী যদি পরবর্তী রমজান পায়, তবে তাকে পুনরায় মানতের ইতেকাফ পূর্ণ করা উচিত। কারণ, ওজরবশতঃ কেউ হজে না যেতে পারলে তার পক্ষ থেকে কাউকে হজে পাঠাতে পারে। কিন্তু পরবর্তী সময় ওজর দূর হয়ে গেলে, অর্থাৎ হজযাত্রার সক্ষমতা ফিরে পেলে পুনরায় তাকে হজ করতে হয়। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রে তার পূর্বের বদলী হজ বাতিল হয় এবং নতুন করে হজ করা হয়ে যায় ওয়াজিব।— এই সিদ্ধান্তটি কি ঠিক নয়?

ইমাম আবু হানিফা বলেন, আল্লাহ্‌র সরাসরি হুকুমে ইতেকাফে রোজা রাখার নির্দেশ দেয়া হলে তো রমজানে ইতেকাফ করা শুদ্ধই হবে না। কারণ ইতেকাফের ওয়াজিব রোজা পালন করলে রমজানের ফরজ রোজা তাহলে রাখবে কীভাবে? আবার মানতের ওয়াজিব রোজাই বা রমজানের রোজা দ্বারা পূরণ হবে কী করে? রমজানের রোজা আবার মানতের রোজার উপরে নির্ভরশীলও নয়। কারণ পূর্ব থেকেই তা ফরজ। তাই বুঝতে হবে, রমজানের মর্যাদার কারণেই রমজান মাসে ইতেকাফের মানতকে জায়েয করা হয়েছে। এরকম করা হয়েছে কেবল প্রয়োজনবশতঃ। তাই রমজানে ইতেকাফের মানত পূর্ণ না করতে পারলে রমজানের ফযীলত হস্তচ্যুত হবে বটে, কিন্তু মূল মানত ঠিকই থাকবে। আর তা রোজাসহ অন্য সময়ে পালনও করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা এরকমই বলেন। কারণ তাঁর নিকট ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত। আর যাঁরা এ শর্ত মানেন না, তাঁরা বলেন, বাদ পড়ে যাওয়া রমজানের ইতেকাফের মানত পূর্ণ হয়ে যাবে রোজা ব্যতিরেকেই এবং পরবর্তী রমজানেও এই বাদ পড়ে যাওয়া ইতেকাফ আদায় করা যাবে। আর এরকম না করে কেউ যদি রমজানের পর কেবল কাফ্‌ফারার রোজাও

www.eelm.weebly.com

রাখে তবু তা হবে তার মানতের ক্ষতিপূরণ। অর্থাৎ এমতো মানতকারী রমজানের পরে ইতেকাফ করতে পারবে রোজাসহ, অথবা রোজা ব্যতিরেকে। অথবা এর ক্ষতিপূরণ করতে পারবে কেবল মানতভঙ্গের কাফ্ফারা স্বরূপ রোজা রেখে। পরবর্তী রমজান পেলেও আর তাকে ইতেকাফ করতে হবে না। যেমন— পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করে কেউ যদি তার ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়ে নেয়, তবে ওয়াক্ত শেষে পানি পাওয়া গেলেও তাকে আর ওজু করে নামাজ পড়তে হয় না। আবার বস্ত্রহীন ব্যক্তি নগ্ন হয়ে ওয়াক্তিয়া নামাজ পাঠের পর বস্ত্র লাভ করলেও বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় আর তাকে করতে হয় না নামাজের পুনরাবৃত্তি।

কাফের অবস্থার মানতঃ ইসলাম গ্রহণের পরেও কাফের অবস্থার ইবাদতমূলক মানত পূরণ করা ওয়াজিব— এরকম বলেন ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ। কারণ হজরত ওমরের কাফের অবস্থার মানত পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন রসুল স. স্বয়ং। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ীর মতে কাফের জীবনের মানত ইসলাম গ্রহণের পর পূরণ করা ওয়াজিব নয়। কেননা কাফের কখনোই ইবাদত করার উপযুক্ত নয়। ইমান ছাড়া ইবাদত করার উপযুক্ততা অর্জন করা যায় না। কাফেরের ইবাদত গোনাহ্। আর গোনাহ্ সম্পৃক্ত মানত পূরণের উপযোগী নয়। রসুল স. হজরত ওমরকে প্রকৃতপক্ষে কাফের অবস্থার মানত পূরণ করতে বলেননি। ইতেকাফের অত্যধিক আগ্রহ লক্ষ্য করেই তিনি তাঁকে এমতো নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর এরকম নির্দেশ দ্বারা কাফের অবস্থার মানত পূরণ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না।

মাসআলা ঃ আনুগত্যমূলক মানত পূরণ করার পূর্বে কেউ যদি ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে যায়, তারপর আবার যদি সে ইসলাম ধর্মে ফিরে আসে, তবে তাকে আর তার মানত পূরণ করতে হবে না। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। কারণ ইবাদতের মানত অবশ্যই ইবাদত, আর ইবাদতের এই যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায় ধর্মত্যাগ করলে।

মাসআলা ঃ সব সময় রোজা রাখার মানত করার পর কেউ যদি পার্থিব বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে মাঝে মাঝে রোজা বাদ দিতে বাধ্য হয়, তবে তাকে বাদ পড়ে যাওয়া প্রতি রোজার বদলে দান করতে হবে এক সা (প্রায় চার সের) গম। ইবনে হুম্মামও একথা লিখেছেন। তিনি আরো লিখেছেন, আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে যদি সে এরকম করতে না পারে তবে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এমতোক্ষেত্রে এরকম অভিমতও এসেছে যে, সে ইচ্ছা করলে রোজা রাখবে, অথবা প্রতি রোজার বদলে দান করবে চার সের গম। এ ধরনের অসহনীয় আমলের ক্ষেত্রেও এরকম অভিমত দেয়া হয়েছে। আর যাঁরা এভাবে কাফ্ফারা বা

www.eelm.weebly.com

ক্ষতিপূরণের কথা বলেন তাঁরা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন এই হাদিসটি— হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, যারা অস্বাভাবিক মানত করে বসে, তাদের কাফ্ফারা কসমের কাফ্ফারার মতো।

মাসআলা ঃ দশ অথবা একশত হজ করার মানত যে করবে, তাকে সবকটি হজ পালন করতে হবে। অথবা যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন তাকে প্রতি বছর হজ পালন করে যেতে হবে। 'খোলাসা' প্রণেতা গ্রহণ করেছেন প্রথমোক্ত অভিমতটিকে। অন্যান্য ইমামগণ দ্বিতীয়োক্ত বক্তব্যটিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন সাহেবাইনের সঙ্গে। ইমাম সারখ্সীর নিকটেও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে দ্বিতীয় বক্তব্যটি।

যদি একই বছরে ওই ব্যক্তি দশটি হজের মানত করে, তবে তার উপরে ওয়াজিব হবে দশ বছরে দশটি হজ পালন করা। 'খোলাসা' গ্রন্থের বক্তব্যানুসারে, তাকে ওই বছরেই দশজনকে দিয়ে বদলী হজ করিয়ে নিতে হবে। কিন্তু যদি সে এর পর দশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে, তবে প্রতি বছর হজ পালন করে যেতে হবে। বদলী হজ দ্বারা তার মানত পূরণ হতে পারবে কেবল তখন, যখন সে ওই বছরের হজের পরে মরে যাবে। এখন কথা হচ্ছে, সে পরের দশ বছর বেঁচে থাকলেও হজ করার সামর্থ্য যদি হারিয়ে ফেলে, তখন কী হবে? এমতাবস্থায় কাফ্ফারা আদায় করাই যথেষ্ট কিনা সে সম্পর্কে মতদ্বৈধতা বিদ্যমান।

মাসআলা ঃ কেউ বললো ' আমি হজ করবো'— এটা কি মানত? না, এরকম কথা বলে অঙ্গীকার বা শপথ করা হয়, মানত করা হয় না। তবে এমতো অঙ্গীকার পূরণ মোস্তাহাব।

মাসআলা ঃ 'আল্লাহ্ আমাকে এই রোগ থেকে মুক্তি দিলে আমি হজ করবো' এরকম বললে তা হবে মানত। তখন ইসলামের নির্ধারিত ফরজ হজ ছাড়াও তাকে আর একটি হজ করতে হবে মানতরূপে। এমতাবস্থায় ওই লোক যদি সুনির্দিষ্ট নিয়ত ছাড়াই হজ করে তবে সমাধা হবে তার ফরজ হজ। এরপর নিয়ত ছাড়া আর একটি হজ যদি করে তবে তার সেই হজ হবে নফল। এতে করে তার মানতের ওয়াজিব হজ আদায় হবে না। পরে তাকে আর একটি হজ করতে হবে সুনির্দিষ্ট মানতের নিয়ত করে। মানতের হজের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ত অত্যাবশ্যক। কেউ কেউ এরকম অভিমতই ব্যক্ত করেছেন।

মাসআলা ঃ কেউ বললো 'জায়েদ যদি ইচ্ছা করে তবে আমার হজ আমার উপরে ওয়াজিব'— একথা শুনে জায়েদ বললো, হ্যাঁ আমি ইচ্ছুক। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তির উপরে ওয়াজিব হবে একটি মানতের হজ। তবে এমতোক্ষেত্রে এরকম করা জরুরী নয়, যে মজলিশে জায়েদ 'আমি ইচ্ছুক' বললো, সেই মজলিশেই ওই

www.eelm.weebly.com

ব্যক্তি তার হজের অভিলাষ ব্যক্ত করবে। তালাকের ক্ষেত্রে আবার অভিলাষ প্রকাশের নিয়ম এর বিপরীত। এদু'টো অবস্থার পার্থক্য এরকম— তালাকের মধ্যে থাকে তালাকদাতার কর্তৃত্ব এবং তা দেয়া হয় বুঝে শুনে। আর হজের ক্ষেত্রে অভিলাষ প্রকাশের সম্পর্ক জায়েদের ইচ্ছার উপর— যা একটি শর্ত।

মাসআলা ঃ কেউ বললো 'আমি আমার সমস্ত সম্পদ দান করে দিবো'— এমতাবস্থায় পছন্দনীয় ও উত্তম হচ্ছে, দান করতে হবে ওই পরিমাণ সম্পদ, যার উপরে জাকাত ফরজ। কেননা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নেসাব পরিমাণ সম্পদের উপরেই জাকাত ফরজ করা হয়েছে। এরই ভিত্তিতে তুলনীয় করা হয়েছে বান্দার মানতকে। এরকম অভিমতও এসেছে যে, এ ধরনের বাক্যের দ্বারা প্রকাশ্যভাবে জানা যায় অতিরিক্ত সম্পদ দান করাই এখানে উদ্দেশ্য। আর জাকাতের নেসাবই হচ্ছে অতিরিক্ত সম্পদ। অছিয়তের বিধান আবার আলাদা। কারণ অছিয়ত তখনই করা হয়, যখন সম্পদের প্রয়োজন আর থাকে না। তবে কেউ যদি 'আমি আমার অধিকৃত সকল সম্পদ দান করবো' এরকম বলে, তবে ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইনের মত হচ্ছে, এরকম মানতকারীর উপরে ওয়াজিব হবে তার্ সকল সম্পদ দান করে দেয়া। আর ইমাম আহমদ, ইমাম জোফার ও ইমাম শাফেয়ী বলেন 'সমস্ত সম্পদ' এবং 'অধিকৃত সম্পদ' কথা দু'টোর মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। তাই উভয় অবস্থায় সকল সম্পদ দান করে দেয়া হবে ওয়াজিব। ইমাম মালেক বলেন, উভয় অবস্থায় দান করতে হবে সমস্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ। রযীন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু লুবাবা একবার রসুল স. এর নিকটে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আমার কৃত অপরাধের তওবারূপে আমার ওই গৃহের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চাই, যেখানে বসে আমি অপরাধ করেছি। আর দান করে দিতে চাই আমার সকল সম্পদ। রসুল স. নির্দেশ করলেন, তোমার পক্ষ থেকে এক তৃতীয়াংশ দান করাই যথেষ্ট। আমি বলি, এই হাদিসে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই, যাতে করে বুঝা যায় যে, হজরত লুবাবা তাঁর সকল সম্পদ দান করার মানত করেছিলেন। বরং এতটুকু বুঝা যায়, তিনি এরকম ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আর রসুল স. তাঁকে এক তৃতীয়াংশ দান করার পরামর্শ দিয়েছিলেন মাত্র, যাতে করে তাঁর উত্তরাধিকারীদের অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়। হজরত কা'ব ইবনে মালেক বর্ণিত এক হাদিসেও এরকম পরামর্শ দানের কথা এসেছে। যেমন— তিনি বলেন, একবার আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! আমি আমার তওবার ব্যবস্থারূপে আমার সমস্ত সম্পদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই এবং তা পেশ করতে চাই আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের খেদমতে। রসুল স. আজ্ঞা করলেন, কিছু সম্পদ রেখে দাও। এটাই তোমার জন্য উত্তম। বোখারী, মুসলিম। আমি বললাম, তাহলে আমার খায়বরের সম্পত্তি আমি নিজের জন্য রেখে দিবো।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ 'আমার সম্পদ দরিদ্রদের জন্য দানকৃত'— এরকম বললে বক্তার ওই সম্পদ তাঁর এমতো বাক্যের বহির্ভূত হবে, যা অন্যের।

মাসআলা ঃ কেউ বললো. 'আমি আমার বর্তমান সম্পদ এবং ভবিষ্যতে যে সম্পদ আমার অধিকারে আসবে তার সকল কিছু দান করার মানত করলাম'— এমতাবস্থাতেও সে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ, নিজের স্ত্রীর ভরণ পোষণের প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং যাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব তার উপরে রয়েছে সে সকল সম্পদ দান করতে পারবে না। যেমন— কেউ সব সময় রোজা রাখার মানত করলেও রমজানের রোজা তার অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর এ জন্য তাকে কোনো কাফ্ফারাও দিতে হবে না। কেননা রমজানের রোজা তো সরাসরি আল্লাহ্র হকের অন্তর্ভুক্ত। এরকম মানতকারী যদি রমজানের রোজা ছাড়া অন্যান্য মাসে রোজা না রাখে তবে ওই রোজাগুলির জন্য তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে।

মাসআলাঃ কেউ বললো 'আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমি একটি ছাগল অথবা গাভী অথবা উট জবাই করবো'— এমতাবস্থায় এটা হবে তার মানত। তখন তাকে একটি ছাগল অথবা গাভী অথবা উট জবাই করতেই হবে। আর যদি সে এর সঙ্গে কোনো শর্ত জুড়ে দেয় তবে তাকে জবাই করতে হবে শর্ত পূরণের পর। যেমন বললো 'আমার ভাই সুস্থ হলে আমি এরকম করবো' তবে তাকে জবাই করতে হবে ভাইয়ের সুস্থতার পর। এরকম পশু সে যে কোনো স্থানে জবাই করতে পারবে। কিন্তু গোশত বণ্টন করে দিতে হবে দরিদ্র ও দুস্থ জনসাধারণের মধ্যে।

'নাওয়াদির ইবনে সুমায়া' গ্রন্থে রয়েছে, এরকম বললে মানত হয় না। তাই জবাই করা তার উপরে ওয়াজিব নয়। তবে সে যদি 'দান করে দিবো' এরকম বলে তবেই কেবল তা বিবেচিত হবে মানতরূপে। আমি বলি, একথার দ্বারা বুঝা যায়, সে দান করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সুতরাং তার 'জবাই করবো' কথাটির অর্থ হবে 'কোরবানী করবো' এবং তার গোশত বণ্টন করে দিবো দরিদ্র ও দুস্থ জনসাধারণের মধ্যে। অর্থাৎ কেবল জবাই করার নিয়ত করলে গোশত বণ্টন করা ওয়াজিব হবে না। তখন তার বক্তব্যকে মানতরূপেও গণ্য করা যাবে না। আর যদি কেউ এরকম বলে 'আল্লাহ্র ওয়াস্তে হাদী (কোরবানী) ওয়াজিব, তবে জবাই করতে পারবে ভেড়া, বকরী, উট, গাভী ইত্যাদি যে কোনো বৈধ কোরবানীর পশু। আবার কোন পশুকে যদি নির্দিষ্ট করে নেয়, তবে কোরবানী করতে হবে ওই নির্দিষ্ট পশুকেই। এমতাবস্থায় কোরবানী করতে হবে হেরেমের সীমানার মধ্যে। কারণ 'হাদী' উচ্চারণ দ্বারা হেরেমে কোরবানী করাই বুঝায়। কোরবানীর দিবস সমূহে যদি এরকম মানত করা হয় তবে কোরবানী করতে হবে মিনায়। এরকম করা সুন্নত। আবার এরকম কোরবানী করা যেতে পারবে মক্কার যে কোনো

www.eelm.weebly.com

স্থানেও অর্থাৎ হেরেমের সীমানায়। আর যদি 'হাদী' উচ্চারণের সাথে উচ্চারণ করে 'জায্ওয়ার' তবে হেরেমের মধ্যে উট জবাই করা হবে ওয়াজিব। আর 'জায্ওয়ার' এর সাথে 'হাদী' উচ্চারণ না করে, তদস্থলে 'জবেহ্' অথবা তার সমার্থক কোনো শব্দ উচ্চারণ করে, তবে কোরবানী করতে হবে উট— হেরেমের অভ্যন্তরে, অথবা বাইরে। আর যদি উচ্চারণ করে 'বুদনাহ্', তবে যেহেতু 'বুদনাহ্' বা উট হাজী সাহেবগণ পূর্বাহ্নে প্রেরণ করে থাকেন, সেহেতু ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, এমতাবস্থায় হেরেমের ভিতরেই কোরবানী করা হবে ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন 'বুদনাহ্' মানত করলে হেরেমের ভিতরে উট কোরবানী করা ওয়াজিব হবে না। যদি উচ্চারণ করে 'আলাইয়া বাদানাতু মিন শাআ'ইরিল্লাহ্', তবে ওই উট হেরেমের ভিতরে জবাই করা ওয়াজিব হবে। কারণ 'শাআ'ইরিল্লাহ্' বলে ওই উটকে যাতে থাকে বিশেষ চিহ্ন, যা বলে দেয়— এই পশু কোরবানীর জন্য পাঠানো হচ্ছে হেরেমে। আর হেরেমের সীমানায় জবাই কৃত পশুর গোশত বণ্টন করে দিতে হবে হেরেমে অবস্থিত মিসকিনদের মধ্যে। আবার ইচ্ছে করলে ওই গোশত হেরেমের বাইরের মিসকিনদের মধ্যেও বণ্টন করে দেয়া যাবে।

যদি কেউ 'হাদী'র মানত করার পর ওই 'হাদী'র মূল্য হেরেমে প্রেরণ করে সেখানকার মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়, তবে তা জায়েয হবে কিনা সে সম্পর্কে এসেছে দু'টি অভিমত। আবু সুলায়মানের বর্ণনানুসারে প্রথমটি এরকম— পশুর জাকাত যেমন ওই পশুর মূল্য বণ্টনের মাধ্যমে আদায় করা যায়, তেমনি 'হাদী'র মূল্যও বণ্টন করা যাবে। আবু হাফসের বর্ণনানুসারে বলা হয়েছে, এরকম করা নাজায়েয। কারণ 'হাদী'র ক্ষেত্রে জবাই করা শর্তটি বিদ্যমান, যা জাকাতের মধ্যে নেই। এমতোক্ষেত্রে গোশত বণ্টনের প্রসংগটি আসে জবাইয়ের পর। জাকাতের সঙ্গে গোশত বণ্টনের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই পশু অথবা পশুর মূল্য বণ্টন করলেই জাকাত আদায় হয়ে যায়।

মাসআলা ঃ কেউ ছাগল মানত করার পর যদি উট জবাই করে, তবে তার মানত আদায় হয়ে যাবে এবং তা হবে উত্তম। কারণ উটের মূল্যমান ছাগলের মূল্যমান অপেক্ষা বেশী। কিন্তু কেউ যদি দু'টি ছাগল মানত করার পর চারটি ছাগলের মূল্যমানের সমান একটি ছাগল কোরবানী করে, তবে তার মানত পূর্ণ হবে না। একটি ছাগলকে সবসময় একটি ছাগলই ধরতে হবে, তার মূল্য যত বেশীই হোক না কেনো।

মাসআলা ঃ কেউ যদি কোনো একটি ছাগলকে মানত হিসেবে নির্ধারণ করে, তবে তাকে ওই ছাগলটিই জবাই করতে হবে। জবাইয়ের আগে ছাগলটি যদি মরে যায় অথবা চুরি হয়ে যায়, তবে আর তাকে অন্য কোনো ছাগল জবাই করতে হবে

www.eelm.weebly.com

না। অনুরূপ কেউ যদি তার কোনো নির্দিষ্ট অর্থ দান করার মানত করে, তবে ওই অর্থ দান করাই হবে তার উপর ওয়াজিব। ওই অর্থ যদি হারিয়ে যায়, চুরি হয়ে যায় তবে তাকে আর অন্য কোনো অর্থ দান করতে হবে না। আবার ওই অর্থ মজুদ থাকা সত্ত্বেও যদি সে ওই অর্থের সমপরিমাণ অন্য অর্থ দান করে দেয়, তবে তা জায়েয হবে। তেমনি রুটি দানের মানত করার পর যদি কেউ ওই রুটির সমপরিমাণ অর্থ দান করে দেয় তবে তাও জায়েয।

মাসআলা : বস্ত্রদানের মানতকারী যদি কাবাগৃহের দরিদ্র প্রহরীদেরকে বস্ত্রদান করে, তবে তা জায়েয । কিন্তু দরিদ্র নয়, এমন প্রহরীকে দান করলে তার মানত পূর্ণ হবে না। আবার ওই বস্ত্র দ্বারা কাবা গৃহের অথবা দেয়ালের গেলাফ অথবা অন্য কিছু যদি তৈরী করে দেয়, তবুও মানত অপূর্ণই থাকবে।

মাসআলা : কেউ বললো 'আমি এই পশুটি বায়তুল্লায় অথবা কাবায় অথবা মক্কায় জবাইয়ের জন্য প্রেরণ করবো' এমতাবস্থায় তাকে তার মানত পূর্ণ করতেই হবে। আর এরকম না বলে যদি 'হেরেম' অথবা 'মসজিদে হারামে' প্রেরণের কথা বলে, তবে তার উপরে মানত ওয়াজিব হবে না। সাহেবাইনের মতে উভয় অবস্থায় মানত ওয়াজিব হবে এবং ওই মানত পূর্ণ করা হবে ওয়াজিব। কিন্তু যদি বলে 'সাফায় প্রেরণ করবো' সম্মিলিত অভিমতানুসারে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়।

একটি সন্দেহ : 'হাদী' উচ্চারণ করলে হেরেমে জবাই করা ওয়াজিব হয়ে যায়, কিন্তু এর সঙ্গে 'হেরেম' অথবা 'সাফা' উচ্চারণ করলে হেরেমে জবাই করা ওয়াজিব হয় না— এর কারণ কী?

সন্দেহ ভঞ্জন : শুধুমাত্র 'হাদী' উচ্চারণ করলে মনে করতে হবে এর সঙ্গে রয়েছে বায়তুল্লাহ্ অথবা মক্কার গোপন এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কিন্তু এর সঙ্গে 'হেরেম' অথবা 'মসজিদ' উচ্চারণ করলে এরকম গোপন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রমাণিত হবে না। তাই তা আর হেরেমের অভ্যন্তরে জবাই করা জরুরী নয়।

মাসআলা : কেউ বললো 'আমার এই কাপড় দ্বারা আমি বায়তুল্লাহ্‌র পর্দা বা গেলাফ তৈরী করবো, অথবা হাতীমে লাগাবো', —এমতাবস্থায় উত্তমতার দৃষ্টিতে তার এই বাক্যকে মানত বলে সাব্যস্ত করা হবে। কেননা হাদিয়া প্রেরণ করাই এমতো বাক্যের সুপ্রসিদ্ধ অর্থ।

মাসআলা : কেউ অন্য কোনো ব্যক্তির ছাগলের প্রতি ইশারা করে বললো 'এই ছাগল যদি আমি ক্রয় করি, তবে তা কাবার হাদিয়া করবো'— ইমাম শাফেয়ীর মতে এরকম মানত অনর্থক মানতের পর্যায়ভূত। কারণ যা নিজের অধিকারে নেই, তার সঙ্গে মানতের সম্পর্ক করা সিদ্ধ নয়। রসুল স. বলেছেন, যা নিজের মালিকানায় নেই, তা মানত করা যায় না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন,

www.eelm.weebly.com

মালিকানায় না থাকার কারণ এখানে বিদ্যমান বলেই এরকম মানতকে মানত বলা হয়নি কিন্তু এই কারণেই প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হলে মানত পূরণ করা হবে ওয়াজিব। অর্থাৎ ওই ছাগলটি ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে তা কোরবানী করে মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। সুতরাং এধরনের মানত নিরর্থক মানতের পর্যায়ভূত নয়।

মাসআলা ঃ কেউ বললো 'আমি নিজেকে অথবা আমার ছেলেকে কিংবা আমার ক্রীতদাসকে জবাই করবো' তবে তা হবে পাপযুক্ত মানত। তাই এধরনের মানত পূরণ করা ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এমতোক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে, সে একটি ছাগল কোরবানী করবে। আর যদি একাধিক ছেলেমেয়েকে জবাই করার মানত করে তবে এক এক জনের জন্য কোরবানী করবে একটি করে ছাগল। ইমাম মোহাম্মদ বলেন, ছেলেমেয়ে জবাই করার কথা বললে ছাগল কোরবানী করা ওয়াজিব হবে, কিন্তু নিজেকে অথবা নিজের গোলামকে জবাইয়ের মানত করলে তা হবে নিরর্থক মানত। তাই এমতোক্ষেত্রে তার উপরে কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না।

হজরত ইব্রাহিমের উপরে তাঁর প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইলকে কোরবানী করা ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু অন্য কারো জন্য আত্মহত্যা অথবা সন্তান হত্যা ওয়াজিব করা হয়নি। তাই এমতোক্ষেত্রে নিজের অথবা সন্তানের পরিবর্তে ছাগল কোরবানী করাকে উত্তম বলা হয়েছে। মোহাম্মদ ইবনে মুনতাশীর বর্ণনা করেন, এক লোক নিজেকে কোরবানী করার মানত করলো। বললো, শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পেলে আমি নিজেকে কোরবানী করবো। এরপর সে হজরত ইবনে আব্বাসের নিকটে গিয়ে এ বিষয়ে করণীয় কি তা জানতে চাইলো। তিনি বললেন, তুমি মাসরুকের নিকটে গিয়ে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করে দেখো। তাই করলো সে। মাসরুক বললেন, এরকম করলে তুমি হয়ে যাবে মুমিনকে হত্যাকারী। এবং অনতিবিলম্বে পৌঁছে যাবে জাহান্নামে। সুতরাং তুমি একটি দুম্বা ক্রয় করে জবাইয়ের পর দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। হজরত ইসমাইল ছিলেন তোমার চেয়ে উত্তম। তাঁর ক্ষেত্রে এরকমই করা হয়েছিলো। লোকটি হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে পুনরায় দেখা করে মাসরুকের অভিমতের কথা জানালো। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, আমিও এরকম বলতে চেয়েছিলাম। ইবনে রযীন।

মাসআলা ঃ কেউ বললো 'তোমার সম্পদের মাধ্যমে আমার যে মুনাফা হবে, তা খয়রাত করে দেয়া আমার উপরে ওয়াজিব' এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তিকে কথিত

www.eelm.weebly.com

মুনাফা খয়রাত করে দিতেই হবে। কিন্তু যদি ওই মুনাফা তাকে আমন্ত্রণ করে আহার করানো হয়, অথবা আহার্যরূপে প্রদান করা হয়, তবে খয়রাত করা আর ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ কেউ মানত করলো ' আমি যা আহার করি তার সমপরিমাণ দান করবো' অথবা 'দান করবো ততটুকু যতটুকু আমি পান করি' তবে তা পূর্ণ করা হবে তার উপরে ওয়াজিব। প্রথমাবস্থায় প্রতিটি লোকমা বা গ্রাসের বিনিময়ে এক দিরহাম এবং দ্বিতীয় অবস্থায় প্রতিটি চুমুক বা ঢোকের পরিবর্তে এক দিরহাম দান করতে হবে । কিন্তু প্রয়োজনীয় পানাহারের পরিমাণ কম করে দিয়ে এরকম করা যাবে না।

মাসআলা ঃ কেউ বললো 'জায়েদ যেদিন আসবে, সেদিন আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে রোজা রাখা হবে আমার উপরে ওয়াজিব'— এরকম বাক্য বিবেচিত হবে কসমরূপে। এমতাবস্থায় জায়েদ যদি রমজান মাসের কোনো এক দিবসে আগমন করে তবে তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে, মানতের কাজা করতে হবে না। কারণ তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশক রোজা পালনের কোনো সুযোগই থাকবে না। কিন্তু রোজার নিয়তের পূর্বেই যদি জায়েদ চলে আসে, তারপর যদি সে শুকরিয়ার রোজার নিয়ত করে, এবং তখনো যদি সে রমজানের নিয়ত না করে থাকে, তবে তার কসম পুরা হয়ে যাবে এবং তার রমজানের রোজাও আদায় হয়ে যাবে, মানতের কাজা ওয়াজিব হবে না। রমজানের রোজা তো তার উপরে আগে থেকেই ফরজ ছিলো তাই তার রোজার মানত গৃহীত হবে না। আর কাফ্ফারা দিতে হবে না একারণে যে, কসমের নিয়ত সে করেনি। আর মানতের কাজার প্রয়োজনও একারণে নেই যে মানত এখানে সঠিকই হয়নি।

মাসআলা ঃ কোনো পীড়িত ব্যক্তি বললো 'আমি এক মাস রোজা রাখার মানত করলাম'— এমতাবস্থায় সুস্থ হওয়ার পর পরই যদি সে মৃত্যুবরণ করে, তবে তার উপরে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা ঃ যদি কেউ কোনো মাস অথবা বৎসরের নির্দিষ্ট তারিখে রোজা রাখার মানত করে, তবে সারা জীবন ধরে ওই নির্দিষ্ট তারিখসমূহে রোজা রাখা তার উপরে ওয়াজিব হয়েই থাকবে।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ যদি কেউ সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার রোজা রাখার মানত করে, তবে এক সোমবার অথবা এক বৃহস্পতিবার রোজা রাখাই যথেষ্ট। কিন্তু যদি সে প্রতি সোমবার অথবা প্রতি বৃহস্পতিবার রোজা রাখার মানত করে তবে সারা জীবন ধরে ওই নির্দিষ্ট দিনসমূহে তাকে রোজা পালন করে যেতে হবে।

মাসআলাঃ সারা বছর রোজা রাখার মানত— মানতের বাক্যাবলী যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে উচ্চারিত হয়, তবু এমতো বাক্য উচ্চারণকারীকে মানত পূরণ করতে হবে। কারণ মানত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কোনো সংবাদ নয়, যাতে সত্য ও মিথ্যা উভয়ের সম্ভাবনা বিদ্যমান। আর 'ইনশা' বাক্যে মিথ্যার সম্ভাবনা নেই। রসুল স. বলেছেন, তিনটি বিষয় মূলসহ পবিত্র। অর্থাৎ ওই তিনটি বিষয়কে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া যাবে এবং তার কার্যকারিতাও থাকবে অটুট। আর তার আস্বাদও পবিত্র। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মাসআলাঃ চলমান বৎসরে রোজা রাখার মানত— কেউ বললো 'চলতি বছর আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার রোজা'— এমতাবস্থায় তখন থেকে একাধারে বারো মাস তাকে রোজা রাখতে হবে। কিন্তু 'ফতোয়ায়ে কাজী খান' এবং 'খোলাসা' গ্রন্থে রয়েছে, সুন্নত নিয়ম, তা হলো— রোজা শুরু করবে মহররম মাসে এবং শেষ করবে জিলহজে। আর চলমান বৎসরের প্রতি যদি তার ইঙ্গিত থাকে, তবে তখন থেকে জিলহজ পর্যন্ত। বৎসরের বিগত দিনগুলোতে রোজা রাখা তার উপরে আর ওয়াজিব থাকবে না। এভাবে 'আমি গতকাল রোজা রাখবো' যদি কেউ বলে, তবে তা হবে তার নিরর্থক মানত। এরকম অসার বাক্য কখনোই মানত নয়। আবার যদি কেউ বলে 'আমি এ মাসে রোজা রাখার মানত করলাম', তবে তাকে তখন থেকে মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে রোজা রাখতে হবে। বিগত দিনগুলো তখন হবে নিরর্থক মানতের অন্তর্ভুক্ত।

মাসআলাঃ কেউ বললো 'গতকালের রোজা রাখা আজ আমার উপরে ওয়াজিব'— এমতাবস্থায় তাকে ওই দিনই রোজা রাখতে হবে। গতকালের রোজার কাজা তার উপরে ওয়াজিব হবে না।

মাসআলাঃ কেউ বললো ' আমি সারা বছর রোজা রাখবো' এমতাবস্থায় তাকে সারা বছর রোজা রাখতে হবে নিষিদ্ধ দিবসসমূহ বাদ দিয়ে। আর মেয়েদেরকে রোজা রাখতে হবে ঋতুকালীন দিবসগুলো বাদ রেখে। এই বাদ পড়া দিবসের কাজাও তাদেরকে করতে হবে না।

মাসআলাঃ নিষিদ্ধ সময়ের রোজার মানত— যদি কোনো রমণী হায়েজের দিবসসমূহে রোজা রাখার মানত করে, তবে সে মানত সঠিক হবে না। এ জন্য তাকে রোজার কাজাও করতে হবে না। আবার কেউ রাতে রোজা রাখার মানত করলেও তা হবে অবিশুদ্ধ। কারণ রাতে রোজা রাখার বিধান শরিয়তে নেই।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াল ইয়াত্ তাওয়াফু বিল বাইতিল আ'তীক্ব' (এবং যেনো সে তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের)।

হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত যোবায়ের, মুজাহিদ এবং কাতাদার বরাত দিয়ে ইমাম বাগবী লিখেছেন, 'আতীক্ব' অর্থ মুক্ত। ইদৃশ নামকরণের স্বার্থকতা হচ্ছে, অত্যাচারী সম্রাটের জবর দখল বা প্রভাব থেকে আল্লাহ্ কাবা গৃহকে চিরমুক্ত রেখেছেন। সে কারণেই এ পর্যন্ত কোনো সম্রাটই কাবা গৃহকে স্ব-অধিকারে রাখতে পারেনি।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, খর্ব উরুসন্ধির অধিকারী এক হাবশী কাবা ধ্বংস করবে। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অশুরু উরুসন্ধির অধিকারী এক হাবশী কাবাগৃহের পাথর একটি একটি করে খুলে ফেলছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত ওই হাবশী তোমাদেরকে পরিহার করে চলবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বিরোধ বাধিয়ো না। কেননা কাবাগৃহের সম্পদ ওই হাবশী ব্যতীত অন্য কোনো হ্রস্ব উরুসন্ধির অধিকারী লুণ্ঠন করতে পারবে না। আবু দাউদ, হাকেম, সিহাহ্।

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ কাবাকে হজরত নূহের সময়ের মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হতে দেননি। কাবাকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন ঊর্ধ্বাকাশে। কাবাকে আ'তীক্ব বলা হয় একারণেই। ইবনে জায়েদ ও হাসান বলেছেন, আ'তীক্ব অর্থ প্রাচীন। এটা মানুষের তৈরী সর্ব প্রথম গৃহ; যা মহা মর্যাদাসম্পন্ন, প্রাচীন ও স্থায়ী।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, আ'তীক্ব অর্থ সম্মানিত, শ্রেষ্ঠ, সুস্বীকৃত। ই'তাক্বুল খাইল অর্থ উচ্চ অশ্ব। ইত্‌ক্বুর রক্বীক্ব অর্থ গোলামীর লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার সম্মান অর্জন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, কোনো মানুষ কাবাগৃহকে ব্যক্তি অধিকারে আনতে পারেনি এবং পারবেও না। এর চতুষ্পার্শ্ব এবং হেরেমের অধিবাসীরাও অন্যের অধীনতা থেকে মুক্ত। আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেছেন— স্থানীয় ও অস্থানীয়দের জন্য বরাবর।

সতর্কবাণী ঃ তাওয়াফ বলে কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করাকে। তাওয়াফে কুদুম অর্থ প্রারম্ভিক তাওয়াফ। তাওয়াফ তিন প্রকার— ১. ফরজ তাওয়াফ। এই তাওয়াফ হজ ও ওমরার একটি স্তম্ভ ও অত্যাবশ্যকীয়। ২. ওয়াজিব তাওয়াফ। এই তাওয়াফ আগমনী ও প্রস্থানিক। অর্থাৎ তাওয়াফ করতে হয় প্রথম কাবাদর্শন ও কাবাগৃহ থেকে বিদায়কালে। ৩. বর্ণিত দুই প্রকারের তাওয়াফ ছাড়া বাকী সকল প্রকারের তাওয়াফ নফল। নফল তাওয়াফের জন্য নির্ধারিত কোনো সময় নেই। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, হে আবদে মান্নাফের উত্তর পুরুষেরা! তোমাদের মধ্যে

www.eelm.weebly.com

যে জননেতা হবে, সে যেনো দিন ও রাত্রির কোনো সময়ে কাউকে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করতে বাধা না দেয়। হাদিসটি ইমাম শাফেয়ী, সুনান প্রণেতাবৃন্দ, ইবনে খুজায়মা, ইবনে হাব্বান, দারা কুতনী, হাকেম, তিরমিজি বর্ণনা করেছেন যোবায়ের ইবনে মুতয়ীম থেকে। বিশুদ্ধায়ন করেছেন ইমাম তিরমিজি। দারা কুতনীও এই হাদিসটি অপর এক সূত্রপরম্পরায় হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটির সূত্রপরম্পরা ত্রুটিযুক্ত। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও দারা কুতনী ভিন্ন সূত্রে হাদিসটি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর নিকট থেকে আবার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু নাঈম তাঁর 'তারীখে ইসপাহান' গ্রন্থে এবং খতীব বাগদাদী তাঁর 'তাখলীস' নামক সংকলনে। কিন্তু এগুলোর সূত্রপরম্পরাও ত্রুটিমুক্ত নয়। হাদিসটির আরেকটি সূত্রপরম্পরা এরকমঃ ইবনে সাদী— সাঈদ ইবনে রাশেদ— আতা— হজরত আবু হোরায়রা।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের নিকটে আগমনী তাওয়াফ সুন্নত। ইমাম মালেকের মতে ওয়াজিব। ইমাম আবু সাওর শাফেয়ীও এমতো অভিমত পোষণ করেন। অর্থাৎ এই তাওয়াফ পরিত্যাগ করলে কোরবানী ওয়াজিব হয়। কিন্তু এ বিষয়ে সকলে একমত যে, তাওয়াফে কুদুম পরিত্যক্ত হলেও হজ আদায় হয়ে যায়।

হজরত ওরওয়া ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, আমার নিকটে জননী আয়েশা রসুল স. এর হজের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে— রসুল স. মক্কায় পৌঁছে সর্বপ্রথমে ওজু করে তাওয়াফ করেছেন। এরপর কোনো ওমরা পালন করেননি। হজরত আবু বকর হজ করেছেন এবং হজের সময় সর্ব প্রথমে তাওয়াফ করেছেন কাবা। এরপর তিনিও ওমরা করেননি। ওমরা করেছেন পরবর্তী সময়ে। এরপর হজরত ওসমানও এরকম করেছেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. মক্কায় গিয়ে সর্বপ্রথম হজ ও ওমরার তাওয়াফ করেছেন এভাবে— প্রথম তিন প্রদক্ষিণ বীরত্বব্যঞ্জকতার সঙ্গে দ্রুত এবং অবশিষ্ট চার প্রদক্ষিণ বিলম্বিত পদবিক্ষেপে। তারপর সেজদা করেন দুটি। শেষে সায়ী করেন সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের থেকে ইমাম মালেক বর্ণনা করেন, রসুল স. হজ করেছিলেন একা। কেননা হাদিস শরীফে এসেছে, তারপর ওমরা ছিলো না। আর তাওয়াফে কুদুমের কথা উপরে বর্ণিত দুটি হাদিসেই বলা হয়েছে। একথাও বিশুদ্ধসূত্রে এসেছে যে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা আমার নিকট থেকে হজের বিধান শিক্ষা করো। তাঁর এমতো আজ্ঞার কারণে তাওয়াফে কুদুম ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে। আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে একথাও সুপ্রমাণিত যে, তাওয়াফে

www.eelm.weebly.com

কুদুমের পর সাফা ও মারওয়ায় সায়ী করা জায়েয। এই সায়ী আবার ওয়াজিবও। বিষয়টি ঐকমত্যসঞ্জাত। সায়ী করা উচিত তাওয়াফের পর। তাই তাওয়াফও ওয়াজিব হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা ওয়াজিব কখনো সুন্নত বা নফলের অনুগামী হতে পারে না। সেকারণেই মক্কাবাসীদের জন্য তাওয়াফে জিয়ারতের পূর্বে সায়ী করা জায়েয নয়। কেননা তাদের জন্য তাওয়াফে কুদুম নেই এবং তাওয়াফের পর নফল সায়ীও জায়েয নয়। আর রসুল স. ইফরাদ হজ করেননি, করেছিলেন কিরান হজ। অর্থাৎ একই সঙ্গে তিনি নিয়ত করেছিলেন হজ ও ওমরার। একথার প্রমাণ রয়েছে অধিকাংশ হাদিসে। হজরত আনাস বলেছেন, আমি স্বকর্ণে রসুল স. কে হজ ও ওমরার তালবিয়া উচ্চারণ করতে শুনেছি এভাবে— লাব্বায়িকা ওমরাতাও ওয়া হাজ্জান। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বর্ণনা করেন, রসুল স. হজ ও ওমরা পালন করেছিলেন একসঙ্গে। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, বিদায় হজে রসুল স. ওমরা করার পর হজ পর্যন্ত 'তামাত্তু' করেছিলেন এবং কোরবানী করেছিলেন সঙ্গে নিয়ে যাওয়া পশু। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিস এবং এরকম অন্যান্য হাদিসের প্রতি লক্ষ্য করে ইমাম আহমদ বলেন, রসুল স. 'ইফরাদ' অথবা কিরান কোনোটাই করেননি। করেছিলেন 'তামাত্তু' হজ। আমরা বলি, এই হাদিসে উল্লেখিত 'তামাত্তু' অর্থ 'কিরান'। কেননা অভিধানানুসারে 'তামাত্তায়া বিল উ'মরাতি ইলাল হাজ্জ' অর্থ একই বছরে হজের মাসে ওমরা ও হজ দু'টোই সম্পাদন করা। এরকম হজ একবার ইহরাম বেঁধে যেমন করা যায়, তেমনি করা যায় পৃথক পৃথক ভাবে দুইবার ইহরাম বেঁধে। সুরা বাকারার ১৯৬ সংখ্যক আয়াতে এরকমই বলা হয়েছে। তবে ফকীহ্গণের পরিভাষায় 'তামাত্তু' ও 'কিরান' পৃথক প্রকৃতির। কিন্তু কোরআন ও হাদিসের বক্তব্যপ্রকরণ এরকম নয়। তাছাড়া উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে একথা স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, রসুল স. মক্কায় উপস্থিত হয়ে একটি তাওয়াফ করেছিলেন, অথবা করেছিলেন দুইটি তাওয়াফ— একটি তাওয়াফে কুদুম এবং অপরটি তাওয়াফে ওমরা। জমহুর বলেন, তিনি তখন একটি তাওয়াফই করেছিলেন। ইমাম আবু হানিফা বলেন, তিনি তখন তাওয়াফ করেছিলেন দু'টি। জমহুরের বক্তব্যের সমর্থনে রয়েছে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে— রসুল স. মক্কায় আগমন করলেন, তাওয়াফ করলেন এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যস্থলে সায়ী করলেন। পুনরায় তিনি তাওয়াফের জন্য কাবার নিকটবর্তী হননি। পরে তাওয়াফ করেছিলেন আরাফা থেকে ফিরে এসে। বোখারী ও মুসলিম এই হাদিসটি হজরত ইবনে ওমরের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

www.eelm.weebly.com

হাজ্জাজ বাহিনীর দ্বারা যে বছর খলিফা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের মক্কায় অবরুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই বছর হজ যাত্রার সংকল্প করেছিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর। তাঁকে তখন বলা হয়েছিলো, মানুষ এখন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত। আশংকা হয়, আপনি বাধাগ্রস্থ হবেন। তিনি তখন পাঠ করলেন 'তোমাদের জন্য রসুলুল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ'। তারপর বললেন, রসুল স. যা করেছিলেন, আমি তাই করবো। তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি ওমরাকে ওয়াজিব করে নিলাম। একথা বলে তিনি যাত্রা শুরু করলেন। বায়দার বাইরে যখন পৌঁছলেন তখন বললেন, হজ ও ওমরা একই প্রকৃতির। তোমরা আরো সাক্ষী থেকো যে, আমি ওমরার সঙ্গে হজকেও ওয়াজিব করে নিলাম। একথা বলে তিনি ক্রয়কৃত একটি কোরবানীর পশুও সঙ্গে নিলেন। ওই পশু তিনি কোরবানীর দিবসের পূর্বে কোরবানী করেননি। ইহরামও পরিত্যাগ করেননি। করেননি মস্তক মুণ্ডন অথবা কেশ কর্তন। আর এমন কাজও করেননি যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। শেষে কোরবানীর দিবস যখন এলো, তখন তিনি কোরবানী করলেন, মস্তক মুণ্ডন করলেন এবং ধারণা করলেন প্রথম তাওয়াফেই তাঁর হজ ও ওমরা সম্পন্ন হয়েছে। হজরত ইবনে ওমর বলেন, রসুল স. এরকমই করেছিলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, যিনি হজ এবং ওমরা একত্রে আদায় করেন, তাঁর জন্য এক তাওয়াফই যথেষ্ট। তাঁর একথার অর্থ হচ্ছে, ইহ্রাম একবার বেঁধে হজ ও ওমরা একত্রে সমাপনের পর তা খুলে ফেলতে হবে। মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি যখন মক্কায় গিয়েছিলেন, তখন কাবা প্রদক্ষিণ করেছিলেন সাত বার এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন সাত বার। এর অধিক কিছু করেননি এবং ধারণা করেছিলেন এরকম করাই যথেষ্ট।

হানাফীগণ তাদের অভিমতের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেন হজরত আলীর আমল থেকে। তিনিও হজ ও ওমরা আদায় করেছেন একসঙ্গে। কিন্তু উভয়ের জন্য পৃথক পৃথকভাবে তাওয়াফ করেছেন দু'বার । সায়ীও করেছেন দু'বার এবং বলেছেন, আমি রসুল স. কে এরকম করতে দেখেছি। দারা কুতনী, নাসাঈ। ইমাম মোহাম্মদ তাঁর কিতাবুল আছারে আবু হানিফার বর্ণনাক্রমে পরিণত শ্রেণীর বিবরণরূপে বর্ণনা করেন, হজরত আলী বলেছেন, যখন হজ ও ওমরার জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধবে তখন উভয়ের জন্য পৃথক পৃথকরূপে সম্পন্ন করবে দু'টি তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ায় সায়ীও করবে দু'বার। স্বসূত্রে ইমাম তাহাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, কিরান হজ সম্পাদনকারীকে তাওয়াফ করতে হবে দু'বার এবং সায়ীও দু'বার। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত এই

www.eelm.weebly.com

হাদিস সুপরিণত শ্রেণীরূপে দুর্বল। তবে পরিণত শ্রেণীর হাদিসরূপে ইমাম তাহাবী বিভিন্ন সূত্র সহযোগে বর্ণনাটিকে হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদের বক্তব্যরূপে সাব্যস্ত করেছেন, যা সামগ্রিকরূপে গ্রহণযোগ্য। আর এতে কোনো দুর্বলতাও নেই।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিস যথাসূত্রসম্বলিতরূপে প্রমাণিত হলেও এতে করে একথা সাব্যস্ত হয় না যে, রসুল স. মক্কায় পৌছবার পর মিনায় গমনের পূর্বেই দু'টি তাওয়াফ করেছিলেন— একটি কুদুমে হজের, অপরটি ওমরার। বরং হাদিসের মর্ম এই যে, রসুল স. ওমরা সম্পাদনার্থে কাবা তাওয়াফ করেছিলেন এবং সায়ীও করেছিলেন। আর তিনি এরকম করেছিলেন মীনা যাত্রার পূর্বে। পরবর্তীতে তিনি কোরবানীর দিবসসমূহে হজের জন্য পুনরায় তাওয়াফ ও সায়ী করেছিলেন। হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের উদ্দেশ্যও এরকম। অর্থাৎ রসুল স. তখন পৃথক পৃথক সময়ে তাওয়াফ করেছিলেন দুইটি এবং সায়ী করেছিলেন দু'বার। দারা কুতনী।

কোনো বিবরণেই এ কথা আসে নি যে, রসুল স. তাওয়াফে ওমরার পর তাওয়াফে কুদুম করেছেন। কেবল মসনদে আবু হানিফায় এসেছে, জবী ইবনে মা'বাদ বলেছেন, আমি জজিরা থেকে হজে কিরান সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। পথিমধ্যে সুলায়মান ইবনে রবীয়া এবং জায়েদ ইবনে সাওহানের পাশাপাশি গমনকালে আমি উচ্চারণ করছিলাম 'লাব্বায়িকা বিহাজ্জাতিন ওয়া ওমরাতিন'। বর্ণিত বুজর্গদ্বয় আমার এমতো উচ্চারণ শ্রবণ করলেন। একজন বললেন, এলোক যে উটের চেয়েও অধিক পথভোলা। অন্যজনও একই কথা বললেন। কিন্তু আমি কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলাম না। এভাবেই হজ সম্পন্ন করলাম। এরপর আমাকে উপস্থিত হতে হলো বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকটে। এখানে বর্ণনাকারী বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তারপর বলেছেন, হজরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে হজ সম্পাদন করেছো? আমি নিবেদন করলাম, আমি সব সময় লাব্বায়েক ধ্বনি উচ্চারণ করেছি। তারপর ওমরার জন্য তাওয়াফ ও সায়ী করেছি। হজের জন্য দ্বিতীয় বারও আমি এরূপ করেছি। ইহ্রাম অবস্থায় হাজীসাহেবরা যা করেছেন, আমিও তা করেছি। এভাবে পূর্ণ করেছি হজের সকল রোকন। তিনি বললেন, তুমি লাভ করেছো রসুল স. এর সুন্নত। মসনদে ইমাম আবু হানিফার এই বিবরণটি অনির্ভরশীল ও অগ্রহণীয়। গ্রন্থকার ও ইমাম আবু হানিফার মাঝের সূত্রপরম্পরাভূত অনেক বর্ণনাকারী অপরিচিত ও অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ওই সকল বর্ণনাকারীকে বোখারী কর্তৃক উপস্থাপিত হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনার

www.eelm.weebly.com

বিপরীতে দাঁড় করানো সম্ভব নয়। আর সেখানে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে যে, রসুল স. আরাফা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত পুনরায় কাবার নিকটবর্তী হননি। তাছাড়া এ বিষয়টিও সুপ্রমাণিত যে, রসুল স. করেছিলেন কিরান হজ এবং তাওয়াফে ওমরা ব্যতীত হজের তাওয়াফে কুদুম তিনি করেননি। সুতরাং বুঝা গেলো, তাওয়াফে কুদুম হজের রোকন নয়। আর এই তাওয়াফ সার্বক্ষণিক ওয়াজিবও নয়। বরং এই আমলটি তাহ্ইয়াতুল মসজিদের নামাজের ন্যায় সুন্নত। আর ওয়াজিব ও সুন্নতের মাধ্যমে এই সুন্নত পূর্ণ হয়ে যায়। রসুল স. যখন মক্কায় পৌছেন ও ওমরার জন্য তাওয়াফ করে নেন, তখন তাওয়াফে কুদুমের স্থলে এই তাওয়াফই যথেষ্ট হয়ে যায়।

মাসআলাঃ নফল তাওয়াফ নফল নামাজের মতই মানতের দ্বারা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর আলোচ্য আয়াতে আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে তাওয়াফ দ্বারা হজের তাওয়াফে যিয়ারতের কথা বলা হয়েছে, যা হজের রোকনসমূহের অত্যাবশ্যকীয় রোকন। ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এর উপরেই। সুতরাং অন্য কোনো তাওয়াফ হজের রোকন নয়।

মাসআলাঃ তাওয়াফে সদর অর্থ তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ। উম্মতের ঐকমত্য এই যে, তাওয়াফে সদর হজের রোকন নয়। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ ও সাহেবাইনের মতে এই তাওয়াফ ওয়াজিব। এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এরকম। ইমাম আবু হানিফা এই তাওয়াফকে হজের ওয়াজিবগুলির মধ্যে গণ্য করেছেন। আর ইমাম মোহাম্মদ একে চিহ্নিত করেছেন পৃথক ওয়াজিব হিসেবে। যদি কেউ তাওয়াফে বিদা করার পর আরো কিছুকাল মক্কায় অবস্থান করে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে মক্কা ত্যাগ করার সময় তার আর বিদায়ী তাওয়াফ করার দরকার নেই। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ বলেন পুনরায় তাকে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। এরকম করা ওয়াজিব।

ইমাম মালেকের নিকটে তাওয়াফে সদর সুন্নত। এক বর্ণনানুযায়ী ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এরকম। তাওয়াফে সদর আবার কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার কারণে অথবা নারীদের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের কারণে ঐক্যমত্যানুসারে রহিত হয়ে যায়।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, হজের পর লোকজন যে বিভিন্ন নিয়মে প্রত্যাবর্তন করতেন। রসুল স. নির্দেশ করেছেন, বায়তুল্লাহ্র সঙ্গে শেষ সাক্ষাত না করা পর্যন্ত মক্কা থেকে বের হয়ো না। আহমদ। দারাকুতনীর বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— লোকজন মিনা থেকে বের হয়ে আপনাপন গন্তব্যস্থলে চলে

www.eelm.weebly.com

যেতো। রসুল স. তাদেরকে বলতেন, প্রত্যেকের বিদায়ী সাক্ষাত বায়তুল্লাহ্‌র সঙ্গে হওয়া উচিত। আর তিনি স. এই বিধান থেকে ঋতুবতী নারীদেরকে অব্যাহতি দিতেন। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, তোমরা কেউ বায়তুল্লাহ্‌র সঙ্গে শেষ সাক্ষাত না করে মক্কা থেকে বের হয়ো না। কিন্তু তিনি ঋতুগ্রস্তা নারীদের জন্য এই বিধান শিথিল করে দিয়েছিলেন। বোখারী মুসলিমে সঙ্কলিত হয়েছে এভাবে— রসুল স. জনগণকে আদেশ দিলেন, তারা যেনো পরিশেষে বায়তুল্লাহ্‌র জিয়ারত করে।

হজরত ইবনে ওমর বলেন, যে ব্যক্তি কাবায় হজ করবে তার শেষ কাজ হবে বায়তুল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাত । ঋতুগ্রস্তা নারীরা এই বিধানের বাইরে। রসুল স. তাদেরকে এই অবকাশ দিয়েছেন। তিরমিজি, সিহাহ্। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আউসের বর্ণনায় এসেছে, আমি স্বয়ং রসুল স. কে বলতে শুনেছি, যে কাবাগৃহে হজ ও ওমরা করবে, তার বিদায়ী সাক্ষাত হতে হবে এই গৃহেরই সঙ্গে। তিরমিজি। শেষোক্ত হাদিসের মাধ্যমেই ইমাম আবু হানিফা প্রমাণ করেন যে, তাওয়াফে সদর ওয়াজিব। কারণ এখানে স্পষ্ট করে হজ ও ওমরার উল্লেখ এসেছে। আমি বলি, তাহলে তো ওমরার ক্ষেত্রেও তাওয়াফে সদর ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু এরকম কথা কেউই বলেননি।

ইমাম আহমদ বলেন, 'লা ইয়ানফিরু আহাদ' (কেউ যাত্রা করবে না) কথাটি সাধারণ অর্থবোধক। তাই তাওয়াফে সদর ওয়াজিব হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইমাম আবু হানিফার মতানুসারে এই চূড়ান্ত অর্থবোধককে সীমিত অর্থবোধক করার আবশ্যক করে না। কেননা সীমিতকরণ এখানে কারণের উপরে নির্ভরশীল। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে, প্রত্যেক আজাদ ও গোলামের পক্ষ থেকে আদায় করো। অন্য হাদিসে এসেছে, 'প্রত্যেক মুসলমান আজাদ ও গোলামের পক্ষ থেকে আদায় করো। শেষোক্ত হাদিসে রয়েছে 'মুসলমান' শব্দটি। এভাবে সাধারণ বিধানকে করা হয়েছে সীমিত। সুতরাং এরকম করা যায়। কিন্তু তাওয়াফে সদরের হাদিসে এধরনের কিছু নেই। শর্ত এখানে জড়িত রয়েছে কারণের উপর। সুতরাং হজের পর মক্কা থেকে চূড়ান্ত বিদায়কালে তাওয়াফ ওয়াজিব।

তাওয়াফের শর্ত, ওয়াজিব রোকন সমূহ এবং সুনানের বিবরণঃ তাওয়াফের কিছু রোকন ফরজ, কিছু ওয়াজিব এবং কিছু সুন্নত। আবার মোস্তাহাব রূপেও রয়েছে কিছু কিছু আদব।

১. তাওয়াফের শর্তসমূহঃ তাওয়াফের জন্য নিয়ত শর্ত যেমন সকল মৌলিক ইবাদতের ক্ষেত্রে নিয়ত অত্যাবশ্যক। শরিয়ত দ্বারা এই মাসআলাটি প্রমাণিত। আর এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঐকমত্য। তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য সাধারণ তাওয়াফের নিয়তই যথেষ্ট। 'ফরজ তাওয়াফ করছি' এরকম সুনির্দিষ্টভাবে বলা জরুরী নয়।

www.eelm.weebly.com

প্রশ্নঃ উকুফে আরাফাত (আরাফা প্রান্তরে অবস্থান) এবং তাওয়াফে জিয়ারত হজের অত্যাবশ্যক রোকন। উকুফে আরাফাতের নিয়ত অবশ্য অত্যাবশ্যক নয়। কেউ যদি আরাফা প্রান্তরে অবস্থান করে নিদ্রিত বা সংজ্ঞাহীন অবস্থায়, অথবা বিভিন্ন পর্বতবাসীদের সাথে অবস্থান করে যাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আরাফার পর্বতবাসীও, অবস্থানকারী জানেই না যে, এরা আরাফার পর্বতবাসী; তবুও সকলের উকুফে আরাফাতের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। হজরত ওরওয়া ইবনে মুফরাস একবার নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি এসেছি বনী তাঈয়ের পাহাড় থেকে। দীর্ঘ পথ অতিক্রমের কারণে আমার উট দুর্বল । আমিও পরিশ্রান্ত। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমি কোনো পাহাড়ীর সঙ্গ ত্যাগ করিনি। আমার হজ কি হবে? রসুল স. বললেন, যে আমাদেরকে সমাবেশস্থলে ফজরের নামাজের সময় পেয়েছে, আগের রাতে অথবা দিবসে আরাফায় পৌঁছেছে, তার হজ সম্পন্ন হয়েছে। আবু দাউদ।

এখন কথা হচ্ছে, তাওয়াফে জিয়ারতের নিয়তকে যদি হজের শর্ত বলা হয়, তবে নির্ধারিত ফরজ ছাড়া সাধারণ তাওয়াফের নিয়ত যথেষ্ট হওয়ার কী অর্থ হতে পারে? ফরজ নিয়তের নির্ধারণ তো ওই সকল ফরজ আদায়ের জন্য শর্ত, যার জন্য রয়েছে নির্ধারিত সময়— যেমন নামাজ।

উত্তরঃ প্রকৃত কথা এই যে, ইহ্রাম বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে হজের সকল রোকনের নিয়ত হয়ে যায়। অন্য কোনো নিয়ত এর পরিপন্থী না হওয়া পর্যন্ত প্রথম নিয়ত সকল রোকন সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ এমতো ধারণা রাখতে হবে যে, প্রতিটি রোকনের নিয়ত ওই প্রারম্ভিক নিয়তের অনুগামী। রোকনসমূহ পালনের জন্য নতুন নতুন নিয়তের আর প্রয়োজন নেই। যেমন নামাজ পাঠের জন্য নিয়ত করতে হয় প্রথমেই। এরপর ক্বেরাত, রুকু, সেজদা ইত্যাদির জন্য নতুন নিয়তের প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ, কোনো রোকন যদি পৃথক ইবাদতের যোগ্যতা রাখে, তবে তা আদায়ের জন্য নতুন নিয়ত আবশ্যক। যেমন তাওয়াফ ও তাওয়াফের দুই রাকাত নামাজ। এই রোকনদ্বয় শুরুর পূর্বে সাধারণ নিয়তই যথেষ্ট নয় আবশ্যক হয় নতুন নিয়ত। নামাজ ও তাওয়াফ দু'টোরই দু'টি অবস্থা রয়েছে— ১. পৃথক একটি ইবাদত এবং ২. ইবাদতের অংশ হওয়া। প্রথম অবস্থায় নিয়ত করতে হবে তাওয়াফ ও নামাজের প্রারম্ভে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় ইহ্রামের সময়ের নিয়তই যথেষ্ট। আমরা উভয় অবস্থাকে সংরক্ষণ করি। তাই বলি পৃথক ইবাদতের বেলায় করতে হবে পৃথক নিয়ত, আর মূল ইবাদতের অংশ হওয়ার কারণে ইহ্রামকালীন সাধারণ নিয়ত। আরো বলি, তাওয়াফে জিয়ারত মূল ইবাদত হজ নয়, বরং হজের অংশ। যেমন অংশ আরাফায় অবস্থান, সাফা-মারওয়ায় সায়ী ইত্যাদি। এ সকল রোকনের জন্য নতুন নতুন নিয়তের প্রয়োজন নেই। ইহ্রামকালীন নিয়তই যথেষ্ট।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ কেউ অন্য কাউকে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে তাওয়াফ করলে এমতোক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধান রয়েছে। যেমন— ১. বহনকারী ইহ্‌রামবদ্ধ নয়, আরোহী ইহ্‌রামবদ্ধ এবং বহনকারী আরোহীর তাওয়াফের নিয়ত করেছে, সাথে সাথে আরোহীও তাওয়াফের নিয়ত করেছে— এমতাবস্থায় আরোহীর তাওয়াফ হয়ে যাবে। ২. বহনকারী ইহ্‌রামবদ্ধ, কিন্তু আরোহী ইহ্‌রামবদ্ধ নয়— এমতাবস্থায় বহনকারী যদি তার নিজের তাওয়াফের নিয়ত করে, তবে তার তাওয়াফ হয়ে যাবে। ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত। ৩. বহনকারী ও আরোহী দুজনেই ইহ্‌রামবদ্ধ, কিন্তু বহনকারী নিয়ত করেছে আরোহীর জন্য— এমতাবস্থায় কেবল আরোহীর তাওয়াফ আদায় হবে। সঙ্গে সঙ্গে যদি নিজের জন্য নিয়ত করে, তবে তারও তাওয়াফ হয়ে যাবে। আর যদি সে একসঙ্গে উভয়ের জন্য নিয়ত করে, তবে ইমাম শাফেয়ীর মতে কেবল বহনকারীর তাওয়াফ হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, ইহ্‌রামবদ্ধ বহনকারী যদি নিজ তাওয়াফের নিয়ত করে, অথবা নিজের নিয়তের সঙ্গে আরোহীর নিয়তও করে এবং একই সঙ্গে যদি আরোহীও তার নিজের নিয়ত করে, তবে উভয়েরই তাওয়াফ হয়ে যাবে। কারণ আপন আপন স্থানে উভয়ের নিয়ত বিদ্যমান। এমতোক্ষেত্রে উভয়ের নিয়তের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

মাসআলাঃ তাওয়াফের শর্তসমূহের মধ্যে লঘু ও গুরু অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকাও একটি শর্ত। শরীর, পোশাক ও স্থানের পবিত্রতাও জরুরী। আর জমহুরের নিকট গুপ্তাঙ্গ আবৃত থাকাও আবশ্যক। জননী আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. মক্কায় উপস্থিত হয়ে প্রথমে ওজু করলেন, তারপর সম্পাদন করলেন তাওয়াফ। এরপর বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে হজের বিধান শিক্ষা করো।

জননী আয়েশা বললেন, আমি মক্কায় উপস্থিত হয়েছিলাম ঋতুবতী অবস্থায়। রসুল স. আমাকে বললেন, হাজীরা যা করে, তুমিও তা করো। কিন্তু পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কাবা তাওয়াফ কোরো না। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. তখন বললেন, তাওয়াফ করবে না, যতক্ষণ না গোসল করবে। জননী আরো বলেন, মক্কা থেকে যাত্রা শুরুর সময় সাফিয়্যার রজঃস্রাব শুরু হলো। একথা জানতে পেরে রসুল স. বললেন, সে কি কোরবানীর দিবসে তাওয়াফে জিয়ারত করেছে? বলা হলো, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, তাহলে রওনা হয়ে যাও। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, বিদায় হজের পূর্বে হজরত আবু বকরের অধিনায়কত্বে যে হজের কাফেলা প্রেরণ করা হয়, ওই হজ সম্পাদনকালে

www.eelm.weebly.com

কোরবানীর দিন হজরত আবু বকর আমাকে জনগণের নিকট এই ঘোষণা করার জন্য প্রেরণ করলেন যে, এই বছরের পর আর কোনো অংশীবাদী হজ করতে পারবে না। আর এখন থেকে উলঙ্গ হয়েও কেউ কাবা তাওয়াফ করতে পারবে না। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, সতর আবৃত করা অত্যাবশ্যক।

আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেন— 'আমার গৃহকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে' (আয়াত ২৬)। এই ঘোষণার মাধ্যমে স্থানের পবিত্রতার অত্যাবশ্যকতা সুপ্রমাণিত। আর পোশাক ও শরীর পবিত্রতার কথা তো আরো অধিক প্রামাণ্য। বিশেষতঃ লঘু ও গুরু অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকার বিষয়টি আরো অধিক সুস্পষ্ট। কেননা প্রকৃত অপবিত্রতা অপেক্ষা বিধানগত অপবিত্রতা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যেমন পরিস্থিতিগত কারণে কখনো অপবিত্রতার সঙ্গেও নামাজ পাঠ করা যায়, কিন্তু ওজু বা তায়াম্মুম ছাড়া কখনোই নামাজ পাঠ করা যায় না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ্ তাঁর রসুলের প্রতি নির্দেশ করেছেন— 'এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখো তাওয়াফকারীদের জন্য এবং যারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকু করে ও সেজদা করে'। এই আয়াতেও নামাজের পূর্বে এসেছে তাওয়াফের কথা। প্রকৃত পক্ষে তাওয়াফ নামাজের মতোই। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, তাওয়াফকালে কথা বলা যায়। কিন্তু নামাজ পাঠকালে কথা বলা যায় না। সুতরাং তাওয়াফরত অবস্থায় যে কথা বলতে চায়, সে যেনো পুণ্য কথা বলে। হাকেম, সিহাহ্, তিবরানী, বায়হাকী। তিরমিজি, হাকেম, দারাকুতনী, ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ হচ্ছে নামাজ। পার্থক্য কেবল এই যে, আল্লাহ্ তাওয়াফে কথা বলাকে বৈধ করে দিয়েছেন। বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত বলেছেন ইবনে সাকান।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, প্রকৃত অপবিত্রতা (নাজাসাতে হাকিকি) থেকে পবিত্র হওয়া সুন্নত এবং বিধানগত অপবিত্রতা (নাজাসাতে হুকমী) থেকে পবিত্র হওয়া ওয়াজিব। আর সতর আবৃত করাও ওয়াজিব। এগুলোকে পরিত্যাগ করলে গোনাহ্গার হতে হবে। উলঙ্গ হয়ে অথবা গোসল ফরজ হয়েছে এমন অবস্থায় যদি কেউ তাওয়াফ করে, তবে তার উপরে একটি গাভী অথবা উট কোরবানী করা হবে ওয়াজিব। ওজুবিহীন অবস্থায় কেউ ফরজ তাওয়াফ করলে তার উপরেও কমপক্ষে একটি ছাগল কোরবানী ওয়াজিব হবে। অনুরূপ ফরজ ব্যতীত অন্য তাওয়াফ যদি কেউ নির্বস্ত্র হয়ে অথবা অপবিত্র অবস্থায় আদায় করে তবে ছোট অথবা বড় যে কোনো প্রকার কোরবানী দিলেই চলবে। আর ফরজ ছাড়া অন্য তাওয়াফ ওজুবিহীন অবস্থায় করলে কাফ্ফারা স্বরূপ তাকে মিসকিনকে দান করতে হবে অর্ধ 'সা' গম।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আবু হানিফার নিকট উপরোল্লিখিত বিষয়াদির কোনোটাই তাওয়াফের অত্যাবশ্যক শর্ত নয়। কারণ তাওয়াফের নির্দেশ এসেছে সরাসরি কোরআন মজীদের মাধ্যমে। তাই আল্লাহ্‌র কিতাবের উপরে অতিরিক্ত করা এক অর্থে কোরআনের বিধানকে রহিত করে দেয়া। আর তাঁর নিকটে একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা কোরআনের বিধানকে রহিত করা সিদ্ধ নয়। তাই তিনি বলেন, আমরা শর্তকে অত্যাবশ্যক ফরজ হিসেবে সাব্যস্ত করি না। তবে হ্যাঁ, হাদিস শরীফের উপরে আমল করাও যেহেতু ওয়াজিব, সেহেতু আমরা বলি, উপরোল্লিখিত কর্মসমূহ কতিপয় ক্ষেত্রে ওয়াজিব।

মাসআলাঃ তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য সময়ও একটি অত্যাবশ্যক শর্ত। তাই এই তাওয়াফ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সম্পন্ন করা যায় না। আবার নির্ধারিত সময়ের পর তা কাজা করাও অত্যাবশক। এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঐকমত্য। আর যদি কোনো ক্ষতির আশংকায় কেউ নির্ধারিত সময়ের পরে এই তাওয়াফ সম্পাদন করে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে তার উপরে কোরবানী ওয়াজিব হবে। জমহুরের অভিমত এর বিপরীত। আর যদি ঋতুগ্রস্তা হওয়া অথবা কোনো শক্তিশালী শত্রুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি শরিয়ত সমর্থিত ওজরের কারণে কেউ নির্ধারিত সময়ে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে না পারে, তবে কোরবানী ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, তাওয়াফে জিয়ারতের সময় শুরু হয় কোরবানীর দিন সুবহে সাদেক থেকে। আর জমহুর বলেন, সময় শুরু হয় কোরবানীর দিন অর্ধরাত্রি থেকে। কেননা জননী আয়েশা বলেন, রসুল স. আমাকে কোরবানীর রাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ফজরের পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করেছি। তারপর মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে জিয়ারত করেছি। দারা কুতনী। এই হাদিসের সূত্রপরম্পরা শিথিল। কারণ এই সূত্রপ্রবাহভূত এক বর্ণনাকারী জুহাক ইবনে ওসমানকে ব্যক্তিত্বহীন বলে সাব্যস্ত করেছেন কাত্‌তান। তদুপরি এই বর্ণনাটি হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসের বিপরীত বক্তব্য প্রকাশক, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. তাঁর পরিবার পরিজনদের মধ্যে যারা দুর্বল তাঁদেরকে পূর্বাহ্নে প্রেরণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ কোরো না। তিরমিজি। আবু দাউদ, নাসাঈ, তাহাবী ও ইবনে হাব্বান হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাসান গারাবী সূত্রে। হাসান, তিরমিজি এবং তাহাবীও হাদিসটির সংকলক। আবু দাউদ, নাসাঈ, তাহাবী ও ইবনে হাব্বানও বিভিন্ন সূত্রপরম্পরা যোগে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এভাবে সূত্রগুলো একে অপরের পরিপূরক হয়ে হাদিসের বক্তব্যকে দিয়েছে শক্তিমানতা। এছাড়া হাদিসটিতে বলা হয়েছে 'ফা রমাতিল জুমরাতা', এরপর বলা হয়েছে 'ছুম্মা মাদ্বত ফাআফাদ্বত'। সুতরাং একথা বুঝতে

www.eelm.weebly.com

অসুবিধা হয় না যে, রসুল স. এর নির্দেশে কংকর নিক্ষেপ করা হয়েছিলো ফজরের পূর্বে। কিন্তু তাওয়াফে জিয়ারত করা হয়েছিলো সূর্যোদয়ের পর। মধ্যবর্তীতে উল্লেখিত 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটিই এর প্রমাণ।

তাওয়াফে জিয়ারতের শেষ সময় আইয়ামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেন। কতিপয় বর্ণনায় এসেছে, শেষ সময় কোরবানীর দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আমি সুরা বাকারার এতদসংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীরে লিখেছি যে, জমহুরের নিকট তাওয়াফে জিয়ারতের শেষ সময় কেবল কোরবানীর দিনই। হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত একটি সুপরিণত শ্রেণীর হাদিসও একথার সাক্ষ্যবাহী। আবু দাউদ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, এক বর্ণনানুসারে হজরত আলীর অভিমতও এরকম। ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, 'ইয়াওমিল হাজ্বজ্বিল আকবর' অর্থ মিনার দিবসসমূহ। অর্থাৎ কেবল কোরবানীর দিন নয়। সুফিয়ান সওরীর বক্তব্যও এরকম। তিনি একথাও বলেছেন, 'ইয়াওমুন' এর অর্থ সময় এবং কালও হয়। যেমন ইয়াওমুস সিফ্ফীন, ইয়াওমুল জামাল, ইয়াওমুল কিয়ামাহ্ ইত্যাদি। এগুলোর অর্থ যথাক্রমে সিফ্ফীন যুদ্ধের সময়, জামাল যুদ্ধের সময়, কিয়ামতের সময়।

মাসআলাঃ ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, তরতীব (ধারাবাহিকতা)ও তাওয়াফের একটি শর্ত। ইমাম মোহাম্মদের অভিমতও এরকম। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, এক্ষেত্রে তরতীব কোনো শর্ত নয়। অর্থাৎ ফরজ নয়। আর অধিকাংশ হানাফী আলেমগণের নিকটে তরতীব সুন্নত, যা পরিত্যাগ করা মাকরূহ (অনভিপ্রেত)। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, ইমাম মহোদয়ের নিকট তরতীব ওয়াজিব, যা পরিত্যাগ করলে কোরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ রসুল স. সব সময়ে তাওয়াফের তরতীব রক্ষা করেছেন। একথাও তিনি স. বলেছেন যে, তোমরা আমার কাছ থেকে হজের বিধান শিখে নাও। তবে তরতীবকে ফরজ বলা হলে তা হবে অতিরঞ্জিত। তরতীব রক্ষা করতে হবে এভাবে— প্রথমে দাঁড়াতে হবে হাজরে আসওয়াদের নিকটে, তারপর সামনের দিকে মুখ করে শুরু করতে হবে তাওয়াফ। এভাবে কাবাকে বাম দিকে রেখে শুরু করতে হবে পদবিক্ষেপ। এর বিপরীত করা নাজায়েয।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, তাওয়াফ করতে হবে কাবা চত্বরে, মসজিদের সীমানার মধ্যে। এর বাইরে এদিকে ওদিকে তাওয়াফ করা যাবে না। রসুল স. এর জামানা থেকেই চলে এসেছে এই নিয়মটি।

তাওয়াফে সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করা একটি অত্যাবশ্যক রোকন। এটাই সুপ্রসিদ্ধ ও চলমান রীতি। উত্তম সূত্রসম্বলিত হাদিসের মাধ্যমেও এ কথা এসেছে যে, প্রদক্ষিণের গাণিতিক হিসাব নামাজের রাকাতের গাণিতিক হিসাবের মতো অবশ্য পালনীয়।

www.eelm.weebly.com

এরকম সন্দেহ অনুচিত যে, 'ওয়াল ইয়াত্‌তাওয়াফ্‌ফু' (তাওয়াফ করে), কথাটি নির্দেশসূচক। আর এমতো নির্দেশসূচকতার দাবীও এরকম হতে পারে না যে, নির্দেশকে পুনরাবৃত্তি করতে হবে। সুতরাং একবার তাওয়াফ করলেই তাওয়াফ হয়ে যাবে। বরং এরকম নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো, সে আমলের পুনরাবৃত্তিকে গ্রহণ করে না। এবং পুনরাবৃত্তিবিহীনতাকেও নয়। কিন্তু পুনরাবৃত্তি প্রমাণিত হয়েছে প্রসিদ্ধ হাদিসসমূহের দ্বারা। অতএব, সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করা কোরআনের আয়াতের পরিপন্থী নয়।

মাসআলাঃ তাওয়াফ অর্থ সাতবার কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ। ইমাম আবু হানিফা বলেন, চারবার কাবা প্রদক্ষিণ করলেও তাওয়াফ হয়ে যাবে। কিন্তু তাওয়াফে জিয়ারতে এরকম করা হলে পরিত্যক্ত প্রদক্ষিণত্রয়ের জন্য একটি কোরবানী করতে হবে। আর অন্যান্য তাওয়াফের ক্ষেত্রে কিছু সদ্‌কা খয়রাত করা হবে ওয়াজিব। কারণ অধিকাংশ সমষ্টির তুল্য। তাই চার বার প্রদক্ষিণ করলেই তাওয়াফ হয়ে যাবে বটে, কিন্তু পরিত্যক্ত তিন প্রদক্ষিণের ক্ষতিপূরণ করতে হবে কোরবানী অথবা সদ্‌কা খয়রাতের দ্বারা।

অন্যান্য ইমামগণ বলেন, সাতবারের কম প্রদক্ষিণ করলে তাওয়াফ পূর্ণ হবে না। যেমন নামাজের এক বা একাধিক রাকাত পরিত্যাগ করলে নামাজ হয় না, তেমনি যে কোনো এক বা একাধিক প্রদক্ষিণ পরিত্যাগ করলে তাওয়াফ হবে না।

মাসআলাঃ হাতিম কাবাগৃহের অংশ। তাই প্রদক্ষিণের সময় কাবাগৃহসহ হাতিমকেও প্রদক্ষিণ করতে হবে। জননী আয়েশা বলেছেন, আমি একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করলাম, (হাতিমের) এই দেয়াল কি কাবার অংশ? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম তাহলে এই স্থানকে কাবাগৃহের অন্তর্ভুক্ত করা হলো না কেনো? তিনি স. বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের তখন পূর্ণাঙ্গ গৃহ নির্মাণের ব্যয়ভার বহনের সাধ্য ছিলো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই গৃহের দরজা রাখা হয়েছে কেনো? তিনি স. বললেন, যাতে জনসাধারণের ব্যাপক অনুপ্রবেশ রোধ করা যায়। তোমাদেরকে মূর্খতার যুগের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত যদি পেতাম তবে আমি হাতিমকে মূলগৃহের সঙ্গে মিলিয়ে দিতাম। দরজাকেও মিশিয়ে দিতাম মৃত্তিকার সঙ্গে। কিন্তু আমার আশংকা হয় সর্বসাধারণ এ পরিবর্তনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করবে না। বোখারী, মুসলিম।

তিরমিজি ও নাসাঈর বর্ণনায় জননী আয়েশার বর্ণিত হাদিসটি এসেছে এভাবে— জননী বলেন, আমি কাবাগৃহের অভ্যন্তরভাগে নামাজ পড়বার আকাংখা পোষণ করতাম। তাই রসুল স. আমাকে হাতে ধরে হাতিমে প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং বললেন, এখানে নামাজ পড়ে নাও। এ স্থান কাবার অংশ। আবু দাউদের বর্ণনাও এরকম।

তাত্ত্বিকগণ লিখেছেন, হাতিম কাবারই অংশ আর হাতিমের দৈর্ঘ্য তিন গজের কিছু বেশী। জননী আয়েশা থেকে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

তোমাদের সম্প্রদায় যদি পৌত্তলিকতার যুগসংলগ্ন না হতো (ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা যদি না থাকতো) তবে আমি কাবা গৃহকে মৃত্তিকায় মিশিয়ে দিতাম। নির্মাণ করতাম নতুন করে। হাতিমের তিন গজ নিয়ে আসতাম গৃহসীমানায়। আর দরজা বানাতাম দুটি— একটি পূর্বে, আর একটি পশ্চিমে। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হাতিমের স্থান প্রায় সাড়ে তিন গজ। বোখারী সূত্রে জারীর ইবনে হাজেম থেকেও এরকম কথা এসেছে।

ইয়াজিদ ইবনে রুমমান বর্ণনা করেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের যখন কাবা গৃহ ভেঙে পুনরায় নির্মাণ করেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি হাতিমকে মূলগৃহের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। আমি তখন (পুনঃনির্মাণের পূর্বে) হজরত ইব্রাহিম কর্তৃক নির্মিত উটের কুজ সদৃশ ভিত্তি দর্শন করেছি। দেখেছি হাতিমের স্থান প্রায় তিন গজ।

মুজাহিদ বলেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের হাতিমের তিন গজ জমিন বায়তুল্লাহ্র সীমানাভূত করেছিলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, অর্ধহাত এবং তিন গজ।

মাসআলাঃ তাওয়াফের সময় হাতিমকে কেউ প্রদক্ষিণের বাইরে রাখলেও তার তাওয়াফ হয়ে যাবে, কিন্তু এর জন্য একটি কোরবানী দিতে হবে— এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। কেননা হাতিম যে কাবার অংশ, তা প্রমাণিত হয়েছে খবরে আহাদ (একক বর্ণনা) দ্বারা। তাই তাকে কোরবানীর মাধ্যমে ওয়াজিব পরিত্যাগের ক্ষতিপূরণ করে দিতে হবে। সরাসরি হাতিমকে কাবার অংশ প্রমাণ করা যায় না। কারণ এরকম কথা কোরআনে নেই। তাই হাতিমকে প্রদক্ষিণের অন্তর্ভুক্ত করা ফরজ নয়। এর পরেও যদি এরকম করাকে ফরজ বলা হয়, তাহলে খবরে আহাদকে কিতাবুল্লাহ্র উপরে অগ্রাধিকার দিতে হয়, যা অসিদ্ধ। জমহুরের অভিমত এর বিপরীত। তাঁরা বলেন খবরে আহাদকে কিতাবুল্লাহ্র উপরে অগ্রাধিকার দেয়া জায়েয।

আমি বলি, হাতিমকে তাওয়াফের অন্তর্ভুক্ত ফরজ মনে করলে খবরে আহাদকে কিতাবুল্লাহ্র উপরে অগ্রাধিকার দেয়া হয় না। কেননা আল্লাহ্ 'বায়তুল আতিক্ব' তাওয়াফ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর 'আলআতিক্ব' এর আলিফ লাম হচ্ছে সীমিত। অর্থাৎ 'আল বাইত' অর্থ ওই ঘর যা নির্মাণ করেছিলেন হজরত ইব্রাহিম। আর তাঁর নির্মিত কাবার মধ্যে হাতিমও ছিলো। আয়াতের বক্তব্যের প্রকৃতিই এর প্রমাণ। যেমন এরশাদ হয়েছে— 'ওয়া ইজ্ বাওয়া'না লি ইব্রাহীমা মাকানাল বাইত'(আর আমি যখন ইব্রাহীমের জন্য তৈরী করেছিলাম গৃহের স্থান)। সুতরাং হাতিমকে তাওয়াফের বাইরে রাখলে পূর্ণাঙ্গ তাওয়াফে দেখা দেয় সন্দেহ। আর তাওয়াফ অর্থ পূর্ণাঙ্গ তাওয়াফ। এরকম পূর্ণাঙ্গ তাওয়াফই ফরজ, আংশিক তাওয়াফ নয়।

www.eelm.weebly.com

এরকমও বলা যেতে পারে যে, হজরত ইব্রাহিম যে কাবা নির্মাণ করেছিলেন, হাতিমও ছিলো তার সীমানাভূত। সংক্ষিপ্ত একটি হাদিসেও একথা এসেছে।

মাসআলাঃ ইমামগণের ঐকমত্য এই যে, অক্ষম ব্যক্তি অন্য কারো উপরে সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করতে পারবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, সক্ষম ব্যক্তির জন্য পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করা ওয়াজিব। সক্ষম ব্যক্তি যদি কারো উপরে সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করে, তবে তাকে পুনরায় পদব্রজে তাওয়াফ করতে হবে। এরকম না করলে দিতে হবে কোরবানী।

অন্যান্য ইমামগণ বলেন, পদব্রজে তাওয়াফ সুন্নত, ওয়াজিব নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. উটে চড়ে তাওয়াফ করেছেন। রোকনের নিকট পৌঁছে ইশারা করতেন হাতের ছড়ি অথবা লাঠি দিয়ে এবং বলতেন আল্লাহু আকবার। বোখারী, মুসলিম। হজরত জাবের বর্ণনা করেন, রসুল স. উষ্ট্রারোহী হয়ে সাফা ও মারওয়ায় প্রদক্ষিণ করতেন, যেনো মানুষ সহজে তাঁকে দেখতে পান। সকলের চোখের সামনে তিনি অবতরণ করতেন। আর লোকজন তাঁকে বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। মুসলিম।

উম্মত জননী হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বিদায় হজে কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ করেছিলেন উষ্ট্রারোহী হয়ে। প্রত্যেক চক্রেই তিনি চুমো দিতেন রোকনে।

হানাফীগণ বলেন, রসুল স. এরকম করেছিলেন অসুস্থতার কারণে। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. মক্কায় আগমন করেছিলেন কিছুটা অসুস্থ হয়ে। তাই তিনি তাওয়াফ করেছিলেন উষ্ট্রারোহী হয়ে। যখন রোকনে উপস্থিত হতেন, তখন রোকন স্পর্শ করতেন ছড়ি দ্বারা। তাওয়াফ শেষে উপবেশন করাতেন উটকে। তারপর অবতরণ করে পাঠ করতেন দুই রাকাত নামাজ। আবু দাউদ।

অন্যান্য ইমাম, হানাফীগণের এই জবাবের প্রেক্ষিতে বলেছেন, রসুল স. যে তখন অসুস্থ ছিলেন, তা অনুমান মাত্র। বিষয়টি সুপ্রমাণিত নয়। বাকী রইলো আবু দাউদের বর্ণনাটির কথা। তাঁর বর্ণনাসূত্রভূত ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদ বর্ণনাকারী হিসেবে শক্তিমান নয়। তাই বর্ণনাটিকে প্রামাণ্য বলা যায় না। ইমাম শাফেয়ী আবার এ সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, আমি জানিনা ওই হজে রসুল স. পীড়িত ছিলেন কিনা।

আমি বলি, রসুল স. তখন অসুস্থ থাকলে আগমনী তাওয়াফ পদব্রজে করতে পারতেন না। অথচ হজরত জাবের প্রমুখের বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আগমনী তাওয়াফ চার চক্কর দিয়েছেন তেজব্যঞ্জকতার সঙ্গে এবং

www.eelm.weebly.com

অবশিষ্ট তিন চক্কর সাধারণভাবে পদব্রজে। হজরত জাবের থেকে আর একটি বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে সায়ী করেছিলেন এবং ঘর্মাক্ত হয়েছিলো তাঁর বসন। একথায় প্রমাণিত হয় যে, অসুস্থতার কারণে তিনি উষ্ট্রারোহণ করে তাওয়াফ করেননি। করেছিলেন একথা জানিয়ে দিতে যে, এরকম করা সিদ্ধ। আর এভাবে হজের নিয়ম শিক্ষা দেয়াই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য।

বাহনারোহী হয়ে নফল তাওয়াফ করা মাকরূহ— এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। জমহুর বলেন, সিদ্ধ। জমহুরের পক্ষে রয়েছে বোখারীর একটি বর্ণনা, যা আমি উল্লেখ করেছি সুরা ফাতাহ্ এর তাফসীরে। বর্ণনাটি এই— রসুল স. যখন মক্কা জয় করেন, তখন তাওয়াফে কুদুম করেন উষ্ট্রীর উপরে আরোহণ করে।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, তাওয়াফে বিরতিহীন চক্রাবর্তন ফরজ নয়। বরং সুন্নত। সাঈদ ইবনে মনসুর বর্ণনা করেন, হজরত ইবনে ওমর বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করছিলেন, এমন সময় নামাজের ইকামত হলো। তিনি জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে পূর্ণ করে নিলেন অবশিষ্ট চক্রাবর্তন। ইবনে আবু বকর সূত্রে আবদুর রহমান এবং আবদুর রাজ্জাকও এরকম বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। সাঈদ ইবনে মনসুরের বর্ণনায় আরো এসেছে, আতা বলেন, তাওয়াফের কিছু অংশ সম্পন্ন করার পর কেউ যদি কারো জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ করে, তবে তাকে জানাজা শেষে বাকী অংশ পূর্ণ করে নিতে হবে। নতুন করে তাওয়াফ শুরু করতে হবে না।

নাফে বলেছেন, তাওয়াফরত অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা বেদাত। হাসান বলেছেন, তাওয়াফরত অবস্থায় যদি কেউ নামাজের ইকামত শোনে, তবে তাকে তাওয়াফ ছেড়ে দিয়ে নামাজের জামাতে শরীক হতে হবে। নতুনভাবে তাওয়াফ করতে হবে নামাজের পর।

মাসআলাঃ ফরজ তাওয়াফ ফরজ নামাজের জন্য স্থগিত রাখা হলেও তা হবে মাকরূহ। জননী উম্মে সালমার বর্ণনায় এসেছে, তাঁরা আগমনী তাওয়াফ করেছিলেন এবং ওই তাওয়াফের মধ্যবর্তীতে রসুল স. ফজরের নামাজ পাঠ করেছিলেন।

মাসআলাঃ নফল তাওয়াফ পালনকালে ফরজ নামাজের ইকামত হলে, অথবা জানাজার নামাজ বাদ পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে তাওয়াফ স্থগিত রেখে নামাজ অথবা জানাজায় শরীক হতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে নফল কোনো ইবাদতের কারণে নফল তাওয়াফ স্থগিত রাখা যাবে না। তবে বিতির নামাজে শরীক হওয়ার জন্য নফল তাওয়াফ স্থগিত রাখা উত্তম। একথার প্রমাণ রয়েছে হজরত আব্দুর রহমান ইবনে হজরত আবু বকরের আচরণে।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ সাতবার কাবা প্রদক্ষিণের পর দুই রাকাত নফল নামাজ পড়া ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেন। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এরকম। তাওয়াফের পরের এই দুই রাকাত নামাজ যে পরিত্যাগ করবে তার উপরে একটি কোরবানী ওয়াজিব হবে। এ সম্পর্কিত আলোচনা আমরা উপস্থাপন করেছি 'ওয়াততাখিজু মিম্ মাক্বমি ইব্রাহীমা মুসল্লা' আয়াতের তাফসীরে।

তাওয়াফের মোস্তাহাবসমূহঃ কাবা শরীফের প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়তে হবে 'আল্লাহু আকবার' এবং 'লাইলাহা ইল্লাল্লহ্। তারপর করতে হবে দোয়া। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, কাবা শরীফ দেখলে দোয়া করা মোস্তাহাব। হাজরে আসওয়াদের নিকটে উপস্থিত হলে চুম্বন করতে হবে হাজরে আসওয়াদ নামক ওই প্রস্তর খণ্ডটি, যদি অন্য লোককে কষ্ট না দিয়ে তা করা সম্ভব হয়। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করতেন এবং তাতে চুম্বন দান করতেন। সুপরিণত সূত্রসহযোগে ইমাম শাফেয়ীর বর্ণনায় এসেছে, তিনি দীর্ঘ সময় হাজরে আসওয়াদের উপরে ওষ্ঠদ্বয় রাখতেন। ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, তিনি অনেকক্ষণ তাঁর দুই ওষ্ঠ হাজরে আসওয়াদের উপরে রাখতেন এবং ক্রন্দন করতেন। হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, তিনি হাজরে আসওয়াদে চুমু খেতেন এবং মস্তকও স্থাপন করতেন তার উপরে।

এভাবে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা বা স্পর্শ করা যদি সম্ভব না হয়, তবে কী করতে হবে, তা বলা হয়েছে উপরে বর্ণিত একটি হাদিসে। বলা হয়েছে, রসুল স. উষ্ট্রারোহী হয়ে তাওয়াফ করেছেন এবং হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন ছড়ি দ্বারা। এরকম করাও যদি সম্ভব না হতো, তবে তিনি হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে সেখানে কিছুক্ষণের জন্য থামতেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেন রসুল স. আমাকে নির্দেশ করেছেন, তুমি একজন শক্তিমান পুরুষ। সুতরাং হাজরে আসওয়াদের নিকটে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে গমন করবে না, যাতে দুর্বল লোকেরা কষ্ট পায়। যখন লোকজন সরে যাবে, তখন স্পর্শ করবে হাজরে আসওয়াদ। নয়তো সেদিকে মুখ করে পাঠ করবে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্)। আহমদ।

মাসআলাঃ জমহুর বলেন, যখন রোকনে ইয়ামিনের নিকট দিয়ে গমন করবে তখন তাকে স্পর্শ করবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এরকম করা মোস্তাহাব, সুন্নত নয়। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেন, আমি দেখেছি রসুল. স. হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামিন উভয়কে স্পর্শ করেছেন (অথবা চুম্বন করেছেন)। সুপরিণত সূত্রসহযোগে দারাকুতনীর বর্ণনায়

www.eelm.weebly.com

এসেছে, রসুল স. রোকনে ইয়ামিনকে চুমু দিয়েছেন এবং তার উপরে স্থাপন করেছেন তাঁর পবিত্র গণ্ডদেশ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে সুপরিণত সূত্রে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রোকনে ইয়ামিনে রয়েছে সত্তর জন মোয়াক্কেল ফেরেশতা। যখন কেউ সেখানে উপস্থিত হয়ে পাঠ করে 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল আ'ফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফীদ্ দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি রব্বানা আতিনা ফীদ্ দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফীল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বীনা আ'জাবান্নার' তখন ওই ফেরেশতারা বলে 'আমীন'।

মাসআলাঃ ইহ্রামের উর্ধদেশের বস্ত্রখণ্ড ডান বগলের নিচে দিয়ে বুক ঢেকে নিয়ে স্থাপন করতে হবে বাম স্কন্ধে, ডান কাঁধ থাকবে খোলা— এরকম অবস্থায় বীরত্বব্যঞ্জকতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে আগমনী তাওয়াফের প্রথম তিন চক্কর। চক্রাকারে প্রদক্ষিণ শুরু করতে হবে হাজরে আসওয়াদের অবস্থান স্থল থেকে। সেখানে এসেই সমাপ্ত হবে প্রতিটি প্রদক্ষিণ। এরকম করাই সুন্নত। বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাওয়াফের প্রথম তিন প্রদক্ষিণ বীরের মতো তেজব্যঞ্জকতার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত। অবশিষ্ট চারটি প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করতেন স্বাভাবিক পদবিক্ষেপে। প্রতি প্রদক্ষিণ শুরু হতো হাজরে আসওয়াদের চুম্বন অথবা স্পর্শনের মাধ্যমে। এটাই বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরাগত রসুল স. এর আমল। এরপর তিনি মাকামে ইব্রাহিমের নিকটে সম্পাদন করতেন দুই রাকাত নামাজ। ওই নামাজের দুই রাকাতে পাঠ করতেন সুরা কাফিরূন ও সুরা এখলাস। এরপর পুনরায় চুম্বন করতেন হাজরে আসওয়াদ এবং পাঠ করতেন আল্লাহু আকবার এবং লাইলাহা ইল্লাল্লহ্। হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাওয়াফ শেষের দুই রাকাত নামাজ পাঠ কালে সম্মুখে রাখতেন মাকামে ইব্রাহিম এবং কাবা শরীফ। আর নামাজের প্রথম রাকাতে পাঠ করতেন কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'কুলহুয়াল্লহু আহাদ'। তারপর চুম্বন করতেন হাজরে আসওয়াদ।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৩০, ৩১

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۭ وَاُحِلَّتْ
لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا
قَوْلَ الزُّوْرِ ۝ حُنَفَاۗءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۭ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا
خَرَّ مِنَ السَّمَاۗءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۝

www.eelm.weebly.com

❒ ইহাই বিধান এবং কেহ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করিলে তাহার প্রতিপালকের নিকট তাহার জন্য ইহাই উত্তম। তোমাদিগের নিকট উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলি ছাড়া অন্যান্য আনয়াম তোমাদিগের জন্য বৈধ করা হইয়াছে। সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিরূপ অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা-কথন হইতে,

❒ আল্লাহের প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া এবং তাহার কোন শরীক না করিয়া; এবং যে-কেহ আল্লাহের শরীক করে তাহার অবস্থাঃ সে যেন আকাশ হইতে পড়িল, অতঃপর পাখী তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল, কিংবা বায়ু তাহাকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করিল।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শুরুতে 'জালিকা' (ইহাই বিধান) উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আলোচিত বিধানাবলীর প্রতি। অর্থাৎ বলা হয়েছে— এতক্ষণ ধরে যে বিধানগুলোর উল্লেখ করা হলো, সেই বিধানগুলোই হজের আবশ্যকীয় বিধান। অবশ্য পালনীয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া মাঁইইয়ুআজজিম হুরুমাতিল্লাহি ফাহুয়া খইরুল লাহু ই'নদা রব্বিহী' (এবং যে কেউ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর সম্মান করবে তার প্রতিপালকের নিকটে তার জন্য তা-ই উত্তম)। এখানে 'হুরুমাতিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানসমূহ। উল্লেখ্য, পবিত্র অনুষ্ঠানসমূহে রয়েছে কিছু কিছু নির্দেশ ও কিছু কিছু নিষেধাজ্ঞা। এগুলো সম্মানার্হ। বিশেষ করে নিষেধাজ্ঞাসমূহকে পরিত্যাগ করতে হবে অত্যধিক গুরুত্ব সহকারে। কেননা বিশ্বাসীগণের নিকটে পাপ মস্তকোপরি পতনশীল পাহাড়ের মতো ভয়াবহ। আর কপটচারীদের নিকটে পাপ হচ্ছে নাসিকার উপরে পতিত মক্ষিকা সদৃশ, যে মক্ষিকা সামান্য হস্ত সঞ্চালন করলেই উড়ে চলে যায়। মুমিন ও মুনাফিকের তুলনা হাদিস শরীফে এভাবেই করা হয়েছে।

ফকীহ্ লাইছ বলেছেন, 'হুরুমাতিল্লাহ্' অর্থ ওই সকল কাজ, যার প্রতিপালন অবধারিত। অর্থাৎ আল্লাহ্র সকল নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাই 'হুরুমাতিল্লাহ্' এর অন্তর্গত।

জুজায বলেন, 'হুরুমাত' হচ্ছে ওই আমল যা পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পাদন করা ওয়াজিব। ন্যূনতা বা অপূর্ণাঙ্গতার সুযোগ যে আমলে একেবারেই। নিষিদ্ধ।

কোনো কোনো আলেম বলেন, এখানে 'হুরুমাতিল্লাহ্' অর্থ হজের আদব। ইবনে জায়েদ বলেন, এখানে 'হুরুমাতিল্লাহ্' অর্থ সম্মানিত শহর, সম্মানিত গৃহ এবং সম্মানিত মাস। অর্থাৎ মক্কা, কাবা শরীফ এবং ওই সকল মাস যেগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ। আর 'তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম' অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এটাই তার জন্য শ্রেষ্ঠ সওয়াব।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের নিকট উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া অন্যান্য আনয়াম তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে'। একথার অর্থ— কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন বিভিন্ন পশু ও প্রাণী— স্থলভাগের ও সমুদ্রের। আর বাহিরা, সায়েবাহ্, ওয়াসিলা, হাম ইত্যাদি পশুগুলোকেও আল্লাহ্ করে দিয়েছেন হালাল, যদিও পৌত্তলিকেরা ওগুলোকে হারাম বলে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা বর্জন করো মূর্তিরূপ অপবিত্রতা এবং দূরে থাকো মিথ্যা কথন থেকে'। এ কথার অর্থ— সুতরাং হে মানুষ! তোমরা জীবনযাপন করো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বৈধতার সীমানায়। আর বর্জন করো প্রতিমা পূজার মতো ঘৃণ্য অপবিত্রতাকে। নিঃসন্দেহে পৌত্তলিকতা নাপাক। তাই যারা জ্ঞানবান ও বিচক্ষণ, তারা প্রতিমা পূজা থেকে এমনভাবে নিজেকে রক্ষা করে, যেমনভাবে সর্ব সাধারণ পরিহার করে চলে অপরিচ্ছন্নতা ও অপবিত্রতা।

'ফাজ্বতানিবূ' অর্থ বর্জন করো অর্থাৎ বিরত থাকো। এভাবে এখানে শব্দটির মাধ্যমে মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকার জোর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়েছে। অর্থাৎ মূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এমতো নিকৃষ্টতম অপবিত্রতা যে তার নিকটবর্তী হওয়াও নিষেধ। কেউ কেউ এখানকার 'রিজ্বসুন্' (অপবিত্রতা) শব্দটির অর্থ করেছেন 'রিজ্যুন' (শাস্তি)। অর্থাৎ মূর্তিপূজা শাস্তিযোগ্য। তাই বুঝতে হবে, রূপক অর্থে মূর্তিকেই এখানে শাস্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

'ক্বওলায্ যূর' অর্থ মিথ্যা কথন। শব্দটি উৎসারিত হয়েছে 'যাওরুন' থেকে। এর অর্থ ফিরে যাওয়া বা প্রত্যাবর্তিত হওয়া, যেমন মিথ্যা কথা সত্য থেকে ফিরে যায় বা প্রত্যাবর্তন করে। যেমন 'ইফ্‌ক্' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'ইফ্‌কুন' থেকে। এর অর্থ ফিরিয়ে দেয়া বা ঘুরিয়ে দেয়া। সত্য কথাও তেমনি মিথ্যা কথাকে ঘুরিয়ে দেয় বা ফিরিয়ে দেয়। উল্লেখ্য যে, 'যূর' শব্দটির মধ্যে সকল প্রকার মিথ্যা অন্তর্ভুক্ত হলেও এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কেবল পৌত্তলিকদের কতিপয় সুনির্দিষ্ট বক্তব্য বুঝাতে। যেমন তারা বলে, 'ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা' 'মূর্তি আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে' (তালবিয়া পাঠের সময়ের) 'তোমার কোনো শরীক নেই, কেবল ওই শরীক ছাড়া, যার মালিক তুমি, যে তোমার মালিক নয়' ইত্যাদি।

মিথ্যা সাক্ষ্য শিরিকতুল্যঃ হজরত হুজায়েম ইবনে ফাতিক থেকে ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিবরানী ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. ফজরের নামাজ পাঠ করলেন। নামাজ শেষে দণ্ডায়মান হয়ে ঘোষণা করলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান আল্লাহ্‌র সঙ্গে অংশী স্থাপনের নামান্তর। এ

www.eelm.weebly.com

কথা তিনি উচ্চারণ করলেন তিনবার। তারপর পাঠ করলেন, 'সুতরাং তোমরা বর্জন করো মূর্তিরূপ অপবিত্রতা এবং দূরে থাকো মিথ্যা কসম থেকে, আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোনো শরীক না করে'।

কাতাদা বলেন, অংশীবাদিতার যুগে মানুষ নিজেরা হজ করতো, কিন্তু তাদের মাতা, কন্যা ও ভগ্নীদেরকে হজ করতে দিতো না। আবার নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতো 'হানীফ' (হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাধিষ্ঠিত বলে)। তাদের ওই মূর্খজনোচিত বক্তব্য ও আচরণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। নির্দেশ দেয়া হয়— হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শের উপরে যদি তোমরা প্রতিষ্ঠিত বলতে চাও, তবে বর্জন করো মূর্তিরূপ অপবিত্রতা এবং দূরে থাকো মিথ্যা কথন থেকে।

পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর সাথে কোনো শরীক না করে'। এখানকার 'হানীফ' শব্দটি এসেছে 'হানাফা' থেকে। কামুস গ্রন্থে এসেছে 'হানাফ' অর্থ সুদৃঢ়। অর্থাৎ সত্যের উপরে সুদৃঢ়। এরকম সুদৃঢ় থাকার অর্থই হচ্ছে, আপন উপাসনাকে কেবল আল্লাহ্‌র জন্য বিশুদ্ধ করে নেয়া এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনোকিছুর উপাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়ে যাওয়া। সুতরাং বুঝতে হবে যারা হানীফ তারাই হজরত ইব্রাহিমের সত্যিকার অনুসারী এবং তারা কস্মিনকালেও অংশীবাদী হতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করে তার অবস্থা ঃ সে যেনো আকাশ থেকে পড়লো, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।'

আল্লাহ্‌র ইবাদতই সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। এই সর্বোচ্চ মর্যাদার সঙ্গে যখন কেউ অংশীবাদিতাকে মিশ্রিত করে, তখন সে হয়ে যায় ওই অনুল্লেখ্য বস্তুর মতো, যা উর্ধ্বাকাশ থেকে পতিত হয় মাটিতে, তারপর কোনো পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যায়। কিংবা ক্ষিপ্রবাতাস তাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করে অজ্ঞাত কোনো স্থানে। এটাই আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থ।

'তাহ্‌বী বিহির্ রীহু' অর্থ বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। 'ফী মাকানিন্ সাহীক্ব' অর্থ নিক্ষেপ করে অজ্ঞাত স্থানে বা দূরবর্তী স্থানে। প্রকৃত অর্থে শয়তানই মানুষকে নিক্ষেপ করে এরকম অপপরিণতিতে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদতের মতো সুউচ্চ আকাশ থেকে অংশীবাদীরা যখন তাদের পতনকে তরান্বিত করে, তখন শিকারী পাখির মতো শয়তান ছিনিয়ে নেয় তাদের হৃদয়ের শান্তি ও পরিতৃপ্তি , তাদেরকে নিক্ষেপ করে ইমান থেকে বহুদূরের দুর্ভাগ্য ও ভ্রষ্টতায়।

এখানে 'আও' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শূন্যে মিলিয়ে না যাওয়ার অর্থে, একত্রিত না হওয়ার অর্থে নয়। অর্থাৎ এখানে পাখির ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া এবং বাতাসে উড়িয়ে নেয়া ইত্যাদি বাস্তব অর্থে বলা হয় নি। বলা হয়েছে রূপক অর্থে, উপমারূপে।

www.eelm.weebly.com

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'আও' শব্দটি এসেছে প্রকরণের জন্য। কেননা অংশীবাদীদের অবস্থা হতে পারে দু'ধরনের— ১. যে কখনোই শিরিক ত্যাগ করে না, অথবা অংশীবাদিতা পরিহার করা তার পক্ষে সম্ভবই হয় না— সে যেনো শিকারী পাখির নখরদংশিত, যে পাখি তাকে ছিঁড়ে ফেঁড়ে ক্ষতবিক্ষত ও ধ্বংস করে দিয়েছে। ২. সে তওবা করে, ফলে মুক্তিলাভ করে অংশীবাদিতার স্থায়ী আগ্রাসন থেকে, যেনো ঝোড়োবাতাস তাকে দূরে নিক্ষেপ করলেও অবশেষে সে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে স্বগৃহে।

প্রকৃত কথা এই যে, এখানে অংশীবাদীদেরকে তুলনা করা হয়েছে আকাশ থেকে পতিত সহায়হীন ব্যক্তি বা বস্তুর মতো, যে নিজেকে কোনো প্রকারেই রক্ষা করতে পারেনি। ধ্বংস তার জন্য অবধারিত, যেনো মাঝপথে কোনো পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছে অথবা তুফান তাকে নিক্ষেপ করেছে দূরে, বহু দূরে।

হাসান বর্ণনা করেছেন, এখানে অবিশ্বাসীদের আমলকে আকাশ থেকে পতিত ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এভাবে একথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অবিশ্বাসীদের আমল নিষ্ফল। নিশ্চিত ধ্বংস থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায়ই তাদের নেই।

সুরা আরাফের 'লা তুফাত্তাহু লাহুম আবওয়াবুস্ সামায়ি'— এই আয়াতের তাফসীরে আমি হজরত বারা বিন আজীব কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসের কিয়দংশের বিবরণ দিয়েছি, যার সারমর্ম এরকম; রসুল স. একবার অবিশ্বাসীদের মৃত্যুকালীন অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, ফেরেশতারা তাদের রুহ্ কবজ করে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছে যায় এবং আকাশের দরজা উন্মোচনের অনুমতি প্রার্থনা করে, কিন্তু তাদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করা হয় না। একথা বলে তিনি পাঠ করলেন 'লা তুফাত্তাহু লাহুম আবওয়াবুস্ সামায়ি'। তারপর বললেন, আল্লাহ্ তখন নির্দেশ দেন, তার আমলনামা সর্বনিম্ন স্তরে (সিজ্জিনে) নিয়ে যাও। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'সে যেনো আকাশ থেকে পড়লো, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো.......'।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৩২, ৩৩

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ○ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ○

❒ ইহাই আল্লাহের বিধান, এবং কেহ আল্লাহের নিদর্শনাবলীকে সম্মান করিলে ইহা তো তাহার হৃদয়ের ধর্মনিষ্ঠাসঞ্জাত।

❒ এই সমস্ত আন্‌আমে তোমাদিগের জন্য নানাবিধ উপকার রহিয়াছে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য; অতঃপর উহাদিগের কুরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট।

---

www.eelm.weebly.com

এখানে 'শাআ'ইরাল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ উট ও অন্যান্য পশু যা কোরবানীর জন্য প্রেরণ করা হয়। 'শাআর' শব্দটি এসেছে 'আশআর' থেকে। 'আশআর' অর্থ চিহ্নিত করে দেয়া। যাতে করে বুঝা যায় — এগুলো কোরবানীর পশু। আর কোরবানীর পশুকে সম্মান করার অর্থ পশুকে সুঠামদেহী করে তোলা। বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরায় এসেছে, রসুল স. কোরবানী করেছিলেন একশ'টি উট। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর কোরবানী দিয়েছিলেন একটি তেজী উট, যার মূল্যছিলো তিন শত দিনার।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা তো তার হৃদয়ের ধর্মনিষ্ঠাসঞ্জাত'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হচ্ছে ধর্মানুরাগরঞ্জিত পবিত্র হৃদয়ের অধিকারীদের আমলসমূহের মধ্যে একটি উত্তম আমল।

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'এই সমস্ত আনয়ামে তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে, এক নির্দিষ্ট কালের জন্য।' উল্লেখ্য যে, কোরবানীর উদ্দেশ্যে হেরেমে প্রেরিত পশুর উপরে আরোহণ করা, সেগুলোকে দিয়ে বোঝা বহন, সেগুলোর দুগ্ধদোহন ও পান ইত্যাদি সিদ্ধ।

জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ কোরবানীর পূর্ব পর্যন্ত কোরবানীর পশু থেকে বিভিন্ন উপকার গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই। আতা ইবনে রিবাহ্, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইবনে ইসহাক আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ চিহ্নিত করেছেন এভাবেই। তবে তাঁরা শর্ত আরোপ করেন, এতে করে যেনো পশুগুলোকে অতিরিক্ত কষ্ট দেয়া না হয়।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. দেখলেন এক লোক তার কোরবানীর পশু নিয়ে পায়ে হেঁটে পথ চলছে। তিনি স. বললেন, পশুর উপরে আরোহণ করো। লোকটি বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! এটাতো কোরবানীর পশু। তিনি স. পুনরায় বললেন, আরোহণ করো। সে আবারো বললো, এটা যে কোরবানীর উট। তিনি স. বললেন, সওয়ার হওয়া যায়। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বার তিনি স. বললেন, তোমার ক্ষতি হোক। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাস থেকেও বোখারী এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনে ওমর একবার এক লোককে কোরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন, এর উপর আরোহণ করে যাও। দ্যাখো, রসুল স. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিধান অপেক্ষা অন্য কোনো বিধানকে সহজ বলে মনে কোরো না। (কোরবানীর পশুকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা সুন্নত)। তাহাবী।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আবু হানিফা বলেন, বিশেষ কোনো প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোরবানীর পশুর উপরে আরোহণ করা, তাকে বোঝা টানার কাজে ব্যবহার করা অথবা সেগুলোর দুগ্ধদোহন অসিদ্ধ। কারণ সেগুলোকে উৎসর্গ করা হয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র জন্য। তাঁর অভিমতে একথাই প্রতিভাত হয় যে, কোনো অবস্থাতেই কোরবানীর পশু থেকে উপকার গ্রহণ সিদ্ধ নয়। কারণ এতে কোরবানীর পশুর স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। আর এরকম করা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিপন্থী। কিন্তু যেহেতু হাদিস শরীফের মাধ্যমে এরকম উপকার গ্রহণ সুন্নত প্রমাণিত হয়েছে, তাই আমরা বলি, প্রয়োজনবশতঃ এরকম করা সিদ্ধ, যাতে একটি সুন্নত আমল পরিত্যক্ত না হয়। তাহাবী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসেও একথার প্রমাণ রয়েছে। দুই সূত্রে হামীদুত্ তা'বীল গ্রন্থের বরাত দিয়ে হজরত আনাস থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. দেখলেন, এক লোক পায়ে হেঁটে তার কোরবানীর পশুকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটিকে পরিশ্রান্ত দেখে রসুল স. আজ্ঞা করলেন, সওয়ার হয়ে যাও। লোকটি বললো, ইয়া রসুলাল্লাহ্! এটা যে কোরবানীর পশু। তিনি স. বললেন, সওয়ার হও। অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. বললেন, কোরবানীর পশু হলেও তার উপরে সওয়ার হয়ে যাও।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর দেখলেন, এক লোক তার কোরবানীর পশু হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পদব্রজে চলতে চলতে সে হয়ে পড়েছে ক্লান্ত। তিনি তাকে বললেন, সওয়ার হয়ে যাও। বর্ণনাটি ইতোপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, আবু যোবায়ের বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌কে একবার কোরবানীর উটের উপর আরোহণ সম্পর্কিত মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, তিনি স. বলেছেন, যখন তুমি অন্য কোনো বাহন না পেয়ে অপারগ হয়ে পড়বে, তখন নিয়মানুযায়ী কোরবানীর পশুর উপরে আরোহণ করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের 'নানাবিধ উপকার রয়েছে' কথাটির ব্যাখ্যা এরকমই।

মুজাহিদ, কাতাদা ও জুহাক বলেছেন, তোমাদের জন্য পশু থেকে ওই সময় পর্যন্ত উপকার গ্রহণ অনুমোদিত যতক্ষণ না ওই পশুকে কোরবানী হিসেবে নির্ধারণ না করা হয়। নির্ধারণ শেষে ওই পশু থেকে আর কোনো প্রকার উপকার গ্রহণ করা যাবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'ছুম্মা মাহিল্লুহা ইলাল বাইতিল আতীক্ব' (অতঃপর তাদের কোরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট)। 'মহল' অর্থ এখানে কোরবানীর

www.eelm.weebly.com

স্থান অথবা কোরবানীর সময়। আর 'ছুম্মা (অতঃপর) শব্দটি এসেছে এখানে সময়ের অগ্রপশ্চাত বুঝানোর জন্য। এভাবে পূর্ণ বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— কোরবানী করা হয় পারলৌকিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে, কিন্তু কোরবানীর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোরবানীর পশু থেকে নানাবিধ উপকার গ্রহণ করা সিদ্ধ। তারপর নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে কোরবানী সম্পন্ন হওয়ার পর যে সওয়াব লাভ হবে, তার দ্বারা উপকার লাভ হবে আখেরাতে।

এখানে 'ইলাল বায়তিল আতীক্ব' (প্রাচীনগৃহের নিকটে) বলা হয়েছে হেরেমের সমগ্র পরিসরকে যা মানুষের আধিপত্য থেকে মুক্ত। কোনো মানুষ হেরেমের জমিন ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে না। উল্লেখ্য, সমগ্র হেরেমই প্রাচীনগৃহের (বায়তুল আতীক্বের) বিধানভূত। আরববাসীরা বলে, 'বালাগতুল বালাদা'। এর অর্থ— আমি শহর পর্যন্ত পৌঁছেছি। এরকম বললে শহরাভ্যন্তরে প্রবেশ করা জরুরী হয় না।

কেউ কেউ বলেন, এখানকার 'কোরবানীর স্থান' কথাটির অর্থ হেরেমের সীমানা থেকে বায়তুল আতীক্ব বা কাবা পর্যন্ত। সুতরাং বলা যেতে পারে হেরেমের সীমানাভূত যে কোনো স্থানে কোরবানী করা জায়েয।

ইমাম মালেক বলেন, হাজী সাহেবগণ কেবল মিনায় এবং ওমরাকারীরা কেবল মারওয়ায় কোরবানী করতে পারবে। এর অন্যথা করা নাজায়েয। কারণ রসুল স. এরকমই করেছেন। আমরা বলি, রসুল স. মিনায় কোরবানী করলেও এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, হেরেমের অন্যান্য স্থানে কোরবানী নিষিদ্ধ। আর কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নত দ্বারা হেরেমের অন্যান্য স্থানেও কোরবানীর বৈধতা প্রমাণিত। রসুল স. বলেছেন, সমগ্র মিনা কোরবানীর স্থান, মক্কার সকল পাহাড়ী রাস্তা কোরবানীর স্থান, আর সমগ্র আরাফা ও মুজদালিফা অবস্থানের স্থান। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও ইবনে মাজা।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, 'শায়াইরিল্লাহ্' অর্থ ধর্মের বিশেষ নিদর্শন। আর ধর্মের বিশেষ নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা মুত্তাকিগণের জন্য একটি অনির্ণেয় বিধান। 'লাকুম ফিহা মানাফীউ' (তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে) — এই আয়াতের ব্যাখ্যা 'ওয়া উহিল্লাত লাকুমুল আনয়ামু ইল্লা মা ইউত্‌লা আ'লাইকুম' (তোমাদের নিকট উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া অন্যান্য আনয়াম তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে)। এভাবে এর সঙ্গে সংযোজিত 'আজালিম্ মুসাম্মা' (এক নির্দিষ্টকালের জন্য) কথাটির অর্থ হবে মৃত্যু। আর মাহিল্লুহা (কোরবানীর স্থান) এর উদ্দেশ্য হবে শেষ গন্তব্য স্থল এবং 'আলবাইত' (গৃহ) এর উদ্দেশ্য হবে উচ্চ স্থান, যে উচ্চ স্থানে পুণ্যকর্মসমূহ

www.eelm.weebly.com

পৌঁছে যায়, অথবা পুণ্যকর্মের বিনিময় অর্জিত হয়। এভাবে বক্তব্যটির উদ্দেশ্য এরকম হতে পারে যে— আনয়ামে (চতুষ্পদ জন্তুতে) তোমাদের জন্য রয়েছে পার্থিব উপকার, যা মৃত্যু পর্যন্ত লাভ করা যেতে পারে, শেষে ওই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায় যে স্থানে পৌঁছে সকল পুণ্যকর্ম অথবা যে স্থানে লাভ হয় পুণ্যকর্মসমূহের সওয়াব ।

কেউ কেউ বলেছেন, 'শায়াইর' অর্থ হজের ফরজসমূহ এবং সেখানে উপনীত ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান, যেখানে রয়েছে পার্থিব বানিজ্যিক প্রাপ্তি। অর্জিত হয় মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সৌভাগ্য। আর 'ছুম্মা মাহিল্লুহা' অর্থ ইহ্রাম খুলে ফেলা। আর 'বায়তিল্ আ'তীক্ব' অর্থ কাবায় পৌঁছে কোরবানীর দিবসে তাওয়াফে জিয়ারত সমাপন করা।

সূরা হাজ্জ : আয়াত ৩৪, ৩৫

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

❑ আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করিয়া দিয়াছি যাহাতে আমি তাহাদিগকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সব চতুষ্পদ আন্য়াম দিয়াছি সেগুলি জবেহ্ কালে আল্লাহের নাম লয়। তোমাদিগের ইলাহ্ তো একমাত্র ইলাহ্, সুতরাং তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে, —

❑ যাহাদিগের হৃদয় ভয়-কম্পিত হয় আল্লাহের নাম স্মরণ করা হইলে, যাহারা তাহাদিগের বিপদ-আপদে ধৈর্য-ধারণ করে, এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়ালিকুল্লি উম্মাতিন জাআলনা মানসাকান' (আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কোরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি)। 'মানসাকুন' এর শাব্দিক অর্থ উপাসনালয়। শব্দটি স্থান বা কালবাচক বিশেষ্য। 'মানসাক'কে যদি মূল শব্দ ধরা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য হবে রক্ত প্রবাহিত করা, কোরবানীর পশু জবেহ্ করা, অথবা ওই কোরবানীর পশু যা মানুষ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোরবানী করে তাঁর নৈকট্যভাজন হওয়ার আশায়।

www.eelm.weebly.com

জবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র জিকির অত্যাবশ্যক। এ সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো স্মরণ ও উচ্চারণ নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ্র স্মরণই কোরবানীর মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং আল্লাহ্র নাম না নিয়ে অথবা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো বা কোনোকিছুর নাম নিয়ে জবেহ্ করলে তা হালাল হবে না।

'বাহীমাতুল আনয়াম' অর্থ চতুষ্পদ জন্তু। চতুষ্পদ জন্তু বাকশক্তিহীন। তাই সেগুলোকে বলা হয় 'বাহীমাহ্'। আর 'আনয়াম' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে উট, গাভী, বলদ, মহিষ, ছাগল, দুম্বা ইত্যাদি হালাল পশুকে। অন্যান্য পশু যেমন ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ইত্যাদিকে আনয়াম বলা যায় না। এখানে 'বাহীমাহ্' এর পরে অতিরিক্তরূপে 'আনয়াম' উল্লেখ করে ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ইত্যাদিকে বাদ দেয়া হয়েছে। আর আনয়াম দ্বারা এখানে যে গৃহপালিত পশুর কোরবানী জায়েয করা হয়েছে সে ব্যাপারে বিশ্বাসীগণ একমত। সুতরাং বুঝতে হবে নীল গাই, বন্য গরু ও ছাগল ইত্যাদির কোরবানী অসিদ্ধ। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের শুরুতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কোরবানীর নিয়মের কথা বলে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে উম্মতে মোহাম্মদীকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের ইলাহ্ তো একমাত্র ইলাহ্, সুতরাং তাঁরই নিকটে আত্মসমর্পণ করো'। এ কথার অর্থ— হে শেষ রসুলের উম্মত! তোমরা তোমাদের সংকল্পকে কেবল আল্লাহ্র জন্য বিশুদ্ধ করে নাও। অন্য কাউকে তাঁর অংশীদার বানিয়ো না— না কোরবানীর কালে, না জিকিরের সময়। কারণ তিনিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া বাশ্‌শিরিল মুখবিতীন' (এবং সুসংবাদ দাও বিনীতদেরকে)। 'খাবাত' অর্থ মূল্যহীন, হীন। আল্লাহ্কে যে ভয় করে এবং সে কারণে নিজেকে মূল্যহীন ও হীন বলে জানে, সে-ই 'মুখবিত্'। 'কামুস' অভিধানে রয়েছে, 'আখবাত্' অর্থ অক্ষম, সম্বলহীন। হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা বলেছেন, 'মুখবিতীন' অর্থ বিনয়ীগণ। আখফাশ অর্থ করেছেন ভীত, ত্রস্ত, অক্ষম। কোনো কোনো অভিধানবেত্তা বলেছেন, 'খাবাত' বলে নিম্নভূমিকে। তাই মুজাহিদ 'মুখবিতীন' মর্মার্থ করেছেন, আল্লাহ্র স্মরণমগ্ন ব্যক্তিবর্গ। ইমাম নাখয়ী অর্থ করেছেন— বিশুদ্ধাচারী। কালাবী অর্থ করেছেন— বিনম্র, দয়ার্দ্র। ওমর বিন আওস বলেন, 'মুখবিত্' সে, যে কারো উপরে অত্যাচার করে না। এবং অত্যাচারিত হলেও প্রতিশোধ গ্রহণ করে না। সার কথা হচ্ছে, 'মুখবিতীন' অর্থ ওই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিবর্গ, যাদের হৃদয়ে সতত প্রতিভাসিত হয় আল্লাহ্র মহামর্যাদার জ্যোতি। তাই তাদের হৃদয়ে জেগে থাকে আল্লাহ্র সকম্প ভীতি। এসকল সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিবর্গের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (৩৫)।

www.eelm.weebly.com

বলা হয়েছে— 'যাদের হৃদয় ভয়-কম্পিত হয় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে, যারা বিপদে আপদে ধৈর্যধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।'

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৩৬

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

❑ এবং উষ্ট্রকে তোমাদিগের জন্য করিয়াছি আল্লাহের নিদর্শনগুলির অন্যতম; তোমাদিগের জন্য উহাতে মংগল রহিয়াছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় উহাদিগের জবেহ্‌কালে তোমরা আল্লাহের নাম লও। যখন উহারা কাত হইয়া পড়িয়া যায় তখন তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং আহার করাও যে প্রার্থী নহে তাহাকে এবং প্রার্থীকে; এইভাবে আমি উহাদিগকে তোমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছি যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং উষ্ট্রকে তোমাদের জন্য করেছি আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোর অন্যতম।' একথার অর্থ— হে মানুষ! আমি উটকে করেছি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র ধর্মের নিদর্শন।

এখানে 'বুদনা' অর্থ উট, উটনী, বলদ, গাই, মহিষ ইত্যাদি। শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে, 'বাদাতুন'। যেমন 'খাশাবাতুন' এর একবচন 'খুশবুন'। শব্দটি অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে উট বা উটনী বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। বৃহৎ আকারের জন্যই উটকে সাধারণতঃ এরকম বলা হয়।

কামুস প্রণেতা লিখেছেন, বুদনা অর্থ উষ্ট্রী, গাভী, মহিষ। ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এরকম। আতা ও সুদ্দী বলেছেন, উট ও গাভী বুদনা, কিন্তু ছাগল নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন বিশেষভাবে উট ও উটনীকেই বলা হয় বুদনা। বায়যাবী লিখেছেন, বৃহৎ অবয়ব বিশিষ্ট হওয়ার কারণেই উটের ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট। ইমাম বাগবী বলেন, বড় ও মোটা হওয়ার কারণে উটকে বলা হয় বুদনাহ্। দীর্ঘ ও স্থূলকায় মানুষকেও তাই বলা হয় 'বাদানার রজুলু বাদানাতান'। আর অধিক বয়সী বৃদ্ধকে বলা হয় 'বাদ্দানার রজুলু তাবদীনা'।

www.eelm.weebly.com

যাঁরা বুদনাহ্ শব্দটি কেবল উটের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার পক্ষপাতি তাঁরা প্রমাণ পেশ করেন একটি হাদিসের মাধ্যমে। হাদিসটি এই— হজরত জাবের বলেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে হুদায়বিয়ায় কোরবানী করেছি— সাতজনের পক্ষ থেকে একটি গাভী এবং সাতজনের পক্ষ থেকে একটি বুদনা। তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হাদিসটি। তিনি একথাও বলেছেন, এর সূত্রপরম্পরা উত্তম ও বিশুদ্ধ।

আমরা বলি, মুসলিমের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— হজরত জাবের বলেন, আমরা মক্কায় পৌঁছলে রসুল স. নির্দেশ করলেন, যার সঙ্গে কোরবানী নেই, সে যেনো ইহ্রাম খুলে ফেলে। আর যাদের সঙ্গে কোরবানী রয়েছে, তারা সাতজন সাতজন করে এক একটি বুদনায় শরীক হয়ে যাও।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের জন্য এতে মঙ্গল রয়েছে'। একথার অর্থ— তোমাদের জন্য এই অন্যতম নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাদের জবেহ্কালে তোমরা আল্লাহ্র নাম নাও।' একথার অর্থ— আল্লাহ্র নামে তোমরা উট জবাই করো দণ্ডায়মান অবস্থায়, সারিবদ্ধভাবে। হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উট জবাই করবে উটকে দাঁড় করিয়ে এবং জবাইয়ের পূর্বে বলবে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা'। এরপর বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে কণ্ঠদেশে সজোরে আঘাত করবে বল্লম দিয়ে।

আবু দাউদ, ইবনে মাজা এবং হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, সুপরিণত সূত্রসহযোগে হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. উট জবাইকালে পাঠ করতেন— 'ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজ্হিয়া লিল্লাজী ফাত্বারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব আ'লা মিল্লাতি ইব্রহীমা হানিফাঁও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন— ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন— লা শরীকালাহু ওয়া বি জালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন'।

কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'সাওয়াফ্ফুন' (সারিবদ্ধ ভাবে) শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে ফাওয়াউল ওজনে। অর্থাৎ শব্দটি কর্মপদ এবং বহুবচনবোধক। এর একবচন 'সফ্' (সারি)। শব্দটি আবার কর্তৃকারক অর্থেও ব্যবহার্য। আবার 'মুসাফ্ফাফ'ও কর্তৃকারক, যা কর্মপদরূপেও ব্যবহৃত হয়। আর এখানে 'দণ্ডায়মান

www.eelm.weebly.com

অবস্থায়' অর্থ উটকে দাঁড় করাতে হবে তিন পায়ের উপর— দু'টি পিছনের এবং একটি সামনের। আর সামনের বাম পা বেঁধে রাখতে হবে রশি দিয়ে, যাতে উটটি পালিয়ে যেতে না পারে। এভাবে দাঁড় করিয়ে তার বুকে আঘাত করতে হবে বর্শা দিয়ে।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, এক লোক উটকে বসিয়ে রেখে তার কণ্ঠদেশ বর্শাবিদ্ধ করলো। হজরত ইবনে ওমর এ দৃশ্য দেখে বললেন, উটটিকে দাঁড় করিয়ে দাও এবং পা বেঁধে নাও। এটাই রসুল স. এর বিধান।

আবদ্ ইবনে হুমাইদ, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, আবু জুব্ইয়ান বলেন, আমি একবার হজরত ইবনে আব্বাসের নিকটে 'সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাদের জবেহ্কালে তোমরা আল্লাহ্র নাম নাও'— কথাটির ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, উট কোরবানী করতে চাইলে তাকে দাঁড় করাতে হবে তিন পায়ের উপর। তারপর এক পা বেঁধে বলতে হবে 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার মিনকা ওয়া লাকা।' প্রলম্বিত সূত্রে বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস সাওয়াফ্ফা (সারিবদ্ধভাবে) কথাটির অর্থ করেছেন 'ক্বীয়ামান্' (দণ্ডায়মান অবস্থায়)। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা তাঁর তাফসীরে উবায়দুল্লাহ্ ইবনে ইয়াযীদের বর্ণনাসূত্রে একথাই বলেছেন। সাঈদ ইবনে মনসুরের বক্তব্যও এরকম।

মুজাহিদ বলেছেন, উটকে যখন তিনপায়ের উপরে দাঁড় করানো হয় এবং পিছনের বাম পা বেঁধে ফেলা হয়, তখন তার ওই অবস্থাকে বলে সাওয়াফ্ফা। হজরত ইবনে মাসউদ শব্দটিকে উচ্চারণ করতেন সাওয়াফ্ফান্। সাওয়াফ্ফান্ হচ্ছে ওই সকল পশু, যেগুলোকে তিন পায়ের উপরে দাঁড় করানো হয় এবং বেঁধে রাখা হয় সামনের একটি পা। হজরত ইবনে উবাইয়ের উচ্চারণরীতি অনুসারে মুজাহিদ ও হাসান শব্দটিকে পড়তেন 'সাওফ্ফী'। এর অর্থ— কেবল আল্লাহ্র জন্য। এরপর বলা হয়েছে— 'যখন তারা কাৎ হয়ে পড়ে যায়, তখন তোমরা তা থেকে আহার করো এবং আহার করাও যে প্রার্থী নয় তাকে এবং প্রার্থীকে'। উল্লেখ্য, এই নির্দেশটি বৈধতা প্রকাশক, ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ নিজের কোরবানীর গোশত ভক্ষণ করা জায়েয। অপরকে আহার করানোও জায়েয।

ইকরামা, কাতাদা ও ইবরাহিম নাখয়ী বলেছেন, এখানে 'যে প্রার্থী নয়' অর্থ যে অক্ষম হলেও যাচ্ঞাবিমুখ। অর্থাৎ যে যাচ্ঞা ব্যতিরেকে যা পায় তাতেই তুষ্ট থাকে। আর 'প্রার্থী' অর্থ ওই ব্যক্তি যে যাচ্ঞা করে। আউফী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ক্বনিয়'(যে প্রার্থী নয়) বলে ওই লোককে, যে কারো কাছে কিছু চায় না এবং কেউ কিছু দিলে তা প্রত্যাখ্যানও করে না। আর

www.eelm.weebly.com

মু'তার (প্রার্থী) অর্থ ওই লোক, যে দাতার সামনে নিজেকে উপস্থিত করে, কিন্তু কিছু চায় না। দু'টো শব্দই উৎসারিত রয়েছে 'কানায়াত'(অল্পে তুষ্টি) থেকে। এভাবে 'প্রার্থী নয়' 'প্রার্থী' শব্দ দু'টির অর্থ দাঁড়ায়— ওই যাচ্ঞাবিমুখ ও যাচ্ঞাকারী, যে যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। সাঈদ ইবনে যোবায়ের, হাসান এবং কালাবী বলেছেন, 'কৃনিয়' অর্থ দরিদ্র যাচ্ঞাকারী। আর মু'তার অর্থ দরিদ্র, কিন্তু যাচ্ঞাবিমুখ, দাতার সম্মুখে প্রাপ্তির আশা নিয়েও যে থাকে নির্বাক। এরকম অর্থ করা হলে বুঝতে হবে 'কৃনিয়' শব্দটি এসেছে কুনুয়ান' থেকে, যার অর্থ চাওয়া। ইবনে যায়েদ বলেছেন, 'কৃনিয়' অর্থ মিসকিন। আর মু'তার অর্থ মিসকিন নয় কিন্তু সম্পদের স্বল্পতার কারণে কোরবানী করতে অক্ষম, অথচ যে গোশত লাভের আশায় কোরবানী দাতার সম্মুখে উপস্থিত হয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'এভাবে আমি তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।' একথার অর্থ— আমিই তোমাদেরকে দণ্ডায়মান অবস্থায় উষ্ট্রের কোরবানীর অধিকার দিয়েছি। সেগুলোকে করে দিয়েছি তোমাদের অনুগত। সুতরাং তোমরা কৃতজ্ঞচিত্ত হও, কোরবানী করো বিশুদ্ধ সংকল্পের সঙ্গে।

ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় এসেছে, মূর্খতার যুগে মানুষ কোরবানীর রক্ত কাবায় ছিটিয়ে দিতো এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতো গোশতের টুকরা। ইসলামের আগমনের পর সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো এরকম করতে পারি। তাঁদের একথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। ইবনে মুনজির ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৌত্তলিকেরা কোরবানী করার পর জবেহ্কৃত পশুর রক্ত নিয়ে উপস্থিত হতো কাবা গৃহের সম্মুখে এবং ওই রক্ত তারা ছুঁড়ে মারতো কাবায়। সাহাবীগণও এরকম করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৩৭, ৩৮

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۚ كَذٰلِكَ
سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ○
اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ

❒ আল্লাহের নিকট পৌঁছায় না উহাদিগের মাংস এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদিগের ধর্মনিষ্ঠা। এইভাবে তিনি ইহাদিগকে তোমাদিগের অধীন করিয়া

www.eelm.weebly.com

দিয়াছেন যাহাতে তোমরা আল্লাহের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্ম পরায়ণদিগকে।

❐ আল্লাহ্ রক্ষা করেন বিশ্বাসীদিগকে। তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে ভালবাসেন না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র নিকট পৌঁছায় না তাদের মাংস এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা'। একথার অর্থ— কোরবানীকারীরা শোনো, তোমাদের জবেহ্কৃত পশুর গোশত ও রক্ত কিছুই আল্লাহ্তায়ালা গ্রহণ করেন না, গ্রহণ করেন তোমাদের বিশুদ্ধ পুণ্যাভিলাষ। সুতরাং কোরবানী করতে হবে অংশীবাদিতার সংমিশ্রণবিবর্জিত বিশুদ্ধ সংকল্প নিয়ে, কেবলই আল্লাহের উদ্দেশ্যে। এর ভিত্তি হচ্ছে সাবধানতা বা তাক্ওয়া।

এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবে তিনি এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো এ জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন'। একথার অর্থ— সুতরাং তোমরা প্রদত্ত নেয়ামতের জন্য আল্লাহ্র এককত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। কারণ তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নৈকট্যভাজন হওয়ার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, হজের নিদর্শন ও হজের নিয়মাবলী জানিয়ে দিয়েছেন এবং এসকল পশুকে তোমাদের করায়ত্ব করে দিয়েছেন, যার ফলে তোমরা এদেরকে জবেহ্ করতে সক্ষম হও।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, 'তাকবীর' শব্দটির উদ্দেশ্য ইহ্রাম পরিত্যাগ করা এবং জবেহ্কালে 'আল্লাহু আকবার'- বলা।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্মপরায়ণদেরকে'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'মু'মিনীন' কথাটির মর্মার্থ একত্ববাদীগণ।

পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ রক্ষা করেন বিশ্বাসীগণকে। তিনি কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে ভালোবাসেন না'। এখানে 'খাওয়ানিন্' অর্থ খেয়ানতকারী বা বিশ্বাসঘাতক। আর 'কাফুর' অর্থ আল্লাহ্র নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

জুজায বলেছেন, যে ব্যক্তি জবাই করার সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম স্মরণ ও উচ্চারণ করে এবং জবেহ্কৃত পশু প্রতিমার সামনে উপস্থিত করে প্রতিমাগুলোর সান্নিধ্যকামী হয়, তাকেই বলে 'খাওয়ানিন কাফুর' (বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ)।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আহমদ, তিরমিজি, সুদ্দী ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. যখন মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কাভূমি ত্যাগ করলেন, তখন তাঁর সঙ্গী হজরত আবু বকর বললেন, হায়! এসকল লোক তাদের নবীকে দেশত্যাগী হতে বাধ্য করলো, এদের ধ্বংস অনিবার্য। তখন অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৩৯, ৪০

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَ
لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ
اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

❒ যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল তাহাদিগকে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে; কারণ তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সম্যক সক্ষম;

❒ তাহাদিগকে তাহাদিগের ঘর-বাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে শুধু এই কারণে যে তাহারা বলে 'আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্।' আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তাহা হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত খৃষ্টান সংসারবিরাগীদিগের উপাসনাস্থান, গীর্জা, ইহুদীদিগের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাহাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহের নাম। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাকে সাহায্য করেন যে তাঁহার দ্বীনকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী'।

মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে জেহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে। প্রথমে বলা হয়েছে— যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, মক্কার পৌত্তলিকেরা সাহাবীগণকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছিলো। সাহাবীগণ প্রায়শঃই প্রহৃত ও আহত অবস্থায় রসুল স. এর দরবারে হাজির হতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! দেখুন আমাদের কী হাল। রসুল স. তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে

www.eelm.weebly.com

যেতেন এবং বলতেন, ধৈর্যধারণ করো। এখনো আমাকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি। এরপর একসময় রসুল স. হিজরত করলেন মদীনায়। সেখানেই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

হজরত ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, বায্যার, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হাব্বান, হাকেম, ইবনে মারদুবিয়া এবং বায়হাকীও এরকম বর্ণনা এনেছেন। তিরমিজি বলেন, বর্ণনাটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। আর একে বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত বলেছেন হাকেম। উল্লেখ্য, সত্তরের অধিক আয়াতে যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হওয়ার পর আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়। ওরওয়া ইবনে যোবায়ের সূত্রে ইবনে আবী হাতেম ও আবদুর রাজ্জাক এবং জুহুরী সূত্রে ইবনে মুনজিরও একথা বলেছেন। বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করে যাঁরা অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মদীনায় হিজরতকালে পথিমধ্যে বাধাগ্রস্ত হন মক্কার মুশরিকদের প্রস্তরাক্রমণ দ্বারা। অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ওই সকল অত্যাচারিতদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে।

'বিআন্নাহুম জুলিমু' অর্থ কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। অর্থাৎ অত্যাচারকে এখানে যুদ্ধের অনুমতি প্রদানের কারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। একথার মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যে সকল অবিশ্বাসীর অত্যাচার করার ক্ষমতা নেই, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা তাদেরকে হত্যা করা বৈধ নয়। তাই ইমামগণের ঐকমত্য এই যে, অবিশ্বাসী মহিলাদেরকে হত্যা করা নাজায়েয। কিন্তু যদি তারা মুসলমানদের বিপক্ষে পরামর্শ দেয়, অথবা সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহায়তা প্রদান করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ, তাদেরকে হত্যা করাও জায়েয। এই নীতির প্রেক্ষিতে বিধর্মী বৃদ্ধ, সাধু সন্যাসী, অন্ধ, অচল ও বিকলাঙ্গকে হত্যা করাও নাজায়েয। ইমাম শাফেয়ী বলেন, হত্যা নাজায়েয হবে কেবল তখন, যখন তারা বিরত থাকবে কাফের যোদ্ধাদেরকে পরামর্শ প্রদান, তাদের জন্য অর্থ ব্যয় ইত্যাদি সহায়তামূলক কর্মকাণ্ড থেকে।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, মহিলা মুরতাদকে (ধর্মত্যাগিনীকে) হত্যা করা যাবে না। বরং তাদেরকে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী করে রাখতে হবে, এভাবে তার মৃত্যু হলেও।

হজরত রিবাহ্ ইবনে রবী বর্ণনা করেছেন, আমরা এক যুদ্ধে রসুল স. এর সঙ্গী ছিলাম। নিকটে এক স্থানে দেখা গেলো লোকজনের ভীড়। রসুল স. কী ঘটেছে

www.eelm.weebly.com

তা জানার জন্য সেখানে একজনকে প্রেরণ করলেন। প্রেরিত ব্যক্তি ফিরে এসে জানালেন, লোকেরা ভীড় জমিয়েছে এক নিহত মহিলাকে কেন্দ্র করে। তিনি স. বললেন, সে তো যুদ্ধ করেনি। সে সময় অগ্রগামী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন খালেদ বিন ওলীদ। রসুল স. তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন কোনো মহিলা ও শ্রমিককে হত্যা করা যাবে না। আবু দাউদ। এই হাদিসের 'আসিফ' শব্দটির আর এক অর্থ— অক্ষম বৃদ্ধ। আর 'ইম্‌রাআতুন' অর্থ সাধারণ রমণী— সে যে কেউ হোক না কেনো— কাফের অথবা মুরতাদ। হাদিসটিতে রমণীবধ করার কারণ দেখানো হয়েছে এই যে, তারা যুদ্ধ করে না। অর্থাৎ তারা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত নয়।

হানাফীগণ বলেন, পৃথিবী কর্মক্ষেত্র। আর কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে পরকালে। আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেছেন, 'লা ইকরাহা ফিদ্‌দীন' (ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই)। সুতরাং বুঝতে হবে অন্যায় হত্যা, চুরি, মদ্যপান, ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ ইত্যাদির শাস্তিবিধানের মধ্যে রয়েছে কল্যাণ। এমতো বিধান সংশোধনমূলক। জীবন, সম্পদ, সম্মান, বংশরক্ষা ও জ্ঞানের রক্ষাকবচ।

মুরতাদকে হত্যা করা ওই সময় ওয়াজিব হবে, যখন সে হবে যুদ্ধংদেহী এবং মুসলমানদের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের জন্য হুমকি। এটা তার কুফরীর (অবিশ্বাসের) শাস্তি নয়। কুফরীর শাস্তি তো আরো ভয়াবহ, যা দেয়া হবে আখেরাতে। সুতরাং যে মুরতাদ যোদ্ধাদের দলভূত, তার অনিষ্ট থেকে রক্ষাকল্পে তাকে হত্যা করা যাবে। কিন্তু নিরীহ নারী এরকম নয়, তাই তাকে হত্যা করা যাবে না, যদিও সে কাফের হয়, অথবা হয় মুরতাদ। রসুল স. তাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন একারণেই। উল্লেখ্য, শাস্তি অপরাধকে মুছে দেয়। কিন্তু কাফেরকে হত্যা করলেও তার কুফরীর পাপ মোচন হয় না। আখেরাতে তার প্রাপ্য শাস্তি সুনির্ধারিত।

কেউ কেউ বলেন, ধর্মত্যাগিনীদেরকেও হত্যা করা ওয়াজিব। কারণ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যে স্বধর্মত্যাগ করবে, তাকে হত্যা কোরো। এখানে তিনি স. পুরুষ-মহিলার পার্থক্য করেননি। বাহায ইবনে হাকীম সূত্রে তিবরানীর মুআ'জ্জামে কবীর গ্রন্থে এবং জননী আয়েশা থেকে আল আওসাত পুস্তকেও এরকম সমার্থবোধক হাদিস এসেছে। সেখানেও পুরুষ বা মহিলার উল্লেখ আসেনি। বলা হয়েছে কেবল স্বধর্মত্যাগীদের কথা, যা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হানাফীগণ এর জবাবে বলেন, এই হাদিসে বলা হয়েছে আংশিক নির্দিষ্ট নীতির বা বিধানের কথা। কিন্তু অন্য হাদিসে রমণীদের বিধানকে আলাদা করা হয়েছে। অতএব এখানকার বিধানটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য হবে কেবল পুরুষের বেলায়। যদি এই হাদিসের সাধারণ অর্থই গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয়, তবে অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, কোনো

www.eelm.weebly.com

কাফের মুসলমান হলে, অথবা কোনো ইহুদী খৃষ্টান হয়ে গেলে তাকেও বধ করতে হবে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার সেরকম নয়। সুতরাং 'মান্ বাদ্দালা দীনাহু' (যে স্বধর্ম ত্যাগ করবে) কথাটি সাধারণ অর্থবোধক নয়। অন্যান্য হাদিসই এর প্রমাণ।

আমি বলি, হানাফীগণের অভিমত অবশ্যই প্রণিধাননীয়। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাকেম কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদিসটির বর্ণনা এসেছে এভাবে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, মুসলমানদের মধ্যে যে আপন ধর্ম পরিত্যাগ করবে, তাকে হত্যা কোরো। এখানে ধর্মপরিত্যাগকারী মুসলমানকে বধ করা ওয়াজিব করা হয়েছে। সুতরাং কাফেরের মুসলমান হওয়া এবং ইহুদীর খৃষ্টান হওয়ার ক্ষেত্রে বধ করার বিধান প্রয়োগের সন্দেহ সৃষ্টি হয় না।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের সূত্রপরম্পরাভূত বর্ণনাকারী হাফস ইবনে ওমর একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। কোনো কোনো আলেম তাকে ত্রুটিযুক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, ধর্মত্যাগীদেরকে বধ করা জায়েয (সিদ্ধ)। কারণ, হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, উম্মে মারওয়ান নাম্নী এক রমণী ধর্ম পরিত্যাগ করেছিলো। রসুল স. তার সম্পর্কে নির্দেশ করেছিলেন, তাকে ইসলামের দিকে আহবান জানাও। যদি সে তওবা করে, তবে উত্তম, নতুবা তাকে সংহার করো। দারাকুতনী হাদিসটিকে বর্ণনা করেছেন দুটি সূত্রে। একটি সূত্রে একথাও এসেছে যে, ওই স্ত্রীলোকটি মুসলমান হতে অস্বীকার করে, তাই তাকে হত্যা করা হয়েছিলো। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, বর্ণনাটির উভয় সূত্রপরম্পরা দুর্বল। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রপরম্পরা দুর্বল যথাক্রমে ওমর ইবনে রওয়াহা এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে আওনীয়াহ্ এর কারণে। ইবনে হাব্বান বলেন, হাদিসটি থেকে দলিল গ্রহণ করা যাবে না।

জননী আয়েশা থেকে বর্ণিত আর একটি হাদিসে এসেছে, উহুদ যুদ্ধের দিন এক মহিলা ইসলাম বর্জন করলো। রসুল স. নির্দেশ দিলেন, তাকে তওবা করতে বলো, যদি অস্বীকার করে, তবে হত্যা করো। এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহভূত মোহাম্মদ বিন আবদুল মালেক সম্পর্কে হাদিসবেত্তাগণ মন্তব্য করেছেন, সে নিজে নিজে হাদিস বানায়। আবার এ হাদিসগুলি অন্য হাদিসগুলির বিপরীত যেমন— হজরত ইবনে আব্বাস থেকে দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নির্দেশ দিয়েছেন, মহিলা মুরতাদের সংহার সিদ্ধ নয়। দারাকুতনী আবার এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহসংযুক্ত আবদুল্লাহ্ ইবনে আলীস জযরীকে অসত্যভাষী ও হাদিস প্রস্তুতকারী বলে চিহ্নিত করেছেন।

www.eelm.weebly.com

ইবনে আদী তাঁর 'আল কামিল' পুস্তকে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর জামানায় এক রমণী ধর্মত্যাগিনী হয়েছিলো। তিনি স. তাকে বধ করতে বলেননি। হাদিসটি শিথিল সূত্রবিশিষ্টরূপে চিহ্নিত হয়েছে এর এক বর্ণনাকারী হাফস ইবনে সুলায়মানের কারণে।

তিবরানীর 'মুআ'জ্জাম' পুস্তকে এসেছে, হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বলেছেন, আমাকে ইয়ামেনের প্রশাসকরূপে নিযুক্তি দানের প্রাক্কালে রসুল স. নির্দেশ করেছিলেন, যে পুরুষ ধর্মত্যাগী হবে, তাকে পুনরায় ইসলামের দিকে ডাক দিয়ো, যদি সে তোমার ডাকে সাড়া দেয়, তবে তাকে গ্রহণ কোরো, বধ কোরো সাড়া না দিলে। আর যে রমণী ধর্মত্যাগিনী হবে, তাকেও আহ্বান জানিয়ো প্রত্যাবর্তনের । যদি প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাকে ছেড়ে দিয়ো তার অবস্থার উপর, (হত্যা কোরো না)।

ইমাম আবু ইউসুফ— ইমাম আবু হানিফা— আসেম বিন আবীন্নুযুদ— আবু রযীন— এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ধর্মপরিত্যাগিনীকে হত্যা করা যাবে না। তাকে বন্দী করতে হবে এবং পুনঃ আহ্বান জানাতে হবে ইসলামের দিকে। বাধ্য করতে হবে ইসলামে ফিরে আসতে (মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি দেয়া যাবে না, কিন্তু প্রহার করা যাবে না, অথবা বন্ধ করে দেয়া যাবে না তার পানাহার)। 'বালাগাতে মোহাম্মদ' পুস্তকেও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, এক রমণী খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিলো। হজরত ওমর তার সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়, এমন কোনো স্থানে নিয়ে গিয়ে তাকে ক্রীতদাসীরূপে বিক্রয় করে দাও। এমন স্থানে বিক্রয় কোরো না, যে স্থানে তার স্বধর্মীদের বসতি বিদ্যমান। এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে তাকে বিক্রয় করে দেয়া হলো দু'মাতুল জন্দল নামক এক স্থানে।

দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, মহিলা মুরতাদকে তওবা করাতে হবে, তাকে মেরে ফেলা যাবে না। এর সূত্রপ্রবাহভূত জাল্লাসের কারণে সূত্রটি দুর্বল।

মাসআলাঃ মুসলিম সেনাপতি যুদ্ধরত কাফের সৈনিকের স্ত্রীকে বধ করার নির্দেশ দিতে পারবে, সে অবিশ্বাসিনী, অথবা ধর্মত্যাগিনী, যেই হোক না কেনো। সুরা ফাতাহের এক আয়াতের তাফসীরে আমি লিখেছি, মক্কাবিজয়ের দিন রসুল স. তাঁর সেনাপতিদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে তোমাদের দিকে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হবে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করবে না। এরপর কয়েকজনের নাম উচ্চারণ করে বললেন, এদেরকে অবশ্যই হত্যা করবে, কাবাগৃহের আচ্ছাদনের

www.eelm.weebly.com

নিচে আশ্রয় নিলেও। তাঁর এই নির্দেশের অন্তর্গত ছিলো কতিপয় রমণীও। যেমন আবদুল্লাহ্ ইবনে খাত্তাল -এর দু'জন ক্রীতদাসী গায়িকা— কারীনা ও কারনা। কারীনাকে হত্যা করা হয়েছিলো। আর কারনা লাভ করেছিলেন ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য। এরকম সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন আরো দু'জন নারী। তাঁরা ধর্মত্যাগিনী ছিলেন না, ছিলেন অবিশ্বাসিনী, আমর বিন হাশেমের ক্রীতদাসী ও আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিনদা। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া ইন্নাল্লহা আ'লা নাসরিহিম লাক্বদীর' (আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম)। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে অত্যাচারিত মুসলমানদেরকে দেয়া হয়েছে বিজয়ের অঙ্গীকার।

পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে, 'তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্'। একথার অর্থ— 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্' হচ্ছে চরমতম সত্যের স্বীকৃতি। সুতরাং তা কস্মিনকালেও অপরাধ নয়। অথচ মিথ্যাপ্রেমিকেরা এটাকেই গর্হিত অপরাধ বিবেচনা করলো। আর এ কারণে সত্যপ্রেমিকদেরকে বাধ্য করলো দেশত্যাগী হতে। তাই সন্দেহ মাত্র নেই যে তারা অত্যাচারী। মহান্যায়বিচারক আল্লাহ্ই অত্যাচারিতদের রক্ষক। সে কারণেই তো তিনি তাদেরকে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে লড়বার অনুমতি দিলেন।

আরববাসীরা বলে, অমুক ব্যক্তির কোনো গুণ নেই, কেবল এই গুণটি ছাড়া— সে উপকারীর বিরুদ্ধে অসদাচরণ করে (ক্ষতি করে তার, যে উপকার করে)। উল্লেখ্য, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক' বাক্যটি মহাকল্যাণময়, সুতরাং তা চিরপ্রশংসিত। তাই একারণে কাউকে বিতাড়ন করা অন্যায়। অথচ অবিশ্বাসীরা তাই করলো। সত্যোচ্চারণকারীদেরকে বের করে দিলো তাদের ঘরবাড়ী থেকে। অন্য আয়াতেও অবিশ্বাসীদের এমতো অত্যাচারের বিবরণ রয়েছে। যেমন— ওয়ামা তানক্বিমু মিন্না ইল্লা আন আমান্না' (শুধুমাত্র ইমান গ্রহণের কারণে প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে আমাদের উপর)।

জনৈক কবি বলেছেন— ওয়া বালদাতিন লাইসা বিহা আনীসুন ইল্লাল ইয়াআ'ফীরু ওয়া ইল্লাল ই'সু।

অর্থঃ এবং এমন শহর, যেখানে হরিণ ও মেটে রঙের উট ছাড়া অধিক চিত্তহারক আর কিছু নেই।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, এখানকার 'ইল্লা আঁইয়াকুলু' (তারা শুধু বলে) কথাটির 'ইল্লা' ইসতিস্নায়ে মুনকাতে (বিকর্তিত)। এভাবে 'ইল্লা' এর অর্থ দাঁড়াবে 'লাকিন্না'(কিন্তু)। এভাবে বাক্যটির মর্মার্থ হবে— একারণে

www.eelm.weebly.com

তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে যে, তারা কেবল বলে 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক'। অথচ এটাই পরম সত্যোচ্চারণ। এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'মুসতাসনা মিনহু' (ব্যতিক্রমী বাক্য) এখানে লুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ অন্য কোনো কারণে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়নি, বহিষ্কার করা হয়েছে কেবল একারণে যে, তারা বলে ' আল্লাহ্ আমাদের রব'।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো খৃষ্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্র নাম'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যদি মুসলমানদেরকে শক্তিমান না করতেন, তবে ধ্বংস হয়ে যেতো সকল ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়। এক সম্প্রদায় ধ্বংস করে ফেলতো অপর সম্প্রদায়ের ধর্মালয়।

মুজাহিদ ও জুহাক বলেছেন, এখানকার 'সাওয়ামি' শব্দটির অর্থ পৃথিবীর প্রতি অনাসক্ত সন্যাসীদের উপাসনাগৃহ, খানকা। কাতাদা বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য সাবেয়ীনদের উপাসনাগার। 'বিয়াউন' শব্দটি 'বিয়াতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ— খৃষ্টানদের গীর্জা। 'সালাওয়াতুন' অর্থ ইহুদীদের উপাসনাস্থান। ইবরানী ভাষায় ইহুদীদের উপাসনাস্থানকে 'সালাওয়াতুন'ই বলা হয়। আর 'মাসজিদ' অর্থ মুসলমানদের মসজিদ। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা মানুষের এক দলকে দিয়ে অন্য দলকে প্রতিহত করেন। যদি এরকম না করতেন তবে তারা প্রত্যেক নবীর যুগে তাঁদের উম্মতগণের উপাসনালয়সমূহ ধ্বংস করে ফেলতো। বিধ্বস্ত করে দিতো হজরত মুসার যুগে সাবেয়ীনদের ইবাদতখানা, হজরত ঈসার যুগে খৃষ্টানদের গীর্জা, সাবেয়ীনদের ইবাদতখানা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর যুগে মসজিদসমূহ।

'ইয়াজ্কুরুফীহাস্ মুল্লাহি কাছীরা ' অর্থ— যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্র নাম। একথা বলে বুঝানো হয়েছে বর্ণিত চার ধর্মাবলম্বীদের উপাসনাগারসমূহকে, অথবা কেবল মসজিদসমূহকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র মনোনীত ধর্মের জন্য যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, আল্লাহ্ তাকেই করেন অজেয়। তার অগ্রযাত্রা কেউ রোধ করতে পারে না। উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে পুনর্ব্যক্ত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত বিজয়ের অঙ্গীকার।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ নিশ্চয় সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যেহেতু অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সর্বশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী, সেহেতু আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্যকারীদের বিজয় সুনিশ্চিত। তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেনই।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝ وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ۝ وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ۝ وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝

❐ আমি ইহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করিলে ইহারা সালাত কায়েম করিবে, জাকাত দিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্যে নিষেধ করিবে; সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহের এখ্‌তিয়ারে।

❐ এবং লোকে যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে উহাদিগেব পূর্বে তো নূহ, আদ এবং সামূদের সম্প্রদায়,

❐ ইব্‌রাহীম ও লূতের সম্প্রদায়,

❐ মাদ্‌য়ানবাসীরা তাহাদিগের নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল এবং মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিল মূসাকেও। আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে অবকাশ দিয়াছিলাম ও পরে তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। কী ভয়ংকর ছিল আমার শাস্তি।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমটিতে 'আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করবো' বলে মুসলমানদেরকে ঐক্য, সংহতি ও শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। বাহ্যত বাক্যটি একটি শর্তবাচক বাক্য। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞপ্তি প্রদায়ক।

এখানে বিশ্বাসীগণের যে সকল গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, সে সকল গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিলো রসুল স. এর পরবর্তী চার প্রতিনিধি বা খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে। এই আয়াত তাঁদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের প্রমাণ। অপরাপর মুহাজিরগণকে এরকম পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী করা হয়নি। তাই এই

www.eelm.weebly.com

আয়াত তাঁদের ক্ষমতালাভের প্রমাণও নয়। উল্লেখ্য, হজরত মুয়াবিয়া মুহাজির (হিজরতকারী) ছিলেন না। তাই আলোচ্য আয়াতের সুসংবাদ তাঁর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। কারণ ক্ষমতালাভের যোগ্যতা হিসেবে এখানে পূর্ববর্তী আয়াতে ধরা হয়েছে, তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু একারণে যে, তারা বলে 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্' কথাটিকে। কিন্তু কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন আলোচ্য আয়াতটির সম্পৃক্তি রয়েছে পরবর্তী বাক্য 'আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন' এর সঙ্গে। এভাবে পূর্ণ বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারী। এভাবে আল্লাহ্র সাহায্য পেয়ে তারা হবে রাষ্ট্রনায়ক। কায়েম করবে সালাত, প্রদান করবে জাকাত। নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করবে যথাক্রমে সৎ ও অসৎ কাজের।

একথা সন্দেহাতীতরূপে সত্য যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। সম্মানিত খলিফা চতুষ্টয়ের মাধ্যমে পরাজিত করেছেন আরবের অত্যাচারী গোত্রীয় নেতাদেরকে এবং অনারবদের সম্রাটদেরকে। উল্লেখ্য, প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর উৎখাত করেছিলেন জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতদেরকে। পরবর্তী খলিফাত্রয়ও আল্লাহ্র দ্বীনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন উপায়ে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা ইচ্ছাময়। তিনি যা খুশী তাই করেন। সকল পরিণতিই তার অভিপ্রায়ভূত। সুতরাং তাঁর মনোনীত ধর্মের পৃষ্ঠপোষকদেরকে তিনি বিজয় দান করবেনই।

পরবর্তী আয়াতত্রয়ে (৪২, ৪৩, ৪৪) রসুলপাক স.কে দেয়া হয়েছে সান্ত্বনার বাণী। জানানো হয়েছে, বিগত যুগের নবী-রসুলগণকেও অসত্যভাষী বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিলো। আর আল্লাহ্তায়ালাও ওই প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সাময়িক অবকাশদানের পর নিপতিত করেছিলেন ভয়াবহ শাস্তির মধ্যে।

উল্লেখ্য, পূর্বের সকল নবী-রসুলকে তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের লোকেরাই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। কিন্তু হজরত মুসাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো ফেরাউনের সম্প্রদায় কিবতীরা। তারা হজরত মুসার নিজ সম্প্রদায় বনী ইসরাইল ছিলো না। তাই এখানে হজরত নুহের সম্প্রদায়, আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়, হজরত ইব্রাহিম ও হজরত লুতের সম্প্রদায় ও মাদিয়ানবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা তাদের নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো। আর হজরত মুসা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিলো মুসাকেও'। অর্থাৎ তিনি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন

www.eelm.weebly.com

হয়েছিলেন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা। এরকমও বলা যেতে পারে যে, হজরত মুসার মোজেজা বা অলৌকিক কর্মকাণ্ড ছিলো সুপ্রসিদ্ধ। আর সেগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো বিভিন্ন গোত্র ও দল। তাই তাঁর কথা এখানে বলা হয়েছে বিশেষভাবে, আলাদা করে।

'ফাকাইফা কানা নাকীর' অর্থ কী ভয়ংকর ছিলো আমার শাস্তি। বাক্যটির রূপ প্রশ্নবোধক মনে হলেও এখানে কোনো প্রশ্নই উত্থাপন করা হয়নি। বরং এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে এক ধরনের বিস্ময়, অথবা শাস্তির ভয়াবহতা। সুনিশ্চিত শাস্তির ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ এরকম বিস্ময়বোধক বাক্য ব্যবহৃত হয়।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ○ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ○

❒ আমি ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ— যাহাদিগের বাসিন্দারা ছিল সীমালংঘনকারী, এই সকল জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ হইয়াছে জনমানব শূন্য।

❒ যাহাতে তাহারা জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে কি তাহারা দেশ ভ্রমণ করে নাই? বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হইতেছে বক্ষস্থিত হৃদয়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি ধ্বংস করেছি কতো জনপদ, যাদের বাসিন্দারা ছিলো সীমালংঘনকারী'। একথার অর্থ— আমি অনেক জনপদ জনশূন্য করে দিয়েছি। কারণ, ওই জনপদবাসীরা ছিলো সীমালংঘনকারী। এখানে 'জালেম' অর্থ সীমালংঘনকারী। অর্থাৎ যে শুভবুদ্ধি ও ন্যায়ানুগতার সীমানা অতিক্রম করে, প্রকৃত বস্তুকে স্থাপন করে অযথার্থ স্থানে। যেমন— ইবাদত করতে হবে কেবল আল্লাহ্‌র। অথচ তারা ইবাদত করে প্রতিমার। অথবা প্রতিমাপূজাকে সংমিশ্রিত করে আল্লাহ্‌র ইবাদতের সাথে। এভাবে হয়ে যায় সীমালংঘনকারী, মুশরিক।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওই সকল জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিলো'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র আযাবে ধসে পড়েছিলো তাদের গৃহের ছাদ ও দেয়াল।

www.eelm.weebly.com

অর্থাৎ প্রথমে ধসে পড়েছিলো দেয়াল, তারপর ছাদ। এরকম অর্থ গ্রহণ করলে বুঝতে হবে এখানে 'আ'লা উ'রুশিহা' শব্দটির সম্পর্ক রয়েছে 'খবীয়াতুন্' এর সঙ্গে। 'খবীয়াতুন্' অর্থ ধসিত, পতিত। অথবা 'খওইয়াতুন' এর অর্থ হবে ফাঁকা, বিরান, জনশূন্য। এমতাবস্থায় 'আ'লা উরুশিহা' সম্পৃক্ত হবে একটি উহ্য শব্দ 'কুয়িমাতুন' অথবা 'কায়িআতুন' এর সঙ্গে। তখন অর্থ দাঁড়াবে— জনপদগুলো হয়ে গিয়েছিলো জনমানবশূন্য, সেখানে দণ্ডায়মান ছিলো কেবল গৃহসমূহের ছাদ। এবার এরকম অর্থও হওয়া সম্ভব যে— সেখানকার জনশূন্য বসতবাটিগুলোর ছাদগুলো গিয়েছিলো ধসে, দাঁড়িয়ে ছিলো কেবল দেয়ালগুলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কতো কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিলো ও কতো সুদৃঢ় প্রাসাদ হয়েছিলো জনমানবশূন্য'। একথার অর্থ— সেখানকার পানিপূর্ণ কূপগুলোও হয়ে গিয়েছিলো পরিত্যক্ত, পানি উত্তোলনের জন্য কেউ আর সেখানে অবশিষ্ট ছিলো না। আর সেখানকার সুদৃঢ় প্রাসাদগুলোতেও ছিলো না কোনো মানুষের পদচারণা।

কাতাদা, জুহাক ও মুকাতিল বলেছেন, এখানকার 'মাশীদ' শব্দটির অর্থ সুউচ্চ, বৃহৎ। যেমন বলা হয়— 'শাদা বিনাহু' (সে তার প্রাসাদকে উচ্চ করেছে)। সাঈদ ইবনে যোবায়ের, আতা এবং মুজাহিদ বলেছেন, 'শাঈদ' অর্থ পাকা মেঝে। তাই মাশীদ অর্থ হবে চুন সুড়কি নির্মিত পাকা মেঝে।

বাগবী লিখেছেন, আয়াতে বর্ণিত 'পরিত্যক্ত কূপ' ও 'সুদৃঢ় প্রাসাদ' ছিলো ইয়েমেনে। পাহাড়ের চূড়ায় ছিলো প্রাসাদ এবং পাদদেশে ছিলো কূপ। ওই সকল কূপ ও প্রাসাদের মালিকেরা ছিলো বড়ই আরামপ্রিয়। আল্লাহ্র অবাধ্যও ছিলো তারা। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে সমূলে বিনাশ করেছিলেন। ফলে পরিত্যক্ত হয়েছিলো তাদের জলাধার সমূহ এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো সুদৃঢ় ও সুউচ্চ অট্টালিকা।

জুহাক সূত্রে আবু রওক বর্ণনা করেছেন, ওই কূপগুলো ছিলো হাজরামাউত নামক এলাকায়। আর বিনাশপ্রাপ্ত জনপদটির নাম ছিলো হাসুরা। ওই শহরে বাস করতেন নবী সালেহ্ ও তাঁর চারহাজার বিশ্বাসী অনুসারী। ওই শহরেই ঘটে তাঁর মহাতিরোধান। শহরটিকে হাজরা মাউত বলা হয় সেকারণেই। উল্লেখ্য, ওই স্থান হজরত সালেহের জন্মভূমি ছিলো না, ছিলো কর্মভূমি। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পবিত্র সমাধির চারপাশে লোকেরা একটি বেষ্টনী তৈরী করে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাঁর কূপের পাশে। নেতা ও বিচারক নির্বাচন করে দীর্ঘকাল সেখানে বসবাস করতে থাকে তারা। জনসংখ্যা বেড়ে যায় অনেক গুণ। অনেকেই স্খলিত হয়ে পড়ে সত্য ধর্ম থেকে। শুরু করে বিগ্রহবন্দনা। আল্লাহ্ তখন তাদের

www.eelm.weebly.com

পথপ্রদর্শনের জন্য নবী করে পাঠান হজরত হানজালা ইবনে সাফওয়ানকে। তিনি ছিলেন শ্রমিক। বাজারে গিয়ে লোকের বোঝা বহন করতেন। আর মানুষকে আহ্বান জানাতেন সত্য ধর্মের দিকে। কিন্তু মূর্তিপূজকেরা তাঁর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং একদিন বাজারেই তাঁকে বধ করে ফেললো। আল্লাহ্ তাঁর শহীদ নবীর হন্তারকদের উপরে অবতীর্ণ করলেন আযাব। ফলে বিনাশপ্রাপ্ত হলো তারা। পড়ে রইলো তাদের পরিত্যক্ত কূপ ও জনমানবশূন্য সুউচ্চ প্রাসাদ।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'যাতে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারে এই উদ্দেশ্যে কি তারা দেশভ্রমণ করেনি?' একথার অর্থ— ওই সকল অর্বাচীন আল্লাহ্র নিদর্শনরাজি প্রত্যক্ষ ও অনুভব করার মানসিকতা নিয়ে দেশভ্রমণে বের হয় না কেনো? কেনো বোঝেনা যে, এরকম অনুসন্ধিৎসু পরিব্রাজনার ফলে লাভ হতে পারে জ্ঞানবুদ্ধিপূর্ণ হৃদয় এবং সত্যশ্রবণপ্রবণ শ্রুতি? হায়! এরকম যদি তারা করতো, তবে লাভ করতে পারতো আল্লাহ্র এককত্ব অনুধাবনের প্রবৃত্তি ও অন্তর্দৃষ্টি, আর অর্জন করতে পারতো সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বানের আওয়াজ।

শেষে বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়'। একথার অর্থ— তাদের দৃষ্টি রুদ্ধ নয়, কিন্তু তারা কল্যাণ-দর্শন থেকে বঞ্চিত। তাই তারা ভ্রমণকালে ধ্বংসস্তূপে পরিণত বিরান জনপদসমূহকে আল্লাহ্র অসন্তোষের নিদর্শনরূপে দেখে না, দেখলেও দেখে বাহ্যিকভাবে। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নয়। কারণ তাদের বক্ষাভ্যন্তরস্থিত হৃদয় দৃষ্টিহীন, বিশ্বাসবিচ্যুত।

আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, চোখের অন্ধত্ব প্রকৃত অন্ধত্ব নয়, অন্তরের অন্ধত্বই আসল অন্ধত্ব। কাতাদা বলেছেন, চোখের দৃষ্টি পতিত হয় দ্রষ্টব্যের আকারের প্রতি, যা উপকার আহরণের একটি মাধ্যম। কিন্তু দ্রষ্টব্যের তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছে কেবল অন্তর্দৃষ্টি, যা উপকার প্রদায়ক।

রসুল স. বলেছেন, অন্তরের অন্ধত্ব নিকৃষ্টতম অন্ধত্ব। আবু দাউদ তাঁর 'দালায়েল' নামক পুস্তকে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন উকবা ইবনে আমের জুহুনী থেকে ইবনে আসাকের, আবী দারদা থেকে আবু নসর সঞ্জরী এবং পরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইমাম শাফেয়ী।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে 'অন্ধ হচ্ছে তাদের বক্ষস্থিত হৃদয়' একথা বলে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, ওই সকল অবিশ্বাসীদের অন্তর সত্যবোধবর্জিত, আর 'শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী' কথাটির অর্থ এখানে অন্তর্দেশ কর্তৃক সত্য-শ্রবণের অধিকারী অর্থাৎ তারা ছিলো সত্যশ্রুতিবঞ্চিত।

www.eelm.weebly.com

বায়যাবী লিখেছেন, 'মান কানা ফী হাজিহী আ'মা ফাহুয়া ফীল আখিরাতি আ'মা' (যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ, সে পরকালেও অন্ধ) —এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন দৃষ্টিহীন সাহাবী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাকতুম নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমিও কি তবে আখেরাতে অন্ধ হবো? তাঁর এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

আমি বলি, এ ব্যাপারে ইবনে আবী হাতেম ও কাতাদার বক্তব্যও সাদৃশ্যপূর্ণ। কাতাদা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জায়েদা এবং হজরত ইবনে উম্মে মাকতুমকে লক্ষ্য করে।

সূরা হাজ্জ্ব ঃ আয়াত ৪৭, ৪৮

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ○ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ع

❑ তাহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে অথচ আল্লাহ্ তাহার প্রতিজ্ঞা কখনও ভংগ করেন না, তোমার প্রতিপালকের এক দিন তোমাদিগের গণনার সহস্র বৎসরের সমান;

❑ এবং আমি অবকাশ দিয়াছি কত জনপদকে যখন উহারা ছিল সীমালংঘনকারী; অতঃপর উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।

প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, 'তারা শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে তোমাকে' অবিশ্বাসীদের ইদৃশ উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো তাদের হৃদয়। যারা শাস্তি কবলিত হওয়ার জন্য ত্বরা করে তারা অন্ধ নয়তো কী?

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে নজর বিন হারেছকে লক্ষ্য করে। সে বলেছিলো, হে আল্লাহ্! মোহাম্মদ যা বলে তা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমার উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করো। এভাবে সে কামনা করেছিলো ত্বরিৎ শাস্তি। তাই প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ করেন না'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! ওই সকল অংশীবাদীরা আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে নির্ভয়। তাই তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। কিন্তু তারা একথা জানেনা যে, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে অতি অবশ্যই কার্যকর হবে। কারণ

www.eelm.weebly.com

তিনি কস্মিনকালেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী নন। উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসীরা অন্তর্দৃষ্টিহীন, নতুবা তারা এভাবে শাস্তি ত্বরান্বিত করার কথা বলতে পারতো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের এক দিন তোমাদের গণনার সহস্র বৎসরের সমান।' একথার অর্থ— সময়ের অগ্র-পশ্চাৎ ও নিকটবর্তীতা-দূরবর্তীতা মানুষের দিক থেকে গণনাযোগ্য, আল্লাহ্‌র দিকে এমতো খণ্ডিত কাল চেতনার অবকাশ নেই। সেখানে রয়েছে কেবল মহাকালবোধ, যা অখণ্ড ও অবিভাজ্য। বিষয়টিকে তুলনা করলে বলতে হয়, আল্লাহ্‌র একদিন, মানুষের গণনায় এক বৎসরের সমতুল। সুতরাং আল্লাহ্‌র শাস্তির ব্যাপারে ত্বরায়ন-বিলম্বায়নের প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ মাত্র নেই।

অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতার জন্য শাস্তি অনিবার্য। কোরআন, হাদিস ও আলেমগণের ঐকমত্য একথাই বলে। তাই যাদের জীবন সাঙ্গ হবে অবিশ্বাসের সঙ্গে, অথবা আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞানানুসারে যাদের মৃত্যু ঘটবে শিরিক সহকারে, তাদের শাস্তি অবধারিত। আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও দয়া গুণ তাদের কোনো উপকারে আসবে না। তাঁর ক্ষমা ও দয়া প্রযোজ্য হবে কেবল পাপী বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে। আর এমতো ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গের অবকাশও নেই।

আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে মন্তব্য করেছেন, 'আল্লাহ্‌র একদিন তোমাদের গণনার সহস্র বৎসর তুল্য' এরকম বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। যখন ইচ্ছা, তখনই তিনি শাস্তি অবতীর্ণ করতে পারেন। আর কোনো কিছু তাঁর আওতাবহির্ভূতও নয়। সকল কিছুই তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতায়ত্ত। সুতরাং শাস্তি বিলম্বিত হলেও, সে শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার সাধ্য কারো নেই।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— অন্তর্দৃষ্টি বিবর্জিত এ সকল অর্বাচীনেরা আল্লাহ্‌র শাস্তির দ্রুত আগমনাকাংখী। কিন্তু তারা জানেনা, আল্লাহ্‌র আযাবের একটি দিনকে মানুষের কাছে মনে হবে এক সহস্র দিবস। প্রকৃত কথা এই যে, দুঃখের দিবসকে মনে হয় সুদীর্ঘ এবং সুখের সময়কে মনে হয় ক্ষণিক। তাই এখানে বুঝিয়ে বলা হয়েছে যে— কেনো তোমরা কামনা করো দ্রুত শাস্তি? তোমরা কি জানোনা, শাস্তির একদিনকে মনে হবে এক হাজার দিনের সমান?

কোনো কোনো আলেম বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালার সর্বোচ্চ সহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে। বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ওয়াদা ভঙ্গ কখনোই করেন না'। কিন্তু তিনি শাস্তিকে বিলম্বিত করেন ওই সময় পর্যন্ত যখন একদিনের

www.eelm.weebly.com

পরিমাণ হবে তোমাদের হাজার বছরের সমান। আর সেই সময় হচ্ছে কিয়ামতের সময়। মুজাহিদ ও ইকরামা বলেছেন, কিয়ামতের এক দিবস হবে তোমাদের এক হাজার বছরের সমান। হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. ঘোষণা করেছেন, হে নিঃসম্বল মুহাজিরবর্গ! কিয়ামতের সময় তোমরা লাভ করবে পরিপূর্ণ নূর। বিত্তশালীদের অর্ধদিবস পূর্বেই তোমরা প্রবেশ করবে জান্নাতে। তোমাদের প্রভুপ্রতিপালকের এক দিবস তখন হবে তোমাদের সহস্র দিবসের সমান। আহমদ। তিরমিজিও এর বর্ণনাকারী। তিনি এ কথাও বলেছেন যে হাদিসটি উত্তমসূত্রসম্বলিত।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. সুসংবাদ প্রদান করেছেন, দরিদ্র ইমানদারেরা ধনী ইমানদারের অর্ধদিবস বা পাঁচ শত বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিরমিজি।

পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কতো জনপদকে যখন তারা ছিলো সীমালংঘনকারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।' একথার অর্থ— আমি তাৎক্ষণিক শাস্তি অবতীর্ণ করিনি বলে মুশরিকেরা যেনো এ কথা মনে না করে যে, তাদেরকে অব্যাহতি প্রদান করা হবে। ইতোপূর্বেও আমি তাদের পূর্বসুরীদেরকে এরকম সাময়িক অবকাশ দিয়েছিলাম। ওই অবকাশে তারা সীমালংঘন করেই চলতো। তারপর যথাসময়ে আমি তাদেরকে ঠিকই শাস্তি দিয়েছিলাম। সে শাস্তি থেকে তাদের শেষরক্ষা হয়নি। আর সকলের অবশেষে গন্তব্য তো আমার দিকেই।

সূরা হাজ্জ : আয়াত ৪৯, ৫০, ৫১

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

❒ বল, 'হে মানুষ! আমি তো তোমাদিগের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী;

❒ সুতরাং যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা;

❒ এবং যাহারা প্রবল হইবার উদ্দেশ্যে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহারাই হইবে জাহান্নামের অধিবাসী।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, হে মানুষ! আমি তো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি সকলকে এইমর্মে হুঁশিয়ার করে দিন, হে মানুষ! আমি যে তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনকারী, একথা নিশ্চিত।

প্রশ্নঃ রসুল স. ছিলেন যুগপৎ সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী। তবে এখানে কেনো তিনি আদিষ্ট হলেন শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শক হিসাবে?

উত্তরঃ মক্কার মুশরিকেরা আল্লাহ্‌র শাস্তির অতিদ্রুত বাস্তবায়ন কামনা করেছিলো। তাই এখানে রসুল স. এর পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে কেবল সতর্ককারী বা ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে। তিনি যে সুসংবাদ দানকারী, সে কথা তাই এখানে বলা হয়নি। এরকমও বলা যেতে পারে যে— ভীতিপ্রদর্শনের আলোচনা আসে সাধারণতঃ শুভসংবাদের আলোচনার পূর্বে। শুভসংবাদের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে কেবল আল্লাহ্‌র অনুগতদের সঙ্গে। আর সতর্ককরণের সম্পর্ক থাকে অনুগত অননুগত সকলের সঙ্গে। হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. জানিয়েছেন, আল্লাহ্ আমাকে যে বার্তাসহ পাঠিয়েছেন, সেই প্রত্যাদেশিত বার্তা এবং আমার সম্পর্ক এরকম— এক সতর্ককারী তার সম্প্রদায়ের লোকজনকে সম্বোধন করে বললো, হে আমার স্বজাতি! আমি দেখতে পাচ্ছি, পাহাড়ের ওপারে একদল শত্রুসেনা আক্রমণোদ্যত। জলদি করো, জলদি করো (পালাও, পালাও)। কিছু লোক তার কথা মেনে নিয়ে রাতের অন্ধকারেই অন্যত্র পালিয়ে গেলো। সদ্ব্যবহার করলো সুযোগের। এভাবে তারা পরিত্রাণ পেলো শত্রুর আক্রমণ থেকে। আবার কিছু সংখ্যক লোক তার কথা বিশ্বাস করলো না। পড়ে রইলো আপনাপন বসতবাটিতে। পরিণাম এই দাঁড়ালো যে, পরদিন প্রত্যুষে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো শত্রুর আক্রমণে। ওই সতর্ককারীর মতোই আমার অবস্থান। যে আমার কথা মানবে এবং আমি শুভবার্তা হিসেবে যা এনেছি তা মান্য করে চলবে, সে পরিত্রাণ পাবে। আর যে মানবে না, সে ভোগ করবে শাস্তি।

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা'। একথার অর্থ— বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের জন্য রয়েছে শুভসমাচার— ক্ষমার ও সম্মানজনক জীবিকার। রসুল স. বলেছেন, ইসলাম পূর্ববর্তী পাপসমূহকে মুছে ফেলে। হজরত আমর ইবনে আস থেকে মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'এবং যারা প্রবর হবার উদ্দেশ্যে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী'। এখানে 'মুয়া'জিযীন' অর্থ ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে, উপস্থিত করে স্থবিরতা, বিশৃংখলা, বিরুদ্ধবাদিতা। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ— যারা আমার আয়াতকে প্রতিহত করতে চায় একথা বলে যে, কিয়ামত বলে কিছু নেই, জান্নাত-জাহান্নামও নেই। অথবা এর অর্থ— যারা নিজেদেরকে আমার আওতাবহির্ভূত বলে মনে করে, আরো ভাবে আমি তাদেরকে শাস্তি দিতে অক্ষম। কথাটির অর্থ এরকম হওয়াও সম্ভব যে— যারা আমার প্রতিপক্ষ হতে চায়, ভাবে তারাই বিজয়ী হবে, অব্যাহতি পাবে আমার শাস্তি থেকে।

আমি বলি, কথাটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে, যারা আমার রসুলকে অক্ষম করতে চায়, তিনি তো তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে চান, অথচ তারা স্বেচ্ছায় প্রবেশ করতে চায় জাহান্নামে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উদাহরণ এরকম— এক লোক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলো। ক্রমশঃ প্রসরমান ওই অগ্নির দিকে ছুটে আসতে লাগলো কীটপতঙ্গেরা। তারা উন্মাদের মতো ঝাঁপ দিতে লাগলো ওই আগুনে। লোকটি প্রাণপনে বাধা দিতে লাগলো তাদেরকে। কিন্তু সে বাধা তারা মানলো না। ক্ষান্ত হলো না আত্মাহুতি দান থেকে। আমিও ওই লোকটির মতো তোমাদের কটিদেশ আঁকড়ে ধরে বাধা প্রদান করি, তবুও তোমাদের অগ্নি-অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রক্রিয়া রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী বলেছেন, রসুল স. এর দিক থেকে যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং তাদের ওই বৈমুখ্য যখন রসুল স. এর নিকটে হয়ে পড়লো অত্যন্ত অস্বস্তিকর, তখন তিনি স. আল্লাহ্‌র নিকট কামনা করলেন এক সহজ পদ্ধতির, যা তাদেরকে নিকটবর্তী করবে। অর্থাৎ তিনি স. মনেপ্রাণে চাইতেন তারা পথপ্রাপ্ত হোক। এমতাবস্থায় একদিন তিনি কুরায়েশদের এক সমাবেশে উপস্থিত হলেন। সেখানে অবতীর্ণ হলো সুরা আন্‌নজম। তিনিও তৎক্ষণাৎ তা পাঠ করে শোনালেন। যখন উচ্চারণ করলেন 'আফা রআইতুমুল্ লাতা ওয়ালউ'জ্‌জা ওয়াল মানাতা ছুছালিছাতাল উখরা', তখন শয়তান তাঁর সম্প্রদায়ের হেদায়েতপ্রাপ্তির অতি আগ্রহের সুযোগকে কাজে লাগালো। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো 'তিলকাল গারানীকুল উ'লা ওয়া ইন্‌না শাফায়াতা হুন্‌না লাতুরতাবা'। শেষোক্ত বাক্যটি শুনে প্রীত হলো কুরায়েশেরা। রসুল স. তাঁর

www.eelm.weebly.com

তেলাওয়াত সমাপ্ত করলেন। সেজদা করলেন। কুরায়েশেরাও সেজদা করলো তাঁর সঙ্গে। সেজদা করলো না কেবল ওলীদ ইবনে মুগীরা ও সাঈদ ইবনে আস। তারা শুধু এক মুঠো কংকর কপালে ঠেকিয়ে বললো, এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারা দু'জনেই ছিলো অতি বৃদ্ধ। তাই তারা সেজদা করতে পারলো না। সমাবেশস্থল ত্যাগের প্রাক্কালে কাফের কুরায়েশরা বলাবলি করতে লাগলো, এতদিনে মোহাম্মদের মুখ থেকে আমাদের দেব-দেবীদের প্রশংসা উচ্চারিত হলো। আরে, আমরাও তো একথা মানি যে, আল্লাহ্ই সৃষ্টিকর্তা, জীবন-মৃত্যুদাতা ও রিজিক প্রদাতা। তার সঙ্গে প্রতিমাপূজা করি তো কেবল এজন্য যে, ওগুলো আল্লাহ্র দরবারে আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। এতোদিনে মোহাম্মদ আমাদের অধিকার স্বীকার করে নিলো। এখন থেকে আমরাও তার অধিকারকে স্বীকার করে নিলাম।

সেদিনই সায়াহ্নে হজরত জিবরাইল অবতীর্ণ হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! একি করলেন আপনি। কেনো সংযোজন করলেন আল্লাহ্র বাণীর সঙ্গে অন্যের কথা। রসুল স. ভীত ও চিন্তিত হলেন। তখন আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করলেন পরবর্তী আয়াত। সান্ত্বনা দিলেন তাঁকে। রসুল স. এর অনেক সাহাবী তখন হিজরতকারী হিসেবে বসবাস করছিলেন আবিসিনিয়ায়। রসুল স. এর সঙ্গে কুরায়েশদের সেজদা করার সংবাদ তাঁদের নিকটেও পৌঁছলো। তাঁরা মনে করলেন, কুরায়েশরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই খুশী হয়ে অনেকেই ফিরে আসতে শুরু করলেন মক্কায়। বললেন, মক্কাবাসীদের প্রতি রয়েছে আমাদের ভালোবাসা। তাদের ভুল ভাঙলো শহরের সন্নিকটে এসে। পুনরায় আবিসিনিয়া যাত্রা ছিলো দুষ্কর। তাই তারা গোপনে গোপনে অথবা অন্য কারো নিরাপত্তার আশ্বাসে প্রবেশ করলেন মক্কায়।

সূরা হাজ্জ্ঃ আয়াত ৫২

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

❒ আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রসূল কিংবা নবী প্রেরণ করিয়াছি তাহারা যখনই কিছু আবৃত্তি করিয়াছে তখনই শয়তান তাহাদিগের আবৃত্তিতে কিছু প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে, কিন্তু শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ্ তাহা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়;

---

www.eelm.weebly.com

ইমাম বাগবী লিখেছেন, হজরত জিবরাইল যাঁর নিকটে প্রত্যাদেশ নিয়ে আবির্ভূত হন, তিনিই রসুল। আর যিনি প্রত্যাদেশ পান স্বপ্ন অথবা ইলহামের মাধ্যমে, তিনি হচ্ছেন নবী। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেন নতুন শরিয়তের প্রবর্তক যিনি, তিনিই রসুল। আর 'নবী' শব্দটি নবী ও রসুল উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যিনি রসুল তিনি নবীও। কিন্তু সকল নবী রসুল নন। কেবলই নবী যাঁরা, তাঁরা প্রচার করেন তাঁদের পূর্ববর্তী রসুলের শরিয়ত। যেমন ছিলেন হজরত মুসা পরবর্তী এবং হজরত ঈসা পূর্ববর্তী সময়ের নবীগণ।

হজরত আবু জর বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সর্বপ্রথম নবী কে? তিনি স. বললেন, আদম। আমি বললাম, তিনি কি রসুলও ছিলেন? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। তিনি এমন নবী, যাঁর সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রসুলের সংখ্যা কতো? তিনি স. বললেন, একটি বৃহৎ দল, যাদের সংখ্যা তিনশত দশের অধিক।

হজরত আবু উমামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু জর বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! নবীগণের সর্বমোট সংখ্যা কতো? তিনি বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজারের একটি সুবৃহৎ দল, তন্মধ্যে রসুলের সংখ্যা হচ্ছে তিনশত পনেরো। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ এবং ইবনে রাহওয়াইহ্ তাঁদের মসনদে। ইবনে হাব্বান এবং হাকেম তাঁদের সিহাহ্ এবং মুসতাদ্রাকে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তোমার পূর্বে যে সকল রসুল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু আবৃত্তি করেছে, তখনই শয়তান তাদের আবৃত্তিতে কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! চিন্তিত হবেন না। এরকম ঘটনা নতুন নয়। আপনার পূর্ববর্তী রসুলগণের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটেছিলো। তাঁরা যখন তাঁদের উম্মতের পথপ্রাপ্তির অত্যুগ্র আগ্রহবশতঃ আল্লাহ্র বাণী থেকে কোনো আয়াত পাঠ করতেন, তখন শয়তান তার সঙ্গে তার নিজস্ব কথা প্রক্ষেপ করতো। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখনকার 'ইজা তামান্না' অর্থ যখনই আন্তরিক আকাংখা করতেন। কিন্তু কথাটির মর্মার্থ হবে এখানে 'যখনই কিছু আবৃত্তি করতেন' (বঙ্গানুবাদে সেকথাই লেখা হয়েছে)। উল্লেখ্য, অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন, 'তামান্না' অর্থ পাঠ করা বা আবৃত্তি করা। আর 'আমনিয়াতুন' অর্থও পাঠ। যেমন হজরত ওসমানের শাহাদত বরণের পর জনৈক কবি পদ বেঁধেছিলেন—

তামান্না কিতাবাল্লহি আউয়ালা লাইলাতিন
ওয়াআখারাহা লাক্বা হিমালি মাক্বাদি।

অর্থঃ রাত্রির প্রথমাংশে তিনি আল্লাহ্র কিতাব আবৃত্তি করেন, আর শেষাংশে সাক্ষাত করেন মৃত্যুর সঙ্গে।

www.eelm.weebly.com

'আলক্বাশ্ শাইত্বনু' অর্থ শয়তান কুমন্ত্রণা প্রক্ষেপ করেছে। অর্থাৎ নবীগণ যখন তাঁদের উম্মতের হেদায়েত প্রাপ্তির উদগ্র কামনা নিয়ে আল্লাহ্র কালাম তেলাওয়াত করেন, তখন শয়তান কর্তৃক কোনো কিছু প্রক্ষিপ্ত হয়। বায়যাবী লিখেছেন, শয়তান নবীগণের কামনার অনুকূলে অতি সূক্ষ্ম ভ্রান্তি প্রক্ষেপ করে, ফলে তাঁরা নিপতিত হন সাময়িক ভ্রান্তিতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, আল্লাহ্ তা বিদূরিত করেন'। একথার অর্থ— শয়তানের কুমন্ত্রণাজাত প্রক্ষেপণকে আল্লাহ্তায়ালা অপসারণ করেন। নিষ্ফল করে দেন তার অপপ্রচেষ্টা। এভাবে নির্দোষ ও নিরাপদ রাখেন তাঁর প্রিয় নবীগণকে।

শেষে বলা হয়েছে— 'অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন'। একথার অর্থ— এভাবে নবীগণকে হেফাজতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর বাণীকে রাখেন নিষ্কলুষ ও সুদৃঢ়। ফলে নবীগণও মুক্ত থাকেন সাময়িক ভ্রম থেকে। নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত থাকে তাঁদের নবীত্ব ও নিষ্পাপত্ব।

একটি চরম জটিলতাঃ অন্যান্য নবীর মতো রসুল স.ও নিষ্পাপ ছিলেন। আর ধর্মীয় নির্দেশনার মূল ভিত্তি হচ্ছে কোরআন। সুতরাং তাঁর কোরআন আবৃত্তিতে ভুল হওয়ার কথা কীভাবে মেনে নেয়া যায়? তাছাড়া এ সম্পর্কে রয়েছে আল্লাহ্পাকের সুস্পষ্ট নিরাপত্তা। যেমন—'লা ইয়াতিহিল বাত্বিলু মিম্বাইনি ইয়াদাইহি ওয়ালা মিন খলফিহী' (শয়তান তার কাছে আসতে পারে না, সামনে থেকেও নয়, পিছন থেকেও নয়)। তাই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত সম্পর্কে বর্ণিত বিবরণ উপেক্ষা করেছেন ভাষ্যকার বায়যাবী। তদুপরি তত্ত্বজ্ঞগণের দৃষ্টিতে আলোচ্য আয়াত অবতরণের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কিত বিবরণটি (শানে নুজুল) যথার্থ নয়। কিন্তু জালালউদ্দিন সুয়ূতি বলেন, বিবরণটি বায্যার, ইবনে মারদুবিয়া ও তিবরানী উপস্থাপন করেছেন সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

আমি বলি, বায্যার কর্তৃক বিবরণটি এসেছে একটি অকর্তিত সূত্রপ্রবাহের মাধ্যমে। এর অন্য কোনো সূত্রপ্রবাহ এরকম অকর্তিত নয়। আর অকর্তিত এই সূত্রপরম্পরাভূত উমাইয়া ইবনে খালেদ একজন সুপ্রসিদ্ধ ও বলিষ্ঠ বর্ণনাকারী। ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজির অপরিণতসূত্রে সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. তখন মক্কায়। অবতীর্ণ হলো সুরা আন্নজম। তিনি এক সমাবেশে তা আবৃত্তি করে শোনালেন। যখন পাঠ করলেন 'আফারাআইতুমুল্ লাতা ওয়াল উ'জ্জা ওয়া মানাতা ছ্ছালিছাতাল উখরা', তখন শয়তান তাঁর উচ্চারণের সঙ্গে সংযুক্ত করলো 'তিলকাল গারামীক্বু উ'লা ওয়া ইননা

www.eelm.weebly.com

শাফায়াতা হুন্না লা তুতাজ্বা'। মুশরিকেরা একথা শুনতে পেয়ে আনন্দিত হয়ে বললো, মোহাম্মদ ইতোপূর্বে এভাবে আমাদের উপাস্যগুলো সম্পর্কে উত্তম আলোচনা করেনি। তেলাওয়াত শেষ হলে রসুল স. আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সেজদা করলেন। মুশরিকেরাও সেজদা করলো তাঁর সঙ্গে। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। নুহাশ এই বিবরণটিকে অকর্তিত সূত্রে সম্পৃক্ত করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে। কিন্তু এই সূত্রপরম্পরাভূত ওয়াকেদী বর্ণনাকারীরূপে অগ্রাহ্য। আবু সালেহের মাধ্যমে কালাবী সূত্রে ইবনে মারদুবিয়াও বিবরণটিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে। কিন্তু কালাবীও অগ্রহণীয়।

বিবরণটি আরো উল্লেখ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আউফী সূত্রে ইবনে জারীর, মোহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইবনে শিহাব মাগাজী গ্রন্থে, মোহাম্মদ ইবনে কা'ব ও মোহাম্মদ ইবনে কায়েসের মাধ্যমে ইবনে জারীর এবং সুদ্দীর বরাত দিয়ে ইবনে আবী হাতেম। এসকল বিবরণের উদ্দেশ্য এক এবং এগুলোর সকল সূত্রপরম্পরাই হয় শিথিল, নয়তো কর্তিত। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে বায্যার, ইবনে মারদুবিয়া ও তিবরানীর বর্ণনাটি অবশ্য অকর্তিত ও শক্তিশালী, যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই আলোচনার শুরুতে।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, বহুসূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে অন্ততঃ এতটুকু আন্দাজ করা যায় যে, বিবরণটি অবশ্যই ভিত্তিবিবর্জিত নয়। এর মধ্যে আগেকার দু'টো অপরিণত সূত্রপরম্পরা বোখারী এবং মুসলিমের শর্তানুসারেও গ্রাহ্য। তন্মধ্যে তিবরানীর একটি সূত্র এরকমঃ ইউনুস ইবনে ইয়াজিদ—ইবনে শিহাব—জুহুরী—হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর। তাঁর অপর একটি সূত্র এসেছে ইবনে হারেছ—ইবনে হিশাম, এভাবে। এরকম আরো একটি সূত্রে তিবরানী ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ মুকীম ইবনে সুলায়মান—হাম্মাদ বিন সালমান—দাউদ—আবুহিন্দ—আবুল আলীয়া।

উল্লেখ্য, আলেমগণ বিভিন্নভাবে উদ্ভূত সন্দেহভাজনতাকে দূর করতে চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, রসুল স. তখন শয়তান কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত বক্তব্যটি উচ্চারণ করেননি। উপস্থিত সাহাবীগণও তাঁর মুখ থেকে এরকম শোনেননি। শয়তানই তাঁর তেলাওয়াতের সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত কথাগুলো সংযোজন করে মুশরিকদের কানে পৌঁছে দিয়েছিলো। আর তারা মনে করেছিলো কথাগুলো রসুল স. এর মুখ থেকেই উচ্চারিত হয়েছে।

কাতাদা বলেছেন, ওই সময় রসুল স. ছিলেন অর্ধচেতন অবস্থায়, ওই সুযোগে শয়তান তাঁর রসনা থেকে তার কথা গুলো তাঁর অনিচ্ছাকৃত অবস্থায় বের করে

www.eelm.weebly.com

দিতে পেরেছিলো। কিন্তু পরক্ষণেই আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এক বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, আবইয়াদ (শাদা শয়তান) নামক এক শয়তান তখন এক কূটচাল চেলেছিলো, ক্ষণিকের জন্য হলেও সফলও হয়েছিলো। আর এটা ছিলো আল্লাহ্‌ কর্তৃক তাঁর বান্দাদের প্রতি একটি পরীক্ষাও। এতে করে কেউ কেউ যেনো এ সন্দেহ না করেন যে, কোরআনে শয়তানের প্রক্ষেপণজাত কোনো কথা নেইতো! কিন্তু এমতো সন্দেহের অপনোদন ঘটিয়েছেন আল্লাহ্‌ নিজে পরবর্তী বাক্যে এভাবে 'কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, আল্লাহ্‌ তা বিদূরিত করেন'। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ শয়তানের কুমন্ত্রণাজাত এমতো সন্দেহ দূর করে দেন। প্রকাশ করে দেন যে, প্রক্ষিপ্ত কথাগুলো শয়তানের। এভাবে কোরআনের প্রকৃত বাণীকে তিনি রাখেন অমলিন, নিঃসন্দিগ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত। অতএব সম্পূর্ণ কোরআন বিশ্বাসযোগ্য। যদি না হয় তবে 'কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ্‌ তা বিদূরিত করেন'— এই আয়াত আবার বিশ্বাসযোগ্য হবে কীভাবে? এমতো সন্দেহের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে জ্ঞান ও প্রমাণের দাবি এই যে, আল্লাহ্‌পাক যখন কাউকে পয়গম্বর বানিয়ে প্রেরণ করেন, তখন দ্বীনের ভিত্তি কোরআন ও অন্যান্য কিতাব প্রচারের ক্ষেত্রেও তাঁকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেন। সুতরাং একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, পয়গম্বরগণ মাসুম ও মাহফুজ (নিষ্পাপ ও সুরক্ষিত)। তাই বিশুদ্ধচিত্ত জ্ঞানীগণ তাঁদের প্রচারিত কিতাবকে সত্য বলেই জানেন। সর্বান্তকরণে মানেন, এই কিতাব অবশ্যই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ মহাসত্য। সন্দিগ্ধতা থেকে তাঁদের হৃদয় সতত মুক্ত ও পবিত্র।

জ্ঞাতব্যঃ কাযী আয়াজ তাঁর 'আশ্‌শিফা' গ্রন্থে লিখেছেন, আলেমগণ কোনো অকর্তিত বিশুদ্ধ বর্ণনায় এঘটনার উল্লেখ করেননি। আর কোনো অকর্তিত ও বিশুদ্ধ সূত্রেও ঘটনাটি প্রমাণিত নয়। কেবল ঐতিহাসিকগণ ও তাফসীরকারেরা তাঁদের গ্রন্থে সত্য ও অসত্য ভালোভাবে যাচাই না করে বিভিন্ন বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে সেকারণেই। কাযী আবুবকর আলা মালেকী বলেছেন, কিছুসংখ্যক প্রবৃত্তি-প্রভাবিত বেদাতী তাফসীরকারের দিকে কোনো কোনো লোক ধাবিত হয়। তাদের সামনে বর্ণনাকারীরাও হয়ে যায় অপ্রস্তুত। ফলে ছিন্ন হয়ে যায় তাদের বর্ণনাসূত্র। শব্দ ব্যবহারে ঘটে বিশৃঙ্খলা। ধর্মদ্রোহীরা আবার এসকল কথাকেই জোরে-শোরে প্রচার করে। আবার তাদের মধ্যে রয়েছে বর্ণনা বৈষম্যও। যেমন— কেউ বলেছে ঘটনাটি ঘটেছিলো নামাজের মধ্যে। কেউ বলেছে সুরা আন্‌নজম তেলাওয়াতের প্রাক্কালে। কেউ কেউ আবার বলে, রসুল স. এর অন্তরে আপনা থেকেই প্রক্ষিপ্ত কথাগুলো উদিত হয়েছিলো। পুরো ব্যাপারটি ছিলো অনবধানতাজনিত। আবার কেউ বলে, রসুল স. এর উচ্চারণের অনুকরণে

www.eelm.weebly.com

শয়তানই ওই কথাগুলো বলেছিলো। রসুল স. সে কথা শোনার সাথে সাথে বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ। এরকম আয়াত আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেননি। কেউ কেউ বলে, শয়তান তাঁর স. মুখ দিয়ে ওই অপবচন উচ্চারণ করিয়েছিলো। হজরত জিবরাইল একথা শুনতে পেয়ে বলেছিলেন, আমি তো এগুলো আপনাকে পাঠ করে শোনাইনি। আবার ঘটনাটি সম্পৃক্ত করা হয় কেবল তাবেয়ীগণের সঙ্গে। কোনো সাহাবীর সঙ্গে এর সরাসরি সম্পৃক্তি নেই। আর বিবরণটির অধিকাংশ সূত্র শিথিল ও অযথার্থ। এর একটি সূত্রপরম্পরাই কেবল সুপরিণত স্তরে পৌঁছেছে সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস পর্যন্ত। কিন্তু এই সূত্র পরম্পরাটিও সন্দেহাতীত নয় এ কারণে যে, তিনি স. তখন কোথায় ছিলেন তা স্পষ্ট নয়— কাবা গৃহের চত্বরে, কুরায়েশদের অন্য স্থানের সমাবেশে, না মিনায়।

আবু বকর বায্‌যার বলেছেন, আমি জানিনা এই বিষয়টির এমন কোনো অকর্তিত সূত্র রসুল স. পর্যন্ত উপনীত হয়েছে, যার বর্ণনা করা জায়েয। কিন্তু উমাইয়া ইবনে খালেদ প্রমুখ একে অপরিণতরূপে প্রত্যয়ন করেছেন কেবল সাঈদ ইবনে যোবায়েরের সঙ্গে, হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে এর সম্পর্ক প্রত্যয়িত নয়। কেবল কালাবী আবু সালেহের বরাত দিয়ে একে হজরত ইবনে আব্বাস পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন। বায্‌যার আরো বলেন, এই একটি সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রেই এটি বর্ণনাযোগ্য নয়। আর প্রকাশ থাকে যে, কালাবীর বর্ণনা উপস্থাপন করা জায়েযই নয়। কারণ তা অত্যন্ত শিথিল ও পরিত্যাজ্য।

শেষে বলা হয়েছে,— 'এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ যেহেতু সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়, সেহেতু তিনি একথা ভালোভাবেই জানেন যে, কে বিশুদ্ধচিত্ত ও হেদায়েত প্রাপ্তির যোগ্য এবং কে এরকম নয়। তাই তিনি হেদায়েতের যোগ্যকে দান করেন হেদায়েত এবং পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্যকে করেন পথভ্রষ্ট। তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞাজাত এমতো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা রচনার অধিকার ও সাধ্য কারোরই নেই। আলোচ্য বাক্যের অর্থ এরকমও হতে পারে যে, আল্লাহ্ যে প্রত্যাদেশ তাঁর বার্তাবাহকগণের প্রতি অবতীর্ণ করেন এবং যা কিছু তিনি করতে ইচ্ছা করেন, সে সম্পর্কে তিনি অবশ্যই অবগত, কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। আর শয়তান তাঁর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোনো কিছু প্রক্ষিপ্ত করলে, তা-ও তিনি বিদূরিত ও ব্যর্থ করে দেন। এভাবেই তিনি তাঁর আদিঅন্তহীন বাণীকে করেন চির প্রতিষ্ঠিত। কারণ তাঁর প্রজ্ঞা অসীম, অনন্ত।

www.eelm.weebly.com

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ۙ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

❒ ইহা এই জন্য যে, শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি উহাকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাহাদিগের জন্য যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে, যাহারা পাষাণহৃদয়। সীমালংঘনকারীরা অশেষ মতভেদে রহিয়াছে;

❒ এবং এই জন্যও যে, যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে যে, ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য, অতঃপর তাহারা যেন উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাহাদিগের অন্তর যেন উহার প্রতি অনুগত হয়। যাহারা বিশ্বাসী তাহাদিগকে অবশ্যই আল্লাহ্ সরলপথে পরিচালিত করেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এটা এ জন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি তাকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যারা পাষাণ হৃদয়।' এখানে ফিত্নাতান' অর্থ পরীক্ষা বা বিপদ। 'মারদ্ব' অর্থ ব্যাধি— মুনাফিকদের অন্তরের সন্দেহ ও কপটতা। 'ক্বাসিয়াতি কুলুবুহুম' অর্থ পাষাণ হৃদয়। অর্থাৎ কঠিন অন্তর বিশিষ্ট অংশীবাদী। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে এই যে— শয়তানের পক্ষ থেকে প্রক্ষেপণ ও আল্লাহ্ কর্তৃক তার অপসারণ হচ্ছে কপটচারী ও অংশীবাদীদের জন্য একটি ভয়ানক পরীক্ষা, যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়াই তাদের ললাটলিখন। কারণ তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত ও সুকঠিন।

এরপর বলা হয়েছে— 'সীমালংঘনকারীরা অশেষ মতভেদে রয়েছে'। এখানে 'আজ্জলিমীন' (সীমালংঘনকারীরা) অর্থ রসুল স.এর বিরুদ্ধপক্ষ— মুনাফিক ও মুশরিক। আর 'শিক্বাক্ব' অর্থ সত্যবিরোধী অথবা রসুল স. এবং বিশ্বাসীগণের বিরুদ্ধাচারী। উল্লেখ্য, আগের বাক্যে 'যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে' এবং 'যারা পাষাণ হৃদয়' বলে মুনাফিক ও মুশরিকদের পরিচয় সুস্পষ্ট করা হয়েছে। তাই আলোচ্য বাক্যের শুরুতে 'ইন্নাহুম' (নিশ্চয়ই তারা) বললেই চলতো। কিন্তু বলা হয়েছে 'ইন্নাজ জলিমীনা' (সীমালংঘনকারীরা)। এরকম করা হয়েছে কেবল তাদের পরিচিতিকে অধিকতর স্পষ্ট করে তুলবার জন্যই।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'এবং এ জন্যও যে, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেনো জানতে পারে যে, এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত সত্য, অতঃপর তারা যেনো এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেনো এর প্রতি অনুগত হয়।' এখানে 'লি ইয়া'লামা' (তারা যেনো জানতে পারে) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি লুপ্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। এভাবে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যপ্রবাহ চলে এসেছে এই আয়াতেও। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— আমি শয়তানকে যেমন প্রক্ষেপণের শক্তিদান করি তেমনি সে প্রক্ষেপণ-প্রচেষ্টাকে ব্যর্থও করে দেই, সুপ্রতিষ্ঠিত করি আমার বাণীকে। আমার এমতো কর্মের উদ্দেশ্য দু'টি— ১. শয়তানের প্রক্ষেপণকে ব্যাধিগ্রস্ত কপট ও পাষাণহৃদয় অংশীবাদীদের জন্য দুর্লঙ্ঘ পরীক্ষা করে দেয়া ২. জ্ঞানবানদের হৃদয়ে সৃষ্টি করে দেয়া ইমানের দৃঢ়তা, যেনো তারা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে নিতে পারে যে, এই বাণী সত্য এবং আল্লাহ্র নিকট থেকে সমাগত। এভাবে তাদের হৃদয় যেনো আমার বাণীর প্রতি হয় সতত অনুগত।

এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'লিইয়া'লামা' এবং 'লিইয়াজ্আ'লা' শব্দ দু'টোর লাম হচ্ছে পরিণতি সূচক অব্যয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র এমতো কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে— অবিশ্বাসীদেরকে বিপদগ্রস্ত করা এবং বিশ্বাসীদেরকে দৃঢ় ইমান দান করা। এরকম বক্তব্য এসেছে অন্য আয়াতেও। যেমন— 'মুসাকে পেলো ফেরাউনের গৃহিনী। পরিণতিতে তিনি তাদের জন্য হয়েছিলেন শত্রু ও যাতনার কারণ।' এখানে লিইয়াকুনা (যেনো হয়) বাক্যে লাম অব্যয়টি ও পরিণতি সূচক, অর্থাৎ তাঁকে পাওয়ার পরিণতি হচ্ছে দুঃখ-যাতনা ও শত্রুতা।

'উতুল ই'লমা' (যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে) বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ওই সকল লোককে, যারা আল্লাহ্র নির্দেশাবলী সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। সুদ্দী বলেন, কথাটির মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদেরকে, যারা শয়তানের প্রক্ষেপণকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়াকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

'ইন্নাহু' অর্থ— অবশ্যই এটা। অর্থাৎ এই বাণীকে আল্লাহ্পাকই যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— শয়তানের পক্ষ থেকে প্রক্ষেপণ বা কুমন্ত্রণাদানের নিয়মটি একটি চিরাচরিত সত্য। এ নিয়ম বলবৎ রয়েছে মানুষের সূচনালগ্ন থেকে, হজরত আদমের সময় থেকে।

'ফা ইউ'মিনু বিহী' অর্থ তাদের অন্তর যেনো তার প্রতি (আল্লাহ্র বাণীর প্রতি) সুদৃঢ়রূপে অনুগত হয়। অর্থাৎ ওই সকল জ্ঞানী যেনো আল্লাহ্র এই পবিত্র বাণী সম্ভারকে গ্রহণ করে অন্তরের সঙ্গে। বিশ্বাস করে, এই কালাম নিশ্চয় আল্লাহ্র। অথবা তাঁরা যেনো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আল্লাহ্কে। 'ফা ইউ'মিনু বিহী' কথাটির

www.eelm.weebly.com

'ফা' এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী বাক্যের 'ইয়া'লামা' এর সংযোগ থাকার কারণে এ অর্থটিও প্রকাশ পায় যে, কেবল অবগতির নাম ইমান নয়, বরং ইমান হচ্ছে হৃদয়ের বৈভব, যার প্রাপ্তি ঘটতে পারে কেবল আল্লাহ্র বিশেষ দয়ায়। জ্ঞানীগণ প্রথমে অবগত হন, তারপর তা ধারণ করেন হৃদয়ে। ফলে আল্লাহ্র বাণীর প্রতি তাদের হৃদয় থাকে সতত অনুগত ও প্রশান্ত।

আর 'ফাতুখবিতা' অর্থ— অক্ষম করে। অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হয় ভীতি। অনুসারী হয় আল্লাহ্র নির্দেশের । ফলে তাদের অন্তর হয় নিষ্কলুষ।

শেষে বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাসী তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্ সরলপথে পরিচালিত করেন'। একথার অর্থ— ইমানদারেরা যখন দোদুল্যচিত্ততার সম্মুখীন হন, তখন আল্লাহ্ই তাদেরকে দেখান ন্যূনতা ও বাহুল্যবিমুক্ত সরল সঠিক পথ।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৫৫, ৫৬, ৫৭

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ۝ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

❒ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা উহাতে সন্দেহ পোষণ হইতে বিরত হইবে না, যতক্ষণ না উহাদিগের নিকট কিয়ামত আসিয়া পড়িবে আকস্মিকভাবে, অথবা আসিয়া পড়িবে এক ভয়ংকর দিনের শাস্তি।

❒ সেই দিন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হইবে আল্লাহেরই; তিনিই উহাদিগের বিচার করিবেন। সুতরাং যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাহারা অবস্থান করিবে সুখদ কাননে,

❒ এবং যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাহাদিগেরই জন্য থাকিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কাফেরেরা রসুল স. অথবা কোরআন, অথবা ইমানদারগণ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহে নিপতিতবলে, এ আবার কেমন রসুল! একবার আমাদের পূজিত প্রতিমাগুলোর প্রশংসা করে, আবার বলে, এগুলো শয়তানের পক্ষ থেকে প্রক্ষিপ্ত। তাদের এমতো সন্দেহ স্বভাবজাত। তাই তা বিদূরিত হবে না, যতক্ষণ না কিয়ামত আসবে, অথবা আসবে ভয়ংকর কোনো আযাব।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'মিররইয়াত্' অর্থ সন্দেহ। আর 'মিনহু' (এতে) বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে, কোরআনকে, অথবা বিশ্বাসীগণকে। 'আস্সায়াত' অর্থ শাস্তির সময় বা মৃত্যুর সময়। আর 'ইয়াওমিন আ'ক্বীম' অর্থ কিয়ামত দিবস। ইকরামা ও জুহাক বলেছেন, 'ইয়াওমিন আক্বীম' অর্থ ওই দিবস, যে দিবস শেষে রাত্রি আসে না। অর্থাৎ কিয়ামত দিবস। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'আস্সায়াত' অর্থ কিয়ামত এবং 'আ'ক্বীম' অর্থ বদর দিবস, যেদিন অবিশ্বাসীদের ভাগ্যে ঘটেছিলো ঘোর অকল্যাণ। শব্দটির অভিধানগত অর্থ নিষিদ্ধ। 'রিহুন আক্বীম' অর্থ বৃষ্টিহীন বাতাস। এরকম হওয়াও সম্ভব যে, এখানে 'আস্সায়াত' এবং 'ইয়াওমিন আ'ক্বীম' দুটোর অর্থই কিয়ামত দিবস। কেবল সেদিনের ভয়াবহতাকে প্রকট করে তুলবার জন্যই শেষে সংযোজন করা হয়েছে 'ইয়াওমিন আক্বীম'।

পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'সে দিন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্রই, তিনিই তাদের বিচার করবেন সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তারা অবস্থান করবে সুখদ কাননে'। একথার অর্থ— সেই কিয়ামতের সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কর্তৃত্বই থাকবে না। তিনি তখন সকলের বিচার করবেন। বিশ্বাসীদেরকে পুরস্কৃত করবেন এবং তিরস্কৃত করবেন অবিশ্বাসীদেরকে।

এখানে 'ফা উলাইকা' কথাটির 'ফা' অক্ষরটি একথাই প্রমাণ করে যে, বিশ্বাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ্র অনুগ্রহে, তাদের আমলের বিনিময়ে নয়। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের মন্দ আমল হবে তাদের শাস্তির কারণ। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'লাহুম আ'জাবুন'। 'হুম কী আ'জাবিন' এরকম কথা সেখানে আসেনি।

'জান্নাতিন নায়ীম' অর্থ সুখদ কাননে বা জান্নাতের উদ্যানে। বলা বাহুল্য, সুখদ কাননের অধিকার লাভ হবে আল্লাহ্তায়ালার দয়ায়। রসুল স. একবার বললেন, সৎ আমল কাউকে পরিত্রাণ প্রদান করবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনাকেও কি? তিনি স. বললেন, না। আমাকেও নয়। কিন্তু আমি যে তাঁর অপার ও অনুগ্রহের দ্বারা আসত্তাআবৃত। বোখারী, মুসলিম।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আরো এসেছে, জননী আয়েশা বলেন, একবার রসুল স. জানালেন, সঠিক পথে চলো, আনন্দিত হও এবং মনে রেখো, কাউকে তার আমল জান্নাতে নিয়ে যাবে না। উপস্থিত সহচরবৃন্দ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আপনাকেও কি নয়? তিনি স. জবাব দিলেন, না। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমার অস্তিত্ব যে আল্লাহ্র ক্ষমা ও অনুগ্রহে সম্পূর্ণ আবৃত। হজরত জাবের থেকে মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এবং তিবরানী হজরত ইবনে আবী মুসা, শরীক ইবনে তারেক, উমামা ইবনে শরীক ও আসাদ ইবনে করজ সূত্রে।

www.eelm.weebly.com

একটি সন্দেহঃ আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'তোমরা আপন আমল দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করো' (সুরা নাহল)। এতে করে কি একথা প্রমাণিত হয় না যে, আমল দ্বারাই জান্নাত লাভ হয়?

সন্দেহের জবাবঃ জান্নাতে রয়েছে মর্যাদার বিভিন্ন স্তর। ওই সকল স্তর লাভ হবে সৎ আমলের বিনিময়ে। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ ও সেখানে স্থায়ী হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহনির্ভর। হান্নাদ তাঁর 'আজজুহুদ' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্র ক্ষমা ও অনুগ্রহে পুলসিরাত পাড়ি দিবে, আল্লাহ্র দয়ায় লাভ করবে বেহেশত এবং মর্যাদা লাভ করবে আপনাপন আমলের দ্বারা। আউন ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে আবু নাঈমও এরকম বর্ণনা এনেছেন।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'এবং যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদেরই জন্য থাকবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি'। একথার অর্থ— এবং যারা সত্য ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃত ও আমার প্রত্যাদেশিত বাণী প্রত্যাখ্যানে অনড়, তাদের জন্যই অপেক্ষমাণ রয়েছে দোজখের অবমাননাকর আযাব।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৫৮, ৫৯

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝

❐ যাহারা গৃহ ত্যাগ করিয়াছে আল্লাহের পথে এবং পরে নিহত হইয়াছে অথবা মৃত্যু বরণ করিয়াছে তাহাদিগকে আল্লাহ্ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করিবেন; এবং আল্লাহ্, তিনি তো সর্বোৎকৃষ্ট জীবিকাদাতা।

❐ তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করিবেন যাহা তাহারা পছন্দ করিবে এবং আল্লাহ্ তো প্রজ্ঞাময়, সহনশীল।

'হাজারু' অর্থ হিজরত করেছে বা ধর্ম রক্ষার নিমিত্তে ত্যাগ করেছে স্বভূমি ও স্বজন। 'ফী সাবীলিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র পথে বা আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনার্থে। 'ক্বুতিলু' অর্থ ধর্মযুদ্ধে নিহত। 'মাতূ' অর্থ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু। 'লাইয়ারযুক্বান্নাহুমু-ল্লহু রিযক্বান হাসানা' অর্থ আল্লাহ্ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন তাদেরকে। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— যারা জীবন ও ধর্ম রক্ষার্থে ত্যাগ করেছে তাদের স্বদেশ ও স্বজন কেবল আল্লাহ্র

www.eelm.weebly.com

সন্তোষ অর্জনের অভিপ্রায়ে, এরপর জীবনদান করেছে জেহাদে অথবা বরণ করেছে স্বাভাবিক মৃত্যু, আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্যই চিরসুখময় বেহেশতে প্রদান করবেন সর্বোৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ। আর আল্লাহ্ই তো সর্বোৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ প্রদাতা।

পরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থলে দাখিল করবেন, যা তারা পছন্দ করবে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র পরিতোষকামী ওই সকল হিজরতকারীকে আল্লাহ্পাক প্রবেশ করাবেন বেহেশতে, যা তাদের নিকটে হবে পছন্দনীয়। অথবা তাদেরকে দেয়া হবে ওই অনুগ্রহসম্ভার যা কোনো চক্ষু দর্শন করেনি, কোনো কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং অনুভব করেনি কারো অন্তর। ওই অনুগ্রহসম্ভার হবে তাদের একান্ত মনোপুত।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ তো প্রজ্ঞাময়, সহনশীল'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তাঁর প্রতিপক্ষদের অবস্থা ভালোভাবে জানেন, কারণ তিনি প্রজ্ঞাময়, কিন্তু তাদের উপর তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রয়োগ করা তাঁর বিধান নয়, কারণ তিনি সহিষ্ণু।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৬০, ৬১, ৬২

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝

❒ ইহাই হইয়া থাকে; কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হইয়া যথোপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হইলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাহাকে সাহায্য করিবেন; আল্লাহ্ নিশ্চয়ই পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

❒ উহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে পরিণত করেন দিবসে এবং দিবসকে পরিণত করেন রাত্রিতে; এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা।

❒ এই জন্যও যে, আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে উহা তো অসত্য, এবং আল্লাহ্, তিনিই তো সমুচ্চ, মহান।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এরকমই হয়ে থাকে; কোনো ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে যথোপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করলে ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে আল্লাহ্

www.eelm.weebly.com

অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন'। একথার অর্থ— অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে। পুনরায় যদি সে অত্যাচারিত হয়, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই ওই অত্যাচারিতকে সাহায্য করবেন।

উল্লেখ্য, অত্যাচারের বিনিময়ে সমপরিমাণ অত্যাচার অন্যায় নয়। তবুও এমতো বিনিময়কে এখানে বলা হয়েছে 'আ'ক্বাব' বা প্রতিশোধ। কার্যকারণ ভিন্ন হলেও উভয়ের মধ্যে রয়েছে আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ নিশ্চয় পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।' একথার অর্থ— প্রতিশোধস্পৃহাও এক ধরনের প্রবৃত্তিজাত ক্ষোভ। আর প্রবৃত্তিজাত ক্ষোভও এক ধরনের পাপ। কিন্তু অত্যাচারিতের এ ধরনের প্রবৃত্তিকে আল্লাহ্ পাপ বলে গণ্য করবেন না। কারণ তিনি পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। এরকমও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ এ ধরনের প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছুক মনোবৃত্তিকে ক্ষমা করে দেয়া এবং এ ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করাকে নিজের জন্য সমীচীন ও উত্তম বলে সাব্যস্ত করেছেন। এরকম বক্তব্য এসেছে অন্য আয়াতেও। যেমন— 'যে ধৈর্য ধারণ করে ও ক্ষমা করে, এটা নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ বদান্যতা। আর প্রতিশোধ গ্রহণ উত্তমতার পরিপন্থী। তবুও এরকম করলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল' (সুরা শুআরা)। এই আয়াতেও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে— আল্লাহ্ যখন সর্বশক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করেন, তখন বান্দারও উচিত, যে তার ক্ষতি করেছে তাকে ক্ষমা করে দেয়া। এটাই সর্বোত্তম।

'আ'ফুউন' অর্থ পাপ মোচনকারী। আল্লাহ্ যে শাস্তি দিতেও সক্ষম, সেই ইঙ্গিতটিও নিহিত রয়েছে শব্দটির মধ্যে। কারণ তিনিই 'আ'ফুউন' যার রয়েছে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা।

বাগবী লিখেছেন, হাসান আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন এভাবে— যে মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, যেভাবে মুশরিকেরা তার সঙ্গে যুদ্ধ করে, এরপর পুনরায় যদি তার উপরে অত্যাচার করা হয়, দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন।

কোনো কোনো হাদিস বিশারদ বর্ণনা করেছেন, একবার কতিপয় অংশীবাদী বিশ্বাসীগণের একটি দলের উপরে আক্রমণ করে বসলো ২৮ শে মহররমে। মহররম মাস সম্মানিত। এ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ বৈধ নয়। তাই বিশ্বাসীরা তাদেরকে বললো, ক্ষান্ত হও। এ মাসে তো যুদ্ধ-বিগ্রহ অবৈধ। কিন্তু অংশীবাদীরা একথা মানলো না। বন্ধ করলো না তাদের আক্রমণ। বিশ্বাসীরাও সুদৃঢ় থাকলো স্বস্থানে। আল্লাহ্পাকও তাদেরকে সাহায্য করলেন।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, এমতাবস্থায় 'পাপমোচনকারী, ক্ষমাশীল' এর মর্মার্থ হবে— নিষিদ্ধ মাসে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছে বলে আল্লাহ্পাক তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কারণ তিনি পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

পরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— 'এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে পরিণত করেন দিবসে এবং দিবসকে পরিণত করেন রাত্রিতে।' একথার অর্থ— তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিধর। তাই তিনি রূপান্তর করতে পারেন পরস্পর বিরুদ্ধতাকে। যেমন রাতকে করেন দিন এবং দিনকে করেন রাত। ইচ্ছেমতো একদিকে যতটুকু বাড়ান, ততটুকু কমান অপর দিকে। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— তিনি আলোকিত স্থানে ক্রমপ্রসারমান সূর্যাস্ত প্রবর্তন করে নামিয়ে আনেন রাতের অন্ধকার এবং অন্ধকারাচ্ছাদিত স্থানে সূর্যাস্তের বিস্তৃতি ঘটিয়ে নিয়ে আসেন দিবসের আলোকোজ্জ্বলতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা'। একথার অর্থ— প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং যার উপরে প্রতিশোধ কার্যকর করা হয়, তিনি উভয়ের কথা শোনেন। অথবা শোনেন বিশ্বাসীগণের প্রার্থনা এবং তা গ্রহণও করেন। আর দেখেন উভয়ের আমল। সুতরাং কারো আমলই তিনি বিনিময়বিহীন অবস্থায় ছেড়ে দিবেন না। তাদের আমল অনুসারে তাদের জন্য নির্ধারণ করবেন স্বস্তি অথবা শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে — 'এটা এজন্যও যে, আল্লাহ্ ; তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা তো অসত্য'। এখানে 'আল হাক্ক' অর্থ স্বতোৎসারিত সত্য অস্তিত্ব, যিনি এক, একক ও অংশীবিহীন। আর তিনিই অস্তিত্ব দান করেছেন সৃষ্টির সকল কিছুকে। তিনি সর্বজ্ঞও। সকল পূর্ণতা ও শুভবৈশিষ্ট্য তাঁর সত্তাসম্পৃক্ত। কেননা তিনি সর্বশক্তিধরও । তাঁর শ্রবণ-দর্শনও আনুরূপ্যবিহীনরূপে সমগ্র সৃষ্টিকে পরিবেষ্টনকারী। তাই তাঁর সত্তা, গুণাবলী, কার্যাবলী— সকল কিছুই সত্য, মহাসত্য।

'আল বাত্বিল' অর্থ অসত্য, অস্তিত্বহীন। অর্থাৎ সত্তাগতভাবে যা অস্তিত্বশীল নয়, বরং যার অস্তিত্ব সম্ভাব্য, অত্যাবশ্যক নয়— অস্তিত্ব বিদ্যমানতার ব্যাপারে যা সত্যের (আল্লাহ্র) মুখাপেক্ষী। অথবা 'বাত্বিল' অর্থ অস্তিত্বহীনতা। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকলের ও সকল কিছুর অস্তিত্ব অসত্য, ভিত্তিহীন।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্, তিনিই তো সমুচ্চ, মহান'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ অংশীবাদিতার ধারণা থেকে অতুলনীয়রূপে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। এখানে 'আ'লী' অর্থ সমুচ্চ এবং 'কবীর' অর্থ মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

www.eelm.weebly.com

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

❒ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ বারি বর্ষণ করেন আকাশ হইতে যাহাতে সবুজ শ্যামল হইয়া উঠে ধরিত্রী। আল্লাহ্ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, খবর রাখেন সর্ব বিষয়ের।

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই, এবং আল্লাহ্, তিনিই তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ্ বারি বর্ষণ করেন আকাশ থেকে, যাতে সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে ধরিত্রী'? এই প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (ইস্তেফহামে ইনকারী)। প্রশ্নাকারে এখানে এই নির্দেশনাটি দেয়া হয়েছে যে— দ্যাখো, দেখে নাও, মেনে নাও। এর মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! তুমি, তোমরা কি লক্ষ্য করো না, অনুধাবন করো না ও জানো না যে, আল্লাহ্ই আকাশ থেকে বৃষ্টি নামিয়ে পৃথিবীর মৃত্তিকাকে করে তোলেন সুজলা, সুফলা ও শ্যামলিমাময়?

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, খবর রাখেন সর্ববিষয়ের।' আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় আল্লাহ্র আনুরূপ্যহীন জ্ঞান ও শক্তিমত্তার সর্বত্রগামিতা ও সর্বত্র পরিব্যপ্ততা। এখানে 'লাত্বীফ' অর্থ সূক্ষ্ম জ্ঞান, গোপন রহস্যের পরিজ্ঞান। অথবা 'লাত্বীফ' এমন অপার দয়া, যা ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকলের ও সকল কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর 'খবীর' অর্থ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল পরিকল্পনা, সৃষ্টির সকল অবস্থা ও তাদের জীবনোপকরণ নির্ধারণ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। অর্থাৎ যাঁর নির্ভুল অবহিতি রয়েছে সৃষ্টির সকল বিষয়ের।

পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই, এবং আল্লাহ্, তিনিই তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ই আকাশসমূহ ও মেদিনীমণ্ডলসহ সকল সৃষ্টির একক সৃজয়িতা। তাঁর সৃজন গুণসহ অন্য সকল গুণই মুখাপেক্ষিতারহিত। আর সত্তাগতভাবে তিনিই প্রশংসার্হ, যে প্রশংসার সঙ্গে কারো বা কোনোকিছুর কোনো প্রকার সংশ্লিষ্টি ও সম্পৃক্তি নেই।

www.eelm.weebly.com

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ۝

❒ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়কে এবং তাঁহার নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানসমূহকে তোমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছেন, এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাহাতে উহা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁহার অনুমতি ব্যতীত। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

❒ এবং তিনি তো তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন; অতঃপর তিনিই তোমাদিগের মৃত্যু ঘটাইবেন, পুনরায় তোমাদিগকে জীবন দান করিবেন। মানুষ তো অতি মাত্রায় অকৃতজ্ঞ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মানুষ একথা কেনো অনুধাবন করতে চেষ্টা করে না যে, পৃথিবীতে বিচরণশীল আরোহণযোগ্য পশুকুল, অন্যান্য বাহন এবং সমুদ্রগামী সকল জলযানের উপরে তাদেরকে দেয়া হয়েছে নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও ক্ষমতা, যাতে তারা এগুলোর দ্বারা উপকৃত হয়। আর তিনিই আকাশকে রেখেছেন অচঞ্চল, যাতে তা স্থানচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে পতিত না হয়, বা পৃথিবীকে আঘাত না করে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। মানুষের স্থলভাগের এবং জলভাগের চলমানতাকে নির্বিঘ্ন রাখা হচ্ছে তাঁর ওই অপার দয়ার এক নিদর্শন, তাঁর সার্বভৌমত্ব ও এককত্ব বুঝানোর মাধ্যম সমূহের মধ্যে এক অনন্য মাধ্যম।

প্রকাশ থাকে যে, গগনমণ্ডলের জড় প্রকৃতি, এ ধরাধামের জড় প্রকৃতির অনুরূপ। পৃথিবী যেমন ধ্বংসশীল, পতনশীল, নিম্নমুখী, তেমনি আকাশও পতনশীল নিম্নমুখী। তবে বিধাতার অসামান্য মহিমা বলে তা পতন থেকে সুরক্ষিত। এখানে 'তিনি আকাশ স্থির রাখেন' কথার ব্যাখ্যা ব্যপদেশে আল্লামা বায়যাবী বলেন— আকাশের জড় প্রকৃতিই হচ্ছে উর্ধ্বমুখী। উর্ধ্বমুখীনতাই তার অভিলাষ। তিনি আরো বলেন, মহাপ্রলয়ের দিন নিম্নমুখী হওয়ার অনুমতি পাবে আকাশ।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, মহাপ্রলয়ের দিন এ ধরাপৃষ্ঠে আকাশের পতন প্রামাণ্য নয়। তবে ফেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়া তেলের গাদের মত হওয়া বা মোচড়ানো কাগজের মতো দুমড়ে মুচড়ে যাওয়ার প্রমাণ অবশ্যই বিদ্যমান।

উত্তম সমাধান হচ্ছে— ইসতেস্নার ব্যতিক্রমক চায়না ব্যতিক্রমের উপস্থিতিকে। আবার অবিদ্যমানতাকেও নয়। সেক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, তাঁর আদেশ ব্যত্রীত আকাশ পতিত হবে না ভূমিতলে। অর্থাৎ আকাশ যতোক্ষণ স্থির থাকবে ততোক্ষণ তার পতিত হওয়ার আদেশ থাকবে অনুপস্থিত। ফলে কোন সময়েই আকাশের পতিত হওয়ার আদেশ কামনা করা যায় না।

পরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'এবং তিনি তো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন।' একথার অর্থ— হে মানুষ! প্রথমে তো তোমরা ছিলে জড় পদার্থ তুল্য অপ্রাণ। তিনিই তোমাদের শুক্র, মাংশপিণ্ড, মানবাকার ইত্যাদি অধ্যায় শেষে তোমাদেরকে পরিগঠিত করেছেন দেহ ও আত্মা সম্বলিত পরিণত ও জীবন্ত মানুষরূপে। তারপর নির্ধারিত আয়ুষ্কাল শেষে তিনিই ঘটাবেন তোমাদের মৃত্যু। এরপর পুনরুত্থিত করবেন পরকালে।

শেষে বলা হয়েছে— 'মানুষ তো অতি মাত্রায় অকৃতজ্ঞ।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ মানুষের জীবন ও মৃত্যুকে ভরপুর করে দিয়েছেন অসংখ্য নেয়ামতে। নেয়ামতের মহাসমুদ্রে এভাবে আসত্তা নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞচিত্ত নয়। উল্লেখ্য, জীবনের মতো মৃত্যুও একটি অমূল্য নেয়ামত। কারণ মৃত্যুর পরেই উন্মুক্ত হয় আখেরাতের অনন্ত সুখসম্ভার লাভের দুয়ার। আর তা হতে পারে কেবল পুনরুত্থানের পরেই। তাই জীবন-মৃত্যু-পুনরুত্থানের কথা এখানে ধারাবাহিকভাবে বলা হয়েছে। নেয়ামত লাভের এই পথপরিক্রমা সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ অসচেতন। তাই শেষে বলা হয়েছে 'মানুষ তো অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ'। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— জীবন-মৃত্যু-পুনরুত্থানের এই সুনির্ধারিত প্রক্রিয়াই আল্লাহ্তায়ালার এককত্ব, সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমানতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অথচ অবিশ্বাসীরা কেমন অবলীলায় এ সকল কিছুকে উপেক্ষা করে চলে। এটাই প্রমাণ যে, তারা অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৬৭, ৬৮, ৬৯

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ۝ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

www.eelm.weebly.com

❒ আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি নিয়ম-কানুন— যাহা উহারা পালন করে; সুতরাং উহারা যেন তোমার সহিত বিতর্ক না করে এই ব্যাপারে। তুমি উহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, তুমি তো সরল পথেই আছ।

❒ উহারা যদি তোমার সহিত বিতণ্ডা করে তবে বলিও, 'তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।'

❒ 'তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদিগের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন।'

পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে আলোচ্য আয়াতের সরাসরি প্রসঙ্গতঃ কোনো সম্পর্ক নেই। তাই বাক্যের শুরুতে এখানে সংযোজক অব্যয় 'ওয়া' (এবং) ব্যবহৃত হয়নি।

প্রথমে বলা হয়েছে— ' আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি নিয়ম কানুন যা তারা পালন করে।' হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একটি শরিয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা তারা মেনে চলে। এখানে 'মানসাকান' অর্থ নিয়ম কানুন বা শরিয়ত। কেউ কেউ শব্দটির অর্থ করেছেন— খুশীর দিন। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, শব্দটির অর্থ কোরবানীর স্থান, যেখানে কোরবানী করা হতো। কেউ কেউ বলেছেন, ইবাদতের স্থান। কেউ আবার বলেছেন, মেলা বা সমাবেশ। আরবী ভাষায় 'মানসাকান' বলে ওই স্থানকে, যেখানে মানুষ ভালো অথবা মন্দ কাজের উদ্দেশ্যে একত্রিত হতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। হজের স্থানে প্রতি বছর মানুষ একত্র হয় বলে ওই একত্রায়নকে বলে 'মানাসিকে হজ'।

কামুস প্রণেতা লিখেছেন, নুসুক অর্থ ইবাদত। 'আরিনা মানাসিকানা' অর্থ আমাদেরকে ইবাদতের স্থানসমূহ দেখিয়ে দিন। 'মানসাক' অর্থ জবেহ্ অথবা জবেহের স্থান। 'নাসিকাতুন যাবিহাতুন নুসুক' অর্থ মেলার স্থান। আর 'মানসাক' অর্থ উপবেশন স্থল।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তারা যেনো তোমার সঙ্গে বিতর্ক না করে এ ব্যাপারে।' এখানে 'আলআমর' অর্থ ধর্মীয় বিধান, জবেহের নিয়ম। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনার শত্রুকুল মূর্খ ও বিতণ্ডাপ্রবণ। যদি তারা জ্ঞানী হতো তবে অশালীনভাবে ধর্মীয় ব্যাপারে আপনার সঙ্গে বচসায় লিপ্ত হতো না, বুঝতে পারতো, আপনার প্রবর্তিত ধর্ম বিতর্কাতীত।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বুদাইল ইবনে ওরাকা, ইয়াযীদ ইবনে খানিস ও বশীর ইবনে সুফিয়ান সম্পর্কে। তারা সাহাবীগণকে বলেছিলো, যে পশুগুলোকে তোমরা নিজ হাতে হত্যা করো, সেগুলো খাও, কিন্তু আল্লাহ্ যেগুলোর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটান সেগুলো খাও না (এ কেমন কথা)।

জুজায বলেছেন, প্রকাশ্যতঃ মনে হয় এখানে বিতর্ক পরিহার করতে বলা হয়েছে আরববাসীদেরকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিতর্ক পরিহারের শুভ নির্দেশনাটি এখানে প্রযোজ্য হবে রসুল স. এর প্রতি। আরববাসীরা বলে, অমুক ব্যক্তি যেনো তোমার সঙ্গে বিতর্ক না করে। এ কথার অর্থ হবে— তুমি তার সঙ্গে বিতর্ক কোরো না। মোটকথা বিতর্কের সঙ্গে জড়িত থাকে উভয় পক্ষ। বিতর্ক কখনো এক দিক থেকে হয় না। সুতরাং 'লা ইয়াদ্বরিবান্নাকা যায়দুন' এর অর্থ এরকম হতে পারে না যে— তুমি জায়েদকে মেরো না। হ্যাঁ, যদি 'লা ইউদ্বারিবান্নাকা যায়দুন' বলা হয়, তবে তার অর্থ 'তুমি জায়েদকে মেরো না'। —এরকম বলা যাবে। বিবাদ-বিতর্ক সংঘটিত হয় বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের মাধ্যমে। এর মধ্যে একজন সরে দাঁড়ালে বিবাদের অস্তিত্বই আর থাকে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করো, তুমি তো সরল পথেই আছো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল বিভ্রান্তদেরকে আল্লাহ্র এককত্ব, আল্লাহ্র ইবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্যভাজনতার দিকে আহ্বান করুন। নিঃসন্দেহে আপনি ওই সরল পথের পথিক, যা নিয়ে যায় আল্লাহ্র নৈকট্যের দিকে।

পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে—'তারা যদি তোমার সঙ্গে বিতণ্ডা করে তবে বোলো, তোমরা যা করো, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত'। একথার অর্থ— হে আমার বার্তাবাহক! তারা যদি বচসায় লিপ্ত হয়, তবে আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা যে বিষয়ে আমার সঙ্গে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছো, সে সম্পর্কে যথাসময়ে আল্লাহ্ই তোমাদেরকে এর প্রতিফল প্রদান করবেন। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে অংশীবাদীদেরকে করা হয়েছে মৃদু ভর্ৎসনা। আয়াতটি জেহাদের বিধান প্রবর্তনের পূর্বের।

এরপরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করে দিবেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় বচনবাহক! আপনি আরো বলুন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ই এ বিতর্কের সমাধান করে দিবেন, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন যে, কে সত্য এবং কে সত্য নয়। এভাবে সেদিন সত্য-অসত্যের

www.eelm.weebly.com

দ্বন্দ্বদীর্ণতার চির অবসান ঘটবে। সত্যানুসারীরা হবে পুরস্কৃত এবং অসত্যানুগামীরা হবে তিরস্কৃত। উল্লেখ্য, সত্য-অসত্যের পার্থক্যসূচক প্রমাণ রয়েছে পৃথিবীতেই, আর মহাবিচারের দিবসে প্রকাশিত হবে এর বাস্তবরূপ।

'তাখতালিফুন' অর্থ মতভেদ করছে। 'ইখতেলাফ' অর্থ মতভেদ, পরস্পর বিরোধী মনোভাব।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৭০, ৭১, ৭২

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ۝ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

❒ তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে আল্লাহ্ তাহা অবগত আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; ইহা আল্লাহের নিকট সহজ।

❒ এবং উহারা ইবাদত করে আল্লাহের পরিবর্তে এমন কিছুর যাহার ইবাদতের সমর্থনে তিনি কোন দলিল প্রেরণ করেন নাই, এবং যাহার সম্বন্ধে তাহাদিগের কোন জ্ঞান নাই। বস্তুতঃ সীমালংঘনকারীদিগের কোন সাহায্যকারী নাই।

❒ এবং উহাদিগের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইলে তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের মুখ-মণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখিবে। কেহ উহাদিগের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করিলে তাহার প্রতি উহারা মার-মুখো হইয়া উঠে। বল, 'তবে কি আমি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দিব?' —ইহা আগুন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ সতর্ক করিয়া দিয়াছেন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে। এবং ইহা কত নিকৃষ্ট আবাস স্থল!

প্রথমেই উপস্থাপন করা হয়েছে একটি স্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (ইস্তেফহামে তাকরীরি)। বলা হয়েছে— 'তুমি কি জানো না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু

www.eelm.weebly.com

রয়েছে আল্লাহ্ তা অবগত আছেন?' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তো একথা অবশ্যই জানেন যে, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; এটা আল্লাহ্র নিকট সহজ।' একথার অর্থ— আকাশ পৃথিবীর অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সকল ঘটিত ও ঘটিতব্য বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত ফলকে। সুতরাং হে আমার নবী! আপনি অংশীবাদীদের কথাবার্তা, আচার ব্যবহার, চাল-চলন ও বিতর্ক-বিতণ্ডাকে গুরুত্ব প্রদান করবেন না। আল্লাহ্পাক তাদের সকল কিছুই জানেন। আর সেগুলো সংরক্ষিত রয়েছে তাঁর অসীম ও অতুলনীয় জ্ঞানে। আর জানিত বিষয়সমূহ লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রাখা তাঁর জন্য কদাচ কঠিন নয়। সকল জ্ঞাতব্যই তাঁর জ্ঞানায়ত্ব।

পরের আয়াতে (৭১) বলা হয়েছে— 'এবং তারা ইবাদত করে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর, যার ইবাদতের সমর্থনে তিনি কোনো দলিল অবতীর্ণ করেননি এবং যার সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই।' এখানে 'সুলতান' অর্থ ইবাদতের বৈধতার প্রমাণ। 'ইলমুন' অর্থ প্রত্যাদেশিত, বুদ্ধিগত, সত্য সংবাদবাহকগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত, অথবা পঞ্চ ইন্দ্রিয়লব্ধ সুবিদিত কোনো জ্ঞান। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়িয়েছে— অংশীবাদীরা আল্লাহ্কে ছেড়ে উপাসনা করে প্রতিমার। অথচ তাদের এমতো উপাসনার পক্ষে প্রত্যাদেশগত প্রমাণ অথবা সত্যসংবাদদাতার মাধ্যমে প্রাপ্ত, বুদ্ধিগত কিংবা সুবিদিত সূত্রগত কোনো জ্ঞানই তাদের নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ সীমালংঘনকারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।' একথার অর্থ— ওই সকল অংশীবাদী অবশ্যই সীমালংঘনকারী। আর সীমালংঘনকারীদের এমন সাহায্যকারী থাকে না, যা আল্লাহ্র আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে।

এর পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'এবং তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখবে।' এখানে 'আয়াতুনা' অর্থ কোরআনের আয়াত। 'বায়্যিনাতিন' অর্থ সুস্পষ্ট, আল্লাহ্র নিকট থেকে সমাগত বিশুদ্ধ বিশ্বাসসম্বলিত। 'আল মুনকারা' অর্থ প্রত্যাখ্যানজনিত অসন্তোষ। 'উজুহুণ' অর্থ মুখমণ্ডল। এখানে 'উজুহিহিম' বললেই যথেষ্ট হতো। তা না করে আরো অধিক স্পষ্ট করে বলা হয়েছে 'উজুহিল্ লাজীনা

www.eelm.weebly.com

কাফারূ'। এভাবে এই ইঙ্গিতটি দেয়া হয়েছে যে, তাদের অস্বীকৃতিজ্ঞাপন চরম ও অনড় সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আর 'মুনকারা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাদের ওই সকল দুর্বিনীত আচরণকে, যা তারা বিশ্বাসীগণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে চায়। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি দেখবেন, যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সম্মুখে আমার নিকট থেকে প্রেরিত কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হবে, তখন তাদের মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হবে অনড় অসন্তোষের চিহ্ন, যা তাদের প্রত্যাখ্যানপ্রবণতারই এক নির্লজ্জ প্রকাশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'কেউ তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করলে, তার প্রতি তারা মারমুখো হয়ে ওঠে।' এখানে 'ইয়াসতুনা' অর্থ হয়ে ওঠে আক্রমণোদ্যত, মারমুখো। অশ্ব যখন হর্ষোৎফুল্ল হয়ে, অবাধ্যতা অথবা তেজিভাব দেখিয়ে, অথবা, কোনো মাদী অশ্বের প্রতি কামোদ্দীপ্ত হয়ে হাঁটু মুড়ে সামনের পা দু'টো উত্তোলন করে, তখন তার ওই অবস্থাকে বলে 'সাতুল ফারাসু' (বাবে নাসারা)। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'সাতু আ'লাইহি' এবং 'সাতু বিহী' শব্দ দু'টো সমার্থক। 'সাতুউন' এবং 'সাতুওয়াতুন' হচ্ছে, ধাতুমূল। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— বিশ্বাসীগণের কেউ যদি তাদের সম্মুখে আমার বাণী আবৃত্তি করে, তবে তারা হয়ে ওঠে ক্ষিপ্ত অশ্বের মতো মারমুখো।

শেষে বলা হয়েছে— 'বলো, তবে কি আমি তোমাদেরকে এর চেয়ে মন্দ কিছুর সংবাদ দিবো'? — এটা হচ্ছে আগুন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ সতর্ক করে দিয়েছেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। এবং এটা কতো নিকৃষ্ট আবাসস্থল'। এখানে 'বিশাররিন' অর্থ মন্দ, নিকৃষ্ট। আর 'মিনজালিকুম' অর্থ এগুলির চেয়ে। অর্থাৎ এই কোরআনের চেয়ে, অথবা তোমাদের অসন্তোষ ও উষ্মার চেয়ে, অথবা বিশ্বাসীগণের প্রতি তোমাদের মারমুখো হওয়ার চেয়ে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, ক্ষান্ত হও। তোমরা কি চাও, কোরআনের বাণীবৈভবের চেয়ে, যার আবৃত্তি শুনে তোমরা উষ্মা প্রকাশ করো, মারমুখো হয়ে ওঠো, অতুষ্ট হও— সে সকল কিছুর চেয়ে নিকৃষ্ট কোনোকিছুর সংবাদ আমি তোমাদেরকে দিবো? তবে শোনো, ওই নিকৃষ্ট সংবাদ হচ্ছে জাহান্নাম, যার লেলিহান আগুন থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। হায়, ওই অগ্নিআবাস কতোই না মন্দ।

www.eelm.weebly.com

يَاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ○ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○

❏ হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হইতেছে, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর ঃ তোমরা আল্লাহের পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারিবে না, এই উদ্দেশ্যে তাহারা সকলে একত্রিত হইলেও। এবং মাছি যদি কিছু লইয়া চলিয়া যায় তাহাদিগের নিকট হইতে, ইহাও তাহারা উহার নিকট হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। অক্ষম যাঞ্ছাকারী ও যাহার নিকট যাচ্ঞা করা হয় তাহা।

❏ উহারা আল্লাহ্কে যথোচিত সম্মান করে না, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করো।' এখানে 'মাছালুন' অর্থ একটি উপমা বা একটি আশ্চর্য উদাহরণ। 'ফাস্তামিউ'লাহ্' অর্থ শ্রবণ করো মনোযোগের সঙ্গে, নিবিষ্ট চিত্তে অথবা চিন্তা ভাবনার সঙ্গে ।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য একথা বলা যে, আমার এই উপমায় একথা স্পষ্ট হবে , সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মিথ্যা উপাস্যসমূহ আসলে কোনোকিছুই নয়। এভাবে প্রকৃত সত্য প্রমাণিত হবার পরেও কি কাফেরেরা আল্লাহ্র সমকক্ষ অথবা অংশী নির্ধারণের উপরে অনড় রইবে? এরকম বক্তব্যভঙ্গির পর শুরু হয়েছে অনবদ্য উপমাটি।

বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এই উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্রিত হলেও এবং মাছি যদি কিছু নিয়ে চলে যায় তাদের নিকট থেকে, এটাও তারা তার নিকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে না।' একথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! তোমরা আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে যাদের নিকট প্রার্থী হও, সেই সকল প্রতিমা এককভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে একটি মাছি সৃষ্টি করতেও তো পারবে না,

www.eelm.weebly.com

আবার কোনো মাছি যদি তাদের সামনে থেকে কোনোকিছু নিয়ে চলে যায়, তবে তা ওই মাছিটির কাছ থেকে তারা উদ্ধারও তো করতে পারবে না। তাহলে বোঝো, কতো অথর্ব, অক্ষম, অচল ও অপাংক্তেয় তোমাদের উপাস্য।

এখানে 'জুবাবা' শব্দটির স্বল্প বহুবচন বোধক হচ্ছে 'আজিব্বাতুন'। আর অধিক বহুবচন বোধক 'জুববান'। যেমন 'গরাবুন' এরও বহুবচন যথাক্রমে 'আস্রিবাতুন' এবং 'গুরবানুন'। 'জুবুবুন' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'জাব্বুন' থেকে। এর অর্থ বিতাড়ন। মাছি দেখলেই সকলে তাকে তাড়া করে। তাই মাছিকে বলা হয় 'জুবাব'।

'ওয়ালাবিজ্তামিউ লাহু' অর্থ— এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্রিত হলেও। অর্থাৎ প্রতিমাগুলো সম্মিলিতভাবেও একটি মক্ষিকা সৃজনে সক্ষম নয়। উল্লেখ্য, এর আগে একক উদ্যোগের অসামর্থ্যের কথা তো বলা হয়েছেই।

মক্কার মুশরিকেরা তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর উপরে জাফরানের প্রলেপ দিতো। আর সেগুলোর সামনে রেখে দিতো নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য। সেগুলোর উপরে বসতো মাছি। কোনো কোনো মাছি আবার খাদ্যকণা নিয়ে চলেও যেতো সেখান থেকে। কিন্তু মূর্তিগুলো ছিলো মাছি বিতাড়ন অথবা তাদের নিয়ে যাওয়া খাদ্যকণা উদ্ধারে সম্পূর্ণ অক্ষম। সে কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য বাক্যে। আল্লাহ্পাক এভাবে তাদের উপাস্যগুলোর পূর্ণ অক্ষমতা প্রকাশ করে দিয়ে ঘটিয়েছেন মূর্তিপূজকদের চরম মূর্খতার বহিঃপ্রকাশ। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— ১. যিনি সকল কিছুর সৃজয়িতা, সেই পবিত্রতম ও চিরঅপ্রতিদ্বন্দ্বী আল্লাহ্র সঙ্গে পৌত্তলিকেরা এমন অংশীকে মেনে নেয়, যে মক্ষিকার মতো ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ সৃষ্টিকেও সৃজন করতে সমর্থ নয়। না এককভাবে, না সমষ্টিগতভাবে। ২. সেগুলো এতোই অক্ষম ও দুর্বল যে, তাদের সামনে থেকে মক্ষিকাও যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবে তা উদ্ধার করারও শক্তি সে রাখে না। বিতাড়িতও করতে পারে না মক্ষিকাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'দুর্বল যাচ্ঞাকারী ও যার নিকট থেকে যাচ্ঞা করা হয় তা'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'ত্বলিব' (যাচ্ঞাকারী, অন্বেষণকারী) অর্থ মক্ষিকা, যা অন্বেষণ করে প্রতিমাগুলোর সামনে রক্ষিত ভোগ বা আহার্যদ্রব্য। আর 'মাত্বলুব' (অন্বেষিত) অর্থ প্রতিমাসকল, যেগুলোর কাছে মক্ষিকারা খাদ্যান্বেষণে আসে। অর্থাৎ অন্বেষণকারী তো দুর্বলই, অন্বেষিত তো আরো দুর্বল, বরং নিরেট জড় পদার্থ। কেউ কেউ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন বিপরীতভাবে। বলেছেন, এখানে 'ত্বলিব' অর্থ মূর্তি আর 'মাত্বলুব' অর্থ মাছি। কিন্তু ব্যাখ্যাটি ঠিক নয়। কারণ মূর্তি যেহেতু নিরেট জড়পদার্থ, তাই সেগুলোর অন্বেষণেচ্ছা ও প্রচেষ্টা তো থাকতেই পারে না। জুহাক বলেছেন, এখানে 'ত্বলিব' অর্থ মূর্তিপূজারী, আর 'মাত্বলুব' অর্থ মূর্তি।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্কে যথোচিত সম্মান করে না।' একথার অর্থ সমগ্র সৃষ্টির এক, এককক, অবিভাজ্য ও অংশীবিহীন একমাত্র প্রভুপালনকর্তা হিসেবে আল্লাহ্কে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করা সমীচীন ছিলো, অংশীবাদীরা সেরূপ সম্মান প্রদর্শন করে না। পরিচয় লাভ করতে চেষ্টা করে না তাঁর আনুরূপ্যবিহীন সত্তা, গুণবত্তা ও কার্যকলাপের। তাইতো তারা নিরবচ্ছিন্নরূপে লালন করে চলে অপবিত্র ও অযথার্থ অংশীবাদিতার।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ নিশ্চয় ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী'। এখানে 'ক্বিয়্যুন' অর্থ ক্ষমতাবান, সম্ভাব্য সৃষ্টির সৃজনায়ন যার ক্ষমতায়ত্ব। আর 'আ'যীয' অর্থ পরাক্রমশালী, অজেয়, যার তুলনায় জড়-অজড় সকল কিছুই চিরঅবদমিত।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৭৫, ৭৬

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

❒ আল্লাহ্ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য হইতে মনোনীত করেন বাণীবাহক, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা।

❒ মানুষের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তিনি তাহা জানেন, এবং সমস্ত কিছু আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে মনোনীত করেন বাণীবাহক।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ তাঁর বার্তাবাহক মনোনীত করেন ফেরেশতা, মানুষ উভয় শ্রেণী থেকে। ফেরেশতা বার্তাবাহকেরা আল্লাহ্‌র বার্তা পৌছে দেন মানুষ নবীগণের কাছে, কেউ আবার কবজ করেন প্রাণীকুলের রূহ, আবার কেউ পালন করেন সৃষ্টিকুলের রিজিক বণ্টনের দায়িত্ব।

বাগবী লিখেছেন, বার্তাবাহক ফেরেশতাবৃন্দ হচ্ছেন হজরত জিবরাইল, হজরত আজরাইল, হজরত মিকাইল ও হজরত ইস্রাফিল। আর বার্তাবাহক মানুষ হচ্ছেন পৃথিবীতে প্রেরিত নবী-রসুলগণ। তাঁরা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদেশিত বিধানাবলী প্রচার করেন মানুষের মধ্যে। রসুলগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছেন হজরত আদম আ. এবং সর্বশেষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স.।

বাগবী আরো লিখেছেন, পৌত্তলিকেরা বলেছিলো, আমাদের মধ্যে এই সাধারণ লোকের উপরে কি কোরআন অবতীর্ণ করা হলো (অভিজাত ও বিত্তশালী নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি সত্ত্বেও)। তাদের একথার প্রতিবাদে আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করলেন আলোচ্য আয়াত, যার মর্মার্থ হচ্ছে— বার্তাবাহক মনোনয়নের অধিকার

www.eelm.weebly.com

রয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র। আর তিনি তাঁর চিরমুক্ত অভিপ্রায়ানুসারে বার্তাবাহকরূপে নির্বাচন করেন কিছুসংখ্যক ফেরেশতা এবং কিছু সংখ্যক মানুষকে। এব্যাপারে ভিন্ন বক্তব্য প্রদান করবার অধিকার কারো নেই।

বায়যাবী লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌পাক প্রকাশ করেছেন তাঁর সত্তাগত এককত্ব ও প্রভুপালকত্ব। আর এই আয়াতে প্রকাশ করেছেন তাঁর গুণগত এককত্বের ধারণা। এভাবে নবী-রসুলগণের স্বাধীন মনোনয়নের কথা বলে খণ্ডন করেছেন অংশীবাদীদের অসার যুক্তি। অজ্ঞ ও অপবিত্র তারা। তাই বলতে সাহস পায় 'আমরা মূর্তি ও ফেরেশতাদের পূজা করি এজন্য যে, ওগুলো আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন করে তুলবে। আরো বলে 'ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা।' কিন্তু প্রকৃত কথা তা নয়। আল্লাহ্‌র মনোনীত নবী-রসুলগণই হচ্ছেন তাঁর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। তাই বিশুদ্ধচিত্ততার সঙ্গে ইবাদত সম্পাদন করতে হবে কেবল তাঁদের অনুসরণে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা'। একথার অর্থ শ্রুতির উপযোগী ও দর্শনের যোগ্য সকল কিছুই আল্লাহ্‌র জ্ঞানায়ত্ব ও ক্ষমতাভূত। সকল কিছুর উপরে রয়েছে তাঁর নির্ভুল নিয়ন্ত্রণ।

পরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'মানুষের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তিনি তা জানেন'। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মানুষ ভালো ও মন্দ যতকিছু আমল পূর্বাহ্নে প্রেরণ করেছে এবং পশ্চাতে রেখে এসেছে, তার সকলকিছুই আল্লাহ্‌ জানেন। হাসান বলেছেন, কথাটির অর্থ— মানুষ উত্তম অনুত্তম যা কিছু করেছে ও করবে, তার সকল কিছুই আল্লাহ্‌ অবহিত। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'হুম' (তা) সর্বনামটির সম্পৃক্তি ঘটেছে নবী-রসুলগণের সঙ্গে। অর্থাৎ নবী-রসুলগণের জন্মপূর্ব ও জন্মপরবর্তীর সকল কিছু সম্পর্কে আল্লাহ্‌ সবিশেষ জ্ঞাত।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং সমস্ত কিছু আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে'। একথার অর্থ— সকলের অবশেষ প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌রই নিকটে। প্রত্যাবর্তনের পর তিনিই সকলের কর্মকাণ্ডের হিসাব গ্রহণ করবেন। ভালো, মন্দ সব কিছুর। তাঁর কর্মকাণ্ডের উপরে প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার ও ক্ষমতা কারোরই নেই।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৭৭

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

www.eelm.weebly.com

❑হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং তোমাদিগের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

এখানে 'রুকু করো' এবং 'সেজদা করো' কথা দু'টোর সম্মিলিত অর্থ— নামাজ পাঠ করো। রুকু ও সেজদা হচ্ছে নামাজের অপরিহরণীয় স্তম্ভ। ক্বিয়াম (দণ্ডায়মানতা) ও ক্বেরাত (কোরআন পাঠ) নামাজের অত্যাবশ্যক অঙ্গ বটে, কিন্তু এ দু'টো রুকু ও সেজদা তুল্য গুরুত্ব রাখে না। তাই দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য দণ্ডায়মানতা পরিহরণীয়, আবার মুক ব্যক্তির জন্য ক্বেরাতও পরিত্যাজ্য হয়। কিন্তু রুকু ও সেজদা কোনো অবস্থায় কারো জন্যই পরিহারের অনুমতি নেই। একারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেন, যে ব্যক্তি মাথার সাহায্যে রুকু ও সেজদা করতে পারে না, সে যেনো তার নামাজকে বিলম্বিত করে। যখন সামর্থ্য ফিরে পাবে, তখন সে নামাজ পাঠ করবে। কেবল অন্তরের নিয়ত অথবা জ্র'র ইশারায় নামাজ হয় না।

'তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো' অর্থ ইবাদত সম্পন্ন করো আল্লাহ্পাক কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মানুসারে। আর 'সৎকর্ম করো' কথাটিকে হজরত ইবনে আব্বাস ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো, তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখো এবং শুভ চরিত্রের অধিকারী হও। অবশ্য প্রকাশ্যতঃ সকল শুভকর্মই সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বলা যেতে পারে, এখানে 'সৎকর্ম করো' বলে নির্দেশ করা হয়েছে সকল প্রকার শুভকর্ম সম্পাদন করতে।

রসুল স. জানিয়েছেন, বনী ইসরাইলের জনৈক নবীকে আল্লাহ্পাক এই মর্মে প্রত্যাদেশ করেছিলেন যে, তোমার উম্মতের ইবাদতকারীদেরকে জানিয়ে দাও, তারা যেনো কেউ তাদের পুণ্যকর্মের উপরে নির্ভরশীল না হয়। আমি মহাবিচারের দিবসে সকলকে একত্র করবো। তখন যাকে চাইব, শাস্তি দিবো (হিসাব গ্রহণ করবো কঠোরতার সঙ্গে, যার উপকার চাইবো না, সে অবশ্যই হবে আযাবগ্রস্ত)। আর তোমার পাপী উম্মতদেরকে বলে দাও, তারা যেনো নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে না দেয় (এরকম যেনো না মনে করে যে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য, আল্লাহ্র রহমত থেকে তারা যেনো নিরাশ না হয়)। আমি ইচ্ছা করলে চরম পাপীকেও ক্ষমা করে দিবো, কারোরই পরওয়া করবো না। হজরত আলী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু নাঈম।

হজরত আনাস থেকে বায্যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, প্রত্যেকের জন্য উপস্থিত করা হবে তিন প্রকার হিসাবের দপ্তর— একটি পুণ্যের, একটি পাপের এবং একটি নেয়ামতের। এরপর আল্লাহ্ তাঁর সবচেয়ে ক্ষুদ্র

www.eelm.weebly.com

নেয়ামতকে লক্ষ্য করে বলবেন, এই ব্যক্তির পুণ্যের দপ্তর থেকে তোমার সমতুল্য পুণ্যকর্ম বের করে আনো। ওই ক্ষুদ্র নেয়ামত তখন তার সকল পুণ্য বের করে আনবে। তবুও পুণ্যসমূহ তার সমতুল্য হবে না। নেয়ামত তখন বলবে, হে আল্লাহ্! আপনার সম্মানের শপথ! আমি আমার সমতুল্য হিসেবে এ লোকের সকল পুণ্য নিয়ে নিয়েছি। এখন অবশিষ্ট রয়েছে কেবল তার পাপরাশি। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ যদি তাঁর ওই বান্দার প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে চান, তবে বলবেন, হে আমার বান্দা! আমি তোমার পুণ্যগুলোকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দিলাম, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম তোমার পাপরাশি থেকে এবং তোমাকে দান করলাম আমার নেয়ামত।

মাসআলাঃ আলোচ্য আয়াত পাঠের পর তেলাওয়াতের সেজদা করতে হবে কিনা, সে সম্পর্কে আলেমগণের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম সুফিয়ান সওরী এবং আরো কতিপয় আলেম বলেন, এখানে সেজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়। এখানে 'সেজদা' অর্থ নামাজের সেজদা। কেননা সেজদার সঙ্গে সঙ্গে রুকুর কথাও বলা হয়েছে। এ ধরনের অন্যান্য আয়াত দৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে, এ ধরনের 'সেজদা'র অর্থ নামাজ। যেমন— 'ওয়াস্‌জুদি ওয়ারকায়ী মাআ'র রকিয়ী'ন'। এখানেও 'সেজদা' অর্থ নামাজ। কেননা এখানেও সেজদার সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে 'রুকু'র কথা। কিন্তু ইমাম ইবনে মোবারক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, আলোচ্য আয়াত পাঠের পর তেলাওয়াতের সেজদা অবশ্যই করতে হবে। কারণ হজরত উকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সুরা হজের মধ্যে কি দু'টি সেজদা রয়েছে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। যে দু'টি সেজদা করবে না, সে যেনো ওই আয়াত তেলাওয়াত না করে। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি। হাদিসটি আরো বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী, বায়হাকী ও হাকেম। কিন্তু এর সূত্রপরম্পরা শিথিল। কারণ এর অন্তর্ভুক্ত ইবনে লেহিয়া বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটির সূত্রপ্রবাহ শক্তিশালী নয়।

ইবনে জাওজী লিখেছেন, ইবনে ওহাব বলেন, ইবনে লেহিয়া অসৎ ব্যক্তি নন, কিন্তু তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল। হাকেম লিখেছেন, তিনি তো ছিলেন ইমাম, কিন্তু শেষ বয়সে তাঁর স্মৃতিবিপর্যয় ঘটে। আর তিনিই যেহেতু হাদিসটির একক বর্ণনাকারী, তাই হাদিসটিকে বলা হয় শিথিলসূত্রবিশিষ্ট।

আবু দাউদ তাঁর 'আল মারাসিল' গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনে লেহিয়া রসুল স. এর বাণীরূপে বর্ণনা করেছেন, সুরা হজ পেয়েছে দু'টি সেজদা সংযুক্ত হওয়ার ফযীলত। কিন্তু তাঁর এই বর্ণনাকে যথাসূত্রসম্বলিত বলা যায় না।

হজরত আমর ইবনে আস বলেছেন, রসুল স. আমাকে পাঠ করিয়েছেন কোরআনের ১৫টি তেলাওয়াতের সেজদাবিশিষ্ট আয়াত। তন্মধ্যে তিনটি সেজদা

www.eelm.weebly.com

রয়েছে সুরা মুফাস্‌সালাতে এবং দু'টি সুরা হজে। আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারাকুতনী, হাকেম, আলমনজুরী, আননববী। শায়েখ আবদুল হক এবং ইবনে কাত্তান বলেছেন বর্ণনাটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। কারণ এই সূত্রপ্রবাহে রয়েছে ইবনে মুনাইন কালালী নামক একজন অপ্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী। তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবার আর একজন অপ্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী হারেছ ইবনে সাঈদ সাকাফী মিসরী।

হজরত উকবা ইবনে আমেরের ইতোপূর্বের বর্ণনাটির পোষকতায় হাকেম বলেছেন, হজরত ওমর, হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু দারদা, হজরত আবু মুসা এবং হজরত আম্মারের পরিণত শ্রেণীর একটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত বর্ণনাতেও এর সমর্থন রয়েছে। আর এর প্রত্যয়নার্থে বায়হাকী তাঁর আলমা'রেফা পুস্তকেও খালেদ ইবনে মা'দানের একটি অপরিণত শ্রেণীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত ইবনে ওমরের অভিমতও এরকম।

আমি বলি, এখানে পরিণত শ্রেণীও সুপরিণত শ্রেণীর সমতুল। কেননা কোনো আয়াতে সেজদায়ে তেলাওয়াত হওয়া না হওয়া সম্পর্কে সাহাবীগণের বর্ণনাই যথেষ্ট। কারণ তাঁরা নিশ্চয়ই রসুল স. এর নিকট থেকে না শুনে বর্ণনা করেননি। সেজদায়ে তেলাওয়াত সংক্রান্ত মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ আমি দিয়েছি সুরা ইনশিক্বাক্বের তাফসীরে।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৭৮

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

❒ এবং সংগ্রাম কর আল্লাহের পথে যে ভাবে সংগ্রাম করা উচিত। তিনি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগের জন্য কঠিন কোন বিধান দেন নাই তোমাদিগের দ্বীনে; এই দ্বীন তোমাদিগের পিতা ইবরাহীমের দ্বীনের অনুরূপ। আল্লাহ্ পূর্বে তোমাদিগের নামকরণ করিয়াছেন 'মুসলিম' এবং এই কিতাবেও করিয়াছেন; যাহাতে রসূল তোমাদিগের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং

www.eelm.weebly.com

তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা স্বালাত কায়েম কর, জাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদিগের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!

'জুহুদ' অর্থ সামর্থ্য, শক্তিমত্তা। 'জাহাদ' অর্থ কষ্ট। কোনো কোনো অভিধানবেত্তা বলেছেন, 'জাহাদ' অর্থ প্রাণপণ প্রচেষ্টা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'জুহুদ' ও 'জাহাদ' দু'টো শব্দের অর্থই সামর্থ্য শক্তিমত্তা, কষ্ট। আর প্রাণপণ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কেবল 'জাহাদ'। আর 'জিহাদ' ও 'মুজাহিদাহ্' মুফাইলাত প্রক্রিয়ায় পরিগঠিত হয়েছে 'জাহাদা' থেকে। এর অর্থ পক্ষ-প্রতিপক্ষ উভয় দিক থেকে প্রাণপণ প্রচেষ্টা ও কষ্টস্বীকার। যুদ্ধক্ষেত্রে এরকমই পরিদৃষ্ট হয়। উভয় দিক থেকে সম্পদ ও শক্তিমত্তার সর্বোচ্চ ব্যবহার ঘটে তখন। মৌখিক ও সামরিক সকল যুদ্ধের এটাই নিয়ম।

'ফীল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র পথে, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে মর্যাদায়িত ও সমুচ্চ করার অভিপ্রায়ে। কেউ কেউ বলেছেন, 'ফীল্লাহ্' অর্থ 'ওয়াজহিল্লাহ্'(কেবল আল্লাহ্‌র জন্য)। 'হাক্কা জিহাদিহী' শব্দের বাক্যবিশ্লেষণ বিপরীতার্থক। অর্থাৎ কথাটির অর্থ— এমন জেহাদ করো, যা হবে কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষ অর্জনার্থে। এভাবে দৃঢ়তা সৃষ্টির জন্য জেহাদের সঙ্গে সম্পৃক্তি ঘটানো হয়েছে 'হাক্ব' শব্দটির। যেমন বলা হয় 'হুয়া হাক্কুন আ'লীম'। তাই কথাটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— কেবল আল্লাহ্‌র জন্য জেহাদ করো। হজরত ইবনে আব্বাস তাই 'হাক্কা জিহাদিহী' কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— নিজের সম্পূর্ণ যোগ্যতা ও ক্ষমতা ব্যয় করো আল্লাহ্‌র পথে এবং ধর্মের ব্যাপারে মন্দ ব্যক্তির রক্তচক্ষুকে ভয় পেয়ো না। মুকাতিল ও জুহাক বলেছেন, কথাটির অর্থ— আল্লাহ্‌র জন্য এমন কাজ করো যেমন করা সমীচীন এবং এমনভাবে তাঁর ইবাদত করো, যেমন করা উচিত।

অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন, হক্ব জেহাদ হচ্ছে খালেস নিয়তে আল্লাহ্‌র জন্য জেহাদ। সুদ্দী বলেছেন, কথাটির অর্থ— ইবাদত করো কেবল তাঁর, অবাধ্যচারী হয়ো না। আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক বলেছেন, কুপ্রবৃত্তি ও লোভের বিরুদ্ধে জেহাদ করার নাম জেহাদে আকবর বা হক্ব জেহাদ।

বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে রসুল স. বলেছিলেন, আমরা এবার ক্ষুদ্র জেহাদ থেকে বৃহৎ জেহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। বায়হাকী তাঁর 'আজ্‌জুহুদ' পুস্তকে হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন কতিপয় যুদ্ধবিজয়ী। তিনি স. তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, তোমরা এবার

www.eelm.weebly.com

জেহাদে আসগর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে জেহাদে আকবরের দিকে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! জেহাদে আকবর কী? তিনি স. বললেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। বায়হাকী বলেছেন, বর্ণনাটি দুর্বলতাদুষ্ট।

আমি বলি, এখানে 'এবং সংগ্রাম করো আল্লাহ্র পথে যে ভাবে সংগ্রাম করা উচিত' কথাটির অর্থ কেবল অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ নয়। কারণ সশস্ত্র যুদ্ধের স্পষ্ট উল্লেখ এখানে নেই। বরং আলোচ্য বাক্য হচ্ছে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা যার শুরুতে বলা হয়েছে বিশেষভাবে নামাজের কথা, তারপর দোয়া ইবাদতের নির্দেশ, নামাজও যার অন্তর্ভুক্ত। এরপর বলা হয়েছে 'সৎকর্ম করো'। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র হক, বান্দার হক, নামাজ-রোজা, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, উত্তম চরিত্র গঠন ইত্যাদি। সকল সুন্নত ও মোস্তাহাব আমলও এর অন্তর্ভুক্ত। সবশেষে এসেছে জেহাদের নির্দেশ। সুতরাং এখানে জেহাদকে কেবল কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং এই জেহাদের অর্থ হবে— বিশুদ্ধতা অর্জন করো বিশ্বাসে, কথায় ও কর্মে। আর প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমেই কেবল এমতো বিশুদ্ধতা অর্জন সম্ভব। প্রবৃত্তির বিলোপন ছাড়া বিশুদ্ধতা অর্জন সম্ভবই নয়। আর প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে প্রয়োজন নবুয়তের দীপালোক। ওই আলোকাভিসারকেই বলা হয় জজবা ও সুলুক। প্রাচীন কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ এটাকেই বলেছেন এখলাস বা বিশুদ্ধায়ন। সুফী সাধকগণ এভাবে যখন তাঁদের প্রবৃত্তি বিলোপনে সমর্থ হন, তখন তাঁরা হন বিশুদ্ধাচারী বা মুখলিস। এই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিবর্গ কারো নিন্দামন্দের পরওয়া করেন না। সুনাম ও প্রসিদ্ধির আকাংখা ছাড়াই তাঁরা সম্পাদন করেন আল্লাহ্র ইবাদত। সকল অবস্থায় তাঁরা হন আনুগত্যশোভিত ও অবাধ্যাচরণমুক্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে এটারই নাম জেহাদে আকবর। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হচ্ছে এই মহান জেহাদের একটি প্রকাশ্য প্রকাশ। জ্ঞাতব্য, কেবল আল্লাহ্র পরিতোষ কামনায় যদি জেহাদ সম্পন্ন না হয়, তবে সমস্ত প্রচেষ্টাই পরিণত হবে নিষ্ফলতায়। রসুল স. অবহিত করেছেন, কর্মফল নিয়তনির্ভর। অর্জন হয় নিয়তানুযায়ী। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের জন্য দেশত্যাগ করবে তার হিজরত হবে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের জন্য। আর যে কোনো রমণীর পানি গ্রহণের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনো পার্থিব প্রাপ্তির জন্য দেশত্যাগ করবে, তার হিজরত হবে তারই উদ্দেশ্যানুযায়ী। হজরত ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমি সকল প্রকার অংশীদারের অংশীবাদিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী। কেউ পুণ্যকর্ম সম্পাদনের সময় অন্য কাউকে আমার অংশীদার করলে আমি অতুষ্ট হই, তখন তার ওই কর্ম হয়ে যায় তার জন্য, যাকে সে করেছিলো আমার অংশীদার। মুসলিম।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ্র রসুল স. বলেছেন, তোমরা এবার ছোটো জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলে। তাঁর একথায় প্রতীয়মান হয় যে, নফসের বিরুদ্ধে জেহাদই হচ্ছে বড় জেহাদ। আর কেবল কামেল পীরের সংসর্গ গ্রহণের পরেই মুরিদ এ জেহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হতে পারে। যুদ্ধ শেষে রসুল স. এর সংসর্গে সাহাবীগণও ওই বড় যুদ্ধের বরকত লাভ করতেন। তখন তাঁদের অন্তর্জগতে বিশেষভাবে বর্ষিত হতো রেসালতের নূরের ঝলক। তার ফলে অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে যেতো তাদের হৃদয় ও প্রবৃত্তি। সাহাবীগণ ছিলেন সতত সত্যানুসারী। তাই তাঁরা তখন বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমরা সত্যিই এবার প্রত্যাবর্তন করেছি বৃহৎ জেহাদের ময়দানে। উল্লেখ্য, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা রসুল স. এর সঙ্গে থাকলেও তখন তাঁদেরকে পূর্ণ অথবা আংশিকরূপে লক্ষ্য রাখতে হতো শত্রুর প্রতি। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পরেই কেবল তাঁরা রসুল স. এর প্রতি হতে পারতেন পূর্ণ মনোযোগী। নিবিষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারতেন প্রকাশ্য ও গোপন জ্ঞানসম্ভার।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি তোমাদের জন্য কঠিন কোনো বিধান দেননি তোমাদের দ্বীনে।'

আমি বলি, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে বিশেষভাবে মনোনীত করে নিয়েছেন সমগ্র মানবমণ্ডলী থেকে। আমার সহচরবৃন্দকেও নির্বাচন করেছেন তিনিই। তাঁদের মধ্যে কেউ আবার আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বিশেষ সহযোগী।

হজরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা' বলেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বনী ইসমাইলের মধ্য থেকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন বনী কেনানাকে, বনী কেনানা থেকে বনী কুরায়েশকে, বনী কুরায়েশ থেকে বনী হাশেমকে এবং বনী হাশেম থেকে আমাকে। মুসলিম।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ নবী ইব্রাহিমের বংশধরগণের মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন বনী ইসমাইলকে এবং বনী ইসমাইল থেকে বনী কেনানাকে। আর ধর্মের বিষয়ে আল্লাহ্ তোমাদের উপরে কঠোরতা আরোপ করেননি।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, কোনো বিশ্বাসী পাপ করে বসলে আল্লাহ্ তার জন্য প্রস্তুত করে দেন শাস্তি থেকে অব্যাহতির পথ— তওবার মাধ্যমে, জাগতিক বিপদাপদ আরোপ করে, অধিকার পরিপূরণ দ্বারা, অথবা

www.eelm.weebly.com

ক্ষতিপূরণ কার্যকর করিয়ে। অর্থাৎ আল্লাহ্ ইসলামে এরকম অনড় কঠোরতা রাখেননি, যাতে করে পাপমোচনের কোনো উপায়ই থাকে না। পূর্ববর্তী উম্মতের বেলায় অবশ্য বিষয়টি ছিলো অত্যন্ত কঠিন। কোনো কোনো পাপের শাস্তি তাদের পেতেই হতো। সেগুলোর বেলায় তওবার কোনো সুযোগই তাদের ছিলো না।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'ধর্মের ব্যাপারে কঠোরতা রাখেননি' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্ ফরজ দায়িত্বসমূহ পালনের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন— নামাজের সময়, রমজানের চাঁদ, ঈদের চাঁদ, হজের সময় ইত্যাদি।

মুকাতিল বলেছেন, 'কঠোরতা রাখেননি' অর্থ— কষ্টকর অবস্থায় আমল সহজ করে দিয়েছেন। যেমন— সফরের সময়ের কসর নামাজ, ওজুর স্থলাভিষিক্তরূপে তায়াম্মুম, অপারগতার ক্ষেত্রে উপবিষ্ট অথবা শায়িত অবস্থায় নামাজ পাঠের অনুমতি, জীবন সংকটাপন্ন হলে পরিমিত হারাম আহার্য ভক্ষণের অনুমতি ইত্যাদি। কালাবীও কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে। রসুল স.ও নির্দেশ করেছেন, আমি যখন তোমাদেরকে কোনো হুকুম করি, তখন তা সাধ্যমতো পালন কোরো।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ— বনী ইসরাইলের উপরে যে সকল কঠোর বিধান আরোপ করা হয়েছিলো, তোমাদের উপরে সেরকম কঠোরতা নেই।

আমি বলি, 'ধর্মের ব্যাপারে কঠোরতা রাখেননি' কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আল্লাহ্ মুসলমানের জন্য শরিয়তের হুকুম পালন কষ্টদায়ক করেননি। বরং হুকুম সমূহকে করেছেন প্রিয় বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

রসুল স. বলেছেন, নামাজ আমার চোখের শান্তি। আহমদ, নাসাঈ, হাকেম ও বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এই দ্বীন তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের দ্বীনের অনুরূপ'। একথার অর্থ— হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! আমার রসুল মোহাম্মদ তোমাদের নিকটে যে ধর্মাদর্শ নিয়ে এসেছেন সেই ধর্ম তোমাদের পিতৃপুরুষ নবী ইব্রাহিমের ধর্মমতের অনুরূপ। সুতরাং এই ধর্মের অনুসারী হও। উল্লেখ্য, প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশনাটি কুরায়েশদেরকে লক্ষ্য করে উপস্থাপন করা হলেও পরোক্ষভাবে এর লক্ষ্য সমগ্র মানবমণ্ডলী। অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিম যাদের পিতৃপুরুষ নন, তারাও আলোচ্য নির্দেশনার অন্তর্ভূত। রসুল স. বলেন, সকল মানুষ কুরায়েশদের অনুসারী। বিশ্বাসীরা অনুসারী বিশ্বাসী কুরায়েশদের এবং অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাসী কুরায়েশদের। বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

www.eelm.weebly.com

হজরত জাবের থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মানুষ ভালো ও মন্দ উভয় বিষয়ে কুরায়েশদের অনুসারী। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য নির্দেশনায় সম্বোধন করা হয়েছে সমগ্র আরববাসীকে। কেননা আরববাসীরা সকলেই হজরত ইবাহিমের বংশোদ্ভূত। ব্যাখ্যাটি যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ বিখ্যাত সাহাবী হজরত সালমান ফারসী, হজরত বেলাল, হজরত সুহাইব প্রমুখ ছিলেন অনারব। তাছাড়া পৃথিবীর সুবিশাল জনগোষ্ঠীর অনেকেই সরাসরি হজরত ইব্রাহিমের বংশোদ্ভূত নয়। তাই অনেকে বলেছেন, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতিকে। সেকারণেই বলতে হয়, হজরত ইব্রাহিম হচ্ছেন মুসলিম জনগোষ্ঠীর পিতা। আর তিনি ছিলেন রসুল স. এর পিতৃপুরুষ। আবার রসুল স. এই উম্মতের পিতা সদৃশ। ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে যে পবিত্র ও অক্ষয় জীবন লাভ হয়, তিনি স. সেই জীবনের জন্মদাতা। আর তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণ হচ্ছে সকল মুসলমানের মা। তাই এরশাদ হয়েছে— ওয়া আয্ওয়াজুহু উম্মাহাতুকুম'।

রসুল স. বলেছেন, আমি তোমাদের জনয়িতা সদৃশ। আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি— তোমরা শৌচাগারে গিয়ে কখনো কেবলার দিকে মুখ করে অথবা পিঠ দিয়ে বোসো না। ডান হাত দিয়ে শৌচকর্মও কোরো না। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও ইবনে হাব্বান হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মক্কাবাসী মনে করতো, তারা হজরত ইব্রাহিমের ধর্মমতানুসারী। তাই তাদের মনোভাব খণ্ডনার্থে আল্লাহ্পাক এখানে বলেছেন 'এই দ্বীন তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের দ্বীনের অনুরূপ'। অর্থাৎ হে মক্কাবাসী— এখন তোমাদের সম্মুখে আমার প্রিয় রসুল মোহাম্মদ যে ধর্মমত নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, সেই ধর্মই কেবল তোমাদের পিতৃপুরুষ ইব্রাহিমের ধর্মের অনুরূপ। এর বিপরীত ধর্মমতাবলম্বীরা হজরত ইব্রাহিমের ধর্মমতানুসারী নয়। সুতরাং তোমরা সকলে সমর্পিতপ্রাণ হও আমার এই শেষ রসুলের ধর্মাদর্শে। অপর এক আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন— 'ইব্রাহিমের সবচেয়ে নিকটতম ওই ব্যক্তি, সে তাঁর অনুসারী, এই নবী ও তার উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ'।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও করেছেন।' এখানে 'হুয়া সাম্মাকুমুল মুসলিমীন' অর্থ তিনি তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম'। (বঙ্গানুবাদে 'তিনি' এর অর্থ করা হয়েছে 'আল্লাহ্')। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানকার 'হুয়া' (তিনি) অর্থ হজরত

www.eelm.weebly.com

ইব্রাহিম। অর্থাৎ নবী ইব্রাহিম তার যুগেই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম। তিনি তাঁর প্রার্থনায় বলেছিলেন, 'হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদেরকে তোমার মুসলিমীন (সমর্পিত) বানিয়ে দাও, আর অগণিত বংশধরকে করো 'মুসলমান উম্মত'। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করেছিলেন। সেকারণেই কোরআন মজীদে এই উম্মতকে বলা হয়েছে মুসলিম। কোনো কোনো আলেম আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন এভাবে— নবী ইব্রাহিম ইতোপূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম। সেকথাই আল্লাহ্ জানিয়ে দিচ্ছেন এই কোরআনে। প্রকৃত প্রস্তাবে কথাটি পূর্ববর্তী বাক্যে উল্লেখিত 'তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন' এর ব্যাখ্যা। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে তোমাদেরকে কঠিন তা বিমুক্ত ধর্মাদর্শ ইসলামের প্রতি পথপ্রদর্শন এবং তোমাদের 'মুসলিম' নামকরণের কারণ এই যে, তোমরা আমা কর্তৃক মনোনীত।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবজাতির জন্য।' একথার অর্থ— মানবজাতির মধ্যে যুগে যুগে ইসলাম প্রচার করা হয়েছে এবং তোমাদেরকে নাম দেয়া হয়েছে মুসলিম, মহাবিচারের দিবসে একথার সাক্ষ্য দিবেন তোমাদের রসুল স্বয়ং আর তোমরাও তখন মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয়ে এ বার্তার স্বীকৃতি প্রদান করবে।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আমি আমার উম্মতকে নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করবো একটি উঁচু পাহাড়ে। সেখান থেকে দেখা যাবে সমবেত জনতাকে। তারাও ইচ্ছা করবে আমাদের মতো পর্বতারোহণের। নবীগণের মধ্যে তখন এমন কেউই থাকবেন না, যাদেরকে তাদের উম্মত মিথ্যা প্রতিপন্ন না করবে। কেবল আমরা হবো তাঁদের সত্যতার সাক্ষী। বলবো, তাঁরা আল্লাহ্র বাণী যথাযথরূপে তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন।

ইবনে মোবারক তাঁর 'আজ্‌জুহ্দ' পুস্তকে লিখেছেন, ইবনে সা'দ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের বরাত দিয়ে আমাকে বলেছেন, স্বসূত্রে আবু হিলা বর্ণনা করেছেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম আহ্বান করা হবে হজরত ইস্রাফিলকে। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি আমার বাণী পৌঁছে দিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। আমি তা যথাযথরূপে পৌঁছিয়েছি জিবরাইলের নিকট। এরপর হজরত জিবরাইলকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি? তিনিও বলবেন, আমিও আপনার বাণী যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছি। এরপর নবী রসুলগণকে ডেকে প্রশ্ন করবেন, জিবরাইল কি তোমাদের কাছে আমার বার্তা ঠিকঠাক পৌঁছিয়েছিলো? তাঁরা বলবেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলবেন,

www.eelm.weebly.com

তোমরা কী করেছো? নবী-রসুলগণ বলবেন, আমরা আপনাপন উম্মতকে তোমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি। আল্লাহ্ সকল উম্মতকে ডেকে যখন একথার স্বীকৃতি চাইবেন, তখন কিছু সংখ্যক লোক একথা স্বীকার করবে এবং কেউ কেউ বলে উঠবে, না, আমাদের নিকট কোনো কিছু পৌঁছানো হয়নি। নবী-রসুলগণ বলবেন, আমাদের পক্ষে সত্য সাক্ষ্যদাতারা এখানে উপস্থিত। আল্লাহ্ বলবেন, কে? তাঁরা বলবেন, উম্মতে মোহাম্মদী। তখন উম্মতে মোহাম্মদীকে ডেকে বলা হবে, সাক্ষ্য পেশ করো। তাঁরা বলবেন, আমরা এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, নবী-রসুলগণের কথা সত্য। একথা শুনে অন্যান্য উম্মতের অবাধ্যরা বলবে, এরা তো পৃথিবীতে এসেছে অনেক পরে। আমাদের যুগের কথা এরা কীভাবে জানলো? উম্মতে মোহাম্মদী বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমি আমাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলে একজন মহা সম্মানিত রসুল। তাঁর উপরে অবতীর্ণ করেছিলে কোরআন। ওই মহাগ্রন্থে আমরা পাঠ করেছি, নবী-রসুলগণ তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের নিকট আপনার বার্তা যথাযথরূপে পৌঁছে দিয়েছেন। —আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা এটাই। অন্য আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন— 'ওয়া কাজালিকা জায়ালনাকুম উম্মাতাঁও ওয়াসাত্বাল্ লিতাকুনূ শুহাদাআ আ'লান্নাসি ওয়া ইয়াকুনার রসুলু আ'লাইকুম শাহীদা।' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী প্রমুখ যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আমি তা উল্লেখ করেছি সুরা বাকারার তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম করো, জাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে অবলম্বন করো।' একথার অর্থ— সুতরাং তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করো দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত, আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়ো না। হাসান বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্কে অবলম্বন করো' অর্থ আল্লাহ্র মনোনীত ধর্মকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একথার অর্থ— আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেনো সকল প্রকার অপ্রিয় বিষয় হতে তোমাদেরকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— স্বীয় প্রভুপালনকর্তা সকাশে এই মর্মে প্রার্থনা করো, যেনো তিনি তোমাদেরকে সত্য ধর্মের উপরে দৃঢ়পদ রাখেন।

কেউ কেউ বলেছেন, 'আল্লাহ্কে অবলম্বন করো' অর্থ— কোরআন ও সুন্নাহ্কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। রসুল স. উপদেশ দিয়েছেন, আমি তোমাদের জন্য দু'টো বিষয় রেখে গেলাম। যতক্ষণ তোমরা এ দু'টোকে দৃঢ়তার সঙ্গে

www.eelm.weebly.com

আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টো বিষয় হচ্ছে— আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসুলের আদর্শ। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন অপরিণত সূত্রে।

হজরত আসীফ ইবনে হারেছ ইয়ামানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ এমন কোনো জাতি সৃষ্টি করেননি যাদের একটি নব আবিষ্কৃত আমল একটি সুন্নতকে বিলুপ্ত না করেছে, সুতরাং সুন্নতের উপরে অটল থাকা বেদাত প্রবর্তন করা অপেক্ষা উত্তম। আহমদ।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক এবং কতো উত্তম সাহায্যকারী তিনি।' একথার অর্থ— তিনিই তোমাদের উত্তম হেফাজতকারী, তিনিই তোমাদের কর্মসমূহের স্রষ্টা ও রক্ষক।

এখানে 'ফানি'মা' (কতোনা উত্তম) কথাটির 'ফা' (কতো) অব্যয়টি কারণ প্রদর্শক। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হয়ে যাবেন সর্বোত্তম রক্ষক ও সাহায্যকারী। কারণ তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃজয়িতা ও সাহায্যদাতা। তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই। প্রকৃত কথা হচ্ছে— সৃজয়িতা ও সাহায্যদাতা তিনি ব্যতীত অন্য কেউই নয়। ওয়াল্লহু আ'লাম। আদি-অন্তের সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য প্রশস্তি আল্লাহ্‌র, কেবলই আল্লাহ্‌র। সুরা হজের তাফসীর শেষ হলো আজ ৮ই জিলহজ, ১২০৩ হিজরী সনে। আলহামদু লিল্লাহ্।

সূরা মু'মিনূন

এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। সুরা আম্বিয়ার পরে অবতীর্ণ এই সুরায় রয়েছে ১১৮টি আয়াত— একথা বলেছেন কুফার আলেমগণ। আর বসরার ক্বারীগণের মতে এই সুরার আয়াত সংখ্যা ১১৯।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত বলে আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. নামাজ পাঠকালে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। এমতাবস্থায় অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ১, ২

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قَدۡ اَفۡلَحَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ○ الَّذِيۡنَ هُمۡ فِىۡ صَلَاتِهِمۡ خٰشِعُوۡنَ ○

www.eelm.weebly.com

❑ অবশ্যই সফলকাম হইয়াছে বিশ্বাসীরা,

❑ যাহারা বিনয়-নম্র নিজদিগের সালাতে,

আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. তাঁর দৃষ্টি নিম্নগামী করেন। ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আকাশের দিকে ইতস্তত: দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর সহচরবৃন্দ নামাজরত অবস্থায় আকাশের প্রতি নেত্রনিক্ষেপ করতেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁরা নেত্রনিবদ্ধ করতে থাকেন সেজদার স্থানে।

ইবনে সিরীন থেকে অপরিণত সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, সাহাবীগণ নামাজ সম্পাদনকালে আসমানের প্রতি নজর করতেন। তাঁদের এমতো আচরণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

'ক্বদ আফলাহাল মু'মিনূন' অর্থ বিশ্বাসীরা সফলকাম হয়েছে। 'ক্বদ্' শব্দটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় দৃঢ়তাব্যঞ্জক বিষয়ে। যেমন 'লাম্‌মা' ব্যবহৃত হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৃঢ়তার নেতিবাচকতার বিষয়ে। 'ক্বদ' (অবশ্যই) অতীতকালবাচক হলে বক্তব্যে ফুটে ওঠে নিকট বর্তমানে অবশ্য ঘটিতব্য বিষয়। যেমন— 'ক্বদ্ ক্বমা' (সে এখনই দণ্ডায়মান হলো) 'ক্বদ্ আকালা' (এখনই সে আহার সম্পন্ন করলো)। আলোচ্য আয়াতেও 'ক্বদ্' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থে। অর্থাৎ এখানে বিশ্বাসীগণকে এই মর্মে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে— তাদের সফলতা সুনিশ্চিত।

'কামুস' প্রণেতা লিখেছেন, 'ফালাহ্' অর্থ সাফল্য, ভীতিকর অবস্থা থেকে মুক্তি, কল্যাণকর্মসম্পৃক্ততা। 'সাফল্য' অর্থ এখানে দুনিয়ার অথবা আখেরাতের কল্যাণ। অবশ্য এখানে আখেরাতের কল্যাণই উদ্দেশ্য। আখেরাতের কল্যাণসমূহ হচ্ছে— কবরের আযাব থেকে মুক্তি, কাঠিন্যবিমুক্ত হিসাব, কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে পরিত্রাণ, অতি সহজে পুলসিরাত অতিক্রম, দোজখের আগুন থেকে অব্যাহতি, জান্নাত লাভ, আল্লাহ্‌র নৈকট্য, সন্তোষ ও দর্শনলাভ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, এরকম পূর্ণ সফলতা পাপী বিশ্বাসীগণের ভাগ্যে জুটবে না। তবে তাঁরা বিশ্বাসী বলে বিভিন্ন উপায়ে পাপস্খলনের পর শেষ পর্যন্ত অবশ্যই জান্নাত লাভ করবেন। আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেন— 'বিন্দুবৎ পুণ্যও নজরে পড়বে পুণ্যবানদের, আর পাপীদের দৃষ্টিতেও পড়বে তাদের বিন্দু সমতুল পাপ।' কিন্তু ইমান বা বিশ্বাসই হচ্ছে সর্বসাফল্যের মূল। তাই তাদের পরিত্রাণ সুনিশ্চিত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌র এককত্বের সাক্ষ্যপ্রদানকারী সৌভাগ্যশালী হবে এবং প্রবেশ করবে জান্নাতে।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সুপরিণত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ জান্নাতে আদন সৃষ্টি করলেন। ওই জান্নাতে সৃষ্টি করলেন বিপুল ফলভারে ভারানত বৃক্ষরাজি। তারপর সেখানে প্রবাহিত করে দিলেন সলিলিত নদী। তারপর জান্নাতে আদনকে বললেন, কথা বলো। জান্নাত বললো, 'ক্বদ্ আফলাহাল মু'মিনূন'। আল্লাহ্ বললেন, আমার গৌরব ও সম্মানের শপথ, কোনো কৃপণ তোমার মধ্যে প্রবেশ করবে না। তিবরানী।

আমি বলি, আলোচ্য হাদিসে কৃপণ বলে বুঝানো হয়েছে কাফেরকুলকে। তওহীদের স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রে কার্পণ্য প্রদর্শন করে তারাই। ভিন্ন সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ জান্নাতে আদন সৃষ্টির পর তাতে স্থাপন করলেন এমন নেয়ামতসম্ভার, যা কোনো কর্ণ কখনো শ্রবণ করেনি, কোনো চক্ষু কখনো দেখেনি এবং যা উপলব্ধিও করেনি কোনো হৃদয়। এরপর আল্লাহ্ তাকে বললেন, এবার কথা বলো। জান্নাতে আদন বললো, 'অবশ্যই সফলকাম হয়েছে বিশ্বাসীরা'। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বায্যার, তিবরানী এবং বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন। আরো এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত কা'ব থেকে বায়হাকী ও মুজাহিদ এবং হজরত আনাস থেকে হাকেম। ইবনে আবিদ দুন্ইয়া তাঁর 'সিফাতুল জান্নাত' গ্রন্থে হজরত আনাস থেকে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ জান্নাতুল আদনের ইমারতসমূহ সৃজন করেছেন শ্বেতশুভ্র মোতি, লোহিতাভ ইয়াকুত এবং সবুজাভ জবরজাদের ইষ্টক দ্বারা। সেগুলোর দরজা ও ঘর মেশকের, উদ্যানের তৃণরাজি জাফরানের, প্রান্তরস্থিত প্রস্তর মোতির এবং মৃত্তিকা অম্বরের। এভাবে সৃজন সমাপনের পর আল্লাহ্ তাকে বললেন, আওয়াজ দাও। জান্নাতুল আদন আওয়াজ দিলো 'অবশ্যই সাফল্য লাভ করেছে বিশ্বাসীরা'। আল্লাহ্ বললেন, আমার মহামর্যাদার শপথ! তোমার অভ্যন্তরে কোনো কৃপণ প্রবেশ করবে না।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত সফলতার অর্থ জান্নাতে প্রবেশ করা। যদিও তা হয় পাপের শাস্তি ভোগের পরে। সুতরাং পুণ্যবান-পাপী সকল বিশ্বাসীরাই এর অন্তর্ভূত। কেননা সফলতাই এঁদের সকলের অবশেষ পরিণতি। অনেক হাদিসে একথার প্রমাণ রয়েছে। ইমানদারেরা হতে পারেন দু'শ্রেণীর— পুণ্যবান ও পাপী। কিন্তু এখানে 'পুণ্যবান বিশ্বাসীগণ' বলা হয়নি। বলা হয়েছে কেবল বিশ্বাসীগণ। সুতরাং বিশেষভাবে পুণ্যবান বিশ্বাসীরা সফলকাম হবেন— একথা বলা গেলেও একথা বলা যাবে না যে, পাপী বিশ্বাসীরা সাধারণভাবেও সফলকাম হবেন না। আমি বিবেকবিরোধী বক্তব্যের প্রবক্তা নই। ফেকাহ্ শাস্ত্রের নিয়ম হচ্ছে— কোনো আলোচনায় সুনির্দিষ্ট শর্ত বা গুণের উল্লেখ থাকলে অবশ্যই ওই শর্ত বা গুণের আলোকে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করতে হবে। কিন্তু যেখানে এরকম

www.eelm.weebly.com

শর্ত বা গুণের উল্লেখ নেই, সেখানে বক্তব্যকে গ্রহণ করতে হবে সাধারণভাবে। এখানেও তেমনি 'বিশ্বাসীগণ' কথাটির অর্থ হবে পুণ্যবান, পাপী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বিশ্বাসীগণ। অর্থাৎ এখানে সাফল্যের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে সকল বিশ্বাসীকে, বিশেষভাবে কেবল পুণ্যবান বিশ্বাসীগণকে নয়। তাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য এই যে, গোনাহ্গার মুমিনেরা তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে অথবা পাপের শাস্তি প্রদানের পর অবশেষে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে'। এখানে 'আল খশিউ'ন ' অর্থ বিনয়ী, আল্লাহ্ সকাশে বিনয়-নম্র হওয়া। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ— নিজেকে নিকৃষ্ট ভাবা, বিনীত হওয়া। মুজাহিদ বলেছেন, এর অর্থ— নিম্নগামী দৃষ্টির অধিকারী, মৃদুভাষী। হজরত আলী বলেছেন, নামাজ পাঠকালে এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত না করার নাম খুশু বা নম্রতা। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ডানে বামে কে আছে, তা অবহিত না হওয়ার নাম খুশু।

আমর ইবনে দিনার বলেছেন, খুশু অর্থ সুস্থির পুণ্যবান। আলেমগণের একটি দলের অভিমত হচ্ছে, খুশু অর্থ— সেজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। আতা বলেছেন, নামাজের সময় শরীরের কোনো অংশ নিয়ে কৌতুক না করা, অপ্রয়োজনে না চুলকানো ইত্যাদি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, একাগ্রচিত্ততার নাম খুশু। অর্থাৎ নামাজে মনোনিবদ্ধ রাখা, উচ্চার্য দোয়া কালামে গভীরভাবে অভিনিবেশী হওয়া, স্থানচ্যুত না হওয়া, এদিকে ওদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন না করা, পার্থিব কোনো কিছুতে আকৃষ্ট না হওয়া, আঙুল না মটকানো ইত্যাদি।

হজরত আবু দারদা বলেছেন, খুশু উদ্দেশ্য— বিশুদ্ধ উচ্চারণ, আল্লাহ্ সকাশে অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান হওয়া, পূর্ণ বিশ্বাস, পরিপূর্ণ ধ্যানমগ্নতা ও একাগ্রতা।

'কামুস' রচয়িতা লিখেছেন, 'খুশু'র অর্থ 'খুজু' (নম্রতা), অথবা বিনয়। কিংবা কথাটি সম্পর্কিত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'খুজু' অর্থ নিবিষ্টচিত্ততা, স্থিরতা, একাগ্রতা— যার সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে। আর 'খুজ্জ'র অর্থ প্রকাশ্য কোমলতা ও বিনম্রতা — যার সম্পর্ক নির্ভর করে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর।

হজরত আবু জর গিফারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, যতক্ষণ না সে নামাজের মধ্যে এদিক ওদিক দৃষ্টি না ফেরায়। সে এদিক ওদিক তাকালে, আল্লাহ্ও তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী।

www.eelm.weebly.com

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে নামাজে এদিক ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি স. বলেছেন, এটা এক রকমের বিপর্যয়, এর মাধ্যমে শয়তান মানুষের নামাজ বিনষ্ট করে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নামাজে এদিক ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালনের বিপদ সম্পর্কে বলেছেন, এরকম আচরণ পুণ্যকামীদের জন্য অবশ্য পরিহরণীয়। নতুবা তাদের দৃষ্টি রুদ্ধ করা হবে। বাগবী। মুসলিম ও নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, নামাজের দোয়াকালাম পাঠের সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি করার অপঅভ্যাস অবশ্য পরিত্যাজ্য। অন্যথায় তার দৃষ্টি হরণ করা হবে।

হজরত জাবের ইবনে সামুরা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, লোকদের উচিত, তারা যেনো আকাশের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করা থেকে বিরত থাকে। এরকম যেনো না হয় যে, চিরতরে তার দৃষ্টি হারায়। মুসলিম, আবু দাউদ, আহমদ, ইবনে মাজা।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, একবার রসুল স. এক লোককে নামাজের মধ্যে তার দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন, তার মধ্যে খুশু থাকলে তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেও প্রকাশ পেতো। হাকেম ও তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন শিথিল সূত্রে।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. বললেন, আমি কপটতামিশ্রিত বিনয় থেকে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণার্থী। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কপটতামিশ্রিত বিনয় কী? তিনি স. বললেন, বাহ্যিক বিনয় ও আন্তরিক অবিনয়।

মুজাহিদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়েরের নামাজের দণ্ডায়মানতা ছিলো স্থির কাষ্ঠখণ্ডের মতো। হজরত আবু বকর সিদ্দীকের অবস্থাও ছিলো তদ্রূপ।

হজরত আসমা বিনতে হজরত আবু বকর বর্ণনা করেন, আমার মাতা উম্মে রুম্মান বলেছেন, হজরত আবু বকর একবার আমাকে নামাজে এদিক ওদিক ঢলে যেতে দেখে এমন ধমক দিলেন যে, আমার নামাজ ভঙ্গ হওয়ার উপক্রম হলো। নামাজ শেষ হলে তিনি বললেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, কেউ নামাজে দণ্ডায়মান হলে সে যেনো তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুস্থির রাখে। ইহুদীদের মতো যেনো এদিক ওদিক না দোলে। নামাজে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অচঞ্চল রাখা নামাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইজালাতুল খিফা।

হজরত আবুল আহওয়াস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নির্দেশনা দিয়েছেন, কেউ নামাজে দণ্ডায়মান হলে সে যেনো তার সামনের পাথর কণা সরাতে ব্যস্ত না হয়ে

www.eelm.weebly.com

পড়ে, কেননা তার সম্মুখে তখন বর্ষিত হতে থাকে আল্লাহ্র রহমত। বাগবী। হজরত আবু জর থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন আহমদ, ইবনে আদী, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও ইবনে হাব্বান।

পরিচ্ছেদ ঃ হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. আমাকে বলেছেন, নামাজ পাঠকালে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে সেজদার জায়গায়। হাদিসটি বায়হাকী বর্ণনা করেছেন তাঁর 'সুনানে কবীর' নামক গ্রন্থে। হজরত আনাসের বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, রসুল স. আমাকে বলেছেন, নামাজে উপবেশনাবস্থায় এদিক সেদিক তাকিয়ো না। এরকম করলে নামাজ নষ্ট হয়। নফল নামাজে এমতো আচরণ সিদ্ধ হলেও ফরজ নামাজে অসিদ্ধ।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৩, ৪

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝

❐ যাহারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হইতে বিরত থাকে,

❐ যাহারা জাকাত দানে সক্রিয়,

আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'লাগবি' (অসার ক্রিয়াকলাপ) অর্থ শিরিক। হাসান বলেছেন, পাপ, অবাধ্যতা। আমি বলি, এর অর্থঃ ওই কর্মসমূহ, যা আখেরাতে হবে নিষ্ফল— বক্তব্যগত অথবা আচরণগত। আর 'মু'রিদুন' দ্বারাও এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে অংশীবাদিতা, অবাধ্যতা এবং আখেরাতের ক্ষতিকর কর্মসমূহের প্রতি। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতে বিশ্বাসীগণের একটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে— 'যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে'।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে অসার কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে অর্থ— যে অবিশ্বাসীদের গালমন্দের জবাব গালমন্দের মাধ্যমে দেয় না। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে— 'ওয়া ইজা মাররু বিল লাগবি মাররু কিরামান' (অসৌজন্যের বিনিময়ে দান করতো সৌজন্য)।

পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'যারা জাকাত দানে সক্রিয়'। 'জাকাত' ও 'জাকাত দান' উভয়ই জাকাতের অন্তর্ভূত। তৎসত্ত্বেও এখানে জাকাতের সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে 'ফায়িলুন' শব্দটি। সুতরাং বুঝতে হবে এক্ষেত্রে কেবল জাকাতের জন্য নির্ধারিত সম্পদের উল্লেখ করা হয়নি, বলা হয়েছে জাকাত প্রদানের কথা। কিন্তু এতে করেও বক্তব্যটি পরিষ্কার হয় না। তাই মনে করতে

www.eelm.weebly.com

হবে এখানে অনুক্ত রয়েছে 'আদা' (আদায় করে) শব্দটি। ওই অনুক্ত শব্দসহকারে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— 'লি আদায়িয্ যাকাতি ফায়িলূন' (যারা জাকাত দানে সক্রিয়)। এখানে 'ফায়িলূন' অর্থ সক্রিয়, জাকাত প্রদানে দৃঢ়বদ্ধ। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, এখানে 'জাকাত দানে সক্রিয়' অর্থ পুণ্যকর্মসমূহ সম্পাদনে সক্রিয়।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৫, ৬

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝

❒ যাহারা নিজদিগের যৌন অংগকে সংযত রাখে

❒ তবে নিজদিগের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসিগণের ক্ষেত্রে অন্যথা করিলে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না,

---

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে'। একথার অর্থ— যে সকল বিশ্বাসী নর-নারী তাদের গোপনাঙ্গকে পবিত্র রাখে অবৈধ যৌনাচার থেকে।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না।' এখানকার 'আ'লা আয্ওয়াজ্বিহিম' (নিজেদের পত্নী) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'হাফিজূন' (সংযত রাখে) কথাটির সঙ্গে। একটি আরবী প্রবাদে রয়েছে 'ইহ্ফাজ আ'লাইয়া ই'নানা ফারাসী'। এর অর্থ— আমার ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখো, স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়ো না। এই প্রবাদে 'আ'লা শব্দের ব্যবহারে যে নিয়মে ঘটেছে, সেই নিয়মই প্রয়োগ করা হয়েছে 'হাফিজূনা আ'লা আয্ওয়াজ্বিহিম' এর বেলায়। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে 'হিফ্জ্' (সংযত রাখা) কথাটির মধ্যে রয়েছে 'দান না করা', ব্যয় না করার অর্থ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে 'লা ইয়াব্জিলুনা ইল্লা আ'লা আয্ওয়াজ্বিহিম' (যারা আপন গোপনাঙ্গকে আপন স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোথাও ব্যয় করে না) অথবা এখানকার 'আ'লা আয্ওয়াজ্বিহিম' এর সম্পর্ক রয়েছে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই অনুক্ত ক্রিয়াসহযোগে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— 'হুম লা ইয়াবাজ্জিলুনা ইল্লা আ'লা আয্ওয়াজ্বিহিম'।

'মা মালাকাত আইমানুহুম' অর্থ— অধিকারভুক্ত দাসীগণ। অর্থাৎ বিশ্বাসীগণ আপন স্ত্রী এবং ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য কোনো রমণীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয় না।

www.eelm.weebly.com

বায়যাবী লিখেছেন, অধিকাংশ বিবেকবর্জিত বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় 'মা' (বিবেকবানদের ক্ষেত্রে 'মান')। এখানেও সেই অর্থে ক্রীতদাসীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'মা'। কেননা ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী তাদের মালিকের অভিপ্রায়াভূত বলে বিবেকবর্জিত বস্তুতুল্য। তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্য থাকে না। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত 'ফুরুজ' (যৌন অঙ্গ) অর্থ নারী-পুরুষ উভয়ের যৌন অঙ্গ। আর সেখানে নারী-পুরুষ উভয়ের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখতে বলা হয়েছে। তারপর আলোচ্য আয়াতে পৃথক করা হয়েছে স্ত্রী ও ক্রীতদাসীকে। অর্থাৎ বিশ্বাসী পুরুষ তার স্ত্রী ও ক্রীতদাসীর সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হতে পারবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে 'মা মালাকাত' (অধিকারভূত) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বায়যাবী ক্রীতদাসকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে করে এই সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে, তাহলে কোনো বিশ্বাসী রমণী কি তার ক্রীতদাসের সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হতে পারবে? আমি বলি, উদ্ভূত প্রশ্ন ও সন্দেহ অবান্তর। কারণ এখানে 'মা মালাকাত আইমানুহুম' এর অর্থ কেবল ক্রীতদাসী, ক্রীতদাস নয়। কারণ এখানে 'মান' ব্যবহার না করে ব্যবহার করা হয়েছে 'মা'। স্বল্পজ্ঞানের কারণে নারী জাতিকে সাধারণতঃ বিবেকহীন সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। অর্থাৎ তাদেরকে গণ্য করা হয় স্ত্রীলিঙ্গবাচক প্রাণীকুলের সঙ্গে। সুতরাং 'মা' প্রয়োগের কারণে এখানকার 'মালাকাত আইমানুহুম' কথাটির অর্থ দাঁড়াবে কেবলই ক্রীতদাসী, অধিকারভূত দাসী— ক্রীতদাস কখনোই নয়।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝

❑ এবং কেহ ইহাদিগকে ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা হইবে সীমালংঘনকারী,

❑ এবং যাহারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে

❑ এবং যাহারা নিজদিগের সালাতে যত্নবান,

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং কেউ এদেরকে ছেড়ে অন্যকে কামনা করলে সে হবে সীমালংঘনকারী।' এখানে 'আ'দূন' অর্থ সীমা অমান্যকারী, হালালকে ছেড়ে হারামের দিকে গমনকারী। উল্লেখ্য, এই আয়াতের মাধ্যমে মুতায়ার (সাময়িক বিবাহের) অনুমতি রহিত করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইসলামের প্রথম দিকে মুতায়া বৈধ ছিলো। কেউ দূরের কোনো শহরে সফরে গেলে সেখানকার কোনো মহিলাকে কিছুদিনের জন্য বিবাহ করতো। ওই মহিলা তার আহার্য রন্ধন করতো এবং তার মালসামানের হেফাজত করতো। এরপর পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়। ফলে স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য সকল মহিলার সঙ্গে যৌনচরিতার্থতা রহিত হয়ে যায়। তিরমিজি। উল্লেখ্য, মুতায়ার মাধ্যমে যে রমণীকে গ্রহণ করা হয় সে কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্ত্রী নয়। শিয়া সম্প্রদায় মুতায়াকে এখনো জায়েয মনে করলেও তারাও একথা বলে যে, মুতায়ালব্ধ স্ত্রীর উত্তরাধিকার নেই। এমতোক্ষেত্রে স্বামীও স্ত্রীর উত্তরাধিকার পায় না। সুতরাং তারা প্রকৃত অর্থে স্বামী-স্ত্রী নয়। অথচ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক উত্তরাধিকার কোরআন কর্তৃক স্বীকৃত। আমি সুরা নিসার তাফসীরের যথাস্থানে বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, হস্তমৈথুন নিষিদ্ধ। এটাই সাধারণ আলেমগণের অভিমত। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আমি আতা সমীপে বিষয়টি উত্থাপন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এরকম আমল মাকরুহে তাহরিমী (প্রায় হারাম)। তিনি আরো বলেছিলেন, আমি শুনেছি, কিছুসংখ্যক লোক হাশরের ময়দানে গর্ভবতী হাত নিয়ে উত্থিত হবে। আমি ধারণা করি তারা অভ্যস্ত ছিলো হস্তমৈথুনে। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, কোনো কোনো লোক পুরুষাঙ্গ নিয়ে খেলা করতো। আল্লাহ্ এজন্য তাদেরকে দণ্ডদান করেছিলেন।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।' একথার অর্থ— বিশ্বাসীগণের নিকট আমানত স্বরূপ কোনো কিছু রেখে দিলে তারা তা যথাযথরূপে সংরক্ষণ করে এবং কারো নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে সে অঙ্গীকারও অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করে।

অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি দু'প্রকার— ১. আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার, যা ইমানের সঙ্গে সতত সম্পৃক্তঃ যেমন— নামাজ, রোজা ও শরিয়তের অন্যান্য নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ, ২. মানুষের সঙ্গে সম্পাদিত পারস্পরিক অঙ্গীকারঃ যেমন— আমানত, ব্যবসায়, বিবাহ ইত্যাদি।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে বান্দার নিকটে সর্বপ্রথম হিসাব গ্রহণ করা হবে নামাজের। নামাজ সঠিক হলে সে হবে সফলকাম, আর নামাজ সঠিক না হলে সে বঞ্চিত হবে সফলতা থেকে। যদি তার ফরজ নামাজে ত্রুটি পরিদৃষ্ট হয়, তবে আল্লাহ্ নির্দেশ করবেন, আমার এই বান্দার নফল দ্বারা ত্রুটি পূর্ণ করো। এভাবে বিচার করা হবে

www.eelm.weebly.com

তার অন্যান্য আমলকেও। অপর বর্ণনায় এসেছে, এরপর হিসাব গ্রহণ করা হবে তার জাকাতের, তারপর অন্যান্য আমলের। বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও আহমদ।

এর পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান।' একথার অর্থ— এবং যে সকল বিশ্বাসী নির্ধারিত সময়ে নামাজ পাঠ করে সুন্দর ও সুচারুরূপে। উল্লেখ্য ইতোপূর্বেও ২ সংখ্যক আয়াতে নামাজের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সেখানে বলা হয়েছে বিনয়-নম্রতার কথা। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যত্নবান হওয়ার কথা। এভাবে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করে নামাজের প্রসঙ্গকে করে তোলা হয়েছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আর এভাবে ফুটে উঠেছে নামাজের দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য— বিনয়-নম্রতা ও যত্নবানতা।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ১০, ১১

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

❒ তাহারাই হইবে উত্তরাধিকারী,

❒ উত্তরাধিকারী হইবে ফিরদাউসের যাহাতে উহারা স্থায়ী হইবে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমাংশে সাধারণভাবে কেবল বলা হয়েছে বিশ্বাসীগণের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির কথা, পরের অংশে সুনির্দিষ্টভাবে জান্নাতুল ফেরদাউসের সুসংবাদ প্রদানের পর বলা হয়েছে সেখানকার চিরস্থায়ী বসবাসের কথা। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— এতক্ষণ ধরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারীগণই তাদের সফলতার প্রতিভূরূপে লাভ করবে জান্নাতুল ফেরদাউসে বসবাসের চিরস্থায়ী অধিকার।

'ওয়ারিছুন' অর্থ উত্তরাধিকারী। এভাবে বিশ্বাসীগণকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বলে সম্মানিত করা হয়েছে এখানে। কিন্তু এতে করে আবার এমতো সন্দেহ পোষণ করা যাবে না যে, পূর্বে অন্য কেউ বেহেশতের মালিক ছিলো, আর বিশ্বাসীগণ লাভ করবে তাদের পরিত্যক্ত জান্নাত। না, তা নয়। আমি বলি, প্রকৃত কথা এই যে, অবিশ্বাসীদের জন্যও শর্তসাপেক্ষে জান্নাত নির্ধারিত ছিলো। সে শর্ত হচ্ছে ইমানের শর্ত। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করলে হবে জান্নাতের ওই অংশের মালিক। কিন্তু বিশ্বাস আনয়ন না করার কারণে তারা হবে জাহান্নামী। আর তাদের জন্য নির্ধারিত জান্নাতের অধিকারী করে দেয়া হবে বিশ্বাসীগণকে। বিষয়টি উত্তরাধিকার হস্তান্তর করার মতো। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে 'ওয়ারিছুন' বলা হয়েছে একারণেই।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত রয়েছে দু'টি বাসস্থান— একটি বেহেশতে, আর একটি দোজখে। কেউ অবিশ্বাসী হয়ে মৃত্যুবরণের পর দোজখবাসী হলে তার বেহেশতের বাসস্থানের উত্তরাধিকার লাভ করবে বেহেশতবাসীরা। আলোচ্য আয়াতে সেই উত্তরাধিকারিত্বের কথাই বলা হয়েছে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা, সাঈদ ইবনে মনসুর, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকী। আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর ও হাকেমের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— বেহেশতবাসীরা নিজেদের জন্য নির্ধারিত অংশের অধিকারী তো হবেই, তদুপরি হবে তার ওই ভাইয়ের উত্তরাধিকারী যে দোজখবাসী হয়েছে বিশ্বাস গ্রহণ না করার কারণে।

হজরত আনাস থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে উত্তরাধিকারিত্ব গ্রহণে অনীহ হয়, আল্লাহ্ নিঃশেষ করে দেন তার বেহেশতের উত্তরাধিকার।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ওয়ারিছু বা উত্তরাধিকারী হওয়ার অর্থ কর্মফল হিসেবে জান্নাত লাভ। অর্থাৎ উত্তরাধিকারী যেমন শেষ পর্যন্ত তার প্রাপ্য উত্তরাধিকার লাভ করে, তেমনি পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীরাও অবশেষে লাভ করে বেহেশত।

'হুম ফীহা খলিদূন' অর্থ— তারা সেখানে স্থায়ী হবে। অর্থাৎ বিশ্বাসীগণ জান্নাতুল ফেরদাউসে কেবল প্রবেশই করবে না, তারা সেখানে বসবাসও করবে অনন্তকাল ধরে।

ইমাম আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও হাকেম হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর নিকটে যখন 'ওহী' (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ হতো, তখন তাঁর মুখমণ্ডলের সামনে ধ্বনিত হতো মধুমক্ষিকাদের গুঞ্জনের মতো আওয়াজ। একবার প্রত্যাদেশ অবতরণকালে আমি উপস্থিত ছিলাম তাঁর মহান সান্নিধ্যে। অবতরণ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি স. কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে আরো অধিক দান করো, কম দিয়ো না, আমাদেরকে মর্যাদায়িত করো, লাঞ্ছিত কোরো না, সফল করো, বঞ্চিত কোরো না, আমাদেরকে করো অন্যাপেক্ষা অগ্রগণ্য, অন্যদেরকে আমাদের অগ্রণী কোরো না। আর আমাদেরকে করো প্রীত, প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত। তুমিও দয়া করে তুষ্ট হয়ে যাও আমাদের প্রতি। প্রার্থনা শেষে তিনি স. আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার উপরে অবতীর্ণ হয়েছে দশটি আয়াত। যে এই আয়াতগুলোর উপরে আমল করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'ক্বদ আফলাহাল মু'মিনূন' থেকে 'হুমুল ওয়ারিছুন' পর্যন্ত (আলোচ্য সুরার প্রথম দশ

www.eelm.weebly.com

আয়াত)। নাসাঈ হাদিসটিকে বলেছেন পরিত্যক্ত। কিন্তু হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। উল্লেখ্য, এই সুরার প্রথম দশ আয়াতে দেয়া হয়েছে প্রকৃত বিশ্বাসীগণের গুণাবলীসমূহের অনিন্দ্যসুন্দর বিবরণ। বিশ্বাসীগণের সত্তাগত ও গুণগত পরিপূর্ণতা উন্মোচিত, বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হয় এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমেই। আল্লাহ্তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত।

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ১২, ১৩

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝

❒ আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকার উপাদান হইতে,

❒ অতঃপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে;

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! আমিই তোমাদের একক সৃজয়িতা। আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে। সুতরাং মনে রেখো, আমাকে একক স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করা এবং কেবল আমার ইবাদত করা তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক।

এখানে 'সুলালাতিন্' অর্থ উপাদান, উপকরণ। আর 'মিন ত্বীন' অর্থ মৃত্তিকা থেকে। এখানকার 'মিন' হচ্ছে বর্ণনামূলক। তাই 'সুলালাতিম্ মিন ত্বীন' এর অর্থ দাঁড়ায়— মৃত্তিকার সারবস্তু থেকে।

এখানে 'ত্বীন' এর আরেক অর্থ হজরত আদম। আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর ও আবদ ইবনে হুমাইদের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, এখানে 'ত্বীন' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত আদমকে। আবদ ইবনে হুমাইদ স্বয়ং বলেছেন, 'মিন সুলালাতিম্ মিন ত্বীন' কথাটির অর্থ— আদম সন্তানগণের বীর্য। অর্থাৎ ত্বীন অর্থ বনী আদম এবং সুলালাতিন অর্থ বীর্য বা শুক্র।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'সুলালাতিন' অর্থ পানির সারবস্তু। ইকরামা বলেছেন, 'সুলালাতিন্' অর্থ ওই পানি যা নির্গত হয় পৃষ্ঠদেশ থেকে। আরববাসীরা 'নুত্ফা' বা বীর্যকে বলে 'সুলালাহ্'।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে'। অর্থাৎ আমি শুক্রবিন্দুর সারবস্তু সেখানে স্থাপন করি। এখানকার 'জাআ'লনাহু' (তাকে স্থাপন করি) এর 'হু' (তাকে) সর্বনামটি পূর্ববর্তী আয়াতের 'সুলালাতিন্' (উপাদান) এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এখানে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়, আমি ওই মৃত্তিকার সারবস্তু শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি

www.eelm.weebly.com

এক নিরাপদ আধারে। এরকমও হতে পারে যে, সর্বনামটি সম্বন্ধযুক্ত হবে পূর্ববর্তী আয়াতের 'মানুষ' (ইনসান) এর সাথে। এভাবে বুঝতে হবে 'নুত্বফা' কথাটির পূর্বে লুপ্ত রয়েছে একটি জের প্রদানকারী অব্যয় (হরফে জার)। ওই অব্যয়টিকে উহ্য রেখে এখানে সংযোজিত হয়েছে 'নুত্‌ফাতান্' (শুক্রবিন্দুরূপে) কথাটি।

'ক্বারারিন' অর্থ আধার। অর্থাৎ গর্ভাধার। 'মাকীন' অর্থ নিরাপদ্। উল্লেখ্য যে, এখানে 'নিরাপদ আধার' এর নিরাপত্তা গর্ভধারিণীর জন্য নয়, বরং গর্ভস্থিত শিশুর জন্য। অর্থাৎ গর্ভস্থিত শিশুর কারণেই মাতৃউদরকে করা হয়েছে নিরাপদ আধার। সুতরাং বুঝতে হবে, গর্ভাশয়কে এখানে নিরাপদ আধার বলা হয়েছে রূপক অর্থে।

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ১৪

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ○

❐ পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢাকিয়া দিই মাংস দ্বারা; অবশেষে উহাকে আরো এক রূপ দান করি। সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান!

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে।' এখানে 'মুদ্বগা়তান্' অর্থ রক্তপিণ্ড যার আকার চর্বনের উপযোগী পর্যায়ের।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর জমাট রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে; অতঃপর অস্থিকে ঢেকে দেই মাংস দ্বারা'। একথার অর্থ— অতঃপর আমি ওই রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি আরো ঘনবদ্ধ এক পিণ্ডে, গোশতপিণ্ডে। তারপর তার একাংশকে অস্থিতে পরিণত করে অপর অংশকে করি তার আবরণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'অবশেষে তাকে আরো এক রূপ দান করি'। একথার অর্থ— অবশেষে তাতে আত্মার সম্পাত ঘটিয়ে দান করি জীবন্ত রূপ। এখানে 'আন্‌শা'নাহু' এর 'হু' সর্বনামটির সম্পর্ক ঘটেছে 'সুলালাতিন' অথবা 'ইনসান' এর সঙ্গে। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরামা, জুহাক ও আবুল আলীয়া বলেছেন, এখানে 'খলক্বান আখার' (আরো এক রূপ) বলে বুঝানো হয়েছে রূহ নিক্ষেপ করাকে।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, বর্ণিত ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হবে, ওই রূহ অধোস্থিত রূহ বা পাশবিক প্রবৃত্তি, প্রকৃত রূহ নয়। কারণ প্রকৃত রূহ সমুচ্চ ও পবিত্র এবং এর অবস্থানস্থল আরশের ঊর্ধ্বে, যা স্থানসম্ভূত কিছু নয়। আর নফস্, প্রাণ বা প্রবৃত্তি হচ্ছে তরল বা বায়বীয় এক ধরনের সূক্ষ্ম ও উষ্ণ পদার্থ, যা দেহজাত, অর্থাৎ মানবদেহের অধ্যায়ান্তরের প্রতিফল বা পরিণতি। আলোচ্য বাক্যে এই নফসের কথাই বলা হয়েছে। আর প্রকৃত রূহ তো সৃজিত হয়েছে মানবদেহ সৃষ্টির বহু পূর্বে আলমে আরওয়াহ্‌তে (আত্মার জগতে)। সেখানেই সকল রূহকে একত্রিত করে আল্লাহ্ প্রশ্ন করেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভুপালক নই? রূহসকল তখন সমস্বরে জবাব দিয়েছিলো, হ্যাঁ। আর তখন তো মানবদেহের অস্তিত্বই ছিলো না।

রূহনিক্ষেপ কাকে বলেঃ 'নাফাখে রূহ' হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার একটি গুণ, যা অবিনশ্বর। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— 'ওয়ানাফাখতু ফিহী মিররূহী'। অস্থিসমূহ যখন চর্ম-গোশতের পোশাক পরিধান করে, তখন শরীরের সঙ্গে ঘটে রূহের সম্পর্ক। কিন্তু মনে রাখতে হবে শরীর হাদেছ (নশ্বর) এবং রূহ ক্বদীম (অনশ্বর)। তবে 'আনশা' অর্থ যদি এখানে 'রূহনিক্ষেপ' বা 'আত্মাসম্পাত' হয়, নতুন সৃষ্ট কোনোকিছু না হয়, তবে এমতো প্রমাণের আর আবশ্যক হয় না।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র সত্য রসুল স. বলেছেন, মানব-বীর্য তার রমণীগর্ভে মনি হিসেবে থাকে চল্লিশ দিন। তারপর তা পরিণত হয় রক্তপিণ্ডে, তারপর গোশতপিণ্ডে। এরপর আল্লাহ্ তার জন্য চারটি নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেন একজন ফেরেশতাকে— ১. ভালো-মন্দ কর্ম-পরিক্রমা ২. আয়ুষ্কাল ৩. রিজিক বা জীবনোপকরণ ৪. সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য। তারপর তার প্রতি ঘটানো হয় আত্মার সম্পাত। যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! কিছুসংখ্যক লোক জীবনভর পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে, এভাবে পৌঁছে যায় বেহেশতের এক গজ ব্যবধানে, এমতাবস্থায় তকদীর তার উপরে প্রবল হয়, সে তখন শুরু করে পাপাচার, এভাবে সাঙ্গ হয় তার জীবনলীলা। আবার কিছুসংখ্যক লোক আজীবন পাপকর্ম করতে করতে উপনীত হয় এমন স্থানে, যখন তার এবং দোজখের মধ্যে ব্যবধান থাকে এক গজ, এমতাবস্থায় তার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে তকদীর, সে তখন পৃথিবী পরিত্যাগ করে বেহেশতী লোকের মতো পুণ্যকর্ম করতে করতে, দোযখী হয়ে যায় বেহেশতী (এভাবে প্রায় নিশ্চিত বেহেশতী হয়ে যায় দোজখী এবং প্রায়নির্ধারিত দোজখী হয়ে যায় বেহেশতী)। বোখারী, মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

একটি প্রশ্নঃ আলোচ্য আয়াতে শুক্রবিন্দু-জমাট রক্তপিণ্ড-অস্থিপঞ্জর-মাংস দ্বারা আবৃত হওয়া, এ সকল অবস্থাকে প্রকাশ করা হয়েছে 'ফা' অব্যয় দ্বারা। এতে করে বুঝা যায়, বর্ণিত পরিবর্তনগুলো বাস্তবায়িত হয় অতি দ্রুত, বিরতিহীনভাবে। কিন্তু উপরে বর্ণিত হাদিসে পরিবর্তনগুলোর মধ্যবর্তীতে উল্লেখিত হয়েছে 'ছুম্‌মা' (তারপর) শব্দটি। এতে করে বুঝা যায় পরিবর্তনগুলো সূচিত হয় বিলম্বিত লয়ে, বিরতি সহকারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতে করে আলোচ্য আয়াত ও উল্লেখিত হাদিসের বিবরণগত বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না কি?

জবাবঃ হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, দুই পরিবর্তনের মধ্যবর্তী সময়ের পরিসর চল্লিশ দিন। তাই এমতো ক্ষেত্রে 'ছুম্‌মা' শব্দটির ব্যবহারই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু একথাও একই সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, এমতো সুসঙ্গত রূপান্তরের ক্ষেত্রে চল্লিশ দিনের সংখ্যাগত দিকটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। সুসঙ্গত এবং রূপান্তরণের গতিপ্রকৃতির বিস্ময়কর দিকটিই এখানে প্রধান। তাই আলোচ্য আয়াতে প্রতিটি রূপান্তরকে প্রকাশ করা হয়েছে 'ফা' অব্যয় সহযোগে। তাছাড়া আগাগোড়া সকল রূপান্তরণের ক্ষেত্রে 'ফা' অব্যয় সংযোজিত হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে ছুম্‌মা— যেমন ১. ছুম্‌মা জাআ'লনাহু নুত্‌ফাতান (অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি) ২. ছুম্‌মা খলাক্বনা নুত্‌ফাতা আলাক্বতান (পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাটরক্তে)। পরবর্তী তিন অবস্থা (পিণ্ড, অস্থিপঞ্জর, মাংস দ্বারা অস্থিপঞ্জর ঢেকে দেয়া) কে প্রকাশ করা হয়েছে 'ফা' অব্যয় সহযোগে। শেষে আবার ব্যবহৃত হয়েছে ছুম্‌মা। যেমন— ছুম্‌মা আনশা'নাহু খল্‌ক্বান আখার (অবশেষে তাকে আরো এক রূপ দান করি)। সুতরাং বুঝতে হবে বর্ণনাভঙ্গির এই কৌশলের মধ্যে রয়েছে রূপান্তরণের ব্যবধান ও বিভিন্নতার প্রতি ইঙ্গিত। মৃত্তিকার উপাদানকে শুক্রবিন্দুতে পরিণত করা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তারপর পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে মাতৃগর্ভে তাকে স্থাপন করা এবং তাকে জমাটরক্তরূপে নিরাপদ রাখার বিষয়টিও কম আশ্চর্যের নয়। নিঃসন্দেহে এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র এক বিরল অলৌকিকতা। কিন্তু এর পরের অবস্থাগুলো (পিণ্ড, অস্থি-পঞ্জর, মাংসের আবরণ) তত্তুল্য আশ্চর্যজনক নয়। তাই প্রথম দুই অবস্থায় 'ছুম্‌মা' এবং শেষ তিন অবস্থায় 'ফা' ব্যবহার করা হয়েছে। শেষ ধাপে আবার রয়েছে উত্তুঙ্গ বিস্ময়। তাই সেখানে পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছে 'ছুম্‌মা'। বলা বাহুল্য, এরকম করাই ছিলো যুক্তিসঙ্গত।

মাসআলাঃ কেউ যদি অন্যায়ভাবে ডিম হস্তগত করে এবং হস্তগতকারীর নিকটে ওই ডিম্ব থেকে বাচ্চা নির্গত হয়ে মরে যায়, অথবা পেটের ভিতর থেকে ডিম বের করার পর বাচ্চা ফুটে বের হয়, তবে উভয় অবস্থায় ওই ডিমের জন্য জরিমানা দিতে হবে। কারণ তখন ওই ডিমে সৃজিত হয় জীবনের চিহ্ন। উল্লেখ্য, জরিমানার সম্পর্ক করা হয়ে থাকে প্রথম জীবনপ্রাপ্তির সঙ্গে।

www.eelm.weebly.com

কাতাদা বলেছেন, এখানে 'আরো এক রূপ দান করি' কথাটির অর্থ— তখন তার অস্থিতে উদগত হয় দন্ত ও কেশ। ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ পূর্ণ যৌবনে পদার্পন। হাসান বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ অবশেষে আমি তাকে পরিণত করি নর অথবা নারীতে। আউফীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ— অবশেষে তার রূপান্তর ঘটাই এভাবে— জন্মগ্রহণ, ক্রন্দন, দুগ্ধপান, বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা, দুগ্ধপান ছেড়ে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ, কৈশোর- যৌবন ইত্যাদি।

আমি বলি, কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আমি অতঃপর দান করি এক নতুন জীবন, সুফী সাধকগণের যে জীবন লাভ হয় পশুপ্রবৃত্তি সমূহের বিনাশনের (ফানার) পর। উল্লেখ্য, পরিবর্তিত এই জীবন ফেরেশতাদের মতো পবিত্র। ফেরেশতা-জীবন অতিক্রমণের পরেও রয়েছে আল্লাহ্‌র রহমতের দিকে নিরন্তর অভিযাত্রা, যার অবশেষ উপনীতির নাম বাকাবিল্লাহ্। ওই জীবনের কথাই বলা হয়েছে এখানে 'আরো এক রূপ দান করি'- এর মাধ্যমে।

শেষে বলা হয়েছে— 'সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ্ কতো মহান'। এখানে 'ফাতাবারকা' কথাটির 'ফা' কারণ প্রকাশক। অর্থাৎ এতক্ষণ ধরে বর্ণিত মানব সৃষ্টির অধ্যায়ান্তর ও বিবর্তন শেষে পূর্ণত্ব প্রদানের কারণে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্‌তায়ালা সুনিপুণ স্রষ্টা, সুউচ্চ, মহান। সুতরাং তিনি এক, অবিভাজ্য, আনুরূপ্যবিহীন। তাই একমাত্র তাঁর উপাসনা ভিন্ন সৃষ্টির অন্য কোনো উপায় নেই।

মুতাজিলাদের অভিমতঃ মুতাজিলারা বলে, বান্দা নিজেই তার কর্মের স্রষ্টা। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তাদের অভিমত হচ্ছে— আল্লাহ্‌তায়ালা সুনিপুণ ও মহান স্রষ্টা। তাই বুঝতে হবে স্রষ্টা আরো রয়েছে, কিন্তু সুনিপুণ ও মহান নয়। এর জবাবে আমরা বলি, সৃজন কেবলই আল্লাহ্‌র। এক্ষেত্রে কেউ তাঁর অংশী নয়। একথা শরিয়তের দলিল ও বুদ্ধিগত প্রমাণ দ্বারা সুপ্রত্যয়িত। সুতরাং বান্দা তার কর্মের নির্মাতা বটে, কিন্তু স্রষ্টা কদাচ নয়। যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করেন— 'খলাক্বাকুম ওয়ামা তা'মালুন' (আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কার্যাবলীকেও)। সৃষ্টির অস্তিত্ব অনস্তিত্বজাত। আল্লাহ্ই তাকে অস্তিত্বায়িত করেছেন। যে স্বয়ম্ভূ নয়, সে আবার অন্যকে অস্তিত্ব প্রদান করতে পারে কীভাবে। সুতরাং বুঝতে হবে সৃষ্টির অস্তিত্বের স্রষ্টা যেহেতু আল্লাহ্ তাই তার প্রতিক্রিয়া বা কর্মসমূহের স্রষ্টাও আল্লাহ্। সেকারণেই সকল সাহাবী এবং সত্যাধিষ্ঠিত বিদ্বজ্জন এ ব্যাপারে একমত যে, স্রষ্টা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ নয়। তবে আমরা একথাও বলি যে, অপ্রত্যক্ষ বা রূপক অর্থে সৃজনকর্মের সম্পর্ক বান্দার সঙ্গেও প্রমাণ করা যায়। যেমন হজরত ঈসা বলেছিলেন— আন্‌নী

www.eelm.weebly.com

আখলুক্কু লাকুম্ মিনাত্ত্বীনি কাহাইআতিত্তুইরি (আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা একটি পাখি নির্মাণ করেছি)। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে— 'ওয়া তাখলুক্কুনা ইফ্কান' (এবং তোমরা মিথ্যা রচনা করো)। কিন্তু একথা স্মরণ রাখাও অত্যাবশ্যক যে, 'খলক্ব' (সৃজন) শব্দটি যখন বান্দার সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়, তখন তার অর্থ হবে নির্মাণ করা, রচনা করা, প্রস্তুত করা বা তৈরী করা। অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করা নয়। প্রকৃত কথা এই যে, বান্দাকে দেয়া হয়েছে সংকল্পের স্বাধীনতা। অর্থাৎ সে হতে পারে ভালো অথবা মন্দ কর্মের পরিকল্পক বা সংকল্পক, স্রষ্টা কখনো নয়। কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ্ স্বয়ং। তিনিই বান্দার সৎ অথবা অসৎ উদ্দেশ্যকে অস্তিত্ব দান করেন, ফলে তা লাভ করে বাস্তব রূপ। বান্দার পুরস্কার এবং তিরস্কার নির্ধারণ করা হয় তার ওই ইচ্ছাগত স্বাধীনতার কারণে। তাই সে হতে পারে অর্জনকারী, স্রষ্টা কখনোই নয়। অর্থাৎ অর্জন সৃষ্টির, আর সৃজন আল্লাহ্র। বান্দা কেবলই পরিকল্পক ও নির্মাতা, আর আল্লাহ্ যেমন নির্মাতা, তেমনি সৃজয়িতাও। এ কারণেই মুজাহিদ বলেন, বান্দা নির্মাণ করে, আল্লাহ্ও নির্মাণ করেন, কিন্তু তিনি বান্দার চেয়ে উত্তম নির্মাতা, কারণ সৃজন তাঁর, কেবলই তাঁর।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'আল খলিক্বীন' অর্থ আকৃতি প্রস্তুতকারী বা পরিকল্পনাকারী। 'খলক্ব' এর আভিধানিক অর্থ পরিকল্পনা বা অনুমান। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, কথাটির ভিত্তি— অসম্ভবকে মেনে নেয়া কিন্তু অসম্ভব নয়। অর্থাৎ সৃষ্টির স্রষ্টা হওয়াকে অসম্ভব বলে মেনে নিলেও, বলতে হবে আল্লাহ্তায়ালাই সর্বোত্তম ও মহান স্রষ্টা, অন্য কেউ নয়।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, আমার প্রভুপালনকর্তার পক্ষ থেকে আমার চারটি বিষয় লাভ করেছে আল্লাহর আনুকূল্য, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে— 'আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে ....অবশেষে তাকে আরো এক রূপ দান করি' অবতীর্ণ হওয়ার পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার মুখে উচ্চারিত হয়েছিলো 'সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ্ কতো মহান'। এই কথাটিই পরে অবতীর্ণ হয়েছে প্রত্যাদেশরূপে।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ্ ইবনে সা'দ ইবনে সারাহ্ ছিলো রসুল স. এর সঙ্গী। প্রত্যাদেশিত বাণী লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব ছিলো তার উপরে। একদিন রসুল স. বলবার আগেই সে উচ্চারণ করলো 'ফা তাবারাকাল্লাহু আহ্সানুল খলিক্বীন'। রসুল স. বললেন, লিখে ফেলো, এটাই প্রত্যাদেশ। এরপর থেকে আবদুল্লাহ্ প্রচার করতে শুরু করলো, আমিও নবী, আমার উপরেও প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ইসলাম ত্যাগ করে সে চলে গেলো মক্কায়। কিছুকাল পরে মক্কা বিজিত হলো। রসুল স. কয়েকজন মহাঅপরাধীর তালিকা

www.eelm.weebly.com

প্রস্তুত করে বললেন, এদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করতে হবে। আবদুল্লাহ্র নামও ছিলো ওই তালিকায়। সে আশ্রয় নিলো হজরত ওসমানের কাছে। হজরত ওসমান রসুল স. সকাশে তার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করলেন। রসুল স. কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর বললেন, তথাস্তু। হজরত ওসমান তাকে নিয়ে প্রস্থান করার পর রসুল স. বললেন, আমি 'তথাস্তু' বলার আগে তোমরা তাকে বধ করলেনা কেনো? আমি তো এজন্যেই সময়ক্ষেপণ করেছিলাম। জনৈক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো ছিলাম ইঙ্গিতের অপেক্ষায়। রসুল স. বললেন, এরকম নেপথ্য নির্দেশ নবীর জন্য অশোভন। উল্লেখ্য, আবদুল্লাহ্ ওই দিনই মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর থেকে আজীবন তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধাচারী বিশ্বাসী।

আমি বলি, 'সাবিলুর রাশাদ' গ্রন্থে আবদুল্লাহ্র ধর্মত্যাগী হওয়া, মক্কাবিজয়ের পর তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হওয়া, হজরত ওসমানের মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রাপ্তি, পুনঃ ইসলাম গ্রহণ সকল কিছুই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ওহি লিপিবদ্ধ করার সময় তাঁর মুখ থেকে ওহির কোনো বাণী আগাম উচ্চারিত হয়েছিলো— সেকথা সেখানে নেই। ঐতিহাসিক বিচারে এরকম হওয়া অসম্ভবও। কারণ আবদুল্লাহ্ ধর্মত্যাগ করেছিলো মদীনায়। আর আলোচ্য আয়াতের অবতরণস্থল হচ্ছে মক্কা। অর্থাৎ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো রসুল স. এর মদীনায় হিজরতের পূর্বেই।

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ১৫, ১৬

ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۝

❒ ইহার পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করিবে,

❒ অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! মৃত্তিকার উপাদান থেকে তোমাদের সৃজনায়ন শুরু হবার পর থেকে বিভিন্ন স্তরান্তর শেষে তোমরা যখন পরিণত অবস্থায় উপনীত হবে, তখন এক সময় সাঙ্গ হবে তোমাদের জীবনলীলা। তখন অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে তোমাদের সকলকে। সুতরাং সচেতন হও। যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করো মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য।

'মায়্যিত' ও 'মায়্যেত' ওই ব্যক্তি, যে মৃত্যুবরণ কারী। আর 'মায়্যাত' অর্থ মৃত। সুতরাং এই শব্দটিকে এখানে 'জজম' যোগে উচ্চারণ করা সিদ্ধ নয়। যেমন— 'ইন্নাকা মায়্যিতুন ওয়া ইন্নাহু মায়্যিতুন' (নিশ্চয় তুমি মৃত্যুবরণ করবে

www.eelm.weebly.com

এবং মৃত্যুবরণ করবে তারাও)। এ স্থানেও 'জজম' সংযোজন অসিদ্ধ। এরকম বলেছেন বাগবী। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'মাতা', 'ইয়ামূতু' হচ্ছে বাবে নাসারা, 'ইয়ামাতু' হচ্ছে ফাতাহা এবং 'ইয়ামিতু' হচ্ছে দ্বরাবা। 'মায়্যিতুন' ও 'মায়তুন' উভয় দিক থেকে জীবনের বিপরীত। 'মা-তা' এর শাব্দিক অর্থ নিদ্রাভিভূত, সমাহিত, স্থবিরিত। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'মায়তুন' ওই ব্যক্তি, যে মৃত্যুবরণ করেছে এবং 'মায়্যিতুন' ও 'মায়্যেতুন' ওই ব্যক্তি যে মৃত্যুবরণ করবে।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে'। এ কথার অর্থ— মৃত্যুর পর সমাধিস্থ হবে তোমরা। সেখানে এক নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হলে শুরু হবে মহাপ্রলয়। ওই মহাপ্রলয় শেষে অনন্ত জীবনের স্বস্তি অথবা শাস্তি নির্ণয়ার্থে ঘটানো হবে তোমাদের মহাপুনরুত্থান।

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ১৭, ১৮

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ○ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ

❒ আমি তো তোমাদিগের উর্ধ্বে সৃষ্টি করিয়াছি সপ্তাকাশ এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অনবধান নহি,

❒ এবং আমি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর আমি উহা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি; আমি উহাকে অপসারিত করিতেও সক্ষম।

'সাবয়া তুরায়িক্বা' অর্থ সপ্ত পথ। এখানে কথাটির অর্থ সপ্তাকাশ। কারণ প্রতিটি উর্ধ্বাকাশ নিম্নবর্তী আকাশের উপর আরূঢ়। আকাশকে এখানে পথ বলার আর একটি কারণ এই হতে পারে যে, প্রতিটি আকাশে রয়েছে ফেরেশতাদের চলাচলের পথ। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের প্রথমাংশের অর্থ দাঁড়ায়— আমি তো তোমাদের জন্য উর্ধ্বদেশে সৃষ্টি করেছি অসংখ্য পথসমৃদ্ধ সপ্তাকাশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়ামা কুন্না আনিল খলক্বি গফিলীন' (এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অনবধান নই)। এখানে 'গফিলীন' অর্থ অনবধান, অসতর্ক, উদাসীন। এভাবে আলোচ্য বাক্যটি হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যের কারণ। মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আমি তোমাদের উপরে সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছি এ কারণে যেনো তোমাদের প্রতি সতত উন্মুক্ত থাকে তোমাদের রিজিক ও বরকতের দ্বার, যেনো তোমাদেরকে

www.eelm.weebly.com

আলোক প্রদান ও অন্যান্য কল্যাণ প্রদানে সদা নিয়োজিত থাকে সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডলী। এ সকল কিছু হচ্ছে তোমাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য অত্যাবশ্যক। আর এই অত্যাবশ্যকতা সংরক্ষণের জন্য আমি এক মুহূর্তও উদাসীন নই। তাইতো তোমাদের জীবনপ্রবাহ এতো সুসংরক্ষিত, সুবিন্যস্ত ও সুপরিণত।

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি'। এখানে আকাশ থেকে বর্ষিত পানি অর্থ বৃষ্টির পানি। 'বিক্বদারিন' অর্থ পরিমিতভাবে, যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু। আর 'মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি' অর্থ— আমি ওই পানি জমা হতে দেই নদী-নালায়, পুষ্করিণীতে ও বিভিন্ন জলাশয়ে, যাতে মানুষ সেগুলো থেকে নির্বাহ করতে পারে তাদের প্রয়োজন। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করি মৃত্তিকাভ্যন্তরে, যাতে মানুষ তাদের প্রয়োজনে ভূগর্ভ খুঁড়ে সে পানি তুলে আনতে পারে।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমি তাকে অপসারণ করতেও সক্ষম'। একথার অর্থ— ওই পানিকে আমি আবার করে দিতে পারি বাষ্পাকারে অন্তর্হিত, অথবা পানের অযোগ্য, কিংবা পৌঁছে দিতে পারি মানুষের আওতাবহির্ভূত গভীর অতলে। 'লাক্বদিরূন' অর্থ আমি পানি অপসারণ করতে ওইরূপ সক্ষম, যেমন সক্ষম বৃষ্টি বর্ষণ করতে। অর্থাৎ আমি যদি পৃথিবীতে পতিত বৃষ্টির পানি অন্তর্হিত করে দিতে চাই, তবে তোমরা প্রচুর বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও পিপাসার পানি পাবে না। পিপাসার্ত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরবে তোমরা, তোমাদের পশুকুল এবং নিষ্ফলা হয়ে যাবে তোমাদের জীবন।

বাগবী লিখেছেন, হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্পাক বেহেশত থেকে চারটি নদী প্রবাহিত করেছেন— সাইহান, জাইহান, দজলা ও ফোরাত। বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামা ও ইবনে সুফিয়ান সূত্রে ইমাম হাসান উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ জান্নাতের একটি নদী থেকে জিবরাইলের তত্ত্বাবধানে পৃথিবীতে দান করেছেন পাঁচটি নদী— সাইহান, জাইহান, দজলা, ফোরাত ও নীল। জিবরাইল নদী পাঁচটিকে স্থাপন করেছেন পর্বতে, সেখান থেকে মানব-কল্যাণার্থে প্রবাহিত করেছেন সমতলভূমিতে। একথারই ইঙ্গিত রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এরপর যখন ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব ঘটবে, তখন আল্লাহ্ পৃথিবী থেকে জিবরাইলের মাধ্যমে উঠিয়ে নিবেন

www.eelm.weebly.com

কোরআন, সকল প্রকার ধর্মবোধ, হাজরে আস্ওয়াদ, মাক্বামে ইব্রাহিম, তাবুতে মুসা (তওরাত সংরক্ষক সিন্দুক) এবং ওই পাঁচটি নদী। এদিকে লক্ষ্য করেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি তাকে অপসারণ করতেও সক্ষম'।

আমি বলি, সম্ভবতঃ পৃথিবীর সকল নদীই জান্নাত থেকে উৎসারিত। আর হাদিস শরীফে কেবল উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে পঞ্চনদীর কথা।

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ১৯, ২০

فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَٰكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْءَاكِلِينَ ○

❒ অতঃপর আমি উহা দ্বারা তোমাদিগের জন্য খর্জুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; ইহাতে তোমাদিগের জন্য আছে প্রচুর ফল; আর উহা হইতে তোমরা আহার করিয়া থাক;

❒ এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যাহা জন্মায় সিনাই পর্বতে, ইহাতে হয় মানুষের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন।

বৃষ্টিপাতের ফলে জমিনে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন প্রকারের সুপ্রচুর ফল ও ফসল— এগুলোই মানুষের রিজিক, অত্যাবশ্যক জীবনোপকরণ। এগুলো খেয়েই জীবন রক্ষা করতে হয় মানুষকে। মানুষের রিজিক আল্লাহ্ নিশ্চিত করেছেন এভাবে। প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ এটাই। আর আরব ও তৎসন্নিহিত এলাকায় খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানই অধিক পরিদৃষ্ট হয়। তাই উদাহরণ স্বরূপ এখানে উল্লেখিত হয়েছে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানের কথা।

পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ, যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, যাতে হয় মানুষের জন্য তেল ও ব্যঞ্জন'। এখানকার 'সাইনাআ' শব্দটির অর্থ বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে করেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, শব্দটির অর্থ বরকত। অর্থাৎ বরকতপূর্ণ পর্বতে আমি সৃষ্টি করেছি যয়তুন বৃক্ষ। কাতাদা, জুহাক ও ইকরামা বলেছেন, শব্দটির অর্থ উৎকৃষ্ট, চমকদার। জুহাক বলেছেন, শব্দটি নাবত্নী। ইকরামা বলেছেন, আবিসিনীয়। কালাবী বলেছেন, 'সাইনাআ' অর্থ বৃক্ষের মালিক। কেউ কেউ বলেছেন, সুরিয়ানী ভাষায় ঘন তরুবীথিকে বলে 'সাইনাআ'। মুকাতিল বলেছেন, যে পর্বতে অধিক ফলবান বৃক্ষ জন্মায়, ওই পর্বতকে বলে সাইনাআ এবং সিনীন। মুজাহিদ বলেছেন, সাইনাআ হচ্ছে বিশেষ

www.eelm.weebly.com

এক প্রকারের পাথর, যা অধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয় তুর পর্বতে। তাই শব্দটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তুর পর্বতের সঙ্গে। ইবনে জায়েদ বলেছেন, তুরে সাইনাআ একটি পূর্ণ নাম। যেমন পূর্ণ নাম ইমরাউল কায়েস। ওই নামের পর্বত রয়েছে মিসর ও ইলা'র মধ্যবর্তী স্থানে। ওই পর্বতের দিকেই হজরত মুসাকে আহ্বান করা হয়েছিলো।

'মানুষের জন্য তেল ও ব্যঞ্জন' অর্থ সিনাই পর্বতের যয়তুনের মধ্যে রয়েছে দু'ধরনের উপকারিতা— ১. ওই যয়তুনের তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো ও মালিশের কাজ হয় এবং তা ব্যবহৃত হয় ব্যঞ্জন বা তরকারীরূপে। অর্থাৎ ওই তেল রুটিতে মেখে নিয়ে খাওয়া যায়।

বাগবী লিখেছেন, 'সিবগিন' এবং 'সিবাগুন' অর্থ ওই তরকারী, যার মধ্যে রুটি চুবিয়ে রাখলে রুটি রঞ্জিত হয় তেলের রঙে। সাধারণ ব্যঞ্জনসমূহকে এরকম বলা হয় না।

মুকাতিল বলেছেন, আল্লাহ্ ওই বৃক্ষকে ব্যঞ্জন যেমন বানিয়েছেন, তেমনি বানিয়েছেন জ্বালানীও। তিনি বলেছেন, তুর পর্বতেই সর্বপ্রথম যয়তুন বৃক্ষের উদগম হয়েছিলো। তাই শব্দটিকে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করা হয় তুরের সঙ্গে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, হজরত নুহের মহাপ্লাবনের পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মাথা তুলে দাঁড়ায় যয়তুন বৃক্ষ। বৃক্ষটির বিশেষত্ব এ কারণেই।

সূরা মু'মিনূনঃ ২১, ২২

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ○

❒ এবং তোমাদিগের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে আন্‌য়ামে; তোমাদিগকে আমি পান করাই উহাদিগের উদরে যাহা আছে তাহা হইতে এবং উহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা আন্‌য়ামের মাংসও ভক্ষণ কর,

❒ এবং তোমরা উষ্ট্রে ও জলযানে আরোহণও করিয়া থাক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে আনয়ামে'। এখানে 'ইবরাতান' অর্থ শিক্ষণীয় নিদর্শন, দলিল প্রমাণ, যা মহাসৃজয়িতা আল্লাহ্‌তায়ালার পরিপূর্ণ ও আনুরূপ্যবিহীন শক্তিমত্তার পরিচায়ক। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে আনয়াম বা চতুষ্পদ পশুকুলের মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু ধরা পড়ে না। তাই এখানে বসানো হয়েছে 'ইন্‌না' (অবশ্যই) শব্দটি। শব্দটির

www.eelm.weebly.com

মাধ্যমে এখানে দৃঢ়তার প্রকাশ ঘটানো হয়েছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের প্রতি। বলা হয়েছে 'তোমাদের জন্য'। অর্থাৎ সকল মানুষের জন্য চতুষ্পদ পশুকুলের মধ্যে অবশ্যই রয়েছে শিক্ষাপ্রদ বিষয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে আমি পান করাই তাদের উদরে যা আছে তা থেকে'। এখানে 'উদরে যা আছে তা থেকে' অর্থ দুধ বা তরল খাদ্য উপাদান থেকে।

তারপর বলা হয়েছে— 'এবং তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা তা থেকে কিছু ভক্ষণ করো'। একথার অর্থ— এবং তোমরা ব্যবহার করো ওই সকল পশুর দুধ, ঘি, পশম, চর্বি ইত্যাদি, তাছাড়া ভক্ষণ করো সেগুলোর গোশত।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা উষ্ট্রে ও জলযানে আরোহণও করে থাকো'। একথার অর্থ তোমরা কিছু সংখ্যক পশুকে ব্যবহার করো বাহনরূপে, যেমন উট, মহিষ, গর্দভ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে বাহন হিসেবে বলা হয়েছে কেবল উটের কথা। কারণ আরববাসীগণের বাহন প্রধানতঃ উট। তাছাড়া 'ফুলক্' শব্দটি ব্যবহৃত হয় কেবল উটের ক্ষেত্রে, আবার উট স্থলভাগের জাহাজ বলেও সুপরিচিত।

'তুহমালুন' অর্থ তোমরা বোঝা বহন করাও, জলভাগে ও স্থলভাগে। উল্লেখ্য, চতুষ্পদ জন্তুকে আল্লাহ্ই মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। তাই তো মানুষ সেগুলোকে বিভিন্ন কাজে লাগাতে পারে। সুতরাং এগুলোর মধ্যে নিশ্চয় রয়েছে শিক্ষাপ্রদ বিষয়।

'নুসক্বীকুম' অর্থ তোমাদেরকে পান করাই আমি। এখানে রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়। কারণ শুভ্র সুপেয় দুধ আসে বর্জ্য ও রক্তের মাঝ থেকে। চতুষ্পদ জন্তু থেকে দুধ, ঘি, পশম ও চামড়ার উৎপাদন; কৃশ ও দুর্বল দেহ বিশিষ্ট মানুষের সেবায় নিরত এতোবড় বিরাট বপুধারী পশু এসব কি আল্লাহ্পাকের অপার মহিমার পরিচায়ক নয়?

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ২৩, ২৪, ২৫

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○ فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ

www.eelm.weebly.com

لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۖ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۞ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ۞

❒ আমি তো নূহকে পাঠাইয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের নিকট, সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহের ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?

❒ তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহারা লোকদিগকে বলিল, 'এ তো তোমাদিগের মতই একজন মানুষ, তোমাদিগের উপর নেতৃত্ব করিতে চাহিতেছে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে ফেরেশ্তাই পাঠাইতেন; আমরা তো আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণের কালে এইরূপ ঘটিয়াছে, একথা শুনি নাই।

❒ 'এ তো এক উন্মাদ, সুতরাং ইহার বিষয়ে কিছু কাল অপেক্ষা কর।'

পবিত্র কোরআনের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে মহাকল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শন করা। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এতক্ষণ ধরে আলোচিত হয়েছে বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য, মানব সৃষ্টির রহস্য, মানুষের প্রতি প্রদত্ত বিভিন্ন নেয়ামত— যেমন আকাশের পথ, বৃষ্টি, ফল ও ফসলের বাগান, চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদির কথা, যাতে নিহিত রয়েছে ইমান ও আনুগত্যের উদাত্ত আহ্বান।। আলোচ্য আয়াত থেকে শুরু করা হয়েছে ওই সকল লোকদের পরিণতির বিবরণ, যারা মহাকল্যাণের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। শুরু হয়েছে নবী নুহ ও তাঁকে প্রত্যাখ্যানকারীদের কাহিনী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তো নুহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট, সে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ্ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না'? এখানে 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না' অর্থ 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই' এই শাশ্বত সত্যের অস্বীকৃতি হচ্ছে আল্লাহ্রই নেয়ামতসমূহের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা— যা তোমরা অহরহ ভোগ করে চলেছো। আল্লাহ্পাক তো এসকলকিছু তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন, আবার যে কোনো মুহূর্তে দুনিয়া অথবা আখেরাতে তোমাদের উপরে আরোপ করতে পারেন কঠিন শাস্তি। অতএব, হে আমার সম্প্রদায়! তবুও কি তোমরা সচেতন হবে না? আল্লাহ্তায়ালাই যে একমাত্র ইলাহ্ সে কথা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিবে না?

পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলো, তারা লোকদেরকে বললো, এ তো আমাদের মতোই

www.eelm.weebly.com

একজন মানুষ। তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করতে চাচ্ছে, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে ফেরেশতাই পাঠাতেন'। এখানে 'আলমালাউ' অর্থ সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ, প্রধানগণ। উল্লেখ্য, হজরত নুহের সম্প্রদায়ের নেতা ও জনতা সকলেই বিশ্বাস করতো তাদের প্রস্তর নির্মিত প্রতিমাগুলোও উপাস্য হিসেবে আল্লাহ্র অংশীদার। একথাও তারা মনে করতো যে, মানুষ কখনো আল্লাহ্র বার্তাবাহক হতে পারে না। আল্লাহ্র বার্তাবাহক হতে পারে কেবল ফেরেশতা। তাই তারা হজরত নুহের রেসালতকে অস্বীকার করে বসলো এবং নেতারা জনতাকে এই মর্মে সাবধান করে দিলো যে, নুহ যেহেতু মানুষ, সেহেতু রসুল নয়। সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণই হচ্ছে তাঁর রেসালতের দাবীদার হওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ যদি রসুল করতে চাইতেনই, তবে নিশ্চয় রসুল করে পাঠাতেন কোনো ফেরেশতাকে। আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এটাই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষগণের কালে এরূপ ঘটেছে একথা শুনিনি'। একথার অর্থ— ওই নেতারা আরো বললো, আমাদের পিতৃপুরুষগণও তো প্রতিমা পূজা করতে করতে জীবন সাঙ্গ করেছে। কই, তাদের মুখে তো আমরা কখনো এক আল্লাহ্র ইবাদতের কথা, রসুল প্রেরণের কথা, কিয়ামতের কথা, বেহেশত-দোজখ ইত্যাদির কথা বলতে শুনিনি। উল্লেখ্য, বহুকাল ধরে ওই এলাকায় কোনো নবী-রসুল প্রেরিত হননি। তাই তাদের পূর্বসূরীরাও এ বিষয়ে কিছু জানতো না। সেকারণেই তাদের উত্তরসূরীরা হজরত নুহের রেসালাতের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে বসেছিলো।

এর পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'এ তো এক উন্মাদ, সুতরাং এর বিষয়ে কিছুকাল অপেক্ষা করো'। একথার অর্থ— নেতারা আরো বললো, তাহলে বোঝো, সে একটা পাগল। পাগল না হলে কি কেউ রসুল হওয়ার মতো এমন উদ্ভট ও ভিত্তিহীন দাবী করে? আর পাগল কি কখনো আল্লাহ্র রসুল হয়? সুতরাং তোমরা আর পাগলের কথায় কান দিয়ো না। বরং কিছুদিন অপেক্ষা করো, হয়তো তার পাগলামী ধীরে ধীরে ভালো হয়ে যাবে। আর এর মধ্যে সে মরে গেলে তো সব ঝামেলাই একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ২৬, ২৭

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ○ فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا
وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ

www.eelm.weebly.com

اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ○

❒ নূহ বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, কারণ উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে।'

❒ অতঃপর আমি তাহার নিকট প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর, অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিবে ও ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হইবে তখন উঠাইয়া লইও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার পরিজনকে, তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহাদিগকে ব্যতীত; এবং যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে তাহাদিগের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও না, তাহারা নিমজ্জিত হইবে।

সুদীর্ঘ দিবস ধরে সত্যধর্ম প্রচার করতে করতে হজরত নুহ যখন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও বিপর্যস্ত, তখন আল্লাহ্‌পাক তাঁকে জানিয়ে দিলেন, যারা ইমান আনবার তারা ইমান এনেছে, আর কেউই ইমান আনবে না, তখন হজরত নুহ প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! সীমালংঘনকারীদেরকে এতদিন ধরে তোমার যে আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছি, সেই আযাব বাস্তবায়নের মাধ্যমে তুমি আমাকে সাহায্য করো তাদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও। কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে। একথাই বলা হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতে।

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তার নিকট প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করো'। এখানে 'বিআ'ইউনিনা' অর্থ আমার তত্ত্বাবধানে। অর্থাৎ আমার তত্ত্বাবধানে ও প্রত্যাদেশানুযায়ী নৌকা নির্মাণ করলে কেউ তোমার ক্ষতিসাধনে সক্ষম হবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন আমার আদেশ আসবে ও ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হবে, তখন উঠিয়ে নিয়ো প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া'। এখানে 'ফারাত্ তানূর' অর্থ উনুন্ উদ্‌গীরিত হবে। অর্থাৎ তোমার গৃহাঙ্গনের রুটি পাকানো চুলা ফেটে উদগীরিত হতে থাকবে পানি। উল্লেখ্য, আযাব শুরু হওয়ার এটাই ছিলো আলামত। তাঁর স্ত্রী হঠাৎ একদিন দেখলেন, তাঁদের ওই চুলা ফেটে পানি নির্গত হচ্ছে। সাথে সাথে তিনি একথা জানালেন হজরত নুহকে। তিনি তখন শুরু করতে লাগলেন নৌকারোহণের প্রস্তুতি। উল্লেখ্য, তাঁর বসতবাটি ছিলো কুফার মসজিদ সংলগ্ন এক স্থানে, বাবে কুন্দার প্রবেশপথের ডান দিকে। এক বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, সিরিয়ার কোনো এক পাহাড়ের চূড়ায় বসবাস করতেন তিনি।

www.eelm.weebly.com

'ফাস্‌লুক ফীহা' অর্থ উঠিয়ে নাও। 'সালাকা' 'ফেলে লাযেম' (অকর্মক ক্রিয়া) এবং 'মুতাআ'দি'(সকর্মক ক্রিয়া) দু'টোই হয়। যেমন 'ফী কাজা' (আমি এরূপ অবস্থায় জড়িত হয়েছি)। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে— 'মা সালাকাকুম ফী সাক্বার (তোমাদেরকে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করালো কিসে?)।

'মিন কুললি যাওজ্বাইনিছ্ নাইনি' অর্থ প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া। এটা হচ্ছে কর্মপদ। এর অর্থ প্রতিটি প্রাণীর একটি করে জোড়া— নর ও নারী। এক বর্ণনায় এসছে, তখন হজরত নুহের নিকটে হাজির করানো হয়েছিলো প্রতিটি প্রাণীর একটি করে জোড়া। তিনি হস্ত প্রসারিত করলে ডান হাতে এসে পড়তে লাগলো নর এবং বাম হাতে নারী। তিনি সেগুলোকে জোড়ায় জোড়ায় তুলতে লাগলেন তাঁর নৌকায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমার পরিবার পরিজনকে। তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বসিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ব্যতীত'। একথার অর্থ— তোমার পরিবার পরিজন অথবা তোমার অনুসারী বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদেরকেও নৌকায় উঠিয়ে নিতে ভুলো না। তবে তাদেরকে অবশ্যই পরিত্যাগ কোরো সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই যাদের ধ্বংস সুনির্ধারিত। উল্লেখ্য, এরকম দুর্ভাগাদের মধ্যে ছিলো হজরত নুহের এক স্ত্রী এবং কেনান নামক এক পুত্র। আর একটি কথা এই যে, 'আলাইহি' শব্দটি ব্যবহৃত হয় চিরদুর্ভাগ্য নির্ণয়ার্থে, যেমন এখানে হয়েছে। আর 'লাহুম' ব্যবহৃত হয় চিরসৌভাগ্যের বেলায়। যেমন এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে— 'ইন্‌নাল লাজীনা সাবাক্বত লাহুম মিনাল হুসনা'।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং যারা সীমালংঘন করেছে, তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বোলো না, তারা নিমজ্জিত হবে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় নবী নুহ! যারা প্রকৃত অর্থে চিরভ্রষ্ট, তাদের জন্য তুমি আমার কাছে কোনো শুভপ্রার্থনা উপস্থিত কোরো না, তারা তোমার পরিবার পরিজন অথবা নিকটজন— যে-ই হোক না কেনো। মহাপ্লাবনে তাদের নিমজ্জন নিশ্চিত।

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ২৮, ২৯, ৩০

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ○ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ○

www.eelm.weebly.com

❒ যখন তুমি ও তোমার সংগীরা জলযানে আরোহণ করিবে তখন বলিও, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহেরই, যিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন জালিম সম্প্রদায় হইতে।'

❒ আরও বলিও, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে নামাইয়া দাও যাহা হইবে কল্যাণকর; এ ব্যাপারে তুমিই শ্রেষ্ঠ।'

❒ ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। আমি তো উহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা জলযানে আরোহণ করবে তখন বোলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন জালেম সম্প্রদায় থেকে'। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন' অর্থ যিনি আমাদের এই জলযানারোহণ ও অবতরণকে করেছেন নিরাপদ।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'আরো বোলো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে নামিয়ে দাও যা হবে কল্যাণকর; এ ব্যাপারে তুমিই শ্রেষ্ঠ'। এখানে 'মুনযালান মুবারকান' অর্থ বরকতময় বা কল্যাণকর অবতরণ। অবতরণ কল্যাণকর হওয়ার অর্থ অবিশ্বাসী শত্রুদের কবলমুক্ত প্লাবনপরবর্তী পৃথিবীতে নির্বিঘ্নে আল্লাহ্‌র ইবাদতের সুযোগ, নিরাপদ জীবনযাত্রা, স্বস্তিদায়ক বংশবিস্তার ও সুপ্রচুর জীবনোপকরণ। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াতে দোয়া করতে বলা হয়েছে কেবল হজরত নুহকে। এতে করে প্রকাশিত হয়েছে হজরত নুহের বিশেষ মর্যাদা। একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁর দোয়াই তাঁর নিজের এবং উম্মতের জন্য ছিলো যথেষ্ট। উম্মতের জন্য পৃথক প্রার্থনা ছিলো নিষ্প্রয়োজন।

এর পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে'। একথার অর্থ— হজরত নুহের সময়ের মহাপ্লাবনের ঘটনার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে আল্লাহ্‌র মহাশক্তিমত্তার এক বিশেষ নিদর্শন। ওই মহাপ্লাবন থেকে বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ লাভ এবং অবিশ্বাসীদের নিমজ্জনের মাধ্যমে এই নিদর্শনটিও প্রকাশিত হয়েছে যে, তিনি মুমিনদের জন্য কতো দয়ার্দ্র এবং কাফেরদের জন্য কতো ভয়ানক শাস্তিদাতা। বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের জন্য এ ঘটনার মধ্যে নিশ্চয় রয়েছে এক অনন্যসাধারণ জ্ঞান।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমি তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম' (ওয়া ইন্ কুন্না লামুবতালীন)। এখানকার 'ইন্' শব্দটির প্রকৃত রূপ ছিলো 'ইন্না' (নিশ্চয়ই)। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— নিশ্চয়ই আমি নবী নুহের সম্প্রদায়কে বিপদে পতিত করেছিলাম, অথবা নিপতিত করেছিলাম পরীক্ষায়।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'ইন্' হচ্ছে 'না' অর্থবোধক। আর 'লা' অর্থ 'ইল্লা' (ব্যতীত)। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— নুহকে নবীরূপে প্রেরণ ও তাঁর সত্য-আহ্বানের মধ্যে আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না, কেবল এই উদ্দেশ্য ব্যতীত যে, আমি তাদেরকে পরীক্ষা করবো, দেখবো মহাপ্লাবনের আযাব আপতনের পূর্বে তাদের আচরণ কী হয়— বিশ্বাসসম্মত না প্রত্যাখ্যানমুখর।

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ৩১, ৩২

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝ فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

❒ পরে অন্য এক সম্প্রদায়কে তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলাম;

❒ এবং উহাদিগেরই এক জনকে উহাদিগের নিকট রসূল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পরে অন্য এক সম্প্রদায়কে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম'। এখানে 'অন্য এক সম্প্রদায়' বলে বুঝানো হয়েছে আদ অথবা ছামুদ জাতিকে। বাগবী লিখেছেন, প্রথমোক্ত অভিমতটি সুসঙ্গত। কারণ আদ জাতিই ছিলো মহাপ্লাবন পরবর্তী পৃথিবীর প্রথম জনগোষ্ঠী, যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিলো রসুল। তাদের প্রতি প্রেরিত রসুলের নাম হজরত হুদ আর হজরত সালেহ্ প্রেরিত হয়েছিলেন ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরই একজনকে তাদের নিকট রসুল করে পাঠিয়েছিলাম'। একথার অর্থ— তাদের রসুল ছিলো তাদেরই সম্প্রদায়ভূত। তাই তারা তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে ছিলো সম্যক অবগত।

শেষে বলা হয়েছে— 'সে বলেছিলো, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য কোনো ইলাহ্ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না'?

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا

www.eelm.weebly.com

تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۝ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ
إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ۝ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَ
عِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ۝ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۝ إِنْ هِيَ إِلَّا
حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ
افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۝

❒ তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল ও পরলোকের সাক্ষাৎকারকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহাদিগকে আমি দিয়াছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার, তাহারা বলিয়াছিল, 'এ তো তোমাদিগের মত একজন মানুষ; তোমরা যাহা আহার করো সে তো তাহাই আহার করে এবং তোমরা যাহা পান কর সেও তাহাই পান করে;

❒ যদি তোমরা তোমাদিগেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে;

❒ 'সে কি তোমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে তোমাদিগের মৃত্যু হইলেও তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলে তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে?'

❒ 'তোমাদিগকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা কদাচ্ ঘটিবে না, কদাচ্ ঘটিবে না!'

❒ 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদিগের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এইখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হইব না।'

❒ 'সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে এবং আমরা তাহাকে বিশ্বাস করিবার নহি।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমার প্রেরিত রসুলের সম্প্রদায়ের সমাজপতিদেরকে আমি করেছিলাম ধনবল ও জনবলে বলীয়ান। সুপ্রচুর সম্ভোগোপকরণ আমি দিয়েছিলাম তাদেরকে। এজন্য কৃতজ্ঞচিত্ত তো তারা ছিলোই না, উপরন্তু দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলো সত্যের আহ্বানকে। মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবসকে। সম্প্রদায়ের লোকজন বলেছিলো, এই লোক নিজেকে আল্লাহ্র রসুল বলে দাবি করে, অথচ দেখো, সে তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমাদের পানাহারের মতোই তার নিত্যনৈমিত্তিক পানাহার।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা তোমাদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে'। একথার অর্থ— অবাধ্যদের অগ্রণীরা আরো বললো, সুতরাং ভেবে দেখো হে জনতা! তোমরা যদি তোমাদেরই মতো একজন মানুষের ধর্মানুসারী হও, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি না।

এর পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলেও, তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে?' প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (ইস্তেফহামে ইনকারী)। অর্থাৎ প্রশ্নটির মাধ্যমে অস্বীকার করা হয়েছে মহাপুনরুত্থান পর্বকে, যা সুনিশ্চিত। অথবা প্রশ্নটি স্বীকৃতিজ্ঞাপক (সওয়ালে তাকরিরী)। অর্থাৎ এই লোককে কীভাবে রসুল বলে স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভব, যে পুনরুত্থানের মতো অবাস্তবতায় বিশ্বাসী। অথচ চাক্ষুষ বাস্তব হচ্ছে মৃত্যুর পর মৃতদেহসমূহ পরিণত হয় মৃত্তিকায় ও নিষ্প্রাণ অস্থিতে। কিংবা এখানকার প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে তাদের পূর্ববর্তী বক্তব্যের কারণ হিসেবে। তারা বলেছিলো, 'যদি তোমরা তোমাদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে'। সেকথার কারণ বা প্রত্যয়নরূপে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা এ লোকের আনুগত্য করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে একারণেই যে, সে পুনরুত্থানের মতো ভিত্তিহীনতায় বিশ্বাসী। এরকম অবাস্তবতায় বিশ্বাস করলে তোমরা ভয়ে ভয়ে জীবন কাটাবে। আর এতে করে বিঘ্নিত হবে তোমাদের পার্থিব ভোগ-সম্ভোগ।

এর পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা কদাচ ঘটবে না, কদাচ ঘটবে না'। এখানকার 'যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে' কথাটি একটি লুপ্ত উদ্দেশ্যের বিধেয়। তাই তারা বলেছিলো, পুনরুত্থানের বিষয়টি জ্ঞানের অতীত, সত্য থেকে অনেক দূরে। কখনোই ঘটবে না, অথচ সেকথাই তোমাদেরকে বিশ্বাস করতে বলা হচ্ছে। অথবা 'লিমা তূআ'দূন' (যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে) কথাটির 'লাম' অক্ষরটি এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। 'মা তুআ'দূনা' বাক্যটি 'হাইহাতা' ক্রিয়ার কর্তা। এভাবে 'হাইহাতা' কথাটির অর্থ হবে এখানে অতীতকালবোধক। অর্থাৎ যা কখনো ঘটেনি। কেউ কেউ বলেছেন, 'হাইহাতা' শব্দটি এখানে ক্রিয়ামূল যার অর্থ অঘটিতব্য।

এর পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না'। একথার অর্থ— নির্বোধ নেতারা আরো বলেছিলো, পৃথিবী ও পৃথিবীর জীবন-মৃত্যুই আমাদের সবকিছু। পুনরুত্থান আমাদের বিশ্বাসবহির্ভূত। বাগবী বলেছেন, ওই

www.eelm.weebly.com

সকল লোক পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী ছিলো। তাই এখানে 'নাহ্ইয়া' অর্থ এরকম হবে না যে 'আমরা সকলে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হবো'। বরং এখানে ঘটেছে 'তাকদীম' এবং 'তা'খীর' (অগ্র-পশ্চাৎ) অর্থাৎ আমরা তো সকলেই জন্মলাভ করি এবং করি মৃত্যুবরণ। অবশ্য এমতো অর্থ গ্রহণযোগ্য হবে তখন, যখন 'নামুতু' (আমরা মরি) ও 'নাহ্ইয়া' (আমরা বাঁচি) এর উদ্দেশ্য হবে সকল মানুষ।

আমি বলি, এখানে যদি সকল লোকও উদ্দেশ্য হয়, তবুও বাগবীর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কেননা 'ওয়াও' (এবং) প্রকাশ করে সংযোজন ও সমষ্টিভূতকে। হানাফীগণের মতানুসারে ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করে না। সুতরাং কথাটির অর্থ হবে— এই পৃথিবীতে নিরন্তর ঘটে চলেছে আমাদের মৃত্যু ও জন্ম। এরকম অর্থ হবে না যে— এই পৃথিবীতে মৃত্যুবরণের পর আমরা আবার পুনর্জীবন লাভ করবো।

এর পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করবার নই'। একথার অর্থ— সে তো আমাদের মতো মানুষ। অথচ আমাদের ধর্মমতানুসারে কথা না বলে সে আল্লাহ্ সম্বন্ধে উদ্ভাবন ঘটায় মিথ্যার। তাই আমরা তাকে বিশ্বাস করতে পারি না।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ○ قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ ○
فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○
ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ○ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا
وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ○

❑ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর; কারণ উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।'

❑ আল্লাহ্ বলিলেন, 'অচিরে উহারা অনুতপ্ত হইবেই।'

❑ অতঃপর সত্য সত্যই এক মহানাদ উহাদিগকে আঘাত করিল এবং আমি উহাদিগকে তরংগ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করিয়া দিলাম। সুতরাং ধ্বংস হইয়া গেল সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

❑ অতঃপর তাহাদিগের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করিয়াছি।

❑ কোন জাতিই তাহার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করিতে পারে না, বিলম্বিত করিতেও পারে না।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করো, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে'। একথার অর্থ— স্বসম্প্রদায়ের সীমালংঘন ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার ওই রসুল বললো, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! এরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং প্রতিশ্রুত শাস্তি অবতীর্ণ করে তুমি আমাকে এদের কবল থেকে উদ্ধার করো।

পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বললেন, অচিরে এরা অনুতপ্ত হবেই'। এখানকার 'আ'ম্মা শব্দটির 'মা' অতিরিক্তরূপে সংযোজিত, যা সময়ের সংকীর্ণতার উপর বেগ সৃষ্টি করেছে। প্রবল করেছে। অথবা 'মা' অব্যয়টি এখানে অনির্দিষ্ট বাচক। এবং এর বিশেষণ হচ্ছে ক্বলীল (স্বল্প) এর অর্থ অচিরে, অবিলম্বে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে, শীঘ্রই যখন তারা আমার আযাব স্বচক্ষে অবলোকন করবে, তখন অবিদূরণীয় অনুতাপ ভিন্ন তাদের আর কোনো উপায় থাকবে না।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে 'অতঃপর সত্য সত্যই এক মহানাদ তাদেরকে আঘাত করলো'। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'সাইহাতুন' শব্দটির অর্থ ধ্বংস, মহানাদ নয়। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'সাইহাতুন' ও 'সিয়াহুন' অর্থ ভয়ংকর আওয়াজ। 'সিয়াহা বিহিম' অর্থ তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়েছে। 'সিয়াহা ফীহিম' অর্থ তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আর 'সাইহাহ্' বলে আযাবকে।

উল্লেখ্য, ৩১ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'ক্বরনান আখার' (পরে অন্য এক সম্প্রদায়) অর্থ যদি আদ সম্প্রদায় হয়, তবে এখানকার 'সাইহাতুন' এর অর্থ হবে কেবল ধ্বংস। আর ছামুদ সম্প্রদায় হলে শব্দটির অর্থ হবে মহানাদ বা সুবিকট আওয়াজ। এই মহানাদের বিবরণ দিয়েছি আমি সুরা আ'রাফের তাফসীরে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, হঠাৎ একদিন ধ্বনিত হলো গগন-মেদিনী বিদারী ভয়ংকর শব্দ। তার সাথে শুরু হলো মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জন। ওই জীবন সংহারক আওয়াজে কলিজা ফেটে মরে গেলো অবাধ্য ছামুদেরা। আরো উল্লেখ্য, আদ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছিলো ভয়াবহ ঝঞ্ঝাবায়ুর মহামারাত্মক আঘাতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাদেরকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম'। একথার অর্থ তখন আমার আযাবে তাদের অবস্থা হয়ে গেলো স্রোতবতী নদীতে ভাসমান বর্জ্যের মতো। উল্লেখ্য, যে ধ্বংস হয়ে যায়, আরববাসীরা তাকে বলে, নদীর স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেলো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়'। এখানে 'বু'দান' অর্থ ধ্বংস হয়ে গেলো। শব্দটি ক্রিয়ামূল। এর মর্মার্থ— ধ্বংসই

www.eelm.weebly.com

তাদের পরিণতি। অথবা তাদের ধ্বংস অনিবার্য। 'সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়' হচ্ছে এখানে কর্তার স্থলাভিষিক্ত এবং ক্রিয়ামূল 'বু'দান' স্থলাভিষিক্ত ক্রিয়ার। আর 'লিল্' এর 'লাম' এখানে অতিরিক্তরূপে সম্পৃক্ত। অথবা ব্যবহৃত বক্তব্যকে দৃঢ়তা প্রদানার্থে।

এরপরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি'। একথার অর্থ ওই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে বিনাশ করার পর আমি পৃথিবীতে ঘটিয়েছি আরো অনেক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়। যেমন— কওমে ছামুদ, কওমে লুত, কওমে শোয়াইব ইত্যাদি।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'কোনো জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না'। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা সীমালংঘনকারী কোনো জাতির ধ্বংসের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছেন, ওই সময়ের পূর্বে যেমন কেউ ধ্বংস হবে না, তেমনি বেঁচেও থাকতে পারবে না কেউ ওই সময়ের পরে।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৪৪

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّمَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ ۚ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ○

❒ অতঃপর আমি একের পর এক আমার রসূল প্রেরণ করিয়াছি। যখনই কোন জাতির নিকট তাহার রসূল আসিয়াছে তখনই উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে। অতঃপর আমি উহাদিগের একের পর এককে ধ্বংস করিলাম। আমি উহাদিগকে কাহিনীর বিষয় করিয়াছি। সুতরাং ধ্বংস হউক অবিশ্বাসীরা!

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ছুম্মা আরসালনা রসুলানা তাত্রা' (অতঃপর আমি একের পর এক আমার রসুল প্রেরণ করেছি)। এখানকার 'তাত্রা' শব্দটির ধাতু মূল রূপ ছিলো 'ওয়াত্রা'। শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে 'ওয়াতরুণ' থেকে। এর অর্থ— বেজোড়। এর বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে শাফউন্ (জোড়)। 'তাওয়াতুর' ও 'মাওয়াতুর' এর অর্থ সমান্তরালভাবে একে একে আগমন করা এবং সেভাবেই পৃথকরূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকা। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, 'তাওয়াতুর' অর্থ সম্মিলিত অথবা পৃথকরূপে একের পর এক আসা। 'ওয়াতারা মুওয়াতারাতান ওয়া ইতারান' অর্থ একের পশ্চাতে অপর জন আগমন করেছে। কেননা বিচ্ছিন্নরূপে আগমনকে বলা হয়, 'মা ওয়াতারতু বাইনাল আশইয়া'।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, কারো কারো মতে তাওয়াতুর বা ধারাবাহিকতা বলা হয় ওই অবস্থাকে যখন তা ক্রমচ্ছিন্ন হয়, অর্থাৎ পরম্পরলগ্ন হয় না। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক এক হাদিসে এসেছে, 'লা বা'সা বিক্বদ্বয়ি রমাদ্বানা তাতরান' (রমজানের কাজা রোজা বিচ্ছিন্নভাবে আদায় করলে কোনো ক্ষতি হবে না)। নেহায়া আসমায়ী' বলেন, 'ওয়াতারতুল খবরা' (সুবিদিত সংবাদ) বলা হয় ওই বিবরণকে, যা বর্ণনা করে একজনের পর অন্যজন এবং তাদের মধ্যে থাকে কিছু বিরতি। তাই আমি বলি, এজন্যই পর পর বহু সূত্রে অনেক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসকে বলা হয় খবরে মুতাওয়াতির (সুবিদিত বিবরণ) যাকে ঐক্যমত্যানুসারে 'অখ্যাত' বলা অসম্ভব।।

এখানকার 'ছুম্মা আরসালনা' (অতঃপর আমি প্রেরণ করেছি) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে ৩১ সংখ্যক আয়াতের 'পরে অন্য এক সম্প্রদায়কে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম' কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অতঃপর ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির স্থলে আমি অভ্যুদয় ঘটিয়েছি অন্য এক সম্প্রদায়ের। আর তাদেরকে পথপ্রদর্শনের নিমিত্তে প্রেরণ করেছি অন্য এক রসুল। উল্লেখ্য, 'রসুল' শব্দটি প্রেরণকারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হলে বলতে হয় 'আমার রসুল'। আর যদি তার সম্পর্ক ঘটে যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে তাদের সঙ্গে, তবে বলতে হবে— আমি রসুল প্রেরণ করেছি অমুক সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখনই কোনো জাতির নিকট তাঁর রসুল এসেছে, তখনই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে'। উল্লেখ্য, অধিকাংশ সমগ্রের তুল্য। তাই এখানে সামগ্রিকভাবে বলা হয়েছে 'তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে। নতুবা ওই সকল রসুলের সঙ্গে কিছুসংখ্যক বিশ্বাসী তো ছিলেনই।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাদেরকে একের পর এককে ধ্বংস করলাম'। একথার অর্থ— যেমন আমি আমার রসুলগণকে একজনের পর একজন প্রেরণ করেছি, তেমনি তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্তকারীদেরকেও ধ্বংস করে দিয়েছি একে একে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয় করেছি'। একথার অর্থ— ওই সকল সীমালংঘনকারী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের ঘটনাবলী এখন কেবলই ইতিহাসচর্চার বিষয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গই শুধু ওই সকল ইতিকাহিনী থেকে উপদেশ গ্রহণে সচেষ্ট হয়।

'আহাদীছা' অর্থ কাহিনী, ইতিবৃত্ত বা ইতিহাস। শব্দটি বহুবচনবোধক। এর একবচন হচ্ছে 'আহদুছাতুন'। 'আহাদুছাহ্' অর্থ ওই ইতিহাস যা মানুষ পাঠ করে

www.eelm.weebly.com

বিস্ময়ের সাথে চিত্তবিনোদনার্থে এবং পাঠ করে শোনায় অন্যকে। আখফাস বলেন, 'আহাদুছাহ্' ও 'আহাদীছা' ব্যবহৃত হয় মন্দ বিষয়ের স্থলে। আর উত্তম বিষয়ের ক্ষেত্রে বলা হয়— তিনি পর্যবসিত হয়েছেন ইতিহাসে। অর্থাৎ তিনি একজন আলোচিত অথবা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। কেউ কেউ বলেছেন, 'আহাদীছ' হচ্ছে 'হাদীছে'র বহুবচন। যেমন 'আহাদীছুন নবী' অর্থ নবীয়ে করিম স. এর হাদিসসমূহ।

শেষে বলা হয়েছে— 'সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা'। একথার অর্থ— যে সকল লোক আমার প্রেরিত রসুলকে মান্য করে না, সাব্যস্ত করে তাদেরকে মিথ্যাবাদীরূপে, তাদের উপরে পতিত হয় আল্লাহ্র আযাব। তাদের ধ্বংস অবধারিত।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسٰى وَأَخَاهُ هٰرُونَ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ○ إِلٰى
فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ○ فَقَالُوٓا أَنُؤْمِنُ
لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُونَ ○ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ
الْمُهْلَكِينَ ○ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ○

❒ অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তাহার ভ্রাতা হারুনকে পাঠাইলাম,

❒ ফিরাউন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট। কিন্তু উহারা অহংকার করিল; উহারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়।

❒ উহারা বলিল, 'আমরা কি এমন দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিব যাহারা আমাদিগেরই মত? এবং যাহাদিগের সম্প্রদায় আমাদিগের দাসত্ব করে?

❒ অতঃপর উহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিল এবং উহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

❒ আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহাতে উহারা সৎপথ পায়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মুসা ও তার ভ্রাতা হারুনকে পাঠালাম'। এখানে 'সুলত্বনিম্ মুবীন' অর্থ সুস্পষ্ট প্রমাণ, যা বিরুদ্ধবাদীদেরকে করে দেয় নির্জবাব। হজরত মুসার অলৌকিক যষ্টিটিকেও এখানে 'সুলত্বনিম্ মুবীন' বলা হয়ে থাকতে পারে। ওই যষ্টির প্রভাবে

www.eelm.weebly.com

ফেরাউন ও তার অনুসারীরা থাকতো সতত পরাস্ত। ওই যষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হতো অনেক মোজেজা। যেমন— লাঠিটি মাটিতে ছেড়ে দিলেই তা হয়ে যেতো বিরাট সাপ, যাদু প্রতিযোগিতার সময় ওই লাঠি সাপ হয়ে গলাধঃকরণ করেছিলো অনেক যাদুর সাপ ও উপকরণ। ওই লাঠির আঘাতে সাগর তার অভ্যন্তরভাগে সৃষ্টি করে দিয়েছিলো শুষ্ক পথ। ওই লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করলে তা থেকে বেরিয়ে আসতো পানির প্রস্রবণ। সেনাদলের চারদিকে ঘুরে এসে ওই লাঠিই করতো তাদের হেফাজত। রাতে ওই লাঠি জ্বলতো মোমবাতির মতো। কখনো তা পরিণত হতো ফলবান বৃক্ষে। কখনো হয়ে যেতো কূপ থেকে পানি উত্তোলনের রশি। এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'সুলতান' অর্থ মোজেজা বা অলৌকিক নিদর্শন। আবার 'সুলত্বনিম মুবীন' অর্থও হয়তো তা-ই, যেগুলো ছিলো হজরত মুসার রেসালাতের পক্ষের নয়টি দলিল বা প্রমাণ।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট। কিন্তু তারা অহংকার করলো; তারা ছিলো উদ্ধত সম্প্রদায়'। একথার অর্থ— মুসা ও হারুনকে সত্যধর্মসহ যখন আমি ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকটে পাঠালাম, তখন তারা দর্পভরে অস্বীকার করলো নবী ভ্রাতৃদ্বয়কে। তাদের ঔদ্ধত্য ছিলো সীমাহীন।

এরপরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমরা কি এমন দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করবো, যারা আমাদেরই মতো'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক (ইস্তেফহামে ইনকারী)। এর অর্থ— এই দুইজনের রেসালতের দাবী আমরা কিছুতেই মেনে নিবো না, কারণ তারা আমাদেরই মতো মানুষ।

'লিবাশারাইনি মিছলিনা' অর্থ যারা আমাদেরই মতো মানুষ। 'বাশার' শব্দটির সম্পর্ক একজনের সঙ্গেও হতে পারে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফা তামাছ্ছালা লাহা বাশারান সাবীয়্যান' আবার বহুবচনের সঙ্গেও এর সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব। যেমন আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফা ইম্মা তারাইন্না মিনাল বাশারি আহাদান'।

'মিছলিনা' অর্থ আমাদের মতো। এক দুই বা অনেকের সঙ্গে প্রতিতুলনা হিসেবে শব্দটি ব্যবহার্য, ব্যবহার্য পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গের সঙ্গে তুল্যার্থেও।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে। এখানে 'যাদের সম্প্রদায়' অর্থ হজরত মুসা ও হজরত হারুনের সম্প্রদায়। অর্থাৎ বনী ইসরাইল। 'লানা আ'বিদূন' অর্থ আমাদের দাস, আমাদের নির্দেশাধীন। আরববাসীরা অধীনস্থ বা নির্দেশাধীনদেরকে বলে আবদ বা দাস।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বললো, এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো'। একথার অর্থ— সত্যের প্রতিভূ নবী ভ্রাতৃদ্বয়কে ফেরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা যখন অনড়ভাবে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো, তখন নির্ধারিত সময়ে তাদেরকে দান করা হলো সলিল সমাধি। ধ্বংস।

এর পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে তারা সৎপথ পায়'। একথার অর্থ— আমি আমার প্রিয় রসুল মুসাকে দিয়েছিলাম তওরাত, যাতে তাঁর অনুসারীরা আল্লাহ্‌র বিধানাবলী সম্পর্কে অবগত হয় এবং লাভ করে আল্লাহ-প্রাপ্তির পথ। এখানে 'তারা' অর্থ বনী ইসরাইলেরা, ফেরাউনের অনুসারীরা নয়। কারণ তওরাত অবতীর্ণ হয়েছিলো তাদের সলিল সমাধির পর।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৫০

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ○

❒ এবং আমি মরিয়ম-তনয় ও তাহার জননীকে করিয়াছিলাম এক নিদর্শন তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ-বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি মরিয়ম-তনয় ও তার জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন'। হজরত ঈসার পিতা ছাড়া সৃষ্টি এবং তাঁর পবিত্র মাতার স্বামীর মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহ্‌র সৃজনগুণের প্রতিফলনে পুত্রবতী হওয়ার বিষয়টি পরস্পর সম্পৃক্ত, অর্থাৎ এক। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, একবচনবোধক শব্দরূপ 'আয়াত'। বলা হয়েছে 'এক নিদর্শন'। অথবা মনে করতে হবে এখানে 'মরিয়ম-তনয়' কথাটির পরে উহ্য রয়েছে আর একটি 'আয়াত' (নিদর্শন) শব্দ। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এবং আমি মরিয়ম-তনয়কে করেছিলাম এক নিদর্শন এবং আর এক নিদর্শন করেছিলাম তাঁর মাতাকে। মরিয়ম-তনয়ের নিদর্শন হচ্ছে— তিনি দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় কথা বলেছিলেন এবং উপস্থিত করেছিলেন তাঁর মাতার সতীত্বের সাক্ষ্য। আর পুরুষবিবর্জিত অবস্থায় মাতৃত্ব লাভ ছিলো তাঁর মাতার পবিত্রতার নিদর্শন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ-বিশিষ্ট উচ্চ-ভূমিতে'। 'রবওয়াতিন' অর্থ উচ্চ ভূমি। হজরত ইবনে সালাম বলেছেন, ওই স্থানটি ছিলো দামেশকে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব এবং মুকাতিলের অভিমতও এরকম।

www.eelm.weebly.com

জুহাক বলেছেন, এখানে 'রবওয়াতিন' দ্বারা বুঝানো হয়েছে দামেশকের নিম্নাঞ্চলকে। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, 'রবওয়াতিন' বলে বালুময় স্থানকে। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'রবওয়াহ্ উদ্দেশ্য বায়তুল মাকদিস। হজরত কা'ব এবং কাতাদাও এরকম বলেছেন। হজরত কা'ব আরো বলেছেন, 'রবওয়াহ্' এর অংশবিশেষ অন্য ভূমি অপেক্ষা উচ্চ। ইবনে জায়েদের মতে স্থানটি ছিলো মিসরের আশে পাশে। সুদ্দীর মতে ফিলিস্তিনের উচ্চ ভূমি।

'জাতি ক্বরারিন' অর্থ এমন সমতলভূমি, যেখানে নির্বিঘ্নে বসবাস করা যায়। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ ফল-ফসল ও বাণিজ্যসমৃদ্ধ লোকালয়। 'মায়ীন' অর্থ প্রস্রবণ বা স্রোতস্বতী। যেমন বলা হয় 'মাআ'নাল মাআ' (প্রবহমান পানি)। অথবা 'মায়ীন' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'মাউ'ন' থেকে। 'মাউ'ন' অর্থ উপকার প্রদায়ক পানি, বৃহৎ কর্মের উপকরণ। কিংবা 'মায়ীন' হচ্ছে 'আ'না' এর কর্মপদীয়রূপ। 'আ'না' অর্থ দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনোকিছু। অর্থাৎ 'রবওয়াহ' ছিলো এমন উচ্চ অঞ্চল, যা দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হতো।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৫১, ৫২

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۭ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ
وَاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ○

❒ আমি বলিয়াছিলাম, 'হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।

❒ 'এবং তোমাদিগের এই যে জাতি ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদিগের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি বলেছিলাম, হে রসুলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার করো'। এখানে 'ত্বইয়্যেবাত' অর্থ পবিত্র, হালাল, সুস্বাদু, বৈধ, পরিমিত। পরিমিত অর্থ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের মতো স্বল্পাহার-অনাহার যেমন নয়, তেমনি নয় ভোজনবিলাসীদের মতো অতিভোজন। কথাটির মধ্যে রয়েছে নেতিবাচকতারও নির্দেশ। অর্থাৎ তোমরা হারাম ও অপবিত্র আহার্য ভক্ষণ কোরো না।

কেউ কেউ বলেছেন, হালাল হচ্ছে হারামের বিপরীত। আর এখানে হালাল-হারামের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে পরিশুদ্ধ ভোজন-প্রক্রিয়ার কথা। অর্থাৎ তোমাদের আহার যেনো হয় আল্লাহ্‌র স্মরণ সহকারে। ভোজনমগ্নতা যেনো তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণচ্যুত না করে। নিয়ে না যায় প্রবৃত্তিজাত ক্ষতিকর সম্ভোগপ্রবণতার দিকে। পরিমিতিবোধ যেনো থাকে সতত সক্রিয়।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সৎকর্ম করো'। এখানে 'সৎকর্ম করো' অর্থ তোমাদের পুণ্যকর্মসমূহকে করো শিরিকবিমুক্ত, পরিশুদ্ধ, নিখুঁত এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জনের মহাসংকল্পসম্বলিত। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আমি প্রত্যেক যুগের নবী-রসুলগণকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছিলাম যে, তোমরা নিষিদ্ধ আহার্য গ্রহণ কোরো না, গ্রহণ কোরো পরিশুদ্ধ ও পরিমিত আহার্য এবং যথা উদ্দেশ্যে ও যথানিয়মে সম্পাদন কোরো তোমাদের পুণ্যকর্মসমূহ।

'ইয়া আইয়্যুহার রসুলু' (হে রসুলগণ) বলে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে পূর্ববর্তী যুগের রসুলগণকে। কিন্তু হাসান, মুজাহিদ, কাতাদা, সুদ্দী, কালাবী এবং তাফসীরকারগণের এক দল মনে করেন, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে কেবল শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে। একজনের সম্বোধনে এরকম বহুবচনবোধক শব্দপ্রয়োগ আরবী ভাষার একটি রীতি। আমি বলি, এরকম সম্বোধন করা হয় কেবল সম্বোধিতজনকে সম্মান প্রদানার্থে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, রসুল স. মহামানবতার মহান প্রতিনিধি। তাই তাঁকে বহুবচনবোধক শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তিনিই মহামানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। আবার এরকম ব্যাখ্যা করার সুযোগও রয়েছে যে, উপস্থাপিত সম্বোধনের উদ্দেশ্য রসুল স. এবং তাঁর উম্মতের আলেম সমাজ, যাঁরা তাঁর এবং তাঁর উম্মতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী। রসুল স. বলেছেন, আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার কথাগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে হজরত ঈসা এবং তাঁর পূতঃপবিত্রা জননীকে লক্ষ্য করে, যখন তাঁরা আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন প্রস্রবণ-বিশিষ্ট উচ্চভূমি রবওয়াহ্‌তে। উদ্দেশ্য ছিলো একথা জানিয়ে দেয়া যে, তাঁরা যেনো পূর্ববর্তী রসুলগণের প্রতি অবতীর্ণ 'পবিত্রবস্তু আহার করো ও সৎকর্ম করো'— এই নির্দেশটির অনুসরণ করেন। অবশ্য বক্তব্যের ধারাবাহিকতা দৃষ্টে একথাই অনুমিত হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত'। একথার অর্থ— তোমাদের সকল আচরণ ও বিচরণ আমার জ্ঞানায়ত্ত। কারণ আমি সর্বজ্ঞ। আর এর যথাবিনিময়ও আমি যথাসময়ে প্রদান করবো। কারণ আমিই তো সকলের পুরস্কারদাতা এবং শাস্তিপ্রদাতা।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের এই যে জাতি, তাতো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় করো'। একথার অর্থ— তোমরা মানুষ। সকল মানুষ একই জাতিগোষ্ঠিভুক্ত। সুতরাং তোমাদের জন্য বিশ্বাসগত ও মৌলিক বিধানগত দায়িত্বও এক। আর এটাই সকল নবী-রসুলের শরিয়তের মূল কথা যে, একমাত্র আমিই তোমাদের এক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পালনকর্তা। সুতরাং তোমরা সকলে সমবেত হও এই শাশ্বত বিশ্বাসের আশ্রয়ে। আর একারণেই ভয় করো কেবল আমাকেই।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৫৩, ৫৪

فَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ○
فَذَرْهُمْ فِى غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ○

❒ কিন্তু মানুষ নিজদিগের দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করিয়াছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ লইয়া সন্তুষ্ট।

❒ সুতরাং উহাদিগকে বিভ্রান্তিতে থাকিতে দাও কিছু কালের জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কিন্তু মানুষ নিজেদের দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে'। একথার অর্থ— বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রতি পাঠানো হয়েছিলো আমার বাণীবাহকদেরকে। তারা আপনাপন সম্প্রদায়ের নিকটে প্রচার করেছিলেন আমার এককত্বের বিশ্বাস সম্বলিত চিরন্তন ধর্মাদর্শ। কিন্তু বিভ্রান্ত লোকেরা তাঁদের ওই অক্ষয় ধর্মাদর্শকে করেছিলো বিকৃত ও বিস্রস্ত। তদস্থলে প্রতিষ্ঠা করেছিলো অনেক ধর্মমত। যারা বিশ্বাসী তারা দিয়েছিলো সকল নবী-রসুল এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ সকল কিতাবের স্বীকৃতি। অবশিষ্টরা করেছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যান। কেউ কেউ নবী-রসুলগণের কাউকে করেছিলো স্বীকার, কাউকে অস্বীকার। যেমন ইহুদী, খৃষ্টান, সাবায়ী। আবার কেউ কেউ প্রত্যাখ্যান করেছিলো সকল নবী রসুলকে। যেমন— অগ্নিউপাসক ও প্রতিমাপূজারী। উল্লেখ্য, এমতো ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যেতে পারবে তখন, যখন এখানকার 'তাক্বত্তাউ' শব্দটিকে গ্রহণ করা হবে 'ক্বত্তাউ'(তারা টুকরা টুকরা করেছিলো) অর্থে। কারণ 'তাফাদ্দাল' আসে তাফয়ীলের অর্থে। কিন্তু এরকম বক্তব্যও সুসিদ্ধ যে, এখানে 'আমরাহুম' এর পূর্বে লুপ্ত রয়েছে 'জর প্রদান কারী অব্যয়' (ফী)। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— তারা ধর্মীয় বিধান পালন করতে গিয়ে হয়ে যায় পৃথক। ছিন্নভিন্ন। সৃষ্টি করে বিভিন্ন দল-উপদল। এক ধর্মকে করে বহুধাবিভক্ত।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'তাকৃত্তাউ' 'আমরাহুম' ও 'বাইনাহুম' শব্দগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত সর্বনামগুলো বসেছে ওই সকল লোকের স্থলে, যাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন পয়গম্বরগণ। যেমন— ১. লাকৃদ আরসালনা নূহান ইলা কৃওমিহী। ২. আন্‌শা'না ক্বুরুনান ফা আরসালনা ফীহিম রুসূলানা তাত্‌রা'।

'যুবুরান' অর্থ বহুধাবিভক্ত, দল-উপদল। শব্দটি 'যুবুর' এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ টুকরা হওয়া। যেমন বলা হয়— 'যুবুরাল হাদীদ' (লোহার টুকরা)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটির অর্থ— কিতাবসমূহ। 'যাবারতুল কিতাব' অর্থ আমি স্পষ্ট অক্ষরে কিতাব লিখেছি। মোটা অক্ষরবিশিষ্ট গ্রন্থকে বলে 'যুবুর'। এর মমার্থ— তাদের ধর্ম ছিলো প্রথমে গ্রন্থাকারে, আল্লাহ্ যেভাবে অবতীর্ণ করেছিলেন। পরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পরিবর্তন সাধন করে সেগুলোর। হাসান বলেছেন, তারা আল্লাহ্র কিতাবকে করে ফেলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ত্রুটিযুক্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট'। একথার অর্থ— বিকৃত ও পরিবর্তিত মতবাদগুলোকে আবার তারা সত্য বলে জানে এবং এই নিয়ে সন্তুষ্টও থাকে। প্রদর্শন করে মিথ্যাশ্রয়ী দম্ভ।

পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তাদেরকে বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও কিছু কালের জন্য'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একথার অর্থ— কিছুদিন তাদেরকে নিমজ্জিত থাকতে দাও অবিশ্বাস ও ভ্রষ্টতার পঙ্কে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'গামরাতি' অর্থ গাফলত বা অনবহিতি, বিভ্রান্তি। অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞ হওয়ার দাবি। এখানে বিভ্রান্তিকে তুলনা করা হয়েছে ওই পানির সঙ্গে, যা মানুষের উচ্চতা অপেক্ষা উচ্চ। অর্থাৎ যে পানিতে মানুষের পূর্ণ নিমজ্জন ঘটে।

'হাত্তা হীন' অর্থ কিছুকালের জন্য। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত। অথবা ওই সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি অবতীর্ণ হয়। মর্মার্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ক্রমাগত অপআচরণ দর্শনে বিমর্ষ হবেন না। শুনে রাখুন, আমি অবশ্যই তাদেরকে যথাসময়ে আমার শাস্তির অন্তর্গত করবো। অথবা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবো আপনি ও আপনার সহচরবৃন্দের মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রে।

সূরা মু'মিনূন : আয়াত ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ○ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ○ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم

www.eelm.weebly.com

مُّشْفِقُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ
بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ
اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ

❒ উহারা কি মনে করে যে আমি উহাদিগকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দিই বলিয়া উহাদিগের জন্য

❒ সকল প্রকার মংগল ত্বরান্বিত করিব? না, উহারা বুঝে না।

❒ যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত,

❒ যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করে,

❒ যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের শরীক স্থাপন করে না,

❒ এবং যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে এই বিশ্বাসে তাহাদিগের যাহা দান করিবার তাহা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে,

❒ তাহারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তাহারা উহাতে অগ্রগামী হয়।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যে সকল লোক আপন ভ্রষ্টতায় সন্তুষ্ট, যারা তাদের প্রতি প্রেরিত পয়গম্বরগণকে মান্য করে না, অবলীলায় তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে জানে, তারা কি মনে করে আমি তাদেরকে যে বিত্তবল ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি তা তাদের জন্য কল্যাণকর? কখনোই নয়। তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো বিবেকবুদ্ধিহীন। তাই তারা একথা বুঝতে পারে না যে, তাদেরকে সর্বক্ষণ ঘিরে রয়েছে আমার নেয়ামতরূপী আযাব।

হাসান বসরী বলেছেন, মুমিনগণ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা সত্ত্বেও আল্লাহ্র ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে, আর মুনাফিকেরা গোনাহ্ করা সত্ত্বেও থাকে নিশ্চিন্ত।

পরের আয়াত পঞ্চকের (৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১) মর্মার্থ হচ্ছে— 'যারা আল্লাহ্র ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত, যারা তাদের প্রভুপালনকর্তার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা তাদের প্রভুপালনকর্তার ইবাদতে প্রকাশ্য গোপন কোনো প্রকার শিরিক করে না এবং যারা তাদের প্রভুপালনকর্তা সকাশে প্রত্যাবর্তনে আস্থাশীল হয়ে ভীতকম্পিত হৃদয়ে দান খয়রাত করে, তারাই ত্বরান্বিত করে কল্যাণকর কর্মসমূহ, তারাই মহাকল্যাণের পথে অগ্রগামী।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'আয়াত' অর্থ কোরআনের আয়াত যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, অথবা ওই সকল অলৌকিক নিদর্শন যা প্রমাণ করে আল্লাহ্‌র অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অতুলনীয় এককত্বকে। 'ইউমিনূন' অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করে বা মেনে নেয়।

'বিশ্বাস স্থাপন করে' এবং 'শরীক স্থাপন করেনা' কথা দু'টো সমার্থক হলেও ৫৮ ও ৫৯ সংখ্যক আয়াতে কথা দু'টোকে উপস্থাপন করা হয়েছে পৃথকরূপে। দৃশ্যতঃ এটাকে পুনরাবৃত্তি মনে করা হলেও প্রকৃত পক্ষে তা নয়। কারণ বিশ্বাসে শিরিক এবং ইবাদতে শিরিক এক কথা নয়। এই দুই ধরনের শিরিকই নিষিদ্ধ। ইবাদতের শিরিকই প্রকৃত শিরিক। মক্কার মুশরিকেরা এরকম শিরিকই করতো। তারা আল্লাহ্‌কে মানতো বটে, কিন্তু উপাসনা করতো প্রস্তর-প্রতিমার। তাই এখানে প্রকৃত বিশ্বাসীদের গুণস্বরূপ প্রথমে বলা হয়েছে 'বিশ্বাস স্থাপন করে' এবং পরে বলা হয়েছে 'শরীক স্থাপন করে না'।

'মা আতাউ' অর্থ উত্তম দান। বাগবী বলেছেন, জননী আয়েশা কথাটিকে উচ্চারণ করতেন 'ইউতুনা মা আতাউ' এবং বলতেন, এর অর্থ— সকল উত্তম কর্ম।

'ওয়াজ্বিলাতুন' অর্থ ভীত-কম্পিত হৃদয়ে। অর্থাৎ সম্পাদিত পুণ্যকর্ম আল্লাহ্ কবুল করবেন কি করবেন না, এই ভয়ে। অথবা কৃত সৎকর্ম দর্পমিশ্রিত হয়ে যায় কিনা, এই আশংকায়। কিংবা এই চিন্তায় যে, আমার পুণ্য অত্যল্প, কিন্তু পাপ বেশী, সুতরাং এই যৎকিঞ্চিত পুণ্য কি আমাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দিতে পারবে?

'যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে' কথাটির মধ্যে রয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যের কারণ। তাই বুঝতে হবে এখানে অনুক্ত রয়েছে একটি লামে তা'লীলীয়া (হেতু বাচক লাম) । অর্থাৎ তাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত থাকতো একারণে যে, তাদেরকে এক সময় আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত হতে হবেই। অথবা এখানে অনুক্ত রয়েছে একটি 'মিন'(হেতু)। অর্থাৎ একারণে তাদের অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত থাকে যে, আল্লাহ্‌র নিকটে তাদেরকে অবশ্যই উপস্থিত করানো হবে এবং তখন তিনি তাদের সকলের হিসাব গ্রহণ করবেন। হাসান বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— সুচারুরূপে ইবাদত করা সত্ত্বেও যাদের হৃদয় এই ভয়ে ভীত থাকে যে, যদি এই আমল অগ্রাহ্য হয়! জননী আয়েশা বর্ণনা করেন, আমি একবার রসুল স.কে বললাম, 'যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এই ভয়ে দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে' কথাটিতে কাদের কথা বলা হয়েছে? মদ্যপ ও অপহারকদের কথা? তিনি স. বললেন, না গো সিদ্দীক-তনয়া, এখানে বলা হয়েছে

www.eelm.weebly.com

ওই সকল লোকের কথা, যারা নামাজ পাঠ করে, রোজা পালন করে এবং দান-খয়রাতও করে থাকে। তথাপিও তারা এই ভয়ে ভীত হয় যে, যদি এই আমল গ্রহণযোগ্য না হয়। এরাই পুণ্যকর্মে সততসচেতন ও অগ্রগামী। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেন, আমি একবার রসুল স. সকাশে 'ওয়াল্লাজীনা ইউ'তূনা মাআ'তাও ওয়া কুলুবুহুম ওয়াজিলাতুন' এর ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে বললাম, এরা কারা? মদ্যপায়ী ও চোর? তিনি স. বললেন, নাগো সিদ্দীকনন্দিনী, না। এরা হচ্ছে ওই সকল লোক, যারা রাতে নামাজের জন্য জাগ্রত হয় ও দান-ধ্যান করে, সেই সঙ্গে এই আশংকাও করে যে, যদি আমাদের আমল কবুল না করা হয়।

'উলায়িকা ইউসারিউ'না ফিল খইরাতি' অর্থ— তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ। অর্থাৎ— তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে অত্যধিক আগ্রহী, তাই কোনো পুণ্যকর্ম বাদ না পড়ে যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। কথাটির উদ্দেশ্য এরকমও হতে পারে যে, ইবাদতকারীদেরকে পারলৌকিক ও ইহলৌকিক কল্যাণের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সেই সামগ্রিক কল্যাণ অর্জনের জন্য যারা দৃঢ়তা ও দ্রুততার সঙ্গে পুণ্যকর্ম সমাধা করে। রসুল স. বলেছেন, দোয়া ছাড়া বিপদ দূর হয় না। আর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায় না কল্যাণকর কাজ ব্যতিরেকে। কল্যাণকর কাজ হচ্ছে দান ও সচ্চরিত্র। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ওই আয়াতের অনুকূল যেখানে এরশাদ করা হয়েছে— 'ফাআতাহুমুল্লহু ছওয়াবাদ্ দুন্‌ইয়া ওয়া হুসনা ছওয়াবিল আখিরাহ'। অর্থাৎ তারা এমন সওয়াব লাভ করবে, যা তাদের বিরোধীদের ভাগ্যে ঘটবে না।

আমি বলি, বিশ্বাসীরা পৃথিবীতে যে সকল কল্যাণজনক কাজের দিকে প্রবল উৎসাহভরে অগ্রসর হয়, তার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই যে, তারা লাভ করে আল্লাহ্‌র জিকিরের আস্বাদ। তাদের অন্তর পায় প্রশান্তি। স্বল্প জীবনোপকরণ পেয়েই তারা থাকে হৃষ্টচিত্ত ও পরিতৃপ্ত। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু হারাবার ভয় আর তাদের থাকে না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপর কোনো ভয়-ভরসা তাদের নেই। নিদ্রিত অবস্থায়ও তাদের জন্য আশংকার কিছুই নেই। আর তারা ইলহামের মাধ্যমে অবগত হতে থাকে শুভ সমাচার।

'ওয়াহুম লাহা সাবিকুন' অর্থ— এবং তারা এতে অগ্রগামী হয়। অর্থাৎ তারা হয় জান্নাতের পথে সর্বাগ্রগণ্য। অথবা 'সাবিকুন' অর্থ এখানে অগ্রগামী নয়, বরং ইবাদতের দিকে, সওয়াবের দিকে, কিংবা বেহেশতের দিকে দ্রুত

www.eelm.weebly.com

পদবিক্ষেপকারী। কথাটির অর্থ এরকম হওয়াও সম্ভব যে, আখেরাতের আগমনের পূর্বেই তারা জাগতিক কল্যাণের দিকে ধাবমান। অর্থাৎ আখেরাতের আগমনের আগেই যাদেরকে দেয়া হয় পৃথিবীর কল্যাণ। কোনো কোনো আলেম বলেন, এখানকার 'লাহা সাবিকুন' এর 'লাম' অর্থ 'ইলা' (দিকে)। যদি তাই হয়, তবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— তারা কল্যাণকর কাজ ছাড়া অন্য কাজের দিকে অগ্রগামী হয় না। যেমন 'লাহা নাহ্ওয়া আ'নহু' আয়াতের 'লাম'ও 'ইলা' (দিকে) অর্থবোধক। এ কারণেই কালাবী এই আয়াতের অর্থ করেছেন— তারা স্বজাতির সকলের চেয়ে কল্যাণকর কাজের দিকে অধিক অগ্রসর।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— তাদের সৌভাগ্যবান হওয়া পূর্ব থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِيْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ۝ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْـَٔرُوْنَ ۝ لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ۝

❒ আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব যাহা প্রকৃত সাক্ষ্য দেয় এবং উহাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

❒ না, এই বিষয়ে উহাদিগের অন্তর অজ্ঞানতায় আছন্ন, এতদ্ব্যতীত আরও মন্দ কাজ আছে যাহা উহারা করিয়া থাকে।

❒ আমি যখন উহাদিগের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদিগকে শাস্তি দ্বারা আঘাত করি তখনই উহারা আর্তনাদ করিয়া উঠে।

❒ তাহাদিগকে বলা হইবে, 'আজ আর্তনাদ করিও না, তোমরা আমার সাহায্য পাইবে না।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না'। একথার অর্থ— ওই সকল লোক যারা স্বভাবজ পুণ্যানুরাগের কারণে কল্যাণময়তার দিকে দ্রুত ধাবমান, আমি তাদেরকে সাধ্যাতিরিক্ত কোনো নির্দেশ প্রদান করিনি, কাউকে দিইনি সামর্থ্যাতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব যা প্রকৃত সাক্ষ্য দেয়'। একথার অর্থ— আমার নিকটে সংরক্ষিত রয়েছে লওহে মাহফুজ, অথবা মানুষের আমলনামা, যাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে পুণ্য ও পাপের প্রকৃত বিবরণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না'। একথার অর্থ— তাদের কারো অধিকারই খর্ব করা হবে না। এতোটুকু হ্রাস করা হবে না কারো পুণ্য। বৃদ্ধিকরা হবে না করো পাপ।

পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'না, এই বিষয়ে তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন'। একথার অর্থ— না, ধর্ম বিষয়ে তাদের অন্তর অবোধ, বরং তারা সবদিক দিয়েই মূর্খ। অথবা, প্রকৃত ধর্মবোধ সম্পর্কে তারা উদাসীন, অসচেতন। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কোনো বোধই তাদের নেই। কিংবা তারা ধর্ম বিষয়ে পুরোপুরি অসতর্ক। কেননা তারা আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্মকে পরিত্যাগ করেছে। তারপর বিভক্ত হয়েছে বহু দলে উপদলে। অনুসারী হয়েছে তাদের মনগড়া মতবাদের। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— তারা এই কোরআন সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। অথবা গাফেল ইমানের পূর্ণ সৌন্দর্য থেকে। কিংবা গাফেল তাদের আপনাপন আমলনামা সম্পর্কে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতদ্ব্যতীত আরো মন্দ কাজ আছে, যা তারা করে থাকে'। একথার অর্থ— অংশীবাদিতা ও অবিশ্বাস ছাড়াও তারা করে আরো অনেক অপকৃষ্ট কর্ম। অথবা— ইমানদারদের উত্তম আমলসমূহের প্রতি আকৃষ্ট তো তারা হয়ই না, উপরন্তু করে তাদের সঙ্গে শত্রুতা। এরকম মন্দকর্ম রয়েছে তাদের অনেক।

এরপরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'আমি যখন তাদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা আঘাত করি, তখনই তারা আর্তনাদ করে ওঠে'। ইবনে জুরাইজ সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'শাস্তি' দ্বারা বুঝানো হয়েছে বদর যুদ্ধে কুরায়েশ নেতৃবর্গের নিহত হওয়াকে। জুহাক বলেছেন, এখানে 'শাস্তি' অর্থ ওই দুর্ভিক্ষ, যা রসুল স. এর অপপ্রার্থনার ফলে আপতিত হয়েছিলো মক্কার মুশরিকদের উপর। রসুল স. তখন তাঁর প্রার্থনায় বলেছিলেন, হে আমার আল্লাহ্। তুমি এই অবাধ্যদের উপরে অবতীর্ণ করো নবী ইউসুফের সময়ের দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষ। বলা বাহুল্য, তাঁর প্রার্থনা গৃহীত হয়েছিলো। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, অংশীবাদীরা ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করতে বাধ্য হয়েছিলো কুকুরের গোশত ও মৃত জানোয়ারের হাড়-মাংস খেয়ে। এই দুর্ভিক্ষের বিবরণ এসেছে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায়।

www.eelm.weebly.com

'ইয়াজআরূন' অর্থ আর্তনাদ করে ওঠে। আর আলোচ্য আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'হাত্তা' উপস্থাপনের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের কারণ। অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ে ঘোর অজ্ঞতা ও মন্দকর্মপ্রবণতাই তাদের এমতো শাস্তিতে নিপতিত হয়ে আর্তনাদ করে ওঠার কারণ।

এরপরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে বলা হবে, আজ আর্তনাদ কোরো না, তোমরা আমার সাহায্য পাবে না'। একথার অর্থ— তাদের তখন বলা হবে আজ আর আর্তনাদ করে কোনো লাভ নেই। কারণ তোমরা আজ আমার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য পাবে না। আর আমার সাহায্য ব্যতিরেকে পরিত্রাণপ্রাপ্তি তো অসম্ভব।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৬৬, ৬৭

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ۝ مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ۝

☐ আমার আয়াত তো তোমাদিগের নিকট আবৃত্তি করা হইত, কিন্তু তোমরা পিছন ফিরিয়া সরিয়া পড়িতে

☐ দম্ভভরে, এই বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করিতে করিতে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! আমার বাণী তো আমার রসুল তোমাদেরকে আবৃত্তি করে শোনান, কিন্তু তোমরা তা মান্য করা তো দূরের কথা, শ্রবণও করো না, স্থান ত্যাগ করো দর্পভরে, নিরর্থক বাক্যালাপ করতে করতে।

এখানে 'তান্‌কিসূন' অর্থ সরে পড়ে, স্থান ত্যাগ করে। আর এখানকার 'বিহী সামিরান তাহ্‌জুরূন' কথাটির 'বিহী' সর্বনামের সম্পর্ক রয়েছে হেরেম শরীফের সঙ্গে, যদিও এখানে হেরেমের কথা রয়েছে উহ্য। কেননা হেরেমের অধিবাসী বলে মক্কার মুশরিকেরা দর্পপ্রকাশ করতো। অহংকার করতো এই বলে যে, আমরা হেরেমবাসী, কাবাগৃহের প্রতিবেশী। আমরা চিরদুর্জয়, চিরনির্ভয়। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং তাফসীরকারগণের একটি দল এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো আলেম আবার সর্বনামটি 'আয়াত' এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করেন। কেননা 'আয়াত' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক বহুবচন হলে হবে কিতাব বা কোরআনের অর্থপ্রদায়ক। তাই তা অর্থগতভাবে পুংলিঙ্গবাচক একবচনের সর্বনাম। এমতাবস্থায় 'বা' হচ্ছে কারণপ্রকাশক। কেননা কোরআন শ্রবণের পরেই তাদের অন্তরে জেগে উঠেছিলো বিশ্বাসবানদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ববোধের অহমিকা।

www.eelm.weebly.com

'সামার' অর্থ রাত্রিকালিন কিসসা-কাহিনী, গল্প-গুজব করা। অর্থাৎ মুশরিকেরা রাতে কাবার আসে পাশে বসে বিভিন্ন রকমের গল্প-গুজব করতো এবং কোরআন শ্রবণ করলেই প্রকাশ করতো তাদের দম্ভ। 'সামিরুন ' হচ্ছে বহুবচনবোধক বিশেষ্য। যেমন বাকের ও হামেল। এটাও বহুবচন। কেননা শব্দটি ' 'মুসতাকবিরীন' এর কর্তার অবস্থাপ্রকাশক। আর 'মুসতাকবিরীন' হচ্ছে বহুবচন। তাই কথাটিকে 'হুম সামারুন' এবং 'হুম সামিরুন' দু'টোই বলা যায়। 'নেহায়া' গ্রন্থেও একথা বলা হয়েছে। এক হাদিসে এসেছে 'ইজ্‌জ্বাআ-যাওজুহা মিনাস্ সামিরি' (যখন তার স্বামী ওই সকল লোকের কাছ থেকে এসেছে, যারা ব্যস্ত ছিলো কিসসা-কাহিনী নিয়ে)।

'কামুস' রচয়িতা লিখেছেন, 'সামারা', 'সামরান'ও 'সামুরান' অর্থ জাগ্রত থাকে। 'হুমুস সামারা' 'ওয়াস্‌সামিরাতুন' এবং 'সামিরুন' হচ্ছে বহুবচনবোধক বিশেষ্য। 'সামারা' অর্থ রাত্রি, নিশিথের কল্প-কাহিনী, চন্দ্রালোক, রাতের আঁধার, কাল। বায়যাবী লিখেছেন, ফায়িলুনের শব্দরূপে সামিরুন। মূলত শব্দটি ধাতুমূল, যেমন আফিয়াতুন। কেউ কেউ বলেছেন, 'সামিরুন' শব্দটি একটি একবচন বোধক শব্দ। কিন্তু তা বহুবচনার্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন 'তিফলুন' ব্যবহৃত হয় 'আতফালে'র স্থলে। এক আয়াতে এসেছে— 'ইয়াখরুজুকুম ত্বিফলান'। এখানেও 'ত্বিফলান' অর্থ 'আত্বফালান'।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'সামিরুন' বলে আঁধার রাতকে। এই অর্থই হবে এখানে সঙ্গত। তাই এখানে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— রাতে তোমরা কিসসা-কাহিনীতে মত্ত থাকতে, আর কোরআনের আবৃত্তি শুনলে অহংকার প্রদর্শন করতে।

'তাহজুরুন' শব্দটি এসেছে 'হাজরুন' থেকে। এর অর্থ অশ্লীল উক্তি, মন্দ আলোচনা। আর 'হাজর' অর্থ টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া, নিরর্থক কথা বলা, সরে পড়া। অর্থাৎ কোরআন-শ্রবণ থেকে তোমরা কেটে পড়ো, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। অথবা রসুল স. কিংবা কোরআনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে অর্থহীন কথাবার্তা বলো। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, কুরায়েশেরা কাবাগৃহের আশেপাশে বৈঠকী আলোচনায় মত্ত থাকতো। কিন্তু তাওয়াফ করতো না, আবার কাবার প্রতিবেশী বলে অহংকারও করতো। তাদের এমতো আচরণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষোক্তটি।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৬৮, ৬৯, ৭০

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ۝ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ

www.eelm.weebly.com

جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ○

❒ তবে কি উহারা এই বাণী-বিষয়ে অনুধাবন করে না? না উহাদিগের নিকট এমন কিছু আসিয়াছে যাহা উহাদিগের পূর্ব-পুরুষদিগের নিকট আসে নাই?

❒ অথবা উহারা কি উহাদিগের রসূলকে চিনে না বলিয়া তাহাকে অস্বীকার করে?

❒ অথবা উহারা কি বলে যে, সে উন্মাদ? না, সে উহাদিগের নিকট সত্য আনিয়াছে এবং উহাদিগের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তবে কি তারা এই বাণী-বিষয়ে অনুধাবন করে না? না তাদের নিকটে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট আসেনি'? প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। উল্লেখ্য যে না সূচক বাক্যের অস্বীকৃতি থেকে ধর্তব্য হয় হ্যাঁ সূচক । আল ক্বওল অর্থ কোরআন পাক। আলিফ লামটি সীমিতার্থক। অর্থাৎ রসুল মোহাম্মদের উপর অবতীর্ণ বাণীবৈভব যা তিনি উপস্থাপন করেছেন। তারা যথেষ্ট চিন্তা গবেষণা করেছে এ কোরআন সম্পর্কে। যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এর প্রতি। সক্ষম হয়নি ছোট্ট একটি সুরার অনুরূপ সুরা তৈরী করতে। ফলে তাদের নিকট প্রমাণিত হয়েছে এর অজেয়তা। প্রত্যয়িত হয়েছে, এটা মানব রচিত নয়। প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। তাই এর অর্থ দাঁড়ায়— প্রত্যাদেশিত বাণীর বিষয় তো তাদের কাছে নতুন কিছু নয়। তাদের পিতৃপুরুষ হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসমাইলের উপরও অবতীর্ণ হয়েছিলো এরকম প্রত্যাদেশ। এ বিষয়ে তারাতো অবহিত। এখন আবার প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়ে চলেছে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর প্রতি। সুতরাং বিষয়টি তো তাদের কাছে অননুধাবনীয় নয়।

পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'অথবা তারা কি তাদের রসুলকে চিনে না বলে তাকে অস্বীকার করে?' একথার অর্থ— যিনি তাদের কাছে রেসালাতের দাবি উত্থাপন করেছেন, তিনি কি তাদের অপরিচিত কেউ? তাঁর জন্ম, বংশপরিচয়, আমানতদারী, পবিত্র চরিত্র, সৌজন্য, অঙ্গীকারপূরণপ্রিয়তা, অক্ষরের অমুখাপেক্ষিতালব্ধ জ্ঞান— এগুলো সম্পর্কে কি তাদের জানা নেই? এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। প্রকৃত কথা হচ্ছে, বর্ণিত পরিচিতি সমূহের কোনো একটি সম্পর্কেও যদি তাদের জানা না থাকে, তবুও তো বিনা প্রমাণে তাঁকে রসুল না মানা অন্যায়।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'অথবা তারা কি বলে যে, সে উন্মাদ?' এখানকার 'আম' হচ্ছে অস্বীকৃতি প্রকাশক। অর্থাৎ আমার রসুল কস্মিনকালেও উন্মাদ নয়। অথচ ধৃষ্টতা প্রদর্শকেরা বলে, তিনি নাকি মানসিক ভারসাম্যহীন।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতত্রয়ের সকল 'আম' হচ্ছে আমে মুত্তাসিলাহ্ (অবিচ্ছিন্ন বাক্য)। আর 'আফালাম ইয়াদ্‌দাব্‌বারু' হচ্ছে 'জুমলায়ে মুস্তানিফা (বিচ্ছিন্ন বাক্য)। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— শ্রবণকারীরা যখন কোরআনের আয়াত শোনে, তখন তাদের মনে অযথা সন্দেহ জাগে, ফলে তারা সেখান থেকে সরে পড়ে, অহংকার করে এবং হয়ে যায় অশ্লীল বাক্যালাপের মুখপত্র। তারা কি কোরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না, অথবা তাদের নিকট ইতোপূর্বে কি কোনো পয়গম্বর প্রেরণ করা হয়নি, কিংবা আমার এখনকার রসুলের বিশ্বাসভাজনতা সম্পর্কে কি তারা অবহিত নয়? তারা বলে, আমার রসুল উন্মাদ! কী জঘন্য উক্তি! না, এরূপ কখনোই নয় । নবী-রসুলগণ মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ। আমার শেষ রসুলও অবশ্যই সেরকম। একথা সূর্যালোক সদৃশ সত্য, গ্রহণযোগ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'না, সে তাদের নিকট সত্য এনেছে'। একথার অর্থ— আমি আল্লাহ্ স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছি— না, আমার প্রিয়তম রসুল কখনোই উন্মাদ নন। তাঁর বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান সুস্থ, উচ্চ ও'গভীর। সুতরাং বিকৃতমস্তিষ্ক ও হিংসুকেরা ছাড়া তাঁকে কেউ উন্মাদ বলতে পারেই না।

'আল হাক্ব' অর্থ সর্বজনবিদিত সত্য। অর্থাৎ যা প্রত্যাদেশিত প্রমাণ ও বুদ্ধিগত দলিল দ্বারা সুপ্রমাণিত।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অস্বীকার করে'। একথার অর্থ— তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা স্বল্পবুদ্ধি ও গভীর বোধের অভাবে এখনও সত্যের দিকে এগিয়ে আসছে না, কিন্তু তারা শত্রু মনোভাবাপন্ন নয়। ওই কিছু সংখ্যককে বাদ দিলে তাই বলতে হয়, তাদের অধিকাংশই সত্যবিদ্বেষী।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৭১, ৭২

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
بَلْ أَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ○ أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ
خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

www.eelm.weebly.com

❑ সত্য যদি উহাদিগের কামনা-বাসনার অনুগামী হইত তবে বিশৃংখল হইয়া পড়িত আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই। পক্ষান্তরে, আমি উহাদিগকে দিয়াছি উপদেশ, কিন্তু উহারা উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

❑ অথবা তুমি কি উহাদিগের নিকট কোন প্রতিদান চাহ? তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতো, তবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তো আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই'। একথার অর্থ— সত্য যদি ওই সকল পৌত্তলিকদের কামনা-বাসনানুযায়ী হতো, তবে অসংখ্য উপাস্য এ পৃথিবীতে অবস্থান করতো; সবকিছু হয়ে পড়তো বিশৃঙ্খল, বরং এই মহাবিশ্বতো যেন অস্তিত্বই লাভ করতো না। যেমন অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে — যদি এ আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ ছাড়া আরো উপাস্য থাকতো তাহলে অবশ্যই বিনষ্ট করে দিতো এ দুটিকে।

ইবনে জুরাইজ, মুকাতিল, সুদ্দী ও বিচক্ষণ আলেমের একটি দলের অভিমত হচ্ছে, এখানে 'আল হাক্ব' (সত্য) অর্থ আল্লাহ্। হজরত বারা ও জুহাক বলেছেন, এখানে সত্য অর্থ কোরআন। এমতো অর্থ গ্রহণীয় মনে করা হলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ যদি তাদের কামনা-বাসনানুসারে অন্যকে তার শরীক করতেন, সন্তান গ্রহণ করতেন, তবে এই মহানিসর্গ হয়ে পড়তো শতধাবিচ্ছিন্ন। অথবা তিনি যদি এই কোরআন অবতীর্ণ করতেন তাদের অভিপ্রায়ানুসারে, তবে এতে থাকতো অংশীবাদিতা ও পাপের শিক্ষা, তখন আল্লাহ্ তো আর আল্লাহ্ই থাকতেন না। অনস্তিত্বের আঁধারে আবৃত থাকতো সমগ্র সৃষ্টি। কারণ মহাসৃজন ও মহাপ্রতিপালনের ক্ষেত্রে অংশীবাদিতার অস্তিত্ব মাত্র নেই। আর আল্লাহ্ কখনো শিরিক ও গোনাহর শিক্ষা দিতে পারেন না। তিনি যে সকল দোষত্রুটি থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। কোনো কোনো আলেম কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সত্য যদি তাদের ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের অনুগামী হতো, তবে ন্যায়নিষ্ঠতা বলে কোনোকিছু আর অবশিষ্ট থাকতো না, যার উপরে প্রবহমান রয়েছে এই মহাসৃষ্টি। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, রসুল স. কর্তৃক আনীত ধর্ম যদি অংশীবাদীদের আকাংখা, অভিলাষের অনুগামী হতো, তবে আল্লাহ্র এককত্ববোধের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হতো বহু উপাস্যের ধারণা। তখন আল্লাহ্ সকলের উপরে গজব অবতীর্ণ করতেন। ফলে সবকিছু হয়ে যেতো নিশ্চিহ্ন, নিরস্তিত্ব।

এরপর বলা হয়েছে— 'পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ, কিন্তু তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়'। এখানে 'জিকরিহিম' অর্থ এমন

www.eelm.weebly.com

সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থ, যা আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অথবা ওই স্মারক, যা ছিলো তাদের কাম্য। যেমন এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে— লাও আন্‌না ইন্‌দানা জিকরাম মিনাল আউয়ালীনা লাকুন্‌না ইবাদিল্‌লাহিল মুখলাসীন' (আমাদের নিকট যদি থাকতো পূর্ববর্তীদের কোনো উপদেশ, তাহলে আমরা হতাম আল্লাহর বাঞ্ছিত বান্দা)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'জিকরিহিম' দ্বারা বুঝানো হয়েছে ওই গ্রন্থকে, যেখানে বিবরণ রয়েছে বিশ্বাসীদের মর্যাদা ও সম্ভ্রমের। অর্থাৎ কোরআন মজীদ। অন্য আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন— লাক্বাদ আনযালনা ইলাইকুম কিতাবান ফিহী জিকরিহিম' (আমি তোমাদের নিকট এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ)। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া ইন্‌নাহু লাজিকরুল্ লাকা' (নিঃসন্দেহে এটা আপনার মর্যাদার মাধ্যম)। মোট কথা, কোরআনে গ্রহণ করা হয়েছে কুরায়েশদের মুখের ভাষা। আর ভাষার দিক দিয়ে মানুষকে করা হয়েছে কুরায়েশদের অনুগামী। আর রসুলপরবর্তী খেলাফতও নির্ধারিত হয়েছে কেবল তাঁদের জন্য।

'ফাহুম আ'ন্ জিকরিহিম মু'রিদূন' অর্থ— কিন্তু তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মর্মার্থ— তারা এমন কিতাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, যা তাদের মান-মর্যাদার মাধ্যম।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'অথবা তুমি কি তাদের নিকট কোনো প্রতিদান চাও'? এই প্রশ্নটিও অস্বীকৃতিসূচক। সুতরাং এর অর্থ হবে— হে আমার রসুল! আপনি তো তাদের কাছে বিনিময়-প্রত্যাশী নন যে, বিনিময় প্রদানের ভয়ে তারা ইমান ও হেদায়েত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে?

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আল্লাহ্ আখেরাতে যে প্রতিদান আপনাকে দিবেন, সেই প্রতিদানইতো শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই তো শ্রেষ্ঠ জীবনোপকরণপ্রদাতা। সুতরাং আপনি তাদের বিনিময়ের মুখাপেক্ষীই নন। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অস্বীকৃতি জ্ঞাপক 'আম' অব্যয়।

'কামুস' রচয়িতা লিখেছেন, এখানকার 'খরাজ' ও 'খিরাজ'। সমার্থক অর্থাৎ এমন ব্যয়, যার মাধ্যমে উপকৃত হওয়া যায়। আর এক অর্থ অপরকে প্রদান করা। যেমন বায়যাবী লিখেছেন দখল অর্থ আয়, এর বিপরীত অর্থ ব্যয়। শব্দটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত ভূমির করের বেলায়। 'খইর' অর্থ উত্তম, শ্রেষ্ঠ, প্রশস্ত, প্রবহমান।

www.eelm.weebly.com

وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ○ وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ
ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

❒ তুমি তো উহাদিগকে সরলপথে আহ্বান করিতেছ।

❒ যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহারা তো সরল পথ হইতে বিচ্যুত;

❒ আমি উহাদিগকে দয়া করিলেও এবং উহাদিগের দুঃখ-দৈন্য দূর করিলেও উহারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিতে থাকিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমিতো তাদেরকে সরল পথে আহ্বান করছো'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তো মানুষকে আহ্বান জানিয়ে চলেছেন সরল পথের দিকে। উল্লেখ্য, উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে অপসারণ করা হয়েছে আহ্বান প্রত্যাখ্যানের মূল কারণ। বলা হয়েছে আহ্বানকারী যেহেতু পার্থিব লাভ ও লোভের প্রত্যাশী নয়, এবং যেহেতু তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা সকলেই জ্ঞানী এবং যেহেতু তাঁর প্রদর্শিত পথ নয় বক্রতাবিশিষ্ট, সেহেতু তা প্রত্যাখ্যানের অতীত। এতদসত্ত্বেও যারা প্রত্যাখ্যানপ্রবণ তারা যে জ্ঞানহীন ও সত্যের শত্রু, সে কথা সুনিশ্চিত। আর তারা যে এরকম করবে তা তাদের সৃষ্টির সূচনালগ্নেই নিরূপিত হয়েছে। তারা চিরদুর্ভাগা। নয়তো তারা এরকম করবে কেনো? জাগতিক সকল কর্মকাণ্ডে তাদের জ্ঞান সতত সচল থাকলেও স্থায়ী কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রে তাদের বুদ্ধি এতো অকার্যকর হবে কেনো? 'ওয়াল্লাহু ইয়াহ্দি মাঁইয়াশা-উ ইলা সিরাতিম মুসতাক্বীম' (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখিয়ে দেন এবং সঠিক পথে চলার সামর্থ দান করেন)।

পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তারা তো সরলপথবিচ্যুত'। একথার অর্থ— মৃত্যুপরবর্তী জীবনের প্রতি যাদের প্রত্যয় নেই, তারা তো সরল পথ থেকে চ্যুত। তাদের বোধ ও বুদ্ধি বিপর্যস্ত। কারণ তাদের অস্তিত্বের উৎসারণ ঘটেছে আল্লাহ্তায়ালার 'আলমুদ্বিল্লু' (পথ ভ্রষ্ঠকারী) নাম থেকে। সুতরাং সোজা পথে চলা তাদের পক্ষে সম্ভবই নয়।

এর পরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে দয়া করলেও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে'। 'দ্বুররিন্' অর্থ দুঃখ-দৈন্য,

www.eelm.weebly.com

আযাব। এখানে 'দুঃখ-দৈন্য' বলে বুঝানো হয়েছে বদর যুদ্ধে নিহত পৌত্তলিক নেতাদের উপরে আপতিত দুঃখ-দৈন্যকে। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। আর জুহাক বলেছেন, রসুল স এর অপপ্রার্থনার ফলে মক্কার মুশরিকদের উপরে অবতীর্ণ দুর্ভিক্ষকে। উভয় ব্যাখ্যাই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্যের অনুকূল।

'লালাজ্জু ফী তুগ্ইয়ানিহিম ইয়া'মাহুন' অর্থ— তথাপিও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকবে। নিমজ্জিত থাকবে বক্রতা ও ভ্রষ্টতায়।

'ফী তুগ্ইয়ানিহিম' অর্থ বিভ্রান্তিতে, বক্রতায় অথবা ভ্রষ্টতায়। যেমন— আত্মঅহংকারে, সীমালংঘনে অথবা রসুল স. এর শত্রুতায়। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আমি তাদেরকে দয়া করিনি, যদি দয়া করে আমি তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেও দেই, তবুও তারা পড়ে থাকবে বিভ্রান্তির অতল তলে। সেখানেই আবর্তিত ও বিবর্তিত হতে থাকবে অনন্তকাল।

নাসাঈ ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, একবার আবু সুফিয়ান রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, মোহাম্মদ! আমি তোমাকে আল্লাহ্ ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বলছি, এ দুর্ভিক্ষ দূর করে দাও। আমরা তো পশুর পশম ও রক্ত খেয়ে জীবন ধারণ করে চলেছি। তার একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত—

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৭৬, ৭৭

وَلَقَدْ أَخَذْنَٰهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ○

حَتَّىٰٓ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

❒ আমি উহাদিগকে শাস্তি দ্বারা আঘাত করিলাম, কিন্তু উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের প্রতি নত হইল না এবং কাতর প্রার্থনাও করিল না।

❒ যখন আমি উহাদিগের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলিয়া দেই তখনই উহারা ইহাতে হতাশ হইয়া পড়ে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা আঘাত করলাম'। এখানে 'আযাব' (শাস্তি) অর্থ বদর যুদ্ধের মাধ্যমে প্রদত্ত শাস্তি, অথবা শাস্তি দুর্ভিক্ষের।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফামাসতাকানু লিরব্বিহিম' (কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি নত হলো না)। একথার অর্থ— কিন্তু তারা তাদের দয়াময় প্রভুপালকের দিকে ফিরে এলো না, অনড় হয়ে রইলো সত্য-প্রত্যাখ্যানের উপর। 'আস্তাকানু' হচ্ছে বাবে ইস্তেফআ'ল, যার মূল হচ্ছে 'কাউনুন', যা পরিবর্তন বা স্থানান্তরণের মুখাপেক্ষী। অথবা 'আসতাকানু' হবে বাবে ইফতিয়াল থেকে, যার মূল 'সুকুনুন' (কাফের পরে আলিফে ইশবাঈ)।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়ামা ইয়াতাদ্বররাউন'(এবং কাতর প্রার্থনাও করলো না)। একথার অর্থ— এবং তারা রোদনকাতর প্রার্থনাও নিবেদন করলো না, অনুতাপজর্জরিত ও রোদনকাতর হবার যোগ্যতাই যে তাদের নেই।

বায়হাকী তাঁর 'দালায়েল' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আছাল হানাফী রসুল স. এর দরবারে বন্দী অবস্থায় এলে তিনি স. তাঁকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার পর ছেড়ে দেন। তিনি মক্কাগমনের পর মুসলমান হন এবং কুরায়েশদের খপ্পর থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন মক্কা ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী এক স্থানে। এরপর তিনি বন্ধ করে দেন ইয়ামামা থেকে মক্কাভিমুখী যাবতীয় বাণিজ্য কাফেলা। ফলে মক্কাবাসীরা পড়ে বিপাকে। চরম খাদ্যাভাব দেখা দেয় তাদের। ক্ষুধার যন্ত্রণায় যখন তারা জন্তু-জানোয়ারের পশম পর্যন্ত খেতে শুরু করলো, তখন নিরুপায় হয়ে আবু সুফিয়ান মদীনায় রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, মোহাম্মদ! তুমি কি নিজেই দাবি করোনা যে, তুমি সমগ্র বিশ্বের রহমত? রসুল স. বললেন, নিঃসন্দেহে। আবু সুফিয়ান বললো, তাহলে তুমি তোমার বাপ-দাদাদেরকে তলোয়ার দ্বারা এবং তাদের বংশধরদেরকে দুর্ভিক্ষের দ্বারা মেরে চলেছো কেনো? তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। আর এই আয়াতে একথার সাক্ষ্যও বিদ্যমান যে, আমি তাদেরকে দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ - দৈন্য দূর করলেও তারা অবনত হবে না আমার সম্মুখে।

একটি সন্দেহঃ বর্ণিত তাফসীর দৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে, আল্লাহ্ মক্কাবাসীদেরকে যে শাস্তি দ্বারা আঘাত করেছিলেন, তা দূর করেননি। অথচ বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাদের জন্য বদদোয়া করলেন; হে আল্লাহ্! নবী ইউসুফের যুগের মতো এদের উপরেও দুর্ভিক্ষ নামিয়ে দাও। বলাবাহুল্য দোয়া কবুল করা হলো। দুর্ভিক্ষের আঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে আবু সুফিয়ান রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, তুমি কি দাবি করো না যে, তুমি সকলের ও সকলকিছুর জন্য রহমত? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আবু সুফিয়ান বললো, তাহলে তুমি তোমার পিতৃপুরুষদেরকে তরবারীর আঘাতে এবং তাদের সন্তানদেরকে দুর্ভিক্ষের আঘাতে এভাবে সংহার করে চলেছো কেনো? যাহোক, এখন তাহলে দোয়া করো, আল্লাহ্ যেনো দুর্ভিক্ষ দূর করে দেন। রসুল স. দোয়া করলেন। ফলে দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেলো। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। উল্লেখ্য, এ ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর দোয়ার বরকতে আল্লাহ্ দুর্ভিক্ষ অপসারিত করে দিয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাফসীর ও হাদিসের এই বৈসাদৃশ্যের সমন্বয় সাধন কীভাবে সম্ভব। এর জবাবে আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, তাদের প্রতি

www.eelm.weebly.com

দয়া করা হয়নি, শাস্তিও অপসারণ করা হয়নি। কেননা আল্লাহ্ জানতেন যে, শাস্তি দূর করে দিলেও তারা অবিশ্বাসেই অনড় থাকবে। কিন্তু ওই শাস্তি যে দূরীভূত হয়ইনি— সেকথার উল্লেখ আয়াতে নেই। তাই একথা বলতে আর বাধা নেই যে, পরবর্তীতে রসুল স. এর দোয়ায় ওই শাস্তি অপসারিত হয়েছিলো। কিন্তু তার পরেও তারা তওবা করেনি। বরং অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের মতো ঘুরেই চলেছিলো।

পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেই, তখনই তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়ে'। এই আয়াতেও 'কঠিন শাস্তি' অর্থ দুর্ভিক্ষের শাস্তি। অবশ্য ৬৪ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'যখন আমি ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা আঘাত করি' কথাটির অর্থ বদর যুদ্ধের শাস্তি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ক্ষুধার শাস্তি বন্দীত্ব অথবা নিহত হওয়ার শাস্তি অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ। তাই কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেই বলে আলোচ্য আয়াতে উদ্দেশ্য করা হয়েছে দুর্ভিক্ষের শাস্তিকে। আর জুহাকের মতানুসারে যদি কেবল 'শাস্তি' দ্বারা দুর্ভিক্ষের শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে বলে মনে করা হয়, তবে বুঝতে হবে 'কঠিন শাস্তি' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে কবরের আযাব, কিয়ামতের আযাব এবং দোজখের আযাবের কথা। যদি তাই হয় তবে একথাও বুঝতে হবে যে, এখানকার অতীতকালবোধক 'ফাতাহ্না' ব্যবহৃত হয়েছে শাস্তির নিশ্চিতার্থে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে তাদের এ সকল শাস্তি সুনিশ্চিত। যেমন করা হয়েছে 'হাজাশ্ শামসু কুব্বীরাত' আয়াতে। এমতাবস্থায় এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি বিভিন্ন প্রকার শাস্তির মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করেছি— বন্দীত্বের, হত্যার ও দুর্ভিক্ষকালীন ক্ষুধার; কিন্তু কোনো কিছুতেই নত হয়নি তারা, কাতর প্রার্থনাও জানায়নি, অবশেষে যখন তাদেরকে আখেরাতের আযাবে নিপতিত করা হবে, তখন তারা হয়ে পড়বে সম্পূর্ণরূপে হতাশ। উল্লেখ্য, তাদের এমতো হতাশার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে 'ইয়াওমা তাকুমুস সাআ'তু ইউবলিসুল মুজ্রিমুন' আয়াতের তাফসীরে।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৭৮, ৭৯, ৮০

وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ

وَهُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○ وَهُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ

وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

www.eelm.weebly.com

❐ তিনিই তোমাদিগকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ দিয়াছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক।

❐ তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে তোমাদিগের বংশ বিস্তার করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে তাঁহারই নিকট একত্রিত করা হইবে।

❐ তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁহারই বিধানে আবর্তন ঘটে রাত্রি ও দিবসের। তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনিই তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ দিয়াছেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ই তোমাদেরকে শুনবার জন্য কান, দেখবার জন্য চোখ এবং উপলব্ধি করবার জন্য হৃদয় দান করেছেন, যাতে তোমরা দেখে শুনে বুঝে সত্য সরল পথের সন্ধান পেতে পারো। অর্জন করতে সমর্থ হও পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'ক্বলীলাম্ মা তাশকুরূন' (তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো)। এখানে 'ক্বলীলাম্ মা' এর 'মা' অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। 'ক্বলীলান্' অর্থ যৎ সামান্য । গ্রহীতার দায়িত্ব হচ্ছে দাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়, যিনি সৃষ্টি করেছেন ও দান করেছেন, সেই চিরঅসমকক্ষ মহাসৃজয়িতার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক না করা। কিন্তু মানুষ এই অত্যাবশ্যক দায়িত্ব অল্পই পালন করে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রচলিত অর্থে কথাটি না সূচক। যদি এটাকেই গ্রহণ করা হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— তোমরা একেবারেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না।

পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে তোমাদের বংশবিস্তার করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে'। একথার অর্থ— 'হে মানুষ! আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে এনে তোমাদের বংশ থেকেই সৃষ্টি করেছেন বহুসংখ্যক মানুষ। এভাবে তোমাদেরকে সম্প্রসারিত করার পর পুনরায় সকলকে একত্রিত করবেন তাঁর সকাশে পুনরুত্থান দিবসে।

এরপরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে— 'তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই বিধানে আবর্তন ঘটে রাত্রি ও দিবসের'। একথার অর্থ— জীবন-মৃত্যু তাঁরই অভিপ্রায়াধীন ও ক্ষমতায়ত্ত। দিবস-নিশিথের নিয়মিত আবর্তনও তাঁর বিধানানুগত। সুতরাং একথা মেনে নিতে হবেই যে, তিনি অতুলনীয়রূপে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তবুও কি তোমরা বুঝবে না?' একথার অর্থ— তোমরা এতো কিছু শুনে, দেখে, বুঝেও কি একথা মেনে নিবেনা যে, সকল কিছুই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ও শক্তিমত্তার অধীন, জীবন-মৃত্যু, দিবারাত্রির আবর্তন সব। একথাও কেনো স্বীকার করবে না যে, যিনি একবার জীবন দিতে সক্ষম, তিনি তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করতেও সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

সূরা মু'মিনুন ঃ আয়াত ৮১, ৮২, ৮৩

بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ○ قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ○ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

❑ এতদ্‌সত্ত্বেও উহারা বলে উহাদিগের পূর্ববর্তীগণের মত,

❑ উহারা বলে, 'আমাদিগের মৃত্যু ঘটিলে ও আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হইব?'

❑ 'আমাদিগকে তো এই বিষয়েই ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং অতীতে আমাদিগের পূর্বপুরুষগণকেও। ইহা তো সে কালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে।'

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— এতদসত্ত্বেও মক্কার মুশরিকেরা তাদের পূর্ববর্তীযুগের মুশরিকদের মতো একইভাবে বলে, আমাদের মৃত্যু ঘটলে ও আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো?

এখানকার প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায়— এমন কখনোই হতে পারে না যে, আমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবো।

এরপরের আয়াতের মর্মার্থ— আমাদেরকে যেভাবে এখন পুনরুত্থানের কথা শোনানো হচ্ছে, তেমনি শোনানো হতো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও। আসলে পুনরুত্থান, হিসাব নিকাশ এগুলো কিছুই নয়, কল্প-কথা মাত্র।

'আসাত্বীর' অর্থ উপকথা বা মিথ্যা কথা। 'সাত্বর' অর্থ সারি—গ্রন্থের, বৃক্ষের, মানুষের। এখানে প্রথমোক্ত অর্থই উদ্দেশ্য। 'সাত্বরা ফুলানুন' অর্থ অমুক ব্যক্তি লিখেছে। 'সাত্বরে'র বহুবচন 'আসত্বার' 'সুতুর'। আর 'আসাত্বীর' হচ্ছে আসত্বা'র এর বহুবচন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমাদেরকে প্রদত্ত পুনরুত্থানের এই সংবাদ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি। এ হচ্ছে কিংবদন্তী, উপকথা, কল্পকাহিনী যা যুগ যুগ ধরে জনশ্রুতিতে প্রবহমান।

www.eelm.weebly.com

মুবাররাদ বলেছেন, আসাত্বীর হচ্ছে 'আসতুরাহ' এর বহুবচন, যেমন বহুবচন 'আরাজীহ' 'আরজুহাহ' এর 'আহাদীস' 'আহদুসাহ' এর, 'আআজীব' 'আ'জুবাহ্' এর এবং 'আজাহীক' 'আজহুকাহ্' এর। নিছক চিত্তবিনোদনের জন্য লিপিবদ্ধ ও উচ্চার্য ভিত্তিহীন কাহিনীকে বলে আসাত্বীর। তাই শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ মিথ্যা কথন।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ
كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ
لِلّٰهِ ۚ قُلْ فَأَنّٰى تُسْحَرُونَ ۝ بَلْ أَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ۝

❒ জিজ্ঞাসা কর, 'যদি তোমরা জান তবে বল, এই পৃথিবী এবং ইহাতে যাহারা আছে তাহারা কাহার?'

❒ উহারা বলিবে,'আল্লাহের।' বল, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?'

❒ জিজ্ঞাসা কর, 'কে সপ্তাকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি?'

❒ উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?'

❒ জিজ্ঞাসা কর, 'যদি তোমরা জান, তবে আমাকে বল, সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব কাহার হাতে, যিনি রক্ষা করেন এবং যাহার উপর রক্ষক নাই?'

❒ উহারা বলিবে, 'আল্লাহের।' বল, 'তবুও তোমরা কেমন করিয়া বিভ্রান্ত হইতেছ?

❒ আমি তো উহাদিগের নিকট সত্য পৌছাইয়াছি; কিন্তু উহারা তো মিথ্যাবাদী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা জানো, তবে বলো, এই পৃথিবী এবং এতে যারা আছে তারা কার?' এখানে 'যদি তোমরা জানো' কথাটির অর্থ— নিশ্চয় তোমরা জানো। অর্থাৎ আল্লাহ্ই যে সকল কিছুর একক সৃজয়িতা সে কথা না মেনে কারো উপায়ই যে নেই। এই বিষয়টির অস্বীকৃতি অসম্ভব।

www.eelm.weebly.com

এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তোমরা একথা ভালো করে জানো যে, আল্লাহ্ই পৃথিবীবাসীদেরকে ও আকাশ-পৃথিবীর সকল কিছুকে সৃষ্টি করেছেন, তবে তোমরা একথা মানতে চাওনা কেনো যে, তিনি পুনরায় তোমাদেরকে সৃষ্টি করতে পূর্ণরূপে সক্ষম? তিনি এরকম করবেনও। নিশ্চিত করবেন সকলের যথাপুরস্কার ও যথাতিরস্কার। দ্বিতীয় বারের সৃষ্টি নিশ্চয় প্রথম বারের সৃষ্টি অপেক্ষা সহজ।

পরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, আল্লাহ্র। বলো, তবু কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! 'এই পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে, তারা কার' আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে যখন তারা বলবে, আল্লাহ্র, তখন আপনি তাদেরকে বলুন, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ের (৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! তাদেরকে পুনঃ জিজ্ঞেস করুন, সপ্ত আকাশ এবং মহাআরশের মহাঅধিপতি কে? তারা বলবে, আল্লাহ্। আপনি বলুন, এরপরেও কি তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে অনবধান থাকবে? আঁকড়ে ধরে থাকবে অংশীবাদিতাকে? আপনি তাদেরকে আবারো জিজ্ঞেস করুন, যদি তোমরা জানো তবে আমাকে বলো, সামগ্রিক ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি সকলের এবং সকল কিছুর সুরক্ষা নিশ্চিত করেন এবং যিনি ভিন্ন অন্য কোনো রক্ষক নেই? তারা বলবে, আল্লাহ্র। আপনি তখন বলুন, তবুও তোমরা কী কারণে বিভ্রান্তিকে আঁকড়ে ধরে রয়েছো? কীভাবে অস্বীকার করে চলেছো পুনরুত্থানকে।

এখানে 'মালাকুত' অর্থ রাজকীয় কর্তৃত্ব, সম্মান, প্রাধান্য, বিজয়। শব্দটির সঙ্গে 'ওয়াও' ও 'তা' অক্ষরদুটি সংযোজিত হয়েছে মুবালাগার (আধিক্যের) জন্য। সুতরাং শব্দটির অর্থ— এমন চূড়ান্ত বিজয়, যা অননুমাননীয়। সেকারণেই শব্দটি ব্যবহৃত হয় কেবল আল্লাহ্র কর্তৃত্ব ও শক্তিমত্তা জ্ঞাপনার্থে। কেউ কেউ বলেছেন, 'মালাকুত' অর্থ অসীম ভাণ্ডার।

'ইউজ্বীরু' অর্থ রক্ষা করেন, হেফাজত করেন সকল অনিষ্ট থেকে, আশ্রয় দান করেন যাকে খুশী তাকে। 'ওয়ালা ইউজ্বারু আ'লাইহি' অর্থ আল্লাহ্ যাকে আশ্রয় দিবেন না, কেউ আশ্রয় দিতে পারবেও না তাকে। সুতরাং তিনি যাকে আশ্রয় দেন, তাকে কেউ আশ্রয়চ্যুত করতে পারে না এবং যাকে করেন আশ্রয়হারা, তাকেও কেউ দিতে পারে না কোনো আশ্রয়।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৯০) বলা হয়েছে— 'আমি তো তাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছি, কিন্তু তারা তো মিথ্যাবাদী'। এখানে 'আলহাক্ব' (সত্য) অর্থ তওহীদ ও কিয়ামতের সংবাদ। আর এখানে 'তারা তো মিথ্যাবাদী'। অর্থ— তারা তো আল্লাহ্‌র এককত্বের বিশ্বাস প্রত্যাখ্যানকারী এবং মহাপ্রলয়ের সংবাদ অমান্যকারী।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৯১, ৯২

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

❐ আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং তাহার সহিত অপর কোন ইলাহ্ নাই; যদি থাকিত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ নিজ নিজ সৃষ্টি লইয়া পৃথক হইয়া পড়িত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে চাহিত। উহারা যাহা বলে তাহা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র।

❐ তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ কোনো সন্তান গ্রহণ করেন না, কারণ তিনি সন্তান গ্রহণকারীদের সমতুল নন। তিনি সকল সাদৃশ্য ও আনুরূপ্য থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। আর তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলীর মধ্যেও কারো কোনো প্রকার অংশ নেই। এরকম অংশ যদি কারো থাকতো, তবে ওই অংশীদারেরা আপনাপন অংশ নিয়ে পৃথক হয়ে পড়তো। কূটকৌশল ও যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে তারা তখন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হতো একে অপরের উপর। ফলে মহানিসর্গের নিয়ম ও শৃঙ্খলা হয়ে পড়তো বিপর্যস্ত। তাই একাধিক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অসম্ভব। সুতরাং 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেন'— অংশীবাদীদের এমতো উক্তি সর্বৈবরূপে মিথ্যা। এরকম ধারণা, কল্পনা ও বক্তব্য থেকে তিনি চিরমুক্ত, চিরপবিত্র।

পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— ' তিনি তো দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তারা যাকে শরীক করে, তিনি তার ঊর্ধ্বে'। আল্লাহ্‌র অংশীবিহীনতার দ্বিতীয় প্রমাণ বিবৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। উল্লেখ্য, গুণী ব্যক্তির গুণ হতে পারে কোনো নির্দেশের বিশেষ কারণ। যেমন— তোমার পুরনো বন্ধু জায়েদের সঙ্গে

www.eelm.weebly.com

সদাচরণ করো। এখানে পুরাতন বন্ধুত্বই হয়েছে সদাচরণের নির্দেশ প্রদানের কারণ। তেমনি আল্লাহ্‌র কোনো শরীক না থাকার একটি প্রমাণ বা কারণ এই যে, তিনি সর্বজ্ঞ— দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। অন্য কেউই এরকম নয়। হতে পারে না।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّىْ مَا يُوْعَدُوْنَ ۝ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ۝ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ۝

❒ বল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে তুমি যদি তাহা আমাকে দেখাইতে চাও,

❒ 'তবে হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিও না।'

❒ আমি তাহাদিগকে যে-বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করিতেছি আমি তাহা তোমাকে দেখাইতে অবশ্যই সক্ষম।

❒ মন্দের মোকাবেলা কর উত্তম দ্বারা উহারা যাহা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি আমার নিকট প্রার্থনা করুন এভাবেঃ হে আমার প্রভুপালনকর্তা। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখানো হচ্ছে, সে শাস্তি যদি তুমি অবতীর্ণ করতেই চাও, তবে তুমি আমাকে সীমালংঘনকারীদের কাছ থেকে পৃথক করে রেখো।

পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে যে বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করছি, তা আমি তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যে শাস্তির ভয় আমি দেখিয়েছি, তা আমি অবশ্যই আপনাকে দেখাতে পারি। কিন্তু আপনি যে তাদের মধ্যে বিদ্যমান। আবার আপনার কারণে তাদের কেউ কেউ তো ইসলামও গ্রহণ করেছে, ঘটে চলেছে তাদের বংশবিস্তারও।

উল্লেখ্য, মক্কার মুশরিকেরা বার বার কিয়ামত ও আযাবকে অস্বীকার করে যাচ্ছিলো। বার বার বলে যাচ্ছিলো, কথিত আযাব এখনই অবতীর্ণ হচ্ছে না কেনো? তাদের এমতো ত্বরাপ্রবণতাকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'মন্দের মোকাবেলা করো উত্তম দ্বারা'। এখানে 'উত্তম দ্বারা' অর্থ উত্তম আচরণ দ্বারা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ঔদার্য ও কল্যাণকামনা দ্বারা। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াত রহিত হয়েছে জেহাদের আয়াতসমূহ দ্বারা। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'উত্তম' অর্থ কালেমায়ে তওহীদ এবং 'মন্দ' অর্থ কালেমায়ে শিরিক। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'মন্দ' অর্থ পাপ এবং 'উত্তম' অর্থ মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্যাকে বেঁচে থাকতে বলা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আমি জানি আপনাকে নিরন্তর সহ্য করতে হয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অসঙ্গত ও অসুন্দর বাক্যবান, অপআচরণ। এজন্য তাৎক্ষণিক শাস্তিও আমি অবতীর্ণ করতে পারি। সুতরাং আপনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদের জন্য শাস্তি কামনা করবেন না। আপনি যে আমার পক্ষ থেকে প্রেরিত মহাকল্যাণের রসুল। আপনি বরং ধৈর্যধারণ করুন। উত্তম আচরণ দ্বারা প্রতিহত করুন তাদের অযৌক্তিকতাকে। তাদের বোধোদয়ের জন্য কিছুকাল তাদেরকে প্রদান করুন অবকাশ। শাস্তির জন্য নির্ধারিত সময় তো রয়েছেই। যথাসময়ে তাদের উপর আমি অবশ্যই অবাধ্যতার শাস্তি আপতিত করবো।

সূরা মু'মিনূন : আয়াত ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ۝ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن
يَحْضُرُونِ ۝ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۝ لَعَلِّي
أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم
بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

❒ বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হইতে'

❒ 'হে আমার প্রতিপালক। আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি উহাদিগের উপস্থিতি হইতে',

❒ যখন উহাদিগের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক'! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ কর,

www.eelm.weebly.com

❒ যাহাতে আমি সৎকর্ম করিতে পারি যাহা আমি পূর্বে করি নাই।' না, ইহা হইবার নয়। এতো উহার একটি উক্তি মাত্র। উহাদিগের সম্মুখে যবনিকা থাকিবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা থেকে'। এখানে 'হামাযাতিশ্ শাইয়াত্বীন' অর্থ শয়তানের কঠিন কুপ্ররোচনা।

পরের আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি তাদের উপস্থিতি থেকে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমি আমার নামাজে ও অন্যান্য ইবাদতে কঠিন কুপ্ররোচনা প্রেরণকারী ওই সকল শয়তানের উপস্থিতি থেকে তোমার নিকটে আশ্রয় যাচনা করি। কারণ তারা বিশ্বাসীগণের নিকটে উপস্থিত হয় কেবল কুপ্ররোচনা প্রেরণের উদ্দেশ্যেই।

এরপরের আয়াতে (৯৯) বলা হয়েছে— 'যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করো'। এখানকার 'হাত্তা' হচ্ছে 'হাত্তা ইবতেদাইয়া' (সূচনা মূলক অব্যয়) । এর সম্পর্ক রয়েছে ৯৬ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'তারা যা বলে সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত' কথাটির সঙ্গে, অথবা ৯০ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'কিন্তু তারা তো মিথ্যাবাদী' কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কারো মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলে তার জন্য জান্নাত ও জাহান্নামের নির্ধারিত অংশ তাকে দেখানো হয়। বলা হয়, তুমি যদি বিশ্বাসী হতে তবে তোমার জন্য নির্ধারণ করা হতো জান্নাতের ওই স্থানটি, কিন্তু তুমি তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, তাই এখন তোমাকে প্রেরণ করা হবে তোমার জন্য নির্ধারিত জাহান্নামে। ওই সময় সে বলে, হে আমার প্রভুপালক! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও।

এখানে 'ইর্জ্বিউ'নী (আমাকে প্রেরণ করো) বলে সম্বোধন করা হয়েছে আল্লাহ্‌কে। কিন্তু সম্বোধনটি বহুবচনবোধক। উল্লেখ্য, আল্লাহ্ এক হলেও কেবল সম্মান প্রদানার্থেই করা হয়েছে এরকম বহুবচনের ব্যবহার । কেউ কেউ বলেছেন, এটা হচ্ছে ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি। বহুবচনবোধকতার ব্যবহার এসেছে এখানে একারণেই। এর প্রকৃত রূপ ছিলো 'ইরজিঊ'ন'। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে 'প্রতিপালক' (রব) বলে বুঝানো হয়েছে প্রাণহরণকারী ফেরেশতাগণকে। কেননা মৃত্যুপথযাত্রী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সরাসরি প্রার্থনা জানায় তাদের নিকটেই। বলে, আমাদেরকে পুনরায় ফিরে যেতে দাও।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১০০) বলা হয়েছে— 'যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি'। এখানে ফীমা তারাক্তু (যা আমি পূর্বে করিনি) কথাটির অর্থ যে ইমান আমি পূর্বে গ্রহণ করিনি। অর্থাৎ যে ইমানকে আমি পরিত্যাগ করেছিলাম। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যে বিশ্বাসকে আমি ইতোপূর্বে পরিত্যাগ করেছিলাম, সেই বিশ্বাসকে গ্রহণ করে নির্দেশিত সৎকর্ম সম্পাদনার্থে আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে দাও। অথবা— যে সম্পদ আমি পৃথিবীতে ছেড়ে এসেছি সেই সম্পদ পুণ্যকর্মে ব্যয় করনার্থে আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে চলে যেতে দাও।

ইবনে জুরাইজ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতা ইমানদারের নিকট আবির্ভূত হলে বলে, তোমাকে কি দুনিয়াতেই ফিরিয়ে দিবো? ইমানদার বলে, আবার কি সেই চিন্তা-ভাবনাসঙ্কুল আবাসের দিকে? আমি তো যেতে চাই আল্লাহ্র দিকে। আর এমতো প্রশ্নের সম্মুখীন হলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করো।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে মিলনকে প্রিয় মনে করে, আল্লাহ্ও তার সঙ্গে মিলনকে প্রিয় মনে করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে সম্মিলনকে অপ্রিয় মনে করে, আল্লাহ্ও তার সঙ্গে মিলনকে অপ্রিয় মনে করেন। জননী আয়েশা অথবা অন্য কোনো উম্মত জননী একবার নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা কেউই তো মৃত্যুকে প্রিয় মনে করি না। তিনি স. বললেন, না, এরকম নয়। প্রকৃত পরিস্থিতি এরকম— মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলে বিশ্বাসীদেরকে প্রদান করা হয় আল্লাহ্র পরিতোষ ও মর্যাদাদানের সুসংবাদ। তখন পিছনের কোনো কিছুই আর তার কাছে প্রিয় মনে হয় না। তারা তখন হয়ে ওঠে আল্লাহ্র সন্দর্শনাকাংক্ষী। আর অবিশ্বাসীদের মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তাদেরকে দেয়া হয় আল্লাহ্র অপরিতোষ ও শাস্তির বার্তা। তারা তখন আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎকে সর্বাপেক্ষা অধিক অপ্রিয় মনে করে এবং আল্লাহ্ও তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকে অপ্রিয় মনে করেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'না, তা হবার নয়'। একথার অর্থ— মৃত্যুর ফেরেশতা তখন বলে, না, এখন পৃথিবীতে প্রত্যাগমন আর কিছুতেই সম্ভব নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতো তার একটি উক্তি মাত্র'। এখানে 'কালিমাহ্' অর্থ উক্তি— পূর্ণাঙ্গ অথবা আংশিক। ব্যাকরণের পরিভাষায় কথাটির অর্থ একটি শব্দসম্বলিত বাক্য বা উক্তি। কিন্তু আরববাসীগণের পরিভাষায় কথাটির অর্থ পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের সম্মুখে যবনিকা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত'। একথার অর্থ— তাদের সামনে রয়েছে বরজখ। মুজাহিদ বলেছেন, ওই সকল লোকের প্রত্যাগমনের মধ্যে রয়েছে পর্দা বা প্রতিবন্ধক। কাতাদা বলেছেন, এখানে 'বারযাখুন্' অর্থ পৃথিবীর অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল। কেননা অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনন্তজীবনের দিকে যাত্রা করা যায় না। জুহাক বলেছেন, 'বারযাখ্' অর্থ মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়। কেউ কেউ বলেছেন,'বারযাখ' উদ্দেশ্য কবর।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ১০১

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

❒ এবং যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকিবে না, এবং একে অপরের খোঁজ-খবর লইবে না,

---

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে শিংগায় প্রথম ফুৎকারের কথা। অর্থাৎ যে ফুৎকার দিলে সকলে বেহুঁশ হয়ে যাবে, সেই ফুৎকারের কথা। তখন আকাশ পৃথিবীর সকল কিছু হয়ে যাবে নিশ্চেতন। তাই কেউ কারো আত্মীয়স্বজন বা প্রিয়জনের খোঁজখবর রাখতে পারবে না। দীর্ঘকাল এভাবে থাকার পর ধ্বনিত হবে শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকার। তখন সবাই নিজ নিজ স্থানে উঠে দাঁড়াবে এবং বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে চেয়ে থাকবে। বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে শুরু করবে বাক্যালাপ।

কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় ফুৎকারের কথা। তখন সকলে পুনরুত্থিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে নিজ নিজ স্থানে। হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, পুনরুত্থান দিবসে সকল মানব-মানবীকে হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে একে অপরের সম্মুখে। এক ঘোষক বলবে, এ হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুক, সে যদি কারো হক নষ্ট করে থাকে তবে সে যেনো প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তার কাছে চলে আসে। ওই সময় যে লোক তার পিতা, পুত্র, স্ত্রী অথবা ভাইয়ের নিকট কোনো হকের পাওনাদার হয়, তবে সে আনন্দিত হবে। যথাবিনিময়ও আদায় করে নিবে। একথা বলে হজরত ইবনে মাসউদ পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'ফুৎকার' অর্থ শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকার।

www.eelm.weebly.com

'যেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না' কথাটির অর্থ— সেদিন কেউ বংশমর্যাদার কারণে অহংকার প্রদর্শন করতে পারবে না। কারণ বংশীয় বন্ধনের কোনো মূল্য তখন থাকবে না । অথবা কথাটির অর্থ হবে— সেদিন আত্মীয়েরা একে অপরের কোনো উপকার করতে পারবে না। আপন পরিণতি-চিন্তায় তখন সকলে এতো ব্যতিব্যস্ত ও ভীত থাকবে যে, কারো প্রতি কেউ কোনো ভালোবাসা খুঁজে পাবে না। দূর হয়ে যাবে পারস্পরিক সম্প্রীতি। পরিস্থিতিগত ভয়াবহতা এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যে, লোকেরা পালাতে থাকবে তাদের পিতা-মাতা-ভ্রাতা-স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে।

এখানে 'বাইনাহুম' এর 'হুম' সর্বনাম সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের স্থলাভিষিক্ত, যাদের আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে করা হয়েছে। বিশ্বাসীদের অবস্থা হবে তখন অন্যরকম। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আলহাক্বনা বিহিম জুররিয়্যাতাহুম' (আমি তাদের সঙ্গে তাদের সন্তানদের সাক্ষাৎ করিয়ে দিবো)। রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে পুত্রসন্তানেরা দাঁড়িয়ে থাকবে হাউজে কাউসার ও বেহেশতের নহরের নিকটে। তাদের হস্তধৃত পাত্রে থাকবে পবিত্র পানীয়। কেউ ওই পানীয় পান করতে চাইলে তারা বলবে, না, আমি এই পানীয় পান করাবো আমার মাতা-পিতাকে। এমনকি গর্ভপাত হয়ে যাওয়া সন্তানও সেদিন জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে বলবে, আমার মাতা-পিতা জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আমরাও প্রবেশ করবো না। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে ইবনে আবিদ্ দুনইয়া হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু জর থেকেও।

একটি সন্দেহ ঃ বিশুদ্ধসূত্রে ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সেদিন আমার বংশীয় ও নিকটজনদের সম্পর্ক ছাড়া অন্য সকলের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। এ সন্দেহের জবাব কী?

জবাবঃ রসুল স. হচ্ছেন সকল বিশ্বাসীর পিতা। এভাবে বিশ্বাসীরা রসুল স. এর আত্মার আত্মীয়। আর তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণ হচ্ছেন বিশ্বাসীগণের মাতা। আত্মার আত্মীয়তার এই সম্পর্কটিই সেদিন থাকবে অবিচ্ছিন্ন।

বাগবী লিখেছেন, এক হাদিসে এসেছে, মহাবিচারের দিবসে কারো বংশ অথবা অন্য কোনো মাধ্যম উপকারপ্রদায়ক হবে না, কেবল রসুল স. এর বংশ ও মাধ্যম ছাড়া। অর্থাৎ কোরআন ও ইমান ছাড়া।

'একে অপরের খোঁজখবর নিবে না'। কথাটির অর্থ— সেদিন কেউ কারো বংশপরিচয়ের কথা জানতে চাইবে না, যেমন পৃথিবীবাসীরা বলে, তুমি কোন গোত্রের, কোন বংশের?

www.eelm.weebly.com

একটি সন্দেহঃ এক আয়াতে এসেছে— 'ওয়া আক্ববালা বা'দুহুম আ'লা বা'দিন ইয়াতাসাআলুন'। এতে করে বুঝা যায় সেদিন মানুষ একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

সন্দেহের জবাবঃ হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহাপ্রলয়কালে কেউ কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে পারবে না। কারণ তখন সকলে থাকবে অচৈতন্য অবস্থায়। চেতনা ফিরে পাবে পুনরুত্থানের পর। তখন তারা শুরু করবে পারস্পরিক বাক্যালাপ।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ১০২

فَمَنۡ ثَقُلَتۡ مَوَازِيۡنُهٗ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ○

❑ এবং যাহাদিগের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই হইবে সফলকাম।

'মাওয়াযীনু' অর্থ পাল্লা। এর একবচন হচ্ছে 'মাওযুনুন'। এখানে 'পাল্লা ভারী হবে' অর্থ পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে। অর্থাৎ পাপের তুলনায় পুণ্যের ওজন হবে বেশী। অথবা 'মাওয়াযীনু' এর এক বচন হচ্ছে মীযান। মীযান অর্থ হিসাবের পাল্লা। এভাবে 'পাল্লা ভারী হবে' কথাটির অর্থ হবে— হিসাব গ্রহণ কালে যার নেকীর পাল্লা ঝুঁকে পড়বে। এখানে একবচন 'মীযান' উল্লেখ না করে এর বহুবচনবোধক শব্দরূপের ব্যবহার করা হয়েছে একারণে যে, সেদিন সকলের হিসাব গ্রহণ করা হবে পৃথকভাবে পৃথক পৃথক পাল্লার মাধ্যমে। অথবা এখানে 'মাওয়াযীনু' হচ্ছে মীযানের সংখ্যাগত সমষ্টি।

'মুফলিহুন' অর্থ সফলকাম। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেমগণ এবিষয়ে একমত যে, মহাবিচারের দিবসে' মীযানের মাধ্যমে ওজন করা হবে সকলের পাপ-পুণ্য, এব্যাপারে সন্দেহ মাত্র নেই। কিন্তু খারেজী, মুতাজিলা ও শিয়া সম্প্রদায় একে অস্বীকার করে থাকে। অন্যান্য বেদাতীরাও মীযান ও ওজনে বিশ্বাস করে না।

বায়হাকী তাঁর আলবা'ছ গ্রন্থে হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে হাদিসে জিবরাইল নামে যে প্রখ্যাত হাদিস বর্ণনা করেছেন, সেই হাদিসে বলা হয়েছে, হজরত জিবরাইল রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, হে মোহাম্মদ! ইমান কী? তিনি স. বললেন, এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসস্থাপন, আরো বিশ্বাসস্থাপন ফেরেশতাবৃন্দ, বার্তাবাহকবর্গ, জান্নাত-জাহান্নাম, পুনরুত্থান ও মীযানের প্রতি। একথার উপরেও বিশ্বাস স্থাপন যে, সকল ভালো ও মন্দ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত। হজরত

www.eelm.weebly.com

জিবরাইল বললেন, আমি যদি এগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করি, তবে কি আমি বিশ্বাসী বলে গণ্য হবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। হজরত জিবরাইল বললেন, আপনি সত্য বলেছেন।

হজরত সালমান থেকে মুসলিম সূত্রে হাকেম কর্তৃক বর্ণিত ও বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, মহাবিচারের দিবসে মীযান স্থাপন করা হবে। আর ওই মীযান এতো বড় হবে যে, আকাশ ও পৃথিবী তাতে সংকুলান হবে। ইবনে মুবারক তাঁর 'আজ্‌জুহুদ' গ্রন্থে এবং আজরী তাঁর 'আশ্‌শরিয়ত' গ্রন্থে পরিণতসূত্রে এবং ইবনে হাব্বান তাঁর তাফসীর গ্রন্থে যথাক্রমে হজরত সালমান এবং হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন, মীযানের হবে একটি দণ্ড ও দুইটি পাল্লা। ইবনে আবিদ্‌ দুনইয়া ও ইবনে জারীর তাঁদের আপনাপন তাফসীরে বর্ণনা করেছেন, মহাবিচার দিবসে মীযানের পরিচালক হবেন হজরত জিবরাইল। উল্লেখ্য, মীযানের বিষয়টি সুবিদিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে সুপ্রমাণিত।

আনুসাঙ্গিক আলোচনা : পাপ-পুণ্যের ওজন কীরূপে হবে, সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন প্রকার বক্তব্য প্রদান করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, বান্দাকে তার আমলসহ মীযানে ওঠানো হবে। বিশ্বাসীগণের ওজন হবে তাঁদের পুণ্যানুসারে। আর অবিশ্বাসীদের কোনো ওজনই হবে না।

রসুল স. বলেছেন, বিচার দিবসে উপস্থিত করা হবে মোটা-তাজা কিছু লোক। কিন্তু তাদের ওজন হবে ক্ষুদ্র পতঙ্গের পক্ষসদৃশ। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন— 'ফালা নুক্বিমু লাহুম ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ওয়ায্‌নান'। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক হাদিসে একথা এসেছে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, যে সকল লোকের ওজন হাল্‌কা হবে তারা হবে কাফের। পাপী মুমিনদের ওজন কিন্তু হালকা হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, পাল্লায় ওঠানো হবে পাপ-পুণ্যের আমলনামা। হজরত ইবনে ওমর থেকে তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, বিচারকালে আমার এক উম্মতকে সকলের সম্মুখে আনা হবে। নিরানব্বইটি দপ্তর খোলা হবে তার। প্রত্যেকটি দপ্তরের দৈর্ঘ্য হবে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। আল্লাহ্‌ বলবেন, এগুলোর কোনো একটিকেও কি তুমি অস্বীকার করতে চাও? আমার আমল লেখক ফেরেশতারা কি তোমার উপরে জুলুম করেছে? সে বলবে, না। আল্লাহ্‌ বলবেন, কেনো নয়? তোমার তো একটি অলিখিত পুণ্য আমার কাছে জমা রয়েছে। আজ শেষ হিসাবের দিন। সুতরাং তোমার অধিকার খর্ব করা হবে না।

www.eelm.weebly.com

এরপর তার সম্মুখে মেলে ধরা হবে একটি কাগজের টুকরা। সে দেখবে, সেখানে লেখা রয়েছে— আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশআদু আন্না মোহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রসুলুহু। সে নিবেদন করবে, হে আমার প্রভুপালক! আমার এই বিশাল বিশাল দপ্তরের উপস্থিতিতে এই ছোট কাগজের টুকরা উপস্থিত করার রহস্য কী? আল্লাহ্ বলবেন, তোমার প্রতি আজ অবিচার করা হবে না। এরপর সকল দপ্তর এক পাল্লায় রেখে কাগজের টুকরাটি রাখা হবে অপর পাল্লায়। দেখা যাবে, কাগজের টুকরা সম্বলিত পাল্লাটিই অধিক ভারী। আল্লাহ্র নাম অপেক্ষা অন্য কোনো কিছু কি অধিক ভারী ও ওজনদার হয়? হজরত ইবনে ওমর থেকে উত্তম ও বিশুদ্ধসূত্রে আহমদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আমলসমূহকে অবয়ববিশিষ্ট করে পাল্লায় উত্তোলন করা হবে। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, আমার জীবনাধিকারী ওই পবিত্র সত্তার শপথ! আকাশ-পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টিকে মীযানের এক পাল্লায় রেখে দিয়ে অপর পাল্লায় যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্যকে উত্তোলন করা হয়, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র পাল্লাই অধিক ভারী হবে। তিবরানী।

ইবনে আব্দুর রাজ্জাক এলেমের ফযীলতের পরিচ্ছেদে স্বসূত্রে ইব্রাহিম নাখয়ীর উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন, পাপ-পুণ্য ওজনের দিন মানুষের আমল রাখা হবে এক পাল্লায়, অপর পাল্লায় রাখা হবে বালিকণা সদৃশ এক প্রকার বস্তু। দেখা যাবে ওই পাল্লাই অধিক ভারী হয়েছে। অতঃপর ওই লোককে বলা হবে তুমি কি জানো, বালিকণা সদৃশ বস্তুগুলো কী? সে বলবে, না, আমি জানি না। তখন তাকে বলা হবে, এ হচ্ছে এলেমের ফযীলত, যা তুমি মানুষকে শিক্ষা দিতে।

এলেমের ফযীলতের বর্ণনায় হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে ইমাম জাহাবী সূত্রে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমল ওজনের দিবসে ওজন করা হবে আলেমগণের এলেমের নূর ও শহীদগণের রক্ত। দেখা যাবে আলেমগণের পাল্লাই শহীদগণের রক্তাপেক্ষা অধিক ওজনদার।

আমি বলি, সেদিন বিশ্বাসীগণকে তাদের আমলনামাসহ অথবা তাদের আমলকে দেহবিশিষ্ট করে এক পাল্লায় রাখা হবে। অপর পাল্লায় রাখা হবে মন্দ আমলসহ অবিশ্বাসীদেরকে, তাদের আমলগুলোকেও তখন করা হবে দেহবিশিষ্ট। কিন্তু দেখা যাবে, তাদের আমলগুলো কীটপতঙ্গের পাখার মতোও নয়। এই প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে— 'ওয়ামান খফ্ফাত মাওয়ামীনুহু' (মীযানে তার কোনো ওজনই হবে না)। বিশ্বাসীগণের দাঁড়িপাল্লায় কিছু না কিছু ওজন করা হবেই,

www.eelm.weebly.com

কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'র সাক্ষ্যও যদি হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ হয়েছে— 'এবং যাদের পাল্লা ভারী হবে'। তবে ভারী হওয়ার বিষয়ে থাকবে শ্রেণীভেদ। যে বৃহৎ পাপ থেকে বেঁচে থাকবে এবং যার অন্যান্য পাপকে আল্লাহ্ দূর করে দিবেন, দাঁড়িপাল্লায় তার আমলের ওজন হবে সবচেয়ে বেশী, আর তার পাপের পাল্লা হবে শূন্য ও ওজনহীন। আর যাদের আমল হবে পাপপুণ্য সংমিশ্রিত, তাদের কেউ কেউ যাবে জান্নাতে এবং কেউ কেউ জাহান্নামে। এ প্রসঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পাপ পুণ্যের ওজন গ্রহণের সময় যদি কারো পাপের তুলনায় একটি পুণ্যও বেশী হয়, তবে সে-ও প্রবেশ করবে বেহেশতে এবং যার পুণ্যাপেক্ষা পাপ বেশী সে প্রবেশ করবে দোজখে। অর্থাৎ পাপ থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যেই তাকে তখন প্রবেশ করানো হবে দোজখের আগুনে, যেমন আগুনে পুড়ে পাকসাফ করা হয় লোহাকে। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, মীযানে ওজন করা হবে ছয় রতির চেয়েও কম পাপ-পুণ্যের। যাদের পাপ-পুণ্য সমান হবে, তারা হবে আরাফের অধিবাসী, এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেখানে বসবাসের পর আল্লাহ্র অভিপ্রায় ও নির্দেশানুসারে এক সময় তারা চলে যাবে বেহেশতে। ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তিতে অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। বলা হয়নি একারণে যে, অবিশ্বাসীদের কোনো পুণ্যই থাকবে না। আবার কোরআন মজীদে কেবল বলা হয়েছে পুণ্যবান বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের কথা। পাপী বিশ্বাসীগণের কোনো আলোচনা কোরআনে নেই। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার ওই যুগে সকল বিশ্বাসীগণই ছিলেন পুণ্যবান। তারা ছিলেন রসুল স. এর সম্মানিত সহচর। উল্লেখ্য, বৃহৎ পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারীও পাপহীনগণের মতো।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ১০৩, ১০৪

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ۝ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ۝

❒ এবং যাহাদিগের পাল্লা হাল্‌কা হইবে তাহারাই নিজদিগের ক্ষতি করিয়াছে; উহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে।

❒ অগ্নি উহাদিগের মুখমণ্ডল দগ্ধ করিবে এবং উহাদিগের মুখমণ্ডল হইবে বীভৎস;

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— এবং যাদের পুণ্যের পাল্লা শূন্য হবে, অথবা যারা হবে পুণ্যহীন তাদের আমলের কোনো ওজনই করা হবে না। তারাই হবে অবিশ্বাসী ও ক্ষতিগ্রস্ত। জাহান্নাম হবে তাদের স্থায়ী আবাস।

হজরত আনাস থেকে বাযযার ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আদম সন্তানদেরকে দাঁড় করানো হবে মীযানের দুই পাল্লার মাঝখানে। সেখানে নিয়োজিত করা হবে এক ফেরেশতাকে। যার পাল্লা হবে ভারী, সমগ্র সৃষ্টি শুনতে পায়, এমন আওয়াজে ওই ফেরেশতা তার সম্পর্কে বলবে, এই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান। সে আর কখনো দুর্ভাগা হবে না। আর যার পাল্লা হবে হালকা, তার সম্পর্কে সে বলবে, এই ব্যক্তি ভাগ্যহীন। সে আর কখনো সৌভাগ্যশালী হবে না। এই হাদিসে 'খফ্‌ফাত' শব্দটির উদ্দেশ্য— একেবারেই ওজন না হওয়া।

আমি বলি, সম্ভবত পাপী বিশ্বাসীদের আমলনামা ওজন করা হবে দু'বার। প্রথম ওজনে পুণ্যাপেক্ষা পাপ বেশী হওয়ার কারণে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে দোজখে। কিছুকাল শাস্তিভোগের পর যখন তাদের পাপক্ষয় হবে, তখন পুনরায় ওজন করা হবে তাদের আমলনামা। তখন দেখা যাবে তাদের পাপাপেক্ষা পুণ্যের পাল্লা ভারী। ঘোষক ফেরেশতা তখন উচ্চকণ্ঠে বলবে, এই ব্যক্তি সৌভাগ্যমণ্ডিত। আর কখনও সে সৌভাগ্যহীন হবে না। আমি সুরা ক্বরিয়া'য় এসম্পর্কে বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছি।

আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে কেবল কাফেরদের পরিণতির কথা। বলা হয়েছে, 'তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে'। এ কথার অর্থ পৃথিবীতে নিজেকে পুণ্যসমৃদ্ধ করার যে সুযোগ তারা পেয়েছিলো, সেই সুযোগ চিরতরে হারিয়ে ফেলেছে তারা।

পরের আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে— 'অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে'। একথার অর্থ— তখন তাদের মুখমণ্ডলে জ্বালিয়ে দেয়া হবে আগুন আর আগুন। কামুস গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। কিন্তু গোনাহ্‌গার মুমিনেরা কিছুকালের জন্য দোজখবাসী হলেও তাদের মুখমণ্ডলে আগুন জ্বালানো হবে না। হজরত জাবের থেকে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, এই উম্মতের কিছু লোক দোজখবাসী হবে সত্য, দোজখের আগুন তাদেরকে দগ্ধও করবে, কিন্তু তাদের মুখমণ্ডল থাকবে অগ্নিশূন্য। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনা হবে। জিয়া এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু দারদা বলেছেন, 'অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে' সম্পর্কে একবার রসুল স. কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, আগুনের একটি

www.eelm.weebly.com

লেলিহান শিখা তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। ফলে তাদের সারা শরীরের গলিত মাংস বয়ে পড়বে পদতলের গ্রন্থিসমূহে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিবরানী ও আবু নাঈম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন জাহান্নামীদেরকে যখন জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তাদেরকে স্পর্শ করবে আগ্নির একটি সুতীব্র শিখা। ফলে তাদের গোশত হবে অস্থিচ্যুত এবং তা ঝুলে পড়বে পায়ের টাখনু পর্যন্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের মুখমণ্ডল হবে বীভৎস'। কথাটির অর্থ— তখন তাদের অগ্নিদগ্ধ দুই ওষ্ঠ সরে যাবে স্বস্থান থেকে— উপরের ওষ্ঠ উপরের দিকে এবং নীচের ওষ্ঠ নিচের দিকে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. 'এবং তাদের মুখমণ্ডল হবে বীভৎস' এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আগুন তাদেরকে এমনভাবে দগ্ধিভূত করবে যে, উপরের ঠোঁট উঠে যাবে মস্তকের মধ্যখান পর্যন্ত এবং নিচের ঠোঁট গিয়ে ঠেকবে নাভিমূলে। হান্নাদ বর্ণনা করেছেন, মুখমণ্ডল বীভৎস হওয়া সম্পর্কে হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আগুনে পুড়ে তাদের দন্ত হবে বহির্গত ও ওষ্ঠ সংকুচিত।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۝ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۝

❒ তোমাদিগের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় নাই? তোমরা তো সে সব অস্বীকার করিয়াছিলে।

❒ উহারা বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়;

❒ 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! এই অগ্নি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, অতঃপর আমরা যদি পুনরায় সত্য প্রত্যাখ্যান করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হইব।'

❒ আল্লাহ্ বলিবেন, 'তোরা হীন অবস্থায় এই খানেই থাক্ এবং আমার সহিত কোন কথা বলিস্ না।'

---

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— তখন দগ্ধমান দোজখীদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলবেন, দেখো, কী নিদারুণ দুর্দশা আজ তোমাদের? তোমরা তো যথাসময়ে সতর্ক হতে পারতে। তোমাদেরকে সতর্ক করণার্থে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকটে আবৃত্তি করা হয়েছিলো। হয়নি? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! দুর্ভাগ্য আমাদের উপরে অনড়ভাবে চেপে বসেছিলো। তাইতো আজ আমাদের এই করুণ পরিণতি। এখন আমরা বুঝতে পারছি, সত্যি সত্যিই আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত। কিন্তু হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! এ অবিশ্রান্ত অগ্নিদহন যে অসহনীয়। আমরা পরিত্রাণার্থী। অতএব, আমাদেরকে উদ্ধার করো। পুনরায় প্রেরণ করো পৃথিবীতে। আমরা আর সত্যপ্রত্যাখ্যান করবো না। যদি করি, তবে তো আমরা অবশ্যই হবো সীমালংঘনকারী এবং চিরশাস্তির উপযুক্ত। আল্লাহ্ তখন বলবেন, না, পৃথিবীতে পুনঃপ্রেরণ আমার নিয়ম নয়। সুতরাং তোরা এখানেই অনন্ত কাল ধরে হীন অবস্থায় দগ্ধীভূত হতে থাক। হয়ে যা নির্বাক।

'ইখসাউ' অর্থ হীন অবস্থায় নির্বাক হয়ে যা। অর্থাৎ দূর হয়ে যা। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'খসাআল কালবা' অর্থ কুকুরকে তাড়িয়ে দিয়েছে। 'খসাআল কালবু' অর্থ কুকুর দূর হয়েছে। যেমন— 'ইনখসাআ' অর্থ দূর হয়েছে। কথাটি ইনফিয়াল রূপে লাজেমও হবে, আবার হবে মুতাআদ্দিও। আর 'খসাউন' এবং 'খুসুউন' হচ্ছে ধাতুমূল।

'ওয়ালা তুকাল্লিমুনী' অর্থ কথা বলিস্ না। অথবা আমার কাছে শাস্তি থেকে উদ্ধারের কথা আর বলিস্ না। এ শাস্তি অন্তহীন। এ ঘোষণার পর চিরহতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যাবে দোজখীরা।

হাসান বলেছেন, এটাই হবে চিরদোজখীদের সঙ্গে শেষ কথা। এরপর কেবল ভয় ও বাধ্যগত ধৈর্য অবলম্বনই হবে তাদের শেষ সম্বল। শুধু কুকুরের মতো অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে থাকবে তারা। নিজের অপরের কারো কথাই আর বুঝতে সক্ষম হবে না। কুরতুবী বলেছেন, যখন তাদেরকে বলা হবে 'আমার সঙ্গে আর কথা বলিস্ না' তখন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সকল আশাভরসা থেকে। নিমজ্জিত হবে নিঃসীম নিরাশায়। একে অপরের মুখোমুখি হয়ে কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে কেবল। আর চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হবে দোজখের উপরের সকল দরজা।

হান্নাদ, তিবরানী, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ তাঁর 'জাওয়াইদুল জুহুদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, দোজখবাসীরা দোজখের পরিচালক মালেক ফেরেশতাকে ডেকে বলবে, হে দোজখ-সংরক্ষকদের নেতা! তুমি তোমার

www.eelm.weebly.com

প্রভুপালককে ডেকে বলো, তিনি যেনো আমাদেরকে উদ্ধার করেন। মালেক চল্লিশ বছর নিশ্চুপ থাকার পর বলবে, এখানেই তোমাদেরকে থাকতে হবে চিরকাল। দোজখীরা তখন আল্লাহ্কে ডেকে বলবে, 'হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! এই অগ্নি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো, অতঃপর আমরা যদি পুনরায় সত্যপ্রত্যাখ্যান করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হবো'। আল্লাহ্ তাদের কথার কোনো জবাব দিবেন না। এভাবে কেটে যাবে পৃথিবী সৃষ্টি ও ধ্বংসের সময়ের দ্বিগুণ পরিমাণ সময়। তারপর আল্লাহ্ বলবেন, 'তোরা হীন অবস্থায় এখানে থাক্ এবং আমার সঙ্গে কোনো কথা বলিস্ না'। এর পর থেকে দোজখীরা হয়ে পড়বে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ। শ্বাস-প্রশ্বাসের গড়্গড় শব্দ ছাড়া আর কোনো কিছুই তাদের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হবে না।

সাঈদ ইবনে মনসুর এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেছেন, যেন অগ্নিবাসীরা আল্লাহ্কে ডাকতে থাকবে। চতুর্থ বার ডাকার পর আল্লাহ্ তাদের কথার জবাব দিবেন। পঞ্চমবারের পর তারা আর কথা বলতে পারবে না। প্রথম বার বলবে, 'হে আমাদের প্রভুপালক! তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু এবং দু'বার জীবন দান করেছো। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। এখন এখান থেকে বের হবার কোনো পথ কি আমাদের জন্য খোলা আছে?' আল্লাহ্ বলবেন, 'যখন তোমাদের এক আল্লাহ্র উপরে আস্থা আনয়ন করতে বলা হয়েছিল, তখন তোমরা সে আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে। আশ্রয় করেছিলে অংশীবাদিতাকে। তাই তো তোমাদের আজ এই করুণ পরিণতি। আজ সিদ্ধান্ত সেই আল্লাহ্র যিনি আনুরূপ্যহীনভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত। 'তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা সবকিছু দেখলাম, শুনলাম। এখন তুমি আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে দাও। আমরা এবার অবশ্যই তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবো ও পুণ্য কর্মে থাকবো সততসম্পৃক্ত'। আল্লাহ্ বলবেন, 'এই দিবসের আগমনে তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে, তাই আমিও আজ তোমাদের এই অগ্নি আযাব থেকে স্বেচ্ছাবিস্মৃত। এখন গ্রহণ করো তোমাদের মন্দ কর্মের নিদারুণ পরিণতির আস্বাদ। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালয়িতা! আমাদেরকে দান করো কিছুকালের অবকাশ। আমরা তোমার আহ্বানকে মান্য করবো, তোমার বচনবাহকের কথা মতো চলবো'। আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা কি আজকের এই দুর্দশার পূর্বে পৃথিবীর জীবনে এই মর্মে শপথ করো নি যে, আমরা দুর্ভাগ্যবিমুক্ত?' তারা বলবে, 'হে আমাদের মহাসৃজয়িতা! আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও, আমরা যেনো বিগত জীবনের আমল অপেক্ষা উত্তম আমল করতে পারি'। আল্লাহ্ বলবেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি, যা ছিলো সদুপদেশ গ্রহণের জন্য যথেষ্ট? আর তোমাদের নিকট কি কোনো ভীতিপ্রদর্শনকারী প্রেরিত হয়নি? এবার তবে গ্রহণ করো শাস্তির স্বাদ। আজ

www.eelm.weebly.com

সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই'। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা। দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিলো এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রভুপালয়িতা! এই অগ্নি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো, অতঃপর আমরা যদি পুনরায় সত্যপ্রত্যাখ্যান করি, তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হবো'। আল্লাহ্ বলবেন, 'তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক। এবং আমার সঙ্গে কোনো কথা বলিস্ না'। এরপর আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। ওই দগ্ধ ও বীভৎস মুখমণ্ডলে না থাকবে মুখ, না থাকবে নাসিকার কোনো চিহ্ন। থাকবে কেবল ভিতরে ভিতরে ধ্বনিত নিঃশ্বাসের ঘড় ঘড় শব্দ। আগুনের সর্প ও বৃশ্চিক পতিত হবে তাদের উপর। সেগুলো অহরহ দংশন করতে থাকবে তাদেরকে। ওই সাপগুলোর কোনো একটি যদি পৃথিবীর এক প্রান্তে নিঃশ্বাস ফেলে, তবে তার বিষের প্রতিক্রিয়ায় পুড়ে যাবে অপর প্রান্তের অধিবাসীরা। আর ওই বিচ্ছুগুলোর কোনো একটি দংশন করলে মরে যাবে পৃথিবীর লোকেরা। ওই সকল আগুনের সাপ-বিচ্ছুর দংশনে চির দোজখীদের শরীরের সকল গোশত ঝুলে পড়বে তাদের পায়ের কাছে। আর কণ্ঠদেশ থেকে অনবরত উত্থিত হতে থাকবে অরণ্যের পশুকুলের আওয়াজের মতো অর্থহীন আওয়াজ।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ১০৯, ১১০, ১১১

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ○ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ○ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ○

❒ আমার দাসদিগের মধ্যে একদল ছিল যাহারা বলিত, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি তো দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

❒ 'কিন্তু তাহাদিগকে লইয়া তোমরা হাসিঠাট্টা করিতে এতো মশ্গুল ছিলে যে, উহা তোমাদিগকে আমার কথা ভুলাইয়া দিয়াছিল। তোমরা তো তাহাদিগকে লইয়া হাসি-ঠাট্টাই করিতে'

❒ 'আমি আজ তাহাদিগকে তাহাদিগের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করিলাম যে, তাহারাই হইল সফলকাম।'

---

www.eelm.weebly.com

মুকাতিল বলেছেন, হজরত আম্মার, হজরত সুহাইব, হজরত সুলায়মান প্রমুখ দরিদ্র সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতত্রয়। মক্কার মুশরিকেরা তাঁদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতো। বিদ্রূপবানে জর্জরিত করতো।

আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আমার এই সকল দাস দরিদ্র হলেও আমার প্রিয়। তারা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী। কারণ তারা বিদ্রূপবানে জর্জরিত হয়েও বলে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তুমি আমাদের ক্ষমা করো ও দয়া করো, প্রদান করো আশ্রয়। তুমি তো দয়ালুগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু হে অংশীবাদীরা! তোমরা এদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টায় এতো বিভোর হয়ে যাও যে, আমার কথা তোমাদের মনেই থাকে না। হাসি-ঠাট্টা করাই যেনো তোমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। অথচ দেখো, আজ তারা তাদের ধৈর্যের কারণে পুরস্কৃত, সফলকাম।

'সিখরিয়্যান' অর্থ হাসি-ঠাট্টা। ক্বারী কুসাই ও ফারা বলেছেন, 'সিখরিয়্যা' এর 'সিন' অক্ষরটি হবে যের বা কাসরা যুক্ত। আর যদি 'সিন' পেশ যুক্ত হয়ে 'সুখরিয়্যান' হয় তবে তার অর্থ হবে কাউকে ক্রীতদাস বানিয়ে নেয়া, অপদস্থ করা। খলিল বলেছেন, শব্দ দু'টো সমার্থক। যেমন—'বাহ্রু লুজ্বিয়্যেন', 'বাহ্রু লিজ্বিয়্যেন'এবং 'কাওকাবুন দুররী' 'কাওকাবুন দিররী'। সুরা যুখরুফে উল্লেখিত 'সুখরিয়্যান' তাই হাসি-হাট্টা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ক্বারীগণ এব্যাপারে একমত। কামুস গ্রন্থেও এরকম বলা হয়েছে। গ্রন্থকার লিখেছেন, 'সাখিরুমিনহু' এবং 'সাখিরুবিহী' অর্থ তার সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছে। ঠাট্টা (সাখিরু) এখানে বিশেষ্য। আর শব্দটি পেশযুক্ত যেমন হয়, তেমনি হয় যের যুক্ত। যেমন— সাখরাতুন, সিখরিয়্যান ও সুখরিয়্যান। এর অর্থ— তাকে থামিয়ে দিয়েছে অথবা বাধ্য করেছে এমন কাজের জন্য, যা সে করতে চায় না। নেহায়া গ্রন্থেও এরকমই বলা হয়েছে।

প্রকৃত কথা হচ্ছে,'সিখরিয়ুন' ধাতুমূল। আর এখানে শব্দটি এসে মুবালাগার (আধিক্যের) জন্য। অতিরিক্ত হিসেবে সংযোজিত হয়েছে 'ইয়া'। আর এখানে 'তামাশা' (ইসতিহ্জাহ) উদ্দেশ্য। এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে। বলা হয়েছে 'ওই হাসি তামাশা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিলো'।

হাসি-ঠাট্টা বাচনিক বিদ্রূপের পরেই হয়ে থাকে। এখানে আল্লাহ্র স্মরণচ্যুত হওয়াকে বিশ্বাসীগণের সঙ্গে রূপক অর্থে যুক্ত করা হয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিলো তাদের স্মরণচ্যুত হওয়ার কারণ। ওই কারণকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এখানে তাই বলা হয়েছে, ওই হাসি-ঠাট্টাই তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিলো।

www.eelm.weebly.com

قَٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ○ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ ٱلْعَآدِّينَ ○ قَٰلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

❒ আল্লাহ্ বলিবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কয় বৎসর অবস্থান করিয়াছিলে?'

❒ উহারা বলিবে, 'আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ; আপনি না হয় গণনাকারীদিগকে জিজ্ঞাসা করুন।'

❒ তিনি বলিবেন, 'তোমরা অল্পকালই অবস্থান করিয়াছিলে, যদি তোমরা জানিতে।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে বলবেন, বলো, কতো বছর তোমরা ছিলে পৃথিবীতে ও মৃত্যুপরবর্তী কবরের জগতে?

পরের আয়াতে(১১৩)বলা হয়েছে—'তারা বলবে, আমরা অবস্থান করেছিলাম এক দিন অথবা দিনের কিছু অংশ'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন বলবে, আমরা সেখানে অবস্থান করেছিলাম এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ। উল্লেখ্য, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পশ্চাতের যাপিত জীবনকালকে মনে করবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এর বিভিন্ন কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে। যেমন— ১. দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হলে অতীতের সুখের সময়কে মনে হয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ২. বর্তমান ও ভবিষ্যতের তুলনায় অতীতকে মনে হয় অত্যন্ত অল্প। ৩. আখেরাতের অনন্ত জীবনের তুলনায় পৃথিবী ও কবরের জীবনকে কম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ৪. অতীত কেটেছে আনন্দ উল্লাসে, তাই আখেরাতের কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে এসে সে আনন্দ উল্লাসকে যৎকিঞ্চিত মনে হতেই তো পারে। শেষোক্ত কারণটিকে গ্রহণ করা হলে কেবল পৃথিবীর জীবনই হবে ধর্তব্য। কারণ কোরআন, হাদিস এবং উম্মতের ঐকমত্যানুসারে একথা সুপ্রমাণিত যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কবরের আযাব অবশম্ভাবী। তাদের পৃথিবীর জীবনই কেবল আনন্দ-উল্লাসমুখর।

এরপর বলা হয়েছে— 'আপনি না হয় গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করুন'। এ কথার অর্থ— হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের জবাব যদি সঠিক না হয়, তবে আপনি আপনার বিশ্বাসী বান্দাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। তাদের জবাবই হবে সঠিক জবাব। কারণ তারা আজ পুরস্কৃত ও আনন্দিত। আর আমরা

www.eelm.weebly.com

তিরস্কৃত, অপদস্থ ও শাস্তিযোগ্য। অথবা এখানে 'গণনাকারীগণ' বলে বুঝানো হয়েছে আমল লেখক ফেরেশতাগণকে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আপনি না হয় এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন আপনার পক্ষ থেকে নিয়োজিত আমাদের আমল লেখক ফেরেশতাদেরকে। আমাদের জীবনালেখ্য তাদের কাছেই সুসংরক্ষিত। সুতরাং তাদের জবাবই হবে সঠিক জবাব।

এরপরের আয়াতে (১১৪) বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তখন বলবেন, আখেরাতের অনন্তকালের শাস্তির তুলনায় পৃথিবীর জীবন যৎসামান্য। সুতরাং যৎসামান্য সময়ের জন্যই তোমরা অবস্থান করেছিলে পৃথিবীতে। তোমাদের জন্য আক্ষেপ! একথা যদি তোমরা তখন বুঝতে পারতে।

রসুল স. বলেছেন, হাতের আংগুল সমুদ্রে ডুবিয়ে আনার পর তাতে যেটুকু পানি লেগে থাকে সেই পানিটুকুকেই পৃথিবীর জীবনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে অসীম জলধিসম আখেরাতের অনন্ত জীবনের তুলনায়। মুসতাওয়ারাদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, ইবনে মাজা ও মুসলিম।

'যদি তোমরা জানতে' কথাটির মাধ্যমে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের মূল দোষ। যেনো বলা হয়েছে— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! তোমরা যদি তখন সত্যিসত্যি বুঝতে পারতে যে অতিশীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে পৃথিবীর জীবন, তবে তোমরা হাসি-ঠাট্টা, আরাম-আয়েশ ও প্রবৃত্তিপূজার মধ্য দিয়ে তোমাদের মূল্যবান জীবনকে নষ্ট হতে দিতে না। আজকের এই বিচার দিবসের কথাও বিস্মৃত হতে না। রসুল স. নির্দেশ করেছেন, দুনিয়ায় বসবাস করো মুসাফিরের মতো। হজরত ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী। তিরমিজি ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এ কথাটিও সংযুক্ত রয়েছে যে, 'নিজেকে কবরবাসীর মধ্যে গণ্য করে নাও'।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ○ فَتَعٰلَى
اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ○ وَمَنْ يَّدْعُ
مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَإِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۚ إِنَّهٗ
لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ○ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ○

www.eelm.weebly.com

❒ 'তোমরা কি মনে করিয়াছিলে যে আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না?'

❒ মহিমান্বিত আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; সম্মানিত আরশের তিনি অধিপতি।

❒ যে ব্যক্তি আল্লাহের সহিত ডাকে অন্য ইলাহ্কে, যাহার নিকট এ বিষয়ে কোন সনদ নাই; তাহার হিসাব তাহার প্রতিপালকের নিকট আছে; নিশ্চয়ই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সফলকাম হইবে না।

❒ বল, 'হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদিগের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

প্রথমোক্ত আয়াতে উত্থাপিত হয়েছে একটি হুমকি সহ অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (হামযায়ে ইনকারিয়া তাওবিখিয়া)। সুতরাং প্রশ্নের আকার উঠিয়ে দিলে এর মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! তোমরা যেরকম মনে করেছিলে সেরকম নয়। তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে অনর্থকরূপে এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না— এরকম কিছুতেই নয়। তোমরা ছিলে অজ্ঞ। তাই এ কথা তখন বুঝতে পারোনি যে, আল্লাহ্র পরিচয় অর্জন ও এক আল্লাহ্র ইবাদতে সমর্পিত প্রাণ হওয়াই ছিলো তোমাদের অস্তিত্বায়নের মূল উদ্দেশ্য। এখানে 'আ'বাসা' অর্থ অনর্থক, উদ্দেশ্যবিবর্জিত।

পরের আয়াতে (১১৬) বলা হয়েছে— 'মহিমান্বিত আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই'। এখানে 'আলমালিকুল হাক্ব' অর্থ প্রকৃত মহারাজাধিরাজ। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, প্রকৃত রাজা বা বাদশা কেবল আল্লাহ্। তিনিই সমগ্র সৃষ্টির একক অধিকর্তা। এভাবে বক্তব্যটির উদ্দেশ্য দাঁড়িয়েছে— তিনিই যেহেতু সমগ্র সৃষ্টির একক সৃজয়িতা ও অধিকর্তা, সেহেতু তাঁর এই সৃষ্টি অনর্থক নয়। আর তাঁর নিকটে জবাবদিহির জন্য প্রত্যাবর্তন করার বিষয়টিও প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'সম্মানিত আরশের তিনি অধিপতি'। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র মহামর্যাদার জ্যোতিচ্ছটা প্রতিনিয়ত পতিত হয় আল্লাহ্র আরশের উপরে। তাই এখানে আরশকে বিশেষ গুণে বিভূষিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'আ'রশিল কারীম' (সম্মানিত আরশ)।

এরপরের আয়াতে (১১৭) বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে ডাকে অন্য ইলাহ্কে, যার নিকট এ বিষয়ে কোনো সনদ নেই; তার হিসাব তার

www.eelm.weebly.com

প্রতিপালকের নিকটে আছে; নিশ্চয়ই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সফলকাম হবে না।' এখানে 'ডাকে' অর্থ ইবাদত করে। তওহীদের নির্দেশ হচ্ছে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না। এমন ধর্মাদর্শও গ্রহণ করা যাবে না, যা প্রত্যাদেশিত নয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যে ব্যক্তি প্রত্যাদেশিত প্রমাণ ব্যতিরেকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করে, মহাবিচারের দিবসে অবশ্যই তাকে এর জন্য কঠোর জবাবদিহি করতে হবে। চিরদিনের জন্য শাস্তিগ্রস্তও হতে হবে। অনন্তকালের জন্য বাস করতে হবে অগ্নিকুণ্ডে। সেখান থেকে বের হয়ে আসার কোনো প্রকার সুযোগ কোনো দিনই আর তারা পাবে না।

শেষ আয়াতে (১১৮) বলা হয়েছে— 'বলো, হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করো ও দয়া করো, দয়ালুদিগের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু। এটাই সুরা মু'মিনূনের শেষ আয়াত। উল্লেখ্য, সুরার শুরুতে বলা হয়েছে 'অবশ্যই সফলকাম হয়েছে বিশ্বাসীরা'। এবং শেষে বলা হলো 'নিশ্চয়ই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সফলকাম হবে না'। আর সবশেষে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে রসুল স. এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর সকল অনুসারীগণকে শিক্ষা দেয়া হলো একটি উত্তম প্রার্থনা। বিশ্বাসীরা সফলকাম বলেই তাদের কাছে এই প্রার্থনার মূল্য অনেক, অনেক।

'ইগফির' অর্থ ক্ষমা করো। 'ওয়ারহাম' অর্থ— এবং দয়া করো। বলাবাহুল্য, এ দু'টো ছোট্ট কথার মাধ্যমে রচিত হয় প্রার্থনার বিশাল পরিসর। ক্ষমার মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়ে যায় পশ্চাতের সকল অপরাধ। আর দয়াপ্রাপ্তির ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ যাকে দয়া করবেন, সেই লাভ করবে মহাকল্যাণ।

বাগবী লিখেছেন, হানাশ বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ইবনে মাসউদের নিকটে এক পাগলকে নিয়ে আসা হলো। তিনি ওই পাগলের দুই কানে 'আফাহাসিবতুম আন্নামা খলাক্বনাকুম' থেকে (১১৫ সংখ্যক আয়াত থেকে) এই সুরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফু দিলেন। পাগলটি সুস্থ হয়ে গেলো। রসুল স. হজরত ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি ওই লোকের কানে কী পড়ে ফুঁ দিয়েছিলে? তিনি বললেন, সুরা মু'মিনূন। রসুল স. বললেন, আমার জীবনাধিকারী ওই পবিত্র সত্তার শপথ! এই সুরা পাঠ করে কেউ যদি কোনো পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য করে ফুঁ দেয়, তবে সেই পাহাড়ও হয়ে পড়বে স্থানচ্যুত।

আলহামদুলিল্লাহ্ সুরা মু'মিনূনের তাফসীর শেষ হলো আজ সফর মাসের ১৫ তারিখে, ১২০৪ হিজরী সনে।

www.eelm.weebly.com

সূরা নূর

এই সূরার অবতরণ স্থল মদীনা। এর আয়াত সংখ্যা ৬৪ এবং রুকু সংখ্যা ৬। সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে সুরা হাশর এর পরে।

সূরা নূর ঃ আয়াত ১, ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

❑ ইহা একটি সূরা ইহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি এবং ইহাতে দিয়াছি অবশ্য পালনীয় বিধান, ইহাতে আমি অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাহাতে তোমরা সতর্ক হও।

❑ ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী— উহাদিগের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করিবে; আল্লাহের বিধান কার্যকরীকরণে উহাদিগের প্রতি দয়া যেন তোমাদিগকে অভিভূত না করে যদি তোমরা আল্লাহে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; বিশ্বাসীদিগের একটি দল যেন উহাদিগের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— এই সূরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরা। আমিই এই সুরার অবতারণক। আর আমি এতে সন্নিবেশিত করেছি অবশ্য পালনীয় বিধানাবলী। আরো উপস্থাপন করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তোমাদেরকে সতর্ক করণার্থে।

এখানে 'এটা আমি অবতীর্ণ করেছি' বলে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই সুরার বিশেষত্বকে। 'ফারাদ্বনা' অর্থ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে অবতারিত অবশ্যমান্য বিধান। কেউ কেউ বলেছেন, 'ফারাদ্বনা' অর্থ— আমি একে বর্ণনা করেছি বিস্তারিতভাবে, পৃথক পৃথকরূপে ও স্পষ্ট করে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'ফারাদ্বনা' অর্থ 'কাদ্দারনাহা' (আমি এর সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি)।

www.eelm.weebly.com

'বাইয়্যিনাত' অর্থ প্রকাশ্য, সুস্পষ্ট। 'যাতে তোমরা সতর্ক হও' অর্থ যাতে তোমরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করো, বেঁচে থাকতে পারো নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী— তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে'। 'ফাজ্‌লিদু' কথাটির মাধ্যমে এখানে দেয়া হয়েছে ব্যভিচারের বিধানের বিবরণ। আর সে বিধান হচ্ছে, অপরাধ প্রমাণিত হলে নারী-পুরুষ উভয়কে করতে হবে একশত কশাঘাত এরকম বলেছেন সিব্‌ওয়াইহ্‌। মোবাররাদ বলেছেন, এখানে 'আয্‌যানী' (ব্যভিচারী) এবং 'আয্‌যানীয়াহ্‌ (ব্যভিচারিণী) এর মধ্যে রয়েছে আলিফ লামে মাউসুলা (জোযক অব্যয়) এবং শর্তের সম্বন্ধ রয়েছে এর সঙ্গে। তাই 'ফাজ্‌লিদু' শব্দটির 'ফা' গণ্য হবে ফায়ে জাযাইয়া (পরিণতিপ্রকাশক ফা) হিসেবে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— যে সকল নারী-পুরুষ ব্যভিচার করবে, তাদেরকে করতে হবে একশতটি কশাঘাত। আর এখানে 'ফাজ্‌লিদু' বলে এটাও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আঘাত করতে হবে শরীরের চামড়ার উপর। 'জ্বালদুন' অর্থ শরীরের চামড়ার উপরে প্রহার করা। যেমন 'জালদাহু' (তার চামড়ায় মেরেছে), 'র'সাহু' (তার মাথায় মেরেছে), 'বাত্বনাহু' (তার পেটে মেরেছে)।

মাসআলাঃ প্রহার করতে হবে এমন ছড়ি বা চাবুক দ্বারা যার রয়েছে গ্রন্থি বা গিরা। হানজালা সুদুসীর উক্তিরূপে ইবনে শায়বার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস ইবনে মালেক বলতেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, চাবুকের গিরা কেটে দিতে হবে। এরপর চাবুকটিকে দু'টি পাথরে রেখে উত্তমরূপে থেতলা করতে হবে। এরপর শুরু করতে হবে কশাঘাত। হানজালা বলেন, আমি একথা শুনে বললাম, হে রসুল স. এর সহচর! এরকম করা হতো কোন সময়ে? তিনি বললেন, খলিফা ওমর ইবনে খাত্তাবের সময়ে।

ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবী কাছীর সূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছি। সুতরাং আমার উপরে হদ প্রয়োগ করুন। রসুল স. একটি চাবুক আনতে নির্দেশ দিলেন। একটু পরেই চাবুক আনা হলে তিনি স. বললেন, এটা তো খুবই শক্ত। আর এতে গিরাও রয়েছে। আনতে হবে এর চেয়ে অশক্ত একটি চাবুক। একটু পরে আর একটি চাবুক আনা হলে তিনি স. বললেন, না, এটাও নয়। এটা আবার বেশী নরম। এরপর আনা হলো মধ্যম প্রকৃতির আর একটি চাবুক। তিনি স. তখন ওই চাবুক দিয়ে কশাঘাত করালেন লোকটিকে। জায়েদ ইবনে আসলাম সূত্রে ইবনে আবী শায়বাও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালেক হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর মুয়াত্তা'য়।

www.eelm.weebly.com

'মিয়াতা জালদাতিন' অর্থ একশত কশাঘাত করবে। উল্লেখ্য, ব্যভিচারের প্ররোচনা প্রথমে আসে সাধারণতঃ নারীর দিক থেকে। কেননা শারীরিক সৌন্দর্য উন্মোচন করে তারাই আগে পুরুষকে উত্তেজিত করে। তাই আলোচ্য আয়াতে ব্যভিচারীর পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে ব্যভিচারিণীর কথা। আবার চৌর্যবৃত্তির পুরোধা হচ্ছে পুরুষ। তাই চুরি সম্পর্কিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— আস্ সারিকু ওয়াস্ সারিক্বাতু (চোর আর মহিলা চোর) প্রথমে পুরুষ, তারপর নারী।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী যদি অবিবাহিত, প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ও স্বাধীন হয়, তবে তাদের উপরে প্রয়োগ করতে হবে একশত কশাঘাত। আলোচ্য আয়াতে এই বিধানেরই বিবরণ দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, তাদেরকে এর চেয়ে আর অধিক শাস্তি দেয়া যাবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, শাস্তি কার্যকর করার পর তাকে এক বৎসরের জন্য এমন দূরত্বে প্রেরণ করতে হবে, যে দূরত্বের কারণে নামাজকে কসর করতে হয়। যাত্রাপথ যদি নিরাপদ হয় তবে মুহরিম ছাড়াই শাস্তিপ্রাপ্তা নারীকে দূরে প্রেরণ করা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের দু'টি অভিমত জানা যায়। 'মিনহাজ' গ্রন্থে রয়েছে, বিশুদ্ধ মত এই যে, এরকম নারীকে একাকী দেশান্তর করা যাবে না। দেশান্তর করতে হবে স্বামী অথবা মুহরিম (যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) পুরুষের সঙ্গে। তার ওই পুরুষ সঙ্গীকে কিছু বিনিময়ও দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই বিনিময় দিবে কে? এ সম্পর্কেও রয়েছে দু'টি অভিমত। একটি হচ্ছে— বিনিময় দিতে হবে ওই নারীর সম্পদ থেকে। দ্বিতীয় অভিমত হচ্ছে— বায়তুল মাল থেকে দিতে হবে ওই বিনিময়। বিনিময় প্রদান করা সত্ত্বেও যদি তার স্বামী অথবা মুহরিম তার সঙ্গে যেতে না চায়, তবে এক বর্ণনায় এসেছে, বিচারক তাকে যেতে বাধ্য করবেন। মিনহাজে রয়েছে, বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, ইমাম এ ব্যাপারে বল প্রয়োগ করতে পারবে না। ইমাম মালেক বলেন, শাস্তি প্রয়োগ করার পর ব্যভিচারীকে দেশান্তর করতে হবে, ব্যভিচারিণীকে নয়।

ইমাম শাফেয়ী তাঁর অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেন নিম্নের হাদিসসমূহ। যেমন— ১. হজরত উবাদা ইবনে সামেত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, অবিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার করলে উভয়কে একশত কশাঘাত করতে হবে এবং তাদেরকে দেশান্তর করতে হবে এক বৎসরের জন্য। এবং বিবাহিত নারী-পুরুষ যথাক্রমে পরপুরুষ ও পরনারীর সঙ্গে ব্যভিচার করলে উভয়কে একশত কশাঘাত করার পর করতে হবে সঙ্গেসার। এই হাদিসের প্রথমে রয়েছে, আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও (ব্যভিচারের

www.eelm.weebly.com

বিধান আমার নিকট থেকে শিখে নাও, শিখে নাও)। উল্লেখ্য, প্রথমে বিধান দেয়া হয়েছিলো, ব্যভিচারিণীকে কারারুদ্ধ করে রাখতে হবে, যতক্ষণ না তার জন্য নতুন বিধান দেয়া হয়। এরপর অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। বলা হয়— ব্যভিচারক ও ব্যভিচারিকা উভয়কে করতে হবে একশত কশাঘাত। সুরা নিসার তাফসীর করতে গিয়েও আমি যথাস্থানে হাদিসটি সন্নিবেশিত করেছি। ২. হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে করতে হবে একশত করে বেত্রাঘাত এবং তাদেরকে করতে হবে দেশান্তরিত। বোখারী। ৩. বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে খালেদ ও হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. এর মহান দরবারে একবার উপস্থিত হলো দু'জন লোক। একজন বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে আমাদের বিবাদ মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে কিছু বলবার অনুমতি দিন। রসুল স. বললেন, বলো। লোকটি বললো, আমার ছেলে ছিলো এ লোকের কর্মচারী। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। লোকজন আমাকে বলে, তোমার ছেলেকে সঙ্গেসার করা হবে (মাটিতে পুঁতে প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে মেরে ফেলা হবে)। শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে আমি তাকে একশ'টি ছাগল ও একটি ক্রীতদাসী দিলাম। এরপর আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, আমার ছেলেকে একশত বেত্রাঘাত করার পর দেশান্তর করতে হবে এক বৎসরের জন্য। আর ওই মহিলাকে করতে হবে সঙ্গেসার। একথা শুনে রসুল স. বললেন, যার অধিকারে আমার জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! আমি এ বিষয়ের মীমাংসা করবো কিতাবুল্লাহ্‌র বিধানানুসারে। যাও, তুমি তোমার ছাগল ও ক্রীতদাসী ফেরত নিয়ে নাও। তোমার ছেলের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত, আর ওই মহিলার শাস্তি সঙ্গেসার। এরপর তিনি স. হজরত আনাসকে বললেন, আনাস! যাও, ওই মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে এসো। সে যদি তার অপরাধ স্বীকার করে তবে তাকে সঙ্গেসার করো। ওই মহিলা এসে তার দোষ স্বীকার করলো। সঙ্গেসারও কার্যকর করা হলো তার উপর।

ইমাম মালেক এর জবাবে বলেন, হাদিসে উল্লেখিত 'আল বিকরুবিল বিকরি ওয়া তাগরীবু আমিন' কথাটির মধ্যে রমণীদের কথা বলা হয়নি। সুতরাং নারীদেরকে দেশান্তর করার বিধান এর অন্তর্গত নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ইমাম মালেকের এই অভিমতটি অযথার্থ। উল্লেখিত কথাটির অন্তর্গত নারীরাও। কারণ এই হাদিসের শুরুতেই বলা হয়েছে আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, নিয়ে নাও— আল্লাহ্ নারীদের জন্য একটি পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

www.eelm.weebly.com

এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, বিক্র (কুমারী নারী) থেকে (বিবাহের) অনুমতি নিতে হবে। তাছাড়া হজরত জায়েদের হাদিসে উল্লেখিত 'মান যানা' কথাটিও সাধারণ অর্থবোধক, পুরুষ ও নারী উভয়েই এর অন্তর্গত। তবে ইমাম মালেকের অভিমতকে বিশুদ্ধ বলা যেতে পারে এই বলে যে, রসুল স. নারীদেরকে মুহরিম কাউকে সঙ্গে না নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং মুহরিম সঙ্গী ব্যতীত নারীরা সফর করতে পারবে না। বোখারী, মুসলিম। আহমদ ও আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও বোখারী, মুসলিম ও ইমাম আহমদ এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন হাকেম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে এবং আবু দাউদ হজরত আবু হোরায়রা থেকে। এ সকল হাদিসের ভিত্তিতেই ইমাম মালেক বলেছেন, দেশান্তর করতে হবে কেবল পুরুষকে, নারীকে নয়। আর ইমাম শাফেয়ী বলেছে, নারীকেও দেশান্তর করতে হবে, কিন্তু তার সঙ্গে দিতে হবে তার মুহরিম সঙ্গী।

তাহাবী লিখেছেন, নারীর জন্য যদি একাকী দেশান্তরের সফর নিষিদ্ধ করা হয়, তবে নিষিদ্ধ করতে হবে পুরুষের ক্ষেত্রেও। কারণ যদি কোনো সাধারণ বিধানের কিছু অংশ সুনির্দিষ্ট হয় তবে অনুমানের (কিয়াসের) মাধ্যমে অবশিষ্ট অংশকেও সুনির্দিষ্ট করা যায়। প্রমাণ স্বরূপ এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস। যেমন তিনি বলেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি তোমাদের কোনো ক্রীতদাসী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, আর সেই ব্যভিচার যদি প্রমাণিত হয়, তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে, হুমকি প্রদর্শন করবে না। এখানে উল্লেখিত হয়েছে 'লা ইয়াছরিবু' কথাটিও; যার অর্থ আমি করেছি 'হুমকি প্রদর্শন করবে না'। কথাটির আর একটি অর্থ এই হতে পারে যে, হুমকি প্রদর্শনকেই যথেষ্ট মনে করবে না, বরং ব্যভিচারের দণ্ডবিধিও প্রয়োগ করবে। হাদিসটির পরবর্তী অংশ এরকম— দ্বিতীয় বার যদি সে এরকম করে, তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে, এর অতিরিক্ত কিছু করবে না। তৃতীয়বার যদি সে ব্যভিচার করে এবং তা প্রমাণিত হয়, তবে তাকে বিক্রয় করে দিবে। এক মুঠো চুলের বিনিময়ে হলেও। বোখারী, মুসলিম। এখানে রসুল স. তৃতীয় বার ব্যভিচার প্রমাণিত হলে ওই ক্রীতদাসীকে বিক্রয় করে দিতে বলেছেন। এখন কথা হচ্ছে, যদি দেশান্তরকে প্রাধান্য দেয়া হয় তবে ক্রীতদাসী তো আর তার মালিকের অধিকারে থাকবে না। সুতরাং বলা যেতে পারে, বিক্রেতার অধিকার যদি ক্ষুন্ন হয় তবে ক্রেতার অধিকার সে প্রতিষ্ঠা করবে কী করে? কাজেই, এমতো নির্দেশ রসুল স. দিতে পারেন না। সুতরাং বলতে হয়, ব্যভিচারিণী ক্রীতদাসীর উপরে দেশান্তরের বিধান প্রযোজ্য নয়। আর ক্রীতদাসীকে যদি দেশান্তর করা না যায়, তবে স্বাধীন রমণীকে তো

www.eelm.weebly.com

দেশান্তর না করাই উত্তম হবে। কারণ ক্রীতদাসীর শাস্তি স্বাধীন রমণীর শাস্তির অর্ধেক। যেমন এরশাদ হয়েছে— 'আলাইহিন্না নিসফু মা আলাল মুহসানাতি মিনাল আজাবি'। আর স্বাধীন রমণীকে যদি দেশান্তর করা না যায়, তবে স্বাধীন পুরুষকেও যাবে না। কারণ উভয়ের বিধান এক, এর মধ্যে কমবেশী করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু একথা বলার উপায় নেই যে, তাহাবীর এমতো ব্যাখ্যা যথার্থ। কারণ রমণীদের দেশান্তর প্রমাণিত হয়েছে হাদিসের মাধ্যমে। পুরুষের একাকী সফরের নিষিদ্ধতা কোনো হাদিসে নেই। সুতরাং পুরুষের উপর দেশান্তরের বিধান প্রযোজ্য না হওয়ার কোনো যুক্তি নেই। কোনো কোনো হানাফী মতাবলম্বী বলেন, বর্ণিত হাদিসের উপরে দেশান্তরের প্রমাণ স্থাপন করা ঠিক হবে না। কারণ এতে করে প্রমাণিত হবে যে, হাদিস কোরআনকে রহিত করে। এরকম একক বর্ণনা দ্বারা কোরআন রহিত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু একথা না বলেও উপায় নেই যে, তাদের দলিলও অগ্রহণীয়। রহিত হওয়ার বিধানে যে অগ্রাধিকারকে মেনে নেয়া হয়, তা সামগ্রিক অগ্রাধিকার নয়, বরং অগ্রাধিকার প্রযোজ্য হবে কেবল কোনো বিশেষ কারণ, শর্ত বা গুণবত্তার উপর, যেনো সুসিদ্ধ কোনো কিছুকে আবার অসিদ্ধ না বলতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, নামাজে রোকনের মধ্যে সুরা ফাতিহার নির্ণায়ন, কাফ্ফারার ক্ষেত্রে বিশ্বাসী ক্রীতদাস মুক্ত করার শর্ত, কাজা রোজার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা, তাওয়াফের সময় পবিত্রতার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির কথা। এ সকল ক্ষেত্রে হাদিস দ্বারা কোরআন রহিত হওয়ার ধারণা করা যায় না। কিন্তু সকল ক্ষেত্র এরকম নয়। যদি তাই হয়, তবে অধিকাংশ হাদিস অগ্রহণীয় বলে সাব্যস্ত হবে। যেমন বৈধব্যের ইদ্দত কোরআন দ্বারা প্রমাণিত, কিন্তু শোকপ্রকাশের প্রত্যয়ন কোরআনে নেই। শোক প্রকাশের কথা এসেছে হাদিসে, আর তা ইদ্দতের আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবেও আসেনি। ইদ্দত পালনকালে কোনো রমণী যদি শোক পালন না-ও করে, তবু তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে, কিন্তু ওয়াজিব পরিত্যাগ করার কারণে সে হয়ে যাবে গোনাহ্গার। কিন্তু ইদ্দত শেষে তার পুনঃবিবাহ অসিদ্ধ হবে না। এ কারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেন, নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ এবং এর সঙ্গে অন্য সুরা মিলানো ওয়াজিব, কিন্তু তা নামাজের রোকন নয়। সুতরাং হাদিসের মাধ্যমে যদি বেত্রাঘাতের সঙ্গে দেশান্তরকে যুক্ত করা হয়, তবে এতে করে জায়েযকে নাজায়েয করা হয়েছে বলা যাবে না।

শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ বলেন, দেশান্তর করা না করার বিষয়ে কোরআনে কোনো কিছুই বলা হয়নি। তাই হাদিসের মাধ্যমে বিষয়টি কোরআনের বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত করা হলে অনিবার্য হয়ে পড়বে কোরআনের বিধানে অতিরিক্ত সংযোজন করা, যাতে সূচিত হবে রহিত করণ, যা কখনোই বিধিবদ্ধ নয়।

www.eelm.weebly.com

হানাফী তাত্ত্বিকগণ বলেন, সিবওয়াইহ্ এর বক্তব্যানুসারে সূরা নিসায় যে বিধানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো, সেই বিধানের বিবরণ দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। সুতরাং এখানকার বিধানটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান। যদি এরকম না হতো, তবে একে পরিহার করাই হতো শ্রেয়। কিন্তু মোবাররাদের উক্তি অনুসারে যদি আলোচ্য আয়াতের 'ফাজ্‌লিদু' কথাটিকে শর্তের পরিণতি সাব্যস্ত করা হয়, তবে কথাটির উদ্দেশ্য হবে, একশত বেত্রাঘাতের বিধান তো অবশ্যই স্বস্থানে অনড়, এখন এর সঙ্গে যদি দেশান্তরকেও যোগ করা হয়, তবে তা হবে অতিরিক্ত।

এখানে এই মর্মে একটি সন্দেহ উত্থাপিত হতে পারে যে, হাদিসটি প্রসিদ্ধ বলে ইসলামী বিশ্ব গ্রহণ করেছে। আর একথাও মেনে নিয়েছে যে, এরকম হাদিস দ্বারা কোরআনের বিধানের সঙ্গে নতুন বিধান সংযোজন করা যায়। এ সম্পর্কে বলা যায়, ইসলামী বিশ্ব নিশ্চয় বর্ণিত হাদিসকে যথাসূত্রসম্বলিত বলে স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু একথাও ঠিক যে, যথাসূত্রসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এর শ্রেণীচরিত্র পরিবর্তিত হবে না। অর্থাৎ একে একক বর্ণনার বাইরে কিছু মনে করা যাবে না। আর যথাসূত্রবিশিষ্ট হওয়ার এই উদ্দেশ্যটিকেও মানা যাবে না যে, সমগ্র উম্মতকে বিষয়টি মেনে নিতে হবে এবং এর উপরে আমল করতেই হবে। উল্লেখ্য, অধিকাংশ উম্মত দেশান্তরের আবশ্যকতাকে স্বকীয় বলে মনে করে না।

একটি জটিলতা ঃ সুবিদিত আয়াত তো স্বতঃসিদ্ধই। কিন্তু এর মর্মার্থ যুক্তিসিদ্ধ। কেননা আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, এই আয়াত আংশিক নির্দিষ্টকৃত একটি সাধারণ বিধান। যেমন আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী— তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে'। যদিও ব্যভিচারলিপ্ত প্রত্যেকেই এ বিধানের অর্ন্তভুক্ত, তবুও বিধানটি প্রযোজ্য হবে কেবল স্বাধীন ও প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের বেলায়। তাছাড়া অধিকাংশ আলেমগণের মতে তাদেরকে অবিবাহিতও হতে হবে। এর সঙ্গে দেশান্তরের বিধানের সংযোজনকেও করে নিতে হবে অনুমানের ভিত্তিতে। বিষয়টি স্বয়ং যুক্তিসিদ্ধ। এর উদ্ভাবন যুক্তিনির্ভর। পরিশেষে অধিকাংশ ফকিহ্ ও আরবী ভাষাবিদ এরূপ উদ্ভাবনের প্রবক্তা নন। এতে অনুমিত হয় যে, আয়াতটি সূত্রের দিক থেকে স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু পরিগঠিত হয়েছে যুক্তিসিদ্ধ হিসাবে। আর আলোচ্য হাদিসটি সূত্রের দিক থেকে একক বর্ণিত যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু পরিগণিত হয়েছে স্বতঃ সিদ্ধ হিসাবে। এখন কথা হচ্ছে একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা যখন কোরআন রহিত করা যায়, তখন উত্তম হবে হাদিসকেই অগ্রাধিকার দেয়া। এর সমাধান কী?

www.eelm.weebly.com

সমাধানঃ এমতোক্ষেত্রে কোরআন ও হাদিসের বিধানে সমতার কথা যদি মেনেও নেয়া যায়, তবে অন্ততঃ এতটুকু স্বীকার করে নিতে হবে যে, ব্যভিচারী নারী-পুরুষের জন্য হাদিসের হুকুমই প্রথম হুকুম। হজরত উবাদার হাদিসে এসেছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, নিয়ে নাও। আল্লাহ্ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীদের জন্য পথ বের করে দিয়েছেন। অবিবাহিতদের জন্য শাস্তি একশত বেত্রাঘাত এবং এক বৎসরের দেশান্তর, আর বিবাহিতদের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও সঙ্গেসার। এখন দেখা যাচ্ছে আয়াত ও হাদিসে সৃষ্টি হচ্ছে দ্বন্দ্ব। আর এ কথা অনস্বীকার্য যে, দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে আয়াত রহিত হয় না, হয় রহিতকারী। ইমাম শাফেয়ী তাই বলেছেন, বিবাহিতদের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাতের শাস্তি রহিত হয়েছে। তাদেরকে করতে হবে কেবল সঙ্গেসার। সুতরাং অবিবাহিতদের জন্য যদি দেশান্তরকে রহিত মনে করা হয়, তবে ক্ষতি কী? আর আলোচ্য আয়াতই হতে পারে এর রহিতকারী। এক্ষেত্রে অনুমানসিদ্ধতার অবকাশ আর নেই।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, দেশান্তর ওয়াজিব, এরকম কথা কোনো হাদিসে নেই। সুতরাং আমি একে ওয়াজিব সাব্যস্ত করতে পারি না। তবু হাদিসের মাধ্যমে কেবল ওয়াজিব বিধান বেত্রাঘাতের সঙ্গে দেশান্তরের বিষয়টিও উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এতে করে দেশান্তর ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। বরং বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. বেত্রাঘাতের সঙ্গে দেশান্তরের কথাও বলেছেন। এই হাদিস দৃষ্টে অনুমতি হয়, দেশান্তরের সিদ্ধান্ত ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ ছিলো না। শাস্তি ছিলো কেবল বেত্রাঘাত। কারণ এতে করে প্রমাণিত হয় অপরাধী ও অপরাধিনীর চরম অবমাননা, অথবা শাস্তির পুনরাবৃত্তি। তবে হ্যাঁ, পরিস্থিতিগত কারণে যদি বিচারক বেত্রাঘাতের পর দেশান্তরের নির্দেশ দেন, তাহলে তাকে নাজায়েযও বলা যাবে না।

দ্রষ্টব্যঃ শাফেয়ীগণ দেশান্তরের বিধানকে প্রাধান্য প্রদানার্থে বলেন, এতে করে ব্যভিচারের পথ হয়ে যায় রুদ্ধ। কারণ নতুন স্থানে সে হয়ে যায় অপরিচিত। ফলে ব্যভিচারের সুযোগও তার জন্য হয়ে যায় অনিশ্চিত। কিন্তু হানাফীগণ বলেন, বরং এতে করে তার জন্য ব্যভিচারের সুযোগ হয়ে যায় অবারিত। যেমন ব্যভিচারিণী পরিচিত জনদের ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তার লজ্জা-শরম বলে আর কিছু থাকে না। অপরিচিত স্থানে সে বরং আরো বেশী নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে ব্যভিচার করার সুযোগ পায়। প্রবৃত্তিজাত আকর্ষণে সে যদি এরকম না-ও করে, তবে জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনেও তার ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যাওয়া সম্ভব। এমতাবস্থায় আবদুর রাজ্জাক এবং মোহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানীর কিতাবুল আছারের বর্ণনার মাধ্যমেও এ আশংকা প্রমাণিত হয়। তারা লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা, হান্নাদ

www.eelm.weebly.com

সূত্রে ইব্রাহিম নাখয়ীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, অবিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে এবং তাদেরকে দেশান্তর করতে হবে এক বছরের জন্য। হজরত আলী একথা শুনে বললেন, দেশান্তর করলে তো সৃষ্টি হবে আরো অনেক বড় ফেতনা।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের উক্তিরূপে জুহুরী সূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন, হজরত ওমর মদ্যপানের অপরাধে রবীয়া ইবনে উমাইয়াকে খয়বরে দেশান্তর করেন। রবীয়া সেখানে গিয়ে রোমীয় প্রশাসক হেরাক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয় এবং খৃষ্টান হয়ে যায়। হজরত ওমর এ সংবাদ পেয়ে বলেন, ভবিষ্যতে আর কোনো মুসলমানকে দেশান্তরের শাস্তি দিব না।

মাসআলাঃ বিচারক যদি মনে করেন বেত্রাঘাতের পর দেশান্তর প্রয়োজন, তবে তিনি দেশান্তরের বিধানও প্রয়োগ করতে পারবেন। রসুল স. এর দেশান্তর সম্পর্কিত হাদিস এবং হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও হজরত ওসমানের সিদ্ধান্তেও একথার প্রমাণ রয়েছে। নাসাঈ, তিরমিজি ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত ও বোখারী-মুসলিমের শর্তানুসারে হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এবং দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত আর এক হাদিসে এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. বেত্রাঘাতও করেছেন, আবার দেশান্তরও করেছেন, এরকম করেছেন হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরও। ইবনে কাত্তান বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। আর দারাকুতনী বলেছেন, হাদিসটি পরিণত শ্রেণীর।

অপ্রসিদ্ধ সূত্রে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, হজরত ওসমান এক মহিলাকে বেত্রাঘাত করেন এবং দেশান্তরিত করে পাঠিয়ে দেন খয়বারে। উল্লেখ্য, কেবল ব্যভিচারের ক্ষেত্রেই নয়, বিচারক অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রেও দেশান্তরের বিধান কার্যকর করতে পারেন।

হজরত আমর ইবনে শোয়াইব থেকে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক তার গোলামকে হত্যা করে ফেললো। রসুল স. তার উপরে কার্যকর করলেন একশত বেত্রাঘাত ও দেশান্তর। তাকে খারিজ করেন বিজ্ঞজনের তালিকা থেকে এবং মুক্ত করে দিতে বলেন একটি ক্রীতদাসকে।

সাঈদ ইবনে মনসুর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক লোক রমজান মাসে মদ্যপান করলো। হজরত ওমর তাকে দশটি বেত্রাঘাত করলেন এবং দেশান্তরিত করে পাঠিয়ে দিলেন সিরিয়ায়। বোখারী এই বর্ণনায় একটি অংশ বর্ণনা করেছেন তা'লীকরূপে। বাগবী তাঁর আলজু'দিয়াতে অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন এই কথাটুকু— হজরত ওমর কারো উপর রাগান্বিত হলে তাকে প্রেরণ করতেন

www.eelm.weebly.com

সিরিয়ায়। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, বসরায়। নাফে— আইয়ুব— মুয়াম্মার সূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর এক লোককে দেশান্তরিত করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ফাদাকে।

সম্মানিত পীর মাশায়েখগণ কখনো কখনো কোনো মুরিদের মধ্যে কুপ্রবৃত্তির তীব্রতা অনুভব করলে তাকে কিছু সময়ের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগের নির্দেশ দিয়ে থাকেন, যেনো বিদেশ বিভূঁয়ে ঘুরে তার চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং স্বভাবে সৃষ্টি হয় বিনয়-নম্রতা। উল্লেখ্য, কুপ্রবৃত্তিই মানুষকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়, চিরস্থায়ী সুখ ও অপরিসীম শান্তির পথ থেকে স্খলিত করে বানিয়ে দেয় শয়তানের পদাঙ্ক অনুসারী। অবশেষে উপনীত করায় দোজখের দ্বারপ্রান্তে। তাই প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধি, আল্লাহ্‌র নৈকট্য, সন্তোষ ও চিরসুখময় বেহেশত প্রাপ্তির নিমিত্তে কামেল পীর মাশায়েখগণের কাছে বায়াত হওয়া অত্যাবশ্যক। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন— 'ওয়াত্তাকুল্লহা ওয়া কুনু মায়াস্‌সদিক্বীন'। একথার অর্থ— এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও সত্যবাদীগণের (পীর-মাশায়েখগণের) সংসর্গ বরণ করো।

আমি বলি, বিচারক যদি কোনো মুসলমানকে পাপে প্রলিপ্ত দেখতে পান এবং ওই মুসলমান যদি তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, তবে তিনি তার উপর এক বৎসরের দেশান্তরের বিধান প্রয়োগ করতে পারেন। আর যদি সে তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত না হয়, তবে তার শাস্তি এই যে তওবা না করা পর্যন্ত তাকে সমস্ত পৃথিবী থেকে বের করে দিতে হবে। অর্থাৎ তাকে করতে হবে বন্দী। আল্লাহ্‌ই প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অধিক অবহিত।

মাসআলাঃ বিবাহিত ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর শাস্তি সঙ্গেসার। সাহাবীগণ এ ব্যাপারে একমত। আলেমগণও বলেছেন, বিষয়টি ঐকমত্যসম্মত। কেবল বিভ্রান্ত খারেজীরা এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণকারী। তারা সাহাবীগণের ঐকমত্য ও একক বর্ণিত হাদিসকে অস্বীকার করে। দাবি করে, সঙ্গেসার বা রজম কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত নয়। আর একক বর্ণনার (খবরে আহাদের) বিধানও ওয়াজিব কিছু নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, সঙ্গেসার প্রমাণিত হয়েছে সুবিদিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে, যা অনস্বীকার্য। এরকম সুবিদিত ও সুপ্রসিদ্ধ বিষয়কে কিছুতেই অগ্রাহ্য মনে করা যায় না। যেমন— হজরত আলীর বীরত্ব, হাতিম তাঈয়ের বদান্যতা। সঙ্গেসারের হাদিস যদিও ব্যাপকার্থে সুবিদিত নয়, তবুও তা ঐকমত্যোৎসারিত হওয়ার কারণে বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট। আর এর বিশেষত্ব ও অবস্থার কথা একক বর্ণিত হাদিসে তো এসেছেই।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স.কে আল্লাহ্‌তায়ালা পয়গম্বর করে পাঠিয়েছেন, তাঁর উপরে অবতীর্ণ

www.eelm.weebly.com

করেছেন কিতাব, ওই কিতাবে অন্যান্য আয়াতের সঙ্গে রজমের (সঙ্গেসারের) আয়াতও অবতীর্ণ করেছেন। তিনি স. এ বিধান কার্যকর করেছেন। আমিও এ বিধান কার্যকর করেছি। সুতরাং ব্যভিচারী বিবাহিতাদের সঙ্গেসারের বিধান সত্য। তবে শর্ত হচ্ছে অপরাধ প্রমাণিত হতে হবে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা, গর্ভবতী হওয়ার দ্বারা, অথবা অপরাধী-অপরাধিনীর স্বীকারোক্তি দ্বারা। বোখারী, মুসলিম।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ মোহাম্মদ স.কে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপরে কিতাব নাজিল করেছেন। নাজিলকৃত আয়াতের মধ্যে সঙ্গেসার সম্পর্কিত বিধানও রয়েছে। আমি ওই আয়াত পাঠ করি এবং স্মরণে রাখি। যেমন— 'আশশায়খু ওয়াশশায়খাতু ইজা যানায়া ফারজুমুহুমা আল বত্তাতা নাকলাম মিনাল্লহি ওয়াল্লহু আযীযুন হাকীম' (বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যদি ব্যভিচার করে, তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে সঙ্গেসার করে দাও এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়)। রসুল স. সঙ্গেসার করিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে আমিও সঙ্গেসার করিয়েছি। এই হাদিসের শেষাংশে রয়েছে, হজরত ওমর আরো বলেছেন, 'ওমর কিতাবুল্লাহ্র সঙ্গে নতুন কিছু সংযোজন করেছে' মানুষের এরকম উক্তির আশংকা না থাকলে আমি সঙ্গেসার সম্পর্কিত আয়াত কোরআন মজীদের টীকা ভাষ্যরূপে সংযুক্ত করে দিতাম। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন, আমি আশংকা করি দীর্ঘদিন গত হলে মানুষ বলবে কোরআন মজীদে রজমের বিধান নেই। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, আমার কাছে একথা পছন্দনীয় নয় যে, কেউ বলবে, ওমর আল্লাহ্র কিতাবে প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। যদি এরকম ধারণা আমার না থাকতো, তবে আমি রজমের আয়াত কোরআনে লিখে দিতাম। কেননা আমার ভয় হয়, পরবর্তী যুগের কেউ কেউ বলবে, কিতাবুল্লাহ্য় রজমের বিধান পাওয়া যাচ্ছে না। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর একদিন তাঁর ভাষণে বললেন, আমার একথা মনোপুত নয় যে কেউ বলুক 'ওমর আল্লাহ্র কিতাবে নতুন কিছু যোগ করেছেন'— এরকম বলার অবকাশ যদি না থাকতো, তবে আমি রজমের বিধান কোরআনে সংযোজন করে দিতাম। কেননা আমার ভয় হয়, ভবিষ্যতে কিছু লোক বলবে, রজমের বিধান তো কোরআনে নেই। হজরত ওমর তাঁর এই ভাষণ দিয়েছিলেন সাহাবীগণের এক সমাবেশে। কিন্তু কেউই তখন তাঁর কথার প্রতিবাদ করেননি। এতে করে বোঝা যায়, রজমের আয়াত যে কোরআনের অন্তর্ভুক্ত সে ব্যাপারে তাঁরা সকলে একমত। হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে হাকেম ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রজমের বিধান এই— বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যদি ব্যভিচার করে,

www.eelm.weebly.com

তবে তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ সঙ্গেসার করে দাও। সহিহ্ ইবনে হাব্বান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, সূরা আহযাব ছিলো সূরা বাকারার সমান দীর্ঘ। আর ওই সূরাতেই ছিলো রজম বিষয়ক আয়াত। সহিহ্ বোখারী ও সহিহ্ মুসলিম গ্রন্থে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করবে, তার রক্তপাত হালাল নয়। তবে তিন কারণে তা করা যেতে পারে— ১. কেসাস (জীবনের বদলে জীবন) ২. বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার ৩. ধর্মত্যাগ।

হজরত আবু উমামা বিন সহল বিন হানিফের বর্ণনায় এসেছে, যখন খলিফা হজরত ওসমানের বসতবাটি ঘেরাও করা হলো, তখন তিনি একদিন তাঁর প্রকোষ্ঠের জানালায় দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদেরকে আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, রসুল স. কি একথা বলেননি যে, তিনটি কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে মুসলমানের রক্তপাত ঘটানো বৈধ নয়? সে তিনটি কারণ কি এই নয় যে, ব্যভিচারলিপ্ত হওয়া, কেসাস ও ধর্ম পরিত্যাগ? অতএব, তোমরা শুনে নাও, আমি এ তিনটির একটির মধ্যেও পড়ি না। তবু কি তোমরা আমাকে হত্যা করবে? তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও দারেমীও হাদিসটির বর্ণনাকারী। শাফেয়ী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর মসনদে। আরো বর্ণনা করেছেন বায্যার ও হাকেম। হাকেম আবার বোখারী ও মুসলিমের সূত্রানুসারে হাদিসটির সূত্রপরম্পরাগত বিশুদ্ধতাও নির্ণয় করেছেন। বায়হাকী ও আবু দাউদ বোখারী ও আবু কালাবার বর্ণনানুসারে হাদিসটিকে সনাক্ত করেছেন ফে'লী (কর্মকাণ্ডগত) হাদিসরূপে। হজরত আবু কালাবার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তিন কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দান করেননি— হত্যাকাণ্ড, বিবাহিতের অবৈধ যৌনচরিতার্থতা এবং ধর্মত্যাগী, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করে।

বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. হজরত মা'জ ইবনে মালেকের সঙ্গেসার কার্যকর করিয়েছিলেন তখন, যখন তিনি নিজ মুখে এর স্বীকারুক্তি দিয়েছিলেন। হাদিসটি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি ও ইবনে মাজা। বোখারী ও মুসলিম হজরত আবু হোরায়রা, হজরত জাবের প্রমুখ থেকেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত বুরাইদা বর্ণনা করেছেন, হজরত মা'জ ইবনে মালেক রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপনীত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে পবিত্র করে দিন।

রসুল স. গামেদ গোত্রীয় এক মহিলাকেও সঙ্গেসার করিয়েছিলেন। ওই মহিলা রসুল স. এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজ মুখে তাঁর ব্যভিচারজাত

www.eelm.weebly.com

গর্ভধারণের কথা জানিয়েছিলেন। রসুল স. তাঁকে সঙ্গেসার করিয়েছিলেন তাঁর সন্তান প্রসবের পর। অপর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাঁকে সঙ্গেসার করিয়েছিলেন তখন, যখন তাঁর সন্তান দুগ্ধপান ত্যাগ করে স্বাভাবিক আহার গ্রহণ করতে শিখেছিলো।

জোহনিয়া গোত্রীয় এক রমণীর উপরেও সঙ্গেসার কার্যকর করিয়েছিলেন রসুল স.। তিনিও ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করেছিলেন তাঁর নিজ জবানে। হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

ওলামা, ফোকাহা ও হাদিসবেত্তাগণের বক্তব্য হচ্ছে, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও সঙ্গেসার প্রয়োগের ঘটনা ঘটেছে। এ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো পৌঁছেছে সুবিদিত পর্যায়ে। আল্লাহ্ই অধিক অবহিত।

মাসআলাঃ একজন বিবাহিত এবং অন্যজন অবিবাহিত হলে অবিবাহিতকে করতে হবে বেত্রাঘাত এবং বিবাহিতকে সঙ্গেসার, যেমন করা হয়েছিলো এক লোকের অধীনস্থ শ্রমিক ও তার স্ত্রীর সঙ্গে সংঘঠিত ব্যভিচারের বেলায়। শ্রমিককে করা হয়েছিলো বেত্রাঘাত ও তার মনিবপত্নীকে করা হয়েছিলো সঙ্গেসার।

মাসআলাঃ বিবাহিতদেরকে সঙ্গেসার করার পূর্বে বেত্রাঘাত করতে হবে কিনা, সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন, আলোচ্য আয়াত দৃষ্টে মনে হয়, প্রথমে বেত্রাঘাত করতে হবে। তারপর করতে হবে সঙ্গেসার। অবশ্য তাঁর মতে আলোচ্য আয়াতের বিধান কেবল অবিবাহিতদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এবং এই আয়াত রহিতও নয়। তিনি একথাও বলেছেন যে, আলোচ্য বিধানটি পূর্ণ শাস্তি নয়, বরং এ হচ্ছে আংশিক শাস্তি। অপর অংশটি বর্ণিত হয়েছে হাদিস শরীফে। আর তা হচ্ছে এক বৎসরের দেশান্তর, আর বিবাহিতদের বেলায় অপর অংশটি হচ্ছে সঙ্গেসার। একথাও ঠিক যে, দেশান্তরের হাদিসের সঙ্গে যেমন আলোচ্য আয়াতের কোনো বিরোধ নেই, তেমনি বিরোধ নেই এই আয়াতের সঙ্গে রজম বিষয়ক হাদিসেরও। উভয় ক্ষেত্রে হাদিস হয়েছে কোরআনের পরিপূরক বা সম্প্রসারক। আর রজমের হাদিস যেহেতু সুবিদিত পর্যায়ের, তাই আয়াত ও হাদিস উভয়ের উপরে আমল করা যাবে। হজরত উবাদা ইবনে সামেতের হাদিস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়। যেমন তিনি বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, অবিবাহিত ও অবিবাহিতার প্রত্যেকের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত এবং এক বৎসরের দেশান্তর। আর বিবাহিত ও বিবাহিতার প্রত্যেকের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও সঙ্গেসার।

হজরত সালমা ইবনে মাহ্বাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার নিকট থেকে নিয়ে নাও, নিয়ে নাও। আল্লাহ্ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর মুক্তির উপায় জানিয়ে দিয়েছেন। অবিবাহিত ও অবিবাহিতার প্রত্যেকের জন্য

www.eelm.weebly.com

একশত বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের দেশান্তর। আর বিবাহিত-বিবাহিতার প্রত্যেকের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও সঙ্গেসার। হজরত আলীর বক্তব্য থেকেও একথা প্রমাণিত হয়। বক্তব্যটি শা'বী সূত্রে বর্ণনা করেছেন হাকেম, আহমদ ও নাসাঈ। বক্তব্যটি এই— হজরত আলী কুফায় সুরাহা হামেদানিয়াকে বেত্রাঘাত করার পর সঙ্গেসারও করেন। বেত্রাঘাত করা হয় বৃহস্পতিবারে এবং সঙ্গেসার শুক্রবারে। এভাবে দণ্ড কার্যকর করার পর তিনি বলেন, আমি বেত্রাঘাত করেছি কিতাবুল্লাহ্ অনুসারে এবং সঙ্গেসার রসুল স. এর সুন্নত অনুযায়ী। এই বিবরণটি সহিহ্ বোখারীতেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে ওই মহিলার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ীর নিকটে আলোচ্য আয়াতের বিধান কেবল অবিবাহিত-অবিবাহিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অথবা বিধানটি বিবাহিত-বিবাহিতার ক্ষেত্রে রহিত। হজরত উবাদা এবং হজরত সালমার হাদিসের মাধ্যমেও একথা জানা যায়। তাছাড়া রসুল স. হজরত মায়ে'জ, গামেদিয়া গোত্রীয় এবং জোহনীয়া গোত্রীয় দুই নারীকে সঙ্গেসার করিয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গেসারের পূর্বে তাদেরকে বেত্রাঘাত করেননি। বিভিন্ন সূত্রপরম্পরায় ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনোটাতেই সঙ্গেসারের পূর্বে বেত্রাঘাতের কথা নেই। হজরত জায়েদ ইবনে খালেদের হাদিসে ইতোপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, এক শ্রমিক ও তার প্রভুপত্নীর ব্যভিচারের কথা। শ্রমিক সম্পর্কে রসুল স. নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাকে বেত্রাঘাত করো এবং এক বৎসরের জন্য নির্বাসনে পাঠাও। আর হজরত আনাসকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আনাস! যাও, ওই মহিলা যদি তার ব্যভিচারের কথা নিজ মুখে স্বীকার করে, তবে তাকে সঙ্গেসার করে দাও। এক্ষেত্রেও দেখা যায়, তিনি স. বলেছেন কেবল সঙ্গেসারের কথা, বেত্রাঘাতের কথা উচ্চারণই করেননি। উল্লেখ্য 'নাসিখের' (রহিতকারীর) বিধান তিন প্রকার— ১. নাসেখ কোনো মনসুখের (রহিতের) হুকুম রহিত করে দিবে, অবশিষ্ট থাকবে কেবল তার আবৃত্তি ২. ওই নাসেখ যা ওহির (প্রত্যাদেশের) পরিপূরক কিন্তু যা গায়রে মাতলু (হাদিস) ৩. ওই নাসেখ যার হুকুম কার্যকর থাকে, কিন্তু তার আবৃত্তি হয়ে যায় রহিত। যেমন— আশশায়খু ওয়াশ্‌শায়খাতু........। এই আয়াতের তেলাওয়াত রহিত হয়েছে, কিন্তু হুকুম রয়েছে কার্যকর। এই বিধানটি প্রমাণ করেছে যে, সঙ্গেসার একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্তি। সুতরাং এই বিধান ও বেত্রাঘাতের বিধান অবশ্যই একটি অপরটিকে রহিত করবে। আর একটি কথা, যদি আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত শাস্তিকে ওয়াজিব নির্ধারণ না করা হয়, তবে

www.eelm.weebly.com

উভয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বই থাকে না এবং একটিকে রহিতকারী এবং অপরটিকে রহিত নির্ধারণের প্রয়োজনও আর পড়ে না। বরং এতে করে উভয় শাস্তিই ওয়াজিব প্রমাণিত হয়— বেত্রাঘাতের ও সঙ্গেসারের, যেমন বলেছেন ইমাম আহমদ।

এখন অবশিষ্ট রইলো হজরত আলীর কার্যক্রম সম্পর্কে। তিনি কুফায় এক রমণীকে বেত্রাঘাত করার পর সঙ্গেসারও করেছিলেন। কিন্তু হজরত ওমরের আমল এরকম ছিলো না। তিনি বিবাহিত-বিবাহিতাদেরকে কেবল সঙ্গেসারই করতেন, বেত্রাঘাত করতেন না। সুতরাং বুঝা গেলো বিষয়টি ছিলো ইজতেহাদী (চিন্তা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত)। তাহাবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু ওয়াকেদ লাইছি আশজায়ী বলেছেন, আমরা একবার খলিফা ওমরের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো এক লোক। বললো, হে আমিরুল মুমিনীন! আমার স্ত্রী ব্যভিচার করেছে। সে একথার স্বীকৃতিও দিয়েছে। খলিফা ওমর আমাকে নির্দেশ দিলেন, যাও, কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে একথার সত্যতা যাচাই করে এসো। আমি কয়েকজনকে নিয়ে লোকটির স্ত্রীর কাছে গেলাম। আমার প্রশ্নের জবাবে তার স্ত্রী বললো, আমার স্বামী ঠিকই বলেছেন। আমি ফিরে এসে খলিফাকে এই সংবাদ জানালাম। তিনি ওই রমণীকে সঙ্গেসারের নির্দেশ দিলেন। এর পূর্বে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেননি। আর এরকম না করার কারণে কেউ আপত্তিও তোলেননি।

আমি বলি, হজরত আলী কুফায় যে রমণীকে বেত্রাঘাতের পর সঙ্গেসারের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, তিনি হয়তো প্রথমে অবগত ছিলেন না যে, ওই রমণী বিবাহিত। বেত্রাঘাতের পর তিনি সম্ভবত একথা জানতে পেরেছিলেন এবং বাস্তবায়ন করেছিলেন তার সঙ্গেসার। আর তাঁর 'কিতাবুল্লাহ্ অনুসারে আমি বেত্রাঘাত করেছি এবং সঙ্গেসার করেছি রসুল স. এর সুন্নত অনুযায়ী' কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, তিনি হয়তো উপস্থিত সকলকে একথাই জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, বেত্রাঘাতের শাস্তি কোরআনের এবং সঙ্গেসারের শাস্তি হাদিসের। এরকমই ব্যাখ্যা এসেছে একটি বর্ণনায়। হজরত জাবের সূত্রে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, এক লোক ব্যভিচার করেছিলো। রসুল স. এর নির্দেশে প্রথমে তাকে দেয়া হয়েছিলো বেত্রদণ্ড। অতঃপর তিনি স. জানতে পারলেন, লোকটি বিবাহিত। তখন তাকে দিলেন সঙ্গেসারের দণ্ড।

কোরআনের বক্তব্যানুসারে প্রকাশ থাকে যে, ইহ্সান শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এখানে 'ইহ্সান' অর্থ দয়া। অবশ্য কোরআন মজীদে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কয়েকটি অর্থে। যেমন— ১. স্বাধীন, মুক্ত। ২. বিবাহ, যেমন— 'ওয়াল মুহসানাতু মিনান্নিসায়ি ইল্লা মা মালকাত আইমানুকুম'— এখানে

www.eelm.weebly.com

'আলমুহসানাতু' অর্থ বিবাহিত নারী এবং 'ফা ইজা উহসিন্না ফাইন আতায়না বিফাহিশাতিন ফা আ'লাইহিন্না নিসফু মা আ'লাল মুহসানাতি মিনাল আজাব'— এখানে 'উহসিন্না' অর্থ বিবাহ করে নেয় আর 'মুহসানাত' উদ্দেশ্য স্বাধীন নারী। ৩. পবিত্র, সতীসাধ্বী, যেমন ওয়াল মুহসানাতু মিনাল মু'মিনাতি ওয়াল মুহসানাতু মিনাল্লাজীনা উতুল কিতাবা'— এখানে বুঝানো হয়েছে সতীসাধ্বী মুসলিম ও আহলে কিতাব রমণীদেরকে।

উল্লেখ্য, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে সঙ্গেসার করার ক্ষেত্রে 'ইহ্সান' এর অর্থ বিবাহিত হওয়া অথবা বিশুদ্ধ বিবাহে আবদ্ধ হওয়া। কেননা বিবাহের পর রমণীরা তার স্বামীর গৃহে সংরক্ষিত হয়। তাই রসুল স. 'মুহসিন' কে বিবাহিত এবং গায়রে মুহসিনকে অবিবাহিতরূপে উপস্থাপন করেছেন।

আলেমগণ সঙ্গেসারের শর্তরূপে নির্ধারণ করেছেন স্বাধীন হওয়া, জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়াকে। এর সঙ্গে আরো দু'টো শর্তকে তারা আবশ্যকীয় মনে করেছেন। সে দু'টো হচ্ছে— শরিয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ হওয়া এবং বিবাহের পরে বাসরযাপন করা। এই পাঁচটি শর্ত পাওয়া না গেলে সঙ্গেসার সিদ্ধ হবে না। অবশ্য যে কোনো দণ্ড কার্যকর করার জন্য অপরাধীর জ্ঞানবান হওয়া, স্বাধীন হওয়া ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত। তাই ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর ব্যভিচারের দণ্ড একশত বেত্রাঘাত নয়, বরং পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। তবে বিবাহ সঠিক হওয়া কেবল সঙ্গেসারেরই অত্যাবশ্যক শর্ত।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম মোহাম্মদের নিকট ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর মুসলমান হওয়াও একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবু ইউসুফ আবার মুসলমান হওয়াকে অত্যাবশ্যক মনে করেননি। ইমাম আবু হানিফার স্বপক্ষে দলিল এই— রসুল স. বলেছেন, যে লোক আল্লাহ্র শরীক করে, সে 'মুহসিন' নয়। ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্ তাঁর মসনদে হজরত ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দুইভাবে— সুপরিণতরূপে (মারফু) এবং পরিণত (মাওকুফ) হিসেবে। অর্থাৎ এক স্থানে কথাটি এসেছে রসুল স. এর সরাসরি বক্তব্যরূপে, অন্য স্থানে হজরত ইবনে ওমরের উক্তি হিসেবে। ইবনে জাওজী লিখেছেন ইসহাক ব্যতীত অন্য কেউ এই হাদিসকে সুপরিণতসূত্রে বর্ণনা করেননি। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, ইসহাক পরবর্তী সময়ে হাদিসটিকে আর সুপরিণত সূত্রে বর্ণনা করেননি। প্রকৃত কথা হচ্ছে, হাদিসটি পরিণত শ্রেণীর। অর্থাৎ এটা হজরত ইবনে ওমরের উক্তি, রসুল স. এর স্বমুখে উচ্চারিত বাণী নয়। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, যদি এর

www.eelm.weebly.com

সূত্রপ্রবাহ যথাযথ হয়, তবে এরূপ হাদিসকে সুপরিণত বলা যাবে। কেননা বর্ণনাকারী যদি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ হন, তবে তার অভিমতের ভিত্তি হবে নিশ্চয় কোনো বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।

আমি বলি, ইসহাক যদি হাদিসটির সুপরিণত হওয়ার দাবি পরিত্যাগ করেই থাকেন, তবে আর তাকে সুপরিণত বলার প্রয়োজনই বা কী। আর হাদিসটিকে সুপরিণত বলে স্বীকার করা হলেও 'লাইসা বি মুহসিনিন' কথাটির মাধ্যমে সঙ্গেসারের জন্য বিবাহিত হওয়ার শর্তটি আর থাকে না।

কোরআন মজীদে বিবিধ অর্থে 'ইহসান' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। আর হাদিসে'মুহসিন' অর্থ 'পবিত্র' হওয়াও সম্ভব। যদি তাই হয় তবে বলা যেতে পারে মুশরিকেরা সঙ্গেসারের উপযুক্ত নয়। কারণ মুশরিকেরা অপবিত্র। সুতরাং মুশরিকদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ প্রদানকারী অপবাদের শাস্তির যোগ্য নয়। কেননা চরিত্রবতী ও পবিত্র নারীকে অপবাদ দিলে অপবাদের শাস্তি পেতে হয়, কিন্তু সে যদি চরিত্রবতী ও পবিত্র না হয়, তবে তার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী শাস্তিযোগ্য হবে না। তাই এই হাদিস দ্বারা সঙ্গেসারের জন্য মুসলমান হওয়াকে অত্যাবশ্যক প্রমাণ করা যাবে না। আর একটি বিষয়ও প্রণিধাননীয় যে, 'বিবাহিত' 'বিবাহিতা' শব্দ দু'টো সাধারণ অর্থবোধক। মুসলমান-অমুসলমান সকলেই এর অন্তর্ভূত।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, কতিপয় ইহুদী একবার রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, আমাদের এক নারী ও একজন পুরুষ ব্যভিচার করেছে। এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কী? রসুল স. বললেন, রজম সম্পর্কে তোমরা তওরাতে কী পেয়েছো? তারা বললো, আমরা ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীকে তা'জির করে থাকি (মুখে কালি মাখিয়ে বাজারে ঘুরিয়ে আনি, বিশেষভাবে তাকে চিহ্নিত করি) এবং কশাঘাত করি। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বললেন, তোমরা ঠিক বলোনি। তওরাত নিয়ে এসো। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, তওরাতে স্পষ্টাক্ষরে রজমের বিধান লেখা আছে। তওরাত আনা হলো। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম পাঠ করতে শুরু করলেন। রজমের আয়াত বের করা হলে একজন ইহুদী তা তার হাত দিয়ে ঢেকে ফেললো। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বললেন, হাত সরাও। সে হাত সরিয়ে নিলো। স্পষ্ট প্রতিভাত হতে লাগলো রজমের আয়াত। অন্য ইহুদীরা বললো, হে মুসলমানদের নবী! আবদুল্লাহ্ ঠিকই বলেছে। রসুল স. তখন সঙ্গেসার কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন। যথারীতি তাঁর নির্দেশ প্রতিপালিতও হলো। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, সঙ্গেসারের ক্ষেত্রে মুসলমান-অমুসলমানের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। আর এটাই হচ্ছে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদের অভিমত।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে, অতীতের শরিয়তের বিধান এই উম্মতের জন্যও অবশ্যপালনীয়, যতক্ষণ তা আমাদের শরিয়ত দ্বারা মানসুখ (রহিত) না হয়। আর ওই বিধান তো পালন করা আরো অধিক অবশ্যপালনীয় হবে, যার উপরে আমল করেছেন রসুল স. স্বয়ং। তাঁর এমতো আমল একথাই প্রমাণ করে যে, ওই বিধান আমাদের শরিয়তেও কার্যকর। মনসুখ যদি হতো তবে রসুল স. নিশ্চয় তার উপরে আমল করতেন না এবং আল্লাহ্‌র শেষ অবতীর্ণ বিধানের বিরুদ্ধে রায় দিতেন না। ইমাম আবু হানিফার এমতো অভিমতের ফলে আমাদেরকে এ বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে হবে যে, এমন কোনো আয়াত অথবা হাদিস কি আছে, যা সঙ্গেসারের বিধানকে মনসুখ করে ? না, এরকম কোনো কিছুই আমরা পাইনি। আর যানি-যানিয়াহ (ব্যভিচারিণী-ব্যভিচারী), শায়েখ-শায়েখাহ্ (বৃদ্ধ-বৃদ্ধা), ছাইব-বিকর (বিবাহিত-বিবাহিতা) —এ সকল শব্দও তো সাধারণ অর্থবোধক। মুসলমান-অমুসলমান সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। তাই আমি বলতে চাই 'মান আশরাকা বিল্লাহি ফালাইসাবি মুহসিন' এই হাদিস দ্বারা সঙ্গেসারের জন্য মুসলমান হওয়ার শর্ত প্রমাণিত হয় না। আর আলোচ্য আয়াতে 'ইহসান' না হওয়ার উদ্দেশ্য পবিত্র না হওয়া। অর্থাৎ মুশরিকেরা পবিত্র নয়, তাই তাদের উপর ব্যভিচারের অপবাদ দিলে অপবাদকারী শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা সঙ্গেসারের জন্য 'মুহসিন' (বিবাহিত) হওয়ার ব্যাপারে এই শর্ত আরোপ করেছেন যে, স্বামী-স্ত্রীকে বসবাস করতে হবে বিশুদ্ধ বিবাহসহ, আর তাদেরকে হতে হবে জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমান, প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন। ইমাম আহমদ মুসলমান হওয়ার শর্তটি ছাড়া অন্য সকল শর্তে ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে একমত। এমনকি কোনো জ্ঞানসম্পন্ন স্বাধীন মুসলমান কোনো ক্রীতদাসী, অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা, উন্মাদিনী, অথবা আহলে কিতাব নারীর সঙ্গে যদি সঙ্গম করে, তবুও সে বিবাহিত ব্যভিচারী বলে গণ্য হবে না এবং সঙ্গেসারের উপযুক্তও হবে না। এভাবে যদি কোনো স্বাধীনা নারী, কোনো গোলাম, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, অথবা পাগলকে বিবাহ করে এবং সহবাসও করে, তথাপিও সে বিবাহিতা ব্যভিচারিণী বলে গণ্য হবে না এবং তার উপরে সঙ্গেসারও কার্যকর করা যাবে না। যদি কোনো মুসলমান কোনো জিম্মি রমণীকে বিবাহ করে, সহবাসও করে, তারপর ওই রমণী যদি মুসলমান হয়ে যায় এবং মুসলমান হওয়ার পর তার স্বামী যদি তার সঙ্গে সহবাস না করে থাকে, তবে ওই নারী যদি অন্য কারো সঙ্গে সহবাস করে, তবুও সে বিবাহিতা ব্যভিচারিণীরূপে গণ্য হবে না এবং তার উপরে সঙ্গেসারও প্রয়োগ করা যাবে না।

www.eelm.weebly.com

যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমান আপন বাঁদীর সঙ্গে সহবাস করে, তারপর তাকে স্বাধীন করে দেয়, স্বাধীন করে দেয়ার পর যদি তার সঙ্গে সহবাস না করে, এমতাবস্থায় যদি ওই বাঁদী ব্যভিচার করে, তবুও সে সঙ্গেসারের উপযুক্ত হবে না।

হানাফীগণ তাঁদের অভিমতের সমর্থনে দারাকুতনী ও ইবনে আদী কর্তৃক বর্ণিত হাদিস উপস্থাপন করেন, যা আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী মরিয়ম আলী ইবনে তালহার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে হজরত কা'ব ইবনে মালেকের উক্তিরূপে এভাবে— হজরত কা'ব বলেন, আমি একবার ইহুদী অথবা খৃষ্টান মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করলাম। রসুল স. আমাকে নিষেধ করলেন। বললেন, সে তোমাকে 'মুহসিন' (পবিত্র) বানাবে না। দারাকুতনী বলেন, আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনাকারী হিসেবে অত্যন্ত দুর্বল। আর আলী ইবনে আবী তালহা হজরত কা'ব ইবনে মালেকের সাক্ষাত পাননি। ইবনে হুম্মাম বলেন, বাক্বিয়া ইবনে ওলীদ— উতবা ইবনে তামীম—আলী ইবনে আবী তালহা—হজরত কা'ব ইবনে মালেক; এই সূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সূত্রটিও কর্তিত।

আমি বলি, বাক্বিয়া ইবনে ওলীদ বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল ও বর্ণনাকারীকে গোপনকারী। ইবনে হুম্মাম বলেন, আমাদের কাছে কখনো কখনো কর্তিত সূত্রও অপরিণত রূপে গ্রহণীয়। আর এরকম অপরিণত শ্রেণীর বর্ণনাও আমাদের কাছে দলিল, তবে শর্ত হলো সূত্রপরম্পরাভূত সকল বর্ণনাকারীকে হতে হবে ন্যায়পরায়ণ (আদেল)। আমি আরো বলি, একজন ইহুদী ব্যভিচারী ও একজন ইহুদী ব্যভিচারিণীকে রসুল স. সঙ্গেসার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাদিসটি উল্লেখিত হয়েছে বোখারী ও মুসলিমে। বর্ণিত হাদিসটি কিন্তু তত্তুল্য শক্তিশালী নয়। তাই এর উপরে আমল করা নাজায়েয। ইমাম আহমদ যেহেতু বিবাহিত ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীর মুসলমান হওয়াকে অত্যাবশ্যক শর্ত বলে গণ্য করেন না, তাই তিনি আপন অভিমতের সমর্থনে বর্ণিত হাদিসটিকে উপস্থাপন করতে পারেন না।

ইউনুস থেকে আবু ওয়াহাবের পদ্ধতিতে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, জুহুরী বলেন, আমি নিজে শুনেছি, আবদুল মালেক একবার ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবাকে জিজ্ঞেস করলেন, ক্রীতদাসীর সঙ্গে সহবাস করলেও কি একজন স্বাধীন মানুষ বিবাহিত বলে গণ্য হবে? ওবায়দুল্লাহ্ বললেন, হ্যাঁ। আবদুল মালেক বললেন, আপনি এই অভিমত কোন সূত্র থেকে পেয়েছেন? ওবায়দুল্লাহ্ বললেন, জনৈক সাহাবী থেকে। বায়হাকী আরো বর্ণনা করেছেন, আমি একথাও জানতে

www.eelm.weebly.com

পেরেছি, মোহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া আওজায়ীও এরকম অভিমত পোষণ করেন। বর্ণিত অভিমতটি আবার ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্র উক্তিরূপে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন জুহ্রী-ওমর সূত্রে এবং আবদুর রাজ্জাকের পদ্ধতিতেও।

মাসআলাঃ পুরুষ ও রমনীর একজন বিবাহিত ও অন্যজন যদি অবিবাহিত হয় তবে বিবাহিতকে করতে হবে সঙ্গেসার এবং অবিবাহিতকে কশাঘাত। আলেমগণ এব্যাপারে একমত। হজরত জায়েদ বিন খালেদ ও হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে ইতো পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে— রসুল স. শ্রমিককে করেছিলেন বেত্রাঘাত আর তার প্রভুপত্নীকে করেছিলেন প্রস্তরাঘাত।

মাসআলাঃ দুজনের মধ্যে যদি একজন পাগল ও একজন সুস্থমস্তিষ্ক হয়, তবে শরিয়তের শাস্তি প্রবর্তিত হবে তার উপর, যে পাগল নয়— এরকম বলেছেন ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, নারী পাগলিনী আর পুরুষ জ্ঞানবান যদি হয়, তবে শরিয়তের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে পুরুষের উপর, কিন্তু যদি পুরুষ পাগল ও নারী জ্ঞানসম্পন্না হয় তবে ওই নারীর উপরে শাস্তি আরোপ করা যাবে না। কেননা ব্যভিচারের কর্তা হচ্ছে পুরুষ, নারী হচ্ছে ব্যভিচারের প্রেক্ষাপট বা পাত্র। নারীকে ব্যভিচারিণী বলা হয় রূপকার্থে, প্রত্যক্ষার্থে নয়। আর নারীকে ব্যভিচারের শাস্তি দেয়া হয় এ কারণে যে, সে ব্যভিচারের অনুমতিপ্রদাত্রী। অন্যান্য ইমাম বলেন, এমতোক্ষেত্রে নারীকে অব্যাহতি দিলে শাস্তি তো প্রয়োগ করতে হয় পুরুষের উপর। কিন্তু পাগলের উপরে শাস্তি কার্যকর হয় না। অথচ ব্যভিচার সুপ্রমাণিত। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নারী যেহেতু জ্ঞানসম্পন্না এবং যেহেতু সে ব্যভিচারের অনুমতি দিয়েছে, তাই শাস্তি দিতে হবে তাকেই।

অন্যান্য ইমাম বলেছেন, রমণী যদি হয় শরিয়তসম্মত অজুহাতধারিনী, শাস্তি যদি তাকে না দেয়া হয় আর পুরুষটি যদি হয় অজুহাতশূন্য সেক্ষেত্রে ঐকমত্যানুসারে সে শরিয়তের বিধান থেকে রেহাই পেতে পারে না। আর যদি পুরুষটি হয় অজুহাতধারী আর মহিলাটি হয় সুস্থমস্তিষ্ক তবে অজুহাতধারী পুরুষের অজুহাতে শরিয়তের বিধান মহিলাটির উপর রহিত হবেনা। বরং তা কার্যকরী করতে হবে। আর আমরা এটা মানতে পারি না যে, মহিলাকে বলা হয় রূপকার্থে যেনাকারিণী। আবার যদি একথা মেনেও নেয়া যায়, তবু বলতে হয় পুরুষ লোকটিকে ব্যভিচারের অনুমতি দেয়ার কারণে মহিলার উপর শরিয়তের দণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। এমতোক্ষেত্রে অপ্রাপ্তবয়স্ক অথবা বিকৃতমস্তিস্কধারীর যেনা করাকে ব্যভিচার বলা যাবে না, একথা অনুমোদনের অযোগ্য। কারণ, অভিধান ও শরিয়ত এটাকে ব্যভিচার বলেছে, যদিও শরিয়ত এদের উপর কার্যকর নয় বলেই দণ্ডবিধান ও অকার্যকর।

www.eelm.weebly.com

পরিচ্ছেদঃ শরিয়তপ্রদত্ত অধিকার ছাড়া, অর্থাৎ আপন স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য কোনো নারীর সংগুপ্ত অঙ্গ দ্বারা সঙ্গমসুখ চরিতার্থ করার নাম যেনা বা ব্যভিচার। পশ্চাদ্দ্বারে সঙ্গম করলে তাকে ব্যভিচার বলা যায় না— নারী বা পুরুষ যে কোনো কারো হোক না কেনো। এমতো কর্মকে বলা হয় সমকামিতা। আমি সুরা নিসার যথাস্থানে এসম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি।

মাসআলাঃ কেউ যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে ঋতুগ্রস্তা অবস্থায়, রোজা পালনরতা অবস্থায়, হজ্ব বা ওমরার ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায়, অথবা তার যৌথ মালিকানাভূত ক্রীতদাসীর সঙ্গে, মুশরিক ক্রীতদাসীর সঙ্গে, কিংবা দুধপানের সম্পর্কে যার সঙ্গে বিবাহ হারাম এমন মহিলার সঙ্গে সঙ্গম করে ফেলে, তবে তাকে ব্যভিচার বলা যাবে না। তাই এমতোক্ষেত্রে ব্যভিচারের শাস্তিও আরোপ করা যাবে না। তবে এরকম যে করবে সে অবশ্যই গোনাহ্‌র কাজই করবে। ইমাম চতুষ্টয় এবং জাহিরিয়া সম্প্রদায়ের আলেমগণ ব্যতীত অন্যান্য বিদ্বজ্জন এ ব্যাপারে একমত যে, এমতো কর্ম সম্পাদনকারীরা পাপী হলেও শাস্তিযোগ্য নয়। কারণ রসুল স. নির্দেশ করেছেন, সন্দেহ সৃষ্টি হলে শাস্তি রহিত করে দাও। মুকসিমের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে মসনদে আবী হানিফায়। জুহ্‌রীর পদ্ধতিতে ওরওয়ার মাধ্যমে তিরমিজি, হাকেম ও বায়হাকী হজরত আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন, যদি কোনো উপায় পাও, তবে মুসলমানদের উপর শাস্তিকে রহিত কোরো। কেননা বিচারকের ভুল রায় অপেক্ষা ক্ষমাপ্রদর্শন উত্তম। এই বর্ণনার সূত্রপরম্পরাভূত ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদ দামেশকি বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। বোখারী ও নাসাঈ তাকে চিহ্নিত করেছেন অগ্রাহ্য ও পরিত্যাজ্য বলে। ওয়াকী বর্ণনাটিকে উপস্থাপন করেছেন পরিণত সূত্রে। এটাই সমধিক শুদ্ধ। তিরমিজিও এই অভিমতের প্রবক্তা। তিনি আরো বলেছেন, কতিপয় সাহাবীও এরকম বলেন। বায়হাকী বলেছেন, ওয়াকী'র বর্ণনা নির্ভরযোগ্যতার নিকটবর্তী। রাশেদীনও আকিলের মাধ্যমে জুহ্‌রী সূত্রে এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে রাশেদীন বর্ণনাকারীরূপে শক্তিমান নন।

হজরত আলী থেকে সুপরিণত সূত্রে এসেছে, সন্দেহের স্থলে শাস্তিকে রহিত কোরো। শাস্তিকে রহিত করা বিচারকের জন্য বৈধ নয়। তবে সন্দিগ্ধাবস্থায় শাস্তি রহিত করা যায়। বোখারী মন্তব্য করেছেন এই বর্ণনার সূত্রপ্রবাহভূত মুখতার ইবনে নাফে'র হাদিস পরিত্যাজ্য।

এ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধতম বিবরণ এসেছে সুফিয়ান সওরীর সূত্রপরম্পরায়, এভাবে— হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, সন্দেহজনিত পরিস্থিতিতে শাস্তিকে স্থগিত রেখো এবং যতদূর সম্ভব মুসলমানদের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ো

www.eelm.weebly.com

জীবনসংহারক শাস্তি। ইবনে আবী শায়বা ও হজরত উকবা ইবনে আমের এবং হজরত মুয়াজ থেকেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে পরিণত সূত্রে। হজরত ওমর থেকেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে কর্তিত ও পরিণত সূত্রে। ইবনে হাজাম তাঁর কিতাবুল ইসালে যথাসূত্রে হজরত ওমর পর্যন্ত হাদিসটিকে উপস্থাপন করেছেন পরিণত শ্রেণীভূতরূপে। ইব্রাহিম নাখয়ীর পদ্ধতিতে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তি রহিত করা আমার নিকট শাস্তি কার্যকর করা অপেক্ষা উত্তম। জাহেরিয়া সম্প্রদায় বলে, প্রমাণিত অপরাধের শাস্তি সন্দেহের কারণে স্থগিত করা যায় না। কারণ শাস্তি রহিতকরণ প্রসঙ্গে রসুল স. থেকে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। প্রমাণ এসেছে কেবল কতিপয় সাহাবীর বক্তব্য থেকে, তাও এসেছে আবার কয়েকটি অসঙ্গত সূত্রপরম্পরায়। অবশিষ্ট থাকে কেবল হজরত ইবনে মাসউদের পরিণত শ্রেণীভূত হাদিসটি। প্রকৃতপক্ষে বর্ণনাটি অপরিণত শ্রেণীর। ইবনে আবী শায়বা ছাড়াও হজরত মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবদুর রাজ্জাক। কিন্তু তাঁর সূত্রপ্রবাহ সংলিপ্ত ইসহাক ইবনে আবী ফরওয়া বর্ণনাকারী হিসেবে ত্রুটিপূর্ণ।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, সন্দেহজনক অবস্থায় শাস্তিস্থগিত বিষয়ক হাদিসকে এই উম্মতের সকলেই গ্রহণ করেছেন। রসুল স. এবং সাহাবীগণের এ সম্পর্কিত বক্তব্যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি অখণ্ডনীয় বিধানে। রসুল স. হজরত মায়ে'জকে শাস্তিপ্রদানের পূর্বে বার বার বলেছিলেন, সম্ভবতঃ তুমি চুম্বন করেছো, স্পর্শ করেছো, অথবা জড়িয়ে ধরেছো। তিনি স. চেয়েছিলেন, তাঁর কথার হাঁ সূচক উক্তি পেলেই তাঁকে ছেড়ে দেবেন। চুরির অপরাধে আনীত এক অপরাধী সম্পর্কেও তিনি স. মন্তব্য করেছিলেন, সম্ভবত সে চুরি যাকে বলে তা করেনি। গামেদীয়া গোত্রীয় মহিলা সম্পর্কেও তিনি স. এরকম অব্যাহতি প্রদানের মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। হজরত আলীও ব্যভিচারের স্বীকৃতিপ্রদানকারিণী এক ক্রীতদাসীকে বার বার করে বলে যাচ্ছিলেন, সম্ভবতঃ ব্যাপারটা সেরকম কিছু নয়। ভেবে দেখো, মনে হয় তুমি শুয়েছিলে, হঠাৎ ওই লোকটি তোমার উপরে পড়ে গিয়েছিলো, না হয় লোকটা তোমার উপরে বলপ্রয়োগ করেছিলো। আর না হয় তোমার মালিক তার সঙ্গে তোমাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়েছিলো, সে কথা হয়তো তোমার মনে নেই, না হয় সে কথা তুমি চেপে যাচ্ছো। খুঁজলে সাহাবীগণের এধরনের বিবরণ অনেক পাওয়া যাবে। মোট কথা রসুল স. এবং সাহাবীগণের এধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে সুপ্রমাণিত যে, শাস্তি রহিতকরণের সকল প্রকার সম্ভাব্য চেষ্টা শরিয়তসমর্থিত।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ উল্লেখ্য যে, সন্দেহ দু'ধরনের— **সাদৃশ্য সন্দেহঃ** এমতোক্ষেত্রে কেবল সন্দেহগ্রস্ত ব্যক্তিই সন্দেহে নিপতিত থাকে, অন্যরা থাকে সন্দেহমুক্ত। এরকম সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে তখন, যখন বৈধতার প্রকৃত দলিল থাকে অনুপস্থিত। কিন্তু ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী এমন কোনোকিছুকে দলিল মনে করে যা বাস্তবে দলিল নয়। যেমন কেউ অনবধানতাবশতঃ সহবাস করে বসলো মাতা পিতা অথবা স্ত্রীর বাঁদীর সঙ্গে। এমতাবস্থায় মাতা-পিতা অথবা স্ত্রীর সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রাহ্য নয়। আবার— কেউ সঙ্গম করে ফেললো তার তিনতালাক দেয়া স্ত্রীর সঙ্গে ওই স্ত্রীর ইদ্দতাবস্থায়, যখন সে যথারীতি স্ত্রীকে দিয়ে চলেছে খোরপোশ। এমতাবস্থায় ওই মহিলা তার স্ত্রী যেমন নয়, তেমনি অন্যের স্ত্রীও নয়। কারণ ইদ্দত পালনকালে বিবাহ নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় অজ্ঞতা অথবা অনবধানতাবশতঃ কেউ সহবাস করে ফেললে তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ করা যাবে না। তবে সজ্ঞানে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যদি সে এরকম করে, তবে তার উপর কার্যকর করতে হবে ব্যভিচারের শাস্তি।

অধিকার বিষয়ক সন্দেহঃ এরকম সন্দেহ হতে পারে ওই সকল ক্ষেত্রে যে সকল ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষ অথবা অস্পষ্ট হলেও বৈধতার দলিল উপস্থিত থাকে। যেমন পুত্রের ক্রীতদাসীর সঙ্গে সঙ্গম। এরকম সঙ্গম ব্যভিচারের পর্যায়ভূত কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। কেননা এক হাদিসে এসেছে রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে এক লোক বললো, হে আল্লাহ্র রসুল। আমার সন্তান সন্ততি ও সম্পদ আমার পিতা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়। তিনি স. বললেন, তুমি ও তোমার সম্পদ (সবকিছু) তোমার পিতার। ইবনে কাত্তান ও মানজারী বলেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। হাদিসটি তিবরানী তাঁর 'আল আসগরে' এবং বায়হাকী তাঁর 'দালায়েলে' উল্লেখ করেছেন। এই হাদিস দৃষ্টে অনুমিত হয়, পুত্রের ক্রীতদাসী সম্ভোগ করার অধিকার পিতার রয়েছে। দলিলটি ত্রুটিপূর্ণ হলেও দলিল। আবার তালাকে কেনায়া প্রাপ্তা মহিলাকে তালাকদাতা যদি তার ইদ্দত পালনকালে পুনঃবিবাহ ব্যতীত সম্ভোগ করে, তবুও তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ করা যাবে না। কেননা সাহাবীগণ এমতোক্ষেত্রে শাস্তি আরোপ করার ব্যাপারে একমত নন। তাই কেউ কেউ মনে করেন, তালাকে কেনায়া প্রদান করার পরেও তালাক প্রদাতা তালাক প্রাপ্তাকে স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নিতে পারেন। সাক্ষীবিবর্জিত বিবাহের ব্যাপারটিও সন্দেহজনক। এরকম বিবাহ শরিয়তানুগ নয়। তাই বলতে হয়, এরকম অধিকার বিষয়ক সন্দেহের ক্ষেত্রে ব্যভিচারের শাস্তি রহিত হয়ে যায়। অনুরূপ যদি কোনো রমণী প্রথমবার বিদায় নেয়ার পর পুনরায় কতিপয় সঙ্গিনীর সঙ্গে ফিরে আসে এবং সঙ্গিনীরা যদি বলে,

www.eelm.weebly.com

এ হচ্ছে তোমার স্ত্রী, এরপর স্বামী যদি তার সঙ্গে সহবাস করে, তবু ওই স্বামীর উপরে ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ করা যাবে না, তবে তাকে মোহরানা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। হজরত আলী এমতো একটি ঘটনায় এরকমই সিদ্ধান্ত দান করেছিলেন এবং রমনীটিকে ইদ্দতও পালন করতে বলেছিলেন। এমতোক্ষেত্রে স্বামীর উপরে ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ না করার কারণ এই যে, স্বামী রমণীর সঙ্গিনীদের কথায় নির্ভর করেছিলো। কেননা বাস্তব সাক্ষ্যপ্রমাণ অস্বীকার না করাই স্বাভাবিক। তবে কেউ যদি তার শয্যায় কোনো অপরিচিতাকে পেয়ে তার সঙ্গে সঙ্গম করে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে তার উপরে শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে। কিন্তু ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে যাবে না। ইমাম আবু হানিফা বলেন, প্রথমবার একত্রবাসের পর স্ত্রী আর অপরিচিতা থাকে না। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে অপরিচিতা কাউকে স্ত্রী বলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক নয়, অন্ধ পুরুষের ক্ষেত্রেও নয়। কারণ সে ওই অপরিচিতাকে জিজ্ঞেস করতে সক্ষম, অথবা অন্য কোনো উপায়েও তার পরিচয় জেনে নিতে সক্ষম। তবে অন্ধ পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে ডাকে, আর সেই ডাকে অন্য কোনো মহিলা সাড়া দিয়ে কাছে আসে এবং বলে আমি তোমার স্ত্রী, এমতাবস্থায় যদি ওই লোক ওই মহিলার সঙ্গে সঙ্গম করে, তবে তাকে ব্যভিচারী বলে সাব্যস্ত করা যাবে না। কারণ একজনের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অন্যজনের কণ্ঠস্বরের মিল থাকা সম্ভব। আর কণ্ঠস্বরের ধোকায় পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, যদি ইতোপূর্বে তার স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা হয়ে থাকে অল্পক্ষণের জন্য।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম জোফার ও ইমাম সুফিয়ান সওরী বলেন, বিবাহ নিষিদ্ধ এরকম কোনো নারীকে যদি কেউ বিবাহ করার পর সম্ভোগ করে, তবে তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করা যাবে না বটে, কিন্তু কার্যকর করতে হবে তদপেক্ষা অধিক কঠিন শাস্তি।

আমি বলি, তাকে হত্যা করাই সঙ্গত। আর এরকম করলে তা হয়ে যাবে হাদিসের পূর্ণ অনুকূল। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক বলেন, বিবাহ হারাম, একথা জানা সত্ত্বেও যদি কেউ বিবাহনিষিদ্ধ নারীকে বিবাহ করে, তবে তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে, কারণ তার আমল ঐকমত্যবিরোধী, অর্থাৎ তার আমলের অবৈধতা সম্পর্কে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহেরও অবকাশ নেই।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, প্রত্যেক নারীই বিবাহের পাত্রী। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা পাত্রী হিসেবে যোগ্য নয়। তাই এমতোক্ষেত্রে বিবাহ হয়ে গেলেও তা গণ্য হবে বাতিল বলে। আর এমতো পরিস্থিতি সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। কারণ এতে রয়েছে বৈধ বিবাহের মতো একপ্রকার সাদৃশ্য, যদিও তা বৈধ নয়। তাই এমতো

www.eelm.weebly.com

অবস্থা ব্যভিচার বলে গণ্য নয়। সুতরাং ব্যভিচারের শাস্তিও এমতোক্ষেত্রে কার্যকর নয়। বিষয়টি অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ সন্দেহ নেই, কিন্তু তা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যভিচারের শাস্তির আওতায় পড়ে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, ব্যভিচারের অপবাদ প্রদানকারীর শাস্তি আশি বেত্রাঘাত; কিন্তু কুফরীর অপবাদকারীদের জন্য কোনো শাস্তি নেই, যদিও কুফরীর অপবাদ ব্যভিচারের অপবাদ অপেক্ষা অধিক গর্হিত।

রসুল স. গীবতকে (পরচর্চাকে) ব্যভিচার অপেক্ষা অধিক গর্হিত সাব্যস্ত করেছেন। বলেছেন, গীবত ব্যভিচার অপেক্ষা গুরুতর। হজরত আবু সাঈদ ও হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী তাঁর শো'বুল ঈমানে। লক্ষণীয়, এতদসত্ত্বেও গীবতের জন্য কোনো শাস্তি নির্ধারিত হয়নি।

এখানে বিবাহনিষিদ্ধ নারী অর্থ ওই সকল নিষিদ্ধ নারী যাদের সঙ্গে বিবাহ স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ, বংশগত সূত্রে, দুধপান সম্পর্কীয় সূত্রে অথবা বৈবাহিক সূত্রে। যেমন মা, বোন, দাদী, নানী, দুধমা, দুধদাদী, দুধনানী, শাশুড়ী, নানী শাশুড়ী ইত্যাদি। কিন্তু বিশুদ্ধ বিবাহ যদি মতানৈক্যপূর্ণ হয়, যেমন— সাক্ষীবিহীন বিবাহ; এমতো বিবাহের সহবাস ব্যভিচার পদবাচ্য নয়। তাই এমতোক্ষেত্রে ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ করা যায় না। শুধু বলা যায়, মোহরানা পরিশোধ করতে হবে। এরকম অবৈধতা স্থায়ী নয়। এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। যেমন— স্বাধীনা স্ত্রীর বর্তমানে ক্রীতদাসী বিবাহ, অগ্নিপূজারিণীকে বিবাহ, ক্রীতদাসীকে তার মালিকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ, মালিকের অনুমতি ছাড়া তার ক্রীতদাসের বিবাহ, অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ, অন্যের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার ইদ্দত পালনকালে বিবাহ, স্বামীর মৃত্যুর পর তার ইদ্দত পালনরতা স্ত্রীকে বিবাহ, নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদানের পর পুনরায় সরাসরি বিবাহ, স্ত্রীর বর্তমানে শ্যালিকাকে বিবাহ, স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পর তার ইদ্দত পালনকালে শ্যালিকাকে বিবাহ, চার স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পঞ্চম বিবাহ। এ ধরনের সকল বিবাহ হারাম। কিন্তু এই হারাম আবার চিরস্থায়ী হারাম নয় । তাই এমতোক্ষেত্রে ব্যভিচারের শাস্তি অত্যাবশ্যক নয়— এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। আর ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ থেকে এসেছে দু'টি অভিমত। একটি ইমাম আবু হানিফার অনুকূল, আর অপরটি প্রতিকূল। ইমাম আবু হানিফার অভিমতের পোষকতায় রয়েছে তাহাবীর একটি বর্ণনা, যেখানে বলা হয়েছে, হজরত ওমর সকাশে একবার এই মর্মে অভিযোগ করা হলো, এক লোক এক মহিলাকে বিবাহ করেছে তার ইদ্দত পালনের সময়। হজরত ওমর তখন ওই লোককে ডেকে নিয়ে এসে

www.eelm.weebly.com

প্রহার করলেন। কিন্তু সে প্রহার ব্যভিচারের শাস্তির মতো ছিলো না। এরপর তিনি ওই লোককে দিয়ে ওই মহিলাকে মোহরানা প্রদান করালেন। তারপর দু'জনকে দিলেন বিচ্ছিন্ন করে। বললেন, এ দু'জন আর কখনো একত্র হতে পারবে না।

মুহরিম (বিবাহনিষিদ্ধ)দের সঙ্গে বিবাহবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে, এরকম যারা করবে তাদের কণ্ঠকর্তন করতে হবে। ইমাম আহমদ, ইসহাক এবং জাহিরিয়া সম্প্রদায়ের অভিমতও এরকম। কিন্তু ইবনে হাজাম বলেছেন, কণ্ঠকর্তন করতে হবে কেবল তাদের যারা তাদের পিতার মৃত্যুর পর পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করে। কেননা হাদিস শরীফে এরকমই বলা হয়েছে। এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আহমদ বলেছেন, এরকম লোকের কণ্ঠকর্তন করতে তো হবেই, তদুপরি বাজেয়াপ্ত করতে হবে তার সম্পদ। কেননা হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেন, আমার মামার সঙ্গে একদিন পথিমধ্যে সাক্ষাত হলো। তাঁর হাতে ছিলো একটি নিশান। বললাম, আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এক লোক তার মৃত পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। রসুল স. এর আজ্ঞানুসারে আমি তার শিরকর্তন করবো এবং বাজেয়াপ্ত করবো তার মালমাত্তা। আবু দাউদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। কতিপয় সূত্রে তাহাবীও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর কোনো কোনো বর্ণনায় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার কথা নেই। আবার কোনো কোনোটিতে আছে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যে ব্যক্তি তার মুহরিম মহিলার উপরে উপগত হবে, তাকে হত্যা কোরো। মুয়াবিয়া ইবনে কুররা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আমার পিতামহকে এমন এক লোকের মস্তককর্তন ও তার মালামাল বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে বিবাহ করেছিলো তার মৃত পিতার স্ত্রীকে।

হানাফীগণ এ সকল হাদিসের প্রেক্ষিতে বলেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগের নির্দেশ নেই— না বেত্রাঘাতের, না সঙ্গেসারের। আবার হাদিসগুলোতে সহবাসের কথাও নেই, কেবল রয়েছে বিবাহ করার কথা। মুহরিম নারীকে বিবাহ করলেই ব্যভিচারের শাস্তি অত্যাবশ্যক হয় না। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। অতএব বলা যেতে পারে, রসুল স. এরকম লোককে হত্যা ও তার মালামাল বাজেয়াপ্ত করার কথা বলেছিলেন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ন রাখতে। আবার এ রকমও বলা যেতে পারে যে, ওই সকল লোক পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করাকে বৈধ মনে করে নিয়েছিলো। মূর্খতার যুগের মানুষ এরকমই করতো। কিন্তু এরকম কাজ শরিয়তসিদ্ধ নয়। আর শরিয়তে যা হারাম তাকে

www.eelm.weebly.com

হালাল মনে করায় তারা হয়ে গিয়েছিলো মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)। তাছাড়া সম্ভবতঃ তারা হয়ে গিয়েছিলো ইসলামের সশস্ত্র প্রতিপক্ষও। তাই রসুল স. দিয়েছিলেন গর্দানকর্তন ও তাদের মালামাল ক্রোক করার নির্দেশ।

মাসআলাঃ কেউ যদি অর্থ প্রদানের চুক্তিতে কোনো মহিলাকে সম্ভোগ করে, তবে তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি অত্যাবশ্যক হবে না। কেননা বিবাহের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু এরকম যে করবে, তার উপরে প্রয়োগ করতে হবে রাষ্ট্রীয় শাস্তি। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেছেন। কিন্তু জমহুর বলেছেন, তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি অত্যাবশ্যক। অর্থ প্রদান দ্বারা ব্যভিচারকে বৈধ করা যাবে না। বিষয়টি এরকম— যেমন কেউ রান্নাবান্না করে দেয়ার জন্য অর্থের বিনিময়ে নিয়োজিত করলো কোনো মহিলাকে, তারপর তাকে সম্ভোগও করলো। অর্থহচ্ছে শ্রমের বিনিময়, আর ব্যভিচার ব্যভিচারই। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বিনিময় নির্ধারণ করায় উপকৃত হয় সে-ই যে বিনিময় গ্রহণ করে। কিন্তু বিনিময়ের স্থান নির্ধারিত, যা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার স্থান। যেমন কেউ জায়গা অথবা ঘোড়া ভাড়া করলো। এমতাবস্থায় ভাড়াকৃত স্থান বা ঘোড়া হচ্ছে বিনিময়ের ফল। কিন্তু চুক্তিবদ্ধ স্থান নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এই বিনিময় প্রকৃত বিনিময়ের অনুরূপ। রান্নাবান্নার জন্য বিনিময় প্রদানের অবস্থা এরকম নয়। এরকম চুক্তি বিবাহের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, ব্যভিচার প্রমাণিত হওয়ার জন্য চারজন পুরুষের সাক্ষ্য অপরিহার্য। নারীদের সাক্ষ্য দ্বারা ব্যভিচারের সত্যায়ন হয় না। আবার চারজনের কম পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারাও ব্যভিচারকে প্রমাণ করা যায় না। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'রমণীদের ব্যভিচার প্রমাণার্থে নিজেদের (মুসলমানদের) মধ্য থেকে চারজন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করো'। অন্যত্র এরশাদ করেছেন— 'তারা চারজন পুরুষের সাক্ষ্য কেনো উপস্থিত করে না'।

মাসআলাঃ যদি চারজন পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশে সাক্ষ্য দেয়, তবুও ব্যভিচার প্রমাণিত হবে— এরকম বলেছেন ইমাম শাফেয়ী। কিন্তু অপর তিনজন ইমাম বলেছেন, এভাবে সাক্ষ্য দিলে ব্যভিচার প্রমাণিত হবে না। বরং সাক্ষ্যদাতাদেরকে গণ্য করতে হবে অপবাদকারীরূপে এবং তাদের উপরে প্রয়োগ করতে হবে অপবাদের শাস্তি। কেননা এমতোক্ষেত্রে সাক্ষ্য সম্পূর্ণ হয় চার জনের একত্র সাক্ষ্যের মাধ্যমে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থানের সাক্ষ্য অগ্রহণীয়। এরকম অসম্পূর্ণ সাক্ষ্য নাকচ করা ওয়াজিব। আর এভাবে এক, দুই বা তিন জনের সাক্ষ্য নাকচ হয়ে যাওয়ার পর অন্য কেউ যদি সাক্ষীরূপে আবির্ভূত হয়, তবুও তাকে নাকচ হয়ে যাওয়া সাক্ষ্যের সঙ্গে মেলানো যাবে না, কারণ তা

www.eelm.weebly.com

ইতোমধ্যেই গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। সকল সাক্ষী যদি আবার একত্র হয়ে সাক্ষ্যদান করে, তবে ইমাম আহমদের নিকটে তা গ্রহণীয়, কিন্তু ইমাম মালেক এবং ইমাম আবু হানিফার নিকটে গ্রহণীয় নয়। কারণ প্রথমেই চারজন সাক্ষীর একত্র সাক্ষ্যদান ছিলো অপরিহার্য।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ ও অধিকাংশ আলেমের মতে ব্যভিচারিণী অথবা ব্যভিচারীর পুনঃপুনঃ স্বীকারোক্তি অত্যাবশ্যক। সাক্ষ্যবিহীন অবস্থায় জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীকে তার কৃত অপরাধের স্বেচ্ছাস্বীকৃতি দিতে হবে চার বার। চার বারের কম স্বীকারোক্তি যথেষ্ট নয়। ইমাম আবু হানিফার মতে একই বৈঠকে চারবার স্বীকারোক্তিও যথেষ্ট নয়। স্বীকারোক্তির মজলিশ হতে হবে ভিন্ন ভিন্ন। কারণ ব্যভিচার প্রমাণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সতর্কতা প্রয়োজন। ইমাম আহমদ ও আবু লাইসের অভিমতে যদি একই সমাবেশে বার বার স্বীকারোক্তি করে তবে তা হবে ব্যভিচার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, একবার রসুল স. মসজিদে উপস্থিত হতেই এক লোক বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি ব্যভিচার করেছি। রসুল স. তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে পুনরায় রসুল স. এর সম্মুখে হাজির হয়ে বললো, আমি যেনা করেছি। তিনি স. পুনরায় তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পুনরায় রসুল স. এর সামনে গিয়ে একই কথা উচ্চারণ করলো। এভাবে চারবার স্বীকারোক্তির পর রসুল স. তাকে বললেন, তোমার কি মাথা খারাপ? সে বললো, না। তিনি স. বললেন, তুমি কি বিবাহিত? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, একে নিয়ে যাও এবং সঙ্গেসার করে দাও।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের পোষকতায় উপস্থাপন করেন হজরত বুরাইদা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস। হাদিসটি এই— হজরত মায়ে'জ রসুল স. এর নিকটে হাজির হয়ে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করলেন। রসুল স. তাঁর স্বীকারোক্তিকে নাকচ করে দিলেন। তিনি ফিরে গেলেন। পুনরায় হাজির হয়ে একই কথা বললেন। রসুল স. তখন তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য একজনকে পাঠালেন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে। সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, আমরা তো তাঁকে জ্ঞানবান ও পুণ্যবান বলে জানি। হজরত মায়ে'জ রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হলেন তৃতীয়বার। এবারো তিনি স্বীকারোক্তি দিলেন তাঁর অপরাধের। এবারো রসুল স. তাঁর মানসিক সুস্থতা যাচাইয়ের জন্য লোক পাঠালেন। তাঁর গোত্রের লোকেরা বললো, না, তাঁর মধ্যে কোনো দোষ নেই। তিনি বুদ্ধিভ্রষ্টও নন। এরপর চতুর্থবার যখন হজরত মায়ে'জ তাঁর অপরাধের স্বীকৃতি দিলেন, তখন রসুল স. প্রদান করলেন সঙ্গেসারের নির্দেশ।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্ ও ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক বলেছেন, আমি রসুল স. সকাশে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ সেখানে মায়ে'জ এসে তার ব্যভিচারের কথা প্রকাশ করলো। রসুল স. তাঁর স্বীকারোক্তি নাকচ করে দিলেন। মায়ে'জ চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর পুনরায় এসে একই কথা বললো। এবারো রসুল স. তাকে ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে তৃতীয়বার এসে স্বীকৃতি প্রদানের পর আমি বললাম, চতুর্থবার তুমি স্বীকারোক্তি করলে কিন্তু রসুল স. তোমাকে সঙ্গেসার করার নির্দেশ দিবেন। কিন্তু চতুর্থবারও সে তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। তখন রসুল স. তাঁকে বন্দী করলেন এবং তাঁর জনপদের লোকজনের নিকট জিজ্ঞেস করে পাঠালেন, মায়ে'জ কেমন লোক? লোকেরা বললো, উত্তম?। আমরা তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখিনি। —এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর পবিত্র দরবারে হজরত মায়ে'জ পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন পুনঃপুনঃ প্রস্থানের পর। তাই হানাফীগণ বলেন, একই বৈঠকের চারবার স্বীকারোক্তি ধর্তব্য নয়। স্বীকারোক্তি দিতে হবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মজলিশে।

ইবনে হাব্বান তাঁর 'সহিহ্' পুস্তকে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেন, মায়ে'জ ইবনে মালেক একবার রসুল স. এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি ব্যভিচারী। রসুল স. বললেন, বাজে বোকো না। তুমি হয়তো জানো না ব্যভিচার কী? এরকম ভর্ৎসনার পর তিনি স. তাঁকে বের করে দিলেন তাঁর মজলিশ থেকে। পুনরায় মায়ে'জ উপস্থিত হয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো। রসুল স. পুনরায় তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। তৃতীয়বারও যখন তিনি উপস্থিত হলেন, তখন রসুল স. একজনকে নির্দেশ দিলেন, ওকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও। কিন্তু তিনি চতুর্থবারও এলেন। রসুল স. তাঁর চতুর্থবারের স্বীকারোক্তি শুনে বললেন, তুমি কি তোমার যথাঅঙ্গ প্রবেশের পর বের করে নিয়েছিলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. একথা শুনে প্রদান করলেন সঙ্গেসারের নির্দেশ। —এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে আরো অনেক সূত্রে। আর এগুলোর মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, স্বীকারোক্তির স্থান ও সময় হতে হবে পৃথক। যে হাদিসে 'তিনি স. তখন মুখ ফিরিয়ে নিলেন' বলা হয়েছে, সেখানেও বুঝতে হবে তিনি স. হজরত মায়ে'জের কথা শুনে বার বার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন ভিন্ন ভিন্ন মজলিশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং হজরত মায়ে'জও তাঁর স. মুখোমুখি হয়ে বারংবার স্বীকারোক্তি করেছিলেন এক মজলিশে নয়।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, আবু সাওর, হাসান এবং হাম্মাদ ইবনে সোলায়মান বলেন, একবার স্বীকারোক্তি করলেই ব্যভিচার প্রমাণিত হবে। কেননা হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ এবং হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, যখন

www.eelm.weebly.com

শ্রমিক ও তার প্রভুপত্নীর ব্যভিচারের অভিযোগে রসুল স. হজরত আনাসকে বললেন, ওই মহিলার কাছে যাও। সে যদি স্বীকার করে তবে তাকে সঙ্গেসার কোরো। হজরত আনাস যথারীতি ওই মহিলার স্বীকারোক্তি গ্রহণের পর তাকে সঙ্গেসার করলেন। আলেমগণ বলেন, গামেদ গোত্রীয় মহিলার ক্ষেত্রেও একবার স্বীকারোক্তির কথা এসেছে।

আমরা বলি, 'যদি সে স্বীকার করে তবে তাকে সঙ্গেসার কোরো'— রসুল স. এর এরকম নির্দেশের অর্থ হচ্ছে যদি সে এরকম স্বীকারোক্তি করে, যা ব্যভিচারের স্বীকৃতিরূপে গ্রহণযোগ্য (অর্থাৎ চারবার), তবে তাকে সঙ্গেসার করে দিয়ো। চারবার স্বীকারোক্তির কথা সাহাবীগণ জানতেন বলেই তিনি স. সে কথা উল্লেখ করেননি। আর হজরত মায়ে'জের ঘটনা ঘটেছিলো সাহাবীগণের সামনেই। অবশিষ্ট রইলো গামেদ গোত্রের মহিলার কথা। তিনি যে একবার মাত্র স্বীকারোক্তি করেছিলেন, সেকথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ আবু দাউদ ও নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, হজরত মায়ে'জ ও গামেদ গোত্রের মহিলা যদি স্বীকারোক্তির পরও তাদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নিতেন, তবে রসুল স. তাঁদেরকে অভিযুক্ত করতেন না। সুতরাং বুঝতে হবে, তাঁদেরকে রসুল স. সঙ্গেসার করেছিলেন চারবার স্বীকৃতিদানের পর। অবশ্য এ সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি। তবে বায্যার তাঁর মুসনাদে জাকারিয়া ইবনে সলীমের মাধ্যমে জনৈক কুরায়েশ বৃদ্ধের বরাত দিয়ে লিখেছেন, হজরত আবু বকরা বলেছেন, গামেদ গোত্রের ওই মহিলা চার বার স্বীকারোক্তি করেছিলো। আর রসুল স. বারংবার তা নাকচ করে যাচ্ছিলেন। শেষে বলেছিলেন, যাও, সন্তান প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করো। এই বর্ণনার সূত্রপরম্পরাভূত একজন বর্ণনাকারী অপ্রসিদ্ধ। তাই আবু দাউদ ও নাসাঈর বর্ণনা অপূর্ণতাকে অতিক্রম করতে পারেনি।

মাসআলাঃ বিচারকের জন্য এরকম করা মোস্তাহাব যে, তিনি অপরাধী বা অপরাধিনীকে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন, যেমন রসুল স. হজরত মায়ে'জকে বলেছিলেন, সম্ভবতঃ তুমি কেবল চুম্বন করেছিলে, নয়তো কেবল স্পর্শ করেছিলে।

মাসআলাঃ চারবার স্বীকারোক্তির পর শাস্তি শুরুর পূর্বে, প্রাক্কালে অথবা শাস্তি চলাকালে অপরাধী-অপরাধিনী যদি তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং শাস্তিও রহিত হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে অবশ্য ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক, দু'রকম বর্ণনাই এসেছে। ইমামগণের প্রমাণ এই যে, স্বীকারোক্তির মধ্যেও সত্য-মিথ্যা উভয় সম্ভাবনা রয়েছে। স্বীকৃতির পর তা সত্য কি মিথ্যা তা প্রতিপন্ন করার যেহেতু কেউ নেই, তাই বিষয়টি হারিয়ে ফেলবে তার নিঃসন্দিগ্ধতা। আর সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তি কার্যকর করা যায় না। তবে যে সকল

www.eelm.weebly.com

বিষয়ে আল্লাহ্র হকের সঙ্গে বান্দার হক বিজড়িত থাকে, সে সকল ক্ষেত্রে শাস্তি রহিত হবে না। কারণ এমতোক্ষেত্রে অপরাধীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার লোক থাকে। যেমন— কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা), ব্যভিচারের অপবাদ ইত্যাদি। হজরত ইয়াজিদ ইবনে মুনঈমের সূত্রে আবু দাউদ যে বিবরণ উপস্থাপন করেছেন, তাতে বর্ণনাকারী একথাও বলেছেন যে, প্রস্তরনিক্ষেপের ফলে রক্তাক্ত হজরত মায়ে'জ পালাতে শুরু করলেন। শাস্তিদাতা তাঁকে ধরতে পারলেন না। ধরে ফেললেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আনিস। তিনি উটের পায়ের একটি হাড় ছুঁড়ে মারলেন। ওই হাড়ের আঘাতেই ইন্তেকাল করলেন হজরত মায়ে'জ। রসুল স. পরে একথা জানতে পেরে বললেন, তোমরা তাকে পালিয়ে যেতে দিলেনা কেনো? সম্ভবতঃ সে তওবা করে নিতো, আর আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করে নিতেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি ও ইবনে মাজার বর্ণনায়ও একথাগুলো এসেছে।

মাসআলাঃ পীড়িত ব্যক্তি যদি ব্যভিচার করে এবং সঙ্গেসারের উপযুক্ত হয়, তবে তাকেও সঙ্গেসার করে দিতে হবে। অসুস্থতার অজুহাতে শাস্তি রহিত হবে না। কারণ সঙ্গেসারের উদ্দেশ্যই হচ্ছে অপরাধীকে শেষ করে দেয়া। কিন্তু অসুস্থ ব্যভিচারী সতর্কীকরণ শাস্তির যোগ্য হয়, তবে তার সুস্থ হওয়া পর্যন্ত শাস্তি স্থগিত রাখা যাবে, যেনো শাস্তি আবার তার মৃত্যুর কারণ না হয়। তবে তার সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা যদি আদৌ না থাকে, অথবা সে যদি হয় জন্মগতভাবে দুর্বল, তবে একশতটি কঞ্চি আটি বেঁধে নিয়ে তাকে এমনভাবে একবার আঘাত করতে হবে যাতে সকল কঞ্চিই তার শরীর স্পর্শ করে। যেমন বাগবী তাঁর শরহে সুন্নাহ্র এবং ইবনে মাজা আবু উমামা, ইবনে সহল ইবনে হানীফের মাধ্যমে হজরত সাঈদ ইবনে সা'দ ইবনে উবাদা সূত্রে বর্ণনা করেন, আমাদের ক্রীতদাসীদের মধ্যে থাকতো এক পুরুষ। সে ছিলো জন্মগতভাবেই দুর্বল। একদিন দেখলাম, সে এক ক্রীতদাসীর সঙ্গে সঙ্গমরত। এসংবাদ পৌঁছানো হলো রসুল স. সকাশে। তিনি স. বললেন, তাকে একশত কশাঘাত করো। হজরত সা'দ বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সে তো অত্যন্ত দুর্বল। একশত কশাঘাত করলে সেতো মরেই যাবে। তিনি স. বললেন, একশত কঞ্চি দিয়ে একটি আঁটি বাঁধো। তারপর ওই আঁটি দিয়ে তাকে একবার আঘাত করো এবং বের করে দাও। আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু উমামা থেকে জনৈক আনসারী সাহাবীর বরাত দিয়ে । নাসাঈ বর্ণনা করেছেন আবু উমামা ইবনে সহল সূত্রে, তিনি তাঁর পিতা থেকে। আর তিবরানী আবু উমামা সূত্রে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, বর্ণিত সূত্রগুলোর পদ্ধতিগুলি মাহফুজ অর্থাৎ

www.eelm.weebly.com

একজন দৃঢ়মনা বর্ণনাকারীর বিপরীতে দৃঢ়তরমনা বর্ণনাকারীর বিবৃতি। উপরন্তু আবু উমামা বর্ণনা করেছেন সাহাবীগণের একটি দল থেকে। আর বায়হাকী আবু উমামা থেকে অপরিণত সূত্রে।

মাসআলাঃ গর্ভবতী ব্যভিচারিণীকে তার সন্তান প্রসবের পূর্বে সঙ্গেসার করা যাবে না। আর যদি সে সতর্কীকরণ শাস্তির যোগ্য হয় তবে নেফাস থেকে মুক্ত হওয়ার আগে তাকে কশাঘাত করা যাবে না। হজরত আলী বলেছেন, লোকসকল! তোমরা তোমাদের ব্যভিচারী ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর উপরে শরিয়তের হদ (শাস্তি) কার্যকর করো, বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত । রসুল স. এর এক ক্রীতদাসী ব্যভিচার করেছিলো। তাঁর নির্দেশে আমি তাকে কশাঘাত করেছিলাম। তখন সে ছিলো নেফাসগ্রস্তা। আমার ভয় হচ্ছিলো এমতাবস্থায় কশাঘাত করলে সে হয়তো মরে যাবে। আমি আমার আশংকার কথা রসুল স.কে জানালাম। তিনি স. বললেন, তুমি ঠিকই করেছো। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, ক্রীতদাসীর শাস্তি ওই সময় পর্যন্ত বন্ধ রাখো যতক্ষণ না তার রক্তপাত বন্ধ হয়। আপন ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর উপরেও কশাঘাতের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। আর ক্রীতদাসীর উপরে নেফাস অবস্থাতেও সঙ্গেসার কার্যকর করা যাবে, কেননা তার সন্তান প্রসব হয়েছে। মৃত্যুর আশংকা এমতোক্ষেত্রে বাতুলতা মাত্র। কেননা সঙ্গেসারের পরিণতি তো মৃত্যুই।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, সন্তান প্রসবের পরেও ততদিন পর্যন্ত ব্যভিচারের শাস্তি বিলম্বিত করা যাবে, যতদিন ওই সন্তান থাকবে তার মায়ের উপরে নির্ভরশীল। সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব নেয়ার কেউ না থাকলে শাস্তি বিলম্বিত করা জরুরী। কারণ প্রতিপালনকারী ব্যতিরেকে ওই শিশুসন্তানের মৃত্যুর আশংকা রয়েছে। হজরত বুরাইদা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. গামেদ গোত্রের মহিলার সঙ্গেসার স্থগিত রেখেছিলেন তার প্রসবকাল পর্যন্ত। সঙ্গেসার কার্যকর করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন একজন আনসার সাহাবীকে। সন্তান প্রসবের পর তিনি রসুল স. কে একথা জানালেন। রসুল স. বললেন, এখনই তাকে শাস্তি দিয়ো না। দুগ্ধপোষ্য শিশুটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একথা শুনে অন্য একজন আনসারী সাহাবী বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! শিশুটি প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম আমি। তখন রসুল স. তার শাস্তি কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন। অপর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. ওই রমণীকে বললেন, যাও, প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো। যথাসময়ে সন্তান প্রসবের পর ওই রমণী রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলো। তিনি স. বললেন, যাও, বাচ্চাকে দুধ পান করাতে থাকো। বাচ্চা যখন দুধ পান করা ছেড়ে দিবে তখন আবার এসো। বাচ্চা কোলে নিয়ে পুনরায় যখন সে রসুল স. এর দরবারে হাজির হলো, তখন তার বাচ্চার হাতে ছিলো রুটির টুকরা। সে বললো, হে

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌র রসুল! আমি একে দুধপান ছাড়াতে পেরেছি। এখন সে অন্য খাদ্য খেতে পারে। রসুল স. তখন শিশুটির প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পণ করলেন জনৈক সাহাবীর উপরে। এরপর হুকুম দিয়ে খনন করলেন রমণীটির বুক সমান একটি গর্ত। তারপর ওই গর্তে তাকে নামিয়ে বললেন, সঙ্গেসার করো।

জ্ঞাতব্যঃ গামেদ গোত্রীয় রমণী এবং হজরত মায়ে'জের ঘটনায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীগণ ছিলেন সত্যের মাপকাঠি। কেননা নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তাঁরা সত্যকেই আশ্রয় করেছিলেন। জীবনের চেয়ে সত্যই ছিলো তাঁদের কাছে বড়। তাঁরা বিশুদ্ধচিত্ত ইমানদার ছিলেন বলেই আল্লাহ্‌র পরিতোষ লাভের আশায় কেবল আল্লাহ্‌র ভয়ে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করতে পেরেছিলেন। একটি হাদিসে হজরত মায়ে'জের জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদও এসেছে। অধিকাংশ মানুষ পাপী। তাই তারা মহান সাহাবীগণের এমতো আদর্শকে সত্যের মাপকাঠি বলে মেনে নিতে পারে। এমতাবস্থায় রসুল স. সরাসরি পাপী মানুষের জন্য সত্যের মাপকাঠি নন। কারণ রসুল স. ছিলেন নিষ্পাপ। সুতরাং তিনি সত্যের প্রবক্তা। আর তার সাহাবীগণ হচ্ছেন সত্যের মাপকাঠি। অনুবাদক।

মাসআলাঃ আলোচ্য আয়াতে 'ফাজলিদু' (কশাঘাত করবে) বলে সম্বোধন করা হয়েছে বিচারকগণকে। একারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেন, বিচারকের অনুমোদন ব্যতীত কেউ তার ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর উপরে ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক বলেন, মালিক তার ক্রীতদাসীকে বিচারকের অনুমোদন ব্যতিরেকেই হদ জারী করতে পারবে। তবে বিবাহিতা ক্রীতদাসীর উপরে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেন, মালিক যদি জিম্মি কাফের হয়, অথবা হয় নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস কিংবা মহিলা, তবে বিচারকের অনুমতি ছাড়া সে শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবে না।

ইমাম শাফেয়ী শরিয়তের সকল শাস্তির ক্ষেত্রে অন্য ইমামগণের সঙ্গে মতানৈক্য করেছেন। বলেছেন, মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড, ছিনতাইকারীর দণ্ড, চোরের হস্তকর্তন সকল শাস্তিই বিচারকের অনুমোদন ব্যতীত কার্যকর করা যাবে। তিনি আরো বলেন, শরিয়তের শাস্তি কার্যকর করার অধিকার রয়েছে সকল মুসলমানের। ইমাম নববী শাফেয়ী বলেন, বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে বিচারকের অনুমতি ব্যতীত দণ্ডবিধান কার্যকরী করা একটি সাধারণ বিধান। কেননা হাদিসসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে দণ্ডবিধানের বিবরণাবলী চূড়ান্ত অর্থবোধক। তাই সাধারণ অর্থে সকল মুসলমান হতে পারে এর প্রয়োগকারী । সুতরাং বুঝতে হবে নির্দেশটি সর্বসাধারণ মুসলমানের জন্য। 'তাহযীব' গ্রন্থে রয়েছে, হস্তকর্তন ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অধিকার রয়েছে কেবল বিচারকের। এটাই বিশুদ্ধ মত।

www.eelm.weebly.com

ত্রয়ী ইমাম প্রমাণ গ্রহণ করেছেন নিম্নে বর্ণিত হাদিসসমূহ থেকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর নিকটে একবার এই মর্মে জিজ্ঞেস করা হলো, অবিবাহিত ক্রীতদাসী যদি ব্যভিচার করে, তবে তার বিধান কী? রসুল স. বললেন, বেত্রাঘাত। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারের ব্যভিচারেও বেত্রাঘাত। আর চতুর্থবার যদি সে এরকম করে, তবে তাকে বিক্রয় করে দিতে হবে, এক গাছি চুলের বিনিময়ে হলেও। তিনি স. একথাও বলেছেন, তোমরা তোমাদের অধিকৃত গোলাম-বাঁদীর উপরে ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ কোরো। হাদিসটি নাসাঈ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন হজরত আলী থেকে। আর মুসলিম বর্ণনা করেছেন পরিণত সূত্রে।

ইমাম শাফেয়ীর বর্ণনায় এসেছে, নবীনন্দিনী হজরত ফাতেমা তাঁর এক ব্যভিচারিণী ক্রীতদাসীর উপরে শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন। ইবনে ওয়াহাব ইবনে জারীহের মাধ্যমে ওমর ইবনে দীনার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুলতনয়া হজরত ফাতেমা তাঁর ব্যভিচারিণী বাঁদীকে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত করিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেকের বরাত দিয়ে নাফে সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের এক গোলাম চুরি করেছিলো। তিনি ওই চোরকে হস্তকর্তনের জন্য প্রেরণ করেছিলেন মদীনার বিচারক সাঈদ ইবনে আসের নিকটে। সাঈদ তখন বলেছিলেন, চুরি করলেও গোলামের হস্তকর্তন করা যায় না। হজরত ইবনে ওমর বলেছিলেন, আপনি একথা কোন কিতাবে পেয়েছেন? একথা বলে তিনি নিজেই হাত কেটে দিয়েছিলেন ওই গোলামের ।

আব্দুর রাজ্জাক তদীয় 'মুসান্নিফ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন মুয়াম্মারের মাধ্যমে আইয়ুব সূত্রে নাফে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমরের এক গোলাম চুরি করেছিলো। আর এক গোলাম করেছিলো ব্যভিচার। তিনি তাদেরকে বিচারকের নিকট প্রেরণ না করে নিজেই একজনের কেটে দিয়েছিলেন হাত এবং আর একজনকে করেছিলেন কশাঘাত। ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, ওই গোলাম দু'জন ছিলো জননী আয়েশার। সাঈদ ইবনে মনসুর—হাশেম—ইবনে আবী লায়লা—নাফে সূত্রেও এরকম বর্ণনা এসেছে। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় এবং ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা মক্কায় আগমন করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলো হজরত আবু বকর সিদ্দীকের পুত্রের এক গোলাম। ওই গোলাম চুরি করেছিলো এবং চুরির কথা স্বীকারও করেছিলো। জননী আয়েশার নির্দেশে তার হাত কেটে দেয়া হয়। ইমাম মালেক লিখেছেন, জননী হাফসা তাঁর এক বাঁদীকে হত্যা করিয়েছিলেন। সে যাদু করেছিলো। আবদুর রাজ্জাক এ ঘটনার বিবরণ দানের পর বলেছেন, হজরত ওসমান এ কাজকে শরিয়ত-পরিপন্থী বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, উম্মত-জননীর ওই কাজকে শরিয়তবিরোধী বলে সাব্যস্ত করেছিলেন হজরত ওসমান।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের প্রমাণ স্বরূপ সুপরিণত ও পরিণত সূত্রে লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যোবায়ের চারটি বিষয়কে বিচারকের অধিকারভূত বলে সাব্যস্ত করেছেন— ১. হুদুদ ২. জাকাত আদায় ও বণ্টন ৩. জুমআর নামাজ ৪. গনিমত জমা ও বণ্টন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেনো তোমাদেরকে অভিভূত না করে'। একথার অর্থ— শাস্তি আরোপের ক্ষেত্রে অপরাধীর প্রতি মমতাবশতঃ তোমরা যেনো আল্লাহ্র বিধান পরিত্যাগ না করো। এরকম তাফসীর করেছেন মুজাহিদ, ইকরামা, আতা, নাখয়ী, শা'বী ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের।

হজরত আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, বনী মাখজুমের এক মহিলা একবার চুরি করে বসলো। কুরায়েশদের জন্য বিষয়টি হয়ে দাঁড়ালো অত্যন্ত বিব্রতকর। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে ঠিক করলো, উসামা ইবনে জায়েদ রসুল স. এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তাকেই এব্যাপারে সুপারিশকারী নিযুক্ত করা হোক। উসামা ইবনে জায়েদ তাদের অনুরোধে সুপারিশ করতে সম্মত হলেন। তাঁর কথা শুনে রসুল স. বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্র বিধান অকার্যকর করার জন্য সুপারিশ করতে চাও? এরপর তিনি স. মিম্বরে আরোহণ করে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। বললেন, অতীতে সম্মানিত লোকেরা কেউ চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিতো। আর শাস্তি প্রয়োগ করতো দুর্বল লোকদের উপর। আল্লাহ্র কসম! আমার কন্যা ফাতেমা চুরি করলেও তো আমি তার হাত কেটে দিবো।

তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— তোমরা আল্লাহ্র বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে নম্রতা প্রদর্শন করবে না। হালকাভাবেও প্রহার করবে না, প্রহার করবে কঠোরভাবে। এরকম তাফসীর করেছেন হাসান এবং সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবও। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে কঠোরতার সঙ্গে। মদ্যপানের শাস্তি অপেক্ষাকৃত কম কঠোরতার সঙ্গে এবং ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি আরো কম কঠোরতার সঙ্গে। কেননা এরকমও হতে পারে যে, ব্যভিচারের অপবাদদাতা বাস্তবে সত্যবাদী (কিন্তু সে পরিপূর্ণ সাক্ষ্যের অভাবে তার বক্তব্য প্রমাণ করতে পারছে না)। মদ্যপানের শাস্তিতে ভুলের সম্ভাবনা থাকে না। আর ব্যভিচারের শাস্তি মদ্যপানের শাস্তি অপেক্ষা অধিক গুরুতর। তাই ব্যভিচারের শাস্তি অধিক কঠোর।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের এক দাসী ব্যভিচার করেছিলো। তিনি তাকে কশাঘাত করান। কশাঘাতকারীকে বলেন, তার পিঠে ও উরুদেশে প্রহার করো। তাঁর এক পুত্র আবৃত্তি করলেন 'আল্লাহ্র বিধান

www.eelm.weebly.com

কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেনো তোমাদেরকে অভিভূত না করে'। হজরত আবদুল্লাহ্ বললেন, বৎস! আল্লাহ্ আমাকে এ নির্দেশ দেননি যে, আমি তাকে হত্যা করি। আমি তাকে কশাঘাত করালাম। কষ্ট দিলাম (এটাই তো যথেষ্ট)।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা আল্লাহ্য় ও পরকালে বিশ্বাসী হও'। একথার অর্থ— যদি তোমাদের আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস থাকে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্র বিধান পালনে তোমরা নম্রতা প্রদর্শন করবে না। শরিয়তের শাস্তি কার্যকর করবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এটাই ইমানের দাবী।

এরপর বলা হয়েছে— 'বিশ্বাসীদের একটি দল যেনো তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে'। জনসমক্ষে শাস্তি কার্যকর করা হলে তা হয় অধিকতর লাঞ্ছনা এবং অনেকের শিক্ষার কারণ। তাই এখানে বলা হয়েছে 'বিশ্বাসীদের একটি দল যেনো তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে'। এখানে 'ত্বইফাতুন' অর্থ দল। অর্থাৎ ওই দল যা চতুর্দিক থেকে ঘিরে থাকে। 'ত্বইফাহ' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'ত্বওফুন' থেকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন 'ত্বইফাহ্' এর ন্যূনতম সংখ্যা চারজন, যারা দণ্ডায়মান থাকবে চারদিকে। কেউ কেউ বলেছেন, দল হওয়ার জন্য তিন জনই যথেষ্ট। কারণ বহুবচনের ন্যূনতম সংখ্যা তিন। আর এখানে 'ত্বইফাতুন' ব্যবহৃত হয়েছে 'ত্বয়িফুন' এর বহুবচন হিসেবে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'দুটিদল' অর্থেও 'ত্বইফাতুন' ব্যবহৃত হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া ইন্ ত্বইফানি মিনাল মু'মিনীনা ক্বতালূ' (যদি মুসলমানদের দুটি দল যুদ্ধ করে)।

'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে 'ত্বইফাতুম্ মিনাশ্শাইয়ি' অর্থ কোনোকিছুর টুকরা, অথবা একের অধিক, অথবা এক থেকে হাজার পর্যন্ত বা কমপক্ষে দুই ব্যক্তি কিংবা একই ব্যক্তি। একজন উদ্দেশ্য হলে অর্থ হবে নিজে বা স্বয়ং।

আমি বলি, শব্দটি বহুবচন হওয়াও সম্ভব, যাকে ইঙ্গিত স্বরূপ প্রকাশ করা হয়েছে একবচনরূপে। একথাও ঠিক যে, 'রদিয়াহ্' ও 'গোলামাহ্' এর মতো এই শব্দটিও আধিক্যবাচক। নাখয়ী ও মুজাহিদ বলেছেন, কমপক্ষে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বলে ত্বইফাহ'। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এই অর্থটি প্রকাশ পেয়েছে।

ইমাম আহমদ, আতা, ইকরামা ও ইসহাক বলেছেন, দুই অথবা ততোধিক লোকের দলকে বলে 'ত্বইফাহ'। হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেন। জুহুরী ও কাতাদার অভিমতও এরকম। ইমাম মালেক ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, 'দল ' এর সংখ্যা চারজন। ব্যভিচারের সাক্ষ্যপ্রদাতার সংখ্যাও চারজন। হাসান বসরীর মতে 'দল' অর্থ দশ অথবা ততোধিক সংখ্যক লোকের দল। আমি বলি, এই অভিমতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা আলোচ্য বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্প্রচার।

www.eelm.weebly.com

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

❒ ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা অংশীবাদিনীকেই বিবাহ করিবে এবং ব্যভিচারিণী— তাহাকে কেবল ব্যভিচারী অথবা অংশীবাদীই বিবাহ করিবে, বিশ্বাসীদিগের জন্য ইহাদিগকে বিবাহ করা অবৈধ।

আবু দাউদ, তিরমিজি ও হাকেম আমর ইবনে শোয়াইব থেকে, তিনি শোয়াইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, মারছাদ নামক এক লোক মক্কা থেকে কতিপয় বন্দীকে নিয়ে হাজির হলো মদীনায়। মক্কায় ছিলো তার এক বান্ধবী। সে রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার ওই বান্ধবীকে বিবাহ করার অনুমতি চাইলো। রসুল স. নিশ্চুপ রইলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। তিনি স. মারছাদকে আয়াত খানি পাঠ করে শোনালেন এবং বললেন, তুমি তাকে বিবাহ কোরো না।

নাসাঈ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেন, উম্মে মাহযুল নাম্নী এক ভ্রষ্টা মহিলাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন জনৈক সাহাবী। তখনই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

সাঈদ ইবনে মনসুরের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহ্ যখন ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা করলেন, তখন কয়েকজন সুন্দরী ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কেউ কেউ। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, মদীনায় হিজরতকারী সাহাবীগণের অনেকেই ছিলেন রিক্ত, নিঃস্ব, আপনজন ও আশ্রয়চ্যুত। মদীনায় তখন বাস করতো কতিপয় ধনাঢ্য মহিলা। নিঃসম্বল সাহাবীগণ স্বচ্ছলতা লাভের আশায় তাঁদেরকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যখন তাঁরা রসুল স. সকাশে এ বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলো তখনই। বলা হলো, ওই সকল রমণীকে বিবাহ করা বিশ্বাসীদের পক্ষে সঙ্গত নয়। কারণ তারা পৌত্তলিক। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন আতা ইবনে আবী রেবাহ্, মুজাহিদ, কাতাদা, জুহরী ও শা'বী। আউফীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যাও এরকম।

আমি বলি, অপরিণত সূত্রে সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে আবী শায়বাও এরকম বর্ণনা করেছেন। বাগবী লিখেছেন, ইকরামা বলেছেন, মক্কা ও মদীনার কতিপয় মহিলা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তন্মধ্যে

www.eelm.weebly.com

নয়জন মহিলা ছিলো চিহ্নিত পতিতা। তারা তাদের তাঁবুর সামনে পতাকা উত্তোলন করে রাখতো। তাদের একজনের নাম ছিলো উম্মে মাহজুল। সে ছিলো সায়েব ইবনে সায়েব মাখজুমীর দাসী। মূর্খতার যুগে অনেকে তাদের দাসীদেরকে দিয়ে পতিতাবৃত্তি করাতো এবং ভক্ষণ করতো তাদের উপার্জন। ইসলামের আবির্ভাবের পর পর কোনো কোনো মুসলমানের ইচ্ছা হলো, তাঁরা ওই সকল পতিতাকে বিবাহ করবেন এবং তাদের দ্বারা অর্থ উপার্জন করবেন। তাঁদের একজন উম্মে মাহজুলকে বিবাহ করার জন্য রসুল স. এর অনুমতিপ্রার্থী হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

আলোচ্য আয়াত এবং উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের আলোকে ইমাম আহমদ বলেন, ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী তওবা না করা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে বিবাহ জায়েয নয়। তওবা করার পর তাদেরকে আর ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী বলাও যাবে না। (কারণ হাদিস শরীফে এসেছে, পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী নিষ্পাপ)। অন্য ইমামত্রয় বলেন, ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর বিবাহ শুদ্ধ। বাহ্যতঃ একথা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিপন্থী নয়। কারণ এখানকার নিষিদ্ধতা এসেছে একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তাই সাধারণভাবে এই বিধানটি প্রযোজ্য নয়। এটাই আলোচ্য আয়াতের ভাবগত ব্যাখ্যা। স্বভাবতই ব্যভিচারীরা হয় দুষ্ট প্রকৃতির। তাই পুণ্যবতী নারীর প্রতি তারা আকৃষ্ট হয় না। ব্যভিচারিণীরাও সাধারণতঃ চায়না পুণ্যবান স্বামী।

লক্ষণীয়, পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয়ের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা অনুসারে প্রথমে ব্যভিচারিণীর উল্লেখ হওয়াই ছিলো সুসমঞ্জস। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে ব্যভিচারীর কথা। এরকম করার উদ্দেশ্য, এখানে প্রধানতঃ পুরুষদের বিবাহেচ্ছার কথা বলা হয়েছে। ব্যভিচারের কথা বলা এখানে মূল উদ্দেশ্য নয়। তাই বিবরণ এসেছে এখানে বিপরীত দিক থেকে।

সর্বশেষ আলোচিত তাফসীরের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— বিশ্বাসীগণকে অপ্রীতিকর বিষয়াবলী থেকে বেঁচে থাকতে হবে। ইমাম মালেক তাই বলেছেন, ইমানদার পুরুষ-নারীর জন্য ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর সঙ্গে বিবাহবন্ধ হওয়া মাকরূহে তাহ্‌রিমা।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো আলেমের মতে আলোচ্য আয়াতের 'বিবাহ' শব্দটির অর্থ 'সহবাস'। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীরা তাদের সমস্বভাবসম্পন্ন নারী-পুরুষ অথবা অংশীবাদী নারী-পুরুষ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে যৌনক্ষুধা মেটায় না। এরকম ব্যাখ্যার প্রবক্তা সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও জুহাক। তাঁরা আবার এমতো ব্যাখ্যাকে সম্পৃক্ত করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে।

www.eelm.weebly.com

জায়েদ ইবনে হারুন বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য একথা বলা যে— ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী যদি হালাল মনে করে পরস্পরের সঙ্গে তাদের কামপ্রবৃত্তি নিবারণ করে, তবে তারা অবিশ্বাসী, আর যদি হারাম মনে করে এ কাজ করে, তবে তারা ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী।

আলেমগণের একটি দল মনে করেন, এখানে না সূচক বাক্য 'লা ইয়ানকিহ্' (বিয়ে করবেনা) কথাটির অর্থ হবে নিষেধাজ্ঞাসূচক— অথাৎ সে যেনো বিয়ে না করে। কোনো কোনো ক্বেরাতে এমন পাঠ বিদ্যমান। যেনা কারিনীর সাথে বিবাহের নিষিদ্ধতা তো স্ব স্থানে বিদ্যমান। তবে এ নিষিদ্ধতা সর্ব সাধারণের জন্য নয়। এখানকার নিষিদ্ধতা প্রযোজ্য কেবল ওই সকল সহায়-সম্বলহীন মুহাজির সাহাবীগণের বেলায় যারা ব্যভিচারিণীদেরকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।

আমি বলি, একথা ঠিক নয়। অর্থাৎ এখানকার নিষিদ্ধতা কেবল সাহাবীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যদি তাই হতো তবে আয়াতের বক্তব্যটি দাঁড়াতো এরকম— বিশ্বাসীগণ বিবাহ করবে কেবল বিশ্বাসিনীগণকে; ব্যভিচারীনি অথবা অংশীবাদীনিদেরকে নয়। তাছাড়া সাহাবীগণের উক্তিও সীমাবদ্ধতাবিরোধী। হজরত ইবনে মাসউদ ব্যভিচারিণীকে বিবাহবদ্ধ হওয়াকে হারাম সাব্যস্ত করতেন এবং বলতেন, ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী বিবাহবদ্ধ হলে সর্ব অবস্থায় ব্যভিচারলিপ্তই থেকে যায়।

হাসান বলেছেন, শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যভিচারী বিবাহ করে না অথবা করবে না শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যভিচারিণী ছাড়া অন্য কাউকে এবং শাস্তিপ্রাপ্তা ব্যভিচারিণী বিবাহ করে না অথবা করবে না শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যভিচারী ব্যতীত অন্য কাউকে। আমর ইবনে শোয়াইবের মাধ্যমে আবু মাকবরী সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী বিবাহ করে না অথবা করবে না তাদের সমস্বভাব সম্পন্ন ছাড়া অন্য কাউকে। এসকল উক্তির সারসংক্ষেপ এই যে, এখানকার নিষিদ্ধতা অনির্দিষ্ট। আর এই আয়াত রহিতও নয়।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব ও তাফসীরকারগণের একটি দলের অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়াত মনসুখ। এর নাসেখ (রহিতকারী) আয়াত হচ্ছে 'ওয়ানকিহুল আয়ামা মিনকুম'(তোমাদের মধ্য থেকে বিধবাদের বিয়ে করো)। এভাবে বিধবাবিবাহের অনুমতির সাথে সাথে ব্যভিচারিণী বিবাহেরও অনুমতি দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ব্যভিচারিণীরাও বিধবাগণের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যভিচারিণীর বিবাহ হজরত জাবের থেকে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত হয়। হাদিসটি এই— একবার এক লোক রসুল স. এর মহান

www.eelm.weebly.com

সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার স্ত্রী স্পর্শকারীর (আহ্বানকারীর) হাতকে প্রতিহত করে না। রসুল স. বললেন, ওকে তালাক দিয়ে দাও। লোকটি বললো, সে তো সুন্দরী। আর তাকে আমি ভালোওবাসি। তিনি স. বললেন, তাহলে আস্বাদন করো। অপর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বললেন, তাহলে তুমি তাকে রেখে দাও। তিবরানী ও বায়হাকীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে, তিনি আবদুল করিম ইবনে মালেক থেকে, তিনি আবু জোবায়ের থেকে, তিনি হজরত জাবের থেকে। ইবনে আবু জাবের বলেন, আমি এই হাদিস সম্পর্কে আমার পিতার কাছে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমার নিকট মোহাম্মদ বিন আবদে কাছীর মু'তামাবের বরাত দিয়ে আবদুল করিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আবদুল করিম বলেন, আমার কাছে বনী হাশেমের একজন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস থেকে বলেছেন, আবু জোবায়ের এক লোক রসুল স. এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলো। এর পরের বিবরণ পূর্ববৎ।

সুফিয়ান সওরীও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ওই লোকটির নাম ছিলো হিশাম। তিনি ছিলেন বনী হাশেমের আজাদ করা গোলাম। আবু দাউদ ও নাসাঈও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে উমাইরের পদ্ধতিতে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। নাসাঈ একথাও লিখেছেন যে, একজন প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী হাদিসটির সূত্রপরম্পরাকে উন্নীত করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস পর্যন্ত। অপর বর্ণনাকারী হাদিসটিকে তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেননি। সুতরাং বলা যেতে পারে, বর্ণনাটি পরিণত শ্রেণীর নয়, বরং অপরিণত শ্রেণীর। নাসাঈ ও আবু দাউদ এর সূত্রপ্রবাহকে সংযুক্ত করতে পেরেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, বর্ণনাটির সূত্রপ্রবাহ বিশুদ্ধ। নববীও একে বিশুদ্ধ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে জাওজী হাদিসটি মূলগতভাবে লিখেছেন শুদ্ধ সূত্রের সঙ্গে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট করেছেন মাওদ্বুয়াতের(কল্পিত হাদিসের) মধ্যে। ইমাম আহমদ বলেছেন, এ প্রসঙ্গে কোনো হাদিস নেই, বরং পুরো বিবরণটিই ভিত্তিহীন।

দ্রষ্টব্যঃ উপরে বর্ণিত হাদিসের 'আমার স্ত্রী স্পর্শকারীর (আহ্বানকারীর) হাতকে প্রতিহত করে না' কথাটির অর্থ উদ্ধার করতে গিয়ে কতিপয় আলেম বলেছেন, বক্তব্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— কেউ যদি তাকে স্পর্শ করতে চায় তবে সে তাকে বাধা দেয় না। এ রকম ব্যাখ্যা করেছেন নাসাঈ, আবু উবাইদা, ইবনুল আরাবী খাত্তাবি, ফারইয়াবি ও নববী। এই অর্থটিকে গ্রহণ করে বাগবী ও রাফেয়ী বলেছেন, ব্যভিচারিণীর সঙ্গে বিবাহবন্ধ হওয়া জায়েয। কোনো কোনো আলেম কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে — আমার স্ত্রী যাচ্ঞাকারীদেরকে ফেরায় না।

www.eelm.weebly.com

যে যা চায় সে তাকে তাই দিয়ে দেয়, অতিরিক্ত খরচ করে। ইমাম আহমদ, আসমায়ী ও মোহাম্মদ ইবনে নসর এই অর্থটিকেই গ্রহণ করেছেন। এই অর্থটিকে গ্রহণ করলে ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করা বৈধ— একথা মানা যায় না।

বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব এক যুবক ও এক যুবতীকে ব্যভিচারের অপরাধে প্রহার করার পর তাদেরকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু যুবকটি অসম্মত হয় (এতে করে বুঝা যায় ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর বিবাহ জায়েয)। তিবরানী ও দারাকুতনীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসুল! পুরুষ-রমণী ব্যভিচারের পর যদি পরস্পরকে বিবাহ করতে সম্মত হয়, তবে তার বিধান কী? তিনি স. বললেন হারাম কখনো হালালকে হারামে পরিণত করতে পারে না। আবদুর রাজ্জাক ও আবী শায়বা তাদের আপন আপন গ্রন্থে লিখেছেন, এক লোক একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি কেউ কোনো মহিলাকে সম্ভোগ করার পর তাকে বিয়ে করতে চায়, তবে তার সম্পর্কে বিধান কী? তিনি বললেন প্রারম্ভে ব্যভিচার পরিশেষে বিবাহ।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৪

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰنِينَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ۝

☐ যাহারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাহাদিগকে আশিটি কশাঘাত করিবে এবং কখনো তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না; ইহারাই সত্যত্যাগী।

'ইয়ারমূনা' অর্থ অপবাদ আরোপ করে, সাধ্বী রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়। যেমন বলে— তুমি ব্যভিচার করেছো, অথবা তুমি ব্যভিচারিণী। এই ব্যাখ্যাটি সকল তাফসীরকার ও ফেকাহ্‌বিদগণের নিকট গ্রহণযোগ্য। কেননা ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থিত করার শর্ত কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং চারজনের একত্র সাক্ষ্য ছাড়া কাউকেই ব্যভিচারিণী বলা যাবে না। আর এ বিধান প্রযোজ্য হবে কেবল ব্যভিচারের বেলায়। তাই আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, অন্য কোনো গোনাহের অপবাদপ্রদাতার উপরে ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি প্রযোজ্য নয়। বরং বিচারক অন্য সকল ক্ষেত্রে যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচার বিশ্লেষণ করতে পারবেন। তেমনি ইশারা-ইঙ্গিতে যদি কেউ কোনো রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তবু তার উপরে শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। যেমন কেউ বললো 'আমি তোমার সঙ্গে ব্যভিচার

www.eelm.weebly.com

করিনি'। এরকম কথার অর্থ দাঁড়ায়— তোমার যৌনসঙ্গী আমি নই, অন্য কেউ। এমতো অভিমত পোষণ করেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, সুফিয়ান সওরী, ইবনে সিরীন এবং হাসান ইবনে সিলাহ। কিন্তু ইমাম মালেক ও এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের মত এই যে, ইঙ্গিতজাত অপবাদের ক্ষেত্রেও শাস্তি আরোপ করা যাবে। কেননা জুহুরী মালেকের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, হজরত ওমরও এমতোক্ষেত্রে হদ প্রয়োগ করতেন। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলীও ইঙ্গিতে ব্যভিচারের অপবাদদানকারীর উপরে হদ আরোপ করতেন।

ইঙ্গিতে অপবাদ আরোপ প্রকাশ্যে অপবাদ আরোপের মতোই। কিন্তু এদু'টো বিষয় অবিকল এক নয়। তাই আমি বলি ইঙ্গিতের ক্ষেত্রে শাস্তি আরোপ করা যায় না। আর ইঙ্গিত ইঙ্গিতই। প্রকাশ্য বিধানের আওতায় তা আসে না। তাই ইদ্দত পালনকারিণীকে ইঙ্গিতে বিবাহের বারতা জানিয়ে দেয়া যায়, প্রকাশ্যে যায় না। যেমন এরশাদ হয়েছে — 'ওয়ালা জুনাহা আ'লায়কুম ফী মা আররদ্বতুম বিহী মিন খিত্ববাতিন নিসা'।

'আল মুহসানাত' অর্থ সাধ্বী রমণী। উল্লেখ্য, সাধ্বী রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ প্রদান যেমন অপরাধ, তেমনি অপরাধ নিষ্কলংক পুরুষের চরিত্র হনন করাও। তাই আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, দু'টো অপরাধই সমগুরুত্বসম্পন্ন। আর আলোচ্য আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেই এখানে এসেছে কেবল সাধ্বী রমণীর কথা। এরকমও হতে পারে যে, নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপরাধ মানুষের দৃষ্টিতে পুরুষের প্রতি অপবাদারোপ অপেক্ষা অধিক নিন্দনীয়। তাই এখানে বলা হয়েছে কেবল সাধ্বী রমণীর অপবাদের কথা।

আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে 'ইহসান্' দ্বারা বুঝানো হয়েছে স্বাধীনা, প্রাপ্তবয়স্কা, জ্ঞানবতী, মুসলমান হওয়া ও সচ্চরিত্রা হওয়াকে, ইতোপূর্বে ব্যভিচারের অপবাদপ্রাপ্ত না হওয়াকে। রসুল স. ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদতের সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করে, সে 'মুহসিন' নয়। একথার অর্থ— সে মুসলমান নয়।

কেউ জীবনে কখনো ব্যভিচার করার পর যদি তওবা করে, এমতাবস্থায় এক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর যদি কেউ তাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তবে অপবাদকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কেননা তার কথা সত্যও হতে পারে। তবে তাকে ভর্ৎসনা করা যাবে। কারণ সে একজন তওবাকারীকে তার অতীতের পাপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেছে, যে পাপ থেকে সে তওবার মাধ্যমে মুক্ত। এভাবে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী, শিশু ও পাগলকে যে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, সে-ও

www.eelm.weebly.com

শাস্তিযোগ্য নয়। তবে দাউদ জাহেরী বলেন, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে যে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, সে শাস্তিযোগ্য। উল্লেখ্য, ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে আশিটি বেত্রাঘাত।

আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে— 'যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে'। একথার অর্থ— যাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হয়, সে যদি তা অস্বীকার করে তবে অপবাদকারীকে তার বক্তব্যের সমর্থনে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। এরকম করতে পারলে সে আর অপবাদদাতা হিসেবে পরিগণিত হবে না, তাই আশি বেত্রাঘাতের শাস্তিও তার উপরে বর্তাবে না। তখন শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে ব্যভিচারী অথবা ব্যভিচারিণীর উপর। কিন্তু যদি সে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে, তবুও সে দোষমুক্ত হতে পারবে না, কিন্তু সে এড়িয়ে যেতে পারবে আশি বেত্রাঘাতের শাস্তি। কারণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হলেও সাক্ষীর সংখ্যা সে পূর্ণ করতে পেরেছে। ইমাম আবু হানিফা এরকমই বলেছেন। উল্লেখ্য, চারজন সাক্ষীর একত্রায়নের বিধান বলবৎ করা হয়েছে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য, যাতে অভিযুক্তরা অব্যাহতি পেয়ে যায়। কিন্তু এ শর্ত এজন্য করা হয়নি যে শর্ত পুরোপুরি পূরণ না করতে পারলে অপবাদকারীকে শাস্তি পেতে হবেই। আর যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেই তার অপরাধ একবার স্বীকার করে, তবু সে শাস্তিযোগ্য হবে না, অপবাদকারীও হবে না শাস্তির উপযুক্ত।

এখানে 'শুহাদা' (সাক্ষ্য) অর্থ ওই লোকের সাক্ষ্য যে শরিয়ত অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য। সুতরাং অন্ধ, অপবাদের শাস্তিপ্রাপ্ত, ক্রীতদাস— এদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তারা কাউকে অপবাদ দিলে নির্বিচারে তাদের উপরেই শাস্তি আরোপ করতে হবে। আর ক্রীতদাস তো কখনোই সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য নয়। কিন্তু যারা দুষ্ট (ফাসেক), তাদের সাক্ষ্য দ্বারাও ব্যভিচার প্রমাণ করা যাবে না। তাই তাদের উপর অপবাদের শাস্তিও প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ ফাসেক হওয়ার কারণে স্বভাবতই তাদের সাক্ষ্য দুর্বল। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেন, ফাসেক অপবাদদাতার উপরেও অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে। কারণ সে ক্রীতদাসের মতো সাক্ষ্যদানের যোগ্যই নয়।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, যারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে না জেনেও কাউকে ব্যভিচারের অপরাধে অভিযুক্ত করে তাদের উদ্দেশ্য মন্দ। তাদের এমতো কর্ম মুসলমানের সম্মানহানির কারণ। তাই তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে আশি বেত্রাঘাত। হাকেম, আবু নাঈম, আবু মুসা ও বায়হাকী বর্ণনা করেন, একবার হজরত ওমরের সামনে হজরত মুগীরা

www.eelm.weebly.com

ইবনে শো'বার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করলেন হজরত আবু বকরা, নাফে ও শিবল ইবনে মা'বাদ। চতুর্থ সাক্ষী ছিলেন যিয়াদ। তাঁর সাক্ষ্য ছিলো অস্পষ্ট। তাই হজরত ওমর তিনজনকে কশাঘাত করলেন। ঘটনাটি ঘটেছিলো সাহাবীগণের একটি দলের সামনে। তাঁদের কেউই হজরত ওমরের এমতো সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেননি। সুতরাং বুঝতে হবে সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যসম্মত। বোখারী ঘটনাটি বিবৃত করেছেন তা'লীক পদ্ধতিতে। আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন সওরীর মাধ্যমে সুলায়মান তাইমির বরাত দিয়ে নাহজির বর্ণনাক্রমে। এ বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে বলা হয়েছে, যখন যিয়াদ তাঁর সাক্ষ্য পরিবর্তন করেন, তখন হজরত ওমর বলেন, এ লোক সাক্ষ্যপ্রদানের উপযুক্ত নয়। একথা বলেই তিনি অন্য তিনজনকে করেন কশাঘাত।

'ফাজলিদুহুম' অর্থ তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে। অর্থাৎ তাদেরকে একারণে কশাঘাত করবে যে, অপবাদ আরোপের মাধ্যমে ক্ষুণ্ন হয় বান্দার হক, খর্ব হয় মান-সম্মান। সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র হকই অগ্রগণ্য। কিন্তু বান্দার সম্মান অসম্মানের বিষয়টিও আল্লাহ্‌র হকের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সাক্ষ্যদাতাকে হতে হবে স্বাধীন। ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। তবে ফকিহ্‌গণের ঐকমত্য এই যে, ক্রীতদাস কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ রটালে তাকে কশাঘাত করতে হবে চল্লিশটি। তাঁরা বিষয়টিকে তুলনা করেছেন ব্যভিচারের শাস্তির সঙ্গে। অবিবাহিত স্বাধীন ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীর শাস্তি একশত কশাঘাত। আর ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর শাস্তি অর্ধেক, অর্থাৎ পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। ব্যভিচারিণী ক্রীতদাসী সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফাআ'লাইহিন্না নিসফু মা আ'লাল মুহসানাতি মিনাল আ'জাবি'।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ্ ইবনে আমের ইবনে রবীয়া বলেছেন, আমি হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আলীর শাসনামল দেখেছি। তাঁরা ব্যভিচারের অপবাদদানকারী ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করতেন। বর্ণনাটি ইমাম মালেকও লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর মুয়াত্তায়। কিন্তু সেখানে হজরত আবু বকরের নাম নেই। ইমাম আওজায়ী বলেন, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর অপবাদকারীর শাস্তি স্বাধীন অপবাদদাতার মতোই— আশিটি কশাঘাত।

অপবাদপ্রদাতাদের শাস্তি দু'টি— আশিটি কশাঘাত এবং তাদের সাক্ষ্য ভবিষ্যতে গ্রহণ না করা। তাই এখানে বিচারককে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে 'আশিটি কশাঘাত করবে' এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না'।

www.eelm.weebly.com

'তারাই সত্যত্যাগী' বলে এখানে দূর করা হয়েছে একটি সন্দেহকে। সন্দেহটি এই— সন্দেহ সৃষ্টি হলেই তো অভিযুক্তদের উপর শাস্তি রহিত হয়ে যায়। তাহলে আবার অভিযোগকারীকে অপবাদদাতা সাব্যস্ত করা হবে কেনো। আর কেনোই বা সে হবে শাস্তির উপযোগী। পূর্ণ সাক্ষী (চারজন) সে উপস্থিত করতে পারেনি বটে, কিন্তু এমন হওয়াও তো সম্ভব যে তার কথা সত্য। আর সে কেবল আল্লাহ্‌র বিধানকে সমুচ্চ করার অভিপ্রায়েই ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করেছিলো। অন্য কোনো অসৎ উদ্দেশ্য তার ছিলো না। কিন্তু এমতো সন্দেহ যে অযথার্থ সে কথা বুঝাতে সব শেষে বলা হয়েছে 'তারাই সত্যত্যাগী'। অতএব বুঝতে হবে, ব্যভিচারের অপবাদ প্রদাতার নিয়ত কিছুতেই ভালো হতে পারে না। কেবল মুসলমানের সম্মানহানিই ছিলো তার এমতো অপবাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। তাই সে শাস্তিরও যোগ্য।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, এখানকার 'কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না' বাক্যটি একটি ভিন্ন বাক্য। ব্যভিচারের অপবাদের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ অপবাদের শাস্তি প্রদানের শাস্তি কেবলই আশিটি কশাঘাত। সাক্ষ্য গ্রহণ করা না করার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাই শাস্তি প্রয়োগ করা বিচারকের কাজ, কিন্তু কারো সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে কিনা— এরকম বলা তাঁর কাজ নয়। বরং এখানে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করার কারণ বলা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে এভাবে 'তারাই সত্যত্যাগী'। অর্থাৎ সত্যত্যাগী যারা, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। আমি বলি, সাক্ষ্য গ্রহণ না করার নির্দেশটি অপবাদের শাস্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। 'কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না' কথাটির মধ্যে রয়েছে বেত্রাঘাতের নির্দেশ অপেক্ষা অধিক হুঁশিয়ারি ও ভর্ৎসনা। কারণ এ লাঞ্ছনা স্থায়ী। সে কথা প্রকাশ করতেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'আবাদান' (কখনো)। প্রকাশ থাকে যে, ফাসেক বা সত্যত্যাগীদের সাক্ষ্য চিরদিনের জন্য অগ্রাহ্য নয়। অগ্রাহ্য ততদিন পর্যন্ত, যতদিন তাদের সত্যত্যাগপ্রবণতা অটুট থাকে।

একটি সন্দেহঃ 'কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না' কথাটির উদ্দেশ্য এই যে, যতক্ষণ অপবাদপ্রদাতা অপবাদকর্মে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। যখন তওবা করবে তখন তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। যেমন বলা হয়, কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ তারা কাফের থাকে। কিন্তু যখন সে কুফরী থেকে তওবা করবে, তখন তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। এভাবে কাফেরের সঙ্গে ফাসেকের (সত্যত্যাগীর) তুলনা উত্থাপন করা কতটুকু সঙ্গত?

www.eelm.weebly.com

সন্দেহের জবাবঃ এরকম তুলনা ঠিক নয়। কাফেরের সাক্ষ্য ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা যায় না, যতক্ষণ সে কাফের থাকে— একথা ঠিক। তাই এমতোক্ষেত্রে 'আবাদান (কখনো) শব্দটি ব্যবহার্য নয়। কিন্তু ফাসেকের ক্ষেত্রে এখানে এই শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে তীব্র ও তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা। আর ফাসেকীকেই নির্ণয় করা হয়েছে এর প্রধান কারণ। যেমন বলা হয়— তোমার বন্ধু জায়েদের সঙ্গে সদাচরণ করো। এর অর্থ— জায়েদ যেহেতু তোমার বন্ধু, সেকারণেই তার সঙ্গে সদাচরণ করো।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৫

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

তবে যদি ইহার পর উহারা তওবা করে ও নিজেদের কার্য সংশোধন করে — আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেন, এখানকার 'ইল্লাল্লাজীনা' (তবে যদি তারা) ব্যতিক্রমবোধক কথাটি পূর্ববর্তী আয়াতের শেষ বাক্য (তারা সত্যত্যাগী) কথাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— কিন্তু যারা তওবা করে ও নিজেদের আমল সংশোধন করে নেয়, তারা আর সত্যত্যাগী বা ফাসেক থাকে না। আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কারণ আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ার্দ্র। এই মর্মার্থটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, তওবা দ্বারা অপবাদের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায় না, কেবল ফাসেক হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, ফেকাহ্ শাস্ত্রের রীতি অনুসারে ইমাম আবু হানিফার অভিমত এই যে, কয়েকটি বাক্যের পরে যদি ব্যতিক্রমবোধক কোনো বাক্য শুরু হয়, তবে তা সম্পর্কযুক্ত হবে সর্বশেষ বাক্যটির সঙ্গে। কিন্তু কোনো বিশেষ ইঙ্গিত থাকলে ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটির সম্পর্ক ঘটতে পারে পূর্ববর্তী সকল বাক্যের সঙ্গে।

ইমাম আবু হানিফার বর্ণিত তাফসীরে রয়েছে কয়েকটি দলিল। যেমন— ১. ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের সম্পর্ক কেবল পূর্ববর্তী বাক্যসমূহের শেষ বাক্যের সঙ্গে। ২. শেষ বাক্যটির বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী বাক্যসমূহের বিষয়বস্তু থেকে পৃথক, তার বাকরীতিও স্বতন্ত্র, যদিও সর্বনাম ইঙ্গিতসূচক পদের দিক থেকে এর সম্পৃক্তি রয়েছে পূর্বোক্ত সকল বাক্যের সঙ্গে। ৩. ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের জন্য শর্ত হচ্ছে— ব্যতিক্রম ও ব্যতিক্রমক উভয়টি থাকবে সম্মিলিত। এমতোক্ষেত্রে শেষ

www.eelm.weebly.com

বাক্যটি তার পূর্ববর্তী বাক্যসমূহ ও ব্যতিক্রম বোধক বাক্যের মধ্যে সৃষ্টি করেছে অন্তরায়। ৪. শুধুমাত্র ব্যতিক্রমের একটি স্বতন্ত্র অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে বলেই পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের সম্বন্ধ করা হয়। এই আবশ্যকতা পরিপূরিত হতে পারে কেবল আর একটি বাক্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করলে। এখন কথা হচ্ছে, এমতো সম্পৃক্তি ঘটেছে শেষ বাক্যটির সঙ্গে যা বিদ্বজ্জন কর্তৃক সমর্থিত। সুতরাং অন্য বাক্যের সঙ্গে এর সম্পৃক্তি নিষ্প্রয়োজন। অতএব বুঝতে হবে, পূর্ববর্তী বাক্যগুলো ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের উপরে নির্ভরশীল। কারণ সেগুলোর বিধান পরিবর্তিত হওয়া অত্যাবশ্যক। আর ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের দ্বারাই বিধান রূপান্তরিত হয়। তাই শেষ বাক্যের সঙ্গে ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটিকে সম্পর্কযুক্ত করলেই এই রূপান্তরণের পূর্ণতা সাধিত হয়।

একটি সন্দেহঃ 'ওয়াও' (এবং) সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমেই বাক্যসমূহ সংযোজিত হয়। এখানেও তাই হয়েছে। সুতরাং সকল বাক্যই তো ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত। তবে কেনো বলা হবে, কেবল শেষ বাক্যের সঙ্গেই ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত?

সন্দেহের অপনোদন ঃ সংযোজনের উদ্দেশ্য এরকম নয় যে, সংযোজিত বাক্যগুলো কেবল একটি বিধানকে প্রকাশ করবে। বরং প্রতিটি বাক্যের বিধান হতে পারে পৃথক পৃথক। এখানেও তেমনটি ঘটেছে। মনে রাখতে হবে, সংযোজনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল বাক্যকে একটি বিভক্তির অন্তর্ভুক্ত করা, প্রত্যেক বাক্যকে একটি ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের অন্তর্ভূত করা নয়।

তওবার দ্বারা ফাসিকী (সত্যত্যাগপ্রবণতা) অপসারিত হয়, শাস্তি রহিত হয় না। ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের অভিমত হচ্ছে, অন্তরায়বিবর্জিত অবস্থায় আলোচ্য সংযোজ্য ও সংযোজিতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটি সম্বন্ধিত হয়। তাই তাঁর মতে তওবার দ্বারা অপসারিত বা রহিত হয় অপবাদের শাস্তি। আর জমহুরের মতে শাস্তি রহিত হয় না।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, এখানে ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটির সম্বন্ধ হবে শেষ বাক্য দুটোর সঙ্গে। 'কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না' বাক্যটি 'আশিটি কশাঘাত করবে' বাক্যটির সঙ্গে সম্পর্কহীন। তাই এখানে ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটির সম্পর্ক 'আশিটি কশাঘাত করবে' এর সঙ্গে হবে না।

বায়যাবী লিখেছেন, আগের তিনটি বাক্যের সঙ্গেই ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত হবে। তবে একথা বলা যাবে না যে, তওবা দ্বারা শাস্তি রহিত হয়। কারণ শাস্তি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত পরিপূর্ণ তওবা অর্জিত হয় না। অথবা তওবা

www.eelm.weebly.com

অর্জিত হয় যাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে, তার নিকটে ক্ষমা চাইলে এবং অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দিলে।

আমি বলি, তওবার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। সুতরাং তওবার দ্বারা শাস্তি রহিত হলে শরিয়তের শাস্তি আর ওয়াজিব বলে স্বীকৃতি পাবে না। একথার উপরে ভিত্তি করে ইমাম শাফেয়ী বলেন, অপবাদপ্রদাতার শাস্তি কেবল অপবাদের কারণেই নাকচ হয়ে যাবে, অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি বিচার প্রার্থনা করুন, অথবা না করুক। কেননা অপবাদপ্রদাতা ফাসেক। তাই তার সাক্ষ্য অগ্রহনীয়। তবে সে যদি আপন কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে তওবা করে এবং তার স্বভাব- চরিত্র সংশোধন করে নেয় তবে তার সাক্ষ্য আর অগ্রহণীয় থাকবে না। আশা করা যায় শাস্তিভোগের পর সে লজ্জিত হবে এবং তওবা করবে অথবা শাস্তিভোগের পূর্বেই তওবার মাধ্যমে বিদূরিত হয়ে যাবে তার ফাসেকী এবং সাক্ষ্য গ্রহণ না করার কলংক।

বাগবী লিখেছেন, এরকম ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে হজরত ওমর ও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, শা'বী, ইকরামা, জুহুরী এবং ওমর ইবনে আযীযের অভিমতও এরকম।

বাগবী আরো লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ী বলেন, শাস্তিভোগের পর অপবাদের কাফ্‌ফারা পূরণ হয়ে যায়। অপবাদদাতার স্বভাব-চরিত্র হয়ে যায় পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উত্তম। তাকে আর তখন পাপী বলা যায় না। তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ না করার আর কী কারণ থাকতে পারে? সে তো তখন নির্দোষ?

আমরা বলি, আমাদের নিকট অপবাদপ্রদাতার সাক্ষ্য কেবল অপবাদ দেয়ার কারণেই শাস্তি প্রয়োগের পূর্বেই অগ্রাহ্য হয়ে যায়, অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি তার শাস্তি দাবি করুক আর না করুক, কেননা অপবাদ দেয়ার কারণেই সে ফাসেক। এখন অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি শাস্তি দাবি না করলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে তওবা না করবে, সংশোধিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা যাবে না। হজরত ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, অপবাদদাতার তওবা করার অর্থ প্রদত্ত অপবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। এভাবে সে যদি তার নিজের কথাকেই (অপবাদকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করে তবে ভবিষ্যতে তার সাক্ষ্যকে আর অগ্রহণীয় ভাবা যাবে না। বর্ণনাটিকে যদি যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসের শ্রেণীভূত করা যায়, তবে এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়ে যায় ইমাম শাফেয়ীর অভিমত।

আমি বলি, একক বর্ণিত হাদিস যদি কোরআনের প্রকাশ্য বক্তব্যের পরিপন্থী হয়, তবে তাকে গ্রহণ করা যায় না। কোরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে 'কখনো তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না'। একথাও সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, তওবা করলে এবং

www.eelm.weebly.com

সংশোধিত হলেই কেবল তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। দূর হয়ে যাবে তার ফাসেকীর কলংক। কিন্তু যদি অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, তবে আর কখনো তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না, চাই সে তওবা করুক অথবা না করুক। কেননা তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা হয়েছে বান্দার অধিকার ক্ষুণ্ন করার কারণে। আর বান্দার অধিকার তওবা দ্বারা রহিত হয় না।

দ্রষ্টব্য ঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, অপবাদের শাস্তির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্ ও বান্দা উভয়ের হক। বান্দার সম্ভ্রমহানির লজ্জাকে বিদূরিত করার জন্যই তাই দণ্ডবিধান করা হয়েছে আশিটি কশাঘাতের। এই দণ্ডবিধান প্রয়োগের ফলে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির বিশেষ উপকার অর্জিত হয়। এটাকেই আলেমগণ বান্দার হক বলে সাব্যস্ত করেছেন। এর মধ্যে এই রহস্যটিও নিহিত রয়েছে যে, এতে করে অপবাদপ্রদানপ্রবণতার অবসান ঘটে। মানবজাতি রক্ষা পায় ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে। তাই এটা আল্লাহ্রও হক। আবার বান্দার হক বলেই এ শাস্তি প্রয়োগ করতে বান্দাকেই হতে হবে বিচারপ্রার্থী। এভাবে বিচারভূত দাবি আর বাতিল হবে না। বিচারক বাদীর দাবি অনুসারে দণ্ডবিধান করবেন। আশ্রিত কাফেরের অপবাদের ক্ষেত্রেও তিনি এমতো দণ্ড বিধান করতে পারবেন। তবে শর্ত হচ্ছে মামলাটি হতে হবে তার দায়িত্বকালের মধ্যে। অর্থাৎ তাঁর সামনে সাক্ষ্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি দণ্ড কার্যকর করতে পারবেন না। আর যদি কেউ অপবাদ ও ব্যভিচার উভয় শাস্তির উপযুক্ত হয়, অথবা উপযুক্ত হয় চুরি ও অপবাদের শাস্তির, তবে প্রথমে কার্যকর করতে হবে অপবাদের শাস্তি। কেননা ব্যভিচার ও চুরি উভয় অপরাধের শাস্তি কেবলই আল্লাহ্র হক। আর অপবাদের শাস্তি হচ্ছে বান্দার হক। বান্দার হকই অগ্রগণ্য। উল্লেখ্য, অপরাধ স্বীকারের পর তা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করা যায় বটে, কিন্তু ব্যভিচারের সাক্ষ্যদান থেকে প্রত্যাবর্তন করা যায় না। আর অপবাদের শাস্তির সঙ্গে যেহেতু আল্লাহ্র হকও জড়িত, তাই অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি স্বয়ং অপবাদদাতাকে শাস্তি দিতে পারবে না। এ অধিকার রয়েছে কেবল বিচারকের। তবে সন্দেহ সৃষ্টি হলে অপবাদের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। কেননা এতে রয়েছে আল্লাহ্রও হক। আবার এ শাস্তি রহিত হলেও তা রক্তপণ বা জরিমানার মতো বিনিময়ে পরিণত হয় না। আর অপবাদদাতার নিকট থেকে কসম গ্রহণ করা যাবে। স্মর্তব্য, যদি এটা কেবলই বান্দার হক হতো, তবে সাক্ষ্যবিহীন অবস্থায় অপবাদদাতার নিকট থেকে কসম গ্রহণ করা হতো এবং গোলাম অপবাদদাতা হলে তার শাস্তি অর্ধেক হয়ে যেতো। আরো স্মর্তব্য, হক্কুল্লাহ্র ক্ষেত্রে যে শাস্তি ওয়াজিব হয়, সে শাস্তি গোলামের জন্য অর্ধেক হয়ে যায়। অতএব, বুঝা গেলো, অপবাদের শাস্তিও আল্লাহ্র হক। অবশ্য হক্কুল ইবাদের ব্যাপারে যে সকল শাস্তি রয়েছে সে সকল

www.eelm.weebly.com

শাস্তির পরিমাণে কমবেশী করা হকের বিষয়ে কমবেশী করার সমতুল। তাই বুঝতে হবে, স্বাধীন-গোলাম কারো সঙ্গে শাস্তির ন্যূনাধিক্যের কোনো সম্পর্ক নেই।

উপরে বর্ণিত সকল শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে ইমামগণ একমত হয়েছেন। আর অপবাদের শাস্তিতে হককুল্লাহ্ এবং হককুল ইবাদের একত্রায়ণের বিষয়টিও ইমামগণের দৃষ্টিতে ঐকমত্যসম্মত। কিন্তু এর মধ্যে কার হক অগ্রগণ্য সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ীর মতে, বান্দার হক অগ্রগণ্য। যেহেতু বান্দা মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার অভিমত এর বিপরীত। কেননা বান্দার হকের সংরক্ষণকারী হচ্ছে আল্লাহ্র হক। বান্দার হক আল্লাহ্র হকের সংরক্ষণকারী নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র হক বান্দা নিশ্চিত করতে সক্ষম নয়। তবে এই হক সে বাস্তবায়ন করতে পারে আল্লাহ্র প্রতিনিধিরূপে। উদ্ভূত মতানৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাবিত হয়েছে আরো অনেক মাসআলা। যেমন—

১. অপবাদের বিচারপ্রার্থী হওয়ার অধিকার অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী এরকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরকম অধিকার উত্তরাধিকারীদের নেই। কারণ আল্লাহ্র অধিকারে উত্তরাধিকারীরা সম্পৃক্ত হতে পারে না। উত্তরাধিকারীরা সম্পৃক্ত হতে পারে কেবল বান্দার হকের সঙ্গে, সে হক সম্মান বা সম্পদ যে বিষয়েরই হোক না কেনো। যেমন জিম্মাদারী, অভিভাবকত্ব ও সম্পদগত। অপবাদের শাস্তি এই তিন শ্রেণীর কোনোটার মধ্যেই পড়ে না। তাই উত্তরাধিকারীরা এক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থী হতে পারে না। বরং অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অপবাদের শাস্তি বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ অপবাদের শাস্তি প্রয়োগের পূর্বে যদি অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তবে অপবাদদাতার উপর থেকে শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী অবশ্য এর বিপরীত অভিমতের প্রবক্তা।

২. অপবাদদাতার উপরে শাস্তি নির্ধারিত হওয়ার পর যদি অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি তা মাফ করে দেয়, তবুও শাস্তি রহিত হবে না। এরকম বলেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম শাফেয়ী এবং এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু ইউসুফের অভিমত হচ্ছে, শাস্তি রহিত হয়ে যায়। যদি অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি বলে, সে আমাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়নি এবং তার সাক্ষ্য মিথ্যা, তবে সর্বসম্মত অভিমতে শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। কারণ তার এমতো অস্বীকৃতির কারণে অপবাদের অস্তিত্বই আর থাকে না। তা হলে শাস্তি আর ওয়াজিব থাকে কীভাবে? সুতরাং একথাও তখন বলা যাবে না যে, ওয়াজিবকে রহিত করে দেয়া হয়েছে। তবে, হ্যাঁ

www.eelm.weebly.com

কেসাসের প্রসঙ্গটি আবার ভিন্ন। এমতোক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রক্তপণ দিয়ে হত্যাকারীকে অব্যাহতি দিতে পারে। কেননা কেসাসে বান্দার হকই অগ্রগণ্য।

৩. ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক বলেন, ধন-সম্পদ অথবা অন্যান্য সামগ্রী অপবাদের শাস্তির বিনিময়রূপে স্বীকৃত নয়। কেননা এমতোক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র হকই অগ্রগণ্য। ইমাম আহমদ এবং এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর নিকট অপবাদের শাস্তির বিনিময় হতে পারে।

৪. ইমাম আবু হানিফার মতে অপবাদের শাস্তিতে অনুপ্রবেশ সম্ভব। অর্থাৎ একাধিক অপবাদের শাস্তি অপবাদদাতাকে একবারেই দেয়া যাবে। এমন কি কেউ যদি একই ব্যক্তির উপরে কয়েকবার ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, অথবা কয়েকজনের উপর অপবাদ দেয়, তবে সকল অপবাদের শাস্তিই তার উপরে একবারে প্রয়োগ করা যাবে। আর এমতো শাস্তিভোগের পর সে যদি অন্য কারো উপর অথবা পূর্বোক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের উপর অপবাদ দেয়, তবে পুনরায় তার উপরে শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম শাস্তি পরবর্তী অপবাদের জন্য যথেষ্ট হবে না। একজনের অপবাদের শাস্তি চলাকালে যদি অন্য আর একজন অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি বিচারপ্রার্থী হয়ে আসে তবে পূর্ণ করতে হবে কেবল অবশিষ্ট শাস্তি। অর্থাৎ কার্যকর করতে হবে আশিটি কশাঘাতের মধ্যে যেটুকু বাকী থাকে, কেবল সেটুকু। ইমাম শাফেয়ী আবার অনুপ্রবেশের বৈধতাকে স্বীকার করেন না।

আমি বলি, এটা গ্রহণযোগ্য মত যে, অপবাদের শাস্তিতে আল্লাহ্ ও বান্দা উভয়ের হকই বিজড়িত। আর একথাও সুপ্রমাণিত যে, সন্দেহজনক অবস্থা সৃষ্টি হলে শাস্তি রহিত হয়ে যায়। যেনো বিষয়টি এরকম— এক হক শাস্তি ওয়াজিব হওয়ার দাবিদার। আর এক হক দাবিদার শাস্তি রহিত হওয়ার। সুতরাং শাস্তি রহিত হওয়ার বিষয়টিই অগ্রগণ্য। কেননা ভুলের উপরে শাস্তি দেয়া অপেক্ষা ক্ষমা করে দেয়া উত্তম। এ সম্পর্কে হজরত ওমরের উক্তিও ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, ইমাম আবু হানিফার 'অপবাদের শাস্তি উত্তরাধিকারীরা দাবি করতে পারে না' এই অভিমতটি সঠিক। আর অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা করে দিলেও শাস্তি রহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তার পক্ষ থেকে তখন আর কোনো দাবিই থাকবে না। আবার শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য বিচারপ্রার্থী হওয়াও একটি শর্ত। সুতরাং ইমাম শাফেয়ীর ওই অভিমতটি সঠিক, যে অভিমত তিনি পোষণ করেন শাস্তি রহিত হওয়ার মাসআলায়। আর ইমাম আবু হানিফার ওই অভিমতটি বিশুদ্ধ, যে অভিমত তিনি পোষণ করেন শাস্তি প্রয়োগ হওয়ার মাসআলায়। সুতরাং অপবাদগ্রস্ত ও অপবাদদাতা যদি কোনো বিনিময়ের

www.eelm.weebly.com

মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা করে নেয়, তবে যেহেতু অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি হদ রহিত করণে সম্মত হয়েছে, তাই হদ রহিত হয়ে যাওয়াও বাঞ্ছনীয়। আবার যেহেতু এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আল্লাহ্র হক তাই এখানে বিনিময় সিদ্ধ না হওয়াই উচিত।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী লিখেছেন, হজরত হেলাল ইবনে উমাইয়া একবার রসুল স. সকাশে এই মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করলেন যে, তাঁর স্ত্রী শরীক ইবনে সামহারের সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। রসুল স. বললেন শরয়ী সাক্ষ্য (চারজন সাক্ষী) উপস্থিত করো। নতুবা তোমার পিঠে কশাঘাত করা হবে। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কেউ যদি নিজে তার স্ত্রীর উপরে কাউকে উপগত অবস্থায় দেখে, তবে তাকেও কি সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে? রসুল স. বললেন, সাক্ষী অথবা কশাঘাত। তিনি বললেন, ওই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, আমি সম্পূর্ণ সত্য। আমার বিশ্বাস আল্লাহ্ অবশ্যই এমন বিধান অবতীর্ণ করবেন, যাতে করে আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা পাবে। তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে হজরত জিবরাইল অবতীর্ণ হলেন নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৬, ৭

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

❒ এবং যাহারা নিজদিগের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাহাদিগের কোন সাক্ষী নাই তাহাদিগের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হইবে যে, সে আল্লাহের নামে চারি বার শপথ করিয়া বলিবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী,

❒ এবং পঞ্চম বার বলিবে, 'সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহের অভিশাপ।'

প্রত্যাদেশের প্রভাব ক্রমশঃ বিদূরিত হলো। রসুল স. প্রথমোক্ত আয়াত শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। ডেকে আনলেন হজরত হেলাল ও তাঁর স্ত্রীকে। প্রথমে হজরত হেলাল চারবার তাঁর অভিযোগের স্বপক্ষে সাক্ষ্যদান করলেন। পঞ্চমবার বললেন, আমি মিথ্যাবাদী হলে আমার উপরে নেমে আসবে আল্লাহ্র অভিশাপ (যেমন উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে)। উল্লেখ্য, এরকম শপথের নাম লেয়ান। এরপর লেয়ান করলো তার স্ত্রী। চারবার তার নির্দোষিতার স্বপক্ষে সাক্ষ্য

www.eelm.weebly.com

প্রদান করতেই উপস্থিত সাহাবীগণ তাকে থামিয়ে দেন। বলেন, তোমার পঞ্চম সাক্ষ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্তপ্রদায়ক (ভেবে দেখো, এখনো পঞ্চম সাক্ষ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করবে কিনা, যদি তুমি অপরাধিনী হও)। মহিলাটি একটু থামলো। ঘুরে দাঁড়ালো। উপস্থিত সাহাবীগণের মনে হলো, সে হয়তো এবার সত্যি সত্যিই থেমে যাবে। কিন্তু সে থামলো না। বললো, আমি আমার সন্তান-সন্ততিকে চিরদিনের জন্য লজ্জিত ও কলংকিত করতে পারি না। একথা বলেই সে উচ্চারণ করলো পঞ্চম সাক্ষ্য। রসুল স. আজ্ঞা করলেন, এর প্রতি লক্ষ্য রেখো। প্রসবের পর যদি দেখো তার সন্তান হয় কটাচক্ষুধারী, ভারী কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট হয়, হাঁটু ও পায়ের গ্রন্থির মধ্যবর্তী স্থান যদি তার হয় নরম, তবে বুঝবে ওই সন্তান শরীক ইবনে মাসহার। নির্ধারিত সময়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর সকলেই সবিস্ময়ে দেখলো, রসুল স. কথিত সকল লক্ষণগুলোই রয়েছে ওই শিশুটির শরীরে। তিনি স. তখন বললেন, কিতাবুল্লাহ্র ফয়সালা যদি অবতীর্ণ না হতো, তবে আমি ওই মহিলার সঙ্গে পুনরায় বুঝাপড়া করতাম।

'সহিহ্' গ্রন্থে সহল ইবনে সা'দীর বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত ইবনে উয়াইমির উজলানী নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! যদি কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোনো পুরুষকে ব্যভিচার করতে দেখে, তবে সে কী করবে? যদি তাদেরকে হত্যা করে তবে মানুষ তাকে হত্যা করবে কেসাসের দাবি উত্থাপন করে। আর যদি সে সাক্ষী আনার জন্য স্থান ত্যাগ করে তবে পালিয়ে যাবে ওই ব্যভিচারী। তাহলে বলুন, সে কী করবে তখন? রসুল স. বললেন, তোমার ও তোমার স্ত্রীর নামে বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। যাও, তাকে ডেকে আনো। হজরত সহল তাঁর স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এলেন। উভয়ে লেয়ান করলেন মসজিদের ভিতরে রসুল স. এর উপস্থিতিতে। লেয়ান শেষে হজরত সহল বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এরপরেও যদি আমি একে বিবাহবন্ধ রাখি, তবে আমি তো তার উপর অপবাদ আরোপ করলাম। আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্যভিচারের কলংকে কলংকিনীকে কখনো বিবাহবন্ধ রাখে না। একথা বলেই তিনি তাঁর স্ত্রীকে দিলেন তিন তালাক। রসুল স. বললেন, অপেক্ষা করো, দেখবে তার সন্তান হবে কালো চক্ষু, থলথলে শরীর ও নরম নিম্নপদ বিশিষ্ট। আর তা না হয়ে সন্তান যদি হয় তার পিতার মতো লালবর্ণবিশিষ্ট তবে বুঝবে সে-ই তার স্ত্রীর উপরে কলংক আরোপ করেছে। যথাসময়ে সন্তান প্রসবের পর দেখা গেলো সন্তানটি তার পিতার মতো লালবর্ণের নয়। তখন প্রমাণিত হলো হজরত উয়াইমিরই সত্যবাদী। তাই কেউ আর ওই শিশুকে হজরত উয়াইমিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতো না, সম্পৃক্ত করতো তার মায়ের সঙ্গে।

www.eelm.weebly.com

ইকরামা সূত্রে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন আলোচ্য সুরার ৪ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন আনসারগণের নেতা হজরত সা'দ ইবনে উবাদা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আয়াতখানি কি এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে? রসুল স. বললেন, হে আনসারের দল! দেখো তোমাদের নেতা কী বলে? আনসারগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তাঁকে মন্দ ধারণা করবেন না। ইনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি সর্বদা কুমারীদের বিবাহ করেছেন। আর কোনো স্ত্রীকে তিনি কখনো তালাক দেননি, যাতে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্য কেউ বিবাহ করতে পারে। তাঁর এরকম সম্ভ্রমবোধের কারণে আমরা তাঁর ছেড়ে দেয়া স্ত্রীকে বিবাহও করতে পারিনি। এরপর হজরত সা'দ বললেন, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! আমার পিতামাতা আপনারই উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হোক। আমি বিশ্বাস করি, এই আয়াত অবশ্যই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি বিস্মিত হয়েছি এ কারণে যে, আমি কোনো ভ্রষ্টা রমণীকে পরপুরুষের সঙ্গে সঙ্গমরত অবস্থায় দেখতে পেলেও তো তাকে ধরতে পারবো না, যতক্ষণ না আমার সঙ্গে আরো চারজন তা না দেখবে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি লোক ডেকে আনতে গেলেই তো ওই লোক তার কাজ শেষ করে চলে যাবে। এ ঘটনার পর বেশীদিন অতিবাহিত না হতেই হজরত হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনাটি ঘটে। তিনি ছিলেন ওই সাহাবীত্রয়ের একজন যারা তাবুক যুদ্ধে যোগদান না করার কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছিলেন এবং তাঁদের তওবা কবুল করা হয়েছিলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। ঘটনাটি ছিলো এরকম— একদিন গভীর রাতে তিনি বাড়ী ফিরে দেখলেন তাঁর স্ত্রী এক পুরুষের সঙ্গে সঙ্গমরতা। তিনি নিজ কানে তাদের কথাবার্তাও শুনলেন। এদিকে রাত প্রায় ভোর। তিনি রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি জানালেন। রসুল স. রাগান্বিত হলেন। আনসারগণ উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সা'দ ইবনে উ্বাদার উক্তি আমাদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করেছে। রসুল স. মনস্থ করলেন, হজরত হেলালকে কশাঘাত করবেন। লোকজনও তাঁর সাক্ষ্যকে বাতিল ঘোষণা করবে। হজরত হেলাল বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্‌ আমার মুক্তির কোনো পথ অবশ্যই বের করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, রসুল স. কশাঘাত করার প্রস্তুতি নিলেন। ওই সময় তাঁর উপরে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। রসুল স. ওই আয়াত পাঠ করে শোনালেন উপস্থিত সাহাবীবৃন্দকে। হজরত আনাসের উক্তিরূপে আবু ইয়ালীও এরকম বর্ণনা করেছেন। বাগবী এ ঘটনা বর্ণনা করার পর একথাও লিখেছেন যে, রসুল স. তখন বললেন, হেলাল!

www.eelm.weebly.com

তোমার জন্য রয়েছে শুভ বার্তা। আল্লাহ্ তোমার পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন। হজরত হেলাল বললেন, আমি আল্লাহ্র প্রতি এমতো বিশ্বাসই রেখেছিলাম। রসুল স. বললেন, তাকে ডাকো। মহিলাটিকে ডেকে নিয়ে আসা হলো। রসুল স. তাকে হজরত হেলালের অভিযোগ জানালেন। সে অস্বীকার করলো। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন, তোমাদের মধ্যে যে কোনো একজন মিথ্যাবাদী। সে কি একথা স্বীকার করবে? হজরত হেলাল বললেন, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! আমার জনক-জননী আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। রসুল স. ঘোষণা দিলেন, দু'জনকেই লেয়ান করানো হোক। প্রথমে হজরত হেলাল আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ করে বললেন, আমি অবশ্যই সত্য। রসুল স. তাঁর পঞ্চম সাক্ষ্য ঘোষণার পূর্বে বললেন, হেলাল! আল্লাহ্কে ভয় করো। জাগতিক শাস্তি পারলৌকিক শাস্তি অপেক্ষা সহজ। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ্র শাস্তি মানুষের শাস্তির চেয়ে কঠোর। সুতরাং তোমার পঞ্চম সাক্ষ্য যদি অসত্য হয়, তবে তোমার কী অবস্থা হবে? হজরত হেলাল বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তিনি এ সাক্ষ্যের জন্য আমাকে শাস্তি দিবেন না। এরপর তিনি বললেন, আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তবে আমার উপরে আল্লাহ্র লানত। এরপর সাক্ষ্য প্রদান করতে শুরু করলো ওই মহিলা। তার চতুর্থ সাক্ষ্যের পর রসুল স. তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আল্লাহ্কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্র শাস্তি মানুষের শাস্তি অপেক্ষা ভয়াবহ। মহিলাটি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলো। তারপর বললো, আল্লাহ্র কসম! আমি আমার খানদানকে লজ্জিত করবো না। পঞ্চম ও শেষ সাক্ষ্য সে উচ্চারণ করলো এভাবে— হেলাল যদি সত্য হয়, তবে আমার উপর আপতিত হোক আল্লাহ্র রোষ। রসুল স. দু'জনকে পৃথক করে দিয়ে বললেন, এর গর্ভজাত সন্তান হবে তার মাতার । পিতার সঙ্গে তাকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। কিন্তু ওই শিশুসন্তানকে অবৈধও বলা যাবে না। এরপর তিনি স. শিশুর লক্ষণ বর্ণনা করে বললেন, শিশুটি এরকম দেখতে হলে হবে মহিলাটির স্বামীর। আর এরকম দেখতে হলে হবে ওই পরপুরুষের। যথাসময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। শিশুটি ছিলো মেটে রঙের উটের মতো কদাকৃতির। পরবর্তীতে সে হয়েছিলো মিসরের বিচারক। সে জানতো না তার পিতা কে? বাগবী লিখেছেন, এ প্রসঙ্গে সকল বর্ণনায় এসেছে এবং মুকাতিলের বর্ণনাতেও একথা উল্লেখিত হয়েছে, যখন আলোচ্য সুরার ৪ সংখ্যক আয়াত নাজিল হয়, তখন রসুল স. তাঁর মিম্বরের উপরে আরোহণ করে তা পাঠ করে শোনালেন। হজরত আসেম ইবনে আদী আনসারী দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আপনার জন্যই উৎসর্গীকৃত। আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীর উপরে অন্য কোনো পুরুষকে উপগত হয়েছে

www.eelm.weebly.com

দেখতে পায়, তবে সে কী করবে? একথা প্রকাশ করলে তাকে করা হবে আশিটি কশাঘাত। মুসলমানেরা তাকে বলবে ফাসেক। আর তার সাক্ষ্যও হবে চিরতরে প্রত্যাখ্যাত। এমতাবস্থায় সে তার সত্যতার পক্ষে সাক্ষী কোথেকে আনবে? সাক্ষীর খোঁজে বের হলেই তো পলায়ন করবে অপরাধী।

হজরত আসেমের এক চাচাত ভাইয়ের নাম ছিলো হজরত উয়াইমির। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিলো খাওলা বিনতে কায়েস। তিনি একদিন আসেমের কাছে গিয়ে বললেন, ভাই, আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে শরীক ইবনে সামহাকে অপকর্ম করতে দেখেছি। হজরত আসেম পাঠ করলেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। পরবর্তী জুমআর দিন তিনি রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! গত জুমআয় আমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, আমার আপনজনের একজনের ক্ষেত্রেই সেরকম কাণ্ড ঘটেছে। উয়াইমির, খাওলা ও শরীক ছিলো একই বংশের। রসুল স. সকলকে একত্র করলেন। হজরত উয়াইমিরকে বললেন, খাওলা তোমার চাচাত বোন, আবার স্ত্রীও। আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তাকে কলংকিত কোরো না। হজরত উয়াইমির বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি কসম কেটে বলছি, আমি শরীককে তার উপরে উপগত অবস্থায় দেখেছি। আর আমি চার মাস ধরে খওলার সঙ্গে মিলিত হইনি। এখন সে যদি গর্ভবতী হয়, তবে তার কারণ হবে অন্য কেউ, আমি নই। রসুল স. খাওলাকে বললেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যদি তুমি এরকম কিছু করে থাকো, তবে আমার কাছে স্বীকার করো। খাওলা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! উয়াইমিরের রয়েছে সন্দেহের বাতিক। সে আমার ও শরীকের কথা আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছে। তাই সে সন্দেহবশতঃ এই অভিযোগ এনেছে। রসুল স. শরীককে বললেন, তুমি কী বলো? তিনি বললেন, খাওলা যা বলেছে, সেটাই আমার কথা। ইতোমধ্যে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য সুরার ৪ সংখ্যক আয়াত। রসুল স. মুয়াজ্জিনকে বললেন, আজান দাও। আজান ধ্বনিত হলো। লোকজন সমবেত হলো। তিনি স. সকলকে নিয়ে আসরের নামাজ পাঠ করলেন। নামাজ শেষে হজরত উয়াইমিরকে বললেন, দাঁড়াও। আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলো, খাওলা ব্যভিচারিণী। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী। হজরত উয়াইমির প্রথমবার একথাই উচ্চারণ করলেন। দ্বিতীয়বার বললেন, আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি শরীককে খাওলার উপরে উপগত অবস্থায় দেখেছি এবং আমি নিঃসন্দেহে সত্য। তৃতীয়বার বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এই নারীর গর্ভ আমার দ্বারা হয়নি, হয়েছে অন্য কারো দ্বারা। চতুর্থবার বললেন, আমি আল্লাহ্‌র সদাবিদ্যমানতাকে মেনে বলছি, আমি বিগত চারমাস তার সঙ্গে সহবাস করিনি এবং অবশ্যই আমি সত্য। পঞ্চমবার বললেন, এই বক্তব্যে যদি উয়াইমির

www.eelm.weebly.com

মিথ্যা হয়, তবে তার উপর আল্লাহ্‌র লানত। রসুল স. এবার খাওলাকে বললেন, এবার তুমি দাঁড়াও ও সাক্ষ্য দাও। খাওলা দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে বলছি, আমি ব্যভিচারিণী নই এবং উয়াইমির মিথ্যাবাদী। দ্বিতীয়বার বললেন, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, উয়াইমির শরীককে আমার উপরে উপগত অবস্থায় দেখেনি এবং উয়াইমিরের উক্তি অসত্য। তৃতীয়বার উচ্চারণ করলেন, আমি উয়াইমিরের দ্বারাই গর্ভবতী, অন্য কারো দ্বারা নই। চতুর্থবার বললেন, উয়াইমির আমাকে ব্যভিচারলিপ্ত অবস্থায় দেখেনি, তার কথা অসত্য। পঞ্চমবার বললেন, উয়াইমিরের কথা যদি সত্য হয়, তবে খাওলার উপরে নেমে আসুক আল্লাহ্‌র শাস্তি। এভাবে দু'জনের শপথ সম্পন্ন হলে রসুল স. তাদেরকে পৃথক করে দিলেন। বললেন, এভাবে দু'জন কসম না করলে এই নারীর বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারতো। এরপর উপস্থিত জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন, সন্তান জন্মগ্রহণের পর তোমরা দেখবে শিশুটির ভ্রূযুগল হবে প্রশস্ত, বিচ্ছিন্ন ও ঘন। আর তার গায়ের রঙ হবে কালো। এরকম যদি দেখো, তবে বুঝবে ওই সন্তান শরীক ইবনে সামহার। আর যদি মেটে বর্ণের কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট ও উটের মতো অঙ্গসন্ধিবিশিষ্ট হয়, তবে বুঝবে ওই সন্তান উয়াইমিরের। হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, যথাসময়ে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হলো। দেখা গেলো তার চেহারা শরীকের সঙ্গেই অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতপৃথকতা রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত উয়াইমিরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, হজরত হেলালের ঘটনাটিই ছিলো এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত।

কুরতুবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে দু'বার। কেউ কেউ সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলেছেন, প্রথমে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত হেলালের ঘটনাকে লক্ষ্য করে। ওই সময় হজরত উয়াইমিরের ঘটনাটিও ঘটে যায়। তাই বলা যেতে পারে দু'টো ঘটনাই ছিলো আলোচ্য আয়াতের শানে নুজুল। ইমাম নববী এমতো সমাধানকেই প্রাধান্য প্রদান করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, প্রথমে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় হজরত হেলালের বিষয়ে। এরপর সংঘটিত হয় হজরত উয়াইমিরের ঘটনা। তিনি হজরত হেলালের ওই বিষয়ে জানতেন না। তাই রসুল স. তাঁকে এই আয়াত পুনরায় পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত উয়াইমির প্রসঙ্গে এসেছে, হজরত জিবরাইল যখন এই আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন, তখন রসুল স. বললেন, হে উয়াইমির!

www.eelm.weebly.com

তোমার মতোই আরো একজন এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলো। তার ব্যাপারেও এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো। ইবনুস্ সিবাগও তাঁর 'আশ্শামিল' গ্রন্থে এরকম লিখেছেন।

মাসআলা ঃ যেহেতু আলোচ্য আয়াতে সুনির্দিষ্টরূপে কোনো বিশেষ দম্পতিকে উদ্দেশ্য করা হয়নি, তাই ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের অভিমতে যে কোনো দম্পতির ক্ষেত্রে বিধানটি প্রয়োগিত হতে পারে— তারা তালাক যোগ্য হলে, চাই তারা স্বাধীন হোক, অথবা গোলাম, অথবা একজন স্বাধীন, অপরজন অস্বাধীন, অথবা উভয়ে ন্যায়পরায়ণ, কিংবা উভয়ে ফাসেক। এমনকি দু'জনের মুসলমান হওয়াও অত্যাবশ্যক নয়। হতে পারে একজন মুসলমান, একজন আহলে কিতাব, অথবা উভয়েই আহলে কিতাব। ইমাম মালেক উভয়ের কাফের আহলে কিতাব হওয়াকে এক্ষেত্রে সমর্থন করেননি। কেননা তাঁর নিকট কাফেরদের বিবাহই শুদ্ধ নয়। তাই তাদের তালাকও অশুদ্ধ। আর তালাক শুদ্ধ না হলে লেয়ানও জায়েয নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, দু'টি শর্ত পাওয়া না গেলে লেয়ান বিশুদ্ধ হবে না। প্রথম শর্ত হচ্ছে পুরুষকে হতে হবে সাক্ষ্যপ্রদানের যোগ্যতাধারী। অর্থাৎ তাকে হতে হবে মুসলমান, স্বাধীন, জ্ঞানবান ও প্রাপ্তবয়স্ক। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে ব্যভিচারের অপবাদ গ্রস্তাকেও হতে হবে শাস্তিগ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন। অর্থাৎ তাকেও হতে হবে মুসলমান, আজাদ, আকেল ও বালেগ। আর ইতোপূর্বে মহিলাটির উপর অপবাদের প্রলেপ দেয়াও হয়নি, এভাবে যদি কোনো মহিলা এরকম হয় যে, তার অপবাদদানকারীকে শাস্তি প্রয়োগ করা যায় এবং সে হয় ক্রীতদাস অথবা কাফের কিংবা ইতোপূর্বে ব্যভিচারের অপবাদ দানের কারণে শাস্তিপ্রাপ্তা, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে তাকে লেয়ান করার হুকুম দেয়া যাবে না। বরং বিচারক ইচ্ছা করলে তাকে অন্য কোনো শাস্তি দিতে পারে। তবে যদি তার স্বামী অন্ধ ও ফাসেক হয়, তবে উভয়কেই লেয়ানের নির্দেশ দেয়া যাবে। কেননা ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণ করার অধিকার বিচারকের রয়েছে। আর অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না একারণে যে, সে বাদী-বিবাদীর মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। কিন্তু অপবাদ প্রদানের ব্যাপারে যেহেতু সে নিজে নিজেকে জানে, এবং স্ত্রীর সঙ্গে নিজেকে পার্থক্য করতে পারে, তাই সে নিজের সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য। কিন্তু অপরের জন্য সাক্ষ্যদানের যোগ্য নয়। ইবনে মোবারক ইমাম আবু হানিফার যে উক্তি বর্ণনা করেছেন, তার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অন্ধ অপবাদকারী হলে তাকে লেয়ান করানো যাবে না। অনুরূপ ইমাম আবু হানিফার নিকট উল্লিখিত বিষয়সমূহে অপবাদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না, প্রযোজ্য হবে লেয়ান। আর মহিলা

www.eelm.weebly.com

ক্রীতদাসী হোক, অথবা অবিশ্বাসিনী, অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা, কিংবা উন্মাদিনী, কিংবা অশুদ্ধভাবে বিবাহবদ্ধা, অথবা অশুদ্ধ বিবাহের স্বামীর সঙ্গে সহবাসকৃতা, অথবা অজানা পুরুষের সন্তানের মাতা, অথবা জীবনে অন্ততঃপক্ষে একবারও ব্যভিচার লিপ্তা, অতঃপর তওবাকারিণী, অথবা সন্দেহবশতঃ এমন পুরুষ কর্তৃক সম্ভোগিতা, যে তার জন্য হারাম অথবা সন্দিগ্ধ— এসকল অবস্থায় অপবাদকারীকে অপবাদের শাস্তিও দেয়া যাবে না এবং লেয়ানও করানো যাবে না। তবে বিচারক ইচ্ছে করলে মহিলাকে সতর্ককতামূলক কোনো শাস্তি দিতে পারেন।

ইমাম আবু হানিফা যে মহিলার জন্য শর্ত আরোপ করেছেন, সে হবে এরকম— যার অপবাদকারী শাস্তিযোগ্য হবে। এজন্য যে, স্বামীর উপর থেকে অপবাদের শাস্তি দূর করণের জন্য তাকে লেয়ানের হুকুম দেয়া হয়েছে। যে সকল হাদিসে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোতে এরূপই প্রতীয়মান হয়। যেমন রসুল স. বললেন, হেলাল! তোমার জন্য শুভসংবাদ। আল্লাহ্ তোমার পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন। এতে করে বুঝা যায়, অপবাদের শাস্তি থেকে বাঁচাতেই স্বামীকে দেয়া হয়েছে লেয়ানের সুযোগ। অর্থাৎ লেয়ান হচ্ছে তার জন্য অপবাদের শাস্তি গ্রহণের বিকল্প। তাই রসুল স. বলেছিলেন, আল্লাহ্কে ভয় করো। দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তির তুলনায় অনেক সহজ। সুতরাং এরকম স্ত্রীই যদি না হয়, যার অপবাদকারীর উপরে শাস্তি প্রয়োগযোগ্য নয়, তবে তার জন্য আবার লেয়ান কীরূপে জায়েয হতে পারে? ইমাম আবু হানিফার একটি শর্ত এরকম যে, স্বামীকে হতে হবে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য। কেননা আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন যেমন পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তাদের কোনো সাক্ষী নেই'। এখানে দেখা যায়, আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং স্বামীদেরকে সাক্ষ্যদান নির্ধারণ করেছেন। কেননা 'নিজেরা ব্যতীত' কে এখানে করা হয়েছে নেতিবাচকতা থেকে ব্যতিক্রম। আর ব্যতিক্রম হচ্ছে ইতিবাচক। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী নেই, অর্থাৎ তারা নিজেরাই সাক্ষী।

এখানে এমতো সন্দেহও পোষণ করা যাবে না যে, এই আয়াতে 'শুহাদা' এর রূপক অর্থ শপথকারী। বরং অর্থ হবে— তাদের নিকটে তারা নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো শপথকারী নেই। সুতরাং তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য শপথকারী। কিন্তু এরকম অর্থ অযথার্থ। প্রকৃতপক্ষে এখানে শাহাদাত অর্থ শপথ গ্রহণ করা, যা একটি সমষ্টির অংশবিশেষ, যাকে ছাড়া নিজের অস্তিত্বই নেই। ওই সামগ্রিকতার অর্থ নিজের জন্য নিজের সাক্ষ্য নাজায়েয এবং অন্যের জন্য জায়েয।

www.eelm.weebly.com

আর শাহাদাতের প্রকৃত অর্থ যদি শপথও হয়, তথাপিও এস্থলে প্রত্যাবর্তন করতে হবে রূপক অর্থ অর্থাৎ সাক্ষ্যের প্রতি। কেননা অন্যের জন্য শপথ করার কোনো অস্তিত্বই এখানে নেই। আর 'শাহাদাত' এর প্রকৃত অর্থ যখন শপথ নয়, বরং এর রূপক অর্থ যখন শপথ, তখন বলা যেতে পারে এখানে 'শাহাদাত' অর্থ শপথ নয়, সাক্ষ্য।

ইমাম আবু হানিফা স্বামীর জন্য সাক্ষ্যপ্রদানের যোগ্যতাকেও আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। আরো বলেছেন, স্ত্রীকে এমন হতে হবে যেনো তার অপবাদকারীর উপরে শাস্তি প্রয়োগ করা যায়। উভয় বক্তব্যের প্রমাণ রয়েছে আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহের একটি বর্ণনায়। কয়েকটি পদ্ধতিতে বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন ইবনে মাজা ও দারাকুতনী। যেমন—

১. ওসমান ইবনে আবদুর রহমান জুহুরী সূত্রে দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, চারটি ক্ষেত্রে লেয়ান নেই— স্বাধীন স্বামী ও ক্রীতদাসী স্ত্রীর মধ্যে, ক্রীতদাস স্বামী ও স্বাধীনা স্ত্রীর মধ্যে, মুসলমান স্বামী ও ইহুদী স্ত্রীর মধ্যে এবং মুসলমান স্বামী ও খৃষ্টান স্ত্রীর মধ্যে। ইয়াহ্ইয়া, বোখারী, আবু হাতেম রাজী ও আবু দাউদ বলেছেন, ওসমান ইবনে আবদুর রহমান অপরিচিত ও অগ্রহণযোগ্য। ইয়াহ্ইয়া একবার বলেছিলেন, সে অসত্যভাষী। ইবনে হাব্বান বলেছেন, সে জাল হাদিসের সূত্রপরম্পরাকে যুক্ত করে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর সঙ্গে। তাই তার বর্ণনা প্রামাণ্য নয়। নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেন, তার বর্ণনা পরিত্যজ্য।

২. ওসমান ইবনে আতা খোরাসানী সূত্রে দারাকুতনী ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ঘোষণা করেছেন, চার প্রকার রমণী-পুরুষের জন্য লেয়ান নেই। যেমন— খৃষ্টন স্ত্রী-মুসলমান স্বামী, ইহুদী স্ত্রী-মুসলমান স্বামী, স্বাধীনা স্ত্রী-ক্রীতদাস স্বামী ক্রীতদাসী স্ত্রী এবং স্বাধীন স্বামী । ইয়াহ্ইয়া ও দারাকুতনী ওসমান ইবনে আতাকে চিহ্নিত করেছেন দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে। আবু হাতেম ও ইবনে হাব্বান বলেছেন, তার বর্ণনাকে দলিলরূপে গণ্য করা নাজায়েয। আলী ইবনে জুনাইদ বলেছেন, সে পরিত্যজ্য। দারাকুতনী বলেছেন, ইয়াজিদ ইবনে জুরাইব ওসমানের অনুগামী। তিনিও আতা সূত্রে এই বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু ইয়াজিদ ইবনে জুরাইব বর্ণনাকারীরূপে সবল নন।

৩. দারাকুতনী ইমাদ ইবনে মাতারের মাধ্যমে ওমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন এভাবে— রসুল স. ইতাব ইবনে উসাইদকে একস্থানে প্রেরণ করলেন। তার পরের বর্ণনা উপরের বর্ণনার মতোই। আবু হাতেম রাজী বলেন, ইমাদ ইবনে মাতার ভিত্তিহীন হাদিস নির্মাণ করে।

www.eelm.weebly.com

ইবনে আদী বলেন, তার বর্ণনা ভিত্তিবিবর্জিত। আর সে-ও পরিত্যাজ্য। ইমাম আহমদ বলেন, ইমাদ ইবনে মাতার যার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেন, সেই হাম্মাদ ইবনে আমরও কাল্পনিক হাদিস বানাতো। সাজী বলেন, হাদিস বর্ণনাকারীগণের ঐকমত্য এই যে, সে পরিত্যাজ্য। হাম্মাদ ইবনে আমর যার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করতেন, সেই জায়েদ ইবনে রফী বর্ণনাকারী হিসেবে অশক্ত।

ইবনে জাওজী লিখেছেন, ইমাম আওজায়ী এবং ইবনে জুরাইজ, যাদেরকে গণ্য করা হয় হাদিস শাস্ত্রের ইমামরূপে, তিনি এই হাদিস বর্ণনা করেছেন আমর ইবনে শোয়াইবের মাধ্যমে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে। কিন্তু বর্ণনাটিকে তিনি অভিহিত করেছেন আমর ইবনে শোয়াইবের দাদার উক্তিরূপে। রসুল স. এর সঙ্গে তিনি বক্তব্যটিকে সম্পৃক্ত করেননি।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, শিথিলসূত্রবিশিষ্ট হাদিস যদি কয়েকটি পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়, তবে শিথিলতা সত্ত্বেও তা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। বর্ণিত হাদিসটিও সেরকম। আর এর পোষকতা হয়েছে ইমাম আওজায়ী ও ইমাম ইবনে জুরাইজের বর্ণনা থেকে। তাঁরা উভয়েই আবার বর্ণনাটিকে সনাক্ত করেছেন আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহের উক্তিরূপে। অর্থাৎ সুপরিণতরূপে নয়, পরিণতসূত্রসম্বলিতরূপে।

এরপর বলা হয়েছে—'ফাশাহাদাতু আহাদিহিম'— 'সে সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ্‌র শপথ করে চারবার। সে অবশ্যই সত্যবাদী' একথাটিকে ইমাম শাফেয়ী গ্রহণ করেছেন তাঁর মতের দলিলরূপে। অর্থাৎ তাঁর মতে এখানকার 'শাহাদাত' অর্থ কসম বা শপথ, সাক্ষ্য নয়, যদি ও 'শপথ' ও 'সাক্ষ্য' উভয় অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এরপরের 'বিল্লাহ্‌' শব্দটি 'শাহাদাতে'র শপথ অর্থকেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কারণ শপথ করতে হয় আল্লাহ্‌রই নামে, নিজের নামে বা অন্য কারো নামে নয়। আর নিজের সাক্ষ্য নিজের জন্যও গ্রহণীয় নয়। তবে হ্যাঁ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের নামেও শপথ করা যায়। আর শরিয়তে এমন কোনো দৃষ্টান্তও নেই যে, একই স্থানে একই সময়ে একই ব্যক্তি বার বার সাক্ষ্যদান করবে। তবে শপথের পুনরাবৃত্তির দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যেমন কাসামাত। এছাড়া একথাটিও প্রণিধাননীয় যে, সাক্ষ্য দিতে হয় কোনো কিছুকে প্রমাণ করার জন্য, আর শপথ করতে হয় কোনো ধারণাকে অপসারণের জন্য। এটাও আবার অগ্রহণীয় ধারণা যে, প্রকৃত শাহাদাতের সম্পর্ক হবে কেবল একটি বিষয়ের সঙ্গে। আর অবশ্যম্ভাবী একটির প্রকৃত অর্থ ব্যবহার করতে হবে রূপক অর্থরূপে। তাই যখন মূল উদ্দেশ্য হবে শপথ করা, তখন রূপক অর্থই (শপথ) হবে গ্রহণীয়। তখন লেয়ানের জন্য সাক্ষ্যের প্রয়োজন আর পড়বে না।

www.eelm.weebly.com

আমরা বলি, একথা নিশ্চিত যে, নিজের জন্য নিজে সাক্ষ্য দেয়া এবং একই স্থানে বার বার সাক্ষ্য দেয়ার দৃষ্টান্ত শরিয়তে নেই। আবার অন্যের জন্য কসম খাওয়ার দৃষ্টান্তও শরিয়তে অনুপস্থিত। আরো লক্ষণীয়, কোনো বিধানকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করার জন্য কসম খাওয়ার কথাও কোথাও নেই। কসম তো করা হয়ে থাকে বিধানকে প্রতিহত করার জন্য, বিধানকে স্বীকার করার জন্য নয়। সুতরাং যার উপস্থিত করা, বিদূরিত করা এবং ইচ্ছা অনুযায়ী হুকুম দেয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, যখন একই স্থানে উভয় কাজকে প্রাথমিক অবস্থায় শরিয়তসম্মত করে দেয়া যার জন্য জায়েয, তখন তার জন্য এটাও জায়েয যে, প্রথমে সে ওই বিধানকে শরিয়তসম্মতই করে দিবে। এর জন্য অন্য দৃষ্টান্ত অন্বেষণের প্রয়োজনই নেই।

অবশিষ্ট রইলো স্বয়ং সাক্ষ্যদানের প্রসঙ্গ। এর দৃষ্টান্ত তো রয়েছে কোরআন মজীদেই। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'শাহিদাল্লহু আন্নাহু লাইলাহা ইল্লাহুয়া' (আল্লাহ্ স্বয়ং সাক্ষ্য দেন, তিনি ছাড়া অন্য উপাস্য নেই)। আবার আজানের দৃষ্টান্তও এখানে টেনে আনা যেতে পারে। মুয়াজ্জিন যখন বলতেন, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ্' তখন রসুল স. বলেন 'আনা আশহাদু' (আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি)। এতে করে প্রমাণিত হয় রসুল স. তাঁর রেসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন নিজে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে সাক্ষ্যের পুনরাবৃত্তির কথা বলা হয়েছে কেনো? এর জবাব এই যে, যখন কেউ ব্যভিচারের সাক্ষ্য উপস্থিত করতে অসমর্থ হয়, তখন এই চার সাক্ষ্য হয় তার স্থলাভিষিক্ত। কেননা অপবাদের ক্ষেত্রে নিজের সাক্ষ্য (এক সাক্ষ্য) যথেষ্ট নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে অবশ্য এক সাক্ষ্য গ্রহণীয়। আলোচ্য আয়াতে চার বার কসম করার কথা বলা হয়েছে নিজের সত্যতাকে দৃঢ়তর করবার জন্য এবং পঞ্চমবার সাক্ষ্যের মাধ্যমে মিথ্যা হলে আল্লাহ্র অভিশাপ স্বতোপ্রণোদিত হয়ে চেয়ে নেয়ার জন্য।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'এবং পঞ্চমবার বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহ্র অভিশাপ'।

মাসআলা : যদি কেউ তার স্ত্রীর নামে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় অথবা বলে তার স্ত্রীর গর্ভ তার নয় এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি হয় লেয়ানের যোগ্য, এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি তার উপরে আরোপিত অপবাদের শাস্তির জন্য বিচারপ্রার্থিনী হয়, তবে স্বামীর উপরে লেয়ান করা হয়ে যাবে ওয়াজিব। তখন স্বামী যদি লেয়ান করতে অসম্মত হয়, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে বিচারক তাকে লেয়ান না করানো পর্যন্ত অথবা সে যে মিথ্যাবাদী তা স্বীকার না করানো পর্যন্ত বন্দী করে রাখবে। যদি সে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করে, তবে তার উপরে প্রয়োগ করবে আশিটি বেত্রাঘাত।

www.eelm.weebly.com

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের নিকট এমতাবস্থায় ওই লোককে বন্দী করা যাবে না। বরং লেয়ান করতে অস্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার উপরে কার্যকর করতে হবে আশিটি বেত্রাঘাত। কেননা অপবাদ তো শাস্তিই ডেকে আনে। লেয়ানের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে কেবল স্বামীর সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার নিমিত্তে। স্বামী এমতোক্ষেত্রে তার সত্যতা প্রকাশে অক্ষম বলেই তো তাকে নিতে হয় লেয়ানের আশ্রয়। সুতরাং লেয়ানে অস্বীকৃত হলেই বুঝতে হবে সে অপবাদপ্রদাতা। তাই বন্দী করার কথা ভাববার অবকাশই এখানে নেই।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, লেয়ান যে করতে চায় না, সে ফাসেক। ইমাম মালেক বলেন, কেবল লেয়ানে অস্বীকৃতি জানালেই তাকে ফাসেক বলা যায় না।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, লেয়ান করতে অসম্মত হওয়ার অর্থ নিজের মিথ্যাবাদী হওয়াকে অস্বীকার করা। কিন্তু এমতোক্ষেত্রে কিছু সন্দেহও রয়েছে। কেননা সে যে মিথ্যাবাদী সে কথা সে নিজ মুখে স্বীকার করেনি। আর সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তি আরোপ করা যায় না। তাই বাধ্য হয়ে তাকে কয়েদ করে রাখা যাবে, যেনো সে লেয়ানের জন্য প্রস্তুত হয়, অথবা প্রকাশ্যে স্বীকার করে তার মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা, যাতে করে পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ অবস্থায় তার উপরে আশি বেত্রাঘাত কার্যকর করা যায়।

স্বামী যদি লেয়ান করে নেয়, তবে স্ত্রীর উপরে লেয়ান করা হয়ে যায় ওয়াজিব। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। তখন স্ত্রী যদি তা না করতে চায়, তবে বিচারক তাকে বন্দী করে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না সে লেয়ান করতে সম্মত হয়, অথবা স্বীকার করে তার স্বামীর কথার সত্যতা।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, স্বামী লেয়ান করে নিলেই ওই স্ত্রী তার জন্য হয়ে যাবে চিরতরে হারাম। ভূমিষ্ঠ সন্তানের সঙ্গেও তার পিতৃত্বের সম্পর্ক আর থাকবে না। কেননা রসুল স. বলেছেন, দুই লেয়ানকারী কখনো একত্র থাকে না।

আমরা বলি, স্বামীর পরে স্ত্রী লেয়ান না করা পর্যন্ত লেয়ান সম্পূর্ণ হবে না। কেননা লেয়ান এসেছে বাবে মুফা'আলাত থেকে। তাই উভয়ের অংশগ্রহণ ছাড়া মুফা'আলাত যথার্থ হবে না। সুতরাং কেবল স্বামীর লেয়ানের দ্বারা তাদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটবে না, ঘটবে উভয়ের লেয়ান সম্পন্ন হলে।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৮, ৯

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

www.eelm.weebly.com

❑ তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হইবে যদি সে চারিবার আল্লাহের নামে শপথ করিয়া সাক্ষ্য দেয় যে, তাহার স্বামীই মিথ্যাবাদী,

❑ এবং পঞ্চমবার বলে, 'তাহার স্বামী সত্যবাদী হইলে তাহার নিজের উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহের ক্রোধ।'

প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'আলআ'জাব'(শাস্তি) অর্থ ব্যভিচারের শাস্তি, যেমন বলা হয়েছে 'ফা আ'লাইহিন্না নিসফু মা আ'লাল মুহসানাতি মিনাল আ'জাবি'— এই আয়াতে। রসুল স. হজরত হেলালকে বলেছিলেন, 'আল্লাহ্‌র শাস্তি মানুষের শাস্তি অপেক্ষা অত্যন্ত কঠোর। এই শাস্তি রহিত করার কথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে— 'তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী'।

'স্বামীই মিথ্যাবাদী' অর্থ— স্ত্রী বলবে, আমার স্বামীই আমাকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে, আমার গর্ভ যে তার, সে কথাকে অস্বীকার করেছে। তার এমতো উক্তি মিথ্যা। অথবা অর্থ হবে— তার প্রথমোক্ত উক্তি মিথ্যা, কিংবা মিথ্যা শেষোক্ত উক্তি। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, স্বামী লেয়ান করলেই স্ত্রীর উপরে ওয়াজিব হয়ে যাবে ব্যভিচারের শাস্তি। আবার ওই শাস্তি রহিত হয়ে যাবে স্ত্রী লেয়ান করলে। আলোচ্য আয়াতে একথাই বলা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, স্ত্রীর লেয়ানের মাধ্যমে শুধু একটি হুকুমের সম্পর্ক হয়। অর্থাৎ রহিত হয়ে যায় ব্যভিচারের শাস্তি। আর যদি স্বামী চারজন পুরুষ প্রত্যক্ষদর্শীর মাধ্যমে ব্যভিচারকে প্রমাণ করে, তবে লেয়ানের অবকাশ আর থাকে না। এমতাবস্থায় ব্যভিচারের শাস্তি রহিত হবে না। আবার স্ত্রী যদি লেয়ান করতে অস্বীকার করে, তবে ব্যভিচারের শাস্তি হবে ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এমতাবস্থায় লেয়ানে সম্মত হওয়া অথবা স্বামীর অভিযোগকে স্বীকার না করা পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখা যাবে। স্বামীর অভিযোগকে একবার স্বীকার করলে লেয়ানেরও আবশ্যকতা থাকে না। আবার তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তিও ওয়াজিব থাকে না। কারণ একবারের স্বীকারোক্তিতে ব্যভিচারের শাস্তি দেয়া যায় না। আর এখানে 'আনহাল আ'জাব' (স্ত্রীর থেকে শাস্তি) অর্থ যে ব্যভিচারের শাস্তি তা-ও নয়। এর অর্থ বন্দী করাও হতে পারে। কারণ বন্দীত্বও শাস্তি। এমতোক্ষেত্রে যেহেতু সন্দেহ বিদ্যমান, তাই বলতে হয় সন্দেহের স্থলে শাস্তি রহিত হয়ে যায়।

মাসআলা ঃ স্ত্রী যদি একথা স্বীকার করে যে, তার গর্ভস্থিত সন্তান তার স্বামীর নয়, তবে তার এ অস্বীকৃতি সত্য হলেও তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি

www.eelm.weebly.com

অথবা লেয়ান কোনোটাই প্রযোজ্য হবে না। এমতাবস্থায় গর্ভস্থিত শিশু হবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের। কেননা লেয়ান সম্পূর্ণ হওয়ার পর গর্ভস্থিত শিশুর পিতৃত্বের সম্পর্ক তার স্বামীর সঙ্গে ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু লেয়ান সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ সম্পর্ক থাকে অটুট। আর এ হচ্ছে ওই শিশুর বংশগত অধিকার, যে অধিকার স্বামী স্ত্রীর উক্তিতে বিনষ্ট হতে পারে না। এমতো সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা।

আমি বলি, এই মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী দু'জনের উক্তিই আমার কাছে বিস্ময় উদ্রেকক। ইমাম শাফেয়ীর উক্তিতে আশ্চর্য হওয়ার কারণ হচ্ছে, তাঁর নিকট লেয়ান হচ্ছে শপথ। তাই তিনি স্বামীর সাক্ষ্যপ্রদানের যোগ্যতাকে আবশ্যক সাব্যস্ত করেন না। বলেন, সকল পুরুষই লেয়ান করতে পারবে, সে অপবাদকারী গোলাম, কাফের, ইতোপূর্বে অপবাদের শাস্তিপ্রাপ্ত, যে-ই হোক না কেনো। কেননা এরা সকলেই সাক্ষ্যদানের যোগ্য না হলেও শপথ উচ্চারণের অযোগ্য নয়। প্রকাশ থাকে যে, শপথ আবার সম্পদ প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রেও কার্যকর নয়। যেমন— কেউ বললো, আমি অমুকের নিকট এতো টাকা পাই, কিন্তু ওই লোক একথা অস্বীকার করলো, এমতাবস্থায় বাদীর পক্ষে যদি কোনো সাক্ষী না থাকে তবে কেবল তার শপথের মাধ্যমে বিবাদীর উপরে তার সম্পদ প্রত্যর্পণ ওয়াজিব হয় না। যদি তা-ই হয়, তবে স্বামীর শপথের দ্বারা স্ত্রীর উপরে ব্যভিচারের শাস্তিই (সঙ্গেসার) বা কার্যকর হতে পারবে কীভাবে। আর সঙ্গেসার তো সকল শাস্তি অপেক্ষা অধিক কঠিন।

ইমাম আবু হানিফার উক্তি আমার কাছে আশ্চর্যজনক একারণে যে, তাঁর নিকট লেয়ান শপথ নয়, সাক্ষ্য। তাই তাঁর মতে লেয়ানকারীকে হতে হবে সাক্ষদানের যোগ্য। তিনি একথাও বলেন যে, লেয়ানকারীর চারটি সাক্ষ্য ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত। আরো বলেন, স্বামীর চার সাক্ষ্য অপবাদের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত। আর স্ত্রীর চার সাক্ষ্য স্থলাভিষিক্ত ব্যভিচারের শাস্তির। এটাও বিস্ময়কর যে, স্বামীর চার সাক্ষ্যের পরেও স্ত্রীর উপরে ব্যভিচারের শাস্তি ওয়াজিব হয় না। অথচ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়া ইয়াদরাউ আনহাল আ'জাবা' (এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে)। এখানকার 'দারউন' সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক। অর্থাৎ শাস্তি রহিত হওয়া এখানে সুনিশ্চিত। আর স্ত্রীর জন্য যে লেয়ানকে ব্যভিচারের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, যদি স্ত্রী লেয়ান করে তবে তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। আর লেয়ান করতে অস্বীকৃত হলে আরোপিত হবে ব্যভিচারের শাস্তি। সুতরাং এর মধ্যে আবার বন্দী করে রাখার প্রসঙ্গ আসবে কোথেকে? স্ত্রীর লেয়ান তো ব্যভিচারের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত, বন্দীত্বের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত নয়। অতএব, লেয়ান অস্বীকার করলেতো ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

www.eelm.weebly.com

একটি সন্দেহ ঃ স্বামীর চারটি সাক্ষ্য ব্যভিচারের প্রমাণের চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তার ওই চার সাক্ষ্যের মাধ্যমে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়। বরং তার ওই চার সাক্ষ্যের মাধ্যমে সে-ই কেবল রেহাই পেতে পারে অপবাদের শাস্তি থেকে। সুতরাং তার চারটি সাক্ষ্যের এমতো স্থলাভিষিক্ত হওয়ার বিষয়টি সন্দেহজনক।

সন্দেহভঞ্জন ঃ বাদীর চার সাক্ষ্য চারজন সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার বিষয়টি কোরআন, হাদিস ও উম্মতের ঐকমত্যসমর্থিত। আর বাদীর চারটি সাক্ষ্যের দ্বারা ব্যভিচার প্রমাণিত হয় না সত্য, কিন্তু এ কথাও অসত্য নয় যে, চারজন সাক্ষীর দ্বারাও ব্যভিচার তো সুপ্রমাণিত না-ও হতে পারে। এরকম হওয়াও সম্ভব যে, চারজন সাক্ষীই হয়তো মিথ্যা সাক্ষ্য দানের জন্য একজোট হয়েছে। আর এমতো মিথ্যাচারের প্রমাণের সুযোগও তো তেমন নেই। আসল কথা হচ্ছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচারক যে দুই তিন ইত্যাদি সংখ্যক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, তা তো কেবল শরিয়ত পালনার্থেই। এতে করে সন্দিগ্ধতা উত্তরিত হয় দৃঢ়বদ্ধ একটি ধারণায়। আর ওই দৃঢ়বদ্ধ ধারণার উপরে ভিত্তি করে বিচারক দিয়ে থাকেন তাঁর সিদ্ধান্ত। আবার এর উদ্দেশ্য এরকমও নয় যে, বিচারক তাঁর সুদৃঢ় কোনো বিশ্বাসকে শরিয়তের বিধানের কারণে রূপ দিতে অক্ষম।

যখন চার পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা শরিয়তসম্মতভাবে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তখন বাদীর চার বার শপথযুক্ত সাক্ষ্য তো আরো বেশী প্রামাণ্য হওয়া উচিত। কারণ সে এভাবে একথাও স্বীকার করে নেয় যে, তার সাক্ষ্য মিথ্যা হলে তার উপর আল্লাহ্‌র লানত। এরপর সে আবার আদেল (ন্যায়বান) থাকে, ফাসেক হয় না। ভবিষ্যতেও বিদ্যমান থাকে তার সাক্ষ্য দানের অধিকার এবং যোগ্যতা। স্ত্রী লেয়ান করতে যদি অস্বীকার করে, তবে তো তার ন্যায়পরায়ণতা হয়ে ওঠে আরো উজ্জ্বল। আবার দেখুন চার জন সাক্ষীর মিথ্যার উপর একমত হওয়াও অসম্ভব কিছু নয় এবং অপবাদগ্রস্তা লেয়ান করলে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে জেনেও যদি তা করতে অস্বীকার করে, তবে তো সে তার স্বামীর অভিযোগ স্বীকারই করে নিলো। এখন অবশিষ্ট রইলো সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তি রহিত হওয়ার কথা। তবে মনে রাখতে হবে, এমতো সন্দেহের অবকাশ তো সব ক্ষেত্রেই থাকে। সাক্ষ্য, লেয়ান, লেয়ানে অস্বীকৃতি কোনো কিছুই তো সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। কিন্তু শরিয়তের শর্তসমূহ পূরণ হওয়ার পর সন্দেহ আর প্রশ্রয়যোগ্য ও ধর্তব্য নয়। ইমাম আবু হানিফা স্বামীর জন্য সাক্ষ্য দানের যোগ্য হওয়ার যে শর্ত আরোপ করেছেন এবং বলেছেন অপবাদ প্রমাণিত হওয়ার অবস্থায় স্ত্রীকে হতে হবে শাস্তি

www.eelm.weebly.com

গ্রহণের যোগ্যতাধারিণী, আমার মতে এই ধারণাটি যথার্থ। আবার ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, স্ত্রী যদি লেয়ান থেকে বিরত থাকে অথবা লেয়ান করতে অস্বীকৃত হয়, তবে তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। তাঁর একথাও অযথার্থ নয়।

মাসআলা : 'শুধু স্বামী লেয়ান করলেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে' ইমাম শাফেয়ীর এমতো উক্তি প্রামাণ্য নয়। ইমাম জোফার, ইমাম মালেক এবং এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদেরও অভিমত এই যে, এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায়, বিচারক সিদ্ধান্ত প্রদান না করলেও। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম আবু ইউসুফ এবং এক বর্ণানানুসারে ইমাম আহমদের অভিমত, বিচারক সিদ্ধান্ত দানের পূর্বে তালাক কার্যকর হয় না। উভয়ে লেয়ান করলেও। তবে দু'জনের লেয়ান শেষে তাদের তালাক কার্যকর করা বিচারকের উপর হয়ে যায় ওয়াজিব।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদ বলেন, এরকম তালাক হবে এক তালাক বায়েন । আর অন্যান্য ইমামগণ বলেন, এমতো তালাককে বলতে হবে বিবাহবিচ্ছেদ। শেষোক্ত উক্তির দলিল এই বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ। দুধপান বিধানের মতো লেয়ানজাত স্ত্রীও চিরতরে হারাম। আর এটাকেই বলা হয় ফিস্খ্। হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার এক লেয়ানকারী দম্পতিকে বললেন, তোমাদের হিসাব আল্লাহ্‌র অধিকারে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে কোনো একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারপর স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন, এখন তার সঙ্গে তোমার পুনর্মিলনের সকল উপায় চিরতরে রুদ্ধ। স্বামী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার প্রদত্ত মোহরানার কী হবে? রসুল স. বললেন, যদি তুমি তাকে সত্যি সত্যিই অপরাধিনী মনে করো, তবে তা হয়ে গিয়েছে তোমার ইতোপূর্বের সহবাসের বিনিময়। আর যদি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকো, তবে তো তুমি তার নিকট আরো অধিক দায়বদ্ধ। সুতরাং তার জিম্মায় তোমার আর কোনো পাওনা নেই। উল্লেখ্য ইতোপূর্বে হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকে আবু দাউদ কর্তৃক লেয়ানকারী এক দম্পতির কথা বর্ণিত হয়েছে। রসুল স. ওই দম্পতির সম্পর্ক চিরদিনের জন্য ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন ভবিষ্যতে আর কখনো তোমরা মিলিত হতে পারবে না। হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে দারাকুতনীও এরকম বর্ণনা করেছেন। শায়েখ ইবনে হাজার লিখেছেন, হজরত আলী, হজরত ওমর ও হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আব্দুর রাজ্জাক ও ইবনে শায়বার 'আলমুসান্নিফ' গ্রন্থেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

আবু দাউদ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হজরত হেলাল ইবনে উয়াইমিরের ঘটনার শেষাংশে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন স্ত্রীর উপরে আর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া যাবে না এবং তার সন্তানকেও বলা যাবে না ব্যভিচারজাত।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর যুগে এক লোক তার স্ত্রীর বিষয়ে লেয়ান করেছিলো। লেয়ানের পর রসুল স. তাদেরকে পৃথক করে দিয়েছিলেন এবং সন্তানের সম্পর্ক করে দিয়েছিলেন তার মায়ের সঙ্গে। লেয়ানকারীকে তার পিতা সাব্যস্ত করেননি এবং সন্তানকেও সাব্যস্ত করেননি ব্যভিচারজাত। এ প্রসঙ্গে জমহুরের উক্তির পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে রয়েছে হজরত উয়াইমিরের ঘটনাটি, যা হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ তার 'সুনান' গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন এভাবে—রসুল স. লেয়ান সম্পন্ন হওয়ার পর এই মর্মে সিদ্ধান্ত দান করলেন যে, তোমরা চিরতরে পৃথক। স্বামীর উপরে স্ত্রীর আশ্রয় ও খোরপোষের দায়িত্ব নেই। কেননা এই বিচ্ছিন্নতা স্বাভাবিক তালাকের মতো নয়, আর স্ত্রীও এমতোক্ষেত্রে বরণ করেনি বৈধব্য। অর্থাৎ স্বামী তাকে তালাকও দেয়নি, মরেও যায়নি। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে তালাক কার্যকর করার দায়িত্বও বিচারকের উপরে বর্তায় না। এমতাবস্থায় ওই নারী ওই পুরুষের জন্য চিরনিষিদ্ধ। তাই এমতো বিচ্ছিন্ন ফিস্‌খ্‌, তালাকে বায়েন নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, নিষিদ্ধতা প্রতিপন্ন হওয়া বিবাহবিচ্ছেদের দাবি করেনা। যেমন জেহার। জেহারের দ্বারা স্ত্রী হারাম হয়ে যায়, কিন্তু বিবাহ বাতিল হয় না। জেহারের কাফফারা প্রদানের পর পুনরায় স্ত্রী হয়ে যায় হালাল। তবে হারাম হওয়ার পর যখন তার স্বামী শরিয়ত অনুসারে তাকে বিবাহবদ্ধ রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন উত্তম পন্থায় সদাচরণের মাধ্যমে স্ত্রীকে তালাক দেয়া তার উপরে হয়ে যায় ওয়াজিব। তখন সে যদি এরকম না করে, তবে বিচারক ওই স্ত্রীকে তার নিকট থেকে তালাক করিয়ে দিবেন, যাতে করে স্ত্রী বেঁচে যেতে পারে জুলুম থেকে। এর প্রমাণ রয়েছে বোখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায়। হজরত সহল ইবনে সাঈদ বর্ণনাটিকে উপস্থাপন করেছেন এভাবে— উভয়ের লেয়ান সম্পাদনের পর হজরত উয়াইমির বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এখন যদি আমি তাকে আমার কাছে রাখি তবে আমি তো হয়ে যাবো অপবাদদাতা। একথা বলে তিনি স্ত্রীকে তালাক দিলেন। রসুল স. তাঁর এমতো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছুই বলেননি।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে ওমর থেকে দারাকুতনির বর্ণনায় এসেছে রসুল স. দু'জনকে আলাদা করে দিলেন এবং বললেন, ভবিষ্যতে এরা আর কখনো মিলিত হতে পারবে না। কিন্তু এই নির্দেশটি রসুল স. এর কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। এমতো সন্দেহ প্রকাশ করেছেন শায়েখ আবু বকর রাজী।

'তানকিহ্' রচয়িতা লিখেছেন, হাদিসটির সূত্রপরম্পরা পরিশুদ্ধ। তাই নির্দেশটি রসুল স. এরই নির্দেশ। আর এর উদ্দেশ্যই বলে দিচ্ছে, কেবল লেয়ান সম্পন্ন হলেই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে না। ঘটে বিচারকের নির্দেশে, অথবা স্বামীর তালাক প্রদানের ঘোষণায়। হাদিসটি ইমাম শাফেয়ীর মতের বিপক্ষে একটি উত্তম দলিল। এখন অবশিষ্ট রইলো হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাটি, যেখানে বলা হয়েছে রসুল স. সিদ্ধান্ত দিলেন; এখন থেকে স্ত্রীর আবাসন ও ভরন পোষণের দায়িত্ব তার স্বামীর উপরে নেই, কারণ লেয়ানের কারণে তাদের বিবাহবিচ্ছিন্ন। উল্লেখ্য এমতাবস্থায় স্বামীর উপরে স্ত্রীর আবাসন ও ভরন পোষণের দায়িত্ব রয়েছে বলে হজরত ইবনে আব্বাস যে অভিমত দিয়েছেন, তা তার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানজাত। হাদিসে তো এরকম কিছু বলা হয়নি। আমি বলি, লেয়ানের পর আপনাআপনি বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ঐকমত্যসম্মত। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম জোফার ও অন্যান্য ইমামগণের অভিমত তো এ ব্যাপারে একেবারে স্পষ্ট। তাঁরা লেয়ানকেই বিবাহবিচ্ছেদ বলে মনে করেন। আর ইমাম আবু হানিফার অভিমতেও স্ত্রী হারাম হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত। বিচারকের দায়িত্ব কেবল বিষয়টির ঘোষণা প্রদান। একারণেই তো রসুল স. লেয়ানকারীদেরকে পৃথক করে দিতেন। উল্লেখ্য, এমতো বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী। অর্থাৎ লেয়ানকারীরা আর কখনোই স্বামী-স্ত্রী হতে পারবে না। বিষয়টি জেহারের মতো সাময়িক বিবাহবিচ্ছেদের মতো নয়। সুতরাং লেয়ানের দ্বারাই যখন বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়, তখন বিচারকের ঘোষণার আবশ্যকতাই বা রইলো কোথায়?

ইবনে হুম্মাম স্বয়ং লিখেছেন, ইমাম আবু ইউসুফের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, বিচারকের সিদ্ধান্তের উপরে এমতাবস্থায় তালাক নির্ভরশীল নয়। কারণ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, বিচারকের হস্তক্ষেপের পূর্বেই ওই বিবাহ হয়ে যায় বাতিল।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, লেয়ানের পর যেহেতু শরিয়ত মতে স্বামী আর স্ত্রীকে বিবাহে রাখতে সম্মত নয়, তাই বিচারকই তালাকের ঘোষণা প্রদান করবেন। 'তাসরিহুম বিল ইহ্সান' (উত্তমতার সঙ্গে বিদায়) —এই রীতি অনুসারে বিচারকই তখন হবে স্বামীর পক্ষে তালাকের ঘোষণা প্রদানকারী। তাই নিয়ম

www.eelm.weebly.com

হচ্ছে. লেয়ানের পর বিচারক স্বামীকে তালাক দিতে বলবেন। যদি সে এ নির্দেশ পালন না করে তবে বিচারকই তাদেরকে পৃথক করে দিবেন। অস্বীকৃতির পর তালাকের হুকুম জারী রাখার প্রবক্তা কেউই নন। রসুল স.ও তালাকের হুকুম দেননি। তালাক দিয়েছিলেন হজরত উয়াইমির স্বয়ং।

এবার আসা যায় 'স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীর আবাসন ও ভরন পোষণ প্রদান' হজরত ইবনে আব্বাসের এই অভিমত প্রসঙ্গে। তাঁর মতে লেয়ানের দ্বারাই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। উল্লেখ্য, হাদিসে কিন্তু স্পষ্ট করে বলা হয়েছে আবাসন ও ভরন পোষণ না দেয়ার কথা। তিনি স. তো ওই বিষয়ের সকল কিছুই জানতেন। তবু তিনি আবাসন ও ভরন পোষণ প্রদানের বিপক্ষে মত প্রকাশ করলেন কেনো? আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে, লেয়ানের দ্বারাই যদি বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে, তবে হজরত উয়াইমির তালাক দেয়ার আবশ্যকতাই বা বোধ করলেন কেনো? এমতো প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে তিনি হয়তো তখন একথা জানতেন না যে, লেয়ানই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটায়।

এবার আলোচনা করা যাক ইমাম শাফেয়ীর উদ্দেশ্যের শর্তের দলিল হওয়া প্রসঙ্গে। তিনি মাফহুমে শর্তকেই দলিল মনে করেন। কিন্তু এস্থলে বিবাহ চিরতরে হারাম হওয়ার বিষয়টি যেহেতু সুপ্রমাণিত, সেহেতু মাফহুমে শর্তের আমল করে দেয়া হয়েছে স্থগিত। অথবা বলা যেতে পারে 'আল মুতালায়ি'নানি ইজাফতারাকা লা ইয়াজতামীয়ানী আবাদা' এর উদ্দেশ্য— যখন উভয়ে লেয়ান করে, তখনই উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, ভবিষ্যতে আর কখনো তারা বিবাহবদ্ধ হতে পারবে না। ইমাম আবু হানিফার মতে হাদিসে উল্লেখিত 'আলমুতাবাই'নানী বিল খিয়ারি মালাম ইয়াতাফাররাক্বা' এর উদ্দেশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত ইজাব ও কবুল সম্পন্ন না হবে এবং বাচনিকভাবে পৃথক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতার ক্রয় বিক্রয় করার অধিকার আছে। সে কারণেই ইমাম আবু হানিফা মনে করেন পৃথকতা অর্থ বাচনিক পৃথকতা।

মাসআলাঃ লেয়ান সমাপ্ত করার পর স্বামী নিজেকে যদি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, তবে সে তার বিবাহবিচ্ছিন্ন স্ত্রীকে পুনর্বিবাহ করতে পারবে কিনা, সে সম্পর্কে রয়েছে যথেষ্ট মতপৃথকতা। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, এরকম করলে তার ক্ষতি হবে লাভ। অর্থাৎ অপবাদপ্রদাতা হিসেবে ভোগ করতে হবে আশিটি বেত্রাঘাত, কিন্তু সে হবে ওই গর্ভস্থিত শিশুর প্রকৃত পিতা। আর তার স্ত্রী তার জন্য হয়ে যাবে চিরনিষিদ্ধ।

ইমাম আবু হানিফা ও এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের উক্তি এই, যে তার উপরে প্রয়োগ করতে হবে অপবাদের শাস্তি এবং যেহেতু অপবাদের স্বীকারোক্তির

www.eelm.weebly.com

পর তার আর লেয়ান করার অধিকার থাকে না, তাই তার লেয়ান হবে পরিত্যক্ত। তখন লেয়ানের সঙ্গে বিবাহের যে নিষিদ্ধতা ছিলো, তাও হয় যাবে বিলুপ্ত। তাই সে তার স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। অনুরূপ যদি কেউ অন্য কারো স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় এবং সে জন্য তার উপরে শাস্তিও প্রয়োগ করা হয়, তবে সে আর লেয়ানের যোগ্য থাকে না। এই বিধানটি বলবৎ হতে পারবে তখন, যখন স্ত্রী ব্যভিচার করে এবং শাস্তিপ্রাপ্তা হয়, তখন সে-ও আর লেয়ানের অধিকার রাখে না। তাই স্বামী নিজের উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে উভয়ের পুনর্বিবাহ হয়ে যায় জায়েয।

আমি বলি, লেয়ানের যোগ্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে, লেয়ানই হয়নি। তবে লেয়ানের পুনরাবৃত্তি অবৈধ। লক্ষণীয়, কেউ যদি কাউকে ব্যভিচারের অপবাদ প্রদানের পর তা প্রমাণ করতে সমর্থ না হয়, পরে নিজেই তার উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং এজন্য শাস্তিভোগ করে, এরপর যদি কখনো নিজেই ব্যভিচার করে ফেলে, তবে সে আর লেয়ানের যোগ্য থাকবে না এবং তার অপবাদদাতার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে না।

হানাফীগণ বলেন, 'আল মুতালায়ি'নানি লা ইয়াজ্তামিয়া'নি আবাদা' রীতি অনুসারে কাজইয়ায়ি উরফিইয়া এবং আরকাজইয়ায়ি উরফিয়ায় হুকুমের ভিত্তি হয়ে থাকে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। এমতাবস্থায় উদ্দেশ্য হবে, লেয়ানকারী যতক্ষণ পর্যন্ত না লেয়ানের বৈশিষ্ট্য দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে, ততক্ষণ তারা একত্রিত থাকতে পারবে না। লেয়ানের বৈশিষ্ট্য দূর হওয়ার সাথে সাথে আবার একত্রিত না হওয়ার নিষিদ্ধতাও দূর হয়ে যাবে। কেননা স্বামী নিজেই তার কথাকে মিথ্যা বলে স্বীকার করেছে। আমরা বলি, এটা কাজইয়া উরফিয়া নয়। কেননা এর বৈশিষ্ট্য হয় অধিকতর দৃঢ়। আর লেয়ান স্থায়ী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কিছু নয়। তাই এখানে এর বিধান শর্তসাপেক্ষ হতে পারে না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, স্বামী-স্ত্রী কোনো সময় লেয়ান করলে আর কখনোই তারা বিবাহবদ্ধ হতে পারবে না। এরকম নয় যে, বিবাহ নিষিদ্ধ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ তারা থাকবে লেয়ানের উপরে বিদ্যমান এবং একে অপরকে সাব্যস্ত করতে থাকবে মিথ্যাবাদীরূপে, আর যে কোনো একজন তার মিথ্যাবাদী হওয়াকে স্বীকার করলেই তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহ হবে জায়েয।

মাসআলা ঃ স্বামী যদি বলে, এই সন্তান আমার নয়, তবে তার লেয়ানের পর বিচারক ওই সন্তানের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘোষণা দিবেন, বলবেন, এই সন্তান তার মাতার। যারা লেয়ানের পর বিচ্ছেদের জন্য মহামান্য আদালতের সিদ্ধান্ত আবশ্যক মনে করে না; তাদের মতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য স্বামীর অস্বীকৃতিই যথেষ্ট। তাঁদের মতে লেয়ানের সময় স্বামীকে বলতে হবে

www.eelm.weebly.com

একথাগুলো— তার গর্ভস্থিত সন্তানকে আমি আমার সন্তান বলে স্বীকার করি না, আল্লাহ্ সাক্ষী, আমার উক্তি সত্য। স্ত্রীও এরকম বলবে। হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এক দম্পতিকে লেয়ান করান। স্বামী তার স্ত্রীর গর্ভস্থিত সন্তানকে নিজের সন্তান বলে অস্বীকার করেছিলো। তিনি স. ওই দম্পতিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন এবং সন্তানের সম্পর্ক যুক্ত করে দিয়েছিলেন তার মায়ের সঙ্গে। বোখারী, মুসলিম।

মাসআলা ঃ স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার এ গর্ভ আমার দ্বারা হয়নি, তবে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম জোফার ও ইমাম আহমদের মতে লেয়ানের নির্দেশ দেয়া যাবে না, স্বামীর উপরে অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না এবং স্ত্রীকেও দেয়া যাবে না ব্যভিচারের শাস্তি। কেননা তার গর্ভ হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত নয়। এমনো হতে পারে যে স্ত্রী গর্ভবতীই হয়নি। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মতে এমতাবস্থায় লেয়ান করা যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের মতে যদি ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব হয়, তবে লেয়ান করাতে হবে। একথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত লেয়ান করানো যাবে না। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত হেলালের ক্ষেত্রে লেয়ান করানো হয়েছিলো সন্তান জন্মগ্রহণের পর।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় হজরত হেলালের ঘটনায় এসেছে, রসুল স. তখন বললেন, হে আল্লাহ্! সুস্পষ্ট করে দাও। দেখা গেলো সন্তানের সাদৃশ্য রয়েছে কথিত ব্যভিচারীর সঙ্গে। তখন রসুল স. উভয়কে লেয়ান করালেন।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী তাদের মতের অনুকূলে উপস্থাপন করেন আবু দাউদের বর্ণনাটি, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. হেলাল ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটালেন এবং ঘোষণা দিলেন, সন্তানকে তার পিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যাবে না, বলা যাবে না যে, সে ব্যভিচারজাত এবং তার মাতাকেও বলা যাবে না ব্যভিচারিণী। যে ব্যক্তি ওই সন্তানকে ব্যভিচারজাত এবং তার মাতাকে ব্যভিচারিণী বলবে, তার উপরে প্রয়োগ করতে হবে ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি। ইকরামা বলেছেন, ওই সন্তান পরবর্তীকালে হয়েছিলো মিসরের বিচারপতি। সে জানতো না, তার পিতা কে?

অধিকাংশ বর্ণনায় এসেছে, লেয়ান করানোর সময় হজরত হেলালের স্ত্রী ছিলো গর্ভবতী। নাসাঈ হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজলানী ও তার স্ত্রীকে লেয়ান করিয়েছিলেন। ওই সময় তার স্ত্রী ছিলো গর্ভিনী। আবদুর রাজ্জাকও এরকম বর্ণনা করেছেন এবং লিখেছেন, তখন স্বামীটি বলেছিলো

www.eelm.weebly.com

'ইফারুন্ নাখ্ল' থেকে আমি তার নিকটে যাইনি। 'ইফারুন নাখল' অর্থ বৃক্ষের ডালপালা ছেটে দেয়ার পর দুইমাস তার কাছে না যাওয়া। রসুল স. তখন বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! প্রকাশ করে দাও। সন্তান জন্মের পর দেখা গেলো শিশুটি দেখতে অতি কুৎসিত। এই বর্ণনাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, গর্ভবতী অবস্থাতেও লেয়ান করানো যায়।

বর্ণিত হাদিস প্রসঙ্গে একথাও বলা যায় যে, হজরত হেলাল তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর অন্তঃসত্তা হওয়াকে অস্বীকার করেননি। লেয়ান করানো হয়েছিলো সেকারণেই। ওয়াকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত হেলাল তার স্ত্রীর গর্ভ নিজের বলে স্বীকার করেননি, তাই তিনি লেয়ান করেছিলেন। ইমাম আহমদ এই হাদিসের সূত্রপরম্পরাগত যথার্থতাকে স্বীকার করেননি। বলেছেন, এটাই ওয়াকীর ভুল যে, তিনি গর্ভ অস্বীকারকে লেয়ানের কারণ মনে করেছেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, হজরত হেলাল যখন রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে তাঁর স্ত্রীর ব্যভিচার সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করলেন, তখন রসুল স. তাঁকে লেয়ান করালেন। সুতরাং গর্ভ অস্বীকার লেয়ানের কারণ ছিলো না।

আমি বলি, একথা সুস্পষ্ট যে, হজরত হেলাল উভয় অভিযোগই উত্থাপন করেছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা সূত্রে বাগবীর বর্ণনা দৃষ্টে সে কথাই প্রতীয়মান হয়। যদি হজরত হেলাল কেবল ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করতেন, তবে রসুল স. তাঁর সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কচ্ছিন্নতার কথা বলতেন না। কেননা সন্তান তো হজরত হেলালেরও হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। সুতরাং কেবল গর্ভ অস্বীকারের কারণে লেয়ানের বৈধতা তাঁর ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় না। অনুরূপ হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে আজলানী ও তার স্ত্রীর লেয়ানের বিষয়টিও। সেখানেও বলা হয়েছে আজলানীর স্ত্রী তখন ছিলো গর্ভবতী। কিন্তু এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, আজলানী কেবল গর্ভ অস্বীকার করেছিলো, ব্যভিচারের অভিযোগ তোলেনি। বরং ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর বলেছেন, ওয়ায়েল ইবনে হারেছ আজলানী তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে শরীক ইবনে সামহার ব্যভিচারের অভিযোগ তুলেছিলো। ঘটনাটি ঘটেছিলো আমার সামনে। তাঁর স্ত্রী ছিলো গর্ভবতী। ওই গর্ভকে ওয়ায়েল নিজের বলে স্বীকার করেনি। রসুল স. স্বামী-স্ত্রীকে লেয়ান করিয়েছিলেন। তারা দু'জনে মিম্বরের পাশে দাঁড়িয়ে লেয়ান করেছিলো। কিছুদিন পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। ওই নবজাতকের চেহারা ছিলো শরীক ইবনে সামহার মতো। রসুল স. ওই শিশুটির সম্পর্ক করে দিয়েছিলেন তার মায়ের সঙ্গে।

www.eelm.weebly.com

হজরত উয়াইমির যখন তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ তুলেছিলেন, তখন তাঁর বংশের লোকেরা তাঁকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো। বলাবলি করতে লাগলো, তোমার স্ত্রীকে তো আমরা ভালো বলেই জানি। কিন্তু যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো, তখন সকলে সবিস্ময়ে দেখলো নবজাতকের আকৃতি শরীকের মতো। ওই সন্তান দু'বছর পর মারা যায়। ওই ঘটনার পর শরীক লোকসমাজে হয়ে যায় অত্যন্ত নিন্দিত। এ ঘটনার বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, হজরত উয়াইমির তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ যেমন তুলেছিলেন, তেমনি অস্বীকার করেছিলেন তার গর্ভকেও।

ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফের দলিল এই যে, স্বামী যখন তার স্ত্রীর গর্ভকে অস্বীকার করে এবং ছয়মাসের মধ্যে স্ত্রীর সন্তান লাভ হয়, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অস্বীকৃতির সময়েই তার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলো। তাই তার উত্থাপিত অভিযোগ সত্য। আর অপবাদের শাস্তি থেকে রেহাই পাবার জন্যই সে লেয়ান করেছে।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, গর্ভের অস্তিত্ব বাস্তব ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত নয়। তবে এটা হয়েছে সন্তান অস্বীকারের শর্ত এবং উদ্দেশ্য হয়েছে একথা বলা যে, যদি তুমি গর্ভবতী হয়ে থাকো, তবে সে গর্ভ আমার দ্বারা হয়নি। আর অপবাদকে শর্ত করাও ঠিক নয়।

মাসআলা ঃ যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তুমি ব্যভিচার করেছো এবং তোমার গর্ভ ব্যভিচারজাত, তবে সর্বসম্মত মতানুসারে তাকে লেয়ান করাতে হবে। কেননা সে প্রকাশ্যে ব্যভিচারের কথা বলেছে। ইমাম আবু হানিফার মতে এমতাবস্থায় বিচারক বংশীয় সম্পর্কের নিষিদ্ধতার সিদ্ধান্ত দিবেন না। ইমাম শাফেয়ীর উক্তি এর বিপরীত। কেননা রসুল স. এমতাবস্থায় সন্তানের বংশীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। হজরত হেলালের ক্ষেত্রে এরকমই ঘটেছিলো। তাঁর স্ত্রীও তখন ছিলো গর্ভবতী। ইমাম আবু হানিফা বলেন, বিধান প্রবর্তিত হয়েছিলো সন্তান জন্মগ্রহণের পর। কারণ পূর্বের গর্ভ তো অনিশ্চিত। কিন্তু রসুল স. এক্ষেত্রে নিশ্চিত গর্ভের কথা জানতে পেরেছিলেন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। তাই তিনি আভাস দিয়েছিলেন বংশগত সম্পর্কচ্ছিন্নতার।

আমি বলি, ইমাম আবু হানিফার এমতো উক্তি দূরদর্শিতাসমৃদ্ধ নয়। কেননা রসুল স. সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন প্রকাশ্য কার্যকলাপের ভিত্তিতে, যাতে করে সে সিদ্ধান্ত হতে পারে উম্মতের অনুসরণযোগ্য। অপ্রকাশ্য প্রত্যাদেশ তাঁর ফয়সালার ভিত্তি ছিলো না। এরকম না হলে তিনি স. একথা বলতেন না যে, তোমাদের দু'জনের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যাবাদী।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা : সন্তান জন্মের পর যদি স্বামী তাকে তার নিজের সন্তান বলে স্বীকার না করে, তবে ইমাম শাফেয়ীর মতে তার অস্বীকৃতিকে সঠিক বলে মেনে নেয়া যাবে। কিন্তু সন্তান জন্মগ্রহণের সংবাদ শোনার সাথে সাথে যদি অস্বীকার ক'রে, তবে বিষয়টি হবে শর্ত সাপেক্ষ। এমতাবস্থায় তাকে লেয়ান করাতে হবে। আর যদি সে সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কিছু না বলে, পরবর্তীতে বংশীয় সম্পর্কের প্রতি অস্বীকৃতি জানায়, তবে তা গ্রাহ্য হবে না। অর্থাৎ ওই সন্তান বিবেচিত হবে তারই বংশধররূপে। আর অপবাদ প্রদানের কারণে তাকে লেয়ানও করাতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, জন্মের সুসংবাদ দানের সময় সম্পর্ককে অস্বীকার করলে সে অস্বীকৃতি হবে সঠিক। এক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ প্রসঙ্গে অবশ্য ইমাম আবু হানিফার কোনো অভিমত বর্ণিত হয়নি। আবুল লাইছের বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আবু হানিফা অস্বীকৃতির জন্য তিনদিন সময় প্রদানের পক্ষপাতি। হাসানের বর্ণনায় এসেছে সাতদিনের কথা। সাহেবাইনের মতে নেফাসের পুরো সময়টাই অস্বীকৃতির সময়সীমা। কিয়াসের দাবি হচ্ছে, সন্তান জন্মের সংবাদ শুনে যদি অবিলম্বে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তা হবে গ্রহণযোগ্য। আর কিছু সময় ক্ষেপণের পর অস্বীকার করলে তা হবে অগ্রাহ্য। কেননা ওই সময়ের নীরবতা ছিলো তার সম্মতির নিদর্শন। কিন্তু সূক্ষ্মচিন্তাজাত মীমাংসা এই যে, চিন্তা-ভাবনার জন্যও তো কিছু সময়ের প্রয়োজন। এরকম চিন্তা ছাড়া কিছু বললে এমনও তো হতে পারে যে, ওই সন্তান আসলে তারই। যদি তাই হয়, তবে সম্পর্কচ্ছিন্ন করা হবে হারাম। আবার অন্যের সন্তানকেও নিজের বলে স্বীকার করা হালাল নয়।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, অন্য গোত্রের সন্তানকে অর্থাৎ অবৈধসন্তান কোনো মহিলা যদি তার স্বামীর গোত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে, তবে সে হয়ে যায় আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ জেনে শুনে আপন সন্তানের পিতা হতে অস্বীকার করে, পরকালে আল্লাহ্ তাকে দর্শনদান করবেন না, পূর্বাপর সকলের কাছে তাকে করবেন লাঞ্ছিত। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, নাসাঈ, শাফেয়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম। দারাকুতনী বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং হজরত আবু বকরা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আপন পিতা নয় জেনেও যে অন্য ব্যক্তিকে নিজের পিতা বলে পরিচয় দেয়, তার জন্য জান্নাত হারাম।

মাসআলা : সন্তান জন্মের সময় যদি স্বামী দূরে কোথাও অবস্থান করে, তবে তার স্বীকৃতির সময় ধরতে হবে তার প্রত্যাবর্তনের পর থেকে। সাহেবাইনের মতে

www.eelm.weebly.com

ফেরার পর তাকে দেয়া হবে নেফাসের সময়সীমার পরিমাণ সময়। ইমাম আবু হানিফার মতে চিন্তা ভাবনার জন্য সুসংবাদ প্রদানের সময়ের পরিমাণ অবকাশই যথেষ্ট।

মাসআলা ঃ স্বামীর যদি তার স্ত্রীর ব্যভিচার সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, অথবা সে দৃঢ় ধারণা লাভ করে ব্যাপক জনশ্রুতির মাধ্যমে এবং যদি এমতোক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে সহায়ক কোনো কারণ— যেমন জায়েদকে সে দেখেছে তার স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে, এমতাবস্থায়, সে তার স্ত্রীর নামে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে। আবার সহবাস না করা সত্ত্বেও যদি তার স্ত্রীর সন্তান প্রসব হয়, তবে ওই সন্তানের পিতৃত্ব সে অস্বীকার করতেই পারে। তবে সে সহবাস করেছে, কিন্তু তখনো ছয়মাস অতিবাহিত হয়নি, অথচ সন্তান জন্মেছে, এমতাবস্থায়ও তার জন্য সন্তানকে অস্বীকার করা জায়েয। তবে ছয় মাসের উর্ধ্বে দুই বৎসরের মধ্যে যদি সন্তান জন্মে, অথবা ঋতুস্রাব না হওয়ার কারণে গর্ভসঞ্চার ঘটেনি, এমতাবস্থায় পিতৃত্বের অস্বীকৃতি নাজায়েয। আর ঋতুস্রাবের সময় থেকে যদি ছয় মাসের অধিক সময়ের পর সন্তান জন্ম নেয়, তবে তা নিজের হওয়াকে অস্বীকার করা জায়েয।

মাসআলা ঃ যদি সহবাস করে অথবা আজল করে অথবা স্ত্রীর ব্যভিচারের কথা নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া সত্ত্বেও যদি সন্তান তার না অন্যের বলে সন্দেহ করে, তবে এমতাবস্থায় সন্দেহকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, আপন সন্তানকে অস্বীকার করা হারাম। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্ব অবহিত।

সূরা নূর ঃ আয়াত ১০

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ۟

❐ তোমাদিগের প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে এবং আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময় না হইলে তোমাদিগের কেহই অব্যাহতি পাইত না।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অনুগ্রহপ্রদাতা, করুণানিধান, তওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়। যদি এরকম না হতো তবে পৃথিবীতেই তোমাদের প্রতি নেমে আসতো লাঞ্ছনা ও শাস্তি।

'তাওয়াবুন' অর্থ প্রত্যাবর্তনকারী, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন অপকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্তায়ালা সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। বলা বাহুল্য, এরকম প্রত্যাবর্তনকারীর উপরে আল্লাহ্ রহমত করেন, গ্রহণ করেন তাদের প্রত্যাবর্তনকে।

www.eelm.weebly.com

'হাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তোমাদের উপরে তিনি শরিয়তের যে বিধানাবলী প্রবর্তন করেছেন, সেগুলো তাঁর অপার প্রজ্ঞার ফল।

বোখারী, মুসলিম প্রমুখ জুহুরী সূত্রে ওরওয়া ইবনে যোবায়ের, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস ও ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে ওতবা হজরত ইবনে মাসউদের মাধ্যমে জননী আয়েশার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিটি তিনি প্রকাশ করেন তখন, যখন আল্লাহ্ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রমাণ করেন তাঁর নিষ্কলুষতাকে। জুহুরী বলেন, আমার নিকটে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন কয়েকজন হাদিসবেত্তা। ওরওয়ার বর্ণনায় এসেছে, উম্মত জননী হজরত আয়েশা বলেছেন, রসুল স. কোনো সফরে যেতে মনস্থ করলে লটারীর মাধ্যমে সহধর্মিণীগণের মধ্য থেকে নির্বাচন করতেন তাঁর সফরসঙ্গিনী। এক সফরের লটারীতে উঠলো আমার নাম। তিনি আমাকে সঙ্গে নিলেন। ঘটনাটি ছিলো পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরের। আমি উঠে বসলাম একটি পর্দাবৃত হাওদায়। হাওদাটি প্রয়োজনমতো উটের পিঠে ওঠানো হতো। আর নামানো হতো যাত্রাবিরতির সময়। সফরটি ছিলো একটি যুদ্ধযাত্রা। যথাসময়ে যুদ্ধ শেষ হলো। ফিরতি পথে একস্থানে থামলো আমাদের কাফেলা। ঘোষণা দেয়া হলো, যাত্রা শুরু হবে রাত্রিকালে। যাত্রার সময় সন্নিকটবর্তী হলে আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পরিপূরণের জন্য একটু দূরে গমন করলাম। ফিরে আসার পর দেখলাম, আমার গলার ইয়ামানী আকিকের হারটি নেই। কোথায় যেনো ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছে। হারটি খুঁজতে গেলাম তৎক্ষণাৎ। এদিকে আমার হাওদা ওঠানো হলো উটের পিঠে। লোকেরা মনে করলো আমি হাওদার মধ্যেই আছি। আমি ছিলাম তখন ক্ষীণাঙ্গিনী বালিকা। তাই তারা আমার উপস্থিতি-অনুপস্থিতির ওজনগত পার্থক্য করতে পারলো না। হারটি আমি খুঁজে পেলাম। কিন্তু ফিরে এসে দেখলাম সেখানে কেউই নেই। কাফেলা তখন অনেক দূরে। বাধ্য হয়ে আমি সেখানেই বসে রইলাম। ভাবলাম, পরবর্তী যাত্রাবিরতির সময় নিশ্চয় আমার অনুপস্থিতির কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তখন অনুসন্ধান করে খুঁজে নেয়া হবে আমাকে। বসে থাকতে থাকতে আমি বার বার নিদ্রাক্রান্ত হচ্ছিলাম। তাই শুয়ে পড়লাম।

সাফওয়ান ইবনে মু'তাল জাকওয়ানীকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো কাফেলার পশ্চাদবর্তী অনুসন্ধানকারীরূপে। তার দায়িত্ব ছিলো সেনাদলের পরিত্যক্ত জিনিস উদ্ধার করা। সে তার পশ্চাদবর্তী অবস্থান থেকে যাত্রা করেছিলো শেষ রাতে। ভোরে পৌঁছলো আমার অবস্থান স্থলে। আমি তখনো শুয়েছিলাম। পর্দার বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে সে আমাকে দেখেছিলো। তাই চিনতে পারলো। আমাকে দেখেই চমকিত হয়ে পাঠ করলো, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন'। তাঁর এই আওয়াজ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। তৎক্ষণাৎ উঠে বসলাম আমি।

www.eelm.weebly.com

নিজেকে করলাম চাদরাবৃত। আল্লাহ্র কসম! সে আমার সঙ্গে কথা বললো না। আমার পাশে বসালো তার উষ্ট্রী। আমি উঠে বসলাম। সে উটের রশি ধরে পদব্রজে এগিয়ে চললো সম্মুখের দিকে। দ্বিপ্রহরে আমরা পেলাম আমাদের সেনাদলের সাক্ষাৎ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েকজন অপবিত্র লোক আমার নামে অপবাদ রটালো। তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল। মদীনায় পৌঁছে আমি পীড়িত হলাম। সে কারণে অপবাদপ্রদাতারা হয়ে উঠলো আরো সমালোচনামুখর। আমি এসব কিছুই জানতাম না। কেবল লক্ষ্য করতে লাগলাম আমার প্রতি রসুল স. এর মনোযোগ শিথিলতর হচ্ছে। তিনি স. কখনো এসে বলতেন 'সালামুন আলাইকে'। কখনো বলতেন 'এখন কেমন আছো'? এরপর বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করেই চলে যেতেন তিনি। কিছু দিনের মধ্যে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। কিন্তু দুর্বলতা তখনো কাটেনি। এক রাতে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য আমি উম্মে মেস্তাহ্কে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলাম অনতিদূরের এক স্থানে। ফেরার পথে উম্মে মেস্তাহ্র পা তারই চাদরে আটকে যায়। ফলে তিনি হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। তাঁর মুখ থেকে আপনাআপনি উচ্চারিত হয় 'মেস্তাহ্ মরুক'। আমি বলি, তুমি তোমার ছেলেকেই বদদোয়া করে বসলে? সেতো বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলো। উম্মে মেস্তাহ্ বললো, পুত্রী! তুমি কি জানো না, সে কী অপকর্ম করেছে? আমি বললাম, না তো। তিনি তখন সব কথা খুলে বল্লেন। সব শুনে ক্ষোভে দুঃখে আমি পুনরায় পীড়িত হয়ে পড়লাম। এমতাবস্থায় একদিন রসুল স. আমার ঘরে এলেন। বললেন, কেমন আছো? আমি বললাম, আপনার অনুমতি পেলে আমি কয়েকদিন বাপের বাড়ি থেকে আসতে পারতাম। আমার ধারণা ছিলো মা-বাবার কাছে আমি সবকিছু জানতে পারবো। তিনি স. অনুমতি দিলেন। পিতৃগৃহে গিয়ে আমি মাকে বললাম, মানুষ আমাকে নিয়ে কী সব আলোচনা-সমালোচনা শুরু করেছে? মা বললেন, প্রিয় কন্যা আমার! চিন্তিত হয়ো না। স্বামীর দৃষ্টিতে যে অধিক প্রিয়, তার দুর্নাম তো তার সপত্নীরা ছড়াবেই। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্! বাইরের লোকেরাও তো কতোকিছু বলছে। রাতভর আমি কেঁদেছি। যাপন করেছি বিনিদ্র রজনী। এখনো তো কেঁদেই চলেছি।

বেশ কিছুদিন যাবৎ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হচ্ছিলো না। রসুল স. তাই আলী ও উসামা ইবনে জায়েদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। উসামা আমার ও আমার সপত্নীগণের চারিত্রিক পবিত্রতার কথা খুব ভালো করেই জানতো। অপর বর্ণনায় এসেছে, উসামা রসুল স.কে অত্যধিক ভালোবাসতেন। তাই বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তিনি তো আপনার জীবনসঙ্গিনী। তিনি তো সাধ্বী। হজরত আলী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! (আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন কেনো) আপনার কী সঙ্গিনীর অভাব?

www.eelm.weebly.com

এরপর তিনি স. ডাকলেন তাঁর পরিচারিকাকে। বললেন, তুমি কি কখনো আয়েশার কোনো সন্দেহজনক আচরণ লক্ষ্য করেছো? সে বললো, যে আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর সত্য বচনবাহকরূপে প্রেরণ করেছেন, সেই আল্লাহ্র শপথ! আমি সেরকম কোনোকিছুই দেখিনি। তবে সে এখনো সংসারকর্মে অনভিজ্ঞা। তাই দেখা যায়, কখনো হয়তো সে আটার খামির মেখে শুয়ে পড়েছে, আর সে আটা খেয়ে গিয়েছে কোনো ছাগল। এভাবে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর রসুল স. একদিন মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করলেন। বললেন, হে মুসলিম জনতা! আমি আমার পরিবার পরিজনের বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই থেকে দুঃখ কষ্ট পেয়েছি। তোমরা কেউ কি আমার পক্ষ থেকে তাকে শাস্ত করতে পারো? আল্লাহ্র শপথ! আমি আমার পত্নীর মধ্যে অনুত্তম কোনোকিছুই লক্ষ্য করিনি। আর, অপবাদকারীরা তার সঙ্গে যার নাম সংশ্লিষ্ট করেছে, সে-ও অত্যন্ত সৎ। সে কখনো কখনো আমার গৃহে প্রবেশ করে আমারই সঙ্গে। একাকী কখনোই নয়। সা'দ ইবনে মুয়াজ আশহালী দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়েও এভাবে মনোকষ্টে ভুগবেন কেনো? অপবাদকারীর নামোচ্চারণ করুন। সে যদি আউস গোত্রের হয় তবে আমি এক্ষুণি তার গর্দান উড়িয়ে দিবো। আর সে খাজরাজী গোত্রের হলেও প্রতিপালন করবো আপনার নির্দেশ। সাথে সাথে দণ্ডায়মান হলো খাজরাজ গোত্রের সরদার সা'দ ইবনে উবাদা। হাস্‌সানের মা ছিলো তার চাচাত বোন। গোত্রগৌরবে অন্ধ হয়ে সে সা'দ ইবনে মুয়াজকে বললো, তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। এরকম ক্ষমতা তোমার নেই। সে লোক তোমার গোত্রের হলে নিশ্চয় তুমি তাকে হত্যা করতে চাইতে না। সা'দ ইবনে মুয়াজের চাচাত ভাই উসাইদ ইবনে হুদাইর খাজরাজী সরদারকে বললো, তুমিই মিথ্যাবাদী। নিশ্চয় আমরা মুনাফিককে হত্যা করতাম, সে যে গোত্রেরই হোক না কেনো। উত্তেজিত হয়ে উঠলো সমবেত জনতা। আউস ও খাজরাজ উভয় গোত্রই প্রস্তুত হলো যুদ্ধের জন্য। রসুল স. মিম্বরে দাঁড়িয়েই সকলকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। তাঁর চেষ্টায় প্রশমিত হলো সকলে। তিনিও নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

জননী আয়েশা বলেন, ওই দিনও সারাদিন কেঁদেই কাটালাম। মা-বাবা বসেছিলেন আমার পাশে। তাঁরা আশংকা করছিলেন কাঁদতে কাঁদতে কলিজা ফেটে হয়তো আমি মরেই যাবো। এমন সময় এক মহিলা গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলো। অনুমতি দিলাম। সে-ও ক্রন্দন শুরু করলো আমার সঙ্গে। কিছুক্ষণ পর এলেন রসুল স. স্বয়ং। পাশে বসলেন। অপবাদ রটনার পর থেকে তিনি এপর্যন্ত এভাবে আমার পাশে বসেননি। এর মধ্যে গত হয়েছিলো প্রায় পুরো একটি মাস। প্রত্যাদেশও হয়ে গিয়েছিলো রুদ্ধ। রসুল স. আমার পাশে বসে

www.eelm.weebly.com

প্রথমে উচ্চারণ করলেন কলেমায়ে শাহাদাত। তারপর বললেন, আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এরকম এরকম সংবাদ পৌঁছেছে। যদি তুমি নির্দোষ হও, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তা প্রকাশ করে দিবেন। আর যদি তুমি কোনোপ্রকার দোষ করেই থাকো, তবে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হও। তিনি তোমার তওবা কবুল করবেন। রসুল স. এর কথা শুনে আমার কান্না থেমে গেলো। রুদ্ধ হয়ে গেলো অশ্রুধারা। পিতাকে বললাম, জবাব দিন। পিতা বললেন, কী বলবো, আমি তো কোনো জবাবই খুঁজে পাচ্ছি না। মাতাকেও একই কথা বললাম আমি। তিনিও বললেন, জবাব যে খুঁজে পাচ্ছি না মা। আমি তখন নয় বছরের বালিকা মাত্র। কোরআন মজীদও আমি তখন তেমন বেশী পাঠ করিনি। তবু আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! আমি বুঝলাম আপনিও সন্দেহকে প্রশ্রয় দিতে চান। এখন আমি যদি বলি, আমি পবিত্রা, তবু তা আপনার বিশ্বাস হবে না। অথচ আল্লাহ্ জানেন, আমি অবশ্যই পবিত্রা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আপনি তুষ্ট হবেন, এই আশায় আমি কেমন করে বলবো, আমি অপরাধিনী? তাই এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলবো না। আমার অবস্থা তো এখন নবী ইউসুফের পিতা নবী ইয়াকুবের মতো যখন তিনি বলেছিলেন 'সুতরাং পূর্ণ ধৈর্য ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়, তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্য স্থল'। একথা বলেই আমি মুখ ঘুরিয়ে বিছানায় পড়ে গেলাম। জননী বলেন, আমি নিশ্চিত ছিলাম, যেভাবেই হোক আল্লাহ্ আমার সতীত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু এমন কখনো মনে হয়নি যে, আমার জন্য এমন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হবে, যা সর্বযুগে পঠিত হবে কোরআনের আয়াত হিসেবে। আমি মনে করেছিলাম রসুল স.কে হয়তো স্বপ্নযোগে বিষয়টির সত্যাসত্য সম্পর্কে অবগত করানো হবে। আল্লাহ্র শপথ! রসুল স. এর উপবিষ্ট অবস্থাতেই অবতীর্ণ হলো প্রত্যাদেশ। প্রত্যাদেশের প্রভাবে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে কাটালেন কিছুটা সময়। স্বাভাবিকতা ফিরে পাবার পর সহাস্য বদনে বললেন, আয়েশা! প্রসন্ন হও। আল্লাহ্ তোমার সতীত্বের সাক্ষ্য প্রত্যাদেশরূপে অবতীর্ণ করেছেন। মা বললেন, এবার ওঠো। আল্লাহ্র রসুলের পাশে বসো। আমি উঠলাম না। শুয়ে শুয়েই বললাম, না বসবো না। আর আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে আমি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করবো না। কারণ, আমাকে উদ্ধার করেছেন আল্লাহ্ই।

সূরা নূর ঃ আয়াত ১১

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

www.eelm.weebly.com

❒ যাহারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়াছে তাহারা তো তোমাদিগেরই একটি দল; এই অপবাদকে তোমরা তোমাদিগের জন্য অনিষ্টকর মনে করিও না; বরং ইহা তো তোমাদিগের জন্য কল্যাণকর; উহাদিগের প্রত্যেকের জন্য আছে উহাদিগের কৃত পাপকর্মের ফল, এবং উহাদিগের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইন্নাললাজীনা জাউ বিল ইফকি উ'সবাতুম্ মিনকুম' (যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল)। এখানে 'ইফ্ক' অর্থ চূড়ান্ত পর্যায়ের মিথ্যা। এর শাব্দিক অর্থ বিপরীতমুখী করে দেয়া। উম্মত-জননী হজরত আয়েশার উপরে আরোপিত অপবাদকেই এখানে বলা হয়েছে ইফ্ক। চরিত্রবতী ও মর্যাদাবতী হওয়ার কারণে তিনি ছিলেন আপামর জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্রী। ছিলেন সিদ্দীকদুহিতা, রসুল স. এর প্রিয় পত্নী এবং সকল মুসলমানের জননী। অথচ একদল অপবিত্র মানুষ তাঁর মহান চরিত্রের উপরে আরোপ করেছিলো কলংক। অর্থাৎ উল্টিয়ে দিয়েছিলো তাঁর অধিকারকে। তাদের এমতো কর্মকেই এখানে বলা হয়েছে ইফক বা মিথ্যা অপবাদ।

'উসবাতুন' অর্থ দশ থেকে চল্লিশ জনের একটি দল। এর কোনো একক নেই। 'নেহায়া' গ্রন্থের ভাষ্য এরকমই। 'মিনকুম' অর্থ তোমাদেরই। এভাবে 'উসবাতুম মিনকুম ' এর অর্থ দাঁড়ায়— তোমাদেরই একটি দল।

বোখারী প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলতেন, আমার সপত্নী জয়নাব বিনতে জাহাশকে তাঁর ধর্মপরায়ণতার কারণে আল্লাহ্পাক রক্ষা করেছেন। উত্তম কথা ছাড়া তিনি অন্য কিছু উচ্চারণ করেননি। কিন্তু তাঁর ভগ্নি হামনা হয়ে গিয়েছিলো অপবাদ আরোপকারীদের সহচরী। মুনাফিক মেস্তাহ্, হাসসান ইবনে সাবিত ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ছিলো অপবাদ আরোপকারীদের প্রধান। আর অপবাদ রচনা করতো আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই স্বয়ং।

বাগবী লিখেছেন, ওরওয়া কেবল অপবাদ আরোপকারীদের নামের সাথে হাস্সান ইবনে সাবেত, মেস্তাহ্ ইবনে উছাছা ও হামনা বিনতে জাহাশের নামোল্লেখ করেছেন। অন্যদের নাম আমার স্মরণ নেই । কেবল এতটুকু জানা আছে যে, তাদের ছিলো একটি সংঘবদ্ধ দল। আর ওই দলের লোকসংখ্যা ছিলো দশের অধিক। কারণ দশজনের কমসংখ্যার দলকে 'উসবাতুন' বলা হয় না।

ওরওয়া বর্ণনা করেন, জননী আয়েশা হাস্সানকে মন্দ বলা পছন্দ করতেন না। কারণ নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করেছিলেন তিনিই।

ফাইন্না আবী ওয়া ওয়ালিদাতী ওয়া ই'রদ্বি
'লিই'রদ্বি মুহাম্মাদিম্ মিনকুম ওয়াক্বা-উ

www.eelm.weebly.com

অর্থঃ আমি ও আমার জনক-জননীর মর্যাদা মোহাম্মদের মর্যাদার দ্বারাই মর্যাদায়িত, মোহাম্মদের জন্যই উৎসর্গীকৃত আমার ও আমার জনক-জননীর সম্মান।

এরপর বলা হয়েছে— 'লা তাহসাবুহু শাররাল্ লাকুম' অর্থাৎ এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে কোরো না। এখানে 'তাহসাবু' বলে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স. ও সাহাবীগণকে তথা সকল উম্মতকে। কারণ জননী আয়েশার উপর মিথ্যা কলংক আরোপ করার কারণে তাদের হৃদয় ছিলো দুঃখ ভারাক্রান্ত। কারণ তিনি ছিলেন সকল বিশ্বাসীর মহাসম্মানিতা জনয়িত্রী।

এরপর বলা হয়েছে— 'বাল্ হুয়া খয়রুল্ লাকুম' (বরং এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর)। কথাটির মর্মার্থ— হে বিশ্বাসীগণ! এ মিথ্যা অপবাদ বাহ্যতঃ বেদনাদায়ক হলেও অনিষ্টকর কিছু নয়। বরং এতে রয়েছে তোমাদের জন্য মহাকল্যাণ। কারণ এ ঘটনাকে উপলক্ষ করেই তোমরা লাভ করলে আল্লাহ্র বিধান। তোমাদের জননী ও তোমাদের মর্যাদা হলো আল্লাহ্র সাক্ষ্যের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর এই বিধান সম্ভূত আয়াতগুলো কিয়ামত পর্যন্ত উচ্চারিত হতে থাকবে বিশ্বাসীগণের নামাজে, মিম্বরে ও অন্তরে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের পাপকর্মের ফল, এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি'। একথার অর্থ— অপবাদ রটনার মধ্যে তাদের এক একজনের অংশগ্রহণ একএক রকমের। কেউ স্বয়ং অপবাদ রটনাকারী, কেউ রটনা করেছে অন্যের কাছে শুনে, কেউ কেউ আবার ছিলো নীরব সমর্থক। কেউ কেউ আবার রটনাকে পছন্দ করেছে, মিথ্যা জেনেও প্রতিবাদ করেনি। কেউ কেউ মুখে কিছু না বললেও বলেছে ইশারা ইঙ্গিতে। এদের সকলেই মিথ্যা রটনাকারী। তাই অপরাধের তারতম্যানুসারে এদের প্রত্যেকেই ভোগ করবে শাস্তি। এ শাস্তি অবধারিত।

বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশাকে যারা অপবাদ দিয়েছিলো, রসুল স. তাদের প্রত্যেকের উপরে কার্যকর করেছিলেন আশি বেত্রাঘাতের শাস্তি। আমি বলি, ওই শাস্তি ও লাঞ্ছনা ছিলো জাগতিক। আখেরাতেও তাদের জন্য শাস্তি সুনির্ধারিত। আর যে ব্যক্তি এই মিথ্যা অপবাদের উদ্যোক্তা ও প্রধান হোতা তার শাস্তি হবে আরো অধিক ভয়াবহ। জুহরী লিখেছেন, তাদের প্রধান ছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল। আর এখানে 'আজাবুন আজীম' (কঠিন শাস্তি) বলে বুঝানো হয়েছে জাহান্নামের শাস্তিকে।

ইবনে আবী মালিকা ওরওয়া সূত্রে বর্ণনা করেন, ইফকের ঘটনা জননী আয়েশা বলেন, অতঃপর আমি উটে আরোহণ করলাম। আর সাফওয়ান উটের রশি ধরে

www.eelm.weebly.com

চলতে লাগলেন সামনে সামনে। চলতে চলতে সাক্ষাৎ হলো মুনাফিকদের একটি দলের সঙ্গে। বাহ্যত তারা মুসলমান বলেই পরিচয় প্রকাশ করতো। কিন্তু থাকতো মুসলমান বাহিনীর পিছনে পৃথক অবস্থান নিয়ে। মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই জিজ্ঞেস করলো, রমণীটি কে? সাফওয়ান জবাব দিলেন, জননী আয়েশা। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বললো, আল্লাহ্র কসম! তোমাদের দু'জনের কেউ কারো কাছ থেকে রক্ষা পায়নি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তোমাদের নবীর স্ত্রী রাত্রিযাপন করলো এক পরপুরুষের সঙ্গে! কাফেলা আবার চলতে শুরু করলো। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে 'তাদের মধ্যে' কথাটির অন্তর্ভুক্ত ছিলো চারজন— আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল, হাস্সান ইবনে সাবেত, মিসতাহ্ ইবনে উছাছা ও হামনা বিনতে জাহাশ। কিন্তু কথাটি দুর্বল। যদি এরকমই হতো তবে 'ওয়াল্লাজী তাওয়াল্লা' এর স্থলে এখানে বসতো 'ওয়াল্লাজী তাওয়াল্লু'। তাছাড়া মিসতাহ্ ও হাস্সান ছিলেন বদরযোদ্ধা। আর কোরআন মজীদে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের পূর্বাপর সকল অপরাধ ক্ষমা করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাই এখানকার 'আজাবুন আজীম' (কঠিন শাস্তি বা জাহান্নামের শাস্তি) কথাটি তাদের সঙ্গে প্রযুক্ত হতে পারে না।

রসুল স. স্বয়ং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা যা খুশী করোনা কেনো, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ সকল সাহাবী সম্পর্কে এরশাদ করেছেন— 'ওয়া কুল্লাঁও ওয়াদাল্লাহুল হুসনা' (প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্ জান্নাত প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন)। অবশ্য এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, শাস্তি হবেই না। কারণ কেউ কেউ তো জান্নাতে প্রবেশ করবেন জাহান্নামের শাস্তিভোগের পর। তাঁরাও তো জান্নাতের অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ওয়াল্লাজী তাওয়াল্লা' কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে হাস্সানকে। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, মাসরুক বলেছেন, আমি একদিন জননী আয়েশার খেদমতে উপস্থিত হলাম। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কবি হাস্সান স্বয়ং। তিনি জননী আয়েশার প্রশংসায় আবৃত্তি করলেন তাঁর স্বরচিত কবিতা—

হিস্নানুন ওয়া জান্নুন মা তুজান্নু বিরায়বাতিন'
তুসবিহু গুরছা মিন লুহুমিল গওয়াফিলি

অর্থঃ তিনি অতিশয় পবিত্রা, অতীব ধৈর্যশীলা, কারো সন্দেহ তাঁকে অপবাদের পাত্রীতে পরিণত করতে পারে না, তাঁর উদর উদাসীনাদের গোশত থেকে মুক্ত (তিনি পরচর্চিনী নন)।

www.eelm.weebly.com

কবিতা শুনে জননী বললেন, তুমি কিন্তু এরকম নও। মাসরুক বলেন, আমি বললাম, আপনি তাকে এখানে আসার অনুমতি দিয়েছেন কেনো? আল্লাহ্ তো তাদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন 'এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি'। জননী বললেন, অন্ধ হয়ে যাওয়া অপেক্ষা অধিক কঠিন শাস্তি আর কী হতে পারে? এ লোক তো তার কবিতার মাধ্যমে রসুল স. এর প্রতিপক্ষদেরকে প্রতিহত করে থাকে। উল্লেখ্য, মাসরুকের বর্ণনাটির মাধ্যমে অনুমিত হয় যে, এখানকার 'কঠিন শাস্তি' কথাটির অর্থ জাগতিক কঠিন কোনো শাস্তি, জাহান্নামের শাস্তি নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, প্রথমোক্ত তাফসীরই অধিকতর যথার্থ।

সূরা নূর ঃ আয়াত ১২, ১৩

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ
اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ○ لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا
بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

❒ এই কথা শুনিবার পর বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজদিগের বিষয়ে সৎ ধারণা করে নাই এবং বলে নাই 'ইহা তো নির্জলা অপবাদ।'

❒ তাহারা কেন এই ব্যাপারে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই যেহেতু তাহারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই সে কারণে তাহারা আল্লাহের বিধানে মিথ্যাবাদী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অপবাদের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসী পুরুষ ও রমণীগণ কেনো তাদের ধর্মীয় ভ্রাতা-ভগ্নি সম্পর্কে সৎ ধারণা রাখলো না, কেনো স্পষ্ট করে বললো না যে, এটা সম্পূর্ণতই অপবাদ। এখানে 'নিজেদের বিষয়ে' কথাটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, সকল বিশ্বাসী এবং মাযহাবের আলেমগণ একক সত্তার মতো। এমতো উল্লেখ রয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন— ১. 'লা তাল্‌মিজূ আনফুসাকুম' (তোমরা পরস্পর দোষারোপ করো না)। ২. 'লা তাক্বতুলূ আনফুসাকুম' (পরস্পর প্রাণসংহার কোরো না)। ৩. 'লা তুখরিজূ আনফুসাকুম মিন দিয়ারিকুম' (তোমরা পরস্পরকে দেশ থেকে বহিষ্কার কোরো না)। ৪. 'সাল্লিম আ'লা আনফুসিকুম' (তোমরা পরস্পরে সালাম দাও)। এসকল আয়াতে এই মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, ইমানের দাবি হচ্ছে সকল মুসলমান সম্পর্কে উত্তম ধারণা রাখতে হবে। বিরত থাকতে হবে তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করা থেকে। আর প্রতিহত করতে হবে

www.eelm.weebly.com

তাকে, যে বিশ্বাসীগণকে অপবাদ দেয়, যেমন প্রতিহত করা হয় নিজের দোষক্রটি বর্ণনাকারীদেরকে। অর্থাৎ মুসলমান ভ্রাতাকে মনে করতে হবে নিজ সত্তার মতো। এটাই ইমানের দাবি।

ইমানই হচ্ছে প্রশংসা ও মর্যাদার কারণ। সুতরাং যে ব্যক্তি ইমানদারের দোষ বর্ণনা করে, সে প্রকৃত সত্যকেই উল্টে দেয়। অপবাদ ও পরচর্চার কারণে হয়ে যায় ফাসেক। আর ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়।

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানগণ সম্পর্কে উত্তম ধারণা রাখা ওয়াজিব, যতক্ষণ না শরিয়তের দলিল তার বিপক্ষে যায়।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তারা কেনো এই ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি, যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহ্র বিধানে মিথ্যাবাদী'। একথার অর্থ— যেহেতু তারা ব্যভিচারের অপবাদ প্রচার করেছে, বুঝতে হবে তারা সওয়াবের নিয়তেই এরকম করেছে, কারণ আল্লাহ্র বিধান (অপবাদের শাস্তি) প্রয়োগের প্রচেষ্টা সওয়াব লাভের কারণ, যদি তাই হয়, তবে তাদের বক্তব্যের সমর্থনে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করলো না কেনো? এরকম যদি তারা করতো, তবে বোঝা যেতো তাদের উদ্দেশ্য উত্তম। তারা অবাধ্যাচরণ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য ব্যতিরেকেই যদি তারা এরকম করে থাকে, তবে একথা নিশ্চিত যে, তাদের উদ্দেশ্য অতি মন্দ। তারা মুসলমান নর-নারীকে অপদস্থ করতে চায়। সত্যোদ্ধার বা শরিয়তের শাস্তি প্রতিষ্ঠিত করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। এমতাবস্থায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র বিধানানুসারে তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. চারজনের উপরে ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি কার্যকর করেন। তারা হচ্ছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই, হজরত হাস্সান ইবনে সাবেত, হজরত মিসতাহ্ ইবনে উছাছা এবং হজরত হাম্না বিনতে জাহাশ।

সূরা নূর ঃ আয়াত ১৪, ১৫

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ۝

www.eelm.weebly.com

❒ ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদিগের প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে, তোমরা যাহাতে মগ্ন ছিলে তজ্জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদিগকে স্পর্শ করিত,

❒ যখন তোমরা মুখে মুখে ইহা ছড়াইতেছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করিতেছিলে যাহার কোন জ্ঞান তোমাদিগের ছিল না এবং তোমরা ইহাকে তুচ্ছ গণ্য করিয়াছিলে, যদিও আল্লাহের দৃষ্টিতে ইহা ছিল গুরুতর বিষয়।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের রসুলের সান্নিধ্য হচ্ছে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম অনুগ্রহ। এই অনন্য অনুগ্রহ ও আল্লাহ্ প্রদত্ত অন্যান্য জাগতিক দয়া ও দানসমূহ্ যদি তোমাদের সঙ্গে না থাকতো, তবে অপবাদচর্চা ও তার প্রতি মৌন সমর্থনের কারণে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র আযাব আপতিত হতোই। এরকম হয়নি বলেই তো তোমরা লাভ করলে তওবার সুযোগ এবং বহাল রইলো আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাদেরকে প্রদত্ত জান্নাত দানের অঙ্গীকার।

এখানে 'ইফদ্বাহ্' অর্থ মগ্ন হওয়া, কোনোকিছুতে জড়িত হয়ে যাওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ প্রসারিত করা, সংবাদ প্রচার করা।

'লামাস্‌সাকুম' অর্থ অবশ্যই তোমাদেরকে স্পর্শ করতো শাস্তি, যেমন শাস্তি এসেছিলো আদ, ছামুদ, হজরত লুতের সম্প্রদায় ও হজরত শোয়াইবের সম্প্রদায়ের প্রতি। সমূলে উৎপাটন করা হয়েছিলো তাদেরকে।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল বিশ্বাসী সম্পর্কে যাঁরা অপবাদ আরোপকারীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। তাঁরা মুমিনই ছিলেন, মুনাফিক কিছুতেই নন। আর ইতোপূর্বে 'এবং এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি', কথাটি বলা হয়েছে মুনাফিকদেরকে লক্ষ্য করে, যাদের মধ্যে ছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই, জায়েদ ইবনে রেফা'য়া প্রমুখ।

এখানে 'লাওলা' কথাটির মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মুনাফিকদের সঙ্গে মেলামেশা করা সত্ত্বেও ওই সকল বিশ্বাসীর উপরে আল্লাহ্‌র আযাব আপতিত হয়নি। তাঁরা মুনাফিকদের ভিত্তিহীন আলোচনা নীরবে শুনে গেলেও আন্তরিকভাবে তাদের সমর্থক ছিলেন না। কেননা 'লাওলা' এর উদ্দেশ্য কোনো বস্তুর উপস্থিতিতে অন্য কোনো বস্তুর অস্তিত্ব লাভ না করা। সুতরাং যেহেতু বরকত স্বরূপ আল্লাহ্‌র করুণা ও অনুগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে, তাই আযাবের অস্তিত্বায়ন ঘটেনি। আর ১১ সংখ্যক আয়াতে 'লাওলা' না বলে বলা হয়েছে 'তাওয়াল্‌লা'। তাই বুঝতে হবে সেখানে মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে যে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তা সুনিশ্চিত।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'যখন তোমরা মুখে মুখে তা ছড়াচ্ছিলে, এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিলো না'। একথার অর্থ— তোমরা অপবাদ প্রচারক না হলেও একে অপরকে এসম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে, এভাবে মুখে মুখে এই অপসংবাদ নিজেদের অজান্তেই ছড়িয়ে দেয়ার কাজে সাহায্য করে যাচ্ছিলে। কালাবী বলেছেন, তাঁদের কথা ছড়ানোর প্রকৃতি ছিলো এরকম— তারা একজন অন্যজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কৌতূহল প্রকাশ করে বলতেন, আমি তো এরকম শুনলাম। ব্যাপার কী বলোতো? এভাবেই মুখে মুখে ছড়িয়ে যাচ্ছিলো ওই অপসংবাদটি। উল্লেখ্য, এখানকার 'ইজ' (যখন) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'মাস্‌সাকুম' (তোমাদেরকে স্পর্শ করতো) অথবা 'আফাদ্বতুম' (যাতে জড়িত ছিলে তোমরা) এর সঙ্গে। 'ওয়া তাকূলূনা বি আফওয়াহিকুম' অর্থ— তোমরা কেবল বলে যাচ্ছিলে মুখে মুখে, অথচ তার সত্যাসত্য সম্পর্কে বাস্তব কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিলো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে'। এখানে 'হায়্যিনা' অর্থ তুচ্ছ, অনুল্লেখ্য, যার গুরুত্ব সহজবোধ্য নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদিও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ছিলো গুরুতর বিষয়'। একথার অর্থ— অথচ তোমরা যাকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিলে, আল্লাহ্‌র কাছে তা ছিলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সুতরাং অনুধাবন করো, সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ কতো গুরুতর ও ভয়াবহ। আর এ অপবাদ তো আরো অধিক ভয়ংকর। কারণ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন তোমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া জননী ও তোমাদের মহামান্য রসুল স্বয়ং।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং রক্ষা করবে দোজখ থেকে। রসুল স. বললেন, তুমি উত্থাপন করেছো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। তবে আল্লাহ্ যদি কারো জন্য সহজ করেন, তবে তা সহজ। আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তাঁর উপাসনায় ও হুকুম প্রতিপালনে অন্য কাউকে বা কোনোকিছুকে শরীক কোরো না। নামাজ কায়েম কোরো। জাকাত দিয়ো। রমজানে রোজা রেখো। আর হজ কোরো কাবাগৃহের। শেষে বললেন, আমি কি তোমাকে মহাকল্যাণের কথাটি জানাবো না? স্মরণে রেখো, রোজা হচ্ছে আল্লাহ্‌র গজব থেকে রক্ষা পাবার ঢাল। আর দান-খয়রাত পাপের আগুনকে নির্বাপিত করে এমনভাবে যেমনভাবে পানি নিভিয়ে দেয় আগুনকে। গভীর রাতের গোপন নামাজও নিভিয়ে দেয় পাপানল। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন 'তাতাজ্বাফা জুনূবুহুম আনিল মাদ্বাজিয়ি' থেকে 'ইয়া'মালূন' পর্যন্ত। তারপর

www.eelm.weebly.com

বললেন, আমি তোমাদের ধর্মাচরণের মস্তক, স্তম্ভ ও শিখর সম্পর্কে কি বলবো না? শোনো, ইসলাম হচ্ছে মস্তক, নামাজ হচ্ছে স্তম্ভ, আর জেহাদ হচ্ছে তার শিখর। এরপর বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলবো না, যা এসকল কাজের ভিত্তি? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! অবশ্যই বলুন। তিনি স. তাঁর পবিত্র রসনা স্পর্শ করে বললেন, একে সংযত রাখবে। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! কথা বলা থেকেও কি আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে? তিনি স. বললেন, মুয়াজ তোমার মা তোমার জন্য রোদন করুক। রসনার অসংযমের কারণেই তো মানুষকে অধোমুখী করে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

সূরা নূর ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮

وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ۝ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

❒ এবং তোমরা যখন ইহা শ্রবণ করিলে তখন কেন বলিলে না, 'এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদিগের উচিত নহে; আল্লাহ্ পবিত্র, মহান! ইহা তো এক গুরুতর অপবাদ!'

❒ আল্লাহ্ তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন, 'তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে কখনও এইরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করিও না।'

❒ আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য তাঁহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা যখন এটা শ্রবণ করলে তখন কেনো বললে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়'। একথার অর্থ— এবং তোমরা এমতো মিথ্যা অপবাদের কথা যখন শুনলে তখন একথা কেনো বললে না যে, এরকম অসুন্দর উক্তির উচ্চারণ আমাদের জন্য বৈধ নয়। সাধারণ চরিত্রবতী রমণীকে অপবাদ দিলেই তো শাস্তিগ্রস্ত হতে হয়, হতে হয় ফাসেক, আর হারিয়ে যায় সাক্ষ্যপ্রদানের অধিকার। আর তিনি তো সিদ্দীকতনয়া, রসুল স. এর পবিত্র সহধর্মিণী, আর বিশ্বাসীগণের পরম সম্মানার্হা জননী। সুতরাং তাঁর প্রতি অপবাদের কথা আমরা সহ্য করি কীরূপে? এখানে 'মা ইয়াকূনু লানা' অর্থ— এরকম বলা আমাদের জন্য জায়েয নয়। নয় শোভন।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ পবিত্র, মহান! এটাতো এক গুরুতর অপবাদ'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র রসুলের স্ত্রী ব্যভিচারিণী হতে পারে এধরনের অপধারণা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। ব্যভিচারিণীরা স্বামীর সম্মান ধূলিসাৎ করে দেয়। নবী-রসুলগণ তো মানুষের সংশোধনকর্মে সতত নিয়োজিত। সুতরাং তাঁদের ঘরে কি ব্যভিচারিণীর অবস্থান শোভন? সম্ভব? এরকম হলে তাঁরা আর অনুসরণীয় থাকেন কী করে? বর্ণনাসঞ্জাত ও বুদ্ধিগত কোনো প্রকার প্রমাণই যে এর নেই, থাকতে পারে না। উল্লেখ্য, নবীর স্ত্রী কাফের হতে পারে, কিন্তু ব্যভিচারিণী কদাচ নয়। কারণ তাঁর স্ত্রীর অবিশ্বাস বিশ্বাসীদেরকে নবীর সান্নিধ্যে আসতে বাধা প্রদান করে না, এতে করে নবীর সম্মানহানি হয় না। কিন্তু ব্যভিচার সংশোধন কর্মের এক অনড় অন্তরায়। তাই দেখা যায় কোনো নবীরই স্ত্রী ব্যভিচারিণী নন। কিন্তু তাদের কারো কারো স্ত্রী কাফের। যেমন, হজরত নুহের এক পত্নী ছিলো কাফের।

'হাজা বুহতানুন আ'জীম' অর্থ এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। অর্থাৎ এতো বড় অপবাদ যে, যে এরকম শোনে সে হয়ে যায় হতভম্ব। উল্লেখ্য, অপবাদের গুরুত্বের তারতম্য ঘটে অপবাদগ্রস্তার মর্যাদার তারতম্যের উপর।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, তবে কখনো এরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি কোরো না'। এখানে 'ওয়াজ' অর্থ ভীতিপ্রদর্শক প্রকাশ্য সতর্কবাণী, উপদেশ। খলিল বলেন, 'ওয়াজ' অর্থ কল্যাণজনক কথা এমনভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করা, যাতে করে শ্রোতার অন্তরে সৃষ্টি হয় বিনয় ও ভয়। এভাবে এখানে 'উপদেশ দিচ্ছেন' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, প্রদর্শন করছেন ভীতি।

'আন তাউ'দূ লিমিছলিহী আবাদা' অর্থ জীবনে কখনোই এমতো অপউক্তি শুনবে না ও বলবে না, পুনরাবৃত্তি করবে না এমতো অপবাদাচরণের। অথবা কথাটির অর্থ— আল্লাহ্ তোমাদেরকে এই মর্মে সাবধান করে দিচ্ছেন, যেনো তোমরা এমতো অপআচরণের পুনরাবৃত্তি আর না করো। কারণ এমতো কর্ম আল্লাহ্র পরিতোষানুকুল নয়। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ— আল্লাহ্ তোমাদেরকে এরকম গর্হিত কর্ম পুনরায় করতে নিষেধ করছেন।

'ইন কুনতুম মু'মিনীন' অর্থ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। অর্থাৎ বিশ্বাসীই যদি তোমরা হয়ে থাকো, তবে আর কখনো এরকম কোরো না। কারণ এটা ইমানের দাবির পরিপন্থি। আমি বলি, একথায় প্রমাণিত হয় যে, যে সকল শিয়া জননী আয়েশার পবিত্র চরিত্রে কলংক লেপন করে, তারা মুমিন নয়।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তোমাদের জন্য প্রবর্তন করেন তাঁর আদেশ ও নিষেধাবলী, যা সদুপদেশ ও শিক্ষণীয় আদেশে সমৃদ্ধ।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ বলেই তোমাদের জন্য প্রদান করেন শুভ কর্মের আদেশ এবং বিরত থাকতে বলেন অশুভ কার্যাবলী থেকে। উভয় কর্মের পরিণতিই তাঁর জানা। কারণ তিনি যে সর্বজ্ঞ। অথবা কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— এবং অবশ্যই আল্লাহ্ জানেন সিদ্দীকনন্দিনীর সতীত্বকে এবং তাঁর প্রতি আরোপিত মিথ্যা রটনাকে। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ।

'হাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ্‌র এই অতুলনীয় গুণটির উল্লেখের মাধ্যমে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে— তাঁর সকল কার্যের আদি-অন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ। তাই তিনি তাঁর প্রিয় রসুলকে মন্দ কোনোকিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত করাকে বৈধ জ্ঞান করেননি।

সূরা নূর ঃ আয়াত ১৯, ২০

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

❒ যাহারা বিশ্বাসীদিগের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাহাদিগের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ্ জানেন, 'তোমরা জান না'।

❒ তোমাদিগের প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে এবং আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু না হইলে তোমাদিগের কেহই অব্যাহতি পাইত না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা কামনা করে, বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তারা শাস্তি পাবে যেমন পৃথিবীতে, তেমনি পরবর্তী পৃথিবীতে। এ শাস্তি সুনিশ্চিত। আর আল্লাহ্ জানেন, কাদের উদ্দেশ্য উত্তম এবং কাদের উদ্দেশ্য অশ্লীল।

www.eelm.weebly.com

'ওয়া আনতুম লা তা'লামূন' অর্থ— তোমরা জানোনা। অর্থাৎ তোমরা যেহেতু বিষয়টির সত্যাসত্য সম্পর্কে অবগত নও সেহেতু তোমাদের উচিত ছিলো অপবাদদাতাদেরকে চারজন প্রত্যক্ষ্যদর্শীর সাক্ষ্য হাজির করতে বলা। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, সেরকম কোনো সাক্ষীই তাদের নেই। অতএব বুঝতে হবে, পূতপবিত্রা রমণীর চরিত্রহননই তাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং তাদের উপরে এবার প্রয়োগ করো অপবাদের শাস্তি। এভাবে তোমরা হও প্রকাশ্য শরিয়তের অনুগামী। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এই সর্বশেষ শরিয়তের বিধানানুসারে ফয়সালা করো সকলের এবং সকলকিছুর। এভাবে তোমাদের জ্ঞানকে করো আল্লাহ্র অপার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অনুকূল। কারণ তোমরা জানো না। আর আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন।

পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু না হলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতো না'। এখানে 'তোমাদের প্রতি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে ওই সকল সাহাবীকে যাঁরা অপ্রত্যক্ষ ও বাহ্যিকভাবে হলেও ওই অপবাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের কর্মগত শৈথিল্য থাকলেও বিশ্বাসগত কোনো ত্রুটি ছিলো না। তাই তাঁদেরকে লক্ষ্য করে এখানে বলা হয়েছে— তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া পেয়েছো, আর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ। যদি এরূপ না হতো, তবে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তোমাদের পরিত্রাণ ছিলো অসম্ভব, দুনিয়াতেও, আখেরাতেও। উল্লেখ্য, এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে আল্লাহ্র আযাবের ভয় এবং রহমতের আশার কথা। তাই বুঝতে হবে, অপবাদের এই ঘটনাটি ছিলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরাধও ছিলো অত্যন্ত গুরুতর।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, 'যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও তার সঙ্গীদেরকে। 'তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি' বলে বুঝানো হয়েছে ওই মুনাফিকদের দুনিয়ার অপবাদের শাস্তি ও আখেরাতের অনন্ত দোজখবাসের কথা। আর 'তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া থাকলে' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত হাস্সান, হজরত মিসতাহ্ ও হজরত হামনাকে।

সূরা নূর ঃ আয়াত ২১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ
الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا
زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

www.eelm.weebly.com

❑ হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। কেহ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশ দেয়। আল্লাহের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তোমাদিগের কেহই কখনও পবিত্র হইতে পারিতে না, তবে আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পবিত্র করিয়া থাকেন, এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

'আলফাহ্শা' অর্থ সীমাতিরিক্ত মন্দ, চরম পর্যায়ের অশ্লীলতা— ধর্মীয় ও বুদ্ধিগত উভয় দিক থেকে। 'আলমুনকার' অর্থ ওই কাজ, যা শরিয়তের বিধানে অবৈধ। আর 'আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারতো না' কথাটির মাধ্যমে এখানে বলা হয়েছে ওই সকল সাহাবীর কথা যারা অনবধানতা ও অজ্ঞতাবশতঃ মুনাফিকদের ভিত্তিহীন রটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে বিশ্বাসীবৃন্দ! তোমরা নিজের অজান্তে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করতে শুরু করেছিলে। এরকম কখনোই কোরো না। কারণ, শয়তান অশ্লীলতা ও মন্দ পথে নিয়ে যায়। তোমাদের প্রতি রয়েছে আমার অপার অনুগ্রহ ও দয়া। তাই আমি পাপমোচনের জন্য ক্ষমার প্রবর্তন করেছি। আর দান করেছি তওবার সৌভাগ্য। যদি এরকম না করতাম তবে তোমরা কিছুতেই পাপমুক্ত হতে পারতে না। এভাবে আমি আমার অভিপ্রায়ানুসারে যাকে পছন্দ করি তাকে পবিত্র করে থাকি। আর আমিতো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

শায়খাঈন (বোখারী, মুসলিম) ও কতিপয় বর্ণনাকারীর বর্ণনায় এসেছে, অপবাদের ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হজরত মিসতাহ্ ছিলেন হজরত আবু বকরের একজন দরিদ্র আত্মীয়। তিনি তাঁকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করতেন। কিন্তু তাঁর অপআচরণে দুঃখিত হলেন হজরত আবু বকর। বললেন, আল্লাহ্র কসম! এখন থেকে আমি তাকে আর কিছুই দিবো না। তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা নূর ঃ আয়াত ২২

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

www.eelm.weebly.com

❒ তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তাহারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তাহারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে ও আল্লাহের রাস্তায় যাহারা গৃহত্যাগ করিয়াছে তাহাদিগকে কিছুই দিবে না; তাহারা যেন উহাদিগকে ক্ষমা করে এবং উহাদিগের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাহ না যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

'ওয়া লা ইয়া'তালি' অর্থ যেনো শপথ গ্রহণ না করে, কসম না খায়। শব্দটি বাবে ইফতিয়ালের অন্তর্ভুক্ত যা পরিগঠিত হয়েছে 'আলইয়াহ্' থেকে। 'আলইয়াতুন' অর্থ শপথ। অথবা শব্দটির ধাতুমূল হচ্ছে 'আলউন্' যার অর্থ কম করা বা হ্রাস করা। এভাবে 'ওয়া ইয়া'তালি' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— হ্রাস কোরো না, কম কোরো না। হজরত আবু বকর হজরত মিসতাহ্কে কিছুই না দেবার শপথ করেছিলেন। তাই এখানে বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেনো শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে ও আল্লাহ্র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না'।

এখানে 'আল ফাদ্বলি' অর্থ ধর্মীয় মর্যাদাসম্পন্ন। কেননা এরপরে উল্লেখিত হয়েছে 'আস্সায়াত', যার অর্থ সম্পদগত প্রাচুর্য। আলকাদ্বলু' দ্বারা সম্পদের প্রাচুর্য অর্থ গ্রহণ করলে প্রশ্রয় দেয়া হবে পুনরাবৃত্তিকে। সেকারণেই কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— তোমাদের মধ্যে যারা ধর্মীয় ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান এবং সম্পদগত প্রাচুর্যে প্রাচুর্যসম্পন্ন। উল্লেখ্য আত্মীয়-স্বজনের আচরণে দুঃখ পেয়ে তাদেরকে কিছু না দেয়া সাধারণ বিশ্বাসীগণের জন্য হারাম নয়। কিন্তু হজরত আবু বকর ছিলেন অসাধারণ এক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। সেকারণেই এখানে 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্য হতে) বলে তাঁর বিশেষ মর্যাদাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথবা কথাটির উদ্দেশ্য হবে এরকম— তোমাদের মধ্যে যারা ধর্মীয় ও জাগতিক বিত্তে বিত্তবান, তারা কেনো আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মুহাজিরগণকে দান না করার ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করবে? একি তাদের জন্য শোভন, না সমীচীন?

'আল্লাহ্র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে হজরত মিস্তাহকে। কারণ তিনি ছিলেন মুহাজির। অভাবগ্রস্তও ছিলেন। ছিলেন বদরযোদ্ধা। আরো ছিলেন হজরত আবু বকরের আত্মীয়— খালাতো ভাই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যেনো তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষক্রটি উপেক্ষা করে'। একথার অর্থ— মানুষের ভুল তো হতেই পারে। সে ভুল ক্ষমা করা যায় না এমন তো নয়। সুতরাং মর্যাদাবানগণের উচিত তাদেরকে ক্ষমা করা এবং তাদের দোষক্রটি উপেক্ষা করা।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! তোমরা কি চাওনা যে, অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার বিনিময়ে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন? ভেবে দেখো, তোমরাও মানুষ। তোমাদেরও রয়েছে কোনো না কোনো প্রকার সীমাবদ্ধতা, অক্ষমতা, যা আল্লাহ্তায়ালার অপার নেয়ামতের যথাযথ ও পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট নয়। আর আল্লাহ্ তো তাঁর যথাঅধিকার যথাপরিপূরিত না হওয়ার কারণে সকলকেই অভিযুক্ত করতে পারেন। কিন্তু তিনি তা করেন না। কারণ তিনি ক্ষমাপরবশ ও দয়ার্দ্র। অতএব, হে আল্লাহ্প্রেমিকগণ! তোমরাও তোমাদের চরিত্রে প্রতিবিম্বিত করো আল্লাহ্তায়ালার এ দু'টো মহৎ গুণ— ক্ষমা ও দয়া।

শায়খাঈন প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় হজরত আবু বকর বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি তো এটাই চাই যে, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আর কখনোই মিসতাহ্র খরচ বন্ধ করবো না।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়, যে বিনিময় কামনা করে। বরং আত্মীয়তা রক্ষাকারী সে-ই, যে সম্পর্কচ্ছিন্নকারীদের সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রাখে।

হজরত ইবনে আব্বাস ও জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর ও কতিপয় সাহাবী শপথ করলেন, অপবাদে অংশ গ্রহণকারীদেরকে তাঁরা কোনো প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করবেন না। তাঁদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা নূর ঃ আয়াত ২৩

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ الْغَٰفِلَٰتِ الْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

❒ যাহারা সাধ্বী, নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাহাদিগের জন্য আছে মহাশাস্তি।

'আল মুহসানাত' অর্থ সাধ্বী রমণী। 'গফিলাত' অর্থ ব্যভিচার সম্পর্কে বেখবর, ব্যভিচারের কল্পনাও যাদের অন্তরে নেই। অর্থাৎ নিরীহ নারী। 'মু'মিনাত' অর্থ বিশ্বাসবতী। আর 'আজাবুন আ'জীম' অর্থ দোজখের শাস্তি, মহা শাস্তি। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— যারা কোনো সতীসাধ্বী, সরলমনা

www.eelm.weebly.com

ও বিশ্বাসিনীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তারা পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতগ্রস্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে নরকাগ্নির লেলিহান শাস্তি।

আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনাটি সাধারণ। অর্থাৎ যে কোনো সতী, সরলপ্রাণা ও বিশ্বাসবতী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে হতে হবে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতগ্রস্ত এবং ভোগ করতে হবে দোজখের মহাশাস্তি। আর ৪ সংখ্যক আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে সতী-অসতী, ব্যভিচারপ্রবণা— অপ্রবণা সকল প্রকার রমণীর উপরে ব্যভিচার আরোপের বিধান। বলা হয়েছে, যে কোনো নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ তুলতে হবে চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যসহযোগে। এরকম না করলে অভিযোগ উত্থাপনকারীর উপরে প্রয়োগ করতে হবে আশিটি কশাঘাতের শাস্তি। তবে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি সত্য হয়, তবে সে অভিশাপগ্রস্ত হবে না। অভিশাপগ্রস্ত হবে কেবল মিথ্যাবাদীরা। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে এধরনের মিথ্যাবাদীদের কথাই বলা হয়েছে। বিশ্বাসিনী সতী ও নিরীহারা ব্যভিচারের কল্পনাই করে না। তাই তাদেরকে প্রদত্ত অপবাদ অধিকতর নিন্দনীয়। সে কারণেই এখানে বলা হয়েছে, তারা ইহ-পরকালে অভিশপ্ত, আর তাদের জন্য অবধারিত মহা শাস্তি। আরো উল্লেখ্য, এধরনের অপবাদ অনেক বড় পাপ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু কুফরী নয়। সুতরাং তারা গোনাহগার হলেও কাফের নয়। যেমন হন্তারক অভিশপ্ত বটে, কিন্তু কাফের নয়।

মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে অভিশপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে কপটচারী আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে লক্ষ্য করে। তার ধারনা ছিলো একমাত্র অবিশ্বাসীরাই হয় অভিশপ্ত।

তিবরানী লিখেছেন খসিফ বর্ণনা করেছেন, আমি একবার সাঈদ ইবনে যোবায়েরকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদারোপ— এ দু'টোর মধ্যে কোন পাপটি বড়? তিনি বললেন, ব্যভিচার। আমি তখন পাঠ করলাম এই সুরার আলোচ্য আয়াত। তিনি বললেন, এই আয়াত তো অবতীর্ণ হয়েছে জননী আয়েশা প্রসঙ্গে। উল্লেখ্য, এই বর্ণনার সূত্রপরম্পরাভূত ইয়াহ্ইয়া হাসানী কিন্তু বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। বাগবীও খসিফের এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।

কাহিল গোত্রের জনৈক বৃদ্ধের বরাত দিয়ে আ'য়াওয়াম ইবনে হাওশাম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত বিশেষভাবে অবতীর্ণ হয়েছে জননী আয়েশা ও অন্যান্য উম্মতজননীকে লক্ষ্য করে। তাই এখানে তওবার কোনো উল্লেখ নেই। তওবার সুযোগ রয়েছে অন্যান্য নারীর অপবাদের

www.eelm.weebly.com

বেলায়। একথা বলে হজরত ইবনে আব্বাস পাঠ করলেন ৫ সংখ্যক আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে 'তবে যদি এর পর তারা তওবা করে'। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে তওবার কথা নেই। অনুরূপ তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, জুহাক ইবনে মুজাহিম বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কেবল জননী আয়েশা সম্পর্কে।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, এই আয়াত প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. এর প্রিয় সহধর্মিণীগণকে লক্ষ্য করে। এর পর অবতীর্ণ হয় ৪ ও ৫ সংখ্যক আয়াত। আমি বলি, এ প্রসঙ্গের মতপৃথকতাটির ভিত্তি দু'টো বিষয়— ১. এর প্রেক্ষাপট হচ্ছে ওই অপবাদের ঘটনা। ২. কুফর ব্যতীত অন্যান্য কবীরা গোনাহকারীর উপরে অভিশাপের কথা শরিয়তসম্মত নয়। প্রথমোক্ত উক্তি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, নির্দিষ্ট কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে আয়াত অবতীর্ণ হলেও আয়াতের সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো অন্তরায় নেই। আর আলোচ্য আয়াত সেরকমই একটি আয়াত। তাই এখানে বিশেষ কোনো ঘটনার উল্লেখও নেই।

দ্বিতীয় উক্তি সম্পর্কে বলা যায়, অভিশাপ কুফরীর (অবিশ্বাসের) সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত কোনো বিষয় নয়। যেমন হত্যাও কবীরা গোনাহ্। অথচ হত্যাকারীকেও অভিশপ্ত বলা হয়েছে। অতএব বুঝতে হবে, কোনো কোনো কবীরা গোনাহ্ অভিশাপের উপযোগী করে। আর একটি কথা এই যে, এখানে 'তওবা'র উল্লেখ না থাকার কারণে একথা বলা যাবে না যে, উম্মত জননীর প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের জন্য তওবার সুযোগই নেই। অথবা তাদের ক্ষমাপ্রাপ্তি অসম্ভব। কারণ এক আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে— 'ওয়া ইয়াগফিরু মা দূনা জালিকা লি মাইঁয়াশাউ' (এবং মুশরিক ব্যতীত অন্যান্যদের মধ্যে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দিবেন)।

সূরা নূর ঃ আয়াত ২৪, ২৫

يَّوۡمَ تَشۡهَدُ عَلَيۡهِمۡ اَلۡسِنَتُهُمۡ وَاَيۡدِيۡهِمۡ وَاَرۡجُلُهُمۡ بِمَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ○
يَوۡمَئِذٍ يُّوَفِّيۡهِمُ اللّٰهُ دِيۡنَهُمُ الۡحَقَّ وَيَعۡلَمُوۡنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الۡحَقُّ الۡمُبِيۡنُ ○

❒ যে দিন তাহাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাহাদিগের রসনা, তাহাদিগের হস্ত ও তাহাদিগের চরণ তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্বন্ধে—

❒ সে দিন আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তাহারা জানিবে, আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক;

---

www.eelm.weebly.com

ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম হজরত আবু মুসা আশয়ারী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মহাবিচারের দিবসে বিশ্বাসীগণকে একজন একজন করে হিসাব গ্রহণের জন্য উপস্থিত করা হবে। তাদের সামনে উপস্থিত করা হবে তাদের কৃত পাপরাশিকে। বিশ্বাসীরা স্বীকার করবে তাদের অপরাধ। আল্লাহ্পাক তখন পাপসমূহকে আড়াল করে দিবেন। তখন দৃশ্যমান হবে কেবল তাদের পুণ্যসমূহ। লোকেরা তাই দেখে তাদের সুখ্যাতি করতে থাকবে। এরপর উপস্থিত করা হবে মুনাফিকদেরকে। তাদের পাপগুলো তাদের সামনে উপস্থিত করা হলে তারা তা অস্বীকার করে বসবে। বলবে, হে আমার প্রভুপালক! তোমার সম্মানের শপথ! এগুলো আমি করিনি। মিছামিছি ফেরেশতারা এগুলো আমার আমলনামায় লিখে রেখেছে। সংশ্লিষ্ট ফেরেশতা বলবে, তুমি কি অমুকদিন অমুক জায়গায় একাজ করোনি? সে বলবে, আমার প্রভুপালকের কসম করে বলছি, আমি একাজ করিনি। এরপর তার মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে (তখন সাক্ষ্য দিবে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ)। এরপর হজরত আবু মুসা পাঠ করলেন প্রথমোক্ত আয়াতটি। পাঠ শেষে বললেন, আমার ধারণা সর্বপ্রথম কথা বলবে তার ডান রান।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আবু ইয়া'লী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসেও অনুরূপ বিবরণ এসেছে। হাদিসটি সুপরিণত শ্রেণীর।

যথাসূত্রে আহমদ ও তিবরানী হজরত উকবা ইবনে আমেরের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যেদিন মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে, সেদিন সর্ব প্রথম কথা বলবে তার বাম উরু। হজরত মুয়াবিয়া ইবনে জায়দাহ্ থেকে আহমদ, নাসাঈ, হাকেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে মুনাফিকদের মুখ থাকবে বন্ধ। তখন কথা বলবে তার উরুদেশের অস্থি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, তখন মানুষের মন্দ আমলের সাক্ষ্য দিবে তার উরুদেশের গোশত ও হাড়। ওই সকল লোক হবে মুনাফিক। তাদের উপরে পতিত হবে আল্লাহ্র গজব।

একটি সন্দেহ ঃ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের রসনা। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দিব। এই দ্বন্দ্বায়নের নিরসন কী?

নিরসন ঃ মুখে মোহর মেরে দেয়ার অর্থ— সে তখন স্বেচ্ছায় কিছু বলতে পারবে না। এরকম অর্থ নয় যে, তার ইচ্ছার বিপরীত কোনো কথা তার মুখে উচ্চারিত হতে পারবে না এবং রহিত হয়ে যাবে তার বাকশক্তি।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, এমতো তাফসীরের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে লক্ষ্য করে। কাতাদা এরকমই ধারণা করেছেন।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'সেদিন আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানবে আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক'। এখানে 'দীন' অর্থ প্রাপ্য বা বিনিময়। 'হক' অর্থ আবশ্যকীয় প্রতিফল। আর 'আল হাক্কুল মুবীন' অর্থ স্পষ্ট প্রকাশক, তাঁর অস্তিত্বের প্রতিবিম্বের স্পষ্ট প্রকাশক, অথবা প্রতিবিম্বায়নের মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টির রক্ষক। উল্লেখ্য, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্র নাম-গুণাবলীর ছায়া বা প্রতিবিম্ব। আর প্রতিবিম্ব কখনো মূলের অংশ নয়। তেমনি সৃষ্টির কেউ বা কোনোকিছুই আল্লাহ্তায়ালার অংশীদার নয়। তিনিই সমগ্র সৃষ্টির স্পষ্ট প্রকাশয়িতা। সকলের পুরস্কার ও তিরস্কারের একক নির্ধারয়িতা।

অথবা 'আলহাক্ব' অর্থ জুলহাক্ব (সত্যের অধিকারী), আর 'মুবীন' অর্থ 'বায়নুন' (প্রকাশ্য)। অর্থাৎ তিনি সুবিচারের বা সত্যের প্রকাশ্য প্রকাশক। কিংবা 'আল মুবীন' অর্থ প্রকাশকারী। অর্থাৎ তিনি দুনিয়াতে যে অঙ্গীকার প্রদান করেছেন আখেরাতে তার প্রকাশকারী বা বাস্তবায়ক।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই দ্বীন ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতো। কিয়ামতের সময় তার সন্দেহ চিরতরে হয়ে যাবে অন্তর্হিত। কারণ আল্লাহ্তায়ালাই তখন চিরস্থায়ীরূপে সুস্পষ্ট করে দিবেন সত্যের স্বরূপ। সে কথা বুঝাতেই এখানে বলা হয়েছে 'ওয়াল হাক্বক্বুল মুবীন' (তিনি স্পষ্ট প্রকাশক)।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন, ইসলাম ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতো আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই। কিয়ামতের সময় সে বুঝতে পারবে— আল্লাহ্ই সত্য, সত্যের স্পষ্ট প্রকাশক।

আমি বলি, সম্ভবতঃ হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যের মর্ম এরকম— অবিশ্বাসীরা ও ধর্মবোধহীন জনতা মনে করে, আল্লাহ্র অস্তিত্ব কল্পনাপ্রসূত। এই মহাবিশ্ব স্বতোৎসারিত ও স্বতঃপরিচালিত, বিভিন্ন প্রভাব, প্রক্রিয়া, ক্রিয়া-বিক্রিয়ার প্রকাশ। আর কর্মই মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের নির্ধারয়িতা। তাই তারা সম্রাটকে ভয় করে বটে, কিন্তু ভয় করে না সম্রাটের সৃজয়িতাকে। মহাবিচারের দিবসে তাদের এমতো অপবিশ্বাস অন্তর্হিত হয়ে যাবে চিরতরে। কারণ সেদিন আল্লাহ্ পরিপূর্ণরূপে উন্মোচিত করবেন সত্যের স্বরূপ। সকলেই সবিস্ময়ে দেখবে, আল্লাহ্ই সত্যের স্পষ্ট উন্মোচক এবং প্রকাশ্য ন্যায়বিচারক।

www.eelm.weebly.com

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

❑ দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য; ইহাদিগের সম্বন্ধে লোকে যাহা বলে ইহারা তাহা হইতে পবিত্র। ইহাদিগের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতার অভিমত হচ্ছে— এখানকার 'আল খবীছাত' অর্থ অপকৃষ্ট বাক্য, অবমাননা ও অসম্মানতা প্রকাশক শব্দাবলী। যে সকল লোক নীচ ও হীন, এ ধরনের অপবাক্য উচ্চারিত হয় তাদের মুখেই । আলোচ্য আয়াতে সে সকল নারী-পুরুষকেই বলা হয়েছে দুশ্চরিত্রা ও দুশ্চরিত্র। নিঃসন্দেহে এরা নিন্দার্হ। আর সম্মানার্হ হচ্ছেন তাঁরা , যাদের মুখে উচ্চারিত হয় শুভ, সুন্দর ও সৎ বাক্যাবলী। এদেরকে এখানে অভিহিত করা হয়েছে 'সচ্চরিত্রা' ও 'সচ্চরিত্র' বলে। এরা পবিত্র, ক্ষমার্হ এবং সম্মানজনক জীবনোপকরণের অঙ্গীকার প্রাপ্ত। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহাসম্মানিতা উম্মত জননী হজরত আয়েশা সচ্চরিত্রা রমণীগণের নেত্রী। তিনি সতী-সাধ্বী পূতপবিত্রা, মহাপুণ্যবতী ও চির-সত্যাধিষ্ঠিতা। তাই তাঁর পবিত্র চরিত্রের কলংকায়ন অশোভন, অসঙ্গত— নিষিদ্ধ ও অসিদ্ধ, মহাপাপ।

জুজায আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— 'আলখবীছাত' অর্থ অপবিত্রবচন। যেমন অবিশ্বস্ত বাক্য (কুফরীকালাম), অসত্য-ভাষণ, রসুল স. এর সম্মানিত সহচরবৃন্দ ও তাঁর মহাকল্যাণপ্রাপ্ত বংশধরগণের নিন্দাচার, তাঁর পরিবার পরিজনভূত নারীগণের উপরে অপবাদ আরোপণ ইত্যাদি। যে মাটি দিয়ে তাদেরকে গঠন করা হয়েছে, সেই মাটিতেই ছিলো তাদের এসকল অসৎগুণ। আর 'আত্‌তুইয়্যেবাত' অর্থ পবিত্র বচন। যেমন, আল্লাহ্‌র জিকির, রসুল স. এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ, কোরআন মজীদ তেলাওয়াত, বিশ্বাসী-বিশ্বাসিনীদের ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা ইত্যাদি। এসকল সদ্‌গুণ তাঁরা সৃষ্টির সূচনালগ্নের মৃত্তিকা থেকেই প্রাপ্ত। এঁদের রসনা অপবাদারোপকারীদের অপবাক্যসমূহ থেকে পবিত্র। এঁদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার প্রতিশ্রুতি।

www.eelm.weebly.com

ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে 'খবীছাত' ও 'খবীছীন' দ্বারা বুঝানো হয়েছে দুশ্চরিত্রা নারী ও দুশ্চরিত্রা নরকে। অর্থাৎ এটাই সাধারণ বিধান ও বাস্তব যে, দুশ্চরিত্র পুরুষ ও দুশ্চরিত্রা নারী সমমানসিকতাসম্পন্ন। আর সমসংবেদনশীলতা-সম্পন্ন হচ্ছে সচ্চরিত্রা নারী এবং সচ্চরিত্র পুরুষ। আর জননী আয়েশা যেহেতু সচ্চরিত্রা রমণীগণের মস্তক-মুকুট, তাই আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে নির্বাচন করেছেন শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম রসুলের ধর্ম ও কর্মসহচরীরূপে। তাই তিনি ও তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণকারীরা অপবাদ আরোপকারীদের জঘন্য মানসিকতা ও অপবচন থেকে অবশ্যই পবিত্র। জননী আয়েশা সৎচ্চরিত্রা না হলে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠতম রসুলের সহধর্মিণী হতে পারতেন না।

হজরত হিন্দ ইবনে আবী হালা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র পছন্দ নয় যে, আমি জান্নাতী রমণী ছাড়া অন্য কাউকে বিবাহ করি। ইবনে আসাকের।

বাগবী লিখেছেন, কতিপয় অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য জননী আয়েশা প্রকাশ করতেন কৃতজ্ঞায়িত গৌরব। যেমন—

১. তাঁর বিবাহের পূর্বে একদিন হজরত জিবরাইল রসুল স. সকাশে এসে তাঁর দৃষ্টির সামনে মেলে ধরলেন রেশমীবস্ত্রে জড়ানো একটি রমণীপ্রতিকৃতি। বললেন, ইনি আপনার স্ত্রী। আমি বলি, জননী আয়েশা থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন তিরমিজি। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত জিবরাইল ওই প্রতিকৃতিটি রসুল স. এর হাতে দিয়েছিলেন।
২. তিনিই ছিলেন রসুল স. এর একমাত্র কুমারী সহধর্মিণী।
৩. তাঁর পবিত্র কোলে মস্তক রেখেই তিনি স. চিরবিদায় গ্রহণ করেছিলেন এই মর্ত্যলোক থেকে।
৪. রসুল স.কে সমাধিস্থ করা হয়েছে তাঁরই পবিত্র প্রকোষ্ঠে।
৫. তাঁর সঙ্গে একই বস্ত্রাবৃত অবস্থাতেও রসুল স. এর উপর অবতীর্ণ হতো প্রত্যাদেশ, অন্য কোনো সহধর্মিণীর সাহচর্যে থাকা অবস্থায় এরকম ঘটতো না।
৬. তাঁর সচ্চরিত্রতার সাক্ষ্য নেমে এসেছে আকাশ থেকে কোরআনের বাণীরূপে।
৭. তিনি রসুল স. এর প্রথম খলিফার কন্যা।
৮. তিনি সিদ্দীকা (সত্যবাদিনী), তাহেরা (পবিত্রিণী)।
৯. তাঁকেই বিশেষ করে দেয়া হয়েছে মার্জনা ও সম্মানজনক জীবিকার অঙ্গীকার।

www.eelm.weebly.com

তাঁর নিকট থেকে শ্রুত হাদিস বর্ণনা কালে মাসরুক বলতেন, এই হাদিস আমি শুনেছি সিদ্দীকনন্দিনী সিদ্দীকা থেকে, তিনি ছিলেন রসুল স.এর প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী যার সচ্চরিত্রতার প্রমাণ রয়েছে আকাশজ বাণীবৈভবে ইত্যাদি।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে জননী আয়েশার উপরে অপবাদ আরোপকারীদের যেভাবে ধমক ও হুমকি দেয়া হয়েছে, সে রকম কঠোর হুঁশিয়ারী কোরআন মজীদের অন্যত্র নেই।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. একবার আমাকে বললেন, তোমার প্রতিকৃতি আমাকে তিন বার স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। ভ্রাতা জিবরাইল ওই প্রতিকৃতি একটি রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে এসেছিলো এবং বলেছিলো, ইনি আপনার স্ত্রী। আমি রেশমী আবরণ উন্মোচন করে দেখলাম প্রতিকৃতিটি তোমার। তাঁকে বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, তবে এর বাস্তবায়ন ঘটবেই।

জননী আরো বলেছেন, লোকেরা আমার পালার দিন রসুল স. এর খেদমতে আমার প্রকোষ্ঠে হাদিয়া প্রেরণ করতো। রসুল স. এর সন্তুষ্টি অর্জনই ছিলো তাদের এমতো আমলের উদ্দেশ্য। তিনি আরো বলেছেন, রসুল স.এর সহধর্মিণীগণ বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন দু'টি দলে। এক দলে ছিলাম আমি, হাফসা, সুফিয়া ও সাওদা। অন্য দলে ছিলেন উম্মে সালমা ও অন্যান্যরা। একদিন উম্মে সালমার দলের সপত্নীরা তাকে বললেন, তুমি রসুল স.কে বলো, তিনি যেনো লোকদেরকে এমতো নির্দেশ দেন, যেনো তিনি স. যখন যার ঘরে অবস্থান করেন সেখানেই যেনো তারা তাঁর নিকট হাদিয়া পাঠায়। উম্মে সালমা একথা রসুল স.কে বললেন। তিনি স. বললেন, আয়েশা প্রসঙ্গে আমাকে কষ্ট দিয়ো না। আয়েশা ছাড়া অন্য কারো চাদরে আবৃত অবস্থায় আমার নিকট ওহী আসে না। উম্মে সালমা বললেন, আল্লাহ্‌র রসুলকে কষ্ট দেয়া থেকে আমি আল্লাহ্‌র নিকট আত্মরক্ষা প্রার্থনা করি। এরপর তাঁরা ধরে বসলেন রসুলতনয়া ফাতেমাকে। তিনি তাঁদের প্রস্তাব রসুল স. সকাশে পেশ করলেন। রসুল স. বললেন, প্রিয় পুত্রী! আমার পছন্দ কি তোমার পছন্দ নয়? ফাতেমা বললেন, অবশ্যই। তিনি স. বললেন, তবে তুমিও আয়েশাকে ভালোবাস। বোখারী, মুসলিম,

হজরত আবু মুসা আশয়া'রী থেকে বোখারী ও মুসলিম, কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. জানিয়েছেন, অন্যান্য আহার্য বস্তুর তুলনায় ছরিদ যেমন অনন্য, আমার সহধর্মিণীগণের তুলনায় আয়েশার অনন্যাতাও তেমনি । হজরত আবু মুসা আশয়ারী আরো বলেন, সাহাবীগণ কোনো হাদিস বুঝতে অসমর্থ হলে মাতা আয়েশার দ্বারস্থ হতেন। তিনি আমাদের সমস্যার সমাধান করে দিতেন। তিরমিজি।

www.eelm.weebly.com

হজরত মুসা ইবনে তালহা বলেছেন, আমি জননী আয়েশা অপেক্ষা অধিক প্রাঞ্জল বর্ণনাকারিণী দেখিনি। তিরমিজি। বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা চারজন অসাধারণ মানুষকে অপবাদ মুক্ত করেন চারজনের দ্বারা। যেমন— ১. হজরত ইউসুফকে জুলায়খার অপবাদ থেকে রক্ষা করেছিলেন ওই গৃহেরই একটি শিশু দ্বারা। ২. ইহুদিদের অপবাদ থেকে হজরত মুসাকে মুক্ত করেছিলেন একটি পাথর দ্বারা (পাথরটি পলায়ন করেছিলো তাঁর পরিধেয় বসন নিয়ে)। ৩. ইহুদীর অপবাদ থেকে হজরত মরিয়মকে মুক্ত করেছিলেন তাঁরই শিশু পুত্র হজরত ঈসার সাক্ষ্যের মাধ্যমে। ৪. মুনাফিকদের অপবাদ থেকে জননী আয়েশাকে কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, প্রকৃতপক্ষে রসুল স. এর মহান মর্যাদা ও মহিমাকে সমুজ্জ্বল করার জন্যই কোরআনের মাধ্যমে তাঁর প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীর চরিত্রকে এভাবে প্রমাণ করা হয়েছে শাশ্বত-সাধ্বী ও মহিমময়ীরূপে।

আমি বলি, এর দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দৃষ্টে জননী আয়েশার মহান মর্যাদার প্রকাশ ঘটানোই ছিলো মূল উদ্দেশ্য।

আদী ফারইয়ানী ও ইবনে জারীর হজরত ইবনে সাবেত সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স.এর মহান দরবারে হাজির হয়ে একবার এক আনসারী রমণী নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি আমার ঘরে একলা এমন অবস্থায় থাকি যখন আমি চাইনা যে কেউ আমাকে দেখে ফেলুক। কিন্তু বাড়ীর লোকদের মধ্যে কেউ কেউ নির্দ্বিধায় কখনো কখনো আমার ঘরে ঢুকে পড়ে এবং আমাকে দেখে ফেলে অসংবৃত অবস্থায়। এখন আমি কী করবো? তাঁর এমতো প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত এভাবে—

সূরা নূর ঃ আয়াত ২৭

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟ وَ
تُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজদিগের গৃহ ব্যতীত অন্য কাহারও গৃহে গৃহবাসীদিগের অনুমতি না লইয়া ও তাহাদিগকে সালাম না করিয়া প্রবেশ করিও না। ইহাই তোমাদিগের জন্য শ্রেয়, যাহাতে তোমরা সতর্ক হও।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যে গৃহে বসবাস করো, সেই গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে বিনা অনুমতিতে এবং ওই গৃহবাসীদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ কোরো না । এটাই তোমাদের জন্য শোভন ও অবশ্যপালনীয়। অতএব তোমরা এই উপদেশ মেনে নাও।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'গইরা বুয়ূতিন' অর্থ যে গৃহে অন্যরা বসবাস করে। উল্লেখ্য, নিজের গৃহ অন্যকে ভাড়া দিলেও গৃহের মালিক ওই গৃহে বিনা অনুমতিতে ও বিনা সালামে প্রবেশ করতে পারবে না।

'তাসতা'নিসূ' অর্থ অনুমতি গ্রহণ করো। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত উবাই ইবনে কা'ব শব্দটি পড়তেন 'তাসতা'জিনূ'। উভয় শব্দের অভিধানগত অর্থ দেখা, জানা, সহমর্মিতা প্রকাশ করা, অসতর্ক না হওয়া। ইবনে আবী হাতেম বলেন, হজরত আবু আইয়ুবের ভ্রাতুষ্পুত্র হজরত সুরাহ বর্ণনা করেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসুল! সালাম করা কাকে বলে, তাতো আমরা জানি, কিন্তু 'ইস্‌তিনাস' অর্থ কী? তিনি স. বললেন, গৃহের বাইরে দাঁড়িয়ে সশব্দে সুবহানাল্লাহ্‌, আলহামদুলিল্লাহ্‌, আল্লাহু আকবার বলা, গলা খাঁকারী দেয়া (যাতে গৃহবাসী তার উপস্থিতি টের পায়)। তারপর গৃহে প্রবেশের জন্য গৃহকর্তার অনুমতি নেয়া।

কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'উনস' 'ওয়াহশাত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ। আনাসাশ্‌ শাইআ ' অর্থ কোনকিছু দর্শিত হওয়া। 'আনাস সওতা' অর্থ আওয়াজ শ্রবণ করা। খলিল বলেছেন, 'ইস্‌তিনাস' অর্থ দেখা। আনাসতু নারা' অর্থ আমি আগুন দেখতে পেয়েছি। এখানে অনুমতি চাওয়াকে 'ইস্‌তিনাস' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে একারণে যে, অনুমতিপ্রার্থীর অন্তরে থাকে এক ধরনের আশা-আশঙ্কার দোলা। সেভাবে, অনুমতি মিলবে কি মিলবেনা কে জানে? অনুমতি পেলে আশঙ্কা বিদূরিত হয়।

'তুসাল্লিমূ আ'লা আহলিহা' অর্থ গৃহকর্তাকে আসসালামু আলাইকুম বলো। হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. একবার আমাকে এই মর্মে সদুপদেশ প্রদান করলেন যে, বৎস! কোনো বাড়িতে গেলে প্রথমে বাড়ির মালিককে সালাম প্রদান করবে। এতে করে বরকত লাভ হবে তোমার ও গৃহকর্তার।

'অনুমতি প্রার্থনা' ও 'সালাম' এ দু'টোর কোনটি অগ্রে সে সম্পর্কে রয়েছে আলেমগণের মতপৃথকতা। আলোচ্য আয়াতে অবশ্য অনুমতি প্রার্থনার কথাই এসেছে আগে। তাই কেউ কেউ বলেন, আগে চাইতে হবে অনুমতি। তারপর দিতে হবে সালাম। কিন্তু এমতো অভিমত প্রামাণ্য নয়। কারণ দু'টো কথাকে এখানে যুক্ত করা হয়েছে 'ওয়াও' (এবং) সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমে। এর অর্থ দু'টোই করতে হবে। মনে রাখতে হবে 'এবং' কিন্তু অগ্র-পশ্চাৎ নির্ণায়ক নয়। উপরন্তু হজরত ইবনে মাসউদের ক্বেরাতে 'তুসাল্লিম' কথাটি এসেছে 'তাসতা'জিনূ' এর পূর্বে। তাই অধিকাংশ আলেম বলেন, প্রথমে করতে হবে সালাম। হজরত কেলাদা ইবনে হাম্বল বলেছেন, আমি একবার বিনা সালামে ও

www.eelm.weebly.com

বিনা অনুমতিতে রসুল স. এর গৃহে গমন করলাম। তিনি স. বললেন, বাইরে যাও এবং বলো— আসসালামু আলাইকুম, আমি ভিতরে প্রবেশ করতে পারি? আবু দাউদ, তিরমিজি।

হজরত জাবের বলেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম বলবে না, তাকে প্রবেশের অনুমতি দিয়ো না। বায়হাকী।

বাগবী লিখেছেন, এক লোক হজরত ইবনে ওমরের গৃহে গমন করে বললেন, আমি কি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পেতে পারি? হজরত ইবনে ওমর বললেন, না। ওই লোকের সঙ্গী বললো, প্রথমে সালাম বলো, তারপর প্রার্থনা করো প্রবেশের অনুমতি। লোকটি তাই করলো। তখন হজরত ইবনে ওমর প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন, যদি আগন্তুকের দৃষ্টি গৃহবাসীদের কারো উপরে পড়ে, তবে প্রথমে তাকে লক্ষ্য করে সালাম বলবে, আর কাউকে দেখতে না পেলে প্রথমে চাইবে অনুমতি।

হজরত আবু মুসা ও হজরত হুজায়ফা গৃহাভ্যন্তরের মুহরিম নারীগণের নিকটে গমনকালেও অনুমতি প্রার্থনা করতেন। অপরিণত সূত্রে আতা ইবনে ইয়াসার থেকে হাসান বর্ণনা করেন, এক লোক একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি কি আমার জননীর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললো, আমি তো তার সঙ্গেই থাকি। রসুল স. বললেন, তবুও। লোকটি বললো, আমি তো তার সেবক। তিনি স. বললেন, তবুও। তুমি কি তোমার আম্মাকে বিবস্ত্র দেখতে চাও। লোকটি বললো, না। তিনি স. বললেন, তবে তার কাছেও অনুমতি প্রার্থী হয়ো। মালেক।

মাসআলা ঃ যদি সংবাদবাহকের মাধ্যমে কাউকে ডেকে আনা হয় তবে সংবাদবাহক ও তার প্রবেশের অনুমতির প্রয়োজন নেই। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কাউকে ডাকে এবং সে যদি সংবাদবাহকের সঙ্গে চলে আসে, তাহলে ধরতে হবে সে অনুমতিপ্রাপ্ত। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, কাউকে ডাকার জন্য সংবাদবাহক প্রেরণ করার অর্থই তাকে অনুমতি প্রদান করা।

'জালিকুম খইরুল্ লাকুম' অর্থ এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়ঃ। অর্থাৎ মূর্খতার যুগে প্রচলিত বিনা অনুমতিতে অন্যের গৃহে প্রবেশ করার নিয়ম অপেক্ষা এখনকার এই অনুমতি প্রার্থনার বিধান অনেক উত্তম।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বলেছেন, মূর্খতার যুগের লোকেরা সালামের বদলে বলতো 'আনয়া'মাল্লহু বিকা আইনান্' (আল্লাহ্ তোমার চক্ষু শীতল করুন)। কখনো বলতো 'ইন্‌য়া'ম সাবাহান' (শুভপ্রভাত)। ইসলামের আগমনের পর এই অপপ্রথা তিরোহিত হয়। শুরু হয় সালাম আদান প্রদানের নিয়ম। আবু দাউদ।

সূরা নূর ঃ আয়াত ২৮

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

❑ যদি তোমরা গৃহে কাহাকেও না পাও তাহা হইলে তোমাদিগকে যতক্ষণ না অনুমতি দেওয়া হয় ততক্ষণ উহাতে প্রবেশ করিবে না; যদি তোমাদিগকে বলা হয় 'ফিরিয়া যাও' তবে তোমরা ফিরিয়া যাইবে, ইহাই তোমাদিগের জন্য উত্তম, এবং তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তা হলে তোমাদেরকে যতক্ষণ না অনুমতি দেয়া হয়, ততক্ষণ তাতে প্রবেশ করবে না।' একথার অর্থ গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে অথবা তার বিনা অনুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করা যাবে না। কারণ এতে করে হয়তো সম্মুখীন হতে হবে অসংবৃত অথবা শিথিলবসনা গৃহবাসীদের কারো। আবার হয়তো প্রকাশ হয়ে পড়বে তাদের কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা। এটা নিশ্চয় মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ, যা একেবারেই নিষিদ্ধ। তবে কতকগুলো ক্ষেত্রে অনুমতির প্রয়োজনই নেই। যেমন অগ্নিকাণ্ড, গৃহধস, অথবা গৃহাভ্যন্তরে চুরি, হত্যা কিংবা মদ্যবিক্রয় ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমাদেরকে বলা হয় 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম'। একথার অর্থ— অনুমতি না পেলে ফিরে যেতে হবে, অযথা দাঁড়িয়ে থাকা বা জেদ করে প্রবেশ করার চেষ্টা করা যাবে না। এরকম করার অর্থ গৃহবাসীকে বিব্রত করা, যা একেবারেই অনুচিত। উল্লেখ্য, প্রবেশের অনুমতি চাইতে হবে তিনবার। এরপরেও অনুমতি না মিললে বিনা বাক্যব্যয়ে ফিরে আসাই বাঞ্ছনীয়।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, একবার আমার কাছে আবু মুসা আশয়ারী এসে বললেন, খলিফা ওমর লোক মারফত আমাকে ডেকেছিলেন। আমি তাঁর গৃহের বাইরে দাঁড়িয়ে তিনবার সালাম বললাম। কিন্তু কোনো জবাব পেলাম না।

www.eelm.weebly.com

তাই ফিরে এলাম। পরে ওমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, তোমাকে তো আমি ডেকেছিলাম। এলেনা কেনো? বললাম, আমি তো গিয়েছিলাম। তিনবার সালামও বলেছিলাম। কিন্তু কোনো জবাব না পাওয়াতে ফিরে এসেছি। কেননা রসুল স. বলেছেন, কারো নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইতে হবে তিন বার। জবাব না পেলে ফিরে আসতে হবে। ওমর বললেন, সাক্ষ্য উপস্থিত করো। এখন তো আমাকে সাক্ষ্য উপস্থিত করতেই হবে। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেন, আমি তখন আবু মুসা আশয়ারীর সঙ্গে ওমরের নিকটে গেলাম এবং এব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করলাম। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু আইয়ুব আনসারী থেকে সুপরিণত সূত্রসহযোগে বর্ণিত হয়েছে, কারো গৃহে প্রবেশের আগে তিনবার বলতে হবে আস্সালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? এরপর অনুমতি পেলে প্রবেশ করবে, নতুবা ফিরে আসতে হবে। ইবনে মাজা।

বাগবী লিখেছেন, এই হাদিসটি আবার বাশার ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে।

হাসান বলেছেন, প্রথমে প্রদান করবে আগমনের সংবাদ। পরে করবে সালাম ও অনুমতি প্রার্থনা। সালাম ও অনুমতির পর প্রার্থনা করতে হবে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. হজরত সা'দ ইবনে উবাদার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গমন করলেন। বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে চাইলেন প্রবেশের অনুমতি। বললেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্। ভিতর থেকে হজরত সা'দ সালামের জবাব দিলেন। কিন্তু রসুল স. তা শুনতে পেলেন না। এভাবে মোট তিন বার সালাম দিলেন রসুল স.। তিনবারই ভিতর থেকে জবাব এলো। কিন্তু রসুল স. কোনোবারই তা শুনতে পেলেন না। তাই ফিরে এলেন। একটু পরেই পিছনে পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে বেরিয়ে এলেন হজরত সা'দ। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কোরবান। আমি তো আপনার প্রতিটি সালামের জবাব দিয়েছি। আমি অপেক্ষায় ছিলাম আপনার পক্ষ হতে আমার প্রতি আরো অধিক সালাম বর্ষিত হোক। তাই আমি জবাব দিয়েছি নিম্নকণ্ঠে। রসুল স. থামলেন। গমন করলেন হজরত সা'দের গৃহে। হজরত সা'দ উপস্থিত করলেন কিসমিস। রসুল স. তা থেকে কিছু খেলেন। তারপর বললেন, তোমার আহার্য ভক্ষণ করেছে পুণ্যবানেরা। আর রহমত বর্ষণের দোয়া করেছে ফেরেশতারা। আর রোজাদারেরা তোমার সামনেই ভঙ্গ করেছে তাদের রোজা। বাগবী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর শরহে সুন্নাহ'য়।

মাসআলা : যদি কেউ কারো বসতবাটির সামনে যেয়ে প্রবেশের অনুমতি না চেয়ে গৃহকর্তার বাহিরে আসার অপেক্ষায় বসে থাকে, তবে তা সিদ্ধ। হজরত

www.eelm.weebly.com

ইবনে আব্বাস জনৈক আনসারী সাহাবীর নিকট থেকে হাদিস শ্রবণের আশায় তাঁর গৃহের সামনে বসে থাকতেন। অপেক্ষা করতেন তাঁর বহিরাগমনের। প্রবেশের অনুমতি চাইতেন না। ওই সাহাবী বলতেন, হে রসুলের পিতৃব্যপুত্র! আপনি আমাকে ডাকলেই তো পারতেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলতেন, আমাকে এভাবেই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আমি বলি, আল্লাহ্তায়ালার প্রত্যাদেশিত আলোচ্য আয়াতই একথার প্রমাণ।

মাসআলা : কারো গৃহদ্বারে গিয়ে কেউ যদি প্রবেশের অনুমতি চায়, আর যদি সে দরজায় পর্দা না থাকে, তবে সেদিকে মুখ করে দাঁড়ানো যাবে না এবং উঁকি মারা যাবে না কোনো ফাঁক ফোকর দিয়ে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে বাশার বর্ণনা করেন, রসুল স. কারো গৃহের সামনে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতেন না। দাঁড়াতেন ডান অথবা বাম চৌকাঠের কাছে। তিনবার বলতেন, আস্সালামু আলাইকুম। ওই সময় অবশ্য বেশীরভাগ গৃহের দরজায় পর্দা থাকতো না। আবু দাউদ।

হজরত সহল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, একবার এক লোক রসুল স. এর গৃহের পর্দা উত্তোলন করে রসুল স.কে দেখলো। ওই সময় রসুল স. এর হাতে ছিলো একটি ছুঁচালো লৌহদণ্ড। তিনি স. পরে লোকটির কথা জানতে পেরে বললেন, আমি টের পেলে তখনই এটা দিয়ে তার চোখে গুঁতো দিতাম। অনুমতি প্রার্থনা তো করতে হবে পর্দার বাইরে থেকে (পর্দা উত্তোলন করে নয়)। বাগবী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, বিনা অনুমতিতে কেউ তোমাদেরকে পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখলে তোমরা যদি তার দিকে পাথর ছুঁড়ে মারো, আর তাতে করে যদি তার চোখ নষ্ট হয়ে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোনো পাপ হবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ ভালো করেই একথা জানেন যে, তাঁর নির্দেশিত বিধান তোমরা সঠিকভাবে প্রতিপালন করো কি না।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, ইবনে হাব্বান বলেছেন, যখন গৃহে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণের বিধান অবতীর্ণ হলো, তখন হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তাহলে মক্কা মদীনা ও সিরিয়ায় গমনাগমনকারী কুরায়েশ ব্যবসায়ীদের কী হবে, যারা পথিপার্শ্বের বিভিন্ন খালি গৃহে অবস্থান করে। সেগুলোতে গৃহকর্তা বলে তো কেউ থাকেই না। তারা সালাম দিবে কাকে, অনুমতিই বা চাইবে কার কাছ থেকে? তার একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

www.eelm.weebly.com

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ○

❐ যে গৃহে কেহ বাস করে না তাহাতে তোমাদিগের জন্য উপকার থাকিলে সেখানে তোমাদিগের প্রবেশে কোনও পাপ নাই এবং আল্লাহ্ জানেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে কোন কোন গৃহে উপকৃত হওয়ার নিমিত্তে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। যেমন কাতাদা বলেছেন, ওই গৃহগুলো হচ্ছে পান্থশালা, যেগুলো প্রস্তুত করা হয় পথিকদের বিশ্রামগ্রহণ ও মালামাল রক্ষণের জন্য। পান্থশালা ও এধরনের অন্যান্য বিশ্রামাগারগুলোকে লক্ষ্য করেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'যে গৃহে কেউ বাস করে না'। আর 'উপকার থাকলে' বলে বুঝানো হয়েছে অবস্থান গ্রহণ ও শ্রান্তি নিবারণের কথা, অত্যধিক শীতাতপ থেকে আত্মরক্ষার কথা।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, বাণিজ্যিক কুটির, গুদাম ঘর ও বাজারের দোকানগুলোর কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আর ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভবান হওয়াই হচ্ছে এখানে উপকার।

ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, বাজারের দোকানগুলোতে প্রবেশের জন্য অনুমতি নিষ্প্রয়োজন। ইবনে সিরীন বাজারের কোনো দোকানে গেলে বলতেন, আস্সালামো আলাইকুম, প্রবেশ করবো? এরপর জবাবের অপেক্ষা না করেই প্রবেশ করতেন দোকানে। আতা বলেন, জনশূন্য জীর্ণশীর্ণ গৃহ বা পোড়োবাড়ীই আলোচ্য আয়াতে কথিত 'যে গৃহে কেউ বাস করে না' কথাটির উদ্দেশ্য। আর সেখানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোই হচ্ছে উপকার।

কেউ কেউ বলেছেন, যে গৃহে জনমানবের উপস্থিতি নেই, সে গৃহের কথাই বলা হয়েছে এখানে। এ ধরনের গৃহে প্রবেশ করতে অনুমতির প্রয়োজন হয় না। কারণ মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার জন্যই দেয়া হয়েছে অনুমতি গ্রহণের বিধান। সুতরাং মানুষই যেখানে নেই, সেখানে আর অনুমতির প্রয়োজনই বা কী।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ করো এবং যা তোমরা গোপন করো'। এই সতর্কীকরণমূলক বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল নির্লজ্জ ও দুর্বৃত্তদের জন্য, যারা মানুষকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখার জন্য অথবা অন্য কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করে।

www.eelm.weebly.com

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

❒ বিশ্বাসীদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদিগের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাহাদিগের যৌন অংগের হিফাজত করে; ইহাই তাহাদিগের জন্য উত্তম। উহারা যাহা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবহিত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বিশ্বাসীদের বলো, তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বিশ্বাসীগণকে এই মর্মে নির্দেশ দিন যে, তারা যেনো তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে যাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। হাসান বসরী কর্তৃক একটি অপরিণত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র অভিশাপ ওই সকল পুরুষের প্রতি যারা দৃষ্টিপাত করে নিষিদ্ধ নারীদের প্রতি এবং ওই সকল নারীদের প্রতিও যারা দেখা দেয়। বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে।

এখানে 'ইয়াগুদ্দু' (সংযত করে) কথাটি নির্দেশসূচক। এখানে 'লাম' অক্ষরটি রয়েছে উহ্য। আর 'মিন আবসর' এর 'মিন' এখানে আখফাশের মতানুযায়ী অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। তিনি বলেন, হ্যাঁ বাচক বাক্যে 'মিন' এর অতিরিক্ত ব্যবহার সিদ্ধ। আর সিবওয়াইহ্ এর মতে এখানকার 'মিন' তাব্ঈ'জীয়া (আংশিক অর্থ প্রকাশক)। কেননা এখানে বিশ্বাসীদেরকে এমতো নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা কাউকেই দেখতে পারবে না। বলা হয়েছে দেখা যাবে না কেবল তাদেরকে যাদেরকে দেখা নিষেধ। অবশ্য অনিচ্ছাকৃত প্রথম দৃষ্টিপাত নিষিদ্ধ নয়। এতে কোনো পাপ নেই। কিন্তু পরের দৃষ্টিপাত অবশ্যই পাপ। হজরত বুরাইদা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার হজরত আলীকে আজ্ঞা করলেন, আলী! প্রথমবার হঠাৎ কোনো নিষিদ্ধ নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো, দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত কোরো না। প্রথম দৃষ্টি জায়েয। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি নাজায়েয। আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, দারেমী।

হজরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, আমি একবার রসুল স.কে নরনারীর প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে কী করবো সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি স. বলেছিলেন, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো। মুসলিম।

হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার পরক্ষণেই দৃষ্টিকে সংযত করে, আল্লাহ্ তার ইবাদতকে করেন আস্বাদপূর্ণ। আহমদ।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে, এটাই তাদের জন্য উত্তম তারা যা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবগত'। একথার অর্থ— দৃষ্টি সংযত করা এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করা অত্যুত্তম কর্ম। আর আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন, কারা এরকম করে এবং কারা করে না। তিনি যে সর্বজ্ঞ। এখানে লজ্জাস্থানের হেফাজত করার অর্থ আপন স্ত্রী এবং বৈধ দাসী ছাড়া অন্য কোনো নারীর সঙ্গে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত না হওয়া।

আবুল আলীয়া বলেন, অন্যান্য আয়াতে লজ্জাস্থানের হেফাজত করার অর্থ ব্যভিচার থেকে মুক্ত থাকা। কিন্তু এখানে কথাটির অর্থ লজ্জাস্থান আবৃত রাখা, পর্দা করা। বাহাজ ইবনে হাকিমের পিতামহ বর্ণনা করেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা অবশ্যই নিজ পত্নী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য নারীদের নিকট থেকে লজ্জাস্থানকে আবৃত রাখবে। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল। একাকী থাকলে কী হুকুম? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ই সর্বাপেক্ষা বড় হকদার, তাকেই লজ্জা করতে হবে। তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, তোমরা নগ্নতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কোরো। তোমাদের সঙ্গে সর্বাবস্থায় এমন সত্তা বিদ্যমান যিনি তোমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন ও স্ত্রী সম্ভোগের সময় ছাড়া অন্য সময় বিচ্ছিন্ন হন না। সুতরাং তোমরা তাঁকে লজ্জা করো ও সম্মান জানাও।

মুকাতিল সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, একবার হজরত আসমা বিনতে মুরসাদ তাঁর খেজুর বাগানে বসেছিলেন। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো কয়েকজন শিথিলবসনা রমণী। তাদের বক্ষদেশ ও কেশ ছিলো অনাবৃত। পরনে তাদের ইজারও ছিলো না। তাই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো তাদের পায়ের আভরণ। হজরত আসমা তাদের এমতো অবস্থা দেখে বলে উঠলেন, হায়! একি বীভৎস অবস্থা। তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৩১

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ

www.eelm.weebly.com

أَخَوٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التّٰبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ
مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

❑ বিশ্বাসী নারীদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদিগের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদিগের যৌন অংগের হিফাজত করে; তাহাদের যাহা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতীত তাহাদিগের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাহাদিগের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে তাহারা যেন তাহাদিগের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, সেবিকা যাহারা তাহাদিগের অধিকারভুক্ত অনুগত, যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদিগের গোপন অংগ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কাহারও নিকট তাহারা আভরণ প্রকাশ না করে, তাহারা যেন তাহাদিগের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সকলে আল্লাহের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বিশ্বাসী নারীদেরকে বলো, তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে'। একথার অর্থ হে আমার রসুল! আপনি রমণীদেরকেও একথা জানিয়ে দিন যে, তারা যেনো পরপুরুষ দর্শন থেকে দৃষ্টিকে মুক্ত রাখে এবং সুসংরক্ষিত রাখে তাদের লজ্জাস্থানকে। একথার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, রমণীদের জন্য পরপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করা সম্পূর্ণতই নাজায়েয। ইমাম শাফেয়ী একথাই বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যদি কামভাব জাগ্রত হওয়ার আশংকা না থাকে, তাহলে রমণীরা পুরুষের ওই অঙ্গসমূহ দেখতে পারে, যা দেখতে পারে অন্য পুরুষ। ইমাম শাফেয়ী তাঁর অভিমতের পরিপোষকরূপে উপস্থাপন করেন একটি হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, একবার রসুল স. এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন তাঁর দু'জন সহধর্মিণী হজরত উম্মে সালমা ও হজরত মায়মুনা। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত ইবনে উম্মে মাকতুম। রসুল স. বললেন, তোমরা দু'জন আড়ালে চলে যাও। হজরত উম্মে সালমা বলেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! উনিতো দৃষ্টিহীন। তিনি স. বললেন, তোমরাও দৃষ্টিহীন? আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আবু হানিফা দলিল গ্রহণ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস থেকে। হাদিসটি এই— বিদায় হজের বৎসর খাছয়া'ম গোত্রের এক রমণী রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার পিতার উপরে হজ ফরজ। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ। কোনো বাহনে আরোহী হওয়ার সামর্থ্যও তার নেই। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে হজ করি তবে কি তার হজ আদায় হবে? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, ওই সময় রসুল স. এর সঙ্গে এক বাহনে আরোহণ করেছিলো ফজল। সে ওই রমণীর প্রতি তাকিয়েছিলো। রমণীটিও তাকিয়ে ছিলো তার দিকে। রসুল স. ফজলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। বোখারী। হজরত আলী থেকে এই হাদিসটি আবার বর্ণনা করেছেন তিরমিজি। তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে এসেছে এই কথাগুলো— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন রসুল স. তাঁর ভ্রাতুস্পুত্রের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন অন্য দিকে। বললেন, আমি এক যুবক ও এক যুবতীকে পরস্পরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে দেখছি। আমার আশংকা হয় তাদের উপরে শয়তান প্রভাব বিস্তার করবে। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। এই হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে ইবনে কাত্তান অভিমত প্রকাশ করেন, ফেৎনার আশংকা না থাকলে নারীরা পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারে। কেননা রসুল স. তাঁর ভ্রাতুস্পুত্রের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ওই রমণীকে কিছু বলেননি। আর হজরত ইবনে আব্বাস যা বুঝেছিলেন, তা-ই প্রকাশ করেছেন। আর তার ধারণা সঠিক না হলে রসুল স. নিশ্চয়ই তাঁকে সাবধান করে দিতেন। অপর এক হাদিসে এসেছে, হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেছেন, যখন তাঁর স্বামী তাঁকে তালাক দেন, তখন রসুল স. তাঁকে ইদ্দতের সময় অতিবাহিত করতে বলেছিলেন হজরত ইবনে উম্মে মাকতুমের গৃহে। এ হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অনুরক্ত হওয়ার আশংকা না থাকলে নারীরা পরপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারে।

মাসআলা : মহিলারা মহিলাদের এবং পুরুষেরা পুরুষদের নাভি থেকে উরুদেশ দেখতে পারবে না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, পুরুষেরা পুরুষদের ও নারীরা নারীদের সতর (লজ্জা স্থান) দেখতে পারবে না এবং পুরুষ পুরুষের সঙ্গে ও নারী নারীর সঙ্গে বিবস্ত্র অবস্থায় এক বস্ত্রের নিচে শয়ন করতে পারবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ করে থাকে, তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রকাশ না করে'। এখানে 'যীনাত' অর্থ সৌন্দর্য, আভরণ। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এখানে যীনাত' অর্থ সৃষ্টিগত সৌন্দর্য।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের পাঞ্জা 'যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে' এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও কবজি পর্যন্ত দুই হাত আবরণীয় (সতর) নয়। সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে' (মা জাহারা) অর্থ মুখাবয়ব ও উভয় হাতের তালু ও পিঠ। জননী আয়েশা থেকে আতাও এরকম বর্ণনা করেছেন। অপর এক বর্ণনায় মুখ ও হাতের পাঞ্জার সঙ্গে দুই পা-কেও অনাবরণীয় অঙ্গ বলা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ীর প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, কেবল মুখমণ্ডল অনাবরণীয়। অবশ্য মুখমণ্ডল যে আবরণীয় নয়, সে ব্যাপারে ইমাম চতুষ্টয় একমত। তবে এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের নিকট কবজি পর্যন্ত দুই হাতও অনাবরণীয়। 'কাজীখান' গ্রন্থে রয়েছে মেয়েদের উভয় হাতের তালু ও পিঠ আবরণীয় অঙ্গ নয়। অপর এক নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় এসেছে, হাতের তালু আবরণীয় নয়, কিন্তু তার পৃষ্ঠদেশ আবরণীয়। ইবনে হুমামও এরকম বলেছেন। উভয় পায়ের পাতাও আবরণীয় অঙ্গ। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মত এর বিপরীত।

জননী উম্মে সালমা বলেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কোনো স্ত্রী লোক যদি ইজার না পরে কেবল কামিজ ও ওড়না পরে নামাজ পড়ে, তবে কি তার নামাজ হবে? তিনি স. বললেন, এতে কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু কামিজ হতে হবে এমন লম্বা যাতে করে দুই পা আবৃত থাকে। আবু দাউদ, হাকেম। শায়েখ আবদুল হক হাদিসটির সূত্রপরম্পরাকে ত্রুটি মুক্ত মনে করেন না। কেননা ইমাম মালেক প্রমুখ এই হাদিসকে বর্ণনা করেছেন পরিণত সূত্রে। সুতরাং বর্ণনাটি পরিণত শ্রেণীর, সুপরিণত শ্রেণীর নয়। ইবনে জাওজী বলেছেন, একে সুপরিণত শ্রেণীভূত করার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। কেননা ইয়াহ্ইয়া এর সূত্রপরম্পরাভূত আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহকে দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে চিহ্নিত করেছেন। আবু হাতেম রাজী বলেছেন, তার বর্ণনা প্রামাণ্য নয়।

পায়ের উপরি অংশ যে আবরণীয় তার প্রমাণ রয়েছে অন্য এক আয়াতে। যেমন— 'পদযুগল এমনভাবে সঞ্চালন করবে যেনো গোপন থাকে পায়ের অলংকার'। এই আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, পায়ের অলংকার আবরণীয়। অর্থাৎ পায়ের পাতার উপরের অংশও আবরণীয়।

বায়যাবী লিখেছেন, এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে অঙ্গ আবরণের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার সম্পর্ক কেবল নামাজের সঙ্গে, সার্বক্ষণিক পর্দার সঙ্গে নয়। স্বাধীনা

www.eelm.weebly.com

নারীর জন্য সমস্ত শরীরই আবরণীয়। তাই স্বামী ও মুহরিম পুরুষ ছাড়া অন্য কাউকে তারা শরীরের কোনো অংশ দেখাতে পারবে না। তবে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির কথা স্বতন্ত্র। যেমন— চিকিৎসা, সাক্ষ্য গ্রহণ ইত্যাদি। হানাফী মাযহাবের গ্রন্থসমূহে মুখমণ্ডলকে আবরণীয় অঙ্গ থেকে পৃথক করা হয়েছে। আর এই বিধান কেবল নামাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। হেদায়া গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, পুরুষ বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ছাড়া শরীরের অন্য কোনো অংশ দেখতে পারবে না। কেননা আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন 'তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ করে থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে'। অর্থাৎ এই নির্দেশনার মাধ্যমে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের তালু ও তার পৃষ্ঠদেশকে আবরণীয় অঙ্গ থেকে পৃথক করা হয়েছে। তাছাড়া মুখমণ্ডল ও হাতের তালু আবৃত রাখা সুকঠিন। তাই প্রয়োজন বশতঃ এ দু'টো অঙ্গ অনাবৃত থাকাই স্বাভাবিক। তবে প্রবৃত্তির তাড়না ও পদস্খলনের ভয় যদি থাকে, তবে নিরুপায় হয়ে মুখমণ্ডলকেও আবৃত করে নিতে হবে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরকম করা সম্ভবই নয়। যেমন সাক্ষ্য প্রদান করা, বিচারকের সম্মুখে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি।

আমি বলি, ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এরকম। আর এই আয়াতই তাঁর অভিমতের প্রমাণ। পরিণত সূত্রে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার মুখমণ্ডল এবং কবজি পর্যন্ত হাতের তালু ছাড়া অন্য কিছু দেখা জায়েয নয়। আমি আরো বলি, অতি বৃদ্ধের সম্মুখে মেয়েদের আবরণীয় অঙ্গ প্রদর্শন করা জায়েয। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। কোরআন মজীদের প্রত্যয়নও এমতের পূর্ণ অনুকূল। কেননা এমতোক্ষেত্রে ফেৎনার কোনো আশংকা নেই। এভাবে অতি দুর্বল পুরুষের সামনেও আবরণীয় অঙ্গ প্রদর্শন সিদ্ধ। তবে নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টি নিক্ষেপ নাজায়েয, যদি সামান্যতম ফেৎনার সন্দেহ বিদ্যমান থাকে। হেদায়া রচয়িতা এরকমই বলেছেন। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, বেগানা রমণী ও শ্মশ্রুবিহীন বালকের মুখমণ্ডলের দিকে তাকানো নাজায়েয, যদি কুপ্রবৃত্তি প্রবল হওয়ার আশংকা থাকে। এমতো আশংকা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নারীও তার চেহারা বেগানা পুরুষকে দেখাতে পারবে না। কারণ এতে রয়েছে ফেৎনার সমূহ সম্ভাবনা। সুতরাং অতি বৃদ্ধ ও অতি বৃদ্ধা ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে পর্দার বিধান অবশ্যপালনীয়। তাই আমরা বলি, স্বাধীনা রমণী তার স্বামী ও মুহরিম পুরুষ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে তার অবশ্য আবরণীয় অঙ্গ প্রদর্শন করতে পারবে না। একথাও মনে রাখতে হবে যে, মুখমণ্ডলই সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশস্থল। তাই অনাবশ্যকভাবে মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখার মধ্যেও রয়েছে ফেৎনার বিষাক্ত বীজ।

রসুল স. বলেছেন, নারীর আপাদমস্তক আবরণযোগ্য। তারা যখন বাইরে বের হয়, তখন শয়তান তাদের দিকে উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে। হজরত ইবনে মাসউদ

www.eelm.weebly.com

থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, নারীর আপাদমস্তকের আবৃতায়ন ওয়াজিব। কেবল নিতান্ত প্রয়োজন পূরণ এ হুকুম থেকে পৃথক। উম্মতের ঐকমত্য এটাই। বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনার মতো কেউ না থাকলে মেয়েরা পর্দাবৃত হয়ে বাজারে যেতে পারবে। এক চোখ খোলা রাখবে। আপাদমস্তক আবৃত করার মতো কাপড় না থাকলে যে কাপড়েই হোক আবৃত করতে হবে সারা শরীর। এভাবে চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের নিকট এবং সাক্ষ্যদানের জন্য বিচারকের নিকট গমনও সিদ্ধ।

আমরা 'যীনাত' বা আভরণ কথাটির অর্থ করেছি দু'রকমের। ১. কাপড় চোপড়, অলংকার ও সাজসজ্জা এবং অন্যান্য উপকরণ। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন যীনাত অর্থ বস্ত্রবৈভব। এক আয়াতে শব্দটির এরকম অর্থই প্রকাশ পেয়েছে। যেমন— 'খুজু যীনাতাকুম ইন্দা কুল্লি মাসজিদ' (প্রত্যেক নামাজের সময় আভরণ গ্রহণ কোরো)। এখানে যীনাত অর্থ বস্ত্র এবং মাস্জিদ অর্থ নামাজ। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে কাপড় চোপড়ের সৌন্দর্য প্রকাশ করতেই নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য যে কাপড় দ্বারা পর্দা করা হয়, সেই কাপড় কথিত 'যীনাত' বা সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং বুঝতে হবে, বস্ত্রবৈভব প্রদর্শন করাই যখন নিষিদ্ধ তখন অঙ্গ প্রদর্শন তো আরো বেশী নিষিদ্ধ।

আর যদি 'যীনাত' অর্থ এখানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য হয়, তবে বুঝতে হবে এখানে মুখমণ্ডল ও হাত অনাবৃত রাখা জায়েয করা হয়েছে তখন, যখন সমাধা করতে হয় জরুরী কোনো সাংসারিক কাজ, চিকিৎসা, সাক্ষ্য প্রদান ইত্যাদি। আর এই অনাবৃততা কেবল নামাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং এ বিধান সকল সময়ের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেনো মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে'। উল্লেখ্য, এ ধরনের নির্দেশ রয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন— 'হে নবী! আপনার স্ত্রীগণ ও কন্যাগণকে এবং অন্যান্য মুসলমানের স্ত্রীগণকে জানিয়ে দিন, তারা যেনো চাদর দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করে নেয়'। এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত আবু উবায়দা বলেন, মুসলিম রমণীকুল যেনো মাথা ও চেহারা চাদর দ্বারা আবৃত করে নেয়, যাতে করে বুঝা যায় যে, তারা স্বাধীনা। খোলা রাখবে কেবল এক চোখের দৃষ্টিপাতের জায়গা। এখন আলোচনা করা যেতে পারে খাছয়াম গোত্রীয় ওই রমণীর প্রসঙ্গ, যিনি রসুল স.কে তাঁর বৃদ্ধ পিতার বদলী হজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আর তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন হজরত ফজল ইবনে আব্বাস। এই ঘটনার দ্বারা অবশ্য মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখার বৈধতাকে প্রমাণ করা যায় না। কারণ ওই রমণী তখন রসুল স.কে ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। এমন অবস্থায়

www.eelm.weebly.com

সাধারণতঃ মুখমণ্ডল অনাবৃত থাকাই স্বাভাবিক। আর ওই ঘটনায় রসুল স. কর্তৃক হজরত ফজলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়া একথাই প্রমাণ করে যে, গায়ের মুহ্‌রিম রমণীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা নাজায়েয।

মাসআলা ঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, এই আয়াতের বিধান প্রযোজ্য কেবল স্বাধীনা রমণীদের জন্য। আর মুকাতিব, মুদাব্বির, উম্মে ওয়ালাদ ইত্যাদি প্রকারের সকল ক্রীতদাসীর জন্য বিধান হচ্ছে, তারা তাদের মাথা, মুখমণ্ডল, হাতের পাঞ্জা ও পা অনাবৃত রাখতে পারবে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, ক্রীতদাসীদেরকেও পুরুষের মতো নাভি থেকে উরুদেশ পর্যন্ত আবৃত রাখা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা বলেন, ক্রীতদাসীদের জন্যও পিঠ ও পেট আবৃত রাখা ওয়াজিব। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ বলেন, ক্রীতদাসীদের বিধানও স্বাধীনা রমণীদের মতো। ক্রীতদাসীদের মাথা, পা ও হাতের পাঞ্জা কেবল অবশ্য আবরণীয় অঙ্গ নয়। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. যখন হজরত সাফিয়্যাকে গ্রহণ করলেন তখন সাহাবীগণ বলাবলি শুরু করলেন, যদি রসুল স. তাঁকে পর্দা করান তবে বুঝতে হবে তিনি তাঁর সহধর্মিণী। আর যদি তা না করান তবে বুঝতে হবে, তিনি উম্মে ওয়ালাদ (ক্রীতদাসী বিশেষ)। এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বাধীনা ও ক্রীতদাসীর বিধান পৃথক। হজরত আনাস বলেছেন, একবার এক ক্রীতদাসী স্বাধীনাগণের মতো পর্দা করে বাইরে বের হলো। রসুল স. ছড়ি নিয়ে তার সামনে গিয়ে বললেন, হতভাগিনী! স্বাধীনাদের মতো কষ্টদায়ক আমলকে গ্রহণ করেছো কেনো?

এছাড়া 'হে নবী! আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও অন্যান্য মুসলমানের স্ত্রীগণকে জানিয়ে দিন..........' এই আয়াতের শেষাংশও একথা প্রমাণ করে যে, স্বাধীনা ও ক্রীতদাসীদের পর্দার বিধান পৃথক। এরকমও বলা যেতে পারে যে, ক্রীতদাসীদের মাথা, হাত ও পা অনাবৃত রাখার বিধানও অন্তর্নিহিত রয়েছে আলোচ্য আয়াতে 'যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে' কথাটির মধ্যে। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতের বিধান স্বাধীনা-ক্রীতদাসী সকলের জন্য। উল্লেখ্য, ক্রীতদাসীকে ঘরে-বাইরে তার প্রভুর খেদমত করতে হয় বিভিন্নভাবে। তাই তার বস্ত্র হ্রস্ব হওয়াই স্বাভাবিক। সেকারণে ক্রীতদাসীর মাথা, মুখমণ্ডল, হাত ও পা-কে অবশ্যআবরণীয় সাব্যস্ত করা হয়নি।

'ওয়াল ইয়াদ্বরিবনা' অর্থ যেনো কাপড় দ্বারা বা ওড়না দ্বারা আবৃত করে। যেমন 'দ্বারাবাল ইয়াদাহু আ'লাল হায়িতি' অর্থ দেয়ালে হাত রেখেছে। বাগবী লিখেছেন, জননী আয়েশা বলেন, মুহাজির রমণীগণের উপরে যখন আল্লাহ্‌তায়ালা 'তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেনো মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে' অবতীর্ণ করলেন, তখন তারা তাদের চাদর চিরে বানিয়ে নিলো ওড়না।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যেনো তাদের স্বামী, পিতা, শশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, সেবিকা যারা তাদের অধিকারভুক্ত অনুগত, যৌন-কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে'।

স্বামীই স্ত্রীর সর্বাঙ্গ দেখার একমাত্র অধিকারী। স্ত্রী তার সকল সৌন্দর্য দেখাতে পারে কেবল স্বামীকেই। এমনকি লজ্জাস্থানকেও। কিন্তু লজ্জাস্থান দেখা মাকরূহ্। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, সহবাসের সময়েও পর্দা করে নিয়ো। গর্দভের মতো সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ো না। শাফেয়ী, তিবরানী ও বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে, তিনি হজরত উত্‌বা ইবনে আম্বর থেকে, নাসাঈ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সারজাস থেকে এবং তিবরানী হজরত আবু উমামা থেকে। জননী আয়েশা বর্ণনা করেন, আমি কখনো রসুল স. এর লজ্জাস্থান দর্শন করিনি।

নারীরা তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে আরো কতিপয় পুরুষের সামনে। যেমন— পিতা, পিতামহ, মাতামহ, অর্থাৎ পিতা ও মাতার সকল উর্ধ্বতন পুরুষ।

শশুরের সামনেও স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকাশ করাতে কোনো বাধা নেই। তেমনি বাধা নেই শশুরের পিতা, শশুরের ভ্রাতা, তাদের ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে, স্বামীর পুত্রগণ। অর্থাৎ স্বামীর জন্মজাত সূত্রের একই বিধান। এভাবে ভ্রাতাগণ, অর্থাৎ আপন ভাই, সৎ ভাই, আখইয়াবি ভাই (যাদের পিতা ভিন্ন কিন্তু মাতা এক), ভাতিজার পুত্র, ভাতিজির পুত্র— এদের সামনেও পর্দার প্রয়োজন নেই। এভাবে ভ্রাতার সকল শাখার বিধান একই রকম। এরকম আরো যাদের সঙ্গে পর্দা নেই, তারা হচ্ছে ভগ্নির পুত্র, ভগ্নির পুত্রের পুত্র, পুত্রের পুত্র, কন্যার পুত্র। এ সকল নিকটজন নারীদের কাছে যাতায়াত করা স্বাভাবিক। আর এদের মাধ্যমে কোনো ফেৎনা সংঘটনের অবকাশ নেই। তাই আল্লাহ্পাক এদের সামনে নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশকে বৈধ করে দিয়েছেন। আর এসকল পুরুষের জন্যও বৈধ করে দিয়েছেন যে, তারা এসকল নারীর ওই সকল অঙ্গ দেখতে পারবে যেগুলো খেদমতের সময় সাধারণতঃ খোলা থাকে। অর্থাৎ তারা দেখতে পারবে এ সকল নারীর মাথা, হাঁটুর নিম্নাংশ, বাহু ও বুক। পেট ও পিঠ দেখা এদের জন্যও জায়েয নয়। আরো জায়েয নয় নাভি থেকে উরুদেশ পর্যন্ত। এসকল অঙ্গ কাজের সময়েও সাধারণতঃ আবৃত থাকে। আর এ সকল অঙ্গ ঢেকে রাখা কষ্টদায়ক কিছুও নয়। অর্থাৎ যাদের মধ্যে চিরতরে বিবাহ নিষিদ্ধ তাদের ক্ষেত্রেই রয়েছে পর্দার এই শিথিলতা। এ নিষিদ্ধতা যেমন বংশীয় সূত্রে, তেমন দুধ পান সম্পর্কীয় সূত্রেও। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে পিতার ভাইয়ের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে অকাট্য দলিলের মাধ্যমে তারা এবং ভাতিজা-ভাগিনারাও এই বিধানের

www.eelm.weebly.com

অন্তর্ভুক্ত। এব্যাপারে আলেমগণ একমত। কেননা ফুফু যদি তার আভরণ ভাইয়ের ছেলের সামনে প্রকাশ করতে পারে, তবে ভাতিজির জন্যও চাচার সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা জায়েয। উভয় সম্পর্ক সমতুল। অনুরূপ খালা সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে তার বোনের ছেলের সামনে এবং ভাগ্নিও তার মামার সামনে।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, চাচা ও মামার কথা এখানে স্পষ্ট উল্লেখ না করে এটাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এমতোক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। সম্ভবতঃ এরা ভাতিজি বা ভাগ্নির রূপ সৌন্দর্যের কথা বলতে পারে তাদের আপনাপন পুত্রকে, যার ফলে উন্মেষ ঘটতে পারে পরোক্ষ কোনো ফেৎনার।

মাসআলা ঃ মুহরিম নারীদের যে সকল অঙ্গ দর্শন জায়েয, ওই সকল অঙ্গ হাত দ্বারা স্পর্শ করাও জায়েয। চলা ফিরা বা ভ্রমণে অনেক সময় এরকম হয়েও থাকে। কারণ চিরতরে বিবাহ হারাম হওয়ায় ফেৎনার আশংকা এসকল ক্ষেত্রে নেই। তবে এমতোক্ষেত্রেও যদি প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার আশংকা থাকে তবে সতর্কতা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। রসুল স. বলেছেন, চোখও ব্যভিচার করে। আর চোখের ব্যভিচার হচ্ছে কামনার দৃষ্টিতে দেখা। এভাবে ব্যভিচার করতে পারে হাত। আর হাতের ব্যভিচার হচ্ছে কামভাবের সঙ্গে স্পর্শ করা। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ব্যভিচার করে চোখ, হাত, পা ও লজ্জাস্থান। আহমদ ও তিবরানী সুপরিণত সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে। মুহরিম নারীর সঙ্গে ব্যভিচার অত্যন্ত গুরুতর পাপ। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে যদি কখনো প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার আশংকা দেখা দেয় তবে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে দর্শন ও স্পর্শন থেকে।

নারীরা নারীদের সম্মুখে নিজেদেরকে অনাবৃত রাখতে পারবে। সে নারী বিশ্বাসিনী হোক অথবা হোক অবিশ্বাসিনী। স্বাধীনা অথবা ক্রীতদাসী। এভাবে নারীদের সামনে নারীদের নিরাবরণ কামোত্তেজক কোনো অবস্থার সৃষ্টি সাধারণতঃ করে না। তাই এমতোক্ষেত্রে আবরণ অত্যাবশ্যক নয়। তবে নাভি ও উরুদেশ নারীরাও একে অপরের সামনে অনাবৃত করতে পারবে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, নারীর প্রতি নারীর দৃষ্টিপাত মুহরিম নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিপাতের মতো।

কতিপয় কোরআন ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, এখানে 'নিসায়িহিন্না' অর্থ মুসলিম রমণীকুল। অর্থাৎ স্বধর্মীয় ভগ্নিবৃন্দ। এই তাফসীর অনুসারে মুসলিম রমণীরা অমুসলিম রমণীর সামনে তাদের আবরণ উন্মোচন করতে পারবে না। তারা মুসলমানদের আপনজন নয়। আর তারা তাদের পুরুষদের সামনে মুসলিম নারীদের গোপন সৌন্দর্যের কথা প্রকাশও করে দিতে পারে।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, নারী নারীদের সামনে নগ্ন হবে না। কারণ তারা তাদের আপনাপন পুরুষের সামনে অন্য নারীর গোপন সৌন্দর্যের কথা বলবে। ফলে পুরুষের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে ওই নারীর নগ্নরূপ।

বাগবী লিখেছেন, ওমর ইবনে আবদুল আযীয হজরত উবাইদাহ ইবনেল জাররাহ এর নিকট এইমর্মে ফরমান জারী করেছিলেন যে, মুসলিম নারীদেরকে কিতাবী রমণীদের সঙ্গে এক গোসলখানায় যেতে নিষেধ করে দেয়া হোক।

ইবনে জুরাইজ বলেছেন, 'নিসায়িহিন্না' দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে স্বাধীনা রমণীকূলকে। আর 'মালাকাত আইমানুহুন্না' বলে বুঝানো হয়েছে মুসলমান ক্রীতদাসীদেরকে, ক্রীতদাসদেরকে নয়। অংশীবাদিনী ক্রীতদাসীদের সামনেও নিরাবরণ হওয়া দূষণীয় নয়। তবে যদি 'মা-মালাকাত' অর্থ আপন ক্রীতদাসী হয়, তা হলে ওই ক্রীতদাসীও মালিকের ক্রীতদাসের সামনে তার আভরণ প্রকাশ করতে পারবে না। ক্রীতদাসও দেখতে পারবে না তার প্রভুপত্নীর এমন গোপন সৌন্দর্য যা দেখা অন্য পুরুষের জন্য হারাম। ইমাম আবু হানিফা এবং কতিপয় শাফেয়ী মতাবলম্বী আলেম এরকমই বলেছেন। শায়েখ আবু হামেদ শাফেয়ী বলেছেন, আমাদের বিশিষ্ট বন্ধুবর্গের অভিমত এটাই যে, ক্রীতদাস তার প্রভুপত্নীর মুহরিম নয়। ইমাম নববী লিখেছেন, এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। এতে মতোবিরোধের কোনো স্থান নেই। কারণ গোলাম যে তার মালিকপত্নীর মুহরিম হবে তার কোনো দলিলই নেই। তাই 'মা-মালাকাত' অর্থ এখানে বাঁদী। হেদায়া রচয়িতা বলেন, আমাদের মতের স্বপক্ষে প্রমাণ এই যে, গোলাম পুরোপুরি পুরুষ নয়, স্বামী নয়, আবার মুহরিমও নয়। এমতোক্ষেত্রে কামনা-বাসনার সম্ভাবনা বিদ্যমান। মুক্ত হলে তারা স্বাধীনা রমণীদেরকে বিয়ে করতেও সক্ষম। সুতরাং গোলামের সামনে মেয়েদেরকে অবশ্যই পর্দা করতে হবে। গোলামেরা করে সাধারণতঃ বহির্বাটির কাজ। আর অন্দরমহলের কাজ করে বাঁদীরা। তাই বুঝতে হবে এখানে বলা হয়েছে কেবল বাঁদীর কথা। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, হাসান ও অন্যান্যরা বলেছেন, তোমরা সুরা নূরের 'মা-মালাকাত' কথাটির ভুল অর্থ কোরো না। কথাটি বলা হয়েছে কেবল নারীদের সম্পর্কে, পুরুষদের সম্পর্কে নয়।

অবশ্য এরকম তাফসীর ওই সময় যথার্থরূপে গণ্য হবে যখন 'নিসায়িহিন্না' দ্বারা উদ্দেশ্য হবে স্বাধীনা রমণী, মুসলিম রমণী নয়। নতুবা 'মা-মালাক্যত আইমানুহুন্না' কথাটি হয়ে পড়বে একটি নিরর্থক পুনরাবৃত্তি। প্রকৃত কথা হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফার অভিমতানুসারে মুসলিম রমণীরা স্বাধীনা কাফের রমণীদের সামনে তাদের আভরণ প্রকাশ করতে পারবে না।

www.eelm.weebly.com

ইমাম মালেক বলেন, 'মা-মালাকাত আইমানুহুন্না' কথাটির মধ্যে আপন ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রভুপত্নীর নিকটে তার ক্রীতদাস মুহরিম পুরুষদের মতোই। সুতরাং মুহরিম পুরুষের সামনে যে সকল অঙ্গ অনাবৃত রাখা যায় সে সকল অঙ্গ অনাবৃত রাখা যাবে আপন ক্রীতদাসের সামনেও। ইমাম শাফেয়ীও এরকম বলেছেন। প্রসিদ্ধ শাফেয়ী মতাবলম্বীরাও এই মতের প্রবক্তা। এরকম বলার কারণ এই যে, গোলাম গৃহকর্মের প্রয়োজনে সাধারণতঃ বিনা অনুমতিতে অন্দরমহলে যাতায়াত করতে পারে।

বাগবী লিখেছেন, জননী আয়েশা এবং জননী উম্মে সালমা থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। তাছাড়া হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. একবার তাঁর প্রিয় আত্মজাকে একটি গোলাম দান করলেন। গোলামটিকে নিয়ে তিনি যখন হজরত ফাতেমার নিকটে উপস্থিত হলেন, তখন হজরত ফাতেমার পরনে ছিলো একটি খাটো কাপড়, যা দিয়ে মাথা ঢাকলে নগ্ন হয়ে পড়তো পা, আবার পা ঢেকে নিলে নগ্ন হয়ে পড়তো মস্তক। রসুল স. বিষয়টি অবলোকন করে বললেন, কোনো অসুবিধে নেই। এখানে তো কেবল তোমার পিতা এবং তোমার গোলাম। আবু দাউদ। এই হাদিসের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, সম্ভবতঃ ওই গোলাম ছিলো অপ্রাপ্তবয়স্ক। 'গোলাম' এর আর এক অর্থ বালক।

জননী উম্মে সালমা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মুকাতাব ক্রীতদাসের টাকা উশুল হলে তার সঙ্গে পর্দা রক্ষা করা তোমাদের পত্নীদের জন্য নিতান্তই সমীচীন। তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

'যৌন কামনা রহিত পুরুষ' অর্থ অতিবৃদ্ধ। তাদেরকে এখানে 'তাবেয়ীন' বলা হয়েছে একারণে যে, তারা উপার্জনক্ষম নয়। তারা অন্যের উপার্জননির্ভর ও অধীন।

হাসান বলেছেন, এখানকার 'গইরি উলিল ইরবাতি' কথাটির অর্থ যারা নারীর গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অবগতই নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ খোজা।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, কথাটির অর্থ অজ্ঞ, উন্মাদ। ইকরামা বলেছেন, নপুংসক। কেউ কেউ বলেছেন, হিজড়া। মুকাতিল বলেছেন অতিবৃদ্ধ, যৌনশক্তিরহিত, শিথিল গোপনাঙ্গবিশিষ্ট।

বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, খোজা ও শিথিল গোপনাঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তিরাও নারীদের নিকটে সক্ষম পুরুষের মতো। হেদায়া প্রণেতা লিখেছেন, কোনো কোনো সময় পুরুষ খোজারাও সহবাস করতে সক্ষম হয়। আর শিথিল যৌনাঙ্গবিশিষ্ট পুরুষদের ঘর্ষণে ও স্পর্শে বীর্যস্খলন হয়ে যেতে পারে। তাই এধরনের লোকও 'কুল্লিল মু'মিনীনা ইয়াগুদ্দু মিন আবসরিহিম' এর বিধানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বুঝতে হবে,

www.eelm.weebly.com

এধরনের সকল লোককে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে ‘আত্তাবিয়ীনা গয়রি উলিল ইরবাতি’। ‘কিফাইয়া’ রচয়িতা লিখেছেন, হিজড়া বলে তাকে, যে কুকর্মে লিপ্ত হয়, সে নয় যে অঙ্গশৈথিল্যের কারণে জন্মাবধি যৌন-আগ্রহশূন্য। এধরনের যৌন-আগ্রহশূন্যদেরকে আমাদের মাশায়েখবৃন্দ নারীদের নিকটে গমনাগমনের অনুমতি দিয়েছেন। এরাই ‘গইরি উলিল ইরবাতি’।

আমি বলি, প্রকৃতিগতভাবে যে হিজড়া, যার নারীদের মতো যৌনাঙ্গ, স্তন,নারীসুলভ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে, মেয়েরা তার সামনে তাদের আভরণ উন্মোচন করতে পারবে। কারণ তারা নারীদের বিধানের অন্তর্ভূত। এছাড়া অন্য সকল হিজড়ার প্রতি প্রযোজ্য হবে পুরুষের বিধান। নারীরা তাদের সামনেও পর্দা করবে।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুল স. তাঁর প্রিয় পত্নী হজরত উম্মে সালমার ঘরে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো এক হিজড়া। সে হজরত উম্মে সালমার ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়াকে বললো, আবদুল্লাহ্! আগামীকাল যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে তায়েফ বিজয় দান করেন, তবে আমি তোমাদেরকে শোনাবো গাইলানের কন্যার সংবাদ। সে সম্মুখবর্তিনী হলে সাথে আসে চার, আর পশ্চাদ্বর্তিনী হলে সাথে যায় আট। অর্থাৎ সে এমনই দৃষ্টি নন্দিতা যে সম্মুখে অগ্রসরমান হলে উদ্ভিন্ন যৌবনের চারটি ঢেউ জাগে তার দেহে। আর প্রত্যাবর্তনকালে দৃশ্যমান হয় আটটি ঢেউ। দক্ষিণ পঞ্জরে চারটি আর বাম পঞ্জরে চারটি। তার কথা শুনে রসুল স. বললেন, একে আর অন্দর মহলে আসতে দিয়ো না।

কতিপয় আলেম বর্ণিত হাদিসের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, হিজড়ারা নারীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে না। কিন্তু সিদ্ধান্তটি দুর্বল। কারণ এখানে দেখা যায়, রসুল স. ওই হিজড়াকে ঘরে আসতে নিষেধ করেছিলেন তার গাইলান কন্যার রূপ-বর্ণনা করার পর। তার আগে তিনি স. তার সম্পর্কে কিছুই বলেননি। এভাবে নারীর রূপ বর্ণনার দ্বারা অন্য পুরুষকে প্রলুব্ধ করাই ছিলো তার গৃহাগমন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ। যেমন বর্ণনা করা হয়েছে ইতোপূর্বের হজরত ইবনে মাসউদের হাদিসে।

‘আত্তিফলু’ শব্দটি এখানে জাতিবাচক নামপদ। কেননা এর বিশেষণকে এখানে দেয়া হয়েছে বহুবচনের শব্দরূপ। ‘লাম ইয়াজহারু’ অর্থ অপ্রাপ্তবয়স্ক, অথবা যৌনযোগ্যতাহীন বালক। যেমন ‘জাহারা আ'লা যাইদিন’ অর্থ সে জায়েদের উপরে বিজয়ী হয়েছে, হয়েছে ক্ষমতাধিকারী। অথবা ‘লাম ইয়াজহারু’ অর্থ তারা নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে জানেই না, নারীদের আবরণ-নিরাবরণ সম্পর্কীয় জ্ঞানই যাদের নেই।

www.eelm.weebly.com

মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ এতো ছোট বালক, যার নিকট নারীজাতির গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয়ের কোনো পার্থক্য নাই। অর্থাৎ পর্দা কী জিনিস তা সে জানেই না। অবশ্য এখানে প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন অর্থাৎ নারীদের গোপনাঙ্গের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পার্থক্যজ্ঞান যার নাই, তার সামনে নারীরা অনাবৃত হতে পারবে, তবে এমতাবস্থাতেও আবৃত রাখতে হবে নাভি থেকে উরুদেশ পর্যন্ত। 'ইয়াসতা'জিনুকুমুল্ লাজীনা মালাকাত আইমানুকুম ওয়াল্লাজীনা লাম ইয়াবলুগুল হুলুমা মিনকুম ছালাছা মাররাতিন'— এই আয়াতও একথার প্রমাণ। অর্থাৎ ছোটো বালক, অজ্ঞতার দিক থেকে চতুষ্পদ জন্তু, বৃক্ষ ও প্রস্তরের মতো। তাই তার সামনে নারীরা যদি সম্পূর্ণ উলঙ্গও হয়, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু বালক যদি প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থার কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তবে তাকেও গণ্য করতে হবে যুবকরূপে। আর তার সঙ্গে পর্দাও পালন করতে হবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর তারা যেনো তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে'। হাজরামী সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, এক রমণী পায়ে পরতো দু'টি চাঁদির নূপুর এবং পথ অতিক্রমের সময় করতো সজোরে পদবিক্ষেপ; ফলে শোনা যেতো তার ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজ। তার এমতো অপআচরণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য বাক্যটি।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো মহিলা পথ চলার সময় নূপুরের আওয়াজ শোনানোর উদ্দেশ্যে জোরে জোরে পা ফেলে। তাদের বিরত রাখাই আলোচ্য বাক্যের উদ্দেশ্য। তাই বায়যাবী তাঁর আন্নাওয়াযীলে উল্লেখ করেছেন, নারীদের কণ্ঠস্বরও পর্দা। সুতরাং নারীদের নিকট থেকেই তাদের কোরআন শিক্ষা করা উত্তম। একারণেই রসুল স. বলেছেন, পুরুষেরা বলবে সুবহানাল্লাহ্ এবং নারীরা তালি লাগাবে হাতে। বোখারী, মুসলিম।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, এজন্যই বলা হয় নারীরা নামাজে সশব্দে কোরআন পড়লে তাদের নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই মনে রাখতে হবে নামাজ পাঠকালে ইমামের ভুল হলে পুরুষেরা বলবে সুবহানাল্লাহ্ এবং নারীরা তালি দিবে হাতে।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো'। একথার মর্মার্থ— তোমরা সকলে তওবা করো। কারণ তোমাদের কারোরই জীবনযাপন ও আমল সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়। তাই তওবা করাই সমীচীন। এটাই সফলতার পথ। এক হাদিসে এসেছে, সকল আদম সন্তান পাপী। উত্তম তারাই, যারা তওবা করে। তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারেমী।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্তায়ালা সুরা নূরে তোমাদের জন্য যে সকল নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা প্রদান

www.eelm.weebly.com

করেছেন, সে সকলের দিকে কায়মনোবাক্যে প্রত্যাবর্তন করো। কেউ কেউ অর্থ করেছেন— তোমরা ফিরে এসো তোমাদের মূর্খতার জীবনের সকল গ্লানি থেকে। ইসলামের কারণে সে সকল গ্লানি অপনোদনিত হয়ে গেলেও সে সকল অপস্মৃতির কথা মনে করে মনে মনে লজ্জিত হও এবং এটাই নিজেদের উপরে অত্যাবশ্যক করে নাও যে, তোমরা আর কস্মিনকালেও ওগুলোর দিকে গমন করবে না।

'লায়া'ল্লাকুম তুফ্লিহুন' অর্থ 'যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো'। একথার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সফলতার সম্পৃক্তি রয়েছে তওবার সঙ্গে। রসুল স. বলেছেন, আনন্দিত হবে ওই ব্যক্তি, যে তার আমলনামায় পাবে অধিক পরিমাণ ইস্তেগফার।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, হে লোকসকল! আপন প্রভুপালয়িতার দিকে ফিরে এসো (তওবা করো)। আমি নিজেও প্রত্যহ একশত বার ইস্তেগফার করি।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি প্রতিদিন সত্তর বারের অধিক আল্লাহ্র সকাশে ক্ষমাপ্রার্থনা করি ও তওবা করি। বোখারী।

আরাবীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, নিশ্চয় আমারও হৃদয় কখনো কখনো অনভ্র হয়। আর আমি প্রত্যহ একশত বার আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থনা করি ও প্রত্যাবর্তনকামী হই। মুসলিম।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, আমি গণনা করে দেখলাম, রসুল স. এক বৈঠকে বিরতিহীনভাবে একশত বার বলতেন 'রব্বিগফিরলি ওয়াতুব্ আলাইয়া ইন্নাকা আনতাত্ তাওয়াবুর রহীম'। তিরমিজি, ইবনে মাজা, আবু দাউদ।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৩২

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ۚ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

❑ তোমাদিগের মধ্যে যাহারা 'আইয়িম', তাহাদিগের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদিগের দাস ও দাসীদিগের মধ্যে যাহারা সৎ তাহাদিগেরও। তাহারা অভাবগ্রস্ত হইলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়া দিবেন; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

পূর্ববর্তী আয়াতে ব্যভিচার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আরো দেয়া হয়েছে ব্যভিচারপ্রবণতাকে দমন করার জন্য পর্দার নির্দেশ। আর আলোচ্য

www.eelm.weebly.com

আয়াতে দেয়া হয়েছে বিবাহের নির্দেশ, যাতে করে মানব-মানবী বৈধ উপায়ে মেটাতে পারে তাদের স্বাভাবিক যৌন-বৃত্তি। বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং রক্ষা করে ব্যভিচার থেকে।

এখানে 'আনকিহু' বলে সম্বোধন করা হয়েছে অভিভাবকদেরকে যারা সাধারণতঃ বিবাহকর্ম সম্পাদন করতে সহায়তা করে। বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যারা আইয়িম, তাদের বিবাহ সম্পাদন করো'। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে 'আয়ামা'। এর প্রকৃত রূপ 'আইয়িম', যেমন উল্লেখ করা হয়েছে বঙ্গানুবাদে। এরকম শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্যত্রও। যেমন 'ইয়াতামা' শব্দটির আসল রূপ 'ইয়াতাইম'। উল্লেখ্য, 'আইয়িম' একবচন এবং এর বহুবচন হচ্ছে 'আয়ামা'। এর অর্থ ওই পুরুষ যার স্ত্রী নেই এবং ওই রমণী যার স্বামী নেই। উল্লেখ্য, এখানকার 'সম্পাদন করো' নির্দেশটি অত্যাবশ্যক নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তাদেরকেও'। উল্লেখ্য, বিবাহের জন্য সৎ হওয়ার শর্তটি আবশ্যিক নয়। অসৎ লোককে বিবাহ দেয়াও মোস্তাহাব। কিন্তু ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী যদি সৎ হয়, তবে তাদের ধর্মপরায়ণতার প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক। তাই বিশেষভাবে এখানে সৎ দাস-দাসীদেরকে বিবাহ দেয়ার নির্দেশ এসেছে। অবশ্য কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'সলিহীন' (সৎ) বলে বোঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা বিবাহ করার এবং বিবাহের হক আদায় করার যোগ্য।

মাসআলা ঃ যৌনউত্তেজনা যদি অসহ্য হয় এবং অবৈধতার দিকে ধাবিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তবে বিবাহ অত্যাবশ্যক। 'নেহায়া' রচয়িতা লিখেছেন, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকলে বিবাহবদ্ধ হওয়া ফরজ।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, হারাম কাজে প্রলিপ্ত হওয়ার দৃঢ় সম্ভাবনা দেখা দিলে বিবাহ করা ফরজ। আর হারামের আশংকা বিদ্যমান থাকলে ওয়াজিব। কিন্তু এই ওয়াজিব পালন করা যেতে পারবে তখন, যখন বিবাহের হক আদায় করার যোগ্যতা থাকবে। অর্থাৎ যখন থাকবে স্ত্রীর পরিতৃপ্তি বিধান ও ভরণপোষণের উপযুক্ততা। এ যোগ্যতা না থাকলে বিবাহ করা মাকরূহ্। ইবনে হুম্মাম একথাও লিখেছেন, হক রক্ষার বিষয়টিও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। মূল হক বিনষ্ট হওয়ার আশংকা যদি সুনিশ্চিত হয়, তবে বিবাহ করা হারাম। আর যদি আশংকা নিশ্চিত না হয়, তবে বিবাহ করা মাকরূহে তাহরীমা।

'বেদায়া' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, যৌন-উত্তেজনা প্রবল হলে বিবাহ ফরজ। কিন্তু এমতোক্ষেত্রে তার জন্য 'মোহরে মুয়াজ্জাল' (তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ্য

www.eelm.weebly.com

মোহর) প্রদানের যোগ্যতা ও ভরনপোষণের সামর্থ্যও অত্যাবশ্যক। এ শর্ত দু'টো পরিপূরণের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি যৌনতাড়িত ব্যক্তি বিবাহ না করে, তবে সে অবশ্যই গোনাহগার হবে।

যে ক্ষেত্রে বিবাহ করা না করার উপরে গোনাহগার হওয়া না হওয়া নির্ভরশীল নয়, সেক্ষেত্রে দাউদ জাহেরী এবং তাঁর সতীর্থদের মত হচ্ছে এরকম নারী-পুরুষের জন্য বিবাহবদ্ধ হওয়া ফরজে আইন। কিন্তু শর্ত হচ্ছে পুরুষকে জীবনে অন্ততঃ একবার সহবাসক্ষম হতে হবে এবং হতে হবে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগ্য। কেননা আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন 'ফানকিহু মা ত্বা লাকুম' (নারীদের মধ্যে যাকে পছন্দ হয় তাকে বিবাহ করো)। হজরত সামুরা বর্ণনা করেন, রসুল স. অবিবাহিত অবস্থায় জীবন যাপন করতে নিষেধ করেছেন। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

অন্য এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার উকাফ্কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার কি স্ত্রী আছে? তিনি বললেন, না, বাঁদীও নেই। রসুল স. বললেন, তুমি তো বিত্তবানও। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রসুল স. বললেন, তাহলে তুমি তো দেখছি শয়তানের সহোদর। রসুল স. একথাও বলেছেন, বিবাহ আমার আদর্শ (সুন্নত)। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করবে না, সে মন্দ। আর যে এমতাবস্থায় মারা যাবে, সে অত্যন্ত নিম্নস্তরের মৃত। আহমদ।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. সকলকে বিবাহের নির্দেশ দিতেন এবং অবিবাহিত জীবন যাপন থেকে বিরত থাকতে বলতেন। আরো বলতেন, ওই রমণীকে বিবাহ করো, যে তার স্বামীকে ভালোবাসে এবং জননী হয় অধিক সন্তান-সন্ততির। মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্-ভীরুদের তুলনায় আমি আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গৌরব করবো। আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী।

সুরা নিসার তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফাইন খিফতুম আল্লা তা'দিলূ ফা ওয়াহিদাতান আও মা মালাকাত আইমানুকুম'। এই আয়াতের তাফসীরের সঙ্গে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হয়েছে এরকম অনেক হাদিস। কোনো কোনো হানাফী আলেম বলেন, বিবাহ ওয়াজিব বিল কিফায়া, অর্থাৎ সকলের উপরে ওয়াজিব। কিন্তু সকলের জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব নয়। সুতরাং কেউ কেউ বিবাহ করলেই এই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। বিবাহের বিধান প্রবর্তনের আসল উদ্দেশ্য হলো কিছু লোকের মাধ্যমে হলেও যেনো মুসলমানদের প্রজন্মপ্রবাহ প্রবহমান থাকে।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, বিবাহ ফরজে আইন (মৌলিক ফরজ) নয়। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। দাউদ জাহেরী ও তাঁর সতীর্থদের অভিমত তাই ঐকমত্যবিরোধী। কোনো কোনো আলেম বিবাহ ওয়াজিব বিল কিফায়া হওয়াকে

www.eelm.weebly.com

প্রমাণ করেন 'ফানকিহূ মা ত্বাবা লাকুম মিনান্ নিসায়ি' আয়াতের মাধ্যমে। অথচ এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে কাকে কাকে এবং একসঙ্গে কতোজনকে বিবাহ করা যাবে তাদের কথা। আরো বলা হয়েছে ক্রীতদাস বিবাহ করতে চাইলে তাকে যেনো বাধা দেয়া না হয়। এখন অবশিষ্ট রইলো বর্ণিত হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, বিবাহ আমার আদর্শ। উল্লেখ্য, হাদিসটি একক বর্ণনায়ন (খবরে ওয়াহিদ)। এ ধরনের হাদিস দ্বারা ফরজ প্রত্যয়িত হয় না।

কেউ কেউ বলেছেন, বিবাহ সুন্নতে মোয়াক্কাদা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, মোস্তাহাব। তবে সুন্নত-মোস্তাহাব যাই হোক না কেনো, সহবাসক্ষম হওয়া, ভরনপোষণের সামর্থ্য, হক বিনষ্ট হওয়ার অনাশংকা— এগুলো শর্তও প্রতিপালিত হতে হবে। এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি শর্ত পরিপূরিত না হলে বিবাহ হয়ে যাবে মাকরূহ্ অথবা হারাম।

বিবাহ ছিলো রসুল স. এর সার্বক্ষণিক আমল। আর বাচনিক সুন্নত প্রমাণার্থে এই হাদিসটি যথেষ্ট যে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, হে যুবকবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করতে সক্ষম তারা বিবাহবদ্ধ হও। আর যার আর্থিক সঙ্গতি নেই সে যেনো রোজা রাখে। রোজাই তার কামনা বিনাশক প্রতিষেধক। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

জননী আয়েশা থেকে ইবনে মাজা লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার এ সুন্নত পালন করবে না, সে আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। অন্যান্য উম্মতের তুলনায় তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি গর্ব করবো । সুতরাং যে সক্ষম সে বিবাহ করবে, আর যে সক্ষম নয় সে রাখবে রোজা। এই হাদিসের সূত্রপরম্পরাভূত ঈসা ইবনে মায়মুন অবশ্য বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি রোজা রাখি, রোজা ভঙ্গও করি, আর বিবাহ করি রমণীকে। এগুলোই আমার রীতি। সুতরাং যে আমার রীতির অনুগত নয়, সে আমার নয়।

আইয়ুব সূত্রে তিরমিজি লিখেছেন, আল্লাহ্‌র বাণীবহনকারীগণের প্রতিপালিত বিশেষ রীতি চারটি— ১. ব্রীড়া ২. সুবাস ৩. মেসওয়াক ৪. বিবাহ্। ইবনে মাজা লিখেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্রাবস্থায় আল্লাহ্‌র মিলন লাভ করতে চায় তার উচিত বিবাহবদ্ধ হওয়া।

বিবাহ সম্পর্কীয় বর্ণিত আলোচনার মধ্যেই রয়েছে হানাফীগণের অভিমত। ইমাম আহমদের অভিমতও এরকম। ইমাম শাফেয়ীর নিকট বিবাহ সর্বাবস্থায় মোস্তাহাবের অধিক কিছু নয়। আর মোস্তাহাবও হবে ওই সময় যখন বিবাহেচ্ছু ব্যক্তি হবে সহবাসক্ষম, ভরণপোষণে সমর্থ এবং হক নষ্ট করার আশংকামুক্ত। এই শর্তসমূহের বিদ্যমানতায় যদিও বিবাহ মোস্তাহাব, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতলিপ্ত

www.eelm.weebly.com

থাকার সংকল্প করলে বিবাহ না করাই বরং উত্তম হবে। আর বর্ণিত তিন শর্তের যে কোনো একটির অনুপস্থিতিতে বিবাহ করা হয়ে যাবে হারাম অথবা মাকরূহে তাহরিমা। হারাম কর্মে সংলিপ্ত হওয়ার দৃঢ় সম্ভাবনা দেখা দিলে অবশ্য বিবাহের এই মোস্তাহাব বিধানটি হয়ে যায় আরো অধিক শক্তিশালী। এমতাবস্থায় নফল নামাজ, নফল রোজা, নফল হজ এবং নফল জেহাদ অপেক্ষা বিবাহবন্ধ হওয়া উত্তম। ইমাম মালেকের অভিমত এরকমই।

উভয় দলের মতানৈক্যের সারমর্মঃ যে ব্যক্তির হক আদায়ে অক্ষমতার আশংকা রয়েছে, অথবা বিবাহ করার কারণে সম্ভাবনা রয়েছে হারাম কোনো কাজে লিপ্ত হওয়ার, তার জন্য বিবাহবন্ধ হওয়া হারাম অথবা মাকরূহে তাহরিমা। আর যে ব্যক্তির কামোত্তেজনা প্রবল এবং আশংকা হয় যে বিবাহ না করলে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যাবে এবং যার বৈবাহিক হক আদায় করার ক্ষমতাও বিদ্যমান, ইমাম আবু হানিফার মতে তার জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব। আর ইমাম শাফেয়ীর মতে গুরুত্বপূর্ণ মোস্তাহাব।

আমি বলি, ব্যভিচার হারাম, আর হারামের বিপরীত হচ্ছে ওয়াজিব। অধিকন্তু মধ্যবর্তী অবস্থায় যদি কামোত্তেজনা না হয়, ব্যভিচারলিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকে এবং বিবাহিত জীবনের অধিকার খর্ব হওয়ার আশংকাও না থাকে, তবে এমন ব্যক্তির জন্য বিবাহ যদিও মোস্তাহাব, তবুও ইবাদত বন্দেগী নির্বিঘ্ন রাখার জন্য তার বিবাহ না করাই উত্তম, অথবা উত্তম বিবাহ করা। ইমাম আবু হানিফা বলেন, ইবাদত নির্বিঘ্ন রাখার জন্য বিবাহ করাই উত্তম। আর ইমাম শাফেয়ীর মতে উত্তম, বিবাহ না করা। তিনি তাঁর অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেন নবী ইয়াহ্ইয়ার দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্পাক তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন নারীসংস্পর্শ থেকে, যদিও তাঁর ছিলো নারীসম্ভোগের ক্ষমতা। আল্লাহ্পাক তাঁর প্রশংসা করেছেন এভাবে— 'সায়্যিদাঁও ওয়া হাসুরা' (ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ও নারী সঙ্গবিবর্জিত)। ইবনে হুম্মাম বলেন, তাঁর শরিয়তে বিবাহ না করাই ছিলো প্রশংসিত। আর আমাদের শরিয়তে বিবাহবন্ধ হওয়াই প্রশংসনীয়। তাই দেখা যায়, তিনি কোনো রমণীকে বিবাহ করেননি, কিন্তু আমাদের রসুল স. বিবাহ করেছিলেন কয়েকজনকে। সুতরাং বুঝতে হবে, আমাদের জন্য আমাদের রসুলের আদর্শই গ্রহণীয়। বিবাহ বর্জন যদি উত্তম হতো, তবে নিশ্চয় আমাদের রসুল সমগ্রজীবন বিবাহিত অবস্থায় অতিবাহিত করতেন না।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, কতিপয় সাহাবী উম্মত-জননীকে রসুল স. এর দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, তিনি স. শয়ন করতেন এবং ইবাদতও করতেন। তাঁরা আরো বলেছিলেন যে, তোমাদের

www.eelm.weebly.com

মধ্যে এমন কে আছে, যে তাঁর মতো হতে পারে? আর এক ঘটনায় এসেছে— একবার জনৈক সাহাবী বললেন, আমি স্ত্রীসঙ্গম বর্জন করবো। আর এক জন বললেন, আমি গোশত ভক্ষণ করবো না। এ রকম আরো একজন বললেন, আমি কখনো শয্যাগ্রহণ করবো না। তাঁদের এমতো আলোচনার সংবাদ পৌঁছলো রসুল স. এর কানে। তিনি স. তখন লোকজনকে একত্র করে একটি ভাষণ দিলেন। আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি বর্ণনার পর বললেন, আমি শুনতে পেলাম, কিছুসংখ্যক লোক এরকম এরকম বলাবলি করছে। কিন্তু আমিতো নামাজ পড়ি, আবার শয্যাগ্রহণও করি। রোজা রাখি, আবার রোজা পরিত্যাগও করি। আবার আমি বিবাহও তো করি। এগুলো আমার আদর্শ। সুতরাং যে এগুলোকে পরিত্যাগ করবে সে আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তোমরা বিবাহ করো। কারণ সর্বোত্তম ও মহাসম্মানিত রসুল বিবাহ করেছেন। তাঁর সহধর্মিণীও ছিলেন অনেক। আর অধিক স্ত্রী রাখা সত্ত্বেও তাঁর কোনো সম্মানহানি হয়নি। এছাড়া ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. অবিবাহিত থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

আমার মতে প্রকৃত কথা এই যে, যে ব্যক্তি বিবাহ করা ও পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সত্ত্বেও নিজের ইবাদত ও জিকির আজকারকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে পারে, তার জন্য বিবাহ করাই উত্তম। রসুল স., অধিকাংশ নবী, সাহাবী ও পুণ্যবান আলেম এই আদর্শের উপরেই জীবনযাপন করেছেন। শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তাঁদের সাধনা ছিলো নিরবচ্ছিন্ন ও সফল। সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তাঁরা। জ্ঞান-গবেষণার দিক থেকেও তাঁরা ছিলেন অগ্রণী। কিন্তু যারা সাংসারিক জীবনে এমতো দৃঢ়তা অবলম্বন করতে পারবে না বলে আশংকা করে, সাংসারিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা যাদের রয়েছে, তাদের জন্য বিবাহবন্ধ না হওয়াই উত্তম। তবে এই উত্তমতা গ্রাহ্য হবে তখন, যখন তাদের ব্যভিচারলিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকবে না। আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখা, জিকির-জেহাদে জীবনাতিপাত করা— এ সকল কিছুই হচ্ছে আল্লাহ্পাক প্রদত্ত শিক্ষা। যেমন তিনি এরশাদ করেন— ১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদেরকে তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেনো আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন না করে দেয়। যারা এরকম করবে তারা নিপতিত হবে ক্ষতির মধ্যে। ২. হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রসন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের স্বজনগণ এবং তোমাদের সম্পদ, যা

www.eelm.weebly.com

তোমরা অর্জন করেছো এবং তোমাদের ব্যবসায়, যা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা তোমাদের হয় এবং তোমাদের পছন্দনীয় স্থান, যা তোমাদের আবাসস্থল— এ সকল কিছু যদি আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল ও আল্লাহ্র পথে জেহাদ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষায় থাকো, আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশসহ আগমন করবেন। ৩. হে বিশ্বাসীবৃন্দ! তোমাদের কিছু স্ত্রী ও সন্তানেরা তোমাদের শত্রু; তাদের কাছ থেকে সতর্ক থাকবে।

একথা সুপ্রমাণিত যে, নফল ইবাদত একটি প্রকাশ্য ইবাদত। আর বিবাহ মৌলিকভাবে একটি জায়েয কাজ, ইবাদত নয়। তাই বিবাহকে ইবাদত বলা যায় না। যদি ইবাদতই হতো, তবে বিবাহ করার জন্য মুসলমান হওয়া হতো একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কারণ মুসলমান হওয়া ছাড়া ইবাদতের যোগ্যতাই অর্জিত হয় না। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যার হিজরত পার্থিব অর্জন অথবা কোনো নারীকে বিবাহ করার জন্য হয়, তার হিজরত ওইগুলোর জন্যই (আল্লাহ্র জন্য নয়)। এই হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহ ইবাদতরূপে গণ্য নয়। যদি সেরকম কিছু হতো, তবে রসুল স. বিবাহের জন্য দেশত্যাগকে আল্লাহ্র জন্য হিজরত বলে সাব্যস্ত করতেন।

রসুল স. একথাও বলেছেন যে, পৃথিবীর সামগ্রীর মধ্যে নারী ও সুগন্ধকে আমার প্রিয় করে দেয়া হয়েছে। আর নামাজ আমার চোখের প্রশান্তি। নাসাঈ, তিবরানী। হাদিসটি উত্তম সূত্রবিশিষ্ট। এই হাদিসের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নারীকে বিবাহ করা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের মতো একটি জাগতিক অনুমোদিত কর্ম। প্রকৃত কথা হচ্ছে, বিবাহের দ্বারা যে উপকার লাভ হয় এবং দৈহিক ও আত্মিক শুদ্ধি যেহেতু এর সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই বিবাহকে বড় জোর মোস্তাহাব বলা যাবে। নতুবা মৌলিকভাবে বিবাহ অনুমোদিত (মোবাহ) কাজ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশালী কিছু নয়।

রসুল স. বিবাহবন্ধ হওয়া ও সুরভি ব্যবহারকে নবীগণের সুন্নত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু এর উদ্দেশ্য এরকম নয় যে, এমতো কর্ম হেদায়েতের অন্তর্ভুক্ত। বরং এ হচ্ছে সুন্নতে যায়েদা বা অতিরিক্ত সুন্নত। সুনানে হুদা বা হেদায়েত তো বলে ওই সকল কর্মকে, যা রসুল স. সর্বদা ইবাদত হিসেবে প্রতিপালন করতেন।

একটি সন্দেহঃ বিবাহ আমার সুন্নত। যে এই সুন্নত পরিত্যাগ করবে সে আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়— এই হাদিস প্রমাণ করে যে, বিবাহ সুন্নতে হুদা।

www.eelm.weebly.com

সন্দেহের নিরসনঃ না, এ হাদিস দ্বারা একথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না। বিষয়টি আসলে এরকম— যে কাজ রসুল স. স্বয়ং করেছেন এবং পছন্দ করেছেন, সে কাজ থেকে দূরে থাকা এবং তাকে মন্দ মনে করা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু মন্দ মনে না করে তা পরিহার কখনোই শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। হাদিসে 'ইরাজ' দ্বারা উদ্দেশ্য অস্বীকৃতি। অর্থাৎ বীতশ্রদ্ধ হওয়া, মন্দ মনে করে পরিহার করা। কিন্তু সুন্নতে হুদা পরিত্যাগ করাই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই বুঝতে হবে বিবাহ সুন্নতে হুদা নয়।

একটি দ্বন্দ্ব ঃ হাদিস শরীফে এসেছে, দুনিয়ার তিনটি বিষয় আমার প্রিয়— খুশবু, আওরত ও নামাজ। আর নামাজ আমার নয়ন-শান্তি। এই হাদিস দ্বারা নামাজও তো পার্থিব বিষয় বলে প্রতীয়মান হয়।

দ্বন্দ্বায়নের উত্তর ঃ হাফেজ ইবনে হাজার এই হাদিসকে যথাসূত্রপরম্পরাগত বলে মেনে নেননি। বলেছেন, যথাসূত্রে আমাদের নিকট তিনটির কথা পৌঁছেনি। বরং সুপরিণত সূত্রে হজরত আমর ইবনে আস থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দুনিয়ার প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহের মধ্যে পুণ্যবতী নারী হচ্ছে সর্বোত্তম। এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ জাগতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, কোরআন ও হাদিসে বিবাহের যে সকল নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেগুলো আনুমোদনমূলক অথবা মোস্তাহাব সম্বন্ধীয়, আদেশসূচক নয়।

রইলো উকাফ সম্পর্কিত হাদিস। স্ত্রী ও ক্রীতদাসী কোনোটাই ছিলো না বলে তিনি স. তাকে শয়তানের সহোদর বলেছিলেন। রসুল স. এর এমতো মন্তব্য সম্পৃক্ত ছিলো একটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গে। হয়তো তাঁর মধ্যে কামোত্তেজনাবশতঃ ব্যভিচারলিপ্ত হওয়ার আশংকা বিদ্যমান ছিলো। তাই তিনি স. তাঁকে ওরকম করে বলেছিলেন। তাই বুঝতে হবে তাঁর মতো অবস্থা যদি কারো হয়, তবে বিবাহ করা অবশ্যই অত্যন্ত জরুরী বলে বিবেচিত হবে।

বিবাহ যদিও মোবাহ্, ইবাদত নয়, তবুও তা উত্তম উদ্দেশ্যসম্বলিত হলে পরিণত হয় ইবাদতে। যেমন বিবাহের উদ্দেশ্যের সঙ্গে যদি দৃষ্টি সংযত রাখা এবং মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্য সম্মিলিত হয় তবে তা হবে ইবাদত। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এরকম হওয়া সম্ভব। যেমন পানাহার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য মোবাহ্ কাজও যদি উত্তম উদ্দেশ্যসম্বলিত হয়, অর্থাৎ ইবাদতের শক্তি অর্জন, হালাল রিজিক অনুসন্ধান ইত্যাদি উদ্দেশ্য হলে পানাহার, ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য মোবাহ্ কাজও হয়ে যায় সওয়াব অর্জনের মাধ্যম।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ফরজ দায়িত্ব পালনের পর হালাল উপার্জন অন্বেষণও ফরজ। তিবরানী ও বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে। হজরত আনাস ইবনে মালেক থেকে তিবরানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— হালাল জীবিকা অনুসন্ধান সকল মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। প্রজন্মপরম্পরা প্রবহমান রাখা যেমন ফরজে কেফায়া, তেমনি জীবনধারণ পরিমাণ পানাহার ফরজে আইন। কৃষিকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য হালাল পেশা অবলম্বনও ফরজে কেফায়া। সকল মুসলমান যদি উপার্জনবিমুখ হয়ে পড়ে তবে ধর্মকর্ম সবকিছু হয়ে পড়বে বিপর্যস্ত। তখন সকলেই হয়ে যাবে গোনাহগার। রসুল স. বলেছেন, সৎ ব্যবসায়ীরা মহাবিচারদিবসে থাকবে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এবং বলেছেন, হাদিসটি উত্তম সূত্রসম্বলিত। আর ইবনে মাজা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে। বাগবী তাঁর 'শরহে সুন্নাহ্'র হজরত আনাস থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। এতদসত্ত্বেও মনে রাখতে হবে, পার্থিব প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমগুলো উত্তম নিয়তের কারণে ইবাদতরূপে পরিগণিত হলেও কিন্তু সত্তাগতভাবে এগুলো ইবাদত নয়। কিন্তু সকল কিছুর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে কেবল আল্লাহ্র স্মরণে ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকা সত্তাগতভাবেই ইবাদত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার এমন নৈকট্যে পৌঁছায় যে, আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। বোখারী। এই হাদিসে এমন কথা বলা হয়নি যে, আমার বান্দা পানাহার বা বিবাহশাদীর মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করে। রসুল স. এরকমও বলেছেন যে, আমার উপরে এইমর্মে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়নি যে, সম্পদ পুঞ্জীভূত করি, ব্যবসায়ী হই, বরং প্রত্যাদেশিত হয়েছি আমি আল্লাহ্র স্তব-স্তুতি বর্ণনা ও সেজদাবনত হওয়ার জন্য। বাগবী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুরা হুজুরার তাফসীর ব্যপদেশে।

নবী ইয়াহ্ইয়ার অবিবাহিত জীবনযাপন সম্পর্কে একথাও বলা যায় যে, তাঁর শরিয়তে এরকম করাই ছিলো উত্তম। আর আমাদের শরিয়তে যেহেতু বৈরাগ্য অনভিপ্রেত, তাই আমাদের জন্য বিবাহ উত্তমতর। আর রসুল স. যে চারটি বিষয়কে নবীগণের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করেছেন, তার মধ্যে বিবাহ একটি। সর্ব হজরত আদম, নুহ, ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, মুসা, হারুন, আইয়ুব, দাউদ, সুলায়মান, জাকারিয়া সকলেই বিবাহ করেছিলেন। আর তাঁরা

www.eelm.weebly.com

সকলেই ছিলেন নবী ইয়াহ্ইয়া অপেক্ষা উত্তম। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, নবী ইয়াহ্ইয়া সম্ভবতঃ বিবাহ করাকে নিজের জন্য সমীচীন মনে করেননি। হয়তো তাঁর এমতো আশংকা ছিলো যে, এতে করে বিঘ্নিত হবে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ। আবার একথা বলাও ঠিক হবে না যে, হজরত ঈসা এবং হজরত ইয়াহ্ইয়ার শরিয়তে বৈরাগ্য ছিলো উত্তম এবং ইসলামী শরিয়তে তা তিরোহিত করা হয়েছে। প্রকৃত কথা এই যে, খৃষ্টানেরা যে বৈরাগ্যকে উত্তম বলে জেনেছে, তা বেদাত। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন 'ওয়া রহবানিয়া তাব্দাউ'...... (আর বৈরাগ্য তাদের নব আবিষ্কার)। আর হাদিস শরীফে যে বৈরাগ্য পরিত্যাগের নির্দেশনা এসেছে, সে বৈরাগ্য হচ্ছে খৃষ্টীয় বৈরাগ্য। কিন্তু আল্লাহ্র স্মরণে-ধ্যানে নির্জনতা অবলম্বন, সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কছিন্ন করে আল্লাহ্র উপাসনামগ্ন হওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়নি।

রসুল স. বলেছেন, মুসলমানদের জন্য উত্তম সম্পদ ওই ছাগল যা সে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় এবং তার ধর্মাচরণকে রক্ষা করে ফেৎনা থেকে। সুতরাং বৈরাগ্য অর্থ ওই সকল জায়েয কাজ, যেগুলো পরিত্যাগ করার মধ্যে কোনো সওয়াব নেই। যেমন অবিবাহিত থাকা, শয্যাগ্রহণ না করা, গোশত ভক্ষণ পরিত্যাগ করা ইত্যাদি, যেমন করে থাকে খৃষ্টান পুরোহিতেরা। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন 'কুল মান হাররামা যীনাতাল্লাহিল লাতি আখ্রজা লিইবাদিহী ওয়াত্তুয়্যিবাতি মিররিয্ক্বি' (আপনি বলুন, কে নিষিদ্ধ করেছে ওই শোভন বস্ত্র যা আল্লাহ্ উদ্ভাবন করে দিয়েছেন তার বান্দাদের জন্য, আর পবিত্র উপজীবিকা। সুতরাং বুঝতে হবে শরিয়তে এরকম স্বকপোলকল্পিত বৈরাগ্য নিষিদ্ধ। সাহাবীগণের প্রশংসায় হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে— তারা রাতে রাহেব (সংসারবিরাগী) দিনে বাহাদুর (বীর)।

জ্ঞাতব্যঃ ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের অনুকূলে বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে বিধবাদের পৃষ্ঠপোষকদের প্রতিও তাদের অধীনস্থ বিধবাদেরকে বিবাহ দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মালিককেও দেয়া হয়েছে তার ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে বিবাহ দেয়ার অধিকার। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, এ সকল ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বুঝতে হবে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে স্বাধীনা, জ্ঞানসম্পন্না ও প্রাপ্তবয়স্কা মুসলিম রমণীর বিবাহ সিদ্ধ নয়। সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে আমি আলেমগণের মতপ্রভেদসমূহে এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি। সুতরাং বাগবীর বক্ষমান ব্যাখ্যা ভুল। কেননা এখানে 'আয়ামা' অর্থ কেবল বিধবা নয়। 'আইয়িম' বলে পত্নী বিবর্জিত

www.eelm.weebly.com

ও পতিবিবর্জিতাদেরকে, অবিবাহিত-অবিবাহিতা,তালাকের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছিন্ন-বিচ্ছিন্না, মৃত্যুর কারণে বিপত্নীক ও বিধবা— যে কোনো অবস্থায় হোকনা কেনো। শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে প্রাপ্তবয়স্ক-প্রাপ্তবয়স্কা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলের ক্ষেত্রে। অতএব 'আয়াম' দ্বারা এখানে শুধু নারী অথবা শুধু বিধবা অর্থ গ্রহণ করার বিষয়টি নির্ভুল নয়।

এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'বিবাহ সম্পাদন করো' কথাটির অর্থ হবে 'বিবাহে বাধা দিয়ো না'। এভাবে এখানে যেনো এইমর্মে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী যদি তার মালিককে এবং স্বাধীনা রমণী তাদের অভিভাবককে যদি বিবাহ সম্পন্ন করার আবেদন জানায়, তবে মালিক ও অভিভাবকের উপরে তাদের বিবাহ নিষ্পন্ন করা হবে ওয়াজিব। আর এমতো অর্থ ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের অনুকূলও।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য কেবল এই নির্দেশনাটি দেয়া যে, অভিভাবক বা সহায়তাকারী তাদের অধীনাদের বিবাহে অন্তরায় সৃষ্টি করবে না। এমতো উদ্দেশ্য অন্য আয়াতে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে— 'ওয়ালা তা'দুলু হুন্‌না আঁইয়্যানকিহ্‌না আযওয়াজাহুন্‌না ইজা তারাদ্বাউ বাইনাহুম বিল মা'রূফ'(আর তোমরা বাধা দিয়োনা তাদেরকে বিয়ে করতে তাদের স্বামী। যখন তারা উভয়ে সম্মত হবে সঙ্গতভাবে)।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমাদের নিকটে যদি এমন লোক বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করে, যার ধর্মপরায়নতা ও চরিত্রমাহাত্ম্য তোমাদের প্রিয়, তবে তার সঙ্গে তোমরা তোমাদের বোন, কন্যা অথবা প্রিয়জনদের বিবাহ দিয়ে দিয়ো। এরকম না করলে পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি।

হজরত ইবনে খাত্তাব ও হজরত আনাস ইবনে মালেক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তওরাত কিতাবে লিখিত রয়েছে, বারো বৎসর বয়সে পদার্পন করার পর কোনো কন্যাকে যদি তার অভিভাবক বিবাহ না দেয়, আর সে কন্যা যদি কোনো পাপকর্ম করে ফেলে, তবে সে অভিভাবক হয়ে যাবে গোনাহ্‌গার।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী ও হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার ভালো নাম রেখো, গড়ে তুলো চরিত্রবানরূপে, আর বিবাহ দিয়ো যুবক হলে। যুবক হওয়ার পর অবিবাহিত অবস্থায় যদি সে গর্হিতকর্ম করে বসে, তবে তার পাপ পতিত হবে পিতার উপর।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— তোমরা অভাব-অনটনকে কখনো বিবাহের অন্তরায়রূপে গণ্য কোরো না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, তাই তিনি ভালো করেই জানেন, কে অভাবগ্রস্ত, কে নয়। সুতরাং অভাবগ্রস্তদেরকে আল্লাহ্ই তাঁর আপন অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করে দিবেন। অভাব মোচনের ক্ষমতা ও অধিকার রয়েছে তো কেবল তাঁর। কারণ প্রকৃত অর্থে তিনিই একমাত্র প্রাচুর্যাধিকারী। উল্লেখ্য, আল্লাহ্তায়ালাই সকলের এবং সকলকিছুর রিজিকের একমাত্র জিম্মাদার। আর রিজিক তো একটি অনিশ্চিত ও প্রবহমান প্রক্রিয়া। সুতরাং সর্বাবস্থায় নির্ভর করতে হবে কেবল রিজিকদাতার উপর, রিজিকের উপরে নয়।

কেউ কেউ বলেছেন, 'এখানে অভাবমুক্ত করবেন' কথাটির অর্থ হবে— দান করবেন অল্পে তুষ্ট হওয়ার মন-মানসিকতা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ— দান করবেন স্বচ্ছলতা, রিজিক তখন হয়ে যাবে দ্বিগুণ, স্বামী ও স্ত্রীর। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই অধিক যুক্তিসঙ্গত। আলোচ্য আয়াতে বিবাহকারীর জন্য আল্লাহ্পাক এই প্রতিশ্রুতির ঘোষণা দিয়েছেন যে, বিয়ে করার পর তিনি তিরোহিত করবেন তাদের অভাব-অনটন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, ওই ব্যক্তির আচরণ বিস্ময়কর, যে বিবাহ না করেই প্রাচুর্যের প্রত্যাশী হয়। অথচ আল্লাহ্তায়ালা জানিয়েছেন 'তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন'। 'ইঁইয়াকুনূ ফুক্বারাআ ইউগ্‌নি-হুমুল্লাহু মিন ফাদ্বলিহি'।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক বলেছেন, বিবাহ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতিপালন করো। আল্লাহ্ তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পূরণ করবেন। আর তিনি অবশ্যই প্রতিশ্রুতি পূরণকর্তা। তিনি এরশাদ করেছেন তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। কাতাদার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, আমি ওই লোকের কথা ভেবে আশ্চর্য হই, যে বিবাহ না করেই স্বচ্ছলতাপ্রত্যাশী হয়। অথচ বিবাহের মাধ্যমে স্বচ্ছলতা অন্বেষণের নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্। সুতরাং স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করো দাম্পত্য জীবনে পদার্পনের পর। এরপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

বায্যার, খতিব ও দারাকুতনী জননী আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা নারীদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হও। তারাই সম্পদ নিয়ে আসবে (তাদের মাধ্যমেই বিবাহের পর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি উন্মুক্ত করে দিবেন ঐশ্বর্যের দুয়ার)। পরিণত সূত্রে আবু দাউদ হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'মারাসিল' পুস্তকে।

www.eelm.weebly.com

সা'লাবী, এবং 'মসনাদুল ফিরদাউস' রচয়িতা দায়লামীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তোমরা বিবাহের মাধ্যমে রিজিক অন্বেষণ করো।

আমি বলি, — সম্ভবতঃ এ প্রতিশ্রুতি ওই সকল লোকের জন্য যারা শালীনতা রক্ষার্থে বিয়ে করে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হয় পরিশুদ্ধতা অর্জন। রিজিকের জন্য তারা নির্ভরশীল হয় একমাত্র আল্লাহ্র উপর।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৩৩

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهٖ ۚ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ
عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْۤ اٰتٰىكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوْا
فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

❐ যাহাদিগের বিবাহের সামর্থ্য নাই, আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তাহারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদিগের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের মধ্যে কেহ তাহার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করিতে চাহিলে, তাহাদিগের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা জান উহাদিগের মুক্তিদানে কল্যাণ আছে। আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে-সম্পদ দিয়াছেন তাহা হইতে তোমরা উহাদিগকে দান করিবে। তোমাদিগের দাসীগণ সততা রক্ষা করিতে চাহিলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাহাদিগকে ব্যভিচারিণী হইতে বাধ্য করিও না; তবে কেহ্ যদি তাহাদিগকে বাধ্য করে, সেক্ষেত্রে তাহাদিগের উপর জবরদস্তির পর, আল্লাহ্ তো তাহাদিগের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেনো সংযম অবলম্বন করে'। একথার অর্থ— যাদের মোহরানা পরিশোধ, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, বিবাহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ ইত্যাদির ব্যয়ভার নির্বাহের ক্ষমতা নেই, তারা যেনো রোজা প্রতিপালনের মাধ্যমে কামভাব অবদমনের চেষ্টা করে, জীবনযাপন করে

www.eelm.weebly.com

সংযমের সঙ্গে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর আপন অনুগ্রহে আর্থিক সচ্ছলতা দান করেন। উল্লেখ্য, স্বল্পাহার ও রোজা কামোত্তেজনানাশক। রসুল স. বলেছেন, যারা বিত্তহীন, তারা যেনো কামতাড়না দমনার্থে রোজা রাখে। রোজা কামতাড়নানাশক।

'ইউগ্নি হুমুল্লহু মিন ফাদ্বলিহী' অর্থ যতক্ষণ আল্লাহ্ তাঁর স্ব-অনুগ্রহে দান করেন বিত্তপ্রাচুর্য। এখানে 'ফদ্বল' অর্থ প্রাচুর্য। আর 'ইউগ্নিহুম' অর্থ— উপজীবিকার প্রাচুর্য।

ইবনে সাকান তাঁর 'মারেফাতুস্ সাহাবা' গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবীহ্ এর পিতার উক্তিরূপে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেন, আমি ছিলাম হুয়াইতিব ইবনে আবদুল উজ্জার ক্রীতদাস। একদিন আমি তাঁকে বললাম, আমাকে মুকাতাব (অর্থ প্রদানের মাধ্যমে মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ) বানিয়ে দিন। তিনি আমার আবেদন অগ্রাহ্য করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশ।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত হুয়াইতিব একশত দিনার পরিশোধের শর্তে তাঁর ক্রীতদাসকে মুকাতিব বানিয়ে দেন। আর ব্যবসা করার জন্য তাকে দান করেন বিশ দিনার। ওই ক্রীতদাস ওই অর্থ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে একশত দিনার পরিশোধ করে দিয়ে মুক্ত হয়ে যান। মুক্তিলাভের পর তিনি শহীদ হন হুনায়েনের যুদ্ধে।

শুরুতে বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে তার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা জানো এদের মুক্তিদানে কল্যাণ আছে'। এখানে 'চুক্তিতে আবদ্ধ হও' নির্দেশটি অবশ্যপালনীয় অর্থাৎ ওয়াজিব নয়। বরং এই নির্দেশটি অনুমোদনমূলক। অর্থাৎ এরকম করা যেতে পারে। কিন্তু এরকম করতেই হবে— এমন নয়। হেদায়া প্রণেতাও এরকম লিখেছেন এবং এটাকেই সঠিক বলেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, আমাদের কোনো কোনো সম্মানিত পূর্বসূরী 'চুক্তিতে আবদ্ধ হও' কথাটির অর্থ করেছেন— এরকম করা জায়েয। কিন্তু তাঁদের ধারণা সঠিক নয়। সঠিক অর্থ হচ্ছে— এরকম করা মোস্তাহাব। কেননা জায়েয বললে ক্রীতদাসের যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রসঙ্গটি হয়ে যায় নিরর্থক।

এখানে মোবাহ্ বা বৈধতার শর্তের বর্ণনা এসেছে অভ্যাসগতভাবে। নিয়ম হলো মালিক তার ক্রীতদাসকে ওই সময় মুকাতাব বানাবে যখন তার মধ্যে পাওয়া যাবে মুকাতাব হওয়ার যোগ্যতা। এটাকেই আয়াতে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'লিখিত চুক্তি করতে চাইলে'।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো প্রাচীনপন্থি আলেম বলেছেন, এখানে 'কাতিবু' (চুক্তিতে আবদ্ধ হও) নির্দেশটি ওয়াজিব। আতা এবং ওমর ইবনে দীনারের অভিমতও এরকম। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমতও এরকম। কিন্তু এ ওয়াজিবের একটি শর্তও রয়েছে। শর্তটি হচ্ছে, ক্রীতদাস বাজারদর অনুসারে চুক্তিবদ্ধ হবে। অথবা পরিশোধ করতে চাইবে বাজারদর অপেক্ষা অধিক। বাগবী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, ইবনে সিরীন তাঁর প্রভু হজরত আনাস ইবনে মালেকের নিকট নিবেদন করলেন, আমাকে মুকাতাব বানিয়ে দিন। হজরত আনাস তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বললেন না। তখন ইবনে সিরীন অভিযোগ পেশ করলেন হজরত ওমরের কাছে। হজরত ওমর ছড়ি হাতে হজরত আনাসের কাছে এসে বললেন, একে মুকাতাব বানিয়ে দাও। হজরত আনাস তাই করলেন।

মালিক ও ক্রীতদাস উভয় পক্ষ চুক্তিবদ্ধ হলে, তাকে বলা হয় মুকাতাব। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রে ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব ও সম্মতি) উভয়টিই প্রয়োজন। ইজাব হবে মনিবের পক্ষ থেকে এবং ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে হবে কবুল।

'মুকাতাবাত' ধরনের দাসমুক্তি সম্পদ প্রদানের শর্ত সাপেক্ষ নয়। তাই এমতোক্ষেত্রে ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে কবুল আবশ্যকীয় নয়। সুতরাং যে অপ্রাপ্তবয়স্ক ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের জ্ঞান রাখে, সে-ও চুক্তিপত্র গ্রহণ করতে সক্ষম। কিন্তু সে যদি খুবই অল্পবয়স্ক হয়, যে ক্রয়-বিক্রয়ের জ্ঞান রাখে না অথবা হয় পাগল, তবে তার কবুলের দ্বারা চুক্তি স্থিরীকৃত হবে না।

মালিক যদি তার ক্রীতদাসকে বলে 'আমি তোমাকে এই পরিমাণ সম্পদ প্রদানের শর্তে মুকাতাব বানিয়ে দিলাম' এবং ক্রীতদাস যদি বলে 'আমি স্বীকার করলাম', তবে ইমাম আবু হানিফার মতে চুক্তি পূর্ণ হয়ে যাবে। মালিকের তখন আর একথা বলার প্রয়োজন নেই যে, 'যদি তুমি এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করো, তবে তুমি মুক্ত'। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদও এরকম বলেন। ইমাম শাফেয়ী বলেন, কেবল বর্ণিত কথাগুলোর দ্বারা মুকাতাবের চুক্তি পূর্ণ হবে না। বরং তাকে বলতে হবে 'আমি তোমাকে কিসতি অনুসারে এতো টাকা প্রদানের শর্তে মুকাতাব করলাম, তুমি যদি এই অর্থ এই নিয়মে পরিশোধ করো, তবে তুমি মুক্ত'। একথাগুলো মুখে না বলে মনে মনে নিয়ত করলেও চলবে। এরকম বলা হয়েছে 'মিনহাজ' পুস্তকে।

মাসআলা : নির্ধারিত বিনিময় যদি তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধের শর্ত করা হয়, তবুও তা হবে সঠিক। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, কিসতি হওয়া দরকার কমপক্ষে দু'টি। আর কিসতি নির্ধারণও হতে হবে আদায়ের একটি শর্ত। তাৎক্ষণিক আদায়ের কোনো অর্থ নেই। কারণ ক্রীতদাস তাৎক্ষণিকভাবে অর্থই বা পাবে কোথায়?

www.eelm.weebly.com

ইমাম আবু হানিফা বলেন, মুকাতিবের চুক্তিই বিনিময় চুক্তি, যেমন চুক্তি করা হয় বিক্রয়ের। আর মুকাতিবের বিনিময় হবে মূল্যসদৃশ। মূল্যের মৌখিক স্বীকৃতি ক্রয়ের শুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট। ক্রেতার মূল্য আদায়ে সক্ষম হওয়া চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য আবশ্যক নয়। একজন অভাবগ্রস্ত লোকও হাজার টাকা সম্পদ ক্রয়ের চুক্তি করতে পারে। এরকম হওয়াও সম্ভব যে, লিখিত চুক্তির সময় ওই ক্রীতদাসকে কেউ জাকাতের সম্পদ প্রদান করতে পারে, অথবা দিতে পারে অন্য কোনোরকম আর্থিক সহায়তা। এমতাবস্থায় ক্রীতদাস তাৎক্ষণিকভাবে দিতে পারে তার পরিশোধ্য অর্থ। আর একটি কথা এই যে, লিখিত চুক্তি মোতাবেক ক্রীতদাস যদি নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করতে অসমর্থ হয়, তবে মালিক তাকে রেখে দিতে পারবে পূর্বাবস্থায়।

মাসআলা ঃ মুকাতাবের চুক্তি হওয়ার পর ক্রীতদাসের উপর মালিকের কোনো আধিপত্য থাকে না। এমতাবস্থায় ক্রীতদাস ফিরে পাবে সর্বপ্রকার ক্রয়-বিক্রয়, মেহেনত-মজদুরী ও সফরের অধিকার। অবশ্য তাকে স্বীকার করতে হবে মালিকের অধীনস্থতা। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, এমতাবস্থায় সে সম্পূর্ণরূপে মালিকের অধিকারমুক্ত হতে পারবে না যতক্ষণ না কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করবে নির্ধারিত অর্থ।

মাসআলা ঃ লিখিত চুক্তি মালিকের জন্য একান্ত আবশ্যক। মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে দাসের ইচ্ছাকে বাতিল করতে পারবে না। চুক্তি লিপিবদ্ধ করার পর অবশ্য দাসের মুক্ত হওয়ার অধিকার অর্জিত হয়। মুক্ত হওয়ার পর যেমন মালিক দাসের মুক্তি বাতিল করতে পারে না, তেমনি বাতিল করতে পারে না তার মুক্ত হওয়ার অধিকারকে। তবে দাস যদি উপার্জন না করে, চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে না পারে, তবে তার উপরে বলপ্রয়োগও করা যাবে না, বরং তার মতামত নিয়েই চুক্তি বাতিল করা যাবে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ এরকমই বলেন। তবে যদি তার নিকট এরকম অর্থ থাকে যাতে করে সে চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে পারে, অথচ করে না, তবে তাকে ওই অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য করা যাবে, তবুও চুক্তি বাতিল করা যাবে না। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম মালেক বলেছেন, দাসকে রোজগার করতে বাধ্য করা যাবে, তবু চুক্তি বাতিল করা যাবে না। এমতাবস্থায় দাসেরও এমতো অধিকার নেই যে, সে নিঃস্ব হওয়ার কারণে চুক্তিকে বাতিল করবে।

মাসআলা ঃ মুকাতাব যেহেতু পুরোপুরি মুক্ত নয়, তাই লিখিত চুক্তির পরে মালিক ইচ্ছা করলে চুক্তির অর্থ না নিয়েই তাকে মুক্তি দিতে পারে। আর দাসও নিশ্চয় এতে করে সন্তুষ্ট থাকবে।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ মালিক মুকাতাবকে বিক্রয়ও করতে পারবে। এরকম করলে নতুন মালিক হবে পূর্বতন মালিকের স্থলাভিষিক্ত। এমতাবস্থায় দাসকে চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে হবে নতুন মালিককে। ইমাম আহমদ এরকম বলেন। ইমাম শাফেয়ীর প্রথম অভিমতও ছিলো এরকম। আর ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক বলেন, মুকাতাবের স্বীকৃতি না নিয়ে মালিক তাকে অন্যের নিকট বিক্রয় করতে পারবে না। মুকাতাব রাজী হলেই কেবল তার এরকম বিক্রয় শুদ্ধ হবে এবং বাতিল হয়ে যাবে লিখিত চুক্তি। ইমাম শাফেয়ীর পরবর্তী অভিমতও এরকম।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর মুকাতাব মুক্ত হওয়ার অধিকার লাভ করে। মালিক তার এ অধিকার খর্ব করতে পারে না। এমতাবস্থায় অন্য কেউ তাকে ক্রয় করলে নিঃসন্দেহে তার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, ক্রয়ের পরের কর্তৃত্ব অবশ্যই ক্রেতার, যেমন কর্তৃত্ব ছিলো ক্রয়ের পূর্বে বিক্রেতার। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হলেও কোনো অবস্থাতেই মুকাতাবের অধিকার খর্ব হতে পারে না।

ইমাম আহমদ তাঁর মতের পরিপোষকতার উপস্থাপন করেন জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, একদিন রসুল স. সকাশে বারিরাহ্ উপস্থিত হয়ে বললো, আমি মুকাতাব। চুক্তির অর্থ পরিশোধ করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন। ওই সময় পর্যন্ত সে চুক্তির কোনো কিসতিই পরিশোধ করেনি। রসুল স. আমাকে আজ্ঞা করলেন, আয়েশা! একে ক্রয় করে আজাদ করে দাও। দানের বিনিময় পাবে সে, যে তাকে মুক্ত করেছে। আহমদ।

মূল হাদিসটি বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে এভাবে— একদিন বারিরাহ্ জননী আয়েশা সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি নয় উকিয়া স্বর্ণ প্রদানের বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। প্রতি বছর পরিশোধ করতে হবে এক উকিয়া। আমাকে সাহায্য করুন। জননী বললেন, তোমার মালিক যদি রাজী হয়, তবে আমি এক সঙ্গে তোমার সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে চাই। কিন্তু দানের বিনিময় পাবো আমি। বারিরাহ্ তার মালিককে গিয়ে একথা জানালো। কিন্তু তার মালিক এ প্রস্তাবে সম্মত হলো না। বারিরাহ্ পুনরায় এসে জননী আয়েশাকে বললো, আমার মালিক আপনার প্রস্তাবে সম্মত নয়। সে বলে, দানের বিনিময় দিতে হবে তাকেই। ঘটনাটি পৌঁছে গেলো রসুল স. এর কানে। তিনি স. বললেন, কী ব্যাপার বলতো? জননী আয়েশা খুলে বললেন সব কথা। তিনি স. বললেন, তুমি বারিরাহ্কে কিনে মুক্ত করে দাও। দানের বিনিময়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন কোরো না। দানের বিনিময় তারই, যে তাকে মুক্ত করবে। হজরত বারিরাহ থেকে নাসাঈও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য, এই হাদিসে কিন্তু ইমাম আহমদের অভিমতের কোনো প্রমাণ নেই। কেননা ইমামগণের মতানৈক্য ঘটেছে তো মুকাতাবকে তার স্বীকৃতি ছাড়াই বিক্রয় করা না করার বৈধতা প্রসঙ্গে। আর ইমাম আবু হানিফার মত হচ্ছে, মুকাতাবের সম্মতি ছাড়া তাকে তার মালিক বিক্রয় করতে পারবে না। কিন্তু এখানে দেখা যায়, বারিরাহ্ নিজেই বিক্রিত হতে সম্মত। একারণেই বোখারী হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন ভিন্ন একটি অধ্যায়ে, যার শিরোনাম 'বাবে বায়উল মুকাতাবি ইজা রদ্বা'।

মাসআলা ঃ চুক্তির অর্থ পুরোপুরি পরিশোধ করার পরেই কেবল মুকাতাব সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করতে পারে। আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেন, লিখিত চুক্তির অর্থের এক দিরহাম বাকী থাকলেও মুকাতাব ক্রীতদাসই থাকবে। আবু দাউদ, হাকেম ও নাসাঈ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন পদ্ধতিতে। ভিন্নসূত্রে ইবনে মাজা ও নাসাঈ আবার আতার মাধ্যমে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— রসুল স. বলেছেন, যে গোলাম একশত উকিয়া পরিশোধের লিখিত চুক্তি করেছে, সে এক উকিয়া বাকি থাকলেও গোলামই থাকবে। নাসাঈ বলেছেন, বর্ণনাটি পরিত্যাজ্য। ইবনে হাজাম বলেছেন, আতা খোরাসানী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরের নিকট থেকে কোনো হাদিস শ্রবণ করেননি।

তিরমিজি, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, যে মালিক তার ক্রীতদাসকে একশত উকিয়া পরিশোধের বিনিময়ে মুকাতাব বানিয়েছে, তার ওই ক্রীতদাস নব্বই উকিয়া পরিশোধের পর মাত্র দশ উকিয়া বাকি রাখলেও তার ক্রীতদাসই থাকবে।

ইমাম মলেক তাঁর মুয়াত্তায় নাফেয়ের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, পরিশোধ্য অর্থের এক দিরহাম বাকী থাকা সত্ত্বেও ক্রীতদাস ক্রীতদাসই থাকবে। অপর পদ্ধতিতে ইবনে কানেয়' হজরত ইবনে ওমর সূত্রে বর্ণনাটিকে সুপরিণতরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কানেয়' বর্ণনাটির সুপরিণত হওয়াকে করেছেন ত্রুটিযুক্ত।

হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, বর্ণিত মাসআলা প্রসঙ্গে সাহাবীগণের মধ্যে মতপৃথকতা বিদ্যমান ছিলো। 'কেফায়া' গ্রন্থে রয়েছে, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেতের উক্তি এ ব্যাপারে আমাদের অভিমতের অনুকূলে। হজরত আলী বলেছেন, মুকাতাব যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবে, ওই পরিমাণ স্বাধীনতা লাভ করবে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, মুকাতাব যদি বাজারদর অনুসারে

www.eelm.weebly.com

পরিশোধ করে, তবে সে মুক্ত। যদি মালিকের পক্ষ থেকে এর অতিরিক্ত কিছু ধার্য করা থাকে, তবে অন্য ঋণদাতার মতো মালিকও হয়ে যাবে এক প্রকার ঋণদাতা। আর ওই পরিমাণ ঋণগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও মুকাতাব তখন মুক্ত হয়ে যাবে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, লিখিত চুক্তি সম্পাদিত হলেই মুকাতাব মুক্ত হয়ে যায়। তার স্বাধীনতা বিনিময়ের উপরে নির্ভরশীল নয়। তবে মালিক হয়ে যায় তাকে ঋণদাতা, যেমন অন্যান্য ঋণদাতারা হয়। অবশ্য আমরা এব্যাপারে জায়েদ ইবনে সাবেতের উক্তিকেই গ্রহণ করেছি। কারণ এর ভিত্তি সুপরিণতসূত্রসম্বলিত হাদিসের উপরে।

তিরমিজি, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা জননী উম্মে সালমা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, মুকাতাবের নিকট যদি তোমাদের কোনো বিনিময় বিদ্যমান থাকে, তবেও ওই মুকাতাবের নিকট তোমাদের পর্দা করা বাঞ্ছনীয়।

মাসআলা ঃ মুকাতাব যদি কোনো কিসতি পরিশোধ করতে সক্ষম না হয়, তবে বিচারক চিন্তা করে দেখবে সে কারো কাছে পাওনাদার কিনা, অথবা তার অর্থাগমের অন্য কোনো উপায় আছে কিনা। যদি এরকম কিছু থাকে তবে বিচারক তাকে কিসতি পরিশোধের জন্য তিনদিন সময় দিবে, এর বেশী নয়। আর এরকম কোনো উপায় যদি তার না থাকে, তবে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদের মতে বিচারক লিখিত চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, মুকাতাবের দুই কিসতি বাকি না পড়া পর্যন্ত বিচারক তাকে পরিশোধে অক্ষম সাব্যস্ত করবে না। মালিককে চুক্তি বাতিলের ফয়সালাও দিবে না। মালিকেরও এরকম অধিকার নেই যে, সে নিজে নিজে মুকাতাবকে পরিশোধে অক্ষম সাব্যস্ত করবেন। এমতোক্ষেত্রে বিচারকের সিদ্ধান্ত ও মুকাতাবের স্বীকৃতি আবশ্যক।

মাসআলা ঃ মুকাতাব যদি কারো কাছ থেকে জাকাতের সম্পদ লাভ করে এবং ওই সম্পদ তার মালিককে দেয়, কিন্তু এতে করে যদি তার চুক্তির অর্থ পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হয়, এমতাবস্থায় বিচারক যদি তাকে পরিশোধে অক্ষম সাব্যস্ত করে, তবে পরিশোধিত অর্থ মালিকের জন্য হালাল হবে, মালিক সম্পদশালী অথবা হাশেমী হলেও, যদিও হাশেমীদের জন্য কোনো অবস্থায় জাকাতগ্রহণ হালাল নয়। এমতোক্ষেত্রে মুকাতাব অবশ্যই জাকাতগ্রহীতা, কিন্তু মালিক চুক্তির অর্থ গ্রহণকারী— জাকাতগ্রহীতা নয়। কেননা এক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে মালিকানার।

www.eelm.weebly.com

বর্ণিত মাসআলার প্রমাণ রয়েছে জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে। জননী বলেন, একদিন আমাদের গৃহে গোশত পাক হচ্ছিলো। এমন সময় রসুল স. এলেন। আমি তাঁকে খেতে দিলাম রুটি ও সাধারণ তরকারী। তিনি স. বললেন, হাঁড়িতে কি গোশত নেই? গৃহবাসীরা বললেন, অবশ্যই। কিন্তু এ গোশত তো সদকার। আর এগুলো দেয়া হয়েছে বারিরাহ্‌কে। আপনি তো সদকা ভক্ষণ করেন না। তিনি স. বললেন, সদকা তো বারিরাহ্‌র জন্য, আর আমার কাছে এগুলো হাদিয়া। বোখারী, মুসলিম। এখন কথা হচ্ছে মুকাতাব যদি তার প্রাপ্ত জাকাতের সম্পদ কোনো সম্পদশালী অথবা হাশেমীকে কেবল ভক্ষণের অনুমতি দেয়, তবে তাদের জন্য সে সম্পদ ভোগ করা জায়েয হবে না। যেমন কোনো ব্যক্তি বাতিল চুক্তির ভিত্তিতে কোনো সামগ্রী ক্রয় করার পর যদি অন্য ব্যক্তিকে তা ভক্ষণের অনুমতি দেয়, তবে ওই ব্যক্তির জন্য তা হালাল হবে না। কিন্তু যদি দান করে অথবা অন্য কারো কাছে বিক্রয় করে দেয়, অর্থাৎ মালিকানা হস্তান্তর করে, তবে গ্রহীতা অথবা ক্রেতা তা ভক্ষণ করতে পারবে। কারণ এক্ষেত্রে মালিক পরিবর্তিত হয়েছে।

মাসআলা ঃ চুক্তির অর্থ পরিশোধ করার পূর্বেই যদি মুকাতাব মৃত্যুবরণ করে, তবে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থাক আর না থাক লিখিত চুক্তি আপনাআপনি বাতিল হয়ে যাবে, কারণ সে মারা গিয়েছে ক্রীতদাস অবস্থায়। এরকম বলেছেন ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ। বিষয়টি এরকম— বিক্রিত বস্তু ক্রেতার অধিকারে না পৌছানো পর্যন্ত বিক্রেতারই থাকে। এমতাবস্থায় বিক্রিত বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে বিক্রয়চুক্তিও বাতিল হয়ে যায়। বাগবী লিখেছেন, এরকম অভিমত হজরত ওমর, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত, ওমর ইবনে আবদুল আযীয ও কাতাদার। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী, আতা,তাউস, হাসান বসরী ও ইব্রাহিম নাখয়ী বলেন, যদি দেখা যায়, মুকাতাবের পরিত্যক্ত সম্পদ দ্বারা চুক্তির অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা যায়, তবে ওই অর্থ মালিককে দিয়ে তাকে স্বাধীন অবস্থায় মৃত বলে ঘোষণা করতে হবে। আর সম্পূর্ণ বিনিময় পরিশোধ করার পরেও যদি অতিরিক্ত সম্পদ থাকে, তবে তা বণ্টন করে দিতে হবে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইন্ আ'লিমতুম ফীহিম খইর' (যদি তোমরা জানো এদের মুক্তিদানে কল্যাণ আছে)। হজরত ইবনে ওমর, ইমাম মালেক ও সুফিয়ান সওরীর মতে এখানে 'খইর' (কল্যাণ) অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা। হাসান, জুহাক ও মুজাহিদ বলেন, এখানে শব্দটির অর্থ সম্পদ। যেমন অসিয়তের ব্যাপারে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন 'যদি সে সম্পদ পরিত্যাগ করে'। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত

www.eelm.weebly.com

সালমানের এক ক্রীতদাস তাঁর নিকট মুকাতাব করে দেয়ার নিবেদন করলো। তিনি বললেন, তোমার নিকট কি সম্পদ আছে? সে বললো, না। হজরত সালমান তাকে মুকাতাব করলেন না। বললেন, তুমি কি আমাকে ময়লা (সদকা) খাওয়াতে চাও?

মুজাহিদ প্রমুখের ব্যাখ্যা ভুল। কারণ ক্রীতদাসের নিকট সম্পদ থাকার কথা ভাবাই যায় না। ক্রীতদাসের যা কিছু অর্জন তাতো তার মালিকের । জুজায বলেছেন, এখানে 'খইর' অর্থ যদি সম্পদ হতো, তবে 'ফীহিম' শব্দটির স্থলে বসতো 'লাহুম'।

ইব্রাহিম ইবনে জায়েদ ও ওবায়েদ 'খইর' এর অর্থ করেছেন সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতা। আর বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস শব্দটির অর্থ করেছেন সততা ও প্রতিশ্রুতিপূরণ। ইমাম শাফেয়ী বলেন, শব্দটির সর্বোৎকৃষ্ট অর্থ হচ্ছে উপার্জন ও আমানতদারী।

হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, কথাটির অর্থ মুসলমানগণকে আঘাত দিয়ো না। যদি ক্রীতদাস কাফের হয়, আর তার দ্বারা মুসলমানদের ক্ষতির আশংকা থাকে, অথবা সে হয় কাফেরদের সহায়ক, তবে এরকম ক্রীতদাসকে মুকাতাব করা মাকরূহ্। কিন্তু তবুও তাকে মুকাতাব করা নাজায়েয নয়। এক বর্ণনায় উবায়দার উক্তিরূপে এসেছে, এই আয়াতে 'খইর' অর্থ নামাজ প্রতিষ্ঠা। কোনো কোনো আলেম বলেন, এখানে শব্দটির উদ্দেশ্য জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক। শিশু ও পাগল কখনো মুকাতাব হয় না।

আমি বলি, আল্লাহ্তায়ালা প্রথমে বলেছেন 'ওয়াললাজীনা ইয়াবতাগুণাল কিতাবা'। এরপর দিয়েছেন মুকাতাব করার নির্দেশ। জ্ঞানসম্পন্ন না হলে মুকাতাবের নিবেদন গ্রহণীয় নয়। তাই বুঝতে হবে, এখানে ওই ক্রীতদাসকে মুকাতাব বানানোর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যে মুকাতাবের প্রার্থী হওয়ার যোগ্য। অর্থাৎ সে যেনো বিকৃতমস্তিষ্ক না হয়। এখন 'খইর' অর্থ যদি জ্ঞানসম্পন্ন হয়, তবে এই শর্তটি হয়ে যাবে নিরর্থক। রইলো প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার শর্ত। এই শর্তটিও অগ্রহণীয়। যদি সে সচেতন ও বুদ্ধিমান বালক হয়, তবুও তো সে ক্রয়-বিক্রয়ের মতো চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্য মুকাতাব বানানোর নিবেদন জানাতে পারে।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, যে ক্রীতদাস অকর্মণ্য, উপার্জনের অযোগ্য, তাকেও মুকাতাব বানানো জায়েয। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের আর একটি উক্তি এই যে, যেহেতু এখানে 'খইর' উদ্দেশ্য উপার্জন, তাই বলতে হয়, যে ক্রীতদাস উপার্জনক্ষম নয়, তাকে মুকাতাব বানানো মাকরূহ্। আমি বলি, যুক্তিটি অযথার্থ। কারণ 'খইর' অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা— একথা মেনে নিলেও শর্ত অনুপস্থিত থাকা

www.eelm.weebly.com

অবস্থায় মুকাতাব কী রূপে মাকরূহ্ হতে পারে। খুব বেশী বললে বলা যেতে পারে, এমতাবস্থায় বিষয়টি ওয়াজিব অথবা মোস্তাহাব অবস্থায় থাকে না। কেননা উপার্জন ছাড়াও সে জাকাত, সদকা ইত্যাদি লাভ করতে পারে।

মাসআলা : যে ক্রীতদাসী বুদ্ধিমতি কিন্তু উপার্জনক্ষম নয়, আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে তাকে মুকাতাব বানানো মাকরূহ্। কারণ অকর্মণ্যতার কারণে একমাত্র ব্যভিচার ছাড়া তার পক্ষে চুক্তির অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। আর স্বাধীনতা লাভের আশায় তার এই ঘৃণ্য পথে পা বাড়ানোর সম্ভাবনা প্রচুর।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দান করবে'। সাধারণভাবে সকল মুসলমানকে লক্ষ্য করে দেয়া হয়েছে আলোচ্য নির্দেশনাটি। এভাবে সকলকে উৎসাহিত করা হয়েছে দাসমুক্তির মতো কল্যাণজনক কাজে। দান করতে বলা হয়েছে জাকাত, খয়রাত অথবা অন্য কোনো ওয়াজিব সদকা থেকে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এখানে দান করতে বলা হয়েছে ফরজ জাকাতের ওই অংশ, যা আল্লাহ্ তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন 'ফিররিক্বব'— (ক্রীতদাস) এই আয়াতে। অনুরূপ মন্তব্য করেছেন হাসান বসরী ও জায়েদ ইবনে আসলাম। কিন্তু এই আয়াতে শব্দটির সম্পর্ক সাধারণভাবে জাকাতের সঙ্গে বিশেষায়িত করা ঠিক নয়। কেননা দাসমুক্তির জন্য জাকাতের একটি অংশ প্রদান করা তো ফরজই। আর এখানে দান করার কথা বলা হয়েছে মোস্তাহাব হিসেবে, ওয়াজিব হিসেবে নয়। বরং মুকাতাব বানানোর নির্দেশনাটিও তো ওয়াজিব নয়, মোস্তাহাব। কোনো কোনো আলেম বলেন, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে মালিকদেরকে। অর্থাৎ মালিকদের জন্য তার ক্রীতদাসকে মুকাতাব বানানো মোস্তাহাব। আবার কোনো কোনো আলেম বলেন, মালিকদের প্রতি হুকুমটি ওয়াজিব। অর্থাৎ মালিকদেরকে চুক্তিবদ্ধ অর্থের কিছু অংশ ছেড়ে দিতেই হবে। হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত যোবায়ের প্রমুখ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের একটি দল এরকমই বলেন। ইমাম শাফেয়ীও এই অভিমতের প্রবক্তা।

কতোটুকু অংশ ছেড়ে দিতে হবে, সে সম্পর্কে রয়েছে আলেমগণের বিস্তর মতপ্রভেদ। হজরত আলী বলেন, যে বিনিময় নির্ধারণ করা হবে, ছেড়ে দিতে হবে তার এক চতুর্থাংশ। আব্দুর রাজ্জাক, সাঈদ ইবনে মনসুর, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে মারদুবিয়া এবং বায়হাকী ইবনে আব্দুর রহমান সুলাইমি সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আবার হজরত আলী সূত্রে বক্তব্যটিকে সুপরিণত সূত্রে সাব্যস্ত করেছেন রসুল স. এর নির্দেশরূপে।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ছেড়ে দিয়ো এক তৃতীয়াংশ। কেউ কেউ বলেছেন, এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। যতো খুশী ছেড়ে দিতে পারে। ইমাম শাফেয়ীও এরকম বলেন। নাফেয়ের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর তাঁর এক দাসকে পঁয়ত্রিশ হাজার দিরহামের চুক্তিতে মুকাতাব করেছেন। সে ত্রিশ হাজার দিরহাম পরিশোধ করার পর তিনি মাফ করে দিয়েছিলেন বাকি পাঁচ হাজার দিরহাম।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হজরত ইবনে ওমর যখন কোনো গোলামকে মুকাতাব বানাতেন, তখন পরিশেষে যা মাফ করার প্রয়োজন হতো, তা মাফ করে দিতেন। তবে তিনি প্রারম্ভে মাফ করতেন না, মাফ করতেন শেষের দিকে। কেননা তিনি আশংকা করতেন, মুকাতাব যদি শেষে তার কিসতি পরিশোধ করতে না পারে, তবে সে পুনরায় ক্রীতদাস হয়ে যাবে এবং মালিক হয়ে যাবে তার পরিশোধিত অর্থের, যে পরিমাণ অর্থ মাফ করে দেয়া হয়েছিলো। একারণেই তিনি মাফ করতেন শেষের দিকে।

আমি বলি, এখানে মাফ করে দেয়ার অর্থ এরকম নয় যে, গোলামকে কিছু দিয়ে দিতে হবে। বরং এর অর্থ মূল পরিশোধ্য অর্থের কিছু অংশ রহিত করে দেয়া। আর রহিতকরণের মধ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না, অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় পরিশোধিত অর্থের মধ্যে। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেন, নির্ধারিত বিনিময়ের কোনো অংশ মাফ করে দেয়া মালিকের উপরে ওয়াজিব নয়। কেননা ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির মতো মুকাতাবের লিখিত চুক্তিও বিনিময় চুক্তি। আর কোনো বিনিময়ের কোনো অংশ ক্ষমা করে দেয়া ওয়াজিব নয়। বিনিময় চুক্তিতে তো বিনিময় ওয়াজিব হয়, সুতরাং বিনিময় রহিতকরণ ওয়াজিব হতে পারে কীরূপে? মুকাতাব চুক্তিতে নির্ধারিত বিনিময় পরিশোধ করা গোলামের উপরে ওয়াজিব, এখন যদি মালিকের উপরেও ওই বিনিময়ের কিছু অংশ মাফ করে দেয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়, তবে লিখিত চুক্তি হবে ওয়াজিব বিনিময়ের কারণ এবং রহিত বিনিময়ের ওয়াজিবেরও। তাহলে এরকম মাফ করার অর্থ কী? বরং সহজ পদ্ধতি তো এটাই হতো যে, মালিক বিনিময় হিসেবে এক হাজার দিরহাম নিতে চাইলে প্রথমেই হয়তো তিন শত মাফ করে দিয়ে গ্রহণ করতো সাত শত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের দাসীগণ সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারী হতে বাধ্য কোরো না'।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল তার দাসীদের দ্বারা ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতো। তার দু'জন দাসীর নাম ছিলো মুসায়কা ও উমায়মা। তারা ব্যভিচারপ্রবণা ছিলো না বলে রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে এই মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করলো। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য বাক্যটি।

www.eelm.weebly.com

হজরত জাবের থেকে আবু যোবায়েরের পদ্ধতিতে হাকেম বর্ণনা করেন, মুসায়কা ছিলো জনৈক আনসারের দাসী। সে অভিযোগ করেছিলো, আমার মালিক আমাকে ব্যভিচারের মাধ্যমে উপার্জন করতে বাধ্য করে। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতাংশ।

বায্যার ও তিবরানী বিশুদ্ধসূত্রসহযোগে বর্ণনা করেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের এক ক্রীতদাসী মূর্খতার যুগে ব্যভিচার করতো। ইসলামে ব্যভিচার নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে সে পণ করলো, সে আর কখনো ব্যভিচার করবে না। তাকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতের উদ্ধৃত বাক্যটি। একটি শিথিলসূত্রসহযোগে বায্যারও হাদিসটিকে হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। ওই বর্ণনায় এসেছে, ওই ক্রীতদাসীর নাম ছিলো মুয়াজা। সাঈদ ইবনে মনসুরের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ছিলো মুসায়কা ও মুয়াজা নাম্নী দু'জন দাসী। সে ওই দু'জনকে দিয়ে ব্যভিচারের মাধ্যমে উপার্জন করতো । ইসলামের আবির্ভাবের পর তাদের একজন বললো, এ কাজ যদি উত্তম হয়, তবে এ কাজ তো আমি অনেক করেছি। আর উত্তম না হলে এ কাজ বাদ দেয়াই সমীচীন। তার একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় উদ্ধৃত আয়াতাংশ।

বাগবী লিখেছেন, এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের এক দাসী আনলো একটি চাদর এবং অপর জন আনলো দিনার। সে বললো, যাও, আরো কিছু উপার্জন করে আনো। দাসীদ্বয় বললো, আল্লাহ্র কসম! এখন থেকে এরকম কাজ আমরা করবো না। সত্য ধর্ম ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। আর ওই ধর্মে ব্যভিচারকে করা হয়েছে নিষিদ্ধ। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তখন রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে দাসীদ্বয়ের অবাধ্যতার ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করলো। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। সা'লাবীর বর্ণনায় এসেছে, মুকাতিল বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার ছয়জন দাসীকে ব্যভিচারে নিয়োজিত করেছিলো। তার ওই অসদাচরণের প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় 'তোমাদের দাসীগণ সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধনলালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য কোরো না'।

'ইন আরদনা তাহাস্সুনা' অর্থ যদি তারা সততা রক্ষা করতে চায়। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'ইন্' শর্তসূচক। আর এ শর্ত দাসীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে নির্দিষ্ট করে না। যেমন শাফেয়ীগণের মতানুসারে কথাটির বিপরীত অর্থ এরকম— যদি তারা সততা বা সতীত্ব রক্ষা না করতে চায় তবে তাদের জন্য ব্যভিচার বৈধ। কিন্তু এ ধরনের অর্থ ভুল। কারণ এতে করে আপনাআপনি ব্যভিচার স্বীকৃতি লাভ

www.eelm.weebly.com

করে। আমি বলি, এ স্থলে 'ইন' (যদি) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এ জন্য যে, তাদেরকে লক্ষ্য করেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাদের সততা রক্ষা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তাদের এমতো অভিলাষ শক্তিশালী নয়, বরং সন্দেহপূর্ণ। কারণ তারা মালিকের ইচ্ছার কাছে অসহায়। মালিকের বলপ্রয়োগের উর্ধে ওঠার ক্ষমতা তাদের নেই। তাছাড়া তাদের কামোত্তেজনাও তাদের ইচ্ছার পথের প্রতিবন্ধক। তাই এখানে মালিকদেরকে লক্ষ্য করে বলতে চাওয়া হয়েছে, যদি তোমাদের দাসীরা নিজেরাই সততা রক্ষা করতে চায়, তবে তোমরা কেমন পুরুষ যে, তাদের এমতো শুভ অভিলাষে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাও? বাধ্য করো তাদেরকে ব্যভিচারলিপ্ত হতে? তারা তোমাদের বাধ্য, কিন্তু তোমরা তো স্বাধীন। সুতরাং এরকম গোনাহের কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করা তোমাদের জন্য নিতান্তই অনুচিত।

হোসাইন ও ফুজাইল বলেন, বক্তব্যে ঘটেছে কিছু অগ্রপশ্চাৎ। কথাটি হবে এরকম— যদি বিধবা তার সতীত্ব রক্ষা করতে চায়, তবে তার বিয়ে দিয়ে দাও এবং আপন দাসীকেও বাধ্য করো না ব্যভিচারিণী হতে। প্রশ্রয় দিয়ো না পার্থিব জীবনের ধন-লোলুপতাকে। এমতো আকাংখা কোরো না যে, তাদেরকে দিয়ে ব্যভিচার করিয়ে উপার্জন করবে এবং তাদের সন্তানাদি বিক্রয় করে লাভ করবে অর্থ-সম্পদ।

শেষে বলা হয়েছে— 'তবে কেউ যদি তাদেরকে বাধ্য করে, তবে সেক্ষেত্রে তাদের উপর জবরদস্তির পর, আল্লাহ্ তো তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— মালিকেরা যদি তাদের দাসীদেরকে ব্যভিচার করতে বাধ্য করে, তবে আল্লাহ্পাক তাদেরকে ব্যভিচারিণীরূপে গণ্য করবেন না, ক্ষমা করে দিবেন। হাসান যখন এই আয়াত পাঠ করতেন, তখন বলতেন 'লাহুন্না ওয়াল্লহু লাহুন্না' (আল্লাহ্র কসম আল্লাহ্ই ওই দাসীদেরকে ক্ষমা করে দিবেন)। এই উদ্দেশ্যের উপরে ভিত্তি করে 'মাঁই ইউকরিহ্ হুন্না' (তবে কেউ যদি তাদেরকে বাধ্য করে) কথাটি হবে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় থাকবে লুপ্ত। যেহেতু পরবর্তী বাক্যে কোনো যোজক সর্বনাম নেই, যার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী বাক্য বিধেয় হবে না। অর্থ দাঁড়াবে— ব্যভিচারের পাপ ও শাস্তি পতিত হবে তার উপর যে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করবে। আর এমতাবস্থায় ব্যভিচারে বাধ্য দাসীকে আল্লাহ্পাক ক্ষমা করে দিবেন। কথাটির উদ্দেশ্য এরকমও হতে পারে যে, যে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করে, তাকেই আল্লাহ্পাক ক্ষমা করে দিবেন, যদি সে আর এরকম করবে না বলে আন্তরিক তওবা করে নেয়। কিন্তু এমতো অর্থ বাক্যের ধরন ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। কেননা এখানে জবরদস্তি যে করবে, তাকে শাস্তির ভয় দেখানোই উদ্দেশ্য। তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, এরকম উদ্দেশ্য এখানে নেই। তদুপরি

www.eelm.weebly.com

দাসীর মালিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতাংশ। সে ছিলো মুনাফিকশ্রেষ্ঠ। আর মুনাফিকদের সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাকরুন আর না করুন, আল্লাহ্ কখনোই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

একটি সন্দেহ ঃ যে দাসীকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করা হয় সে যখন গোনাহগারই নয়, তখন তাকে ক্ষমা করার প্রয়োজনই বা কী?

সন্দেহের অপনোদন ঃ জবরদস্তি করার পর দায়িত্ববোধ ও জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটে না। কর্মক্ষমতাও রহিত হয় না। তাই যে বাধ্য, তাকে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্তও বলা যায় না। সে কারণেই কাউকে হত্যা করতে যে ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয়েছে এবং যাকে বাধ্য করা হয়েছে ব্যভিচার করতে, তার জন্যও হত্যা করা অথবা ব্যভিচার করা হারাম। ইমাম জোফারের নিকট তো এরকম হত্যা কিসাসের যোগ্যও নয়। তাঁদের অভিমত স্ব স্ব স্থানে সঠিক। তবে আল্লাহ্পাক কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধ্যগত ব্যক্তির উপর থেকে পাপের দায় অপসারণ করে দেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে হারাম কাজেরও অনুমোদন দেয়া হয়েছে। যেমন কুফরী কালাম উচ্চারণ, নামাজ-রোজা পরিত্যাগ, হজের ইহ্রাম ভঙ্গ বাধ্যগত অবস্থায় সিদ্ধ। তবে শর্ত হচ্ছে এরকম কাজ করতে বাধ্য হলেও কাজগুলোর প্রতি থাকতে হবে আন্তরিক ঘৃণা। অতএব বুঝতে হবে, এমতাবস্থায় পাপী বলে সাব্যস্ত না করা অবশ্যই আল্লাহ্তায়ালার অপার দয়া ও ক্ষমার নিদর্শন। লক্ষণীয়, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন— 'ফামানিদ্বতুররা গয়রা বাগিঁউ ওয়ালা আ'দিন ফালা ইছমা আলায়হি ইন্নাল্লহা গফুরুর রহীম'। এরকমও বলা যেতে পারে যে, গোনাহ্গার সাব্যস্ত করা হবে না তখন, যখন বলপ্রয়োগ ছাড়িয়ে যায় তার সীমানা, অর্থাৎ যখন দেখা যায় বলপ্রয়োগকারীর কথা না মানলে জীবন দিতে হবে, অথবা কাটা পড়বে কোনো অঙ্গ। এরকম আশংকা না দেখা দেয়া পর্যন্ত পাপ অবশ্যই বর্তাবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই কিন্তু তার দাসীদেরকে এরকম চরম পর্যায়ের বলপ্রয়োগ করেনি। একথা বলেনি যে, ব্যভিচার না করলে তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা ছেদন করা হবে শরীরের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সুতরাং তার দাসীরা এমতাবস্থায় ব্যভিচার করলে অবশ্যই হবে পাপীয়সী।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৩৪

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

www.eelm.weebly.com

❒ আমি তোমাদিগের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াত এবং দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছি তোমাদিগের পূর্ববর্তীদিগের ও সাবধানীদিগের জন্য দিয়াছি উপদেশ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল। আমি আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছি মহাগ্রন্থ আলকোরআনের এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ সুরা। এর নাম সুরা নূর। এর মধ্যে রয়েছে শরিয়তের কতিপয় সুস্পষ্ট বিধানসম্বলিত আয়াত। অথবা— এই সুরায় আমি অবতীর্ণ করেছি এমতো সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, যার আনুকূল্য ও সমর্থন রয়েছে ইতোপূর্বে অবতীর্ণ আসমানী কিতাব সমূহেও। আর সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন বিবেকও যেগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থক।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি তোমাদের পূর্ববর্তীদের'। একথার অর্থ— এই মহাগ্রন্থে আমি আরো উপস্থাপন করেছি তোমাদের পূর্বসূরীদের বিভিন্ন ঘটনা। যেমন নবী ইউসুফের অত্যাশ্চর্য কাহিনী, হজরত মরিয়মের বিস্ময়কর জীবনেতিহাস ইত্যাদি। তাছাড়া বর্তমানে তোমাদের রসুল জায়ার নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতার সাক্ষ্যবহ আয়াতসমূহও তো কম আশ্চর্যের নয়। আলোচ্য বাক্যের অর্থ এরকমও হতে পারে যে, এই মহাগ্রন্থে আমি দিয়েছি পূর্ববর্তী যুগের অপরাধীদের বিভিন্ন অপকর্ম ও সীমালংঘন ও তার অপপরিণতির স্পষ্ট বিবরণ। অতএব হে কপটচারীরা! তোমরাও জেনে রেখো, সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপের কারণে তোমাদের পরিণতিও হবে সেইরূপ মর্মান্তিক ও ভয়াবহ।

শেষে বলা হয়েছে— 'ও সাবধানীদের জন্য দিয়েছি উপদেশ'। একথার অর্থ— সুস্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে প্রদত্ত এই যে সাবধানবাণী, তার দ্বারা উপকার লাভ করবে কেবল সাবধানী বা মুত্তাকীরাই, অন্যেরা নয়। তাই বলা যেতে পারে যে, প্রত্যাদেশিত এই উপদেশ কেবল মুত্তাকীদের জন্যই, অন্যের জন্য নয়।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি প্রযোজ্য হবে সমগ্র কোরআনের উপর। কারণ 'সুস্পষ্ট আয়াত' 'দৃষ্টান্ত' ও 'উপদেশ' তিনটি কথাই বিধৃত রয়েছে সমগ্র কোরআনে। অর্থাৎ সমগ্র কোরআনই একাধারে সুস্পষ্ট আয়াতের সমাহার, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি ভীতিপ্রদ ঘটনার সমাবেশ এবং উপকারপ্রদায়ক উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য।

www.eelm.weebly.com

ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ○

❒ আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁহার জ্যোতির উপমা কুলুঙগি যাহার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; ইহা প্রজ্বলিত হয় তৈল হইতে পূতপবিত্র জয়তুন বৃক্ষের , যাহা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নি সংযোগ না করিলেও মনে হয় উহার তৈল উজ্জ্বল যেন আলো দিতেছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁহার জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' (আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি)। যে আলোকে চোখ প্রথম উপলব্ধি করে এবং যার মাধ্যমে নয়ন-সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দর্শনীয় দৃশ্যসমূহ, সেই আলোকেই বলে নূর বা জ্যোতি। যেমন চন্দ্র-সূর্যের আলো। 'নূর' শব্দের এই ব্যাখ্যাটিকে যদি গ্রহণ করা হয়, তবে এটা নিশ্চিত যে আল্লাহ্তায়ালাকে 'নূর' বলা যায় না। কারণ নূর দৃষ্টিগ্রাহ্য, কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা দৃষ্টির অতীত। বরং উপলব্ধিরও অতীত। তাই শব্দটিকে ব্যাখ্যা করতে হবে ভিন্নভাবে। যেমন— ১. ধরে নিতে হবে এখানে একটি সম্বন্ধপদ উহ্য। অর্থাৎ বলতে হবে 'আল্লাহ্ আকাশ-পৃথিবীর নূর' অর্থ 'আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীকে নূর প্রদানকারী'। ২. ধাতুমূল থেকে গ্রহণ করতে হবে আধিক্যপ্রকাশক অর্থ। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা এতো সুপ্রচুর নূরপ্রদাতা যে, মনে হয় তিনিই নূর। যেমন জায়েদ নামক ব্যক্তির অত্যধিক ন্যায়পরায়ণতাকে প্রকাশ করা হয় এভাবে— 'যায়দুন আদলুন' (জায়েদই ন্যায়নিষ্ঠ)। আবার যেমন অত্যধিক দয়ার্দ্র ব্যক্তির প্রশংসা প্রকাশার্থে কেউ কেউ বলে 'আপনিই তো দয়া' (দয়ার প্রতিভূ)। ৩. অথবা ধাতুমূলটি (নূর) এখানে হবে কর্তৃকারকের অর্থ

www.eelm.weebly.com

প্রদায়ক। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্তায়ালা চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা, ফেরেশতামণ্ডলী দ্বারা, নবী-রসুলগণের দ্বারা এবং বিশ্বাসীগণের দ্বারা আকাশপৃথিবীকে আলোকিত করেছেন। এরকম অর্থ করেছেন জুহাক। এরকমও বলা যেতে পারে যে— আল্লাহ্ পৃথিবীকে জ্যোতির্ময় করেছেন সবুজ বৃক্ষ ও তৃণরাজির মাধ্যমে।

কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— আকাশ-পৃথিবীসহ অন্য সকল কিছুর নূর তাঁর নিকট থেকেই। যেমন বলা হয় 'অমুক ব্যক্তি আমাদের জন্য রহমত'। অর্থাৎ আমরা রহমত লাভ করেছি তাঁরই মাধ্যমে।

কখনো কখনো আবার 'নূর' শব্দটি ব্যবহার করা হয় প্রশংসা প্রকাশার্থে। যেমন জনৈক কবির কবিতায় রয়েছে— যখন আবদুল্লাহ্ কোন রাতে মরো ত্যাগ করে, তখন হারিয়ে যায় মরোর জ্যোতি ও সৌন্দর্য।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে 'নূর' অর্থ গবেষক, পরিচালক। যেমন বলা হয় অমুক ব্যক্তি 'কওমের নূর' (সম্প্রদায়ের জ্যোতি)।

আবার কারো কারো মত এরকম— নূর হচ্ছে ওই অস্তিত্ব, যা নিজে নিজে বিকশিত হয় এবং বিকশিত করে অন্যকেও। আরো দেখা যায়, দৃশ্যমানতার মূলে আছে অস্তিত্ব আর অদৃশ্যমানতার মূলে অনস্তিত্ব। 'নূরুস্সামাওয়াত' অর্থ আকাশ-পৃথিবীর অস্তিত্ব। আল্লাহ্পাকের অস্তিত্ব সত্তাগত। তিনি স্বয়ং অস্তিত্ব এবং তিনি ব্যতীত সকল কিছুরই তিনি অস্তিত্বপ্রদাতা।

দর্শনশক্তিকেও নূর বলে এজন্যই যে, দর্শনশক্তি বস্তুসমূহের অনুভূতির গ্রাহক। আর দর্শন,সেতো উচ্চ পর্যায়ের একটি গ্রাহক। চক্ষু তার নিজের গ্রাহক নয় তাই সে নিজেকে দেখতে পায় না। কিন্তু দর্শন স্বীয় সত্তা ছাড়াও যাবতীয় সমষ্টি ও ব্যষ্টির প্রতিগ্রহীতা। বস্তুসমূহের তাত্বিক গবেষকই হচ্ছে এই দর্শন শক্তি। প্রতিটি বস্তুর সমন্বয়ন ও স্তরায়ন এরই দ্বারা সূচিত হয় বলে একে নূর বলাই উত্তম।। তিনিই দৃষ্টিশক্তির উপরে বর্ষণ করেন অনুভূতির ফয়েজ বা বর্ষণ, কখনো নবীগণের মাধ্যমে, আবার কখনো ফেরেশতাগণের মাধ্যমে। তাঁর ওই অলৌকিক বর্ষণের নামই নূর। এভাবে বলা যেতে পারে— নবীগণ জ্যোতি, ফেরেশতাগণও জ্যোতি এবং জ্যোতি আল্লাহ্ও, নূরের স্রষ্টা ও দাতা হিসেবে। এভাবেই আল্লাহ্ পথনির্দেশ করে চলেছেন আকাশ-পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টিকে। তাই বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর' অর্থ আল্লাহ্ই আকাশ ও পৃথিবীবাসীর পথপ্রদর্শনকারী। সেকারণেই তো নিশ্চিত হয়েছে বিশ্বসমূহের যথাযথ পরিচালন, বিবর্তন ও পথ-পরিক্রমণ। 'নূর' সম্পর্কে আরো বলা যেতে পারে যে, এর ঔজ্জ্বল্য সকলকিছুকে বেষ্টন করে নেয়। অথবা দৃষ্টির মধ্যেই বিদ্যমান থাকে জ্ঞানগত ও অনুভবগ্রাহ্য নূর।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তাঁর জ্যোতির উপমা কুলুঙ্গি, যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ'। এখানে 'তাঁর জ্যোতির উপমা কুলুঙ্গি' অর্থ তাঁর জ্যোতি হচ্ছে তাঁর ওই জ্যোতির বৈশিষ্ট্য যা প্রোজ্জ্বল থাকে বিশ্বাসীদের হৃদয়ে। তাই তো বিশ্বাসবানগণের অন্তর সতত ধাবমান থাকে আল্লাহ্তায়ালার সত্তা ও গুণাবলীর দিকে, এভাবে পৌঁছে যায় এমন অক্ষয় জ্ঞানগৃহে, যেখানে উপনীত হতে মানবশক্তি অক্ষম। এভাবে প্রকৃত বিশ্বাসীরা পেয়ে যায় সত্য-মিথ্যার প্রভেদ নির্ণায়ক জ্ঞান। এদিকে লক্ষ্য করেই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে— 'ফাহুয়া আ'লা নুরিম্ মির রব্বিহী' (অতঃপর সে বিদ্যমান হয় তার প্রতিপালকের জ্যোতির উপর)।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ আলোচ্য বাক্যটিকে ব্যাখ্যা করতেন এভাবে— 'মাছালু নূরিহী ফী ক্বালবিল মু'মিন' (বিশ্বাসীর অন্তরপটে তাঁর জ্যোতির উপমা)। সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এ নূর হচ্ছে এমন এক বৈশিষ্ট্য, যা বিশেষভাবে আল্লাহ্ দান করেন মুমিনগণকে।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, এখানে 'নূরিহী' কথাটির 'হী' সর্বনাম বিশ্বাসীগণের স্থলাভিষিক্ত। হজরত উবাই ইবনে খলফ বলেছেন, নূর হচ্ছে বিশ্বাসীগণের হৃদয়ের জ্যোতির গুণ। এ ধরনের বিশ্বাসীর অন্তরেই আল্লাহ্ দান করে থাকেন ইমান, বক্ষে দান করেন কোরআনের নূর। হাসান এবং জায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, এখানে 'নূর' উদ্দেশ্য কোরআন। সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং জুহাক বলেছেন, এখানে 'নূর' দ্বারা বুঝানো হয়েছে রসুল পাক স. এর পবিত্র সত্তাকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'নূর' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে বিশ্বাসীগণের আনুগত্যকে, যা আল্লাহ্পাক দয়া করে সম্পৃক্ত করেছেন তাঁর নিজের সত্তার সঙ্গে।

'কা মিশকাতিন্ ফীহা মিসবাহুন' অর্থ 'যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ'। অর্থাৎ কুলুঙ্গি বা দীপাধারে প্রজ্জ্বলিত রয়েছে একটি প্রদীপ। 'মিশকাতুন' অর্থ কুলুঙ্গি বা দীপাধার, যার উভয় পার্শ্ব নিশ্ছিদ্র, আলো প্রদানের জন্য যাতে থাকে সুনির্ধারিত দিক। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'মিশকাত' শব্দটি আবিসিনীয়। মুজাহিদ শব্দটির অর্থ করেছেন 'কুলুঙ্গি' বা কাঁচের তৈরী এমন ঝুলন্ত প্রদীপাধার যাতে প্রজ্জ্বলিত থাকে প্রদীপ। অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত প্রদীপবিশিষ্ট ঝুলন্ত প্রদীপাধার। 'মেসবাহ্' অর্থ প্রদীপ। এটা করণকারকরূপের শব্দ, এখানে শব্দটি এসেছে 'মিফআলুন' সূত্রে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত'। 'যুজ্বাজ্বাত্' অর্থ কাঁচের আবরণ। জুজায বলেছেন, কাঁচের আবরণের মধ্যে আলো অধিকতর উজ্জ্বল হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ'। এখানে 'দুররিউন' অর্থ মোতি অথবা মোতির মতো পরিচ্ছন্ন ও দ্যুতিময় নক্ষত্র।

একটি সন্দেহ ঃ তারকার দ্যুতি ও উজ্জ্বলতা তো মোতির দ্যুতি ও উজ্জ্বলতা অপেক্ষা অধিক। তাহলে এখানে 'নক্ষত্র' অথবা 'মোতির মতো' এরকম বলা হলো কেনো?

সন্দেহভঞ্জন ঃ এখানে উপমাটির উদ্দেশ্য হবে এরকম— উজ্জ্বলতম নক্ষত্র যেরূপ অন্যান্য নক্ষত্র অপেক্ষা অধিক দ্যুতিময়, তেমনি মোতির দানাও অন্যান্য মূল্যবান প্রস্তর অপেক্ষা অধিক দ্যুতিবিশিষ্ট। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'নক্ষত্র' অর্থ ওই পাঁচটি নক্ষত্র, যেগুলো অন্যান্য নক্ষত্রের চেয়ে অধিক আলোকজ্জ্বল। ওই নক্ষত্রগুলোর নাম— যুহাল, মিররিখ, মুশ্তারী, জোহরা ও উত্বারিদ। এগুলোর যে কোনো একটিকে বলা হয় 'কাওকাবু দুররি'। আমি বলি, সম্ভবতঃ জোহরা নক্ষত্রকেই এখানে বলা হয়েছে 'দুররিউন'। কারণ, জোহরা সেতারাই সকল নক্ষত্র অপেক্ষা অধিক প্রোজ্জ্বল।

একটি প্রশ্নঃ এখানে ঔজ্জ্বল্যের উপমা দেয়া হয়েছে নক্ষত্রের সঙ্গে। কিন্তু চন্দ্র-সূর্য তো নক্ষত্র অপেক্ষা আরো অধিক উজ্জ্বল। তৎসত্ত্বেও চন্দ্র-সূর্যের উপমা এখানে দেয়া হলো কেনো?

উত্তরঃ কখনো চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহণ লাগে। কিন্তু নক্ষত্রে কখনো গ্রহণ লাগে না। আমি বলি, অন্য আয়াতে প্রদীপকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন— 'ওয়া জায়ালনাশ্ শামসা সিরাজা'। আর এখানে কাঁচের আবরণকে তুলনা করা হয়েছে নক্ষত্রের সঙ্গে, যাতে করে এই তথ্যটি প্রকাশিত হয় যে, কাঁচের আবরণের দ্যুতি প্রদীপ অপেক্ষা কম। সূর্যের সঙ্গে তুলনা করলে এই উদ্দেশ্যটি পরিবর্তিত হয়ে যেতো। তখন দীপাধারের দ্যুতি বিবেচিত হতো দীপ অপেক্ষা অধিকরূপে। ফলে বক্তব্যের উদ্দেশ্য হয়ে যেতো বিপরীত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা প্রজ্জ্বলিত হয়, তেল থেকে পূত-পবিত্র জয়তুন বৃক্ষের'।

জয়তুন বৃক্ষ একটি অতি বরকতময় বৃক্ষ। তাই এখানে তুলনা দেয়া হয়েছে জয়তুন বৃক্ষের। জয়তুন বৃক্ষ থেকে লাভ হয় বিভিন্ন ধরনের উপকার। যেমন জয়তুন হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু ব্যঞ্জন। আর জয়তুন থেকে তেল বের করার জন্য কোনো মাড়াইকলের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেকেই অল্প আয়াসে জয়তুন থেকে

www.eelm.weebly.com

তেল বের করে নিতে পারে। জয়তুন তেল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও দৃষ্টিস্বস্তিকর। বাগবী লিখেছেন, হাদিস শরীফে এসেছে জয়তুন তেলের দ্বারা অনারোগ্যক্ষত নিরাময় হয়। আর জয়তুন বৃক্ষের আগা-গোড়া শুধু তেল আর তেল।

বাগবী লিখেছেন, হজরত উসাইদ ইবনে সাবেত অথবা হজরত উসাইদ আনসারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা জয়তুন তেল খেয়ো ও শরীরে মালিশ কোরো। কেননা এটি একটি কল্যাণময় বৃক্ষ। হজরত ওমর থেকে তিরমিজিও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আহমদ, তিরমিজি ও হাকেম বর্ণনা করেছেন হজরত আবী উসাইদ থেকে। আর ইবনে মাজা ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, তোমরা জয়তুন তেল খাও ও শরীরে মাখো। কারণ জয়তুন উৎকৃষ্ট ও কল্যাণময়।

আবু নাঈম তাঁর 'আত্তিব্ব' গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, তোমরা জয়তুন তেল খেয়ো ও শরীরে মেখো। কারণ এতে রয়েছে সত্তর প্রকার রোগের নিরাময়। কুষ্ঠ রোগও তার মধ্যে একটি।

এরপর বলা হয়েছে— 'যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়'। সুদ্দী প্রমুখ বলেন, কথাটির উদ্দেশ্য— জয়তুন বৃক্ষ এমন স্থানে অবস্থিত নয়, যেখানে সারাক্ষণ রৌদ্র পতিত হয়, যাতে করে তা সম্পূর্ণরূপে ঝলসে যায়, আবার এমন গোপন স্থানেও অধিষ্ঠিত নয়, যেখানে সূর্যের আলো একেবারেই পৌঁছে না, যাতে করে সে বৃক্ষের বিকাশ হয়ে পড়ে রুদ্ধ অথবা অপরিণত। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, কথাটির অর্থ— জয়তুন বৃক্ষ প্রাচ্যের এমন কোনো স্থানে অবস্থিত নয়, যাতে তার উপরে সূর্যালোক পতিত হয় কেবল সূর্যোদয়ের সময়, আবার প্রতীচ্যের কোনো স্থানও তার জন্য সুনির্ধারিত নয়, যাতে সে সূর্যকিরণ পায় কেবল সূর্যাস্তের কালে। বরং জয়তুন বৃক্ষের অবস্থান পাহাড়ের চূড়ায়, অথবা এমন উচ্চপ্রশস্তভূমিতে, যেখানে সূর্যালোক পতিত হয় সমস্ত দিবসব্যাপী। ফলে জয়তুন ফল হয় পোক্ত এবং তার তৈল হয় স্বচ্ছ।

বাগবী কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— জয়তুন কালো নয়, শাদাও নয়। আবার মিষ্টি যেমন নয়, তেমনি নয় টকও। অর্থাৎ জয়তুন মধ্যম ধরণের রঙ ও স্বাদবিশিষ্ট। ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। কালাবী এবং অধিকাংশ তাফসীরকারের মত এরকম।

কেউ কেউ বলেছেন, জয়তুন পৃথিবীর পূর্ব অথবা পশ্চিমের কোনো অংশের বৃক্ষ নয়। বরং জয়তুন জন্ম নেয় পৃথিবীর মধ্যাঞ্চলে। অর্থাৎ সিরিয়ায়। সিরিয়ার জয়তুনই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

www.eelm.weebly.com

হাসান বলেছেন, প্রাচ্য অথবা প্রতীচ্য কোনো অঞ্চলে জন্মে না, এমন কোনো বৃক্ষ দুনিয়ায় নেই। তাই বুঝতে হবে, এখানে 'যা প্রাচ্যের নয়' প্রতীচ্যেরও নয়' বলে আল্লাহ্ দিয়েছেন তাঁর নূরের উপমা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নূর পূর্ব কিংবা পশ্চিম কোনো দিকের সঙ্গেই সুনির্দিষ্টরূপে সম্পৃক্ত নয়। বরং তাঁর নূর দিকের অতীত। আমি বলি, সম্ভবতঃ এখানে বলা হয়েছে বেহেশতের কোনো অনন্যসাধারণ জয়তুন বৃক্ষের কথা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ দিয়েছেন তাঁর নূরের উপমা।

এরপর বলা হয়েছে— ' অগ্নিসংযোগ না করলেও মনে হয় তার তেল উজ্জ্বল, যেনো আলো দিচ্ছে'। উল্লেখ্য, এই বাক্যটির মাধ্যমে জয়তুন তেলের স্বচ্ছতা ও জয়তুন তেল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের উজ্জ্বলতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'জ্যোতির উপরে জ্যোতি! আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে'। একথার অর্থ— একেতো নূর তৈলবিবর্জিত হওয়া সত্ত্বেও জ্যোতির্ময়। তার উপরে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের কারণে তা হয় আরো অধিক আলো বিকিরণকারী। এভাবে এখানে উল্লেখিত আলো হয়ে উঠেছে তীব্র, প্রখর, প্রখরতর। এভাবে দীপ, দীপাধার, কাঁচের আবরণ সবকিছু মিলে প্রতিভাত ও প্রতিভাসিত হয়েছে আলো, কেবলই আলো,

বাগবী লিখেছেন, 'নূরের উপরে নূর' কথাটিকে আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন ভঙ্গিতে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'নূর' হচ্ছে নূরে মোহাম্মদী। হজরত ইবনে আব্বাস একবার হজরত কা'ব আহবারকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মাছালু নূরিহী কামিশকাতিণী' এই আয়াতের ব্যাখ্যা বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ এই আয়াতে উপমার মাধ্যমে বিবরণ দিয়েছেন তাঁর শেষ নবীর অবস্থার। এখানে 'মিশকাত' অর্থ রসুল স. এর পবিত্র বক্ষাভ্যন্তর। 'কাঁচের আবরণ' উদ্দেশ্য তার জ্যোতির্ময় হৃদয়। 'মিসবাহ' অর্থ তাঁর নূরানী নবুয়ত। আর ইউকাদু যায়তুহা 'ইয়ুদ্বিউ' অর্থ— রসুল স. যদি তাঁর নবুয়তের কথা কাউকে না-ও বলতেন, তবুও তাঁর নবুয়ত গোপন থাকতো না। মানুষের সামনে তাঁর নবুয়ত হয়ে উঠতো আপনাআপনি উজ্জ্বল, অধিকতর উজ্জ্বল।

হজরত কা'ব আহবারের ব্যাখ্যাটি আমার নিকট অধিক মনোপুত। প্রকৃতপক্ষে নূরে মোহাম্মদীর প্রকৃতি এরকমই। সেকারণেই রসুল স. এর নবুয়ত লাভের পূর্বের কিছু কথা আমি এখানে সন্নিবেশ করছি। যেমন রসুল স. এর মহাসম্মানিতা জননী বলেছেন, মোহাম্মদ তখন আমার উদরাভ্যন্তরে। আমি এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমার ভিতর থেকে বের হলো একটি অত্যুজ্জ্বল নূর। সেই নূরের আলোকে আমার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হলো বসরা শহর ও সিরিয়ার অট্টালিকাসমূহ। আর জন্মগ্রহণের পর পরই দেখলাম নবজাতক তার শির উত্তোলন করলো

www.eelm.weebly.com

আকাশের দিকে। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, রসুল স. যখন ভূমিষ্ঠ হলেন, তখন তাঁর মহামর্যাদাশালিনী জনয়িত্রির নয়ন-সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সিরিয়ার অট্টালিকাসমূহ। বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন ইবনে হাব্বান ও হাকেম।

আবু নাঈম তাঁর 'দালায়েল' পুস্তকে লিখেছেন, রসুল স. এর পূত-পবিত্রা মাতা বর্ণনা করেছেন, যখন মোহাম্মদ জন্মগ্রহণ করলো, তখন ফেরেশতারা তাকে তিনবার চুবালো পানিতে। অতঃপর একটি রেশমি থলির মধ্য থেকে একটি মোহর বের করে স্থাপন করলো তার স্কন্ধদেশে। স্থাপিত মোহরটি ছিলো ডিম্বাকৃতির এবং তা দ্যুতি বিকিরণ করতে লাগলো জোহরা তারার মতো।

বায়হাকী ইবনে আবিদ্‌দুনইয়া এবং ইবনে সাকান বর্ণনা করেন, রসুল স. এর জন্মেররাত্রিতে প্রকম্পিত হয়েছিলো পারস্যরাজের প্রাসাদসমূহ। চৌদ্দটি প্রাসাদ ধসে পড়েছিলো ওই কম্পনে। পারস্যরাজ হয়ে পড়েছিলো ভীত সন্ত্রস্ত। নিভে গিয়েছিলো তার হাজার বছরের অনির্বান অগ্নিশিখা। আর শুকিয়ে গিয়েছিলো তাদের সাদত নামক বিশাল হ্রদ।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. যে রাতে ভূমিষ্ঠ হলেন, সে রাতে মক্কাবাসী এক ইহুদী ব্যবসায়ী কুরায়েশদেরকে বললো, আজ রাতে জন্মগ্রহণ করলেন শেষ জামানার নবী। তাঁর স্কন্ধদেশে রয়েছে একটি বিশেষ চিহ্ন। ওই চিহ্নের উপরে রয়েছে অশ্বের কেশগুচ্ছের মতো ক্ষুদ্র এক গুচ্ছ কেশ। লোকেরা বললো, তার কাছে নিয়ে চলো আমাদেরকে। ইহুদী তখন সকলকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলো মা আমেনার গৃহে। দেখতে চাইলো নবজাতককে। যখন তার কাছে নবজাতককে আনা হলো তখন সে তাঁর স্কন্ধদেশের বিশেষ চিহ্নটি দেখে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলো। জ্ঞান ফিরলে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! শেষ হয়ে গেলো বনী ইসরাইলের প্রবহমান নবুয়ত।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে রয়েছে, আসীসা নামক এক খৃষ্টান সন্যাসী কুরায়েশদেরকে বলতো, হে মক্কাবাসী! অনতিবিলম্বে তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন এক মহান পয়গম্বর। সকল আরববাসী হয়ে যাবে তাঁর অধীন। অনারবরাও হবে তাঁর অনুসারী। এখনই তাঁর জন্মগ্রহণের সময়।

হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব বর্ণনা করেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার শিশু অবস্থার অলৌকিক দৃশ্যাবলীর কথা স্মরণ ছিলো বলেই আমি আপনার ধর্মমত গ্রহণ করেছি। আপনি তখন দোলনায় শুয়ে চাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন তার দিকে। চন্দ্র তখন সরে যেতো এক

www.eelm.weebly.com

পাশে। রসুল স. বলতেন, আমি তখন তার সাথে কথা বলতাম। সে-ও কথা বলতো আমার সঙ্গে। আমি কাঁদলে সে আমাকে সান্ত্বনা দিতো। আর সে যখন আরশের নিচে সেজদাবনত হতো, তখন আমি শুনতে পেতাম তার আওয়াজ।

রসুল স. এর অলৌকিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এটাও একটি বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর দোলনাকে ফেরেশতারা দোলাতো। আর এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েই তিনি কথা বলেছেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর থেকে আবু ইয়ালী ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর দুধমাতা হজরত হালিমা বলেন, তাঁকে কোলে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো আমার স্তন। দুধের স্বল্পতার কারণে আমার সন্তান জামুরা ভালোমতো দুধ পেতোনা, তাই সে ঘুমাতে চাইতো না। রসুল স. কে পাওয়ার পর তিনি ও আমার সন্তান দুজনেই পেটপুরে দুধ পান করতো ও যথাসময়ে ঘুমিয়ে পড়তো। আমার উটনীটির স্তনও ছিলো দুধহীন। রসুল স. কে পাওয়ার পর তার ওলানও ভরে গেলো দুধে। আমার স্বামী তা দেখতে পেয়ে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, একি! উটনীর স্তনে এতো দুধ এলো কি করে! তিনি উটনীটি দোহণ করলেন। ওই দুধ পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করলাম আমরা দুজনেই। ওই রাত অতিবাহিত হলো নির্বিঘ্নে। মোহাম্মদকে সাথে নিয়ে আমরা যাত্রা করলাম বাড়ীর দিকে। গাধার উপরে আরোহণ করলাম, শীর্ণ গাধাটি চলতে লাগলো দ্রুতগতিতে। সঙ্গী-সাথীদের গাধাগুলো পড়ে রইলো পেছনে। সঙ্গী সাথীরা বলতে লাগলো, ওগো আবী জুওয়াইব পুত্রী! এটা কি তোমার সেই গাধা, যার উপরে সওয়ার হয়ে তুমি এখানে এসেছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর ভাবলাম, সঙ্গী-সাথীরা তো এরকম বলবেই। আসার সময় আমি বার বার পেছনে পড়ে যাচ্ছিলাম, সঙ্গী-সাথীদেরকেও থেমে যেতে হচ্ছিলো বারবার। আর আজ সকলেই আমার পেছনে পড়ে রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, হজরত হালিমা বলেছেন, আমি যখন রসুল স.এর দুধপান বন্ধ করালাম, তখন তিনি বলে উঠলেন 'আল্লাহু আকবার কাবীরান ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাছীরান ওয়া সুবহানাল্লহি বুকরাতাঁও ওয়া আসিলা'। এটাই ছিলো তাঁর প্রথম কথা।

হজরত ইবনে আব্বাস আরো বর্ণনা করেন, হজরত হালিমা তাঁকে কাছ ছাড়া করতেন না। তবু একদিন তিনি তাঁর দুধ বোন সীমার সঙ্গে চলে গেলেন চারণ ভূমিতে। তাঁরা দুজনে ফিরে এলে জননী বললেন, এই তপ্ত রোদে তোমরা বাইরে যাও কেনো? সীমা বললেন, আমার এই ভাইটি সঙ্গে ছিলো বলে আমাদের গায়ে রোদই লাগেনি। আশ্চর্য! সারাক্ষণ তার মাথার উপরে ছায়া দেয় একখণ্ড মেঘ। সে থেমে গেলে মেঘখণ্ডটিও থেমে যায়। আর চলতে শুরু করলে চলতে শুরু করে মেঘখণ্ডটিও।

www.eelm.weebly.com

শামায়েলে মাজদিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত হালিমা বর্ণনা করেন, যখন থেকে আমি তাঁকে আমাদের ঘরে নিয়ে আসি, তখন থেকেই ফুরিয়ে যায় আমাদের প্রদীপের প্রয়োজন। তাঁর পবিত্র মুখাবয়বের জ্যোতি ছিলো প্রদীপের আলোর চেয়েও উজ্জ্বল। কোথাও প্রদীপের প্রয়োজন দেখা দিলে আমরা তাঁকে নিয়ে যেতাম সেখানে। তাঁর উপস্থিতিতে ওই স্থান হয়ে যেতো আলোকিত।

এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত হালিমা তাঁকে নিয়ে প্রতিমার সামনে গেলে হুবল ও অন্যান্য প্রতিমা তাঁর সম্মানার্থে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থেকেও মস্তক অবনত করে প্রণিপাত করতো। আর হাজরে আসওয়াদের কাছে গেলে ওই কৃষ্ণপাথরটিই এসে মিলিত হতো তাঁর মুখের সঙ্গে।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত হালিমা যখন তাঁকে দুধ পান করাতেন তখন তাঁর বুকে এতো দুধ আসতো যে, দশজন শিশু পরিতৃপ্ত হতে পারতো ওই দুধ পান করে। যখন তিনি রসুল স.কে নিয়ে গমন করতেন কোনো শুষ্কভূমিতে তখন ওই স্থানটি হয়ে যেতো সবুজ-শ্যমল। হজরত হালিমা তখন স্বকর্ণে শুনতে পেতেন সেখানকার পাথর ও বৃক্ষরাজি তাঁকে সালাম বলছে। আর দেখতে পেতেন বৃক্ষের ডালপালাগুলো ঝুঁকে আসছে তাঁর দিকে। আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তাঁর দুধভাইয়ের সঙ্গে মাঠে ছাগল চরাতেন। তাঁর ওই দুধভাই বর্ণনা করেছেন, আমার দুধভাই কোনো উপত্যকায় উপস্থিত হলে তৎক্ষণাৎ ওই উপত্যকা হয়ে উঠতো সবুজ-শ্যামল। আর ছাগলগুলোকে পানি পান করানোর জন্য যখন কোনো কূপের পাড়ে উপস্থিত হতাম তখন পানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে আসতো কূপের কিনারায়। যখন রোদে দাঁড়াতেন তখন এক খণ্ড মেঘ এসে ছায়া দিতো তাঁর মাথার উপর। বণ্য পশুকুলও এসে চুম্বন করতো তাঁর পায়ে।

'খোলাসাতুস্ সিয়ার' গ্রন্থে রয়েছে, রসুল স. এর দুধমাতা বর্ণনা করেন, একদিন তিনি আমাদের উট রাখার জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলো আমার সন্তান, তাঁর দুধভাই। সে হঠাৎ দৌড়ে এসে আমাকে বললো, সর্বনাশ হয়েছে। দুজন শাদা পোশাক পরা অচেনা লোক আমার কুরায়েশ ভাইকে মাটিতে শুইয়ে তার পেট চিরে ফেলেছে। আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গেলাম। দেখলাম, তিনি অন্য দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? তিনি বললেন, দুজন শাদা পোশাক পরা লোক এসে আমাকে মাটিতে শুইয়ে দিলো। তারপর আমার পেট চিরে কী যেনো বের করলো। হজরত শাদ্দাদ ইবনে আউস থেকে আবু ইয়ালী, আবু নাঈম ও ইবনে আবী আসাকের বর্ণনা করেন, রসুল স. তখন বললেন, তারা সংখ্যায় ছিলো তিন জন। একজনের হাতে ছিলো বরফে পরিপূর্ণ সোনার তশতরী। একজন আমাকে ধরে মাটিতে চিৎ করে শোয়ালো। আর একজন পেট ফেঁড়ে কী যেনো বের করে ফেললো। তারপর

www.eelm.weebly.com

পেটের অভ্যন্তরভাগ ধৌত করলো বরফ দিয়ে। উত্তমরূপে ধৌত করার পর দ্বিতীয় জন এগিয়ে এলো। সে বের করে ফেললো আমার হৃৎপিণ্ড। তারপর হৃৎপিণ্ড থেকে বের করলো কালো এক টুকরা গোশত। তারপর হাত ঘুরাতে লাগলো হৃৎপিণ্ডের ডানে ও বামে। মনে হচ্ছিলো, সে কী যেনো খুঁজছে। তখন আমার চোখে পড়লো তার হাতে রয়েছে একটি দ্যুতিময় আংটি। সেদিকে তাকালে দৃষ্টি হয়ে যায় স্থির। দেখলাম, ওই আংটি দ্বারা আমার হৃদয় মোহর করে দেয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয় হয়ে গেলো নূরে ভরপুর। ওই নূর ছিলো জ্ঞানের এবং নবুয়তের । তারপর আমার হৃৎপিণ্ডকে যথাস্থানে রেখে দিলো তারা। ওই মোহরের প্রভাব আমি অনুভব করেছিলাম বেশ কিছুকাল ধরে। আগন্তুকত্রয় এভাবে তাদের কার্য সমাপনের পর তৃতীয় জন বললো, তোমরা এবার সরে যাও। তার সঙ্গী দুজন সরে গেলো। সে হাত ঘোরালো আমার বুক থেকে নাভি পর্যন্ত। সঙ্গে সঙ্গে জোড়া লেগে গেলো চিরে ফেলা বুক ও পেট। হজরত আনাস বলেছেন, আমি রসুল স. এর বক্ষদেশে সেলাইয়ের দাগ লক্ষ্য করেছি।

ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, একবার দেখা দিলো অনাবৃষ্টি। আবু তালিব রসুল স. কে সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টিপ্রার্থনার জন্য উপস্থিত হলেন কাবা শরীফের চত্বরে। কাবাগৃহের দেয়ালে হেলান দিয়ে তিনি ধরলেন রসুল স. এর একটি আঙুল। আকাশ ছিলো তখন নির্মেঘ। হঠাৎ শুরু হলো মেঘের আনাগোনা। অল্পক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। প্লাবিত হয়ে গেলো সমগ্র উপত্যকা। এই ঘটনার কথাই আবু তালিব বলেছেন তাঁর স্বরচিত কবিতায় এভাবে— 'গৌরবর্ণের ওই ব্যক্তির অসিলায় বৃষ্টিপ্রার্থনা করা হয়। তিনি যে পিতৃহীনদের আশ্রয়স্থল এবং দাসীদের সতীত্ব রক্ষাকারী'।

'খোলাসাতুস্ সিয়ার' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বারো বছর বয়সে তাঁর চাচা আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়ায় গমন করেন। বসরায় পৌঁছলে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় খৃষ্টান সন্ন্যাসী বুহায়রার সঙ্গে। বুহায়রা রসুল স.কে দেখেই চিনতে পারেন যে, ইনিই সর্বশেষ রসুল। তিনি রসুল স. এর হাত ধরে বলেন, এই বালক আল্লাহ্র রসুল। আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করেছেন মানবজাতির রহমতরূপে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, একথা আপনি জানলেন কীভাবে? তিনি বললেন, আপনারা যখন আপনাদের অবস্থান স্থল থেকে এগিয়ে আসছিলেন, তখন আমি দেখলাম, বৃক্ষরাজি তাঁর দিকেই অবনত। বৃক্ষদের এ অবস্থা হয় কেবল নবী-রসুল দেখলে। আমরা আমাদের কিতাবে তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ পাঠ করেছি। বুহায়রা এরপর আবু তালিবকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি যদি এঁকে নিয়ে সিরিয়ায় যান, তবে ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। আবু তালিব

www.eelm.weebly.com

আতংকিত হলেন। রসুল স. কে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকেই তিনি ফিরে এলেন মক্কায়। পরবর্তী সময়ে রসুল স. পুনরায় হজরত খাদিজার বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সিরিয়ায় যান। সঙ্গে নেন হজরত খাদিজার এক ক্রীতদাসকে। তখন তিনি ছিলেন পঁচিশ বছরের পূর্ণ যুবক। হজরত খাদিজার সঙ্গে তখনো তাঁর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়নি। সিরিয়ার এক গীর্জার পাশে তিনি যাত্রাবিরতি করলেন। উপবেশন করলেন এক বৃক্ষের নিচে। গীর্জার সন্ন্যাসী তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। ক্রীতদাস মাইসারাকে লক্ষ্য করে বললেন, উনি কে? সে বললো, কুরায়েশ গোত্রের এক যুবক। সন্ন্যাসী বললেন, নবী ছাড়া ওই বৃক্ষের নিচে কেউ উপবেশন করেনি। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, ওই সন্ন্যাসী তখন রসুল স. এর কাছে এসে বললেন, আমি ইমান আনলাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনিই সেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বর যার আলোচনা রয়েছে তওরাত কিতাবে। এর পর তিনি তাঁর নবুয়তের মোহর দর্শন করলেন এবং তাতে চুম্বন প্রদানের পর বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র রসুল। আপনি উম্মি, হাশেমী, আরাবী, মক্কী। আপনিই হাউজে কাওসারের অধিকর্তা। আপনিই শাফায়াতকারী। মহাবিচারের দিবসে আপনার হাতেই শোভা পাবে প্রশংসার পতাকা।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, মাইসারা যখন বলেছিলেন, তখন দ্বিপ্রহর। চতুর্দিকে খাঁ খাঁ করছে রোদ্দুর। তার মধ্যে দুজন ফেরেশতা তাদের পক্ষবিস্তার করে ছায়া দিচ্ছে শেষ জামানার নবীকে। আর তিনি পথ অতিক্রম করছেন উষ্ট্রারোহী হয়ে। পরে মাইসারার এই মন্তব্য কানে গেলো হজরত খাদিজার। সে কারণেই তাঁর অন্তরে জেগে উঠেছিলো রসুল স. এর সঙ্গে বিবাহবন্ধ হবার আকাঙ্খা।

সুহাইলি বলেছেন, 'নবী ছাড়া ওই বৃক্ষের নিচে কেউ উপবেশন করেনি'— খৃষ্টান সন্ন্যাসীর এ কথার অর্থ হবে, ওই সময় যিনি বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট, তিনি অবশ্যই নবী। তাঁর এমতো ব্যাখ্যাকে বাস্তবসম্মতই বলা যেতে পারে। কারণ পূর্ববর্তী নবী হজরত ঈসার সঙ্গে তাঁর মহাআবির্ভাবের সময়ের ব্যবধান ছিলো প্রায় পাঁচশত বছর। একটি গাছের বয়স সাধারণত এতো বছর হওয়া অসম্ভব। তাছাড়া বৃক্ষটি ছিলো পথের পাশে। সে পথ দিয়ে পথিকদের ছিলো নিত্য আনাগোনা। সুতরাং কোনো পথিক ওই বৃক্ষচ্ছায়ায় বসবেনা, এরকম কল্পনাও অসম্ভব। এসকল কারণে সুহাইলির ব্যাখ্যাটিকে যথার্থ বলেই মনে হয়। কিন্তু হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে 'ক্বত্তু' শব্দটি, যার অর্থকে বিকৃত করাও যে যায় না। আর হাদিসের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে 'নবী ছাড়া ওই বৃক্ষের নিচে কেউই উপবেশন করেনি'। সুতরাং বুঝতে হবে, নবী ছাড়া ওই বৃক্ষচ্ছায়ায় অন্য কারো উপবিষ্ট না

www.eelm.weebly.com

হওয়া একটি অলৌকিকত্ব। আর আল্লাহ্ কর্তৃক এমতো অলৌকিকতার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব কিছু নয়। সুহাইলির ব্যাখ্যাটি থেকে কেবল এতটুকু গ্রহণ করা যেতে পারে যে, ওই বৃক্ষটির বয়স হয়তো তখন হয়েছিলো দশ, বিশ বা পঞ্চাশ বছর। আর ওই সময় পর্যন্ত ওই বৃক্ষতলে উপবেশন করেছিলেন কেবল রসুল স.। তওরাতে বর্ণিত হয়েছে ওই বৃক্ষতলে উপবেশন করবেন কেবল আল্লাহ্র রসুল। আল্লাহ্তায়ালাই অধিক পরিজ্ঞাত।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে সালেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, এখানে 'মিশকাত' অর্থ রসুল স. এর পবিত্র বক্ষ। আর 'যুজ্বাজ্ব' অর্থ তাঁর কলব। আর 'মিসবাহ' ওই নূর, যার দ্বারা সমুজ্জ্বল ছিলো তাঁর হৃদয়। 'পূতপবিত্র জয়তুন বৃক্ষ' অর্থ হজরত ইব্রাহিম, রসুল স. ও বনী ইসরাইলের নবীগণ যার শাখা বা ফল। 'প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়' কথাটির অর্থ হজরত ইব্রাহিম ইহুদী অথবা খৃষ্টান কোনো সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভূত নন। আর 'জ্যোতির উপরে জ্যোতি' কথাটির অর্থ এক নূর হজরত ইব্রাহিম, তার উপরে আর এক নূর রসুল স. স্বয়ং।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী বলেছেন, এখানে 'মিশকাত' অর্থ হজরত ইব্রাহিম; 'যুজ্বাজ্ব' অর্থ হজরত ইসমাইল এবং 'মিসবাহ' অর্থ রসুল স.। অন্য আয়াতে রসুল স. কে বলা হয়েছে 'সিরাজ্বাম মুনীরা' (সমুজ্জ্বল প্রদীপ)। এখানেও 'প্রদীপটি প্রজ্জ্বলিত হয় তেল থেকে' অর্থ 'সমুজ্জ্বল প্রদীপ' হজরত ইব্রাহিমের সত্তা, যা ছিলো জ্যোতির্ময়। আর হজরত ইব্রাহিম তো অবশ্যই ছিলেন কল্যাণময় ও জ্যোতির্ময়। অধিকাংশ নবী ছিলেন তাঁর বংশোদ্ভূত। একারণে তিনি ছিলেন এমন বৃক্ষ সদৃশ, যা প্রাচ্যের যেমন নয়, তেমনি নয় প্রতীচ্যেরও। অর্থাৎ তিনি যেমন ইহুদী নন, তেমনি নন খৃষ্টানও। ইহুদীরা ইবাদত করে পশ্চিমমুখী হয়ে। তাই তাদেরকে বলা হয়েছে 'প্রতীচ্য'। আর খৃষ্টানেরা অভিহিত হয়েছে 'প্রাচ্য' বলে। আর এখানকার 'অগ্নিসংযোগ না করলেও মনে হয় তার তেল উজ্জ্বল, যেনো আলো দিচ্ছে' কথাটির অর্থ— প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির পূর্বেই পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছিলো রসুল স. এর কামালিয়ত ও শুভ বৈশিষ্ট্যাবলী। অগ্নিসংযোগের পর, অর্থাৎ প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির পর তা হয়ে উঠেছে আরো অধিক প্রোজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়। 'নূরের উপরে নূর' অর্থ বংশগতভাবে তিনি হজরত ইব্রাহিমের নূরের উত্তরাধিকারী। তদুপরি তাঁর রয়েছে নিজস্ব নূর— নূরে মোহাম্মদী। সুতরাং অবশ্যই তিনি নূরের উপরে নূর বা জ্যোতির উপরে জ্যোতি।

আবুল আলীয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত উবাই ইবনে কা'ব আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— এখানে উপমা উপস্থাপন করা হয়েছে

www.eelm.weebly.com

বিশ্বাসীগণের। তাদের সত্তা যেনো একটি দীপাধার। কাঁচের আবরণ হচ্ছে তাদের বক্ষ, দীপ হচ্ছে তাদের অন্তঃকরণ। দীপালোক হচ্ছে ইমান ও কোরআনের আলো, যা বিদ্যমান থাকে তাদের হৃদয়ে। আর কল্যাণময় বৃক্ষ হচ্ছে তাদের বিশুদ্ধচিত্ততার আলো। অর্থাৎ তাদের এখলাসের আলো অর্জিত হয় কল্যাণময় বৃক্ষ থেকে। যেনো বৃক্ষটি ঘন অরণ্যের কোনো সবুজ সতেজ বৃক্ষ, যা পরিবেষ্টিত থাকে অনেক বৃক্ষের দ্বারা। আর যা সুরক্ষিত থাকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের সূর্যালোক থেকে। বিশ্বাসীগণও এভাবে সুরক্ষিত থাকে ফেৎনা-ফাসাদ থেকে। চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে তাদের। যেমন— ১. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোনো কিছু পেলে তারা প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা ২. কিছু না পেলে ধারণ করে ধৈর্য ৩. বিচার-মীমাংসা করে ন্যায়ানুগতার সঙ্গে এবং ৪. উচ্চারণ করে সত্য বচন। তাদের অন্তর এরূপ প্রদীপে পরিণত হয় যে, প্রজ্জ্বলনের পূর্বেই মনে হয় তা থেকে আরো বিকিরিত হচ্ছে। অর্থাৎ সত্য প্রকাশের পূর্বেই তারা লাভ করে সত্যের পরিচিতি। কেননা তাদের অন্তর স্বভাবতই সত্যমুখী। যেনো নূরের উপরে নূর। এক নূর হচ্ছে তাদের জ্ঞানের নূর। আর এক নূর হচ্ছে প্রবহমান নূর, কিয়ামতের সময় ওই নূরের প্রতিই তারা হবে ধাবমান।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌র নূরের দৃষ্টান্ত ওই নূর, যা বিদ্যমান থাকে মুমিনগণের অন্তরে। তাই তারা স্বভাবগতভাবেই প্রতিষ্ঠিত থাকে সত্যের উপর। শরিয়ত প্রতিপালণের মাধ্যমে যখন তাদের জ্ঞানার্জনে পরিপূর্ণতা আসে, তখন তাদের সর্বাপেক্ষা অধিক সম্পৃক্তি ঘটে হেদায়েতের সঙ্গে। তখন জাগে জ্যোতির জোয়ার। যেনো জ্যোতির উপরে জ্যোতি।

আমি বলি, প্রকৃত কথা এই যে, বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও যথার্থ আমলের কারণে উন্মিলীত হয় সুফিয়ানে কেরামের অন্তর্নয়ণ। তখন তারা নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে সত্যকে আবাহন করে, পরিত্যাগ করে অসত্যকে। রসুল স. তাই আজ্ঞা করেছেন, মতদ্বৈধতার ক্ষেত্রে হৃদয়ের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস কোরো, যদিও মুফতীগণ তোমাকে ফতোয়া দিয়ে দেয়। হাদিসটি উত্তম সূত্রে বর্ণনা করেছেন বোখারী তার 'ইতিহাস' গ্রন্থে। যখন মুমিনের অন্তরে কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নতে রসুলুল্লাহ্‌র জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তার মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে ইমান ও হেদায়েতের নূর। তার এই অবস্থার নামই 'নূরের উপরে নূর'। কালাবী বলেছেন, নূরের উপরে নূর অর্থ ইমান ও আমলের নূর । সুদ্দী বলেছেন, কথাটির অর্থ ইমান ও কোরআনের নূর।

হাসান ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে দেয়া হয়েছে কোরআনের উপমা। প্রদীপ থেকে যেমন আলো লাভ হয়, তেমনি কোরআন নামক প্রদীপ থেকে লাভ হয় হেদায়েতের আলো। 'যুজাজ' বা কাঁচের আবরণ হচ্ছে মুমিনের

www.eelm.weebly.com

কলব। আর তার মুখ ও রসনা হচ্ছে প্রদীপাধার। কল্যাণময় বৃক্ষ হচ্ছে প্রত্যাদেশের বৃক্ষ। জয়তুন হচ্ছে কোরআনের প্রমাণপঞ্জী। তেল দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে যাওয়ার অর্থ কোরআনের প্রমাণপঞ্জী দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া, যদিও তা পাঠ না করা হয়। অর্থাৎ কোরআন অবতরণের পূর্বেই আল্লাহ্তায়ালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর হেদায়েতের নিদর্শন ও প্রমাণপঞ্জী। তারপর যখন কোরআন অবতীর্ণ হলো, তখন তা হয়ে গেলো জ্যোতির উপরে জ্যোতি। স্বভাবজ নূরের সঙ্গে মিলিত হলো অবতারিত কোরআনের নূর।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে দেয়া হয়েছে ওই হেদায়েতের উপমা, যা বিদ্যমান রয়েছে সুস্পষ্ট আয়াতমালাতে যা দীপাধার সদৃশ। এরকমও বলা যেতে পারে যে, মানুষের সন্দেহ ও অনুমানের অন্ধকার তার হেদায়েত প্রবণতাকে পরিবেষ্টন করে রাখে। সুতরাং এই হেদায়েত হচ্ছে প্রদীপতুল্য, যা দূরে সরিয়ে রাখে তার চতুর্দিকের অন্ধকার। অথবা এরকম বলাও সঙ্গত যে, আল্লাহ্ মানুষকে দান করেছেন পাঁচটি বিশেষ শক্তি, যেগুলো সম্পৃক্ত হয় তার চাহিদা ও পরিণতির সঙ্গে। যেমন—

১. অনুভূতি শক্তি। এই শক্তি ধারণ করে মস্তিস্ক। মস্তিস্ক যা অনুভব করে, তা-ই সে প্রকাশ করে উপলব্ধির পাঁচটি পদ্ধতিতে।

২. ধারণা শক্তি। এই শক্তি অনুভূতি শক্তির সঞ্চিত জ্ঞাতব্যসমূহের ভাণ্ডার। অনুভূতি শক্তির মাধ্যমেই এই শক্তি লাভ করে পরিপুষ্টি এবং তা প্রয়োজনবশতঃ উপস্থাপন করে বোধশক্তির কাছে।

৩. বোধ শক্তি। এই শক্তির মধ্যে সমন্বয়িত থাকে অনেক একক উপলব্ধি। এভাবে এই শক্তি হয় অনেক একক অর্জনের সমন্বয়ন।

৪. চিন্তা শক্তি। এই শক্তি জ্ঞাত বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে দাঁড়ায় এবং এভাবে স্পর্শ করতে চেষ্টা করে অজানা ও অনাবিষ্কৃত বিষয়াবলীকে। প্রমাণসমূহের সংযুক্তি ও বিন্যাস সাধনই এই শক্তির কাজ।

৫. পরিশুদ্ধি শক্তি। এই শক্তি লাভ করেন কেবল আম্বিয়া ও আউলিয়াগণ। মহাশক্তির রহস্য ও অদৃশ্যের জ্যোতির উন্মেষ ঘটে এরই দ্বারা। এই শক্তিরই ইঙ্গিত করা হয়েছে এক আয়াতে এভাবে— 'ওয়ালাকিন জায়ালনাহু নূরান নাহ্দীবিহী মান নাশাউ মিন ইবাদিনা' (কিন্তু আমি সেটাকে করেছি একটি জ্যোতি, যদ্দারা আমি হেদায়েত করি আমার বান্দাদেরকে, যাকে ইচ্ছা)। আলোচ্য আয়াতে এই পাঁচটি শক্তিরই উপমা দেয়া হচ্ছে দীপাধার, কাঁচের আবরণ, দীপ, বৃক্ষ ও জয়তুনের মাধ্যমে।

অনুভূতি শক্তি প্রদীপ তুল্য। যেমন এটা একটি বাতায়ন অথবা আলোকাধার যা বহির্মূখী এবং যা কেবল উপলব্ধি করে বাইরের অনুভবযোগ্য বিষয়াবলীকে।

www.eelm.weebly.com

ভিতরের দিকে এ শক্তির কোনো গমনাগমন নেই। আর সে আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে বুদ্ধিগত ভাবে, সত্তাগতভাবে নয়।

ধারণা শক্তি হচ্ছে কাঁচের আবরণের মতো, যা বুদ্ধির আলোককে রাখে সুরক্ষিত এবং আলোকময় হয় বোধশক্তির আলোয়।

বোধশক্তি হচ্ছে এক প্রকার প্রদীপ, যা সমষ্টির জ্ঞান ও আল্লাহ্-পরিচিতির আলোক দ্বারা সমুজ্জ্বল। আর চিন্তাশক্তি একটি কল্যাণময় বৃক্ষ, যার ফল ও ফসল অপরিসীম। তা একটি জয়তুন বৃক্ষ, যা থেকে নির্গত হয় তেল, আর ওই তেল দ্বারা সমুজ্জ্বল হয় প্রদীপ। বৃক্ষটি আবার প্রাচ্য-প্রতীচ্য কোনো অঞ্চলেরই নয়। কেননা বৃক্ষটি সকল প্রকার আকৃতি ও প্রকৃতিগত ব্যাধি থেকে মুক্ত। অথবা বলা যেতে পারে, এই চিন্তা-বৃক্ষটি আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়ের মাঝে অবস্থিত। কল্যাণ লাভ করে উভয় দিক থেকে। আবার ব্যয়িত হয় উভয় দিকে। তাই তা প্রাচ্যের যেমন নয়, তেমনি নয় প্রতীচ্যেরও।

পরিশুদ্ধি শক্তি হচ্ছে জয়তুন তেলের মতো স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন, যা চিন্তা-ভাবনা ও অন্যের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ ব্যতিরেকে আপনাআপনি পরিচিতিমূলক জ্ঞানের আলোকের প্রান্তে উপনীত হয়। এভাবে লাভ করে জ্ঞানালোকের সতত সংযোগ।

এরকম হওয়াও সম্ভব যে, আলোচ্য আয়াতে দেয়া হয়েছে বোধশক্তির উপমা। প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যেকের বোধশক্তি ও জ্ঞানশক্তি থাকে সকল প্রকার আকৃতি শূন্য। কিন্তু তাদের মধ্যে থাকে জ্ঞানধারণের প্রভূত যোগ্যতা। এই অবস্থাকেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'মিশকাত' (প্রদীপ)। প্রাচীন দার্শনিকগণ ও শায়েখ ইবনে সিনা উপলব্ধির এই অবস্থাকে চিহ্নিত করেছে মৌল জ্ঞানরূপে। এই অবস্থা থেকে বোধের স্তরান্তর ঘটে। তখন লাভ হয় প্রমাণাতীত বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। তখন জ্ঞান লাভ হয় চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা ব্যতিরেকেই। কিন্তু অনুমিত বিষয়ের জ্ঞান এমতাবস্থায় কার্যকর হয় না। তবে এমতোক্ষেত্রেও সচল থাকে নিকটের ও দূরের জ্ঞানগ্রহণের যোগ্যতা। প্রতিভাস বিদ্যমান থাকে সামগ্রিক অথবা আংশিক অর্জিত জ্ঞানের। শ্রমসাধ্য বিষয়াবলীর জ্ঞানও সে তখন অর্জন করতে পারে। জ্ঞানের পথের অভিযাত্রিক এমতো স্থানে পৌঁছে নিজেই হয়ে যায় আয়না সদৃশ। এখানে বোধ-চিন্তা-গবেষণা ও অর্জিত জ্ঞান মিলেমিশে হয় কল্যাণময় বৃক্ষের মতো, যেনো তা একটি জয়তুন বৃক্ষ। এখান থেকে যদি সে পুনরাগমন করে তবে তা হবে আহরিত জয়তুন তেল তুল্য। আর তার অর্জিত প্রজ্ঞা যদি হয় পরিশোধিত, তাহলে তার অবস্থা হবে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন তেল ব্যতীতই এমন প্রজ্জ্বোল-সম্ভাবনা, যা অপেক্ষায় থাকে কেবল অগ্নি-স্পর্শের (ওহী অথবা ইলহামের)। তার পরিশুদ্ধি শক্তি তখন এমন হয় যে, প্রত্যাদেশ, প্রক্ষেপণ অথবা ফেরেশতাগণের স্পর্শ ছাড়াই সম্মুখে সমুদ্ভাসিত হয় আলোর বিকাশ। এরপর আরো অগ্রসর হলে তার

www.eelm.weebly.com

বোধশক্তি ধারণ করে দু'টি রূপ— ১. চিন্তা ও শ্রমলব্ধ জ্ঞান যা বিবেকের সম্মুখে সর্বদা উপস্থিত থাকে না। কিন্তু বিবেক যখন তা বুঝতে চায়, তখন তাকে উপস্থিত করাতে পারে। প্রতিচ্ছবি তো বিদ্যমান। প্রয়োজন শুধু দৃষ্টি নিক্ষেপণের। নয়তো বিবেক তার দর্শন লাভ করতে পারে না। বিবেক-চক্ষুর এই দর্শনকেই আমরা প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ২. আর যদি বিবেক-চক্ষুর সামনে ওই জ্ঞান সতত পরিদৃশ্যমান থাকে, তখন তার ওই অবস্থাকে আমরা বলতে পারি 'নূরের উপরে নূর'। জ্যোতির উপরে জ্যোতি।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি তাঁর বিশুদ্ধ কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে আরো দু'টো ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। যেমন—

'আল্লাহু নূরুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' অর্থ আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অস্তিত্বপ্রদাতা। তিনিই এতদুভয়কে নিয়ে এসেছেন অনস্তিত্বের আড়াল থেকে। করেছেন তাঁর নাম-গুণাবলীর ছায়া-প্রতিচ্ছায়া।

'মাছালু নূরিহী' এর 'নূর' অর্থ অস্তিত্ব। 'নূর'কে মর্যাদায়িত করার উদ্দেশ্যেই এখানে আল্লাহ্ নূরের সম্পৃক্তি ঘটিয়েছেন তাঁর নিজের সঙ্গে। যেমন কাবাগৃহকে বলেছেন বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র গৃহ)। নবী সালেহের উষ্ট্রীকে বলেছেন 'নাকুতুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী)। অথবা এরকমও বলা যে, আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টির উপরে নূর নিক্ষেপকারী ও সৃষ্টিকে প্রদত্ত নূরের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাই দেখা যায় পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্র-সূর্যের সম্মুখবর্তী, তার বিপরীত দিকেও প্রতিফলিত হয় চন্দ্র-সূর্যের কিরণ। কারণ পৃথিবী সতত আবর্তনপ্রবণ।

'কামিশকাতিন' অর্থ প্রদীপাধারের জ্যোতি। মোজাফ (সম্বন্ধপদ) এখানে উহ্য।

'ফীহা মিসবাহুন' অর্থ প্রদীপাধারের উপরে রয়েছে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ, যার আলোয় আলোকিত হয়ে আছে প্রদীপাধারও। এভাবেই আল্লাহ্তায়ালার সৌন্দর্যময় নাম ও গুণবত্তার নূরের ছায়া প্রতিচ্ছায়া থেকে সমগ্র সৃষ্টির মূল অর্জন করে অস্তিত্বগত নূর।

'আল মিসবাহু ফী যুজ্বাজ্বাতিন' অর্থ ওই প্রদীপের নূর আলোয় আলোয় ভরা। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেন, নবী ও অলিগণ ছাড়া অন্য সকলের ও সকল কিছুর সূচনাস্থল আল্লাহতায়ালার নাম গুণাবলীর সরাসরি প্রতিবিম্ব নয়, বরং প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া। এ কথার অর্থ আল্লাহ্তায়ালা যেমন তাঁর নাম-গুণবত্তার আনূরূপ্যবিহীনতা সম্পর্কে অবহিত, তেমনি অবহিত আনুরূপ্যের জগতে প্রতিভাসিত তার প্রতিবিম্বিত প্রকাশ সম্পর্কেও। আর এই প্রতিভাস চিরন্তন নয়, যেহেতু তা মূল নয়, প্রতিবিম্ব। তাই প্রতিবিম্বের স্তরে দেখা দেয় বৈপরীত্য। যেমন

www.eelm.weebly.com

জীবন-মৃত্যু, জ্ঞান-অজ্ঞতা, সবল-দুর্বল, শ্রুতি-বধিরতা, দৃষ্টি-দৃষ্টিহীনতা, কথা-নীরবতা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র সত্তা-নাম-গুণাবলী এরকম বৈপরীত্য থেকে সতত মুক্ত ও পবিত্র। আধ্যাত্মিক সাধকের জ্ঞান যখন এমতো বৈপরীত্যকে অপসারণ করতে সক্ষম হয়, তখন তা রঞ্জিত হয় অক্ষয়তা ও চিরন্তনতার রঙে। তখনই ঘটে তার আত্মবিলোপন। অপরিণতি তখন পরিধান করে পরিণতি ও পূর্ণতার পরিচ্ছদ।

সুফিয়ানে কেরাম বলেন, সমগ্র সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার নাম-গুণাবলীর প্রতিবিম্বের প্রতিচ্ছবি। তাই একে বলা যায় 'আয়্‌ইয়ানে ছাবেতা' বা নাম-গুণাবলীর প্রকাশগত দিক, প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব। এই প্রতিচ্ছবিই সমগ্র সৃষ্টির ভিত্তি (আয়্‌ইয়ানে ছাবেতা)। আল্লাহ্‌তায়ালাই এভাবে সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করেছেন। এই অবস্থাকেই এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে প্রদীপের উপমায়। আর তাঁর গুণাবলীর বিচ্ছুরণ হচ্ছে প্রদীপের আলো। প্রতিবিম্ব হচ্ছে কাঁচের আবরণ বা আয়না। সৃষ্টির প্রেক্ষাপট হচ্ছে প্রদীপাধার। প্রদীপের আলোয় তার কাঁচের আবরণ বা চিমনিও আলোকিত হয়। ফলে প্রদীপে আলোর সমুজ্জ্বল হয় স্বচ্ছ কাঁচ, অতঃপর ওই স্বচ্ছ কাঁচের দ্যুতিতে দ্যুতিময় হয় দীপাধার। দীপাধারে উৎসারিত হয় নূরের ঝলক।। এভাবেই সিফাতের (আল্লাহ্‌র গুণাবলীর) নূর আলোকিত করে তার প্রতিবিম্বকে। তাই বলা যেতে পারে প্রদীপ, প্রদীপাধার ও কাঁচের আবরণ আলোকিত হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালারই ইসম-সিফাতের নূরে, তাঁরই অভিপ্রায়ে ও দয়ায়। সৃষ্টির অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও সচলতা তাই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, কেবলই অনুগ্রহ।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, নূর হচ্ছে আল্লাহর্ আনুরূপ্যবিহীন মুখাবয়বের পর্দা। ওই পর্দা উঠিয়ে নিলে একমুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সমগ্র সৃষ্টি। সম্ভবতঃ এই হাদিসে উল্লেখিত 'নূর' অর্থ প্রতিবিম্বিত নূর। আর অবয়বের নূর হচ্ছে তাঁর সিফাতের নূর। প্রকৃত কথা হচ্ছে, অস্তিত্বজ অযোগ্যতার কারণে সিফাতের প্রতিবিম্বের মাধ্যম ছাড়া সৃষ্টি সরাসরি সিফাত থেকে নূর আহরণ করতে পারে না। প্রতিবিম্বের এই মাধ্যম ছাড়া বিলুপ্ত হয়ে যেতো সমগ্র সৃষ্টি। অবশ্য আম্বিয়া ও আউলিয়াগণ সরাসরি সিফাত থেকে নূর আহরণ করতে সক্ষম। বরং তারাই সিফাতের সরাসরি প্রতিবিম্ব। আর অন্য সকলে ও সকল কিছু প্রতিবিম্ব ওই প্রতিবিম্বের।

'আযযুজাজাতু কাআন্নাহাও কাওকাবুন দুররিয়্যুন' অর্থ প্রদীপের জ্যোতিতে কাঁচের আবরণ জ্যোতির্ময়। একারণেই কাঁচের আবরণকে কেউ কেউ মনে করে প্রদীপ। তারা প্রদীপ ও তার চিমনির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। এ অবস্থাকে জনৈক কবি প্রকাশ করেছেন এভাবে—

www.eelm.weebly.com

রক্বক্বায যুজ্বাজু ওয়া রক্বক্বাতিল খমরু
ফাতাশাবাহা ওয়া তাশাকালাল আমরু
ফা কাআন্নামা খমরুন ওয়ালা যুজ্বাজুন ওয়া কাআন্নামা যুজ্বাজুন ওয়ালা খমরু।

অর্থঃ কাঁচ স্বচ্ছ, শরাবও স্বচ্ছ। দু'টোই দেখতে একরকম। তাই দেখলে মনে হয় শরাবই আছে, কাঁচপাত্র নেই। অথবা আছে কেবল কাঁচপাত্র, শরাব নেই।

সিফাতের প্রতিবিম্ব ও সিফাতও তেমনি। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ নয়। তাই একদল আরেফ (আল্লাহ্‌র পরিচয়ধন্য) হয়েছেন 'ওয়াহদাতুল অজুদ' মতবাদের প্রবক্তা। তাঁদের দৃষ্টি বিহ্বল ও অদূরগামী। তাই তাঁরা প্রতিবিম্বকে মূল সিফাত মনে করেছেন। আবার সিফাতকেই মনে করেছেন জাত (সত্তা)। ধারণা করেছেন, সৃষ্টির উপরে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর যে নূর বর্ষিত হয়, ওই নূরই সৃষ্টির মূল। সেই নূরই মূল, সৃষ্টির অস্তিত্ব আদৌ নেই। তাই বলেছেন, জ্যোতিপ্রাপ্ত ও জ্যোতিদানকারী মূলতঃ অভিন্ন সত্তার দু'টি দিক। মূলে সবই এক, অবিভাজ্য আল্লাহ্। এমতো ভুল দর্শনজাত বিশ্বাসকে তাঁরা প্রকাশ করেছেন এভাবে— লাইসা ফীল কাওনি ইল্লাল্লহ্ (জগতের অস্তিত্বে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই নেই)। কেউ কেউ আবার বলেছেন— 'লাইসা ফী জুব্‌বাতী সেওয়াল্লহ' (আমার জোব্বার মধ্যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই নেই)। জনৈক ওয়াহদাতুল অজুদ পন্থী কবি বলেছেন—

লা মুলকা সুলায়মানা ওয়ালা বিলকীসা ওয়ালা আদামিন ফীল কাওনী ওয়ালা ইবলিসা

অর্থঃ জগতের অস্তিত্বে না আছে সুলায়মানের সাম্রাজ্য, না বিলকিসের, না আদমের, না ইবলিসের।

আরো বলেছেন—

ওয়াল কুললু সুয়ারুন ওয়া আনতাল মা'না ইয়া মান হুয়া লিল কুলুবি মিক্বনাতীস্।

অর্থঃ হে ওই সত্তা যে অন্তরকে নিজের দিকের আকর্ষণ করার 'মিক্বনাতীস' (চুম্বকপাথর বিশেষ, যা প্রস্তরখণ্ডকে নিজের দিকে টানে) সদৃশ, তুমিই প্রকৃত অস্তিত্ব, অন্য সকল কিছু কেবলই প্রতিচ্ছবি, প্রতিকৃতি।

উল্লেখ্য, এধরনের বাক্যাবলী হচ্ছে প্রেমোন্মত্ততাজাত উচ্চারণ। এধরনের বক্তব্যপ্রদাতারা নূরগ্রহীতা ও নূরদাতার মধ্যে অস্তিত্বগত পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম হননি।

'ইউকাদু মিন শাজ্বারাতিন মুবাররকাতিন যাইতুনাতিন' অর্থ ওই প্রদীপ কল্যাণময় জয়তুন বৃক্ষের তৈলের সাহায্যে প্রজ্জ্বলিত।

www.eelm.weebly.com

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আল্লাহ্র সিফাত বা গুণাবলীর দিক রয়েছে দু'টি— একটি প্রকাশ্য, আর একটি অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য দিকটি যেমন সম্ভাব্য, তেমনি অপ্রকাশ্য দিকটি অবশ্যম্ভাবী। কারণ প্রকাশ্য দিকটির সম্পর্ক রয়েছে সৃষ্টির সঙ্গে, আর অপ্রকাশ্য দিকটি সম্পর্কিত আল্লাহ্র সঙ্গে। সুতরাং সৃষ্টির দিকটি সম্ভাব্য এবং আল্লাহ্র দিকটি অবশ্যম্ভাবী। সিফাতের অবশ্যম্ভাবী দিকটিই নবী ও ফেরেশতাগণের মাবদায়ে তায়ুন (সূচনাস্থল)। আর সম্ভাব্য দিকটি সূচনাস্থল অন্য সকলের। অবশ্যম্ভাবী দিকটি যেহেতু সংগুপ্ত, তাই অদৃশ্য সত্তার সঙ্গেই তার প্রকৃত সম্পৃক্তি। সুতরাং আল্লাহ্র সত্তা আনুরূপ্যবিহীনরূপে কল্যাণময়, যেনো তা কল্যাণের প্রতীক জয়তুন বৃক্ষ। আর ওই বৃক্ষ পূর্বমুখী যেমন নয়, তেমনি নয় পশ্চিমমুখী। অর্থাৎ তা সর্বমুখী কল্যাণপ্রদায়ক। আর গুণাবলী প্রদীপ সদৃশ যা জাত বা সত্তা থেকে অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুসারে পৃথক ও অতিরিক্ত। এমতো ব্যাখ্যার প্রমাণ রয়েছে কোরআনে এবং রসুল স. এর বচনে। আর এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য।

ইমাম আবু হাসান আশরারী বলেছেন, সিফাত জাত নয়, আবার জাত থেকে পৃথকও নয়। দার্শনিকেরা ও মোতাজিলারা অতিরিক্তরূপে সিফাতের অস্তিত্ব স্বীকারই করে না। জাতকেই তারা সিফাত বলে থাকে। আরো বলে, সিফাতকে জাত থেকে পৃথক করা হলে জাত হয়ে পড়বে সিফাতের মুখাপেক্ষী। আর এরকম হওয়া অসম্ভব। কেননা একাধিক সিফাতের মধ্যে তখন দেখা দিবে দ্বন্দ্ব। সুতরাং সিফাত কখনো জাত থেকে পৃথক অথবা অতিরিক্ত হতে পারে না। ইলমে কালামের আলেমগণ এর জবাবে বলেন, আপন গুণের প্রতি মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল হওয়া অসম্ভব ও অসম্মানজনক কিছু নয়। অন্যের মুখাপেক্ষিতাই কেবল অসম্ভব ও নিষিদ্ধ।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেন, গুণাবলী অবশ্যই সত্তা থেকে অতিরিক্ত ও প্রকাশ্য জগতে অস্তিত্বশীল। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে কোরআন ও হাদিসে। কিন্তু আল্লাহ্র সত্তা কখনো তাঁর নিজের গুণাবলীর মুখাপেক্ষী নয়। অর্থাৎ সত্তা স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ম্ভু। গুণাবলীর মাধ্যমে যা কার্যকর হয়, গুণাবলী ব্যতিরেকে কেবল তাঁর সত্তা দ্বারাই তা কার্যকর হওয়া সম্ভব। সুতরাং গুণাবলীর অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও স্বয়ংপূর্ণ ও স্বয়ম্ভু সত্তা থেকে সকল নিয়ম পদ্ধতি যথাযথরূপে সচল থাকা সম্ভব। উদাহরণতঃ শ্রবণ ও দর্শন গুণ যদি অনুপস্থিতও থাকে, তবু কেবল সত্তার মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে শ্রবণ ও দর্শন। তখন সত্তাকেই বলতে হবে শ্রবণ ও দর্শন। সুতরাং বুঝতে হবে সকল গুণের ভিত্তি হচ্ছে সত্তা। আর প্রতিবিম্বের ভিত্তি হচ্ছে তার গুণাবলী। সুতরাং সম্মান, শক্তি ও নির্ভরতা সমস্তকিছুই ওই সত্তা থেকে সমুদ্ভূত তেলের ন্যায় , যা উৎপন্ন হয় কল্যাণময় জয়তুন বৃক্ষ সদৃশ সত্তায়। এটাই 'এটা প্রজ্জ্বলিত হয় তেল থেকে পুতপবিত্র

www.eelm.weebly.com

জয়তুন বৃক্ষের' বাক্যটির ব্যাখ্যা। অতএব বুঝতে হবে, গুণাবলীর অবিদ্যমানতায়ও সকল কার্যের সম্পৃক্তি সত্তার সঙ্গে সুনিশ্চিত। আর আল্লাহ্‌র প্রতিটি গুণই প্রদীপের অগ্নি তুল্য। আর জয়তুন বৃক্ষ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সত্তার শক্তির উপমা।

'নূরুন আ'লা নূর' অর্থ— প্রথমত প্রদীপের নূর, যা আলোকিত করে রাখে মুকুর ও দীপাধারকে। দ্বিতীয়ত নূর জয়তুন বৃক্ষের তেলের । অর্থাৎ এক নূর সিফাতের, আরেক নূর জাতের। এভাবে সিফাতের মাধ্যমে এই দুই নূর আলোকিত করে রেখেছে সমগ্র সৃষ্টিকে। সুতরাং এ অবস্থারই নাম নূরুন আ'লা নূর (জ্যোতির উপরে জ্যোতি)।

এরপর বলা হয়েছে— ইয়াহদিল্লাহু লিনূরিহী মাঁইয়াশা' (আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে)। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করেন তাঁর মারেফাতের নূর। আর এ নূর যারা লাভ করেন তাঁরাই আরেফ (আল্লাহ্‌র পরিচয়প্রাপ্ত)।

এই দলিলের ভিত্তিতে সকলকিছুর অস্তিত্ব পর্দা ও পর্দাহীনতা থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে পড়ে এবং একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র সত্তাই সকল কিছুর সত্তা অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী। সুরা ক্বফের এক আয়াতে একথার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে এভাবে— 'নাহনু আক্বরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারীদ' (আমি তোমাদের প্রাণরগ অপেক্ষাও নিকটে)। এই আনুরূপ্যহীন নৈকট্যের যথাযথ বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করেছি সুরা ক্বফের তাফসীরের যথাস্থানে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সংকলিত হয়েছে সলফে সালেহীনের বক্তব্যসমূহের ভিত্তিতে। ব্যাখ্যাটি এরকম— 'আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি' অর্থ আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীবাসীগণকে মারেফতের পথ প্রদর্শনকারী। তাই তার জ্যোতির মাধ্যমেই তারা তার সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় প্রাপ্ত হয়। লাভ করে তাঁর নৈকট্য। 'ক্বরীবুম মিনাল মুহসিনীন' এবং 'আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাজীনা আমানু ইউখরিজুহুম মিনাজ্ জুলুমাতি ইলান্ নূর'— এই আয়াতদ্বয়ে পরোক্ষভাবে এই নূরেরই উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসে কুদসীতে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার বান্দা নফলসমূহের মাধ্যমে আমার নৈকট্যভাজন হয়, পরিশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। তখন আমি হই ওই প্রিয়ভাজনের কর্ণ ও চক্ষু, যার দ্বারা সে শ্রবণ করে ও দেখে। উল্লেখ্য, এমতো নৈকট্যভাজনতার নামই বেলায়েত।

'মাছালু নূরিহী কামিশকাতিন ফীহা মিসবাহুন' অর্থ বিশ্বাসীর হৃদয়ে তাঁর নূর এরকম, যেমন দীপাধারের জ্যোতি, যার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত থাকে প্রদীপ। সুতরাং বিশ্বাসীর অন্তর যেনো দীপাধার, যার মধ্যে বিকিরিত হয় আল্লাহ্‌র গুণাবলীর

www.eelm.weebly.com

জ্যোতিচ্ছটা। আর আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রদীপের আলোর মতোন। ওই প্রদীপ জ্বলে পূতপবিত্র জয়তুন বৃক্ষ সদৃশ আল্লাহ্‌র সত্তার তেল দ্বারা, সে বৃক্ষ আবার প্রাচ্য-প্রতীচ্য কোনোখানেই নেই। অর্থাৎ তা স্থানাতীত। ওই স্থানাতীত স্থান থেকেই প্রদীপ গ্রহণ করে তার আলো ও প্রজ্জ্বলন শক্তি।

'আলমিসবাহু ফী যুজ্বাজ্বাতিন, আয্‌যুজ্বাজ্বাতু কাআন্নাহা কাওবাবুন দুররিউন' কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে— আউলিয়া সম্প্রদায় সাধারণতঃ আল্লাহ্‌র গুণাবলী থেকে সরাসরি জ্যোতি আহরণ করতে পারেন না। তাঁরা জ্যোতি আহরণ করেন প্রতিবিম্বের মাধ্যমে। ওই প্রতিবিম্ব হচ্ছে আল্লাহ্‌র গুণরাজির প্রতিবিম্ব। সরাসরি গুণরাজি থেকে নূর আহরণ করেন কেবল নবী-রসুলগণ। অন্যেরা করে গুণরাজির প্রতিবিম্ব থেকে। ওই প্রতিবিম্বের মধ্যেই সাধিত হয় আউলিয়াগণের ফানা ও বাকা। এবং তাঁদের নৈকট্যও ওই প্রতিবিম্বজাত। ওই নৈকট্যের নাম বেলায়েতে সোগরা। তবে অতি অল্পসংখ্যক কামেল ব্যক্তি শরিয়তপ্রণেতার নিখুঁত অনুসরণের মাধ্যমে প্রতিবিম্বের বৃত্ত অতিক্রম করেন। সরাসরি নূর আহরণ করতে সক্ষম হন গুণরাজি থেকে। বরং তাঁরা উন্নীত হন আরো উচ্চ স্তরে— আল্লাহ্‌র শানসমূহের স্তরে। সেখানেই সংঘটিত হয় তাঁদের ফানা ও বাকা। এমতো পূর্ণতার রয়েছে আবার দু'টি দিক— একটি প্রকাশ্য, আর একটি গোপন। প্রকাশ্য দিকটি হচ্ছে বেলায়েতে কোবরা, যা আম্বিয়াগণের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত। আর গোপন দিকটির নাম বেলায়েতে উলিয়া, যা নির্ধারিত বিশেষভাবে ফেরেশতাদের জন্য।

আম্বিয়াগণের মাকামের নিম্নবর্তী মাকাম হচ্ছে সিদ্দিকিয়াতের মাকাম। সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা সিদ্দীক, তাঁদের সম্পর্কে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে 'ছুল্‌লাতুম মিনাল আউয়ালিন' (পূর্ববর্তীগণের মধ্যে অধিক সংখ্যক এবং সাহাবী নন, এমন সিদ্দীকগণ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'ওয়াক্বলীলুম মিনা আখিরীন' (আর পরবর্তীগণের মধ্যে অল্পসংখ্যক)। সিদ্দীকগণ গুণরাজি ও শানসমূহের বৃত্ত অতিক্রম করে উপনীত হন নিছক সত্তা সকাশে এবং সেখান থেকেই সরাসরি আহরণ করেন নূর। অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্তা থেকে তাঁদের উপরে ঘটে জ্যোতিসম্পাত। গুণরাজি ও শানসমূহের পর্দা তখন থাকেই না। সিদ্দীকগণের এই দুই শ্রেণী সম্পর্কে অবশ্য আলোচ্য আয়াতে কোনো ইঙ্গিত নেই। 'নূরের উপরে নূর' কথাটি তাই এখানে কেবল আউলিয়াগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কথাটির অর্থ— নূরের উপরেও যেহেতু নূর আছে, তাই বুঝতে হবে আউলিয়াগণের বেলায়েতের মধ্যে আছে অনেক স্তরগত পার্থক্য।

www.eelm.weebly.com

'ইয়াহদিয়াল্লহু লিনূরিহী মাঁইয়াশা-উ' অর্থ 'আল্লাহ্ তাঁর নূর দ্বারা যাকে ইচ্ছা তাকে পথপ্রদর্শন করেন'। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করেছেন অন্ধকারে, অতঃপর তার উপরে ঘটিয়েছেন নূরের সন্নিপাত। ওই নূরের ছটা যে পেয়েছে, সে-ই পেয়েছে পথের সন্ধান। আর যে পায়নি, সে হয়েছে পথভ্রষ্ট। তাই আমি বলি, শুকিয়ে গিয়েছে ললাটলিপি লিপিবদ্ধ করার কালি। আহমদ, তিরমিজি। এর অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন অজ্ঞতার অন্ধকারে। তারপর তার উপরে নিক্ষেপ করেছেন নূর। ওই নূরের ঝলক যে পেয়েছে, সে পেয়েছে হেদায়েত এবং যে পায়নি, সে হয়েছে গোমরাহ্। আর ওই নূর সমগ্র সৃষ্টিতে প্রতিসরিত ও পরিব্যপ্ত হয়েছে বিশ্বসমূহের রহমতরূপী রসুল স. এর মাধ্যমে এভাবে— তাঁর বক্ষদেশকে করা হয়েছে সম্প্রসারিত, তারপর তাতে ঢেলে দেয়া হয়েছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নূর। পরিপূর্ণ করা হয়েছে তাঁর বিশ্বাসকে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁকেই একমাত্র অনুসরণীয় বলে মেনে নিলো, সে হয়ে গেলো ওই রহমতের আয়না, হলো ওই রহমতের নূরে সমুজ্জ্বল, প্রোজ্জ্বল ও সাধ্যমতো পরিপূর্ণ।

মানুষ তিন ধরনের— ১. যাঁরা লাভ করেছেন অক্ষয় বিশ্বাস। লাভ করেছেন পরিত্রাণ, দুনিয়ায় পাপ থেকে এবং আখেরাতে দোজখ থেকে। ২. যারা লাভ করে বিশ্বাসের মূল তত্ত্ব— এ তত্ত্ব আবার বহু স্তরবিশিষ্ট। ৩. যারা বিশ্বাসবিচ্যুত, এরাই পথহারা, গোমরাহ।

হজরত আবু আমবাসা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ্র নূরের আধার । অর্থাৎ পুণ্যবানগণের হৃদয় আল্লাহ্র নূরে পরিপূর্ণ। তাই তাঁরা হন বিনয়াবণত ও নম্র। তাঁরাই আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন।

'ওয়া ইয়াদ্বরিবুল্লহুল আমছালা লিন্নাস' (আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন)। একথার অর্থ— আল্লাহ্ দুর্বোধ্য বিষয়াবলীকে বোধগম্য করবার জন্য উৎকৃষ্ট উপমার অবতারণা করে থাকেন। আলোচ্য বাক্যের অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়ভাজনগণকে উপমার জগতে ওই সকল বিষয়াবলীর প্রতিচ্ছবি দর্শন করান, বাস্তব জগতে যার কোনো সাদৃশ্য নেই। এটাকে সত্যদর্শনও বলা যেতে পারে। বান্দাগণ যে আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন হন, তা তো কোরআন ও হাদিসের দ্বারা সুপ্রমাণিত। কিন্তু এই নৈকট্যের স্বরূপ বর্ণনা করা অসম্ভব। ওই অবস্থা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অনুভূতির অতীত। বুদ্ধি-প্রজ্ঞা কোনোকিছুই ওই স্থান পর্যন্ত উপনীত হতে পারে না। অর্জিত জ্ঞান-আত্মজ্ঞান

www.eelm.weebly.com

(ইলমে হুসুলী-ইলমে হুজুরী) কোনো জ্ঞানের সঙ্গে ওই নৈকট্যবোধের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং ওই জ্ঞান দান করা হয় সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। এই অবস্থাকেই হাদিসে কুদসীতে পরোক্ষ ইঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— 'আমি হই তার কর্ণ ও শ্রবণ, যার দ্বারা সে শোনে ও দেখে'। সত্তাসম্পৃক্ত সরাসরি এই প্রাপ্তি অন্য একটি মাধ্যমেও হওয়া সম্ভব। তা হচ্ছে উপমার জগত। ওই জগতে এমন আকৃতি প্রতিভাসিত হয়, বাস্তব জগতে যার কোনো আকৃতি নেই। যেমন— শত্রুতা, ভালোবাসা, সত্যবাদিতা, জ্ঞান, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, অজ্ঞতা ইত্যাদি। অবশ্য বাস্তব জগতে বা পৃথিবীতে এগুলোর প্রকাশস্থল বিদ্যমান। সুফী-আউলিয়াগণ উপমার জগতে এগুলো দেখে থাকেন প্রতিবিম্বের বৃত্তে। তাঁদের নফল ইবাদত যতো বিশুদ্ধ হয়, ততোই তাঁদের ওই দর্শন লাভ করে অধিকতর নৈকট্য। পরিশেষে ওই বৃত্তের গভীরে হারিয়ে যায় তাঁদের সত্তা। এভাবে তাঁরা স্পর্শ করেন আল্লাহ্‌র গুণাবলীর সর্বশেষ সীমানা এবং পরিপূর্ণরূপে রঞ্জিত হয়ে যান আল্লাহ্‌র গুণাবলীর রঙে। প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোনো রঙও নেই। কারণ ওই স্তর রঙের অতীত। ভাষা ওই অবস্থা প্রকাশ করতে অক্ষম। 'রঙ' শব্দটি তাই ব্যবহার করা হয়েছে নিরূপায় হয়ে। এ অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে আর একটি আয়াতে এভাবে— 'আমি তাদেরকে তাদের অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে নিদর্শন দেখিয়ে থাকি, যেনো তাদের সামনে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌ই সত্য'।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ অবগতিবিহীন কোনো তথ্য প্রকাশ করেন না, অজ্ঞতাপ্রসূত কোনো উপমাও দেন না। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ, তাঁর জ্ঞান সর্বত্রগামী।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৩৬

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ○

❒ আল্লাহ্ তাঁহার নাম স্মরণ করিবার জন্য যে সব গৃহকে মর্যাদায় উন্নত করিয়াছেন সেথায় সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,

---

এখানে 'সেই সকল গৃহ' অর্থ সেই সকল মসজিদ। সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৃথিবীর মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌র গৃহ। পৃথিবীবাসীদের দৃষ্টিতে আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ যেমন সমুজ্জ্বল,আকাশবাসীদের

www.eelm.weebly.com

দৃষ্টিতে পৃথিবীর মসজিদসমূহও তেমনি। আর মসজিদসমূহ সমুন্নত করার অর্থ পৃথিবীতে মসজিদসমূহ নির্মাণ করা। এরকম বলেছেন মুজাহিদ।

এখানে 'রফা' অর্থ সমুন্নত করা বা প্রতিষ্ঠা করা। শব্দটি 'প্রতিষ্ঠা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন— 'ওয়া ইজ্ ইয়ুরফাউ' ইবরাহীমু ক্বাওয়াইদা মিনাল বাইতি ওয়া ইসমাইল' (যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল আল্লাহ্‌র গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলো)। রসুল স. বলেছেন, যে আল্লাহ্‌র স্মরণ প্রতিষ্ঠার জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ্ তার জন্য গৃহ নির্মাণ করবেন জান্নাতে। হাদিসটি বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন হজরত ওসমান থেকে।

হাসান বলেছেন, এখানকার 'আজিনাল্লহু আন তুরফায়া' কথাটির অর্থ 'আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর গৃহের সম্মান করতে'। অর্থাৎ মসজিদে অশ্লীল ও অনর্থক কথা বলা যাবে না। 'আন তাহ্হিরা বাইতিয়া' আয়াতটির অর্থও এরকম। অর্থাৎ মসজিদে নিরর্থক ও অসুন্দর কথা বলা যাবেই না। সালেহ্ ইবনে হাব্বান সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেন, হজরত বুরাইদা বলেছেন, কেবল চারটি মসজিদ মহাসম্মানিত, যেগুলো নির্মাণ করেছেন পয়গম্বরগণ। কাবা মসজিদ তৈরী করেছেন হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসমাইল, বায়তুল মাকদিস নির্মাণ করেছেন হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মান। আর মদীনার মসজিদ ও মসজিদে কোবা প্রতিষ্ঠা করেছেন রসুল স. স্বয়ং। এর মধ্যে কোবা মসজিদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটা ওই মসজিদ যা প্রথম দিবস থেকেই তাকওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

আমি বলি, যদিও উল্লেখিত মসজিদ চতুষ্টয় মহাসম্মানিত, তবুও এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই যে, এখানে বলা হয়েছে কেবল ওই চারটি মসজিদের কথা। বরং সকল মসজিদই এখানকার বক্তব্যভূত। আবার এরকম বলারও কোনো কারণ নেই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর নূরের যে উপমা দিয়েছেন, সেই নূর হচ্ছে মসজিদসমূহে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ বা আলো। আমার কাছে এরকম ব্যাখ্যা দুর্বল। পূর্ববর্তী আয়াতের প্রসঙ্গ এই আয়াতে প্রবহমান নয়। আর এমতো ব্যাখ্যাও ভিত্তিহীন যে, মসজিদে ব্যবহৃত কাঁচ নির্মিত ঝাড়বাতির সঙ্গে রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'দীপাধার' 'প্রদীপ' ইত্যাদির সম্পৃক্তি। কারণ ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদের গৃহেও এর চেয়ে সুন্দর ও উজ্জ্বল ঝাড়বাতি ব্যবহৃত হয়। এরকম বলাই বরং সুসঙ্গত হবে যে, পূর্ববর্তী আয়াতের 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন তাঁর জ্যোতির দিকে' কথাটির সঙ্গে রয়েছে এই আয়াতের বক্তব্যগত সংযোগ। কারণ মসজিদে ইতেকাফকারী ও নামাজ সম্পাদনকারীরাই সাধারণতঃ পথ পেয়ে থাকেন আল্লাহ্‌র নূরের দিকে। রসুল স. বলেছেন, নামাজ মুমিনগণের মেরাজ। আরো আজ্ঞা করেছেন, বান্দা সেজদাবনত অবস্থায় লাভ করে তার প্রভুপালকের

www.eelm.weebly.com

অধিকতর নৈকট্য। সুতরাং তোমরা সেজদাবনত অবস্থায় অধিক প্রার্থনা কোরো। মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

এরকম হওয়াও সম্ভব যে, এখানকার বক্তব্যটির সম্পর্ক রয়েছে একটি অনুক্ত নির্দেশের সঙ্গে। যদি তাই হয়, তবে কথাটি দাঁড়ায়— তোমরা আল্লাহ্র গৃহসমূহে তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করো।

'ওয়া ইউজকারা ফীহাসমুহু' অর্থ— আল্লাহ্ এরকমও নির্দেশ দিয়েছেন যে ওই গৃহসমূহে যেনো আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হয়— নামাজে হোক, অথবা নামাজের বাইরে। হজরত ইবনে আব্বাস 'তাঁর নাম স্মরণ করবার জন্য' কথাটির অর্থ করেছেন— তাঁর কিতাব পাঠ করবার জন্য।

'ইউসাব্বিহু লাহু ফীহা বিল গুদুয়্যি ওয়াল আসল' অর্থ কিছুসংখ্যক লোক ওই গৃহসমূহে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার অর্থ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পাঠ করা। মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয় তো নামাজ পাঠের জন্যই। ফজরের নামাজ হচ্ছে সকালের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা এবং অবশিষ্ট চার ওয়াক্তের নামাজ হচ্ছে সন্ধ্যার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা। 'আসাল' শব্দটি এখানে বহুবচনার্থক। এর অর্থ দিবসের শেষাংশ। কেউ কেউ বলেছেন, সকাল-সন্ধ্যার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনার কথা বলে এখানে বুঝানো হয়েছে কেবল ফজর ও আসর নামাজকে। বিশেষভাবে এই দুই ওয়াক্তের নামাজের গুরুত্ব অত্যধিক। কারণ ফজরের সময়ে মানুষ থাকে সাধারণত নিদ্রামগ্ন এবং আসরের সময়ে থাকে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় মুখর। তাই রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দুই শীতলতার সময়ের নামাজ পড়বে, সে প্রবেশ করবে জান্নাতে। মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু মুসা থেকে। আর আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'নামাজের যত্ন কোরো, বিশেষতঃ মধ্যবর্তী নামাজের' (আসরের)।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সকালের পবিত্রতা বর্ণনা হচ্ছে চাশতের নামাজ। কারণ রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ওজু করে নামাজ পড়তে যায়, সে লাভ করে ইহরামবদ্ধ হজ পালনকারীর সমান পুণ্য। আর যে ব্যক্তি এভাবে পবিত্র হয়ে চাশতের নামাজ পড়তে যায়, সে লাভ করে ওমরা পালনকারীর সমান সওয়াব। তদুপরি তার আমলনামায় লিখে দেয়া হয় পরবর্তী ওয়াক্তের নামাজ পাঠ করার মতো পুণ্য।

www.eelm.weebly.com

বাগবী ও তিবরানী হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পদব্রজে ফরজ নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে গমন করে, সে যেনো পালন করে একটি হজ। আর যে ব্যক্তি গমন করে নফল নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে, সে যেনো পালন করে একটি নফল ওমরা।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৩৭, ৩৮

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ
اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۝
لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ
مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

❑ সেই সব লোক, যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহের স্মরণ হইতে এবং সালাত কায়েম ও জাকাত প্রদান হইতে বিরত রাখে না, তাহারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাহাদিগের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িবে।

❑ তাহারা আল্লাহের মহিমা ঘোষণা করে যাহাতে তাহারা যে-সৎকর্ম করে তজ্জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগের প্রাপ্যের অধিক দেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে এবং সালাত কায়েম ও জাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না'। এখানে 'রিজ্বালুন' অর্থ সেই সব লোক। অর্থাৎ সেই সকল পুরুষ। লক্ষণীয়, এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে কেবল পুরুষদের কথা। কারণ মেয়েদের জন্য সাধারণতঃ জামাতে নামাজ পাঠ ও জুমআ আদায়ের জন্য মসজিদে গমন করা অত্যাবশ্যক নয়। অথবা মেয়েরা সাধারণতঃ হয় অসতর্কা ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্না। তাই তাদের কথা এখানে রয়েছে অনুল্লেখিত।

'তিজ্বারাত' অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়। এরপর বায়উন (বিক্রয়) শব্দটির উল্লেখের কোনো প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'বিক্রয়' কথাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে একারণে যে, ক্রয় অপেক্ষা বিক্রয়ের গুরুত্ব অধিক। ক্রয়ের মধ্যে রয়েছে উপকার, কিন্তু বিক্রয়ের মধ্যে রয়েছে নগদ অর্থপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা। কেউ কেউ আবার বলেন, 'তিজ্বারাত' এর অর্থ এখানে 'ক্রয়-বিক্রয়' না হয়ে হবে

www.eelm.weebly.com

কেবল 'ক্রয়' এবং 'বায়' অর্থ বিক্রয়। এভাবে শব্দ দু'টোর সম্মিলিত অর্থ দাঁড়াবে ক্রয়-বিক্রয়। অথবা 'তিজারাত' অর্থ ব্যবসা বাণিজ্য এবং 'বায়' অর্থ ক্রয়-বিক্রয়। উল্লেখ্য, ক্রয় হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রারম্ভিকা।

কোনো কোনো আলেম বলেন, 'তিজ্বারাত' এর উদ্দেশ্য এখানে আদান-প্রদানের উপকারিতা। এরপর 'বায়' উল্লেখ করে প্রকাশ করা হয়েছে বিক্রয়ের গুরুত্বকে। ফাররা বলেন, 'তিজ্বারাত' এর সম্পর্ক আমদানীকারকদের সঙ্গে আর রপ্তানীকারকদের সম্পর্ক 'বায়' এর।

'জিকরিল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র স্মরণ) অর্থ নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন। সালেম সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, একবার আমি ছিলাম বাজারে। এমন সময় নামাজের একামত শুরু হলো। বাজারের লোকজন দোকান পাট বন্ধ করে শামিল হলো নামাজের জামাতে। তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

অথবা এখানে 'জিকরিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র সার্বক্ষণিক জিকির। এভাবে 'জিকির' শব্দটি হবে ব্যাপক অর্থবোধক। ওই সকল ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে যারা সর্বক্ষণ থাকে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন। অন্তর্ভুক্ত হবে ওই সকল লোকও, যারা জাগতিক কাজকর্ম পরিহার করে না বটে, কিন্তু যাদের অন্তর থাকে সতত স্মরণমুখর। ব্যবসা-বাণিজ্য ও পার্থিব দায়িত্ব যাদের অন্তরকে আল্লাহ্‌র স্মরণচ্যুত করতে পারে না। অর্থাৎ তাদের বাহির পৃথিবীর প্রয়োজন সমূহের সঙ্গে সংযুক্ত, কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ পার্থিবতা থেকে বিমুখ।

'ইক্বামিস্ সালাত' অর্থ নামাজ প্রতিষ্ঠা। বাগবী লিখেছেন, নামাজ প্রতিষ্ঠার অর্থ যথাসময়ে নামাজ পাঠ। যথাসময়ে যারা নামাজ পাঠ করে না, তারা নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী নয়।

'ওয়া ঈতাইয্‌যাকাত' অর্থ জাকাত প্রদান। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ যথানিয়মে, যথাসময়ে ও যথাপাত্রে যারা জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত থাকে না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'জাকাত' অর্থ সকল প্রকার পুণ্যকর্ম।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা ভয় করে সেই দিনকে। যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়বে'।

এখানে 'তাতাক্বাল্লাবু' অর্থ ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়বে বা উলটপালট হয়ে যাবে। কেউ কেউ অর্থ করেছেন— সেদিন অবিশ্বাসীদের অন্তর অবস্থান গ্রহণ করবে অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতার বিপরীতে। তাদের দৃষ্টি থেকে সরে যাবে ভ্রষ্টতার পর্দা। তাদেরকে দেখানো হবে এমন দৃশ্যাবলী, যা তারা কখনো দেখেনি

www.eelm.weebly.com

এবং যা তারা ইতোপূর্বে কল্পনাও করতে পারেনি। বিশ্বাসীগণের অবস্থা হবে অন্যরকম। তারা তো পূর্ব থেকেই অনুগত ও তুষ্ট ছিলো আল্লাহ্র বিধানাবলীর প্রতি। তাই সেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি হয়ে যাবে পরিবর্তিত। তারা তখন তাদের প্রভুপালককে দেখবে চতুর্দশীর চন্দ্র অথবা চতুর্থ প্রহরের সূর্যের মতো।

কেউ কেউ বলেছেন, সেদিন শাস্তির ভয় ও মুক্তির আশায় বিহ্বল ও চঞ্চল হয়ে পড়বে বিশ্বাসীগণের অন্তরও। দৃষ্টি সঞ্চালিত হবে এদিকে ওদিকে। ক্ষণে ক্ষণে শংকিত ও আশান্বিত হয়ে দেখতে থাকবে কোনদিক থেকে আসবে ডাক— বাম দিক থেকে, না ডান দিক থেকে। আমলনামাই বা হাতে আসবে কী ভাবে, সম্মুখ থেকে, না পশ্চাৎ দিক থেকে, না উল্টো ঘুরে। কোনো কোনো আলেম কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সে দিন ভয়ে ও ত্রাসে তাদের অন্তর্দেশে ঘটবে বিপর্যয়। অন্তর আটকে যাবে কণ্ঠদেশে— নিচেও নামবে না, যেতে পারবে না উপরেও। আর তখনকার ভয়াবহ অবস্থা দেখে চোখ হয়ে যাবে নিষ্পলক, পাথরের মতো নিশ্চল, অথবা দৃষ্টিবিবর্জিত।

পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা করে যাতে তারা যে সৎকর্ম করে, তজ্জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন'। আলোচ্য বাক্যের সম্পর্ক রয়েছে ৩৬ সংখ্যক আয়াতের 'ইউসাব্বিহু' (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে), অথবা ৩৭ সংখ্যক আয়াতের 'তুলহীহিম' (ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত রাখে না) এর সঙ্গে। তাই বলা যায় আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। অথবা আলোচ্য বাক্যের সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়বে' কথাটির সঙ্গে। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের শুরুতে লিখিত 'লাম' অক্ষরটি হবে প্রতিফলজ্ঞাপক। তখন বলতে হবে, পূর্ববর্তী আয়াতের উদ্দেশ্য বা কারণ বর্ণনা আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য নয়। কেননা ভয় ইত্যাদি ইচ্ছাধীন বিষয় নয়, কিন্তু উদ্দেশ্য ও কারণ স্বেচ্ছানির্ভর কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

'ওয়া ইয়াযীদাহুম মিন ফাদ্বলিহী' অর্থ 'এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন'। অর্থাৎ আমলের প্রতিদান প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ দিয়েছেন, দান করে তার চেয়ে বেশী, যা তাদের প্রাপ্য নয়, যা তাদের প্রতি প্রদত্ত দয়া এবং যা ছিলো তাদের ধারণার অতীত।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। একথার অর্থ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন অগণন জীবনোপকরণ। তাঁর অভিপ্রায়কে রোধ করার সাধ্য কারো নেই। কারণ তিনি যে তাঁর অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে সতত স্বাধীন, চিরমুক্ত।

www.eelm.weebly.com

وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْـَٔانُ مَآءً ۖ حَتّٰىٓ
إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَوَجَدَ اللّٰهَ عِندَهُۥ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهُۥ ۗ وَاللّٰهُ
سَرِيعُ الْحِسَابِ ○ أَوْ كَظُلُمٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ
مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ۚ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ
يَكَدْ يَرٰىهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ○

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগের কর্ম মরুভূমির মরীচিকাসম, পিপাসার্ত যাহাকে পানি মনে করিয়া থাকে কিন্তু সে উহার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিবে উহা কিছুই নহে এবং সে পাইবে সেথায় আল্লাহ্কে অতঃপর তিনি তাহার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

❒ অথবা উহাদিগের কর্মের উপমা অন্ধকার অতল সমুদ্রের, যাহাকে উদ্বেলিত করে তরংগের পর তরংগ, যাহার উর্ধ্ব দেশে ঘনমেঘ, এক অন্ধকারের উপর আর এক অন্ধকার, হাত বাহির করিলে তাহা একেবারেই দেখিতে পাইবে না। আল্লাহ্ যাহাকে জ্যোতি দান করেন না তাহার জন্য কোনও জ্যোতিই নাই।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাবিচারের দিবসে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের আমল তাদের কোনো উপকারে আসবে না। কারণ তা মরুভূমির মরীচিকার মতো অস্তিত্বহীন। মরুভূমির পিপাসার্ত পথিকেরা মরীচিকাকে পানি মনে করে কাছে যায়, কিন্তু কিছুই পায় না। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীও তেমনি তাদের স্বকপোলকল্পিত পুণ্যকর্মের বিনিময় আখেরাতে পাবে না। সেখানে পাবে কেবল আল্লাহ্র সিদ্ধান্তকে। আল্লাহ্ তখন তাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের শাস্তি দিবেন পূর্ণ মাত্রায়। তখন সকলেরই হিসাব গ্রহণ করবেন তিনি। একজনের হিসাব গ্রহণ অন্য একজনের হিসাব গ্রহণকে বিলম্বিত করবে না। পৃথিবীর অর্ধদিবসের সমান সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত হবে সকলের হিসাব। সুতরাং একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, তিনি হিসাব গ্রহণে অতুলনীয়রূপে তৎপর।

অবিশ্বাসীদের কর্মসমূহ সেদিন হবে নিষ্ফল। মরীচিকার মতো। মরীচিকা বলে চাকচিক্যময় বালুরাশিকে যা দৃষ্টিগোচর হয় মরুভূমিতে। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রৌদ্রতাপে দূর থেকে ওই বালুকারাশী ভ্রম হয় পানি বলে।

www.eelm.weebly.com

'ক্বীয়া'হ' এবং 'ক্বায়' অর্থ একটি সমতল প্রান্তর। এর বহুবচনবোধক সর্বনাম হচ্ছে 'ক্বীয়ান'। আর 'ক্বুয়াইইন' হচ্ছে তাসগীরের (ন্যূনতাসূচক তার) শব্দরূপ। কেউ কেউ বলেছেন, 'ক্বীয়াতুন' হচ্ছে 'ক্বাউন' এর বহুবচন। মরুভূমির প্রান্তরসমূহে দূর থেকে দর্শনীয় মরীচিকাকে মনে হয় পানি। সেই মরীচিকাকেই এখানে উপমা করা হয়েছে কাফেরদের কর্মসমূহের পরিণামের। এভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ব্যর্থতাই তাদের অবশেষ পরিণাম।

একটি সন্দেহ ঃ 'সে সেথায় পাবে আল্লাহ্কে' কথাটির অর্থ এখানে— সে মহাবিচারের দিবসে যখন তার হিসাব গ্রহণের স্থানে উপস্থিত হবে, তখন পাবে তার জন্য প্রস্তুত আল্লাহ্র শাস্তির সিদ্ধান্তকে অথবা শাস্তিকে। তাহলে কীভাবে বলা যাবে যে এখানকার 'ওয়াজ্বাদা' (সে পেলো) এর সর্বনামের সম্পর্ক হবে 'সে সত্যপ্রত্যাখ্যান করে'(কাফারু) এর সঙ্গে। যেখানে মরীচিকার মতো কাল্পনিকতা দৃষ্ট হয়, সেখানে আল্লাহ্কে লাভ করা তো একটি অতীব ভ্রান্তিপূর্ণ কথা।

সন্দেহের নিরসন ঃ আমার মতে উত্থাপিত প্রশ্নটির উত্তর দেয়া যেতে পারে দুইভাবে— ১. শেষ বিচারের দিবসে কাফেরেরা হবে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত। তখন পানির আকারে তার সামনে দেখা দিবে আগুন। পানি মনে করে সে তখন সেদিকেই ছুটে যাবে। কিন্তু কাংখিত পানির বদলে সেখানে পাবে আল্লাহ্র আযাবরূপী আগুন। এভাবে তার প্রচেষ্টা পর্যবসিত হবে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায়। ২. এখানে যে আযাবের কথা বলা হয়েছে, সে আযাব আখেরাতের নয়, দুনিয়ার। মানুষের অপকর্মই পার্থিব বিপদাপদসমূহের কারণ যার মর্মার্থ দুঃখ, অসফলতা। অধিক তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মরীচিকার সামনে পড়লে যেমন হয়।। তাই অন্যত্র এরশাদ হয়েছে— 'তোমাদের উপরে যে বিপদ পতিত হয়, তা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল'। আর আল্লাহ্ তোমাদের অনেক অপরাধ ক্ষমা করে দেন (নতুবা শাস্তি হতো আরো অনেক বেশী)।

উত্তম উপায় হচ্ছে, 'হাত্তা' অর্থাৎ 'তার নিকট উপস্থিত হলে' কথাটিকে এখানে প্রারম্ভিকা ধরে নিলে একথা মেনে নিতে হবে যে, এর সম্পর্ক রয়েছে 'আ'মালুহুম কাসারাবিন' (তাদের কর্ম মরীচিকাময়) এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী যখন সেখানে তাদের আপনাপন আমলের নিকটে পৌছবে এবং হিসাব প্রদানের কাজ শেষ করবে, তখন দেখবে সম্মুখে কেবল আল্লাহ্র শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। অতএব বুঝতে হবে এখানকার 'জ্বাআহু' কথাটির ''জ্বাআ' শব্দের সর্বনাম সম্পৃক্ত হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে, 'জামআন' এর সঙ্গে হবে না। আর 'হু' সর্বনামটির সম্পর্ক হবে আমল বা কর্মের সঙ্গে। মরীচিকার সঙ্গে নয়।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে — 'আর আল্লাহ্পাক দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অর্থাৎ একের হিসাব গ্রহণের বেলায় বিলম্বিত হবে না আরেকজনের হিসাব গ্রহণ। পৃথিবীর অর্ধ দিবস পরিমাণ সময়ের মধ্যে সাঙ্গ হবে হিসাব নিকাশ।

পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'অথবা তাদের কর্মের উপমা অন্ধকার অতল সমুদ্রের, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের পর তরঙ্গ'। এখানকার 'অন্ধকার' কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে মরীচিকার সঙ্গে। এভাবে বলা হয়েছে, তাদের কর্মসমূহ মরীচিকার মতো অথবা ঘন অন্ধকারের মতো, যে অন্ধকার জমাট বেঁধে থাকে অতল সমুদ্র সম তলদেশে। তাই পরবর্তী পৃথিবীতে তাদের কর্মসমূহ হবে অকল্যাণকর ও আক্ষেপ-উদ্রেকক।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'অথবা' উল্লেখ করে এখানে বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কর্মসমূহের প্রকারগত পার্থক্যের কথা। কারণ তাদের পাপকর্মের সাথে থাকে কিছু কিছু পুণ্যকর্মও— যেমন দান-ধ্যান, বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সদাচরণ ইত্যাদি। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের প্রথম প্রকারের আমল মরীচিকার মতো এবং দ্বিতীয় প্রকারের আমল অন্ধকারের মতো। কিংবা এখানে এরকম বলার সুযোগও রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে প্রকাশ করা হয়েছে তাদের আমলের সময়গত ও স্থানগত বিভাজনকে। বলা হয়েছে, আখেরাতে তাদের আমল মরুভূমিতে পরিদৃষ্ট মরীচিকার মতো এবং দুনিয়ায় ঘোর অন্ধকার সমুদ্র সদৃশ।

'লুজ্জীয়্যিন' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই আঁধারকে যা বিদ্যমান থাকে অথৈসমুদ্রের অভ্যন্তরভাগে। 'লুজ্জুন' অর্থ ওই হ্রদ বা জলাশয়, যেখানে পানি আবদ্ধ থাকে। বায়যাবী বলেছেন, 'লুজ্জীয়্যিন' অর্থ সমুদ্রের ওই অংশ, যেখানে থাকে অতল সলিল। 'নেহায়া' ও 'কামুস' গ্রন্থে বলা হয়েছে, শব্দটির অর্থ অনেক পানি। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র। 'মাওজুন' অর্থ তরঙ্গের পর তরঙ্গ, যা উদ্বেলিত হয় ক্ষিপ্র বাতাসের প্রভাবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যার উর্দ্ধদেশে ঘনমেঘ, এক অন্ধকারের উপরে আরেক অন্ধকার, হাত বের করলে তা একেবারেই দেখতে পাবে না'। একথার অর্থ— সমুদ্রজ তমসাই কেবল নয় তার উপরে রয়েছে ঘন ও পুঞ্জীভূত মেঘ, যা চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রপুঞ্জের দ্যুতিরোধক। এভাবে এক অন্ধকারের উপরে আর এক অন্ধকার। এরূপ অন্ধকারে নিপতিত ব্যক্তি কি তার হাত বের করলে দেখতে পায়? পায় না। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তো এরকম অন্ধকারেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

উল্লেখ্য, এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তুলনা করা হয়েছে তরঙ্গসংক্ষুব্ধ ঘোর অন্ধকার সমুদ্রের ও ঘনকালো জমাট মেঘমালার নিচে আটকে পড়া পথহারা এক নাবিকের সঙ্গে, যদিও এখানে সে নাবিকের স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

www.eelm.weebly.com

প্রকৃত কথা এই যে, কাফেরদের অপকর্মসমূহের কালিমা তাদের অন্তরে স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে, যা তার সত্যোপলব্ধি ও পথপ্রাপ্তির অন্তরায়। সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবৃত্তি হচ্ছে তরঙ্গসংক্ষুব্ধ অতলান্তিক অন্ধকার সমুদ্রের মতো। তার উপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে চিরভ্রষ্টতার ঘনকালো মেঘের ছায়া সদৃশ মোহর। তাই তো তারা দেখতে পায় না ইমান ও ইসলামের চিরন্তন জ্যোতির্ময়তাকে। অস্বীকার করে মানুষের সর্বাপেক্ষা আপনজন নবী-রসুলগণকে। প্রত্যাখ্যান করে বসে তাদের আনীত গ্রন্থসমূহ ও সুস্পষ্ট নিদর্শনরাজিকে। উপাসনায় প্রলিপ্ত হয় এক ও অবিভাজ্য মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রতিপালনকর্তাকে ছেড়ে অন্যের বা অন্য কোনোকিছুর।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার জন্য কোনো জ্যোতিই নেই'। একথার অর্থ আল্লাহ্ যাকে পথপ্রদর্শন করেন না, সে কখনোই পথপ্রাপ্ত হয় না। পথপ্রাপ্তি বা হেদায়েত হচ্ছে আল্লাহ্র বিশেষ দয়া ও দান। জ্ঞান-বুদ্ধিও আল্লাহ্র দান, কিন্তু আল্লাহ্র দয়া ও নির্দেশনা ব্যতিরেকে তা কখনো লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হতে পারে না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, জাগতিক বিষয়ে প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও অনেকে পরবর্তী পৃথিবী সম্পর্কে উদাসীন ও অজ্ঞ। আবার পার্থিব বিষয়ে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ না হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ চিরন্তন কল্যাণের পথে আত্মসমর্পিত। রসুল স. জানিয়েছেন, আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকে অস্তিত্বায়িত করেছেন অন্ধকারে। তারপর তার উপরে ঘটিয়েছেন নূরের সন্নিপাত। ওই নূর যে লাভ করেছে, সে পেয়েছে হেদায়েত। আর যে ওই নূর পায়নি সে হয়ে গিয়েছে পথভ্রষ্ট। তাই আমি বলি, শুকিয়ে গিয়েছে অদৃষ্টলিপি লিপিবদ্ধ করার কলমের কালি।

মুকাতিল সূত্রে বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে উকবা ইবনে রবীয়া সম্পর্কে। মূর্খতার যুগে সে ছিলো সত্য ধর্মের অন্বেষক। তার স্বভাবে ও পোশাক পরিচ্ছদে প্রকাশ পেতো পৃথিবীর প্রতি অনাসক্তি। চটের পোশাক পরিধান করতো সে। কিন্তু যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটলো, তখন সে তাকে করলো প্রত্যাখ্যান।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৪১, ৪২

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَٰفَّٰتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

www.eelm.weebly.com

❒ তুমি কি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকুল আল্লাহের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? সকলেই তাহাদিগের প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। এবং উহারা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহেরই এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! প্রত্যাদেশ, বুদ্ধি, আত্মিক বিজ্ঞপ্তি ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে একথা তো আপনি অবশ্যই অবহিত যে, আকাশের ফেরেশতা, পৃথিবীর মানুষ, জ্বিন ও অন্যান্য সৃষ্টি এবং উড়ন্ত বিহঙ্গের পাল সকলেই তাদের নিজ নিজ ভাষা ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে নিরন্তর ঘোষণা করে চলেছে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা। আল্লাহ্র পবিত্রতা ও সপ্রশংস মহিমা বর্ণনের যথাপদ্ধতিও সকলের জানা। আর তাদের এমতো শুভকর্ম ও অন্যান্য কর্ম সম্পর্কেও আল্লাহ্ উত্তমরূপে অবগত। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ।

'মান' শব্দটি ব্যবহৃত হয় সকল বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টির ক্ষেত্রে। কারণ তাদের সাক্ষ্য অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তাই বুঝতে হবে এখানে 'মান' ব্যবহার করে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বিবেকবান সৃষ্টিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে 'ওয়াত্তত্বইরু সাফ্ফাতিন' (এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল)। পাখিদের কথা এভাবে আলাদা করে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, পাখি আকাশে ওড়াউড়ি করলেও তার আবাস পৃথিবীতে। তাই পাখির উল্লেখ এসেছে এখানে আলাদাভাবে।

'কুল্লুন্ ক্বদ্ আ'লিমা সলাতাহু ওয়া তাসবীহাহ্' অর্থ এবং সকলে তাদের প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার কথা জানে। এখানে 'সলাত' অর্থ দোয়া বা প্রার্থনা। এভাবে এখানকার শেষ বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্ তাদের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা ও প্রার্থনাসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ই সকলেরও সকলকিছুর একক অধিকর্তা। সকলের সকল কিছুর অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব, গুণাবলী ও কার্যকলাপেরও একক সৃজয়িতা ও তাদের প্রতিপালনকারীও তিনিই।

শেষে বলা হয়েছে— 'তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন'। একথার অর্থ— সকলের ও সকলকিছুর অবশেষ প্রত্যাবর্তন যে কেবল তাঁর দিকে, সে কথা সুনিশ্চিত। তখন সকলকে তিনিই দান করবেন যথাবিনিময়— পুরস্কার অথবা তিরস্কার। এমনকি পৃথিবীতে শিঙবিহীন ছাগল যদি শিঙবিশিষ্ট ছাগলের দ্বারা অত্যাচারিত হয়, তবে মহাবিচারের দিবসে অত্যাচারিত ছাগলকেও দিবেন প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ।

www.eelm.weebly.com

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ۙ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ

❑ তুমি কি দেখনা আল্লাহ্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, অতঃপর তাহাদিগকে একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, তুমি দেখিতে পাও, অতঃপর উহা হইত নির্গত হয় বারিধারা; আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হইতে তিনি বর্ষণ করেন শীলা এবং ইহা দ্বারা তিনি যাহাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর হইতে ইহা অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন। মেঘের বিদ্যুতঝলক দৃষ্টি-শক্তি প্রায় কাড়িয়া লয়।

❑ আল্লাহ্ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদিগের জন্য।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! এবিষয়টিও তো আপনার প্রত্যক্ষগোচর ও জ্ঞানগোচর যে, আল্লাহ্ই সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে। প্রথমে সেগুলো থাকে টুকরো টুকরো, অনুল্লেখ্য বস্তুর মতো। তিনিই সেগুলোকে একত্র করেন, করেন পুঞ্জীভূত। তারপর তা থেকে বর্ষণ করেন বৃষ্টি। আরো বর্ষণ করেন আকাশে ভাসমান শিলাস্তূপ বা বরফের পাহাড় থেকে শিলা বা বরফের টুকরা। সেই শিলাখণ্ডের মাধ্যমে তিনি কারো কারো হরণ করেন প্রাণ, ধ্বংস করেন কারো কারো ফসল ও অন্যান্য সম্পদ এবং কাউকে কাউকে বাঁচিয়ে দেন এমতো ক্ষতি থেকে। আবার মেঘজ বিদ্যুৎঝলক দেখুন কতো তীব্র, তীক্ষ্ণ, দৃষ্টিশক্তি নিষ্ক্রিয়ক। উল্লেখ্য, এখানে 'মিনাস্ সামায়ি মিন জ্বিবালিন' (আকাশস্থিত শিলাস্তূপ) কথাটির প্রথমোক্ত 'মিন' সূচনামূলক এবং শেষোক্তটি বর্ণনামূলক।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ এই আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আকাশে রয়েছে শিলাস্তূপ বা বরফের পাহাড়। অর্থাৎ আল্লাহ্ বরফের বড় বড় পাহাড়সদৃশ টিলা থেকে ঘটান শিলাবৃষ্টি।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, এতে শিক্ষা রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য। এখানে 'দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান' অর্থ দিনের পরে আনেন রাত্রি এবং রাত্রির পরে দিন। অথবা অর্থ হবে—হ্রাসবৃদ্ধি ঘটান দিবস ও রজনীর সময়ের পরিসরের। তাই শীতে ও গ্রীষ্মে দিন ও রাত হয়ে থাকে ছোট অথবা বড়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ এরশাদ করেন, আদম-সন্তান আমাকে দুঃখ দেয়। তারা দুর্নাম করে কালের। অথচ কালের বিবর্তন ঘটাই আমিই। আমারই নির্দেশে আবর্তিত হয় দিবস ও যামিনী।

'আলআবসার' অর্থ অন্তর্দৃষ্টি কর্তৃক অবলোকিত ও উপলব্ধ যথার্থ জ্ঞান। 'উলিল আবসার' অর্থ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। এভাবে 'শিক্ষা রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য' কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে মেঘপুঞ্জ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎঝলক, দিবস-বিভাবরীর নিয়মিত আবর্তন ইত্যাদি হচ্ছে এক অব্যয়, অক্ষয়, শাশ্বত ও আনুরূপ্যবিহীন মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রতিপালনকর্তার স্বয়ম্ভু অস্তিত্বের প্রমাণ। সকলকিছুই তাঁর অভিপ্রায়াধীন ও ক্ষমতায়ত্ব। সকলকে ও সকলকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে তাঁর জ্ঞান। মহাসৃষ্টি সর্ববিষয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী, আর তিনি সকল কিছু থেকে চিরঅমুখাপেক্ষী। এই মহাসত্যবোধ বিশ্বাসে, চিন্তায় ও কর্মে লালন করতে পারেন কেবল তাঁরাই, যারা অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তর্বোধসম্পন্ন।

সূরা নূর : আয়াত ৪৫, ৪৬

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

❒ আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে, উহাদিগের কতক বুকে ভর দিয়া চলে, কতক দুই পায়ে চলে এবং কতক চলে চারি পায়ে, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❒ আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করিয়াছি, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ অধিকাংশ প্রাণীকে অস্তিত্বায়িত করেছেন পানি থেকে। অধিকাংশ সমষ্টির তুল্য। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'কুল' (সমস্ত) শব্দটি। অর্থাৎ অধিকাংশ প্রাণীর অস্তিত্বই সলিলজ, অথবা বীর্য-উদ্ভূত। বীর্যও একপ্রকার পানি। কিন্তু কোনো কোনো প্রাণী অস্তিত্ব লাভ করে বীর্য ব্যতিরেকেই। আবার ফেরেশতা ও জ্বিন 'দাব্বাত' (জীব) পদবাচ্য নয়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'পানি থেকে' কথাটি জীবজগতের সৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। অর্থাৎ কথাটির মাধ্যমে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যাবলীকে। অর্থাৎ একথাই বলা এখানে উদ্দেশ্য যে, 'পানি থেকে' অথবা অন্য কোনো কিছু থেকে যা-ই বলা হোক না কেনো, সকলকিছুর একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্।

জ্ঞাতব্য ঃ এ্যারিস্টটল ও তাঁর অনুসারীগণ বলেছেন, প্রাণীসমূহের অস্তিত্বের মূল ভিত্তি চারটি— পানি, বাতাস, মাটি ও আগুন। ইবনে সিনা এগুলোর নাম দিয়েছেন 'উসত্বাকুস্সাত' (মৌল চতুষ্টয়)। কোনো কোনো গ্রীক দার্শনিকদের মতে সৃষ্টবস্তুসমূহের মূল উপাদান দু'টি। কেউ কেউ বলেছেন, কেবল বাতাস হচ্ছে সৃষ্ট বস্তুর মূল। পানি, মাটি ও আগুন হচ্ছে বাতাসেরই পরিবর্তিতরূপ।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সৃষ্টির মূল হচ্ছে পানি। পানিই ক্রমান্বয়ে জমাট বেঁধে পরিণত হয়েছে পাথরে। ওই পানিই আবার রূপান্তরিত হয়ে পরিণত হয়েছে বাতাস ও আগুনে। তাই বুঝতে হবে প্রতিটি প্রাণীর অস্তিত্বের মূল ভিত্তি হচ্ছে পানি।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্ প্রথমে সৃষ্টি করেছেন পানি। তারপর ওই পানির কিছু অংশকে বানিয়েছেন বাতাস। ওই বাতাস দ্বারা তৈরী করেছেন ফেরেশতামণ্ডলীকে। আবার কিছু অংশকে বানিয়েছেন আগুন, যার দ্বারা সৃষ্টি করেছেন জ্বিন। আবার তার কিছু অংশকে পরিণত করেছেন মৃত্তিকায়, যার দ্বারা সৃষ্টি করেছেন হজরত আদমকে। আর অবশিষ্ট মৃক্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন অন্যান্য প্রাণীকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে'। একথার অর্থ আল্লাহ্ কর্তৃক সৃজিত প্রাণীকুল বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তাদের কেউ কেউ দ্বিপদ বিশিষ্ট— যেমন, মানুষ, পক্ষীকুল। কেউ কেউ আবার চরণহীন। তারা পথ চলে বুকে ভর দিয়ে। যেমন সাপ ও অন্যান্য সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ চতুষ্পদ। তারা পথ চলে চার পায়ে ভর করে। এমন প্রাণীও রয়েছে যাদের পায়ের সংখ্যা

www.eelm.weebly.com

চারের অধিক। কিন্তু তাদের বিচরণও চতুষ্পদদের মতো। অর্থাৎ তারাও পথ চলবার সময়ে চতুষ্পদ জন্তুদের মতো মস্তক ও মুখ উপরের দিকে ওঠাতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'। একথার অর্থ আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টি করেন তাঁরই চিরস্বাধীন অভিপ্রায়ের অনুকূলে, যেহেতু তিনি তাঁর সত্তা, গুণাবলী, কার্যাবলী— সকল বিষয়ে চিরঅমুখাপেক্ষী। তিনিই তাঁর ইচ্ছা মতো 'মৌলিক' ও 'যৌগিক' সকল সৃষ্টিকে দিয়েছেন বিভিন্ন আকার, প্রকার, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে স্বাধীন ও সর্বশক্তিধর।

জ্ঞাতব্য ঃ গ্রীক দার্শনিকদের পরিভাষায় 'বাসিত্ব' বলে ওই সকল অবয়বকে, যাদের প্রতিটি অংশের নাম ও পরিচয় মূল পরিচয়ে বিধৃত। যেমন পানি। পানির প্রতিটি বিন্দুই পানি নামে অভিহিত ও পরিচিত। আর 'মোরাক্কাব' হচ্ছে ওই সকল বস্তু, যার ভগ্নাংশের নাম ও পরিচয় যায় বদলে। যেমন মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর শরীরের মূল উপাদান পানি, মাটি, বাতাস ও আগুন। কিন্তু চারটি পদার্থই ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত ও পরিচিত।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি'। একথার অর্থ— আমি তো অবতীর্ণ করেছি মহাগ্রন্থ আলকোরআন, যা সুস্পষ্ট নিদর্শনরাজিতে ভরপুর। অথবা অর্থ হবে— এই মহাসৃষ্টি যে আল্লাহ্তায়ালার আনুরূপ্যহীন নাম-গুণাবলীর ছায়া-প্রতিচ্ছায়া, তার সুস্পষ্ট প্রমাণপঞ্জী আমি সন্নিবেশিত করেছি এই কোরআনে। যার ফলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই মহাসৃষ্টিই আল্লাহ্র অস্তিত্বের ও তাঁর অতুলনীয় সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ। এভাবেই তো আমি মহাসত্যকে করেছি সুপ্রকাশিত।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে পরিচালিত করেন ইসলামের শাশ্বত-সুন্দর ও সরল পথে। ফলে সে পরিত্রাণ লাভ করে দোজখাগ্নি থেকে। পায় জান্নাত, সেই সাথে আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তোষ। উল্লেখ্য, এখানেও এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানটি প্রকাশ করা হয়েছে যে, ইমান সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্র অনুগ্রহনির্ভর। বুদ্ধি অথবা চিন্তা-ভাবনার সাহায্যে কখনো ইমান লাভ করা যায় না। কারণ আল্লাহ্ যেমন জ্ঞান-বুদ্ধি-ধারনা-কল্পনার অতীত, তেমনি তাঁর প্রতি নিষ্কলুষ বিশ্বাসও।

বাগবী লিখেছেন, এক ইহুদী ও এক মুনাফিকের মধ্যে ছিলো জমাজমি সংক্রান্ত বিবাদ। ইহুদীর ভাবনা ছিলো, বিবাদ-মীমাংসার জন্য রসুল স. এর শরণাপন্ন হওয়াই উত্তম। কারণ, সে জানতো তিনি স. ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু

www.eelm.weebly.com

মুনাফিক লোকটি বলে বসলো, চলো, আমরা কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে গিয়ে আমাদের বিবাদটা মিটিয়ে ফেলি। মোহাম্মদের কাছে যাওয়া ঠিক নয়। তিনি আমাদের অধিকার খর্ব করবেন। তার একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা নূর ঃ আয়াত ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ
بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ○ وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○ وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ
يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ○ اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ
يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ۚ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

❑ উহারা বলে, 'আমরা আল্লাহে ও রসূলে বিশ্বাসী এবং আমরা আনুগত্য করি;' কিন্তু ইহার পর উহাদিগের একদল মুখ ফিরাইয়া লয়; বস্তুতঃ উহারা বিশ্বাসী নহে।

❑ উহাদিগকে উহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের দিকে আহ্বান করিলে উহাদিগের একদল মুখ ফিরাইয়া লয়।

❑ সিদ্ধান্ত উহাদিগের স্বপক্ষে হইবে মনে করিলে উহারা বিনীতভাবে রসূলের নিকট ছুটিয়া আসে।

❑ উহাদিগের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না, উহারা সংশয় পোষণ করে? না উহারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল উহাদিগের প্রতি জুলুম করিবেন? বরং উহারাই তো সীমা লংঘনকারী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বিশার ও তার মতো অন্যান্য মুনাফিকেরা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করি। কিন্তু তাদের একথা মৌখিক, আন্তরিক নয়। কারণ পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকলে তারা আল্লাহ্র রসুলের মীমাংসা মানতে চায় না। উল্লেখ্য, এখানে 'তারা' বলে বুঝানো হয়েছে সকল মুনাফিককে। আর আলোচ্য আয়াতে এই সতর্কবাণীটিও উচ্চারিত হয়েছে যে, কেবল মুখে মুখে বিশ্বাসী হওয়ার কথা বললেই ইমানদার হওয়া যায় না। সে বিশ্বাস রাখতে হয় অন্তরেও। বস্তুতঃ অন্তরের বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'আল মু'মিনীন' এর আলিফ লাম সীমিত অর্থে ইঙ্গিত করা হয়েছে ওই সকল বিশ্বাসীর প্রতি যাদের অকপটতা ও একনিষ্ঠতা সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত। রসুল স.ও তাদেরকে প্রকৃত ইমানদার বলেই জানতেন। আলোচ্য আয়াতে সে দিকে ইঙ্গিত করেই বলে দেয়া হয়েছে যে 'বস্তুত তারা বিশ্বাসী নয়'। অর্থাৎ যারা কেবল মুখে মুখে তাদের ইমানকে প্রকাশ করে, তারা ওই সকল ইমানদারগণের মত বিশুদ্ধচিত্ত ও একনিষ্ঠ নয়।

হাসান বসরী থেকে অপরিণত সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, কতিপয় মুনাফিকের স্বভাব ছিলো এরকম— তাদের সঙ্গে কারো বিবাদ উপস্থিত হলে যখন তাদেরকে মীমাংসার জন্য রসুল স. এর শরণাপন্ন হতে বলা হতো, তখন যদি তারা সত্যদাবির উপরে থাকতো এবং মনে করতো যে, এই মীমাংসা হবে তাদের অনুকূলে, তাহলে তারা এমতো প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যেতো। আর যদি দেখতো সঠিক মীমাংসা করলে তা তাদের বিরুদ্ধে যাবে, তখন তারা রসুল স. এর শরণাপন্ন হতে অনীহা প্রকাশ করতো। বলতো, না, অমুক ব্যক্তিকে মীমাংসার দায়িত্ব দেয়া হোক। তাদের এ ধরনের মানসিকতা ও আচরণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াতটি(৪৮)।

বলা হয়েছে— 'তাদেরকে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দিকে আহ্বান করলে তাদের এক দল মুখ ফিরিয়ে নেয়'। এখানে 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দিকে' অর্থ আল্লাহ্র বিধান ও সেই বিধানানুসারে রসুলের সিদ্ধান্তের দিকে।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'সিদ্ধান্ত তাদের স্বপক্ষে হবে মনে করলে তারা বিনীতভাবে রসুলের নিকট ছুটে আসে'। একথার অর্থ— যদি তারা বুঝতে পারে যে সিদ্ধান্ত তাদের অনুকূল হবে, তবে তারা হয়ে যায় বিনয়ের অবতার। তৎক্ষণাৎ অবনত মস্তকে ছুটে যায় রসুলের কাছে ।

শেষোক্ত আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না, তারা সংশয় পোষণ করে? না, তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল তাদের উপরে জুলুম করবেন? বরং তারাই তো সীমালংঘনকারী'। একথার অর্থ— তাদের এহেন অপআচরণ তাহলে কোন বিষয়টি প্রমাণ করে? তাদের হৃদয় কি ব্যাধিগ্রস্ত? না সংশয়াচ্ছন্ন? কী কারণে হে আমার রসুল! আপনার প্রতি তারা এমতো অনাস্থা স্থাপন করলো? তবে কী তারা এই ভয়ে ভীত যে, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুল তাদের অধিকার হরণ করবেন? আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষে কি এরকম জুলুম হওয়ার কল্পনা করা যায়? কখনোই নয়। বরং বুঝতে হবে, তারাই জালেম, সীমালংঘনকারী। কারণ তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সিদ্ধান্তের প্রতি অনীহা প্রকাশ করার তিনটি কারণ বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে— ১. তাদের অন্তরের ব্যাধিগ্রস্ততা ২. বিচার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ ৩. সন্দেহ দু'টি বিষয়ের— বিশ্বাসভাজনতার এবং অধিকার হরণের। উল্লেখ্য, নবী রসুলগণের বিশ্বাসভাজনতা ও অধিকার রক্ষার যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। তাই শেষোক্ত কারণ দু'টিকে 'বরং' (বাল্) কথাটির মাধ্যমে নিবারণ করা হয়েছে। নিশ্চিত করা হয়েছে প্রথম কারণটিকে। অর্থাৎ বলা হয়েছে, নবী-রসুলগণের সুসিদ্ধান্ত প্রদানের যোগ্যতা যেহেতু সংশয়াতীত এবং কারো অধিকার ক্ষুণ্ন করার প্রবণতা যখন তাঁদের একেবারেই নেই, তাই বুঝতে হবে রসুল স. এর সিদ্ধান্ত মানতে না চাওয়ার কারণ হচ্ছে তাদের অন্তরের কপটতারূপ ব্যাধি, অন্য কিছু নয়। প্রকৃত অর্থে তারাই সীমালংঘনকারী, মুনাফিক। ইমানদার যদি তারা হতো, তবে অবশ্যই হৃষ্টচিত্তে আন্তরিক আস্থা ও বিনয় নিয়ে সরল বিশ্বাসে ধাবিত হতো রসুল স. এর যথাসিদ্ধান্তের দিকে।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُونَ ○ وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُلْ لَا تُقْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

❒ যখন বিশ্বাসীদিগকে তাহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাহারা তো কেবল এই কথাই বলে 'আমরা শ্রবণ করিলাম ও মান্য করিলাম' উহারাই সফলকাম।

❒ যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁহার শাস্তি হইতে সাবধান থাকে তাহারাই সফলকাম।

❒ উহারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহের শপথ করিয়া বলে যে, তুমি উহাদিগকে আদেশ করিলে উহারা জিহাদের জন্য বাহির হইবেই; তুমি বল, 'শপথ করিও না, তোমাদিগের আনুগত্য তো জানাই আছে! তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।'

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কিন্তু বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সতত অনুগত। তাই তাদেরকে যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সিদ্ধান্তের দিকে ডাকা হয়, তখন তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারণ করেন 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম'। এধরনের কাপট্যহীন সরলচিত্ত বিশ্বাসীরাই সফলকাম হবে, পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী উভয় স্থানে।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম'। একথার অর্থ— যারা সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্যকে, পাপের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার আশংকায় ভয় করে আল্লাহ্কে এবং সাবধান থাকে আল্লাহ্র নির্দেশের পরিপন্থী কর্মকাণ্ড থেকে, তারাই লাভ করে সাফল্য— দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে' অর্থ সুখ ও শোক উভয় অবস্থায় অনুগত থাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি।

'তাঁর শাস্তি থেকে সাবধান থাকে' অর্থ আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে যথাযথরূপে পালন করে তাঁর নির্দেশাদি ও বিরত থাকে তাঁর নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে।

এরপরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র শপথ করে বলে যে, তুমি তাদের আদেশ করলে তারা জেহাদের জন্য বের হবেই'। বাগবী লিখেছেন, এখানে উক্ত হয়েছে মুনাফিকদের বক্তব্য। তারা রসুল স. এর সম্মুখে শপথ করে বলতো, আল্লাহ্র কসম। আমরা সব সময় আপনার সঙ্গে থাকবো। যুদ্ধযাত্রা করতে বললেও পিছপা হবো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি বলো, শপথ কোরো না, তোমাদের আনুগত্য তো জানাই আছে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল মুনাফিককে জানিয়ে দিন, সাবধান! এভাবে মিথ্যা শপথ উচ্চারণ কোরো না। তোমাদের আনুগত্যের কপটতা সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা ভালো করেই জানেন।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার 'তোমাদের আনুগত্য তো জানাই আছে' কথাটির অর্থ— তোমাদের আনুগত্য বাহ্যিক, আন্তরিক নয়। অর্থাৎ মুখে মুখে আনুগত্যের ব্যাপারে কসম করলে কী হবে, অন্তরে তোমরা কদাচ অনুগত নও। এ বিষয়টি আল্লাহ্ উত্তমরূপে অবগত। কারণ তিনি অন্তর্যামী। কোনো কোনো তাফসীরকার কথাটির অর্থ করেছেন— তোমাদের এ মৌখিক আনুগত্য যে কপটতাময় ও আন্তরিক বিশ্বাসবিবর্জিত, সেকথা আল্লাহ্র অজানা নয়। মুকাতিল কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— তোমাদের নিকট থেকে আন্তরিক আনুগত্য

www.eelm.weebly.com

প্রকাশিত হওয়াই ছিলো বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তোমরা তা করতে পারো না। কারণ তোমরা মুনাফিক, মুমিন নও। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— তোমাদের এমতো কপট আনুগত্যের প্রত্যাশী আল্লাহ্ নন, প্রত্যাশী উত্তম আনুগত্যের।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা যা করো, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত'। এ কথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয় সম্পর্কেই তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত। সুতরাং কাপট্য ও ছল-চাতুরী তাঁর কাছে অচল।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৫৪

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

❒ বল, 'আল্লাহের আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তবে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদিগের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী; এবং তোমরা তাহার আনুগত্য করিলে সৎপথ পাইবে, রসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলে দিন, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্র ও তাঁর রসুলের। যদি তা না করো, তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, রসুলের কোনো অনিষ্ট হবে না। কারণ তাঁর দায়িত্ব ছিলো স্পষ্টভাবে আল্লাহ্র বিধান বর্ণনা করা, আর তোমাদের দায়িত্ব ছিলো যথানিয়মে তা পালন করা। সুতরাং সাবধান হও। রসুলের অনুসরণ করলে উপকৃত হবে তোমরাই। লাভ করবে জান্নাতের পথ। আর একথাও মনে রেখো যে, আল্লাহ্র বিধান স্পষ্টরূপে জানিয়ে দেয়া ছাড়া রসুলের আর কোনো দায়িত্ব নেই।

এখানে 'আল বালাগ' অর্থ জানিয়ে দেয়া বা পৌঁছে দেয়া। আর 'আল মুবিন' অর্থ স্পষ্টভাবে। এভাবে আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে এই শাশ্বত তথ্যটি জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র বার্তাবাহকগণের মূল দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ্রই নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা সমূহের সুস্পষ্ট প্রচার।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে তিবরানী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. যখন

www.eelm.weebly.com

মদীনায় হিজরত করলেন, তখন সেখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন আরো অনেক মুহাজির। মদীনার আনসার সাহাবীগণ তাঁদেরকে আশ্রয় দিলেন। অপরপক্ষে প্রায় সমগ্র আরব শত্রু হয়ে দাঁড়ালো তাঁদের। জীবন যাপন থেকে উধাও হয়ে গেলো স্বাভাবিকতা। শত্রুর আক্রমণাশংকায় অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় অতিবাহিত হতো রজনী, প্রত্যূষ। পরিস্থিতি এমন সঙ্গিন হয়ে পড়লো যে, তাঁরা ভাবতে শুরু করলেন, শান্তি ও নিরাপত্তা কি আর ফিরে আসবে আমাদের প্রাত্যহিকতায়? আর কি আমরা এমন একটি রাত পাবো, যে রাত আমাদের অতিক্রান্ত হবে শত্রুর আক্রমণাশংকা ছাড়া আল্লাহ্‌র ভয়ে? এমতো পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা নূর ঃ আয়াত ৫৫

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى
لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ
بِيْ شَيْـًٔا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

❑ তোমাদিগের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করিবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলেন তাহাদিগের পূর্ববর্তীদিগকে এবং তিনি অবশ্যই তাহাদিগের জন্য সুদৃঢ় করিবেন তাহাদিগের দ্বীনকে যাহা তিনি তাহাদিগের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাদিগের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করিবেনই। তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার কোন শরীক করিবে না, অতঃপর যাহারা অকৃতজ্ঞ হইবে তাহারা তো সত্যত্যাগী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই'। এখানে 'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে' বলে বলা বলা হয়েছে, ওই সকল সাহাবীগণের মধ্যে কাউকে কাউকে আল্লাহ্ করবেন আরব ও আরববহির্ভূত অনেক ভূখণ্ডের শাসক ও বিচারক। অথবা তাদেরকে পৃথিবীতে এমন আধিপত্য দান করবেন, যেমন আধিপত্য থাকে রাজা-বাদশাহদের। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'যেমন প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে'। একথার অর্থ— যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন বনী ইসরাইলকে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কাতাদা। উল্লেখ্য, রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের পূর্বে নবুয়ত ও রাষ্ট্রক্ষমতা প্রবহমান ছিলো বনী ইসরাইলদের মধ্যে। মিসর ও সিরিয়ার রাজা-বাদশাহদের উপরে আল্লাহ্পাক তাদেরকে বিজয়ী করেছিলেন। হজরত মুসাকে দিয়েছিলেন সিরিয়া বিজয়ের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় সে বিজয় বাস্তবায়িত হয়নি। বরং বনী ইসরাইলদের অবাধ্যতার কারণে চল্লিশ বৎসর যাবৎ তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছিলো তীহ্ প্রান্তরের বন্দী জীবন। হজরত মুসার মহাতিরোধানের পর নবুয়ত পেয়েছিলেন হজরত ইউশা ইবনে নূন। চল্লিশ বৎসরের বন্দীত্বের অবসানের পর তাঁর নেতৃত্বেই অর্জিত হয়েছিলো প্রতিশ্রুত ও কাংখিত বিজয়। এভাবে দেখা যায়, রসুল স. এর পৃথিবীবাসের সময়েও আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত প্রতিনিধিত্ব বা বিজয় অর্জিত হয়নি। হয়েছিলো তাঁর মহাতিরোধানের পরে হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরের শাসনামলে।

হজরত আবু বকর ভণ্ডনবী মুসায়লামার বাহিনীকে পরাস্ত করেছিলেন। যুদ্ধ করেছিলেন মুরতাদদের বিরুদ্ধে। এভাবে সমগ্র আরবভূমিকে করেছিলেন নিরাপদ। আর হজরত ওমর জয় করেছিলেন সিরিয়া ও ইরাক। ইরাক অভিযানের পূর্বে তিনি যখন অন্যান্য সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করেছিলেন, তখন হজরত আলী আলোচ্য আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করে বলেছিলেন, আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। কারণ আমাদেরকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বেশ কয়েকটি গ্রন্থে এই ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে। শিয়াদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'নাহজুল বালাগা' তেও লিপিবদ্ধ হয়েছে ঘটনাটি। বলা হয়েছে, হজরত আলী তখন বললেন, সেনাসংখ্যার আধিক্য অথবা স্বল্পতার উপরে বিজয় নির্ভরশীল নয়। বিজয় তো আল্লাহ্তায়ালার দান। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে বিজয় দান করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন, বলেছেন 'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন'। সুতরাং একথা নিশ্চিত যে, আমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন'। হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— এবং আল্লাহ্ অবশ্যই ইমানদার ও সৎকর্মশীলদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করে দিবেন। এভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেনই'। একথার অর্থ— ইমানদারদের বর্তমান নিরাপত্তাহীন জীবনযাত্রার অবসান ঘটবেই। বাতিল ধর্মমত ও ধর্মমতানুসারীদের উপরে প্রতিশ্রুত বিজয় কার্যকর করে তিনি তাদের নিরাপত্তা বিধান করবেনই। অথবা আলোচ্য বাক্যটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বাক্য, যার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে প্রতিনিধিত্বের অধিকার লাভের কারণ বা উপায়। আর তা হচ্ছে নিরাপত্তা।

আবুল আলীয়া বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা সমগ্র আরব ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন রসুল স. এর একচ্ছত্র শাসন। আরবের সকল গোত্র গ্রহণ করেছিলো ইসলাম। এভাবে মুসলমানদেরকে দান করেছিলেন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। তাঁর মহাতিরোধানের পরে হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং হজরত ওসমানের খেলাফতের সময়েও ব্যাপক প্রসার ঘটেছিলো ইসলামের। ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়েছিলো মুসলিম শাসনের সীমানা। এভাবে তাদের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ছিলো অটুট। অবশ্য হজরত ওসমানের খেলাফতের শেষ দিকে দেখা দিয়েছিলো মুসলমানদের আত্মকলহ, গৃহবিবাদ। ফলে তাদের নিরাপত্তা হয়ে পড়েছিলো বিপর্যস্ত।

আবুল আলীয়ার বর্ণনায় আরো এসেছে, প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির প্রথম দিকে রসুল স. তাঁর সহচরবৃন্দকে নিয়ে মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। মক্কার অংশীবাদীরা তখন বিভিন্নভাবে সাহাবীগণকে নির্যাতন করতে শুরু করলো। রসুল স. তাঁদেরকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিলেন। এরপর আল্লাহ্র ইশারায় তিনি স. হিজরত করলেন মদীনায়। অংশীবাদীরা সেখান থেকে তাঁকে উৎখাত করবার জন্য গ্রহণ করলো যুদ্ধ প্রস্তুতি। রসুল স.ও অনুমতি পেলেন জেহাদের। সাহাবীগণের জীবনযাত্রায় দেখা দিলো নিরাপত্তাহীনতা। শত্রুর আক্রমণাশংকায় তাঁদেরকে সব সময় থাকতে হতো অস্ত্রসজ্জিত হয়ে। এমতো সঙ্গিন পরিস্থিতিতে একজন তো একবার বলেই ফেললেন, অস্ত্রবিহীন নিরাপদ জীবন আর কখনো কি আমরা ফিরে পাবো? তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আমাদেরকে লক্ষ্য করে, যখন আমরা অতিবাহিত করতাম নিরাপত্তাহীন দিবস ও রজনী। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। ভয়-ভীতি দূর করে দিয়ে তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করেন নিরাপত্তা। বিস্তীর্ণ ভূমিতে সম্প্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেন ইসলাম ও আমাদের প্রভাব।

আলোচ্য আয়াত রসুল স. এর রেসালতের সত্যতার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রমাণ খলিফা চতুষ্টয়ের সত্যতারও। কারণ তাঁদের শাসনামলেই প্রতিষ্ঠিত

www.eelm.weebly.com

হয়েছিলো প্রকৃত ইমানদার ও সৎকর্মশীলদের সুশাসন। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো ইসলামের আলো। বিশাল ভূভাগ জুড়ে সম্প্রসারিত হয়েছিলো মুসলিম শাসন। ফলে মুসলমানেরা হয়েছিলেন পূর্ণ নিরাপদ। একথাও বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছিলো যে, ইসলামই আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত। আর এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, শিয়াদের মতবাদ ভ্রান্তিবিদ্ধ। তারা বলে, ইমামগণ সব সময় ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জীবনযাপন করেছেন। ইমাম মেহেদীও নাকি এখন পর্যন্ত ভয়ে আত্মগোপন করে আছেন। তাদের এমতো বিশ্বাস এই আয়াতের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তাই বুঝতে হবে এই আয়াতের 'নিরাপত্তা দান করবেনই' কথাটির উপরে তাদের আদৌ বিশ্বাস নেই।

এখানে 'মিনকুম' (তাদেরকে) বলে বুঝানো হয়েছে সাহাবীগণকে। সুতরাং শিয়াদের এমতো ধারণাটিও অসত্য যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত নিরাপত্তা প্রদান করা হবে ইমাম মেহেদীর আবির্ভাবের পর। এ বিশ্বাসটিও ভিত্তিহীন যে, আল্লাহ্‌পাক সাহাবীগণকে প্রদত্ত অঙ্গীকার হাজার বছর পরেও পূর্ণ করেননি। এমতো মূর্খজনোচিত অপবিশ্বাস থেকে আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় যাচনা করি।

রসুল স. কর্তৃক মুক্ত ক্রীতদাস হজরত সাফীনা বর্ণনা করেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, তিনি স. বলেছেন, 'আমার পরে খেলাফত থাকবে তিরিশ বছর। তারপর আগমন ঘটবে বাদশাহীর'। তিনি আরো বর্ণনা করেন, আবু বকরের খেলাফত দুই বছর, ওমরের দশ বছর, ওসমানের বারো বছর এবং আলীর ছয় বছর— এভাবে খেলাফতের মোট সময়সীমা দাঁড়ায় তিরিশ বছর।

হজরত আদী ইবনে হাতেম বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে বললো আমি ক্ষুধার্ত। আর একজন এসে বললো, পথে আমার মালামাল লুণ্ঠিত হয়েছে। তিনি স. আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আদী! তুমি কি হীরা দেখেছো? আমি বললাম, না। তবে আমি এ সম্পর্কে জানতে বাসনা রাখি। তিনি স. বললেন, তুমি যদি আর কিছুকাল বেঁচে থাকতে পারো, তাহলে দেখতে পাবে, এক মহিলা হীরা থেকে একাকী এসে কাবা গৃহ তাওয়াফ করে নির্বিঘ্নে স্বস্থানে ফিরে যাবে। আল্লাহ্ ছাড়া তখন সে আর কাউকেও ভয় পাবে না। আমি মনে মনে বললাম, বনী তাঈয়ের দুর্ধর্ষ দস্যুরা তাহলে তখন কোথায় থাকবে, যারা এখন দেশটাকে তছনছ করে ফেলছে। তিনি স. বললেন, তুমি যদি আর কয়েক বছর হায়াত পাও, তবে স্বচক্ষে দেখবে পারস্যরাজের ধনভাণ্ডার তোমাদের হাতের মুঠোয়। আমি নিবেদন করলাম, পারস্যরাজের ধনভাণ্ডার? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। কিছুক্ষণ পর বললেন, যদি তোমার বয়স আরো দীর্ঘায়িত হয়, তবে দেখতে পাবে লোকে মুঠো ভর্তি

www.eelm.weebly.com

সোনারূপা নিয়ে গ্রহীতাকে খুঁজে বেড়াবে। কিন্তু কোনো গ্রহীতা খুঁজে পাবে না। তারপর দুনিয়ার জীবন সাঙ্গ হলে তোমরা সকলে হাজির হবে তোমাদের প্রভুপ্রতিপালকের সকাশে। তখন তোমাদের ও তাঁর মধ্যে কোনো মধ্যস্থতাকারী থাকবে না। আল্লাহ্ তার এক বান্দাকে বলবেন, তোমাদের নিকটে কি আমার রসুল প্রেরিত হয়নি? সে বলবে, অবশ্যই। তিনি বলবেন, আমি কি পৃথিবীতে তোমাকে ধন-সম্পদ দেইনি? তোমার প্রতি দয়া করিনি? সে বলবে, নিশ্চয়ই। এরপর সে দেখবে, তার বাম ও দক্ষিণ উভয় পাশে জাহান্নাম। অতএব, হে আদী! জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা কোরো, একটি খেজুর দান করে হলেও। যদি তাতেও সমর্থ না হও, তবে যাচ্ঞাকারীকে বিদায় দিয়ো মিষ্টি কথায়। হজরত আদী এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর তাঁর দুই ছাত্রকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, এক মহিলা একাকী হীরা থেকে এসে কাবাগৃহ তাওয়াফ করে চলে যেতো। পথিমধ্যে দস্যু-তস্কর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয় সে করতো না। তোমাদের বয়স যদি দীর্ঘ হয়, তবে তোমরাও দেখতে পাবে লোকে মুঠো ভর্তি সোনা-রূপা নিয়ে দান করবার জন্য গ্রহীতা খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সে রকম কাউকে পাচ্ছে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরীক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারা তো সত্যত্যাগী'। একথার অর্থ— প্রকৃত বিশ্বাসী ও পুণ্যকর্মশীলেরা যখন পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে, বিশাল ভূভাগ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম, তখন কৃতজ্ঞচিত্ত বিশ্বাসীরা কায়মনোবাক্যে সমর্পিত হবে আমার উপাসনায়। আমার সঙ্গে তারা কাউকে অথবা কোনোকিছুকে অংশীদার বানাবে না। কিন্তু তাদের পরবর্তীদের মধ্যে কেউ কেউ অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে আল্লাহ্র এই বিশেষ দানের প্রতি। তারা বাহ্যত বিশ্বাসী হলেও প্রকৃতপক্ষে সত্য-পরিত্যাগী।

বাগবী লিখেছেন, তাফসীরকারগণ বলেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ্র এই দানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছিলো ওই সকল লোক, যারা শহীদ করেছিলো তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানকে। তিনি শাহাদত বরণ করলে আল্লাহ্ তাঁর এই বিশেষ দান প্রত্যাহার করে নেন। ফলে তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে অবিশ্বাস ও শংকা। তারা তখন প্রলিপ্ত হয় গৃহবিবাদ ও রক্তপাতে।

হুমাইদ ইবনে হেলাল সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম তখন বিদ্রোহীদেরকে বলেছিলেন, যখন রসুল স. এই মদীনায় শুভাগমন করেন, তখন থেকে রক্ষী ফেরেশতারা এই শহরকে বেষ্টন করে রয়েছে। যদি তোমরা আমিরুল মুমিনীনকে হত্যা করো, তবে ওই ফেরেশতারা স্থানত্যাগ করে

www.eelm.weebly.com

চলে যাবে। আর কখনো তারা ফিরে আসবে না। আরো শোনো, খলিফার হত্যাকারী আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত হবে হস্তকর্তিত অবস্থায়। আল্লাহ্র তলোয়ার এখনো কোষবদ্ধ। যদি উন্মুক্ত হয়, তবে কিয়ামত পর্যন্ত তা কোষমুক্ত থাকবে। আল্লাহ্র শপথ! কোনো নবীকে যখন হত্যা করা হয়, তখন তার বদলারূপে প্রাণসংহার করা হয় সত্তর হাজার লোককে। আর খলিফার হত্যার বদলা নেয়া হয় পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করে।

আমি বলি, আল্লাহ্পাক মুসলমানদেরকে পৃথিবীতে যে প্রতিনিধিত্ব ও নিরাপত্তা দান করেছিলেন, তার প্রতি প্রথম অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রাফেজী (শিয়া) ও খারেজীর দল। এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে হজরত মুয়াবিয়ার পুত্র এজিদের প্রতি। সে রসুল স. এর প্রিয় দৌহিত্র ও অনেক সাহাবীকে হত্যা করিয়েছে। অবমাননা করেছে নবীবংশের। গর্ব করেছে এই বলে যে, আজ গ্রহণ করা হলো বদর দিবসের প্রতিশোধ। মদীনা মনোয়ারার অমর্যাদাও করেছে সে। করেছে লুণ্ঠন। অসম্মান করেছে মসজিদে নববীর, যার মধ্যে রয়েছে জান্নাতের বাগান। প্রথম দিন থেকে যে মসজিদ তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সেই মসজিদের সম্মানহানি ঘটাতেও সে পিছপা হয়নি। আবার কাবাগৃহের প্রতি পাথরনিক্ষেপক কামানের মাধ্যমে নিক্ষেপ করেছে পাথর। এভাবে যুদ্ধে নিহত করেছে হজরত আবু বকরের প্রিয় দৌহিত্র খলিফা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়েরকে। এতোকিছু করা সত্ত্বেও সে ক্ষান্ত হয়নি। ঘটিয়েছে ধর্মবিভ্রাটও। হারামকে ঘোষণা করেছে হালাল বলে।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৫৬, ৫৭

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○
لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَ
لَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

❒ সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য কর, যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হইতে পার।

❒ তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে পৃথিবীতে প্রবল মনে করিও না। উহাদিগের আশ্রয়স্থল অগ্নি; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম।

প্রথমোক্ত আয়াতে সালাত প্রতিষ্ঠা এবং জাকাত প্রদানের নির্দেশের সাথে সাথে পুনঃনির্দেশ দেয়া হয়েছে রসুল স. এর আনুগত্যের। এমতো পুনঃনির্দেশের প্রবর্তন ঘটানো হয়েছে রসুলানুসরণের বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের

www.eelm.weebly.com

জন্য। একথাটিও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র রহমত প্রাপ্তির বিষয়টিও তাঁর রসুলের আনুগত্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেকারণেই শেষে বলা হয়েছে 'যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পারো'।

পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'তোমরা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পৃথিবীতে প্রবল মনে কোরো না। তাদের আশ্রয়স্থল অগ্নি, কতো নিকৃষ্ট এই পরিণাম'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুলের অনুসারীবৃন্দ! তোমরা এরূপ কখনো ভেবো না যে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বর্তমান দাপট চিরস্থায়ী ও অজেয়। আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করতে অসমর্থও নন। কিন্তু তাদের এ আস্ফালন যে সাময়িক। স্থিরনিশ্চিত নরকাগ্নিই হচ্ছে তাদের প্রকৃত পরিণতি। সুতরাং তাদের প্রাবল্যের এই সাময়িকতা উপেক্ষণীয়। অবশেষের করুণ পরিণতির বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ। হায়! কতোইনা মন্দ পরিণতি হবে তাদের।

মুকাতিল ইবনে হাব্বান সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আসমা বিনতে মুরছাদের এক ক্রীতদাস যখন তখন বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতো তাঁর কক্ষে। দাসের এমতো আচরণ তাঁর একেবারেই পছন্দ হতো না। তাই তিনি একদিন রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! আমার পরিচারক ক্রীতদাসটি যখন তখন আমার কামরায় ঢুকে পড়ে অনুমতি ছাড়াই। তার এরকম আচরণ আমার মোটেও ভালো লাগে না। তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। এরশাদ করা হলো—

সূরা নূর ঃ আয়াত ৫৮

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ
لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ
تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَٰثُ
عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّٰفُونَ
عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

❑ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদিগের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণ এবং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা বয়োপ্রাপ্ত হয় নাই তাহারা যেন তোমাদিগের কক্ষে প্রবেশ করিতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা

www.eelm.weebly.com

বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বস্ত্র শিথিল কর তখন এবং এশার সালাতের পর; এই তিন সময় তোমাদিগের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এই তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিলে তোমাদিগের জন্য এবং তাহাদিগের জন্য কোন দোষ নাই। তোমাদিগের এককে অপরের নিকট তো যাতায়াত করিতেই হয়। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগের নিকট তাঁহার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমে সম্বোধন করা হয়েছে 'হে বিশ্বাসীগণ'। কিন্তু বিশ্বাসিনীগণও এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে সম্বোধন করার পর এই বিধানটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী এবং কিশোর বালক-বালিকারা তাদের আপনাপন মালিক ও অভিভাবকদের ঘরে ফজরের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে এবং এশার নামাজের পর বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ এই তিন সময় মানুষ সাধারণতঃ থাকে শিথিলবসন এবং শিথিলবসনা। এই তিন সময় হচ্ছে একান্ত বিশ্রাম ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা অবলম্বনের কাল। অন্য সময়ে অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ তখন প্রাত্যহিক প্রয়োজনে একে অপরের সঙ্গে মেলামেশা করতেই হয়। শেষে বলা হয়েছে 'এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুল স. তাঁর এক আনসারী ক্রীতদাসকে হজরত ওমরকে ডেকে আনার জন্য তাঁর গৃহে প্রেরণ করলেন। ওই ক্রীতদাস হজরত ওমরের গৃহে গিয়ে সোজাসুজি ঢুকে পড়লো তাঁর কামরায়। হজরত ওমর তখন ছিলেন অসংবৃত অবস্থায়। ফলে দু'জনেই হলেন অপ্রস্তুত। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

এখানে 'যারা বয়োঃপ্রাপ্ত হয়নি' অর্থ যারা এখানো যৌবনে পদার্পন করেনি। উল্লেখ্য, যৌবনকালের নিকটবর্তীরাও প্রাপ্তবয়স্কদের অন্তর্ভুক্ত।

ফজরের নামাজের পূর্বে অনুমতি ব্যতিরেকে কারো ঘরে প্রবেশ নিষেধ একারণে যে, তখন মানুষ গাত্রোত্থান করে এবং নিজেদের শিথিল বেশবাস ঠিক করে নেয়। দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামের সময়ও অনুমতি ছাড়া কারো প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়া অনুচিত। কারণ বিশ্রামকালেও মানুষ থাকে আলুথালু অবস্থায়। এরকম অবস্থাতেও অন্যের অনাহুত উপস্থিতি বিব্রতকর। আর এশার নামাজের পরে মানুষ অতিরিক্ত পোশাক আশাক খুলে ফেলে শয্যাগ্রহণ করে। অন্যের অনুমতিহীন উপস্থিতি তাই এমতো অবস্থায়ও অনভিপ্রেত।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন 'এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়' কথাটির অর্থ হবে— এই তিন সময় তোমাদের আবরণীয় অঙ্গসমূহ উন্মোচনের সময়। উল্লেখ্য, আবরণীয় অঙ্গসমূহ প্রকাশ্যে উন্মোচন মন্দ কর্ম। বায়যাবী কথাটির অর্থ করেছেন— এই তিন সময় তোমাদের মন চায়

www.eelm.weebly.com

খোলামেলা অবস্থায় থাকতে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'আওরত' (গোপনীয়তা) শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'আ'র'(মন্দ, নিকৃষ্ট) থেকে। সুতরাং বুঝতে হবে মানুষের যে সকল অঙ্গ উন্মুক্ত করা দূষণীয় বলে বিবেচিত হয়, সে সকল অঙ্গই আওরত। আবার 'আওরত' বলা হয় মন্দ কথাকে, কাপড়ের পর্দাকে এবং গৃহের দরজা ধসে পড়াকে। এক আয়াতে এসেছে-- 'ইন্না বুয়ুতানা আ'ওরতুন' (আমাদের গৃহ পতিত, ভগ্ন)।

'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, 'আওরত' অর্থ সীমারেখা। এরকম নিভৃত সময় তিনটি— ফজরের পূর্ব সময়, দ্বিপ্রহরের সময় ও এশার পরে শয্যাগ্রহণের সময়। মানুষ এই তিন সময় বাইরের লোকের উপস্থিতি পছন্দ করে না। আবার 'আওরত' বলা হয় পাহাড়ের গুহাকেও।

মাসআলা ঃ বর্ণিত তিন সময় প্রাপ্তবয়স্ক অথবা কিশোর গোলামের জন্য অনুমতি ছাড়া তার মালিকের ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। বাঁদীও বিনা অনুমতিতে ওই তিন সময় তার প্রভুপত্নীর ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। তবে ক্রীতদাসী তার প্রভুর নিকট সর্বদা গমনাগমন করতে পারবে। কারণ সে তার প্রভুর স্ত্রীর মতোই। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক অথবা কিশোর ক্রীতদাস কখনোই তার প্রভুপত্নীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ তার সঙ্গে রয়েছে তার প্রভুপত্নীর শরিয়ত নির্দেশিত পর্দা। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'কুললিল মু'মিনীনা ইয়াগুদ্দু মিন আবসরিহিম ওয়ালা ইউব্দিনা যীনাতাহুন্না ইল্লা লিবুউ'লাতিহিন্না'। এখানে পর্দা করতে বলা হয়েছে সকল প্রকার ক্রীতদাস থেকে। আর ক্রীতদাসীদেরকে রাখা হয়েছে এ বিধানের বাইরে।

উল্লেখ্য, উল্লেখিত তিন সময় ব্যতীত অন্য সময় দাস-দাসী ও কিশোর বালক-বালিকারা অনুমতি ছাড়াই তাদের মালিক ও অভিভাবকের গৃহে প্রবেশ করতে পারবে। কারণ দাস-দাসী ও বালক-বালিকা গৃহবাসীদেরই অন্তর্ভুক্ত। সাংসারিক কাজকর্ম ছাড়াও গৃহে তাদের উপস্থিতি হয় সার্বক্ষণিক। তাদের যাতায়াত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। তাই বার বার অনুমতি গ্রহণ তাদের জন্য একটি অবাস্তব ও অস্বাভাবিক ব্যাপার।

'এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নিকট তাঁর বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' অর্থ আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের প্রকাশ্য-গোপন সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাই তো তোমাদের প্রতি প্রবর্তিত তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ হতে পারে এতো বাস্তবমুখী ও সুস্পষ্ট। আর নিঃসন্দেহে এভাবে শরিয়তের বিধান প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তাঁর অপার ও অতুলনীয় প্রজ্ঞার পরিচায়ক।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিধান রহিত হয়েছে, না এখনো কার্যকর আছে, সে সম্পর্কে বিদ্বজ্জন বিভিন্ন রকম মন্তব্য করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, ওই সময় পর্দার প্রচলন ছিলো না। বালক-বালিকা ও পরিচারক-পরিচারিকারা তাই অবাধে প্রবেশ করতে পারতো সকলের ঘরে। আর তাদের দৃষ্টিতে প্রায়শঃই গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীরা বিবস্ত্র অথবা প্রায়বিবস্ত্র অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হতো। কিন্তু এরকম অবস্থা কারো কাম্য ছিলো না। সেকারণেই আল্লাহ্তায়ালা আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে অনুমতি গ্রহণের বিধান প্রবর্তন করেছেন। এরপর মুসলমানদের অবস্থা যখন স্বচ্ছল হলো, তখন প্রত্যেকেই তৈরী করে নিলো ঘরের পর্দা ও কপাট। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষিত হতে লাগলো পর্দা ঝুলিয়ে অথবা কপাট লাগিয়ে। তাই অনুমতি প্রার্থনার প্রয়োজনই আর রইলো না।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিধানকে রহিত করা হয়নি। সুফিয়ান সওরীর বর্ণনায় এসেছে, মুসা ইবনে আয়েশা বলেছেন, আমি একবার শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম, এই আয়াতের বিধান কি রহিত? তিনি বললেন, না। আল্লাহ্র কসম! আমি বললাম, মানুষ তো এর উপরে আমল করে না। তিনি বললেন, আল্লাহ্ই সাহায্যকারী।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, লোকে বলে, এই আয়াত মনসুখ (রহিত) আল্লাহ্র কসম, এই আয়াত মনসুখ নয়। বরং মানুষ এই আয়াতের উপরে আমল করাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনেই করে না।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, বর্তমানে প্রায় সকল গৃহেই দরজা ও পর্দার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই অনুমতি গ্রহণের অবকাশ তেমন নেই। অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন ছিলো তখন, যখন মানুষের গৃহ ছিলো পর্দাহীন ও দরজাবিহীন। এখন যে কারণে অনুমতির আবশ্যক ছিলো, সেই কারণগুলোই নেই। তাই অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজনও আর নেই। তাই বিধানটি এখন কার্যকর হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, বিধানটি রহিত। হজরত ইবনে আব্বাস অবশ্য একে রহিত বলেছেন রূপকার্থে, প্রকৃত অর্থে নয়। অর্থাৎ বিধানটিকে রহিত বলে মনে হয় এ কারণে যে, বিধান কার্যকর হওয়ার কারণগুলো আর নেই। তাই অনুমতি গ্রহণের নিয়মটি এখন গৌণ ও অপ্রয়োজনীয়।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৫৯, ৬০

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

www.eelm.weebly.com

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

❐ এবং তোমাদিগের সন্তান-সন্ততি বয়োপ্রাপ্ত হইলে তাহারাও যেন তাহাদিগের বয়োজ্যেষ্ঠদিগের মত অনুমতি প্রার্থনা করে। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য তাহার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

❐ বৃদ্ধা নারী, যাহারা বিবাহের আশা রাখে না, তাহাদিগের জন্য অপরাধ নাই যদি তাহারা তাহাদিগের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করিয়া তাহাদিগের বহির্বাস খুলিয়া রাখে; তবে ইহা হইতে তাহাদিগের বিরত থাকাই তাহাদিগের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়োপ্রাপ্ত হলে তারাও যেনো তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মতো অনুমতি প্রার্থনা করে'। একথার অর্থ— তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যৌবনে পদার্পন করলে অথবা যৌবনপ্রাপ্ত হলে তাদেরকেও তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মতো বন্ধ করে দিতে হবে ঘরের অবাধ যাতায়াত। উল্লেখ্য, আলোচ্য নির্দেশটি সার্বজনীন। অর্থাৎ সকল মুহরিম ও গায়ের মুহরিম পুরুষ ও রমণীর ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য। হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন, একবার আমার কাছে আবু মুসা এসে বললেন, খলিফা ওমর এক লোকের মাধ্যমে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি যথারীতি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে বাইরে থেকে তিনবার বললাম 'সালামুন আলাইকুম'। কিন্তু কোনো জবাব পেলাম না। তাই ফিরে এলাম। পুনরায় ডেকে পাঠালেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, ফিরে গেলেন কেনো? আমি বললাম, রসুল স. এর নির্দেশ এরকমই। তিনি বললেন, সাক্ষ্য পেশ করো। আবু মুসা আমাকে বললেন, হে আবু সাঈদ! আপনিও তো রসুল স. এর এই নির্দেশ শুনেছেন যে, কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তার বাড়ীর বাইরে থেকে তিন বার সালাম দিতে হবে। জবাব না পেলে ফিরে আসতে হবে বিনা বাক্যব্যয়ে। শোনেননি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে চলুন, খলিফার দরবারে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করুন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করলাম খলিফা ওমর সকাশে। বোখারী, মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

আতা ইবনে ইয়াসারের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে এক লোক বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি আমার মায়ের ঘরে প্রবেশ করতেও কি অনুমতি চাইবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললো, আমি তো আমার মায়ের সঙ্গে একই ঘরে থাকি। তিনি স. বললেন, তবুও। লোকটি বললো আমি তো তাঁর খাদেম। তাঁর সব কাজকর্ম আমাকেই করে দিতে হয়। তিনি স. বললেন, তবুও। তুমি কি তোমার মাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে চাও? লোকটি বললো, না। তিনি স. বললেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর ঘরে ঢোকার আগে অনুমতি গ্রহণ কোরো। ইমাম মালেক হাদিসটি বর্ণনা করেছেন অপরিণত সূত্রে।

বাগবী লিখেছেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, মাতৃ-প্রকোষ্ঠে প্রবেশের পূর্বেও অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন। এমতো অনুমতি গ্রহণের বিধান জানানোর জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

আমি বলি, সম্ভবতঃ আলোচ্য আয়াতে প্রদত্ত অনুমতি প্রার্থনার বিধানটি মোস্তাহাব প্রকৃতির, অত্যাবশ্যক প্রকৃতির নয়। তাই কেউ যদি স্বগৃহে প্রবেশ করতে চায় এবং সেখানে যদি এমন নারীও উপস্থিত থাকে, যার সঙ্গে পর্দা অত্যাবশ্যক, তবুও সে যদি বিনা অনুমতিতে সেখানে প্রবেশ করে, তবে তা হবে মাকরূহে তানজীহী, হারাম নয়। কারণ অন্যের গৃহে বিবস্ত্র হওয়ার সম্ভাবনা এমতোক্ষেত্রে নেই। তবুও এমতো পরিস্থিতিতে অনুমতি প্রার্থনা করা মোস্তাহাব। কিন্তু অন্যের গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ সর্বাবস্থায় হারাম। কেননা আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ কোরো না' (২৭)। অনুরূপ যে গৃহে অপরিচিতা নারী থাকে, সেখানেও তার নিকট বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'বিশ্বাসীদেরকে বলো, তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে(৩০)।

বায়যাবী লিখেছেন, যারা বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক ক্রীতদাস যদি তার প্রভুপত্নীর নিকটে যেতে চায় তবে তার জন্য অনুমতিপ্রার্থনা ওয়াজিব, তারা তাদের অভিমতের অনুকূলে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করেন এই আয়াতকে। কিন্তু অভিমতটি যথাযথ নয়। কারণ আলোচ্য আয়াতে ক্রীতদাসের কথা বলাই হয়নি। বলা হয়েছে প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততির কথা। তবে বায়যাবীর বক্তব্যে একথাই প্রমাণিত হয় যে, প্রাপ্তবয়স্ক ক্রীতদাসের পক্ষে তার প্রভুপত্নীর নিকটে অবাধ গমনাগমনের বিষয়টি মতানৈক্যমণ্ডিত। আর মতানৈক্যের ভিত্তি হচ্ছে, ক্রীতদাস তার প্রভুপত্নীর মুহরিম (বিবাহনিষিদ্ধ পুরুষ) কিনা। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, সে মুহরিম। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, মুহরিম নয়। যদি

www.eelm.weebly.com

মুহরিম হয়, তবে প্রভুপত্নীর কক্ষে প্রবেশের জন্য তার অনুমতি প্রার্থনা হবে মোস্তাহাব যেমন মোস্তাহাব অন্যান্য মুহরিম নারীদের বেলায়। আর যদি মুহরিম না হয়, তবে অনুমতি প্রার্থনা হবে ওয়াজিব।

এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'।

পরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে খুলে রাখে তাদের বহির্বাস'। একথার অর্থ— যে সকল বৃদ্ধা নারী ঋতুস্রাব ও গর্ভধারণের বয়স অতিক্রম করেছে, হারিয়ে ফেলেছে পুরুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা এবং বিবাহের প্রতি যাদের আদৌ আকাংখা জাগে না তারা যদি তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছাড়া তাদের বহির্বাস বা অতিরিক্ত আবরণ উন্মোচন করে, তবে এতে করে তারা শরিয়তের দৃষ্টিতে অপরাধিনী সাব্যস্ত হবে না। রবীয়া বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে ওই বিগত যৌবনা রমণীর কথা, পুরুষেরা যার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তবে বয়স হওয়া সত্ত্বেও যাদের সৌন্দর্য কিছুটা বিদ্যমান থাকে, তারা এই আয়াতে উল্লেখিত শিথিলতাবহির্ভূত।

হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত উবাই ইবনে কা'ব এখানকার 'ছিয়াবাহুন্না' কথাটিকে উচ্চারণ করতেন 'মিন ছিয়াবিহিন্না' যার 'মিন' আংশিক অর্থবোধক। এরকম উচ্চারণ করলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং কোনো স্বাধীনা বিগতযৌবনা নারীও পরপুরুষের সামনে মাথা ও মুখমণ্ডল ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশ উন্মোচন করতে পারবে না।

'গইরা মুতাবাররিজাতিন' অর্থ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। 'বারজ' এর শাব্দিক অর্থ দুর্গ, দৃঢ় অট্টালিকা। আকাশের তারকার সমাবেশকে একারণেই বলা হয় বুরুজ। 'তাবাররুজ' অর্থ গোপন বস্তুকে বিচিত্র সাজে প্রকাশ করা। 'সফিনায়ে বারেজা' বলে ওই নৌকাকে যার উপরে ছই বা আচ্ছাদন থাকে না। চোখের মনির চারপাশের সুপ্রকাশিত শাদা অংশকেও বলে বুরুজ। আর 'তাবাররুজ' শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় বেপর্দা নারীদের পুরুষদের সামনে আগমনের ক্ষেত্রে। এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. দশটি বস্তুকে নিকৃষ্ট মনে করতেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে সাজসজ্জা করে নারীদের গৃহের বাইরে বের হওয়া। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, 'তাবাররুজ' অর্থ পরপুরুষের সামনে নারীদের আবরণ প্রকাশ করা। এমতো রূপপ্রদর্শন শরিয়তের দৃষ্টিতে অপরাধ। তবে নারীরা তাদের স্বামীগণের সামনে তাদের রূপ-যৌবন পূর্ণরূপে উন্মোচন করতে পারবে।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'সৌন্দর্য প্রকাশ না করে' বলা হয়েছে এই অর্থে যে, বিগতযৌবনাগণের বহির্বাস উন্মোচন ওই সময় দূষণীয় হবে না, যখন তাদের সৌন্দর্যপ্রদর্শনের উদ্দেশ্য না থাকবে। যদি সৌন্দর্যপ্রদর্শনের জন্য তারা এরূপ করে, তবে অবশ্যই তা হবে পাপ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম'। এখানে 'ইয়াসতা'ফিফনা' অর্থ বিরত থাকা। 'ইফ্‌ফাত' অর্থ নিষিদ্ধ কর্ম থেকে সংযত হওয়া। এরকম বলা হয়েছে 'কামুস' গ্রন্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— দূষণীয় না হওয়া সত্ত্বেও পরপুরুষদের সামনে বহির্বাস খোলা অপেক্ষা না খোলাই বিগতযৌবনাগণের জন্য উত্তম। কারণ এতে রয়েছে পাপাশংকা থেকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা।

শেষে বলা হয়েছে— ' আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— রমনীরা পুরুষদের সম্পর্কে যে সকল কথা বলাবলি করে তা তিনি উত্তমরূপে অবহিত। কারণ তিনি সর্বশ্রোতা। আর তাদের বহির্বাস উন্মোচনের নেপথ্যে তাদের মনে যে সকল চিন্তার উদয় হয়, সে সকল ভাবনা সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিফহাল। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৬১

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ
وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ
اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ
اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ
مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ
اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ
عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

❐ অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য এবং তোমাদিগের নিজদিগের জন্যও দূষণীয় নহে আহার করা তোমাদিগের সন্তানদিগের গৃহে, অথবা তোমাদিগের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগ্নিগণের গৃহে,

www.eelm.weebly.com

পিতৃব্যদিগের গৃহে, ফুফুদিগের গৃহে, মাতুলদিগের গৃহে, খালাদিগের গৃহে অথবা সেই সব গৃহে যাহার চাবি আছে তোমাদিগের হস্তে অথবা তোমাদিগের বন্ধুদিগের গৃহে; তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাহাতে তোমাদিগের জন্য কোন অপরাধ নাই; তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করিবে তখন তোমরা তোমাদিগের স্বজনদিগের প্রতি সালাম বলিবে— ইহা আল্লাহের নিকট হইবে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য তাঁহার নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

বাগবী লিখেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের,জুহাক প্রমুখ বলেছেন, অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ন ব্যক্তিরা সুস্থ লোকদের সঙ্গে একত্রাহার থেকে বিরত থাকতো। কারণ সুস্থ লোকেরা ভোজনকালে তাদের সঙ্গ পছন্দ করতো না। অন্ধরা ভাবতো, আমি হয়তো বেশী খেয়ে ফেলবো, তাই চক্ষুস্মানেরা আমাদেরকে ভোজনসঙ্গী করতে পছন্দ করে না। খঞ্জরা মনে করতো, আমাদের বসতে জায়গা লাগে বেশী, তাই মনে হয়, সুস্থ ব্যক্তিরা আমাদের সঙ্গে একত্রাহারে অনীহ। তাদের এমতো মনোভাব ও মন্তব্যের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। বলা হয়েছে এ সকল প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে সুস্থ লোকদের একত্রভোজন দূষণীয় নয়।

বাগবী আরো লিখেছেন, ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হয় 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আমানু লা তাকুলু আমওয়ালাকুম বাইনাকুম বিল বাতিলি', তখন মুসলমানেরা প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে পঙক্তিভোজনের ব্যাপারে করতে থাকে ইতস্ততঃ। মনে করতে থাকে, অন্ধরা তো উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দেখতে সক্ষমও নয়। সুতরাং তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হবে নাকি? আবার বিকলাঙ্গরা আহার্যদ্রব্য অন্যের হাতে চলে গেলে তা ফিরিয়েও আনতে পারে না। কারণ চলাচল করা তো দূরের কথা, তারা তো বসতেও পারে না ভালো করে। আর পীড়িত যারা তারা তো এমনিতেই দুর্বল। যথাঅধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতাই তো তাদের নেই। সুতরাং তাদের সঙ্গে পঙক্তিভোজনে আমরা কীরূপে এমতো আশ্বস্ত বোধ করতে পারি যে, আমরা তাদের অধিকার রক্ষা করতে পারবো। তাদের এমতো দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতের শুরু থেকে 'মাফাতিহাহু' পর্যন্ত।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, সাহাবীগণ যখন জেহাদে যেতেন, তখন কোনো কোনো বিকলাঙ্গদেরকে রেখে যেতেন তাঁদের ঘরবাড়ী দেখাশুনার জন্য। গৃহের চাবিও দিয়ে দিতেন তাঁদেরকে। বলে যেতেন, ঘরে রক্ষিত আহার্যবস্তু ভক্ষণের ব্যাপারে তোমরা অনুমতিপ্রাপ্ত। কিন্তু বিকলাঙ্গরা এতে করেও একথা

www.eelm.weebly.com

ভেবে সংকোচবোধ করতেন যে, গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে তাদের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ কি আমাদের পক্ষে শোভন? তখন আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাঁদের এমতো সংকোচকে দূর করা হয়।

হাসান বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যের মাধ্যমে বিকলাঙ্গদের ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। পরবর্তী বাক্যের সঙ্গে এ প্রসঙ্গের কোনো সম্পর্ক নেই।

এখানে 'মিন বুয়ূ্যতিকুম' অর্থ তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের সন্তানদের গৃহে। সন্তানের গৃহও নিজের গৃহ। রসুল স. বলেছেন, তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার। হাদিসটি গ্রন্থিত হয়েছে 'আসহাবুস্ সিত্তাহ' গ্রন্থষষ্ঠক রচয়িতা কর্তৃক। আর ইবনে মাজা ও হাকেম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন জননী আয়েশা থেকে।

জননী আয়েশা থেকে আবু দাউদ, দারেমী, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পবিত্রতম জীবিকা হচ্ছে স্বহস্ত উপার্জিত জীবিকা। এরকম সন্তানগণেরও উপার্জন। স্ত্রীগণেরও। তাই স্ত্রী ও সন্তানের সম্পদ ভক্ষণে কোনো দোষ নেই। এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে কুতাইবাও।

'মা মালাকতুম মাফাতিহাহু' অর্থ সেই সব গৃহে যার চাবি আছে তোমাদের হাতে। অর্থাৎ যে সকল গৃহে আছে তোমাদের একচ্ছত্র অধিকার। স্থলাভিষিক্ত, প্রতিনিধি ও ব্যবস্থাপকদের গৃহ, যারা নিয়োজিত থাকে সম্পদ অথবা পশুপাল রক্ষণাবেক্ষণের কাজে, তাদের দ্বারা উপার্জিত ও উৎপাদিত সম্পদ ভক্ষণও তাদের মালিকদের জন্য হালাল। জুহাক বলেছেন, কথাটির অর্থ আপন দাস-দাসীর গৃহ। তাদের সকল কিছুই তো তাদের মালিকদের। 'মাফাতিহ্' অর্থ ধনভাণ্ডার। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন— 'ওয়া ইনদাহু মাফাতিহুল গইবি লা ইয়া'লামুহা ইল্লাহুয়া' (তাঁর নিকটেই রয়েছে অদৃশ্যের ভাণ্ডার, যা তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে না)। 'মাফাতিহ্'এর আর এক অর্থ চাবিসমূহ।

ইকরামা বলেছেন, চাবির অধিকারীই হচ্ছে স্বত্বাধিকারী। আর স্বত্বাধিকৃত সম্পদভক্ষণে দোষের কিছু নেই। সুদ্দী বলেছেন, কেউ যদি কোনো লোককে তার সম্পদের স্বত্বাধিকারী বানায়, তবে স্বত্বাধিকারী তার আওতাভূত সম্পদ ভক্ষণ করতে পারবে। এতে করে সে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে না।

বায্যার কর্তৃক যথাসূত্রসহযোগে বর্ণিত হয়েছে, জননী আয়েশা বলেছেন, মুসলমানেরা রসুল স. এর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করার ব্যাপারে খুবই আগ্রহান্বিত ছিলো। যুদ্ধগমনের সময় তারা তাদের গৃহের চাবিগুলি বিকলাঙ্গদেরকে দিয়ে বলতো,

www.eelm.weebly.com

তোমরা যত ইচ্ছা আমাদের গৃহ থেকে আহার করতে পারবে। কিন্তু এমতো অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও বিকলাঙ্গদের দ্বিধাসংকোচ কাটতো না। তারা মনে করতো, এরকম অনুমতি দিয়েছে তারা নিরূপায় হয়ে। সুতরাং তাদের সম্পদ ভক্ষণ আমাদের জন্য বৈধ নয়। তাদের এমতো মনোভাবের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, একবার জুহ্‌রীকে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, মুসলমানেরা যুদ্ধে গেলে তাদের গৃহে রেখে যেতেন এদেরকে। ঘরের চাবি দিয়ে বলতেন, আমরা যা রেখে গেলাম, তা থেকে তোমরা পানাহার কোরো। অনুমতি দেয়া হলো। কিন্তু ওই সকল লোক পানাহার করতে ইতস্ততঃ করতো। মনে করতো, গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে তাদের গৃহে প্রবেশ আমাদের জন্য বৈধ নয়। তাদের এমতো চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'মা মালাকতুম মাফাতিহাহু' অর্থ— যে সকল সম্পদ তোমরা জমা করে রাখো, তা ভক্ষণ করতে পারো। মুজাহিদ ও কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন— তোমরা তোমাদের মালিকানাভূত আপন গৃহের সম্পদ ভক্ষণ করতে পারো। এটা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়।

'আওসাদিক্বিকুম' অর্থ— অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। অর্থাৎ প্রকৃত বন্ধুগৃহে তাদের অনুপস্থিতিতেও পানাহার করা যায়। কারণ বন্ধু কখনো বন্ধুর অসুবিধা পছন্দ করে না।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হারেছ ইবনে আমর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই বাক্যটি। তিনি এক যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে তাঁর গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে যান মালেক ইবনে জায়েদকে। যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হারেছ দেখতে পান তাঁর বন্ধু মালেক রুগ্ন ও দুর্বল। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমার অনুপস্থিতিতে ও তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমার গৃহের আহার্যদ্রব্য ভক্ষণ করাকে আমি বৈধ মনে করিনি। তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। সা'লাবী তাঁর তাফসীরে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে মালেক ইবনে জায়েদের স্থলে এসেছে খালেদ ইবনে জায়েদের নাম।

বাগবী লিখেছেন, হাসান ও কাতাদা এই আয়াতের ভিত্তিতে অভিমত প্রকাশ করেছেন, বন্ধুর গৃহে তার বিনা অনুমতিতে পানাহার করা বৈধ। কিন্তু কোনোকিছু নিয়ে যাওয়া বা জমা করে রাখা অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়।

www.eelm.weebly.com

কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিধানটি কার্যকর ছিলো ইসলামের প্রাথমিক যুগে। পরে এই আয়াত রহিত হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, এখন পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের বিধান কার্যকর। তবে এমতো কর্মে গৃহকর্তার অনুমতি আবশ্যক। অথবা যে কোনোভাবে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে, এমতো পানাহারে গৃহকর্তার কোনো আপত্তিমাত্র নেই। আর আলোচ্য আয়াতে আলোচিত হয়েছে কেবল তাদের প্রসঙ্গ যাদের সঙ্গে রয়েছে অন্তরঙ্গতা। এরকম অন্তরঙ্গজনের গৃহে, অর্থাৎ সন্তান, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, পিতৃব্য, ফুফু, খালা ও অধীনস্থ জনের গৃহে পানাহার গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর জন্য আনন্দজনক। তাই এমতো পানাহার স্বাভাবিক ও নির্দোষ। আর এরকম পানাহারের উপরেই টিকে আছে আত্মীয়তা, সম্প্রীতি ও সামাজিকতা। তাই আমরা বলি, সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির গৃহেও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুমতিহীন পানাহার বৈধ, যদি কোনোক্রমে একথা জানতে পারা যায় যে, এতে রয়েছে গৃহকর্তার সানন্দ সম্মতি।

মাসআলা ঃ এই আয়াত প্রমাণ করে যে, মুহরিম ও নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে পানাহারে থাকে গৃহকর্তার সানন্দ সম্মতি। তাই হানাফীগণ বলেন, এরকম নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে কেউ চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। কিন্তু যদি সে এমন কারো বাসায় চুরি করে, সে সম্পদ তার মুহরিম নিকটাত্মীয়েরই তবে তার উপর প্রযোজ্য হবে হস্তকর্তনের বিধান। অপরের বাসায় তার প্রবেশ ছিলো নিষিদ্ধ। কারণ, প্রথমাবস্থায় সম্পদ সুরক্ষিত ছিলো না, কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় ছিলো সুরক্ষিত।

একটি সন্দেহ ঃ যদি তাই হয়, তবে একথাও তো বলা যেতে পারে যে, বন্ধুর গৃহের কিছু চুরি করলেও হাত কাটা যাবে না।

সন্দেহভঞ্জন ঃ আত্মীয়তার মতো বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থায়ী নয়। চুরি করলেও চোরের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় না। কিন্তু বন্ধুগৃহে চুরি করলে, তখন সে আর বন্ধুই থাকে না। কারণ অপহরণ বন্ধুত্ববিরোধী।

বাগবী লিখেছেন, অন্ধ, খঞ্জ ও দুর্বল লোকেরা গৃহে গৃহে আহার্য যাচ্ঞা করতো। গৃহকর্তার নিকটে পানাহার করানোর মতো কিছু না থাকলে তারা যাচ্ঞাকারীদেরকে নিয়ে যেতেন আয়াতে উল্লেখিত আপজনদের গৃহে। এভাবে প্রাপ্ত আহার ভক্ষণ করতে সংকোচ করতো যাচ্ঞাকারীরা। তারা মনে করতো আমাদেরকে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘোরানো হচ্ছে। আর গৃহকর্তার বিনা অনুমতিতে করানো হচ্ছে পানাহার। তাদের এমতো চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্নদের এবং তোমাদের নিজেদের কোনো অপরাধই হবে

www.eelm.weebly.com

না যদি তোমরা একাকী অথবা তাদের সঙ্গে একত্রাহার করো তোমাদের সন্তান, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, পিতৃব্য, ফুফু, খালা ও কর্মচারীদের গৃহে, স্বগৃহে অথবা বন্ধুবর্গের গৃহে।

আতা খোরাসানীর বরাত দিয়ে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোনো কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি যখন তাঁদের দরিদ্র আত্মীয়স্বজনদের বাসায় গমন করতো, তখন তাদের আত্মীয়স্বজনেরা পানাহারের সামগ্রী উপস্থিত করতো অতিথিদের সামনে। ধনাঢ্যরা বলতো, আল্লাহ্র শপথ! আমরা এমতো পাপ করতে পারি না যে তোমাদের আহারে অংশগ্রহণ করি। আমরা হলাম ধনাঢ্য। আর তোমরা তো কাঙ্গাল। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

'তোমরা একত্রে আহার করো অথবা পৃথকভাবে আহার করো তাতে তোমাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই'— বাগবী লিখেছেন, এই বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে বনী লাইছ ইবনে বকর কেনানী সম্পর্কে। তাঁর গোত্রের এক লোক মেহমান ছাড়া পানাহার করতেন না। কখনো কখনো খাবার সামনে নিয়ে মেহমানের অপেক্ষায় বসে থাকতেন দিনভর। তারপর মেহমান পেলে খেতেন। না পেলে সন্ধ্যার দিকে হয়তো সামান্য কিছু আহার করতেন। উটের ওলান দুধে ভরপুর হতো, কিন্তু মেহমান না পেলে দুগ্ধ দোহন করতেন না। এরকম বর্ণনা করেছেন কাতাদা, জুহাক ও ইবনে জুরাইজ।

ইবনে জারীর ও বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা ও আবু সালেহ্ বলেছেন, আনসার সাহাবীগণের অভ্যাস ছিলো তাঁদের গৃহে কোনো অতিথি থাকলে তাদের সঙ্গে ছাড়া তাঁরা একা একা পানাহার করতেন না। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাঁদেরকে একা একা পানাহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তাঁরা অতিথির সঙ্গে অথবা একা একা আহার করলে তাতে কোনো দোষ হবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে'। একথার অর্থ নিজের অথবা অন্যের গৃহে প্রবেশ কালে তোমরা একে অপরকে শান্তিসম্ভাষণ জানিয়ো। উল্লেখ্য, সালাম বা শান্তিসম্ভাষণ বিনিময় হতে পারে কেবল স্বধর্মাবলম্বী ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে। 'আন্ফুস্' শব্দটি ব্যবহৃত হয় স্বধর্মাবলম্বী অথবা স্বজন সম্পর্কে। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'লা তুখ্রিজু আনফুসাকুম মিন দিয়ারিকুম, লা তালমিজু আনফুসাকুম, জান্নাল মু'মিনুনা ওয়াল মু'মিনাতি বি আনফুসিহিম খইরা' (তোমাদের স্বজাতিদেরকে তাড়িয়ে দিয়ো না তোমাদের দেশ থেকে, পার্থক্য কোরো না তোমাদের স্বজনদের মধ্যে, বিশ্বাসী নর-নারীগণ নিজের সম্পর্কে পোষণ করে উত্তম ধারণা)।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন— যদি তোমরা তোমাদের বা অন্যের গৃহে প্রবেশ করে সেখানে কাউকে উপস্থিত না পাও তবে নিজেকে সালাম কোরো। বোলো, আস্সালামু আ'লাইনা ওয়া আ'লা ই'বাদিল্লাহিস্সলিহীন। এরকম সালামের প্রত্যুত্তর দিয়ে থাকে ফেরেশতারা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্র নিকট হবে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন'। এখানে 'তাহিয়্যাত' অর্থ পবিত্রতা।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ নবী আদমকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য স্থিরীকৃত আকৃতিতে। তাঁর উচ্চতা ছিলো ষাট হাত। তাঁর অবয়ব তৈরীর পর তার উপরে ঘটান আত্মার সম্পাত। বলেন, যাও ওই উপবিষ্ট ফেরেশতাদেরকে সালাম বলো এবং তারা কী জবাব দেয় শোনো। তারা যা বলবে, তাই হবে তোমার এবং তোমার বংশধরগণের সালামের উত্তর। নবী আদম তখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আস্সালামু আ'লাইকুম। ফেরেশতারা বললেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমতুল্লাহ্।

'মিন ইনদিল্লাহ্' (এটা আল্লাহ্র নিকট থেকে) অর্থ এই সালাম শুরু হয়েছে আল্লাহ্র নিকট থেকে। এরকমও হতে পারে যে, এখানে মিন ইনদিল্লাহ্ কথাটির সম্পর্কযুক্ত 'তাহিয়্যাতান' এর সঙ্গে। 'তাহিয়্যাতান' অর্থ জীবনের শুভকামনা বা যে জীবনকাল লাভ হয় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।

'মুবারাকান' অর্থ কল্যাণময়, যে কল্যাণময়তা সম্পৃক্ত রয়েছে অভিবাদনের প্রত্যুত্তরের সঙ্গে। সেকারণেই অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে বলা হয় 'ওয়া আলাইকুমুস্সালাম ওয়া রহমাতুল্লহ্ (তোমার বা তোমাদের উপরে বর্ষিত হোক অসংখ্য শান্তি ও সুপ্রচুর কল্যাণ)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, প্রতিঅভিবাদনকে 'কল্যাণময়' বলার কারণ এই যে, এতে রয়েছে অসংখ্য মঙ্গল ও পুণ্য।

'ত্বয়্যিবাতান' অর্থ পবিত্র। অর্থাৎ অপরিচ্ছন্নতা ও অহংকার থেকে পবিত্র, বিশুদ্ধ অন্তরোৎসারিত। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ত্বয়্যিবা' অর্থ ওই উচ্চারণ, যা শ্রুতিসুখকর ও অন্তরানন্দজনক।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মুবারাকান ত্বয়্যিবাতান' অর্থ নন্দিত সুন্দর। হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যখন তোমরা আমার কোনো উম্মতের সঙ্গে মিলিত হবে, তখন তাকে সালাম বলবে। এতে করে তোমরা পাবে দীর্ঘ হায়াত। আর স্বগৃহে প্রবেশ করলে সালাম বলবে গৃহবাসীদেরকে। এতে করে তোমাদের গৃহে বর্ষিত হবে কল্যাণ। আর তোমরা চাশতের নামাজও পাঠ কোরো। এই নামাজই আল্লাহ্র প্রতি ধাবিত হওয়ার

www.eelm.weebly.com

(আউয়্যবীনের) নামাজ। হাদিসটি বায়হাকী বর্ণনা করেছেন তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে এবং সা'লাবী ও হামযা ইবনে ইউসুফ জুরজানী 'তারিখে জুরজান' পুস্তকে। অবশ্য হাদিসটির সূত্রশৃঙ্খল শিথিল।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, গৃহপ্রবেশকালে গৃহবাসীদেরকে সালাম করতে হবে। হজরত জাবের, তাউস, জুহুরী, কাতাদা এবং আমর ইবনে দীনারও এরকম বলেছেন। কাতাদা বলেছেন, তোমরা গৃহপ্রবেশকালে গৃহবাসীদেরকে সালাম বোলো। আর তোমাদের সালামের তারাই অধিক প্রাপক। জনশূন্য গৃহে প্রবেশ করলে বলবে 'আসসালামু আ'লাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সলিহীন'। আমার নিকট এই তথ্যটি পৌঁছেছে যে, এরকম সালামের প্রত্যুত্তর প্রদান করে ফেরেশতারা।

বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমানে' কাতাদার একটি অপরিণত সূত্রে বর্ণনা করেন, গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সময় গৃহবাসীদের সঙ্গে অভিবাদন বিনিময়ের মাধ্যমে বিদায় গ্রহণ কোরো।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. আমাকে নির্দেশ করেছেন, বৎস! গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের সময় গৃহবাসীদেরকে অভিবাদন জানিয়ো। এর মধ্যে রয়েছে তোমার ও তোমার পরিবার পরিজনের জন্য কল্যাণ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, গৃহে কাউকে না দেখলে বলবে 'আস্সালামু আ'লাইনা মির রব্বিনা, আস্সালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিস সলিহীনা, আস্সালামু আ'লা আহলিল বাইতি ওয়া রহমাতুল্লাহি' (আমাদের প্রভুপালনকর্তার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি বর্ষিত হোক শান্তি, শান্তি বর্ষিত হোক পুণ্যবান দাসদের প্রতি, গৃহবাসীদের প্রতিও বর্ষিত হোক আল্লাহ্র দয়া। আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে আমর ইবনে দীনারের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তোমরা যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন বলবে 'আস্সালামু আ'লাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সলিহীন'।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, একবার এক লোক রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! ইসলামে কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি স. বললেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম প্রদান। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকার ছয়টি— ১. পীড়িতকে দেখতে যাওয়া ২. মৃতের জানাযায় উপস্থিত হওয়া ৩. নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা ৪. সাক্ষাতে সালাম প্রদান ৫. হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' এবং ৬. উপস্থিত অনুপস্থিত সকলের জন্য কল্যাণকামনা। নাসায়ী, তিরমিজি।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা আরো বর্ণনা করেন, রসুল স. জানিয়েছেন, তোমরা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ না হলে মুমিনও হতে পারবে না। আমি কি বলবো, পারস্পরিক মহব্বত দৃঢ় হওয়ার মাধ্যম কোনটি? তা হচ্ছে, সালামের ব্যাপক প্রচলন।

হজরত আবু হোরায়রার একটি সুপরিণত শ্রেণীর বর্ণনায় এসেছে, বাহনারোহী ব্যক্তি সালাম প্রদান করবে পদব্রজে গমনকারী পথিককে। পদব্রজে গমনকারী সালাম দিবে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে। আর অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সালাম দিবে অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে। বোখারী, মুসলিম।

বোখারী কর্তৃক হজরত আবু হোরায়রার অপর এক বর্ণনায় এসেছে, বয়োকনিষ্ঠরা সালাম করবে বয়োজ্যোষ্ঠদেরকে।

হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আস্‌সালামু আ'লাইকুম। তিনি স. বললেন, ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম। লোকটি বসে পড়লো। তিনি স. পুনরায় বললেন, তোমার লাভ হলো দশটি পুণ্য। কিছুক্ষণ পর আর এক লোক উপস্থিত হয়ে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্'। তিনি স.ও তাকে অনুরূপ জবাব দিলেন সে বসে পড়ার পর বললেন, তোমার পুণ্য অর্জিত হলো বিশটি। কিছুক্ষণ পর আর এক জন এসে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্'। রসুল স.ও তাকে প্রত্যুত্তরে একই কথা বললেন। তারপর সে বসে পড়ার পর বললেন, তিরিশটি। তিরমিজি, আবু দাউদ। হজরত মুয়াজ ইবনে আনাস থেকে আবু দাউদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে এসেছে এই কথাটুকু— এরপর আরও একজন এলো এবং বললো 'আস্‌সালামু আ'লাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহ্'। রসুল স. বললেন, চল্লিশ। একজন অপেক্ষা অন্যজনের মর্যাদার তারতম্যও এরকম।

হজরত আবু উমামার একটি সুপরিণতসূত্রবিশিষ্ট হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেন, ওই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সর্বাধিক নৈকট্যভাজন যে সর্বাগ্রে সালাম দেয়।

সুপরিণতসূত্রে হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেন, কোনো সমাবেশে উপস্থিত হলে প্রথমে সালাম বলবে আগন্তুক ব্যক্তি। তারপর মন যদি চায়, তবে সে সেখানে বসে পড়তে পারে। তারপর প্রত্যাবর্তনকালেও সালাম

www.eelm.weebly.com

বলবে দণ্ডায়মান হয়ে। মনে রাখতে হবে, এমতোক্ষেত্রে প্রথম সালাম অপেক্ষা দ্বিতীয় সালাম অধিক পুণ্যার্জক নয়। তিরমিজি, আবু দাউদ।

হজরত আলী বলেছেন, পথচারীদের একজনের সালাম তাদের সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট এবং উপবিষ্ট ব্যক্তিদের একজনের সালামের প্রত্যুত্তর যথেষ্ট উপবিষ্ট অন্যান্যদের জন্যও। বাগবী বর্ণিত উক্তিটিকে সাব্যস্ত করেছেন হজরত আলীর উক্তিরূপে এবং বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমানে লিখেছেন বাণীটি স্বয়ং রসুল স. এর।

শেষে বলা হয়েছে— 'এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা বুঝতে পারো'। এই কথাটি উচ্চারিত হয়েছে তৃতীয়বারের মতো (প্রথম ও দ্বিতীয় উল্লেখ এসেছে ৫৮ ও ৫৯ সংখ্যক আয়াতে)। এভাবে আলোচ্য আয়াতের শেষে এমতো উচ্চারণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে বক্তব্যের দৃঢ়তা, গুরুত্ব ও মর্যাদা। প্রথম ও দ্বিতীয় বারের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'। আর এখানে বলা হয়েছে 'যাতে তোমরা বুঝতে পারো'। প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিলো একথা বলা যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবি এরকমই। আর এখানের বক্তব্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে— সত্যোপলব্ধি ও উত্তম বিধানাবলী জ্ঞাত করানোই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য।

বায়হাকী তাঁর 'দালায়েল' গ্রন্থে ইবনে ইসহাক এবং মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজীর বরাত দিয়ে লিখেছেন, আহযাব যুদ্ধের সময় মদীনা আক্রমণ করে বসে কুরায়েশ, গাতফান ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা। তারা সেনাসমাবেশ ঘটায় মদীনার রুম্মাহ্ কূপের মজমাউল আসইয়াল নামক স্থানে। ওই যুদ্ধে তাদের সেনাধিনায়ক ছিলো আবু সুফিয়ান। আর গাতফান গোত্রের সৈন্যরা তখন অবস্থান গ্রহণ করেছিলো উহুদ পাহাড়ের একপাশে নকিবাইন নামক স্থানে। রসুল স. তাদেরকে প্রতিহত করবার জন্য মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করান। তিনি স. নিজেও খনন কার্যে অংশগ্রহণ করেন। সাহাবীগণের সঙ্গে মুনাফিকেরাও বাধ্য হয়ে খননকার্যে অংশ নিয়েছিলো। কিন্তু তারা ছিলো অমনোযোগী। রসুল স.এর অনুপস্থিতিতে তারা চলে যেতো নিজ নিজ বাড়ীতে। সাহাবীগণের মধ্যে কারো কারো অপরিহার্য প্রয়োজন দেখা দিলে রসুল স. এর অনুমতি সাপেক্ষে তাঁরাও কখনো কখনো অপারগ হয়ে স্থান ত্যাগ করতেন। কিন্তু প্রয়োজন শেষে তৎক্ষণাৎ তাঁরা আবার এসে কাজে যোগ দিতেন। এমতো পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

www.eelm.weebly.com

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

❒ তাহারাই বিশ্বাসী যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলে বিশ্বাস করে এবং রসূলের সংগে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্রিত হইলে তাহার অনুমতি ব্যতীত সরিয়া পড়ে না; যাহারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তাহারাই আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলে বিশ্বাসী। অতএব তাহারা তাহাদিগের কোন কাজে বাহিরে যাইবার জন্য তোমার অনুমতি চাহিলে তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিও এবং তাহাদিগের জন্য আল্লাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❒ রসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদিগের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করিও না; তোমাদিগের মধ্যে যাহারা চুপি চুপি সরিয়া পড়ে আল্লাহ্ তাহাদিগকে জানেন। সুতরাং যাহারা তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা সতর্ক হউক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাহাদিগকে গ্রাস করিবে।

❒ জানিয়া রাখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহেরই, তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা জানেন। যেদিন তাহারা তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে সেদিন তিনি তাহাদিগকে জানাইয়া দিবেন তাহারা যাহা করিত। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারাই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলে বিশ্বাস করে এবং রসুলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্রিত হলে অনুমতি ব্যতীত সরে পড়ে না'। এখানে 'আমরিন জামিয়িন' অর্থ সমষ্টিগত কার্য— যেমন পরিখা খনন, জেহাদ, জুমআর নামাজ, ঈদের নামাজ ইত্যাদি। এভাবে এখানকার বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! শুনে রাখুন, আপনি ও আপনার সহযোগীরা যখন শত্রুকে প্রতিহত করবার জন্য পরিখা খননের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত, তখন আপনার অনুমতি ছাড়া যারা স্থান ত্যাগ করে না, তারাই আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের উপর প্রকৃত আস্থা স্থাপনকারী, খাঁটি মুমিন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ্ ও তার রসুলে বিশ্বাসী'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! পুনরায় শুনুন, যারা অপরিহার্য কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য আপনার নিকট স্থান ত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করে, তারপর আপনি অনুমতি দেয়ার পর অন্যত্র চলে যায়, তারাই প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলে বিশ্বাসী। কারণ তাঁরা কেবল অনুমতি প্রার্থনাকেই যথেষ্ট মনে করে না, অপেক্ষা করে আপনার সম্মতির। বলা বাহুল্য যে, এখানে 'বিশ্বাসী' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর একনিষ্ঠ সহচরবৃন্দকে। তাঁরা সকলেই ছিলেন পরিপূর্ণ ইমানদার, কপটতা থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত। সুতরাং বুঝতে হবে রসুল স. এর অনুমতি ব্যতিরেকে যারা কঠিন বিপদের সময় তাঁর মহান সান্নিধ্য থেকে অন্যত্র গমন করে, তারা বিশ্বাসী নয়, কপটাচারী (মুনাফিক)। আরো বুঝতে হবে, এখানে পরপর দু'বার একই কথার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বিশ্বাসীগণের মহান মর্যাদাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব তারা তাদের কোনো কাজে বাইরে যাবার জন্য অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিয়ো'। একথার অর্থ— যখন তখন কর্মস্থল ত্যাগ করা বিশ্বাসীদের স্বভাব নয়। তাই হে আমার রসুল! নিরুপায় অবস্থায় যখন তারা অন্যত্র গমন করতে বাধ্য হয়, তখন তারা অনুমতি প্রার্থনা করলে আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাদেরকে অনুমতি দিতে পারেন। এমতো অনুমতি প্রদান আপনার জন্য আবশ্যিক নয়। বরং তা আপনার অভিপ্রায়নির্ভর। উল্লেখ্য, এরকম অনুমতি প্রদান করা না করার অধিকার রয়েছে রসুল স. এর খলিফাগণেরও।

কেউ কেউ বলেছেন, অনুমতি দেয়া না দেয়ার ব্যাপারটি রসুল স. এর অভিপ্রায়নির্ভর নয়। বরং তা তাঁর বিবেচনানির্ভর। অর্থাৎ রসুল স. যদি দেখেন, অনুমতিপ্রার্থী সত্যি সত্যিই স্থানান্তরে গমন করার ব্যাপারে অপারগ, তবে তিনি স.

www.eelm.weebly.com

তাঁকে অনুমতি দিবেন। আর যদি দেখেন তার প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারটি অপরিহার্য নয়, গৌণ এবং তার অনুপস্থিতিতে বড় কোনো ক্ষতি হবে, তা হলে তিনি স. তাকে অনুমতি দিবেন না।

'এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কোরো। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু'। একথার অর্থ— ইসলাম ও মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থ সর্বাগ্রগণ্য। তাই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অন্যত্র গমন করতে বাধ্য হলেও, তা হবে এক ধরনের অপরাধ। এরকম কার্য অবশ্যই এক ধরনের সংকীর্ণতা। ধর্মীয় বিষয়ের উপরে জাগতিক বিষয়কে প্রাধান্য দেয়ার মতো। সুতরাং হে আমার রসুল! নিরুপায় হয়ে অন্যত্র গমনকারীদের জন্যও আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। আল্লাহ্‌ তো ক্ষমাপরবশ ও দয়ার্দ্র। তাই তিনি তাদের উপায়বিহীনতাজাত এমতো অপরাধকে ক্ষমার্হ বিবেচনা করবেন।

বাগবী লিখেছেন, কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ আলোচ্য আয়াতের অবতরণের প্রেক্ষিত সম্পর্কে উপস্থাপন করেছেন এই তথ্যটি— রসুল স. তাঁর মিম্বরে আরোহণ করে যখন ভাষণ দিতেন, তখন কারো বাইরে যাওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি সাথে সাথে বেরিয়ে যেতেন না। বরং দাঁড়িয়ে রসুল স. এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। রসুল স. ইশারায় তাঁকে বহির্গমনের অনুমতি প্রদান করতেন।

মুজাহিদ বলেছেন, জুমআর দিন খুতবা পাঠকালে ইমাম একান্ত জরুরী প্রয়োজনে বহির্গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে ইশারায় অনুমতি দিতে পারেন। আলেমগণ বলেন, ইসলামের সকল সমষ্টিগত কার্যের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদানের এই বিধানটি প্রযোজ্য। তাই মুসলমানেরা কখনোই কোনো সমাবেশ থেকে অধিনায়কের অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র গমন করতে পারবে না। আবার অধিনায়কের এমতো স্বাধীনতা রয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে অনুমতি দিবেন অথবা দিবেন না। কিন্তু কতক ক্ষেত্রে অধিনায়কের অনুমতি প্রার্থনা ওয়াজিব নয়। যেমন মসজিদে হঠাৎ কোনো নারীর ঋতুস্রাব শুরু হলো, অথবা অপবিত্র হলো অন্য কোনো কারণে, কিংবা সহসা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেলো কোনো রোগের প্রকোপ ইত্যাদি।

পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'রসুলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মতো গণ্য কোরো না'। একথার অর্থ— যখন কোনো সামষ্টিক স্বার্থে রসুল তোমাদেরকে ডাকেন, তখন তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দাও। তাঁর ডাককে অন্য কারো ডাকের সঙ্গে তুল্য ভেবো না। এরকম কদাচ মনে কোরো না যে, অন্যের ডাকে যেমন ইচ্ছা করলে সাড়া দেয়া যায়, অথবা না-ও দেয়া যায়— রসুলের আহ্বান সেই প্রকৃতির নয়, কখনোই সেরকম নয়। উল্লেখ্য, রসুল স. এর ডাকে তৎক্ষণাৎ 'এই যে আমি' (লাব্বাইক) বলে সাড়া দেয়া ফরজ

www.eelm.weebly.com

এবং তাঁর সমাবেশ থেকে বিনা অনুমতিতে চলে আসা হারাম। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'ইয়া আইয়্যুহাললাজীনা আমানুস্ তাজীবু লিল্লাহি ওয়া লির রসুলি ইজা দায়াকুম লিমা ইউহ্য়িকুম (হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি ডাক দিবেন তোমাদেরকে)।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'দুয়া'আর রসুল' কথাটি সম্পর্কযুক্ত কর্মপদের সঙ্গে। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— অন্য লোককে তোমরা যেভাবে সম্বোধন করো, আল্লাহ্র রসুলকে কখনোই সেভাবে সম্বোধন কোরো না। তাঁকে কখনো নাম ধরে ডেকো না। আহ্বান কোরো যথার্থ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে।

আবু নাঈম তাঁর 'আদ্দালায়েল' গ্রন্থে জুহাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যাযাবর বেদুইনেরা রসুল স.কে সম্বোধন করতো ' ইয়া মোহাম্মদ' 'ইয়া আবাল কাসেম' বলে। তাদের এমতো অপসম্বোধন নিষিদ্ধকরণার্থেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। তারপর থেকে সকলে তাঁকে আহ্বান করতে থাকে 'ইয়া নবীআল্লাহ্' 'ইয়া রসুলাল্লাহ্' বলে। উল্লেখ্য, এই ব্যাখ্যাটি পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, রসুল স. সকাশে অনুমতি প্রার্থনা করা না করার কথা। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে প্রার্থনাপূর্ব সম্বোধনের বিধানের কথা। যেনো বলা হয়েছে, তোমরা অনুমতি প্রার্থনার পূর্বে অথবা অন্য যে কোনো কারণে যখন রসুলকে সম্বোধন করো, তখন তাঁকে ডাকো সম্মানসূচকতার সঙ্গে 'হে আল্লাহ্র নবী' 'হে আল্লাহ্র রসুল'— এভাবে। অন্য মানুষকে যেমন নাম বা জাগতিক কোনো পদবী ধরে সম্বোধন করা হয়, সেভাবে তাঁকে কখনোই আহ্বান কোরো না।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— তোমরা কখনো আল্লাহ্র রসুলকে অপ্রসন্ন কোরো না। বেঁচে থেকো তাঁর অপ্রসন্নতা ও অপপ্রার্থনা থেকে। কারণ তাঁর অপ্রসন্নতা ও অপপ্রার্থনা অন্য কারো মতো নয়।

জননী আয়েশা থেকে বোখারী লিখেছেন, একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে কতিপয় ইহুদী উপস্থিত হয়ে বললো 'আসসামু আলাইকুম' (তোমার ধ্বংস হোক, মৃত্যু হোক)। তিনি স. প্রত্যুত্তরে বললেন, 'ওয়া আলাইকুম'। (তোমারও)। এ কথা শুনতে পেয়ে আমি বললাম 'আসসামু আলাইকুম ওয়া লানাতুল্লহি ওয়া গদ্বু আলাইকুম' (তোমার মৃত্যু হোক, তোমার প্রতি পতিত হোক আল্লাহ্র অভিসম্পাত ও রোষ)। তিনি স. বললেন, আয়েশা! সংযত হও। বিনম্র হও। রক্ষা পাও রূঢ় ও অশ্লীল বচন থেকে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি কি শুনতে পাননি

www.eelm.weebly.com

তারা কী বললো? তিনি স. বললেন, তুমি কি শুনতে পাওনি আমি কী বললাম? আমার জন্য তাদের প্রার্থনা গৃহীত হবে না। কিন্তু তাদের জন্য আমার প্রার্থনা গৃহীত হবে।

আমি বলি, এরকম অর্থ গ্রহণ করলে বুঝতে হবে, এখানে 'আলাইকুম' শব্দটি উহ্য রয়েছে। তখন প্রকৃত বক্তব্যটি হবে এরকম— 'লা তাজ্‌আ'লু দুয়াআর রসুলি আলাইকুম কাদুয়ায়ি বা'দ্বিকুম আ'লা বা'দ্বিন'। 'দুয়া 'শব্দের পরে 'আ'লা বসলে অর্থ হবে অপপ্রার্থনা। আর শব্দটির পরে 'লাম' বসলে (যেমন লাহুম, লাকা, লাহু, লি ইত্যাদি) অর্থ হবে উত্তম প্রার্থনা। আর সংযোজক শব্দ ও হরফে জ্বর যদি না থাকে তবে অর্থ হবে আহ্বান করা, সম্বোধন করা, ডাকা বা ভালো-মন্দ কাজের জন্য দোয়া করা। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ছোটরা বড়দের কাছে প্রার্থনা করলে বড়রা হয়তো তা গ্রহণ করে অথবা নাকচ করে দেয়। তোমরা রসুলের প্রার্থনাকে এমন মনে কোরো না। আল্লাহ্ সকাশে তাঁর প্রার্থনা অবশ্য গ্রহণীয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি সরে পড়ে আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন'। এখানে 'সাললুন' অর্থ চুপি চুপি। অপহরণের মতো গোপনীয়তার সঙ্গে রয়েছে শব্দটির সম্পৃক্তি। যেমন 'সাললাল বায়িরু ফী জাওফিল লাইলি' অর্থ রাতে উটটি চুপিসারে চলে গিয়েছে। 'ইনসাল্লা' 'ইসতাল্লা' শব্দ দু'টোও সমার্থবোধক। এরকম বলা হয়েছে 'কামুস' নামক অভিধানে।

এখানকার 'লিওয়াজ্বান' শব্দটি এসেছে 'লিওয়াজ্ব' থেকে। শব্দটি 'বাবে মুফায়ালা' এর ধাতুমূল। শব্দটির রূপান্তরণ এরূপ— 'লাওয়াজ্বা'— 'ইউলায়িজ্জু'— লিওয়াজ্বান। মূল শব্দ হচ্ছে 'রিয়াজ্বান'। 'লিওয়াজ্ব' অর্থ অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা, অন্যের নিকট থেকে গোপন করা, অন্যের সঙ্গে মিলিত হওয়া। যেমন একটি দোয়ায় বলা হয়েছে 'আল্লাহুম্মা আলুজ্বুবিকা' (হে আল্লাহ্' আমি তোমার নিকট সাহায্যপ্রার্থী)। 'লাওয়াজ্ব' অর্থ প্রথমজন দ্বিতীয়জনের এবং দ্বিতীয় জন প্রথম জনের সাহায্যে পরস্পরের আড়াল গ্রহণ করে চলে যায়। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— মুনাফিকেরা চুপি চুপি সরে যায় বা চলে যায়। অথবা অর্থ হবে— যারা স্থানত্যাগের অনুমতি পেতেন, তাদেরকে আড়াল করে যারা সরে যায়।

'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, 'লিওয়াজ্ব' শব্দটি 'লিওয়াজ্ব' এর মতোই। শব্দ দু'টোর অর্থ কোনো কিছুর আড়ালে গোপন হওয়া বা আত্মগোপন করা। উল্লেখ্য, আহযাব যুদ্ধের পরিখা খননকালে মুনাফিকেরা এভাবেই আত্মগোপন করে চুপিসারে সরে পড়তো।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জুমআর দিন মসজিদে অবস্থান করা এবং খুতবা শ্রবণ করা ছিলো মুনাফিকদের জন্য বড়ই অস্বস্তিকর। তাই তারা সাহাবীগণকে আড়াল করে চুপি চুপি সরে পড়তো।

'ক্বদ ইয়া'লামুল্লহ' অর্থ আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। অর্থাৎ তারা যে শাস্তিযোগ্য তা আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। আর যথাসময়ে তাঁর এই শাস্তি কার্যকরও হবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে'। এখানে 'আ'ন আমরিহি' (তাঁর আদেশের) কথাটির 'আন' অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। কেউ কেউ এরকম বলেছেন। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— যারা তাঁর আদেশের চরম বিরুদ্ধাচরণ করে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'মুখলিফুন' কথাটির মধ্যে রয়েছে চরম বিমুখতার অর্থ। আর 'আন' ওই চরম বিমুখতার পরিচায়ক। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— যারা আল্লাহ্র আদেশের প্রতি প্রদর্শন করে চূড়ান্ত পর্যায়ের বৈমুখ্য। যেমন 'খলাফা আনিল আমরি' অর্থ সে বিমুখ হয়েছে, প্রত্যাবর্তন করেছে। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে এখানকার কর্মপদ রয়েছে অনুক্ত। আর এখানকার 'আ'ন আমরিহি' এর 'হি' (তাঁর) সর্বনামটি স্থলাভিষিক্ত হবে আল্লাহ্র অথবা আল্লাহ্র রসুলের।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার 'ফিৎনাতুন' (বিপর্যয়) অর্থ জাগতিক বিপদ বা শাস্তি। আর 'আ'জাবুন আ'লীম' (কঠিন শাস্তি) অর্থ আখেরাতের আযাব।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যদি আমর বা আদেশের ওয়াজিব— মোস্তাহাব কোনোটাই হওয়ার কারণ না থাকে এবং ওই কারণ দ্বারা কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ না পায়, তবে মূল শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে আদেশটি ওয়াজিব শ্রেণীরই হয়ে থাকে। সাধারণ আদেশ একাধিক অর্থবোধক হয় না। আবার হয় না কেবল ওয়াজিব, অথবা কেবল মোস্তাহাব। যেমন ইমাম শাফেয়ী বলেন, না হয় ওয়াজিব, মোস্তাহাব ও মোবাহের মধ্যে, না হয় ওয়াজিব, মোস্তাহাব, মোবাহ্ ও তাহদীদের মধ্যে, যেমন বলে শিয়া মতাবলম্বীরা। ইবনে শোরাইহ্ এর অভিমতও শিয়াদের অভিমতের মতো। সাধারণ আদেশকে যারা ওয়াজিব বলেন, তাদের অভিমতের প্রত্যয়ন হয় এই আয়াতের মাধ্যমেও। কেননা এখানকার আদেশের বিরোধিতা করলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে শাস্তি হবে বলে বলা হয়েছে। আর একথা বলা বাহুল্য যে, বিপর্যয় ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয় ওয়াজিব পরিত্যাগ ও হারাম কার্যে লিপ্ত হওয়ার কারণেই।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'জেনে রেখো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা আল্লাহ্‌রই। একথার অর্থ— আকাশ পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির একক অধিকর্তা কেবলই আল্লাহ্।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ তা জানেন'। একথার অর্থ— হে মনুষ্য সমাজ! তোমাদের জন্য যে বিধানাবলী আমি প্রবর্তন করেছি, তোমরা তা মান্য করো কি করো না, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পরিপূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত। এরকমও হতে পারে যে, এখানে বলা হয়েছে কেবল মুনাফিকদের কথা। আর এর সম্পর্ক পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যে মহাসৃজয়িতা আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টির একক অধীশ্বর, তিনি তো সকলের প্রকাশ্য-গোপন সকল অবস্থা সম্পর্কে জানবেনই। তিনি যে সর্বজ্ঞ।

এরপর বলা হয়েছে— 'যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করতো'। একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে যখন সকলকে একত্র করা হবে, তখন আল্লাহ্ এই মর্মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান করবেন যে, কে পুরস্কারের যোগ্য এবং কে যোগ্য তিরস্কারের। আর সেই মতে তিনি তা পুরোপুরি কার্যকরও করবেন।

এখানে 'ফা ইউনাব্বিউহুম' (জানিয়ে দিবেন) এর 'ফা' অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। আর 'ইয়াওমা ইউরজ্বাউ'না' (যেদিন প্রত্যাবর্তিত হবে) 'ইউনাব্বিউহুম' এর কর্মকারক। যেমন এক সুরায় বলা হয়েছে— 'লি ইলাফি কুরাইশিন ঈলাফিহিম রিহ্‌লাতাশ শিতাঈ ওয়াস সইফ ফাল ইয়া'বুদু রব্বাহাজাল বাঈত'। এখানে 'লিইলাফি' এর সম্পর্ক 'লিইয়া'বুদু' এর সঙ্গে এবং 'ফালইয়া'বুদু' এর 'ফা' এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র নিকট কোনো কিছুই অজ্ঞাত বা গোপন নয়।

জননী আয়েশা থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, নারীদেরকে বালাখানায় রেখো না এবং তাদেরকে লিপিবিদ্যা শিক্ষা দিয়ো না। বরং তাদেরকে শিক্ষা দিয়ো বস্ত্রবুনন কর্ম ও সুরা নূর। আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসুল ও তাঁর সহচরবৃন্দ সত্য কথাই বলেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্। সুরা নূরের তাফসীর শেষ হলো আজ ২৯ শে রমজান, ১৩০৪ হিজরী সনে।

www.eelm.weebly.com

সূরা ফুরক্বান

সুরা ফুরক্বানের আয়াত-সংখ্যা ৭৭ এবং রুকুর সংখ্যা ৬। সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কেবল ৬৯ ও ৭০ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে সুরা ইয়াসিনের পরে।

ইমাম মালেক, ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, আমি একবার হিশাম ইবনে হাকিমকে নামাজের মধ্যে সুরা ফুরক্বান পাঠ করতে শুনলাম। দেখলাম, সে সুরাটি পাঠ করছে কিছু অতিরিক্ত শব্দ সংযোজনা সহকারে। মনে হচ্ছিলো নামাজের মধ্যেই তাকে সতর্ক করে দিই। কিন্তু তা না করে নামাজের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। নামাজ শেষ হতেই তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, তোমাকে এভাবে সুরা পাঠ করতে কে শিখিয়েছে? সে বললো, স্বয়ং রসুল স.। আমি বললাম, তুমি ভুল বললে। তিনি স. তো আমাকে এই সুরা শিখিয়েছেন অন্যভাবে। একথা বলেই আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলাম রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি যেভাবে সুরা ফুরক্বান শিখিয়েছেন, হিশাম সেভাবে পাঠ করে না। রসুল স. হিশামকে বললেন, পড়তো দেখি। হিশাম পাঠ করলো। রসুল স. বললেন, ঠিকই আছে। সুরাটি এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, এবার তুমি পাঠ করো। আমি নির্দেশ পালন করলাম। পাঠ শেষ হলে তিনি স. বললেন, ঠিকই আছে। এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে সুরা ফুরক্বান। আসলে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সাতটি উচ্চারণরীতিতে। যে রীতির পাঠ তোমাদের জন্য সহজ হয় তোমরা সেই রীতিতেই পাঠ কোরো। উল্লেখ্য, হরফে কাছীর অর্থ ধ্বনিমাত্রিক বর্ণ। আমার মতে শব্দটির অর্থ হবে ভিন্ন পাঠরীতি। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ১, ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۙ

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ○

www.eelm.weebly.com

❒ কত মহান তিনি যিনি তাঁহার দাসের প্রতি ফুরক্বান অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হইতে পারে।

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁহারই; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই; সার্বভৌমিকত্বে তাঁহার কোন অংশী নাই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত প্রকৃতি দান করিয়াছেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তাবারকাল্লাজী নায্যালাল ফুরক্বানা আ'লা আ'বদিহী' (কতো মহান তিনি, যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফুরক্বান অবতীর্ণ করেছেন), এখানকার 'তাবারক' (মহান) শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'বারকাত' থেকে। শব্দটির ব্যাকরণ গত রূপান্তর হয় না এবং শব্দটি নির্দিষ্ট কেবল আল্লাহ্‌র জন্য। বারকাত অর্থ অতুলনীয় কল্যাণ বা অতুলনীয়রূপে মহান। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শব্দটির অর্থ সকল প্রকার কল্যাণ যার দিক থেকে সমাগত হয়। হাসানও এরকম বলেছেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শব্দটির অর্থ সকল কিছু অপেক্ষা উত্তম। সকল বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান। শব্দটির মধ্যে রয়েছে অতুলনীয় আধিক্যের ভাব। তাই জুহাক এর অর্থ করেছেন মহামর্যাদাশালী।

'ফুরক্বান' শব্দটি একটি মূল শব্দ। এর অর্থ পার্থক্য নির্দেশক। যেমন 'ফাররাক্বা বাইনাশ্ শাইআইন' অর্থ সে দু'টি বস্তুকে পৃথক করে দিয়েছে। কোরআন মজীদ মিথ্যাকে সত্য থেকে পৃথক করে দেয় বলেই এর নাম ফুরক্বান। কোরআন সত্যানুগামী ও মিথ্যানুসারীকে পৃথক করে দেয়। অথবা কোরআনকে 'ফুরক্বান' বলা হয়েছে এই অর্থে যে, এর অবতারণা বা উপস্থাপনা এক সঙ্গে করা হয়নি, করা হয়েছে বিভিন্ন ঘটনা অথবা সময়ের প্রেক্ষিতে পৃথক পৃথক সময়ে ও পৃথক পৃথক প্রেক্ষাপটে খণ্ড খণ্ড রূপে। এক সঙ্গে নয়। আর যেহেতু কোরআনে রয়েছে অসংখ্য কল্যাণ, তাই এর অবতারক আল্লাহ্‌কে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে 'কতো মহান'(তাবারক) অভিধায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে'। একথার অর্থ— যাতে এই কোরআন যার উপরে অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার সেই মহান রসুল মানুষ ও জ্বিনকে সতর্ক করতে পারেন আল্লাহ্‌র অসন্তোষ অথবা শাস্তি সম্পর্কে। এখানে 'বিশ্বজগত' অর্থ মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়। কেননা তাঁর রেসালাত সমগ্র মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়ের জন্য।

'নাজীরা' অর্থ সতর্ককারী। শব্দটি 'মুনজীর' (ভীতিপ্রদর্শনকারী) এর অর্থ প্রদায়ক। যেমন 'নাকীর' ও 'মুনকীর' সমার্থবোধক।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি'। উল্লেখ্য, খৃষ্টানেরা বলে 'মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র'। তাদের এমতো অপবিশ্বাসকে এখানে মিথ্যা প্রমাণ করা হয়েছে একথা বলে যে, 'তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি'।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'সার্বভৌমিকত্বে তাঁর কোনো অংশী নেই'। একথা বলে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছে অগ্নিউপাসক ও মূর্তিপূজকদের অপবিত্র বিশ্বাসকে। উল্লেখ্য, অগ্নি উপাসকেরা বলে, স্রষ্টা দু'জন। একজন কল্যাণের এবং অপরজন অকল্যাণের। আর মূর্তিপূজকেরা তো বহু স্রষ্টায় বিশ্বাসী। তাদের এমতো অপধারণার অপনোদন করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে আরো স্পষ্ট করে। বলা হয়েছে—

'তিনিই সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত প্রকৃতি দান করেছেন'। একথার অর্থ কেবল তাঁর অভিপ্রায়েও সৃজনে অনস্তিত্ব থেকে সমদ্ভূত হয়েছে সমগ্র সৃষ্টি। সকলের এবং সকল কিছুর সত্তাগত স্বভাবও তাঁর দান। যেমন মানুষকে দিয়েছেন অনুসন্ধিৎসা, বিবেক, বুদ্ধি, ভালোবাসা। অর্থাৎ সৃষ্টির অস্তিত্ব, বৈশিষ্ট্যাবলী সকল কিছুর স্রষ্টা এক, একক, অংশীহীন ও আনুরূপ্যবিহীন মহাসৃজয়িতা আল্লাহ্। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, আল্লাহ্ যেমন সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, তেমনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাদের আয়ুষ্কাল। কখনো কখনো 'খলাক্ব' শব্দটির অর্থ করা হয় 'অস্তিত্ব প্রদাতা'। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ই সমস্তকিছুকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং দান করেছেন তাদের প্রকৃতিগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমূহকে, যাদের মধ্যে প্রকাশিত হয় প্রকৃতিগত পার্থক্য। বজায় থাকে প্রত্যেকের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যসমূহ। যেনো না তারা হতে পারে একে অপরের মধ্যে একাকার।

কোনো কোনো আলেম এখানকার 'প্রত্যেকের যথোচিত প্রকৃতি দান করেছেন' কথাটির অর্থ করেছেন—আল্লাহ্ সকলের ও সকলকিছুর আয়ু, কর্মপরিধি ও জীবনোপকরণ নির্ধারণ করেছেন তাদের অস্তিত্বপ্রাপ্তির আগেই। সেই নির্ধারণানুসারেই বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে তাদের উত্থান, অর্জন ও বিলয়।

তখনকার মক্কাবাসীরা ছিলো আল্লাহ্র এককত্ব ও তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহকগণের প্রতি অবিশ্বাসী। পরবর্তী আয়াতত্রয়ে তাই খণ্ডন করা হয়েছে তাদের অবিশ্বাস ও অপবিশ্বাসকে এভাবে—

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৩, ৪, ৫

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ اِفْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ

www.eelm.weebly.com

عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۝ وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

❐ তবুও তাহারা তাঁহার পরিবর্তে ইলাহরূপে গ্রহণ করিয়াছে অপরকে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং উহারা নিজদিগের ভালও করিতে পারে না, মন্দও করিতে পারে না এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না।

❐ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, 'ইহা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নহে, মুহম্মদ ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে'। উহারা তো অবশ্যই সীমালংঘন করে ও মিথ্যা বলে।

❐ উহারা বলে, 'এইগুলি তো সে কালের উপকথা, যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে; এইগুলি সকাল-সন্ধ্যা তাহার নিকট পাঠ করা হয়।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'আল্লাহই সকলকিছুর অস্তিত্বদাতা ও প্রত্যেকের যথোচিত প্রকৃতিপ্রদাতা হওয়া সত্ত্বেও অংশীবাদীরা উপাসকরূপে গ্রহণ করেছে তাদের স্বহস্তনির্মিত প্রতিমাসমূহকে, যেগুলো তাদের মতোই সৃষ্ট এবং যেগুলো সম্পূর্ণরূপে জড় ও স্থবির, ভালো অথবা মন্দ কোনোকিছুই করার ক্ষমতা যেগুলোর নেই, জীবন-মৃত্যু-মৃত্যুপরবর্তী উত্থান কোনোকিছুর উপরেই যেগুলোর কোনো প্রকার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ নেই।

'তারা নিজেদের ভালোও করতে পারে না মন্দও করতে পারে না' কথাটির মর্মার্থ— আল্লাহ্ তাদের কল্যাণ না চাইলে যেমন তারা নিজে নিজে কল্যাণ লাভ করতে পারে না, তেমনি প্রতিহতও করতে পারে না আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কোনো অমঙ্গল বা ক্ষতি। এমনকি ক্ষুদ্র মক্ষিকাও যদি সেগুলোর সামনে থেকে তাদের উপাসককুল প্রদত্ত প্রসাদের কোনো অংশ নিয়ে উড়ে চলে যায়, তবুও সেগুলো থাকে নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ মক্ষিকাকুলকে বিতাড়নের ক্ষমতাও তাদের নেই। উল্লেখ্য যে, প্রতিমাসমূহই শুধু কল্যাণ অকল্যাণ সাধনে অক্ষম তা নয়, বরং মহা মর্যাদাসম্পন্ন নবী হজরত ঈসা, হজরত উযায়ের এবং ফেরেশ্তামণ্ডলীও অক্ষম, তাদের কল্যাণ অকল্যান সাধনে। তাই এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে— 'কুল্ লা আমলিকু লিনাফসি নাফআঁও ওয়ালা দ্বররান ইল্লা মা শাআল্লাহ ওয়ালাও কুনতু আ'লামুল গইবা লাস্তাকছারতু মিনাল খইরি ওয়ামা মাস্সানিয়াস্ সুউ' (আপনি

www.eelm.weebly.com

বলুন, আমার নিজের জন্য আমি কোন কল্যাণ অকল্যাণের অধিকারী নই। তবে হ্যাঁ যা আল্লাহ্র অভিপ্রায় হয়। আমি যদি জানতাম অদৃশ্যকে তবে অবশ্যই প্রভূত কল্যাণ সাধন করতাম আমি। আর আমাকে সম্পর্শও করতোনা কোনো অনিষ্ট)।

'জীবন-মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরেও কোনো ক্ষমতা রাখে না' কথাটির অর্থ তাদের মিথ্যা উপাস্যসমূহ জীবন যেমন দিতে পারে না, তেমনি প্রতিহত করতে পারে না মৃত্যুকেও। মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান ঘটানো তো আরো অনেক দূরের ব্যাপার। এ সমস্ত কাজ ঘটাতে পারেন কেবল এক, অবিভাজ্য ও আনুরূপ্যবিহীন উপাস্য আল্লাহ্। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের অনন্ত স্বস্তি অথবা শাস্তি নির্ধারণের বিষয়টিও কেবল তাঁর ক্ষমতায়ত্ব।

পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়। মোহাম্মদ এটা উদ্ভাবন করেছে এবং সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে'। একথার অর্থ কাফেররা বলে, এই কোরআন অসত্য। এটা মোহাম্মদের নিজস্ব রচনা। আর এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছে ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভ্রান্ত কিছু লোক। উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কেবল তওহীদ বা আল্লাহ্র এককত্বে অবিশ্বাসীরাই কাফের নয়, প্রেরিত বার্তাবাহক বা নবী-রসুলগণকে অস্বীকারকারীরাও কাফের বা সত্যাপ্রত্যাখ্যানকারী। কেননা কেবল বুদ্ধি প্রকৃত তওহীদ পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম নয়। রেসালাতের মাধ্যম অত্যাবশ্যক। তাই এখানে রসুল স. এবং তাঁর উপরে অবতীর্ণ কোরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। দার্শনিকরা তাই রেসালতের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ্র সত্তা-নাম-গুণাবলীর আলোচনা করতে গিয়ে পথচ্যুত হয়েছে। অন্যকেও করেছে পথভ্রান্ত।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত আব্দুল কয়েসের প্রতিনিধিদলের এক ঘটনায় এসেছে, রসুল স. একবার তাদেরকে বললেন, তোমরা কি জানো এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ কী? তারা বললো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, তওহীদ হচ্ছে— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্।

এখানে 'হাজা' অর্থ এই কোরআন, যা অবতীর্ণ হয়েছে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর উপর। 'ইফ্কুন' অর্থ অসত্য, যা ফিরিয়ে দেয় সঠিক পথ থেকে। অর্থাৎ এটা আল্লাহ্র কালাম নয়, মোহাম্মদের নিজস্ব রচনা।

'ক্বওমুন আখারূন' অর্থ ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক। অর্থাৎ ইহুদীদের একটি দল, বলেছেন মুজাহিদ। হাসান বলেছেন, এর অর্থ ওবায়েদ ইবনুন হসর নামক এক

www.eelm.weebly.com

আবিসীনিয় ক্রীতদাস। সে ছিলো গণক। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে মক্কার কয়েকজন ক্রীতদাসকে, যাদের নাম জবর, ইয়াসার ও আদাস। তারা ছিলো আহলে কিতাব সম্প্রদায়ভূত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা তো অবশ্যই সীমালংঘন করে ও মিথ্যা বলে'। একথার অর্থ রসুল স. ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কোরআনকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারাই মিথ্যাবাদী ও সীমালংঘনকারী। এখানে 'জুলুম' অর্থ সীমালংঘন এবং 'জুর' অর্থ মিথ্যা। বায়যাবী লিখেছেন, এখানকার 'জ্বাআ' শব্দটি 'আতা' (করেছে বা করে) অর্থেও ব্যবহৃত। এরকম হলে শব্দটি হবে ফেলে মুতাআদ্দি (সকর্মক ক্রিয়া)।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'তারা বলে, এগুলি তো সে কালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। এগুলো সকাল সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়'। নজর ইবনে হারেছ বলতো, কোরআন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত নয়। এ হচ্ছে প্রাচীন যুগের কল্পকাহিনী যা কথিত ও শ্রুত হয় জনশ্রুতির মাধ্যমে। তার ওই উক্তিকেই উদ্ধৃত করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আর 'সকাল সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়' কথাটির অর্থ এখানে— ওই মিথ্যাবাদীরা বলে, মোহাম্মদ তো অক্ষর পরিচয়বিচ্যুত। তাই তাকে ওই সকল কল্পকাহিনী তার নিকটে পাঠ করে শোনায় জাবর, ইয়াসার, আদাস প্রমুখ ইহুদী গল্পকারেরা, যাতে সেগুলোকে সে স্মৃতিস্থ করতে পারে।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ۝ وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ۙ
لَوْلَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۝ اَوْ يُلْقٰۤى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ
لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝
اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝

❑ বল, 'ইহা তিনিই অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

www.eelm.weebly.com

❑ উহারা বলে, 'এ কেমন রসূল যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফিরা করে; তাহার নিকট কেন কোন ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ করা হইল না যে তাহার সঙ্গে থাকিত সতর্ককারীরূপে?

❑ তাহাকে ধন-ভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন অথবা তাহার একটি বাগান নাই কেন? যাহা হইতে সে আহার সংগ্রহ করিতে পারে; সীমালংঘনকারীরা আরও বলে, 'তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করিতেছ।'

❑ দেখ, উহারা তোমার কি উপমা দেয়, উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং উহারা পথ পাইবে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য সম্পর্কে অবগত'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই মিথ্যাবাদী ও সীমালংঘনকারীদের অপবক্তব্য খণ্ডনার্থে বলুন, এই কোরআন মানব রচিত নয়। এটা এমন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর সত্তার বাণী যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল রহস্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাইতো শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকেরা এরকম বাণী নির্মাণ করতে যেয়ে পরাভব মেনেছে। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, এই কোরআনে ওই মহাসৃজয়িতার পরিচয় লাভ করা যায় যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রহস্যাবলী সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। অতএব বুঝতে হবে এ বাণী মানব রচিত নয়, এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালাম।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় বার্তাবাহক! আপনি তাদেরকে আরো স্মরণ করিয়ে দিন, হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! আল্লাহ্‌র কালামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কারণে তোমরা অবশ্যই শাস্তির যোগ্য। তবুও তোমরা সাময়িকভাবে হলেও শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছো এ কারণে যে, আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও পরম দয়াপরবশ।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'তারা বলে, এ কেমন রসুল যে আহার করে এবং হাটেবাজারে চলাফিরা করে'। একথার অর্থ—সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, হে মোহাম্মদ! তুমি যদি রসুলই হতে তবে তোমার জীবনযাত্রা ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো। পানাহার, হাটে-বাজারে চলাফিরা এসব তোমার মধ্যে কিছুতেই থাকতো না। এ সকল কিছু তো সাধারণ মানুষের কাজ।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স.কে লক্ষ্য করে মক্কার মুশরিকেরা বলতো, তুমিতো ফেরেশতাও নও। যদি হতে তবে তো নিশ্চয় আমাদের মতো পান-ভোজন করতে না। আবার সম্রাটও তো নও তুমি। হলে নিশ্চয় আমাদের মতো হাটে-বাজারে চলাফেরা করতে না। সুতরাং তোমাকে রসুল বলে মান্য করি কীভাবে?

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, কথাটি এমন নয়। কারণ রসুল স. কখনোই নিজেকে ফেরেশতা বা সম্রাটরূপে জাহির করেননি। বরং তিনি বলেছেন 'আমি তোমাদের মতো মানুষ, কিন্তু আমার উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়'। অর্থাৎ তিনি নিজেকে প্রকাশ করতেন আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক বা রসুলরূপে। আর পানাহার এবং বাজারে গমনাগমন কখনই রসুল হওয়ার অন্তরায় নয়। কারণ এগুলো হচ্ছে মানবিক বৈশিষ্ট্য। আর মানুষের রসুল তো মানুষই হন। অন্য কোনো সৃষ্টি মানুষের রসুল হতে পারে না। কারণ উপকার আদান-প্রদানের জন্য সমসম্প্রদায়ভূত হওয়া প্রয়োজন। অন্য এক আয়াতে কথাটিকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— 'যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বসবাস করতো, তবে তাদের জন্য আমি আকাশ থেকে রসুল হিসেবে অবতীর্ণ করতাম ফেরেশতাকেই'। অতএব বুঝতে হবে মানুষের রসুল মানুষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তার নিকট কেনো কোনো ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হলো না, যে তার সঙ্গে থাকতো সতর্ককারীরূপে'। একথার অর্থ— তারা আরো বলে, রসুল হওয়ার দাবিদার এই ব্যক্তি নিজে তো ফেরেশতা নয়ই, তদুপরি তার রেসালতের সাক্ষ্যদাতারূপে তার সঙ্গে কোনো ফেরেশতাও নেই, যার সাক্ষ্য শুনে আমরা তার রেসালতের সত্যতা সম্পর্কে জেনে নিতে পারি।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'তাকে ধনভাণ্ডার দেয়া হয় না কেনো, অথবা তার একটি বাগান নেই কেনো, যা থেকে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে'? একথার অর্থ— তারা আরো বলে, আকাশ থেকে যদি তাকে কোনো ধনভাণ্ডার দেয়া হতো, তবে তাকে পার্থিব প্রয়োজনে হাটে বাজারে গমনাগমন করতে হতো না। অথবা অন্ততঃপক্ষে একটি বাগানও যদি তার থাকতো, তবুও তো সে ওই বাগানের ফলমূল ভক্ষণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারতো। আয়-উপার্জনের চিন্তা তাহলে তাকে করতে হতো না। কিন্তু এগুলোও তো তার নেই।

পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াত দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের আপত্তি ছিলো তিনটি— ১. রসুল ফেরেশতা নয় কেনো ২. যদি নিজে সে ফেরেশতা না হয় তবে তার পক্ষে সাক্ষ্যদাতারূপে কোনো ফেরেশতাই বা থাকলো না কেনো ৩. যদি এগুলো না-ই হয় তবে পার্থিব প্রয়োজন পূরণের জন্য তার গোপন ধন-ভাণ্ডার অথবা বাগানই বা থাকলো না কেনো, যেমন থাকে বিত্তশালীদের।

এরপর বলা হয়েছে— 'সীমালংঘনকারীরা আরো বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছো'। একথার অর্থ— সীমালংঘনকারীরা রসুল স. এর প্রিয় সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করে আরো বলে, তোমরা তো সত্যি সত্যিই

www.eelm.weebly.com

নির্বোধ। সেকারণেই তো অনুসারী হয়েছো যাদুগ্রস্ত এই তথাকথিত রসুলের। এখানে 'মাসহুর' অর্থ যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এর অর্থ প্রতারক। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ সত্যবিমুখ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটি কর্মকারক হলেও কর্তৃকারকের অর্থপ্রদায়ক। এভাবে শব্দটির অর্থ হয় যাদুকর।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'দেখো, তারা তোমার কী উপমা দেয়'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় বাণীবাহক! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সীমালংঘনের নমুনা দেখুন। দেখুন তাদের অবিমৃশ্যকারিতার দৃষ্টান্ত। তারা আপনার উপমা দেয় এক এক বার এক এক জনের সঙ্গে এক এক ভাবে। কখনো আপনাকে তুলনা দেয় অসত্যভাষীদের সঙ্গে, কখনো বলে আপনি নাকি প্রাচীন যুগের জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর বর্ণনাকারী, যা আপনি অন্যের কাছ থেকে শিখেছেন। আবার কখনো যাদুকরের সঙ্গে নির্মাণ করে আপনার সৌসাদৃশ্য। কখনো বলে, আপনি ফেরেশতা নন কেনো, আপনার সঙ্গে সাক্ষ্যদাতা ফেরেশতা নেই কেনো, যদি তা না-ই থাকে তবে বিত্তবৈভব অথবা বাগান নেই কেনো? এগুলো কি তাদের বিভ্রান্তির স্পষ্ট নিদর্শন নয়?

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে'। একথার অর্থ— তাদের এসকল অপভাষণের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, তারা সত্য পথ পরিত্যাগ করেছে। হয়েছে পথভ্রষ্ট। অথচ আপনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনি মানুষ ও রসুল। আর রসুলগণ নিষ্পাপ ও প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত। আর আল্লাহ্প্রদত্ত মোজেজাই পার্থক্য নির্দেশ করে সত্য রসুল ও মিথ্যা রসুলের দাবিদারদের মধ্যে, যেমন করেছে এই অলৌকিক গ্রন্থ কোরআন।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তারা পথ পাবে না'। একথার অর্থ— এবং তারা স্বেচ্ছাভ্রষ্ট বলেই হেদায়েতের পথ আর পাবে না। অথবা কথাটির অর্থ হবে— তাদের অপউক্তিগুলো স্ববিরোধী, তাই তাদের পথপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আর নেই।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় এসেছে, হজরত খাইছুমা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ একবার রসুল স.কে জানালেন, হে আমার রসুল! আপনি যদি চান, তবে আমি আপনাকে দান করবো পৃথিবীর ধনাগারের চাবি। এতে করে আপনার পরবর্তী পৃথিবীর প্রাপ্তি এতটুকুও কমবে না। আর আপনি যদি চান, তবে এখানকার দানকেও আমি একত্রিত করে রাখবো পরলোকের সম্পদের সাথে। রসুল স. জবাব দিলেন, আমাকে যা দান করতে চান, তার সকল কিছুই জমা রাখা হোক পরকালের জন্য। এটাই আমার বিনীত অভিপ্রায়। রসুল স. এর এ অভিপ্রায়ের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

تَبٰرَكَ الَّذِىْۤ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ۝ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَ
اَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۝ اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ
سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ۝ وَاِذَاۤ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ
دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ۝

❒ কত মহান তিনি, যিনি ইচ্ছা করিলে তোমাকে দিতে পারেন ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু—উদ্যানসমূহ যাহার নিম্নদেশে নদীনালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ।

❒ কিন্তু উহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাহাদিগের জন্য আমি প্রস্তুত রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নি।

❒ দূর হইতে অগ্নি যখন উহাদিগকে দেখিবে তখন উহারা শুনিতে পাইবে ইহার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার;

❒ এবং যখন উহাদিগকে হস্তপদ শৃংখলিত অবস্থায় উহার কোন সংকীর্ণস্থানে নিক্ষেপ করা হইবে তখন উহারা তথায় ধ্বংস কামনা করিবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সেই আল্লাহ্ কতোই না মহান, যিনি ইচ্ছে করলে, হে আমার প্রিয় রসুল, আপনাকে দিতে পারেন পৃথিবীর উদ্যানরাজি অপেক্ষা অনেক উত্তম উদ্যান, যেগুলোর মধ্যে বয়ে যাবে স্রোতস্বিনীসমূহ, আরো দিতে পারেন সুরম্য প্রাসাদমালা। কিন্তু তিনি তা করেননি। আপনার জন্য সমস্ত বৈভব জমা করে রেখেছেন আখেরাতে।

ইকরামা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মহানতম আল্লাহ্ তো ইচ্ছে করলে আপনাকে অবশ্যই দিতে পারতেন বাজারে চলাফিরা করা এবং উপার্জনান্বেষণ অপেক্ষা অধিকতর উত্তম নেয়ামতসম্ভার।

এখানে 'ক্বুসুরান' অর্থ সুদৃঢ় ভবন। আরববাসীরা 'ক্বসর' বলেন মজবুত প্রাসাদকে।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে আহমদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক 'উত্তম সূত্রবিশিষ্ট' আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমার জন্য মক্কার পার্বত্যভূমিকে স্বর্ণে পরিণত করে দিতে চেয়েছিলেন। আমি নিবেদন করেছি, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমি এরকম চাই না। আমি চাই একদিন পানাহার করবো, আর একদিন থাকবো অনাহারে। পানাহারবিহীন দিবসে হবো প্রার্থী। আর পানাহার বিশিষ্ট দিবসে হবো কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

জননী আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি ইচ্ছে করলে আমার পশ্চাতে চলতে থাকতো স্বর্ণের পাহাড়। একদিন দীর্ঘদেহী এক ফেরেশতা, যার কটিদেশ ছিলো কাবাগৃহের ছাদ বরাবর, আমাকে এসে বললো, আপনার প্রভুপালনকর্তা আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন। বলেছেন, আপনি ইচ্ছা করলে হতে পারেন নবী ও সম্রাট, অথবা নবী ও দাস। আমি নিকটে উপস্থিত ভ্রাতা জিবরাইলের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। তিনি আমকে ইঙ্গিতে গ্রহণ করতে বললেন বিনয়বনতাকে। আমি বললাম, আমি থাকতে চাই নবী ও দাস। জননী আয়েশা বলেন, এরপর থেকে রসুল স. হেলান দিয়ে পানাহার করতেন না। পানাহারকালে বলতেন, আমি উপবেশন ও আহার গ্রহণ করি দাসের মতোন।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে'। পূর্ববর্তী আয়াতের (৭) 'তারা বলে' কথাটির সঙ্গে রয়েছে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যগত সম্পর্ক। আর আলোচ্য আয়াতের শুরুতে 'বাল' (কিন্তু) উল্লেখিত হয়েছে বক্তব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তারা রসুল সম্পর্কে বিভিন্ন অবান্তর কথাই কেবল বলে না, উপরন্তু অস্বীকার করে মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবসকে। অথবা মর্মার্থ হবে— হে আমার রসুল! সীমালংঘনকারীরা অনর্থক আপনাকে বাক্যবানে জর্জরিত কেবল করে না, অধিকন্তু অবিশ্বাস করে কিয়ামতকে। তাদের দৃষ্টি পার্থিব প্রাপ্তিকে অতিক্রম করতে পারে না। সুতরাং তারা মহাপ্রলয়ের প্রতি আস্থাশীল হবে কীভাবে? অথবা বক্তব্যার্থ হবে এরকম— তারা তো কিয়ামতকেই স্বীকার করে না, সুতরাং একথা তারা কীভাবে বিশ্বাস করবে যে, আখেরাতে আমি আপনার জন্য প্রস্তুত রেখেছি কল্পনাতীত অনুগ্রহসম্ভার। কিংবা কথাটি দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে বলে মনোক্ষুণ্ন হবেন না। তারা এর চেয়ে আরো মর্মপীড়াদায়ক কথা বলতে অভ্যস্ত। তারা তো কিয়ামতকেই বিশ্বাস করতে চায় না, যা অনিবার্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে আমি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি'। এখানে 'সায়ীরা' অর্থ জ্বলন্ত অগ্নি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'সায়ীর' একটি জাহান্নামের নাম।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'দূর থেকে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার'। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞ লিখেছেন, এখানে দেখার বিষয়টি যখন দোজখাগ্নির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে, তখন বুঝতে হবে আদতেই দোজখের আগুন হবে চক্ষুষ্মান। বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার উপর কলংক লেপন করবে সে যেনো তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয় আগুনের দুই চোখের মাঝখানে। উপস্থিত সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আগুনের কি চোখ থাকবে? তিনি স. বললেন, তোমরা কি শোনোনি আল্লাহ্র বাণী— 'দূর থেকে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পারবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার'।

কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, এখানে দেখার প্রসঙ্গটি রূপকার্থক, প্রকৃতার্থক নয়। অর্থাৎ তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দোজখের ফেরেশতারা দেখবে। অথবা কথাটির অর্থ হবে— দোজখের লেলিহান আগুন যখন এসে পড়বে দৃষ্টির সীমানায় তখন শ্রুত হবে তার ক্রুদ্ধ আওয়াজ ও ভয়ংকর নাদ। উল্লেখ্য, দোজখের এই দেখার দূরত্ব হবে একশত বছরের পথের দূরত্বের সমান। এরকম বলেছেন কালাবী। কেউ কেউ বলেছেন, দোজখের আগুন তাদেরকে দেখতে পাবে পাঁচশত বছরের পথের দূরত্বের সমান দূর থেকে।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'এবং যখন তাদেরকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় তার কোনো সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে'। এখানে সংকীর্ণ কোনো স্থানে নিক্ষেপ করার অর্থ ভয়াবহতম শাস্তিতে নিপতিত করা। কারণ প্রশস্ততার তুলনায় সংকীর্ণতা অধিক শাস্তিদায়ক। ইয়াহ্ইয়া ইবনে উসাইদ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স.কে একবার এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, যার অধিকারে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তার শপথ! তাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে এমনভাবে চেপে দেয়া হবে, যেমন দেয়ালের উপরে ঠুকে দেয়া হয় পেরেক। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, যেমন বস্তায় বিদ্ধ বর্শা। কাতাদাসূত্রে ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, কাফেরদের জন্য জাহান্নাম সংকীর্ণ হবে এরকম, যেমন দেয়ালে বিদ্ধ বল্লম।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আবিদ দুন্ইয়া ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, চিরস্থায়ী দোজখবাস যাদের জন্য নির্ধারিত হবে, তাদেরকে প্রথমে আবদ্ধ করা হবে লোহার সিন্দুকে, তারপর

www.eelm.weebly.com

ওই সিন্দুককে প্রবেশ করানো হবে আর একটি লোহার সিন্দুকে, তারপর নিক্ষেপ করা হবে দোজখের তলদেশে। তাই দোজখীরা নিজেকে ছাড়া অন্য কারো শাস্তি দেখতে পাবে না। সুয়াইদ ইবনে গাফলা সূত্রে আবু নাঈম ও বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

'মুক্বাররানীনা' অর্থ হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় বা খামের সঙ্গে হাত পা বাঁধা অবস্থায় বা শৃঙ্খলিত অবস্থায়। কেউ কেউ বলেছেন, তাদেরকে তখন বেঁধে ফেলা হবে শয়তানের সঙ্গে বা শয়তানের দঙ্গলের সঙ্গে।

'ছুবুরা' অর্থ ধ্বংস বা ধ্বংস কামনা। এরকম অর্থ করেছেন জুহাক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন 'ছুবুরান' অর্থ 'ওয়ালান' (ধ্বংস, বিলয়)।

আহমদ, বাযযার, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন রসুল স. বলেছেন, সর্বপ্রথম ইবলিসকে আগুনের পোশাক পরানো হবে। সে তখন ওই পোশাক টানাটানি করতে করতে চিৎকার করে বলতে থাকবে 'ইয়া ছুবুর' 'ইয়া ছুবুর' (হায় ধ্বংস, হায় ধ্বংস)। তার বংশধরেরাও এভাবে আগুনের পোশাক পরে চিৎকার করতে করতে চলতে থাকবে জাহান্নামের দিকে। পরিশেষে সকলে প্রবেশ করবে জাহান্নামের ভিতর। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে 'আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা কোরো না, বহুবার ধ্বংস হবার কামনা করতে থাকো'। একথাই বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ○ قُلْ أَذٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَّمَصِيرًا ○ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خٰلِدِينَ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ○

❒ উহাদিগকে বলা হইবে, 'আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করিও না, বহুবার ধ্বংস হইবার কামনা করিতে থাক।'

❒ উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ইহাই শ্রেয়, না স্থায়ী জান্নাত, যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে সাবধানীদিগকে? ইহাই তো তাহাদিগের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল।

❒ সেথায় তাহারা যাহা কামনা করিবে তাহাই পাইবে এবং স্থায়ী হইবে; এই প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ধ্বংস তাদের কেবল একবার হবে না। হবে বার বার। তাই তাদেরকে বলা হবে, একবার নয়, তোমরা ধ্বংসকে আহ্বান করতে থাকো বার বার। অথবা তখন তাদের ধ্বংসাত্মক শাস্তি হবে বার বার। তাই তখন যেনো তারা একবার নয়, বার বার 'ধ্বংস' 'ধ্বংস' বলে চিৎকার করতে থাকে। অন্য আয়াতে এসেছে— 'যতোবার তাদের চামড়া জ্বলে যাবে, ততোবার আমি সৃষ্টি করবো তাদের নতুন চামড়া যেনো তারা পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করতে পারে আযাবের স্বাদ। অথবা এখানকার 'ছুবুরান কাছীরান' কথাটির অর্থ হবে, ধ্বংস থেকে তারা কোনো সময়েই মুক্ত থাকতে পারবে না। তাদের এমতো অবস্থা হবে নিরবচ্ছিন্ন।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, এটাই শ্রেয়, না স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সাবধানীদেরকে'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, দোজখের ওই ভয়াবহ আযাব অথবা পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার ও বাগান অপেক্ষা কি জান্নাতের চিরসুখময় বসবাস শ্রেষ্ঠ নয়, যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে বিশ্বাসীদেরকে? প্রশ্নটি একটি স্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন (ইস্তেফহামে তাকরিরী)। আর এর মধ্যে রয়েছে প্রচ্ছন্ন উপহাস ও বৈমুখ্য।

এখানে 'আল মুত্তাক্বুন' অর্থ সকল শ্রেণীর বিশ্বাসী। কারণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিপরীতে এসেছে 'আলমুত্তাক্বুন'। সুতরাং এখানে শব্দটিকে বিশেষায়িত করা যায় না। তাই বুঝতে হবে শাব্দিক অর্থে (সাবধানী বা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী) শব্দটি এখানে প্রয়োগ করা হয়নি। আর একারণেও কথাটিকে এখানে সাধারণায়ন করা যেতে পারে যে, জান্নাত তো লাভ হবে পুণ্যবান-পাপী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বিশ্বাসীর।

'জান্নাতুল খুলদ' (স্থায়ী জান্নাত) কথাটির মাধ্যমে এখানে একথাই প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের স্থায়িত্ব সাময়িক নয়, চিরকালীন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটাই তো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল'। এখানে 'কানাত' অতীতকালবোধক শব্দরূপটিকে মান্য করলে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— এটাই ছিলো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল। অর্থাৎ এখানকার এই পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থলের কথা পূর্বাহ্নে সংরক্ষিত ছিলো আল্লাহ্‌র জ্ঞানে অথবা লওহে মাহফুজে। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এভাবেই বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, যেমন এখন হলো।

'জাযাআন' অর্থ পুরস্কার বা আমলের বিনিময়। আর 'মাসীরান' অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। শব্দটিতে 'তানবীন' সংযুক্ত হয়েছে প্রত্যাবর্তনস্থলের মর্যাদা প্রকাশার্থে।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা যা কামনা করবে তা-ই পাবে এবং স্থায়ী হবে'। উল্লেখ্য, অপূর্ণ বিশ্বাসীরা ওই সকল নেয়ামত পাবে না, যা লাভ করবে পরিপূর্ণ বিশ্বাসীরা। আর আলোচ্য বাক্যে একথাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, মানুষের সকল কামনা-বাসনা চরিতার্থ হবে জান্নাতে, দুনিয়ায় নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এই প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব'। একথার অর্থ— এই প্রতিশ্রুতি যেহেতু আল্লাহ্‌পাক তাঁর চিরমুক্ত ও চিরস্বাধীন অভিপ্রায়ানুসারে দিয়েছেন এবং প্রতিশ্রুতি লংঘন যেহেতু একটি দোষ এবং তিনি যেহেতু সকল দোষ-ত্রুটি থেকে চিরপবিত্র, তাই বাধ্যগতভাবে বা অক্ষম হয়ে নয়, আপন অভিপ্রায়, মর্যাদা ও ক্ষমতা প্রকাশার্থেই তিনি করুণা করে তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতি সেদিন পরিপূরণ করবেনই। এ দায়িত্ব তাঁর স্বেচ্ছাচারিতাপ্রসূত, বাধ্যগত কিছুতেই নয়।

'মাসউলা' অর্থ আল্লাহ্‌পাক এমন এক অতুলনীয় সত্তা যাঁর সকাশে প্রার্থনা করা যায়। আর তিনি তা দয়া করে পূরণও করেন, যেমন পূরণ করবেন তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতি অথবা শব্দটির অর্থ, তিনি সকলের প্রার্থনাস্থল। তাইতো সকলে প্রার্থী হয় তাঁর সকাশে। যেমন প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে এক আয়াতে এভাবে— 'হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমাদেরকে ওই জান্নাত দান করুন যার প্রতিশ্রুতি আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন আপনার বচনবাহকগণের মাধ্যমে'।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী বলেছেন, তখন ফেরেশতারা প্রার্থনা করতে থাকবে 'রব্বানা আদ্‌খিলহুম জান্নাতি আদনিনিল্ লাতী ওয়াআদ্‌তাহুম'(হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তাদেরকে তুমি প্রবেশ করিয়ে দাও স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দিয়েছো)।

সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ১৭, ১৮, ১৯

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ
عِبَادِىْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ○ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ
يَنْبَغِىْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ
وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا ○ فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا
تَقُوْلُوْنَ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ
عَذَابًا كَبِيْرًا ○

www.eelm.weebly.com

❐ এবং যেদিন তিনি একত্রিত করিবেন অংশীবাদীদিগকে এবং উহারা আল্লাহের পরিবর্তে যাহাদিগের ইবাদত করিত তাহাদিগকে, সেদিন তিনি উহাদিগের উপাস্যগুলিকে জিজ্ঞাসা করিবেন 'তোমরাই কি আমার এই দাসদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলে, না উহার নিজেরাই পথভ্রষ্ট হইয়াছিল'?

❐ উহারা বলিবে, 'পবিত্র ও মহান তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতে পারি না; তুমিই তো ইহাদিগকে এবং ইহাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে ভোগ-সম্ভার দিয়াছিলে; পরিণামে উহারা তোমাকে বিস্মৃত হইয়া ছিল এবং পরিণত হইয়াছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।'

❐ আল্লাহ্ অংশীবাদীদিগকে বলিবেন, 'তোমরা যাহা বলিতে উহারা তাহা মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে। সুতরাং তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, সাহায্যও পাইবে না। তোমাদিগের মধ্যে যে সীমালংঘন করিবে আমি তাহাকে মহাশাস্তি আস্বাদ করাইব।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং যেদিন তিনি একত্রিত করবেন অংশীবাদীদেরকে এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করতো তাদেরকে'। এখানে 'মা ইয়া'বুদুন' অর্থ আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের উপাসনা করতো তাদেরকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মহাবিচারের দিবসে যখন আল্লাহ্ একত্র করবেন অংশীবাদী ও তাদের উপাস্যসমূহকে। 'মা' শব্দটি ব্যবহৃত হয় বিবেকসম্পন্ন ও বিবেকহীন উভয়ের ক্ষেত্রে। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে 'তাদের উপাস্যসমূহ' বলে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতা, জ্বিন, হজরত ঈসা ও হজরত উযায়ের সহ প্রতিমাপূজারীদের অন্যান্য প্রতিমাসমূহকে। এরকম বলেছেন মুজাহিদ। আর ইকরামা, জুহাক ও কালাবী বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে কেবল বিবেকহীন জড় প্রতিমাগুলোর কথা। কেননা ব্যাকরণবেত্তাগণের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, 'মা' ব্যবহৃত হয় কেবল জড়পদার্থের বেলায়। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে মহাবিচারের দিবসে ওই প্রতিমাগুলোকে জীবন দান করা হবে। সচল করা হবে সেগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ এবং দেয়া হবে কথা বলার ক্ষমতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'সেদিন তিনি তাদের উপাস্যগুলোকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরাই কি আমার এই দাসদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিলো'? একথার অর্থ— হজরত ঈসা, হজরত উযায়ের, ফেরেশতা, জ্বিন এবং জীবনপ্রাপ্ত প্রতিমা, পাথর ইত্যাদিকে অথবা কেবল প্রতিমাসমূহকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ সেদিন বলবেন, তোমাদেরকে আল্লাহ্র অংশীরূপে (আল্লাহ্র পুত্র, কন্যা বা সুপারিশকারী) উপাসনা করবার কথা কি তোমরাই অংশীবাদীদেরকে শিখিয়েছিলে, না তারা নিজেরাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পূজা করেছিলো তোমাদের?

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, পবিত্র ও মহান তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না'। একথার অর্থ— অংশীবাদীদের উপাস্যসমূহ তখন বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠবে, পবিত্রতম ও মহানতম তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা কীভাবে অন্যকে উপসনা করার কথা ভাবতে পারি। আর যা আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাসবহির্ভূত তা আমরা অন্যকে শিক্ষা দিতেই বা পারি কীরূপে! এখানকার 'কুনু' শব্দরূপটি অতীতকালবোধক। তৎসত্ত্বেও এখানে ভবিষ্যতকালের অর্থ (জিজ্ঞেস করবেন) নেয়া হয়েছে একারণে যে, বিষয়টি সুনির্ধারিত ও সুনিশ্চিত। এখানে 'তারা বলবে' বলে যদি হজরত ঈসা, হজরত উযায়ের বা ফেরেশতাকে বুঝানো হয়, তবে তাদের পক্ষে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপাসনা করার কথা তো ভাবাই সম্ভব নয়। কারণ তাঁরা নিষ্পাপ। তাই অংশীবাদিতা শিক্ষা দেয়ার মতো এতো গুরু অপরাধ তাঁরা করতেই পারেন না। তাই বিষয়টি তাঁদের কাছে বিস্ময়কর তো হবেই। সেকারণেই বিস্ময় প্রকাশার্থে তাঁরা তখন বলবেন 'পবিত্র ও মহান তুমি'। আর 'তারা বলবে' অর্থ যদি এখানে ধরে নেয়া হয় জড়প্রতিমাগুলো বলবে, তবে সেগুলোর পক্ষেও 'পবিত্র ও মহান তুমি' বলে বিস্ময় প্রকাশ করা স্বাভাবিক। কারণ তারা পৃথিবীতে ছিলো অচেতন ও শক্তিহীন। সুতরাং তারা তাদের পূজারীদেরকে তাদের পূজা করার কথা বলতেই বা পারবে কীভাবে?

অথবা জড়প্রতিমাগুলো একারণে বিস্ময় প্রকাশ করবে যে, আমরা তো আল্লাহ্র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনায় সতত নিয়োজিত। আমাদের সম্পর্কে তো একথা বলাই হয়েছে যে— 'ওয়া ইম্‌মিন শাইয়্যিন ইল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদিহী'। সুতরাং আমরা কীভাবে অন্যকে পথভ্রষ্ট করতে পারি, শিক্ষা দিতে পারি অংশীবাদিতার।

'মা কানা ইয়ামবাগী লানা' অর্থ আমাদের জন্য এরকম করা বৈধই ছিলোনা। কারণ আমাদেরকে বানানো হয়েছে নিষ্পাপ, সুতরাং আমরা কস্মিনকালেও আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না। তাই আমাদের পক্ষে অন্যকে পথভ্রষ্ট করার বিষয়টি চরম বিস্ময়কর বৈকি। উল্লেখ্য, এধরনের জবাব আসবে ফেরেশতা, নবী ও জড়প্রতিমাগুলোর পক্ষ থেকে। কিন্তু যারা নিজেরাই অন্যের প্রভুপ্রতিপালক সেজে বসেছিলো, তাদের পক্ষ থেকে এরকম জবাব আসবে না, তারা মানুষ অথবা জ্বিন যেই হোক না কেনো। তারা বলবে, আল্লাহ্র কসম! যিনি আমাদের প্রভুপালক, আমরা মুশরিক ছিলাম না। শয়তান বলবে 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি ছিলো সত্য। আল্লাহ্ তা পূর্ণ করেছেন। আর আমি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা ভঙ্গ করলাম। তোমাদের উপর আমার কোনো বলপ্রয়োগ ছিলো না, শক্তি ছিলো না'।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলে, পরিণামে তারা তোমাকে বিস্মৃত হয়েছিলো এবং পরিণত হয়েছিলো এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে'। একথার অর্থ— অংশীবাদীরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র পুত্র-কন্যা জ্ঞান করতো তাঁরা অথবা যাদেরকে মনে করতো আল্লাহ্ সকাশে সুপারিশকারী সেই প্রতিমাগুলো তখন বলবে, হে আমাদের পরম প্রভুপালক! তুমিই তো তাদেরকে দিয়েছিলে জীবন-যৌবন, শারীরিক সুস্থতা, বিত্ত-বৈভব, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, অথচ তারা ঘোর পার্থিবতায় গা ভাসিয়ে স্খলিত হয়েছিলো তোমার স্মরণ থেকে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্ব থেকে, ভুলে গিয়েছিলো তারা সর্ববিষয়ে তোমার মুখাপেক্ষী, উপেক্ষা করেছিলো কোরআনকে, কোরআনের বিধানাবলীকে, এভাবে পরিণত হয়েছিলো ধ্বংসপ্রাপ্ত এক সম্প্রদায়ে।

মুতাজিলারা বলে, মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা। তাই আল্লাহ্‌র সঙ্গে পাপকর্মের সম্পর্ক করা যাবে না। সেকারণেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা তোমাকে বিস্মৃত হয়েছিলো এবং পরিণত হয়েছিলো এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে'। তাফসীরকারগণ এর জবাবে বলেন, মানুষ পাপ-পুণ্য অর্জনকারী, আর আল্লাহ্ পাপ-পুণ্যের স্রষ্টা। সুতরাং পাপের সম্পর্ক এখানে মানুষের সঙ্গে করা হয়েছে তাদের অর্জন হিসেবে। আল্লাহ্‌র সঙ্গে যদি এর সম্পর্ক করা হতো তবে বুঝতে হতো সে সম্পর্ক স্রষ্টা হিসেবে! সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, এই আয়াত আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমতের পরিপোষক এবং মুতাজিলাদের অপবিশ্বাস খণ্ডনকারী।

'ওয়া কানু কুওমাস্ বূরান' অর্থ এবং পরিণত হয়েছিলো এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শাশ্বত সিদ্ধান্তানুসারে ওই সকল অংশীবাদীরা পরিণত হয়েছিলো এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগোষ্ঠীতে। এখানকার 'বূরান' (ধ্বংসপ্রাপ্ত) শব্দটি একটি মূল শব্দ। একবচন বহুবচন সকল ক্ষেত্রে শব্দটি একইরূপে ব্যবহার্য। কারো কারো মতে শব্দটি 'বায়িরুন' এর বহুবচন। যেমন 'উজুন' বহুবচন 'আয়িজুন' এর।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ অংশীবাদীদেরকে বলবেন, তোমরা যা বলতে তারা তা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে'। একথা বলা হয়েছে পৃথিবীবাসী অংশীবাদীদেরকে। এর অর্থ— আখেরাতে আল্লাহ্ পৃথিবীর এই মুশরিক জনগোষ্ঠীকে বলবেন, দ্যাখো, এখন তোমাদের উপাস্যরাই তোমাদের অপবচনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। মহাবিচারের দিবসে এমতো ঘটনা অনিবার্য, তাই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে অতীতকালবোধক শব্দরূপ। যেনো তা ঘটেই গিয়েছে। বলা হয়েছে 'ফাক্বদ কাজ্জাবুকুম বিমা তাক্বলুন'। এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন— 'ইজাস্ সামআউন্ শাক্কৃত'।

www.eelm.weebly.com

কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— সেদিন আল্লাহ্ মুশরিকদেরকে বলবেন, তোমরা তাদেরকে উপাস্য স্থির করেছিলে, এখন আবার বলছো ওরাই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলো, দ্যাখো এখন তারাই তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না, সাহায্যও পাবে না'। একথার অর্থ— অতএব শোনো হে অংশীবাদী জনতা। আজ তোমাদের শাস্তি অনিবার্য। সে শাস্তি প্রতিহত করার সাধ্য তোমাদের নেই। আর এব্যাপারে তোমরা কোনো সাহায্যকারীও পাবে না। অথবা অর্থ হবে— তোমরা শাস্তিকে রদ তো করতেই পারবে না, তদুপরি পারবে না নিজেকে সাহায্য করতে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'সরফ' শব্দটির অর্থ উপায়, প্রচেষ্টা। আরববাসীগণ বলেন 'ফুলানুন ইয়াতাসরাফু' (অমুক ব্যক্তি কিছু উপায় বের করেছে) : এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা এখন না বের করতে পারবে কোনো উপায়, না পাবে কারো সহযোগিতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যে সীমালংঘন করবে, আমি তাকে মহাশাস্তি আস্বাদ করাবো'। একথার অর্থ— যে শিরিক করবে, তাকে আমি মহাশাস্তি দিবই দিব। এখানে 'সীমালংঘন' (জুলুম) অর্থ অংশীবাদিতা (শিরিক)। শিরিকের শাস্তি অবধারিত। আলেমগণ এব্যাপারে একমত। কিন্তু 'জুলুম' অর্থ যদি এখানে দুরাচারিতা (ফিসক্ব) গ্রহণ করা হয়, তবে তার জন্য মহাশাস্তি হবে না। হবে সাধারণ শাস্তি, তা-ও আবার সর্বসম্মত অভিমতানুসারে ক্ষমাও করা হতে পারে। আর আমাদের মতে তা তওবা ছাড়াও কেবল আল্লাহ্র দয়ায় অথবা শাফায়াতের মাধ্যমে রহিত হয়ে যেতে পারে।

জুওয়াইবীর সূত্রে ওয়াহিদী, জুহাক সূত্রে বাগবী এবং সাঈদ ও ইকরামা সূত্রে ইবনে জারীর লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন মুশরিকেরা রসুল স.কে অভাবগ্রস্ততা ও দরিদ্রতার অপবাদ দিলো, বললো 'এ কেমন রসুল যে আহার করে, হাটে বাজারে চলাফিরা করে, তখন তিনি স. মনোক্ষুণ্ন হলেন। তাঁর ওই মনোক্ষুণ্নতার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ২০

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ يَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۗ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ۝

www.eelm.weebly.com

❒ তোমার পূর্বে আমি যে সব রসূল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই তো আহার করিত ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করিত। হে মানুষ! আমি তোমাদিগের মধ্যে এককে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করিয়াছি। তোমরা ধৈর্য ধারণ করিবে কি? তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছু দেখেন।

প্রথমেই রসুল স. কে সান্ত্বনা প্রদানার্থে বলা হয়েছে— 'তোমার পূর্বে আমি যে সব রসুল প্রেরণ করেছি তারা সকলেই তো আহার করতো ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করতো'।

এরপর বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে এক কে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি'। একথার অর্থ— হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের একজনকে অপরজনের জন্য করেছি পরীক্ষা সদৃশ। যেমন দরিদ্রদের জন্য পরীক্ষা ধনবানেরা। দরিদ্ররা তাই আক্ষেপ করে বলে, 'আমি অমুকের মতো ধনবান হলাম না কেনো? এভাবে পীড়িত ব্যক্তি আক্ষেপ করে নিরোগ ব্যক্তিকে দেখে। অনভিজাতরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে অভিজাতদের দিকে তাকিয়ে দেখে ইত্যাদি।

হজরত ইবনে আব্বাস পূর্বোক্ত বাক্য এবং এই বাক্যের মর্মার্থ করেছেন এভাবে— হে মানুষ! আমি তোমাদের একজনকে করেছি অপরজনের জন্য পরীক্ষা। যেনো তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধবাদীদের শত্রুতা ও অসংযত কথাবার্তা শুনেও আত্মপ্রবোধ দিতে পারো। সহিষ্ণুতার সঙ্গে চলতে পারো সহজ সরল পথে।

কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সমাজের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষকে লক্ষ্য করে। তখনকার অবস্থাটা ছিলো এরকম— প্রভাবশালী কোনো লোক হয়তো ইসলাম গ্রহণ করতে মনস্থ করলো। ইত্যবসরে দেখা গেলো প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন কেউ ইসলাম গ্রহণ করলো। এমতাবস্থায় প্রভাবশালী ব্যক্তি ভাবতো, এখন আমি মুসলমান হলে অগ্রগামীর মর্যাদা তো আর পাবো না। একথা ভেবে সে আর মুসলমান হতে চাইতো না। এটাই ছিলো এক কে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করার প্রেক্ষিত। কালাবী এরকম বলেছেন। মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবু জেহেল, ওলীদ ইবনে উতবা, আ'স ইবনে নওফিল ও নজর ইবনে হারেছ সম্পর্কে। তারা যখন দেখলো হজরত আবু জর, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আম্মার, হজরত বেলাল, হজরত সুহাইব এবং হজরত আমের ইবনে ফুহাইরা মুসলমান হয়েছেন, তখন তারা বলতে লাগলো, এখন যদি আমরা মুসলমান হই, তবে আমাদের সম্মানহানি হবে, মর্যাদায় আমরা হয়ে যাবো তাদের সমতুল।

কাতাদা বলেছেন, মুশরিকেরা যখন সাহাবীগণকে উপহাসের পাত্র বানিয়ে বলতে শুরু করলো, দ্যাখো মোহাম্মদের অনুচরদের অবস্থা। আমাদের ক্রীতদাস

www.eelm.weebly.com

ও আমাদের সমাজের নিম্নবিত্তরাই তার সঙ্গী, তখন আল্লাহ্পাক সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ করলেন 'আমি তোমাদের মধ্যে এক কে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি'।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা ধৈর্যধারণ করবে কি? একথার অর্থ হে সত্যানুসারী বিশ্বাসবানেরা! বলো, অংশীবাদীদের বাক্যবানে জর্জরিত হয়েও তোমরা কেবল আমার পরিতোষ লাভের বাসনায় ধৈর্যধারণ করবে, না করবে না? ধৈর্যধারণ করলে পাবে উত্তম বিনিময়। আর না করলে বাড়তে থাকবে তোমাদের মর্মবেদনা ও আক্ষেপ।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছু দেখেন'। একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের ধৈর্য ও ধৈর্যহীনতাসহ তোমাদের প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই আল্লাহ্র অবলোকনের আওতায়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী, মুসলিম ও আহমদ বর্ণনা করেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, সম্পদ ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে উর্ধ্বগামী যদি করো, তবে নিম্নগামী করতেও ভুলো না (উন্নতদের দেখে যে আক্ষেপ আসবে, তা দূর হবে অনুন্নতের দেখলে, লাভ হবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্য)।

উনবিংশ পারা

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ২১, ২২, ২৩

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ۝ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ۝ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ۝

❑ যাহারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না তাহারা বলে, 'আমাদিগের নিকট ফেরেশ্তা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদিগের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন?' উহারা উহাদিগের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং উহারা সীমালংঘন করিয়াছে গুরুতররূপে।

www.eelm.weebly.com

❑ যেদিন উহারা ফেরেশ্‌তাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে সেদিন অপরাধীদিগের জন্য সুসংবাদ থাকিবে না এবং উহারা বলিবে, 'রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

❑ আমি উহাদিগের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করিব, অতঃপর সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল করিয়া দিব।

'যারা আমার সাক্ষাত কামনা করে না' অর্থ— যারা মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত হওয়াকে স্বীকার করে না। অর্থাৎ আখেরাতের কল্যাণ অথবা অকল্যাণ কোনোকিছুর প্রতিই যাদের বিশ্বাস নেই। এখানকার 'রিজ্বা' শব্দটি রূপকভাবে ব্যবহৃত হয় ভীতি অর্থে। 'তাহামাহ্'দের ভাষায় শব্দটি ব্যবহৃত হয় ভয় ও আশা উভয় অর্থে। ফার্‌রাও এরকম বলেছেন। যেমন অন্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে— 'মালাকুম লা তারজুনা লিল্লহিওয়াক্বুরা' (তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের ভয় করোনা কেনো)।

'লিক্বা' অর্থ কোনো কিছু পর্যন্ত পৌঁছানো, কোনো কিছুর সম্মুখীন হওয়া বা কারো সাথে সাক্ষাৎ করা। এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহ্‌র শাস্তি পর্যন্ত পৌঁছানো অর্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বলে, আমাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়না কেনো'? একথার অর্থ মক্কার মুশরিকেরা বলে, মোহাম্মদের সঙ্গীরূপে কোনো ফেরেশতা আমাদের নিকটে উপস্থিত হয় না কেনো, যে আমাদের সামনে তাঁর নবুয়তের সত্যতার সাক্ষ্য দিবে। অথবা আল্লাহ্ দূতরূপে আমাদের কাছে কোনো ফেরেশতা অবতীর্ণ করেন না কেনো?

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে'। একথার অর্থ— তারা আমার নবীর প্রতি পোষণ করে চরম ঔদ্ধত্য। অথবা কোরআনের প্রতি প্রদর্শন করে চূড়ান্ত পর্যায়ের অবজ্ঞা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতররূপে'। একথার অর্থ তারা লংঘন করেছে সত্যপ্রত্যাখ্যানের সর্বশেষ সীমা, পৌঁছে গিয়েছে অবিশ্বাসের সর্বোচ্চ শিখরে। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ তারা প্রদর্শন করেছে চূড়ান্ত পর্যায়ের অবাধ্যতা। মুকাতিল বলেছেন, এর অর্থ— তারা করেছে সত্যের প্রতি চরম বিরুদ্ধতা। বাগবী লিখেছেন, কথাটির মর্মার্থ— তারা করেছে অত্যধিক কুফরী এবং বড় ধরনের জুলুম। 'উত্‌ওয়ান কাবীরা' অর্থ তারা পৌঁছেছে সত্যপ্রত্যাখানের চরম শিখরে। এমন কি দাবি তুলেছে আল্লাহকে দেখার।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'উত্‌ওয়ান কাবীরা' (গুরুতর সীমালংঘন) অর্থ সুস্পষ্ট মোজেজা স্বচক্ষে অবলোকন করেও তারা তা অস্বীকার করেছে, এমন কিছু দাবি করে বসেছে, যা উচ্চ স্তরের জ্ঞানীদেরও অর্জনার্হ নয়।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে 'রক্ষা করো' 'রক্ষা করো'। একথার অর্থ মৃত্যুর সময় অথবা কিয়ামতের দিন যখন সীমালংঘনকারীরা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন তাদের জন্য কোনো শুভসংবাদ আর থাকবে না। অথবা ওই ফেরেশতারা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে 'আজ অপরাধীদের জন্য কোনো শুভসংবাদ নেই'। আতিয়া বলেছেন, কথাটির অর্থ কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দিবে আর কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমাদের জন্য আজ কোনো ভালো সংবাদ নেই।

কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— মৃত্যুকালে অথবা মহাবিচারের দিবসে ফেরেশতারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে কোনো সুসংবাদ দিবে না। জান্নাতের সুসংবাদ দিবে বিশ্বাসীগণকে।

'লিল মুজ্‌রিমীন' অর্থ অপরাধীদের জন্য। বাহ্যত মনে হয় এখানে 'লাহুম' কথাটির সংযোজন আবশ্যক ছিলো। কিন্তু এভাবে সর্বনামের স্থলে প্রত্যক্ষভাবে 'মুজ্‌রিমীন' বলায় একথাই প্রতীয়মান হয় যে, তাদের অপরাধী হওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দিগ্ধ। আর বিষয়টিও এতে করে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, অপরাধী হওয়ার কারণেই তারা সেদিন হবে সুসংবাদ থেকে বঞ্চিত।

'হিজ্‌রাম্‌ মাহজুরা' অর্থ— 'রক্ষা করো' 'রক্ষা করো'। অর্থাৎ আযাবের ফেরেশতাদেরকে দেখে অপরাধীরা তখন বলতে থাকবে 'রক্ষা করো' 'রক্ষা করো'। আতা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফেরেশতারা তখন তাদেরকে দেখে বলবে— হারাম, হারাম। অর্থাৎ যারা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' কালেমায় বিশ্বাসী নয়, তাদের জন্য জান্নাত হারাম।

মুকাতিল বলেছেন, কবর থেকে উত্থিত হওয়ার পর কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে ফেরেশতারা বলবে 'তোমাদের জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ'। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যখন পাপিষ্ঠদেরকে কবর থেকে তোলা হবে, তখন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখে নিজেরাই এরকম বলবে। ইবনে জারীহ্ সূত্রে বাগবী লিখেছেন, আরববাসীরা বিপদ মুসিবতে পতিত হলে বলে থাকে 'হিজ্‌রাম মাহজুরা' (রক্ষা করো, রক্ষা করো)। সুতরাং বুঝতে হবে পাপিষ্ঠরাই সে সময় আযাবের ফেরেশতা দর্শন করে 'রক্ষা করো' 'রক্ষা করো' বলে চিৎকার করবে।

এর পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করবো, অতঃপর সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল করে দিব'। একথার

www.eelm.weebly.com

অর্থ— আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সৎকর্মসমূহ, যেমন অতিথি সৎকার, পরিবার পরিজনের ভরনপোষণ, জনকল্যাণমূলক কাজ, মানুষের সঙ্গে সদাচার ইত্যাদিকে আখেরাতে গণ্য করবো নিষ্ফল কর্মরূপে। এগুলোর জন্য কোনো সওয়াব তারা পাবে না। কারণ তাদের ইমানই নেই। উল্লেখ্য, ইবাদত ও সৎকর্মসমূহ আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হওয়ার প্রধান শর্ত হচ্ছে ইমান। আর কাফেরদের সৎকর্মাবলীর সঙ্গে ইমানের সংযোগ থাকে না বলেই তা হয় নিষ্ফল।

হজরত আলী বলেছেন, এখানকার 'হিবা' এর শাব্দিক অর্থ ওই ধূলিকণা যা দরজা বা জানালার ফাঁক দিয়ে রৌদ্রকিরণে দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু যা হাত দিয়ে ধরা যায় না এবং ছায়াতেও যা দৃষ্টিগাচর হয় না। হাসান, মুজাহিদ ও ইকরামাও এরকম বলেছেন। আর এখানে 'মানছূরা' অর্থ হয়রান পেরেশান।

হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'হিবা' হচ্ছে বাতাসে উড়ন্ত ধূলিকণা। মুকাতিল বলেছেন, দৌড়ের সময় ঘোড়ার পায়ের আঘাতে যে ধূলিকণা ওড়ে, ওই ধূলিকণার নাম 'হিবা'। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'হিবাআম মানছূরা' হচ্ছে দরজা বা জানালার ফাঁকে প্রবিষ্ট সূর্যালোকে দৃষ্ট ধূলিকণা, আর 'হিবা আমমামবাছ' হচ্ছে অশ্বপদাঘাতে উত্থিত উড়ন্ত ধূলিকনা।

মোটকথা, আখেরাতে কাফেরদের সৎকার্যাবলী হবে ধূলিকণার মতো অনুল্লেখ্য, নিষ্ফল, তুচ্ছাতিতুচ্ছ। সে কথাকেই আলোচ্য আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে 'হাবাআম মানছূরা' কথাটির মাধ্যমে। অর্থাৎ সেদিন তাদের সৎকর্মসমূহ হবে বাতাসে উড়ন্ত ধূলিকণার মতো মূল্যহীন, গুরুত্বহীন।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ২৪

أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّأَحْسَنُ مَقِيلًا ○

❒ সেই দিন জান্নাতবাসীদিগের বাসস্থান হইবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হইবে মনোরম।

'মুসতাক্বর' অর্থ বাসস্থান, আবাস, মানুষ যেখানে অধিকাংশ সময় অবস্থান করে। আর 'মাক্বীলান' অর্থ ওই গৃহ, স্ত্রী-সান্নিধ্যের আশায় মানুষ যেখানে বার বার ফিরে ফিরে আসে। অথবা 'মাক্বীল' দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে ওই স্থানকে যে স্থানে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে থাকে। শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে রূপকার্থে। কারণ জান্নাতে শ্রান্তি-পরিশ্রান্তি বলে কিছু নেই। সুতরাং সেখানে বিশ্রামস্থলেরও কোনো প্রয়োজন নেই।

www.eelm.weebly.com

আজহারী বলেছেন, দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামকে বলে 'ক্বাইলুলা' বা 'মাক্বীল' নিদ্রাভিভূত না হলেও। তাই নিদ্রা না থাকলেও জান্নাতে সেখানকার উপযোগী বিশ্রামের ব্যবস্থা তো থাকবেই। সেকারণেই এখানে বলা হয়েছে 'এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম'।

'আহসান' অর্থ এখানে সুন্দর বা মনোরম। এখানে শব্দটির প্রয়োগায়ন একথাই প্রমাণ করে যে, বেহেশতের বিভিন্ন স্থান থাকবে বিভিন্ন প্রকার চিত্র ও সাজ-সজ্জায় চিত্রিত ও অলংকৃত। এরকমও হতে পারে যে, এখানাকার 'মুসতাক্বর' ও 'মাক্বীল' দু'টো শব্দই মূল শব্দ এবং জরফে জামান (কালাধিকরণ কারক)। অর্থাৎ তাদের সেখানকার বসবাসস্থল ও বিশ্রামের সময় হবে এতো উন্নত ও চিত্তাকর্ষক, যা কল্পনাও করা যায় না। অথবা আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— পৃথিবীবাসীদের আরামআয়েশের সময় ও বসবাসস্থল অপেক্ষা বেহেশতবাসীদের বিশ্রামকাল ও আবাস হবে অনেক বেশী উত্তম ও মনোমুগ্ধকর।

ইবনে মোবারকের 'জুহদ' পুস্তকে, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও হাকেমের বর্ণনায় হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহাবিচার সমাপনের পর দ্বিপ্রহরের পূর্বেই জান্নাতী ও জাহান্নামীরা উপস্থিত হবে তাদের স্ব স্ব আবাসে। বর্ণনাটিকে 'বিশুদ্ধ' আখ্যা দিয়েছেন হাকেম। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, হিসাব-কিতাব সমাপনের পর দুপুর না হতেই বেহেশতীরা পৌঁছে যাবে বেহেশতে এবং দোজখীরা পৌঁছে যাবে দোজখে। তারপর তিনি পাঠ করেন 'ছুম্‌মা মাক্বীলাহুম লা ইলাল জ্বাহীম'। হজরত ইবনে মাসউদ আলোচ্য আয়াত পাঠ করেছেন এভাবেই। ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এবং আবু নাঈমের 'হুলিয়া' পুস্তকে এসেছে, ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, এই ধারণাটিই সুপ্রচল যে, মহাবিচারকালে অর্ধ দিবসের মধ্যে সমাপ্ত হবে সকলের হিসাব-কিতাব। তারপর দুপুরের মধ্যে অথবা দুপুরে জান্নাতে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করবে জান্নাতীরা এবং দোজখে গিয়ে শাস্তি ভোগ করবে দোজখীরা।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই বিচারানুষ্ঠান শুরু হবে দিবসে এবং দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামের সময় জান্নাতে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করবে জান্নাতবাসীরা। বাগবীর বর্ণনায় আরো এসেছে, বিশ্বাসীদের জন্য মহাবিচারের দিবসকে করে দেয়া হবে সংক্ষিপ্ত। তাদের কাছে বিচারকালকে মনে হবে আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ের মতো সংক্ষেপিত।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ২৫

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا۝

www.eelm.weebly.com

❒ যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হইবে এবং ফেরেশ্তাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হইবে—

এখানে উল্লেখিত মেঘপুঞ্জের কথা এসেছে সূরা বাকারার ২১০ সংখ্যক আয়াতে এভাবে— 'তারা শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ মেঘের ছায়ায় ফেরেশতাসহ তাদের নিকট উপস্থিত হবেন, তৎপর সবকিছু মীমাংসা হয়ে যাবে'। এখানে 'গামাম' অর্থ এক ধরনের শাদা হালকা মেঘমালা, যা আল্লাহ্পাক তীহ্ প্রান্তরে অবতীর্ণ করেছিলেন কেবল বনী ইসরাইলদের জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়া ইয়াওমা তাশাক্কাক্কুস সামাউ বিল গামামি' (সেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে)। বাগবী লিখেছেন, 'বিলগামামি'র 'বি' এখানে 'আন' (থেকে) অর্থজ্ঞাপক। যেমন আরববাসীরা বলে 'রমাইতুস্ সাহমা বিল কওসি' (আমি ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করেছি)। এখানেও তেমনি আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে— যেদিন মেঘপুঞ্জ ফেটে (থেকে) বের হবে আকাশ।

এরপর বলা হয়েছে 'এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে'। ইবনে আবিদ দুন্ইয়ার 'কিতাবুল আহওয়ালে' এবং হাকেম, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ সকল সৃষ্টিকে একত্র করবেন। জ্বিন, মানুষ, পশু-পাখি ও অন্যান্য সকল প্রাণীর সমাবেশ ঘটবে সেখানে। সেদিন বিদীর্ণ হবে আকাশ ও পৃথিবী। নিকটতম আকাশ থেকে অবতরণ করবে পৃথিবীবাসীদের চেয়েও বেশী আকাশবাসী। পৃথিবীবাসীদেরকে ঘিরে ফেলবে তারা। পৃথিবীবাসীরা তাদেরকে বলবে, তোমরা কি আমাদের প্রভুপালনকর্তাকে দেখেছো? তারা বলবে, না। এরপর অবতীর্ণ হবে দ্বিতীয় আকাশের অধিবাসীরা। তাদের সংখ্যা হবে আগের দুই দল অপেক্ষা বেশী। পৃথিবীবাসী ও প্রথম আকাশবাসী তখন একযোগে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, আমাদের প্রভুপালয়িতা কি তোমাদের মধ্যে রয়েছেন? তারা বলবে, না। এভাবে একে একে নেমে আসবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশের অধিবাসীরা। প্রতিটি নবাগত দলের জনসংখ্যা হবে পূর্ববর্তী দল অপেক্ষা অধিক, তারা পরিবেষ্টন করে রাখবে পূর্ববর্তী দলসমূহকে। আর পূর্ববর্তীরা নতুন দলকে একইরূপ প্রশ্ন করে যাবে। পরবর্তীদের জবাবও হবে একইরকম। অবশেষে মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করবেন আল্লাহ্ স্বয়ং। তাঁকে কেন্দ্র করে সমবেত হবে নৈকট্যভাজন ফেরেশতারা। তাদের সংখ্যা হবে পৃথিবী ও সাত আকাশের ফেরেশতাদের চেয়েও বেশী। সেখানে আরো উপস্থিত থাকবে আরশবাহী ফেরেশতারা। বর্শাফলকের মতো ধারালো হবে তাদের শিঙ। তাদের দুই পায়ের ব্যবধান হবে অনেক...অনেক। তাদের পদতল থেকে পায়ের গ্রন্থি

www.eelm.weebly.com

পর্যন্ত ব্যবধান হবে পাঁচশ' বছরের দূরত্বের সমান। গ্রন্থি থেকে হাঁটু এবং হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত দূরত্বও হবে পাঁচশ বছরের দূরত্বের সমান। কোমর থেকে কণ্ঠনালীর দূরত্বও তদ্রূপ। আবার ঘাড় থেকে কানের দূরত্বও তেমনি।

এই হাদিস ও এতদ্‌সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে সুরা বাকারার ২১০ সংখ্যক আয়াতের তাফসীরে। আর বর্ণিত হাদিসটির সূত্রপরম্পরা তেমন শক্তিশালী নয়। কারণ এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন কতিপয় অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী।

ইবনে জারীর ও ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, জুহাক বলেছেন, কিয়ামতের সময় আকাশ তার অধিবাসীদেরকে নিয়ে বিদীর্ণ হবে। ফেরেশতারা থাকবে আকাশের প্রান্তদেশে। তারা অবতরণ করে ঘিরে ফেলবে পৃথিবীবাসীদেরকে। এভাবে একে একে নেমে আসবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশের ফেরেশতারা। এরপর সকলে দাঁড়িয়ে যাবে সারিবদ্ধভাবে। এক কাতারের পরে থাকবে আর এক কাতার। এরপর এমন একজন ফেরেশতা আগমন করবে যার বাম দিকে থাকবে জাহান্নাম। পৃথিবীবাসীরা ওই জাহান্নাম দেখে ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকবে। কিন্তু যেদিকেই তারা যাবে, সেদিকেই দেখবে অটল প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে ফেরেশতাদের সারি। তাদের এরকম কাতার থাকবে সাতটি। পলায়নপর জনতা তখন বাধ্য হয়ে ফিরে আসবে পূর্বের স্থানে। এ অবস্থার বর্ণনা এসেছে অন্য আয়াতেও— যেমন ১. ইন্নি আখাফু আলাইকুম ইয়াওমাত্‌তানাদ ইয়াওমা তুওয়াল্লুনা মুদবিরীনা ২. ওয়া জ্বাআ রব্বুকা ওয়াল মালাকু সফ্‌ফান সফ্‌ফা ৩. ওয়া জ্বিআ ইয়াওমায়িজ্বিম বিজ্বাহান্নামা ৪. ইয়া মা'শারাল জ্বিন্নি ওয়াল ইনসি ইনিস্ তাত্ব'তুম আনতানফুজু মিন আক্বত্বরিস্‌সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ফানফুজু ৫. ওয়াআনশাক্কাতিস সামাউ ফাহিয়া ইয়াওমাইর্জিউ ওয়াহিয়াতুঁও ওয়াল মালাকু আ'লা আরজ্বাইহা।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ২৬

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ اِلْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ۝

❒ সেইদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হইবে দয়াময়ের এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের জন্য সেই দিন হইবে কঠিন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের'। একথার অর্থ— সেদিন রূপকার্থেও কর্তৃত্ব কারো থাকবে না। কর্তৃত্ব থাকবে কেবল আল্লাহ্‌র।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেই দিন হবে কঠিন'। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স.কে সেই দিবস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যখন এক দিবসের পরিসর হবে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। তিনি স. বললেন, যার আনুরূপ্যবিহীন অধিকারে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তার শপথ! বিশ্বাসীদের কাছে ওই সময় মনে হবে এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজের মতো সহজ ও সংক্ষিপ্ত।

বাগবী লিখেছেন, উকবা ইবনে আবী মুয়ীতের অভ্যাস ছিলো, সে কোনো সফর থেকে ফিরে এলে ভোজের আয়োজন করতো। নিমন্ত্রণ করতো গোত্রপতিদেরকে। ওই গোত্রপতিরা প্রায়শঃ রসুল স. এর সঙ্গে বসে থাকতো। একবার সে এক সফর থেকে ফিরে এসে গোত্রপতিদের সঙ্গে রসুল স.কেও দাওয়াত করে বসলো। রসুল স. তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তাঁর সামনে আহার্যদ্রব্য নিয়ে এলে তিনি স. বললেন, উকবা! তুমি 'লাইলাহা ইল্লাল্লহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্' কলেমার সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত আমি আহার করবো না। একথা শুনে সে কলেমা পাঠ করলো। রসুল স. হৃষ্টচিত্তে তার পরিবেশিত আহার্য ভক্ষণ করলেন। এসংবাদ পৌছে গেলো উকবার অন্তরঙ্গ বন্ধু উবাই ইবনে খালফের কাছে। সে তৎক্ষণাৎ এসে উকবাকে বললো, তুমি বিধর্মী হয়ে গিয়েছো। উকবা বললো, আল্লাহ্‌র কসম। আমি বিধর্মী হইনি। মেহমানকে সন্তুষ্ট করেছি মাত্র। না হলে তিনি যে আমার গৃহে অন্ন গ্রহণ করতেন না। উবাই বললো, আমি তোমার একথায় কিছুতেই প্রসন্ন হবো না, যতক্ষণ না তুমি গিয়ে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করে আসবে। উকবা রসুল স. এর কাছে গিয়ে তাঁর পবিত্র বদনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করলো। তিনি স. বললেন, উকবা! মনে রেখো, মক্কার বাইরে যেদিন তোমাকে পাবো সেদিন আমি অবশ্যই তোমার স্কন্ধে তরবারীর আঘাত হানবো। এরকমই ঘটেছিলো। পরবর্তীতে বদর যুদ্ধে তাকে বন্দী করা হয়েছিলো। শেষে করা হয়েছিলো হত্যা। উবাই ইবনে খালফকেও বদর যুদ্ধের সময় রসুল স. স্বহস্তে হত্যা করেছিলেন। ইবনে জারীরও অপরিণত সূত্রে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় এসেছে, উবাই তখন উকবাকে বললো, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার উপরে তুষ্ট হবো না, যতক্ষণ না তুমি তাঁর কাঁধে পদাঘাত করেছো এবং তার প্রতি থুথু নিক্ষেপ করেছো। উকবা সেরকমই করলো। নামাজ পাঠকালে তিনি স. যখন সেজদাবনত হলেন মন্ত্রনাগৃহে, তখন সে তাঁর পবিত্র স্কন্ধদেশে করলো পদাঘাত। রসুল স. নামাজ শেষে বললেন, শোনো উকবা! মক্কা থেকে দূরে তোমাকেও আমি ভাগে পাবো একদিন। তখন আমি তলোয়ারের আঘাত করবো তোমার মাথায়। তাই হয়েছিলো। বদর যুদ্ধে তাকে বন্দী করা হয়েছিলো।

www.eelm.weebly.com

রসুল স.ও যথারীতি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন হজরত আলীকে। আর যুদ্ধ চলাকালে তিনি স. উবাইয়ের দিকে ছুঁড়ে মারেন একটি বল্লম। ওই বল্লমের জখম নিয়ে সে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। অল্প কয়েকদিনের মাথায় পতিত হয় মৃত্যুমুখে। সেই উকবা ও উবাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ২৭, ২৮, ২৯

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝ يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۝ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَٰنُ لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا ۝

❒ সীমালংঘনকারী সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিতে করিতে বলিবে, 'হায়, আমি যদি রসূলের সহিত সৎপথ অবলম্বন করিতাম'

❒ 'হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম'!

❒ 'আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করিয়াছিল আমার নিকট কুরআন পৌঁছিবার পর।' শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগই করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সীমালংঘনকারী সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে'। এখানে 'সীমালংঘনকারী' বলে বুঝানো হয়েছে উকবা ইবনে আবী মুয়ীতকে। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উবাই ইবনে খালফ রসুল স. এর কাছে যাতায়াত করতো। উকবা ইবনে মুয়ীত তাকে ফিরিয়ে রাখতো। তার এমতো গর্হিত অপকর্ম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতত্রয়।

বাগবী লিখেছেন, এখানে হস্তদ্বয় দংশন করার অর্থ ক্ষোভে ও ক্রোধে নিজের হাতের আঙুল কামড়ানো।

জুহাক বলেছেন, উকবা রসুল স. এর দিকে যে থুথু নিক্ষেপ করেছিলো, সে থুথু ফিরে এসে পতিত হয়েছিলো তার নিজের মুখেই। ফলে পুড়ে গিয়েছিলো তার দুই চোয়াল। আর ওই পোড়ার দাগ অবশিষ্ট ছিলো তার মৃত্যু পর্যন্ত। শা'বী বর্ণনা করেন, উকবা ছিলো উমাইয়া ইবনে খালফের অন্তরঙ্গ বন্ধু। উকবা ইসলাম গ্রহণ

www.eelm.weebly.com

করলে উমাইয়া বললো, তুমি মুসলমান হয়েছো। তাই তোমার ও আমার পারস্পরিক মুখ দর্শন নিষিদ্ধ। একথা শুনে উকবা তার ইসলাম গ্রহণকে অস্বীকার করে, হয়ে যায় ধর্মত্যাগী। তার এমতো অপকর্মের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে তাকে আখ্যায়িত করা হয় 'সীমালংঘনকারী'। এই সীমালংঘনের কারণেই সে আখেরাতে লজ্জায় ও আক্ষেপে তার আপন হস্ত দংশন করতে থাকবে।

কাতাদা বলেছেন, সে আখেরাতে নিজের হাত দংশন করতে করতে কনুই পর্যন্ত ভক্ষণ করবে। পুনরায় তার হাত তৈরী করে দেয়া হবে। পুনরায় সে হাত দংশন করতে করতে খেয়ে ফেলবে। পুনরায় নির্মিত হবে নতুন হাত। এভাবে পুনঃ পুনঃ তার হস্তদংশন চলতেই থাকবে বিরতিহীনভাবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলবে, হায়, আমি যদি রসুলের সঙ্গে সৎপথ অবলম্বন করতাম'। একথার অর্থ— সে তখন হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায় পৃথিবীতে যদি আমি রসুল স. এর অনুগমন করে শুভপথানুসারী হতাম। উবাই ইবনে খালফের কথা যদি না শুনতাম।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম'। একথার অর্থ— সে আরো বলবে, হায়, আজ কী দুর্দশা আমার। যথাসময়ে আমি সত্যপথের পরিচয় পাইনি। তাই শয়তান অথবা শয়তানের দোসর উবাইকে গ্রহণ করেছিলাম অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে। এরকম যদি না করতাম।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিলো আমার নিকটে কোরআন পৌঁছবার পর'। এখানে 'জিক্‌র' অর্থ কোরআন মজীদ অথবা রসুল স. এর সদুপদেশ কিংবা কলেমায়ে শাহাদাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগই করে'। এখানে 'শয়তান' অর্থ ভ্রষ্ট পথের দিকে পরিচালনাকারী সুহৃদ, আল্লাহ্‌র পথের সর্বপ্রকার অন্তরায়, মানুষ অথবা জ্বিন।

'খুজুলান' অর্থ সহায়হীনভাবে পরিত্যাগ করা', প্রয়োজনের সময় সাহায্য না করা। মর্মার্থ হচ্ছে— শয়তান কারো বন্ধু নয়। সে তার অনুসারীকে ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে ফেলে দিয়ে সঙ্গ ত্যাগ করে।

আলোচ্য আয়াতত্রয় নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও ঘটনাকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হলেও এর বিধান এ ধরনের সকল ব্যক্তির প্রতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ পাপকর্মের ভিত্তিতে যারা পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে তাদের সকলের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য যে 'শয়তান (মানুষ অথবা জ্বিন) তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগই করে'।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুণ্য ও পাপ যথাক্রমে মেশক আম্বর ও কামারের হাপরের মতো। কারো কাছে মেশকের সৌগন্ধ যদি থাকে তবে তুমি তার কাছে হয়তো তা বিনা মূল্যে পেতে পারো, অথবা তা নিতে পারো কিনে। তার সঙ্গ লাভ করলেও তুমি পেতে পারো সুঘ্রাণ। আর হাপরের কাছে থাকলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পুড়িয়ে দিতে পারে তোমার পরিধেয় বস্ত্র, বা কমপক্ষে দুর্গন্ধ তো নিশ্চিত। বোখারী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা প্রকৃত বিশ্বাসী ছাড়া অন্য কারো সান্নিধ্যে যেয়ো না। আর তোমাদের খাদ্য যেনো পরহেজগার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ না খায় (নিমন্ত্রণ কোরো কেবল পুণ্যবানদেরকে)। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, হাকেম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষ সাধারণতঃ অনুসরণ করে অন্তরঙ্গ বন্ধুর ধর্ম ও চালচলন। তাই প্রথম থেকেই তার দেখে নেয়া উচিত, সে কার সংসর্গ অবলম্বন করতে যাচ্ছে। বাগবী।

হজরত আনাস থেকে বোখারী, মুসলিম, আহমদ ও সুনান রচয়িতাবৃন্দ এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে যাকে ভালোবাসে সে তার সঙ্গী।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৩০, ৩১

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ۝ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا

❒ রসূল বলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে।'

❒ আল্লাহ্ বলেন, 'এইভাবেই প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছিলাম আমি অপরাধীদিগকে। তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— স্বসম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখানের প্রতি অনুযোগ উত্থাপন করে রসুল স. বলেন, হে আমার প্রভুপালক! এরা তো এই কোরআনের প্রতি বিমুখ। তাদের কাছে এর বিধানাবলী পরিত্যাজ্য।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'মাহজুর' (পরিত্যাজ্য) শব্দটি এসেছে 'হুজ্বরুন' থেকে। 'হুজ্বরুন' অর্থ নিরর্থক উক্তি, বাগাড়ম্বর , বাচালতা। এভাবে

www.eelm.weebly.com

বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রভুপালক! আমার সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো এই কোরআনকে মনে করে নিরর্থক বচন। কেউ বলে 'কবির কল্পনা', কেউ বলে 'যাদু', কেউ বলে 'প্রাচীনকালের উপকথা'। নাখয়ী ও মুজাহিদ এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন।

কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— পৃথিবীতেই রসুল স. বলেছেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমার সম্প্রদায় যে এই মহাগ্রন্থকে পরিত্যাগ করেছে। অথবা বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত উক্তির মাধ্যমে রসুল স. তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহ্তায়ালা সকাশে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। আর এর জবাবে আল্লাহ্তায়ালা সান্ত্বনা প্রদান করেছেন তাঁর প্রিয়তম রসুলকে।

পরবর্তী আয়াতে (৩১) সে কথাই বলা হয়েছে এভাবে— 'আল্লাহ্ বলেন, এভাবেই প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম আমি অপরাধীদেরকে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আচরণে দুঃখিত হবেন না। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব এভাবেই চলে এসেছে আবহমানকাল থেকে। আপনার পূর্বসূরীদের বিরুদ্ধেও আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেকে করে দিয়েছিলাম শত্রু।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট'। ইবনে আবী হাতেম ও হাকেমের বর্ণনায় এবং জিয়ার 'আলমুখতার' গ্রন্থে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কার পৌত্তলিকেরা বলতো, মোহাম্মদ যদি আল্লাহ্র নবীই হবেন, তবে তাকে আল্লাহ্ এভাবে বার বার কষ্ট দেন কেনো, কেনো একবারে অবতীর্ণ করে না সম্পূর্ণ কোরআন। তাদের এমতো অপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৩২, ৩৩, ৩৪

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

www.eelm.weebly.com

❑ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, 'সমগ্র কুরআন তাহার নিকট একবারে অবতীর্ণ হইল না কেন? ইহা আমি তোমার নিকট এইভাবেই অবতীর্ণ করিয়াছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করিয়াছি তোমার হৃদয়কে মজবুত করিবার জন্য।'

❑ উহারা তোমার নিকট কোন সমস্যা উপস্থিত করিলে আমি তোমাকে উহার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি।

❑ যাহাদিগকে মুখে-ভর দিয়া চলা অবস্থায় একত্রিত করা হইবে ও জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে, উহাদিগেরই স্থান হইবে অতিনিকৃষ্ট এবং উহারাই পথভ্রষ্ট।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, সমগ্র কোরআন তার নিকট একবারে অবতীর্ণ হলো না কেনো? এখানকার 'নুয্যিলা' অর্থ উনযিলা। অর্থাৎ একবারে, ক্রমে ক্রমে নয়। কারণ এর পরেই এসেছে 'জুমলাতাঁও ওয়াহিদাতান' কথাটি। অর্থাৎ সমগ্র কোরআন।

বায়যাবী লিখেছেন, কাফেরদের এমতো অভিযোগ ছিলো ভিত্তিহীন। কারণ কোরআন পৃথক পৃথকভাবে বা একবারে যেভাবেই অবতীর্ণ করা হোক না কেনো, কোনো অবস্থাতেই এর অনবদ্যত্ব ও অলৌকিকত্ব ক্ষুণ্ন হতো না। বরং পৃথক পৃথক ভাবে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। পরবর্তীতে সেকথাই বলে দেয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা আমি তোমার নিকট এভাবেই অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি, তোমার হৃদয়কে মজবুত করবার জন্য'। এখানে 'কাজালিকা' (এটা) এর 'কাফ' এর সঙ্গে উহ্য রয়েছে একটি ক্রিয়াপদ। বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি এটা এরকমভাবে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি, যাতে এর প্রতিটি আয়াত কাফেরদের অহমিকা ও মূর্খতাকে পরাস্ত করতে পারে আর এভাবে যেনো আমার রসুলের মন-মানসিকতা হয়ে যায় অধিকতর বলিষ্ঠ। জিবরাইলও যেনো আমার নির্দেশে আমার রসুলের হৃদয়ের শক্তি-বৃদ্ধি ঘটায়। উল্লেখ্য, এভাবে বিরতি সহকারে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে নাসেখ-মানসুখের বিষয়টিও বাস্তবরূপ লাভ করে। ফলে ফুটে ওঠে কোরআন মজীদের অপরাজেয় বচনশৈলির বৈশিষ্ট্য।

'রাত্তালনাহু তারতীলা' অর্থ স্পষ্টভাবে। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— আমি কোরআনকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। 'তারতীল' অর্থ 'তুরসাল', থেমে থেমে পরিমিত বিরতিসহ আবৃত্তি। সুদ্দী অর্থ করেছেন- খণ্ড খণ্ডরূপে, পৃথক পৃথক ভাবে। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— এক অংশের উল্লেখ অপর

www.eelm.weebly.com

অংশের পশ্চাতে। নাখয়ী ও হাসান অর্থ করেছেন— আমি একে বন্টন করে দিয়েছি ভিন্ন ভিন্ন অংশে। উভয় দন্তপাটির সুসমঞ্জস একত্রায়নের মধ্যেই প্রকাশ পায় 'তারতীলে'র উচ্চারণগত রূপ।

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'তারা তোমার নিকট কোনো সমস্যা উপস্থিত করলে আমি তোমাকে তার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! বিরুদ্ধবাদীরা আপনাকে বিব্রত করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার অসঙ্গত প্রশ্নের অবতারণা করে। সেগুলোর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদানও এমতো খণ্ড খণ্ডরূপে সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজনানুসারে কোরআন অবতীর্ণ করার আর একটি উদ্দেশ্য।

'ইল্লা জ্বি'নাকা বিলহাক্কি' অর্থ সঠিক সমাধান। 'আহসানা তাফসীরা' অর্থ সুন্দর ব্যাখ্যা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্নের মাধ্যমে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যখন সমস্যা সৃষ্টি করে, তখন আমি আপনাকে দেই আমার পক্ষ থেকে বিশেষ প্রজ্ঞা, যার মাধ্যমে আপনি সমস্যাকে যেমন উন্মোচন করেন, তেমনি দেন সুন্দর ও সুসঙ্গত ব্যাখ্যা। ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় সঠিক সমাধান। বিকশিত হয় আপনার নবুয়তের মূল উদ্দেশ্য।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তাদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট'।

এখানে 'তারাই পথভ্রষ্ট' অর্থ তারা পৃথিবীতে রসুল স.কে পথভ্রষ্ট মনে করতো, কিন্তু তারাই আদতে পথভ্রষ্ট। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— এসকল লোক দুনিয়ায় রসুল স.কে মনে করতো পথভ্রষ্ট। কিন্তু আখেরাতে তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে পথভ্রষ্ট আসলে কে? তাদের তখন মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে এবং নিয়ে যাওয়া হবে দোজখের দিকে। তাদের ওই বাসস্থান কতোইনা নিকৃষ্ট।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কযুক্ত ২৪ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে যেখানে বলা হয়েছে 'সেই দিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম'। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে পথপ্রাপ্ত জান্নাতবাসীদের বিপরীত অবস্থা হবে তাদের। জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট ও মনোরম, আর জাহান্নামবাসীদের অবস্থা হবে অতি নিকৃষ্ট। কারণ জান্নাতবাসীরা পথপ্রাপ্ত এবং জাহান্নামবাসীরা পথভ্রষ্ট।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, হাশর প্রান্তরের মানুষকে চালিত করা হবে তিনভাবে। কাউকে আনা হবে বাহনে চড়িয়ে, কাউকে পায়ে হাঁটিয়ে এবং কাউকে মুখের উপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায়।

www.eelm.weebly.com

উপস্থিত একজন এই অদ্ভুত অবস্থার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি স.বললেন, যিনি পা দ্বারা মানুষকে চালাতে পারেন, তিনি নিশ্চয় মুখে ভর দেয়া অবস্থায় চালাতেও সক্ষম। আবু দাউদ, বায়হাকী।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, একবার রসুল স.কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! বিচারের ময়দানে মুখে ভর দিয়ে মানুষ চলবে কীভাবে? তিনি স. বললেন, যিনি পা দিয়ে মানুষকে চালনা করেন, তিনি নিশ্চয় মুখে ভর দেয়া অবস্থাতেও মানুষকে চালনা করতে পারবেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত মুয়াবিয়া ইবনে হিদাহ্ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, আমি স্বকর্ণে শুনেছি রসুল স. বলেছেন, মানুষের হাশর হবে তিনভাবে— সওয়ারী হয়ে, পদব্রজে এবং মুখের উপরে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি এবং বলেছেন এর সূত্রপরম্পরা উত্তম পদবাচ্য।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র সত্যবাদী নবী আমাকে বলেছেন, বিচারের ময়দানে মানুষ উপস্থিত হবে তিনভাবে— একদল আগমন করবে বাহনারোহী হয়ে, একদল পায়ে হেঁটে এবং আর একদল মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়। আরোহীরা থাকবে পরিতৃপ্ত ও উৎকৃষ্ট পোশাক পরিহিত। আর ফেরেশতারা চালিয়ে নিয়ে যাবে মুখে ভর দিয়ে দাঁড়ানোদেরকে। নাসাঈ, হাকেম, বায়হাকী।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ۝ فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ۝ وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝ وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا۠ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ۝ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ؗ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ۝

❒ আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং তাহার ভ্রাতা হারুণকে তাহার সাহায্যকারী করিয়াছিলাম,

❒ এবং বলিয়াছিলাম, 'তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও যাহারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।' অতঃপর আমি সেই সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছিলাম।

www.eelm.weebly.com

❒ এবং নূহের সম্প্রদায় যখন রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল তখন আমি উহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম এবং উহাদিগকে মানব জাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করিয়া রাখিলাম। সীমালংঘনকারীদিগের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

❒ আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম আদ, সামূদ, রস্‌বাসী এবং উহাদিগের অন্তরবর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও।

❒ আমি উহাদিগের প্রত্যেককে দৃষ্টান্ত দ্বারা সতর্ক করিয়াছিলাম এবং অবাধ্যতার জন্য উহাদিগের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছিলাম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং, তার ভ্রাতা হারুণকে তার সাহায্যকারী করেছিলাম'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! স্মরণ করুন, আপনার পূর্বসূরী রসুল মুসাকে আমি দান করেছিলাম মহাগ্রন্থ তওরাত, আর তাঁর ধর্মপ্রচারের কাজে সাহায্যকারী করে দিয়েছিলাম নবী হারুণকে। এখানে 'ওয়াযীরা' অর্থ পরামর্শদাতা, সাহায্যকারী। উল্লেখ্য, হজরত হারুণকে এখানে 'সাহায্যকারী' বলাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি নবী ছিলেন না। অবশ্যই তিনিও ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী। কিন্তু তিনি তাঁর নবুয়তের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁর ভ্রাতা হজরত মুসার সঙ্গে যৌথভাবে। অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে দু'জন একত্রিত হলে একজন অপরজনের সাহায্যকারীই হয়ে থাকে। তাই এখানে তাঁকে বলা হয়েছে 'সাহায্যকারী'।

পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'এবং বলেছিলাম, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করেছে'। একথার অর্থ— আমি ওই নবী ভ্রাতৃদ্বয়কে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা ফেরাউন ও তার অনুসারীদের নিকটে যাও, তারা আমার এককত্ব ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করেছে, দিনাতিপাত করে চলেছে অহমিকা ও পৌত্তলিকতা নিয়ে। তাদেরকে তোমরা আহ্বান জানাও অক্ষয় মহাসফলতার দিকে, মহাসত্যের দিকে।

এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'নিদর্শনাবলী' অর্থ হজরত মুসার মোজেজাসমূহ। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে, এখানকার 'যারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করেছে' বলে বুঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় হজরত মুসার মোজেজাসমূহকে স্বীকার করতো না। এখানে 'আয়াতিনা' (নিদর্শনাবলী) অর্থ তওরাতের আয়াত নয়। আর তওরাতের আয়াতে অবিশ্বাসের দায় ফেরাউন ও তার অনুসারীদের উপরে বর্তে না। কারণ তওরাত অবতীর্ণ হয়েছিলো তাদের ধ্বংসের পর।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি সেই সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিলাম'। এখানে বক্তব্যকে সংক্ষিপ্তরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে করেই পরিপূরিত হয়েছে বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একথা বলাই এখানে উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্‌র বার্তাবাহকগণকে বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক। আর প্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংস অনিবার্য। অবশ্য নবী ভ্রাতৃদ্বয়ের আহ্বানকার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত রয়েছে অনেক ঘটনা। যথাস্থানে সেগুলোর বিবরণও দেয়া হয়েছে।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'এবং নুহের সম্প্রদায় যখন রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানবজাতির জন্য নিদর্শন করে রাখলাম।' উল্লেখ্য, একজন নবীকে অস্বীকার করার অর্থ সকল নবীকে অস্বীকার করা। হজরত নুহের সম্প্রদায়ের অবাধ্যরা অস্বীকার করেছিলো কেবল হজরত নুহকে। তাদের এই অস্বীকৃতি ছিলো সকল নবীর প্রতি অস্বীকৃতি তুল্য, প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র নবুয়তের বিধানের প্রতি অবজ্ঞা। তাই এখানে বলা হয়েছে 'এবং নুহের সম্প্রদায় যখন রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো'। কথাটির অর্থ কেবল হজরত নুহ ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি অস্বীকৃতি— এরকম অর্থও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। আবার এরকমও বলা যেতে পারে যে, নবী-রসুলগণের আবির্ভাবকে তারা প্রজন্ম- পরম্পরায় প্রত্যাখ্যান করে চলতো। রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপের কথা এখানে বলা হয়েছে সে কারণেই । অর্থাৎ তাদের মনোভাব ছিলো এরকম— যতো নবী-রসুলই প্রেরণ করা হোক না কেনো, আমরা তাকে অথবা তাদেরকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করবো না। আমরা অনুসরণ করবো কেবল পিতৃপুরুষদের ধর্মমত।

এরপর বলা হয়েছে—'সীমালংঘনকারীদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি'। একথার অর্থ ওই সকল অবাধ্যকে আমি পৃথিবীতে সলিলসমাধি তো দিয়েছিই, তদুপরি আখেরাতে তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি দোজখের অন্তহীন ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'আমি ধ্বংস করেছিলাম আদ, ছামুদ, রসবাসী এবং তাদের অন্তর্বতীকালের বহু সম্পদায়কেও'। সুরা আ'রাফ ও অন্যান্য সুরায় আদ ও ছামুদ জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রসবাসীর কথা অবশ্য অন্যান্য সুরায় আসেনি। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'রস' বলে কোনোকিছুর অগ্রভাগকে। কূপের উপরিভাগকে ঘিরে রাখা, সংস্কার করা, ভেঙে ফেলা, খনন করা ও মৃতকে দাফন করাকে 'রস' বলা হয়। আবার আজারবাইজানের একটি পার্বত্য উপত্যকার নাম 'রস্‌সুল হিমা' অথবা 'রসিসুল হিমা', যার অর্থ ধূলোবালির পুরোভাগ।

www.eelm.weebly.com

ওই সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্যোক্তা, একই সঙ্গে সত্যপ্রত্যাখ্যানের পুরোধা। তাই এখানে তাদেরকে বলা হয় রসবাসী। বৃহৎ কূপের মালিক ছিলো তারা। বাস করতো 'রস' নামক এক পার্বত্য উপত্যকায়। তাই তাদের নাম 'রস্‌মি' বা 'রসবাসী'। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে রসবাসী বলে বুঝানো হয়েছে হজরত শোয়াইবের সম্প্রদায়কে। তারাই একটি বৃহৎ কূপের পাশে এক পার্বত্য এলাকায় বসবাস করতো। তারা ছিলো পশুপালক ও প্রতিমাপূজক। চরম অবাধ্য হয়ে উঠলে একদিন আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশে সেখানে সংঘটিত হয় ভয়ংকর ভূমিধ্বস। ফলে তারা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে তাদের আপনাপন আবাসে। এই বিবরণটি দিয়েছেন ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্‌। ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকের বিবরণটির সম্পৃক্তি ঘটিয়েছেন কাতাদার সঙ্গে।

বাগবী লিখেছেন, কাতাদা ও কালাবী বলেছেন, 'রস্‌' হচ্ছে ইমামা এলাকার একটি কূপ। ওই কূপের পার্শ্ববতী লোকেরা তাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে শহীদ করে দিয়েছিলো। পরিণামে তাদের প্রতি নেমে এসেছিলো সর্বগ্রাসী ধ্বংস।

কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, ছামুদ সম্প্রদায়ের যে সকল লোক আল্লাহ্‌র গজব থেকে রক্ষা পেয়েছিলো, পরবর্তী সময়ে তারা বসতি স্থাপন করেছিলো উন্মুক্ত পার্বত্য উপত্যকার একটি কূপের পাশে। রসবাসী তারাই। এক আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'ওয়া বি'রিম্‌ মুয়া'ততা্‌লাতিঁউ ওয়া কাস্‌রিম মাশীদ'(আর অকেজো কূপ ও সুউচ্চ ভবন)। আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম এই বিবরণটির বর্ণনাকারীরূপে সাব্যস্ত করেছেন কাতাদাকে। বাগবী লিখেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, রসবাসীদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন নবী হানযালা ইবনে সাফওয়ান। তারা তাঁকে শহীদ করে ফেলে। পরিণামে আল্লাহ্‌র রোষানলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরকমও বলা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি পতিত হয়েছিলো অনেক বিপদ-মুসিবত। দীর্ঘ গলা বিশিষ্ট একটি বাজপাখি থাকতো সেখানকার পার্শ্ববর্তী এক পাহাড়ে। দীর্ঘ গলা থাকার কারণে পাখিটিকে বলা হতো সি মোরগ। পাখিটি ওই সম্প্রদায়ের শিশুদেরকে ছোঁ মেরে উঠিয়ে নিয়ে যেতো। হজরত হানযালা ওই পাখিটির জন্য বদদোয়া করেন। ফলে একটি বজ্রপাতের আঘাতে পাখিটি অক্কা পায়। রসবাসী হয়ে যায় নিরাপদ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারাই আবার হজরত হানযালার প্রতি হয়ে ওঠে মারমুখী। এক সময় তারা তাঁকে শহীদও করে দেয়। পরিণামে হয় বিনাশপ্রাপ্ত।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, কা'ব, মুকাতিল ও সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, রস হচ্ছে ইনতাকিয়ার একটি কূপ। জনগণ হাবীব ইবনে নাজ্জারকে হত্যা করে ওই কূপে নিক্ষেপ করেছিলো। হাবীব ইবনে নাজ্জার এবং তার সম্প্রদায়ের আলোচনা এসেছে সুরা ইয়াসিনের তাফসীরে।

কেউ কেউ বলেছেন, 'আসহাবুল উখ্‌দুদ'ই 'আসহাবুর 'রসু'। তারা তাদের সম্প্রদায়ের ইমানদারদের নিধনের উদ্দেশ্যে খনন করেছিলো বড় বড় গর্ত এবং তার মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো আগুন। ইকরামা বলেছেন, তারা তাদের নবীকে কূপে নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দিয়েছিলো। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানকার 'রস' বলে খনিকে,খনির মালিককে। 'রস' এর বহুবচন 'রসাস'।

'কুরুনুন' শব্দটি 'কুরনুন' এর বহুবচন। কুরনুন বলে সমসাময়িক যুগের লোকদেরকে। 'কুরনুন' এর সম্বন্ধ যদি কোনো ব্যক্তির সঙ্গে করা হয়, তবে বুঝতে হবে ওই ব্যক্তি বা ওই ব্যক্তির অনুসারীদের অন্তর্ভূতদেরকে। হাদিস শরীফে 'কুরুনে খইর'(উত্তম যুগ) বলা হয়েছে এই অর্থের পরিপ্রেক্ষিতেই।

রসুল স. বলেছেন, নিশ্চয় সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ, তারপর তৎপরবর্তী, তারপর তৎপরবর্তী। এভাবেই নির্ণীত হয়েছে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীনের যুগ। অর্থাৎ এই যুগ প্রতিটি সময়ের পরবর্তী যুগ অপেক্ষা উত্তম।

যদি 'কুরণ' কে এখানে সম্পর্কযুক্ত করা না হয়, তবে বুঝতে হবে এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে সমসাময়িক যুগের শিশু যুবক বৃদ্ধ সকলকে। এভাবেই চলতে থাকে প্রজন্মায়ন। একারণেই রূপকার্থে 'কুরণ' শব্দটিকে সম্পৃক্ত করতে হয় একটি বিশেষ সময়-পরিসরের সঙ্গে। সে সময় পরিসর হতে পারে দশ, বিশ, তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, যাট, সত্তর, আশি অথবা নব্বই বৎসরের। কেউ কেউ বলেছেন একশত বিশ বছরে হয় এক 'কুরণ'। সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, 'কুরণ' অর্থ এক শতাব্দী। কেননা রসুল স. এক বালকের শতায়ু হওয়ার দোয়া করেছিলেন। তিনি বেঁচেছিলেন এক শতাব্দীকাল। আর যদি এখানে 'কুরণ' অর্থ 'সময়' গ্রহণ করা হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি কোনো কোনো যুগের সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

এর পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'আমি তাদের প্রত্যেককে দৃষ্টান্ত দ্বারা সতর্ক করেছিলাম এবং অবাধ্যতার জন্য তাদের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম'।

'ওয়াকুল্লা দ্বরাব্না' অর্থ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। আখফাশ কথাটির অর্থ করেছেন— আমি তছনছ করে দিয়েছিলাম তাদের সবকিছু। জুজায বলেছেন, কোনোকিছুকে টুকরো টুকরো করা বা তছনছ করে দেয়াকে বলে তাত্বীর। স্বর্ণ ও রূপার টুকরাকে 'তিব্র' বলা হয় একারণেই।

www.eelm.weebly.com

وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِىْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۭ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ۝ وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۭ اَهٰذَا الَّذِىْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ۝ اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۭ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا

❐ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তো সেই জনপদ দিয়াই যাতায়াত করে যাহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল শাস্তি তবে কি উহারা ইহা প্রত্যক্ষ করে না? বস্তুতঃ উহারা পুনরুত্থানের আশংকা করে না।

❐ উহারা যখন তোমাকে দেখে তখন উহারা তোমাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলে, 'এ-ই কি সে যাহাকে আল্লাহ্ রসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন?

❐ 'সে তো আমাদিগকে আমাদিগের দেবতাগণ হইতে দূরে সরাইয়াই দিত যদি না আমরা তাহাদিগের আনুগত্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত থাকিতাম।' যখন উহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উহারা জানিবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তো সেই জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার উপর বর্ষিত হয়েছিলো শাস্তি, তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না'? এখানে 'সেই জনপদ' অর্থ সাদুম ও তৎসন্নিহিত জনপদসমূহ, যেখানে বসবাস করতো হজরত লুতের সম্প্রদায়। তারা লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো সমকামিতার মতো ঘৃণ্য অপরাধে। হজরত লুতের শত আহ্বানেও তাদের চৈতন্যোদয় ঘটেনি। তাই আল্লাহ্র গজবরূপে তাদের উপরে বর্ষিত হয় পাথরের বৃষ্টি। এভাবে ধ্বংস করা হয় তাদেরকে। মক্কার মুশরিকদের মধ্যে কেউ কেউ ওই জনপদের পাশ দিয়ে সিরিয়ায় বাণিজ্য ব্যপদেশে যাতায়াত করতো। সে কথাই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বলা হয়েছে 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো সেই জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে'। এভাবে কিছুসংখ্যক লোকের যাতায়াতকে সকলের যাতায়াত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। কোরআন মজীদের অন্যত্রও এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন হজরত সালেহের উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিলো কিছুসংখ্যক লোক। তবু সকলকে জড়িত করা হয়েছে সেই অপকর্মের সঙ্গে। বলা হয়েছে— 'ফা কাজ্জাবুহু ফাআক্বারুহা'।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, হজরত লুতের সম্প্রদায়ের বসতি ছিলো পাঁচটি জনপদে। তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট জনপদটি রক্ষা পেয়েছিলো আল্লাহ্র গজব থেকে। ওই জনপদগুলো ছিলো সিরিয়া গমনাগমনের পথে।

'আফালাম ইয়াকুনু' 'ইয়ারাওনাহা' অর্থ তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না? প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এর অর্থ— মুশরিকেরা তো ওই সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের ধ্বংসচিহ্ন তাদের যাতায়াতের পথে প্রায়শঃই লক্ষ্য করে, তবু তারা আল্লাহ্তায়ালার গজবের ওই নিদর্শনাদি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করেনা কেনো, সতর্ক হয় না কেনো?

এরপর বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ তারা পুনরুত্থানের আশংকা করে না'। একথার অর্থ— প্রকৃত কথা হচ্ছে তাদের চোখের দৃষ্টি অন্ধ নয়। অন্ধ তাদের অন্তর্দৃষ্টি। তাই ধ্বংসের নিদর্শন স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও তারা সাবধান হয় না। ফিরে আসে না সত্যের পথে। মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, পরকালের সওয়াব ও আযাব এসব কিছুর প্রতি তাদের বিশ্বাস মাত্র নেই।

পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে'। এখানে 'হুযুওয়ান' অর্থ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পাত্র। শব্দটি একটি মূল শব্দ এবং কর্মবাচক বিশেষ্য।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবু জেহেল ও তার সতীর্থদের সম্পর্কে।

এরপর বলা হয়েছে, 'এবং বলে, এই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রসুল করে পাঠিয়েছেন'? একথার অর্থ— আবু জেহেল ও তার সতীর্থরা বিস্ময় ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এরকমও বলে, এই লোকই কি সেই লোক যাকে আল্লাহ্ রসুল করে পাঠিয়েছেন? তাজ্জব ব্যাপার তো! প্রশ্নটি একটি বিস্ময়বোধক প্রশ্ন। তাদের ধারণায় রসুল স. ছিলেন রসুল হওয়ার অযোগ্য। তাই তারা এমতো প্রশ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করতো তাদের ঘৃণ্য বিস্ময়।

এরপরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাগণ থেকে দূরে সরিয়েই দিতো যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকতাম'। একথার অর্থ— আবু জেহেলেরা বলতো আমাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর প্রতি আমাদের বিশ্বাস অটল। না হলে মোহাম্মদের অপ্রতিরোধ্য আহ্বান নিশ্চয় আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের থেকে আলাদা করে দিতো।

আবু জেহেলদের এমতো উক্তি একথাই প্রমাণ করে যে, রসুল স. এর আহ্বান তাদের সামনে বিকশিত হয়েছিলো পরিপূর্ণরূপে। তিনি স. প্রদর্শন করেছিলেন

www.eelm.weebly.com

অনেক মোজেজাও। এর ফলে ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো অংশীবাদিতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর। কিন্তু চিরবঞ্চিত ও চিরহতভাগ্যরা তবুও ছিলো তাদের অপবিত্র বিশ্বাসে অনড়। একারণেই তো তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ দেখে সদুপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। গ্রহণ করতে পারে না সহজ সরল সত্যকে।

'লাওলা আন সবারনা আ'লাইহা' অর্থ যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকতাম। এখানে 'লাওলা' (যদি না তাদের) কথাটির বিধেয় রয়েছে উহ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যদি না আমরা আমাদের দেব-দেবীদের আনুগত্যে অটল থাকতাম। একথার মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত হয় যে, পৌত্তলিকেরা রসুল স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দকে সর্বান্তঃকরণে পথভ্রষ্ট বলে মনে করতো। পরবর্তী বাক্যে একথাই প্রকাশ পেয়েছে।

তাই শেষে বলা হয়েছে— 'যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা জানবে কে পথভ্রষ্ট'? একথার অর্থ— বিষয়টি চিরদিন এভাবে মীমাংসাহীন অবস্থায় থাকবে না। যথাসময়ে তাদের উপরে পতিত হবে আল্লাহ্‌র আযাব। তখন তারা ঠিকই বুঝতে পারবে কে পথভ্রষ্ট এবং কে নয়। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, তাদের উপরে আল্লাহ্‌র শাস্তি অবধারিত।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৪৩, ৪৪

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

❒ তুমি কি দেখ না তাহাকে যে তাহার কামনা-বাসনাকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তাহার কর্মবিধায়ক হইবে?

❒ তুমি কি মনে করো যে, উহাদিগের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে? উহারা তো পশুরই মত; বরং উহারা আরও অধম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি কি দেখো না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করে'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে ফেরাবেন কী করে? তারা যে তাদের অপপ্রবৃত্তির অনুগামী, প্রবৃত্তিপূজক, তাদের ধর্মাদর্শ তাদেরই কামনা-বাসনা নির্ভর। সত্য প্রমাণনির্ভর নয়। হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! দেখুন ওই

www.eelm.weebly.com

পথভ্রষ্টকে, যে তার কামনা-বাসনার উপাসক। সে তার প্রভুপালকের ইবাদত পরিত্যাগ তো করেছেই, তার উপরে নত হয়েছে প্রস্তর প্রতিমার কাছে, যে প্রতিমা তার নিজের কামনা-বাসনার প্রতীক।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবু কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! স্বপ্রবৃত্তির অনড় অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও বলুন, কী করে আপনি তাকে পৌত্তলিকতা থেকে ফেরাবেন?

'ওয়াকিল' অর্থ কর্মবিধায়ক, জিম্মাদার। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের প্রথম প্রশ্নটি বিস্ময় বিমিশ্রিত স্বীকৃতিসূচক এবং পরের প্রশ্নটি অস্বীকৃতিসূচক। এদু'টো বাক্যের মাধ্যমে রসুল স.কে এই মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, হে আমার রসুল! তাদের অনড় অংশীবাদিতা যদিও আপনার মনোকষ্টের কারণ, তথাপি একথাটিও সুনিশ্চিত যে, আপনি এ ব্যাপারে মোটেও দায়বদ্ধ নন।

কালাবী বলেছেন, সংগ্রামের আয়াত দ্বারা এ আয়াত রহিত।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'তুমি কি মনে করো যে, তাদের অধিকাংশ শোনে ও বুঝে'? এই প্রশ্নটিও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এই প্রশ্নের মাধ্যমে রসুল স.কে সান্ত্বনা প্রদানার্থে একথাই বলে দেয়া হয়েছে যে, ওই অংশীবাদীদের অন্তর্দুয়ার অবরুদ্ধ। বধির তাদের হৃদয়ের কান এবং অন্ধ তাদের অন্তরের চোখ। তাই সদুপদেশ ও অলৌকিক নিদর্শন তাদের মর্মে পশে না। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আর একটি কথাও প্রমাণিত হয় যে, সত্যের প্রতিটি প্রমাণ বিশুদ্ধ, উপকারপ্রদায়ক ও শুভপরিণতিমুখী। কিন্তু কোনো প্রমাণই মানুষকে প্রকৃত সত্যে উপনীত করায় না। সত্যোপলব্ধি ও সত্যপ্রাপ্তি নির্ভর করে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ও দয়ার উপর।

'আকছার' অর্থ অধিকাংশ। এখানে এই শব্দটি প্রয়োগের মাধমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সকলেই না বুঝে সত্য পরিত্যাগ করেনি, কিছু লোক ঈমান এনেছিলো তাদের মধ্য থেকে। আবার অনেকে সত্যের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে বুঝে শুনে। এর পশ্চাতে ছিলো তাদের অহমিকা, বিদ্বেষ ও নেতৃত্ব হারানোর আশংকা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা তো পশুরই মতো, বরং তারা আরো অধম'। একথার অর্থ তাদেরও আছে পশুর মতো কান ও হৃৎপিণ্ড। পশুর মতো তারাও ব্যবহার করে তাদের শ্রবণেন্দ্রিয় ও অস্তিত্বরক্ষার অনুভূতি। কিন্তু পশুরা যেমন বোধ-বুদ্ধিহীন, তারাও সেরকম। সেকারণেই সদুপদেশ ও অলৌকিক নিদর্শনাদি শুনে ও দেখে তাদের বোধোদয় ঘটে না। বরং তারা পশুরও অধম। কারণ পশুকুল সত্তাগত ভাবেই সত্যোপলব্ধির যোগ্যতারহিত। কিন্তু তাদের

www.eelm.weebly.com

সত্যপোলব্ধির যোগ্যতাকে তারা কাজে লাগিয়েছে বিপরীতভাবে। মিথ্যাকে মনে করেছে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা। এরকম গর্হিত কর্ম পশুরাও করে না। সুতরাং তারা তো পশুরও অধম। কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— পশুকুল তাদের মালিকের অনুগত। কিন্তু অংশীবাদীরা তাদের প্রভুপালকের অবাধ্য। পশুরাও পলায়ন করে অনিষ্ট থেকে। কিন্তু অংশীবাদীরা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা মাত্র করে না।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, পশুরা তাদের স্রষ্টাকে জানে। তারা তাদের আপনাপন অভিব্যক্তিতে ও ভাষায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতাও বর্ণনা করে। কিন্তু অংশীবাদীরা প্রশংসা করে তাদের দেব-দেবীদের। সুতরাং তারা পশুরও অধম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এক লোক তার বলদকে নিয়ে একস্থানে যাচ্ছিলো। পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো সে। তাই চড়ে বসতে চাইলো বলদের উপর। বলদটি তখন বললো, আমাকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি। সৃষ্টি করা হয়েছে কৃষিকাজের জন্য। উপস্থিত সাহাবীবৃন্দ একথা শুনে বললেন, সুবহানাল্লাহ্! গরুও তাহলে কথা বলে! রসুল স. বললেন, হ্যাঁ, আমি একথা বিশ্বাস করি। আবু বকর ও ওমরও বিশ্বাস করে। ওই সময় তাঁরা দু'জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। রসুল স. বললেন, এক লোক ছাগল চরাচ্ছিলো। হঠাৎ একটি নেকড়ে ছাগলটিকে আক্রমণ করে বসলো। লোকটি নেকড়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলো তার ছাগলকে। নেকড়েটি বললো, কিয়ামতের দিন তুমি কীভাবে তাকে সাহায্য করবে? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, সুবহানাল্লাহ্! হিংস্র পশুও তাহলে কথা বলে! রসুল স. বললেন, হ্যাঁ, আমিতো বিশ্বাস করি। আবু বকর ও ওমরও করে। তাঁরা দু'জন তখনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

জ্ঞাতব্যঃ ফেরেশতাদের মধ্যে রয়েছে আত্মা ও বিবেক, আর জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে আছে কেবল প্রবৃত্তি। আর মানুষের মধ্যে আছে ফেরেশতা ও পশু উভয়ের বৈশিষ্ট্য। তাই তার পশুপ্রবৃত্তি আত্মা ও বিবেকের উপরে প্রবল হলে সে হয়ে যায় পশুর চেয়ে অধম। আর আত্মা ও বিবেক যখন তার প্রবল হয়ে যায় পশুপ্রবৃত্তির উপর, তখন সে হয়ে যায় ফেরেশতার চেয়ে উত্তম।

সূরা ফুরক্বান : আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝

www.eelm.weebly.com

❒ তুমি কি দেখ না কিভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়া বিস্তার করেন? তিনি তো ইচ্ছা করিলে ইহাকে স্থির রাখিতে পারিতেন; বরং তিনি সূর্যকে করিয়াছেন ইহার নির্দেশক।

❒ অতঃপর তিনি ইহাকে ধীরে ধীরে গুটাইয়া আনেন।

❒ এবং তিনিই তোমাদিগের জন্য রাত্রিকে করিয়াছেন আবরণস্বরূপ, বিশ্রামের জন্য তোমাদিগকে দিয়াছেন নিদ্রা এবং কর্মের জন্য দিয়াছেন দিবস।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি কি দেখোনা, কীভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়া বিস্তার করেন'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কি অবলোকন করেননি আপনার প্রভুপালকের ছায়াসৃষ্টির কৌশল? দেখেননি কি যে, কীভাবে তিনি ছায়াকে প্রলম্বিত ও বিস্তৃত করেন? উল্লেখ্য, সৃষ্টিই তার স্রষ্টার প্রমাণ। আর ছায়াও আল্লাহ্তায়ালার একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। সুতরাং ছায়াও প্রমাণ করে তার স্রষ্টার প্রজ্ঞাময়তা ও সৃজনকৌশলকে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয়তম রসুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর সৃজনৈনপুণ্যের দিকে।

'জিল' (ছায়া) বলে ফজরের সময় থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কে। ওই সময়ের ছায়া বিস্ময়কর। কারণ ওই সময় ছায়া থাকে, কিন্তু সূর্য থাকে না। অর্থাৎ তখনকার ছায়া হয় সূর্যের উপস্থিতিহীন। যেমন জান্নাতের ছায়া সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া জিল্লিম মাম্দুদিন'। অথবা শব্দটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে, যা দৃষ্ট হয় সূর্যের উপস্থিতিতে দেয়াল বা বৃক্ষরাজির আড়ালে।

আবু উবায়দা বলেন, যে ছায়া সূর্যের আলো দ্বারা অপসারিত হয়, তাকে বলে 'জিল'। আর যে ছায়া দ্বারা রৌদ্র অপসারিত হয়, তাকে বলে 'ফাই'। সুতরাং বুঝতে হবে সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে হয় 'জিল' এবং সূর্য ঢলে পড়ার পরে আসে ফাই। 'ফায়উন' অর্থ প্রত্যাবর্তন। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরের ছায়া বিস্তৃত হয়ে পড়ে পশ্চিম দিগন্ত থেকে পূর্ব দিগন্তে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'জিল' হচ্ছে শেষ রাত্রির ওই আবছায়া অন্ধকার যা অপসারিত হয় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তো ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে ছায়াকে অপরিবর্তনীয়ও রাখতে পারতেন। অর্থাৎ সূর্যোদয় আর ঘটতোইনা। কিয়ামত পর্যন্ত প্রলম্বিত হতো রাত্রি। এরকম অর্থ করলে বুঝতে হবে, এখানকার 'সাকিনুন' শব্দটি উৎসারিত হয়েছে 'সাকানা' থেকে। 'সাকানা' অর্থ স্থির। অথবা 'সাকিনুন' এর অর্থ আবর্তনশীল। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে 'সাকিনুন' শব্দটি এসেছে 'সুকুন' থেকে। অর্থাৎ আল্লাহ্ সূর্যকে রাখেন একস্থানে স্থির।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'বরং তিনি সূর্যকে করেছেন এর নির্দেশক'। একথার অর্থ— আমি সূর্যকে দান করেছি ছায়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। তাই সূর্য না থাকলে ছায়া থাকে না। আলো না থাকলে অন্ধকারের পরিচয় জানা যায় না। বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় তার বিপরীত বস্তুর মাধ্যমে। তাছাড়া ছায়ার সংকোচন প্রসরণও নিয়ন্ত্রিত হয় সূর্যের দ্বারা।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি তাকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনেন'। একথার অর্থ— সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ছায়া দূর হয়ে যায়। আর এই বিদূরণ কর্মও সংঘটিত হয় ধীরে, ধীরে শেষে ছায়ার আর অস্তিত্ব মাত্র থাকে না।

আমার নিকটে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে অন্যভাবেও। বলা যেতে পারে, 'জিল' বা ছায়া দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে সমগ্র সৃষ্টিকে। অর্থাৎ এই সম্ভাব্য জগত অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব আল্লাহ্‌তায়ালার নাম-গুণাবলীর ছায়া। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনি কী অনুধাবন করেননি, আল্লাহ্ কীভাবে তাঁর এই মহাসৃষ্টিকে অস্তিত্বায়িত করেছেন। তারপর এছায়াকে সম্প্রসারিত করেছেন শত-সহস্র প্রকৃতিতে ও বৈচিত্রে? আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এই মহাসৃষ্টিকে রাখতে পারতেন এক স্থানে স্থির। কিন্তু তিনি এরূপ করেননি। তিনি একে দিয়েছেন চলমানতা ও বিবর্তনশীলতা। আবার একে বানিয়েছেন বিলুপ্তি ও বিলীয়মানতার নিদর্শন, যাতে এ সৃষ্টি থাকে আল্লাহ্‌র অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের ও নাম-গুণাবলীর সতত মুখাপেক্ষী। 'বরং তিনি সূর্যকে করেছেন এর নির্দেশক' অর্থ আমি নাম-গুণাবলীর জ্যোতিচ্ছটাকে করেছি সুফীগণের হৃদয়ের পথনির্দেশক। ওই জ্যোতিসম্পাতের কারণে তারা বুঝতে পারে সমগ্র সৃষ্টি আমার নাম-গুণাবলীর জ্যোতিচ্ছটার ছায়া। এর ফলে দূর হয়ে যায় তাদের ধারণার পূর্বতন অস্বচ্ছতা। 'অতঃপর তিনি একে ধীরে ধীরে গুটিয়ে নেন' অর্থ তারপর আমি তাদেরকে নিয়ে আসি আমার একান্ত সন্নিধানে, তখনই তারা হয় আমার নৈকট্যভাজন, তাদের ওই নৈকট্যভাজনতা বোধগম্য হওয়া সত্ত্বেও বোধাতীত। রসুল স.বলেছেন, আল্লাহ্ এরশাদ করেন— নফল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা হয় আমার সমীপবর্তী। হয় প্রিয়ভাজন। আমি তখন তাকে ভালোবাসি। হই তার কর্ণ, যে কর্ণ দিয়ে সে শোনে।

সুফী সাধকগণ বলেন, যার দুই দিবস একরূপ, সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূত। অর্থাৎ যার পরবর্তী দিবসের আধাত্মিক অবস্থা পূর্ববর্তী দিবস অপেক্ষা উন্নততর নয়, সে আত্মিক পরিব্রাজনার দিক থেকে বঞ্চিত।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণস্বরূপ। বিশ্রামের জন্য দিয়েছেন নিদ্রা'। একথার অর্থ— অন্ধকার

www.eelm.weebly.com

রজনীকে তিনি তোমাদের জন্য করেছেন আত্মগোপনের পরিচ্ছদ সদৃশ। আর নিদ্রাকে করেছেন তোমাদের জন্য শ্রান্তিনিবারক। এখানে 'লিবাসা' অর্থ আবরণ, পরিচ্ছদ। আর 'সুবাতান' অর্থ ছিন্ন করা। নিশিথের নিদ্রা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয় দিবসের কর্মমুখরতাজনিত পরিশ্রান্তিকে। অথবা 'সুবাতান' অর্থ হতে পারে মৃত্যু। অন্য এক আয়াতে নিদ্রাকে তুলনা করা হয়েছে মৃত্যুর সঙ্গে। যেমন— 'হুয়াল লাজী ইয়াতাওয়াফ্‌ফাকুম বিল্‌লাইলি'(তিনি ওই পরম সত্তা যিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন নিশাগমে)। এ অর্থের প্রেক্ষিতে মৃতকে বলা হয় 'মাসবুত'।

শেষে বলা হয়েছে—'এবং কর্মের জন্য দিয়েছেন দিবস'। একথার অর্থ— আর তিনি তোমাদের ধর্মীয় ও জাগতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনার্থে দিয়েছেন দিবস। তাইতো তোমরা আলোকিত দিবসে হতে পারো যত্রতত্র কর্মমুখর।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৪৮, ৪৯

وَهُوَ الَّذِىٓ اَرۡسَلَ الرِّيٰحَ بُشۡرًاۢ بَيۡنَ يَدَىۡ رَحۡمَتِهٖ‌ۚ وَاَنۡزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوۡرًا ۙ لِّـنُحۡیِۦَ بِهٖ بَلۡدَةً مَّيۡتًا وَّنُسۡقِيَهٗ مِمَّا خَلَقۡنَاۤ اَنۡعَامًا وَّاَنَاسِىَّ كَثِيۡرًا

❒ তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আকাশ হইতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করেন—

❒ উহা দ্বারা মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য এবং অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য;

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনিই অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন এবং আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করেন'। এখানে 'ত্বহুরা' অর্থ ওই বস্তু যার দ্বারা বিশুদ্ধতা বা পবিত্রতা অর্জন করা যায়। যেমন 'সাহুর' অর্থ সেহেরীর খাদ্য, ফাতুর অর্থ ইফতারির আহার্য। রসুল স. বলেছেন, পানির অনুপস্থিতিতে পবিত্র মৃত্তিকা মানুষের জন্য পবিত্রতাপ্রদায়ক, দশ বছর এভাবে অতিবাহিত হলেও। আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু জর গিফারী থেকে। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। তিনি স. একথাও বলেছেন যে, সমগ্র পৃথিবী আমাদের জন্য মসজিদ। আর সমগ্র পৃথিবীর মাটি পবিত্র।

অথবা 'কাবুল' যেমন মূল শব্দ, তেমনি মূল শব্দ'ত্বহুর'ও। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন,

www.eelm.weebly.com

তোমাদের কারো পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয়, তবে ওই পাত্র ধৌত করতে হবে সাতবার। প্রথমবার পাত্রটি মাজতে হবে মাটি দিয়ে। এখানেও পানিকে ত্বহুর বলা হয়েছে। কিংবা 'ত্বহুর' নিজেই আধিক্য প্রকাশক। অর্থাৎ পবিত্র হওয়ার দিক থেকে পূর্ণ। যেমন 'সাবুর' অর্থ বড়ই ধৈর্যশীল। 'শাকূর' অর্থ বড়ই কৃতজ্ঞতাপরায়ন। 'কাতু' অর্থ অধিক কর্তনক্ষম। 'দ্বাহুক' অর্থ অধিক হাস্যময়।

বাগবী লিখেছেন, কেউ কেউ মনে করেন, 'ত্বহুর' ওই পদার্থ যা বার বার পবিত্র করে দেয়। যেমন 'সবুর' ওই ব্যক্তি যার মাধ্যমে বার বার প্রকাশ পায় ধৈর্য। এভাবে পুনঃপুনঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর নাম 'শাকূর'। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম মালেক বলেন, ওজুতে ব্যবহৃত পানি দ্বারা পুনরায় ওজু করা যায়।

আমি বলি, কথাটি ভিত্তিবিবর্জিত। কারণ পবিত্র হওয়া ও পবিত্র করার মধ্যে রয়েছে অনেক ব্যবধান। শব্দরূপ ফাউলের মধ্যে শব্দরূপ তাফয়ীলের প্রভাব আদৌ নেই। সুতরাং ত্বহুরের সঙ্গে তাতহীরেরও কোনো সম্পর্ক নেই। অধিকন্তু বলা যেতে পারে, ফাউলের শব্দরূপ এখানে ক্রিয়ার আধিক্য নির্দেশক। ক্রিয়াপরম্পরা নির্দেশকারী নয়। তবে এরকম বলা যেতে পারে যে, 'ত্বহুর' অর্থ পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা। পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা হতে পারে দু'ভাবে— ১. নিজে পবিত্র হবে ২. পবিত্র করবে অপবিত্রতাকে। শরিয়তের অকাট্য প্রমাণ, সুবিদিত বিবরণ ও উম্মতের ঐকমত্যের মাধ্যমে এবিষয়টি সুপ্রমাণিত যে, পানি নিজে পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্রকারী। পানিকে অন্য কোনোকিছু অপবিত্র করতে পারে না। এরকম বলেছেন ইমাম মালেক। তিনি একথা প্রমাণ করেন রসুল স. এর পবিত্র বাণীর মাধ্যমে। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ইমাম আহমদ, ইবনে খুজাইমা ও ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। সুনান চতুষ্টয়ে এসেছে, ইন্নাল্ মাআ লা ইউখবাছু' (পানি নাপাক হয় না)। দারাকুতনী আবার এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন জননী আয়েশা থেকে।

তিবরানীর 'আলআওসাত' গ্রন্থে, হজরত শরীক থেকে আবু ইয়ালী, বায্যার, আবু আলী ইবনে সাকানের বর্ণনায় এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ ও নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! ওই বোদাকুপের পানিতে কি ওজু করা যাবে, যেখানে মূর্খতার যুগে ধোয়া হতো মেয়েদের ঋতুস্রাবের রক্ত মাখা কাপড়, ফেলা হতো মৃত কুকুর ও অন্যান্য দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা? তিনি স.বললেন, পানির পবিত্রতাকে কোনোকিছু অপবিত্র করতে পারে না। কারণ পানি হচ্ছে 'ত্বহুর' (স্বয়ং পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্রকারী)।

www.eelm.weebly.com

ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, যে সকল জলাশয়ে নেমে হিংস্র প্রাণী, কুকুর, গাধা ইত্যাদি পানি পান করে, ওই সকল জলাশয়ের পানি দিয়ে ওজু করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে একবার রসুল স.কে প্রশ্ন করা হলে তিনি স.জানালেন, ওই সকল পশুর পানি ততটুকুই যতটুকু তারা তাদের উদরে তুলে নিয়েছে। অবশিষ্ট পানি পাক।

একটি সন্দেহঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, বর্ণিত হাদিসদ্বয় পরিত্যাজ্য। এমনকি ইমাম মালেক বলেন, বর্ণ-গন্ধ-স্বাদ, পানির এ সকল গুণ পরিবর্তিত হলে তা হয়ে যায় নাপাক। সাধারণ অর্থে তখন তা আর পানি পদবাচ্য থাকে না। আর আমাদের বক্তব্য এই সাধারণ পানির পবিত্রতা-অপবিত্রতা সম্পর্কে।

সন্দেহভঞ্জনঃ বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে ওই সকল জলাশয়ের কথা, যেগুলোতে পানি থাকে অনেক। সুতরাং বর্ণিত হাদিসদ্বয়কে আর অগ্রহণীয় মনে করা যায় না। কেননা অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে, পানিতে নাপাক বস্তু পতিত হলে ওই পানি হয়ে যায় নাপাক, তার গুণত্রয় অবশিষ্ট থাকলেও।

মুসলিম ও আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কোনো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে ওই পাত্র পবিত্র করতে হবে সাতবার পানি দিয়ে ধুয়ে। প্রথমবার মাজতে হবে মাটি দিয়ে। তিনি স. আরো বলেছেন, আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করে সেই পানিতে আবার তোমরা ওজু কোরো না যেনো। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম এবং সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় হজরত আবু হোরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, নিদ্রাভঙ্গের পর তোমরা তিনবার হাত না ধুয়ে কোনো পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ো না। কেননা কেউ একথা জানে না যে, নিদ্রামগ্ন অবস্থায় তার হাত কোথায় থাকে। হাদিসটি এসেছে হজরত ইবনে ওমর, হজরত জাবের এবং হজরত আয়েশা সূত্রেও।

বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, অধিক পরিমাণ পানি নাপাক বস্তু দ্বারা নাপাক হয়ে যায় না। নাপাক হয় অল্প পানি। তবে অধিক ও অল্প পানি কাকে বলে সে সম্পর্কে অবশ্য আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এ ব্যাপারে ইমামগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে দুই মটকা পানিকেই বেশী পানি বলা যায়। এই পরিমাণ পানিতে নাপাক কোনোকিছু পতিত হলেও ওই পানি নাপাক হবে না। তবে পতিত নাপাক বস্তুর কারণে যদি পানির বর্ণ, গন্ধ অথবা স্বাদে পরিবর্তন আসে, তবে বেশী পানিও হয়ে যায় নাপাক। আবার অল্প পানিতে নাপাক কোনোকিছু পতিত হওয়ার পর পানির বৈশিষ্ট্যত্রয় অক্ষুণ্ণ থাকলেও তা হয় নাপাক।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আবু হানিফা বলেন, যদি এ ধারণা প্রবল থাকে যে, পানির একধারে পতিত অপবিত্রতা অপরদিকের পানিতে প্রভাব বিস্তার করতে অক্ষম, তবে ওই দিকের পানি বিবেচিত হবে পবিত্র বলে। এরকম না হলে ওই পানিকে ধরতে হবে অল্প পানি। পরবর্তী সময়ের আলেমগণ বেশী পানির একটি পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। দশগজ দৈর্ঘ্য ও দশ গজ প্রস্থ জলাধারের পানি বেশী পানি। কেউ কেউ মাপ নির্ধারণ করেছেন পনেরো গজ দৈর্ঘ্য পনের গজ প্রস্থ। কেউ কেউ বলেছেন, দৈর্ঘ্য বারো হাত, প্রস্থ বারো হাত। কেউ কেউ বলেছেন আট-আট। আবার কেউ কেউ বলেছেন সাত-সাত।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ বেশী পানির পরিমাণ সম্পর্কে কিছুই বলেননি, কেননা শরিয়ত প্রবর্তক স. এব্যাপারে কোনো সীমানির্দেশ করেননি। দুই মটকা সম্পর্কিত হাদিস শিথিলসূত্রবিশিষ্ট, সুতরাং তা প্রমাণ হিসেবে ধর্তব্য নয়। তাই বেশী পানির পরিমাণের বিষয়টি তার উপরে ছেড়ে দেয়াই যুক্তিসঙ্গত, যে পানি ব্যবহার করে।

ইমাম শাফেয়ী, ও ইমাম মালেক দুই মটকা বিশিষ্ট হাদিসকে দলিলরূপে গণ্য করেছেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত, যেহেতু আব্দুল্লাহ্ ইবনে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাব্বান, হাকেম, দারাকুতনী, বায়হাকী ও সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স.কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! ওই পানির বিধান কি যে পানি পান করে যায় হিংস্র জানোয়ার ও অন্যান্য চতুষ্পদ পশু? তিনি স. বললেন, ওই পানি যদি দুই মটকা পানির সমপরিমাণ হয়, তবে ওই পানিকে কেউ বা কোনোকিছু অপবিত্র করতে পারে না। আবু দাউদ ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, ওই পানি নাপাক হয়ে যায় না। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত ও শায়খাইনের (বোখারী ও মুসলিমের) শর্তানুসারী । ইবনে মানদাহ্ বলেছেন, এই হাদিসের সূত্রাবলী ইমাম মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য। তাহাবীও এই হাদিসের বিশুদ্ধতাকে মেনে নিয়েছেন।

একটি সন্দেহ ঃ হাদিসটি বোখারী ও মুসলিম শুনেছেন ওলীদ ইবনে কাছীর থেকে। তাঁর পূর্বে কখনো এসেছে মোহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে যোবায়েরের নাম। আবার কখনো নাম এসেছে মোহাম্মদ ইবনে উব্বাদ ইবনে জাফরের। তাঁর ঊর্ধতন বর্ণনাকারী হিসেবে এসেছেন কখনো আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবার কখনো ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর। এভাবে হাদিসটির সূত্রপরম্পরা হয়েছে ত্রুটিযুক্ত।

www.eelm.weebly.com

অপনোদন ঃ হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এরকম সূত্রগত ত্রুটি হাদিসের বিশুদ্ধতাকে বিনষ্ট করতে পারে না। কেননা এর সকল বর্ণনাকারীকে যদি নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হয় তবে বিষয়টি হবে এক নির্ভরযোগ্যতা থেকে অন্য নির্ভরযোগ্যতার দিকে প্রত্যাবর্তনের মতো। এতে করে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। তবে বিচার্য বিষয় হচ্ছে, ওলীদ ইবনে কাছীর হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দুই সূত্রে— ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্। বর্ণনাকারীদের একটি দল আবার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দু'টি পদ্ধতিতে। এই দুই পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতিসম্বলিত সূত্র আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত নয়।

দারাকুতনী বলেছেন, উভয় মতই বিশুদ্ধ। ওলীদ ইবনে কাছীর থেকে দু'টি সূত্রেই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন উসামা । তৃতীয় আরেকটি সূত্রকেও বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন ইবনে মুঈন। সূত্রটি এরকমঃ হাম্মাদ ইবনে সালমা—আসেম ইবনে মুনজির—আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর।

একটি জিজ্ঞাসা ঃ এক বর্ণনায় এসেছে 'লাম ইয়াহমিল খাবছা'। (অপবিত্রতা বহন করে না)। অপর বর্ণনায় এসেছে 'লাম ইয়ুনাজ্জিসুহু শাইউন' (তাকে অপবিত্র করে না কোনো কিছুই)। আর এক বর্ণনায় এসেছে 'লা ইয়াতানাজ্জাসু (তা-অপবিত্র হয় না)। এগুলো কি তবে বর্ণনাবিভ্রাট নয়?

জবাব ঃ না। কারণ এগুলোর মধ্যে রয়েছে কেবল শব্দগত ভিন্নতা। অর্থগত দ্বন্দ্ব এতে নেই। সুতরাং একে বর্ণনাবিভ্রাট বলা যায় না।

দ্বিতীয় সন্দেহ ঃ হাদিসের 'কুল্লাতাঈন' (দুই মটকা) শব্দটি সন্দেহপূর্ণ। কেননা সেখানে বলা হয়েছে 'ইজা বালাগাল মা উকুল্লাতাঈন আও ছালাছান' (পানি যখন দুই অথবা তিন মটকা হয়)। আসলে 'আও' (অথবা) শব্দটি এখানে সৃষ্টি করেছে সন্দেহ। এই শব্দাবলীসহ ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে সুপরিণতরূপে ওয়াকী সূত্রে থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। দারাকুতনী ইয়াজিদ ইবনে হারুন সূত্রে এবং এর আগে ওয়াকী ও ইয়াজিদ আসেম ইবনে মুনজির থেকে উবাইদুল্লা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হজরত উমর থেকে সুপরিণত সূত্রে। ইবনে জাওজী লিখেছেন, হাম্মাদের অধঃস্তন বর্ণনাকারীদের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে বৈষম্য। ইব্রাহিম ইবনে হাজ্জাজ ও কামিল ইবনে তালহা হাম্মাদ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন উপরে বর্ণিত শব্দ সহযোগে। কিন্তু আফ্ফান, ইয়াকুব ইবনে ইসহাক হাজরামী, বিশর ইবনে সাররা, আলা ইবনে আবদুল জব্বার, মুসা ইবনে ইসমাইল ও ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে মুসা আবসী হাম্মাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স.বলেছেন 'ইজা কানাল মাউ কুল্লাতাঈন'। সেখানে এর পূর্বে 'ছালাছান' শব্দটি নেই। রয়েছে কেবল 'কুল্লাতাঈন'।

www.eelm.weebly.com

অনুরূপ ইয়াজিদ ইবনে হারুন সূত্রে ইবনে সাবাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসেও রয়েছে সন্দেহসূচক 'আও' শব্দটি। কিন্তু হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় সেরকম কিছু নেই। সুতরাং এরকম বর্ণনার উপরে আমল করা যায়।

এরকমও বলা যেতে পারে যে 'আও' শব্দটি সন্দেহসূচক নয়। বরং এখানে 'আও' (অথবা) শব্দটি এসেছে প্রত্যাখ্যান অথবা গ্রহণ প্রকাশার্থে। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— দুই মটকা হোক অথবা তিন মটকা।

একারণেও অবশ্য সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, কোনো কোনো হাদিসে এসেছে চল্লিশ মটকার কথা। যেমন দারাকুতনী, ইবনে আদী ও উকাইলী মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, রসুল স.এর পবিত্র নির্দেশনা ছিলো এরকম— যখন চল্লিশ মটকার সমান পানি হবে, তখন অপবিত্রতার সম্ভাবনা আর থাকবে না।

একথার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ইমাম আহমদ, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন, আবু জারআ ও আবী হাতেম রাযী বলেছেন, বর্ণনাকারী কাসেম ইবনে আবদুল্লাহ্ অসত্যভাষী। সে নিজে নিজে হাদিস তৈরী করে। সুতরাং তার সূত্রসংযুক্ত হাদিস দ্বারা যথাসূত্রসম্বলিত কোনো হাদিসকে ক্রটিপূর্ণ সাব্যস্ত করা যাবে না। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে যদি কেউ এমতো সন্দেহ প্রকাশ করে বসে যে, তাহলে দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের ভাষ্যও তো এরকম। যেমন— 'ইজা বালাগাল মাউ আরবায়ীনা কুল্লাতিন লাম ইয়াতানাজ্জাস্'। এই হাদিসটি এসেছে রওহা ইবনে কাসেমের সনদে ইবনে মুনকাদির সূত্রে হজরত ইবনে ওমর থেকে। অবশ্য হাদিসটি সুপরিণত শ্রেণীভূত নয়, পরিণত শ্রেণীভূত। ওয়াকী ইবনে সুফিয়ান সওরী এবং মা'মারও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মুনকাদির সূত্রে। আর বর্ণনাকারীর উক্তি যদি তার বর্ণনার বিপরীত হয়, তবে তা হাদিসের বিবরণকে করে দেয় ক্রটিযুক্ত। একারণেই বলতে হয়, ইবনে ওমরের সুপরিণত শ্রেণীর বিবরণটি ক্রটিযুক্ত।

আমরা বলি, ইমাম আবু হানিফার নিকটে সাধারণভাবে কোনো অবস্থাতেই শর্তের অর্থ দলিলরূপে গণ্য হয় না। আর ইমাম শাফেয়ীর নিকটে যদি প্রশ্নের জবাবকে শর্তযুক্ত করা হয়, তবে তার অর্থ দলিল হয় না। সুতরাং 'ইজা বালাগাল মাউ আরবায়ীনা কুল্লাতিন' কথাটির অর্থ এরকম হতে পারে না যে, চল্লিশ মটকার কম পানিতে নাপাক কোনোকিছু পতিত হলে ওই পানি নাপাক হয়ে যায়। কেননা কারণের শর্ত কখনো হুকুম বলে গণ্য হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত ঃ 'কুল্লাতিন' শব্দটি একাধিক অর্থবোধক। ছোট বড় মাটির পাত্র, পানির পাত্র, লোটা, ঘড়া সবকিছুকেই বলা হয় কুল্লা। সুতরাং বর্ণিত

www.eelm.weebly.com

হাদিসসমূহের সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলা যেতে পারে,কুল্লাতাঈনের হাদিসের উদ্দেশ্য দু'টি বড় মটকা। আর চল্লিশ মটকার হাদিসের উদ্দেশ্য বিশ লোটার সমান এক মটকা, এভাবে চল্লিশ লোটার সমতুল্য দুই মটকা।

অতিরিক্ত সন্দেহ ঃ কামুস প্রণেতা লিখেছেন, 'কুল্লাতুন' অর্থ ঘড়া, মশক, ডোল, পাহাড়ের চূড়া, চুলের বেনী, উটের কুঁজ, বড় কূপ, বড় ঘড়া, সাধারণ ঘড়া, পেয়ালা ইত্যাদি। যদি তাই হয় তবে এর শব্দার্থটি তো অবশ্যই হবে স্বনির্বাচিত। আর পাথরের মটকার কথা কোনো যথাসূত্রবিশিষ্ট হাদিসে আসেনি। তবে ইবনে আদীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন 'ইজা বালাগাল মাউ কুল্লাতাঈনি মিন কিলালি হাজরিন লাম ইয়ানজ্বাসহু শাইউন'। এই হাদিসে অবশ্য পাথরের মটকার কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এর সূত্রপরম্পরাভূত মুগীরা ইবনে সাকলান হচ্ছে মুনকিরুল হাদিস (হাদিস শাস্ত্রানুসারে পরিত্যজ্য)। সুতরাং কুল্লাতাঈনের সঠিক অর্থ চিহ্নিত করা নিজে নিজে সম্ভব নয়। তাই এরকম বর্ণনার উপরে আমল না করাই শ্রেয়।

আমরা বলি, পাহাড়ের চূড়া, উটের কুঁজ অথবা মাথার চুলের বেনীর কথা এখানে বলা হয়নি। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। আর পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানোর কথা বলাও এখানে অযৌক্তিক। উটের কুঁজের প্রসঙ্গও এখানে নেই। সুতরাং বুঝতে হবে, শব্দটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে অল্প বা বেশী পানির কথা। আর পানির পাত্র যেহেতু বিভিন্নরকম হয়, তাই সবগুলোর ক্ষেত্রেই 'কুল্লাতিন' শব্দটি প্রযোজ্য। কিন্তু এখানে পাথরের মটকার বিষয়টিই অগ্রগণ্য। কেননা আরবী কবিরা তাদের কবিতায় এই অর্থেই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। এরকম বলেছেন আবু উবায়দা তার কিতাবুত্ তুহুরে। বায়হাকী বলেছেন, আরবে পাথরের মটকার ব্যবহারই ছিলো বহুল প্রচলিত। সেকারণেই রসুল স. তাঁর মেরাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, আমি দেখেছি ওই বৃক্ষের পাতা হাতির মতো এবং ফল পাথরের মটকা সদৃশ। এভাবে শব্দটির অর্থ নির্দিষ্ট করার আর একটি কারণ এই যে, আজহারী বলেছেন, পাথরের মটকাই ছিলো আরব দেশের সর্ববৃহৎ মটকা। শরিয়ত প্রণেতা স. যখন মটকার সংখ্যা দ্বারা পানির পরিমাপ বুঝাতে চেয়েছেন, তখন বুঝতে হবে তিনি স. বলতে চেয়েছেন সর্ববৃহৎ মটকারই কথা। কেননা একটি বড় পাত্র যদি দু'টি ছোট পাত্রের সমান হয়, তবে বড়টিকে ছেড়ে ছোটটির উল্লেখ বাস্তবসম্মত নয়।

তৃতীয়তঃ দু'টি ছোটো মটকার পরিমাণ পানিতে নাপাকি পড়লে যদি পানি নাপাক না হয়, তবে দু'টি বড় মটকার পরিমাণ পানিতে নাপাকি পড়লে তো ওই পানির নাপাক না হওয়া আরো বেশী নিশ্চিত। তাই সতর্কতা প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে বড় মটকার কথা। আর ছোট মটকার পানির সংকুলান তো বড় মটকাতেও হয়।

www.eelm.weebly.com

একটি প্রচণ্ড বিরোধ এই যে, কুল্লাতাঈনের হাদিসকে শিথিলসূত্রবিশিষ্ট বলেছেন হাফেজ ইবনে আবদুল বার, আসী ইসমাইল ইবনে ইসহাক এবং আবু বকর ইবনে ওলী। তাঁরা তিনজন ছিলেন মালেকী মাজহাবের অনুসারী। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, শাফেয়ীর উক্তি বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে যেমন দুর্বল, তেমনি বর্ণনা পরম্পরাগত দিক দিয়েও সুপ্রমাণিত নয়। এই বর্ণনাটি সম্পর্কে আলেমগণের একটি দলের মতপ্রভেদ রয়েছে। তদুপরি কোনো যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসে কুল্লাতাঈনের পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়নি। আর বিষয়টি ঐকমত্যসমর্থিতও নয়। এমতো মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, পূর্বোল্লিখিত প্রশ্নসমূহ আলেমগণের উক্তিতে এসেছে সংক্ষিপ্তরূপে। কিন্তু এই হাদিসের বর্ণনাকারীদেরকে কেউই দুর্বল আখ্যা দেননি। তাঁরা সকলেই ছিলেন বর্ণনাকারী হিসেবে বলিষ্ঠ। সুতরাং মালেকী মাজহাবের ত্রয়ী আলেমের মন্তব্যটি অগ্রহণীয়।

মাসআলা : পানি ছাড়া অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারা ওজু ও গোসল করা ঐকমত্যানুসারে অসিদ্ধ। কোরআন মজীদে বলা হয়েছে, পানি না পাওয়া গেলে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে তায়াম্মুমের মাধ্যমে, মাটি দ্বারা। অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ কোরআনে নেই। কিন্তু প্রকৃত নাপাকি পানি ব্যতীত অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারা দূর করা জায়েয কিনা? জমহুর বলেন, নাজায়েয। ইমাম আবু হানিফা বলেন, জায়েয। বাগবী মত প্রকাশ করেছেন জমহুরের পক্ষে। তিনি তাঁর অভিমতের সমর্থনে দলিলরূপে উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য আয়াতকে। লিখেছেন, এখানে 'ত্বহুর' (পবিত্র) অর্থ 'মুতহির' (পবিত্রতাকারী)। কেননা অন্য আয়াতে বৃষ্টির পানিকে বলা হয়েছে মুতাহ্হির। যেমন— ওয়া ইউনায্যিলু আ'লাইকুম মিনাস্ সামায়ি মাআন লিইউত্বহ্হিরাকুম'। এতে করে বুঝা যায় পবিত্র করার গুণ রয়েছে কেবল পানির মধ্যেই। যদি অন্য কোনো তরল পদার্থের মধ্যে এই গুণ আছে বলে ধরে নেয়া হয়, তবে বুঝতে হবে ওই তরল পদার্থ দিয়ে ওজু ও গোসলও সিদ্ধ। বাগবীর এই দলিল বিশুদ্ধ নয়। কারণ আয়াতে পানিকে 'পবিত্রতাকারী' বলা হলেও একথা বলা হয়নি যে, অন্য কোনো তরল পদার্থ অপবিত্রতা দূর করতে সক্ষম নয়। বরং পানিকে 'পবিত্রতাকারী বলার অর্থ এই যে, কেবল পানিই পবিত্র, অন্য কোনো তরল পদার্থ পবিত্র নয়,এমনটি নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হদস (ওজুহীনতা ও জানাবাতের অপবিত্রতা) এবং নাজাসাতে হাকীকীর (মৌলিক অপবিত্রতা) মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। হদস্ (বিধানগত অপবিত্রতা) নাজাসাতে হুকমী। এরকমই সাব্যস্ত করেছে শরিয়ত। যে কোরআন মজীদ ও ঐকমত্যানুসারে এ ধরনের অপবিত্রতা দূর করা যেতে পারে

www.eelm.weebly.com

কেবল পানির দ্বারা। অনুরূপ অপবিত্রতা পানি ছাড়া অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারাও দূর হতে পারে না। কিন্তু মৌলিক অপবিত্রতা (নাজাসাতে হাকীকী) তো দৃশ্যমান। তাই তা পানি ছাড়া অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারা দূর করা যায় না।

আমি বলি, ইমাম আবু হানিফার হদস্ ও নাজাসাতের এমতো পার্থক্য নিরূপণের বিষয়টি অযথার্থ নয়। কিন্তু এর মধ্যেও রয়েছে কিছুটা বৈপরীত্য। যেমন কোনো নাপাকিতে কোনো পাক পানি ঢেলে দিলে ওই পানি হয়ে যায় নাপাক। সুতরাং ওই পানি দিয়ে কোনো কাপড় তিনবার বা সাতবার ধৌত করা হলে ওই কাপড় পাক হবে, এরকম বলা যাবে না। আবার প্রতিবার নতুন নতুন পানিতে কাপড় চুবিয়ে ও চিপে ফেললেও তো ওই কাপড় পাক হওয়ার আশা নেই। কারণ ভালো করে চিপে পানি নিংড়ে ফেলা সত্ত্বেও কিছু না কিছু পানি তো ওই কাপড়ে থেকেই যায়। বিষয়টিকে এভাবে কিয়াস করা হলে তো বলতে হয় নাপাক কাপড় কখনোই পাক করা যায় না। সেকারণেই পূর্ববর্তী শরিয়তে বলা হয়েছিলো, কাপড়ের যে অংশে নাপাকি লাগবে, ওই অংশ কেটে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু আমাদের শরিয়তের বিধান এরকম কঠোর নয়। আমাদের বিধানে তিনবার ধৌত করা ও চিপে পানি নিংড়ে ফেলাই যথেষ্ট। এটা কিয়াসের বিপরীত। আর যে বিধান বিধিবদ্ধ হয় কিয়াসের বিপরীতে, সে বিধান থেকে কিয়াস করা নীতিশাস্ত্রের পরিপন্থি। তাই এমতোক্ষেত্রে কিয়াস অচল। আমাদের শরিয়তে অন্যান্য তরল পদার্থ তাই পানির সমান্তরাল নয়।

মাসআলা ঃ পানিতে নাজাসাত পতিত হলে যেমন পানি নাপাক হয়ে যায়, তেমনি নাজাসাতের উপরে পানি পতিত হলেও তা হয়ে যায় নাপাক। কেননা উভয় ক্ষেত্রে ঘটেছে পাক-নাপাকের মিশ্রণ। ইবনে জাওজী বলেছেন, ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, শরীর অথবা কাপড়ের নাজাসাত ধৌত করা পানির বর্ণ-গন্ধ-স্বাদে যদি পরিবর্তন না ঘটে, তবে তা পাক। অনুরূপ মাটি অথবা অন্য কোনো স্থানে পতিত প্রস্রাবের উপর যদি পানি প্রবাহিত করে দেয়া হয়, আর এর ফলে যদি প্রস্রাবের চিহ্ন মুছে যায় এবং পানির বৈশিষ্ট্যত্রয় থাকে অটুট, তবে ওই পানিও পাক। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীও এরকম বলেছেন। তাঁদের প্রমাণ হচ্ছে এই হাদিস— হজরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেন, রসুল স. একদিন মসজিদে আগমন করে দেখতে পেলেন, এক বেদুইন সেখানে প্রস্রাব করেছে। তিনি স. উপস্থিত একজনকে লক্ষ্য করে বললেন, যাও, এক বালতি পানি এনে এর উপর প্রবাহিত করে দাও। আহমদ। বোখারী ও মুসলিমও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁদের আপনাপন গ্রন্থে। বোখারী অবশ্য হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

www.eelm.weebly.com

আমরা বলি, বর্ণিত হাদিস বিশুদ্ধ কিয়াসের পরিপন্থী। সুতরাং হাদিসের মর্মার্থ করতে হবে এভাবে— প্রথমে রসুল স. দিয়েছিলেন ওই স্থানের মাটি অপসারণের নির্দেশ। তারপর পানি প্রবাহ করিয়ে দিয়েছিলেন তার উপর দিয়ে। কোনো কোনো বর্ণনায় এরকম স্পষ্ট উল্লেখও এসেছে। যেমন দারাকুতনী আবদুল জব্বারের বরাত দিয়ে, ইবনে উআইনিয়ার বর্ণনাসূত্রে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, এক বেদুইন একবার মসজিদে প্রস্রাব করলো। রসুল স. নির্দেশ দিলেন, ওই স্থানের মাটি খনন করে অপসারণ করো। তারপর ওই স্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত করে দাও এক বালতি পানি।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এই হাদিসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। দারাকুতনী অবশ্য সন্দেহ করে বলেছেন যে, ইবনে উআইনিয়া সম্পর্কে আবদুল জব্বারের সন্দেহ রয়েছে। কেননা ইবনে উআইনিয়ার সঙ্গী যিনি হাফেজে হাদিসের মর্যাদা রাখেন, তিনি ইবনে উআইনিয়ার মাধ্যমে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদসূত্রে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। সেখানে খনন করার নির্দেশের উল্লেখ নেই।

আমরা বলি, আবদুল জব্বার নির্ভরযোগ্য। এরকম নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর কিঞ্চিত অতিরঞ্জনও গ্রহণযোগ্য।

দারাকুতনী হজরত ইবনে মাসউদ প্রমুখ সূত্রেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদিসটির সূত্রপরম্পরা শিথিল। কিন্তু এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই অসত্যভাষণের অপবাদ থেকে মুক্ত।

দারাকুতনী ও আবু দাউদ আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল থেকেও এরকম বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। দারাকুতনী একথাও বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল ছিলেন তাবেয়ী এবং তাঁর সূত্রপরম্পরাগত সকল বর্ণনাকারীই বলিষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয়। কিন্তু মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাঁর মস্তিষ্কে গোলোযোগ দেখা দিয়েছিলো। তাই তাঁর পুত্র ওয়াহাব তাঁকে হাদিস বর্ণনা থেকে বিরত রেখেছিলেন। তিনি ওই অবস্থায় আর হাদিস বর্ণনা করেননি। ইবনে মুঈন বলেছেন, জারীর ইবনে হাকিম যখন কাতাদা সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তখন বুঝতে হবে তিনি বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

আমি বলি, এই হাদিস কাতাদা সূত্রে বর্ণিত হয়নি। বরং বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমায়ের সূত্রে। তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ বর্ণনাকারী। বোখারী ও মুসলিমও তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আহমদ এই বর্ণনাকে সাব্যস্ত করেছেন 'পরিত্যাজ্য' বলে। কিন্তু তাঁর উক্তি সংকীর্ণতার উর্ধ্বে নয়। উপযুক্ত ব্যপ্তি ছাড়া এরকম সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয়া যায় না। তাঁর যুক্তি কেবল এতটুকুই যে, তাঁর মতে প্রসিদ্ধ হাদিস সমূহে খনন

www.eelm.weebly.com

করার কথা নেই। কিন্তু এই যুক্তিটি অচল। কারণ বলিষ্ঠ বর্ণনাকারীদের কিঞ্চিত অতিরঞ্জিত অপ্রসিদ্ধ হাদিসও গ্রহণযোগ্য।

তাহাবী ইবনে উআইনিয়ার বরাত দিয়ে ওমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি তাউস থেকে এবং সাঈদ ইবনে মনসুর ইবনে উআইনিয়া সূত্রে বর্ণনা করেন, রসুল স. তখন নির্দেশ করলেন, ওই স্থানের মাটি খনন করে ফেলে দাও এবং তার উপরে পানি ঢেলে দাও। হাদিসটি অপরিণত সূত্রবিশিষ্ট। আর ইমাম আবু হানিফার নিকট অপরিণত শ্রেণীর হাদিস মুসনাদ শ্রেণীর হাদিস অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মত এর বিপরীত। কিন্তু একথাও ঠিক যে, অপরিণত শ্রেণীভূত হাদিস দলিলরূপে গ্রাহ্য না হওয়ার কোনো কারণ নেই। ইমাম শাফেয়ীর মতে অপরিণত শ্রেণীতে পাঁচটি শর্তের যে কোনো একটি না পাওয়া পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। শর্ত পাঁচটি হচ্ছে— ১. অন্য কোনো বর্ণনাকারী একে বর্ণনা করেছেন 'মুরসাল' (অপরিণত) অথবা মুসনাদ সূত্রে কিন্তু হাদিসের ওস্তাদ বিভিন্ন। ২. বর্ণনাটি কোনো সাহাবীর উক্তি। ৩. অধিকাংশ আলেম কর্তৃক সমর্থিত। ৪. বর্ণনাটি এসেছে ন্যায়পরায়ণ কোনো বর্ণনাকারী থেকে । ৫. বর্ণনাকারীর নামোল্লেখ না করলেও তাঁর এরূপ অভ্যাস আছে যে, তিনি ন্যায়নিষ্ঠ বর্ণনাকারী থেকেই সূত্রপ্রবাহ অনুল্লেখ রাখেন।

এখানে তাউস কর্তৃক বর্ণিত মুরসাল হাদিসটি গ্রহণীয়। কেননা আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল দ্বারা তা সত্যায়িত হয়েছে। আর এই সূত্রটি উত্তমও বটে। আর হজরত আনাসের মুসনাদও বিশুদ্ধ, অথবা উত্তম। অবশ্য হজরত ইবনে মাসউদের মুসনাদ দুর্বল।

যদি প্রশ্ন করা হয়, সহীহাইনে (বোখারী ও মুসলিমে) হজরত আনাসের বর্ণনা অন্যান্য বর্ণনাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও অধিক অগ্রাধিকারীরূপে গৃহীত হয়েছে, তা হলে তার জবাবে আমরা বলবো, সহীহাইনের হাদিস সূত্রগত দিক দিয়ে অবশ্যই বিশুদ্ধ, কিন্তু অর্থগত দিক দিয়ে তা দুর্বল। কেননা এর পরিপূর্ণতা ওই হাদিসসমূহের দ্বারা হয়, যা কমপক্ষে সুবিদিত এবং যা হয় নাজাসাতের মিশ্রণে পানি অপবিত্র হওয়ার প্রমাণবাহী। আর একটি বিষয় এই যে, অগ্রাধিকারের প্রশ্ন ওঠে তখন, যখন দেখা দেয় বর্ণনাবৈষম্য। কিন্তু এখানে সেরকম কিছু নেই। বরং উল্লেখিত সকল হাদিসে এসেছে মাটি খনন করার কথা। খননের কথা নেই কেবল হজরত আনাসের হাদিসে। তাই কোনো হাদিসকেই অগ্রহণীয় বলা যাবে না।

মাসআলা ঃ হদস দূরীকরণার্থে এবং কেবল সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে ওজুর ব্যবহৃত পানি জমহুরের নিকট পাক। হাসান থেকে ইমাম আবু হানিফা বর্ণনা

www.eelm.weebly.com

করেন, এরূপ পানি গুরু অপবিত্র (নাজাসাতে গলীজা)। ইমাম আবু ইউসুফের বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরকম পানি লঘু অপবিত্র (নাজাসাতে খফীফা), কেননা এরকম পানি সম্পর্কে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, এরকম ব্যবহৃত পানি সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য জমহুরের অনুকূল। অর্থাৎ ব্যবহৃত পানি পাক। সাধারণভাবে হানাফীগণ ব্যবহৃত পানিকে নাপাক বলেন হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে। আর কিয়াসের দাবিও এরকম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ যেনো আবদ্ধ পানিতে জানাবাতের পবিত্রতা অর্জনের গোসল না করে। আবু দাউদের বর্ণনায় কথাটি এসেছে এভাবে— কেউ যেনো আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে এবং জানাবাতের গোসল না করে। এরকম কর্ম নিষিদ্ধ। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, ওই পানি তখন নাপাক হয়ে যায়। তারা বলেন ওই নিষিদ্ধতা লঘু অর্থে, গুরু অর্থে নয়। কেননা এক্ষেত্রে এমতো সম্ভাবনা রয়েছে যে, যার উপরে গোসল ফরজ হয়েছে, তার শরীরের কোনো অংশে লেগেছিলো মনী বা বীর্য। এমতাবস্থায় বদ্ধ পানিতে যদি সে নামে তবে ওই পানি হয়ে যায় নাপাক। বিষয়টি ঐকমত্যসম্মত। মতানৈক্য তো রয়েছে কেবল নাজাসাতে হুকমীয়ার বেলায়। যেমন নিদ্রা থেকে জাগ্রত ব্যক্তিকে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করাতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ নিদ্রাবস্থায় নাজাসাতে হাকীকী দ্বারা নাপাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার হস্ত। সেকারণেই রসুল স. বলেছেন, তোমরা ঘুম থেকে উঠে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ো না। অবশিষ্ট রইলো কিয়াস দ্বারা দলিল গ্রহণ করা প্রসঙ্গ। একথা তো স্পষ্ট যে, যে পানির দ্বারা নাজাসাতে হাকীকী দূর হয়, তা নাপাক। সুতরাং আমরা এই প্রক্রিয়ানুসারে তুলনা করে থাকি হদস বিদূরক ও সওয়াব অর্জনের জন্য ব্যবহৃত পানিকে।

আমরা আরো বলি, এমতো প্রতিতুলনা হয়তো ঠিক নয়। কারণ এমতোক্ষেত্রে তুলনা ও তুলনীয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। নাজাসাতে হাকীকীবিদূরক পানি একারণে নাপাক যে, এর সাথে মিশ্রিত হয়ে যায় অপবিত্রতা। আর নাজাসাতে হুকমিয়া বিদূরণকারী পানিতে নাজাসাতে হুকমিয়ার অংশ মিলিত বা মিশ্রিত হয় না। কেননা লঘু ও গুরু উভয় প্রকার হচ্ছে একটি হুকমী আমর বা আদেশী কাজ। এরূপ নাজাসাতের কোনো অংশ হয় না। কেননা একটি অঙ্গ ধৌত করলে কেউ পবিত্র পদবাচ্য হয় না, বরং অপবিত্র ব্যক্তিকে পবিত্র হতে হলে ধৌত করতে হয় তার সমস্ত শরীর। আর যে ওজু করে, তাকে ধৌত করতে হয় চারটি অঙ্গ। এতে করে বুঝা যায় ওজুর পানির এক একটি অংশ পাক। এভাবে পাক অংশ পাক অংশের সঙ্গে মিলিত হলে সমষ্টিগতভাবেও তখন তা আর নাপাক থাকে না।

www.eelm.weebly.com

ওজু থাকা সত্ত্বেও যদি কেবল পুণ্যার্জনার্থে কেউ ওজু করে তাহলে হানাফীগণ তার ওই ব্যবহৃত পানিকে নাপাক বলেন। কেননা রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওজু করে, তার গোনাহসমূহ তার শরীর থেকে ঝরে পড়ে যায়। এমনকি ঝরে যায় তার আঙুলের নিচের গোনাহ্ও। বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ওসমান থেকে এবং মুসলিম হজরত আবু হোরায়রা থেকে। এই হাদিসের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, গোনাহ্ যেহেতু নাপাক, তাই গোনাহমিশ্রিত পানিও নাপাক। উল্লেখ্য, হানাফীগণের এই অভিমতটি ভুল। কারণ গোনাহর কোনো আকৃতি নেই। আর এতে এমন কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য অপবিত্রতাও নেই যে, তা পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যাবে। গোনাহ নাজাসাতে হাকীকীর মতো নয়। অর্থাৎ তা এমন কোনো বস্তু নয় যা শরীর থেকে ঝরে পড়ে পানির সাথে মিশ্রিত হবে এবং পানিকে করে দিবে নাপাক। বরং এখানে গোনাহ ঝরে পড়ার অর্থ গোনাহ মাফ হয়ে যাওয়া। গোনাহ যদি বাহ্যিক নাপাকির মতো হতো, তবে তো পাপী বিশ্বাসীদের নামাজ পাঠ বৈধই হতো না। অথচ এরকম বিশ্বাসীদের নামাজ হয় তাদের পাপের ক্ষতিপূরণ। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন— 'ইন্নাল হাসানাতি ইউজহিবনাস সায়্যিয়াতি' (পুণ্য কর্মসমূহ দূর করে পাপসমূহকে)। রসুল স. বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তাদের মধ্যবর্তী সময়ের, জুমআর নামাজ পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত সময়ের এবং এক রমজান আর এক রমজান পর্যন্ত সময়ের পাপের ক্ষতিপূরক। তবে শর্ত হচ্ছে এমতো আমলকারীকে বেঁচে থাকতে হবে বৃহৎপাপ থেকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এক লোক চুম্বন করে বসলো এক রমণীকে। একথা সে প্রকাশ করে দিলো রসুল স. এর কাছে। তখন অবতীর্ণ হলো 'আক্বিমিস্ সলাতা ত্বরাফাইনিন্ নাহারি ...... শেষ পর্যন্ত। বোখারী, মুসলিম।

ব্যবহৃত পানিকে যারা পাক বলেন, তাদের অভিমতের পরিপোষকতায় রয়েছে কয়েকটি হাদিস। যেমন— হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, আমি একবার পীড়িতাবস্থায় হয়ে গেলাম সংজ্ঞাহীন। জ্ঞান ফিরলে জানলাম, রসুল স. এসে ওজু করে ওজুর ব্যবহৃত পানি ছিটিয়ে দিয়েছিলেন আমার উপর। আমি সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছি সে কারণেই। আমি তখন নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার কোনো উত্তরাধিকারী নেই— না মাতা-পিতা, না সন্তান-সন্ততি। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াতসমূহ। বোখারী, মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

হজরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ বর্ণনা করেন, একবার আমার খালা আমাকে নিয়ে গেলেন রসুল স. এর মহান দরবারে। বললেন, এই ছেলেটি আমার ভগ্নির। সে দুঃখী ও অসুস্থ। রসুল স.তখন তার বরকতের জন্য দোয়া করলেন। এরপর ওজু করে ব্যবহৃত পানি পান করতে দিলেন আমাকে। আমি তা পান করলাম। বোখারী, মুসলিম।

হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির বিবরণে এসেছে, হজরত মুসাওয়ার ইবনে মাখরিমা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র কসম! রসুল স. এর থুথু কেউ মাটিতে পড়তে দিতো না। সাহাবীগণ তা হাত পেতে নিতেন এবং মাখতেন মুখে ও শরীরে। আর তিনি স. যখন ওজু করতেন, তখন ওজুর ব্যবহৃত পানি নেয়ার জন্য তাঁদের মধ্যে লেগে যেতো কাড়াকাড়ি। বোখারী।

মাসআলা ঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, হদস দূর করার জন্য এবং সওয়াব অর্জনের জন্য ওজু ও গোসলের ব্যবহৃত পানি দ্বারা নাজাসাতে হাকীকী দূর করা যায়। যারা বলেন, এরকম পানি নাপাক, তাঁদের মতে এরকম পানি নাজাসাতে হাকীকী দূর করতে সমর্থ নয়। কিন্তু ওই পানি দ্বারা পুনরায় ওজু অথবা গোসল করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতপ্রভেদ রয়েছে। ইমাম মোহাম্মদ বলেন, সওয়াব অর্জনের জন্য যে পানি দ্বারা একবার ওজু করা হয়েছে, ওই পানি দ্বারা পুনরায় ওজু অথবা গোসল করা যাবে না। এরকম পানি পবিত্র বটে, কিন্তু পবিত্রকারী নয়। আর ইমাম জোফার ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, হদস দূর করার জন্য যে পানি ব্যবহার করা হয়েছে, ওই পানি দ্বারা পুনরায় ওজু অথবা গোসল করা নাজায়েয। কারণ ওই পানি পবিত্র, কিন্তু পবিত্রকারী নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, হদস দূরীকরণ, অথবা কেবল সওয়াব অর্জন উভয় উদ্দেশ্যে ওজু ও গোসলে ব্যবহৃত পানি পবিত্র, কিন্তু পবিত্রকারী নয়। তাঁর এমতো অভিমত তিনি প্রমাণ করেছেন হাদিস ও কিয়াস উভয়ের দ্বারা। প্রামাণ্য হাদিসটি এই— রসুল স. জানিয়েছেন, তোমাদের কেউ যেনো বদ্ধ পানিতে স্নান না করে। হাদিসে উল্লেখিত এমতো নিষিদ্ধতার কারণ হতে পারে দু'টি— ১. ওই পানি নাপাক হয়ে যায় ২. ওই পানি পাক, কিন্তু অন্যকে পাক করতে পারে না। এরকম ব্যবহৃত পানিকে অবশ্য নাপাক বলা যায় না। সুতরাং বলতে হয়, এরকম পানি পবিত্র, কিন্তু অন্যকে পবিত্রকারী নয়। আমরা বলি, এই নিষিদ্ধতা তাহরীমি নয়, তানযিহী। অর্থাৎ এরকম পানি নিশ্চিত নাপাক নয়, তবে নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা এতে রয়েছে। সুতরাং ওই পানিকে যেমন নিশ্চিতভাবে নাপাক বলা যায় না, আবার পবিত্রকারী হওয়া পানির যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সে কথাকেও করা যায় না অস্বীকার।

www.eelm.weebly.com

হদস দূর করা অথবা সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পানিকে 'পবিত্রকারী নয়' বলে মত প্রকাশকারীরা ওই পানিকে তুলনা করে থাকেন জাকাতের সঙ্গে। এর কারণ স্বরূপ তাঁরা বলেন, জাকাত প্রদান করলে যেমন ফরজ দায়িত্ব পালিত হয়, তেমনি অর্জিত হয় সওয়াব। জাকাতের সম্পদ নাপাক, তাই তা হাশেমীগণের জন্য তা হারাম করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ওই সম্পদকে নিশ্চিতরূপে অপবিত্র সাব্যস্ত করা হয়নি। অনুরূপ হদস বিদূরণকারী ও সওয়াব প্রদায়ক ওজু ও গোসলের ব্যবহৃত পানি হারিয়ে ফেলে তার পুনঃপবিত্রতাপ্রদায়ক শক্তি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ওই পানিকে অপবিত্র বলা যায় না। এমতো অভিমত অবশ্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, ইসকাতে ফরজ (ফরজের রূপায়ণ) ও ইকামাতে কুরবত (নৈকট্যের প্রতিষ্ঠা) এর দ্বারা মধ্যবর্তীতে এসেছে যার ঘনত্ব ও অপবিত্রতা। হাশেমীদের জন্য জাকাত নিষিদ্ধ করার নির্দেশটি বুদ্ধি-বিবেকের উর্ধে ইবাদতমূলক নির্দেশ। স্মর্তব্য যে, শরীর ও পোশাকের দ্বারা নামাজ আদায় করা যায় এবং এতে করে আদায় হয়ে যায় ইসকাতে ফরজ। আবার অর্জিত হয় সওয়াবও। কিন্তু এর কোনোটির দ্বারাই প্রমাণিত হয় না নিশ্চিত ঘনত্ব অথবা অপবিত্রতা। কোরবানীর বিষয়টিও তদ্রূপ। কোরবানী করলে ওয়াজিব আদায় হয়, কিন্তু কোরবানীর গোশতে মিশ্রিত হয় না কোনো অপবিত্রতা। তাই রসুল স. নিজেও কোরবানীর গোশত খেয়েছেন।

তাছাড়া সাধারণভাবে পবিত্রকারী হওয়া পানির একটি অত্যবশ্যক গুণ। যা নিজে পবিত্র, তাতো অন্যকে পবিত্র করতে পারবেই। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'পানি না পাওয়া গেলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কোরো'। নির্দেশটি একটি সাধারণ নির্দেশ। অতএব বুঝতে হবে ব্যবহৃত পানির উপস্থিতিতেও মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা যাবে না। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম নাজায়েয, বরং এমতোক্ষেত্রে ব্যবহৃত পানি দ্বারা ওজু করা হবে ওয়াজিব। যদি কেউ বলে, ব্যবহৃত পানি সাধারণ পানি নয়। সাধারণ পানি হচ্ছে ওই পানি, যার মধ্যে অপবিত্রতার লেশ মাত্র নেই। এরকম পানি দ্বারা সর্বাবস্থায় নামাজের জন্য ওজু করা জায়েয। এর পরিপ্রেক্ষিত আমরা বলি, সাধারণ পানি যে পবিত্র পানি, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। এরকম পানিতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার বর্ণ-গন্ধ-স্বাদ এই বৈশিষ্ট্যত্রয়। কিন্তু ব্যবহৃত পানিতেও সাধারণত এই গুণত্রয়ের কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। সেকারণেই জুহুরী বলেন, ওজু করার জন্য তাজা পানি না থাকলে কুকুর মুখ দিয়েছে এরকম পাত্রের পানি দ্বারাও ওজু করা যাবে, তবু তায়াম্মুম করা যাবে না। সুফিয়ান সওরী বলেন, ফেকাহশাস্ত্রের দিক থেকে এমনটিই বোধ্য। পানি না পেলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কোরো— নির্দেশটির অর্থ সাধারণ পানি না পেলে তায়াম্মুম কোরো। বোখারী এরকম বর্ণনা করেছেন প্রলম্বিত সূত্রে।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু আমরা বলি, আল্লাহ্তায়ালা আমাদেরকে অপবিত্র পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন ওয়ায়িাবাকা ফাত্বহ্হির ওয়ার রুজ্যা ফাহ্জুর। অন্যত্র এরশাদ করেছেন 'ওয়ালাকিঁইইয়ুরিদু লিইয়ুত্বহ্হিরাকুম'। হজরত আবু হোরায়রা সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমাদের কারো পানির পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয়, তবে ওই পাত্রের পানি ফেলে দিয়ো। তারপর পাত্রটি ধৌত কোরো সাতবার। অন্য এক হাদিসে এসেছে, ওই নাপাকীসমূহের কোনো একটিতে যদি কাউকে লিপ্ত হতে হয়, তবে সতর্কতা অবলম্বন কোরো আল্লাহ্র বিধানানুসারে।

এক আয়াতে আল্লাহ্ এরশাদ করেন— 'ইউহিললু লাহুমুত্ ত্বয়্যিবাতি ওয়া ইউহার্‌রিমু আলাইহিমুল খবায়িছা'(তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে পবিত্রবস্তু আর হারাম করা হয়েছে অপবিত্রবস্তু)। এখন কেউ নাপাক পানি পেলেও সে কিন্তু শরিয়ত কথিত পানি পায়নি। কারণ নাপাক পানি ব্যবহার শরিয়তে নিষিদ্ধ। পরিস্থিতিটি এরকম— যেমন কেউ কূপের পাশে বসে আছে। কিন্তু কূপ থেকে পানি তোলার রশি বা বালতি তার কাছে নেই। তেমনি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে পানি উপস্থিত থাকলেও রোগবৃদ্ধির আশংকায় সে তা ব্যবহার করতে সক্ষম নয়। ব্যবহৃত পানির বিষয়টি কিন্তু এরকম নয়। কারণ তা নাপাক নয়। সুতরাং ব্যবহৃত পানির উপস্থিতিতে তায়াম্মুম অসিদ্ধ। আর ওই পানি পবিত্র তো বটে, পবিত্রকারীও।

মাসআলা ঃ যদি কোনো পাক জিনিস পানিতে পতিত হয়, তার ফলে পানির তিনটি গুণে যদি কোনো পরিবর্তন না আসে, পানির মৌলিকত্বে নতুন কিছু যদি সংযুক্ত না হয়, তবে ওই পানি দ্বারা ওজু জায়েয। কিন্তু পানির এক বা একাধিক গুণ যদি এতে করে পরিবর্তিত হয়, এমতো পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয় যা থেকে বেঁচে থাকা কঠিন, যেমন বর্ষাকালের পানির সঙ্গে মিশ্রিত থাকে ঘাস, পাতা ইত্যাদি এতে করে পানির গুণে কিঞ্চিত পরিবর্তনও আসে, এমতোক্ষেত্রে আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, পানির ঘনত্ব ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত না হওয়ার শর্তে এরকম পানি দিয়ে ওজু করা সিদ্ধ। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেন, এরকম পানি দিয়ে ওজু হবে না। কারণ এরকম পানি সাধারণ পানি নয়। বরং তা রস বা সূরা পদবাচ্য।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, এরকম পানি দিয়ে ওজু সিদ্ধ। তবে যদি কোনো ঘন বস্তু পতিত হওয়ার কারণে পানি গাঢ় হয়ে যায়, অথবা যদি পরিবর্তিত হয়ে যায় পানির অধিকাংশ গুণ, যেমন নাবিজ (এক প্রকার মদ্য), অথবা যদি কোনো তরল পদার্থ পানিতে পড়ে পানির চেয়ে অধিক পরিমাণ হয়ে যায়, পানির অংশ

www.eelm.weebly.com

হয়ে যায় অম্ল, অথবা এতে করে নষ্ট হয়ে যায় পানির অধিকাংশ গুণ, অথবা ওই তরল পদার্থ পানিতে পাক করার ফলে হয়ে যায় সূরা বা রস, তবে ওই পানি দিয়ে ওজু সিদ্ধ হবে না। কিন্তু পানি অধিকতর উত্তম করার জন্য যদি আমপাতা বা বরইপাতা দ্বারা পানি সিদ্ধ করা হয়, তবে পানির গুণে সামান্য পরিবর্তন দেখা দিলেও ওই পানি ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই। ইবনে খুজাইমা ও নাসাঈ হজরত উম্মে হানী সূত্রে বর্ণনা করেন, রসুল স. এবং তাঁর পবিত্র সহধর্মিণী হজরত মায়মুনা একবার একটি বড় পাত্রে রক্ষিত পানি দিয়ে গোসল করেছিলেন। অথচ ওই পানিতে ছিলো আটার খামিরের চিহ্ন। বোখারী হজরত উম্মে আতিয়া নাম্মী এক আনসার রমণী থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. এর প্রিয় কন্যা পরলোক গমন করলে তিনি স. আমাদের কাছে এসে বললেন, তাকে গোসল করাও তিনবার, পাঁচবার অথবা আরো অধিকবার কুলের পাতা দ্বারা সিদ্ধ পানি দিয়ে। আর ওই পানিতে মিশিয়ে দাও কিছু কর্পুর।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাযযার বর্ণনা করেছেন, সালমা ইবনে আমাল যখন ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন রসুল স. তাঁকে বললেন, কুলপাতা সিদ্ধ পানি দিয়ে প্রথমে গোসল করে নাও। কায়েস ইবনে আসেমের বর্ণনামতে এরকম কথা এসেছে।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'উহা দ্বারা মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করবার জন্য এবং অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য'। এখানে 'বালদাতান' অর্থ ভূখণ্ড, শহর, নগর, জনপদ। সেকারণেই এর বিশেষণরূপে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে পুংলিঙ্গবাচক 'মাইতান' শব্দটি।

'আনাসিয়্যা' অর্থ প্রান্তরের প্রাণীকুল ও যাযাবর শ্রেণীর মানুষ, কেননা তাদের জীবনযাপন নির্ভরশীল বৃষ্টির পানির উপর।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা মানুষের প্রতি প্রদত্ত তাঁর ব্যাপক নেয়ামতের কথা বর্ণনা করেছেন। লক্ষণীয়, মানুষের আগে উল্লেখ করেছেন 'অসংখ্য জীবজন্তু'র কথা। এর কারণ হচ্ছে মানুষের জীবন অনেকাংশে অন্যান্য প্রাণীকুলের উপর নির্ভরশীল। তাই বৃষ্টির পানির দ্বারা তাদের পরিতৃপ্তির কথা উল্লেখিত হয়েছে আগে। আবার তার আগে উল্লেখিত হয়েছে মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করার কথা। কারণ মৃত্তিকা সঞ্জীবিত না হলে প্রাণীকুলের অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব। প্রাণীকুলের খাদ্য তো জন্মে মাটিতেই। আর মাটিই বুকে করে ধরে রাখে নদ-নদী, জলাশয় ও অন্যান্য পানির আধার।

এখানে 'আনাসিয়্যা' অর্থ মরুচারী, যাযাবর, বেদুইন, যেহেতু তাদের জীবিকা নির্ভর করে বারিবর্ষণের উপর। এর একবচন 'ইনসিউন' অথবা 'ইনসান', যেমন

www.eelm.weebly.com

'জারাবীউন' বহুবচন 'জারবানুন' এর। যদি 'আনাসিয়্যা' কে 'ইনসান' এর বহুবচন সাব্যস্ত করা হয়, তবে বলতে হয় শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ছিলো 'আনাসীনুন', যেমন 'বুসতানুন' এর বহুবচন বাসাতীন। এখানে 'নূন' পরিবর্তিত হয়েছে 'ইয়া' দ্বারা এবং একে সূচারুরূপে মিলিত করে দেয়া হয়েছে পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে।

শহর মফঃস্বলের অধিবাসীরা সাধারণতঃ বসবাস করে নদী-খাল-বিলের উপকণ্ঠে। তারা তাদের প্রয়োজনীয় পানি ব্যবহার করে নদী-বিল-খাল থেকেই। বারিপাতের প্রতি তারা তেমন মুখাপেক্ষী নয়।

আলোচ্য আয়াতে মানবের প্রতি প্রদত্ত নেয়ামত রাশির কথা স্মরণ করে দিয়েছেন আল্লাহ্‌পাক। মানবের প্রধান উপকারী ও নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হচ্ছে চতুস্পদ জন্তু। তাই তার উল্লেখ হয়েছে মানুষের পূর্বেই। তার পূর্বে উল্লেখ হয়েছে ভূমির সঞ্জীবিত হওয়ার কথা। যেহেতু বারিপাতে জীবন্ত হয় ভূমি। আর ভূমির তৃণলতা দ্বারা প্রাণবন্ত হয় চতুস্পদ জন্তু।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৫০, ৫১, ৫২

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ○ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ○ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ○

❑ এবং আমি ইহা উহাদিগের মধ্যে বিতরণ করি যাহাতে উহারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

❑ আমি ইচ্ছা করিলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করিতে পারিতাম।

❑ সুতরাং তুমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের আনুগত্য করিও না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে উহাদিগের সহিত কঠোর সংগ্রাম চালাইয়া যাও।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং আমি তা তাদের মধ্যে বিতরণ করি'। একথার অর্থ— এবং আমি বৃষ্টিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পতিত করাই বিভিন্ন ভূখণ্ডের উপর।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, এক বছর অপেক্ষা অন্য বছরের বৃষ্টি অধিক হয় না। কারণ আল্লাহ্‌ বৃষ্টি বর্ষণ করেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এরপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত। সুপরিণত শ্রেণীর এক বর্ণনায় এসেছে, দিবস-রাত্রির মধ্যে এমন সময় নেই, যখন বৃষ্টিপাত না হয়। আল্লাহ্‌ যেদিকে ইচ্ছা করেন সেদিকেই ঘুরিয়ে দেন বৃষ্টির গতিবিধি। ইবনে

www.eelm.weebly.com

ইসহাক, ইবনে জারীর ও মুকাতিলের বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, এক বছরের চেয়ে অন্য বছরের বৃষ্টি বেশী হয় না। আল্লাহ্ই রিজিক বণ্টন করে দিয়েছেন। নিম্নাকাশের মেঘপুঞ্জে রেখে দিয়েছেন বৃষ্টির ভাণ্ডার। সেখান থেকে বৃষ্টিপাত ঘটান পৃথিবীতে। মানুষ পাপাচারী হলে তিনি বৃষ্টির গতি ঘুরিয়ে দেন বিজন বন অথবা সমুদ্রের দিকে।

কেউ কেউ বলেছেন, বৃষ্টিপাত হয় কখনো মুষলধারায়, আবার কখনো স্বাভাবিক ছন্দে। 'বৃষ্টি বিতরণ করি' কথাটির মধ্যে রয়েছে এ বিষয়েরই ইঙ্গিত। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ সমুদ্র ও জলাশয়ের দিকে ফিরিয়ে দেয়া বা বিতরণ করা। আবার কেউ বলেছেন, এখান 'সররাফনা' (বিতরণ করি) অর্থ— এসকল কথা আমি আমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাবসমূহে বার বার বিবৃত করি।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে তারা স্মরণ করে'। একথার অর্থ— যাতে তারা আল্লাহ্র এই বিস্ময়কর নিদর্শন দেখে তাঁর অপার দয়া ও ক্ষমতার কথা স্মরণ করে এবং সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করে সদুপদেশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে'। একথার অর্থ— বৃষ্টিপাত ঘটান আল্লাহ্ই। অথচ অধিকাংশ লোক বলে, বৃষ্টি হয়েছে অমুক তারকার প্রভাবে। এভাবে তারা হয়ে যায় আল্লাহ্র অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞচিত্ত। হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ জুহ্নী বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের রাতে বৃষ্টিপাত হলো। ফজরের নামাজ শেষে রসুল স. বসলেন তাঁর সহচরবৃন্দের মুখোমুখি। বললেন, তোমরা কি জানো, তোমাদের প্রভুপালনকর্তা কী বলেছেন? সহচরবৃন্দ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই এ সম্পর্কে উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন, ভোরবেলা আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ কেউ হয় বিশ্বাসী এবং কেউ কেউ হয়ে যায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। একদল বলে, আমাদের প্রতি বর্ষিত হয়েছে আল্লাহ্র দয়ার বৃষ্টি। এরা তারকার প্রভাব অস্বীকারকারী এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। আর একদল বলে, বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে অমুক তারকার প্রভাবে। তারা তারকার উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং আমাকে প্রত্যাখ্যানকারী। বোখারী, মুসলিম।

পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন করে সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম'। নবী-রসুলগণ মানুষকে আল্লাহ্র অসন্তোষ ও শাস্তির প্রতি সতর্ক করে থাকেন। তাই তাঁদেরকেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'সতর্ককারী'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার গুরুদায়িত্বের ভার আমি লাঘব করে দিতে পারতাম।

www.eelm.weebly.com

প্রতিটি জনপদে পাঠাতে পারতাম পৃথক পৃথক রসুল। কিন্তু আমার ইচ্ছা, আমি আপনাকে প্রদান করবো অতুলনীয় মর্যাদা। করবো সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত। তাই তো আপনি হয়েছেন মহামানবতার ও মহানিসর্গের মহানতম সতর্ককারী, মহিমময় রসুল।

এরপরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আনুগত্য কোরো না এবং তুমি কোরআনের সাহায্যে তাদের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও'। একথার অর্থ— অতএব হে আমার প্রিয়তম রসুল! সৃষ্টির প্রতি আপনার অতিরিক্ত মমত্ববশতঃ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পথ প্রদর্শনের চিন্তায় তাদের প্রতি তো আনুগত্য প্রদর্শন করবেনই না, বরং হৃদয়ের বিশ্বাস ও কোরআনের বাণীর মাধ্যমে চালিয়ে যাবেন নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৫৩, ৫৪

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۝ وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ۝

❐ তিনিই দুই দরিয়াকে প্রবাহিত করিয়াছেন, একটির পানি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটির পানি লোনা, খর, উভয়ের মধ্যে তিনি রাখিয়া দিয়াছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।

❐ এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে; অতঃপর তিনি মানব জাতির মধ্যে রক্তগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনিই দুই দরিয়াকে প্রবাহিত করেছেন, একটির পানি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটির পানি লোনা, খর, উভয়ের মধ্যে তিনি রেখেছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান'। এখানে 'মারাজ্বাল বাহরাইনি' বলে বুঝানো হয়েছে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুই সমুদ্রের সম্মিলিত প্রবহমানতাকে। এরকম সম্মিলনের কারণে দুই সমুদ্রের একাকার হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় না। কারণ পাশাপাশি প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও দুই সমুদ্রের স্রোতের আপনাপন বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখাই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়। আর তাঁর চিরঅমুখাপেক্ষী অভিপ্রায়ের ব্যত্যয় কদাচ ঘটে না।

www.eelm.weebly.com

'ফুরাতুন' অর্থ পিপাসা নিবারণকারী, সুপেয়। আর 'উজ্বাজুন' অর্থ পিপাসাবর্ধক, লবনাক্ত, অত্যধিক খর হওয়ার কারণে বিস্বাদ। 'বারযাখান' অর্থ অন্তরায়। 'হিজ্রাম মাহজুরা' অর্থ অনতিক্রম্য ব্যবধান।

বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'অনতিক্রম্য ব্যবধান' এমন, যেনো বাইরে থেকে কেউ প্রবেশ করে সমুদ্রাভ্যন্তরকে চিরে দিয়েছে। এভাবে প্রবহমান পাশাপাশি বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে যুগল সমুদ্র। দুটোর পানি দু'রকম। একটির আস্বাদ অপরটির আস্বাদকে এতটুকুও প্রভাবিত করতে পারে না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন 'সুপেয় পানির দরিয়া' দ্বারা বুঝানো হয়েছে নীল, ফোরাত ইত্যাদি মিঠা পানির নদ-নদীকে। 'আর লোনা পানির দরিয়া' বলে বুঝানো হয়েছে সমুদ্রসমূহকে। আর 'অন্তরায়' ও 'অনতিক্রম্য ব্যবধান' বলে বুঝানো হয়েছে নদী-সমুদ্রের মাঝে অবস্থিত দোয়াব অঞ্চলকে।

পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে, অতঃপর তিনি মানব জাতির মধ্যে রক্তগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে দিয়েছেন'। এখানে 'নসব' অর্থ বংশগত বা রক্তগত সম্বন্ধ, যার উৎসারণ স্থল পুরুষ। কারণ বংশগত সম্পর্ক পরিচিতি লাভ করে প্রধানতঃ পুরুষের সঙ্গে। আর 'সিহরান' অর্থ বৈবাহিক সম্বন্ধ, যার ভিত্তি হচ্ছে নারী। এবিষয়টির ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'জ্বাআলা মিনহুম্ যাওজ্বাইনিজ্ জাকারা ওয়াল উনসা' আয়াতে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'রক্তগত সম্পর্ক' অর্থ নারীপুরুষের বংশগত ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ যেমন পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং 'সিহরান' অর্থ নারী-পুরুষের বৈবাহিক আত্মীয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান'। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টি করেন তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে। যেভাবে খুশী, সেভাবে। কারণ তিনি সর্বশক্তিমান। সৃষ্টি করেন নারী অথবা পুরুষ। দান করেন তাদেরকে অঙ্গ সৌষ্ঠবগত ও স্বভাবগত পৃথকতা। অথচ তাদের উভয়ের সৃষ্টি একই আকৃতির শুক্রকণা থেকে। এভাবে আবার কাউকে কাউকে করেন যমজ।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৫৫, ৫৬, ৫৭

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

www.eelm.weebly.com

❒ উহারা আল্লাহের পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে যাহা উহাদিগের উপকার করিতে পারে না, অপকারও করিতে পারে না, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তো স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী।

❒ আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করিয়াছি।

❒ বল, 'আমি তোমাদিগের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না; তবে, যে ইচ্ছা করে সে তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে যা তাদের উপকার করতে পারে না অপকারও করতে পারে না, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তো স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী। তারা করতে পারেনা উপাসকদের কোন হিত সাধন। আবার অহিত সাধনও করতে পারেনা যারা পূজা করে না তাদের।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'জহীরুন' কথাটির অর্থ লাঞ্ছিত করেছে। আর এক অর্থ বিরোধী হয়েছে। যেমন 'জ্বাআ'লানী জহীরা' অর্থ সে আমাকে লাঞ্ছিত করেছে। 'জহারতুশ্ শাইয়ান' অর্থ আমি ওই বস্তুকে ঘৃণাভরে পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছি। অর্থাৎ দয়া পাওয়ার অযোগ্য করে দিয়েছি।

পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি আপনাকে কারো জিম্মাদার করে প্রেরণ করিনি। প্রেরণ করেছি বিশ্বাসীগণকে বেহেশতের সুসংবাদদানকারী এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'বলো, আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না; তবে যে ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, এই যে আমি তোমাদেরকে সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান করে চলেছি, এর জন্য আমি তোমাদের নিকট পার্থিব কোনো বিনিময় বা পারিশ্রমিক চাই না। সুতরাং তোমরা মনে কোরো না যে, সত্যকে গ্রহণ করলে তোমাদেরকে কোনো অর্থদণ্ড দিতে হবে। অতএব, আমার এ নিঃস্বার্থ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তোমরা যারা চাও, তারা তাদের প্রভুপালনকর্তার পথ গ্রহণ করো। এটাই আমার একান্ত কামনা।

উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধসমূহ পালনার্থে রসুল স. এর আনুগত্যকেই এখানে রেসালাতের বিনিময়রূপে সাব্যস্ত করা হয়েছে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে পার্থিব বিনিময়কে। এতে যেনো কেউ এই সন্দেহে পতিত না হয় যে, রসুলের দাবিদার

www.eelm.weebly.com

এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাম করে পার্থিব ধনসম্পদের অধিকারী হতে চায়। শেষে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, এমতো নিঃস্বার্থ আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করা অনুচিত। আপন ইচ্ছায় সকলের এগিয়ে আসা উচিত সত্য ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। আর এমতো সত্যগ্রহণই হচ্ছে রসুলের রেসালাতের বিনিময়। যেহেতু রসুলের মাধ্যমে মানুষ পথপ্রাপ্ত হয় তাই সত্য পথপ্রাপ্তির সওয়াব লাভ হবে রসুলের। এক হাদিসে একথা খোলাখুলি বলেও দেয়া হয়েছে। যেমন রসুল স. বলেছেন পুণ্যপথ প্রদর্শনকারীও পুণ্য অর্জনকারীর মতো সওয়াব লাভ করবে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায্‌যার হজরত ইবনে মাসউদ থেকে, তিবরানী হজরত সহল ইবনে সা'দ ও হজরত আবু মাসউদ সূত্রে, ইমাম আহমদ, সিহাহ্ সিত্তাহ্ প্রণেতাগণ, কিছু অতিরিক্তসহ জিয়া, হজরত বুরাইদা থেকে এবং ইবনে আবিদ দুন্ইয়া 'কৃদ্বাউল হাওয়ায়িজ' গ্রন্থে হজরত আনাস থেকে। জিয়ার অতিরিক্ত বর্ণনাটুকু এই— আল্লাহ্ বিপদগ্রস্তদের প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। হজরত জারীর থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম অনুসরণের জন্য কোনো উত্তম পদ্ধতি প্রবর্তন করবে, তার জন্য সে লাভ করবে সওয়াব এবং লাভ করবে ওই সকল ব্যক্তির আমলের সমান সওয়াব যারা অনুসরণ করবে ওই পদ্ধতির। আর এতে করে অনুসারীদের সওয়াবও কিছুমাত্র কমবে না।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'ইল্লা মান শাআ' (তবে যে ইচ্ছা করে) বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। এর অর্থ— যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের জন্য ব্যয় করতে ইচ্ছুক সে এরূপ করবে। আর 'আমি নিজের জন্য কিছু চাই না' অর্থ আমিতো নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা করি না। তবে আল্লাহ্‌র সন্তোষ কামনার জন্য আল্লাহ্‌র পথ অবলম্বন ও আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ ব্যয় করতেও আমি বাধা দেই না।

জাকাত ও সদকার বিধান প্রবর্তনের কারণে কেউ যদি এরকম সন্দেহ করে যে, এর মধ্যে রয়েছে রসুল স. এর সম্পদ লাভের অভিলাষ, তাহলে তার এমতো সন্দেহ হবে ভিত্তিহীন। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালা রসুল স. ও তাঁর পরিবার পরিজনের জন্য জাকাত ও সদ্‌কার সম্পদ ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন।

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ অসিদ্ধ। তাই কোরআন, হাদিস ও ফেকাহশাস্ত্র শিক্ষাদান এবং আজান প্রদান, ইমামতি, ধর্মীয় বক্তৃতা ও ধর্মপ্রচার ইত্যাদির জন্য বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না।

www.eelm.weebly.com

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝ (السجدة)

❒ তুমি নির্ভর কর তাঁহার উপর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁহার মৃত্যু নাই এবং তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তাঁহার দাসদিগের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।

❒ তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিবসে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই 'রহমান', তাঁহার সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।

❒ যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'সিজদাবনত হও 'রহমান' -এর প্রতি।' তখন উহারা বলে, 'রহমান' আবার কে?' তুমি কাহাকেও সিজ্‌দা করিতে বলিলেই কি আমরা তাহাকে সিজ্‌দা করিব। ইহাতে উহাদিগের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'হে আমার রসুল! আপনি নির্ভর করুন কেবল তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু যাকে স্পর্শ করতে পারে না। বরং তিনিই সকলের ও সকলকিছুর জীবনদাতা ও মৃত্যুপ্রদাতা। বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্টতা থেকে এবং মানুষের অর্থ সম্পদ থেকে অমুখাপেক্ষী রাখতে পারেন কেবল তিনিই। সুতরাং কেবল আশ্রয় করুন তাঁর মুখাপেক্ষিতাকে। বর্ণনা করুন শুধু তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা। আর পাপিষ্ঠদের সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতা সম্পর্কে ভাববেন না। তিনি তাদের পাপাচরণ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। যথাসময়ে তাদের শাস্তিবিধান তিনি করবেনই।

এরপর বলা হয়েছে, — 'তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন তাঁর প্রশংসাসহ। তিনি যথেষ্ট অবহিত তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে।'

এখানে 'সাব্‌বিহ্‌' অর্থ মহিমা ঘোষণা করুন। অর্থাৎ একথার স্বীকৃতি দিন যে, তিনি যাবতীয় অপূর্ণ এবং দূষণীয় বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র।

www.eelm.weebly.com

'বিহামদিহী' অর্থ — হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি সাধুবাদ দিন তাঁর যাবতীয় পরিপূর্ণ গুণের । আর আকাঙ্খী হোন তাঁর অনুগ্রহ রাশির । কোনো কোনো আলেম 'সাব্‌বিহ্' শব্দের অর্থ করেছেন— নামাজ পড়ুন। আর 'বিহাম্‌দিহী' কথার অর্থ করেছেন. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন তাঁর অনুগ্রহ সম্ভারের। সেক্ষেত্রে মর্মার্থ দাঁড়ায়— তাঁর অনুগ্রহসম্ভারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই নামাজ আদায় করুন।

পরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্তকিছু ছয় দিবসে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন'। একথার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ই যখন আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর স্রষ্টা তখন সকল বিষয়ে নির্ভর করতে হবে কেবল তাঁর উপর। আর সকল কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করার কথা বলে এখানে শিক্ষা দেয়া হয়েছে ধারাক্রম ও ধীরতা-স্থিরতার শিক্ষা। বলা হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা সর্বশক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও একমুহূর্তে ও এক সঙ্গে সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করেননি। করেছেন ধারাবাহিকভাবে, ধীরে ধীরে, ছয় দিনে। সুতরাং মানুষের উচিত তাদের সকল কর্মকাণ্ডকে এভাবে ধারাবাহিকতাভূত এবং ধীরতাসম্ভূত করা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনিই রহমান, তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখো'। কালাবী আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন— হে মানুষ! আল্লাহ্তায়ালার আরশে সমাসীন হওয়ার রহস্য সম্পর্কে এবং সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে জানতে হলে, জ্ঞানীগণের শরণাপন্ন হও।

এখানে 'খবীরুন' বলে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্তায়ালাকে, অথবা হজরত জিব্‌রাইলকে অথবা ওই সকল আলেমকে, যাঁরা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে আলোচ্য বিষয়ের বিবরণ পাঠ করেছিলেন। কারো কারো নিকট এখানকার 'বিহি' (তাঁকে) এর 'হি' সর্বনাম 'রহমান' বা আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— যদি কেউ আল্লাহ্র জন্য 'রহমান' সম্বোধনটিকে অসমীচীন মনে করে, তবে তোমরা এ সম্পর্কে আহলে কিতাবদের আলেমগণের নিকট জিজ্ঞেস করে দেখো। তারা তোমাদের জানাবে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও 'রহমান' নামটি উল্লেখিত হয়েছে 'আল্লাহ্' নামের সমার্থকরূপে। উল্লেখ্য, জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্পর্কে 'সাআলা আনহু' এবং 'সাআলা বিহী' উভয় বাক্যরীতি সুপ্রচল। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'ফাসআল' এর সম্বোধিতরা হচ্ছে সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ এখানে তাদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে— হে মানুষ! তোমরা 'রহমান' সম্পর্কে জানতে হলে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। তাঁরা তোমাদেরকে এব্যাপারে সঠিক দিকদর্শন দিতে পারবে।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'যখন তাদেরকে বলা হয় সেজদাবনত হও 'রহমান' এর প্রতি, তখন তারা বলে, রহমান আবার কে? তুমি কাউকে সেজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সেজদা করবো'? উল্লেখ্য, মুশরিকেরা আল্লাহ্কে রহমান বলে স্বীকার করতো না। বলতো, ইয়ামামার রহমান (মুসায়লামা ইবনে কাজ্জাব) ছাড়া আর কোনো রহমানকে আমরা চিনি না। তাই রসুল স. যখন তাদেরকে বলতেন, তোমরা 'রহমান' এর প্রতি সেজদাবনত হও, তখন তারা বলতো, তুমি কি যাকে তাকে সেজদা করতে বললেই আমরা সেজদা করবো?

শেষে বলা হয়েছে— 'এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়'। একথার অর্থ— এরকম অস্বীকৃতির কারণে সত্যের প্রতি প্রকাশ পায় তাদের অধিকতর বৈমুখ্য ও অবজ্ঞা।

নির্দেশনা ঃ ৬০ সংখ্যক আয়াত যারা আরবীতে পাঠ করেছেন, তারা সেজদা করে নিবেন।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৬১, ৬২, ৬৩

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ۝ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ۝ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝

❐ কত মহান তিনি যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন রাশিচক্র এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।

❐ এবং যাহারা অনুসন্ধিৎসু ও কৃতজ্ঞচিত্ত তাহাদিগের জন্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি এবং দিবসকে, পরস্পরের অনুগামীরূপে।

❐ 'রহমান'-এর দাস তাহারাই যাহারা নম্রভাবে চলাফিরা করে পৃথিবীতে এবং তাহাদিগকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তাহারা জবাব দেয় প্রশান্তভাবে;

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কতো মহান তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র এবং তাতে স্থাপন করেছেন সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র'।

হাসান, কাতাদা ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'বুরুজ' অর্থ রাশিচক্র। বৃহদাকৃতির তারকাপুঞ্জকে বলে বুরুজ। আতিয়া ও আউফি বলেছেন, বুরুজ বলে ওই সকল বড় বড় প্রাসাদকে, যে গুলোতে নিয়োজিত থাকে প্রহরী।

www.eelm.weebly.com

‘সিরাজ্বান’ অর্থ আলোকময় প্রদীপ, অর্থাৎ সূর্য। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে—ওয়া জ্বাআ'লাশ্ শামসা সিরাজ্বা’। ক্বারী কুসাই এবং ক্বারী হামযার ক্বেরাতে উচ্চারিত হয়েছে শব্দটির বহুবচনরূপ ‘সুরুজ্বান’। ‘সুরুজ্বান’ উচ্চারণ করলেও এখানে শব্দটির অর্থ হবে সূর্য। অন্যান্য তারকা ও চন্দ্র এর অর্ন্তভূত হবে না। আর চন্দ্র তো নিজস্ব আলোকে আলোকময় নয়। সূর্যের আলোতেই সে আলোকময়রূপে দৃষ্ট হয়। আর এখানে চন্দ্রের উল্লেখও এসেছে আলাদাভাবে। বলা হয়েছে— ‘ওয়া ক্বমারাম মুনীরা’ (এবং জ্যোতির্ময় চন্দ্র)।

পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— ‘এবং যারা অনুসন্ধিৎসু ও কৃতজ্ঞচিত্ত তাদের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং দিবসকে পরস্পরের অনুগামীরূপে’। এখানে ‘খিলফাতান’ অর্থ পরস্পরের অনুগামী বা স্থলাভিষিক্তরূপে। একারণেই কারো কোনো আমল দিবস ও রাত্রিতে বাদ পড়ে গেলে তা করে নিতে হয় যথাক্রমে রাতে ও দিনে।

বাগবী লিখেছেন, এক লোক হজরত ওমরের দরবারে এসে বললো, আমার রাতের নামাজ ফউত হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, এখন দিনে তা আদায় করে নাও। কেননা আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন— ‘এবং যারা অনুসন্ধিৎসু ও কৃতজ্ঞচিত্ত তাদের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং দিবসকে, পরস্পরের অনুগামীরূপে’।

মুজাহিদ বলেছেন, ‘খিলফাতান’ অর্থ বিপরীত, পরস্পরবিরোধী। যেমন রাত কালো, দিন শাদা।

‘ইয়াজ্জাক্কারা’ অর্থ অনুসন্ধিৎসু। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহসম্ভার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে। অনুসন্ধান করে ফেরে সেগুলোর রহস্য এবং উত্তমরূপে অবগত হয় যে, এসকল কিছুর সৃজয়িতা কতো প্রজ্ঞাময়, কতো দয়াময়। অথবা কথাটির অর্থ— ওই সকল দায়িত্ব সচেতন ব্যক্তি যারা তাদের দিবসের পরিত্যক্ত কর্ম সম্পাদন করে রাতেই এবং রাতের পরিত্যক্ত কর্ম সম্পন্ন করে দিবসের মধ্যেই।

‘আও আরদা শাকুরা’ অর্থ অথবা কৃতজ্ঞচিত্ত। অর্থাৎ যারা আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তির কথাকে স্মরণ করে। আর একারণে প্রকাশ করে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

জ্ঞাতব্য ঃ হাসান বর্ণনা করেন, একবার হজরত ওমর চাশতের নামাজ পড়লেন অতি বিলম্বে। একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো এরকম আমল আগে কখনো করেননি। তিনি বললেন, এ হচ্ছে আমার রাতের বাদ পড়ে যাওয়া আমল। অর্থাৎ রাতের পরিত্যক্ত আমল আদায় করলাম এখন। এরপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৬৩)বলা হয়েছে— 'রহমান এর দাস তারাই যারা নম্রভাবে চলাফিরা করে পৃথিবীতে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা জবাব দেয় প্রশান্ত ভাবে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দাগণের অভিব্যক্তি ও আচারাচরণ হয় বিনম্র, পদবিক্ষেপ হয় বিনয়মণ্ডিত। অজ্ঞ লোকের উগ্র ও বচসাপ্রবণতাকে তাঁরা মোকাবিলা করেন ধৈর্য ও স্থৈর্যের সঙ্গে। বলেন, শান্তি, শান্তি। একবার হজরত ওমর এক যুবককে দর্পভরে পথ চলতে দেখে বললেন, এরকম দম্ভিত পদচারণার প্রয়োজন হয় সমরক্ষেত্রে। শান্তির সময়ে এমতো বীরত্বব্যঞ্জকতার প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

এখানে 'ইবাদুর রহমান' (রহমানের দাস) বলে প্রকাশ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাগণের মর্যাদা। অথবা একথা বুঝানো হয়েছে যে, রহমানের বান্দাগণই আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দা। 'আবিদুন' এর বহুবচন 'ইবাদুন' যেমন 'তাজ্বীর' এর বহুবচন 'তিজ্বার' এখানে আল্লাহ্‌র অন্যান্য নামের বদলে 'রহমান' উল্লেখ করার মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে, তিনি তাঁর প্রকৃত দাসগণকে দান করবেন পরিপূর্ণ রহমত। তাদের প্রতি এটা হচ্ছে তাঁর পরিপূর্ণ মেহেরবানী।

'ইয়ামশুনা আ'লাল আরদ্বি' হাওনান' অর্থ ভূপৃষ্ঠে চলাফিরা করে নম্রভাবে। অর্থাৎ যাদের পদবিক্ষেপে থাকেনা গর্ব বা আত্মপ্রদর্শনেচ্ছা। 'হাওনুন' এর শাব্দিক অর্থ নম্রতা। কামুস প্রণেতা লিখেছেন, স্থিরতা। এক হাদিসে শব্দটি এসেছে এই অর্থেই। যেমন রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীরা হয় ধীর, স্থির চালচলন সম্পন্ন। এমনকি অত্যধিক নম্রতার কারণে তাদেরকে কখনো কখনো মনে হয় নির্বোধ। শিথিল সূত্রসহযোগে বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

'ওয়া ইজা খাতাবাহুমুল্‌ জাহিলুনা ক্বলু সালামা' অর্থ এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে 'সালাম'। মুজাহিদ ও মুকাতিল ইবনে হাব্বান এখানকার 'সালাম' এর অর্থ করেছেন সাদাদ (সোজা-সরল কথা), যদ্দ্বারা নিরাপদ থাকা যায় পাপ থেকে। হাসান বলেছেন, আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দারা অজ্ঞ লোকের অজ্ঞানোচিত আচরণের জবাবে সমান্তরাল আচরণ করেন না, অবলম্বন করেন ধৈর্য। হাসান বলেছেন তাঁরা উচ্চারণ করেন, শান্তি, তোমাদের উপরে শান্তি। কেননা এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে— 'ওয়া ইজা সামিউল্‌লা লাগ্‌ওয়া আ'রাদ্বু আনহু ওয়া ক্বলু লা'না আ'মালুনা ওয়া লাকুম আ'মালুকুম সালামুন আ'লাইকুম'। আবুল আলীয়া বলেছেন, জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আলোচ্য আয়াতের বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে।

www.eelm.weebly.com

আসল ব্যাপার হলো আয়াতটি রহিত নয়, বরং কার্যকরী। কারণ, সংগ্রামকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্র বাণীকে সমুচ্চ করবার জন্য। মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ মেনে নিলে অথবা জিযিয়া প্রদানে স্বীকৃত হলে যুদ্ধের অবকাশ আর থাকে না। রসুল স. বলেছেন, আমাকে আদেশ করা হয়েছে ওই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করতে যতক্ষণ না মানুষ বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্। বোখারী ও মুসলিমে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর থেকে।

অতএব বুঝতে হবে 'যে সকল লোক ইমান গ্রহণ করবে না যুদ্ধ করো তাদের সাথে.... এমন কি তারা যেনো পরাস্ত হয়ে জিযিয়া দিতে শুরু করে' এই আয়াত আলোচ্য আয়াতের রহিতকারী নয়। এখানে তো শিক্ষা দেয়া হয়েছে কেবল অজ্ঞ লোকদেরকে উপেক্ষা করার বিধান। বলা হয়েছে, অজ্ঞ লোকেরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে চাইলেও বিশ্বাসীগণের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে শান্তিসম্ভাষণের মাধ্যমে এড়িয়ে যাওয়া, উপেক্ষা করা।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, একবার এক লোক রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রসুল! আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইলেও আমার কোনো কোনো আত্মীয় আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি । অথচ তারা আমার সঙ্গে করে মন্দ ব্যবহার। আমি এগুলো সহ্য করি নীরবে। রসুল স. বললেন, তুমি যদি এরকমই করে থাকো, তবে তো তুমি তাদের প্রতি নিক্ষেপ করে চলেছো ধূলো। যতক্ষণ তুমি এরকম সদাচরণ বজায় রাখবে, ততক্ষণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমার সঙ্গী হিসেবে থাকবে একজন সাহায্যকারী।

এক বর্ণনায় এসেছে, হাসান বসরী এই আয়াত আবৃত্তি করতেন এবং বলতেন, এরকমই ছিলো সাহাবীগণের দিবাকালীন বিশেষত্ব। আর তাঁদের রাত্রিকালীন বিশেষত্ব উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে এভাবে—

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৬৪, ৬৫, ৬৬

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ○ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ○ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ○

www.eelm.weebly.com

❐ এবং তাহারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদিগের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজ্‌দাবনত হইয়া ও দণ্ডায়মান থাকিয়া;

❐ এবং তাহারা বলে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগ হইতে জাহান্নামের শাস্তি নিবৃত্ত কর; জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ',

❐ আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে উহা কত নিকৃষ্ট।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে'। হাসান বলেছেন, রাত্রিকালীন ইবাদত যেমন অহমিকার আশংকামুক্ত, প্রদর্শনেচ্ছাহীন, তেমনি কষ্টকর। তাই প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে সাহাবীগণের রাত্রিকালীন ইবাদত বন্দেগীর কথা। তাছাড়া দিবসে রয়েছে অন্যান্য ইবাদতের সুযোগ ও অপরাপর দায়িত্ব। যেমন জেহাদ, শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ, পুণ্যবানগণের সাহচর্য ইত্যাদি। কিন্তু রাতের ইবাদত একান্ত অনুরাগরঞ্জিত, গোপনীয়তামণ্ডিত।

'সুজ্জাদান' অর্থ সেজদাবনত হয়ে। শব্দটি 'সাজ্বেদুন' এর বহুবচন। যেমন 'ক্বিয়ামান' বহুবচন 'ক্বায়িমুন' এর। 'ক্বিয়ামান' অর্থ দণ্ডায়মান হয়ে। শব্দটি একটি মূল শব্দ। এটা কর্তৃকারক। রাতের নামাজের ফযীলত সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের নেতৃবর্গ হবে কোরআন বহনকারী (হাফেজে কোরআন) এবং রাতে নামাজ আদায়কারী। বায়হাকী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ হচ্ছে নিশীথের নামাজ। আহমদ।

হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা রাত্রিকালীন দণ্ডায়মানতায় অভ্যস্ত হয়ো। কেননা এমতো অভ্যাস ছিলো পূর্ববর্তী যুগের পুণ্যবানদের। রাতের নামাজ আল্লাহ্‌র নৈকট্যদায়ক, পাপের ক্ষতিপূরক এবং ভবিষ্যতের পাপাশংকার প্রতিরোধক। তিরমিজি।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তিন ধরনের লোকের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ্ প্রীত হন— ১. গভীর নিশীথে জাগ্রত হয়ে নামাজ পাঠকারী ২. কাতারবদ্ধ হয়ে নামাজ পাঠকারী ৩. শত্রুর বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে সংগ্রামকারী। বাগবী।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজের পর দুই রাকাত অথবা ততোধিক নামাজ পাঠ করে, সে যেনো সারারাত্রি থাকে সেজদাবনত ও দণ্ডায়মান।

www.eelm.weebly.com

হজরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করে সে যেনো দণ্ডায়মান হয়ে নামাজ পড়ে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত। মুসলিম।

পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'এবং তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি নিবৃত্ত করো', একথার অর্থ— ওই সকল বিশ্বাসীরা সূচারুরূপে ইবাদত বন্দেগী সম্পাদন ও অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত থাকেন এবং এই মর্মে প্রার্থনা করেন যে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমিতো চির অমুখাপেক্ষী আর আমরা তোমার চিরমুখাপেক্ষী। আমরা তো আমাদের আমলের উপরে নির্ভরশীল নই। তোমার দয়ার উপরেই আমাদের সতত নির্ভরতা। সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো, রক্ষা করো তোমার অসন্তোষ ও শাস্তি থেকে, বিশেষতঃ দোজখের শাস্তি থেকে।

হজরত আলী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, বনী ইসরাইলের জনৈক নবীর নিকটে একবার আল্লাহ্‌পাক এই মর্মে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলেন যে, তোমার উম্মতের পুণ্যবানদেরকে বলে দাও, তারা যেনো তাদের আমলের উপর নির্ভরশীল না হয়। কেননা মহাবিচারের দিবসে আমি যাকে খুশী তাকে শাস্তি দিব। আর তোমার পাপী উম্মতকে বলে দাও, তারা যেনো নিজেদেরকে ধ্বংসে নিপতিত না করে (আল্লাহ্‌র ক্ষমা থেকে নিরাশ না হয়)। কেননা সেদিন আমি যাকে খুশী তাকে ক্ষমা করে দিব। আবু নাঈম।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইন্‌না আ'জাবাহা কানা গরামা' (জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ)। 'গরামা' অর্থ বিনাশপ্রাপ্ত, দেউলিয়া। ঋণগ্রস্তকে গরীম' বলা হয় একারণেই। বাগবী লিখেছেন, 'গরাম' অর্থ কঠোর হস্তে দমনকারী। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন ধ্বংস, বিনাশ। এরকমও বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন অত্যধিক বিপদ মুসিবতে পতিত হয় তখন তাকে বলে গরাম।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী বলেছেন, মানুষের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ। কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তা লংঘন করে। তাই আল্লাহ্‌পাক তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন কঠোর শাস্তি। জাহান্নামই হবে তাদের সার্বক্ষণিক আবাস। হাসান বলেছেন, প্রত্যেক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি একসময় বিপদ থেকে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু জাহান্নামীরা কখনোই পৃথক হতে পারবে না জাহান্নাম থেকে।

এরপরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কতো নিকৃষ্ট'। একথার অর্থ— জাহান্নামের আশ্রয় ও বসবাস সর্বাপেক্ষা অধিক অকল্যাণকর ও নিকৃষ্ট। উল্লেখ্য, এখানে 'মুসতাক্বররা' (আশ্রয়) এবং 'মুকাম' (বসতি) শব্দ দু'টো ধাতুগত অর্থ প্রকাশক। কারণ দু'টো শব্দই মূল শব্দ।

www.eelm.weebly.com

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۝

❐ এবং যখন তাহারা ব্যয় করে তখন তাহারা অমিত ব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তাহারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে।

❐ এবং তাহারা আল্লাহের সহিত কোন ইলাহ্‌কে শরীক করে না, আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যাহারা এইগুলি করে তাহারা শাস্তি ভোগ করিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অমিত ব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না'। এখানে 'লাম ইউস্‌রিফু' অর্থ অমিত ব্যয়, পাপ পথে খরচ, অত্যল্প হলেও। আর 'ইক্‌তার' অর্থ কার্পণ্য, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হওয়া। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা ও ইবনে জুরাইজ। হাসান আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন, তারা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার পথে যেমন ব্যয় করে না, তেমনি কুণ্ঠিত হয় না আল্লাহ্‌র অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে ব্যয় করতে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয়কে বলে অপব্যয়, যা সম্পদবিনষ্টির নামান্তর। আর প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যয় করাকে বলে কার্পণ্য। ইব্রাহিম আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন এভাবে— তারা অন্নহীনকে রাখেনা অভুক্ত এবং বস্ত্রহীন রাখেনা বস্ত্রবিবর্জিতদেরকে। আবার এতো অধিক ব্যয়ও করে না, যাতে করে জনসমক্ষে হয়ে যায় অপচয়ক।

আমি বলি, শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা অপেক্ষা উত্তম। কেননা বৈধ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও শরিয়তের সীমা অতিক্রম অপচয়ের পর্যায়ভূত। এরকম কর্মও নিষিদ্ধ ও পাপ। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন— 'ইন্‌নাল মুবাজ্‌জিরীনা কানু ইখওয়ানাশ্ শায়াত্বীনি ওয়া কানাশ্ শায়ত্বানু লিরব্বিহী কাফুরা (নিশ্চয় অমিতব্যয়ীরা শয়তানের দোসর। আর শয়তান তার পালনকর্তায় অবিশ্বাসী)। সুতরাং শরিয়তের নির্দেশ এই যে, নিরন্ন ও নির্বস্ত্র মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যয় অত্যাবশ্যক, এমতোক্ষেত্রে কৃপণতা নিষিদ্ধ। প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয়ও তেমনি অসিদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য আয়াতের আমল পরিপূর্ণরূপে দৃশ্যমান হতো সাহাবীগণের জীবনযাপনে। তাঁরা ভোজনবিলাসী যেমন ছিলেন না, তেমনি ছিলেন না আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি আকৃষ্ট। তাঁরা অন্নগ্রহণ করতেন ইবাদতের শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং পোশাক পরিচ্ছদ পরতেন আবরণীয় অঙ্গ ঢেকে রাখা এবং শীতাতপ থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, এটাও অপচয় যে, মানুষের যা অভিরুচি তাই ক্রয় করবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে'। এখানে 'ক্বওয়ামান' অর্থ মধ্যবর্তী পন্থা। অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী দুই অতিরিক্ততার মধ্যবর্তী পরিমিতি।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সর্ববৃহৎ পাপ কোনটি? তিনি স. বললেন, কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ ধারণা করা, অথচ আল্লাহ্‌ই তোমার একমাত্র সৃজক। আমি বললাম, তারপর? তিনি স. জবাব দিলেন, এই ভয়ে সন্তান বধ করা যে, সে তোমার অন্নে অংশগ্রহণ করবে। আমি বললাম, তারপর। তিনি স. বললেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার। উল্লেখ্য, রসুল স. এর এমতো বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

এরপরের আয়াতে (৬৮) তাই বলা হয়েছে— 'এবং তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোনো ইলাহ্‌কে শরীক করে না, আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না'। এখানে 'বিল হাক্বি' অর্থ সত্য পন্থায়, যথার্থ কারণসহ। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— এবং তারা আল্লাহ্‌র অংশীদাররূপে অন্য কারো অস্তিত্ব যেমন স্বীকার করে না, তেমনি শরিয়তসম্মত কারণ (কেসাস, সঙ্গেসার ইত্যাদি) ব্যতিরেকে কারো জীবন সংহার করে না এবং বিরত থাকে অবৈধ যৌনচরিতার্থতা থেকে।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে সাহাবীগণের ইবাদত-বন্দেগীর আলোচনা ইতিবাচক বাক্যে। আর আলোচ্য আয়াতে দেয়া হয়েছে তাঁদের পাপাচরণবিমুখতার বিবরণ নেতিবাচক বাক্যে। যারা আনুগত্যের ভিত্তিমূলের রঙে রঞ্জিত, পাপ প্রবণতা থেকে বিমুক্ত; তারাই তো পরিপূর্ণ পুরুষ। শেষ বাক্যে বলে দেয়া হয়েছে— 'যারা এগুলো করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে'। একথার অর্থ— যারা সাহাবীগণের মতো ইবাদতপ্রিয়, পুণ্যকর্মপ্রেমিক এবং শিরিক, অবৈধ হত্যা ও ব্যভিচারিতা থেকে মুক্ত নয়, তারাই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এমতো অবাধ্যতার জন্য তাদের শাস্তি অবধারিত।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'আছামা' অর্থ শাস্তি, বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। এরকম বলেছেন আবু উবায়দাও। আর মুজাহিদ বলেছেন, 'আছামা' হচ্ছে জাহান্নামের একটি আগ্নেয় উপত্যকার নাম। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস্ বলেছেন, জাহান্নামের দু'টি কূপের নাম 'গাই' ও 'আছাম'। সেখানে গিয়ে জমা হবে জাহান্নামীদের গলিত পুঁজ ও রক্ত।

আমি বলি, ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, জাহান্নামের একটি জ্বলন্ত উপত্যকার নাম 'আছাম'। হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, এরকম মন্তব্য করেছে সুফিয়ান সওরীও।

ইবনে জারীর, তিবরানী ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, দশ আউকিয়া ওজনের কোনো পাথর দোজখের তীর থেকে ভিতরে ফেলে দিলে তা সত্তর বছর পর গিয়ে পৌঁছবে গাই ও আছামে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! গাই ও আছাম কী? তিনি স. বললেন, জাহান্নামের তলদেশের দু'টি স্রোতধারা। সেখানে জমা হবে নারকীদের গলিত পুঁজ ও রুধির ধারা। এ দু'টোর উল্লেখ রয়েছে এক আয়াতে এভাবে—'ফাসাওফা ইয়ালক্বাওনা গাইয়ান' এবং অন্য আয়াতে— 'ওয়া মাঁইইয়াফয়াল জালিকা ইয়ালক্বা আছামা'।

সূরা ফুরক্বানঃ আয়াত ৬৯, ৭০, ৭১

يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۝ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا

❒ কিয়ামতের দিন উহাদিগের শাস্তি বর্ধিত করা হইবে এবং সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে হীন অবস্থায়;

❒ তাহারা নহে, যাহারা তওবা করে, বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ্ উহাদিগের পাপ ক্ষয় করিয়া দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❒ যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে সেই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহের অভিমুখী হয়।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে—আখেরাতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দেয়া হবে দ্বিগুণ শাস্তি। সেখানে তারা পতিত হবে চরম অবমাননার মধ্যে। তাদের ওই অবমাননা ও শাস্তি হবে চিরস্থায়ী। আর যারা এখন এই পৃথিবীতে সর্বান্তঃকরণে তওবা করবে, ঈমান আনবে, সৎকর্মপরায়ণ হবে, আল্লাহ্ তাদের

www.eelm.weebly.com

পাপসমূহ মোচন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। কারণ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াপরবশ। বিশুদ্ধ তওবাকারী ও সৎকর্মপরায়ণেরাই হয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র পথের অভিযাত্রী।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কিছুসংখ্যক মুশরিক ছিলো মহাপাপী। হত্যা ও ব্যভিচারে তারা করেছিলো সীমালংঘন। একদিন তারা রসুল স.-এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আপনার আহবান অত্যুত্তম। কিন্তু আমরা যে মহাপাপী। আপনার ধর্মে কি আমাদের পাপমোচনের ব্যবস্থা আছে? তাদের এমতো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় ৬৮ সংখ্যক আয়াতের 'এবং তারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোনো ইলাহকে শরীক করে না' থেকে ৭০ সংখ্যক আয়াতের 'তারা নয়, যারা তওবা করে ও সৎকর্ম করে' পর্যন্ত।

হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, এখানে 'তওবা' অর্থ পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন এবং 'আমানা' অর্থ আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। উল্লেখ্য, ৬৭ সংখ্যক আয়াতটিও অবতীর্ণ হয়েছে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী প্রমুখ বর্ণনা করেন, 'এবং তারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোনো ইলাহ্কে শরীক করে না' যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন মক্কার মুশরিকেরা বলে, আমরা এতদিন ধরে দেব-দেবীদের পূজা অর্চনা করেছি, অন্যায়ভাবে হত্যাকাণ্ডও ঘটিয়েছি অনেক। তদুপরি করেছি অজস্র ব্যভিচার। এমতাবস্থায় আমরা ইসলাম গ্রহণ করলে আমাদের পরিণতি কী হবে? তাদের এমতো জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় ৭০ সংখ্যক আয়াতটি।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমরা রসুল স. এর সময়ে দুই বৎসর যাবত আলোচ্য সুরার ৬৮ ও ৬৯ সংখ্যক আয়াত পাঠ করে যাচ্ছিলাম। তারপর অবতীর্ণ হলো আলোচ্য সুরার ৭০ ও ৭১ সংখ্যক আয়াত এবং সূরা ফাতাহ্ এর ১ম ও ২য় আয়াত। তিনি এতে অত্যন্ত আনন্দিত হন। আমি আগে কখনো তাঁকে এতো আনন্দিত দেখিনি।

একটি সন্দেহঃ ব্যতিক্রম বিশিষ্ট বিষয় উপস্থাপিত হয় ব্যক্তিরিক্তের সাথে। আর এখানে লক্ষ করা যায় ব্যতিক্রম বিশিষ্ট বিষয় ও ব্যক্তিরিক্তের মধ্যে রয়েছে দুই বৎসরের ব্যবধান যা অসঙ্গত। তাহলে একথা কী করে মেনে নেয়া যেতে পারে যে, বর্ণিত ৬৮ ও ৬৯ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দুই বৎসর পর অবতীর্ণ হয়েছে ৭০ সংখ্যক আয়াতটি?

সন্দেহের নিরসনঃ আমরা বলি, প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিলো কেবল ৬৮ ও ৬৯ সংখ্যক আয়াত ব্যতিক্রম ছাড়াই। দুই বছর পর পুনরায় আয়তদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে ৭০ সংখ্যক আয়াতের শেষ পর্যন্ত একত্রে। তাই বলা যেতে পারে, পরে অবতীর্ণ

www.eelm.weebly.com

৬৮, ৬৯ ও ৭০ সংখ্যক আয়াতত্রয়ের সঙ্গে পূর্বে অবতীর্ণ ৬৮ ও ৬৯ সংখ্যক আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে একযোগে। তাই ধরে নেয়া যায় বিষয়গত সুপরিমিতির মাধ্যমে পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয় রহিত।

অতিরিক্ত সন্দেহঃ ফেকাহ্ শাস্ত্রের এই রীতিটি সুবিদিত যে, বিধান রহিত হয়, কিন্তু বিজ্ঞপ্তি রহিত হয় না। আর আলোচ্য ত্রয়ী আয়াত হচ্ছে বিজ্ঞপ্তিমূলক। এগুলোতে কোনো বিধানের উল্লেখ নেই। তাহলে এখানে রহিত হওয়ার প্রসঙ্গটি প্রশ্রয় পায় কীভাবে?

সন্দেহের অপনোদনঃ বিজ্ঞপ্তি রহিত হয় না, একথা ঠিক। কারণ এতে করে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বের বিজ্ঞপ্তিটি ছিলো মিথ্যা। আর আল্লাহ্র বাণীর মধ্যে মিথ্যার কোনো সংস্রবই থাকতে পারে না। কিন্তু যে বিজ্ঞপ্তি শাস্তিমূলক, সে বিজ্ঞপ্তি রহিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে চিরস্বাধীন ও চিরঅমুখাপেক্ষী। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর শাস্তি রহিত করতে পারেন। আর ৬৮ ও ৬৯ সংখ্যক আয়াতে ছিলো শাস্তির বিজ্ঞপ্তি। পরে আয়াতদ্বয়ের সঙ্গে ৭০ সংখ্যক আয়াত যোগ করে শাস্তি ও শাস্তি থেকে অব্যাহতির উপায় বলে দেয়া হয়েছে মাত্র। আর এরকম হওয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে সিদ্ধ। অবশ্য বিভ্রান্ত মুতাজিলাদের অভিমত এর বিপরীত।

এরপর এসেছে 'আল্লাহ্ তাদের পাপ ক্ষয় করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা'। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন—তওবা করার পর আল্লাহ্ তাদের পূর্বের পাপরাশি মার্জনা করে দিবেন, তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন তাদের পরবর্তী সময়ের পুণ্যসমূহ। অথবা—পাপকর্ম করার যে শক্তি তাদের মধ্যে ছিলো, তওবা করার পর আল্লাহ্তায়ালা তাদের সে শক্তিকে পরিণত করে দিবেন পুণ্য অর্জনকারী শক্তিতে। শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান, সাঈদ, ইবনে যোবায়ের, মুজাহিদ, জুহাক ও সুদ্দী। একথার প্রেক্ষিতে বলতে হয়, তওবাকারী লাভ করে শিরিকের বদলে ইমান, পাপের বদলে পুণ্য, যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বাসী হত্যার বদলে অবিশ্বাসী হত্যার সুযোগ এবং ব্যভিচারের বদলে পবিত্র দাম্পত্যজীবন।

কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— আল্লাহ্তায়ালা একান্ত দয়াপরবশ হয়ে আখেরাতে তওবাকারীদের পূর্বের পাপপুঞ্জকে পরিণত করে দিবেন পুণ্যে। এরকম বলেছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, মাকহুল, জননী আয়েশা, হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত সালমান ফারসী। হজরত আবু জরের এক বর্ণনাতেও একথার সমর্থন রয়েছে। যেমন রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে এক লোকের হিসাব গ্রহণকালে তার সামনে আনা হবে তার ক্ষুদ্র

www.eelm.weebly.com

পাপসমূহকে। আর বৃহৎপাপসমূহকে করা হবে গোপন। সে তার ক্ষুদ্র পাপসমূহের কথা স্বীকার করবে আর আশংকা করবে, এই বুঝি বড় পাপগুলো সামনে আনা হচ্ছে। কিন্তু যখন সিদ্ধান্ত দেয়া হবে, এর পাপগুলোকে পুণ্যে পরিণত করে দেয়া হোক, তখন সে বলে উঠবে, আমার তো আরো পাপ রয়েছে, সেগুলোকে তো দেখতে পাচ্ছি না। বর্ণনাকারী বলেন, একথা বলে রসুল স. এমনভাবে হেসে উঠলেন যে, উন্মোচিত হলো তার অধিকাংশ দন্ত। মুসলিম।

হজরত সালমান ফারসী থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, শেষ বিচারের দিনে এক লোককে তাঁর আমলনামা দেয়া হবে। আমলনামা পড়তে শুরু করলেই সে হয়ে পড়বে বিষণ্ন। কিন্তু পড়তে পড়তে শেষের দিকে সে দেখবে অজস্র পুণ্য। সবিস্ময়ে আরো দেখবে আগের লেখা পাপগুলোও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে পুণ্যে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহা বিচারের দিবসে আল্লাহ্ এমন কিছু লোককেও তাঁর ক্ষমার অন্তর্ভূত করবেন, যারা ধারণা করতো তাদের পাপ অসংখ্য। জনৈক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল, ওই সকল লোক কারা? তিনি স. বললেন, যাদের পাপ পরিবর্তিত করা হবে পুণ্যে।

একটি সন্দেহঃ পাপ আল্লাহ্র অপছন্দ, আর পছন্দ পুণ্য। তাহলে পাপকে তিনি পুণ্যে পরিণত করতে পারেন কীভাবে? অপছন্দনীয় কোনো কিছু কি গ্রহণ করার চিন্তা করা যায়?

সন্দেহভঞ্জনঃ এই সন্দেহটি ভঞ্জন করা যেতে পারে দু'ভাবে। যেমন—১, আল্লাহ্তায়ালার নির্ধারণ বা তকদীর অনুসারে আল্লাহ্র কোনো পুণ্যবান বান্দার দ্বারা পাপ কর্ম সংঘটিত হলে তিনি হয়ে যান লজ্জিত, অনুতপ্ত, মনে করেন তাঁর মতো নিকৃষ্ট কেউ নয়। তখন আল্লাহ্র ভয়ে শুরু করেন রোদন এবং পুনঃ পুনঃ ক্ষমাপ্রার্থনা করেন মহান আল্লাহ্ সকাশে। পরিশেষে তাঁর উপরে এমন রহমত বর্ষিত হয় যা কখনোই বর্ষিত হতো না, যদি তিনি পাপ না করতেন। এভাবে দেখা যায়, যে পাপ ছিলো শাস্তির কারণ, বিশুদ্ধ তওবার পর সেই পাপই হয়ে যায় অভাবিত পুণ্য। এক হাদিসে তাই বলা হয়েছে, রসুল স. বলেন, তোমরা পাপ না করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উঠিয়ে নিতেন, তার বদলে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতেন এমন সৃষ্টি যারা পাপ করতো, তারপর ক্ষমাপ্রার্থনা করতো এবং আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

রসুল স. আরো বলেছেন, মা'জ ইবনে মালেকের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো। সে খাঁটি তওবাকারী। তার তওবা একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টন করে দিলেও তা

www.eelm.weebly.com

তাদের পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট হবে। উল্লেখ্য, হজরত মা'জ ছিলেন একজন সাহাবী। তকদীরের নির্ধারণানুসারে তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো ব্যভিচার। সে কারণে অনুতাপে জর্জরিত হয়ে তিনি রসুল স. এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজ মুখে অপরাধ স্বীকার করেন এবং চেয়ে নেন শরিয়তের শাস্তি।

গামেদ গোত্রীয় এক রমনীও ব্যভিচার করার পর অনুতাপে দগ্ধীভূত হয়ে রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে পবিত্র করুন। রসুল স. তাঁর উপরে প্রয়োগ করেছিলেন সঙ্গেসার। হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ তাঁর সম্পর্কে অনুত্তম মন্তব্য করলে তিনি স. বলেছিলেন, খালেদ! চুপ করো। শপথ ওই সত্তার যার অধিকারে আমার জীবন, মেয়েটি এমন তওবা করেছে, তা কোনো মাকস্ওয়ালা করলেও ক্ষমা পেয়ে যাবে (মাকস ওই অবৈধ কর, যা সরকারী লোকেরা ওশরের বাহানা করে আদায় করে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে)। হজরত বুরাইদা থেকে হজরত মা'জ ও গামেদীয় রমণীর ঘটনা দু'টো বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

বর্ণিত ঘটনা দু'টোর মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, পাপের জন্য প্রকৃত অনুশোচনা ও তওবা প্রদর্শনপ্রবণতা পুণ্যকর্ম অপেক্ষা উত্তম।

আল্লাহ্ প্রেমিকেরাও প্রবল প্রেমাতিশয্যবশতঃ কখনো এমন উক্তি করে থাকেন, যা বাহ্যত শরিয়তবিরুদ্ধ। তাঁরা প্রেমসমুদ্রেসতত সন্তরণকারী। তাই তাঁদের মত্ততাসম্ভূত উক্তির পাপকে আল্লাহ্তায়ালা পরিণত করে দেন পুণ্যে। মওলানা রুমীর এক কবিতায় রয়েছে বিষয়টির সুসঙ্গত উদ্ভাস, যা হজরত আবু জর কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসের প্রতিধ্বনি বা প্রতিবিম্ব স্বরূপ, যেখানে বলা হয়েছে, মহাবিচারের দিবসে এক লোকের ছোট পাপগুলো আনা হলে বলা হবে, এ লোকের পাপগুলোকে পুণ্যে পরিণত করে দাও, তখন ওই লোক তার গোপন বড় পাপগুলোর কথা মনে করে বলবে, আমার তো আরো অনেক পাপ রয়েছে। সম্ভবতঃ এ রকম ঘটবে আল্লাহ্র পরিচয়ধন্য ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে। কারণ তাঁরাই প্রেমদহনে দগ্ধীভূত হয়ে উচ্চারণ করেন এমন উক্তি যা প্রকাশ্যতঃ পাপ। শরিয়তের দৃষ্টিতে ওই সকল পাপ হচ্ছে সগীরা গোনাহ, কবীরা গোনাহ নয়। ওই পাপগুলোকেই আল্লাহ্পাক পুণ্যে পরিণত করে দেন। আর কবীরা গোনাহগুলোকে রাখেন গোপনে এবং গোপনে গোপনেই তা মাফ করে দেন। সেদিকে ইঙ্গিত করেই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ার্দ্র বলেই ক্ষমা করে দেন ছোট বড় সকল ধরনের পাপ, তওবার মাধ্যমে, অথবা তওবা ছাড়াই।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, 'এবং তারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোনো ইলাহকে শরীক করে না' আয়াতে (৬৮) ইঙ্গিত করা হয়েছে কল্‌বের ফানার দিকে। কলবের ফানা সংঘটিত হওয়ার পর মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কল্পনাই করে না। নির্ভরও করে না আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপর। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ভয়ও তখন থাকে না তার অন্তরে। আল্লাহ্ই হয় তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এ রকম একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে উপাস্য। এই আরাধ্য উপাস্যের উপস্থিতিতে অন্য সকলের অস্তিত্ব হয়ে যায় বিলীন। অন্য সকলের মতো সে তখন নিজেকেও মনে করে অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের অনুল্লেখ্য কোনো প্রতিবিম্ব বা ছায়া।

একটি সন্দেহঃ সাধারণভাবে সকল বিশ্বাসীই তো একথা স্বীকার করে যে আল্লাহ্র অস্তিত্বই প্রকৃত অস্তিত্ব। অন্য সকল কিছুর অস্তিত্ব প্রতিবিম্বসম্ভূত। তাহলে একথা বুঝতে আবার কলবের ফানা হওয়ার আবশ্যকতা কী?

সন্দেহের নিরসনঃ আমি বলি, সাধারণ বিশ্বাসীগণের বিশ্বাস ভাবগত, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিত্তিক নয়। তাই দেখা যায় আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রতি তাদের লোভ ও ভয়ের উদ্রেক হয়। সেকারণেই বুঝতে হবে, সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী আয়াতের (৬৮) 'আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না' কথাটির মধ্যে রয়েছে নফসের ফানা হওয়ার ইঙ্গিত। 'নাফসুন আম্মারাতুন বিস্‌সু' (পাপের প্রতি প্ররোচনাপ্রদায়ক প্রবৃত্তি) যখন ফানা বা বিলীন হয় তখন লাভ হয় প্রশান্ত প্রবৃত্তি (নফসে মুত্‌মাইন্না)। এই প্রশান্ত প্রবৃত্তির সঙ্গে পাপপ্রবণতার সম্পর্ক আর থাকেই না। সে হয়ে যায় তখন আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের পূর্ণ অনুগত। সুতরাং বুঝতে হবে ৬৩ সংখ্যক আয়াত থেকে এ পর্যন্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে প্রশান্ত প্রবৃত্তিধারী প্রকৃত বিশ্বাসীগণের অর্থাৎ সাহাবীগণের। সাধারণ বিশ্বাসীরা এ প্রসঙ্গের অন্তর্ভূত নয়। অবশ্য পরোক্ষভাবে সকল বিশ্বাসীই এ প্রসঙ্গের অধীন।

এর পরের আয়াতে (৭১) বলা হয়েছে—'যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে-ই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অভিমুখী হয়'। একথার অর্থ— যে লোক লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে শিরিক ও অন্যান্য পাপ পরিহারপূর্বক আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে, জীবনকে করে আল্লাহ্র আনুগত্যমণ্ডিত ও সৎকর্মশোভিত, সে-ই পায় আল্লাহ্র ক্ষমা। তার পূর্বোক্ত পাপকেই আল্লাহ্ পরিবর্তিত করে দেন পুণ্যে। কারণ সে হয় তখন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অভিপ্রায়ানুসারী।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এখানকার 'মাতাবান' (আল্লাহ্র অভিমুখী) কথাটিতে 'তানবীন' সংযুক্ত হয়েছে সম্মানার্থে, তওবাকারীদের প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে। এভাবে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে,

www.eelm.weebly.com

তওবাকারীরা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রিয় এবং তাঁর দয়ায় সম্মানার্হ। তাই তাদের তওবা পাপমোচক এবং পুণ্যপ্রদায়ক। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে আল্লাহ্‌র অভিমুখী হওয়ার অর্থ আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রদত্ত সওয়াবের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পূর্বের আয়াতেও তওবার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝতে হবে পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত তওবা ও আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত তওবা এক প্রকারের নয়। আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে— শিরিক, হত্যা ও ব্যভিচারবিমুক্ত যে ব্যক্তি ইমান আনয়নের পর সৎকর্মমগ্ন হয়, তার তওবা ওই ব্যক্তির তওবা অপেক্ষা উত্তম যার তওবাপূর্ব জীবন ছিলো পাপমগ্ন। এমতাবস্থায় প্রথমোক্ত তওবা হবে প্রতিদান। আর শেষোক্তটি সম্মান।

আমি বলি, পূর্ববর্তী আয়াতের 'আল্লাহ্‌ তাদের পাপ ক্ষয় করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা' কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে ওই সকল তওবাকারীকে যাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রেমোন্মত্ততাপ্রভাবিত, প্রেমাতিশয্যবশতঃ যাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় এমন উক্তি, যা বাহ্যত শরিয়তবিরুদ্ধ। আল্লাহ্‌ তাদের ওই সকল অপরাধকে পরিণত করে দেন পুণ্যে। আর আলোচ্য আয়াতে বুঝানো হয়েছে ওই সকল সচেতন আল্লাহ্‌প্রেমিকদের কথা, সকল অবস্থায় যারা থাকেন সতর্ক ও চৈতন্যময়। এই শেষোক্ত ব্যক্তিরাই সর্বোত্তম। রসুল স. এর সম্মানিত সহচরবৃন্দ এরকমই ছিলেন। তাঁদের আদর্শ ও আধ্যাত্মিক প্রভাবই যুগে যুগে অনুসৃত হয়ে চলেছে নকশবন্দিয়া তরিকায়।

সূরা ফুরক্বানঃ আয়াত ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ
اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ۝ وَالَّذِيْنَ
يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۝ اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ
فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝

❒ যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার-ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হইলে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে উহা পরিহার করিয়া চলে

❒ যাহারা, তাহাদিগের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করাইয়া দিলে অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না,

www.eelm.weebly.com

❒ যাহারা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদিগকে আমাদিগের জন্য নয়নপ্রীতিকর কর এবং আমাদিগকে সাবধানীদিগের জন্য আদর্শস্বরূপ কর,'

❒ তাহাদিগকে প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হইবে জান্নাত, যেহেতু তাহারা ছিল ধৈর্যশীল, তাহাদিগকে সেথায় অভ্যর্থনা করা হইবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে।

❒ সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে উহা কত উৎকৃষ্ট!

প্রথমে বলা হয়েছে—'যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না'। এখানে 'যূর' অর্থ মিথ্যা সাক্ষ্য। বাগবী লিখেছেন, জুহাক এবং অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে 'যূর' অর্থ শিরিক।

আমি বলি, শব্দটির অর্থ 'শিরিক' ধরলে প্রতিষ্ঠিত হয় পুনরাবৃত্তি। কেননা ৬৮ সংখ্যক আয়াতেও শিরিক নিষিদ্ধ হওয়ার কথা এসেছে। আলী ইবনে তালহা বলেন 'শাহাদাতে যূর' দ্বারা এখানে মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা দরকার এবং মুখে চুনকালি দিয়ে বাজারে ঘুরিয়ে আনা দরকার।

ইবনে আবী শায়বা আবু খালেদের সূত্রে হাজ্জাজের বরাত দিয়ে মাকহুল ও ওলীদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর সিরিয়ায় নিযুক্ত সরকারী কর্মকর্তাদের নিকটে এইমর্মে লিখিত রাষ্ট্রীয় আজ্ঞা প্রেরণ করেছিলেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে করতে হবে চল্লিশটি বেত্রাঘাত। তারপর তার মস্তক মুণ্ডন করে মুখে লাগাতে হবে চুনকালি এবং জেলখানায় বন্দী করে রাখতে হবে দীর্ঘ দিন। আবদুর রাজ্জাক তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে মাকহুল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর এক মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছিলেন। তিনি একথাও লিখেছেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আ'লা ও ইয়াহ্ইয়া থেকে আহওয়াস্ ইবনে হাকিম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আহওয়াস্ তাঁর পিতার সূত্রে বলেন, হজরত ওমর মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার শাস্তি নির্ধারণ করেছেন এরকম— তার মুখে চুনকালি মাখানো হবে এবং তাকে ঘুরিয়ে আনতে হবে জনসাধারণের সামনে দিয়ে।

হজরত ওমরের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে দিতে হবে সতর্কতামূলক শাস্তি (চল্লিশ বেত্রাঘাত)। তারপর তাকে হাজির করতে হবে জনসমক্ষে যাতে সকলে অবহিত হয়ে যায় যে, সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা। ইমাম মালেক লিখেছেন, তাকে উপস্থিত করতে হবে মসজিদে ও বাজারে। ইমামগণ

www.eelm.weebly.com

আরো বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্যদান কবীরা গোনাহ। হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার তাঁর সহচরবৃন্দের সমাবেশে বললেন, তোমরা কী জানো, সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অবশ্যই বলুন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র সমকক্ষ নির্ধারণ ও মাতা-পিতার অবাধ্যাচরণ। ওই সময় তিনি স. ছিলেন হেলান দেয়া অবস্থায়। হঠাৎ তিনি সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, আরো শোনো, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, মিথ্যাকথন। তিনি স. একথা উচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন বিরতিহীনভাবে। আমরা মনে মনে কামনা করছিলাম, তিনি স. যদি বিরত হতেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা এক আয়াতে শিরিক ও মিথ্যা সাক্ষ্যদান সম্পর্কে একসাথে মিলিয়ে এরশাদ করেছেন— 'ফাজ্‌তানিবুর রিজ্‌সা মিনাল আওছানি ওয়াজ্‌তানিবু ক্বওলায্‌ যুরি' (তোমরা বিরত থাকো প্রতিমার অপবিত্রতা থেকে, আরো বিরত থাকো মিথ্যা সাক্ষ্য দান থেকে)। অতএব একথা সত্য যে, মিথ্যাসাক্ষ্যদান মহাপাপ। কিন্তু শরিয়ত এর জন্য কোনো শাস্তি নির্ধারণ করেনি। মিথ্যাসাক্ষ্যদাতাকে করা হয়েছে কেবল ভীতি প্রদর্শন। তাই এর জন্য প্রচারই যথেষ্ট। বেত্রাঘাত ও বন্দী করে রাখার প্রয়োজন নেই। এরকম শাস্তির মধ্যে রয়েছে কঠোরতা, যা তার মিথ্যার স্বীকারোক্তি প্রদানের অন্তরায় তাই তার জন্য প্রয়োজন লঘু শাস্তি, যাতে সে তার অপরাধ স্বীকার করার সাহস পায়। নতুবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদীর মিথ্যাচার প্রমাণ করা কঠিন। এরকম অভিমত প্রকাশ করেছেন ইমাম আবু হানিফা। আর হজরত ওমর কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি (বেত্রাঘাত ইত্যাদি) ছিলো রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাভিত্তিক। শরিয়ত রাষ্ট্রনায়ককে স্থান-কাল-পাত্রভেদে এরকম কঠোর আইন প্রণয়নের অধিকার দিয়েছে।

কাজী শোরাইহ্‌ এর অভিমতও ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যের মতো। ইমাম মোহাম্মদ তাঁর কিতাবুল আছারে লিখেছেন, কাজী শোরাইহ যদি কোনো মিথ্যাসাক্ষ্যদাতাকে ধরতে পারতেন, আর লোকটি যদি হতো নগরবাসী তাহলে তিনি তাকে জনসমক্ষে পাঠিয়ে দিতেন,সঙ্গে পাঠাতেন একজন ঘোষক। তাকে বলতেন, তুমি লোকের কাছে গিয়ে আমার সালাম বোলো, আরো বোলো কাজী সাহেব আপনাদেরকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, আপনাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তির মিথ্যাচারের প্রমাণ আমি পেয়েছি। সুতরাং আপনারা তার সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। অপরাধী যদি স্থানীয় না হয়ে আরব গোত্রভূত হতো, তবে তিনি ঘোষক পাঠাতেন মসজিদে। ইবনে আবী শায়বাও কাজী শোরাইহ্‌ এর এমতো সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন। ইবনে জুরাইজের নিকটে 'যূর' অর্থ সকল প্রকার মিথ্যাচার, কেবল শিরিক নয়।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না' অর্থ যারা মিথ্যাচর্চার মজলিশে যোগদান করে না। এই তাফসীরের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, কিস্‌সাকাহিনী ও কবিয়ালদের আসরে অংশ গ্রহণ করা নাজায়েয। মুজাহিদ এরকমই বলেছেন। তাঁর উক্তির অর্থ হচ্ছে— যারা অংশীবাদীদের বিভিন্ন পর্ব ও উৎসবে যোগদান করে না। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ যারা মৃতব্যক্তির জন্য মাতমকারীদের সমাবেশে যোগ দেয় না। কাতাদা অর্থ করেছেন— যারা অনর্থক ও বাতিল কাজকে সমর্থন ও সাহায্য করে না। মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া অর্থ করেছেন— নির্লজ্জ ও নৃত্যগীতের সমাবেশে যোগদান করে না। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, অপসঙ্গীত মানুষের অন্তরে উৎপন্ন করে অপবিত্রতা, যেমন পানি উৎপন্ন করে শস্য।

বাগবী লিখেছেন, 'যূর' এর প্রকৃত অর্থ কোনো কিছুকে আকর্ষণীয়রূপে উপস্থাপন এবং প্রকৃত অবস্থার বিপরীত রূপ প্রদর্শন। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, এখানে 'যূর' অর্থ মিথ্যাকে সত্যের প্রলেপ দেয়া, যেনো মনে হয় এটাই সত্য। আমি বলি, 'যূর' এর শাব্দিক অর্থ ঘুরিয়ে দেয়া বা ফিরিয়ে দেয়া। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে—'তাযাওয়ারু আন্ কাহ্‌ফিহিম'। মিথ্যার জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেহেতু সত্য থেকে ফিরিয়ে দেয় মিথ্যা। একারনে অনর্থক বচনকেও 'যূর' বলে।

কামুস প্রণেতা লিখেছেন, 'যূর' অর্থ শিরিক, মিথ্যা, ইহুদী— খৃষ্টানদের পালাপার্বন, মদ্যপানের আসর, নাচ-গানের আসর, বাতিল উপাস্য। আমি বলি, শুধু জননেতা ও শক্তি ছাড়া সকল অর্থই এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার করে চলে'। 'যূর' অর্থ যেমন পাপাচার, তেমনি 'লাগবি' অর্থও পাপাচরণ। আর শুহুদ অর্থ উপস্থিত হওয়া। হাসান ও কালাবী এরকমই বলেছেন। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে—যারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পাপের সমাবেশে গমন করে না, যদি ঘটনাক্রমে তারা পাপ-সমাবেশের পাশ দিয়ে যায়, তবে মুখ ফিরিয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করে অতি দ্রুত।

মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে—তারা যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মুখনিঃসৃত কষ্টদায়ক বচন শোনেন, তখন ক্ষমা করে দেন ও মুখ ফিরিয়ে নেন। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, মুজাহিদের বক্তব্যও এরকম।

সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য আয়াত রহিত হয়েছে পরবর্তীতে অবতীর্ণ জেহাদ সংক্রান্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে। আমি বলি, এই আয়াতের সঙ্গে জেহাদ সংক্রান্ত আয়াতের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কারণ যুদ্ধ ও হত্যার নির্দেশ জিযিয়া দিতে সম্মত

www.eelm.weebly.com

হলে রহিত হয়ে যায়। কিন্তু গালিগালাজ ও অন্যান্য কষ্ট প্রদানের কারণে তো কখনোই জেহাদের হুকুম দেয়া হয়নি।

পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে—'যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরসদৃশ আচরণ করে না'। একথার অর্থ—সদুপদেশ, কোরআনের আয়াত, অথবা তওহীদের প্রকাশ্য-গোপন দলিলসমূহ যখন তাদের সামনে উচ্চারিত অথবা প্রদর্শিত হয়, তখন তারা উৎকর্ণ করে তাদের শ্রুতিকে এবং দৃষ্টিকে করে সজাগ, অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করে সত্যকে। অন্ধ ও বধির হয়ে থাকে না।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে অবস্থার নিষিদ্ধতাকে। ক্রিয়ার নিষিদ্ধতাকে বুঝানো হয়নি। অর্থাৎ তাদের অবস্থা তখন অন্ধ ও বধিরের মতো হয় না। যেমন বলা হয় 'লা ইয়ালক্বানী যায়দুন রকিবান' (জায়েদ আরূঢ় অবস্থায় আমার সঙ্গে মিলিত হয়নি)।

এর পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে—'যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর করো'। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ক্ষুদ্রতম বহুবচনবোধক শব্দ।

'আ'ইউনিন' (নয়নপ্রীতিকর)কে বৃহত্তম বহুবচনবোধক 'উয়ুন' বলা হয়নি। এর কারণ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য কেবল বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা। আর তাদের সংখ্যা হয় অল্পই। এখানকার 'মিন আযওয়াজিনা এর 'মিন' হচ্ছে প্রারম্ভিকা। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— তারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের পরিবার পরিজনকে পুণ্যবান বানিয়ে দাও, যেনো তাদেরকে দেখে আমাদের নয়ন হয়ে যায় শীতল।

কুরতুবী লিখেছেন, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহ্‌র অনুগত দেখা অপেক্ষা অন্য কোনো কিছুই একজন বিশ্বাসীর দৃষ্টিতে অধিক নয়নপ্রীতিকর নয়।

হাসান বলেছেন, 'কুররাতুন' শব্দটি একটি মূল শব্দ। তাই শব্দটিকে এখানে একবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। 'কুর্‌রাতুন' এর শাব্দিক অর্থ ঠাণ্ডা, শীতল, উষ্ণতার বিপরীত। আরবদেশ গ্রীষ্মকালপ্রভাবিত। তাই আরববাসীরা শীতলতাপ্রেমিক। তাঁরা আরামদায়ক পরিস্থিতিকে বলেন 'চোখের শান্তি'। আর তপ্ত চক্ষু বলেন অশান্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়াকে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, শান্তি ও আনন্দের অশ্রু শীতল। আর অশান্তির অশ্রু তপ্ত। আজহারী বলেছেন, 'কুররাতুল আইনি' অর্থ কাংখিতজনদর্শন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমাদেরকে সাবধানীদের জন্য আদর্শস্বরূপ করো'। একথার অর্থ তারা আরো প্রার্থনা করে, আমাদেরকে দান করো সতর্কতাশোভিত ও পুণ্যপ্লাবিত বিশুদ্ধ জীবন, যাতে করে বিশুদ্ধ জীবনের

www.eelm.weebly.com

অভিলাষী যারা তাদের জন্য আমরা হই আদর্শস্থানীয়। এখানে ব্যবহৃত 'ইমাম' (আদর্শস্থানীয় বা অগ্রণী) শব্দটি একবচনবোধক। একটি দলের ক্ষেত্রে এরকম একবচন বোধকতার নিয়মটি সুপ্রচল। যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছে—'ছুম্মা ইউখরিজুকুম তিফ্লান ফা ইন্নাহুম আদুয়্যুলি ইল্লা রব্বাল আ'লামীন'.....( )।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'ইমাম' শব্দটি 'আম্মা' শব্দের ধাতুমূল। যেমন 'সিয়াম' 'ক্বিয়াম' ইত্যাদি। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, কথাটির অর্থ—আমাদের মধ্যে প্রত্যেককে বানিয়ো বিশুদ্ধাচারীদের নেতা। এরকম শব্দ ব্যবহার ঘটেছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন—'ইন্না রসুলু রব্বিকা'। এখানেও 'রসুল' এর স্থলে বলা হয়েছে 'রসুল'। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'ইমাম' 'আম্মুন' এর বহুবচন। যেমন 'সিয়ামুন' বহুবচন 'সায়েমুন' এর। এরকম অর্থ গ্রহণ করলে আলোচ্য বক্তব্যটি দাঁড়াবে—আমাদেরকে করো সাবধানীদের (মুত্তাকীদের) পথের পথিক এবং তাদের আনুগত্যের সংকল্পকারী।

এর পরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে—'তাদেরকে প্রতিদানস্বরূপ দেয়া হবে জান্নাত'। বোখারী, মুসলিম ও আহমদ হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এবং তিরমিজি হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. একবার বললেন, নিম্নমর্যাদাধারী জন্নাতীরা উচ্চ মর্যাদাধারী জান্নাতীদেরকে দেখবে এভাবে, যেভাবে মেঘলা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম প্রান্ত থেকে পরিদৃষ্ট হয় তারকাপুঞ্জ। উপস্থিত সাহাবীবৃন্দ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! উর্ধ্বস্তরের ওই জান্নাত তো নবী-রসুলগণের জন্য নির্দিষ্ট। অন্য কেউই তো সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি স. বললেন, কেনো পারবে না। আমার জীবনাধিকারী সেই পবিত্র সত্তার শপথ! যারা মনেপ্রাণে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীবাহকগণকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, তারাও পৌঁছতে সক্ষম হবে উর্ধ্বস্তরের বেহেশতে। হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ, হাকেম, বায়হাকী, হজরত আলী থেকে তিরমিজি, বায়হাকী, হজরত আবু মালেক আশয়ারী থেকে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার বললেন, বেহেশেতের কোনো কোনো বালাখানার ভিতর থেকে বাইরের দৃশ্য এবং বাইরে থেকে ভিতরের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হবে। সাহাবীগণ বললেন, কারা হবে ওই সকল বালাখানার অধিকারী? তিনি স. বললেন, বিনম্র ব্যক্তিবর্গ, যারা পবিত্র কথা বলে, নিরন্নকে অন্নদান করে এবং রাতে যখন সকলে নিদ্রামগ্ন থাকে তখন দণ্ডায়মান হয় নামাজে। হজরত আলী থেকে বর্ণিত হাদিসটি এরকম—রসুল স. তখন বললেন, যারা হবে নম্র ও পবিত্রভাষী, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম

www.eelm.weebly.com

প্রদানকারী, ক্ষুধার্তকে অন্নদানকারী এবং গভীর নিশীথে নামাজ পাঠকারী, যখন মানুষ থাকে নিদ্রিত। হজরত আবু মালেক থেকে বর্ণিত হাদিসটি একরম—রসুল স. তখন বললেন, ওই সকল লোক যারা উচ্চারণ করে নম্র ও পবিত্র বচন, রোজা পালন করে নিয়মিতভাবে এবং নামাজ পাঠ করে তখন, যখন মানুষ থাকে নিদ্রাভিভূত।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে আবু নাঈম ও বায়হাকী বর্ণনা করেন, রসুল স. একবার বললেন, আমি কি তোমাদের নিকটে বেহেশতের বালাখানার বিবরণ দিবো না? উপস্থিত সাহাবীবর্গ বললেন, নিশ্চয়। তিনি স. বললেন, সেখানকার কোনো কোনো বালাখানা হবে বিভিন্নপ্রকার মূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মিত। সেগুলো এতো স্বচ্ছ হবে যে, বাইরে থেকে দেখা যাবে ভিতরের ভোগ-বিলাসের উপকরণসমূহ এবং ভিতর থেকে দেখা যাবে বাইরের বিলাসের আয়োজনসম্ভার। সেখানকার নেয়ামতরাজি শ্রুতি ও দৃষ্টির অতীত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ওই সকল বালাখানার মালিক হবে কে? তিনি স. বললেন, যারা সালামের প্রচলন করে, অভুক্তকে পানাহার করায়, সর্বদা রোজা রাখে এবং এমন সময় নামাজ পাঠ করে যখন মানুষ থাকে ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এরকম আমল করার শক্তি রাখে কে? তিনি স. বললেন, আমার উম্মত। যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভ্রাতাকে সালাম দেয়, অথবা তার সালামের জবাব দেয়, সে-ই সালামের প্রচলনকারী, যে ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানাহার করায়, সে-ই অভুক্তকে অন্নদানকারী, যে ব্যক্তি রমজান ছাড়া অন্য মাসগুলোর মধ্যবর্তী সময়ে (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে) রোজা রাখে, সে-ই সর্বদা রোজা পালনকারী এবং সে-ই ইহুদী-খৃষ্টান-অগ্নিউপাসকদের রাতের নিদ্রাকালে জাগ্রত থেকে নামাজ পাঠকারীর মতো, যে এশা ও ফজর নামাজ আদায় করে জামাতের সঙ্গে। উল্লেখ্য, এই হাদিসের সূত্রশৃঙ্খল তেমন শক্তিশালী নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আদী ও বায়হাকী বর্ণনা করেন, রসুল স. সাহাবীগণের এক সমাবেশে একবার বললেন, জান্নাতের কিছুসংখ্যক ভবন হবে অত্যন্ত স্বচ্ছ। ওই ভবনের অধিকারীরা ভিতরে অবস্থান করলেও অনায়াসে দেখতে পাবে বাইরের দৃশ্য এবং বাইরে থাকলেও ভিতরের দৃশ্য তাদের কাছে গোপন থাকবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! কারা হবে ওই সকল ভবনের অধিকর্তা? তিনি স.বললেন, যারা নম্র ও পবিত্রবচনধারী, নিরবচ্ছিন্ন রোজা প্রতিপালনকারী, অন্নহীনকে অন্নদানকারী, শান্তিসম্ভাষণ প্রচলক এবং রাতের এমন সময় নামাজ সম্পাদক, যখন সকলে থাকে সুপ্তিমগ্ন। সাহাবীগণ বললেন, হে

www.eelm.weebly.com

আল্লার বাণীবাহক! পবিত্রবচন অর্থ কী? তিনি স. বললেন, সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লহু আকবর। এই পবিত্রবচন হাশরপ্রান্তরে এর পাঠকের সামনে পিছনে সাহায্যকারীরূপে উপস্থিত থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, নিরবচ্ছিন্ন রোজা প্রতিপালনকারী কারা ? তিনি স. বললেন, যারা প্রতি বছর পূর্ণ রমজান রোজা রাখে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! অন্নহীনকে অন্নদানকারী কারা? তিনি স. বললেন, যারা পানাহার করায় তাদের আপনাপন পরিবার পরিজনকে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, শান্তিসম্ভাষণ প্রচলক তবে কারা? তিনি স. বললেন, যারা তাদের মুসলমান ভ্রাতার সাক্ষাৎ পেলে সালাম বিনিময় করে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, আর মানুষের সুপ্তিমগ্ন অবস্থার নামাজ তাহলে কোনটি? তিনি স. বললেন, এশার নামাজ।

হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকে সুপরিণতসূত্রে হাকেম ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, বেহেশতের বালাখানা হবে লাল ইয়াকুত, সবুজ জবরজদ ও শাদা মোতির দ্বারা নির্মিত। সেগুলো হবে বাতায়নবিমুক্ত ও ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যেহেতু তারা ছিলো ধৈর্যশীল'। একথার অর্থ— তাদেরকে জান্নাত দেয়া হবে একারণে যে, তারা পৃথিবীতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সকল বিরোধিতায় অবলম্বন করেছে ধৈর্য, প্রবৃত্তির শত প্রলোভনেও প্রদর্শন করেছে সংযম এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে নিয়মিত সম্পাদন করেছে ইবাদত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে'। একথার অর্থ— বালাখানার মধ্যে ফেরেশতারা তাদেরকে জানাবে সাদর অভ্যর্থনা, জানাবে অভিবাদন ও শান্তিসম্ভাষণ। অর্থাৎ তারা ওই জান্নাতবাসীদের নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা জানাবে আল্লাহ্ সকাশে। কালাবী বলেছেন, কথাটির অর্থ তারা একে অপরকে করবে অভিবাদন বিনিময় এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি পতিত হবে শান্তির বিরতিহীন বর্ষণ।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বায্যার, আহমদ ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র বান্দাগণের মধ্যে প্রথমে ওই সকল দরিদ্র মুহাজির জান্নাতে প্রবেশ করবে, যাদের দ্বারা সংরক্ষিত হয় সীমান্ত। অথচ তারা পৃথিবী ত্যাগ করে দারিদ্রজর্জরিত হয়ে, নিজেদের অতৃপ্ত কামনা-বাসনাকে বুকে ধারণ করে। আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে নির্দেশ দিবেন, যাও তাদেরকে সালাম জানাও। ফেরেশতারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমরা আকাশবাসীরা আপনার নির্বাচিত ও নৈকট্যভাজন। অথচ আমাদের উপরে

www.eelm.weebly.com

নির্দেশ করা হচ্ছে মাটির মানুষকে সালাম প্রদান করার। আল্লাহ্ বলবেন, ওরা যে ওই সকল লোক, যারা পৃথিবীতে ইবাদত করেছিলো কেবল আমার উদ্দেশ্যে, আমার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক না করে, তাদের দ্বারা রক্ষা করা হয়েছিলো ইসলামের সীমানা। অন্যান্যরা রক্ষা পেয়েছিলো তাদের অসিলায়। অথচ তারা পৃথিবীর জীবন সাঙ্গ করেছিলো তাদের কামনা-বাসনা ও অন্যান্য প্রয়োজন অপরিপূরিত রেখে। ফেরেশতারা তখন তাদের নিকটে গিয়ে বলবে, সালামুন আ'লাইকুম বিমা সবারতুম ফা নি'মা উকবাদ্দার। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'তাহিয়্যাত' ও 'সালাম' অর্থ চিরনিরাপত্তা, যা তারা পাবে তাদের মহাসফলতার পুরস্কাররূপে।

এরপরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কতো উৎকৃষ্ট'। একথার অর্থ— জান্নাতই হবে তাদের চিরকালীন আবাস। ওই আবাস ও আশ্রয়স্থলই সর্বোৎকৃষ্ট।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তখন এক ঘোষক ঘোষণা করবে, তোমরা এবার চিরনিরোগ, আর কখনো তোমরা পীড়িত হবে না, তোমাদের এই জীবন চিরায়ত। সুতরাং তোমরা এখানে থাকবে চিরযুবক। কখনো সাক্ষাৎ পাবে না বার্ধক্যের। মৃত্যুও তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না আর কোনোদিন। তোমাদের সকল দুঃখ কষ্টের এবার হলো চির অবসান।

সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ৭৭

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

❒ বল, 'তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকিলে তাঁহার কিছু আসে যায় না। তোমরা দ্বীনকে অস্বীকার করিয়াছ, ফলে নামিয়া আসিবে অনিবার্য শাস্তি।'

প্রথমে বলা হয়েছে— ' বলো, তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে যায় না'। এখানকার 'ইয়া'বাউ' শব্দটি এসেছে 'আ'বাআতুল জাইশ' থেকে। এর অর্থ আমি সৈন্যদেরকে সাজিয়ে দিয়েছি, প্রস্তুত করেছি। নেহিয়া গ্রন্থেও এরকম বলা হয়েছে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা না করো, তবে কীভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে? কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'দুয়াউকুম' অর্থ ইবাদত অথবা ঈমান। কোনো কোনো আলেম

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, এই আয়াত দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ যদি তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি পথ প্রদর্শন না করতেন, তবে কীভাবে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে? তোমরা ইমান গ্রহণ করেছো বলেই তো এখন তিনি তোমাদের জান্নাতগমন সুগম করেছেন। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, এখানকার 'ইয়া'বাউ' শব্দটি এসেছে 'আবা' থেকে। 'আবা' অর্থ ভার বা ওজন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যদি তোমাদের পক্ষ থেকে আনুগত্য ও ইবাদত না থাকে তবে আল্লাহ্র কাছে তোমাদের কী ওজন বা গুরুত্ব থাকবে। আল্লাহ্ তো তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। মানুষের গুরুত্ব ও মর্যাদা তো কেবল আনুগত্য ও আল্লাহ্পরিচিতির মাধ্যমে হয়। নতুবা তোমরা তো চতুষ্পদ জন্তুতুল্য। বরং তার চেয়েও অধম। অথবা বক্তব্যটি হবে এরকম— যদি তিনি তাঁর রসুলের মাধ্যমে তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান না জানাতেন এবং তোমরা এই আহ্বান গ্রহণ না করতে, তবে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তোমাদের তো কোনো মূল্যই থাকতো না।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'মা ইয়াবাউ বিকুম' অর্থ তোমাদেরকে সৃষ্টির প্রয়োজনই বা কী ছিলো, যদি না এতে তোমাদের আনুগত্য ও ইবাদতের উদ্দেশ্য না থাকতো? অর্থাৎ তিনি তো তোমাদেরকে তাঁর ইবাদত করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। অন্য এক আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলেই দেয়া হয়েছে যে— ' মা খলাক্বতুল জ্বিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদূন' (আমি জ্বিন ও মানুষকে ইবাদতের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি)। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদের উক্তি এরকমই।

কেউ কেউ আবার 'মা ইয়া'বাউ বিকুম' এর অর্থ করেছেন মা ইয়ুবালীবিকুম অর্থাৎ আল্লাহ্র কী প্রয়োজন রয়েছে তোমাদেরকে ক্ষমা করার, যদি তোমরা তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে ডাকো। আর তোমাদের শাস্তি দিয়েই বা তিনি কী করবেন, যদি তোমরা শিরিক না করো? এমতো ব্যাখ্যার পরিপোষকরূপে রয়েছে অন্য একটি আয়াত— 'মা ইয়াসআলুল্লহ বি আজাবিকুম ইন শাকারতুম ওয়া আমানতুম'। কেউ কেউ আবার আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ তোমাদের উপরে আপতিত শাস্তির কী পরোয়া করবেন, যদি তোমরা বিপদমুক্তির জন্য তাঁকে না ডাকো? এমতো ব্যাখ্যার সমর্থনে রয়েছে এই আয়াত— 'ফাইজা রকিবু ফিল ফুলকি দাআউল্লাহা মুখলিসীনা লাহুদ্দীন'। কোনো কোনো আলেম আবার বক্তব্যটির অর্থ করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য সৃষ্টি করেননি, তাঁর কাছে তোমাদের কোনো মূল্যও নেই, তিনি তোমাদেরকে কেবল এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যে, তোমরা তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করবে, এতে করে লাভবান হবে তো তোমরাই। ক্ষমাপ্রার্থনা করলে

www.eelm.weebly.com

পাবে ক্ষমা, পাপের শাস্তি থেকে পাবে পরিত্রাণ। এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, এখানকার 'মা ইয়াবাউ' এর 'মা' নেতিবাচক অর্থ প্রকাশক।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা দ্বীনকে অস্বীকার করেছো, ফলে নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তাঁর রসুলের মাধ্যমে তোমাদেরকে দিয়েছেন তাঁর এককত্বে বিশ্বাস এবং তাঁর দাসত্বের দাওয়াত। কিন্তু তোমরা তাঁর রসুলকে প্রত্যাখ্যান করেছো, তাহলে জান্নাতে প্রবেশের অবলম্বন তোমাদের আর রইলো কোথায়? অথবা অর্থ দাঁড়াবে— তোমরা যেহেতু তাঁর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছো, সেহেতু তাঁর দরবারে তোমাদের আর মূল্যই বা কী? অথবা— প্রত্যাখ্যানের পরে তোমাদেরকে শাস্তি দিতে তিনি পরোয়াই বা করবেন কেনো? অতএব তোমাদের পরিণতি এই যে, তোমরা রইবে প্রত্যাখ্যানপ্রবণতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। তওবার তওফিক তোমরা পাবেই না। পাবে কেবল তোমাদের দুষ্কর্মের প্রতিফল, অবধারিত শাস্তি। অথবা কথাটির অর্থ হবে— মিথ্যাচারিতার শাস্তি তোমাদের সঙ্গে থাকবে অবিচ্ছিন্নরূপে। অথবা— মিথ্যাচারের প্রতিক্রিয়া তোমাদের সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। একারণেই অধোমুখী অবস্থায় তোমরা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে।

হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'লিযামান' শব্দটির অর্থ করেছেন মৃত্যু। আবু উবায়দা অর্থ করেছেন ধ্বংস। ইবনে যায়েদ অর্থ করেছেন যুদ্ধ। আর ইবনে জারীর বলেছেন, কথাটির অর্থ— চিরস্থায়ী শাস্তি, যা ক্রমাগত ধাবিত হবে একজন থেকে আরেক জনের দিকে।

বাগবী লিখেছেন, 'লিযামান' দ্বারা এখানে কী বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত উবাই ইবনে কা'ব এবং মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে বদর যুদ্ধকে। ওই যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো অংশীবাদীদের সত্তর জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আর নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিপতিত হয়েছিলো চিরস্থায়ী আযাবে।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন ঘটিতব্য পাঁচটি বিষয় ইতোমধ্যে ঘটেই গিয়েছে। সেগুলো হচ্ছে— ১. আকাশের ধুম্র (যা দৃশ্যমান হয়েছে আকাশে) ২. চন্দ্র (যা হয়েছে দ্বিখণ্ডিত) ৩. রুম বিজয়ী হয়েছে পারস্যবাসীদের উপর। ৪. 'বাত্‌শা (বদর যুদ্ধের বন্দীত্ব) ও ৫. 'লিযাম' (বদর যুদ্ধে অবিশ্বাসীদের নিহত হওয়া)। কেউ কেউ বলেছেন, 'লিযামান' দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে পরকালের শাস্তিকে। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্র অপার দয়া ও সমর্থনে সুরা ফুরক্বানের তাফসীর শেষ হলো আজ ৬ই সফর ১২৫০ হিজরী সনে।

www.eelm.weebly.com

সূরা শুআরা

সূরা শুআরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কেবল শেষের চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এই সুরার আয়াতের সংখ্যা ২২৭।

হাকেম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন রসুল স. বলেছেন, সুরা ত্ব হা এবং ত্ব-সীন-মীম (সুরা শুআরা) আর 'হামীম' যুক্ত সুরা সমূহ আমাকে দেয়া হয়েছে রসুল মুসার কিতাবের ফলক থেকে।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
طٰسٓمٓ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا
يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ
لَهَا خٰضِعِيْنَ ۝

❒ ত্বা, সীন, মীম ।

❒ এইগুলি কিতাবের আয়াত।

❒ উহারা বিশ্বাস করে না বলিয়া তুমি হয়তো মনোকষ্টে আত্মঘাতী হইয়া পড়িবে।

❒ আমি ইচ্ছা করিলে আকাশ হইতে উহাদিগের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করিতে পারি, ফলে, উহারা নত হইয়া পড়িবে উহার প্রতি।

প্রথমে বলা হয়েছে— ত্ব-সীন-মীম। ইকরামা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ত্ব-সীন-মীম' এর তাফসীর করতে আলেমগণ অক্ষম। আলী ইবনে তালহা এবং আলাভীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ত্ব-সীন-মীম' হচ্ছে শপথ এবং আল্লাহ্‌র নাম সমূহের মধ্যে একটি নাম। অর্থাৎ আল্লাহ্ এখানে তাঁর এই নামের শপথ করেছেন। কাতাদা বলেছেন, 'ত্ব-সীন-মীম' কোরআনের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। মুজাহিদ বলেছেন, একজন রমণীর নাম। মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে এখানে আল্লাহ্ কসম করেছেন তাঁর অতুলনীয় শক্তিমত্তার, 'সীনা'র, অর্থাৎ নূরের এবং মহামর্যাদার। তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, 'ত্ব' এর মাধ্যমে এখানে

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্তায়ালা ইঙ্গিত করেছেন তাঁর শক্তিমত্তার দিকে, 'সীন' দ্বারা নূরের দিকে এবং 'মীম' দ্বারা মহামর্যাদার দিকে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, 'ত্ব-সীন-মীম' বিভিন্ন সুরায় উল্লেখিত হরফে মুকাত্তায়াতের মতো। অর্থাৎ এখানকার 'ত্ব-সীন-মীম' ও বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি, যা চিররহস্যময়। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই এর গোপন তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগত।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আয়াতুল কিতাবিম মুবীন' (এইগুলি কিতাবের আয়াত)। একথার অর্থ— এই কিতাবের আয়াতগুলি স্পষ্ট অথবা স্পষ্টকারী। অর্থাৎ এই কিতাবের আয়াতসমূহ মোজেজারূপে সুপ্রকাশ্য অথবা আল্লাহ্র বিধানাবলী ও হেদায়েতের পথ উন্মুক্তকারী।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তারা বিশ্বাস করে না বলে তুমি হয়তো মনোকষ্টে আত্মঘাতী হয়ে পড়বে'। 'লায়া'ল্লাকা বাখিউন্ নাফসাকা' অর্থ মনোকষ্টে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। যেমন 'বাখাআ'নাফসাহু' অর্থ, সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে তার জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। 'বাখাউ' অর্থ পশ্চাতের একটি শিরা যা স্কন্ধ পর্যন্ত পৌঁছে। জামাখশারী বলেছেন 'বাখা' অর্থ হারাম মগজ ব্যতীত অন্যকিছু। এর প্রকৃত অর্থ পশু জবেহ করার সময় তার গর্দানের একটি শিরায় ছুরি চালিয়ে দেয়া। তারপর পর্যায়ক্রমে শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে মুবালাগার (আধিক্যপ্রকাশক) ক্ষেত্রে।

'আল্লা ইয়াকুনু মু'মিনীন' অর্থ তারা বিশ্বাসী হয় না বলে। উল্লেখ্য, রসুল স.কে যখন মক্কার মুশরিকেরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। রসুল স. এতে করে বড়ই ব্যথিত হন। কারণ তিনি সর্বান্তঃকরণে চাইতেন মক্কাবাসীরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করুক। এক পর্যায়ে তিনি স. একথাও ভাবতে শুরু করেন যে, মক্কাবাসীদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের কারণে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয় কিনা। এমতাবস্থায় তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। এখানকার 'লায়া'ল্লা' শব্দটি আশাব্যঞ্জক রহমত বা দয়া অর্থপ্রকাশক । অর্থাৎ এখানে বলে দেয়া হয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি আপনার আত্মার উপর দয়াপরবশ হোন। দুরাচারেরা ইমান গ্রহণ করলো না বলে আপনি আপনার বিশুদ্ধতম জীবনকে বিনাশ করবেন কেনো? আমিই তো তাদের ইমান গ্রহণ করাকে পছন্দ করিনি।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতে পারি, ফলে, তারা নত হয়ে পড়বে তার প্রতি'। একথার অর্থ— আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে অবতীর্ণ করতাম এমন নিদর্শন, যা অবলোকন করে তারা ইমান গ্রহণ করতে বাধ্য হতো। অথবা ইচ্ছা

www.eelm.weebly.com

করলে তাদের উপর অবতীর্ণ করতাম বিপদ-মুসিবত, ফলে ইমান গ্রহণ করা ব্যতিরেকে তাদের আর কোনো উপায়ই থাকতো না।

কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এমন নিদর্শন প্রকাশ করতে সক্ষম, যা দেখে কোনো লোকের পক্ষেই ইমানদার হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকতো না। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা কারোরই নেই। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে আকাশ থেকে এমন নিদর্শন অবতীর্ণ করতে পারেন, যা দেখে সকলেই বাধ্য হয়ে ইমানদার হয়ে যেতো। অবাধ্য বলে আর কেউই পৃথিবীতে থাকতো না।

একটি সন্দেহঃ 'উনুক্বুন' শব্দের বহুবচন 'আ'নাক্বুন'। 'উনুক্বুন' স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ। তাই এখানে 'আনাক্ব' এর পরে 'খদ্বিয়াতান' বসানোই সঙ্গত ছিলো। কিন্তু তা না করে এখানে বহুবচনবোধক ও পুংলিঙ্গবাচক 'খদ্বিয়ী'ন' ব্যবহার করা হলো কেনো?

সন্দেহের নিরসন ঃ ১. পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে ছন্দীয় সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য এরকম শব্দ ব্যবহার ঘটেছে। ২. কথাটির প্রকৃতরূপ ছিলো 'ফাজল্‌লু লাহা খদ্বিয়ীন'। এটাই ছিলো বিশুদ্ধ। তবে এখানে নত হওয়ার অঙ্গকে চিহ্নিত করার জন্য অতিরিক্তরূপে ব্যবহার করা হয়েছে 'আনাক্ব'। ৩. এখানে উহ্য রয়েছে মুজাফ বা সম্বন্ধপদ। কথাটি প্রকৃতপক্ষে ছিলো 'আসহাবুল আনাক্ব' (স্কন্ধধারী) কিন্তু সম্বোধিত বিষয়কে এখানে করা হয়েছে সম্বন্ধ পদের স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ ঘাড় বা স্কন্ধ নত হলে তো স্কন্ধধারীও অবনত হয়ে যাবে। ৪. আখফাশ বলেছেন, এখানকার 'খদিয়ীন' শব্দটি সম্পর্কিত হয়েছে 'আ'নাক্বুহুম' এর পুংলিঙ্গবাচক ও বহুবচনবোধক সর্বনাম 'হুম' (তারা) এর সঙ্গে। শব্দটি সরাসরি 'আনাক্ব' এর সঙ্গে জড়িত নয়। ৫. বিনত হওয়া জ্ঞানসম্পন্নদের বৈশিষ্ট্য। তাই এখানে 'আনাক্ব'কে জ্ঞানসম্পন্নদের স্থলাভিষিক্ত করে 'খদ্বিয়ীন'কে দেয়া হয়েছে পুংলিঙ্গবাচক বহুবচনের রূপ। ৬. আরববাসীরা স্ত্রীলিঙ্গকে পুংলিঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত করলে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দকে ধরে নেয় পুংলিঙ্গবাচকরূপে। আবার পুংলিঙ্গকে স্ত্রীলিঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত করলে পুংলিঙ্গবাচক শব্দকে ধরে নেয় স্ত্রীলিঙ্গবাচকরূপে। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে প্রথমোক্ত নিয়মটি। ৭. 'উনুক্ব' দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে সম্পূর্ণ শরীর অবনত হওয়াকে। কেবল স্কন্ধ অবনত হওয়াকে নয়। যেমন 'জালিকা বিমা ক্বাদ্দামাত ইয়াদাকা'— এই বাক্যে 'ইয়াদা' (হাত) অর্থ হস্তধারী। আবার 'আলযাম্‌নাহু ত্বয়ীরুহু ফী উনুক্বিহী'— এখানেও আ'নাক্ব দ্বারা বুঝানো হয়েছে ব্যক্তিকে। ৮. মুজাহিদ বলেছেন, 'আনাক্ব' এর প্রকৃত অর্থ এখানে উদ্দেশ্য

www.eelm.weebly.com

নয়। বরং শব্দটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে বড় বড় নেতাদেরকে। অর্থাৎ বলা হয়েছে— 'আকাশ থেকে নিদর্শন নেমে এলে তাদের বড় বড় নেতারা সে নিদর্শনের প্রতি নত হয়ে পড়তো'। ৯. আ'নাক্ব দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে দল সমূহকে। যেমন আরববাসীরা বলেন 'জ্বাআ'ল ক্বওমু উনুক্বন উনুক্বন' (মানুষ দলে দলে বিভক্ত হয়ে এসেছে)।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۝ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

❑ যখনই উহাদিগের নিকট দয়াময়ের কোন নূতন উপদেশ আসে তখনই উহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

❑ উহারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুতরাং উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহারা যথার্থ শীঘ্রই জানিতে পারিবে।

❑ উহারা কি পৃথিবীর প্রতি দৃকপাত করে না? আমি উহাতে কত উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ-উদগত করিয়াছি'

❑ নিশ্চয় উহাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

❑ তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যখনই তাদের নিকট দয়াময়ের কোনো নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়'। এখানে 'জিকরিন' অর্থ উপদেশ। অর্থাৎ কোরআনের কোনো অংশ, যেখানে প্রধান হয়ে ওঠে আল্লাহ্‌র স্মরণ। এখানে 'মিন জিকরিন' এর 'মিন' অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত এবং 'মিনার রহমান' (দয়াময়ের) এর 'মিন' হচ্ছে প্রারম্ভিক মিন।

'মুহদাছিন' অর্থ নতুন। অর্থাৎ নতুনরূপে অবতারিত, চিরন্তন হলেও। উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌র বাণী চিরন্তন এবং এর মৌলিক শিক্ষা একই। যেমন— আল্লাহ্‌র সত্তা-গুণবত্তা-কার্যের অদ্বিতীয়ত্ব, প্রত্যাদেশ, নবুয়ত, ফেরেশতা, জান্নাত-জাহান্নাম, মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, হাশর প্রান্তরের মহাসমাবেশ পুণ্য-পাপের পার্থক্যায়ন ইত্যাদি বিবরণ ভিন্নভাষায় হলেও সকল আসমানী কিতাবে উপস্থাপিত হয়েছে

www.eelm.weebly.com

একইরূপে। এসকল বিবরণের উপর কাল ক্রিয়াশীল নয়। কিন্তু কলোত্তর কালামের রয়েছে কালজ প্রকাশ। তাই পৃথিবীতে তার পূর্বাপরতার বিষয়টিও প্রণিধাননীয়। একারণেই পূর্ববর্তী আকাশী পুস্তিকা ও মহাগ্রন্থের সঙ্গে কালগত ব্যবধান রয়েছে কোরআনের। সেদিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে 'যখনই তাদের নিকট দয়াময়ের কোনো নতুন উপদেশ আসে'।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'তারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে'। একথার অর্থ— অংশীবাদীরা আল্লাহ্র বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। প্রত্যাখ্যান করেছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সঙ্গে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তার যাথার্থ শীঘ্রই জানতে পারবে'। একথার অর্থ— যে সদুপদেশ তারা এখন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিচ্ছে, তা সত্য না মিথ্যা তার প্রত্যক্ষরূপ তারা দর্শন করতে পারবে অনতিবিলম্বে, বদর যুদ্ধের দিবসে, মৃত্যুকালে অথবা কিয়ামতের সময়।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'তারা কি পৃথিবীর প্রতি দৃকপাত করে না? আমি তাতে কতো উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদ্গত করেছি'। এখানকার প্রথমোক্ত প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় বাক্যে প্রকাশ করা আল্লাহ্র মহাসৃজনের একটি অনবদ্য নিদর্শন। এভাবে আয়াতদ্বয়ের সম্মিলিত অর্থ দাঁড়িয়েছে— অংশীবাদীরা আমার রসুলের নিকট আল্লাহ্র অতুলনীয় এককত্ব, মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ইত্যাদির নিদর্শন দেখতে চায়, কিন্তু শতসহস্র নির্দশন তো এই পৃথিবীতেই সতত পরিদৃশ্যমান। যেমন আমিই তো তাদের চোখের সামনে সৃষ্টি করে চলেছি বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের শতসহস্র উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ। ফুল-ফল-বীজ-অঙ্কুরোদগম-কিশলয় উন্মোচন, বিস্তার-বৃদ্ধি এসকল কিছু কি তাঁর মহাসৃজনের বিস্ময়কর নিদর্শন নয়?

এখানে 'কারীমিন' অর্থ উৎকৃষ্ট। উদ্ভিদরাজি থেকে উদগত হয় মানুষ ও পশুর বিভিন্ন রকমের খাদ্য, প্রস্তুত হয় পীড়ার প্রতিষেধক, কখনো এককভাবে আবার কখনো যুথবদ্ধভাবে। এগুলো আল্লাহ্র অপার প্রজ্ঞা ও সৃজনশীলতার প্রমাণ। আবার বৃক্ষের মৃত্যু, জন্ম ইত্যাদির মধ্যেও তো রয়েছে মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের নিদর্শন।

উল্লেখ্য, এখানে 'কাম' শব্দটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে সকল উৎকৃষ্ট বৃক্ষকে এবং 'কুললি' দ্বারা বুঝানো হয়েছে বৃক্ষরাজির বিভিন্ন প্রকারকে।

এর পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় এতে আছে নিদর্শন'। একথার অর্থ— বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ অথবা একটি বৃক্ষের জন্মরহস্য ও উন্মোচনের কলাকৌশলের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র সৃজনৈপুণ্যের বহুবিধ নিদর্শন, যা সহজে প্রমাণ করে আল্লাহ্র এককত্ব ও প্রজ্ঞাময়তাকে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার আদি-অন্তহীন জ্ঞানে ও সিদ্ধান্তে একথা পূর্বস্থিরীকৃত যে, অধিকাংশ লোক ইমান আনবে না। তাই আল্লাহ্‌র অলৌকিকত্বের দ্বারা সতত পরিবেষ্টিত হয়েও তারা থেকে যায় বোধ-বুদ্ধিহীন, অন্তর্দৃষ্টিহীন ও পথহারা। রয়ে যায় বিশ্বাসবিহীন।

শেষোক্ত আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, আপনার প্রভুপালনকর্তা মহাশক্তিধর। যে কোনো মুহূর্তে তিনি আপনার বিরুদ্ধবাদীদেরকে শাস্তি দিতে সক্ষম। কিন্তু তিনি যে দয়াময়ও। তাই তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে দিয়েছেন সাময়িক অবকাশ। অথবা আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে— আল্লাহ্‌তায়ালা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম, কারণ তিনি মহাপরাক্রমশালী এবং বিশ্বাসীগণের প্রতি তিনি দয়া বর্ষণ করেন অবিশ্রান্তভাবে, কারণ তিনি মহাদয়াপরবশ।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ
اَلَا يَتَّقُوْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ۝ وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ
وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ۝ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ
يَّقْتُلُوْنِ ۝ قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ۝ فَاْتِيَا
فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝

❐ স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের নিকট যাও,

❐ ফিরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট; উহারা কি ভয় করে না?'

❐ তখন সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে,

❐ 'এবং আমার হৃদয় হতবল হইয়া পড়িবে, আমার জিহ্বা তো জড়তাগ্রস্ত। সুতরাং হারুনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও।

❐ 'আমার বিরুদ্ধে তো উহাদিগের এক অভিযোগ আছে; আমি আশংকা করি উহারা আমাকে হত্যা করিবে।'

www.eelm.weebly.com

❒ আল্লাহ্ বলিলেন, 'না কিছুতেই পারিবে না, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তোমাদিগের সঙ্গে থাকিয়া শুনিব।'

❒ অতএব তোমরা ফিরাউনের নিকট যাও এবং বল, 'আমরা তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের রসূল,

❒ 'সুতরাং আমাদিগের সহিত যাইতে দাও বনি-ইসরাঈলকে।'

কুরায়েশ নেতৃবর্গের বারংবার সত্যপ্রত্যাখ্যান ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কারণে রসুলে পাক স. মনোক্ষুণ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে এখান থেকে শুরু করা হয়েছে হজরত মুসা এবং হজরত হারুনের কাহিনী। সত্যের প্রতি আহ্বানের পথ যে কুসমাস্তীর্ণ নয়, পূর্ববর্তী আহ্বানকারীগণ যে বিভিন্ন প্রকার প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন সে বিষয়ের প্রতি সর্বশেষ রসুল স. এর দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক তাঁকে উজ্জীবিত করাই আলোচ্য কাহিনী অবতারণার উদ্দেশ্য।

ইতিবৃত্তটি শুরু হয়েছে এভাবে— 'স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক মুসাকে ডেকে বললেন, তুমি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের নিকট যাও'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রভুপালনকর্তা প্রত্যাদেশ প্রদানের নিমিত্তে নবী মুসাকে ডেকে নিলেন তুর পাহাড়ে। সেখানে একটি দ্যুতিদগ্ধ বৃক্ষের মাধ্যমে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করলেন যে, তুমি আমার বার্তাবাহক। মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানানোর দায়িত্ব এখন থেকে অর্পিত হলো তোমার উপর। সুতরাং প্রথমে তুমি গমন করো ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে। তারা লংঘন করেছে সত্যের সীমানা। আশ্রয় করেছে অপবিত্র অংশীবাদিতাকে।

পরের আয়াতে (১১)বলা হয়েছে— 'ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট, তারা কি ভয় করে না'?

ফেরাউনের নির্দেশে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বনী ইসরাইল জনতাকে দাস-দাসীতে পরিণত করেছিলো। হত্যা করে যাচ্ছিলো তাদের নবজাতক পুত্র সন্তানদেরকে। তাই এখানে 'ফেরাউনের নিকট যাও' না বলে বলা হয়েছে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট যাও। আর এখানকার 'তারা কি ভয় করে না' প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এর অর্থ— ওই সীমালংঘনকারীদের সংযত হওয়া উচিত। আল্লাহ্র ভয়ে পরিত্যাগ করা উচিত অংশীবাদিতা ও অত্যাচার। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— হে মুসা! তুমি ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট যাও এবং তাদেরকে বলো, সংযত হও, ভয় করো আল্লাহ্কে।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'তখন সে বলেছিলো, হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে'। একথার

www.eelm.weebly.com

অর্থ— তখন মুসা বললো, হে আমার প্রভুপালক! আমিতো ফেরাউনের গৃহেই প্রতিপালিত হয়েছি। তারপর দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসী। এতদিন পর তার কাছে রেসালতের দাবি নিয়ে উপস্থিত হলে সে কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'এবং আমার হৃদয় হতবল হয়ে পড়বে, আমার জিহ্বা তো জড়তাগ্রস্ত। সুতরাং হারুনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও'। একথার অর্থ— হজরত মুসা আরো বললেন, হে আমার প্রভুপালক! তারা আমাকে বিশ্বাস না করলে তো আমি হতোদ্যম হয়ে যাবো। আর আমার রসনা ও বাকশক্তি শানিত নয়। সুতরাং আমার ভ্রাতা হারুনকেও এ কাজে আমার সহচর করে দাও। তাকেও দান করো বার্তাবহনের দায়িত্ব। বাগবী লিখেছেন, এখানকার 'আমার হৃদয় হতবল হয়ে পড়বে' অর্থ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বললে তো আমার হৃদয় হয়ে পড়বে সংকুচিত।

বায়যাবী লিখেছেন, 'হারুনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও' হজরত মুসার এমতো বাক্যে দায়িত্বপালনে অনীহা প্রকাশিত হয়নি। বরং তিনটি কারণ ছিলো তাঁর এমতো প্রার্থনার— ১. যৌথ আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে মিথ্যার মোকাবিলা ২. অসত্যারোপের ফলে হৃদয়ের সংকোচন। ৩. সত্যের সুষম ও শানিত উপস্থাপনা। কারণ তাঁর জিহ্বা ছিলো জড়তাগ্রস্ত এবং হজরত হারুন ছিলেন বাগ্মী।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'আমার বিরুদ্ধে তো তাদের এক অভিযোগ আছে'। একথার অর্থ— আমাকে তো ফেরাউন কিবতী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করবে। উল্লেখ্য, মিসরে অবস্থানকালে হজরত মুসার দ্বারা ফেরাউনের সম্প্রদায়ভূত (কিবতী) নিহত হয়েছিলো। সেকারণেই তিনি দেশত্যাগী হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পরে রেসালতের দায়িত্ব নিয়ে মিসরে গমনের নির্দেশ পেয়ে সেই ঘটনার কথাই তিনি উল্লেখ করেছেন। অবশ্য ওই হত্যাকাণ্ডটি ছিলো তাঁর অনিচ্ছাকৃত। তাছাড়া ওই কিবতীটিও ছিলো অংশীবাদী ও অত্যাচারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি আশংকা করি তারা আমাকে হত্যা করবে'। একথার অর্থ— 'হে আমার প্রভুপালক! মৃত্যু ভয়ে আমি ভীত নই। কিন্তু আশংকা করি, ফেরাউন তো কিবতী হত্যার অভিযোগে প্রথমেই আমাকে হত্যা করে ফেলবে। তখন সত্য ধর্মের আহ্বান কার্য সম্পাদনের কী ব্যবস্থা হবে?

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বললেন, না, কিছুতেই পারবে না, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে থেকে শুনবো'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তখন বললেন, ফেরাউন কিছুতেই তোমার জীবনসংহার করতে পারবে না। কারণ তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার পক্ষ

www.eelm.weebly.com

থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। সুতরাং নির্ভয়ে তোমরা দু'জন ফেরাউনের কাছে যাও। তোমাদের সঙ্গে থাকবে আমার সতত উপস্থিতি। আর আমি তোমাদের ও তাদের সকল কথোপকথন শুনবো, কারণ আমি যে সর্বশ্রোতা।

'কাল্লা' অর্থ কক্ষনোই নয়। এ কথার দ্বারা অঙ্গীকার করা হয়েছে হত্যা থেকে জীবন রক্ষার । 'ফাজহাবা' (তোমরা দু'জন যাও) দ্বারা হজরত হারুনকে দোসর বানিয়ে দেয়া হয়েছে হজরত মুসার। যেনো বলা হয়েছে— মুসা! তুমি হত্যার আশঙ্কা কোরো না। তোমার আবেদনের প্রেক্ষিতে সাথে করে নিয়ে যাও তোমার ভাই হারুনকে। ইন্না মাআ'কুম (নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে) বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে আমি তোমাদের সাহায্যকারী। অথবা বলা যায়— তোমাদের ও তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে আমি অবহিত। আর 'মুস্তামিউ'ন' এর মর্মার্থ তোমাদেরকে বিজয়ী করবো আমি তাদের উপর।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'অতএব তোমরা ফেরাউনের নিকট যাও এবং বলো, আমরা তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের রসুল'। এখানে 'রসুল' অর্থ রেসালাত (বার্তাবহনদায়িত্ব)। শব্দটির অর্থ 'মুরসাল' (প্রেরিত)ও হয়। বায়যাবী লিখেছেন, একারণেই শব্দটি ব্যবহৃত হয় কখনো একবচন, আবার কখনো দ্বিবচনরূপে। এখানে শব্দটি প্রয়োগিত হয়েছে দ্বিবচন অর্থে। অর্থাৎ আমরা দু'জন আল্লাহ্র রসুল। শব্দটি এখানে এভাবে ব্যবহার করার আর একটি কারণ এ-ও হতে পারে যে, ফাউলের শব্দরূপে একবচন দ্বিবচন উভয় অর্থে শব্দটির ব্যবহার ব্যাকরণসম্মত। 'কামুস' প্রণেতা লিখেছেন, এখানে' 'ইন্না রসুলু রব্বিল আ'লামীন' বলার কারণ হচ্ছে, ফাউল ও ফায়ীলের নিয়মে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন, বহুবচন সকল ক্ষেত্রের শব্দরূপ একইরকম। আবু উবায়দা বলেছেন, 'রসুল' শব্দের ব্যবহার দুই বা দুইয়ের অধিকের সঙ্গেও হয়। আরববাসীরা বলে, হাজা রসুলী ওয়া ওয়াকিলী (এ হচ্ছে আমার বার্তাবাহক ও প্রতিনিধি)। কোরআন মজীদে ফাউল শব্দরূপের শব্দকে বহুবচন অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন— 'ওয়াহুম লাকুম আদুওউন' (তারা তোমাদের শত্রু)। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত মুসা ও হজরত হারুন ছিলেন সহোদরভ্রাতা। তাই দু'জনকে একান্ত বা একক সত্তা ধরে নিয়ে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে একবচনার্থক 'রসুল'। কেউ কেউ আবার বলেছেন, রসুল হিসেবে তাঁরা দু'জন ছিলেন একে অপরের পরিপূরক। তাই দু'জনকে সম্মিলিতভাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একবচনের শব্দরূপে। অথবা কথাটির অর্থ হবে— আমাদের দু'জনের প্রত্যেকেই আল্লাহ্র রসুল।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'সুতরাং আমাদের সঙ্গে যেতে দাও বনী ইসরাইলকে'। একথার অর্থ— হে রসুল ভ্রাতৃদ্বয়! তোমরা ফেরাউনকে একথাও

www.eelm.weebly.com

জানাও যে, মুক্ত করে দাও এবার বনী ইসরাইলের দাসত্বের শৃঙ্খল, যেনো তারা আমাদের সঙ্গে চলে যেতে পারে তাদের পিতৃভূমি সিরিয়ায়। এই বার্তাটি পৌঁছানোর ব্যাপারেও আমরা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত।

বাগবী লিখেছেন, মিসররাজেরা বনী ইসরাইলকে চারশ' বছর ধরে ক্রীতদাসতুল্য করে রেখেছিলো। হজরত মুসার সময়ে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো ছয় লক্ষ আশি হাজার। তুর পর্বতে প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির পর হজরত মুসা মিসর অভিমুখে যাত্রা করলেন। হজরত হারুন তখন ছিলেন মিসরে। তিনিও সেখানে তাঁর রেসালতের শুভবার্তা পেলেন। যথাসময়ে পশমী জোব্বা পরে একটি লাঠি হাতে নিয়ে মিসরে উপস্থিত হলেন হজরত মুসা। ওই লাঠির প্রান্তে ঝুলন্ত ছিলো একটি ঝোলা। ঝোলার মধ্যে ছিলো তাঁর পানাহারের সামগ্রী। স্বগৃহে প্রবেশ করলে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন হজরত হারুন। তাঁর সম্মানিতা জননী তাঁকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, শিগগির পালাও। মিসররাজ তোমাকে পেলেই হত্যা করে ফেলবে। হজরত মুসা নীরবে শুনলেন মায়ের কথা। এতটুকুও শংকিতও হলেন না তিনি। ভ্রাতাকে বললেন, আমরা দু'জন আল্লাহ্র বার্তাবহনকারী। আমাদের প্রতি রয়েছে মিসররাজের সঙ্গে সাক্ষাতের নির্দেশ। ওই রাতেই রসুল ভ্রাতৃদ্বয় গমন করলেন রাজপ্রাসাদে। বহির্দরজায় করাঘাত করতেই প্রহরী চেঁচিয়ে উঠলো, কে?

এক বর্ণনায় এসেছে, প্রাচীরের উপরে পাহারাদানরত নৈশপ্রহরী তাঁদেরকে দেখে চিৎকার করে বললো, কে তোমরা? হজরত মুসা বললেন, আমরা বিশ্ব-জগতের প্রভুপালনকর্তার বার্তাবাহক। প্রহরী তাঁদের আগমনের সংবাদ প্রেরণ করলো অন্দরমহলে। ফেরাউন বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিলো না। রাত শেষ হলো। সকালে সে ডেকে পাঠালো দু'জনকে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, এক বৎসর পর্যন্ত ফেরাউন তাঁদেরকে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়নি। তারপর একদিন বললো, ঠিক আছে, তাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হোক, আমি তাদের সঙ্গে কিছুটা ঠাট্টা-মশকরা করবো। রসুল ভ্রাতৃদ্বয় ফেরাউনের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। প্রথম দর্শনেই তিনি চিনতে পারলেন হজরত মুসাকে। কারণ তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন তার গৃহেই।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ۝ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝

www.eelm.weebly.com

❐ ফিরাউন বলিল, 'আমরা কি তোমাকে আমাদিগের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করি নাই যখন তুমি শিশু ছিলে? এবং তুমি কি তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদিগের মধ্যে কাটাও নাই?

❐ 'তুমি তো অপরাধ যাহা করিবার তাহা করিয়াছ; তুমি অকৃতজ্ঞ।'

❐ মূসা বলিল, 'আমি তো ইহা করিয়াছিলাম তখন যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, আমরা কি তোমাকে আমাদের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করিনি যখন তুমি শিশু ছিলে? এবং তুমি কি তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদিগের মধ্যে কাটাওনি?'

এখানে 'ওয়ালিদ' অর্থ শিশুকালে। উল্লেখ্য, হজরত মুসা ফেরাউনের গৃহে জন্মগ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি শিশুকাল থেকে প্রতিপালিত হয়েছিলেন তার গৃহে। তিরিশ বছর পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। তারপর চলে যান মাদিয়ানে। সেখানে দশবছর অতিবাহিত করার পর পুনরায় ফিরে আসেন মিসরে। তারপর তিরিশ বছর ধরে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ডাকতে থাকেন সত্যধর্মের পথে। আর ফেরাউন ও তার অনুসারীদের সমুদ্রনিমজ্জনের পরে বেঁচে ছিলেন আরো পঞ্চাশ বছর। মহাতিরোধানের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো একশত বিশ বছর।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তুমি তো অপরাধ যা করবার তা করেছো, তুমি অকৃতজ্ঞ'। একথার অর্থ— ফেরাউন আরো বললো, তোমাকে আমরা লালন-পালন করে বড় করলাম। অথচ তুমিই কিনা আমার সম্প্রদায়ের একজনকে হত্যা করে পালালে। অকৃতজ্ঞ ছাড়া এরকম অপরাধ কি কেউ করে? আউফির বর্ণনায় এসেছে, এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতাও। অর্থাৎ এখানে 'কাফেরীন' শব্দের অর্থ অকৃতজ্ঞ। কেননা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফরী করার বিষয়ে ফেরাউনের কোনো ধারণাই ছিলো না।

হাসান ও সুদ্দী বলেছেন, এখানকার 'আনতা মিনাল কাফিরীন' অর্থ ফেরাউন বললো, হে মুসা! এখন তুমি যে উপাস্যের প্রতি আমাকে আহ্বান করছো, প্রথমে তুমিই তো ছিলে তার প্রত্যাখ্যানকারী। ইতোপূর্বে তুমিতো ছিলে আমাদেরই ধর্মমতানুসারী। অথবা কথাটির অর্থ হতে পারে এরকম— তুমিতো আমাকে অস্বীকারকারী। কিংবা— তুমি আমার উপকারের কথা ভুলে গিয়েছো, ফিরে এসে আবার লিপ্ত হয়েছো আমারই বিরোধিতায়। অথবা অর্থ হবে— তুমি তো আমাদের ধর্মমতানুসারে কাফের।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে(২০) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, আমি তো তা করেছিলাম তখন, যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ'। একথার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, ওই সময় তো আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পথপ্রাপ্ত ছিলাম না। এটাই ছিলো আমার অনবধানতার কারণ। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, আমি তো তখন তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আঘাত করিনি। ভাবতেও পারিনি যে, এক আঘাতেই সে প্রাণত্যাগ করবে। অথবা অর্থ হতে পারে— আমার ওই অপরাধ ছিলো অনিচ্ছাকৃত, হত্যার উদ্দেশ্যবিবর্জিত। অসতর্কতাই ছিলো আমার এমতো স্খলনের কারণ। অথবা বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যারা অজ্ঞতাবশতঃ অন্যায় করে ফেলে, আমার অবস্থা তখন ছিলো তাদের মতন।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'দ্বলালাত' শব্দটির অর্থ ভুলে যাওয়া। অর্থাৎ ভুল বশতঃ তখন আমার দ্বারা ওই অশুভ কর্মটি সম্পন্ন হয়েছিলো। যেমন বলা হয়েছে— 'আন তাদ্বিল্‌লা ইহ্‌দাহুমা ফাতুজাক্‌কির ইহ্‌দাহুমাল উখ্‌রা' অর্থাৎ যদি কোনো রমনী ভুলে যায়, তবে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। এখানেও দ্বলালাত শব্দটির অর্থ করা হয়েছে ভুলে যাওয়া।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ২১, ২২

فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ
وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ

❒ 'অতপর আমি যখন তোমাদিগের ভয়ে ভীত হইলাম তখন আমি তোমাদিগের নিকট হইতে পলাইয়া গিয়াছিলাম। তৎপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং আমাকে রসূল করিয়াছেন।'

❒ 'আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিতেছ তাহা তো এই যে তুমি বনি ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করিয়াছ।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মুষ্টাঘাতের ফলে যখন লোকটি নিহত হলো, তখন আমি তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম। পালিয়ে গেলাম মাদায়েনে। তারপর আমার প্রভুপালক আমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে বানিয়েছেন তাঁর বচনবাহক।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করছো তা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাইলকে দাসে পরিণত করেছো'। এখানে 'তিলকা' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে ফেরাউন কর্তৃক হজরত মুসার প্রতিপালনের প্রতি অথবা তার অন্যায় আচরণের প্রতি।

www.eelm.weebly.com

'আবাদ্‌তা' অর্থ দাসে পরিণত করেছো। উল্লেখ্য, 'আবাদতু' 'ইস্‌তায়বাদ্‌তু' ও 'তায়াবাদতু' শব্দত্রয় সমঅর্থসম্পন্ন। ব্যাখ্যাতাগণ কথাটির অর্থ করেছেন বিভিন্ন রকম। যেমন— ১. হজরত মুসা এখানে ফেরাউনের অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবে— তুমি আমাকে বনী ইসরাইলের অন্যান্য নবজাতকদের মতো হত্যা না করে বাঁচিয়ে রেখেছো সত্য, কিন্তু বধ করেছো হাজার হাজার শিশু। একথাও ঠিক যে, আমাকে তুমি তোমার গৃহে সাদরে প্রতিপালন করেছো, কিন্তু অন্যদিকে দাস বানিয়ে রেখেছো সমগ্র বনী ইসরাইল জনতাকে। দাস বানাওনি কেবল আমাকে।

২. প্রকাশ্যতঃ এখানে অনুগ্রহ স্বীকার করেছেন হজরত মুসা। অপ্রকাশ্যতঃ করেছেন অস্বীকার। সরাসরি তিনি তার উপকারের প্রতি অস্বীকৃতি প্রকাশ করেননি। শুধু বুঝিয়ে দিয়েছেন, তোমার অনুগ্রহ তো প্রকৃত অনুগ্রহ ছিলো না। বরং তা ছিলো তোমার অত্যাচারের পরিণতিরূপে আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায় ও কৌশল। তাই তো তুমি নিজের অজান্তে বাধ্য হয়েছিলে আমাকে লালন-পালন করতে। বনী ইসরাইলের নর-নারী ছিলো তোমার জুলুমের শিকার। তাদের পুত্র সন্তানেরা ও তোমার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। তোমার সেই অকথ্য নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র ইশারায় আমাকে পৌছানো হয়েছিলো তোমার গৃহে। আর তাঁর ইঙ্গিতেই বাধ্য হয়ে তুমি দায়িত্ব পালন করেছিলে আমার লালন-পালনের। এইতো ছিলো তোমার অনুগ্রহের নমুনা।

৩. বাক্যটি আসলে একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (ইস্তেফহামে ইনকারী)। তাই বুঝতে হবে, এখানে উহ্য রয়েছে একটি প্রশ্নপ্রকাশক 'হাম্‌যা'। এভাবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়— তুমি যে অনুগ্রহের কথা তুললে তা কি প্রকৃতপক্ষে কোনো অনুগ্রহ? আমার গোটা সম্প্রদায় যখন তোমার দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী, যখন সদ্যপ্রসূত শিশুদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে চলেছে তোমার ঘাতকদলের খঞ্জর, শোকাকুলা জননীদের বিলাপে যখন ভারী হয়ে গিয়েছে মিসরের আকাশ বাতাস, তখন একা আমি তোমার রাজানুগ্রহে লালিত। এটাই কি তবে তোমার অনুগ্রহ? বলো, এটাই কি তোমার অনুকম্পা?

ফেরাউন হজরত মুসার দৃঢ়তা দেখে দমে গেলো। বুঝলো এঁকে প্রতিহত করা কঠিন। তাই সে এবার সৃষ্টি করতে চাইলো বিতর্কের কুয়াশা। প্রথমেই প্রশ্ন করে বসলো মহাবিশ্বের মহাঅধিপতির স্বরূপ সম্পর্কে। বললো—

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَآ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ○ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ○ قَالَ رَبُّكُمْ

www.eelm.weebly.com

وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ○ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

❒ ফিরাউন বলিল, 'বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আবার কী?'

❒ মূসা বলিল, 'তিনি হইতেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।'

❒ ফিরাউন তাহার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'তোমরা শুনিতেছ তো!'

❒ মূসা বলিল, 'তিনি তোমাদিগের প্রতিপালক এবং তোমাদিগের পূর্ব পুরুষগণেরও প্রতিপালক।'

❒ ফিরাউন বলিল, 'তোমাদিগের প্রতি প্রেরিত তোমাদিগের রসূলটি তো এক বদ্ধ পাগল।'

❒ মূসা বলিল, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক; যদি তোমরা বুঝিতে।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আবার কী? এরকম প্রশ্ন মূর্খতার পরিচায়ক। কারণ আল্লাহ্তায়ালার সত্তা আনুরূপ্যবিহীন, আকারাতীত, প্রকারাতীত, তাই অবোধ্য, অনির্ণেয়। তবে তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণবত্তা ও কার্যকলাপের ইঙ্গিতার্থক পরিচয় দেয়া যায়। কারণ তার প্রতিফলন ও প্রতিবিম্বায়ন ইন্দ্রিয়গোচর।

তাই পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে, 'মুসা বললো, তিনি হচ্ছেন আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এদের মধ্যবর্তী সমস্তকিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও'। একথার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, তিনি হচ্ছেন আকাশসমূহ, পৃথিবী ও সমগ্র সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক, বিবর্তক ও প্রতিপালক। কারণ এই মহা নিসর্গ এককভাবে কেবল তাঁরই কর্তৃত্বাগত। আর সৃজন সম্পূর্ণতই তাঁর। যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হয়ে থাকো তবে সহজেই বুঝতে পারবে। এ সকল কিছু হচ্ছে তাঁর অনির্ণেয় এককত্ব ও অস্তিত্বের নিদর্শন, পরিচয় বিধৃতকারী। অর্থাৎ নিজে নিজে এগুলো অস্তিত্বশীল হয়নি। এগুলোর অস্তিত্বদাতা নিশ্চয় কেউ রয়েছেন। তিনিই আল্লাহ্। সৃষ্টি সম্ভাব্য, নতুন। আর তিনি অনাদি, অনন্ত। তাই সৃষ্টি সকল বিষয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী। আর তিনি সর্ববিষয়ে সকলকিছু থেকে চিরস্বাধীন, চিরঅমুখাপেক্ষী, অব্যয়, অক্ষয়। আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি সেই চিরন্তন সত্তার দিকেই। সুতরাং তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করো। প্রভুপালনকর্তা ও উপাস্য বলে মেনে নাও সেই মহাসৃজয়িতাকে।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বললো, তোমরা শুনছো তো? একথার অর্থ— ফেরাউন ছিলো স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন। তাই বুঝতে পারলো না, এই মহাসৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহ্‌র অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য ও অবোধ্য অস্তিত্বের বিশেষ নিদর্শন। সুতরাং এগুলো দেখেই পৌঁছতে হবে বিশ্বাসের গন্তব্যে। এটাই সত্যোপলব্ধির পথ ও পদ্ধতি। কিন্তু ফেরাউন এপথে আসতে নারাজ। তার জ্ঞান ও বিবেচনার গতি অবরুদ্ধ। তাই সে তার পারিষদবর্গের দিকে লক্ষ্য করে মূর্খের মতো বলে উঠলো, শুনলে তো তোমরা। আমি প্রশ্ন করলাম কী? আর সে উত্তর দিচ্ছে কেমন করে। বক্তব্যটি এরকমও হতে পারে যে— ফেরাউন মনে করতো আকাশ ও পৃথিবী অবিনাশী এবং এ দু'টো যেমন কারো দ্বারা সৃষ্ট নয়, তেমনি নয় কোনো কর্তার প্রভাবের অধীন। কেননা শত শত বছর ধরে এগুলোর অস্তিত্ব অটুট। তাই সে তার পারিষদবর্গকে হজরত মুসার বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবজ্ঞাভরে বললো, কী হে, শুনলে তো এ লোকের প্রলাপ।

হজরত মুসা বুঝতে পারলেন, ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ সংকীর্ণচিত্ত ও স্থূলদর্শী। তাই তিনি তাঁর বক্তব্যের মোড় ঘোরালেন অন্যদিকে। সেকথাই বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (২৬) এভাবে— 'মুসা বললো, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণেরও প্রতিপালক'। হজরত মুসার এই জবাবটি ছিলো অধিকতর শানিত। কারণ নিরন্তর এই দৃশ্যটি সতত পরিদৃশ্যমান যে, মানুষ জন্ম-মৃত্যুর অধীন। সুতরাং জন্ম-মৃত্যু নিশ্চিতকারী নিশ্চয়ই কেউ রয়েছেন। পূর্বাপর সকল মানুষ ও বিশ্বজগতের প্রভুপালক তো তিনিই।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসুলটি তো এক বদ্ধ পাগল'। একথার অর্থ— হজরত মুসার এমতো বক্তব্যের বিপরীতে ফেরাউন কোনো যুৎসই জবাব খুঁজে পেলো না। অক্ষমতা ক্রোধকে উসকে দেয়। ফেরাউনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। তাই সে রোষ ও ব্যঙ্গবিমিশ্রিত কণ্ঠে পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বললো, দেখলে তো তোমাদের এই উন্মাদ রসুলের কাণ্ড। আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে সে কেমন একের পর এক প্রলাপ বকে চলেছে। উল্লেখ্য, ফেরাউন এখানে হজরত মুসাকে রসুল বলেছে উপহাসচ্ছলে।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা বুঝতে'। একথার অর্থ— হজরত মুসা তখন উপস্থাপন করলেন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব-নির্দেশক আর একটি অব্যর্থ প্রমাণ। বললেন, দেখো সূর্যের নিয়মিত নভঃপরিক্রমা। পরিক্রমনরত একই

www.eelm.weebly.com

নিয়মে, অথচ বৃত্ত ভিন্নতরে। দেখো এর স্বচ্ছন্দ উদয়ন ও অস্তায়ন। পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রতিদিন একে প্রধাবিত করে চলেছে কে? দিকের সীমানা দিয়ে ঘেরা এই মহানিসর্গের মহাসৃজয়িতা তো তিনিই। তিনিই তো বিশ্বজগতের মহাপ্রভুপ্রতিপালক।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ○ قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ○ قَالَ فَاْتِ بِهٖۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ○ وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ○

❒ ফিরাউন বলিল, 'তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করিব।'

❒ মূসা বলিল, 'আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনয়ন করিলেও?'

❒ ফিরাউন বলিল, 'তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে উহা উপস্থিত কর।'

❒ অতঃপর মূসা লাঠি নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল।

❒ এবং মূসা হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদিগের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ করো, আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করবো'। ফেরাউন নিজেই মিসরবাসীর প্রভুপালক বলে দাবি করতো। তাই তার কাছে বিশ্বজগতের প্রভুপালকের রসুলের উপস্থিতি ছিলো অসহনীয়। তদুপরি হজরত মুসা যখন আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও এককত্বের প্রমাণ একে একে উপস্থিত করতে শুরু করলেন, তখন সে হয়ে পড়লো আরো অসহায়। ফলে রাগান্বিত হয়ে সে বললো, শোনো মুসা, অনেক বকেছো, আর নয়। শিগগীর অন্যদের মতো আমাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো। নতুবা তোমাকে কারারুদ্ধ করবো। জানোই তো আমার শাস্তি কতো কঠোর। এখানকার 'আল মাসজুনীন' শব্দের আলিফ লাম সীমিত অর্থপ্রকাশক।

কালাবী বলেছেন, ফেরাউনের কারাদণ্ড ছিলো মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষা অধিক ভীতিপ্রদ। বন্দীদেরকে সে চালান করে দিতো সংকীর্ণ সুড়ঙ্গের ঘুটঘুটে অন্ধকারে। বন্দীরা সেখানে ঘনঘোর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতো না।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত মুসা তখন বললেন, হে মিসরের সম্রাট! নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ্‌র রসুল। আমার দাবির সমর্থনে রয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেয়া অলৌকিকত্ব (মোজেজা)। ওই অলৌকিকত্বের প্রকাশ যদি আমি ঘটাই, তবুও কি তুমি আমাকে কারারুদ্ধ করার সাহস দেখাতে পারবে? ফেরাউন বললো, তবে প্রকাশ করো তোমার সেই অলৌকিকত্ব যদি তুমি তোমার দাবিতে সত্য হও। হজরত মুসা তৎক্ষণাৎ তাঁর হস্তধৃত যষ্টিটি নিক্ষেপ করলেন মৃত্তিকাপৃষ্ঠে। সঙ্গে সঙ্গে যষ্টিটি হয়ে গেলো বিশাল এক অজগর। ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ হয়ে গেলো বিস্মিত ও ভীত। পুনরায় অলৌকিকত্ব দেখতে চাইলো তারা। হজরত মুসা তখন ডান হাত প্রবেশ করিয়ে দিলেন তাঁর বাম বগলে। তারপর হাত বের করে আনতেই সকলে সবিস্ময়ে দেখলো ওই হাত থেকে বিকিরিত হচ্ছে শুভ্র ও সমুজ্জ্বল দ্যুতি। ওই আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো আকাশের প্রান্ত। কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত ও বাকরুদ্ধ হয়ে রইলো ফেরাউন ও তার মোসাহেবের দল।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيمٌ ۝ يُرِيدُ أَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ
أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝ قَالُوٓا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ
حٰشِرِينَ ۝ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ۝ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝

❒ ফিরাউন তাহার পারিষদবর্গকে বলিল, 'এ তো এক সুদক্ষ যাদুকর।'

❒ 'এ তোমাদিগকে তোমাদিগের দেশ হইতে তাহার যাদুবলে বহিষ্কৃত করিতে চাহে। এখন তোমরা কী করিতে বল?'

❒ উহারা বলিল, 'তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদিগকে পাঠাও।'

❒ 'যেন তাহারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।'

❒ অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদিগকে একত্র করা হইল,

---

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে বললো, এতো এক সুদক্ষ যাদুকর'। একথার অর্থ— সহসা বিচলিত হলো ফেরাউন। কিন্তু নিশ্চিত পরাজয়ের গ্লানিমোচনের উপায়ও স্থির করলো মুহূর্তমধ্যে। নিজেকে এবং তার স্তাবকদেরকে উদ্ধারের জন্য বলে উঠলো, দেখলে তো মুসার কীর্তি। কী সাংঘাতিক! এতো দেখছি এক মহাপারদর্শী যাদুকর।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— পারিষদবর্গের নিকট থেকে পরামর্শ চাইলো ফেরাউন। বললো, মুসা ও হারুনের অভিসন্ধি কী, তাতো এবার বুঝতে পারলে। তারা যাদুশক্তির বলে অধিকার করতে চায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। বের করে দিতে চায় তোমাদেরকে দেশ থেকে। এখন তবে তোমরাই বলো, কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? পারিষদবর্গ বললো, যাদুর মোকাবিলা যাদুর মাধ্যমে হওয়াই সমীচীন। মহামান্য সম্রাট! এবার এই দুই ভাইকে সংযত হতে বলুন। জানিয়ে দিন, তাদের যাদুর মোকাবিলা করতে আমরা প্রস্তুত। কিছুকাল অপেক্ষা করতে বলুন তাদেরকে। তারপর দিকে দিকে পাঠিয়ে দিন সংগ্রাহকের দল। তারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রেষ্ঠ যাদুকরদেরকে এনে যেনো আপনার দরবারে একত্রিত করে। ফেরাউন পারিষদবর্গের পরামর্শ মেনে নিলো। সংগ্রাহকের দলকে পাঠিয়ে দিলো বিভিন্ন স্থানে। তারা বড় বড় যাদুকরদেরকে ডেকে আনলো। নির্ধারিত হলো যাদু প্রতিযোগিতার দিন ও তারিখ। দিনটি ছিলো তাদের ধর্মীয় উৎসবের দিন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ঘটনাক্রমে ওই দিনটি ছিলো নববর্ষের প্রথম শনিবার।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ۝ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝

❒ এবং লোকদিগকে বলা হইল, 'তোমরাও একত্র হও,

❒ 'যেন উহারা বিজয়ী হইলে আমরা উহাদিগকে সমর্থন করিতে পারি।'

❒ যাদুকরেরা ফিরাউনের নিকট আসিয়া বলিল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই আমাদিগের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো?'

❒ ফিরাউন বলিল, 'হাঁ, তখন তোমরা আমার পারিষদবর্গের শামিল হইবে।'

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— এতোকিছু করেও ফেরাউন পুরোপুরি স্বস্তিলাভ করতে পারলো না । ভাবলো, প্রতিযোগিতার ময়দানে বিশাল সমর্থক গোষ্ঠীর উপস্থিতি প্রয়োজন। তাই সে চতুর্দিকে এই মর্মে ফরমান জারী করলো যে, হে মিসরবাসী! বনী ইসরাইলের দুই যাদুকরের সঙ্গে আমাদের যাদুকরদের প্রতিযোগিতাস্থলে তোমরা সকলে হাজির হও, যাতে করে যথাসময়ে আমরা আমাদের বিজয়ী যাদুকরদেরকে দিতে পারি কল্লোলিত সমর্থন।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'আস্‌সাহারাতু' বলে বুঝানো হয়েছে ফেরাউন পক্ষীয় যাদুকরদেরকে। আবার কথাটির দ্বারা এখানে হজরত মুসা ও হজরত হারুনকেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। কারণ এর পূর্বে বলা হয়েছে 'লায়াল্লা নাত্তাবিউ'। 'লায়াল্লা' শব্দটি আশাপ্রদায়ক। আর 'নাত্তাবিউ' অর্থ সমর্থন করতে পারি অথবা হতে পারি তাদের ধর্মের অনুসারী। এভাবে ব্যাখ্যা করলে শেষোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— যদি মুসা ও হারুন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়, তবে যেনো আমরা অনুসারী হতে পারি তাদের ধর্মের। আর না হলে প্রত্যাখ্যান করতে পারি তাদেরকে।

পরের আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যাদুকরেরা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে ফেরাউনের কাছে নিবেদন করলো, মহামান্য সম্রাট! আমরা তো আশাবাদী। কিন্তু জানতে চাই বিজয়ী যদি আমরা হই, তবে আমাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে কি? ফেরাউন বললো, নিশ্চয়। বিজয় লাভ করলে তোমরা গৃহীত হবে আমার পারিষদরূপে।

সূরা শুআরা : আয়াত ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১

قَالَ لَهُمْ مُّوسَىٰٓ اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ○ فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا
بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ○ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ
تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ○ فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ○ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ○ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ○ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ
لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَاُقَطِّعَنَّ
اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○ قَالُوْا لَا ضَيْرَ
اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ○ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

❒ মূসা উহাদিগকে বলিল, 'তোমাদিগের যাহা নিক্ষেপ করিবার তাহা নিক্ষেপ কর।'

❒ অতঃপর উহারা উহাদিগের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং উহারা বলিল, 'ফিরাউনের ইজ্জতের শপথ। আমরাই বিজয়ী হইব।'

www.eelm.weebly.com

❒ অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল; সহসা উহা উহাদিগের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল।

❒ তখন যাদুকরেরা সিজদাবনত হইল,

❒ এবং বলিল, 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের প্রতি—

❒ 'যিনি মূসা ও হারুনেরও প্রতিপালক।'

❒ ফিরাউন বলিল, 'কী'! আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিলে? দেখিতেছি, এতো তোমাদিগের প্রধান। এ-ই তো তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে। শীঘ্রই তোমরা ইহার পরিণাম জানিবে। আমি অবশ্যই তোমাদিগের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিব এবং তোমাদিগের সকলকে শূলবিদ্ধ করিব।'

❒ উহারা বলিল, 'কোন ক্ষতি নাই, আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব,

❒ আমরা আশা করি যে, আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগের অপরাধ মার্জনা করিবেন; কারণ, আমরা বিশ্বাসীদিগের মধ্যে অগ্রণী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মুসা তাদেরকে বললো, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ করো'। একথার অর্থ— যাদুকরেরা হজরত মুসাকে লক্ষ্য করে বললো, প্রথমে তুমি যা নিক্ষেপ করতে চাও তা করো, নতুবা অনুমতি দাও আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করি। তখন হজরত মুসা বললেন, তোমরাই প্রথমে যা করতে চাও তা করো। সুরা আ'রাফে কথাটি বলা হয়েছে এভাবে— ইম্‌মা আন তুলক্বিয়া ওয়া ইম্‌মা আন্ নাকুনা নাহনুল মুলক্বিন (তুমিই কি নিক্ষেপ করবে, না আমরা নিক্ষেপ করবো)।

উল্লেখ্য, হজরত মুসা আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে যাদুর হুকুম দেননি। কারণ যাদু হারাম। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে তিনি যাদুকরদেরকে দিয়েছেন প্রথমে যাদু প্রদর্শনের অনুমতি। মোজেজা প্রদর্শন করে মিথ্যার উপরে সত্যের বিজয় প্রতিষ্ঠাই ছিলো তাঁর এমতো অনুমতি প্রদানের উদ্দেশ্য। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে তিনি অনুমতি প্রদান করেছেন তুচ্ছতা প্রকাশার্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ঠিক আছে, তোমাদের যা করণীয় আছে তা প্রথমেই করে ফেলো।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'অতপর তারা তাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করলো এবং তারা বললো ফেরাউনের ইজ্জতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হবো'। উল্লেখ্য, ফেরাউনের শক্তিমত্তার উপরে ছিলো তাদের অগাধ বিশ্বাস, তাই তারা এভাবে শপথ উচ্চারণ করতে পেরেছিলো। অথবা তারা এভাবে শপথ করেছিলো রাজানুগ্রহ আকর্ষণার্থে।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর মুসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলো, সহসা তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগলো'। একথার অর্থ— যাদুকরদের নিক্ষিপ্ত রজ্জু ও লাঠিগুলো যখন সাপের আকারে সারা মাঠ জুড়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলো, তখন হজরত মুসা মাটিতে নিক্ষেপ করলেন তাঁর অলৌকিক যষ্টি। যষ্টিটি সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলো একটি বিরাট অজগর এবং একে একে গলধঃকরণ করে ফেললো যাদুকরদের যাদুর সাপগুলোকে।

পরের আয়াতত্রয়ের (৪৬, ৪৭, ৪৮) মর্মার্থ হচ্ছে— এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে গেলো যাদুকরেরা। তাদের অন্তরের যাদুপ্রীতির অন্ধকারে প্রবেশ করলো সত্য রসুলের অপ্রতিরোধ্য মোজেজার সুতীব্র সূর্যালোক। হৃদয়ে প্রবেশ করলো চিরঅক্ষয় ইমান। শ্রদ্ধাবনতচিত্তে নিজের অজান্তেই সেজদাবনত হলো তারা। বললো, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম বিশ্বজগতের সেই আনুরূপ্যবিহীন প্রভুপালনকর্তার প্রতি, যিনি এই রসুল ভ্রাতৃদ্বয়েরও প্রভুপালনকর্তা।

যাদু হচ্ছে একপ্রকার কৌশল যা বিভ্রান্ত করে মানুষের দৃষ্টি ও চিন্তাকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যাদু এক প্রকার বাস্তবসম্মত প্রতিক্রিয়া। আমি বলি, আলোচ্য প্রসঙ্গের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, যাদুর কোনো বাস্তবতা নেই। এর প্রতিক্রিয়া বাস্তবে দৃশ্যমান হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অলীক। তাই এখানে যাদুকরদের যাদুর সাপগুলোকে বলা হয়েছে অলীক সৃষ্টি।

'রব্বি মুসা ওয়া হারুন' অর্থ যিনি মুসা ও হারুনের প্রভুপালনকর্তা। ইমানের ঘোষণা দেয়ার পর এই বাক্যটি উচ্চারণের মাধ্যমে যাদুকরেরা এখানে একথাই জানিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, রসুল ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক প্রকাশিত অভূতপূর্ব মোজেজাদর্শনই হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস আনয়নের কারণ। আর সত্যিই তাঁরা আল্লাহ্‌র রসুল।

এর পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা এতে বিশ্বাস করলে? দেখছি, এতো তোমাদের প্রধান। এ-ই তো তোমাদেরকে যাদুশিক্ষা দিয়েছে'। একথার অর্থ— যাদুকরদের শোচনীয় পরাজয় দেখে এবং তাদের ইমানের নির্ভীক ঘোষণা শুনে ফেরাউন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই সে আত্মস্থ হলো। বুঝতে পারলো, এখন বিষয়টিকে সন্দেহজনক করে না তুলতে পারলে উপস্থিত জনতাকেও আর থামানো যাবে না। সকলেই একযোগে অনুগত হয়ে পড়বে মুসা ও হারুনের প্রতি। তাই সে হুংকার ছেড়ে বললো, কী এতো বড় স্পর্ধা তোমাদের! আমার সামনেই তোমরা আমার বিনা অনুমতিতে তাদের আনুগত্যকে স্বীকার করলে? বুঝতে পারছি, তোমরা আসলে এক। এ তোমাদের পাতানো খেলা। মুসা ও হারুনই হচ্ছে তোমাদের যাদুবিদ্যার গুরু।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— ' শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করবো এবং তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করবো'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৫০, ৫১) মর্মার্থ হচ্ছে— তওবাকারী যাদুকরেরা বললো, হে মিসররাজ! তুমি যা খুশী তা করতে পারো। এতে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। বরং এতে রয়েছে আমাদের জন্য উপকার। তুমি আমাদেরকে হত্যা করলে আমরা পাবো শাহাদাতের মর্যাদা, ইমানদারদের জন্য যা অত্যন্ত লোভনীয়। যত দ্রুত আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারবো তত দ্রুত পাবো আমাদের প্রভুপালনকর্তার সন্দর্শন। আমরা আশাধারী, তিনি আমাদের বিগত জীবনের অপরাধ মার্জনা করবেন। কারণ, আজ এই মহাসমাবেশে আমরাই প্রথম ঘোষণা দিয়েছি ইমানের। সুতরাং এর পর যারা ইমান আনবে আমরা হবো তাদের অগ্রনায়ক।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ○ فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ
فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ○ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ○ وَاِنَّهُمْ لَنَا
لَغَآئِظُوْنَ ○ وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ○ فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○
وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ○ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

❐ আমি মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম এই মর্মে ঃ আমার দাসদিগকে লইয়া রজনীযোগে বহির্গত হও, তোমাদিগের তো পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে।

❐ অতঃপর ফিরাউন শহরে শহরে লোকসংগ্রহকারী পাঠাইল,

❐ এই বলিয়া যে, বনি ইসরাঈল তো ক্ষুদ্র একটি দল,

❐ উহারা তো আমাদিগের ক্রোধ উদ্রেক করিয়াছে;

❐ এবং আমরা তো এক দল, সদা সতর্ক।

❐ পরিণামে আমি ফিরাউন-গোষ্ঠীকে বহিষ্কৃত করিলাম উহাদিগের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হইতে

❐ এবং ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হইতে।

❐ এইরূপই ঘটিয়াছিল এবং বনি ইসরাঈলকে করিয়াছিলাম এই সমুদয়ের অধিকারী।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পরও যখন ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা ইমান আনলো না, তখন আমি মুসার প্রতি এই মর্মে প্রত্যাদেশ করলাম যে, এবার তুমি বনী ইসরাইল জনতাকে নিয়ে তোমাদের পিতৃভূমি সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করো। সাবধান! এ সংবাদ যেনো বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর বাইরে আর কেউ জানতে না পারে। আর যাত্রা করতে হবে রাতে, দিনে নয়। দিনে বহির্গত হলে তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হবে। রাতে রওনা হলেও প্রভাতে যখন ফেরাউনেরা এ সংবাদ জানতে পারবে তখন তারা তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন না করে ছাড়বে না।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ তখন হজরত মুসাকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানালেন, বনী ইসরাইল জনতাকে বলো, তারা যেনো প্রতি চার ঘরের লোক একত্র হয় একটি ঘরে। তারপর যেনো ভেড়ার বাচ্চা জবাই করে তার রক্ত লাগিয়ে দেয় ঘরগুলোর দরজায়। আমি ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবো, ওই সকল ঘরে যেনো তারা প্রবেশ না করে। আরো নির্দেশ দিবো, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের শিশুদেরকে হত্যা করো এবং নষ্ট করে দাও তাদের সকল সম্পদ। তারা তাই করবে। হে মুসা, তোমার অনুসারীদেরকে আরো বলো, তারা যেনো পথের পানাহাররূপে সঙ্গে নেয় রুটি। তারপর গভীর রাতে বের হয়ে পড়ে সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রতীরে পৌঁছলে পাবে পরবর্তী প্রত্যাদেশ। হজরত মুসা প্রত্যাদেশানুসারে রাতের আঁধারে মিসর ত্যাগ করলেন। পরদিন সকালে কিবতীরা জানতে পারলো বনী ইসরাইলদের উধাও হওয়ার সংবাদ। তৎক্ষণাৎ তারা এ সংবাদ পৌঁছে দিলো ফেরাউনের কাছে। বললো, বনী ইসরাইলেরা আমাদের শিশুদেরকে হত্যা করেছে। আর আমাদের ধনসম্পদ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে রাতের আঁধারে। ফেরাউন তখন বনী ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রস্তুত করলো এক বিশাল বাহিনী। পনেরো লক্ষ সেনাপতি এবং তাদের প্রত্যেকের অধীনে এক হাজার করে সৈন্য নিয়োজিত করে একটি বিশালাকৃতির সিংহাসনে বসে সে-ও রওনা দিলো ওই সেনাবাহিনীর সঙ্গে। আমি বলি, বর্ণনাটি অতিরঞ্জিত। গ্রহণযোগ্য কোনো বিবরণে এরকম কথা উল্লেখ করা হয়নি।

পরের আয়াতদ্বয়ে (৫৩, ৫৪) বলা হয়েছে— 'অতঃপর ফেরাউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠালো এই বলে যে, বনী ইসরাইল তো ক্ষুদ্র একটি দল'। আমি বলি, একথার অর্থ— ফেরাউন বনী ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। আশে পাশের শহরগুলোতে সেনাসংগ্রহের জন্য লোক পাঠালো। তাদেরকে বলে দিলো, চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। বনী ইসরাইলেরা তো সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশী নয়।

www.eelm.weebly.com

এখানে বলা হয়েছে 'বনী ইসরাইল তো ক্ষুদ্র একটি দল'। একথা প্রমাণিত হয় যে, যে সকল বিবরণে তাদের সংখ্যা ছয়লক্ষ সত্তর হাজার বলা হয়েছে, ওই সকল বিবরণ অতিরঞ্জিত। আবার ফেরাউনের সেনাসংখ্যাও নিশ্চয় সাত লক্ষ বা পনেরো লক্ষ ছিলো না। কারণ পৃথিবীর কোনো রাজ্যের লোকসংখ্যাই তখন অতো বেশী ছিলো না। আমি বলি, 'বনী ইসরাইল তো একটি ক্ষুদ্র দল' বলে ফেরাউন একথাই বুঝাতে চেয়েছে তারা কিবতীদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী নয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৫৫, ৫৬) মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরাউন আরো বললো, বনী ইসরাইলের এরকম গোপন পলায়ন আমাদের মধ্যে সঞ্চার করেছে ক্রোধ। অথচ তারা কি জানেনা যে, আমরা একটি পরাক্রান্ত জনগোষ্ঠী। নিশ্চেষ্টও আমরা নই। আমরা তো সতত সাবধান।

এখানে 'হাজিরূন' অর্থ সদাসতর্ক বা সততসাবধান। ফার্‌রা বলেছেন, 'হাজির' (আলিফ যুক্ত 'হা') অর্থ ওই ব্যক্তি যার উপস্থিতি ভীতিকর। আর 'হাজির'(আলিফ বিহীন 'হা') অর্থ ভয়ংকর দর্শন। শব্দ দু'টোর মধ্যে রয়েছে ক্রিয়ার অস্থায়ীত্ব ও স্থায়ীত্বের পার্থক্য। কেউ কেউ বলেছে, 'হাজিরূন' অর্থ শক্তিমান। আর 'হাজিরূন' অর্থ সতর্কসজাগ। জুজাযও এরকম অর্থের প্রবক্তা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৫৭, ৫৮) মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরাউনের কাছে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হলো বহুসংখ্যক কিবতী। ফেরাউন তাদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত পরামর্শের পর স্থির করলো, বনী ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবন করতেই হবে। উপস্থিত সকলেই শিরোধার্য করে নিলো ফেরাউনের ফরমান। একযোগে তারা যাত্রা শুরু করলো সিরিয়ার পথাভিমুখে। পেছনে পড়ে রইলো তাদের সাধের বাগান, প্রিয় প্রস্রবণ, সম্পদের ভাণ্ডার ও নয়নাভিরাম প্রাসাদমালা।

এরপরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'এইরূপই ঘটেছিলো এবং বনী ইসরাইলকে করেছিলাম এই সমুদয়ের অধিকারী'। একথার অর্থ— ফেরাউনের দল সাগরবক্ষে নিমজ্জিত হলো। সলিলসমাধি ঘটলো তাদের সকলের। বনী ইসরাইল তখন সাগরের ওপারে। পুনরায় একসময় মিসরে এলো তারা। অধিকার করলো মৃত কিবতীদের পরিত্যক্ত উদ্যান-নির্ঝর-ধনভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ۝ فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا
لَمُدْرَكُوْنَ ۝ قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ۝ فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ

www.eelm.weebly.com

اَضۡرِبۡ بِّعَصَاكَ الۡبَحۡرَ ؕ فَانۡفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٍ كَالطَّوۡدِ الۡعَظِيۡمِ ۚ وَ اَزۡلَفۡنَا ثَمَّ الۡاٰخَرِيۡنَ ۚ وَاَنۡجَيۡنَا مُوۡسٰى وَمَنۡ مَّعَهٗۤ اَجۡمَعِيۡنَ ۚ ثُمَّ اَغۡرَقۡنَا الۡاٰخَرِيۡنَ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ

❑ উহারা সূর্যোদয়কালে তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল।

❑ অতঃপর যখন দুইদল পরস্পরকে দেখিল তখন মূসার সংগীরা বলিল, 'আমরা তো ধরা পড়িয়া গেলাম।'

❑ মূসা বলিল, 'কিছুতেই নয়! আমার সংগে আছেন আমার প্রতিপালক; তিনি আমাকে পথ-নির্দেশ করিবেন।'

❑ অতঃপর মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তোমার যষ্টি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' ফলে, ইহা বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হইয়া গেল;

❑ আমি সেথায় উপনীত করিলাম অপর দলটিকে

❑ এবং মূসা ও তাহার সংগী সকলকে আমি উদ্ধার করিলাম।

❑ তৎপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করিলাম।

❑ ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

❑ তোমার প্রতিপালক— তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াতগুলোর মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরাউন ও তার বাহিনী বনী ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবন করলো পরদিন সকালে। সকলেই ছিলো অশ্বারোহী। তাই একসময় তারা গিয়ে পৌঁছলো বনী ইসরাইলের দৃষ্টিসীমানায়। আতংকিত হলো তারা। বললো, আমরা তো ধরাই পড়ে গেলাম। হজরত মুসা বললেন, কিছুতেই নয়। আমাদের এই অভিযাত্রা আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ানুগামী। তিনি আমাদের সতত সঙ্গী। তাই তিনি আমাদেরকে প্রদর্শন করবেন পরিত্রাণের পথ। সহসা প্রত্যাদেশ হলো, হে আমার প্রিয় নবী! তোমার হাতের লাঠি দ্বারা সমুদ্রবক্ষে আঘাত করো। মুসা নির্দেশ পালন করলেন। ফলে সমুদ্রাভ্যন্তরের পানি দু'দিকে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে গেলো। এভাবে সৃষ্টি হলো বারোটি শুষ্ক পথ। বনী ইসরাইলের বারোটি গোত্র অগ্রসর হলো ওই পথগুলো দিয়ে। ফেরাউনের দল যখন তটদেশে পৌঁছলো, তখন বনী ইসরাইলেরা মাঝ দরিয়ায়। কালবিলম্ব না করে তারাও নেমে পড়লো সমুদ্রাভ্যন্তরের পথে। সমুদ্রের অপর পাড়ে যখন বনী ইসরাইলেরা পৌঁছে গেলো তখন ফেরাউনের বিশাল বাহিনী মাঝ দরিয়ায়। সহসা ভেঙে পড়লো পানির দেয়াল। ডুবে মরলো ফেরাউন ও তার পুরো বাহিনী। উদ্ধার পেলো মুসা ও

www.eelm.weebly.com

তার অনুসারীরা। এভাবে একদলের বিনাশ ও অন্য দলের পরিত্রাণপ্রাপ্তির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু মানুষ একথা সহজে বুঝতে চায় না। কারণ তাদের অনেকেই অবিশ্বাসী। আল্লাহ্‌ই তো সকলের পালনকর্তা। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী শত্রুনিধনের ক্ষেত্রে এবং পরমদয়াপরবশ বিশ্বাসীদের বেলায়।

উল্লেখ্য, অল্প কয়েকজন বাদে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সকলেই ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এক বর্ণনায় এসেছে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের মধ্যে হজরত মুসার ধর্মাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন ফেরাউনের স্ত্রী মহাপুণ্যবতী হজরত আছিয়া, স্ববিশ্বাস গোপনকারী খারঈল, তাঁর সহধর্মিণী এবং মরিয়ম বিনতে নামুসিয়া। এই মরিয়মই চিহ্নিত করেছিলেন নীলনদাভ্যন্তরস্থিত হজরত ইউসুফের সমাধি।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ৬৯,৭০,৭১,৭২,৭৩,৭৪,৭৫,৭৬,৭৭

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ۘ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ○ قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ○ قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ○ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ○ قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ○ قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ○ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ○ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○

❒ উহাদিগের নিকট ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।

❒ সে যখন তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা কিসের ইবাদত কর?'

❒ উহারা বলিল, 'আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সহিত উহাদিগের পূজায় নিরত থাকিব।'

❒ সে বলিল, 'তোমরা আহ্বান করিলে উহারা কি শুনে?'

❒ 'অথবা উহারা কি তোমাদিগের উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে?'

❒ উহারা বলিল, 'না, তবে আমরা আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে এইরূপই করিতে দেখিয়াছি।'

❒ তোমরা কি তাহার সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিয়াছ যাহার পূজা করিতেছ—

❒ তোমরা এবং যাহার পূজা করিত তোমাদিগের অতীত পিতৃপুরুষেরা?

❒ বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক ব্যতীত তাহারা সকলেই আমার শত্রু;

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মক্কাবাসীদের নিকট বর্ণনা করুন আপনার ও তাদের পিতৃপুরুষ নবী ইব্রাহিমের বৃত্তান্ত। তিনি প্রতিমাপূজক পিতা ও সম্প্রদায়ের লোকজনকে একবার বললেন, তোমরা উপাসনা করো কার? তারা উত্তর দিলো, প্রতিমার। প্রতিমাপূজাই আমাদের ধর্ম। আর এমতো আরাধনায় আমরা নৈষ্ঠিক ও আন্তরিক।

প্রতিমাপূজাকে অসার প্রমাণ করবার জন্যই হজরত ইব্রাহিম অবতারণা করেছিলেন প্রশ্নের। বলেছিলেন 'তোমরা উপাসনা করো কার'। নতুবা বিষয়টি তাঁর জানাই ছিলো। লক্ষণীয়, তাঁর প্রশ্নটি ছিলো সংক্ষিপ্ত। আর তাদের জবাব ছিলো দীর্ঘ। দম্ভপ্রকাশই ছিলো তাদের এমতো প্রলম্বিত জবাব প্রদানের কারণ।

'ফানাজাললু লাহা আকিফীন' কথাটির শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায়— আমরা সারাদিনমান তাদের পূজায় নিয়োজিত থাকি। কিন্তু প্রকৃত অর্থ হবে— সার্বক্ষণিক আমরা নিয়োজিত থাকি তাদের উপাসনায়। বাগবী লিখেছেন, তারা প্রতিমার উপাসনা করতো দিনের বেলায়, রাতে নয়।

পরবর্তী আয়াত ষষ্ঠকের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইব্রাহিম তখন বললেন, তোমাদের ডাক কি ওই জড়প্রতিমাগুলো শোনে? তোমরা তাদের উপাসনা করলে কি সেগুলো করতে পারে তোমাদের কোনো উপকার, অথবা না করলো কোনো অপকার? তারা বললো, অত শত বুঝি না। বুঝি শুধু এতটুকু যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরাও এরকম করেছেন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, কিন্তু তোমরা বিষয়টির সত্যাসত্য অনুধাবন করতে চেষ্টিত হবে না কেনো। কেনো পার্থক্য করতে চাইবে না সত্য ও মিথ্যার। পূর্বপুরুষেরা করলেই মিথ্যা কখনো সত্যে পরিণত হয় না। শুভবুদ্ধি ও সুস্থ চেতনা একথা সমর্থনও করে না। সুতরাং হে আমার অশুভ বিবেকানুসারী সম্প্রদায়! শুনে রাখো, আমি কিন্তু অন্ধভক্তির প্রশ্রয়দাতা নই। আমি আরাধনা করি সেই অদ্বিতীয় ও অবিভাজ্য মহাসৃজয়িতার, যিনি বিশ্বজগতের মহান প্রভুপালক। তিনি ছাড়া তোমরা, তোমাদের উপাস্যরা ও তোমাদের বিভ্রান্ত পূর্বপুরুষেরা সকলেই আমার প্রতিপক্ষ।

জড়প্রতিমাকে এখানে শত্রু বলা হয়েছে রূপকার্থে। আর 'আমার শত্রু' বলে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ওই প্রতিমাগুলো তো আসলে তোমাদেরও শত্রু। অর্থাৎ তাদের কারণেই তোমরা অবশেষে হবে চিরতরে ক্ষতিগ্রস্ত। এভাবে নিজের উপরে দায় টেনে নিয়ে অন্যকে উপদেশ দেয়ার রীতিটি একটি প্রভাববিস্তারক রীতি। হজরত ইব্রাহিম এখানে এই রীতিটিই অবলম্বন করেছেন। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'ওয়ামা লিয়া লাআ'য়ুবুদুল্ লাজী ফাত্বারানী' (কী কারণ রয়েছে যে, আমি আমাদের মহাসৃজয়িতার ইবাদত করবো না)। তাছাড়া মহাবিচারের দিবসে প্রতিমাগুলো

www.eelm.weebly.com

সত্যি সত্যিই শত্রু হয়ে যাবে তাদের উপাসকদের। সেকথাই বলা হয়েছে আরেক আয়াতে এভাবে— 'সাইয়াকফুরুনা বি ইবাদাতিহিম ওয়া ইয়াকুনুনা'লাইহিম দ্বিদ্দা' (অচিরেই তাদের পূজকদেরকে তারা অস্বীকার করবে। আর হয়ে যাবে তাদের বিপরীত পক্ষ)।

এখানকার 'আদুওউন' (শত্রু) শব্দটি ফাউলুনের ওজনের। শব্দটি একটি মূল শব্দ। যেমন— 'কুবুলুন'। শব্দটি একবচন। অথবা বহুবচন। বহুবচন হলে অর্থ দাঁড়াবে— তোমাদের সকল উপাস্যই আমার শত্রু।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'আদুওউন' ও 'সাদিকুন' 'ফাউলুন' ও 'ফায়িলুন' এর বিশেষণবাচক শব্দরূপ। একবচন ও বহুবচন উভয় অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তাই কথাটিকে 'রজুলুন আদুওউন' এবং 'কওমুন আদুওউন'ও বলা যায়। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'ওয়া কাজালিকা জায়া'লনা লিকুললি নাবিয়্যিন আ'দুউয়ান শায়াত্বিনাল ইনসি ওয়াল জ্বিন্নি'।

'ইল্লা রব্বাল আ'লামীন' অর্থ বিশ্বজগতের প্রতিপালক ব্যতীত। কথাটি পূর্বের বক্তব্যধারা থেকে পৃথক। এখানে 'ইল্লা' (ব্যতীত) অর্থ 'কিন্তু' হওয়াই সমীচীন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তারা সকলেই আমার শত্রু, কিন্তু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আমার প্রিয়ভাজন, বন্ধু। অথবা বলা যেতে পারে, তাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র ইবাদত করতো। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— বিশ্বজগতের প্রভুপালক ব্যতীত তোমাদের সকল উপাস্য আমার শত্রু। এমতাবস্থায় আলোচ্য বাক্যটি হবে পূর্বের বক্তব্যধারার অন্তর্ভুক্ত, পৃথক কোনো বাক্য নয়।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ○ وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ ○ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ○ وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ○ وَالَّذِىْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْٓـَٔتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ ○

❐ তিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে পথ-প্রদর্শন করেন।
❐ তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়,
❐ এবং রোগাক্রান্ত হইলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন;
❐ এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাইবেন, অতঃপর পুনর্জীবিত করিবেন।
❐ এবং আশা করি, তিনি কিয়ামতদিবসে আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করিয়া দিবেন।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন'। একথার অর্থ— তিনিই সৃষ্টি করেছেন আমাকে ও মহাবিশ্বকে। আর তিনিই মহাবিশ্বের সকলের এবং সকলকিছুর মতো আমাকেও পথপ্রদর্শন করেন। অর্থাৎ সকলের ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের পথ প্রদর্শন করেন তিনিই। অন্য এক আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন— 'এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথনির্দেশ করেন'। মানুষের পার্থিব সৃজন শুরু হয় মাতৃগর্ভে, আর সফল সমাপ্তি ঘটে জান্নাতে। আর এমতো অভিযাত্রায় পথনির্দেশনা দান করেন আল্লাহ্ই।

পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়'। একথার অর্থ— সমগ্র সৃষ্টির জীবনোপকরণ প্রদাতা কেবলই আল্লাহ্। আর তিনি সকলের মতো আমাকেও দান করেন আহার্য ও পানীয়।

এরপরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে— 'এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন'। রোগ ও সুস্থতা উভয়ের স্রষ্টা আল্লাহ্। কিন্তু এখানে হজরত ইব্রাহিম রোগমুক্তির বিষয়টিকেই গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেছেন আল্লাহ্র প্রতি অগাধ সম্মান ও শিষ্টাচার প্রদর্শনার্থে। অন্য এক আয়াতে হজরত খিজিরের উক্তিতেও প্রকাশ পেয়েছে এরকম শিষ্টাচার। যেমন— 'আমি ইচ্ছা করেছি এই নৌকাটি ত্রুটিযুক্ত করে দিবো'. এখানে তিনি ত্রুটির সম্পর্ক করেছেন নিজের সঙ্গে। আবার অন্যত্র বলেছেন— 'আমার প্রভুপালক ইচ্ছা করেছেন, তারা দুজন তাদের পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছে যাবে'। এখানে তিনি শুভকর্মকে সংযুক্ত করেছেন আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের সঙ্গে। আল্লাহ্র পরিচয়ধন্য ব্যক্তিগণের বচন এরকমই সতর্কতাসমৃদ্ধ ও শিষ্টাচারমণ্ডিতই হয়।

এখানে 'রোগাক্রান্ত হলে' অর্থ আমি রোগাক্রান্ত হলে। এরকম উক্তির মাধ্যমে তিনি একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, মানুষের উপরে আপতিত বিপদাপদ আল্লাহ্রই ক্রিয়াকলাপের প্রতিফলন। তাছাড়া হজরত ইব্রাহিমের আলোচ্য বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামতের বর্ণনা করা। আর রোগ কখনো নেয়ামত নয়। তাই তিনি এখানে রোগের সম্পর্ক নিজের সঙ্গে করে রোগমুক্তির সম্পর্ক করেছেন আল্লাহ্র সঙ্গে। কারণ রোগমুক্তি হচ্ছে নেয়ামত।

এরপরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন'। এখানে আবার মৃত্যুকে সম্পর্কিত করা হয়েছে আল্লাহ্র সঙ্গে। যদিও মৃত্যু প্রকাশ্যতঃ নেয়ামত নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, মৃত্যু কষ্টদায়ক কিছু নয়। কষ্টকর হচ্ছে মৃত্যুর সময়ের রোগযন্ত্রণা। তাছাড়া বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদের জন্য

www.eelm.weebly.com

মৃত্যু অবশ্যই নেয়ামত। কারণ তাঁদের প্রিয়তম প্রভুপালকের মিলন তাঁরা লাভ করেন মৃত্যুর মাধ্যমেই। স্মরণীয় একটি বাণী এই যে, মৃত্যু একটি মিলন সেতু, যা বন্ধুকে পৌঁছে দেয় বন্ধুর কাছে। এক হাদিসে এসেছে, সহসা মৃত্যু বিশ্বাসীদের জন্য শান্তি এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য জবাবদিহিতা। সুপরিণত সূত্রে জননী আয়েশা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ ও বায়হাকী। অপর এক হাদিসে এসেছে, মৃত্যু হচ্ছে মুমিনের গোনাহর কাফফারা (ক্ষতিপূরণ)। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু নাঈম তাঁর হুলিয়ায় এবং শিথিল সূত্রে বায়হাকী হজরত আনাস থেকে।

আর একটি কথা হচ্ছে— মৃত্যু ত্বরান্বিত ও বিলম্বিত হয় জীবনোপকরণের স্বল্পতা ও অস্বল্পতার কারণে। আর আগুন-পানি-মাটি-বাতাস এই চারটি পরস্পরবিরোধী বস্তুর সমন্বয়ে জীবনের আধারকে ধরে রাখার বিষয়টি অত্যাশ্চর্যের। এ হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার প্রজ্ঞাময়তা ও শক্তিমত্তার এক বিস্ময়কর নিদর্শন। এই আয়োজনের অবলুপ্তিও কম বিস্ময়ের নয়।

এরপরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'এবং আশা করি তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ সমূহ মার্জনা করে দিবেন'। নবী-রসুলগণ আল্লাহ্তায়ালার বিশুদ্ধচিত্ত দাস। নিষ্পাপ তাঁরা। তাই বিনয়-নম্রতা তাঁদের স্বভাবভূষণ। সেই নবীসুলভ বিনম্রতাই প্রকাশ পেয়েছে হজরত ইব্রাহিমের আলোচ্য উক্তিতে। অথবা এরকম কথা তিনি বলেছেন উম্মতকে শিক্ষাপ্রদানার্থে।

জ্ঞাতব্যঃ ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী তাঁর তাফসীরে কবীরে লিখেছেন, হজরত ইব্রাহিমের 'আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করে দিবেন' কথাটিকে বিনম্রবচন বলা, অথবা উম্মতকে শিক্ষাদানার্থে বলা কিংবা কৃতভুলের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনার কথা বলা— এর কোনোটিই ঠিক নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন কেনো? তিনি কি অপরাধী? বিনয়ের কারণে অসত্যভাষণও তো অন্যায়। প্রথমাবস্থায় তিনি তো নিষ্পাপই থাকেন না। আবার উম্মতের শিক্ষাদানার্থেও অসত্যভাষণ অন্যায়। সুতরাং এগুলোর একটিও ঠিক নয়। আমি বলি, ইমাম রাজীর উত্থাপিত সমস্যাগুলোই দৌর্বল্যদুষ্ট। কারণ অসত্যভাষণের অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারতো তখন, যখন তিনি জেনে শুনে এরকম বলতেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তিনি যে নিষ্পাপ সে কথা তিনি তো জানতেনইনা। বিষয়টি এরকম— সুফীসাধকগণ ফানার মাকাম অতিক্রম করার পর নিঃসন্দিগ্ধভাবে উপলব্ধি করেন যে, তাঁর অস্তিত্ব ও অস্তিত্বজ সকল শুভঅর্জন আল্লাহ্প্রদত্ত। নিজেকে তখন তাঁর মনে হয় অনুল্লেখ্য কোনোকিছু। তখন তিনি স্পষ্টতই অনুভব করেন যে, আমার প্রবৃত্তিই সকল অনিষ্টের উৎপত্তিস্থল। যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করেন— 'মা আসবাকা মিন

www.eelm.weebly.com

হাসানাতিন ফামিনাল্লহি ওয়ামা আসবাকা মিন সায়্যিয়াতিন ফামিন নাফসিকা' (তোমাদের নিকট শুভ যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, আর যা কিছু অশুভ তা সমুদ্ভূত হয় তোমাদের প্রবৃত্তি থেকে)। এমতাবস্থায় তিনি নিজেকে অপরাধী বলেই মনে করেন। আর এমতো দর্শনকে অসত্য বলা যায় না।

রসুল স. একবার জোহরের নামাজ দুই রাকাত পড়েই সালাম ফিরিয়েছিলেন। জুল ইয়াদাইন নামক জনৈক সাহাবী তখন নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! নামাজ কি হ্রাস করা হয়েছে, না ভুলক্রমে এরকম হলো? তিনি স. বললেন, দু'টোর একটিও নয়। হজরত জুল ইয়াদাইন তখন বললেন, কিছু তো একটা হয়েছেই। লক্ষণীয়, রসুল স. এর এমতো উক্তিকে কি অসত্য বলা যায়? তবে ভুল তো বলা যায় অবশ্যই। পাপ ও ভুল নিশ্চয়ই এক কথা নয়। একটি ইচ্ছাকৃত এবং অপরটি অনিচ্ছাকৃত। একারণেই রসুল স. প্রার্থনা করতেন, 'রব্বিগফিরলি খত্বিয়াতী' (হে আমার প্রভুপালক! আমার ভুলসমূহ মার্জনা করো)। এ হচ্ছে তাঁর রসুলসুলভ বিনয়বচন। আর এরকম উক্তিতে অসত্যাচারের সন্দেহ আসতেই পারে না। হজরত ইব্রাহিমের আলোচ্য উক্তিটিও তেমনি। তাছাড়া এমতো উক্তিকে ঠিক বিনয়বচনও বলা যায় না। এ হচ্ছে আসলে চিরঅমুখাপেক্ষী আল্লাহ্র সকাশে চিরমুখাপেক্ষী সৃষ্টির পরাভব প্রকাশ। বরং এ হচ্ছে সর্বোচ্চ সত্যভাষণ। বাহ্যিক অথবা আন্তরিক পাপের সঙ্গে এর অনুমাত্র সম্পর্ক নেই। এই প্রসঙ্গটির কিয়দংশ আমি আলোচনা করেছি 'সুরা মুহাম্মদ' এর 'ইস্‌তাগফির লিজামবিকা' আয়াতের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরকমও হতে পারে যে, হজরত ইব্রাহিম হয়তো কখনো কখনো উম্মতের হিতাকাংখাজনিত মমতাবশে কষ্টসাধ্য (আযীমত) আমলের স্থলে সহজসাধ্য (রুখসাত) আমল করে থাকবেন, যাতে উম্মতের অনুসরণ কর্ম সহজসাধ্য হয়। সে কারণেই তিনি হয়তো আমলের অপেক্ষাকৃত কম উত্তমতা স্মরণ করে বলেছিলেন 'এবং আশা করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করবেন'।

কেউ কেউ বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের তিনটি বক্তব্য ছিলো ভুল। যেমন— তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছিলেন 'ইন্‌নি সাক্বীম' (আমি অসুস্থ)। অথচ তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন না। ২. 'বাল ফায়া'লাহু কাবীরুহুম' (একর্ম করেছে বড় মূর্তিটি), অথচ মূর্তি কোনো কর্মই করতে পারে না। ৩. হজরত সারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন, 'হাজিহী উখতি' (এ হচ্ছে আমার বোন), অথচ তিনি তাঁর বোন ছিলেন না, ছিলেন পত্নী। এই তিনটি ভুলকে চিহ্নিত করেছেন মুজাহিদ। আর হাসান উদ্ধার করেছেন তাঁর আর একটি ভুলের কথা।

www.eelm.weebly.com

সেটি হচ্ছে 'হাজা রব্বি' (এটিই তো আমার প্রভুপালক)। অনুসন্ধিৎসার পথপরিক্রমার এক পর্যায়ে তারকা-চন্দ্র-সূর্যকে লক্ষ্য করে তিনি এরকম বলেছিলেন। সুতরাং তাঁর এমতো ভুলের সংখ্যা দাঁড়ালো চারে। আমি বলি, এগুলো প্রকৃতপক্ষে কোনো ভুলই নয়। এগুলো হচ্ছে লক্ষ্যার্থক উক্তি। এমতো উক্তির মধ্যে বক্তার উদ্দেশ্য থাকে একরকম এবং শ্রোতা তার অর্থ করে অন্যরকম। আসল কথা হচ্ছে, নিজেকে অপরাধী ভাবা আল্লাহ্‌র দাসত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অনুভূতি। নবী-রসুলগণই হচ্ছেন আল্লাহ্‌র প্রকৃত দাস। অন্যান্য বিশ্বাসীরা তাঁদের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ অনুকারক মাত্র। সুতরাং বুঝতে হবে নবী-রসুলগণের অপরাধ মার্জনার বিষয়টিতে রয়েছে আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজনতা ও দাসসুলভতার সর্বোত্তম দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা ও চেতনা। এ বিষয়টি তাই বিচার্য অসাধারণত্বের ও মহাসত্যের নিরিখে। সাধারণ নিরিখ এক্ষেত্রে অচল। মাসরুক সূত্রে বাগবী লিখেছেন, জননী আয়েশা বর্ণনা করেন, একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করা হলো, মূর্খতার যুগে জাদয়া'ন ছিলো পুণ্যকর্মপ্রেমিক। সে পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনের উপকার করতো, পানাহার করাতো দরিদ্র ও নিরন্নদের। সে কি আখেরাতে এর বিনিময় পাবে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, যদি সে কখনো বলে থাকে, 'আশা করি কিয়ামত দিবসে আমার প্রভুপালক আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করে দিবেন'।

এভাবে আলোচ্য আয়াত পঞ্চকের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হজরত ইব্রাহিম তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে প্রকৃত উপাস্যের বৈশিষ্ট্যাবলী উন্মোচন করলেন এভাবে— তিনি সৃষ্টি করেন, পথপ্রদর্শন করেন, পানাহার করান, দান করেন নিরাময়, মৃত্যু এবং মার্জনা করেন মানুষের অপরাধ। এ সকল গুণ যার মধ্যে নেই, সে বা তারা কখনোই উপাস্য হতে পারে না। সুতরাং তার বা তাদের উপাসনা অসিদ্ধ, নিষিদ্ধ ও অমার্জনীয় অপরাধ।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ○ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ
فِي الْآخِرِينَ ○ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ○ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ
مِنَ الضَّالِّينَ ○ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ○ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ○
إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ○

www.eelm.weebly.com

❒ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানদান কর এবং সৎকর্মপরায়ণদিগের শামিল কর।'
❒ 'আমাকে পরবর্তীদিগের মধ্যে যশস্বী কর,
❒ 'এবং আমাকে সুখদ কাননের অধিকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত কর,
❒ 'আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর, তিনি তো পথভ্রষ্ট।'
❒ 'এবং আমাকে লাঞ্ছিত করিও না পুনরুত্থান দিবসে,
❒ যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসিবে না',
❒ 'সে দিন উপকৃত হইবে কেবল সে যে আল্লাহের নিকট আসিবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানদান করো এবং সৎকর্মপরায়ণদের শামিল করো'। এখানে 'হুকমান' অর্থ জ্ঞান ও কর্মের পূর্ণত্ব। আর 'সলিহীন' অর্থ নবী-রসুলগণ, যাঁরা নিষ্পাপ এবং জ্ঞান ও কর্মে যাঁদের অপূর্ণতা বলে কিছু নেই। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হজরত ইব্রাহিম প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমাকে সমৃদ্ধ করো জ্ঞানগত ও কর্মগত বৈভবে, যেনো আমি স্থায়ী হই তোমার বচনবহনের দায়িত্বে হই সৎকর্মপরায়নদের সফল সতীর্থ।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী করো'। একথার অর্থ— পরবর্তী যুগের মানুষের স্মরণে ও উচ্চারণে আমার স্মৃতিকে করো অমলিন ও উচ্চকিত। আমার প্রসঙ্গকে করো অপযশবিমুক্ত। অথবা অর্থ হবে— আমার শুভস্মরণের মাধ্যমে আগামী মানবতা যেনো পায় পথের দিশা। অযথার্থ সুনামে অথবা দুর্ণামে যেনো তারা কলংকিত না করে আমার স্মৃতিকে।

এরপরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'এবং আমাকে সুখদ কাননের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো'। একথার অর্থ— আর পরবর্তী পৃথিবীতে যারা পাবে তোমার চিরঅনুগ্রহরঞ্জিত স্বর্গোদ্যানের অধিকার, আমাকে কোরো তাদেরই অন্তর্ভূত।

এরপরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'আর আমার পিতাকে ক্ষমা করো, তিনি তো পথভ্রষ্ট'। উল্লেখ্য, হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতার জন্য এরকম প্রার্থনা করতেন ততকাল পর্যন্ত, যতকাল তাঁর এই তথ্যটি জানা ছিলো না যে, তাঁর পিতা চিরভ্রষ্ট। কিন্তু যখন তিনি একথা জানতে পারেন, তখন স্থগিত করেন তাঁর এমতো ক্ষমাপ্রার্থনা। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন 'ওয়ামা কানাস্তিগফারু

www.eelm.weebly.com

ইবরহীমা লি আবীহী ইল্লা আন্ মাওয়ি'দাতিন ওয়াআদাহা ইয়্যাহু ফালাম্মা তারা ইয়্যানা লাহু আন্নাহু আদুওউলিল্লাহি তাবাররাআ মিনহু'। আরো উল্লেখ্য, হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতার জন্য নিয়মিত ক্ষমাপ্রার্থনার অঙ্গীকার করেছিলেন, তাই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি তাঁর অঙ্গীকার পালন করেছিলেন। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার জন্য এরকম প্রার্থনা করে গিয়েছিলেন।

এরপরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— 'এবং আমাকে লাঞ্ছিত কোরো না পুনরুত্থান দিবসে'। একথার অর্থ— এবং যখন আপন সমাধি হতে আমি পুনরুত্থিত হবো, তখন আমাকে কোরো না অপমানিত।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমাকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি ওই সকল লোক সম্পর্কে কিছু জানেন কি, পরকালে আল্লাহ্ যাদের সঙ্গে গোপনে কথা বলবেন। আমি বললাম, হ্যাঁ। রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে একদল লোক তখন তাদের প্রভুপালকের এতো নিকটবর্তী হবে যে, পর্দা বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ্ তাদের এক একজনকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি পৃথিবীতে এই এই অপকর্মগুলো করোনি? তারা বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলবেন, পৃথিবীতে আমি সেগুলোকে মানুষের নিকট থেকে গোপন রেখেছিলাম। আর আজ এগুলোকে মাফ করে দিলাম। এরপর তাদের আমলনামা দেয়া হবে তাদের ডান হাতে। আর কাফের ও মুনাফিকদেরকে লক্ষ্য করে ঘোষণা দেয়া হবে— 'হাউলায়িললাজীনা কাজজাবু আ'লা রব্বিহিম আলা লা'নাতুল্লহি আ'লাজ্ জলিমীন' (এরা সে সব লোক যারা অসত্যারোপ করেছিলো তাদের পালনকর্তার উপর। সাবধান! জালেমদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ)।

এরপর ৮৮ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যেদিন কোন কাজেই আসবেনা সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি'।

এরপরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহ্র নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে'। এখানে 'ক্বলবিন সালিম' অর্থ শিরিক ও সন্দেহ থেকে মুক্ত হৃদয়। এরকম প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিকে যে পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে এমন নয়। কারণ অল্পবিস্তর পাপ মানুষের থাকেই। বাগবী লিখেছেন, এটাই অধিকাংশ ব্যাখ্যাতাগণের অভিমত।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, বিশ্বাসীরা প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী। আর ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয়ের অধিকারী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটচারীরা। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, পুণ্যবান-পাপী সকল প্রকার বিশ্বাসীরা প্রশান্ত হৃদয় বিশিষ্ট। আবু ওসমান নিশাপুরী বলেছেন, সুন্নতের অনুসারী এবং বেদাত থেকে

www.eelm.weebly.com

বিমূখ ব্যক্তিরাই সালিম কলব বিশিষ্ট। অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অনুসারী যারা, তাদের অন্তঃকরণই প্রশান্ত। এভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়— ওই দিন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কারো কোনো উপকারে আসবে না, উপকারে আসবে কেবল তাদের যাদের রয়েছে প্রশান্ত হৃদয়। প্রকৃত কথা হচ্ছে, ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পুণ্যকর্ম, যেমন স্বজনদের সঙ্গে সদাচার, অতিথি সৎকার, নিরন্নকে অন্নদান ইত্যাদি তাকে পরিত্রাণ দিতে পারে না, যেহেতু সে বিশ্বাসী নয়। এমন কি তার সন্তান যদি নবীও হন, তবুও তার কোনো লাভ হবে না। কারণ কোনো নবীই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সুপারিশ করবেন না। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'নবী এবং বিশ্বাসীগণের জন্য বৈধ নয় যে, তারা অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবে, যদিও তারা হয় নিকটাত্মীয়'।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, মহাবিচারের দিবসে নবী ইব্রাহিম তাঁর পিতাকে দেখতে পাবেন ধূলিধূসরিত অবস্থায়। বলবেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আমার অনুসরণ করুন? পিতা বলবেন, আজ আমি তোমার অনুগত। নবী ইব্রাহিম প্রার্থনা করবেন, হে আমার প্রভুপালক! তুমি অঙ্গীকার করেছিলে, কিয়ামতের দিন আমাকে অপমানিত করবে না। আজ আমার জনয়িতা দুর্দশাগ্রস্ত। তাঁর অবমাননা কি আমার অবমাননা নয়? আল্লাহ্ বলবেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য জান্নাত হারাম। এরপর তাঁর প্রতি নির্দেশ ঘোষিত হবে, তোমার পায়ের দিকে লক্ষ্য করো। তিনি তাঁর দৃষ্টি অধোমুখী করলে দেখতে পাবেন, একটি হিংস্র ও লোমশ মাংশাসী জন্তুকে দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায় দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। নবী ইব্রাহিম তখন হয়ে যাবেন নির্বাক, নির্বিকার। শোনো, বিশ্বাসীরা আল্লাহ্র পথে পুণ্যার্জনের আশায় যে সম্পদ ব্যয় করে, তার বিনিময় সে অবশ্যই পাবে। আর তার পুণ্যবান সন্তান-সন্ততিরাও সেদিন তাদের জন্য করবে সুপারিশ ও ক্ষমাপ্রার্থনা।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ৯০—১০১

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۝ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ۝ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ۝ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۝ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۝ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ۝ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ۝ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ۝

www.eelm.weebly.com

❒ সাবধানীদিগের নিকটবর্তী করা হইবে জান্নাত,

❒ এবং পথভ্রষ্টদিগের জন্য উন্মোচিত করা হইবে জাহান্নাম;

❒ উহাদিগকে বলা হইবে, 'তাহারা কোথায় তোমরা যাহাদিগের ইবাদত করিতে

❒ 'আল্লাহের পরিবর্তে? উহারা কি তোমাদিগের সাহায্য করিতে পারে? না, উহারা আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম?'

❒ অতঃপর উহাদিগকে এবং পথভ্রষ্টদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে অধোমুখী করিয়া,

❒ এবং ইব্‌লীসের বাহিনীর সকলকেও।

❒ উহারা সেথায় বিতর্কে লিপ্ত হইয়া বলিবে,

❒ আল্লাহের শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম,

❒ 'যখন আমরা তোমাদিগের বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করিতাম।'

❒ 'আমাদিগকে দুষ্কৃতিকারীরা বিভ্রান্ত করিয়াছিল।'

❒ 'পরিণামে, আমাদিগের কোন সুপারিশকারী নাই।'

❒ এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নাই!

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাবিচারের দিবসে বিচারস্থল থেকেই পৃথিবীতে পথপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টরা দেখতে পাবে যথাক্রমে জান্নাত ও জাহান্নাম। তারা তখন সকলেই বুঝতে পারবে তাদের আপনাপন গন্তব্য সুনিশ্চিত। বায়যাবী লিখেছেন, প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে 'উযলিফাত' এবং দ্বিতীয় আয়াতে 'বুররিযাত'। উভয় শব্দ আল্লাহ্‌তায়ালার দৃঢ় অঙ্গীকারজ্ঞাপক। অর্থাৎ বিষয়টির অন্যথা অসম্ভব।

পরের আয়াতদ্বয়ের (৯২, ৯৩) মর্মার্থ হচ্ছে— পথভ্রষ্টদেরকে তখন বলা হবে, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা যে সকল মিথ্যা মাবুদের উপাসনা করতে, তারা কি এখন তোমাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি প্রতিহত করতে পারবে, তারা নিজেরাই কি আত্মরক্ষা করতে পারবে? সুতরাং তোমরা ও তোমাদের উপাস্যরা সকলেই হবে জাহান্নামের ইন্ধন।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৯৪, ৯৫) মর্মার্থ হচ্ছে—অতঃপর সেই সকল বাতিল উপাস্য ও তাদের উপাসকদেরকে অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে নরকাগ্নিতে। নিক্ষেপ করা হবে ইবলিসের বাহিনীর সকলকেও।

হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'ফাকুবকিবু' কথাটির অর্থ করেছেন— জাহান্নামের মধ্যে তাদেরকে একত্রিত করা হবে। মুজাহিদ অর্থ করেছেন,

www.eelm.weebly.com

তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অধোমুখী করে। মুকাতিল বলেছেন, ঠেলে ফেলে দেয়া হবে। জুজায বলেছেন, একজনকে ছুঁড়ে ফেলা হবে অপরজনের উপর। কুতাইবী বলেছেন, মাথা নিম্নমুখী করে ফেলে দেয়া হবে দোজখে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'কাব্‌বাহু' অর্থ উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন— 'আকাব্‌বাহু ওয়া কাবকাবাহু ফাআকাব্‌বাহু' (তাকে উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে, তারপর সে পড়ে গিয়েছে উপুড় হয়ে)। অর্থাৎ 'কাব্‌বা' ও 'কাব্‌কাবা' শব্দ দু'টো সমঅর্থসম্পন্ন। বায়যাবী লিখেছেন, 'কাবকাব' এর দ্বিতীয় 'কাফ' অক্ষরটি পুনরাবৃত্তিজ্ঞাপক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে, সে গড়াতে গড়াতে পতিত হবে দোজখের তলদেশে।

'ইবলিসের বাহিনীর সকলকেও' অর্থ যে সকল জ্বিন ও মানুষ ইবলিসের অনুসারী তাদেরকে। কেউ কেউ বলেছেন, ইবলিসের বংশোদ্ভূতদেরকে।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ের (৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯) মর্মার্থ হচ্ছে— প্রতিমাপূজকেরা সেখানে প্রতিমাগুলোর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, আল্লাহ্‌র শপথ! পৃথিবীতে আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রভুপালনকর্তার সমকক্ষ মনে করে কতোইনা বিভ্রান্তিতে পড়েছিলাম। আর আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলো শয়তান, পুরোহিত ও বিভ্রান্ত সমাজপতিরা। উল্লেখ্য, সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হবে প্রতিমাগুলো ও তাদের পূজারীরা। আল্লাহ্ তখন জড়প্রতিমাগুলোকে জীবন দান করবেন। অথবা বর্ণিত বিতর্ক উপস্থাপন করবে কেবল পূজারীরা। প্রতিমাগুলো থাকবে পূর্বের মতোই অপ্রাণ। সুতরাং এখানে 'বিতর্ক করবে' কথাটির অর্থ হবে আক্ষেপ করবে। অর্থাৎ ওই নিথর মূর্তিগুলোর সামনে তারা আক্ষেপে জর্জরিত হয়ে স্বীকার করবে যে, তোমাদেরকে উপাস্য মনে করেই আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আর শয়তান, পুরোহিত ও অংশীবাদী সমাজপতিরাই আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো বিভ্রান্তির দিকে। কালাবী বলেছেন, এখানে 'দুষ্কৃতিকারীরা' অর্থ নেতৃস্থানীয় অংশীবাদীরা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (১০০, ১০১) মর্মার্থ হচ্ছে— তারা আরো বলবে, হায়! আজ আমরা অসহায়। বিশ্বাসীদের সুপারিশকারী বন্ধুরূপে আজ রয়েছে নবী, ফেরেশতা ও সৎকর্মপরায়ণেরা। অথচ আমাদের পক্ষে আজ কেউই নেই।

এখানে 'শাফিয়ীন' (সুপারিশকারীগণ) বহুবচনে এবং 'সদিক্ব' (বন্ধু) একবচনে ব্যবহার করার কারণ থাকতে পারে কয়েকটি। যেমন— ১. সাধারণতঃ সুপারিশকারী হতে পারে অনেক, কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু হয় খুব কম। ২. অনেক সুপারিশকারীর চেয়েও একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদের প্রচেষ্টায় থাকে অধিকতর গভীর আগ্রহ ও ভালোবাসা। ৩. 'সদিক্ব' শব্দটি একবচন, বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে

www.eelm.weebly.com

ব্যবহার্য। যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, ফাউল ও ফায়ীলের ওজনের ব্যবহার হয় একবচন ও বহুবচনে। ৪. 'সদিক্ব' প্রকৃতপক্ষে 'জানীন' ও 'সাহীল' এর মতো ধাতুমূল ও বিশেষণবাচক,আর এরকম মূল শব্দের একবচন ও বহুবচনের শব্দরূপ একইরকম। প্রকৃত কথা হচ্ছে ধাতুমূলের বহুবচন হয়ই না। 'হামীম' অর্থ সহৃদয়। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, শব্দটির অর্থ নিকটজন। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে আসীর এর ওজনে। এর বহুবচন 'আহমা'। শব্দটি বহুবচনার্থে এবং স্ত্রীলিঙ্গবাচকরূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এভাবে তাদের বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আজ আমাদের কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, নিকটাত্মীয়ও নেই, যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন— 'ওই দিন অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে, মুত্তাক্বীগণ ব্যতীত'। অর্থাৎ মুত্তাক্বীরা সেদিন হবে একে অপরের বন্ধু।

হজরত জাবের বর্ণনা করেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, জান্নাতবাসীদের কেউ কেউ বলবে, আমার অমুক বন্ধু কোথায় গেলো? ওই সময় তার ওই বন্ধু জাহান্নামে থাকলেও নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হোক। ওই সময় অন্যান্য জাহান্নামীরা বলবে 'আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই এবং কোনো সহৃদয় বন্ধুও নেই'। হাসান বলেছেন, তোমরা তোমাদের বন্ধুসংখ্যা বৃদ্ধি করো। কেননা পরকালে তারা হবে সুপারিশকারী।

সূরা শুআরা : আয়াত ১০২, ১০৩, ১০৪

فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

❐ 'হায়, যদি আমাদিগের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটিত তাহা হইলে আমরা বিশ্বাসী হইয়া যাইতাম!'

❐ ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশ বিশ্বাসী নহে।

❐ তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— তারা আরো বলবে, হায়! যদি একটিবার আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারতাম, তবে নিশ্চয় আমরা হয়ে যেতাম বিশ্বাসী। এখানে বাক্যের প্রথমেই ব্যবহৃত হয়েছে 'ফালাও'। উল্লেখ্য, 'লাও' হচ্ছে আকাংখাজ্ঞাপক।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১০৩) বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ বিশ্বাসী নয়'। একথার অর্থ— নবী ইব্রাহিমের বৃত্তান্তে রয়েছে মহাসত্যের মহানিদর্শন। যে ব্যক্তি সত্যানুসন্ধিৎসু ও সদুপদেশাকাংখী তার জন্য তাঁর জীবনালেখ্য ও কর্মকুশলতার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র অদ্বিতীয়ত্বের এবং সৃষ্টিরহস্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ। কতো গভীর ছিলো তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও মানবপ্রেম। কতো শানিত ও মর্মস্পর্শী ছিলো বচনামৃত। সত্যের প্রতি আমন্ত্রণের পন্থা ছিলো তাঁর কতো অপরূপ। অসত্যের বিরুদ্ধাচরণের ভঙ্গিটিও ছিলো তাঁর কতো অসাধারণ।

কোরআন মজীদে হজরত ইব্রাহিমের ঘটনা সত্যিই উপস্থাপিত হয়েছে এক অনন্য ব্যঞ্জনায়। সত্যপ্রেমিকেরা তাঁর বৃত্তান্ত পাঠ করে ও শ্রবণ করে আপ্লুত না হয়ে পারেই না। তদুপরি তাঁর এমতো বৃত্তান্তের অভূতপূর্বে পরিবেশনা একথাটিও প্রমাণ করে যে, সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. সত্য নবী। কারণ অক্ষরের অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে অক্ষরের এমতো অতুলনীয় বিন্যাস। অতএব একথা মানতেই হবে যে, কোরআন যেমন সত্য, তেমনি সত্য কোরআন ধারণকারীও।

এরপরের আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— এই কোরআন অস্বীকারকারীকে আল্লাহ্ অবশ্যই যে কোনো মুহূর্তে শাস্তিতে নিপতিত করতে পারেন। কারণ তিনি সর্বশক্তিধর। মহাপ্রতাপশালী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে কিছুকাল অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যদি তারা ফিরে আসে, অথবা যদি ফিরে আসে তাদের সন্তান-সন্ততিরা। সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের পথ তো সতত উন্মুক্ত। আর প্রত্যাবর্তনকারীকে তিনিই তো করেন অনন্ত সম্ভাবনা ও অনুগ্রহরাজিতে ভরপুর। তিনি যে তাঁদের প্রতি পরম অনুগ্রহপরবশ।

সূরা শুআরা : আয়াত ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝ وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝

❒ নূহের সম্প্রদায় রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল।

❒ যখন উহাদিগের ভ্রাতা নূহ উহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না?'

www.eelm.weebly.com

❒ আমি তো তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল,

❒ 'অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

❒ 'আমি তোমাদিগের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না; আমার পুরস্কার তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

❒ 'সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'নুহের সম্প্রদায় রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিলো'। এখানকার 'ক্বওমুন' (সম্প্রদায়) শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক। সুতরাং শব্দটি তাসগীরের (ন্যূনতা প্রকাশক) অবস্থায় 'কুয়াইমাতুন' হতে পারতো। এভাবে প্রকাশ করা যেতো তায়ে তানীসকে। আর 'আল মুরসালীন' (রসুলগণ) বহুবচনের শব্দরূপ হলেও জাতিবাচক অর্থ প্রকাশক। যেমন বলা হয় 'ফুলানুন ইয়ারকাবুনা খইলা' (অমুক ব্যক্তি ঘোড়ার উপর আরোহণ করে) এমতাবস্থায় লোকটি একটি ঘোড়ায় আরোহণ করলেও 'ইয়ারকাবুনা খইলা' বলা যাবে। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, হজরত নুহের সম্প্রদায় সকল রসুলকেই অস্বীকার করতো। তাই এখানে ব্যবহৃতা হয়েছে বহুবচনার্থক 'আল মুরসালীন'।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হাসান বসরীকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, আবু সাঈদ এরকম বলেছেন, আল্লাহ্পাক একস্থানে এরশাদ করেছেন 'কাজ্জাবাত ক্বওমু নুহি লিল্ মুরসালীন', আর এক স্থানে বলেছেন 'কাজ্জাবাত ছামুদুলিল মুরসালীন'। অথচ হজরত নুহের সম্প্রদায় এবং আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়ের জন্য রসুল প্রেরিত হয়েছিলেন একজন করে। হাসান বসরী একথা শুনে বললেন, প্রত্যেক রসুল প্রেরিত হন একই বিশ্বাস ও ধর্মের একই মূলনীতি নিয়ে। তাই তাঁদের যে কোনো একজনকে অস্বীকার করার অর্থ সকলকেই অস্বীকার করা। আর সে কারণেই তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি একজন করে রসুল প্রেরিত হলেও ব্যবহৃত হয়েছে জাতিবাচক ও বহুবচনার্থক 'আলমুরসালীন'।

পরের আয়াতে (১০৬) বলা হয়েছে— 'যখন তাদের ভ্রাতা নুহ তাদেরকে বললো, তোমরা কি সাবধান হবে না?' এখানে 'তাদের ভ্রাতা' অর্থ তাদের বংশসম্পৃক্ত ভ্রাতৃস্থানীয়, ধর্মীয় ভ্রাতা নয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (১০৭, ১০৮) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত নুহ তাদেরকে আরো বললেন, আমিতো তোমাদের জন্য বিশ্বাসভাজন বার্তাবাহক। অতএব, তোমরা আল্লাহ্র অসন্তোষের ভয়ে বিগ্রহবন্দনা পরিহার করো। আশ্রয় করো আমার আনুগত্যকে।

এখানে 'বিশ্বস্ত রসুল' (রসুলুন আমীনুন) অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশের রক্ষক, আমানতদার। আর তোমাদের মধ্যেও আমার সংরক্ষকত্বক গুণ ও সত্যবাদিতা সুবিদিত।

www.eelm.weebly.com

'আমার আনুগত্য করো' অর্থ প্রত্যাদেশিত যে বিধান আমি তোমাদের সামনে প্রচার করি, আনুগত্য করো সেই বিধানের।

এরপরের আয়াতে (১০৯) বলা হয়েছে— 'আমি তোমাদের নিকট এর জন্য অন্য কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটেই আছে'। একথার অর্থ— হজরত নুহ তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানালেন এই মর্মে যে, দ্যাখো, সত্যপ্রচারের যে শ্রম আমি দিয়ে চলেছি তার জন্য আমি পার্থিব প্রতিদানাকাংখী নই, আমার শ্রমের বিনিময় তো জমা রয়েছে আমার, তোমাদের ও মহাবিশ্বের প্রভুপালনকর্তা আল্লাহ্‌র কাছে। সুতরাং ভেবে দেখো আমার আনুগত্য তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক কিনা। আমি তো যেমন আমানতদার, তেমনি নির্লোভ। সুতরাং তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবেনা কেনো?

শেষোক্ত আয়াতে (১১০) বলা হয়েছে— 'সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো'। বাক্যটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে বক্তব্যকে দৃঢ়তা প্রদানার্থে এবং অতিশয় গুরুত্ব আরোপনার্থে।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬

قَالُوٓا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ۝ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ۝ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ إِنْ
أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۝

❐ উহারা বলিল, 'আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব যখন দেখিতেছি ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করিতেছে?'

❐ নূহ বলিল, 'উহারা কী করিত তাহা আমি জানি না।'

❐ 'উহাদিগের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ; যদি তোমরা বুঝিতে!'

❐ 'বিশ্বাসীদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নহে।'

❐ 'আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।'

❐ উহারা বলিল, 'হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে তোমাকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহত করা হইবে।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো যখন দেখছি ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করছে?' এখানে 'আরজালূন'

www.eelm.weebly.com

অর্থ বিত্তহীন, মর্যাদাহীন। বায়যাবী লিখেছেন, যার মর্যাদা ও সম্পদ কম তাকে বলে 'আরজালূন'। বাগবী শব্দটির অর্থ করেছেন, ইতর শ্রেণীর লোক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ স্বর্ণকার। ইকরামা বলেছেন, তাঁতী ও মুচি।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হজরত নুহের সম্প্রদায়ের উক্তিতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, তারা ছিলো নির্বোধ। কারণ পার্থিব সম্মান ও সম্পদকেই তারা মনে করতো আভিজাত্য ও কৌলিন্যের প্রতীক। তাই তাদের ধারণা হয়েছিলো, ব্রাত্যজনেরা নুহের অনুসারী হয়েছে পার্থিব কিছু প্রাপ্তির জন্য, অথবা জাতে ওঠার জন্য। চিন্তা-ভাবনা করে তাদের কেউ নুহের ধর্মমতানুসারী হয়নি। এমতো অপধারণার বশবর্তী হয়েই তারা ভেবে বসেছিলো, নুহের ধর্মমত অভিজাতদের জন্য নয়।

পরের আয়াতদ্বয়ের (১১২, ১১৩) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত নুহ জবাব দিলেন, আমার অনুসারীরা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী, না বিত্তলোভী তা দেখার দায়িত্ব আমার নয়। আল্লাহ্ যথাসময়ে তাদের, তোমাদের ও আমার হিসাব গ্রহণ করবেন। তিনিই সকলের অন্তরের গোপনীয়তা সম্পর্কে সম্যক অবগত। একথা তোমরা জানো না, জানলে এভাবে নির্বোধ ও অন্তর্দৃষ্টিহীনদের মতো কথা বলতে পারতে না। ফার্রা কথাটির অর্থ করেছেন— যদি তোমরা জ্ঞানী হতে, তবে ব্যক্তিগত কারণে তাদেরকে হীন মনে করতে না। জুজায বলেছেন, ধর্মীয় সম্মান পেশার উপরে নির্ভরশীল নয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (১১৪, ১১৫) মর্মার্থ হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা দরিদ্র বিশ্বাসীদেরকে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলো, তাই নবী নুহ তাদেরকে বললেন, যারা বিশ্বাসবান, তারা সম্মানার্হ, বিতাড়নের পাত্র তারা নয়। ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণকে আল্লাহ্র অসন্তোষ ও শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করাই আমার দায়িত্ব। তাই অভিজাতদের আবদারে অনভিজাতদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার জন্য অনাধিকার চর্চা।

জুহাক বলেছেন, এখানকার 'মুবীন' অর্থ সুস্পষ্ট প্রমাণ। এভাবে শেষোক্ত বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি তো সুস্পষ্ট প্রমাণের দ্বারা তোমাদেরকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সাবধানকারী। সুতরাং তোমাদের সন্তোষ সাধনার্থে আমি বিশ্বাসবানদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারি না।

এরপরের আয়াতে (১১৬) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে নুহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করা হবে'। মুকাতিল, কালাবী ও জুহাক এখানকার 'মারজুমীন' কথাটির অর্থ করেছেন 'মাশতুমীন'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হজরত নুহের নবীসুলভ প্রজ্ঞা ও প্রতর্কাস্ত্রের সামনে

www.eelm.weebly.com

টিকতে না পেরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। রোষভরে বললো, হে নূহ! তোমার ধর্মপ্রচার যদি তুমি বন্ধ না করো, তবে আমরা তোমার প্রতি বর্ষণ করবো অকথ্য গালাগালি ও ভর্ৎসনা।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ○ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَ مَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ○ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ○ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ○ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

❑ নূহ বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে।'

❑ 'সুতরাং আমার ও উহাদিগের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করিয়া দাও এবং আমাকে ও আমার সহিত যে-সব বিশ্বাসী আছে তাহাদিগকে রক্ষা কর।'

❑ অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার সংগে যাহারা ছিলো তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম বোঝাই নৌ-যানে।

❑ তৎপর অবশিষ্ট সকলকে নিমজ্জিত করিলাম।

❑ ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

❑ এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— সুদীর্ঘকাল ধরে সত্যধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত রইলেন হজরত নূহ। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া তাঁর সম্প্রদায়ের অধিকাংশই রয়ে গেলো সত্যপ্রত্যাখ্যানে অনড়। এক সময় আল্লাহ্র প্রিয় নবী নিশ্চিত হলেন যারা ইমান আনবার তারা ইতোমধ্যেই ইমান এনেছে, অবশিষ্টরা কস্মিনকালেও আর ইমান আনবে না, তখন তিনি এ বিষয়ে একটি মীমাংসা কামনা করলেন। প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! অবাধ্যরা বার বার আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেই চলেছে। সুতরাং আমার ও তাদের মধ্যে একটা মীমাংসা করে দাও। তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করো আমাকে ও আমার অনুসারীগণকে। হজরত নূহের প্রার্থনা গৃহীত হলো। প্রত্যাদেশানুসারে তিনি নির্মাণ করলেন একটি বৃহৎ তরণী। ওই তরণীতে অনুসারীগণকে নিয়ে

www.eelm.weebly.com

আরোহণ করলেন মহাপ্লাবনের প্রাক্কালে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা উচ্চভূমিতে ও পর্বতশিখরে উঠে বাঁচতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। ভয়াবহ প্লাবনে নিমজ্জিত হলো সারা পৃথিবী। পরিত্রাণ লাভ করলেন কেবল হজরত নুহ ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরেরা।

অবাধ্য ও দুর্বিনীত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বছরের পর বছর হজরত নুহের উপরে চালিয়েছিলো অকথ্য অত্যাচার। কিন্তু এ সকল অত্যাচারের কথা তিনি তাঁর প্রার্থনায় উল্লেখ করেননি। উল্লেখ করেছেন কেবল এই কথাটি 'আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে'। একথার অর্থ— আমি তোমার যে বাণীর প্রচারক, সেই সত্য বাণীকেই তো তারা ক্রমাগত মিথ্যা সাব্যস্ত করে চলেছে। সুতরাং তাদের সঙ্গে আমার ও আমার অনুচরবর্গের একটা চূড়ান্ত মীমাংসা আমি চাই।

এখানে 'আল বাক্বীন' অর্থ অবশিষ্টরা। অর্থাৎ হজরত নুহের তরণীতে যারা আরোহণ করেনি, তারা। বলাবাহুল্য, তারা সকলেই মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়ে চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিলো পৃথিবী থেকে। তারা সকলেই ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

পরের আয়াতদ্বয়ের (১২১, ১২২) মর্মার্থ হচ্ছে— নিশ্চয় নবী নুহ ও মহাপ্লাবনের ইতিবৃত্তের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার পরাক্রম ও দয়ার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সলিল সমাধিপ্রাপ্তি এবং নৌকারোহী বিশ্বাসীগণের উদ্ধারপ্রাপ্তি নিঃসন্দেহে নিদর্শন তাঁর অপার পরাক্রমের ও দয়ার। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের অভিযাত্রা যেহেতু বিশ্বাসের দিকে নয়, তাই তারা বিষয়টির অন্তর্নিহিত রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করে না। ক্ষতিগ্রস্ত হয় চিরতরে।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِيْنَ ○ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ○ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ○ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○ وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ○ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ○

☐ আদ-সম্প্রদায় রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল।

☐ যখন উহাদিগের ভ্রাতা হুদ উহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না?'

www.eelm.weebly.com

❒ 'আমি তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।'

❒ 'অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।'

❒ 'আমি তোমাদিগের নিকট ইহার জন্যে কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট আছে।'

❒ 'তোমরা তো অযথা প্রতিটি উচ্চস্থানে স্তম্ভ নির্মাণ করিতেছ;'

❒ 'তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছ এই মনে করিয়া যে, তোমরা চিরস্থায়ী হইবে।'

আদ সম্প্রদায়ের উর্ধ্বতন পিতৃপুরুষের নাম আদ। কিন্তু এখানে তার নাম উচ্চারণ করে বুঝানো হয়েছে তার সম্প্রদায়কে। সেকারণেই ব্যবহৃত হয়েছে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দরূপে 'কাজ্‌জাবাত'। 'আখুহুম' অর্থ সম্প্রদায়সম্পৃক্ত ভ্রাতা, ধর্মসম্পর্কিত ভ্রাতা নয়। 'আলা তাত্তাকুন' অর্থ সাবধান হও শিরিক থেকে, গ্রহণ করো আল্লাহ্‌র এককত্বের বিশ্বাসকে। আর 'রসুলুন আমীন' অর্থ বিশ্বাসভাজন রসুল। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— সত্যপথচ্যুত আদ সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে আমি তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম আমার প্রিয় নবী সালেহ্‌কে। কিন্তু তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, আমি তো তোমাদেরই সম্প্রদায়ভূত। আমি তো তোমাদের প্রকৃত সুহৃদ। অতএব আমার কথা মান্য করো। আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত বিশ্বজগতের প্রভুপালকের বচনবাহক। আমি এ দায়িত্বে বিশ্বস্ত। আর তোমাদের কাছেও আমার বিশ্বস্ততার বিষয়টি অবিদিত নেই। হে আমার সম্প্রদায়! সাবধান হও। পরিত্যাগ করো অংশীবাদিতা। গ্রহণ করো এক আল্লাহ্‌র চিরঅক্ষয় বিশ্বাস। ভয় করো কেবল তাঁকে এবং আনুগত্য করো আমার। কালাবী বলেছেন, এখানে 'তোমাদের এক বিশ্বস্ত রসুল' কথাটির অর্থ— হজরত সালেহ্ তাদেরকে বললেন, রেসালতের দাবি উত্থাপনের পূর্বেও তো তোমরা আমাকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসভাজন বলে মানতে, তথাপি তোমরা কেনো মেনে নিচ্ছো না আমার রেসালাতের শুভসমাচারকে।

পরের আয়াতে (১২৭) বলা হয়েছে— 'আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে'। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী যুগের মনিষীবৃন্দ বলেছেন, ধর্মীয় শিক্ষাদান ও ধর্মপ্রচারের পারিশ্রমিক গ্রহণ অসিদ্ধ।

এরপরের আয়াতে (১২৮) বলা হয়েছে— 'তোমরা তো অযথা প্রতিটি উচ্চস্থানে স্তম্ভ নির্মাণ করছো।' একথার অর্থ— হজরত হুদ তাদেরকে আরো বললেন, তোমরা তো বিনা প্রয়োজনে ও কারণে অধিকাংশ উচ্চ স্থানে প্রাসাদ ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করছো।

www.eelm.weebly.com

ওয়ালুবির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'রিউন' অর্থ উচ্চস্থান। জুহাক ও মুকাতিল অর্থ করেছেন, প্রতিটি পথ। আউফির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতও এরকম। মুজাহিদ বলেছেন, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলে 'রিউন'। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, এর অর্থ প্রমোদগৃহ। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, শব্দটি 'কাস্‌রা' ও 'ফাতহা' যুক্ত হলে অর্থ হবে, মৃত্তিকার উচ্চ অংশ অথবা পর্বতের সুড়ঙ্গপথ, কিংবা পার্বত্যভূমির পানি নির্গমনের পথ। 'রী' কাস্‌রা সহযোগে অর্থ হবে, ইহুদীদের উপাসনাগৃহ, ধর্মশালা এবং কবুতরের ঘর। আর এখানকার 'আয়াতান' অর্থ স্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ, প্রাসাদ।

এরপরের আয়াতে (১২৯) বলা হয়েছে— 'তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছো এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে'। একথার অর্থ— তোমাদের এই প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাসাদ পৃথিবীতে যেমন নিরর্থক, তেমনি অনুপকারী আখেরাতে। কী ভেবেছো তোমরা? এমতো নির্মাণ কি তোমাদেরকে চিরস্থায়ী করে রাখবে? তোমরা যেমন মৃত্যুবরণ করবে, তেমনি একসময় এগুলোও হয়ে যাবে ধূলিসাত।

আদ সম্প্রদায় তারকার অবস্থান দেখে নির্ণয় করতো তাদের ভ্রমণের গতিপথ। তাই পথের দিশা নির্ণায়করূপে তারা তাদের সুউচ্চ প্রাসাদমালাগুলো ব্যবহার করতো। হজরত হুদ তাদের ওই নির্মাণকে বলেছিলেন নিরর্থক। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, আদ সম্প্রদায়ের লোকেরা উঁচু মিনারগুলিতে উঠে পর্যবেক্ষণ করতো পথিকদের গতিবিধি। আর এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে করতো হাসিঠাট্টা।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আদেরা কবুতর পালতো, আর উঁচু উঁচু মিনারে সেগুলোর জন্য স্থাপন করতো টঙ। নিঃসন্দেহে এগুলো ছিলো অনর্থক কর্ম। তাই হজরত হুদ বলতেন, এগুলো কি তোমাদেরকে চিরস্থায়ী করবে?

আমি বলি, পৃথিবীপূজকদের রীতি এরকমই। তারা স্মৃতিকে অক্ষয় করবার উদ্দেশ্য নিয়ে নির্মাণ করে বিভিন্ন প্রকার ভাস্কর্য ও স্তম্ভ। এধরনের লোক সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'তোমাদের কি জানা নেই, তোমাদের প্রভুপালক সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণকারী আদ সম্প্রদায়ের সঙ্গে কীরকম আচরণ করেছেন'? রসুল স.ও জাকজমকপূর্ণ অট্টালিকা নির্মাণ পছন্দ করতেন না। তিনি স. বলেছেন, আল্লাহ্ যখন তাঁর কোনো বান্দার অমঙ্গল চান, তখন তাকে নিয়োজিত করে দেন মাটি ও পানি মর্দনের কাজে (ইট তৈরীর কাজে)। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী। তাঁর 'আওসাত' গ্রন্থে হজরত

www.eelm.weebly.com

আবুল বাশার আনসারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যখন তাঁর কোনো বান্দার লাঞ্ছনা কামনা করেন, তখন সে তার সম্পদ ব্যয় করে দালান কোঠা নির্মাণের কাজে। হজরত ওয়াসিলা ইবনে আস্কা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি প্রাসাদ তার মালিকের জন্য বিপদ ও আযাব, ওই প্রাসাদ ব্যতীত, যা এরকম। একথা বলে তিনি প্রসারিত করলেন তাঁর পবিত্র হস্তদ্বয় (ইশারায় দেখালেন—যা প্রয়োজনীয়)।

রসুল স. একবার বাজারের দিকে গমনকালে দেখতে পেলেন একটি গোলাকার ছাদবিশিষ্ট সুদৃশ্য ভবন। বললেন, এটা কার? সঙ্গী সাহাবী বললেন, অমুক আনসারীর। তিনি স. নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। পরে যখন ওই ভবনের মালিক তাঁর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম বললেন, তখন তিনি স. সালামের জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ওই সাহাবী বুঝতে পারলেন, তিনি স. তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন হয়েছেন। কিন্তু তার কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না। পরে অন্যদের কাছে জানতে পারলেন, আসল ঘটনা কী। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভবনটির নিকটে গিয়ে সেটাকে ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার হুকুম দিলেন শ্রমিকদেরকে। কিছুদিন পর রসুল স. সেদিকে গমন করে ভবনটি না দেখতে পেয়ে সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, দালানটির কী হলো। সঙ্গীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার অপ্রসন্নতার কথা জানতে পেরে মালিক দালানটিকে ধূলিসাত করে দিয়েছেন। তিনি স. বললেন, শোনো, প্রত্যেক দালান তার মালিকের জন্য বিপদ ও শাস্তি।

হজরত আনাস থেকে আহমদ ও ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি ইমারত মহাবিচারের দিবসে তার মালিকের জন্য হবে আক্ষেপ ও শাস্তির কারণ, কেবল মসজিদ ও বাসগৃহ ব্যতীত।

আলোচ্য আয়াতের 'মাসানিয়া' শব্দটির অর্থ পানির চৌবাচ্চা, সুদৃঢ় অট্টালিকা, দুর্গ। আর 'লায়ালৃলাকুম তাখলুদুন' অর্থ যেনো তোমরা চিরস্থায়ী হবে।

মাসআলাঃ পার্থিব বিষয়ে অতিরিক্ত আকাংখা মাকরুহ, পরিমিত আকাংখা মোস্তাহাব। হজরত ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. একবার আমার শরীরে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে আজ্ঞা করলেন, আবদুল্লাহ্ ! দুনিয়ায় বসবাস কোরো প্রবাসীরূপে মুসাফিরি হালে এবং নিজেকে গণ্য কোরো মৃত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। বোখারী।

হজরত ওমর বর্ণনা করেন, একবার আমি নির্মাণ কার্যে রত ছিলাম। ইত্যবসরে সেখানে রসুল স. উপস্থিত হয়ে বললেন, কী করছো? আমি বললাম, গৃহ মেরামতের কাজ। তিনি স. বললেন, নির্ধারিত নির্দেশ (মৃত্যু) তো এর আগেই এসে পড়তে পারে। আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীভূত।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. সফরের সময় পানি ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি ফেলে দিতেন। পথে আবার ওজুর প্রয়োজন হলে করে নিতেন তায়াম্মুম। এরকম পরিস্থিতিতে আমি একবার বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! একটু অগ্রসর হলেই তো পানি পাওয়া যাবে। তিনি স. বললেন, অতদূর যাওয়ার আগে আমার যে শেষযাত্রার সিদ্ধান্ত নেমে আসবে না, সে সম্পর্কে কি তুমি নিশ্চয়তা দিতে পারো? হাদিসটি বাগবী বর্ণনা করেছেন তাঁর 'শরহে সুন্নাহ্'য় এবং ইবনে জাওজী তাঁর 'কিতাবুল ওয়াফা'য়।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১৩০—১৪০

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ○ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○ وَاتَّقُوا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ○ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ○ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○ قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ○ اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ○ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ○ فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

❑ 'আর যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হানিয়া থাক নিষ্ঠুরভাবে।'

❑ 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

❑ 'ভয় কর তাঁহাকে যিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন সেই সমুদয় যাহা তোমরা জান।'

❑ 'তোমাদিগকে দিয়াছেন আনয়াম ও সন্তান-সন্ততি,

❑ 'উদ্যান ও প্রস্রবণ',

❑ 'আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তি।'

❑ উহারা বলিল, 'তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও উভয়ই আমাদিগের নিকট সমান।'

❑ 'আমাদিগের এই সব কর্ম পূর্ব পুরুষদিগেরই রীতিনীতি মাত্র,

❑ আমরা শাস্তি পাইব না।'

❑ অতঃপর উহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল এবং আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিলাম। ইহাতে অবশ্যই আছে নিদর্শন; কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই অবিশ্বাসী।

❑ এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াত ষষ্ঠকের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত হুদ তাদেরকে বললেন, তোমরা তো নিষ্ঠুর, নির্দয়, অহংকারী এবং বিনা কারণে মানুষ বধকারী। অতএব, সংযত হও, ভয় করো আল্লাহ্‌কে। আর আনুগত্য করো আমার আনীত ধর্মমতের। ভয় তো করতে হবে তোমাদেরকে তাঁকেই, যিনি তোমাদেরকে দান করেছেন শতসহস্র নেয়ামত। এসকল কথা তোমাদের অজানাও নয়। যেমন ধরো পশুপাল, উদ্যান ও প্রস্রবণ। এতদসত্ত্বেও তোমরা সত্যপ্রত্যাখ্যানে কীরূপ অনড়! তাই তো আমার আশংকা, মহাবিচারের দিবসে তোমাদের অন্তহীন শাস্তি হয়তো অবধারিত।

এখানে 'জাকারীন' অর্থ নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, অন্যায়ভাবে হত্যাকারী। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, শব্দটির অর্থ অহংকারী, ওই অন্তর যা নির্মম এবং অন্যায় হত্যাকাণ্ডের সংঘটক। 'ইননি আখাফু আ'লাইকুম আ'জাবা ইয়াওমিন আ'জীম' অর্থ হে আমার স্বজাতি! যদি তোমরা আমার আনুগত্য না করো, তবে আশংকা হয় মহাবিচারের দিবসে তোমাদের দণ্ড সুনিশ্চিত। এরকম তাফসীর করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস।

পরবর্তী আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— তারা হজরত হুদের সদুপদেশ মান্য করলো না। বরং দর্পভরে বললো, তুমি আমাদেরকে উপদেশ দাও আর না-ই দাও, আমরা অনড় থাকবো আমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মমতে। আমরা যা কিছু করি তা আমাদের স্বসৃষ্ট কিছু নয়। আমাদের সকল রীতি-নীতি প্রজন্ম পরম্পরাগত। আর শাস্তির কথা বলছো ? তাতো আমাদের হবেই না। আমাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন জন্মেছেন, তেমনি মরেও গিয়েছেন। আমাদের জন্ম এবং জীবনও একসময় পর্যবসিত হবে মৃত্যুতে। তারা যেমন পুনরুত্থিত হননি, তেমনি আমরাও হবো না। সুতরাং আমাদের শাস্তি হবে কীভাবে?

ক্বারী কুসাই, ক্বারী আবু জাফর এবং ক্বারী আবু ওমরের উচ্চাররীতিতে এখানকার 'খুলুক্ব' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে 'খুল্‌ক্ব'রূপে। এমতো উচ্চারণের কারণে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তুমি আমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছো, তা পূর্বযুগের মানুষের স্বরচিত উক্তি। এগুলো হচ্ছে মিথ্যা কথন। 'খুলুক্ব' অর্থ মিথ্যা রচনা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ইয়াখলুক্বুনা ইফকান (তোমরা মিথ্যা রচনা করেছো)।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ের (১৩৯, ১৪০) আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— তারপর তারা আমার প্রিয় নবী হুদের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করলো। ফলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করলাম। নিশ্চয় এতে রয়েছে আমার শক্তির সর্বত্রগামিতার শিক্ষণীয় নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তো ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আর আমি

www.eelm.weebly.com

তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি প্রকাশ করি আমার মহাপ্রতাপ। কারণ আমি মহাপ্রতাপশালী। আর বিশ্বাসীদের প্রতি বর্ষণ করি অপরিমেয় দয়া। কারণ আমি যে পরম দয়াপরবশ।

এখানে 'তাদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী' কথাটির মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আদ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ অথবা কমপক্ষে যদি অর্ধেকও ইমান আনতো, তবে তারা রক্ষা পেতো সর্বগ্রাসী আযাব থেকে। কারণ ইমানদারদের উপস্থিতির কল্যাণে কাফেরেরাও বেঁচে যায় পার্থিব শাস্তি থেকে। কুরায়েশ অংশীবাদীরা একারণেই বেঁচে গিয়েছিলো আল্লাহ্‌র আযাব থেকে। সেকথাই বিধৃত হয়েছে এক আয়াতে এভাবে— 'যদি বিশ্বাসী নর-নারীরা না থাকতো, তবে অবশ্যই আমি ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে অবতীর্ণ করতাম ভয়াবহ শাস্তি'।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ صٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ إِنِّيْ
لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ۝ وَمَا أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ أَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَا اٰمِنِيْنَ ۝ فِيْ
جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝ وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ۝

❑ সামূদ সম্প্রদায় রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল।

❑ যখন উহাদিগের ভ্রাতা সালিহ্ উহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না?'

❑ 'আমি তো তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।'

❑ 'অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর,'

❑ 'আমি তোমাদিগের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে।'

❑ 'তোমাদিগকে কি পার্থিব ভোগসম্পদের মধ্যে নিরাপদে রাখিয়া দেওয়া হইবে,

❑ 'উদ্যান, প্রস্রবণ,

❑ 'ও শস্যক্ষেত্রে এবং মঞ্জরিত খর্জুর বাগানে?

আলোচ্য আয়াতগুলোর মর্মার্থ হচ্ছে— ছামুদ সম্প্রদায়ও আমাকর্তৃক প্রেরিত বার্তাবাহকগণকে অস্বীকার করেছিলো। তাদের পথপ্রদর্শনার্থে আমি নবীরূপে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরই সম্প্রদায়ভূত সালেহ্‌কে। তিনি বলেছিলেন, হে আমার

www.eelm.weebly.com

জাতিগোষ্ঠীভূত জনতা, আল্লাহ্র আযাব থেকে তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের প্রতি প্রেরিত রসুল। আমি যে বিশ্বাসভাজন ও নির্ভরযোগ্য, সে কথা তোমরাও জানো। তাই বলি, আমার কথা মান্য করো। ভয় করো আল্লাহ্কে এবং মান্য করো আমার আনীত ধর্মমতকে। সত্যধর্ম প্রচারের শ্রমজনিত বিনিময় তো আমি তোমাদের নিকট চাই না। আমার প্রভুপালকই যথাসময়ে আমাকে যথাবিনিময় প্রদান করবেন। তোমরা ভেবেছো কী, তোমাদের পার্থিব সম্ভোগ-সম্ভার কি চিরস্থায়ী? এই কানন, স্রোতস্বতী, শস্যপ্রান্তর ও ফলভারাবনত খর্জুর উদ্যান?

এখানে 'তালউ'হা হাদ্বীম' অর্থ মঞ্জরিত খর্জুর কানন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'হাদ্বীম' অর্থ কোমল। আবুল আলীয়ার অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শব্দটির অর্থ উপকারপ্রদায়ক, পরিপুষ্ট। ইকরামা শব্দটির অর্থ করেছেন,নরম। হাসান বলেছেন, ঝুলন্ত। মুজাহিদ বলেছেন, যে খেজুরের খোসা শুকিয়ে যায়, ওই খেজুরকে বলে হাদ্বীম', আর সুপক্ক খেজুরকে বলে 'হাদ্বীম'। জুহাক ও মুকাতিল বলেছেন, 'হাদ্বীম' অর্থ স্তরে স্তরে, সারিবদ্ধরূপে, অর্থাৎ বহুলপরিমাণে। অভিধানবেত্তাগণ বলেন, 'হাদ্বীম' ওই খোসা, যা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই অভ্যন্তরস্থিত হয়। আজহারী বলেছেন, কথাটির অর্থ, একটির সঙ্গে অপরটি মিলিতরূপে। কেউ কেউ বলেছেন, 'হাদ্বীম' অর্থ 'হা-যীম' (হজম কারক)।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২

وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ○ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○ وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ○ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ○

- 'তোমরা তো নৈপুণ্যর সহিত পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিতেছ।'
- 'তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর
- এবং সীমালংঘনকারীদিগের আদেশ মান্য করিও না;
- ইহারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না।'

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আমার প্রিয় নবী সালেহ্ তাদেরকে বললেন, হে আমার ঔদাসীন্যদীর্ন জাতিগোষ্ঠী! তোমরা তো পার্থিব নির্মাণকর্মে মগ্ন। পর্বতগাত্রে গৃহনির্মাণে তোমরা সুপটু। নির্মাণনৈপুণ্যের অহমিকা গ্রাস করেছে তোমাদের শুভবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে। তাই আমি বলি, আল্লাহ্র অসন্তোষ ও

www.eelm.weebly.com

আযাবের ভয়ে ভীত হও। অনুসরণ করো আমার আনীত ধর্মাদর্শের । আর যারা অলৌকিক উষ্ট্রী বধপর্বের অগ্রনায়ক, সেই সকল সীমালংঘনকারীদের কথায় কর্ণপাত কোরো না। তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, শান্তি স্থাপনকারী তারা নয়।

এখানে 'ফারিহীন' অর্থ প্রস্তরকর্তনকর্মে পারদর্শী। ইকরামা শব্দটির অর্থ করেছেন, যারা আপন কুশলতায় দর্পিত। সুদ্দী বলেছেন, এর অর্থ অত্যাশ্চর্য নির্মাতা। আখফাশ বলেছেন, এর অর্থ খুশী। লোভ-লালসাকেও প্রকাশ করা হয় 'ফারেহীন' শব্দটির মাধ্যমে। আবু উবায়দা বলেছেন, বক্তব্যটি এরকম— তোমরা আপন সৃজনৈপুণ্যে মদমত্ত, তাই সত্যবিমুখ।

'মুসরিফীন' অর্থ সীমালংঘনকারী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ অংশীবাদী। মুকাতিল বলেছেন, যে নয়জন মহাদুর্বৃত্ত আল্লাহ্‌র অলৌকিক উষ্ট্রীটি বধ করেছিলো, তাদেরকেই এখানে বলা হয়েছে 'মুসরিফীন' (সীমালংঘনকারী)। 'ইউফসিদূন' অর্থ অশান্তি সৃষ্টিকারী। আর 'লা ইউসলিহূন' অর্থ যারা শান্তি স্থাপন করে না।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯

قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ○ مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ○ قَالَ هَـٰذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ○ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا۟ نَـٰدِمِينَ ○ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ○ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ○

❒ উহারা বলিল, 'তুমি তো যাদুগ্রস্ত।'

❒ তুমি তো আমাদিগেরই মত একজন মানুষ, 'কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও কোন একটি নিদর্শন উপস্থিত কর।'

❒ সালিহ্ বলিল, 'এই যে উষ্ট্রী, ইহার জন্য এবং তোমাদিগের জন্য আছে পানি পানের স্বতন্ত্র পালা, নির্ধারিত এক এক দিনে;

❒ 'এবং উহাকে কোন ক্লেশ দিও না; দিলে মহাদিবসের শাস্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হইবে।'

❒ কিন্তু উহারা উহাকে বধ করিল, পরিণামে উহারা অনুতপ্ত হইল।

www.eelm.weebly.com

❐ অতঃপর শাস্তি উহাদিগকে গ্রাস করিল। ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

❐ তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা বললো, তুমি তো যাদুগ্রস্ত'। একথার অর্থ— ছামুদ সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জনতা বললো, হে সালেহ্! তোমাকে তো যাদু করা হয়েছে। তাই তুমি আমাদেরকে অহেতুক কথা শোনাচ্ছো। এরকম অর্থ করেছেন মুজাহিদ ও কাতাদা। কিন্তু আবু সালেহ্ সূত্রে কালাবী অর্থ করেছেন, তারা বললো— তুমি তো প্রতারণাকবলিত। আরববাসীরা বলেন, 'সাহারাহু' (তাকে পানাহার করিয়ে বশ করা হয়েছে)। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— তুমিতো আমাদের মতোই পানাহার করো, সুতরাং তুমি তো ফেরেশতা নও। তাহলে তুমি আবার রসুল হতে পারো কীভাবে?

পরের আয়াতে (১৫৪) বলা হয়েছে— 'তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ। কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে কোনো একটি নিদর্শন উপস্থিত করো'। একথার অর্থ— তারা আরো বললো, হে সালেহ্! তুমি তো আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ। তোমার বিশেষত্বের প্রমাণ কোথায়? তোমার রেসালতের দাবিতে তুমি যদি সত্য হও, তবে আমাদেরকে তোমার বিশেষ একটি নিদর্শন দেখাও।

এরপরের আয়াতে (১৫৫) বলা হয়েছে— 'সালেহ্ বললো, এই যে উষ্ট্রী, এর জন্য এবং তোমাদের জন্য আছে পানি পানের স্বতন্ত্র পালা, নির্ধারিত এক এক দিনে'। একথার অর্থ— হজরত সালেহ্ তখন আল্লাহ্‌র কাছে মোজেজা প্রার্থনা করলেন। তৎক্ষণাৎ একটি বড় পাথর ফেটে বের হলো একটি উষ্ট্রী। তিনি তখন বললেন, দ্যাখো, এই অলৌকিক উষ্ট্রীটি আমার রেসালতের প্রমাণ। সুতরাং তোমরা এর সঙ্গে অসৎ আচরণ কোরো না। এখন থেকে তোমাদের কূপের পানি পান করার জন্য পালাবণ্টন করা হলো এভাবে— একদিন পর একদিন এ কূপের পানি পান করবে যথাক্রমে এই উষ্ট্রী ও তোমাদের পশুগুলো।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (১৫৬, ১৫৭) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত সালেহ্ তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিলেন যে, সাবধান! আল্লাহ্‌র এই অলৌকিক উষ্ট্রীটিকে তোমরা কষ্ট দিয়ো না। যদি দাও, তবে তোমাদের উপরে এসে পড়বে সর্বগ্রাসী আযাব। কিন্তু অবাধ্যরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না। একদিন সকলের সম্মতিক্রমে তাদের কয়েকজন মিলে বধ করে ফেললো প্রস্তরাগত অলৌকিক উষ্ট্রীটিকে। তারপর অত্যাসন্ন আযাব দেখে আক্ষেপ করতে লাগলো।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতের (১৫৮) মর্মার্থ হচ্ছে— তারপর তাদের উপরে এসে পড়লো মহাশাস্তি। ওই সর্বগ্রাসী শাস্তিতে সম্পূর্ণরূপে মূলোৎপাটিত হলো চিরভ্রষ্ট ছামুদ সম্প্রদায়। তাদের ওই মূলোৎপাটনের ঘটনার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে প্রণিধাননীয় নিদর্শন, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারেনি। কীভাবে পারবে? তাদের অধিকাংশই যে বিশ্বাসবিমুখ।

শেষোক্ত আয়াতে (১৫৯) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! অবাধ্য ছামুদ সম্প্রদায়ের যে কাহিনী আমি আপনাকে জানালাম, তাতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ অবাধ্যদের প্রতি প্রকাশ করেন তাঁর মহাপ্রতাপ। কারণ তিনি মহাপ্রতাপশালী। আর সাথে সাথে এ বিষয়টিও প্রমাণ হয়ে যায় যে, বিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর মেহেরবানীর সীমা পরিসীমা নেই। কারণ তিনি যে তাদের প্রতি পরম দয়ার্দ্র।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১৬০—১৬৮

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ○ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ○
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ○ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ○ وَمَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ
مِنَ الْعَالَمِينَ ○ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ
قَوْمٌ عَادُونَ ○ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ○
قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ○

❒ লূতের সম্প্রদায় রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল,

❒ যখন উহাদিগের ভ্রাতা লূত উহাদিগকে বলিল,'তোমরা কি সাবধান হইবে না?'

❒ 'আমি তো তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।'

❒ সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

❒ 'আমি ইহার জন্য তোমাদিগের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে।'

www.eelm.weebly.com

❒ 'মানুষের মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষের সহিতই উপগত হও,

❒ এবং তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের জন্য যে-স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদিগকে তোমরা বর্জন করিয়া থাক। তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।'

❒ উহারা বলিল, 'হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হইবে।'

❒ লূত বলিল, 'আমি তো তোমাদিগের এই কর্মকে ঘৃণা করি।'

আলোচ্য আয়াতসমূহের মর্মার্থ হচ্ছে— আমার প্রিয় নবী লূতের সম্প্রদায়ও আমা কর্তৃক প্রেরিত বার্তাবাহকবৃন্দকে অস্বীকার করেছিলো। লূত ছিলেন তাদের স্বদেশী ভ্রাতা। তিনি বললেন, হে দেশবাসী! এখনো কি তোমাদের সাবধান হওয়ার সময় হয়নি? আমি যে তোমাদের প্রতি প্রেরিত বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শনকারী, সে কথা মেনে নেয়ার সময় কি এখনো আসেনি? আমার উপদেশ শোনো, ভয় করো আল্লাহ্র আযাবের এবং আনুগত্য করো আমার আদর্শের। একথা কস্মিনকালেও ভেবো না যে, পথপ্রদর্শনকর্মের পার্থিব পুরস্কার এবং কৃতিত্ব আমি তোমাদের নিকটে চাই। আমাকে তো পুরস্কৃত করবেন আমার, তোমাদের ও বিশ্বজগতের প্রভুপালক আল্লাহ্। ভেবে দ্যাখো, তোমাদের কর্মকাণ্ড কতো ঘৃণ্য, জঘন্য। আল্লাহ্পাক তোমাদের বৈধ যৌনচরিতার্থতার জন্য সৃষ্টি করেছেন রমণীকূলকে। অথচ তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করে উপগত হও পুরুষের উপর। পশুরাও এরকম করে না। এখানো কি তোমরা বুঝতে পারছো না যে, তোমরা সীমালংঘনকারী? সংযত হও। সাবধান হও। পরিত্যাগ করো ঘৃণ্য সমকামিতাকে। তওবা করো। তারা বললো, হে লূত! আমরা তোমাকে মানি না। সুতরাং তুমি আর আমাদেরকে উপদেশ দিতে এসো না। এর পরেও যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই আমরা তোমাকে নির্বাসন দান করবো। লূত বললেন, অসম্ভব। সত্যোচ্চারণ আমি করবোই। তোমাদের এই পাপাচারকে আমি ঘৃণা করি।

এখানে 'আখুহুম' (তাদের ভ্রাতা) অর্থ তাদের স্বদেশবাসী ভ্রাতা, বংশীয় কিংবা ধর্মীয় ভ্রাতা নয়। কারণ হজরত লূত যেমন তাদের বংশভূত কেউ ছিলেন না, তেমনি ছিলেন না তাদের ধর্মমতানুসারী। 'মিন আযওয়াজিকুম' (তোমাদের জন্য রমণী) কথাটির 'মিন' বর্ণনামূলক। সুতরাং এর অর্থ হবে পুরুষের সঙ্গে উপগত হওয়া তো যাবেই না, নারীদেরও ব্যবহার করা যাবে না যথাঅঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনো অঙ্গ। সুতরাং বুঝতে হবে আপন স্ত্রী ও ক্রীতদাসীদের সঙ্গে যৌনচরিতার্থতা করা যাবে না পুরুষদের মতো করে সমকামের পদ্ধতিতে।

www.eelm.weebly.com

'আলমুখরজীন' অর্থ নির্বাসন দেয়া হবে, বিতাড়িত করা হবে স্বদেশভূমি থেকে। আর 'মিন্নাল ক্বলীন' অর্থ ঘৃণা করি, প্রসিদ্ধি লাভ করি তাদের মতো যারা তোমাদের এহেন অস্বাভাবিক ও অবৈধ কর্মে ঘৃণা পোষণ করে যশস্বী হয়।

সুরা শুআরা : আয়াত ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۝ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۝ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ۝ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

❒ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে, উহারা যাহা করে তাহা হইতে রক্ষা কর।'

❒ অতঃপর আমি তাহাকে এবং তাহার পরিবার-পরিজন সকলকে রক্ষা করিলাম

❒ এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত।

❒ অতঃপর অপর সকলকে ধ্বংস করিলাম।

❒ তাহাদিগের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম, যাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল তাহাদিগের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট।

❒ ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

❒ তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াতমালার মর্মার্থ হচ্ছে— নবী লুত তখন প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! এই দুর্বিনীত ও দুরাচারেরা সত্যপ্রত্যাখ্যানে অনড়। সুতরাং তুমি এদের ঘৃণিত পরিবেশ থেকে আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো। আমি তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করলাম। যথাসময়ে তাঁকে ও তাঁর পরিবার পরিজনকে আমার আযাব থেকে রক্ষা করলাম, কেবল তাঁর এক স্ত্রী ব্যতীত। তাঁর ওই স্ত্রী ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী এবং সমকামপ্রিয় জনতার সমর্থক। সে-ও ধ্বংস হয়ে গেলো তাদের সাথে। তাদের উপরে আমি আপতিত করেছিলাম প্রস্তরবৃষ্টি। ওই ভয়াবহ বৃষ্টিপাতে বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিলো তাদের পুরো

www.eelm.weebly.com

জনবসতি। এ ঘটনার মধ্যেও রয়েছে আল্লাহ্‌র অপার পরাক্রমের এক অনন্য নিদর্শন। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারেনি। কারণ তাদের অধিকাংশই ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। নিঃসন্দেহে সত্যবিমুখদের প্রতি আল্লাহ্‌র পরাক্রম অপার, দুর্বার। আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অফুরন্ত বিশ্বাসীদের প্রতি। কারণ তিনি মহাপরাক্রান্ত এবং মহানুগ্রহপরবশ।

উল্লেখ্য, আকাশ থেকে প্রস্তরবর্ষণ শুরু হওয়ার আগেই নবী লুত প্রত্যাদেশানুসারে ওই জনবসতি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এক স্ত্রী ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী। সে পথ চলছিলো সকলের পশ্চাতে। আকাশ থেকে পতিত অসংখ্য পাথরের একটি আঘাত করেছিলো তাকে। আর ওই আঘাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো সে। এখানে তাকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে 'এক বৃদ্ধা ব্যতীত'। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, সে হজরত লুতের সঙ্গে বসতি থেকে বেরই হয়নি। ফলে অন্য অবাধ্যদের সঙ্গে সে-ও লাভ করেছে প্রস্তরসমাধি। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ বলেছেন, তাদের উপরে পতিত হয়েছিলো গন্ধক ও অগ্নিবৃষ্টি।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১৭৬—১৮৪

كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا
تَتَّقُوْنَ ۝ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝ وَمَآ
اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا
مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۝ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۝ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝ وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ
وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ۝

❒ শোয়াইব সম্প্রদায় রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল,

❒ যখন শোয়াইব উহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না?'

❒ 'আমি তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।'

❒ 'সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।'

❒ 'আমি তোমাদিগের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না। আমার পুরস্কার তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে।'

www.eelm.weebly.com

❒ 'মাপে পূর্ণমাত্রায় দিবে; যাহারা মাপে কম দেয় তাহাদিগের মত হইও না;'
❒ 'এবং ওজন করিবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।'
❒ 'লোকদিগকে তাহাদিগের প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইবে না।'
❒ 'এবং ভয় কর তাঁহাকে যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদিগের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।'

আলোচ্য আয়াতসম্ভারের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই অরণ্যবাসীরাও ছিলো আমার বচনবাহকগণকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। তাদের প্রতি আমি প্রেরণ করেছিলাম আমার প্রিয় নবী শোয়াইবকে। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, হে অরণ্যবাসী! তোমরা কি আল্লাহ্‌র ভয়ে তোমাদের অপকর্মসমূহ পরিত্যাগ করবে না? আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি তোমাদের সংশোধনার্থে। আর আমার বিশ্বাসভাজনতার বিষয়টিও তোমাদের নিকট অবিদিত নেই। সুতরাং আমার শুভউপদেশ শোনো। ভয় করো আল্লাহ্‌কে এবং আনুগত্য করো আমার। আর মনে কোরো না যে, এমতো সংশোধনকর্মের শ্রমফল আমি তোমাদের কাছে চাই। কখনোই নয়। আমি তো কেবল বিশ্বজগতের প্রভুপালয়িতার কাছেই শ্রমফল প্রত্যাশী। মাপে কম প্রদান মহাপাপ। সুতরাং তোমরা মাপে কম প্রদানকারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। দাঁড়িপাল্লায় ওজন কোরো যথাযথরূপে। মানুষকে ঠকিয়ো না। পৃথিবীতে সৃষ্টি কোরো না বিপর্যয়। আর একথা ভুলে যেয়ো না যে, আল্লাহ্‌ই সৃজন করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বসূরীদেরকে, যারা এখন বিগত।

এখানে 'আইকাহ্' অর্থ ঘনকণ্টকবিশিষ্ট বৃক্ষ। উল্লেখ্য, এরকম ঘনকণ্টকবিশিষ্টবৃক্ষপূর্ণ অরণ্যে বাস করতো আইকাহ্ সম্প্রদায়। স্থানটি ছিলো মাদিয়ান শহর থেকে দূরে অবস্থিত একটি আরণ্যক জনপদ। মাদিয়ানের অধিবাসী হজরত শোয়াইবকে প্রেরণ করা হয়েছিলো তাদের সংশোধনার্থে।

'পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি কোরো না' অর্থ— কোরো না ছিনতাই, রাহাজানি, লুণ্ঠন। উল্লেখ্য, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ কিন্তু বিপর্যয় পদবাচ্য নয়। তাই শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যারা যুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধবাদীরা শাস্তিযোগ্য।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১

قَالُوٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۞ وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ
نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۞ فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ

www.eelm.weebly.com

الصّٰدِقِيْنَ ۚ قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۚ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ
يَوْمِ الظُّلَّةِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ
اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

❒ উহারা বলিল, 'তুমি তো যাদুগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত;'

❒ 'তুমি আমাদিগেরই মত একজন মানুষ, আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদিগের অন্যতম।'

❒ 'তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আকাশের এক খণ্ড আমাদিগের উপর ফেলিয়া দাও।'

❒ সে বলিল, 'আমার প্রতিপালক ভাল জানেন তোমরা যাহা কর।'

❒ অতঃপর উহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, পরে উহাদিগকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করিল। ইহা ছিল এক ভীষণ দিবসের শাস্তি।

❒ ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

❒ এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াত গুচ্ছের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই অরণ্যবাসীরা তাদের প্রতি প্রেরিত নবী শোয়াইবকে বললো, নিঃসন্দেহে তুমি যাদুগ্রস্ত। আর তুমি তো আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ। রাজা-বাদশাহ কিংবা ঐশ্বর্যশালী কেউ নও। সুতরাং তুমি আল্লাহ্‌র রসুল হতে পারো না। তুমি মিথ্যাবাদী। সত্যবাদী যদি হও, তবে আকাশের একখণ্ড মেঘ আমাদের উপরে ফেলে দিয়ে দেখাও। শোয়াইব বললেন, তোমরা ওজনে ও মাপে কম দাও। লুট-তরাজ-রাহাজানি করো এবং অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করো। এসকল কিছু আমার প্রভুপালনকর্তা জানেন। এ সকল অপকর্মের জন্য তিনি তোমাদেরকে কখন কোথায় কীভাবে শাস্তি দিবেন তা তিনিই জানেন। এ বিষয়টি আমার দায়িত্বভূত নয়। আমার দায়িত্ব তো কেবল তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাদি তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া। দুরাচারেরা তবুও শোয়াইবকে বিশ্বাস করলো না। আরো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রইলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকে। তারপর একদিন তাদের উপরে নেমে এলো মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি। সে শাস্তি ছিলো বিকট, বীভৎস, ভয়ংকর। নিশ্চয় এই বৃত্তান্তে রয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার সর্বগ্রাসী পরাক্রমের অভূতপূর্ব নিদর্শন। কিন্তু তারা একথা বুঝবে

www.eelm.weebly.com

কীভাবে? তারা যে অতিমাত্রায় অবিশ্বাসী। আর আল্লাহ্ তো অবিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর মহাপ্রতাপ প্রদর্শনকারী। কারণ তিনি মহাপ্রতাপশালী। আর বিশ্বাসীদের প্রতি প্রদর্শনকারী অপরিমেয় দয়া। কারণ তিনি যে পরম করুণাপরবশ।

ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে— একদিন শুরু হলো প্রচণ্ড দাবদাহ। তীব্র উত্তাপে অতিষ্ঠ হয়ে তারা আশ্রয় নিলো তাদের ভূগর্ভস্থ গৃহসমূহে। কিন্তু সেখানে ছিলো আরো অধিক গরম। তাই তারা পুনরায় ওঠে এলো মাটির উপরে। অকস্মাৎ দেখলো অদূরে আকাশে ভাসছে একখণ্ড কালো মেঘ। মেঘের ছায়ায় স্বস্তিলাভের আশায় তারা অরণ্যাবাস ছেড়ে ছুটে গেলো সেদিকেই। সবাই যখন জড় হলো, তখন ওই মেঘমালা থেকে শুরু হলো অগ্নিবর্ষণ। ওই অনলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলো অবাধ্যরা। এই কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে সুরা হুদের তাফসীরে।

এ পর্যন্ত বর্ণিত সাতটি ইতিবৃত্তে নবীগণ ও তাদের আপনাপন অবাধ্য উম্মতের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার বিবরণ ছিলো রসুলে পাক স. এর প্রতি সান্ত্বনা। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা এই ঘটনাগুলোর মাধ্যমে এই মর্মে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চিরায়ত স্বভাব এরকমই। তারা তাদের একান্ত সুহৃদ ও প্রেমময় অভিভাবক নবী-রসুলগণকে চিনতে পারে না। তাঁদের মর্মস্পর্শী আহ্বানকে বার বার প্রত্যাখ্যান করে বসে। পরিণামে লাভ করে পরাজয় ও ধ্বংস। আর জয় হয় সত্যের, সত্যের পতাকাবাহী নবী-রসুলগণের। সুতরাং হে আমার প্রিয়তম রসুল! মক্কার মুশরিকদের অপ-আচরণে ব্যথিত হবেন না। নিরবচ্ছিন্ন সহিষ্ণুতার সঙ্গে পালন করে চলুন সত্যধর্ম প্রচারের দায়িত্ব। নিশ্চিত জানবেন আল্লাহ্তায়ালার শাশ্বত বিধানানুসারে আপনারও বিজয় এবং সাফল্য সুনিশ্চিত।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ○ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ○ عَلَىٰ قَلْبِكَ
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ○ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ○ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ○
أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَٰٓؤُا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ○

❒ আল্ কুরআন তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ।
❒ জিবরাইল ইহা অবতীর্ণ করিয়াছে
❒ তোমার হৃদয়ে, যাহাতে তুমি সতর্ককারী হইতে পার।
❒ অবতীর্ণ করা হইয়াছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।
❒ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই ইহার উল্লেখ আছে।

www.eelm.weebly.com

❒ বনি-ইসরাঈলের পণ্ডিতগণ ইহা অবগত আছে— ইহা কি উহাদিগের নিদর্শন নহে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল কোরআন তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক থেকে অবতীর্ণ'। এখানে 'তানযীল' অর্থ মুনায্যাল। 'তানযীল' শব্দটি ধাতুমূল ও কর্তৃকারকের অর্থজ্ঞাপক।

পরের আয়াতে (১৯৩) বলা হয়েছে— 'জিবরাইল এটা অবতীর্ণ করেছে'। একথার অর্থ— হজরত জিবরাইল এই কোরআন পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন। উল্লেখ্য, হজরত জিবরাইল আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত প্রত্যাদেশাবলীর বিশ্বস্ত বাহক। তাই এখানে তাঁর নামের শেষে প্রযুক্ত হয়েছে 'আমীন' বিশেষণটি।

এরপরের আয়াতে (১৯৪) বলা হয়েছে— 'তোমার হৃদয়ে যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো'। এখানে 'হৃদয়ে' অর্থ সানুবর বৃক্ষাকৃতিবিশিষ্ট বক্ষস্থিত কলবে, যা স্থূল জগতের কলব বা হৃদয়। এখানে সূক্ষ্ম জগতের মূল কলব বা লতিফায়ে রব্বানীকে বুঝানো হয়নি। কারণ সূক্ষ্ম জগতের (আলমে আমরের) অবস্থান আরশের উর্ধ্বে। আর ওই কলব প্রত্যাদেশের ভার বহন করতে অক্ষম। এই ভার বহন করতে পারে কেবল জড়জগতের (আলমে খালকের) কলব। এই কলব একই সঙ্গে জড়জগত ও সূক্ষ্ম জগতের কেন্দ্র ও প্রকাশস্থল। কিন্তু প্রত্যাদেশের প্রয়োজন হয় জড়জগতেই। তাই বুঝতে হবে জড় জগতস্থিত দেহসম্পৃক্ত কলবের দিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে বলা হয়েছে 'তোমার হৃদয়ে'। অর্থাৎ তোমার এই জগতস্থিত অস্তিত্বসম্পৃক্ত হৃদয়ে।

'যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো' অর্থ প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির পর যাতে আপনি প্রত্যাদেশানুসারে মানুষকে সচেতন ও সাবধান করতে পারেন আল্লাহ্র নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ সম্পর্কে। অর্থাৎ পালন করতে পারেন রেসালাতের দায়িত্ব।

এরপরের আয়াতে (১৯৫) বলা হয়েছে— 'অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখন 'সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়' অর্থ কুরায়েশদের মাতৃভাষায়। এরকম করার কারণ হচ্ছে, তারা যেনো একথা না বলতে পারে যে, কোরআনের ভাষা আমরা বুঝি না।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, হজরত জিবরাইল এই কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন রসুল স. এর হৃদয়ে। অন্য ভাষায় অবতীর্ণ হলে অবতীর্ণ করতে হতো তাঁর শ্রুতিতে, হৃদয়ে বা মরমে নয়। কারণ মাতৃভাষা সরাসরি মরমে পশে। ফলে হৃদয় ধারণ করতে পারে অন্তর্নিহিত অর্থ বা ভাব। ভাষা এমতোক্ষেত্রে কেবল বাহক, অন্য কিছু নয়। কিন্তু বিদেশীভাষা প্রধানতঃ সচকিত

www.eelm.weebly.com

ও আলোড়িত করে শ্রুতিকে। শব্দাবলীর ধ্বনিব্যঞ্জনাই এমতোক্ষেত্রে আকৃষ্ট ও অভিভূত করে শ্রোতাকে। পরে হৃদয় ধারণ করতে পারে তার মর্ম, যদি তা মর্মাভিসারী হয়।

এরপরের আয়াতে (১৯৬) বলা হয়েছে— 'পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে'। অধিকাংশ ব্যাখ্যাতা বলেছেন, কথাটির অর্থ— কোরআন অবতরণের কথা উল্লেখিত হয়েছে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে। মুকাতিল বলেছেন, এর অর্থ— পূর্ববর্তী আকাশজ গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর বিবরণ। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'হু' (এর) সর্বনামটি সম্পৃক্ত আল্‌কোরআনের সঙ্গে। অর্থাৎ এই কোরআনেই রয়েছে সকলকিছুর উল্লেখ।

এখানে 'যুবুর' অর্থ কিতাব বা আকাশজ গ্রন্থ। শেষোক্ত ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে হানাফীগণ বলেন, কোরআন শুধু মর্মার্থসম্ভারের নাম। কেননা পূর্ববর্তী আকাশজ পুস্তকগুলোতে কোরআনের অর্থই লিখিত ছিলো। ওগুলো আরবী লিপিবিশিষ্ট ছিলো না। এই ব্যাখ্যাটিকে প্রাধান্য প্রদানের কারণে কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা বলেন, কোরআনের অর্থসম্বলিত ফারসী ভাষাতেও নামাজের ক্বেরাত সম্পন্ন করা যায়।— কথাটি কিন্তু এরকম নয়। তিনি এমতো মত প্রকাশ করেছিলেন কেবল ওই সকল আলেমগণকে লক্ষ্য করে যারা ভাষা ও অলংকার শাস্ত্রে পারদর্শী এবং যারা নামাজে কোরআন পাঠকালে কোরআনের ভাষাসৌকর্যে হয়ে যান মগ্ন ও অভিভূত, ফলে আল্লাহ্‌র দিকে তাদের মনোযোগ আর থাকে না। এমতাবস্থায় তাদের ভাষাসৌকর্যবোধ ও বিদ্যাবত্তাই হয়ে যায় আল্লাহ্ ও তাদের মধ্যের অন্তরায়। ফলে ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যই হয়ে পড়ে বিপন্ন। যারা ভাষাবিশারদ ও ধ্বনিবিজ্ঞানে পারদর্শী নয় সেই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তাঁর বর্ণিত অভিমতটি প্রযোজ্য নয়। আর এরকম কথা তিনি বলেনওনি। ইমাম আবু হানিফা যদি ঢালাওভাবে মন্তব্যটি করতেন, তবে তো তিনি একথাও বলতেন যে, ফারসী কিংবা অন্যান্য ভাষায় অনূদিত কোরআন স্পর্শ করা ঋতুবতী নারী, অথবা জুনুবী (যার উপরে গোসল ফরজ) দের জন্য নাজায়েয। কিন্তু তিনি তো এরকম কথা বলেননি।

আমি বলি, প্রকৃত কথা হচ্ছে, কোরআন অর্থ একই সঙ্গে শব্দ ও মর্ম দু'টোই। সেকারণেই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে 'সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়'। কোরআন যেহেতু মোজেজা, আর মোজেজা যেহেতু প্রধানতঃ প্রকাশ্য, তাই বুঝতে হবে এখানে বলা হয়েছে কোরআনের ভাষার কথা, যা আবার আশ্রয় করে রয়েছে তার মর্মবাণীর উপরে। সেকারণেই আরবী লিপিবিশিষ্ট কোরআন অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা ও

www.eelm.weebly.com

পাঠ করা নাজায়েয, কিন্তু এর অনুবাদ যে ভাষায়ই হোক না কেনো, অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা ও আবৃত্তি করা জায়েয। ইমাম আবু হানিফা বলেছিলেন, কেবল নামাজে কোরআনের মর্ম অন্য ভাষায় পাঠ করা জায়েয। কারণ তাঁর মতে কোরআনের অর্থই আসল, ভাষা নয়। তাই নামাজে ভিন্নভাষায় কোরআনের মর্মবাণী উচ্চারণ জায়েয, যদি আরবী ভাষার বাকশৈলী পাঠককে মগ্ন ও স্থবির করে রাখে। অর্থাৎ যদি তা হয় উপাস্য ও উপাসকের মধ্যের অন্তরায়। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা তাঁর এমতো অভিমতের উপরে স্থির থাকেননি। পরবর্তীতে তিনি মত পরিবর্তন করেছিলেন। স্পষ্টতই বলেছিলেন, নামাজে আরবীলিপি বিশিষ্ট কোরআনের পাঠ ছাড়া অন্য কোনো ভাষার পাঠ নাজায়েয। এটাই হানাফীগণের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। অধিকাংশ ইমামও এই অভিমতের প্রবক্তা।

এরপরের আয়াতে (১৯৭) বলা হয়েছে— 'বনী ইসরাইলের পণ্ডিতগণ একথা অবগত আছে— এটা কি তাদের নিদর্শন নয়'? এ কথার অর্থ— এই কোরআন যে আল্লাহ্র নিকট থেকে সমাগত, সে কথা বনী ইসরাইলের পণ্ডিতেরা ভালোভাবেই জানে, সুতরাং এটাই কি তাদের জন্য সত্যের নিদর্শন নয়?

আতিয়ার বর্ণনায় এসেছে, এখানে 'বনী ইসরাইলের পণ্ডিতগণ' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সময়ের পাঁচজন ইহুদী তওরাতবিশারদকে। তাঁরা হচ্ছেন— আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, ইবনে ইয়াসিন, তা'লাবা, আসাদ এবং উসাইদ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কাবাসীরা মদীনায় গিয়ে ইহুদী পণ্ডিতদের কাছে রসুল স. সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো। তারা বলেছিলো, হ্যাঁ, শেষ যুগের পয়গম্বরের আবির্ভাবের সময় এটাই। আমরা তওরাতে তাঁর নাম ও বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ পাঠ করেছি।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩

وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ○ فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ
كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ○ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا
الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○ فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○ فَيَقُوْلُوْا هَلْ
نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ○

❒ যদি ইহা কোন আজমীর প্রতি অবতীর্ণ করা হইত,

❒ 'এবং উহা সে উহাদিগের নিকট পাঠ করিত তবে উহারা উহাতে বিশ্বাস করিত না;

www.eelm.weebly.com

❒ এইভাবে আমি অপরাধিগণের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করিয়াছি।

❒ উহারা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না যতক্ষণ না উহারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে;

❒ ইহা উহাদিগের নিকট আসিয়া পড়িবে আকস্মিকভাবে; উহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।

❒ তখন উহারা বলিবে, 'আমাদিগকে কি অবকাশ দেওয়া হইবে না?'

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যদি আমি এই কোরআন কোনো অনারবীর উপরে অবতীর্ণ করতাম এবং তিনি তা পাঠ করে শোনাতেনও, তবুও মক্কাবাসীরা তাঁকে বিশ্বাস করতো না। বলতো, তোমার কথাই তো আমরা বুঝতে পারি না।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানকার 'আ'জ্বামীন' শব্দটি 'আ'জ্বামী' এর বহুবচন। সেকারণেই এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সালিম (অবিকৃত) সর্বনামের শব্দরূপে। শব্দটি 'আ'জ্বাম' এর বহুবচন বলে শব্দরূপটি এখানে এরকম হতো না। কেননা এর স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দরূপ হচ্ছে 'উজ্বামাউ'। আর যে ক্রিয়ার শব্দগঠন পদ্ধতিতে স্ত্রীলিঙ্গবাচক 'ফয়ুলা' এর গঠনপদ্ধতি গৃহীত হয়, তার সালিম (অবিকৃত) সর্বনামরূপ হয় না। যেমন 'আশআ'রুন' এর বহুবচন 'আশআ'রা'। শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'আশআ'রীন'। ধ্বনিসংক্ষেপের কারণে তা হয়ে গিয়েছে 'আশআ'রুন'। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যদি আমি এই কোরআন অবতীর্ণ করতাম আরবী ভাষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির উপর, তবে তো মক্কাবাসীরা তাকে বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, তার কথা শুনতোই না। ভাষাবৈভবগত দর্পে অন্ধ হয়ে তারা প্রথমেই তার সঙ্গে শুরু করে দিতো চিরস্থায়ী শত্রুতা। অথবা তার কথা অনুধাবন না করতে পেরে প্রদর্শন করতো চরম বৈমুখ্য। বলতো, কী যে বলো, তোমার কথার আগামাথা কিছুই তো আমরা বুঝতে পারি না। অন্য এক আয়াতে এই বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— ওয়ালাও জ্বায়া'লনাহু কুরআনান আজ্বামিয়্যান লা ক্বলু লা ফুস্‌সিলাত আয়াতুহু'।

পরের আয়াতে (২০০) বলা হয়েছে— 'এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি'। হাসান ও মুজাহিদ আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন— এভাবেই আমি সত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারীদের অন্তরে সন্নিবেশিত করি অনড় অবিশ্বাস। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, অংশীবাদ ও অবিশ্বাসের স্রষ্টাও আল্লাহ্। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'সালাকনাহু' (আমি উহা সঞ্চার করে দিয়েছি) এর 'হু' সর্বনাম কোরআনের সঙ্গে

www.eelm.weebly.com

সম্পর্কযুক্ত। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— এই কোরআনকে আমি অপরাধীদের অন্তরে প্রবিষ্ট করে দিয়েছি, ফলে তারা একথাও বুঝেছে যে, কোরআন হচ্ছে আকাশজ বার্তা, তৎসত্ত্বেও কেবল বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তারা ইমান আনে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে (২০১, ২০২) বলা হয়েছে— 'তারা তা বিশ্বাস স্থাপন করবে না যতোক্ষণ না তারা প্রত্যক্ষ করবে ব্যথাদায়ক শাস্তি'। 'এটা তাদের নিকট এসে পড়বে আকস্মিকভাবে, তারা কিছুই বুঝতে পারবে না'। আল্লাহ্পাক যাদের অংশীবাদীতাসহ মৃত্যু হওয়ার কথা নিশ্চিতরূপে অবগত, এখানে বলা হয়েছে সেই সকল চিরঅবিশ্বাসীদের কথা। তাদের উপরে মর্মন্তুদ শাস্তি শুরু হবে তাদের জীবনাবসানের পর। ওই সময় তারা বাধ্য হয়ে প্রকৃত সত্যকে বিশ্বাস করবে, কিন্তু ওই বিশ্বাস তাদের কোনো উপকারে আসবে না। তাই শেষে বলা হয়েছে 'তারা কিছুই বুঝতে পারবে না'।

শেষোক্ত আয়াতে (২০৩) বলা হয়েছে— 'তখন তারা বলবে, আমাদেরকে কি অবকাশ দেওয়া হবে না'? একথার অর্থ— তারা তখন বলবে, আমাদেরকে যদি পৃথিবীতে পুনরায় প্রেরণ করা হয়, তবে আমরা এবার অবশ্যই ইমান আনবো। আমাদেরকে কি সে অবকাশ দেয়া হবে না? প্রশ্নবোধকটি এখানে মিনতিসূচক।

মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশানুসারে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করলেন, তখন তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের স্বরে বলতে লাগলো, কতোদিন পর্যন্ত আর এভাবে ভয় দেখাবে? কবে আসবে আযাব? তাদের এমতো অপউক্তির পরিপ্রেক্ষিত অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ○ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ ○ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ○ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ ○

❒ উহারা কি তবে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে চাহে?

❒ তুমি বলত— যদি আমি তাহাদিগকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করিতে দিই,

❒ এবং পরে উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহা উহাদিগের নিকট আসিয়া পড়ে

❒ তখন উহাদিগের ভোগ-বিলাসের উপকরণ উহাদিগের কোন কাজে আসবে কি?

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! 'কবে আসবে আযাব' বলে অংশীবাদীরা আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্‌র শাস্তিকে তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাও কোন সাহসে। তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর সুদীর্ঘ ভোগ-বিলাসময় জীবন দান করলেও তো এক সময় শেষ হয়ে যাবে তোমাদের পরমায়ু। তখন? তখন তো তোমাদের কাম্য শাস্তি সুনিশ্চিত। বলো, সে অনন্ত শাস্তি শুরু হলে তোমাদের অতীতের সম্ভোগমুখরিত জীবন কি তোমাদের কোনো উপকারে আসবে? ওই ভয়ংকর শাস্তি তো চিরতরে ভুলিয়ে দিবে তোমাদের অতীতের সুখস্মৃতি।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতগুচ্ছ অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কার অংশীবাদীদের কতিপয় অপউক্তির প্রেক্ষিতে। কোরআনের অন্যত্র সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে। যেমন— ১. আনযিল আ'লাইনা হিজ্বারাতাম্ মিনাস সামায়ি আবি'তিনা বি আজাবিন আ'লীম ('আকাশ থেকে আমাদের উপর বর্ষণ করো প্রস্তর অথবা নিয়ে এসো কোনো ব্যাথাদায়ক শাস্তি')। ২. ফা'তিনা বিমা তুয়ি'দুনা ('আমাদের যে অঙ্গিকার দিচ্ছো তা নিয়ে এসো')। প্রকৃত কথা হচ্ছে, অংশীবাদীরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো, তাদের জীবন চিরনিরাপদ। আযাব তাদের উপরে কোনোদিনই নেমে আসবে না। তাই তারা রসুল স.কে বিব্রত করণার্থে বার বার ব্যঙ্গচ্ছলে আযাব ত্বরান্বিত করার কথা বলতো।

সূরা শুআরা : আয়াত ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ○ ذِكْرٰى ۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ
وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ○ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ○ اِنَّهُمْ عَنِ
السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ○ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ
وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ○

- ❐ আমি কোন জনপদ ধ্বংস করি নাই সতর্ককারী প্রেরণ না করিয়া,
- ❐ ইহা উপদেশস্বরূপ, আমি অন্যায়াচারী নহি,
- ❐ শয়তান আল-কুরআন অবতীর্ণ করে নাই,
- ❐ উহারা এই কাজের যোগ্য নহে এবং উহারা ইহার সামর্থ্যও রাখে না।
- ❐ উহাদিগকে ফেরেশতাগণের কথা শ্রবণের অধিকার দেওয়া হয় নাই।

www.eelm.weebly.com

❐ অতএব তুমি অন্য কোন ইলাহ্‌কে আল্লাহের শরীক করিও না; করিলে তুমি শাস্তি পাইবে।

❐ তোমার স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক করিয়া দাও।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের অর্থ— আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেই না। প্রথমে তাদের নিকট সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করি আমার কোনো বার্তাবাহককে। তিনি তাদের নিকট পৌঁছে দেন সত্যের পয়গাম। তৎসত্ত্বেও যদি তারা সতর্ক না হয়, দীর্ঘ অবকাশ প্রদানের পরেও সত্যের দিকে ফিরে না আসে, তখন তাদের উপরে অবতীর্ণ করি সর্বগ্রাসী ধ্বংস। আমার উপদেশরীতি এরকমই অনুগ্রহ ও সহিষ্ণুতাশোভিত। কারণ আমি অন্যায়াচরণ থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র।

এখানে 'মুনজিরুন' অর্থ সতর্ককারী। আর 'জিকরা' অর্থ উপদেশ। এভাবে এখানে 'উপদেশ' হয়েছে সতর্ককরণের কারণ। অর্থাৎ ধ্বংসের পূর্বে সতর্ককরণের কারণে বা উদ্দেশ্যেই আমি তাদের প্রতি প্রথমে প্রেরণ করি সতর্ককারী। বরং অর্থ হবে সদুপদেশের মূর্ত প্রতীকরূপে প্রথমে আমি তাদের সম্মুখে উপস্থিত করি আমার কোনো না কোনো বাণীবাহককে।

পরের আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— অংশীবাদীরা বলে 'মোহাম্মদের উপরে কোরআন অবতীর্ণ করে শয়তান'। তাদের একথা সর্বৈবরূপে মিথ্যা। কারণ কোরআন ও শয়তানের আহ্বান পরস্পরবিরুদ্ধ। কোরআন পথপ্রদর্শন করে হেদায়েতের, আর শয়তান গোমরাহির। সুতরাং শয়তান সত্যপথপ্রদর্শনকর্মের যোগ্য নয়। এমতো সুযোগ ও সামর্থ্যও তার নেই। কোরআনে পরিবেশন করা হয়েছে অদৃশ্যের সংবাদ। এ সংবাদ শয়তানের জানা সম্ভবই নয়। তারা উপরে উঠে আকাশবাসী ফেরেশতাদের সংবাদ শুনতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। কারণ এরকম অধিকার তাদেরকে দেয়াই হয়নি।

এরপরের আয়াতে (২১৩) বলা হয়েছে— 'অতএব তুমি অন্য কোনো ইলাহ্‌কে আল্লাহ্‌র শরীক কোরো না, করলে তুমি শাস্তি পাবে'। আলোচ্য বাক্যটি রসুল স.কে লক্ষ্য করে বলা হলেও এর প্রকৃত লক্ষ্য অন্যান্য মানুষ। অর্থাৎ শিরিক এবং তার পরিণাম যে কতো ভয়াবহ হতে পারে, সে কথা মানুষকে জানিয়ে দেয়াই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য। যেনো এখানে বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত। তাই আপনি আমার কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। আপনার শিরিকবিজড়িত হওয়ার কল্পনা অসম্ভব। তৎসত্ত্বেও যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্যকে আপনি গ্রহণ করবেন বলে ধরে নেয়া হয়, তবে একথা নিশ্চিত যে ওই অবস্থায় আপনিও আর শাস্তিবিমুক্ত থাকবেন না। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (২১৪) বলা হয়েছে— 'তোমার স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক করে দাও'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! সর্বপ্রথম আপনি আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করুন আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে, এরপর তদপেক্ষা কম নিকটজনকে। তারপর তদপেক্ষাও কম নিকটজনকে। এভাবে পাড়া, এলাকা, শহর, দেশ এবং বিশ্বকে। কারণ সর্বাপেক্ষা অধিক নৈকট্যভাজনেরাই সর্বাগ্রে হেদায়েত লাভের অধিকারী। এভাবে অগ্রসর হলে সকলের নিকট আপনার প্রচারকর্ম হয়ে পড়বে অধিকতর বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। কারণ মানুষ সাধারণতঃ নিকটজনের সঙ্গে প্রতারণা করে না। আর উত্তম কোনোকিছু তারা নিজের জন্য যেমন চায়, তেমনি কামনা করে নৈকট্যভাজনদের জন্যও। আর এভাবে স্বজন— নিকটজনকে সতর্ক করতে থাকলে দূরবর্তীদের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে পড়বে যে, রসুলের নিকটজন হলেও আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। রক্ষা পাওয়া যায় তাঁর আনীত ধর্মাদর্শের অনুসারী হলে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো রসুল স. আমাকে ডেকে বললেন, আমার উপরে অবতীর্ণ হয়েছে স্বজনকুলকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করার নির্দেশ। এ নির্দেশ আমাকে চিন্তিত করে তুলেছে। আমি জানি এ নির্দেশ পালন করতে গেলে তাদের মধ্যে ঘটবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এই মাত্র জিবরাইল বলে গেলেন, এ নির্দেশ পালন না করলে আমার উপরেও নেমে আসবে শাস্তি। সুতরাং এ নির্দেশ আমাকে পালন করতেই হবে। তুমি এক কাজ করো। অর্ধ ছা আটা দিয়ে রুটি বানাও। আর ছাগলের রান দিয়ে বানাও ব্যঞ্জন। তারপর নিমন্ত্রণ জানাও আবদুল মুত্তালিবের জ্ঞাতিগোষ্ঠীদেরকে। আমি নির্দেশ প্রতিপালন করলাম। আমাদের বংশভূতরা সকলেই এলেন। রসুল স. প্রথম এক টুকরা গোশত থেকে কিছু অংশ দাঁত দিয়ে কেটে মুখে পুরলেন। বাকী অংশ ব্যঞ্জনপাত্রে রেখে বললেন, শুরু করুন। সকলে আহার করলেন পরিতৃপ্তির সঙ্গে। অথচ আল্লাহ্‌র শপথ! পরিবেশিত আহার্য একাধিক ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করার মতো ছিলো না। বরকতময় ওই ভোজনপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি স.বললেন, আলী! এবার সবাইকে দুধ পান করাও। আমি এক পেয়ালা দুধ আনলাম। আল্লাহ্‌র কসম! ওই দুধ একজনকেও পরিতৃপ্ত করতে পারতো না। কিন্তু সকলেই ওই দুধ পান করলেন পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে। ভোজন শেষে আবু লাহাব দাঁড়িয়ে বললো, তোমাদের নিমন্ত্রণদাতা যাদুকর। তার একথা শুনে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো সকলে। রসুল স. আর কিছু বলার সুযোগই পেলেন না। কিছুদিন পর রসুল স. বললেন, আলী! পুনরায় সকলকে

www.eelm.weebly.com

দাওয়াত দাও। আমি পুনরায় আয়োজন করলাম পানাহারের। নিমন্ত্রণ জানালাম নিকটাত্মীয়দেরকে। যথাসময়ে সকলে এসে পানাহার করলেন। শেষে রসুল স. বললেন, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশদ্ভূত ব্যক্তিবর্গ। আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন, আমি যেনো তোমাদেরকে এই কল্যাণের দিকে আহ্বান করি। অতএব, কে এগিয়ে আসতে চাও, হতে চাও আমার প্রতিনিধি ও সহকর্মী। তাঁর কথা শুনে সকলে নিশ্চুপ হয়ে গেলো। ওই সমাবেশে আমিই ছিলাম বয়োকনিষ্ঠ। আমি বলে উঠলাম, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমি হবো আপনার সতীর্থ ও সহায়ক। তিনি স. প্রীত হলেন। পবিত্র হস্ত স্থাপন করলেন আমার স্কন্ধদেশে। বললেন, এ হচ্ছে আমার ভ্রাতা। আমার প্রতিনিধি। সুতরাং তোমরা সকলে এর নির্দেশনা মেনে নিয়ো। একথা শুনে সকলে একযোগে হেসে উঠলো। স্থান ত্যাগ করার সময় বলতে বলতে গেলো, কী কৌতুক! কী কৌতুক! আমাদেরকে নাকি এই বালকের কথা মেনে চলতে হবে।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. আরোহণ করলেন সাফা পর্বতের চূড়ায়। উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, হে বনী ফিহির! হে আওলাদে আদী! শিগগীর সকলে একত্র হও। তাঁর ডাক শুনে একত্রিত হলো কুরায়েশকুল। যারা আসতে পারলো না, তারাও পাঠিয়ে দিলো তাদের প্রতিনিধি। নেতৃবর্গের মধ্যে অন্যান্যদের সঙ্গে আবু লাহাবও উপস্থিত হলো সেখানে। সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে রসুল স. বললেন, হে মক্কাবাসী! আমি যদি বলি, এই পাহাড়ের পশ্চাতে এক দল শত্রুসেনা তোমাদের প্রতি আক্রমণোদ্যত, তোমরা কি আমার একথা বিশ্বাস করবে? সকলে সমস্বরে বললো, অবশ্যই। তিনি স. বললেন, কেনো? তারা বললো, তুমি যে সতত সত্যবাদী, মিথ্যাবচনবিবর্জিত। তিনি স. বললেন, তাহলে বিশ্বাস করো আমি আল্লাহ্র রসুল। আমি তোমাদেরকে সাবধান হতে বলছি আল্লাহ্র আযাব থেকে। আবু লাহাব একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠলো, ধ্বংস হও। এ জন্যই তাহলে তুমি আমাদেরকে জমায়েত করেছো? তার একথার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় 'তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিঁউ' সুরাটি।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'তোমার স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক করে দাও' তখন রসুল স. কুরায়েশদেরকে একত্র করে বললেন, হে কুরায়েশ বংশদ্ভূতরা! জীবন ক্রয় করে নাও (আত্মরক্ষা করো আসন্ন আযাব থেকে)। আল্লাহ্র শাস্তি শুরু হলে আমি তোমাদের কোনো উপকারে আসবো না। হে আবদে মান্নাফের সন্তান-সন্ততি!

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌র শাস্তির প্রতিকূলে আমি তোমাদেরকে সহায়তা করতে পারবো না। হে প্রিয় পিতৃব্য আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহ্‌র অসন্তোষের বিরুদ্ধে আমি আপনাদের কেউ নই। হে আল্লাহ্‌র রসুলের পিতার ভগ্নি সুফিয়া! হে মোহাম্মদ দুলালী ফাতেমা! এই মুহূর্তে আমার নিকট থেকে আহরণ করো আল্লাহ্ প্রদত্ত মহাকল্যাণ। নতুবা আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবো না।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর পর রসুল স. আরোহণ করলেন সাফা পাহাড়ে। উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, হে জনতা! একত্র হও। ত্বরা করো। শশব্যস্ত হয়ে সকলে একত্র হলো পাহাড়ের পাদদেশে। তিনি স. বললেন, হে সমবেত জনমণ্ডলী! আমি যদি এখন বলি, এই পাহাড়ের বিপরীত প্রান্তে একদল সশস্ত্র দস্যু তোমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষমান, তাহলে কি তোমরা আমার একথা মেনে নিবে? সকলে বললো, তুমি তো সত্যবাদী (সুতরাং বিশ্বাস করবো না কেনো?) তিনি স. বললেন, তাহলে বিশ্বাস করো অংশীবাদিতার জন্য আযাব অত্যাসন্ন। আবু লাহাব বিকট চিৎকার করে বলে উঠলো, নিপাত যাও। এগুলো বলার জন্যই কি তুমি আমাদেরকে সমবেত করেছো? তার এমতো অপবচনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো 'তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিঁউ ওয়া তাব্‌বা' (উচ্চারণরীতিটি ক্বারী আ'মাশের)।

আবদুল্লাহ্ ইবনে হিমার মাজাশায়ী' সূত্রে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা প্রচার করবার জন্য আমি নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি। আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার বান্দাদেরকে যে বৈধ বিত্তসম্ভার দান করেছি, তা তাদের জন্য হালাল। আর আমি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার অতুলনীয় এককত্বে বিশ্বাসীরূপে। কিন্তু শয়তান তাদেরকে করে বিশ্বাসচ্যুত। তাদের চোখে আমা কর্তৃক ঘোষিত হালালকে শয়তানই করে দিয়েছে হারাম। আমি সকলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, যাকে এবং যে সকল কিছুকে আমি উপাস্যরূপে প্রামাণ্য করিনি, তাদেরকে ও সেসকল কিছুকে আমার অংশীরূপে কল্পনা কোরো না। রসুল স. আরো বলেছেন, অথচ আরব-অনারব সকল জনগোষ্ঠীর অনেকেই এখন অংশীবাদিতামগ্ন। তাদের সকলের প্রতিই তিনি অপরিতুষ্ট। কেবল তাদের প্রতি অতুষ্ট নন, যারা আহলে কিতাব এবং মূল ধর্মানুসারী। আর আমার প্রতি এই মর্মেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেনো স্বজনবর্গকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করি। আমি নিবেদন করলাম, হে আমার প্রভুপালক। এ নির্দেশ পালন করলে তারা তো আমার শিরশ্ছেদ করবে। চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে আমার মস্তক। আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমাকে পরীক্ষা করবো,

www.eelm.weebly.com

পরীক্ষা করবো তোমার মাধ্যমে অন্যদেরকেও। তোমাকে আমি প্রেরণ করেছি এই উদ্দেশ্যেই। আমি তোমার উপরে অবতীর্ণ করেছি একটি অক্ষয় গ্রন্থ, (কালের) সলিল যাকে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারবে না । তুমি ওই গ্রন্থ পাঠ কোরো শয়নে জাগরণে। ওই গ্রন্থের বিধানাবলী প্রতিষ্ঠার জন্য তুমি সংগ্রাম করো, বিজয়ী হবে। তুমি আমার বান্দাদের জন্য অর্থব্যয় করো, তোমার জন্য ব্যয় করা হবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে একজন সংগ্রামকারীকে প্রস্তুত করো। আমি তোমার সাহায্যার্থে প্রস্তুত রাখবো পাঁচগুণ সৈন্য। তুমি তোমার অনুচরবর্গকে নিয়ে অবাধ্যদের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাও নিরন্তর অভিযান। মনে রেখো, তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতী— ১. ন্যায়বিচারক ২. স্বজন ও বিশ্বাসীদের প্রতি দয়ার্দ্র ও কোমল আচরণবিশিষ্ট ব্যক্তি ৩. সচ্চরিত্র ও বিত্তশালী, যে সদাচারী ও অপরের জন্য অর্থ ব্যয়কারী। আর পাঁচ শ্রেণীর লোক জাহান্নামী— ১. ওই নির্বোধ, যে ভালো-মন্দবোধবিবর্জিত এবং যে অন্যকে উত্যক্তকারী ২. ওই ব্যক্তি যে ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তোমাদেরকে ও তার পরিবার পরিজনকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে ৩. ওই লোক যে তুচ্ছ বস্তুর জন্যও লোভাতুর ৪. ওই ব্যক্তি যে অশ্লীল ভাষণবিশিষ্ট এবং ৫. ওই ব্যক্তি যে কৃপণ ও মিথ্যাচারী। বর্ণনাকারী বলেন, কৃপণ ও মিথ্যাচারীদের কথাও সম্ভবতঃ তিনি বলেছিলেন। আল্লাহ্ই সমধিক অবহিত।

ইবনে জুরাইজ সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'তোমার স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক করে দাও' তখন রসুল স. তাঁর স্বজনদেরকে বিশেষভাবে আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করতে লাগলেন। শুরু হলো বিরূপ প্রতিক্রিয়া। সাহাবীগণের জন্য এমতো প্রত্যাখ্যানজনিত পরিস্থিতি হয়ে গেলো অসহনীয়। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ
إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَرَاكَ
حِينَ تَقُومُ ۝ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ۝ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

❑ এবং যাহারা তোমার অনুসরণ করে সেই সমস্ত বিশ্বাসীর প্রতি বিনয়ী হও।

❑ উহারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তুমি বলিও, 'তোমরা যাহা কর তাহার জন্য আমি দায়ী নহি।'

❑ তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহের উপর,

www.eelm.weebly.com

❒ যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দণ্ডায়মান হও সালাতে

❒ এবং তোমাকে দেখেন সিজ্‌দাকারীদিগের সহিত উঠিতে-বসিতে।

❒ তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের প্রতি বিনম্র হও'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আপনার বিশ্বাসী অনুচরবর্গের প্রতি প্রদর্শন করুন কোমল আচরণ, যাতে করে কেটে যায় তাদের কঠোর নির্দেশপালনের ভীতি। যেনো তারা আশ্বস্থ হয়, হয় সহজ ও স্বাভাবিক।

এখানে 'আখফিদ্ব' অর্থ বিনম্র হও। নিম্নে অবতরণকালে পাখিরা তাদের ডানা গুটিয়ে নেয়। কথাটির মাধ্যমে এখানে রূপকার্থে বুঝানো হয়েছে সেইরূপ সংযত নিম্নগামিতাকে। কথাটির মর্মার্থ তাই— বিনম্র হও, হও সংযত আচরণবিশিষ্ট, মনোহর আচরণপ্রবণ।

'মিনাল মু'মিনীন' অর্থ সেই সকল বিশ্বাসীদের প্রতি। এখানকার 'মিন' বয়ানিয়া (বর্ণনামূলক), অথবা তাবয়ি'দ্বীয়া (আংশিক অর্থপ্রকাশক)। আর এখানকার 'যারা তোমার অনুসরণ করে' কথাটি যদি ব্যাপকার্থক হয় তবে পূর্ণ-অপূর্ণ উভয় ধরনের অনুসরণ হবে এর অর্থভূত। আর যদি এর অর্থ কেবল পূর্ণ অনুসরণ হয়, তবে এখানকার 'মিন' হবে তাবয়ি'দ্বিয়া (আংশিক অর্থপ্রকাশক)। অবশ্য 'বিশ্বাসী' অর্থ পুণ্যবান-পাপী উভয় প্রকার বিশ্বাসী। তাই বুঝতে হবে এখানকার 'মিন' বর্ণনামূলকই। অর্থাৎ সকল প্রকার বিশ্বাসীর প্রতি কোমল আচরণের নির্দেশপ্রাপ্ত ছিলেন রসুল স.। পরবর্তী আয়াতে (২১৬) দৃষ্টে সেকথাই প্রতীয়মান হয়। কারণ সেখানে বলা হয়েছ কেবল পাপী-বিশ্বাসীগণের কথা।

বলা হয়েছে— 'তারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে, তুমি বোলো, তোমরা যা করো, তার জন্য আমি দায়ী নই'। উল্লেখ্য, এখানে 'তোমরা যা করো' বলে পাপ থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, পাপীদের থেকে পৃথক থাকতে বলা হয়নি। বরং পুণ্যবানদের মতো তাদের সঙ্গেও প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে বিনম্র আচরণ।

এর পরের আয়াতে (২১৭) বলা হয়েছে— 'তুমি নির্ভর করো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তো সতত নির্ভরশীল থাকেন সেই আল্লাহ্‌র উপর যিনি অবাধ্যদেরকে শাস্তিদানের ব্যাপারে মহাপ্রতাপশালী এবং যিনি আপনার উপর এবং আপনার বিশ্বাসী অনুসরণকারীদের উপর অতুলনীয়রূপে দয়াপরবশ।

এখানে 'তাওয়াক্‌কাল্' অর্থ নির্ভরশীল হওয়া। অর্থাৎ নিজের সকলকিছুর ব্যাপারে অন্যের উপরে নির্ভর করা। এই নির্ভরশীলতা অপাত্রে হলে অসিদ্ধ এবং

www.eelm.weebly.com

যথার্থ পাত্রে হলে সুসিদ্ধ। বলা বাহুল্য আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ও নির্ভরশীলদের প্রতি মহাকল্যাণপ্রদাতা। তাই তাঁর প্রতি নির্ভর করা অবশ্যই সুসিদ্ধ, বরং অত্যাবশ্যক।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (২১৮, ২১৯) মর্মার্থ হচ্ছে— বিশেষভাবে ওই নির্ভরশীলতা প্রকাশ পায় আপনার নামাজের দণ্ডায়মানতায় এবং আপনার জামাতবদ্ধ নামাজের সারিবদ্ধ রুকুতে ও সেজদায়। আপনার নির্ভরশীলতার এমতো সুচারু বিকাশ তিনি অবশ্যই অবলোকন করেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'তাক্বাল্লুবাকা' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে কিয়াম, রুকু, সিজদা, বৈঠক অর্থাৎ নামাজের সকল ভঙ্গিমা ও চলমানতাকে। আর এখানে 'ফীস্সাজ্বিদীন' অর্থ ফীল মুসল্লীন, অর্থাৎ নামাজীগণের সঙ্গে।

মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'ফীস্সাজিদীন' অর্থ নামাজীদের সঙ্গে। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়, আল্লাহ্ আপনাকে একাকী নামাজপাঠরত এবং দলবদ্ধরূপে নামাজরত উভয় অবস্থায় অবলোকন করেন।

মুকাতিল বলেছেন— 'ফীলমুসাল্লীন' অর্থ মাআ'ল মুসল্লীন। অর্থাৎ তোমরা একাকী নামাজ আদায় করলে তা প্রত্যক্ষ করেন আল্লাহ্পাক, আবার জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করলে সেটাও অবলোকন করেন আল্লাহ্পাক।

মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ— নামাজ পাঠকালে আপনার সম্মুখবর্তী ও পশ্চাদবর্তী দৃষ্টি সঞ্চালনকেও আল্লাহ্ দেখেন। উল্লেখ্য, রসুল স. জামাতে নামাজ পাঠকালে সামনে যেমন দেখতেন, তেমনি দেখতে পেতেন পিছনের নামাজীদেরকেও। এমতো দ্বিমুখী দৃষ্টিপাত ছিলো তাঁর নবীসুলভ আচরণের অন্তর্গত।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আমাদেরকে বললেন, তোমরা নামাজ পাঠকালে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখো আমার দিকে। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের বিনম্রতা ও একাগ্রতার বিষয়টি আমার নিকট গোপন থাকে না। কারণ আমি তো পিছনেও দেখি। বাগবী।

হাসান বলেছেন, এখানে তাক্বাল্লুবাকা' অর্থ 'তাসাররুফা'। অর্থাৎ বিশ্বাসীদের মধ্যে আপনার আগমন প্রত্যাগমনকেও আল্লাহ্ অবলোকন করেন। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে 'সাজ্বিদীন' দ্বারা বুঝানো হয়েছে অন্যান্য নবীগণের অবস্থাকে। এভাবে কথাটি দাঁড়িয়েছে— অন্যান্য নবীর চালচলন যেমন আল্লাহ্র সতত পর্যবেক্ষণভূত ছিলো, তেমনি আপনার সকল কিছুও তাঁর সতত পর্যবেক্ষণ বহির্ভূত নয়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'দেখেন' অর্থ তিনি লক্ষ্য করেন আপনার এবং আপনার অনুসারী তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠকারীদের আগমন-প্রত্যাগমনকে।

www.eelm.weebly.com

বায়যাবী লিখেছেন, যে রাতে রাত্রিকালীন নামাজের অপরিহার্যতা (ফরজ) রহিত করা হলো, ওই রাতে রসুল স. সাহাবীগণের নিশীথের নামাজ পাঠ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য গৃহ থেকে নিক্রান্ত হলেন। তিনি দেখতে পেলেন সকলেই আপনাপন গৃহে নামাজ পাঠে. জিকিরে অথবা কোরআন তেলাওয়াতে মগ্ন। তাঁদের কোরআন পাঠের আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছে মধুমক্ষিকাদের গুঞ্জরণের মতো।

উল্লেখ্য, রসুল স. এর বিশেষ বৈশিষ্টমণ্ডিত অবস্থা ছিলো অনেক। এখানে কেবল উল্লেখ করা হয়েছে সাহাবীগণের সঙ্গে নামাজ আদায় করার প্রসঙ্গটিকে। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'তাক্বাল্লুবাকা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর পিতামহ থেকে পিতার ললাটদেশে নূরে মোহাম্মদীর স্থানান্তরিত হওয়াকে। কিন্তু এমতো ব্যাখ্যা রসুল স. এর বিশেষত্বকে অনন্যসাধারণ করে তোলে না। কারণ মানুষের জন্মপ্রবাহ পিতামহ-পিতা এভাবেই প্রবহমান হয়। এমতোক্ষেত্রে কুরায়েশেরা এবং সমগ্র মানুষ সমতুল। সুতরাং এমতো ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে, এখানে 'তাক্বাল্লুবাকা' দ্বারা বুঝানো হচ্ছে রসুল স. এর পবিত্র পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর পবিত্রা মাতার উদরাভ্যন্তরে স্থানান্তরিত হওয়াকে। আর এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টিও প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তাঁর উর্ধ্বতন সকল পিতৃপুরুষ ছিলেন বিশ্বাসী ও পবিত্র। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন আল্লামা সুয়ূতী।

এসম্পর্কে হাফেজ শামসুদ্দিন ইবনে নাসিরউদ্দিন দামেশকী একটি কবিতা রচনা করেছেন যার অর্থ— প্রত্যেক মহাসম্মানিত নূর স্থানান্তরিত হয়, যা জ্যোতির্ময় হতে থাকে একত্ববাদীগণের বদনমণ্ডলে। এভাবেই ওই মহান নূর স্থানান্তরিত হতে হতে পায় তার প্রকাশ কাল। অবশেষে জন্মলাভ করেন সাইয়্যেদুল মুরসালীন স.। সহীহ বোখারীর বর্ণনা দ্বারাও এই ব্যাখ্যাটি প্রত্যয়িত হয়। যেমন— রসুল স. বলেছেন, যুগের পর যুগ অতিক্রম করিয়ে আল্লাহ্ আমাকে স্থানান্তরিত করেছেন সর্বোত্তম যুগে। শেষে হয়েছে আমার এ সময়ের এই আবির্ভাবায়ন। হজরত ওয়াছিলা ইবনে আসকাআ থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ নবী ইব্রাহিমের সন্তানগণের মধ্যে মনোনীত করেছেন নবী ইসমাইলকে, তাঁর বংশাবলী থেকে বনী কেনানাকে, বনী কেনানা থেকে কুরায়েশকে, কুরায়েশ থেকে বনী হাশেমকে এবং বনী হাশেম থেকে আমাকে। বায়হাকী তাঁর 'দালায়েলুন্ নবুয়ত' গ্রন্থে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ মনুষ্যজাতিকে বিভক্ত করেছেন দু'টি দলে, উত্তমতর দলভূত করেছেন আমাকে। তারপর আমার পিতামাতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন আমাকে। মূর্খতার যুগের সকল অকল্যাণ থেকে আমাকে রেখেছেন

www.eelm.weebly.com

মুক্ত। পিতা আদম থেকে বৈধ বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছি আমি ও আমার পিতৃপুরুষেরা, ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়। সুতরাং সন্তাগতভাবে আমি যেমন সকল মানুষ অপেক্ষা উত্তম, তেমনি বংশগতভাবেও।

উল্লেখ্য, হজরত আদম থেকে রসুল স. এর সকল পিতৃপুরুষের মুমিন হওয়ার বিষয়ে আমি রচনা করেছি একটি স্বতন্ত্র পুস্তক। ওই পুস্তকে রয়েছে পক্ষ-বিপক্ষের সকল দলিল। শেষে রয়েছে সিদ্ধান্তমূলক উপসংহার। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে ওই পুস্তকটি পাঠ করা যেতে পারে।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যেহেতু সকলের বাক্যাবলী শ্রবণ করেন এবং জানেন সকলের অন্তরস্থিত উদ্দেশ্যাবলী, তাই বিশ্বাসীগণের জন্য কেবল তাঁর উপরেই ভরসা করা সমীচীন, অন্য কারো উপরে নয়।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ২২১, ২২২, ২২৩

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ۝ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۝ يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ۝

❒ তোমাকে কি আমি জানাইব কাহার নিকট শয়তান অবতীর্ণ হয়?

❒ উহারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট।

❒ উহারা কান পাতিয়া থাকে এবং উহাদিগের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

মক্কার মুশরিকেরা বলতো, 'মোহাম্মদের উপরে কোরআন অবতীর্ণ করে শয়তান'। তাদের এমতো অপউক্তির জবাব দেয়া হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ে এভাবে— 'তোমাকে কি আমি জানাবো, কার নিকট শয়তান অবতীর্ণ হয়? তারা তো অবতীর্ণ হয় ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট'। এভাবে সকলকে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মোহাম্মদ মোস্তফা স. আল্লাহ্‌র সত্য রসুল। আর তাঁর অবস্থান শয়তানের সম্পূর্ণ প্রতিপক্ষে। শয়তানের সম্পর্ক তো ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপিষ্ঠদের সঙ্গে। মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর উপরে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয় অদৃশ্যের সংবাদ, যা জানার অধিকার ও যোগ্যতা শয়তানের নেই। তার অনুসারী মিথ্যাবাদী জ্যোতিষী ও পাপিষ্ঠদের তো নেই-ই।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেন, একবার কিছুসংখ্যক লোক উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রসুল! গণকদের কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? তিনি স. বললেন, না। লোকেরা বললো, তাদের কোনো কোনো কথা তো ফলেও যায়।

www.eelm.weebly.com

তিনি স. বললেন, ফেরেশতাদের আলাপচারিতা থেকে শয়তান দুই একটা কথা শুনে এসে তাদের ভক্ত গণকদেরকে মোরগের মতো আওয়াজ করে জানায়। তারা আবার ওই কথাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জনসমক্ষে প্রচার করে। বোখারী, মুসলিম।

জননী আয়েশা আরো বলেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, ফেরেশতারা মেঘের উপরে অবতরণ করে ঊর্ধ্বদেশের কোনো কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করে। শয়তান মেঘের কাছাকাছি উঠে গিয়ে চুপিসারে তাদের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করে। কোনো একটি সংবাদ কোনোক্রমে শুনতে পেলেই তারা পৃথিবীতে নেমে আসে এবং ওই কথা প্রবেশ করিয়ে দেয় গণকদের অন্তরে। গণকেরা তখন ওই কথার সঙ্গে মিশ্রিত করে অনেক মিথ্যা। তারপর তা প্রচার করে জনসমক্ষে। বোখারী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যখন ঊর্ধ্বাকাশে কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তখন ফেরেশতারা বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশের জন্য সভয়ে সঞ্চালন করতে থাকে তাদের পক্ষ। ফলে সৃষ্টি হয় পাথরের উপরে শিকলের আঘাত করার মতো আওয়াজ। এভাবে তাদের ভীত-সন্ত্রস্ততা দূর হয়ে গেলে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করে, বলতো দেখি আমাদের পরম প্রভুপালনকর্তা কী ঘোষণা দান করলেন? অপরজন জবাব দেয়, যা কিছুই ঘোষণা করা হোক না কেনো, তা অবশ্যই সত্য, শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদায়িত। তাদের ওই আলাপচারিতার দিকে উৎকর্ণ হয়ে থাকে শয়তান। তারপর তা বলে দেয় তাদের ভক্তকুল জ্যোতিষগোষ্ঠীকে। তারা ওই আলাপচারিতা শোনে একে অপরের কাঁধে সওয়ার হয়ে। এভাবে সকলের উপরের শয়তান থেকে একে একে তাদের সংবাদ নেমে আসে পৃথিবীতে। কখনো কখনো আবার তাদের সংবাদের এমতো ক্রমঅবতরণ নির্বিঘ্ন হয় না। হঠাৎ তারকার জ্বলন্ত কোনো অংশ নিক্ষিপ্ত হয় তাদের দিকে। ফলে তারা সকলে হয়ে যায় ভস্মীভূত। কখনো আবার ওই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগেই সর্বনিম্নস্থিত শয়তানের মাধ্যমে সংবাদটি পৌঁছে যায় গণকদের কাছে। তারা তখন সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে করে ভবিষ্যদ্বাণী। বোখারী।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারী সাহাবী বলেছেন, এক রাতে আমরা উপবিষ্ট ছিলাম রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। হঠাৎ অতিউজ্জ্বল হয়ে খসে পড়লো আকাশের একটি তারা। তিনি স. বললেন, মূর্খতার যুগে এরকম তারা খসে পড়া সম্পর্কে তোমরা কি কিছু জানতে? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই এবিষয়ে উত্তমরূপে অবহিত। আমরা তখন বলতাম, আজ রাতে একজন মন্দ লোকের জন্ম হলো। তিনি স. বললেন, জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে নক্ষত্রপতনের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এরকম— আমাদের

www.eelm.weebly.com

মহাসৃজয়িতা ও মহামর্যাদাময় প্রভুপালনকর্তা যখন ঊর্ধ্বাকাশে কোনো সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন, তখন সেখানকার ফেরেশতামণ্ডলী মুখর হয় তাঁর সপ্রশংস মহিমা স্মরণে। তারপর আরশবাহী ফেরেশতাদেরকে তারা বলে, আমাদের প্রভুপালনকর্তা তাঁর কী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন? আরশবাহীরা তখন সদ্যঘোষিত সিদ্ধান্তের কথা জানায়। ওই সংবাদ ক্রমান্বয়ে ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৌঁছে যায় পৃথিবীর নিকটতম আকাশের ফেরেশতাদের কাছে। শয়তান তখন তাদের কাছাকাছি গিয়ে সে কথা শুনে নেয় এবং পৃথিবীতে এসে প্রচার করে তাদের বশংবদ গণকদের কাছে। গণকেরা তখন তা সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণে প্রচার করে জনসমক্ষে। তাই তাদের কিছু কিছু কথা বাস্তবে ফলে যায়। মুসলিম।

শয়তানের এমতো কার্যকলাপের কথাই উল্লেখিত হয়েছে শেষোক্ত আয়াতে এভাবে— 'তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী'।

আওফীর সূত্রে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর যুগে দু'জন কবি পালা করে পরস্পর বিরোধী সমালোচনার কাব্যের আসর করতো। একজন ছিলো আনসারগণের মধ্য হতে, আরেকজন ছিলো ভিন্ন গোত্রের। আরো কিছুলোক ছিলো তাদের সহায়ক। কবিরা মুখস্থ বলতো ও তাদের সাথে জারী ধরতো অন্যান্যরা। তাদের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۝ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ۭ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۝

❒ এবং কবিদিগকে অনুসরণ করে তাহারা, যাহারা বিভ্রান্ত।

❒ তুমি কি দেখ না উহারা লক্ষ্যহীনভাবে সর্ব বিষয়ে কল্পনা-বিহার করিয়া থাকে?

❒ এবং যাহা বলে, তাহা করে না।

❒ তবে তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে এবং আল্লাহ্কে বার বার স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হইবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানিবে উহাদিগের গন্তব্যস্থল কোথায়?

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়াশ্‌শুআ'রাউ ইয়াত্‌তাবিউ'হুমুল গউন' (এবং কবিদেরকে অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত)। একথার অর্থ— বিভ্রান্তরাই কবিদের অনুসারী। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন জুহাক সূত্রে ইমাম বাগবী। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আতিয়াও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবী হাতেম এবং ইকরামা সূত্রেও এরকম ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে 'শুআরা' বলে ওই সকল কবিদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা রসুল স. এর শত্রুকুলের সাহায্যার্থে তাদের কবিতায় তাঁর দুর্নাম রটনা করতো। মুকাতিল বলেছেন, ওই সকল কবিদের মধ্যে ছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের সাহমী, হুবাইরাহ ইবনে আবী ওয়াহাব মাখজুমী, শফি ইবনে আবদে মান্নাফ, আবু উয্‌যা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর মাহ্‌জহী এবং উমাইয়া ইবনে সলত সাকাফী। এরা বলতো, মোহাম্মদ যেভাবে কবিতা রচনা করে, সেভাবে আমরাও পদ রচনা করতে পারি। কোনো কোনো লোক তাদের কবিতা শোনার জন্য তাদের কাছে জড়ো হতো। তাদেরকেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'গউন' (বিভ্রান্ত)। তাদের কাব্য আসরের মূল উপজীব্যই ছিলো রসুল স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দের প্রতি বিদ্রূপ ও শ্লেষ।

কাতাদা ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'গউন' দ্বারা বুঝানো হয়েছে শয়তানদেরকে। আর 'হুমুল গউন' একটি পৃথক বাক্য। যার মাধ্যমে অপনোদন করা হয়েছে রসুল স. এর কবি হওয়ার ধারণাকে। পরবর্তী আয়াত পাঠে সেকথাই অনুমিত হয়।

পরের আয়াতে (২২৫) বলা হয়েছে— 'তুমি কি দেখনা তারা লক্ষ্যহীনভাবে সর্ববিষয়ে কল্পনা-বিহার করে থাকে'? এখানকার 'ওয়াদী' হচ্ছে বাক্যালাপের একটি প্রকার, অথবা সকল বিষয়ের অতিরঞ্জিত বিবরণ— যেমন, প্রশংসা-দুর্ণাম, অহমিকা-বিনয়, ভালোবাসা-ঘৃণা ইত্যাদির অতিরঞ্জন। আরববাসীরা যেমন বলে 'আনা ফী ওয়াদীন ওয়া আনতা ফী ওয়াদীন' (আমি এক উপত্যকায়, আর তুমি অন্য উপত্যকায়)। অর্থাৎ আমি বলি একরকম, আর তুমি বলো অন্য কিছু।

'ইয়াহীমুন' অর্থ কল্পনাবিহার। এর শাব্দিক অর্থ নিজের সীমানা ছেড়ে অন্যের সীমানায় যথেচ্ছ পরিভ্রমণকারী। উল্লেখ্য, ওই সকল কবি সত্যমিথ্যার পার্থক্যরেখা মানতো না। তাদের রচিত পঙক্তিগুলো ছিলো কল্পনাবিহারের লাগামহীন প্রতিভাস।

কাতাদা বলেছেন, কবিরা যেমন মিথ্যা প্রশংসা করে থাকে, তেমনি রচনা করে ভিত্তিহীন অপযশ। কেউ কেউ 'সর্ব বিষয়ে কল্পনা-বিহার করে থাকে' কথাটির অর্থ করেছেন— তারা প্রতিটি বক্তব্য প্রকাশ করে ছন্দবদ্ধভাবে, যুগ্মপঙক্তি সহযোগে।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (২২৬) বলা হয়েছে— 'এবং যা বলে তা করে না'। একথার অর্থ— তারা তাদের কবিতার মাধ্যমে অনেক মিথ্যা কথা বলে, যা বাস্তবকর্মসম্মত নয়।

কোরআন অবশ্যই মোজেজা। এই মোজেজার দিক রয়েছে দু'টি— একটি বিবরণগত, আর একটি অর্থগত। ওই সকল কবি বলতো, কোরআন অবতীর্ণ করে শয়তান। আর এর ভাষাশৈলীর নির্মাতা মোহাম্মদ। আর আমরাও তো কাব্যনির্মাণকৌশল জানি। তাদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে এই সুরায় পৃথক করে দেয়া হয়েছে গণকের গণনা এবং কবিদের কবিত্ব থেকে মোহাম্মদ স. এর নবুয়তকে। ইতোপূর্বে গণকদেরকে বলা হয়েছে মিথ্যাবাদী ও পাপী (আয়াত ২২১, ২২২)। আর আলোচ্য আয়াতে কবিদের সম্পর্কে বলা হলো— তারা যা বলে তা করে না। অর্থাৎ তারাও সর্ববিষয়ে কল্পনাবিহারী মিথ্যাবাদী। আর প্রিয়তম রসুল স. অপর কল্পনা অভিসারী কবিদের থেকে অনেক অনেক উর্ধে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কবিতা দ্বারা উদরপূর্তি করা অপেক্ষা রক্ত ও পুঁজ দ্বারা উদরপূর্তি করা উত্তম। বোখারী, মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, আমরা একবার রসুল স. এর সঙ্গে পার্বত্যপথ অতিক্রম করছিলাম। এমন সময় দেখা গেলো এক বাউণ্ডলে কবি তার কবিতা আবৃত্তি করতে করতে যাচ্ছে। রসুল স. বললেন, শয়তানটাকে ধরে নিয়ে এসো (উচিত শিক্ষা দেই)। তারপর বললেন, কবিতা দ্বারা পেট ভরানো অপেক্ষা রক্ত-পুঁজ দ্বারা পেট ভরানো ভালো।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রসুল স. একবার বললেন, কথায় অতিশয়োক্তি যারা করে, তারা ধ্বংস হয়েছে। একথা তিনি স. উচ্চারণ করলেন তিনবার।

হজরত আবু ছা'লাবা খাশানী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় এবং আখেরাতে সর্বাধিক নৈকট্যভাজন ওই ব্যক্তি, যার স্বভাব-চরিত্র নির্মল। আর আমার কাছে সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় ও পরকালে আমার সবচেয়ে দূরবর্তী সে, যার স্বভাব-চরিত্র অসুন্দর, যে রচনা করে অশ্লীল বাক্যাবলী, যে বাচাল এবং যে তার বক্তব্যকে করে অতিরঞ্জিত। আমি বলি, কবিরাই সাধারণতঃ এসকল দোষে দোষী। তিরমিজি। হজরত জাবের থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। আর এক বর্ণনায় এসেছে, একবার সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো বাক্যবাগীশ ও অতিরঞ্জনকারীদেরকে জানি, কিন্তু 'মুতাফাইহিক্বুন্' আবার কারা? তিনি স. বললেন, অহংকারীরা।

www.eelm.weebly.com

হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, মে'রাজ রজনীর রহস্যময় পরিভ্রমণকালে আমি একস্থানে দেখতে পেলাম, কিছু সংখ্যক লোকের ওষ্ঠকর্তন করা হচ্ছে আগুনের কাঁচি দিয়ে। ভ্রমণসহচরকে বললাম, ভ্রাতা জিবরাইল! এরা কারা? জিবরাইল বললেন, আপনার উম্মতের ওই সকল ওয়ায়েজীন, যারা তাদের বক্তৃতায় মানুষকে সদুপদেশ দেয়, কিন্তু নিজে তা পালন করে না। ইমাম তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুস্প্রাপ্য শ্রেণীর।

ওরওয়া সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, যখন আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথম তিনটি আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা বললেন, আল্লাহ্ ভালো জানেন, আমিও তো কবি (তবে আমার পরিণতি কী হবে?) তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় সুরার শেষ পর্যন্ত।

আবুল হাসান সূত্রে ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখনা, তারা লক্ষহীনভাবে সর্ববিষয়ে কল্পনা বিহার করে থাকে এবং যা বলে তা করে না' তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা, হজরত কা'ব ইবনে মালেক এবং হজরত হাস্সান ইবনে সাবেত রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্পাক তো জানেন, আমরা কবি। তাহলে যে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাঁদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য সুরার সর্বশেষ আয়াত (২২৭) এভাবে— 'তবে তাদের কথা স্বতন্ত্র যারা বিশ্বাস করে, সৎকার্য করে এবং আল্লাহ্কে বার বার স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্য স্থল কোথায়'?

'জাকারুল্লহা কাছীরা' অর্থ আল্লাহ্কে বার বার স্মরণ করে। অর্থাৎ যাদের কবিতা রচনা ও আবৃত্তি আল্লাহ্র অধিক স্মরণের অন্তরায় নয়। বরং তাদের কবিতায় পুনঃপুনঃ প্রতিভাত হয় আল্লাহ্র স্মরণ, ভালোবাসা, মহিমা, প্রশংসা ও ইবাদতের প্রতি প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন অনুপ্রেরণা। আবু ইয়াযিদ বলেছেন, আল্লাহ্র নামের সংখ্যাগত উচ্চারণের নাম বার বার স্মরণ করা নয়। বার বার স্মরণ অর্থ হৃদয়ের নিরবচ্ছিন্ন স্মরণমগ্নতা।

'অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে' কথাটির অর্থ— যারা অবিশ্বাসী কবিদের কবিতায় উল্লেখিত ও উচ্চারিত ইসলাম ও মুসলমানবিদ্বেষী বক্তব্য দ্বারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয় এবং এমতো অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করে নতুন নতুন উৎকৃষ্ট পঙক্তিমালা রচনা করে।

www.eelm.weebly.com

বাগবী তাঁর 'শরহে সুন্নাহ' ও 'মুয়া'লিম' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত কা'ব ইবনে মালেক একবার রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! আল্লাহ্‌পাক তো কবিদের সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। এখন তবে আমি ও আমার মতো কবিদের উপায় কী? তিনি স. বললেন বিশ্বাসীরা যেমন তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করে, তেমনি যুদ্ধ করে রসনা দ্বারাও। যার অধিকারে আমার জীবন সেই পবিত্রতম সত্তার শপথ! তোমাদের কথার তীর, ধনুক থেকে সুতীক্ষ্ণ তীর নিক্ষেপের মতো।

আবদুল বার তাঁর 'ইস্তিয়াব' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত কা'ব ইবনে মালেক একবার নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! কবিতা সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে পারি কি? তিনি স.বললেন, বিশ্বাসীরা জেহাদ করে অস্ত্র ও কথা উভয়ের সাহায্যে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বর্ণনা করেন, ওমরার কাজা আদায়ের নিমিত্তে যখন রসুল স. মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন ইবনে রওয়াহা পথ চলছিলেন তাঁর সম্মুখবর্তী সতর্ককারীরূপে। তাঁর কণ্ঠ থেকে তখন ধ্বনিত হচ্ছিলো কবিতার কতিপয় পঙক্তি। রসুল স. সঙ্গী ওমরকে কিঞ্চিত উত্তেজিত হতে দেখে বললেন, ওমর! ওকে কবিতা পাঠ করতে দাও। দেখেছো. পঙক্তিগুলো বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি কীরকম সুতীক্ষ্ণ, শানিত তীরের চেয়েও ধারালো।

হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, বনী কুরায়জার সঙ্গে যুদ্ধের দিবসে রসুল স. হজরত হাস্‌সানকে লক্ষ্য করে বললেন, কবিতায় অবিশ্বাসীদের অখ্যাতি বর্ণনা করো, জিবরাইল আমীন তোমার সঙ্গী। তিনি স. তখন তাঁকে একথাও বলেছিলেন যে, আমার পক্ষ থেকে তাদের কুৎসার জবাব দাও। হে আল্লাহ্! রুহুল কুদুস দ্বারা হাস্‌সানকে সাহায্য করো।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, একবার রসুল স. আমাকে বললেন, অংশীবাদী কুরায়েশদের নিন্দা করতে থাকো। তোমার এমতো বচন তাদের কাছে হবে তীরবিদ্ধ হওয়ার চেয়ে অধিক কষ্টদায়ক। জননী আয়েশা আরো বলেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. হাস্‌সানকে বলেছেন, যখন তুমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে বাকযুদ্ধে লিপ্ত থাকবে তখন রুহুল কুদুস হবে তোমার সঙ্গী ও সহায়ক। তিনি আরো বলেছেন, রসুল স. বলেছেন, হাস্‌সান সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কুৎসা প্রচার করেছে, সুতরাং সে পরিবেশন করেছে নিরাময়ক।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. হাস্‌সানের জন্য মসজিদে একটি আলাদা মিম্বর রেখে দিতেন। ওই মিম্বরে উঠে হাস্‌সান আবৃত্তি করতেন রসুল স. এর মাহাত্ম্য এবং তাঁর শত্রুদের অপযশমূলক কবিতা।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. তাঁর সম্পর্কে বলতেন, আল্লাহ্ রুহুল কুদুসের মাধ্যমে হাস্সানকে সাহায্য করেন, যতক্ষণ সে রসুল স. এর পক্ষ হয়ে বাক্যবান ছুঁড়তে থাকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি।

জননী আয়েশা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমরা কাফের কুরায়েশদের দুর্নাম বর্ণনা করো। ওই দুর্নাম হবে তাদের জন্য শরাঘাত অপেক্ষা অধিক অসহনীয়। তারপর তিনি ইবনে রওয়াহাকে ডেকে এনে বললেন, কাফেরদের নিন্দাবাদসম্বলিত কবিতা রচনা করো এবং তা প্রচার করো। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু তাঁর রচনা রসুল স. এর তেমন মনোপুত হলো না। তাই তিনি ডেকে আনলেন কা'ব ইবনে মালেককে। তারপর হাস্সান ইবনে সাবেতকে। তারপর তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, সুসময় সমুপস্থিত। তুমি ওই অরিকুলের প্রতি শরনিক্ষেপ শুরু করো, যারা তর্জন গর্জন শুরু করে দিয়েছে। হাস্সান তাঁর রসনা মুখ থেকে বের করলেন, তারপর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! যিনি আপনাকে সত্যপয়গম্বররূপে প্রেরণ করেছেন, সেই পবিত্রতম সত্তার শপথ! আমি আমার রসনা দ্বারা তাদেরকে চামড়া ছিলার মতো করে ছিলবো। রসুল স. বললেন, ব্যস্তসমস্ত হয়ো না। আবু বকর কুরায়েশদের বংশপ্রবাহ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত। আমার বংশ কুরায়েশদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে আবু বকর জানেন, কীভাবে আমি তাদের বংশ থেকে পৃথক। হাস্সান তৎক্ষণাৎ গেলেন আমার পিতার কাছে। তাঁর কাছ থেকে সবকিছু শুনে এসে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আবু বকর আপনার বংশ কীভাবে পৃথক হয়েছে তা আমাকে বলেছেন। আপনাকে যিনি সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, সেই মহিমময় সত্তার কসম! আমি তাদের বংশবন্ধন থেকে আপনাকে অবশ্যই পৃথকরূপে প্রতিভাসিত করবো যেমন করে মন্থন করা আটা থেকে পৃথক করা হয় কেশ। এরপর হাস্সান রচনা করলেন—

হাজ্বাওতা মুহাম্মাদান ফাআজ্বাবতু আনহু— ওয়া ইনদাল্লহি ফী জাকাল জ্বাযাউ।

অর্থঃ তুমি মোহাম্মদের অখ্যাতি রচনা করেছো, আমি দিচ্ছি তার জবাব। আমি জানি, এর জন্য আল্লাহ্র নিকটে জমা রয়েছে আমার পুরস্কার।

হাজ্বাওতা মুহাম্মাদান আবার্রান তাক্বিয়ান— রসুলুল্লহিশীমা তুহুল ওয়াফা।

অর্থঃ কোন সাহসে তুমি পুতপবিত্র মোহাম্মদের দুর্নাম করছো? তুমি কি জানো না যে তিনি আল্লাহ্র সত্য রসুল, সতত সত্যাধিষ্ঠিত ও সৎচরিত্র? তিনি যে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির পূর্ণ প্রতিচ্ছবি।

www.eelm.weebly.com

ফা ইন্‌না আবী ওয়া ওয়ালাদাতী ওয়া ইরদ্বি— লি ইরদ্বি মুহাম্মাদিন মিনকুম ওয়াক্বাউ

অর্থঃ আমার মাতাপিতা ও আমি আজ মোহাম্মদের কারণেই সম্মানার্হ। সুতরাং তাঁর সম্মানকে চিরভাস্বর করবার জন্য আমরা তাঁরই জন্য উৎসর্গীকৃত।

আমাঁই ইয়াহ্‌জুরু রসুলুল্লহি মিনকুম— ওয়া ইয়ামদাহুহু ওয়া ইয়ানসুরুহু সাওয়া।

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা এই রসুলের কুৎসা গায় এবং বর্ণনা করে তাঁর মহিমা, তারা কি কখনো সমান?

ওয়া জিবরীলু ওয়া রসুলুল্লহি ফীনা— ওয়া রুহুল কুদুসু লাইসা লাহু কাফাউ

অর্থঃ দ্যাখো, আল্লাহ্‌র মহান রসুল এবং মহান জিবরাইল আমীন আমাদের মধ্যেই বিদ্যমান, তোমরা কেউই তাঁদের সমকক্ষ নও।

ইবনে সিরীনের একটি অপরিণত বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. একবার হজরত কা'ব ইবনে মালেককে ডেকে বললেন, শুরু করো তোমার কবিতা। হজরত কা'ব তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন। রসুল স. প্রীত হয়ে বললেন, এগুলো তো কুরায়েশদের কাছে শরবিদ্ধ হওয়া অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাদায়ক।

জ্ঞাতব্য ঃ উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহ দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মিথ্যা ও অশ্লীলতামুক্ত কবিতা পাঠ সিদ্ধ। জননী আয়েশা থেকে দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এটাও এক প্রকার কথা, যা হতে পারে ভালো-মন্দ দু'টোই। সুতরাং তোমরা উত্তমকে গ্রহণ করো এবং পরিহার করো অনুত্তমকে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম পঙক্তি রচয়িতা কবি লবীদ। ওই পঙক্তিটি হচ্ছে— 'আলা কুললি শাইয়িন মা খলাল্লাহু বাতিলুন' (ভালো করে শোনো হে মানুষ! আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য সকলকিছুই অস্তিত্বহীন)। বোখারী, মুসলিম।

আমর ইবনে শাদীদ বর্ণনা করেন, আমার পিতা বলেছেন, একদিন আমি রসুল স. এর পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলাম একই বাহনে। তিনি স. বললেন, উমাইয়া ইবনে সলতের কোনো কবিতা কি তোমার মুখস্থ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, আবৃত্তি করো। আমি উমাইয়ার একটি কবিতা শোনালাম। তিনি স. বললেন, আর একটি শোনাও। আমি নির্দেশ প্রতিপালন করলাম। তিনি স. বললেন, আরো। এভাবে তাঁর নির্দেশে আমি আবৃত্তি করলাম একশতটি কবিতা। মুসলিম।

হজরত জুনদুব বর্ণনা করেন, এক যুদ্ধে জখম হলো রসুল স. এর হাতের একটি আঙুল। ওই রক্তাক্ত আঙুলের দিকে চেয়ে তিনি স. আবৃত্তি করলেন—

www.eelm.weebly.com

হাল আনতি ইল্লা ইসবাহুন দুমিতী ওয়া ফী সাবিলিল্লাহি মা লাক্বীতী।

অর্থঃ তুমি তো আঘাত পেয়েছো। তুমি তো হাতের একটি আঙুল। স্বীকার করো অনন্য এ সৌভাগ্যকে। এ আঘাত তো আল্লাহ্র পথে। বোখারী, মুসলিম।

শা'বীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং হজরত আলী— এই ত্রয়ী খলিফা কবিতা আবৃত্তি করতেন। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস স্বয়ং কবিতা আবৃত্তি করতেন মসজিদের মধ্যে। অন্যদেরকেও পাঠ করতে বলতেন। একবার তিনি বিখ্যাত কবি আমর ইবনে রবীকে ডেকে এনে তাঁর কবিতা শুনেছিলেন, যার প্রথম ছত্রটি ছিলো এরকম—

আমানা আল্ লুগমা আনতা গদিন্ওয়া মুবাক্কিরিন— গদাতা গদিন আম রাইহুন্ ফামুহাজ্জারুন।

এভাবে ইবনে রবীয়া তাঁকে শুনিয়েছিলেন সত্তরটি পদ। আর একবার শুনেই তিনি ওই দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ করে নিলেন। পাঠ করে শোনালেনও। এমনই অসাধারণ ছিলো তাঁর স্মৃতিশক্তি।

জ্ঞাতব্য ঃ যে কবিতায় আল্লাহ্র জিকির, ধর্মীয় জ্ঞান ও মানুষের জন্য সদুপদেশ থাকে, সে কবিতা পাঠ করা ইবাদত।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কোনো কোনো কবিতা প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানগর্ভ। বোখারী।

হজরত সাখার ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে বুরাইদা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কোনো কোনো বক্তব্য যাদুর মতো ক্রিয়াশীল এবং কোনো কোনো কথা মূর্খজনোচিত। আর কিছু কিছু কবিতা জ্ঞানগর্ভ, আবার কিছু কিছু কথা সুস্পষ্ট অর্থবোধক। আবু দাউদ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোনো কোনো বক্তৃতা যাদুর মতো প্রভাব বিস্তারক। আর কোনো কোনো কথা মূর্খতামণ্ডিত। কতিপয় কবিতা জ্ঞানের আকর। আর কোনো কোনো বিবরণ সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশক। আবু দাউদ। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, কোনো কোনো ভাষণ যাদুর মতো প্রভাব রাখে, আর কিছু কিছু কবিতায় রয়েছে জ্ঞানের নির্যাস। আবু দাউদ, আহমদ।

ইতোপূর্বে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, বিশ্বাসীরা যেমন তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করে, তেমনি সংগ্রাম করে কথার দ্বারাও। হজরত আনাস থেকে নাসাঈ ও দারেমী বর্ণনা করেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা তোমাদের সম্পদ ও রসনা দ্বারা অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোরো।

উল্লেখ্য, এই শেষোক্ত আয়াতের প্রথমাংশে যেমন মুসলিম কবিদের প্রশংসা করা হয়েছে, তেমনি শেষ বাক্যে প্রদর্শন করা হয়েছে মুশরিক কবিদের প্রতি

www.eelm.weebly.com

ভীতি। বলা হয়েছে 'অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়'? এখানে 'অত্যাচারীরা' অর্থ অংশীবাদীরা, যারা রসুল স. এর কুৎসা রটনা করতো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'গন্তব্যস্থল' বলে বুঝানো হয়েছে জাহান্নামকে।

বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে সকল অংশীবাদীকে দেয়া হয়েছে কঠিন হুমকি, কেবল কবিদেরকে নয়। অর্থাৎ বলা হয়েছে, তাদের এমতো ভয়ংকর অগ্নিশাস্তি অবধারিত।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, আমার মহাসম্মানিত জনয়িতা তাঁর অন্তিমকালের অসিয়তনামায় লিখেছিলেন— বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। এই অসিয়তনামা আবু বকর ইবনে আবু কোহাফার, যা তিনি লিপিবদ্ধ করালেন তাঁর অন্তিমকালে। এই সময় এমন এক সময় যখন কাফেরেরাও ঈমান আনে, পাপিষ্ঠরা হয়ে যায় পুণ্যবান এবং মিথ্যাবাদীরাও করে সত্যোচ্চারণ। আমি তোমাদের জন্য ওমর ইবনে খাত্তাবকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে গেলাম, যদি তিনি সতত ন্যায়নিষ্ঠ থাকেন, তাঁর সম্পর্কে অবশ্য আমি এরকমই সুধারণা পোষণ করি। আর যদি তিনি অত্যাচারী হয়ে যান, তবে আমি হবো অক্ষম পদবাচ্য। কারণ আমি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নই। আমি কেবল উচ্চারণ করতে চাই আল্লাহর এই বাণী 'অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়'?

সুরা শুআরার তাফসীর শেষ হলো আজ রজব মাসের ৪ তারিখে, বৃহস্পতিবার, ১২০৫ হিজরী সনে।

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন ওয়া সাল্লাল্লহু আ'লা খইরি খলক্বিহি মুহাম্মাদিউ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজ্মায়ী'ন।

অষ্টম খণ্ড শেষ

www.eelm.weebly.com

সূরা নমল আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

طٰسٓ ۚ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ﴿١﴾ هُدًى وَّ بُشْرٰى
لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ
بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٣﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا
لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ۗ﴿٣﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ
وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ﴿٥﴾ وَ اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ
لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ﴿٦﴾

r ত্ব, সীন; এইগুলি আল- কুরআনের আয়াত,— আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের;

r পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ বিশ্বাসীদিগের জন্য।

r যাহারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় ও পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাসী।

r যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের দৃষ্টিতে তাহাদিগের কর্মকে আমি শোভন করিয়াছি, ফলে উহারা বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়ায়;

r ইহাদিগের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং ইহারাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

r নিশ্চয় তোমাকে আল-কোরআন দেওয়া হইতেছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ আল্লাহের নিকট হইতে,

---

ত্ব, সীন হচ্ছে বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি। কোরআন মজীদে কোনো কোনো সুরার প্রথমে এরকম বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজির সন্নিবেশ পরিদৃষ্ট হয়। এগুলোর মর্ম চিরদুর্জ্ঞেয় ও চিররহস্যাচ্ছন্ন। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই এ বিষয়ে সম্যক অবগত। আর অবগত অতি অল্পসংখ্যক আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন, যাঁরা জ্ঞানে সুগভীর (ওলামায়ে রসিখীন)।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তিলকা আয়াতুল কুরআনি ওয়া কিতাবিম মুবীন' (এগুলো আল কোরআনের আয়াত, আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের)। এখানে 'তিলকা' (এগুলো) দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে আলোচ্য সুরার আয়াত সম্ভারের প্রতি।

'কুরআন' ও 'কিতাব' সমঅর্থসম্পন্ন। দু'টোই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদেশিত বাণীবৈভবের নাম। আর নামপদ হওয়ার কারণেই শব্দ দু'টো কখনো ব্যবহৃত হয় নির্দিষ্টার্থক অব্যয় 'আল' সহযোগে। আবার কখনো এমতো নির্দিষ্টার্থকতা ছাড়াই। শব্দ দু'টো এখানে ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহ্র বাণীসম্ভারের বৈশিষ্ট্য প্রকাশার্থে। তাই বলা হয়, আল্লাহ্র বাণীর পঠিতরূপ 'কুরআন' এবং লিখিতরূপ 'কিতাব'।

'কিতাবিম মুবীন' অর্থ সুস্পষ্ট বা সমুজ্জ্বল কিতাব, যা লিপিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহফুজের সুরক্ষিত ফলকে। উল্লেখ্য, ওই সুরক্ষিত ফলকে কেবল কোরআন নয়, লিপিবদ্ধ রয়েছে মহাসৃষ্টির আদিঅন্তের সকল বিবরণ। ওই সুরক্ষিত ফলককেই আল্লাহ্তায়ালা এখানে চিহ্নিত করেছেন 'মুবীন' (সুনিশ্চিত, সুস্পষ্টরূপ বা সমুজ্জ্বল) অভিধায়।

কোরআনের পঠিত ও লিপিবদ্ধরূপের সঙ্গে আমরা অধিকতর ঘনিষ্ঠ। সুরক্ষিত ফলকে মুদ্রিত 'কিতাব' বা গ্রন্থের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এতোখানি ঘনিষ্ঠ নয়। তাই প্রত্যাদেশের লক্ষ্য যেহেতু আমরা, তাই এখানে 'কোরআনে'র উল্লেখ এসেছে কিতাবে'র পূর্বে। অথবা বলা যেতে পারে 'কিতাবুম মুবীন' বলে এখানে বোঝানো হয়েছে আমাদের এই কোরআনকেই। কারণ এই মহাগ্রন্থেই মুদ্রিত হয়ে রয়েছে আল্লাহ্র সত্তা-গুণাবলী ও নির্দেশ- নিষেধাজ্ঞাসমূহের সবিস্তার বিবরণ। এর অলৌকিকত্ব এবং অসাধারণ তত্ত্ব সতত-সুস্পষ্ট, সদা-সমুজ্জ্বল।

পরের আয়াতদ্বয়ের (২, ৩) মর্মার্থ হচ্ছে— কোরআনের আহ্বান স্বতঃস্ফূর্ত ও সার্বজনীন হলেও কেবল বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরাই এ আহ্বানে সাড়া দেয়। জীবনকে অর্থবহ করে তোলে এর অন্তহীন আলোকে। তাই তাদের জন্যই কোরআন পথনির্দেশ ও শুভসমাচার। আর বিশ্বাসী তারাই যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দেয় এবং প্রত্যয় রাখে মৃত্যু-পরবর্তী অনন্তজীবনের প্রতি। অর্থাৎ যারা তাদের পরলোকের প্রতি বিশ্বাসকে প্রকাশ করে নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত প্রদানের ঐকান্তিকতায়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৪, ৫) মর্মার্থ হচ্ছে— যারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাদের প্রতি আমি অপ্রসন্ন। তাই তাদেরকে আমি করেছি শুভচেতনাচ্যুত। তাদের অপকর্মগুলোকেই তাদের দৃষ্টিতে করে দিয়েছি শোভন। ফলে তাদের আচরণ ও বিচরণ হয় উদভ্রান্ত ও বিভ্রান্তদের মতো স্বস্তিহীন। এদের জন্যই পরবর্তী পৃথিবীতে নির্ধারিত রয়েছে সুকঠোর শাস্তি। আর তারাই তো সেখানে হবে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

www.eelm.weebly.com

শেষোক্ত আয়াতে(৬) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় তোমাকে আলকোরআন দেওয়া হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে'। আলোচ্য আয়াতটি বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত প্রথমোক্ত আয়াতের সঙ্গে। কারণ সেখানেও বলা হয়েছে কোরআনের কথা। আর এখানে বলা হলো— হে আমার রসুল! আপনাকে এই মহাগ্রন্থ দেওয়া হলো আপনার মহাপ্রভুপালক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ যে আনুরূপ্যহীন সত্তার জ্ঞানের অন্তহীনতা ও প্রজ্ঞার উত্তুঙ্গ শিখরকে স্পর্শ করার সাধ্য কারো নেই, সেই চিরদুর্জ্ঞেয় সত্তাই আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছেন এই কোরআন।

'আলীম' অর্থ জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় এবং 'হাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। সাধারণ জ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান অথবা সাধারণ প্রজ্ঞা, বিশেষ প্রজ্ঞাকেই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার এ দু'টো বিশেষ নামের মাধ্যমে। এভাবে এখানে আল্লাহ্ তাঁর দু'টো বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, অতুলনীয়রূপে যিনি মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়, তিনি ব্যতীত এরকম অক্ষয় বাণী সম্ভার রচনা করার সাধ্য কারোই নেই। অথবা বলা হয়েছে, এই মহাগ্রন্থে বিধৃত বিষয়াবলীর কোনো কোনোটি সাধারণ প্রজ্ঞাজাত। আবার কোনো কোনোটিতে রয়েছে বিশেষ প্রজ্ঞায়নের প্রকাশ। অর্থাৎ এতে রয়েছে কতিপয় ইতিবৃত্ত প্রকাশক সরল বিবরণ এবং কতিপয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বের সারাৎসার। আর এগুলোই হচ্ছে আল্লাহ্‌র মহাজ্ঞান ও মহাপ্রজ্ঞার নিদর্শন। সম্ভবতঃ তার মহাজ্ঞানের দৃষ্টান্তরূপেই পরবর্তী আয়াত থেকে শুরু হয়েছে মহাপ্রেমিক মুসা নবীর ইতিকাহিনী। বলা হয়েছে—

সূরা নমল ঃ আয়াত ৭, ৮

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِۦٓ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًا سَـَٔاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ
ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِىَ أَنۢ
بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٨﴾

r স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মূসা তাহার পরিবারবর্গকে বলিয়াছিল, 'আমি আগুন দেখিয়াছি, সম্ভবতঃ আমি সেথা হইতে তোমাদিগের জন্য কোন খবর আনিতে পারিব, অথবা তোমাদিগের জন্য আনিতে পারি জলন্ত কাষ্ঠখণ্ড, যাহাতে তোমরা আগুন পোহাইতে পার।'

www.eelm.weebly.com

r অতঃপর সে যখন আগুনের নিকট আসিল তখন তাহাকে ডাকিয়া বলা হইল, 'ধন্য তাহারা যাহারা আছে অগ্নি দ্বারা আলোকিত স্থানে এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন মুসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিলো, আমি আগুন দেখেছি'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! বনী ইসরাইলের নবী মুসার কথা স্মরণ করুন। তিনি মাদিয়ান থেকে সপরিবারে মিসর গমনকালে হারিয়ে ফেললেন পথ। তখন ছিলো শীতকাল। দিবাবসানে নেমে এলো শীতার্ত রাত্রি। প্রয়োজন দেখা দিলো আগুনের। এদিকে ওদিকে পতিত হলো তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিপাত। সহসা দেখলেন, দূরবর্তী এক শৈলশিখরে জ্বলছে আগুন। তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে বললেন, ওইতো আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি। উল্লেখ্য, হজরত মুসা 'আগুন দেখতে পাচ্ছি' কথাটি বলেছিলেন তাঁর মাতৃভাষায়। এখানে তাঁর ওই বক্তব্যটি উল্লেখিত হয়েছে আরবী বচনে। এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স. এর বক্তব্য যে কোনো ভাষায় অক্ষরান্তরিত করা যায়। সুতরাং বুঝতে হবে, যে কোনো ভাষায় বিবাহ-শাদী পড়ানো সিদ্ধ, যদি ওই সকল ক্ষেত্রে পরিপূরিত হয় বিবাহের শর্তসমূহ।

এরপর বলা হয়েছে— 'সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর আনতে পারবো'। একথার অর্থ— হজরত মুসা তাঁর পরিবারবর্গকে আরো বললেন, তোমরা এখানেই অবস্থান করো। দূর করো পথশ্রান্তি। আমি আগুনের কাছে যাই। সেখানে নিশ্চয় পাবো মানুষের উপস্থিতি, অথবা লোকালয়। তাদের কাছে হয়তো পাবো হারানো পথের সন্ধান। সেই সংবাদ পৌঁছাতে পারবো তোমাদের কাছেও।

এখানে 'সাআতীকুম' অর্থ সংবাদ আনতে পারবো। আর সুরা ক্বসাসে এই কথাটি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— 'লাআ'ললি আতীকুম' (সম্ভবতঃ আমি আনব)। বাক্য দু'টোর একটিতে প্রকাশ পেয়েছে দৃঢ়তাব্যঞ্জকতা, আর একটিতে আশাবাদ।

'বি খবারিন' অর্থ বিজ্ঞপ্তি, সংবাদ, পথনির্দেশনা। শীতার্ত নিশীথে বিজন প্রান্তরে হজরত মুসা হারিয়ে ফেলেছিলেন পথ। তাই এখানে শব্দটির মর্মার্থ হবে 'পথের সন্ধান'। আর এখানে 'সাআতীকুম' (সম্ভবতঃ কোনো সংবাদ আনতে পারবো) কথাটির মধ্যে একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে দৃঢ়তা ও অজুহাত। অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনের দৃঢ়তা ও বিলম্বের অজুহাত। কারণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিটি ছিলো দূরে। তাই বিলম্বিত প্রত্যাবর্তন ছিলো অবধারিত। একই সঙ্গে অনিবার্য ছিলো তাঁর প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিও।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'অথবা তোমাদের জন্য আনতে পারি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো'। একথার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, অথবা কেবল পথের সংবাদই নয়, তোমাদের জন্য সম্ভব হলে আনতে পারি ওই অগ্নিকুণ্ডের কোনো জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড। তাহলে তোমরা আগুনও পোহাতে পারবে। দূর করতে পারবে শীতের কষ্ট।

কামুস রচয়িতা লিখেছেন, বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড থেকে আহরিত অগ্নিশিখাকে বলে 'শিহাব'। বাগবী লিখেছেন, 'শিহাব' ও 'ক্বাবাস' শব্দ দু'টো অনেকটা সমঅর্থসম্পন্ন। 'ক্বাবস' বলে ওই কাষ্ঠখণ্ডকে যার একাংশ অক্ষত এবং অপরাংশ দগ্ধমান।

'ইয়াসতালূন' অর্থ আগুন পোহাতে পারো। 'ইসতিলা' শব্দটি ধাতুমূল। 'সালইয়ুন' অর্থ আগুন জ্বালানো। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— তোমরা শৈত্যনিবারণের জন্য পোহাতে পারবে আগুন।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে যখন আগুনের নিকটে এলো, তখন তাকে ডেকে বলা হলো, ধন্য তারা যারা আছে অগ্নি দ্বারা আলোকিত স্থানে আর তার চতুষ্পার্শ্বে'। এখানে 'যারা আছে অগ্নি দ্বারা আলোকিত স্থানে' অর্থ যারা বা যিনি উপস্থিত হয়েছেন অগ্নির নিকটে। উদ্দিষ্ট স্থলে উপনীত ব্যক্তিকে আরববাসীরা বলেন 'বালাগাল ফুলানুল মানযিলা'। নূদিয়া' অর্থ ডেকে বলা হলো। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং হাসান বসরী বলেছেন 'যারা আছে অগ্নি দ্বারা আলোকিত স্থানে এবং এর চতুষ্পার্শ্বে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্পাকের আনুরূপ্যহীন উপস্থিতিকে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্ স্বয়ং হজরত মুসাকে আহ্বান করলেন। তাঁর সাথে কথোপকথন করলেন। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, ওই আগুন পার্থিব কোনো আগুন ছিলো না, ছিলো আল্লাহ্তায়ালার অলৌকিক জ্যোতিচ্ছটা। কিন্তু হজরত মুসা ওই জ্যোতির্ময়তাকে মনে করেছিলেন পার্থিব আগুন। তাই ওই জ্যোতিকে এখানে অভিহিত করা হয়েছে 'আগুন'।

ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু মুসা আশয়ারী বলেছেন, রসুল স. একবার আমাদের এক সমাবেশে দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণ দিলেন পাঁচটি বিষয়ে। বললেন, আল্লাহ্ নিদ্রাভিভূত হন না। এরকম করা তাঁর জন্য সমীচীনও নয়। তিনি দাঁড়িপাল্লা ঊর্ধ্বগামী ও অধোগামী করেন। কাউকে করেন লাঞ্ছিত এবং কাউকে সম্মানিত। মানুষের রাতের কৃতকর্মের পূর্বেই তাঁর কাছে পৌঁছে যায় তাদের দিনের কৃতকর্ম এবং দিনের কার্যকলাপ পৌঁছে রাতের কার্যকলাপের পূর্বে। জ্যোতি তাঁর যবনিকা। ওই যবনিকা উন্মোচিত হলে ভস্মীভূত হয়ে যাবে সমগ্র সৃষ্টির সকল প্রকার পরিদৃশ্যমানতা।

www.eelm.weebly.com

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ওই আগুন ছিলো প্রকৃতই আগুন। অর্থাৎ ওই আগুন ছিলো আল্লাহ্‌তায়ালার আনুরূপ্যবিহীন সত্তার দৃষ্টান্তাতীত বেষ্টনী। কোনো কোনো বর্ণনায় তাই দেখা যায় 'জ্যোতির আড়ালে' এর স্থলে 'অগ্নির আড়ালে'র উল্লেখ। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় আলোচ্য আয়াত রহস্যাচ্ছন্ন আয়াতের (আয়াতে মুতাশাবিহাতের) পর্যায়ভূত। যেমন অন্য এক আয়াতে এসেছে 'তারা তো অপেক্ষমাণ যে আল্লাহ্ তাদের নিকট আগমন করবেন মেঘের ছায়ায়'।

আল্লাহ্‌তায়ালা অবয়বাতীত ও স্থানাতীত। তিনি আকার ও প্রকার থেকে চিরমুক্ত ও চিরপবিত্র। এই ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই আলোচ্য আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে 'বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ পবিত্র, মহিমান্বিত'। অর্থাৎ হজরত মুসার দৃষ্টিতে প্রতিভাত ওই আগুন স্থানসম্ভূত অথবা কালজ নয়। বরং তা স্থান-কাল এবং আকার প্রকার থেকে সতত মুক্ত, চিরপবিত্র।

মুজাহিদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'বূরিকা মান ফিন্‌নারি' অর্থ ওই অগ্নিকে করা হয়েছে কল্যাণময়। সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি উবাই ইবনে কা'বকে বাক্যটি পাঠ করতে শুনেছি এভাবে— 'আন বূরিকাতিন নারু ওয়া মান হাওলাহা', যার অর্থ দাঁড়ায়— ওই অনল সুপ্রচুর কল্যাণপ্রাপ্ত এবং তার চতুষ্পার্শ্বও। 'মান' এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে অতিরিক্তরূপে। অবশ্য 'বূরিকান নারু' এবং 'বূরিকা ফিন্ নারি' সমার্থক। আরবীভাষীগণ বলেন' 'বারাকাল্লাহ্' 'বারাকাল্লাহু ফীহ্' 'বারাকাল্লহু আলাইহি', এই বাক্যগুলোও সমার্থক। এভাবে বক্তব্যটি মর্মার্থ পরিগ্রহ করে এরকম— ফেরেশতামণ্ডলী আছে অগ্নি দ্বারা আলোকিত স্থানে এবং হজরত মুসা আছেন তার সন্নিকটে।

ভূমিখণ্ডকে যেমন বলা হয় 'বুক্বআ'তুন মুবারাকাতুন' (কল্যাণময় ভূখণ্ড), তেমনি এখানকার 'আন্‌নারু মুবারাকুন' অর্থ বরকতময় অগ্নি। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফীল বুক্বআতিল মুবারাকাতি' (পবিত্রতম ভূখণ্ডে, বরকতময় মৃত্তিকায়)। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'বূরিকা মান ফিন্‌নার' অর্থ অগ্নি-অন্বেষককে দেয়া হয়েছে বরকত। অথবা সুপ্রচুর কল্যাণ প্রদত্ত হয়েছে অনল-স্থলে উপস্থিতজনকে। অর্থাৎ ওই অলৌকিক অনলের সন্নিকটে ও চতুষ্পার্শ্বে সমবেত ফেরেশতামণ্ডলী এবং হজরত মুসা সাধুবাদ প্রাপ্তির যোগ্য। আর হজরতের প্রতি প্রেরিত সাধুবাদের বাহক হচ্ছেন ফেরেশতামণ্ডলী, যেমন ফেরেশতারা বাচনিক সাধুবাদ জানিয়েছিলেন নবী ইব্রাহিম ও তার পরিবারবর্গকে। বলেছিলেন— আল্লাহের আশীষ ও কল্যাণ আপনাদের উপর, হে গৃহবাসীগণ'!

www.eelm.weebly.com

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ‘মান হাওলাহা’ কথাটি সাধারণ অর্থবোধক। অর্থাৎ আলোকিত স্থান বলে এখানে বুঝানো হয়েছে সমগ্র সিরিয়া ভূমিকে, ওই অগ্নিদর্শনের স্থানও যার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে এই শুভসমাচারটি নিহিত রয়েছে যে— হজরত মুসার জীবনের পরবর্তী অধ্যায় আল্লাহ্ প্রদত্ত সুপ্রচুর কল্যাণে ভরা। আর ওই কল্যাণময়তার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে পরবর্তী সময়ে সিরিয়ায়।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘মান ফিন নার’ অর্থ যুথবদ্ধ ফেরেশতা এবং ‘মানহাওলাহা’ অর্থ হজরত মুসা। অর্থাৎ ওই অলৌকিক অনলে আল্লাহ্র গুণগানে রত ছিলো ফেরেশতারা এবং তার সমীপবর্তী ছিলেন হজরত মুসা। এ সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আয়াতের ‘সুবহানাল্লাহি রব্বিল আলামীন’ বাক্যটির অর্থ আপনাআপনিই উন্মোচিত হয়ে পড়ে। সহজেই বুঝতে পারা যায়, তাঁর পরবর্তী বিবরণ হবে অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৯, ১০, ১১

يٰمُوْسٰۤى اِنَّهٗۤ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُۙ ﴿٩﴾ وَاَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا
تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۫
اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۖ ﴿١٠﴾ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا
بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١﴾

r ‘হে মূসা! আমি তো আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়,’

r ‘তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।’ অতঃপর যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল তখন পিছনে না তাকাইয়া সে বিপরীত দিকে ছুটিতে লাগিল। বলা হইল, ‘হে মূসা! ভীত হইও না, আমার সান্নিধ্যে তো রসূলেরা ভয় পায় না;

r ‘তবে যাহারা সীমালংঘন করিবার পর মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে তাহাদিগের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘হে মুসা! আমি তো আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’। একথার অর্থ— ওই অলৌকিক জ্যোতিস্নাত পরিবেশে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীকে ডেকে বললেন, হে মুসা! আমিই আল্লাহ্। আমার পরিচয় শোনো— আমি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। তাইতো আমি আমার চিরস্বাধীন সিদ্ধান্তানুসারে যা কিছু করি, তা হয় নিশ্চিত, নির্ভুল, নিখুঁত।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো। অতঃপর সে যখন তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলো, তখন পিছনে না তাকিয়ে সে বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলো'। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ নির্দেশ করলেন, তুমি তোমার হস্তধৃত যষ্টিটি মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করো। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে যষ্টিটি রূপান্তরিত হলো বিরাট এক অজগরে। বিশালদেহী অজগরটি ছুটাছুটি শুরু করলো। তাই না দেখে মুসা পিছন ফিরে দিলেন দৌড়। মুকাতিল বলেছেন, এখানকার 'আ'ক্বক্বিব' কথাটির অর্থ পলায়ন করার পর আবার প্রত্যাবর্তন করা।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলা হলো, হে মুসা! ভীত হয়ো না, আমার সান্নিধ্যে তো রসুলেরা ভয় পায় না'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তখন বললেন, হে মুসা! তুমি তো আমার রসুল। আমার সান্নিধ্যে আমার রসুলেরা তো থাকে নিশঙ্কচিত্ত। তবে তুমি ভীত হচ্ছো কেনো? কেনো হতে চাইছো দূরবর্তী। এভাবে হজরত মুসাকে একথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বা কোনো কিছুকে ভয় পাওয়া নবী-রসুলগণের স্বভাব নয়। সুতরাং অজগরকে তিনি ভয় পাবেন কেনো? নবী-রসুলগণ তো ভয় পাবেন কেবল আল্লাহ্কে। যেমন রসুল স. বলেছেন, আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্কে অধিক ভয় করি। অথবা আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে এরকম— প্রত্যাদেশের প্রভাব তো কেবল আল্লাহ্র ভয় ছাড়া অন্য সকলের ও সকলকিছুর ভয় দূর করে দেয়। হে মুসা! এখন তো তুমি প্রত্যাদেশায়িত। তাহলে তুমি অজগর-ভীতিকে অনর্থক প্রশ্রয় দিতে চাও কেনো। শান্ত হও। অভিনিবেশী হও কেবল আমার দিকে। অথবা অর্থ হবে— নবী-রসুলগণের শুভপরিণাম সুনিশ্চিত। অতএব হে আমার নবী! তুমি চঞ্চল-বিহ্বল হবে কেনো?

এর পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তবে যারা সীমালংঘন করার পর মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে, তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। এখানকার 'ইল্লা' (তবে) অব্যয়টি ব্যতিক্রমবোধক। অব্যয়টি এখানে হতে পারে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যপ্রবাহসংযুক্ত, অথবা বিচ্ছিন্ন। কেউ কেউ বলেছেন, সংযুক্ত। যদি তাই হয় তবে বুঝতে হবে, এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে কিবতী হত্যার প্রসঙ্গটির দিকে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— রসুলগণ কাউকে ভয় করে না। তবে তাদের দ্বারা সর্বোত্তমকে ছেড়ে অপেক্ষাকৃত কম উত্তমকে গ্রহণ করাও অসমীচীন। উল্লেখ্য, দুরাচার কিবতী লোকটি নিহত হয়েছিলো হজরত মুসার মুষ্টাঘাতে। কিন্তু তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য তাঁর আদৌ ছিলো না। আরো উল্লেখ্য, এখানে 'সীমালংঘন' অর্থ অসমীচীনতা, লঘুত্রুটি। বলা বাহুল্য, এরকম

www.eelm.weebly.com

লঘুত্রুটিও নবী-রসুলগণের মর্যাদার অনুকূল নয়। সুতরাং এরকম অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকেও তাঁদের তওবা করা উচিত। আর তাঁদের মর্যাদার অনুকূল এরকম তওবা তাঁরা করেনও এবং অবশ্যই পান আল্লাহ্র অপার ক্ষমা ও দয়া। আর এখানে 'মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে' কথাটির মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নবী-রসুলগণের পদস্খলন কখনোই ঘটে না। নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেও নয়। আর তাঁদের পবিত্র স্বভাব হচ্ছে, অনিচ্ছাকৃত ও অনবধনতাজনিত অনুল্লেখ্য ত্রুটির কারণেও তাঁরা আল্লাহ্র সকাশে করেন সানুতপ্ত ও প্রেমময় প্রত্যাবর্তন।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ছুম্মা বাদ্দালা' বাক্যটির সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে একটি লুপ্ত শব্দ। তারপর থেকে সূচিত হয়েছে একটি পৃথক বাক্য। অর্থাৎ 'মান জলামা' পর্যন্ত এসে বসবে একটি যতিচিহ্ন। তারপর শুরু হবে পৃথক বাক্য এভাবে— 'ফামান জলামা ছুম্মা বাদ্দালা' (যারা পাপ করেছে অতঃপর করেছে তওবা)। এমতাবস্থায়— এ বাক্যটি সম্পৃক্ত হবে সর্বসাধারণের সঙ্গে, কেবল নবী-রসুলগণের সঙ্গে নয়। অর্থাৎ নবী-রসুলগণ থাকবেন কথিত সীমালংঘন বা গুরু পাপ থেকে মুক্ত।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ব্যতিক্রমবোধক 'ইল্লা' আলোচ্য আয়াতকে বিচ্ছিন্ন করেছে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্য প্রবাহকে। কারণ, নবী-রসুলগণের দ্বারা 'জুলুম' বা সীমালংঘন সম্ভবই নয়। আল্লাহ্পাক তাদেরকে পাপ থেকে রাখেন সতত মুক্ত। তাই তাঁরা নিষ্পাপ। এমতাবস্থায় এখানকার 'ইল্লা' শব্দটির অর্থ 'লাকিন্না' (কিন্তু) এবং আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— কিন্তু নবী-রসুল ব্যতীত অন্য কেউ যদি সীমালংঘন করবার পর তওবা করে এবং মন্দকর্মের স্থলে শুরু করে সৎকর্ম, তবে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেন। কারণ তিনি ক্ষমাপরায়ণ ও পরম দয়ার্দ্র। আর তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ভয় থাকে বলেই সীমালংঘনের সম্ভাবনা থেকে তারা মুক্ত নয়।

কেউ কেউ আবার মন্তব্য করেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহ্র রোষজাত মহিমা। সুতরাং বুঝতে হবে নবী-রসুলগণের দ্বারা সীমালংঘন সম্ভব নয়, সম্ভব নয় বিশ্বাসগত কোনো ভুল, কিন্তু বুদ্ধিগত সাময়িক ভুল হওয়া তাঁদের জন্যও অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যে সকল নবী বুদ্ধিগত ভুল অনিচ্ছাসত্ত্বেও করে ফেলেন এবং অনতিবিলম্বে তওবা করে ওই ভুল পরিত্যাগপূর্বক আশ্রয় করেন শুভকর্মাবলীকে, তাদেরকেও আল্লাহ্ মার্জনা করে দেন। আর ওই নবীগণও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বা কোনোকিছুকে ভয় পান না।

www.eelm.weebly.com

বর্ণিত ব্যাখ্যাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত মুসা অজগর দেখে ভয় পাননি। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত। কারণ পূর্ববর্তী আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে 'হে মুসা! ভীত হয়ো না'। অতএব একথা না বলে উপায় নেই যে, ভয় তিনি ঠিকই পেয়েছিলেন। কিন্তু সে ভয় প্রকাশ্যত সাপের হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিলো আল্লাহ্র ভয়। কারণ মৃত্তিকায় নিক্ষিপ্ত যষ্টি অজগরে পরিণত হয়েছিলো আল্লাহ্র নির্দেশ। তাই তার ভীতি ছিলো আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি, সাধারণ কোনো সাপের প্রতি নয়। যেমন হজরত ইব্রাহিম নমরুদের অগ্নিকুণ্ডকে ভয় পাননি। কারণ তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ছিলো না। আবার রসুলে পাক স. ঝড়-তুফানের সম্ভাবনা দেখলে ভীত হয়ে পড়তেন। কারণ ঝড়-ঝঞ্চা সৃষ্টির পক্ষ থেকে হয় না। হয় আল্লাহ্র নির্দেশানুসারে।

সূরা নমল ঃ আয়াত ১২, ১৩, ১৪

وَ اَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ قف فِيْ تِسْعِ
اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهٖ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا
جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٣﴾ وَ جَحَدُوْا
بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّ عُلُوًّا ط فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤﴾

r এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ। ইহা বাহির হইয়া আসিবে নির্মল উজ্জ্বল হইয়া। ইহা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত। উহারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

r অতঃপর যখন উহাদিগের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন আসিল, উহারা বলিল, 'ইহা সুস্পষ্ট যাদু।'

r উহারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করিল, যদিও উহাদিগের অন্তর এইগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদিগের পরিণাম কী হইয়াছিল?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখো'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ বললেন, হে মুসা! এবার তোমার ডানহাত রাখো তোমার বাম বগলে বা জেবে। এখানে 'জাইব' অর্থ জেব বা বগল। 'কামুস' গ্রন্থে এরকমই

www.eelm.weebly.com

বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, অঙ্গাবরণকে বলে 'জাইব'। 'জওব' অর্থ কর্তন করা। যেহেতু কাপড় কেটে অঙ্গাবরণ প্রস্তুত করা হয়, তাই তার নাম 'জাইব'। বাগবী লিখেছেন, কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, সে সময় হজরত মুসার শরীর আবৃত ছিলো একটি আস্তিন ও গলবন্ধবিহীন পশমী বস্ত্রে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে'। একথার অর্থ— বগলে বা জেবে হাত রাখার পর তা বের করে আনলে ওই হাত থেকে বিচ্ছুরিত হবে শুভ্র-অভ্র ও নির্মল জ্যোতিচ্ছটা। অর্থাৎ ওই শুভ্রতা স্বেত-রোগের মতো অনির্মল ও অসুন্দর হবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকটে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত'। একথার অর্থ— হজরত মুসা যে নয়টি নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, শ্বেত-শুভ্রহস্তের নিদর্শনও তার অন্তর্গত। তাঁর নয়টি নিদর্শন হচ্ছে— ১. যষ্টির সর্পরূপ ধারণ ২. শ্বেত-শুভ্র জ্যোতির্ময় হস্ত ৩. ঝড়-ঝন্ঝা ৪. পঙ্গপালের আক্রমণ ৫. জোঁকের আক্রমণ ৬. ভেকের প্রাবল্য ৭. পানির রক্ত হয়ে যাওয়া ৮. দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস এবং ৯. মাতৃস্তনের দুধ শুকিয়ে যাওয়া। উল্লেখ্য, যষ্টির আঘাতে সমুদ্রাভ্যন্তরের পথ প্রকাশিত হওয়ার নিদর্শনটি এখানে উল্লেখিত নয়টি মোজেজার অন্তর্ভূত করা হয়নি। কারণ এই নিদর্শনটি ছিলো ফেরাউন ও তার দল-বলের সলিল-সমাধি হওয়ার সময়ে। তাদের পথপ্রদর্শনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অথবা এখানকার 'ফীতিস্‌য়ি আয়াত' একটি পৃথক বাক্য। এর মর্মার্থ হবে 'ইজহাব ফী তিস্‌য়ি আয়াত' (নয়টি নিদর্শনসহ যাও)।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়'। এই বাক্যটিতে প্রকাশ করা হয়েছে হজরত মুসার মিসর গমনের কারণ। অর্থ্যাৎ ফিরাউন ও তার অনুসারীরা যেহেতু সত্যচ্যুত ও দুষ্কর্মপরায়ণ তাই তাদের পথ প্রদর্শনার্থে তাদের নিকটে প্রেরণ করা হলো রসুল মুসাকে।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'অতপর যখন তাদের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন এলো, তারা বললো, এতো সুস্পষ্ট যাদু'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ বলেন, যথাসময়ে হজরত মুসা তাঁর ভ্রাতা হজরত হারুনকে নিয়ে উপস্থিত হলেন মিসর রাজ্যের দরবারে। সেখানে প্রদর্শিত হলো নয়টি নিদর্শনের মধ্যে দু'টি নিদর্শন— যষ্টির সর্পরূপ ধারণ এবং শ্বেত-শুভ্র হস্তের জ্যোতির্ময় বিচ্ছুরণ। ভীত, বিস্মিত ও অভিভূত হলো সম্রাট, তার পারিষদবর্গ। তৎসত্ত্বেও বিদ্বেষবশতঃ বললো, এ যে দেখছি জলজ্যান্ত যাদু।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করলো, যদিও তাদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলো'। একথার অর্থ ফেরাউন ও তার বংশধরেরা ছিলো অন্যায়াভ্যস্ত ও উদ্ধত তাই তারা হজরত মুসার অভূতপূর্ব নিদর্শনদ্বয়কে সত্য জেনেও গ্রহণ করলো না। প্রত্যাখ্যান করলো অন্যায়ভাবে, উদ্ধতভরে। এখানে 'ইস্তিক্বান' অর্থ মনে মনে সত্য জেনেও। আর 'জুলুম' অর্থ আত্মপীড়ন। অর্থাৎ তারা ওই নিদর্শনদ্বয়কে মনে মনে সত্য জানা সত্ত্বেও তার প্রতি প্রদর্শন করেছিলো দুর্বিনয় ও ঔদ্ধত্য। এভাবে নিজের জন্য তারা নির্ধারণ করে নিয়েছিলো অনন্ত নরক।

শেষে বলা হয়েছে — 'দেখো, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিলো'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল এবং হে শুভবোধসম্পন্ন মানবমণ্ডলী! অনুধাবন করো, ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম হলো কত ভয়াবহ। ইহজগতে সমুদ্র-সমাধি তো তাদের হলোই, পর জগতেও তারা হলো অনন্ত শাস্তির উপযোগী।

সূরা নমলঃ আয়াত ১৫

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَ قَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥﴾

r আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাহারা বলিয়াছিল, 'প্রশংসা আল্লাহের যিনি আমাদিগকে তাঁহার বহু বিশ্বাসী দাসের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম'। একথার অর্থ— সাধারণ মানুষ যেমন তাদের আপন অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত ও সততসম্পৃক্ত, তেমনি আমি আমার প্রিয় নবী দাউদ ও সুলায়মানের সঙ্গে স্থায়ী সম্পৃক্তি ঘটিয়েছিলাম আমার সত্তা-গুণবত্তা ও বিধানবিষয়ক জ্ঞানের। জ্ঞানরাজ্যের সঙ্গে এমতো সম্পর্কায়নের কারণে তাঁরা বুঝতে পারতেন অনেক কিছু। যেমন ভূচর ও খেচর প্রাণীকুলের ভাষা, গিরিমালার স্তব-স্তুতি। করতে পারতেন আরো অনেক অসম্ভব কর্ম। যেমন, কেবল হাতের সাহায্যে লোহাকে মোমের মতো গলিয়ে ফেলা, সিংহাসনারূঢ় হয়ে বাতাসে ভর করে উড়ে চলা ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা বলেছিলো, প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু বিশ্বাসী দাসের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন'। একথার অর্থ—

www.eelm.weebly.com

মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মান নবুয়ত ও অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞা লাভ করে তাঁরা হয়েছিলেন বিনীত ও বিমোহিত। তাই সকৃতজ্ঞচিত্তে বলেছিলেন, প্রশংসা ও মহিমা কেবলই আল্লাহ্র। তিনিই তো তাঁর বিশ্বাসী দাসগণের মধ্যে আমাদেরকে করেছেন অনন্যবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, প্রজ্ঞা দিয়ে, অলৌকিকত্ব দিয়ে এবং মানুষের পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দিয়ে।

আলোচ্য বাক্যের শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে 'ওয়াও' (এবং)। এতে করে অনুমিত হয়, এর পূর্বে রয়েছে একটি বাক্যের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি। ওই অনুক্ত বাক্যটি এরকম— তাঁরা আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন এবং কার্যক্ষেত্রে দেখেছিলেন তার সফল প্রয়োগ। তাই তাঁরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে যথাযথরূপে। অথবা এখানকার 'ওয়াও' কে মেনে নিতে হবে 'ফা'। তাহলেই ফুটে উঠবে আলোচ্য বক্তব্যের সম্পূর্ণরূপ। এবং এর মর্মার্থ হবে অধিকতর স্পষ্ট। যেমন বলা হয়— 'আ'তাইতুহু ফাশাকারা' (আমি তাকে দান করেছি, তাই সে প্রকাশ করেছে কৃতজ্ঞতা)। আর আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ অনুদান। জ্ঞানই মানুষকে মহিমান্বিত করে।

রসুল স. বলেছেন, উপাসনাপ্রবণদের উপরে জ্ঞানীদের মর্যাদা নক্ষত্রপুঞ্জমধ্যে পূর্ণ শশী সদৃশ। জ্ঞানীরাই নবীগণের উত্তরাধিকারী। তাঁরা উত্তরাধিকাররূপে রেখে যান কেবল জ্ঞান। তাই যে তাঁদের জ্ঞান আহরণ করলো, সে-ই সৌভাগ্যশালী। সে-ই পেলো সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার। হাদিসটি আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন কাছীর ইবনে কায়েস থেকে। তিরমিজি লিখেছেন, তাঁর নাম ছিলো কায়েস ইবনে কাছীর।

রসুল স. আরো বলেছেন, তাপসের উপরে বিদ্বানের মর্যাদা তোমাদের মধ্যে আমার মর্যাদার মতো। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু উমামা থেকে।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আরো প্রমাণিত হয়, জ্ঞানরূপ বৈভবপ্রাপ্তির যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ অত্যাবশ্যক। এতে রয়েছে আর একটি শিক্ষণীয় বিষয়। সেটি হচ্ছে জ্ঞানপ্রাপ্তদেরকে হতে হবে বিনয়াবনত। তাঁদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে অনেক মানুষের মধ্যে আমরাও মানুষ। নিজেদের যোগ্যতায় নয়, আমাদেরকে জ্ঞানী করা হয়েছে আল্লাহ্র দয়ায়। আর আল্লাহ্ এক এক জনকে দিয়েছেন এক এক রকমের জ্ঞান। সুতরাং জ্ঞানীদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের দায়িত্ব দাতার, গ্রহীতার নয়। গ্রহীতার দায়িত্ব কেবল কৃতজ্ঞতা ও বিনয়াবনতা, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা নয়।

www.eelm.weebly.com

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾

r সুলাইমান ছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলিয়াছিল, 'হে মানুষ! আমাকে বিহংগকুলের ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং আমাকে সবই দেওয়া হইয়াছে, ইহা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সুলায়মান ছিলো দাউদের উত্তরাধিকারী'। একথার অর্থ— সুযোগ্য পিতা হজরত দাউদের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন হজরত সুলায়মান। উত্তরাধিকারীরূপে তিনি তাঁর পিতার মতো লাভ করেছিলেন নবুয়ত, রাজত্ব ও প্রজ্ঞা। কাতাদা এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। আর ব্যাখ্যাটি সূত্রায়িত হয়েছে আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম থেকে।

বিভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায় আলোচ্য বাক্য থেকে আহরণ করেছে একটি অপধারণা ও ক্ষতিকর দলিল। সেটি হচ্ছে— নবীগণও তাঁদের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেন। কিন্তু এমতো অপবিশ্বাস অজ্ঞজনোচিত। এখানে উল্লেখিত উত্তরাধিকারকে যদি প্রচলিত উত্তরাধিকাররূপে গণ্য করা হয়, তবে বলতে হয়, হজরত সুলায়মান একাই লাভ করেছিলেন তাঁর পিতার উত্তরাধিকার। আর তাঁর অন্যান্য অষ্টাদশ ভ্রাতা হয়েছিলো বঞ্চিত। কিন্তু তা কী করে সম্ভব?

অংশীদারিত্বের বিধান হচ্ছে— ক্রয়-বিক্রয়, দান-প্রতিদান অথবা কোনো প্রকার চুক্তি ব্যতিরেকে একজনের অধিকারভূত হওয়া, তারা পরস্পরের আত্মীয় হোক অথবা না হোক। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'আমি বনী ইসরাইলকে ওই ভূখণ্ডের অধিকারী করে দিলাম'। আরো এরশাদ করেছেন— 'আমি তোমাদেরকে তাদের ভূমি ও বাড়ীঘরের মালিক করে দিলাম'। রসুল স. বলেছেন, আমরা কোনো উত্তরাধিকার রাখি না। কথাটির অর্থ— নবীগণের মহাপ্রয়াণপরবর্তী সম্পদের কোনো উত্তরাধিকারী হয় না। যদি সেরকম কিছু থাকে, তবে তা হয় আল্লাহ্র সংরক্ষণভূত।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্পাক হজরত দাউদকে যে বিত্ত-বৈভব দান করেছিলেন, তা-ই তিনি প্রদান করেছিলেন হজরত সুলায়মানকে। বরং তিনি পেয়েছিলেন আরো কিছু বৈশিষ্ট্য। যেমন— বাতাস ও জ্বিনের উপরে প্রভুত্ব।

www.eelm.weebly.com

মুকাতিল বলেছেন, হজরত সুলায়মানের সাম্রাজ্য ছিলো হজরত দাউদের সাম্রাজ্যাপেক্ষা বৃহৎ। আর বিচারকরূপে তিনি ছিলেন তার পিতাপেক্ষা বিজ্ঞ। হজরত দাউদ ছিলেন অধিক ইবাদতকারী। আর হজরত সুলায়মান ছিলেন অধিক কৃতজ্ঞতাপ্রকাশকারী। আমি বলি, হজরত দাউদও ছিলেন এমনই।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সে বলেছিলো, হে মানুষ! আমাকে বিহঙ্গকুলের ভাষা বুঝবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে'। বাক্যটি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশক। এভাবে পাখিদের ভাষা বুঝবার ক্ষমতাপ্রাপ্তির কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ করে তিনি মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ্‌র দিকে।

'নুতক্ব' এবং 'মানতিক্ব' শব্দের দ্বারা প্রকাশ পায় মনের কথা, শব্দ একক বা যৌগিক, যেরকমই হোক না কেনো। 'কামুস' অভিধানে বলা হয়েছে, 'নুতক্ব' ও 'মানতিক্ব' অর্থ— এমন বর্ণসম্বলিত ধ্বনি, যা বোধগম্য। মানুষের ভাষার মধ্যেই ঘটে তার ভাবের প্রকাশ। তাই 'নুতক্ব' দ্বারা বুঝায় মানবোচ্চারিত শব্দ সম্ভারকে। মানুষ মানুষের ভাষা বুঝে, কিন্তু হজরত সুলায়মান বিহঙ্গকুলের ভাষাও বুঝতেন। তাদের কল-কাকলীর অর্থ করতে পারতেন যথাযথভাবে। সেকারণেই পাখির কুজনকেও এখানে বলা হয়েছে 'মানতিক্ব'।

বাগবী লিখেছেন, হজরত কা'ব বর্ণনা করেছেন, একবার এক সমাবেশে হজরত সুলায়মান তাঁর লোক জন নিয়ে বসেছিলেন। অদূরে একটি বন্য কবুতর চিৎকার করছিলো। তিনি জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন, কবুতরটি কী বলছে জানো? লোকেরা বললো, না। তিনি বললেন, সে বলছে, মৃত্যুর জন্য জীবনকে এবং ধ্বংসের জন্য গৃহকে প্রস্তুত রাখো। আর একবার চিৎকার করছিলো একটি পক্ষীশাবক। তিনি সঙ্গীদেরকে বললেন, জানো, সে কী বলে চলেছে? তারা বললো, না। তিনি বললেন, সে বলছে, আক্ষেপ! এ বিশাল সৃষ্টিশালা যদি অস্তিত্বলাভ না করতো। ময়ূরের ডাক শুনে একবার তিনি বললেন, জানো, তার এ কেকার অর্থ কী? লোকেরা বললো, জানি না। তিনি বললেন, সে বলছে, অপরের জন্য যেমন আচরণ করবে, তেমনি আচরণ পাবে তুমিও। পেঁচকের ডাক শুনে বললেন, বলতো সে কী বলছে? উপস্থিত লোকেরা বললো, তার ভাষা তো আমরা জানি না। তিনি বললেন, পেঁচকটি বলছে, অন্যকে যে করুণা করে না, সে নিজেও করুণাসিক্ত হয় না। বাজপাখির চেঁচামেচি শুনে একবার জিজ্ঞেস করলেন, জানো সে কী বলে? লোকেরা বললো, না। তিনি বললেন, সে বলে, ওহে পাপী-তাপীর দল! আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর একদিন তিতিরের কর্কশ স্বর শুনে তিনি তার সঙ্গীদের কাছে প্রশ্ন করলেন, বলতে পারো, তার এমতো উচ্চারণের মানে কী? সঙ্গীরা জবাব দিলো, না। তিনি বললেন, তার আওয়াজের

www.eelm.weebly.com

মানে— প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুপথগামী, আর প্রতিটি নতুন অবক্ষয়প্রবণ। আর একবার বললেন, বলো, ওই পাখিটির উচ্চারণে কী প্রকাশ পাচ্ছে? সম্বোধিতজনেরা বললো, বলতে পারবো না। তিনি বললেন, সে উপদেশ দিচ্ছে, পূর্বাহ্নে পুণ্য প্রেরণ করো, সবটাই পেয়ে যাবে। কবুতরের বাকবাকুম শুনে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, সে কী জানাতে চায়? উপস্থিত জনেরা বললো, জানি না। তিনি বললেন, সে জানাতে চায়— আমার সুমহান প্রভুপালনকর্তার গুণকীর্তন দ্বারা আকাশ-বাতাস পূর্ণ করে দাও। একবার একটি কামারী পাখি শিস দিয়ে উঠলো। তিনি বললেন, বলো, তার শিসের মর্ম কী? লোকেরা বললো, আমাদের জানা নেই। তিনি বললেন, সে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে— বর্ণনা করো আমার মহামহিম প্রভুপালকের মহিমা। তিনি আরো বললেন, এক দশমাংশ কর সংগ্রহকারীকে কাকেরা অভিসম্পাত দেয়। আর চিলেরা বলে, আল্লাহ্ ব্যতীত সকল কিছুই ধ্বংসশীল। ফিঙ্গে বলে, স্বল্পবাকেরা নিরাপদ। তোতাপাখি সতর্ক করে দেয়— পার্থিবতা যাদের লক্ষ্য, তাদের পরিণাম অশুভ। ভেক ও তার সঙ্গিনী বলে, বর্ণনা করো আমার সুমহান আল্লাহ্র পবিত্রতা।

মাকহুলের বর্ণনায় এসেছে, একদা একটি তিতির পাখির ডাক শুনে হজরত সুলায়মান তাঁর সহচরদেরকে বললেন, বুঝতে পারছো তিতিরটি কী বলছে? সহচরেরা বললো, না। তিনি বললেন, সে বলছে 'আর রহমানু আ'লাল আরশিস্ তাওয়া' (দয়াময় আরশে অধিষ্ঠিত)। ফারকুদ সুবহীর বর্ণনায় এসেছে, বৃক্ষ শাখায় বসে একটি বুলবুলি এদিকে ওদিকে তার মস্তক আন্দোলিত করছিলো, আর চিৎকার করছিলো তার নিজের ভাষায়। হজরত সুলায়মান সে পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। সহযাত্রীদেরকে তিনি বললেন, বলতে পারো, পাখিটির চিৎকারের কী অর্থ? সহযাত্রীরা বললো, আল্লাহ্ এবং তাঁর নবীই অধিক অবগত। তিনি বললেন, সে বার বার বলছে, আমি ভক্ষণ করেছি একটি শীষের অর্ধেক। এখন পৃথিবীর দায়িত্ব শূন্য অর্ধাংশ পূর্ণ করা।

এক বর্ণনায় এসেছে, একবার একদল ইহুদী হজরত ইবনে আব্বাসের কাছে এসে বললো, আমরা আপনাকে সাতটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই। যদি আপনি প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দিতে পারেন, তবে আমরা মুসলমান হয়ে যাবো। স্বীকৃতি দিবো আপনার জ্ঞানবত্তাকে। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, কৌতুহল নিবারণের জন্য প্রশ্ন করতে পারো। জিগীর্ষার জন্য নয়। তারা বললো ১. চণ্ডাল পাখি সুমিষ্ট সুরে কী বলে? ২. ব্যাঙের ডাকের অর্থ কী? ৩. কী অর্থ মোরগের ডাকের? ৪. গর্দভের গর্জনে কী অর্থ প্রকাশ পায়? ৫. অশ্বের হ্রেষাধ্বনির মর্মার্থ কী? ৬. কী অর্থ গীত হয় তিতির পাখির গানে এবং ৭. কোন অর্থ বহন করে জর্জরপক্ষীর

www.eelm.weebly.com

কুজন? হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, চণ্ডাল পাখি বলে, হে আল্লাহ্! মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর বংশধরগণের প্রতি ঈর্ষাপোষণকারীদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করো। ভেক বলে, সেই উপাস্যই পবিত্রাতিপবিত্র, প্রোত্তাল পয়োধির গভীর অতল ও যার স্মরণে সতত মুখর। কুক্কুট বলে, হে উদাসীন! আল্লাহ্কে স্মরণ করো। গর্দভের গর্জনে প্রকাশ পায়— হে আল্লাহ্! এক দশমাংশ ওশর সংগ্রাহকদের উপরে বর্ষণ করো অভিশাপ। সমরপ্রতিযোগিতায় সমরাশ্বের হ্রেষারবে উচ্চারিত হয়— 'সুববুহুন কুদ্দুসুন রব্বুনা ওয়া রব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার রূহ'। জর্জর পাখি বলে, হে জীবনোপকরণপ্রদাতা! তুমি প্রতিদিনের উপজীবিকা দাও প্রতিদিনে এবং তিতির পাখির জিকিরে উচ্চারিত হয়— আর রহমানু আ'লাল আরশিস্ তাওয়া। উল্লেখ্য, হজরত ইবনে আব্বাসের এমতো নির্ভুল জবাবে ওই ইহুদীরা মুসলমান হয়েছিলেন এবং জীবনপাত করেছিলেন মুসলমান হয়েই।

ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতামহ বলেছেন, গর্দভ তার স্বভাষায় চিৎকার করে বলে, হে আদম সন্তান! যা খুশী করতে পারো, কিন্তু মনে রেখো, শেষ পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। ঈগল পাখির আওয়াজের অর্থ— মানুষ থেকে দূরে অবস্থান করার মধ্যেই রয়েছে নিরাপত্তা। চণ্ডাল পাখির কলগানে সমুচ্চারিত হয়, হে আল্লাহ্! অভিসম্পাতগ্রস্ত করো তাদেরকে যারা রসুল স. এর বংশধরগণের প্রতি ঈর্ষান্বিত। খাতাফ পাখির কুজনে প্রকাশ পায়— আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন। এভাবে পুরো সুরা আবৃত্তির শেষে এমনভাবে 'ওলাদ্দ্বললীন'কে দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট করে, যেমন প্রলম্বিত লয়ে শব্দটি উচ্চারিত হয় একজন ক্বারীর কণ্ঠে।

আমি বলি, পশু-পাখির আওয়াজের অর্থসম্বলিত উপরে বর্ণিত বিবরণাবলী ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। ওই বিবরণসমূহ দৃষ্টে একথা মেনে নেয়া অত্যাবশ্যক নয় যে, তারা সব সময় এরূপ বলে। বরং বুঝতে হবে, হয়তো কখনো কোনো কারণে কোনো বিশেষ সময়ে তারা ওরকম করে বলে, তাদের সার্বক্ষণিক বুলি ওরকম নয়। লক্ষণীয়, আলোচ্য সুরায় হুদ্হুদ্ পাখি ও পিপীলিকার কথা বলার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের বক্তব্যগুলো ছিলো কয়েকটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তাদের বক্তব্যগুলোও সার্বক্ষণিক নয়। অবশ্য এ প্রসঙ্গে ইহুদীদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে হজরত ইবনে আব্বাসের জবাবদানের বিবরণটি নির্ভরযোগ্য। তবুও তার ঢালাও অর্থ করার ব্যাপারে রয়েছে যথাযথ ব্যাখ্যার অবকাশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমাকে সবই দেয়া হয়েছে'। একথার অর্থ— এবং আমাকে দেয়া হয়েছে আরো অনেক কিছু। এটা ছিলো হজরত সুলায়মানের

www.eelm.weebly.com

অত্যধিক অনুগ্রহপ্রাপ্তির স্বীকৃতি। যেমন আরবী বাকরীতি অনুসারে বলা হয়— তার নিকটে সকলেই আসে। একথার অর্থ— তার নিকটে আসে অনেকেই।

এখানে 'উল্লিমনা' অর্থ বুঝবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে বা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর 'উতীনা' অর্থ দেওয়া হয়েছে। 'উতীনা' শব্দটি পুংলিঙ্গবাচক বহুবচন। তাই কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— দেয়া হয়েছে আমাদেরকে সবকিছু। সুতরাং বুঝতে হবে হজরত সুলায়মান একথার অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁর পিতা হজরত দাউদকেও। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি ও আমার পিতাকে দেয়া হয়েছে আরো অনেক কিছু। অথবা বলা যায়, তিনি তাঁর এই বক্তব্যটির অন্তর্ভূত করেছেন তাঁর অনুসারীদেরকে। বলা বাহুল্য তাঁর অনুসারীগণও তাঁর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিলেন আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের অনেককিছু। কিংবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রীয় আচার পালনার্থেই তিনি ব্যবহার করেছিলেন পুংলিঙ্গবাচক ও বহুবচনার্থক শব্দরূপ 'উতীনা'। রাষ্ট্রনায়কগণ রাজমহিমা প্রকাশার্থে নিজের দিকে ইঙ্গিত করেন এরকম বহুবচনার্থক শব্দের মাধ্যমে। অর্থাৎ তারা 'আমি' এর স্থলে বলেন 'আমরা'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সবই দেওয়া হয়েছে' কথাটির অর্থ— দেয়া হয়েছে ইহকাল ও পরকালের অনেককিছু। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ— দেওয়া হয়েছে নবুয়ত, নৃনায়কত্ব, জ্বিন ও পবনের উপরে আধিপত্য।

শেষে বলা হয়েছে— 'এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ'। একথার অর্থ— এ হচ্ছে পরম প্রাপ্তি,অযাচিত অনুগ্রহ, যা আমি লাভ করেছি কেবল আল্লাহ্পাকের দয়ায়, স্বীয় যোগ্যতায় নয়। অথবা এখানে 'সুস্পষ্ট অনুগ্রহ' অর্থ উন্মুক্ত মহিমা। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকই তাঁর অপার মহিমায় এভাবে আমাকে করেছেন মহিমায়িত, অনুগ্রহায়িত। তাঁর পবিত্র অভিপ্রায় ছিলো এরকমই। উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানের এমতো উক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিশেষরূপ। দর্পপ্রবণতা এভাবেই এখানে হয়েছে নিশ্চিহ্ন। রসুল স. বলেছেন, আমি আদমনন্দনদের অধিনায়ক। একথা আত্মম্ভরিতাপ্রকাশক নয়। মহাবিচারের দিবসে সকল মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করবে আমার পতাকাতলে। উল্লেখ্য, রসুল স. এর এমতো বাক্যাবলী ছিলো আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশানুসারে। যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন— 'আপনি আপনার প্রভুপালয়িতার অনুগ্রহসমূহ প্রকাশ করুন'।

বাগবী লিখেছেন, হজরত সুলায়মান রাজত্ব করেছিলেন সুদীর্ঘ সাড়ে সাত শত বছর ধরে। তাঁর কর্তৃত্ব ছিলো মানুষ, জ্বিন, পশু-পাখি ও পবনের উপরে। পশু-পাখিদের ভাষা তিনি বুঝতেন। আরো অনেক অভূতপূর্ব ও বিস্ময় উদ্রেকক ঘটনা ঘটেছিলো তাঁর শাসনামলে। নব নব বিস্ময়কর উদ্ভাবনে ভরে দিয়েছিলেন এ ধরা। ওই যুগ ছিলো প্রকৃতই স্বর্ণ-যুগ।

www.eelm.weebly.com

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ
يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ
ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا
يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ
اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩﴾

r সুলাইমানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাহার বাহিনীকে—জিন, মানুষ ও বিহংগকুলকে, এবং উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইল বিভিন্ন ব্যূহে।

r যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছিল তখন এক পিপীলিকা বলিল, 'হে পিপীলিকা-বাহিনী! তোমরা তোমাদিগের গৃহে প্রবেশ কর, না করিলে, সুলাইমান এবং তাহার বাহিনী তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে তোমদিগকে পদতলে পিষিয়া ফেলিবে।'

r সুলাইমান উহার উক্তিতে মৃদু হাস্য করিল এবং বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমকে সামর্থ্য দাও যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি যাহা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ দাসদিগের শ্রেণীভুক্ত কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হলো তার বাহিনীকে— জ্বিন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যূহে'। এখানে ইয়ুযাউন' অর্থ ব্যূহ, বাধাপ্রদায়ক সারি বা সুশৃঙ্খল সমাবেশ। সৈনিকদের সারি বা ব্যূহগুলো থাকে পৃথক পৃথক অবস্থানে। তাদের সম্মিলনে রয়েছে নির্দেশায়িত অন্তরায়। তাই তাদের ব্যূহগুলোকে বলে 'ওয়াযেয়'। এরকম বলা হয়েছে কামুস অভিধানে। শব্দটির অর্থ পৃথকীকরণ এবং বণ্টনও হয়। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'ইয়ূযাউন' অর্থ তারা পরিচালিত হতো।

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেছেন, এক শত মাইল পরিসর জুড়ে অবস্থান করতো হজরত সুলায়মানের সেনাবাহিনী। ওই সুবিস্তৃত সেনানিবাসে মানব সেনাদের জন্য সংরক্ষিত ছিলো পঁচিশ মাইল, জ্বিন সেনাদের জন্য পঁচিশ এবং বিহঙ্গবাহিনীর জন্য পঁচিশ। অবশিষ্ট পঁচিশ মাইল ছিলো অন্যান্য প্রজাতির সৈন্যদের জন্য। তাঁর রাজপ্রাসাদ ছিলো একশত ভবনবিশিষ্ট। তাঁর তিনশত সহধর্মিণী বসবাস করতেন ওই সকল ভবনে। আর তাঁর সাতশত কিংকরী বসবাস করতো সাতশত পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠে। তার নির্দেশে তাঁর সুবৃহৎ সিংহাসনকে আকাশে উঠিয়ে নিতো বাতাস। তারপর ঝিরিঝিরি বাতাসে এগিয়ে চলতো তাঁর নভ-সিংহাসন। এভাবে এক আকাশযাত্রাকালে তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হলো, হে সুলায়মান! তোমার ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দিলাম। এখন থেকে তুমি শুনতে পারবে আমার সকল সৃষ্টির আওয়াজ, তারা যতদূরেই অবস্থান করুক না কেনো। এক আকাশবিহার শেষে তিনি উপনীত হয়েছিলেন পিপীলিকা অধ্যুষিত এক উপত্যকায়। পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে (১৮, ১৯) দেয়া হয়েছে সেই ঘটনার বিবরণ।

বলা হয়েছে— 'যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছলো— এখানে 'আ'লা ওয়াদিন' অর্থ উপত্যকার উপর। একথায় প্রমাণিত হয় যে, হজরত সুলায়মান সেখানে স্থলপথে গমন করেননি, বরং অবতরণ করেছিলেন উপর থেকে। আরো জানা যায়, তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন, ওই বিস্তীর্ণ উপত্যকার সর্বশেষ প্রান্তে। পিপীলিকার রাজ্য ছিলো সেখানেই।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেছেন, আকাশ বিহারকালে হজরত সুলায়মানের সঙ্গে থাকতো তাঁর পরিবার পরিজন, দাস-দাসী ও সিপাহী-সৈনিকের দল। আরো থাকতো আহারের আয়োজন, আসবাবপত্র ও তৈজসপত্র। আহার্য প্রস্তুত করবার জন্য সঙ্গে নেয়া হতো বৃহদাকৃতির নয়টি ডেকচি, যার একটিতেই রান্না করা যেতো নয়টি উটের গোশত। পশুপালের বিচরণের জন্য সেখানে থাকতো নাতি-হ্রস্ব প্রান্তর। এভাবে সকলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন তিনি আকাশযাত্রায়। সেখানে আহার্য প্রস্তুতের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকতো রাজ-পাচকেরা। এভাবে একদিন মদীনা অতিক্রমকালে তিনি বললেন, এই স্থানেই ঘটবে শেষ জামানার নবীর মহাআবির্ভাব। তাদের জন্য শুভসমাচার, যারা হবে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ও অনুরাগী। কাবাগৃহের পাশ দিয়ে গমনকালে তিনি নিম্নে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেলেন সেখানে রয়েছে পৌত্তলিকদের প্রতিমাসমূহ। কাবাগৃহ নভপরিভ্রমণরত নবীকে দেখে কেঁদে উঠলো। আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশ করলেন, হে কাবা! তোমার রোদনের হেতু কী? কাবা বললো, হে চিরঅমুখাপেক্ষী মহাপ্রভুপালয়িতা! তোমার আকাশচারী নবী এইমাত্র আমার পাশ দিয়ে গেলেন,

www.eelm.weebly.com

অথচ আমার সন্নিকটে নামাজ পাঠ করলেন না। আমাকে ঘিরে চলছে ঘৃণ্য ও জঘন্য প্রতিমাপূজা। এ লজ্জা আমি রাখি কোথায়? আল্লাহ্পাক বললেন, প্রিয় কাবা! কেঁদো না। শান্ত হও। সেই সময় আসন্ন, যখন বিশ্বাসীগণের পদচারণায় তোমার অবস্থানস্থল হবে সতত মুখরিত। তোমাকে ঘিরে ফেলবে অসংখ্য নামাজী ও তাওয়াফকারী। দেখতে পাবে তোমারই সন্নিকটে অবতারিত হচ্ছে আমার সর্বশেষ নভজ গ্রন্থ। তোমার সান্নিধ্য ফুঁড়ে উদিত হবে সর্বশেষ নবুয়ত। ওই নবুয়ত-সূর্যের আলোকে যারা স্নাত হবে, তাদের মাধ্যমেই আমি পূর্ণরূপে প্রকাশ করবো তোমার মহিমা। তারা তোমার কাছে ছুটে আসবে তেমনি করে, যেমন করে ক্ষুধার্ত গর্দভ ছুটে আসে তার আহার্যের কাছে। যেমন ছুটে যায় মমতাময়ী উষ্ট্রী-মাতা তার প্রিয় শাবকের কাছে। কবুতর নীড়ে ফিরে আসে তার ডিমের টানে। তখন তুমি চিরদিনের জন্য মুক্ত হবে মূর্তিপূজার বিবমিষা থেকে।

হজরত সুলায়মান অবশেষে উপনীত হলেন তায়েফের একাংশে সদীর নামক বিস্তীর্ণ ভূভাগে। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, সদীর উপত্যকা রয়েছে সিরিয়ায়। কেউ কেউ বলেছেন, ওই উপত্যকা ছিলো জ্বিনদের বাসভূমি। আর পিপীলিকাবাহিনী ছিলো ওই জ্বিনদের বাহন। ফরক হুমাইদি বলেছেন, পিপীলিকাগুলো ছিলো মক্ষিকাসদৃশ। আবার কেউ কেউ বলেছেন উষ্ট্রসদৃশ। আর হজরত সুলায়মানের সঙ্গে কথোপকথনকারী পিপীলিকাটি ছিলো অতি ক্ষুদ্র। শা'বী বলেছেন, পিঁপড়াটির ছিলো দু'টি ডানা। কেউ কেউ বলেছেন, সে ছিলো খঞ্জ। জুহাক বলেছেন, তার নাম ছিলো তাহিয়্যা। মুকাতিল বলেছেন, নাম ছিলো তার হজমী।

এরপর বলা হয়েছে — 'তখন এক পিপীলিকা বললো, হে পিপীলিকাবাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো, না করলে সুলায়মান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে ফেলবে'।

আরবী ভাষায় 'নামলাতু' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। তাই এখানে শব্দটির পরে স্ত্রীলিঙ্গবাচক 'উদ্খুলুনা' সন্নিবেশিত হওয়াই ছিলো ব্যাকরণ সম্মত। কিন্তু তা না করে এখানে বসানো হয়েছে পুংলিঙ্গবোধক সম্বোধন 'উদখুলূ'। এরকম করার অবশ্য যুক্তিসঙ্গত কারণও রয়েছে। কারণটি এই— আরবী ভাষায় বিবেকবিবর্জিত প্রাণীদেরকে করা হয় স্ত্রীলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। জড়পদার্থের বেলাতেও প্রয়োগ করা হয় এই নিয়মটি। কিন্তু মানুষের মতো বাক ও বিবেকবান প্রাণীকে করা হয় পুংলিঙ্গভূত। পিপীলিকা বাক ও বিবেকবান। তাই তাদেরকে সম্বোধনার্থে এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে পুংলিঙ্গবাচক শব্দ 'উদ্খুলূ'।

জ্ঞাতসারে কোনো প্রাণীকে পদতলে পিষ্ট করা বৈধ নয়। অথচ এখানে দেখা যায় হজরত সুলায়মান ও তাঁর বাহিনীর প্রতি এমতো কর্মের কোনো নিষেধাজ্ঞা

www.eelm.weebly.com

নেই। বরং নেতা পিপীলিকা তার দলবলকে দিচ্ছে তাড়াতাড়ি আপনাপন গর্তে প্রবেশ করার হুকুম। এতে করে বুঝা যায়, আহারান্বেষণের অনিবার্য প্রয়োজন ব্যতিরেকে পিপীলিকাকুলের জন্য গর্তের বাইরে থাকা বৈধ নয়। কারণ এতে করে তারা মানুষ অথবা অন্য কোনো বৃহৎপ্রাণীর পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারাতে পারে। আর এরকম হতে পারে তাদের অজ্ঞাতসারেই। অর্থাৎ তারা বুঝতেই পারবে না, কখন পদপিষ্ট হলো এবং কখন মরে গেলো। বিষয়টি হজরত সুলায়মান ও তাঁর বাহিনীর কাছেও রয়ে যাবে অজ্ঞাত। অতিক্ষুদ্র পিপীলিকার প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ না হওয়াই স্বাভাবিক। প্রকৃত কথা হচ্ছে, নেতা-পিপীলিকার কথায় এখানে প্রকাশ পেয়েছে হজরত সুলায়মান ও তাঁর বাহিনীর পক্ষে অজুহাত। অজুহাতটি হচ্ছে — অজ্ঞাতসারে তারা পিপীলিকাবধ করলে তারা দায়ী হবেন না। কিন্তু একই সঙ্গে এখানে এই সদুপদেশটিও নিহিত রয়েছে যে, জ্ঞাতসারে এমতো অপরাধ অসমীচীন।

একটি সন্দেহঃ হজরত সুলায়মান তখন ছিলেন ঊর্ধ্বগগনের পবনবিহারী। তাহলে তাঁর ও তাঁর বাহিনীর পদতলে পিপীলিকা নিষ্পেষণের অবকাশ কোথায়?

সন্দেহভঞ্জন ঃ উত্থাপিত সন্দেহের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, হয়তো তখন তাঁর এক পদাতিক বাহিনী উপস্থিত হয়েছিলো ওই উপত্যকায়। অথবা ঘটনাটি ঘটেছিলো তখন, যখন তিনি লাভ করেননি বাতাসের কর্তৃত্ব। কোনো কোনো মর্মজ্ঞ বলেছেন, তখন নেতা-পিপীলিকা তার সতীর্থদেরকে ডেকে বলেছিলো, হে পিপীলিকাকুল! তোমরা মহাসম্রাট সুলায়মানের মহাআড়ম্বরপূর্ণ আকাশী রাজত্ব ও তার বাহিনীর জাঁক-জমক দেখে বিমোহিত হয়ে যেয়ো না। এরকম করলে তোমরা বিস্মৃত হবে আল্লাহ্‌র স্মরণ। আর ওই স্মরণচ্যুতিই তোমাদের জন্য ডেকে আনবে সর্বনাশা মৃত্যু। মুকাতিলের বর্ণনায় এসেছে, নেতা-পিপীলিকার আলোচ্য হুঁশিয়ারিটি হজরত সুলায়মান শুনতে পেয়েছিলেন তিন মাইল দূরে থেকে। কারণ আল্লাহ্ তাঁকে দিয়েছিলেন বহুদূরের প্রাণীর ভাষা বুঝবার ক্ষমতা।

এরপর বলা হয়েছে — 'সুলায়মান তার উক্তিতে মৃদু হাস্য করলো'। একথার অর্থ— নেতা-পিপীলিকার এরকম আত্মরক্ষাজ্ঞানবিশিষ্ট বক্তব্য শুনে হজরত সুলায়মান হলেন বিস্মিত, অভিভূত ও পুলকিত। বিস্মিত ও অভিভূত হলেন তাদের আত্মরক্ষার কৌশল দর্শনে। আর পুলকিত হলেন এই ভেবে যে, পিপীলিকাকুলও তাহলে তাঁর ও তাঁর বাহিনীর ন্যায়নিষ্ঠতার কথা জানে। সেকারণেই তো নেতা-পিপীলিকা বললো 'অজ্ঞাতসারে ও অকারণে তোমাদেরকে পদতলে পিষে ফেলবে'। অর্থাৎ জ্ঞাতসারে প্রাণীবধকে তাঁরা সমীচীন মনে করেন না। এরকম বোধ ও ভাবনার কারণেই তাঁর ওষ্ঠাধারে জেগে উঠেছিলো মৃদুহাস্য।

www.eelm.weebly.com

‘তাবাসসুম’ অর্থ মৃদু এবং ‘দ্বাহিক্ব’ অর্থ হাসি। দু’টো শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। সেকারণেই বোঝা যায়, হজরত সুলায়মান ওই পিপীলিকার কথা শুনে হেসেই ফেলেছিলেন, যদিও সে হাসি ছিলো মৃদু ও মধুর। এমনও বলা যেতে পারে যে, প্রথমে তাঁর ওষ্ঠে প্রকাশ পেয়েছিলো মৃদু হাসির চিহ্ন। পরে সেই হাসিই পরিগ্রহ করেছিলো পূর্ণাঙ্গ হাসির রূপ। উম্মত-জননী হজরত আয়েশা বলেছেন, আমি রসুল স.কে কখনোই এমনভাবে হাসতে দেখিনি, যাতে প্রকাশ পায় তাঁর আল-জিহবা। তাঁর হাসি ছিলো মৃদু ও মধুর। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হারেস বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. এর চেয়ে অধিক মৃদু হাস্য করতে আর কাউকে দেখিনি। তিরমিজি।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং বললো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছো তার জন্য’। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে হজরত সুলায়মানের অনন্যসাধারণ বিনয়বনতা। নবীসুলভ বিনয়বনতা এরকমই হয়। এখানে তিনি নিজেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যোগ্যও মনে করেননি। সম্পূর্ণতই নির্ভর করেছেন আল্লাহ্র প্রতি। প্রার্থনা করেছেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্যপ্রাপ্ত অনুগ্রহসম্ভারের জন্য।

এখানকার ‘আওযি’নী’ শব্দটির বুৎপত্তি ঘটেছে ‘ইযায়’ থেকে। কামুস অভিধানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে— থামিয়ে দেয়া, বাধা দেয়া। বায়যাবী লিখেছেন, এখানকার বক্তব্যটি হবে— হে আমার প্রভুপালক! আমি তোমার অনুদানের কৃতজ্ঞতাকে আটকে রাখবো আমার মুখে ও বুকে। এ সম্পদকে কখনোই পরিত্যাগ করবো না। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, ‘আওযি’নী’ এর মর্মার্থ এরকম— হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি আমাকে এমন সামর্থ্য দাও, যার দ্বারা আমি প্রতিহত করতে পারি অকৃতজ্ঞতাকে। কেউ কেউ অর্থ করেছেন— আমার প্রবৃত্তিকে যেনো রাখতে পারি সকল অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত।

হজরত সুলায়মান এখানে তাঁর পিতামাতাকে প্রদত্ত অনুগ্রহরাজির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্য কামনা করেছেন। এতে করে প্রতীয়মান হয়, পিতামাতার জন্য দোয়া করা সন্তানদের জন্য অত্যাবশ্যক। পুণ্যবান সন্তানেরা এরকম করেও থাকেন। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— আর তাদের সাথে সংযুক্ত করেছি তাদের আত্মজদেরকে, আর তাদের কর্মের এতটুকুও হ্রাস করিনি।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পছন্দ করো এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ দাসদের শ্রেণীভুক্ত করো’। এখানে ‘সৎকর্মপরায়ণ দাস’ অর্থ পূর্ববর্তী নবী হজরত ইব্রাহিম, হজরত

www.eelm.weebly.com

ইসমাইল, হজরত ইসহাক ও হজরত ইয়াকুব। আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে হজরত সুলায়মান তাঁর ওই সকল মহাসম্মানিত পূর্বসূরীগণের শ্রেণীভূত হবার অভিলাষ প্রকাশ করেছেন।

সূরা নমল ঃ আয়াত ২০, ২১

وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ۝٢٠ لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝٢١

r সুলাইমান বিহংগদলকে পর্যবেক্ষণ করিল এবং বলিল, 'হুদ্‌হুদ্‌কে দেখিতেছি না কেন? সে অনুপস্থিত নাকি?'

r 'সে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইলে আমি অবশ্যই উহাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা হত্যা করিব।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সুলায়মান বিহঙ্গদলকে পর্যবেক্ষণ করলো এবং বললো হুদ্‌হুদ্‌কে দেখছিনা কেনো? একথার অর্থ— প্রার্থনা শেষে তিনি মনোসংযোগ করলেন তার বিহঙ্গবাহিনীর দিকে। লক্ষ্য করলেন সকলেই উপস্থিত। কিন্তু হুদ্‌হুদ্‌ পাখি নেই। বললেন, কী ব্যাপার? হুদ্‌হুদ্‌কে তো দেখতে পাচ্ছি না। সে কি অনুপস্থিত।

এখানকার 'তাফাক্কদা' অর্থ অনুসন্ধান করলেন, পর্যবেক্ষণ করলেন। হজরত সুলায়মানের নিয়ম ছিলো, আকাশ থেকে তিনি কোথাও অবতরণ করলে বিহঙ্গকুল পক্ষবিস্তার করে ছায়া দিতো তাঁকে ও তাঁর পুরো বাহিনীকে। আর হুদ্‌হুদ্‌ করতো পানির সন্ধান। ভূগর্ভ তার জন্য ছিলো আয়না সদৃশ। তাই সে কোথাও পানির সন্ধান পেলে ভূপৃষ্ঠে এঁকে দিতো চঞ্চুর চিহ্ন। ওই চিহ্নিত স্থানে তখন মৃত্তিকা খনন করতো জ্বিনেরা। খননকৃত কূপ থেকে বের করতো সুপেয় পানি। এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা ও আবদ্‌ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, বিবৃতিটি বিশুদ্ধ।

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত ইবনে আব্বাস এক সমাবেশে সুলায়মান নবীর ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। সেখানে উপস্থিত নাফে ইবনে আযরক বললেন, আপনি একি বলছেন? একটি বাচ্চা ছেলে ফাঁদ পেতে রেখে তার উপরে সামান্য মাটির আস্তরণ যদি দেয়, তবুও তো হুদ্‌হুদ্‌ পাখি সেই ফাঁদে ধরা পড়ে। মাটির নিচের ফাঁদ তো সে দেখতেই পায় না।

www.eelm.weebly.com

তাহলে সে ভূগর্ভস্থ পানির সন্ধান দিতে পারে কী ভাবে? হজরত ইবনে আব্বাস একথা শুনে তাঁকে বললেন, তোমার অমঙ্গল হোক। নির্বোধ তুমি, তাই জানো না, নিয়তি প্রবল হলে চক্ষু হয় দৃষ্টিবিবর্জিত। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি তখন বললেন, অদৃষ্টের অমোঘ বিধান যখন কার্যকর হয়, তখন দৃষ্টি হয় অবরুদ্ধ।

যাহোক, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরকম— আকাশবিহারী বিশাল সিংহাসন নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করলেন হজরত সুলায়মান। সেখানে ছিলো একটি পান্থশালা। পাখিরা যথারীতি পক্ষবিস্তার করে আছে মাথার উপর। প্রয়োজন দেখা দিলো পানির। কিন্তু আশে পাশে কোনো পানি পাওয়া গেলো না। সেকারণেই তিনি বিশেষভাবে খোঁজ করলেন হুদ্‌হুদ্ পাখির। না দেখতে পেয়ে বললেন, হুদ্‌হুদ্ আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো? রোষান্বিত নবীর এর পরের উক্তি উল্লেখিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (২১) এভাবে—

'সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দিবো অথবা হত্যা করবো'। একথার অর্থ— আমি তাকে এমন শাস্তি দিবো যাতে করে তার মৃত্যু হবে অবধারিত। নতুবা তাকে দেখাতে হবে অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ।

এখানে 'কঠিন শাস্তি দিবো' অর্থ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবো, যাতে করে তার স্বজাতিরা সাবধান হয়ে যায় বা শিক্ষা পেয়ে যায় । এখানকার 'কঠিন শাস্তি' কী, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন বিদ্বজ্জনেরা। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— আমি তার পালক উঠিয়ে দিগম্বর করে তাকে রেখে দিবো রোদে। কীট পতঙ্গেরা ভক্ষণ করবে তার অস্থি-মজ্জা-মাংস। মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— তার পালকবিহীন দেহকে আমি নিক্ষেপ করবো প্রখর রৌদ্রে। কেউ কেউ বলেছেন— তাকে করবো পিঞ্জরাবদ্ধ। আবার কেউ কেউ বলেছেন— চিরদিনের জন্য তাকে করবো কেন্দ্রচ্যুত। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— আমি তাকে তার প্রতিপক্ষসহ বন্দী করে রাখবো। কিংবা তাকে করে দিবো তার সতীর্থদের অনুচর। উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানের জন্য হুদ্‌হুদ্ পাখির শাস্তিদান ছিলো সিদ্ধ।

'আও লা ইয়া'তিইয়ান্‌নী বি সুলত্বনিম্ মুবীন' অর্থ অবশ্যই সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ। এখানে 'আও' অর্থ অথবা। শব্দটির অর্থ 'ব্যতীত', 'কিন্তু' ও 'তাছাড়া'ও হয়। শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করলে কথাটি দাঁড়ায়— তাছাড়া সে স্পষ্ট কারণ দর্শাবে, তাহলে হয়তোবা অব্যাহতি পাবে শাস্তি থেকে। আরবীভাষীরা বলেন 'লা আলযিমান্‌নাকা আও তু'তিয়ানী' (আমি তোমার পিছু ছাড়ছিনা, কিন্তু যদি তুমি আমার অধিকারে সমর্পিত হও)। এখানে 'আও' ব্যবহৃত হয়েছে 'ব্যতীত' অথবা 'কিন্তু' অর্থে।

www.eelm.weebly.com

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَ جِئْتُكَ مِنْ
سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ۝٢٢ اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَ اُوْتِيَتْ مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ وَّ لَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ۝٢٣ وَجَدْتُّهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ
لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ
عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝٢٤ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ
الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ
۝٢٥ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝٢٦ السجدة

r অনতিবিলম্বে হুদ্‌হুদ্‌ আসিয়া পড়িল এবং বলিল, 'আপনি যাহা অবগত নহেন আমি তাহা অবগত হইয়াছি এবং 'সাবা' হইতে সুনিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি।

r 'আমি এক নারীকে দেখিলাম উহাদিগের উপর রাজত্ব করিতেছে। তাহাকে সবই দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার আছে এক বিরাট সিংহাসন।'

r 'আমি তাহাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে দেখিলাম তাহারা আল্লাহের পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করিতেছে। শয়তান উহাদিগের কার্যাবলী উহাদিগের নিকট শোভন করিয়াছে এবং উহাদিগের সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে; ফলে উহারা সৎপথ পায় না;'

r 'নিবৃত্ত করিয়াছে এই জন্য যে, উহারা যেন সিজদা না করে আল্লাহ্‌কে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন যাহা তোমরা গোপন কর এবং যাহা তোমরা ব্যক্ত কর।'

r আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি মহা আরশের অধিপতি।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অনতিবিলম্বে হুদ্‌হুদ্‌ এসে পড়লো এবং বললো, আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি এবং সাবা থেকে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি'। একথার অর্থ— অত্যল্পকালের মধ্যে সেখানে উপস্থিত

www.eelm.weebly.com

হলো অপরাধী হুদ্‌হুদ্‌। ভয়ে ভয়ে বললো, হে মহামান্য নবী! আমি অতি অবশ্যই অপরাধী। কিন্তু আপনি শুনলে হয়তো খুশী হবেন যে, আমি নিয়ে এসেছি এক চমকপ্রদ সংবাদ। জেনে এসেছি সাবা নামক নিকটবর্তী এক রাজ্যের সমুদয় বিবরণ। আপনি সে সাম্রাজ্য সম্পর্কে এখনো কিছুই জানেন না।

বিদ্বজ্জনগণের ভাষায় নেপথ্যের ঘটনা এরকম— হজরত সুলায়মানের তত্ত্বাবধানে এক সময় শেষ হলো বায়তুল মাকদিস নির্মাণের কাজ। হৃদয়ে জাগ্রত হলো বায়তুল্লাহ্‌ শরীফ দর্শনের বাসনা। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি কিছুদিন পর যাত্রা করলেন মক্কা অভিমুখে। সেখানে পৌঁছে অপেক্ষা করলেন কিছুকাল। প্রতিদিন সেখানে তিনি কোরবানী করতে লাগলেন পাঁচ হাজার উট; পাঁচ হাজার বলদ এবং পাঁচ হাজার মেষ। উপস্থিত জনতাকে একদিন বললেন, এই পবিত্র স্থানেই আবির্ভূত হবেন আরবী নবী। তাঁকে বিজয়ী করা হবে তাঁর প্রতিপক্ষের উপর। তাঁর রোষ প্রভাববিস্তারক হবে এক মাসের পথের দূরত্বের সমান দূরত্ব জুড়ে। দূর-অদূর হবে তাঁর কাছে এক বরাবর। আল্লাহ্‌পাক সম্পর্কিত বিষয়ে তিনি পরোয়া করবেন না নিন্দুকদের নিন্দার। জনতা জানতে চাইলো, তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকবেন কোন ধর্মে? হজরত সুলায়মান বললেন, আল্লাহ্‌র এককত্বে, দ্বীনে হানীফে। অভিনন্দন তাঁর প্রতি, আর তার প্রতিও যে ইমান পাবে তাঁর মহান সান্নিধ্যে। জনতা আরো জানতে চাইলো, তাঁর মহাআবির্ভাবের আর কতো দেরী? তিনি বললেন, এক হাজার বৎসর। তোমরা আমার একথা পৌঁছে দিয়ো অনুপস্থিতজনদের কাছে। অবশ্যই তিনি হবেন রসুলগণের মহান অগ্রণী এবং সর্বশেষ রসুল।

বর্ণনাকারী বলেন, হজরত সুলায়মান মক্কা শরীফে পৌঁছে হজ সম্পাদন করলেন। তারপর যাত্রা করলেন ইয়েমেন অভিমুখে। সলিয়া নামক স্থানে যখন পৌঁছলেন, তখন দ্বিপ্রহর বিগত প্রায়। স্থানটি ছিলো শস্যশ্যামল ও নয়নাভিরাম। মনস্থ করলেন এই স্থানেই অবতরণ করবেন তিনি। এখানেই সমাধা করবেন পানাহার ও আসরের নামাজ। হুদ্‌হুদ্‌ পাখি কিন্তু অবতরণ করলো না। ভাবলো ইত্যবসরে আরো ঊর্ধ্বে উঠে পৃথিবীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ একটু দেখে নেয়া যাক। ঊর্ধ্বাকাশে উড়াল দিলো হুদ্‌হুদ্‌। সেখান থেকে তার নজরে পড়লো সাবা রাজ্যের নয়নমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী। রাজপ্রাসাদের চিত্তাকর্ষক পুষ্পোদ্যান। কৌতূহল নিবারণের জন্য সেদিকেই ছুটে গেলো সে। সেখানে সাক্ষাত হলো আর একটি হুদ্‌হুদ্‌ পাখির সঙ্গে। হজরত সুলায়মানের হুদ্‌হুদ্‌ পাখিটির নাম ছিলো ইয়াফুর। আর সাবা রাজ্যের ওই হুদ্‌হুদ্‌টির নাম ছিলো আনফীর। সে পথিক পাখিকে বললো, কোথা থেকে আসছো? ইয়াফুর বললো, আমি দাউদতনয় সম্রাট

www.eelm.weebly.com

সুলায়মানের আকাশ ভ্রমণের সঙ্গী। এখন আসছি সিরিয়া থেকে। আনফীর বললো, তিনি আবার কে? ইয়াফুর বললো, জানোনা, তিনি তো নবী এবং মহাপ্রতাপশালী সম্রাট। মানব-দানব, পাখি ও পবন তাঁর অনুগত। এবার বলো, তুমি কোন দেশের? আনফীর বললো, এই রাজ্যেই আমার বসবাস। এ দেশ রমণীশাসিত। এখানকার রাণীর নাম বিলকিস। বুঝলাম, তোমাদের সম্রাটের সাম্রাজ্য সুবিশাল। কিন্তু জেনে রেখো, আমাদের সম্রাজ্ঞীর রাজ্যও অবিশাল নয়। তাঁর অধীনস্থ সেনাধিনায়কদের সংখ্যা বারো হাজার। আবার তাদের প্রত্যেকের অধীনে আছে এক লক্ষ করে সৈন্য। এসো দেখবে আমাদের রাজ্য কতো সুন্দর। ইয়াফুর বললো, না, এখন যাই। সম্রাটের এখন নামাজের সময়। পানির খোঁজ করবেন তিনি। তখনই ডাক পড়বে আমার। আনফীর বললো, ভায়া, এসেছো যখন দেখেই যাওনা ভালো করে। রাণী বিলকিসের সংবাদ জানতে পেলে তোমাদের সম্রাট খুশীই হবেন। ইয়াফুর আর অমত করলো না। আনফীরের সঙ্গে ঘুরে ফিরে দেখলো রাজ প্রাসাদ ও রাজবাড়ীর মনোহর কুসুম কানন। তারপর অতি দ্রুত ফিরে আসতে লাগলো হজরত সুলায়মান সকাশে।

এদিকে ভূমি স্পর্শ করার পরক্ষণেই বিহঙ্গবাহিনীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন হজরত সুলায়মান। বিশেষভাবে খোঁজ করলেন হুদ্‌হুদের। কারণ আসর নামাজের সময় সমাগত প্রায়। পানির একান্ত প্রয়োজন। হুদ্‌হুদ্‌কে না দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হুদ্‌হুদ্‌ কোথায়? কোথায় গেলো সে? উপস্থিতদের কেউ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলো না। রোষান্বিত হলেন আল্লাহ্‌র নবী। বললেন, তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অবশ্যই দেয়া হবে, যদি সে তার অনুমতিবিহীন অনুপস্থিতির উপযুক্ত কৈফিয়ত না দিতে পারে। বিহঙ্গবাহিনীর অধিনায়ককে তলব করে বললেন, এক্ষুণি যাও। যেখান থেকে পারো, সেখান থেকে যত দ্রুত পারো পাকড়াও করে আনো হুদ্‌হুদ্‌কে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়াল দিলো বিহঙ্গাধিনায়ক। ঊর্ধ্বাকাশে উঠতেই দেখলো ইয়েমেনের দিক থেকে ছুটে আসছে হুদ্‌হুদ্‌। কাছে আসতেই আক্রমণোদ্যত হলো তার উপর। শংকিত হুদ্‌হুদ্‌ অনুনয় জানালো, নেতৃপ্রবর! সদয় হও। আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে বলি, আমাকে আঘাত কোরো না। আমাকে নিয়ে চলো মহামান্য সম্রাটের দরবারে। সেখানেই হোক আমার বিচার। বিহঙ্গাধিনায়ক বললো, হতভাগা; নিপাত যাও। সম্রাট তো তোমাকে শাস্তিদানের জন্য শপথ করেছেন। একথার পর দু'জনে দ্রুত উড়াল দিলো ফিরতি পথে। দরবারের কাছাকাছি আসতেই দেখা হলো শকুনের সাথে। সে বললো, হে হুদ্‌হুদ্‌! তুমি অপরাধী। সম্রাট রোষতপ্ত। মনে হয় এ যাত্রায় তোমার আর রক্ষা নেই। হুদ্‌হুদ্‌ বললো, তিনি কি শর্তযুক্ত শপথ করেছেন, না শর্তবিমুক্ত? অন্য পাখিরা সমস্বরে

www.eelm.weebly.com

বললো, হ্যাঁ। বলেছেন, তোমাকে উপযুক্ত কারণ দেখাতে হবে। না দেখাতে পারলে কঠিন শাস্তি অবধারিত। হুদ্‌হুদ্‌ বললো, তাহলে আশা রাখি আমি রেহাই পেয়ে যাবো।

সিংহাসনে সমাসীন হজরত সুলায়মানের সম্মুখে হাজির হলো হুদ্‌হুদ্‌। জানালো বিনয়াবনত অভিবাদন। কাছে এলে রোষতপ্ত নবী তাকে ধরে ফেললেন শক্ত হাতের মুঠোয়। বললেন, দুরাচার! কোথায় ছিলে এতক্ষণ? উন্মত্ত হস্তীর পদতলে আমি পিষ্ট করবো তোমাকে। হুদ্‌হুদ্‌ বললো, সম্রাটপ্রবর! মহাবিচারের দিবসের কথা স্মরণ করুন, যখন আপনি উপস্থিত হবেন জব্বার কাহ্‌হার আল্লাহ্‌র সকাশে। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রোষ অন্তর্হিত হলো নবীর। নম্রকণ্ঠে বললেন, তাহলে বলো, কোথায় গিয়েছিলে তুমি। হুদ্‌হুদ্‌ বললো, মহামান্য নবী! আমি গিয়েছিলাম রমণীশাসিত এক রাজ্যে। সে রাজ্যের নাম সাবা। আমি নিয়ে এসেছি সে রাজ্যের নিশ্চিত সংবাদ, যা আপনি জানেন না।

কোনো বিষয়ের পরিপূর্ণ ও সুনিশ্চিত জ্ঞান আহরণ করাকে বলে 'ইহাত্বা'। প্রকৃত অর্থে শব্দটি শোভন কেবল আল্লাহ্‌র বেলায়। কারণ তিনিই সকলকিছুর পরিপূর্ণ ও সুনিশ্চিত পরিজ্ঞাতা। অন্যদের বেলায় শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে কেবল রূপক অর্থে, প্রকৃত অর্থে নয়। কারণ সর্বজ্ঞ হওয়ার যোগ্যতা ও অধিকার অন্য কারোই নেই। সুতরাং এখানে হুদ্‌হুদের 'সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি' কথাটির অর্থ হবে— হে মহামান্য নবী! আমি ওই সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি, যা আপনি অবহিত নন। হুদ্‌হুদের একথার মধ্যে হজরত সুলায়মানসহ সকলের জন্য এই সদুপদেশটি নিহিত রয়েছে, মহাজ্ঞানীগণও যেনো সর্বজ্ঞ হওয়ার ধারণা থেকে সততমুক্ত থাকেন। দর্পাক্রান্ত যেনো না হন। যেনো মনে করেন, সৃষ্টির সকলকিছুর মধ্যেই রয়েছে জ্ঞানের পৃথক পৃথক অর্জন। তাই জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁরা একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। বিভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায়ের একটি অপবিশ্বাসের অপনোদন হয়ে যায় আলোচ্য বিবরণে। তারা বলে, আমাদের ইমাম সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। তাই কোনো বিষয়ই তাঁদের কাছে গোপন নয়। কিন্তু উল্লেখিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে একথাই সুপ্রমাণিত হয় যে, তাদের এমতো বিশ্বাস অযথার্থ ও বিভ্রান্ত।

সাবা ছিলো ইয়েমেন অঞ্চলের একটি জাঁকজমকপূর্ণ শহর। সান্‌য়া থেকে ওই শহরটির দূরত্ব ছিলো মাত্র ছত্রিশ মাইল। বাগবী লিখেছেন, একবার রসুল স. কে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানিয়েছিলেন, সাবা একজন মানুষের নাম। দশজন পুত্র ছিলো তার। তন্মধ্যে ছয়জন বসতি স্থাপন করেছিলো ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলে। আর অবশিষ্ট চারজন লোকালয় গড়ে তুলেছিলো উত্তরাঞ্চলে, সিরিয়ায়।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'আমি এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে সবই দেওয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন'।

সাবার রাণীর নাম ছিলো বিলকিস। তাঁর পিতার নাম শুরাহীল। তিনি ছিলেন তাঁর বংশের চল্লিশতম নৃপতি। তাঁর উর্ধ্বতন ঊনচল্লিশ পুরুষ সকলেই ছিলেন প্রতাপশালী সম্রাট। রাজত্বের প্রলম্বিত উত্তরাধিকারের কারণে শুরাহীলের ছিলো বিশেষ এক ধরনের অহংকার। তাই পার্শ্ববর্তী রাজ্যপালদেরকে তিনি তেমন গণ্য করতেন না। তাদের কারো কন্যার পানি গ্রহণকেও তিনি মনে করতেন অবমাননাকর। তাই তিনি পানি গ্রহণ করেছিলেন এক জ্বিন রমণীর। তার নাম ছিলো রায়হানা বিনতে সাকান। ওই জ্বিন রমণীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন তাঁর প্রিয় পুত্রী বিলকিস। বিলকিসের মাতা ছিলো কাকবন্ধা। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, বিলকিসের জনক-জননীর মধ্যে কোনো একজন ছিলেন জ্বিন বংশদ্ভূত। শুরাহীলের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরূঢ়া হলেন বিলকিস। কিন্তু দেশবাসীদের কেউ কেউ ছিলো রমণীশাসনের ঘোর বিরোধী। ফলে তাঁর রাজ্য হয়ে গেলো দ্বিখণ্ডিত। বিরোধীপক্ষীয়রা নির্বাচন করলো নতুন রাজা। তাদের ওই রাজা ছিলো দুরাচারী ও চরিত্রহীন। সাধারণ রমণীরাও তার লালসার আগুন থেকে অব্যাহতি পেতো না। জনতা ক্ষিপ্ত হলো। কিন্তু তাকে উৎখাত করার কোনো উপায় খুঁজে পেলো না। নারীপীড়ক রাজার প্রতি বিলকিসও ছিলেন ক্ষিপ্ত। তৎসত্ত্বেও তিনি কৌশল অবলম্বনকেই শ্রেয় মনে করলেন। তার নিকট পত্র প্রেরণ করলেন এই মর্মে যে, হে রাজা! তুমি আমার আত্মীয়স্বজনের কাছে আমাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব উত্থাপন করো। তুমি তো রাজা। সুতরাং এ বিয়েতে আমার আপত্তি থাকতে পারে না। আর আমাদের বিয়ে হলে দ্বিখণ্ডিত রাজ্য পুনরায় একত্রিত হবে। উৎকণ্ঠা অন্তর্হিত হবে প্রজাসাধারণের জীবন থেকে। আমরাও রাজ্যশাসন করতে পারবো নিশ্চিন্তে। রাজা ভাবলো এইতো সুযোগ। যথাসময়ে সে বিলকিসের আত্মীয়স্বজনের কাছে পাঠালো বিবাহের প্রস্তাব। তারা বললো, আমাদের এরকম সাহস নেই। মনে হয় বিলকিস এ প্রস্তাবে কুপিতা হবেন। রাজা বললো, তোমরা তাকে বলেই দেখো না। আমি নিশ্চিত, তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। তাই হলো। আত্মীয়-স্বজনদের প্রস্তাব খুশীমনে গ্রহণ করলেন বিলকিস। কিছুকালের মধ্যে মহাসমারোহে সম্পন্ন হলো তাদের বিবাহ। নববধুকে নিয়ে রাজা ফিরে এলো স্বপ্রাসাদে। একান্ত মিলনের প্রাক্কালে বিলকিস তাকে পান করালেন শরাব। রাজাও আনন্দে বিভোর হয়ে বার বার গ্রহণ করতে লাগলেন প্রিয়তমার হাতের মদ্যপূর্ণ পেয়ালা। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে এক সময় সে হয়ে পড়লো ঘোর মাতাল। ওই সুযোগে বিলকিস করলেন তার শিরশ্ছেদ। কর্তিত মস্তক ঝুলিয়ে দিলেন ঘরের দরোজায়।

www.eelm.weebly.com

তারপর রাতের অন্ধকারেই চুপি চুপি ফিরে এলেন নিজের রাজপ্রাসাদে। সকাল হলো। সকলেই দেখলো রাজগৃহের দরজায় ঝুলছে রাজার ছিন্ন মস্তক। জনতা উৎফুল্ল হলো। বুঝলো, বিয়েটা ছিলো সাবার রাণী বিলকিসের একটি ছলনা। এভাবে বিলকিস হয়ে গেলেন সমগ্ররাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়িকা।

হজরত আবু বকর বর্ণনা করেন, রসুল স. যখন অবগত হলেন, পারস্যবাসীরা একজন রমণীকে তাদের রাজ্যাধিকারিণী নির্বাচন করেছে, তখন মন্তব্য করলেন, যে জাতি রমণীশাসন মেনে নেয়, তারা কখনো সফল হয় না। বোখারী, আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ।

আলোচ্য আয়াতের 'তাকে সবই দেয়া হয়েছে' অর্থ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার সবকিছুই দেয়া হয়েছে সাবার রাণীকে। অথবা 'সবই' অর্থ এখানে সর্বপ্রকার প্রাচুর্য। অর্থাৎ সেনাশক্তির প্রাচুর্য, সম্পদের প্রাচুর্য, রাষ্ট্রের আয়তনের প্রাচুর্য ইত্যাদি।

প্রকৃত অর্থেই রাণী বিলকিসের সিংহাসনটি ছিলো সুবিশাল। তাই এখানে বলা হয়েছে 'এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন'। ওই সিংহাসন ছিলো অলক্তরাগরঞ্জিত, ইয়াকুতশোভিত, জবরজদ-মর্মরখচিত এবং চোখ ধাঁধানো অলংকরণমুদ্রিত। পায়াগুলো ছিলো জমরুদ পাথরের। সাতটি প্রকোষ্ঠ ছিলো ওই সুবৃহৎ সিংহাসনের। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের তোরণ ও বাতায়ন থাকতো নিয়ত অর্গলাবদ্ধ। যোবায়ের ইবনে মোহাম্মদের মধ্যস্থতায় ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, ওই প্রকাণ্ড রাজাসনটি ছিলো প্রধানত স্বর্ণের। তার সঙ্গে যুক্ত ছিলো ইয়াকুত ও জবরজদের সুষম মিশ্রণ। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছিলো যথাক্রমে আশি ও চল্লিশ হাত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রাণী বিলকিসের সিংহাসনের দৈর্ঘ্য ছিলো তিরিশ হাত। প্রস্থও তিরিশ।

এর পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে, ফলে তারা সৎপথ পায় না'। একথার অর্থ— হুদ্হুদ্ আরো বললো, আমি দেখেছি সাবার রাণী সূর্যের উপাসিকা। তার প্রজারাও এ বিষয়ে তার একনিষ্ঠ অনুগামী। এক আল্লাহ্র ইবাদতের স্থলে এরকম জঘন্য অংশীবাদিতাকে শয়তানই তাদের দৃষ্টিতে করে রেখেছে শোভন ও হৃদয়গ্রাহী। সুতরাং তারা সৎপথ পাবেই বা কী করে।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'নিবৃত্ত করেছে এ জন্য যে, তারা যেন সেজদা না করে আল্লাহ্‌কে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন'। এখানকার 'আল্‌লা' শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'আন্' (যেন) এবং 'লা' (না)। অর্থাৎ যেনোনা। আবার এর পূর্বে রয়েছে একটি উহ্য জের প্রদায়ক অব্যয় 'লি' (জন্য)। এভাবে শব্দটি দাঁড়ায় 'লি আন্ লা'। এমতাবস্থায় আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— শয়তান তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করেছে, যেন তারা আল্লাহ্‌কে সেজদা করতে না পারে। অথবা বলা যেতে পারে, 'লা' এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত এবং এর সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'ইয়াহতাদুন' (সৎপথ) এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়ায়— তারা আল্লাহ্‌কে সেজদা করার পথও পায় না।

'খবআ' অর্থ লুক্কায়িত বা গোপন বিষয়। শব্দটি কর্মপদরূপী ধাতুমূল। 'ইখরাজ' অর্থ প্রকাশ করা। অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে আকাশের লুক্কায়িত বস্তু হচ্ছে বৃষ্টি এবং পৃথিবীর লুক্কায়িত বিষয় হচ্ছে উদ্ভিদের অদৃশ্য সূচনা। এরকমও বলা যেতে পারে যে, গগনমণ্ডলী ও ধরণীর লুক্কায়িত বিষয় হয়েছে অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা। 'খবআ' এবং 'ইখরাজ' শব্দ দু'টো সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় নক্ষত্রপুঞ্জের উদয়, বারি বর্ষণ, ভূপৃষ্ঠে সবুজের উত্থান ইত্যাদি সম্পর্কে। প্রতিটি সম্ভাব্য বস্তুর অনস্তিত্বকে অস্তিত্বায়িত করার ক্ষেত্রেও অবশ্য শব্দ দু'টো সমানভাবে উচ্চার্য। প্রকাশ পায় তো তাই-ই, যা গোপন। অর্থাৎ অনস্তিত্বের গোপনীয়তাই হচ্ছে অস্তিত্বের প্রকাশ্যমানতা। বলা বাহুল্য, এরকম অনির্দেশ্য কর্মকে উন্মোচিত করবার জ্ঞান, অধিকার ও ক্ষমতা রয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র। স্বতিষ্ঠ ও সদাবিদ্যমান একমাত্র তিনিই। তাই তিনি সকলের সেজদা গ্রহণের একমাত্র, অসমকক্ষ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি জানেন, যা তোমরা গোপন করো এবং যা তোমরা ব্যক্ত করো'। একথার অর্থ— তোমরা যা মনে রাখো এবং যা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করো মুখে ও আচরণে তার সকলকিছুই আল্লাহ্ জানেন। সুতরাং তোমাদের জন্য প্রকাশ্য-গোপন সকল প্রকার অংশীবাদিতা থেকে মুক্ত থাকা অত্যাবশ্যক।

শেষোক্ত আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহা আরশের অধিপতি'। একথার অর্থ— যে আল্লাহ্ সকলের এবং সকলকিছুর প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা সম্পর্কে সতত অবগত, সেই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো বা কোনোকিছুর উপাসনা চিরনিষিদ্ধ। সুতরাং চিরায়ত সত্যোচ্চারণ হচ্ছে; তিনি ব্যতীত উপাস্য কেউ-ই নেই। আর তিনি মহাআরশের মহামহিম প্রভুপালয়িতা।

নির্দেশনাঃ এই আয়াত যাঁরা আরবীতে পাঠ করেছেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সেজদা করে নিবেন।

www.eelm.weebly.com

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾ اِذْهَبْ
بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ
﴿٢٨﴾ قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾ اِنَّهٗ مِنْ
سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ
وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

r সুলাইমান বলিল, 'আমি দেখিব, তুমি কি সত্য বলিয়াছ, না তুমি মিথ্যাবাদী?'

r 'তুমি যাও আমার এই পত্র লইয়া এবং ইহা তাহাদিগের নিকট অর্পণ কর, অতঃপর তাহাদিগের নিকট হইতে সরিয়া পড় এবং দেখ, তাহারা কী উত্তর দেয়।'

r বিলকীস বলিল, 'হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হইয়াছে;'

r 'ইহা সুলাইমানের নিকট হইতে এবং ইহা এইঃ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহের নামে,'

r অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করিও না, এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সুলায়মান বললো, আমি দেখবো, তুমি সত্য বলেছো, না তুমি মিথ্যাবাদী'। 'মিনাল কাজিবীন' অর্থ মিথ্যাবাদীদের পর্যায়ভূত। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হজরত সুলায়মান হুদ্‌হুদের কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে। তোমার কথা তো আমি শুনলাম। কিন্তু আমি পরীক্ষা করে ও ভেবে-চিন্তে দেখবো, তোমার কথা সত্য, না তুমি মিথ্যাবাদীদের পর্যায়ভূত। উল্লেখ্য, এরকম বক্তব্যে সন্দেহটাই প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণেই প্রয়োজন পড়ে পরীক্ষার। সেকারণেই পত্র প্রেরণের মাধ্যমে হুদ্‌হুদ্‌কে পরীক্ষা করেছিলেন হজরত সুলায়মান।

এরপর হুদ্‌হুদ্ পানির সন্ধান দিলো। তার চঞ্চু ও নখরচিহ্নিত স্থানে জনতা ও জ্বিনেরা মিলে অল্প সময়ের মধ্যে খনন করল বিশাল ও গভীর এক জলাশয়। প্রয়োজন মতো সকলে ওজু গোসল করলো। পানি পান করলো পরিতৃপ্তির সঙ্গে।

www.eelm.weebly.com

পশুপালকেও করলো পরিতৃপ্ত। ইত্যবসরে হজরত সুলায়মান রাণী বিলকিসের উদ্দেশ্যে একটি পত্র রচনা করলেন এভাবে— পরম করুণাময় আল্লাহ্তায়ালার নামে— আল্লাহ্র নগণ্য সেবক দাউদতনয় সুলায়মানের পক্ষ থেকে সাবার সম্রাজ্ঞী বিলকিসের প্রতি। সত্য পথের পথিকগণের প্রতি শুভাশীস। অহমিকাভরে আমাকে অস্বীকার কোরো না। অনুগত চিত্তে আমার নিকটে উপস্থিত হও।

ইবনে জুরাইজ লিখেছেন, হজরত সুলায়মানের ওই পত্রে উল্লেখিত হয়েছিলো এতটুকুই। আর ৩০ ও ৩১ সংখ্যক আয়াতে এতটুকুই উদ্ধৃত হয়েছে। কাতাদা বলেছেন, নবী-রসুলগণের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বক্তব্যসংক্ষিপ্তকরণ।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'তুমি যাও, আমার এই পত্র নিয়ে এবং এটা তাদের নিকট অর্পণ করো; অতঃপর তাদের নিকট থেকে সরে পড়ো এবং দেখ তারা কী উত্তর দেয়'।

হজরত সুলায়মানের পত্র নিয়ে হুদ্হুদ্ উড়ে চললো সাবা রাজ্যের দিকে। রাণী বিলকিস তখন অবস্থান করছিলেন সানআ থেকে তিন মঞ্জিল দূরে মারেবে। সেখানে গিয়ে হুদ্হুদ্ দেখলো, রাজপ্রাসাদের সকল তোরণ অর্গলাবদ্ধ। সে অনেক কৌশল করে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে সমর্থ হলো রাণীর শয়নকক্ষে। দেখলো, শয্যায় পৃষ্ঠ স্থাপন করে রাণী বিশ্রামরতা। সে চঞ্চুধৃত চিঠিটি ফেলে দিলো রাণীর বুকের উপর। শিথিল সূত্র সংযোগে এরকম বর্ণনা করেছেন আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

ইবনে জায়েদ সূত্রে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বর্ণনা করেছেন, রাণী বিলকিসের একান্ত ব্যক্তিগত প্রকোষ্ঠে ছিলো পূর্বমুখী একটি জানালা। তিনি ছিলেন সূর্যপূজারিণী। প্রত্যুষের সূর্যদর্শন ও সূর্যের প্রতি প্রণিপাত করাই ওই গবাক্ষ নির্মাণের উদ্দেশ্য। ওই গবাক্ষ পথেই রাণীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেছিলো হুদ্হুদ্। সূর্যোদয়ের পূর্বেই হুদ্হুদ্ তার পক্ষবিস্তার করে ঢেকে দিলো বাতায়নটি। ফলে সেদিন রাণীর ঘুম ভাঙলো সূর্যোদয়ের পর। সেদিন আর তার প্রথম সূর্যের পূজা করা হলো না। ঘুম ভাঙতেই বুঝতে চেষ্টা করলো সূর্যদর্শন না হওয়ার কারণ। ত্রস্ত পদে এগিয়ে গেলেন বাতায়নের দিকে। ঠিক তখুনি হুদ্হুদ্ পত্রটি নিক্ষেপ করলো তাঁর শরীরে। রানী বিলকিস পত্রটি উঠিয়ে নিয়ে মেলে ধরলেন চোখের সামনে। সবিস্ময়ে দেখলেন, সংক্ষিপ্ত পত্রটিতে মুদ্রিত রয়েছে সম্রাট সুলায়মানের সিলমোহর ও স্বাক্ষর। অপ্রস্তুত হলেন রাণী। সংকিতও হলেন কিছুটা। কারণ পত্রটিতে মুদ্রিত ছিলো সম্রাট সুলায়মানের বিশাল সাম্রাজ্যের মানচিত্রও।

বিচলিত রাণী তলব করলেন তাঁর সভাসদদেরকে। একত্র করলেন বারো হাজার সেনাপতিকে। তারা প্রত্যেকেই ছিলো একলক্ষ সুশিক্ষিত সৈনিকের

www.eelm.weebly.com

অধিকর্তা। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রাণীর ছিলো একলক্ষ নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রত্যেকের অধীনে আবার ছিলো একলক্ষ করে রণনিপুণ যোদ্ধা। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, সাবা-রাজ্ঞীর ছিলো তিনশত সদস্যবিশিষ্ট পরামর্শসভা। ওই সভার প্রত্যেক সদস্যের অধীনে ছিলো দশ সহস্র করে সৈনিক।

এর পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে'। এখানে 'কিতাবুন কারীম' অর্থ সম্মানিত পত্র। আতা বলেছেন, পত্রটি ছিলো মোহরাঙ্কিত। তাই ওই পত্রকে রাজ্ঞী বলেছিলেন 'সম্মানিত পত্র'। মোহরাঙ্কিত পত্র সম্মানিতই হয়। রসুল স. বলেছেন, লিপিকার মর্যাদা নির্ভর করে মোহরমুদ্রিত হওয়ার উপর। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে শিথিল সূত্র সহযোগে হাদিসটি উপস্থাপন করেছেন তিবরানী।

ইবনে মারদুবিয়া ও জুজায বলেছেন, 'কারীম' অর্থ মোহরাঙ্কিত। ইবনে জুরাইজ শব্দটির অর্থ করেছেন— উৎকৃষ্ট। হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে এক বর্ণনায় এসেছে, 'কারীম' অর্থ মহান। কারণ এর প্রেরক ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব। কেউ কেউ পত্রটিকে এরকম অভিধায় চিহ্নিত করার কারণ সম্পর্কে বলেছেন, পত্র হস্তগত হওয়ার পরিবেশটি ছিলো বিস্ময়কর। সুরক্ষিত শয়নকক্ষে ওভাবে পত্র পৌঁছবার কোনো উপায়ই ছিলো না। তাই বিলকিস ওই ব্যতিক্রমী উপায়ে প্রাপ্ত পত্রটিকে বলেছিলেন 'কারীম'। কেউ কেউ আবার বলেছেন, পত্রের শুরুতে উৎকীর্ণ ছিলো 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম'। তাই রাণী ওই পত্রটিকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'সম্মানিত'।

এর পরের আয়াতদ্বয়ে (৩০, ৩১) বলা হয়েছে— 'এটা সুলায়মানের নিকট থেকে এবং এটা এই, দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে, অহমিকাবশে আমাকে অমান্য কোরো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও'।

পত্রটি ছিলো অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ। দয়ালু ও দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু করে প্রথমেই বলা হয়েছে 'অহমিকাবশে আমাকে অমান্য কোরো না'। অহংকারই সকল পাপের মূল, সকল পতনের সূচনা। তাই প্রথমে উপদেশ দেয়া হয়েছে অহংকার পরিত্যাগের। তারপর দেয়া হয়েছে ইমান ও আনুগত্যের নিমন্ত্রণ। এখানে 'আমাকে অমান্য কোরো না' অর্থ অমান্য কোরো না আমার নবুয়তকে। আর রেসালাতের প্রমাণ স্বরূপ অসাধারণ উপায়ে প্রেরিত হয়েছে পত্র। সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদের ততোধিক সুরক্ষিত শয়নকক্ষে পক্ষীদূতের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ নিশ্চয় হজরত সুলায়মানের নবুয়তের এক অজেয় প্রমাণ।

www.eelm.weebly.com

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا
حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ﴿٣٢﴾ قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ۬
وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا
دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ
وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ
يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٥﴾

r বিল্‌কীস বলিল, 'হে পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদিগের অভিমত দাও। আমি যাহা সিদ্ধান্ত করি তাহা তো তোমাদিগের উপস্থিতিতেই করি।'

r উহারা বলিল, 'আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা' তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কী আদেশ করিবেন তাহা আপনি ভাবিয়া দেখুন।'

r সে বলিল, 'রাজা-বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন উহাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয় এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদিগকে অপদস্ত করে; ইহারাও এইরূপই করিবে;

r 'আমি তাহার নিকট উপঢৌকন পাঠাইতেছি দেখি, দূতেরা কি উত্তর আনে।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বিলকিস বললো, হে পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। আমি যা সিদ্ধান্ত করি, তা তো তোমাদের উপস্থিতিতেই করি'। এখানে 'আফতূনী' অর্থ অভিমত দাও। 'ফাতাওয়া' বা'ফুতইয়া' অর্থ সুচিন্তিত অভিমত, জটিল কোনো বিষয়ের সমাধান প্রদান। এভাবে 'আফতূনী' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— যে জটিল বিষয়ের সম্মুখীন আমি হয়েছি, সে বিষয়ে তোমরা যথাযথ পরামর্শ দাও।

'হাত্তা তাশহাদূন' অর্থ যতক্ষণ তোমরা উপস্থিত থাকবে। অথবা যতক্ষণ তোমরা এই সমস্যার সমাধান না দিবে। অর্থাৎ তোমরা আছো বলেই আমি তোমাদের পরামর্শ কামনা করছি। না থাকলে তো করতাম না।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কী আদেশ করবেন, তা আপনি ভেবে দেখুন'। এখানে 'কুওত' অর্থ যুদ্ধ করার শক্তি, শৌর্য, বীর্য। 'বা'সিন শাদীদ' অর্থ রণনিপুণ যোদ্ধা। মুকাতিল বলেছেন, 'কুওত' শব্দটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে সৈন্যের সংখ্যাধিক্যকে। আর 'বা'স' এর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে অকুতভয় বীরত্বব্যঞ্জকতাকে। পূর্ববর্তী আয়াতে প্রকাশ পেয়েছে রাণী বিলকিসের বাকচাতুর্য। তিনি সেখানে কৌশলে জানতে চেয়েছেন, তাঁর পরামর্শসভার সদস্যরা কী চায়— সন্ধি না যুদ্ধ। আর আলোচ্য আয়াতে ফুটে উঠেছে তাঁর সভাসদদের অকুতোভয় মনোভাব। কিন্তু 'ক্ষমতা আপনারই' বলে তারা রাণীর উপরে ছেড়ে দিয়েছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার। এভাবে প্রকাশ পেয়েছে রাণী ও তাঁর সভাসদদের বুদ্ধিমত্তা ও সাহস। সভাসদদের এমতো মন্তব্য ছিলো বনী ইসরাইলদের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। হজরত মুসা যখন তাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দিয়েছিলেন, তখন তারা বলেছিলো 'আপনি এবং আপনার প্রভুপালক অগ্রসর হোন, যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে রইলাম'। আর এখানে দেখা যাচ্ছে, বিলকিসের পরামর্শদাতারা সরাসরি যুদ্ধের পক্ষে সায় দিচ্ছে। সেই সঙ্গে বলছে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাণীর। অর্থাৎ এভাবে তারা তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছে যুদ্ধ অথবা সন্ধি উভয়টির পক্ষে।

'মাজা তা'মুরীন' অর্থ আপনি যা আদেশ করবেন। এখানকার 'মা' অব্যয়টি প্রশ্নপ্রকাশক। আর একবচনে সম্পাদিত শব্দটি এখানে 'উনজুরি' (ভেবে দেখুন) বাক্যের কর্মপদ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— মহামান্য সম্রাজ্ঞী! এবার আপনি নিজেই ভাবুন, বুঝুন, কী করবেন— যুদ্ধ, না সন্ধি। আপনার যে কোনো নির্দেশ পালন করতে আমরা সতত প্রস্তুত।

এর পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'সে বললো, রাজা বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করে। এরাও এরকম করবে'। একথার অর্থ— রাণী বললো, কোনো রাজ্য বিজিত হলে সেখানকার ধন-সম্পদ লুটপাট করা হয়। সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে করা হয় লাঞ্ছিত। উৎসন্ন করা হয় জনগণের ঘরবাড়ী। এটাই বিজয়ী নরপতি ও তাদের বাহিনীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চিরাচরিত অভ্যাস। আমি ধারণা করি, বাদশাহ্ সুলায়মানের বাহিনীও এর ব্যতিক্রম নয়। উল্লেখ্য, আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে রাণী তাঁর পারিষদবর্গের মনে হজরত সুলায়মান সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার করতে চেয়েছেন। প্রকারান্তরে একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যুদ্ধ নয়, সন্ধিই উত্তম।

www.eelm.weebly.com

‘কাজালিকা ইয়াফআলুন’ অর্থ এরাও এরূপ করবে। অর্থাৎ আমার আশংকা এরকমই। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা যেতে পারে, এখানকার ‘এরা’ সর্বনামটি সাধারণভাবে অন্যান্য বিজয়ী নরপতিদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, বাদশাহ্ সুলায়মানের সঙ্গে নয়। অথবা বলা যেতে পারে, বাক্যটির অর্থ হবে— এরূপই তারা করে। এমতাবস্থায় উক্তিটি হবে আল্লাহ্পাকের। অর্থাৎ বিলকিসের বক্তব্যের সমর্থনে আল্লাহ্পাকই এখানে বলেছেন— রাজা বাদশাহ্দের কর্মকাণ্ডও এরকমই হয়।

এর পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— ‘আমি তার নিকট উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। দেখি, দূতেরা কী উত্তর আনে’। একথার অর্থ— সম্রাজ্ঞী শেষে বললেন, আমি সুলায়মানের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করে দেখি, কী ফলাফল হয়। প্রেরিত দূতেরা কী সংবাদ নিয়ে আসে।

বাগবী লিখেছেন, সম্রাজ্ঞী বিলকিস দূতের মাধ্যমে উপঢৌকন প্রেরণ করে প্রথমে এটাই পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন যে, হজরত সুলায়মান শুধুই সম্রাট, না আল্লাহ্র সত্য নবী। শুধু সম্রাট হলে উপঢৌকন নিয়েই তিনি পরিতুষ্ট হবেন। পরিত্যাগ করবেন যুদ্ধের সংকল্প। আর যদি সত্যি সত্যিই তিনি নবী হন, তবে উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করবেন। কারণ নবীর নিকট বিশ্বাসী আনুগত্যই মূল বিবেচ্য বিষয়।

উপঢৌকন হিসেবে প্রেরিত হলো একদল ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই দাস-দাসীদের পোশাক ছিলো একই রকম। ফলে চেনা যেতো না কে দাস, আর কে দাসী। মুজাহিদ বলেছেন, রাণী বিলকিস পাঠিয়েছিলেন দুই শত দাস এবং দুই শত দাসী। মুজাহিদ ও মুকাতিল মন্তব্য করেছেন, দাসীদেরকে পরানো হয়েছিলো দাসের পোশাক, আর দাসদেরকে সজ্জিত করা হয়েছিলো দাসীর পরিচ্ছদে। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, দাস-দাসীদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিলো সুবর্ণখণ্ড ও রেশমীবস্ত্রসহ। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের সঙ্গে দেয়া হয়েছিলো চারটি সুবর্ণ গোলক। ওয়াহাব ইবনে মুনাববাহ বলেছেন, রাণী বিলকিস দাসদেরকে সাজিয়েছিলো দাসীদের বস্ত্রে ও অলংকারে এবং দাসীদেরকে পরিয়েছিলেন দাসের পোশাক। দাসদের বাহুতে ছিলো বাজুবন্দ, কণ্ঠে কাঞ্চন মালা এবং কর্ণলতিতে দুল। আর দাসীদের গলায় লোহার বালা ও কটিদেশে পুরুষদের মতো কোমরবন্ধ। দাসেরা আরূঢ় ছিলো অশ্বের উপর, আর খচ্চরে সমারূঢ়া ছিলো দাসীরা। ওই বাহনগুলোর বলগা ছিলো সুবর্ণরঞ্জিত এবং তাদের পৃষ্ঠে স্থাপিত আসন ছিলো রঙ বেরঙের রেশমীসূত্রগ্রথিত।

www.eelm.weebly.com

দাস-দাসীদেরকে একত্রিত করার পর রাণী হাজির করলেন পাঁচশত রৌপ্যনির্মিত ও মুক্তাখচিত মুকুট। মেশক আম্বর ও চন্দনের একটি কৌটা। তার মধ্যে রাখলেন একটি মহামূল্যবান অক্ষত মুক্তা। কৌটাটি ঢেকে দিলেন একটি বঙ্কিম পুতুল দিয়ে। বাদশাহ্ সুলায়মানের উদ্দেশ্যে একটি পত্রও লিখলেন তিনি। পত্র ও উপঢৌকনাদি অর্পণ করলেন মুনজির ইবনে আমর নামক একজনকে। তার সঙ্গে দিলেন সদাসতর্ক প্রহরী দলকে। তারপর তার নেতৃত্বে সকলকে প্রেরণ করলেন বাদশাহ্ সুলায়মানের উদ্দেশ্যে। যাত্রার প্রাক্কালে মুনজিরকে ডেকে বললেন, তুমি আমার মুখপাত্র। বাদশাহ সুলায়মানের সম্মুখীন হয়ে বলবে, আপনি যদি নবী হন, তাহলে দাস-দাসীদেরকে পৃথক করে দিন। আর বলুন, এই কৌটার মধ্যে কী আছে? যদি তিনি বলতে পারেন, তবে বোলো, কৌটার ভিতরের মুক্তাটির যথাস্থানে ছিদ্র করে দিন। ওই ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিন সুতা। তবে একাজগুলো করবেন আপনি স্বয়ং। কোনো মানব-দানবের সাহায্য নিতে পারবেন না। দাসদেরকে বললেন, তোমরা কথা বলবে দাসীর মতো। আর দাসীদেরকে বললেন, তোমরা কথা বলবে দাসের মতো করে। মুখপাত্রকে পুনরায় বললেন, তুমি কিন্তু লক্ষ্য রেখো, তোমাদের সঙ্গে তিনি কেমন আচরণ করেন— রূঢ়, না কোমল। যদি তিনি রোষকষায়িত নেত্রে তোমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তবে বুঝবে তিনি নবী নন, কেবলই বাদশাহ্। এমতাবস্থায় তাঁকে ভয় করার কিছু নেই। কারণ আমরা তাঁর সমকক্ষ। আর যদি দেখো, তিনি প্রশস্তললাটধারী, শিষ্টাচারী ও ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তাহলে বুঝবে তিনি একজন প্রেরিত পুরুষ। তখন তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনো, অনুধাবন করতে চেষ্টা কোরো। যথাবিহিত সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক ভেবে-চিন্তে উত্তর দিয়ো তাঁর কথার।

এদিকে আড়ালে থেকে হুদ্হুদ্ সবকিছু লক্ষ্য করলো। দূতবাহিনী পৌঁছানোর আগেই সে সকল সংবাদ জানালো হজরত সুলায়মানকে। তিনি তখন জ্বিনদেরকে নির্দেশ দিলেন, সুবর্ণইষ্টক প্রস্তুত করো। ওই ইষ্টক দিয়ে নির্মাণ করো সুদীর্ঘ সাতাশ মাইলের রাজ পথ। ওই পথ দিয়ে আমার কাছে আসবে রাণী বিলকিসের দূত ও তার বাহিনী। আর সোনার রাজপথ যেখানে এসে শেষ হবে, তৎসন্নিহিত প্রান্তরের সম্পূর্ণটাই ঘিরে ফেলো স্বর্ণইষ্টক নির্মিত দেয়াল দিয়ে। এরপর তিনি জানতে চাইলেন, জলচর ও ভূচর প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র প্রাণী কোনটি? উপস্থিত জনতা বললো, মহামান্য নবী! আমরা অমুক স্থানে দেখেছি একটি বহুবর্ণচিত্রিত সমুদ্রচারী প্রাণী। দু'টি ডানা রয়েছে তার। আর তার গ্রীবাদেশে রয়েছে মোরগের মতো ঝুঁটি। ললাটদেশ পশমাচ্ছাদিত। হজরত সুলায়মান বললেন, এক্ষুণি ওই প্রজাতির একটি প্রাণীকে সমুদ্রাভ্যন্তর থেকে ধরে আনো।

www.eelm.weebly.com

আদেশ প্রতিপালিত হলো। ওই বিচিত্র প্রাণীটিকে মনিকাঞ্চনের পটভূমিতে বেঁধে রাখা হলো স্বর্ণ-ইট নির্মিত প্রাচীরের এক পাশে। তার সামনে রেখে দাও তার পছন্দের খাদ্য-বস্তু। এরপর জ্বিনদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দাও রাজপথের দক্ষিণে ও বামে। এই নির্দেশটিও পালিত হলো যথারীতি। তিনি তখন গৌরবান্বিত করলেন তাঁর সিংহাসনকে। সিংহাসনের উভয় পাশে স্থাপন করলেন চার হাজার করে মঞ্চ।

রাণী বিলকিসের দূত ও তাঁর বাহিনী যতই নিকটবর্তী হচ্ছিলো, ততই হয়ে যাচ্ছিলো হতভম্ব ও বিস্ময়াহত। একি অভূতপূর্ব জৌলুস! স্বর্ণইষ্টক নির্মিত রাজপথ। দু'পাশে জনতার সুদীর্ঘ সারি। সোনার প্রাচীর ঘেরা প্রান্তর। প্রান্তরের পাশে অদ্ভুত সুন্দর এক প্রাণী। বিশাল নয়নাভিরাম ও সমীহউদ্রেকক সিংহাসন। দর্শনার্থীদের জন্য রক্ষিত হাজার হাজার মঞ্চ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো রাণী বিলকিসের দূত ও তাঁর পুরোবাহিনী।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত সুলায়মান যখন স্বর্ণ ও চাঁদির ইট প্রান্তরে বিছিয়ে দিতে বললেন, তখন খালি রাখতে বললেন, ওই পরিমাণ জায়গা, যা আচ্ছাদন করবার সমপরিমাণ স্বর্ণইট নিয়ে এগিয়ে আসছিলো রাণী কিলকিসের দূতেরা। তারা যখন আগমন করলো, তখন প্রান্তরের ইটশূন্য অংশ দেখে ঘাবড়ে গেলো। ভাবলো ইট চুরির অপবাদ যেনো আবার তাদের ঘাড়ে না পড়ে। তাই তারা ভয়ে ভয়ে আনীত ইটগুলো বিছিয়ে দিলো প্রান্তরের ইটবিহীন অংশে। তারপর রাজপ্রাসাদের দিকে যতই তারা অগ্রসর হতে লাগলো ততোই হতে লাগলো বিস্মিত ও ভীত। কী বিশাল আয়োজন! দু'পাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মানুষ, জ্বিন ও হিংস্রপশু। তার সাথে সমবেত হয়েছে হাজার হাজার পাখির দল। জ্বিনদেরকে দেখেই তারা ভয় পেলো বেশী। জ্বিনেরা অভয় দিলো, ভয় পাবার কিছু নেই। তোমরা অতিথি। সামনে অগ্রসর হও। দূতেরা যখন হজরত সুলায়মান সকাশে উপস্থিত হলো তখন তিনি তাদের উপরে নিক্ষেপ করলেন সদয় দৃষ্টি। বললেন, বলো, কী সংবাদ নিয়ে এসেছো? প্রধান দূত অর্পণ করলো রাণীর চিঠি ও উপঢৌকন। হজরত সুলায়মান চিঠি খুলে পড়লেন। তারপর বললেন, কৌটাটি কোথায়। এবার কৌটাটিও অর্পণ করলো প্রধান দূত। তিনি বন্ধ কৌটাটি হাতে নিয়ে নাড়া দিলেন। ইত্যবসরে সেখানে হজরত জিব্রাইল উপস্থিত হয়ে হজরত সুলায়মানকে জানিয়ে দিলেন কী আছে কৌটায়। পরক্ষণেই তিনি বললেন, কৌটার মধ্যে আছে একটি অটুট মূল্যবান মুক্তা এবং একটি ছিদ্রযুক্ত পুতুল। দূত বললো, ঠিকই বলেছেন। এবার আপনি মুক্তাটি ছিদ্র করুন এবং ছিদ্রপথে সুতা ঢুকিয়ে এক সঙ্গে গ্রথিত করুন মুক্তা ও পুতুলকে। হজরত সুলায়ান উপস্থিত মানুষ ও ভালো জ্বিনদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী মুক্তোটি ছিদ্র

www.eelm.weebly.com

করতে পারবে? তারা জবাব দিলো, না। তিনি তখন মন্দ জ্বিনদেরকে বললেন, তোমরা ? তারাও অক্ষমতা প্রকাশ করলো। বললো, মহামান্য সম্রাট! ঘুণ পোকা মনে হয় একাজ করতে পারবে। ঘুণ পোকাকে ডাকা হলো। সে এসে মুক্তাটি ছিদ্র করে ফেললো। তারপর সুতো মুখে নিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলো মুক্তা ও পুতুলের ছিদ্রপথে। ফলে সহজে সূত্রবদ্ধ করা গেলো ওই দু'টো বস্তুকে। হজরত সুলায়মান বললেন, তুমি কি কিছু চাও? ঘুন পোকা বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! কাঠকে আমার উপজীবিকা নির্ধারণ করে দিন। তিনি বললেন, তথাস্তু। এরপর হজরত সুলায়মান প্রেরিত দাস-দাসীদেরকে হস্ত-পদ প্রক্ষালনের নির্দেশ দিলেন। পথশ্রান্ত দাস-দাসীরা হাত মুখ ধুতে শুরু করলো। দেখা গেলো দাসীরা এক হাতে পানি নিয়ে আর এক হাত দিয়ে পানি নিক্ষেপ করছে মুখমণ্ডলে। আর দাসেরা মুখে পানি দিচ্ছে দুই হাত দিয়ে এক সঙ্গে। দাসীরা হাতে পানি ঢালছে কনুইয়ের দিক থেকে এবং দাসেরা পানি ঢালছে কবজির দিক থেকে। এভাবে হাত মুখ ধোয়ার সময় পরিষ্কার বোঝা গেলো কারা দাস এবং কারা দাসী। ছদ্মবেশ দিয়ে তারা আর ঢেকে রাখতে পারলো না তাদের পরিচয়। তিনি এভাবে কৌশল করে পৃথক করে ফেললেন দাস-দাসীদেরকে। এরপর তিনি ফেরত দিলেন আনীত উপঢৌকনাদি। বিবরণটি সংগৃহীত হয়েছে বাগবীর বিভিন্ন সূত্রের বর্ণনা থেকে। কতক তথ্য আবার সুদ্দী সূত্রে বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেম। আবার কিছু তথ্য ইয়াজিদ ইবনে রুম্মান সূত্রে উপস্থাপন করেছেন যুগপৎ ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মুনজির।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ۬ فَمَآ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ
اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ
فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّ
هُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا
قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا
اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ
اَمِيْنٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ

www.eelm.weebly.com

يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ
فَضْلِ رَبِّيْ ۖ لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا
يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ﴿٤٠﴾

r দূত সুলাইমানের নিকট আসিলে সুলাইমান বলিল, 'তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়া সাহায্য করিতে চাহ? আল্লাহ্ আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ, অথচ তোমরা তোমাদিগের উপঢৌকন লইয়া উৎফুল্ল বোধ করিতেছ।'

r 'উহাদিগের নিকট তোমরা ফিরিয়া যাও আমি অবশ্যই উহাদিগের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী লইয়া আসিব যাহার মোকাবিলা করিবার শক্তি উহাদিগের নাই। আমি অবশ্যই উহাদিগকে তথা হইতে বহিস্কৃত করিব লাঞ্ছিতভাবে এবং উহারা হইবে অবনমিত।'

r সুলাইমান আরো বলিল, 'হে আমার পারিষদবর্গ! সে আত্মসমর্পণ করিয়া আমার নিকট আসিবার পূর্বে কে তাহার সিংহাসন আমাকে আনিয়া দিবে?'

r এক শক্তিশালী জিন বলিল, 'আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বে আমি উহা আনিয়া দিব এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।'

r কিতাবের জ্ঞান যাহার ছিল সে বলিল, 'আপনি চক্ষুর পলক ফেলিবার পূর্বেই আমি উহা আপনাকে আনিয়া দিব।' সুলাইমান যখন উহা সম্মুখে রক্ষিত দেখিল তখন সে বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাহাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করিতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তাহা করে নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জানিয়া রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'দূত সুলায়মানের নিকটে এলে সুলায়মান বললো, তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও?' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। সুতরাং এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— দূতের মাধ্যমে প্রেরিত উপঢৌকনাদি দেখে হজরত সুলায়মান বললেন, এসকল উপঢৌকনের কোনো আবশ্যকই আমার নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে শ্রেষ্ঠ, অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্ল বোধ

www.eelm.weebly.com

করছো’। একথার অর্থ— হজরত সুলায়মান আরো বললেন, হে দূত! আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন অপার্থিব ও অক্ষয় সম্পদ— সত্য ধর্ম, নবুয়ত, প্রজ্ঞা, তৎসহ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। আর তোমাদের রাণী কেবলই অবক্ষয়প্রবণ পার্থিব মর্যাদা ও বিত্ত-বৈভবের অধিকারিণী। সুতরাং বুঝতেই পারছো আমার কাছে যা আছে, তা তোমাদের কাছে যা আছে, তা থেকে শ্রেষ্ঠ। উপঢৌকন পেয়ে তোমরা উৎফুল্ল হতে পারো, আমি কদাচ নয়। সুতরাং তোমরা আমাকে তোমাদের মতো করে দেখতে চেয়ো না। আমি যে তোমাদের প্রতি প্রেরিত নবী।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— ‘তাদের নিকট তোমরা ফিরে যাও, আমি অবশ্যই তাদের নিকট এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসবো যার মোকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করবো লাঞ্ছিতভাবে এবং তারা হবে অবনমিত’। একথা বলে দূতদেরকে ফেরত পাঠালেন হজরত সুলায়মান। এখানে ‘আজিললাতুন’ অর্থ লাঞ্ছিত। আর ‘সগীরূন’ অর্থ অবনমিত। কেউ কেউ বলেছেন, ‘জিল্লত’ (লাঞ্ছনা) এর বিপরীত শব্দ ‘ইজ্জত’ (সম্মান)। সুতরাং এখানে ‘জিল্লত’ অর্থ সম্মানহানি, ক্ষমতাচ্যুতি এবং ‘সগীরূন’ অর্থ বন্দীত্ব। অর্থাৎ রাণী বিলকিস ও তার সভাসদেরা যদি সত্যধর্মের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে বের করে দেয়া হবে ওই রাজ্য থেকে অথবা তাদেরকে করা হবে বন্দী।

ওয়াহাব ইবনে মুনাববাহ্ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, প্রত্যাবর্তিত দূতদের মুখ থেকে হজরত সুলায়মানের সকল কথা শুনে রাণী তেমন বিচলিত হলেন না। পারিষদবর্গকে ডেকে বললেন, শপথ আল্লাহ্র! আমি তো প্রথমেই বুঝেছিলাম, সাধারণ কোনো নৃপতি তিনি নন। তিনি প্রেরিত পুরুষ। তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। সুতরাং সমর্পণই শ্রেয়। শেষে রাণী এই বলে হজরত সুলায়মানের নিকটে প্রস্তাব পাঠালেন যে, আমি আমার পারিষদবর্গ ও রাজ্যের নির্বাহী নেতৃবর্গসহকারে শীঘ্রই আপনার কাছে আসছি। যে ধর্মের প্রতি আপনি আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, সে ধর্মের স্বরূপ কী, তা আমরা স্বচক্ষে যাচাই করে দেখতে চাই।

যাত্রার প্রস্তুতি চললো। রাণী তাঁর সিংহাসন সাতটি প্রকোষ্ঠে সাজিয়ে রেখে প্রকোষ্ঠগুলো তালাবদ্ধ করে দিলেন। অথবা সাতটি পৃথক প্রকোষ্ঠে তিনি সংরক্ষণ করলেন সিংহাসনের বিশেষ বিশেষ অংশ। কিছু সংখ্যক দুর্ধর্ষ নিরাপত্তা প্রহরী নিযুক্ত করলেন সেগুলোর প্রহরায়। নির্দেশ দিলেন, সাবধান! কেউ যেনো আমার সংরক্ষিত সিংহাসনাংশগুলোর কাছে ঘেষতে না পারে। রাষ্ট্রীয় ঘোষককে নির্দেশ দিলেন, রাজ্যজুড়ে ঘোষণা করে দাও, আমরা বের হয়েছি এক বিশেষ অভিযানে। এভাবে সব কিছু গোছগাছ করার পর রাণী বিলকিস তাঁর বারো হাজার নির্বাহী নেতৃবর্গ নিয়ে যাত্রা করলেন নবী-নৃপতি সুলায়মানের দরবার অভিমুখে।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, হজরত সুলায়মান ছিলেন একাধারে মহাপ্রতাপশালী, ধর্মনিষ্ঠ, ন্যায়নিষ্ঠ ও শিষ্ট। তাঁর নবী ও নৃপতিসুলভ ব্যক্তিত্বের প্রখর প্রভাবে তাঁর সহচর ও অনুচরেরা হয়ে যেতো ম্রিয়মান। তাই তিনি তাদের কারো কাছে কোনো বিষয়ে জানতে চাইলে সে বলতো, আল্লাহ্‌র নবীই এ বিষয়ে সমধিক জ্ঞাত। একবার তিনি তাঁর আকাশী সিংহাসনে আরোহণ করে কোনো এক স্থানে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একস্থানে যাত্রাবিরতি করলেন তিনি। ভূমিতে অবতরণ করার পর জানতে পারলেন, মাত্র মাইল তিনেক দূরে শিবির স্থাপন করছেন রাণী বিলকিস।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'সুলায়মান আরো বললো, হে আমার পারিষদবর্গ! সে আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট আসবার পূর্বে কে তার সিংহাসন আমার নিকট এনে দিবে'? হজরত সুলায়মানের উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ্‌র শক্তিমত্তার নিদর্শন রাণী বিলকিসের সামনে মোজেজারূপে প্রকাশ করা। তাই তিনি তাঁর সিংহাসন আনবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর ধীশক্তি নিরীক্ষণ করাও ছিলো এমতো নির্দেশের আর একটি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রাণী অকল্পনীয় পরিবেশে তাঁর রূপান্তরিত সিংহাসন চিনতে পারেন কিনা, সেটাও তিনি দেখতে চেয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানের নির্দেশ ছিলো আত্মসমর্পণ করার পূর্বে অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার আগেই তিনি তাঁর সিংহাসন আনতে বলেছিলেন। এর কারণ হচ্ছে, বিনা অনুমতিতে এক মুসলমানের সম্পদ অন্য মুসলমানের হস্তগত হওয়া বৈধ নয়। তাছাড়া সিংহাসন অধিকার করা তাঁর উদ্দেশ্যও ছিলো না। উদ্দেশ্য ছিলো মোজেজা প্রদর্শন, যা নবীদের জন্য শোভন ও সঙ্গত।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'এক শাক্তিশালী জ্বিন বললো, আপনি আপনার স্থান থেকে উঠবার পূর্বে আমি তা এনে দিবো এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান ও বিশ্বস্ত'। এখানে 'ইফরীত' অর্থ শক্তিশালী। জুহাক বলেছেন— নিকৃষ্ট। ফাররা অর্থ করেছেন— প্রচণ্ডশক্তিধর। ইবনে কুতাইবা বলেছেন, যার সৃষ্টিগত অবয়ব সুদৃঢ়। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'ইফর' থেকে। 'ইফর' অর্থ মৃত্তিকা। যেমন বলা হয় 'আফারাহু' (মল্লযুদ্ধের মাধ্যমে তাকে ভূপাতিত করা হয়েছে। এভাবে কথাটি দাঁড়িয়েছে— মহামান্যবর নবী! আপনি যে স্থানে এখন উপবিষ্ট সে স্থানে দণ্ডায়মান হওয়ার পূর্বেই আমি রাণী বিলকিসের সিংহাসন আপনার সম্মুখে উপস্থিত করতে পারি। এ ব্যাপারে আপনি আমার ক্ষমতা ও যোগ্যতার উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন। আর ওই সিংহাসনের রত্নরাজি আত্মসাৎ অথবা বিনষ্ট হওয়া কোনোটাই আমার দ্বারা হবে না। কারণ আমি বিশ্বস্তও।

www.eelm.weebly.com

ওয়াহাব বলেছেন, ওই জ্বিনটির নাম ছিলো লুজাই। কেউ কেউ বলেছেন সাখরজনী। আবার কেউ কেউ বলেছেন, জাকোয়ান। তার দেহাবয়ব ছিলো পর্বত সদৃশ বিশাল। দৃষ্টির শেষ সীমায় পড়তো তার প্রতিটি পদক্ষেপ।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'কিতাবের জ্ঞান যার ছিলো, সে বললো, আপনি চক্ষুর পলক ফেলবার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দিবো'। একথার অর্থ— হজরত সুলায়মান চাইলেন, রাণী বিলকিসের সিংহাসন আরো দ্রুত তাঁর সামনে আসুক। তাই তিনি জ্বিনটির প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। বললেন, এর চেয়ে দ্রুত কে সম্পন্ন করতে পারবে এ কাজ? দরবারে উপস্থিত ছিলেন এক রহস্যময় পুরুষ। তিনি ছিলেন আকাশী গ্রন্থের জ্ঞানে সুগভীর। তিনিই তখন বলে উঠলেন, আমি। চোখের পলক ফেলার আগেই আমি আপনার সামনে হাজির করতে পারবো বিলকিসের রাজসিংহাসনটি।

ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, তিনি ছিলেন হজরত খিজির। ইবনে লেহিয়াও এরকম বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, চোখের পলক পড়ার পূর্বে সিংহাসন এনে দিতে চেয়েছিলেন হজরত জিব্রাইল। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি অন্য কোনো ফেরেশতাও হতে পারেন। কোরআন ব্যাখ্যাতাগণের অভিমত হচ্ছে, ওই রহস্যময় পুরুষের নাম ছিলো আসফ ইবনে বরখিয়া। তিনি ছিলেন সিদ্দীক (সত্যবাদী) আর তিনি জানতেন ইসমে আজম। ওই ইসমে আজমসহ দোয়া করলে তাঁর দোয়া গৃহীত হতো চোখের পলক পড়ার পূর্বেই। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে জুহাকের মাধ্যমে জুহাক ও মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, হজরত সুলায়মান তখন দৃষ্টিপাত করলেন ইয়েমেনের দিকে। আসফ করলেন প্রার্থনা। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্পাকের নির্দেশে ফেরেশতারা রাণী বিলকিসের সিংহাসন এনে দিলো, মাটির নিচে সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করে সেই পথ দিয়ে। একেবারে হজরত সুলায়মানের সামনে।

কালাবী বর্ণনা করেছেন, আসফ সেজদায় পতিত হয়ে ইসমে আজমের সহায়তায় আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থী হলেন। তৎক্ষণাৎ রাণী বিলকিসের সিংহাসন মাটির ভিতর দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে ছুটে আসতে শুরু করলো। শেষে মাটি ফুঁড়ে উপস্থিত হলো হজরত সুলায়মানের আসনের সামনে। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, রাণী বিলকিসের সিংহাসন থেকে হজরত সুলায়মানের অবস্থানস্থলের দূরত্ব ছিলো দুই মাসের পথের দূরত্বের সমান। মুজাহিদ বলেছেন, আসফ সেজদায় পড়ে বলেছিলেন 'ইয়া জালজ্বালালি ওয়াল ইকরাম'। এটাই ইসমে আজম। আর কালাবী বলেছেন, 'ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম'। এটাই ছিলো আসফের দোয়া।

জুহুরী বলেছেন, আসফ ছিলেন ইসমে আজমের অধিকারী। তিনি সেজদাবনত হয়ে পাঠ করেছিলেন এই দোয়াটি— 'ইয়া ইলাহানা ওয়া ইলাহা কুল্লি শাইইন ইলাহাঁও ওয়াহিদা লা ইলাহা ইল্লা আনতা ই'তীনী বিআ'রশিহা'।

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেছেন, এখানে 'কিতাবের জ্ঞান যার ছিলো' বলে বোঝানো হয়েছে হজরত সুলায়মানকে। আল্লাহ্পাক তাঁকে দান করেছিলেন প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা। আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্ব। আর একথাটিও প্রকাশিত হয়েছে যে, হজরত সুলায়মানের মোজেজা ও মহিমার প্রেক্ষাপট ছিলো প্রজ্ঞাময়।

'আপনি চক্ষুর পলক ফেলবার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দিবো' কথাটি বলেছিলেন আসফ। তার উদ্দেশ্য ছিলো, ইফ্রিতসহ সকল শুভ-অশুভ জ্বিনকে পরাস্ত করা এবং হজরত সুলায়মানের অধিকতর শানিত মোজেজা প্রকাশ করা। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, এখানকার 'আলকিতাব' (কিতাবের) শব্দটির আলিফ লাম (আল) জাতিবাচক। অর্থাৎ এখানে 'কিতাবের জ্ঞান' অর্থ সকল আসমানী কিতাবের জ্ঞান, অর্থাৎ লওহে মাহফুজের জ্ঞান। 'ত্বরফ' অর্থ চোখের পলক। শব্দটির মাধ্যমে এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে যে— মহামান্য নবী! আপনি কোনোকিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার পরক্ষণে চোখের পলক ফেলবার আগেই আমি ওই সিংহাসন হাজির করবো।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুলায়মান যখন তা সম্মুখে রক্ষিত দেখলো, তখন সে বললো, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন। আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ'। একথার অর্থ— হজরত সুলায়মান আসফের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। আসফ দোয়া করলেন। চোখের পলক ফেলার আগেই হজরত সুলায়মান সামনে দেখতে পেলেন মাটি ফুঁড়ে বের হয়েছে রাণী বিলকিসের সিংহাসন। তৎক্ষণাৎ বিস্ময়ে, আনন্দে ও কৃতজ্ঞতাভরে বলে উঠলেন, এ হচ্ছে আমার প্রভুপালয়িতার অনন্য অনুগ্রহ। আর এটা আমার জন্য অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষাও বটে। পরীক্ষাটি হচ্ছে— আমি এ অনুপম অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞপরায়ণ হই, না হই অকৃতজ্ঞ।

'মিন ফাদ্বলি রব্বি' অর্থ আমার প্রভুপালনকর্তার অনুগ্রহ। এখানকার 'মিন' আংশিক অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ এ হচ্ছে আমার প্রভুপালনকর্তার অসীম অনুগ্রহের কিয়দংশ। 'লি ইয়াবলুআনী' অর্থ আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য। 'আ আশকুরা আম আকফুরু' অর্থ আমি কৃতজ্ঞ, না অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার এই বিশেষ অনুগ্রহ সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করি, না মনে করি এ আমার নিজস্ব অর্জন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব'।

www.eelm.weebly.com

প্রাপ্ত অনুগ্রহের সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতিদানের ফলে অনুগ্রহ হয় প্রাচুর্যময় ও প্রলম্বিত। উন্মোচিত হয় অধিক অনুগ্রহ প্রাপ্তির দুয়ার। আর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের জন্য এমতো স্বীকৃতি প্রদান একটি অত্যাবশ্যক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনকারীর পদমর্যাদা যেমন উন্নীত হয়, তেমনি সে লাভ করে পুণ্যপ্রাপ্তির যোগ্যতাও। তাই বলা হয়— 'আশশুকরু ক্বয়দুন নি'মাতিল মাওজুদাতি ওয়া স'য়দুন নি'মাতিল মাফকুদ' (বর্তমান অনুগ্রহ অটুট থাকে কৃতজ্ঞতার দ্বারা। আর ভবিষ্যতের অনুগ্রহও লাভ হয় ওই কৃতজ্ঞতা দ্বারাই)।

রসুল স. বলেছেন, আহারের পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ধৈর্যশীল রোজাদারের মতো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে যথার্থ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা ও হাকেম। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, পানাহারকারীর পানাহারোত্তর কৃতজ্ঞতার জন্য নির্ধারিত রয়েছে তেমনি পুণ্য, যেমন পুণ্য নির্ধারিত রয়েছে একজন ধৈর্যধারণকারী রোজাদারের রোজার।

'গনিয়্যুন' অর্থ অভাবমুক্ত। আর 'কারীম' অর্থ মহানুভব। এভাবে শেষ বাক্যটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্তায়ালা যেহেতু চির অভাবমুক্ত, তাই মানুষের কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী তিনি নন। আর তিনি মহানুভবও। তাই কারো কৃতজ্ঞতার পরোয়া না করেই তিনি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে পূরণ করেন সকলের প্রয়োজন।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْۤ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ
لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ
كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَ اُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَ
صَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ
كٰفِرِيْنَ ﴿٤٣﴾ قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً
وَّ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۬ؕ
قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَ اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٤﴾

www.eelm.weebly.com

r সুলাইমান বলিল, 'তাহার সিংহাসনের আকৃতি বদলাইয়া দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পাইতেছে—না কি সে বিভ্রান্ত?'

r বিলকীস যখন পৌঁছিল তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'তোমার সিংহাসন কি এইরূপই? সে বলিল 'ইহা তো ঐরূপই।' আমরা ইতিপূর্বেই সমস্ত অবগত হইয়াছি এবং আত্মসমর্পণও করিয়াছি।'

r আল্লাহের পরিবর্তে সে যাহার পূজা করিত তাহাই তাহাকে সত্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল, সে ছিল সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

r তাহাকে বলা হইল, 'এই প্রাসাদে প্রবেশ কর।' যখন সে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল তখন তাহার মনে হইল ইহা এক স্বচ্ছ জলাশয় এবং সে তাহার কাপড় টানিয়া হাঁটু পর্যন্ত তুলিয়া ধরিল। সুলাইমান বলিল, 'ইহা তো স্বচ্ছ স্ফটিক-নির্মিত প্রাসাদ।' বিলকীস বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করিয়াছিলাম, আমি সুলাইমানের সহিত বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সুলায়মান বললো, তার সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখি সে সঠিক দিশা পাচ্ছে— নাকি সে বিভ্রান্ত'। একথার অর্থ— হজরত সুলায়মান রাণী বিলকিসের বুদ্ধিমত্তা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিলেন, সিংহাসনটির আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হোক। তারপর সে এলে পরীক্ষা করা যাবে, তার নিজের সিংহাসন সে সনাক্ত করতে পারে, না হয়ে যায় বুদ্ধিবিভ্রাটের শিকার। এখানে 'নাক্কিরু' অর্থ আকৃতি বদলিয়ে দাও। অর্থাৎ এমনভাবে আকৃতি পরিবর্তন করে দাও, যাতে সে তার নিজের সিংহাসন চিনতে না পারে। এক বর্ণনায় এসেছে, সিংহাসনটির ঊর্ধ্বাংশ নিম্নে এবং নিম্নাংশ ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছিলো। আর লাল ও সবুজ মনিমুক্তাগুলো সন্নিবেশিত হয়েছিলো একে অপরের স্থানে।

'লা তাহতাদুন' অর্থ সঠিক দিশা পায় কিনা। অর্থাৎ আপন রাজাসনের সঠিক পরিচয় তার দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয় কিনা।

হজরত সুলায়মানের এমতো নির্দেশ দানের কারণ সম্পর্কে ওয়াহাব ইবনে মনাব্বাহ বর্ণনা করেছেন জ্বিনেরা আশংকা করেছিলেন, হজরত সুলায়মান রাণী বিলকিসের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবেন। কিন্তু তারা ছিলো এমতো পরিণয়ের ঘোর বিরোধী। কারণ বিলকিস ছিলেন, এক জ্বিন বংশদ্ভূতার পুত্রী। তাঁর ওই পরীমাতা জ্বিনদের অনেক গোপন রহস্য জানতো। সে গোপন রহস্য নিশ্চয় বিলকিসেরও অজানা নয়। আর পরিণয়াবদ্ধ হওয়ার পর হজরত সুলায়মানেরও তা

www.eelm.weebly.com

জানতে বাকী থাকবে না। আবার বিলকিসের সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে-ই হবে পরবর্তী সম্রাট। ফলে হজরত সুলায়মানের মহাঅন্তর্ধানের পরেও তাদেরকে অনুগত থাকতে হবে তাঁর পুত্রের। এভাবে পুরুষানুক্রম তাদেরকে করতে হবে হজরত সুলায়মানের বংশদ্ভূতদের দাসত্ব। তাই তারা রাণী বিলকিস সম্পর্কে হজরত সুলায়মানকে ভুল ধারণা দিতে চেষ্টা করেছিলো। বলেছিলো, বিলকিস ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্না। তার পা গর্দভের ক্ষুরের মতো। আর পায়ের গোছায় রয়েছে রাজ্যের পশম। হজরত সুলায়মান তাই উপযুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ভুল প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন বিলকিসকে প্রদত্ত এমতো অপবাদ। সিংহাসনের আকৃতি বদল করার পরীক্ষাটি ছিলো তার মধ্যে একটি। আর একটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৪৪ সংখ্যক আয়াতে।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'বিলকিস যখন পৌঁছলো, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বললো, এটা তো এরূপই'। একথার অর্থ— হজরত সুলায়মান সকাশে উপনীত হলেন রাণী বিলকিস। তিনি তাঁকে বললেন, দ্যাখো ভালো করে, এই সিংহাসনটি তোমার কি না? মুকাতিল বলেছেন, বুদ্ধিমত্তা যাচাইয়ের জন্য এরকমই দ্বিধাদ্বন্দ্ববিজড়িত প্রশ্নই করা হয়ে থাকে। আর রাণী বিলকিস এ প্রশ্নের জবাবও দেয়েছিলেন সংশয়মিশ্রিতভাবে। বলেছিলেন, হ্যাঁ, এটাতো সেরকমই মনে হয়। কারণ যেমন প্রশ্ন তেমন জবাব দেয়াই বুদ্ধিমত্তার দাবি। অর্থাৎ প্রশ্ন যেমন ছিলো অনিশ্চিতার্থক, জবাবও ছিলো তেমনি। কেউ কেউ বলেছেন, আদতেই রাণী এ ব্যাপারে ছিলেন দোদুল্যমনা। তাই জবাব দিয়েছিলেন এভাবে, যাতে করে স্বীকৃতি-অস্বীকৃতি দু'দিকেরই থাকে সমান সম্ভাবনা। আর এর মধ্যেই হজরত সুলায়মান বুঝে নিয়েছিলেন তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা ইতোপূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আত্মসমর্পণও করেছি'। একথার অর্থ— রাণী বিলকিস আরো বললেন, আপনার এরকম অলৌককত্ব আমরা ইতোপূর্বেই দেখেছি। অর্থাৎ হুদ্‌হুদ্ পাখির মাধ্যমে আমার শয়নকক্ষে প্রাপ্ত পত্র, আমার দূত কর্তৃক প্রেরিত উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান, দূত মারফত প্রেরিত আমন্ত্রণপত্র, ওগুলোও তো ছিলো অলৌকিক। ওগুলোর মাধ্যমে ইতোপূর্বেই আমাদের কাছে এই নিশ্চিতি প্রতিভাত হয়েছিলো যে, আপনি প্রেরিত পুরুষ। আর যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর শক্তিমত্তা অজেয় ও অসীম।

কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য উক্তিটি ছিলো হজরত সুলায়মানের সহচরবৃন্দের। অর্থাৎ রাণী বিলকিসের 'এটাতো এরূপই' বলার পর তাঁরাই সমস্বরে বলে উঠেছিলেন 'হ্যাঁ, আমাদের মহামান্য সম্রাট হচ্ছেন আল্লাহ্‌তায়ালার

www.eelm.weebly.com

প্রিয়ভাজন পয়গম্বর। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্ই তাঁকে দিয়েছেন এমতো অলৌকিক ক্ষমতা। তাই আমরা তাঁর প্রতি আত্মসমর্পিত। অনুগত তাঁর আনীত ধর্মাদর্শের। আলোচ্য ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, হজরত সুলায়মানকে প্রদত্ত অনুগ্রহসম্ভারের স্বীকৃতি প্রদান এবং তাঁর নবুয়তের মর্যাদা উচ্চকিত করাই ছিলো তাঁর সহচরবৃন্দের এমতো অকুণ্ঠ বক্তব্যের উদ্দেশ্য। কেউ কেউ আবার বক্তব্যটির মর্মার্থ করেছেন এভাবে— তাঁর সহচরবৃন্দ তখন বললেন, সাবার সম্রাজ্ঞী এখানে আসার আগে থেকেই আমরা আমাদের নবীর মাধ্যমে প্রকাশিত আল্লাহ্র সর্বশক্তিমানতার পরিচয় জানি। সেকারণেই তো আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অনুসারী হয়েছি তাঁর ধর্মমতের।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র পরিবর্তে সে যার পূজা করতো, তা-ই তাকে সত্য থেকে নিবৃত্ত করেছিলো, সে ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত'। একথার অর্থ— রাণী বিলকিস ছিলেন সূর্যপূজারীদের বংশদ্ভূতা। তাই অংশীবাদী পরিবেশেই বেড়ে উঠতে হয়েছিলো তাকে। ফলে আল্লাহ্র এককত্বের পরিচয় পায়নি। আর সেকারণেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী হওয়া ছাড়া তার কোনো উপায়ও ছিলো না। হজরত সুলায়মানই তাঁকে পথপ্রদর্শন করেন তওহীদের দিকে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত অরুণোপসনার ঐতিহ্যই তাঁকে ফিরিয়ে রেখেছিলো এক আল্লাহ্র ইবাদত থেকে। ফলে এক আল্লাহ্র ইবাদত ত্যাগ করে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হয়েছে, ইতোপূর্বে তিনিও ছিলেন তার অন্তর্ভূতা। উল্লেখ্য, 'বিলকিস স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্না, সে কারণেই সূর্যপূজারিণী' জ্বিনদের এমতো যুক্তি অসঙ্গত। কারণ সত্য বিশ্বাসপ্রাপ্তি বুদ্ধিনির্ভর নয়। আল্লাহ্র দয়ানির্ভর। আর সে দয়া প্রকাশিত হয় নবী প্রেরণের মাধ্যমে।

এরপরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'তাকে বলা হলো, এই প্রাসাদে প্রবেশ করো'। একথার অর্থ— 'তার পায়ের গোছা পশম পূর্ণ' জ্বিনদের এ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে হজরত সুলায়মান রাজপ্রাসাদের প্রবেশ পথে জ্বিনদের দ্বারা নির্মাণ করিয়ে নিয়েছিলেন শীশমহল। স্বচ্ছ কাঁচ নির্মিত ওই প্রবেশ পথটিকে দেখলে মনে হতো একটি স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ জলাশয়। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন একটি কাঁচের অলিন্দ, যার নিম্নে প্রবাহিত ছিলো কাকচক্ষু পানি। ওই পানিতে খেলা করছিলো মৎস্য ও ভেক। তার উদ্দেশ্য ছিলো ওই অলিন্দের পাশে তিনি সভাসদসহ উপবিষ্ট থাকবেন, আর দেখবেন রাণী বিলকিসের পদবিক্ষেপের দৃশ্য। তাই করলেন তিনি। যথাআসনে ও যথাস্থানে উপবেশন করলেন তিনি। তাঁকে ঘিরে সমবেত হলো মানুষ, জ্বিন ও পশু-পাখিরা। তারপর রাণীকে নির্দেশ দিলেন, অলিন্দ দিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করো। কারো কারো

www.eelm.weebly.com

ধারণা, তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন কাঁচ বিছানো একটি অঙ্গন। নিচে স্থাপন করিয়েছিলেন মীন, ভেক ও জলজ উদ্ভিদ। তারপর রাণীকে দিয়েছিলেন ওই জলভ্রমসম্বলিত অঙ্গন অতিক্রমের নির্দেশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখন সে উহার উপর দৃষ্টিপাত করলো, তখন তার মনে হলো, এটা এক স্বচ্ছ জলাশয় এবং সে তার কাপড় টেনে হাঁটু পর্যন্ত তুলে ধরলো। একথার অর্থ— রাণী বিলকিস মনে করলেন জলাশয় অঙ্গন অতিক্রম করতে গেলে ভিজে যাবে তার পরিধেয় বসন। তাই তিনি পদবিক্ষেপের পূর্বমুহূর্তে তাঁর বসন গুটিয়ে নিলেন হাঁটু পর্যন্ত। ফলে প্রকাশিত হয়ে পড়লো তার পায়ের গোছা।

এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে একটি দীর্ঘ বিবৃতি উল্লেখ করেছেন ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির, আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম। ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে— হজরত সুলায়মান নির্মাণ করিয়েছিলেন বহুমূল্যবান প্রস্তর ও স্ফটিক সম্বলিত একটি মনোহর প্রাসাদ। ওই প্রাসাদের গমন পথে নির্মাণ করিয়েছিলেন একটি কৃত্রিম জলাধার। ওই জলাধারটি সম্পূর্ণ আবৃত করেছিলেন স্বচ্ছ কাঁচ দ্বারা। কিন্তু স্বাভাবিক দৃষ্টিপাতে ওই কাঁচের অস্তিত্ব ধরা পড়তো না। মনে হতো জলাধারটির উপরিভাগে কোনোকিছুই নেই। স্বচ্ছ কাঁচের আবরণ বিশিষ্ট ওই জলাধারের উপর দিয়ে প্রাসাদে গমন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি রাণীকে। রাণী তখন কাপড় ভিজবে বলে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে নিয়ে পদবিক্ষেপ শুরু করেছিলেন। তাঁর গমন পথের একপাশে এক বিশেষ আসনে উপবিষ্ট হজরত সুলায়মান তখন দেখে নিয়েছিলেন তাঁর পায়ের গোছা। সুন্দর, কিন্তু লোমশ। একটু পরেই তিনি তাঁর দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন অন্য দিকে। উল্লেখ্য, পরনারীর প্রতি এরকম একবারের দৃষ্টিপাত অসিদ্ধ নয়। বিশেষ করে যাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়, তাকে এভাবে দেখা সিদ্ধ। আলেমগণ এরকমই বলেছেন।

রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা যদি কোনো রমণীকে বিবাহ করতে চাও, তবে সম্ভব হলে তার অনাবরণীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে নিয়ো। হজরত মুগীরা ইবনে শোবা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও দারেমী এবং হজরত জাবের থেকে আবু দাউদ। হজরত মুগীরা বলেছেন, আমি এক রমণীকে পরিণয়-প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। রসুল স. একথা শুনে বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছো? আমি বলেছিলাম, না। তিনি স. বললেন, দেখে নাও। এরকম দর্শন সম্প্রীতিস্থাপনকে সাবলীল করবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুলায়মান বললো, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ'। রাণীর এরকম বিব্রতকর অবস্থা দেখে হজরত সুলায়মান বলে উঠলেন, বিব্রত হবার কোনো কারণ নেই। শীশমহলের এই অলিন্দটিও স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত। সুতরাং স্বাভাবিক ছন্দে পদবিক্ষেপ করো।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'বিলকিস বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছিলাম। আমি সুলায়মানের সঙ্গে বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করছি'। একথার অর্থ— হজরত সুলায়মানের এরকম অভূতপূর্ব অভ্যর্থনার আয়োজন দেখে রাণী বিলকিস হলেন যুগপৎ লজ্জিতা ও বিস্মিতা। বুঝতে পারলেন আল্লাহ্‌র নবীর এমতো বিস্ময়কর আয়োজনের মাহাত্ম্য। তাই আল্লাহ্‌ সকাশে নিবেদন জানালেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! ইতোপূর্বে আমি সূর্য পূজা করে মহা পাপ করেছি। করেছি আত্মঅত্যাচার। সেই জঘন্য বিশ্বাস থেকে আমি বিশুদ্ধ চিত্তে তওবা করছি। তোমার প্রিয় নবী সুলায়মানের আনুগত্য স্বীকার করে ইমান আনয়ন করছি তোমার প্রতি। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় এরকমও বলা হয়েছে যে, কৃত্রিম জলাধার অতিক্রম করার নির্দেশ পেয়ে রাণী মনে করলেন, এভাবে তাঁকে সলিল সমাধি দেয়াই হয়তো সুলায়মানের ইচ্ছা। কিন্তু বিষয়টির রহস্যউদঘাটনের পর তিনি তাঁর অপধারণার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। তাই নিজের দোষ স্বীকার করে বললেন, হে আমার প্রভুপালক! তোমার প্রিয় নবী সুলায়মান সম্পর্কে মন্দ ধারণা করে আমি নিজেই নিজের উপর অত্যাচার করেছি। সেই মহা অন্যায় থেকে আমি এখন প্রত্যাবর্তিতা। তোমার নবীর মাধ্যমে তোমারই প্রতি আত্মসমর্পিতা।

এভাবে মুসলমান হওয়ার পর রাণী বিলকিসের কী হয়েছিলো সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করেছেন। আউন ইবনে আবদুল্লাহ্‌ বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি একবার আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উয়াইনাকে জিজ্ঞেস করলো, এরপর হজরত সুলায়মান কি রাণী বিলকিসকে বিয়ে করেছিলেন? তিনি বললেন, ব্যস, আমি সুলায়মানের সঙ্গে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করছি। এটাই ছিলো তাঁর শেষ কথা। এর পরের ঘটনা আমার জানা নেই।

কোনো কোনো তাফসীরকার মনে করেন, হজরত সুলায়মান তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, হজরত সুলায়মান রাণী বিলকিসকে বিবাহ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু তাঁর পায়ের নিম্নাংশে লোমশ দেখে তাঁর আগ্রহে কিছুটা ভাটা পড়লো। তৎসত্ত্বেও এর একটা বিহিত করা যায় কিনা তিনি তা ভাবতে শুরু করলেন। এ ব্যাপারে পরামর্শ বিনিময় করলেন কারো কারো সঙ্গে। কেউ কেউ বললো লোম উৎপাটক অস্ত্র নির্মাণের কথা। কিন্তু রাণী বিলকিস এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, লৌহনির্মিত কোনো অস্ত্র আমার শরীর স্পর্শ করতে পারবে না। হজরত সুলায়মানও প্রস্তাবটিকে ভালো মনে করলেন না। তিনি এবার শুভ জ্বিনদের কাছে জানতে চাইলেন, এ ব্যাপারে তোমরা কি কিছু জানো? তারা বললো, না। তখন তিনি অশুভ জ্বিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি এ ব্যাপারে কিছু

www.eelm.weebly.com

জানা আছে। অশুভ জ্বিনেরা বললো, হ্যাঁ। আমরা এমন পদ্ধতির কথা জানি যা অবলম্বন করলে রমণীদের ত্বক লোমমুক্ত তো হয়ই, অধিকন্তু হয় শুভ্র ও লাবণ্যময়। এরপর তারা পরামর্শ দিলো গোসলখানা নির্মাণের। আর চুন, হরিতাল ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত করে দিলো লোমনাশক মলম। সেই থেকে মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে গোসলখানা ও লোমনাশক রসায়নের ব্যবহার। যথাসময়ে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হলো। হজরত সুলায়মান তাঁর নবপরিণীতা সহধর্মিণীকে রাজ্যচ্যুত করলেন না। ইয়েমেনেই রেখে দিলেন সে রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হিসেবে। প্রতি মাসে তিনি তিন দিন সেখানে গিয়ে অবস্থান করতেন। যেতেন সকালবেলা। আসতেনও সকালে। জ্বিনদের দ্বারা তিনি সেখানে নির্মাণ করিয়েছিলেন তিনটি অদৃষ্টপূর্ব দুর্গ। সেগুলোর নাম ছিলো সালহুন, মিননুন ও আমাদান। সম্রাজ্ঞী বিলকিস হয়েছিলেন হজরত সুলায়মানের এক পুত্র সন্তানের জননী।

ওয়াহাব বলেছেন, ইতিহাসবেত্তাদের ধারণা এরকম— মুসলমান হওয়ার পর হজরত সুলায়মান রাণীকে বললেন, আপনি এবার আপনার সম্প্রদায়ভূত কাউকে পতিরূপে বরণ করুন। বিলকিস বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি তো জানেনই আমি ছিলাম রাণী। আমার রাজ্যে প্রতাপশালী ব্যক্তিরাও রয়েছেন। কিন্তু তাদের কাউকে আমি পছন্দ করতে পারিনি। হজরত সুলায়মান বললেন, সে কথা তো আমি জানিই। কিন্তু আল্লাহ্ যা বৈধ করেছেন, তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা কি ঠিক? বিলকিস বললেন, ঠিক আছে। আপনার নির্দেশ শিরোধার্য। আপনি তাহলে হামাদান অধিপতি জীতারার সঙ্গে আমাকে বিবাহ দিয়ে দিন। হজরত সুলায়মান তাই করলেন। জীতারার সঙ্গে তাঁর শুভ বিবাহ সম্পন্ন করিয়ে দিলেন। ইয়েমেনের শাসনভারও অর্পণ করলেন জীতারার উপর। একদল জ্বিনকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা আমার হুকুমে জীতারার রাজ্য রক্ষা করো। এভাবে জ্বিনেরাই হলো জীতারার রাজ্যের প্রধান প্রতিরক্ষাবাহিনী। বয়ে চললো দিন। মাস। বছর। এক বছর পর হজরত সুলায়মান ডাক শুনতে পেলেন তাঁর পরম প্রেমময় প্রভুপ্রতিপালকের। চলে গেলেন নশ্বর ধরাধাম থেকে। জ্বিনেরা কিন্তু তাঁর মহা প্রস্থানের সংবাদ জানতেই পারলো না। জানতে পারলো আরো এক বছর গত হওয়ার পর। তেহামা প্রদেশে আবির্ভূত হলো এক অশুভ জ্বিন। সে-ই কথাটা সেখান থেকে বিরাট আওয়াজে ঘোষণা করলো। বললো, শুভ সংবাদ। শুভ সংবাদ। সম্রাট সুলায়মানের মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। ভেঙে গিয়েছে তোমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল। তোমরা এখন স্বাধীন। এখন তোমরা পৃথিবীতে করতে পারো যথেচ্ছ ভ্রমণ। সেই থেকে শেষ হয়ে গেলো মহাপ্রতাপশালী নবী সম্রাট সুলায়মানের শাসনকাল। একই সঙ্গে শেষ হয়ে গেলো জীতারার ও রাণী বিলকিসের রাজত্বও।

www.eelm.weebly.com

বর্ণিত হয়েছে, হজরত সুলায়মান সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন তের বছর বয়সে। আর তিপ্পান্ন বছর বয়সে করেছিলেন পরলোকগমন। এভাবেই এক সময় শেষ হয়ে যায় পুণ্যবান-পাপী সকল পরাক্রমশালী সম্রাটের সাম্রাজ্য। স্থায়ী থাকেন কেবল আল্লাহ্। আর সাম্রাজ্যাধিকার চিরপ্রবহমান থাকে কেবল তাঁর। তিনি যে চিরঞ্জীব, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।

লা মুলকা সুলাইমান ওয়ালা বিলকিসা ওয়ালা আদামা ফীল কওনি ওয়াল ইবলীসা ওয়ালা কুল্লু ফতুরাতুন ওয়া আনতাল মা'না ইয়া মান হুয়ালিকুরুবি মাকনাতীসু।

অর্থঃ কারো রাজ্য চিরস্থায়ী নয়। না সুলায়মানের, না বিলকিসের। না আদমের, না ইবলিসের। হে চিরঅক্ষয় সত্তা! কেবল তোমার রাজত্বই চিরস্থায়ী। তুমি সত্য। তুমি অনিত্য। তুমি অনাদি, তুমি অনন্ত।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ؕ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٧﴾

r আমি অবশ্যই সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা সালিহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম, এই আদেশসহ যে, 'তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর,' কিন্তু উহারা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বিতর্কে লিপ্ত হইল।

r সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতে চাহিতেছ? কেন তোমরা আল্লাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হইতে পার?

r উহারা বলিল, 'তোমাকে ও তোমার সংগে যাহারা আছে তাহাদিগকে আমরা অমংগলের কারণ মনে করি।' সালিহ্ বলিল, 'তোমাদিগের শুভাশুভ আল্লাহের এখতিয়ারে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইতেছে।'

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি অবশ্যই ছামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহ্‌কে প্রেরণ করেছিলাম এই আদেশসহ যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। কিন্তু তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলো'। একথার অর্থ— ছামুদ সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে আমা কর্তৃক নবী সালেহ্‌কে প্রেরণের বিষয়টি সুনিশ্চিত। সালেহ্ ছিলেন ছামুদ সম্প্রদায়ের বংশীয় ভ্রাতা। তাঁকে আমি এই নির্দেশটি প্রচার করতে বলেছিলাম যে, তোমরা অংশীবাদিতা ও অহংকার পরিত্যাগ করো। ইবাদত করো কেবল আল্লাহ্‌র। কিন্তু অনেকেই তাঁর কথা মান্য করলোনা। মান্য করলো অল্পকিছু লোক। এভাবে ছামুদেরা বিভক্ত হলো দু'টি দলে। সত্যপন্থী ও মিথ্যানুসারীদের মধ্যে এভাবে শুরু হলো বিতর্ক, দ্বন্দ্ব। সুরা আ'রাফের যথাস্থানে এ দু'টো দলের বিশদ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেনো কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছো'? একথার অর্থ— নবী সালেহের উদাত্ত আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করলো অধিকাংশ মানুষ। উলটা বরং বললো, আমরা তোমাকে মানি না। তোমার আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় দেখালেও না। আমরা যদি তোমাকে না মানলে শাস্তিযোগ্য হই, তবে সে শাস্তি আসে না কেনো? হজরত সালেহ্ দরদভরা কণ্ঠে বললেন, হে আমার স্বজাতি! সংযত হও। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ্‌তায়ালা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে শাস্তি দিতে অবশ্যই সক্ষম। নির্বোধ তোমরা। তাই শাস্তির জন্য উতলা হয়েছো। কল্যাণের পরিবর্তে কামনা করছো অকল্যাণকে। আর সে অকল্যাণকে আবার ত্বরান্বিতও করতে চাইছো। এখানে 'সাইয়্যিআহ' অর্থ অকল্যাণ, শাস্তি। আর 'হাসানা' অর্থ কল্যাণ, তওবা।

এরপর বলা হয়েছে— 'কেনো তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছো না যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পারো'? একথার অর্থ— তিনি আরো বললেন, হে অবিমৃশ্য জনতা! ক্ষান্ত হও। যা বলেছো, বলেছো। এখন ক্ষতিপূরণ করতে চেষ্টা করো সত্যপ্রত্যাখ্যানের। তওবা করো। ক্ষমাপ্রার্থনা করো লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে। এরকম করলে তোমরা হবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহভাজন।

এরপরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি'। একথার অর্থ— অবাধ্যরা বললো, হে সালেহ্! আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি ও তোমার সঙ্গী সাথীরা অশুভ। যেদিন থেকে তোমরা নতুন ধর্মের প্রচার শুরু করেছো, সেদিন থেকেই ক্রমাগত আমাদের উপরে নেমে আসছে দুর্ভোগ। শুরু হয়েছে অনাবৃষ্টি, অজন্মা, খরা। দুর্ভিক্ষ বিস্তার করে চলেছে তার ক্রমপ্রসরমান থাবা। তোমাদের জন্যই আমরা আজ বিপন্ন, বিপর্যস্ত, দুর্দশাকবলিত।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'সালেহ্ বললো, তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহ্র এখতিয়ারে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে'। একথার অর্থ— নবী সালেহ্ বললেন, শুভাশুভের একমাত্র নির্ণয়ক, নিয়ন্ত্রক ও বাস্তবায়ক কেবলই আল্লাহ্, অন্য কেউ নয়। তাই প্রকৃত কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ই তোমাদেরকে এভাবে বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চান— তোমরা নম্র হয়ে সত্যের দিকে ফিরো আসো কিনা, না রয়ে যাও চির অবাধ্যদের দলে। নিশ্চিত জেনো, তকদীরের বাস্তবায়ন অনিবার্য। কিন্তু কারণের উদয় ঘটায় মানুষ। তোমরাও তোমাদের উপর্যুপরি সত্যপ্রত্যাখ্যানের কারণে হয়েছো এমতো দুর্দশার শিকার।

'ত্বইরুকুম ইনদাল্লাহ্' অর্থ তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহ্র এখতিয়ারে। তকদীরের লিখন অতিদ্রুত কার্যকর হয়। তাই তকদীরকে রূপকার্থে বলা হয়েছে 'ত্বইর'। মানুষের কৃতকর্মও অতি সত্বর উত্থিত হয় আকাশে। তাই কর্মফল বুঝাতেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কর্মযোগ তকদীর বাস্তবায়ন হওয়ার কারণ। আবার তকদীর ও বাস্তবায়নের কারণ দু'টোই অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন। তাই বলা হয় 'লা শাইয়া আস্রাউ মিন ক্বদ্রি মাহতুম' (নিয়তির চেয়ে অধিক দ্রুতগতিসম্পন্ন আর কিছু নেই)।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ত্বইর' বলা হয়েছে দুর্বিনীত ছামুদদের অশুভ কর্মকে। তারা প্রবাস গমনকালে পাখিদের বিশেষ ওড়ার ভঙ্গি ও বিশেষ ধ্বনিকে অশুভ মনে করতো। তাদের ওই কুসংস্কারকেই আলোচ্য বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে 'ত্বইর' শব্দটির মাধ্যমে।

'ফিৎনা' অর্থ পরীক্ষা। 'তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে' অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতার জন্যই তোমরা এভাবে পরীক্ষিত হচ্ছো। ক্রমাগত সম্মুখীন হচ্ছো বিপদাপদের। এভাবে পরীক্ষা করার কথা এসেছে অন্য এক আয়াতে এভাবে— 'সুখ দুঃখ দিয়ে আমি তোমাদেরকে যাচাই করি'।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ
لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا
وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

www.eelm.weebly.com

مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَ قَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ
خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَ
اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٣﴾

r আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যাহারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করিত, শান্তি প্রতিষ্ঠা করিত না।

r উহারা বলিল, 'চল, আমরা আল্লাহের নামে শপথ গ্রহণ করি যে, আমরা রাত্রিকালে তাহাকেও তাহার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই হত্যা করিব; অতঃপর তাহার দাবীদারকে নিশ্চয় বলিব, 'তাহার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।'

r উহারা চক্রান্ত করিয়াছিল এবং আমিও চক্রান্ত করিলাম, কিন্তু উহারা বুঝিতে পারে নাই।

r অতএব দেখ উহাদিগের চক্রান্তের পরিণাম কী হইয়াছে— আমি অবশ্যই উহাদিগকে ও উহাদিগের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করিয়াছি।

r এইতো ঘরবাড়ীগুলি— সীমালংঘন হেতু যাহা জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে; ইহাতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

r এবং যাহারা বিশ্বাসী ও সাবধানী ছিল তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আর সেই শহরে ছিলো এমন নয় ব্যক্তি যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো, শান্তি প্রতিষ্ঠা করতো না'। একথার অর্থ— ছামুদ সম্প্রদায়ের নয়জন দুর্বৃত্তের একটি দুর্ধর্ষ দল বাস করতো হিজর নামক শহরে। বিপর্যয় সৃষ্টি করাই ছিলো তাদের কাজ। শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা তারা ভাবতেও পারতো না। দল বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'রহাত্ব' শব্দটি। তিন অথবা নয়জনের অধিক জনসমষ্টিকে বলে 'রহাত্ব'। আর 'নফর' বলে তিন থেকে নয়জনের দলকে। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত নয়জন ছিলো ছামুদ জাতিগোষ্ঠীর গোত্রীয় নেতৃবর্গের সন্তান। তাই তারা ছিলো দুর্দান্ত স্বভাবের। কাজার ইবনে মালেক ছিলো তাদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য। এরাই বধ করেছিলো হজরত সালেহের অলৌকিক উষ্ট্রীটিকে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা বললো, চলো, আমরা আল্লাহ্র নামে শপথ গ্রহণ করি যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে এবং তার পরিবারপরিজনকে অবশ্যই হত্যা করবো; অতঃপর তার দাবীদারকে বলবো, তার পরিবার-পরিজনের

www.eelm.weebly.com

হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী'। একথার অর্থ— ওই নয়জন মহাদুর্বৃত্ত মিলিত হলো গোপন পরামর্শসভায়। বললো, চলো, আমরা সালেহ্ ও তার পরিবার-পরিজনকে রাতের আঁধারে হত্যা করার ব্যাপারে আল্লাহ্র নামে শপথ করি। পরে তাদের দাবিদারেরা যদি আমাদেরকে সন্দেহ করে, তবে আমরা বলবো, তাদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তো আমরা কিছুই জানি না। আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

এখানে 'ক্বালু' (তারা বললো) অর্থ তারা পরস্পরকে উদ্দেশ্য করে বললো। 'তাক্বাসামু' অর্থ শপথ গ্রহণ করি। শব্দরূপটিকে অতীতকালবোধক ধরে নিলে এরকমই অর্থ দাঁড়ায়। আর অনুজ্ঞাসূচক ধরে নিলে অর্থ দাঁড়ায়— তোমরা পরস্পরে শপথ গ্রহণ করো।

'লানুবাইয়্যিতান্নাহু' অর্থ তাকে অবশ্যই রাত্রিকালে হত্যা করবো। 'ওয়া আহ্লাহু' অর্থ— এবং হত্যা করবো তার পরিবার-পরিজনকে। অর্থাৎ তাকে বিশ্বাস করে যারা তার অনুসারী হয়েছে তাদেরকে। 'লিওয়ালিয়্যিহী' অর্থ অভিভাবকদেরকে। অর্থাৎ যেসকল নিকটাত্মীয় নিহত ব্যক্তিদের 'হত্যার বদলে হত্যা'র বা রক্তপাতের দাবিদার হয় তাদেরকে। 'মুহ্লিকা আহ্লিহী' কথাটির 'মুহ্লিকা' অর্থ হত্যার স্থান বা সময়। শব্দটি ক্রিয়ার আধাররূপে পরিগণিত। অথবা শব্দটি হতে পারে ধাতুমূল। এভাবে অর্থ হয়— হত্যা হতে, হত্যার ব্যাপারে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমরা নবী সালেহ্ ও তার অনুচরবর্গের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তো নইই, অধিকন্তু সেখানে বা সে সময়ে আমরা উপস্থিতও ছিলাম না। আরববাসীগণ বলেন, 'মা রআইতু ছাম্মা রজুলান বাল্ রজুলাইনি' (আমি সেখানে একজনকে দেখিনি, বরং দেখিনি দু'জনকেও)।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'তারা চক্রান্ত করেছিলো এবং আমিও চক্রান্ত করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি'। একথার অর্থ— ওই নয়জন দুর্বৃত্ত যে চক্রান্ত করেছিলো, তার বিপরীতে আমি প্রয়োগ করেছিলাম এক অব্যর্থ কৌশল। ফলে তাদের ষড়যন্ত্র তো বিফল হয়েছিলোই, তদুপরি তারা নিজেরাই পড়ে গিয়েছিলো তাদের স্বসৃষ্ট ষড়যন্ত্রের ফাঁদে। অন্যকে ধ্বংস করতে গিয়ে নিজেরাই হয়ে গিয়েছিলো ধ্বংসের শিকার।

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'অতএব দেখো, তাদের ধ্বংসের পরিণাম কী হয়েছে— আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি'। এখানে 'কাইফা কানা' (কী হয়েছে) প্রশ্নটি একটি বিস্ময়সুচক প্রশ্ন। এভাবে কথাটি দাঁড়িয়েছে— বিস্ময় বিস্ফরিত নেত্রে লক্ষ্য করো তাদের মর্মন্তুদ পরিণতির দিকে।

www.eelm.weebly.com

‘আন্‌না দাম্‌মারনাহুম’ অর্থ কীভাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছি। এভাবে তাদের ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে সংক্ষিপ্তাকারে। কীভাবে কোন্ পদ্ধতিতে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো তার বিবরণ এখানে নেই। তবে এই ধ্বংস সম্পর্কে পাওয়া যায় বিভিন্ন রকম বিবৃতি। যেমন হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ্‌পাক হজরত সালেহ্ ও তাঁর গৃহবাসীদেরকে রক্ষার নিমিত্তে নিয়োজিত করেছিলেন ফেরেশতাদেরকে। গভীর নিশীথে ওই নয়জন দুরাচার যখন হজরত সালেহের বসতবাটি ঘিরে ফেললো, তখন ওই ফেরেশতারা ছুঁড়তে শুরু করলো বৃষ্টির মতো পাথর। দুরাচারেরা পাথর দেখতে পেলো কেবল। প্রস্তর নিক্ষেপকারীরা ছিলো অদৃশ্য। অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো আক্রমণকারীরা।

মুকাতিল বলেছেন, পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে তারা জড়ো হয়েছিলো একটি পাহাড়ের পাদদেশে। কথা ছিলো, সেখান থেকে তারা একযোগে যাত্রা করবে হজরত সালেহের বসতবাটির দিকে। কিন্তু তারা একত্র হওয়ামাত্র পাহাড়টি ধসে পড়লো তাদের উপর। ফলে সেখানেই সমাধিপ্রাপ্ত হলো তারা। আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, পাহাড় থেকে পতিত প্রকাণ্ড একটি পাথরের নিচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছিলো তারা।

‘ওয়া ক্বওমাহুম আজমাঈন’ অর্থ এবং ধ্বংস করেছি তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে। উল্লেখ্য, ছামুদ সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সকলেই ধ্বংস হয়েছিলো আল্লাহ্‌র গজবে। অকস্মাৎ অদৃশ্য থেকে উত্থিত হয়েছিলো মহানাদ, বিকট, বীভৎস, ভয়ংকর গগনবিদারী আওয়াজ। ওই আওয়াজের আঘাতেই তারা মরে পড়ে রয়েছিলো আপনাপন বাসগৃহে।

এরপরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— ‘এইতো ঘরবাড়ীগুলি— সীমালংঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে; এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে’। একথার অর্থ— অবাধ্যদের ধ্বংসের নিদর্শনরূপে এখানে মহাকালের সাক্ষী হয়ে আছে তাদের জনমানবহীন জনপদ। এই নিদর্শন দৃষ্টে জ্ঞানীগণ সহজেই অনুধাবন করতে পারেন আল্লাহ্‌তায়ালার মহাপরাক্রমের পরিচয়। একই সঙ্গে একথাও জানতে পারেন যে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষগণ এবং তাঁদের আনীত ধর্মমত সত্য।

এরপরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— ‘এবং যারা বিশ্বাসী ও সাবধানী ছিলো, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি’। একথার অর্থ— যারা আমার প্রিয় নবী সালেহের ধর্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করে বিশ্বাসকে আশ্রয় করেছিলো এবং অবলম্বন করেছিলো সতর্কতা, তাদেরকে আমি আমার ওই মহাশাস্তি থেকে মুক্ত রেখেছিলাম। দিয়েছিলাম পরিত্রাণ ও কল্যাণ। উল্লেখ্য, হজরত সালেহের উম্মতের সংখ্যা ছিলো চার সহস্র।

www.eelm.weebly.com

وَ لُوۡطًا اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِہٖۤ اَتَاۡتُوۡنَ الۡفَاحِشَۃَ وَ اَنۡتُمۡ تُبۡصِرُوۡنَ ﴿۵۴﴾
اَئِنَّکُمۡ لَتَاۡتُوۡنَ الرِّجَالَ شَہۡوَۃً مِّنۡ دُوۡنِ النِّسَآءِ ؕ بَلۡ اَنۡتُمۡ قَوۡمٌ
تَجۡہَلُوۡنَ ﴿۵۵﴾ فَمَا کَانَ جَوَابَ قَوۡمِہٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ قَالُوۡۤا اَخۡرِجُوۡۤا اٰلَ
لُوۡطٍ مِّنۡ قَرۡیَتِکُمۡ ۚ اِنَّہُمۡ اُنَاسٌ یَّتَطَہَّرُوۡنَ ﴿۵۶﴾ فَاَنۡجَیۡنٰہُ وَ اَہۡلَہٗۤ
اِلَّا امۡرَاَتَہٗ ۫ قَدَّرۡنٰہَا مِنَ الۡغٰبِرِیۡنَ ﴿۵۷﴾ وَ اَمۡطَرۡنَا عَلَیۡہِمۡ مَّطَرًا ۚ
فَسَآءَ مَطَرُ الۡمُنۡذَرِیۡنَ ﴿۵۸﴾

r স্মরণ কর লূতের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা জানিয়া-শুনিয়া কেন অশ্লীল কাজ করিতেছ।'

r 'তোমরা কি কাম-তৃপ্তির জন্য নারীকে ছাড়িয়া পুরুষে উপগত হইবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।'

r উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলিল 'লূত পরিবারকে তোমাদিগের জনপদ হইতে বহিষ্কৃত কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা পবিত্র সাজিতে চাহে।'

r অতঃপর তাহাকে ও তাহার স্ত্রী-ব্যতীত তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিলাম। তাহার স্ত্রীকে করিয়াছিলাম ধ্বংসপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত।

r তাহাদিগের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম; যাহাদিগকে ভীতিপ্রদর্শন করা হইয়াছিল তাহাদিগের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো লুতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমরা জেনে শুনে কেনো অশ্লীল কাজ করছো?' বাক্যটির সম্পর্ক রয়েছে ৪৫ সংখ্যক আয়াতের 'আমি অবশ্যই ছামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহ্কে পাঠিয়েছিলাম' কথাটির সঙ্গে। অথবা 'স্মরণ করো' কথাটি এখানে একটি উহ্য সম্বোধনের অনুবাদ। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! স্মরণ করুন নবী লুতের ঘটনা। 'ফাহিশাতু' অর্থ অশ্লীল কর্ম। 'আতা'তুনা' অর্থ কেনো করছো? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিসূচক, অথবা তিরস্কারবোধক। আর 'ওয়া আনতুম তুবসিরূন' অর্থ জেনে শুনে। অর্থাৎ কর্মটি অশ্লীল সে বিষয়ের অবহিতি থাকা সত্ত্বেও। উল্লেখ্য, জ্ঞাতসারে কুকর্ম সম্পাদন অধিকতর নিকৃষ্ট।

www.eelm.weebly.com

অথবা কথাটির অর্থ— এতাদৃশ নির্লজ্জ কর্ম তোমরা সম্পন্ন করো প্রকাশ্যে। অবশ্য নবী লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের স্বভাব ছিলো এরকমই। সমকামিতার মতো ঘৃণ্য কর্ম তারা সম্পাদন করতো একে অপরের সামনে। কিংবা বক্তব্যটি হতে পারে এরকম— ছামুদ সম্প্রদায়ের হত্যা ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত তোমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। সুতরাং দেখে শুনে বুঝেও কেনো তোমরা জড়িত হয়েছো এমতো অশ্লীলতায়।

পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়'। আলোচ্য আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে হজরত লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের জঘন্য কুকর্মটির কথা। বলা হয়েছে, তারা কামপরিতৃপ্তির জন্য রমণীর পরিবর্তে ব্যবহার করতো পুরুষকে। আর 'তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়' বলে এখানে একথাটিও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কামপরিতৃপ্তির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈধ উপায়ে সন্তান লাভ। কারণ সন্তান উৎপাদন করতে পারে নারীরাই। গর্ভধারণ করে তারাই, পুরুষেরা নয়। অথবা কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে, এরকম জঘন্য কাজ শুধুমাত্র আল্লাহ্র গজবকেই ডেকে আনে। এ বিষয়টি সম্পর্কে তোমরা সত্যিই অজ্ঞ।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আর একটি কথা প্রমাণিত হয় যে, বস্তুর উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা শরিয়ত নির্ভর নয়, বরং তার সৃষ্টিগত স্বভাব নির্ভর যদিও কোনো কোনো বস্তুর ভালো-মন্দ চিহ্নিত করে শরিয়ত।

এর পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বললো, লুত-পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কৃত করো, এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়'। এ কথার অর্থ— হজরত লুতের সদুপদেশকে কিছুতেই গ্রহণ করলো না তাঁর সম্প্রদায়। শুধু বললো, তার উপস্থিতিই আমাদের স্বেচ্ছাচরণের অন্তরায়। এতো ভালো মানুষের প্রয়োজন নেই আমাদের। সুতরাং তাকে তার পরিবার পরিজন সহকারে এদেশ থেকে বহিষ্কার করাই শ্রেয়। হে জনতা! তোমরা এখন এই কাজটিই করো।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৫৭, ৫৮) মর্মার্থ হচ্ছে— অতঃপর আমি চিরভ্রষ্ট লুতের সম্প্রদায়ের উপর আপতিত করলাম গজব। আমার প্রিয় নবী লুতকে নির্দেশ দিলাম, রাতের অন্ধকারে অন্যত্র গমন করো। তিনি ওই জনপদের সীমানা অতিক্রম করার পরক্ষণেই শুরু হলো ভয়াবহ প্রস্তর বৃষ্টি। ওই মারাত্মক বৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেলো অবাধ্যরা। লুতের এক স্ত্রী ছিলো অবাধ্যদের অন্তর্গত। সেও ধ্বংস হয়ে গেলো অবাধ্যদের সঙ্গে। নিরাপদ রইলেন কেবল আমার নবী ও তাঁর পরিবারের বিশ্বাসী অনুচরেরা।

www.eelm.weebly.com

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۵۹﴾

r বল, প্রশংসা আল্লাহেরই এবং শান্তি তাঁহার মনোনীত দাসদিগের প্রতি! শ্রেষ্ঠ কে— আল্লাহ্, না উহারা যাহাদিগকে শরীক করে তাহারা?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, প্রশংসা আল্লাহ্রই এবং শান্তি তাঁর মনোনীত দাসদের প্রতি'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল মোহাম্মদ! শুনলেন তো এতক্ষণ ধরে বর্ণিত আপনার পূর্বসূরী নবী ও তাঁদের অবাধ্য সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ইতিবৃত্ত। এখন আপনি মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি তার প্রিয়ভাজন নবীগণের শত্রুকুলের যথোপযুক্ত শাস্তিবিধান করেন। আর শান্তি বর্ষণ করেন তাঁর মনোনীত দাসগণের প্রতি, যাঁরা নবুয়তের দায়িত্বপ্রাপ্তরূপে আপনার পূর্বসূরী।

মুকাতিল বলেছেন, 'আল্লাজী নাসত্বফা' (মনোনীত দাস) বলে এখানে বুঝানো হয়েছে নবী রসুলগণকে। তাঁদের প্রতিই এখানে বর্ষণ করা হয়েছে শান্তিবারতা।

ইমাম মালেকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আল্লাজী নাস্ত্বফা' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর প্রিয়ভাজন সহচরবৃন্দকে। সুফিয়ান সওরীর অভিমতও এরকম। কালাবী বলেছেন, এখানকার শান্তিবারতার লক্ষ্য রসুল স. এর সমগ্র উম্মত। কেউ কেউ বলেছেন, পূর্বাপর সকল নবীর বিশ্বাসী উম্মতই আলোচ্য আয়াতে কথিত শান্তি ঘোষণার লক্ষ্যস্থল।

কোনো কোনো তাফসীরকার মনে করেন, আলোচ্য আয়াতটিও হজরত লুতের ইতিবৃত্তের অন্তর্ভূত। অর্থাৎ এখানে 'বলো' বলে নির্দেশ করা হয়েছে হজরত লুতকে। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে এর পূর্বে উহ্য রয়েছে 'কুলনা' শব্দটি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি লুতকে নির্দেশ করলাম, বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। আর শান্তি প্রার্থনা করো তাদের জন্য যাদেরকে আল্লাহ্ সুরক্ষিত রেখেছেন অশ্লীলতা ও ধ্বংস থেকে। তারাই আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন দাস। অথবা বক্তব্যটি হবে এরকম— হে আমার প্রিয় নবী লুত! তুমি শান্তি প্রার্থনা করো সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা এবং তাঁর উম্মতের প্রতি, যেহেতু ওই শেষ নবীর নূরের বরকতেই তুমিসহ

www.eelm.weebly.com

তোমার অন্যান্য সতীর্থ নবীকে রক্ষা করেছি আমি বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদ থেকে এবং তোমাদের সকলকে করেছি মর্যাদামণ্ডিত। রসুল স. জানিয়েছেন, নবীরূপে আমার সৃষ্টি সর্বাগ্রে এবং আবির্ভাব সকলের শেষে। কাতাদা থেকে অপরিণত সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নাঈম।

রসুল স. আরো ঘোষণা করেছেন, আমি তখনো নবী ছিলাম, যখন আদম ছিলেন দেহাবয়ব ও আত্মার মাঝামাঝি। হজরত মায়সারা থেকে বিশুদ্ধসূত্রে আবীল জাআদের মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে সাআদ। আর হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন তিবরানী।

এরপর বলা হয়েছে— 'শ্রেষ্ঠ কে— আল্লাহ্, না তারা যাদেরকে শরীক করে তারা'? আলোচ্য বাক্যের সংযোগ রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'ইন্নাল্লাজীনা লা ইউমিনূন বিল আখিরাতি..... হুমুল আকছারুন' এর সঙ্গে। অর্থাৎ আলোচ্য প্রশ্নাকারে একত্রিত করা হয়েছে অংশীবাদীদের নির্বুদ্ধিতাকে। বলা হয়েছে একথা যে, যে আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত দাসগণকে সম্মানিত করেন এবং তাদের অরিকুলকে ধ্বংস করে দিয়ে যুগেযুগে সত্যের মহিমাকে সমুন্নত রাখেন, সেই আল্লাহ্ই সর্বশক্তির। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং ইবাদত করতে হবে কেবল তাঁর। অন্য কারো বা অন্য কোনোকিছুর নয়। আর একথাও নিশ্চিত যে, যারা অংশীবাদী, তারা নির্বোধতম।

www.eelm.weebly.com

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ
فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ
ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦٠﴾ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ
جَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ
حَاجِزًا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ اَمَّنْ يُّجِيْبُ
الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ
الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ
ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا ۢ بَيْنَ يَدَيْ
رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٣﴾ اَمَّنْ يَّبْدَؤُا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ
مَّعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦٤﴾

r অথবা তিনি, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হইতে তোমাদিগের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর উহা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেন, উহার বৃক্ষাদি উদগত করিবার ক্ষমতা তোমাদিগের নাই। আল্লাহের সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহারা সত্য বিচ্যুত হয়।

www.eelm.weebly.com

r কিংবা তিনি, যিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন বাসোপযোগী এবং উহার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করিয়াছেন নদী-নালা এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন অন্তরায়; আল্লাহের সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও উহাদিগের অনেকেই উহা জানে না।

r অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁহাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহের সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করিয়া থাক।

r কিংবা তিনি, যিনি তেমাদিগকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। আল্লাহের সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? উহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ তাহা হইতে বহু উর্ধ্বে।

r অথবা তিনি, যিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর উহাকে পুনরায় সৃষ্টি করিবেন, এবং যিনি তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ দান করেন। আল্লাহের সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদিগের প্রমাণ পেশ কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অথবা তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী?' এখানে 'আম্' (অথবা) হচ্ছে সংযোজক অব্যয়। আর সংযোজ্য বাক্যটি এখানে রয়েছে প্রচ্ছন্ন। ওই প্রচ্ছন্ন বাক্যসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায় এরকম— বলো, সৃজনে অক্ষম তোমাদের বাতিল উপাস্যগুলোই উত্তম, না উত্তম মহাসৃজয়িতা আল্লাহ্, যিনি সৃজন করেছেন গগনমণ্ডল ও মেদিনী? কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানকার 'আম' অর্থ 'বাল' (বরং)। কারণ একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, সকল কল্যাণ সমুদ্ভূত হয় আল্লাহ্ থেকে। পৌত্তলিকদের উপাস্যরা সম্পূর্ণরূপে কল্যাণবিচ্যুত। সুতরাং সৃজনকর্মের ব্যাপারে প্রশ্নাকারে আল্লাহ্র সঙ্গে পৌত্তলিকদের প্রতিমাগুলোকে সমান্তরাল করা নিতান্তই অশোভন। সেকারণেই পূর্ববর্তী আয়াতের প্রশ্নটির সঙ্গে আলোচ্য আয়াতটিকে পৃথক করা হয়েছে। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য বাক্যের প্রশ্নটি স্বীকৃতিসূচক ও দার্ঢ্য অর্থ প্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যিনি গগন-ভূবনের সৃজয়িতা, তিনিই সর্বোত্তম।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি, অতঃপর তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেন, তার বৃক্ষাদি উদ্গত করবার ক্ষমতা তোমাদের নেই'। 'হাদাইক্ব' হচ্ছে 'হাদিক্বাতুন' এর বহুবচন। এখানে শব্দটির অর্থ উদ্যানসমূহ। ফাররা বলেছেন, 'হাদিক্বাহ্' বলে প্রাচীর বেষ্টিত বাগানকে। বায়যাবী বলেছেন, 'হাদিক্বাহ্' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'ইহ্দাক্ব' থেকে। এর অর্থ পরিবেষ্টিত।

www.eelm.weebly.com

'জাতা বাহজাত' অর্থ মনোরম, মনোহর, নয়নাভিরাম, অনিন্দ্যসুন্দর। 'ফাআমবাতনাহু' অর্থ আমিই উদগত করেছি। কথাটির মধ্যে রয়েছে সৃজনতত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত। এতক্ষণ ধরে বক্তব্যটি উপস্থাপন করা হয়েছে প্রশ্নাকারে উত্তমপুরুষে সে বা তিনি। এক্ষণে পুরুষান্তর ঘটিয়ে সরাসরি বলা হয়েছে 'আমি'। অর্থাৎ আমিই বারিবর্ষণের মাধ্যমে সৃষ্টি করি নয়নাভিরাম কানন। বক্তব্যকে এভাবে তীক্ষ্ণিকৃত করার উদ্দেশ্য শ্রোতৃবর্গকে সচকিত ও সজাগ করা, যাতে তারা বুঝতে পারে, প্রতিটি উদ্ভিদের জন্মায়ন ও প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়া এক হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রকাশ ও বিকাশ বিভিন্ন প্রকৃতির। এভাবে সকল বৃক্ষের সমাবেশ ঘটিয়ে শ্যামল ও মনোমুগ্ধকর উদ্যান সৃষ্টি করা এক আল্লাহ্ ছাড়া আর করো পক্ষে কি সম্ভব? কখনোই নয়। অতএব হে মানুষ! স্বীকার করো, সৃজন সম্পূর্ণই আল্লাহ্র। অন্য কারো নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? তবু তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্যবিচ্যুত হয়'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যে সকলের ও সকলকিছুর একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৃজয়িতা ও পালয়িতা, সে কারণে একমাত্র সমকক্ষহীন উপাস্য, এই চিরন্তন সত্যটির বিকল্প তো কিছু নেই। অথচ উন্নাসিক ও অপবিত্র অংশীবাদীরা তাদের উপাসনা নিবেদন করে অপাত্রে। এভাবে হয়ে যায় বিভ্রান্ত, সত্যবিচ্যুত। এখানে 'এমন এক সম্প্রদায়' অর্থ মক্কার মুশরিকেরা।

পরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— 'কিংবা তিনি, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং এর মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা এবং এতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়।'

এখানে 'জ্বাআ'লাল আরদ্বা ক্বারারা' অর্থ ভূপৃষ্ঠের কিছু অংশের পানি সরিয়ে দিয়ে সেই স্থানের মৃত্তিকাকে করেছেন মানুষের বাসোপযোগী। 'ওয়াজ্বাআ'লা খিলালাহা আনহারা' অর্থ ওই মৃত্তিকাখণ্ডে প্রবাহিত করে দিয়েছেন অসংখ্য জলবতী নদী। 'ওয়া জ্বআ'লালাহা রাওয়াসিয়া' অর্থ তার উপরে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত, যেনো ভূপৃষ্ঠ থাকে অচঞ্চল, সুস্থির। সেগুলো আবার করেছেন নদ-নদীর উৎস।

'বাহরাইন' অর্থ দুই দরিয়া বা দু'টি সাগর—একটি লবনাক্ত, আর একটি সুপেয়। 'হাজ্বিয' অর্থ অন্তরায়। অর্থাৎ ওই দুই সাগরের মধ্যে আবার সৃষ্টি করেছেন বাধা, প্রতিবন্ধকতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ্ আছে কি? তবুও তাদের অনেকেই তা জানে না'। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার এতোকিছু

www.eelm.weebly.com

নিদর্শন সতত দৃষ্টিগোচর হওয়া সত্ত্বেও একথা কি কেউ ভাবতে পারে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যের অস্তিত্ব আছে? অথচ অবিশ্বাসীরা কতো নিশ্চিন্ত, নির্লিপ্ত, উদাসীন। মোহাবিষ্ট অংশীবাদীদের অনেকে এই সরল রহস্যটি সম্পর্কে জানেই না। আবার জানিয়ে দিলেও মানতে চায় না।

এরপরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন'। একথার অর্থ— অথবা তিনি, যিনি আর্তের ডাক শোনেন ও পরিত্রাণার্থে সাড়া দেন, দূর করে দেন তাদের অসহায়ত্ব ও উপায়বিহীনতাকে। এভাবে উদ্ধার করেন বিপদকবলিত অবস্থা থেকে। এখানে 'দুররুন' অর্থ আর্ত, বিপদগ্রস্ত, আশ্রয়ার্থী, যারা নিরুপায় হয়ে আল্লাহ্র সকাশে পরিত্রাণ যাচ্না করে। এখানকার 'আলমুদ্বত্বররা' এর 'আলিফ লাম' (আল) জাতিবাচক। এর অর্থ সকল আর্ত জনগোষ্ঠী। 'ইজা দাআ'হু' অর্থ সাড়া দেন, অনুগ্রহ করে গ্রহণ করেন পরিত্রাণের প্রার্থনা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন'। একথার অর্থ— এবং পৃথিবীতে তোমাদের উত্তরসূরীদেরকে করেন তোমাদের পূর্বসূরীদের স্থলাভিষিক্ত, এভাবে পৃথিবীতে তোমাদের বসবাসের অধিকার নিশ্চিত হয় প্রজন্মপরম্পরায়। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— তিনিই জ্বিন জাতির পরে তোমাদেরকে দান করেন পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব। আমি বলি, কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— তিনি তোমাদের মধ্যের কিছুসংখ্যককে করেন তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি। কথাটিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করবো' আয়াতের মর্ম।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ্ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাকো'। একথার অর্থ— তাহলে বলো, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব কি? অবশ্যই নয়। কিন্তু তোমরা এমনই অগভীর চিন্তা-চেতনা ও অসুন্দর মন মানসিকতা সম্পন্ন যে, এই মহাসত্যের স্বরূপ উদঘাটনে মনোনিবেশই করতে চাও না। কিছুতেই গ্রহণ করতে চাওনা কল্যাণকর উপদেশ। এখানে 'ক্বলীলাম মা' এর 'মা' অব্যয়টির অর্থ— অতি সামান্য, যৎকিঞ্চিত, অত্যল্প। অর্থাৎ একেবারেই না। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমাদের সত্য গ্রহণের যোগ্যতা এতো কম যে, তা মূলতঃ কল্যাণ বিবর্জিত।

এরপরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'কিংবা তিনি, যিনি তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে

www.eelm.weebly.com

সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ্ আছে কি?' একথার অর্থ— কিংবা ধরো, জলে ও স্থলের ঘোর অন্ধকার রজনীতে অথবা ঘন তমসাসদৃশ বিভিন্ন প্রকার বিপদ-আপদে তোমাদেরকে নির্দেশনা দানকারী নক্ষত্রের মাধ্যমে অথবা অন্যবিধ উপায়ে পথের সন্ধান জানান অথবা তোমাদেরকে উদ্ধার করেন কে? কে সৃষ্টির প্রতি অপার মমতাবশে প্রেরণ করেন সুমন্দ মলয়? তিনিই কি সেই মহাসৃজয়িতা ও মহাপালয়িতা এক ও অবিভাজ্য আল্লাহ্ নন? তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যের অস্তিত্ব কি আদৌ সম্ভব? নিশ্চয় নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে'। একথার অর্থ— অংশীবাদীদের অংশীবাদিতার ভিত্তিহীন ও অপবিত্র ধারণা থেকে মহান আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, সতত বিমুক্ত।

এরপরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'অথবা তিনি, যিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ দান করেন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ্ আছে কি?' একথার অর্থ— কিংবা মনে করো তোমাদের নিজেদের ও সকল সৃষ্টির অস্তিত্বের কথা। তোমরা তো অস্তিত্বপ্রাপ্তির পূর্বে কিছুই ছিলে না। তোমাদের সকলের এবং সকলকিছুর অস্তিত্ব তো দিয়েছেন তিনিই। আকাশ ও পৃথিবী থেকে বিভিন্নভাবে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন তিনিই। আবার তিনিই তোমাদের অস্তিত্বকে করে চলেছেন পরিপুষ্ট ও পরিণতিমুখী। এভাবে এক সময় তোমাদের সকলকে গ্রহণ করতে হবে মৃত্যুর স্বাদ। তারপর এক সময় ঘটাবেন তোমাদের পুনরুত্থান। আর পুনরুত্থানের বিষয়টিও সুনিশ্চিত। কারণ প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি অপেক্ষা নিশ্চয় সহজ। তবে এবার বলো, এমতো সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর মহাসৃজক ও মহাপালক ব্যতিরেকে অন্য কোনো উপাস্য থাকা কি সম্ভব? নিশ্চয় নয়।

উল্লেখ্য, মানুষের জীবনোপকরণ সৃষ্টিতে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবী উভয়ের অংশগ্রহণ। যেমন আকাশের সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-মেঘমালা এবং পৃথিবীর মৃত্তিকা-সলিল-সমীরণ। শস্য উৎপাদনের সফল প্রক্রিয়ায় এগুলোর প্রত্যেকের রয়েছে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ অংশগ্রহণ। তাই এখানে বলা হয়েছে 'যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ দান করেন'।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ করো'। এখানে 'হাতু বুরহানাকুম' অর্থ প্রমাণ পেশ করো। অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যকে মানতে চাও, তবে তার স্বপক্ষে

www.eelm.weebly.com

উপস্থাপন করো তার সৃজনায়ন ও প্রতিপালনায়নের এমতো বিস্ময়কর আয়োজনের প্রমাণ। মহামূর্খ ও মহানির্বোধ তোমরা, তাই দিবালোকের চেয়ে অধিক স্পষ্ট এই বিশ্বাসটিকে গ্রহণ করতে চাওনা যে, মহাসৃষ্টির অস্তিত্বায়ন ও প্রতিপালনের ক্ষমতা, যোগ্যতা ও অধিকার সবকিছুই এককভাবে সংরক্ষণ করেন আল্লাহ্। কেবলই আল্লাহ্।

আল্লামা বাগবী লিখেছেন, একবার মক্কার মুশরিকেরা রসুল স. এর কাছে জানতে চাইলো, মোহাম্মদ! বলো, কিয়ামত কখন হবে? তাদের এমতো প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৬৫, ৬৬

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ ۫ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا ۫ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

r বল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং উহারা জানে না উহারা কখন পুনরুত্থিত হইবে।'

r 'পরলোক সম্পর্কে তো উহাদিগের জ্ঞান নিঃশেষ হইয়াছে; উহারা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ বরং এ বিষয়ে উহারা অন্ধ।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না'। এখানে 'মান ফীস্ সামাওয়াতি' (আকাশমণ্ডলীর কেউ) এবং 'মান ফীল আরদ্বি' (পৃথিবীর কেউ) বলে বুঝানো হয়েছে যথাক্রমে ফেরেশতামণ্ডলীকে এবং জ্বিন ও মানুষকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন— ফেরেশতা-জ্বিন-মানুষ কেউই জানে না অদৃশ্যের সংবাদ। এ বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান সংরক্ষণকারী কেবল আল্লাহ্। কারণ তিনিই একমাত্র আ'লীমুল গইব (অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা)। এখানে 'আল্লাহ্ ব্যতীত' কথাটির মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্তায়ালা আকাশমণ্ডলী পৃথিবী অর্থাৎ সৃষ্টির অন্তর্ভূত বা সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত কোনো সত্তা নন। তিনি স্থানাতীত, কালাতীত। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ইল্লাল্লহ্' (আল্লাহ্ ব্যতীত) বাক্যটি বিকর্তিত। আবার কেউ কেউ বলেছেন মিলিত। উল্লেখ্য, আল্লাহ্পাক দয়া করে তাঁর প্রিয়ভাজন নবী-রসুল এবং আউলিয়াকে কোনো কোনো অদৃশ্যের সংবাদ জানান। তাই আল্লাহ্র পক্ষ

www.eelm.weebly.com

থেকে প্রাপ্ত হিসেবে তারা অদৃশ্যের সংবাদ জানেন, একথা বলাতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু সাথে সাথে এ বিশ্বাসটিও রাখতে হবে যে, তারা কেউ সত্তাগতভাবে 'আ'লীমূল গইব' নন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা জানে না তারা কখন পুনরুত্থিত হবে'। একথার অর্থ— মহাপ্রলয় ও মহা পুনরুত্থান অবধারিত। কিন্তু তার সঠিক দিনক্ষণ সম্পর্কে তিনি কাউকেই জানাননি। সুতরাং তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ কিছু জানে না।

পরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'পরলোক সম্পর্কে তো তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে'। এখানকার 'ইদ্দারাকা' শব্দটির মূল রূপ ছিলো 'তাদারুক'। এর অর্থ সম্পূর্ণরূপে জানা। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পরকালের ধারণা পুরোপুরি লাভ করেছে নবীগণের মাধ্যমে। অথবা মর্মার্থ দাঁড়াবে— পরকালে যখন তারা বিচারপর্ব চাক্ষুষ করবে, তখন পুরোপুরি উন্মিলীত হবে তাদের জ্ঞান চক্ষু পৃথিবীতে যা সম্ভব নয়। 'তাদারকাল ফাকিহাতু' অর্থ ফল পেকে গিয়েছে, পৌঁছে গিয়েছে পক্কাবস্থার শেষ পর্যায়ে। অর্থাৎ ইহকালেই বিশ্বাসীগণ লাভ করেছে পরকাল সম্বন্ধীয় জ্ঞান। অবিশ্বাসীরাও একথা শুনেছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ'। একথার অর্থ— রসুল স. সর্বসমক্ষে সত্যবাদী বলে স্বীকৃত। অথচ মক্কার মুশরিকেরা তাঁর পরকাল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সংবাদে বিশ্বাস করে না। রয়ে যায় দোদুল্যচিত্ত।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'বাল ইদরাক' কথাটি প্রশ্নবোধকরূপে বিবেচ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— পরলোক সম্পর্কে কি তাদের জ্ঞান পূর্ণ হয়েছে? না, তা হয়নি। পুনরুত্থানের জ্ঞানও অর্জিত হয়নি তাদের। আর মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত চেষ্টা করলেও তারা এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারবে না। কারণ বিষয়টি তাদের যোগ্যতাবহির্ভূত। এমতো ব্যাখ্যার পরিপোষকতা রয়েছে হজরত ইবনে আব্বাসের উচ্চারণরীতিতে। তিনি পাঠ করতেন 'বালিদ্দারকা'। অর্থাৎ তিনি 'বাল' (বরং) এর স্থলে পাঠ করতেন 'বালা' (হ্যাঁ)। আর তাঁর 'আদ্দারকা' এর 'হামযা' (আ) অর্থ— 'কি' হচ্ছে প্রশ্নবোধক অব্যয়, যা মিলিত অবস্থায় পঠিত হয় 'বালিদ্দারকা'। ক্বারী উবাই পাঠ করতেন 'আমতাদারকা'। আরববাসীরা প্রায়শঃ 'বাল' ও 'আম' শব্দ দু'টো একে অপরের স্থলে ব্যবহার করে থাকেন।

আলী ইবনে ঈসা এবং ইসহাকের মতে এখানে 'বাল' ব্যবহৃত হয়েছে 'লাও' (যদি) অর্থে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— পরকালে তাদের যা জানবার, তা যদি তারা ইহকালেই জেনে নিতে পারতো, তবে তারা এভাবে সন্দেহে পতিত হতো না।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ'। এখানকার 'আ'মূন' 'উমউয়ুন' এর বহুবচন। এর অর্থ দৃষ্টিবিবর্জিত, অন্ধ। আর মর্মার্থ— অন্তর্দৃষ্টিবিবর্জিত। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শুরুতে আল্লাহ্তায়ালা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। তাঁর বক্তব্যের এই নেতিবাচকতা প্রলম্বিত ও বেগমান হয়েছে পরবর্তী বাক্যগুলোতে। অর্থাৎ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন পুনরুত্থান সম্পর্কে তাদের অনুভূতিই নেই। এরপর বক্তব্যকে প্রবাহিত করেছেন ভিন্নখাতে। সোজাসাপটা বলে দিয়েছেন— প্রমাণপঞ্জির মাধ্যমে তোমাদের অর্জিত হয়েছে কেবল এইটুকু তথ্য যে, পুনরুত্থান হবেই হবে। কিন্তু কখন হবে সে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নিঃশেষ, অকার্যকর। এরপর বক্তব্যকে আরো কিছুটা প্রলম্বিত করে বলেছেন, মহাপুনরুত্থানান্তে মহাবিচারের বিষয়টির দলিল প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা এ বিষয়ে দোদুল্যচিত্ত, সন্দিগ্ধ, যেনো তাদের হাতে কোনো প্রমাণপঞ্জিই নেই। সবশেষে কঠোর ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন— যাদের বিশ্বাস এরকম ভঙ্গুর ও বিকৃত, তাদের হৃদয় অবশ্যই দৃষ্টিহীন, অন্ধ।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতদ্বয় প্রধানতঃ উপস্থাপিত হয়েছে অংশীবাদীদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু এর বক্তব্যভূত করা হয়েছে জ্বিন-ইনসান-ফেরেশতাসহ সমগ্র সৃষ্টিকে। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, এখানে 'বাল' (বরং) শব্দটির দ্বারা তারা যে পুনরুত্থানপর্ব সম্পর্কে অনবগত সে কথা অস্বীকার করা হয়েছে। বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে বলা হয়েছে—হ্যাঁ, হ্যাঁ। পুনরুত্থানপর্ব সম্পর্কে তাদের জ্ঞান টনটনে। কোনো কোনো ভাষ্যকারের মতে এখানকার 'ইদরাক' অর্থ শেষ স্তরে উপনীতি। এরকম চূড়ান্ত উপনীতির অর্থ জ্ঞানলোপ পাওয়া। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আখেরাতের ব্যাপারে বিলোপ হয়ে গিয়েছে তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّ اٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ﴿٦٧﴾
لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ
اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُنْ فِىْ
ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ

www.eelm.weebly.com

صٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ
تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ
صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَ
الْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٥﴾

r সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, 'আমরা ও আমাদিগের পিতৃপুরুষেরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইয়া গেলেও কি আমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে?'

r 'আমাদিগকে তো এ বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে, পূর্বে আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণকেও এরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। তাহা তো সে কালের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নহে।'

r বল, 'পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদিগের পরিণাম কী হইয়াছে।'

r উহাদিগের আচরণে তুমি দুঃখ করিও না এবং উহাদিগের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ন হইও না।

r উহারা বলে 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই শাস্তি কখন ঘটিবে;

r বল, 'তোমরা যে-বিষয়ে ত্বরান্বিত করিতে চাহিতেছ সম্ভবতঃ তাহার কিছু শীঘ্রই তোমাদিগের উপর আসিয়া পড়িবে।'

r নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

r উহাদিগের অন্তর যাহা গোপন করে এবং উহারা যাহা প্রকাশ করে তাহা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন।

r আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন রহস্য নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নহে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! দেখুন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কতো নির্বোধ। তারা বলে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা মরে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আমরাও মরার পর মিশে যাবো মাটিতে। এটাই তো নিয়ম। মাটিতে মিশে যাওয়ার পরেও কি কারো পুনরুত্থান হয়? আলোচ্য আয়াতের প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ এমতো প্রশ্নের মাধ্যমে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পুনরুত্থানের ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'আমাদেরকে তো এ বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে, পূর্বে আমাদের পূর্ব পুরুষগণকেও এরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো। এতো সে কালের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নয়'। পূর্ববর্তী আয়াতে দেখা যায় তারা পুনরুত্থানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। এই আয়াতে আবার দেখা যায়, তারা বিষয়টিকে বিদ্রূপের ছলে অভিহিত করেছে উপকথা বা কল্পকথা বলে। বলেছে, পুনরুত্থানের এই কল্পকাহিনীটি নতুন কিছু নয়। আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও পুনরুত্থানের কথা বলে ভয় দেখানো হয়েছিলো। এখন আবার আমাদেরকেও দেখানো হচ্ছে ভয়। কিন্তু হে মোহাম্মদ আমরা কী এতোই বোকা যে, কিস্সা-কাহিনী শুনে ভয় পেয়ে যাবো?

এর পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'বলো, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই পুনরুত্থান-অস্বীকারকারীদেরকে বলুন, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখো, তোমাদের পূর্ববর্তী অবাধ্যদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ দেখে শিক্ষা গ্রহণ করো। সাবধান হও। নিশ্চিত জেনো, এভাবে ক্রমাগত সত্যের বিরোধিতা করলে কিন্তু তোমাদের উপরেও নেমে আসবে আল্লাহ্র গজব। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে হুমকি দেয়া হয়েছে রসুল স. এর বিরুদ্ধবাদীদেরকে। আর এখানে একই সঙ্গে এই ইঙ্গিতটিও নিহিত রয়েছে যে, যারা রসুল স. এর অনুগত বিশ্বাসী তারা নিরপরাধ।

এরপরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'তাদের আচরণে তুমি দুঃখ কোরো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনোঃক্ষুণ্ন হয়ো না'। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অস্বীকৃতির কারণে আপনি মনোক্ষুণ্ন হবেন না। তারা যতো ষড়যন্ত্র করুক না কেনো, তাতে করে উদ্বিগ্নও হবেন না। অবশেষে বিজয়ী হবেন তো আপনিই। আর তারা হবে পরাভূত। বাগবী লিখেছেন, মক্কার পৌত্তলিকেরা বিভিন্নভাবে রসুল স.কে উত্যক্ত করতো। তিনি স. এতে করে ব্যথিত হতেন। তাই তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতে (৭১) বলা হয়েছে— 'তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো, এই শাস্তি কখন ঘটবে'? একথার অর্থ— ওই পৌত্তলিকেরা রসুল স. এবং তাঁর প্রিয় সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করে বলে, বার বার তোমরা শাস্তির কথা বলো। অথচ দ্যাখো, আমরা তো নিরাপদেই রয়েছি। সুতরাং এরকম মিথ্যা দাবি আর করো না। তোমরা যদি সত্যবাদীই হয়ে থাকো, তবে বলো কখন আসবে তোমাদের কথিত শাস্তি'?

এর পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— বলো, তোমরা যে বিষয়ে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছো, সম্ভবতঃ তার কিছু শীঘ্রই তোমাদের উপর এসে পড়বে'। একথার

www.eelm.weebly.com

অর্থ— হে আমার রসুল! ওই সকল দুর্বিনীতদেরকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন, যে শাস্তির আপতন তোমরা কামনা করছো, মনে হয় সে শাস্তির কিছু অংশ প্রকাশিত হবে খুব শিগগিরই। আর তখন তোমরা সে শাস্তিকে প্রতিহতও করতে পারবে না।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত শাস্তি হচ্ছে বদর যুদ্ধের শাস্তি। আল্লামা বায়যাবী লিখেছেন, 'আ'সা' (সম্ভবতঃ), 'লায়াল্লা' (আশা করা যায়), 'সাওফা' (অচিরেই) এই কথাগুলোর মাধ্যমে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে রাজা-বাদশাহ্রা। বাহ্যত অদৃঢ় মনে হলেও কথাগুলো দৃঢ় অঙ্গীকারজ্ঞাপক। অর্থাৎ তাদের এমতো ইঙ্গিতার্থক বচনের বাস্তবায়ন অপ্রতিরোধ্য। আত্মমর্যাদা প্রকাশার্থেই তারা ব্যবহার করে এতাদৃশ ইঙ্গিত। এভাবে তারা এই উদ্দেশ্যটিই ব্যক্ত করতে চায় যে, তাদের ইশারা ইঙ্গিতও প্রকাশ্য নির্দেশের মতো অবশ্যপালনীয়। আল্লাহ্পাক তাঁর প্রবল পরাক্রম ও মর্যাদাপ্রকাশার্থে এখানে ব্যবহার করেছেন এমতো বাচনভঙ্গি। সুতরাং এখানকার 'সম্ভবতঃ তার কিছু তোমাদের উপর এসে পড়বে' কথাটির অর্থ হবে, শীঘ্রই শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার এই সংবাদটির বাস্তবায়ন অমোঘ, অনিবার্য। আরো উল্লেখ্য, বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে শাস্তির হুমকি পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক তওবার কারণে, অথবা বিনা তওবায় কেবল অনুগ্রহে তাদেরকে মার্জনাও করতে পারেন। কিন্তু অবিশ্বাসীরা ক্ষমার অযোগ্য। ফেরাউন সম্পর্কে হজরত মুসা ও হজরত হারুন এই মর্মে নির্দেশিত হয়েছিলেন যে— 'তোমরা তার সঙ্গে কথা বোলো নম্র স্বরে, যেনো সে উপদেশ গ্রহণ করে ও ভয় করে'। কথাটি ছিলো তিরস্কার প্রকাশক। তাই দেখা গিয়েছিলো, ফেরাউন উপদেশ তো গ্রহণ করেইনি, ভীতও হয়নি।

এরপরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ'। একথার অর্থ— এটা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্ মানুষের প্রতি মহাঅনুকম্পাপরবশ। তাই তিনি বিশ্বাসীদের স্খলন ক্ষমা করে দেন এবং বিলম্বিত করেন অবিশ্বাসীদের প্রাপ্য শাস্তিকে। এভাবে তাদেরকে দান করেন তওবার দীর্ঘ অবকাশ। মক্কার মুশরিকদের উপর শাস্তি বিলম্বিত হচ্ছে তো একারণেই। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন মুকাতিল।

'কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ' অর্থ— আল্লাহ্র দয়া ও দানের যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ যে অত্যাবশ্যক, অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়টি জানে না। জানলেও বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় না। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো সম্পূর্ণ অকৃতজ্ঞ। তারা আল্লাহ্র দয়ার পরিবর্তে কামনা করে তার শাস্তির। বিষয়টিকে আবার ত্বরান্বিতও করতে বলে।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, আপনার শত্রুরা তাদের মনের গহন কোণে আপনার প্রতি যে গোপন দুরভিসন্ধি পালন করে এবং প্রকাশ্যে যে শত্রুতার প্রকাশ ঘটায় তার সকলকিছুই আল্লাহ্ জানেন। আর এগুলোর জন্য তিনি যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি বিধান করবেন। সুতরাং তারা যেনো একথা মনে না করে যে, আল্লাহ্র কাছে তাদের গোপনীয়তা অজানা।

এরপরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— 'আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোনো রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই'। একথার অর্থ— আকাশ ও পৃথিবীর সকল গোপন বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে সুরক্ষিত ফলকে বা লওহে মাহফুজে। এখানে 'গইবাত' অর্থ দর্শনাতীত বিষয়, গোপন রহস্যাবলী। এখানে অনুক্ত রয়েছে একটি বিশেষণের বিশেষ্য। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— নিঃশব্দ নির্দেশ বা অদৃশ্য সিদ্ধান্তসমূহ। আর 'কিতাবুম মুবীন' অর্থ সুস্পষ্ট কিতাব— লওহে মাহফুজ।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ
يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٦﴾ وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾ اِنَّ رَبَّكَ
يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٨﴾ ۚ فَتَوَكَّلْ عَلَى
اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ﴿٧٩﴾ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ
الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٨٠﴾ وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِي الْعُمْيِ عَنْ
ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾ وَ
اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ
اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٢﴾ ع

www.eelm.weebly.com

q এই কুরআন বনি ইসরাঈল যে সব বিষয়ে মতভেদ করে তাহার অধিকাংশের বৃত্তান্ত তাহাদিগের নিকট বিবৃত করে।

q এবং নিশ্চয়ই ইহা বিশ্বাসীদিগের জন্য নির্দেশ ও দয়া।

q তোমার প্রতিপালক নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।

q অতএব আল্লাহের উপর নির্ভর কর; তুমি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

q মৃত ব্যক্তিকে তুমি তোমার কথা শুনাইতে পারিবে না, বধিরকেও পারিবে না তোমার আহ্বান শুনাইতে যখন উহারা মুখ ফিরাইয়া লয়।

q তুমি অন্ধদিগকে উহাদিগের পথভ্রষ্টতা হইতে পথে আনিতে পারিবে না। যাহারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাহারাই তোমার কথা শুনিবে। কারণ তাহারা আত্মসমর্পণকারী।

q যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদিগের নিকট আসিবে তখন আমি মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে নির্গত করিব এক জীব যাহা মানুষের সহিত কথা বলিবে। বস্তুতঃ উহারা আমার নিদর্শনে চির অবিশ্বাসী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এই কোরআন বনী ইসরাইল যে সব বিষয়ে মতভেদ করে, তার অধিকাংশের বৃত্তান্ত তাদের নিকট বিবৃত করে'। একথার অর্থ— বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের ধর্মগ্রন্থের বিধানাবলীর বিষয়ে ছিলো বহু মতবিরোধ। এই কোরআন সে সকল বিষয়কে প্রকটিত করেছে, সেই সঙ্গে দিয়েছে সেগুলোর অধিকাংশের সুষ্ঠু সমাধান।

পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় এটা বিশ্বাসীদের জন্য নির্দেশ ও দয়া'। একথার অর্থ— কোরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারে কেবল বিশ্বাসবানেরা। সেকারণেই কোরআন হচ্ছে তাদের জন্য যথানির্দেশনা ও করুণা। কিন্তু অবিশ্বাসীদের জন্য কোরআন এরকম উপকারী নয়, সে অবিশ্বাসী গ্রন্থধারী হলেও।

এরপরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক তাঁর চিরন্তন বিধানানুসারে ইহুদীদের বিরোধিতার ব্যাপারে যথোপযুক্ত মীমাংসা অবশ্যই করবেন। আর এ ব্যাপারে তারা কিছু বলবার বা করবার অবকাশও পাবে না। এমতো মীমাংসার সুফল, কুফল এবং গুঢ় তত্ত্ব জানেন কেবল তিনিই। কারণ তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ। এখানে 'ইয়াকৃদ্বী' অর্থ মীমাংসা করবেন। অর্থাৎ চূড়ান্ত মীমাংসা করবেন মহাবিচারের দিবসে। 'বাইনাহুম' অর্থ ধর্মীয় বিষয়ে তাদের পারস্পরিক মতানৈক্যের।

www.eelm.weebly.com

একটি সন্দেহ ঃ 'ইয়াক্বদ্বী' অর্থ মীমাংসা করবেন। কথাটি ধাত্যর্থে দ্ব্যর্থবোধক। আর 'কৃদ্বা'ও 'হুকুম' সমার্থক। অথচ, আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে 'ইয়াক্বদ্বী বি হুকমিহী'। যেমন বলা যেতে পারে 'ইয়াহকুমু বিহুকমিহী'। আর এরকম শব্দ বিন্যাস রীতিবিরুদ্ধ।

সন্দেহের অপনোদন ঃ 'হুকুম' অর্থ 'মাহকুম' (আদিষ্ট বিষয়)। যেমন 'সমাধানযোগ্য' অর্থ, যার সমাধান দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় যদি এখানকার 'হুকুম' কে বলা হয় কোরআন নির্দেশিত সমাধান, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ মীমাংসা করবেন কোরআনের সমাধানানুসারে। কথাটির মর্মার্থ এভাবে দাঁড় করালে রীতিবিরুদ্ধতার সন্দেহ আর থাকেই বা কোথায়?

এরপরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'অতএব আল্লাহ্র উপর নির্ভর করো, তুমি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আল্লাহ্র উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে আপনি আপনার অগ্রযাত্রাকে রাখুন সতত সচল। বিরুদ্ধাচারীদের পরওয়া করবেনই না। আপনি তো দিবালোক অপেক্ষা অধিক স্পষ্টরূপে সত্যাধিষ্ঠিত। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সত্যাশ্রয়ীদের উচিত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্নির্ভর হওয়া।

এরপরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে— 'মৃতকে তুমি তোমার কথা শোনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না তোমার আহ্বান শোনাতে, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের হৃদয় মৃত। আর তাদের শ্রবণেন্দ্রিয় সত্যোচ্চারণ শ্রবণের অযোগ্য। সুতরাং আপনি তাদের মরমে কোরআনের বাণী প্রবেশ করাবেন কীভাবে? কীভাবেই বা কোরআন আবৃত্তির দ্বারা তাদের শ্রুতিকে করবেন সচকিত? অধিকন্তু যদি তাদের বৈমুখ্য হয় অনড়?

একটি প্রশ্নঃ বধিরেরা তো কোনো কিছু শুনতেই পায় না, তারা মুখ ফিরিয়ে নিক, অথবা না নিক। তবু এখানে 'যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়'— এমন বলা হলো কেনো?

উত্তর ঃ বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্ব ও দৃঢ়তা প্রদানার্থেই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এমতো বক্তব্য ভঙ্গি। কেউ কেউ বলেছেন, বধিরেরা বক্তার মুখোমুখি হলে তাদের ওষ্ঠ সঞ্চালন, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদির মাধ্যমে অনেককিছুই বুঝে নিতে পারে। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিলে সেটুকুও বুঝবার অবকাশ থাকে না। তাই 'যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়' কথাটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে চরম বীতশ্রদ্ধা প্রকাশক অভিব্যক্তিকে। অর্থাৎ তারা সত্যের আমন্ত্রণের প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের বীতস্পৃহ।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'তুমি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথে আনতে পারবে না। যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তারাই তোমার কথা শুনবে। কারণ তারা আত্মসমর্পণকারী'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! অবিশ্বাসীদের হৃদয়চক্ষু অন্ধ। সুতরাং আপনি তাদেরকে কখনোই দেখাতে পারবেন না সত্যের স্বরূপ। আপনার কোরআনের আবৃত্তি দ্বারা উপকার গ্রহণ করতে পারবে কেবল তারা, যারা বিশ্বাসী, আত্মসমর্পিত। সত্যের স্বরূপ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয় কেবল তাদেরই। কারণ তারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।

এরপরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট আসবে তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ থেকে নির্গত করবো এক জীব, যা মানুষের সঙ্গে কথা বলবে'।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, 'দাব্বাতুল আরদ্ব' বা মৃত্তিকাগর্ভ থেকে নির্গত ওই জীবটি হবে শ্মশ্রুবিশিষ্ট এবং পুচ্ছহীন। একথায় প্রতীয়মান হয় যে. ওই অদ্ভুত প্রাণীটি হবে মনুষ্যজাতীয়। কিন্তু অধিকাংশ ভাষ্যকারের মতে প্রাণীটি হবে চতুষ্পদ পশুজাতীয়। আবদ ইবনে হুমাইদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রাণীটি হবে পশম ও রঙবেরঙের পালকাবৃত এবং চতুষ্পদ। অকস্মাৎ একদিন তার অভ্যুদয় ঘটবে হজযাত্রীদের পশ্চাৎ দিক থেকে। ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু যোবায়ের বলেছেন, তার মাথা হবে ষাঁড়ের মাথার মতো। চোখ শকুনের মতো। শিঙ হবে বারোটি শিঙের সমান। আর তার বক্ষদেশ হবে সিংহের বক্ষদেশের মতো। রঙ নেকড়ের রঙের মতো। মস্তিষ্কের আকৃতি বিড়ালের মাথার মতো। লেজ মেষের লেজের মতো এবং পা হবে উটের পায়ের মতো। গ্রন্থিগুলোর মধ্যে থাকবে বারো হাতের ব্যবধান। তার নিকট থাকবে হজরত মুসার যষ্টি এবং হজরত সুলায়মানের অঙ্গুরীয়। ওই যষ্টির অগ্রভাগ দিয়ে সে বিশ্বাসীদের ললাটদেশে দাগ এঁকে দিবে। ফলে তাদের মুখাবয়ব হয়ে উঠবে সমুজ্জ্বল। আর হজরত সুলায়মানের আঙটি দিয়ে সে দাগ দিবে অবিশ্বাসীদের কপালে। ফলে তাদের চেহারা ধারণ করবে কৃষবর্ণ। হাটে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় কালে তখন একে অপরকে সহজভাবে সম্বোধন করবে 'হে মুমিন! এটার দাম কতো' অথবা 'ওহে কাফের! কতো মূল্য এই জিনিসটির'? আবার সে মানুষকে 'জান্নাতী এবং জাহান্নামী' অভিধায়ও চিহ্নিত করে ফেলবে।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, দাব্বাতুল আরদ্বের সমাগম ঘটবে কোনো এক গিরিপথ দিয়ে। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর জানিয়েছেন, দাব্বাতুল আরদ্ব আত্মপ্রকাশ করবে সাফা-মারওয়া

www.eelm.weebly.com

পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক ফাটল থেকে। মেঘের মতো উঁচুতে থাকবে তার মাথা, আর পা চারটি থাকবে মৃত্তিকায় প্রোথিত। নামাজ পাঠকারীদের পাশ দিয়ে গমনকালে সে বলবে, ওহে নামাজী! নামাজের আর কী প্রয়োজন? এরপর সে চিহ্ন এঁকে দিবে তাদের ললাটে ও নাসিকায়।

হজরত আবু শুরাইহা আনসারী থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, মোট তিনবার অভ্যুদয় ঘটবে দাব্বাতুল আরদ্বের । একবার সে বের হবে ইয়েমেন থেকে। তার আবির্ভাবের সংবাদে শোরগোল পড়ে যাবে পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও। মক্কা পর্যন্তও পৌঁছে যাবে তার আত্মপ্রকাশের সংবাদ। শেষে সে উপনীত হবে মসজিদে হারামে। মসজিদের সমবেত জনতা হঠাৎ দেখতে পাবে তাকে। বর্ণনাকারী বলেন, রুকনে আসওয়াদ ও বাবে বনী মাখজুমের মধ্যবর্তী স্থানে দৃষ্টিগোচর হবে তার উপস্থিতি। সে দৃষ্টিপাত করবে প্রত্যেকের দিকে। কেউ কেউ ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি শুরু করে দিবে। আবার কেউ কেউ তার সম্মুখেই গ্রহণ করবে দৃঢ় অবস্থান। তারা ধরেই নিবে, আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায় অবশ্যই কার্যকর হবে, পালিয়ে গেলেও। সুতরাং স্বস্থানে অনড় থাকাই শ্রেয়। দাব্বাতুল আরদ্ব তার মাথার ধূলি ঝাড়তে ঝাড়তে ওই সকল লোকের দিকে অগ্রসর হবে। তাদের মুখমণ্ডলে এঁকে দিবে বিশেষ চিহ্ন। ফলে তাদের মুখাবয়ব সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে আকাশের তারকার মতো। এরপর দ্রুত পথ চলতে শুরু করবে মৃত্তিকা বিদীর্ণ করে। কেউ তাকে এড়াতেও পারবে না, আবার পালাতেও পারবে না কেউ তার খপ্পর থেকে। তাকে দেখলেই লোকজন দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করে দিবে। তৃতীয়বার সে নিজেকে প্রকাশ করবে একদল নামাজীর পিছন দিক থেকে। বলবে, হে নামাজীরা! তোমরা এতক্ষণে নামাজ আদায় করছো। এই বলে সে এগিয়ে যাবে তাদের সম্মুখে এবং তাদের কপালে এঁকে দিবে সৌভাগ্যের রাজটিকা। এরপর থেকে মানুষের বসবাসে নেমে আসবে শান্তি ও সম্প্রীতি। তারা পরস্পরের প্রতি হবে একান্ত আন্তরিক। কিন্তু স্পষ্টরূপে চিহ্নিত হয়ে পড়বে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা। বিশ্বাসীরা সরাসরি সম্বোধিত হতে থাকবে 'মুমিন' বলে, আর অবিশ্বাসীদেরকে ডাকা হবে 'কাফের' বলে।

হজরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামিন বর্ণনা করেন, একবার রসুল স. এর সম্মুখে দাব্বাতুল আরদ্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হলে তিনি স. বললেন, তার আবির্ভাব ঘটবে মহিমান্বিত মসজিদ থেকে। নবী ঈসা তখন থাকবেন তাওয়াফরত অবস্থায়। তাঁর অসংখ্য অনুচরের পদভারে তখন প্রদীপশিখার মতো কাঁপতে থাকবে সেখানকার মাটি। ঠিক তখনই সাফা পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্ত বিদীর্ণ করে বের হয়ে আসবে সে। প্রথমে বের হবে তার মাথা। তারপর সমস্ত শরীর। দেখা

www.eelm.weebly.com

যাবে তার সারা শরীর পশম ও পালকে আচ্ছাদিত। কেউ তার অগ্রযাত্রা রোধ করতে পারবে না। পালাতেও পারবে না কেউ তার আওতা থেকে। জনতাকে সে চিহ্নিত করবে 'মুমিন' ও 'কাফের' এই দু'টি দলে। মুমিনদের মুখাকৃতি হবে নক্ষত্রসদৃশ উজ্জ্বল, আর কাফেরদের মুখমণ্ডল ধারণ করবে কৃষ্ণবর্ণ। আলো ও অন্ধকার ছড়িয়ে পড়বে তাদের দুই চোখের মধ্যস্থলের চিহ্নিত দাগ থেকে। কপালে লেখা থাকবে যথাক্রমে 'মুমিন' ও 'কাফের'। এরকম বর্ণনা করেছেন বাগবী এবং ইবনে জারীর। সহল ইবনে সালেহ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. একবার দুই অথবা তিনবার উল্লেখ করলেন, হান্নাদের পার্বত্যপথটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্বত্যপথ। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! কী কারণে ? তিনি স. বললেন, ওখান থেকে অভ্যুদয় ঘটবে দাব্বাতুল আরদ্বের। আত্মপ্রকাশের পরক্ষণে সে হুংকার ছাড়বে তিনটি। সে হুংকার শুনতে পাবে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকলেই। তার মুখাকৃতি হবে মানুষের মতো। আর অবশিষ্ট দেহ হবে পাখির দেহের মতো। যাকে সে সামনে পাবে, তাকেই বলবে, মক্কাবাসীরা তাদের রসুল এবং কোরআনের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো না।

'যা মানুষের সঙ্গে কথা বলবে' অর্থ ওই অদ্ভুত প্রাণীটি মানুষের সঙ্গে খোলামেলা কথাবার্তা বলবে। সুদ্দী বলেছেন, সে বলবে, ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম বাতিল। কেউ কেউ বলেছেন, সে কাউকে দেখে বলবে, এ লোক বিশ্বাসী, আবার কাউকে দেখে বলবে, এই লোকটি হচ্ছে অবিশ্বাসী। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে।

এরপর বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ উহারা আমার নিদর্শনে ছিলো অবিশ্বাসী'। মুকাতিল বলেছেন, সে কথা বলবে আরবী ভাষায়। আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে ঘোষণা করবে, অবশ্যই জনতা ছিলো আমার নিদর্শনে অপ্রত্যয়ী। অতীতের প্রসঙ্গ তুলে সে বলবে, মক্কাবাসীরা কোরআন ও কিয়ামতে আস্থা রাখতো না।

এখানকার 'আন্না' উচ্চারণরীতিটি কুফাবাসীদের। মুকাতিলের উক্তি এই উচ্চারণরীতিনির্ভর। আর যারা আলোচ্য বচনটিকে দাব্বার বচন বলে থাকেন, তাঁরাও উচ্চারণ করেন 'আন্নান্নাসা'। তবে জমহুরের উচ্চারণ হচ্ছে 'ইন্নান্নাসা'। এই উচ্চারণটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, আলোচ্য উক্তিটি একটি পৃথক বাক্য। এমতাবস্থায় এর মর্মার্থ দাঁড়ায় দাব্বাতুল আরদ্বের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ আমার নিদর্শনের উপরে বিশ্বাস রাখতো না। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'নিদর্শন' অর্থ দাব্বাতুল আরদ্বের অভ্যুদয়ন, যা কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, দাব্বাতুল আরদ্বের অভ্যুদয় ঘটবে তখন, যখন বন্ধ হয়ে যাবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের কার্যক্রম।

www.eelm.weebly.com

শায়েখ জালালউদ্দিন মাহাল্লী বলেছেন, দাব্বাতুল আরদ্বের আত্মপ্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যাবে সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের নিষেধের প্রক্রিয়া। ওই সময়ের পর থেকে কোনো কাফের আর ইমান আনবে না, যেমন আল্লাহ্তায়ালা একসময় হজরত নুহকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, যারা বিশ্বাসী হওয়ার কথা, তারা বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছে, এরপর থেকে কোনো অবিশ্বাসী আর বিশ্বাসী হবে না। আমি বলি, বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটেছে বিভিন্ন হাদিস ও আছারের (সাহাবীবচনের) মাধ্যমে। যেমন রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, ছয়টি বিষয়ের প্রকাশ হওয়ার পূর্বে তোমরা যতো বেশী পারো পুণ্য কর্ম করে নিয়ো। ওই ছয়টি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে— ধোঁয়া, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ্ব এবং পশ্চিম দিকের সূর্যোদয়।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বলেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, মহাপ্রলয়ের প্রথম আগমনী সংকেত হচ্ছে পশ্চিম দিগন্তের সূর্যোদয়। তারপর বেলা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ঘটবে দাব্বাতুল আরদ্বের আবির্ভাব। এ দু'টোর মধ্যে একটির পরক্ষণেই ঘটবে অপরটি। মুসলিম। হজরত হুজায়ফা ইবনে আসাদ গিফারী বলেছেন, আমরা কয়েকজন মিলে মগ্ন ছিলাম মহাপ্রলয় সম্পর্কিত আলাপচারিতায়। সহসা সেখানে উপস্থিত হলেন রসুল স. স্বয়ং। তিনি স. বললেন, তোমরা কী নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছো? আমরা বললাম, কিয়ামত সম্পর্কে। তিনি স. বললেন, জেনে রেখো, মহাপ্রলয়ের প্রাক্কালে সংঘটিত হবে দশটি বিষয়। সে দশটি বিষয় হচ্ছে— ১. ধুম্রমেঘে আচ্ছাদিত হবে আকাশ ২. আবির্ভূত হবে দাজ্জাল ৩. দাব্বাতুল আরদ্ব ৪. মরিয়মতনয় ঈসা ৫. ইয়াজুজ মাজুজ ৬. সূর্য উঠবে পশ্চিম দিকে ৭. ধস নামবে পৃথিবীর তিনটি স্থানে— প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে ও আরব উপদ্বীপে ৮. ইয়েমেন থেকে উদগত হবে একটি অগ্নি, ওই অগ্নি সকলকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে হাশর প্রান্তরের দিকে ৯. বর্ণনান্তরে উল্লেখ— অগ্নি পরিদৃশ্যমান হবে ইডেনের একটি কূপে এবং ১০. অপর বর্ণনানুসারে— একজন দৃষ্টিহীনকে নিক্ষেপ করা হবে সমুদ্রবক্ষে। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ওই সময় আত্মপ্রকাশ করবে দাব্বাহ। তার কাছে থাকবে রসুল মুসার লাঠি এবং নবী সুলায়মানের আঙটি। ওই লাঠির ছোঁয়ায় জ্যোতির্ময় হবে বিশ্বাসীদের বদন এবং অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডল হবে কৃষ্ণাভ। তখন মানুষ একে অপরকে সম্বোধন করবে 'হে বিশ্বাসী' 'হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী'— এভাবে। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম।

হজরত আবু উমামা বাহেলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দাব্বাতুল আরদ্ব আবির্ভূত হয়ে মানুষের নাসিকায় এঁকে দিবে বিশেষ চিহ্ন। এরপরেও তারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে কিছুকাল। পশুক্রয়কারী কাউকে যদি কেউ প্রশ্ন করে, কার নিকট থেকে ক্রয় করলে? সে উত্তর দিবে, একজন চিহ্নিত লোকের কাছ থেকে।

www.eelm.weebly.com

এরকমই দাঁড়াবে তখনকার অবস্থা। আহমদ। হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দাব্‌বাতুল আরদ্ব সমুদ্ভূত হবে শুক্রবার রাতে। সে অগ্রসর হতে থাকবে মীনা প্রান্তরের দিকে। ইবনে আবী শায়বা, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, রসুল মুসা একবার দাব্‌বাতুল আরদ্ব দর্শনের প্রার্থনা করলেন। তাঁর প্রার্থনানুসারে তিন দিন তিন রাত্রির জন্য অভ্যুদয় ঘটেছিলো দাব্‌বাতুল আরদ্বের। সে ছিলো ভয়ংকরদর্শন ও বিশাল বপুধারী। রসুল মুসা তার অপসারণের জন্য পুনঃ প্রার্থনা জানালেন। আল্লাহ্‌পাকও তাকে উঠিয়ে নিলেন।

আমি বলি, এ সকল হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, দাব্‌বাতুল আরদ্ব ওই সময় প্রকৃত বিশ্বাসী ও কপটাচারীদেরকে সুচিহ্নিত করবেন। সে কাউকে ‘জাহান্নামী’ বললে তার জাহান্নামবাস হয়ে পড়বে অনিবার্য। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, তাদের ওই জাহান্নামবাস চিরস্থায়ী হবে না। কারণ তাদেরকে ‘কাফের’ বলা হবে রূপক অর্থে, প্রকৃত অর্থে নয়। অর্থাৎ তারা হবে কাফেরতুল্য, পাপী। কিন্তু প্রকৃত কাফের তারা হবে না। কারণ মক্কা বিজয়ের পর থেকে কোনো প্রকৃত কাফের মক্কাবাসী হয়নি, হবেও না। সুতরাং কাফের ও ইমানদারের প্রার্থক্যকরণের কাজটি সেখানে ঘটবে না। ঘটবে অন্যত্র।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৮৩, ৮৪, ৮৫

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾ حَتّٰٓى إِذَا جَآءُوْ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِيْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٥﴾

r স্মরণ কর সেই দিনের কথা, যেই দিন আমি সমবেত করিব এক একটি দলকে সেই সমস্ত সম্প্রদায় হইতে যাহারা আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করিত এবং উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইবে বিভিন্ন ব্যূহে।

r যখন উহারা সমাগত হইবে তখন আল্লাহ্ উহাদিগকে বলিবেন, ‘তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে, যদিও এ বিষয় তোমাদিগের জ্ঞানগম্য ছিল না? না তোমরা অন্য কিছু করিতেছিলে?

r সীমালংঘন হেতু উহাদিগের উপর ঘোষিত শাস্তি আসিয়া পড়িবে; ফলে উহারা বাক-শক্তি রহিত হইয়া পড়িবে।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! মহাবিচারের দিবসের সেই ভয়াবহ দিবসের কথা স্মরণ করুন। তখন আমি সকল মানুষকে একত্র করবো। আর যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করতো তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখবো দলে দলে।

এখানে 'উম্মাত' অর্থ যুগ, বিভিন্ন যুগের নবীগণের উম্মত। উল্লেখ্য, ওই সময় সকল মানুষকে সমবেত করার পর আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমকে বলবেন, তুমি তোমার বংশধরদের মধ্যে জাহান্নামীদেরকে পৃথক করে ফেলো। সুরা হজের তাফসীরে যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

'ইয়ুযাউন' অর্থ সংঘবদ্ধ করা হবে বিভিন্ন ব্যুহে। বায়যাবী লিখেছেন, একথার অর্থ তাদের সংখ্যা হবে অত্যধিক। আর বিভিন্ন ব্যুহে আবদ্ধ ওই সংঘবদ্ধ দলগুলি বিস্তৃত হয়ে পড়বে বহুদূর পর্যন্ত।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'যখন তারা সমাগত হবে তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, যদিও এ বিষয়ে তোমাদের জ্ঞানগম্য ছিলো না? না তোমরা অন্য কিছু করেছিলে?' এ কথার অর্থ— তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, তোমরা আমার নিদর্শনাবলীর বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা মাত্রই করবে না, এরকম চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই কি পৃথিবীতে নিয়েছিলে? যদি এতটুকুও ভাবতে, তবে প্রকৃত তত্ত্ব হতো তোমাদের জ্ঞানায়ত্ব। অথবা মর্মার্থ হবে— তোমরা সরাসরি অস্বীকার করে বসেছিলে আমার নিদর্শনরাজিকে, অথচ একটি বারের জন্য ভেবে দেখলে না, সেগুলো গ্রহণযোগ্য না গ্রহণযোগ্য নয়? এখানকার প্রশ্নটি তিরস্কারসূচক। 'না তোমরা অন্য কিছু করেছিলে' প্রশ্নটিতেও রয়েছে ধমকের সুর। আলোচ্য আয়াতের কিছু কথা রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ত বক্তব্যসহ আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— সেদিন তাদেরকে বলা হবে, ধরা যাক তোমরা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অসত্যারোপ করোনি। যদি তাই হয়, তবে প্রশ্ন করি, তাহলে তোমরা করেছিলেটা কী? বলো, কী করেছিলে? উল্লেখ্য, এভাবে প্রশ্ন করা হবে বলেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হয়ে যাবে নিরুত্তর। এরকমও বলতে পারবে না যে, আমরা ঠিক অসত্যারোপ করিনি, ভেবেছিলাম .... ভেবেছিলাম.....।

এরপরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'সীমালংঘন হেতু তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে, ফলে তারা বাকশক্তি রহিত হয়ে পড়বে'। এ কথার অর্থ— এরপর তাদের উপরে আপতিত হবে ঘোষিত শাস্তি। ফলে তারা তখন আর কোনো অনুযোগই উপস্থাপনের অবকাশ পাবে না। হয়ে যাবে নির্বাক। অর্থাৎ

www.eelm.weebly.com

অনুযোগ উত্থাপনের কোনো অবলম্বনই তাদের থাকবে না। অথবা কৈফিয়ত প্রদর্শনের কোনো অনুমতিই তারা তখন পাবে না। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের মুখে তখন সিলমোহর করে দেয়া হবে। তাই তখন তাদের রসনা হয়ে যাবে রুদ্ধ। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তখন শাস্তির ভয়াবহতা দর্শনে অনুযোগ উত্থাপনের কোনো খেয়ালই তাদের আর থাকবে না। অবশ্য প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই অধিকতর প্রাসঙ্গিক ও পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৮৬, ৮৭

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَ كُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿٨٧﴾

r উহারা কি অনুধাবন করে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছি উহাদিগের বিশ্রামের জন্য এবং দিবসকে করিয়াছি আলোকজ্জ্বল। ইহাতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

r এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেই দিন আল্লাহ্ যাহাদিগকে ভীতিগ্রস্ত করিতে চাহিবেন না, তাহারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়িবে এবং সকলেই তাঁহার নিকট আসিবে লাঞ্ছিত অবস্থায়।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— দিবস-বিভাবরীর চক্রাবর্তনের নিখুঁত নিয়মটির ব্যাপারে তারা চিন্তা-ভাবনা করে না কেনো? আঁধার রাতের বিশ্রাম এবং আলোকজ্জ্বল দিনের কর্মযোগ— এ সকলকিছুর সুযোগ তো করে দিয়েছি আমিই। নির্বোধ তারা। সেই সাথে অবিশ্বাসীও। তাই এ অনন্য নিদর্শনের মাধ্যমে ও নিয়মে পথের স্রষ্টার পরিচয় পায় না। অথচ বিশ্বাসীরা জ্ঞানবান। তাই তারাই কেবল এ অনন্য নিদর্শন দর্শনে অভিভূত হয় এবং সন্ধান পায় প্রকৃত সত্যের।

এখানে 'আলাম ইয়ারাও' অর্থ তারা কি দ্যাখে না? অর্থাৎ তারা কি এই বিস্ময়কর নিদর্শনটি অবলোকন করা সত্ত্বেও প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করে না? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এমতো অস্বীকৃতিজ্ঞাপকতা বা নেতিবাচকতা থেকে উৎপত্তি ঘটে ইতিবাচকতার। অর্থাৎ তারা দেখেছে ও অনুধাবন করেছে ঠিকই, কিন্তু তাকে গ্রহণ করেনি।

www.eelm.weebly.com

‘জ্বাআলনা’ অর্থ এখানে ‘খলাক্বনা’ (আমি সৃষ্টি করেছি)। ‘লি ইয়াসকুনু’ অর্থ যেনো বিশ্রাম গ্রহণ করে, ঢলে পড়ে সুপ্তির ক্রোড়ে। ‘মুবসিরান’ অর্থ আলোকোজ্জ্বল, পরিদৃশ্যমান। দিবস নিজে দ্যাখে না, দেখতে সাহায্য করে। দিবসের আলোকোজ্জ্বলতা বিকাশ ঘটায় দৃষ্টিশক্তির। সেকারণেই দিবসকে করা হয়েছে আলোকোজ্জ্বল। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— তারা কি অবগত নয়, আলো-আঁধারের এই আশ্চর্যজনক চক্রাবর্তনের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চয় কেউ করেন। তিনিই তো প্রকৃত কর্তা, সমগ্রসৃষ্টির অধিকর্তা, স্রষ্টা। তিনিই তো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী। তাঁর উপাসনার প্রতি পথপ্রদর্শনার্থে তিনিই তো নবী-রসুল প্রেরণের একক ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন, করতে পারেন। তিনিই তো নির্ধারণ করতে পারেন যথোপযুক্ত পুরস্কার ও তিরস্কার। জীবন-মৃত্যু-মৃত্যুপরবর্তী জীবন এ সকল কিছু তো সম্পূর্ণতই তাঁর অমোঘ নির্ধারণ। এ সকল বিষয়ই তো প্রমাণ করে যে, তিনিই সত্য এবং সত্য তাঁর প্রেরিত পুরুষগণ। এভাবে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরেও কি তা প্রত্যাখ্যানের অবকাশ থাকে? থাকে কি সত্যবিমুখতার পক্ষের কোনো অনুযোগ? নিশ্চয় নয়। সুতরাং সত্যের স্বীকৃতি প্রদান একটি অনিবার্য দায়িত্ব। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এ দায়িত্ব পালনে পরান্মুখ। আর বিশ্বাসীরা দায়িত্বসচেতন। তাই তো এমতো নিদর্শন কেবল তাদের জন্যই উপকারপ্রদায়ক।

পরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— ‘এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন আল্লাহ্ যাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না, তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে’।

একবার এক বেদুইন রসুল স. সকাশে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! বলুন, শিংগা কী? তিনি স. বললেন, শিংগা একটি শিঙ, যাতে ফুঁ দেয়া হবে। আবু দাউদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। এরকম বর্ণনা এসেছে নাসাঈ, ইবনে হাব্বান ও হাকেমের মাধ্যমেও। হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন মুসাদ্দাদ।

হজরত যায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি স্বস্তি পাই কীরূপে। যখন শিংগাধারী তার শিংগা নিয়ে নির্দেশপ্রাপ্তির জন্য অপেক্ষিত ও উৎকর্ণ। উপস্থিত সাহাবীগণ এমতো বক্তব্যে বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। এরপর রসুল স. পাঠ করলেন— ‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি’মাল ওয়াকীল’ (আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি উত্তম আশ্রয়স্থল)। এই হাদিসটিই আহমদ, হাকেম, বায়হাকী ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। তিরমিজি, হাকেম ও বায়হাকী হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এবং আবু নাঈম হজরত জাবের থেকে।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে সাঈদ ইবনে মনসুর ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শিংগাধারী ইস্রাফিলের দক্ষিণে ও বামে অবস্থান করে যথাক্রমে জিবরাইল ও মীকাইল। কুরতুবী লিখেছেন, সকল নবী রসুলের ঐকমত্য এই যে, শিংগায় ফুৎকার দিবেন হজরত ইস্রাফিল।

আল্লাহ্তায়ালা ইচ্ছাময়, চিরমুক্ত ও চিরস্বাধীন অভিপ্রায়ধারী। সকলে এবং সকলকিছুই তাঁর অভিপ্রায়ভূত। আর মহাপুনরুত্থানের সময় তিনি কাউকে কাউকে মুক্ত রাখবেন ভীতিপ্রদ অবস্থা থেকে। আর অবশিষ্টদেরকে করবেন ভীত-সন্ত্রস্ত ও লাঞ্ছিত। তাই এখানে বলা হয়েছে— আল্লাহ্ যাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না, তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই সেদিন হয়ে পড়বে ভীত-সন্ত্রস্ত। আর তাদেরকে বিচারের ময়দানে আনা হবে চরম অপদস্থ অবস্থায়। অর্থাৎ ভীতিমুক্ত থাকবেন ফেরেশতা ও পুণ্যবান মানুষ। আর ভীত ও অপমানিত হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপীরা।

শিংগার ফুৎকারের সংখ্যা সম্পর্কে বিদ্বজ্জনেরা একমত হতে পারেননি। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম ফুৎকার শুনে সৃষ্টিকুল হয়ে পড়বে ভীত-সন্ত্রস্ত। দ্বিতীয় ফুৎকার শুনে তারা হারিয়ে ফেলবে জ্ঞান, এভাবেই ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। তৃতীয় ফুৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঘটবে তাদের পুনরুত্থান। সকলেই পুনর্জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে আপনাপন সমাধিস্থলে। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে প্রথম ফুৎকারের কথা। অপর এক আয়াতে মৃত্যুপ্রদায়ক ও পুনরুত্থানসংঘটক ফুৎকারের কথা বলা হয়েছে এভাবে— 'আর ফুৎকার দেয়া হবে শিংগায়। ফলে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সকলে হারিয়ে ফেলবে জ্ঞান। তবে আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা করবেন (সে থাকবে সজ্ঞান)। অতঃপর ফুৎকার হবে দ্বিতীয়বার। তখন দেখা যাবে তারা দণ্ডায়মান অবস্থায়'। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন ইবনে আরাবী। আর তিনটি ফুৎকারের বিবরণ এসেছে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে। অচিরেই আমরা হাদিসটি উপস্থাপন করবো।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, একই সঙ্গে শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে দু'বার। তার মধ্যে অধিকতর বিভীষিকাপূর্ণ ফুৎকারটি হবে মৃত্যুপ্রদায়ক ফুৎকার। তাঁদের ধারণা ফুৎকার হবে একটি, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হবে দু'টি। কুরতুবী বলেছেন, সিদ্ধান্তটি যথার্থ। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি বলেছেন, অতি বিভীষাকাপূর্ণ ফুৎকার থেকে পৃথক করা হয়েছে 'ইল্লা মা শাআল্লাহ্' (আল্লাহ্ যাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না) কথাটিকে। এতেকরে প্রমাণিত হয় যে, পৃথক পৃথক সময়ে ফুৎকার দেয়া হবে না। একই সঙ্গে ফুৎকার ধ্বনিত হবে দু'টি অথবা তিনটি।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, প্রমাণটি যথাযথ নয়। কারণ এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, দু'টি ফুৎকার পর্যবসিত হবে একটি ফুৎকারে। আবার বাক্য দুটির ব্যতিহার দু'টো এক, দুই নয়। তবে দু'টি স্থল থেকে পৃথক করার অর্থ আবার এমনও নয় যে, ব্যতিহার দু'টি একাকার।

বাগবী লিখেছেন, কারা এই ব্যতিক্রমের বৃত্তভূত হবেন, সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে রয়েছে মতদ্বৈধতা। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আল্লাহ্ সেদিন যাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না, তারা কারা? তিনি স. বললেন, শাহাদত বরণকারীরা, যেহেতু তারা আল্লাহ্‌র সন্নিধানধন্য চিরঞ্জীব। তাই ইসরাফিলের শিংগাধ্বনি তাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে পারবে না। এ বিষয়ে কালাবী এবং মুকাতিলের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন বাগবী। একটু পরেই সে আলোচনা শুরু হবে। কিন্তু বাগবীর এখানকার এই বক্তব্যটির মাধ্যমে জানা গেলো, আতংকসঞ্চারক ও প্রাণ সংহারক ফুৎকার পৃথক পৃথক নয়, বরং একটি। তবে ফুৎকার যে আসলে দু'টি হবে, সে কথাও অস্বীকার করার জো নেই।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু ইয়ালী, বায়হাকী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, একবার আমি ভ্রাতা জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলাম 'এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন আল্লাহ্ যাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না, তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়বে' এই আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করুন। তিনি বললেন, ভীতিগ্রস্ত হবে না বিদ্বানগণ ও শহীদগণ— তারা তখন আশ্রয় লাভ করবে ঝুলন্ত কৃপাণ বেষ্টিত আরশের। কারণ তারা পেয়েছে আল্লাহ্‌র সন্নিধানধন্য চিরন্তন জীবন। বিভিন্ন সাহাবীবচন থেকে বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্পাক স্বঅভিপ্রায়ে শহীদগণকে মুক্ত রাখবেন জ্ঞান বিলোপক শিংগা-হুংকার থেকে। সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে হান্নাদ ইবনে সাররা ও বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন নুহাস তাঁর 'মানাযীলুল কোরআন' গ্রন্থে।

কালাবী ও মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্পাক যাদেরকে সেদিন শিংগায় ভীতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবেন, তাঁরা হচ্ছেন ত্রয়ী ফেরেশতা— জিবরাইল, আজরাইল ও ইসরাফিল। ফারইয়াবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার এক সমাবেশে রসুল স. আলোচ্য আয়াত পাঠ করলেন 'ইল্লা মান শাআল্লাহ্' পর্যন্ত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ওই ভীতিবিমুক্ত কারা? তিনি স. বললেন, জিবরাইল, আজরাইল, মীকাইল, ইসরাফিল এবং আরশবাহী ফেরেশতারা। আল্লাহ্পাক যখন আত্মা আপন অধিকারভূত করবেন, তখন আজরাইলকে বলবেন, হে মৃত্যুদূত! আর কি কেউ অবশিষ্ট

www.eelm.weebly.com

রয়েছে? তিনি বলবেন, হে মহাবিশ্বের মহান অধিপতি, তুমি মহামঙ্গলময়। অবশিষ্ট রয়েছে কেবল মীকাইল, জিবরাইল ও আমি। আল্লাহ্ বলবেন, মীকাইলের প্রাণ বের করে নাও। আজরাইল নির্দেশ পালন করবেন। নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকবে মীকাইলের মরদেহ। আল্লাহ্ বলবেন, আর কে আছে? তিনি বলবেন, জিবরাইল ও আমি। আল্লাহ্ বলবেন, হে মৃত্যুদূত! তুমি মৃত হও। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবে আজরাইল। তারপর আল্লাহ্ বলবেন, এবার? জিবরাইল বলবেন, আমি। আল্লাহ্ বলবেন, তোমারও নিস্তার নেই। সাথে সাথে সেজদাবনত হবেন জিবরাইল। কিছুক্ষণ ডানা ঝাপটাবার পর তিনিও হয়ে যাবেন মৃত লাশ। তিনি স. আরো বলেছেন, জিবরাইলের দেহাবয়বের তুলনায় মীকাইলের দেহ হবে বিশাল পর্বতের তুলনায় ছোট একটি টিলার মতো। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে হজরত আনাস থেকে বায়হাকী উপস্থাপন করেছেন একটি সুপরিণত শ্রেণীর হাদিস। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, ওই সময়ের আল্লাহ্র অভিপ্রায়াশ্রিত ভীতিমুক্ত ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন তিনজন— জিবরাইল, মীকাইল ও আজরাইল। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করবেন, হে আজরাইল! জানকবজ করা হয়নি এরকম কি কেউ বাকী আছে? আজরাইল বলবেন, হে আমার অবিনশ্বর, চিরঅক্ষয়, মহাকরুণাপরবশ আল্লাহ্! বাকী রয়েছে তোমার ত্রয়ী দাস জিবরাইল, মীকাইল ও আজরাইল। আল্লাহ্ বলবেন, মীকাইলের প্রাণ হরণ করো। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপালিত হবে নির্দেশ। আল্লাহ্ পুনরায় জিজ্ঞেস করবেন, আর বাকী রইলো ক'জন? আজরাইল বলবেন, তোমার নিরতিশয় নগণ্য দুই দাস— জিবরাইল ও আমি। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা দু'জনেই মরে যাও। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ কার্যকর হবে। পড়ে থাকবে তাদের নিশ্চল মরদেহ। তখন আল্লাহ্ স্বগতঃ উক্তি করবেন, সৃজন আমার। ধ্বংসও আমার । পুনঃসৃজনও আমার। কোথায় আজ দর্প ও অহংকারের ধ্বজাধারীকুল। সব যে আজ মহানির্জনতা, মহা নিস্তব্ধতা। পুনরায় বলবেন, আজকার এ একচ্ছত্র রাজত্ব কার? জবাবহীন ওই মহামৌনতা ভেদ করে পুনরায় উচ্চারণ করবেন, চিরবিজয়ী, চিরঞ্জীব মহাসৃজয়িতার। এরপর শুরু হবে পুনরুত্থানপর্ব। শিংগায় ধ্বনিত হবে দ্বিতীয় মহানাদ। সর্ব প্রথম পুনরুত্থিত হবে জিবরাইল। তারপর অন্যেরা।

হজরত যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, মহাপ্রলয়কালীন ভয়ংকর শিংগাধ্বনি থেকে মুক্ত থাকবেন জিবরাইল, মীকাইল, ইসরাফিল, আজরাইল ও আরশ বহনকারী আটজন ফেরেশতা— এই বারো জন। বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, প্রথমে জান কবজ করা হবে জিবরাইল ও মীকাইলের। তারপর আরশবাহক আটজন ফেরেশতার। তারপর ইসরাফিলের। শেষে আজরাইলের।

www.eelm.weebly.com

বাগবী আরো লিখেছেন, সকলের রূহ কবজ শেষ হলে রূহ কবজের নির্দেশ কার্যকর হবে আজরাইলের। আবু শায়েখ তাঁর কিতাবুল উজমা গ্রন্থে লিখেছেন, ওয়াহাব বলেছেন, আল্লাহ্পাক সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন জিবরাইল, মীকাইল, ইসরাফিল ও আজরাইল ফেরেশতা চতুষ্টয়কে। তাদের মৃত্যু ঘটাবেন সকলের শেষে। আবার প্রথমে পুনরুত্থিত হবে তারাই। সেকথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'ওয়াল মুদাববিরাতে আমরন' (কার্যনির্বাহী ফেরেশতা) এবং 'আলমুক্বাসসিমাতে আমরান'(কর্ম বন্টনকারী ফেরেশতা) আয়াতদ্বয়ে। আল্লামা সুয়ূতি লিখেছেন, মহাপ্রলয়ের ভীতিউদ্রেককারী আওয়াজ থেকে পরিত্রাণ লাভকারীদের সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে মূলতঃ কোনো বৈসাদৃশ্য নেই। হাদিসগুলোতে যাদের যাদের কথা বলা হয়েছে তারা সকলেই 'আল্লাহ্ যাকে ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না' কথাটির অন্তর্ভূত।

আমি বলি, শিংগাতে ফুৎকার দেওয়া হবে তিনবার। প্রথম আওয়াজে সকলে হয়ে পড়বে ভীত-সন্ত্রস্ত। দ্বিতীয় আওয়াজে ঘটবে সকলের মৃত্যু। আর শেষ আওয়াজে ঘটবে পুনরুত্থান। তারপর সকলে সমবেত হবে হাশর প্রান্তরে। অথবা শিংগা ধ্বনিত হবে দু'বার। প্রথম ধ্বনি শুনে মানুষ আতংকগ্রস্ত হয়ে বরণ করবে মৃত্যু। আর দ্বিতীয় ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ঘটবে সকলের পুনরুত্থান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে— যাঁরা আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না, তাঁরা কোন ফুৎকার ধ্বনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট? মৃত্যু ধ্বনির সঙ্গে, না পুনরুত্থান ধ্বনির সঙ্গে? জবাবে বলা যেতে পারে, নিশ্চয়ই প্রথম ফুৎকার ধ্বনির সঙ্গে নয়। আর এটাও নিশ্চিত যে, ওই সৌভাগ্যশালীগণ হচ্ছেন পুণ্যবান বিশ্বাসী। যেমন এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে 'যারা পুণ্যসহ আগমন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তদপেক্ষা উত্তম পরিণতি। অদ্যকার দিবসে তারা মহাত্রাস থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। আর এক আয়াতে জানানো হয়েছে 'আমার পক্ষ থেকে যাদের জন্য প্রথম থেকে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে, তারা দূরে থাকবে নরক থেকে, তার ক্ষীণতম আওয়াজও তারা শুনতে পাবে না, তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী জান্নাতে বসবাস করবে চিরকাল। মহাত্রাসের শব্দ তাদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করবে না। উল্লেখ্য, এ সকল আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, যারা দোজখ না দেখে সরাসরি বেহেশতেগমন করবে মহানিনাদে তারা এতটুকুও আতংকিত হবে না। আর মহানিনাদের সময় অবিশ্বাসীরা ছাড়া আর কেউই পৃথিবীতে থাকবে না।

রসুল স. বলেছেন, ধরাপৃষ্ঠে যখন 'আল্লাহ্' বলার কেউ থাকবে না, তখনই সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও মুসলিম। অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আনাস থেকে আহমদ, মুসলিম ও তিরমিজি কর্তৃক। বলা হয়েছে, রসুল স. উল্লেখ করেছেন, পৃথিবীতে

www.eelm.weebly.com

‘আল্লাহ্’ উচ্চারণ করার কোনো লোক থাকবে না যখন, তখনই সংঘটিত হবে কিয়ামত। আবদুর রাজ্জাক তাঁর ‘জামে’ গ্রন্থে লিখেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন চালু থাকবে কাবা গৃহের হজ। হজরত ওমর থেকে মানজারী বর্ণনা করেছেন, যতদিন পর্যন্ত কোরআন ও কাবা উঠিয়ে না নেয়া হবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। এরকম হাদিস রয়েছে অনেক। একারণেই রসুল স. শহীদগণের আত্মাসমূহকে মহাত্রাসধ্বনির আতংক বহির্ভূত রেখেছেন। কেননা, তাঁরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ ধরনের জীবনপ্রাপ্ত। উল্লেখ্য, নবীগণ ও বিশিষ্ট ফেরেশতাগণের আত্মাসমূহও মহাত্রাসধ্বনির আতংকবহির্ভূত।

ইবনে জারীরের তাফসীরে, তিবরানীর মুতাওয়ালাত ‘গ্রন্থে, আবু ইয়ালীর মসনদে, বায়হাকীর ‘আল বা’ছে’, আবু মুসা মাদিনীর মুতাওয়ালাতে, আলী ইবনে মা’বাদের আত্ত্বয়াত ওয়াল ইস্ইয়ানে, আবু শায়েখের কিতাবুল আজমতে, হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবদ ইবনে হুমাইদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে একটি দীর্ঘ হাদিস। হাদিসটি এই— শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তিনবার। প্রথম ফুৎকার ত্রাসসঞ্চারক, দ্বিতীয় ফুৎকার মৃত্যু প্রদায়ক এবং তৃতীয় ফুৎকার পুনরুত্থান সংঘটক। অবশ্য আল্লাহ্পাক কর্তৃক নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ মুক্ত থাকবে সেই মহাত্রাসের প্রভাব থেকে। অন্যেরা হবে মহাসন্ত্রাসের শিকার। ফলে স্তন্যদায়িনী মাতা ভুলে যাবে তার স্তন্যপানরত শিশুর কথা। অন্তঃসত্তা রমণীদের ঘটবে গর্ভপাত। শাদা হয়ে যাবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের মাথার চুল। শয়তানেরা ভয়ে ছুটাছুটি করতে থাকবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। আর ফেরেশতারা বারবার চপেটাঘাত করতে থাকবে তাদেরকে। মানুষেরাও পলায়ন করতে থাকবে এদিকে ওদিকে। চিৎকার করে সাহায্য কামনা করতে থাকবে একে অপরের। আল্লাহ্পাক ওই দিনকেই বলেছেন ‘ইয়াওমুত্তানাদ’ (ডাকের দিন)। রসুল স. আরো জানিয়েছেন, কবরবাসীরা সেদিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! ওই সকল ব্যক্তি কারা, যাদেরকে আল্লাহ্ ভীতিগ্রস্ত করবেন না বলেছেন? তিনি স. বললেন, শহীদেরা। পৃথিবীর মানুষ সেদিন সকলেই হবে সন্ত্রস্ত। কিন্তু শহীদেরা সে সন্ত্রাসের কিছুই জানতে পারবে না। কেননা তারা আল্লাহ্র সন্নিধানে জীবিত। আর তারা জীবিকাও পেয়ে থাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। শাস্তি আপতিত হবে কেবল নিকৃষ্টজনদের প্রতি। আল্লাহ্ তাই এরশাদ করেছেন ‘হে মানবমণ্ডলী! ভয় করো তোমাদের প্রভুপ্রতিপালককে। অবশ্যই মহাপ্রলয়ের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার’। যতদিন আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, ততদিন বিরাজ করবে ওই মহাআতঙ্ক। তারপর ধ্বনিত হবে শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকার। ওই ফুৎকারে মৃত্যুমুখে পতিত হবে আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীরা। বেঁচে থাকবে কেবল তারা যাদেরকে আল্লাহ্

www.eelm.weebly.com

বাঁচিয়ে রাখবেন। মৃত্যুর ফেরেশতা বলবে, হে মহাবিশ্বের মহাঅধীশ্বর! সকলেই এখন মৃত, ব্যতিক্রম কেবল তারা, যাদেরকে তুমি কৃপা করেছো। হজরত আবু হোরায়রার এর পরের বর্ণনায় পরিবেশিত হয়েছে মহাসম্মানিত ফেরেশতা চতুষ্টয় ও আরশবাহক ফেরেশতাদের মৃত্যুর কথা, যেমন ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে।

একটি সন্দেহ ঃ শয়তান তো আকাশে থাকে না। আর সেদিন মহাসন্ত্রাসাক্রান্ত হবে কেবল মানুষ ও জ্বিন শয়তান। তাহলে আলোচ্য আয়াতে এরকম কেনো বলা হলো যে, আকাশবাসীরাও হবে মহাসন্ত্রাসের শিকার?

সন্দেহভঞ্জন ঃ আমার ধারণা, এরকম বলা হয়েছে কথার কথা হিসেবে। অর্থাৎ কথাটির অর্থ হবে— ধরা যাক শয়তান যদি আকাশেও অবস্থান গ্রহণ করে, তবুও সে সেখানে হবে মহাসন্ত্রাসাক্রান্ত। অথবা বলা যেতে পারে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানাহরণের জন্য তখন কিছু সংখ্যক শয়তান হয়তো আকাশচারী অবস্থায় থেকে যেতে পারে। কিংবা বলা যায়, আকাশ অর্থ এক্ষেত্রে মেঘপুঞ্জ। কেননা ঊর্ধ্বদেশের সকল কিছুকেই সাধারণতঃ আকাশ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফালইয়াম্‌দুদ্ বিসাবাবিন্ ইলাস্ সামায়ী' (তাদের উচিত ছাদ পর্যন্ত রশি টেনে নিক)। অথবা এরকমও হওয়া সম্ভব যে, এখানে 'মান্‌ফীস্ সামাওয়াত' অর্থ বিশ্বাসীগণের আত্মা। আর 'সাবাক্বাত মিনাল হুসনা' অর্থ নবী রসুল এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজনগণ।

সেদিনের সেই মহানাদ থেকে যারা মুক্ত থাকবেন, তাঁদের সম্পর্কে বিচক্ষণ ভাষ্যকারগণ বলেন, সাধারণভাবে 'সাআ'ক্ব' অর্থ অচৈতন্য ও মৃত্যু দু'টোই হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে, তখন পরলোকগতরা হয়ে পড়বে অচৈতন্য এবং জীবিতরা বরণ করবে মৃত্যু। আর ওই চেতনাহীনতা আরোপিত হবে অন্তরাল জগতের (আলমে বরজখের) সকল নবী-রসুলের প্রতিও। অবশ্য হজরত মুসা সেদিন চেতনা হারাবেন কিনা, সে বিষয়টি বির্তকাহত। কারণ তাঁর সম্পর্কে বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি ও ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একদা এক ইহুদী বাজারে বলে বেড়াচ্ছিলো, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি নবী মুসাকে মহিমান্বিত করেছেন সকলের উপর। জনৈক আনসারী সাহাবী একথা শুনেই তাকে চপেটাঘাত করলেন। বললেন, এতো বড় দুঃসাহস তোমার হলো কেমন করে, অথচ এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল। কথাটা কানে গেলো রসুল স. এর। তিনি স. বললেন, প্রথম শিংগার ফুৎকার ধ্বনিতে মহাত্রাস কবলিত হবে আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীরা। দ্বিতীয় ফুৎকার ধ্বনিতে ঘটবে সকলের পুনরুত্থান। সকলেই আপনাপন সমাধিতে

www.eelm.weebly.com

পুনরুত্থিত হয়ে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকাতে থাকবে এদিকে ওদিকে। আমিই পুনরুত্থিত হবো সর্বপ্রথমে। দেখতে পাবো, নবী মুসা দাঁড়িয়ে রয়েছেন আরশের পায়া ধরে। আমি বুঝতে পারবো না, তিনি কি আমার পূর্বেই চৈতন্যপ্রাপ্ত হয়েছেন, না আদৌ চৈতন্য হারাননি। মহাসন্ত্রাস বলতে যখন মৃত্যু ও চৈতন্যহীন দু'টোই বুঝায়, আর নবীগণও যখন অন্তরাল জগতে অচৈতন্য হয়ে পড়বেন, তখন শহীদগণ তো অচৈতন্য হয়ে পড়বেনই। ফেরেশতাদের অবস্থাও হবে তদ্রূপ। অবশ্য মহাসম্মানিত ফেরেশতা চতুষ্টয় এবং আরশবাহী ফেরেশতাদের মৃত্যু শিংগার ফুৎকারে হবে না। হবে অন্যভাবে, যেমন বলা হয়েছে ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসসমূহে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং সকলেই তাঁর নিকট আসবে লাঞ্ছিত অবস্থায়'। একথার অর্থ— পুনরুত্থান সংঘটক শিংগাধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার পর সকলেই আপন আপন সমাধিতে পুনর্জীবনপ্রাপ্ত হবে। তারপর সকলে সমবেত হবে হাশর প্রান্তরে। শুরু হবে মহাবিচারপর্ব। বিষয়টি অবধারিত, তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সুনিশ্চিতার্থক অতীতকালবোধক 'আতাওহু'।

সূরা নমল ঃ আয়াত ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ
اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٨٨﴾ مَنْ جَآءَ
بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ
جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ؕ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ
حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ؗ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩١﴾ وَ
اَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ
فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ
فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

www.eelm.weebly.com

r তুমি পর্বতমালা দেখিয়া অচল মনে করিতেছ কিন্তু সেই দিন উহারা হইবে মেঘপুঞ্জের মত সঞ্চরমান। ইহা আল্লাহেরই সৃষ্টি-নিপুণতা, যিনি সমস্ত কিছুকে করিয়াছেন সুষম। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত।

r যে কেহ সৎকর্ম করিবে সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাইবে এবং সেই দিন উহারা শংকা হইতে নিরাপদ থাকিবে।

r যে কেহ মন্দকর্ম করিবে তাহাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হইবে অগ্নিতে এবং উহাদিগকে বলা হইবে 'তোমরা যাহা করিতে তাহারই প্রতিফল তোমরা ভোগ করিতেছ।'

r আমি তো আদিষ্ট হইয়াছি এই নগরীর রক্ষকের ইবাদত করিতে, যিনি ইহাকে করিয়াছেন সম্মানিত। সমস্ত কিছু তাঁহারই। আমি আরও আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের একজন হই।

r এবং আরও আদিষ্ট হইয়াছি কুরআন আবৃত্তি করিতে; অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে সে তাহা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং কেহ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিলে তুমি বলিও 'আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী।'

r বল, 'প্রশংসা আল্লাহেরই, তিনি তোমাদিগকে দেখাইবেন তাঁহার নিদর্শন; তখন তোমরা উহা বুঝিতে পারিবে। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নহেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছো, কিন্তু সেই দিন তারা হবে মেঘপুঞ্জের মতো 'সঞ্চরমান'। একথার অর্থ— হে দর্শক! ওই মহাসন্ত্রাসের সময় তুমি পর্বতসমূহকে দেখে মনে হবে ওগুলো অচঞ্চল, অবিচল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, ওগুলো তখন হবে মেঘমালার মতো চলমান, সঞ্চরমান। অর্থাৎ ওগুলো দ্রুত ধাবমান হয়ে আছড়ে পড়বে ভূপৃষ্ঠে। উল্লেখ্য, সুবিশাল কোনোকিছুর দ্রুতধাবমানতা সাধারণতঃ অনুমানসাধ্য নয়। সেদিন শৈলশ্রেণীর ধাবনতাও তাই স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ধরা পড়বে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিনিপুণতা। যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম। তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত'। একথার অর্থ— এ সকল কিছু হচ্ছে আল্লাহ্‌র সৃজন শৈলীর নিদর্শন, তিনিই তাঁর এই মহাসৃষ্টিকে করেছেন সুবিন্যস্ত, সুষম। আর তিনি তাঁর আনুগত্যপরায়ণ ও আনুগত্যবিমুখ দাসদের সকলকিছুই জানেন। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। যথাসময়ে তিনি তাদেরকে যথোপযুক্ত বিনিময় প্রদান করবেনই। পরবর্তী আয়াতে (৮৯) কথাটি বলা হয়েছে আরো স্পষ্ট করে।

www.eelm.weebly.com

বলা হয়েছে— 'যে কেউ সৎকর্ম করবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে'। মা'শার বর্ণনা করেছেন, ইব্রাহিম দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, এখানে 'আল হাসানা' শব্দটির অর্থ— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'। কাতাদা বলেছেন, সুরা এখলাস। অথবা অনুপম আবরণ। কোনো কোনো আলেম অর্থ করেছেন— আনুগত্য।

'খইর' (উৎকৃষ্টতর) শব্দটি এখানে তারতম্যমূলক বিশেষণ নয়। আর 'মিনহা' এর 'মিন' (থেকে) অব্যয়টি হেতুবাচক। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়ায়— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কিছু নেই। হতেও পারে না। সুতরাং বুঝতে হবে শব্দটি তারতম্যমূলক বিশেষণ নয়। বরং এটা বাস্তবসম্মত ভাবেই উত্তম, অতুলনীয়রূপে উৎকৃষ্ট। অর্থাৎ পুণ্যার্জন ও শাস্তি থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্তি লাভ হবে 'হাসানা' বা সৎকর্মের কারণে। আবার মোহাম্মদ ইবনে কা'ব এবং আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ বলেছেন, এখানকার 'মিন' অব্যয়টি তারতম্যমূলক, হেতুবাচক নয়। এমতাবস্থায় মর্মার্থ দাঁড়ায় সাতগুণ থেকে দশগুণ পর্যন্ত, আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায় হলে আরো অনেক গুণ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যে উত্তমকর্ম নিয়ে আসবে, তার জন্য থাকবে দশগুণ'।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সেদিন তারা শংকা থেকে নিরাপদ থাকবে'। একথার অর্থ— সেই মহাসন্ত্রাসের দিবসেও তাদের কোনো ভয়-ভীতি থাকবে না। 'ফায্য়ীন' শব্দটি এখানে তানভীনযুক্ত অনির্দিষ্টবাচক, নিমজ্জনাত্মক সমষ্টিবাচকতাসম্পন্ন। আর 'আমীনূন' অর্থ— শংকাহীন ভয়-লেশশূন্য। যেহেতু শব্দটি অনির্দিষ্টবাচক হওয়ায় নিমজ্জনাত্মকতার অর্থবহ, তাই এর প্রকৃত অর্থ হবে— একেবারে ভয়-লেশশূন্য।

পরের আয়াতে (৯০) বলা হয়েছে— 'যে কেউ মন্দ করবে, তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিতে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমরা ভোগ করছো'। এখানে 'আস্সাইয়্যিআতু' অর্থ শিরিক। 'ফাকুব্‌রাত উজুহুহুম' অর্থ অধোমুখে। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সেদিন অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে নরকাগ্নিতে।

'হাল তুজ্যাওনা' অর্থ তোমরা কি বিনিময় প্রাপ্ত নয়? শিরিক হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট পাপ। আর জাহান্নামবাস হচ্ছে সর্বোচ্চশাস্তি। তাই বলতে হয়, সর্বনিকৃষ্ট পাপীদেরকে সেদিন দেয়া হবে সর্বোচ্চ শাস্তি। অধোমুখে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামাগ্নিতে। তারা এমতো শাস্তিরই উপযোগী।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৯১) বলা হয়েছে— 'আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর রক্ষকের ইবাদত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। সমস্ত কিছু তাঁরই। আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি যেনো আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন হই'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মক্কাবাসীদেরকে বলুন, হে মক্কার জনতা! এই মহান নগরীকে যিনি মহাসম্মানিত করেছেন এবং যিনি একে করেছেন সুরক্ষিত, সেই পরম প্রভুপালকের ইবাদত করবার জন্যই তো আমি প্রত্যাদিষ্ট। সমস্ত কিছুই তাঁর। এই মহান নগরীরও তিনিই রক্ষাকর্তা। সেই অধিকর্তা ও রক্ষাকর্তার প্রতি সমর্পিত হওয়ার বিষয়েও আমি তো প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি।

এখানে 'হাজিহিল বালাদাতি' অর্থ এই নগরী। অর্থাৎ এই মক্কা নগরী। 'রব' অর্থ এখানে পালনকর্তা, রক্ষক। শব্দটিকে এভাবে এই নগরীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে মক্কাধামের অনন্য সাধারণ মর্যাদাকে। ইঙ্গিত করা হয়েছে এই বিষয়টির প্রতিও যে, এই শহর প্রতিনিয়ত স্নাত হয় আল্লাহ্‌র বিশেষ জ্যোতির সম্পাতে।

'আললাজী হাররমাহা' অর্থ যিনি একে করেছেন সম্মানিত। এখানে নিষিদ্ধ করেছেন উৎপীড়ন, শোণিতরঞ্জন, লুণ্ঠন। তাই এখানকার তৃণগুল্ম উৎপাটনও নিষিদ্ধ। এভাবে মক্কার কুরায়েশদেরকে একথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে— দ্যাখো, তোমাদের এই বসবাসকে আল্লাহ্‌তায়ালা করেছেন চিরনিরাপদ। সুতরাং তোমরা এর নিরাপত্তাপ্রদাতার নিকটে আত্মসমর্পণ করবে না কেনো? কেনো মেনে নিবে না তাঁর রসুল কর্তৃক আনীত পবিত্র ধর্মাদর্শকে?

'আল মুসলিমীন' অর্থ আত্মসমর্পণকারী, সমর্পিতপ্রাণ। এভাবে 'যেনো আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন হই' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— এসো আমরা সকলে বিশ্বজগতের প্রভুপালক এবং এই মহান নগরীর রক্ষকের নির্দেশানুগত হয়ে যাই। হয়ে যাই ইসলামী মিল্লাতের একনিষ্ঠ ধারক, বাহক, সেবক ও প্রচারক।

এরপরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— 'এবং আরো আদিষ্ট হয়েছি কোরআন আবৃত্তি করতে'। একথার অর্থ— এই মর্মেও আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেনো মানুষকে কোরআন আবৃত্তি করে শোনাই। এখানে 'আতলু' অর্থ আবৃত্তি করি। অথবা শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'তিলবুন' থেকে। 'তিলবুন' শব্দটি ধাত্যর্থে পশ্চাদানুসরণ বা পশ্চাদানুগমন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এই মর্মে আমি আদিষ্ট যে, আমি যেনো হই কোরআনুসারী। বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহ্‌পাক মানবমণ্ডলীর সম্মুখে তুলে ধরেছেন পৃথিবী ও পরবর্তী

www.eelm.weebly.com

পৃথিবীর বাস্তবচিত্র। অতঃপর রসুলেপাক স. এর প্রতি আজ্ঞা করেছেন, হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন, সত্যপ্রচারের দায়িত্ব ভিন্ন অন্য কোনো দায়িত্ব আমার নেই। আমার মূল দায়িত্ব হচ্ছে ইবাদতেমগ্ন হওয়া এবং আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি, কথাটির পূর্বে রয়েছে একটি উহ্য শব্দ 'কুল' (বলুন)। এভাবে পূর্ণ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি বলে দিন, আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি নিবিষ্টচিত্ত ইবাদত করতে এবং কেবল তাঁর আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে তুমি বোলো, আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! কারো পথপ্রাপ্তি ও পথভ্রষ্টতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়নি। আপনি কারো জন্য জবাবদিহি করতেও বাধ্য নন। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে শুভপথের সংবাদ প্রচার। এরপর যে আপনাকে বিশ্বাস করে আপনার আনুগত্যকে স্বীকার করবে, সে তো এরকম করবে তাঁর নিজের কল্যাণ নিশ্চিতার্থে। আর যে আপনাকে মানবে না, তাকে শুধু এতোটুকু জানিয়ে দিন যে— আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী।

শেষোক্ত আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— 'বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র' একথার অর্থ— হে আমার নবী! আপনি আরো বলে দিন, সত্য ধর্মপ্রচারের মহান দায়িত্ব যিনি আমাকে দিয়েছেন, যিনি আমাকে পরিচালিত করে চলেছেন, নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তা সহকারে, সেই সুমহান আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা-প্রশস্তি-স্তবস্তুতি। আমি তাঁর প্রতি সতত কৃতজ্ঞ ও অনুগত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে দেখাবেন তাঁর নিদর্শন'। এখানে নিদর্শন অর্থ— ইহজগতে প্রকাশিত মোজেজাসমূহ, যেমন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, হস্তধৃত প্রস্তরকণার তসবীহ পাঠ, বদর যুদ্ধে প্রকাশিত অলৌকিকত্ব, দাব্বাতুল আরদ্বের আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি। এরকম নিদর্শন প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন 'সত্বর আমি দেখাবো আমার নিদর্শনাবলী, সুতরাং ত্বরা কোরো না'। অথবা এখানে 'নিদর্শন' অর্থ পরকালের নিদর্শনসমূহ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সত্বর আমি প্রদর্শন করবো আমার জ্যোতির্ময় নিদর্শন তাদের বহির্জগতে ও সত্তায়'।

এরপর বলা হয়েছে— 'তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে'। একথার অর্থ— যখন তোমরা আমার নিদর্শনরাজির প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করতে পারবে ঠিকই, কিন্তু সে উপলব্ধি তোমাদের কাজে আসবে না। কারণ তখন প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ফলাফল।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা যা করছো, সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় নবী! বিরুদ্ধবাদীদের অপআচরণের কারণে ব্যথিত হবেন না। তাদের উন্মাসিকতা, অবিমৃশ্যকারিতা ও সত্যপ্রত্যাখ্যান প্রবণতা সম্পর্কে আমি অনবগত নই। যথাসময়ে আমি তাদেরকে অবশ্যই প্রদান করবো যথোপযুক্ত শাস্তি।

সূরা ক্বসাস

৮৮ সংখ্যক আয়াত ও ৯ সংখ্যক রুকু সম্বলিত এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। তবে কেবল ৫২ থেকে ৫৫ আয়াত পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। আর ৮৫ সংখ্যক আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে হিজরতকালে জাহ্‌ফা নামক স্থানে। সুরা নমলের পরে অবতরণ ঘটেছে সুরা ক্বসাসের।

সূরা ক্বসাস ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

طٰسٓمّٓ ۝۱ تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ الۡمُبِيۡنِ ۝۲ نَتۡلُوۡا عَلَيۡكَ مِنۡ نَّبَاِ
مُوۡسٰى وَ فِرۡعَوۡنَ بِالۡحَقِّ لِقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ ۝۳ اِنَّ فِرۡعَوۡنَ عَلَا فِى
الۡاَرۡضِ وَ جَعَلَ اَهۡلَهَا شِيَعًا يَّسۡتَضۡعِفُ طَآئِفَةً مِّنۡهُمۡ يُذَبِّحُ
اَبۡنَآءَهُمۡ وَ يَسۡتَحۡىٖ نِسَآءَهُمۡ‌ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الۡمُفۡسِدِيۡنَ ۝۴
وَ نُرِيۡدُ اَنۡ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيۡنَ اسۡتُضۡعِفُوۡا فِى الۡاَرۡضِ وَ نَجۡعَلَهُمۡ
اَئِمَّةً وَّ نَجۡعَلَهُمُ الۡوٰرِثِيۡنَ ۝۵ لا وَ نُمَكِّنَ لَهُمۡ فِى الۡاَرۡضِ وَ نُرِىَ
فِرۡعَوۡنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوۡدَهُمَا مِنۡهُمۡ مَّا كَانُوۡا يَحۡذَرُوۡنَ ۝۶

r ত্বা-সীন্-মীম;

r এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

r আমি তোমার নিকট মুসা ও ফিরাউনের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করিতেছি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে।

www.eelm.weebly.com

r ফিরাউন নিজ দেশে পরাক্রমশালী হইয়াছিল এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদিগের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করিয়াছিল; উহাদিগের পুত্রগণকে সে হত্যা করিত এবং নারীগণকে জীবিত রাখিত। সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

r সে-দেশে যাহাদিগকে হীনবল করা হইয়াছিল আমি ইচ্ছা করিলাম তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিতে; তাহাদিগকে নেতৃত্বদান করিতে ও দেশের অধিকারী করিতে;

r ইচ্ছা করিলাম, তাহাদিগকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং ফিরাউন, হামান ও তাহাদিগের বাহিনীকে তাহা দেখাইয়া দিতে যাহা সেই শ্রেণীটি হইতে উহারা আশংকা করিত।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'ত্ব-সীন-মীম'। এগুলো হচ্ছে বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি। কোরআন মজীদের কোনো কোনো সুরার প্রথমে উল্লেখিত এ সকল বিচ্ছিন্ন অক্ষরের মর্ম চিরদুর্জ্ঞেয়, চিররহস্যাচ্ছন্ন। আল্লাহ্তায়ালা এবং তাঁর রসুলই এগুলোর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। আর অবগত অল্পকিছু সংখ্যক আলেম, যারা জ্ঞানে সুগভীর (ওলামায়ে রসিখীন)।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত'। এখানে 'মুবীন' অর্থ সুস্পষ্ট। শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে 'আবান'থেকে। 'আবান' ক্রিয়াটি সকর্মক ও অকর্মক উভয় অর্থে ব্যবহার্য। সকর্মক ধরে নিলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এই গ্রন্থ বিধানাবলী, উপদেশাবলী, ইতিবৃত্ত, পুরস্কার-তিরস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা উপস্থিত করে। আর অকর্মক ধরে নিলে অর্থ দাঁড়ায়— চির অজেয় হওয়ার কারণে এই মহাগ্রন্থটি এটাই প্রকাশ্যে প্রমাণ করে যে, এর আয়াতসমূহ অবশ্যই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'আমি তোমার নিকট মুসা ও ফেরাউনের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে'। এখানে 'নাতলু' অর্থ বিবৃত করছি বা আবৃত্তি করছি। অর্থাৎ অবতীর্ণ করছি জিবরাইলের মাধ্যমে। 'মিননাবা' অর্থ কিছু ইতিকথা বা বৃত্তান্ত। এখানকার 'মিন' আংশিক অর্থ প্রকাশক। 'বিল হাক্বক্বি' অর্থ যথাযথভাবে নির্ভুল তথ্যসহকারে। 'লি ক্বওমিঁই ইয়ুমিনূন' অর্থ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। কারণ এ বৃত্তান্ত শুনে উপকৃত হবে কেবল তারাই। বিশ্বাসবিবর্জিতরা এ কাহিনী শুনে কোনোই উপকার পাবে না।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'ফেরাউন নিজ দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিলো এবং সেখানকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে, তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিলো'। এ কথার অর্থ— ফেরাউন ছিলো মিসর রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। প্রবল প্রতাপশালী ও নিষ্ঠুর ওই ফেরাউন তার

www.eelm.weebly.com

সাম্রাজ্যের জনপুঞ্জকে বিভক্ত করে রেখেছিলো বিভিন্ন শ্রেণীতে, যেনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা জোটবদ্ধ না হতে পারে। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হলেও মূল দল ছিলো দু'টি —— আদি অধিবাসী কিবতী এবং সিরিয়া থেকে আগত প্রায় চারশ' বছর পূর্বের অধিবাসী বনী ইসরাইল। এই দুই দলকে সে চিহ্নিত করেছিলো অভিজাত ও অনভিজাতরূপে। এখানে 'শীয়া' অর্থ শ্রেণী বা দল। কামুস প্রণেতা লিখেছেন, কারো অনুসৃত দলকে বলে শীয়া, যারা হয় ওই অনুসৃতের অনুগামী বা সাহায্যকারী। এর থেকে পৃথক দলকেও বলে শীয়া।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের পুত্রগণকে সে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে জীবিত রাখতো। সে ছিলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী'। একথার অর্থ অনভিজাতরূপে চিহ্নিত ওই হীনবল জনগোষ্ঠীর শিশু পুত্রদেরকে সে দিয়েছিলো হত্যার নির্দেশ। সে নির্দেশ পালিতও হতো যথারীতি। আর তাদের কন্যা সন্তানকে সে হত্যা করাতো না। আর অত্যাচারিত ওই জনগোষ্ঠীর নারী-পুরুষকে সে বাধ্য করতো প্রায় দাস-দাসী রূপে জীবন যাপন করতে। সে ছিলো প্রকৃত অর্থেই এক নিষ্ঠুর নরপতি। বিপর্যয় সৃষ্টি করাই ছিলো তার শাসনকর্মের মূল কথা।

এখানে 'ইউজাববিহু আবনাআহুম' অর্থ— তাদের পুত্রগণকে হত্যা করতো। এরকম করার কারণ ছিলো এই যে, একদিন এক জ্যোতিষী ফেরাউনকে জানালো, বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন শিশু। সে-ই বড় হয়ে ধ্বংস করবে ফেরাউন ও তার সাম্রাজ্যকে। হজরত কাতাদা থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মুনজির।

এখানে 'জীবিত রাখতো নারীদেরকে' অর্থ কন্যাসন্তানেরা ছিলো তার হত্যার নির্দেশ বহির্ভূত। 'কানা মিনাল মুফসিদীন' অর্থ সে ছিলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। অর্থাৎ তার কর্মকাণ্ড ছিলো ধ্বংসাত্মক। অসংখ্য শিশু হত্যাই ছিলো তার ওই ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের প্রধান প্রমাণ।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিলো, আমি ইচ্ছা করলাম তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে এবং দেশের অধিকারী করতে'। একথার অর্থ— নিগৃহীত বনী ইসরাইলকে আমি করুণাধন্য করবো বলে ইচ্ছা করলাম। আরো ইচ্ছা করলাম তাদেরকে দান করতে নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রাধিকার।

এখানে 'আইম্‌মাতুন' অর্থ নেতৃত্ব। মুজাহিদ বলেছেন, ধর্মীয় নেতৃত্ব। কাতাদা বলেছেন, শব্দটির অর্থ রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আর আমি তোমাদেরকে দিয়েছি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব'। 'আল ওয়ারিছীন' অর্থ উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত ফেরাউন ও তাঁর অনুসারীদের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'ইচ্ছা করলাম, তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা সেই শ্রেণীটি থেকে তারা আশংকা করতো'। একথার অর্থ— আমি আরো ইচ্ছা করলাম তাদেরকে সিরিয়া ও মিসরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং বনী ইসরাইলের অভ্যুত্থানের যে আশংকা ফেরাউন, হামান ও তাদের লোকেরা করতো, তা তাদেরকে সত্যে পরিণত করে দেখাতে।

এখানকার 'নুমাক্‌কিনু' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'তামকীন' থেকে, যার ধাত্যর্থ কোনোকিছুকে স্থান করে দেয়া, সুপ্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং ধাত্যর্থে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তাদেরকে আমি তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করি। আর রূপকার্থে কথাটি দাঁড়ায়— দান করি প্রশাসনাধিকার, বিজয়, আধিপত্য।

'হজর' অর্থ 'দ্বরর' বা অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভ। উল্লেখ্য, জ্যোতিষীর ভবিষদ্বাণী অনুসারে ফেরাউন, হামান ও তাদের বংশধরেরা সদাশংকিত থাকতো এই ভেবে যে, কখন না জানি বনী ইসরাইলের সফল অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত হয়ে যায় তাদের সাধের সাম্রাজ্য। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে বলা হয়েছে 'যা সেই শ্রেণীটি থেকে তারা আশংকা করতো'।

সূরা ক্বসাস ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯

وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ
فِى الْيَمِّ وَ لَا تَخَافِىْ وَ لَا تَحْزَنِىْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَ جَاعِلُوْهُ مِنَ
الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧﴾ فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَنًا ؕ
اِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ﴿٨﴾ وَ قَالَتِ
امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَ لَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰٓى اَنْ
يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩﴾

r মূসা-জননীর অন্তরে আমি ইংগিতে নির্দেশ করিলাম, 'শিশুটিকে স্তন্যদান কর।' যখন তুমি ইহার সম্পর্কে কোন আশংকা করিবে তখন ইহাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিও এবং ভয় করিও না, দুঃখও করিও না। আমি ইহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব এবং ইহাকে রসূলদিগের একজন করিব।

www.eelm.weebly.com

r অতঃপর ফিরাউনের লোকজন মূসাকে উঠাইয়া লইল। ইহার পরিণাম তো এই ছিল যে, সে উহাদিগের শত্রু ও দুঃখের কারণ হইবে। ফিরাউন, হামান ও উহাদিগের বাহিনী ছিল অপরাধী।

r ফিরাউনের স্ত্রী বলিল, 'এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর। ইহাকে হত্যা করিও না, সে আমাদিগের উপকারে আসিতে পারে, আমরা তাহাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করিতে পারি।' প্রকৃতপক্ষে উহারা ইহার পরিণাম বুঝিতে পারে নাই।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মুসা-জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম, শিশুটিকে স্তন্য দান করো'। বাগবী লিখেছেন, রসুল মুসার জননীর নাম ছিলো ইয়ুখ্‌বিজ বিনতে লাবী। আর লাবী ছিলেন নবী ইয়াকুবের পুত্র।

এখানে 'অন্তরে ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে 'আওহাইনা' কথাটি, যার শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় প্রত্যাদেশ করলাম। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা ওহী বা প্রত্যাদেশ ছিলো না। কারণ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় কেবল নবী-রসুলগণের প্রতি। আর হজরত মুসার জনয়িত্রী নবী ছিলেন না। নারীরা কখনো নবী হনও না। কাতাদা তাই কথাটির অর্থ করেছেন— আমি মুসা-জননীর হৃদয়ে নির্দেশ দিলাম প্রক্ষেপনাকারে,ইঙ্গিতে। সুফি দার্শনিকেরা এমতো প্রক্ষেপণকে বলে থাকেন ইলহাম। ইলহাম বলে এক ধরনের শুভ স্বপ্নকেও। তাই বলা যেতে পারে, এখানকার 'আওহাইনা' অর্থ ইলহামের মাধ্যমে নির্দেশনা দিলাম, যেনো তার হৃদয়ে জন্মে প্রতীতি ও প্রশান্তি। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, ইলহামও জ্ঞানার্জনের একটি মাধ্যম, যদিও তা সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত নয়, বরং এর মাধ্যমে অর্জিত হয় অনুপ্রেরণা ও প্রণোদনা। আর ইলহাম প্রতিভাসিত হতে পারে ওই হৃদয়ে, যে হৃদয় পরিশুদ্ধ ও প্রশান্ত। শয়তানের কুমন্ত্রণাও প্রক্ষেপিত হয় হৃদয়ে। কিন্তু ওই কুমন্ত্রণা দ্বারা চিত্তপ্রশান্তি ঘটে না, ঘটে চিত্তচাঞ্চল্য। কিন্তু ইলহাম আনে চিত্তপ্রশান্তি ও প্রত্যয়।

এখানে 'শিশুটিকে স্তন্য দান করো' অর্থ যতক্ষণ পর্যন্ত সদ্যজাত শিশুটির জন্ম সংবাদ গোপন রাখা সম্ভব হয়, ততক্ষণ তাকে গোপনে গোপনে দুগ্ধপান করাও। শিশু মুসা কতোদিন পর্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করেছিলেন, সে সম্পর্কে আলেমগণ মতপৃথকতা করেছেন। কেউ কেউ বেলছেন, আটমাস। কেউ বলেছেন চারমাস, আবার কেউ বলেছেন তিন মাস।_তাঁর মাতা তাকে কোলে বসিয়ে দুধ পান করাতেন। আর তিনি কখনো কাঁদতেন না। প্রকাশও করতেন না কোনো চাঞ্চল্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখন তুমি এর সম্পর্কে কোনো আশংকা করবে, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কোরো এবং ভয় কোরো না, দুঃখও কোরো না। আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিবো এবং একে রসুলগণের একজন করবো'।

www.eelm.weebly.com

একথার অর্থ— ইলহামের মাধ্যমে আমি তাকে আরো জানালাম, হে মুসা-জননী! যখন দেখবে ফেরাউনের শিশু হন্তারকেরা মুসার সন্ধানে ঘোরাফিরা করছে, তখন তাকে সিন্দুকে পুরে ভাসিয়ে দিয়ো নীল নদের তরঙ্গে। সে ডুবে মরবে, এরকম ভয় কোরো না। আর পুত্রবিরহে ব্যথিতও হয়ো না। যথাসময়ে আমি তাকে তোমার কোলেই ফিরিয়ে দিব এবং পরিণত বয়সে আমি তাকে করবো আমার প্রিয়ভাজন বার্তাবাহক।

এখানে 'ফীল ইয়াম্মি' অর্থ নদীবক্ষে। অর্থাৎ নীল নদীতে। আর 'ইন্না রদদুহু ইলাইকি' অর্থ অচিরেই আমি তোমার সন্তানকে ফিরিয়ে দিব তোমার নিকটে। তখন তোমার দুঃখ করার আর কিছুই থাকবে না।

আতা ও জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন মিসরে বনী ইসরাইলের সংখ্যা বেড়ে গেলো, তখন তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হতে লাগলো জনবলের অহমিকা। বেপরোয়া হয়ে গেলো তারা। দুর্বলদের উপরে শুরু করলো অত্যাচার। আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে শুরু করলো শৈথিল্য। পরিত্যাগ করলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব। ফলে আল্লাহ্ তাদের উপরে কর্তৃত্ব দান করলেন কিবতীদের। কিবতীরা চূর্ণ করে দিলো তাদের দর্প ও প্রভাব-প্রতিপত্তি। দীর্ঘকাল ধরে নিগৃহীত হবার পর আল্লাহ্ তাদের উপরে দয়া বর্ষণ করলেন। আবির্ভূত হলেন হজরত মুসা। তাঁর মাধ্যমেই এক সময় তিনি কিবতী সম্রাটের কবল থেকে রক্ষা করলেন তাদেরকে। তিনি আরো বলেছেন, মুসা জননীর ছিলো এক ধাত্রী-বান্ধবী। সে ছিলো ফেরাউন পক্ষীয়। বনী ইসরাইলদের প্রসূতিদের খোঁজ নেয়াই ছিলো তার কাজ। সন্তানপ্রসবের প্রাক্কালে তিনি ডেকে আনলেন তাঁর ওই ধাত্রী-বান্ধবীকে। বললেন, আমার প্রসবকাল অত্যাসন্ন। ভালোবাসার দাবীতে এবার তোমার সহায়তা কামনা করি। ধাত্রী আন্তরিকভাবে তাঁর যত্ন-পরিচর্যা করলেন। যথাসময়ে জন্ম নিলো ফুটফুটে এক পুত্রসন্তান। শিশুটির ললাটদেশে প্রোজ্জ্বল ছিলো একটি অপার্থিব প্রভা। ওই প্রভা দেখে বিস্মিতা হলেন ধাত্রী। অতি অভিভূতির ফলে শুরু হলো তার হৃৎকম্পন। অল্প সময়ের মধ্যে তার হৃদয় ভরে গেলো নবজাতকের মায়ায়। তাঁর মাকে বললেন, আমি ভেবে এসেছিলাম, তোমার পুত্রসন্তান হলে আমি তাকে তুলে দিবো ফেরাউনের শিশু হন্তারকদের হাতে। কিন্তু এখন এ শিশুর মমতায় আমার হৃদয় পরিপূর্ণ। তাই আমার পরামর্শ, শিশুটির হেফাজত করো। একথা বলেই সে প্রস্থান করলো। একটু পরেই সেখানে উপস্থিত হলো এক রাজকর্মচারী। সে ছিলো শিশু হন্তারক। সে গৃহমধ্যে প্রবেশের উদ্যোগ করতেই হজরত মুসার বোন অতি দ্রুত তাঁকে কোলে নিয়ে নিক্ষেপ করলো পাশের ঘরের প্রজ্জ্বলিত উনুনে। কর্মচারীটি জিজ্ঞেস করলো, এখানে ধাত্রী কেনো এসেছিলো। মুসা-জননী বললেন, সে আমার

www.eelm.weebly.com

বান্ধবী। এসেছিলো সাক্ষাত করতে। কর্মচারীটি এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছুটা সন্দেহ নিয়ে ফিরে গেলো। রাজকর্মচারী দেখে মুসা জননীর চেতনা লোপ হবার উপক্রম হয়েছিলো। সম্বিত ফিরে পেয়ে তিনি কন্যাকে ডেকে বললেন, কোথায় রেখেছো বাচ্চাকে। কন্যা বললো, উনুনে। এরকম করেছি আমি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। মাতা-কন্যা দু'জনেই পাগলের মতো ছুটে গেলেন পাশের ঘরে। দেখলেন, উনুনের আগুন অন্তর্হিত। সেখানে আপনমনে হাত পা নেড়ে খেলা করছেন শিশু মুসা। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে প্রিয়তম আত্মজকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন জননী। একটু পরেই আবার বিষণ্ন হয়ে গেলেন তাঁর নিরাপত্তাচিন্তায়। শিশু হন্তারকেরা বার বার এসে অনুসন্ধান চালায়। কতোদিন আর তিনি এভাবে আগলে রাখতে পারবেন তাঁর বুকের মানিককে? সহসা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শুভ ইঙ্গিত প্রক্ষেপিত হলো, ওকে নদীতে ভাসিয়ে দাও। তার অকল্যাণ হবে, একথা ভেবো না। কিছু কালের মধ্যেই তাকে ফিরে পাবে আপন ক্রোড়ে। আর যথাসময়ে তাকে আমি দায়িত্ব দান করবো আমার বাণীবাহকের। মুসা-জননী এবার ছুটে গেলেন এক সূত্রধরের কাছে। বললেন, আমাকে একটি ছোটো সিন্দুক বানিয়ে দাও। সূত্রধর বললো, সিন্দুক দিয়ে কী করবেন? তিনি তখন সূত্রধরকে অকপটে খুলে বললেন সব। সূত্রধর অল্পক্ষণের মধ্যে সিন্দুক বানিয়ে দিলেন। সিন্দুকটি নিয়ে মুসা জননীর প্রস্থানের পরক্ষণেই সে রওয়ানা দিলো রাজকর্মচারীর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। কিন্তু রাজকর্মচারীর দেখা যখন পেলো সে তখন বাকশক্তিরহিত। ইশারায় কিছু বলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কর্মচারীটি কিছুই বুঝতে পারলো না। নিরুপায় হয়ে স্বগৃহে ফিরে এলো সূত্রধর। বাকক্ষমতা ফিরে পেলো আগের মতোন। তাই সে পুনরায় গমন করলো রাজকর্মচারীর কাছে। এবার হারালো বাকশক্তি ও দর্শনশক্তি দু'টোই। ফলে এবারো সে কর্মচারীটিকে কিছুই বোঝাতে পারলো না। কর্মচারীটি বিরক্ত হলো। উত্তম মধ্যম দিয়ে তাড়িয়ে দিলো সেখান থেকে। নিরুপায় সূত্রধর গমন করলো একটি উন্মুক্ত উপত্যকায়। সে এবার বুঝতে পারলো, ওই শিশুটি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তাই অনুতাপে জর্জরিত হয়ে প্রার্থনা করলো, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমাকে ক্ষমা করো। সুস্থ করে দাও। সন্ধান দাও ওই মহান শিশুর। আমি এখন থেকে তার প্রহরী হবো। প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো। আল্লাহ্ তাকে জানালেন, শিশুনবীর পরিচয় ও তাঁর অবস্থানস্থলের বিবরণ।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ' বর্ণনা করেছেন, অন্তঃসত্ত্বা হবার পর থেকেই যথাসম্ভব আত্মগোপন করে রইলেন মুসা-জননী। আল্লাহ্ তাঁকে হেফাজত করলেন বিশেষভাবে। ফলে কেউ তাঁর সন্তানবতী হবার কথা জানতে পারলো না। অনুসন্ধানকারিণী ধাত্রীরা কেউই তাঁকে সন্তানসম্ভবা বলে সনাক্ত করতে পারলো

www.eelm.weebly.com

না। যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হলেন শিশু মুসা। ভূমিষ্ঠকালে তাঁর মাতার পাশে হাজির ছিলেন কেবল তাঁর এক বোন। তাঁর নাম ছিলো মরিয়ম। নবজাতককে দেখে তাঁর অমঙ্গলাশংকায় চিন্তিত হলেন মাতা। আল্লাহ্ই তাঁকে চিন্তামুক্ত করলেন। ইলহামের মাধ্যমে জানালেন, নির্ভয়ে তাকে স্তন্য দান করো। মন্দ কিছুর আশংকা করলে তোমার ওই পুত্রধনকে সিন্দুকে আবদ্ধ করে নীল নদের উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়ে দিয়ো। তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, এমন ভেবো না। সে আমা কর্তৃক নিরাপত্তা প্রাপ্ত। অত্যল্পকাল পরে আমি তাকে তোমার বুকেই ফিরিয়ে দিবো। আর অদূর ভবিষ্যতে তাকে বানাবো আমার একান্ত আপন বচনবাহক। জননী তাঁর মহান আত্মজকে অতিসঙ্গোপনে দুধ পান করালেন তিন মাস ধরে। এরমধ্যে শিশু মুসা একবারের জন্যও কাঁদেননি। এরপর জননী-হৃদয় আশংকিত হলো, ধীরে ধীরে শিশু বড় হচ্ছে। আর তো তাকে গোপন করা যাবে না। তিনি তখন আল্লাহ্র ইলহাম অনুসারে তৈরী করিয়ে নিলেন একটি সিন্দুক। তারপর সিন্দুকে বুকের মানিককে পুরে তাকে ভাসিয়ে দিলেন নীল নদের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জলে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফেরাউন ছিলো এক কন্যা সন্তানের জনক। আর কোনো সন্তান সন্ততি ছিলো না তার। তাই পিতৃস্নেহের পুরোটাই অধিকার করেছিলো রাজনন্দিনী একাই। কিন্তু তার শরীর ছিলো ধবলকুষ্ঠাক্রান্ত। ফেরাউন রাজ্যের বড় বড় চিকিৎসককে দিয়েও সে রোগ নিরাময় করতে পারেনি। শেষে সে শরণাপন্ন হলো জ্যোতিষীদের। তারা বললো, একটি মাত্র উপায় আছে। নীল নদের দিক থেকে যদি কোনো মনুষ্য আকৃতির প্রাণী ভেসে আসে এবং তার মুখের লালা যদি রাজনন্দিনীর শরীরে লেপন করা হয়, তবে তার রোগনিরাময় নিশ্চিত। সম্ভবতঃ অমুক দিন অমুক প্রহরে মানবাকৃতির কোনোকিছু ভেসে আসতে পারে। সেদিন থেকে ফেরাউন সতর্ক প্রহর গুণতে লাগলো। নির্দিষ্ট দিনে রাজমহিষী আসিয়াও প্রিয়তম কন্যাকে নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন নীলনদের তীরে নির্মিত প্রমোদপ্রাসাদে। সখীকুল সমভিব্যাহারে রাজনন্দিনী নেমে গেলো তটভূমিসংলগ্ন শান বাধানো ঘাটে। সহসা জলকেলিরতা ললনাদের চোখে পড়লো একটি ভাসমান সিন্দুক। মনে হচ্ছিলো নদীতরঙ্গে দোলায়মান সিন্দুকটি তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে যেনো। সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটে গিয়ে সংবাদটি জানালো প্রতীক্ষারত ফেরাউন ও সম্রাজ্ঞী আসিয়াকে। ফেরাউন নির্দেশ দিলো, সিন্দুকটি উঠিয়ে আনা হোক। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো যথারীতি। মাঝিমাল্লার দল ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে। একটু পরেই তারা ছোট্ট সিন্দুকটি হাজির করলো ফেরাউনের সামনে। ফেরাউনের পুনঃনির্দেশে তারা সিন্দুকটির ঢাকনা খোলার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। এগিয়ে গেলেন সম্রাজ্ঞী আসিয়া। তাঁর সামান্য চেষ্টাতেই খুলে গেলো

www.eelm.weebly.com

ঢাকনাটি। সকলেই সবিস্ময়ে দেখলো, সিন্দুকের ভিতরে আপন মনে খেলা করছে একটি ফুটফুটে মানব শিশু। তার অবয়ব থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অপার্থিব জ্যোতি। কিন্তু সে জ্যোতিচ্ছটা সম্রাজ্ঞী আসিয়া ছাড়া অন্য কেউ দেখতে পেলো না। তবে সকলে দেখলো এক অভূতপূর্ব দৃশ্য— শিশুটি তাঁর হাতের আঙুল চুষছে। আর সে আঙুল থেকে উদগিরিত দুধ পান করে সে পরিতৃপ্ত হচ্ছে। প্রথম দর্শনেই শিশুটিকে ভালোবেসে ফেললেন সম্রাজ্ঞী আসিয়া। তার রূপে মুগ্ধ হলো ফেরাউন নিজেও। আর রাজনন্দিনী কোনোকিছু না বলে শিশুটির মুখের লালা নিয়ে ঘষতে লাগলো শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা গেলো তার শরীরে ধবলকুষ্ঠের কোনো চিহ্নই আর নেই। রাজনন্দিনী আনন্দের আতিশয্যে বুকে জড়িয়ে নিলো শিশুটিকে। আদরে চুম্বনে ভরিয়ে দিলো তাকে। নিকটে দণ্ডায়মান রাজজ্যোতিষীরা এ দৃশ্য দেখে বলে উঠলো, মহামান্য সম্রাট! মনে হয় এই সেই শিশু, যার মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে আপনার সাধের সাম্রাজ্য। সম্ভবতঃ এ শিশু বনী ইসরাইল বংশদ্ভূত। আপনার শিশুহন্তারকদের ভয়ে নিশ্চয় তার মাতা-পিতা এভাবে একে ভাসিয়ে দিয়েছে নীল নদের জলে। ফেরাউন মনস্থির করলো, না কোনো দুর্বলতা নয়। এই মুহূর্তে হত্যা করতে হবে শিশুটিকে। সম্রাজ্ঞী আসিয়া তার মনোভাব বুঝতে পেরে মিনতি জানালো, মহামাননীয় সম্রাট! শিশুটি দেখুন কতো সুন্দর। দয়া করুন। এ নিষ্পাপ মানব সন্তানকে বধ করে আপনার অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাপ্রতাপের অমর্যাদা করবেন না। বরং ভাবুন, এ আমাদেরই সন্তান। আপনি তো পুত্রহীন। ফেরাউন সংযত হলো। সম্রাজ্ঞীর মনোরঞ্জনার্থে কেবল বললো, ঠিক আছে তুমিই রেখে দাও। ওর কোনো প্রয়োজন আমার নেই।

রসুল স. বলেছেন, ফেরাউন তখন যদি বলতো, শিশুটি তোমাকে যেমন মোহিত করেছে, তেমনি আমাকেও করেছে বিমোহিত। তবে সম্রাজ্ঞী যেমন হেদায়েত পেয়েছিলেন, তেমনি ফেরাউনও লাভ করতো হেদায়েত। সম্রাজ্ঞী আসিয়াই তাঁর নাম রেখেছিলেন মুসা। 'মু' অর্থ পানি। আর 'সা' অর্থ বৃক্ষ। যেনো তিনি নদী নামক বৃক্ষের পানিসদৃশ শাখা থেকে তুলে এনেছেন একটি বিস্ময়কর ভালোবাসার পুষ্প— মুসা।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'অতঃপর ফেরাউনের লোকজন মুসাকে উঠিয়ে নিলো। এর পরিণাম তো এইছিলো যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিলো অপরাধী'। এ কথার অর্থ— ফেরাউন তার লোকজনের মাধ্যমে নীল নদ থেকে শিশু মুসাকে উঠিয়ে নিয়ে রাজপ্রাসাদে স্থান করে দিলো। এভাবে সে নিজেই বেছে নিলো আত্মসংহারের

www.eelm.weebly.com

পথ। সে বুঝতে পারলো না, তার শত্রু এখন থেকে বেড়ে উঠতে শুরু করবে তার গৃহেই। এভাবেই আল্লাহ্ ফেরাউন, হামান ও তাদের বশংধরদেরকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কারণ তারা ছিলো সীমালংঘনকারী।

এখানে 'লিয়াকূনা' (যেনো হয়) কথাটির 'লাম' (যেনো) অব্যয়টি পরিণতি প্রকাশক। অর্থাৎ কোনো একটি ক্রিয়ার পরিণতি অপর একটি ক্রিয়ার কারণ বা সূচনা। 'আদুও্ওয়ান' অর্থ শত্রু, এমন শত্রু, যে হবে তাদের মহাদুঃখের কারণ।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— ফেরাউনের স্ত্রী বললো, 'এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন প্রীতিকর। একে হত্যা করো না'। একথার অর্থ— সিন্দুকটি উন্মোচন করা হলো। দেখা গেলো তার মধ্যে আপন মনে খেলা করছে এক জ্যোতির্ময় শিশু। সম্রাজ্ঞী আসিয়া প্রথম দর্শনেই তাকে ভালোবেসে ফেললেন। অভিভূত হয়ে বলে উঠলেন, হে সম্রাটপ্রবর! এ যে আমাদের পরম সৌভাগ্য। এ শিশু আমার ও আপনার নয়নমণি।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, সিন্দুকটি খোলার পর তার ভিতরে একটি সুন্দর মানব শিশু দেখতে পেয়েই ফেরাউন চিৎকার করে বলে উঠলো, আরে এ যে দেখছি বনী ইসরাইলদের শিশু। এতো আমার শত্রু। আশ্চর্য! এ আমার লোকদের হাত থেকে বেঁচে গেলো কী করে। ফেরাউনের পত্নী আসিয়া ছিলেন বনী ইসরাইলের কোনো এক নবী বংশদ্ভূত। পতিপরায়ণা ওই মহীয়সী রমণী ছিলেন দরিদ্র-দুঃখীদের আশ্রয়স্থল। তিনি তখন ছিলেন ফেরাউনের পাশে উপবিষ্টা। ক্রোধান্বিত ফেরাউনকে তিনি সংযত করতে চেষ্টা করলেন। বললেন, হে সম্রাট! শান্ত হোন। আপনি বনী ইসরাইলদের শিশু হত্যার নির্দেশ জারী করেছেন বছর খানেক হলো। আর এ শিশুটির বয়স তো দেখা যায় এক বৎসরের বেশী। সুতরাং কোনো ভয় নেই। এতো আমার আপনার দু'জনেরই নয়ন শীতল করবে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, সম্রাজ্ঞী আসিয়া তখন বলেছিলেন, শিশুটি সম্ভবতঃ উজানের কোনো দেশ থেকে ভেসে এসেছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি'। একথার অর্থ— সম্রাজ্ঞী আরো বললেন, এ শিশু বড়ই সৌভাগ্যশালী। তার অবয়ব জুড়ে জ্বল জ্বল করছে মহাকল্যাণ। সুতরাং তার দ্বারা আমাদের উপকার ব্যতীত অন্যবিধ কিছু ঘটবে না। দেখুন না, আমাদের প্রিয়তমা দুহিতা তো নিরাময় লাভ করলো এর কারণেই। ভেবে দেখুন, আমরা তাকে তো পুত্রস্নেহে প্রতিপালন করতে পারি।

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রকৃতপক্ষে তারা এর পরিণাম বুঝতে পারেনি'। একথার অর্থ— ফেরাউন তাঁর পত্নীর কথায় শান্ত হলো। আর কোনো উচ্চবাচ্য

www.eelm.weebly.com

করলো না। এভাবেই রাজপ্রাসাদে পাকাপোক্ত হয়ে গেলেন হজরত মুসা। কিন্তু ফেরাউন সেদিন ঘুণাক্ষরেও একথা জানতে পারলো না যে, ভবিষ্যতে এর পরিণাম তার জন্য হবে কতো ভয়াবহ।

পরিণতসূত্রে মোহাম্মদ ইবনে কায়েস থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, ফেরাউন তখন আসিয়াকে বলেছিলো, এ তোমার নয়নপ্রীতিকর হতে পারে, কিন্তু আমার নয়। কিন্তু সে যদি তখন আসিয়ার মতো বলতো, হ্যাঁ। এ শিশুটি তোমার আমার নয়ন-প্রীতিকর, তাহলে আল্লাহ্‌পাক আসিয়ার মতো তাকেও সৎপথ প্রদর্শন করতেন। মোহাম্মদ ইবনে ওয়াহাবের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌দ্রোহী ফেরাউন যদি সেদিন তাঁর পত্নীর এমতো উক্তি পুনরাবৃত্তি করতো, তবে সে-ও পেতো হেদায়েতের মতো মহাকল্যাণ। কিন্তু সে ছিলো চিরভ্রষ্ট। তাই ‘এ শিশু তোমার আমার নয়ন-প্রীতিকর’ এরকম মহাকল্যাণময় বচন উচ্চারণের সৌভাগ্য তার হয়নি।

সূরা ক্বসাস ঃ আয়াত ১০, ১১, ১২, ১৩

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ؕ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ
رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ
قُصِّيْهِ ۫ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١١﴾
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى
اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى
اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾

r মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য তাহার হৃদয়কে আমি দৃঢ় করিয়া না দিলে সে তাহার পরিচয় তো প্রকাশ করিয়াই দিত।

r সে মূসার ভগ্নিকে বলিল, ‘ইহার পিছনে পিছনে যাও।’ সে উহাদিগের অজ্ঞাতসারে দূর হইতে তাহাকে দেখিতেছিল।

www.eelm.weebly.com

r পূর্ব হইতেই আমি ধাত্রীস্তন্য পানে তাহাকে বিরত রাখিয়াছিলাম। মূসার ভগ্নি বলিল 'তোমাদিগকে আমি এমন এক পরিবারের কথা বলিব কি যাহারা তোমাদিগের হইয়া ইহাকে লালন-পালন করিবে এবং উহার মংগলকামী হইবে?'

r অতঃপর আমি তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম তাহার জননীর নিকট যাহাতে তাহার চক্ষু জুরায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝিতে পারে যে, আল্লাহের প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ইহা বুঝে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মুসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল'। একথার অর্থ— প্রিয় আত্মজকে নীলনদের পানিতে ভাসিয়ে দেয়ার পর যখন ধীরে ধীরে সিন্দুকটি দৃষ্টির আড়াল হয়ে যাচ্ছিলো, তখন তাঁর জননী-হৃদয় হাহাকার করে উঠেছিলো। মস্তিষ্ক হয়ে গিয়েছিলো জ্ঞানশূন্য প্রায়। হয়ে গিয়েছিলেন তিনি হতবিহ্বল, চঞ্চল।

এখানে হৃদয়ের অস্থিরতা অর্থ অন্তরের শূন্যতা। প্রিয়তমজনকে হারালে এরকম শূন্যতাবোধ বিরাজ করে মানুষের মনে। হাসান বসরী বলেছেন, এখানকার অস্থিরতা বা শূন্যতার অর্থ— ওই সময় মুসা-জননী ভুলে গিয়েছিলেন ইলহামের মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহ্র অভয়-বাণীর কথা, যেমন বলা হয়েছে ৭ সংখ্যক আয়াতে 'ভয় কোরো না, দুঃখও কোরো না। আমি একে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিবো এবং একে রসুলগণের একজন করবো'। এ অভয়বাণীর কথা তাঁকে ভুলিয়ে দিয়েছিলো ইবলিস। সেই সঙ্গে কুমন্ত্রণা দিয়েছিলো, মা হয়ে তুমি কী করে পারলে আপন আদরের সন্তানকে এভাবে ভাসিয়ে দিতে। ভেবে দ্যাখো তুমি নিজেই তোমার সন্তানের হন্তারক। ইবলিসের এমতো কুমন্ত্রণার কারণেই মুসা-জননী তখন হয়ে পড়েছিলেন চঞ্চলচিত্ত, হৃদয়ে তাঁর নেমে এসেছিলো সীমাহীন শূন্যতা। তারপর যখন জানলেন, সিন্দুকটি উঠিয়ে নিয়েছে ফেরাউন, তখন তিনি হয়ে পড়লেন আরো অধিক দুঃশ্চিন্তাগ্রস্তা, উম্মাদিনীপ্রায়। সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হলেন আল্লাহ্তায়ালার অঙ্গীকার। আমি বলি, ইলহামের কথা তিনি বিস্মৃত হননি, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস হয়ে পড়েছিলো টলোমলো। কারণ ওলীগণের ইলহাম নবীগণের ওহীর মতো বিশ্বাসকে অটল রাখতে পারে না। নবীগণের প্রত্যাদেশ নির্ভুল এবং অবশ্য অনুসরণীয়। কিন্তু ওলীগণের ইলহাম কোনো কোনো সময় আস্থার্জক হলেও অধিকাংশ সময় হয় ভুল। কারণ নিজের ধারণার মিশ্রণ থেকে তা প্রায়শই মুক্ত নয়, নয় প্রত্যাদেশের মতো সম্পূর্ণরূপে স্বধারণার প্রভাবমুক্ত। তাই ইলহামে ভুলের সম্ভাবনা কিছু না কিছু থেকেই যায়।

আবু উবায়দা বলেছেন, এখানে হৃদয় শূন্য হওয়ার অর্থ হৃদয় মর্মপীড়াশূন্য হওয়া। অর্থাৎ এ বিষয়ে তাঁর সুদৃঢ় প্রতীতি ছিলো যে, আল্লাহ্পাক অবশ্যই তাঁর প্রিয়তম আত্মজের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করবেন। তাই তখন তাঁর অন্তর হয়ে

www.eelm.weebly.com

গিয়েছিলো দুঃশ্চিন্তাশূন্য। কুতাইবা বলেছেন, আবু উবায়দার এমতো ব্যাখ্যা যথাযথ নয়। কারণ পরবর্তী বাক্যে তাঁর হৃদয়ের অস্থিরতা বা শূন্যতাবোধের কথা বলা হয়েছে আরো স্পষ্ট করে।

বলা হয়েছে— 'যাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য তার হৃদয়কে আমি দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিতো'। একথার অর্থ— আমিই তখন তাঁর হৃদয়ে সহিষ্ণুতাকে দৃঢ়বদ্ধ করে দিয়েছিলাম। নতুবা চরম মানসিক চাপে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতো তাঁর পুত্রের পরিচয়। আর সে পরিচয় জানতে পারলে অবশ্যই ফেরাউন শিশু মুসাকে হত্যা করে ফেলতো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শোকাকুলা মুসা-জননী তখন চিৎকার করে বলতে উদ্যত হয়েছিলেন 'হায় আমার পুত্র'!

মুকাতিল বলেছেন, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ নদীতে ভাসমান সিন্দুকটি দেখে মুসা জননীর মনে হচ্ছিলো, এই বুঝি ঢেউয়ের তলায় হারিয়ে গেলো তাঁর বুকের মানিক। সে দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। মনে হচ্ছিলো, এক্ষুণি তিনি চিৎকার করে জানিয়ে দেন, ওই সিন্দুকটি আমার, আমার প্রিয়তম পুত্রের। কালাবী বলেছেন, মুসা-জননীর চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছিলো আরো পরে, যখন মুসা কিশোর অথবা যুবক। তখন সকলেই তাঁকে ফেরাউনের পুত্র বলতো। তিনি সে কথা সহ্য করতে পারতেন না। মনে হতো, এক্ষুণি চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দেন, না, মুসা আমার।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, যখন মুসা জননী শুনতে পেয়েছিলেন, লোকে তাঁর পুত্রকে ফেরাউনের পুত্র বলে, তখন তাঁর উচ্চকিত কণ্ঠে বলতে ইচ্ছা হয়েছিলো, না, সে তো ফেরাউনের পালক পুত্র। আমিই তাঁর আসল জননী।

ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, আল্লামা সুদ্দী বলেছেন, নদীর পানি থেকে উদ্ধার করা শিশুটিকে অনেক চেষ্টা করেও কারো দুধ পান করানো গেলো না। বাইরে জমে ছিলো দুগ্ধদাত্রী রমণীদের ভিড়। ওই ভিড়ে মিশে ছিলেন হজরত মুসার বড় বোন মরিয়ম। তিনি বললেন, আমি এক ধাত্রীমাতার সন্ধান জানি। মনে হয় শিশুটি ওই রমণীর স্তন পান করতে অনাগ্রহী হবে না। রাজকর্মচারীরা তাকে অনুমতি প্রদান করলো। মরিয়ম অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁর মাকে হাজির করলেন সেখানে। মুসা-জননী অন্দর মহলে গিয়ে কোলে তুলে নিলেন প্রিয়তম পুত্রকে। শিশু মুসা পরম সুখে নিশ্চিন্তে পান করতে লাগলেন আপন জননীর দুধ। ওই সময় আনন্দে অস্থির হয়ে বলে উঠতে চাইলেন, দ্যাখো দ্যাখো, নিজের পেটের সন্তান না হলে কী এভাবে নিশ্চিন্তে মাতৃস্তন্য পান করে? কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং তাঁর ওই সময়ের এমতো চিত্তচাঞ্চল্য দূর করে দেন। তাঁর হৃদয়কে করেন সুদৃঢ়। এভাবে গোপন রাখেন শিশু মুসার প্রকৃত পরিচয়।

www.eelm.weebly.com

আবু উবায়দা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মুসা-জননী তখন ছিলেন নির্বিকার, নিশ্চিন্ত। কারণ আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে অভয় দিয়েছিলেন 'ভয় কোরো না, দুঃখও কোরো না'। তিনি একথার উপরে ছিলেন পূর্ণ আস্থাশীল। তাই তিনি তখন নির্ভয়ে বলতে চেয়েছিলেন এ সন্তান আমার। অথবা তিনি তখন অতিনিশ্চিতির সঙ্গে একথা সর্বসমক্ষে প্রকাশই করে দিতে চেয়েছিলেন যে, এ পুত্র আমার। আল্লাহ্ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি আমার কোলেই ফেরত দিবেন একে। সে প্রতিশ্রুতি এখন পূর্ণ হলো। তিনি আমাকে আরো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমার এই মহাসৌভাগ্যশালী পুত্র ভবিষ্যতের নবী।

এখানে 'ইন' (যদি) অব্যয়টি ধাতুমূল শব্দটির মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, স্বগৃহে শত্রুপালন একটি অসম্ভব ব্যাপার। আর আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায় এই অসম্ভবকে সম্ভব করার পক্ষে। সুতরাং বিষয়টির গোপনীয়তা সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। অথচ মুসা-জননী দুঃশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে অথবা আনন্দের আতিশয্যে এই রহস্যটি প্রকাশ করে দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু পারেনি একারণে যে, তা ছিলো আমার অভিপ্রায়বিরোধী। আর আমার অভিপ্রায়ের বিপরীতে কোনো কিছু থাকে না। তাই তখন তিনি তার চিত্তচাঞ্চল্য দূর করে তদস্থলে দৃঢ়বদ্ধ প্রতীতি প্রতিষ্ঠা করে গোপন রহস্যকে গোপনই রেখে দিয়েছিলেন। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এখানকার 'যাতে সে হয়' (লিতাকুনা) কথাটি সম্পর্ক 'মুসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিলো' কথাটির সঙ্গেও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মুসা জননীর হৃদয় তখন ছিলো ভয়-লেশশূন্য। কারণ সে ছিলো আমার অঙ্গীকারের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীলা। আর এমতো মানসিক দৃঢ়তা আমিই তখন দিয়েছিলাম তাঁকে। নতুবা তিনি তো গোপন রহস্যটি প্রকাশ করেই দিতেন।

উল্লেখ্য, আমরা যেভাবে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করলাম, তাতে করে আবু উবায়দাকৃত মর্মার্থের উপরে কুতাইবার সমালোচনার অবকাশ আর রইলো না। ইউসুফ ইবনে হোসাইন বলেছেন, মুসা জননীকে দেয়া হয়েছিলো দু'টি নির্দেশ। দু'টি নিষেধাজ্ঞা এবং দু'টি সুসংবাদ। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় ও স্বউদ্যোগে সেগুলোর একটি থেকেও উপকৃত হতে পারতেন না, যতক্ষণ না আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সরাসরি সাহায্য না করেছেন। সেকারণেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'তার হৃদয়কে আমি সুদৃঢ় করে না দিলে'।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে—'সে মুসার ভগ্নিকে বললো, এর পিছনে পিছনে যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে দূর থেকে তাকে দেখছিলো'। একথার অর্থ— মুসা জননী আল্লাহ্র ইলহাম অনুসারে শিশু মুসাকে সিন্দুকে পুরে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। তারপর কন্যাকে বললেন, সকলের অজ্ঞাতসারে দূর থেকে সিন্দুকটির গতিবিধির উপরে দৃষ্টি রেখো। কন্যা তাই করলো।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীস্তন্য পানে তাকে বিরত রেখেছিলাম'। একথার অর্থ— সম্রাজ্ঞী আসিয়া শিশু মুসাকে দুধ পান করানোর উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু তিনি কোনো স্তন্যদায়িনীর দুধ পান করলেন না। এভাবে ব্যর্থ হয়ে গেলো অনেক স্তন্যদায়িনীর প্রচেষ্টা। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার ছিলো আমিই তাকে অন্যের দুধ পান থেকে বিরত রেখেছিলাম। উল্লেখ্য, এরকম করা হয়েছিলো স্বভাবগত কারণে, ধর্মীয় কারণে নয়। কারণ দুগ্ধপোষ্য শিশু ধর্মীয় বিধানবিমুক্ত। এখানকার 'মারদ্বিয়া' শব্দটির কয়েক রকমের অর্থ হয়। যদি শব্দটিকে 'মুরদ্বিউন' এর বহুবচন ধরা হয় তবে অর্থ হয়— ওই সময় ওই স্তন্যদায়িনীদের স্তনের দুগ্ধপ্রবাহ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। এভাবে দুগ্ধপান থেকে বিরত রাখা হয়েছিলো হজরত মুসাকে। আর যদি শব্দটিকে ধরা হয় 'মরদ্বাউন' এর বহুবচন, তাহলে অর্থ দাঁড়ায়— তখন হজরত মুসার দুগ্ধপান শক্তিই রহিত করা হয়েছিলো। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে বিরত ছিলেন দুধপানে। আবার যদি বলা হয়, শব্দটির একবচন 'মারদ্বিউন' তবে আধারাধিকরণে অর্থ দাঁড়ায়— মাতৃস্তনই ছিলো তখন দুগ্ধপ্রদানে অক্ষম। আর এটাই ছিলো তাঁর দুগ্ধপান থেকে বিরতির কারণ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সম্রাজ্ঞী আসিয়া তখন শিশু মুসাকে দুগ্ধপান করানোর জন্য অনেক প্রচেষ্টা চালালেন। একে একে অনেক ধাত্রী তাঁকে দুধপান করাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি কারো স্তন মুখে নিলেন না। ওই ধাত্রীদের দলে মিশে গিয়েছিলেন তাঁর বড় বোন। তিনি বিষয়টি আগাগোড়া লক্ষ্য করে গেলেন। এভাবে অতিবাহিত হলো আটটি রাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'মুসার ভগ্নি বললো, তোমাদেরকে আমি এমন এক পরিবারের কথা বলবো কি, যারা তোমাদের হয়ে এর লালন পালন করবে এবং এর মঙ্গলকামী হবে'? একথার অর্থ— হজরত মুসার বোন তখন বললেন, আমি এক মমতাময় পরিবারের কথা জানি। আমার মনে হয়, ওই পরিবারই শিশুটির লালনপালনের দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য। একমাত্র তারাই হতে পারে এ শিশুর কল্যাণকামী এবং উপযুক্ত প্রতিপালক।

এখানকার 'নাসহুন' (কল্যাণকামনা) শব্দটি ত্রুটি, কার্পণ্য ও হৃদয়হীনতার বিপরীতার্থক। কর্মকে ত্রুটিমুক্ত রাখার নাম 'নাসহুন'। এভাবে 'হুমলাহু নাসিহুন' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— তারা হবে তার মঙ্গলকামী। ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় এসেছে, সুদ্দী বলেছেন, যাদের সম্মুখে হজরত মুসার ভগ্নি এমতো প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন, তারা সকলেই ছিলো ফেরাউনের একনিষ্ঠ অনুসারী। তারা

www.eelm.weebly.com

তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ফেললো। বললো, মনে হয় তুমি এ শিশুর পরিচয় জানো? বলো, এর মাতা-পিতা কে? তিনি বললেন, না, আমি এর পরিচয় জানি না। তবে এতটুকু জানি, যে পরিবারের কথা আমি বলেছি, তারা মহামান্য সম্রাটের হিতাকাংখী। ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেমও এরকম বলেছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুসার ভগ্নিকে যখন শাসানো হলো, তখন তিনি সম্রাটপক্ষীয়দের সন্তোষ আকর্ষণার্থে ওরকম কথা বলেছিলেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুসার ভগ্নি বর্ণিত প্রস্তাব করলেন, তখন উপস্থিত সকলে কৌতূহলবশতঃ তাঁকে ঘিরে বললো, বলো, কে আছেন এমন মমতাময়ী ধাত্রী। তিনি বললেন, আমার মা। তারা বললো, তার কি কোনো সন্তান আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সন্তানটির নাম হারুন। তার জন্ম শিশুবধ আইন প্রয়োগের সময় বহির্ভূত। তারা বললো, তাহলে এক্ষুণি নিয়ে এসো তাকে। হজরত মুসার বোন সাথে সাথে রওয়ানা দিলেন বাড়ীর দিকে। মাকে খুলে বললেন সব। তারপর তাঁকে নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হলেন রাজপ্রাসাদে। শিশুকে কোলে তুলে নিলেন মা। স্তন্য তুলে দিলেন শিশুর মুখে। শিশুও মাতৃসুরভিতে মোহিত হয়ে পরমানন্দে পান করতে লাগলেন তাঁর দুধ। সুদ্দী বলেছেন, ধাত্রী হিসেবে মুসা-জননীর পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়েছিলো প্রতিদিন এক দীনার। তিনি ওই পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন একারণে যে, তা ছিলো অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সম্পদ।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার জননীর নিকট যাতে তার চক্ষু জুড়ায়। সে দুঃখ না করে এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা বোঝে না'। একথার অর্থ— ফেরাউনের লোকেরা স্বচক্ষে দেখলো, কুড়িয়ে পাওয়া অবুঝ শিশুটি পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে তার ধাত্রীমাতার দুধ পান করছে। এভাবেই আমি মুসাকে ফিরিয়ে দিলাম তার মাতৃক্রোড়ে যাতে করে তার জননীর নয়ন শীতল হয়, উবে যায় তার দুঃখবোধের শেষ চিহ্নটুকু এবং সে ভালোভাবে এ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার অতি অবশ্যই পরিপূরিত হয়ে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যারা ফেরাউন ও তার অনুসারীদের মতো. তারা এবিষয়টি মোটেও উপলব্ধি করতে পারে না। কারণ তারা সত্যবোধবিচ্যুত। উল্লেখ্য, মুসা জননী তাঁর নয়নমণিকে নীলনদের উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়ে দিয়ে কিছুকালের জন্য হলেও আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার বিস্মৃত হয়েছিলেন। হয়েছিলেন শোকাকুলা ও বিরহকাতরা। তাঁর এমতো স্খলনের কারণেই এখানে স্নেহসিক্ত ভর্ৎসনা স্বরূপ বলা হয়েছে 'এবং বুঝতে পারে যে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য'।

www.eelm.weebly.com

এখানে ‘লা ইয়ালামূন’ অর্থ তারা বোঝে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার যে কতো অমোঘ ও অবশ্যকার্যকর সে সম্পর্কে ফেরাউন ও তার অনুসারীরা মোটেও জানে না। তারা তাই ধারণাও করতে পারেনি যে, মুসা প্রতিপালিত হয়ে চলেছেন আপন মাতৃক্রোড়ে। আর এ আয়োজন সুসম্পন্ন যিনি করেছিলেন, তিনি অন্য কেউ নন, হজরত মুসারই আপনবোন। যাহোক, এভাবে গড়িয়ে চললো দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। হজরত মুসা অতিবাহিত করলেন তাঁর দুগ্ধপানের বয়স। যথাসময়ে তাঁর মাতা তাকে তুলে দিলেন ফেরাউনের তত্ত্বাবধানে। তারপর পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও নিশ্চিতি নিয়ে ফিরে এলেন স্বগৃহে।

সূরা ক্বসাস ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا ؕ وَ كَذٰلِكَ
نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤﴾ وَ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ
اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۫ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَ هٰذَا
مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ
فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۫ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ
عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ
فَغَفَرَ لَهٗ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ
عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٧﴾ فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ
خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ؕ
قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ
هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا

www.eelm.weebly.com

بِالْاَمْسِ ۖ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ
اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ
يَسْعٰى ۫ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ
اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۫ قَالَ
رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢١﴾

r যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হইল তখন আমি তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম; এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

r সে নগরীতে প্রবেশ করিল যখন ইহার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেথায় সে দুইটি লোককে বিবাদমান দেখিল— একজন তাহার নিজদলের এবং অপর জন তাহার শত্রুদলের। মূসার দলের লোকটি উহার শত্রুর বিরুদ্ধে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন মূসা উহাকে ঘুষি মারিল; এইভাবে সে তাহাকে হত্যা করিয়া বসিল। মূসা বলিল, 'শয়তানের প্ররোচনায় ইহা ঘটিল। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।'

r সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করিয়াছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর।' অতঃপর তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

r সে আরও বলিল,'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহার শপথ, আমি কখনও অপরাধীকে সাহায্য করিব না।'

r অতঃপর ভীত-শংকিত অবস্থায় সে নগরীতে তাহার প্রভাত হইল। হঠাৎ সে শুনিতে পাইল, পূর্বদিন যে ব্যক্তি তাহার সাহায্য চাহিয়াছিল সে তাহার সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতেছে। মূসা তাহাকে বলিল, 'তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি।'

r অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল তখন সে ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, 'হে মূসা! গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করিতে চাহিতেছ? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হইতে চাহিতেছ, শান্তি স্থাপনকারী হইতে চাহ না!'

www.eelm.weebly.com

r নগরীর দূর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল ও বলিল, 'হে মূসা! ফিরাউনের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। সুতরাং তুমি বাহিরে চলিয়া যাও, আমি তো তোমার মংগলকামী।'

r ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সে তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি জালিম সম্প্রদায় হইতে আমাকে রক্ষা কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যখন মুসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হলো, তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম'। একথার অর্থ, মুসা যখন যৌবনপ্রাপ্ত হলেন ও পৌঁছলেন পরিণত বয়সে তখন আমি তাকে দান করলাম উচ্চতর প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'শিদ্দত' শব্দের বহুবচন 'আশুদ্দা'। এর অর্থ দৃঢ়, পাকাপোক্ত। অর্থাৎ হজরত মুসা যখন ওই বয়সে উপনীত হলেন, যে বয়সে প্রকাশ পায় পরিণত বুদ্ধিমত্তা। কালাবী বলেছেন, আঠারো থেকে কুড়ি বৎসর বয়সকে বলে 'আশুদ্দা'। মুজাহিদের মতে বয়সের পরিণতির শেষ সীমা হচ্ছে তেত্রিশ বৎসর।

'ইসতাওয়া' অর্থ জ্ঞানের পূর্ণত্ব, পরিণতি। অর্থাৎ যখন তাঁর বয়স হয়েছিলো চল্লিশ বৎসর। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সাঈদ ইবনে যোবায়ের। কারো কারো মতে 'ইসতাওয়া' বলে যৌবনের শেষসীমাকে।

'হুকমান' অর্থ উচ্চতর প্রজ্ঞা, নবুয়ত। আর 'ইলমান' অর্থ জ্ঞান, আল্লাহ্তায়ালার বিধানাবলীর পরিচিতি। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম' কথাটির মাধ্যমে তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তির বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। কারণ তিনি নবুয়ত পেয়েছিলেন আরো পরে, মিসর থেকে মাদিয়ান গমনের পর মিসরে পুনঃপ্রত্যাবর্তনের পথে। তাই এখানকার 'উচ্চতর প্রজ্ঞা' ও 'জ্ঞান' অর্থ হবে নবীসুলভ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ধর্মবোধ। আমি বলি,'ওয়াও' (এবং) সংযোজক অব্যয়টি এখানে সাধারণ যোজনী হিসেবে ব্যবহৃত। পরম্পরাগত বিন্যাস এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য নয়। তাই বলতে হয়, যদিও তিনি নবুয়ত পেয়েছিলেন আরো পরে, তবুও এখানে সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে প্রসঙ্গক্রমে। কৃত প্রতিশ্রুতির অঙ্গ হিসেবে। কারণ তাঁকে নবুয়ত প্রদানের বিষয়টিও ছিলো হজরত মুসার জননীকে প্রদত্ত অঙ্গীকারভূত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি'। একথার অর্থ— যেভাবে আমি মুসা ও তাঁর জননীকে তাদের পুণ্যকর্মের প্রতিদান দিয়েছি, সেভাবেই আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি অন্যান্য পুণ্যবানদেরকে।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'সে নগরীতে প্রবেশ করলো যখন তার অধিবাসীরা ছিলো অসতর্ক'। সুদ্দী বলেছেন, মিসরের সীমান্তবর্তী ওই শহরটির

www.eelm.weebly.com

নাম ছিলো মাদিয়ান। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'শহর' অর্থ খানীনের একটি প্রদেশ, যার অবস্থিতি ছিলো রাজধানী থেকে ছয় মাইল ব্যবধানে। কেউ কেউ বলেছেন, ওই শহরটির নাম মদীনাতুশ্‌শামস। মাহাল্লী বলেছেন, মান্নাফ'।

এখানে 'হিনি গাফলাতিন' অর্থ অসতর্ক মুহূর্তে, দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামের সময়। মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী বলেছেন, মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়। ঘটনাটি ছিলো এরকম— হজরত মুসা পরিচিত ছিলেন ফেরাউনের পুত্র হিসেবে। তাঁর বাহন ছিলো ফেরাউনি বাহনের মতো। পোশাক পরিচ্ছদ ছিলো রাজকীয়। একদিন মিসর সম্রাট ফেরাউন তার দলবলসহ কোথায় ভ্রমণে বের হয়ে গেলো। হজরত মুসা তখন সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। পরে এসে দেখলেন তাঁকে ছেড়েই সকলে রওয়ানা হয়ে গিয়েছে। তৎক্ষণাৎ তিনিও একটি বাহনে চড়ে বের হয়ে পড়লেন। দ্বিপ্রহরের সময় তিনি উপস্থিত হলেন মান্নাফ শহরে। শহরবাসীরা তখন স্ব স্ব গৃহে বিশ্রামরত। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, ওই শহরের ইসরাইল বংশীয় কিছু সংখ্যক লোক ছিলো হজরত মুসার ভক্ত। তারা তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতো। আর অনুসরণ করতে চেষ্টা করতো তাঁর শুভ উপদেশের। যখন তাঁর অভ্যন্তরস্থিত সুপ্ত শুভবোধ জাগ্রত হতে শুরু করলো, তখন তিনি বিরোধী হয়ে উঠলেন ফেরাউন ও তার অনুসারীদের অশুভধর্মমতের। বিষয়টি সম্রাটের কানেও পৌঁছলো। অনেকে তাঁকে সতর্ক হবার পরামর্শ দিলো। তাই তিনি ওই শহরে যাতায়াত করতে শুরু করলেন গোপনীয়তা বজায় রেখে। ওই দিনও তিনি ওই শহরে প্রবেশ করলেন এমন সময় যখন অধিকাংশ শহরবাসী ছিলো বিভিন্নরকমের ক্রীড়াকৌতুকে মগ্ন। কারণ দিনটি ছিলে তাঁদের উৎসবের দিন।

এরপর বলা হয়েছে— সেখানে সে দু'টি লোককে বিবদমান দেখলো, একজন তার নিজ দলের এবং অপরজন তার শত্রুদলের'। এখানে 'ইয়াক্বতাতিলান' অর্থ বিতণ্ডারত বিবাদমান, 'মিন শীয়া'তিহী' অর্থ নিজ দলের। অর্থাৎ বনী ইসরাইলদের। আর 'মিন আ'দুউবিহী' অর্থ শত্রুদলের। অর্থাৎ ফেরাউনের দলের, যারা পরিচিত ছিলো কিবতী হিসেবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'মুসার দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করলো'। একথার অর্থ— কিবতী ছিলো আক্রমণপ্রবণ। তাই ইসরাইলী লোকটি তার আক্রমণ থেকে অব্যাহতি কামনার্থে হজরত মুসার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলো।

এখানে 'ইসতাগাছাহু' অর্থ, সে সাহায্য প্রার্থনা করলো। ঘটনাটি এরকম— হজরত মুসা ভয়ে জড়সড় ইসরাইলী লোকটির সাহাযার্থে এগিয়ে গেলেন। তাঁর মুসার পরিচয় কিবতীটির জানা ছিলো। সর্বসাধারণের মতো সে-ও জানতো তিনি

www.eelm.weebly.com

শিশুকালে দুধপান করেছেন এক বনী ইসরাইলী রমণীর। সেকারণেই হয়তো তাঁর মধ্যে দেখা যেতো তাদের প্রতি একধরনের পক্ষপাতিত্ব। সে কিছুটা থমকে গেলো। কিন্তু তার আক্রমণপ্রবণতা পরিত্যাগ করলো না। হজরত মুসা রাগান্বিত হলেন। কিবতীটিকে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। কিবতী বললো, কেনো ছাড়বো? আপনি জানেন না, ও হচ্ছে আপনার পিতার আহার্য্যশালার জ্বালানী সরবরাহকারী। অথচ সে তার দায়িত্ব পালনে নিস্পৃহ। হজরত মুসা তখন পূর্ণ যৌবনদীপ্ত বলিষ্ঠদেহী পুরুষ। তিনি তার মুখে মুখে তককরা সহ্য করতে পারলেন না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তখন মুসা তাকে ঘুষি মারলো'। এইভাবে সে তাকে হত্যা করে বসলো'। এখানকার 'ওয়াকাযাহু' শব্দটিকে হজরত ইবনে মাসউদ পাঠ করতেন 'লাকাযাহু'। শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। এর অর্থ— তাকে ঘুষি মারলেন। কেউ কেউ বলেছেন, বুকে ঘুষি মারাকে বলে 'ওয়াকাযা'। আর পিঠে ঘুষি মারাকে বলে 'লাকাযা'। ফাররা বলেছেন, এর অর্থ ধাক্কা দেয়া। আবু উবায়দা বলেছেন, 'ওয়াকাযাহু' অর্থ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়ে ধাক্কা দেওয়া। কোনো কোনো তাফসীরে পাওয়া যায়, হজরত মুসা ওই কিবতীর উপরে তখন প্রয়োগ করেছিলেন বিশাল ওজনের মুষ্টাঘাত।

'ফাকৃদ্বা আলাইহী' অর্থ সে অক্কা পেলো। অর্থাৎ হজরত মুসা তাকে বধ করলেন। মাহাল্লী লিখেছেন, নিহত কিবতীটিকে সেখানেই বালির মধ্যে পুঁতে ফেলেছিলেন হজরত মুসা। কিন্তু এভাবে সে নিহত হবে একথা ভাবতেই পারেননি তিনি। তাই তিনি এর জন্য হয়েছিলেন অতিশয় অনুতপ্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, শয়তানের প্ররোচনায় এরকম ঘটলো। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী'। একথার অর্থ— হজরত মুসা ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত ও অনুতপ্ত। বললেন, এরকম কাজ তো শয়তানের প্ররোচনাজাত। সেতো মানুষের নিশ্চিত শত্রু। এভাবেই সে তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। উল্লেখ্য, হজরত মুসা তখনো কাফেরবধের নির্দেশপ্রাপ্ত হননি, সেকারণেই তিনি ওই হত্যাকে অভিহিত করেছিলেন শয়তানের কর্ম বলে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, এভাবে কাউকে হত্যা করার পরিকল্পনা তাঁর আদৌ ছিলো না। বিষয়টি সম্পূর্ণতঃই ছিলো তাঁর অনিচ্ছাকৃত। সুতরাং এ ঘটনা তাঁর নিষ্পাপত্বের অন্তরায় নয়। কিন্তু যেভাবেই ঘটনাটি ঘটে থাকুক না কেনো, ঘটনাটি কোনো শুভ ঘটনা নিশ্চয়ই নয়। তাই তিনি কর্মটিকে চিহ্নিত করেছিলেন শয়তানী কর্ম বলে এবং এর জন্য যথারীতি প্রকাশ করেছিলেন আন্তরিক অনুতাপ।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করো। অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— হজরত মুসা প্রার্থনা করলেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! তোমার নির্দেশ

www.eelm.weebly.com

ব্যতিরেকেই আমার দ্বারা হত্যাকাণ্ড সাধিত হলো। নিশ্চয় এটা আমার চরম অপরাধ। সুতরাং তুমি কৃপাপরবশ হয়ে আমাকে ক্ষমা করো। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে মার্জনা করলেন। কারণ তিনি তো মার্জনা প্রার্থীদের প্রতি ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ার্দ্র। উল্লেখ্য, এখানে ঘোষিত হয়েছে আল্লাহ্র অধিকার খর্বের মার্জনা প্রদানের কথা। এরপর রইলো বান্দার অধিকার খর্বের কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে সে প্রশ্নের অবতারণা করার সুযোগও নেই। কারণ নিহত কিবতীটি ছিলো অংশীবাদী ও অপরাধী। সুতরাং কিসাস ও রক্তপণের অবকাশও এখানে অনুপস্থিত।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'সে আরো বললো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছো, তার শপথ! আমি কখনো অপরাধীকে সাহায্য করবো না'।

আমি বলি, এখানকার 'বিমা আনআ'মতা' (তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছো) বাক্যটির 'বা' অব্যয়টি শপথার্থক। আর পরবর্তী বাক্যটি পরিণতি প্রকাশক। 'ফালান আকুনা' (আমি কক্ষনোই হবো না সাহায্যকারী) কথাটি সংযোজিত রয়েছে একটি অনুক্ত বাক্যের সঙ্গে। ওই অনুক্ত বাক্যটিসহ পূর্ণ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রভুপালক! তুমি যে অনুগ্রহরাজি দ্বারা আমাকে ধন্য করেছো, তার শপথ করে আমি ঘোষণা দিচ্ছি, তোমার প্রতি অনুতপ্ত প্রত্যাবর্তনের। একথায় প্রকাশ করছি যে, আমি কখনোই সাহায্যকারী হবো না কোনো অন্যায়চারীর।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আলমুজ্রিমীন' অর্থ অবিশ্বাসীদের। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যার পক্ষে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, সেই বনী ইসরাইল লোকটি ছিলো অবিশ্বাসী। এরকম অবিশ্বাসীর সাহায্যকারী আমি আর কখনো হবো না। কেউ কেউ বলেছেন, বক্তব্যটি হবে এরকম— আমি ভবিষ্যতে আর কখনো এরকম ব্যক্তিকে সাহায্য করবো না, যার ফলে আমিই হয়ে যাবো অপরাধীদের অন্তর্ভূত।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'অতঃপর ভীত-শংকিত অবস্থায় সে নগরীতে তার প্রভাত হলো। হঠাৎ সে শুনতে পেলো, পূর্বদিন যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিলো, সে তার সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। মুসা বললো, তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি'। একথার অর্থ— যে শহরে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিলো ওই শহরেই হজরত মুসা রাত্রিযাপন করলেন। সারারাত কাটলো তাঁর ভয়ে ভয়ে। সকালে রাস্তায় বের হতেই দেখলেন, গতকাল যে লোকটি তাঁর সাহায্যার্থী হয়েছিলো, সেই লোকটিই আজ আবার সাহায্যের জন্য তাঁকে চিৎকার করে ডাকছে। তিনি বুঝলেন, মানুষের সঙ্গে কলহ বাধানোই তার স্বভাব। তাই তাকে বললেন, তুমি তো দেখছি অমানুষ, বিভ্রান্ত।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'ইয়াস্তাসরিখুহু' অর্থ সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। কথাটি নিষ্পন্ন হয়েছে 'সুরাখ' থেকে। এর অর্থ চিৎকার করা, চিৎকার করে সাহায্য প্রার্থনা করা।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন ওই হত্যাকাণ্ডের কথা জানাজানি হয়ে গেলো, তখন একদল কিবতী ফেরাউনের দরবারে গিয়ে এই মর্মে অভিযোগ উপস্থিত করলো যে, জনৈক বনী ইসরাইল আমাদের একজন লোককে হত্যা করেছে। আমরা এর প্রতিকারার্থী। ফেরাউন বললো, সে লোককে খুঁজে বের করো এবং উপস্থিত করো চাক্ষুষ সাক্ষী। কিন্তু কিবতী জনতা দু'টোর একটিও করতে পারলো না। ওদিকে হজরত মুসা যখন ওই শহর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করলেন, তখন দেখলেন, আগের দিন যাকে সাহায্য করতে গিয়ে তিনি মহাঅনর্থ ঘটিয়েছিলেন সেই লোকটি আজ আবার বিতণ্ডা করছে আর একজন কিবতীর সঙ্গে। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার সাহায্যের জন্য চিৎকার শুরু করলো। হজরত মুসা বললেন, তুমি আসলে ভয়ানক দুষ্ট লোক। যার তার সাথে যখন তখন বিবাদ বাধাও। একথা বলেই তিনি লোকটির উপরে চড়াও হলেন।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন মুসা উভয়ের শত্রুকে প্রহার করতে উদ্যত হলো, তখন সে ব্যক্তি বলে উঠলো, হে মুসা! গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাও, শান্তিস্থাপনকারী হতে চাও না'।

এখানে 'ওয়া আদুউল লাহুমা' অর্থ উভয়ের শত্রু। অর্থাৎ হজরত মুসা ও সাহায্যার্থী লোকটির শত্রু। কেননা সে ছিলো বিধর্মী। অথবা বলা যেতে পারে, কিবতীরা বনী ইসরাইলের জাতীয় শত্রু। পরের দিনেও ওই বনী ইসরাইলী হয়েছিলো আর এক কিবতীর দ্বারা আক্রান্ত। তাই হজরত মুসা তাকে 'বিভ্রান্ত' বললেও তার সাহায্যেই হস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ওই ইসরাইলী ভাবলো, আজ মুসা তাকেই ঘুষি মেরে বসবে। তাই সে চিৎকার করে বললো, তুমি কি কালকের লোকটির মতো আমাকেও মেরে ফেলবে নাকি। অথবা বলা যায়, 'এরকম বলেছিলো তার প্রতিপক্ষ কিবতীটি। কারণ হজরত মুসা যখন বনী ইসরাইলীটিকে বিভ্রান্ত' বললেন, তখন সে ধারণা করলো এই লোকটিই তাহলে গতকালের হত্যাকাণ্ডের নায়ক। তবে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই সুসঙ্গত।

এখানে 'জ্বাব্বারান' অর্থ স্বেচ্ছাচারী, দুর্ধর্ষ, বিশ্বসেরা খুনী। এভাবে এখানকার শেষ বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে মুসা! তুমি ঘোর স্বেচ্ছাচারীর মতো একের পর এক মানুষ খুন করতে চাও নাকি? সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চাও তোমার অবাধ স্বেচ্ছাচরণ? অথচ তুমি ইচ্ছে করলেই তোমার শক্তিকে করতে পারো সংযত, সংহত। হতে পারো বিবদমান দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে শান্তিস্থাপয়িতা। সেরকম মহৎ ইচ্ছা কি তোমার আদৌ নেই?

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এলো ও বললো, হে মুসা ফেরাউনের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছে। সুতরাং তুমি বাইরে চলে যাও। আমি তো তোমার মঙ্গলকামী।' একথার অর্থ— ওই কিবতী যখন বনী ইসরাইল লোকটিকে বলতে শুনলো 'গতকাল তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাও' তখন সে নিশ্চিত হলো যে, মুসাই গতকালের হত্যাকাণ্ডের হোতা। তাই সে অতি দ্রুত যাত্রা করলো রাজধানীতে। ফেরাউনের দরবারে উপস্থিত হয়ে খুলে বললো সব। ফেরাউন তার পারিষদবর্গের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ঠিক করলো, এর যথোপযুক্ত বিহিত অবশ্যই করতে হবে। হজরত মুসাও তখন রাজধানী অভিমুখী। নগরীতে প্রবেশের প্রাক্কালে তিনি দেখলেন, একজন লোক ছুটতে ছুটতে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। তিনি থমকে দাঁড়ালেন। লোকটি কাছে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, হে মুসা! শিগগির এ নগরী থেকে পালাও। ফেরাউন ও তার সভাসদেরা তোমাকে হত্যা করতে চায়। সুতরাং তুমি আর দেরী কোরো না। এক্ষুণি চলে যাও। আমি তোমার কল্যাণকামী।

অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতার মতে ওই লোকটির নাম ছিলো হুজাইল, কেউ বলেছেন শামউন, আবার কেউ বলেছেন সামআ'।। তিনি ছিলেন কিবতী কিন্তু বিশ্বাসী। অন্য এক আয়াতে এঁকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে 'মু'মিনুম মিন আলি ফিরআউন (কিবতীদের মধ্যে বিশ্বাসী)।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সে সেখান থেকে বের হয়ে পড়লো এবং বললো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি জালিম সম্প্রদায় থেকে আমাকে রক্ষা করো'। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, নবী-রসুলগণও আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ভয়ে ভীত হন। অথচ অন্যত্র এরশাদ হয়েছে 'লা ইয়াখ্শাওনা আহাদান ইল্লাল্লহ্ (তারা এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় পায় না)। এই আয়াত বৈসাদৃশ্যের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, ভয় সৃষ্টিকুলের স্বভাবজ বৃত্তি। এরকম স্বভাবজ বৃত্তির প্রকাশ নবী-রসুলগণের জন্য অশোভন অথবা অসমীচীন নয়। আর 'তাঁরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় পায় না' কথাটি প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— তাঁরা আল্লাহ্র বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে প্রাণনাশের আশংকা থাকলেও আদিষ্ট দায়িত্ব থেকে কখনো পশ্চাদপসরণ করেন না। আর তাঁরা আল্লাহ্র বান্দাদেরকে ভয় করেন একারণে যে, আল্লাহ্র রোষ অনেক ক্ষেত্রে তাঁর বান্দাদের দ্বারাই বাস্তবায়িত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকেই কখনো কখনো করেন শাস্তিদানের মাধ্যম। সুতরাং এরকম বান্দার ভয় প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্রই ভয়।

www.eelm.weebly.com

এরপরের ঘটনা হচ্ছে— সেই মুহূর্তে হজরত মুসা যাত্রা করলেন মিসর ছেড়ে মাদিয়ান অভিমুখে। পেছনে পড়ে রইলো মাতৃস্মৃতি, কৈশোর ও যৌবনের এক কর্মকোলাহল অধ্যায়। পড়ে রইলো শতসহস্র স্মৃতি। পথ চলতে চলতে তিনি তাঁর প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তা সমীপে প্রার্থনা করলেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! আমি কেবল তোমার শরণ যাচনা করি। আমাকে পৌঁছে দাও নিরাপদ কোনো ভূখণ্ডে। সীমালংঘনকারীদেরকে আমার কাছে উপনীত হতে দিয়ো না।

সূরা ক্বসাস ঃ আয়াত ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاۤءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَاۤءَ
السَّبِيْلِ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاۤءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ
يَسْقُوْنَ ۖ وَ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا
خَطْبُكُمَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاۤءُ ۜ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ
كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ
اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٣﴾ فَجَاۤءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى
اسْتِحْيَاۤءٍ ۖ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۗ
فَلَمَّا جَاۤءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۗ نَجَوْتَ مِنَ
الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ
اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى
ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
عِنْدِكَ ۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ مِنَ

www.eelm.weebly.com

الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾

r যখন মূসা মাদ্‌য়ান অভিমুখে যাত্রা করিল তখন বলিল, 'আশা করি, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করিবেন।'

r যখন সে মাদ্‌য়ানের কূপের নিকট পঁহুছিল, দেখিল, একদল লোক তাহাদিগের জানোয়ার গুলিকে পানি খাওয়াইতেছে এবং উহাদিগের পশ্চাতে দুই জন রমণী তাহাদিগের পশুগুলিকে আগ্‌লাইতেছে। মূসা বলিল, 'তোমাদিগের কী ব্যাপার?' উহারা বলিল, 'আমরা আমাদিগের জানোয়ারগুলিকে পানি খাওয়াইতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা উহাদিগের জানোয়ারগুলিকে লইয়া সরিয়া না যায়। আমাদিগের পিতা অতি বৃদ্ধ।'

r মূসা তখন উহাদিগের জানোয়ারগুলিকে পানি খাওয়াইল। তৎপর সে ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিবে আমি তাহার প্রার্থী।'

r তখন রমণীদ্বয়ের একজন শরম-জড়িত চরণে তাহার নিকট আসিল এবং বলিল, 'আমার পিতা তোমাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতেছেন, কেন না তুমি আমাদিগের জানোয়ারগুলিকে পানি খাওয়াইয়াছ।' অতঃপর মূসা তাহার নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে সে বলিল, 'ভয় করিও না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল হইতে বাঁচিয়া গিয়াছ।'

r উহাদিগের একজন বলিল, 'হে পিতা! তুমি ইহাকে মজুর নিযুক্ত কর, কারণ তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।'

r পিতা মূসাকে বলিল, 'আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সহিত বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর আমার কাজ করিবে যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তুমি আমাকে সদাচারী পাইবে।'

r মূসা বলিল, 'আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রহিল। এই দুইটি মিয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করিলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলিতেছি আল্লাহ্ তাহার সাক্ষী।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত মুসা ছিলেন সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্‌র প্রতি সমর্পিত। তাই তিনি মিসর থেকে নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রাক্কালে বললেন, আমি দৃঢ় আশা রাখি, আল্লাহ্‌পাক অবশ্যই আমাকে দেখাবেন সরল পথ। জুজায

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, তিনি যে পথ ধরে যাত্রা করেছিলেন ওই পথের শেষ গন্তব্য ছিলো মাদিয়ান। মাদিয়ান হজরত ইব্রাহিমের বংশধরগণের দ্বারা আবাদকৃত একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ। আর সেখানে তিনি উপনীত হয়েছিলেন পদব্রজে। মিসর থেকে আটদিনের সময়ের দূরত্বের ওই জনপদটি ছিলো ফেরাউনের সাম্রাজ্যবহির্ভূত। হজরত মুসার ওই যাত্রা ছিলো অনির্দিষ্ট এক গন্তব্যের দিকে। মিসর রাজ্যের বাইরে গমন করার জন্যই তিনি ধরেছিলেন একটি অচেনা পথ। আর যখন তিনি বললেন 'আশা করি আমার প্রভুপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। তখন মানবাকৃতিতে আবির্ভূত হলো এক ফেরেশতা। তার হাতে ছিলো একটি বর্শা। মানবরূপী ওই ফেরেশতাই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন মাদিয়ানে।

কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন, ওই যাত্রায় হজরত মুসা ছিলেন পাথেয়হীন। পথিপার্শ্বের লতাপাতা ভক্ষণ করেই তাঁকে তখন নিবারণ করতে হয়েছিলো ক্ষুন্নিবৃত্তি। দিনের পর দিন সবুজ লতাপাতা ভক্ষণ করে তাঁর পুরীষ ধারণ করেছিলো সবুজবর্ণ। আর ক্রমাগত পথ চলতে চলতে পায়ের নখগুলো পড়েছিলো খসে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত ওই ক্লেশকর অভিযাত্রাই ছিলো তাঁর জন্য প্রথম পরীক্ষা।

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'যখন সে মাদিয়ানের কূপের নিকট পৌঁছলো, তখন দেখতে পেলো, একদল লোক তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি খাওয়াচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন রমণী তাদের পশুগুলোকে আগলাচ্ছে'। এ কথার অর্থ— পথশ্রান্ত মুসা উপনীত হলেন মাদিয়ানের এক কূপের পাশে। দেখলেন, রাখালেরা ওই কূপ থেকে পানি তুলে নিজেরা পান করছে এবং পান করাচ্ছে তাদের পশুগুলোকে। আর একটু তফাতে তাদের পশুপাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন যুবতী। পিপাসিত পশুগুলো বার বার কূপের দিকে যেতে চাচ্ছে আর সেগুলোকে সামলে রাখছে তারা, যাতে সেগুলো অন্য রাখালদের পশুপালের সঙ্গে মিশে না যায়।

এরপর বলা হয়েছে— মুসা বললো, 'তোমাদের কী ব্যাপার'? একথার অর্থ— হজরত মুসা বুঝলেন, যুবতীদ্বয় সমস্যাক্রান্ত। তাই বললেন, তোমরা এভাবে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছো কেনো? এখানে 'খাতাব' অর্থ সমাচার, বিষয়। এরকম বলা হয়েছে 'কামুস' নামক অভিধানগ্রন্থে। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটি একটি মূল শব্দ এবং কর্মপদার্থক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমাদের উদ্দেশ্য কী?

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমরা আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি খাওয়াতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা তাদের জানোয়ারগুলোকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ'। একথার অর্থ— তারা বললো, পুরুষ রাখালদের পশুগুলোর ভিড়ে আমরা কূপের কাছে ঘেঁষতে পারছি না। ওদের

www.eelm.weebly.com

পশুগুলো পরিতৃপ্ত হয়ে চলে গেলেই কেবল আমরা কূপের কাছে যেতে পারবো এবং পানি পান করাতে পারবো আমাদের পশুগুলোকে। এভাবে প্রতিদিনই সবার পরে আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে হয়। বাড়ীতে রয়েছেন কেবল আমাদের বৃদ্ধ পিতা। তিনি তো অক্ষম।

এখানে যুবতীদ্বয়ের উদ্ধৃত বাক্যে ফুটে উঠেছে শালীনতা ও আভিজাত্যবোধ। পুরুষ রাখালদের ভিড় থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখাই তাদের আভিজাত্যবোধ ও সম্ভ্রমবোধের প্রমাণ।

'ওয়া আবুনা শাইখুন কাবীর' অর্থ আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ। বাহ্যত মনে হয় কথাটি অবান্তর। কারণ হজরত মুসা এ সম্পর্কে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করেননি। যুবতীদ্বয় একথা বলেছেন স্বতঃপ্রণোদিতা হয়ে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায়, কথাটি এখানে অবান্তর নয়। বরং হজরত মুসার উক্তিতে এই উত্তরের প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন ছিলো। তাঁর 'তোমাদের কী ব্যাপার' কথাটির মর্মার্থ ছিলো এরকম— কূপ তো সামনেই। তবু তোমরা তোমাদের পশুগুলোকে সেখানে যেতে দিচ্ছো না কেনো? আর যুবতীদ্বয়ের উত্তর ছিলো, কেমন করে যেতে দিবো। আমরা তো নারী। পুরুষদের ভিড়ে আমরা যাই কি করে? আর আমাদের বাড়ীতে রয়েছেন কেবল আমাদের অতি বৃদ্ধ পিতা। তিনি যদি সক্ষম হতেন তবে আমাদেরকে আর এখানে আসতে হতো না। কাজেই এখন আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আলোচ্য আয়াতে কথিত 'অতি বৃদ্ধ' ব্যক্তিকে সে সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। হাসান, মুজাহিদ,জুহাক ও সুদ্দী বলেছেন, তিনি ছিলেন মহামান্য নবী হজরত শোয়াইব। সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং ওয়াহাব বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো শীবোয়ান। তিনি ছিলেন হজরত শোয়াইবের ভ্রাতুষ্পুত্র। হজরত শোয়াইবের মহাতিরোধান ঘটেছিলো এ ঘটনার আগে। আর তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিলো মাকামে ইব্রাহিম ও জমজম কূপের মধ্যবর্তী স্থলে। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, তিনি ছিলেন ভিন্ন এক বিশ্বাসবান ব্যক্তি, যিনি ইমান এনেছিলেন হজরত শোয়াইবের পবিত্র সান্নিধ্যে।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'মুসা তখন তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি খাওয়ালো'। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুসা যুবতীদ্বয়ের কথা শুনে এগিয়ে গেলেন। তাদের ছাগ-যুথকে নিয়ে পৌঁছলেন কূপের সন্নিকটে। তারপর রাখালদের পশুগুলোকে সরিয়ে দিয়ে ছাগগুলোকে পানি পান করালেন পরিতৃপ্তি সহকারে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি তখন মেয়ে দু'টোর ছাগপালকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন নিকটবর্তী আর একটি কূপের দিকে। কূপটি ঢাকা ছিলো একটি বিশাল পাথর দিয়ে। তিনি একাই সেই

www.eelm.weebly.com

পাথরটি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ফেললেন। তারপর ওই কূপ থেকে পানি তুলে পান করালেন তাদের ছাগলগুলোকে। ওই কূপের উপরের পাথরটি ছিলো প্রকাণ্ড। কয়েকজন মিলেও পাথরটি সরাবার ক্ষমতা রাখতো না। অথচ হজরত মুসা একাই সেই প্রকাণ্ড পাথরটি উঠিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন দূরে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, রাখালদের কূপটি থেকেই কোনোক্রমে হজরত মুসা উঠিয়েছিলেন এক বালতি পানি। আর ওই সামান্য পানি দিয়েই তিনি পরিতৃপ্ত করিয়েছিলেন মেয়ে দু'টোর ছাগপালকে।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে— হজরত মুসা দেখলেন, পানি পানপর্ব শেষ করে রাখালেরা কূপটির মুখে পাথর চাপা দিলো। তারপর ধরলো যার যার বাড়ীর পথ। হজরত মুসা এগিয়ে গিয়ে কূপের মুখের পাথরটি সরিয়ে দিলেন। পাথরটি ছিলো প্রকাণ্ড। কয়েকজন মিলেও সেটিকে সরাবার সামর্থ্য রাখতো না। অথচ তিনি একাই সেটিকে সরিয়ে দিয়ে কূপ থেকে পানি তুললেন। তারপর পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করালেন যুবতীদ্বয়ের ছাগপালকে। পানি তিনি তুলেছিলেন মাত্র এক বালতি। আর তা দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলেন তাদের সকল ছাগলকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তৎপর সে ছায়ার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করে বললো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে আমি তার প্রার্থী'। হজরত মুসার এমতো প্রার্থনায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে সুক্ষ্ম অনুযোগ। আর আপনতম প্রভুপালকের উদ্দেশ্যে এমতো অনুযোগ উত্থাপনের মধ্যে দোষের কিছু নেই। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হজরত মুসা ছিলেন পথশ্রান্ত। তদুপরি সম্পন্ন করলেন ছাগ-পালকে পানি পান করানোর মতো শ্রমসাধ্য কাজ। তাই তিনি বিশ্রাম যাপনার্থে বসে পড়লেন নিকটের এক বৃক্ষচ্ছায়ায়। তারপর বললেন, হে আমার প্রভুপালয়িতা! আমি পরিশ্রান্ত। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। তাই আমি তোমার কাছে ওই অনুকম্পা যাচনা করি, যা তুমি নির্ধারণ করেছো তোমার একান্ত মুখাপেক্ষী এ দাসের জন্য।

বিদ্বজ্জনের মতে এখানকার 'লিমা আনযালতা' কথাটির 'লি' অব্যয়টি 'ইলা' (প্রতি) অর্থে ব্যবহৃত। আর 'ফক্বীরুন' অর্থ প্রার্থী, মুখাপেক্ষী। 'ইনযাল' অর্থ অবতরণ, প্রেরণ। এখানে অর্থ হবে— দান। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আনযালল্লাহু নিয়ামাহু আও নি'মাতাহু আ'লাল খলক্ব' (আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকে দান করেছেন অনুগ্রহরাজি)। উল্লেখ্য, আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহরাজি কখনো আসে সরাসরি। যেমন কোরআনের আয়াতের অবতরণ, বৃষ্টিবর্ষণ ইত্যাদি। আবার কখনো অনুগ্রহ সম্ভার আসে উপলক্ষ আকারে অপ্রত্যক্ষরূপে। যেমন এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে 'ওয়া আনযালনাল হাদীদা' (আর আমি অবতীর্ণ করেছি লৌহ)। অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে 'আমি তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছি গাত্রাবরণ'।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'আনযালতা' অর্থ তুমি অবতীর্ণ করেছো। কথাটি অতীতকালবোধক শব্দরূপে পরিবেশিত হলেও এর মর্মার্থ ভবিষ্যতকালার্থক। অর্থাৎ তুমি যা অবতীর্ণ করবে আমি তার মুখাপেক্ষী। অথবা এখানকার 'আনযালতা' অর্থ 'ক্বদ্‌দারতা'। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— তুমি আমার জন্য যে অনুগ্রহ নির্ধারণ করেছো, আমি সে অনুগ্রহের প্রার্থী।

'মিন খয়রিন' অর্থ আহার্য, অধিক অথবা অনধিক। 'ফক্বীর' অর্থ মুখাপেক্ষী, যাচক, প্রার্থী। শব্দটির মধ্যে 'প্রার্থী' অর্থ নিহিত থাকার কারণেই কিন্তু এখানে 'ইলা' (প্রতি) এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে 'লি' (জন্য)।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসা তখন আল্লাহ্‌র কাছে যাচ্‌না করেছিলেন এক মুঠো খাদ্য। ইমাম বাকের বলেছেন, সে সময় মুসার প্রয়োজন ছিলো এক টুকরো খেজুরের। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, আলোচ্য প্রার্থনার কারণেই তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে লাভ করেছিলেন মহান মর্যাদা। কারণ চরমতম দাসত্ব প্রকাশ পায় এমতো সমর্পণ ও মুখাপেক্ষিতার মধ্যেই।

মুজাহিদ বলেছেন, তিনি তখন 'খইর' বা কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রত্যাশী হননি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'লিমা' পদটির 'লাম' কারণ নির্ণায়ক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার প্রভুপালক! তুমি যেহেতু আমাকে দান করেছো 'খইর' (ধর্মবোধ ও প্রজ্ঞা), যার মুখাপেক্ষী আমি ছিলাম, সেকারণেই তো আমি বিরোধিতা করেছি ফেরাউনের ভ্রষ্ট ধর্ম মতের। আর সেই কারণেই এখন আমি বিপদগ্রস্ত। সহায়সম্বলহীন, স্বজন-নিকটজনহীন, অর্থ বিত্তহীন,অন্নহীন। রাজমহিমাচ্যুত হয়ে সেকারণেই তো আমি আজ পথের কাঙাল। সে জন্য কোনো দুঃখ নেই। এখন আমি তোমারই দরবারে প্রার্থী এক টুকরো খেজুরের অথবা একখণ্ড রুটির। উল্লেখ্য, হজরত মুসার এমতো আকুতির মধ্যে ফুটে উঠেছে পরম প্রাপ্তির এক প্রচ্ছন্ন আনন্দ এবং হৃদয়ভরা কৃতজ্ঞতা।

আমি বলি, এরকম ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আবেগময় সংযোজ্য হিসেবে একথাগুলোকেও যোগ করা যেতে পারে যে, হজরত মুসা আরো বললেন, হে আমার প্রভুপালয়িতা! তুমি আমাকে ধন্য ও সৌভাগ্যবান করেছো দ্বীন ও হিকমত দিয়ে। তোমার এমতো দানের আধিক্য আমার কাম্য। আমাকে আরো দাও। 'রব্বি যিদনী ইলমান্'।

আমি আরো বলি, এখানকার 'আনযালতা' পদটি 'নুযুল' থেকেও সাধিত হয়ে থাকতে পারে। 'নুযুল' অর্থ আতিথেয়তা বা অতিথি আপ্যায়ন। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে সমূহ ঐশ্বর্যের অধিপতি! তুমি দয়া করে আমার জন্য যতটুকু আহার্য নির্ধারণ করেছো, আমি ততটুকুই যাচনা করি। তোমার অনুগ্রহমণ্ডিত নির্ধারণই আমার প্রার্থনা।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'তখন রমণীদের একজন শরমজড়িত চরণে তার নিকট এলো এবং বললো, আমার পিতা তোমাকে পুরস্কৃত করবার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন, কেননা তুমি আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি খাইয়েছো'।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, ওই রমণীদ্বয় নির্বাক ছিলো না, আবার পুরুষদের সঙ্গে খোলামেলা মিশবার প্রবৃত্তিও তাদের ছিলো না। তাই তাদের একজন পুনরাগমন করে ছিলো সলজ্জ পদবিক্ষেপে। অধোবদনে দাঁড়িয়ে কেবল বলেছিলো, আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন। তিনি চান আপনাকে পুরস্কৃত করতে, যেহেতু আপনি আমাদের উপকার করেছেন।

বাগবী ও ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, আবু হাযেম সালমা ইবনে দীনার বলেছেন, হজরত মুসার আমন্ত্রণে সাড়া দেয়ার ইচ্ছা খুব একটা ছিলো না। কিন্তু তিনি ছিলেন তখন ক্ষুধার্ত। তাই নিরুপায় হয়ে তাঁকে ওই রমণীর অনুসারী হতে হলো। দমকা বাতাস বইছিলো তখন। সে কারণে রমণীটির বসন স্খলিত হচ্ছিলো বার বার। প্রকাশিত হচ্ছিলো তার পদযুগলের নিম্নাংশের শোভা। হজরত মুসা তাই তাকে বললেন, তুমি আমার পশ্চাদবর্তিনী হও। আমি পথ ভুল করলে পেছন থেকে বলে দিয়ো। রমণীটি তাই করলো। এভাবে দু'জনে একটু পরে উপস্থিত হলেন হজরত শোয়াইবের গৃহাঙ্গনে। পানাহারের আয়োজন তখন সম্পন্ন প্রায়। হজরত শোয়াইব তাঁকে আদর করে বসালেন। তারপর বললেন, হে যুবক অতিথি! আহার্য গ্রহণ করো। হজরত মুসা বললেন, আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয়ার্থী। হজরত শোয়াইব বললেন, এরকম বলছো কেনো? হজরত মুসা বললেন, আমি আপনার ছাগ-পালকে পানি পান করিয়েছিলাম। একি তার বিনিময়? আমি তো এমন পরিবারের সন্তান, যারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে না। হজরত শোয়াইব বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এ তোমার পারিশ্রমিক নয়। অতিথিসহ ভোজন করা যে আমার মহান পিতৃপুরুষগণের রীতি। হজরত মুসা আর দ্বিরুক্তি করলেন না। আদবের সঙ্গে উপবেশন পূর্বক পানাহারপর্ব সমাধা করলেন।

আমি বলি, আবু হাযেমের বিবরণটি আলোচ্য আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ ওই রমণী প্রথমেই বলেছিলেন 'আমার পিতা আপনাকে পুরস্কৃত করবেন বলে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন'। আর এ কথা শুনে হজরত মুসা বিনা বাক্য ব্যয়ে সে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলেন। তাহলে তার আমন্ত্রণ গ্রহণে খুব একটা আগ্রহ ছিলো না, এরকম কথা বলা যায় কীভাবে? তাছাড়া অপর এক আয়াতে দেখা যায়, হজরত মুসা নিজেই এক পুণ্যকর্মের পারিশ্রমিক গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন। যেমন তিনি হজরত খিজিরকে বলেছিলেন 'যদি আপনি ইচ্ছা

www.eelm.weebly.com

করতেন তবে অবশ্যই আপনি আমাদের শ্রমের বিনিময় দাবি করতে পারতেন'। সুতরাং বলতেই হয়, আবু হায়েমের বিবরণটিকে আলোচ্য আয়াতের যথার্থ ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা যায় না।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি, যিনি ছাগল চরাননি। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আপনিও কি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ আমিও। আমিও একসময় মক্কাবাসীদের ছাগল চরিয়েছি কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। বোখারী।

উল্লেখ্য, যে সকল কর্ম ইবাদত এবং ইবাদতের পূর্বশর্তরূপে স্বীকৃত সে সকল কর্মের বিনিময় গ্রহণ সিদ্ধ নয়। যেমন কোরআন শিক্ষা দান, আজান প্রদান, ইমামের দায়িত্বপালন ইত্যাদি। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কিন্তু যে সকল কাজ পুণ্যার্জক নয়, কিন্তু সৎউদ্দেশ্যে করলে যে সকল কাজে পুণ্যলাভ হয়, সেসকল কাজের বিনিময় গ্রহণ সিদ্ধ। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী আজান দেয়ার পারিশ্রমিক গ্রহণকে সিদ্ধ বলেছেন। পরবর্তী সময়ে হানাফী আলেমগণ আজানের মজুরী গ্রহণকে সিদ্ধ বলে রায় দিয়েছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর মুসা তার নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে সে বললো, ভয় কোরো না। তুমি জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে বেঁচে গিয়েছো।' একথার অর্থ— পানাহার পর্ব শেষে হজরত মুসা সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললেন হজরত শোয়াইবকে। তিনি তখন সান্ত্বনা প্রদানার্থে হজরত মুসাকে বললেন, এখন আর কোনো ভয় নেই তোমার। এ অঞ্চল ফেরাউনের সাম্রাজ্য সীমাবহির্ভূত। এখন তুমি পূর্ণ নিরাপদ। আল্লাহ্ই তোমাকে ফেরাউনের মতো জালেমের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

'ফালাম্মা জাআহু' অর্থ যখন সে তার নিকট এলো। 'ক্বাস্সুন' বা 'ক্বাসাসুন' অর্থ পদাঙ্কানুসরণ। যেমন 'ক্বাস্সাল খবরু' অর্থ পুরো ঘটনা বিবৃত করলো। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— হজরত মুসা তখন হজরত শোয়াইবকে খুলে বললেন আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত। আর এখানে 'আজ্জলিমীন' (জালেম সম্প্রদায়) অর্থ ফেরাউন ও তার দোসরেরা।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'তাদের একজন বললো, হে পিতা! তুমি একে মজুর নিযুক্ত করো, কারণ তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সে-ই, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত'। একথার অর্থ— হজরত শোয়াইবের অন্য এক কন্যা বললেন, হে পিতা! তুমি তো কর্মক্ষম নও। তাই তোমার একজন শ্রমিকের নিতান্ত প্রয়োজন। আর এই যুবকই হতে পারে তোমার কর্মচারী, শ্রমিক। সে যোগ্যতা এর আছে। কারণ ইনি কর্মক্ষম এবং বিশ্বস্তও।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য, 'শক্তিশালী' ও 'বিশ্বস্ত' এ দু'টো গুণের পরিচয় হজরত শোয়াইবের কন্যা ইতোপূর্বেই পেয়েছিলেন। স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তিনি সজোরে সরিয়ে দিয়েছিলেন কূপের উপরের প্রকাণ্ড পাথর। আর বিশ্বস্ততার পরিচয় পেয়েছিলেন পথিমধ্যে ও বাড়ীতে আগমনের সময়। হজরত মুসা পথ চলার সময় তাঁকে করে নিয়েছিলেন পশ্চাদবর্তিনী।

এখানকার 'ইসতাজারতা' কথাটি অতীতকালার্থক। অর্থাৎ তুমি তাকে মজুর করেই নিয়েছো। কিন্তু এর মর্মার্থ হবে— তুমি একে মজুর নিযুক্ত করো। তাই বুঝতে হবে এখানে নিশ্চিতার্থক শব্দ ব্যবহারের ফলে পরীক্ষিত হয়েছে তাঁর শক্তিমত্তা ও বিশ্বস্ততা।

খতীব বাগদাদী তাঁর 'ইতিহাস' গ্রন্থে হজরত আবু জর গিফারী থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হজরত শোয়াইব তখন তাঁর আদরের কন্যাকে প্রশ্ন করেছিলেন, সে যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত, একথা তুমি জানলে কেমন করে? কন্যা জবাব দিয়েছিলেন 'কূপের উপরে ছিলো একটি প্রকাণ্ড পাথর, যা দশজন অথবা চল্লিশজন মিলেও সরাতে পারতো না। অথচ তিনি একাই পাথরটি সরিয়ে দিয়েছেন। আর পথ চলার সময় তিনি আমাকে রেখেছিলেন পশ্চাতে'।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তিনজন মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন অসাধারণ সতর্ক। তার মধ্যে একজন ছিলেন হজরত শোয়াইব দুহিতা। দ্বিতীয় জন হচ্ছেন মিসরের আযীয। সে বালক নবী ইউসুফকে দেখে বলেছিলেন, 'সম্ভবতঃ সে আমাদের উপকারে আসবে'। আর তৃতীয়জন হচ্ছেন ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর। দ্বিতীয় খলিফা ওমরের নির্বাচন ছিলো তাঁর অসাধারণ সতর্কতা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'পিতা মুসাকে বললো, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ করো সে তোমার ইচ্ছা।' আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে'।

শুয়াইব জাবায়ী বলেছেন, কন্যাদ্বয়ের একজনের নাম ছিলো সফুরা এবং অন্যজনের নাম লাইয়া। ইবনে ইসহাক বলেছেন, তাঁদের নাম ছিলো সফুরা ও শুরাক্বা। কেউ কেউ লিখেছেন, জ্যেষ্ঠার নাম ছিলো সফুরা এবং কনিষ্ঠার নাম সফীরা। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, হজরত মুসার বিয়ে হয়েছিলো জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে। কিন্তু অধিকাংশ ভাষ্যকারের মত হচ্ছে, হজরত মুসা পাণি গ্রহণ

www.eelm.weebly.com

করেছিলেন কনিষ্ঠা কন্যার। তাঁর নাম ছিলো সফুরা। তিনি আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন বৃক্ষছায়ায় উপবিষ্ট হজরত মুসাকে। হজরত আনাস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন বায্যার ও তিবরানী। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু জরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কেউ যদি জানতে চায়, নবী মুসা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন কোন ভাগ্যবতীর সঙ্গে, তবে তোমরা বোলো কনিষ্ঠার সঙ্গে। আর তিনি আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন নবী মুসাকে এবং তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, 'হে পিতা! তুমি একে মজুর নিযুক্ত করো'।

'এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে' অর্থ আট বছর যদি তুমি আমার কর্মচারীরূপে থাকতে সম্মত হও, তবে আমি আমার কন্যাদ্বয়ের একজনের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দিবো। এখানকার 'হিজ্বাজ্বিন' শব্দটি 'হুজ্জাতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ বৎসর বা সাল।

'যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো সে তোমার ইচ্ছা' অর্থ আর যদি তুমি আট বৎসরের জায়গায় দশ বৎসর থাকতে সম্মত হও, তবে সেটা হবে তোমার পক্ষে সৌজন্যের নিদর্শন।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হজরত শোয়াইবের এরকম উক্তি দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এটা ছিলো তাঁর পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব। পাকাপাকি বিবাহের কথা নয়। কারণ বিবাহ নির্ধারণ করা হলে নিশ্চয় কন্যাকেও নিদিষ্ট করা হতো। 'এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে' এরকম বলা হতো না। সুতরাং বুঝতে হবে, হজরত শোয়াইব বিবাহ নির্ধারণ করেছিলেন পরে অন্য কোনো কথার মাধ্যমে, যার উল্লেখ এখানে নেই। তবে এখানে এতটুকু বুঝা যায় যে, আট বৎসর কর্মচারী হিসেবে থাকার শর্তটি ছিলো বিবাহের মোহরানা স্বরূপ— আংশিক অথবা সম্পূর্ণ। হজরত উতবা ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এরকমই আভাস বিদ্যমান। যেমন— তিনি বর্ণনা করেন, একবার আমরা কয়েকজন উপবিষ্ট ছিলাম রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। তিনি স. ত্ব-সিন-মীম পাঠ করলেন। পাঠ করতে করতে যখন নবী মুসার ইতিবৃত্তে পৌঁছলেন, তখন পাঠ সমাপ্ত করে বললেন, নবী মুসা তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার্থে এবং জঠর জ্বালা নিবারণার্থে আট বছর শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে সম্মত হয়েছিলেন। আহমদ, ইবনে মাজা।

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াত এবং উপরে বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে বিধানবেত্তাগণ প্রমাণ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার ছাগল চরানোর কাজকে মোহরানা নির্ধারণ করে তাকে বিবাহ করে, তবে বিবাহ হবে শুদ্ধ। আমরাও এরকম বলি। কারণ রসুল স. এ ঘটনা বিবৃত করেছেন, অথচ এর বিপক্ষে কিছু বলেননি। সুতরাং আমাদের শরিয়তে এ ধরনের বিবাহকে অসিদ্ধ

www.eelm.weebly.com

বলার কোনো কারণ নেই। ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যরূপে ইবনে সিমাআর বর্ণনায় এসেছে, এবম্বিধ বিবাহ বিশুদ্ধ। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, অধিকাংশ বর্ণনায় এসেছে, এরকম বিবাহকে তিনি বিশুদ্ধ বলেননি। কারণ আলোচ্য আয়াতে বিবাহের ইতিবাচক প্রমাণ অনুপস্থিত। মোহরানার প্রাপিকা কন্যা। কিন্তু ছাগপালের মালিক তো কন্যা ছিলেন না; ছিলেন তাঁর পিতা। আর আমাদের শরিয়তের সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, মোহরানার মালিকানা কন্যার, তার অভিভাবকের নয়। সুতরাং বুঝতে হবে শোয়াইবি শরিয়তে এরকম বিবাহ বিশুদ্ধ হলেও আমাদের শরিয়তে সিদ্ধ নয়। আমরা এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছি সুরা নিসার 'উহিল্লা লাকুম মা ওয়ারাআ জালিকুম' আয়াতের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে' অর্থ ইনশাআল্লাহ্ দেখবে তোমার প্রতি প্রসন্ন ও শুভদৃষ্টিসম্পন্ন। এখানে 'ইনশাআল্লাহ্' (আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে) কথাটিতে কোনো দোদুল্যচিত্ততা প্রকাশ করা হয়নি। বরং এর মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা হয়েছে আল্লাহ্র অভিপ্রায় ও আল্লাহ্ প্রদত্ত সামর্থ্যের উপর। অর্থাৎ 'ইনশাআল্লাহ্' এখানে কৃত প্রতিশ্রুতির উপক্রমণিকা স্বরূপ।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রইলো। এ দু'টো মেয়াদের কোনো একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না'। এ কথার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, ঠিক আছে। তাহলে আপনার ও আমার মধ্যে এই কথাই পাকাপাকি হয়ে গেলো। আমি আট বছর ধরে আপনার কাজ করে দিতে পারি অথবা কাজ করতে পারি দশ বছর। যেটাই করি না কেনো, আপনি কিন্তু দু'টো মেয়াদের যে কোনো একটি শেষ হলে আমাকে আর কাজ করার কথা বলতে পারবেন না। কিংবা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে কাজ ছেড়ে দিলেও আমাকে আর দায়ী করতে পারবেন না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তার সাক্ষী'। একথার অর্থ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। সুতরাং তিনিই সাক্ষী হয়ে রইলেন আমাদের এই চূড়ান্ত চুক্তির ব্যাপারে। 'ওয়াকীল'(রক্ষক) শব্দটির মর্মার্থ এখানে সাক্ষী।

হজরত শাদ্দাদ ইবনে আউস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শোয়াইব নবী অত্যধিক ক্রন্দন করতেন। তাই তাঁর নয়নযুগল হয়ে গিয়েছিলো দ্যুতিহীন। আল্লাহ্ তাঁকে পুনরায় দৃষ্টিদান করলেন। কিন্তু তাঁর রোদন এতটুকুও কমলো না। ফলে পুনরায় দৃষ্টি হারালেন তিনি। আবারো আল্লাহ্ তাঁকে দান করলেন দৃষ্টি। বললেন, হে আমার নবী! তোমার এতো রোদনের হেতু কী? স্বর্গাশা, না

www.eelm.weebly.com

নরকাশংকা? তিনি বললেন, কোনোটাই নয়। আমি রোদন করি তো কেবল তোমার সন্দর্শনাপেক্ষায়। আল্লাহ্ বললেন, যদি তাই হয়, তবে তোমার পার্থিব দৃষ্টির আর প্রয়োজনই বা কী? তাহলে সন্দর্শনলগ্ন পর্যন্ত তুমি এভাবেই থাকো। হে বিরহী, তোমাকে জানাই সাধুবাদ। আর তোমার পার্থিব প্রয়োজনসমূহ পূরণ করবার জন্য মুসা হোক তোমার বিশ্বস্ত অনুচর।

চুক্তি সম্পাদন শেষে হজরত শোয়াইব কন্যাকে বললেন, মুসাকে এনে দাও একটি যষ্টি। সে ওই যষ্টি দিয়ে ছাগল চরাবে এবং সেগুলোকে রক্ষা করবে হিংস্রপশুদের আক্রমণ থেকে। এই যষ্টিটি সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য পরিলক্ষিত হয়। ইকরামার ধারণা— যষ্টিটি স্বর্গাগত। হজরত আদম বেহেশত থেকে এনেছিলেন লাঠিটি। তাঁর মহাপ্রস্থানের পর সেটি হস্তগত করেন হজরত জিবরাইল। আর একদা এক গভীর নিশীথে পারস্পরিক সাক্ষাতকালে তিনি ওই লাঠিটি দিয়ে দেন হজরত মুসাকে। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, হজরত আদম ওই লাঠিটি জান্নাত থেকে আনেন এবং পরবর্তীতে তা বংশপরম্পরায় হাত বদল হতে থাকে। নবী ছাড়া অন্য কারো অধিকারভূত হয়নি লাঠিটি। হজরত নূহ এবং হজরত ইব্রাহিমের মাধ্যমে ওই লাঠির মালিক হন হজরত শোয়াইব। আর তাঁর কাছ থেকে পান হজরত মুসা। সুদ্দীর বর্ণনায় এসেছে, এক ফেরেশতা ওই লাঠি গচ্ছিত রেখেছিলো হজরত শোয়াইবের নিকটে। তিনি কন্যাকে লাঠি আনতে বললে কন্যাটি ওই লাঠিটিই গৃহকোণ থেকে নিয়ে এলেন। হজরত শোয়াইব বললেন, ঘরে তো আরো লাঠি আছে। সেগুলোর মধ্য থেকে একটি নিয়ে এসো। এটি রেখে এসো যথাস্থানে। কন্যা ঘরে গেলেন। কিন্তু অন্য লাঠি আনার চেষ্টা করেও পারলেন না। বার বার তার হাতে উঠে আসতে লাগলো ওই লাঠিটিই। তিনি উপায়ান্তর না দেখে গচ্ছিত লাঠিটি নিয়ে পুনরায় উপস্থিত হলেন পিতার সমীপে। পিতা বললেন, বললাম তো, এটা নয়, অন্য কোনো লাঠি আনো। এভাবে তিনবার ফেরত পাঠানো সত্ত্বেও কন্যা পূর্বের লাঠি ছাড়া অন্য কোনো লাঠি আনতে পারলেন না। উপায়ন্তর না দেখে শেষে ওই লাঠিটিই তিনি দিয়ে দিলেন হজরত মুসাকে। হজরত মুসা লাঠিটি হাতে নিয়ে ছাগল চরানোর উদ্দেশ্যে চলে গেলেন মাঠের দিকে। হজরত শোয়াইবের হঠাৎ মনে হলো, একি করলেন তিনি? গচ্ছিত বস্তু কি এভাবে কাউকে হস্তান্তর করা যায়? একথা মনে হতেই তিনি মাঠের দিকে গমন করলেন। যষ্টিধৃত মুসাকে পেয়ে গেলেন কিছুক্ষণ পথ চলবার পর। বললেন, লাঠিটি দাও। হজরত মুসা অস্বীকৃত হলেন। দু'জনের মধ্যে শুরু হলো মৃদু বিতর্ক। কেউ কারো প্রস্তাব মানতে চান না। শেষে দু'জনে একমত হলেন, কোনো আগন্তুক যদি এদিকে এসে পড়েন, তবে তাঁর মীমাংসাই হবে চূড়ান্ত। একটু পরেই সেখানে হাজির হলেন এক মানবাকৃতিবিশিষ্ট ফেরেশতা। দু'জনেই তাকে

www.eelm.weebly.com

উদ্ভূত সমস্যার মীমাংসা করে দিতে বললেন। আগন্তুক বললো, লাঠিটি মাটিতে ফেলে দেয়া হোক। তারপর যে লাঠিটি উঠিয়ে নিতে পারবে, সে-ই হবে ওটির মালিক। হজরত মুসা লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। প্রথমে সেটিকে কুড়িয়ে নিতে গেলেন হজরত শোয়াইব। কিন্তু পারলেন না। কিন্তু হজরত মুসা লাঠিটিকে তুলে নিতে পারলেন সহজেই। অগত্যা হজরত শোয়াইব তাঁর দাবি পরিত্যাগ করলেন। আর সেই থেকে লাঠির অধিকারী হলেন হজরত মুসা।

দিন শেষে রাত এলো। রাতের আঁধার চিরে পুনরায় উদ্ভাস ঘটলো দিনের। এভাবে পালাক্রমে আবর্তিত বিবর্তিত হতে লাগলো রহস্যময় সময়। এভাবে চুক্তির সময় অতিক্রান্ত হলে হজরত শোয়াইব তাঁর আদরের দুলালীকে তুলে দিলেন হজরত মুসার হাতে। হজরত মুসা তাঁর নবপরিণীতা বধুকে বললেন, তোমার মান্যবর জনয়িতাকে জানাও, তিনি যেনো আমাদেরকে কিছু সংখ্যক ছাগল প্রদান করেন। মুসা-জায়া পিতার কাছে আবেদন জানালেন। হজরত শোয়াইবের ইচ্ছা ছিলো, আরো কিছুকাল দু'জনকে নিজের কাছে রাখবেন। তাই বললেন, এ বছর মনে হয় বিভিন্ন রকমের মেষ-ছাগল জন্মগ্রহণ করবে। সুতরাং কিছুকাল অপেক্ষা করো। যথাসময়ে আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিবো ওই শাবকগুলো। নবদম্পতি আর দ্বিরুক্তি করলেন না। অপেক্ষা করাকেই শ্রেয় মনে করলেন। ইত্যবসরে এক রাতে হজরত মুসা স্বপ্নে শুনলেন, তাঁকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে— তুমি তোমার হাতের লাঠি ছাগলগুলোর পান ঘাটের পানিতে চুবিয়ে দাও। হজরত মুসা নির্দেশ পালন করলেন। দেখা গেলো ওই ঘাটে পানি পানকারী ছাগলগুলো সে বৎসর প্রসব করলো বিচিত্র রঙের চিত্তহারী শাবক। হজরত শোয়াইব সেগুলোকে দেখে মুগ্ধ হলেন। বুঝলেন, আল্লাহ্ই মুসার জন্য এগুলোকে করেছেন এমন দৃষ্টিমনোহর।

সূরা ক্বাসাস ঃ আয়াত ২৯,৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ
نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّیْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّیْۤ اٰتِیْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ
جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِیَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ
الْاَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ یّٰمُوْسٰۤی اِنِّیْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ

www.eelm.weebly.com

الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۰﴾ وَ اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ
وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّ لَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰۤى اَقْبِلْ وَ لَا تَخَفْ قف اِنَّكَ مِنَ
الْاٰمِنِيْنَ ﴿۳۱﴾ اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ
سُوْٓءٍ ۫ وَّ اضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ
رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿۳۲﴾ قَالَ
رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿۳۳﴾ وَ اَخِيْ
هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْۤ اِنِّيْۤ
اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿۳۴﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَ نَجْعَلُ
لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚۛ بِاٰيٰتِنَاۤ اَنْتُمَا وَ مَنِ
اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿۳۵﴾

r মূসা যখন তাহার মিয়াদ পূর্ণ করিবার পর সপরিবারে যাত্রা করিল তখন সে তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখিতে পাইল। সে তাহার পরিজনবর্গকে বলিল, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখিয়াছি, সম্ভবতঃ আমি সেথা হইতে তোমদিগের জন্য কোন খবর আনিতে পারি অথবা একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনিতে পারি যাহাতে তোমরা আগুন পোহাইতে পার।'

r যখন মূসা আগুনের নিকট পঁহুচিল তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ হইতে তাহাকে আহ্বান করিয়া বলা হইল, 'হে মূসা আমিই আল্লাহ্, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক;

r আরও বলা হইল, 'তুমি তোমার যষ্ঠি নিক্ষেপ কর।' অতঃপর, যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল তখন পিছনে না তাকাইয়া সে বিপরীত দিকে ছুটিতে লাগিল, তাহাকে বলা হইল, 'হে মূসা! ফিরিয়া আইস, ভয় করিও না; তুমি তো নিরাপদ।

www.eelm.weebly.com

r ‘তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ইহা বাহির হইয়া আসিবে নির্মল উজ্জ্বল হইয়া। ভয় দূর করিবার জন্য তোমার হস্তদ্বয় বুকের উপর চাপিয়া ধর। এই দুইটি ফিরাউন ও তাহার পারিষদবর্গের জন্য তোমার প্রতিপালকপ্রদত্ত প্রমাণ। উহারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

r মূসা বলিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তো উহাদিগের একজনকে হত্যা করিয়াছি। ফলে, আমি আশংকা করিতেছি উহারা আমাকে হত্যা করিবে।

r ‘আমা ভ্রাতা হারুন আমা অপেক্ষা বাগ্মী; অতএব তাহাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর, সে আমাকে সমর্থন করিবে। আমি আশংকা করি উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে।’

r আল্লাহ্ বলিলেন, ‘আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করিব এবং তোমাদিগের উভযকে প্রাধান্য দান করিব। উহারা তোমাদিগের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তোমরা এবং তোমাদিগের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে উহাদিগের উপর প্রবল হইবে।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘মুসা যখন তার মেয়াদ পূর্ণ করবার পর সপরিবারে যাত্রা করলো, তখন সে তুর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেলো’। একথার অর্থ— চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর হজরত মুসা যাত্রা করলেন মিসর অভিমুখে। চলতে চলতে পথ হারিয়ে উপনীত হলেন সিনাই উপত্যকায়। দিবাবসান হলো। চরাচর ঢেকে গেলো ঘনঘোর অন্ধকারে। তখন ছিলো শীতকাল। শীতার্ত নবীপরিবার আগুনের অভাব বোধ করলেন। কিন্তু দেখলেন, ধারে কাছে কোনো জনবসতির চিহ্ন মাত্র নেই। হঠাৎ নজরে পড়লো দূরের তুর পর্বতে আগুন জ্বলছে।

বাগবী লিখেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হিরা প্রদেশের এক ইহুদী একবার আমার নিকট জানতে চাইলো, নবী মুসা তখন কোন মেয়াদটি পূর্ণ করেছিলেন— আট বছরের না দশ বছরের? আমি বললাম, জানি না। তবে হজরত ইবনে আব্বাসের কাছে এর জবাব জেনে নিতে পারবো। তারপর আপনাকেও জানাতে পারবো সঠিক উত্তর। একদিন হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে দেখাও হলো আমার। আমি এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই তিনি উত্তরে জানালেন, তিনি ওই মেয়াদই পূর্ণ করেছিলেন, যা ছিলো তাঁর ও হজরত শোয়াইবের মনোপুত। আল্লাহ্র নবীগণের কথা ও কাজ সব সময় একই হয়। হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, নবী মুসা কোন মেয়াদটি পূর্ণ করে ছিলেন, তবে তোমরা বোলো, যা ছিলো কৃত অঙ্গীকারের সঙ্গে

www.eelm.weebly.com

অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। বায্যার। মুজাহিদ, বলেছেন, হজরত মুসা মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন দশ বছরের। এরপর শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেছিলেন আরো দশ বছর। তারপর তিনি তাঁর মান্যবর শ্বশুরের অনুমতিক্রমে যাত্রা করেছিলেন মিসর অভিমুখে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে তার পরিজনবর্গকে বললো, তোমরা অপেক্ষা করো, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর আনতে পারি, অথবা একটুকরো জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোয়াতে পারো'। এ কথার অর্থ— দূরের তুর পাহারের ওই আগুনের দিকে তাকিয়ে হজরত মুসা তাঁর প্রিয়তমা ভার্যাকে বললেন, আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি। তোমরা এখানেই অবস্থান করো। মনে হয় আমি ওখান থেকে তোমাদের জন্য আগুনের সংবাদ আনতে পারবো, অথবা নিয়ে আসতে পারবো একখণ্ড অগ্নিময় কাষ্ঠখণ্ড। তোমাদেরকে তাহলে শীতের কষ্ট করতে হবে না।

বাগবী লিখেছেন, কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, এখানকার 'জ্বাজওয়াতুন' অর্থ ওই কাষ্ঠখণ্ড যার কিয়দংশ দগ্ধমান। শব্দটির বহুবচন 'জুজা'। কামুস অভিধানে রয়েছে, 'জ্বাজওয়া' অর্থ কাষ্ঠখণ্ড— দগ্ধমান হোক, অথবা না হোক। সে কারণেই এখানে পৃথকভাবে বলা হয়েছে 'মিনান্নার' (জ্বলন্ত)। আর এখানে 'তাসত্বলুন' অর্থ যাতে তোমরা আগুন পোয়াতে পারো।

পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'যখন মুসা আগুনের নিকট পৌঁছলো, তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ থেকে তাকে আহ্বান করে বলা হলো, 'হে মুসা! আমিই আল্লাহ্, বিশ্বজগতের প্রতিপালক'।

'আলবুক্বআ'তিল মুবারাকাতু' অর্থ পবিত্র ভূমি। ওই পবিত্র ভূমিই ছিলো হজরত মুসা ও তাঁর পরম প্রেমময় প্রভুপালকের কথোপকথনের স্থান। রেসালাতের মহান দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হয়েছিলো ওই কল্যাণময় ভূমিতেই। আতা বলেছেন, এখানে 'মুবারকা' অর্থ চিরপবিত্র। এরকমই মর্মার্থ উপস্থাপিত হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে— 'বিল ওয়াদিল মুকাদ্দাসি ত্বুয়া'।

'মিনাশ শাজারাতি' অর্থ সেই বৃক্ষ যা অবস্থিত ছিলো উপত্যকার পার্শ্বে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, বৃক্ষটি ছিলো সতেজ ও সমুজ্জ্বল। কাতাদা, কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, সেটা ছিলো 'এওজানামীল' নামক এক বিশাল মহীরুহ। ওয়াহাব বলেছেন, বৃক্ষটি ছিলো অলৌকিক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বৃক্ষটি ছিলো অজব বা নয়নাভিরাম বৃক্ষ।

'ইননী আনাল্লহ' অর্থ আমিই আল্লাহ্। সুরা ত্ব হা তে বলা হয়েছে 'আনা রব্বুকা' (আমি প্রভুপালনকর্তা)। সুরা নমলে বলা হয়েছে 'আনাল্লহুল আযীযুল

www.eelm.weebly.com

হাকীম' (আমি তো আল্লাহ্,পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়)। বাণীসমূহ সমার্থক, যদিও এগুলোর শব্দবিন্যাস ভিন্ন। এতদসত্ত্বেও বলতে হয় আলোচ্য আয়াতের 'ইননী আনাল্লাহু রব্বুল আ'লামীন' এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আল্লাহতায়ালার সমষ্টিগত গুণবত্তার। এরকম সামগ্রিকতা অন্য উক্তিগুলোতে নেই। অন্যান্য আয়াতে রয়েছে বক্তব্যটির সংক্ষিপ্তায়নের নমুনা। যেমন সুরা 'ত্ব হা' র আরেক স্থানে বলা হয়েছে 'ফাখ্‌লা' না'লাইকা ইন্‌নাকা বিল ওয়াদি মুক্বদ্দাসি তুয়া' (তোমার পাদুকাদ্বয় খুলে ফেলো, কেননা তুমি এখন পুণ্যভূমিতে)। সুরা নমলের এক স্থানে বলা হয়েছে 'বুরিকা মানফিন নারি ওয়ামান হাওলাহা' (ধন্য তারা যারা আছে অগ্নি দ্বারা আলোকিত স্থানে এবং তার চতুষ্পার্শে।

এর পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'আরো বলা হলো, তুমি তোমার যষ্টি নিক্ষেপ করো! অতঃপর সে যখন তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলো তখন পিছনে না তাকিয়ে বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলো'। একথার অর্থ— পুনঃপ্রত্যাদেশ হলো, হে মুসা! এবার তোমার হাতের লাঠিটি মাটিতে ফেলে দাও। তিনি তাই করলেন। মাটিতে পড়ার সাথে সাথে লাঠিটি হয়ে গেলো ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন অজগর সাপ। হজরত মুসা চমকে উঠলেন। ভয়ে দৌড় দিলেন বিপরীত দিকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাকে বলা হলো, হে মুসা! ফিরে এসো, ভয় কোরোনা, তুমি তো নিরাপদ'। একথার অর্থ— ভীত-চকিত নবীর প্রতি উচ্চারিত হলো অভয়বাণী, হে মুসা! তুমি তো আমার নবী। আমার নবীগণ আমার সন্নিধানে সতত নিরাপদ। সুতরাং ভয় কোরো না। ফিরে এসো।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, হাতটি বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে। ভয় দূর করবার জন্য তোমার হস্তদ্বয় বুকের উপরে চেপে ধরো'।

আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা ভয় দূর করবার জন্য বুকের উপর হাত চেপে ধরতে বলেছেন। ভয় দূর করবার এটি একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সকল ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তি এভাবে ভয়-ভীতি দূর করতে সক্ষম। মুজাহিদ বলেছেন, ভয়ার্ত ব্যক্তি যদি তার দুটো হাত বুকে চেপে ধরে, তবে ভয় মুক্ত হয়ে যায়।

'জ্বানাহ' বলে পুরো হাতকে, কেবল বাহুকে নয়। কেউ কেউ বলেছেন, কেবল বাহুর উপরের অংশের নাম 'জ্বানাহ'। বিদ্বজ্জনের বক্তব্য হচ্ছে, এখানে বুকের উপর হাত চেপে ধরার অর্থ কেবল ধাত্যর্থক নয়। বরং কথাটি এখানে রূপকার্থক।

www.eelm.weebly.com

এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— তিষ্ঠ, সুস্থির, বলিষ্ঠ ও অনড় অবস্থান গ্রহণ করো। যেমন দেখা যায় ভয়ার্ত বিহঙ্গ ডানা প্রসারিত করে দেয়, আবার তা গুটিয়ে নেয় স্বস্তির আভাস পেলে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত মুসার প্রতি তখন আদেশ হয়েছিলো ভয় কোরো না, কারণ ভীতকম্পিত অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ বাক্যালাপ চলে না। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'আর তোমার বাহুদ্বয় নম্র করো তাদের উপর যারা তোমার...... করে। অন্যত্র বলা হয়েছে 'ওয়াখফিদ্ব লাহুমা জ্বানাহাজ জুললি মিনার রহমাত'। অর্থাৎ তাদের প্রতি প্রদর্শন করো বিনম্র আচরণ। যারা বলেছেন, এখানে 'জ্বানাহা, অর্থ যষ্টি। অর্থাৎ এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে— হে মুসা! তোমার যষ্টিটি তোমার নিজের দেহের সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

কোনো কোনো অভিধানবেত্তা লিখেছেন, হুমাইর গোত্রের আঞ্চলিক ভাষায় জামার আস্তিনকে বলে 'রহব'। আনসারী বলেছেন, আমি আরববাসীদেরকে বলতে শুনেছি 'আ'তীনী মা ফী রহবিকা' (তোমার আস্তিনে যা আছে আমাকে দিয়ে দাও)। এখানে 'আস্তিন' অর্থ বুকপকেট। এমতো অর্থের প্রেক্ষিতে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বুকপকেট থেকে হাত নামাও, মিলিয়ে নাও শরীরের সাথে। অর্থাৎ হজরত মুসা তখন হাত রেখেছিলেন তাঁর জামার পকেটে। আর আল্লাহ্ বলেছিলেন, ভয় কোরো না, সাপটিকে (অজগরটিকে) ধরো। আমার মতে বক্তব্যটির মর্মার্থ হবে এরকম— ভীতি প্রশমনার্থে বাহুদ্বয় রাখো স্বীয় শরীরসংলগ্ন। এভাবে বলতে হয়, বাক্যটি একটি ব্যাখ্যামূলক পরিযোজনা। অর্থাৎ পূর্বোক্ত বাক্যের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণায়ন। যেহেতু 'জুনাহ' অর্থ হাত পকেটস্থ করণ। উল্লেখ্য, এখানকার পূর্বাপর বাক্যদুটোর বিষয়বস্তুর পরস্পরপরিপূরকতার মধ্যে রয়েছে দু'টি উপযোগিতা। একটি হচ্ছে— চিত্তচাঞ্চল্য বিদূরণপূর্বক চিত্তপ্রশান্তি আনয়ন। আর একটি হচ্ছে— আশংকা অপসারণ। অর্থাৎ সাহস সঞ্চার ও সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণের পরামর্শ প্রদান। এটাই আলোচ্য বক্তব্যের মূল মর্ম। বিষয়টির আরো সহজ ব্যাখ্য হতে পারে এরকম— হে মুসা! সর্পভয়ে ভীত না হয়ে তোমার হস্তদ্বয় পকেটের ভিতরে ঢোকাও। পুনরায় হস্তদ্বয় পকেট থেকে বের করে আনো। তাহলে প্রকাশিত হবে দ্বিতীয় মোজেজাটি। তোমার হস্তদ্বয় থেকে বিচ্ছুরিত হবে শুভ্র, উজ্জ্বল ও নির্মল আলো। সুরা 'ত্ব হা'য় বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— 'ওয়াদ্বমুম ইয়াদাকা ইলা জ্বানাহিকা তাখরুজ বায়দ্বআ মিন গইরি সূইন আয়াতান উখরা' (এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, হাত বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অপর এক নিদর্শন স্বরূপ)।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এ দু'টো ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের জন্য তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ। তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়'। একথার অর্থ— এবার নির্দেশ প্রদান করা হলো, হে মুসা! লাঠির সর্পরূপধারণ ও হাতের শুভ্র-নির্মল বিকীরণ— এ দু'টো অলৌকিকত্ব নিয়ে তুমি এবার মিসরাধিরাজ ও তার পারিষদবর্গের নিকটে যাও। আহ্বান জানাও তাদের চিরন্তন সত্যধর্মের প্রতি। তারা তো সত্যবিচ্যুত।

'কামুস' অভিধানে রয়েছে 'বুরহান' অর্থ দলিল বা প্রমাণ। এর ধাতুমূল 'বরহুন'। যেমন বলা হয়েছে 'বারিহার রজুলূ' (লোকটি ফর্সা হয়েছে) সে কারণেই গৌরবর্ণা রমণীকে বলা হয় 'বুরাহাত'। কামুস গ্রন্থে আরো রয়েছে, 'আবরাহা' অর্থ সে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। অথবা চমকপ্রদ কথা বলেছে। অথবা সে মানুষের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমি আশংকা করছি তারা আমাকে হত্যা করবে'। এ কথার অর্থ— ফেরাউনের নিকট গমনের নির্দেশ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হজরত মুসার স্মৃতি জাগ্রত হলো। মনে পড়ে গেলো নিহত কিবতীটির কথা। তাঁর মুষ্টাঘাতের ফলেই তো তাকে প্রাণ হারাতে হয়েছিলো। সে কথা স্মরণ হতেই হজরত মুসা বললেন, হে আমার প্রভুপালক! আমি তো ফেরাউনের সম্প্রদায়ের একজনকে হত্যা করার ব্যাপারে অভিযুক্ত। এমতাবস্থায় আমি ফেরাউনের দরবারে হাজির হলে আমি তোমার বাণী পৌঁছানোর পূর্বেই তো তারা আমাকে সেই অভিযোগে বধ করে ফেলবে। তাহলে তোমার বাণী প্রচারের প্রবহমানতা অক্ষুণ্ণ থাকবে কী করে?

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'আমার ভ্রাতা হারুন আমা অপেক্ষা বাগ্মী, অতএব তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ করো, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশংকা করি তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে'।

শিশুকালে একবার হজরত মুসা জ্বলন্ত অঙ্গার তুলে মুখে পুরেছিলেন। ফলে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো তাঁর রসনার কিয়দংশ। পরিণত বয়সেও তাই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো উচ্চারণগত আড়ষ্টতা। সেকারণেই তিনি তাঁর আহ্বানকর্মের সহায়তাকারীরূপে পেতে চেয়েছিলেন। প্রাঞ্জলভাষী সহোদর হজরত হারুনকে। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত প্রার্থনায় সে কথাই উপস্থাপিত হয়েছে।

এখানে 'রিদ্বউন' অর্থ সহায়তাকারী। যেমন 'আরদ্বাতুহু' অর্থ আমি তাকে সহায়তা করেছি। বস্তুত যার দ্বারা সহায়তা করা হয়, তাকেই বলে রিদ্বউন'।

www.eelm.weebly.com

‘সে আমাকে সমর্থন করবে’ অর্থ সে হবে আমার মুখপত্র, আমার বক্তব্যের সুদক্ষ ও শাণিত উপস্থাপয়িতা। স্পষ্ট বর্ণনাবিন্যাসের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করবে যে, আমি সত্যবাদী। নতুবা তারা তো আমাকে প্রতিপন্ন করবে মিথ্যাচারীরূপে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে এরকম— তাঁর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দ্বারাই জনসমক্ষে দিবালোকের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আমার সত্যপরায়ণতা। মুকাতিল বলেছেন এখানকার ‘সে’ সর্বনামটি প্রযুক্ত হবে ফেরাউনের সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি যদি আমার সহকর্মীরূপে আমার ভ্রাতা হারুনকে মনোনয়ন প্রদান করো, তবে তার বাগ্মীতায় অভিভূত হবে ফেরাউন। হয়ে যাবে আমার সমর্থকদের একজন।

‘ওয়াআখাফূ’ অর্থ এবং আমি আশংকা করি। অর্থাৎ যেহেতু আমি স্পষ্টবাক নই, সেহেতু আমার মধ্যে এই আশংকা বিদ্যমান যে, ফেরাউন হয়তো আমার আড়ষ্ট বচনের মর্মার্থ উপলব্ধি না করেই আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহুশক্তিশালী করবো এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করবো। তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে’। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, হে মুসা! তুমি চিন্তা কোরো না। আমি তোমার ভ্রাতাকে প্রদান করবো নবুয়ত। সে তোমার সহপ্রচারক হবে নবী হিসেবেই। এভাবে আমি তোমার নবুয়তকে করবো দ্বিগুণ শক্তিশালী। তদুপরি তোমাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করবো মোজেজার মাধ্যমে। ফলে পরাক্রমশালী মিসরাধিরাজ তোমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। এভাবে আমাপ্রদত্ত নিদর্শন বলে তোমাদের এবং তোমাদের অনুসারীদেরই লাভ হবে নিরঙ্কুশ বিজয়।

এখানে ‘বি আয়াতিনা’ অর্থ আমার নিদর্শন বলে। কথাটির সম্পৃক্তি রয়েছে ‘নাজ্বআ’লু’(আমি দান করবো)। এর সঙ্গে। অথবা একটি অনুক্ত বাক্যের সঙ্গে রয়েছে কথাটির সংযোগ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমরা দু’জন আমা কর্তৃক প্রদত্ত অলৌকিক নিদর্শন সহ গমন করো। কিংবা বলা যেতে পারে কথাটির সংযোজন রয়েছে ‘তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না’ এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমা কর্তৃক দানকৃত মোজেজাসমূহের কারণে মিসরপতি ও তার লোকেরা তোমাদের কাছে ঘেষতেও পারবে না। আবার ‘তাদের উপরে প্রবল থাকবে এবং সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকতে পারে কথাটি। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটির মর্মার্থ হবে— আমার অলৌকিক নিদর্শন বলে তোমরা দু’জন যেমন নিরাপদ থাকবে, তেমনি নিরুপদ্রব থাকবে তোমাদের অনুসারীরা।

www.eelm.weebly.com

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ
مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٦﴾ وَ قَالَ مُوْسٰى
رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ
الدَّارِ ط اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا
عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ج فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ
فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى لا وَ اِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ
الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣٨﴾ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ
ظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٣٩﴾ فَاَخَذْنٰهُ وَ جُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ
فِي الْيَمِّ ج فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَ جَعَلْنٰهُمْ
اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ج وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾ وَ
اَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ج وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ
الْمَقْبُوْحِيْنَ ع ﴿٤٢﴾

r মূসা যখন উহাদিগের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলি আনিল, উহারা বলিল, 'ইহা তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র! আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণের কালে কখনও এইরূপ ঘটিতে শুনি নাই।'

r মূসা বলিল, 'আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত কে তাঁহার নিকট হইতে পথনির্দেশ আনিয়াছে, এবং কাহার পরিণাম শুভ হইবে। সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হইবেই না।'

r ফিরাউন বলিল, ' হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ আছে বলিয়া জানি না! হে হামান! তুমি আমারজন্য ইট পোড়াও এবং এক

www.eelm.weebly.com

সুউচ্চ প্রাসাদ তৈয়ার কর; হয়ত আমি ইহাতে উঠিয়া মূসার ইলাহ্‌কে দেখিতে পারি। তবে, আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীই।'

r ফিরাউন ও তাহার বাহিনী অকারণে পৃথিবীতে অহংকার করিয়াছিল এবং উহারা মনে করিয়াছিল যে, উহারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না।

r অতএব আমি তাহাকে ও তাহার বাহিনীকে ধরিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম। দেখ, সীমালংঘনকারীদিগের পরিণাম কি হইয়া থাকে!

r উহাদিগকে আমি নেতা করিয়াছিলাম। উহারা লোকদিগকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করিত; কিয়ামতের দিন উহারা সহায় পাইবে না।

r এই পৃথিবীতে আমি উহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছিলাম এবং কিয়ামতের দিন উহারা হইবে ঘৃণিত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— তারপর আমার নির্দেশানুসারে ফেরাউনের দরবারে হাজির হলো নবী ভ্রাতৃদ্বয়। হজরত মুসা ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গকে আহ্বান জানালেন আল্লাহ্‌র পথে। তাঁর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণার্থে প্রকাশ করলেন যষ্টির সর্পরূপ ধারণ ও হাতের শুভ্র-উজ্জ্বল হওয়ার নিদর্শন। ফেরাউন ও তার লোকেরা হতচকিত হলো বটে, কিন্তু তাঁকে বিশ্বাস করলো না। বললো, এগুলো তো যাদুমন্ত্রের নিদর্শন মাত্র। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এরকম ইন্দ্রজাল কখনো দেখেনি। যদি দেখতো, তবে আমাদেরকে তা অবশ্যই জানাতো। সুতরাং এদের এ সমস্ত ভেলকিবাজি আমরা বিশ্বাস করি না।

এখানে 'এতো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র' অর্থ— হাতের লাঠির অজগর হয়ে যাওয়ার এই ব্যাপারটি যাদু ছাড়া অন্য কিছু নয়। উল্লেখ্য, ফেরাউন ও তার দরবারীদের সামনে হজরত মুসা মোজেজা প্রদর্শন করেছিলেন দু'টি— যষ্টির সর্পরূপ ধারণ এবং হাতের শুভ্রোজ্জ্বল বিকিরণ। 'মুফতারান' অর্থ এখানে অলীক, অভূতপূর্ব। অথবা এর মর্মার্থ— এ হচ্ছে হজরত মুসা কর্তৃক প্রদর্শিত ইন্দ্রজাল, মিথ্যা যাদু, যা প্রদর্শন করা হচ্ছে আল্লাহ্‌র নাম করে। কিংবা 'মুফতারান' শব্দটি এখানে যাদুর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত, কেননা সকল যাদুর উৎপত্তি হয় মিথ্যা থেকে। আর 'বিহাজা' অর্থ এখানে এই যাদু অথবা নবুয়তের এই দাবি।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত কে তাঁর নিকট থেকে পথনির্দেশ এনেছে এবং কার পরিণাম শুভ হবে। সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হবেই না'। একথার অর্থ— হজরত মুসা তখন বললেন, আমার আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন যে, কে সত্যানুসারী এবং কার জন্য অপেক্ষা করছে শুভপরিণাম। আর সত্যবিমুখই বা কারা। মহাসত্যের প্রমাণ

www.eelm.weebly.com

প্রকাশিত হওয়ার পরেও যারা সত্যবিমুখতার উপরে অনড় অবস্থান গ্রহণ করে তারা অবশ্যই সীমালংঘনকারী। আর সীমালংঘনকারীরা কস্মিনকালেও সফল হয় না। দুনিয়াতে তো নয়ই, আখেরাতেও নয়।

এখানে 'আক্বিবাতুদ্ দার' অর্থ শুভ পরিণাম, পারলৌকিক আবাস বা সফলতা। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'আদ্দার'অর্থ ইহজগতের কল্যাণ, যা পরিণত হবে পারলৌকিক সুখময় আবাসে বা সফলতায়। কেননা, ইহজগত হচ্ছে পরজগতের শস্যক্ষেত্র। 'পুণ্যার্জন'ই এখানে মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পুণ্যাভিসারীরাই সফল। আর অসফল পুণ্যবিমুখেরা।

কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, 'আক্বিবাত' এবং 'উক্ববা' শব্দদু'টো ব্যবহৃত হয় পুণ্য-প্রতিদানের ক্ষেত্রে। আর 'ইক্বাব' 'উকুবাত' এবং 'মুআক্বিবাত' ব্যবহৃত হয় পাপ-প্রতিফলের ক্ষেত্রে। কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে শব্দগুলো এরকমভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'খইরুন সওয়াবাঁও ও উক্ববা' (উত্তম পুরস্কার ও প্রতিদান), 'লাহুম উক্ববাদ্দার (তাদের জন্য পারলৌকিক নিবাস), 'নিমা উক্ববাদ্দার' (কতোইনা উত্তম পারলৌকিক আবাস), 'ওয়াল আক্বিবাতু লিল্ মুত্তাক্বীন' (আর সংযমীদের জন্য রয়েছে পারলৌকিক পুরস্কার)। আবার 'ফাহাক্বক্বা ইক্বাব' (শাস্তি প্রকটিত হলো), 'শাদীদুল ইক্বাব' (কঠোরতর শাস্তি), 'ওয়া ইন্ আক্বাবতুম ফাআক্বিবু বি মিছলি মা উক্বিবতুম বিহী' (যদি তুমি দণ্ড প্রদান করতে চাও, তবে তুমি অনুরূপ দণ্ড প্রদান কোরো, যেমন দণ্ড তুমি পেয়েছো তার দ্বারা) ইত্যাদি।

'সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হবেই না' অর্থ তারা দুনিয়াতে যেমন পাবে না সৎপথ তেমনি আখেরাতেও থাকবে পুন্যবিবর্জিত। এভাবে দুনিয়া-আখেরাতে উভয় স্থানে তাদের অসফল হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ্ আছে বলে জানিনা'। ফেরাউনের এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, সে ছাড়া অন্য কোনো প্রভুপ্রতিপালকের অস্তিত্ব - অনস্তিত্বের বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়। তার 'জানিনা' কথাটিই এর প্রমাণ। পরবর্তী বাক্যেও তার এমতো সন্দেহের বিষয়টি সুপ্রকট।

এরপর বলা হয়েছে— 'হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং এক সুউচ্চ প্রাসাদ তৈয়ার করো, হয়তো আমি এতে উঠে মুসার ইলাহ্কে দেখতে পারি'। হামান ছিলো ফেরাউনের প্রধান মন্ত্রণাদাতা। আর এই হামানকেই সে সর্ব-প্রথম দিয়েছিলো মাটি পুড়িয়ে ইট প্রস্তুত এবং সেই ইট দিয়ে সুউচ্চ মিনার নির্মাণের নির্দেশ। এখানে 'সরহান' অর্থ সুউচ্চ অট্টালিকা, স্তম্ভ বা মিনার। এখানে

www.eelm.weebly.com

'তানভীন' ব্যবহৃত হয়েছে সম্ভ্রমার্থে। আর ফেরাউনের ধারণা ছিলো, মুসার উপাস্য যদি কেউ থেকেই থাকে তবে তার অবস্থান অবশ্যই আকাশে। কেননা পৃথিবীতে সেরকম কারো অস্তিত্ব তো নিরীক্ষ্য নয়।

এরপর বলা হয়েছে— ' তবে আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীই'। একথার অর্থ সন্দেহগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ফেরাউন তখন জোর গলায় বললো, তবে এটা নিশ্চিত যে, আকাশ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ্— মুসার এ দাবি সর্বৈবরূপে মিথ্যা। উল্লেখ্য, ফেরাউন ছিলো আসত্তা পথভ্রষ্ট। তার ধারণা ছিলো, তার মতো মহাসম্রাট যেহেতু এখন কেউই নয়, তাই সে-ই হচ্ছে পৃথিবীবাসীদের প্রতিপালক। অন্য কেউ নয়।

বাগবী লিখেছেন, সম্মানিত ভাষ্যকারগণ বলেন, ফেরাউনের নির্দেশ মোতাবেক হামান আশেপাশের রাজা-বাদশাহ ও শ্রমিকদেরকে একত্রিত করলো। একত্রিত করলো পঞ্চাশ হাজার রাজমিস্ত্রিকেও। ইটনির্মাতা, চুন প্রস্তুতকারী, জ্বালানী-যোগানদারও হাজির করলো অসংখ্য। তারপর বহু অর্থ ব্যয়ে নির্মাণ করলো পৃথিবীর সর্বোচ্চ অট্টালিকা। নির্মাণ সমাপনের পর ফেরাউন তার ঘনিষ্ঠ সহচরদের নিয়ে আরোহণ করলো অট্টালিকাটির সর্বোচ্চ কামরায়। এক তুখোড় তীরন্দাজকে হুকুম দিলো, এখান থেকে আকাশের দিকে তীর ছুঁড়তে থাকো। মুসার আল্লাহকে বধ করতেই হবে। তীরন্দাজ হুকুম তামিল করলো। সকলেই দেখতে পেলো তীরগুলো পুনরায় পতিত হচ্ছে তাদেরই সামনে। আল্লাহ্র নির্দেশে ফেরেশতারা তীরগুলোতে রক্ত মাখিয়ে দিয়েছিলো। ফেরাউন এ দৃশ্য দেখে প্রতারিত হলো। দর্পভরে বললো, দ্যাখো, মুসার আল্লাহ্ আর বেঁচে নেই। রক্তমাখা এই তীরগুলোই তার প্রমাণ। সে প্রাসাদে আরোহণ করেছিলো গাধায় চড়ে। আল্লাহ্র নির্দেশে হজরত জিবরাইল তার ডানার আঘাতে গাধাটিকে তিন টুকরা করে ফেললো। এক টুকরা আঘাত হানলো ফেরাউনের সেনাবাহিনীকে আর এক টুকরা ছিটকে পড়লো দূরবর্তী সমুদ্রের লোনা জলে। আর তৃতীয় টুকরাটি আঘাত হানলো ওই সকল শ্রমিককে, যারা ছিলো তার সাধের প্রাসাদটির নির্মাণকর্মী। ফলে দেখা গেলো বিশাল এলাকাজুড়ে মরে পড়ে রয়েছে ফেরাউন পক্ষীয় অসংখ্য লোক।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'ফেরাউন ও তার বাহিনী অকারণে পৃথিবীতে অহংকার করেছিলো এবং তারা মনে করেছিলো যে, তারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না'। 'হক্ব' অর্থ সত্য। এখানে শব্দটির মর্মার্থ— হকদার, অধিকারী, সত্যের দাবিদার। উল্লেখ্য, প্রকৃত অর্থে সত্যের দাবিদার হতে পারেন কেবল আল্লাহ্। কেননা তাঁর সত্তায় এবং গুণবত্তায় অপূর্ণতার কল্পনা অসম্ভব।

www.eelm.weebly.com

অহংকার কেবল তাঁর পক্ষেই শোভন। আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, অহংকার আমার উত্তরীয় এবং মহিমা আমার পরিধেয়। যে আমার এ ভূষণ দু'টো দাবি করবে, তাকে আমি অবশ্যই নিক্ষেপ করবো নরকে। বিশুদ্ধসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে কেবল ইবনে মাজা। এই হাদিসটিই আবার হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন এভাবে— অহমিকা আমার চাদর। যে আমার এ চাদর ধরে টান দিবে, আমি তাকে ধ্বংস করে দিবো। হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে সামুবিয়া বর্ণনা করেছেন, যে আমার পরিচ্ছদ দু'টোর যে কোনো একটি তার নিজের দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করবে, তাকে আমি শায়েস্তা করবো।

এর পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ, সীমালংঘনকারীদের পরিণাম কীরূপ হয়ে থাকে'। একথার অর্থ— আত্মম্ভরিতা ও সত্যপ্রত্যাখ্যানে সীমালংঘনের কারণে অবশেষে আমি ফেরাউন ও তার বাহিনীকে দান করলাম সলিল সমাধি। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি মক্কাবাসীদেরকে এই কাহিনিটি শুনিয়ে দিন এবং বলুন, তাহলে বুঝতে চেষ্টা করো, সীমালংঘনের পরিণাম কতো ভয়াবহ হয়। এখনো সময় আছে, সর্বান্তকরণে গ্রহণ করো মহাসত্য ইসলাম।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ের (৪১, ৪২) মর্মার্থ হচ্ছে— আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিপত্তি দিয়েছিলাম। করে ছিলাম মানবগোষ্ঠির অধিনায়ক। অথচ তারা মানুষকে শুভপথে পরিচালিত না করে নিয়ে গিয়েছিলো জাহান্নামের পথে। উত্থান দিবসে তাই তারা হবে সহায়হীন। পৃথিবীতে আমি তাদেরকে করেছিলাম অভিশপ্ত। আর পরবর্তী পৃথিবীতেও তারা হবে ঘৃণিত।

এখানে 'আইম্মাতান' অর্থ পথভ্রষ্টদের অধিনায়ক। অথবা বিত্ত-প্রতিপত্তিশালী, অভিজাত শ্রেণীর নেতা। 'ইলান নার' অর্থ নরকাগ্নির দিকে। অর্থাৎ ওই সকল কর্মকাণ্ডের দিকে যা জাহান্নামগমনের সহায়ক। 'লা ইয়ুনসারুন' অর্থ সহায় পাবে না। 'লা'নাতান' অর্থ অভিশাপ— আল্লাহ্‌র, ফেরেশতার ও বিশ্বাসীর। অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা কুড়াবে আল্লাহ্‌র ফেরেশতামণ্ডলীর ও বিশ্বাসীগণের অভিসম্পাত। আর 'আলমাক্ববুহীন' অর্থ— ঘৃণিত, কৃষ্ণবর্ণ মুখাবয়ব ও কুৎসিতদর্শন নীল চক্ষু বিশিষ্ট। আরববাসীরা বলে থাকে 'ক্বব্বাহুল্লহু' (আল্লাহ্ তার আকৃতি বিকৃত করেছেন)। কল্যাণ বিচ্যুত যারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করেও আবরবাসীরা বলেন 'ক্বব্বাহাহুল্লহু ক্ববহান ও ক্ববুহান'।

www.eelm.weebly.com

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ
الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٣﴾
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا
كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ
الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ
وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا
وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ
قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٦﴾

r আমি তো পূর্ববর্তী বহুমানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিবার পর মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা, পথ-নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

r মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়াছিলাম তখন তুমি পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না।

r বস্তুতঃ মূসার পর অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটাইয়াছিলাম; অতঃপর উহাদিগের বহু যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তুমি তো মাদ্‌য়ানবাসীদিগের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না উহাদিগের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করিবার জন্য। আমিই তো ছিলাম রসূল প্রেরণকারী।

r মূসাকে যখন আমি আহ্বান করিয়াছিলাম তখন তুমি তূর পর্বত-পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুতঃ এই সংবাদ তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে দয়াস্বরূপ, যাহাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার যাহাদিগের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই যেন উহারা উপদেশ গ্রহণ করে;

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তো পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠিকে বিনাশ করবার পর মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা, পথনির্দেশ ও দয়া স্বরূপ যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে'। এখানে 'পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠী'

www.eelm.weebly.com

বলে বুঝানো হয়েছে হজরত মুসার জামানার পূর্বের হজরত নুহ, হজরত হুদ, হজরত সালেহ, হজরত লুত প্রমূখ নবীগণের সময়ের সীমালংঘনকারীদেরকে।

এখানকার 'বাসাইর' শব্দটি 'বাসীরাত' এর বহুবচন। এর অর্থ হৃদয়জ আলোকবর্তিকা, যার দ্বারা উদ্ভাসিত হয় প্রকৃত তত্ত্বের গুঢ় রহস্য এবং যার ফলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সত্য-মিথ্যার বিভাজনরেখা। 'হুদান' অর্থ পথনির্দেশ, যার মাধ্যমে অর্জিত হয় পরিত্রাণের উপায়, পৃথক হয়ে যায় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কর্মকাণ্ডসমূহ। 'রহমাতান' অর্থ দয়াস্বরূপ। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার কৃপালাভের হেতুস্বরূপ। আর 'যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' অর্থ যাতে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় উপদেশ লাভের যোগ্যতা। উল্লেখ্য, এমতো উপদেশ লাভের যোগ্যতা সৃষ্টি হয় তখন, যখন জাগ্রত হয় আল্লাহ্র স্মরণ ও ভয়। এরকম স্মৃতি ও ভীতি উৎসারিত হয় প্রজ্ঞা বা জ্ঞান থেকে। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'অবশ্যই আমাকে ভয় করে তারা, যারা জ্ঞানী।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'মুসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম, তখন তুমি পর্বতের পশ্চিমপ্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না'।

এখানে 'বি জ্বানিবিল গরবিয়্যি' অর্থ পর্বতের পশ্চিম পার্শ্বে। কাতাদা ও সুদ্দী বলেছেন, পশ্চিম পর্বতের পাশে। কালাবী বলেছেন, পশ্চিম উপত্যকার ধারে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে' বলে ওই স্থানটিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে স্থানে একান্ত আলাপন সম্পন্ন হয়েছিলো আল্লাহ্র সঙ্গে মহাপ্রেমিক মুসার। আর এখানে সর্বশেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে— তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলেনা' এবং 'তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনিতো ওই সময়ে তুর পর্বতের পশ্চিমপ্রান্তে উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি মুসার সঙ্গে করেছিলাম বাক্যবিনিময়। আর ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীও তো আপনি নন। অথবা এখানে 'প্রত্যক্ষদর্শী' বলে বুঝানো হয়েছে বনী ইসরাইলের ওই সত্তরজন নেতাকে, যাদেরকে নিয়ে পরবর্তী সময়ে তওরাত শরীফ গ্রহণার্থে হজরত মুসা গমন করেছিলেন তুর পর্বতে। যদি তাই হয়, তবে শেষ বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— আর আপনি তো ওই সকল সাক্ষ্যদাতা ইসরাইলি নেতাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যারা অবলোকন করেছিলো তওরাত শরীফের অবতরণ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার মহাপ্রেমাস্পদ! মহাপ্রেমিক মুসার ইতিবৃত্ত ইতোপূর্বে কখনো শোনেননি। তাঁর জীবনে তুর পর্বতের বিস্ময়কর দৃশ্যাবলীই কখনো স্বচক্ষে দর্শন করেননি। ওই কাহিনী এখন আমিই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি

www.eelm.weebly.com

এই কোরআনের মাধ্যমে। এটাই কী আমার পক্ষ থেকে প্রদত্ত আপনার রেসালতের পক্ষের প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয়? তাহলে বিষয়টিকে আপনার স্বজাতি অনুধাবন করতে চেষ্টা করে না কেনো? কেনো আপনাকে বরণ করে না আল্লাহ্‌র সত্য রসুল হিসেবে?

এর পরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ মুসার পরে অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম; অতঃপর তাদের বহুযুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে'।

এখানে 'ক্বুরুনান্' অর্থ অনেক যুগ বা বিভিন্ন যুগের মানুষ, অনেক মানবগোষ্ঠী। 'ফাতাওয়াললা আ'লাইহিমুল উমুরু' অর্থ তাদের বহুযুগ হয়েছে বিগত। অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে নবী প্রেরণবিষয়ক পরম্পরা। ফলে বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত হয়ে পড়েছে তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থসমূহের মর্মবাণী। দেখা দিয়েছে শতসহস্র মতপ্রভেদ। সেকারণেই এখানকার এই কোরআনকে তাদের কাছে মনে হচ্ছে অতিনতুন ও অপরিচিত কোনো বাণী।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্‌পাক হজরত মুসা এবং তাঁর স্বজাতির কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন যে, যখন শেষ রসুলের মহাআবির্ভাব ঘটবে, তখন তাঁকে মেনে নিতে হবে সর্বান্তঃকরণে। কিন্তু সুদীর্ঘকাল পর তাদের সেই প্রতিশ্রুতির স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলো তারা। তদস্থলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো ঔদাসীন্য, কেবলই ঔদাসীন্য। এভাবে বক্তব্যপরম্পরাটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনার সম্পর্কে আমি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম নবী মুসা ও তাঁর সহচরবৃন্দদের নিকট থেকে। ওই সময় তো আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এ ব্যাপারে আপনি কখনো আবেদনও করেননি। বরং ওই সিদ্ধান্তটি ছিলো আমার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, নিছক করুণাসঞ্জাত। আর ওরকম করেছিলাম আমি এ জন্য যে, ভবিষ্যতে যেনো তারা কখনো প্রতিশ্রুতিভঙ্গের কোনো অজুহাত প্রদর্শন করতে না পারে। এরপর অতিবাহিত হতে লাগলো যুগের পর যুগ। শতাব্দীর পর শতাব্দী। এভাবে অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব— তিরোভাবের পর দেখা গেলো সেই প্রতিশ্রুতির কথা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের আর স্মরণেই নেই। অন্য এক আয়াতে প্রতিশ্রুতির উল্লেখ এসেছে এভাবে— 'যখন আদম সন্তানদের নিকট থেকে আপনার প্রভুপালক প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন তাদের পিতাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে..... যেনো তারা না বলতে পারে, নিশ্চয় আমরা এসম্পর্কে ছিলাম উদাসীন'।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি তো মাদিয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেনা তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করবার জন্য'। একথার অর্থ— হে আমার

www.eelm.weebly.com

রসুল! আপনি তো মাদিয়ানবাসীদের সৎপথ প্রদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্তও ছিলেন না। মুকাতিল বক্তব্যটির অর্থ করেছে— 'আপনি তো মাদিয়ানবাসীদের ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শীও নন, যাতে করে মক্কাবাসীদের নিকটে বিবৃত করতে পারেন তাদের বিবরণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমিই তো ছিলাম রসুল প্রেরণকারী'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমিই তো আপনাকে প্রেরণ করেছি আমার বার্তাবাহকরূপে। আর আপনার মাধ্যমে মক্কাবাসী ও জগতবাসীদের জানিয়ে দিচ্ছি পূর্ববর্তী মানবগোষ্ঠির উত্থান-পতনের বিলুপ্ত কাহিনী। আমি ছাড়া এ সকল কাহিনী যথাযথরূপে বর্ণনা করার সাধ্য রাখে কে? অতএব, একথা অবশ্য-বিশ্বাস্য যে, আমি যেমন আপনার পূর্বসূরী বার্তাবাহকগণের একমাত্র প্রেরক, তেমনি আপনারও। সুতরাং আপনাকে সত্য রসুল বলে তারা মেনে নিবে না কেনো?

এরপরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'মুসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম, তখন তুমি তুর পর্বত পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুতঃ এই সংবাদ তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে দয়াস্বরূপ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি যেনো তারা উপদেশ গ্রহণ করে'। একথার অর্থ— হে আমর রসুল! আপনি ওই সময় সেখানে ছিলেন না, যেখানে আমি মুসাকে ডেকে এনেছিলাম কথাবার্তা বলবার জন্য এবং তুর পর্বতের ওই স্থানটিতেও ছিলো আপনার অনুপস্থিতি, যেখানে আমি তাকে দান করেছিলাম নবুয়ত। বস্তুতঃ এ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ অনুকম্পাপরবশ হয়ে আমিই আপনাকে জানাচ্ছি, যাতে আপনি যে সত্য পয়গম্বর সেকথা জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে যায় এবং আপনি হতে পারেন আপনার স্বজাতির দরদী পথপ্রদর্শক, যাদের প্রতি ইতোপূর্বে কখনো প্রেরিত হননি কোনো প্রেরিতপুরুষ। উল্লেখ্য, হজরত ইব্রাহিমের পরের নবী-রসুলগণ ছিলেন বনী ইসরাইল বংশদ্ভূত। বনী ইসমাইলদের অন্তর্ভূত ছিলেন কেবল শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.। তাই তাঁর বংশভূতদের সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে 'যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি'।

এখানে 'ইজ নাদাইনা' অর্থ যখন আমি মুসাকে আহ্বান করেছিলাম। অর্থাৎ যখন আমি নবী মুসাকে তুর পর্বতে ডেকে নিয়ে তওরাত প্রত্যর্পণ করেছিলাম এবং বলেছিলাম এ গ্রন্থ আঁকড়ে ধরো সুদৃঢ়রূপে। আর 'তুর পর্বত পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেনা' অর্থ উপস্থিত ছিলেন না ওই সময় যখন তাকে দান করেছিলাম নবুয়ত।

www.eelm.weebly.com

ওয়াহাব বলেছেন, একবার হজরত মুসা প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালক! শেষ রসুলের সঙ্গে আমার সাক্ষাত ঘটিয়ে দিন। আল্লাহ্ বললেন, কখনোই নয়। তবে আমি তাঁর উম্মতের সঙ্গে তোমার সাক্ষাত ঘটিয়ে দিতে চাই। ওই শোনো তাদের জিকির আজকারের কলগুঞ্জন। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে রূহানীভাবে উপস্থিত হলো অসংখ্য উম্মতে মোহাম্মদী। চতুষ্পার্শ্বে আওয়াজ উত্থিত হলো, লাব্বাইক, লাব্বাইক। আবু জারআ ইবনে আমর ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ তখন সমবেত উম্মতে মোহাম্মদীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে উম্মতে আহমদ! আমাকে আহ্বান করবার পূর্বেই আমি সাড়া দেই। আর আমি তোমাদেরকে দান করি যাচ্‌নার আগে। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ ডাক দিলেন, হে উম্মতে মোস্তফা! উম্মতে মোস্তফা পিতৃপৃষ্ঠ অথবা মাতৃজঠর থেকে জবাব দিলো, এই যে আমি, এই যে আমরা। হে আমাদের পরম প্রভুপালক! সকল স্তব-স্তুতি তোমার। কোনো বিষয়ে তোমার কোনো অংশীদার নেই। আল্লাহ্পাক বললেন, হে আমার শ্রেষ্ঠ রসুলের শ্রেষ্ঠ অনুগামীবৃন্দ। শোনো, আমার কোপ অপেক্ষা কৃপা অগ্রগামী। শাস্তি প্রদানপ্রবণতা অপেক্ষা প্রবল মার্জনাকাংখা। আমি তোমাদের প্রদান করি প্রার্থনার পূর্বে এবং সাড়া দেই আহ্বানের আগে। আর মার্জনা করি ক্ষমাপ্রার্থনার অপেক্ষা না করেই। মহা বিচার দিবসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লহ' এর সাক্ষ্য নিয়ে যে আমার সকাশে উপস্থিত হবে তার স্বর্গবাস অবধারিত, যদিও তার পাপরাশি হয় সমুদ্রের ফেনপুঞ্জতুল্য।

সূরা ক্বসাস ঃ আয়াত ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۗ وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ

www.eelm.weebly.com

اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ
بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٥٠

r রসূল না পাঠাইলে উহাদিগের কৃতকার্যের জন্য উহাদিগের কোন বিপদ হইলে উহারা বলিত, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগের নিকট কোন রসূল প্রেরণ করিলে না কেন? করিলে, আমরা তোমার নিদর্শন মানিয়া চলিতাম এবং আমরা হইতাম বিশ্বাসী।'

r অতঃপর যখন আমার নিকট হইতে উহাদিগের নিকট সত্য আসিল উহারা বলিতে লাগিল, 'মূসাকে যেরূপ দেওয়া হইয়াছিল মুহাম্মদকে সেরূপ দেওয়া হইল না কেন?' কিন্তু পূর্বে মূসাকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহা কি উহারা অস্বীকার করে নাই? উহারা বলিয়াছিল, উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে।' এবং উহারা বলিয়াছিল, 'আমরা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করি।'

r বল, 'তোমরা সত্যবাদী হইলে আল্লাহের নিকট হইতে এক কিতাব আনয়ন কর যাহা পথ-নির্দেশে এতদুভয় হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে; আমি সেই কিতাব অনুসরণ করিব।'

r অতঃপর উহারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহা হইলে জানিবে উহারা তো কেবল নিজদিগের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহের পথ-নির্দেশ অমান্য করিয়া যে-ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তাহা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথ-নির্দেশ করেন না!

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আমার চিরাচরিত নিয়ম এই যে, আমি রসুল প্রেরণের মাধ্যমে প্রথমে সতর্ক না করে কোনো সম্প্রদায়ের উপরে শাস্তি আরোপ করি না। যদি করতাম, তবে তারা এই অজুহাতটি খাড়া করতো যে, হে আমাদের প্রভুপালক! তুমি আমাদেরকে শাস্তি প্রদানের পূর্বে সতর্ক করলে না কেনো, কেনো আমাদেরকে সাবধান করে দিলে না তোমার কোনো বার্তাবাহকের মাধ্যমে। আমরা তা হলে সাবধান হতে পারতাম। তোমার নিদর্শনরাজির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে আত্মরক্ষা করতে পারতাম তোমার শাস্তি থেকে। কিন্তু এরকম অজুহাতের অবকাশ আমি রাখিনি। আর এখন আপনাকে প্রেরণের মাধ্যমেও আপনার স্বজাতি ও সমকালের মানুষের জন্য রুদ্ধ করে দিয়েছি এমতো অনুযোগের সুযোগ। এভাবেই আমি পরিপূর্ণ করেছি মহাসত্যের পক্ষের দলিল প্রমাণ। অন্য এক আয়াতে বক্তব্যটি উপস্থিত করা হয়েছে এভাবে— 'যেনো তা রসুল প্রেরণের পর হয়ে যায় একটি অনস্বীকার্য দলিল। অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার স্বপক্ষে যেনো তারা কোনো অনুযোগ উত্থাপনের কোনো অবকাশই আর না পায়'।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তাদের নিকট সত্য এলো তারা বলতে লাগলো, মুসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিলো মোহাম্মদকে সেরূপ দেয়া হলো না কেনো'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! দেখুন মক্কাবাসীদের উক্তি কীরূপ জঘন্য। তারা বলে, রসুল মুসাকে যে রকম যষ্টির অলৌকিকত্ব ইত্যাদি দেয়া হয়েছিলো, সেরকম অলৌকিকত্ব আপনাকে দেয়া হলো না কেনো? অথবা এর মর্মার্থ হবে— তাঁর উপর তওরাত যেমন অবতীর্ণ হয়েছিলো একযোগে, তেমনি এক সঙ্গে আপনার উপর অবতীর্ণ হলো না কেনো কোরআন?

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু পূর্বে মুসাকে যা দেওয়া হয়েছিলো তাকি তারা অস্বীকার করেনি?' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, মুসার মোজেজাসমূহ অবলোকন করে কীইবা লাভ হয়েছিলো ওই সকল অবাধ্যদের? তারা কি সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে মহাশাস্তির উপযোগী হয়ে যায়নি?

আলোচ্য প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। সুতরাং 'তা কি তারা অস্বীকার করেনি' অর্থ তারা ওই সকল অলৌকিকত্ব অবশ্যই অস্বীকার করেছিলো। অতএব, হে মক্কার মুশরিকেরা! তোমাদের সম্মুখে মোজেজা প্রদর্শন করেই বা কী লাভ? স্বভাবে-চরিত্রে তোমরা তো তাদেরই মতো।

কালাবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন সত্যধর্ম ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করলেন তখন কুরায়েশ নেতৃবর্গ তাঁর রেসালাত সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হবার অভিপ্রায়ে কিছুসংখ্যক লোককে প্রেরণ করলো মদীনার ইহুদী পণ্ডিতদের কাছে। তাদের কথা শুনে ওই পণ্ডিতেরা বললো, হ্যাঁ, আমাদের তওরাতে রয়েছে তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ। কিন্তু তারা মক্কায় ফিরে একথা জানানো সত্ত্বেও নেতারা তাদের কথাকে গ্রাহ্য করলো না। পূর্বের মতোই রয়ে গেলো অনড় বিরুদ্ধবাদী। এভাবে তারা কোরআনের সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করে বসলো তওরাতকেও। পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে সেকথাই।

বলা হয়েছে— 'তারা বলেছিলো, উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে। এবং তারা বলেছিলো, আমরা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করি'। 'এখানে উভয়ই যাদু' অর্থ হজরত মুসা আ. এবং হজরত মোহাম্মদ স. দু'জনই যাদুকর। এরকম বলেছেন কালাবী। আর অন্যান্য ভাষ্যকারগণ বলেছেন, এখানে দু'জনেই যাদুকর বলে বুঝানো হয়েছে হজরত মুসা ও হজরত হারুনকে।

'একে অপরকে সমর্থন করে' অর্থ হজরত মুসা ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা দু'জনেই একে অপরের সমর্থক। অর্থাৎ তাদের উপরে অবতীর্ণ তওরাত ও কোরআন একে অপরের প্রত্যয়নকারী। অথবা কথাটির অর্থ হবে হজরত মুসা ও

www.eelm.weebly.com

হজরত হারুন একে অপরকে সমর্থন করেন। আর 'তারা বলেছিলো, আমরা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করি' কথাটির অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা বলেছিলো, আমরা প্রত্যাখ্যান করি মুসা ও মোহাম্মদ দু'জনকেই।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এক কিতাব আনয়ন করো যা পথনির্দেশে এতদুভয় থেকে উৎকৃষ্টতর হবে, আমি সেই কিতাব অনুসরণ করবো'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি ওই অংশীবাদীদেরকে বলুন, ঠিক আছে। তোমাদের কথা মতো মুসা ও মোহাম্মদ যদি যাদুকর হয়েই থাকেন, আর তাঁদের আনীত গ্রন্থদ্বয় যদি হয়েই থাকে যাদু প্রভাবিত, তবে আনো এ দু'টোর চেয়ে উত্তমতর কোনো গ্রন্থ, সে গ্রন্থের অনুসারী হবো আমিও। কিন্তু এমতো কর্মও তো তোমাদের সাধ্যবহির্ভূত।

'ইন্‌কুনতুম সদিক্বীন' অর্থ যদি তোমরা সত্যবাদী হও। 'ইন' (যদি) শব্দটি ব্যবহৃত হয় সন্দেহ প্রকাশার্থে। কিন্তু এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে উপহাস প্রকাশার্থে। এভাবে কথাটি দাঁড়িয়েছে— ঠিক আছে, দ্যাখো, যদি পারো।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে তারা তো কেবল নিজেদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ আনয়নের যে প্রস্তাব আপনি তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন, সে প্রস্তাবে যদি তারা সম্মত না হয়, তবে নিশ্চিত জানবেন তারা স্বকপোলকল্পনার অনুগামী। প্রকৃত সত্যের সঙ্গে তাদের চিন্তা ও কথার সম্পর্কমাত্র নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ আমান্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র শুভনির্দেশনা পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তি হয়ে যায় তার স্বপ্রবৃত্তির অনড় অনুগামী, তাকে আল্লাহ্ দান করেন না সৎপথ প্রাপ্তির সৌভাগ্য। কেননা সে চিরভ্রষ্ট। রসুল স. জানিয়েছেন, তোমাদের মধ্যে কেউই পূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অনুসারী হবে আমা কর্তৃক আনীত পথনির্দেশের। বাগবী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর শরহে সুন্নাহ্ গ্রন্থে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে। ইমাম নববী বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

এখানে 'আজ্‌জলিমীন' অর্থ আত্মঅত্যাচারী। অর্থাৎ যে জুলুম করে তার আপন সত্তার উপর। এভাবে হয়ে যায় সীমালংঘনকারী।

www.eelm.weebly.com

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾ اَلَّذِيْنَ
اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَ اِذَا يُتْلٰى
عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ
مُسْلِمِيْنَ ﴿٥٣﴾ اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا
وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٥٤﴾
وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ
اَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ﴿٥٥﴾

r ‘আমি তো উহাদিগের নিকট বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছি। যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

r ইহার পূর্বে আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছিলাম তাহারা ইহাতে বিশ্বাস করে।

r যখন উহাদিগের নিকট ইহা আবৃত্তি করা হয় তখন উহারা বলে, ‘আমরা ইহাতে বিশ্বাস করি, ইহা আমাদিগের প্রতিপালক হইতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম;

r উহাদিগকে দুইবার পুরস্কৃত করা হইবে, কারণ উহারা ধৈর্যশীল এবং উহারা ভালোর দ্বারা মন্দের মোকাবিলা করে ও আমি উহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে উহারা ব্যয় করে।

r উহারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন উহারা তাহা পরিহার করিয়া চলে এবং বলে, ‘আমাদিগের কাজের জন্য আমরা দায়ী এবং তোমাদিগের কাজের জন্য তোমরা দায়ী; তোমাদিগের প্রতি ‘সালাম’। আমরা অজ্ঞদিগের সংগ চাহি না।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আমি তো তাদের নিকট বাণী পৌঁছে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে’।

www.eelm.weebly.com

‘লাক্বদ ওয়াস্‌সালনা’ অর্থ নিশ্চয় আমি মিলিয়ে দিয়েছি বা পৌঁছে দিয়েছি। ফাররা বলেছেন, কথাটির অর্থ— আল্লাহ্‌পাক বলেন, আমি তো কোরআনের বাণীসমূহ অবতীর্ণ করেছি একে একে, যাতে করে সেগুলো স্মৃতিপটে থাকে সতত জাগ্রত। অথবা অর্থ হবে এরকম— আমি অবতীর্ণ বিষয়াবলীর যোগসূত্র অক্ষুণ্ন রেখেছি, যেনো তা সত্যের আমন্ত্রণকর্মে আনে প্রমাণশোভিত শক্তিমত্তা ও সদুপদেশ। মাদারেক রচয়িতা লিখেছেন, এখানকার ‘তাওসীল’ অর্থ মিলন বা যোগসূত্রের অটুটতা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ‘ওয়াস্‌সালনা’ অর্থ ‘বাইয়্যান্‌না’। অর্থাৎ আমি তো প্রকাশ করেছি খোলাখুলিভাবে। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আমার বাণীসম্ভারভূত এক আয়াতের বিষয়বস্তুকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে অপর আয়াত। কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা অতীতকালের মানুষের সঙ্গে কী আচরণ করেছেন, কোরআনে তা উল্লেখিত হয়েছে বারংবার। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ— আল্লাহ্‌ বলেন, বার বার অতীতের অবাধ্যদের করুণ পরিণতির কথা আমি তো জানিয়ে দিয়েছি মক্কাবাসীদেরকে। ইবনে জায়েদ বলেছেন, বক্তব্যটির মর্মার্থ হবে— আল্লাহ্‌ বলেন, আমি তো আমার বাণীসম্ভারে ঘটিয়েছি ইহলৌকিকতা ও পারলৌকিকতার সেতুবন্ধন। সেকারণেই তো মানুষ ইহকালবাসী হয়েও লাভ করতে পারে পারত্রিক জ্ঞান। ইবনে জারীর ও তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত রেফায়া কারাজী বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে দশ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে, তার মধ্যে আমিও একজন। ইবনে জারীরের বর্ণনায় আরো এসেছে, আলী ইবনে রেফায়া বলেছেন, আহলে কিতাবগণের অন্তর্ভুক্ত ওই দশ জনের একজন ছিলেন আমার পিতা। দশজনের ওই দলটি সরাসরি রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সত্য ধর্ম ইসলামের পথে তাঁরা সহ্য করেছিলেন অনেক দুঃখ যাতনা।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— ‘এরপূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে’।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের পূর্বে ইহুদীদের মধ্যে দশ ব্যক্তি ছিলেন সত্যপ্রেমিক ও ন্যায়পরায়ণ। রসুল স. মদীনায় আগমন করার পর পরই তাঁরা একযোগে গ্রহণ করেছিলেন ইসলামের সুশীতল ছায়া। হজরত ইবনে সালাম ছিলেন তাঁদের অন্তর্ভূত। এরকম লিখেছেন বাগবীও। ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বিবরণ উপস্থিত করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। তিবরানী তাঁর ‘আযীমাত’ গ্রন্থে

www.eelm.weebly.com

লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বাদশাহ নাজ্জাসীর দেশ থেকে মদীনায় আগমন করেছিলেন চল্লিশজনের একটি প্রতিনিধি দল। কিন্তু তাঁদের কেউই তখন শাহাদত বরণের সৌভাগ্য লাভ করেননি। খয়বর যুদ্ধের পর তাঁরা লক্ষ্য করলেন, মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বড়ই নাজুক। তাই তাঁরা রসুল স. সকাশে এই মর্মে আবেদন জানালেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো বিত্তশালী। আপনার সদয় অনুমতি যদি পাই, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে অর্থ-বিত্ত এনে আমাদের এখানকার মুসলিম ভাইদের খেদমতে লাগাতে চাই। তাঁদের এমতো প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

ইবনে আবী হাতিমের বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ইসলামের প্রথম হিজরতকারী দলটি হজরত জাফরের নেতৃত্বে উপস্থিত হলেন আবিসিনিয়ায়। সেখানকার সদাশয় সম্রাট নাজ্জাশী তাঁদেরকে জানালেন সাদর অভ্যর্থনা। প্রদর্শন করলেন সহৃদয় আতিথ্য। কয়েক বৎসর সেখানে অতিবাহিত করার পর যখন তাঁদের প্রত্যাবর্তনের সময় হলো, তখন কতিপয় আবিসিনিয়াবাসী সম্রাটপ্রবর সকাশে নিবেদন করলো, আমরাও আমাদের এই দূরদেশী ভ্রাতাগণের প্রত্যাবর্তনসহচর হতে চাই। সমুদ্রভ্রমণে আমরা তাদেরকে সাহায়তা করতে পারবো। শেষে তাঁদের সঙ্গেই মিলিত হতে পারবো আখেরী জামানার পয়গম্বরের সঙ্গে। তাঁর ও আমাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির নবায়নও নিশ্চিত করতে পারবো সে সময়। মহামান্য সম্রাট তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করলেন। তাঁরা যথাসময়ে যাত্রা শুরু করলেন সকলে মিলে। রসুল স. তখন হিজরত করে চলে এসেছেন মদীনায়। সেখানেই সকলে মিলিত হলেন রসুল স. এর সঙ্গে। মুসলমানেরা তখন উপর্যুপরি যুদ্ধ করতে করতে পর্যুদস্ত প্রায়। বিশেষ করে তাঁদের আর্থিক অবস্থা হয়ে পড়েছিলো শোচনীয়। এমতো অবস্থা দেখে আবিসিনিয়ার প্রতিনিধিদল মর্মাহত হলেন। নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! মুসলিম জনগোষ্ঠী বিত্তবিপর্যয়গ্রস্ত। আর দেশে রয়েছে আমাদের অনেক অর্থ-বিত্ত। সদয় অনুমতি প্রদান করলে আমরা দেশে গিয়ে সে সম্পদগুলো এনে আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। তাঁদের এমতো শুভনিবেদনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের প্রমুখের উদ্ধৃতি দিয়ে বাগবী লিখেছেন, ওই আবিসিনীয় প্রতিনিধিবৃন্দের বদান্যতার স্বীকৃতিরূপে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তিনি আরো লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইসলাম গ্রহণকারী আশিজন গ্রন্থধারীদেরকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি, তন্মধ্যে চল্লিশজন ছিলেন নাজরানবাসী। বত্রিশজন ছিলেন আবিসিনিয়ার এবং বাকি আটজন সিরিয়ার।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'যখন তাদের নিকট এটা আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এতে বিশ্বাস করি, এটা আমাদের প্রতিপালক থেকে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম'। একথার অর্থ— ইহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়ভূত ওই সকল সত্যপ্রেমিকগণের সম্মুখে যখন সদ্য অবতীর্ণ কোরআনের বাণী আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এই কোরআনকে এবং যাঁর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেই মহান রসুলকে বিশ্বাস করি। সর্বান্তঃকরণে একথা মানি যে, এই নভজ বাণীবৈভব আমাদের পরম প্রভুপালকের পক্ষ থেকে সমাগত মহাসত্য। আমাদের হৃদয়ে সতত লালিত এই বিশ্বাস নতুন নয়, চিরন্তন। পূর্বেও আমরা ছিলাম আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলগণের প্রতি আত্মসমর্পিত।

এখানে 'মুসলিমীন' অর্থ আত্মসমর্পিত, রসুল স. এর রেসালতের সত্যসাক্ষ্যদাতা। উল্লেখ্য, হজরত মুসা এবং হজরত ঈসার প্রতি যাঁরা আত্মসমর্পিত, রসুল স. এর প্রতি তাঁদের আত্মসমর্পিত না হওয়া অসম্ভব। কারণ, তাঁদের উপরে অবতীর্ণ তওরাত ও ইঞ্জিলে রসুল স. এর পরিচিতি সমুদ্ভাসিত। যেমন হজরত ঈসা বলেছেন— সুসমাচার শ্রবণ করো। নিশ্চয় আমার পর আসবেন একজন মহান রসুল, যাঁর নাম আহমদ। তওরাত শরীফেও বিধৃত হয়েছে রসুল স. এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলীর মনোমুগ্ধকর বিবরণ। সেকারণেই ওই সকল সৌভাগ্যবান গ্রন্থধারী বলতে পেরেছিলেন 'আমরা তো পূর্বেও আত্মসর্ম্পণকারী ছিলাম'। অর্থাৎ ইতোপূর্বে আমরা তাঁর পরিচয় জেনেছি এবং তাঁকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেছি। এই উক্তিটি নতুন কোনো বাক্যের সূচনা নয়। বরং বলা যেতে পারে কথাটি পূর্ববর্তী বক্তব্যের প্রলম্বায়ন। আর এখানকার 'আমরা এতে বিশ্বাস করি' কথাটিতে রয়েছে পূর্বাপর দু'টি বিশ্বাসেরই সম্মিলিত প্রকাশ। বরং বুঝতে হবে, বিশ্বাস এখানে দু'টি নয়— একটি। 'আমরা তো পূর্বেও আত্মসর্ম্পণকারী ছিলাম' কথাটি এখানে নতুনতর বিশ্বাসের সম্ভাবনাকে তিরোহিত করেছে।

এরপরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে দু'বার পুরস্কৃত করা হবে'। একথার অর্থ— যেহেতু তারা ইতোপূর্বে বিশ্বাস করেছিলো তওরাত ও ইঞ্জিলে এবং এখন কোরআনে, তাই তাদের দুই দফা বিশ্বাসের জন্য তাদেরকে পুরস্কারও দেয়া হবে দুই বার।

এরপর বলা হয়েছে— 'কারণ তারা ধৈর্যশীল'। একথার অর্থ— কারণ তারা যেমন কোরআন বিশ্বাস করার সাথে সাথে ছিলো তাদের পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের প্রতি একনিষ্ঠ, তেমনি আত্মসমর্পিত ছিলো পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে কোরআনের প্রতিও। এ হচ্ছে তাদের সত্যের প্রতি অবিচল ধৈর্যের অনন্য প্রকাশ। কিন্তু সকল ইহুদীরা

www.eelm.weebly.com

এরকম ছিলো না। তারা রসুল স.কে বিশ্বাস করতো বটে, কিন্তু তাঁকে চাক্ষুষ করবার পর হয়ে গেলো বিশ্বাসবিচ্যুত, বিদ্বেষায়িত। তাঁর মহাআবির্ভাবের আগে তারা বিধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধকালে তাঁকে ওসিলা করেই আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করতো। কিন্তু তাঁর মহান সাহচর্য পেয়ে হলো অবিশ্বাসী। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এর মূলে ছিলো হিংসা। কেবলই হিংসা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জ্ঞাপন করেছেন, তিন ধরনের লোক পাবে দ্বিগুণ প্রতিদান। ১. ওই গ্রন্থধারী, যে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত নবীর উপরে ইমান এনেছে, তারপর ইমান এনেছে আমার উপর। ২. ওই ক্রীতদাস যে আল্লাহ্‌র অধিকার পরিপূরণের সাথে সাথে পরিপূরণ করেছে তার মালিকের অধিকার এবং ৩. ওই ব্যক্তি যে তার ক্রীতদাসীকে ধর্মজ্ঞান দানের পর করে দিয়েছে মুক্ত, তারপর তার সাথে আবদ্ধ হয়েছে পরিণয়সূত্রে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা ভালোর দ্বারা মন্দের মোকাবিলা করে'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ— সকল মন্দের বিরুদ্ধে তওহীদের বাণীই তাদের শাণিত সঙ্গীন। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ— তারা অংশীবাদীদের ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণের পরও তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়।

আমি বলি, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— তারা শত্রুতার প্রতিকার করে শিষ্টাচারের মাধ্যমে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন— আপনার যারা শত্রু শিষ্টাচারের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে স্থাপিত হতে পারে অন্তরঙ্গতা। কথাটির অর্থ এরকম হওয়াও সম্ভব যে— তারা আনুগত্য দ্বারা প্রতিরোধ করে অনানুগত্যের। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন— 'নিশ্চয় কল্যাণকর বিষয়ের মাধ্যমে বিলোপিত হয় অকল্যাণকর বিষয়'। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, পাপ হয়ে গেলে ধাবিত হয়ো পুণ্যের দিকে। পুণ্য পাপকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে'। একথার অর্থ— তারা আমা কর্তৃক প্রদত্ত সম্পদ থেকে ব্যয় করে পুণ্য পথে।

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— তারা যখন আমার বাক্য শ্রবণ করে, তখন তারা তা পরিহার করে চলে এবং বলে, আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী এবং তোমাদের কাজের জন্য দায়ী তোমরা; তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না'। একথার অর্থ— বিশ্বাসবানেরা যখন অবিশ্বাসীদেরকে

www.eelm.weebly.com

কটুক্তি করতে শোনে, তখন তা উপেক্ষা করে এবং বলে, দ্যাখো, তোমাদের ও আমাদের ধর্মবিধান তো এক নয়, তোমাদের কাজের জন্য যেমন আমরা অভিযুক্ত হবো না, তেমনি আমাদের কর্মকাণ্ডের জন্যও দায়ী করা হবে না তোমাদেরকে। সুতরাং শান্তি,শান্তি। তোমাদের মতো অজ্ঞদের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িত হওয়ার প্রবৃত্তি আমাদের নেই।

এখানে 'লাগবু' অর্থ কটুক্তি, অসারবচন। বাগবী লিখেছেন, অংশীবাদীরা ইসলাম গ্রহণকারী ইহুদীগণকে গাল-মন্দ করতো। বলতো, তোমাদের মরণ হোক। তোমরা তোমাদের পিতৃধর্ম পরিত্যাগকারী। কিন্তু তাঁরা এ সকল গালি গায়ে মাখতেন না। বলতেন, তোমাদের প্রতি শান্তিসম্ভাষণ। উল্লেখ্য, তাঁদের এমতো শান্তি সম্ভাষণ ছিলো শুভাশিসবিবর্জিত। বরং এমতো সম্ভাষণকে বলা যেতে পারে বিদায়ী সালাম বা সম্পর্কচ্ছিন্নতার সম্ভাষণ। এমতাবস্থায় 'তোমাদের প্রতি সালাম, কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কটুবচন ব্যবহার করলেও আমরা সেরকম করবো না। বরং আমরা কোনো প্রত্যুত্তরই করবো না।

'লা নাবতাগীল জাহিলীন' (আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না) কথাটির অর্থ এখানে— তোমাদের ধর্মমতের প্রতি আমরা আগ্রহান্বিত নই। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— তোমাদের মতো অর্বাচীনদের সতীর্থ হবার অভিলাষ আমাদের নেই। আবার কেউ কেউ অর্থ করেছেন— তোমাদের মতো অকাট্য মূর্খ আমরা হতে চাই না। অর্থাৎ তোমরা আমাদের গালি দাও আর যা-ই বলো, আমরা কিন্তু সেরকম কিছু করবো না। রয়ে যাবো প্রত্যুত্তরহীন। নতুবা আমরাও হয়ে যাবো তোমাদের মতো মূর্খ। আর মূর্খ সাজবার আকাংখা আমাদের আদৌ নেই। আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয়াকাংখী। তিনি যেনো আমাদেরকে এরকম মূর্খজনোচিত বচন থেকে রক্ষা করেন।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিধান কার্যকর ছিলো জেহাদ অপরিহার্য হওয়ার পূর্বে। কিন্তু আমার মতে বাগবীর এই মন্তব্যটি যথার্থ নয়। কারণ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ। তিনি ও তাঁর সাথীরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন জেহাদ ফরজ হওয়ার পর। অথবা বলা যেতে পারে, আলোচ্য আয়াতের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে আবিসিনীয় প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে। তাঁরাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন খায়বর যুদ্ধের পর ষষ্ঠ হিজরীতে। কিংবা বলা যায়, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো চল্লিশজন নাজরানবাসী এবং আটজন সিরিয়াবাসী খৃষ্টানের ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে। কিন্তু তাঁরাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন রসুল স. এর হিজরতের পরে মদীনায়। আর তখন কার্যকর হয়েছিলো জেহাদের বিধান। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতের বিধান রহিত নয়। বরং তা সাধারণভাবে এখনো পালনীয়।

www.eelm.weebly.com

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ
مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ
كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ
أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ
تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا
كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا
ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
زِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾

r কাহাকেও প্রিয় মনে করিলে তুমি তাহাকে সৎপথে আনিতে পারিবে না, তবে আল্লাহ্ই যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন কাহারা সৎপথ অনুসারী।

r উহারা বলে, 'আমরা যদি তোমার পথ ধরি তবে আমাদিগের দেশ হইতে আমরা উৎখাত হইব।' আমি কি উহাদিগের জন্য এক নিরাপদ 'হার্‌ম' প্রতিষ্ঠিত করি নাই যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেওয়া জীবনোপকরণ স্বরূপ? কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই ইহা জানে না।

r কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহার বাসিন্দারা নিজদিগের ভোগসম্পদের জন্য মদমত্ত ছিল! এইগুলিই তো উহাদিগের ঘরবাড়ী; উহাদিগের পর এইগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করিয়াছে। আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী!

www.eelm.weebly.com

r তোমার প্রতিপালক, জনপদ সমূহকে ধ্বংস করেন না উহার কেন্দ্রে তাঁহার আয়াত আবৃত্তি করিবার জন্য রসূল প্রেরণ না করিয়া এবং তিনি জনপদ সমূহকে তখনই ধ্বংস করেন যখন ইহার বাসিন্দারা সীমালংঘন করে।

r তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা এবং যাহা আল্লাহের নিকট আছে তাহা উত্তম এবং স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করিবে না?

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. তাঁর প্রিয় পিতৃব্য আবু তালেবকে বললেন, হে খুল্লতাত! আপনি অন্ততপক্ষে একবার উচ্চারণ করুন লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্। তাহলে আমি মহাবিচারের দিবসে আপনার পক্ষে সুপারিশ করতে পারবো। আবু তালেব বললেন, না, তা হয় না। কুরায়েশ রমণীকুল তাহলে আমাকে লজ্জিত করবে। বলবে, গোত্রপতি আবু তালেব মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে পিতৃধর্ম পরিত্যাগ করেছে। প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র আমার! এমতো অপযশের আশংকা যদি না থাকতো, তবে অবশ্যই আমি তোমার নয়নযুগলকে প্রশান্ত করতাম। তার এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতখানি। বলা হয়েছে— 'কাউকে প্রিয় মনে করলে তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ্ই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভালো জানেন কারা সৎপথ অনুসারী'।

এখানে 'মান আহ্বাবতা' অর্থ— যার সৎপথপ্রাপ্তি আপনার কাম্য। অথবা আত্মীয়তার বন্ধনে যে আপনার প্রিয়ভাজন।

'ওয়া হুয়া আ'লামু বিল মুহতাদীন' অর্থ এবং তিনিই ভালো জানেন কারা সৎপথ অনুসারী। মুজাহিদ ও মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— যাদের জন্য সুপথ লাভ নির্ধারিত, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। ইবনে আসাকের তাঁর 'দামেশকের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আবু সাঈদ একবার হজরত ইবনে ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন 'কাউকে প্রিয় মনে করলে তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না' এই আয়াত কি আবু জেহেল ও আবু তালেব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়েখ, ইবনে মারদুবিয়া এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব উল্লেখ করেছেন, আমার পিতা বলেছেন, আবু তালেবের অন্তিমযাত্রার প্রাক্কালে তার শয্যাপাশে উপস্থিত হলেন রসুল স.। বললেন, চাচাজান! একবার অন্তত বলুন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'। তাহলে আমি আল্লাহ্ সকাশে এই সত্যোচ্চারণের সাক্ষ্যদাতা হতে পারবো। আবু জেহেলও উপস্থিত ছিলো সেখানে। সে তৎক্ষণাৎ বলে বসলো, হে গোত্রাধিনায়ক! আপনি কি শেষকালে

www.eelm.weebly.com

পিতৃধর্ম পরিত্যাগ করবেন? ক্রমশঃ সংকীর্ণ হচ্ছিলো সময়। রসুল স. বার বার উচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন পবিত্র কলেমা। কিন্তু আবু তালেবের কণ্ঠে শেষ বাক্য উচ্চারিত হলো, আবদুল মুত্তালিবের ধর্মাদর্শই আমার ধর্মাদর্শ। রসুল স. বললেন, আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আমার প্রিয় পিতৃব্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতেই থাকবো। তখন অবতীর্ণ হলো 'কোনো নবী অথবা বিশ্বাসীদের জন্য এটা সমীচীন নয় যে, তারা অংশীবাদীদের পক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা করে'। তারপর অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত, যার মর্মার্থ— হে আমার রসুল! আপনি কাউকে ভালোবাসলেও তাকে সৎপথানুসারী করতে সক্ষম নন। বরং আমি যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথ প্রদান করি। আর আমি একথাও ভালোভাবে জানি যে, কারা সৎপথপ্রাপ্তির যোগ্য।

পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'তারা বলে, আমরা যদি তোমার পথ ধরি তবে আমাদের দেশ থেকে আমরা উৎখাত হবো'। বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হারেছ ইবনে ওসমান ইবনে নওফেল ইবনে আবদে মানাফের উদ্দেশ্যে। সে বলেছিলো, মোহাম্মদ! তোমার আহ্বান যথার্থ। কিন্তু তোমার কথামতো চললে যে মক্কাবাসীরা আমাদেরকে দেশান্তর করবে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে নাসাঈ এবং ইবনে মুনজিরও এরকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে নাসাঈ বলেছেন, এরকম অপবচন উচ্চারিত হয়েছিলো হারেছ ইবনে ওসমানের কণ্ঠে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ হারম প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেওয়া জীবনোপকরণ স্বরূপ? একথার অর্থ— হারেছের অপবচনের প্রতিবাদে আল্লাহ্ বলেন, আমি তো তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছি চিরশান্তির আবাস মক্কাধামে। এখানেই তো জীবনোপকরণস্বরূপ তোমাদের জন্য সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ফলমূলের।

আলোচ্য প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এর সঙ্গে প্রচ্ছন্নরূপে সংযুক্ত রয়েছে আরো কিছু কথা। ওই প্রচ্ছন্ন কথা সহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি কি তাদেরকে মক্কা নগরীতে মহাসম্মানিত হেরেমের অভ্যন্তরে তাদেরকে নিরাপদে বসবাস করবার সুযোগ প্রদান করিনি? অথচ সমগ্র আরব কতো অশান্ত। চতুর্দিকে প্রতিনিয়ত সংঘটিত হয় হত্যা, লুণ্ঠন ও হানাহানি। সেকারণেই তো শান্তিভূমি মক্কার প্রতি রয়েছে সকলের সমীহবোধ। অর্থাৎ কেবল হেরেমের সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে পৌত্তলিকেরাও যেহেতু এ ভূমিতে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সেহেতু আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীরা এখানে নিরাপত্তাহীনতার আশংকা করবে কেনো? কেনো উত্থাপন করবে উৎখাত হয়ে যাওয়ার অনুযোগ?

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না'। একথার অর্থ এ পবিত্র শহর যে জীব-সম্পদ জীবনোপরকণ সকল দিক থেকেই নির্বিঘ্ন সেকথা এদের অধিকাংশই বুঝতে পারে না। একথাও হৃদয়ঙ্গম করতে চায় না যে, ভয় করা উচিত তো আল্লাহ্‌র অবাধ্যতাজনিত শাস্তির, যে শাস্তি অপ্রতিরোধ্য।

এরপরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— 'কতো জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের সম্পদের জন্য মদমত্ত ছিলো; এগুলোই তো তাদের ঘরবাড়ী; তাদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী'। একথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! ইতোপূর্বে আমি তোমাদের বর্তমান জনপদের মতো অনেক কোলাহলমূখর জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি। কারণ, তারা আমা কর্তৃক প্রদত্ত বিত্তবৈভব পেয়েও আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো না। বরং জনবল ও ধনবলের জন্য অহংকার করতো। সময় কাটাতে আমোদ-প্রমোদে ও প্রতিমাপূজায়। এখনো তো রয়েছে তাদের বিরাণ ঘরবাড়ীগুলোর চিহ্ন। সেগুলোতে হয়তো থাকে কোনো নিরাশ্রয় নিরুপায় কিছু মানুষ, অথবা ক্ষণকালের জন্য ঠাঁই নেয় পরিশ্রান্ত পথিক। তোমরাও তো তাদেরই মতো অপরিণামদর্শী। তোমরা কি জানো না, যে কোনো মুহূর্তে তোমাদের উপরেও নেমে আসতে পারে আযাব। তোমরা কি এখনো বিশ্বাস করো না যে, সকল কিছুর চূড়ান্ত মালিকানা আমার?

এখানে 'বাত্বিরত' অর্থ যারা ছিলো অহংকারী, ছিলো ধনসম্পদের জন্য মদমত্ত, গর্বিত, ছিলো কৃতঘ্ন। আতা বলেছেন, তারা জীবনযাপন করতো আমোদ-প্রমোদ ও পূজা-অর্চনা নিয়ে। 'মায়ীশাতাহা' কথাটি এখানে কালাধিকরণ কারক। এর অর্থ বিনোদনকালে তারা থাকতো মদমত্ত। সেকারণেই আল্লাহ্ তাদেরকে বিনাশ করেছেন।

'ফা তিলকা মাসাকিনুহুম' অর্থ এগুলোই তো তাদের ঘরবাড়ি। অর্থাৎ এগুলোই তো তাদের বিরাণ বসতবাটি, যা এক সময় ছিলো তাদের কোলাহলমুখর প্রমোদভবন। 'মিম বা'দিহিম' অর্থ তাদের পর। অর্থাৎ তাদের বিনাশপ্রাপ্তির পর। 'ইল্লা ক্বলীলা' অর্থ সামান্যই । অর্থাৎ এই বিরাণ গৃহগুলোতে গৃহবাসীরা বসবাস করেছে সামান্য সময়ের জন্য। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বিরাণ বসতবাটিতে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় নেয় কেবল পথশ্রান্ত পথিক। চিরকাল তারা সেখানে থাকে না। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন, অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া অন্য কেউ সেখানে বসবাস করে না। এটা তাদেরই পাপের ফল।

'আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী' অর্থ— মানুষ পৃথিবীতে আসে কিছুকালের জন্য। মালিক সাজে ধনসম্পদের ও বসতবাটির। তারপর চিরতরে মালিকানা হারিয়ে চলে যায় পরপারে। কিন্তু আমি দ্যাখো, সকল কিছুর চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, তার কেন্দ্রে তাঁর আয়াত আবৃত্তি করবার জন্য রসুল প্রেরণ না করে এবং তিনি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করেন যখন তার বাসিন্দারা সীমালংঘন করে'।

এখানে 'মা কানা রব্বুকা' অর্থ প্রভুপালকের রীতি। 'আলকুরা' অর্থ অবাধ্যদের জনপদসমূহ। 'রসূলান' অর্থ আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক, যিনি পালন করেন সতর্ককারী ভূমিকা। অর্থাৎ যিনি মানুষকে এই মর্মে সতর্ক করে দেন যে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো, নতুবা অশুভ পরিণাম অনিবার্য। আর কেন্দ্রে আয়াত আবৃত্তি করার অর্থ হচ্ছে— সমাজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থানরত শাসকবর্গ ও জননেতাদের সামনে আল্লাহ্‌র বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়া। কেননা সাধারণ জনতা সাধারণতঃ শাসক নেতাদের অনুগামী। শেষ রসুলও তাই প্রেরিত হয়েছিলেন পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে মহাতীর্থ মক্কায়। আবার তিনি বার্তা প্রেরণ করেছিলেন রোমীয়দের দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী নৃপতি, পারস্যরাজ ও আবিসিনিয়ার সম্রাটের প্রতিও। রোম নরপতির নিকট লিখিত পত্রে তিনি স. জানিয়েছিলেন— ইসলাম গ্রহণ করো, লাভ করবে চিরন্তন শান্তি। অন্যথায় তোমাকেই বহন করতে হবে প্রজাসাধারণের পাপের বোঝা। মুকাতিল বলেছেন, এখানে আয়াত আবৃত্তি করার অর্থ একথা জানিয়ে দেয়া যে, ইমান আনো, অন্যথায় তোমাদের উপরে আপতিত হবে আল্লাহ্‌র শাস্তি। 'আহলুহা জলিমূন' অর্থ সীমালংঘনকারী, রসুলের বার্তা অগ্রাহ্যকারী।

এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন, আল্লাহ্‌র চিরাচরিত রীতি এরকম নির্মম নয় যে, তিনি কোনো জনপদের প্রধান নেতাদের নিকট রসুল প্রেরণের মাধ্যমে তাদের পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যতিরেকেই তাদের জনপদসমূহকে ধ্বংস করে দিবেন। বরং তিনি ধ্বংসের নির্দেশ দেন তখন, যখন সংশোধনের দীর্ঘ অবকাশ প্রদানের পরেও নেতা ও জনতার চৈতন্যোদয় না হয়, যখন লংঘিত হয় সহনীয়তার সর্বশেষ সীমা।

এরপরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা এবং যা আল্লাহ্‌র নিকট আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না'?

এখানে 'মাতাউল হায়াতিদ্ দুনইয়া ওয়া যীনাতুহা ' অর্থ পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা। 'খইর' অর্থ উত্তম, উৎকৃষ্ট। 'আবক্ব' অর্থ স্থায়ী। আর 'আফালা তা'ক্বিলূন' অর্থ তোমরা কি অনুধাবন করবে না? এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, সে সকল

www.eelm.weebly.com

কিছু তো পার্থিব জীবনের সম্ভোগোকরণ ও সৌন্দর্য। আর আখেরাতের যে সকল কল্যাণসম্ভার আল্লাহ্ জমা রেখে দিয়েছেন তা সর্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী। একথা বলার পরেও কি তোমরা জাগতিক ও পারত্রিক প্রাপ্তির তুলনামূলক মূল্যায়নকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছো না?

সূরা ক্বসাস ঃ আয়াত ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭,

اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ
يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٢﴾ قَالَ
الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ
اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ۫ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا
يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ
يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَ
يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ
عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَىِٕذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٦٦﴾ فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَ
اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٧﴾

r যাহাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, যাহা সে পাইবে সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাহাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়াছি, যাহাকে পরে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হইবে অপরাধীরূপে?

r এবং সেই দিন উহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলা হইবে, 'তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক গণ্য করিতে, তাহারা কোথায়?'

r যাহাদিগের জন্য শাস্তি অবারিত হইয়াছে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! ইহাদিগকেই আমরা বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম; ইহাদিগকে বিভ্রান্ত

www.eelm.weebly.com

করিয়াছিলাম যেমন আমরা বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম; আপনার নিকট আমাদিগের নিবেদন এই যে, ইহাদিগের জন্য আমরা দায়ী নহি। ইহারা কেবল আমাদিগেরই ইবাদত করিত না।'

r উহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমাদিগের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর।' তখন ইহারা উহাদিগকে ডাকিবে। কিন্তু উহারা ইহাদিগের ডাকে সাড়া দিবে না। ইহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে। হায়, ইহারা যদি সৎপথ অনুসরণ করিত।

r এবং সেই দিন আল্লাহ্ ইহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, 'তোমরা রসুলগণকে কী জবাব দিয়াছিলে?'

r সেদিন তাহাদিগের আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলিবার থাকিবে না। এবং ইহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করিতে পারিবে না।

r তবে যে ব্যক্তি তওবা করে এবং বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, সে তো সফলকাম হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যাকে আমি উত্তম পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার করেছি, সে তো কখনো ওই ব্যক্তির সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না, যাকে আমি পার্থিব ভোগসম্ভার প্রদানের পর মহাবিচারের দিবসে উপস্থিত করবো অপরাধীরূপে। 'আফামান' সম্বোধনসংযুক্ত আলোচ্য প্রশ্নটি সরাসরি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ অঙ্গীকৃত পুরস্কারের অধিকারীর সঙ্গে পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত অবিশ্বাসীর তুলনা হওয়া অসম্ভব। আর এখানে উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি অর্থ— জান্নাত প্রদানের অঙ্গীকার। কারণ পুরস্কার হিসেবে জান্নাত অত্যুত্তম। সুতরাং তার প্রতিশ্রুতিও অত্যুত্তম।

'ফাহুয়া লাক্বীহী' অর্থ যা সে পাবে। অর্থাৎ প্রতিশ্রুত পুরস্কার সে পাবেই। কারণ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়া অসম্ভব। 'মাতাআ'ল হায়াতিদ্ দুনইয়া' অর্থ পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার। অর্থাৎ যে ভোগোপকরণ অবক্ষয় প্রবণ, নশ্বর এবং যা অর্জন করতে প্রয়োজন হয় অনেক কৌশল, পরিকল্পনা ও শ্রমের।

'আল মুহ্‌দ্বারীন' অর্থ ওইসব লোক যারা নীত হবে হিসাব অথবা শাস্তির জন্য। মুকাতিল বলেছেন, পার্থিব জীবনে বিশ্বাসী ও পুণ্যবানেরাও সম্পদাধিকারী হন। কিন্তু এর জন্য তাঁরা আখেরাতে অভিযুক্ত হবেন না। কেননা তাঁদের উপার্জন ও ব্যয় সিদ্ধসূত্রগত। সুতরাং তাঁদের পার্থিব সম্পদ উৎকৃষ্ট। আর অবিশ্বাসীদের পার্থিব সম্পদ তাদের অনন্ত দুঃখভোগের উপকরণ।

মুজহিদ সূত্রে বাগবী ও ইবনে জারীর বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. ও আবু জেহেলকে উপলক্ষ করে। অপর এক সূত্রে বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য ছিলেন হজরত হামযা এবং আবু জেহেল।

www.eelm.weebly.com

মুকাতিল এবং মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো হজরত হামযা-আবু জেহেল অথবা হজরত আলী ও আবু জেহেলকে কেন্দ্র করে। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত আম্মার এবং ওলীদ ইবনে মুগীরা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'এবং সেই দিন তাদেরকে আহ্বান করে বলা হবে, তোমরা যাদেরকে শরীক গণ্য করতে, তারা আজ কোথায়'? আমি বলি, এখানে 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে বলে বুঝানো হয়েছে অংশীবাদীদের নেতৃবর্গকে। কারণ তাদের প্রভাবেই সাধারণ জনতা গ্রহণ করে অংশীবাদিতাকে। তাই এখানে বিদ্রূপার্থে তাদের সম্পর্কেই তখন বলা হবে 'তারা কোথায়'?

এরপরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এদেরকে আমরাই বিভ্রান্ত করেছিলাম। এদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম, আপনার নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, এদের জন্য আমরা দায়ী নই। এরা কেবল আমাদেরই ইবাদত করতো না'। একথার অর্থ— যাদের জন্য শাস্তি অনিবার্য, অবিশ্বাসীদের সেই সকল পথিকৃতেরা তখন বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! এরাই ওই সকল লোক যাদেরকে আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম, যেমন আমরাও হয়েছিলাম বিপথগামী। আমাদের বিপথগামিতার পক্ষে অন্য কারো অভিপ্রায় কার্যকর ছিলো না। বরং আমাদের বিপথগমন ছিলো সম্পূর্ণতই আমাদের স্বেচ্ছাচরণের ফল। আর এদের অবস্থাও ছিলো সেরকমই। আমরা এদেরকে পথভ্রষ্ট হতে বাধ্যতো করিনি। করেছিলাম কেবল প্রলোভিত ও প্ররোচিত। কিন্তু আমাদের ও এদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলো তোমার বার্তাবাহকেরা। তাঁরা উপস্থিত করেছিলেন মহাসত্যের নানাবিধ প্রমাণ। শুনিয়েছিলেন তোমার প্রত্যাদেশিত বাণী। তবে তারা আমাদের প্রতারণাকে তখন পরিত্যাগ করেনি কেনো? সুতরাং আজ তোমা সকাশে আমাদের নিবেদন এই যে, এদের বিভ্রান্তির প্রকৃত কারণ আমরা নই। বরং আমরা আজ তাদের প্রতি বীতস্পৃহ, বিতৃষ্ণ। আর তারা বাহ্যত আমাদের অনুকারক হলেও প্রকৃত অর্থে তারা ছিলো তাদের নিজেদের আকাংখার উপাসক। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তুগত সাযুজ্য রয়েছে অপর একটি আয়াতের সঙ্গে। যেমন, 'আর শয়তান বললো, সমাধান.........'শেষ পর্যন্ত।

এখানে 'যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে' একথা বলা হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে— 'আমি জ্বিন ও মানুষ দ্বারা নরক পরিপূর্ণ করবো'। এরকম শাস্তি অবধারিত হওয়ার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে আরো অনেক আয়াতেও। আর এখানে 'আগওয়াইনা' কথাটির কর্মপদের সর্বনাম রয়েছে উহ্য। এভাবে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে— এরাই তারা যাদেরকে আমরা বিপথগামী করেছিলাম।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের দেবতাগুলোকে আহ্বান করো। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। এরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। হায়, এরা যদি সৎপথ অনুসরণ করতো'।

এখানে 'শুরাকাআকুম' অর্থ তাদের পূজিত দেবমূর্তিসমূহ, অযথার্থ উপাস্যকুল। 'ফাদাআ'ওহুম' অর্থ এরা ওইসকল উপাস্যদেরকে ডাকবে। অথবা অর্থ হবে— ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উম্মাদের মতো তারা তখন পরিত্রাণের আশায় ডাকাডাকি করতে থাকবে তাদের পূজিত দেবতাদেরকে। 'ফালাম ইয়াসতাজ্বীবু' অর্থ তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। উপাসককুলের পরিত্রাণার্থে এক পা-ও অগ্রসর হবে না।

'ওয়ারাআউল আ'জাবা' অর্থ তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, যে শাস্তি থেকে তারা অবশ্যই অব্যাহতি লাভ করতো যদি পৃথিবীতে আনতো ইমান। আর 'লাও আন্নাহুম কানু ইয়াহ্তাদূন' অর্থ হায়, এরা যদি সৎপথ অনুসরণ করতো। এখানে 'লাও' অর্থ যদি। কথাটি বিফল আশামিশ্রিত আক্ষেপ প্রকাশক। অর্থাৎ তারা তখন আক্ষেপের সুরে বলবে, হায়, কতোই না ভালো হতো, যদি আমরা পৃথিবীতে সৎপথ অনুসরণ করে চলতাম।

এরপরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'এবং সেই দিন আল্লাহ্ এদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রসুলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে'? আলোচ্য আয়াতে উত্থাপিত প্রশ্নটির মধ্যে রয়েছে দু'টি বিষয়। একটি শিরিক বা অংশীবাদিতা সম্পর্কে শাসনমূলক। আর একটি নবীগণকে অস্বীকার করার ব্যাপারে সতর্কবাণী।

এরপরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'সেদিন তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলার থাকবে না। এবং এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না'। একথার অর্থ— সে দিন 'তোমরা রসুলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে' প্রশ্নটির জবাবে তারা কিছুই বলতে পারবে না হয়ে যাবে স্থাণুবৎ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আর নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করার ক্ষমতাও তখন হারিয়ে ফেলবে তারা। বাক্যটির মূল গঠন ছিলো এরকম— 'ফাআমু আনিল আমবায়ি' (তারা তখন হবে তথ্যপ্রকাশের ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীন)। কিন্তু বাকরীতিটি ভঙ্গ করে এখানে বলা হয়েছে 'ফাআ'মিয়াত্ আ'লাইহিমুল আমবাউ'। এরকম করা হয়েছে অবশ্য বক্তব্যকে অধিকতর আবেদনময় করবার জন্য। এভাবে এখানে একথা জানিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, পৃথিবীর কর্মকাণ্ডসমূহের কারণাবলী হচ্ছে বাহ্যিক অনুষঙ্গ মাত্র। প্রকাশ্য প্রভাবই পার্থিব বিষয়াবলীর পরিণতি নির্ণায়ক। কিন্তু পরবর্তী পৃথিবীতে

www.eelm.weebly.com

প্রকাশ্য প্রভাব অকার্যকর। সুতরাং পরিণতি নির্ণায়ন সেখানে অকার্যকর ও অনুপস্থিত। তাই তখন ওই সকল অংশীবাদী হয়ে যাবে নির্জবাব। এখানে 'আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলবার থাকবে না' অর্থ রসুলগণকে অস্বীকার করার কোনো কারণই তারা সেদিন খুঁজে পাবে না। মুজাহিদ বলেছেন, তারা তখন খুঁজেই পাবে না নবী-রসুলগণের প্রতি অসত্যারোপ করবার কোনো দলিল।

বায়যাবী লিখেছেন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্পাকের জিজ্ঞাসাবাদের প্রকৃতি দেখে নবী রসুলগণ হয়ে পড়বেন বিব্রত ও ভীত। তাই তাঁরাও তখন কোনো প্রত্যুত্তর করবেন না। কেবল বলবেন, আল্লাহ্পাকই সমধিক জ্ঞাত। তাঁদের এমতো অবস্থা দেখে অবিশ্বাসীরা হয়ে যাবে বাকশক্তিহীন। তাই এখানে বলা হয়েছে 'এবং এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না'। অথবা পরিস্থিতি দৃষ্টে তারা তখন ভাববে, আমাদের সকলের অবস্থাই এখন সঙ্গীন। সকলেই অপরাধী। সুতরাং কার কাছে আর কী জিজ্ঞেস করবো। এরকম ভাবনার কারণেই তারা তখন হয়ে যাবে নির্বাক।

এরপরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'তবে যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে তো সফলকাম হবে'।

এখানকার 'আ'সা' (সম্ভবতঃ) শব্দটি নিশ্চিতার্থক। মহারাজাধিরাজেরাই এভাবে ব্যক্ত করেন তাদের দৃঢ় অভিপ্রায়। অর্থাৎ তাদের মুখনিঃসৃত 'সম্ভবতঃ' অর্থ 'অবশ্যই'। এ হচ্ছে তাঁদের মহাপরাক্রম প্রকাশের এক বিশেষ ভঙ্গি। আল্লাহ তায়ালার মহাপরাক্রম প্রকাশার্থেই তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এ রকম বচন ভঙ্গি। অথবা আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— তবে যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে যেনো আশাধারী হয়ে থাকে যে, সে হবে সফল। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রে 'আ'সা' (সম্ভবতঃ, আশা করা যায়) শব্দটি সম্পৃক্ত হবে তওবাকারীর সৎকর্মশীলতার সঙ্গে, আল্লাহ্র সঙ্গে নয়।

সূরা ক্বাসাস ঃ আয়াত ৬৮, ৬৯ ৭০

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ سُبْحٰنَ
اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ
وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى
وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾

www.eelm.weebly.com

r তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, ইহাতে উহাদিগের কোন হাত নাই। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং উহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি ঊর্ধ্বে।

r ইহাদিগের অন্তর যাহা গোপন করে এবং ইহারা যাহা ব্যক্ত করে তোমার প্রতিপালক তাহা জানেন।

r তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, ইহকাল ও পরকালে প্রশংসা তাঁহারই; বিধান তাঁহারই; তোমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের কোনো হাত নেই'।

এখানে 'যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন' অর্থ যাকে মনোনীত করাকে তিনি সঙ্গত মনে করেন। তিনি সকল মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলরূপে মনোনীত করেছেন মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে। এটাই ছিলো তাঁর চিরস্বাধীন ও চিরপবিত্র অভিপ্রায়। সুতরাং তাঁর এমতো অভিপ্রায় ছিলো অতি অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুসঙ্গত।

'মা কানা লাহুমুল খিয়ারাত' অর্থ এতে তাদের কোনো হাত নেই।' খিয়ারাত' শব্দটি ধাতুমূল। ভিন্নরূপে শব্দটি ব্যবহার্য। যেমন— মোহাম্মাদুন খিয়ারতুল্লহি মিন খলক্বিহী' (আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে মোহাম্মদ এক নির্বাচিত ব্যক্তিত্ব)। এখানে শব্দটি কর্মপদরূপে ব্যবহৃত। তাই এখানে এর অর্থ নির্বাচিত বা মনোনীত। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— মানুষের এমতো অধিকার নেই যে তারা বলবে, অমুককে নবী করলে ভালো হতো অথবা অমুককে নবী বানানো ঠিক হয়নি। এভাবে বলতে হয় 'এতে তাদের কোনো হাত নেই' কথাটি 'তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন' বাক্যটির বেগ ও আবেগ। বরং এখানে এ কথাটির মাধ্যমে প্রচণ্ড প্রতিবাদ করা হয়েছে মক্কার মুশরিকদের একটি অপউক্তির। তারা বলেছিলো, আমাদের নেতৃবর্গের মধ্যে ওলীদ ইবনে মুগীরা ও ওরওয়া ইবনে মাসউদ অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত। সুতরাং তাদের উপরে কোরআন অবতীর্ণ হলো না কেনো? তাদের এমতো অপবচনের পরিপ্রেক্ষিতেই অবশ্য অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা বলেছেন, এখানকার 'মা কানা লাহুম' এর 'মা' হচ্ছে সংযোজক অব্যয়, 'ইয়াখতারু' এর কর্মপদ। আর 'আলখিয়ারাত' অর্থ কল্যাণ। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বান্দার জন্য যা যথার্থ ও কল্যাণময়, আল্লাহ্পাক সেটাই অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ করেন। অর্থাৎ মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলরূপে মনোনয়ন প্রদান যথার্থ ও কল্যাণকর। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, বান্দাগণ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মানতে

www.eelm.weebly.com

বাধ্য। তাই বলে মোতাজিলাদের মতো কোনো অসৎ বিশ্বাস আরোপের অবকাশ এখানে নেই। তাদের অপবিশ্বাসটি হচ্ছে— আল্লাহ্‌র পক্ষে তাঁর বান্দাদের জন্য অত্যুত্তম ও যথার্থ বিষয় সৃষ্টি করা ওয়াজিব। আর তাদের জন্য নিকৃষ্ট কোনো সৃষ্টি না করা তাঁর পক্ষে অনিবার্য। তাদের এমতো অপবিশ্বাস আহরণের স্থান এটা নয়। কারণ এখানকার বক্তব্য বিষয় হচ্ছে— বান্দার জন্য যা সমীচীন ও শোভন তা সৃষ্টি করবার অধিকার সংরক্ষণ করেন কেবল আল্লাহ্। বান্দাদের এমতো অধিকার আদৌ নেই। আর বান্দার জন্য কল্যাণকর কোনো কিছু সৃজন হচ্ছে তাদের প্রতি তাঁর অনুপম অনুকম্পা। কিন্তু এরকম দায়িত্ব পালন করতে তিনি বাধ্য নন।

কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেন, ওই আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ সর্ববিষয়ে নিরুপায়, একান্ত বাধ্য। কিন্তু একথাও ঠিক নয়। যদি তাই হতো, তবে এখানে 'আলখিয়ারাত' না বলে বলা হতো, 'খইরাত'। অর্থাৎ কোনো অধিকারই মানুষের নেই। এভাবে অভিপ্রায় ও অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দেওয়া হতো। কিন্তু 'আল খিয়ারাত' বলে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের অভিপ্রায় ও অধিকার অচল। এভাবে এখানে মানুষের অধিকারকে করা হয়েছে সীমায়িত। অতএব বক্তব্যটি দাঁড়াবে— নবী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানুষের কোনো অধিকার নেই, অভিপ্রায় প্রয়োগের নেই কোনো সুযোগ। আলোচ্য আয়াতের অবতরণের প্রেক্ষিত এই ব্যাখ্যাটিকেই দৃঢ়বদ্ধ করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ পবিত্র মহান এবং তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি ঊর্ধ্বে'। একথার অর্থ আল্লাহ্‌র সত্তা-গুণবত্তা-কার্যাবলী সবকিছুই এক, একক, অবিভাজ্য, মহান, মহানতম, পবিত্র ও পবিত্রতম। অংশীবাদীরা মনে করে তাঁর চিরমুক্ত অভিপ্রায় ও অধিকারের সঙ্গে অন্য কারো অভিপ্রায় ও অধিকারের সংমিশ্রণ হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাদের এমতো ধারণা অযথার্থ, অপবিত্র। এরকম অংশীবাদ দুষ্ট ধারণা থেকে তিনি অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'এদের অন্তর যা গোপন করে এবং এরা যা ব্যক্ত করে তোমার প্রতিপালক তা জানেন'। একথার অর্থ— রসুল স. সম্পর্কে যে হিংসা-বিদ্বেষ অংশীবাদীরা হৃদয়ে লালন করে এবং যে শত্রুতার প্রকাশ তারা ঘটায়, আল্লাহ্‌তায়ালা তার সকল কিছুই অবগত। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ।

এরপরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, ইহকাল ও পরকালে প্রশংসা তাঁরই, বিধান তাঁরই, তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে'। একথার অর্থ— যে সত্তা অদৃশ্য, অবোধ্য ও

www.eelm.weebly.com

আনুরূপ্যবিহীন, তিনিই আল্লাহ্। তিনি ভিন্ন উপাস্য কেউ নেই। ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে অতুলনীয়রূপে প্রশংসাভাজন। কারণ সুন্দরতম তিনি। আর স্রষ্টা সকল সৌন্দর্যের। বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীরা তাই কেবল তাঁরই প্রশংসা করে অহরহ ধন্য হয়। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে। যেমন বেহেশতে প্রবিষ্ট হওয়ার পর তারা বলবে ‘সকল স্তব-স্তুতি আল্লাহ্র, যিনি আমাদের নিকট থেকে চিরদিনের জন্য দূর করে দিয়েছেন আক্ষেপপ্রবণতাকে’। সকলের এবং সকল কিছুর উপরে তাঁর বিধান সতত ক্রিয়াশীল। যেমন অনুগতদের উপরে ক্রিয়াশীল মার্জনা এবং অননুগতদের উপর কার্যকর শাস্তি। আর সকলের অবশেষ প্রত্যাবর্তন তাঁর দিকে। কেবল তাঁরই দিকে।

সূরা ক্বাসাস ঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿৭১﴾ قُلْ
اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا
تُبْصِرُوْنَ ﴿৭২﴾ وَ مِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ
لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿৭৩﴾
وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿৭৪﴾
وَ نَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا
اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿৭৫﴾ ع

r বল, ‘তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি আল্লাহ্ যদি রাত্রির অন্ধকারকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন— আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্ আছে যে তোমাদিগকে দিবালোক দান করিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করিবে না?’

www.eelm.weebly.com

r বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি— আল্লাহ্ যদি দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্ আছে যে তোমাদিগের জন্য রাত্রির আর্বিভাব ঘটাইবে যখন তোমরা বিশ্রাম করিতে পার। তবুও কি তোমরা ভাবিয়া দেখিবে না?'

r তিনিই তাঁহার দয়ায় তোমাদিগের জন্য করিয়াছেন রজনী ও দিবস, যাহাতে রজনীতে তোমরা বিশ্রাম করিতে পার এবং দিবসে তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

r সেই দিন উহাদিগকে আহবান করিয়া বলা হইবে, 'তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক গণ্য করিতে তাহারা কোথায়?'

r প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে আমি এক জন সাক্ষী দাঁড় করাইব এবং বলিব, তোমাদিগের প্রমাণ উপস্থিত কর।' তখন উহারা জানিতে পারিবে ইলাহ্ হইবার অধিকার আল্লাহেরই এবং উহারা যাহা উদ্ভাবন করিত তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে।

'আরাআইতুম' অর্থ হে মক্কাবাসী! তোমরা বলতে পারো কি? অর্থাৎ তোমরা ভেবে দেখেছো কি? 'সারমাদা' অর্থ চিরস্থায়ী। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'সুরুদ' থেকে। এখানে 'মীম' অক্ষরটি সংযোজিত হয়েছে অতিরিক্ত হিসেবে, আধিক্য শব্দরূপে। এভাবে এর মর্মার্থ হয়েছে— রজনী যদি প্রলম্বিত হয় মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত। 'বিদ্বিয়াইন' অর্থ কে আছে এমন যে দিবালোক দান করতে পারে, যাতে তোমরা নিয়োজিত হতে পারো জীবিকান্বেষণ কর্মে। 'আফালা ইয়াসমাউন' অর্থ তবুও কি তোমরা চিন্তাভাবনা সহ সদুপদেশ শ্রবণ করবে না? এভাবে এখানকার প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে মক্কাবাসী! তোমরা একথা কখনো ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ্ যদি রাতের আঁধারকে মহাপ্রলয়দিবস পর্যন্ত প্রলম্বিত করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কে আছে, যে তোমাদের জীবিকান্বেষণকে নিশ্চিত করবার জন্য আনতে পারে দিনের আলো? তবুও কি আমার বার্তাবাহক কর্তৃক বারংবার উচ্চারিত সদুপদেশ তোমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে না?

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'হাল ইলাহুন' (এমন কোন উপাস্য আছে) না বলে বলা হয়েছে 'মান ইলাহুন' (কে আছে এমন উপাস্য)। এরকম বলা হয়েছে অবিশ্বাসীদের আনুকূল্য রক্ষার্থে। কারণ এখানে সম্বোধিত হয়েছে তারাই।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ্ যদি দিবসকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোনো ইলাহ্ আছে যে তোমাদের জন্য রাত্রি আবির্ভাব ঘটাবে যখন তোমরা বিশ্রাম করতে পারো। তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবেনা'? একথার অর্থ— হে মক্কার মানুষ! একথাও কি তোমরা কখনো ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ্ যদি সূর্যকে মধ্যগগনে সুস্থির করে দিয়ে দিবসকে প্রলম্বিত করেন মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত, তবে

www.eelm.weebly.com

এমন কোনো উপাস্য কি কেউ আছে, যে তোমাদের আনতে পারবে বিশ্রামপ্রদায়ক রজনী? তবুও কি তোমরা আল্লাহ্‌র শক্তির সর্বত্রগামিতার এই মহানিদর্শনটির প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করতে সচেষ্ট হবে না?

রাত্রির আবির্ভাবজনিত উপকারের কথা বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বলা হয়েছে 'যখন তোমরা বিশ্রাম করতে পারো। কিন্তু পূর্ববর্তী আয়াতে দিবসের আবির্ভাব ঘটে কেনো, সেকথা রয়েছে অনুক্ত। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, দিবসের আলোক আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত এক বিশাল অনুগ্রহ, রাত্রির অন্ধকার তত্তুল্য নয়। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 'তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না'? আর এখানে বিষয়টির সপ্রমাণ উল্লেখের পর বলা হয়েছে 'তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না'? এরকম বলার কারণ হচ্ছে, যেনো শ্রবণ জ্ঞানকে করে সচকিত এবং দর্শন ভাবনাকে।

এরপরের আয়াতে(৭৩) বলা হয়েছে— 'তিনিই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য করেছেন রজনী ও দিবস, যাতে রজনীতে তোমরা বিশ্রাম করতে পারো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো'। একথার অর্থ— জীবিকান্বেষণের কর্মমুখরতা শোভিত দিবস এবং শ্রান্তিনিরোধতামুদ্রিত বিভাবরী তো আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে দয়া করে দান করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না কেনো?

এখানে 'দিবসে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো' অর্থ দিবসে সন্ধান করতে পারো ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ। এখানে 'ফিহী' শব্দটির 'হী' (তার) সর্বনামটি প্রযুক্ত হবে রজনী'র সঙ্গে। এমতোক্ষেত্রে বর্ণনার ধারাক্রমই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। প্রথমে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে 'রজনী ও দিবস'। তারপর এ দু'টোর বিষয়ে আলোচিত হয়েছে ক্রমান্বয়ে এভাবে— যাতে রজনীতে তোমরা বিশ্রাম করতে পারো এবং দিবসে সন্ধান করতে পারো তাঁর অনুগ্রহ'। অর্থাৎ লাভ করতে পারো ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ । জুজায বলেছেন, বক্তব্যটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— তিনি তোমাদের জন্য রজনী-দিবস সৃষ্টি করেছেন একারণে যেনো, তোমরা এ দু'টোর একটিতে গ্রহণ করতে পারো বিশ্রাম এবং অন্য একটি ব্যবহার করতে পারো মহাকল্যাণ অন্বেষণার্থে।

এরপরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'সেদিন তাদেরকে আহ্বান করে বলা হবে, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে তারা কোথায়'? একথার অর্থ— হে মক্কার জনতা! মহাবিচারের দিবসে অবশ্যই তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বলা হবে পৃথিবীতে তোমরা যাদেরকে পরিত্রাতা বলে পূজো করতে, তারা আজকের এই ভয়ানক বিপদে তোমাদেরকে সাহায্য করতে আসে না কেনো?

www.eelm.weebly.com

এখানে এক হুমকির পর দেয়া হয়েছে অপর হুমকি। গুরুত্বসহকারে এই বিষয়টিকেই স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে যে, শাস্তি অবধারিত হওয়ার প্রধান উপলক্ষ হচ্ছে শিরিক বা অংশীবাদিতা। প্রথম হুমকির উদ্দেশ্য ছিলো একথা জানিয়ে দেওয়া যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে ছেড়ে আনুগত্য করেছিলে তোমাদের অংশীবাদ প্রিয় সমাজপতিদের। আর দ্বিতীয় হুমকিটি এরকম— তোমাদের বক্ষস্থিত বিশ্বাসই ডেকে এনেছে বিপর্যস্ত। তা না হলে তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত ছেড়ে দিয়ে বিগ্রহবন্দনার মতো ধ্বংসাত্মক আচরণকে গ্রহণ করবে কেনো?

এরপরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী দাঁড় করাবো এবং বলবো, তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো। তখন তারা জানতে পারবে ইলাহ্ হবার অধিকার আল্লাহরই এবং তারা যা উদ্ভাবন করতো তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে'।

এখানে 'নাযা'না' অর্থ বের করে আনবো, দাঁড় করাবো সাক্ষীরূপে। অর্থাৎ সেদিন প্রত্যেক নবীকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের। এখানে 'বুরহানাকুম' অর্থ দলিল-প্রমাণ। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা যে মতবাদের অনুসারী ছিলো, তার পক্ষের দলিল প্রমাণ। 'আন্নাল হাক্ক্বা লিল্লাহ' অর্থ সুনিশ্চিত সত্য আল্লাহ্র পক্ষে। অর্থাৎ আল্লাহ্রই রয়েছে একমাত্র উপাস্য হওয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকার, যার মধ্যে কারো বা কোনোকিছুর অংশগ্রহণের অবকাশ মাত্র নেই। 'দ্বল্লা' অর্থ অপসৃত হবে, মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। আর 'মা কানু ইয়াফতারূন' অর্থ তারা পৃথিবীতে যে সকল অলীক ধারণার উদ্ভাবন ঘটাতো। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— মহাবিচারের দিবসে আমি আমার নবীগণকে করবো তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের কৃতকর্মের সাক্ষী। বলবো, তোমরা পৃথিবীতে এঁদেরকে অমান্য করে যে সকল অপধারণা ও অপআচরণের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়েছিলে, সেগুলোর সপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করো। কিন্তু তারা তখন আমার এমতো প্রস্তাব পরিপূরণ করতে হবে সম্পূর্ণ অক্ষম। ফলে এ বিষয়টি আর তাদের কাছে অস্পষ্ট থাকবে না যে, উপাস্য হওয়ার একক ও অবিভাজ্য অধিকার সংরক্ষণ করেন কেবল আল্লাহ্। আর তাদের আল্লাহ্বিরোধী সকল উদ্ভাবনা ও কর্মকাণ্ড সর্বৈবরূপে মিথ্যা।

সূরা ক্বসাস ঃ আয়াত ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ۖ وَ اٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ ۗ اِذْ قَالَ

www.eelm.weebly.com

لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿٧٦﴾ وَ ابْتَغِ فِيْمَآ
اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ اَحْسِنْ
كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾ قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ؕ اَوَلَمْ
يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ
قُوَّةً وَّ اَكْثَرُ جَمْعًا ؕ وَلَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٧٨﴾
فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٧٩﴾
وَ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهٖ وَ
بِدَارِهِ الْاَرْضَ ۗ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ ق
وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾ وَ اَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ
بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ
عِبَادِهٖ وَ يَقْدِرُ ۚ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ؕ وَيْكَاَنَّهٗ
لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾ ع

r কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাহাদিগের প্রতি জুলুম করিয়াছিল। আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম ধনভাণ্ডার যাহার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তাহার সম্প্রদায়

www.eelm.weebly.com

তাহাকে বলিয়াছিল, 'দম্ভ করিওনা, আল্লাহ্ দাম্ভিকদিগকে পছন্দ করেন না'।

r আল্লাহ্ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তদ্দ্বারা পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে তুমি উপেক্ষা করিও না; তুমি সদাশয় হও, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদাশয়, এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিও না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভাল বাসেন না।'

r সে বলিল, 'এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হইয়াছি।' সে কি জানিত না আল্লাহ্ তাহার পূর্বে ধ্বংস করিয়াছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে যাহারা তাহা অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? অপরাধীদিগকে উহাদিগের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে না।

r কারূন তাহার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল জাঁকজমক সহকারে। যাহারা পার্থিব জীবন কামনা করিত তাহারা বলিল, 'আহা, কারূনকে যাহা দেওয়া হইয়াছে আমাদিগকে যদি তাহা দেওয়া হইত! প্রকৃতই তিনি মহা ভাগ্যবান।'

r এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল তাহারা বলিল, 'ধিক তোমাদিগকে, যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আল্লাহের পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত ইহা কেহ পাইবে না।'

r অতঃপর আমি কারূনকে ও তাহার প্রাসাদকে ভূগর্ভস্থ করিলাম। তাহার সপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহের শাস্তির বিরুদ্ধে তাহাকে সাহায্য করিতে পারিত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।

r পূর্ব দিন যাহারা তাহার মত হইবার কামনা করিয়াছিল তাহারা বলিতে লাগিল, 'দেখ, আল্লাহ্ তাহার দাসদিগের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা ইহা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ্ আমাদিগের প্রতি সদয় না হইতেন তবে আমাদিগকেও তিনি ভূগর্ভস্থ করিতেন। দেখ, সত্যপ্রত্যাখ্যনকারীরা সফলকাম হয় না।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কারূন ছিলো মুসার সম্প্রদায়ভূত'। বাগবী লিখেছেন, কারূন ছিলো হজরত মুসার পিতৃব্যপুত্র। হজরত মুসার পিতা ইমরান এবং কারূনের পিতা ইয়াসহার ছিলেন কাহত ইবনে লাবী ইবনে ইয়াকুব আ. এর পুত্র। ইবনে জুরাইজ থেকে ইবনে মুনজিরও এরকম তথ্য উপস্থাপন করেছেন। আর ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, কারূন ছিলো হজরত মুসারই পিতৃব্য। তওরাত শরীফের প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ছিলো সে। কিন্তু সামেরীর মতো সে-ও হয়ে পড়েছিলো কপটাচারী। জালালুদ্দিন মাহাল্লী লিখেছেন, কারূন ছিলো হজরত মুসার চাচাত ভাই। আর তার মা ছিলো হজরত মুসার খালা।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু সে তাদের প্রতি জুলুম করেছিলো। আমি তাকে দান করেছিলাম ধনভাণ্ডার। যার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিলো'।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, ফেরাউন কারূনকে বানিয়েছিলো বনী ইসরাইলদের দলপতি। সে কারণে সে বনী ইসরাইলদের উপরে চালাতো অকথ্য উৎপীড়ন। সুতরাং এখানকার 'ফাবাগা আ'লাইহিম' কথাটির অর্থ হবে— সে বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর উপরে করেছিলো অবর্ণনীয় অত্যাচার। জুহাক বলেছেন, সে হয়ে গিয়েছিলো অংশীবাদী। তাই প্রতিপক্ষ হয়েছিলো স্ববংশীয়দের। কেউ কেউ বলেছেন, সে ছিলো উগ্র, দাম্ভিক। আবার কেউ কেউ বলেছেন, দারুন পরশ্রীকাতর ছিলো সে। শ্রেষ্ঠ বিত্তপতি হওয়াই ছিলো তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, কারূন ছিলো হজরত মুসার চাচাত ভাই। বনী ইসরাইলদের সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সময় সেত ছিলো তাদের অনুগামী। কিন্তু পরে সামেরীর মতো সে-ও হয়ে গিয়েছিলো কপটাচারী। ধনবল ও জনবলের গর্ব করতো সে। কারণ প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ছিলো অনেক সন্তান-সন্ততির পিতা। তার দম্ভ চরমে পৌঁছলে আল্লাহ্পাক তাকে ধ্বংস করে দেন। সুরা মুমিনের বিবরণ অবশ্য অন্যরকম। সেখানে বলা হয়েছে 'আর এটা সুনিশ্চিত যে, আমি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মুসাকে পাঠিয়েছিলাম ফেরাউন, হামান ও কারূনের প্রতি। তারা বলেছিলো, তুমি তো স্পষ্ট মিথ্যাবাদী, যাদুকর'। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, কারূন কপটাচারী ছিলো না, ছিলো ফেরাউন ও হামানের মতো প্রকাশ্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। উল্লেখ্য, প্রকাশ্যতঃ ইমানদার, আর ভিতরে ভিতরে কাফের যারা তাদেরকে বলা হয় মুনাফিক বা কপট বিশ্বাসী। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী প্রকাশ্য গোপন উভয় অবস্থায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বা কাফের। শহর ইবনে হাওসাব বলেছেন, গর্বোন্মত্ত কারূনের পরিধেয় বসন আলুলায়িত হয়ে থাকতো মৃত্তিকা পর্যন্ত। অহংকারীদের পোশাক এরকমই হয়।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যার পরিধেয় বস্ত্রের নিম্নাংশে ভূমি স্পর্শ করে, আল্লাহ্ তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার উত্তরীয় আস্ফালন সহ উড়িয়ে বেড়ায়, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ তার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না। সর্বোন্নত সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আহমদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ মহাবিচারের দিবসে ওই লোকের দিকে দয়ার্দ্র দৃষ্টিতে তাকাবেন না, যে লোক তার পরিধেয় বসন মাটির সঙ্গে হেঁচড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

www.eelm.weebly.com

'মিনাল কুনুযী' অর্থ সঞ্চিত ধনভাণ্ডার। 'মাফাতিহাহু' অর্থ ওই ধনভাণ্ডারের সিন্দুকসমূহের চাবি। 'মাফাতিহ্' শব্দটি 'মিফতাহ্' এর বহুবচন। এর অর্থ কুঞ্জিকাসমূহ। এরকম বলেছেন কাতাদা, মুজাহিদ প্রমুখ। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ সম্পদের খনি। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন— 'আর তাঁর নিকটে রয়েছে অদৃশ্যের ভাণ্ডার, যার সম্পর্কে তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না'।

এখানে বলা হয়েছে 'যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিলো। সুতরাং বুঝতে হবে, অপরিমিত সম্পদের খনি যাকে বলে, কারূন সে রকম অফুরন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলো না। কারণ চল্লিশ জন বলবান লোকের পক্ষেও চার লক্ষ দিরহামের সংরক্ষণাগারের চাবি বহন করা দুঃসাধ্য নয়।

মনসুরের মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, খাইছামা বলেছেন, কারূনের ধনভাণ্ডারের চাবি বহন করতো চল্লিশটি গর্দভ। আর চাবিগুলো আকারে এক আঙুলের অধিক লম্বা ছিলো। প্রতিটি সিন্দুকের জন্য ছিলো একটি করে চাবি। আর চাবিগুলো ছিলো লোহার। লোহার চাবি অত্যধিক ভারী বলে পরে সে চাবি তৈরী করিয়ে নিয়েছিলো কাঠ ও গরুর চামড়া দিয়ে। সেগুলো বহন করতেও লাগতো চল্লিশটি খচ্চর। উল্লেখ্য, বর্ণনাটি কোরআনের বর্ণনার অনুকূল নয়। কারণ গাধা বা খচ্চর নয়, এখানে বলা হয়েছে একদল বলবান লোকের কথা।

'উ'সবাহ্' অর্থ একটি দল। বাগবী লিখেছেন, কতোজন লোকের সমষ্টিকে 'উ'সবাহ্' বলে, সে সম্পর্কে বিদ্বজ্জনের মধ্যে রয়েছে বিস্তর মতপৃথকতা। মুজাহিদ বলেছেন, 'উ'সবাহ্' বলে দশ থেকে পনেরো জনের দলকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'উ'সবাহ্' হচ্ছে তিন থেকে দশ জনের সমষ্টি। কাতাদা বলেছেন, তিরিশ থেকে চল্লিশজনের জোটকে বলে 'উ'সবাহ্'। 'কামুস' অভিধানগ্রন্থেও এরকম বলা হয়েছে। কেউ কেউ আবার 'উ'সবাহ্'র সদস্য সংখ্যা নির্ণয় করেছেন সত্তর জন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কারূনের ধনভাণ্ডারের কুঞ্জিকাসমূহ বহন করতো চল্লিশজন শক্তিমান পুরুষ। আর এখানকার 'চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিলো' কথাটির অর্থ— অত্যধিক ভারী হওয়ার কারণে চাবিবহনকালে ওই শক্তিমান পুরুষেরা ঝুঁকে পড়তো মাটির দিকে।

আবু উবায়দা বলেছেন, অগ্রপশ্চাত ঘটেছে এখানকার বক্তব্যবিন্যাসে। বক্তব্যটি পরিবেশিত হওয়া সমীচীন ছিলো এভাবে— 'ইন্নাল উ'সবাতা লা তানুউলাহা' (উট দল তা উত্তোলন করতো)।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিলো, দম্ভ কোরো না, আল্লাহ্ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না'। একথার অর্থ— কারূনের স্বসম্প্রদায়ের পুন্যবানেরা তাকে এই মর্মে উপদেশ দিয়েছিলো, দ্যাখো কারূন! ধন ঐশ্বর্যের কারণে গর্বিত ও উল্লসিত হয়ো না। আল্লাহ্ এরকম উল্লাসপ্রবণ ঐশ্বর্যশালীর দাম্ভিকতাকে পছন্দ করেন না।

এখানকার 'ফরহুন' অর্থ উল্লসিত, আকাংখিত বস্তুলাভের কারণে অত্যধিক আনন্দিত। উল্লেখ্য গর্বোল্লাস নিষিদ্ধ। প্রাপ্তির সাধারণ ও স্বাভাবিক আনন্দ সে রকম নয়। তবে প্রায়শঃই দেখা যায়, ধনাঢ্য মানুষ হয় গর্বোন্মত্ত। এমতো উন্মত্ততা অবশ্যই নিষিদ্ধ। আল্লাহ্পাক এধরনের আচরণকে বলেছেন 'তুগইয়ান' (বিরুদ্ধাচরণ)। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'মানুষ যখন নিজেকে পেয়েছে বিত্তশালী হিসেবে, তখন সে অবশ্যই হয়ে উঠেছে বিরুদ্ধাচারী'। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে 'ফারহুন' অর্থ উল্লাস, আত্মপ্রদর্শন।

সফলতার আনন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রকাশ পায়। সুতরাং এরকম স্বভাবজ আনন্দ নিষিদ্ধ নয়। তবে আল্লামা বায়যাবী লিখেছেন, পার্থিব প্রাপ্তি জনিত আনন্দ পরিহরণীয় আর এতে করে প্রবল হয় পৃথিবীপ্রীতি, আর ঔদাসীন্যের আবরণ নেমে আসে পরকালপ্রীতির উপর। ফলে মানুষ ভুলে যায় যে, এ প্রাপ্তি নশ্বর। সুতরাং পার্থিব প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিকে সমতুল মনে করাই শ্রেয়। আল্লাহ্পাকের উপদেশও এরকম। যেমন— 'হৃত বিষয়ের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ কোরো না, আবার প্রাপ্তিতে হয়ো না উল্লসিত'।

'লা তাক্বরাহ্' অর্থ উল্লসিত হয়ো না, দম্ভ কোরো না। অর্থাৎ বিত্ত-দম্ভের কারণে উচ্ছাস প্রকাশ কোরো না। কারণ, এমতো উচ্ছাস ক্ষতি করে আল্লাহ্ প্রীতির। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যারা প্রতারণাপূর্ণ পার্থিব আস্বাদনে চঞ্চলিত হয়, তারা হয় মদগর্বিত। তারা আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, আল্লাহ্প্রেমিকও নয়'।

কোনো কোনো তাত্ত্বিক লিখেছেন, বিত্তোচ্ছ্বাস যে দূষণীয় সে কথার উল্লেখ রয়েছে কোরআন মজীদের অনেক স্থানে। যেমন— ১, যখন তাদের নিকট দলিল প্রমাণসহ রসুলগণ আগমন করলেন, তখনও তারা পূর্বধারণা নিয়েই মেতে রইলো ২. আর তারা উল্লসিত হয়েছে পার্থিব জীবনে ৩. তোমাদের এমতো অবস্থা এজন্য যে, অন্যায়ভাবে তোমরা মত্ত ছিলে ঘোরপার্থিবতায়। আবার কোনো স্থানে আনন্দ প্রকাশ করারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেমন— ১. অনন্তর একারণেই তোমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত ২. আজ আল্লাহ্র সাহার্যপ্রাপ্তিতে বিশ্বাসবানেরা আনন্দ প্রকাশ করবে।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, প্রকৃত কথা এই যে, যে প্রাপ্তি পরকালে ফলপ্রদ, সে প্রাপ্তিতে উল্লসিত হওয়া প্রশংসনীয়। সেকারণেই এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তোমরা আনন্দোল্লাস করো'। আবার জাগতিক প্রাপ্তির সকৃতজ্ঞ উচ্ছ্বাসও অপ্রশংসনীয় নয়। একারণেই রসুল স. বলেছেন, কৃতজ্ঞ ভোজনকারী ধৈর্যশীল রোজাদারদের মতো। আবার ধর্মপরায়ণতাজাত সাফল্য আস্বাদনে যদি প্রকাশ পায় অকৃতজ্ঞতা ও প্রদর্শনপ্রবণতা, তবে তাও নিন্দনীয়। অতএব বুঝতে হবে, সাফল্যের উচ্ছ্বাস প্রশংসনীয় না অপ্রশংসনীয়, তা নির্ভর করে কৃতজ্ঞতা এবং অকৃতজ্ঞতার উপর। আর আল্লাহ্ প্রেমিকেরা ওই সকল সাফল্যে অবশ্যই প্রীত হন, যা আল্লাহ্র পরিতোষ অর্জনের সহায়ক। তাঁরা উদ্দেশ্য সাধনে থাকেন সতত তৎপর। পক্ষান্তরে মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে যারা বেখবর, আল্লাহ্ প্রেমিক হওয়া তো তাদের পক্ষে সম্ভবই নয়।

পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন, তদ্দ্বারা পরকালের কল্যাণ অনুসন্ধান করো। ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে তুমি উপেক্ষা কোরো না; তুমি সদাশয় হও, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদাশয় এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না'।

এখানে 'ফীমা আতাকাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন। 'পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান করো' অর্থ অন্বেষণ করো জান্নাতের পথ। অর্থাৎ জান্নাত প্রাপ্তির নিশ্চয়তার্থে আল্লাহ্ প্রদত্ত অনুগ্রহরাজির জন্য প্রকাশ করো যথাকৃতজ্ঞতা। ব্যয় করো তাঁর সন্তোষের অনুকূলে। 'ওয়ালা তানসা' অর্থ উপেক্ষা কোরো না, পার্থিব সম্পদে তোমার বৈধ অংশের কথা ভুলে যেয়ো না, যে সম্পদ হতে পারে তোমার পরকালের সফলতার পাথেয়। মুজাহিদ ও ইবনে যায়েদ বলেছেন, যেহেতু এ জগত পরজগতের শস্যক্ষেত্র। তাই এজগতের প্রকৃত অর্জন সেটাই, যার দ্বারা লাভ হয় পরকালের সাফল্য।

সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে তুমি উপেক্ষা কোরো না' অর্থ এজগতে দান খয়রাত করার কথা ভুলে যেয়ো না, অপরিপূরিত রেখো না আত্মীয়-স্বজনের অধিকার। হজরত আলী বলেছেন, তুমি তোমার সুস্থতা, শক্তিমত্তা, যৌবন ও বিত্ত-বৈভব আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে পরলোকের কল্যাণ অর্জন করতে ভুলো না। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, পাঁচটি বিষয়কে তোমরা আল্লাহ্র অযাচিত দান বলে ধরে নিয়ো— ১. মৃত্যু পূর্ব আয়ুষ্কাল ২. ব্যধিগ্রস্ত হওয়ার পূর্বের সুস্থতা ৩. কর্ম ব্যস্ততার পূর্বের অবকাশ ৪. বার্ধক্য কবলিত হওয়ার পূর্বের যৌবন এবং ৫. বিত্তহীন হওয়ার পূর্বের স্বচ্ছলতা। বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাকেম ও বায়হাকী। আর 'জুহুদ' গ্রন্থে উল্লেখ

www.eelm.weebly.com

করেছেন ইমাম আহমদ। প্রায়োন্নত সূত্রে ওমর ইবনে মাইমুন থেকে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন বাগবী, ইবনে হাব্বান এবং আবু নাঈম। হাসান বসরী বলেছেন, এরকম একটি নির্দেশও রয়েছে যে— প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করো, রেখে দাও ততটুকু, যতটুকু তোমার জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট। মনসুর ইবনে মাজান বলেছেন, এখানে 'ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে তুমি উপেক্ষা কোরো না' কথাটির অর্থ— নিজের ও পরিবারবর্গের প্রয়োজনীয় উপজীবিকাটুকু পরিত্যাগ কোরো না।

'ওয়া আহসিন্' অর্থ সদাশয় হও। আল্লাহ্র বান্দাদের উপকার করো। অথবা অর্থ হবে— আল্লাহ্র উপকার করো উত্তমরূপে। হৃদয়ে জাগ্রত রাখো তাঁর বিরতিহীন স্মরণ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাঁর প্রতি দানের। জীবনকে করো আনুগত্য শোভিত, কেননা আল্লাহ্ তোমার প্রতি সতত সদাশয়।

'ওয়ালা তাব্গিল ফাসাদ' অর্থ বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে নিষিদ্ধ হয়েছে উৎপীড়ন ও অনাচার। বাগবী লিখেছেন, যারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

এরপরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— ' সে বললো, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে পেয়েছি।' একথার অর্থ—তার সম্প্রদায়ের পুণ্যবানদের সদুপদেশের প্রতিবাদে কারূন বললো, আমাকে আবার কারো কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে কেনো? কেনোই বা অন্যের জন্য করতে হবে অর্থব্যয়? আমার মান-সম্মান, কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব, বিত্ত-বৈভব এসব কিছু তো পেয়েছি আমার জ্ঞানবুদ্ধিবলে।

কোনো কোনো বিদ্বান এখানকার 'জ্ঞানবলে' কথাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, কারূন ছিলো প্রাজ্ঞ রসায়নবিদ। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, হজরত মুসা ছিলেন রসায়ন শাস্ত্রে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী। ওই বিদ্যা তিনি কিছু কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন হজরত ইউশা ইবনে নুনকে। কালেব ইবনে ইয়ুকনা এবং কারূনও পেয়েছিলো ওই বিদ্যার এক তৃতীয়াংশ করে জ্ঞান। কিন্তু সুচতুর কারূন ক্রমে ক্রমে ওই জ্ঞানের সবটাই রপ্ত করে ফেলে। প্রবঞ্চিত করে হজরত ইউশা এবং কালেবকে। তার অঢেল সম্পদ আহরণের উৎসই ছিলো তার অধিকৃত রসায়ন জ্ঞান। সেকারণেই সে বলেছিলো 'এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।'

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'জ্ঞানবলে' অর্থ ব্যবসায়িক বুদ্ধিবলে। কৃষিপণ্য উৎপাদনের কৌশলসহ অন্যান্য অর্থাগমের কলাকৌশল জানা ছিলো তার। ওই সকল কলাকৌশলের যথাযথ প্রয়োগের ফলে সে লাভ করেছিলো প্রচুর অর্থবিত্ত।

www.eelm.weebly.com

সহল বলেছেন, যে নিজের সাফল্যে গর্বিত, সে প্রকৃত অর্থে সফল নয়। বরং সফল সে-ই যে সুফল প্রাপ্তিতে থাকে কৃতজ্ঞচিত্ত। কেননা দর্পোন্মত্তরা অবশেষে কারূনের মতো ধ্বংস হয়ে যায়। আর টিকে থাকে কৃতজ্ঞচিত্তরা।

এরপর বলা হয়েছে— ' সে কি জানতো না, আল্লাহ্ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠিকে যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিলো প্রবল। সম্পদে ছিলো প্রাচুর্যশালী'।

এখানে 'আওয়ালাম ইয়ালাম' অর্থ সে-কি অবগত নয়? দান ও বঞ্চনা তাঁরী অভিপ্রায়াগত। তিনিই তো সকলের একমাত্র উপাস্য। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর, অধিকারী অতুলনীয় পরাক্রমের । আর এখানকার 'ধ্বংস করে দিয়েছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে' বলে বুঝানো হয়েছে বিগত যুগের নবীগণের অবাধ্য সম্প্রদায়ের ধ্বংস হয়ে যাওয়াকে, যারা ছিলো কারূন অপেক্ষাও অধিক বলবান ও বিত্তবান। যেমন আদ, ছামুদ, হজরত নূহের সম্প্রদায় ইত্যাদি। আলোচ্য প্রশ্নটি বিস্ময়প্রকাশক, অথবা অস্বীকৃতি জ্ঞাপক।

এরপর বলা হয়েছে— 'অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না'। একথার অর্থ— আল্লাহতায়ালা সবজ্ঞ। তাই অপরাধীদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করার কিছুই নেই। সেকারণেই তো অতীতের অবাধ্যদেরকে ধ্বংস করেছে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ না করেই। পরিশেষে তাদেরকে দিয়ে পরিপূর্ণ করা হবে জাহান্নাম। এখানে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই প্রকাশ করা হয়েছে যে, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সকল কালের অপরাধীদের অপরাধের প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। তাই তাদের শাস্তি যেমন অবধারিত, তেমনি প্রশ্নাতীত। হজরত কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ—তাদেরকে নরকে প্রবেশ করানো হবে বিনা প্রশ্নে। মুজাহিদ বলেছেন, ফেরেশতারাও তাদেরকে তাদের পাপ সম্পর্কে কিছুই বলবে না। তারা যে শাস্তিযোগ্য অপরাধী সেকথা তারা বুঝতে পারবে তাদের আকৃতি দেখেই। হাসান বসরী বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে অভিযোগ প্রমাণ অথবা কোনোকিছু জানার জন্য তাদেরকে কিছুই বলা হবে না। কিছু কিছু প্রশ্ন করা হবে কেবল তাদেরকে ত্রাসিত করার জন্য, হুমকি প্রদানের জন্য।

এরপরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'কারূন তার সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হয়েছিলো জাঁক-জমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো তারা বললো, আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেওয়া হতো! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান'।

www.eelm.weebly.com

ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, কারূন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা পরিধান করতো লাল অথবা সবুজ রঙের পোশাক। একদিন সে তার সম্প্রদায়ের লোকের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলো মহাআড়ম্বর জাফরান রঙের পোশাক পরে। ওই সময় তার সঙ্গে ছিলো সত্তর হাজার সঙ্গী সাথী। সেদিনের ঘটনার কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

মুজাহিদ বলেছেন, জাফরানী রঙের রসনাচ্ছাদিত হয়ে লোহিত বর্ণের বিচিত্র গদি আঁটা ঘোড়ায় চড়ে বহু অনুরক্ত সমভিব্যাহারে উৎসবের মেজাজে সেদিন পথে নেমে এসেছিলো কারূন। মুকাতিল বলেছেন, সে প্রমোদভ্রমণে বের হতো শ্বেতখচ্চরের উপরে আরোহণ করে। খচ্চরটি সুসজ্জিত থাকতো সুবর্ণখচিত আসন দিয়ে। প্রমোদসঙ্গিনীরূপে তার সঙ্গে থাকতো তিনশত কিংকরী। তারা তার সঙ্গে সঙ্গে চলতো শ্বেতখচরে আরূঢ়া হয়ে। আর বলা বাহুল্য, তারা থাকতো সালংকারা ও সুসজ্জিতা।

বনী ইসরাইলদের বিশ্বাসবানেরাও সাধারণতঃ হতো অর্থ গৃধ্নু। কিন্তু তারা পরশ্রীকাতর ছিলোনা। তাই এখানে বলা হয়েছে 'যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো তারা বললো, আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে তা যদি আমাদেরকে দেওয়া হতো, প্রকৃতই সে ভাগ্যবান'। উল্লেখ্য, পরশ্রীকাতর যদি তারা হতো তবে কারূনের সম্পদ ধ্বংসের অভিলাষ প্রকাশ পেতো তাদের কথায়। এতে করে বোঝা যায় 'তারা বললো' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে বনী ইসরাইলদের কিছু সংখ্যক বিশ্বাসীকে, যারা পার্থিব প্রাচুর্য কামনা করলেও মেনে চলতো শরিয়তের বিধান। তাই তাদের কথায় শরিয়তনিষিদ্ধ পরশ্রীকাতরতা ফুটে ওঠেনি।

এর পরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে— 'এবং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিলো তারা বললো, ধিক তোমাদেরকে, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহ্র পুরস্কারই শ্রেয় এবং ধৈর্যশীল ছাড়া এটা কেউ পাবে না'।

এখানে 'ঊতুল ই'লমা' অর্থ যাদেরকে দেওয়া হয়েছে ধর্মজ্ঞান। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ কর্তৃক সংরক্ষিত পুণ্যকর্মের বিনিময় সম্পর্কে জ্ঞাত, যে বিনিময় বা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ্ স্বয়ং। এখানে বলা হয়েছে, তারাই পার্থিব বিলাসাকাংখীদেরকে বললো, ধিক তোমাদের।

'ওয়াইলাকুম' কথাটির 'ওয়াইল' শব্দটি ধাতুমূল। এর অর্থ ধ্বংস। এখানে শব্দটি একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সাধারণ কর্মপদ। এভাবে কথাটির মর্ম দাঁড়ায়— তোমরা নিপাত যাও, ধ্বংস হোক তোমাদের, ধিক তোমাদেরকে। অশুভ কামনাই এমতো শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য। কিন্তু এমতো সম্বোধন ব্যবহৃত হয় সাধারণতঃ অশোভন কর্ম থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে, অশুভ কিছু হয়েই যাক, এই উদ্দেশ্যে নয়। অর্থাৎ এ হচ্ছে এক ধরনের হুমকি বা সাবধানবাণী।

www.eelm.weebly.com

‘ওয়া লা ইউলাক্বক্বাহা ইল্লাস্ সবিরূন’ অর্থ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত কেউ এটা পাবে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌প্রদত্ত পুরস্কারই যে সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট, সে কথা জানে ও মানে কেবল সহনশীলেরা। অথবা অর্থ হতে পারে এরকম— সহিষ্ণু যারা, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কেবল তাদেরকেই দেওয়া হবে পুণ্যের পুরস্কার। এখন প্রশ্ন— ধৈর্যশীলদের পরিচয় কী? এর জবাব এই যে, ধৈর্যশীল তারাই, যারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে সতত নিমগ্ন এবং যারা নিরবচ্ছিন্নরূপে মুক্ত ধনলিপ্সা ও পাপ পঙ্কিলতা থেকে।

এরপরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভস্থ করলাম। তার সপক্ষে এমন কোনো দল ছিলোনা যে, আল্লাহ্‌র শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারতো এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলো না’।

এখানকার ‘ফিয়াতিন’ শব্দটির ধাতুমূল ‘ফাইউন’। এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরিয়ে দেয়া। আর ‘ফিয়াতুন’ অর্থ ওই সাহায্যকারী, বিপদের সময় সাহায্যের আশায় যার দিকে বিপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ‘ইয়ানসুরূনাহু’ অর্থ যে আল্লাহ্‌র শাস্তি প্রতিহত করতে সক্ষম। ‘মিনাল মুনতাসিরীন’ অর্থ সে নিজেও ভূমিধসের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলো না। ‘নাসরাহু’ অর্থ সে তাকে সাহায্য করেছে, আর ‘ইনতাসরা’ অর্থ সে সাহায্য পেয়েছে।

ইতিহাসবেত্তাগণ লিখেছেন, হজরত মুসা ও হজরত হারুনের পরে বনী ইসরাইলদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিজ্ঞব্যক্তি ছিলো কারূন। তদুপরি সে ছিলো প্রিয়ংবদ, সুদর্শন ও বিত্তপতি। কিন্তু সে ছিলো দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বেচ্ছাচারী। তার স্বেচ্ছাচারণ প্রবৃত্তির সূচনা ঘটেছিলো এভাবে—একবার হজরত মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ হলো, হে আমার প্রিয় রসুল! তোমার উম্মতকে এই মর্মে নির্দেশ দাও, যেনো তারা তাদের উত্তরীয়ের চার কোণায় বেঁধে রাখে চারটি নীল রঙের সুতা। ওই নীল সুতা দেখলেই তাদের মনে পড়বে নীল আকাশের কথা, আকাশাধিপতির কথা। মনে পড়বে, আমাদের প্রতি প্রদত্ত প্রত্যাদেশসমূহ আকাশাগত। আর প্রত্যাদেশপ্রদাতা হচ্ছেন আল্লাহ্ মেহেরবান। হজরত মুসা নিবেদন জানালেন, হে আমার মহাকরুণাপরবশ প্রভুপালক’! আমাদের সম্পূর্ণ উত্তরীয় যদি নীল রঙের হয়, তাতে করে কি তোমার এই নির্দেশখানি প্রতিপালিত হবে না? বনী ইসরাইলেরা যে নীল সুতা পছন্দ করে না। আল্লাহ্ বললেন, বাহ্যত ক্ষুদ্র মনে হলেও আমার কোনো নির্দেশই তুচ্ছ নয়। তুমি তোমার লোকজনকে বলে দাও, তারা আমার ক্ষুদ্র নির্দেশ প্রতিপালনে যদি অনীহ হয়, তবে আমার বৃহৎ নির্দেশ প্রতিপালনে সক্ষম হবে কীরূপে? হজরত মুসা বনী ইসরাইল জনতাকে সমবেত করলেন, জানিয়ে দিলেন আল্লাহ্‌র আদেশ। এ আদেশ মেনেও নিলো সবাই।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু কারূন মানল না। অবাধ্যতার সুরে সে বললো, মুসা আমাদেরকে ক্রীতদাস বানাতে চায়। এ নির্দেশ কার্যকর করে সে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তার প্রভূসুলভ প্রতিপত্তি। এভাবেই তো অন্যের দাস থেকে নিজের দাসকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করে নেয় ক্রীতদাসাধিকারীরা। কারূনের স্বেচ্ছাচারণ, আতম্ভরিতা ও অবাধ্যতার সূত্রপাত হয় এভাবেই।

এরপর তিনি একদিন বনী ইসরাইলদেরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন সমুদ্রতীরে। সকলে মিলে সেখানে কোরবানী করাই ছিলো উদ্দেশ্য। কোরবানীর পশু রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুচারুরূপে কোরবানী সম্পন্ন করবার দায়িত্ব ন্যস্ত হলো হজরত হারুনের উপর। তিনি অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন সুশৃঙ্খলরূপে। প্রতিটি পশুর কোরবানী শেষে আকাশ থেকে নেমে আসতে লাগলো শাদা আগুন। অত্যল্প সময়ের মধ্যে জবাই করা কোরবানীর পশু পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ে সে আগুন উঠে যেতে লাগলো আকাশে। হজরত হারুনের এমতো সুশৃঙ্খল দায়িত্ব পালন দৃষ্টে কারূনের শুরু হলো গাত্রদাহ। হিংসায় জ্বলতে লাগলো সে। হজরত মুসার কাছে গিয়ে বললো, তুমি না হয় রেসালাতের দায়িত্ব পেয়ে আত্মপ্রসাদে মজে আছো। কিন্তু তুমি হারুনকে কোরবানী বিভাগের অধিনায়কত্ব দিতে গেলে কেনো? ওই দায়িত্ব তো আমিও পেতে পারি। পারি না? তুমি তো জানোই আমি তওরাত বোদ্ধা। হজরত মুসা বললেন, তুমি ভুল বুঝেছো। আমি নই, এ দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করেছেন আল্লাহ্ স্বয়ং। কারূন বললো, বিনা প্রমাণে তোমার এ কথা আমি মানি কী করে? হজরত মুসা জনতাকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা প্রত্যেকে একটি করে লাঠি নিয়ে আমার কাছে এসো। একটু পরে সবাই একটি করে লাঠি নিয়ে হাজির হলো। তিনি বললেন, সামনের ওই তাঁবুর পাশে সবাই নিজ নিজ লাঠি পুঁতে দাও। সবাই নির্দেশ পালন করলো। পরদিন সকালে দেখা গেলো, হজরত হারুন যে লাঠিটি পুঁতে ছিলেন, সেটি পরিণত হয়েছে একটি সবুজ কিশলয়বিশিষ্ট বৃক্ষে। কারূন বললো, ওহে মুসা! এটা কী কোনো প্রমাণ হলো? তুমি তো এর চেয়ে অনেক বিস্ময়কর অলৌকিকত্ব ইতোমধ্যে প্রকাশ করেছো। এই ঘটনার পর থেকেই কারূন হজরত মুসাকে এড়িয়ে চলতে লাগলো। হজরত মুসা তবুও তার সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন। কিন্তু সে তাঁর সঙ্গে করতো দুর্বিনীত ব্যবহার। ক্রমে ক্রমে ধন সম্পদ বৃদ্ধি পেতে লাগলো কারূনের । সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো তার উন্নাসিকতা ও অহমিকা। এক সময় সে ছিন্ন করলো হজরত মুসার সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক। নির্মাণ করলো একটি বিশাল ও সুদৃশ্য প্রাসাদ। প্রাসাদের প্রধান তোরণ ছিলো স্বর্ণমণ্ডিত। আর তার প্রাচীর প্রাকারগুলো ছিলো সুবর্ণ রঙের। বনী ইসরাইলের নেতৃবর্গের অনেকেই সকাল সন্ধ্যায় যাতায়াত করতে লাগলো তার প্রাসাদে। ওই প্রাসাদাভ্যন্তরে তারা মেতে

www.eelm.weebly.com

থাকতো ক্রীড়া-কৌতুক ও রঙ্গ-রসে। কারূন তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে আপ্যায়ন করতো। এভাবেই কেটে যাচ্ছিলো তাদের হরষিত দিবস এবং আনন্দোন্মত্ত রজনী।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসা প্রত্যাদিষ্ট হলেন, জাকাত আদায় করো। তিনি এ নির্দেশ জানিয়ে দিলেন সকলকে। বললেন, সঞ্চিত সম্পদের জাকাত দিতে হবে এভাবে— প্রতি হাজার দিরহামে এক দিরহাম, প্রতি হাজার ছাগলে একটি ছাগল, অন্যান্য সম্পদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে একই নিয়ম, অর্থাৎ হাজার ভাগের এক ভাগ। কারূন হিসেব কষে দেখলো, এভাবে জাকাত দিলে তার অনেক সম্পদ বেরিয়ে যাবে। কিন্তু কী করবে সে ভেবে পেলো না। শেষে শুরু করলো ষড়যন্ত্র। বনী ইসরাইলদের নেতাদেরকে ডেকে বললো, দ্যাখো, মুসা এবার জাকাতের নাম করে তোমাদের ধন-সম্পদ হাতিয়ে নিতে চায়। এর একটি বিহিত করা যে জরুরী। নেতারা বললো, আপনি তো শ্রেষ্ঠ সম্পদপতি। আপনিই বলুন, কী করতে পারি আমরা। কারূন বললো, অমুক বারবণিতা তো রূপসী ও খ্যাতিবতী। তাকেই ডেকে আনো। সে বলবে, মুসা তার সঙ্গে গোপন সম্পর্ক রাখে। এর জন্য আমি অবশ্য তাকে মোটা দাগে অর্থ প্রদান করবো। এভাবে মুসাকে অপবাদগ্রস্ত করতে পারলে মানুষ তাকে পরিত্যাগ করবে। আমাদের উদ্দেশ্যও হবে সফল। রূপসী বারবণিতাটিকে ডেকে আনা হলো। কারূন তাকে বুঝিয়ে দিলো কী করতে হবে। তারপর বললো, এ কাজ করতে পারলে তোমাকে দান করবো এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা। কেউ কেউ বলেছেন, কারূন তাকে উপহার দিয়েছিলো একটি বৃহৎ স্বর্ণখণ্ড। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কারূন তাকে বলেছিলো, এ কাজ করে দিতে পারলে তোমাকে আমি করে দিবো বিত্তশালিনী। আমার সহধর্মিনীরূপেও গ্রহণ করবো তোমাকে। এরপর কারূন পরদিন প্রাতে বনীইসরাইল জনতাকে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে সমবেত হতে বললো। জানিয়ে দিলো, কাল সকালের সমাবেশে আমাদের নবী মুসা তোমাদেরকে হিতোপদেশ দান করবেন। হজরত মুসাকে বললো, তোমার হিতোপদেশ শুনবার জন্য কাল সকালে আমরা সমবেত হবো। যথাসময়ে তোমার সদয় উপস্থিতি আমাদের কাম্য। আর বারবণিতাকে বললো, তুমি ওই সমাবেশে প্রকাশ করে দিয়ো, মুসা তোমার গোপন প্রণয়ী।

পরদিন সকাল বেলা অপেক্ষমান জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে হজরত মুসা ভাষণ দিলেন, শোনো হে জনতা! অন্যায়াচরণ থেকে বিরত থেকো। যে চুরি করবে আমি তার হস্তচ্ছেদন করবো। যে কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিবে, তাকে করবো বেত্রাঘাত। অবিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারীর শাস্তিও বেত্রাঘাত। আর বিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর শাস্তি সঙ্গেসার। তাদেরকে গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে

www.eelm.weebly.com

প্রস্তরবর্ষণের মাধ্যমে হত্যা করা হবে। কারূন এবার মুখ খুললো। বললো, হে মুসা! এ বিধান কি সকলের জন্য? হজরত মুসা বললেন, অবশ্যই। কারূন বললো, তুমি যদি কোনো অপরাধ করো? হজরত মুসা বললেন, তাহলে দণ্ডাদেশ কার্যকর হবে আমার উপরেও। কারূন বললো, তবে লোকে যে বলে, তুমি অমুক রূপোপজীবিনীর গোপন প্রণয়ী। হজরত মুসা বললেন, সে একথা সর্বসমক্ষে বলতে পারবে? কারূন বললো, নিশ্চয়। একথা বলেই সে ঐ রূপোপজীবিনীকে সামনে এগিয়ে আসতে বললো। হজরত মুসা মনে মনে আল্লাহ্‌র একান্ত সাহায্য কামনা করলেন। মনে মনে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! তুমি তোমার যে রসুলের অনুসারীদের পরিত্রাণের নিমিত্তে সমুদ্রের উত্তাল জলরাশির মধ্যে করে দিয়েছিলে শুষ্কপথ, যে রসুলকে তুমি তওরাত দান করে করেছো মর্যাদায়িত, তোমার সেই প্রিয় রসুল আজ অপবাদগ্রস্ত। তুমি প্রকৃত সত্য সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিয়ে তাকে অপবাদমুক্ত করো। প্রকাশ্যে বললেন, ঠিক আছে, ওই মেয়েটি যা বলবে, আমি তা-ই মেনে নিবো। অপরাধী যদি প্রমাণিত হই, তবে শাস্তিও নিবো মাথা পেতে। মেয়েটি শ্রোতাদের সম্মুখীন হলো। মুহূর্তমধ্যে বদলে গেলো তার মনোভাব। ভাবলো, আল্লাহ্‌র রসুলকে অপবাদ দেওয়ার মতো মহাপাপ আমি করি কী করে? তার চেয়ে তওবাই যে আমার জন্য সহজ। প্রকাশ্যে বললো, হে জনতা! কারূন যা আপনাদেরকে বলেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি ভ্রষ্টা হতে পারি, কিন্তু আল্লাহ্‌র রসুলকে অপবাদ দিবার মতো পাপ কিছুতেই করতে পারি না। প্রকৃত কথা শোনো, কারূন আমাকে সম্পদের লোভ দেখিয়ে আমাদের প্রিয় রসুলের চরিত্র হননের ব্যাপারে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। আমাদের রসুল নিষ্পাপ। আর আমি পাপীয়সী। আর ততোধিক পাপিষ্ঠ কারূন।

হজরত মুসা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সঙ্গে সঙ্গে সেজদাবনত হলেন। সেজদারত অবস্থাতেই প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি তো তোমার বার্তাবাহক! তোমার বার্তাবাহকের সম্মান রক্ষার্থে কারূনের উপরে আপতিত করো মহাশাস্তি। প্রত্যাদেশ হলো, হে আমার প্রিয় রসুল। মৃত্তিকাকে করা হলো তোমার নির্দেশানুগত। এখন তুমি তাকে যে হুকুম করবে, সে তা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করবে।

হজরত মুসা জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, আমাকে যেমন প্রেরণ করা হয়েছিলো ফেরাউনের নিকটে, তেমনি প্রেরণ করা হয়েছে কারূনের নিকটেও। কিন্তু সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং তোমরাও তাকে প্রত্যাখ্যান করো। চলে এসো আমার সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে সকলে পক্ষ অবলম্বন করলো হজরত মুসার। কারূনের পক্ষে রয়ে গেলো কেবল তার অন্তরঙ্গ দু'জন সঙ্গী। হজরত মুসা আদেশ করলেন, হে মৃত্তিকা! কারূনকে গ্রাস করো। সঙ্গে সঙ্গে মাটি গ্রাস করলো তার দুই

www.eelm.weebly.com

পা। তার সঙ্গীদ্বয়ের পা-ও দেবে গেলো মাটিতে। হজরত মুসা পুনঃ নির্দেশ দিলেন, গ্রাস করো। মাটি এবার গ্রাস করলো তাদের কটিদেশ পর্যন্ত। হজরত মুসা পুনরায় বললেন, গ্রাস করো। এবার তাদের কণ্ঠদেশ পর্যন্ত প্রোথিত হলো মৃত্তিকায়। অপরাধীত্রয় অনেক কাকুতি মিনতি করলো। আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে কামনা করলো পরিত্রাণ। কিন্তু রোষতপ্ত নবী তখন নির্মম। তাই কারূনের সত্তরবার ক্ষমাপ্রার্থনাও তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো না। তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলেন না তিনি। পুনঃনির্দেশ দিলেন, আরো গ্রাস করো। এবার মৃত্তিকাভ্যন্তরে চিরদিনের জন্য আড়াল হয়ে গেলো অপরাধীরা।

ক্রমে ক্রমে অপসৃত হলো রসুল মুসার রোষ। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, হে আমার রসুল! এমন নির্মম কেনো তুমি। সত্তরবার তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করলো তোমার কাছে। কিন্তু তুমি সে দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করলে না। আমার মর্যাদা ও মহত্বের কসম! আমি তো একবারের ক্ষমাপ্রার্থনাকেই গ্রহণ করতাম। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্তায়ালা তখন বলেছিলেন, ভবিষ্যতে আমি আর কখনো মৃত্তিকাকে কারো অধীন করে দিবো না। হজরত কাতাদা বলেছেন, এখনো কারূনকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে চলেছে মৃত্তিকা। মহাপ্রলয় পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে তার অতল যাত্রা।

কারূন ও তার সঙ্গীদ্বয়ের এভাবে তলিয়ে যাওয়ার পর কেউ কেউ বলতে শুরু করলো, কারূনের প্রাসাদ, ধনভাণ্ডার সবকিছুই তো রয়ে গেলো। এগুলো আবার আত্মসাৎ করা হবে না তো। হজরত মুসার কানে গেলো এসব কথা। তিনি তৎক্ষণাৎ মাটিকে হুকুম করলেন, এই মুহূর্তে গ্রাস করো কারূনের প্রাসাদ, ধনভাণ্ডার ও তার সকল স্মৃতিচিহ্ন। আল্লাহ্র রসুলের নির্দেশের অন্যথা হলো না। মাটি এবার গ্রাস করে ফেললো কারূনের প্রাসাদ, ধনভাণ্ডার, সবকিছু। সে কথাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভস্থ করলাম'। অর্থাৎ আমি আমার রসুলের নির্দেশের মাধ্যমে মাটির মধ্যে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিলাম কারূনকে ও তার প্রাসাদ-ধনভাণ্ডার সবকিছুকে।

এরপরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'পূর্ব দিন যারা তার মতো হবার কামনা করেছিলো, তারা বলতে লাগলো, দ্যাখো, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন'। এখানে 'মা কানাহু' অর্থ গতকাল পর্যন্ত যারা কারূনের মতো সম্পদপতি হবার আকাংঙ্খা করেছিলো। অথবা এরকম যারা কামনা করেছিলো কিয়ৎকাল পূর্বেই। আর 'ওয়াইকাআন্না' 'ওয়াই' ও 'কাআন্না' সহযোগে গঠিত একটি যৌগিক শব্দ। এর অর্থ 'দ্যাখো'। এটি একটি বিস্ময়প্রকাশক পদ। আর 'কাআন্না' হচ্ছে এর উপমান।

www.eelm.weebly.com

‘আল্লাহু ইয়াব্সুত্বর রিয্ক্বা’ অর্থ আল্লাহই সকলের জীবনোপকরণের প্রসারক ও সংকোচক। রিজিকের প্রসরণ ও সংকোচন দু’টোই তাঁর অভিপ্রায়, অধিকার ও ক্ষমতাভূত। এর মধ্যে অন্য কারো অথবা কোনোকিছুর অংশগ্রহণের অবকাশ মাত্রই নেই। তার একথাটিও প্রণিধাননীয় যে, জীবনোপকরণের প্রাচুর্য তাঁর নিকটে সম্মানার্হ কিছু নয়। আবার জীবনোপকরণের স্বল্পতাও তাঁর নিকটে নয় নিন্দার্হ। খলিল বলেছেন, এখানে ‘ওয়াই’ শব্দটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বিস্ময় ও হীনতা প্রকাশার্থে। অর্থাৎ ক্ষণকাল পূর্বে কারূনের মতো সম্পদপতি হওয়ার কামনা করতো যারা, তারাই আবার আত্মধিক্কারের সুরে বলতে লাগলো, দ্যাখো, দ্যাখো (আমরা যা কামনা করতাম তা কতো ধিকৃত)। কুতরব বলেছেন, এখানকার ‘ওয়াইকা’ পদটির মূল রূপ ছিলো ‘ওয়াইলাকা’। পরে এর ‘লাম’ অক্ষরটি হয়েছে অবলুপ্ত। অবশ্য দু’টো শব্দই সমঅর্থসম্পন্ন।

‘আন্নাল্লাহা’ কথাটি সুনিশ্চিতার্থক। এখানকার ‘আন্না’ একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্মপদ। এভাবে ব্যাখ্যা করলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আরো, জেনে রাখো, আল্লাহ্ই যাকে চান তার জন্য জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ‘ওয়াই কা আন্না’ একটি সম্পূর্ণ বাক্য। বাক্যটি ব্যবহৃত হয় সতর্ক করণার্থে। হাসান বলেছেন, ‘ওয়াইকা’ কথাটি এখানে প্রারম্ভিকা। মুজাহিদ এর অর্থ করেছেন— তুমি কি জানো না? হজরত কাতাদা অর্থ করেছেন— তুমি কি দ্যাখোনি? ফাররা বলেছেন, কথাটি দৃঢ়তা প্রকাশক। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ‘তুমি কি আল্লাহ্র সদাশয়তা ও অনুগ্রহ লক্ষ্য করোনি? অর্থাৎ অবশ্যই তো তুমি এরূপ করেছো। ফাররা আরো বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, এক বেদুইন রমণী তার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললো, ছেলেটি কোথায়? তার স্বামী জবাব দিলো, ‘ওয়াইকা আন্নাহু ওয়ারাআল বাইত’ (তুমি কি দ্যাখোনি, সে তো রয়েছে গৃহের পশ্চাতেই)।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যদি আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন, তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভস্থ করতেন। দ্যাখো, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সফলকাম হয় না’। একথার অর্থ— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। তিনি আমাদের প্রতি সদয় না হলে আমরাও হয়ে যেতাম কারূনের মতো ভূপ্রোথিত। দ্যাখো, একথা প্রমাণিত সত্য যে, আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল এবং পরকালে বিশ্বাসী যারা নয়, তারাই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা দুনিয়া-আখেরাত কোনো স্থানেই সফলকাম হয় না। উল্লেখ্য, এখানে কেবল উপমা ব্যতীত পূর্বের বাক্যের ‘ওয়াইকাআন্নাহু’ কথাটির সকল ব্যাখ্যা সমভাবে গ্রাহ্য।

www.eelm.weebly.com

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي
الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾ مَنْ جَآءَ
بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى
الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾ اِنَّ الَّذِيْ
فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ؕ قُلْ رَّبِّيْۤ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ
بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْۤا اَنْ
يُّلْقٰۤى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا
لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ
اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَلَا
تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۟ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا
وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٨﴾

r ইহা পরলোক— যাহা আমি নির্ধারিত করি তাহাদিগেরই জন্য যাহারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হইতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহে না। শুভ পরিণাম সাবধানীদিগের জন্য।

r যে কেহ সৎকর্ম করে সে তাহার কর্ম অপেক্ষা অধিক ফল পাইবে আর যে মন্দকর্ম করে সে তো শাস্তি পাইবে কেবল তাহার কর্মের অনুপাতে।

r যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করিয়াছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরাইয়া আনিবেন স্বদেশে। বল, 'আমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে সৎপথের নির্দেশ আনিয়াছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।'

r তুমি আশা কর নাই যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইবে। ইহা তো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনও সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদিগের সহায় হইও না।

www.eelm.weebly.com

r তোমার প্রতি আল্লাহের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর উহা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলি হইতে বিমুখ না করে। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর এবং কিছুতেই অংশীবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

r তুমি আল্লাহের সহিত অন্য ইলাহ্কে ডাকিও না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। আল্লাহের সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁহারই এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পারলৌকিক সাফল্য আমি নির্ধারণ করে রেখেছি তাদের জন্য, যারা পৃথিবীতে উদ্ধত আচরণ করে না এবং সৃষ্টি করতে চায় না কোনো বিপর্যয়ের। আর পারত্রিক শুভ পরিণাম কেবল সংযমী ও সাবধানীগণের জন্য।

এখানে 'তিলকাদ্দারুল আখিরাত' অর্থ— এই সেই পারলৌকিক নিরুপদ্রব আবাস, যার কথা তোমরা শুনেছো তার প্রেরিত পুরুষগণের জবানীতে। 'উলুওওয়ান ফীল আরদ্ব' অর্থ যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত আচরণ করে না। মুকাতিল ও কালাবী কথাটির অর্থ করেছেন— যারা পৃথিবীতে প্রদর্শন করে না হঠকারিতা ও আত্মম্ভরিতা। আতা অর্থ করেছেন— যারা জনগণের উপরে চালায় না নিপীড়ন ও নির্যাতন। মানুষের প্রতি যারা প্রদর্শন করে না তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভাব। হাসান অর্থ করেছেন— যারা যাচ্না করে না প্রশাসক ও সমাজপতিদের অনুকম্পা। হজরত আলী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য ওই সকল প্রশাসক, যারা রাষ্ট্রের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হওয়া সত্ত্বেও প্রদর্শন করে বিনয়। অর্থাৎ এরকম বিনয়-নম্র নেতৃবর্গই বিরত থাকে উদ্ধত আচরণ প্রদর্শন থেকে।

'ওয়াল ফাসাদা' অর্থ বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। কালাবী বলেছেন, 'ফাসাদ' অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো অথবা অন্য কোনো কিছুর উপাসনার প্রতি আহ্বান জানানো। ইকরামা বলেছেন, অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ হস্তগত করার নাম ফাসাদ। ইবনে জুরাইজ ও মুকাতিল বলেছেন, 'ফাসাদ' অর্থ পাপ।

'আলআক্বিবাতু' অর্থ শুভপরিণাম। হজরত কাতাদা বলেছেন, শব্দটির অর্থ— জান্নাত। আমি বলি, পুণ্যকর্মের পরিণামের নাম 'আক্বিবাত'। আর পাপকর্মের প্রতিফলকে বলে 'ইক্বাব'।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'যে কেউ সৎকর্ম করে সে তার কর্ম অপেক্ষা অধিক ফল পাবে, আর যে মন্দকর্ম করে সে তো শাস্তি পাবে কেবল তার কর্মের অনুপাতে'। এখানে, 'সে তার কর্ম অপেক্ষা অধিক ফল পাবে, অর্থ সে পুণ্য লাভ করবে তার সৎকর্মের দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাকে এরও বেশী পুণ্য প্রদান করতে পারেন।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে 'হাসানা' (সৎকর্ম) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে একবার। আর 'সাইয়্যেআহ্' (মন্দকর্ম) উল্লেখিত হয়েছে দু'বার, যদিও শব্দটি একবার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হতো। এরকম করার কারণ এই যে, মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকার বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া মন্দ কর্মের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই শব্দটি এখানে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হয়ে থাকতে পারে।

এরপরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'যিনি তোমার জন্য কোরআনকে করেছেন বিধান, তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন স্বদেশে'।

এখানে 'ফারাদ্বা আ'লাইকাল কুরআন' অর্থ যিনি আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছেন কোরআন। অধিকাংশ তাফসীরবেত্তার অভিমত এরকমই। এরকম মন্তব্য করেছেন বাগবী। আর আতা বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হবে— যিনি আপনার উপরে অনিবার্য করেছেন কোরআনের আবৃত্তি, প্রচার ও এর বিধানানুসারে আমল।

'ইলা মাআ'দিন' অর্থ স্বদেশ, মক্কাধাম। এখানকার 'তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন' কথাটির মধ্যে রয়েছে মক্কাবিজয়ের অঙ্গীকার। বলা বাহুল্য, যথাসময়ে মক্কাবিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে দিয়েছিলেন মক্কার সর্বময় কর্তৃত্ব। হজরত ইবনে আব্বাস এরকমই মন্তব্য করেছেন। আউফি এবং মুজাহিদও এরকম বলেছেন। আর কুতাইবি বলেছেন, স্ব স্ব আবাসে সকলেই ফিরে ফিরে আসে। কিন্তু এখানে প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের। তাই তাঁর সম্মানে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে 'তানভীন'। বলা হয়েছে 'মাআ'দিন'।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. রাতের অন্ধকারে অতি সঙ্গোপনে যাত্রা করলেন মদীনা অভিমুখে। পেছনে হননমত্ত শত্রুর দল। তাই তাঁকে গ্রহণ করতে হলো অপ্রচলিত পথ। কয়েক দিন পর শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনাশংকা যখন দূর হলো তখন তিনি উপস্থিত হলেন প্রচলিত পথে। ওই স্থানের নাম ছিলো জুহফা। সেখান থেকে দু'টি পথ মিশে গিয়েছে দুই দিগন্তে। একটি মক্কার দিকে। আর একটি মদীনার দিকে। রসুল স. মক্কার পথের দিকে দৃষ্টিপাত করে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন। জন্মভূমির বিচ্ছেদে মুচড়ে উঠলো তার হৃদয়। হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে বললেন, ভ্রাতঃ মোহাম্মদ! আপনি কি জন্মভূমির জন্য আবেগাহত? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। হজরত জিবরাইল বললেন, আল্লাহ্‌পাক বলেছেন 'যিনি আপনার জন্য কোরআনকে করেছেন বিধান তিনি আপনাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন স্বদেশে'।

সাঈদ ইবনে যোবয়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মাআ'দ' অর্থ মৃত্যু। আমি বলি, মৃত্যু অর্থ প্রকৃত অবস্থার দিকে ফিরে যাওয়া। সে

www.eelm.weebly.com

কারণে 'মাআ'দ'ই মৃত্যু। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— তোমরা তো ছিলে মৃত, তারপর তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন। অতঃপর তিনি পুনর্বার ফিরিয়ে দিবেন মৃত্যুর দিকে'।

জুহুরী ও ইকরামা বলেছেন, 'মাআ'দ' অর্থ মহাবিচারের দিবস। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ জান্নাত। কেননা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে 'শুভ পরিণাম সাবধানীদের জন্য'। তারপর বলা হয়েছে সৎকর্মের অধিক প্রতিদান এবং মন্দকর্মের সমানুপাতিক প্রতিফল প্রদানের কথা। তারপর এখানে বলা হলো রসুল স. এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কথা, যে চিরস্থায়ী স্বদেশে তাঁর জন্য অপেক্ষমান অফুরন্ত সম্মান, অপরিমেয় ভালোবাসা ও জান্নাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, আমার প্রতিপালক ভালো জানেন কে সৎপথের নির্দেশ এনেছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে'। আলোচ্য বাক্য অবতীর্ণ হয়েছে মক্কার অংশীবাদীদের অপমন্তব্যের যথাউত্তর প্রদানার্থে। তারা বলেছিলো, মোহাম্মদ! তুমি তো জলজ্যান্ত বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছো। তাদের ওই জঘন্য উক্তির প্রতিবাদে আল্লাহ্‌তায়ালা জানালেন— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, আমার প্রভুপ্রতিপালক ভালো জানেন কে সৎপথের নির্দেশ এনেছে, এবং কে বিভ্রান্তিতে আছে। অবশেষে কে হবে পুরস্কৃত এবং তিরস্কৃতই বা হবে কে? এখানে পুরস্কৃত ও তিরস্কৃত যে কে এবং কারা, তা বলাই বাহুল্য।

এরপরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'তুমি আশা করোনি যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এতো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ'। ফাররা বলেছেন, এখানকার 'ইললা'ব্যতিক্রমী অব্যয়টি বিকর্তিত এবং এর অর্থ হবে এখানে 'লাকিন্‌না' (কিন্তু)। এমতাবস্থায় উদ্ধৃত বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— আপনার উপরে কিতাব অবতীর্ণ হবে, এমতো আশা তো আপনি করেননি, কিন্তু আপনার প্রভুপালকই কৃপা করে আপনাকে দিয়েছেন আল কোরআন। আবার ব্যতিক্রমী অব্যয়টি এখানে বিযুক্তও হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আপনার প্রভুপালনকর্তা কোনোকিছুকে উপলক্ষ্য করে আপনাকে কোরআন দান করেননি, দান করেছেন নিতান্ত করুণাপরবশ হয়ে।

মুকাতিল বলেছেন, একবার অংশীবাদীরা রসুল স.কে তাঁর পিতৃপুরুষগণের ধর্মে ফিরে যাবার আহ্বান জানালো। তাদের ওই গর্হিত আহ্বানের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌পাক অবতীর্ণ করলেন পরবর্তী আয়াতদ্বয়।

বললেন, 'তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা যেনো তোমাকে কিছুতেই সেগুলি থেকে বিমুখ না করে। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করো, এবং কিছুতেই অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না (৮৭)। তুমি

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য ইলাহ্‌কে ডেকো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্‌ নেই। আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে (৮৮)।

এখানে 'আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য ইলাহ্‌কে ডেকো না' অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদের অপঅভিলাষ চিরতরে নস্যাত করে দিন। 'আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য সবাই ও সকলকিছু সম্ভাব্য জগতের বলয়ভূত। আর সম্ভাব্য জগত সত্তাগতভাবে অস্তিত্বায়িত নয়। বরং তা অনস্তিত্বনির্ভর। এ জগতকে আল্লাহ্‌পাকই দয়া করে অস্তিত্বায়িত করেছেন। নিতান্ত অনুকম্পাপরবশ হয়ে অনস্তিত্বের অন্ধকারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অস্তিত্বের আলো। কেউ কেউ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্‌র পরিতোষ সাধন যে কর্মের উদ্দেশ্য হবে না, সে কর্ম হবে অবশ্যই ধ্বংসাত্বক, নিষ্ফল। এভাবে কথাটি হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্য 'তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই' এর উপলক্ষ। 'বিধান তাঁরই, অর্থ সমগ্র বিশ্বজগতে কেবল তাঁরই বিধান প্রচলনযোগ্য ও কার্যকর। কেননা তিনিই একমাত্র ও একচ্ছত্র বিধানদাতা। আর 'তার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' অর্থ তোমাদের অবশেষ গমন তাঁরই সকাশে। আর তিনিই তোমাদের জন্য তখন নির্ধারণ করবেন চিরস্বস্তি অথবা চিরশাস্তি।

সূরা আন্‌কাবুত

৭ রুকু এবং ৬৯ আয়াত সম্বলিত সুরা আন্‌কাবুত অবতীর্ণ হয় মক্কায়। কিন্তু প্রথম থেকে ১১ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয় মদীনায়। শা'বীর মতে মদীনায় অবতীর্ণ হয় প্রথম দশ আয়াত। এ সুরার অবতরণ শুরু হয় সুরা রূমের পরে।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, শা'বী বলেছেন, রসুল স. মদীনায় হিজরত করলেন। তারপর মক্কায় অবস্থানরত মুসলমানদের কাছে এই মর্মে সংবাদ পাঠালেন যে, যতক্ষণ তোমরা হিজরত করে মদীনায় চলে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ইসলাম গ্রহণ স্বীকৃত হবে না। এ সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মক্কার মুসলমানেরা মদীনাভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। বিধর্মীরা সৃষ্টি করলো বাধা। তারা মদীনাভিমুখী বিশ্বাসীগণকে জোর করে ধরে নিয়ে এলো মক্কায়। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াতসমূহ।

www.eelm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓ ﴿١﴾ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا
يُفْتَنُوْنَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣﴾ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ
السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٤﴾ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا
لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٥﴾ وَمَنْ
جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧﴾

q আলিফ্, লাম্, মীম্;

q মানুষ কি মনে করে যে, উহারা 'আমরা বিশ্বাস করি' এই কথা বলে বলিয়াই উহাদিগকে পরীক্ষা না করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হইবে?

q আল্লাহ্ তো ইহাদিগের পূর্ববর্তীদিগকেও পরীক্ষা করিয়াছিলেন; আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা সত্যবাদী ও কাহারা মিথ্যাবাদী।

q যাহারা মন্দকর্ম করে তাহারা মনে করে যে, তাহারা আমার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে? তাহাদিগের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

q যে আল্লাহের সহিত সাক্ষাৎকার কামনা করে সে জানিয়া রাখুক আল্লাহের নির্ধারিত কাল আসিবেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

q যে কেহ সংগ্রাম করে সে তো নিজের জন্যই সংগ্রাম করে; আল্লাহ্ বিশ্ব-জগতের উপর নির্ভরশীল নহেন।

q এবং যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগের মন্দকর্মগুলি মিটাইয়া দিব এবং তাহাদিগের কর্মের উত্তম ফল দান করিব।

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— আলিফ লাম মীম। দৃশ্যতঃ অবিন্যস্ত এই অক্ষরবিন্যাসের মর্ম রহস্যাচ্ছন্ন। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই এগুলোর মর্ম উত্তমরূপে অবগত। আর অবগত অল্প কিছুসংখ্যক সৌভাগ্যবান, যারা জ্ঞানে সুগভীর (ওলামায়ে রসিখীন)।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'মানুষ কি মনে করে যে, তারা 'আমরা বিশ্বাস করি' এই কথা উচ্চারণ করে বলে তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে?' মদীনাবাসী সাহাবীগণ এই আয়াত লিখে পাঠিয়ে দিলেন মক্কাবাসী সাহাবীগণের নিকটে। তাঁরা সচকিত হলেন। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, এবার আমাদেরকে অবশ্যই হিজরত করতে হবে। মুশরিকেরা বাধা দিলে আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। এই সিদ্ধান্তের পর সকলে একযোগে যাত্রা করলেন মদীনার দিকে। মুশরিকেরা তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়ালো। শুরু হলো সংঘর্ষ। কেউ কেউ শহীদ হলেন। অবশিষ্ট মদীনাযাত্রীকে ফিরে আসতে বাধ্য করা হলো মক্কায়। তাঁদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হলো— এরপর সুনিশ্চিত আপনার পালনকর্তা তাদের সাথে যারা পরীক্ষিত হওয়ার পর হিজরত করেছিলো .....।

কাতাদা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কাবাসী কিছুসংখ্যক মুসলমানকে উপলক্ষ করে, যাঁরা রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার মানসে যাত্রা করেছিলেন মদীনাভিমুখে। যাত্রার শুরুতেই বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন তাঁরা । কেউ কেউ হয়েছিলেন শহীদ। অন্যরা বাধ্য হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন মক্কায়। তাঁদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো নতুন আয়াত। সে আয়াত মদীনা থেকে লিখে পাঠানো হলো মক্কায়। ফলে পুনরায় তাঁরা যাত্রা করলেন মদীনার দিকে। মুশরিকেরা তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। শুরু হলো যুদ্ধ। মদীনাযাত্রীদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করলেন। অবশিষ্টরা কোনোক্রমে পৌঁছতে সমর্থ হলেন মদীনায়। তাঁদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো— 'যারা আমার নিকট পৌঁছতে চেষ্টা করে, আমি তাদেরকে প্রদর্শন করি সুপথ'।

হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'মানুষ' অর্থ রসুল স. এর হিজরতের পরে মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানগণ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হজরত সালমা ইবনে হিশাম, হজরত আইয়াম ইবনে রবীয়া, হজরত ওলীদ ইবনে ওলীদ, হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার প্রমুখ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইর সূত্রে ইবনে সাঈদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার সম্পর্কে। আল্লাহ্র পথে তাঁকে অপরিসীম দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিলো। ইবনে জুরাইজ সূত্রে বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। মুকাতিল

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত মাহজা ইবনে আবদুল্লাহ্‌কে লক্ষ্য করে। উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে তিনিই ওই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যাকে জান্নাতের দ্বারদেশে আহ্বান করা হবে সর্বপ্রথমে।

আমি বলি, হজরত মাহজা'ই বদর যুদ্ধ চলাকালে শত্রুব্যূহ ভেদ করবার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন। আমর ইবনে হাজরামীর শরাঘাতে তাঁকে পান করতে হয়েছিলো শাহদতের সুধা। 'সাবীলুর রাশাদ' গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, যখন তাঁর মাতাপিতা তাঁর বিয়োগ ব্যথায় বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, তখনই অবতীর্ণ হয়েছিলো এই আয়াত।

আলোচ্য আয়াত শুরু হয়েছে এভাবে— আ হাসিবান্‌নাস। এখানকার আদ্যাক্ষর 'আলিফ' (আ) প্রশ্নবোধক। সুতরাং বুঝতে হবে ১ সংখ্যক আয়াত (আলিফ লাম মীম) একটি পৃথক বাক্য। পরবর্তী আয়াত (২) এর সঙ্গে এর বক্তব্যগত যোগসূত্র নেই। যদি যোগসূত্র থাকতো, তবে প্রশ্নবোধক 'আলিফ' উল্লেখিত হতো সর্বপ্রথম, আলিফ লাম মীম এর পূর্বে।

'হাসিবা' পদটির ধাতুমূল 'হুসবান'। এর অর্থ ধারণা করা। সুতরাং এর পূর্বের প্রশ্নবোধক আলিফ (আ) হয় অস্বীকৃতিজ্ঞাপক, না হয় হুমকিপ্রদায়ক। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— মানুষ ভেবেছে কী? 'আমি ইমান এনেছি' একথা বললেই কি পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া এমনি এমনি তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে? না, কখনোই তা নয়। তাকে তো অতিক্রম করতে হবে নানাবিধ দুর্বিপাক, বিপদ-মুসিবত। করতে হবে হিজরত, সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে শত্রুর সঙ্গে। বুক পেতে দিতে হবে জীবন, সম্পদ ও পরিবার পরিজনের উপর আপতিত অনেক সংকট। এভাবে সহিষ্ণুতার মাপকাঠিতে যাচাই করা হবে কে বিশুদ্ধ বিশ্বাসী, কে দোদুল্যচিত্ত। কে মুমিন, কে মুনাফিক। এ ভাবে ধৈর্যশীলেরাই অবশেষে হবে সফল।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহপাকের সর্বপ্রথম হুকুম ছিলো, ইমান আনো। তারপর একে একে দেওয়া হলো নামাজ, জাকাত ও অন্যান্য কর্তব্যকর্মের বিধান। কিছু সংখ্যক লোকের জন্য এগুলো হয়ে উঠলো অসহনীয়। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। এমতো প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানুষ কি মনে করে শরিয়তের বিধান কার্যকর না করা সত্ত্বেও ইমানের ঘোষণাদানকারীকে প্রকৃত ইমানদার বলে গণ্য করা হবে? যদিও একথা অনস্বীকার্য যে, কেবল 'ইমান' চিরস্থায়ী নরকবাস থেকে নিষ্কৃতিপ্রদায়ক এবং অবশেষে জান্নাত অর্জক, তবুও বুঝতে হবে মর্যাদা অর্জন ও সরাসরি জান্নাতগমন নির্ভর করে কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ও শরিয়ত প্রতিপালনের উপরে।

www.eelm.weebly.com

এর পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তো এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলেন। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তো পূর্ববর্তী যুগের নবী-রসুল এবং তাঁদের বিশ্বস্ত অনুচরবর্গকেও বিভিন্ন বিপদ-আপদের মাধ্যমে ইমানের পরীক্ষা নিয়েছেন। নবীগণের কাউকে কাউকে করা হয়েছে দিখণ্ডিত। আর কারো কারো করা হয়েছে জীবনসংহার। তাঁদের উম্মতগণকেও সহ্য করতে হয়েছে অনেক নিগ্রহ। যেমন বনী ইসরাইলদেরকে সহ্য করতে হয়েছে ফেরাউনপক্ষীয়দের অনেক অত্যাচার। এমতো পরীক্ষা চিরাচরিত। সুতরাং এখন এর ব্যত্যয় ঘটতে পারে না কিছুতেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী'। একথার অর্থ— এভাবে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাক সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিবেন, কারা প্রকৃত বিশ্বাসবান এবং কারা তা নয়।

আল্লাহ্‌পাক সর্বজ্ঞ, আদি-অন্তের সকল জ্ঞান সম্পূর্ণতই তাঁর অধিকারায়ত্ত। সুতরাং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তার জ্ঞানার্জনের ধারণাটি অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং বুঝতে হবে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার জন্যই পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পৃথক করে ফেলা হবে সত্য ও মিথ্যাকে। কারণ এর উপরেই নির্ধারণ করা হবে পুরস্কার ও তিরস্কার। কেউ কেউ আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন, কে ইমানের দাবীতে সত্যবাদী এবং কে নয়। তাঁর ওই সংগুপ্ত জ্ঞানেরই তিনি এ জগতে প্রকাশ ঘটাবেন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে। মুকাতিল এখানকার 'ইলম' শব্দটির অর্থ করেছেন— পর্যবেক্ষণ। অর্থাৎ আল্লাহ্ পর্যবেক্ষণ করবেন, কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'জানবেন' বা 'প্রকাশ করবেন' অর্থ পৃথক করে দিবেন বিশুদ্ধাচারী ও অবিশুদ্ধাচারীকে।

এর পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'যারা মন্দকর্ম করে, তারা মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। তাদের সিদ্ধান্ত কতো মন্দ'। একথার অর্থ— অবাধ্যরা মনে করে, তারা আমার জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে পারবে। কিন্তু তাকি কখনো সম্ভব? এরকম অসম্ভব ধারণাকে তারা লালন করে কী ভাবে? এখানে 'মন্দকর্ম' অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যান, অবাধ্যাচরণ। উল্লেখ্য, শারীরিক বাধ্যতা-অবাধ্যতা যেমন 'কর্ম' পদবাচ্য, তেমনি হৃদয়ের বাধ্যতা-অবাধ্যতাবোধও। এখানে 'তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে' অর্থ তারা আমাকে অতিক্রম করবে, অথচ আমি তার প্রতিকার করতে পারবোনা (এরকম তো অসম্ভব)।

www.eelm.weebly.com

এখানকার ‘আম’ হচ্ছে বিয়োজক অব্যয়। এখানে এই বিয়োজক অব্যয়টির মাধ্যমে পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়বস্তুকে ও আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তুকে পৃথক করে ফেলা হয়েছে, যেহেতু বক্তব্য দু'টো বিপরীতধর্মী। পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে বিশ্বাসীদের পরীক্ষা করার কথা। আর আলোচ্য আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপধারণার স্বরূপ। কেউ কেউ বলেছেন, পূর্বোল্লিখিত আয়াতের ধারণকারী বিশ্বাসী, আর আলোচ্য আয়াতের ধারণকারীরা অবিশ্বাসী।

আমি বলি, ‘আম’ অব্যয়টি সংযোজক অব্যয় হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে একযোগে উভয় ধারণাকে নস্যাত করাই এখানে উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় উভয় আয়াতের সম্মিলিত মর্মার্থ দাঁড়াবে— ওহে বিশ্বাসীরা, তোমরা একথা মনে কোরো না যে, পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যতিরেকেই তোমাদেরকে ইমানদার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে তোমাদের শত্রু অবিশ্বাসীরাও যেনো এ ধারণাকে লালন না করে যে, তারা আমার শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে।

এর পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— ‘যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎকার কামনা করে, সে জেনে রাখুক আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কাল আসবেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার ‘ইয়ারজু’ শব্দটির ধাতুমূল ‘রিজ্বা’। এর অর্থ আশা-আকাংখা। কিন্তু এখানে শব্দটির অর্থ হবে— ভীতি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যে ব্যক্তি মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্‌র সকাশে উপনীত হওয়ার ভয়ে ভীত, সে জেনে রাখুক, ওই নির্ধারিত সময় আগমন করবেই। তিনি তাঁর বান্দাগণের সকল কথাবার্তা শোনেন এবং জানেন তাদের বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে। কারণ তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ‘রিজ্বা’ অর্থ কামনা করা, লালায়িত হওয়া। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুণ্যকামী, পুণ্যের জন্য লালায়িত।

আমি বলি, এখানে ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দর্শনের জন্য লালায়িত’— এরকম অর্থও হওয়া সম্ভব। এই অর্থটি গ্রহণ করা হলে প্রমাণিত হবে যে, ইহজগতে আল্লাহ-দর্শন সম্ভব নয়। রসুল স. অবশ্য তাঁর পৃথিবীর জীবনেই আল্লাহ্ দর্শন করেছিলেন। কিন্তু ওই দর্শনের স্থান পৃথিবী ছিলো না। ছিলো আখেরাত। মেরাজ রজনীতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো আখেরাতে। আর সেখানেই সংঘটিত হয়েছিলো আল্লাহ্‌র দীদার। একারণেই আমরা বলতে পারি, এ পৃথিবীতে যারা আল্লাহ্‌দর্শনের দাবিদার, তারা মিথ্যুক।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'আজ্বালাল্লহি' অর্থ আল্লাহ্র সঙ্গে মিলিত হওয়ার নির্ধারিত কাল। মুকাতিল বলেছেন, ওইসময় নির্ধারিত রয়েছে আখেরাতে। অর্থাৎ মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবসের জনসমাবেশ অবধারিত। ওই সময়ই আল্লাহ্র সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময়। সুতরাং পৃথিবীর জীবনে ওই সময়ের শুভপরিণামের জন্য যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ অত্যাবশ্যক। অন্য এক আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে । যেমন— 'যে ব্যক্তি তার প্রভুপালনকর্তার সন্দর্শনাকাংখী, সে যেনো পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে এবং তার প্রভুপালনকর্তার ইবাদতে কাউকে না করে অংশীদার'।

এর পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'যে কেউ সংগ্রাম করে, সে তো নিজের জন্যই সংগ্রাম করে; আল্লাহ্ বিশ্বজগতের উপর নির্ভরশীল নন'। একথার অর্থ— যে ব্যক্তি সমরপ্রান্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, অথবা সংগ্রাম করবে কুপ্রবৃত্তির কামনা বাসনা এবং শয়তানের অশুভপ্ররোচনার বিরুদ্ধে, সে-ই হবে লাভবান। তার ইবাদত-বন্দেগী ও পুণ্যকর্মের প্রতিফল ভোগ করবে সে নিজেই। আল্লাহ্ এতে করে লাভবান হবে, এমতো ধারণা করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ তিনি সকলকিছু থেকে চিরঅমুখাপেক্ষী। বান্দাগণের উপকারের জন্যই তিনি নিতান্ত অনুকম্পাপরবশ হয়ে তাদেরকে দিয়েছেন ইবাদত করার নির্দেশ ও সুযোগ।

এরপরের আয়াতে(৭) বলা হয়েছে— 'এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি নিশ্চয়ই তাদের মন্দকর্মগুলি মিটিয়ে দিবো'। একথার অর্থ— আর যারা সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল ও পরকালে বিশ্বাস করে, তার সঙ্গে সম্পাদন করে পুণ্যকর্ম, আমি তাদের ওই পুণ্যকর্মসমূহের আলো দ্বারা অপসারিত করে দিবো তাদের পাপরাশির অন্ধকারকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তাদের মধ্যবর্তী সময়ের, জুমআর নামাজ জুমা মধ্যবর্তী সপ্তাহের এবং রমজানের রোজা রমজান মধ্যবর্তী বছরের পাপরাশি বিলোপ করে দেয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের কর্মের উত্তম ফল দান করবো'। সর্বোৎকৃষ্ট কাজ হচ্ছে আনুগত্য। সুতরাং এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি তাদের আনুগত্যের প্রতিফল বিনষ্ট করবো না। কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ— আমি তাদেরকে দান করবো তাদের কর্মাপেক্ষা অধিক— দশগুণ থেকে সাতশ'গুণ। অথবা ততোধিক, যেমন আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'আহসান' শব্দটির অর্থ হাসান (উত্তম)।

www.eelm.weebly.com

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾

r আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়াছি তাহার মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে; তবে উহারা যদি তোমাকে আমার সহিত এমন কিছু শরীক করিতে বাধ্য করে যাহার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নাই তুমি তাহাদিগকে মানিও না। আমারই নিকট তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব তোমরা কী করিতেছিলে।

r যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত করিব।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে'।

'অসিয়ত' অর্থ উপদেশবাণী। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ওয়াস্‌সইনা'। এর অর্থ— নির্দেশ দিয়েছি। বিধান দিয়েছি। 'হুসনা' অর্থ এখানে সদ্ব্যবহার, এমন কর্ম যার মধ্যে রয়েছে মঙ্গল। এর শব্দমূল 'হাসান'। 'হুসুন' হচ্ছে 'হাসান' এর আধিক্যসূচক পদ। 'হুসনা' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সেই অর্থেই। সুতরাং এর অর্থ— বাধ্যানুগত হওয়া, অনুকম্পাপরবশ হওয়া, একান্ত বাধ্য হওয়া ইত্যাদি।

মুসলিম, তিরমিজি, বাগবী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, বনী জাহরা গোত্রের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব মালেকের পুত্র হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ছিলেন বেহেশতের শুভসংবাদপ্রাপ্ত দশজন স্বনামধন্য সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত। ছিলেন পূর্বসূরী অগ্রগামী (সবিক্বীন)গণের দলভূত। অপরিসীম মাতৃভক্তি ছিলো তাঁর। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর মাতা হাসনা বিনতে আবু সুফিয়ান অত্যন্ত অতুষ্ট হলেন। বললেন, সা'দ! শুনলাম, তুমি কী সব নতুন কথা বলছো। তুমি যদি এসব কথা পরিত্যাগ না করো, তবে আমি শপথ করে বলছি, আমি আর পানাহার করবো না, যদিও আমার মৃত্যু হয়। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁর মা তখন বললেন, নতুন ধর্ম থেকে যতক্ষণ না তুমি প্রত্যাবর্তন

www.eelm.weebly.com

করবে, ততক্ষণ আমি আহার স্পর্শ করবো না। এ অবস্থায় আমি মরে গেলে লোকে তোমাকে মাতৃহন্তারক বলে লজ্জা দিতে থাকবে। তাঁর কথার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে তারা যদি তোমাকে আমার সঙ্গে এমন কিছু শরীক করতে বাধ্য করে, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদেরকে মেনো না' একথার অর্থ— কিন্তু তোমার মাতাপিতা যদি তোমাকে আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্যকে শরীক করে নিতে বলে, যার সম্পর্কে তোমার বিশ্বাস বা জ্ঞান নেই, তাহলে এমতাবস্থায় তাদের আনুগত্য করা হবে তোমার জন্য অসমীচীন। অর্থাৎ মাতাপিতার শরিয়তসম্মত আনুগত্য অত্যাবশ্যক, কিন্তু বিশ্বাস ও শরিয়তবিরোধী আনুগত্য পরিত্যাজ্য।

রসুল স. বলেছেন, স্রষ্টার আনুগত্যের মধ্যে সৃষ্টির আনুগত্যের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ। এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত ইমরান থেকে ইমাম আহমদ ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি শুদ্ধসূত্রসম্বলিত। হজরত আলী থেকে বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সৃষ্টির আনুগত্যের মধ্যে আল্লাহ্র আনুগত্যের সংমিশ্রণ সিদ্ধ নয়। আর মাতাপিতার আনুগত্য করতে হবে পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত সা'দের জননী তিন দিন অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। হজরত সা'দ তাঁকে বললেন, মা! আপনি যদি একশ'টি প্রাণের অধিকারিণী হন এবং এভাবে একে একে প্রতিটি প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তবুও আমি আমার ধর্ম পরিত্যাগ করবো না। এখন আপনি ভেবে দেখুন, আহার গ্রহণ করবেন, না পরিত্যাগ করবেন? একথা শোনার পর তাঁর জননী হতাশ হয়ে যান। নিরুপায় হয়ে শুরু করেন পানাহার।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি জানিয়ে দিবো তোমরা কী করছিলে'? একথার অর্থ— তোমরা যা কিছুই করো না কেনো, নিশ্চিত জেনো আমার কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতেই হবে। তখন আমি তোমাদেরকে প্রদান করবো যথাপ্রতিফল— স্বস্তি অথবা শাস্তি।

পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করবো'। এখানে 'আস্সলিহীন' অর্থ সৎকর্মপরায়ণ, সজ্জন— নবী, ওলী ও শহীদগণ। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— যারা ইমানদার ও সৎকর্মপ্রবণ, আমি তাদেরকে মহাবিচারের দিবসে জান্নাতে মিলিয়ে দিবো নবী, ওলী ও শহীদগণের সঙ্গে।

www.eelm.weebly.com

সৎকর্ম ও পুণ্যের পূর্ণত্ব হচ্ছে বিশ্বাসীগণের মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তর। নবী-রসুলগণও ওই স্তরাভিলাষী। কারণ ওই পূর্ণ স্তর সকল প্রকার বিভ্রান্তি ও অপকৃষ্টতা থেকে মুক্ত। আবিলতা ও অপরিচ্ছন্নতা বলে সেখানে কোনোকিছুই নেই— না বিশ্বাসে, না কর্মে। না স্বভাবে, না জীবন যাপনে।

ইকরামা সূত্রে ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কার কিছু মুসলমান তাঁদের ইমানকে গোপন রেখেছিলেন। বদর যুদ্ধের সময় মুশরিকেরা তাদেরকে বাধ্য করলো রসুল স. ও তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। যুদ্ধকালে তাঁদের মধ্যে নিহতও হলেন কেউ কেউ। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ইমান গোপনকারী কিছুসংখ্যক লোক বদরে আমাদের প্রতিপক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিহতও হয়েছে। আপনি তাদের মার্জনার জন্য দোয়া করুন। তখন অবতীর্ণ হলো সুরা নিসার আয়াত। 'নিশ্চয় যাদেরকে ফেরেশতামণ্ডলী মৃত্যু দান করেছে, তারা পীড়ন করেছিলো স্বীয় সত্তার উপর'। সাহাবীগণ মদীনা থেকে এই আয়াত উদ্ধৃত করে একটি পত্র প্রেরণ করলেন মক্কার মুসলমানদের নিকটে। তিনি লিখলেন, এখন আর তোমাদের অজুহাত প্রদর্শনের কোনো অবকাশ নেই। হিজরত অত্যাবশ্যক। সুতরাং পত্রপাঠ মাত্র তোমরা মদীনায় চলে এসো। পত্র পাঠ করে তাঁরা আর বিলম্ব করলেন না। যাত্রা করলেন মদীনা অভিমুখে। মুশরিকেরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। বাধ্য করলো তাদেরকে মক্কায় ফিরে যেতে। তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ১০, ১১

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ۭ وَلَىِٕنْ جَاۗءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۭ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٠

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ۝١١

r মানুষের মধ্যে কতক বলে, 'আমরা আল্লাহে বিশ্বাস করি', কিন্তু আল্লাহের পথে যখন উহারা কষ্ট পায় তখন উহারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহের শাস্তির মত গণ্য করে এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে কোন সাহায্য আসিলে উহারা বলিতে থাকে 'আমরা তো তোমাদিগের সংগেই ছিলাম'। মানুষের অন্তঃকরণে যাহা আছে আল্লাহ্ কি তাহা সম্যক অবগত নহেন?

www.eelm.weebly.com

r আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা বিশ্বাসী এবং কাহারা মুনাফিক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মানুষের মধ্যে কতক বলে, আমরা আল্লাহয় বিশ্বাস করি, কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে যখন তারা কষ্ট পায়, তখন তারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহ্‌র শাস্তির মতো গণ্য করে'। উল্লেখ্য, এখানে বর্ণনা করা হয়েছে কপটবিশ্বাসী বা মুনাফিকদের অবস্থা ।

এখানে 'ফীল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র পথে। 'কাআজাবিল্লাহ' অর্থ আল্লাহর শাস্তির মতো। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— প্রকৃত বিশ্বাসীরা যেমন আল্লাহর শাস্তির ভয়ে পরিত্যাগ করে অবিশ্বাস ও অবাধ্যাচরণ, তেমনি কিছুসংখ্যক অপ্রকৃত বিশ্বাসী মুশরিকদের শাস্তির ভয়ে পরিত্যাগ করে ইসলাম। তাদের শাস্তিকে তারা গণ্য করে আল্লাহ্‌র শাস্তির মতো। আল্লাহর পথে তারা এতটুকুও দুঃখ ক্লেশ বরণ করতে সম্মত নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন কিছুসংখ্যক মুসলমান মক্কায় বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছিলেন মুশরিকদের নজরবন্দী অবস্থায়। তাঁরা যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানতে পারলেন, তখন মরিয়া হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, এবার মদীনাযাত্রা আমরা করবোই। বাধা পেলে লড়বো। মরি বাঁচি যা হয় হবে। তখন অবতীর্ণ হলো— 'অবশ্যই আপনার প্রভুপালনকর্তা, যারা বিপদগ্রস্ত হওয়ার পর হিজরত করেছে......'। মদীনাবাসী মুসলমানগণ এই আয়াত লিখে জানিয়েছিলেন মক্কাবাসী মুসলমানদের নিকটে। তখন তাঁরা একযোগে নেমে পড়লেন মদীনার পথে। মুশরিকেরা বাধা দিলো। শুরু হলো সশস্ত্র সংঘর্ষ। কেউ কেউ শহীদ হলেন। অবশিষ্টরা কোনোক্রমে পৌঁছতে সমর্থ হলেন মদীনায়। আর কিছুসংখ্যক মুসলমান বন্দী হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন মক্কায়। হজরত কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল মুসলমানকে লক্ষ্য করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে কোনো সাহায্য এলে তারা বলতে থাকে, আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম। মানুষের অন্তঃকরণে যা আছে, আল্লাহ্ কি তা সম্যক অবগত নন'।

এখানে 'নাসরুন' অর্থ সাহায্য। মর্মার্থ— বিজয় ও গনিমত। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে 'কোনো সাহায্য এলে' কথাটি বলা হয়েছে কপটাচারীদেরকে লক্ষ্য করে। তারা বাহ্যত মুসলমান হলেও প্রকৃত অর্থে অমুসলমান। সেকারণেই শেষে বলা হয়েছে 'মানুষের অন্তঃকরণে যা আছে আল্লাহ্ কি তা সম্যক অবগত নন'? এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার

www.eelm.weebly.com

রসুল! আপনার প্রভুপালনকর্তার পক্ষ থেকে যখন আপনাকে দেওয়া হয় বিজয় ও গনিমত তখন কপটাচারীরা বলে, আমরা তো তোমাদেরই সঙ্গী। কিন্তু তাদের এমতো উক্তি অসত্য। তারা কি ভেবেছে, আল্লাহ্ মানুষের মনের খবর রাখেন না?

এখানে 'আওয়ালাইসা' বলে শেষে যে প্রশ্নটি রাখা হয়েছে, সেই প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। কথাটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য হচ্ছে— এমন তো নয় যে, আল্লাহ্ তাদের মনের খবর রাখেন না। তিনি যে অন্তর্যামী। মানুষের অন্তরের বিশুদ্ধতা অবিশুদ্ধতা সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত। সুতরাং কপটাচারীরা যেনো এমন না মনে করে যে, শাস্তি থেকে তারা অব্যাহতি পাবে।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা বিশ্বাসী এবং কারা মুনাফিক'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ অবশ্যই অন্তরের বিশ্বাসানুসারে প্রতিফল দিবেন। বিশ্বাসীগণকে করবেন পুরস্কৃত এবং তিরস্কৃত করবেন কপটাচারীদেরকে।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ১২, ১৩

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ؗ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣﴾

r সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বিশ্বাসীদিগকে বলে, 'আমাদিগের পথ ধর, আমরা তোমাদিগের পাপভার বহন করিব!' কিন্তু উহারা তো তোমাদিগের পাপভারের কিছুই বহন করিবে না। উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

r উহারা নিজদিগের পাপভার বহন করিবে এবং তাহার সহিত আরও কিছু পাপের বোঝা; এবং উহারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই উহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, আমাদের পথ ধরো। আমরা তোমাদের পাপভার বহন করবো'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, হে মুসলমানেরা! ইসলাম পরিত্যাগ করো। অনুসারী হও আমাদের মতবাদের। এতে যদি তোমাদের পাপ হয়, তবে সে পাপ বহন করবো আমরা। মুজাহিদ বলেছেন, এরকম কথা বলেছিলো, মক্কার পৌত্তলিকেরা।

www.eelm.weebly.com

কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, আবু সুফিয়ান মুসলমানদের মনে অবিশ্বাসের বীজ বপন করার মানসে বলেছিলো, তোমরা আমাদের রীতিনীতি ও আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মাদর্শের উপরে চলো।

ফাররা বলেছেন, এখানকার 'ওয়াল নাহমাল' কথাটির অর্থ আমাদের উচিত হবে বহন করা। শাব্দিক দিক থেকে কথাটি অনুজ্ঞাসূচক। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে একটি শর্তের ফলাফল। অর্থাৎ তোমরা যদি আমাদের পথে চলো, তবে আমাদের কর্তব্য হবে তোমাদের অপরাধের দায়ভার বহন করা। এরূপ অনুজ্ঞাসূচক ও শর্ত-ফলাফলজ্ঞাপক আয়াত উল্লেখিত হয়েছে অন্যত্রও। যেমন— 'ফাল্ ইয়ুলক্বিহীল ইয়াম্‌মু বিস্‌সহিল' (বীচিবিক্ষুব্ধ জলধির উচিত একে নিক্ষেপ করে তটভূমিতে)। অর্থাৎ তরঙ্গমুখর সাগর তার মরদেহ নিক্ষেপ করুক বেলাভূমিতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা তো তোমাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী'। একথার অর্থ— কিন্তু যারা এখন তোমাদের পাপের বোঝা বহন করার ঘোষণা দিচ্ছে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তারা নিজেদের পাপভার বহন করবে এবং তার সঙ্গে আরো কিছু পাপের বোঝা'। একথার অর্থ— তারা নিজেদের পাপাভারই বহন করবে, তার সঙ্গে বহন করবে অন্যকে বিভ্রান্ত করার পাপ। কিন্তু এতে করে তাদের কথা শুনে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের পাপের বোঝাও কমবে না এতটুকুও।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সে সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে'। একথার অর্থ— মানুষকে পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে তারা যে মিথ্যা রটনা করেছিলো, মহাবিচারের দিবসে সে সম্পর্কে তারা জিজ্ঞাসিত হবেই।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ১৪, ১৫

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا
خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٤﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ
وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٥﴾

r আমি তো নূহকে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে উহাদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল সাড়ে নয়শত বৎসর। অতঃপর প্লাবন উহাদিগকে গ্রাস করে; কারণ উহারা ছিল সীমালংঘনকারী।

www.eelm.weebly.com

r অতঃপর আমি তাহাকে এবং যাহারা তরণীতে আরোহণ করিয়াছিল তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম এবং বিশ্বজগতের জন্য ইহাকে করিলাম একটি নিদর্শন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! নূহ নবীর ইতিবৃত্ত স্মরণ করুন। আমি তাঁকে প্রেরণ করেছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের পথপ্রদর্শনার্থে। তাঁকে আমি দিয়েছিলাম সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বৎসরের আয়ুষ্কাল। ওই দীর্ঘ সময় ধরে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের সংশোধনের মানসে ভোগ করেছিলেন অনেক দুঃখ যাতনা। কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া অধিকাংশই রয়ে গিয়েছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানে অনড়। অবশেষে আমি তাদের উপরে আপতিত করেছিলাম মহাপ্লাবনের শাস্তি। ওই মহাবন্যায় চিরতরে সলিল সমাধি ঘটেছিলো তাদের। কেননা তারা ছিলো নিশ্চিত সীমালংঘনকারী।

এখানে 'ফালাবিছা' অর্থ অবস্থান করেছিলেন। কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, নবুয়তের দায়িত্ব লাভের পর হজরত নুহ তাঁর স্বজাতির মধ্যে বসবাস করেছিলেন সাড়ে নয় শত বৎসর।

'তুফান' অর্থ ঝন্ঝাবায়ু। সীমাতিরিক্ত ঘূর্ণায়মান বায়ু অথবা পানিকে বলে তুফান। অর্থাৎ ঘূর্ণীবায়ু বা ঘূর্ণীস্রোত। তুফান বলে বিশাল বন্যাকেও। আবার ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীকেও বলে তুফান। এখানে তুফান অর্থ মহাপ্লাবন বা বিশাল বান। ওই বিশাল বান গ্রাস করেছিলো হজরত নুহের অবাধ্য সম্প্রদায়কে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত নুহ নবুয়তের গুরু দায়িত্ব লাভ করেছিলেন তাঁর চল্লিশ বছর বয়ঃক্রমকালে। তারপর থেকে সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর ধরে নিয়োজিত ছিলেন তাঁর স্বজাতির হেদায়েত চিন্তায় ও প্রচেষ্টায়। মহাপ্লাবনে অবাধ্যরা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি প্লাবনোত্তর পৃথিবীতে বসবাস করেছিলেন আরো ষাট বছর। ক্রমে ক্রমে জনবিস্তার ঘটলো। নতুন প্রজন্ম ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো নতুন নতুন জনপদে। হজরত উপনীত হলেন এক হাজার পঞ্চাশ বছরে। শুনতে পেলেন পরম প্রভুপালকের ডাক। তারপর এক শুভক্ষণে পাড়ি দিলেন মহাপ্রস্থানের পথে। হজরত ইবনে আব্বাসের এই বিবৃতিটি উপস্থাপন করেছেন ইবনে আবী শায়বা, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়েখ ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। ইবনে মারদুবিয়া এবং বাগবীও বর্ণনাটির উপস্থাপক।

ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, হজরত নুহের বয়স যখন এক হাজার চারশত, তখন মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে বয়োপ্রবীণ মান্যবর নবী! এ পৃথিবীর জীবন সম্পর্কে আপনার অনুভূতি কী? তিনি জবাব দিলেন, যেমন এক লোক একটি গৃহ নির্মাণ করলো। তার দরজা নির্মাণ করলো দু'টি। তারপর এক দরোজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করে বেরিয়ে গেলো অপর দরোজা দিয়ে।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতে পৃথিবীতে হজরত নুহের হাজার বছর অবস্থানের কথা আছে। সরাসরি নয়শত পঞ্চাশ বছরের কথা এখানে বলা হয়নি। উল্লেখ্য, হাজার হচ্ছে একটি বিরাট অংকের একক। একক অথচ আধিক্যের অর্থবহ। এভাবে হাজারের উল্লেখের মাধ্যমে এখানে জানিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, সুদীর্ঘ সময় ধরে তিনি তাঁর বিরূপ ও বিভ্রান্ত স্বজাতির অনেক দুঃখক্লেশ সহ্য করে জীবন যাপন করেছেন। স্থাপন করেছেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। অথচ ওই সুদীর্ঘ সময় পরিসর ছিলো মহাকালের বিশাল পরিসরে একটি এককের মতো সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ততর।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাকে এবং যারা তরণীতে আরোহণ করেছিলো তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশ্বজগতের জন্য একে করলাম একটি নিদর্শন'। একথার অর্থ— সুদীর্ঘকালের মধ্যেও যখন ওই দুর্বিনীতের চৈতন্যোদয় হলো না, তাদের সীমালংঘনপ্রবণতা যখন অতিক্রম করল সকল সহনীয় সীমা, তখন আমি আমার প্রিয় নবী নুহের অপপ্রার্থনাকে গ্রহণ করলাম। তাঁকে জানালাম, অবাধ্যদেরকে বিনাশ করা হবে মহাপ্লাবনের মাধ্যমে। সুতরাং আত্মরক্ষার্থে তৈরী করো তরণী। যথাসময়ে শুরু হলো ভয়াবহ প্লাবন। আমার নির্দেশে নুহ ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরবর্গ আরোহণ করলো তরণীতে। মহাবন্যায় ডুবে গেলো চরাচর। সীমালংঘনকারী সে বন্যায় ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো চিরতরে। রক্ষা পেলো আমার নবী ও তাঁর তরণীর বিশ্বাসী অনুচরেরা। আর একটি ঘটনার স্মৃতি আমি জাগ্রত রাখলাম মহামানবতার একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে। যেনো তারা বুঝতে পারে আল্লাহ্‌র পরাক্রান্তির প্রকাশ কতো ভয়াবহ ও অমোঘ।

এখানে 'যারা তরণীতে আরোহণ করেছিলো' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত নুহের পুত্রগণ ও তাঁর অন্যান্য বিশ্বাসী সহচরবর্গকে। হজরত নুহের সঙ্গে তাঁরাই ছিলেন তাঁর নৌকার সৌভাগ্যবান আরোহী। তাদের সংখ্যা ছিলো মোটমাট আশিজন। কেউ কেউ বলেছেন আটাত্তর জন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, দশজন। তাঁদের পুরুষ ও রমণীর সংখ্যা ছিলো সমান সমান। উল্লেখ্য মহাপ্লাবনের এই স্বনামধন্য নবীর ইতিবৃত্ত সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে সুরা হুদ ও সুরা আ'রাফে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ১৬, ১৭

وَ اِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦﴾ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ

www.eelm.weebly.com

اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّ تَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ
وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾

r স্মরণ কর, ইব্‌রাহীমের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর এবং তাঁহাকে ভয় কর; তোমাদিগের জন্য ইহাই শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে!

r 'তোমরা তো আল্লাহ্ ব্যতীত কেবল প্রতিমার পূজা করিতেছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করিতেছ। তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে পূজা কর তাহারা তোমাদিগকে জীবনোপকরণ দানে অক্ষম। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহের নিকট এবং তাঁহারই ইবাদত কর ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো ইব্রাহিমের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাঁকে ভয় করো; তোমাদের জন্য এটাই শ্রেয়'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এবার স্মরণ করুন নবী এবং আপনার সম্মানিত পিতৃপুরুষ ইব্রাহিমের কথা, তিনি যখন লাভ করলেন পরিণত বোধ ও প্রজ্ঞা, লাভ করলেন সত্যের পরিচিতি, ওই সময় আমি তাঁকে অর্পণ করলাম নবুয়তের গুরু দায়িত্ব, আর ওই দায়িত্ব সম্পাদনার্থে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, শোনো হে জনতা! তোমরা পৌত্তলিকতা ছেড়ে গ্রহণ করো এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের পথ এবং সমীহ করো কেবল আল্লাহ্‌কেই, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।

শেষে বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা জানতে'। একথার অর্থ— যদি তোমরা বুঝতে ভালো ও মন্দ। পার্থক্য করতে পারতে সত্য ও অসত্যকে। অথবা মর্মার্থ হবে— যদি তোমরা হতে দূরদর্শী। তোমাদের চিন্তা ও দৃষ্টি মুক্ত হতো একদেশদর্শিতা ও কুপমণ্ডুকতা থেকে। কিংবা উদ্দেশ্য হবে— যদি তোমরা হতে ওই সকল শুভবোধসম্পন্ন ব্যক্তির মতো, যারা প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম, তাহলে সহজেই বুঝতে পারতে তোমাদের অংশীবাদিতাচ্ছন্ন বোধ ও বুদ্ধি অপেক্ষা আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আল্লাহ্‌ভীতি অনেক উত্তম।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'তোমরা তো আল্লাহ্ ব্যতীত কেবল প্রতিমার পূজা করছো এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছো'। একথার অর্থ— হে অবিমৃশ্য

www.eelm.weebly.com

জনতা! তোমরা মহাবিশ্বের মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রতিপালয়িতাকে ত্যাগ করে এমন নিঃসাড় প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হয়েছো, যারা উপকার অথবা ক্ষতি কোনো কিছুই করতে সক্ষম নয়। কতো নির্বোধ তোমরা। তোমরা আবার ধারণা করো ওই অপ্রাণ বিগ্রহগুলোই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে করবে সুপারিশ। বলো, এভাবে তোমরা মিথ্যার উদ্ভাবক হলে কেনো?

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের পূজা করো, তারা তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দানে অক্ষম'। একথার অর্থ— বৃথাই তোমরা দিনের পর দিন বিগ্রহবন্দনা করে চলেছো। ওই বিগ্রহগুলো তো তোমাদেরকে ন্যূনতম জীবনোপকরণ দান করতেও অক্ষম।

মানুষের কর্ম হয় দু'ধরনের— নিন্দনীয় ও অনিন্দনীয়। অনিন্দনীয় কর্মসম্পন্ন মানুষের জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করা হয় বলেই তাকে বলে হাসান। আর যারা নিন্দনীয় কর্মের সম্পাদক, তাদের কর্ম কবীহ্। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদতকে নিন্দনীয় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর 'রিজিক' (জীবনোপকরণ) শব্দটি ধাতুমূল। এর অর্থ জীবনোপকরণ প্রদান। এরকমও হতে পারে যে, শব্দটি এখানে ধাতুমূল হওয়া সত্ত্বেও ধাত্যর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে কর্মপদার্থে। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে শব্দটি এখানে 'যা দেওয়া হয়েছে' অর্থাৎ 'প্রদত্ত' অর্থে ব্যবহৃত। আবার 'রিজিক' এখানে তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়েছে 'তান্‌ভীন' ছাড়াই। অর্থাৎ ওই বিগ্রহগুলো এতটুকু জীবনোপকরণদানের অধিকারী নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা করো আল্লাহ্‌র নিকটে এবং তাঁরই ইবাদত করো ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে'। একথার অর্থ— সুতরাং যিনি একমাত্র জীবিকাপ্রদাতা, সেই মহাপ্রতিপালয়িতার নিকটেই তোমরা প্রার্থি হও উপজীবিকার এবং তাঁরই প্রতি প্রকাশ করো যথাকৃতজ্ঞতা। এভাবে পরিচ্ছন্ন প্রার্থনা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রস্তুতি গ্রহণ করো তাঁর সন্দর্শনের। কারণ তোমাদের সকলের অবশেষে প্রত্যাবর্তন তাঁর দিকেই।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

وَاِنۡ تُكَذِّبُوۡا فَقَدۡ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنۡ قَبۡلِكُمۡ ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوۡلِ

اِلَّا الۡبَلٰغُ الۡمُبِيۡنُ ﴿۱۸﴾ اَوَلَمۡ يَرَوۡا كَيۡفَ يُبۡدِئُ اللّٰهُ الۡخَلۡقَ

ثُمَّ يُعِيۡدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيۡرٌ ﴿۱۹﴾ قُلۡ سِيۡرُوۡا فِى

www.eelm.weebly.com

الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ
الْاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۚ﴿۲۰﴾ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَ
يَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ اِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ﴿۲۱﴾ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي
الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۫ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا
نَصِيْرٍ ﴿۲۲﴾

r 'তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল তবে জানিয়া রাখ, তোমাদিগের পূর্ববর্তীগণও নবীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। সত্যকে স্পষ্টভাবে প্রচার করিয়া দেওয়াই রসূলের কাজ।

r উহারা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর উহা পুনরায় সৃষ্টি করিবেন? ইহা তো আল্লাহের জন্য সহজ।

r বল, 'পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন?' অতঃপর আল্লাহ্ পুনর্বার সৃষ্টি করিবেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

r তিনি যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাহার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

r তোমরা আল্লাহ্কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না স্থলে অথবা অন্তরীক্ষে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদিগের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বলো, তবে জেনে রাখো, তোমাদের পূর্ববর্তীগণও নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো। সত্যকে স্পষ্টভাবে প্রচার করে দেওয়াই রসুলের কাজ'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি অবিশ্বাসীদেরকে বলুন, এই যে তোমরা এখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলেছো, এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। আমার পূর্বে আল্লাহ্র যে সকল বার্তাবাহক পৃথিবীতে এসেছিলেন, তাঁদেরকে তাদের স্বজাতিরাও এভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। এ হচ্ছে সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণদের চিরাচরিত রীতি। আর আল্লাহ্র বার্তাবাহকগণের চিরাচরিত দায়িত্ব হচ্ছে মহাসত্যকে স্পষ্ট করে প্রচার করা। পথপ্রদর্শন করা সত্যের প্রতি। সত্যপথে কাউকে অধিষ্ঠিত করে দেওয়া তাঁদের সাধ্যের বাইরে।

www.eelm.weebly.com

এই আয়াত থেকে ২৪ সংখ্যক আয়াতের সংলাপ হতে পারে হজরত ইব্রাহিমের অথবা এখানে প্রসঙ্গান্তর ঘটিয়ে সংলাপগুলো সম্পৃক্ত করা হয়েছে রসুল স. এর সঙ্গে। অর্থাৎ এই উক্তিগুলো মক্কার কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করে বলতে বলা হয়েছে রসুল স.কে। যাই হোক না কেনো, আয়াতগুলো অবতরণ করার উদ্দেশ্য যে রসুল স.কে সান্ত্বনা প্রদান করা, তা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ তাঁকে একথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপআচরণে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। তাদের চিরাচরিত স্বভাব এরকমই। স্মরণ করুন আপনার মান্যবর পিতৃপুরুষ নবী ইব্রাহিমের কথা। তিনিও তো এরকম বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও সতত নিয়োজিত ছিলেন সত্যধর্ম প্রচারে। তার মতো আপনিও যেহেতু আমার বার্তাবাহক, সেহেতু আপনিও প্রচারের দায়িত্বে থাকুন অবিচল।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তারা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। সোজাসুজি এর অর্থ দাঁড়ায়— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো লক্ষ্য করে আল্লাহ্তায়ালা এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করার পরেও অহরহ সৃষ্টি করে চলেছেন নতুন নতুন মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদ। একথাই তো প্রমাণ করে যে এগুলো ধ্বংস হওয়ার পরেও পুনরায় তিনি এগুলোকে সৃষ্টি করতে সক্ষম। কেননা প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি অধিকতর সহজ। এখানে 'ছুমমা ইয়ুয়ী'দুহু' অর্থ পুনর্বার অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনর্বার জীবন প্রদান। আবার বক্তব্যটি এরকমও হতে পারে যে— তারা তো অবশ্যই এটা লক্ষ্য করে যে, এক মওসুমের ফল ও ফসল উৎপাদন শেষ হওয়ার পরেও পরের মওসুমে আল্লাহ্ উৎপাদন করেন নতুন ফল ও ফসল।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতো আল্লাহ্র জন্য সহজ'। একথার অর্থ— পুনর্জীবন দান অথবা পুনরুৎপাদনের বিষয়টি তাঁর নিকট অতি সহজ। কেননা সকল প্রকার অক্ষমতা থেকে তিনি চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। তিনি যে সর্বশক্তিধর।

এর পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'বলো, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং অনুধাবন করো কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি সকলকে জানিয়ে দিন, পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে দ্যাখো এবং অনুধাবন করতে চেষ্টা করো, কীভাবে অস্তিত্ব লাভ করে তাঁর নব নব সৃষ্টি। এখানকার বক্তব্যটি হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয়, তবে এখানকার 'বলো' সম্বোধনটির লক্ষ্য হবেন নবী ইব্রাহিম।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন'। একথার অর্থ— দ্যাখো, কীভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টির সূচনা করেছেন, অতঃপর জীবনের সমাপ্তি শেষে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার। এখানকার বক্তব্যটিতে রয়েছে বাক্য দু'টি। পুনঃসৃষ্টি

www.eelm.weebly.com

যে সহজতর, সে কথাকে বেগবান করবার জন্যই এমতো বাক্যবিভাজন করা হয়েছে এখানে। প্রথম বাক্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে প্রথম সৃষ্টি সম্পাদিত হয়েছে আল্লাহ্‌র দিক থেকে। সুতরাং একথা অবিসংবাদিত সত্য যে, দ্বিতীয় সৃষ্টিও সম্পাদিত হবে তাঁর দিক থেকেই। কারণ দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টিরই অনুরূপ। সুতরাং বুঝতে হবে, যিনি প্রথম সৃজন সম্পন্ন করতে সক্ষম, তিনি সম্পন্ন করতে সক্ষম দ্বিতীয় সৃষ্টিও। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— প্রথম সৃজন সূচনা করেছেন যিনি, পরের সৃজনও সম্পন্ন করবেন তিনিই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান'। একথার অর্থ— নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান। অর্থাৎ প্রথম দ্বিতীয় সকল সৃষ্টিই তাঁর ক্ষমতায়ত্ত।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন'। একথার অর্থ— আখেরাতে তিনি যাকে ইচ্ছা দান করবেন নরকাগ্নির শাস্তি। আর পৃথিবীতে ওই শাস্তির উপলক্ষ হিসেবে তাদেরকে দেয়া হবে কুস্বভাব, সত্যবিমুখতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ইত্যাদি। আবার তিনি আখেরাতে জান্নাত প্রদান করে অনুগ্রহমণ্ডিত করবেন যাকে খুশী তাকে। আর পৃথিবীতে ওই অনুগ্রহপ্রাপ্তির উপলক্ষ হিসেবে তাদেরকে করা হবে আল্লাহ্‌প্রিয়, রসুল প্রেমিক, কৃতজ্ঞচিত্ত, অনুগত, সংযমী ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার ওই শাস্তি ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য মহাবিচারের দিবসে তোমাদেরকে তাঁর সকাশে উপনীত হতে হবেই।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করতে পারবে না স্থলে অথবা অন্তরীক্ষে'। একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমরা যদি আত্মগোপন করো পৃথিবীর কোনো গোপন বন্দরে অথবা পলায়ন করে আশ্রয় নাও আকাশমার্গের কোনো অচেনা গহ্বরে, তবু তোমরা হতে পারবে না আল্লাহ্‌র বিধানবর্হিভূত। এখানে 'অথবা অন্তরীক্ষে' অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আকাশের দূরতম গ্রহাণুপুঞ্জে পালিয়ে গিয়েও তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না আমার আকাশচারী ফেরেশতামণ্ডলীর ব্যবস্থাপনাকে। যেমন কবি সাহাবী হজরত হাসান ইবনে সাবেতের কবিতায় বলা হয়েছে—

ফা মাঁই ইয়াহজু রসুলাল্লাহি মিনকুম
ওয়া ইয়ামদাহুহু ওয়া ইয়ানসুরুহু সাওয়া

অর্থঃ তোমরা রসুলের নিন্দাবাদ করো, অথবা করো স্তুতিবাদ, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। অর্থাৎ কেউই তাঁর অনিষ্ট করতে সক্ষম নয়।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— ‘এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই’। একথার অর্থ— অন্তরীক্ষ ও স্থলভাগের সকল প্রকার বিপদাপদের একমাত্র পরিত্রাতা তিনিই। একমাত্র অভিভাবক সকলের ও সকলকিছুর।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ لِقَآئِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ
وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ
قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَ قَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ
مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۫ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ
وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى
رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَ
يَعْقُوْبَ وَ جَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَ اٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي
الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

r যাহারা আল্লাহের নিদর্শন ও তাঁহার সাক্ষাৎ অস্বীকার করে তাহারাই আমার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হয়। তাহাদিগের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

r উত্তরে ইব্‌রাহীমের সম্প্রদায় শুধু এই বলিল যে, ‘ইহাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর।’ কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

r ইব্‌রাহীম বলিল, ‘পার্থিব জীবনে তোমাদিগের পারস্পরিক বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহের পরিবর্তে প্রতিমাগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছ;

www.eelm.weebly.com

কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং অভিসম্পাত দিবে। তোমাদিগের আবাস হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদিগের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।'

r লূত তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল। ইব্‌রাহীম বলিল, 'আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করিতেছি। তিনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

r আমি ইব্‌রাহীমকে দান করিলাম 'ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাহার বংশধরদিগের জন্য স্থির করিলাম নবুয়ত ও কিতাব এবং আমি তাহাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করিয়াছিলাম; পরকালেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্যতম হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে তারাই আমার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়'। একথার অর্থ— বিশ্বজগতে সতত পরিদৃশ্যমান রয়েছে আল্লাহ্‌র এককত্বের অসংখ্য নিদর্শন। তৎসত্ত্বেও যারা এ নিদর্শনরাজিকে অস্বীকার করে এবং অস্বীকার করে আখেরাতে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্দর্শনকে, তারা অবশ্যই নিরাশ হয়ে যাবে আল্লাহরঅনুগ্রহ থেকে। অথবা তারা অবশ্যই আশাহত হবে স্বর্গাস্বাদন থেকে। কারণ তারা অস্বীকার করে পারলৌকিক জীবনকেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি'। এখানকার এই বাক্যটি যদি হজরত ইব্রাহিমের বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে বুঝতে হবে এখানে উহ্য রয়েছে 'ক্বালাল্লহ্' (আল্লাহ্ বলেছেন) কথাটি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্ বলেছেন, তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর যদি বক্তব্যটিকে হজরত ইব্রাহিমের উক্তির অংশ বলে মনে করা হয়, তবে বুঝতে হবে এখানে তাঁর উক্তির মাঝখানে ঘটেছে প্রসঙ্গান্তর। অতঃপর পরবর্তী আয়াত(২৪) থেকে প্রসঙ্গটি টেনে নেয়া হয়েছে সম্পূর্ণতই হজরত ইব্রাহিমের দিকে।

বলা হয়েছে— 'উত্তরে ইব্রাহিমের সম্প্রদায় শুধু এই বললো যে, একে হত্যা করো অথবা অগ্নিদগ্ধ করো'। একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিমের প্রতর্কবানে আহত হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের পৌত্তলিকেরা হয়ে গেলো মহাক্ষিপ্ত, উত্তেজিত কণ্ঠে একে অপরকে বলতে শুরু করলো, একে বধ করো, অথবা করো ভস্মীভূত।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন'। একথার অর্থ— পৌত্তলিকেরা একমত হলো নবী ইব্রাহিমকে অগ্নিদগ্ধ করতে হবে। শুরু হলো নবী ইব্রাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্জ্বলনের আয়োজন। সেই লেলিহান আগুনে তারা নিক্ষেপ করলো তাঁকে। আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন, হে অগ্নি! ইব্রাহিমের জন্য তুমি শান্তিদায়ক শীতল হয়ে যাও। তাই হলো। এভাবে আল্লাহ্ রক্ষা করলেন তাঁর প্রিয় নবীকে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের প্রতি'। একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিমের এই ঘটনাটির মধ্যে রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন। এতে করে তারা সহজেই অনুধাবন করতে পারবে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তা কীরূপ সর্বত্রগামী।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'ইব্রাহিম বললো, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পারিক বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে প্রতিমাগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছো; কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না'। এ কথার অর্থ— পৌত্তলিকেরা সবিস্ময়ে দেখলো, লেলিহান অগ্নিকুণ্ডে প্রক্ষিপ্ত নবী ইব্রাহিম সম্পূর্ণ অক্ষত। আগুন তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু এমতো অলৌকিকত্বও তাদেরকে পৌত্তলিকতা থেকে টলাতে পারলোনা। অগ্নিমুক্ত নবী ইব্রাহিম তখন তাদেরকে বললেন, শোনো হে দুর্ভাগার দল! তোমরা তোমাদের পূজনীয় প্রতিমাগুলোকে গ্রহণ করেছো কেবল পার্থিব সম্প্রীতি বজায়ার্থে। কিন্তু মহাবিচারের দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে ও অভিসম্পাত দিবে। জাহান্নামই হবে তখন তোমাদের চিরকালীন আবাস এবং তোমরা ওই ভয়াবহতম বিপদ থেকে কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারবে না।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'লুত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো। ইব্রাহিম বললো, আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করছি'। একথার অর্থ— তখন তাঁর প্রতি ইমান আনলেন কেবল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র লুত ইবনে হারুন। হজরত ইব্রাহিম তাঁকে বললেন, শোনো লুত! আমি এবার আল্লাহ্‌র পরিতোষ লাভের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করবো। চলে যাবো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত কোনো স্থানে।

উল্লেখ্য, পরবর্তী সময়ে হজরত লুতও লাভ করেছিলেন নবুয়তের গুরুদায়িত্ব। নবী-রসুলগণ সতত সত্যাধিষ্ঠিত। আল্লাহপাকের বিশেষ হেফাজত তাঁদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আজন্ম সত্যাশ্রয়ী তাঁরা। সেকারণেই তাঁরা একে অপরকে সনাক্ত করতে পারেন সহজে। হন একে অপরের অকুণ্ঠচিত্ত সতীর্থ, সনাক্তক। হজরত লুতও তাই অবলীলায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন হজরত ইব্রাহিমের প্রতি।

এখানে 'ইলা রব্বী' অর্থ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্‌র পরিতোষ লাভের আশায়, অথবা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত স্থানে। অর্থাৎ ওই স্থানে, যেখানে আল্লাহ্‌র ইবাদত সম্পন্ন হতে পারবে নির্বিঘ্নে। অথবা অর্থ হবে— যেখানে আমি হতে পারবো আমার স্বজাতিদের মতো পৌত্তলিকতাপ্রভাবিত পরিবেশ থেকে মুক্ত। হতে পারবো আল্লাহ্‌র উপাসনায় সনিষ্ঠ ও সততমগ্ন। সুফীসাধকগণ বলেন, এরকম

www.eelm.weebly.com

দেশান্তরের নামই হিজরত। ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন, হজরত ইব্রাহিম হিজরত করেছিলেন কুফা অঞ্চলের কুছা নামক স্থানে। তারপর সেখান থেকে ইরানে। সেখান থেকে আবার সিরিয়ায়। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন তাঁর প্রিয়তমা ভার্যা হজরত সারা এবং স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্র হজরত লুত। ওইসময় তাঁর বয়স হয়েছিলো পঁচাত্তর বৎসর। পরে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন ফিলিস্তিনে। আর হজরত লুত সেখান থেকে চলে যান সাদুমে। নবী হিসেবে প্রেরিত হন সাদুমবাসীদের প্রতি।

জ্ঞাতব্য ঃ হজরত আসমা বিনতে আবু বকর বর্ণনা করেছেন, হজরত ওসমান যখন আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন, তখন রসুল স. বললেন, নবী ইব্রাহিম ও নবী লুতের পরে সর্বপ্রথম হিজরতকারী ওসমান। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুলেপাক স. এর পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম হিজরতকারী হজরত ওসমান, যেমন নবী ইব্রাহিমের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম হিজরতকারী ছিলেন নবী লুত। হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নবী লুতের পরে এবং ওসমান-রুকাইয়ার পূর্বে আর কোনো মুহাজির নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— নবী ইব্রাহিম শেষে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী। অগ্নিকুণ্ড থেকে আমার পরিত্রাণ প্রাপ্তিই তার প্রমাণ। আর তিনি সুগভীর প্রজ্ঞাধিকারী, মহাকুশলী। তাই আমার কর্মকাণ্ড হয়েছে এতো সুসাধ্য ও শুভ।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'আমি ইব্রাহিমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবুয়ত ও কিতাব'। একথার অর্থ— নবী ইব্রাহিম যখন ফিলিস্তিনের স্থায়ী অধিবাসী, তখন তিনি বয়োবৃদ্ধ। তাঁর প্রথমা পত্নী সারাও সন্তানবতী হওয়ার বয়স পেরিয়েছেন অনেক আগেই। তৎসত্ত্বেও আমি দয়া করে প্রবীণ নবীদম্পতিকে দান করলাম ইসহাক নামের এক পুত্ররত্ন। পরে আমি ইসহাক ও তাঁর প্রপৌত্র ইয়াকুবকে দান করেছিলাম নবুয়ত ও আকাশজ বাণীসম্ভার। এখানে 'কিতাব' অর্থ তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআন। উল্লেখ্য, কোরআন নাজিল হয়েছে রসুলেপাক স. এর উপরে। তিনি স. ছিলেন হজরত ইসমাইলের বংশধর। আর হজরত ইসমাইলও ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের অন্য পত্নী হজরত হাজেরার সন্তান। সুতরাং তিনিও 'তাঁর বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবুয়ত ও কিতাব' এই শুভসংবাদের অর্ন্তভুক্ত। সেই হিসাবে কোরআনও এখানকার 'কিতাব' এর মধ্যে পড়ে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম'। এবং আমি তার পৃথিবীর জীবনে সন্তানের পিতা হওয়ার বয়স পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যা ও বয়ঃবৃদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে দান করেছিলাম পুণ্যবান পুত্র;

www.eelm.weebly.com

অতঃপর তাঁর বংশপরম্পরাকে করেছিলাম মহিমান্বিত। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন সুদ্দী। অন্যান্য ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, এখানে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করার অর্থ তাঁর বংশে নবুয়তের ধারা প্রবহমান করা। সেকারণেই ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানদের সঙ্গে রয়েছে তাঁর সম্মানজনক সম্পর্ক। দরূদ ও সালাম তাঁর প্রতি প্রেরিত হতে থাকবে মহাপ্রলয় পর্যন্ত।

আমি বলি, সাধারণ জগদ্বাসী যেমন পার্থিব ভোগ সম্ভারের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়, এই পৃথিবীতে হজরত ইব্রাহিমও তেমনি পরিতৃপ্তি লাভ করতেন জিকির, ফিকির ও ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে। তাঁর ওই পরিতৃপ্তিই ছিলো তাঁর দুনিয়ার পুরস্কার।

এরপর বলা হয়েছে— 'পরকালেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণগণের অন্যতম হবে'। এখানে 'আস্‌সলিহীন' অর্থ সৎকর্মপরায়ণগণ, পুণ্যবানগণ। কথাটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে পরিপূর্ণরূপে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিবর্গকে। অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিম পরকালেও হবেন পরিপূর্ণরূপে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ২৮, ২৯, ৩০

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ٘ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ۬ وَ تَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٣٠﴾

r স্মরণ কর লূতের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল,'তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করিতেছ, যাহা তোমাদিগের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই'।

r 'তোমরা কি পুরুষে উপগত হইতেছ না? তোমরা তো রাহাজানি করিয়া থাকো এবং নিজদিগের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্যকর্ম করিয়া থাক'। উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু এই বলিল যে, 'আমাদিগের উপর আল্লাহের শাস্তি আনয়ন কর— যদি তুমি সত্যবাদী হও।'

r সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর'।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এবার স্মরণ করুন নবী লুতের কথা। আমি তাঁকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলাম সাদুমবাসীদের সংশোধনার্থে। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্টদেরকে বলেছিলেন, হে জনতা! দিনের পর দিন তোমরা অশালীন ও অশ্লীল কর্মে মজে আছো। এরকম জঘন্য অপরাধ পৃথিবীতে তোমাদের আগে আর কেউ করেনি। এখানে 'আলফাহিশাতা' অর্থ সীমাতিরিক্ত বেহায়াপনা।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'তোমরা কি পুরুষে উপগত হচ্ছো না? তোমরা তো রাহাজানি করে থাকো'। সাদুমবাসীরা পথচারীকে পেলে ধরে নিয়ে যেতো। তাদেরকে ব্যবহার করতো নারীদের মতো যৌনসঙ্গিনীরূপে। তাই তাদের বসতির পাশ দিয়ে পথচারীরা পথ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিলো। সে দিকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে— তোমরা কি পুরুষে উপগত হচ্ছো না? তোমরা তো রাহাজানি করে থাকো।

'তাক্বত্বাউ'নাসা সাবীলা' এর ধাত্যর্থ হয়— পথ বন্ধ করে দেওয়া। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা নারীগমনের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলো। তৎপরিবর্তে করতো নরসম্ভোগ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং নিজেদের মজলিশে প্রকাশ্যে ঘৃণ্যকর্ম করে থাকো'। প্রকাশ্য মজলিস বা জমজমাট সভাকে বলে 'নাদী'। আবু সালেহ সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত উম্মে হানী বলেছেন, আমি একবার রসুল স. সকাশে 'নিজেদের মধ্যে প্রকাশ্যে ঘৃণ্যকর্ম করো' কথাটির ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। বললাম, এখানে 'ঘৃণ্যকর্ম' অর্থ কী? তিনি স. বললেন, ওই নিন্দনীয় কর্ম যা নবী লুতের সম্প্রদায় করে থাকতো প্রকাশ্য সমাবেশে। তারা পথিপার্শ্বে জড়ো হতো এবং পথচারীদেরকে লক্ষ্য করে গালাগালি করতো অশ্রাব্য ভাষায়।

বাগবী আরো লিখেছেন, এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হজরত লুতের সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রস্তরভর্তি পাত্র নিয়ে আড্ডা জমাতো পথিকদের গমনাগমনের পথে। কোনো পথিককে দেখলে তারা চিৎকার করে বলতো, 'ধরো'। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি শুরু হতো প্রস্তরবর্ষণ। যার নিক্ষিপ্তপাথর পথিককে স্পর্শ করতো, সেই হতো ওই পথিকের দাবিদার। প্রথমে সে তার মালমাত্তা লুণ্ঠন করতো। তারপর তাকে করতো সম্ভোগ। শেষে তাকে বিদায় করতো তিনটি দিরহাম দিয়ে। তাদের সমাজপতিদের নির্দেশ ছিলো এরকমই।

হজরত লুতের সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো চরম অভদ্র, অভব্য ও অসভ্য। সশব্দে বায়ু নিঃসরণ, থুথু ছিটানো, নগ্ননৃত্য মেহেদীচর্চিত আঙুলে চুটকি বাজানো, কামোত্তেজক অঙ্গভঙ্গি, শীস দেওয়া, তালি বাজানো, হই হল্লা ইত্যাদি অপকর্ম ছিলো তাদের নিত্ত নৈমিত্তিক কর্ম। এভাবে তারা তাদের জনপদকে বানিয়ে নিয়েছিলো অশ্লীলতা ও পৈশাচিকতার লীলাভূমি।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— ‘উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এই বললো যে, আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আনয়ন করো— যদি তুমি সত্যবাদী হও’। একথার অর্থ— হজরত লুতের সদুপদেশের প্রতি তারা প্রদর্শন করলো চরম অবজ্ঞা। বিদ্রূপের সুরে বললো, বুঝলাম আমরা অপরাধী। আর তুমি সত্যবাদী। তোমার নবুয়তও সত্য। যদি তাই হয়, তাহলে আল্লাহ্‌কে বলে আমাদের শাস্তির ব্যবস্থা করছো না কেনো? সত্যবাদী নবীই যদি তুমি হও, তাহলে তো তোমার এরকমই করা উচিত। বৃথা বাক্য ব্যয়ে কী লাভ?

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— ‘হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো’। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী দুর্বৃত্তদের বিদ্রূপবানে জর্জরিত নবী তাদের চৈতন্যোদয়ের আশায় ও অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন। এক সময় ভেঙে পড়লো তাঁর নবীসুলভ সহিষ্ণুতার সকল সীমানা। শেষে নিরুপায় হয়ে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালক! এরা প্রকৃতই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। সুতরাং এদের বিনাশ সাধন করে আমাকে দান করো স্বস্তি ও বিজয়।

এখানে ‘আলমুফসিদীন’ অর্থ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। হজরত লুত তাঁর উদ্ধৃত প্রার্থনাকে আবেগঘন করার উদ্দেশ্যেই কথাটিকে ব্যবহার করেছেন এখানে। আর তারা সত্যিই ছিলো অবধারিত শাস্তির উপযোগী এক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়। ছিলো সমকামের মতো ঘৃণ্য অপকর্মের প্রথম প্রবক্তা।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

وَ لَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مُهْلِكُوْٓا
اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۚ﴿۳۱﴾ قَالَ اِنَّ فِيْهَا
لُوْطًا ؕ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ۫ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَ اَهْلَهٗٓ اِلَّا
امْرَاَتَهٗ ۫ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۳۲﴾ وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا
سِیْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ قَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۫ اِنَّا
مُنَجُّوْكَ وَ اَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۳۳﴾ اِنَّا

www.eelm.weebly.com

مُنْزِلُوْنَ عَلٰۤى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا
يَفْسُقُوْنَ۝٣٤ وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ۝٣٥

r যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্‌তাগণ সুসংবাদ সহ ইব্‌রাহীমের নিকট আসিল, তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা এই জনপদবাসীদিগকে ধ্বংস করিব, ইহার অধিবাসীরা তো সীমালংঘনকারী।'

r ইব্‌রাহীম বলিল, 'এই জনপদে তো লূত রহিয়াছে' উহারা বলিল, 'সেথায় কাহারা আছে তাহা আমরা ভাল জানি; আমরা তো লূতকে ও তাহার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিবই তাহার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো ধ্বংসপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত।

r এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের নিকট আসিল তখন তাহাদিগের আগমনে সে বিষণ্ন হইয়া পড়িল এবং নিজকে তাহাদিগের রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল। উহারা বলিল, 'ভয় করিও না, দুঃখ করিও না; আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিব তোমার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো ধ্বংসপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত;

r 'আমরা এই জনপদবাসীদিগের উপর আকাশ হইতে শাস্তি নাজিল করিব, কারণ ইহারা সত্যত্যাগী।'

r আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রাখিয়াছি।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যখন পুণ্যবান পুত্রসন্তানের শুভসংবাদ নিয়ে দূত ফেরেশতারা হজরত ইব্রাহিমের নিকটে উপস্থিত হলো, তখন তারা তাঁকে বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! পুণ্যবান পুত্র ও মহিমান্বিত বংশপরম্পরার শুভসংবাদ জ্ঞাপনার্থে আমরা আপনাকে এ কথাটিও জানাতে চাই যে, সাদুমবাসীদের বিনাশ সাধন ও আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য। কেননা তারা মহাপাপী ও সীমালংঘনকারী।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'এই জনপদে তো লুত রয়েছে'। একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম একথা শুনে শিউরে উঠলেন। নবীসুলভ মমতাবশে বললেন, কিন্তু সেখানে যে আল্লাহ্‌র নবী লুতও রয়েছেন। তিনি তো আর সীমালংঘনকারী নন।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বললো, সেখানে কারা আছে তা আমরা ভালো জানি', আমরা তো লুত ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবোই'। একথার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত লুতের অবস্থান ও তাঁর নিরাপত্তাপ্রাপ্তির বিষয়টি ফেরেশতারা হজরত ইব্রাহিমের চেয়ে ভালো জানতো। তাই তারা হজরত ইব্রাহিমের দুর্ভাবনা দূরীকরণার্থে তখন বলেছিলো আমরা তো লুত ও তাঁর পরিজনবর্গকে রক্ষা করবোই, শাস্তি আপতিত করবো কেবল সীমালংঘনকারীদের উপর।

এরপর বলা হয়েছে— 'তার স্ত্রীকে ব্যতীত। সে তো ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত'। একথার অর্থ— শেষে ফেরেশতারা বললো, হজরত লুত ও তাঁর পরিজনবর্গ আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাবে বটে, তবে তার স্ত্রী নিষ্কৃতি পাবে না। কারণ সে ওই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একনিষ্ঠ সমর্থক। সুতরাং সে-ও সীমালংঘনকারিণী। হজরত লুত যখন ওই জনপদ ছেড়ে রাতের আঁধারে স্থানান্তরে গমন করবেন, তখন সে পড়ে থাকবে পেছনে, সীমালংঘনকারীদের সঙ্গে। তাই তাকেও গ্রাস করবে সর্বগ্রাসী শাস্তি। এখানে 'ইললা' (ব্যতীত) অব্যয়টি ব্যতিক্রমী। অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী হবে আল্লাহ্ প্রদত্ত নিরাপত্তার ব্যতিক্রম। আর 'সে তো ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত' কথাটিতে প্রকাশ করা হয়েছে তার এমতো ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ। অর্থাৎ সে তখন হবে পশ্চাদবর্তিনী, শাস্তির সীমানাবাসিনী।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লুতের নিকটে এলো, তখন তাদের আগমনে সে বিষণ্ন হয়ে পড়লো এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলো'। একথার অর্থ— এবং যখন দূত ফেরেশতারা নবী লুতের নিকট উপস্থিত হলো তখন তিনি এইভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, এই সুদর্শন অতিথিবর্গকে কামোন্মত্ত দুরাচারদের হাত থেকে রক্ষা করবেন কেমন করে।

এখানে 'জারউন' অর্থ বল, শক্তি। যেমন বলা হয় 'ত্বীলুজ জাররায়ী' (অতিশয় বলশালী)। অর্থাৎ নবীবর তখন এই ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও বলশালী সাদুমবাসীদের বিকৃত কামাক্রমণ থেকে তিনি এই সম্মানিত মেহমানদেরকে রক্ষা করবেন কেমন করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বললো, ভয় করো না, দুঃখ কোরো না; আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবো তোমার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত'। একথার অর্থ দুশ্চিন্তিত নবীকে দেখে তখন ফেরেশতারা বললো, মহামান্য নবী! শংকিত হবেন না। আমরা তো অপার্থিব অতিথি। প্রেরিত হয়েছি সাদুমবাসীদের শায়েস্তা করতে। তাদেরকে আমরা সমূলে বিনাশ করবো। আর রক্ষা করবো আপনাকে ও আপনার পরিজনবর্গকে। কেবল আপনার পত্নীকে

www.eelm.weebly.com

নয়। কেননা সে অবিশ্বাসিনী । সে রয়ে যাবে পশ্চাতে এবং ধ্বংস হবে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— হে নবী! আপনি এমতো দুশ্চিন্তা ও শংকাকে প্রশ্রয় দিবেন না যে, আপনার জনপদবাসী আমাদেরকে বিপদে ফেলবে এবং আমরা হয়ে যাবো অসহায়। বরং আমরাই তো তাদেরকে ধ্বংস করবো। আর রক্ষা করবো আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের আগমন। তবে একথা ঠিক যে, আপনার স্ত্রী রক্ষা পাবে না। কারণ সে পড়ে থাকবে পেছনে এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে নিশ্চিহ্নিতদের সঙ্গে।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ থেকে শাস্তি নাজিল করবো, কারণ এরা সত্যত্যাগী'। মুকাতিল বলেছেন, এখানকার 'রিজযুন' শব্দটির অর্থ ভূমিধস, তদুপরি প্রস্তরবর্ষণ। 'রিজযুন' অর্থ 'অশান্তি'ও হয়। আর অশান্তিও তো শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি'। একথার অর্থ— আমি নবী লুতের সম্প্রদায়ের সমূলে ধ্বংস হওয়ার ঘটনাটিকে করেছি আমার চিরদুর্জয় শক্তিমত্তার একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন। আর এ ঘটনা থেকে সত্যোপলব্ধি করতে পারে কেবল তারা, যারা বোধশক্তিসম্পন্ন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'স্পষ্ট নিদর্শন' অর্থ অবাধ্য সাদুম জনপদের ধ্বংসস্তূপ। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ তাদের উপরে বর্ষিত প্রস্তর খণ্ডগুলো, যা বহুকালধরে ছিলো পরিদৃশ্যমান। মুজাহিদ বলেছেন, তখনকার ভূগর্ভোৎসারিত কৃষ্ণসলিলকেই এখানে বলা হয়েছে 'স্পষ্ট নিদর্শন'। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'স্পষ্ট নিদর্শন' বলা হয়েছে এই কাহিনীটির প্রসিদ্ধিকে। অর্থাৎ নবী লুতের সম্প্রদায়ের মূলোৎপাটনের এই বিখ্যাত ইতিবৃত্তটিকে আমি উপজীব্য করে রেখেছি প্রকাশ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا
الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوْهُ
فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٣٧﴾

r আমি মাদ্‌য়ানবাসীদিগের প্রতি তাহাদিগের ভ্রাতা শোয়াইবকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর, শেষ দিবসকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না।'

www.eelm.weebly.com

r কিন্তু উহারা তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল; অতঃপর উহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল; ফলে, উহারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আর আমি মাদিয়ানবাসীদের নিকট তাদের সংশোধনার্থে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরই স্বগোষ্ঠীভূত নবী শোয়াইবকে। তিনি বলেছিলেন, হে আমার স্বজাতি! তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে সমর্পিত হও। ভয় করো মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ সকাশে উপনীত হওয়ার বিষয়টিকে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা উৎপাদন কোরো না।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'রিজা' এর শাব্দিক অর্থ 'আশা' হলেও এর মর্মার্থ 'ভয়'। অর্থাৎ তোমরা ভয় করো পরকালের শাস্তির এবং তার জন্য এমন পুণ্যকর্মে নিয়োজিত হও, যাতে করে পরকালে অব্যাহতি পেতে পারো শাস্তি থেকে। আর এখানকার 'লা তা'সাও' অর্থ 'লা তুফসিদু' (বিপর্যয় সৃষ্টি কোরো না)। উল্লেখ্য, কোনো জাতির উপর বিপর্যয় নেমে আসে দু'টি উদ্দেশ্যে— ১. সংশোধনার্থে ২. বিনাশ সাধনার্থে। এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে শেষোক্তটিকে।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো। ফলে, তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেলো'। একথার অর্থ— কিন্তু তারা যখন নবী শোয়াইবের কথা মানলো না, তখন তাদের উপরে নেমে এলো শাস্তি। প্রচণ্ড ভূকম্পনের ফলে তারা তাদের আপনাপন গৃহে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে রইলো।

এখানে 'রজফাতু' অর্থ প্রচণ্ড ভূকম্পন। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত জিব্রাইলের মহানাদ, যার ফলে কলিজা ফেটে মুখ থুবড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো তারা। 'জাছিমান' অর্থ মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা। আর 'দার' অর্থ গৃহে। শব্দটি একবচন হলেও এখানে এটি বহুবচনার্থক। অর্থাৎ আপনাপন গৃহসমূহে।

সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

وَ عَادًا وَّ ثَمُوْدَاۡ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ قف وَ زَيَّنَ لَهُمُ
الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ كَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ۝٣٨ لا وَ
قَارُوْنَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ قف وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ
فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۝٣٩ صلے فَكُلًّا اَخَذْنَا

www.eelm.weebly.com

بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ
الصَّيْحَةُ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۴۰﴾
مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۖۚ
اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ؕ وَ اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ
كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۴۱﴾ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَیْءٍ ؕ وَ
هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۴۲﴾ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا
يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿۴۳﴾ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ
اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۴﴾ ع

r এবং আমি আদ ও সামূদকে ধ্বংস করিয়াছিলাম; উহাদিগের বাড়ীঘরই তোমাদিগের জন্য ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান উহাদিগের কাজকে উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল এবং উহাদিগকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়াছিল, যদিও উহারা ছিল বিচক্ষণ।

r এবং আমি সংহার করিয়াছিলাম কারূন, ফিরাউন ও হামানকে; মূসা উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিল; তখন তাহারা দেশে দম্ভ করিত; কিন্তু উহারা আমার শাস্তি এড়াইতে পারে নাই।

r উহাদিগের প্রত্যেককেই তাহার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়াছিলামঃ উহাদিগের কাহারও প্রতি প্রেরণ করিয়াছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, কাহাকেও আঘাত করিয়াছিল মহানাদ, কাহাকেও আমি প্রোথিত করিয়াছিলাম ভূগর্ভে এবং কাহাকেও করিয়াছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি কোন জুলুম করেন নাই; তাহারা নিজেরাই নিজদিগের প্রতি জুলুম করিয়াছিল।

r যাহারা আল্লাহের পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাহাদিগের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর বানায়, এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি উহারা জানিত।

www.eelm.weebly.com

r উহারা আল্লাহের পরিবর্তে যাহা কিছুকে আহ্বান করে আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

r মানুষের জন্য আমি এই সকল দৃষ্টান্ত দিই; কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝে।

r আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং আমি আদ ও ছামুদকে ধ্বংস করেছিলাম; তাদের বাড়ীঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ'। একথার অর্থ— আর আমি আদ ও ছামুদ জাতির মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। হে মক্কাবাসী! ওই ধ্বংসচিহ্নের প্রমাণ তো তোমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাও, যখন গমানগমন করো তাদের উৎসন্ন জনপদের পাশ দিয়ে। এখানে 'আদ' ও 'ছামুদ' শব্দদ্বয়ের প্রারম্ভে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটি ক্রিয়াপদ। অবশ্য বাক্যটির অনুবাদ করা হয়েছে ওই প্রচ্ছন্ন ক্রিয়াপদ সহকারেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিলো এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বন করতে বাধা দিয়েছিলো'। একথার অর্থ— শয়তান হয়েছিলো তাদের সৎপথপ্রাপ্তির অন্তরায়। সে তাদের অপকর্মগুলোকেই তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে রেখেছিলো।

শেষে বলা হয়েছে— 'যদিও তারা ছিলো বিচক্ষণ'। মুকাতিল, কাতাদা ও কালাবী কথাটির অর্থ করেছেন— লোকগুলি তাদের অপবিত্র ধর্মধারণাকেই মনে করতো সত্য। মনে করতো, তারাই সরল সঠিক পথের অনুসারী। আর এমতো অপবিশ্বাস লালনের ক্ষেত্রে তারা ছিলো সতত সজাগ। ফাররা এর অর্থ করেছেন— তারা ছিলো তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন, বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল। কিন্তু এমতোগুণবত্তাকে তারা কাজে লাগাতে চায়নি। কথাটিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে— তারা বুঝতে পেরেছিলো, শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তদুপরি তাদের প্রতি প্রেরিত নবীও তাদেরকে এব্যাপারে পূর্বাহ্নে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সবকিছু জেনে বুঝেও তারা বোধ ও বিচক্ষণতাকে কাজে লাগাতে পারেনি। ফলে তারা উৎপাটিত হয়েছিলো সমূলে।

পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'এবং আমি সংহার করেছিলাম কারূন, ফেরাউন ও হামানকে'। এখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হিসেবে কারূনের নাম এসেছে আগে। কারণ সে বংশগত দিক দিয়ে ছিলো ফেরাউন ও হামান অপেক্ষা কুলীন। আরো প্রণিধাননীয় যে, সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের অপরাধ অন্যাপেক্ষা অধিক জঘন্য। সেই হিসেবেও এখানে আগে এসেছে কারূনের নাম।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— ‘মুসা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলো; তখন তারা দেশে দম্ভ করতো; কিন্তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি’। একথার অর্থ— মহাসত্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে নবী মুসা তাদের সামনে প্রকাশ করেছিলেন বিস্ময়কর মোজেজা। যেমন যষ্টির সর্পরূপ ধারণ, নির্মল শুভ্রোজ্জ্বল হস্ত ইত্যাদি। তৎসত্ত্বেও তাদের বোধোদয় ঘটেনি। তারা সত্যগ্রহণের পরিবর্তে প্রদর্শন করতো আত্মম্ভরিতা। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেনি।

এখানে ‘সবেক্বীন’ অর্থ নিষ্ফলকারী, অক্ষমকারী। যেমন বলা হয় ‘সাবাক্বা ত্বলিবাহু’ (তার আক্রমণকারীকে নিষ্ফল করে সে এগিয়ে গিয়েছে)। অর্থাৎ তার আক্রমক তাকে ধরতেই পারেনি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তারা আমার শাস্তি থেকে অব্যাহতি পায়নি।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— ‘তাদের প্রত্যেককেই তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলামঃ তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, কাউকে আঘাত করেছিলো মহানাদ, কাউকে আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত’। এক কথায়— বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে আমি সংহার করেছিলাম বিভিন্ন প্রকার শাস্তির মাধ্যমে। যেমন প্রস্তর বৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বংস করেছিলাম নবী লুতের সম্প্রদায়ের পাপিষ্ঠদেরকে। মহানাদের মাধ্যমে আপনাপন বসতবাটিতে কলিজা ফেটে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হয়েছিলো নবী শোয়াইবের সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তদেরকে। কারূনকে গ্রাস করেছিলো মৃত্তিকা। মহাপ্লাবন নিশ্চিহ্ন করেছিলো নবী নুহের সম্প্রদায়ের সীমালংঘনকারীদেরকে এবং ফেরাউন ও তার পুরো বাহিনীকে বরণ করতে হয়েছিলো সমুদ্রাভ্যন্তরের সলিল সমাধি।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্ তাদের প্রতি জুলুম করেননি। তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো’। একথার অর্থ— ওই সকল দুর্বৃত্তকে আল্লাহ্তায়ালা শাস্তি দিয়েছিলেন সম্পূর্ণতই ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে। কারণ অন্যায়াচরণ থেকে তিনি সতত পবিত্র। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি করেছিলো জুলুম। সত্তায় সত্যান্বেষণ পিপাসাকে করেছিলো দম্ভদলিত। আর এভাবেই হয়ে গিয়েছিলো শাস্তিযোগ্য অপরাধী।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— ‘যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানতো’। একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্য কাউকে অথবা কোনোকিছুকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের তথাকথিত ধর্মাদর্শ ঊর্ণনাভ নির্মিত জালসদৃশ। যা আশ্রয় হিসেবে

www.eelm.weebly.com

দুর্বলতম। বরং তাদের ওই অপবিশ্বাস ঊর্ণনাভের জালের চেয়েও অধিক অনুপকারী। কেননা কিছুক্ষণের জন্য ওই জাল হতে পারে তার নির্মাতার আশ্রয় ও আহার্যোপকরণ আহরণের মাধ্যম। কিন্তু অবিশ্বাসী ও পৌত্তলিকদের সে সুযোগও নেই। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— বিশ্বাসীদের আল্লাহ্‌র এককত্বনির্ভর বিশ্বাস এবং পৌত্তলিকদের অংশীবাদাশ্রিত ধারণার দৃষ্টান্ত হচ্ছে মনুষ্যগৃহ ও মাকড়সার জাল।

এখানে 'আন্‌কাবুত' অর্থ ঊর্ণনাভ, মাকড়সা। শব্দটি একবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ সকল ক্ষেত্রে সমভাবে ও সমরূপে ব্যবহার্য। কখনো কখনো অবশ্য ব্যবহৃত হয় এর বহুবচনার্থক শব্দরূপ 'আনাকীর'

এরপর বলা হয়েছে—'এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানতো'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যদি বিশ্বাসের গ্রহণরহস্য সম্পর্কে জানতো, তবে ওই অক্ষয় গৃহ ছেড়ে কখনোই গ্রহণ করতো না মাকড়সার গৃহের মতো ক্ষণভঙ্গুরতাকে। পৌত্তলিকতা ও বিচক্ষণতাকে পরিত্যাগ করে কখনোই হতো না একদেশদর্শিতার অনুগ।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে স্মরণ করা যেতে পারে রসুল স. এর একটি হাদিস। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আলী— রসুল স. বলেছেন, হিজরতের প্রাক্কালে সওর পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করলাম আমি ও আবু বকর। অকস্মাৎ একটি মাকড়সা এসে জাল বুনলো গুহামুখে। সুতরাং তোমরা তাকে সংহার কোরো না।

এর পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যা কিছুকে আহ্বান করে আল্লাহ্ তা জানেন'। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে দিয়ে যে সকল দেব-দেবীদের পূজা-অর্চনা করো, সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। এখানকার 'মা' অব্যয়টি প্রশ্নবোধকও হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তারা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে কিসের অর্চনা করে? সে সম্পর্কে তো আল্লাহ্ জানেনই। ধাত্যর্থেও অব্যয়টি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে বলা যায়। এমতাবস্থায় মর্মার্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্ তাদের গায়রুল্লাহ্‌র উপাসনা সম্পর্কে ভালো করেই জানেন। অথবা অব্যয়টি এখানে নেতিবাচক। এটাই যদি মেনে নেয়া যায়, তবে মর্মার্থ হয়— তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত যে করে না, সেকথা আল্লাহ্‌র অজানা নয়। প্রতিমাপূজারীরা নির্বোধ। আর তাদের পৌত্তলিকতা মাকড়সার জাল সদৃশ ভঙ্গুর, একথাকে অধিকতর স্পষ্ট করার জন্যই অবতারণা করা হয়েছে এই আয়াতের।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যেহেতু অতুলনীয়রূপে মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, তাই তাঁকে ছেড়ে দিয়ে অন্যের বা অন্যকিছুর উপাসনা নিশ্চিত মূর্খতা ও হতভাগ্যতা। আর যারা এরূপ মূর্খ ও হতভাগ্য, তারা তো অবশ্যই শাস্তিযোগ্য।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'মানুষের জন্য আমি এই সকল দৃষ্টান্ত দেই; কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বোঝে'। একথার অর্থ— মানুষকে জ্ঞানদানের জন্যই আমি এরকম উপমা উপস্থাপন করি, কিন্তু একথা সকলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। হৃদয়ঙ্গম করতে পারে কেবল তারা, যারা সত্যান্বেষী।

আতার ও আবু যোবায়ের সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত জাবের আয়াতখানি আবৃত্তি করার পর বলতেন, আল্লাহ্ যাকে শুভবোধ দান করেন, সে-ই কেবল বুঝে শুনে গ্রহণ করতে পারে আল্লাহ্র আনুগত্য। আত্মরক্ষা করতে পারে অনানুগত্য থেকে। ছা'লাবী এবং ওয়াহেদীও এরকম বলেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ইবনে হারব তাঁর 'কিতাবুল আকল' গ্রন্থে হারেছ ইবনে উমামা থেকে এবং ইবনে জাওজী তাঁর 'মওজুয়াতে'।

এর পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনৈপুণ্য নিখুঁত, অনবদ্য ও অভূতপূর্ব। তাঁর অভিপ্রায়, প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তার অতুলনীয় নিদর্শন সতত পরিদৃশ্যমান এই দুই মহা সৃষ্টিতে। এ অবাক নিদর্শন অবশ্যই এর মহাসৃজয়িতার দিকে পথপ্রদর্শন করে। কিন্তু সে পথের সন্ধান জানতে পারে কেবল বিশ্বাসীরা। অন্যেরা নয়।

www.eelm.weebly.com

একবিংশতিতম পারা

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ৪৫

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿۴۵﴾

r তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর এবং সালাত কায়েম কর। সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দকার্য হইতে, আল্লাহের স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা জানেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি করো'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! এযাবতকাল পর্যন্ত আপনার উপর কোরআনের যে আয়াতসম্ভার প্রত্যাদেশরূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে, আপনি সেগুলো নিয়মিত আবৃত্তি করতে থাকুন। উল্লেখ্য, কোরআনের তাৎপর্য ও গূঢ়তত্ত্বের পরিচয় পেতে হলে মনোযোগ ও মহব্বত সহকারে এর পৌনঃপুনিক আবৃত্তি অত্যাবশ্যক। এরকম আবৃত্তিকারীর হৃদয়পটে ভেসে ওঠে নভজ বাণীবৈভবের অপার্থিব সুষমা। ফুটে ওঠে এর মর্মার্থ। আর লাভ হয় কোরআনানুগ জীবনাচরণ। অর্জিত হয় মহান আল্লাহ্‌র একান্ত নৈকট্য ও প্রেম।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সালাত কায়েম করো; সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দকর্ম থেকে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি নামাজ প্রতিষ্ঠা করুন, যা অশ্লীল ও অন্যায়াচরণের প্রতিরোধক। এখানে 'অশ্লীল' অর্থ ধর্মগত ও বুদ্ধিগতভাবে যা অশালীন। আর মন্দকর্ম অর্থ সকল প্রকার নিষিদ্ধ কাজ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, এক আনসার যুবক রসুল স. এর সঙ্গে নিয়মিত নামাজ পাঠ করতো। কিন্তু পাপকর্মও করে যেতো অবলীলায়।

www.eelm.weebly.com

একথা রসুল স. এর গোচরীভূত হলে তিনি বললেন, এক সময় এই নামাজই তাকে পাপাচরণ থেকে নিবৃত্ত করবে। তাই হলো। কিছুদিন পর দেখা গেলো তার পাপাচরণ প্রবৃত্তি আর নেই।

ইসহাক তাঁর স্বরচিত গ্রন্থে এবং বায্যার ও আবু ইয়ালী হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করলো, অমুকব্যক্তি রাত জেগে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে, তারপর ভোররাতে বেরিয়ে যায় চুরি করতে। রসুল স. বললেন, ছেড়ে দাও তার কথা। অপেক্ষা করো, দেখবে, একসময় নামাজই মিটিয়ে দিবে তার অপহরণেচ্ছাকে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, নামাজ হচ্ছে অপরাধপ্রবণতার রক্ষাকবচ। যার নামাজ অপরাধ-বিদূরক নয়, সে অবশ্যই আল্লাহ্র সান্নিধ্যচ্যুত।

হাসান ও কাতাদা বলেছেন, যার নামাজ কদর্যতা নিবৃত্তক নয়, তার ওই নামাজ অবশ্যই বিপদার্জক। কোনো কেনো আলেম বলেছেন, এখানে 'সালাত' (নামাজ) অর্থ কোরআন তেলাওয়াত। তবে একথাও অসত্য নয় যে, কোরআন তেলাওয়াতও পাপ-নিরোধক।

হজরত জাবের থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, এক লোক একবার রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আমার পরিচিত এক ব্যক্তি রাতে কোরআন তেলাওয়াত করে। আর দিনে করে চুরি। রসুল স. বললেন, দেখবে শিগগিরই কোরআন পাঠ তাকে নিবৃত্ত করেছে চুরি থেকে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুল স. সকাসে এই মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করা হলো যে, জনৈক ব্যক্তি দিবাভাগে নামাজ পাঠ করে এবং নিশিযোগে করে তস্করতা। তিনি স. বললেন, দেখে নিয়ো, অতিসত্বর নামাজ তাকে পৃথক করে দিবে তাস্কর্যবৃত্তি থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ'। ইবনে আতা বলেছেন, আল্লাহ্র স্মরণের (জিকিরের) গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো পাপই জিকিরের সম্মুখে তিষ্ঠাতে পারে না। আর এখানে 'জিকরুল্লাহ্' (আল্লাহ্র স্মরণ) অর্থ ওই নামাজ যা পাপপ্রতিরোধক। নামাজ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। তাই এখানে নামাজকেই সরাসরি বলা হয়েছে 'জিকরুল্লাহ্'।

জিকিরের মাহাত্ম্যঃ জিকিরের মহিমা-মাহাত্ম্য সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে অসংখ্য হাদিস। তন্মধ্যে কিছুসংখ্যক নিম্নরূপঃ

হজরত আবু দারদার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. একবার উপস্থিত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কর্মের কথা

www.eelm.weebly.com

জানাবো না, যা তোমাদের কর্তা বিধাতার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়, পবিত্র ও সর্বোত্তম। যা আল্লাহ্‌র পথে স্বর্ণ-রৌপ্য দান করা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ? এমনকি অধিক পুণ্যার্জক রণক্ষেত্রে শত্রুনিধনের চেয়েও? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! অবশ্যই দয়া করে বলুন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র জিকির। আহমদ, মালেক, তিরমিজি, ইবনে মাজা। ইমাম মালেক বলেছেন, হাদিসটি প্রায়োন্নত পর্যায়ের।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম বাণীবাহক! আল্লাহ্‌র দাসদের মধ্যে তাঁর নিকট কে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন? তিনি স. বললেন, যারা আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে। আমি বললাম, ধর্মযোদ্ধার চেয়েও কি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, যদিও সে ধর্মযোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে তার কৃপাণ ভেঙ্গে ফেলে এবং রক্তাক্ত হয় নিজে। আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে বিশর বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রসুল স. সকাশে হাজির হয়ে বললো, হে দয়াল নবী! কোন ব্যক্তি সর্বাধিক সৌভাগ্যবান ? তিনি স. বললেন, যার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ ও পুণ্যকর্মশোভিত। লোকটি পুনর্বার বললো, সর্বাধিক নন্দিত কর্ম কোনটি? তিনি স. বললেন, ওই জিকির যা অন্তিমযাত্রার প্রাক্কালে সিক্ত করে রাখে রসনা। আহমদ, তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার মক্কার জুমদান পাহাড়ের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। অতঃপর তিনি স. পাহাড়ের উপর দিয়ে অগ্রসর হলেন। চলতে চলতে সহচরবৃন্দকে বললেন, তোমরা আরও অগ্রসর হও। শোনো, এই পাহাড়ের নাম জুমদান। 'তাফরীদকারীরা' তো অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে। সহচরবৃন্দ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! 'তাফরীদকারী' কারা? তিনি স. বললেন, অত্যধিক জিকিরকারী নারী-পুরুষ। মুসলিম।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা জিকির করে এবং যারা জিকির করে না, তাদের দৃষ্টান্ত— জীবিত ও মৃত। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র একদল ফেরেশতা আছে, যারা জিকিরকারীদের সমাবেশ সন্ধান করে ফেরে। কোথাও কোনো জিকিরের সমাবেশ দেখতে পেলে একজন আর একজনকে ডেকে বলে, এসো, এসো, এই যে এখানে। তখন সকলে সেখানে সমবেত হয়। ঘিরে ফেলে জিকিরের মজলিশ। একজনের উপরে একজন— এরকম করতে করতে ফেরেশতাযুথ পৌঁছে যায় আকাশের কাছাকাছি। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও প্রশ্ন করেন, আমার দাসেরা কী বলে? ফেরেশতারা জবাব দেয়, বর্ণনা করে তোমার পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা। আল্লাহ্ বলেন, তারা কী আমাকে দেখেছে?

www.eelm.weebly.com

ফেরেশতারা বলে, না। আল্লাহ্ বলেন, যদি দেখতো? ফেরেশতারা বলে, তবে তো তাদের জিকির ও ইবাদতে প্রকাশ পেতো আরো বেশী আবেগ, উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাস। তোমার পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা প্রকাশ করতো আরো অধিক উৎসাহভরে। আল্লাহ্ বলেন, তারা কী চায়? ফেরেশতারা বলে, জান্নাত। আল্লাহ্ বলেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা জবাব দেয়, না। আল্লাহ্ বলেন, যদি দেখতো? ফেরেশতারা বলে, তাহলে তো তাদের জান্নাতলাভের কামনা হতো আরো অধিক প্রবল। জান্নাতের জন্য তারা হয়ে উঠতো আরো বেশী চঞ্চল। আল্লাহ্ আবার জিজ্ঞেস করেন, তারা পরিত্রাণার্থী হয় কোন বস্তু থেকে। ফেরেশতারা বলে, জাহান্নাম থেকে। আল্লাহ্ বলেন, তারা কি কখনো জাহান্নাম দেখেছে? ফেরেশতারা বলে, না। আল্লাহ্ বলেন, যদি দেখতো? ফেরেশতারা বলে, তাহলে তো তারা হয়ে যেতো আরো অধিক ভীত-সন্ত্রস্ত। আল্লাহ্ বলেন, হে ফেরেশতামণ্ডলী! তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। জনৈক ফেরেশতা বলে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন যে ঘটনাক্রমে অকস্মাৎ উপস্থিত হয়েছে। জিকিরের উদ্দেশ্য তার আদৌ নেই। আল্লাহ্পাক বলেন, তা হোক। আমার জিকিরকারী বান্দাগণের সঙ্গে যারা উপবেশন করে, তারা কখনো হতভাগ্য নয়। বোখারী। মুসলিমও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনাটির শেষাংশ এরকম— জনৈক ফেরেশতা তখন বলে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! একজন পথিক ভুলক্রমে সেখানে বসে পড়েছে। আল্লাহ্ বলেন, আমি মার্জনা করলাম তাকেও। জিকিরকারীদের দলভুক্তরা সৌভাগ্যবঞ্চিত নয়।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, স্বর্গোদ্যানের পাশ দিয়ে গমন করার সুযোগ পেলে স্বর্গস্বাদ গ্রহণ না করে চলে যেয়ো না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! স্বর্গোদ্যান আবার কী? তিনি স. বললেন, জিকিরের অধিবেশন। তিরমিজি।

হজরত মুয়াবিয়া থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, একবার সাহাবীগণের এক সমাবেশ দেখে রসুল স. থামলেন। বললেন, তোমরা এখানে সমবেত হয়েছো কেনো? সাহাবীগণ বললেন, আমাদেরকে প্রদত্ত অপরিমেয় অনুগ্রহের স্মৃতিচারণার্থে। আমরা অনুগ্রহদাতার স্তব-স্তুতি বর্ণনা করি। তিনিই দয়া করে আমাদেরকে বানিয়েছেন মুসলমান। এ যে তাঁর সীমাহীন কৃপা। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের মতো বান্দাকে নিয়ে গর্ব করেন।

ইমাম মালেক বলেছেন, আমার নিকট এই তথ্যটি পৌঁছেছে যে, রসুল স. বলেছেন, জিকিরমগ্ন ও জিকিরবিচ্যুতদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যথাক্রমে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের বিরুদ্ধে অকুতোভয় যোদ্ধা এবং ধর্মযুদ্ধ থেকে পলাতক কাপুরুষ।

www.eelm.weebly.com

বায়ীন বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন ব্যক্তিদের মধ্যে জিকিরকারী যেনো বিরস বৃক্ষকাণ্ডে পল্লবিত শাখা। যেনো অন্ধকার গৃহমধ্যে প্রদীপের আলো। যারা অমনোযোগীদের মধ্যে আল্লাহ্র স্মরণমগ্ন, মৃত্যুপূর্বেই আল্লাহ্ দেখিয়ে দেন তাদেরকে তাদের জান্নাতের ঠিকানা। তাদের পাপ সকল মানব-দানব-প্রাণী-পাখীর সমতুল হলেও আল্লাহ্ তা মাফ করে দেন।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবালের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নিষ্কৃতিপ্রদায়ক একমাত্র আমল হচ্ছে জিকির। মালেক, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ফেরেশতারা জিকিরের সমাবেশকে বৃত্তাকারে ঘিরে রাখে। আল্লাহ্র করুণার বিরতিহীন বর্ষণ হয় ওই সমাবেশের উপর। অবতীর্ণ হয় সাকিনা (আত্মিক প্রশান্তি)। আর জিকিরকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ আলোচনা করেন তাঁর নৈকট্যভাজন ফেরেশতাদের সঙ্গে। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে, তার কাছে আমি তেমনই। আর আমাকে যখন সে স্মরণ করে তখন আমি হই তার সতীর্থ। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে স্মরণ করি সঙ্গোপনে। আর যদি সে আমাকে স্মরণ করে যুথবদ্ধ হয়ে, তবে আমিও তাকে স্মরণ করি ফেরেশতাদের সঙ্গে যুথবদ্ধ হয়ে। বুখারী, মুসলিম।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'আল্লাহ্র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ' কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে— তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। মানুষ মুখাপেক্ষী। তাই আল্লাহ্র জিকির তার কর্তব্য ও প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ্ চিরঅমুখাপেক্ষী। সুতরাং তিনি অন্যের জিকির করবেন কেনো? সুতরাং বুঝতে হবে আল্লাহ্র জিকির করার বিষয়টিই সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ। এরকম তাফসীর বর্ণিত হয়েছে মুজাহিদ, ইকরামা ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকেও। আর এক বর্ণনানুসারে হজরত ইবনে আব্বাসের তাফসীরও এরকম।

বাগবী লিখেছেন, নাফেয়ের মধ্যস্থতায় মুসা ইবনে উকবার বিবরণে এসেছে, হজরত ইবনে ওমরও সর্বোন্নত সূত্রে রসুল স. থেকে সরাসরি এরকম ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— তোমরা আল্লাহ্র জিকির করতে কার্পণ্য কোরো না। কারণ জিকিরকারী আল্লাহ্র অতুলনীয় স্মৃতিসন্নিহিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। সুতরাং মনে রেখো, তোমাদের স্মরণের তুলনায় আল্লাহ্র স্মরণ অনেক অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ, মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তা জানেন'। আতা বলেছেন, একথার অর্থ— তোমাদের কোনোকিছুই আল্লাহ্র কাছে গোপন নয়।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ৪৬

وَلَا تُجَادِلُوٓا اَهۡلَ الۡكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىۡ هِىَ اَحۡسَنُ ‌ۖ اِلَّا الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا مِنۡهُمۡ‌ وَقُوۡلُوۡۤا اٰمَنَّا بِالَّذِىۡۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡنَا وَاُنۡزِلَ اِلَيۡكُمۡ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمۡ وَاحِدٌ وَّنَحۡنُ لَهٗ مُسۡلِمُوۡنَ ﴿۴۶﴾

r তোমরা কিতাবীদিগের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিবে, কিন্তু সৌজন্যের সহিত তবে তাহাদিগের সহিত নহে যাহারা উহাদিগের মধ্যে সীমালংঘনকারী। এবং বল, 'আমাদিগের প্রতি ও তোমাদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদিগের ইলাহ্ ও তোমাদিগের ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তাঁহারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা কিতাবীর সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে, কিন্তু সৌজন্যের সঙ্গে'। একথার অর্থ— তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে গায়ে পড়ে ধর্মালোচনা করতে যেয়ো না। কেননা তারা উন্নাসিক ও কুটিল। তবে যদি পারো, তবে শিষ্টাচার বজায় রেখে কোরআনের সুললিত বাণীর মাধ্যমে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা কোরো। উপস্থাপন করতে প্রয়াস পেয়ো কোরআনের দলিল-প্রমাণসমূহ।

এখানে 'ইল্লা' (তবে) ব্যতিক্রম বোধক অব্যয়টি বিচ্ছিন্নধর্মী, অথবা বিকর্তিত। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— কিতাবীদের উন্নাসিকতার বিপরীতে তোমরা প্রদর্শন কোরো নম্রতা। সহ্য কোরো তাদের আক্রমণাত্মক মনোভাবকে। তিক্ত বিতর্কের দিকে যেয়োই না। আর যেহেতু শুভকামনা ও সদুপদেশ বিতণ্ডার মধ্যে পড়ে না, তাই এখানকার ব্যতিক্রমটিকে বলা যেতে পারে বিকর্তিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে তাদের সঙ্গে নয়, যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী'। একথার অর্থ— তবে তাদের মধ্যে যারা চুক্তিভঙ্গকারী এবং জিযিয়া কর দিতে অসম্মত, তাদের সঙ্গে কোনো তর্ক-বিতর্ক নয়, বরং তাদের বিরুদ্ধে কোরো সংগ্রাম। সমুচিত জবাব দিও অস্ত্রের মাধ্যমে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন সাঈদ ইবনে যোবায়ের। তিনি আরো বলেছেন, বিধর্মী রাষ্ট্রের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অবশ্য এ বিধানটি কার্যকর নয়। কারণ তাদের নিরাপত্তা মুসলিম রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। সুতরাং জিযিয়াও তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের বিধানটি জেহাদ অত্যাবশ্যক হওয়ার পূর্বের। কারণ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। আর জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হিজরতের পরে মদীনায়। সুতরাং এখানকার 'সীমালংঘনকারী' কথাটির অর্থ হবে দুর্বিনীত, অবাধ্য অথবা শত্রু মনোভাবাপন্ন। কেউ কেউ মনে করেন, এখানে প্রতিবাদী হতে বলা হয়েছে ইহুদী-খৃষ্টানদের ওই সকল অপবচনসমূহের, যেগুলো চরম গর্হিত ও অংশীবাদীতাচ্ছন্ন। যেমন তাদের কেউ কেউ বলে আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ বলে 'আল্লাহ্ অভাবী, আর আমরা ধনী'। আবার কেউ কেউ বলে 'আল্লাহ্ কৃপণ এবং আমরা হচ্ছি দানশীল' ইত্যাদি। এ কারণেই আয়াতটিকে রহিত সাব্যস্ত করেছেন কাতাদা ও মুকাতিল।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বলো, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি'। একথার অর্থ— হে রসুলের সহচরবর্গ! তোমরা বলো, আমাদের প্রতি যে গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতি আমরা তো বিশ্বাস স্থাপন করিই, তৎসঙ্গে বিশ্বাস করি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও ইঞ্জিলকেও। সুতরাং তোমাদের সঙ্গে আমাদের মনোমালিন্য থাকবে কেনো?

বলা বাহুল্য, এমতো সৌজন্য শোভিত ভাষাতেই দূর করতে হয় মনোমালিন্য ও বিতর্ক। অথবা কথাটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবে— তওরাত ও ইঞ্জিলের কোনো বাণী যদি অবিকৃতরূপে তোমাদের সামনে পাঠ করা হয়, তবে তোমরা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নিয়ো। কিন্তু তাদের মনগড়া কোনো কথা মেনো না। যেমন তারা বলে 'নবী মুসার শরিয়ত অনাগতকাল ধরে চলবে' 'নবী ঈসাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে' 'মসীহ হচ্ছেন আল্লাহর পুত্র' ইত্যাদি। এ সকল অসত্য কথনের ক্ষেত্রে হতে হবে প্রচণ্ড প্রতিবাদী। প্রয়োজনে করতে হবে মুবাহিলা। মুবাহিলা বলে 'আমার কথা সত্য না হলে আমার উপরে নেমে আসুক আল্লাহ্র অভিসম্পাত' এরকম শপথানুষ্ঠান। অর্থাৎ তোমরা একথা বোলো যে, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থের উপরে আমরা অবশ্যই বিশ্বাস রাখি। কিন্তু তোমাদের স্বকপোলকল্পিত অপবচনগুলোকে কিছুতেই মানি না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমাদের ইলাহ্ ও তোমাদের ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী'। উল্লেখ্য, ইহুদী-খৃষ্টানেরা তাদের বিদ্বজ্জন ও সন্ন্যাসীদেরকে এক ধরনের উপাস্য মনে করো। তাদের এমতো অপবিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে। স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, উপাস্য কেবলই আল্লাহ্। অন্য কেউ নয়। আর আমরা কেবল তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পিত।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, ইহুদীরা হিব্রুভাষায় তওরাত আবৃত্তি করতো, তারপর তা বুঝিয়ে দিতো আরবী ভাষায়। ফলে আরবীভাষীরা একথা বুঝতে পারতো না যে, তারা ঠিকমতো ব্যাখ্যা করছে কিনা। এমতো দ্বিধাদ্বন্দ্বেই পতিত হতেন সাহাবীগণ। কারণ তাঁরা হিব্রু জানতেন না। রসুল স. তাই তাঁদেরকে বলতেন, তোমরা তাদের কথা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনোটাই কোরো না। শুধু বোলো, তোমাদের ও আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা তা বিশ্বাস করি।

হজরত নামলা আনসারী বলেছেন, আমি একদিন উপবিষ্ট ছিলাম রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। একটু পরে সেখানে উপস্থিত হলো একজন ইহুদী। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো একটি মৃতের জানাযা। ইহুদীটি জিজ্ঞেস করলো, মোহাম্মদ! বলতে পারেন, লাশটি কী বলছে, রসুল স. বললেন, না। ইহুদীটি বললো, সে বলছে এই এই কথাগুলো। ইহুদীটির প্রস্থানের পর রসুল স. আমাদেরকে বললেন, গ্রন্থধারীদের বর্ণনা শরিয়ত বিরুদ্ধে না হলে তোমরা পক্ষে-বিপক্ষে কোনো মন্তব্য কোরো না। কেবল বোলো, আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্কে, তাঁর রসুলগণকে এবং অবতারিত গ্রন্থসমূহকে। এরকম করলে তোমরা পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১

وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ
يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ
اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّ لَا
تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ
بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ
بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ
رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾

www.eelm.weebly.com

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾

r এইভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং যাহাদিগকে আমি কিতাব দিয়াছিলাম তাহারা ইহাতে বিশ্বাস করে এবং ইহাদিগেরও কেহ কেহ ইহাতে বিশ্বাস করে। কেবল সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

r তুমি তো ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর নাই এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লিখ নাই যে, মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করিবে।

r বস্তুতঃ যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগের অন্তরে ইহা স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল সীমালংঘনকারীরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে।

r উহারা বলে, 'তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট অলৌকিক নিদর্শন প্রেরিত হয় না কেন?' বল, 'নিদর্শন আল্লাহের ইখ্‌তিয়ারে।' আমিতো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।'

r ইহা কি উহাদিগের জন্য যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করিতেছি যাহা উহাদিগের নিকট পাঠ করা হয়। ইহাতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রহিয়াছে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এভাবেই আমি তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার পূর্বের নবী-রসুলগণের প্রতি আমি যেমন কিতাব অবতীর্ণ করেছিলাম, তেমনি আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছি এই কোরআন। সুতরাং এই কোরআন ইতোপূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের প্রত্যয়ক।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস করে'। একথার অর্থ— ইহুদী-খৃষ্টানদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তাদের কিতাবকে যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি বিশ্বাস করে আলকোরআনকেও। যেমন হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীগণ। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— গ্রন্থধারীরা রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের পূর্বে কোরআনকে বিশ্বাস করতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং এদেরও কেউ কেউ এতে বিশ্বাস করে'। একথার অর্থ— আপনার স্বজাতি এই মক্কাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ কোরআনকে বিশ্বাস করে। এভাবে হয়ে যায় মুসলমান এবং আপনার ঘনিষ্ঠ সহচর।

www.eelm.weebly.com

তারপর বলা হয়েছে— 'কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে'। একথার অর্থ ইহুদী-খৃষ্টান-পৌত্তলিকদের কেউ কেউ কোরআনে বিশ্বাসী বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই আবার কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসী। এরাই চিরহতভাগ্য, প্রকৃত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এরা কেবল কোরআন থেকে বিমুখ তা নয়, একই সঙ্গে বিমুখ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত অন্যান্য আকাশী গ্রন্থ থেকেও। কারণ কোরআন অস্বীকার করার অর্থ এর অবতারক আল্লাহ্কে অস্বীকার করা। আর আল্লাহ্কে অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত সমূদয় আকাশী গ্রন্থকে অস্বীকার করা, তওরাত-ইঞ্জিল যার অন্যতম। সুতরাং যারা দাবি করে 'আমরা তওরাত-ইঞ্জিলে বিশ্বাস করি, কিন্তু কোরআনে আমাদের বিশ্বাস নেই' তাদের দাবি অযৌক্তিক ও অগ্রহণীয়। কাতাদা বলেছেন, কোনোকিছুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাকে অস্বীকার করার নাম 'জুহুদ'। ইহুদী-খৃষ্টানেরা রসুল স. এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কোরআন সম্পর্কে আগে থেকেই জানতো। তৎসত্ত্বেও তারা তাঁকে এবং কোরআনকে করেছিলো অস্বীকার। এটাই তাদের 'জুহুদ' বা অস্বীকৃতি।

পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'তুমি তো এরপূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করোনি এবং স্বহস্তে কোনো কিতাব লিখোনি যে, মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করবে' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি আপনাকে করেছি উম্মি (অক্ষরের অমুখাপেক্ষী)। তাই তো গ্রন্থপঠন ও গ্রন্থরচনার দায় আপনার নেই। এমতো দায় যদি আপনার থাকতো, তবে তো ইহুদী-খৃষ্টান-পৌত্তলিকেরা এই মর্মে সন্দেহ পোষণ করতে পারতো যে, আপনি এই কোরআন রচনা করেছেন অধিত বিদ্যার উপরে ভর করে। কিন্তু সেরকম সন্দেহের অবকাশ তো এখানে নেই। সুতরাং যারা আপনাকে ও কোরআনকে অস্বীকার করে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

এখানে 'এর পূর্বে' অর্থ এই কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। 'বি ইয়ামিনিকা' অর্থ স্বহস্তে, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা। লেখালেখি করা হয় সাধারণতঃ ডান হাত দিয়েই। তাই 'স্বহস্তে' কথাটির উল্লেখের প্রয়োজন এখানে ছিলো না। তৎসত্ত্বেও লিপিক্রিয়ার সন্দেহকে সম্পূর্ণ অপসারণার্থেই শব্দটিকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এভাবে।

'মিথ্যাবাদীরা' অর্থ এখানে মক্কার মুশরিকেরা। রসুল স.কে কখনো পড়তে এবং লিখতে না দেখা সত্ত্বেও যেহেতু তারা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশকে সন্দেহের চোখে দেখতো, তাই তাদেরকে এখানে বলা হয়েছে মিথ্যাবাদী। কাতাদার ব্যাখ্যা এরকমই।

মুকাতিল বলেছেন, এখানকার 'মুবত্বীলূন' অর্থ মিথ্যানুসারী ইহুদী-খৃষ্টান। তারা তাদের আপনাপন ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই একথা জানতে পেরেছিলো

www.eelm.weebly.com

যে, সর্বশেষ রসুল হবেন অক্ষরের অমুখাপেক্ষী— উম্মি। তৎসত্ত্বেও তারা ছিলো সন্দেহের আবর্তে ঘূর্ণায়মান। এমতো সচেতন সন্দেহ প্রকশ করার কারণেই তাদেরকে এখানে বলা হয়েছে 'মুবত্বীলূন' বা মিথ্যানুসারী।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন'। একথার অর্থ— যাদেরকে দেওয়া হয়েছে বিশ্বাসজ জ্ঞান, তাদের হৃদয়েই কোরআন সুরক্ষিত ও সুমুদ্রিত। কোরআন যে রসুল স. কর্তৃক লিখিত, সম্পাদিত অথবা সংকলিত কোনো গ্রন্থ নয়, এ যে এক সুস্পষ্ট নিদর্শন— একথা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে কেবল তারাই। কোরআন স্বমহিমায় সতত সত্যাধিষ্ঠিত। আর বিশ্বাসীরাই এর ধারক, বাহক, সংরক্ষক, প্রচারক ও বাস্তবায়ক। পরিযোজন, পরিবিয়োজন ও পরিবর্ধন থেকে এই কোরআন চিরসুরক্ষিত। অন্যান্য আসমানী গ্রন্থাবলীর এমতো বৈশিষ্ট্য নেই। এছাড়া এ অনন্য গ্রন্থ সর্বযুগে বহুসংখ্যক বিশ্বাসী সহজে স্মৃতিবদ্ধ করে রাখে। আর অন্যান্য গ্রন্থ স্মৃতিবদ্ধ হওয়ার ঘটনা বিরল। সেগুলো পঠিত হয় দেখে দেখে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'হুয়া' সর্বনামটির লক্ষ্য রসুল স. এর মহিমাময় সত্তা। আর 'যাদেরকে দেওয়া হয়েছে জ্ঞান' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— তওরাত ও ইঞ্জিলে রয়েছে রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিশদ বিবরণ। সুতরাং তারা তাঁকে ভালো করেই চেনে। আর একথাও ভালো করে জানে যে কোরআন দিবালোকাপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট একটি নিদর্শন।

এরপর বলা হয়েছে— 'কেবল সীমালংঘনকারীরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে'। 'জুলুম' অর্থ অপাত্রে স্থাপন। অর্থাৎ যথাসীমা উল্লংঘন। কোরআনের শব্দাবলী ও মর্ম স্বমহিমায় সতত সুস্পষ্ট ও সুপ্রকট। এতদসত্ত্বেও যে এই অপার্থিব নিদর্শনকে অস্বীকার করে সে সীমালংঘনকারী বৈকি।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'তারা বলে, তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট অলৌকিক নিদর্শন প্রেরিত হয় না কেনো'? একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা বলে, মোহাম্মদ যদি নবীই হবেন, তবে পূর্ববর্তী নবীগণের মতো তার সঙ্গে অলৌকিকত্ব নেই কেনো? যেমন নবী সালেহের উষ্ট্রী, নবী মুসার যষ্টি, নবী ঈসার আসমানী আহার্যাধার।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, নিদর্শন আল্লাহ্র এখতিয়ারে। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদের অপকথনের জবাবে জানিয়ে দিন, নিদর্শন তো সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্র

www.eelm.weebly.com

অভিপ্রায়াধীন বিষয়। আর আমি তো প্রেরিত হয়েছি মানুষকে সতর্ক করণার্থে। আমার কাজ শুধু এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করা যে, হে বিভ্রান্ত মানুষ! পরিত্যাগ করো আল্লাহ্দ্রোহিতার পথ। ফিরে এসো মহাসত্যের আশ্রয়ে। নতুবা পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে অথবা কেবল পরবর্তী পৃথিবীতে তোমাদের উপরে আপতিত হবে আল্লাহ্র আযাব।

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কোরআন অবতীর্ণ করছি যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়'। একথার অর্থ'— তারা কেবল নিদর্শন নিদর্শন করে চেঁচায়। কিন্তু এই সর্ববৃহৎ নিদর্শনটিকে কেনো উপলব্ধি করতে পারে না যে, সর্বজ্ঞানের আধার এই কোরআন যিনি তাদের সামনে প্রতিনিয়ত পাঠ করে চলেছেন, তিনি অক্ষরপরিচয়বিমুক্ত।

এখানে 'আল কিতাব' অর্থ কোরআন, যা একাধারে সুবৃহৎ নিদর্শন ও যাবতীয় জ্ঞানের আকর। আবার যা ধর্মবিধানের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে অবতারিত গ্রন্থসমূহের সমান্তরাল।

জনৈক কবি বলেছেন—
লাম তাক্বতারিন বিযমানিন ওয়াহিয়া তুখবিরুহা
আনিল মাআ'দি ওয়া আ'ন আ'দিন ওয়া আন ইরামী
দামাত লাদাইনা ও ফাক্বত কুললা মু'জিযাতিন্
মিনান নাবীয়্যিনা ইজ জ্বাআত ওলাম তুদামী।

অর্থঃ যে সময় রসুল স. আবির্ভূতই হননি, কোরআন আমাদেরকে জানায় সেই সময়ের ইতিবৃত্ত— আ'দ জাতির ও সাবা নগরীর। আরো জানায় অনাগত ভবিষ্যতের সংবাদ— মহাপ্রলয়। এই অপার্থিব বাণীসম্ভার আমাদের জীবনে প্রবহমান রয়েছে কাল থেকে কালান্তরে। এই নিদর্শনটি সকল নবীর নিদর্শনরাজি অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। কারণ এর অলৌকিকত্ব অবিনশ্বর। আর সকল নবীর অলৌকিকত্ব এর অন্তর্ভূত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে।

এখানে 'ফী জালিকা' অর্থ এতে, এই কোরআনে। যা সকলের জন্য উন্মুক্ত একটি চিরন্তন মোজেজা। 'লিক্বওমিঁই ইয়ু'মিনূন' অর্থ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। অর্থাৎ তাদের জন্য, অবিশ্বাস, অপবিশ্বাস ও একদেশদর্শিতা যাদের স্বভাব নয়।

ইমাম দারেমীর মসনদে এবং আবু দাউদের মারাসীলে আমর ইবনে দীনারের পদ্ধতিতে ইয়াহ্ইয়া ইবনে যায়দার বরাতে প্রায়োন্নতরূপে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার কিছুসংখ্যক মুসলমান একটি পশুর

www.eelm.weebly.com

উরুদেশের অস্থি নিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. সকাশে। ওই অস্থিপটে লিপিবদ্ধ ছিলো ইহুদীদের নিকট থেকে শোনা কিছু কথা। রসুল স. তা দেখে বললেন, বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, মানুষ তাদের নিজস্ব নবীর উপরে অবতারিত বিষয়াবলীকে উপেক্ষা করে অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করে অন্য কোনো নবীর বিষয়ে। একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— আওয়ালাম ইয়াকফীহিম আন্‌না আনযালনা আলাইকাল কিতাবা ......(তাদের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে,— আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি কিতাব)। এক বর্ণনায় এসেছে, একবার ইহুদী কা'ব ইবনে আশরাফ বললো, মোহাম্মদ! আপনি যে রসুল সে বিষয়ে কোনো সাক্ষী আছে কী? তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُوْنَ ﴿৫২﴾ وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَ لَوْ لَاۤ اَجَلٌ
مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَ لَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا
يَشْعُرُوْنَ ﴿৫৩﴾ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ
بِالْكٰفِرِيْنَ ۙ﴿৫৪﴾ يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ
اَرْجُلِهِمْ وَ يَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿৫৫﴾ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْۤا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ﴿৫৬﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ
الْمَوْتِ ۫ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿৫৭﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۖ﴿৫৮﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿৫৯﴾

www.eelm.weebly.com

r বল, 'আমার ও তোমাদিগের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত এবং যাহারা অসত্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্কে অস্বীকার করে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।'

r উহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, যদি শাস্তির কাল নির্ধারিত না থাকিত তবে শাস্তি উহাদিগের উপর আসিত। নিশ্চয়ই উহাদিগের উপর শাস্তি আসিবে আকস্মিকভাবে, উহাদিগের অজ্ঞাতসারে।

r উহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, জাহান্নাম তো সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণকে পরিবেষ্টন করিবেই।

r সেইদিন শাস্তি উহাদিগকে গ্রাস করিবে ঊর্ধ্ব এবং অধঃদেশ হইতে এবং তিনি বলিবেন 'তোমরা যাহা করিতে তাহার স্বাদ গ্রহণ কর।'

r হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।

r জীব মাত্রই মরণশীল; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

r যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাহাদিগের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করিব জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে, কত উত্তম পুরস্কার সৎকর্মশীলদিগের,

r যাহারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাহাদিগের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! যারা সাক্ষী তালাশ করে তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্ই তো আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। অন্য সাক্ষীর আর প্রয়োজন কী? আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত। আর যারা এই সত্যকে অবিশ্বাস করেছে ও আল্লাহর প্রতি জানিয়েছে অস্বীকৃতি, তারা জান্নাতের বদলে গ্রহণ করেছে জাহান্নাম। এভাবে চিরতরে হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে অসত্যে বিশ্বাস করে, অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ— তারা পূজা করে অন্যের।

পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদি শাস্তির কাল নির্ধারিত না থাকতো তবে শাস্তি তাদের উপর আসতো। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে'।

www.eelm.weebly.com

নজর ইবনে হারেছ বলেছিলো, হে আল্লাহ্! মোহাম্মদের কথা যদি সত্যি হয়, তবে আকাশ থেকে আমার উপর প্রস্তর বর্ষণ করো। তার এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'আজ্বালুম মুসাম্‌মা' কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রসুলকে বলেছেন, 'আপনার জাতিকে সমূলে ধ্বংস করবো না' এরকম অঙ্গীকার যদি আপনার সঙ্গে আমার না থাকতো, তাহলে অবশ্যই তাদের উপর নেমে আসতো আমার সর্বগ্রাসী শাস্তি। একারণেই আমি মহাপ্রলয় পর্যন্ত আপনার উম্মতের উপর সর্বগ্রাসী আযাব স্থগিত রেখেছি। একথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন— 'বালিস সায়াতু মাওইদুহুম' (বরং মহাপ্রলয়ই হচ্ছে তাদের শাস্তির অঙ্গীকৃত সময়)।

জুহাক বলেছেন, 'আজ্বালুম মুসাম্মা' অর্থ এখানে আয়ুষ্কাল। অর্থাৎ নির্ধারিত আয়ুষ্কাল শেষে তাদের উপর নেমে আসবে শাস্তি। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'নির্ধারিত কাল' অর্থ বদর যুদ্ধ। অর্থাৎ বদর যুদ্ধই হচ্ছে তাদের শাস্তির নির্ধারিত সময়।

'লা জ্বাআ হুমুল আ'জাব' অর্থ নিশ্চয় তাদের উপর শাস্তি আসবে। 'লাইয়া'তিইয়ান্‌নাহুম' অর্থ অবশ্যই তাদের উপর আসবে। এখানকার 'হুম' সর্বনামটি যুক্ত হবে 'শাস্তি' অথবা 'সময়' যে কোনো একটির সঙ্গে।

'বাগতাতান্' অর্থ অকস্মাৎ। অর্থাৎ আকস্মিকভাবে এই পৃথিবীতেও কখনো কখনো শাস্তি এসে পড়তে পারে। যেমন এসে পড়েছিলো বদর যুদ্ধের সময়। আর স্থায়ী শাস্তি তো নির্ধারিত রয়েছে পরকালের জন্য। আর 'লা ইয়াশউ'রূন' অর্থ তাদের অজ্ঞাতসারে।

এরপরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; জাহান্নাম তো সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পরিবেষ্টন করবেই'।

এখানে 'আলকাফিরীন' (সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা) এর 'আলিফ লাম' অঙ্গীকৃত প্রকৃতির অব্যয়। এখানে সর্বনামের স্থলে প্রকাশ্যত নামপদ 'আলকাফিরীন' উল্লেখ থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, রীতিমতো আযাব তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেই। অথবা বলা যেতে পারে, 'আলিফ লাম' এখানে জাতিবাচক। এমতাবস্থায় সাধারণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিধান বর্ণনা করে এখানে বিশেষ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকেও (নজর ইবনে হারেছকেও) এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'সেদিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে ঊর্ধ্ব ও অধঃদেশ থেকে এবং তিনি বলবেন, তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ করো'। একথার অর্থ— মহাবিচার পর্ব শেষ হবার পর শুরু হবে তাদের অন্তহীন

www.eelm.weebly.com

শাস্তি। সকল দিক থেকেই তারা হবে মহাশাস্তিপরিবেষ্টিত। আর আল্লাহ্ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, পৃথিবীতে তোমরা যে মহাঅপরাধ করতে আজ ভোগ করো তার প্রতিফল।

এরপরের আয়াতে (৫৬)বলা হয়েছে— 'হে আমার বিশ্বাসীদাসগণ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো'। একথার অর্থ— হে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তিবর্গ! তোমাদের স্বসমাজ ও স্বদেশ যদি আমার ইবাদতের অন্তরায় হয়, তবে তোমরা হিজরত করে চলে যাও অন্য কোনো দেশে, যেখানে রয়েছে আমার ইবাদত করার অবাধ সুযোগ। ভুলে যেয়ো না, আমার পৃথিবী প্রশস্ত।

এখানকার 'ইয়্যাইয়া' হচ্ছে একটি প্রচ্ছন্ন ক্রিয়ার কর্মপদ। ওই উহ্য পদসহ বাক্যাংশটি দাঁড়ায় 'উ'বুদূ ইয়্যাইয়া' (শুধু আমারই ইবাদত করে)।

মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, সামর্থ্যহীনতার কারণে যে সকল মক্কাবাসী মুসলমান হিজরত করতে পারেননি, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাঁদের সম্পর্কে। একথার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে দুর্বলচেতা মুসলমান! মক্কায় যদি তোমরা প্রকাশ্যে ইমানের ঘোষণা দিতে না পারো, তবে হিজরত করে গমন করো অন্য কোনো স্থানে, যেমন মদীনায়। সেখানে তোমরা ইমান ও ইবাদতের ব্যাপারে হতে পারবে অপ্রতিরোধ্য। মনে রেখো, আমার দুনিয়া অবিস্তৃত নয়।

মুজাহিদ বক্তব্যটির অর্থ করেছেন— আমার পৃথিবী সুবিস্তৃত। সুতরাং জন্মভূমি ছেড়ে চলে যাও নিরাপদ কোনো স্থানে। সেখানে গিয়ে ইবাদত বন্দেগী করো এবং শক্তি সঞ্চয় করো যুদ্ধের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করো হৃত জন্মভূমি। সাইদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, বক্তব্যটির মর্মার্থ হবে এরকম— কোনো জনপদে যদি ব্যাপকভাবে পাপের প্রসার ঘটে, তবে ওই জনপদ পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করো। আতা অর্থ করেছেন— তোমার আপন বসতি যদি পাপেপাপে ছেয়ে যায়, তবে সেখান থেকে চলে যাও অন্য কোনো জায়গায়, সেখানে রয়েছে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের অবাধ অবকাশ। কেননা আমার ভূপৃষ্ঠ এতো সংকীর্ণ নয়।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, কিছু সংখ্যক মুসলমান হিজরতের নিরুদ্দেশ যাত্রাকে মেনে নিতে পারলেন না। ভাবলেন, বিদেশ বিভুঁয়ে আমরা আবাস ও আহার্যের অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরবো। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁদের এমতো চিন্তাকে প্রশ্রয় দেননি। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে খণ্ডন করেছে তাঁদের অজুহাত।

www.eelm.weebly.com

মাতরাফ ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, এখানে 'আমার পৃথিবী প্রশস্ত' অর্থ আমার উপজীবিকা সুপ্রশস্ত। অর্থাৎ ধর্মরক্ষার জন্য তোমরা দেশত্যাগ করো। উপজীবিকা দেবো তো আমিই। রসুল স. জানিয়েছেন, কেবল ধর্মরক্ষার্থে যদি কেউ জন্মভূমি পরিত্যাগ করে স্থানান্তরে গমন করে, তবে সে হয়ে যায় জান্নাতের যোগ্য। এমতাবস্থায় এক বিঘত স্থান অতিক্রম করলেও সে হয়ে যায় মোহাম্মদ ও ইব্রাহিমের প্রিয়জন। প্রায়োন্নত সূত্র পরম্পরায় হাসান বাসরী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ছা'লাবী।

এরপরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'জীব মাত্রই মরণশীল; অতঃপর তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে'। একথার অর্থ— তোমরা মৃত্যুভয়ে অন্যত্র গমনে অনীহ, কিন্তু মনে রেখো, মৃত্যুকে তোমরা কখনোই এড়াতে পারবে না। নির্ধারিত সময়ে সকলকেই গ্রহণ করতে হবে মৃত্যুর তিক্ততম আস্বাদ। সুতরাং সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করো নির্বিঘ্ন ইবাদতের বিষয়টিকে। হিজরত করো এভাবে যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করো মৃত্যুর জন্য। অবশেষে আমার কাছে তো তোমাদেরকে চূড়ান্ত জবাবদিহি করতেই হবে। তখন আমিই তোমাদের জন্য নির্ধারণ করবো চিরস্বস্তি অথবা চিরশাস্তি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করবো জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কতো উত্তম পুরস্কার সৎকর্মশীলদের (৫৮), যারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে (৫৯)।

এখানে 'আল্লাজিনা সাবারূ' অর্থ যারা ধৈর্য অবলম্বন করে। অর্থাৎ যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অত্যাচার, হিজরত এবং নানাবিধ দুঃখ যাতনা সহ্য করে নেয়, নির্ভর করে কেবল আপন প্রভুপালকের উপর। উল্লেখ্য, এধরনের ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ্তায়ালা জীবনোপকরণ প্রদান করেন তাদের কল্পনাতীত সূত্রে।

বাগবী লিখেছেন, হিজরতের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর অনেকেই হিজরত করলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসলমান তখনো রয়ে গেলেন মক্কায়। তাঁরা বলতে শুরু করলেন, মদীনা তো আমাদের জন্য প্রবাস। সেখানে যে আমাদের ঘর দোর বিষয় সম্পত্তি কিছুই নেই। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ

www.eelm.weebly.com

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٠﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى
يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦١﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ يَقْدِرُ
لَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ
السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

r এমন বহু জীব-জন্তু আছে যাহারা নিজদিগের খাদ্য মওজুদ রাখে না; আল্লাহ্ই জীবনোপকরণ দান করেন উহাদিগকে ও তোমাদিগকে; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

r যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন?' উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' তাহা হইলে উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে।

r আল্লাহ্ তাঁহার দাসদিগের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা হ্রাস করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

r যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ভূমি মৃত হইবার পর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া কে উহাকে সঞ্জীবিত করে? উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'প্রশংসা আল্লাহেরই' কিন্তু ইহা উহাদিগের অধিকাংশই অনুধাবন করে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এমন বহু জীব-জন্তু আছে, যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না; আল্লাহ্ই জীবনোপকরণ দান করেন, তাদেরকে ও তোমাদেরকে'। একথার অর্থ— বিহঙ্গকুল, অসংখ্য চতুষ্পদ জন্তু ও অন্যান্য প্রাণী পানাহারের মুখাপেক্ষী। তৎসত্ত্বেও তারা পানাহারসামগ্রী বয়ে নিয়ে বেড়ায় না। রিজিকের সঞ্চয়ও তাদের নেই। তাদেরকেও তো রিজিক আল্লাহ্ই দেন, যেমন দেন তোমাদেরকে। যারা সঞ্চয়প্রবণ।

সুফিয়ান ইবনে আলী ইবনে আরকাম বলেছেন, মানুষ, ইঁদুর ও পিপীলিকা ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী আহার্যসঞ্চয়ী নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় আলোচ্য উদ্ধৃতাংশের মর্মার্থ দাঁড়াবে— ভূচর, জলচর ও খেচর সকলেরই রিজিকের

www.eelm.weebly.com

প্রয়োজন। অথচ তারা সঞ্চয়ী নয়। তাদের রিজিকও তো আল্লাহ্ই সরবরাহ করেন। আর তোমরা যারা সঞ্চয় করে রাখো, তাদেরও একমাত্র রিজিকদাতা তো আমিই। সুতরাং এমন কেউই নেই, যারা আমা কর্তৃক প্রদত্ত জীবনোপকরণনির্ভর নয়। এভাবে এক সময় সকলেরই সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে পার্থিব জীবনোপকরণের সঙ্গে। তখন সকলকেই বরণ করতে হয় মৃত্যু— সঞ্চয়ীদেরকেও। অসঞ্চয়ীদেরকেও। যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেনো — গৃহে অথবা প্রবাসে। সুতরাং হে মানুষ! জীবনোপকরণ চিন্তা তো তোমাদের প্রয়োজন বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য নয়। তোমরা না বিশ্বাসী। তোমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহর নির্দেশানুগত হওয়া। তাঁর নির্বিঘ্ন ইবাদত করার বিষয়টিকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— মনে রেখো আল্লাহ্ই সর্বশ্রোতা। সুতরাং হিজরত করার ব্যাপারে তোমরা যে বাচনিক অনাগ্রহ প্রকাশ করেছো, তা তিনি ঠিকই জানতে পেয়েছেন। আরো মনে রেখো, তিনি সর্বজ্ঞও। সুতরাং তোমাদের হৃদয়ের বিশ্বাসগত দুর্বলতার বিষয়টিকেও তিনি ভালো করেই জানেন।

শিথিল সূত্রে আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে আবী হাতেম, বায়হাকী, ইবনে আসাকের ও বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর সঙ্গে জনৈক আনসারের খেজুর বাগানে প্রবেশ করলাম। তিনি গাছ থেকে পাকা খেজুর ছিঁড়ে খেতে শুরু করলেন। বললেন, তুমিও খাও। আমি বললাম, হে আল্লাহের রসুল! আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। তিনি স. বললেন, আমার খুব খেতে ইচ্ছে করছে। কারণ চার দিন ধরে আমি অভুক্ত। আমি নিবেদন করলাম 'ইন্না লিল্লাহিল মুসতাআন' (আমরা তো ওই সাহায্যদাতা আল্লাহ্র জন্য)। তিনি স. বললেন, শোনো আবদুল্লাহ্! আমি চাইলে আল্লাহ্ আমাকে দান করতেন পারস্যরাজ ও রোম সম্রাটের চেয়েও অধিক সম্পদ। কিন্তু আমি তো তা চাই না। চাই একদিন অভুক্ত থাকি। আর একদিন করি পানাহার। তোমার আয়ুষ্কাল যদি দীর্ঘ হয়, তবে তোমাদেরকে বাস করতে হবে ওই লোকদের সঙ্গে, যারা খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রাখে। আল্লাহ্ যে সকল প্রাণীর রিজিকদাতা, সে বিশ্বাস তাদের থাকবে না। হজরত ইবনে ওমর বলেন, আমি ওই স্থান পরিত্যাগ করার আগেই অবতীর্ণ হলো— এমন বহু জীব-জন্তু আছে, যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না.......।

হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. আগামী দিনের জন্য কোনো সঞ্চয় রাখতেন না। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি এবং বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

www.eelm.weebly.com

হজরত ওমর বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, তোমরা যদি আল্লাহ্র প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে, তবে তিনি তোমাদেরকে সেভাবেই রিজিক দিতেন, যেমন দিয়ে থাকেন পক্ষীকুলকে। তারা উষাকালে নীড় ত্যাগ করে শূন্য উদরে, আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে নীড়ে পরিতৃপ্ত হয়ে। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে আচরণ জান্নাতের সমীপবর্তী করে এবং দোজখকে করে দূরবর্তী, তার সংবাদ আমি তোমাদেরকে জানিয়েছি। জানিয়েছি ওই বিষয়াবলীর কথাও, যা দোজখকে নিকটবর্তী করে এবং দূরে রাখে জান্নাতকে। ভ্রাতা জিব্রাইল আমার হৃদয়ে আর একটি কথা উদয় করিয়ে দিয়েছে। কথাটি এই— নির্ধারিত রিজিক শেষ হওয়ার আগে কেউই মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব তোমরা সতর্ক হও। ভয় করো আল্লাহ্কে। আর রিজিক অন্বেষণে অবলম্বন করো উত্তম পন্থা। বিলম্বিত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধৈর্যচ্যুত হয়ে অবৈধ পথে রিজিক আহরণের চেষ্টা কোরো না। কারণ, আল্লাহ্র কাছে যা সংরক্ষিত, তা তাঁর আনুগত্য বিহনে অর্জিত হয় না। বাগবী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'শরহে সুন্নাহ্'য় এবং 'মারাসীল' রচয়িতা বর্ণনা করেছেন তাঁর নিজস্ব গ্রন্থে।

পরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— 'যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। তাহলে তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছো? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করে দেখুন— 'আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা এবং চন্দ্র-সুর্যের নিয়ন্ত্রক কে? দেখবেন তারা দ্বিধাহীনভাবে উত্তর দিবে— আল্লাহ্। এরপরেও দেখুন তারা আল্লাহ্কে ত্যাগ করে গ্রহণ করেছে পৌত্তলিকতাকে। বিষয়টি বিস্ময়ের নয় কি?

এরপরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তো সকলকেই রিজিক দেন। তবে কাউকে দেন অপরিমেয় এবং কাউকে পরিমিত। এমতো তারতম্য সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায়াগত। আর কল্যাণকর-অকল্যাণকর সকল বিষয়ই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত।

হজরত আনাস থেকে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, আল্লাহ্পাক বলেন, আমার কোনো কোনো বান্দা অতিরিক্ত ইবাদতের অভিলাষ জানায়। কিন্তু আমি তাদেরকে সে সুযোগ দেই না। কারণ অতিরিক্ত ইবাদত তাদেরকে অহংকারী করবে। ফলে তার সবকিছু হয়ে যাবে বরবাদ। আবার আমার কোনো কোনো স্বচ্ছল দাস এমন, যাদের ইমান রক্ষা হয় ওই স্বচ্ছলতার

www.eelm.weebly.com

কারণেই। যদি আমি তাদেরকে বিত্তশূন্য করি, তবে তারা হয়ে যাবে ইমানহারা। কতক বান্দা আবার এমন যে, কপর্দকশূন্যতাই তাদের ইমানকে সতেজ রাখে। যদি আমি তাদেরকে বিত্তপতি করি, তবে তারাও হয়ে যাবে ইমানবিচ্যুত। আবার সুস্থতার কারণে ইমান রক্ষা করে চলেছে— এমন কিছু সংখ্যক বান্দাও আমার রয়েছে। তাদেরকে যদি আমি পীড়িত করি তবে তাদের ইমান রক্ষা করা হবে দুষ্কর। আবার কেউ কেউ এর বিপরীত। রোগগ্রস্ততাই তাদের ইমানকে সবল রাখে। তাদেরকে যদি আমি রোগমুক্ত করি, তবে তারা হারিয়ে ফেলবে ইমান। নিশ্চয় আমি আমার বান্দাগণের অন্তরের খবর জানি। তাই তাদের ইমান রক্ষার জন্য আমি করেছি যথাযথ ব্যবস্থা। আমি তো সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

এরপরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, ভূমি মৃত হবার পর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে কে তাকে সঞ্জীবিত করে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্'।

মক্কাবাসীরা একথা প্রকাশ্যে স্বীকার করতো যে, আল্লাহ্ই আকাশ পৃথিবীর স্রষ্টা, চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণকারী এবং আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে বিশুষ্ক মৃত্তিকাকে সঞ্জীবনকারী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা মূর্তিপূজাকে মনে করতো ইবাদত। তাই ইতোপূর্বে উল্লেখিত ৬১ সংখ্যক আয়াতের শেষাংশে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— তাহলে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে। আলোচ্য উদ্ধৃতাংশের প্রশ্নোত্তরটিও সেরকম। অর্থাৎ এখানেও দেখা যাচ্ছে, তাদের পূজিত দেব-দেবীগুলোকে নয়, আকাশ থেকে বারিবর্ষণকারীরূপে এবং তার ফলে সঞ্জীবিত মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন রিজিকদাতা হিসেবে তারা মানে আল্লাহ্কেই। অথচ কী বিস্ময়ের ব্যাপার ! পৌত্তলিকতাকে তারা পরিত্যাগ করে না কিছুতেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, প্রশংসা আল্লাহ্রই'। একথার অর্থ— হে আমার বার্তাবাহক! আপনি এই ভেবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন যে, আল্লাহ্পাক আপনাকে অংশীবাদীদের অপধারণা থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন। অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন একারণে যে, তাদের এমতো স্বীকৃতি হয়ে যায় আপনার পক্ষেরই প্রমাণ। আর আল্লাহ্ই এমতো প্রমাণকে করে দিয়েছেন প্রবলতর।

শেষে বলা হয়েছে— 'কিন্তু এটা তাদের অধিকাংশই অনুধাবন করে না'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র মহাসৃজয়িতা ও মহাপালয়িতা হওয়ার বিষয়টি যখন সর্বজন স্বীকৃত তখন, একথা তো সহজেই অনুমেয় যে, ইবাদত করতে হবে কেবল তাঁর, অন্য কারো বা অন্য কোনোকিছুর নয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই সহজসরল সত্যটি অনুধাবন করতে পারে না।

www.eelm.weebly.com

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ ؕ وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ
لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾ فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا
اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾ ۙ
لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚۙ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ اَوَلَمْ
يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ؕ
اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ
افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ
مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ
وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾ ع

q এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়াকৌতুক ব্যতীত কিছুই নহে। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন। যদি উহারা জানিত।

q উহারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন উহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়াইয়া উহাদিগকে উদ্ধার করেন তখন উহারা তাঁহার শরীক করে।

q ফলে, উহারা উহাদিগের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে এবং ভোগবিলাসে মত্ত থাকে; অচিরেই উহারা জানিতে পরিবে।

q উহারা কি দেখে না আমি হারম্‌কে নিরাপদ স্থান করিয়াছি অথচ ইহার চতুষ্পার্শ্বে যেসব মানুষ আছে তাহাদিগের উপর হামলা করা হয়। তবে কি উহারা অসত্যেই বিশ্বাস করিবে এবং আল্লাহের অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

q যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁহার নিকট হইতে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তাহার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের আশ্রয়স্থল তো জাহান্নামই।

q যাহারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাহাদিগকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করিব। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদিগের সংগে থাকেন।

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছু নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন'।

এখানে 'হাজিহিল হায়াতুদ দুন্ইয়া' অর্থ পার্থিব তুচ্ছ জীবন। 'লাহ্বু' অর্থ ওই বস্তু যা কল্যাণকামিতার অন্তরায়। অর্থাৎ ওই সকল কর্মকাণ্ড যা আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পথের প্রতিবন্ধক। 'লায়ী'ব' অর্থ অনর্থক ক্রীড়া-কৌতুক। পৃথিবী অবক্ষয়প্রবণ, অনিত্য ও নশ্বর। তাই পৃথিবীকে বলে দুনিয়া। পার্থিব সকল কিছুই উদ্দেশ্যহীন ক্রীড়া-কৌতুকের অর্ন্তভূত। কিন্তু পৃথিবীতে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সম্পাদিত ইবাদতসমূহ কিন্তু দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এগুলো আখেরাত। কারণ এগুলোর প্রতিফল পাওয়া যাবে আখেরাতেই।

'পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত জীবন' অর্থ পারলৌকিক জীবন মৃত্যুহীন, পৃথিবীর জীবনের মতো তা জরা-মৃত্যুর অধীন নয়। আর এখানকার 'হায়াওয়ান' (জীবন) শব্দটি ধাতুমূল। এর মূল রূপ ছিলো 'হায়ায়ান্'। উল্লেখ্য, অর্থগত দিক দিয়ে 'হায়াত' অপেক্ষা হায়ায়ান' অধিক সঙ্গতিপূর্ণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তারা জানতো'। একথার অর্থ— পৃথিবী নশ্বর এবং আখেরাত চিরস্থায়ী, একথা যদি তারা জানতো, তবে আখেরাতকেই তারা প্রাধান্য দিতো পৃথিবীর উপর।

পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্কে ডাকে'। একথার অর্থ— যদি ওই অংশীবাদীরা জলযানারোহী হয়ে সমুদ্রযাত্রা করে এবং সমুদ্র মধ্যে হঠাৎ শুরু হয় ঝড়। তখন উত্তাল নীলাম্বরাশি দেখে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে নিবিষ্টচিত্তে ডাকে কেবল আল্লাহ্কেই, দেব-দেবীদের কথা তখন আর তাদের মনে থাকে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা তাঁর শরীক করে'। একথার অর্থ— ওই ঝড়কবলিতদের জলযান তারপর আমি নিরাপদে ভিড়িয়ে দেই তীরে। কিন্তু তখন তারা আর আমার দয়ার কথা মনে রাখে না। পুনরায় ফিরে যায় অংশীবাদিতায়।

ইকরামা বলেছেন, মূর্খতার যুগে বিগ্রহ-অর্চকেরা সমুদ্রযাত্রার প্রাক্কালে সঙ্গে নিতো বিগ্রহ-মূর্তি। কিন্তু সমুদ্রবক্ষে অকস্মাৎ তুফান শুরু হলে তারা বিগ্রহগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতো সমুদ্রে। আর চিৎকার করে ডাকতো, হে আমাদের পালনকর্তা! হে আমাদের প্রভুপালক! বাঁচাও! বাঁচাও! তারপর তুফান থেমে গেলে নিরাপদে কুলে ওঠার পর পুনরায় অর্চনা শুরু করতো বিগ্রহমূর্তির।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'ফলে তারা তাদের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে এবং ভোগবিলাসে মত্ত থাকে; অচিরেই তারা জানতে পারবে'। অংশীবাদীদেরকে আলোচ্য আয়াতে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে চরমভাবে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তোমরা যা খুশী তা করো, সুনিশ্চিত, আমি তার পরিদর্শক'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তারা এখন বিপদমুক্ত। সুতরাং তারা এখন আমার দয়া ও দান থেকে মুখ ফিরিয়ে তো নিবেই অংশীবাদিতা ও পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত তো হবেই। তারা যে অকৃতজ্ঞ। কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়। অচিরেই তারা জানতে পারবে তাদের পরিণাম কতো অশুভ।

এরপরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'তারা কি দেখেনা আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ চতুষ্পার্শ্বে যে সব মানুষ আছে তাদের উপর হামলা করা হয়। তবে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে'? একথার অর্থ— দাম্ভিক ও নির্বোধ মক্কাবাসীরা আল্লাহ্‌র এই অনন্য অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করে না কেনো যে, আমি তাদেরকে করেছি হেরেমবাসী, ফলে তাদের বসবাস হয়েছে পূর্ণ নিরাপদ, অথচ চতুর্দিকের অন্যান্য জনপদগুলো কতো অশান্ত— সেগুলোতে অহরহ চলেছে লুণ্ঠন, ছিনতাই ও রক্তপাত। তারা তো হেরেমবাসী বলে বহি-শত্রুর আক্রমণ থেকেও সুরক্ষিত। মুক্ত আ'দ ও ছামুদ জাতির উপরে আপতিত সর্বগ্রাসী আযাবের মতো আযাব থেকে। এভাবে আমার অনুগ্রহবেষ্টিত হয়ে থাকা সত্ত্বেও তাদের জন্য অংশীবাদিতা কি শোভন, না সমীচীন। এভাবে তারা কি ক্রমাগত আমার অনুগ্রহের অবমাননা করেই চলবে?

এখানে 'তবে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে' কথাটির অর্থ— তবে কি তারা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে উপাস্যরূপে গ্রহণ করবে তাদের মিথ্যা মাবুদগুলোকে। উল্লেখ্য, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকল কিছুই বাতিল (মিথ্যা)। যেমন রসুল স. সদয় মন্তব্য করেছেন, কবি লোবিদের পদ্যটি কতোই না সুন্দর। সে বলেছে— আলা কুললা শাইইন মা খালাল্লহু বাত্বিল (মনের কান দিয়ে শোনো, আল্লাহ্ ব্যতীত সকল কিছুই অবান্তর)।

'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করে' অর্থ যেহেতু তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের পূজনীয় প্রতিমাগুলোকে সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করায় সেহেতু তারা অবলীলায় অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজিকে। কোনো কোনো জ্ঞানীজন বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ' বলে বোঝানো হয়েছে রসুল স. এর সুমহান ব্যক্তিত্বকে, অথবা কোরআনকে।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়তে (৬৮) বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট থেকে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে'? একথার অর্থ— যে ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের সমকক্ষ হিসেবে মিথ্যা উপাস্য স্থির করে, অথবা তাঁর নিকট থেকে সমাগত মহাগ্রন্থ কোরআনের বাণীকে করে প্রত্যাখ্যান, তার চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী আর কেউ নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আশ্রয়স্থল তো জাহান্নামই'। একথার অর্থ— অবশ্যই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আসল ঠিকানা জাহান্নাম। এখানকার এই প্রশ্নটি স্বীকৃতিসূচক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যখন তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করলো, মহা সত্যের বাণীকে করলো অস্বীকার, তখন কি তারা জাহান্নামের উপযোগী হলো না? অবশ্যই হলো। অথবা মর্মার্থ হবে— জাহান্নাম যে তাদের স্থায়ী ঠিকানা তা কী তারা জানে না? তাহলে তাদের এতো বড় স্পর্ধা কেনো যে, তারা আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করাবে এবং অস্বীকার করবে তার বাণীকে। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিতে জাহান্নামই যে তাদের চিরস্থায়ী আবাস, সেকথাটাই প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। আর শেষোক্ত ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট হয়েছে তাদের অনপনেয় দাম্ভিকতার বিষয়টি।

শেষোক্ত আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো'। একথার অর্থ— যারা প্রবৃত্তির প্রতিপক্ষে দাঁড়ায় বিশুদ্ধচিত্তে মেনে চলে আমার আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহের সীমানা, আমি অবশ্যই তাদেরকে সন্ধান দেই আমার সন্তোষার্জনের নির্ভুল পথের।

এখানে 'আল্লাজীনা জ্বাহাদু' (যারা সংগ্রাম করে) কথাটির 'জ্বাহাদু' (সংগ্রাম) অর্থ সথাসাধ্য চেষ্টা করা। এমতো প্রাণপন চেষ্টার নামই এখানে সংগ্রাম করা। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যারা সমর প্রান্তরে আল্লাহ্র শত্রুর বিরুদ্ধে মরণপন যুদ্ধ করে এবং শান্তির সময় করে প্রবৃত্তির কঠোর বিরুদ্ধাচরণ, তাদেরকেই আমি পরিচালিত করি আমার পথে।

'ফীনা' অর্থ আমার জন্য আমার পরিতোষ কামনায়। 'সুবুলানা' অর্থ আমার পথে, আমার সমীপবর্তী হওয়ার পথে। অথবা পুণ্যের পথে। অথবা তাদেরকে পরিচালিত করি পূন্যের পথে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যারা হেদায়েত চায়, আল্লাহ্ তাদেরকে অতিরিক্ত হেদায়েত দিয়েই দেন'।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'ফরমান' অর্থ যে ব্যক্তি তার পরিচিত পথে চলার চেষ্টা করে, আমি তাকে এমন পথের সন্ধান দেই, যা সে পূর্বে জানতো না।

www.eelm.weebly.com

আতা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ— যে ব্যক্তি আমার পরিতুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, আমি তাকে দেই পুণ্যপথের সন্ধান। জুরাইজ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করে, আল্লাহ্ তাকে প্রদর্শন করেন বিশুদ্ধপথ।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, যখন জনগণের মধ্যে বিস্তর মতপ্রভেদ দেখতে পাবে, তখন ধোরো সীমান্তপ্রহরীদের পথ। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন— যারা আমার পথে জেহাদ করে আমি তাদেরকে পথ দেখাই। সম্ভবতঃ তাঁর মতে এখনকার 'জ্বাহাদু' অর্থ জেহাদ (ধর্মযুদ্ধ)।

হাসান বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রাম হচ্ছে কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ফজল ইবনে আয়াজ বলেছেন, যারা জ্ঞানান্বেষণের পথে চেষ্টা করেছে, আল্লাহ্ তাকে বলে দেন জ্ঞানানুযায়ী কর্ম সম্পাদনের পন্থা। সুহাইল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, যারা সুন্নত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, আমি তাদেরকে জান্নাতের পথ বলে দেই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ— যে ব্যক্তি আমার আনুগত্যের চেষ্টা চালায়, আমি তাকে সন্ধান দেই পুণ্যপথের ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন'। একথার অর্থ— যারা সৎকর্মপরায়ণ, ইহকালে তারা পায় আল্লাহ্র বিশেষ সাহায্য এবং পরকালে পায় মার্জনা ও পুণ্য।

সুফী দার্শনিকগণ বলেন, আল্লাহপাক মিতাচারীদের সঙ্গী। কিন্তু এমতো সঙ্গতা অননুভবনীয়। দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণই কেবল পেতে পারেন এমতো অননুভবনীয় সাহচর্যের প্রচ্ছন্ন পরিচয়।

উল্লেখ্য, আলোচ্য কাব্যে সর্বনামের স্থলে সরাসরি নামপদ 'আল্লাহ্' ব্যবহার করা হয়েছে বক্তব্যটিকে অধিকতর বেগবান করার উদ্দেশ্যে।

সূরা রূম

মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরাটি ৬ রুকু এবং ৬০ আয়াত বিশিষ্ট।

ইবনে শিহাব জুহুরী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম, ইকরামা, ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াসার এবং কাতাদা সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর হিজরত পূর্ব সময়ের মক্কার মুসলমানেরা দিনাতিপাত করতো নিজগৃহে পরবাসীদের মতো। তাঁদেরকে নীরবে সয়ে যেতে হতো বিধর্মীদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও বিভিন্ন রকমের অত্যাচার। আর বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক তো ছিলো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সে

www.eelm.weebly.com

সময় পারস্য ও রোম এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। পৌত্তলিকেরা ছিলো পারস্যের সমর্থক। আর মুসলমানেরা অনুরক্ত ছিলো রুমীয়দের। পৌত্তলিকেরা বলতো, তোমরা বলো রুমীয়রা আহলে কিতাব, আর পারস্যবাসীরা অগ্নিউপাসক। অথচ দ্যাখো পারস্যবাসীরাই এবার জয়ী হয়েছে। আর তোমরা যাকে নবী মানো, তার উপরেও তো কিতাব নাজিল হয়েছে বলে দাবি করো। একথাও বলো যে, ওই কিতাবের বদৌলতে তোমরাও আমাদের উপরে বিজয়ী হবে। কিন্তু দেখলে তো কিতাবী রোমীয়দের অবস্থা। সুতরাং বিজয়ের আশা আর কোরো না। পারস্যবাসী অগ্নিউপাসকেরা যেমন কিতাবী রোমীয়দের উপরে বিজয়ী হয়েছে, মনে রেখো তেমনি করে আমরাও তোমাদের উপরে থাকবো বিজয়ী।

উল্লেখ্য, নিম্নোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে এই পটভূমিকায়।

সূরা রূম ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○

الٓمّٓ ۚ﴿۱﴾ غُلِبَتِ الرُّوۡمُ ۙ﴿۲﴾ فِیۡۤ اَدۡنَی الۡاَرۡضِ وَ ہُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ غَلَبِہِمۡ
سَیَغۡلِبُوۡنَ ۙ﴿۳﴾ فِیۡ بِضۡعِ سِنِیۡنَ ۬ؕ لِلّٰہِ الۡاَمۡرُ مِنۡ قَبۡلُ وَ مِنۡۢ بَعۡدُ ؕ وَ
یَوۡمَئِذٍ یَّفۡرَحُ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ۙ﴿۴﴾ بِنَصۡرِ اللّٰہِ ؕ یَنۡصُرُ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَ
ہُوَ الۡعَزِیۡزُ الرَّحِیۡمُ ۙ﴿۵﴾ وَعۡدَ اللّٰہِ ؕ لَا یُخۡلِفُ اللّٰہُ وَعۡدَہٗ
وَ لٰکِنَّ اَکۡثَرَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۶﴾ یَعۡلَمُوۡنَ ظَاہِرًا مِّنَ
الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ۚۖ وَ ہُمۡ عَنِ الۡاٰخِرَۃِ ہُمۡ غٰفِلُوۡنَ ﴿۷﴾

r আলিফ-লাম-মীম,

r রোমকগণ পরাজিত হইয়াছে, —

r নিকটবর্তী অঞ্চলে, কিন্তু উহারা উহাদিগের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হইবে।

r কয়েক বৎসরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌রই। আর সেই দিন মু'মিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হইবে,

www.eelm.weebly.com

r আল্লাহ্‌র সাহায্যে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

r ইহা আল্লাহ্‌রই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ্ তাঁহার প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

r উহারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে উহারা গাফিল।

প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি আলিফ লাম মীম। এগুলোর মর্ম দুর্জ্ঞেয়। চিররহস্যাচ্ছন্ন এমতো অক্ষরবিন্যাস সন্নিবেশিত হয়েছে কোরআন মজীদের কোনো কোনো সুরার শীর্ষে। আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয়তম রসুল এ সম্পর্কে সম্যক অবগত। আর তাঁদের এই অবগতির বৃত্তভূত হওয়ার সদয় অনুমতি লাভ করেছেন অল্পকিছুসংখ্যক সৌভাগ্যবান বিদ্বজ্জন। তাঁদেরকেই বলা হয় ওলামায়ে রসিখীন বা জ্ঞানে সুগভীর।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'রোমকগণ পরাজিত হয়েছে'।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'নিকটবর্তী অঞ্চলে'। এখানে 'আদনাল আরদ্ব' (নিকটবর্তী অঞ্চল) অর্থ আরব ভূখণ্ডের ওই এলাকা, যা রোমীয় রাজ্যের সন্নিকটবর্তী। এখানকার 'আলআরদ্ব' এর আলিফ লাম আকাংখা প্রকাশক। অর্থাৎ ওই ভূখণ্ড ছিলো আরববাসীদের কামনার বস্তু। কেননা ওই অঞ্চল তাদেরই ভূখণ্ডভূত। অথবা বলা যেতে পারে, 'আলিফ লাম' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সম্বন্ধপদের পরিবর্তে। একারণে দ্বিতীয় ভাষ্যটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

ইকরামা বলেছেন, এখানে 'আদনাল আরদ্ব' বলে বুঝানো হয়েছে সিরিয়ার আজরাত ও কাসকর অঞ্চলকে। মুজাহিদ বলেছেন, বুঝানো হয়েছে আরব উপদ্বীপকে। অপর এক বর্ণনানুসারে মুজাহিদ বলেছেন, শব্দটির উদ্দেশ্য জর্দান ও ফিলিস্তিন।

রোম ও পারস্যের জয়-পরাজয় নিয়ে মক্কার মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে প্রায়শঃই তর্কবিতর্ক বেঁধে যেতো। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, মক্কার অংশীবাদীরা চাইতো পারস্যের বিজয়। কেননা পারস্যবাসীরা ছিলো তাদের মতোই অংশীবাদী। আর মুসলমানেরা চাইতো জয় হোক রোমের। কারণ রোমকরা ছিলো গ্রন্থধারী। কিন্তু দেখা গেলো এক যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে পারস্য। এ সংবাদ শুনে মক্কার অংশীবাদীরা উৎফুল্ল হলো খুব। তারা হজরত আবু বকরের বাড়ীতে যেয়ে শ্লেষাত্মক সুরে জানালো সংবাদটি। তিনি মনঃক্ষুণ্ন হলেন। বিষয়টি গোচরীভূত করলেন রসুল স. এর। রসুল স.

www.eelm.weebly.com

বললেন, খুব শিগগির রোমকরা বিজয়ী হবে। হজরত আবু বকর খুশী হলেন এবং এ কথা প্রচারও করলেন। মুশরিকেরা বললো, কিন্তু কতোদিনের মধ্যে। আমরা তো ভবিষ্যদ্বাণীতে আস্থাশীল নই। সুতরাং নির্দিষ্ট দিন তারিখ বলে দাও এবং এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে বাজী ধরো। নির্ধারণ করো কোনো কিছু সম্পদ। ওই সম্পদ পাবে তারাই, যারা জিতবে। শেষ পর্যন্ত চুক্তি হলো। সময় বেঁধে দেওয়া হলো পাঁচ বৎসর। কিন্তু পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও রোমকদের পুনর্বিজয়ের কোনো সংবাদ পাওয়া গেলো না। হজরত আবু বকর রসুল স.কে কথাটা জানালেন। রসুল স. তাঁকে বললেন, তুমি দশবছরের কথা বলে চুক্তিবদ্ধ হলে না কেনো? কিন্তু এরপর খুব বেশী দিন গত না হতেই এসে পড়লো রোমকদের বিজয়ের সংবাদ। এই বিজয়ের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতসমূহে।

সুফিয়ান বলেছেন, আমি শুনেছি রোমকগণ বিজয়ী হয়েছে বদর যুদ্ধের সময়। হাদিসটি বিভিন্ন প্রসিদ্ধ পদ্ধতিতে অসংখ্যবার বিবৃত হয়েছে হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত বারা ইবনে আজীব ও হজরত লিয়ার ইবনে মুকরিম থেকে।

এর পরে বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে'।

এর পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'কয়েক বৎসরের মধ্যে'। এখানে 'বিদ্বউ'ন' অর্থ কয়েক বৎসর — এক থেকে সাত অথবা নয় বৎসর। জুহুরী বলেছেন দশের কম সংখ্যার উপরে প্রয়োগ করা হয় 'বিদ্বউ'ন' অথবা 'বিদ্বআ'তুন' দশের অধিক সংখ্যার ক্ষেত্রে শব্দটির ব্যবহার অপ্রচল। কিন্তু জুহুরীর এই অভিমতটি অযথার্থ। কারণ তা হাদিসের বিপরীত। যেমন রসুল স. বলেছেন— 'আল ইমানু বিদ্বউঁ ওয়া সাবউনা শু'বাহ্' (ইমানের শাখা কিঞ্চিদধিক সত্তরটি ।

বাগবী লিখেছেন, পারস্য ও রোমের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। মক্কার মুশরিকেরা কামনা করতো পারস্যের বিজয়। কেননা তারা ছিলো অংশীবাদী। আর রোমকরা বিজয়ী হোক এমতো আকাংখা করতো মুসলমানেরা। কারণ তারা ছিলো আহলে কিতাব খৃষ্টান। পারস্য সেনাধ্যক্ষ শাহরিয়াযাদ এবং রোমক সেনাপতি ইয়াহিসের বিশাল বাহিনী দু'টোর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর দেখা গেল বিজয়ী হয়েছে পারস্য বাহিনী। যুদ্ধ সম্পন্ন হয়েছিলো সিরিয়া ও বসরা অঞ্চলের আজরেআত নামক এক সুবিশাল প্রান্তরে। মক্কার মুসলমানেরা মর্মাহত হলেন। আর আনন্দে অধীর হয়ে গেলো মুশরিকেরা। মুসলমানদেরকে ব্যঙ্গ করে বলতে লাগলো, তোমাদের মতো গ্রন্থধারী খৃষ্টানেরা। অথচ বিজয়ী হয়েছে অগ্নি উপাসকেরা। সুতরাং বুঝে নাও, তোমরা যদি কখনো আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তবে এমনি করেই পরাভূত হবে। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিত

www.eelm.weebly.com

অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতগুচ্ছ। রোমকদের বিজয় সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত আবু বকর মুশরিকদেরকে ডেকে বললেন, আনন্দে আটখানা হয়ো না। আমাদের রসুল জানিয়েছেন, কিছুকাল পরে রোমকরা পরাস্ত করবে পারস্য বাহিনীকে। উবাই ইবনে খালফ একথা শুনে বললো, তোমরা অসত্যভাষী। হজরত আবু বকর বললেন, কখনোই নয়। উবাই বললো, তাহলে দশটি উটের বাজী ধরো। যার কথা ঠিক হবে সেই বাজী জিতবে। হজরত আবু বকর বললেন, আমি মেনে নিলাম। তিন বছরের চুক্তি সম্পাদিত হলো দু'জনের মধ্যে। রসুল স. একথা শুনে হজরত আবু বকরকে বললেন, আমি তো তোমাকে কোনো সময় নির্ধারণ করে দেইনি। কয়েক বছর (বিদ্বউন) অর্থ তো তিন থেকে নয় বৎসর। সুতরাং তুমি উবাইয়ের সঙ্গে পুনঃচুক্তি বদ্ধ হও। উটের পরিমাণ ও মেয়াদের বছর দু'টোই বাড়িয়ে নাও। হজরত আবু বকর উবাইয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। উবাই বললো, নির্ঘাত পরাজয়ের কথা ভেবে কি তুমি ইতোমধ্যেই লজ্জিত হতে শুরু করলে নাকি? হজরত আবু বকর বললেন, আরে না। তবে বাজীর মাল ও মেয়াদ দু'টোই বাড়িয়ে দিলে ভালো হয়। উবাই একথায় সম্মত হলো। নির্ধারিত হলো, বাজী যে জিতবে সে পাবে একশত উট। আর সময় তিন বছর থেকে বাড়িয়ে করা হলো নয় বছর। কিছু দিন পর উবাইয়ের মনে হলো হজরত আবু বকর দেশত্যাগী হবেন। তাই সে বললো, হে আবু বকর! মনে হচ্ছে তুমি আর এখানে থাকবে না। সুতরাং এখনই তুমি তোমার একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে রেখে দাও। হজরত আবু বকর বললেন, ঠিক আছে, আমি যদি অবর্তমান হই, তবে আমার প্রতিনিধি হবে আমার পুত্র আবদুল্লাহ্।

উহুদের রণক্ষেত্রে রসুল স. এর অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়েছিলো উবাই। মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো মক্কায় ফেরার পর। এরপর রোমকদের হাতে পারস্য পরাস্ত হয়েছিলো হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়। বর্ণনান্তরে বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে। বাজীর চুক্তি অনুসারে তখন অতিক্রান্ত হয়েছিলো সাত বছর। উল্লেখ্য, ঘটনাটি ঘটেছিলো বাজী-জুয়া নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে।

শা'বী লিখেছেন, বাজীর চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই রোমকরা পরাজিত করেছিলো পারস্য বাহিনীকে। রোমকরা তাদের যুদ্ধাশ্বগুলোকে বেঁধে রেখেছিলো পারস্যরাজের ইরাকস্থ রাজধানী মাদায়েনে। বিজয়ের সংবাদ শোনার পর হজরত আবু বকর দেখা করলেন উবাইয়ের উত্তরাধিকারীর সঙ্গে। তার কাছ থেকে বাজীর একশতটি উট আদায় করে হাজির হলেন রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। রসুল স. আজ্ঞা করলেন, এগুলো আল্লাহ্র পথে দরিদ্র-মিসকিনদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দাও। হজরত আবু বকর থেকে তিরমিজিও এরকম বর্ণনা করেছেন। আর ঘটনাটি ঘটেছিলো বাজী ধরা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানিফা বলেন, যুদ্ধ বিগ্রহরত মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে অসিদ্ধ চুক্তি সিদ্ধ, এমনকি সুদের আদান প্রদানও। অর্থাৎ এমতাবস্থায় কাফেরদের সম্পদ অধিকার করাই মূল উদ্দেশ্য। তবে শর্ত একটিই— আমানতদারী যেনো বিপন্ন না হয়। কারণ জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে যে সকল বিধর্মী রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা (জিম্‌মি) লাভ করে, তাদের সম্পদ কৌশলে বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে করায়ত্ত করা কোনো অবস্থায় সিদ্ধ নয়।

বাগবী লিখেছেন, ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, পারস্যরাজের সেনাধিনায়ক শাহরিয়াযাদ বিজয়ী হলো। দখল করলো রোম সাম্রাজ্যের বিশাল এলাকা। বিজিত জনপদগুলোর উপরে অবাধে চললো হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ। এভাবে এক সময় বিজয়ী বাহিনী উপস্থিত হলো উপসাগরের বেলা ভূমিতে। সেনাধিনায়কের সঙ্গে ছিলো তার কণিষ্ঠ সহোদর ফরমান। বিজয়ের আনন্দে সে হয়ে গেলো আত্মহারা। একদিন সে তার সতীর্থদেরকে নিয়ে মদ্যপানের আসর বসালো। এক সময় ঘোর মাতাল অবস্থায় বলে উঠলো, আমিই পারস্যের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। তার একথা পৌঁছে গেলো পারস্যরাজের কানে। রোষান্বিত রাজা শাহরিয়াযাদকে লিখলো তোমার উপ-সেনাধিনায়ক ফরমানের মস্তক আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। শাহরিয়াযাদ লিখলো, মহামান্য রাজা! শত্রুপক্ষ ফরমানের ভয়ে সদাশংকিত থাকে। এমন বীর দুর্লভ। সুতরাং আদেশ প্রত্যাহার করুন। রাজা এবার লিখলো পারসীয়রা বীরেরই জাতি। ফরমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বীরের অভাব পারস্যে নেই। সুতরাং এই মুহূর্তে নির্দেশ কার্যকর করো। কিন্তু শাহরিয়াযাদ পুনরায় নির্দেশ প্রত্যাহরের জন্য অনুরোধ জানালো। পারস্যরাজ হলো মহাক্ষিপ্ত। সে এবার নির্দেশ প্রেরণ করলো সরাসরি ফরমানের কাছে। লিখলো, আমি শাহরিয়াযাদকে পদচ্যুত করে তদস্থলে তোমাকে প্রধান সেনাধিনায়করূপে নিযুক্ত করলাম। যথাশীঘ্র সম্ভব দায়িত্ব বুঝে নাও। এই নির্দেশের সঙ্গে দূতের নিকট আরো একটি পত্র দিলো পারস্যরাজ। ওই পত্রে লিখিত ছিলো শাহরিয়াযাদের মৃত্যু-পরওয়ানা। দূতকে বললো, এই পত্রটি ফরমানকে দিয়ো সৈনাপত্যের দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পর।

রাজার নির্দেশে শাহরিয়াযাদের নিকট থেকে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব বুঝে নিলো ফরমান। শাহবিয়াযাদও বিনা প্রতিবাদে অনুগত হলো অনুজের। এরপর দূত নতুন সেনাপতির হাতে তুলে দিলো দ্বিতীয় পত্রটি। ফরমান সঙ্গে সঙ্গে তলব করলো শাহরিয়াযাদকে। জল্লাদকেও ডেকে এনে বললো, একে এক্ষুণি বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও। শাহরিয়াযাদ বললো, হে মহাসেনাপতি! কিঞ্চিত বিলম্ব করুন। আমাকে কমপক্ষে একটি অছিয়তনামা লিখবার অবকাশ তো দিন। ফরমান তার আবেদন মঞ্জুর করলো। ইত্যবসরে শাহরিয়াযাদ তার অবস্থানে ফিরে

www.eelm.weebly.com

গিয়ে নথিপত্র ঘেটে বের করলো পারস্যরাজের ওই পত্রদু'টো, যাতে ছিলো ফরমানের মস্তকছেদনের নির্দেশ। পত্রদু'টো নিয়ে সে পুনরায় হাজির হলো ফরমানের সামনে। পত্রদুটো তার হাতে তুলে দিয়ে বললো, আমিও তো এরকম নির্দেশ পেয়েছিলাম। কিন্তু অনর্থক ভ্রাতৃহন্তারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চাইনি। আর তুমি এখন তাই করতে চাও। ফরমান সম্বিত ফিরে পেলো। স্বেচ্ছায় পুনরায় প্রধান সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করলো অগ্রজকে।

এরপর দুইভাই মিলে ভাবতে বসলো, কী করে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা যায়। দু'জনে পরামর্শক্রমে ঠিক করলো, রোমক সেনাপতিকে দলে ভেরাতে হবে। একথা ভেবেই একটি পত্র প্রেরণ করা হলো রোমক সেনাপতির কাছে। লেখা হলো— আমি পারস্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি শাহরিয়াযাদ। একটি বিশেষ ব্যাপারে আপনার ও আমার একান্ত সাক্ষাত নিতান্ত প্রয়োজন। তাই আমার প্রস্তাব— আপনি ও আমি দু'জনেই মাত্র পঞ্চাশ জন বিশ্বস্ত সৈন্য নিয়ে অন্য সকলের অজ্ঞাতে একস্থানে মিলিত হই। আপনি সম্মত থাকলে জানান। রোমক সেনাপতি গুপ্তচরের মাধ্যমে পরিস্থিতি আঁচ করে নিলো। সম্মতিপত্র প্রেরণ করলো তারপর। শুরু হলো একান্ত সাক্ষাতের আয়োজন। একটি নির্জন স্থানে মিলিত হলো একটি অস্থায়ী মিলনায়তনে। যথাসময়ে সেখানে দোভাষীসহ মিলিত হলো দুই রাজ্যের দুই প্রধান সেনাপতি। মাত্র একটি করে খঞ্জর তখন সঙ্গে ছিলো তাদের। শুরু হলো আলাপচারিতা। শাহরিয়াযাদ বললো, আমি ও আমার ভাই ফরমান আপনার সামাজ্যের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছি। বিজয় কেতন উড়িয়েছি আপনার সাম্রাজ্যের বিশাল এলাকায়। কিন্তু এখন আমরা দু'জনেই বিব্রত ও বিপর্যস্ত। পারস্যরাজ আমাদের কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারছে না। বার বার একজনের প্রতি নির্দেশ পাঠাচ্ছে আরেক জনের মস্তক ছেদনের। অথচ আমরা দু'জন জমজ। একজনের মৃত্যু হলে আরেকজনও বেশীদিন বাঁচবে না। এমতাবস্থায় রাজাকে উৎখাত না করা পর্যন্ত আমরা কেউই নিরাপদ নই। তাই আমরা উভয়ে মনস্থির করেছি, এবার তাকে উৎখাত করতেই হবে। কিন্তু ব্যাপরটা সহজ নয়। তাই আমরা এ ব্যাপারে আপনার সহায়তা চাই। এখন আপনি কী বলেন? রোমক সেনাপতি বললো, আপনার প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলাম। যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করুন। বিষয়টি ছিলো অত্যন্ত গোপন এবং অতীব স্পর্শকাতর। তাই দুই সেনাপতির সিদ্ধান্তক্রমে হত্যা করা হলো দোভাষীদ্বয়কে। পারস্য ও রোমক সৈন্যের যৌথ আক্রমণে অবরুদ্ধ হলো পারস্যরাজ। প্রাণপনে বাধা দিলো তার অনুগত বাহিনী। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলোনা। নিহত হলো রাজা। এভাবে রোমকেরা লাভ করলো কাংখিত বিজয়। হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন এ সংবাদ পৌঁছলো রসুল স. সকাশে। মুসলমানেরা একথা শুনে আনন্দিত হলেন খুব। বাস্তবায়িত হলো রসুল স. এর ভবিষ্যদ্বাণী। অবতীর্ণ হলো— আলোচ্য আয়াতগুচ্ছ।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো ক্বেরাত অনুসারে আলোচ্য আয়াতের শব্দবিন্যাস এরকম— 'গুলিবাতির রূম ওয়া মিম বা'দি গাল্‌বাতিহিম সাইউগলাবূন'। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— 'রোমকেরা পারস্যবাহিনীর উপরে বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু অচিরেই তারা হবে পরাভূত'। অর্থাৎ তাদের উপর বিজয়ী হবে মুসলমানেরা। সেরকমই হয়েছিলো। রোমকদের বিজয়ের নয় বছর পর মুসলমানেরা দখল করে নিতে পেরেছিলো রোমসাম্রাজ্যের কিয়দংশ। এবম্বিধ ক্বেরাতের সমর্থন রয়েছে হাদিসেও। যেমন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধের দিন রোমীয়রা পরাজিত করেছিলো পারসিকদেরকে। মুসলমানেরা এসংবাদ শুনে খুশী হয়েছিলেন খুব। অবতীর্ণ হয়েছে— গুলিবাতির রূম.......। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ক্বেরাতটি বিরল। প্রথমোক্ত ক্বেরাতই সর্বজনবিধিত। সুতরাং বলতে হয় বিরল ক্বেরাতটি ছিলো প্রচার নির্দেশ বহির্ভূত প্রত্যাদেশাবলীর অন্তর্গত। রসুল স. হয়তো এমতো প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই অবগত হয়েছিলেন যে, আজ রোমীয়রা বিজয়ী হয়েছে বটে, কিন্তু অচিরেই তারা পরাভূত হবে মুসলমানদের কাছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌রই আর সেইদিন বিশ্বাসীগণ হর্ষোৎফুল্ল হবে'। এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র সাহায্যে'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— পারস্য ও রোমের পারস্পরিক জয়-পরাজয়ের মতো অতীতের ও ভবিষ্যতের সকল জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় আল্লাহ্‌ কর্তৃক। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কার্যকর হতে পারে কেবল তাঁরই সিদ্ধান্ত। এর বিপরীত হওয়া অসম্ভব। আর আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতিরেকে কোনো কিছুই বাস্তবের মুখ দেখে না।

'ইয়াওমাইজিন' (সেই দিন) অর্থ ওই দিন, যেদিন রোমকদের বিজয় সূচিত হবে পারসিকদের উপর। আর সে বিজয়ের সংবাদ শুনে হর্ষোৎফুল্ল হবে মুসলমানেরা।

'বিনাস্‌রিল্লাহ্‌' অর্থ আল্লাহ্‌র সাহায্যে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্যেই রোমকরা বিজয়ী হতে পেরেছে পারসিকদের উপর। অথবা গ্রন্থধারীরা পরাজিত করতে পরেছে গ্রন্থহীনদেরকে। আর আল্লাহ্‌রই সাহায্যে মুসলমানেরা বাজিমাত করতে পেরেছে অংশীবাদীদের উপর। এতে করে মুসলমানেরা হয়েছে অধিকতর দৃঢ়চেতা, আর অংশীবাদীদের গর্ব হয়েছে খর্ব।

সুদ্দী বলেছেন, রসুল স. বদরের দিন এই ভেবে মহাআনন্দিত হয়েছিলেন যে, এদিকে মুসলমানেরা বিজয়ী হলো পৌত্তলিকদের উপর, আর ওদিকে কিতাবীদের বিজয় সংঘটিত হলো অগ্নিউপাসকদের উপর।

www.eelm.weebly.com

জালালুদ্দিন মাহাল্লী বলেছেন, রোমকদের বিজয় এবং পারসিকদের পরাজয় সংবাদ মুসলমানদের কাছে পৌঁছেছিলো বদরের রণক্ষেত্রে। একই সঙ্গে মুসলমান ও খৃষ্টানদের বিজয়ে হর্ষোৎফুল্ল হয়েছিলেন মুসলমানেরা। কারণ উভয়ের প্রতিপক্ষ ছিলো অংশীবাদী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ আল্লাহ্ তাঁর অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন, চিরমুক্ত। তাই তিনি যাকে চান তাকে সাহায্য করেন, এভাবে দান করেন বিজয়। আর যাকে চান তাকে করেন সাহায্যবিচ্যুত। ফলে সে বহন করে পরাজয়ের গ্লানি। এভাবে মানবেতিহাসে পালাক্রমে আসে উত্থান ও পতন। জয় ও পরাজয়। কিন্তু চিরবিজয়ী কেবল আল্লাহ্। কারণ তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন মহাপরাক্রমশালী। তাই পরাজয় বরণ তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আর তিনি পরম দয়ালুও । তাই তো পরাজিত জাতিকে তিনি পুনরায় দান করেন বিজয়। একবার সাহায্যচ্যুত করার পর পুনরায় করেন সাহায্যশোভিত।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্রই প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না'। একথার অর্থ— রোমকদের ও মুসলমানদের এই হচ্ছে আল্লাহ্র অঙ্গীকারভূত। আর তিনি কখনোই অঙ্গীকার ভঙ্গকারী নন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ তত্ত্বটি সম্পর্কে অনবগত। কারণ তারা বিশ্বাসী ও বিচক্ষণ নয়।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত'। একথার অর্থ— প্রাত্যহিক প্রয়োজন সম্পাদন, উপার্জন, রমণ, সন্তান প্রতিপালন, ব্যবসা বাণিজ্য, চাষাবাদ— অবিশ্বাসীরা কেবল পার্থিব জীবনের এসকল বাহ্যিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানে। আর কিছু জানে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর আখেরাত সম্পর্কে তারা গাফেল'। একথার অর্থ— পরজগত সম্পর্কে অবিশ্বাসীরা একেবারেই উদাসীন। এখানকার দ্বিতীয় সর্বনাম 'হুম' (তারা) প্রথম সর্বনাম 'হুম' কে অধিকতর বেগবান করেছে। প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যটিই প্রথম বাক্যের বেগসঞ্চারক। এতে করে একথাটি অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ হয় যে, পশুদের যেমন কোনো বোধ-বিবেক নেই, তারা বস্তুজগতের দিকে ভাবলেশহীন চোখে তাকায়, খায় এবং যত্রযত্র ঘুরে বেড়ায়, অবিশ্বাসীরাও তেমনই। বরং তারা পশুদের চেয়েও নিকৃষ্ট। তারা জানে কেবল পার্থিব জগতের বাহ্যিক দিকের কিছু অংশ সম্পর্কে। এ জগতের প্রকাশ্য দিকের কিছু কিছু তত্ত্ব, বিশেষত্ব, ক্রিয়া-বিক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পশুরাও কিছু কিছু জানে। কিন্তু ভোগোন্মত্ত এ নির্বোধেরা তাও জানে না।

www.eelm.weebly.com

তাহলে তারা পশুর চেয়ে অধম নয় তো কী? একারণেই এখানকার ‘জাহিরান’ (বাহ্যদিক) শব্দটিকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে অনির্দিষ্টরূপে। আর এর অভ্যন্তরীণ দিক সম্পর্কে তারা একেবারেই হস্তীমূর্খ। অথচ তারা যেহেতু মানুষ, সেহেতু তাদের অন্ততঃ এতটুকু জানা উচিত ছিলো যে, ইহজগত হচ্ছে পরজগতের প্রস্তুতি ক্ষেত্র।

সূরা রূম ঃ আয়াত ৮, ৯, ১০

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ قف مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ط وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ﴿٨﴾ أَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوْٓا أَشَدَّ
مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ أَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا
وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ط فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ
كَانُوْٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ أَسَآءُوا
السُّوْٓأٰى أَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٠﴾

r উহারা কি নিজদিগের অন্তরে ভাবিয়া দেখে না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবেই ও আর এক নির্দিষ্ট কালের জন্য? কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাহাদিগের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।

r উহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহা হইলে দেখিত যে, উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল। শক্তিতে তাহারা ছিল ইহাদিগের অপেক্ষা প্রবল, তাহারা জমি চাষ করিত, তাহারা উহা আবাদ করিত উহাদিগের আবাদ করা অপেক্ষা অধিক। তাহাদিগের নিকট আসিয়াছিল তাহাদিগের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ; বস্তুত আল্লাহ্ এমন নহেন যে, উহাদিগের প্রতি জুলুম করেন, উহারা নিজেরাই নিজদিগের প্রতি জুলুম করিয়াছিল।

www.eelm.weebly.com

r অতঃপর যাহারা মন্দ কর্ম করিয়াছিল তাহাদিগের পরিণাম হইয়াছে মন্দ; কারণ তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যান করিত এবং উহা লইয়া ঠাট্টাবিদ্রূপ করিত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না'। একথার অর্থ— তারা তাদের জ্ঞানাশ্বকে ছুটায় মরীচিকাসম জাগতিক দৃশ্যমানতার দিকে। কিন্তু সত্তাভ্যন্তরের গোপন রহস্যের দিকে একবারও দৃকপাত করে না। গবেষণা করে না আত্মার ভাবনা-বেদনা ও চেতনা সম্পর্কে। যদি এরকম করতো, তবে তাদের অন্তর্দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হতো জীবন ও জগতের প্রকৃত রহস্য। বুঝতো প্রতিটি মানুষ এক একটি ক্ষুদ্র জগত, মহাবিশ্বের এক একটি ক্ষুদ্রায়তনিক নমুনা। সুতরাং কেনো তারা তাদের হৃদয়ের অলিন্দে বসে একথা ভাববার চেষ্টা করে না? 'যে আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবেই, আর এক নির্দিষ্ট কালের জন্য'? একথার অর্থ— নিজেদের অন্তরে যদি তারা সত্যোপলব্ধির প্রচেষ্টা চালাতো, তবে বুঝতে পারতো, আকাশসমূহ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর মধ্যেই রয়েছে নিপুণতা, নির্ভুলতা ও সুপরিমিতি। আর এই বিশাল সৃষ্টি চিরন্তন যেমন নয়, তেমনি নয় উদ্দেশ্যবিহীন। নির্ধারিত কাল শেষে এর বিলুপ্তি সাধনের জন্য অবশ্যই এসে পড়বে মহাপ্রলয়। তারপর আসবে পুনরুত্থান পর্ব। মহাবিচারপর্ব। তখন সকলেই পেয়ে যাবে তাদের আপনাপন কর্মের চূড়ান্ত প্রতিফল। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র এরশাদ করেছেন— 'তোমরা কি ধারণা করেছো তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি অকারণে? আমার নিকট কি তোমরা প্রত্যানীত হবে না?'

মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনে ব্যাপৃত বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ এমতো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য যে, সৃষ্টিই তার স্রষ্টার পরিচয়ের প্রমাণ। আর এই বিশাল সৃজনায়ন নিশ্চয় অকারণ ও উদ্দেশ্যবিবর্জিত নয়। সৃষ্টির পরতে পরতে নিদর্শন রয়েছে আল্লাহ্‌র সত্তার ও গুণবত্তার। রয়েছে সর্বত্র তাঁর আনুরূপ্যহীন উপস্থিতির প্রমাণ। আর এ সৃষ্টিও একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান শেষে শুরু হবে বিচারপর্ব। এরকম না হলে কীভাবে পার্থক্য সূচিত হবে সত্য ও মিথ্যার? আল্লাহ্‌র পরিচয় ধন্য এবং আল্লাহ্‌কে অমান্যকারীদের মধ্যে প্রভেদই বা তাহলে সৃষ্টি হবে কী করে? পুরস্কার ও তিরস্কারের বিষয়টি তো কেবল এভাবেই লাভ করতে পারবে বাস্তব রূপ। সুতরাং এমতো পরকাল ভাবনা মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক বলে যদি বিবেচিত হয়, তবেই তো কেটে যেতে পারে তাদের অনভিপ্রেত ঔদাসীন্য। সত্যোন্মচন হতে পারে সহজ ও সাবলীল।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী'। একথার অর্থ মক্কাবাসীদের অনেকে অথবা সমগ্র মানবজাতির অনেকে ভাবে এই মহাবিশ্ব কখনোই ধ্বংস হবে না। সংঘটিত হবে না মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচারপর্ব। হবে না হিসাব-কিতাব, পুরস্কার-তিরস্কার।

পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহলে দেখতো যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছে।' একথার অর্থ— মক্কাবাসীরা কি পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে বাণিজ্য কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে গমনাগমন করে না? নিশ্চয়ই করে। তাহলে তারা তো নিশ্চয় দেখেছে, কী হয়েছে তাদের পূর্বসূরী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম। তাদের বিরাণ জনপদগুলো তো এখনো মহাকালের সাক্ষীরূপে সতত পরিদৃশ্যমান।

এরপর বলা হয়েছে— 'শক্তিতে তারা ছিলো এদের চেয়ে প্রবল, তারা আবাদ করতো এদের চেয়ে অধিক।' এখানে 'আবাদ করতো' অর্থ তারা চাষাবাদের জন্য খাল খনন করতো' জমিতে পানি সিঞ্চন করতো, ভূগর্ভ থেকে উত্তোলন করতো খনিজ সম্পদ। এ কারণেই এখানে বলা হয়েছে— শক্তিতে তারা ছিলো মক্কাবাসীদের চেয়ে প্রবল। মক্কাবাসীরা তো সেরকম কিছুই করে না। চাষাবাদের জমিই তাদের নেই। চতুর্দিকে কেবল ধুধু মরুভূমি এবং প্রস্তরসংকুল পর্বত। তাই তাদের জীবিকার সন্ধানে বাণিজ্যব্যপদেশে ইয়েমেন ও সিরিয়ার মতো দূরদেশে গমন না করলে চলে না। সুতরাং তারা যে তাদের পূর্বসূরীদের চেয়ে দুর্বল সেকথা বলাই বাহুল্য। এতদসত্ত্বেও পার্থিবতার মোহ তাদের কাটে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট এসেছিলো তাদের রসুলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ।' একথার অর্থ— ওই সকল দৈহিক ও বৈত্তিক শক্তিতে শক্তিমান জাতিগুলোর নিকটেও প্রকাশ্য মোজেজাসহ প্রেরিত হয়েছিলেন আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষগণ, যেমন এখন তোমাদের নিকটে প্রেরিত হয়েছেন সর্বশেষ রসুল। ওই দুর্বিনীত ও গর্বিত জাতিগোষ্ঠীগুলোর অধিকাংশই সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং যথারীতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো আল্লাহ্‌র গজবে। সুতরাং তোমরা এই মুহূর্তে সাবধান হয়ে যাও। অকুণ্ঠচিত্তে অনুগত হয়ে যাও সর্বশেষ বার্তাবাহকের।

এরপর বলা হয়েছে— 'বস্তুত তাদের প্রতি জুলুম করা আল্লাহ্‌র কাজ ছিলো না, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো।' এ কথার অর্থ— জুলুমের মতো অপবিত্রতা থেকে আল্লাহ্ চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। সুতরাং তিনি তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ তো করতেই পারেন না। বরং তারা নিজেরাই সত্যপ্রত্যাখ্যান করে ও সীমালংঘন করে স্বেচ্ছায় শিকার হয়েছিলো আল্লাহ্‌র গজবের। নবী রসুলগণের পুনঃপুনঃ সতর্কবাণীর প্রতি তারা দৃকপাত মাত্র করেনি।

www.eelm.weebly.com

এখানে ‘লিইয়াজলিমাহুম’ কথাটির ‘লাম’ অব্যয়ের পর উহ্য রয়েছে ‘আন্’। সুতরাং ওই উহ্য শব্দটি সহযোগে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— জুলুম করা আল্লাহ্‌র পক্ষে অশোভন ও অসম্ভব। তাইতো তিনি পূর্বাহ্নে তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন তাঁর বার্তাবাহকগণকে। তাঁরা তাদের যথাকর্তব্য পালন করেছিলেন সুচারুরূপে। কিন্তু তাঁদের কথায় তারা ভ্রূক্ষেপই করেনি। উল্টো তাদের উপরে অবলীলায় চালিয়েছিলো ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ ও নিগ্রহ। এমতো অবাধ্যতাই ডেকে এনেছিলো সর্বগ্রাসী আজাব। আর দুরাচারিতার শাস্তি নিশ্চয় অন্যায় নয়। বরং তা সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগ। সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে আল্লাহ্ তাদের প্রতি জুলুম করেননি, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো এবং যথাসময়ে পেয়েছিলো সে জুলুমের প্রতিফল।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর যারা মন্দকর্ম করেছিলো, তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ।’ এখানে ‘আস্‌সূআ’ (মন্দ) ‘আসওয়াউ’ এর স্ত্রীলিঙ্গরূপ এবং একই সঙ্গে তুলনামূলক বিশেষণের শব্দরূপ। যেমন ‘আহসান’ এর স্ত্রীলিঙ্গরূপ ‘হুসনা’। অতএব, এখানে ‘আস্‌সূআ’ এর মর্মার্থ হবে— জঘন্য, নির্মম শাস্তি। কেউ কেউ বলেছেন, জান্নাতসমূহের নামগুলোর মধ্যে ‘হুসনা’ যেমন একটি নাম, তেমনি জাহান্নামের নামগুলোর একটি হচ্ছে ‘সূআ’।

এরপর বলা হয়েছে— ‘কারণ তারা আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যান করতো এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।’ কথাটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— ওই হতভাগ্যদের শেষ পরিণতি ছিলো অত্যন্ত মন্দ। তাই তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনরাজিকে অস্বীকার করতো এবং তা নিয়ে নির্ভয়ে করতো ঠাট্টা-উপহাস।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীরা পাপ করলে তার হৃদয় পটে মুদ্রিত হয় কালো দাগ। ওই দাগ দূরীভূত হতে পারে কেবল তওবার লজ্জা ও অনুতাপ দ্বারা। কিন্তু তওবা না করে যদি সে পাপমগ্ন হয়, তবে কালো কালো দাগে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয়ে যায় তার হৃদয়। কোরআন মজীদে এমতো আবিলতাকে বলা হচ্ছে ‘রান’। যেমন— ‘কাল্‌লা বাল রানা আলা কুলুবিহিম মা কানু ইয়াকসিবূন’ (কক্ষণোই নয়, বরং তারা যে কর্ম করতো, তারই আবিলতা ছেয়ে ফেলেছে তাদের অন্তর্জগতকে)। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ এবং আরো অনেকে। অথবা এখানকার বক্তব্যটি হবে এরকম— ওই পাপিষ্ঠদের হৃদয় ছিলো মোহরাঙ্কিত। তাই তো তারা অগ্র-পশ্চাত না ভেবেই প্রত্যাখ্যান করেছিলো আল্লাহ্‌র আয়াতকে এবং তাই নিয়ে মত্ত হয়েছিলো বিদ্রূপ-উপহাসে।

www.eelm.weebly.com

اَللّٰهُ يَبۡدَؤُا الۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيۡدُهٗ ثُمَّ اِلَيۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۱۱﴾ وَ يَوۡمَ تَقُوۡمُ السَّاعَةُ يُبۡلِسُ الۡمُجۡرِمُوۡنَ ﴿۱۲﴾ وَلَمۡ يَكُنۡ لَّهُمۡ مِّنۡ شُرَكَآئِهِمۡ شُفَعٰٓؤُا وَ كَانُوۡا بِشُرَكَآئِهِمۡ كٰفِرِيۡنَ ﴿۱۳﴾ وَ يَوۡمَ تَقُوۡمُ السَّاعَةُ يَوۡمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوۡنَ ﴿۱۴﴾

r আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি ইহার পুনরাবৃত্তি করিবেন, তখন তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যানীত হইবে।

r যেইদিন কিয়ামত হইবে সেইদিন অপরাধিগণ হতাশ হইয়া পড়িবে।

r উহাদিগের দেব-দেবীগুলি উহাদিগের সুপারিশ করিব না এবং উহারাই উহাদিগের দেব-দেবীগুলিকে অস্বীকার করিবে।

r যেইদিন কিয়ামত হইবে সেইদিন মানুষ বিভক্ত হইয়া পড়িবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করবেন, তখন তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যানীত হবে'। একথার অর্থ— সৃজনকর্মের সূচনা হয়েছে আল্লাহ্ কর্তৃক। তারপর এক সময় তিনি তাঁর এই বিশাল সৃষ্টি ধ্বংস করে দিবেন। তারপর ঘটাবেন তোমাদের পুনরুত্থান। তখন তোমাদেরকে ভালো অথবা মন্দ প্রতিফল গ্রহণের নিমিত্তে তাঁর সকাশে উপস্থিত হতেই হবে।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'যেদিন কিয়ামত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে'। কাতাদা ও কালাবী আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন এরকম— সকল কল্যাণ থেকে সেদিন কাফেরকুল হবে সম্পূর্ণ নিরাশ।

'কামুস' প্রণেতা লিখেছেন, 'বালাস' বলে ওই ব্যক্তিকে, যার মধ্যে কল্যাণের লেশমাত্র নেই। আর যে মনের কথা মনেই গোপন রাখে, তাকে বলে 'মুবলিস'। 'আবলাসা' অর্থ সে আশাহত হয়েছে। হয়েছে হতবাক। এখান থেকেই বুৎপত্তি 'ইবলিস্' শব্দটির। অথবা বলা যেতে পারে 'ইবলিস্' শব্দটি অনারব। নেহায়া প্রণেতা লিখেছেন, ভয়ে অথবা দুঃখ-যাতনায় যে ব্যক্তি নির্বাক হয়ে যায়, তাকে বলে 'মুবলিস' আর 'ইবলাস্' অর্থ হতভম্ব হওয়া।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তাদের দেব-দেবীগুলি তাদের সুপারিশ করবে না'। এ কথার অর্থ— দেব-দেবীরা আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশ

www.eelm.weebly.com

করবে বলে যে প্রতিমাগুলোকে অংশীবাদীরা পৃথিবীতে পূজা করতো, সেগুলো সেদিনও থাকবে স্থানুবৎ নিশ্চল অকর্মন্য তখন তারা স্পষ্ট বুঝতে পারবে তাদের অংশীবাদিতা কতো ভ্রান্ত।

মহাবিচার দিবসের ঘটনা অতিনিশ্চিত। তাই এখানে বাক্যটি উপস্থাপিত হয়েছে অতীতকালবোধক শব্দরূপ সহযোগে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা তাদের দেব-দেবীগুলিকে অস্বীকার করবে'। একথার অর্থ— পৌত্তলিকেরা যখন দেখবে, তাদের পূজিত দেবমূর্তিগুলো নিঃসাড়, তখন তারাও ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে সেগুলোকে।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'যেদিন কিয়ামত হবে, মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে'। মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— বিচারপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর মানুষ হয়ে পড়বে দ্বিধাবিভক্ত। একদল যাত্রা করবে চিরন্তন সুখের আলয় বেহেশতের দিকে। আর একদল পা বাড়াবে চিরদুঃখের আগার দোজখ অভিমুখে। ওই দলদু'টো আর কোনোদিনই একত্র হবে না। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে এভাবে—

সূরা রূম ঃ আয়াত ১৫, ১৬

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ﴿١٥﴾ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ لِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾

r অতএব যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা জান্নাতে আনন্দে থাকিবে;

r এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরলোকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করিয়াছে, তাহারাই শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতএব যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে আনন্দে থাকবে'। এখানে 'ফী রওদ্বাতিন' অর্থ জলবতী নদী বিধৌত কুসুমোদ্যানে।

'ইউহ্বারূন' অর্থ আনন্দে থাকবে। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— বেহেশতবাসীরা হবেন মহাসম্মানিত। মুজাহিদ ও কাতাদা অর্থ করেছেন— তারা সেখানে থাকবে পরমানন্দে বিভোর হয়ে। আবু উবায়দা বলেছেন, তারা হবে চিরসুখী। 'হিবরাতুন' অর্থ আনন্দ, সুখ, চিত্তপ্রশান্তি। এমনও

www.eelm.weebly.com

বলা হয়েছে যে, যে কোন সুখের উপকরণই হচ্ছে 'হিবর' কোনো কিছুকে অনিন্দসুন্দররূপে গঠন করার নাম 'তাহবীর'। 'নেহায়া' রচয়িতা লিখেছেন, 'হাবরাতুন' অর্থ অনুগ্রহরাশি, আনন্দসম্ভার। আর রূপ-সৌন্দর্যকে বলে 'হিবরাতুন'। এরকম লিখেছেন 'কামুস' রচয়িতাও।

হজরত আবু মুসা বর্ণনা করেছেন, আমি একবার নিবেদন জানালাম, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল! আমি যদি জানতাম আমার কণ্ঠস্বর আমার প্রিয়তম সখার শ্রুতিবদ্ধ হচ্ছে, তবে আমি আবৃত্তি করতাম 'তাহবীর'সহ। অর্থাৎ আমি কোরআন তেলাওয়াত করতাম অত্যধিক মধুর স্বরে। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, 'তাহবীর' অর্থ মধুর, সুন্দর।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীর থেকে আওজায়ী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, জান্নাতের আকাশের নাম 'ইউহ্বারূন'। ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীরের এমতো উক্তি বর্ণিত হয়েছে হান্নাদ ও বায়হাকীর মাধ্যমেও।

আওজায়ী বলেছেন, হজরত ইসরাফিল একজন সুমধুর কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট ফেরেশতা। তিনি যখন গান গাইতে শুরু করবেন, তখন জান্নাতের তরুলতায় উছলে পড়বে সবুজের তরঙ্গ। তিনি আরো বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টিতে ইসরাফিলের মতো সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী আর কেউই নেই। যখন তিনি সঙ্গীত শুরু করবেন তখন তার সুরের মুর্ছনায় ম্লান হয়ে যাবে সপ্তাকাশের অধিবাসীদের স্তব-স্তুতি।

ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, আওজায়ী বলেছেন, 'ইউহ্বারূন' মূলতঃ সঙ্গীত। জান্নাতবাসীরা সঙ্গীত উপভোগ করতে চাইলে আল্লাহ্‌পাক 'ইফাফা' নামক বেহেশতের বাতাসকে জোরে প্রবাহিত হবার নির্দেশ দান করবেন। বাতাস তখন জীবন্ত মণিমুক্তার বাগানে প্রবেশ করে আলোড়িত হতে থাকবে। ফলে তরুরাজি হবে আন্দোলিত। তারা একে অপরকে জড়াজড়ি করে হতে থাকবে আন্দোলিত ও অনুরণিত। অনির্বচনীয় সেই বনন সুধা ঢেলে দিবে বেহশতবাসীদের শ্রবণবিবরে। আর বৃক্ষরাজির পল্লবনিচয়ও নাচতে থাকবে খুশীতে।

হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ জান্নাতে প্রবেশ করলে তাদের ক্রোড়ে ও পদযুগলে উপবেশন করবে দু'জন হুর। তারা পরিবেশন করবে অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীত, যা কোনো মানব অথবা জ্বিন কল্পনাও করতে পারে না। আর সে সঙ্গীত কোনো শয়তানী সঙ্গীত নয়, সে সঙ্গীত হচ্ছে আল্লাহ্‌র সঙ্গীতময় গুণকীর্তন।

আমি বলি, পৃথিবীতে কাব্য ও সঙ্গীত উপভোগ্য হয় তিনটি কারণে— ১. তা হবে ছন্দময় ২. সুরেলা ও ৩. প্রিয়তমজনের স্মৃতিবিলোড়ক। কিন্তু জান্নাতবাসীদের হৃদয়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রসক্তি হবে চিরতিরোহিত। আর সেখানে প্রতিভাত ও প্রতিভাসিত হতে থাকবে আল্লাহ্‌র পবিত্র জ্যোতিচ্ছটার

www.eelm.weebly.com

হৃদয়হারক সৌন্দর্য। কিন্তু আল্লাহ্‌র দীদারে যখন ছেদ পড়বে, তখন তারা হয়ে যাবে বিরহচঞ্চল। আর তখনই তারা সেই বিরহকাতরতাকে উপভোগ করবে সঙ্গীতের সুরমুর্ছনার মাধ্যমে।

কোনো কোনো হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আয়তলোচনা রমণীকুল তখন তাদের দয়িতাপ্রবরকে শোনাবে মন মাতানো সঙ্গীত, যে সঙ্গীত অশ্রুতপূর্ব। আরো বর্ণিত হয়েছে, সঙ্গীতানুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে হুরদের কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হতে থাকবে এই কথাগুলোও— আমরা অপরূপা, লাবণ্যময়ী। আমরা আমাদের সখাকুলের চোখে চিরসুন্দরী। চিরচিন্ময়ী। আমরা মৃত্যুহীনা। আমরা অক্ষয়া। আমাদের এ আবাসে বিরাজ করে শান্তি। কেবলই শান্তি। রাজরাণী বেশে আমরা এখানে থাকবো চিরকাল, এই অমরাবতীর কূলে, প্রমোদ বিহারে, নিত্য নতুন সাজে। হজরত ইবনে ওমর থেকে সর্বোন্নত সূত্রে তিবরানীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত আনাস থেকেও এরকম বর্ণিত হয়েছে তিবরানী, বায়হাকী ও ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া কর্তৃক। ইমাম আহমদ তাঁর 'জুহুদ' পুস্তকে লিখেছেন, মালেক ইবনে দীনার বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক তখন হজরত দাউদকে বলবেন, হৃদয় পাগল করা সুরে আমার মহিমা বর্ণনা করো। হজরত দাউদ শুরু করবেন মনমাতানো মহিমাসঙ্গীত। বেহেশতের বৈভবরাজির আকর্ষণ ম্লান হয়ে যাবে তাঁর ওই মহিমাসঙ্গীতের অভূতপূর্ব সুর লহরীর কাছে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে সর্বোন্নত সূত্রে ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ বেহেশতের বিটপীকুলকে আদেশ করবেন, তোমরা আমার ওই সকল বান্দাকে সঙ্গীত শোনাও যারা পৃথিবীতে আমার স্মরণে পরিত্যাগ করেছিলো সঙ্গীতের সুর। বিটপীকুল তখন আওয়াজ তুলবে এমন মোহনীয় সুরে, যে সুর কোনো কর্ণই আর কখনো শোনেনি।

এ প্রসঙ্গে হাদিস রয়েছে আরো অনেক। হাকেম তাঁর 'নাওয়াদিরুল উসুল' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু মুসা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা পৃথিবীতে সঙ্গীতের ঝংকার উপভোগ করেছে, তারা বেহেশতের প্রাণদ ধ্বনি শ্রবণের অনুমতি পাবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর বচনবাহক! প্রাণদ ধ্বনি কী? তিনি স. বললেন, বেহেশতবাসীদের সম্মানে যা আবৃত্তি করা হবে।

দাইনুরীর বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, যে ব্যক্তি অশ্লীল গান ও বাদ্য থেকে তার শ্রবণেন্দ্রিয়কে রেখেছে নিরাপদ, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ তাকে স্থান করে দিবেন কস্তুরীসুবাসিত উদ্যানে। ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এদেরকে শোনাও আমার মহিমাসঙ্গীত, যেনো তারা হয়ে যেতে পারে চিরনির্ভয়। বিষণ্নচিত্ততা ও বিমর্ষভাবনা থেকে যেনো হয়ে যেতে পারে চিরমুক্ত। দায়লামীও এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরলোকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে, তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে'। এখানে 'পরলোকের সাক্ষাৎকার' বলে বোঝানো হয়েছে পুনরুত্থানপর্ব শেষে মহাবিচারের দিবসের উপস্থিতিকে। আর 'মুহদ্বারূন' অর্থ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। অর্থাৎ পরলোকে তাদের শাস্তি হবে বিরতিহীন।

সূরা রূম ঃ আয়াত ১৭, ১৮, ১৯

فَسُبۡحٰنَ اللّٰهِ حِیۡنَ تُمۡسُوۡنَ وَ حِیۡنَ تُصۡبِحُوۡنَ ﴿۱۷﴾ وَ لَهُ الۡحَمۡدُ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ عَشِیًّا وَّ حِیۡنَ تُظۡهِرُوۡنَ ﴿۱۸﴾ یُخۡرِجُ الۡحَیَّ مِنَ الۡمَیِّتِ وَ یُخۡرِجُ الۡمَیِّتَ مِنَ الۡحَیِّ وَ یُحۡیِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا ؕ وَ کَذٰلِکَ تُخۡرَجُوۡنَ ﴿۱۹﴾

r সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে—

r এবং অপরাহ্নে ও জুহরের সময়ে; আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁহারই।

r তিনিই মৃত হইতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর উহাকে পুনর্জীবিত করেন। এইভাবেই তোমরা উত্থিত হইবে।

'ফা সুবহানাল্লহ্' (সুতরাং আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো) বাক্যটি একটি উহ্য ক্রিয়ার সাধারণ কর্মপদ। আর এখানকার 'ফা' (সুতরাং) অব্যয়টি অগ্রে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতিক্রিয়া পৌঁছেছে অন্তেও। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্ যেহেতু আদি অন্তের স্রষ্টা, সেহেতু পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো কেবল তাঁরই। আর এখানে 'পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো' অর্থ নামাজ পাঠ করো।

'হীনা তুমসূন' অর্থ সন্ধ্যায়। অর্থাৎ সন্ধ্যায় পাঠ করো মাগরিবের নামাজ। উল্লেখ্য, সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় পরবর্তী দিবসের সূচনা। তাই এখানে প্রথমে উল্লেখিত হয়েছে মাগরিবের নামাজের নির্দেশ। আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় দিন যেমন কেটে গেলো, তেমনি এলো মঙ্গলময় আসন্ন রাত্রি— এরকম কৃতজ্ঞতাভরা মনোভাব নিয়ে পাঠ করা উচিত সন্ধ্যাকালীন নামাজ।

www.eelm.weebly.com

‘ওয়াহীনা তুসবিহুন’ অর্থ এবং প্রভাতে। অর্থাৎ প্রভাতে পাঠ করো ফজরের নামাজ। শ্রান্তি বিদূরক রাত্রি নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হলো, শুরু হলো কর্মমুখর উপার্জনের সুযোগ, এরকম শান্তি ও শ্রমের সুযোগ যিনি দিলেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সম্পন্ন করা প্রয়োজন উষাকালীন প্রার্থনা। সন্ধ্যা-সকাল সতত বিপরীতমুখী। সেই সাতত্যকে মান্য করেই বাক্যবিন্যাস করা হয়েছে এখানে। বলা হয়েছে— সন্ধ্যায় ও প্রভাতে। পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— ‘ওয়ালাহুল হামদু ফীস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি’ একথার অর্থ— আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিবাসীরা প্রতিনিয়ত ব্যাপৃত থাকে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনায়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘ওয়াআ’শীয়্যান’ এর অর্থ বেলা শেষে, অপরাহ্নে। অর্থাৎ পাঠ করো আসরের নামাজ। বেলা শেষে সূর্যালোক হয়ে আসে নিষ্প্রভ। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ‘আ’শীয়্যান’। যেমন বলা হয় ‘আ’শীয়্যাল আইনি’ (চোখের জ্যোতি কমে গিয়েছে)। বিকেলে মানুষ ব্যস্ত থাকে বাজার ঘাট ও অন্যান্য ব্যতিব্যস্ততা নিয়ে। তাই স্বভাবতই তখন আল্লাহ্‌র স্মরণচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অত্যধিক। তাই এসময় এসেছে আসরের নামাজ পাঠের নির্দেশ। আর এই নামাজকে ‘মধ্যবর্তী নামাজ’ (সালাতুল উসতা)ও বলা হয়।

এরপর বলা হয়েছে— ‘ওয়াহীনা তুজহিরূন’। এর অর্থ— এবং জোহরের সময়। অর্থ দ্বিপ্রহরের পরক্ষণে, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, তখন পাঠ করো জোহরের নামাজ অর্থাৎ যে সময়ের প্রচণ্ড উত্তাপ স্মরণ করিয়ে দেয় অগ্নিতপ্ত জাহান্নামের কথা, সেই সময়ে জাহান্নামমুক্তির আশায় নিমগ্ন হও একান্ত প্রার্থনায়।

যে সময়গুলোতে নামাজ পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই সময়গুলোতেই প্রকাশিত হয় আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ মহিমা। নবায়ন করা হয় তাঁর অনুগ্রহসম্ভারকে। তিনি যে চিরপবিত্র, সকল দোষ-ত্রুটি, ক্ষতি-বিনষ্টি ও অপকৃষ্টতা থেকে চিরমুক্ত তা বিশেষভাবে উপলব্ধ হয় ওই সময়গুলোতেই। একথাও হৃদয়ে অনুভূত হয় যে, সপ্তাকাশবাসী ও ধরাধামবাসী— সকলেই ওই ওয়াক্তগুলোতে হয় বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র স্মরণমুখর।

লক্ষণীয়, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে মাগরিব, ফজর, জোহর ও আসর এই চার ওয়াক্তের নামাজের। ইশার নামাজের উল্লেখ এখানে নেই। কিন্তু কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, ইশার নামাজের কথা এখানে প্রচ্ছন্নরূপে এসেছে, ‘তুমসূনা’ (সন্ধ্যায়) কথাটির মাধ্যমে। হজরত ইবনে আব্বাস, ইবনে জারীর, তিবরানী ও হাকেম এরকম অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ ‘সন্ধ্যায়’ কথাটির অর্থ এখানে— মাগরিব ও ইশা।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ সকালে 'হীনা তুমসূনা' থেকে 'ওয়া কাজালিকা তুখরাজূন' পর্যন্ত পাঠ করলে ওই পাঠ হবে তার রাতের পাপকর্মের ক্ষতিপূরণ। আর কেউ সন্ধ্যায় এরকম করলে, মুছে যাবে তার দিবসের পাপের প্রভাব।

বাগবী লিখেছেন, নাফে ইবনে আজরক একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, কোরআন মজীদের কোথাও একসাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উল্লেখ রয়েছে কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি পাঠ করে শোনালেন এই সুরার ১৭ ও ১৮ সংখ্যক আয়াত।

হজরত আনাস থেকে শিথিল সূত্রে ছা'লাবী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পরিপূর্ণ পুণ্য দেওয়া হোক এরকম কামনা যদি কারো থাকে, তবে সে যেনো পাঠ করে 'হীনা তুমসূনা' থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দিবসে অথবা রজনীতে যদি কেউ 'সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহি' একশত বার পাঠ করে, তবে আল্লাহ্‌পাক তার সকল পাপ মাফ করে দেন, যদিও তা হয় সমুদ্রের ফেনপুঞ্জসম অপরিমেয়।

রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় একশত বার 'সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহি' পাঠ করবে, সে মহাবিচারের দিবসে দেখতে পাবে, তার চেয়ে পুণ্যবান আর কেউ নেই। আর যে এই আমল আরো অধিক করবে, সে হবে আরো অধিক পুণ্যশীল। এই হাদিসটিও এসেছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে। আর বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দুই বাক্য এমন যা উচ্চারণে লঘু, কিন্তু ওজনে গুরু। আর বাক্য দু'টো পরমতম দয়ালু আল্লাহ্‌র অতীব প্রিয়। বাক্য দু'টো হচ্ছে 'সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহি' এবং 'সুবহানাল্লহিল আ'জীম'।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, আমার শ্রদ্ধার্হ জনয়িতা একবার এক জনসমাবেশে বললেন, আমরা সকলেই জানি 'আলহামদুলিল্লাহ' অর্থ কী? কথাটি ব্যবহৃত হয় আমাদের পারস্পরিক সৌজন্য বিনিময়ের সময়। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ' এর অর্থ আমাদের অজানা নয়। একথার মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয় আমাদের প্রার্থনা। 'আল্লাহু আকবার' এর মর্মার্থও আমরা জানি। নামাজ পাঠকারীদের কণ্ঠে তো বারবার ধ্বনিত হয় এই আওয়াজ। কিন্তু তোমরা কি বলতে পারো 'সুবহানাল্লহ্' এর মর্মার্থ কী? জনৈক ব্যক্তি বললো, 'আল্লাহু আ'লাম' (আল্লাহ্ সমধিক জ্ঞাত)। হজরত ওমর বললেন, ওমর যদি এ কথা না জানে, তবে সে তো নিরেট হতভাগ্য (আরে 'আল্লাহ্ সমধিক জ্ঞাত' একথা তো আমিও জানি)। হজরত আলী তখন বললেন, হে বিশ্বাসবানগণের অধিনায়ক! এটা এমন এক নাম, যা কোনো সৃষ্টি

www.eelm.weebly.com

বহন করতে পারে না। ওই মহিমাময় নামের প্রতিই তো সকলের প্রত্যাবর্তন। তাঁর পরিতোষ অর্জনার্থেই তো আমাদের জন্য অপরিহার্য হওয়া উচিত ওই নামের উচ্চারণ।

মসজিদের অঙ্গনে অবস্থান করছিলেন হজরত জুয়াইরিয়া। তাঁর আর এক নাম ছিলো বাররা। রসুল স. তাঁর কাছ থেকে উঠে জরুরী কাজে বাইরে চলে গেলেন। বেশ কিছু পরে ফিরে এসে দেখলেন, হজরত জুয়াইরিয়া অজিফা করে চলেছেন। তিনি স. বললেন, তুমি তো এতক্ষণ ধরে অজিফা পাঠ করছিলে, তাই না? হজরত জুয়াইরিয়া বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, আমি তোমার চলে যাবার পর চারটি বাক্য পাঠ করেছি মাত্র তিনবার। আমার এই আমল তোমার এতক্ষণের অজিফার চেয়ে ওজনে ভারী। বাক্যচতুষ্টয় এই— সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহি; আদাদা খলক্বিহী, ওয়া রিদ্বাআ নাফসিহী ওয়া যীনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী। মুসলিম।

হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, চারটি বাক্য সর্বোত্তম— সুবহানাল্লহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ এবং আল্লাহু আকবার। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সর্বাধিক প্রিয় বাক্যচতুষ্টয় হচ্ছে— সুবহানাল্লহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ ও আল্লাহু আকবার।

হজরত আবু জর গিফারী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. সকাশে জানতে চাওয়া হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! সর্বোৎকৃষ্ট বাক্য কোনটি? তিনি স. বললেন, ওই বাক্য যা আল্লাহ্ নির্ধারিত করেছেন ফেরেশতাদের আমলরূপে। সেটি হচ্ছে— সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী। মুসলিম। হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সুবহানাল্লহিল আ'জীম ওয়া বিহামদিহী পাঠ করে, আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতে উৎপন্ন করেন একটি বৃক্ষ। তিরমিজি।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তিনিই মৃত থেকে জীবিতের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ই দৃশ্যতঃ প্রাণহীন শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেন প্রাণবন্ত মানবশিশু। প্রকাশ্যতঃ নিষ্প্রাণ ডিম থেকে পক্ষীশাবকের আত্মপ্রকাশের বিষয়টিও এরকম আর জীবিত প্রাণীকুলকে মৃত্যুদানও করেন তিনি। এভাবে পুনরুত্থান দিবসে তিনিই দান করবেন মৃত্যু-উত্তর জীবন। জীবন-মৃত্যুর এমতো পালাবদল একথাই প্রমাণ করে যে, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করার বিষয়টি একথার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

শেষে বলা হয়েছে— 'এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে'। একথার অর্থ— বর্ণিত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে একথা অনস্বীকার্য যে, মহাপুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং হে

www.eelm.weebly.com

অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমরা এই মুহূর্তে মেনে নাও পুনরুত্থান দিবস ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলীকে। পুনরুত্থান সংঘটক আল্লাহ্‌কে, তাঁর রসুলকে এবং তোমাদের সংশোধনার্থে অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ কোরআনকে।

সূরা রূম ঃ আয়াত ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭

وَ مِنۡ اٰیٰتِهٖۤ اَنۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنۡتُمۡ بَشَرٌ
تَنۡتَشِرُوۡنَ ﴿٢٠﴾ وَ مِنۡ اٰیٰتِهٖۤ اَنۡ خَلَقَ لَكُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ اَزۡوَاجًا
لِّتَسۡكُنُوۡۤا اِلَیۡهَا وَ جَعَلَ بَیۡنَكُمۡ مَّوَدَّةً وَّ رَحۡمَةً ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ
لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّتَفَكَّرُوۡنَ ﴿٢١﴾ وَ مِنۡ اٰیٰتِهٖ خَلۡقُ السَّمٰوٰتِ
وَ الۡاَرۡضِ وَ اخۡتِلَافُ اَلۡسِنَتِكُمۡ وَ اَلۡوَانِكُمۡ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ
لِّلۡعٰلِمِیۡنَ ﴿٢٢﴾ وَ مِنۡ اٰیٰتِهٖ مَنَامُكُمۡ بِالَّیۡلِ وَ النَّهَارِ وَ ابۡتِغَآؤُكُمۡ
مِّنۡ فَضۡلِهٖ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّسۡمَعُوۡنَ ﴿٢٣﴾ وَ مِنۡ اٰیٰتِهٖ
یُرِیۡكُمُ الۡبَرۡقَ خَوۡفًا وَّ طَمَعًا وَّ یُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَیُحۡیٖ
بِهِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّعۡقِلُوۡنَ ﴿٢٤﴾ وَ
مِنۡ اٰیٰتِهٖۤ اَنۡ تَقُوۡمَ السَّمَآءُ وَ الۡاَرۡضُ بِاَمۡرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمۡ
دَعۡوَةً ٭ۖ مِّنَ الۡاَرۡضِ ٭ۖ اِذَاۤ اَنۡتُمۡ تَخۡرُجُوۡنَ ﴿٢٥﴾ وَ لَهٗ مَنۡ فِی
السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوۡنَ ﴿٢٦﴾ وَ هُوَ الَّذِیۡ یَبۡدَؤُا
الۡخَلۡقَ ثُمَّ یُعِیۡدُهٗ وَ هُوَ اَهۡوَنُ عَلَیۡهِ ؕ وَ لَهُ الۡمَثَلُ الۡاَعۡلٰی فِی
السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَكِیۡمُ ﴿٢٧﴾ ع

r তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার পর এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছ।

www.eelm.weebly.com

r আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের সংগিনীদিগকে যাহাতে তোমরা উহাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

r আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। ইহাতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

r আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রাত্রিতে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের অন্বেষণ তাঁহার অনুগ্রহ হইতে। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য।

r আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তিনি তোমাদিগকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে এবং তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন ও তদ্দ্বারা ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন উহার মৃত্যুর পর; ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।

r আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তাঁহারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি থাকে; অতঃপর আল্লাহ্ যখন তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে উঠিবার জন্য একবার আহ্বান করিবেন তখন তোমরা উঠিয়া আসিবে।

r আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবহ।

r তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি ইহাকে সৃষ্টি করিবেন পুনর্বার; ইহা তাঁহার জন্য অতি সহজ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁহারই; এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— তোমরা যে পুনরুত্থিত হবেই, তার আরো দৃষ্টান্ত দেখ। যে আদমের সন্তান তোমরা, সেই আদমকে আমিই সৃষ্টি করেছি নিশ্চেতন মৃত্তিকা থেকে। তারপরেই তো ঘটেছে তার বংশ বিস্তার। ফলে দ্যাখো, তোমরা মানুষেরা এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছো সারা পৃথিবীতে।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন'।

www.eelm.weebly.com

এখানে ‘মিন আনফুসিকুম’ (তোমাদের মধ্য থেকে) কথাটির ‘মিন’ অব্যয়টি সূচনা সূচক। অর্থাৎ নারীজাতিরও সূচনা হয়েছে হজরত আদম থেকে। তারপর থেকে মহামানবতার বিস্তৃতি ঘটেছে নারী-পুরুষের সম্মিলনের মাধ্যমে। অথবা ‘মিন’ এখানে বিবৃতিমূলক। সেক্ষেত্রে মর্মার্থ দাঁড়ায় নারীও নরের মতো মানবগোষ্ঠীভূত। অন্য কোনো সম্প্রদায়ভূত নয়।

‘লি তাসকুনূ’ অর্থ তোমরা একে অপরের প্রতি বোধ করো ভালোবাসা ও দয়া। উল্লেখ্য, জাতিগত ঐক্য মমতা প্রেম ও সহমর্মিতাকে অপরিহার্য করে। আর জাতিগত অনৈক্য সৃষ্টি করে বিরাগ।

‘বাইনাকুম’ অর্থ তোমাদের মধ্যে । অর্থাৎ নর-নারীর মধ্যে। অথবা শুধু নর বা শুধু নারীর মধ্যে নয়।

‘মুওয়াদ্‌দাতাঁও ওয়া রহমাহ্’ অর্থ নর ও নারীর পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া, যা সৃষ্টি হয় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। সম্প্রীতির ও আত্মীয়তার অন্যান্য শাখা প্রশাখাও সৃষ্টি হয় এই সম্পর্কের ভিত্তিতে। এভাবেই পারস্পরিক প্রেম-প্রণয়-প্রীতি-অনুরাগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে প্রবহমান রয়েছে মহামানবতা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে’। একথার অর্থ— যারা বিচক্ষণ ও ভাবুক, তারা মহামানবতার এমতো বন্ধন ও বিস্তারের মধ্যে খুঁজে পায় আল্লাহ্‌র সৃজননৈপুণ্য ও প্রজন্মপরম্পরাগত অনেক বিস্ময়কর উপাত্ত।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— ‘এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে’।

এখানে ‘ইখতিলাফি আলসিনাতিকুম’ অর্থ— ভাষা বা বচনের বৈচিত্র্য। আল্লাহ্‌পাক বিভিন্ন জাতির জন্য সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন ভাষা। আর প্রতিটি ভাষার বর্ণমালা ভিন্ন ভিন্ন। অথবা ভাষার বৈচিত্র্য বলে এখানে বুঝানো হয়েছে বাকভঙ্গিমাগত বৈসাদৃশ্যকে, নানাবিধ স্বরভঙ্গিমাকে। সেকারণেই দেখা যায় একজনের কণ্ঠস্বর অন্যজনের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা পৃথক।

‘ওয়া আলওয়ানিকুম’ অর্থ বর্ণের বৈচিত্র্য। অর্থাৎ মানুষের গাত্রত্বক ও দেহাবয়বের বর্ণগত তারতম্য। একারণেই দেখা যায় কেউ দীর্ঘ, কেউ হ্রস্ব, কেউ কৃশকায়, কেউ স্থূল। কেউ শ্বেতাভ, কেউ লোহিতাভ, কেউ আবার শ্যামল, কেউ শুভ্র। অর্থাৎ আকৃতিগত ও প্রকৃতিগতভাবে কারো সঙ্গে কারো হুবহু মিল নেই।

‘জ্ঞানীগণের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে’ অর্থ মানুষের ভাষা ও বর্ণবৈচিত্রের মধ্যে জ্ঞানান্বেষীরাই খুঁজে পায় আল্লাহ্‌র সৃজনরহস্যের বহুতর নিদর্শন ও নিগুঢ় দর্শন।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত্রিতে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য'।

এখানে 'ইবতিগাউ' ক্রিয়াটির কর্মপদ রয়েছে উহ্য। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— রাত ও দিনের নিদ্রা ও জীবনোপকরণান্বেষণজনিত কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে রয়েছে মহাকুশলী আল্লাহ্‌র প্রভূত পরিমিতি ও বিন্যাস-বিভঙ্গগত সময়াতিপাতের অনেক অবাক নিদর্শন। বিশেষ করে, নিদ্রা তো মহাবিস্ময়। নিদ্রা শ্রান্তিহরণ করে বলেই মানুষ ক্রমাগত উদ্দীপিত হয় নতুন প্রাণপ্রাচুর্যে। প্রবহমান থাকে কর্ম, ঘর্ম ও আবিষ্কার। এ বিষয়টি জ্ঞানায়ত্ত করা অসম্ভব। বরং এই জ্ঞান যেনো শ্রুতিনির্ভর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই শেষে বলা হয়েছে— এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য।

অথবা বলা যেতে পারে, নিশীথের সুপ্তি ও দিবসের জীবিকান্বেষণের কর্মমুখরতা আল্লাহ্‌তায়ালার অতুলনীয় কর্মকুশলতা ও শক্তিমত্তার একটি বিস্ময়কর নমুনা। এখানে দু'টি সংযোজক অব্যয়ের সন্নিবেশনের মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে, শ্রান্তিনিবারণ ও উপার্জন প্রচেষ্টা কর্ম দু'টো দিবস-রাত্রির যে কোনো সময়ে করা যেতে পারে। নিশীথে নিদ্রা, দিবসে কর্মযোগ, অথবা দিবসে নিদ্রা, নিশীথে কর্মসম্পাদন। এমতো ব্যাখ্যার পরিপোষণ রয়েছে অন্য এক আয়াতেও।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসাসঞ্চারকরূপে এবং তিনি আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন এবং তদ্দ্বারা ভূমিকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য'।

এখানে 'খওফান' অর্থ ভয়। অর্থাৎ বজ্রপাতজনিত ভীতি। 'খওফান ওয়া ত্বমআ'ন' এখানে উল্লেখিত অথবা উহ্য দু'টি ক্রিয়াপদের কারণপ্রকাশক কিংবা অবস্থাজ্ঞাপক। আর 'ভূমিকে তার মৃত্যুর পর' অর্থ এখানে— খরাদগ্ধ ভূমি বিশুষ্ক হওয়ার পর। আর 'পুনরুর্জীবিত করেন' অর্থ করেন শস্যশ্যামল।

'ইয়া'ক্বিলূন' অর্থ বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়। অর্থাৎ বোধশক্তিসম্পন্ন যারা তারাই কেবল অনুধাবন করতে পারে আল্লাহ্‌পাকের এসকল নিখুঁত ও নিপুণ কর্মকাণ্ডের মাহাত্ম্য।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি; অতঃপর আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উঠবার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে'। এখানে 'ছুম্‌মা' (অতঃপর) শব্দটি সময়ান্তরজ্ঞাপক অথবা মহাপ্রলয় বা মহাবিচার দিবসের মাহাত্ম্যপ্রকাশক।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ তাফসীর বেত্তার মতে এখানকার 'মিনাল আরদ্ব' (ভূমি থেকে) কথাটির সম্বন্ধ রয়েছে 'তাখরুজুন' এর সঙ্গে। অর্থাৎ তোমরা পুনরুত্থিত হবে ভূমি থেকে। তবে বায়যাবী লিখেছেন, সমাধানটি ভ্রমাত্মক। কারণ 'ইজা'র পূর্বের শব্দের সম্বন্ধ ইজার পরের ক্রিয়ার সঙ্গে সম্ভব নয়। একারণেই এখানে 'ইজা'র সম্বন্ধ হবে 'দাআ' শব্দটির সঙ্গে। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভূমির মধ্য থেকে আহ্বান জানাবেন।

ইবনে আসাকের লিখেছেন, জায়েদ ইবনে জাবের শাফেয়ী 'সেদিন আহ্বানকারী নিকটস্থ স্থান থেকে আহ্বান জানাবে' আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সেদিন হজরত ইস্রাফিল বায়তুল মাকদিসের সন্নিকটবর্তী একটি প্রস্তরখণ্ডের উপরে দাঁড়িয়ে আহ্বান জানাবেন— ওহে বিগলিত অস্থি! ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিলুপ্তপ্রায় বিবর্ণ চর্ম! ধুলিধূসরিত কেশগুচ্ছ! আল্লাহ্র আদেশ শোনো। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য একত্রিত হও। উল্লেখ্য, এখানকার দ্বিতীয় 'ইজা' (যখন) উল্লেখ করা হয়েছে কর্মের আকস্মিকতাকে বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ তোমরা পুনরুত্থিত হবে আকস্মিকভাবে।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ'। একথার অর্থ— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির উপরে রয়েছে নিরঙ্কুশ আধিপত্য। সকলেই এবং সকলকিছুই তাঁর নির্দেশানুগত।

কালাবী বলেছেন, এখানে 'সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ' অর্থ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলেই তাঁর অনুগত। অবশ্য এখানে শরিয়তের আনুগত্যের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে বিধানগত আনুগত্যের কথা। অবিশ্বাসীরা শরিয়তের বিধান লংঘন করতে পারে বটে, কিন্তু যে বিধানে সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও পরিণতি সতত সচল থাকে, সে বিধানের বাইরে যাবার ক্ষমতা তাদেরও নেই। হজরত ইবনে আব্বাস তাই বলেছেন, প্রত্যেকেই জন্ম, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও মহাবিচার দিবসের আইনের দাস, যদিও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হয়ে থাকে আল্লাহ্র ইবাদত বিমুখ।

ইকরামা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হবেই— একথা শুনে হতবাক হয়ে যেতো মক্কার পৌত্তলিকেরা। তাদের এমতো বিস্ময় নিরসনার্থে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি একে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার, এটা তার জন্য অতি সহজ'।

রবী ইবনে হাইছুম, হাসান, কাতাদা ও কালাবী বলেন, এখানকার 'আহওয়ান' (অতিসহজ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'হাইয়্যেন' অর্থে। কেননা আল্লাহ্র পক্ষে অসহজ বলে কোনো কিছুই নেই। এখানকার— এই শব্দরূপটি তুলনামূলক বিশেষণ

www.eelm.weebly.com

হলেও একে গ্রহণ করতে হবে রূপক বিশেষণ অর্থে। আউফি বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যাও এরকম।

মুজাহিদ ও ইকরামা বলেছেন, এখানের 'আহওয়ান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দৃষ্টান্তরূপে। লক্ষ্যার্থে নয়, রূপকার্থে। অর্থাৎ দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টির তুলনায় সহজ। বক্তব্যের লক্ষ্য এখানে যেহেতু মানুষ, তাই যেনো এখানে বলা হয়েছে— দ্বিতীয় সৃষ্টি যে প্রথম সৃষ্টির চেয়ে সহজতর, একথা তোমরাও জানো। অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তটিই তোমাদের জ্ঞানানুকূল।

কেউ কেউ কথাটির মর্মার্থ করেছেন— তোমাদের কাছে যেমন দ্বিতীয় নির্মাণ প্রথম নির্মাণাপেক্ষা সহজ, তেমনি আল্লাহ্র নিকটে এমতো সৃজন অতি অবশ্যই সহজ। কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেন, সৃষ্টিকুলের পক্ষে প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বারের অস্তিত্বগ্রহণ সহজতর। কারণ দ্বিতীয়বার তারা স্বরূপ ধারণ করবে মাত্র একটি মহাধ্বনির প্রতিক্রিয়ায়। প্রথমবারের সৃষ্টি ছিলো সময়সাপেক্ষ, জটিল ও বিবর্তন প্রক্রিয়াভূত। যেমন শুক্রকণা-রক্তপিণ্ড-গোশতপিণ্ড-অস্থিপঞ্জরাবৃত হওয়া— তারপর পূর্ণ দেহাবয়ব, প্রবৃদ্ধি, পরিণতি ইত্যাদি। কিন্তু দ্বিতীয় বারের অস্তিত্বায়ন ঘটবে হজরত ইসরাফিলের মাত্র একটি ফুৎকারধ্বনির মাধ্যমে। কালাবীর সূত্রে বর্ণিত ইবনে হাব্বানের বক্তব্য এবং সালেহের মাধ্যমে উপস্থাপিত হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তির সারকথাও এরকমই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই'। একথার অর্থ— মহাকাশমার্গে ও মেদিনীপৃষ্ঠে যা কিছু বিদ্যমান, সকলেই তাঁর মর্যাদা ও মহিমা মুখর। কথায় অথবা নীরবতায়। ভাষায় অথবা অভিব্যক্তিতে। কেননা তিনিই সর্বোচ্চ মর্যাদাধারী। এমতো মর্যাদা অন্য কারো বা অন্য কোনো কিছুরই নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই' অর্থ— তাঁর দৃষ্টান্ত অনুপম'। কাতাদা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, কলেমায়ে তাইয়্যেবার সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, কথাটির অর্থ হবে— আল্লাহ্র এককত্বের দৃষ্টান্তই সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— সৃজনকর্মে ও প্রভুত্বে তিনি মহাপ্রতাপশালী ও সর্বশক্তিধর। সৃষ্টির সূচনা ও সমাপ্তি দু'টোর কোনো একটিও তাঁর পরাক্রম বর্হির্ভূত নয়। আর তাঁর সকল কর্মকাণ্ড প্রজ্ঞাবিমণ্ডিত।

www.eelm.weebly.com

তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজের সময় অংশীবাদীরাও তালবিয়া পাঠ করতো। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলতো যে, হে আল্লাহ্! তোমার তো কোনো সমকক্ষ নেই। তবে তুমি যাকে মনোনীত করেছো তোমার সমকক্ষরূপে। কিন্তু তুমি তারও প্রভুপালক। সে তোমার মালিক নয়। তাদের এমতো অংশীবাদিতামিশ্রিত অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত। বলা হয়েছে—

সূরা রূম ঃ আয়াত ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ
تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ
لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ
عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٩﴾
فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ﴿٣٠﴾ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا
الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا
دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٣٢﴾

r আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেনঃ তোমাদিগকে আমি যে রিয্ক দিয়াছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের কেহ কি তাহাতে অংশীদার? ফলে তোমরা কি এই ব্যাপারে সমান? তোমরা কি উহাদিগকে সেইরূপ ভয় কর যেইরূপ তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভয় কর? এইভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের নিকট নিদর্শনাবলী বিবৃত করি।

www.eelm.weebly.com

r বরং সীমালংঘনকারীগণ অজ্ঞানতাবশত তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে; সুতরাং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছেন, কে তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিবে? আর তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

r তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

r বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁহার অভিমুখী হইয়া তাঁহাকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর এবং অন্তর্ভুক্ত হইও না মুশরিকদের ,

r যাহারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ লইয়া উৎফুল্ল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ এবার তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছেন। উপমাটি এই— দ্যাখো, তোমরা ও তোমাদের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীরা উভয়েই মানব হিসেবে সমতুল। তবুও তোমাদের সম্পদে তাদের অধিকার অস্বীকৃত। তোমরা অন্য মানুষকে ভয় করলেও তাদের আনুগত্য সম্পর্কে কেমন নিঃশঙ্কচিত্ত। এই যদি হয় অবস্থা, মানুষ হয়েও যদি তারা তোমাদের সমকক্ষতা দাবি না করতে পারে, তবে কোনো প্রস্তর প্রতিমা মহাবিশ্বের একক সৃজয়িতা ও পালয়িতার সমকক্ষ হতে পারে কীভাবে? আর কীভাবেই বা তোমরা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে নিয়োজিত হতে পারো বিগ্রহবন্দনায়?

এখানে 'দ্বরাবা' অর্থ আল্লাহ্ উপস্থাপন করেন। 'লাকুম' অর্থ তোমাদের জন্য। 'মা মালাকাত আইমানাকুম' অর্থ তোমাদের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী। 'ফীহি সাওয়াউন' অর্থ তোমাদের সম্পদের মালিকানা যথেচ্ছ ব্যবহারে সমতুল কি তারাও? তারাও কি ব্যয় করতে পারে তোমাদেরই মতো? 'তাখাফূনাহুম' অর্থ তোমরা তাদেরকে ভয় করো, কখন তারা তোমাদের সম্পদে হস্তক্ষেপ করে। 'কাখীফাতিকুম আনফুসাকুম' অর্থ তোমরা যেমন তোমাদের মতো স্বাধীন লোকদেরকে ভয় করো, তেমনি কি ভয় করো তোমাদের দাসদাসীদেরকে? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজা অর্থ তোমরা তাদের সম্পর্কে থাকো নির্ভয়। তাদেরকে মনে করো হেয়। তারা তোমাদের সম্পদের অংশীদারও নয়। তাই তোমাদের মতো যথেচ্ছ ব্যয়ের অধিকার তাদের নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'এভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের নিকট নিদর্শনাবলী বিবৃত করি'। একথার অর্থ— উল্লেখিত উপমা দ্বারা সত্যোপলব্ধি করতে পারে কেবল তারা, যারা শুভ বোধ ও বিশুদ্ধ বিবেকসম্পন্ন। আর আমি

www.eelm.weebly.com

তাদের উপকারের জন্যই বিবৃত করি এমতো দৃষ্টান্তমূলক নিদর্শন। তাই তো তারা এমতো দৃষ্টান্তের মধ্যে খুঁজে পায় তাদের চিন্তাগবেষণার প্রকৃষ্ট উপাত্ত। তিবরানী বলেছেন, জুয়াইবীর ও দাউদ ইবনে হিনদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে আলী জয়নুল আবেদীন আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ সীমালংঘনকারীগণ অজ্ঞানতাবশতঃ তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে থাকে'। একথার অর্থ— প্রকৃত কথা হচ্ছে, আল্লাহ্র অংশী, সমকক্ষ অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী কেউই নেই, হতে পারেও না। সুতরাং যারা শিরিক করে তারা সীমালংঘনকারী। এই জঘন্য ও শাস্তিযোগ্য অমার্জনীয় পাপটি তাদেরই ধারণাপ্রসূত। তারা খেয়াল-খুশীর অনুসারক। আর এমতো অন্ধ অনুসরণ তারা করে অজ্ঞানতাবশতঃ।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, কে তাকে সৎপথে পরিচালিত করবে? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজা অর্থ— যারা তাদের স্বপ্রবৃত্তির উপাসক। অজ্ঞতা ও খেয়াল-খুশীর অনুসারক এবং যারা অবজ্ঞা ও অবহেলা ভরে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত পথনির্দেশনাকে, তাদেরকে আবার পথ দেখাবে কে? তারা যে চিরভ্রষ্ট।

শেষে বলা হয়েছে— 'তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানে যারা অনঢ় ও অবিচল, তাদেরকে পাপমুক্ত করার দায় কারো উপরেই বর্তেনা। সুতরাং তারা কোনো সাহায্যকারীও পায় না।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত করো'। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল। যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা চিরঅজ্ঞ ও স্বেচ্ছাচারীতায় অবিচল, তখন তাদের জন্য আর অযথা আক্ষেপ করে সময় নষ্ট করবেন কেনো। আপনি তো আপনার আমন্ত্রণকর্তব্য যথাযথরূপে পালন করেছেনই। সুতরাং এবার সম্পূর্ণরূপে মনোনিবদ্ধ করুন ধর্মাচরণের প্রতি। ইবাদত-বন্দেগীকে করুন নৈষ্ঠিক, ঐকান্তিক এবং একাগ্রচিত্ততায়িক'।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র প্রকৃতির অনুসরণ করো, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন'। এখানে 'ফিতরাত' অর্থ প্রকৃতি বা স্বভাব। আর মর্মার্থ— ইসলাম। মানুষকে সৃজন করা হয়েছে ইসলামের স্বভাবের উপর। হজরত ইবনে আব্বাস সহ অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা এরকমই বলেছেন।

এখানে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স. এর প্রতি সরাসরি। কিন্তু সমগ্র মানবজাতি এ সম্বোধনের বৃত্তভূত। আর এর মর্মার্থ হচ্ছে— সমগ্র সৃষ্টির জন্যই

www.eelm.weebly.com

ইসলাম বা আনুগত্য অপরিহার্য। আর ফিতরতকে উপলব্ধি করার যোগ্যতাও সকলের রয়েছে, যদিও এ যোগ্যতাকে অনেকে স্বেচ্ছায় নষ্ট করে ফেলে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বলতে হয়, ফিতরত অর্থ স্বভাবজ সামর্থ্য বা সত্তাগত যোগ্যতা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফিতরত অর্থ ওই অঙ্গীকার যা আল্লাহ্তায়ালা সমগ্র মানবজাতির নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। আলমে আরওয়াহে বলেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভুপালক নই? সকলে সমস্বরে জবাব দিয়েছিলো, অবশ্যই। এরপর পৃথিবীতে সকল শিশুই জন্মগ্রহণ করে অঙ্গীকারের দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়ে। হানাফী আলেমগণ এরকমই বলে থাকেন। সুরা আলে ইমরানের এ সম্পর্কিত এক আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সকল মনুষ্যসন্তান জন্ম গ্রহণ করে ফিতরতের উপর। তারপর তাদের পিতামাতাই তাদেরকে বানিয়ে দেয় ইহুদী, খৃষ্টান অথবা অন্য কোনো ধর্মমতানুসারী। যেমন পশুশাবক, তাদের জন্ম আকৃতি নিখুঁত, কিন্তু পরবর্তীতে তাদের করা হয় অঙ্গছেদন। এরপর রসুল স. আবৃত্তি করলেন— আল্লাহ্র প্রকৃতির অনুসরণ করো, প্রকৃতি অনুসারে.......।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র ধর্মাদর্শে রূপান্তর ঘটিয়ো না। মুজাহিদ ও ইব্রাহিম নাখয়ী কথাটির অর্থ করেছেন— সুদৃঢ়রূপে অবস্থান গ্রহণ করো আল্লাহ্র ফিতরতের উপর। আল্লাহ্র এককত্বের বিশ্বাসকে বিমিশ্রিত কোরো না অংশীবাদিতার সঙ্গে।

এক বর্ণনায় এসেছে, প্রতিটি মানবশিশু জন্ম গ্রহণ করে ফিতরতের উপর। হাদিসটিকে আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— প্রত্যেক মানবশিশু জন্মগতভাবে সৌভাগ্যবান অথবা দুর্ভাগা হিসেবে নির্ধারিত। ওই নির্ধারণের অনুকূল স্বভাব নিয়েই তারা পৃথিবীতে আগমন করে এবং প্রত্যাগমনও করে ওই একই স্বভাব নিয়ে। পৃথিবীতে তাদের কর্মকাণ্ডও হয় স্বস্বভাবানুকূল। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে 'আল্লাহ্র সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— যে শুভ ও অশুভ স্বভাব নিয়ে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, তা অপরিবর্তনীয়। সুতরাং ভাগ্যবান ও হতভাগ্যরা কখনোই তাদের স্বস্বভাব বদলাবে না।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের আদি রূপ মাতৃউদরে অবস্থান গ্রহণ করে শুক্রবিন্দু আকারে। এরপর ওই আকৃতি হয় রক্তপিণ্ড। তারপর গোশতপিণ্ড। এরপর এক ফেরেশতা তার ললাটে লিখে দেয় চারটি নির্ধারণ— আয়ুষ্কাল, উপজীবিকা, সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য। এরপর ওই গোশতপিণ্ডে ঘটানো হয় প্রাণের সম্পাত। যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! কোনো কোনো মানুষ জীবনভর

www.eelm.weebly.com

পুণ্যকর্ম করে, এমনকি সে চলে যায় জান্নাতের প্রায় একহাত ব্যবধানে। সহসা তার উপরে প্রবল হয়ে যায় তার জন্মকালীন ললাটলিপি। সে তখন শুরু করে জাহান্নামবাসীদের মতো আমল। পরিশেষে জাহান্নামই হয় তার গন্তব্য। আবার কোনো কোনো মানুষ জীবনব্যাপী আমল করে জাহান্নামবাসীদের মতো। এমনকি তার এবং জাহান্নামের মধ্যে ব্যবধান হয় প্রায় একহাত। সহসা তার উপরে প্রবল হয় তাঁর জন্মকালীন অদৃষ্টলিপি। তখন সে শুরু করে নিরবচ্ছিন্ন পুণ্যকর্ম। ফলে তার জান্নাতগমন হয় সুনিশ্চিত। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, একবার আমরা রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে সমবেত হয়ে আমাদের পরিণামের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। রসুল স. বললেন, যদি শোনো, কোনো পাহাড় স্থানচ্যুত হয়েছে, তবু সে তথ্যে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারো। কিন্তু যদি শোনো, কোনো মানুষের স্বভাব বদল হয়েছে, তবে সে কথা বিশ্বাস কোরো না। কারণ মানুষের পরিণতি তার সুনির্ধারিত স্বভাবের অনুকূল। আহমদ। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্পাক প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য নির্ধারিত স্বভাবের উপর। তারা সে স্বভাব পরিবর্তন করতে অক্ষম। অতএব হে আমার রসুল! একথা জেনে আনন্দিত হোন যে, আল্লাহ্ আপনাকে এবং সহচরবৃন্দকে করেছেন সৌভাগ্যবান। সুতরাং একনিষ্ঠভাবে আপনি ও আপনার অনুচরবর্গ স্বভাবকে পরিচ্ছন্ন ও শাণিত করবার নিমিত্তে ধর্মাধিষ্ঠিত হোন। সতত অনুসারী থাকুন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত চিরন্তন প্রকৃতির। এমতাবস্থায় বলতে হয়, আলোচ্য আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের কারণ প্রকাশক। অর্থাৎ আলোচ্য বক্তব্যে নিহিত রয়েছে ধর্মীয় পরিশুদ্ধি অর্জনের আবেগঘন নির্দেশনা। ইকরামা ও মুজাহিদ আবার পুরো আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্র সৃষ্টির রূপান্তর ঘটিয়ো না। যেমন জন্তু-জানোয়ারকে বানানো হয় খাশী ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটাই সরল দ্বীন'। একথার অর্থ— যে প্রকৃতি সম্মত ধর্মের কথা বলা হলো, সেই ধর্মই হচ্ছে বক্রতাবিমুক্ত প্রকৃত ধর্ম।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না'। একথার অর্থ— কিন্তু মক্কার অধিকাংশ মানুষ এই সরল তত্ত্বটি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে না।

এরপরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় করো, সালাত কায়েম করো এবং অন্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের'। এখানকার 'মুনীবীন' শব্দটির বুৎপত্তি ঘটেছে 'আনাবা' থেকে। এর অর্থ— সবকিছু পরিত্যাগ করে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্ অভিমুখী হওয়া।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! ধর্মাদর্শের বিষয়ে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী, তাদের অনুরাগী আপনি কস্মিনকালেও হবেন না। তারা তো নিজ নিজ মতবাদকে ধর্ম মনে করেই খুশী।

এখানকার 'যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে' বাক্যটি পূর্ববর্তী আয়াতের। 'অন্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের' কথাটির অর্থান্তরন্যাস। অর্থাৎ অংশীবাদীরাই বিচ্ছিন্নতাবাদী। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যারা প্রবৃত্তির প্ররোচনায় নির্বাচন করে নিয়েছে পৃথক পৃথক উপাস্য, রূপান্তরিত করেছে ধর্মের অবকাঠামো, তোমরা তাদের দলভুক্ত নও। তারা তো তাদের স্বকপোলকল্পিত মতবাদ নিয়েই তুষ্ট। তাদের প্রত্যেক দলের আচার্য আকর পৃথক পৃথক। তারাই ছিন্নভিন্ন করেছে প্রকৃত ধর্মাদর্শকে আর অধিকাংশ লোক হয়েছে তাদেরই অন্ধ অনুসারী।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে এই উম্মতের বেদাতী দলগুলোকে। তারাও ধর্মের নামে হয়েছে আপনাপন মতবাদের অনুসারী। আর তারা 'মুশরিক' (অংশীবাদী) এই অর্থে যে— তারা আল্লাহ্‌র রসুল প্রবর্তিত ধর্মাদেশ ছেড়ে উপাসনা করতে শুরু করেছে স্বপ্রবৃত্তির। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিয়াত্তরটি দলে, তন্মধ্যে একটি দল ব্যতীত অন্য সকল দল হবে জাহান্নামী। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ওই দলটি কোন দল। তিনি স. বললেন, আমি ও আমার সহচরবৃন্দের দল। তিরমিজি।

এখানে 'মা লাদাইহিম' অর্থ নিজ নিজ মতবাদ। 'ফারিহূন' অর্থ উৎফুল্ল। বাতিলপন্থীরা নিজেদেরকে মনে করে সত্যপন্থী। তাই আপন মতবাদ নিয়েই তারা থাকে সতত উৎফুল্ল। ইবনে মোবারক ও আওজায়ীর সূত্রে ইব্রাহিম ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে দারেমী বর্ণনা করেছেন, ইবলিস একবার তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে বললো, তোমরা আদম সন্তানদেরকে বিভ্রান্ত করবার জন্য কীভাবে প্রচেষ্টা চালাও? সাঙ্গপাঙ্গরা বললো যারা একত্ববাদী, তাদেরকে বিভ্রান্ত করা দুরূহ। কারণ একত্ববাদদের সঙ্গে জড়িত রয়েছে এক আল্লাহ্‌র মার্জনা। ইবলিস বললো, ঠিক আছে, আমি তাহলে তাদের মধ্যে এমন প্রথার প্রচলন ঘটাবো, যাতে করে তারা আর কখনো মার্জনাই কামনা করবে না। অর্থাৎ পাপকে পাপই মনে করবে না। মনে করবে, তারা যা করছে, সেটাই সঠিক। একথা বলে ইবলিস আদম সন্তানদের প্রবৃত্তিকে করে দিলো বিভিন্ন নতুনত্বের প্রতি অনুরাগী।

www.eelm.weebly.com

وَ اِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۙ فَتَمَتَّعُوْا ۥ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾ اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٥﴾

r মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্যস্পর্শ করে তখন উহারা বিশুদ্ধ চিত্তে উহাদের প্রতিপালককে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন উহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান তখন উহাদের একদল উহাদের প্রতিপালকের শরীক করিয়া থাকে;

r ফলে উহাদিগকে আমি যাহা দিয়াছি, তাহা উহারা অস্বীকার করে। সুতরাং ভোগ করিয়া লও, শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে!

r আমি কি উহাদের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা উহাদিগকে শরীক করিতে বলে?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'মক্কায় পৌত্তলিকেরা যখন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তখন তারা তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর পূজা অর্চনা ছেড়ে একমনে ডাকে কেবল আল্লাহ্কে। তারপর আল্লাহ্ যখন তাদের বিপদাপদ দূর করে দেন, তখন তারা আবার ফিরে যায় পৌত্তলিকতায়।

এখানে 'রহমত' (অনুগ্রহ) অর্থ বিপদমুক্তি। অথবা দীর্ঘ দুর্ভিক্ষের পর ফল-ফসলের সমারোহ। আর এখানে 'শরীক করে থাকে'। অর্থ করুণা দাতা হিসেবে বিপদের সময় আল্লাহ্কে মেনে নিলেও বিপদ অপসারিত হওয়ার নিষ্কৃতিদাতা হিসেবে মানতে শুরু করে প্রতিমাগুলোকে।

হজরত খালেদ ইবনে জায়েদ জুহুনী বর্ণনা করেছেন, তখন আমরা হুদায়বিয়ায়। রাতে বৃষ্টি হলো। প্রাতে রসুল স. আমাদেরকে নিয়ে পাঠ করলেন ফজরের নামাজ। নামাজ শেষে তিনি স. আমাদের দিকে মুখ করে বসে বললেন, জানো তোমাদের প্রভুপালনকর্তা কী বলেছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই সমধিক পরিজ্ঞাত। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন— এই সকালেই আমার বান্দাগণের মধ্যে কেউ হলো মুমিন এবং কেউ কাফের। যারা বললো, সদাশয় আল্লাহ্ দয়া করে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। তারা ইমানদার। তারা নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভাব অস্বীকারকারী। আর যারা বললো, বৃষ্টি হয়েছে অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে, তারা কাফের। তারা আমাকে প্রত্যাখ্যানকারী। বোখারী, মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আকাশ থেকে যখন আল্লাহ্‌র বরকতের বর্ষণ হয়, তখন একদল মানুষ হয় আল্লাহ্‌র রহমত অস্বীকারকারী। বৃষ্টিপাত ঘটান আল্লাহ্‌ই, অথচ তারা বলে, বৃষ্টি হয়েছে অমুক অমুক নক্ষত্রের উদয় হওয়ার কারণে।

পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'ফলে তাদেরকে আমি যা দিয়েছি তা তারা অস্বীকার করে'। এখানে 'লিইয়াকফুরূ' কথাটির 'লি' (যেনো, যা) অব্যয়টি পরিণতি প্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ফল এই দাঁড়ায় যে, তারা অকৃতজ্ঞ হয় আল্লাহ্‌ যা দিয়েছেন, তার প্রতি। অথবা বলা যেতে পারে 'লি' এর 'লাম' অক্ষরটি এখানে অনুজ্ঞাবোধক। আর অনুজ্ঞা অর্থ এখানে হুমকি প্রদান। যেনো বলা হয়েছে— ঠিক আছে, এখন তোমরা আমার দেওয়া অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি অকৃতজ্ঞ হচ্ছো, হও। কিন্তু এর প্রতিফল তোমরা পরকালে পাবে শাস্তিরূপে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে'। এ কথার অর্থ— এখন মজা লুটতে থাকো। কিন্তু সে দিনও বেশী দূরে নয়, যখন জানতে পারবে এমতো সম্ভোগের পরিণাম কতো অশুভ।

এর পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'আমি কি তাদের নিকট এমন কোনো দলিল অবতীর্ণ করেছি যা তাদেরকে শরীক করতে বলে'? এখানকার 'আম' অব্যয়টি যোজক অথবা বিয়োজক। দু'ভাবেই এর ব্যবহার সুপ্রচল। আর অব্যয়টির সম্বন্ধ রয়েছে এখানে একটি উহ্য ক্রিয়ার সাথে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা কি কোনো প্রমাণ ব্যতিরেকেই আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরিক করে, না আল্লাহ্‌ তাদের শিরিক করার জন্য অবতীর্ণ করেছেন কোনো প্রমাণ? প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— কখনোই আল্লাহ্‌ তাদের অংশীবাদিতার সমর্থনে কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সুলতান' অর্থ প্রমাণ বা অজুহাত। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ আকাশজ গ্রন্থ। কেউ কেউ 'সুলতান' অর্থ করেছেন সুলতানধারী, অর্থাৎ ফেরেশতা, যাদের সাথে প্রমাণরূপে থাকে অলৌকিক নিদর্শন। অথবা সুলতান অর্থ এখানে নবী-রসুল, যাদেরকে সাহায্য করা হয় অলৌকিক প্রমাণ বা মোজেজা দ্বারা।

'ইয়াতাকাল্লামু' অর্থ বলে বা বলছে, ভাষায় অথবা অভিব্যক্তিতে। এমতো ব্যাখ্যার সমর্থন রয়েছে অন্য একটি আয়াতেও। যেমন— 'আমার গ্রন্থ সত্য কথা বলে'।

'বিমা কানু বিহী ইউশরিকূন' (যা তাদেরকে শরীক করতে বলে) কথাটির 'মা' অব্যয়টি এখানে ধাতুমূল। অর্থাৎ যা তাদেরকে শিরিক অথবা শিরিকের বৈধতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে 'মা' অব্যয়টির অর্থ কর্ম।

www.eelm.weebly.com

যদি তাই হয়, তবে 'বা' অব্যয়টি এখানে হবে কারণপ্রকাশক এবং বক্তব্যটি দাঁড়াবে— এমন উৎকৃষ্ট কর্ম যার কারণে তারা আল্লাহ্‌র অংশী স্থাপন করছে, মেনে নিচ্ছে মিথ্যা উপাস্যগুলোকে।

সূরা রূম ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

وَإِذَآ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ط وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا
قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ط إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾
فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ
لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ز وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَمَآ
اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْٓ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ج وَمَآ
اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ
شَيْءٍ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾

r আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই উহারা তাহাতে উৎফুল্ল হয় এবং উহাদের কৃতকর্মের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হইলেই উহারা হতাশ হইয়া পড়ে।

r উহারা কি লক্ষ্য করে না, আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা রিয্‌ক প্রশস্ত করেন এবং সীমিত করেন? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

r অতএব আত্মীয়কে দিবে তাহার হক এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে তাহাদের জন্য ইহা শ্রেয় এবং তাহারাই সফলকাম।

r মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তোমরা যে সুদ দিয়া থাক, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তাহা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়া থাক তাহাই বৃদ্ধি পায়; উহারাই সমৃদ্ধিশালী।

www.eelm.weebly.com

r আল্লাহ্ই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে রিয্ক দিয়াছেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পরে তোমাদিগকে জীবিত করিবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলির এমন কেহ আছে কি, যে এ সমস্তের কোন কিছু করিতে পারে? উহারা যাহাদিগকে শরীক করে, আল্লাহ্ উহা হইতে পবিত্র, মহান।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি যখন মানুষকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করি, তখন তারা অতিরিক্ত উৎফুল্ল হয়। শুরু করে দম্ভপ্রদর্শন। আর যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয়, তখন ডুবে যায় সীমাহীন নৈরাশ্যে। উল্লেখ্য, বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদের বিষয়টি ঠিক এর বিপরীত। তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ করবে কৃতজ্ঞচিত্ত হয়ে এবং বিপদ-মুসিবতে ধারণ করে ধৈর্য। আর আশা রাখে ধৈর্যের যথাবিনিময়ের। নৈরাশ্য তাদেরকে কখনোই পীড়িত করে না।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'তারা কি লক্ষ্য করে না, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করেন এবং সীমিত করেন'। একথার অর্থ— জীবনোপকরণ প্রসরণ ও সংকোচন সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায়নির্ভর। সুতরাং এই নিয়ে মানুষ চাঞ্চল্য প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিবে কেনো? কেনো হবে প্রাপ্তিতে দম্ভোৎফুল্ল এবং অপ্রাপ্তিতে নৈরাশ্য পীড়িত? তোমরা তো সকলে আল্লাহ্র সকাশে প্রত্যানীত হবেই। তবে এই মুহূর্তে কেনো পরিত্যাগ করবে না অংশীবাদিতা ও পাপাসক্তি? কেনো বিপদে ধৈর্যধারণ করবে না প্রকৃত বিশ্বাসীদের মতো? আর এর জন্য কেনোই বা আশা করবেনা পুণ্যের?

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য'। একথার অর্থ— রিজিকের প্রসরণ-সংকোচন ও বিপদ-মুসিবতে ধৈর্যধারণের মধ্যে যে আল্লাহ্র অতুলনীয় প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তার নিদর্শন রয়েছে, সে কথা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে কেবল তারা, যারা বিশ্বাসবান। অন্যেরা এমতো উপলব্ধি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'অতএব আত্মীয়কে দিবে তার হক এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও'। একথার অর্থ— হে মানুষ! এবার অবগত তো হলে যে, জীবনোপকরণ প্রসরণ-সংকোচনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায়াধীন। তাহলে আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে আর শৈথিল্য প্রদর্শন করবে কেনো? কেনো পরিপূরণ করবে না তাদের অধিকার? আর কেনোই বা প্রয়োজন পূরণ করবে না অভাব গ্রস্তদের এবং প্রবাসী পথিকদের। তারা স্বগৃহে স্বচ্ছল হলেও প্রবাসে তো প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী। সুতরাং আত্মীয়-অভাবগ্রস্ত-পথিক এদেরকে নির্দ্বিধায় দান করো জাকাতের সম্পদ থেকে। আর

www.eelm.weebly.com

তোমরা জাকাত ছাড়াও তো ইচ্ছে করলে তাদের জন্য অর্থব্যয় করতে পারো। তোমাদের এমতো আবশ্যিক ও স্বেচ্ছাকৃত দানে যেমন মানুষ উপকৃত হয়, তেমনি প্রীত হন আল্লাহ্ স্বয়ং।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটাই শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম'।

এখানে 'জালিকা খইর' (এটাই শ্রেয়) কথাটির মর্মার্থ— সম্পদ একা ভোগ করা অপেক্ষা স্বজন-অভাবী-পথিকদের অধিকার পরিপূরণসহ ভোগ করাই উত্তম। এতে করে মানবিক সৌহার্দ ও বন্ধন হয় অধিকতর দৃঢ়। আর তা সমাজে বয়ে আনে প্রভূত কল্যাণ।

'ওয়াজহাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা বা দিক। আর মর্মার্থ— বিশ্বাসবানেরা কামনা করে আল্লাহ্র পরিতুষ্টি। অভিলাষী হয় পুণ্যের। সুখ্যাতি অথবা দানের স্বীকৃতি পাওয়ার লোভে তারা দান-খয়রাত করে না।

'হুমুল মুফলিহুন' অর্থ তারাই সফলকাম। অর্থাৎ নশ্বর জগতের কিছু অর্থ-বিত্ত দিয়ে তারা যেহেতু ক্রয় করে নেয় অবিনশ্বর আখেরাতকে, সেহেতু তারাই সফল। আর সাফল্য বঞ্চিত তারা, যারা এর বিপরীত।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না'। এখানে 'ওয়ামা আতাইতুম' অর্থ তোমরা সুদখোরকে যা দাও। 'মিররিবা' অর্থ শরিয়তবিরোধী ওই প্রাপ্তি অথবা দেয় যা দাতা-গ্রহীতা পরস্পরকে প্রদান করে। অথবা দাতা অতিরিক্ত বিনিময় লাভের আশায় গ্রহীতাকে কিছু দেয়। এরকম দানকেই এখানে বলা হয়েছে 'ফী আমওয়ালিন নাসি' (মানুষের সম্পদে)। দাতা অথবা গ্রহীতার সম্পদ বৃদ্ধিই থাকে এমতো দানের উদ্দেশ্য। আর 'ফালা ইয়ারবূ ইনদাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে না।

বাগবী লিখেছেন, আলেমগণ আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্নভাবে। সাঈদ ইবনে যোবায়ের, মুজাহিদ, তাউস, কাতাদা প্রমুখ বলেছেন, অতিরিক্ত বিনিময় প্রাপ্তির প্রত্যাশায় দান যদিও শরিয়তসমর্থিত, তবুও আখেরাতে এর জন্য কোনো পুণ্য নেই। এটাই 'আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না' কথাটির উদ্দেশ্য। এরকম কর্ম রসুল স. এর জন্যও নিষিদ্ধ ছিলো। যেমন তাঁকে লক্ষ্য করে এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'অধিক প্রাপ্তির কামনা করবেন না'। জুহাক বলেছেন, আলোচ্য বক্তব্যটির মর্মার্থ এরকম— আল্লাহ্তায়ালার তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কেবল সম্পদ বৃদ্ধির লালসায় যে ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজন অথবা বন্ধু-সুহৃদদেরকে দান করে। সেই দান আল্লাহ্র কাছে সম্পদবর্ধক বলে গণ্য নয়।

www.eelm.weebly.com

শা'বী বলেছেন, এখানকার বক্তব্যটির অর্থ হবে এরকম— যে ব্যক্তি সেবা-যত্ন, প্রবাস-সঙ্গ, বাণিজ্য আনুকূল্য ইত্যাকার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অপরের সঙ্গে কিছু দান করার মাধ্যমে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলে, তার কথাই বলা হয়েছে এখানে। এরকম দান পরকালের পুণ্যশূন্য। কারণ আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষ সাধনের উদ্দেশ্য এখানে অনুপস্থিত। রসুল স. বলেছেন, কর্ম উদ্দেশ্যনির্ভর। যার যেমন উদ্দেশ্য থাকবে, সে ফলাফল পাবে তেমনই। যার পার্থিব প্রাপ্তি অথবা বিবাহের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, সে পাবে সেগুলোই। বোখারী, মুসলিম।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে জাকাত তোমরা দিয়ে থাকো, তা-ই বৃদ্ধি পায়। তারাই সমৃদ্ধিশালী'। এখানে 'ওয়ামা আতাইতুম' অর্থ তোমরা জাকাত দাও অথবা দান খয়রাত করো। 'ওয়াজহাল্লহ' অর্থ পুণ্য লাভ অথবা আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের জন্য।

'আল মুদ্বইফূন' অর্থ তারাই সমৃদ্ধিশালী। অর্থাৎ এরকম লোকের পুণ্যলাভ হবে কয়েকগুণ। এক একটি পুণ্যকে বৃদ্ধি করা হবে দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত। অথবা এর চেয়ে বেশী, যেমন আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করবেন। অথবা কথাটির অর্থ— তারা পাবে কয়েকগুণ সওয়াব।

এখানে সুদ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধন সম্পদ বৃদ্ধি করে না'। সুতরাং জাকাতের ক্ষেত্রে এরকম বলাই সঙ্গত ছিলো, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে। কিন্তু এখানে তা বলা হয়নি। বলা হয়েছে— তোমরা যে জাকাত দিয়ে থাকো তা-ই বৃদ্ধি পায়। নিন্দার্হ ও প্রশংসার্হ বিষয়ের পার্থক্যকে প্রকট করে তোলার জন্যই এখানকার বাকরীতিতে এসেছে এরকম ভিন্নতর উপস্থাপনা কৌশল। আবার জাকাতদাতাদের প্রসঙ্গে প্রথমে বলা হয়েছে 'তুরীদূনা' (তোমরা কামনা করো) অথচ শেষে বলা হয়েছে 'হুমুল মুদ্বইফূন' (তারাই সমৃদ্ধিশালী)। এভাবে মধ্যমপুরুষের সম্বোধন থেকে পুরুষান্তরে গমন করা হয়েছে জাকাত প্রদাতার মর্যাদাকে সমুন্নত করবার জন্য। জুজায বলেছেন, এখানে অনুক্ত রয়েছে 'আহলুহা' (তার ধারকবাহক) শব্দটি। ওই লুপ্ত শব্দসহযোগে এখানকার শেষ বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— জাকাতদাতাগণ কয়েকগুণ পুণ্যের অধিকারী।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছেন; তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পরে তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলীর এমন কেউ আছে কি, যে এসমস্তের কোনো কিছু করতে পারে?

www.eelm.weebly.com

এখানে 'হালমিন্ শুরাকায়িকুম' কথাটির মর্মার্থ— তোমরা যে সকল প্রতিমাকে কল্পিত দেব-দেবীরূপে পূজা করে থাকো সেগুলো কি সৃজন, জীবনোপকরণদান এরকম কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সক্ষম?

আল্লাহ্পাক এখানে প্রথমে উল্লেখ করেছেন প্রকৃত উপাস্যের যোগ্যতা ও ক্ষমতার কথা। বলেছেন, যিনি উপাস্য হওয়ার যোগ্য, তার অবশ্যই থাকতে হবে সৃজন ক্ষমতা, জীবনোপকরণ প্রদানের যোগ্যতা, তদুপরি থাকতে হবে জীবন-মৃত্যু-পুনরুত্থান সংঘটনের শক্তিমত্তা। তারপর প্রকাশ করেছেন পৌত্তলিকদের মিথ্যা উপাস্যগুলোর শক্তিহীনতা ও অলীকতার কথা এবং বিষয়টিকে তিনি ছুঁড়ে দিয়েছেন অস্বীকৃতিজ্ঞাপক অপ্রতিরোধ্য প্রশ্নবানরূপে, সবেগে। বলেছেন এমন কেউ আছে কি যে এ সমস্তের কোনোকিছু করতে পারে? সুতরাং এটাই অবধারিত ও অত্যাবশ্যক যে, উপাস্য হিসেবে আল্লাহ্র অংশী, প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা সমকক্ষ কেউ নেই। কোনোকিছুই নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা যাদেরকে শরীক করে। আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র, মহান'। একথার অর্থ— অক্ষম, অথর্ব ও উপাস্য হওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত প্রতিমাগুলোকে পৌত্তলিকেরা আল্লাহ্র এক উপাস্য হওয়ার ক্ষেত্রে অংশীদার বানাতে চায়। কিন্তু তাদের এমতো অপবিত্র বিশ্বাস থেকে আল্লাহ্তায়ালার সত্তা-গুণবত্তা কার্যকলাপ সম্পূর্ণ পবিত্র ও মহিমময়।

সূরা রূম ঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ
لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤١﴾ قُلْ
سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلُ ؕ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ﴿٤٢﴾ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ
الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ
يَّصَّدَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٥﴾

www.eelm.weebly.com

r মানুষের কৃতকর্মের দরুন সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়াইয়া পড়ে; যাহার ফলে উহাদিগকে উহাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।

r বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হইয়াছে! উহাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।

r তুমি সরল দীনে নিজকে প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যে দিবস অনিবার্য তাহা উপস্থিত হইবার পূর্বে, সেই দিন মানুষ বিভক্ত হইয়া পড়িবে।

r যে কুফরী করে কুফরীর শাস্তি তাহারই প্রাপ্য; যাহারা সৎকর্ম করে তাহারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখ-শয্যা।

r কারণ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। তিনি কাফিরদিগকে পছন্দ করেন না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে'। একথার অর্থ— মানুষের অনানুগত্য ও পাপাচরণের ফলেই স্থলভাগে ও জলভাগে নেমে আসে মহা বিপর্যয়। এখানে স্থলভাগের বিপর্যয় অর্থ খরা, মহামারী, অকাল মৃত্যু, অধিক মৃত্যু, প্লাবন, অগ্ন্যুৎপাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি। আর জলভাগের বিপর্যয় হচ্ছে তুফান, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি।

বাগবী লিখেছেন, 'স্থলে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মরুভূমি, মরুদ্যান ও বনভূমিকে। আর 'সমুদ্রে' বলে বুঝানো হয়েছে সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর, নগরসমূহকে। আতীয়া বলেছেন, এখানে 'বার' অর্থ স্থলভাগ এবং 'বাহ্‌র' অর্থ সমুদ্র। উল্লেখ্য, অনাবৃষ্টির প্রভাব যেমন স্থলভাগে পড়ে, তেমনি পড়ে জলভাগেও। বৃষ্টি শুরু হলে সমুদ্রের ঝিনুকগুলো পানির উপরে ভেসে ওঠে। হা করে গলাধঃকরণ করে বৃষ্টির ফোটা তারপর ডুবে যায় সমুদ্রের অতলে। ওই বৃষ্টির ফোটাই তাদের উদরাভ্যন্তরে জন্ম দেয় মণিমুক্তার। বৃষ্টিপাত বন্ধ হলে মণিমুক্তা সৃষ্টির এই অনন্য প্রক্রিয়াও হয়ে যায় স্তব্ধ। সুতরাং এটাকেও বলা যেতে পারে জলভাগের বিপর্যয়।

হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে স্থলভাগের বিপর্যয় বলে বুঝানো হয়েছে হজরত আদমতনয় কাবিলের ভ্রাতৃহত্যাকে। আর জলভাগের বিপর্যয় হচ্ছে হজরত মুসার যুগের অত্যাচারী রাজা জলনদি কর্তৃক জোরপূর্বক নৌকা ছিনিয়ে নেওয়াকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'সে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছিলো প্রত্যেকটি তরণী'।

ফারইয়াবী, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, কাবিল কর্তৃক হাবিল হত্যা থেকেই পৃথিবীর স্থলভাগে শুরু হয়েছে অনাসৃষ্টি। আর অত্যাচারী নৃপতি আম্মান কর্তৃক নৌকা ছিনেয়ে নেওয়ার ঘটনা

www.eelm.weebly.com

থেকে শুরু হয়েছে জলভাগের বিপর্যয়। পৃথিবীর স্থলাংশ ছিলো আগে সবুজ শ্যামল। বৃক্ষপত্রে বিরাজ করতো বিরতিহীন বসন্ত। আর জলাংশের সকল পানি ছিলো সুপেয়। নেকড়ে বাঘও আক্রমণ করতো না গরুছাগলকে। তারপর যখন কাবিল হত্যা করলো তার আপন অগ্রজকে, তখন থেকেই শুরু হলো অনাসৃষ্টি। পৃথিবীর বিশাল ভূভাগ হয়ে গেলো মরুময়। মওসুমে মওসুমে পাতা ঝরতে শুরু করলো বৃক্ষকুলের। সমুদ্রের পানি হলো পানের অনুপযোগী, লবণাক্ত। আর নেকড়ে, বাঘ ইত্যাদি বন্যপ্রাণী হয়ে উঠলো হিংস্র। আক্রমণ করতে শুরু করলো নিরীহ প্রাণীকুলকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যার ফলে তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে'। একথার অর্থ— মানুষের পাপকর্মের তাৎক্ষণিক প্রতিফলরূপে আল্লাহ্তায়ালা পৃথিবীর মানুষকে কখনো কখনো দেন শাস্তি। ওই শাস্তিই তাদেরকে এনে দেয় সত্যের প্রতি সানুতপ্ত ও সলজ্জিত প্রত্যাবর্তনের সুযোগ। উল্লেখ্য, মক্কার মুশরিকদেরকেও আল্লাহ্তায়ালা এই উদ্দেশ্যেই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত করেছিলেন। ওই দীর্ঘ দুর্ভিক্ষের সময় তারা বাধ্য হয়েছিলো মৃত জন্তুর অস্থি, চামড়া ও গোশত খেয়ে জীবন ধারণ করতে।

কাতাদা বলেছেন, রসুল স. এর মহাআবির্ভাবপূর্ব পৃথিবী ছিলো অন্যায়, অনাচার ও অনাসৃষ্টিতে পরিপূর্ণ। তারপর তিনি স. যখন এলেন তখন বহু মানুষ আপন কৃতকর্মের কারণে অনুতপ্ত হতে পারলো এবং ফিরে পেলো ইসলামের চিরশীতল আশ্রয়।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দ্যাখো, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিলো মুশরিক'। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিকদেরকে বলুন, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে আল্লাহ্র আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীগুলো এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ স্বচক্ষে দেখে এসো। জেনে রেখো, তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে প্রতিমার উপাসনা করতো বলেই তাদেরকে দেওয়া হয়েছিলো শাস্তি। তবুও কি তোমাদের বোধোদয় হবে না?

এখানে 'কানা আকছারুহুম মুশরিকীন' (তাদের অধিকাংশই ছিলো মুশরিক) কথাটির মর্মার্থ— তারা বিভিন্ন প্রকার পাপকর্মে লিপ্ত ছিলো বটে, কিন্তু অংশীবাদিতাই ছিলো তাদের প্রধানতম পাপ। আর সেকারণেই তাদের উপরে নেমে এসেছিলো সর্বগ্রাসী শাস্তি। অথবা অর্থ হবে— তাদের অধিকাংশই লিপ্ত হয়েছিলো অংশীবাদিতায়। আর অপরাপর অপরাধপ্রবণতা ছিলো তাদের স্বল্পসংখ্যকদের মধ্যে। কিন্তু বিনাশ করা হয়েছিলো তাদের সকলকেই। কারণ

www.eelm.weebly.com

স্বল্পসংখ্যকেরা ছিলো অংশীবাদীদের সতীর্থ। আবার কথাটির অর্থ হতে পারে এরকমও— ওই স্বল্পসংখ্যক অংশীবাদী না হলেও তারা পরিত্যাগ করেছিলো 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' এর দায়িত্ব। তাদের চোখের সামনে অংশীবাদিতার মতো বৃহত্তম পাপ সংঘটিত হতে দেখেও তারা অংশীবাদীদেরকে সাবধান করেনি। জানায়নি সত্যের আমন্ত্রণ। তাই অংশীবাদীদের সঙ্গে তাদেরকেও হতে হয়েছিলো শাস্তিপ্রাপ্ত।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'তুমি সরল দ্বীনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে দিবস অনিবার্য, তা উপস্থিত হবার পূর্বে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে'। একথার অর্থ— অতএব হে আমার রসুল! আপনি সহজ সরল ধর্ম ইসলামে আপনার অবস্থানকে করুন অধিকতর দৃঢ়। সতত ব্যাপৃত থাকুন সত্য ধর্মপ্রচারকর্মে, ওই অনিবার্য দিবস আগমন করবার পূর্বেই, যে দিবসে কর্মফল প্রাপ্তির জন্য সকলকে উপস্থিত হতে হবে আল্লাহ্ সকাশে। আর এটা সুনিশ্চিত যে, ওই দিন মানুষ চিরদিনের জন্য বিভক্ত হয়ে যাবে দু'টি দলে। একদল প্রবেশ করবে জান্নাতে। আর জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে অপর দল। অথবা তারা বিভক্ত হবে এজগতেই। একদল হবে নিহত ও বন্দী এবং অপর দল লাভ করবে নিরাপত্তা ও বিজয়। যেমন হয়েছিলো বদর যুদ্ধে।

এরপরের আয়াতে(৪৪) বলা হয়েছে— 'যে কুফরী করে, কুফরীর শাস্তি তারই প্রাপ্য, যারা সৎকর্ম করে, তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখ-শয্যা'। একথার অর্থ— যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে, পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে, অথবা কেবল পরবর্তী পৃথিবীতে তাদের শাস্তিভোগ অবধারিত। আর যারা পুণ্যকর্মে ব্যাপৃত থাকে, তারাই সংগ্রহ করে চিরন্তন সুখের পাথেয়।

এরপরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'কারণ যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন'। আলোচ্য বক্তব্য থেকে একথাই পরিস্ফুট হয় যে, বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করার ব্যাপারে আল্লাহ্ স্বয়ং আগ্রহান্বিত। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা একথা জানে না বলেই পুরস্কারের পথে ধাবিত না হয়ে স্বেচ্ছায় বরণ করে তিরস্কারের পথ। তাই বলতে হয়, তিরস্কার তাদের স্বনির্বাচিত বিষয়। আর আল্লাহ্ও তাই তাদেরকে শাস্তিদান করবেনই। যথাসময়ে দিবেন যথোপযুক্ত শাস্তি।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্ তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন তাদের প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক— দশগুণ, সাতশ' গুণ অথবা অনেক অনেকগুণ।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাঁর প্রিয়ভাজন নয়, বরং বিরাগ উদ্রেককারী। ব্যাখ্যাটিকে সুসঙ্গত বলা যেতে পারবে তখন, যখন ধরে নেয়া হবে এখানকার 'লি ইয়াজ্বযিয়া' (পুরস্কৃত করেন) কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে পূর্ববর্তী আয়াতের 'ইয়ামহাদূন' (তারা পাথেয় সংগ্রহ করে) এর সঙ্গে। কিন্তু শায়েখ জালালুদ্দিন মাহাল্লী লিখেছেন, এখানকার 'পুরস্কৃত করেন' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে ৪৩ সংখ্যক আয়াতের 'বিভক্ত হয়ে পড়বে' এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বিভক্ত দু'টি দলই হবে প্রতিদান প্রাপ্তির আওতাভূত এবং 'তিনি কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না'। কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তিনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দিবেন।

লক্ষণীয়, এখানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন'। এতে করে বুঝা যায়, পুণ্যকর্মসমূহ পুরস্কার প্রাপ্তিকে অবধারিত করতে পারে না। বরং পুরস্কার হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার কৃপানির্ভর। তিনি কৃপাপরবশ হয়ে কিছু দিলে তবেই ঘটে প্রাপ্তিযোগ্য, সে প্রাপ্তি পুণ্যকর্মের বিনিময় হোক, পুণ্যাধিক্য হোক, অথবা হোক নিছক অনুগ্রহ। একথার সমর্থন রয়েছে আবুল হারেছ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে, যা ইমাম আহমদ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'জুহুদ' গ্রন্থে। লিখেছেন, একবার আল্লাহ্তায়ালা নবী দাউদের প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন, হে আমার নবী! আমার বান্দাগণকে ভীতি প্রদর্শন করো, তারা যেনো গর্ব না করে, নিজেদের পুণ্যকর্মের উপরে যেনো নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে। কারণ আমি তাদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবোই। আর ন্যায়বিচার করলে দেখা যাবে, তারা সকলেই হয়েছে শাস্তির উপযোগী (অতএব পুণ্যকর্ম সম্পাদন করার সাথে সাথে তারা যেনো সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয় আমার অনুগ্রহের উপর)।

হজরত আলী থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ একবার বনী ইসরাইলের এক নবীর প্রতি এই মর্মে প্রত্যাদেশ করলেন, হে আমার নবী! তোমার উম্মতের পুণ্যবানদেরকে বলে দাও, তারা যেনো তাদের পুণ্যকর্মের উপর নির্ভরশীল না হয়। কারণ মহাবিচারের দিবসে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করবো আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবো। আর আমার এমতো সিদ্ধান্ত অবশ্যই জুলুম নয়। তোমার পাপিষ্ঠ উম্মতকেও বলে দাও, তারা যেনো নিরাশ না হয়। কারণ আমি সেদিন মার্জনা করবো বড় বড় পাপীকে। আমি তো কারো পরওয়া করি না।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওয়াসিলা ইবনে আমকাআ বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ বিচারের জন্য দাঁড় করাবেন একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে। বলবেন, আমি তোমার নিকট উপস্থাপন করবো দু'টি বিষয়। তুমি তার যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারো। ১. তুমি কি তোমার পুণ্যের বিনিময়প্রার্থী

www.eelm.weebly.com

২. না আমার করুণা প্রত্যাশী? সে বলবে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি তো জানোই, আমি কখনো তোমার অবাধ্য হইনি। আল্লাহ্ নির্দেশ দিবেন, এই ব্যক্তির পুণ্যসমূহের সমান্তরালে আমার একটি নেয়ামতকে দাঁড় করানো হোক। তাই করা হবে। তখন দেখা যাবে মাত্র একটি নেয়ামতের বিপরীতে তার সমুদয় পুণ্য নিঃশেষ। এ দৃশ্য দেখে সে মিনতি জানাবে, হে আমার পরম প্রভুপালক! আমি তোমার করুণা প্রত্যাশী।

হজরত আনাস থেকে বাযযার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হবে তিনটি বৃহৎ পাণ্ডুলিপি। তন্মধ্যে একটি হবে পাপের, অপরটি পুণ্যের এবং আর একটি নেয়ামতের। তারপর আল্লাহ্ তাঁর নেয়ামতরাশির মধ্য থেকে একটি নগণ্য নেয়ামত দেখিয়ে বলবেন, আমার এই বান্দার পুণ্যসমূহকে এর বিপরীতে দাঁড় করানো হোক। তাই করা হবে। দেখা যাবে ওই নগণ্য নেয়ামতের সামনে তার সকল পুণ্যকর্ম নিঃশেষ। নেয়ামতের পাণ্ডুলিপি তখন নিবেদন করবে, হে মহানতম বিচারক! তোমার সমুচ্চ সম্মানের শপথ! আমার নগণ্য প্রকাশ তোমার এ বান্দার পুণ্যরাশিকে পরাভূত করেছে। এখন বাকি রয়েছে কেবল তার পাপরাশি। এরপর আল্লাহ্ যার প্রতি করণা করবেন, এরকম এক বান্দাকে ডেকে বলবেন, ওহে আমার দাস! আমি তোমার পুণ্যরাশিকে বৃদ্ধি করে দিচ্ছি কয়েকগুণ। বরং অনেক অনেক গুণ। এবার দ্যাখো, তোমার পরিত্রাণ কীরূপ সুনিশ্চিত।

হজরত ইবনে ওমর থেকে তিবরানী তাঁর 'আলআওসাত' গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে স্বীকার করেছে— আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র সুদৃঢ় অঙ্গীকার। আর যারা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছে, আল্লাহ্ সর্বোতভাবে ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত, যারা বলেছে 'সুবহানাল্লহ্' তাদেরকে দেয়া হবে এক লক্ষ পুণ্য। জনৈক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো কীরূপে (শাস্তি তো তাহলে আমাদের হতেই পারে না)? তিনি স. বললেন, যার আনুরূপ্যহীন অধিকারে আমার জীবন, সেই পবিত্রাতিপবিত্র সত্তার শপথ! মহাবিচারের দিবসে বান্দা উপস্থিত হবে পর্বতশ্রেণী তুল্য পুণ্যকর্ম নিয়ে। কিন্তু দেখা যাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতের তুলনায় ওই বিশাল পুণ্য সম্ভার কোনো কিছুই নয়। তবে হ্যাঁ, সেদিন মানুষের সাফল্য অর্জিত হবে কেবল তাঁর দয়ার কারণেই। সেদিন উদ্বেলিত হবে আল্লাহ্‌র করণাসিন্ধু।

উম্মত জননী হজরত আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, সহজ সরল পথে সম্মিলিতভাবে জীবন যাপন করো এবং সাধুবাদ গ্রহণ করো। নিশ্চিত, পুণ্যকর্ম কাউকে বেহেশতে প্রবেশ করাতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আপনাকেও কি নয়? তিনি স.

www.eelm.weebly.com

বললেন, না। আমার ক্ষেত্রেও একই বিধান। তবে আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি তো এখন তখন সর্বক্ষণ আসত্তা নিমজ্জিত তার ক্ষমায় ও দয়ায়। হজরত জাবের থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন মুসলিম ও শরীক ইবনে তারেক, হজরত আবু মুসার পুত্র থেকে বাযযার এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ। শরীক ইবনে তারেক, উমামা ইবনে শুরাইক ও আসাদ ইবনে কারাজী থেকে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন তিবরানীও।

দু'টি সংশয়ঃ ১. অবস্থা যদি এরকমই হয়, তবে আর পুণ্যকর্মের প্রয়োজন কী? পাপবর্জনেই বা কী লাভ? আল্লাহ্ কৃপাপরবশ না হলে পুণ্যবানদের জন্যও তো নরক নিশ্চিত। আর যদি কৃপাপরবশ হন, তবে মহাপাতকের স্বর্গ প্রাপ্তিও তো অনিবার্য।

২. আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'তোমরা যে সৎকর্ম করেছিলে, তার বিনিময়ে আজ প্রবেশ করো জান্নাতে'। তাহলে উল্লেখিত হাদিসের তাৎপর্যই বা কী?

সংশয়ের অপনোদনঃ ১. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রসুলের অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তাকে ভালোবাসেন। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন, তারা যদি আমার ভালোবাসা চায়, তবে যেনো তারা হয় আপনার একনিষ্ঠ অনুসারী। তাহলে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং ক্ষমা করবেন। হাদিসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্ বলেন, নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার বান্দা আমার নৈকট্য ভাজন হয়। আমি তখন তাকে ভালোবাসতে থাকি। বোখারী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

২. পুণ্যকর্মের তারতম্যের কারণে জান্নাতের মর্যাদা ও তারতম্য ঘটবে যদিও প্রাথমিকভাবে জান্নাতের প্রবেশাধিকার লাভ করবে সকল পুণ্যবান। যেমন হান্নাদ তাঁর 'জুহুদ' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্র দয়া-দাক্ষিণ্যের উপরে পার হয়ে যাবে পুলসিরাত। জান্নাতে প্রবেশ করবে তাঁর কৃপা ধন্য হয়ে। আর তোমাদের জান্নাতের মর্যাদাগত স্তর নির্ণীত হবে তোমাদের পুণ্যকর্মের ভিত্তিতে। আবু নাঈমও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন সউন ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে।

www.eelm.weebly.com

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّ لِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ
رَّحْمَتِهٖ وَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى
قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ
وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ
فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَ يَجْعَلُهٗ
كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ
مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۚ﴿٤٨﴾ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ
عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ
كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَ هُوَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ
مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ﴿٥١﴾ فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ
الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٢﴾
وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ
يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٥٣﴾ ع

www.eelm.weebly.com

r তাঁহার নিদর্শনাবলীর একটি যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দিবার জন্য ও তোমাদিগকে তাঁহার অনুগ্রহ আস্বাদন করাইবার জন্য; এবং যাহাতে তাঁহার বিধানে নৌযানগুলি বিচরণ করে, যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

r আমি তো তোমার পূর্বে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। তাহারা উহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছিল; অতঃপর আমি অপরাধীদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। মু'মিনদিগকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

r আল্লাহ্ তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে ইহা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; অতঃপর তিনি ইহাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়াইয়া দেন, পরে ইহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখিতে পাও উহা হইতে নির্গত হয় বারিধারা; অতঃপর যখন তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাদের নিকট ইচ্ছা ইহা পৌঁছাইয়া দেন, তখন উহারা হয় হর্ষোৎফুল্ল,

r যদিও উহারা উহাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশ ছিল।

r আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমিকে জীবিত করেন উহার মৃত্যুর পর। এইভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

r আর আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যাহার ফলে উহারা দেখে শস্য পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তখন তো উহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে।

r তুমি তো মৃতকে শুনাইতে পারিবে না, বধিরকেও পরিবে না আহ্বান শুনাইতে, যখন উহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

r আর তুমি অন্ধকেও পথে আনিতে পরিবে না উহাদের পথভ্রষ্টতা হইতে। যাহারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাহাদিগকেই তুমি শুনাইতে পারিবে, কারণ তাহারা আত্মসমর্পণকারী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! দ্যাখো, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কতোখানি করুণাপরবশ। দ্যাখো, তাঁর অপার শক্তিমত্তার একটি অনন্য নিদর্শন। তিনি তোমাদের জন্যই প্রবাহিত করেন সুমন্দ সমীরণ, বৃষ্টির আগাম শুভবারতারূপে। তারপর বৃষ্টি হয়। মৃত্তিকায় জেগে উঠে ফল-ফসলের সমারোহ। সেগুলো তোমরা ভক্ষণ করতে পারো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরূপে। আর ওই মানবহিল্লোলেই তো সুগম হয় তোমাদের বাণিজ্যবহরগুলোর জলধিযাত্রা। ফলে তোমাদের বসতি হয় সচল ও সফল। তোমরা লাভ করতে পারো বৈধ জীবনোপকরণ। অতএব তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'মিন আয়াতিহী' অর্থ তাঁর অসীম শক্তিমত্তার যৎকিঞ্চিত নিদর্শন। 'বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দিবার জন্য' অর্থ বৃষ্টিবাহী মেঘের আগাম বারতা ঘোষণার্থে প্রেরণ করেন বায়ুপ্রবাহ— দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, এক এক সময় এক এক দিক থেকে। 'মুবাশ্‌শিরাত' অর্থ সুসংবাদ, শুভবারতা। 'তাঁর অনুগ্রহ আস্বাদন করানোর জন্য' অর্থ ভূমিজাত ফল-ফসল-সবজির আস্বাদ গ্রহণের জন্য। 'ওয়ালি তাজ্‌রিয়াল ফুলকা' অর্থ যাতে তাঁর বিধানে নৌযানগুলো পরিচালিত হয়।' 'যাতে তোমরা তাঁর অনুসন্ধান করতে পারো' অর্থ যাতে তোমাদের সমুদ্রযাত্রা হয় নির্বিঘ্ন, ফলে তোমাদের তেজারত হয় লাভজনক। আর 'তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও' অর্থ— তাঁর এমতো দয়ার প্রতি তোমরা যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তোমাদের ইহ-পরকালকে করো অর্থবহ ও সফল।

পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমার পূর্বে রসুলগণকে প্রেরণ করেছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলো'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক। ইতোপূর্বে ও আমি আমার বার্তাবাহকগণকে প্রেরণ করে ছিলাম তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে। তাঁদেরকে আমি আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট নিদর্শনরাজি।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব'। একথার অর্থ— ওই সকল প্রেরিত পুরুষকে কেউ কেউ বিশ্বাস করেছে, আবার কেউ কেউ করেছে প্রত্যাখ্যান। প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আমি দিয়েছি সমুচিত শাস্তি। আর উদ্ধার করেছি বিশ্বাসীদেরকে। আর বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করা তো আমার দয়ার্দ্র দায়িত্ব। তারা সত্যের সৈনিক। তাই তাদেরকে বিজয়ী করবার জন্য আমি শাস্তি দিয়েছিলাম সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

একটি সন্দেহঃ 'মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব'— একথায় বুঝা যায় আল্লাহ্‌তায়ালা বিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করার দায়িত্ব নিজের উপরে অবধারিত করে নিয়েছেন। যদি তাই হয়, তবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো চিরপরাভূত। অথচ বাস্তবে রয়েছে এর অনেক বিপরীত দৃষ্টান্ত।

সন্দেহভঞ্জনঃ এখানকার 'আল মু'মিনীন' (বিশ্বাসীদেরকে) কথাটির 'আলিফ লাম' অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষার্থে। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়ায় বিশেষভাবে ওই সকল বিশ্বাসীকেই আল্লাহ্‌তায়ালা বিশেষভাবে সাহায্যমণ্ডিত করেন, যারা আল্লাহ্‌র মহিমা সমুন্নত করার নিমিত্তে কেবল তাঁর পরিতোষ লাভের আশায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কেবল তাদেরকে সহায়তা করাকেই আল্লাহ্‌তায়ালা দয়া করে তাঁর দায়িত্ব বলে গণ্য করেছেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভ্রাতার সম্ভ্রম রক্ষায় ব্রতী হয়, তাকে নরকানল থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আল্লাহ্র। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন আলোচ্য আয়াত। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। হজরত আসমা ইবনে ইয়াজিদ থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন তিবরানী ও ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্।

উল্লেখ্য, কোনো কোনো উচ্চারণরীতিতে এখানকার 'হাক্কুন' শব্দটিতে যতিপাত পরিলক্ষিত হয়। এভাবে পাঠ করলে বুঝতে হবে এখানকার 'হাক্কুন' (দায়িত্ব) কথাটি সম্পর্কযুক্ত পূর্ববর্তী বাক্যের 'ফানতাক্বম্‌না' (শাস্তি দিয়েছিলাম) কথাটির সঙ্গে এবং অর্থ দাঁড়াবে— অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়া ছিলো আমার দায়িত্ব।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তিনি যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চলিত করে; অতঃপর তিনি তাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন; পরে তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও তা থেকে নির্গত হয় বারিধারা; অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট এটা পৌঁছে দেন, তখন তারা হয় হর্ষোৎফুল্ল'। এখানে মেঘসঞ্চালক বাতাস, মেঘের বিচিত্র বিন্যাস এবং বৃষ্টিপাতের কথা বলা হয়েছে মনোমুগ্ধকর ভাষায়। শেষে বলা হয়েছে, বৃষ্টির জন্য অপেক্ষিত কৃষককুলের কাছে যখন আল্লাহ্ পৌঁছে দেন ফল ও ফসলের সুসংবাদবাহী বৃষ্টিসম্ভার, তখন কৃষককুল হয় হর্ষোৎফুল্ল।

এখানে 'আসসামাউ' অর্থ ঊর্ধ্বদেশ, প্রকৃত অর্থে আকাশ নয়। অর্থাৎ মেঘপুঞ্জকে আল্লাহ্ ছড়িয়ে দেন ঊর্ধ্বদেশে, রূপকার্থে আকাশে, সে মেঘপুঞ্জ আবার বহুবর্ণের এবং বহুরকমের। পুঞ্জীভূত, বিক্ষিপ্ত, শাদা, কালো ইত্যাদি। 'ইয়াবসতু' অর্থ ছড়িয়ে দেয়া।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'যদিও ইতোপূর্বে তাদের প্রতি বৃষ্টিবর্ষণের আগে তারা নিরাশ ছিলো'। এখানে 'মিন ক্বলিহী' দ্বারা পূর্বোক্ত 'মিন ক্বলি' কথাটিকে বেগবান করা হয়েছে'। এভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কৃষকদের দীর্ঘ অনাবৃষ্টিজনিত নৈরাশ্যের প্রগাঢ় অনুভবকে। এখানকার 'ইন' অব্যয়টির অর্থ 'যদি' ধরা হলে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা এরকমই দাঁড়ায়। আর যদি 'ইন' অর্থ ধরা হয় 'ইল্‌লা' (ব্যতীত) তাহলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ইতোপূর্বে ওই কৃষকদের নিরাশ হওয়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায় ছিলো না। অর্থাৎ তারা হয়ে পড়েছিলো সম্পূর্ণরূপে নিরাশ।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা করো, কীভাবে তিনি ভূমিকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। এভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

www.eelm.weebly.com

এখানে আল্লাহ্র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা করো অর্থ— বৃষ্টিপাতের ফলে বিশুষ্ক মৃত্তিকায় ফল ও ফসলের যে সমারোহ মূর্ত হয়ে ওঠে, সে সম্বন্ধে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখো যে, তোমার প্রতি আল্লাহ্র রহমত কতো ব্যাপক ও বিস্তৃত। তোমাদের জীবন ধারণ ও যাপন নির্ভর করে তো তাঁর এমতো অনুগ্রহের উপরেই। 'ভূমির মৃত্যুর পর' অর্থ ভূমি বিশুষ্ক ও নিস্ফলা হয়ে যাওয়ার পর। 'ইন্না জালিকা' অর্থ অবশ্যই তিনি নিস্ফলা ভূমিকে প্রাণবন্ত করতে সমর্থ। আর 'লা মুহয়ীল মাওতা' অর্থ অবশ্যই তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম। অর্থাৎ আল্লাহ্ যে মানুষের মৃত্যুর পর পুনরুত্থান দিবসে সকলকে পুনর্জীবিত করবেন, নিস্ফলা মৃত্তিকায় প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এর পরেও মহাপুনরুত্থানে অস্বীকৃতি বাতুলতা ছাড়া আর কী?

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'আর যদি আমি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা দেখে শস্য পীতবর্ণ ধারণ করেছে, তখন তো তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে'। এখানে 'রীহান' বলে বুঝানো হয়েছে ফসল সম্ভাবনাকে নস্যাৎকারী ভিন্ন ধরনের বায়ু প্রবাহকে। এধরনের বায়ু প্রবাহ মেঘসঞ্চালন করে না, বরং মেঘকে করে বিতাড়িত। ফলে মৃত্তিকাও হয়ে যায় অধিকতর বিশুষ্ক।

'ফার আওহু' অর্থ পীতবর্ণ, বিবর্ণ, অসবুজ। আর 'ইয়াকফুরূন' অর্থ অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, তারা বিশুদ্ধবিশ্বাসী, ধৈর্যশীল ও চিন্তাশীল নয় বলেই এমতো বিরূপ পরিস্থিতিতে হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ। কিন্তু যারা বিশ্বাসী, ধৈর্যশীল ও চিন্তাশীল, তারা নিশ্চয় এরকম করে না। করে ক্ষমাপ্রার্থনা। বলে আল্লাহ্ নিশ্চয় দয়া করবেন। সুতরাং তাঁর দয়ার আশায় ও অপেক্ষায় থাকাই আমাদের কর্তব্য।

এরপরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'তুমি তো মৃতকে শোনাতে পারবে না'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! যারা চিরভ্রষ্ট, তারা শারীরিকভাবে জীবিত হলেও আত্মিকভাবে মৃত। সুতরাং আপনি তাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে জাগ্রত করবেন কীভাবে? মৃতরা কি কখনো শোনে? তাদের বোধ, বুদ্ধি ও বিশ্বাসগ্রহণযোগ্যতা যে চিরঅন্তর্হিত।

ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, বদর যুদ্ধ শেষে রসুল স. নির্দেশ করলেন, মুশরিকদের মরদেহগুলোকে এভাবেই পড়ে থাকতে দাও। তিনদিন পর যখন তাদের লাশগুলো পচতে শুরু করলো তখন তিনি স. সেগুলোর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, হে উমাইয়া ইবনে খাল্ফ! হে আবু জেহেল ইবনে হিশাম। ওহে উতবা ইবনে রবীয়! তোমাদের প্রভুপালনকর্তা তোমাদের সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছিলেন. সেই অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন এবার দেখলে তো? হজরত ওমর এগিয়ে এসে বললেন, হে মহানুভব রসুল। মৃত্যুর তিনদিন পর আপনি তাদেরকে এভাবে ডাকছেন কেনো? তারা কি শুনতে পাচ্ছে? আল্লাহ্ যে জানিয়েছেন 'তুমি তো মৃতকে শোনাতে পারবে না'।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. জবাব দিলেন, যার অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, সেই আনুরূপ্যবিহীন সত্তার শপথ! আমার কথা তারা তোমার চেয়েও ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু জবাব দিবার অধিকার ও ক্ষমতা তাদের নেই। অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর থেকেও।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসকে যদি বিশুদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনি স্বইচ্ছায় ও স্বচেষ্টায় মৃতদেরকে যখন যা খুশী তা শোনাতে পারবেন না। তবে শোনাতে পারবেন তখন, যখন আল্লাহ্পাক এরকম ইচ্ছা করবেন। অথবা মর্মার্থ হবে— আপনি তাদেরকে শোনাতে পারবেন না কল্যাণজনক কোনো কথা।

এরপর বলা হয়েছে— 'বধিরকেও পারবেন না আহ্বান শোনাতে, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়'। একথার অর্থ— আর আপনি বধিরকেও তো শোনাতে পারবেন না সত্যের আহ্বান। কারণ তারাও সম্পূর্ণরূপে শ্রবণযোগ্যতারহিত তবু যদি তারা আপনার সামনাসামনি হতো, তবে চোখের দেখা দেখেও হয়তো অনুমানে আপনার বক্তব্য বুঝবার চেষ্টা করতে পারতো। কিন্তু তারা যে অবজ্ঞাভরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়। আপনার দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র করে না।

এরপরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'আর তুমি অন্ধকেও পথে আনতে পারবে না তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে'। একথার অর্থ— আর আপনি তো দৃষ্টিহীনকেও দেখাতে পারবেন না সত্যের পথ। নিরসন করতে পারবেন না তাদের পথভ্রান্তি। উল্লেখ্য, চিরভ্রষ্টরা দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও অন্ধ। তাই সত্য দর্শন তাদের অদৃষ্টে ঘটে না। অথবা বলা যেতে পারে, 'অন্ধ' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে তাদের হৃদয়ের অন্ধত্বকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাদেরকেই তুমি শোনাতে পারবে, কারণ তারা আত্মসমর্পণকারী।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! আপনার কথা শুনতে বুঝতে ও মানতে পারবে কেবল তারা, যারা বিশ্বাস করেছে আমাকে এবং মান্য করেছে আমার নিদর্শনাবলীকে। তারা যে আপনার অনুগত। অথবা অর্থ— যারা বিশ্বাসাভিলাষী এবং আল্লাহ্পাক যাদের অদৃষ্টে রেখেছেন ইমান, কেবল তারাই সর্বান্তঃকরণে শুনতে পাবে আপনার আহ্বান। তারা যে আপনার বিশ্বস্ত অনুগামী।

সূরা রূম ঃ আয়াত ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّ شَیْبَةً ؕ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ ﴿۵۴﴾ وَ یَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ

www.eelm.weebly.com

يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا
يُؤْفَكُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ
كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۫ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا
الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ﴿٥٨﴾ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ
الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ
الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٦٠﴾ ع

r আল্লাহ্ তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

r যেদিন কিয়ামত হইবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করিয়া বলিবে যে, তাহারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করে নাই। এইভাবেই তাহারা সত্যভ্রষ্ট হইত।

r কিন্তু যাহাদিগকে জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হইয়াছে তাহারা বলিবে, 'তোমরা তো আল্লাহ্র বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ। ইহাই তো পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানিতে না।'

r সেইদিন সীমালংঘনকারীদের ওযর-আপত্তি উহাদের কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভের সুযোগও দেওয়া হইবে না।

r আমি তো মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়াছি। তুমি যদি উহাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর, কাফিররা অবশ্যই বলিবে, 'তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী।'

r যাহাদের জন্য নাই আল্লাহ্ এইভাবে তাহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেন।

r অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। যাহারা দৃঢ়বিশ্বাসী নহে তাহারা যেন তোমাকে বিচলিত করিতে না পারে।

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের জন্মলগ্নকালে করে রাখেন নিরতিশয় দুর্বল, যৌবনে করেন শক্তিশালী, তারপর বার্ধক্যে করেন অসহায়। এভাবে তিনি যেমন ইচ্ছা করেন তেমনই করেন। তাঁর সৃজন-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায় ও ক্ষমতাভূত। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। অথবা বলা যেতে পারে, তোমাদের সৃষ্টির ভিত্তিই দুর্বল। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'মানুষ ত্বরাপ্রবণ'। কিংবা বলা যেতে পারে, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুক্রকণার মতো মৌল উপকরণ থেকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে কি আমি সৃষ্টি করিনি অনুল্লেখ্য সলিল বিন্দু থেকে?

এখানে 'তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন' অর্থ তিনিই নির্ধারণ করেন তোমাদের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বাধক্য। 'তিনি সর্বজ্ঞ' অর্থ সৃষ্টির আদি অন্তের সকল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। আর 'সর্বশক্তিমান' অর্থ তিনি তাঁর অভিপ্রায় কার্যকর করবার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি'। একথার অর্থ যখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হবে, তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা শপথ উচ্চারণ করে আক্ষেপের স্বরে বলবে, হায়! আমাদের পৃথিবীবাস তো ছিলো মুহূর্তকাল মাত্র।

'সাআ'ত' অর্থ সময়, কাল। এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'কিয়ামত' অর্থে। এরকম অর্থে এখানে শব্দটি ব্যবহার করার হেতু হচ্ছে, মহাপ্রলয়মুহূর্তটি হবে পৃথিবীর বয়সের শেষ সময়ে। অথবা 'সাআ'ত' অর্থ এখানে ত্বরিৎ, একবারে। অর্থাৎ মহাপ্রলয় অনিবার্য এবং তা সংঘটিত হবে অতি সত্বর। উল্লেখ্য, 'সাআ'ত' শব্দটি 'কিয়ামত' বা মহাপ্রলয় অর্থেই অধিক প্রচলিত।

সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মনে হবে, পৃথিবীতে তারা বসবাস করেছিলো অল্প কিছু সময়ের জন্য। তাই একথা বলবে তারা শপথ করে। এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— 'আল্লাহর নির্ধারণে তোমরা মহাবিচারের দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছিলে কবরে'। অথবা সেদিন ভুলে যাবে অপসৃত অতীতের স্মৃতি। তাই তাদের আবছা আবছা মনে হবে, তাদের পৃথিবীবাস ছিলো হয়তো অল্প কিছু সময়ের জন্য। সে কারণেই ওই অল্প সময়কে এখানে 'মুহূর্তকাল' বা ক্ষণকাল বলা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবেই তারা সত্যভ্রষ্ট হতো'। একথার অর্থ— অযথার্থ অনুমান ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করাই তাদের স্বভাব। আর ওই অপস্বভাবের কারণেই তারা পৃথিবীতে যখন মহাপ্রলয়ের কথা শুনতো, তখন সে কথা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতো। শুরু করতো বাগাড়ম্বর। আর নির্দ্বিধায় চালিয়ে যেতো অংশীবাদিতা।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে(৫৬) বলা হয়েছে— ‘কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ইমান দেওয়া হয়েছে তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহ্‌র বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছো’। একথার অর্থ— যারা পৃথিবীতে পেয়েছিলো নবী-রসুলগণের মহান শিক্ষা, লাভ করেছিলো প্রজ্ঞা ও প্রত্যয়, তারা তখন বলবে, মুহূর্তকাল নয়, তোমরা আজকের এই পুনরুত্থান পর্যন্ত পৃথিবীতে ও কবরে অবস্থান করেছিলে সুদীর্ঘকাল। আর তা করেছিলে আল্লাহ্‌র বিধানানুসারেই।

এখানে ‘লাবিছতুম ফী কিতাবিল্লাহ’ অর্থ তোমাদের যতোদিনের অবস্থান আল্লাহ্‌পাক তোমাদের অদৃষ্টের বিধানে লিখে দিয়েছিলেন, তোমরা পৃথিবীতে ও কবরে ছিলে ততোদিন। অথবা ‘কিতাবিল্লাহ্‌’ অর্থ এখানে লওহে মাহ্‌ফুজ। অথবা ওই সময়কালকে এখানে আল্লাহ্‌র বিধান বলা হয়েছে, যে সময় মাতৃজঠরস্থিত মানবশিশুর জন্য ফেরেশতা কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা হয় চারটি বিষয়। যেমন রসুল স. বলেছেন, মাতৃজঠরে মানবশিশু শুক্রবিন্দুরূপে অবস্থান করে চল্লিশ দিন। চল্লিশ দিন পর ওই বিন্দুটি পরিণত হয় রক্তপিণ্ডে। তার চল্লিশ দিন পর গোশতপিণ্ডে। তখন তার নিকট আল্লাহ্‌পাক প্রেরণ করেন একজন ফেরেশতা। সে লিপিবদ্ধ করে ওই শিশুর আয়ুষ্কাল, জীবনোপকরণ পরিমাণ, ভালো অথবা মন্দ ভাগ্য। কিংবা ‘কিতাবিল্লাহ’ অর্থ এখানে কোরআন মজীদ। যেমন কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে— ‘আর তাদের পশ্চাতে রয়েছে অন্তহীন জগত, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত’।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এটাইতো পুনরুত্থান দিবস। কিন্তু তোমরা জানতে না’। এ কথার অর্থ— দ্যাখো, এটা সে-ই প্রতিশ্রুতি দিবস। আর তোমরা পৃথিবীতে এই দিবসকে করতে অস্বীকার। এখন তো বুঝলে, পৃথিবীতে তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট।

এরপরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— ‘সেদিন সীমালংঘনকারীদের ওজর-আপত্তি কাজে আসবে না এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের সুযোগও দেওয়া হবে না’।

এখানে ‘ওয়ালা হুম ইয়ুস্‌তা’তাবূন’ অর্থ সেদিন তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না আল্লাহ্‌র সন্তোষসাধনমূলক কোনো কথা ও কাজ। যেমন— তওবা, ক্ষমাপ্রার্থনা, আনুগত্য। এগুলো তাদেরকে করতে বলা হয়েছিলো পৃথিবীতে। ‘কামুস’ অভিধানে লেখা রয়েছে ‘উছবা’ অর্থ সন্তুষ্টি। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাদেরকে কামনা করতে বলা হয়েছিলো পৃথিবীতে। পরকালে এর কোনো সুযোগই থাকবে না। এ সম্পর্কে কোনো প্রকার প্রশ্নই করা হবে না তাদেরকে। যেমন আরববাসীরা বলেন ‘ইস্‌তা’তাব্‌না যায়দুন ফাআরদ্ব’তুহু’ (জায়েদ আমার সন্তুষ্টি চেয়েছিলো, আমি তার আশা পূরণ করেছি)। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— মহাবিচারের

www.eelm.weebly.com

দিবসে কাম্য হবে না সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিতুষ্টি। বরং পরিতুষ্টি কামনা করা হবে বিশ্বাসীদের। যেমন হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, তোমরা কি তুষ্ট? তারা বলবে, অবশ্যই। তুমি তো আমাদেরকে দান করেছো এমন নেয়ামত, যা অনেককেই দাওনি। আল্লাহ্ বলবেন, এর চেয়েও উৎকৃষ্ট নেয়ামত আছে। তারা বলবে, কী? আল্লাহ্ বলবেন, আমার প্রসন্নতা। সেই নেয়ামতও তোমাদেরকে দিলাম। আমি আর কখনো তোমাদের প্রতি হবো না অপ্রসন্ন। এরকম শুভসংবাদ ঘোষিত হয়েছে এক আয়াতে এভাবে— 'আর সুনিশ্চিত, অচিরেই তিনি প্রসন্ন হবেন'।

এরপরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— 'আমি তো মানুষের জন্য এই কোরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়েছি'। একথার অর্থ— এই কোরআনে আমি দৃষ্টান্তরূপে বর্ণনা করেছি অনেক জনগোষ্ঠীর উত্থানপতনের কাহিনী। বিবৃত করেছি বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের শুভপরিণতি ও অপপরিণতির অনেক উপমাময় আলোচনা। এভাবে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বৃত্তান্তই হয়েছে এই কোরআনের প্রসঙ্গভূত। সুতরাং মহাবিচারের দিবসে মহাসত্যকে গ্রহণ না করার কোনো প্রকার ওজর আপত্তিই চলবে না। অথবা বলা যেতে পারে, যেসকল ঘটনা, দৃষ্টান্ত ও বিবরণ দ্বারা সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহ্র এককত্ব, আল্লাহ্র রসুলের সততা ও সত্যতা এবং পারলৌকিক বিষয়সমূহ, তার সকল কিছুই আমি লিপিবদ্ধ করেছি এই কোরআনে, যেনো মানুষের পথপ্রাপ্তি হয় সহজ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি যদি তাদের নিকট কোনো নিদর্শন উপস্থিত করো, কাফেররা অবশ্যই বলবে, তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি যদি অংশীবাদীদের সম্মুখে উপস্থাপন করেন কোরআনের কোনো আয়াত অথবা নবী মুসার যষ্টির মতো অন্য কোনো অলৌকিকত্ব, তবুও তারা তা সত্য বলে মেনে নিবে না। উল্টো আপনি ও আপনার অনুগামীদেরকে বলবে, তোমরাই মিথ্যাশ্রয়ী। আমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মাদর্শই সত্য।

এরপরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'যাদের জ্ঞান নেই, আল্লাহ্ এভাবে তাদের হৃদয় মোহর করে দেন'। একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকদের অন্তরকে যেভাবে আমি চিরতরে অবরুদ্ধ করে দিয়েছি, সেভাবেই অবরুদ্ধ করে দেই অন্যান্য চিরভ্রষ্ট অংশীবাদীদের হৃদয়ও। এখানে 'লা ইয়ালামূন' অর্থ যারা আল্লাহ্র অখণ্ডনীয় এককত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। অথবা বলা যেতে পারে, আল্লাহ্র সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপ সম্পর্কে জানবার স্পৃহা যাদের একেবারেই নেই।

www.eelm.weebly.com

শেষোক্ত আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— ‘অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য।’ একথার অর্থ— হে আমার রসুল! অংশীবাদীদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত বৈরী পরিবেশ দৃষ্টে আপনি চঞ্চল হবেন না। বরং এমতাবস্থায় ধৈর্য অবলম্বনই আপনার জন্য শ্রেয়। আর নিশ্চিত জানবেন যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী। তিনি তো আপনার সঙ্গে এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, অচিরেই তিনি আপনার আনীত ধর্মমতকে বিজয়ী করে দিবেন স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র।

সবশেষে বলা হয়েছে— ‘যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেনো তোমাকে বিচলিত না করতে পারে’। এখানে ‘তারা যেনো তোমাকে বিচলিত করতে না পারে’ কথাটির অর্থ— ওই সকল পথভ্রষ্টরা যেনো আপনাকে উৎসাহিত অথবা প্ররোচিত না করতে পারে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো গুরুত্বহীনতার দিকে।

সূরা লুক্‌মান

এই সুরার রুকুর সংখ্যা চার এবং আয়াতের সংখ্যা চৌত্রিশ। আর এর অবতরণস্থল মক্কা।

সূরা লুক্‌মান ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

الٓمّٓ ۚ﴿۱﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ﴿۲﴾ هُدًى وَّ رَحْمَةً
لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ﴿۳﴾ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ
بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ؕ﴿۴﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۵﴾

r আলিফ-লাম-মীম;
r এইগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত,
r পথ-নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ সৎকর্মপরায়ণদের জন্য;
r যাহারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর তাহারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী;

www.eelm.weebly.com

r তাহারাই তাহাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তাহারাই সফলকাম।

প্রথমে উল্লেখিত হয়েছে বিচ্ছিন্ন ও রহস্যাচ্ছন্ন বর্ণরাজি আলিফ লাম মীম। কোরআন মজীদের কোনো কোনো সুরার প্রথমে এধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি পরিদৃশ্যমান। এগুলোর মর্মার্থ জানেন কেবল আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল। অবশ্য অতিনগণ্য সংখ্যক সৌভাগ্যবানও এ জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন। তাঁরাই 'ওলামায়ে রসিখীন'। বিষয়টি সাধারণবোধ নয়। তাই প্রকাশ্যে এর মর্মোন্মচনও নিষিদ্ধ।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'এগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত'। এখানে 'হাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানগর্ভ। কোরআন মজীদের সঙ্গে এভাবে এখানে প্রজ্ঞাময়তার সম্পর্ক করা হয়েছে পরোক্ষভাবে।

এর পরের আয়াতে (৩, ৪) বলা হয়েছে— 'পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ সৎকর্মপরায়ণদের জন্য; যারা সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয়, আর তারাই আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাসী'। একথার অর্থ— জ্ঞানগর্ভ এই গ্রন্থ বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ। আর বিশ্বাসীগণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— তারা সাধারণভাবে হবে সৎকর্মপরায়ণ। আর এই বিশেষ তিনটি সদগুণ তাদের থাকবেই— ১. নামাজ প্রতিষ্ঠা ২. জাকাত প্রদান এবং ৩. পরকালে বিশ্বাস। অথবা বলা যেতে পারে যে, এখানে নামাজ-জাকাত-পরকালবিশ্বাস এই ত্রয়ী পুণ্যকর্মের উল্লেখের কারণ হচ্ছে, এগুলোকে অন্যান্য পুণ্যকর্মাপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণরূপে প্রতিভাত করা। আর বিষয়টিকে অধিকতর মর্যাদায়িত করবার জন্য এখানে করা হয়েছে 'হুম' (তারা) সর্বনামটির পুনঃপুনঃ সন্নিবেশন।

এরপরের আয়াতে(৫) বলা হয়েছে— 'তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম'। একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্র উপরে পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে কেবল তাঁর পরিতোষার্থে নামাজ পাঠ করে, জাকাত দেয় এবং অন্যান্য সৎকর্মের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে পরকালের জন্য যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করে তারাই নির্ভুল গন্তব্যাভিসারী এবং তারাই ইহপরকালে সফল।

জুয়াইবীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নজর ইবনে হারেছ একবার ক্রয় করলো এক গায়িকা ক্রীতদাসী। নৃত্যপটিয়সীও ছিলো সে। কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে যাচ্ছে, এরকম সংবাদ শুনতে পেলেই নজর ইবনে হারেছ তাকে ডেকে আনতো। ক্রীতদাসীটিকে ডেকে বলতো, একে গান শোনাও এবং নগ্ননৃত্য দেখাও। তারপর তার ওই অতিথিকে বলতো, আরে মোহাম্মদের আমন্ত্রণ তো নিরস কর্মকাণ্ডের দিকে। নামাজ-জাকাত-স্বজনবৈরিতা এসবের

www.eelm.weebly.com

কথাই তো সে বলে। আর দ্যাখো, আমার আমন্ত্রণ কতো সরস ও উপভোগ্য। কী বলো, ঠিক বলিনি? তার এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা লুক্মান ঃ আয়াত ৬

وَ مِنَ النَّاسِ مَنۡ یَّشۡتَرِیۡ لَهۡوَ الۡحَدِیۡثِ لِیُضِلَّ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ بِغَیۡرِ عِلۡمٍ ٭ۖ وَّ یَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِکَ لَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِیۡنٌ ﴿۶﴾

r মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করিয়া লয় এবং আল্লাহ্-প্রদর্শিত পথ লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। উহাদেরই জন্য রহিয়াছে অবমাননাকর শাস্তি।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কোনো কোনো মানুষ এমন, যারা নিজে তো আল্লাহ্‌র পথে চলেই না, উপরন্তু তারা অন্যকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার অপ-উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করে অর্থহীন ও পুণ্যহীন কথা ও কাজের। নিশ্চয় তাদের এমতো প্রবর্তনা অজ্ঞাতাপ্রসূত। আবার আল্লাহ্-প্রদর্শিত পথ সম্পর্কে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপও করে। তাদের জন্যই অপেক্ষা করছে চরম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, যা অবধারিত।

এখানে 'লাহ্ওয়াল হাদীছ' অর্থ ওই বাক্য, যা অসার, অর্থহীন, পুণ্যহীন, অসঙ্গত, অলীক, অসত্য, কৌতুকপ্রদ, অশুভ, অকল্যাণকর। 'হাদীছ' অর্থ বাক্য, বাণী, কথা, বক্তব্য।

আউফির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে জনৈক কুরায়েশ ব্যক্তি সম্পর্কে। সে ক্রয় করেছিলো একটি সঙ্গীতপটিয়সী ক্রীতদাসীকে।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সালমা কর্তৃক বিবৃত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ক্রীতদাসীকে গান শেখানো ঠিক নয়। গায়িকা ক্রীতদাসীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভক্ষণ নিষিদ্ধ। এদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে— মানুষের মধ্যে যারা ক্রয় করে আমার বাণী। গায়ক-গায়িকা গান শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্পাক দু'জন শয়তানকে তার উপরে চাপিয়ে দেন। তারা গিয়ে বসে তার দুই কাঁধে। গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা পদাঘাত করতে থাকে তাদেরকে। হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে তিরমিজি প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, গায়িকা দাসী কেনাবেচা কোরো না। তাদের ক্রয়-বিক্রয় কল্যাণহীন। তাদের বিক্রয়লব্ধ মূল্য ভক্ষণ হারাম। তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে, 'মানুষের মধ্যে.....'।

www.eelm.weebly.com

মুকাতিল ও কালাবী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে নজর ইবনে হারেছকে উদ্দেশ্য করে। সে ছিল বণিক। বাণিজ্য ব্যপদেশে সে হীরাত অঞ্চলে গমনাগমন করতো। সেখান থেকে সে শিখে আসতো অনারব জনগোষ্ঠীদের প্রচলিত কিস্‌সা-কাহিনী। সেগুলো আবার শোনাতো মক্কাবাসীদেরকে। বলতো, মোহাম্মদের চেয়ে আমি কম গল্প জানি না। সে তোমাদেরকে আদ-ছামুদের কাহিনী শোনায়। আর আমি শোনাই রোস্তম-সোহরাব ও পারস্য-রাজাদের কিংবদন্তী। তার কাহিনী বর্ণনার ভঙ্গি ছিলো আকর্ষণীয়। তাই অনেকেই তার দিকে ঝুঁকে পড়তো। আগ্রহ হারিয়ে ফেলতো কোরআনের সদুপদেশাবলীর প্রতি। এমতো পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকীও এরকম বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তার ‘শো’বুল ইমান’ গ্রন্থে।

মুজাহিদ বলেছেন, গায়ক-গায়িকা উভয়েই এখানকার ‘লাহ্ওয়াল হাদীছ’ এর উদ্দেশ্যভূত। এখানে কিছু কথা রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ত অংশসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানুষের মধ্যে এরকম মানুষও আছে, যারা ক্রয় করে গায়ক ও গায়িকা। অথবা— কিছু সংখ্যক লোক এমন, যারা কোরআনের চিরকল্যাণবহ বাণী নিচয়কে উপেক্ষা করে নিমগ্ন হয় সঙ্গীতচর্চায়। এমতো ক্ষেত্রে ‘ক্রয় করে’ মর্মার্থ হবে— প্রাধান্য দেয়। মাকহুল বলেছেন, যে ব্যক্তি গায়িকা ক্রীতদাসী ক্রয় করে সারাজীবন ধরে তার গান শুনতে থাকে, আমি তার জানাজা পড়বো না। কেননা আমার সামনে রয়েছে এই আয়াত।

হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে আব্বাস, ইকরামা ও সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মতে, এখানকার ‘লাহ্ওয়াল হাদীছ’ অর্থ সঙ্গীতশ্রবণ। আবুস্ সোহবা বর্ণনা করেছেন, আমি একবার হজরত ইবনে মাসউদের নিকটে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ জানতে চাইলাম। তিনি তিনবার শপথ উচ্চারণ করে বলবেন, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, সেই পবিত্র সত্তার শপথ করে বলছি ‘লাহ্ওয়াল হাদীছ’ অর্থ সঙ্গীত।

ইবনে জুরাইজ বলেছেন, শব্দদুটোর অর্থ বাদ্যযন্ত্র। আমি বলি, সঙ্গীত নৃত্য-বাদ্য-কিস্‌সা-কাহিনী— যে কারণেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়ে থাকুক না কেনো, এর বিধান কিন্তু সার্বজনীন ও সর্বকালীন। একারণেই কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে নিন্দা করা হয়েছে সবধরনের চপল, চটুল ও অশ্লীল চিত্তবিনোদনের। জুহাক অবশ্য বলেছেন, ‘লাহ্ওয়াল হাদীছ’ অর্থ শিরিক।

মাসআলাঃ ফকীহ্গণের সর্বসম্মত মত এই যে, সর্ববিধ বাদ্য হারাম।

‘আলমুত্তাকিক’ গ্রন্থে রয়েছে, বাদ্যযন্ত্র বাজানো যেমন হারাম, তেমনি হারাম বাদ্যশ্রবণও। যেমন ঢোল তবলা। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদেরকে সতর্ক করণার্থে

www.eelm.weebly.com

ঢাক পেটানো অসিদ্ধ নয়। বরং অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে এ রকম করা হলে তা হবে পুণ্যপদবাচ্য। ‘মুলতাফাত’ গ্রন্থে রয়েছে, কেউ কেউ মনে করেন, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করণার্থে এবং বিবাহ উৎসবে আনন্দ প্রকাশার্থে সঙ্গীত সিদ্ধ।

লক্ষণীয়, বিবাহ উৎসবে দফ বাজানো সিদ্ধ। অথচ দফও একটি বাদ্যযন্ত্র। কিন্তু দফ বাজানোর উদ্দেশ্য যেহেতু থাকে বিবাহের আনন্দ প্রচার, তাই তা অসিদ্ধ নয়। তাছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠানে দফ বাজানো সুন্নতও বটে। রসুল স. স্বয়ং এর অনুমতি দিয়েছেন। বলেছেন, তোমরা বিবাহের সংবাদ প্রচার কোরো, দফ বাজিয়ে হলেও।

‘জখীরা’ পুস্তকে রয়েছে, কেউ কেউ বলেছেন, ঈদের সময় দফ বাজানোর মধ্যে পাপ নেই। এক বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুল স. অবস্থান করছিলেন স্বগৃহে। দিনটি ছিলো ঈদের দিন। একটু পরে তাঁর গৃহের অঙ্গনে এসে হাজির হলো দুই কিশোরী। তারা দফ বাজিয়ে গান পরিবেশন করতে লাগলো। হঠাৎ হজরত আবু বকর সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমরা করছো কী? আল্লাহ্‌র রসুলের ঘরের সামনে গান বাজনা শুরু করে দিয়েছো! রসুল স. তাঁকে কাছে ডেকে বললেন, গাইতে দাও। আজ যে ঈদের দিন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কুকুর বিক্রয়ের অর্থ এবং বংশীবাদকের উপার্জন ভক্ষণ করা নিষেধ করে দিয়েছেন। হজরত আবু মালেক আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে কেউ কেউ হবে মদ্যপ। আর তারা মদকে দিবে ভিন্ন ভিন্ন নাম। তাদের সামনে পরিবেশিত হবে বাদ্য ও গায়িকাদের সঙ্গীত। আল্লাহ্‌ তাদের কাউকে কাউকে ভূমিধসের মাধ্যমে ভূপ্রোথিত করবেন। আর কারো কারো আকৃতি রূপান্তরিত করে দিবেন শূকর ও বানরের আদলে। বিবরণটিকে শুদ্ধসূত্রসম্বলিত আখ্যা দিয়েছেন ইবনে হাব্বান। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন আমার উম্মত পনেরোটি অপঅভ্যাসে লিপ্ত হবে, তখন তাদের উপরে আপতিত হবে বিভিন্ন প্রকারের বিপদাপদ। উপস্থিত সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র মহামান্য রসুল! ওই অপঅভ্যাসগুলো কী কী? তিনি স. বললেন— ১. যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে পার্থিব সম্পদরূপে গণ্য করা ২. গচ্ছিত সম্পদকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে ভাবা ৩. জাকাতকে মনে করা জরিমানা ৪. স্ত্রৈন্য হওয়া ৫. জননীর অনানুগত্য ৬. বন্ধুবান্ধবকে সবচেয়ে আপনজন ভাবা ৭. পিতৃদ্রোহীতা ৮. মসজিদে উচ্চস্বরে আওয়াজ করা ৯. সমাজপতিরূপে নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের অধিষ্ঠান ১০. অনিষ্টের আশংকায় দুরাচারকে সম্মান প্রদর্শন ১১. অবাধ মাদকাসক্তি ১২. পুরুষদের রেশমী বস্ত্র ব্যবহার ১৩. রক্ষিতারূপে গায়িকা সংরক্ষণ ১৪. বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রসার এবং ১৫. উত্তরপুরুষ কর্তৃক পূর্ব পুরুষদেরকে অভিসম্পাত প্রদান। এই পাপগুলো প্রকাশ পেলে মানুষ যেনো অপেক্ষা করতে থাকে ভয়ংকর তুফান, অগ্নুৎপাত ও ভূমিধসের।

www.eelm.weebly.com

মাসআলাঃ ফকীহ্গণ বলেন, আলোচ্য আয়াত এবং বর্ণিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সঙ্গীতশ্রবণ হারাম।

সূফী দার্শনিকগণ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র স্মরণে সততমগ্ন ও নির্জনাচারী, তার জন্য সঙ্গীত শ্রবণ দূষণীয় নয়। বরং নামাজ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক ইবাদতের সময় ব্যতীত অন্য সময় সঙ্গীত শ্রবণ তাদের জন্য সিদ্ধ তো বটেই, উপরন্তু মোস্তাহাব (অভিপ্রেত)। কারণ তারা পুরোপুরি আল্লাহ্মনস্ক। সঙ্গীত তাদের আল্লাহ্প্রেমের আগুনকে করে অধিকতর প্রোজ্জ্বল। অন্য মানুষেরা এর বিপরীত। তাই সঙ্গীত তাদের অপপ্রবৃত্তিকে করে অধিকতর উদাসীন। বেশী করে উসকে দেয় তাদের পাপাগ্নিকে।

'শরহে কাফী' গ্রন্থে রয়েছে, যে ক্রীড়া-কৌতুক অনুষ্ঠিত হয় পাপবাসনা নিবারণার্থে, তাকেই বলে 'লাহ্ওয়াল হাদীছ'। এধরনের কামনা অন্তরে পোষণ করে তারা, যারা নামাজ সম্পাদন, কোরআন পাঠ ইত্যাদি পুণ্যকর্মের ধারে কাছেও যায় না। অথচ সহজে আকৃষ্ট হয় বাদ্য-সঙ্গীতের প্রতি। আমাদের বিদ্বজ্জনের অভিমত্যানুসারে এধরনের লোকদের জন্যই সঙ্গীত নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্প্রেমিক এবং শরিয়তের বিধানসমূহ পালনে যত্নবান, তাদের জন্য সঙ্গীত সিদ্ধ। কারণ সঙ্গীত তাদেরকে অধিকতর আল্লাহ্অভিমুখী করে। শাণিত করে তাদের পরকাল চেতনাকে।

'বজদবী' গ্রন্থের ভাষ্যকার আবুল কাসেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ দামেশকী তাঁর ভাষ্যগ্রন্থ নুরী কিতাবে উল্লেখ করেছেন, সঙ্গীতশ্রবণ সম্পর্কে আলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে মতদ্বৈধতা পরিদৃষ্ট হয়। যারা নামাজবর্জনকারী ও মদ্যপ তারাই সাধারণতঃ যত্রতত্র গানের আসর বসায়। তাদের জন্য সঙ্গীত নিশ্চিত হারাম। কিন্তু যারা আল্লাহ্ভীরু, নামাজ, কোরআন পাঠ, দরূদপাঠ ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগীতে নিবিষ্টচিত্ত তাদের জন্য সঙ্গীত হারাম নয়। সঙ্গীত তাদের আল্লাহ্প্রেম ও পরকালবোধকে জাগ্রত করে। তাঁরা আল্লাহ্প্রেমে মত্ত হয়ে যদি নৃত্য শুরু করেন, তাও অসিদ্ধ নয়।

'আলইকনা' গ্রন্থে রয়েছে, কোনো কোনো গান হৃদয়কে করে বিনম্র। আল্লাহ্র সাক্ষাত লাভের বাসনায় অন্তরকে করে বিরহকাতর। আল্লাহ্র অসন্তোষের আশংকায় অন্তরে সৃষ্টি করে ভয় ও বিস্ময়। এধরনের গানে ইন্দ্রিয়জ অপরিচ্ছন্নতার লেশমাত্র থাকে না।

শায়েখ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়াদি তাঁর 'আল আওয়ায়েফ' গ্রন্থে লিখেছেন, যারা বিশুদ্ধচিত্ত, সঙ্গীত তাদেরকে আকৃষ্ট করে আল্লাহ্তায়ালার অপারসিন্ধুর তরঙ্গমুখরতার দিকে। 'ফতোয়ায়ে খোলাসা' গ্রন্থে রয়েছে, জ্ঞানপ্রবীণগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন, কেবল বিনোদনের উদ্দেশ্যে কাউকে গান শোনানো মাকরূহ (অশোভন)। কিন্তু তাঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বলেছেন, বিবাহ-উৎসবে ও

www.eelm.weebly.com

অন্যান্য নির্দোষ প্রমোদায়োজনে সঙ্গীত পরিবেশন সিদ্ধ। দুঃখ-কষ্ট বা ভীতি প্রশমনার্থে সঙ্গীত পরিবেশনকে কেউই অশোভন বলেননি। ইমাম সুরুখসীও এ অভিমতের সমর্থক। আবার কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সকল প্রকার সঙ্গীত মাকরূহ। ইমাম সাহেবগণও এ অভিমতের প্রবক্তা।

'জামেউল মুজমারাত' গ্রন্থে 'আন্নাফে' এবং 'জখীরা' গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, কেউ যদি অপরের তুষ্টি-অতুষ্টির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কেবল নিজের চিত্তোদ্বেগ ও দুঃখ-যাতনা প্রশমনার্থে গান গায়, তবে তা দূষণীয় নয়। আমি ইমাম নজমুদ্দীনকেও এরকম বলতে শুনেছি, মনের খেদ দূর করবার জন্য যদি কেউ তার নিজের ক্রীতদাসীর গান শোনে, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। অভিমতটি বর্ণিত হয়েছে হামীয়ার ঘটনাবলীতে। 'আওয়ায়েফ' গ্রন্থে ক্রীতদাসীর সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে আপন সহধর্মিণীর কথাও। অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর মুখে গান শোনা সিদ্ধ। এরকম উল্লেখ রয়েছে ইব্রাহীম শামীতেও। 'আল মুহীত' গ্রন্থে ইমাম সুরুখসী উল্লেখ করেছেন, ইমাম মোহাম্মদ তাঁর 'সীয়ারে কাবীর' গ্রন্থে লিখেছেন, একবার হজরত আনাস ইবনে মালেক তাঁর ভাইয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, তিনি গীতানুশীলনে মগ্ন।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে অনর্থক ক্রীড়াকৌতুককে নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। কিন্তু সুফী সাধকগণের সঙ্গীত (ছামা) এই নিষিদ্ধতার পর্যায়ে পড়ে না। আর হাদিস শরীফসমূহে যে নিষিদ্ধতা বিঘোষিত হয়েছে, সে নিষিদ্ধতা সাধারণভাবে সকল প্রকার সঙ্গীতের উপরে প্রযোজ্য নয়। কারণ কোনো কোনো হাদিসে আবার সঙ্গীত সিদ্ধ হওয়ার কথাও এসেছে। এতে করে এমতো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোনো কোনো সঙ্গীত নিষিদ্ধ এবং কোনো কোনো সঙ্গীত সিদ্ধ। এ কারণেই আমরা বলি, পাপপ্রবণতা উদ্রেকক সঙ্গীতই কেবল নিষিদ্ধ। অন্যগুলো নয়।

যে সকল হাদিস দ্বারা সঙ্গীত ও দফ বাজানো সিদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হাদিস এরকম— হজরত রবী বিনতে মুয়াজ ইবনে আফরা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আমার বিবাহের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স. উপবেশন করেছিলেন আমার পাশেই। কতিপয় কিশোরী তখন দফ বাজিয়ে সুরেলা কণ্ঠে শোকগাঁথা গাইছিলো। শোকগাঁথাটি ছিলো বদরযুদ্ধের শহীদগণ সম্পর্কে। তাঁর মধ্যে একটি শ্লোক ছিলো এরকম— আমাদের মধ্যে এমন একজন মহান নবী বিদ্যমান, যিনি ভবিতব্য সম্পর্কে জানেন। রসুল স. তখন বাধা দিয়ে বললেন, তোমরা এই চরণটি আর উচ্চারণ কোরো না। অন্যগুলো বলো। বোখারী। ইবনে মাজার বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— আর এরকম বোলো না। ভবিতব্য তো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

www.eelm.weebly.com

জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জনৈক আনসার সাহাবীর সঙ্গে বিবাহ হলো এক রমণীর। বিবাহের পর যখন ওই রমণী পতিগৃহে উপস্থিত হলো, তখন রসুল স. নবদম্পতির দিকে লক্ষ্য করলেন। তারপর উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে গানবাজনা জানে, এমন কী কেউ নেই। ওরা যে সঙ্গীত প্রেমিক। বোখারী।

জননী আয়েশা কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, অমুকের বিবাহের অনুষ্ঠান করো মসজিদে। আর দফ বাজিয়ে জোরে জোরে অনুষ্ঠানের প্রচার করো। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য। জননী আরো বর্ণনা করেছেন, এক আনসার আমার কাছেই থাকতো। আমার উদ্যোগেই তার বিবাহ হলো। বিয়ের আসরে রসুল স. উপস্থিত হয়ে বললেন, আয়েশা! গানবাজনার ব্যবস্থা কই? এই মেয়েটির গোত্র তো সঙ্গীতপ্রেমিক।

ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার জননী আয়েশা তাঁর এক নিকটাত্মীয়ার বিবাহ দিলেন জনৈক আনসারী যুবকের সঙ্গে। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর রসুল স. সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমরা কি মেয়েটিকে বিদায় করে দিয়েছো? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, আনসারীজনতা গজলপ্রেমিক। সুতরাং তোমরা যদি কোনো গায়ককে সেখানে পাঠিয়ে দিতে তবে উত্তম হতো। সে তাদেরকে শোনাতো এই গজলটি 'আতাইনাকুম আতাইনাকুম ফাহাইয়্যানা ওয়া হাইয়্যাকুম' (আমরা তোমাদের অতিথি; আল্লাহ্ আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন; তোমাদেরকেও করুন কল্যাণধন্য)। ইবনে মাজা।

আমের ইবনে সাআদ বর্ণনা করেছেন, একবার আমি এক বিবাহ উৎসবে যোগদান করলাম। সেখানে উপস্থিত ছিলেন হজরত করজ ইবনে কাআব এবং হজরত আবু মাসউদ আনসারী। কয়েকজন বালিকা সুললিত কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করতে শুরু করলো। আমি নিবেদন করলাম, হে রসুল স. এর মহামান্য সহচর! আপনাদের সামনে একি হচ্ছে? তাঁরা দু'জনেই সমস্বরে বলে উঠলেন, তোমার ইচ্ছা হলে থাকো, না হয় চলে যাও। আমরা বিবাহ অনুষ্ঠানে গান শোনার অনুমতিপ্রাপ্ত।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, তখন ছিলো হজের মওসুম। দু'জন বালিকা আমার সামনে দফ বাজাতে শুরু করলো। রসুল স. শুয়েছিলেন আচরণ শির চাদরাবৃত হয়ে। হঠাৎ আমার পিতা হজরত আবু বকর সেখানে উপস্থিত হয়ে বালিকাদেরকে ধমক দিলেন। রসুল স. চাদরের ভিতর থেকে মুখ বের করে বললেন, আবু বকর! ওদেরকে কিছু বোলো না। আজ তো ঈদের দিন। ওদেরকে

www.eelm.weebly.com

আনন্দ করতে দাও। বোখারী। ইবনে মাজার বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— রসুল স. আরো বললেন, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রয়েছে উৎসব-পরব পালনের প্রথা। সে রকম উৎসব-পরব আমাদেরও রয়েছে। যেমন আজ।

হজরত আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহ বর্ণনা করেছেন, একবার এক রমণী রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র প্রিয় বচনবাহক! আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করেছি যে, যদি আপনি দয়া করে আমার গৃহে পদধূলি দেন, তবে দফ বাজিয়ে আমি আনন্দ প্রকাশ করবো। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে, তাই কোরো। আবু দাউদ। এখানে প্রণিধাননীয় যে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতাজনিত অঙ্গীকারপূরণ নিষিদ্ধ। সুতরাং বুঝতে হবে দফ বাজিয়ে আনন্দ প্রকাশ করা দূষণীয় নয়। যদি হতো তবে রসুল স. নিশ্চয় ওই রমণীকে এমতো অনুমতি দিতেন না। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. যখন মদীনায় শুভাগমন করেন, তখন নাজ্জার গোত্রের বালিকারা গেয়ে উঠেছিলো—

নাহনু জ্বাওয়ারিম্ মিন বনী নাজ্জারিন
ইয়া হাব্‌বাজা মুহাম্মাদান মিন জ্বারিন।

অর্থ ঃ আমরা বনী নাজ্জার দুলালী। আর মোহাম্মদ হচ্ছেন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অতিথি।

ওই বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, রসুল স. ওই বালিকাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ্ জানেন, আমি তোমাদেরকে ভালোবাসি।

বায়যাবীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. তখন ওই বালিকাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ্ উত্তমরূপে অবগত যে, আমি তোমাদেরকে ভালোবাসি। জননী আরো বলেছেন, পুণ্যময় মদীনায় রসুল স. এর শুভাগমনকালে বালক-বালিকারা সমস্বরে গেয়ে ছিলো—

তালায়া'ল বদরু আ'লাইনা
মিন ছানিয়াতিল বিদায়ী
ওয়াজ্বাবাশ্ শুকরু আ'লাইনা
মাদায়া লিল্লাহি দায়ী'।

অর্থ ঃ বিদা শৈলশিখরে উদিত হয়েছে পূর্ণিমার শশী। এ অনন্য সৌভাগ্যের যথা-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমাদের একান্ত কর্তব্য। আমাদের প্রতি প্রেরিত হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি তো এনেছেন এমন বিধান যা সকল মানুষের অবশ্য অনুসরণীয়।

হজরত আনাস থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, যখন মদীনায় রসুল স. এর শুভপদার্পণ ঘটলো, তখন আনন্দোৎফুল্লকারীরা ছোট ছোট বর্শা নিক্ষেপের খেলা খেলেছিলো।

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদ ইবনে হাতেব জুমুহী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সঙ্গীত ও বিবাহের সময় দফ বাজানোর মধ্যে সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ দু'টোরই ইঙ্গিত রয়েছে। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, নাসাঈ।

ইমাম গায্যালী তাঁর 'ইহ্ইয়াউল উলুম' গ্রন্থে লিখেছেন, শুভদিনের উৎসবে সঙ্গীত শ্রবণ করলে পরিবেশ হয়ে ওঠে আনন্দঘন। উৎসব যদি সিদ্ধ হয়, তবে সে উৎসবের সঙ্গীতও হবে সিদ্ধ। যেমন ঈদ, বিবাহ, ওলীমা, প্রবাসীজনের প্রত্যাবর্তন মুহূর্ত, শিশুর জন্মগ্রহণ, আকীকা, খৎনা, শিশুর কোরআন মজীদ হেফজ করার সূচনালগ্ন ইত্যাদি। আমি বলি, কোরআন মজীদ শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষকের হাতে সন্তান সম্প্রদানকালে আনন্দোৎসবের সময়ের সঙ্গীতও এই বিধানের পর্যায়ভূত। এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করা হলো, তাতে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, পাপপ্রবণতার সহায়ক সঙ্গীত নিষিদ্ধ এবং যে সঙ্গীত এরকম নয়, তা সিদ্ধ। নক্শবন্দিয়া তরিকার পীর-মোর্শেদগণ অবশ্য এ ব্যাপারে অত্যধিক সতর্ক। তাঁরা নিজেরা সঙ্গীত নৃত্য (ছামা রাক্কাসা) ইত্যাদির সঙ্গে মোটেও সংশ্লিষ্ট নন। আবার যারা এগুলো করে তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলেনও না।

এখানে 'অজ্ঞতাবশতঃ' অর্থ তারা জানেই না যে, অসার বাক্যক্রয় লাভজনক না ক্ষতিকর। অথবা বলা যেতে পারে, এমতো ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকৃতি সম্পর্কেই তারা অনবগত। তাদের জন্য লাভজনক ছিলো কোরআনানুসরণ। অথচ তারা কোরআনকে বাদ দিয়ে গ্রহণ করেছে চটুল বিনোদনপন্থা। কাতাদা বলেছেন, আয়াতে কথিত লোকগুলি ছিলো চরম পর্যায়ের ভ্রান্ত। মহাসত্য পরিত্যাগ করে তারা গ্রহণ করেছিলো অলীক বাণী।

সূরা লোকমান ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ
اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَعْدَ اللّٰهِ
حَقًّا ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٩﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ
تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا
مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۗ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ

www.eelm.weebly.com

كُلِّ زَوۡجٍ كَرِيۡمٍ ۝١٠ هٰذَا خَلۡقُ اللّٰهِ فَاَرُوۡنِیۡ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيۡنَ
مِنۡ دُوۡنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوۡنَ فِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ۝١١

r যখন উহার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরাইয়া লয় যেন সে ইহা শুনিতে পায় নাই, যেন উহার কর্ণ দুইটি বধির; অতএব উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

r যাহারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে সুখদ-কানন;

r সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়!

r তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত-তোমরা ইহা দেখিতেছ; তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন পর্বতমালা যাহাতে ইহা তোমাদিগকে লইয়া ঢলিয়া না পড়ে এবং ইহাতে ছড়াইয়া দিয়াছেন সর্বপ্রকার জীব-জন্তু। এবং আমিই আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়া ইহাতে উদ্গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ।

r ইহা আল্লাহ্র সৃষ্টি! তিনি ব্যতীত অন্যেরা কী সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও। সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— নজর ইবনে হারেছ এবং তার মতো লোকেরা কোরআন পাঠ শুনলে দর্পভরে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে, অথবা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে স্থান ত্যাগ করে। তাদের ভাব দেখে মনে হয়, তারা যেনো কিছু শুনতেই পায়নি, যেনো তারা বধির। ঠিক আছে, আল্লাহ্র কালামের প্রতি এমতো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের যথাপ্রতিফল তারা পাবেই। হে আমার রসুল! সেই অনিবার্য শাস্তির সুসংবাদ আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন। উল্লেখ্য, এখানে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদকে সুসংবাদ বলা হয়েছে উপহাসসলে। অথবা বলা যেতে পারে 'সুসংবাদ দাও' কথাটির অর্থ— একথা জানিয়ে দাও যে, তারা সকল প্রকার শুভসংবাদ থেকে চিরবঞ্চিত। আর এখানে 'ওয়াক্বরা' অর্থ শ্রবণক্ষমতা রহিতকারী ভারবস্তু। অর্থাৎ বধিরতা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়, যেনো তাদের কান দু'টো বধিরতাক্রান্ত। যেনো তারা বধির।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে (৮, ৯)বলা হয়েছে— 'যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে সুখদ কানন; সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।

www.eelm.weebly.com

এখানে ‘ওয়া হুয়াল আ’যীয’ অর্থ তিনি মহাপরাক্রমশালী, পুণ্যদানের প্রতিশ্রুতি পূরণে এবং মর্মন্তুদ শাস্তি কার্যকর করার ব্যাপারে তাঁকে বাধ্য করার ক্ষমতা কারো নেই। আর ‘আল হাকীম’ অর্থ প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি যা কিছু করেন, তার সকলকিছুই প্রজ্ঞামণ্ডিত।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— ‘তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা তা দেখছো; তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে’। এখানে ‘রওয়াসী’ অর্থ ভূপ্রোথিত পাহাড়।

প্রশ্ন জাগতে পারে, আকাশ কি আদৌ স্তম্ভবিহীন। যদি স্তম্ভ থেকেই থাকে, তবে তা দৃষ্টিগোচরই বা হয় না কেনো? আর এখানে আকাশকে স্তম্ভবিহীন বলার অর্থই বা কী? এমতো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে— ১. হয়তো আকাশ প্রতিষ্ঠিত কোনো অদৃশ্য অবলম্বনের উপর। ২. আদতেই এরকম অবলম্বনের কোনো অস্তিত্ব নেই।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীবজন্তু। এবং আমিই আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে এতে উদগত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ’।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র একক সৃজনী শক্তি ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাক্রমের প্রমাণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে স্তম্ভবিহীন আকাশ নির্মাণ এবং পর্বতশ্রেণীর নিম্নাংশকে ভূপ্রোথিত করে পৃথিবীকে অচঞ্চল ও বাসপোযোগী করার কথা। আরো উল্লেখ করা হয়েছে পৃথিবীতে বিচরণশীল অসংখ্য ও বহুধাবিচিত্র প্রাণী-পাখি-পশুদের বিচরণশীলতার কথা। আর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ এবং তার মাধ্যমে ফল ও ফসলের উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন করার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে সকলের শেষে। এভাবে এখানে পরমপ্রভুপালক এবং উপাস্যরূপে এক আল্লাহ্‌কে গ্রহণ করার জন্য দেয়া হয়েছে প্রচ্ছন্ন সদুপদেশ। একই সঙ্গে পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে সকল প্রকার অংশীবাদিতাকে। সুতরাং একথা সহজে অনুমেয় যে, যে ব্যক্তি এরকম করবে না, সে চিরভ্রষ্ট। পরবর্তী আয়াতে (১১) এ বিষয়টিকেই করা হয়েছে অধিকতর স্পষ্ট।

বলা হয়েছে— ‘এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। তিনি ব্যতীত অন্যেরা কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে’।

সূরা লোকমান ঃ আয়াত ১২

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا
يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿١٢﴾

www.eelm.weebly.com

r আমি লুকমানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তাহা করে নিজেরই জন্য এবং কেহ অকৃতজ্ঞ হইলে আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি লোকমানকে জ্ঞানদান করেছিলাম'। বাগবী লিখেছেন, লোকমান ছিলেন বাউরের পুত্র। বাউর পুত্র ছিলেন নাখুরের এবং নাখুর পুত্র ছিলেন তারেখের। এই তারেখই আজর বলে পরিচিত। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্‌বাহ বলেছেন, লোকমান ছিলেন নবী আইয়ুবের ভাগিনেয়। মুকাতিল বলেছেন, লোকমান ছিলেন আইয়ুব নবীর খালাতো ভাই। বায়যাবী লিখেছেন নবী দাউদের যুগ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন লোকমান। তিনি ছিলেন সুবিজ্ঞ বিধানবেত্তা (মুফতী)। নবী দাউদের মহাআবির্ভাবের পর তিনি ফতোয়া দেওয়া বন্ধ করে দেন। বলেন, এখন আর আমার সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার নেই। কারণ নবীর বর্তমানে অনুসারীর কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়। ওয়াহেদী বলেছেন, লোকমান ছিলেন বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর বিজ্ঞ বিচারকর্তা। তাফসীরে দুর্‌রে মনসুরে বলা হয়েছে, ইবনে আবী শায়বার অভিমতও এরকম। 'জুহুদ' গ্রন্থে রয়েছে, ইমাম আহমদও এ মত সমর্থন করেন। 'আল মামলুকীন' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়াও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। আর ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, লোকমান ছিলেন একজন কাফ্রী ক্রীতদাস। পেশাগতভাবে তিনি ছিলেন সূত্রধর। খালেদ বরঈর সূত্রে বাগবীও এরকম বলেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, কাফ্রী ক্রীতদাস ছিলেন তিনি। আর তাঁর ওষ্ঠদ্বয় ছিলো পুরুষ্ট এবং পদদ্বয় প্রশস্ত। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, তিনি ছিলেন দরজি। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তিনি ছিলেন মেষ ও ছাগলের রাখাল।

এখানে 'হিকমাত' অর্থ জ্ঞান, অভিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, ন্যায়ানুগতা, নবুয়ত, আসমানী কিতাব সম্পর্কে প্রাজ্ঞ। 'কামুস' অভিধানগ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে 'ইন্‌না মিনাশ শি'রি লাহিকমাহু'। এই 'হিকমত' অর্থ জ্ঞান। অপর এক হাদিসে এসেছে 'আ'লা ওয়াফী র'সিহী হিকমাহ'। এই 'হিকমত' অর্থ বিচক্ষণতা। আলোচ্য বাক্যে উল্লেখিত 'হিকমাত' এর অর্থ দু'টোই হয়। অর্থাৎ লোকমান ছিলেন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ। বাগবী লিখেছেন, বিদ্বজ্জনের ঐকমত্য এই যে, লোকমান নবী ছিলেন না, ছিলেন একজন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি।

ইকরামাই কেবল হজরত লোকমানের নবী হওয়ার প্রবক্তা। ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্‌বাহ্‌র কাছে একবার জানতে চাওয়া হলো, হজরত লোকমান কি নবী ছিলেন? তিনি বললেন, না। তিনি কোনো প্রত্যাদেশ

www.eelm.weebly.com

পাননি। তবে তিনি ছিলেন অতীব বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ। ইবনে জারীর এবং মুজাহিদও এরকম মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁকে নবুয়ত গ্রহণ করা না করার অধিকার দেওয়া হয়েছিলো। তিনি নবুয়ত না নিয়ে নিয়েছিলেন হিকমত।

বাগবী লিখেছেন, একবার হজরত লোকমান দ্বিপ্রহরিক নিদ্রা উপভোগ করছিলেন তাঁর আপন শয্যায়। স্বপ্নমধ্যে আদিষ্ট হলেন, লোকমান! তুমি কি চাও, আল্লাহ্ পৃথিবীতে তোমাকে তাঁর প্রতিনিধি মনোনীত করুন এবং তুমি রাজকার্য পরিচালনা করো ন্যায়নিষ্ঠতার সঙ্গে? তিনি স্বপ্নের ভিতরেই জবাব দিলেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আপনি যদি ভালো মনে করেন তবে আমাকে মার্জনা করুন। এটাই আমার জন্য উত্তম। আর যদি এটা আপনার অনড় আজ্ঞা হয়, তবে সে আজ্ঞা তো শিরোধার্য। কারণ আমি জানি আপনার অভিপ্রায়ের সঙ্গেই জড়িত থাকে দায়িত্বপালনের সামর্থ্য। পুনঃ ঘোষণা হলো, হে লোকমান! তুমি এমন করে বললে কেনো? তিনি জবাব দিলেন, সন্দিগ্ধ ও অস্পষ্ট সমস্যাগুলোর সমাধান অতি দুরূহ, গভীর কুয়াশাচ্ছন্ন। সুতরাং ওই সকল ক্ষেত্রে যদি আমি সঠিক সিদ্ধান্ত উদ্ধার করতে অক্ষম হই, তবে তো আমি হারিয়ে ফেলবো জান্নাতের পথ। এমতো আশংকাতেই আমি বলতে চাই, পৃথিবীতে নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হওয়া অপেক্ষা অন্যের অধীন হয়ে থাকাই নিরাপদ। যারা ইহকালকে প্রাধান্য দেয় পরকালের উপর, তারা হারিয়ে ফেলে পরকালের কল্যাণ। আল্লাহ্ তাঁর এমতো জবাব পছন্দ করেছিলেন। এভাবে আর একদিনের স্বপ্নে আল্লাহ্পাক তাঁকে দান করেছিলেন হিকমত। তাই তো তিনি হতে পেরেছিলেন প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ।

নবী দাউদকেও এভাবে স্বপ্নযোগে হিকমত দান করা হয়েছিলো এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন বিনা শর্তে। কিন্তু বাস্তবে তিনি কয়েকবার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে ভুল করে বসেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ সে ভুলগুলো সংশোধন করে দিয়েছিলেন হজরত লোকমানের মাধ্যমে। সুতরাং নিছক ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকে হিকমত বলা যাবে না। যদি তাই বলা যেতো, তবে হজরত লোকমান তা গ্রহণ করতে ইতস্তত করতেন না।

জাযারী তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ 'নেহায়া'য় একটি চমকপ্রদ ঘটনার অবতারণা করেছেন। বলেছেন, হিকমত হচ্ছে সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। আমি বলি, সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে আল্লাহ্র পরম সত্তা। আর তিনি সকল প্রকার আনুরূপ্য থেকে চিরপবিত্র। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'লাইসা কামিছলিহী শাইয়ুন' (তিনি যাবতীয় আনুরূপ্য থেকে পবিত্র)। আর এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে— 'আইয়ু শাইইন আকবর শাহাদাতান কুলিল্লাহ্' (কোন সত্তা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রত্যক্ষ গোচর? বলো, আল্লাহ্)। আর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হচ্ছে ওই জ্ঞান, যেখানে ঔদাসীন্যের ছায়াপাত মাত্র নেই। এই জ্ঞানকেই বলে আত্মজ্ঞান (এলমে হুজুরী)। পক্ষান্তরে অর্জিত জ্ঞান

www.eelm.weebly.com

(এলমে হুসুলী) নির্ভুল নয়। কারণ তাতে প্রায়শঃ পতিত হয় উদাসীনতার ছায়া। তাই অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পরিচয়প্রাপ্তি অসম্ভব। কোনোকিছুর প্রতিচ্ছবি অনুভবের আয়নায় প্রতিফলিত হওয়ার নাম অর্জিত জ্ঞান। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা যে অনুভবের অতীত, আকার প্রকার ও আনুরূপ্যহীন। আল্লাহ্‌পাকের সত্তা তাঁর সত্তাসঞ্জাত জ্ঞান অপেক্ষাও অনেক উচ্চ ও মহিমান্বিত। জ্ঞানীদের আত্মজ্ঞান আবার আল্লাহ্‌র সত্তাসঞ্জাত জ্ঞানের বিচারে অর্জিত জ্ঞানতুল্য। সুতরাং বুঝতে হবে আত্মজ্ঞান ও অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে বিস্তর প্রভেদ। অর্জিত জ্ঞান বিবেকনির্ভর, আর আত্মজ্ঞান সত্তানির্ভর। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানই মূল জ্ঞান এবং অর্জিত জ্ঞান তার অতি দূরবর্তী ছায়া। আর এই দূরবর্তিতার কারণেই অর্জিত জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও অনির্ভরযোগ্য। যেমন প্রত্যেকে তার সত্তাকে এভাবে অনুভব করে যে, আমি আমিই। এমতো জ্ঞান পূর্ণ। কিন্তু আল্লাহ্ বলেছেন 'আমি তোমার প্রাণরগ অপেক্ষাও নিকটে)। অর্থাৎ তুমি তোমার যতো নিকটে, তার চেয়ে আমি তোমার অধিক নিকটে। সুতরাং এই জ্ঞান অধিকতর পূর্ণ; বরং পূর্ণতম। কারণ সমীপবর্তী ও দূরবর্তীরূপে আত্মজ্ঞান ও অর্জিত জ্ঞান সত্তাসন্নিহিত। কিন্তু আল্লাহ্‌র নৈকট্যের জ্ঞান যে সত্তারও অতীত। আর এমতো দুর্বোধ্য ও অনির্বচনীয় নৈকট্যের মাধ্যমেই লাভ হয় আল্লাহ্‌র পরিচিতি (মারেফত)। আর এই মারেফতের সম্পর্ক সত্তা ও আত্মার সঙ্গে। তাই হাদিসে কুদসীতে এসেছে, 'নভোমণ্ডলে ও ভূবনে আমার সংকুলান হয় না, সংকুলান হয় কেবল মানবাত্মায়'।

উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ প্রিয়ভাজন যারা, তাঁদের অনেকেই সত্তাসঞ্জাত জ্ঞান লাভ করে ধন্য হয়েছেন। হজরত আনাস থেকে বায়হাকী ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত লোকমান ছিলেন নবী দাউদের বিশেষ অনুচর। নবী দাউদ স্বহস্তে নির্মাণ করতেন লৌহবর্ম। কিন্তু হজরত লোকমান কোনোদিনই তাঁর নিকটে এ সম্পর্কে কিছু জানতে চাননি। একদিন নবী দাউদ একটি লৌহবর্ম প্রস্তুত করে পরিধান করলেন। তারপর বললেন, কী চমৎকার একটি যুদ্ধ-পরিচ্ছদ। হজরত লোকমান বললেন, নিশ্চুপ থাকাই বীরত্ব। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, বলুন, সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে অপকর্ম করে প্রকাশ্যে।

ইবনে আবী শায়বা, ইমাম আহমদ ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, খালেদ রবয়ী বলেছেন, হজরত লোকমান ছিলেন একজন কাফ্রী ক্রীতদাস এবং তিনি ছিলেন সূত্রধর। একবার তাঁর মালিক তাকে নির্দেশ দিলেন, একটি ছাগল জবাই করে তার মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালো দু'টো টুকরা নিয়ে এসো। তিনি একটি ছাগল জবাই করে তার মধ্য থেকে নিয়ে এলেন জিহ্বা ও যকৃত। কিছুদিন পর তাঁর মালিক আদেশ করলেন, এবার একটি ছাগল জবাই করো এবং নিয়ে এসো

www.eelm.weebly.com

তার সর্বনিকৃষ্ট দু'টো অংশ। এবারও তিনি উপস্থিত করলেন জিহ্বা ও যকৃত। এরকম করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, এই অংশদুটো ভালো থাকলে সমস্ত শরীর ভালো থাকে এবং খারাপ হলে সমস্ত দেহ হয়ে যায় খারাপ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বলেছিলাম, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো'। এ কথার অর্থ— এবং আমি তাকে বলেছিলাম, হে লোকমান! তোমার প্রতি আমার এই যে অযাচিত দান, এই যে, হিকমাত, এর জন্য তুমি কায়মনোবাক্যে প্রকাশ করো আমার কৃতজ্ঞতা। অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা বলেছেন, এখানকার 'আন' অব্যয়টি সন্নিবেশিত হয়েছে ব্যাখ্যামূলক হিসেবে। আমি বলি, এখানে হিকমত প্রদান করার অর্থ হিকমত শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের। সুতরাং এখানে ব্যাখ্যামূলক অব্যয় ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত। আর হিকমত প্রদানের অর্থই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ প্রদান।

'আনিশকুরু' (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো) কথাটি অনুজ্ঞাসূচক। আর এ অনুজ্ঞা হচ্ছে সৃষ্টিগত বা স্বভাবজাত। কারণ শরিয়তগত নির্দেশ তো রয়েছে সাধারণভাবে সকলের উপরেই। কেবল হজরত লোকমান তো এমতো নির্দেশের অন্তর্গত নন। যদি একে শরিয়তের সাধারণ অনুজ্ঞাই ধরে নেয়া হয়, তবুও তাঁর উপর সাধারণভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য হয় না। কিন্তু যদি তা সৃষ্টিগত বা স্বভাবজ হয়, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্ব হয়ে যায় অনিবার্য। হিকমত দান করার পর যেমন তা গ্রহণ করা অনিবার্য, তেমনি এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানানোও অবধারিত।

ভাবার্থে 'হিকমত'কে কৃতজ্ঞতা বলা সিদ্ধ। আর দানের জন্য যথাকৃতজ্ঞ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কারণ অবধারণ এর স্থলে অবধারিত এবং অবধারিত এর স্থলে অবধারণ মর্মগ্রহণ ব্যকরণসিদ্ধ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থঃ 'শোকর' অর্থ দাতার দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর 'কুফর' অর্থ অকৃতজ্ঞ হওয়া, দাতার দান গোপন করা। 'কামুস' রচয়িতা লিখেছেন, 'শোকর' অর্থ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। কারো কারো ধারণা শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'কোশর'। অক্ষরের অগ্রপশ্চাত করে ওই শব্দটিই হয়েছে 'শোকর'। 'কোশর' অর্থ উন্মোচন করা, উদঘাটন করা। তদ্রূপ 'শোকর' অর্থও নেয়ামতের প্রকাশন। শোকর ত্রিবিধ— ১. চিত্তে ধারণ করা ২. নেয়ামত দাতার স্তুতি বর্ণনা করা এবং ৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আনুগত্য প্রকাশ করা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'শোকর' শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে 'আইনুন শাকিরুন' প্রবাদ বাক্যটি থেকে। প্রবাদ বাক্যটির অর্থ সলিলধারিণী নির্ঝরিণী। এমতাবস্থায় 'শোকর' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়— দাতার দানকে স্মরণমুখর করা। একারণেই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়াক্বলিলুম মিন ইবাদিয়াশ্ শাকুর' (আমার

www.eelm.weebly.com

দাসগণের অতি অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী)। তাছাড়া আল্লাহ্পাক মহাগ্রন্থ কোরআনে তাঁর দু'জন বিশেষ বান্দাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বলেছেন। তাঁরা হচ্ছেন নবী ইব্রাহিম এবং নবী নূহ। প্রথম জন সম্পর্কে বলেছেন— 'শাকিরাল লি আনউমিহী' (তাঁর দানসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী) এবং দ্বিতীয়জন সম্পর্কে বলেছেন 'ইননাহু কানা আবদান শাকুরা' (অবশ্যই তিনি ছিলেন কৃতজ্ঞ সেবক)।

আল্লামা জাযারী বলেছেন, দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হতে পারে বাচনিকভাবে, আবার আনুষ্ঠানিকভাবেও। কখনো তা হয় আন্তরিক, কখনো আক্ষরিক। মুখের কথায় দাতার গুণগান করা প্রয়োজন। আবার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা ফুটিয়ে তোলা উচিত কৃতজ্ঞতা বোধকে। তদুপরি হৃদয়ে এই বিশ্বাসটিও দৃঢ়বদ্ধ করা আবশ্যিক যে, নেয়ামতদাতাই আমার একমাত্র অভিভাবক।

এরপর বলা হয়েছে— 'যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো তা করে নিজেরই জন্য'। একথার অর্থ— যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে অনুদানসম্ভার থাকে সুরক্ষিত। খুলে যায় অতিরিক্ত উপহারের দুয়ার। অবধারিত হয়ে পড়ে আল্লাহ্র সামীপ্য ও জান্নাত। এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে— 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি দান করবো আরো অতিরিক্ত'।

শেষে বলা হয়েছে—'এবং কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ'। এ কথার অর্থ— কেউ যদি আল্লাহ্র দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে, তবে যথাকর্তব্যে অবহেলার দায়িত্ব আপতিত হয় তার উপরেই। আল্লাহ্ কারো কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন। এমনিতেই তিনি চিরপ্রশংসিত। এই বিশাল সৃষ্টির সকলেই এবং সকলকিছুই তাঁর প্রশংসায় সততমুখর।

সূরা লোকমান ঃ আয়াত ১৩, ১৪, ১৫

وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۳﴾ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ
حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ
وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿۱۴﴾ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰۤى اَنْ تُشْرِكَ
بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا
فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ

www.eelm.weebly.com

مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴿١٥﴾

r স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশাচ্ছলে তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল, 'হে বৎস! আল্লাহ্‌র কোন শরীক করিও না। নিশ্চয় শির্‌ক চরম জুলুম।'

r আমি তো মানুষকে তাহার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়াছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করিয়া গর্ভে ধারণ করে এবং তাহার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

r তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে যে-বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাহাদের কথা মানিও না, তবে পৃথিবীতে তাহাদের সহিত বসবাস করিবে সদ্‌ভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হইয়াছে তাহার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যাহা করিতে সে বিষয়ে আমি তোমাদিগকে অবহিত করিব।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা, যখন লোকমান তাঁর আত্মজকে এই মর্মে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, প্রিয় পুত্র! আল্লাহ্‌র কোনো অংশীদার সাব্যস্ত কোরো না। নিশ্চয় অংশীবাদিতা হচ্ছে চরমতম অপরাধ।

হজরত লোকমানের পুত্রের নাম ছিলো আজআম, অথবা আশকাম, কিংবা মাছাম। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, লোকমানতনয় ছিলো অংশীবাদী। পরে পিতার সদুপদেশ শুনে সে ইমানদার হয়ে যায়।

'জুলুম' অর্থ অপাত্রে স্থাপন, এমতো অন্যায় অল্প-বিস্তর যেরকমই হোক না কেনো। আধার বা সময়ের হেরফের করাও জুলুম। আবার কিঞ্চিদধিক সত্যের সীমাতিক্রমও জুলুম পদবাচ্য। একারণেই ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল পাপকেই 'জুলুম' বলা হয়। আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য কাউকে অথবা কোনোকিছুকে উপাস্য স্থির করার অর্থ অযথার্থ উপাসনা করা, যা নিঃসন্দেহে জুলুম। এখানেও আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে অন্যের ইবাদত শরীক করাকে তাই বলা হয়েছে 'ইন্‌নাশ শিরকা লাজুলমুন আ'জীম' (নিশ্চয় শিরিক চরমতম জুলুম)।

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি'। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের প্রসঙ্গ ভিন্ন। হজরত লোকমানের প্রসঙ্গ এখানে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়।

যা হোক, এরপর বলা হয়েছে— 'জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে'। এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে মায়ের বিশেষ অধিকারের

www.eelm.weebly.com

কথা। গর্ভধারণের কষ্টই মায়েদের প্রধানতম কষ্ট। তাই এখানে সেদিকে বিশেষভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একদিন আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! পৃথিবীতে আমার উপরে সবচেয়ে বেশী অধিকার কার? তিনি স. বললেন, মায়ের। এরকম বললেন তিনি তিনবার। চতুর্থবার বললেন, পিতার। এরপর বললেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার যথাক্রম অনুসারে। বোখারী, মুসলিম। হজরত মুগীরা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের জন্য জননীর অনানুগত্যকে করা হয়েছে নিষিদ্ধ। বোখারী, মুসলিম।

এখানে 'ওয়াহ্নান আ'লা ওয়াহ্নিন' অর্থ কাঠিন্যের উপরে কাঠিন্য। হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। আর মুজাহিদ বলেছেন, এর অর্থ কষ্টের পর কষ্ট। গর্ভধারণ রমণীদেহে আনে দ্রৌর্বল্য, তদুপরি গর্ভ তার জন্য হয়ে ওঠে দুর্ভার। সন্তান প্রসবকালেও ভোগ করতে হয় অতিরিক্ত রজঃস্রাবজনিত ক্লেশ ও দুগ্ধপান করানোর মতো বলক্ষয়তা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বৎসরে'। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ প্রমাণ করেন যে, শিশুর দুগ্ধপানের সময়সীমা দুই বৎসর। আমি এ প্রসঙ্গে সবিস্তার আলোচনা উপস্থাপন করেছি সুরা বাকারার তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও'। আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলো, সে আদায় করলো আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা এবং যে নামাজ শেষে পিতা-মাতার জন্য দোয়া করলো, সে আদায় করলো পিতামাতার কৃতজ্ঞতা।

শেষে বলা হয়েছে— 'প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট'। একথার অর্থ— একসময় আপনাপন কর্মের জবাবদিহিতার জন্য সকলকে আমার সকাশে উপস্থিত হতেই হবে। তখনই আমি তাদেরকে দিবো যথাপ্রতিফল। কৃতজ্ঞদেরকে জান্নাত এবং অকৃতজ্ঞদেরকে জাহান্নাম।

এরপরের আয়াতে (১৫) বল হয়েছে— 'তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেনো না'।

এখানে 'লাইসা লাকা বিহী ই'লম' অর্থ যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আল্লাহ্র সঙ্গে শিরিক করার বিষয়টি যেহেতু প্রামাণ্য নয়, আপনার কাছেও যখন শিরিকের স্বপক্ষে কোনো জ্ঞান ও প্রমাণ অনুপস্থিত, তখন পিতামাতাও যদি আপনাকে শিরিক করতে বলে, তবে আপনি তাদেরকে অমান্য করবেন। কারণ একথা সুপ্রমাণিত ও সুস্পষ্ট যে, শিরিক অগ্রাহ্য, পরিত্যক্ত ও মিথ্যা। মনে রাখবেন আল্লাহ্র অধিকারই সর্বাগ্রগণ্য।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, সৃষ্টির আদেশ পালন করতে গিয়ে স্রষ্টার অবাধ্য হয়ো না। ইমরান ও হাকেম ইবনে আমর গিফারী সূত্রে এরকম বর্ণনা করেছেন আহমদ ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি শুদ্ধসূত্রসম্বলিত। হজরত আলী থেকেও এরকম বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে বসবাস করবে সদ্ভাবে'। একথার অর্থ— তাদের সঙ্গে পৃথিবীতে প্রদর্শন করতে হবে সদাচরণ, যেমন সদাচরণ শরিয়তসমর্থিত।

মাসআলা ঃ আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, পিতা-মাতা যদি কাফের ও দরিদ্র হয়, তবে তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ না করা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা সন্তানের জন্য ওয়াজিব।

হজরত আবু বকর তনয়া আসমা বর্ণনা করেছেন, একদিন আমার কাছে এলেন আমার পিতামহী। তখন তিনি ছিলেন পৌত্তলিক। আমি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য টের পেয়ে রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলাম। বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার পিতামহী আর্থিক সাহায্যলাভের উদ্দেশ্যে আমার কাছে এসেছেন। তিনি তো মুসলমান নন। আমি কি তাঁকে অর্থ সাহায্য করতে পারবো? তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো। বোখারী, মুসলিম। সুরা আনকাবুতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানকার ১৪ এবং ১৫ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ এবং তাঁর জননী সম্পর্কে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে, তার পথ অবলম্বন করো'। এখানে 'সাবীল' অর্থ পথ, দ্বীন, ধর্ম, বিধান। আর 'মান আনাবা ইলাইয়া' (যে বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্ অভিমুখী হয়েছে) বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এবং তাঁর প্রিয়ভাজন সহচরবৃন্দকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'যে আল্লাহ্ অভিমুখী হয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীককে। ঘটনাটি ছিলো এরকম— হজরত আবু বকরের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পেয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন হজরত ওসমান, তালহা, যোবায়ের, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ। বললেন, আপনি কি ওই ব্যক্তির উপরে ইমান এনেছেন, যিনি নিজেকে রসুল বলে দাবি করছেন? আপনি কি মনে করেন তিনি সত্য রসুল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি সত্য রসুল। তোমরাও তাঁর উপর ইমান আনো। এরপর তিনি তাঁদের সকলকে নিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। সকলে অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করলেন ইসলাম। তাঁরাই ছিলেন ইসলাম গ্রহণের পুরোধা। আর তাঁরা এরকম হতে পেরেছিলেন

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু বকরের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে। তাঁর এমতো অবদানকে লক্ষ্য করেই এখানে তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে...।

মাসআলা ঃ পিতা-মাতা যদি কোনো ফরজ দায়িত্ব পালন করতে নিষেধ করেন, অথবা কোনো হারাম কাজ করতে বলেন, তবে তা মানা যাবে না। আল্লাহ্পাকের নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্য কারো নির্দেশ কার্যকর করার নামই শিরিক। ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসেও একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তবে পিতামাতা যদি কোনো শরিয়তসিদ্ধ কর্মের নির্দেশ দেন, তবে তা পালন করা দূষণীয় নয়। বরং ক্ষেত্রবিশেষে পিতামাতার এমতো হুকুম পালন করা অত্যাবশ্যক।

পিতা-মাতা যদি অধিক জিকির আজকার ও নফল ইবাদতে বাধা দেন, অথবা দেন সাধ্যাতীত উপার্জনের আদেশ, তবে সে আদেশ কি অবশ্যপালনীয়? আমি বলি, এ ধরনের আদেশ পালন ওয়াজিব নয়। কারণ আলোচ্য আয়াতেই দেওয়া হয়েছে যারা বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্ অভিমুখী হয়, তাদের পথে চলার নির্দেশ। আর আল্লাহ্ অভিমুখী যাঁরা, তাঁরা হন ইবাদতপ্রিয় ও পৃথিবীপ্রসক্তিহীন। সাহাবীগণ এরকমই ছিলেন। আল্লাহ্র নৈকট্য ও ভালোবাসাই ছিলো তাঁদের একমাত্র কাম্য। আর একারণেই তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন স্বদেশ, স্বজন ও সম্পদ। অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন আল্লাহ্র পথে। এরকমই দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে— 'হে আমার নবী! আপনি বিশ্বাসীদেরকে জানিয়ে দিন, তোমাদের পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, সহধর্মিণী ও আত্মীয়স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, বাণিজ্যসম্ভার, যা বিনষ্ট হওয়ার আশংকায় তোমরা সশংকিত থাকো, তোমাদের বসতবাটি, যেগুলোর প্রতি তোমরা সতত প্রসক্ত, এসকলকিছু যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পথে সংগ্রামের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তবে অপেক্ষা করো, আল্লাহ্ অতিসত্বর তাঁর বিধান নিয়ে আগমন করছেন'। এই আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করার লক্ষ্যে সকলকিছু পরিত্যাগ করা কেবল সিদ্ধই নয়, বরং অত্যাবশ্যক। সুতরাং পিতামাতার নির্দেশে ইবাদত বন্দেগী পরিত্যাগ করা সিদ্ধ হবে কীভাবে?

আমের ইবনে আবদুল্লাহ্র মাধ্যমে হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, একবার হজরত আবু বকরের পিতা আবু কোহাফা তাঁকে বললেন, শুনলাম তুমি নাকি দুর্বল ক্রীতদাসদেরকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিচ্ছো। দাসমুক্ত যদি করতেই হয়, তবে সবল ক্রীতদাস মুক্ত করছো না কেনো? তারা তোমার সহায়তা করতে পারতো, যুদ্ধ বিগ্রহের সময় দাঁড়াতো তোমার সপক্ষে। হজরত আবু বকর বললেন, পিতা! আমি তো ওই পুণ্যরাজির আশা করি, যা সংরক্ষিত রয়েছে আমার আল্লাহ্র নিকট। তাঁর এমতো কথার প্রেক্ষিতে

www.eelm.weebly.com

অবতীর্ণ হলো 'আর অচিরেই এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তিকে, যে তার ধনসম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্‌র সন্তোষ কামনায়'। ঘটনাটি ঘটেছিলো তখন, যখন হজরত বেলাল, হজরত আমের ইবনে ফুহাইরা, হজরত উম্মে উমাইস, হজরত যোবায়ের প্রমুখকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন হজরত আবু বকর। আবার হিজরতকালে তিনি রসুল স. এর সহযাত্রী হয়েছিলেন চার হাজার স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে নিয়ে। পরিবার পরিজনের জন্য কোনো অর্থ সম্পদ রেখে যাননি। তাঁর এমতো কর্ম ছিলো তাঁর পিতার ইচ্ছাবিরুদ্ধ। সুরা তওবার তাফসীরে আমি এব্যাপারে সবিস্তার আলোচনা করেছি। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো'। একথার অর্থ— তোমরা যা কিছুই করো না কেনো, নিশ্চিত জেনো, মহাবিচারের দিবসে তোমাদেরকে আমার কাছে জবাবদিহি করতেই হবে। তখন তোমরা পৃথিবীতে যা করতে, তার যথাপ্রতিফল আমি দিবো। ইসলাম গ্রহণের পুরস্কার যেমন দিবো, তেমনি দিবো পিতামাতার অবাধ্যতার শাস্তি ।

সূরা লোকমান ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ
فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ١٦
يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاصْبِرْ عَلٰي مَآ اَصَابَكَ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ١٧ وَلَا
تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ١٨ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ
صَوْتِكَ ۭ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ١٩

r 'হে বৎস! ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং উহা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ্ তাহাও উপস্থিত করিবেন। আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।

www.eelm.weebly.com

r ‘হে বৎস! সালাত কায়েম করিও, সৎকর্মের নির্দেশ দিও আর অসৎ কর্মে নিষেধ করিও এবং আপদে বিপদে ধৈর্য ধারণ করিও। ইহাইতো দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

r অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করিও না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ্ কোনো উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

r ‘তুমি পদক্ষেপ করিও সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করিও; নিশ্চয় সুরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।’

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত লোকমানের পুত্র তাঁর পিতার সদুপদেশ শুনে বললো, হে পিতা! আমি অতি সঙ্গোপনে যদি কোনো পাপকর্ম করি, তাহলে আল্লাহ্তায়ালা তা জানবেন কীভাবে? তখন হজরত লোকমান বললেন, হে বৎস! আল্লাহ্র কাছে কোনো কিছুই গোপন নয়। অতি ক্ষুদ্র পাপ অথবা পুণ্য সকল কিছুই তাঁর জানা, যদিও সে পাপ অথবা পুণ্য থাকে প্রস্তরাভ্যন্তরে, অথবা অতি দূরবর্তী আকাশে, কিংবা ভূগর্ভে। মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্তায়ালা ওই সরিষাদানাবৎ পাপও উপস্থিত করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি সুক্ষ্মদর্শী এবং সকলকিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত।

এখানে ‘ইন্নাহা’ বলে বুঝানো হয়েছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাপ-পুণ্য উভয়কে। কাতাদা বলেছেন, এখানে ‘ইন্নাহা’ এর ‘হা’ সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত হবে একটি উহ্য শব্দ ‘খাত্বা’ (পাপ) এর সঙ্গে। কারণ হজরত লোকমানের পুত্র বলেছিলো, আমি যদি অতি গোপনে পাপ করি, তবে আল্লাহ্ জানবেন কীভাবে? আলোচ্য আয়াত তার ওই কথারই প্রত্যুত্তর।

‘হাব্বাতিম মিন খরদালিন’ অর্থ ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ বস্তু। আর ‘তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নিচে’। কথাটির অর্থ— ওই তুচ্ছাতিতুচ্ছ পাপ যদি থাকে সুসংরক্ষিত কোনো অদৃশ্য স্থানে, যেমন প্রস্তরগর্ভে, অথবা আকাশের দুর্নিরিক্ষ্য ঠিকানায় কিংবা মৃত্তিকাভ্যন্তরে।

কাতাদা বলেছেন, এখানে ‘সাখরাহ’ অর্থ পাহাড়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ‘সাখরাহ’ বলে বুঝানো হয়েছে ওই পাথরকে যা সন্নিবেশিত রয়েছে মৃত্তিকার সপ্তস্তরের নিচে। ওই প্রস্তরবক্ষেই জমা হয় অবিশ্বাসী ও দুর্বৃত্তদের কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া। আকাশের নীল আভা ওই অপপ্রতিক্রিয়ারই প্রতিবিম্ব। সুদ্দী বলেছেন, আল্লাহ্ ভূমণ্ডলকে স্থাপন করেছেন একটি প্রকাণ্ড মৎস্যের পৃষ্ঠদেশে। কোরআন মজীদে ওই মৎস্যকেই বলা হয়েছে ‘নূন’। যেমন— ‘নূন’ ওয়াল ক্বলামি ওয়া মা ইয়াসতুরূন’ (নুন এবং শপথ ওই কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে)। মৎস্যটির অবস্থিতি পানির অভ্যন্তরে সুবৃহৎ এক পাথরের উপর। আর ওই পাথরটি রয়েছে এক বৃহদাকার ফেরেশতার পৃষ্ঠদেশে। ওই ফেরেশতা দণ্ডায়মান রয়েছে আর একটি পাথরের উপর। এই পাথরের কথাই হজরত

www.eelm.weebly.com

লোকমান উল্লেখ করেছেন তাঁর আলোচ্য উপদেশ বাক্যে। বলেছেন— তা যদি থাকে শিলাগর্ভে। এই পাথরটি পৃথিবীসম্পৃক্ত যেমন নয়, তেমনি নয় আকাশসংযুক্ত। বরং তা অবস্থিত বায়বীয় ভিত্তির উপর।

আর এখানকার 'ইয়া'তি বিহাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্ তা-ও সর্বসমক্ষে উপস্থিত করবেন মহাবিচারের সময়। অর্থাৎ ওই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও সংগুপ্ত পাপ-পুণ্যও আনা হবে বিচারের আওতায়।

'আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত' অর্থ সূক্ষ্মাতিতসূক্ষ্ম বিষয়ও আল্লাহ্র জ্ঞান ও দর্শনের আওতাভূত। তাঁর অবলোকন ও অবহিতির অতীত কোনো কিছুই নেই। হাসান বলেছেন, কথাটির অর্থ— তাঁর অবগতি ও দর্শনক্ষমতা প্রতিটি বস্তুকে করে রেখেছে সতত বেষ্টিত। বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যটিই ছিলো হজরত লোকমানের শেষ বাক্য। অর্থাৎ কথাটির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিদীর্ণ হয়েছিলো তাঁর হৃৎপিণ্ড এবং সেই মুহূর্তেই তিনি যাত্রা করেছিলেন পরপারে।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'হে বৎস! সালাত কায়েম কোরো, সৎকর্মের নির্দেশ দিয়ো আর অসৎকর্মে নিষেধ কোরো'। একথার অর্থ— হজরত লোকমান পুনঃউপদেশ দিলেন, হে প্রিয়পুত্র! আত্মসংশোধনার্থে নামাজ প্রতিষ্ঠা কোরো এবং অপরের সংশোধনার্থে দিয়ো উপদেশ— সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আপদে বিপদে ধৈর্য ধারণ কোরো'। একথার অর্থ অন্যের সংশোধনদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তুমি যদি বৈরীতার সম্মুখীন হও, অথবা পতিত হও দুঃখক্লেশে, তবে ধৈর্য অবলম্বন কোরো, আপন সংকল্পে থেকো অটল।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ প্রচারে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ একটি অতি আবশ্যকীয় কর্ম, যেমন অত্যাবশ্যক করা হয়েছে অন্যান্য ফরজ ও ওয়াজিব দায়িত্বকে। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যে কাজ অপরিহার্য করে দিয়েছেন, সে কাজই সর্বোত্তম। অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন, কোনো কর্মের সুদৃঢ় অভিপ্রায়কে বলে 'আ'যম'। এ ব্যাখ্যার আলোকে ধাতুমূল 'আ'যম' এর অর্থ হবে কর্মপদরূপ 'মা'যুম'। অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প বা দৃঢ় পদক্ষেপ।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কোরো না'। একথার অর্থ— মানুষের নিকট আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ বর্ণনা করতে গিয়ে যদি তাদের অশোভন ও ক্লেশকর আচরণের সম্মুখীন হও, তবুও তাদের প্রতি বিমুখ হয়ো না। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— মানুষ তোমার উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ডকে ভুল বুঝবে, বিতণ্ডা করবে, তবুও তাদেরকে পাপী বলে তুচ্ছ ভেবো না এবং নিজেকে পুণ্যবান মনে করে হয়ো না গর্বিত।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ কোরো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ কোনো উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না'। এখানে 'মুখতাল' অর্থ ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী এবং 'ফাখুর' অর্থ অহংকারী।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তুমি পদক্ষেপ কোরো সংযতভাবে'। একথার অর্থ— এমন দাপটের সঙ্গে পথ চোলো না, যাতে মনে হয় তুমি অহংকারী, আবার পদবিক্ষেপকে কোরো না এমন চঞ্চল, যাতে মনে হতে পারে তুমি ব্যক্তিত্বহীন। অর্থাৎ অবলম্বন কোরো এমন সংযম, যাতে মনে হয়, তুমি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, অথচ নির্দাম্ভিক। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, চঞ্চল পদচারণা বিশ্বাসীদের জন্য মর্যাদা হানিকর। হাদিসটি উল্লেখ করেছেন ইবনে আদী এবং 'হুলিয়া' গ্রন্থে আবু নাঈম। উল্লেখ্য, এখানে নিন্দা করা হয়েছে অস্বাভাবিক দ্রুত পদচারণার। স্বাভাবিক দ্রুত পদচারণা কিন্তু নিন্দনীয় নয়। বরং তা মোস্তাহাব।

ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইয়াজিদ ইবনে মারছাদ বলেছেন, রসুল স. এর স্বাভাবিক চলাও আমাদের কাছে মনে হতো দ্রুত। তাঁর সঙ্গ বজায় রাখতে আমাদেরকে চলতে হতো দ্রুতই। হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে তিবরানী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পদবিক্ষেপকে সংযত কোরো। জানাযাযাত্রায় বজায় রেখো মধ্যম গতি। বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থষষ্ঠকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জানাযা বহন কোরো ত্বরিত গতিতে। মৃত ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হয়, তবে তাকে দ্রুত আস্বাদন করতে দাও সাফল্যের স্বাদ। আর পাপী হলে দ্রুত মুক্ত হও তার বহন কর্ম থেকে। এই সকল হাদিসের প্রেক্ষিতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, অভ্যস্ত দ্রুত পদবিক্ষেপ দূষণীয় নয়। এখানে উল্লেখিত হয়েছে 'ক্বসদ' শব্দটি। এর অর্থ দৌড় নয়, আবার মন্থর গতিও নয়। অর্থাৎ ত্বরা ও মন্থরতার মাঝামাঝি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমার কণ্ঠস্বরকে নিচু কোরো; নিশ্চয় স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর'। মুকাতিল বলেছেন, 'ওয়াগদুদ' অর্থ নিম্নগ্রাসের স্বর। গাধার আওয়াজ ঠিক এর উল্টো— উগ্র, উৎকট ও অশোভন। উল্লেখ্য দোজখীদের গলার আওয়াজ হবে গাধার আওয়াজের মতো শ্রুতিকটু। প্রথমাবস্থায় হবে 'যফীর' এবং পরিশেষে হবে 'শহীক্ব'। অর্থাৎ প্রথমে তারা চিৎকার করবে গাধার মতো। তারপর তাদের কণ্ঠ থেকে উত্থিত হবে গোঁঙানি। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, শব্দটির অর্থ হবে— শ্রুতিপীড়াদায়ক কুৎসিত কণ্ঠস্বর। ওয়াহাব বলেছেন, হজরত লোকমান তাঁর আপনভাষায় উন্মোচন করেছেন প্রজ্ঞার বারো হাজার তোরণ। অর্থাৎ তিনি রেখে গিয়েছেন বারো হাজার প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী। পরবর্তী যুগের মানুষ সেগুলোকেই তাদের প্রবাদের ও প্রবচনের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে।

www.eelm.weebly.com

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَ
اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً ؕ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ
يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ لَا هُدًى وَّ لَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٢٠﴾ وَ اِذَا
قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٢١﴾
وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا
يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ
عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى
عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٢٤﴾

r তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিয়াছেন? মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাহাদের না আছে পথ-নির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।

r উহাদিগকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা অনুসরণ কর।' উহারা বলে 'বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহারই অনুসরণ করিব।' শয়তান যদি উহাদিগকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কি?

r যে কেহ আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মযবুত হাতল, যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ্র ইখ্তিয়ারে।

www.eelm.weebly.com

r আর কেহ কুফরী করিলে তাহার কুফরী যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই নিকট উহাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি উহাদিগকে অবহিত করিব উহারা যাহা করিত। অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

r আমি উহাদিগকে জীবনোপকরণ ভোগ করিতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর উহাদিগকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা কি দ্যাখো না, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন'। এখানে আকাশস্থিত কল্যাণপ্রদায়ক বস্তুগুলো হচ্ছে— চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা ও মেঘপুঞ্জ। আর পৃথিবীর কল্যাণকর বস্তুগুলো হচ্ছে উদ্ভিদকুল, প্রাণীকুল, সমুদ্র, নদী, পাহাড়-পর্বত ও খনিজ সম্পদ। মানুষ এসমস্তকিছু থেকে সুফল লাভ করে সরাসরি অথবা কোনো মাধ্যম সহযোগে, আবিষ্কার, উদ্ভাবনা ইত্যাদির দ্বারা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন।' এখানে প্রকাশ্য অনুগ্রহ হচ্ছে— ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুগ্রহসম্ভার। যেমন সুঠাম শরীর, সৌন্দর্য, রিজিক, দৈহিক সুস্থতা ইত্যাদি। শত্রুর উপর বিজয়দানও প্রকাশ্য অনুগ্রহ। তেমনি রসুল, কোরআন ও ইসলাম প্রাপ্তিও প্রকাশ্য নেয়ামত। শরিয়তের নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহ দুর্বহ অথবা অবহ না হওয়াও প্রকাশ্য অনুগ্রহ পদবাচ্য। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মের উপরে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাও প্রকাশ্য অনুগ্রহের অন্তর্গত।

আর অপ্রকাশ্য অনুগ্রহসম্ভারের মধ্যে রয়েছে— আত্ম-বিবেক, ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান, উদার অন্তঃকরণ, সত্যান্বেষণ, সদ্বিশ্বাস, তওবার সুযোগ, ফেরেশতাদের সহায়তা, আল্লাহ্প্রেম, রসুলপ্রেম, শাফায়াতের শুভসংবাদ, মারেফত ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাদের না আছে পথনির্দেশক, না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব'। এখানে 'বিতণ্ডা করে' অর্থ তারা বিতণ্ডা করে আল্লাহ্র রসুলের সঙ্গে। 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে' অর্থ আল্লাহ্র সত্তা ও গুণবত্তা সম্পর্কে। 'অজ্ঞতাবশত' অর্থ নির্ভরযোগ্য জ্ঞান ও প্রমাণ ব্যতিরেকে। 'না আছে পথনির্দেশক' অর্থ তাদের না আছে কোনো পথপ্রদর্শক রসুল এবং 'না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব' অর্থ তাদের নেই কোনো নভজ মহাগ্রন্থও। অর্থাৎ তারা বিতণ্ডা করে স্বকপোলকল্পিত ধারণার উপরে ভিত্তি করে, পথনির্দেশক নবী এবং প্রত্যাদেশিত গ্রন্থের সমর্থন ব্যতিরেকেই।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে নজর ইবনে হারেছ ও উবাই ইবনে খাল্‌ফকে উদ্দেশ্য করে।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা অনুসরণ করো। তারা বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করবো'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যখন বলা হয়, আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র বিধানের, তখন তারা জবাব দেয়, না, আমরা তো আনুগত্য করবো আমাদের পিতৃপুরুষদের আচরিত ধর্মের। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহে অন্য কারো আনুগত্য নিষিদ্ধ। তবে ধর্মের শাখা প্রশাখাগত বিষয়ে অন্যেরগবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা যায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কী'? একথার অর্থ— তারা বলে, কী? শয়তান যদি তাদের পূর্বপুরুষদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে গিয়ে থাকে, তবুও কি তারা তাদের অনুসারী হবে? এখানে 'জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে' অর্থ, শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করে শিরিক ও সীমালংঘনের দিকে। উল্লেখ্য, আলোচ্য প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'যে কেউ আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়, সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মজবুত হাতল, যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে'।

এখানে 'মাই ইয়ুসলিম ওয়াজ্বহাহু' অর্থ যে আল্লাহ্‌র প্রতি সতত একাগ্র, একনিষ্ঠ ও আন্তরিক, সমর্পিত, যার সকল চিন্তা ও কার্যক্রম আবর্তিত হয় কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষকামনাকে কেন্দ্র করে। 'ওয়াহুয়া মুহসিন' অর্থ সে সৎকর্ম পরায়ণ। রসুল স. বলেছেন, 'ইহসান' হচ্ছে— এমনভাবে ইবাদত করো, যেনো তুমি আল্লাহ্‌কে দেখছো, অথবা মনে করো, তিনি তো তোমাকে দেখছেন। অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ হওয়ার অর্থ নিবিষ্টচিত্তে ইবাদতমগ্ন হওয়া। 'ফাক্বাদিস্‌তামসাকা' অর্থ দৃঢ়ভাবে ধারণ করা। 'উরওয়াতুল উছক্বা' অর্থ মজবুত হাতল বা সুদৃঢ় রজ্জু। অর্থাৎ সে শক্তহাতে ধরেছে সত্যের রজ্জু, এভাবে সত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়েছে চির অটুট। আর 'যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে' অর্থ, সকল কিছুই তাঁর অভিপ্রায়ভূত, সুতরাং মনে রেখো আপনাপন কর্মকাণ্ডের হিসাব দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে একদিন তাঁর কাছে ফিরে যেতেই হবে।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'আর যে কেউ কুফরী করলে তার কুফরী যেনো তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তাদেরকে অবহিত করবো তারা যা করতো। অন্তরে যা রয়েছে সে

www.eelm.weebly.com

সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনাকে যে প্রত্যাখ্যান করবে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। ভাববেন না যে, তারা আপনার কোনো অনিষ্ট করতে সক্ষম। অপেক্ষা করুন, তাদেরকে তো আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে। তখন আমি তাদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে দিবো, তাদের অপরাধ কতো ভয়াবহ ও অমার্জনীয়। সকলের ও সকলকিছুর প্রকাশ্য গোপন সবকিছুই আমি জানি। সুতরাং তাদের অপকর্মের প্রতিফল তারা পাবেই।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিবো স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তিভোগ করতে বাধ্য করবো'। এখানে 'আ'জাবিন গলীজ' অর্থ গুরু শাস্তি বা কঠিন শাস্তি। ভারী বস্তু যেমন দুর্বহ, তেমনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে আপতিত শাস্তিও হবে অত্যন্ত গুরুভার, কঠিন।

সূরা লোকমান ঃ আয়াত ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۵﴾ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۲۶﴾ وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ
شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ
كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۷﴾ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ
اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۲۸﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ
يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ
وَ الْقَمَرَ ۫ كُلٌّ يَّجْرِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
خَبِيْرٌ ﴿۲۹﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ
الْبَاطِلُ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿۳۰﴾

www.eelm.weebly.com

r তুমি যদি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন?' উহারা নিশ্চয়ই বলিবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই', কিন্তু উহাদের অধিকাংশই জানে না।

r আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহ্রই; আল্লাহ্, তিনি তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

r পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং ইহার সহিত আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্র বাণী নিঃশেষ হইবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

r তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

r তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন? তিনি চন্দ্র সূর্যকে করিয়াছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।

r এইগুলি প্রমাণ যে, আল্লাহ্ই সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে, তাহা মিথ্যা। আল্লাহ্, তিনি তো সমুচ্চ মহান।

প্রথমে বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! মহাবিশ্বের সৃজয়িতা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে কেউই নয়, তার প্রকাশ্য প্রমাণ রয়েছে ভুরিভুরি, অজস্র, অসংখ্য। তাই অবিশ্বাসীরাও একথা মেনে নিতে বাধ্য হয়। বিষয়টি আপনি না হয় এখনই পরীক্ষা করে দেখুন। তাদেরকে প্রশ্ন করুন, বলো, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কে? জবাবে তারা নিশ্চয় বলবে, আল্লাহ্। সুতরাং হে আমার প্রিয় রসুল! কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে উচ্চারণ করুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র । কারণ তিনি আপনার অন্তর ও বাহিরকে করেছেন সত্যের দীপ্তিতে সতত প্রোজ্জ্বল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষকে তিনি করেছেন সত্যবোধবিচ্যুত। তাইতো তারা মুখে আল্লাহ্কে সৃষ্টিকর্তা বলে মেনে নিতে বাধ্য হলেও অন্তরে লালন করে অবিশ্বাস।

পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই, আল্লাহ্, তিনি তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ'। একথার অর্থ গগনমণ্ডলে ও ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, তার সকল কিছুই তাঁর একক মালিকানাধীন। সুতরাং তিনি ব্যতীত উপাস্য হওয়ার অধিকার ও যোগ্যতা অন্য কারো বা কোনোকিছুর নেই। আর তিনি কারো বা কোনোকিছুর মুখাপেক্ষীও নন। তিনি যে চিরঅভাবমুক্ত ও চিরপ্রশংসিত— কেউ তার প্রশংসা করুক অথবা না করুক।

আতা ইবনে ইয়াসারের উক্তিরূপে ইবনে ইসহাক এবং বাগবী বর্ণনা করেছেন, 'ওয়ামা উতিতুম মিনাল ইলমি ইল্লা ক্বলীলা'(তোমাদেরকে অত্যল্প জ্ঞানই দেওয়া

www.eelm.weebly.com

হয়েছে)। এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো রসুল স. এর হিজরতপূর্ব সময়ে মক্কায়। এরপর তিনি স. যখন মদীনায় শুভাগমন করলেন, তখন একদিন একদল ইহুদী পণ্ডিত তাঁর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আপনি নাকি বলেন 'তোমাদেরকে অত্যল্প জ্ঞান দেওয়া হয়েছে'? একথার লক্ষ্যস্থল কারা? আপনারা না আমরা? তিনি স. বললেন, সমগ্র মানবজাতি। পণ্ডিতেরা বললো, আপনার উপরে যে গ্রন্থ অবতারিত হয়েছে, তাতে কি একথার উল্লেখ নেই যে, আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তওরাত, যা জ্ঞানের মহাভাণ্ডার? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞানের তুলনায় তওরাতের জ্ঞানও অত্যল্পই। তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (২৭)।

বলা হলো— 'পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং এর সঙ্গে আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষ হবে না'। একথার অর্থ পৃথিবীর সকল বৃক্ষকে কলম এবং সমুদ্রসমূহের সকল পানিকে কালি বানিয়ে যদি আল্লাহ্‌র জ্ঞানভাণ্ডারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে শুরু করা হয়, তবে দেখা যাবে একসময় কলম-কালি সবকিছু নিঃশেষ হয়েছে, কিন্তু তাঁর জ্ঞান রয়েছে আগের মতোই অনিঃশেষ, অন্তহীন।

এখানে 'ইয়ামুদ্‌দুহু' অর্থ বিদ্যমান সাতসাগরের পানির সঙ্গে যদি যুক্ত করা হয় আরো সাতটি সাগরের পানি এবং সে গুলোকে যদি পরিণত করা হয় কালিতে। দোয়াতে কালি ঢেলে দেয়াকে বলে 'মাদদাদ্ দাওয়াত'। একথা থেকেই পরিগঠিত হয়েছে এখানকার 'ইয়ামুদদুহু'। আর এখানকার 'কালিমাতুল্লহ্' (আল্লাহ্‌র বাণী) কথাটির মর্মার্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার আনুরূপ্যবিহীন অবহিতি, তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারের অতুলনীয় পরিসর।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ চিরদুর্জয়, চিরঅজেয়। তাঁর প্রজ্ঞাও অবধিবিহীন, অতুলনীয়রূপে অসীম। কোনোকিছুই তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাবহির্ভূত নয়।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, একবার ইহুদীরা রসুল স. সকাশে প্রশ্ন করে বসলো, বলুন, আত্মা কী? তখন অবতীর্ণ হলো 'তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলে দিন, রূহ হচ্ছে আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত একটি আদেশ। আর তোমাদেরকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা অতি অল্প'। রসুল স. সদ্য অবতীর্ণ এই আয়াত পাঠ করে শোনালেন। তারা বললো, আপনি কি মনে করেন আমরা অত্যল্প জ্ঞানের অধিকারী? কিন্তু আপনি তো জানেনই আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তওরাত, যা জ্ঞানের মহাআঘার। তাদের এমতো কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এমতো ব্যাখ্যার আলোকে বলতে হয়, আলোচ্য আয়াতের অবতরণস্থল মদীনা। কিন্তু কেউ কেউ

www.eelm.weebly.com

মনে করেন, এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। আর 'আত্মা কী' এরকম প্রশ্ন রসুল স. এর সম্মুখে উপস্থিত করেছিলো মক্কার মুশরিকেরা। অবশ্য মদীনায় প্রেরিত তাদের দূতকে এরকম প্রশ্ন করার পরামর্শ দিয়েছিলো সেখানকার ইহুদীরাই। মক্কায় কোনো ইহুদীর বসবাস ছিলো না।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, আবু শায়েখ তাঁর কিতাবুল উজমা গ্রন্থে লিখেছেন, মক্কার মুশরিকেরা বলতো, কোরআন অবলুপ্ত হয়ে যাবে অল্পদিনের মধ্যেই। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা'। একথার অর্থ— হে মানুষ! ভালো করে জেনে নাও, আল্লাহ্র কর্মপদ্ধতি তোমাদের কর্মপদ্ধতির মতো নয়। তোমরা এক কাজ করার সময় আর এক কাজ স্থগিত রাখতে বাধ্য হও। কিন্তু আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করলে এক লহমায় একজন অথবা এক নির্দেশে অসংখ্যজনকে সৃষ্টি করতে সক্ষম। তাঁর অভিপ্রায়, প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে অগ্রপশ্চাত অথবা পূর্বাপর বলে কিছুই নেই। অসম্ভব বলেও কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। সুতরাং জেনে নাও, তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান তোমাদের যে কোনো একজনের সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের মতো তাঁর আনুরূপ্যবিহীন একই নির্দেশের অধীন। আর তিনি সর্বশ্রোতা এবং সম্যক দ্রষ্টাও। শ্রুতিযোগ্য ও দর্শনযোগ্য সকলকিছুই তাঁর আকারপ্রকারবিহীন শ্রুতি ও দর্শনের অন্তর্ভূত। এ ক্ষেত্রেও পূর্বাপরতা অনুপস্থিত। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রেও তাঁর কোনো এক বিষয়ের জানা শোনা অন্য বিষয়ের জানা শোনার অন্তরায় নয়। উল্লেখ্য, এখানে 'নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা' কথাটির মর্মার্থ হবে— নিশ্চয় আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরকাল অস্বীকৃতিমূলক অপবচনের শ্রোতা এবং তাদের বিশ্বাসবিরোধী কর্মকাণ্ডের দর্শক।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'তুমি কি দ্যাখো না আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন? তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত; তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত'। এখানে 'প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত' অর্থ চন্দ্র-সূর্যের এই নিয়মিত নভঃপরিক্রমণ চলতে থাকবে মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'এইগুলি প্রমাণ যে, আল্লাহ্ই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, তা মিথ্যা'। একথার অর্থ— এতক্ষণ ধরে আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন ও চিরঅপ্রতিদ্বন্দ্বী সত্তা-গুণবত্তা-কর্মকুশলতার যে সকল পরিচয় তুলে ধরা হলো, তার প্রেক্ষিতে একথা মেনে না নিয়ে গত্যন্তর নেই যে,

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্ই সন্দেহাতীতরূপে সত্য, আর অংশীবাদীরা যাদের উপাসনা-অর্চনা করে সেগুলো সর্বৈবরূপে মিথ্যা। সুতরাং হে মানুষ! সত্যকে গ্রহণ করো এবং বর্জন করো অসত্যকে।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্, তিনি তো সমুচ্চ, মহান'। একথার অর্থ আল্লাহ্ই উচ্চতম ও মহানতম। সুতরাং তাঁর মহাপ্রতাপের উদ্দেশ্যে পূর্ণ সমর্পিত হওয়া ছাড়া সৃষ্টির অন্য কোনো উপায়ই নেই।

সূরা লোকমান ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣١﴾ وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ
كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ
فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٢﴾
يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ
وَّلَدِهٖ ۖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۗ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿٣٣﴾

r তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে নৌযানগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে, যদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

r যখন তরংগ উহাদিগকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মত তখন উহারা আল্লাহ্কে ডাকে তাঁহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া। কিন্তু যখন তিনি উহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে পৌঁছান তখন উহাদের কেহ কেহ সরল পথে থাকে; কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

r হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসিবে না, সন্তানও কোন উপকারে আসিবে না তাহার পিতার। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদিগকে কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে নৌযানগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে, যদ্দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন আল্লাহ্র শক্তিমত্তা ও অনুগ্রহের আর একটি দৃষ্টান্ত। তা হচ্ছে সমুদ্রগামী জলযানগুলোর নিরাপদ বিচরণ। ওগুলোও তো মানুষের বাণিজ্যবেসাতির অন্যতম উপকরণ। আয়-উপার্জনের বিশিষ্ট মাধ্যম।

এখানে 'নি'মাতি' অর্থ আমার অনুগ্রহ, অনুকম্পা, দয়াদাক্ষিণ্য, করুণা, বদান্যতা। 'মিন আয়াতিহি' অর্থ তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু, নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে। এখানকার 'মিন' (থেকে, হতে) অব্যয়টি আংশিক অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ বিশাল নীলাম্বুরাশির উপরে ভাসমান রয়েছে তাঁর কিছু বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য'। এখানে 'সব্বার' বলে বুঝানো হয়েছে ওই ব্যক্তিকে, যে অন্তর্জগত ও বহির্জগত, আত্মা ও সত্তাসন্নিহিত জ্ঞানের রহস্য উন্মোচনে সতত নিয়োজিত। আর এমতো জ্ঞানান্বেষণের পথে যে সহ্য করে অনেক ক্লেশ ও দুঃখ-যাতনা। আর 'শাকুর' বলে ওই ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ্তায়ালার অনুকম্পা সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত এবং অনুকম্পাদাতার প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত। অথবা বলা যায় পূর্ণ ইমানদার ব্যক্তিকেই এখানে অভিহিত করা হয়েছে 'সব্বারিন্ শাকুর' (ধৈর্যশীল-কৃতজ্ঞ)। কারণ হজরত আনাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইমানের অর্ধাংশ হচ্ছে ধৈর্য এবং অপর অর্ধাংশ কৃতজ্ঞতা।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মতো, তখন তারা আল্লাহ্কে ডাকে তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে স্থলে পৌঁছান, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে; কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে'।

এখানে 'গাশিয়াহুম' অর্থ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে, ঢেকে নেয়। 'কাজ্জুলালি' অর্থ মেঘচ্ছায়ার মতো। এরকম অর্থ করেছেন কালাবী। আর মুকাতিল অর্থ করেছেন—পাহাড়ের মতো। 'জুললাতুন' এর বহুবচন 'জুলাল'। 'মুখলিসীনা লাহুদদীন' অর্থ তার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো অথবা অন্য কোনোকিছুর দিকে না তাকিয়ে। উল্লেখ্য, মৃত্যুর সমূহ সম্ভাবনার সম্মুখে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মানুষের লালিত অপবিশ্বাস ও কুসংস্কার কর্পুরের মতো উবে যায়। বাঁচবার জন্য তখন তারা সকলে কেবল আল্লাহ্কেই ডাকতে থাকে। আলোচ্য বাক্যাংশে তাদের ওই অবস্থার কথাই তুলে ধরা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

‘ফা মিনহুম মুক্বতাসীদ’ অর্থ, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে। তাফসীরবেত্তাগণের অনেকেই বক্তব্যটিকে পূর্বোল্লিখিত বাক্যের ফলাফল বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাঁদের অভিমতটি অযথার্থ। বরং বলা যেতে পারে, ফলাফল এখানে রয়েছে উহ্য। সুতরাং প্রকৃত বক্তব্যটি হবে এরকম— আল্লাহ্পাক যখন তাদেরকে সমুদ্রঝড়ের কবল থেকে উদ্ধার করে তটভূমিতে পৌঁছে দেন, তখন কেউ কেউ প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা, কেউ কেউ হয় অকৃতজ্ঞ এবং কেউ কেউ অবলম্বন করে মধ্যম পন্থা। আবার প্রকৃত অবিশ্বাসীদের অস্বীকৃতির প্রকৃতি আবার ভিন্ন। তারা তো অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে হতে চায় একে অপর অপেক্ষা অগ্রগামী। কালাবী ‘মুক্বতাসীদ’ এর অর্থ করেছেন মধ্যম পন্থার অকৃতজ্ঞ। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবেত্তাগণের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, শব্দটির অর্থ মধ্যবর্তী পথের উপরে অবস্থানকারী। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ্র এককত্বের বিশ্বাসের উপরে। আয়াতখানি হজরত ইকরামা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলো বলেই এরকম ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা হয়েছে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দলভূত ছিলেন তিনি। তাই মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে তিনি ভীত হয়ে পালিয়ে যান লোহিত সাগরের পাড়ে। অন্য দেশে গমন করার উদ্দেশ্যে আরোহণ করেন এক জাহাজে। কিন্তু সমুদ্রবক্ষে ওঠে প্রচণ্ড ঝড়। তিনি তখন প্রতিজ্ঞা করেন, আল্লাহ্ যদি এযাত্রায় আমাকে বাঁচিয়ে দেন, তবে আমি রসুল স. এর পবিত্র হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করবো। অকস্মাৎ ঝড় স্তিমিত হলো। জাহাজ নিরাপদে ভিড়লো ডাঙ্গায়। তিনি আর কালক্ষেপণ না করে উপস্থিত হলেন মক্কায়। যথারীতি পালন করলেন তাঁর প্রতিজ্ঞা। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, পলাতকদের কেউ কেউ অবলম্বন করেছিলেন মধ্যবর্তী সরল পথ এবং অবশিষ্টরা রয়ে গিয়েছিলো আগের মতোই চরমপন্থী, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

‘খত্তার’ অর্থ বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক, অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। ‘কাফুর’ অর্থ অকৃতজ্ঞ। আর এখানে ‘আয়াত’ অর্থ আল্লাহ্তায়ালার শক্তিমত্তার নিদর্শনাবলী। এভাবে এখানকার শেষোক্ত বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— বিপদকবলিত অবস্থায় জীবনরক্ষার্থে ইসলাম গ্রহণের অঙ্গীকার যারা করে, তাদের মধ্যে যারা পরিত্রাণ প্রাপ্তির পর তাদের কৃত অঙ্গীকারের কথা ভুলে যায়, তাদের মতো বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই মহাবিপদ থেকে ত্রাণকর্তা আল্লাহ্র শক্তিমত্তার এই বিরল নিদর্শনসমূহের প্রতি জানায় অস্বীকৃতি।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— ‘হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো এবং ভয় করো সেই দিনের, যখন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না, সন্তানও উপকারে আসবে না তার পিতার’। একথার অর্থ— হে আমার রসুলের সহচরবৃন্দ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করার সাথে সেই দিনের

www.eelm.weebly.com

কথা স্মরণ কর ও ভীত হও, যেদিন বিশ্বাসী পিতা তার অবিশ্বাসী পুত্রের এবং বিশ্বাসী পুত্র তার অবিশ্বাসী পিতার পক্ষে কোনো সুপারিশ করতে পারবে না। মিলিতও হতে পারবে না একে অপরের সঙ্গে। উল্লেখ্য, সেদিন বিশ্বাসী পিতা-পুত্র একে অপরের উপকারে আসবে। চিরবিচ্ছেদ তদের ঘটবে না। যেমন এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে— 'যারা ইমান এনেছে, আর তাদের সন্তানগণ ইমান সহ তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের সাথে আমি মিলিত করবো তাদের সন্তানদেরকে'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আদন জান্নাত; তারা তাতে প্রবেশ করবে। আর যারা শুদ্ধাচারী তাদের পিতৃগণ থেকে, সহধর্মিণীগণ ও সন্তানগণ থেকে'।

'ওয়ালাদ' অর্থ সন্তান এবং 'মাওলুদ' অর্থ ভূমিষ্ঠ। সেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না। এই কথাটিকে বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যেই এখানে 'ওয়ালাদ' এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে 'মাওলুদ'। 'মাওলুদ' বলে সন্তানকে। আর সন্তানের সন্তানকে বলে 'ওয়ালাদ'। এভাবে এখানে এই বক্তব্যটিকেই পরিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করা হয়েছে যে, সন্তান হচ্ছে প্রত্যক্ষ উত্তরপুরুষ। সেই সন্তানই যদি সেদিন কোনো কাজে না আসে, তবে পরোক্ষ উত্তরপুরুষ সন্তানের সন্তান আর কী কাজে আসবে? অধিকন্তু 'ওয়ালাদ' শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় পৌত্র, প্রপৌত্র এধরণের দূরবর্তী উত্তরপুরুষদের ক্ষেত্রে।

উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যে 'হে মানুষ' বলে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স. এর সাহাবীগণকে। কারণ তাঁদের অনেকের পিতা-পিতামহ পৃথিবী পরিত্যাগ করেছিলো কাফের অবস্থায়। সেকারণেই তাঁদেরকে এখানে দৃঢ়ভাবে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের ওই সকল পিতৃপরুষ মহাবিচারের দিবসে তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেনো কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত না করে'। একথার অর্থ—মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচারপর্ব, চিরস্বস্তি অথবা চিরশাস্তি— এসকল কিছু অমোঘ। কারণ এ সকল ঘটনা ঘটবে বলে আল্লাহ্ স্বয়ং ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর ঘোষণার বিপরীত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং তোমরা পার্থিব জীবনের সাময়িক সুখ-সম্ভোগের ফাঁদে আটকে যেয়ো না। নিশ্চিত জেনো, অতিরিক্ত ইহকালপ্রীতি পারত্রিক সাফল্যের অন্তরায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সেই প্রবঞ্চক যেনো তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র অপার দয়া ও প্রতিশ্রুত শাস্তির বিলম্বিতি তোমাদেরকে যেনো এই মর্মে প্রবঞ্চনায় পতিত না করে যে, শাস্তি টাস্তি বলে আসলে কোনো কিছু নেই।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'গরূর' অর্থ শয়তান। এই শয়তানই মানুষকে করে প্রবঞ্চিত। মন্ত্রণা দেয়, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল। সুতরাং পাপাচার করলেও ক্ষতি নেই। তিনি মার্জনা করবেন।

মুজাহিদ থেকে প্রায়োন্নত সূত্রপরম্পরায় ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার এক মরুচারী উপস্থিত হলো রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। বাগবীর বর্ণনানুসারে লোকটির নাম ছিলো আমর ইবনে হারেছ। সে বললো, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! কখন অনুষ্ঠিত হবে কিয়ামত ও হাশর-নশর? আমার স্ত্রী অন্তঃসত্তা। কবে জন্মগ্রহণ করবে তার সন্তান? আমাদের অঞ্চলে চলছে প্রচণ্ড খরা। বলুন, সেখানে বৃষ্টি হবে কখন? আরো বলুন, আমার মৃত্যু হবে কোথায়? তার এতো প্রশ্নাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। ঘোষিত হলো —

সূরা লোকমান ঃ আয়াত ৩৪

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

r কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ূতে আছে। কেহ জানে না আগামীকল্য সে কি অর্জন করিবে এবং কেহ জানে না কোন্ স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পাঁচটি বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। ওই পাঁচটি বিষয় হচ্ছে— ১. কখন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় ২. কোথায় কখন বৃষ্টিপাত হবে কী পরিমাণে ৩. কোন রমণীর গর্ভাশয়ে রয়েছে কোন্ আকৃতি ও কোন প্রকৃতির সন্তান ৪. আগামী দিবস কে কোথায় হবে কোন পরিস্থিতির শিকার এবং ৫. কোন স্থানে কে কখন পরিত্যাগ করবে শেষ নিঃশ্বাস। নিশ্চয় এগুলো জানেন কেবল আল্লাহ্। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নেই — ১. আগামীকাল কী ঘটবে? ২. মাতৃউদরে কী রয়েছে ৩. কিয়ামত সংঘটিত হবে কখন ৪. মৃত্যু সংঘটিত হবে কোন স্থানে এবং ৫. কখন শুরু হবে বৃষ্টিপাত। আহমদ, বোখারী।

www.eelm.weebly.com

উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে ওমরের বর্ণিত হাদিসটি বর্ণনা করার পর বাগবী লিখেছেন, রসুল স. আরো বর্ণনা করেছেন, অদৃশ্যের ভাণ্ডারস্থিত বিষয় এই পাঁচটি। তারপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

ইবনে আবী শায়বা তাঁর 'আলমুসান্নিফ' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত খাইছুমা বর্ণনা করেছেন, একবার নবী সুলায়মানের নিকট আগমন করলেন মৃত্যুর ফেরেশতা হজরত আজরাইল। নবী সুলায়মানের এক পার্শ্বচরের প্রতি তিনি হানলেন তির্যক দৃষ্টি। লোকটি ভয় পেয়ে গেলো। নবী সুলায়মানকে বললো, আগন্তুকটি কে? নবী সুলায়মান বললেন, মৃত্যুর ফেরেশতা। লোকটি বললো, মনে হচ্ছে সে আমার প্রাণসংহার করতে চায়। হে মহামান্য নবী! আপনি বায়ুকে আদেশ করুন, সে যেনো এই মুহূর্তে আমাকে হিন্দুস্তানে পৌঁছে দেয়। নবী সুলায়মান বায়ুকে আদেশ করলেন। নবীর আদেশে বায়ু তাকে অতিদ্রুত পৌঁছে দিলো হিন্দুস্তানে। হজরত আজরাইল বললেন, হে নবীপ্রবর! আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লোকটিকে দেখলাম, আর ভাবলাম, মাত্র কয়েক মুহূর্ত পর তার মৃত্যু হবে হিন্দুস্তানে। অথচ সে রয়েছে তার মৃত্যুস্থান থেকে এতো দূরে। আল্লাহ্‌তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত।

উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর জ্ঞানের পরিসর প্রকাশ করবার জন্যই এখানে বলেছেন 'ই'লমুস্‌সাআ'ত' (কিয়ামতের জ্ঞান), 'ইয়া'লামু মাফীল আরহাম'(তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে)। আর সৃষ্টির জ্ঞানকে তিনি এখানে নাকচ করে দিয়েছেন একথা বলে— 'মা তাদরী' (কেউ জানে না)।

এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে 'ইলম' (জ্ঞান) এবং 'দেরায়েত' (বুদ্ধি) এর মধ্যে পার্থক্য কী? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, যদিও শব্দ দু'টো প্রায় সমার্থক, তবুও এ দু'টোর মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম পার্থক্যও। যেমন 'ইলম' হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান এবং 'দেরায়েত' হচ্ছে গবেষণালব্ধ জ্ঞান। 'কামুস' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'দারাইতুহু' অর্থ 'আ'লীমতুহু' 'বিদ্বরবিম্ মিনাল হীলাতি' অর্থ 'দেরায়েত' ওই জ্ঞানের নাম, যা আমি শিক্ষা করেছি গবেষণার মাধ্যমে। অর্থাৎ 'দেরায়েত' হচ্ছে ভূয়োদর্শন।

আলোচ্য আয়াতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টি যতোই গবেষণায় লিপ্ত হোক না কেনো, এ বিষয়ে সে কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারবে না যে, আগামী দিবস তার পরিণতি হবে কী? এভাবে যদি সে নিজের অসহায়ত্ব প্রকটভাবে অনুভব করে, তবে সে একথাও বুঝতে পারবে অন্যের সুনির্ধারিত অদৃষ্টের ব্যাপারেও তার করণীয় কিছু নেই। তবে আল্লাহ্‌তায়ালা যদি তাঁর নবী-রসুলগণের মাধ্যমে অথবা অলৌকিক নিদর্শনের মাধ্যমে আগাম কোনোকিছু জানিয়ে দেন, তবে সে কথা স্বতন্ত্র।

www.eelm.weebly.com

‘ইন্নাল্লহা আ’লীমুন খবীর’ অর্থ, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। এই সর্ব বিষয়ে অবহিতির অর্থ হচ্ছে সকল কিছুর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিকের, বরং সকল দিকের অবগতি।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের একটি স্বপ্নের বিবরণ। একবার তিনি স্বপ্নযোগে সাক্ষাত পেলেন হজরত আজরাইলের। স্বপ্নেই জিজ্ঞেস করলেন, আমি আর কতোদিন বাঁচবো? হজরত আজরাইল কোনো কথা বললেন না। কেবল দেখালেন হাতের পাঁচটি আঙুল। স্বপ্নভঙ্গের পর তিনি স্বপ্নবিশারদগণকে ডেকে তাঁদের নিকট থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তাঁদের কেউ কেউ অর্থ করলেন, ওই পাঁচ আঙুলের অর্থ— আপনার আয়ু আছে আর মাত্র পাঁচ দিন। কেউ কেউ বললেন, পাঁচ বছর। ইমাম আবু হানিফা বললেন, এর অর্থ পাঁচটি বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। ওই পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে সুরা লোকমানের শেষ আয়াতে।

সূরা সাজদা

এই সুরার রুকুর সংখ্যা তিন এবং আয়াতের সংখ্যা ৩০। সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

সূরা সাজদা ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

الٓمّٓ ۝١ تَنۡزِيۡلُ الۡكِتٰبِ لَا رَيۡبَ فِيۡهِ مِنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۝٢ اَمۡ يَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰىهُ ۚ بَلۡ هُوَ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّكَ لِتُنۡذِرَ قَوۡمًا مَّاۤ اَتٰىهُمۡ مِّنۡ نَّذِيۡرٍ مِّنۡ قَبۡلِكَ لَعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُوۡنَ ۝٣

r আলিফ-লাম-মীম,

r এই কিতাব জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

r তবে কি উহারা বলে, ‘ইহা সে নিজে রচনা করিয়াছে?’ না, ইহা তোমার প্রতিপালক হইতে আগত সত্য, যাহাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার, যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই। হয়তো উহারা সৎ পথে চলিবে।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে উল্লেখিত হয়েছে বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি আলিফ-লাম-মীম। এই বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি চিরদুর্বোধ্য। কেবল আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল এবং অতি নগণ্যসংখ্যক তত্ত্বজ্ঞ এগুলোর রহস্যভেদ করতে সক্ষম। এগুলোকে সর্বসাধারণবোধ্য করে তোলার চেষ্টা পরিহরণীয়। কেবল বিশ্বাস রাখতে হবে কোরআন মজীদের বিভিন্ন সুরার শিরোনামরূপে লিপিবদ্ধ এই রহস্যাচ্ছন্ন অক্ষরগুলো অন্যান্য সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের মতোই প্রত্যাদেশপ্রদাতা এক ও আনুরূপ্যবিহীন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সমাগত।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'এই কিতাব জগত সমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ। এতে কোনো সন্দেহ নেই'। একথার অর্থ— এই কোরআন যে বিশ্বসমূহের পালনকর্তা আল্লাহ্র বাণী, সেকথা সুনিশ্চিত। এমতো বিষয় ও বিশ্বাসে দ্বিধা-সংশয় আরোপনের অবকাশ মাত্র নেই।

এর পরের (৩) আয়াতে বলা হয়েছে— 'তবে কি তারা বলে, এটা সে নিজে রচনা করেছে? না, এটা তোমার প্রতিপালক থেকে আগত সত্য'। এখানে 'তোমার প্রতিপালক থেকে আগত সত্য' কথাটি পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যকে (এতে কোনো সন্দেহ নেই) করেছে অধিকতর সংহত ও সবল। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে মক্কার মুশরিকেরা! এই যে আলিফ-লাম-মীম অবতীর্ণ হলো। তোমরা তো এই দৃশ্যতঃ অবিন্যস্ত অক্ষরগুলোর মর্মোদ্ধার করতে পারলে না। তোমাদের এমতো অক্ষমতা কি একথাই প্রমাণ করে না যে, এই বাণী মানব রচিত কোনো বাণী নয়। নিঃসন্দেহে এই মহান বাণীবৈভব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সমাগত। তবে তোমরা কেনো একথা বলো যে, মোহাম্মদ এর রচয়িতা! তোমাদের এমতো অপমন্তব্য অবশ্যই পরিত্যাজ্য। পুনরায় ভালো করে শুনে নাও, অবতরণরত এই অপার্থিব বচনসম্ভার বিশ্বসমূহের মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রতিপালয়িতার পক্ষ থেকে আগত মহাসত্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি, হয়তো তারা সৎপথে চলবে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপমন্তব্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। আপনি কোরআনের প্রচারকর্মে দৃঢ়ভাবে আত্মনিয়োগ করুন। আপনাকে তো এমন এক সম্প্রদায়ের সংশোধনার্থে প্রেরণ করা হয়েছে যারা ইতোপূর্বে কোনো নবী-রসুলের প্রত্যক্ষ সাহচর্য লাভের সুযোগ পায়নি। সুতরাং তাদের এখনকার বিরুদ্ধবাদিতা অনড় মনে হলেও ভবিষ্যতে তাদের সত্যোপলব্ধি ঘটা অসম্ভব কিছু নয়। হয়তো তারা একসময় মিথ্যাচার পরিত্যাগ করবে। অবলম্বন করবে সত্যের পথ।

www.eelm.weebly.com

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ وَّ لَا شَفِیْعٍ ؕ
اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤﴾ یُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَی الْاَرْضِ ثُمَّ
یَعْرُجُ اِلَیْهِ فِیْ یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٥﴾ ذٰلِكَ
عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۙ﴿٦﴾ الَّذِیْۤ اَحْسَنَ كُلَّ
شَیْءٍ خَلَقَهٗ وَ بَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنٍ ۚ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ
سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِیْنٍ ۚ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَ نَفَخَ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَ جَعَلَ
لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٩﴾

r আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আর্‌শে সমাসীন হন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নাই এবং সুপারিশকারীও নাই; তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

r তিনি আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁহার সমীপে সমুত্থিত হইবে— যে দিনের পরিমাপ হইবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসর।

r তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু,

r যিনি তাঁহার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন উত্তমরূপে এবং কর্দম হইতে মানব-সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন।

r অতঃপর তিনি তাহার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হইতে।

r পরে তিনি উহাকে করিয়াছেন সুঠাম এবং উহাতে ফুঁকিয়া দিয়াছেন রূহ হইতে এবং তোমাদিগকে দিয়াছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা অবশ্যই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। এই বিশাল সৃষ্টিকে অস্তিত্বদান করা তাঁর জন্য ছিলো মুহূর্তের ব্যাপার। তৎসত্ত্বেও তিনি ধীরতা ও স্থিরতার দৃষ্টান্ত স্থাপনের নিমিত্তে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর সৃজন সমাপন করেছেন ছয় দিনে। সূচনা রবিবারে এবং সমাপ্তি শুক্রবারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন'। আল্লাহ্র আরশে সমাসীন হওয়ার এই বিষয়টি অবোধ্য। কারণ আল্লাহ্তায়ালা যেমন আনুরূপ্যবিহীন, তেমনি তাঁর সমাসীন হওয়ার প্রকৃতিটিও। এ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে সুরা ইউনুস এবং সুরা আ'রাফের তাফসীরে, যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং সুপারিশকারীও নেই'। একথার অর্থ— হে মানুষ! আল্লাহ্পাকই তোমাদের আপনতম আশ্রয়। সুতরাং তাঁকেই তোমরা মেনে নাও তোমাদের প্রকৃত অভিভাবক ও দয়ার্দ্র সপক্ষরূপে, পরিত্রাণই যদি তোমাদের কাম্য হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না'? এখানকার 'ফা' অব্যয়টি একটি যোজক অব্যয়। এর যোজনা রয়েছে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে। ওই উহ্য বাক্যটিসহ বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে মানুষ! তবু কি তোমরা এবিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করবে না, চিন্তা করে দেখবে না?

পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমূদয় বিষয় পরিচালনা করেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ই তাঁর অদৃশ্য সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালনা করেন আকাশ ও পৃথিবীর সকল কার্যক্রম।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর একদিন সমস্তকিছুই তাঁর সমীপে সমুত্থিত হবে— যে দিনের পরিমাপ হবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসর'।

এখানে 'ছুম্মা ইয়া'রুজু ইলাইহি' কথাটির অর্থ প্রতিটি কর্মই তাঁর সমীপে উপনীত হয়। সতত বিদ্যমান থাকে তাঁর জ্ঞানের আওতায়। 'ইয়ুদাব্বিরুল আম্‌রা' অর্থ তিনিই বিধান পরিচালনা করেন, প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেন হজরত জিবরাইলের মাধ্যমে। অথবা অর্থ হবে,— তাঁর আদেশে সেসব ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ধরাপৃষ্ঠে নেমে আসে আকাশজ সমাধান। অতঃপর হজরত জিবরাইল অথবা সেবক ফেরেশতাগণ তার প্রতিফল নিয়ে উত্থিত হয় আল্লাহ্পাকের সন্নিধানে। অর্থাৎ ওই স্থানে, যে স্থান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত। আর 'ফী ইয়াওমিন' এর শাব্দিক অর্থ 'এক দিন' হলেও এর মর্মার্থ— এক সময়ে। কেননা ফেরেশতাগণের ঊর্ধ্বমার্গে ওঠানামা চলে দিনে ও রাতের যে কোনো সময়ে।

www.eelm.weebly.com

'কানা মিক্বদারুহু' অর্থ ফেরেশতাদের অবতরণ ও ঊর্ধ্বারোহণ। আর 'যে দিনের পরিমাপ হবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসর' কথাটির অর্থ— হে মানুষ! ফেরেশতারা যে দূরত্ব এক লহমায় অতিক্রম করে, তা যদি তোমরা অতিক্রম করতে চাও, তবে সময় লাগবে এক হাজার বৎসর। সুতরাং বুঝে নাও, আল্লাহ্তায়ালা ফেরেশতাদেরকে কীরূপ দ্রুতগতিসম্পন্ন করেছেন। আর একথাও বুঝে নাও যে, তাঁর প্রতাপ ও শক্তিমত্তা কতো প্রবল।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে ফেরেশতাদের ভূবনাবরোহণ এবং আকাশারোহণের কথা। আর বলা হয়েছে মানুষের হিসাবে এই দূরত্ব এক হাজার বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। কিন্তু অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফেরেশতামণ্ডলী ও জিবরাইল একদিনে ঊর্ধ্বগমন করে তাঁর সান্নিধ্যে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর'। এখানে বলা হয়েছে ভূপৃষ্ঠ থেকে সপ্তম আকাশের সিদরতুল মুনতাহা পর্যন্ত দূরত্বের কথা। অবশ্য হজরত জিবরাইলের সর্বোচ্চ গন্তব্য ওই পর্যন্তই। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হজরত জিবরাইল ও তাঁর সহচর ফেরেশতারা সিদরাতুল মুনতাহা ও পৃথিবীর মধ্যে যাতায়াত করেন অত্যল্প সময়ে। মানুষের হিসাবে ওই দূরত্ব পঞ্চাশ হাজার বৎসরে অতিক্রমযোগ্য দূরত্বের সমান। এরকম বলেছেন মুজাহিদ ও জুহাক। তবে আমার মতে দু'টো আয়াতের লক্ষ্য একটিই। অর্থাৎ দু'টো আয়াতেই বলা হয়েছে পৃথিবী ও সিদরাতুল মুনতাহার মধ্যবর্তী ব্যবধানের কথা। একটিতে এক হাজার বৎসর এবং অপরটিতে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। এমতো পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে এভাবে— গতি দ্রুততর হলে সময় লাগবে এক হাজার বৎসর। এবং শ্লথগতিসম্পন্ন হলে সময় লাগবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। কেননা হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবী থেকে প্রথম আকাশের দূরত্ব একাত্তর, বায়াত্তর অথবা তিয়াত্তর বৎসর। আবার হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি ও আহমদ কর্তৃক বর্ণিত অপর এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবী থেকে প্রথম আকাশ এবং এক আকাশ থেকে অন্য আকাশ পর্যন্ত দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। এতে করে সহজেই একথা প্রতীয়মান হয় যে, এমতো ক্ষেত্রে দূরত্বের তারতম্য নির্ণীত হয়েছে গতির তারতম্যের উপর। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

কোনো কোনো বিদ্বজ্জন অভিমত প্রকাশ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা জাগতিক কার্যক্রম নিষ্পন্ন করেন আকাশী আয়োজনের মাধ্যমে। অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাধ্যমে। এমতো ব্যবস্থাপনা চলতে থাকবে মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত। মহাপ্রলয়কালের ব্যবস্থাপনায় মাধ্যম বলে আর কিছু থাকবে না। তখন কেবল আল্লাহ্ই হবেন

www.eelm.weebly.com

মহাপ্রলয়ের সরাসরি পরিচালক। আর ওই প্রলয়কালপরিসর হবে এক হাজার বৎসরের সমান। ওই সুদীর্ঘ দিবসই কিয়ামতের দিবস (ইয়াওমাল কিয়ামাহ্)। একথার সমর্থন রয়েছে তিরমিজী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে, যেখানে বলা হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিত্তহীন বিশ্বাসীরা বেহেশতে প্রবেশ করবে বিত্তশালী বিশ্বাসীদের অর্ধদিবস পূর্বে। ওই অর্ধদিবসের পরিমাণ পৃথিবীর হিসাবে পাঁচশত বৎসর। আর যে আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বৎসরের কথা বলা হয়েছে, সে আয়াতের বক্তব্য প্রযোজ্য হবে মহাবিচার দিবসের ক্ষেত্রে। কিন্তু হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীতে যে সকল পুঁজিপতি জাকাত আদায় করেনি, সেদিন তাদের জমানো সম্পদগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে দোজখের আগুনে। সেগুলো দিয়ে বানানো হবে বড় বড় পাথরের চাঁই। আর ওই সকল উত্তপ্ত পাথরের চাঁই দিয়ে দাগ দেওয়া হবে পুঁজিপতিদের পাঁজরে ও ললাটে। বিচারপর্ব সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকবে তাদের এরকম শাস্তি। আর ওই বিচারপর্বের সময়ের পরিধি হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। তবে বলা যেতে পারে, এ ব্যাপারে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটিই অধিক অগ্রগণ্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও উদ্ভূত সময়সম্পর্কিত সমস্যাটি অসমাধ্য বলেই অনুমিত হয়। তবে এর সমাধান দেওয়া যেতে পারে আর একভাবে। যেমন— সেদিন আপনাপন কর্মের প্রভাবে মহাবিচারের দিবসের পরিসর এক এক জনের কাছে অনুমিত হবে এক এক রকম। কারো কারো মনে হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। কারো মনে হবে এক হাজার বৎসর। আবার কারো কারো কাছে অনুমিত হবে পৃথিবীর একটি দিনের চেয়েও কম সময়। যেমন হজরত আবু হোরায়রা থেকে উন্নত ও প্রায়োন্নত উভয় সূত্রে হাকেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, বিশ্বাসবানগণের নিকট মহাবিচারপর্বের সময়পরিসরকে মনে হবে জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়টুকুর সমান। বাগবী লিখেছেন, ইব্রাহিম তাইমি এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন।

উত্তম সূত্রপরম্পরায় আবু ইয়ালী, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সাঈদ বলেছেন, একবার রসুল স.কে মহাবিচারপর্বের পঞ্চাশ হাজার বৎসর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, যাঁর অধিকারে আমার জীবন, সেই পবিত্রতম সত্তার শপথ! ইমানদারদের কাছে ওই দিনকে মনে হবে তার পৃথিবীর ফরজ নামাজ পাঠের সময়ের চেয়েও কম সময়।

বাগবী লিখেছেন, ইবনে আবী মালিকা বলেছেন, একবার আমি ও হজরত ওসমানের মুক্ত করা ক্রীতদাস আবদুল্লাহ্ ইবনে ফিরোজ উপস্থিত হলাম হজরত ইবনে আব্বাস সকাশে। জানতে চাইলাম পঞ্চাশ হাজার বৎসরের দীর্ঘ দিবস সম্পর্কে। তিনি জবাব দিলেন, এ বিষয়ের জ্ঞান আমার নেই। সুতরাং আমার

www.eelm.weebly.com

পক্ষে এ সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয়। জালালউদ্দিন মাহাল্লী তাঁর তাফসীরে এই বর্ণনাটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে এরকম— ফেরেশতারা একবারে নিয়ে আসেন এক হাজার বৎসরের কার্যক্রমের ফিরিস্তি। এক হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় নিয়ে আসেন এক হাজার বৎসরের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশনা। এই নিয়মেই তারা দায়িত্ব পালন করে চলবে কিয়ামত পর্যন্ত।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— তিনি সকলের ও সকল কিছুর গোপন ও প্রকাশ্য সকলকিছু উত্তমরূপে অবগত বলেই তাঁর ব্যবস্থাপনা এতো নির্ভুল, নিখুঁত ও যথাযথ। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি একাধারে পরাক্রমশালী ও পরম দয়াবান। অর্থাৎ বান্দাগণের কল্যাণের দিকেই তাঁর দয়া ও দান সতত তৎপর।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ প্রত্যেক সৃষ্টিকে তাদের আপনাপন ধারণক্ষমতা ও যোগ্যতানুসারে সুঠাম ও সুন্দর করেছেন। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কাতাদা। আর হজরত ইবনে আব্বাস ব্যাখ্যা করেছেন— আল্লাহ্ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে করেছেন শক্ত-সমর্থ, বলিষ্ঠ। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের কটিদেশ খুব সুন্দর করে সৃষ্টি করেননি, করেছেন মজবুত। মুকাতিল 'খুব সুন্দর' বা 'অত্যুত্তম' কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্পাক তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির সৃজনশৈলী সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। আরবী প্রবাদে বলা হয় 'ফলানুন ইউহ্সিনু কাজা' (কীভাবে একাজ করতে হবে, তা অমুক লোক জানে)।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কর্দম থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন'। একথার অর্থ— এবং তিনি মানুষের আদি পিতা আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি তাঁর বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে'। এখানে 'নসল' অর্থ পৃথক হওয়া। যেহেতু অনাগত সন্তান তার পিতার পৃথক অংশ, তাই এখানে ঘটেছে এমতো শব্দ ব্যবহার। আর এখানে 'তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস' (সুলালাতিন) অর্থ শুক্রকণা। 'সুলালাতিন' এসেছে 'আসাললুন' থেকে। 'আসাললুন' অর্থ আক্ষেপণ। যেহেতু মানুষের শরীর থেকে বীর্য নির্গত হয় আক্ষেপের সঙ্গে, তাই এখানে শুক্রকণা বা তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাসকে বলা হয়েছে 'সুলালাতিন'।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম'। একথার অর্থ—তারপর তিনি ওই শুক্রকণাকে দিয়েছেন দৃষ্টিগ্রাহ্য অবয়ব।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাতে ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর রূহ থেকে'। এখানে 'মিররুহিহী' এর 'হী' (তার) সম্বন্ধ পদটির দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মানব সৃষ্টি একটি মহৎকর্ম। আর এমতো কর্ম অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্নও। কারণ এমতো সৃজনকর্ম অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ'। একথার অর্থ— মাতৃউদরস্থিত মানবাবয়বে আত্মার সম্পাত ঘটানোর পর তিনি তোমাদেরকে শুনবার জন্য কান, দেখবার জন্য চোখ এবং বুঝবার জন্য হৃদয় দিয়েছেন, যেনো তোমরা সমর্থ হও শুনতে, দেখতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো'। এ কথার অর্থ— তোমরা আল্লাহ্‌র এমতো দয়া ও দানের পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না। অথবা— তোমাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোক এব্যাপারে যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। এখানে 'মা' অব্যয়টি অতিরিক্তরূপে স্বল্পতা জ্ঞাপক অর্থে সন্নিবেশিত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা এমতো অনুগ্রহদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো খুব কমই। আর খুব কম সংখ্যকই তাঁর প্রতি ইমান আনো এবং তাঁর ইবাদত করো।

সূরা সাজদা ঃ আয়াত ১০, ১১

وَقَالُوٓا۟ ءَإِذَا ضَلَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ ءَإِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍۭ ۚ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَٰفِرُونَ ﴿١٠﴾ ۞ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

r উহারা বলে, 'আমরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইলেও কি আমাদিগকে আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি করা হইবে? বরং উহারা উহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ অস্বীকার করে।

r বল, 'তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা তোমাদের প্রাণ হরণ করিবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হইবে।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা বলে, আমরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হলেও কি আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে'? একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা বলে, আমরা মরে গেলে তো মাটির সঙ্গে মিশে যাবো, তারপরেও কি

www.eelm.weebly.com

আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? এরকম কথা কি বিশ্বাস করা যায়? এখানে 'দ্বলালনা ফীল আরদ্বি' অর্থ মৃত্তিকায় পর্যবসিত হলেও, মাটিতে মিশে গেলেও। যেমন বলা হয় 'দ্বললাল মাউ ফীল লাবান' (পানি মিশেছে দুধের সঙ্গে)। উল্লেখ্য, আলোচ্য উক্তিটি ছিলো উবাই ইবনে খালফের। অন্যান্য অংশীবাদীরাও ছিলো তার একথার সঙ্গে একাত্ম। তাই এখানে 'সে বলে' না বলে বলা হয়েছে 'তারা বলে'।

এরপর বলা হয়েছে— 'বরং তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত অস্বীকার করে'। একথার অর্থ— তাদের এমতো অপবচনের কারণ এই যে, পরকালের প্রতি তাদের আদৌ বিশ্বাস নেই।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণহরণ করবে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! তাদেরকে বলে দিন, সকলের প্রাণহরণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মৃত্যুর ফেরেশতা আজরাইলকে। তিনি যথাসময়ে তোমাদের প্রাণহরণ করবেনই।

এখানে 'ইয়াতাওফ্‌ফা' অর্থ 'ইয়াসতাওফিয়া'। এরকম এক সূত্রভূত শব্দের অন্য অর্থ প্রদান ব্যাকরণসম্মত। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণসংহার করবে সম্পূর্ণরূপে। প্রাণের কোনো অংশই সে ছেড়ে দিবে না। অথবা ছেড়ে দিবে না তোমাদের কাউকেও। বলাবাহুল্য, এখানে 'মৃত্যুর ফেরেশতা' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত আজরাইলকে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মৃত্যু পৃথিবীর সকল দুঃখ-যাতনা হরণকারী। কারো অন্তিমকাল উপস্থিত হলে মৃত্যুর ফেরেশতা তার কাছে এসে বলে, হে আল্লাহ্‌র দাস! তোমার কাছে তো এ পর্যন্ত অনেক সংবাদই পৌঁছেছে। আমি এসেছি শেষ বার্তা নিয়ে। এবার তোমাকে বলতেই হবে, আমি প্রস্তুত। একথা বলেই সে ওই ব্যক্তির জান কবজ করে। সুহৃদ -স্বজনেরা শোকাচ্ছন্ন হয়, বিলাপ করে। মৃত্যুদূত তখন বলে, কার জন্য তোমাদের এ আর্তনাদ? রোদনই বা কার জন্য? আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমি কারো আয়ুষ্কাল এক মুহূর্তও হ্রাস করিনি। ভক্ষণ করিনি কারো এক কণা উপজীবিকা। তাকে তো ডাক দিয়েছেন তার প্রভুপালনকর্তা স্বয়ং। ওহে বিচ্ছেদাহত ব্যক্তিবর্গ। তোমরা রোদন করো তোমাদের নিজেদের জন্য। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি বার বার আসবো। আমার হাত থেকে কারোরই নিস্তার নেই।

এখানে 'আল্‌লাজীনা বুককিলা বিকুম' অর্থ মৃত্যু সংঘটনকারী ফেরেশতামণ্ডলী। তারা সকলে হজরত আজরাইলের সহযোগী। সুরা আনয়া'মের যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ হজরত আজরাইল ও তাঁর সহযোগীরা আগে থেকে কখন কার কোথায় মৃত্যু হবে তা জানে না। জানে মৃত্যু কার্যকর করার পূর্ব মুহূর্তে। ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়ার বর্ণনায় এসেছে ইবনে জুরাইজ বলেছেন, কারো মৃত্যুর সময় অত্যাসন্ন হলে হজরত আজরাইলকে জানানো হয়, যাও, অমুক সময়ে অমুক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করো।

মাসআলা ঃ মৃত্যুদূত বিশ্বাসবান ব্যক্তিদের সামনে উপস্থিত হয় মনোমুগ্ধকর-রূপে। আর অবিশ্বাসীদের কাছে যায় ভয়ংকরদর্শন হয়ে। ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ যখন নবী ইব্রাহিমকে তাঁর বন্ধু (খলিল) নির্বাচন করলেন, তখন হজরত আজরাইল নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালক! দয়া করে অনুমতি দিন, আমি এই শুভসমাচারটি নবী ইব্রাহিমকে দিয়ে আসি। আল্লাহ্পাক অনুমতি দিলেন। হজরত আজরাইল নবী ইব্রাহিমের নিকটে উপস্থিত হয়ে শুভসমাচার জানালেন। নবী ইব্রাহিম তৎক্ষণাৎ উচ্চারণ করলেন, 'আলহামদু লিল্লাহ'। তারপর বললেন, হে মৃত্যুদূত! আমাকে দেখাও, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জীবন তুমি হরণ করো কীভাবে? হজরত আজরাইল বললেন, আপনি সহ্য করতে পারবেন না। নবী ইব্রাহিম বললেন, পারবো। হজরত আজরাইল পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়ালেন নবী ইব্রাহিমের মুখোমুখি হয়ে। নবী ইব্রাহিম দেখলেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিকট, বীভৎস ও বিশাল এক দানব। তার মুখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন। তার প্রতিটি লোমকূপে রয়েছে এক একটি মানবাকৃতির প্রাণী। তাদের মুখ থেকেও নির্গত হচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। মুহূর্ত মধ্যে চেতনা হারিয়ে ফেললেন আল্লাহ্র নবী। কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরে পেয়ে দেখলেন, হজরত আজরাইল দাঁড়িয়ে রয়েছেন আগের মতো মনোহর বেশ নিয়ে। বললেন, হে মৃত্যুদূত! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আর কোনো শাস্তি না পেলেও তোমার বীভৎস দর্শনই তো তাদের জন্য শাস্তি হিসেবে যথেষ্ট। যা হোক, এবার দেখাও তুমি বিশ্বাসবানদের কাছে উপস্থিত হও কোনরূপ ধরে। মৃতুদূত পুনরায় পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। পরক্ষণেই যখন নবী ইব্রাহিমের মুখোমুখি হলেন, তখন ইব্রাহিম সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁর চিত্তহারী রূপ। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে অপার্থিব সুবাস। আর তার পরনে রয়েছে শুভ্রঅভ্রমুক্তাখচিত নয়নাভিরাম পরিচ্ছদ। বললেন, হে মৃতুদূত! বিশ্বাসবানেরা আর কোনো পুরস্কার না পেলেও তোমার এই হৃদয় পাগল করা রূপই পুরস্কার হিসেবে তাদের জন্য হবে যথেষ্ট।

হজরত কা'ব বলেছেন, হজরত আজরাইল নবী ইব্রাহিমের নিকট প্রথমে নিজেকে প্রদর্শন করেছিলেন অনিন্দ্য সুন্দররূপে, যে রূপে তিনি আবির্ভূত হন বিশ্বাসীগণের রূহ্ কবজ করার সময়। তাঁর ওই ভূবনমোহিনী রূপের প্রকৃত তত্ত্ব

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ অবগত নয়। পুনর্বার তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন ভীষণ নিষ্ঠুর আকৃতিতে, যার ফলে নবী ইব্রাহিম হয়ে পড়েছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত ও সংজ্ঞাহীন।

মাসআলা ঃ পশু-পাখির মৃত্যু কীভাবে হয়, সে সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু শায়েখ ও দায়লামী এবং সেটি উকাইলি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'সানআ' গ্রন্থে। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, পশু-পাখি ও কীট-পতঙ্গ যতদিন আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনায় লিপ্ত থাকে, ততদিন প্রলম্বিত থাকে তাদের আয়ু। একাজ যখন বন্ধ হয়, তখন আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং ঘটান তাদের মৃত্যু। তাদের ক্ষেত্রে আজরাইলের কোনো ভূমিকা নেই। অপর এক সূত্রে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে খতিব বাগদাদী। হাদিসটিকে আতীয়া ও কুরতুবী ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মৃত্যুদূতের অংশগ্রহণ ছাড়াই আল্লাহ্ স্বয়ং নিভিয়ে দেন তাদের প্রাণপ্রদীপ।

আমি বলি, মৃত্যুকালে বিশ্বাসীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং অবিশ্বাসীদেরকে হুমকি প্রদানের জন্যই মৃত্যুদুতের সঙ্গে নিযুক্তি দেয়া হয়েছে তার সহযোগী ফেরেশতাদেরকে।

খতিব বাগদাদী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, জুহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত আজরাইল প্রাণহরণ করেন কেবল মানুষের। জ্বিন, শয়তান এবং ভূচর, খেচর ও জলচর প্রাণীদের মৃত্যুর ফেরেশতা ভিন্ন ভিন্ন। ফেরেশতামণ্ডলী মৃত্যুমুখে পতিত হবে কিয়ামতের সময় হজরত ইসরাফিলের প্রথম ফুৎকারধ্বনি উত্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তাদের প্রাণও হরণ করবেন হজরত আজরাইল। সবশেষে হজরত আজরাইলকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে। আর যারা জেহাদের ময়দানে শহীদ হন এবং জলে ডুবে মরেন, তাদের প্রাণহরণ করেন আল্লাহ্ নিজে। তারা আল্লাহ্র বিবেচনায় সম্মানার্হ বলে হজরত আজরাইলকে তাদের কাছে পাঠান না। সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিতরা তো আল্লাহ্র পথের পথিক বলেই গণ্য। হাদিসটির সূত্রপ্রবাহভূত জুয়াইবীর আবার বর্ণনাকারীরূপে অকিঞ্চন বলে পরিচিত। এদিকে আবার হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে জুহাকের যোগসূত্রও বিচ্ছিন্ন। অবশ্য বর্ণিত সাহাবীবচনের শেষ দিকের অনুরূপ একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে সর্বোন্নত সূত্রে।

হজরত আবু উমামা বাহিলী থেকে ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা শহীদগণ ছাড়া অন্য সকলের প্রাণহরণ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন হজরত আজরাইলের উপর। আর সমুদ্রসমাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রাণহরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন নিজে। আমি বলি, আল্লাহ্র প্রেমসমুদ্রে সমাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিই এমতো সৌভাগ্যলাভের অধিকতর যোগ্য। আল্লাহ্ই সমধিক অবহিত।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে'। একথার অর্থ— মৃত্যুর পর বিশ্বাসীগণের পুণ্য আত্মা নিয়ে রহমতের ফেরেশতারা উঠে যাবে সপ্তম আকাশে 'ইল্লিয়্যীন' নামক স্থানে। আর অবিশ্বাসীদের আত্মা নিয়ে আযাবের ফেরেশতারা প্রথম আকাশে উঠে যাবে। কিন্তু তাদের জন্য প্রথম আকাশের দরোজা উন্মুক্ত করা হবে না। বরং দুরাত্মাগুলোকে নিক্ষেপ করা হবে দূরে, সিজ্জীন নামক স্থানে। হাদিসটির পূর্ণ উল্লেখ সন্নিবেশিত হয়েছে সুরা আনয়া'মের যথাস্থানে। ইচ্ছে করলে সেখানে পুরো হাদিসটি দেখে নেওয়া যেতে পারে। অথবা আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে এরকম— অবশেষে তোমাদের আপনাপন সমাধি থেকে তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করে নিয়ে যাওয়া হবে হাশর প্রান্তরে। সেখানেই দেওয়া হবে চূড়ান্ত ফলাফল।

সূরা সাজ্‌দা ঃ আয়াত ১২, ১৩, ১৪

وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَاۤ
اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَلَوْ
شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَئَنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۳﴾ فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ
لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴﴾

r হায়, তুমি যদি দেখিতে! যখন অপরাধীরা তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হইয়া বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম ও শ্রবণ করিলাম, এখন তুমি আমাদিগকে পুনরায় প্রেরণ কর, আমরা সৎকর্ম করিব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।'

r আমি ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করিতাম; কিন্তু আমার এই কথা অবশ্যই সত্য ঃ আমি নিশ্চয়ই জ্বিন্ ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিব।

r তবে, 'শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ আজিকার এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হইয়াছিলে। আমিও তোমাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছি, তোমরা যাহা করিতে তজ্জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করিতে থাক।'

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! পরকালে অবিশ্বাসী পৌত্তলিকদের অপপরিণতির দৃশ্য যদি আপনাকে প্রত্যক্ষ করানো হতো, তবে আপনি দেখতে পেতেন, তারা লজ্জায়,আক্ষেপে ও ভয়ে জড়সড়ো হয়ে মাথা হেঁট করে বলছে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! ইতোপূর্বে আমরা পুনরুত্থান, বিচার এসব কথা শুনেছিলাম, এখন তা স্বচক্ষে দেখলাম। বুঝলাম, আমরা নিমজ্জিত ছিলাম চরম ভুলের ভিতরে। আমরা সে ভুল এবার শুধরে নিতে চাই। সুতরাং তুমি আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করো। আমরা এবার হবো দৃঢ় বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ।

এখানে 'আবসরনা' (প্রত্যক্ষ করলাম) অর্থ আমাদের পৃথিবীবাসের সময় পরকাল সম্পর্কিত যে সকল সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছেছিলো, আজ তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। 'সামি'না' (শ্রবণ করলাম) অর্থ পৃথিবীতে তোমার প্রেরিত পুরুষগণ যে সকল কথা আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন, আজ সে সকল বিষয় আমরা সরাসরি শুনলাম তোমার পক্ষ থেকে। কেউ কেউ কথাদুটোকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমরা এবার স্বচক্ষে অবলোকন করলাম আমাদের পাপরাশিকে এবং স্বকর্ণে শুনতে পেলাম আমাদের নিদারুণ পরিণতির কথা। আর 'ইন্না মূক্বিনূন' (আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী) অর্থ— আমরা পৃথিবীতে ছিলাম সন্দিগ্ধচিত্ত, কিন্তু স্বচক্ষে সবকিছু দেখে এবং স্বকর্ণে সবকিছু শুনে এবার আমরা হয়েছি দৃঢ় প্রত্যয়ী।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম, কিন্তু আমার কথা অবশ্যই সত্যঃ আমি নিশ্চয় জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো'। একথার অর্থ— আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে অবশ্যই প্রত্যেক মানুষ ও জ্বিনকে করতে পারতাম সত্যপথানুসারী। কিন্তু আমার স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবোই। আর পূর্ণ করবো অবিশ্বাসী মানুষ ও জ্বিনদের দ্বারা'।

এখানে 'মিনাল জ্বিন্নাতি ওয়ান্নাস' (জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা) বাক্যটির 'আলিফ-লাম' সীমিত অর্থবোধক। এর দ্বারা সীমায়িত করা হয়েছে মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল পাপিষ্ঠদেরকে। জননী আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কোনো কোনো মানুষ জন্মপূর্ব থেকে পিতার পৃষ্ঠদেশে থাকার সময়েই দোজখীরূপে নির্ধারিত এবং কোনো কোনো মানুষ বেহেশতী বলে স্থিরীকৃত জন্মপূর্ব সময় থেকেই, যখন তারা অবস্থান করে তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, প্রত্যেকের জন্যই স্থিরীকৃত রয়েছে সুনির্দিষ্ট আবাসস্থল— জান্নাত অথবা জাহান্নাম। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! তাহলে আমরা আমল পরিত্যাগ করে

www.eelm.weebly.com

নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবো না কেনো? তিনি স. আজ্ঞা করলেন, না, কর্মরত থাকো। প্রত্যেকেই ওই কর্ম সম্পন্ন করবার সামর্থ্যপ্রাপ্ত, যে কর্মের জন্য সে সৃষ্ট। সৌভাগ্যবানদের জন্য সহজ পুণ্যকর্ম এবং দুর্ভাগাদের জন্য মনোপুত পাপ। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন— 'ফাআম্‌মা মান আ'তা ওয়াত্তাক্বা ওয়া সদ্দাক্বা বিল হুসনা' (কাজেই যে দান করে ও সংযমী হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে মনে করে, আমি তাকে সহজ পথ দান করবো সুখের বিষয়ের জন্য)। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. তাঁর পবিত্র হাতে দুটি লিখিত কাগজ নিয়ে বহির্বাটিতে উপস্থিত হলেন। বললেন, তোমরা কি জানো, এই কাগজ-দুটোতে কি লেখা রয়েছে? আমরা বললাম, জানিনা। তিনি স. তাঁর ডান হাতের কাগজটি দেখিয়ে বললেন, এতে রয়েছে স্বর্গবাসীদের নাম ও পিতৃপরিচয়। এটাই অদৃষ্ট লিপি। এ অদৃষ্টলিপি চূড়ান্ত, অপরিবর্তনীয়। এরপর তিনি স. তাঁর বাঁ হাতের কাগজটি দেখিয়ে বললেন, আর এতে রয়েছে নরকবাসীদের নাম ও পিতৃপরিচয়। এটাও অদৃষ্ট লিপি, আর এটাও চূড়ান্ত ও পরিবর্তনরহিত। আমরা বললাম, হে প্রত্যাদেশিত পুরুষ! বিষয়টি যখন চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তিকৃত, তখন কর্মের আর কী প্রয়োজন? তিনি স. বললেন, কর্মসচল থাকো মধ্যম গতিতে, সম্মিলিতভাবে। স্বর্গবাসীরা অন্তিমযাত্রা করবে পুণ্যশোভিত হয়ে, ইতোপূর্বে সে যা কিছু করে থাকুক না কেনো। আর নারকীরা জীবন সাঙ্গ করবে পাপিষ্ঠরূপে, ইতোপূর্বে তারা যা কিছুই করুক না কেনো। অতঃপর রসুল স. শূন্যে নিক্ষেপ করলেন তাঁর হাতের কাগজদুটো। মুহূর্ত মধ্যে উধাও হয়ে গেলো সেদুটো। তারপর বললেন, তোমাদের প্রভুপালক তাঁর অনুচরবর্গের নিকট থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন— একদল স্বর্গবাসী, আরেকদল নারকী।

এখানকার 'জাহান্নাম পূর্ণ করবো' কথাটি 'এই কথা' পদের বিশেষণ। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'এই কথা' বলে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌র ওই অঙ্গীকারকে, যা তিনি ঘোষণা করেছিলেন ইবলিসকে লক্ষ্য করে। বলেছিলেন— অবশ্যই আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবো তুমি ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টিও সুপ্রকট যে, মানুষের ইমানপ্রাপ্তি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়নির্ভর। তাই এখানে 'এই কথা অবশ্যই সত্য' বলে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, দোজখবাসীরা অভিপ্রায়শূন্য। আর তাদের অবিশ্বাসী হওয়া এবং দোজখগমনের বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়পুষ্ট। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'জাহান্নাম পূর্ণ করবো' অর্থ তাদের জাহান্নামগমনের সিদ্ধান্তটি পূর্বনির্ধারিত। তাই ইমান প্রাপ্তির বিষয়টি তাদের অভিপ্রায়গত নয়।

www.eelm.weebly.com

অবশ্য পূর্ববর্তী আয়াতে পরকালবিস্মৃতিকে তাদের জাহান্নামগমনের কারণরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু কারণ পূর্বনির্ধারিত নয়। পূর্বনির্ধারিত হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়। সেকথাই বলা হয়েছে এই আয়াতে।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং শাস্তি আস্বাদন করো, কারণ আজকের এই সাক্ষাতকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে। আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়েছি। তোমরা যা করতে তার জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকো'।

উল্লেখ্য, ভুলে যাওয়া একটি ত্রুটি, আর আল্লাহ্ যাবতীয় ত্রুটি থেকে পবিত্র। সুতরাং এখানকার 'আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়েছি' কথাটির মর্মার্থ হবে— আমিও আজ তোমাদেরকে বঞ্চিত করলাম আমার কৃপা থেকে। অথবা মর্মার্থ হবে— মানুষ যে ভাবে ভুল করে কোনো জিনিসকে ফেলে রেখে দেয়, তেমনি আমি ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে হলেও তোমাদেরকে এখন ফেলে রাখলাম অনন্ত শাস্তিতে। আমার অনুকম্পা থেকে তোমাদেরকে করলাম চিরবঞ্চিত।

এখানে 'আজকের এই সাক্ষাতের কথা' অর্থ আপনাপন সমাধি থেকে গাত্রোত্থানের পর মহাবিচারপর্বের এই লগ্নের কথা। আর ' তোমরা যা করতে তার জন্য' অর্থ পৃথিবীতে তোমরা যে কুফরী ও অনানুগত্য করতে তার জন্য। ইতোপূর্বেও পরকালের প্রতি অস্বীকৃতি বা কুফরীকে নির্ধারণ করা হয়েছে দোজখের শাস্তির কারণরূপে। এখানেও সেরকমই করা হলো। পুনঃপুনঃ একথা উল্লেখ করার মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে, পরলোকবিস্মৃতি ও পাপাচারের সীমালংঘনই দোজখের শাস্তিকে করে অবধারিত।

আলোচ্য আয়াত বিভ্রান্ত জাব্‌রিয়া ও কাদ্‌রিয়া সম্প্রদায়ের অপবিশ্বাসের একটি বিরুদ্ধ প্রমাণ। জাব্‌রিয়া সম্প্রদায় মানুষকে মনে করে জড়পদার্থতুল্য অসহায়। আর কাদ্‌রিয়ারা বিশ্বাস করে, মানুষ নিজেই তার কর্মের স্রষ্টা। এখানে 'এই সাক্ষাতের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে'কথাটি জাব্‌রিয়াদের মতাদর্শের বিরুদ্ধে একটি অনড় প্রতিবাদ। পরকালবিস্মৃতিই এখানে তাদের শাস্তিভোগের কারণ। সুতরাং পরকালবিস্মৃতির জন্য তারা অবশ্যই দায়ী। কেননা চিন্তা-গবেষণা, ইমান, পাপ ইত্যাদি মানুষের ইচ্ছাধীন। আর কাদ্‌রিয়ারা বলে, আল্লাহ্পাক চান কেবল ইমান ও পুণ্যকর্ম। কিন্তু মানুষ নিজ ইচ্ছায় তা পরিত্যাগ করে। সুতরাং তার নিজের দুষ্কর্মের স্রষ্টা সে নিজে। একথার প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে এভাবে— 'আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম'। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের কোনো ইচ্ছাই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে কার্যকর হয় না। কিন্তু আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় অবিকল বলপ্রয়োগ যেমন নয়, তেমনি কেউই তাঁর অভিপ্রায়ের

www.eelm.weebly.com

আওতাবহির্ভূতও নয়। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে মধ্যবর্তী বিশ্বাসই হচ্ছে সরল ও নির্ভুল বিশ্বাস। অর্থাৎ সৃজন আল্লাহ্‌র এবং অর্জন বান্দার। তাই তিনি সৃজয়িতা এবং তাঁর দাসেরা নির্মাতা। অতএব একথা মেনে নিতেই হবে যে, মানুষ আল্লাহ্‌র বিধানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, কিন্তু তাঁর অভিপ্রায়কে অমান্য করতে পারে না কিছুতেই।

সূরা সাজ্‌দা ঃ আয়াত ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا
وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۩ ﴿١٥﴾ تَتَجَافٰى
جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ز وَّمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ
اَعْيُنٍ ج جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ
كَانَ فَاسِقًا ط لَا يَسْتَوٗنَ ﴿١٨﴾ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ز نُزُلًاۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾
وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ط كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ
يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ
الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ
الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ
بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ط اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿٢٢﴾

r কেবল তাহারাই আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে যাহারা উহার দ্বারা উপদিষ্ট হইলে সিজ্‌দায় লুটাইয়া পড়ে এবং তাহাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আর তাহারা অহংকার করে না।

www.eelm.weebly.com

r তাহারা শয্যাত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায়, এবং আমি তাহাদিগকে যে রিয্‌ক দান করিয়াছি উহা হইতে তাহারা ব্যয় করে।

r কেহই জানে না তাহাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হইয়াছে তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ!

r তবে যে ব্যক্তি মু'মিন, সে কি পাপাচারীর ন্যায়? উহারা সমান নহে।

r যাহারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে তাহাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাহাদের আপ্যায়নের তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান হইবে জান্নাত।

r এবং যাহারা পাপাচার করিয়াছে তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম; যখনই উহারা জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই উহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে উহাতে এবং উহাদিগকে বলা হইবে, 'যে অগ্নিশাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলিতে উহা আস্বাদন কর।'

r গুরুশাস্তির পূর্বে উহাদিগকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাইব, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।

r যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া তাহা হইতে মুখ ফিরায় তাহার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বিশ্বাসবানদের স্বভাব এরকম, তারা আমার প্রত্যাদেশিত সদুপদেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেজদাবনত হয়ে প্রকাশ করে তাদের কৃতজ্ঞতা এবং ঘোষণা করে আমার প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা। আর তারা এমতো পুণ্যবান হওয়া সত্ত্বেও হয় বিনয়ী, অহংকার প্রকাশ কদাচ করে না।

এখানে 'জুক্‌কিরু' অর্থ যখন তাদেরকে প্রদান করা হয় উপদেশ। 'খর্‌রু' অর্থ লুটিয়ে পড়ে। 'সাববাহু' অর্থ ঘোষণা করে পবিত্রতা, যেহেতু তারা জানে তাদের প্রভুপালক সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অজ্ঞতা-অক্ষমতা থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। 'বি হামদি রববিহিম' অর্থ বর্ণনা করে তাদের প্রভুপালকের সকৃতজ্ঞ প্রশংসা। যেহেতু তিনি তাদেরকে দিয়েছেন ইমান গ্রহণের সুযোগ ও সামর্থ্য। অর্থাৎ তারা তাদের হৃদয়ের প্রতীতি সহ বাচনিকভাবে বলে 'সুবহানাল্লহি ওয়া বি হামদিহী'।

নির্দেশনাঃ এই আয়াত যাঁরা আরবীতে পাঠ করলেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সিজদা করে নিন।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায়'। একথার অর্থ— ওই সকল কৃতজ্ঞচিত্ত ও বিনয়াবনত বিশ্বাসবানেরা রাতের শয্যাসুখ পরিত্যাগ করে নামাজে দণ্ডায়মান হয় আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ও শাস্তির ভয়ে এবং তাঁর পরিতোষ ও পুণ্যপ্রাপ্তির আশায়।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'শয্যাত্যাগ করে' অর্থ রাতের নিদ্রাসুখ পরিহার করে। হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ বলেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ মহাবিচারের দিবসে এক সুবিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরে সকলকে সমবেত করবেন। সেখানকার ঘোষণা সকলে শুনতে পাবে একইভাবে এবং একইভাবে দেখতে পাবে পরস্পরকে। জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবেন, যারা পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত আল্লাহ্র স্তব-স্তুতি করতো, তারা কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডায়মান হবে একদল লোক। তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে বিনা হিসাবে। এরপর ঘোষণাকারী পুনঃঘোষণা করবে, কোথায় ওই সমস্ত মানুষ যারা শয্যা ত্যাগ করে আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন হতো? সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াবে কিছুসংখ্যক মানুষ। তারাও বিনা বিচারে প্রবেশ করবে বেহেশতে। এরপর শুরু হবে বিচারপর্ব। এই হাদিসটি হান্নাদ ইবনে রহওয়াইহ্ এবং আবু ইয়ালীও লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের আপনাপন গ্রন্থে। তবে তাঁদের উদ্ধৃতিতে অতিরিক্ত রয়েছে এই কথাটুকু— ওই ঘোষকের ঘোষণা সকলেরই শ্রুতিগোচর হবে সমভাবে। ফলে তারা বুঝতে পারবে, আজ সর্বাধিক কল্যাণপ্রাপ্ত কারা।

হাসান বসরী, মুজাহিদ, ইমাম মালেক, ইমাম আওযায়ী ও আলেমগণের এক বিরাট দল বলেছেন, এখানে শয্যাত্যাগ করে আশা-আশংকার দোলায় দুলে আল্লাহ্কে ডাকার অর্থ তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠ করা।

ইমাম আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে আবী শায়বা, ইসহাক ইবনে রহ্ওয়াইহ্ ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুয়াজ বলেছেন, আমি একবার আমার প্রাণপ্রিয় রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে প্রত্যাদেশিত পুরুষ! আমাকে এমন একটি আমলের কথা জানিয়ে দিন, যা আমাকে দোজখ থেকে মুক্ত রাখবে এবং নিয়ে যাবে জান্নাতে। তিনি স. বললেন, তুমি জানতে চেয়েছো এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে আল্লাহ্ যাকে সামর্থ্য দেন, তার জন্য একাজ কঠিন নয়। তবে শোনো, তুমি যা চাও, তা পেতে হলে ইবাদত কোরো কেবল আল্লাহ্র, অন্য কাউকে বা কোনোকিছু স্থির কোরো না তাঁর সমকক্ষ। আর পালন কোরো নামাজ, আদায় কোরো জাকাত, রোজা রেখো রমজান মাসে এবং হজ কোরো কাবা শরীফের। তিনি স. আরো বললেন, কল্যাণতোরণের সন্ধানও জেনে নাও এই সাথে। শোনো, রোজা প্রতিরক্ষার উপকরণ। পানি যেমন অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করে, তেমনি দান-খয়রাত নির্বাপিত করে পাপাগ্নিকে। আর প্রকৃত কল্যাণতোরণ হচ্ছে মধ্য রাতের নামাজ। এরপর তিনি স. তেলাওয়াত করলেন আলোচ্য আয়াত। পুনর্বার তিনি স. বললেন, ধর্মের স্তম্ভ ও শৈলশৃঙ্গ কী তা-ও শুনে নাও এবার। ধর্মের স্তম্ভ হচ্ছে নামাজ এবং শৈলশৃঙ্গ হচ্ছে জেহাদ। তিনি স. আবারো বললেন, আমি কি তোমাকে জানাবো না, এসকল পুণ্যের পটভূমিকাটি কী? আমি বললাম, নিশ্চয়। তিনি স. তাঁর পবিত্র রসনা স্পর্শ করে বললেন, একে সংযত রেখো। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কথা বলার জন্যও কি

www.eelm.weebly.com

আমাদেরকে অভিযুক্ত হতে হবে? তিনি স. বললেন, মুয়াজ! তোমার জন্য তোমার মাতা বিলাপ করুক। জেনে রেখো, কেবল রসনার অসংযতিই মানুষের দোজখ প্রবেশের জন্য যথেষ্ট।

হজরত আবু মালেক আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে রয়েছে এমন এমন স্বচ্ছ প্রাসাদ যেগুলোর ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে ভিতরে দৃষ্টিগোচর হবে অনায়াসে। ওই প্রাসাদগুলোর অধিকারী হবে তারা, যারা মিষ্টভাষী, নিরন্নকে অন্নপ্রদাতা, নিরবচ্ছিন্ন রোজা প্রতিপালনকারী এবং গভীর রাতে নামাজ পাঠকারী, যখন মানুষ থাকে সুপ্তিমগ্ন। বায়হাকী হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর শো'বুল ইমানে। অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আলী থেকে তিরমিজিও।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, রমজানের রোজার পরে সর্বোত্তম রোজা হচ্ছে আল্লাহ্‌র মাসের রোজা। অর্থাৎ মহররম মাসের রোজা। আর ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হচ্ছে নিশিথের নামাজ। ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত অনুরূপ হাদিসের শেষ কথাটি এরকম— ফরজ নামাজের পরে সর্বোত্তম নামাজ হচ্ছে নিশুতি রাতের নামাজ।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, দু'ধরনের লোককে আল্লাহ্ ভালোবাসেন। এক ধরনের লোক তারা, যারা গভীর রাতের নিদ্রাসুখ পরিত্যাগ করে নামাজে দণ্ডায়মান হয়। আর এক ধরনের লোক তারা, যারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে। পরাজিত হয়ে তাৎক্ষণিক পশ্চাদপসরণ করলেও পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুসেনার উপর। এভাবে প্রাণপন লড়াই করে হয় শহীদ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রহওয়াইহ্ খাজরাজী আনসারীর এক কবিতায় বলা হয়েছে— আমাদের মধ্যে রয়েছেন একজন প্রত্যাদেশিত পুরুষ। প্রভাতে তিনি নিমগ্ন হন কোরআন পাঠে। আমরা পথ হারাবার পর তিনিই আমাদেরকে দিয়েছেন পথের দিশা। আমরা তাঁকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। তিনি নিশুতি রাতে শয্যাসুখ ত্যাগ করেন, যখন অবিশ্বাসীরা পড়ে থাকে তাদের আপনাপন শয্যায় মৃতবৎ।

আমি তাহাজ্জুদ নামাজের মাহাত্ম্যসম্বলিত হাদিসগুলি সন্নিবেশিত করেছি সুরা মুয্যামমিলের তাফসীরে। যথাস্থানে সেগুলো পাঠ করে নেয়া যেতে পারে।

তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে তাদের কথা, যারা মাগরিবের নামাজ সমাধা করার পর অপেক্ষমান থাকে ইশার নামাজের জন্য।

www.eelm.weebly.com

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আমাদেরকে অর্থাৎ আনসারদেরকে লক্ষ্য করে। আমরা মাগরিবের নামাজ পাঠ করে বসে থাকতাম ইশার প্রতীক্ষায়। তারপর যথাসময়ে রসুল স. এর সঙ্গে ইশার নামাজ সমাধা করে ফিরে যেতাম আপনাপন গৃহে।

হজরত আনাস কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কিছুসংখ্যক সাহাবী সম্পর্কে। তাঁরা মাগরিবের নামাজ সমাপনের পর মসজিদে বসেই অপেক্ষা করতেন ইশার নামাজের । বর্ণনাটি সংকলন করেছেন ইবনে মারদুবিয়া। মূল বিবরণটি উল্লেখিত হয়েছে সুনানে আবু দাউদে। ইবনে আবী হাতেম এবং মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে আউয়াবিন নামাজের কথা। শিথিল সূত্র সহযোগে বায্যার বর্ণনা করেছেন, হজরত বেলাল বলেছেন, আমরা কয়েক জন মাগরিবের পর ইশার নামাজের অপেক্ষায় মসজিদেই বসে থাকতাম। আমাদের এমতোকর্মকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু দারদা, হজরত আবু জর এবং হজরত উবাদা ইবনে সামেত রসুল স. এর সঙ্গে জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করতেন ইশা ও ফজর। হজরত ওসমান থেকে আহমদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করলো, সে যেনো ইবাদত করলো অর্ধরাত্রি ব্যাপী। এর সঙ্গে সে যদি ফজরের নামাজও জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করে তাহলে সে যেনো ইবাদতে অতিবাহিত করলো সারা রাত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী, মুসলিম, আহমদ ও নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আজান দেওয়া এবং প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠ করার মর্যাদা যদি মানুষ জানতো তবে লটারী ছাড়া কেউ আজান দিতে এবং সামনের কাতারে দাঁড়াবার সুযোগ পেতো না। তেমনি জোহরের নামাজের ফযীলত সম্পর্কে জানলে মানুষ জোহরের জামাতে উপস্থিত হতো দৌড়ে। আর ফজর ও ইশার নামাজের উপকার কী তা বুঝতে পারলে চলচ্ছক্তিহীনেরাও জামাতে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করতো ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে'। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে জাকাতের অর্থ ব্যয় করার কথা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ব্যয় করে' অর্থ নফল দান-খয়রাত করে।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ'। এখানে 'নাফসুন' (কেউই) বলে বুঝানো হয়েছে নবী-রসুলগণ ও নৈকট্যভাজন ফেরেশতাবৃন্দকে। অর্থাৎ তারাও জানেন না, বিশ্বাসবানগণের জন্য আল্লাহ্ কীরকম নয়নাভিরাম পুরস্কার রেখে দিয়েছেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার পুণ্যবান বান্দাগণের জন্য এমনই পুরস্কার রেখে দিয়েছি, যার বিবরণ কখনো শোনেনি কোনো কান এবং সে পুরস্কার কখনো দেখেনি কোনো চোখ। আর যার কথা কখনো ধারণাও করতে পারে না কোনো মানবহৃদয়। একথার প্রমাণরূপে যদি তোমরা চাও তবে আবৃত্তি করো— কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর...।

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে ওয়াহেদী ও ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার বিতণ্ডা উপস্থিত হলো হজরত আলী ও ওলীদ ইবনে উকবার মধ্যে। এক পর্যায়ে ওলীদ ভয়ানক রেগে গিয়ে বললো, চুপ থাকো। আমি তোমার চেয়ে অধিক বাকপটু, মল্লযোদ্ধা ও বীর। হজরত আলী বললেন, তুমি চুপ থাকো। তুমিতো আল্লাহ্র অবাধ্য। এঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত(১৮)।

বলা হলো— 'তবে যে ব্যক্তি মুমিন, সে কি পাপাচারীর ন্যায়? তারা সমান নয়'। এখানে 'ফাসেক্ব' অর্থ বিশ্বাসবিবর্জিত, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, কাফের।

উল্লেখ্য, হজরত আলী এবং ওলীদ ইবনে উকবার বচসার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। একথা হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বিভিন্ন সূত্রপরম্পরায় ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আতা ইবনে ইয়াসারের বিবৃতির অনুরূপ ওয়াহেদী ও ইবনে আসাকেরের বিবৃতি সংকলন করেছেন ইবনে জারীর। খতিব বাগদাদী তাঁর 'ইতিহাস' গ্রন্থে উপরন্তু কালাবীর মাধ্যমে আবু সালেহ সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে আদী। আবার আমর ইবনে দীনারের উদ্ধৃতিতে ইবনে লেহিয়ার মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃত উক্তিটি সংকলন করেছেন ইবনে আসাকের। সবগুলো বিবরণের তথ্য একই। অর্থাৎ হজরত আলী ও ওলীদ ইবনে উকবার বচসাই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত। 'তারা সমান নয়' অর্থ বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী কখনোই সমান্তরাল নয়। তাদের উভয়ের কর্মকাণ্ড, গতিবিধি ও গন্তব্য বিপরীতমুখী। এই বিপরীতমুখিতা সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াত চতুষ্টয়ে।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'যারা ইমান আনে, সৎকর্ম করে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য তাদের স্থায়ী বাসস্থান হবে জান্নাত'। একথার অর্থ— বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলেরা যাবে জান্নাতে। সেখানে তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে সাদর আপ্যায়নের বিপুল আয়োজন।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'এবং যারা পাপাচার করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম; যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাতে এবং তাদেরকে বলা হবে, যে অগ্নিশাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে, তা আস্বাদন করো।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য, মানুষের প্রকৃত স্বদেশ হচ্ছে জান্নাত আর বিদেশ জাহান্নাম। সে যদি স্বদেশে ফিরে যেতে না চায়, তবে তাদেরকে ঠেলে দেয়া হবে বিদেশ বা জাহান্নামের দিকেই। আর বিদেশবাস তাদের জন্য হবে চিরস্থায়ী। এখানকার 'উয়ীদূ ফীহা' (ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাতে), কথাটির মধ্যে রয়েছে সে বক্তব্যেরই ইঙ্গিত। আর 'ওয়া ক্বীলা লাহুম' (তাদেরকে বলা হবে) অর্থ তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অপমান করার উদ্দেশ্যেই তখন বলা হবে— যে অগ্নিশাস্তিকে তোমরা অস্বীকার করতে, এখন ভোগ করো সেই আগুনেরই শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাবো, যাতে তারা ফিরে আসে'। একথার অর্থ— পরকালের কঠিন শাস্তির পূর্বে আমি তাদেরকে এই দুনিয়ায় আস্বাদন করাবো লঘু শাস্তি, যাতে তাদের চৈতন্যোদয় হয়, ফিরে আসার সুযোগ পায় সত্যের পথে।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব, জুহাক, হাসান বসরী ও ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, এখানে 'লঘু শাস্তি' বলে বুঝানো হয়েছে অবিশ্বাসীরা পৃথিবীতে যে সকল রোগ-শোক ও দুঃখ বিপদে ভোগে, সেই সকল সমস্যাকে। দায়লামীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। ইকরামা বলেছেন, এখানে 'লঘু শাস্তি' অর্থ শরিয়তের ইহজাগতিক দণ্ডবিধান। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'লঘু শাস্তি' দ্বারা বুঝানো হয়েছে মক্কার পৌত্তলিকদের উপরে আপতিত সুদীর্ঘ ছয় বৎসরের একটানা দুর্ভিক্ষের কথা। ওই সময় তারা ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়েছিলো মৃত জন্তুর হাড় মাংস খেতে। কুকুরের গোশত পর্যন্ত ভক্ষণ করতে হয়েছিলো তাদেরকে।

'যাতে তারা ফিরে আসে' অর্থ বদর যুদ্ধের পরে যে সকল পৌত্তলিক বেঁচে ছিলো, যারা রক্ষা পেয়েছিলো দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে তারা যেনো লাভ করে ইসলামে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা থেকে মুখ ফিরায় তার অপেক্ষা অধিক জালেম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি'।

এখানে 'মুখ ফিরায়' অর্থ আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে তারা চিন্তা-ভাবনা মাত্রই করে না, অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল ও কোরআনকে। আর এখানকার 'ছুম্মা' পরম্পরা-প্রকাশক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে বিস্ময় প্রকাশার্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী তো প্রকাশ্যেই পরিদৃশ্যমান, অথচ অংশীবাদীরা কতোইনা জালেম! তারা এ সম্পর্কে একটু ভেবেও দেখলো না।

www.eelm.weebly.com

'আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি' অর্থ, এটাই আমার চিরাচরিত নিয়ম যে, যারা অপরাধী তারা আমার দ্বারা অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আর মক্কার পৌত্তলিকেরা তো সবচেয়ে বড় অপরাধী। কেননা তারা অস্বীকার করে চলেছে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশেষ রসুল ও সর্বশেষ মহাগ্রন্থকে। সুতরাং তাদেরকে শাস্তি তো আমি দিবোই।

সূরা সাজ্‌দা ঃ আয়াত ২৩, ২৪

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٣﴾ وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ۗ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

r আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম; অতএব তুমি তাহার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ করিও না, আমি ইহাকে বনী ইসরাইলের জন্য পথ-নির্দেশক করিয়াছিলাম।

r আর আমি উহাদের মধ্য হইতে নেতা মনোনীত করিয়াছিলাম যাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ-প্রদর্শন করিত। যেহেতু উহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল আর উহারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমিতো মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতএব তুমি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ কোরো না'। একথার অর্থ— হে আমার সর্বশেষ রসুল! আপনাকে যেমন কোরআন দিয়েছি, মুসা নবীকেও তেমনি দিয়েছিলাম একটি কিতাব। সুতরাং মুসা নবী যেমন আমা কর্তৃক প্রদত্ত ওই গ্রন্থ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি আপনিও হৃদয়ের সকল অনুরাগ দিয়ে গ্রহণ করুন এই কোরআনকে, এ সম্পর্কে দ্বিধা আড়ষ্টতাকে প্রশ্রয় দিবেন না মোটেও। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন সুদ্দী। আর হজরত ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যাটি, যা রসুল স. কর্তৃক অনুমোদিত, তা বর্ণনা করেছেন তিবরানী। ব্যাখ্যাটি এরকম— নবী মুসা আল্লাহ্‌র সাক্ষাত পেয়েছিলেন তুরপর্বতে, সুতরাং হে আমার সর্বশেষ নবী! আপনি বিষয়টিকে অস্পষ্ট কোনো বিষয় বলে মনে করবেন না। কেউ কেউ বক্তব্যটির মর্মার্থ করেছেন এভাবে— এ বিষয়টি সন্দেহাতীত যে, মেরাজ রজনীতে রসুল স. এর সঙ্গে সাক্ষাত ঘটেছিলো হজরত মুসার। যেমন বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মেরাজ রজনীতে নবী মুসার সঙ্গে সাক্ষাত ঘটেছিলো আমার। তিনি ছিলেন ঝাঁকড়া চুল

www.eelm.weebly.com

বিশিষ্ট কৃশকায় ও সুন্দর। দেখে মনে হচ্ছিলো, তিনি হয়তো শিনওয়া গোত্রের কেউ। ঈসা নবীর সাক্ষাতও পেয়েছিলাম আমি। তিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির। তাঁর গায়ের রঙ যেনো দুধে আলতায় মেশানো। আর তাঁর মাথায় ছিলো বাবরী চুল। আরো অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো ওই রাতে। যেমন দোজখের প্রহরীপতি মালেক, অভিশপ্ত দাজ্জাল। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন 'অতএব তুমি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ কোরো না'।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, একবার আমি এক প্রবাসযাত্রায় সহযাত্রী হলাম রসুল স. এর। কাফেলা চলছিলো এক গিরি উপত্যকার পাশ দিয়ে। তিনি স. প্রশ্ন করলেন, এটা কোন উপত্যকা? আমাদের মধ্যে একজন বললেন, আম্‌রক। তিনি স. বললেন, মেরাজরজনীতে আমি উড়ে গিয়েছিলাম এই উপত্যকার উপর দিয়ে। হঠাৎ দেখলাম, মুসা নবী তাঁর দুই কর্ণে আঙুল প্রবেশ করিয়ে উচ্চস্বরে 'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক' বলে আল্লাহ্‌কে ডাকছেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এরপর আমরা আরো অগ্রসর হলাম। এবার পৌঁছলাম আর এক গিরিপথের সন্নিকটে। রসুল স. বললেন, এটা কোন গিরিপথ? আমরা বললাম, মারশা। তিনি স. বললেন মেরাজের রাতে এখানেই আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো নবী ইউনুসের। তিনি ছিলেন একটি লোহিতবর্ণ উষ্ট্রীপৃষ্ঠে আরুঢ়। সর্বাঙ্গ আবৃত ছিলো তাঁর দীর্ঘ পরিচ্ছদে। হাতে ছিলো উষ্ট্রীর লাগাম। তিনিও পথ চলছিলেন 'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক' (এই যে আমি, এই যে আমি) বলতে বলতে।

সুরা বনী ইসরাইলের তাফসীর ব্যাপদেশে মেরাজ সম্পর্কিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. এর সঙ্গে নবী মুসার দেখা হয়েছিলো ষষ্ঠ আসমানে। সেখানে তাঁদের মধ্যে নামাজের ওয়াক্তের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনাও হয়েছিলো। আবার হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মেরাজ রজনীতে আমি রসুল মুসাকে তাঁর সমাধিতে নামাজ পাঠরত অবস্থায় দেখেছি।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি একে বনী ইসরাইলের জন্য পথপ্রদর্শক করেছিলাম'। একথার অর্থ— আমি রসুল মুসার উপরে যে মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছিলাম, সেই মহাগ্রন্থকেই উপলক্ষ করেছিলাম বনী ইসরাইলদের সুপথপ্রাপ্তির। কাতাদা অর্থ করেছেন— আমি মুসাকে পথপ্রদর্শক করেছিলাম বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর। হজরত ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যাও এরকম। আর তাঁর এরকম ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন তিবরানী।

পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করতো'। একথার

www.eelm.weebly.com

অর্থ— আমি বনী ইসরাইলদের বংশে মনোনীত করেছিলাম অনেক নবী। তাঁরা আল্লাহ্‌র নির্দেশানুসারেই জনগণকে পথপ্রদর্শন করতেন। অথবা আমা কর্তৃক প্রদত্ত সামর্থ্য আনুসারেই তাঁরা মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করতেন। কাতাদা বলেছেন, এখানে পথপ্রদর্শনকারীরূপে নবীগণের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে বনী ইসরাইলদের বিভিন্ন শাখাগোত্রের নেতৃবৃন্দকে। বিভিন্ন কল্যাণকর বিষয়ে জনতা তাদের অনুসরণ করতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিলো' একথার অর্থ— মিসরে অবস্থানকালে ওই সকল নেতৃবর্গকে সহ্য করতে হয়েছিলো অনেক রকম নিগ্রহ। আলোচ্য বাক্যাংশের দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিপদাপদে ধৈর্যধারণ নেতাদের জন্য একটি অত্যাবশ্যক গুণ। এরকমও বলা যায় যে, যারা চরম বিপদে ধৈর্যধারণ করে, তারাই হতে পারে জননেতা।

শেষে বলা হয়েছে— 'আর তারা ছিলো আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী'। একথার অর্থ— পথপ্রদর্শন, ধৈর্যধারণ এ সকল গুণ তারা অর্জন করতে পেরেছিলো একারণেই যে, তারা আমা কর্তৃক অবতারিত মহাগ্রন্থ তওরাতের আয়াতসমূহ দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে অধ্যয়ন করতো।

সূরা সাজ্‌দা ঃ আয়াত ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ
يَمْشُونَ فِي مَسٰكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ
يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَآءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ
مِنْهُ أَنْعٰمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا
الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِيمٰنُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾

r উহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিতেছে তোমার প্রতিপালকই কিয়ামতের দিন তাহাদের মধ্যে উহার ফয়সালা করিয়া দিবেন।

www.eelm.weebly.com

r ইহাও কি তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিল না যে, আমি তো ইহাদের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি কত মানবগোষ্ঠী-যাহাদের বাস ভূমিতে ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে; তবুও কি ইহারা শুনিবে না?

r উহারা কি লক্ষ্য করে না, আমি ঊষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করিয়া উহার সাহায্যে উদ্‌গত করি শস্য, যাহা হইতে আহার্য গ্রহণ করে উহাদের আন্'আম এবং উহারাও? উহারা কি তবুও লক্ষ্য করিবে না?

r উহারা জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, কখন হইবে এই ফয়সালা?'

r বল, 'ফয়সালার দিনে কাফিরদের ঈমান আনয়ন উহাদের কোন কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! অংশীবাদীরা না জেনে, না বুঝে কেবল বিদ্বেষবশত আপনার সঙ্গে মতবিরোধ করছে। তাদের এ মতোবিরোধের চূড়ান্ত সমাধান এ পৃথিবীতে হবে না, হবে পরকালে হাশরের মাঠে। তখন আল্লাহ্ চিরদিনের জন্য সত্য ও মিথ্যাকে পৃথক করে দিবেন। ফলে মতোবিরোধের কোনো সুযোগ তখন কেউই পাবে না।

পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'এটাও কি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করলো না যে, আমি তো তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কতো মানবগোষ্ঠী— যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, তবুও কি এরা শুনবে না'? একথার অর্থ— মক্কার পৌত্তলিকেরা তো ওই সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর বিরাণ লোকালয় স্বচক্ষে দ্যাখে। ওগুলো তো তাদের বাণিজ্যপথের পাশেই। আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার এমতো মর্মবিদারক পরিণাম দেখা সত্ত্বেও কোরআনের সতর্কবাণীর দ্বারা তাদের জ্ঞানকর্ণ সচকিত হয় না কেনো? অবাধ্যতাকে পরিত্যাগ করে কেনো হয় না সত্যপথের অনুসারী? ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদগুলো তো অবশ্যই আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিশোধ গ্রহণের নিদর্শন। নিদর্শন তাঁর সর্বশক্তিধরতার।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তারা কি লক্ষ্য করে না, আমি উষরভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে উদগত করি শস্য, যা থেকে আহার্য গ্রহণ করে তাদের আনয়া'ম এবং তারাও। এরা কি তবুও লক্ষ্য করবে না'?

এখানে 'আলজুরুয্' অর্থ উষর ভূমি, নিষ্ফলা মৃত্তিকা, শ্যামলিমাবিহীন মাটি। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমিই বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে নিষ্ফলা মৃত্তিকাকে করি সঞ্জীবিত। ফলে সেখানে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন প্রকার তৃণগুল্ম, ফল ও ফসল। আর সেগুলো দ্বারা উদরপূর্তি করে মানুষ ও প্রাণীকুল। ফলে তাদের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও প্রজন্মপরম্পরা হতে পারে নির্বিঘ্ন। সতত পরিদৃশ্যমান এই

www.eelm.weebly.com

নিদর্শনটির প্রতি তবুও তারা দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না কেনো? কেনো মেনে নেয় না আল্লাহ্‌কে একমাত্র সৃজয়িতা ও পালয়িতা বলে? আর একথাটাও কেনো বুঝতে চেষ্টা করে না যে, আল্লাহ্‌তায়ালা কতো করুণাপরবশ ও শক্তিমান। তিনি যেমন এ বিশাল সৃষ্টিকে সৃজন ও প্রতিপালন করে চলেছেন, তেমনি তিনি এসকল কিছু ধ্বংস করে পুনরায় পূর্বের মতো সৃষ্টি করতেও সক্ষম। সুতরাং কেনো তারা একথা বিশ্বাস করতে চায় না যে, পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। মহাবিচারপর্বও সুনিশ্চিত।

কাতাদা সূত্রে ইবনে জারীরের একটি বিবরণ বাগবী উল্লেখ করেছেন এভাবে— সাহাবীগণ মক্কার মুশরিকদেরকে বলেছিলেন, সামনে রয়েছে আমাদের শুভদিন। আল্লাহ্‌ তোমাদের সঙ্গে আমাদের চিরবিচ্ছেদ ঘটাবেন। আমি বলি, সাহাবীগণের এমতো কথার উদ্দেশ্য ছিলো একথা বলা যে— আল্লাহ্‌ আখেরাতে তোমাদের সঙ্গে আমাদের চিরবিচ্ছেদ ঘটাবেন। কালাবী বলেছেন, সাহাবীগণ একথার মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছিলেন মক্কাবিজয়ের। সুদ্দী বলেছেন, তারা বলতে চেয়েছিলেন বদরযুদ্ধের কথা। তাঁরা আরো বলতেন, আল্লাহ্‌ই আমাদের সাহায্যকারী। তিনি আমাদেরকে তোমাদের উপরে বিজয়ী করবেন। একথা শুনে তারা উপহাস করতো। তাদের সেই উপহাসের কথাই বিবৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (২৮)।

বলা হয়েছে— 'তারা জিজ্ঞেস করে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো কখন হবে এই ফয়সালা'?

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'বলো, ফয়সালার দিনে কাফেরদের ইমান আনয়ন তাদের কোনো কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল বিদ্রূপপ্রবণ ও উন্নাসিক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে জানিয়ে দিন যে, চূড়ান্ত মীমাংসা তো হবে শেষ বিচারের দিন। আর ওই দিন হচ্ছে প্রতিফল প্রদানের দিন। সুতরাং তোমাদের ওই সময়ের বিশ্বাস তোমাদের কোনো কাজেই তো আসবে না। কারণ তখন মহাসত্য হবে সুস্পষ্ট। ফলে সত্যপ্রত্যাখ্যানের সুযোগ আর কারো থাকবেই না। থাকবে না নতুন করে বিশ্বাসানুকূল আমলের অবকাশ। অবশ্য যারা এখানকার 'ফয়সালা' এর অর্থ করেন বদর দিবস, তারা বক্তব্যটির মর্মার্থ করেন এভাবে— বদরের যুদ্ধে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তারা সম্মুখীন হবে ভয়াবহ শাস্তির। তখন তারা বিশ্বাস গ্রহণ করলেও তা তাদের কোনো উপকারে আসবে না। আর সে সুযোগও তাদেরকে দেওয়া হবে না।

লক্ষণীয়, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রশ্নটি ছিলো 'কখন হবে এই ফয়সালা'? তার উত্তরে এখানে বলা হয়েছে 'ফয়সালার দিনে তাদের ইমান আনয়ন তাদের কোনো কাজে আসবে না, আর সে অবকাশও তাদেরকে দেওয়া হবে না'।

www.eelm.weebly.com

বাহ্যতঃ মনে হয় জবাবটি যথাযথ নয়। কিন্তু একটু গভীরে ভাবলেই বোঝা যায়, এটাই ছিলো তাদের প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব। কারণ বিজয়ের দিন তারিখ জানার উদ্দেশ্য তাদের মোটেও ছিলো না। তারা মুসলমানদের বিজয়ের কথা একেবারেই বিশ্বাস করতো না। সুতরাং ফয়সালার দিনক্ষণ জানিয়ে আর লাভ কী? বরং তাদের ব্যাঙ্গাত্মক প্রশ্নের প্রেক্ষিতে একথা বলাই তো উচিত যে, ফয়সালার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে আর কী লাভ? তোমরা তো একথা বিশ্বাসই করো না। তবে এতটুকু শুনে নাও যে, ফয়সালার দিবস যখন সমাগত হবে, তখন বাস্তব অবস্থা দেখে শাস্তি থেকে অব্যাহতির নিমিত্তে যদি তোমরা তখন ইমানও আনো, তবুও তো তা গৃহীত হবে না। আর সে অবকাশই বা তোমাদেরকে দেওয়া হবে কেনো? তোমরা যে চিরভ্রষ্ট। উল্লেখ্য, এই যুক্তিসঙ্গত জবাবটিকেই উপস্থাপন করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

সূরা সাজদা ঃ আয়াত ৩০

فَاَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ وَ انۡتَظِرۡ اِنَّهُمۡ مُّنۡتَظِرُوۡنَ ﴿۳۰﴾

r অতএব তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং অগ্রাহ্য কর, উহারাও অপেক্ষা করিতেছে।

এখানে 'অতএব তুমি তাদেরকে অগ্রাহ্য করো' অর্থ হে আমার রসুল! আপনি তাদের অপবচনসমূহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করবেন না। তারা যা বলে ও করে, তা-ই বলতে ও করতে দিন তাদেরকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রহিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতের বিধান।

'এবং অপেক্ষা করো' অর্থ, আপনি অপেক্ষা করুন ওই বিজয়ের, যে বিজয়ের অঙ্গীকার আমি করেছি। আর 'তারাও অপেক্ষা করছে' অর্থ অবধারিত অশুভ পরিণামের জন্য তারাও অতিবাহিত করছে বহমান সময়। কেউ কেউ কথা দু'টোর মর্মার্থ করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আপনি অপেক্ষা করুন শাস্তি আগমনের আর তারা অপেক্ষা করুক শাস্তিভোগের।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. ফজরের নামাজে পাঠ করতেন সুরা সাজদা ও হাল আতা আ'লাল ইনসান। হজরত জাবের বলেছেন, রসুল স. সুরা সাজদা ও সুরা মুলক তেলাওয়াত না করে শয্যাগ্রহণ করতেন না। আহমদ, তিরমিজি, দারেমী। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত।

হজরত খালেদ ইবনে মা'দান বলেছেন, আমি সুরা সাজ্‌দা ও সুরা মুলক সম্পর্কে একটি ঘটনা জানি। ঘটনাটি এই— এক লোক প্রতিদিন সুরা দু'টো পাঠ করতো। তার মৃত্যুর পরে সুরা দু'টো তাকে ঘিরে ফেলে আল্লাহ্ সকাশে সুপারিশ

www.eelm.weebly.com

করলো, হে মহাদয়াপরবশ আল্লাহ্। তুমি এ লোকের উপরে সদয় হও। নিশ্চিহ্ন করে দাও তার পাপরাশিকে। সে প্রতিদিন আমাদেরকে আবৃত্তি করতো। আল্লাহ্তায়ালা তাদের সুপারিশ গ্রহণ করলেন। ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন, লোকটির পাপরাশি মুছে ফেলো। তৎপরিবর্তে লিখে দাও পুণ্য। আর তার মর্যাদাও করে দাও অধিকতর উন্নত।

এক বর্ণনায় এসেছে, এই সুরা দু'টো কবরে হবে তাদের পাঠকের প্রতিনিধি। নিবেদন জানাবে, হে মহাপ্রভুপালক! আমরা যদি তোমা কর্তৃক অবতারিত গ্রন্থের সুরা হয়ে থাকি, তবে এই লোকের জন্য আমাদের সুপারিশ গ্রহণ করো। আর যদি তা না হই, তবে তোমার মহাগ্রন্থ থেকে আমাদেরকে অপসারিত করে দাও। এই বলে সুরা দু'টো তাদের ডানা বিস্তার করে দিবে তার পাঠকের উপর। এভাবে আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্ত করবে তাদের পাঠককে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, অন্যান্য সুরার তুলনায় এই সুরার মর্যাদা ষাট গুণ বেশী। দারেমী।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে দায়লামী ও ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরা সাজদা ও সুরা মুলক পাঠ করলো, সে যেনো সওয়াব লাভ করলো কদর রাতের ইবাদতের। হজরত ইবনে ওমর থেকেও ইবনে মারদুবিয়া অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতি বলেছেন, বর্ণনাটি তাঁর নিজস্ব।

সূরা আহযাব

সুরা আহযাব অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এই সুরার রুকুর সংখ্যা ৯ এবং আয়াতের সংখ্যা ৭৩। হজরত উবাই ইবনে কা'ব হজরত আবু জরকে একবার বলেছিলেন, বলুন, কয়টি আয়াত রয়েছে সুরা আহযাবে? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, তিয়াত্তরটি। হজরত উবাই ইবনে কা'ব তখন বলেছিলেন, আল্লাহ্র শপথ। এই সুরাটি তো ছিলো সুরা বাকারার মতো দীর্ঘ, অথবা তদপেক্ষাও বড়। এই সুরাতেই তো আমি পাঠ করেছি এই আয়াতটি— 'আশ্শায়খু ওয়াশশাইখাতু ইজা যানায়া ফারজুমুহুমা নাকালাম মিনাল্লাহি ওয়াল্লহু আযীযুন হাকীম'।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَ لَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ

www.eelm.weebly.com

اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ﴿۱﴾ وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ﴿۲﴾ وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى
بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۳﴾

r হে নবী! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করিও না। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

r তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা ওহী হয়, তাহার অনুসরণ কর; তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্‌তো সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

r আর তুমি নির্ভর কর আল্লাহ্‌র উপর, এবং কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

জুহাক সূত্রে জুয়াইবীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা, শায়বা ইবনে রবীয়া প্রমুখ কুরায়েশ গোত্রপতি একবার রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে প্রস্তাব দিলো, আপনি আপনার মতাদর্শ পরিত্যাগ করুন, আমরা আমাদের সম্পদের একাংশ আপনাকে দান করবো। এদিকে মদীনার মুনাফিক ও ইহুদীরা হুমকি দিলো, হে মোহাম্মদ! আপনি যদি আপনার ধর্মাদর্শ প্রচার স্থগিত না করেন, তবে আমরা আপনাকে হত্যা করবো। তাদের এমতো প্রস্তাব ও হুমকির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথমোক্তটি।

বলা হলো— 'হে নবী! আল্লাহ্‌কে ভয় করো'। লক্ষণীয় এখানে রসুল স.কে নাম ধরে ডাকা হয়নি। সম্বোধন করা হয়েছে 'হে নবী' বলে। এভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে রসুল স. এর অনন্যসাধারণ মর্যাদাকে। একথাটিও প্রমাণ করা হয়েছে যে, তিনি সাধারণ কোনো ব্যক্তি নন, তিনি একজন মহামর্যাদাসম্পন্ন নবী। আবার 'ভয় করো' বলেও একথা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভয় বা 'তাক্বওয়া'র গুরুত্ব কতো বেশী এবং সেই ভয় আল্লাহ্‌র নবীগণের জন্য কতো প্রয়োজনীয়।

বাগবী লিখেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আবু সুফিয়ান ইবনে হরব, ইকরামা ইবনে আবু জেহেল ও আবুল আয়ওয়ার আমর ইবনে সুফিয়ান সালামীকে উদ্দেশ্য করে। উহুদ যুদ্ধের পর এই নেতৃত্রয় উপস্থিত হলো মদীনার মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের বাড়ীতে। সেখান থেকে তারা রসুল স. এর কাছে আলোচনার প্রস্তাব পাঠালো। রসুল স. সম্মতি দিলেন। তারা সকলে রসুল স. এর সঙ্গে দেখা করলো। তাদের পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী সা'দ ও তু'মা ইবনে উবাইরিক প্রস্তাব রাখলো, আপনি আমাদের দেবতা লাত, উজ্‌জা ও মানাতের সমালোচনা পরিত্যাগ করুন। আর একথাও সকলকে বলুন যে, এই দেবতাগুলো তাদের উপাসকদের জন্য সুপারিশ করবে। এরকম যদি আপনি

www.eelm.weebly.com

বলেন, তবে আমরা আপনার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াবো না। রসুল স. তাদের কথা শুনে মর্মাহত হলেন। সেখানে উপস্থিত হজরত ওমর বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! অনুমতি দিন, আমি এদের শিরোশ্ছেদ করি। রসুল স. বললেন, না, তা হয় না। আমি এদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছি যে। তারপর তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা এবার যেতে পারো। তোমাদের উপর বর্ষিত হোক আল্লাহ্র ক্রোধ ও অভিসম্পাত। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

কোনো কোনো ভাষ্যকার লিখেছেন, এখানে রসুল স. কে সরাসরি সম্বোধন করা হলেও, এর বিধান (ভয় করো) প্রযোজ্য হবে সমগ্র উম্মতের উপর। জুহাক বলেছেন আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি ভয় করুন কেবল আল্লাহ্কে এবং বজায় রাখুন বিধর্মীদের সঙ্গে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ভয় করো' কথাটির মর্মার্থ হবে— আত্মরক্ষা করুন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কাফেরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য কোরো না'। একথার অর্থ— আর আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী আবু সুফিয়ান, আবুল আয়্ওয়ার এবং কপটবিশ্বাসী আবুদল্লাহ্ ইবনে উবাই, আবদুল্লাহ্ ইবনে সা'দ তু'মা ইবনে উবাইরিক প্রমুখের প্রস্তাব মানবেন না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তো তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে জানেনই যে, কে দুর্বৃত্ত এবং কে সুশীল। তাঁর সকল ব্যবস্থাপনায় রয়েছে তাঁর অপার প্রজ্ঞার প্রভাব।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা ওহী হয়, তার অনুসরণ করো'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার পরম প্রভুপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়, আপনি অনুসরণ করুন কেবল সেই প্রত্যাদেশের। এ কথার মাধ্যমে প্রবলতর করা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত নির্দেশটিকে। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি কেবল আল্লাহ্কে ভয় করুন, কাফের মুনাফিকদের অমান্য করুন এবং অনুসরণ করুন কেবল প্রত্যাদেশিত বিষয়ের।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তো সে বিষয়ে সম্যক অবহিত'। এখানে রসুল স. সহ সম্বোধন করা হয়েছে সাহাবীগণকেও। পূর্বের আয়াতে একবচনবোধক সম্বোধন ব্যবহৃত হলেও, সেই সম্বোধনের মধ্যেও সাহাবীগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে এখানে খোলাখুলিভাবে' তোমরা' সম্বোধন করা হয়েছে এজন্যে যে, এতে করে যেনো প্রস্তুত হয় অধিকতর মান্যতার মনোভাব। যেনো অধিকভাবে সাহাবীগণের মনে সৃষ্টি হয়শাস্তির ভীতি ও পুরস্কারের প্রতীতি।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'আর তুমি নির্ভর করো আল্লাহ্‌র উপর এবং কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট'। জুজায বলেছেন, বাক্যটি বিবৃতিমূলক হওয়া সত্ত্বেও অনুজ্ঞা অর্থ প্রকাশক। এর মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করাই যথেষ্ট। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি পুরোপুরি কেবল তাঁর প্রতিই নির্ভরশীল হোন। কারণ তিনিই কেবল সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, মহাদয়াপরবশ। সকল কর্মের সমাধান কেবল তাঁর অধিকারায়ত্ত। সুতরাং অপর কারো প্রতি নির্ভর করার অবকাশ মাত্র নেই।

সূরা আহ্‌যাব ঃ আয়াত ৪

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنۡ قَلۡبَيۡنِ فِىۡ جَوۡفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزۡوَاجَكُمُ الّٰٓـئِْ تُظٰهِرُوۡنَ مِنۡهُنَّ اُمَّهٰتِكُمۡ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدۡعِيَآءَكُمۡ اَبۡنَآءَكُمۡ ؕ ذٰلِكُمۡ قَوۡلُكُمۡ بِاَفۡوَاهِكُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ يَقُوۡلُ الۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِى السَّبِيۡلَ ﴿۴﴾

r আল্লাহ্ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই; তোমাদের স্ত্রীগণ, যাহাদের সহিত তোমরা জিহার করিয়া থাক, তিনি তাহাদিগকে তোমাদের জননী করেন নাই এবং তোমাদের পোষ্য পুত্রদিগকে, তিনি তোমাদের পুত্র করেন নাই; এইগুলি তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ কোনো মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি'। একথা অনস্বীকার্য যে, হৃৎপিণ্ড হচ্ছে সকল কর্ম-পরিকল্পনার কেন্দ্র। আর কেন্দ্র যেহেতু একাধিক হয় না। তাই কারও হৃৎপিণ্ডও একাধিক হতে পারে না। যদি কারো দু'টি হৃদয়ের অস্তিত্ব ধরেও নেওয়া যায়, তবে দেখা যাবে একটি দ্বারাই সমাধা হচ্ছে সকল পরিকল্পনা এবং অপরটি রয়েছে বেকার। অথবা দুই হৃদয় দ্বারা সাধিত হচ্ছে একটিই পরিকল্পনা। তাহলে দু'টি হৃদয়ের প্রয়োজনই বা কী? সুতরাং একটিই তো যথেষ্ট। কিংবা যদি ধরা যায় একটি হৃদয় দ্বারা সে একটি কাজের পরিকল্পনা করবার পর তা বাস্তবায়িতও করলো। পরে কাজে লাগালো অপরটিকে। তখন অপর হৃদয়টি বাতিল করে দিলো প্রথমোক্ত কর্মটিকে। এমনি করে হৃদয়ে হৃদয়ে শুরু হলো দ্বন্দ্ব। এমতো অবস্থা কি সুখকর, না অভিপ্রেত। এরকম হলে তো জগতের সকল কর্মকাণ্ডই হয়ে পড়বে বিপর্যস্ত, ভণ্ডুল।

www.eelm.weebly.com

সুদ্দী ও ইবনে নাজীহের সূত্রে বাগবী ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, আবু মুয়াম্মার জামীল ইবনে মুয়াম্মার ফিহরী নামক এক লোক ছিলো প্রখর মেধাসম্পন্ন। কোনো কিছু একবার শুনলেই সে তা স্মরণবদ্ধ করে রাখতে পারতো। লোকে তাই বলতো আবু মুয়াম্মারের রয়েছে দু'টি হৃদয়। সে নিজেও ফলাও করে বলতো, আমার হৃৎপিণ্ড দুইটি। মোহাম্মদ যা বোঝে, আমি আমার একটি হৃদয় দিয়েই তা বুঝি আরো ভালোভাবে। তার এমতো গর্হিত বচনের পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য প্রতিবাদটি।

বদরের রণক্ষেত্রে যখন মুশরিকবাহিনী পরাস্ত হলো, তখন আবু মুয়াম্মার পালাতে শুরু করলো ঊর্ধ্বশ্বাসে। তার পায়ে ছিলো তখন একটি জুতো, আর একটি ছিলো তার হাতে। আবু সুফিয়ান তার এ অবস্থা দেখে বললো, কী আবু মুয়াম্মার, এভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছো কেনো? আবু মুয়াম্মার বললো, কুরায়েশরা পরাজয় বরণ করেছে। আবু সুফিয়ান বললো, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তোমার জুতো কেনো একটি পায়ে, আরেকটি হাতে? আবু মুয়াম্মার চমকে উঠে বললো, তাইতো! আমিতো মনে করেছিলাম জুতো দু'টো আমার দু'পায়েই রয়েছে। তার সাথীরাও দেখলো তার এরকম উদভ্রান্ত অবস্থা। সেই থেকে তাদের ধারণা গেলো পাল্টে। সকলেই বুঝলো, তার দু'টো হৃদয়ের ব্যাপারটি একটি প্রচারণা মাত্র।

খসীফ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, ইকরামা এবং মুজাহিদ বলেছেন, আরব দেশে ছিলো একজন দুই হৃদয়বিশিষ্ট লোক। তাকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য বাক্যটি।

আউফির মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। আউফি আবার কাতাদার মাধ্যমেও বর্ণনা করেছেন হাসান বসরীর অনুরূপ মন্তব্য। শেষোক্ত বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে এসেছে এই কথাটুকু— সে বলতো, আমার একটি হৃদয়ে কোনো অনুপ্রেরণার উদয় হলে অপরটি তা নাকচ করে দেয়।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার রসুল স. সহসা দণ্ডায়মান হলেন। তাঁর অন্তরে সৃষ্টি হলো কী রকম যেনো এক দ্বিধা-সংকোচ। তাই তিনি স্থির করতে পারলেন না কী করবেন এখন। তাঁর এরকম অবস্থা দেখে এক কপটবিশ্বাসী বলে বেড়াতে লাগলো, মোহাম্মদের রয়েছে দুটি হৃদয়। একটি সংলিপ্ত তোমাদের সঙ্গে। আর একটি সংযুক্ত অপর কারো দিকে। এমতো ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য বাক্যটি। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি উত্তম সূত্রবিশিষ্ট।

www.eelm.weebly.com

জুহুরী ও মুকাতিল বলেছেন, দোদুল্যচিত্তদেরকে লক্ষ্য করে আলোচ্য বাক্যটি অবতীর্ণ হয়নি। আবার এর প্রকাশ্য অর্থও গ্রহণীয় নয়। বরং আল্লাহ্পাক এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন ওই ব্যক্তির কথা, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে জেহার করে থাকে (জেহার বলে বিবাহনিষিদ্ধ রমণী যেমন মা, খালা বা ভগ্নির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে আপন স্ত্রীর কোনো অঙ্গের তুলনা করাকে)। উপমা স্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে ওই ব্যক্তির প্রসঙ্গও যে অপরের পুত্রকে বলে নিজের পুত্র। যেমন সে এক মনে বলে, সে আমার স্ত্রী, আবার অপর মনে বলে, সে আমার মা। অনুরূপ অপরের সন্তানকে বলে নিজের সন্তান। আর এরূপ দৃষ্টান্ত উল্লেখের উদ্দেশ্যে একথা প্রমাণ করা যে, এক লোকের যেমন দু'টি হৃদয় থাকা সম্ভব নয়, তেমনি জেহারকারীর স্ত্রী কখনোই হতে পারে না তার মাতা। হতে পারে না একারণে যে, দু'টি বংশধারার একত্রায়ন অসম্ভব। এমতো একত্রায়ন অবাস্তব বলেই অপরের পুত্রও হতে পারে না নিজের পুত্র।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সঙ্গে তোমরা জেহার করে থাকো, তিনি তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি'। উল্লেখ্য, মূর্খতার যুগে জেহারকে মনে করা হতো তালাক। ইসলাম জেহারকে তালাক সাব্যস্ত করেনি। তবে এই বিধান দিয়েছে যে, প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত জেহারকারী তার স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক মিলন সম্পাদন করতে পারবে না।

জেহারের দৃষ্টান্ত এরকম— যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বললো, তুমি আমার মায়ের পিঠ। জেহার সম্পর্কে আমি বিশদ আলোচনা করেছি সুরা মুজাদিলার তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যায়।

বায়যাবী লিখেছেন, 'জেহার' শব্দটি এসেছে 'জাহর' থেকে। 'জাহর' অর্থ পৃষ্ঠদেশ। রূপক অর্থে পেট। উল্লেখ্য, পিঠ পেটেরই প্রকাশ্য অংশ। আগের যুগে পিঠ বলে পেটকেই বোঝানো হতো। অথবা 'জেহার' এর মর্মার্থ— কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। কারণ পিঠের দিক দিয়ে, অর্থাৎ উপুড় করে স্ত্রী সম্ভোগ করাকে সে যুগে মনে করা হতো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তিনি তোমাদের পুত্র করেননি'।

এখানকার 'আদ্য়ি'ইয়া' শব্দটি 'দাউন' এর বহুবচন। শব্দটি নিপাতনে সিদ্ধ। অর্থাৎ কাউকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করলেই সে ঔরষজাত পুত্র হয় না। তাই সে হতে পারে না উত্তরাধিকারের বিধানভূতও। সুতরাং বংশগত বৈবাহিক নিষিদ্ধতাও তার উপরে কার্যকর নয়। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে মুর্খতার যুগের পোষ্যপুত্রকে আপন পুত্র ভাবার কুসংস্কারটিকে প্রতিহত করা হয়েছে সেভাবে, যেভাবে

www.eelm.weebly.com

প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে একই ব্যক্তির দুই হৃদয়ের বিদ্যমানতাকে। তেমনি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এ কুসংস্কারটিকে যে, জেহার তালাকে বায়েন। জেহারকৃত স্ত্রী মায়ের মতো চিরতরে হারাম।

এরপর বলা হয়েছে— 'এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথনির্দেশ করেন'।

হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা ছিলেন রসুল স. এর ক্রীতদাস। তিনি স. তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। তাই তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন পোষ্যপুত্ররূপে এবং তাঁর ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে। হজরত জয়নাব বিনতে জাহাশের সঙ্গে তিনি স. তাঁকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের দাম্পত্য জীবনে তুমুল অশান্তি দেখা দিলে রসুল স. তাদের মধ্যে ঘটিয়ে দিলেন বিবাহ বিচ্ছেদ। তারপর হজরত জয়নাবকে নিজেই বিবাহ করলেন। তখন কপটাচারীরা বলে বেড়াতে লাগলো, দ্যাখো, মোহাম্মদ শেষ পর্যন্ত তার পুত্রবধুকে বিয়ে করলো। অথচ অপরের এমতো কর্মের প্রতি রয়েছে তার নিষেধাজ্ঞা। তাদের এমতো কথার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য বাক্য। এর মর্মার্থ হচ্ছে— পোষ্যপুত্র যেহেতু আপনপুত্র নয়, তাই তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিবাহ করাও তার পোষক পিতার জন্য অসিদ্ধ নয়। সুতরাং যারা এরকম বিবাহের বিরুদ্ধে বলে, তাদের কথা কথার কথামাত্র। এরকম নিরর্থক কথা গণ্যই করা যায় না। কারণ, আল্লাহ্ এমতো বিধানকে সিদ্ধ বলেছেন। সুতরাং তাঁর বিধান সত্য। আর তাঁর পথ নির্দেশনাই সরল।

উম্মতজননী হজরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন, একবার আবু হুজায়ফা ইবনে উতবা ইবনে রবীয়ার পত্নী সহলা বিনতে সহল ইবনে আমর রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আবু হুজায়ফা তাঁর এক ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিয়ে পোষ্যপুত্র বানিয়ে নিয়েছে। তাকে আমরা আপন পুত্রই মনে করি। সেও নিজের ছেলের মতো আমার কাছে যখন তখন আসে। আমার বেশবাশও তখন থাকে শিথিল। এ ব্যাপারে শরিয়তের বিধান কী? তার এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৫

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآىِٕهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْۤا اٰبَآءَهُمْ

فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ مَوَالِيْكُمْ ؕ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

www.eelm.weebly.com

جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝۵

r তোমরা তাহাদিগকে ডাক তাহাদের পিতৃ-পরিচয়ে; আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা অধিক ন্যায়সংগত, যদি তোমরা তাহাদের পিতৃ-পরিচয় না জান তবে তাহারা তোমাদের দীনি ভাই এবং বন্ধু; এই ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করিলে তোমাদের কোন অপরাধ নাই, কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকিলে অপরাধ হইবে, আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা তাদেরকে ডাকো তাদের পিতৃপরিচয়ে'। একথার অর্থ তোমাদের পোষ্যপুত্র যদি থাকে, তবে তার প্রকৃত পিতার সঙ্গে জড়িয়ে দাও তার বংশলতিকা।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটা অধিক ন্যায়সঙ্গত। এখানকার 'আক্বসাতু' শব্দটি হচ্ছে তুলনামূলক বিশেষণ। আর তুলনামূলক আধিক্য বুঝিয়ে এখানে বংশগত আধিক্য বোঝানো হয়নি, বোঝানো হয়েছে ন্যায়ানুগতার আধিক্যের কথা। অর্থাৎ এটা একটি বিশুদ্ধ সত্যবচন। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আগে আমরা জায়েদ ইবনে হারেছাকে বলতাম জায়েদ ইবনে মোহাম্মদ। তারপর একদিন অবতীর্ণ হলো 'তোমরা তাদেরকে ডাকো তাদের পিতৃপরিচয়ে.....'।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই ও বন্ধু। এ ব্যাপারে তোমরা কোনো ভুল করলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে, আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় জানতে না পারো, তবে তাদেরকে গ্রহণ কোরো তোমাদের ধর্মীয় ভ্রাতা ও বন্ধুরূপে। এই বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অথবা এই নিষেধাজ্ঞাটি ভুলে যদি তোমরা এ ব্যাপারে অপরাধ করে থাকো, তবে তোমাদেরকে অভিযুক্ত করা হবে না। কিন্তু তোমাদের ইচ্ছাকৃত ও সচেতন অপরাধ ক্ষমার্হ নয়। আর আল্লাহ্ মার্জনা করেন তাকে, যে ভুল করে গেলেও অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। কারণ তিনি ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ার্দ্র।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ এবং হজরত আবু বকর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনে শুনে আপন পিতাকে পরিত্যাগ করে অন্যকে পিতা হিসাবে গ্রহণ করে, তার জন্য জান্নাত হারাম। বোখারী, মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

www.eelm.weebly.com

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে নিজের পিতাকে ছেড়ে অন্যের পিতৃপরিচয়ে পরিচিত হয় এবং যে ক্রীতদাস তার প্রভুর বদলে স্বীকার করে অন্যের প্রভুত্ব, তার উপর মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নরূপে বর্ষিত হতে থাকবে অভিসম্পাত। আবু দাউদ। সুয়ূতী বলেছেন, বর্ণনাটি যথাসূত্রসম্বলিত।

বায়যাবী লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ীর মতে মৌখিক স্বীকৃতি দানকারী পুত্ররূপে গণ্য নয়। অর্থাৎ মুখের কথায় কেউ কারো পুত্র হয় না। ইমাম আবু হানিফা বলেন, যদি কেউ তার ক্রীতদাসকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে, তবে ওই ক্রীতদাস মুক্ত হয়ে যাবে। আবার কেউ যদি কোনো অপরিচিত বালককে পুত্র সম্বোধন করে, তবে লাভ করবে পুত্রের অধিকার। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে বায়যাবীর এই মন্তব্য সঠিক নয়। কেননা ইমাম আবু হানিফার সমাধানটি এরকম— কেউ তার ক্রীতদাসকে 'তোমাকে আমি পুত্র করলাম' বললেই সে তার পুত্র হয়ে যাবে না। আবার অজ্ঞাত কাউকে 'আমি তোমাকে আমার পুত্র করলাম' বললেও সে তার পুত্র হয়ে যাবে, এমন কথাও তিনি বলেননি। বরং তিনি বলেছেন, যদি কেউ তার চেয়ে বয়সে বড় অথবা ছোট ক্রীতদাসকে বলে 'তুমি আমার পুত্র', তবে তার উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করতে হবে। সে যদি তার এরকম কথাকে রূপক অর্থে গ্রহণ করে থাকে, তবে তার ক্রীতদাস অবশ্যই মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ রক্ত সম্পর্কীয় কেউ ক্রীতদাস থাকতে পারে না। যেমন রসুল স. বলেছেন, কেউ যদি উত্তরাধিকার সূত্রে, ক্রয়সূত্রে এবং দান সূত্রে কারো মালিক হয়ে যায়, তবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তি আপনা-আপনি মুক্ত হয়ে যাবে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ ও সুনান প্রণেতাগণ।

তবে এমতোক্ষেত্রে ভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ। বলেছেন কেউ যদি তার চেয়ে বয়সে বড় ক্রীতদাসকে 'আমার পুত্র' বলে, তবে ওই ক্রীতদাস মুক্ত হবে না। উদ্ধৃত মতবিরোধটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে অন্য আর একটি মতবৈষম্যমূলক সূত্রের উপর। ফেকাহ শাস্ত্রীয় সূত্র গ্রন্থে রয়েছে যার আলোচনা। মতবৈষম্যের বিষয়ে শব্দের রূপকার্থ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রকৃত অর্থ বিচার্য নয়। এটাই হচ্ছে পার্থক্য নিরসনের মূল সূত্র। তাই কেবল বাক্যালাপের ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ের জন্য রূপকার্থ গ্রহণ করাকেই যথেষ্ট বলে গণ্য করা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কেউ তার চেয়ে বয়সে বড় ক্রীতদাসকে 'আমার পুত্র' বললেও সে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের নিকট রূপকার্থ প্রকৃত অর্থের স্থলাভিষিক্ত নয়। অর্থাৎ যেখানে প্রকৃত অর্থ প্রয়োগের অবকাশ নেই, সেখানে রূপকার্থ গ্রহণীয় নয়। তাই তাঁদের মতে এমতাবস্থায় ওই ক্রীতদাস মুক্ত হবে না।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. যখন জেহাদের আমন্ত্রণ জানাতেন, তখন কেউ কেউ বলতো, আমরা তো প্রস্তুত। তবে পিতামাতার অনুমতি সাপেক্ষে। এমতো পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

সূরা আহ্যাব ঃ আয়াত ৬

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝٦

r নবী মু'মিনদের নিকট তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাহার পত্নীগণ তাহাদের মাতা। আল্লাহ্র বিধান অনুসারে মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যাহারা আত্মীয়, তাহারা পরস্পরের নিকটতর। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুবান্ধবের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিতে চাহ- তাহা করিতে পার। ইহা কিতাবে লিপিবদ্ধ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'নবী মুমিনগণের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর'। একথার অর্থ— বিশ্বাসবানগণের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতার চেয়ে নবীগণের সঙ্গে তাঁদের উম্মতের ঘনিষ্ঠতা অধিকতর সুদৃঢ়। এ কারণেই তাঁদের আদেশ তাঁদের বিশ্বাসবান অনুচরদের জন্য অবশ্যপালনীয়। পিতামাতার আদেশ নবীর নির্দেশের পরিপন্থী হলে তা প্রত্যাখ্যান করাও অনিবার্য। আর নবীগণ জেহাদের আহ্বান জানান আল্লাহ্র আদেশে। তাই তাঁদের সে আদেশ প্রতিপালন করতে হয় বিনাবাক্যব্যয়ে। এমতোক্ষেত্রে অজুহাত অচল।

উদ্ধৃত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাস ও আতা বলেছেন, রসুল স. এর আদেশের বিপরীত প্রবৃত্তি অবশ্যপরিহরণীয়। মনে রাখতে হবে, তাঁর আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে ইহ-পারত্রিক কল্যাণ। প্রত্যাদিষ্ট না হয়ে তিনি কোনো নির্দেশ প্রদান করেন না। এক আয়াতে একথা বলাও হয়েছে স্পষ্ট করে। যেমন— 'তিনি বিশ্বাসবানগণের হিতাকাংখী, তাদের প্রতি স্নেহ-পরবশ ও দয়ার্দ্র'।

www.eelm.weebly.com

মানুষের প্রবৃত্তি অশুভ কর্মের প্রতি সতত ধাবমান। তাই তাদের জন্য প্রবৃত্তির অনুগমন নিষিদ্ধ। রসুল স. এর নির্বিবাদ অনুগমনই হচ্ছে তাদের পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়। সুতরাং রসুল-প্রেমে হৃদয়ে পরিপূর্ণ রাখা এবং রসুলানুগত্যকে আদর্শ বলে স্থির করা ছাড়া মুক্তির আশা করা বৃথা। যারা রসুলপ্রেমিক নয়, তারা ইমানদারও নয়। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কোনো ব্যক্তিই পুরাপুরি ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার নিকট না হবো তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তুতি এবং পৃথিবীর সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইহ-পরকালে মুমিনদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রগাঢ় ও অবিচ্ছেদ্য। যদি এর প্রমাণ চাও, তবে পাঠ করো 'নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর'। পৃথিবী পরিত্যাগকারী মুমিনের সম্পদের অধিকারী হবে তার উত্তরাধিকারীরা। আর যে মুমিন অসহায়ভাবে পরিত্যাগ করে থাকে তার পরিবারবর্গকে, তারা আসবে আমার কাছে। আমিই হবো তাদের উত্তমতর অভিভাবক। বোখারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তার পত্নীগণ তাদের মাতা'। একথার অর্থ— রসুলের সহধর্মিণীগণ বিশ্বাসীগণের জননীতুল্য। সুতরাং তাঁদেরকে দিতে হবে জননীর মর্যাদা। আপন জননীর সঙ্গে বিবাহবন্ধ হওয়া যেমন হারাম, তেমনি হারাম তাঁদের সঙ্গেও। আবার অপরিচিত রমণীর সঙ্গে যেভাবে পর্দা করতে হয় সেভাবে তাঁদের সঙ্গেও পালন করতে হবে পর্দার বিধান। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা নবী-পত্নীগণের নিকট থেকে কিছু চাও, তবে তা চেয়ে নাও পর্দার অন্তরাল থেকে'।

উল্লেখ্য, রসুলেপাক স. এর পবিত্র সহধর্মিণীগণ মুমিনদের মাতা হলেও তাঁদের সন্তান-সন্তুতিরা কিন্তু মুমিনগণের ভ্রাতা ও ভগ্নি নন। আবার উম্মত জননীগণের বোন ও ভাইও নন এই উম্মতের খালা ও মামা। অর্থাৎ উম্মত জননীগণের সন্তান-সন্তুতি ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন মুমিনগণের বংশসম্পর্কিত কোনো আত্মীয় নন। যেমন হজরত যোবায়ের বিবাহ করেছিলেন জননী আয়েশার বোন হজরত আসমাকে। তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, হজরত আসমা ছিলেন তাঁর খালা। রসুল স. তাঁর আদরের দুলালী হজরত ফাতেমাকে বিবাহ দিয়েছিলেন হজরত আলীর সঙ্গে। অন্য দু'জন আদরের কন্যাকে বিবাহ দিয়েছিলেন হজরত ওসমানের সঙ্গে।

বাগবী লিখেছেন, মাসরুক সূত্রে শা'বী বর্ণনা করেছেন, একবার এক রমণী জননী আয়েশাকে সম্বোধন করলেন 'আম্মাজান' বলে। তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, আমি তোমার মা নই। আমি পুরুষ জাতির মা। বায়হাকীও বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর সুনান গ্রন্থে। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর সম্মানিতা

www.eelm.weebly.com

সহধর্মিণীগণকে জননীরূপে স্থির করার উদ্দেশ্য একথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, রসুল স. এর মহাতিরোধানের পর তাঁদেরকে বিবাহ করা মুমিনগণের জন্য হারাম। হজরত উবাই ইবনে কা'বের ক্বেরাতে এ বিষয়টি ফুটে ওঠে অধিকতর সুস্পষ্টরূপে। তিনি উচ্চারণ করতেন—'ওয়া আযওয়াজুহুম উম্মাহাতুহুম ওয়াহুয়া আবুল লাহুম' (এবং তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতা ও তিনি তোমাদের পিতা)। সুতরাং চিরাচরিত নিয়ম এই যে, সকল নবী-রসুল তাঁদের আপনাপন উম্মতের পিতা এবং তাঁদের সহধর্মিণীগণ তাদের মাতা। কেননা মানব জাতির অবিনশ্বর জীবনের মূল ভিত্তিই হচ্ছেন নবী-রসুলগণ। এভাবে নবী-রসুলগণ যেহেতু নিজ নিজ উম্মতের পিতা, তাই বিশ্বাসীগণও পরস্পরের ধর্মীয় ভাই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে মুমিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতর'।

'কিতাবুল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র গ্রন্থ। কিন্তু এখানে কথাটির মর্মার্থ হবে আল্লাহ্‌র বিধানে, অথবা লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ অদৃষ্টলিপি অনুসারে। অথবা এই আয়াত অনুসারে, কিংবা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত অনুসারে।

'যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতর' অর্থ উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানে যারা যোগ্য অংশীদার। সেকারণেই রসুল স. বলেছেন, পরিত্যক্ত সম্পদের অংশীদার হবে পরলোকগত ব্যক্তির রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন।

'মিনাল মু'মিনীন' অর্থ বিশ্বাসীগণের মধ্যে। উল্লেখ্য, রসুল স. মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বসম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তাই আনসারগণের পরিত্যক্ত সম্পদের অংশ পেতেন মুহাজিরগণও। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে এই প্রথাটি রহিত করে দেওয়া হয়। স্পষ্ট করে বলা হয় উত্তরাধিকারিত্বের ক্ষেত্রে মুহাজির-আনসার ভ্রাতৃসম্পর্ক অপেক্ষা রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনেরাই অধিকতর ঘনিষ্ঠ। অর্থাৎ এখন থেকে আত্মীয়-স্বজনেরাই পাবে পরিত্যক্ত সম্পদের অংশ। কাতাদা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে উত্তরাধিকার বণ্টন করা হতো মুহাজির-আনসার সম্পর্কের ভিত্তিতে। বাগবী লিখেছেন, কালাবী বলেছেন, রসুল স. একজন মুহাজির-একজন আনসার এভাবে জোড়ায় জোড়ায় ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁরা হতেন একে অপরের ওয়ারিশ। পরিশেষে এই বিধানটি রহিত হয়ে যায় আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে।

'উলূল আরহাম' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে যারা কোরআনে কথিত অংশীদার নয়, আবার রক্ত সম্পর্কীয়ও নয়, সেই সকল আত্মীয়কে। ইমাম শাফেয়ীর মতে 'জাবীল আরহাম' বা কেবল নিকটজন যারা, তারা উত্তরাধিকার বঞ্চিত। আর ইমাম আবু হানিফার মতে জাবীল ফুরূজ ও আসবাতগণের

www.eelm.weebly.com

অবর্তমানে তারাও অংশীদারিত্ব লাভের যোগ্য। 'জাবীল ফুরূজ' তারা, যারা প্রধান উত্তরাধিকারী। এদের কথা কোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে সুস্পষ্টরূপে। আর 'আসবাত' তারা, যারা সমুদয় ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারী হয় 'জাবীল ফুরূজের' অবর্তমানে। জাবীল ফুরূজগণের মধ্যে অংশ বণ্টনের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে, তা পায় আসবাতেরা। আর 'উলূল আরহাম' তারা, যারা অংশ পায় জাবীল আরহাম ও আসবাতের অবর্তমানে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী কোনো অবস্থাতেই 'উলূল আরহাম'গণের অংশ পাওয়ার কথাকে স্বীকার করেন না। বলেন, আসবাতের অবর্তমানে পরিত্যক্ত সম্পদ জমা করে দিতে হবে বায়তুল মালে। আমরা বলি, 'উলূল আরহাম'গণকে যেহেতু সাধারণ মুসলমান অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে সেহেতু তারা আসবাতের অবর্তমানে হবে অংশীদার।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করতে চাও, তবে তা করতে পারো'। একথার অর্থ— প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং নিকটাত্মীয় ব্যতীত তোমরা যদি তোমাদের মুহাজির ভ্রাতা অথবা যে কোনো মুসলমানকে বন্ধুত্বের খাতিরে যদি কিছু দিতে চাও, তবে সেটা হবে তোমাদের জন্য অতিরিক্তরূপে সিদ্ধ।

এখানে 'মা'রূফ' (আনুকূল্য) অর্থ অসিয়ত। অন্তিমকালে কেউ যদি তার সম্পদের কিছু অংশ অথবা সমুদয় সম্পদ তার কোনো প্রিয়জনকে সম্প্রদানের অভিলাষ প্রকাশ করে, তবে তাকে বলে অসিয়ত বা অন্তিম অভিপ্রায়। এরকম অন্তিম অভিপ্রায়ের আনুকূল্য যে পায়, তার দাবি হয় অংশীদারগণের দাবি অপেক্ষা অগ্রগণ্য। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে অসিয়তের কথা বলা হয়েছে সাধারণভাবে। কিন্তু রসুল স. এর বিধান ও ঐকমত্য এই বিধানটিকে করেছে সীমায়িত। এভাবে বিধানটি দাঁড়িয়েছে— অসিয়ত কার্যকর হবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের উপর। অর্থাৎ পরলোকগত ব্যক্তি যদি তার কোনো প্রিয়জনকে সমস্ত সম্পত্তি সম্প্রদান করার অসিয়ত করে থাকে, তবুও তার ওই প্রিয়জন এক তৃতীয়াংশের অধিক পাবে না।

প্রকাশ থাকে যে, কোরআনের বিধানানুসারে নিকটাত্মীয়দের অধিকারই সর্বাগ্রগণ্য। কিন্তু সেই অসিয়তকৃত স্বজন বা প্রিয়জনেরা এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ যার জন্য অসিয়ত করা হয়, সে নিকটাত্মীয় অপেক্ষা অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত। অথবা বলা যেতে পারে ব্যতিক্রমটি এখানে বিকর্তিত। অর্থাৎ নিকটাত্মীয় ও অসিয়তকৃত স্বজনদের মধ্যে দ্বন্দ্বগত সম্পর্কটি এখানে বিকর্তিত। বরং এমতোক্ষেত্রে সংযোজিত হয়েছে একটি নতুন বিধান, যা রহিত করে দিয়েছে পূর্বের মুহাজির ও বন্ধু-বান্ধবদের অংশীদারিত্বের বিধানকে। আর এই নতুন বিধানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে অসিয়তকে। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে এবার যে কেউ তার সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা অন্তিম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারে।

www.eelm.weebly.com

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুহাজিরীনা' কথাটির 'মিন' অব্যয়টি বিবৃতিমূলক। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে, বিশ্বাসী ও মুহাজির মৃতের স্বজন সেই অংশীদারিত্বের প্রধান হকদার। এতে করে আরো প্রতীয়মান হয় যে, অবিশ্বাসী-বিশ্বাসী, মুহাজির-অমুহাজির উত্তরাধিকারিত্বের মাপকাঠি নয়। তবে অবিশ্বাসী ও অমুহাজিরদের ক্ষেত্রে অসিয়ত করা যেতে পারে। বাগবী লিখেছেন, কাতাদা, আতা ও ইকরামা এমতো অভিমতের প্রবক্তা।

আমি বলি, এখানকার 'মিন' কে বিবৃতিমূলক ধরে নিলে তুলনামূলক শব্দরূপ 'আওলা' (নিকটতর) এর ব্যবহার এখানে ব্যাকরণসম্মত হবে না। কারণ তুলনামূলক শব্দরূপ ব্যবহারের রীতি তিনটি— হয় তার সঙ্গে যুক্ত হবে 'আলিফ লাম' অথবা পদটি হবে সম্বন্ধপদ, নতুবা তার যোজকের সঙ্গে উল্লেখিত হবে 'মিন' অব্যয়টি। অথচ এই তিনটি রীতির কোনো একটিরও প্রয়োগ এখানে নেই। পক্ষান্তরে 'মিন' অব্যয়টি এখানে বিবৃতিমূলক ধরে না নিলে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্বের বিলোপসাধনের উপর শব্দগত অথবা অর্থগত নির্দেশ হবে অসম্পূর্ণ। এভাবে দেখা দিবে একটি অমোচনীয় অসঙ্গতি। আর যদি মুমিনগণই উত্তরাধিকারীরূপে অধিক ঘনিষ্ঠ হয়, তবে এই বিষয়টিই প্রমাণিত হবে যে, মুমিন উত্তরাধিকারী বর্তমান না থাকলেও কাফের উত্তরাধিকারীকে পরিত্যক্ত সম্পদের অংশ দেওয়া যাবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ'। একথার অর্থ— উত্তরাধিকারীত্বের এই বিধানটি লিপিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহফুজের সুরক্ষিত ফলকে, অথবা কোরআনে। আবার কেউ কেউ অর্থ করেছেন— এ বিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে তওরাতে।

সূরা আহ্যাব ঃ আয়াত ৭, ৮

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُّوْحٍ وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَ اَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٧﴾ لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٨﴾

r স্মরণ কর, যখন আমি নবীদের নিকট হইতে অংগীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমার নিকট হইতেও এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও মার্য়াম-তনয় ঈসার নিকট হইতে, তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম দৃঢ়অংগীকার—

www.eelm.weebly.com

r সত্যবাদীদিগকে তাহাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য। তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! ওই অবিস্মরণীয় অঙ্গীকার দিবসের কথা স্মরণ করুণ, যখন আমি আপনার নিকট থেকে এবং নুহ-ইব্রাহিম-মুসা-ঈসাসহ সকল নবীগণের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম।

বলা বাহুল্য, কথিত অঙ্গীকার গ্রহণপর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিলো রসুলেপাক স. এর পৃথিবীর মহাআবির্ভাবের বহুপূর্বে। তখন সৃজিত হয়েছিলেন কেবল হজরত আদম। আল্লাহ্পাক তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর অনাগত বংশধরদের রূহ বের করে এক স্থানে সমবেত করেছিলেন এবং এই মর্মে সকলের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তারা পৃথিবীতে গিয়ে কেবল আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং নবী-রসুলগণ অন্যকেও আহ্বান জানাবেন এক আল্লাহ্র দিকে। আর তাঁরা আপনাপন উম্মতের প্রতি হবেন সদয় ও কল্যাণকামী। আর নিজেদের মধ্যে প্রবহমান রাখবেন পারস্পরিক সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষণ।

এখানকার 'আন্নাবীয়্যিন' কথাটির অন্তর্ভূত হয়েছেন পূর্বাপর সকল নবী-রসুল। তাঁদের মধ্যে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র কয়েকজনের নাম। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, যাঁদের নাম এখানে বলা হলো তাঁরা তাঁদের অন্যান্য সঙ্গী অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত। কেননা তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে মহাগ্রন্থ ও আকাশী পুস্তিকা। দেওয়া হয়েছে তাঁদেরকে তাঁদের সমকালের উপযোগী পৃথক পৃথক বিধান ও প্রবিধান। আরো একটি বিষয়ও এখানে প্রণিধাননীয় যে, তাঁদের সকলের আগে উল্লেখ এসেছে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর। এতে করে এ বিষয়টি আর অস্পষ্ট থাকে না যে, তিনিই রসুলশ্রেষ্ঠ, নবীকুলশিরোমনি। তিনি স. নিজেও বলেছেন, মানবজাতির শুরুতে যেমন আমি, তেমনি শেষেও। আমার মহাআবির্ভাব নবুয়তপ্রবাহের শেষ প্রান্তে। প্রায়োন্নত সূত্রপরম্পরায় কাতাদা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে সা'দ। এই হাদিসটিই আবার বাগবী বর্ণনা করেছেন কাতাদা, হাসান ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে যথা সূত্রসহযোগে। বাগবী আরো লিখেছেন, এটাই হলো আলোচ্য আয়াতের সারকথা। কেননা এখানে রসুল স. এর উল্লেখ এসেছে সকলের পুরোধারূপে সর্বাগ্রে।

ইবনে সা'দ এবং আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' গ্রন্থে মাইসারা ইবনে ফখর ইবনে সা'দের মাধ্যমে আবুল জাদআর সূত্রে এবং তিবরানী তাঁর 'আওসাত' গ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— রসুল স. বলেছেন, আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদি পিতা আদম ছিলেন দেহ ও আত্মার মধ্যবর্তী টানাপোড়েনে।

www.eelm.weebly.com

‘মীছাক্বান গলীজা’ অর্থ সুদৃঢ় অঙ্গীকার, মহামর্যাদায়িত প্রতিশ্রুতি। অথবা ওই প্রতিজ্ঞা, যা সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— ‘সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবার জন্য’। একথার অর্থ— আমার ওই অঙ্গীকার গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিলো এই, মহাবিচারের দিবসে আমি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করবো, তাঁরা তাঁদের উম্মতকে কী বলেছিলেন? অথবা অর্থ হবে— সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের লাঞ্ছিত করবার উদ্দেশ্যেই আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো, তোমরা কি তোমাদের প্রতি প্রেরীত আমার নবী-রসুলগণকে মান্য করেছিলে? কিংবা অর্থ হবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তখন আমি জিজ্ঞেস করবো, কেনো তোমরা আমার বচনবাহকগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে? তাঁরা কি সত্যবাদী ছিলেন না? আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ আবার এরকমও হতে পারে যে— যারা তাদের পৃথিবীবাসের সময় অন্তরে বাহিরে ছিলো সত্যাশ্রয়ী, সেদিন তাদের সেই সত্যপ্রীতিকে আমি চূড়ান্ত স্বীকৃতি দান করবো।

শেষে বলা হয়েছে— ‘তিনি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি’। একথার অর্থ— আর আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য যে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি, সেদিন সে শাস্তি তাদেরকে আস্বাদন করতেই হবে।

সূরা আহ্যাব ঃ আয়াত ৯

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۚ﴿۹﴾

r হে মু’মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল এবং আমি উহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী যাহা তোমরা দেখ নাই। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে এখান থেকে। ওই যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধও বলা হয়। কুরায়েশ, ইহুদী এবং আরো কতিপয় আরব গোত্রের সম্মিলিত বাহিনী তখন চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিলো মদীনাবাসী মুসলমানদেরকে। ঝঞ্ঝাবায়ু ও ফেরেশতাবাহিনী প্রেরণ করে আল্লাহ্‌পাক তখন বিতাড়িত করেছিলেন শত্রুবাহিনীকে। আল্লাহ্‌তায়ালার ওই বিশেষ অনুগ্রহের কথা

www.eelm.weebly.com

স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহ্বান জানানো হয়েছে এখানে। বলা হয়েছে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র ওই বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদেরকে অবরুদ্ধ করেছিলো, আর তিনি ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করেছিলেন। ফলে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। ফেরেশতাবাহিনীও অলক্ষ্যে প্রেরিত হয়েছিলো তোমাদের সাহায্যার্থে। আর তোমরা আত্মরক্ষার উপলক্ষ হিসেবে মদীনার চতুর্দিকে যে পরিখা খনন করেছিলে, তোমাদের সেই শুভপ্রচেষ্টাও অতি অবশ্যই ছিলো আল্লাহ্‌র গোচরীভূত।

এখানে 'জুনুদুন' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে দু'বার। প্রথমটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে শত্রুবাহিনীকে এবং ফেরেশতাবাহিনীকে বুঝানো হয়েছে পরেরটি দ্বারা। শত্রুবাহিনীতে ছিলো মক্কার কুরায়েশ, মদীনার উপকণ্ঠে বসবাসকারী বনী কুরায়জার ইহুদী ও গাতফান গোত্র। তাদের সম্মিলিত সংখ্যা ছিলো বারো হাজার।

'রীহান' অর্থ ঝঞ্ঝাবায়ু। তখন ছিলো শীতকাল। শত্রুবাহিনী গড়ে তুলেছিলো শক্তিশালী অবরোধ। কিন্তু পরিখা ভেদ করে তারা মদীনাভ্যন্তরে প্রবেশও করতে পারছিলো না। এভাবেই বয়ে যাচ্ছিলো জয়-পরাজয়হীন অনিশ্চিত সময়। সহসা এক রাতে আল্লাহ্‌পাক প্রেরণ করলেন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু। শুরু হলো প্রবল শৈত্যঝড়। শত্রুকুলের তাঁবুর খুঁটিগুলো পড়লো উপড়ে। তাঁবুগুলো হয়ে গেলো ছিন্নভিন্ন। তাঁবুর প্রদীপ, রান্নাবান্নার সরঞ্জাম সবকিছু হয়ে গেলো লণ্ডভণ্ড। যুদ্ধাশ্বগুলোও ছুটে পালাতে শুরু করলো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। ফলে পলায়ন ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর রইলো না। প্রেরিত ফেরেশতাবাহিনীকে যুদ্ধই করতে হলো না। তারা কেবল শত্রুদেরকে করে তুললো অধিকতর ভীত-সন্ত্রস্ত। গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে মুসলিমবাহিনীর সঙ্গে তারাও মুহুর্মুহু উচ্চারণ করতে লাগলো আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। কেঁপে উঠলো শত্রুদলের সেনাপতিদের বুক। তারা তাদের ছত্রভঙ্গ সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে বার বার বলতে লাগলো, বিপদ! বিপদ! পালাও! পালাও! আত্মরক্ষা করো।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আ'দ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিলো পশ্চিমী লু হাওয়া দ্বারা। আর আমাকে সাহায্য করা হয়েছিলো পূবাল বাতাস প্রেরণ করে।

পরিখার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে। একথা লেখা রয়েছে 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে। সেখানে বর্ণনাকারী হিসেবে রয়েছেন মুসা ইবনে উকবার নাম। বর্ণনাটি এরকম— চরম অপরাধের শাস্তিস্বরূপ রসুল স. মদীনা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন ইহুদীদের বনী নাজির গোত্রকে। তাদের

www.eelm.weebly.com

বিতাড়নের আট মাস পর সংঘটিত হয়েছিলো খন্দক যুদ্ধ। বহিষ্কৃত বনী নাজির গোত্র বিভিন্ন অঞ্চলে অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। এভাবে শেষে উপস্থিত হয় খায়বরে। সেখানে তাদের সঙ্গে মিলিত হয় ইহুদীনেতা সালাম ইবনে আবীল হাকীক, কেনানা ইবনে রবী ও হুয়াই ইবনে আখতাব।

বাগবী লিখেছেন, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, আমাকে পরিখা যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করেছেন ওরওয়া ইবনে যোবায়ের থেকে ইয়াজিদ ইবনে রুমান। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইবনে কা'আব ইবনে মালেক, জুহুরী এবং আসেম ইবনে আমর ইবনে কাতাদা, অধিকন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী বকর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হযম এবং মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী। সবগুলো বর্ণনার তথ্যাবলী প্রায় একই রকম। যেমন— রসুলেপাক স. এর বিরুদ্ধে সকল অমুসলিমকে একত্র করবার কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলো ইহুদী গোত্রপতি সালাম ইবনে আবীল হাকীক, হুয়াই ইবনে আখতাব, কেনানা ইবনে রবী, হাওদা ইবনে কায়েস ও আবু আমের লেওয়ায়ী। বনী নাজির ও বনী ওয়ায়েলের কিছু লোক ছিলো এদের একান্ত সহযোগী। তারা সকলে মিলে একদিন উপস্থিত হলো মক্কায়। কুরায়েশ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে বললো, মোহাম্মদকে মূলোৎপাটিত করবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করো। আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। কুরায়েশ নেতারা বললো, তোমরা জ্ঞানী গুণী সজ্জন। তোমাদের রয়েছে একটি আকাশী গ্রন্থও। মোহাম্মদের সঙ্গে তো আমাদের বিরোধ উপস্থিত হয়েছে ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে। আচ্ছা, তোমরা ঠিক করে বলোতো, তোমাদের ধর্ম উৎকৃষ্ট, না আমাদের? ইহুদীরা জবাব দিলো, তোমাদের ধর্ম সনাতন, তাই তোমরাই অধিক সত্যানুসারী। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় 'আলামতারা আ'লাল্লাজীনা ......'(আপনি কি দেখেননি তাদেরকে, যাদেরকে দেওয়া হয়েছে কিতাবের কিছু অংশ, তারা আবার বিশ্বাস করে প্রতিমা ও শয়তানকে)। ইহুদীদের জবাব শুনে কুরায়েশরা খুবই আনন্দিত হলো। প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে শুরু করে দিলো যুদ্ধ প্রস্তুতি। ইহুদীরা এবার গেলো গাতফানদের কাছে। ওই গোত্রটি ছিলো কায়েস ইবনে গাইলানের একটি শাখা। তাদেরকে বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর কথা শুনিয়ে উত্তেজিত করে তুললো ইহুদীরা। বললো, কুরায়েশরাও আমাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত। সুতরাং ভয়ের কিছুই নেই।

আমি বলি, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, কুরায়েশদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলো বনী নাজির ও বনী ওয়াইলের অন্ততঃ কুড়িজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আবু সুফিয়ান তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। বললো, তোমরা আমাদের দৃষ্টিতে মহান। কারণ, তোমরা মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চাও। আমরা তো এরকম চুক্তিকে মনে করি পরম সৌভাগ্য।

www.eelm.weebly.com

ইহুদীরা বললো, হে মান্যবর গোত্রপতি! আপনিসহ আপনার গোত্রের পঞ্চাশজনকে ঠিক করুন। আমরাও পঞ্চাশজন যোগ দিবো আপনাদের সাথে। তারপর সকলে মিলে প্রবেশ করবো কাবা শরীফের গেলাফের অন্তরালে। তারপর কাবার দেয়ালে বুক স্থাপন করে শপথ করে বলবো, মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আমরা একমত। আমাদের মধ্যে একজন জীবিত থাকা পর্যন্ত আমরা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই থাকবো। এ প্রস্তাবে একমত হলো সকলেই। ইহুদীরা এভাবে কুরায়েশদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবার পর উপস্থিত হলো গাতফান গোত্রের নিকটে। তাদেরকে বললো, যদি তোমরা আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তবে আমরা তোমাদেরকে আমাদের খায়বরের ফলের বাগানগুলোর ফল ভক্ষণ করতে দিবো ছয় মাস অথবা এক বৎসর ধরে। তাদের এমতো প্রস্তাবে একাত্মতা ঘোষণা করলো গাতফানদের গোত্রাধিপতি উয়াইনা ইবনে হুসাইন ফাজারী। তারা নিজ উদ্যোগে বনী আসাদ গোত্রকেও করে নিলো তাদের মিত্রশক্তিভূত। এভাবে আবু সুফিয়ানের সৈন্যাপত্যে গঠিত হলো এক বিশাল বাহিনী। একত্রিত হলো ইহুদী, গাতফান, বনী ফাজারা, বনী আশজাআ ইত্যাদি। নির্ধারিত দিনে তারা রওয়ানা হলো মদীনা অভিমুখে।

আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ছিলো চার হাজার সৈনিক। তদের মধ্যে অশ্বারোহী তিন হাজার ও এক হাজার উষ্ট্রারোহী। অন্যান্যরা পদাতিক। নিশান বরদারের দায়িত্ব দেয়া হলো ওসমান ইবনে আবী তালহাকে। তাঁর বাহিনী যাত্রাবিরতি করলো মাররুজ জাহরান নামক স্থানে। সেখানে একে একে সমবেত হলো বনী আসলাম, বনী আশজাআ, বনী মুররা, বনী কেনানা, বনী ফাজারা ও বনী গাতফান। সেখান থেকে সকলে একজোটে যাত্রা করলো মদীনার দিকে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর শত্রুবাহিনী উপনীত হলো মদীনার উপকণ্ঠে। বিভিন্ন গোত্রের বিচিত্র মনোবৃত্তি ও আচার আচরণের লোক মিলে শত্রুবাহিনী গঠিত হয়েছিলো বলেই এই যুদ্ধের নাম ছিলো আহযাব্ বা অসমবাহিনীর যুদ্ধ।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. যখন শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনীর মদীনা আক্রমণের সংবাদ জানতে পারলেন, তখন ডেকে পাঠালেন হজরত সালমানকে এবং তাঁর পরামর্শক্রমেই তিনি মদীনার চতুষ্পার্শ্বে খনন করালেন পরিখা।

হজরত সালমান ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। জীবনের বহু ঘাতপ্রতিঘাত উত্থানপতন পেরিয়ে দাস পরিচয়ে তাঁকে উপনীত হতে হয়েছিলো মদীনায়। রসুল স. এর সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলেই তিনি মুক্ত হতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন রসুল স. এর একান্ত প্রিয়ভাজনগণের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি প্রথম যে যুদ্ধ পেয়েছিলেন, সেই যুদ্ধেই লাভ করেছিলেন বিশেষ পরামর্শদাতার ভূমিকা। তিনি বলেছিলেন, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আমি পারস্যবাসী বলে সে দেশের যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে জানি। সেখানকার সেনাবাহিনী শত্রুবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে

www.eelm.weebly.com

পড়বার আশংকা করলে আত্মরক্ষার জন্য তাদের চতুষ্পার্শ্বে নির্মাণ করে পরিখা। এটি একটি মোক্ষম আত্মরক্ষামূলক কৌশল। তাঁর এমতো পরামর্শ রসুল স. এর মনোপূত হলো খুব। পরিকল্পনাটি শ্রমসাধ্য হলেও রসুল স. এর নির্দেশের বরকতে কিছুদিনের মধ্যেই সমাপ্ত হলো পরিখা খননের কাজ।

আমি বলি, এক হাদিসে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে— শত্রুদলের সমন্বিত বাহিনীর আক্রমণের সংবাদ রসুল স. এর শ্রুতিগোচর হলো। তৎক্ষণাৎ তিনি পাঠ করলেন 'হাসবুনাল্লহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' (আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনিই আমাদের উত্তম অভিভাবক)। এরপর মুহাজির ও আনসারগণকে ডেকে বসালেন পরামর্শসভা। সেখানে হজরত সালমান ফারসী পরামর্শ দিলেন পরিখা খননের। রসুল স. সে পরামর্শ গ্রহণও করলেন। মদীনার অভ্যন্তরভাগের দেখাশোনার দায়িত্বভার অর্পণ করলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমের উপর। তারপর সকলকে নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন পরিখার পাড়ে সশস্ত্রপ্রহরীর ভূমিকায়। সাহাবীগণ অবস্থান গ্রহণ করলেন পরিখার বিভিন্ন পাড়ে। মুহাজির-আনসার মিলিয়ে তাঁর সেনাসংখ্যা ছিলো তিন হাজার। মুহাজিরগণের নিশানবহনের দায়িত্ব পেলেন হজরত জায়েদ ইবনে হারেছা। আর আনসারগণের পতাকা তুলে ধরলেন হজরত সা'দ ইবনে উবাদা।

আমি বলি, অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ওই যুদ্ধে মুসলিমবাহিনীর ছিলো মাত্র ছত্রিশটি যুদ্ধাশ্ব। কিছুসংখ্যক অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য হয়ে উঠলো উদগ্রীব। রসুল স. তাদের মধ্যে গ্রহণ করলেন পনেরো বৎসর বয়সের উপরে যাদের বয়স, তাদেরকে। অবশিষ্টদেরকে অনুমতি দিলেন না। প্রায় যুবক যে সকল সাহাবী তখন যুদ্ধ করবার অনুমতি পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত, হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত বারা ইবনে আজীব। এরপর রসুল স. পরিদর্শন করলেন পরিখার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলো। তিনিই স. অবশ্য স্বহস্তে এঁকে দিয়েছিলেন পরিখার রেখাচিহ্ন। পেছনে রেখেছিলেন পাহাড় এবং সামনে সমতলভূমি।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আউফ বলেছেন, পরিখার যুদ্ধের সময় রসুল স. স্বহস্তে যে দাগ এঁকে দিয়েছিলেন, সে দাগের উপরেই পরিখা খনন করা হয়েছিলো। প্রতি দশজন সাহাবীর ভাগে পড়েছিলো চল্লিশ হাত পরিখা খনন করার দায়িত্ব। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সালমান ফারসীকে নিয়ে আমাদের মধ্যে শুরু হলো টানাটানি। মুহাজিরগণ বলতে শুরু করলেন, সালমান আমাদের দলভূত। আনসারগণ বললেন, না, আমাদের। রসুল স. তখন বিষয়টির সমাধান করে দিলেন একথা বলে যে, সালমান আমার পরিবারপরিজনের অন্তর্ভূত। হজরত আমর ইবনে আউফ বলেছেন, আমি,

www.eelm.weebly.com

সালমান, হুজায়ফা, নোমান এবং আরো ছয়জন আনসারের উপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো চল্লিশ হাত পরিখা খননের । আমরা যথারীতি খননকার্য শুরু করলাম। আটকে গেলাম একস্থানে এসে। সেখানে দেখা গেলো একটি প্রকাণ্ড পাথর। আমরা অনেক চেষ্টা করেও পাথরটিকে না ভাঙতে পারলাম, না পারলাম সরাতে। আমি বললাম, সালমান! রসুল স.কে সমস্যাটির কথা জানাও। দ্যাখো, তিনি কী নির্দেশ দেন। সালমান রসুল স. এর নিকটে গিয়ে সব খুলে বললেন। একটু পরেই তিনি স. উপস্থিত হলেন অকুস্থলে। পরিখার মধ্যে নামলেন তিনি। তারপর একটি শাবল দিয়ে পাথরটিতে বাড়ি দিলেন সজোরে। সঙ্গে সঙ্গে পাথরে সৃষ্টি হলো একটি ফাটল। আর সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হলো অপার্থিব আলো। সে আলোয় আলোকিত হলো মদীনার দুই প্রান্ত। মনে হলো, কেউ যেনো প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলো অন্ধকার ঘরে। রসুল স. এর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো জয়ধ্বনি। তার প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হলো সাহাবীগণের কণ্ঠে। এবার তিনি স. হানলেন দ্বিতীয় আঘাত। এবার দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো পাথরটি। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মদীনার অপর দুই প্রান্ত। এবারও মনে হলো আঁধার ঘরে যেনো সহসা প্রজ্জ্বলিত হলো প্রদীপ। এবারও জয়ধ্বনি উচ্চারিত হলো রসুল স. এর কণ্ঠে। সাহাবীগণের কণ্ঠেও উচ্চারিত হলো তার অনুরণন। এরপর তিনি স. তৃতীয়বার আঘাত হেনে চুরমার করে দিলেন পাথরটিকে। শেষে হজরত সালমানের হাত ধরে উঠে এলেন পরিখাভ্যন্তর থেকে। সালমান বললেন, হে রহমতের নবী। একী দৃশ্য দেখলাম আজ! তিনি স. সাহাবীগণের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমরা কী সালমানের কথা শুনলে? সকলে সমস্বরে বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, প্রথম আঘাতে যে আলোকস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলো, তাতে আমার সামনে পরিদৃশ্যমান হলো ইরাকশাহের রাজধানী ও হেরাপ্রদেশের মাদায়েন নগরী। আমি দেখতে পেলাম তাদের রাজপ্রাসাদ। দেখে মনে হলো যেনো পুরতঃ পতিত কুকুরের সম্মুখস্থিত মাংসাশী দাঁত। ভ্রাতা জিবরাইল বললেন, ওই হেরা ও মাদায়েন অচিরেই করতলগত হবে আপনার উম্মতের। তোমরা দেখেছো দ্বিতীয় আঘাতেও বিচ্ছুরিত হলো অপার্থিব আলোকচ্ছটা। ওই আলোতে আমার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হলো রোমীয়দের রাজপ্রাসাদ। যেভাবে তোমরা প্রত্যক্ষ করো হিংস্র কুকুরের স্বচ্ছধবল দন্তপাটি। ভ্রাতা জিবরাইল বললেন, সেদিন বেশী দূরে নয়, যখন রোমসাম্রাজ্যও পদানত হবে আপনার উম্মতের। অতএব, তোমাদের জন্য সাধুবাদ ও শুভসংবাদ। রসুল স. এর এমতো বচন শুনে সাহাবীগণের অন্তরে শুরু হলো আনন্দের ঝড়। সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, সকল স্তব-স্তুতি আল্লাহ্‌র। তাঁর অঙ্গীকার অবশ্যই সত্য। তিনিই তো আমাদেরকে শুভসংবাদ দিলেন, অবরুদ্ধ হওয়ার পর আসবে বিজয়, মহাবিজয়।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু কপটবিশ্বাসীরা একথা শুনে অন্তরে অন্তরে দগ্ধীভূত হতে শুরু করলো। সাহাবীগণের কারো কারো কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগলো, আশা আকাংখারও তো একটা সীমা আছে। মোহাম্মদ তো দেখছি কল্পনাবিহারী। তোমাদেরকেও তার কল্পনাবিহারে অংশগ্রহণ করতে বলছে। পারস্য ও রোম দু'টোই মহাপরাক্রান্ত সাম্রাজ্য। তোমাদের মতো দুর্বল ও আত্মরক্ষাচিন্তায় বিষণ্ন দলের কাছে তাদের পরাজিত হওয়া কি চাট্টিখানি কথা। সে রকম কিছু করার সামর্থ্য যদি তোমাদের থাকতো, তবে তোমরা এভাবে পরিখা খনন করে এদেশের শত্রুদের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টায় কালাতিপাত করতে না। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো— 'আর স্মরণ করো, মুনাফিকেরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিলো, তারা বলছিলো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়' (আয়াত ১২)। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে আবার অবতীর্ণ হলো— 'হে নবী! আপনি বলুন, হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌমত্বের অধিকারী'।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, শীতের সকাল। রসুল স. উপনীত হলেন পরিখার পাড়ে। দেখলেন, মুহাজির আনসার সকলেই পরিখা খননে মগ্ন। তাঁদের পানাহার হয়েছে কিনা তার খোঁজখবর নিলেন তিনি স.। তারপর আবৃত্তি করলেন—

ইন্নাল আইশা আইশুল আখিরাহ্
ফাগফিরিল আনসারা ওয়াল মুহাজিরাহ্

পারলৌকিক কল্যাণই তো প্রকৃত কল্যাণ হে আল্লাহ্! ক্ষমা করো আনসার ও মুহাজিরকে।

সাহাবীগণ আবৃত্তি করলেন—

নাহনুল লাজীনা বায়াউ' মুহাম্মাদান
আ'লাল জিহাদি মা বাক্বাইনা আবাদান।

আমরা প্রতিশ্রুত এই মর্মে যে, মোহাম্মদের সঙ্গী হয়েই আমরা যুদ্ধ করবো আজীবন।

বোখারীর বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, রসুল স.ও তখন পরিখা খননের কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মাটি ও পাথর অপসারণে তাঁর পবিত্র শরীরও তখন হয়েছিলো ধূলিধূসরিত। তিনি স. তখন কাজ করতেন ছন্দোবদ্ধ কবিতার তালে তালে। ইবনে রওয়াহা রচিত ওই কবিতাটি ছিলো এরকম—

আল্লাহুম্মা লাওলা আন্‌তা মাহতাদাই না
ওয়ালা তাসাদ্‌দাক্বনা ওয়ালা সল্‌লাইনা

www.eelm.weebly.com

ফাআন্‌যিলান্‌ সাকিনাতান আ'লাইনা
ওয়া ছাববিতিল আক্বদামা ইন লাক্বিনা
ইন্‌নাল উলা ক্বদ বাগাও আ'লাইনা
ইজা আরাদু ফিত্‌নাতান্‌ আবাইনা।
ওয়াল্লুহি লাওলাহু মাহতাদাই না।

অর্থঃ হে আমাদের আল্লাহ্‌! তুমি সামর্থ্য না দিলে আমরা কীভাবে পেতাম হেদায়েত? পাঠ করতাম নামাজ? জাকাতই বা প্রদান করতাম কীভাবে? অতএব হে আমাদের প্রভুপালক! তুমি আমাদের উপরে অবতীর্ণ করো প্রশান্তি। আর সুদৃঢ় রাখো আমাদের অবস্থান তখন, যখন আমরা হই শত্রুর সম্মুখীন। তারাই তো সীমাতিক্রমকারী। তাদের অনাসৃষ্টির কারণেই তো আমরা বার বার বাধ্য হই তাদের সশস্ত্র প্রতিপক্ষ হতে। শপথ তোমার! তুমি সুযোগ না দিলে আমরা কখনোই পেতাম না হেদায়েত।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত সালমান ছিলেন বলিষ্ঠ দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী। তিনি একাই প্রায় দশ জনের সমান কাজ করতে পারতেন। পরিখার যুদ্ধের সময় তিনি প্রতিদিন খনন করতেন পাঁচ হাত গভীর ও পাঁচবর্গহাত আয়তনের মাটি। তাঁর এমতো শক্তিমত্তা দেখে একবার তাঁর প্রতি বদনজর পড়লো কায়েস ইবনে সানা'আর। ফলে তিনি হয়ে পড়লেন সংজ্ঞাহীন। রসুল স. কায়েসকে বললেন, কোনো পাত্রের ভিতরে ওজু করো। তারপর ওই পাত্রের পানি দিয়ে সালমানকে গোসল করাও। তারপর খালি পাত্রটি উপুড় করে নিক্ষেপ করো দূরে। কায়েস তাই করলেন। হজরত সালমানও সুস্থ্য হয়ে উঠলেন।

বোখারী ও ইমাম আহমদ উল্লেখ করেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ বলেছেন, পরিখা খননের সময় আমি ছিলাম রসুল স. এর পাশে। পুরোদমে খননকার্য চলাকালে একদিন সামনে পড়ল একটি বিশাল পাথর। সেটিকে ভাঙ্গা বা অপসারণ কোনটিই করা যাচ্ছিলো না। সকলে রসুল স. সকাশে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এখন আমরা কী করবো? রসুল স. বললেন, দেখি কী করা যায়। একথা বলেই তিনি স. উপস্থিত হলেন ওই পাথরটির কাছে? তখন তিনি স. ছিলেন তিন দিনের অনাহারী। তৎসত্ত্বেও তিনি স. সজোরে আঘাত হানলেন পাথরটির উপর। সঙ্গে সঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গেলো পাথরটি। এর পর অনুমতি নিয়ে আমি ফিরে এলাম স্বগৃহে। আমার স্ত্রীকে বললাম, রসুল স. আজ নিয়ে তিন দিনের অভুক্ত। ঘরে কি কিছু আছে। সে সঙ্গে সঙ্গে বের করে আনলো একটি থলি। দেখা গেলো থলিতে রয়েছে চার সের যব। আমি উৎফুল্ল হলাম। বললাম এই যবের আটা তৈরী করো। তার পর বানাও রুটি। আর আমাদের ছাগলটাও আমি জবাই করে দেই। শুরু হলো পানাহারের আয়োজন। রান্না বান্না শেষ

www.eelm.weebly.com

হওয়ার আগেই আমি রওয়ানা হলাম। স্ত্রী বললো যাচ্ছো, যাও। কিন্তু বেশী লোককে দাওয়াত দিয়ে আবার আমাকে লজ্জায় ফেলে দিয়ো না। কারণ, অধিক লোকের আয়োজন তো নেই। আমি রসুল স. সমীপে উপস্থিত হলাম। বললাম, হে আল্লাহর প্রিয়তম রসুল! আমার গৃহে পানাহারের আয়োজন প্রায় প্রস্তুত। দয়া করে কয়েকজন সঙ্গী সাথী নিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। তিনি স. বললেন, কতজনের জন্য আয়োজন করেছো? আমি খুলে বললাম সব। তিনি স. বললেন যথেষ্ট। বরকতময়। তুমি আগেই যাও। গিয়ে তোমার গৃহিনীকে বলো আমি না আসা পর্যন্ত সে তার গোশতের হাঁড়িঁ উনুন থেকে যেনো না নামায়। আর রুটি যেনো না সেঁকে। একথা বলার পর তিনি উচ্চস্বরে সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, হে পরিখাবাসী! জাবের তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছে। সকলে মিলে চলো যাই। আমি প্রায় দৌড়ে আগে ভাগে উপস্থিত হলাম বাড়ীতে। গিন্নিকে গিয়ে বললাম, রসুল স. তো আনসার মুহাজির সকলকে দাওয়াত করে বসেছেন। বলো এখন কী করা যায়? গিন্নি বললেন, চিন্তিত হবার কী আছে। মনে করতে হবে এটাই আল্লাহ্র নির্ধারণ। আর আল্লাহ্র রসুল তো জেনে শুনেই সবাইকে আসতে বলেছেন। আমি বললাম হ্যাঁ, আমি তো তাকে সব খুলেই বলেছি। গিন্নি বললেন, তাহলে তো সব ঠিকই আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে রসুল স. তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে প্রথমে গৃহাঙ্গনে উপস্থিত হলেন তিনি। তারপর সাহাবীগণকে ডেকে বললেন, তোমরাও ভিতরে এসো। এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়িয়ো না। আমি আটার খামির রসুল স. এর সম্মুখে পেশ করলাম। তিনি স. ওই খামিরের সাথে মিশ্রিত করলেন তাঁর পবিত্র মুখের কিছু লালা। দোয়া করলেন বরকতের জন্য। উনুনে চাপানো গোশতের হাঁড়ির মুখ ঢেকে দিলেন স্বীয় রুমাল দিয়ে। এরপরেও দোয়া করলেন বরকতের জন্য। তারপর আমাকে বললেন, তোমার স্ত্রীকে এবার রুটি সেঁকতে বলো। আর তুমি বণ্টন করো গোশত। তাই করলাম আমরা। রসুল স. এর কাছে একে একে হাজির করলাম রুটি ও গোশতের টুকরা। তিনি স. রুটি ও গোশতের টুকরো বেঁটে দিতে লাগলেন সকলের হাতে হাতে। প্রায় এক হাজার সাহাবী সকলেই এভাবে আহার করলেন পরিতৃপ্তির সঙ্গে। অনেকেই পরিবেশিত খাদ্য পুরোপুরি খেতেও পারলেন না। অথচ তখন পর্যন্ত মনে হচ্ছিলো হাঁড়ি থেকে বের হয়ে আসছে গোশতের স্রোত। মনে হচ্ছিলো রুটিও যেনো ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এর পর তিনি স. আমার স্ত্রীকে বললেন, এবার তুমি খাও। তারপর উদ্বৃত্ত রুটি গোশত পাঠিয়ে দাও প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে। আজ সকলেই অনাহারক্লিষ্ট।

আমি বলি, সাহাবীগণ পরিখা খনন শেষ করেছিলেন ছয় দিনে। যথাসূত্র-সম্বলিত বিবৃতিগুলোতে এরকমই বলা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. পরিখা খনন শেষ হওয়া মাত্র মদীনার উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হলো শত্রুবাহিনী। প্রায় দশ হাজার সৈন্য ছাউনি ফেললো মুজতামাউল আসবালে। বনি গাতফান তাদের মিত্রশক্তি নজদী সেনাবাহিনীসহ অবস্থান গ্রহণ করলো উহুদ পর্বতের এক পাশে নকমীর পিছনের দিকে। ইত্যবসরে রসুল স. তাঁর প্রাণ উৎসর্গকারী তিন হাজার সাহাবী নিয়ে পরিখার পাড়ে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিলেন। ঢাল হিসেবে পিছনে রাখলেন সলআ পাহাড়কে। ফলে মুসলিম বাহিনী ও অমুসলিম বাহিনীর মাঝে অন্তরায় হলো কেবল পরিখা। আর নারী ও শিশুদেরকে রসুল স. অবস্থান গ্রহণ করতে বললেন পেছনের পর্বত শিখরে।

বনী নাজিরের গোত্রীয় নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব স্বস্থান থেকে গাত্রোত্থান করলো। প্রথমে গেলো কাআ'ব ইবনে কারাজির বাড়িতে। বনী কুরাইজার নেতা কাআ'ব তার স্বগোত্রীয়দের নিরাপত্তার স্বার্থে শান্তিচুক্তি করেছিলো রসুল স. এর সঙ্গে। সে কারণেই সে হুয়াইয়ের আগমন টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে খিল এটেঁ দিলো। হুয়াই বার বার দরজা খোলার অনুরোধ জানালো। কিন্তু কা'ব তার কথায় ভ্রূক্ষেপই করলো না। বরং বললো, দ্যাখো হুয়াই! আমি মোহাম্মদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবো না। তিনি অত্যন্ত সজ্জন ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে একনিষ্ঠ। তিনি কখনোই কারো সঙ্গে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করেননি। এরকম লোকের সঙ্গে আমি প্রতারণা করতে পারবো না। হুয়াই তবুও নাছোড়বান্দা। সে এবার ধরলো ভিন্ন কৌশল। বললো, আমি তোমার অন্নে ভাগ বসাবো বলেই তো তুমি দরোজা খুলছো না। কা'ব এবার রেগে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে দরোজা খুলে দিয়ে বললো, আমাকে এমন অপবাদ তুমি দিতে পারলে? হুয়াই বললো, শোনো কাআ'ব! মোহাম্মদের বিরুদ্ধে এক বিশাল অভিযানের ব্যবস্থা করেছি আমি। কুরায়েশ, গাতফান ও আরো অনেক আরব গোত্র একত্রিত হয়ে এসেছে এবার। তাদের সঙ্গে আমরা তো আছিই। তারা সকলে আমার সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, মোহাম্মদের মূলোৎপাটন না করা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরে যাবে না। সুতরাং তোমার জন্যও এসেছে এবার বিরাট সুযোগ। ইচ্ছা করলেই তুমি এখন হতে পারো এক সফল অধিনায়ক। কাআ'ব বললো, তুমি আমার জন্য নিয়ে এসেছো একটা স্থায়ী গঞ্জনা। নিয়ে এসেছো এমন বারিশূন্য মেঘ, যাতে রয়েছে কেবল বজ্রধ্বনি ও অশনিসংকেত। মোহাম্মদ প্রসঙ্গে আমাকে আর কিছু বোলো না। তিনি অঙ্গীকার রক্ষার বিষয়ে অতি বিশ্বস্ত। এরকম লোকের সঙ্গে আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করি কীরূপে? হুয়াই এতে করেও দমলো না। জিদ করতে লাগলো বার বার। বললো, কা'ব! তুমি অযথা ভীত হচ্ছো। তুমি কি মনে করেছো কুরায়েশেরা

www.eelm.weebly.com

পরাভূত হবে? কখনোই নয়। আর যদি সে রকম কিছু হয়েও যায়, তবে তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি জীবন থাকতে আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগ করবো না। মোহাম্মদের দিক থেকে আক্রমণের আশংকা দেখা দিলে আমি আমার লোকজনকে নিয়ে অবশ্যই তা প্রতিহত করবো। কাআ'ব এবার নরম হলো। কথা দিলো, সে-ও তার লোকজনকে নিয়ে কুরায়েশ বাহিনীকে সাহায্য করবে।

সংবাদ খুব শীঘ্রই পৌঁছে গেলো রসুল স. এর কানে। তিনি স. বিষয়টির সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য বনী কুরায়জার কাছে পাঠালেন সর্ব হজরত আউস গোত্রের নেতা সা'দ ইবনে মুয়াজ আশহালী, খাজরাজ গোত্রের নেতা সা'দ ইবনে উবাদা সায়েদী, আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা খাজরাজী এবং খাওয়াত ইবনে যোবায়ের আমেরীকে। তাঁদেরকে বলে দিলেন, তোমরা যদি বুঝতে পারো ঘটনা সত্য, তাহলে সেকথা আমাকে জানিয়ো ইশারা-ইঙ্গিতে। না হলে আমাদের অনেকের মনোবল যাবে ভেঙে। আর যদি দ্যাখ্যো, ঘটনা সত্য নয়, তবে বিষয়টি প্রকাশ্যেই আমাকে জানাতে পারবে। তারা সকলে পৌঁছে গেলো বনী কুরায়জাদের বসতিতে। তাদের সঙ্গে আলাপ করে সহজেই বুঝতে পারলো অবস্থা বেগতিক। তারা স্পষ্ট করেই জানালো, মোহাম্মদের সঙ্গে আমাদের কোনো অঙ্গীকার নেই। হজরত সা'দ ইবনে উবাদা ছিলেন তেজস্বী। তিনি তাদেরকে শুনিয়ে দিলেন কঠোর প্রকৃতির কিছু কথা। হজরত সা'দ ইবনে মুয়া'জ বাধা দিয়ে বললেন, যেতে দাও। বড় বাড় বেড়েছে ওদের। একথা বলে সকলে প্রত্যাবর্তন করলেন। রসুল স. এর দয়ার্দ্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার সহচরবৃন্দের সঙ্গে প্রতারণা তো সাংঘাতিক ব্যাপার। আল্লাহু আকবর! হে মুসলিম ভ্রাতৃবর্গ! শুভ সংবাদ শ্রবণ করো। সাহাবীগণ আঁচ করতে পারলেন, পরিস্থিতি খুব একটা সুবিধের নয়। ভিতরে বাইরে শত্রু। সংশয়ের কালো মেঘ ছায়াপাত করতে শুরু করলো তাঁদের উপর। মুনাফিকেরা সবই বুঝলো। তাদের দলের মা'তাব ইবনে কুশাইর আমেরী প্রকাশ্যে বলেই বসলো, মোহাম্মদ! আপনি তো অঙ্গীকার করেছেন, আমাদের দখলে আসবে রোম ও পারস্যের ধনভাণ্ডার। কিন্তু এখন তো আমাদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। আমরা তো জঙ্গলে গিয়েও আর প্রাণরক্ষা করতে পারবো না। তাহলে কী আপনার ও আপনার আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি প্রতারণাপূর্ণ নয়? আর এক মুনাফিক আউস ইবনে কিবতী বললো, হে আল্লাহ্র প্রতিনিধি! আমার গৃহ অরক্ষিত। বাড়িও বেশ দূরে। আমাকে এবার বাড়ি ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হোক। এভাবে বিভিন্ন বাহানায় অন্য মুনাফিকেরাও সরে পড়তে লাগলো।

আমি বলি, কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গের ঘটনাটি কাআ'ব তার গোত্রনেতাদেরকে ডেকে জানালো। ওই গোত্রনেতাদের মধ্যে ছিলো, যোবায়ের ইবনে বালতা, নাব্বাশ ইবনে কায়েস, উকবা ইবনে জায়েদ ও আরো অনেকে। তারা সকলেই

www.eelm.weebly.com

কাআ'বের কথা শুনে মনোক্ষুণ্ন হলো। কেউ কেউ ভর্ৎসনা করলো কাআ'বকে। সঙ্গীসাথীদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখে কাআ'বও হয়ে গেলো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু তখন সে আর প্রত্যাবর্তনের কোনো পথই খুঁজে পেলো না।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত যোবায়ের ইবনে আ'ওয়াম বলেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে আমাকে এই মুহূর্তে এনে দিতে পারবে বনী কুরায়জার সংবাদ? একথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তৎক্ষণাৎ রওয়ানা দিলাম বনী কুরায়জার বসতির দিকে। অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে জানালাম তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের তথ্য। তিনি স. বললেন, তোমার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক আমার পিতা-মাতা।

আমি বলি, হজরত যোবায়ের বনী কুরায়জার বসতিতে সংবাদ সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন হজরত সা'দ ও হজরত মুয়াজের প্রত্যাবর্তনের পর। প্রথম যাত্রাটি ছিলো অঙ্গীকার ভঙ্গের সংবাদ যাচাইকল্পে এবং পরের যাত্রা ছিলো তাদের যুদ্ধপ্রস্তুতির খবরাখবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। হজরত যোবায়ের এসে জানালেন, বনী কুরায়জারা তাদের দুর্গ সংস্কার করছে। আশে পাশের রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে। গৃহপালিত পশুগুলোকেও আবদ্ধ করছে দুর্গমধ্যে। রসুল স. তাঁর সঠিক সংগ্রহের ফিরিস্তি শুনে প্রীত হলেন খুব। বললেন, প্রত্যেক নবীর একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলো। আর আমার বিশ্বস্ত বন্ধু যোবায়ের।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. ও সাহাবীগণকে তাঁদের পরিখার পাড়ের অবস্থান থেকে একটু অগ্রবর্তী অথবা পশ্চাদবর্তী হতে হয়নি। কুরায়েশ বাহিনীও তাদের অবস্থান থেকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়নি। এভাবেই উভয়বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান নিয়ে অতিবাহিত করেছিলো কুড়িটি দিন। উভয় বাহিনীর মধ্যে পাথর ও তীর ছোঁড়াছুড়ি হয়েছিলো কিছুটা। কিন্তু যুদ্ধ হয়নি। তাই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিও হয়নি কোনো পক্ষের। ফলাফল অনিশ্চিত ছিলো, তাই রসুল স. সাহাবীগণের সদাসতর্ক অবস্থার কষ্ট বিবেচনা করে ভাবলেন, সন্ধি করাই উত্তম। অস্বাভাবিকতার অবসান ঘটানোই শ্রেয়। এমতো ভাবনার কারণেই তিনি স. সর্বপ্রথম ডেকে পাঠালেন গাতফান গোত্রের উমাইয়া ইবনে হোসাইন ও আবুল হারেছ ইবনে আমরকে। বললেন, তোমরা তোমাদের গোত্রের লোকজন নিয়ে ফিরে যাও। বিনিময়ে আমি তোমাদেরকে দিবো এখানকার খেজুরবাগানগুলোর উৎপাদিত খেজুরের এক তৃতীয়াংশ। এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলো তারা। সন্ধির চুক্তিপত্র প্রস্তুত করা হলো। কিন্তু তাতে স্বাক্ষর করার আগে রসুল স. পরামর্শ চাইলেন হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ এবং হজরত সা'দ ইবনে উবাদার কাছে। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি যদি আল্লাহ্‌র হুকুমে এ কাজ করেন,

www.eelm.weebly.com

তবে তো তা পালন করা আমাদের জন্য হবে অত্যাবশ্যক। আর বিষয়টি যদি হয় আপনার নিজস্ব চিন্তাভাবনার ফসল, তবুও তা আমরা মেনে নিতে বাধ্য। আর যদি আপনি আমাদের সুবিধা হবে বলে এরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তবেই কেবল আমরা আমাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবো। রসুল স. বললেন, আমি কেবল তোমাদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করেই এমতো উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমি দেখতে পাচ্ছি, সমগ্র আরব উপদ্বীপ তোমাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ। তারা তাদের সমুদয় তীর নিক্ষেপ করতে চাইছে একটি মাত্র ধনুক থেকে। আমি চাচ্ছি তাদের এ সংঘবদ্ধ শক্তির বিভেদ। হজরত সা'দ ইবনে মুআ'জ নিবেদন করলেন, হে প্রত্যাদেশিত পুরুষপ্রবর! ইতোপূর্বে আমরাও ছিলাম ওদের মতো পৌত্তলিক। আল্লাহ্কে আমরা চিনতাম না। তাঁর ইবাদত কীভাবে করতে হয় তা-ও জানতাম না। সেই সময়ও তো কেউ সাহস করে দাবি করতে পারেনি মদীনার একটি খেজুর। নিমন্ত্রণ ছাড়া এখানকার খেজুর ভক্ষণের কোনো সুযোগও তাদের ছিলো না। আর এখন আমাদেরকে ধন্য করা হয়েছে ইসলামের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ বৈভবে। আপনার মহান ব্যক্তিত্বের সাহচর্যে আমরা পেয়েছি অমূল্য আভিজাত্য। তাহলে কী কারণে আমরা আমাদের শত্রুদলকে খেজুর প্রদান করতে বাধ্য হবো? সুতরাং আমাদের বক্তব্য এই যে, এরকম অবমাননাকর চুক্তির প্রয়োজন আমাদের নেই। আল্লাহ্র শপথ! আমরা বিনা কারণে কিছুই দিবো না। রসুল স. প্রীত হয়ে বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যা পছন্দ করো, তাই হবে। হজরত সা'দ ইবনে মুআ'জ তখন ছিঁড়ে ফেললেন লিখিত সন্ধিপত্রটি। দূতদ্বয়কে বললেন, তোমরা এবার যাও যা করতে পারো করো।

আমি বলি, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, সর্বপ্রথম এরকম কথা বলেছিলেন হজরত উসাইয়েদ ইবনে হুদাইর। এরপর একই অস্বীকৃতি উচ্চারণ করেছিলেন হজরত সা'দ ইবনে উবাদা। ওই বৈঠকে গাতফানদের দূত উমাইয়া ইবনে হোসাইন বসে ছিলো দু'পা ছড়িয়ে। হজরত সা'দ ইবনে মুআ'জ তাকে ধমক দিয়ে বললেন, এই বেয়াদব! পা সোজা করে বসো না। আল্লাহ্র রসুলের উপস্থিতি না থাকলে আমি এক্ষুণি বল্লমের ফলা দিয়ে তোমার কুঁজো পিঠ সোজা করে দিতাম। অগত্যা বাধ্য হয়ে ফিরে গেলো উয়াইনা ও হারেছ। বুঝতে পারলো, মুসলমানদের উপরে প্রভাব বিস্তার করার আশা সুদূরপরাহত।

বাগবী লিখেছেন, শত্রুদের অবরোধ চললো দিনের পর দিন। কিন্তু যুদ্ধ হলো না মোটেও। শুধুমাত্র একদিন কয়েকজন অশ্বারোহী বনী কেনানার বসতির উপর দিয়ে অশ্ব ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় চিৎকার করে বললো, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আজ টের পাবে কোন্ অশ্বারোহীর পাল্লায় তোমরা পড়েছো। ওই অশ্বারোহীরা ছিলো আমর ইবনে আবদুদ আমেরী, ইকরামা ইবনে আবু জেহেল মাখজুমী, হুবাইরা ইবনে ওয়াহাব মাখজুমী, নওফেল ইবনে আবদুল্লাহ্, দ্বারার

www.eelm.weebly.com

ইবনে খাত্তাব এবং মিরদাস ইবনে লুওয়াই মুহারেবী। তারা ধাবিত হলো পরিখার দিকে। কাছাকাছি গিয়ে পরিখা দেখে বলে উঠলো, আরে এযে দেখছি অভিনব কৌশল। এরপর তারা অনুসন্ধান করে দেখতে লাগলো, দুর্বলতম অবস্থান কোনটি। এভাবে তারা উপস্থিত হলো অপেক্ষাকৃত কম সুরক্ষিত একটি স্থানে। ঘোড়াগুলো নিয়ে চক্কর দিতে লাগলো পরিখা ও সালআ পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে। হজরত আলী কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে গেলেন তাদের সামনে। পরিখার ওই অংশের সুরক্ষা করলেন অধিকতর সুদৃঢ়। দেখলেন, অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে শত্রুপক্ষের আমর ইবনে আবদুদ। বদরযুদ্ধে আহত হয়েছিলো। তাই উহুদযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এখন পরিখার যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছে মহাউৎসাহে অশ্বারোহী সৈনিকদের প্রশিক্ষকরূপে। হজরত আলী তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আমর! তুমি কিন্তু একবার আল্লাহ্‌র শপথ করে বলেছিলে, কোনো কুরায়েশ যদি তোমার সামনে হাঁ বা না সূচক কোনো কথা উপস্থাপন করে, তবে তুমি গ্রহণ করবে তার যে কোনো একটি। আমর বললো, অবশ্যই। আমি এক কথার মানুষ। হজরত আলী বললেন, আমি তোকে আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসুল ও ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমর বললো, আমার এগুলোর কোনোই আবশ্যক নেই। হজরত আলী বললেন, তবে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হও। সে বললো, ভাতিজা! এরকম বলছো কেনো? আমার হাতে কি তুমি বেঘোরে প্রাণটা হারাতে চাও? আমি তো তা চাই না। হজরত আলী বললেন, আমি চাই তোমার রক্ত। একথা শুনে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলো আমর। লাফিয়ে নামলো ঘোড়া থেকে। তারপর তার ঘোড়ার পায়ে হানলো তলোয়ারের আঘাত। অথবা ঘোড়াটিকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তার মুখে মারলো অঙ্কুশ। তারপর অগ্রসর হয়ে দাঁড়ালো হজরত আলীর মুখোমুখি। হজরত আলীও অগ্রসর হলেন। শুরু হলো দ্বৈরথ যুদ্ধ। অল্পক্ষণের মধ্যে হজরত আলী তাকে পাঠিয়ে দিলেন মৃত্যুর দুয়ারে। হত্যা করলেন তার আরো দু'জন সাথীকে। একজন প্রাণ বাঁচালো পালিয়ে। তাদের একজন হলো শরাহত। সে মৃত্যুবরণ করেছিলো মক্কায় ফিরে গিয়ে। তার নাম মুনাব্বেহ্ ইবনে ওসমান ইবনে আবদুস সিয়াক। নওফেল ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগীরা সাহস করে নেমে পড়লো পরিখায়। সাহাবাগণ প্রস্তর বর্ষণ করতে শুরু করলেন তার উপর। অবস্থা বেগতিক দেখে সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, ওহে আরবী যোদ্ধৃবৃন্দ! প্রস্তরবর্ষণ অপেক্ষা উত্তম রণকৌশল কি তোমাদের জানা নেই? বীর যদি হও, তবে সামনে এগিয়ে আসো না কেনো? একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পরিখায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন হজরত আলী। মুহূর্তমধ্যে তলোয়ারের আঘাতে উড়িয়ে দিলেন তার গর্দান। কুরায়েশবাহিনী থেকে প্রস্তাব এলো, নগদ মূল্যের বিনিময়ে আমাদের যোদ্ধাদের লাশ ফেরত দেওয়া হোক। রসুল স. বলে পাঠালেন, নগদ মূল্যের প্রয়োজন আমাদের নেই। তোমরা লাশ নিয়ে যেতে পারো।

www.eelm.weebly.com

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, মদীনার দুর্গগুলোর মধ্যে বনী হারেছার দুর্গটি ছিলো সর্বাপেক্ষা অধিক সুদৃঢ়। আমরা পরিখার যুদ্ধের সময় ওই দুর্গেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। তখনো পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই সেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজও। তিনি ছিলেন লৌহবর্ম পরিহিত। কিন্তু বর্মবহির্ভূত ছিলো তাঁর দুই বাহু। কাফের বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে শুনে এক হাতে একটি বর্শা নিয়ে তিনি ছুটে চললেন রণক্ষেত্রের দিকে। তাঁর মুখে তখন উচ্চারিত হচ্ছিলো একটি টগবগে কবিতা— হায়! আমার উষ্ট্রীটিও যদি অবতীর্ণ হতো এই লড়াইয়ে। যখন উপস্থিত হয় মৃত্যুর মহালগ্ন তখন মৃত্যুভয় আর থাকেই বা কেমন করে?

সা'দের মা তাঁকে বললেন, বৎস! এক্ষুণি পৌঁছে যাও রসুল স. সকাশে। আল্লাহ্‌র শপথ! জলদি যাও। পেছনে পড়ে থেকো না। আমি বললাম, হে সা'দের মাতা! সা'দ যে বর্মটি পরিধান করেছে তা আকারে ছোট। বড় একটি বর্ম পরলে ভালো হতো। তার অনাবৃত বাহু তো সহজেই তীরবিদ্ধ হতে পারে। তাই হয়েছিলো। শত্রুপক্ষের হাইয়্যানের তীর বিদ্ধ হলো তাঁর বাহুতে। রক্তরঞ্জিত হলেন তিনি। হাইয়্যানকে অভিশাপ দিলেন, আল্লাহ্ তোকে শাস্তি দিবেন জাহান্নামে। তারপর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বললেন, হে আল্লাহ্! কুরায়েশদের সঙ্গে যুদ্ধ যদি এখনো শেষ না হয়ে থাকে, তবে তুমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যই আমাকে বাঁচিয়ে রাখো। কারণ তারা তোমার রসুলকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং বিতাড়িত করেছে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি থেকে। আর যদি তুমি মনে করো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রয়োজন আর নেই, তাহলে এই আঘাতেই ইতি টেনে দাও আমার পৃথিবীর জীবনের। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বনী কুরায়জার শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত তো আমার নয়ন শীতল হবে না। সুতরাং হে আমার আল্লাহ্! তাদের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ আমাকে দাও। অথচ মূর্খতার যুগে সা'দ ইবনে মুয়াজের গোত্র ও বনী কুরায়জা ছিলো পরস্পরের মিত্র।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইবাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে ইবাদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মুজাহিদ ও মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, আবদুল মুত্তালিব তনয়া হজরত সাফিয়া বর্ণনা করেছেন, আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম হাস্‌সান ইবনে সাবেতের দুর্গে। হাস্‌সান নিজেও তাঁর পরিবারবর্গসহ ঠাঁই নিয়েছিলো সেখানে। একদিন আমরা লক্ষ্য করলাম এক ইহুদী আমাদের দুর্গের আশে পাশে ঘুর ঘুর করছে। সে ছিলো সন্ধিচুক্তি ভঙ্গকারী বনী কুরায়জার দলভূত। ওদিকে রসুল স. কুরায়েশ বাহিনীর আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্ত। বনী কুরায়জার পক্ষ থেকে হামলার আশংকা করছিলাম আমরা। তাদেরকে প্রতিহত করবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও আমাদের ছিলো না। আমি হাস্‌সানকে ডাক দিয়ে বললাম, দ্যাখো, ওই ইহুদীটির ঘোরাফেরা সন্দেহজনক। আমাদের দুর্গও অরক্ষিত। ইহুদীরা অতর্কিতে আমাদের

www.eelm.weebly.com

উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তার আগেই তুমি লোকটিকে হত্যা করে ফেলো। হাস্‌সান বললো, হে আবদুল মুত্তালিব নন্দিনী! আল্লাহ্ আপনাকে মার্জনা করুন। আপনি তো জানেনই, একাজে আমি সিদ্ধহস্ত নই। তার কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম না। বরং নিজেই তাঁবুর একটি খুঁটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দুর্গ থেকে। একটু এগিয়ে যেতেই সাক্ষাত পেলাম লোকটির। সে কিছু বুঝে উঠবার আগেই আমি খুঁটিটি সজোরে বসিয়ে দিলাম তার মাথায়। ওই এক আঘাতেই লোকটি মরে পড়ে রইলো। ফিরে এসে আমি হাস্‌সানকে বললাম, খতম করেছি দুশমনকে। এবার তুমি যাও, তার শরীর থেকে খুলো নিয়ে এসো অস্ত্র ও পোশাক। হাস্‌সান বললো, হে অকুতোভয়া! আমার অতো সাহস নেই। অস্ত্র ও পোশাকের প্রয়োজনও আমার নেই।

আমি বলি, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, বনী কুরায়জার পরিকল্পনা ছিলো, তারা রাতের অন্ধকারে হামলা চালাবে দুর্গের উপর। রসুল স. তাদের অশুভ পরিকল্পনা সম্পর্কে আগেভাগেই আঁচ করতে পারলেন। তাই হজরত সালমা ইবনে আসলামের নেতৃত্বে দুইশত সৈন্য পাঠালেন অরক্ষিত দুর্গগুলোর নিরাপত্তার্থে। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর তাঁবু রক্ষার জন্য প্রহরায় নিয়োজিত ছিলেন হজরত উব্বাদ ইবনে বশীর ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা। কুরায়েশ বাহিনী পরিখা ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়বার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। আর বার বার প্রস্তর ও তীর বর্ষণের দ্বারা সাহাবীগণ তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখছিলেন। রসুল স. নিজেও ছিলেন সদাসতর্ক।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জননী আয়েশা বলেছেন, মদীনায় আগমনের পর প্রথমদিকে রসুল স. কে শত্রুর আক্রমণাশংকায় সদাসতর্ক থাকতে হতো। এক রাতে শয্যাগ্রহণের পূর্বে রসুল স. বললেন, কেউ যদি পাহারায় থাকতো। হঠাৎ আমরা শুনতে পেলাম অস্ত্রের আওয়াজ। মনে হয় অস্ত্রধারী কে যেনো এগিয়ে আসছে। রসুল স. বললেন, কে? আওয়াজ এলো, আমি স'াদ। অকস্মাৎ রসুল স. এর নিরাপত্তাচিন্তা আমাকে ব্যাকুল করে তুললো। আমার সশস্ত্র আগমন সেকারণেই। এরপর রসুল স. তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং নিশ্চিন্তচিত্ত হয়ে করলেন শয্যাগ্রহণ। জননী আয়েশা আরো বলেছেন, পরিখার যুদ্ধের সময় রসুল স. এর প্রধান দেহরক্ষী ছিলো সা'দ। তখন থেকেই তাঁর প্রতি আমার মায়া পড়ে গিয়েছিলো খুব।

পরিখার আবেষ্টনীর একটি স্থানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিলো দুর্বল। আশংকা ছিলো, ওই জায়গা দিয়েই শত্রুরা ব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা করবে। আর রসুল স. অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন ওই জায়গাতেই। কোনো কোনো সময় প্রচণ্ড শীতে কাবু হয়ে পড়তেন তিনি। সঙ্গীদেরকে সতর্ক থাকতে বলে চলে আসতেন আমার

www.eelm.weebly.com

সান্নিধ্যে। শরীরের উষ্ণতা ফিরে পাবার পর পুনরায় চলে যেতেন তাঁর রণ অবস্থানে। একবার আমাকে বললেন, শত্রুর আক্রমণ থেকে আমরা আশংকামুক্ত নই। কেউ যদি পাহারা দিতো, তবে আজ রাতে আমি একটু নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারতাম। এমন সময় আমরা শুনতে পেলাম সশস্ত্র কারো এগিয়ে আসার আওয়াজ। উৎকর্ণ হলাম আমরা। রসুল স. ধমকের সুরে বললেন, কে আসে? জবাব এলো, আমি সা'দ। আজ রাতে আমি এখানেই প্রহরায় থাকবো। তিনি স. আর দ্বিরুক্তি করলেন না। নিশ্চিন্তে শয্যাগ্রহণ করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই হলেন নিদ্রাভিভূত। আমি শুনতে পেলাম তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের ভারী শব্দ।

উম্মত জননী হজরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেছেন, প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করেও প্রতি রাতে রসুল স. পাহারা দিতেন পরিখার বেষ্টনীতে। এক রাতের ঘটনা। তিনি স. ঘরে এসে নামাজ পাঠ করলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন তাঁর প্রহরার নির্দিষ্ট স্থানে। বললেন, শত্রুরা ইতস্ততঃ ঘোরাফিরা করছে। এরপর ডাক দিলেন, উব্বাদ ইবনে বশীর কোথায়? উব্বাদ আওয়াজ দিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এই যে আমি। তিনি স. বললেন, তোমার সঙ্গী-সাথীরা কি প্রস্তুত? উব্বাদ বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, ভালো করে নজর রাখো। দেখতে পাচ্ছো, শত্রুসেনারা কাছাকাছি ঘোরাফিরা করছে। তুমি তোমার সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে তাদের গতিবিধির উপরে কড়া নজর রাখো। নস্যাৎ করে দাও তাদের অশুভ উদ্যোগ। উব্বাদ তাঁর সঙ্গীসাথীদেরকে নিয়ে টহল দিতে দিতে একস্থানে দেখলো, পরিখাবেষ্টনীর একস্থানে অপরিসর ঢাল বেয়ে পরিখাভ্যন্তরে অবতরণ করছে আবু সুফিয়ান ও কিছুসংখ্যক পৌত্তলিক সৈন্য। মুসলিম সেনারা একটু পরেই টের পেয়ে গেলো তাদের গতিবিধি। সঙ্গে সঙ্গে তাদের দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগলো পাথর ও তীর। উব্বাদও সেখানে পৌঁছে গেলো সদলবলে। তারাও ছুঁড়ে মারতে শুরু করলো পাথর ও তীর। শত্রুরা উপায়ন্তর না দেখে পিছু হঠতে শুরু করলো। অতি দ্রুত ফিরে গেলো তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে। আমি ফিরে এসে দেখলাম, রসুল স. গভীর মগ্নতার সঙ্গে নামাজ পাঠ করছেন। নামাজ শেষ হলে আমি তাঁকে খুলে বললাম সব।

জননী উম্মে সালমা আরো বর্ণনা করেছেন, নামাজ সমাপনের পর তিনি স. নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। আমি শুনতে পেলাম তাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ভারী আওয়াজ। ভোরে বেলালের আজান ধ্বনিত হলো। জেগে উঠলেন আল্লাহ্র নবী। যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করে মসজিদে গিয়ে ইমামতি করলেন ফজরের জামাতের। নামাজ শেষে দোয়া করলেন, হে আমার পরমপ্রভুপালক। তুমি উব্বাদের উপরে সদয় হও। তার উপরে বর্ষণ করো তোমার অপার করুণাবারি।

www.eelm.weebly.com

তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। রসুল স. ছিলেন নিদ্রাভিভূত। সহসা বাইরে শোনা গেলো জনগুঞ্জন। কে যেনো বলে উঠলো, হে আল্লাহ্র বিশেষ বাহিনী! আরোহণ করো। মুহাজিরগণ সাধারণতঃ যুদ্ধকালে এরকমই বলতেন। আর এক বর্ণনায় এসেছে রাতে শত্রুরা তোমাদের প্রতি আক্রমণোদ্যত হলে তোমাদের পরিচিত ধ্বনি হবে— হা মীম লা ইউনসরূন। বর্ণনা দু'টোর সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলা যেতে পারে মুহাজিরদের পরিচিত ধ্বনি ছিলো 'হে আল্লাহ্র বিশেষবাহিনী! আরোহণ করো' এবং আনসারগণের পরিচিতি ধ্বনি হবে 'হা মীম লা ইউনসরূন'। জননী সালমার বর্ণনায় বাকী অংশটুকু এরকম— বাইরের আওয়াজ শুনে জাগ্রত হলেন রসুল স.। বাইরে বেরিয়ে গেলেন। প্রহরী উব্বাদকে জিজ্ঞেস করলেন, খোঁজ নাও তো, কীসের শোরগোল হচ্ছে? উব্বাদ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! পৌত্তলিকদের আমর ইবনে আবদুদের কিছুসংখ্যক সৈন্যের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘর্ষ চলছে। চলছে তীর নিক্ষেপণ ও প্রস্তর বর্ষণ। রসুল স. পুনরায় তাঁবুতে ফিরে এলেন। বেরিয়ে গেলেন অস্ত্রসজ্জিত হয়ে। এরপর অশ্বারোহী হয়ে কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ যাত্রা করলেন সংঘর্ষস্থলের দিকে। উৎফুল্লচিত্তে ফিরে এলেন কিছুক্ষণ পর। বললেন, আল্লাহ্ তাদের দুষ্প্রচেষ্টা প্রতিহত করেছেন। আহত হয়েছে তাদের অনেকে। তারপর পলায়ন করেছে। তিনি স. পুনরায় শয্যাগ্রহণ করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি শুনতে পেলাম তাঁর ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ। কিছুক্ষণ পর পুনরায় বাইরে থেকে ভেসে এলো জনগুঞ্জন। তিনি স. জাগ্রত হয়ে বাইরে গেলেন। কী হচ্ছে তা জানার জন্য। ঘটনাস্থলের দিকে প্রেরণ করলেন উব্বাদকে। তিনি ফিরে এসে জানালেন, এবার সংঘর্ষ শুরু হয়েছে দ্বেরার ইবনে খাত্তাবের বাহিনীর সঙ্গে। উভয়পক্ষ থেকে চলছে শরবর্ষণ ও প্রস্তর নিক্ষেপণ। তিনি স. পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত হয়ে যাত্রা করলেন। যুদ্ধ শুরু করলেন শত্রুদের সঙ্গে। লড়াই চললো সকাল পর্যন্ত। তারপর রসুল খুশী মনে ফিরে এসে বললেন, ওরা অনেকেই আহত হয়েছে। শেষে তিষ্ঠাতে না পেরে পালিয়েছে।

জননী উম্মে সালমা আরো বর্ণনা করেছেন, আমি আমার প্রিয়তম রসুলের বিশেষ সঙ্গিনী ছিলাম। মুরাইসি, খায়বর, হুনায়েন যুদ্ধ ও মক্কাবিজয়ের সময়। কিন্তু ওগুলোর কোনোটাই পরিখার যুদ্ধের মতো অধিক সংকটময় ছিলো না। পরিখার যুদ্ধেই তাঁর লোকেরা আহত হয়েছিলো অধিকসংখ্যক। আর তখন ছিলো অত্যন্ত শীত। মানুষও ছিলো অনটন কবলিত।

এক বর্ণনায় এসেছে, শত্রুরা পুরো পরিখা বেষ্টন করে ফেললো। মুসলিম বাহিনী গড়ে তুললো দুচ্ছেদ্য প্রতিরোধ। জ্বলে উঠলো তীব্র রণানল। দিবাবসান

www.eelm.weebly.com

হলো। যুদ্ধ চললো বিরতিহীনভাবে। রসুল স. এবং সাহাবীগণ আসর ও মাগরিব সঠিক সময়ে আদায় করার সুযোগই পেলেন না। কাজা আদায় করলেন ইশার সময়ে।

তিরমিজি ও নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, আবু উবায়দা বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, পরিখার যুদ্ধে অংশীবাদীরা রসুল স.কে চার ওয়াক্ত নামাজ পড়তে দেয়নি। রাতে যখন যুদ্ধ বন্ধ হলো, তখন তিনি স. একে একে আদায় করলেন জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। প্রতি ওয়াক্তের নামাজের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে আজান ও একামত বললেন বেলাল। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটির সূত্রপরম্পরা ত্রুটিবিহীন। তবে এ সম্পর্কে কেবল এতোটুকু বলা যেতে পারে যে, আবু উবায়দা তাঁর পিতার নিকট থেকে হাদিসটি শোনেননি। সুতরাং বলা যেতে পারে, এর সূত্রপরম্পরা বিকর্তিত। ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনান গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, পরিখার যুদ্ধের সময় একদিন আমরা জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা কাজা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। শেষে বিজয় এলো আমাদেরই পক্ষে। আল্লাহ্ এ সম্পর্কে অবতীর্ণ করলেন 'ওয়া কাফাল্লহুল মু'মিনীনাল্ ক্বীতাল' (বিশ্বাসীগণের সংগ্রামে আল্লাহ্ই যথেষ্ট)। রসুল স. তখন নামাজে দণ্ডায়মান হলেন। বেলাল বললেন ইকামত। এভাবে কাজা নামাজগুলো আদায় করা হলো পৃথক পৃথক ইকামতের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, এ ঘটনা ঘটেছিলো ভীতিপ্রদ অবস্থার নামাজের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। ইবনে হাব্বানও তাঁর 'সসীহ্' পুস্তকে এরকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনায় ইশার নামাজের কথা নেই। ইশার নামাজ কাজা হয়নি বলেই হয়তো ইশার নামাজের কথা সেখানে অনুল্লেখিত রাখা হয়েছে। তবে ইশা কাজা না হলেও হয়েছিলে বিলম্বিত। তাই কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে চারওয়াক্ত নামাজের কথা।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, পরিখার যুদ্ধের সময় একদিন রসুল স. সময় মতো চার ওয়াক্তের নামাজ পাঠ করতে পারেননি— জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। রাতের প্রথম প্রহর অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি স. নামাজ পাঠের অবকাশ পেলেন। তখন বেলালকে নির্দেশ দিলেন, আজান দাও ও ইকামত বলো। বেলাল নির্দেশ পালন করলেন। রসুল স. আদায় করলেন জোহর। তিনি স. পুনঃনির্দেশ দিলেন, আজান দাও ও ইকামত বলো। যথারীতি নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। তিনি স. এবার পাঠ করলেন আসর। পুনরায় নির্দেশ দিলেন আজান ও ইকামতের। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। এভাবে আজান ও ইকামতসহ আদায় করলেন মাগরিব। ইশার নামাজও আদায় করলেন এভাবেই। তারপর বললেন, এখন পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই, যারা এখন

www.eelm.weebly.com

তোমাদের মতো আল্লাহ্‌র স্মরণে মগ্ন। হাদিসটির সূত্রপরম্পরাভূত এক বর্ণনাকারীর নাম আবদুল করিম ইবনে আবীল মুখারিক। তিনি আবার বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

সুপ্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখিত হয়েছে, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। কুরায়েশ বাহিনীর আক্রমণ তবু থামতেই চায় না। থামলো সন্ধ্যার অনেক পর। ওমর তাদেরকে কঠোর ভাষায় গালি দিতে দিতে রসুল স. সকাশে হাজির হলেন। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! দুশমনদের কারণে আমিতো আসর নামাজ পড়তেই পারলাম না। তিনি স. বললেন, আমিও পারিনি। এরপর তিনি স. আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে গমন করলেন বুতহান নামক স্থানে। সেখানে ওজু সমাপনের পর আমাদেরকে নিয়ে আদায় করলেন আসর, তারপর মাগরিব।

সুপ্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থদ্বয়ে আরো বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, পরিখার যুদ্ধের সময় একদিন সময়মতো নামাজ পাঠ করতে না পারায় রসুল স. উত্তেজিত হলেন। বললেন, ওরা আমাদেরকে সময়মতো নামাজ পড়তে দিলো না। আল্লাহ্ ওদের ঘরদোর ও কবর অগ্নি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন। মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে এসেছে এই কথাটুকু— এরপর রসুল স. মাগরিব ও ইশার মাঝামাঝি সময়ে আদায় করলেন আসরের কাযা। উল্লেখ্য, পরিখার যুদ্ধ চলেছিলো বেশ কিছুদিন ধরে। সুতরাং ওই সময়ের কাযা নামাজ আদায়ের মধ্যে যে বর্ণনাবৈষম্য দেখা যায়, তার সমাধানার্থে বলা যেতে পারে, সম্ভবতঃ বিবরণগুলো সম্পৃক্ত বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে। অথবা সম্পৃক্ত একই ঘটনার সঙ্গে। হাদিস বেত্তাগণ বলেন, বর্ণনাকারী ভিন্ন ভিন্ন হলেও এরকম বর্ণনাবৈষম্য সৃষ্টি হওয়া দূষণীয়ও নয়।

মাসআলা ঃ একবারে কয়েক ওয়াক্তের নামাজ কাযা হলে প্রতি ওয়াক্তের কাযা আজান ও ইকামতসহ আদায় করতে হবে কিনা সে সম্পর্কে মত-প্রভেদ রয়েছে। তবে সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে— প্রতি ওয়াক্তের কাযা পৃথক পৃথক আজান-ইকামতসহ সম্পাদিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইতোপূর্বে বর্ণিত বায্যারের বিবরণের মাধ্যমে সেকথাই প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

প্রলম্বিত পরিখার যুদ্ধে মুসলমানদের দুর্ভোগ বাড়িয়েই চললো। তখন একদিন রসুল স. শত্রুবাহিনীর জন্য অপপ্রার্থনা করলেন। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলের সে প্রার্থনা অনুমোদনও করলেন। যেমন ইমাম বোখারী তাঁর 'সহীহ্' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা বলেছেন, অবিশ্বাসীদের যৌথবাহিনী যখন মদীনা অবরোধ করে বসলো তখন রসুল স. নিবেদন করলেন, হে মহাগ্রন্থের অবতারক! হে মহাবিচার দিবসের পরিচালক! তুমি সংঘবদ্ধ শত্রু সেনাকে বিভেদিত করো, করো পর্যুদস্ত।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্র বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. পরিখার যুদ্ধের সময় তাঁর অবস্থান স্থল মসজিদে ফাতাহ থেকে পরপর তিন দিন শত্রুবাহিনীর জন্য অশুভপ্রার্থনা করেছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, সোম, মঙ্গল ও বুধবার— এই তিনদিন তিনি স. আল্লাহ্ সকাশে নিবেদন করেছিলেন তার অশুভ নিবেদন। আর এ নিবেদন কবুল করা হয়েছিলো শেষ দিন, অর্থাৎ বুধবার জোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে। আর রসুল স. এর পবিত্র মুখমণ্ডলে আনন্দের আভাষ দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁর নিবেদন আল্লাহ্ কবুল করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর একদিন আমাদের উপরও নেমে এসেছিলো চরম সংকট। তখন আমরাও কাফেরদের জন্য বদদোয়া করেছিলাম। আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলের উপস্থিতির বরকতে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন আমাদের প্রার্থনাও।

পরিখার যুদ্ধের সময় ঘটলো আর একটি চমকপ্রদ ঘটনা। গাতফান গোত্রের নাঈম ইবনে মাসউদ অতি সঙ্গোপনে দেখা করলেন রসুল স. এর সঙ্গে। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল ! আমি মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমার স্বগোত্রীয়রা একথা জানে না। এখন আমি কামনা করি আপনার আদেশ। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করবো। রসুল স. বললেন, তুমি যেমন গোপনে এসেছো, তেমনি গোপনে গিয়ে তোমার গোত্রীয় ভ্রাতাদের সঙ্গে মিশে যাও। বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করো তাদের একের সঙ্গে অপরের, যেনো তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আমাদের দিক থেকে দৃষ্টি উঠিয়ে নিয়ে পথ খোঁজে পলায়নের। কৌশলাবলম্বনই তো যুদ্ধ।

আমি বলি, অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত নাঈম তখন বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আপনি সদয় অনুমতি প্রদান করুন। আমি কৌশলাবলম্বন করি। সত্য-মিথ্যা বলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি করি বিভেদ। রসুল স. তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি প্রথমে গেলেন বনীকুরায়জার বস্তিতে। তিনি ছিলেন তাদের পূর্বপরিচিত। তাই তারা ঔৎসুক্য নিয়ে সমবেত হলো তাঁর কাছে। তিনি বললেন, হে বনী কুরায়জা। তোমরা তো জানোই আমি তোমাদের একান্ত শুভানুধ্যায়ী। তারা বললো, তাতো জানিই। তিনি বললেন, তাহলে শোনো, তোমরা কুরায়েশ এবং গাতফানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছো বটে, কিন্তু তাদের অবস্থা তো তোমাদের মতো। তোমরা মদীনার অধিবাসী। তোমাদের পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ সবই তো এখানে। তারা কিন্তু তাদের পরিবার পরিজন ধন-সম্পদ কোনো কিছুই এখানে নিয়ে আসেনি। আর যুদ্ধের পরিণাম কী হবে, তা কি নিশ্চিত করে বলা যায়। যদি তারা জয়ী হয়, তবে তোমরা হয়তো পাবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের কিঞ্চিত অংশ। কিন্তু পরাজিত হলে? তারা

www.eelm.weebly.com

তা তোমাদের কথা আর ভাববেই না। প্রাণ বাঁচাতে পলায়ন করবে ঊর্ধ্বশ্বাসে। তোমাদেরকে রেখে যাবে মুসলমানদের তোপের মুখে। তাই আমি বলি, যেমন ব্যাধি, তার ব্যবস্থাপত্রও হওয়া দরকার তেমনি। উত্তম হয়, যদি তোমরা তাদের দলের কয়েকজন নেতাকে জিম্মি হিসেবে আটকে রাখতে পারো। এরকম করলে তারা আর তোমাদেরকে ফেলে পালিয়ে যেতে পারবে না। এক্ষুণি তোমরা তাদেরকে একথা জানাও। যদি তারা তোমাদের প্রস্তাবে সাড়া দেয়, তবে তো ভালোই। আর যদি অসম্মত হয়, তবে বুঝবে তাদের উদ্দেশ্য খুব একটা সুবিধের নয়। বনী কুরায়জার লোকেরা হজরত নাঈমের প্রস্তাবটিকে পছন্দ করলো খুব। এভাবে তাদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করে দিয়ে হজরত নাঈম এবার আগমন করলেন প্রধান সেনাপতি আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য কুরায়েশ নেতৃবর্গের কাছে। বললেন, হে কুরায়েশ মণ্ডলবর্গ! তোমরা তো জানোই আমি ও আমার গোত্র তোমাদের কতো অন্তরঙ্গ। মোহাম্মদের প্রতি আমাদের কী মনোভাব, সেকথাও তোমাদের অজানা নয়। এক্ষুণে অন্তরঙ্গতার দাবি নিয়ে আমি তোমাদের কাছে গচ্ছিত রাখতে চাই একটি সঙ্গোপন হিতোপদেশ। কিন্তু কথা দিতে হবে, একথা তোমরা কিছুতেই প্রকাশ করতে পারবে না।

কুরায়েশ নেতৃবর্গ বললো, ঠিক আছে, কথা দিলাম। হজরত নাঈম বললেন, তাহলে শোনো, বনী কুরায়জাকে আর বিশ্বাস করা যায় না। তারা গোপনে গোপনে মোহাম্মদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। বলেছে, হে মোহাম্মদ! আমরা আপনার সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে মহা অন্যায় করে ফেলেছি। আমরা এখন অনুতপ্ত। এখন কীভাবে এর প্রায়শ্চিত্য করবো তা বলে দিন। যদি বলেন, তবে আমরা সুকৌশলে গাতফান ও কুরায়েশদের কয়েকজন নেতাকে আমাদের আওতায় নিয়ে আসি। তারপর তাদেরকে বন্দী করে সোপর্দ করি আপনার কাছে। আপনি তাহলে সহজেই তাদের শিরোশ্ছেদ করতে পারবেন। ফলে শত্রুরা হয়ে পড়বে ভীত-সন্ত্রস্ত। তখন আমাদের যৌথ আক্রমণের সামনে তারা আর তিষ্ঠাতেই পারবে না। হে মোহাম্মদ! এখন আপনার প্রসন্নতাই আমাদের কাম্য। মোহাম্মদ তাদের এ প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন। সুতরাং সাবধান! বনী কুরায়জা যদি এরকম কোনো প্রস্তাব নিয়ে আসে তবে কিছুতেই তাতে সম্মতি দেওয়া যাবে না। এরপর হজরত নাঈম গেলেন তাঁর আপন গোত্রের লোকদের কাছে। তাদের মনেও সন্দেহ এবং ভয় ঢোকালেন বিভিন্ন কথা বলে।

হিজরী পঞ্চম সাল। শাওয়াল মাস আল্লাহ্পাক প্রলম্বিত পরিখার যুদ্ধের ইতি ঘটালেন এভাবে— আবু সুফিয়ান কুরায়েশ এবং গাতফান গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক নিয়ে গঠন করলেন একটি প্রতিনিধি দল। তারপর ইকরামা ইবনে আবু জেহেল এবং ওরাকা ইবনে গাতফানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটিকে পাঠালেন বনী

www.eelm.weebly.com

কুরায়জার নিকটে। তারা যেয়ে বনী কুরায়জাকে বললো, দ্যাখো, আমরা তো এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য আসিনি। আমাদের যুদ্ধাশ্ব ও উটগুলোও শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবার শুরু করবো সর্বাত্মক যুদ্ধ। তোমারাও প্রস্তুত হও। মোহাম্মদের সঙ্গে এবার হোক আমাদের চূড়ান্ত বোঝাপড়া।

বনী কুরায়জা বললো, আজ শনিবার, তোমরা তো জানোই শনিবার আমাদের কাছে কীরূপ সম্মানার্হ। সুতরাং আজ তো আমরা যুদ্ধের ময়দানে নামতে পারবোই না। তাছাড়া এ সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্যও আছে। বক্তব্যটি হচ্ছে— যুদ্ধে আমাদের জয় যদি হয়, তবে তো ভালোই। আর যদি পরাজয় হয়, তবে তো তোমরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করতে পারবে। তখন একা পেয়ে মোহাম্মদের দল আমাদেরকে সমূলে উৎখাত করে ফেলবে। তাই আমরা চাই, তোমরা তোমাদের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে জামানতস্বরূপ আমাদের অধীনে রেখে দাও। প্রতিনিধি দল ফিরে গেলো। সেনাপতি আবু সুফিয়ানের কাছে খুলে বললো সব। সে এবং তাদের দলের নেতারা তখন বলে উঠলো, নাঈম ইবনে মাসউদের কথাই তাহলে ঠিক। বনী কুরায়জা বিশ্বাস ঘাতক। একথা ভেবেই তারা বনী কুরায়জাকে বলে পাঠালো, আমরা এরকম জামানত রাখতে অসম্মত। বনী কুরায়জার নেতারা তখন বললো, নাঈম তো তাহলে ঠিক কথাই বলেছে। বহিরাগতদের মনে রয়েছে দূরভিসন্ধি। তারা জয়ী হলে গণিমত নিয়ে সরে পড়বে। আর পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখলেই আমাদেরকে অসহায় অবস্থায় রেখে যাবে পালিয়ে। তখন বেঘোরে জীবন দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায়ই থাকবে না। এভাবে পারস্পরিক অবিশ্বাসের কারণে শত্রুবাহিনী হয়ে পড়লো হতোদ্যম। এর মধ্যে হঠাৎ এক রাতে শুরু হলো ভয়ংকর তুফান। তখন উনুনে চড়ানো ছিলো সৈন্যদের খাদ্যপ্রস্তুত করার ডেগ। প্রচণ্ড বাতাসে সেগুলো হয়ে গেলো লণ্ডভণ্ড। তাঁবুগুলো গেলো উড়ে। তাঁবুর খুঁটি, খুঁটির দড়ি সব কিছু ছড়িয়ে পড়লো এদিকে ওদিকে। উড়ন্ত খুঁটির আঘাত খেয়ে ঘোড়াগুলো পালাতে শুরু করলো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। প্রচণ্ড শীতে সৈন্যরা কাঁপতে লাগলো ঠক ঠক করে। সকলে হয়ে গেলো কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

শত্রুবাহিনীর ছত্রভঙ্গ হওয়ার সংবাদ জানতে পেরে রসুল স. পরদিন সকালে তাদের অবস্থা জানার জন্য গুপ্তচররূপে প্রেরণ করলেন হজরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামিনকে। জায়েদ ইবনে জিয়াদের সূত্রে মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজীর উক্তিরূপে এরকম বর্ণনা করেছেন মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক। কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন ইব্রাহিম তাইমির কথা। উভয় বর্ণনায় এসেছে, একবার এক কুফাবাসী যুবক হজরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামিনের নিকটে জানতে

www.eelm.weebly.com

চাইলো, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি কি কখনো রসুল স. এর অনুপম সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো কিছুদিনের পবিত্র সাহচর্য। যুবক বললো, আপনার সঙ্গে তিনি স. কীরূপ আচরণ করতেন? হজরত হুজায়ফা বললেন, আমরা তো ছিলাম তাঁর একান্ত অনুচর ও সহযোগী। যুবক বললো, আমরা তাঁকে পেলে পায়ে হেঁটে পথ চলতে দিতাম না। ঘাড়ে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। হজরত হুজায়ফা বললেন, তুমি তো জানো না, তখন কতোই না কষ্ট করতে হয়েছে— আমাদেরকে। আল্লাহ্‌র শপথ! পরিখার যুদ্ধের মহাসংকটময় দিনগুলোর ছবি তো এখনো আমার চোখে ভাসে। এক রাতের ঘটনা। প্রচণ্ডশীত পরেছিলো সে রাতে। সকলেই শীতার্ত। রসুল স. বললেন, আছো এমন কেউ, যে আমাকে এনে দিতে পারবে শত্রুদলের অভ্যন্তরীণ খবর। আল্লাহ্ তাকে দান করবেন জান্নাতের প্রবেশাধিকার। কারো পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। এরপর কিছুক্ষণ ধরে নামাজ পাঠ করলেন তিনি স.। তারপর আমাদের মুখোমুখি হয়ে পুনরাবৃত্তি করলেন আগের ঘোষণাটির। এবারেও কেউ সাড়া দিলো না। তিনি স. পুনরায় নামাজে নিমগ্ন হলেন। নামাজ শেষে পুনরায় বললেন, যে ব্যক্তি আজ শত্রুশিবিরে উপস্থিত হয়ে তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিবরণ জেনে এসে আমাকে বলবে, সে হবে আমার জান্নাতের সঙ্গী। কিন্তু সকলেই তখন শীতে আড়ষ্ট, অনাহার ক্লিষ্ট এবং ভীত। তাই সাড়া পাওয়া গেলো না কারো পক্ষ থেকেই। রসুল স. তখন আমাকে ডাকলেন। বললেন, হুজায়ফা! আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এই যে আমি। একথা বলেই আমি গিয়ে দাঁড়ালাম রসুল স. এর একেবারে সামনে। প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে আমার উরু দু'টো তখন কাঁপছিলো থর থর করে। রসুল স. তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে দিলেন আমার শরীরে। আমি হয়ে গেলাম সুস্থির ও শান্ত। তিনি স. আজ্ঞা করলেন, একাজ তোমাকেই করতে হবে। যাও, শত্রুদের অভ্যন্তরীণ খবরাখবর সংগ্রহ করে নিয়ে এসো। সোজা এসে দেখা কোরো আমার সঙ্গে। পথে আবার কোনো হাস্যকৌতুকের বৈঠকে বসে পোড়ো না যেনো। এরপর দোয়া করলেন— হে আমার আল্লাহ্! তুমি হুজায়ফাকে হেফাজত করো সম্মুখে-পশ্চাতে, দক্ষিণে-বামে, উপরে-নিচে সব দিক থেকে।

আমি আমার তূণ ভরে নিলাম তীর। কটিদেশে ঝুলিয়ে নিলাম তলোয়ার। তারপর নিঃশঙ্কচিত্তে যাত্রা করলাম শত্রুশিবিরের দিকে। মনে হচ্ছিলো, আমি যেনো নিরুদ্বিগ্ন মনে যাচ্ছি আমার কোনো নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে। একসময় আমি মিশে গেলাম শত্রুসেনাদের সঙ্গে। তখনো চলছে উথাল পাথাল ঝড়। ফলে তাদের তখন বেহাল অবস্থা। তাঁবু, আসবাবপত্র, আহারের আয়োজন সবকিছু লণ্ডভণ্ড। ছুটন্ত ঘোড়াগুলোকে বেদম প্রহার করে বাগে আনতে চেষ্টা করছিলো

www.eelm.weebly.com

কেউ কেউ। একস্থানে দেখলাম, আবু সুফিয়ান এক বিক্ষিপ্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে আগুন তাপাচ্ছে। মনে হলো, এই মুহূর্তে একটি তীর নিক্ষেপ করে মিটিয়ে দেই তার যুদ্ধের সাধ। কিন্তু সংযত হলাম এই ভেবে যে, আমি কেবল শত্রুদের অভ্যন্তরীণ গতিবিধি সংগ্রহের নির্দেশপ্রাপ্ত। সকলের বেহাল অবস্থা দেখে আবু সুফিয়ান নড়ে চড়ে বসলো। চিৎকার করে বলতে শুরু করলো, হে কুরায়েশ বাহিনী! ছুটাছুটি না করে প্রত্যেকেই তার সঙ্গীর হাত ধরে বসে থাকো। যেনো আমাদের ভিতরে প্রতিপক্ষের কোনো গুপ্তচর ঢুকে না পড়তে পারে। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার পাশের একজনের হাত ধরে বসে পড়লাম। জিজ্ঞেস কররাম, তুমি কে? সে বললো, হায় আল্লাহ্! তুমি আমাকে চেনো না? আরে আমি তো অমুকের পুত্র অমুক। বুঝলাম, লোকটি হাওয়াযীন গোত্রের। আবু সুফিয়ান পুনরায় চিৎকার করে বললো, হে কুরায়েশ জনতা! আমরা তো এখানে চিরদিনের জন্য থাকতে আসিনি। আমাদের সাজ-সরঞ্জাম বাহন সবকিছু বিপর্যস্ত। বনী কুরায়জারা বিশ্বাসঘাতকতা করলো। প্রচণ্ড ঝড়ে ও শীতে আমাদের অবস্থাও জুবুথুবু। তাই আমি বলি, এখান থেকে কেটে পড়াই উত্তম। বলেই গাত্রোত্থান করলো সে। তার উটে আরোহন করে চলতে শুরু করলো মদীনা ছেড়ে। মুহূর্তমধ্যে সকলে অনুসরণ করলো তাকে। এদৃশ্য দেখে গাতফান গোত্রের লোকেরাও হলো প্রস্থানোদ্যত। আমি ফিরে এলাম রসুল স. সকাশে। দেখলাম, তিনি স. নামাজে নিমগ্ন। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে নামাজ সমাপন করলেন তিনি স.। আমার দিকে মুখ ফেরাতেই আমি তাকে খুলে বললাম আনুপূর্বিক ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেলো আমার আত্মীয়বাড়ি যাওয়ার মতো মনের অবস্থা। শীতও গায়ে লাগতে শুরু করলো আগের মতো। রসুল স. আমার অবস্থা টের পেয়ে হেসে দিলেন। নিশীথের বিদ্যুৎচমকের মতো ঝকঝক করে উঠলো তাঁর মুক্তাসদৃশ দন্তপাটি। আদর করে তিনি স. ডেকে নিলেন একেবারে কাছে। ঢেকে দিলেন তাঁর শীতবস্ত্রের একাংশ দিয়ে। আমার বুকের উপরে রাখলেন তাঁর পবিত্র হাত। সে স্বর্গীয় হাতের মধুর পরশ যে অবিস্মরণীয়। মনে নেই কখন যেনো নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লাম আমি। ভোরে জেগে উঠলাম রসুল স. এর দরদভরা ডাক শুনে। শুনতে পেলাম, তিনি স. আদর করে ডাকছেন, হুজায়ফা! ও হুজায়ফা। ওঠো। উঠে পড়ো।

আমি বলি, কাতাদা সূত্রে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, ওই সময় কাফের বাহিনীর উপরে আক্রমণ চালিয়েছিলো অদৃশ্য ফেরেশতারা। কাফেরেরা কেবল শুনতে পেলো চতুর্দিক মুহুর্মুহু ধ্বনিত হচ্ছে 'আল্লাহু আকবর'। তালহা ইবনে খুয়াইলিদ চিৎকার করে বলতে শুরু করলো, উপস্থিত জনতা!

www.eelm.weebly.com

সাবধান হও। মোহাম্মদ চালাতে শুরু করেছে তার ভয়ানক যাদু। সুতরাং প্রাণে বাঁচতে চাইলে পালাও। তার একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পড়িমরি করে ছুটে পালাতে শুরু করলো শত্রুরা।

আমি আরো বলি, শায়েখ ইমামুদ্দিন ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. মহাবিশ্বের রহমত যদি না হতেন, তবে শত্রুদেরকে টুকরা টুকরা না করে ছাড়তেন না। শত্রুরা ধ্বংস হয়ে যেতো তেমনি করে, যেমন ভাবে সর্বগ্রাসী মহাপ্রভঞ্জনের আঘাতে মূলোৎপাটিত হয়েছিলো অবাধ্য আদ সম্প্রদায়।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত হুজায়ফা বলেছেন, শত্রুশিবির থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আমি দেখলাম কুড়িজন অপার্থিব ঘোড়সওয়ারকে। তারা ছিলো শ্বেতশুভ্র উষ্ণীশ পরিহিত। তাদের একজন আমাকে বললেন, তোমার সাথীকে গিয়ে বোলো, আল্লাহ্ নিজে আপনার কর্ম সুসম্পন্ন করেছেন। আপনাকে মুক্ত করেছেন তাদের অনিষ্ট থেকে।

বোখারী ও মুসলিম তাঁদের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করেছেন, হজরত জোবায়ের বলেছেন, পরিখার যুদ্ধকালীন এক রাতে রসুল স. বললেন, কে আমাকে এনে দিতে পারবে শত্রুদলের গতিবিধির সংবাদ? আমি জবাব দিলাম, আমি। পুনরায় তিনি একই প্রশ্নের অবতারণা করলেন। আমিও জবাব দিলাম একই ভাবে। তৃতীয় বার বললেন, বলো, কে আমাকে এনে দিতে পারবে শত্রুদলের গোপন তথ্য? আমি বললাম, আমি। রসুল স. তখন বললেন, প্রত্যেক নবীরই থাকে একজন বিশেষ সহচর। আর আমার বিশেষ সহচর হচ্ছে যোবায়ের।

বোখারী তাঁর 'সহীহ' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত সুলায়মান ইবনে সারীদ বলেছেন, পরিখার যুদ্ধক্ষেত্র যখন শত্রুমুক্ত হলো, তখন রসুল স. বললেন, এখন থেকে ওরা আর আমাদেরকে আক্রমণ করার সাহস পাবে না। এখন থেকে আমরাই ক্রমাগত প্রবলতর হতে থাকবো তাদের উপর। বোখারী আরো উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. জেহাদ, হজ এবং ওমরা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিন বার উচ্চারণ করতেন 'আল্লাহু আকবর'। তারপর বলতেন— লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বদীর। আয়িবূনা তায়িবূনা আবিদূনা সাজিদূনা লি রব্বিনা হামিদূনা সাদাকাল্লহু ওয়'াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহমারা ওয়াহ্দাহু।

মোহাম্মদ ইবনে ওমর বলেছেন, পরিখার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন ছয় জন সাহাবী। আর ছয় জন নিহত হয়েছিলো বিরুদ্ধপক্ষীয়দের।

www.eelm.weebly.com

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ اِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ
وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ﴿١٠﴾
هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ زُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ﴿١١﴾ وَ اِذْ
يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ
رَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢﴾ وَ اِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ
يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ
النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚۛ اِنْ
يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ
سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ
كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَ كَانَ عَهْدُ
اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ﴿١٥﴾ قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ
الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَ اِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ ذَا
الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ
رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧﴾

r যখন উহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল তোমাদের উপরের দিক ও নীচের দিক হইতে, তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছিল, তোমাদের প্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে;

www.eelm.weebly.com

r তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল।

r আর স্মরণ কর, মুনাফিকরা ও যাহাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তাহারা বলিতেছিল, 'আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নহে।'

r আর উহাদের একদল বলিয়াছিল, 'হে ইয়াছরিববাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নাই, তোমরা ফিরিয়া চল', এবং উহাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়া বলিতেছিল, 'আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত'; অথচ ঐগুলি অরক্ষিত ছিল না, আসলে পলায়ন করাই ছিল উহাদের উদ্দেশ্য।

r যদি বিভিন্ন দিক হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে শত্রুগণের প্রবেশ ঘটিত, অতঃপর তাহাদিগকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করা হইত, তবে তাহারা অবশ্য তাহাই করিয়া বসিত, তাহারা ইহাতে কালবিলম্ব করিত না।

r ইহারা তো পূর্বেই আল্লাহ্র সহিত অংগীকার করিয়াছিল যে, ইহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে না। আল্লাহ্র সহিত কৃত অংগীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হইবে।

r বল, 'তোমাদের কোন লাভ হইবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর তবে সেই ক্ষেত্রে তোমাদিগকে সামান্যই ভোগ করিতে দেওয়া হইবে।'

r বল 'কে তোমাদিগকে আল্লাহ্ হইতে রক্ষা করিবে যদি তিনি তোমাদের অমংগল ইচ্ছা করেন অথবা তিনি যদি তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কে তোমাদের ক্ষতি করিবে?' উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিলো তোমাদের উপরের দিক ও নিচের দিক হতে'। একথার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে আক্রমণকারী বনী আসাদ, বনী গাতফান ও বনী কুরায়জাকে। উল্লেখ্য, পূর্ব প্রান্ত থেকে এক হাজার পৌত্তলিক সৈন্যসহ আক্রমণ চালিয়েছিলো মালেক ইবনে আউফ নজরী ও উয়াইনা ইবনে হোসাইন ফাযায়ী। বনী আসাদ নেতা তুলাইহা ইবনে খুয়াইলিদ আমাদীর নেতৃত্বে বনী আসাদ গোত্রও ছিলো তার সহযোগী। আর বনী কুরায়জার অধিনায়ক ছিলো হুয়াই ইবনে আখতাব।

'ও নিচের দিক থেকে' অর্থ পশ্চিম প্রান্তের বাত্নে ওয়াদীর দিক থেকে'। পশ্চিম দিক থেকে অভিযান চালিয়ে ছিলো বনী কেনানা ও কুরায়েশ। এ দলের অধিনায়ক ছিলো আবু সুফিয়ান। আর পরিখার দিক থেকে আক্রোমণোদ্যত হয়েছিলো আবুল আ'ওয়ার আমর ইবনে সুফিয়ান সালামী।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিলো; তোমাদের প্রাণ হয়েছিলো কণ্ঠাগত।' একথার অর্থ— শত্রুদলের এরকম আক্রমণ প্রস্তুতি দেখে ভয়ের প্রভাব পড়েছিলো তোমাদের মনে ও চোখে-মুখে। ফলে তোমাদের চোখ হয়েছিলো বিস্ফারিত এবং কণ্ঠাগত হয়েছিলো প্রাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে।' এ কথার অর্থ— কপটবিশ্বাসীরা তখন ধারণা করেছিলো, এবার মনে হয় আর রক্ষা নেই। মোহাম্মদ ও তাঁর একান্ত অনুচরদের ধ্বংস এবার অনিবার্য। আর দুর্বলচিত্ত বিশ্বাসীরা ভাবতে শুরু করেছিলো কী জানি কী হয়। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীরা ছিলো বিশ্বাসে অনড়। তারা জানতো, আল্লাহ্র অঙ্গীকার সত্য এবং আশা করতো, অবশ্যই আসবে প্রতিশ্রুত সাহায্য ও বিজয়।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিলো এবং তারা ভীষণভাবে পরীক্ষিত হয়েছিলো'। একথার অর্থ— তখন চরম সংকটের মাধ্যমে পরীক্ষা করে কপটবিশ্বাসী ও দুর্বলচিত্ত বিশ্বাসীদের থেকে পৃথক করে ফেলা হয়েছিলো বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদেরকে। ওই ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন কেবল বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা, যারা ছিলো প্রকৃত অর্থেই বিশ্বাসী।

এর পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আর স্মরণ করো, মুনাফিকেরা ও যাদের আন্তরে ছিলো ব্যাধি, তারা বলছিলো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা ব্যতীত কিছু নয়।' এখানে 'মুনাফিকেরা ও যাদের অন্তরে ছিলো ব্যাধি' বলে বুঝানো হয়েছে কপট মা'কাব ইবনে কুশাইর, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এবং তাদের অনুসারী ভীরু-কাপুরুষদেরকে।

বাগবী লিখেছেন, এখানে কপটবিশ্বাসীদের 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন' অর্থ— যে প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিয়েছিলেন পারস্য ও রোম বিজয়ের। আর 'তা প্রতারণা ব্যতীত কিছু নয়' অর্থ সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন তো দূরের কথা, এখন আমাদের জীবন নিয়েই টানাটানি। মদীনা এখন অবরুদ্ধ সম্মিলিত শত্রুসেনার দ্বারা। সুতরাং মোহাম্মদের কৃত প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া অন্যকিছু নয়? এরকম ব্যাখ্যা সুদ্দী সূত্রে ইবনে আবী হাতেমের মাধ্যমে। আর বর্ণনাকারীরূপে এসেছে বশীর ইবনে মাতা'ব এর নাম।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'আর তাদের এক দল বলেছিলো, হে ইয়াছরীববাসী! এখানে তোমাদের কোনো স্থান নেই, তোমরা ফিরে চলো'। উল্লেখ্য, এরকম উক্তি করেছিলো আউস ইবনে কিবতী। আর 'ইয়াছরীব' অর্থ এখানে মদীনা। আবু উবায়দা বলেছেন, ইয়াছরীব হচ্ছে এক আরব ভূখণ্ড, যার একাংশে অবস্থিত মদীনাতুন্ নবী, অর্থাৎ নবী-নগরী।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, রসুর স. আজ্ঞা করেছেন তোমরা এই নগরীকে ইয়াছরীব বলো না, বলো মদিনা। উল্লেখ্য, 'ইয়াছরীব' অর্থ— ভর্ৎসনা করা। লজ্জা দেওয়া। কোন অপরাধের কারণে লাঞ্ছনা ভোগ করা। 'মুছরিব' বলে ওই ব্যক্তিকে, যে ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ, কামুক।

'মুক্বাম' অর্থ অবস্থান স্থল। আর এখানে 'ফিরে চলো' অর্থ পরিত্যাগ করো মোহাম্মদের সাহচর্য, পরিহার করো তার বন্ধুত্ব। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা তোমাদের জন্য অসমীচীন, সমীচীন হচ্ছে অংশীবাদীদের পক্ষাবলম্বন। এরকম করার মধ্যেই রয়েছে তোমাদের নিরাপত্তা। অথবা কথাটির অর্থ— ইসলাম ও মোহাম্মদ তোমাদের জন্য অবশ্য পরিত্যজ্য। সুতরাং চলে যাও এই স্থান থেকে অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিলো, আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত; অথচ ওইগুলি অরক্ষিত ছিলো না; আসলে পলায়ন করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, এরকম অব্যাহতি প্রার্থনা করেছিলো বনী হারেছা ও বনী সালমা। এখানে অজুহাত হিসেবে উপস্থাপিত তাদের 'অরক্ষিত' কথাটির অর্থ— শত্রুর আক্রমণাশংকা, অথবা আশংকা চুরির।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'যদি বিভিন্ন দিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুগণের প্রবেশ ঘটতো, অতঃপর তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করা হতো, তবে তারা অবশ্য তাই করে বসতো, তারা এতে কালবিলম্ব করতো না'।

এখানে 'দুখিলাত' প্রবেশ করতো। অর্থ সংঘবদ্ধ শত্রুসেনাদের অনুপ্রবেশ ঘটতো মদীনায়। 'আ'লাইহিম' অর্থ তাদের উপর, তাদের আবাসস্থলে, তাদের বিরুদ্ধে। 'আল'ফিত্‌নাতা' অর্থ বিদ্রোহ, অমুসলমান ও মুসলমানের মধ্যে যুদ্ধ। 'লাআতাওহা' অর্থ যোগ দিতো বিদ্রোহীদের দলে। আর 'ওয়ামা তালাব্‌বাছু বিহা ইল্‌লা ইয়াসীরা' অর্থ তারা এতে কালবিলম্ব করতো না। অর্থাৎ তারা তখন আর গৃহে অবস্থান করতো না। কালবিলম্ব না করে 'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক' বলতে বলতে মিশে যেতো বিদ্রোহীদের দলে। অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা কথাটির অর্থ করেছেন এভাবেই। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, এখানে 'বিহা' (এতে, সেখানে) বলে বুঝানো হয়েছে মদীনাকে। অর্থাৎ তারা তখন খুব কম সংখ্যকই অবস্থান করতে পারতো মদীনায়। তাদেরকে করা হতো দেশান্তর, অথবা উড়িয়ে দেওয়া হতো তাদের গর্দান।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'এরা তো পূর্বেই আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলো যে, এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না'।

ইয়াজিদ ইবনে রুম্‌মান বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন বনী হারেছা সংকল্প করেছিলো, তারা বনী সালমাকে সংহার করবেই। কিন্তু তাদের সম্পর্কে যখন আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন তারা প্রদর্শন করে সংযম। বলে, আর কখনো আমরা এরকম বলবো না।

কাতাদা বলেছেন, বদর যুদ্ধে কিছুসংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হয়নি। যুদ্ধশেষে বিজয়ী যোদ্ধাদের মর্যাদা দেখে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। সংকল্প করে, এরকম সুযোগ যদি আমরা আবার পাই, তবে জান-প্রাণ দিয়ে লড়বো। তাদের কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য বাক্যে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে'। একথার অর্থ— কৃত অঙ্গীকার তারা পূর্ণ করেছিলো কিনা, সে সম্পর্কে পরকালে আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আর শাস্তি দিবেন অঙ্গীকারভঙ্গের।

এর পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমাদের কোনো লাভ হবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন করো'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আপনার অনুচরবর্গকে জানিয়ে দিন, মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে কোনো লাভ নেই। কারণ প্রত্যেকের মৃত্যুক্ষণ সুনির্ধারিত। যথাসময়ে সে মৃত্যু এসে পড়বেই— স্বাভাবিক নিয়মে, অথবা যুদ্ধাহত অবস্থায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে'। একথার অর্থ— পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। এখানকার সম্ভোগ্য উপকরণ অত্যধিক হলেও তা অত্যল্প। সুতরাং পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবন পেলেও জানতে হবে, এখানকার ভোগ-সম্ভোগ সামান্যই। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— মনে করো যুদ্ধ থেকে পালিয়ে তোমরা প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হলে। জীবনযাপন ও শুরু করলে নিশ্চিন্তে। কিন্তু তারপর? তোমাদের ওই নিরুপদ্রব জীবন কি একসময় ফুরিয়ে যাবে না? মৃত্যু কি তোমাদেরকে গ্রাস করবে না?

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'বলো, কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ থেকে রক্ষা করবে, যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন, অথবা তিনি যদি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন, তবে কে তোমাদেরকে ক্ষতি করবে'?

এখানে 'সূআন' অর্থ অমঙ্গল, শাস্তি। 'আও আরদা বিকুম রহমাহ্' অর্থ যদি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন। এর সঙ্গে উহ্য রয়েছে এখানকার 'তবে

www.eelm.weebly.com

কে তোমাদের ক্ষতি করবে’ কথাটি। আরববাসীগণ বলেন ‘সাইফান ওয়া রুমছা’ (গলবন্ধ করে নিয়ে এসো তরবারী ও তীর)। সুতরাং বুঝতে হবে এখানকার ‘রক্ষা করবে’ কথাটির মধ্যে পরিত্রাণ বা নিষ্কৃতির ইঙ্গিত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না’। এখানে ‘ওলী’ অর্থ অভিভাবক, শুভানুধ্যায়ী, সুহৃদ, নিকটজন। আর ‘নাসীরা’ অর্থ সাহায্যকারী, অমঙ্গল বিদূরণকারী।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ
اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ ﴿۱۸﴾ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖۚ فَاِذَا
جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ
يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ
حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۗ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ
اَعْمَالَهُمْ ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿۱۹﴾ يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ
لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى
الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ۗ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا
اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۲۰﴾

r আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কাহারা বাধাদানকারী এবং কাহারা তাহাদের ভ্রাতৃবর্গকে বলে, ‘আমাদের সঙ্গে আইস।‘ উহারা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয়—

r তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতাবশত আর যখন ভীতি আসে তখন তুমি দেখিবে, মৃত্যুভয়ে মুর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উল্টাইয়া উহারা তোমার দিকে তাকায়। কিন্তু যখন ভয় চলিয়া যায় তখন উহারা ধনের লালসায় তোমাদিগকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। উহারা ঈমান আনে নাই, এইজন্য আল্লাহ্ উহাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করিয়াছেন এবং আল্লাহ্র পক্ষে ইহা সহজ।

www.eelm.weebly.com

r উহারা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী চলিয়া যায় নাই। যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার আসিয়া পড়ে, তখন উহারা কামনা করিবে যে, ভাল হইত যদি উহারা যাযাবর মরুবাসীদের সহিত থাকিয়া তোমাদের সংবাদ লইত! উহারা তোমাদের সংগে অবস্থান করিলেও উহারা যুদ্ধ অল্পই করিত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কে বাধাপ্রদানকারী এবং কারা তাদের ভ্রাতৃবর্গকে বলে, আমাদের সঙ্গে এসো।

এখনে 'ভ্রাতৃবর্গকে বলে' অর্থ বলে মদীনার অধিবাসীবৃন্দকে। অর্থাৎ মুনাফিকেরা মদীনার অধিবাসীবৃন্দকে বলে, তোমরা আমাদের দলে ভিড়ে যাও। পরিত্যাগ করো মোহাম্মদের দল। নতুবা আমাদের আশংকা হয় তোমরা বেঘোরে প্রাণ হারাবে। 'আওক্ব' অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া। আর 'আয়িক্ব' অর্থ বাধাদানকারী। কাতাদা বলেছেন, মদীনার কপটবিশ্বাসীরাই রসুল স. এর সাহচর্য গ্রহণে অন্য মুসলমানদেরকে বাধা দান করতো। বলতো, মোহাম্মদ ও তার সঙ্গী-সাথীরা হচ্ছে গোশতের টুকরা, ওরাই আবু সুফিয়ান ও তার দলের লোকদের মুখের গ্রাস।

মুকাতিল বলেছেন, ইহুদীরা মদীনার কপটবিশ্বাসীদেরকে রসুল স. এর সংসর্গ ত্যাগ করতে উৎসাহিত করতো। বলতো, আবু সুফিয়ান ও তার বাহিনীর হাতে তোমরা নিজেদেরকে নিহত করতে চাও কেনো? সে একবার সুযোগ পেলে তোমাদের কাউকেই আস্ত রাখবে না। তোমরা আমাদের প্রতিবেশী। তাই তো তোমাদের অমঙ্গলাশংকায় আমাদের মন কাঁদে। সুতরাং বাঁচতে যদি চাও, তবে ভালোয় ভালোয় ভিড়ে যাও আমাদের সঙ্গে। ইহুদীদের এমতো প্রস্তাব খুব মনোপুত হলো কপটপ্রধান আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের। সে তার একান্ত অনুচরদেরকে নিয়ে বিভিন্ন কৌশলে সৃষ্টি করতে লাগলো বাধা। আবু সুফিয়ানের ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলো মুসলমানদেরকে। বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদের সঙ্গে তোমরা আর থাকবে কোন্ ভরসায়? সে তো তোমাদেরকে আবু সুফিয়ানের বাহিনীর হাতে নিহত করেই ছাড়বে। দেখেছো, অসংখ্য সৈন্য নিয়ে আবু সুফিয়ান আক্রমণোদ্যত। ভেবেছো তার হাত থেকে নিস্তার পাবে। সেতো তোমাদের কাউকেই ছাড়বে না। সুতরাং ভালো চাও তো আমাদের সঙ্গে এসো। চলো, সকলে যোগ দেই ইহুদীদের দলে। উল্লেখ্য, রসুল স. এর প্রিয়ভাজন সাহাবীগণ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও তার দলের লোকদের এরকম প্রস্তাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেননি। কারণ তাঁরা যে ছিলেন রসুল অন্তঃপ্রাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয়'। একথার অর্থ— কপটচারীরা বাইরে বিশ্বাসী এবং অন্তরে অবিশ্বাসী। তাই জেহাদে অংশগ্রহণের কথা শুনলে বিভিন্ন অজুহাত তুলে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পেছন

www.eelm.weebly.com

থেকে করে বাগাড়ম্বর। জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির আশায় প্রদর্শন করে কেবল বাহ্যিক আনুগত্য। আর তাদের এমতো প্রতারণার পক্ষে দাঁড় করায় বিভিন্ন রকমের অজুহাত। কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, মুনাফিকদের সম্পর্কে চূড়ান্ত মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য বাক্যে। এখানে বলা হয়েছে তাদের যুদ্ধকালীন টালবাহানার কথা। তাদের ধারণা, এভাবে বিভিন্ন টালবাহানার মাধ্যমে যুদ্ধযাত্রা থেকে পৃথক হয়ে পড়লে রসুল স. ও তাঁর সহচরগণ হতোদ্যম হয়ে পড়বে। ফলে তারা শত্রুকে প্রতিহত করার সাহস ফেলবে হারিয়ে।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতাবশত'। একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ। কপটাচারীরা কস্মিনকালেও তোমাদের কল্যাণকামী নয়। তাইতো তারা তোমাদের সহযোদ্ধা হওয়ার ব্যাপারে প্রকাশ করে এতো কার্পণ্যতা। তারা একেবারেই চায়না যে, তোমরা বিজয়ী হও এবং অধিকারী হও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের। এখানকার 'আশিহ্‌হাতুন' শব্দটি 'শাহিহুন' এর বহুবচন। এর অর্থ কৃপণ, লোভী।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর যখন ভীতি আসে, তখন তুমি দেখবে, মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির মতো চোখ উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকায়'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! যুদ্ধভীতির সম্মুখীন হলে আপনি কপটাচারীদেরকে চিনতে পারবেন সহজেই। দেখবেন, তখন তারা মৃত্যুর আশংকায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য ব্যক্তির মতো আপনার দিকে তাকিয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে।

এখানে 'তাদূরু আ'ইয়ুনুহুম' অর্থ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে তোমার দিকে তাকায় অস্থির দৃষ্টিতে। মনে হয় ভয়ে তাদের চোখের তারা দু'টো যেনো অস্থির হয়ে ঘুরছে। আর 'মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির মতো' হচ্ছে এখানে একটি উপযুক্ত উপমা। মুনাফিকদের যুদ্ধভীতি তাদের চোখে মুখে প্রকাশ পায় এভাবেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু যখন ভয় চলে যায়, তখন তারা ধনের লালসায় তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে'। এখানে তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে' অর্থ— হে বিশ্বাসীবৃন্দ! যখন তোমরা যুদ্ধে জয়লাভ করো, তখন বাকচাতুরীতে তারা তোমাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়। তোমাদের নামে বের করে বিভিন্ন দুর্নাম। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'সালাকূকুম' অর্থ, তারা তোমাদেরকে জর্জরিত করে বাক্যবানে। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ— যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনকালে তারা সমালোচনা করে তীর্যক ভাষায়। যেমন বলে— যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তোমাদের অধিকার আমাদের চেয়ে অধিক নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা ইমান আনেনি, এজন্য আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করেছেন। একথার অর্থ— তারা কপট, বাহ্যত বিশ্বাসী হলেও অন্তরে

www.eelm.weebly.com

অবিশ্বাসী। সুতরাং তাদেরকে ইমানদার বলে গণ্য করা যায় না। আর তাদের উদ্দেশ্যও অসাধু। আল্লাহ্পাক তাই তাদের কর্মকাণ্ডকে করে দিয়েছেন নিষ্ফল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য সম্বলিত কর্ম ছাড়া অন্য সকল কর্ম এভাবে নিষ্ফলতাতেই পর্যবসিত হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্র পক্ষে এটা সহজ'। একথার অর্থ— আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় যেহেতু কোনো ব্যক্তি বা বস্তুনির্ভর নয়, বরং অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে যেহেতু তিনি চিরপবিত্র, চিরঅমুখাপেক্ষী ও চিরস্বাধীন, সেহেতু সকল প্রকার নির্ধারণই তাঁর পক্ষে সম্ভব ও সহজ। সুতরাং বুঝতে হবে মানুষের সাফল্য ও বৈফল্য সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায় নির্ভর। আর এটাও তাঁর চিরন্তন অভিপ্রায় যে কপটাচারীদের অসাধু উদ্দেশ্যসম্বলিত কর্মকাণ্ডকে তিনি নিষ্ফল করবেনই।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'তারা মনে করে সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি'। একথার অর্থ— মুনাফিকেরা তখন পর্যন্ত মনে করেছিলো, আবু সুফিয়ান ও তার সম্মিলিত বাহিনী এখনো স্থান ত্যাগ করেনি। তাই তারা বসেছিলো মদীনার অভ্যন্তরেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার এসে পড়ে তখন তারা কামনা করবে যে, ভালো হতো যদি তারা যাযাবর মরুবাসীদের সঙ্গে থেকে তোমাদের সংবাদ নিতো'। একথার অর্থ— তারা মনে মনে ভাবে, যদি আবু সুফিয়ানের বাহিনী মদীনায় ঢুকেই পড়ে, তবে তারা পালিয়ে যাবে দূরের মরু অঞ্চলে। সেখানকার যাযাবরদের সঙ্গে মিশে গিয়ে গোপন করবে নিজেদের পরিচয়। আর সেখান থেকেই খবরাখবর রাখবে কী হলো আল্লাহ্র রসুল ও তাঁর সহচরবৃন্দের।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করলেও তারা যুদ্ধ অল্পই করতো'। একথার অর্থ— লৌকিকতা বা চক্ষুলজ্জার খাতিরে যদি তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হতো, তবে সারাক্ষণ বেঁচে থাকতে চেষ্টা করতো প্রতিপক্ষীয়দের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ থেকে। অস্ত্রধারণ করলেও করতো কখনো কখনো, অতি অল্প সময়ের জন্য।

সূরা আহ্যাব ঃ আয়াত ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾ وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ

www.eelm.weebly.com

الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ صَدَقَ اللّٰهُ وَ
رَسُوْلُهٗ ۡ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّ تَسْلِيْمًا ﴿٢٢﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ
مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾ لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ
الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ
عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾ وَ رَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۭ وَ كَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ
الْقِتَالَ ۭ وَ كَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾ وَ اَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ
مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَ قَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ
فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾

r তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ।

r মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখিল, উহারা বলিয়া উঠিল, 'ইহা তো তাহাই, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহার প্রতিশ্রুতি আমাদিগকে দিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল সত্যই বলিয়াছিলেন।' আর ইহাতে তাহাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পাইল।

r মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সহিত তাহাদের কৃত অংগীকার পূর্ণ করিয়াছে, উহাদের কেহ কেহ শাহাদাত বরণ করিয়াছে এবং কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। উহারা তাহাদের অংগীকারে কোন পরিবর্তন করে নাই;

r কারণ আল্লাহ্ সত্যবাদীদিগকে পুরস্কৃত করেন তাহাদের সত্যবাদিতার জন্য এবং তাঁহার ইচ্ছা হইলে মুনাফিকদিগকে শাস্তি দেন অথবা উহাদিগকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

r আল্লাহ্ কাফিরদিগকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরাইয়া দিলেন, তাহারা কোন কল্যাণ লাভ করে নাই। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

www.eelm.weebly.com

r কিতাবীদের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি তাহাদের দুর্গ হইতে অবতরণ করাইলেন এবং তাহাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করিলেন; এখন তোমরা উহাদের কতককে হত্যা করিতেছ এবং কতককে করিতেছ বন্দী।

'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে' অর্থ যারা আকাংখী হয় আল্লাহ্র নিকট থেকে পুণ্যের, পুণ্যময় দীদারের, অর্থাৎ পারলৌকিক সফলতার। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে আল্লাহ্ ও আখেরাতকে ভয় করার অর্থ আল্লাহ্র অনুগ্রহের আশা ও শাস্তির ভয় করা, বিশেষ করে আশা করা পরকালের পুরস্কারের এবং ভয় করা তিরস্কারের। যেমন আরবীভাষীরা বলেন 'আরজু যায়দান ওয়া ফাদ্বলাহু' (আমি জায়েদের করুণাকামী)। মুকাতিল বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ— যারা শংকিত থাকে আল্লাহ্ ও মহাবিচারদিবসের ভয়ে। আর 'আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে' অর্থ আল্লাহ্কে স্মরণ করে সুখে-দুঃখে সব সময়। উল্লেখ্য, অধিক স্মরণই হয় অব্যাহত আনুগত্যের কারণ। সেজন্যই এখানে আল্লাহ্কে ভয় করার সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে তাঁকে অধিক স্মরণের কথা। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তাঁকে অধিক স্মরণ করে, তারাই হয় তাঁর রসুলের একান্ত অনুগামী।

তোমাদের জন্য রসুলুল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' অর্থ রসুল স. এর জীবনে এমন অনেক মহান আদর্শ রয়েছে, যা তোমাদের জন্য অবশ্য অনুসরণীয়। যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে অকুতোভয় অবস্থান গ্রহণ, যে কোনো বিপদাপদের সাথে ধৈর্যময় ও সহিষ্ণুতাশোভিত মোকাবিলা। অথবা কথাটির অর্থ— রসুল স. তোমাদের অগ্রণী। সুতরাং তাঁর অনুগমন তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। আরবীভাষার রীতি অনুসারে এরকম অর্থ গ্রহণই সুসঙ্গত। যেমন 'ফীল বাইদ্বতে ইশরূনা মুন্না হাদীদ' অর্থ শিরত্রাণে কুড়িসের লোহা আছে। শব্দটি তাই 'ফুলাতুন' রূপে উস্ওয়াতুন' এবং ইফতিয়াল শব্দগঠন প্রক্রিয়ায় সাধিত। যেমন 'ইক্বতিদা' থেকে গঠিত হয়েছে 'কুদওয়াতুন'। শব্দটি ধাতুমূলের স্থলে নামপদ। সুতরাং এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— রসুলের অনুরাগী হওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। তিনি যেমন সত্যধর্ম প্রচার-প্রসারের দায়িত্বে আসক্তা নিবেদিত, তেমনি নিবেদিতপ্রাণ হওয়া উচিত তোমাদেরও। উহুদ যুদ্ধে উৎপাটিত হয়েছে তাঁর পবিত্র দন্ত, রক্তরঞ্জিত হয়েছে পবিত্র শরীর, আবার ওই যুদ্ধে তিনি হারিয়েছেন তাঁর প্রিয় পিতৃব্য হামযাকে। তৎসত্ত্বেও তো তিনি তাঁর মূল লক্ষ্যে অবিচল। সুতরাং তোমরাও অনড় ও অবিচল থাকো সত্যের পথে। তাঁর মতোনই পর্বতপ্রমাণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে অতিক্রম করো বাধা-প্রতিবন্ধকতার সকল চড়াই-উৎরাই।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখলো, তারা বলে উঠলো, এটাতো তা-ই, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল সত্যই বলেছিলেন'।

এখানে প্রতিশ্রুতি অর্থ, ওই অঙ্গীকার যার কথা ঘোষিত হয়েছে সুরা বাকারায় এভাবে— তোমরা কি ধারণা কর, জান্নাতে প্রবেশ করবে এমনি এমনি......মনে রেখো, আল্লাহ্র সাহায্য অতি নিকটে'। এই আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বিশ্বাসীগণকে পরীক্ষা করা হবে কঠোরভাবে, তাদেরকে চরম বিপদে পতিত করে যাচাই করা হবে তারা জান্নাতলাভের উপযোগী ইমানদার কিনা। উল্লেখ্য, পরিখার যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে সাহাবীগণের সে কথাই মনে পড়ে গিয়েছিলো। আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত উক্তিটি তাঁরা করেছিলেন সে কারণেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর এতে তাদের ইমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেলো'। এখানে 'ইমান' (বিশ্বাস) অর্থ রসুল স. এর উক্তির উপরে অটল আস্থা। আর 'তাসলীম' (আনুগত্য) অর্থ আল্লাহ্তায়ালার সাধারণ বিধান ও নিয়তির বিধানকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নেয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়ের প্রতি পূর্ণ সমর্পিত হওয়া।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে'। একথার অর্থ— সাহাবীগণ রসুল স. এর সঙ্গে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন বলে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, সে অঙ্গীকার তারা যথারীতি পূর্ণ করেছেন। এখানে 'সদাক্কু' অর্থ অঙ্গীকারকারীরা তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোনো পরিবর্তন করেনি'। একথার অর্থ— তাদের মধ্যে কেউ কেউ কৃত অঙ্গীকার পূরণ করতে গিয়ে আল্লাহ্র পথে জীবন দিয়েছে, কেউ কেউ অপেক্ষায় রয়েছে অঙ্গীকার পূরণের। এভাবে তারা তাদের কৃত অঙ্গীকারের প্রতি প্রদর্শন করে চলেছে যথাযথ সম্মান।

এখানকার, 'নহব' শব্দটির অর্থ 'মানত' এবং 'মৃত্যু' দু'টোই হয়। যদি শব্দটির অর্থ 'মৃত্যু' ধরা হয় তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তাদের মধ্যে কেউ কেউ অঙ্গীকার পূরণ করতে গিয়ে সম্মুখীন হয়েছে মৃত্যুর। যেমন হজরত হামযা। কিন্তু কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন— তারা প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্ষেত্রে করেছে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। আরববাসীরা বলেন 'নাহিবু ফুলানুন ফী মাইসিরাতি ইয়াওমিহী ওয়া লাইলাতিহী' (সে চলার পথে দিন-রাত দু'টোকেই কাজে লাগিয়েছে)।

www.eelm.weebly.com

বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে আবী শায়বারা, আবু দাউদ, ইবনে সা'দ এবং বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, আমার পিতৃব্য আনাস ইবনে নজর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি বলে তীব্র মনোকষ্টে কালাতিপাত করতেন। তিনি পণ করলেন, আর কোনো যুদ্ধেই তিনি অনুপস্থিত থাকবেন না। এক সময় এসে পড়লো উহুদ যুদ্ধের ডাক। তিনি বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধে। প্রথম দিকে পর্যুদস্ত হলো মুসলিম বাহিনী। রসুল স. এর পবিত্র বদন হলো রক্তরঞ্জিত। সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো, রসুল স. শহীদ হয়েছেন। একথা শোনার সাথে সাথে অনেকে অসি সম্বরণ করে বিমর্ষচিত্তে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে রইলেন। আমার পিতৃব্য আনাস বললেন, হে আমার আল্লাহ! আমার সঙ্গীসাথীদের এমতো নির্বিকার অবস্থাকে আমি তোমার দরবারে পেশ করছি অজুহাত হিসেবে। একথাও নিবেদন করছি যে, অংশীবাদীরা যা করেছে তার প্রতি আমি ভয়ানক অতুষ্ট। এরপর তিনি মর্মাহত মুসলিম সৈন্যদের কাছে যেয়ে বললেন, কী ভাবছো তোমরা? তাঁরা বললেন, আমাদের প্রিয়তম নবী যখন শাহাদত বরণ করেছেন, তখন কী আর করতে পারি আমরা? তিনি বললেন, তাই যদি হয় তবে আমাদের আর বেঁচে থেকেই বা কী লাভ? যে ধর্মাদর্শের জন্য আমাদের প্রিয়তম নবী প্রাণোৎসর্গ করেছেন, সেই পবিত্র ধর্মাদর্শের জন্য জীবনদান করাই তো আমাদের একমাত্র কর্ম। চলো। অগ্রসর হও। তাঁর এ কথায় সম্বিত ফিরে পেলেন সকলে। উন্মুক্ত অসি হাতে ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে গেলেন শত্রুদের দিকে। হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজও ছিলেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেছেন, আনাস ইবনে নজর তখন চরম উল্লসিত হয়ে বললো, হাঃ হাঃ আবু আমর! আমি ঘ্রাণ পাচ্ছি জান্নাতের। উহুদের রণপ্রান্তর এখন জান্নাতের সুরভিতে ভরপুর। একথা বলেই তিনি মত্ত শার্দুলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুশমনদের উপর। হজরত আনাস বলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার প্রিয় পিতৃব্য পান করলেন শাহাদতের পেয়ালা। তাঁর শরীরে ছিলো তখন দুশমনদের তীর ও তলোয়ারের আশিটি আঘাত। তারা তাঁর নাক কান ইত্যাদি কেটে নিয়েছিলো বলে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে সনাক্ত করাও সম্ভব হয়নি। শেষে তাঁকে সনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁর ভগ্নি বিশামা। আর আমাদের বদ্ধমূল ধারণাও হয়েছিলো এই যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো আমার শহীদ পিতৃব্য এবং তাঁর মতো অন্যান্য শহীদগণকে লক্ষ্য করে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত খাব্বাব ইবনে আরত বলেছেন, রসুল স. এর সঙ্গে আমরা যারা হিজরত করেছিলাম, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অল্পদিনের মধ্যে এ ধরাধাম ছেড়ে চলে যান। তাদের ত্যাগ তিতিক্ষার কোনো বিনিময়ই তাঁরা এ পৃথিবীতে পাননি। তাঁদের একজনের নাম মাসআব ইবনে উমায়ের। উহুদ যুদ্ধে

www.eelm.weebly.com

শহীদ হয়েছিলেন তিনি। ওই সময় তাঁর পরনে ছিলো একটি হ্রস্ব কম্বল। দাফনের সময় ওই কম্বলটি দ্বারা তাঁর শরীরকে পুরোপুরি আবৃত্ত করাও সম্ভব হয়নি। মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে পড়তো। আবার পা ঢেকে দিলে উন্মোচিত হয়ে পড়তো মস্তক। এ অবস্থা দেখে তখন রসুল স. বললেন, মাথার দিকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও আর পা ঢেকে দাও ইজখর ঘাস দিয়ে। আবার আমাদের হিজরতকারীদের অনেকেই পেয়েছিলেন দীর্ঘ হায়াত। তাঁরা যেমন উপভোগ করতে পেরেছিলেন দুনিয়ার নেয়ামত, তেমনি অধিকতর সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন তাঁদের আখেরাতকেও।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, রসুল স. একবার হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্কে দেখিয়ে বললেন, কেউ যদি পৃথিবীতে চলমান কোনো জান্নাতবাসীকে দেখে পরিতৃপ্ত হতে চায়, সে যেনো দেখে একে। তালহা তো পূর্ণ করেছে তার পৃথিবীর আয়ুষ্কাল।

হজরত ঈসা ইবনে তালহা বর্ণনা করেছেন, একবার আমি ও আমার বোন উপস্থিত হলাম জননী আয়েশা সকাশে। জননী আয়েশার বড় বোন হজরত আসমাও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তাঁদের তিনজনের মধ্যে শুরু হলো বাদানুবাদ। হজরত আসমা আমার বোনকে বললেন, আমার পিতা তোমার পিতার চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। আমার বোন তাঁর কথা মানতে চাইলো না। শুরু করলো বিতর্ক। জননী আয়েশা তাঁদের দু'জনকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এ ব্যাপারে আমি যদি সিদ্ধান্ত প্রদান করি তবে কি তা উত্তম হয় না? তাঁরা দু'জনে বললেন, অবশ্যই। জননী বললেন, একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন আমার পিতা আবু বকর। রসুল স. তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আতীক্ব (নরকমুক্ত)। কিছুক্ষণ পর সেখানে উপস্থিত হলেন তালহা। রসুল স. তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, তালহা! যারা মানতপূরণ করেছে এবং পূরণ করেছে তাদের পৃথিবীর জীবন, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।

তিরমিজির বর্ণনা এসেছে, হজরত মুয়াবিয়া বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, যারা তাদের পৃথিবীর আয়ুষ্কাল পূর্ণ করেছে, তালহা তাদের মধ্যে গণ্য।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত কায়েস ইবনে হাযেম বলেছেন, আমি দেখেছি, তালহার একটি হাত ছিলো পক্ষাঘাতগ্রস্ত। ওই হাত দিয়েই তিনি রসুল স.কে উহুদ যুদ্ধের সময় শত্রুর আক্রমণ থেকে হেফাজত করেছিলেন। শত্রুরা তার ওই হাতের উপরেই হেনেছিলো আঘাত। শত্রুর তীর ও তলোয়ারের আঘাতে চরমভাবে জখম হওয়া তাঁর ওই হাত পরবর্তী সময়ে হয়েছিলো পক্ষাঘাতের শিকার। সম্বলিতসূত্রে হজরত যোবায়েরের মাধ্যমেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, হাকেম প্রমুখ।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'কারণ আল্লাহ্ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন তাদের সত্যবাদীতার জন্য'। এখানে 'সত্যবাদীতার জন্য' অর্থ প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য, প্রতিশ্রুতি পূরণের বিনিময়ে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন'। একথার অর্থ— এবং আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়ানুসারে তাদেরকে কপটাচারী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করতে হয়, অথবা ইচ্ছে করলে আল্লাহ্ তাদেরকে দান করেন বিশুদ্ধ তওবার সুযোগ, ফলে তারা মৃত্যুবরণ করতে পারে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে, ইমান নিয়ে।

এরপর বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— তওবাকারীর প্রতি আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ এবং পরম দয়ার্দ্র।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ কাফেরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোনো কল্যাণ লাভ করেনি'। একথার অর্থ— গোটা আরবের অংশীবাদীরা সংঘবদ্ধ আক্রমণ করেও আল্লাহ্র রসুল ও তাঁর সহচরবৃন্দের কোনো ক্ষতি করতে পারলো না। আল্লাহ্ তাদের উপর চাপিয়ে দিলেন পরাজয়ের দ্বিগুণ গ্লানি। ফলে তারা আপনাপন জনপদে ফিরে যেতে বাধ্য হলো বুক ভরা ক্ষোভ ও আক্রোশ নিয়ে এবং কল্যাণবিবর্জিত অবস্থায়। না পেলো জয়ের আনন্দ, না লাভ করতে পারলো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ।

এরপর বলা হয়েছে— 'যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট'। একথার অর্থ— পরিখার এই চরম সংকটময় যুদ্ধে বিশ্বাসীদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করলেন আল্লাহ্তায়ালা। তাই তো তারা পেলো নিরঙ্কুশ বিজয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী'। একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক সর্বশক্তিমান বলেই প্রচণ্ড তুফানের মাধ্যমে তছনছ করে দিলেন অংশীবাদীদের বিশাল সমরায়োজন। আর মহাপ্রতাপশালী বলেই শায়েস্তা করলেন, ইসলামের শত্রুদেরকে। এভাবেই অবাধ্যদের উপরে কার্যকর হলো তাঁর রোষ ও প্রতিশোধ।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিলো, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে অবতরণ করালেন'। একথার অর্থ— মদীনাবাসী হওয়া সত্ত্বেও ইহুদী বনী কুরায়জারা মিত্রশক্তি হিসেবে সাহায্য করেছিলো কুরায়েশ, গাতফান ও অন্যান্য আরবীয় অংশীবাদীর দলকে, সেই অপরাধে আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে বের করে দিলেন তাদের সুদৃঢ় দুর্গ থেকে।

www.eelm.weebly.com

এখানকার ‘সীয়াসীউন’ শব্দটি ‘সীসাতুন’ এর বহুবচন। এর অর্থ দুর্গ, নিরাপদ আশ্রয়, আত্মরক্ষার উপলক্ষ। উল্লেখ্য, আত্মরক্ষার উপলক্ষ বলেই কেউ কেউ হরিণের শিঙ, মোরগের নখর এবং তন্তুকরদের তাঁতের হাতিয়ারকে বলে ‘সীসা’।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করলেন, এখন তোমরা তাদের কতককে হত্যা করেছো এবং কতককে করেছো বন্দী’। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা বনী কুরায়জার অন্তরে সৃষ্টি করলেন মুসলমানদের শৌর্যবীর্যের ভীতি। ফলে তারা বাধ্য হলো মুসলমানদের কাছে অস্ত্রসমর্পণ করতে। মুসলমানেরাও তখন সহজে তাদের পুরুষদের উপরে কার্যকর করতে পারলো মৃত্যুদণ্ড এবং নারী ও শিশুদেরকে করতে পারলো বন্দী।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনানুসারে বনী কুরায়জার পুরুষের সংখ্যা ছিলো ছয়শত। হজরত সা’দ ইবনে মুয়াজের ভাষ্যানুযায়ী আবু আমরও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। অপরিণতসূত্রে কাতাদা থেকে ইবনে আয়েজ বর্ণনা করেছেন, তাদের সংখ্যা ছিলো সাতশত। সুহাইল বলেছেন অনধিক আটশত। যথাসূত্রসহযোগে হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তাদের যুদ্ধক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ছিলো চারশত। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিলো নয়শত। উল্লেখিত বর্ণনাবৈষম্যের সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলা যেতে পারে যে, তাদের যুদ্ধক্ষম পুরুষের সংখ্যা চারশতই ছিলো, অবশিষ্টরা ছিলো তাদের সহযোগী। আর তাদের নারী ও শিশুর সংখ্যা ছিলো নয়শত। ‘সাবীলুর রাশাদ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, একহাজার।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ২৭

وَ اَوۡرَثَكُمۡ اَرۡضَهُمۡ وَ دِيَارَهُمۡ وَ اَمۡوَالَهُمۡ وَ اَرۡضًا لَّمۡ تَطَـُٔوۡهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیۡءٍ قَدِيۡرًا ﴿٢٧﴾

r আর তিনি তোমাদিগকে অধিকারী করিলেন উহাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধনসম্পদের এবং এমন ভূমি যাহাতে তোমরা এখনও পদার্পণ কর নাই। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্পাক বিনা যুদ্ধে মুসলমানদেরকে মালিক করে দিলেন বনী কুরায়জার জমি-জমা, বসতবাটি ও চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারের। এর সঙ্গে দিলেন আরো অনেক ভূখণ্ডের অধিকার, যা কর্তৃত্বাগত হবে পরবর্তী সময়ে। আর এরকম বিজয় প্রদান আল্লাহ্র জন্য অতি সহজ। কারণ তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিধর।

www.eelm.weebly.com

মুকাতিল ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে 'এমন ভূমির যাতে তোমরা এখনো পদার্পণ করোনি' বলে বুঝানো হয়েছে খায়বরকে। কাতাদা বলেছেন, মক্কা নগরীকে। হাসান বলেছেন, পারস্য ও সিরিয়াকে। ইকরামার অভিমত হচ্ছে, কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই সকল অমুসলিম জনপদের কথা, যেগুলো বিজিত হবে পরবর্তী সময়ে।

বনী কুরায়জাদের পরিণাম মোহাম্মদ ইবনে ওমর তাঁর শায়েখ (শিক্ষক) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, পৌত্তলিকদের সম্মিলিত বাহিনী পরিখার যুদ্ধের অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবার পর ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়েছিলো বনী কুরায়জারা। ইমাম আহমদ, বোখারী ও মুসলিম সংক্ষিপ্তাকারে এবং অপর এক সূত্রে বায়হাকী ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবিদ বর্ণনা করেছেন হুমাইদ ইবনে হেলালের মাধ্যমে। আবার হজরত ইবনে আবী আওফা সূত্রে জারীর, ওরওয়ার মাধ্যমে বায়হাকী এবং মাজিশুন ও ইয়াজিদ ইবনে আসামের মাধ্যমে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইবনে সা'দও।

মোহাম্মদ ইবনে ওমরের বর্ণনাটি এরকম— পৌত্তলিকবাহিনী যখন পালিয়ে গেলো, তখন মুসলিম বাহিনী ছিলো রণক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তাঁরা স্বগৃহে ফিরে এসে অস্ত্রসম্বরণ করলেন। রসুল স. উপস্থিত হলেন তাঁর প্রিয়তমা ভার্যা হজরত আয়েশার ঘরে। পানি চেয়ে নিয়ে ধৌত করলেন তাঁর পবিত্র মস্তক। বাগবী লিখেছেন, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে রসুল স. প্রথম পদার্পন করেছিলেন তার প্রিয়তমা পত্নী হজরত জয়নাব ইবনে জাহাশের প্রকোষ্ঠে। রসুল স. এর মাথা ধুয়ে দিয়েছিলেন তিনিই। মাথার এক পাশ ধোয়া হতে না হতেই সেখানে প্রবেশ করলেন হজরত আয়েশা। তিনি বলেছেন, ওই সময় বাইরে থেকে শ্রুত হলো সালামের আওয়াজ।

মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, জননী আয়েশা বলেছেন, লোকটি বাইরে জানাযার খাট রাখার স্থানে দাঁড়ালো। উচ্চস্বরে বলতে লাগলো, হে যোদ্ধৃবৃন্দ! তোমাদেরকে অস্ত্রসম্বরণ করতে বললো কে? রসুল স. হতচকিত হয়ে বাইরে গেলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালাম। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, লোকটি দাহিয়া কালবী। মাথা থেকে ধূলো ঝেড়ে ফেলছিলো সে।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, উকীষ পরিহিত লোকটি বললো, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আল্লাহ্ আপনার প্রতি মহানুভবতা বর্ষণ করুন। আপনি তো অতিদ্রুত যুদ্ধাস্ত্র ও রণপোশ খুলে রেখেছেন। অথচ যেদিন থেকে শত্রুরা মদীনা অবরোধ করেছে, সেদিন থেকে এখনো ফেরেশতারা যুদ্ধসাজে সজ্জিত। আমরা হামরাউল আসাদ পর্যন্ত শত্রুসেনাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে ভাগিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্র নির্দেশ ছিলো এরকমই। এখন আপনার প্রতি আল্লাহ্র আদেশ হচ্ছে, এই মুহূর্তে

www.eelm.weebly.com

বনী কুরায়জার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। আমি আমার বাহিনী নিয়ে চললাম। ভূকম্পন তুলতে হবে তাদের দুর্গে। আপনিও আপনার সৈন্যসামন্ত নিয়ে সেখানে চলুন।

হুমাইদ ইবনে হেলাল বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন বললেন, আমার সঙ্গী সহচরেরা শ্রান্ত। দু'চারদিনের বিশ্রাম পেলে উত্তম হয়। হজরত জিবরাইল বললেন, আপনার এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে বনী কুরায়জাকে আক্রমণ করা। তার পরের দায়িত্ব আমাদের। আমরা তাদেরকে ধরে ধরে এমনভাবে আছাড় মারবো, যেমন পাথরের উপরে আছড়ে ফেলা হয় ডিম। তারপর আমরা তাদেরকে এমনভাবে আতঙ্কগ্রস্ত করবো যে, দুর্গ থেকে বের হওয়া ছাড়া তাদের কোনো উপায়ন্তর থাকবে না।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন ঘরে ফিরে এলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! আপনার সঙ্গে যে লোকটি কথা বললো, সে কে? তিনি স. বললেন, তুমি কি তাকে দেখতে পেয়েছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, লোকটি কার মতো দেখতে বলতো? আমি বললাম, অনেকটা দাহিয়া কালবীর মতো। তিনি স. বললেন, তিনি জিবরাইল। তাঁর মাধ্যমে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেনো এক্ষুণি বনী কুরায়জাকে আক্রমণ করি।

হুমাইদ আরো বর্ণনা করেন, হজরত জিবরাইল তাঁর কথা শেষ করেই যাত্রা করলেন বনী কুরায়জার বসতির দিকে। তাঁর সঙ্গীসাথীরাও অনুগামী হলো তাঁর। তাদের ধাবমান অশ্বখুরের দাপটে বনী গানামের বসতিতে পরিদৃষ্ট হলো ধূলোর মেঘ। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, তাদের যাত্রাপথের ধূলোর মেঘ এখনো আমার চোখে ভাসে। কাতাদা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ইবনে আবিদের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এভাবে—রসুল স. তখন মদীনার মুসলিম জনপদে প্রেরণ করলেন এক ঘোষক। সে ঘোষণা করলো— 'ওহে আল্লাহ্র আরোহী! আপনাপন বাহনে সমারূঢ় হও।' আবার হজরত বেলালকে নির্দেশ দিলেন, তুমি ঘোষণা করে দাও, যে আল্লাহ্র রসুলের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা শুনেছে, সে যেনো বনী কুরায়জার বসতিতে পৌঁছার পূর্বে আসরের নামাজ আদায় না করে। আজ আসরের নামাজের স্থান হচ্ছে বনী কুরায়জার জনপদ।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম, জননী আয়েশা ও ইবনে উকবা থেকে বায়হাকী এবং হজরত কা'ব ইবনে মালেক থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি তোমাদেরকে কঠোরভাবে আদেশ দিচ্ছি, তোমরা আজ বনী কুরায়জার বসতি ছাড়া অন্য কোথাও নামাজ পড়তে পারবে না। হজরত ইবনে ওমরের উদ্ধৃতি দিয়ে মুসলিম লিখেছেন, রসুল

www.eelm.weebly.com

স. সেদিন বলেছিলেন জোহরের নামাজ পাঠ করার কথা। যাহোক, রসুল স. এর এই নির্দেশ পালন করার ব্যাপারে সাহাবীগণের মধ্যে দেখা দিলো মতোপ্রভেদ। একদল ক্রমাগত পথ চলে বনী কুরায়জার বসতিতে যখন পৌঁছলেন তখন সূর্য পাটে বসেছে। শুরু হয়েছে মাগরিবের সময়। ওই সময়েই তাঁরা পাঠ করলেন আসর। তাঁরা বললেন, আমরা আল্লাহ্‌র রসুলের নির্দেশ পালন করেছি যথাযথভাবে। আর একদল পথ চলতে চলতে ভাবলেন, বনী কুরায়জার বসতিতে পৌঁছার আগেই আসরের নামাজের সময় শেষ হয়ে যাবে। আবার ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করা শরিয়তের একটি ফরজ নির্দেশ। তাই তাঁরা পথিমধ্যেই সঠিক ওয়াক্তে আদায় করলেন আসর। তাঁরা মনে করলেন, গন্তব্যে পৌঁছতে বিলম্ব যাতে না হয়, সে কারণেই রসুল স. নির্দেশ দিয়েছিলেন ওরকম করে। পরে যখন বিষয়টি রসুল স. এর শ্রুতিগোচর হলো, তখন কোনো দলকেই কিছু বললেন না। অর্থাৎ একথা কোনো দলকে বললেন না যে তোমাদের আমল ভুল।

পর্যালোচনা ১. উল্লেখিত বর্ণনাবলীতে দেখা যায়, রসুল স. সাহাবীগণকে গন্তব্যে পৌঁছে আদায় করতে বলেছিলেন জোহর, অথবা আসর। এরকম বর্ণনাবৈষম্যের হেতু নির্ণয়ার্থে বলা যেতে পারে, নিশ্চয় তাঁদের একদল যাত্রা করেছিলেন অগ্রগামী বাহিনীরূপে। তাদেরকেই তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন গন্তব্যে পৌঁছে জোহর আদায় করার। আর পশ্চাদবর্তী বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন গন্তব্যে উপস্থিত হয়ে তারা যেনো পাঠ করেন আসর। অথবা বলা যেতে পারে, যারা ছিলেন তেজস্বী, দ্রুতগামী ও বনী কুরায়জার বসতির অধিকতর নিকটে বসবাসকারী, তাদেরকেই তিনি স. দিয়েছিলেন অকুস্থলে পৌঁছে জোহর পাঠ করার। আর অবশিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছিলেন আসরের।

পর্যালোচনা ২. বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিধানবেত্তাগণ যদি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টায় ভুলও করে বসেন, তবুও তিনি দোষী সাব্যস্ত হবেন না। সেকারণেই সাহাবীগণ তাঁর নির্দেশের বাস্তবায়ন দু'ভাবে করা সত্ত্বেও তিনি স. তাদের কোনো দলকেই সাধুবাদ যেমন দেননি, তেমনি করেননি তিরস্কারও।

'যাদুল মাআদ' রচয়িতা লিখেছেন, দু'টো দলই তাঁদের আপনাপন উদ্দেশ্য অনুসারে অর্জন করেছেন পুণ্য। তবে যাঁরা পথে সময়মতো নামাজ আদায় করেছেন তারা লাভ করেছেন দ্বিগুণ পুণ্য— একগুণ সঠিক সময়ে নামাজ পাঠ করার জন্য এবং আরেকগুণ প্রতিপালন করার জন্য রসুল স. এর নির্দেশের। আর একগুণ পুণ্যলাভ করেছে অকুস্থলে পৌঁছে নামাজ পাঠকারীরা। আর উভয় দলই যেহেতু রসুল স. এর নির্দেশের প্রতি ছিলেন সতত সতর্ক তাই তাঁদের সকলেই

www.eelm.weebly.com

ছিলেন পুণ্যাভিসারী। যা হোক, ওই অভিযানে রসুল স. বিজয় কেতন অর্পণ করেছিলেন হজরত আলীর হাতে। ওই কেতন পরিখার যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরেও তা ছিলো অনবনমিত।

মোহাম্মদ ইবনে আমর, ইবনে হিশাম ও বালাজুরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ওই অভিযানের সময় মদীনায় তাঁর প্রতিনিধিরূপে রেখে গিয়েছিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমকে। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ ইবনে ওমর ও বাগবীর বর্ণনা এরকম— পঞ্চম হিজরী। ২৩ জিলকদ। রসুল স. যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। শিরস্ত্রাণ ও বর্মসজ্জিত হয়ে হাতে তুলে নিলেন বর্শা। গলায় ঝুলিয়ে নিলেন ঢাল। আরোহণ করলেন ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন একটি অশ্বে। জুলু নামক স্থানে অস্ত্রসজ্জিত হলেন ছত্রিশজন অশ্বারোহী সাহাবী। অবশিষ্টরা ছিলেন পদাতিক। তাঁরা সকলে রসুল স.কে পরিবেষ্টন করে এগিয়ে চললেন বনী কুরায়জার বসবাসস্থলের দিকে।

ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, ওই সময় রসুল স. এর সহযোদ্ধার সংখ্যা ছিলো তিন হাজার।

পর্যালোচনা ৩. বনী কুরায়জার ঘটনায় একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ যাত্রা সিদ্ধ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রসুল স. এর বিদায় হজের ভাষণের মাধ্যমে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়। অথবা বলা যেতে পারে, পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কেবল রসুল স. এর জন্য ওই অভিযানটির অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। যেমন হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে রক্তপাত নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মক্কা বিজয়ের পরক্ষণে কেবল রসুল স. এর জন্যই সেখানে অল্পকিছুক্ষণের জন্য হত্যাকাণ্ড ঘটানো বৈধ করা হয়েছিলো। এরপর সেখানেও রক্তপাত নিষিদ্ধ হয়ে যায় চিরতরে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, যুদ্ধের সূচনা হয়েছিলো তখন বনী কুরায়জার পক্ষ থেকেই। তারা আবির্ভূত হয়েছিলো পৌত্তলিকদের সম্মিলিত বাহিনীর মিত্রশক্তিরূপে। তাই নিষিদ্ধ মাস হওয়া সত্ত্বেও রসুল স. ওই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

হজরত আবু রাফে' এবং হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন বনী কুরায়জাদের বসবাস স্থলে উপনীত হলেন, তখন আরোহণ করলেন একটি গদিবিহীন গাধার উপর। সৈনিক সাহাবীগণ তখন পরিবেষ্টন করে রেখেছিলেন তাঁকে।

জননী আয়েশা থেকে হাকেম, বায়হাকী ও আবু নাঈমের বর্ণনায় এবং মোহাম্মদ ইবনে আমর ও ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন অভিযান চালিয়ে ছিলেন সাওবাইনের দিক থেকে। সেদিকে আগে থেকেই অবস্থান নিয়েছিলেন সশস্ত্র হারেছা ইবনে নোমান আনসারী ও তাঁর বাহিনী। রসুল স.

www.eelm.weebly.com

তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কোনো সুসজ্জিত সেনাবাহিনী কি তোমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছে? আনসারগণ জবাব দিলেন, হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগে এদিক দিয়ে অতিক্রম করেছেন খচ্চরারোহী দাহিয়া কালবী। তিনিই আমাদেরকে এখানে থাকতে বলেছেন সশস্ত্র প্রহরায়। তিনি আরো বলে গিয়েছেন, এপথেই শুভাগমন ঘটবে আল্লাহ্র রসুলের। হারেছা ইবনে নোমান বললেন, সে কারণেই তো আমরা দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি সশস্ত্র সান্ত্রীরূপে। রসুল স. বললেন, তোমরা যাকে দাহিয়া কালবী বলছো, তিনি ছিলেন আসলে জিবরাইল। তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন বনী কুরায়জার দুর্গে ভূকম্পন সৃষ্টির এবং তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চারের। ইত্যবসরে সেখানে মুহাজির ও আনসারের একটি দল নিয়ে উপস্থিত হলেন হজরত আলী।

মোহাম্মদ ইবনে আমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু কাতাদা বলেছেন, যখন আমরা বনী কুরায়জার দুর্গের সন্নিকটে উপস্থিত হলাম, তখন তারা বুঝতে পারলো, চূড়ান্ত বুঝাপড়া আজ হবেই হবে। হজরত আলী উত্তোলন করলেন মুসলিম বাহিনীর বিজয় পতাকা। দুর্গবাসী ইহুদীরা অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে লাগলো রসুল স. এবং তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণের উদ্দেশ্যে। আমরা কোনো উচ্চবাচ্য করলাম না। নীরবে কেবল বুঝিয়ে দিলাম, তলোয়ারের দ্বারাই আজ হবে চূড়ান্ত মীমাংসা। ইত্যবসরে সেখানে আগমন করলেন রসুল স. স্বয়ং। দুর্গের কাছাকাছি একটি অসমতল প্রস্তরময় ভূমিতে উনা নামক কূপের পাশে শিবির স্থাপন করলেন তিনি স.। দৃশ্য দেখা মাত্র আলী আমাকে পতাকা হাতে দিয়ে এগিয়ে গেলেন রসুল স. এর দিকে। তিনি মনে প্রাণে চাইছিলেন ইহুদীদের অশ্রাব্য গালিগালাজ যেনো রসুল স. এর পবিত্র শ্রুতি পর্যন্ত না পৌঁছায়। তাই তিনি নিবেদন করলেন, মহামান্য রসুল! ওদের কাছাকাছি না ঘেষলেও চলে। তিনি স. বললেন, আলী! তুমি কি আমাকে ফিরে যেতে বলো! আমার ধারণা তুমি হয়তো ওদের কটুকাটব্য শুনেই একথা বলছো। আলী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার অনুমান যথার্থ। তিনি স. বললেন, তারা আমাকে এখনো দেখতে পায়নি বলেই এরকম করে বলতে পারছে। দেখলে আর বলতে পারবে না। একথা বলে রসুল স. দুর্গের দিকে আরো এগিয়ে গেলেন। তাঁর সামনে সামনে চলতে লাগলেন উসায়েদ ইবনে হুদায়ের। তিনি বলে উঠলেন, ওরে আল্লাহ্র দুশমন! মনে রেখো, তোমরা অনাহারে মৃত্যু মুখে পতিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা তোমাদেরকে অবরুদ্ধ করলাম। দেখি গহ্বরবাসী শেয়ালের মতো তোমরা কতক্ষণ বাস করবে দুর্গে। দেখতেই তো পাচ্ছো, তোমাদের রসদপত্রের সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। দুর্গবাসীদের একজন বললো, হে উসায়েদ! তুমি তো আমাদের

www.eelm.weebly.com

মিত্রপক্ষীয়। খাজরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় তোমরা আমাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেছিলে। মনে নেই? উসায়েদ বললেন, এখন আর তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো চুক্তিই নেই। নেই কোনো আত্মীয়তার বন্ধন।

রসুল স. দুর্গের আরো কাছে গেলেন। উচ্চস্বরে তাদের নেতাদের নাম ধরে ডেকে ডেকে বললেন, ওরে হতভাগা, বৃক্ষচর ও বক্রবক্তের ভ্রাতা! ওহে শয়তানের সহচর বিগ্রহবন্দনাকারী! জবাব দাও, আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেননি? তোমাদের উপরে কি আপতিত করেননি তাঁর রোষ? তবে তোমরা আমাকে গালমন্দ করছো কেনো? দুর্গের ভিতর থেকে জবাব এলো, হে আবুল কাসেম। আমরা তো আপনাকে গালমন্দ করিনি। আর আপনি তো মূর্খ ও বাচাল কোনোটাই নন।

দিবাবসান হলো। মুসলিম সৈনিকেরা সমবেত হলেন রসুল স. সকাশে। হজরত সা'দ ইবনে আবু উবায়দা কয়েক বস্তা খেজুর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওই খেজুরই হলো সকলের রাতের আহার। আহারের প্রাক্কালে রসুল স. বললেন, খেজুর অতি উপাদেয় আহার্য।

পরদিন তিনি স. গাত্রোত্থান করলেন অতিপ্রত্যুষে। তীরন্দাজবাহিনীকে অবস্থান গ্রহণ করতে বললেন দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে। নির্দেশ মোতাবেক তাঁরা চতুর্দিক থেকে দুর্গ ঘিরে ফেলে বর্ষণ করতে শুরু করলেন তীর ও পাথর। দুর্গের ভিতর থেকে তীর ও পাথর ছুঁড়তে লাগলো ইহুদীরাও। সারাটা দিন কেটে গেলো এভাবেই। সন্ধ্যা হলো। মুসলিম বাহিনী রইলো আপনাপন অবস্থানে অটল। তাঁদের পক্ষ থেকে তীর ও পাথরও নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো উপর্যুপরি। কিন্তু ইহুদীরা হঠাৎ করে কেমন যেনো নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লো। তীর ও পাথর নিক্ষেপ বন্ধ করে তারা প্রস্তাব পাঠালো সন্ধির। রসুল স. বলে পাঠালেন, ঠিক আছে, তাহলে আলোচনায় বসো। দুর্গ থেকে তারা আলোচনার জন্য পাঠালো নাব্বাস ইবনে কায়েসকে। সে এসে বললো, বনী নাজির যে সকল শর্তসহ আপনাদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলো, আমরাও ওই সকল শর্তসহ সন্ধি করতে চাই। তাদের মতো আমরাও আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিজন নিয়ে দেশান্তরে গমন করবো। উটের পিঠে যতটুকু মালমাত্তা নেওয়া সম্ভব তাই কেবল নিবো আমরা। আর তাদের মতোই ছেড়ে যাবো আমাদের অস্ত্রপাতি ও অবশিষ্ট সম্পদ। রসুল স. বললেন, না, তা সম্ভব নয়। নাব্বাস বললো, ঠিক আছে, আমরা পরিত্যাগ করে যাবো সবকিছু, সঙ্গে করে নিয়ে যাবো কেবল পরিবার পরিজনদের। রসুল স. বললেন, তা-ও সম্ভব নয়। বরং তোমরা বিনা শর্তে বের হয়ে এসো। তারপর আমরা যা সিদ্ধান্ত দিবো, তা-ই তোমাদেরকে মেনে নিতে হবে। নাব্বাস ফিরে গেলো। দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই উৎসুক ইহুদীরা ঘিরে ফেললো তাকে। নাব্বাস

www.eelm.weebly.com

তাদেরকে খুলে বললো সবকিছু। নির্বাক হয়ে গেলো সকলে। কা'ব ইবনে আসাদ কেবল বললো, শোনো বনী কুরায়েজ! বুঝতেই পাচ্ছো তোমরা এখন মহাসংকটে নিমজ্জিত। এ মহাসংকট থেকে পরিত্রাণের তিনটি উপায় আমি বলে দিতে পারি তোমাদেরকে, যদি তোমরা তা শুনতে চাও। গোত্রপতিরা বললো, ঠিক আছে, বলো দেখি তুমি কী বলতে চাও? কা'ব বললো, প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে— তোমরা তো জানোই যে, মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র নবী। একথা তো লেখা রয়েছে তোমাদের তওরাত গ্রন্থেই। সুতরাং তোমরা তাঁকে নবী বলে মেনে নাও। বায়াত গ্রহণ করো তাঁর পবিত্র হাতে হাত রেখে। এরকম করলে তোমরা সহজেই রক্ষা করতে পারবে তোমাদের জীবন, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার পরিজন সবকিছু। তিনি বনী ইসরাইল বংশদ্ভুত নন বলেই তো তোমরা ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে অস্বীকার করছো। উপেক্ষা করছো মহা সত্যকে। ভেবে দ্যাখো, এতে করে কি তোমরা শেষ রক্ষা করতে পারবে? তাঁর সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কি আমাদের উচিত হয়েছে? প্রথম থেকেই আমি ছিলাম এর ঘোর বিরোধী। কুলাঙ্গার হুয়াই ইবনে আখতাবই যতো নষ্টের মূল। দ্যাখো, এখন এতো বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েও সে কেমন নির্বিকারচিত্তে ঝিমুচ্ছে। ইবনে জাওয়াসের কথা কি তোমাদের মনে নেই? তিনি বলেছিলেন, এই আবর উপদ্বীপে আবির্ভূত হবেন এক মহামান্য নবী! আমার জীবদ্দশায় যদি আমি তাকে পাই, তবে আমি অবশ্যই হবো তাঁর একনিষ্ঠ অনুগ। আর যদি তাঁর মহাআবির্ভাব ঘটে আমার মৃত্যুর পর, তবে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে, তারা অবশ্যই হয়ো তার একনিষ্ঠ অনুসারী। সাবধান! এর অন্যথা কোরো না যেনো। মনে রেখো ওই মহামান্য নবীকে মেনে নিলে তোমরা হবে দ্বিগুণ সৌভাগ্যের অধিকারী। একগুণ তওরাত মান্য করার কারণে, আর একগুণ অনুসারী হওয়ার কারণে। সর্বশেষ প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থের। তাঁকে অবশ্যই জানিয়ো আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন। বোলো, আমি পৃথিবী পরিত্যাগ করেছি তাঁকে জেনে ও মেনে। সুতরাং হে বনী কুরায়জা জনগোষ্ঠী! এসো, আমরা সমর্পিত হই তাঁর পবিত্র হস্তে। জনতা সমস্বরে বলে উঠলো, না, না, তা হয় না। হতে পারে না। কোনো কিছুর বিনিময়েই আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না তওরাত। তওরাতের পরিবর্তে অন্য কোনো গ্রন্থের বিধান মান্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভবই নয়। কা'ব বললো, তাহলে আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব শোনো। এসো আমরা স্বহস্তে হত্যা করি আমাদের আপনাপন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের। তারপর জীবনপণ সংগ্রাম শুরু করি মোহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে। যদি নিহত হই, তবে আমাদের আর স্বজন-বিচ্ছেদের কোনো দুঃখ থাকবে না। আর যদি জয়ী হই, তবে নতুন করে রচনা করতে পারবো সংসার। জনতা বললো, নিরীহ স্বজনদের আমরা স্বহস্তে হত্যা করতে পারি কীরূপে? আর তাদেরকে হত্যা করলে আমাদের বেঁচে থাকার

www.eelm.weebly.com

স্বার্থকতাই বা কী? কা'ব বললো, তাহলে শোনো তৃতীয় প্রস্তাব— আজ শনিবার রাত। মোহাম্মদ ও তাঁর দলের লোকেরা ভালো করেই জানে যে, এরাত আমাদের কাছে কতো সম্মানের। তাই তারা আজ রাতে সময়াতিপাত করছে নিশ্চিন্তে। আজ রাতে আমাদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশংকা তাদের একেবারেই নেই। তাই এসো, আজ রাতে এক্ষুণি আমরা তাদেরকে আক্রমণ করি। এরকম করলে আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। জনতা বললো, অসম্ভব। এরাতের মর্যাদাহানি ঘটানও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ রাতের সম্মান নষ্ট করার কারণে আমাদের পূর্বসূরীদের অনেকে হয়েছে অভিসম্পাতগ্রস্ত। রূপান্তরিত হয়েছে শূকর ও বানরে। সুতরাং এ রাতের মর্যাদা বিনষ্ট করলে আমাদের উপরেও নেমে আসবে আল্লাহ্‌র আযাব। কা'ব বললো, আক্ষেপ মাতৃজঠর থেকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অবধি আজ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত বিবেকবান হতে পারলে না। ছা'লাবা ইবনে সাঈদ, উসায়েদ ইবনে সাঈদ ও উসাইয়েদ ইবনে উবাইয়েদ তখন বললো, হে বনী কুরায়জা জনতা! আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা ভালো করেই জানো যে, তিনি আল্লাহ্‌র সত্য রসুল। আমাদের তওরাতেও রয়েছে তাঁর অবয়বগত ও স্বভাবগত অবস্থার স্পষ্ট বিবরণ। আমাদের গোত্রের এবং বনী নাজিরের আলেমগণ সে কথা আমাদেরকে বহুবার শুনিয়েছেন। আমাদের জনগোষ্ঠীভূত ইবনে হাইয়্যান ছিলেন একজন সত্যাধিষ্ঠিত ব্যক্তি। তিনিও আমাদেরকে শেষ পয়গম্বের কথা বলে গিয়েছেন অনেক বার। আমাদের নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবও জানেন তাঁর প্রকৃত পরিচয়। সুতরাং তাঁকে আমরা স্বীকার করবো না কেনো? জনতা একযোগে বলে উঠলো, না , না, তা হয় না। তওরাতের বিধানের স্থলে অন্য কোনো বিধান আমরা মানতেই পারি না। ছা'লাবা ও তাঁর সঙ্গী দু'জন যখন বুঝতে পারলেন, ইহুদীরা তাদের অস্বীকৃতিতে অটল তখন তাঁরা আর অন্যের জন্য অপেক্ষা না করেই দুর্গ থেকে বেরিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। তাঁর পবিত্র হস্তে গ্রহণ করলেন ইসলামের বায়াত। এভাবে তাঁরা ইমানের সৌভাগ্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা করতে সমর্থ হলেন নিজেদের ও তাঁদের পরিবার পরিজনের জীবন।

এবার আমর ইবনে মাসউদ বলে উঠলেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা মোহাম্মদের সঙ্গে কৃত সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছো। আমি ওই সন্ধিচুক্তির অঙ্গীভূত নই। তাই চুক্তিভঙ্গের দায়ও আমার উপরে নেই। তবুও আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি একটি উত্তম প্রস্তাব। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করতে না-ই যদি চাও, তবে মুসলমানদেরকে জিযিয়া দাও। তাহলেই রক্ষা পেতে পারে তোমাদের জান ও মাল। তোমাদেরকে তাহলে ইহুদী ধর্মত্যাগও করতে হয় না। বনী কুরায়জা জনতা বললো, অসম্ভব। জিযিয়ার দায় ঘাড়ে নিয়ে আমরা আরবদের কাছে ছোট হতে

www.eelm.weebly.com

পারি না। এর চেয়ে যে মৃত্যুও ভালো। আমর বললেন, তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলাম। বিদায়। একথা বলেই তিনি তাঁর দুই সন্তানকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন দুর্গ থেকে। চলতে চলতে উপস্থিত হলেন মুসলিম বাহিনীর তখনকার প্রতিরক্ষা-অধিনায়ক মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমার সম্মুখে। প্রতিরক্ষা-অধিনায়ক জানতে চাইলেন তাঁর পরিচয়। তিনি বললেন, আমি আমর ইবনে মাসউদ। আর এ দু'জন আমার সন্তান। আমি রসুল স. এর সাক্ষাতপ্রার্থী। অধিনায়ক বললেন, হে আল্লাহ্! মর্যাদাবান ব্যক্তির সাহচর্য্য থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত কোরো না। একথা বলে পথ ছেড়ে দিলেন তিনি। আমর তাঁর দুই সন্তান নিয়ে সরাসরি পৌঁছে গেলেন রসুল স. সকাশে। রাত্রি অতিবাহিত করলেন সেখানেই। রসুল স. বলেছেন, অঙ্গীকার পূরণের বিনিময়ে আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করেছেন।

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, ইহুদীরা তখন রসুল স. এর কাছে প্রস্তাব পাঠালো, আমরা এ ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই আবু লুবাবার সঙ্গে। দয়া করে তাঁকে আমাদের দুর্গে পাঠিয়ে দিন। হজরত আবু লুবাবা ছিলেন ইহুদীদের মিত্র আউস গোত্রীয় আমর ইবনে আউফের বংশভূত। রসুল স. তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন তাদের দুর্গাভ্যন্তরে। ইহুদীরা তাঁকে জানালো সাদর অভ্যর্থনা। নারী ও শিশুরা শুরু করলো ক্রন্দন। হজরত আবু লুবাবার হৃদয় দ্রবীভূত হলো। তারা বললো, আবু লুবাবা! তুমি কী বলো? মোহাম্মদের ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা কি সকলে দুর্গ থেকে বের হয়ে পড়বো? তিনি বললেন হ্যাঁ। কিন্তু হাতে ইশারা করলেন তাঁর কণ্ঠনালীর দিকে। অর্থাৎ ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, তোমাদের সকলের কণ্ঠচ্ছেদন করা হবে। পরে তিনি স্বয়ং বলেছেন, ইশারা করার পরক্ষণেই আমার মনে হলো, একি করলাম আমি! আমি তো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে করলাম প্রতারণা। ভঙ্গ করলাম গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকার। একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়ে বেরিয়ে এলাম দুর্গ থেকে। রসুল স. সকাশে উপস্থিত না হয়ে গেলাম মসজিদ প্রাঙ্গণে। মসজিদের একটি স্তম্ভের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলে হলাম স্বেচ্ছাবন্দী। বললাম, আমি প্রতারক। এভাবে স্বেচ্ছাবন্দী হয়েই আমি নিজেকে নিজে শাস্তি দান করলাম। এভাবেই আমি বন্দী অবস্থায় অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করবো, যদি না আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করেন।

রসুল স. হজরত আবু লুবাবার বিষয়টি জানতে পেরে বললেন, সে যদি সোজা আমার কাছে আসতো, তবে আমিই তার পক্ষ হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে মার্জনা চেয়ে নিতাম। কিন্তু সে যেহেতু স্বেচ্ছাশাস্তি নির্বাচন করেছে, সেহেতু বিষয়টি আর আমার অধিকারে নেই। এখন বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ও অধিকারভূত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হলো 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না। তোমাদের নিকটে যা গচ্ছিত রয়েছে, তা তো তোমরা ভালো করেই জানো'। এর কিছু দিন পর অবতীর্ণ হলো ক্ষমার শুভসংবাদ। জননী উম্মে সালমা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন আমার প্রকোষ্ঠে। সহসা আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি স. মৃদু মৃদু হাসছেন। নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম বচনবাহক! কৃপা করে জানাবেন কি, আপনার এমতো হাসির কী কারণ? তিনি স. বললেন, আবু লুবাবার তওবা কবুল করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি বললাম, আমি কি একথা তাকে জানাতে পারবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আমি উঠে দরজার কাছে গেলাম। অনতিদূরেই ছিলো স্বেচ্ছাবন্দী অনাহারক্লিষ্ট আবু লুবাবা। আমি কিঞ্চিত উচ্চ আওয়াজে জানালাম, আবু লুবাবা! তোমার জন্য সাধুবাদ। আল্লাহ্ তোমাকে মার্জনা করেছেন। মুহূর্তমধ্যে ছড়িয়ে পড়লো শুভসমাচারটি। সাহাবীগণের কেউ কেউ জড়ো হয়ে তার বাঁধন খুলে দিতে উদ্যত হলো। আবু লুবাবা বললো, আল্লাহ্র শপথ। তোমরা কেউ আমার বাঁধন খুলো না। আমি চাই, আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল স্বয়ং আমাকে বন্ধনমুক্ত করুন। একটু পরেই ফজরের আজান ধ্বনিত হলো। রসুল স. মসজিদে গমন কালে বন্ধনমুক্ত করলেন আবু লুবাবাকে।

আলী ইবনে জায়েদ ইবনে জাদআনের উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম জয়নুল আবেদীন ইবনে হজরত ইমাম হোসাইন সূত্রে হান্নাদ ইবনে সালমা বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু লুবাবাকে বন্ধনমুক্ত করতে গিয়েছিলেন নবীনন্দিনী হজরত ফাতেমা। তিনি তখন বলে উঠলেন, আমি যে শপথ করেছি, রসুল স. স্বয়ং আমার বাঁধন খুলে না দেওয়া পর্যন্ত আমি এভাবেই থাকবো। রসুল স. একথা শুনতে পেয়ে বললেন, ফাতেমা তো আমারই অংশ। উল্লেখ্য, বর্ণনাটি প্রায়োন্নত পর্যায়ের।

হজরত আবু লুবাবা স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, বনী কুরায়জা যখন অবরুদ্ধ, তখন আমি এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমি পতিত হয়েছি পূঁতিগন্ধময় কৃষ্ণপঙ্কে। অসহ্য দুর্গন্ধে আমি মৃতপ্রায়। কিন্তু আমার নিষ্কৃতিলাভের কোনো উপায়ই পরিদৃষ্ট হলো না। সহসা দেখলাম, নিকটেই একটি স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী। অতি কষ্টে উঠে গিয়ে আমিও স্রোতস্বিনীতে দিলাম ডুব। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি পেলাম অসহ্য দুর্গন্ধ থেকে। অনুভব করলাম অপার্থিব সুরভি। এ স্বপ্নের কথা আমি জানালাম শ্রদ্ধেয় আবু বকরকে। তিনি বললেন, তুমি কোনো দুঃখজনক ঘটনার ফাঁদে পড়বে। তারপর সেখান থেকে উদ্ধার পাবে আল্লাহ্র বিশেষ করুণায়। স্বেচ্ছাবন্দী অবস্থায় আমার বার বার মনে হচ্ছিলো পরম শ্রদ্ধেয় আবু বকরের কথা। অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হওয়া সত্ত্বেও তাই মনে আশা জাগতো, অবশেষে হয়তো মার্জনা লাভে বঞ্চিত হবো না। দিনের পর দিন গত হতে লাগলো। চরম অবসাদে দুর্বল হয়ে পড়লো শরীর। একসময় শ্রুতিও হয়ে গেলো বধিরপ্রায়। কিন্তু আমি একথাও

www.eelm.weebly.com

জানতাম যে, আমি রয়েছি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে। ইবনে হিশাম বলেছেন, তিনি স্বেচ্ছাবন্দী অবস্থায় অতিবাহিত করেছিলেন ছয় রাত। তাঁর সম্মানীয়া সহধর্মিণী নামাজের সময় হলে তাঁকে বন্ধনমুক্ত করতেন। নামাজ শেষে পুনরায় তাঁকে বেঁধে রাখতেন আগের মতো।

ইবনে উকবা বলেছেন, অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন, স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে তিনি কাটিয়েছিলেন কুড়ি রাত। 'বেদায়া' পুস্তকে রয়েছে, এই অভিমতটিই অধিকতর যথার্থ। ইবনে ইসহাক বলেছেন, তিনি বন্ধনাবস্থায় অতিবাহিত করেছিলেন পঁচিশ দিন। কেবল নামাজ ও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের জন্য তাঁকে বন্ধন মুক্ত করতেন তাঁর আদরের কন্যা। উল্লেখ্য, উদ্ভূত বর্ণনা বৈষম্যের কারণে বলতে হয়, তাঁকে কখনো কখনো বন্ধনমুক্ত করতেন তাঁর পত্নী এবং কখনো কখনো তাঁর কন্যা। যে আয়াতের মাধ্যমে তাঁর ক্ষমাপ্রাপ্তির শুভসমাচার ঘোষিত হয়েছে, সে আয়াতখানি এই— 'আর অপর যারা অপরাধ স্বীকার করেছে, মিশ্রিত করেছে সৎ ও অসৎকর্ম, আশা করা যায় আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কৃপাপরবশ, দয়াময়'।

বাগবী লিখেছেন, মুসলমানদের দ্বারা বনী কুরায়জা অবরুদ্ধ ছিলো পঁচিশ দিন। তাদের দুঃখ-কষ্ট পৌঁছেছিলো চরমে। তদুপরি আল্লাহ্পাক তাদের অন্তরে সঞ্চার করেছিলেন অসহনীয় আতঙ্ক। অবশেষে তারা রসুল স. এর নির্দেশ মানতে বাধ্য হয়। দুর্গ ছেড়ে বের হয়ে আসে সকলেই। রসুল স. হজরত মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমাকে নির্দেশ দেন, ওদেরকে পিঠ মোড়া করে বাঁধতে এবং নারী ও শিশুদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলতে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামকে দায়িত্ব দেন নারী ও শিশুদের দেখা শোনার। এরপর একত্রিত করা হয় তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও মালমাত্তা। দেখা যায়, সেখানে রয়েছে পনেরো শত তরবারী, তিনটি লৌহবর্ম, দুই হাজার বর্শা, চামড়ানির্মিত ছোটবড় পনেরো শত ঢাল এবং প্রচুর সাংসারিক তৈজসপত্র ও মদ্যভাণ্ড। মদ্যভাণ্ডগুলো চুরমার করে দেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে। তাদের উট ও গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও ছিলো অনেক। রসুল স. সব কিছু দেখলেন। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো আউস গোত্রের কিছু লোক। বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! বনী কুরায়জা ছিলো আমাদের মিত্র, খাজরাজদের নয়। আপনার নিশ্চয় স্মরণ আছে খাজরাজ নেতা ইবনে উবায়ের মিত্র বনী কায়নুকার সঙ্গে আপনি কীরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিলেন। খাজরাজদের খাতিরে আপনি মার্জনা করে দিয়েছিলেন বনী কায়নুকার তিনশত নিরস্ত্র এবং চারশত সশস্ত্র লোককে। আমাদের মিত্র বনী কুরায়জা তাদের কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত। সুতরাং আজ আমাদের খাতিরে তাদেরকে আপনি দয়া করে মার্জনা করে দিন। রসুল স. নিশ্চুপ রইলেন। তারা তবুও জেদ করতে লাগলো। রসুল স.

www.eelm.weebly.com

এবার মুখ খুললেন। বললেন, আচ্ছা, তোমরা কি এটাই উত্তম মনে করো না যে, বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটুক তোমাদের গোত্রের কারো মাধ্যমে? তারা সানন্দে বলে উঠলো, নিশ্চয়ই। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে তাহলে সা'দ ইবনে মুয়াজই এ ব্যাপারে মীমাংসা করে দিক। উকবার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন বললেন, আমার সাহাবীগণের মধ্যে যাকে তোমরা ভালো মনে করো, তাকেই নির্বাচন করো মীমাংসাকারীরূপে। তখন তাঁরাই মীমাংসাকারীরূপে নির্বাচন করলো হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজকে।

পরিখার যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ। সাহাবীয়া হজরত রফীদার শুশ্রূশাধীনে তখন তাঁর তাঁবুতেই অবস্থান করছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, হজরত রফীদা ছিলেন স্বেচ্ছাসেবিকা। কোনো পার্থিব বিনিময়ের আশায় নয়, কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষ অর্জনার্থে তিনি পরিচর্যা করতেন যুদ্ধাহত সাহাবীগণের। আউস গোত্রের নেতারা তাঁর তাঁবুতেই হজরত সা'দ চিকিৎসাধীন রয়েছেন জানতে পেরে সেদিকেই এগিয়ে গেলো। কাছে গিয়ে বললো, রসুল স. এর নির্দেশে তাঁকেই মীমাংসা করে দিতে হবে বনী কুরায়জার সমস্যাটির। হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ অগত্যা গাত্রোত্থান করলেন। তখনো তিনি পুরোপুরি নিরাময় হননি বলে তারা তাঁকে উঠিয়ে নেয় একটি তেজী গর্দভের উপর। গাধাটির পিঠে ছিলো পশমী কম্বলের সুদৃশ্য গদি। লাগাম ছিলো খেজুর গাছের আঁশের। হজরত সা'দ ছিলেন বেশ মোটাসোটা। আউস গোত্রের লোকেরা তাঁকে পরিবেষ্টন করে নিয়ে চললো বিচারস্থলের দিকে। যেতে যেতে তাঁকে লক্ষ্য করে তারা বললো, আবু আমর! আল্লাহ্‌র রসুল আপনার মিত্রভাইদের বিচারমীমাংসার ভার অর্পণ করেছেন আপনারই উপর। বুঝতেই পারছেন বনী কুরায়জার প্রতি শিষ্ট আচরণ প্রদর্শন করাই আল্লাহ্‌র রসুলের এমতো নির্বাচনের উদ্দেশ্য। সুতরাং এ বিষয়টি আপনি উপেক্ষা করবেন না। দেখেছেন তো ইতোপূর্বে ইবনে উবাইয়ের মিত্রদের সঙ্গে কীরূপ নম্র আচরণ প্রদর্শন করা হয়েছিলো। হজরত সা'দ কোনো কথা বললেন না। কিন্তু তারা বার বার এধরনের কথা বলে তাঁকে উত্যক্ত করতেই থাকলো। শেষে তিনি অতিষ্ট হয়ে বললেন, আমি তো দায়িত্ব পালন করবো আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে। সুতরাং এ ব্যাপারে কারো নিন্দা-প্রশংসার তোয়াক্কা আমি করি না। একথা শুনে জুহাক ইবনে খলিফা আনসারী ও অন্যান্যরা প্রমাদ গুণলেন। বললেন, আক্ষেপ! গোত্ররঞ্জনের দিন এবার শেষ। এদিকে হজরত সা'দের দৃঢ় ও নিরপেক্ষ মনোভাবের কথা প্রচার হয়ে গেলো আউস গোত্রীয়দের মধ্যে। আর ওদিকে জুহাক গিয়ে বনী কুরায়জাদেরকে সংবাদ দিলো, এবার তাদের আর রক্ষা নেই।

বোখারী ও মুসলিমের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, দুর্গ অবরোধকালে রসুল স. বনী কুরায়জার বসতিতে নির্মাণ করেছিলেন একটি মসজিদ। হজরত সা'দ সেখানে

www.eelm.weebly.com

উপস্থিত হওয়ার প্রাক্কালে রসুল স. বললেন, হে আউস সম্প্রদায়। তোমরা তোমাদের নেতাকে দণ্ডায়মান হয়ে অভ্যর্থনা জানাও। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. বললেন, তোমাদের উত্তম স্বজনের সম্মানে দাঁড়িয়ে যাও। মুহাজিরগণের অভিমত্যানুসারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো কেবল আনসারগণকে উদ্দেশ্য করে। আর আনসারগণের অভিমত হচ্ছে, নির্দেশটি ছিলো সাধারণ। অর্থাৎ মুহাজির— আনসার সকলের উপরেই প্রযোজ্য ছিলো নির্দেশটি। ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন আজ্ঞা করলেন, তোমাদের নেতাকে বরণ করার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও। বনী আবদে আশহালের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর আদেশ পালনার্থে আমরা তখন সকলেই দণ্ডায়মান হলাম সারিবদ্ধ হয়ে।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, এরপর রসুল স. বললেন, সা'দ! বনী কুরায়জার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দাও। সা'দ বললেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদানের অধিকারী তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল। রসুল স. বললেন, সেই অধিকার এখন অর্পিত হলো তোমার উপর। সুতরাং প্রদান করো ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা। সা'দ একথা শুনে মুখোমুখি হলেন উপস্থিত জনমণ্ডলীর। বললেন, হে আনসার ও আউস ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা কি আমার সিদ্ধান্ত নির্বিবাদে মান্য করবে? জনতা জবাব দিলো, নিশ্চয়ই। আমরা তো তোমার অনুপস্থিতিতেই তোমাকে বিচারক মনোনীত করেছি। আর আমরা এমতো আশাও পোষণ করি যে, তুমি আমাদের প্রতি সদয় হবে, যেমন ইবনে উবাই সদয় হয়েছিলো তার মিত্রপক্ষীয় বনী কাইনুকার প্রতি। সা'দ বললেন, আবার ভেবে দেখো, তোমরা কি আল্লাহ্র সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, আমার সিদ্ধান্ত অবশ্যই মাননীয়? আনসার ও আউস জনতা সমস্বরে বলে উঠলো, অবশ্যই, অবশ্যই। এবার সা'দ তাঁর পাশে উপবিষ্ট মহামান্য রসুলের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, আমার পাশে উপবিষ্ট যিনি, তিনিও কি এব্যাপারে একমত? রসুল স. জবাব দিলেন, নিঃসন্দেহে। সা'দ এবার ঘোষণা দিলেন, বনী কুরায়জার প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদেরকে হত্যা করতে হবে। আর তাদের নারী ও শিশুরা হবে মুসলমানদের দাস-দাসী। তাদের ধনসম্পদও বণ্টন করে দেওয়া হবে মুসলমানদের মধ্যে। আর তাদের বসতবাটির অধিকারী হবে মুহাজির ও আনসারগণ। রসুল স. তাঁর এই রায় শুনে বললেন, তোমার সিদ্ধান্ত সপ্তাকাশ থেকে অবতীর্ণ আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের অনুরূপ। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন বললেন, আজ অতি প্রত্যুষে এই সিদ্ধান্তই আমাকে জানিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্র এক ফেরেশতা।

সেদিন সকালেই রসুল স. এর নির্দেশে কার্যকর করা হলো বিচারের রায়। হত্যা করা হলো বনী কুরায়জার সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে। আর আহত সাহাবী হজরত সা'দ ওই রাতেই দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্! যদি আর কখনো

www.eelm.weebly.com

কুরায়েশদের সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা করতে হয়, তবে তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রেখো। আমার বড় সাধ, আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করি। তারা যে তোমার রসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। দিয়েছে অনেক দুঃখক্লেশ। শেষে বহিষ্কার করেছে তাঁকে তাঁর জন্মভূমি থেকে। তাই তাদের মুখোমুখি আমি হবোই। আর যদি কুরয়েশদের সঙ্গে আর যুদ্ধের প্রয়োজন না থাকে, তবে এই আঘাতকেই তুমি নির্ণয় করো আমার শাহাদাতের অজুহাতরূপে। তবে আমার মিনতি এতটুকুই, তাদের ধ্বংস প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত তুমি আমাকে মৃত্যু দিয়ো না। উল্লেখ্য, কুরায়েশদের না হলেও আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দুশমন বনী কুরায়জার ধ্বংস প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

বনী কুরায়জার দুর্গ অবরোধের সমাপ্তি ঘটলো জিলহজ মাসের পাঁচ তারিখে বুধবারে। রসুল স. প্রত্যাবর্তন করলেন স্বগৃহে। তাঁর নির্দেশে বন্দীদেরকে আটকে রাখা হলো হজরত রমলা বিনতে হারেছের গৃহাঙ্গণে। পরদিন সকালে তিনি স. গমন করলেন বাজারের দিকে। নির্দেশ দিলেন আবুল জুহুম আদুবীর বাড়ীর পাশ থেকে আদুহ্জারুয যাইত পর্যন্ত একটি লম্বা ও গভীর গর্ত খননের। গর্ত খনন শেষ হলে বললেন, ওদেরকে একজন একজন করে গর্তে বসিয়ে হত্যা করা হোক। তাদেরকে বধ করার জন্য প্রস্তুত হলেন হজরত আলী ও হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম। প্রথমে হাজির করা হলো হুয়াই ইবনে আখতাবকে। তার দু'হাত ছিলো পিছ মোড়া দিয়ে বাঁধা। আর পরনে ছিলো তার মৃত্যুদণ্ডকালীন পোশাক। পোশাকটিকে সে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে আগেই এমনভাবে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলো, অন্য কেউ যেনো পোশাকটি ব্যবহার করতে না পারে। রসুল স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্র দুশমন! বলো এবার, আল্লাহ্ তোমাকে আমার কর্তৃত্বাগত করেছেন কিনা? হুয়াই বললো, অবশ্যই। তবে হে মোহাম্মদ! স্মরণ রাখবেন, আমি কিন্তু আপনাকে হেয় মনে করিনি। বরং সমকক্ষ মনে করেই মোকাবিলা করতে চেয়েছি আপনাকে। কিন্তু বিধি বাম। আল্লাহ্র অনুমোদন আপনার পক্ষে। সুতরাং আপনার উপরে প্রবল হতে পারবে কে? এরপর সে অন্যান্য বন্দীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, উপস্থিত জনতা! আল্লাহ্র বিধানে কোনো অমঙ্গল নেই। বনী ইসরাইলদের উপরে যা ঘটতে চলেছে, তা তাদের অনড় বিধিলিপি। আল্লাহ্র অমোঘ নির্ধারণ। একথা বলেই সে গর্তে প্রবেশ করে বসে পড়লো। পরক্ষণেই উড়িয়ে দেওয়া হলো তার গর্দান।

দুপুর হলো । গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে ঝলসে যেতে লাগলো চরাচর। রসুল স. নির্দেশ করলেন, এখন বিরতি দাও। সকলে তৃষ্ণার্ত। সুতরাং পানি পান করো। বন্দীদেরকেও পান করাও। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। মধ্যাহ্নের বিরতি ও বিশ্রামের পর রসুল স. পুনরায় বধ্যভূমির সন্নিকটে উপস্থিত হলেন। পুনরায় শুরু

www.eelm.weebly.com

হলো বন্দীনিধন। প্রথমে আনা হলো কা'ব ইবনে আসাদকে। রসুল স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হে কা'ব! ইবনে জাওয়াস কি যথাসময়ে তোমাদেরকে সদুপদেশ দেয়নি? সে কি বলেনি যে, আমার আনুগত্য স্বীকারের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা? কা'ব বললো, হে আবুল কাসেম! তওরাতের শপথ! ইবনে জাওয়াস যথাসময়ে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলো। কিন্তু আমার স্বজাতি আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলবে, মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে আমি আপনার অনুগত হয়েছি; তারা যদি এরকম না বলতো, তবে অবশ্যই আমি আনুগত্য স্বীকার করতাম আপনার। আমি তো এখনো বিশুদ্ধ ইহুদী ধর্মমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত। রসুল স. নির্দেশ দিলেন, একে নিয়ে যাও। কা'বকে গর্তের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হলো। পরক্ষণেই কর্তন করা হলো তার মস্তক। উল্লেখ্য, কেবল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের উপরেই কার্যকর করা হয়েছিলো মৃত্যুদণ্ড। আর প্রাপ্ত বয়সের চিহ্নরূপে ধরা হয়েছিলো নাভির নিচের পশম গজানোকে। ইমাম আহমদ এবং সুনান প্রণেতাগণ লিখেছেন, আতীয়া কারাজী বলেছেন, তখন আমি ছিলাম বালক। নাভির নিচের পশম গজায়নি বলেই তখন আমাকে রেহাই দেওয়া হয়েছিলো।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আসলাম আনসারী বলেছেন, বালকেরা প্রাপ্তবয়স্ক কিনা, তা দেখবার ভার ছিলো আমার উপর। যে সকল বালকের নাভির নিচের পশম গজিয়েছে দেখতে পেতাম তাদেরকে আমি পাঠিয়ে দিতাম বধ্যভূমিতে। আর তা না দেখতে পেলে গণ্য করতাম তাদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে।

রেফা ইবনে শামুয়েল কারাজী বয়োপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও রসুল স. তাকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। কারণ তার জন্য সুপারিশ করেছিলেন রসুল স. এর খালা উম্মে মুনজির। তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিনীদের দলভূতা। দুই কেবলার দিকেই নামাজ পাঠের সৌভাগ্য নসিব হয়েছিলো তাঁর। রেফা তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি রসুল স. এর নিকটে নিবেদন জানালেন, হে দয়াল নবী। মেহেরবানী করে আপনি রেফাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করুন। সে ভবিষ্যতে নামাজ পাঠ করবে, উটের গোশত ভক্ষণ করবে। মনে প্রাণে গ্রহণ করবে ইসলাম। রসুল স. তাঁর নিবেদন মঞ্জুর করলেন। সেই থেকে রেফা মানুষ হতে লাগলেন হজরত উম্মে মুনজিরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। পরবর্তী সময়ে তিনি হয়েছিলেন খাঁটি মুসলমান। নিধনপর্ব শেষ হতে হতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। সবকিছুই ঘটেছিলো হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজের চোখের সামনে। এভাবেই আল্লাহ্পাক তাঁকে দেখিয়েছিলেন তাঁর দোয়ার বাস্তব রূপ।

www.eelm.weebly.com

সেদিন বনী কুরায়জার রমণীদের মধ্যে হত্যা করা হয়েছিলো কেবল বানানা নাম্নী এক রমণীকে। সে ছিলো বনী নাজির সম্প্রদায়ের মেয়ে। কিন্তু তার বিয়ে হয়েছিলো বনী কুরায়জার এক যুবকের সাথে। তাদের দাম্পত্যপ্রণয় ছিলো অত্যন্ত গভীর। তখন অবরোধের শেষ পর্যায়। তাদের সকলেই বুঝলো, এবার আর তাদের নিস্তার নেই। বানানা তার স্বামীকে বললো, তোমাকে তো এবার আমার কাছ থেকে পৃথক করে ফেলা হবে। তাই যদি হয় তবে আমার আর বেঁচে থেকে কাজ কী? যুবক বললো, মোহাম্মদ জয়ী হলে তোমাকে হত্যা করবে না। করবে চিরদাসী। কারণ তার ধর্মে নারী হত্যার বিধান নেই। কিন্তু তুমি কারো দাসী হয়ে থাকবে, সে কল্পনাও আমার জন্য অসহনীয়। তার চেয়ে তুমি এক কাজ করো। ওই আটা পেশার যাঁতার চাকতিটি এখান থেকে নিচে গড়িয়ে দাও। যদি ওই চাকতির আঘাতে কোনো মুসলমান সৈনিক নিহত হয়, তবে সেই অপরাধে তোমাকে দেওয়া হবে মৃত্যুদণ্ড। আমি চাই তোমাকে মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হোক। বানানা তার স্বামীর কথামতো যাঁতার চাকতিটি দুর্গের একটি ফোকর দিয়ে নিচে গড়িয়ে দিলো। বাইরে তখন মধ্যাহ্নের প্রখর উত্তাপ। ওই সময় মুসলিম সৈন্যদের অনেকে দুর্গের দেয়ালের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। চাকতি সোজা গড়িয়ে পড়লো সেরকম বিশ্রামরত এক সৈনিকের মাথায়। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যে শাহাদত বরণ করলেন তিনি।

ওরওয়ার বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, যখন বনী কুরায়জার পুরুষদেরকে হত্যা করা হয়, তখন বানানা ছিলো আমার কাছে। প্রায় সারাক্ষণ হাস্য-কৌতুকে মেতে থাকা ছিলো তার স্বভাব। ওদিকে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হচ্ছিলো, আর সে মাঝে মাঝেই কৌতুক করে বলছিলো, কী মজা! আজ বনী কুরায়জার পুরুষদেরকে বধ করা হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বাইরে থেকে আওয়াজ এলো, বানানা কোথায়? সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, এই যে আমি এখানে। আমি বললাম, হতভাগিনী! লোকটি তোমার কে? সে বললো, আমাকে ডাকা হচ্ছে হত্যা করার জন্য। আমি বললাম, কী কারণে? সে বললো, নিশ্চয় কোনো অপরাধ করেছি। জননী আয়েশা আরো বলেছেন, যার উপরে মৃত্যুর পরওয়ানা ঝুলছে, তার এরকম আনন্দ-উচ্ছলতা করার কথা আমি জীবনে শুনিনি। তার কথা আমার আজও মনে পড়ে যায়।

একটি সমস্যা ও তার সমাধান ঃ জমহুরের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ভারী কোনো বস্তুর আঘাতে কাউকে হত্যা করলে কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) কার্যকর হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, এমতোক্ষেত্রে কিসাস প্রযোজ্য নয়, যদিও আবু কুবাইসের মতো বৃহৎপাহাড়ের আঘাতে কাউকে হত্যা করা হয়। হত অথবা আহত হওয়ার ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর করা যাবে তখন, যখন ব্যবহার করা হবে

www.eelm.weebly.com

ধারালো কোনো অস্ত্র। সুরা বাকারায় ‘কুতিবা আ’লাইকুমুল ক্বিসাস’ আয়াতের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যথা স্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

জুহুরী সূত্রে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, মূর্খতার যুগে সংঘটিত বুআছ যুদ্ধের সময় বনী কুরায়জার যোবায়ের ইবনে বাতা বন্দী করেছিলো হজরত সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মামকে। কিন্তু সে তাঁকে হত্যা করেনি। বরং ছেড়ে দিয়েছিলো মস্তকের সামান্য কেশ কর্তন করে। তাদের দুর্গ অবরোধকালে যোবায়ের হয়ে গিয়েছিলো বৃদ্ধ। হজরত সাবেত তাকে চিনতে পেরে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমার কথা কি তোমার মনে আছে? আমি সাবেত। বৃদ্ধ যোবায়ের বললো, আমি কি তোমার কথা ভুলতে পারি। হজরত সাবেত বললেন, সেদিন আপনি আমাকে বধ না করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আজ আমি সে অনুকম্পার বিনিময় দিতে চাই। বৃদ্ধ বললো, মহৎব্যক্তিগণ তো এরকমই করেন। কল্যাণের বিনিময়ে দান করেন কল্যাণ। হজরত সাবেত তৎক্ষণাৎ রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলেন। বললেন, হে মহাবিশ্বের রহমতের প্রতিভূ! আমার প্রতি রয়েছে বৃদ্ধ যোবায়েরের একটি অপরিশোধিত মহানুভবতা। তিনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। আজ আমিও বাঁচাতে চাই তার প্রাণ। সুতরাং আমার সবিনয় আরজ, দয়া করে তার প্রাণ ভিক্ষা দিন। রসুল স. বললেন, তথাস্তু। হজরত সাবেত বৃদ্ধের নিকটে গিয়ে বললেন, রসুল স. আপনার জীবন ভিক্ষা দিয়েছেন। সে বললো, আমি তো বৃদ্ধ। তদুপরি পরিবার পরিজনহীন। এভাবে একা একা বাঁচা কি সম্ভব? হজরত সাবেত পুনরায় ছুটে গেলেন রসুল স. সকাশে। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! যোবায়েরের পরিবার পরিজন বন্দী। দয়া করে তাদেরকে ছেড়ে দিন। রসুল স. বললেন, তাই করা হলো। হজরত সাবেত এবারে প্রায় দৌড়ে গিয়ে শুভসংবাদটি জানালেন যোবায়েরকে। সে এবার বললো হেজাজের কারো গৃহে যদি সাংসারিক সরঞ্জাম না থাকে, তবে সে জীবন ধারণ করবে কী করে? হজরত এবারো ছুটলেন রসুল স. এর কাছে। তিনি স. এবার যোবায়েরের বাজেয়াপ্ত করার মাল-সামানও ফেরত দিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ যোবায়ের এতেও নিরস্ত হলো না। বললো, সাবেত! ওই লোকটির তাহলে কী হবে, যে আমার জীবনের প্রতিচ্ছবি? সমাজের দিকদর্শন? আমি বলছি সেই কা’ব ইবনে আসাদের কথা। হজরত সাবেত বললেন, তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। বৃদ্ধ বললো, আর ওই লোকটি, সে ছিলো শহর বন্দর প্রান্তরের নেতা। সকলের কাছেই তো সে শ্রদ্ধার্হ। যুদ্ধের সময় সে সৈনিকদেরকে যোগাড় করে দিতো বাহন। অনটনের সময় যোগাতো আহার্য। সেই হুয়াই ইবনে আখতাব? তার খবর কী? হজরত সাবেত বললেন, একই পরিণতি লাভ করেছে সে-ও। বৃদ্ধ বললো, তাহলে বলো

www.eelm.weebly.com

গাজালা ইবনে শামুয়েলের সংবাদ। সে তো থাকতো সকল যুদ্ধে অগ্রগামী। চরম সংকটকালেও সে যুদ্ধ করতো কখনো বামে, আবার কখনো দক্ষিণে অবস্থান নিয়ে। হজরত সাবেত বললেন, সে-ও এখন বিগত। বৃদ্ধ এবার বললো, বনী কা'ব ইবনে কুরায়জা এবং বনী আমর ইবনে কুরায়জার সম্মেলন কেন্দ্রের সংবাদ কী? হজরত সাবেত বললেন, সম্মেলনকারীরাই তো বিপদিত। সুতরাং সম্মেলন ডাকবে কে? কেই-বা হাজির হবে সম্মেলন কেন্দ্রে? বৃদ্ধ বললো, সাবেত! শোনো, আমি যদি তোমার সামান্য ইষ্টও করে থাকি, তাহলে আমার মিনতি রক্ষা করো। আমাকেও পাঠিয়ে দাও তাদের কাছে। শপথ আল্লাহ্‌র! জীবনের প্রতি আমার আর কোনোই আগ্রহ নেই। যাদের নাম করলাম, তাদেরকে যখন দেখবো না, দেখবো কেবল তাদের শূন্য গৃহগুলো, তখন হাহাকার করে উঠবে আমার হৃদয়। আমি তা সহ্য করতে পারবো না। সুতরাং ভাই সাবেত! অনুরোধ করি, আমার অবর্তমানে তুমি একটু খেয়াল রেখো আমার পরিবার-পরিজনদের প্রতি। তোমার সাথীদেরকে বোলো, তারা যেনো তাদেরকে মুক্ত জীবনযাপনের অধিকার দেয়। আর তোমার প্রতি আমার এখনো যে অধিকারটুকুও বর্তমান আছে, তার দোহাই দিয়ে বলছি, অতি সত্বর আমাকে পাঠিয়ে দাও আমার সুহৃদ ও সঙ্গী সাথীদের কাছে। বিলম্ব যে অসহনীয়। ইবনে ইসহাক বলেছেন, হজরত সাবেত তার অভিপ্রায় পূরণ করেছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিভিয়ে দিয়েছিলেন তার প্রিয়জনবিচ্ছেদের যাতনা।

মোহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, হজরত সাবেত তখন বললেন, যোবায়ের! তোমাকে হত্যা করা আমার সাধ্য বহির্ভূত। বৃদ্ধ যোবায়ের বললো, আরে রেখে দাও তোমার অজুহাত। কার হাতে আমি নিহত হলাম, সে ভাবনা আমার নেই। শেষে তার মস্তক ছেদন করলেন হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম। বৃদ্ধ যোবায়েরের স্বজন মিলনের অত্যুগ্র আগ্রহের কথা শুনে হজরত আবু বকর মন্তব্য করলেন, সে তার সুহৃদ স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হবে জাহান্নামে।

এরপর বনী কুরায়জার যাবতীয় সম্পদ বণ্টন করা হলো মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে। মুসলামানদের সেনাসংখ্যা ছিলো তিন হাজার। তারমধ্যে ছত্রিশজন ছিলেন অশ্বারোহী এবং অবশিষ্টরা পদাতিক। তাই সমুদয় সম্পদ ভাগ করা হলো তিন বায়াত্তর ভাগে। শেষে বণ্টন করা হলো এভাবে— অশ্বারোহী দুই অংশ এবং পদাতিকেরা এক, রসুল স. এর তিনটি ঘোড়া ছিলো। কিন্তু তিনি স. অংশ নিয়েছিলেন কেবল একটি ঘোড়ার জন্য। একারণেই ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, একজন সৈনিকের একাধিক ঘোড়া থাকলেও সে অংশ পাবে কেবল একটির জন্য। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ বলেন, একজন সৈনিকের দুইয়ের অধিক ঘোড়া থাকলেও সে অংশ পাবে কেবল

www.eelm.weebly.com

দুইটি ঘোড়ার জন্য। উল্লেখ্য, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টনবিধি সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা সন্নিবেশ করা হয়েছে সুরা আনফালের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

রসুল স. শহীদ খাল্লাদ ইবনে সুয়াইদের অংশও নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁকে শহীদ করেছিলো ইহুদী রমণী বানানা। আবার অবরোধে অংশগ্রহণ করলেও স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণকারী হজরত সামান ইবনে মুহসীনের জন্যও অংশ নির্ধারণ করেছিলেন তিনি স.। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইমামত্রয় অভিমত প্রকাশ করেন, কোনো মুসলমান যুদ্ধে অংশ নেয়ার পর শত্রুদের পরাজয় অথবা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলিম রাষ্ট্রে একত্র করার আগে যদি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার জন্যও অংশ নির্ধারণ করতে হবে।

উন্নত সূত্রসহযোগে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, গণিমতের অংশ সে-ই পাবে, যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। তিবরানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুউন্নত উন্নত উভয় প্রকার সূত্রসহযোগে। তবে তাঁর বর্ণনাটিকে উন্নত বলাই হবে অধিকতর সমীচীন। কারণ বর্ণনাটি উন্নীত হয়েছে হজরত ওমর পর্যন্ত। আবার ইমাম শাফেয়ীর বর্ণনাপরম্পরা উন্নীত হয়েছে হজরত আবু বকর পর্যন্ত।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, গণিমতের মাল মুসলিম রাষ্ট্রে এনে একত্র করার পর তা বিলি-বণ্টন করতে হবে। এর পূর্বে কোনো সৈনিক স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলে অথবা নিহত হলে তার জন্য গণিমতের অংশ নির্ধারণ করা যাবে না। ফলে তাদের উত্তরাধিকারীও কিছু পাবে না। কিন্তু সাহায্যকারী বাহিনী যদি গণিমত একত্র করার পূর্বে শত্রুদেশে পৌঁছে যায়, তবে গণিমতের অংশ পাবে তারাও।

একটি সমীক্ষা ঃ জমহুর বলেন, অশ্বারোহী সৈনিককে দিতে হবে তিনটি অংশ। এক অংশ তার এবং দুই অংশ তার ঘোড়ার। ইমাম আবু হানিফা বলেন, অশ্বারোহীর অংশ দুটি— একটি তার এবং অপরটি তার ঘোড়ার। অবশ্য বনী কুরায়জার যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টনবিধি জমহুরের অভিমতের পক্ষে এবং ইমাম আবু হানিফার বিপক্ষে।

উপযোগ ঃ রসুল স. যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ (খুমুস) গ্রহণ করতেন। সেখান থেকে তিনি কাউকে মুক্ত করে দিতেন, অথবা কাউকে দান করে দিতেন। বনী কুরায়জার যুদ্ধের গণিমত হিসেবে তিনি তাদের খেজুর বাগানের এক পঞ্চমাংশও গ্রহণ করেছিলেন। আর বাগানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন মাহমীয়া ইবনে জামুস জুবাইদিকে। অবশিষ্ট চার অংশ তিনি স. বণ্টন করে দিয়েছিলেন অবরোধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে।

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রমণীগণের জন্য রসুল স. কোনো অংশ নির্ধারণ করতেন না। তবে তাঁদেরকে আলাদাভাবে কিছু দিয়ে দিতেন। বনী কুরায়জার অবরোধে

www.eelm.weebly.com

যে সকল মহিয়সী রমণী অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন সর্বহজরত সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব, উম্মে আম্মারা, নাসিয়াহ, উম্মে আলা আনসারী, উম্মে সলীত, সুমাইয়া বিনতে কায়েস, উম্মে সা'দ ইবনে মুয়াজ এবং কাবশা বিনতে রাফে।

রসুল স. তখন হজরত সা'দ ইবনে উবাদার দায়িত্বে কিছু বন্দীকে বাজারে পাঠিয়েছিলেন তাদেরকে বিক্রয় করবার জন্য। উদ্দেশ্য ছিলো বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে কিনবেন কিছু অস্ত্রশস্ত্র। এরকম বলেছেন মোহাম্মদ ইবনে ওমর। তবে ইবনে ইসহাক বলেছেন, তিনি বন্দীবিক্রয়ের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদ আনসারীকে। আর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে তিনি স. ক্রয় করেছিলেন ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র। যৌথ উদ্যোগে কিছু বন্দিনী ক্রয় করে ছিলেন হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান এবং হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ। তারপর তাঁরা বন্দিনীকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। একভাগে রাখলেন বৃদ্ধা এবং অপরভাগে রাখলেন যুবতীদেরকে। বৃদ্ধাদের ভাগটি গ্রহণ করলেন হজরত ওসমান। ফলে তিনি হয়ে গেলেন প্রভূত সম্পদের অধিকারী। কারণ ওই বৃদ্ধারা ছিলো সম্পদ শালিনী। ইবনে সীরা লিখেছেন, ওই বৃদ্ধাদের নিকট থেকে সম্পদ পাওয়া গিয়েছিলো দীর্ঘ একমাস পর। তাই ওই সম্পদকে গণিমতের অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। হজরত ওসমান তাদেরকে ক্রয় করে প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন মুক্তিপণ। মুক্তিপণ পরিশোধের সময়ও বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। আর যথাসময়ে মুক্তিপণ যারা দিতে পেরেছিলো, তাদেরকে তিনি মুক্তিও দিয়েছিলেন যথারীতি।

বন্দিনীদের নিকট থেকে তাদের শিশু সন্তানদেরকে পৃথক করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন রসুল স. বণ্টনের সময়ে হোক অথবা বিক্রয়ের সময়ে। বলেছিলেন, মাতার নিকট থেকে তার সন্তান-সন্ততিকে পৃথক কোরো না, যতক্ষণ না শিশুরা বয়োপ্রাপ্ত হয়। জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, হে আল্লাহ্র রসুল! বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার চিহ্ন কী? তিনি স. বললেন, মেয়েরা যখন ঋতুবর্তী হয় এবং ছেলেদের যখন শুরু হয় স্বপ্নদোষ। হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যয়ন করেছেন হাকেম। হাদিসটি এরকম— রসুল স. বললেন, বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে শিশুদেরকে তাদের মাতাদের নিকট থেকে আলাদা কোরো না। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! বয়োপ্রাপ্ত হয় কখন? তিনি স. বললেন, যখন বালিকারা হয় ঋতুবর্তী এবং বালকদের শুরু হয় স্বপ্নদোষ। ইবনে জাওজী বলেছেন, তিবরানী মন্তব্য করেছেন, হাদিসটির সূত্রপ্রবাহভূত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে হাসান বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। আলী ইবনে মাদামী তাকে দায়ী করেছেন অসত্যভাষণের দায়ে।

www.eelm.weebly.com

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু আইয়ুব আনসারী বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো শিশুকে তার মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ্ তাকে তার প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন মহাবিচারের দিবসে। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম ও বিরল শ্রেণীর। হাকেম হাদিসটি প্রত্যয়ন করেছেন ইমাম মুসলিমের পদ্ধতিতে। তবে এর সূত্রপরম্পরা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। কেননা এই সূত্রপরম্পরাভূত হুয়াই ইবনে আবদুল্লাহ্র কোনো বর্ণনাই বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থগুলোতে সংকলিত হয়নি। হাদিসটি তিরমিজি কর্তৃক প্রত্যয়িত হয়নি সেকারণেই। হাকেম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে। তিনি বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন যে ব্যক্তি কোনো শিশুকে তার মাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, সে অভিশপ্ত। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। তবে এর সূত্রপরম্পরাভূত এক বর্ণনাকারী তালীক ইবনে মোহাম্মদ থেকে বিভিন্নভাবে তিনি হাদিসটি উপস্থাপন করেছেন। কখনো করেছেন হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে তালীকের মাধ্যমে, কখনো হজরত আবী বুরদা থেকে তালীকের মাধ্যমে,আবার কখনো কোনো তালীক থেকে রসুল স. পর্যন্ত অপরিণতসূত্রে। এমতোসূত্রপরম্পরা বৈষম্যের সমাধানার্থে বলা যেতে পারে, তালীক হাদিসটি শুনেছেন হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন এবং হজরত আবী বুরদা উভয়ের নিকট থেকে। ইবনে কাত্তান বলেছেন, তালীক কোনো সুপরিচিত বর্ণনাকারী নন। কাজেই তাঁর বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, সূত্রপরম্পরাটিকে অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই ইবনে কাত্তান এরকম মন্তব্য করেছেন। নতুবা হাদিসটি তো আরো অনেক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ওই বর্ণনাগুলোর শব্দবিন্যাস বিভিন্ন রকমের হলেও সেগুলোর মর্মার্থ এক। অর্থাৎ মাতার নিকট থেকে তার শিশুকে পৃথক করে ফেলা নিষেধ।

স্বসূত্রে দারাকুতনী মায়মুন ইবনে আবু শোয়াইব থেকে উল্লেখ করেছেন, হজরত আলী একবার এক ক্রীতদাসীকে বিক্রয় করার সময় তার শিশুসন্তানকে পৃথক করে ফেললেন। রসুল স. একথা শুনতে পেয়ে ওই বিক্রয় ও বিক্রয়চুক্তিকে বাতিল করে দিলেন। আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আলী ও মায়মুন ইবনে আবু শোয়াইবের উল্লেখ ব্যতিরেকে প্রায়োন্নত সূত্রে। ইবনে হুম্মান বলেছেন, প্রায়োন্নত সূত্রপরম্পরাগত হাদিস আমাদের নিকট অগ্রাহ্য নয়। আবার হাকেম হাদিসটি যথাসূত্রেই বর্ণনা করেছেন। আর একে প্রাধান্য দিয়েছেন বায়হাকীও।

মাসআলা ঃ বর্ণিত হাদিসসমূহের প্রেক্ষিতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, দু'টি অপ্রাপ্তবয়স্ক ক্রীতদাস, যারা পরস্পর রক্তসম্পর্কিত স্বজন, তাদেরকে বিক্রয় বা

www.eelm.weebly.com

দানসূত্রে পৃথক করে দেওয়া যাবে না। তেমনি ঔরষজাত সম্পর্কীয় প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্কের মধ্যেও ঘটানো যাবে না বিচ্ছেদ। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম আহমদ বলেছেন ঔরষজাত সম্পর্কীয় দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। ইমাম মালেকের অভিমত হচ্ছে, পৃথকীকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার বিধানটি প্রযোজ্য হবে কেবল মা ও শিশুর ক্ষেত্রে। আর ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হচ্ছে শিশুসন্তানকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যাবে না তার মাতৃবংশীয় অথবা পিতৃবংশীয়দের নিকট থেকে। যেমন— পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, মাতামহ, প্রমাতামহ এরকম আরো ঊর্ধ্বতন মাতৃবংশীয় ও পিতৃবংশীয়।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ পৃথকীকরণের অন্তরায় হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন বৈবাহিক নিষিদ্ধতার সম্পর্ককে। অর্থাৎ শিশুকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না কেবল তাদের নিকট থেকে যাদের সঙ্গে তার বিবাহ নিষিদ্ধ। কোনো কোনো হাদিসে স্বজনের শাখা ও মূল ব্যতিরেকেও অন্যদের ক্ষেত্রে পৃথকীকরণের নিষিদ্ধতা আরোপিত হয়েছে। হজরত আলী বলেছেন, একবার রসুল স. আমাকে দান করলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক দু'টো বালক। আমি তাদের একজনকে বিক্রয় করে দিলাম। পরে তাদের একজনকে দেখে তিনি স. বললেন, আলী! আর একজন কৈ? আমি বললাম, বিক্রি করে দিয়েছি। তিনি স. বললেন, শীগগির ওকে ফেরত নিয়ে এসো। তিরমিজি লিখেছেন, হাদিসটি উত্তম ও বিরল শ্রেণীর। কিন্তু আবু দাউদ এর সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহভূত মায়মুন ইবনে শোয়াইব হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আলী থেকে। অথচ তিনি হজরত আলীর সমসাময়িক নন। আমরা বলি, তবে তো প্রমাণিত হয়, হাদিসটি প্রায়োন্নত পর্যায়ের। আর আমাদের নিকট প্রায়োন্নত সূত্রের হাদিসও প্রামাণ্যরূপে গণ্য। হাদিসটি আবার ভিন্নতর পদ্ধতিতে সংকলন করেছেন হাকেম ও দারাকুতনী। যেমন— আবদুর রহমান ইবনে আবী লাইস বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, একবার রসুল স. এর সম্মুখে আনা হলো কিছুসংখ্যক বন্দীকে। তিনি স. বললেন, এর মধ্যে ওই দুই ভাইকে নিয়ে বিক্রয় করে দিয়ে এসো। আমি দু'জনকে নিয়ে বাজারে গেলাম এবং তাদেরকে বিক্রয় করে দিলাম পৃথক পৃথক বিক্রেতার কাছে। ফিরে এসে একথা রসুল স.কে জানাতেই তিনি বলে উঠলেন, এক্ষুণি যাও, ওদেরকে ফেরত নিয়ে এসো। ওদেরকে বিক্রয় করতে হবে একসঙ্গে। বোখারী ও মুসলিমের রীতি অনুসারে এই হাদিসের সূত্র প্রত্যয়ন করেছেন হাকেম। আর এ সূত্রকে ত্রুটিমুক্ত বলেছেন ইবনে কাত্তান। বলেছেন, আলোচ্য প্রেক্ষাপটে হাদিসটি উত্তম শ্রেণীভূত ও নির্ভরযোগ্য। ইমাম আহমদ ও বাযযার আবার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ভিন্নতর সূত্রে। ইবনে হুম্মাম মন্তব্য

www.eelm.weebly.com

করেছেন, তাঁদের সূত্রে রয়েছে বিচ্ছিন্নতা। তবে এতে করে কিছু আসে যায় না আমাদের দৃষ্টিতে। দারাকুতনী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তালীক ইবনে ইমরান থেকে এবং তিনি আবী বুরদা থেকে এবং তিনি হজরত আবু মুসা থেকে এভাবে— রসুল স. অভিসম্পাত দিয়েছেন তাকে, যে বিচ্ছেদ ঘটায় মাতা ও তার শিশু সন্তানের মধ্যে এবং ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে। উল্লেখ্য, হাদিসের মাধ্যমে যখন দুই ভাইয়ের নিষিদ্ধতা জানা গেলো, তখন বুঝতে হবে, পৃথকীকরণের নিষিদ্ধতার মূলসূত্র হচ্ছে স্বজন ও মুহরিম। তবে দুধপান সম্পর্কীয় মুহরিম এর মধ্যে পড়ে না। অর্থাৎ মুহরিম না হলে নিষিদ্ধতা কার্যকর হবে না। যেমন নিষিদ্ধতা প্রযোজ্য হবে চাচাতো ভাইয়ের ক্ষেত্রে।

সমাধান ঃ কেউ যদি বিক্রয়কালে মাতা ও সন্তানের বিচ্ছেদ ঘটায়, সে গোনাহ্গার। কিন্তু তার বিক্রয়চুক্তি অকার্যকর নয়। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদ। কিন্তু ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন, তার ওই বিক্রয়চুক্তিও হবে বাতিল। জন্মসূত্রের স্বজনদের ক্ষেত্রেও বলবত হবে একই বিধান— এরকম বলেছেন ইমাম আহমদ। আর ইমাম আহমদ বলেছেন, বিশেষভাবে বিক্রয়চুক্তি পণ্ড হবে জন্মসূত্রের স্বজনদের বেলায়। তিনি আরো বলেছেন, জন্মসূত্রে অথবা অন্য যে কোনো সূত্রের আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও পণ্ড হবে বিক্রয়চুক্তি। অবশ্য সূত্রগত পার্থক্যই এরকম মতপৃথকতার কারণ। অর্থাৎ কোনো সংকেত ছাড়া যদি শরিয়তসম্মত বিধানে নিষিদ্ধতা আরোপিত হয়, তবে ওই নিষিদ্ধতা শরিয়তের বিধানকে করে অকার্যকর। এটাই হচ্ছে ইমামত্রয়ের অভিমত। ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সহচরদ্বয়ের অভিমতে এমতোনিষিদ্ধতা অনিবার্য করে বিশৃঙ্খলাকে। কিন্তু তা বিক্রয়চুক্তিকে পণ্ড বা নাকচ করে না। কারণ বিক্রয়চুক্তির শর্তগুলো থাকে তখনো বিদ্যমান। সুতরাং উভয়পক্ষের অনুমোদন সিদ্ধ না হওয়ার কারণ এক্ষেত্রে নেই। অতএব, বুঝতে হবে নিষিদ্ধতা এখানে বলবত হয়েছে বহিরাগত একটি কারণে। যেমন শুক্রবার জুমআর আজানের পর নিষিদ্ধ হয়ে যায় ক্রয়-বিক্রয়। আর বাহ্যিক কারণে নিষিদ্ধতা আরোপিত হলে মূল ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় না। তবে অনিবার্য কোনো দোষের কারণে নিষিদ্ধতা আরোপিত হলে বিক্রয়চুক্তি পণ্ড বা নাকচ হওয়ার বিষয়টি হয় অনিবার্য।

ইমাম আবু ইউসুফের অভিমতের ভিত্তি হচ্ছে ওই হাদিস, যেখানে রসুল স. হজরত আলীকে নির্দেশ করেছিলেন বিক্রিত বস্তু ফেরত আনার। আর এরকম নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে তখনই, যখন বিক্রয়চুক্তি হয়ে যায় বরবাদ। আর ইমাম আবু হানিফা ফেরত আনার নির্দেশটিকে গণ্য করেছেন নাকচ করার দাবিরূপে। এই নাকচ করার দাবি দ্বারা বানচাল হয়ে যায় ইতোপূর্বের বিক্রয়চুক্তি। আপনাআপনি প্রথম চুক্তি বানচাল হয় না।

www.eelm.weebly.com

সমাধান ঃ হজরত উবাদা ইবনে সামেত কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক দাসদাসীর মধ্যে যে কোনো রকমের আত্মীয়তা থাকুক না কেনো, তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সিদ্ধ। ইমাম আহমদ বলেন, অসিদ্ধ। কারণ হাদিসের শব্দগুলো সাধারণার্থক। আবার বর্ণিত হাদিসের প্রতিবাদী হয়েছেন ইবনে জাওজী।

আমাদের দলিল হচ্ছে, হজরত সালমা ইবনে আযওয়া কর্তৃক বর্ণিত ওই হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, একবার আমরা হজরত আবু বকরের নেতৃত্বে যাত্রা করলাম বনী ফাযারার যুদ্ধে। প্রতিপক্ষীয়রা আমাদের হাতে বন্দী হলো। তাদের মধ্যে ছিলো আরবের এক সেরা সুন্দরী। তার ক্রোড়ে ছিলো একটি ফুটফুটে শিশু কন্যা। হজরত আবু বকর ওই রমণীকে সম্প্রদান করলেন আমার হাতে। মদীনায় ফিরে এলে রসুল স. আমাকে বললেন, সালমা! শিশু কন্যাটি আমার অধিকারে দাও। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সবকিছুই তো আপনার। রসুল স. তখন মেয়েটির বিনিময়ে মুক্ত করে নিয়ে ছিলেন তিনজন মুসলিম বন্দীকে।

এক বর্ণনায় এসেছে, মিসরের রাজা মকুকস্ একবার রসুল স. এর নিকটে উপঢৌকনরূপে প্রেরণ করলেন দু'জন তরুণীকে। তাঁদের একজনের নাম মারীয়া কিবতীয়া এবং অন্যজনের নাম সীরিন। রসুল স. সীরিনকে সম্প্রদান করলেন হজরত হাস্সান ইবনে সাবেতের হাতে। আর মারীয়াকে রাখলেন নিজের জন্য। সীরিন জননী হয়েছিলেন আবদুর রহমান ইবনে হাস্সানের এবং মারীয়া জননী হয়েছিলেন রসুল স. এর পবিত্র পুত্র ইব্রাহিমের।

সমাধান ঃ যদি শিশুর সঙ্গে তার পিতা-মাতা দু'জনই থাকে, তবে তাদের একজনকেও পৃথক করে বিক্রয় করা যাবে না। আর যদি তার মায়ের সঙ্গে থাকে ফুফু, খালা অথবা ভাই, তবে কেবল মা ছাড়া অন্য সকলকে পৃথক করে বিক্রয় করা সিদ্ধ হবে। এরকম বলা হয়েছে জাহিরুর রেওয়ায়েতে। কেননা মায়ের তুলনায় অন্যদের ভালোবাসা কিছুই নয়। আর যদি ভ্রাতা-ভগ্নি মিলে তারা থাকে ছয়জন, তবে তাদের একজন ছোট-একজন বড় এভাবে জোড়ায় জোড়ায় বিক্রয় করা যাবে। যদি অপ্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে থাকে দাদী, ফুফু ও খালা, তবে দাদী ছাড়া অন্যদেরকে আলাদা করে বিক্রয় করা যাবে। আর যদি দাদী ছাড়া কেবল থাকে ফুফু, তবে তাকে পৃথক করে বিক্রয় করা যাবে না। মূল সূত্র হচ্ছে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে তার অধিকসংখ্যক নিকটজন থাকলে তাদের মধ্য থেকে দূরবর্তীদেরকে পৃথক করে বিক্রয় করা যাবে। আর যদি একই স্তরের হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য থাকে, যেমন পিতা, মাতা, খালা, ফুফু, তবে কাউকেই পৃথক করে বিক্রয় করা যাবে না। এমতাবস্থায় সবাইকে বিক্রয় করতে হবে একসাথে। অথবা কাউকেই বিক্রয় করা যাবে না। কিন্তু যদি তারা

www.eelm.weebly.com

শ্রেণীগতভাবে এক হয়, যেমন দুই ভাই, দুজন চাচা, তবে অপ্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে তাদের যে কোনো একজনকে রেখে অন্যদের বিক্রয় করা হবে সিদ্ধ।

সমাধান ঃ 'সাবীলুর রাশাদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, বনী কুরায়জার বন্দীদের মধ্য থেকে মা ও তার শিশুসন্তানকে আরবের পৌত্তলিক ও ইহুদীদের কাছে বিক্রয় করা হয়নি। তাদেরকে বিক্রয় করা হয়েছিলো কেবল মুসলমানদের কাছে। এরকম করার কারণ এই যে, অপ্রাপ্তবয়স্করা পৌত্তলিক ও ইহুদীদের সঙ্গে বেড়ে উঠবে তাদের স্ব স্ব অপধর্মমতানুসারে। কিন্তু মুসলমানদের সংসারে ওই শিশুরা হয়ে যায় মুসলমান। আল্লাহ্ই সমধিক পরিজ্ঞাত।

বনী কুরায়জার অবরোধকালে শহীদ হয়েছিলেন কেবল দু'জন— হজরত খাল্লাদ ইবনে সুয়াইদ এবং হজরত মুনজির ইবনে মোহাম্মদ।

উপযোগ ঃ ওই অবরোধ যুদ্ধে বন্দিনী হয়েছিলেন রায়হানা নাম্নী বনী নাজির গোত্রের এক রমণী। তিনি ছিলেন বনী কুরায়জাদের এক যুবকের পত্নী। বন্দী-বণ্টনকালে তিনি পড়লেন রসুল স. এর ভাগে। রসুল স. তাঁকে ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তিনি সাড়া দিলেন না। রসুল স. আশাহত হলেন। হজরত ইবনে সাইয়াকে ডেকে বললেন, তুমি চেষ্টা করে দেখোতো দেখি, তার মতিগতি ফেরে কিনা। হজরত ইবনে সাইয়া বললেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গীকৃত। আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে দেখবেন, অচিরেই তিনি আসবেন ইসলামের আশ্রয়ে। একথা বলেই হজরত সাইয়া গমন করলেন রায়হানার নিকটে। বললেন, স্বজাতির চিন্তা মনে হয় পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। দেখলেন তো, হুয়াই ইবনে আখতাবের শোচনীয় পরিণতি। আল্লাহ্র রহমত যেদিকে, সেদিকে থাকাই তো উত্তম। তাই আমার পরামর্শ শুনুন। ইসলাম গ্রহণ করুন। হয়তো রসুল স. স্বয়ং আপনার পানি গ্রহণ করবেন। এটা কি আপনার জন্য পরম সৌভাগ্য নয়? রায়হানা এবার নরম হলেন। ওদিকে রসুল স. তখন উপবিষ্ট ছিলেন তাঁর প্রিয় সহচরবৃন্দ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে। হঠাৎ সেখানে শ্রুত হলো কারো আগমনের আওয়াজ। রসুল স. বললেন, মনে হচ্ছে এ পদশব্দ ইবনে সাইয়ার। মনে হয় সে আগমন করছে রায়হানার ইসলাম গ্রহণের শুভসংবাদ নিয়ে। বলতে বলতেই হজরত ইবনে সাইয়া সেখানে হাজির হলেন। বললেন, হে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ! শুভসমাচার শ্রবণ করুন। রায়হানা ইসলাম কবুল করেছেন।

রায়হানা ক্রীতদাসীরূপেই সারাজীবন সেবাযত্ন করেছিলেন রসুল স. এর। রসুল স. তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম বাণীবাহক! আমাকে আপনার চরণসেবিকা হয়েই জীবনপাত করতে দিন। এতে করে আপনি যেমন প্রীত হবেন, তেমনি আমিও হবো কৃতজ্ঞ। রসুল স. দ্বিরুক্তি না করে তাঁর এই ব্যবস্থাকেই মেনে নিয়েছিলেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজের পরলোকগমন ঃ বনী কুরায়জাদের পরাজয়ের অধ্যায় সমাপ্ত হলো। এদিকে হঠাৎ করেই অবনতি ঘটতে লাগলো হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজের স্বাস্থের। ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা বাড়তে লাগলো দিন দিন। রসুল স. হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে দেখতে গেলেন। জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, যার আনুরূপ্যবিহীন অধিকারে মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্র জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, আমি আমার ঘর থেকেই শুনতে পেলাম সা'দ ইবনে মুয়াজের বাড়ি থেকে ভেসে আসছে আমার পিতা ও ওমরের কান্নার আওয়াজ। ওমরের রোদন ধ্বনিই ছিলো তীব্রতর। আমি জানতাম, তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো গভীর সম্প্রীতি, যেমন বলা হয়েছে আল্লাহ্র বাণীতে 'রুহামাউ বায়নাহুম' (পরস্পরের প্রতি মায়াময়)।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, সা'দ ইবনে মুয়াজের জানাযা গমনকালে মুনাফিকেরা মন্তব্য করতে লাগলো, দেখেছো জানাযার খাটিয়া কতো হালকা। সে বনী কুরায়জাদের প্রাণ সংহারের আদেশ দিয়েছিলো বলেই তার এরকম অবস্থা। রসুল স. এর কানে একথা যেতেই তিনি স. বললেন, তার খাটিয়া বহন করছে ফেরেশতারা। তিরমিজি। হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, সা'দের চিরপ্রস্থানের কারণে আল্লাহ্র আরশও আন্দোলিত হচ্ছে। বোখারী, মুসলিম। হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. সকাশে পেশ করা হলো এক জোড়া চিত্তাকর্ষক রেশমী বস্ত্র। সাহাবীগণের কেউ কেউ বস্ত্রজোড়া নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। রসুল স. বললেন, তোমরা এই বস্ত্রের সৌন্দর্য দর্শনে মুগ্ধ হচ্ছো। শুনে রাখো, জান্নাতে সা'দ ইবনে মুয়াজের রুমাল হবে এর চেয়ে অনেক অনেক গুণ মনোমুগ্ধকর। বোখারী, মুসলিম।

ইলার ঘটনা ঃ ইলার ঘটনা ঘটেছিলো খায়বর যুদ্ধের পর। বাগবী লিখেছেন, একবার উম্মতজননীগণ এক জোট হয়ে রসুল স. সকাশে অধিকতর উন্নত খোরপোষ ও কিছু বিলাস সামগ্রীর দাবি উত্থাপন করলেন। অপ্রস্তুত ও অতুষ্ট হলেন রসুল স.। শপথ করলেন, একমাস যাবত তিনি স. তাঁদের কারো সঙ্গে শয্যাসম্পর্ক রাখবেন না। অবস্থান গ্রহণ করলেন একাকী এক প্রকোষ্ঠে। সাহাবীগণের সঙ্গেও বন্ধ করে দিলেন দেখা-সাক্ষাত। রোষান্বিত রসুলের এরকম অবস্থা দেখে সাহাবীগণ বলাবলি করতে লাগলেন, সম্ভবতঃ রসুল স. তাঁর সহধর্মিণীগণকে একেবারে পরিত্যাগ করেছেন। হজরত ওমর বললেন, আপনারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। সত্বরই আমি আপনাদেরকে প্রকৃত অবস্থা জানাতে পারবো। একথা বলেই তিনি প্রবেশ করলেন রসুল স. এর নির্জন প্রকোষ্ঠে। নিবেদন করলেন, হে মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়! আপনি কি আপনার পবিত্র ভার্যাগণকে পরিত্যাগ করেছেন। তিনি স. বললেন, না। তিনি পুনরায় নিবেদন

www.eelm.weebly.com

করলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল! আমি মসজিদে প্রবেশ করে জনগুঞ্জন শুনলাম। তারা বলছেন, আপনি তাঁদেরকে তালাক দিয়েছেন। একথা যে সত্য নয়, তাকি আমি তাঁদেরক জানাতে পারবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে জানাতে পারো। হজরত ওমর বলেন, এরপর আমি বেরিয়ে এসে মসজিদে সমবেত সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বললাম, হে জনতা! তোমাদের সন্দেহ সত্য নয়। রসুল স. তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণকে পরিত্যাগ করেননি। ওই সময় অবতীর্ণ হলো— 'আর যখনই প্রাদুর্ভাব ঘটে তাদের নিকটে স্বস্তিদায়ক অথবা অস্বস্তিপ্রদায়ক কোনো বিষয়ের, তখনই তারা তা প্রচার করে। যদি তারা এরকম না করে বিষয়টি গোচরীভূত করতো রসুলের অথবা তাদের ধর্মাধ্যক্ষের, তাহলে উন্মোচিত হতো সত্যতথ্য'। হজরত ওমর আরো বলেন, তখনই আমার সামনে উদ্ভাসিত হলো প্রকৃত বিষয়ের স্বরূপ। এরপর উম্মতজননীগণের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হলো—

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ২৮, ২৯, ৩০

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ
زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾ وَ
اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ
لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ
مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ؕ وَ كَانَ
ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

r হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদিগকে বল, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও উহার ভূষণ কামনা কর তবে আইস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দেই এবং সৌজন্যের সহিত তোমাদিগকে বিদায় দেই।

r 'আর যদি তোমরা কামনা কর আল্লাহ্‌, তাঁহার রাসূল ও আখিরাত, তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্‌ তাহাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রাখিয়াছেন।'

r হে নবী-পত্নীগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেহ তাহা করিলে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে এবং ইহা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি আপনার সহধর্মিণীগণকে এই বলে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দিন যে, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের জাঁকজমক ও বিলাস-ব্যসন কামনা করো, তবে এসো, আমি তোমাদেরকে প্রতুল সম্ভোগ-সম্ভাবের ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সঙ্গে তোমাদেরকে পরিত্যাগ করি।

এখানে 'যীনাতাহা' অর্থ পার্থিব ভোগ-বিলাসের উপকরণ। 'ফাতাআ'লাইনী' এর শাব্দিক অর্থ উপরে উঠে এসো। ব্যবহারিক অর্থ— আমার নিকট এসো। আর এখানে কথাটির মর্মার্থ— স্বেচ্ছায় তালাক নিতে এসো। 'উসাররিহ্কুন্না' অর্থ বিদায় করে দেই, দিয়ে দেই তালাক। আর 'সারাহান জামীলা' অর্থ সৌজন্যের সঙ্গে, ভদ্রজনোচিতভাবে।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'আর যদি তোমরা কামনা করো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল ও আখেরাত, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন'।

বাগবী লিখেছেন, ওই সময় রসুল স. এর মোট নয় জন সহধর্মিণীগণের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন কুরায়েশ বংশদ্ভূত। যেমন হজরত আবু বকরের কন্যা হজরত আয়েশা, হজরত ওমরের কন্যা হজরত হাফসা, আবু সুফিয়ানের কন্যা হজরত উম্মে সালমা এবং জামআর কন্যা হজরত সাওদা। আর অকুরায়েশ চারজন ছিলেন হজরত যয়নব বিনতে জাহাশ, হজরত মায়মুনা বিনতে হারেছ হিলালী, হজরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই এবং হজরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারেছ মুসতলকী।

আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. সর্বপ্রথম গমন করলেন হজরত আয়েশার প্রকোষ্ঠে। তাঁকে পাঠ করে শোনালেন সদ্য অবতীর্ণ আয়াতদ্বয়। হজরত আয়েশা সানন্দে বরণ করলেন আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও আখেরাতকে। তাঁর সপত্নীগণও একইভাবে মেনে নিলেন আখেরাতের কল্যাণকে। রসুল স. আনন্দিত হলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন মহান আল্লাহ্র।

কাতাদা বর্ণনা করেছেন, উম্মতজননীগণ যখন সকলেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেন আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও আখেরাতকে, তখন আল্লাহ্পাকও তাঁদের প্রতি প্রেরণ করলেন অভিনন্দনবাণী। সাথে সাথে রসুল স. এর উপরেও এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন যে, তিনি তাঁর সহধর্মিণীর সংখ্যা আর বাড়াতে পারবেন না। এরশাদ করলেন— 'এর পর আর কোনো নারী আপনার জন্য বৈধ নয়'।

আবু যোবায়েরের মাধ্যমে মুসলিম, নাসাঈ এবং আহমদ উল্লেখ করেছেন, হজরত জাবের বলেছেন, একবার হজরত আবু বকর রসুল স. এর অন্দর মহলে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে নিরাশ হলেন। কিছুক্ষণ পর এলেন হজরত ওমর। তিনিও

www.eelm.weebly.com

অন্দরে প্রবেশের অনুমতি পেলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অবশ্য দু'জনেরই অনুমতি মিললো। দু'জনে প্রবেশ করে দেখলেন, মহামতি রসুল স. মুখ ভার করে বসে রয়েছেন তাঁর সহধর্মিণীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে। হজরত ওমর রসুল স. এর অপ্রসন্ন অবস্থা দেখে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, আল্লাহ্র রসুলের এমতো বিষণ্নতা দূর করতেই হবে। এমন কথা বলতে হবে, যাতে তিনি প্রসন্ন হন। একথা ভেবেই তিনি বলে ফেললেন, খারেজার কন্যা (আমার স্ত্রী) যদি আমার কাছে ব্যয়বহুল কোনোকিছুর জন্য আবদার শুরু করে, তবে আমি তার ঘাড় ভেঙে দিবো। রসুল স. তাঁর একথা শুনে হেসে ফেললেন। বললেন, দেখছো তো, আমাকে ঘিরে এরা সেরকমই আবদার জুড়েছে। এক জোট হয়ে দাবি তুলেছে, তাদের ভরন-পোষণের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিতে হবে। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হজরত আবু বকর মারমুখী হলেন তার প্রিয় কন্যা আয়েশার প্রতি। হজরত ওমরও তেড়ে গেলেন তাঁর কন্যা হাফসার দিকে। উভয়ে বললেন, খবরদার! যা রসুল স. এর কাছে নেই, তার জন্য কখনো আবদার জুড়ে দিয়ো না যেনো। রসুল স. তখন তেলাওয়াত করলেন 'আর যদি তোমরা কামনা করো আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও আখেরাত, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।'

এরপর রসুল স. নিভৃতে সাক্ষাত করলেন হজরত আয়েশার সঙ্গে। বললেন, আয়েশা! তোমার কাছে আমি একটি প্রস্তাব রাখছি। আশা করি তুমি ত্বরা না করে এ বিষয়ে ধীরে সুস্থে মতামত দিয়ো তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে। হজরত আয়েশা বললেন, বলুন। রসুল স. আলোচ্য আয়াতদ্বয় পাঠ করলেন। হজরত আয়েশা বললেন, আমি তো স্বেচ্ছায় কবুল করেছি আল্লাহ্কে, আল্লাহ্র রসুলকে ও আখেরাতকে। সুতরাং পিতা-মাতার সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করার কিছু তো দেখি না। তবে আপনার কাছে আমার মিনতি, এ ব্যাপারে আমার সপত্নীগণ যেনো কিছু না জানে। রসুল স. বললেন, কথা দিলাম, আমি তাদেরকে একথা জানাতে যাবো না। কিন্তু জিজ্ঞাসিত হলে আমি তো অপারগ। কারণ আমি আবির্ভূত হয়েছি সকলের মঙ্গলাকাংখী হয়ে। অশান্তি উৎপাদনকারীরূপে নয়।

বিশুদ্ধ বোখারী গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, জুহুরী বলেছেন, রসুল স. শপথ করেছিলেন, একমাস তিনি বিচ্ছিন্ন থাকবেন তাঁর সহধর্মিণীগণের নিকট থেকে। ওরওয়ার বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, শপথের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরক্ষণেই রসুল স. শুভাগমন করেছিলেন আমার প্রকোষ্ঠে। আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! আপনি তো শপথ করেছিলেন এক মাসের। আজ তো অতিবাহিত হলো কেবল ঊনতিরিশ দিন। তিনি স. বললেন, এ মাস তো ছিলো ঊনতিরিশ দিনেরই।

www.eelm.weebly.com

অন্তর্নির্হিত আলোচনা ঃ রসুল স. ওই সময় তার পত্নীগণকে অর্পিত তালাক দিয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে আলেমগণ মতপৃথকতা করেছেন। অপির্ত তালাক অর্থ— রসুল স. এর প্রস্তাব মেনে নিলেই তাঁদের সঙ্গে রসুল স. এর ঘটে যেতো বিবাহবিচ্ছেদ। কেউ কেউ বলেছেন, ওই তালাক অর্পিত তালাকই ছিলো। কিন্তু হাসান, কাতাদা এবং অধিকাংশ আলেম বলেছেন, প্রস্তাবটি অর্পিত তালাক ছিলো না। বরং রসুল স. তাঁদেরকে দিয়েছিলেন তালাক চাওয়ার অধিকার। অর্থাৎ যদি তাঁরা পার্থিবতা কামনা করতেন, তবুও রসুল স.কে তালাক দিতে হতো নতুন করে। কেননা আয়াতে বিজ্ঞাপিত হয়েছে 'এসো, তোমাদেরকে ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং বিদায় করে দেই সৌজন্যের সঙ্গে'। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা পার্থিব ভোগ-সম্ভার গ্রহণ করলেও তাঁদের মুক্তির চাবিকাঠি থাকতো রসুল স. এর অধিকারেই।

সমাধান ঃ স্বামী যদি তার স্ত্রীকে স্বেচ্ছাবিচ্ছেদের অধিকার দেয়, তবে তা হবে অর্পিত তালাক (তালাকে তাফভীজ)। স্ত্রী ওই ইচ্ছা স্বাধীনতা কাজে লাগাতে পারবে ইচ্ছা স্বাধীনতার অধিকার প্রাপ্তির স্থানে। সেখান থেকে অন্যত্র গমন করলে ওই অধিকার তার আর থাকবে না, যেমনটি হয় ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা চুক্তিবদ্ধ হবার পর তাদের কেউ স্থান ত্যাগ করলে যেমন ইচ্ছা স্বাধীনতা বানচাল হয়ে যায়, তেমনি স্বেচ্ছাতালাকের অধিকার প্রাপ্তির পর স্ত্রী স্থানত্যাগ করলে অথবা অন্য কোনো কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে তার ওই অধিকার হয়ে যাবে বানচাল। কারণ অর্পিত তালাক মূলতঃ একটি কর্মের সমর্পণ। হেদায়া প্রণেতা এরকম বৈঠকের উপর সাহাবীগণের ঐকমত্যও উল্লেখ করেছেন।

ইবনে হুম্মামের মন্তব্য হচ্ছে, ইবনে মুনজির বলেছেন, স্ত্রী স্বামীপ্রদত্ত স্বেচ্ছাবিচ্ছেদের অধিকার কতোদিন সংরক্ষণ করতে পারবে, সে সম্পর্কে আলেমগণ মতপৃথকতা করেছেন। হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, ওই রমণী যতক্ষণ তার অধিকার প্রাপ্তির স্থানে অবস্থান করবে, তার প্রাপ্ত অধিকার বলবত থাকবে ততক্ষণ। ওই বৈঠক থেকে উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে যাবে তালাক গ্রহণের ইচ্ছা স্বাধীনতাচ্যুত।। এরকম বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন শায়েখ থেকেও। তবে ওই বর্ণনাগুলোর সূত্রপরম্পরা বিতর্কাহত। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্, আতা, মুজাহিদ, শা'বী, নাখয়ী, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী, আওজায়ী, শাফেয়ী, আবু সওর এবং আসহাবে রাযীর সিদ্ধান্তও এরকম। তবে জুহুরী, কাতাদা, আবু উবাদা ইবনে নসর প্রমুখের অভিমত হচ্ছে ওই বৈঠক থেকে উঠে যাওয়ার পরেও তার অধিকার ক্ষুণ্ন হয় না। ইবনে মুনজির বলেছেন, আমি এমতো অভিমতের সমর্থক। কারণ রসুল স. হজরত আয়েশাকে বলেছিলেন, পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে মতামত জানিয়ো, ত্বরা কোরো না। 'মাগনা' প্রণেতাও এরকম বর্ণনা উল্লেখ করেছেন হজরত আলী থেকে।

www.eelm.weebly.com

ইবনে মুনজিরের অভিমতের আবার সমালোচনা করেছেন ইবনে হুম্মাম। বলেছেন, তিনি হজরত আলী থেকে যে বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন, তা সর্বসম্মত নয়। বরং হজরত আলী থেকে আর একটি বর্ণনাও রয়েছে, যা সাহাবীগণের ঐকমত্যের অনুরূপ। ইমাম আহমদ তাঁর 'বালাগাত' পুস্তকে স্পষ্ট করে লিখেছেন, আমার নিকট এর সংবাদটি পৌঁছেছে যে, হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত জাবের বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার স্ত্রীকে প্রদত্ত স্বেচ্ছাবিচ্ছেদের অধিকার বলবত থাকবে বৈঠকের স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত। স্ত্রী যদি সেখান থেকে উঠে অন্যত্র চলে যায়, তবে অবলুপ্ত হবে তার অধিকার। কোনো সাহাবীই এমতো অভিমতের বিরুদ্ধপ্রবক্তা নন।

এবার অবশিষ্ট রইলো সূত্রপরম্পরাগত সমালোচনার বিষয়টি। এতে করে অবশ্য মূল বিধানের উপর কোনো সন্দেহের ছায়াপাত ঘটবে না। কারণ সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যসম্মত। উপরন্তু হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ ও হজরত ইবনে মাসউদের যে বক্তব্য আবদুর রাজ্জাক উল্লেখ করেছেন, তার সূত্রপরম্পরা সমালোচনার উর্ধ্বে। সুতরাং ইবনে মুনজিরের সূত্রপরম্পরাগত বিবরণ গ্রহণ করা ঠিক হবে না। কেননা রসুল স. এর 'ত্বরা কোরো না' কথার মর্ম অর্পিত তালাক নয়। আর 'এসো' আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং তোমাদেরকে দেই সৌজন্যের সঙ্গে বিদায়' কথাটির উদ্দেশ্যও এরকম।

সমাধান ঃ স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে দেওয়া হলো ইচ্ছার স্বাধীনতা, তবে এমতোক্ষেত্রে অর্পিত তালাকের সংকল্প (নিয়ত) হবে অত্যাবশ্যক। কেননা স্বামী তার স্ত্রীকে নানাবিধ সাংসারিক বিষয়ে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিতে পারে।

সমাধান ঃ কেউ তার স্ত্রীকে বললো, তোমাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দেওয়া হলো। প্রত্যুত্তরে স্ত্রী বললো, আমি গ্রহণ করলাম আমর ইচ্ছা স্বাধীনতাকে। এমতাবস্থায় স্ত্রী হবে ফেরৎযোগ্য, এক তালাক (তালাকে রজয়ী) প্রাপ্তা। এরকম অভিমত প্রকাশ করেছেন হজরত ওমর। হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত ইবনে আব্বাস। কারণ স্বামীর পক্ষ থেকে ইচ্ছা স্বাধীনতা অর্পণের অর্থই হচ্ছে স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া। আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে ইচ্ছা স্বাধীনতা গ্রহণের অর্থই হচ্ছে প্রদত্ত তালাক গ্রহণ করা। বিষয়টি দাঁড়ায় এরকম— স্বামী বললো, আমি তোমাকে দিলাম তোমার ইচ্ছা স্বাধীনতা গ্রহণের সুযোগ অর্থাৎ আমি তোমাকে দিলাম তালাক গ্রহণের স্বাধীনতা। আর স্ত্রী বললো, আমি গ্রহণ করলাম ইচ্ছা স্বাধীনতাকে। অর্থাৎ গ্রহণ করলাম প্রদত্ত তালাক। তবে সর্বসম্মত অভিমত এই যে, এমতোক্ষেত্রে বর্তায় প্রত্যাবর্তনযোগ্য এক তালাক (তালাকে রজয়ী), তিন তালাক নয়। কোরআনের সাক্ষ্য এরকম। এভাবে সিদ্ধান্তটি দিয়েছেন ইমাম

www.eelm.weebly.com

শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ। তবে হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত হয়েছে, এমতোক্ষেত্রে বর্তাবে তিন তালাক। সম্ভোগিত স্ত্রীদের ক্ষেত্রে এমতো সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ইমাম মালেকও। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামী কর্তৃক তখন পর্যন্ত সম্ভোগিত না হয়ে থাকে, তবে এমতোক্ষেত্রে এক তালাকের মর্মকে মান্য করা যায়। হজরত জায়েদ ইবনে সাবেতের যুক্তি হচ্ছে, ইচ্ছা স্বাধীনতা প্রদানের ক্ষেত্রে তালাক গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করেন স্ত্রী। সুতরাং স্ত্রীর সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে তার উপর তার স্বামীর অধিকার না থাকাই সমীচীন। আর স্বামীই যদি তখন পর্যন্ত তালাক প্রদানের অধিকার সংরক্ষণ করলো, তবে তার তালাক অর্পণের অর্থই বা কী দাঁড়ায় ? তালাক প্রদানের অধিকার স্বামী সংরক্ষণ করে বলেই তো সে স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে তালাক প্রত্যাহর করতে পারে। তাই বিশেষভাবে স্ত্রী এমতো অধিকার সংরক্ষণ করতে পারবে তখনই যখন অর্পিত তালাকের অর্থ করা হবে তালাকে বায়েন (চূড়ান্ত তালাক বা তিন তালাক) তালাক চূড়ান্ত না হলে তার পশ্চাতে অবশ্য আগমন ঘটে প্রত্যাহারের বা রজায়াতের। কাজেই স্ত্রীর অধিকারভূত তালাককে তিন তালাক ধরে নেওয়াই সমীচীন।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, স্ত্রীর ইচ্ছা স্বাধীনতা সাপেক্ষে অর্পিত বা সমর্পিত তালাকের ফলে বর্তাবে এক তালাক বায়েন। ইমাম আবু হানিফাও এরকম বলেন। কারণ অধিকার সমর্পণের পর কেবল স্ত্রীই হয় অধিকারের সংরক্ষণকারিণী। স্বামীর অধিকার তখন আর থাকে না। আর স্ত্রীর এই অধিকার প্রাপ্তিই তার জন্য অনিবার্য করে বায়েন তালাককে। আর তালাক ছাড়াও বায়েন তালাক বিধিসম্মত। কেননা সম্পদ প্রদানের শর্তে তালাকের আবেদন (খোলা তালাক) এবং সম্ভোগবিবর্জিতাদের তালাকও তো বায়েন তালাকরূপে গণ্য। সুতরাং এমতাবস্থায় এক তালাক অথবা তিন তালাক যা-ই হোক না কেনো, তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ আর থাকেই না। এমতোক্ষেত্রে বায়েন তো বায়েনই। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এমতাবস্থায় কার্যকর হবে বায়েন তালাক। আবার অপর এক বর্ণনায় এসেছে, এমতাবস্থায় কার্যকর হবে তালাকে রজয়ী। সুতরাং বিষয়টি বিতর্কাতীত নয়। কারণ এরকম পরস্পরাগত বিরোধের ক্ষেত্রে হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা হয় ব্যহত।

আমি বলি, বায়েন তালাক দু'ধরনের— লঘু ও গুরু। সুতরাং বিষয়টি নির্ভর করবে স্বামীর সংকল্পের উপর। অর্থাৎ সে যদি সংকল্প করে গুরু বায়েনের। তবে তা অবশ্যই হবে গুরু বায়েন। নতুবা তা হবে লঘু । কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দেওয়া গেলো, তবে এতে করে বায়েন তালাক প্রমাণিত হবে না। কারণ এতে করে বুঝা যায়, ইচ্ছার বিশুদ্ধ স্বাধীনতা সমর্পণ করা হয়েছে স্ত্রীর উপরে। অর্থাৎ সে নিজের প্রতি

www.eelm.weebly.com

তালাক গ্রহণের অধিকারভূত হলো। উল্লেখ্য, বায়েন তালাক বর্তে বক্তার উক্তির চাহিদা অনুসারে। এখানে পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছে এক তালাক বায়েনের। তাই বলে সাধারণ দুই তিন তালাকে বায়েন এরকম নয়। যেমন 'আনতে বায়েন' কথাটির দ্বারা বুঝা যায়— তুমি বায়েন তালাকপ্রাপ্তা। এমতাবস্থায় তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাকই বর্তাবে। কিন্তু এখানে ব্যাপারটি তো সেরকম নয়। ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রদানের মধ্যে স্পষ্টতঃ বায়েন তালাকের কথা নেই। এখানে পরিস্থিতি অনুসারে কেবল বলা হচ্ছে বায়েন তালাকের কথা। আর এমতাবস্থায় স্বামী যদি বায়েন তিন তালাকের নিয়তও করে, তবু তা হবে এক তালাকে বায়েন। মনে রাখতে হবে নিয়ত সেখানেই কার্যকর হতে পারে যেখানে ভারসাম্য রক্ষা করার মতো কোনো উপযুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যে শব্দে সংকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাবনা থাকে প্রকট। তবে স্বামী যদি তিনবার ইচ্ছার স্বাধীনতার সাথে তালাক সমর্পণ করে এবং তার উদ্দেশ্যের সংখ্যা যদি হয় সুপ্রকট, আর স্ত্রীও যদি সে স্বাধীনাকে লুফে নেয়, তবে এমতোক্ষেত্রে তিনটি বায়েন তালাকই বর্তাবে।

সমাধান ঃ স্ত্রী যদি তার স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত ইচ্ছার স্বাধীনতা সাপেক্ষে অর্পিত তালাকের প্রত্যুত্তরে বলে, আমি অধিকার দিলাম আমার স্বামীকে, তবে জমহুরের অভিমতে কোনো তালাকই বর্তাবে না। কেননা স্বামী তো তার স্ত্রীকে তালাক দেয়নি, সমর্পণ করেছে কেবল তার তালাক গ্রহণের অঘিকার, আর স্ত্রী সে তালাক গ্রহণ না করে গ্রহণ করেছে তার স্বামীর স্বামীত্বকে। কাজেই এ ক্ষেত্রে কোনো তালাকই বর্তাবে না। কিন্তু হজরত আলীর এক উক্তিতে এসেছে, এমতোক্ষেত্রে বর্তাবে এক তালাক রজয়ী (ফেরৎযোগ্য তালাক)। সম্ভবতঃ তিনি অধিকার কথাটির মর্ম গ্রহণ করেছেন তালাক বর্তে যাওয়া। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, জননী আয়েশার একটি বক্তব্য জমহুরের অভিমতের পরিপোষক। তাঁর বক্তব্যটি এরকম— রসুল স. আমাদেরকে দিয়েছিলেন ইচ্ছার স্বাধীনতা। আমরা তা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তাকেই। তিনি স. আর ভিন্নতর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এতে করেই প্রমাণিত হয় যে, এমতোক্ষেত্রে কোনো তালাকই বর্তাবে না।

আমি বলি, ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে, রসুল স. তাঁর পুতঃপবিত্রা সহধর্মিণী-গণকে অর্পিত তালাকের ইচ্ছা স্বাধীনতা দেননি, বরং দিয়েছিলেন তালাক কামনার ইচ্ছা স্বাধীনতা। কাজেই জননী আয়েশার বক্তব্যের দ্বারা হজরত আলীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করা কতোখানি যৌক্তিক তা সহজেই অনুমান করা যায়।

www.eelm.weebly.com

সমাধান ঃ ইচ্ছাস্বাধীনতাসহ অর্পিত তালাকের সঙ্গে জড়িত থাকতে হবে ‘নফস্’ (সত্তা) শব্দটি। শব্দটি ব্যবহার করবে স্বামী অথবা স্ত্রী। যেমন স্বামী বলবে, তালাক প্রদানের আমার নিজের ইচ্ছা স্বাধীনতা তোমাকে অর্পণ করলাম। স্ত্রী বলবে, আমি তা গ্রহণ করলাম আমার নিজের উপর। উভয়েই যদি ‘আমার নিজের ইচ্ছাস্বাধীনতা’ বা ‘আমার নিজের উপর’ কথাটি বাদ দিয়ে শুধু ‘আমি ইচ্ছা স্বাধীনতা অর্পণ করলাম’ বাবলে ‘আমি তা গ্রহণ করলাম’ তবে তালাক বর্তাবে না। কারণ ‘এখতিয়ার’ বা ‘ইচ্ছা’ কথার মর্ম কেবল তালাক হতে পারে না। বরং হতে পারে অনেক কিছুই। অর্থাৎ কথাটি বহু অর্থ বোধক। যুক্তির মাপকাটিতেও কথাটির এরকম অর্থ করা যেতে পারে না। আর ‘এখতিয়ার’ কথাটি যখন নিজেই তালাকের মালিক নয়, তখন অপরকে তা তালাকের মালিক বানাতে পারে কীভাবে? কিন্তু যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যসম্ভূত সিদ্ধান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, স্ত্রী যদি স্বীয় সত্তায় সে এখতিয়ারকে মেনে নেয়, তবে তালাক বর্তাবে, তাই তাঁদের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে আমরা যুক্তিবিরুদ্ধ তালাক বর্তানোর কথা বলি। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তানুসারে স্বামী স্ত্রীর কথার মধ্যে জড়িত থাকতে হবে ‘নফস’ কথাটি। কেননা ‘এখতিয়ার’ অস্পষ্ট অর্থবোধক। অর্থাৎ কথাটির অর্থ ‘আমার ইচ্ছা’ তোমার ইচ্ছা, অথবা অন্য কারো ইচ্ছাও তো হতে পারে। কাজেই অস্পষ্ট কথার দ্বারা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। আর নিজের এখতিয়ারসম্ভূত শব্দে তালাক সংঘটিত হওয়া যেহেতু যুক্তিবহির্ভূত, তাই বুঝতে হবে বিধানটি স্বস্থলে সীমাবদ্ধ। আবার বিধানটি ঐকমত্যসম্ভূতও। তাই উদ্ভূত পরিস্থিতির চাহিদা সত্ত্বেও বদ্ধমূল নিয়ত সহযোগে ‘নফস্’ (নিজের, নিজের উপর) শব্দের ব্যবহার ব্যতীরেকে তালাক বর্তাবে না, যেহেতু এর উপরে ঐকমত্যও হয়নি।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, পরিস্থিতি যখন উপযোগী হয় এবং স্বামী ‘এখতিয়ার’ শব্দের দ্বারাই তালাক ঘটাতে চায়, আর স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চায় তালাক কার্যকর হোক, তবে স্বামীর সংকল্পই বিবেচিত হবে যথেষ্ট বলে। তালাক বর্তাবে কেবল ‘এখতিয়ার’ শব্দের ব্যবহারেই।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, শব্দের যে কোনো মর্মার্থ গ্রহণের সম্ভাবনা থাকুক না কেনো, সংকল্প এখানে অসহায়। কোনো কথা বললে বক্তার মনে যাই থাকুক না কেনো, সেটাই তার জন্য সঠিক হতে পারে। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বললো, এক গ্লাস পানি পান করাও। একথার মধ্যে যদি তার উদ্দেশ্য তালাক থাকে, তবে কি তালাক বর্তাবে? সুতরাং ‘এখতিয়ার’ শব্দের দ্বারাও তালাক সংঘটিত হতে পারে না, তবে ঐক্যমতের প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্র।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, 'এখতিয়ার' এর ভিন্নতর অর্থ গ্রহণ হবে অযৌক্তিক। যেহেতু শব্দটি দু'টি সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। হয় এর মর্মার্থ হবে নিজের অভিলাষ, অথবা হতে পারে অন্য কিছু। স্বামী যদি তার এমতো উক্তির মাধ্যমে সংকল্প করে অর্পিত তালাকের এবং স্ত্রীকে বলে দেয়, আমি নিজেকেই এখতিয়ার করলাম। তাহলে তালাক হয়ে যাবে। কারণ, এমতোক্ষেত্রে স্বামীর উক্তির ব্যাখ্যা ধরে নেওয়া হবে স্ত্রীর কথা। বুঝতে হবে, এখানে স্বামীর 'এখতিয়ার' শব্দটির সঙ্গে জড়িত ছিলো সম্ভাব্য তালাক। কাজেই তালাক এখানে বর্তাবেই।

সমাধান ঃ স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে ইচ্ছা স্বাধীনতা দেওয়া হলো, আর স্ত্রী যদি প্রত্যুত্তর করে বর্তমান ও ভবিষ্যত দ্বিত্বকালবোধক শব্দের দ্বারা, তবে তালাক বর্তাবে না। কথাটি অবশ্য যুক্তিবহির্ভূত। কারণ স্ত্রীর কথায় বর্তমানকালের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ভবিষ্যতের সম্ভবনাও। আর যদি স্ত্রী বলে, আমি নিজেকে তালাক করে নিবো, তবে তার কথাটি যেহেতু ভবিষ্যৎকালবোধক, তাই এমতাবস্থায় তালাক বর্তাবে না।

'হেদায়া' রচয়িতা লিখেছেন, প্রকাশ্য যুক্তির বিপরীত হলেও উত্তমতার দিক থেকে জননী আয়েশার উক্তি ছিলো দিত্বকালবোধক শব্দে। তিনি বলেছিলেন, 'বাল আখতারাল্লহ্ ওয়া রসুলাহ্'। এভাবে তিনি রসুল স. এর উত্তরকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছিলেন।

একটি সন্দেহ ঃ ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে, রসুল স. তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণী হজরত আয়েশাকে দিয়েছিলেন তালাক চাওয়ার ইচ্ছা স্বাধীনতা, তালাক গ্রহণের ইচ্ছা স্বাধীনতা নয়। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে তাঁর উক্তিকে দলিলরূপে গণ্য করা কি সমীচীন ?

সন্দেহভঞ্জন ঃ এখানকার আলোচ্য বিষয় এখতিয়ারের মর্মবোধক নয়। অর্থাৎ তালাক কামনা করা বা গ্রহণ করা নয়। বরং এখানকার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এখতিয়ারের সম্পর্ক সম্বন্ধে। অর্থাৎ রসুল স. তখন তাদের এখতিয়ারবোধক জবাব মেনে নিয়েছিলেন।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'হে নবী পত্নীগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'ফাহিশা' শব্দটির অর্থ অবাধ্যতা, চরিত্রহীনতা, কটুভাষিতা। 'দ্বি'ফাইন' অর্থ অন্যান্য রমণী অপেক্ষা দ্বিগুণ। 'দ্বিফ্' শব্দটি সম্বন্ধ ও সম্পর্কার্থক। অর্থাৎ শব্দটি অর্থ প্রকাশ করে অন্য একটি শব্দ সমন্বয়ে। যেমন— উর্ধ্ব-অধঃ, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি। কাজেই শব্দটি সমপরিমাণ দু'টি বস্তুর একত্রায়নক, 'আদ্বআ'ফুশ শাই' অথবা 'দ্বাআ'ফাতুশ্‌শাই' অর্থবোধক। এভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়— আমি একত্র করেছি একটির সঙ্গে একটি

www.eelm.weebly.com

বস্তুর মতো আরেকটি বস্তুকে। এরকম দু'টি বস্তুর পুনঃ মিলনায়নকেই বলে 'দ্বি'ফাইন'। আবার কখনো কখনো একই রকম দু'টি বস্তুর একত্রায়নকেও 'দ্বি'ফাইন' বলা হয়। যেমন স্বামী-স্ত্রী। আবার কখনো কখনো সমপ্রকৃতির ও সমপরিমাণের মিশ্রিত বস্তুকেও 'দ্বিফ' বলা হয়ে থাকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ফা আতিহিম আ'জাবান দ্বি'ফাম্ মিনান্নার' (তাদেরকে প্রদান করো নরকের দ্বিগুণ শাস্তি। যেমন তারা নিজেরা হয়েছিলো ভ্রষ্ট এবং ভ্রষ্ট করে ছিলো আমাদেরকেও)। অর্থাৎ আমাদের শাস্তির তুলনায় তাদেরকে দাও দ্বিগুণ শাস্তি।

'দ্বিফ' শব্দটি কোনো সংখ্যার সঙ্গে সম্বন্ধিত বলে অর্থ প্রদান করবে ওই সংখ্যার দ্বিগুণ। যেমন একের দ্বিগুণ দুই, দশের দ্বিগুণ কুড়ি, দুই শতের দ্বিগুণ চারশত। আর 'দ্বি'ফাইন' (দ্বিবচনবোধক) শব্দের সম্বন্ধ যদি হয় একের সঙ্গে তবে অর্থ প্রদান করবে এরকম— এক আর দুই তিন।

'কামুস' অভিধানে রয়েছে, একই বস্তুর অনুরূপ বস্তুকে বলে 'দ্বিফ'। আর দু'টিকে বলে 'দ্বি'ফাইন'। অথবা 'দ্বিফ' বলে একটি বস্তুর দুইগুণ, তিনগুণ, চারগুণ ইত্যাদিকে। যেমন আরবীভাষীরা বলেন, 'লাকা দ্বি'ফাহু'। অর্থাৎ তোমার দুইগুণ অথবা তিনগুণ ইত্যাদি, যার কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। আবু দাহদাহের বর্ণনানুসারে 'দ্বিফ' অর্থ দ্বিগুণ। আল্লামা জাযায়ী তাঁর 'নেহায়া' গ্রন্থে এরকমই বলেছেন। তিনি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন আরবীভাষীদের এই প্রবচনটিকে— 'ইন আ'তাইতানী দিরহামান ফালাকা দ্বি'ফুহু' (যদি তুমি আমাকে এক দিরহাম দাও, তবে তোমার জন্য থাকবে দুই দিরহাম)। সুতরাং বুঝতে হবে 'দ্বি'ফাইন' অর্থ দ্বিগুণ।

জুহুরী লিখেছেন, 'দ্বিফ' অর্থ অনেক, দ্বিগুণ নয়। এর ন্যূনতম সংখ্যা একগুণ, আর বৃহত্তম সংখ্যা অগণিত। হাদিস শরীফে এসেছে 'ইয়ুদ্ব'আফু সলাতাল জ্বামায়াতি আ'লা সলাতিল ফাজ্জি খমসাঁও ওয়া ইশরীনা দারাজাহ্' (একাকী নামাজ সম্পাদন অপেক্ষা জামাতের সঙ্গে নামাজ সম্পাদনের পুণ্য পঁচিশগুণ বেশী)। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন 'ইয়ুদ্বআ'ফাহু লাহু আদ্বআ'ফান কাছীরাহ্' (তার পুণ্যবৃদ্ধি করা হবে অনেকগুণে)। আর 'দ্বিফ' যে কেনো শব্দরূপে প্রকাশ করা হোক না কেনো, তার অর্থ হবে অধিক করা, বৃদ্ধি করা। বাগবী বলেছেন শব্দটি যে কোনোরূপে প্রকাশ করা হোক না কেনো, তা গণ্য হবে সমার্থক হিসেবে।

ক্বারী আবু উবায়দা ও ক্বারী আবু আমর বলেছেন, শব্দগঠন সূত্র 'তাফ্য়ীল' এর নিয়মে শব্দটি গঠিত হলে অর্থ হবে দ্বিগুণ। আর 'মুফায়িলাত' এর নিয়মে পরিগঠিত হলে অর্থ হবে কয়েক গুণ। একারণেই ক্বারী আবু আমর আলোচ্য আয়াতে ইয়ুদ্বাআ'ফ শব্দটির স্থলে উচ্চারণ করতেন 'ইয়ুদ্বআ'ফ'।

www.eelm.weebly.com

অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্তা উম্মত জননীগণের দ্বিগুণ শাস্তি বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ স্বরূপ এরকম বলা যেতে পারে যে, অধিক নেয়ামত প্রাপ্তগণের শাস্তিও অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। একারণেই স্বাধীন মানুষের ব্যভিচারের শাস্তি অপেক্ষা ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে অর্ধেক। আরো একটি কারণ রয়েছে তাঁদের দ্বিগুণ শাস্তি নির্ধারণের। সেটি হচ্ছে উম্মত জননীগণের মন্দ স্বভাব রসুল স. এর মহান ব্যক্তিত্বের জন্য সম্মানহানিকর। এরূপ আচরণ নিঃসন্দেহে উম্মতগণের জন্য হৃদয়বিদারক। সুতরাং বুঝতে হবে একারণেই আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে করেছিলেন নিষ্কলুষ, পুত-পবিত্রা, তাঁর প্রিয়তম রসুলের উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ'। উল্লেখ্য, এই বাক্যটি একটি আপ্ত বচন।

www.eelm.weebly.com

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَاۤ
اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَ اَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿৩১﴾ يٰنِسَآءَ
النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿৩২﴾
وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَ
اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا
يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيْرًا ﴿৩৩﴾ وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَ
الْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿৩৪﴾

r তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের প্রতি অনুগত হইবে ও সৎকার্য করিবে তাহাকে আমি পুরস্কার দিব দুইবার এবং তাহার জন্য আমি প্রস্তুত রাখিয়াছি সম্মানজনক রিয্ক।

r হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নহ; যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তবে পর-পুরুষের সহিত কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলিও না, যাহাতে অন্তরে যাহার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলিবে।

r আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করিবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজদিগকে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইবে না। তোমরা সালাত কায়েম করিবে ও যাকাত প্রদান করিবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত থাকিবে। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে।

www.eelm.weebly.com

r আল্লাহ্র আয়াত ও জ্ঞানের কথা যাহা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তাহা তোমরা স্মরণ রাখিবে; আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে নবী সহধর্মিণীগণ! তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পূর্ণ অনুগতা হবে ও হবে সৎকর্মপরায়ণা, তাকে আমি পুরস্কার দিবো দিগুণ এবং তার জন্য আমার কাছে জমা করে রেখেছি মর্যাদামণ্ডিত জীবনোপকরণ।

এখানে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদানের অর্থ— প্রথমতঃ তারা পুরস্কার লাভ করবেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের একান্ত আনুগত্যের জন্য। দ্বিতীয়ত তাঁরা পুরস্কৃত হবেন আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয়তম রসুলের পরিতোষ কামনায় অল্পে তুষ্ট হয়ে মহৎজীবনযাপনের কারণে। মুকাতিল বলেছেন, তখন প্রতিটি পুণ্যের প্রতিদান দেওয়া হবে কমপক্ষে দশগুণ করে।

'রিয্‌ক্বন কারীমা' অর্থ সম্মানজনক জীবনোপকরণ। অর্থাৎ জান্নাত। তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের জীবনসঙ্গিনী বলেই হবেন এমতোসম্মানজনক জীবনোপকরণের অধিকারিণী।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'হে নবীপত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও'। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুলের সহধর্মিণীবৃন্দ! তোমরা যেহেতু সৃষ্টির সর্বোত্তম ব্যক্তিত্বকে স্বামীত্বে বরণ করেছো, হয়েছো তাঁর সুখ-দুঃখের অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী, সেহেতু তোমাদের মহিমা স্বতন্ত্র, সাধারণ পুণ্যবতী অপেক্ষাও তোমাদের মর্যাদা উচ্চ, তেমনি তোমাদের দায়িত্বও অন্যাপেক্ষা অধিক মহিমাময়।

হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— হে পুতপবিত্রা নবী ভার্যাকুল! অপরাপর সতী-সাধ্বীগণের মর্যাদা অপেক্ষা তোমাদের কৌলিন্য ও আভিজাত্য অধিক পূর্ণ ও প্রতিদানেও তোমরা আমার নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্না।

এখানকার 'আহাদ' শব্দটির মূলরূপ হচ্ছে 'ওয়াহাদ'। এর অর্থ 'ওয়াহিদ' বা একক। দ্বিবচন, বহুবচন ও সমষ্টিকে বিলোপ করার লক্ষ্যেই শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে। শব্দটি একবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ সকলক্ষেত্রেই সমরূপে ব্যবহার্য।

আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর পুণ্যবতী সহধর্মিণীগণই সকল রমণী অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবতী। কিন্তু অন্য এক আয়াতে অধিকতর মর্যাদাবতীরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে ঈসা-জননী হজরত মরিয়মকে। যেমন— 'হে মরিয়ম! আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন তোমাকে। করেছেন পবিত্রা। আর নির্ধারণ করেছেন তোমাকে বিশ্বের রমণীকূলের শীর্ষে'। এরূপ বর্ণনাবৈষম্যের সমাধানার্থে বলা যেতে পারে যে, হজরত মরিয়ম ছিলেন তাঁর সময়ের সারা বিশ্বের

www.eelm.weebly.com

রমণীকূলের শীর্ষস্থানীয়া । আর সর্বশেষ রসুলের সহধর্মিণীগণ হচ্ছেন সকল যুগের সকল রমণীর মস্তকমুকুট। এই ব্যাখ্যাটি আবার হয়ে যায় একটি হাদিসের পরিপন্থী। হাদিসটি এই— হজরত আনাস থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সারা পৃথিবীর রমণীকূলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মহিমময়ী হচ্ছে ইমরান তনয়া মরিয়ম, খুয়াইলিদনন্দিনী খাদীজা, মোহাম্মদ-দুলালী ফাতেমা এবং ফেরাউন পত্নী আসিয়া। সুতরাং আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে— হে রসুলের জীবনসঙ্গিনীগণ! তোমাদের অনন্যসাধারণ মর্যাদা সর্বজনবিদিত। সকলেই জানে, তোমাদের তুল্য মর্যাদা সাধারণ পুণ্যবতীগণের নেই।

জমহুরের সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, নারীকুলের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছেন রসুলনন্দিনী হজরত ফাতেমা। আর তাঁর মহিয়ষী ভার্যাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হচ্ছেন হজরত খাদিজা। অধিকন্তু ইমরান দুহিতা মরিয়ম, ফেরাউন পত্নী আসিয়া এবং সিদ্দীক-দুলালী হজরত আয়েশাও সর্বোত্তমাগণের দলভূত।

প্রবীণ হাদিসবেত্তাদ্বয়ের সুপ্রসিদ্ধ বোখারী ও মুসলিম গ্রন্থে এবং আহমদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজার গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুরুষ জাতির মধ্যে অনেকেই পূর্ণত্ব অর্জন করেছেন, কিন্তু নারী জাতির মধ্যে ফেরাউনপত্নী আসিয়া এবং ইমরান-কন্যা মরিয়ম ছাড়া আর কেউ পূর্ণত্ব অর্জন করতে পারেনি। আহার্যের মধ্যে ব্যঞ্জনসিক্ত রুটির কদর যেরকম, নারীকুলের মধ্যে আয়েশার সম্মানও তেমনই। বোখারী ও মুসলিমে আরো উল্লেখিত হয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি স্থলে-অন্তরীক্ষে স্বনামধন্যা রমণী হচ্ছেন মরিয়ম বিনতে ইমরান ও খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ। কুরাইযের বর্ণনায় পাওয়া যায়, রসুল স. একথা বলার সময় ইঙ্গিত করেছিলেন আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি। হজরত আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর কন্যা ফাতেমাকে একবার বললেন, তুমি জান্নাতবাসিনীগণের শীর্ষস্থানীয়া, একথা শুনে কি তুমি প্রসন্ন নও?

হজরত হুজায়ফা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, এক রাতে আমার কাছে এমন এক ফেরেশতা আবির্ভূত হলো, যে আর কখনো এ পৃথিবীতে আসেনি। সে আমাকে অভিবাদন জানাবে বলে তার প্রভুপালনকর্তার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলো। সে আমাকে অভিবাদন জানানোর পর বললো, শুভসংবাদ শ্রবণ করুন। আপনার কন্যা ফাতেমা হবে জান্নাতিনীগণের নেতৃস্থানীয়া। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন বর্ণনাটি দুর্লভ শ্রেণীর।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো তবে পর-পুরুষের সঙ্গে কোমলকণ্ঠে এমন কথা বোলো না, যাতে যাদের অন্তরে ব্যধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়'।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো' অর্থ যদি তোমরা বিরত থাকো আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও তাঁর রসুলের অসন্তোষ থেকে। বাক্যটি শর্তযুক্ত। পূর্ববর্তী বাক্য এর পরিপূরক।

'পর-পুরুষের সঙ্গে কোমলকণ্ঠে কথা বোলো না' অর্থ নারীর কোমলকণ্ঠ অশুদ্ধচিত্তদের অন্তরে সৃষ্টি করে মন্দ প্রতিক্রিয়া। সুতরাং তোমরা এরকম আমল কখনোই কোরো না। বজায় রেখো তোমাদের অনন্যসাধারণ মর্যাদাকে। মনে রেখো, তোমরা সাধারণ কোনো নারী নও। তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের জীবনসঙ্গিনী।

জাযারী তাঁর 'নেহায়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. নারীদের মধ্যে এমন ভাষায় বাক্যালাপ করতে নিষেধ করেছেন, যাতে নারীরা আকৃষ্ট হয়। 'খুদ্বু' শব্দটির অর্থ কোমলতা, সমপর্ণপ্রবণতা। জাযারী আরো লিখেছেন, হজরত ওমর যখন খলিফা তখন তিনি একদিন পথ অতিক্রমকালে দেখলেন একজন পুরুষ ও একজন নারী আলাপ করছে মধুর কণ্ঠে। তিনি পুরুষটির মাথায় এমনভাবে চাঁটি মারলেন যে, তার মাথা ফেটে গেলো। এজন্য তিনি পুরুষটিকে কোনো ক্ষতিপূরণও দেননি।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আমর ইবনে আবা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীদের পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ নিষিদ্ধ করেছেন।

দারাকুতনী আফরাদ গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. এইমর্মে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন যে, মানুষ যেনো নামাজে ও ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্য কোনো নারীর নিকটে অশুভ বার্তা না বলে।

'মারদ্ব' অর্থ ব্যাধি, কপটতা। 'যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে' অর্থ ইমান দুর্বল হওয়ার কারণে যাদের অন্তরে প্রশ্রয় পায় মন্দ চিন্তা অথবা কাপট্য। উল্লেখ্য, পূর্ণ বিশ্বাসীদের অন্তর হয় পবিত্র ও প্রশান্ত। তাদের অন্তরে সতত বিদ্যমান থাকে আল্লাহ্র ভয়। তাই তাদের অন্তর সরল, কাপট্যের প্রভাবমুক্ত।

সমাধান ঃ নারীদের জন্য অবশ্যকর্তব্য যে, তারা পরপুরুষের সঙ্গে প্রয়োজনীয় বাক্যালাপ করবে কর্কশকণ্ঠে, যাতে পুরুষদের মনে সৃষ্টি হয় বিকর্ষণতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে'। একথার অর্থ— এবং তোমরা যখন কথা বলবে, তখন বজায় রাখবে ন্যায়ানুগতা।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে'। একথার অর্থ— আপনগৃহের অবস্থানই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম। যদিও নিতান্ত প্রয়োজনবোধে বাইরে বেরুনোর অনুমতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং প্রাচীন যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না'।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মহামান্যা নবী-পত্নীগণের জন্য আপন গৃহের বাইরে অবস্থান না করা একটি সাধারণ বিধান। নামাজ, হজ বা অন্যান্য মানবিক প্রয়োজনেও তাঁরা গৃহের বাইরে যেতে পারবেন না। পথভ্রষ্ট শীয়া সম্প্রদায় এরকমই ধারণা করে থাকে। একারণেই তারা রসুল স. এর প্রিয়তমা সহধর্মিণী হজরত আয়েশার পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে অবতারণা করে অসঙ্গত আলোচনার । বলে, তিনি তো মদীনা থেকে চলে গিয়েছিলেন মক্কায়। সেখান থেকে বসরায়, যা ছিলো উষ্ট্রের যুদ্ধের ঘটনাস্থল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তারা কি একথা জানেনা যে, সে সময় মদীনার জীবনযাপন ছিলো নিরাপত্তাহীনতাকণ্টকিত। তিনি মদীনা থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার অল্পকাল পরেই শহীদ করা হয়েছিলো হজরত ওসমানকে। মিসরের বিদ্রোহীরা তখন মদীনায় এমনই বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলো যে, হজরত তালহা এবং হজরত যোবায়েরও বাধ্য হয়েছিলেন মদীনা পরিত্যাগ করতে। তাঁরাই মক্কায় পৌঁছে উম্মতজননীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বসরায় গিয়ে মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ থামাবার। জননী প্রথমে তাঁদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁরা তখন উপস্থাপন করলেন কোরআনের এই আয়াত— 'তাদের পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই। তবে হ্যাঁ, সদকার বিষয়ে, অথবা শুভকর্মে কিংবা মানবমণ্ডলীর মধ্যে মীমাংসার উদ্দেশ্যে'। বললেন, মহামান্যা মাতা! মুসলমানদের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে আপনার বসরা গমন অতীব জরুরী। এরপর তিনি আর অমত করতে পারলেন না। চলে গেলেন বসরায়। চেষ্টা করলেন তাঁর অনুরক্ত ও হজরত আলীর ভক্তদের মধ্যে একটি আপোষরফা ঘটানোর । তাঁর প্রচেষ্টা প্রথমদিকে সফলও হলো। কিন্তু মুনাফিক ইহুদী আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবার ঘৃণ্য চক্রান্ত সে আপোষ মীমাংসাকে করে দিলো ছিন্নভিন্ন। সংঘটিত হলো অনভিপ্রেত উষ্ট্রের যুদ্ধ। মুসলমানের তরবারী রঞ্জিত হলো মুসলমানেরই রক্তে। সে এক মর্মবিদারক ও কলংকিত ইতিহাস। আমি বিষয়টির সবিস্তার বিবরণ উপস্থিত করেছি 'সাইফ মাসলুল' (শোণিতাক্ত অসি) গ্রন্থে।

এখানকার 'তাবাররুজ' শব্দটি বুৎপত্তি লাভ করেছে 'বারূজ' থেকে। এর অর্থ রূপ প্রদর্শন। রূপসজ্জা করে পরপুরুষের সমাজে বের হওয়া। ইবনে নাজীহ্ বলেন, 'তাবাররূজ' অর্থ ঠমক সহ চলা। এ জন্যই শব্দটির ভাষ্যগত অর্থ করা হয়েছে চমক প্রদর্শন।

'জাহিলিয়াতে উলা' বা মূর্খতার প্রাচীন যুগ অর্থ ইসলামপূর্ব অজ্ঞতার যুগ। আর অজ্ঞতার বর্তমান যুগ অর্থ বৃহৎপাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়া। শা'বী বলেছেন, হজরত ঈসার আবির্ভাবের পর থেকে রসুল স. এর আবির্ভাবপূর্ব সময় হচ্ছে প্রাচীন অজ্ঞতার যুগ। আবুল আলীয়া বলেছেন, হজরত দাউদ ও হজরত

www.eelm.weebly.com

সুলায়মানের যুগই হচ্ছে মূর্খতার প্রাচীন যুগ। তখনকার রমণীকুল পরিধান করতো এক ধরনের সিলাইবিহীন কুর্তা, যা ছিলো উভয় দিকে উন্মুক্ত। হজরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে ইকরামা বলেছেন, হজরত নুহ ও হজরত ইদ্রিসের মধ্যবর্তী যুগকে বলে প্রাথমিক অন্ধকার যুগ। হজরত আদমের সন্তানগণ হয়ে গিয়েছিলো দু'টি ধারায় বিভক্ত। একদল বসবাস করতো পার্বত্য ভূমিতে এবং অপরদল বসবাস করতো সমতল ভূমিতে। পার্বত্যীয়রা ছিলো গৌরবর্ণের। কিন্তু তাদের নারীরা ছিলো কুরূপা। আর সমতল ভূমির পুরুষ ও রমণীরা ছিলো এর বিপরীত।

একদিন ইবলিস মানবরূপে আবির্ভূত হলো সমতলভূমিতে। এক পরিবারে সে কাজে যোগ দিলো শ্রমিকরূপে। কিছুদিন পর সে তৈরী করলো একটি বাঁশের বাঁশী। বাঁশীতে তুললো মনমাতানো সুর। সে সুরের মুর্ছনায় মোহিত হলো সমতল ভূমির নর-নারী। সমবেত হতে লাগলো তাকে কেন্দ্র করে। এভাবে শুরু হলো গানের আসর। নির্ধারিত দিনে গানের আসরে নারীরাও সেজে গুজে যোগ দিতে লাগলো পুরুষদের সাথে। এরকম এক আসরে একদিন এসে পড়লো এক পাহাড়ী। আসর শেষে সে ফিরে গিয়ে বিষয়টির আলোচনা করলো অন্যান্য স্বজাতীয় পাহাড়ীদের কাছে। তারাও ক্রমে ক্রমে এসে জড়ো হতে লাগলো সমতলভূমির গানের আসরগুলোতে। শুরু হলো নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। ওই অবাধ মেলামেশার ঐতিহ্যই হচ্ছে মূর্খতার প্রথম যুগ। কিন্তু একথা মনে করা যাবে না যে, মূর্খতার দ্বিতীয় যুগও আছে। কারণ দ্বিতীয় ব্যতিরেকেই এরকম প্রথমের উল্লেখ কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। যেমন 'আহলাকা আ'দি-নিল উলা' (তোমরাই পরিবার প্রথম আদ)। এমতোক্ষেত্রে দ্বিতীয় আদের কোনো অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও এখানে বলা হয়েছে প্রথম আদের কথা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা সালাত কায়েম করবে ও জাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুগত থাকবে'। একথার অর্থ— তোমরা মেনে চলবে আল্লাহ্‌তায়ালার যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ। এটাই সংযমশীলতা, যা তোমাদের মর্যাদাবতী হওয়ার একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চান তোমাদের নিকট থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে'। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল পরিবারের সদস্যবৃন্দ! তোমাদেরকে আবিলতামুক্ত করাই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়। তিনি তো তোমাদেরকে করতে চান সম্পূর্ণরূপে পবিত্রাধিষ্ঠিত। বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে এর কোনো যোগসাজশ নেই। এখানে কেবল রসূল স. এর জীবনসঙ্গিনীগণই অন্তরভূতা নন তার সন্তান-সন্ততীগণও এ সম্বোধনের অন্তর্ভূত। তাই এখানকার সম্বোধনটি

www.eelm.weebly.com

সন্নিবেশিত হয়েছে পুংলিঙ্গবাচক শব্দরূপে। বাক্যটি এখানে পরিবেশিত হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যের কারণরূপে। যেনো এখানে এ কথাটিই বলতে চাওয়া হয়েছে যে— হে নবীপত্নীগণ! যে সকল আদেশ-নিষেধকে মান্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে এবং নবী পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে, শয়তানী প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করাই তার উদ্দেশ্য।

'রিজ্‌সুন' অর্থ শয়তানী ক্রিয়াকলাপ, অপবাধপরায়ণ ও অপরাধমূলক ক্রিয়া। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে ধর্মীয় ও স্বভাবগত অনিষ্টতা, যা আল্লাহ্‌পাকের পছন্দ নয়।

'আহলে বাইত' অর্থ রসুলেপাক স. এর মহাসম্মানিত পরিবার। ইকরামা ও মুকাতিল বলেছেন, এর অর্থ উম্মতজননীগণ। সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে একথাই এসেছে। তিনি তাঁর এমতো অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেন এই আয়াত— 'আল্লাহ্‌র আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে'। ইবনে আবী হাতেমও এরকম বলেছেন। এরকম আরো বলেছেন ইকরামা সূত্রে ইবনে জারীর। উদ্ধৃত আয়াতখানিই তাঁদের অভিমতের প্রমাণ। কিন্তু এখানে তো ব্যবহৃত হয়েছে পুংলিঙ্গবাচক সর্বনাম। তাহলে 'আহলে বাইত' অর্থ যে কেবল উম্মতজননীগণ সেকথা কীরূপে মেনে নেয়া যায়? সুতরাং বুঝতে হবে রসুল স. এর সহধর্মিণীগণসহ তাঁর পরিবারের সন্তান-সন্ততিগণও এখানকার 'হে নবী পরিবার' সম্বোধনটির অন্তর্ভূত। আর পুরুষ-প্রাধান্যের কারণেই এখানে সকলকে সম্বোধন করা হয়েছে পুংলিঙ্গের শব্দাকৃতিতে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং তাবেয়ীগণের একটি বিরাট দল, মুজাহিদ ও কাতাদাও যাঁদের মধ্যে রয়েছেন, বলেছেন, আহলে বাইতের অন্তর্ভূত হচ্ছেন হজরত আলী, হজরত ফাতেমা, হজরত হাসান ও হজরত হোসাইন। কেননা জননী আয়েশা বলেছেন একদিন রসুল স. গৃহাঙ্গণে উপস্থিত হলেন চাদরাবৃত হয়ে। চাদরটির উপরে ছিলো উটের পশমের নকশা আঁকা। একটুপরে সেখানে উপস্থিত হলো হাসান। তিনি স. তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে নিলেন। এরপর এলো হোসাইন। তাকেও চাদরে ঢেকে নিলেন তিনি। অতঃপর এলো ফাতেমা। তিনি স. তাকেও টেনে নিলেন ওই চাদরের ভিতর। শেষে এলো আলী। রসুল স. তাকেও জাড়িয়ে নিলেন চাদরের ভিতরে। তারপর পাঠ করলেন এই আয়াত। মুসলিম।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'নাদউ আবনাআনা আবনাআকুম ওয়া নিসাআনা ওয়া নিসাআকুম ওয়া আনফুসানা ওয়া আনফুসাকুম' তখন রসুল স. আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইনের নাম উল্লেখ

www.eelm.weebly.com

করে বললেন, হে আল্লাহ্! এরাই আমার পরিবার, এরাই আমার আপনজন। এদের মধ্য থেকে তুমি অপরিচ্ছনতা দূর করে দাও। পুতপবিত্র করো এদের জীবন।

জননী উম্মে সালমা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. ডাক দিলেন আলী-ফাতেমা-হাসান-হোসাইনকে। তারপর তাদেরকে কম্বলে ঢেকে নিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! এরা আমার আহলে বাইত। সম্পর্কচ্যুত করো এদেরকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে। পুণ্যময় করো এদের জীবন।

বর্ণিত হাদিসসমূহ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই চারজনের মধ্যে আহলে বাইতকে সীমাবদ্ধ করা সমীচীন কিনা। বুদ্ধি ও যুক্তি এমতো সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করে। প্রকৃত কথা হচ্ছে— আহল বা পরিবারবর্গ বলে বুঝানো হয় কেবল রসুল স. এর সহধর্মিণীগণকে। সেই সঙ্গে তাঁদের সন্তান-সন্ততি এবং অন্য সন্তান-সন্ততিরাও হয়ে যায় পরিবার পরিজনভূত। উল্লেখ্য, উম্মতজননীগণের প্রত্যেকেই ছিলেন পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠের অধিবাসিনী।

নবীপ্রবর ইব্রাহিমপত্নী হজরত সারাকে লক্ষ্য করে ফেরেশতারা বলেছিলো 'আতা'জ্বাবীনা মিন আমরিল্লাহি রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলাইকুম আহলাল বাইত' (হে নবী-পরিবার! আপনি কি আল্লাহ্র বিধানে বিস্ময়ান্বিত হচ্ছেন? আপনার উপর বর্ষিত হোক আল্লাহ্র রহমত ও বরকত)। লক্ষণীয়, নবীজায়াকেই এখানে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে আহলে বাইত বলে। আর আলোচ্য বাক্যের সম্বোধনের লক্ষ্যও প্রধানতঃ উম্মতজননীগণ। জননী উম্মে সালমা বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'আল্লাহ্ তো চান তোমাদের নিকট থেকে অপবিত্রতা দূর করতে' তখন রসুল স. ডাকলেন আলী-ফাতেমা ও হাসান-হোসাইন ভ্রাতৃদ্বয়কে। বললেন, এরা আমার আহলে বাইত। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল। আমি কি আহলে বাইতের অন্তর্ভূতা নই? তিনি স. বললেন, কেনো নও? ইনশাআল্লাহ্। বাগবী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন হাদিসটি। আলোচ্য হাদিসের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর সহধর্মিণীগণ ও কন্যা-জামাতা ও দৌহিত্রদ্বয় সকলেই আহলে বাইত। আর রসুল স. 'ইনশাআল্লাহ্' বলেছিলেন ভবিষ্যতের আশায় নয়, বরকতের উদ্দেশ্যে।

হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম বলেছেন, রসুল স. এর আহলে বাইত তারাই, যাদের জন্য হারাম সদকা ও জাকাত গ্রহণ। অর্থাৎ আলী, আকীল, আব্বাস ও হারেছ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান-সন্ততি। আর আলোচ্য আয়াতে পবিত্রকরণের যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ ইহজগতে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি এবং পরকালে মার্জনা।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য, এখানে রূপকভাবে পাপকে বলা হয়েছে অপবিত্রতা এবং সংযমকে বলা হয়েছে পবিত্রতা। কেননা পাপ শরীরনির্গত অথবা শরীরলগ্ন অপবিত্রতার মতোই। আর সংযমীদের জীবনও হয় ধোয়া ফর্সা পরিধেয় বস্ত্রের মতো। সুতরাং বুঝতে হবে পাপের অপবিত্রতা ও বাহ্যিক অপবিত্রতার মধ্যে রয়েছে ঘনিষ্ঠ তুল্যমূল্যতা। একারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, অপবিত্রতা দূরীকরণ অথবা পুণ্যার্জন যে উদ্দেশ্যেই ওজু করা হোক না কেনো, ওজুতে ব্যবহৃত পানি নাপাক।

হজরত ওসমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওজু করে, তার অবয়ব থেকে ঝরে যায় পাপ। এমনকি নখের অভ্যন্তর থেকেও। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন কোনো মুসলমান বান্দা, অথবা বলেছেন বিশ্বাসী বান্দা ওজুকালে ভালো করে ধৌত করে তার মুখমণ্ডল তখন তার মুখ থেকে ঝরে যায় পাপরাশি এবং ঝরে ওই সকল পাপ যা সে অর্জন করেছিলো চোখে দেখে। মুসলিম।

শীয়া মতাবলম্বীরা এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে হজরত আলী, হজরত ফাতেমা, হজরত হাসান ও হজরত হোসাইন নিষ্পাপ এবং তাঁরাই রসুল স. এর প্রকৃত প্রতিনিধি। আর তাঁরা ছাড়া অন্য কারো তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা নেই। আর তাঁদের বংশদ্ভূত ইমামগণের ঐকমত্যই কেবল দলিলরূপে গ্রাহ্য। তারা বলে, আল্লাহ্তায়ালা যখন তাঁদেরকে পবিত্র করবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন, সেহেতু বুঝতে হবে তাঁরা মাসুম (নিষ্পাপ)। কেননা আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায় অবশ্য বাস্তবায়নব্য। আরো বুঝতে হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ্র এমতোঅভিপ্রায় ব্যক্ত হয়নি, তারা নিষ্পাপ নয়। আর খেলাফত ও ইমামতের প্রধান শর্তই হচ্ছে নিষ্পাপ হওয়া। সুতরাং আহলে বাইত নন বলে ইসলামের প্রথম খলিফাত্রয় খেলাফতের যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না। যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন কেবল আহলে বাইত। বলা বাহুল্য, এ ধরনের ধ্যান-ধারণা কয়েকটি কারণে পরিত্যজ্য। যেমন—

১. আলোচ্য আয়াতে কোনো বিধান বর্ণনা করা হয়নি এবং এই আয়াত বিশেষভাবে হজরত আলী, হজরত ফাতেমা ও তাঁদের আত্মজদ্বয়ের সঙ্গে জড়িতও নয়। বরং বুঝতে হবে এখানে উম্মতজননীগণই প্রধানতঃ সম্বোধিতা। অবশ্য ওই মহাত্মাচতুষ্টয়ও এর অন্তর্ভুক্ত।

২. পবিত্রকরণের অভিপ্রায় দ্বারা যে মাসুম (নিষ্পাপ) ছিলেন, একথা প্রমাণ করা যায় না। যেমন ওজুর আয়াতে বলা হয়েছে 'মাইয়ুরিদুল্লাহু লি ইয়াজ্‌আলা আ'লাইকুম মিন হারজ্বি ওয়ালা কিউ ইয়ুরিদু লি ইয়ুত্বাহ্হিরাকুম মিন হারজ্বি' (এটা আল্লাহ্র অভিপ্রায় নয় যে, তিনি তোমাদের জন্য প্রচলন করেন কষ্টকর বিষয়, বরং তিনি তো চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে)। এই আয়াতের মাধ্যমে তাহলে তো একথাই প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত মুসলমানই মাসুম।

www.eelm.weebly.com

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে পবিত্রকরণই এখানে মূল দাবি অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায় হচ্ছে তোমাদেরকে পাক করা। সুতরাং তোমরা ওজু করে মুক্ত হয়ে যাও লঘু ও গুরু অপবিত্রতা থেকে। এ রকম ব্যাখ্যা কিন্তু যথার্থ ও জড়তামুক্ত নয়। কেননা দু'টি আয়াতেই পবিত্রকরণের অভিপ্রায় শর্তযুক্ত, ওজুর আয়াতে ওজুর সঙ্গে এবং আলোচ্য আয়াতে সংযমের সঙ্গে। অর্থাৎ মানুষ যদি ওজু করে, তবে তাদের দেহ পবিত্র হয়ে যাবে। আর উম্মতজননীগণ যদি 'তাকওয়া' বা সংযম অবলম্বন করেন তাহলে তাঁরা হয়ে যাবেন পাপমুক্ত। অর্থাৎ ওজু হচ্ছে বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের শর্ত এবং সংযমের শর্ত আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জনের। ইতোপূর্বের আয়াতেও তাঁদেরকে সংযম অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এভাবে— 'পরপুরুষের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে কথা বোলো না'। কাজেই এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, দৈহিক পবিত্রতা জড়িত পানি ব্যবহারের সাথে। আর আন্তরিক পবিত্রতা নির্ভরশীল সংযমের উপর।

৩. ইমামত ও খেলাফতের জন্য নিষ্পাপ হওয়া কোনো শর্ত নয়। কেননা, নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে অন্যেরা খলিফা হয়েছেন। যেমন হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মানের উপস্থিতিতেই রাষ্ট্রনায়ক হয়েছিলেন তালুত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যখন তাদের নবী তাদেরকে বললো, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য রাজা করে পাঠিয়েছেন তালুতকে'।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে'।

এখানে 'আয়াত' অর্থ কোরআন । আর 'হিকমত' (জ্ঞানের কথা) অর্থ না বলা প্রত্যাদেশ। অর্থাৎ রসুল স. এর পবিত্র বাণী বা হাদিস। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'আয়াতিল্লাহ্' অর্থ কোরআনের বিধান ও শুভনির্দেশনা।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'স্মরণে রাখবে' কথাটির মধ্যে রয়েছে দু'টি নির্দেশ। এক আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের এমতো স্মরণ যে, আল্লাহ্ই দয়া করে তোমাদেরকে দান করেছেন তাঁর রসুলের সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্য। তোমাদের প্রকোষ্ঠগুলোকে বানিয়েছেন তাঁর প্রত্যাদেশের অবতরণস্থল। দুই. প্রত্যাদেশকালে আল্লাহ্‌র রসুলের যে ভাবান্তর ও অপার্থিব অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়, তোমরা হও তার প্রত্যক্ষদর্শিনী। এমতো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়টিও কৃতজ্ঞচিত্তে অবশ্য স্মরণীয়। কারণ এমতো সুযোগ তোমাদেরকে করে অধিকতর ধর্মানুরাগিনী। আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মান্যতার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে অতিরিক্ত ঐকান্তিকতা।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত'। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা অবশ্যই সূক্ষ্মজ্ঞানী। তাই তিনি কৃপাপরবশ হয়ে তোমাদেরকে দান করেন ধর্মীয় বিষয়ে সংস্কারমূলক জ্ঞান। আর তিনি এ বিষয়টিও উত্তমরূপে অবগত যে, নবুয়ত লাভের যোগ্যতম ব্যক্তিত্ব কে। আর কারা হতে পারেন তাঁর সহধর্মিণী হওয়ার যোগ্য ও কারা হতে পারেন তাঁর পবিত্র সাহচর্যধন্য। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'পবিত্র নারী পবিত্র পুরুষের জন্য এবং পবিত্র পুরুষ পবিত্র নারীর জন্য'।

বাগবী লিখেছেন, একবার উম্মত জননীগণ রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কালামে বারংবার উল্লেখ করেছেন কেবল পুরুষ জাতির কথা। নারী জাতি সম্পর্কে তো তেমন আলোচনা করেননি। তাহলে কি আমাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই? আমাদের আনুগত্য কি আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণীয় নয়? তাঁদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত। হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বর্ণনা করেছেন। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন কাতাদা সূত্রে ইবনে সা'দ। আর গ্রহণযোগ্য সূত্রপরম্পরায় হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, কতিপয় মহিলা সাহাবী একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন জানালেন, কোরআন মজীদের প্রায় সর্বত্রই উল্লেখিত হয়েছে বিশ্বাসবান পুরুষের কথা। বিশ্বাসবতী নারীর প্রসঙ্গ সেখানে অনুপস্থিত। এর কারণ কী? তাঁদের এমতো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। প্রায়োন্নত সূত্রে কাতাদা থেকে ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন।

উত্তম সূত্রসহযোগে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত উম্মে আম্মারা রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, কোরআন মজীদের সর্বত্রই উপস্থাপন করা হয়েছে পুরুষদের প্রসঙ্গ। নারীদের প্রসঙ্গ যে একেবারেই নেই। তাঁর এমতো উক্তির সূত্রেই অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত।

মুকাতিল সূত্রে বাগবী লিখেছেন, একবার উম্মত জননী হজরত উম্মে সালমা ও হজরত কা'ব আনসারীর কন্যা হজরত আসীয়া রসুল স. সকাশে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আমাদের প্রভুপালনকর্তা তাঁর বাণীতে আলোচনা করেছেন কেবল পুরুষদের সম্পর্কে। নারীদের সম্পর্কে যে তিনি কিছুই উল্লেখ করেননি। তাই মনে হয় নারীদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নেই। তাঁদের একথার অনুসরণেই অবতীর্ণ হয় এর পরের আয়াত।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আসমা বিনতে উমাইস তাঁর স্বামী হজরত জাফর ইবনে আবী তালেবের সঙ্গে আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এলেন। সাক্ষাত

www.eelm.weebly.com

করলেন উম্মতজননীগণের সঙ্গে। বললেন, মেয়েদের সম্পর্কে কি কোনোকিছু অবতীর্ণ হয়েছে? উম্মতজননীগণ বললেন, না। তখন তিনি সোজা উপস্থিত হলেন রসুল স. এর মহান সাহচর্যে। বললেন, হে আল্লাহ্র প্রেমাস্পদ! মেয়েরা কি অপাংক্তেয়া ও অবাঞ্ছিতা? রসুল স. বললেন, একথা বলছো কেনো? তিনি বললেন, যদি তারা এরকম না হতো তবে তাদের সম্পর্কে তো কোরআন মজীদে আলোচনা করা হতো। তাঁর এমতো কথার সূত্র ধরে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৩৫

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
وَالْقٰنِتِينَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِينَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ
وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ
وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصّٰٓئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ
وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ
مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾

r অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌন অংগ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী— ইহাদের জন্য আল্লাহ্ রাখিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইন্নাল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি'। একথার অর্থ নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে সমর্পিতপ্রাণ পুরুষ ও সমর্পিতপ্রাণ নারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি'। একথার অর্থ বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী। এরপর ধারাবাহিকভাবে বলা হয়েছে অনুগত-অনুগতা, সত্যবাদী-সত্যবাদিনী, ধৈর্যশীল-ধৈর্যশীলা, বিনীত-বিনীতা, দানশীল-দানশীলা,

www.eelm.weebly.com

রোজাপালনকারী-রোজাপালনকারিণী, চরিত্রবান-চরিত্রবতী এবং আল্লাহ্কে স্মরণ-কারী ও আল্লাহ্কে স্মরণকারিণীদের কথা। শেষে বলা হয়েছে— এদের জন্যই আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন মহামার্জনা ও মহাপ্রতিদান।

হজরত মুয়া'জ বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে রসুলগণের মুকুটমনি! সর্বাধিক পুণ্যের অধিকারী কোন মুজাহিদ? তিনি স. বললেন, যে আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে। লোকটি পুনরায় বললো, সর্বাধিক পুণ্যবান রোজাদার কে? তিনি স. বললেন, যে আল্লাহ্র সর্বাধিক জিকির করে। এভাবে সে একে একে প্রশ্ন করলো সর্বাধিক পুণ্যবান নামাজ, হজ, জাকাত ও দান-খয়রাতকারী সম্পর্কে। রসুল স. তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে বললেন, যে আল্লাহ্র সর্বধিক জিকির করে। এরকম প্রশ্নোত্তর শুনে হজরত আবু বকর হজরত ওমরকে বললেন, সর্বাধিক জিকিরকারীই যে অধিকারী হলো সর্বাধিক পুণ্যের। রসুল স. বললেন, অবশ্যই।

বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, যে ব্যক্তি মোটেও আল্লাহ্র স্মরণবিচ্যুত হয় না, বরং দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে- সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত জিকিরকারী। আমি বলি, কলবের ফানা না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত জিকিরকারী হওয়া যায় না। যখন কলব আল্লাহ্র জিকিরে পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়, কেবল তখনই হৃদয়ে জাগ্রত থাকে আল্লাহ্র সতত স্মরণ।

রসুল স. বলেছেন, ইফরাদকারীরাই অগ্রগামী। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল? ইফরাদকারী কারা? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী নারী ও পুরুষ। রসুল স. আরো বলেছেন, আল্লাহ্র শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে কেবল আল্লাহ্র জিকির। সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্র পথে জেহাদও কি জিকিরের সমতুল্য নয়? তিনি স. বললেন, না। জেহাদও জিকিরের তুল্য নয়। তবে যুদ্ধ করতে করতে যদি কোনো মুজাহিদের তলোয়ার ভেঙ্গে যায়, তবে তার মর্যাদা হবে অধিক। বায়হাকী তাঁর 'দাওয়াতুল কবীর' গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর সূত্রে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ সকাশে কে হবে অন্যাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান। তিনি স. বললেন, অধিক জিকিরকারী রমণী ও পুরুষ। পুনঃ নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আল্লাহ্র পথে যারা যুদ্ধ করে, তাদের চেয়েও কি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, যদি সে যোদ্ধা আল্লাহ্র দুশমন নিধন করতে গিয়ে ভেঙে ফেলে তার তরবারী। আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি বিরল প্রকৃতির।

www.eelm.weebly.com

ইমাম মালেক বলেছেন, আমার নিকট পৌঁছেছে এই হাদিসটি— রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র স্মরণবিচ্যুতদের মধ্যে জিকিরকারীর অবস্থান এরকম, যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে পলায়নপর যোদ্ধাদের মধ্যে স্বস্থানে অটল কোনো মুজাহিদ, যেনো বিশুষ্ক বৃক্ষের একটি সতেজ শাখা, যেনো অন্ধকার গৃহে একটি প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ। জিকির-বিস্মৃতদের মধ্যে অবস্থানকারী জিকিরকারীকে দেখানো হয় তার জান্নাতের আবাস। আল্লাহ্ তাদের মার্জনা করেন পৃথিবীর সবাক ও নির্বাক প্রাণীকুলের সমতুল পাপকর্ম করলেও। ইবনে রযীন।

বাগবী লিখেছেন, আতা ইবনে আবী বেরাহ বলেছেন, যাদের কর্মকাণ্ড কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়, তারাই আত্মসমর্পণকারী নারী ও পুরুষ। বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী তারা, যারা মনে ও মুখে একথায় একনিষ্ঠ স্বীকৃতি দেয় যে, আল্লাহ্ আমাদের প্রভুপালনকর্তা, এবং মোহাম্মদ মোস্তফা স. আমাদের রসুল। অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী তারা, যারা আল্লাহ্র অমোঘ বিধান মেনে নেয় এবং পথ চলে তাঁর রসুলের আদর্শানুসারে। যারা তাদের রসনাকে মুক্ত রাখে অসত্যভাষণ থেকে তারাই সত্যবাদী ও সত্যবাদিনী। যারা অনুকূল-প্রতিকূল সকল অবস্থায় আল্লাহ্র আনুগত্যে অটল থাকে ধৈর্যশীল ও ধৈর্যশীলা তারাই। বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী বলে তাদেরকে, যারা অন্যের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে গভীর একাগ্রতা ও নিবিষ্টচিত্ততার সঙ্গে সম্পন্ন করে তাদের নামাজ। যারা সপ্তাহে অন্তত একটি দিরহামও দান করে, তারাই অভিহিত হয় দানশীল দানশীলা বলে। চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখে যারা রোজা রাখে, তারাই রোজাপালনকারী ও রোজাপালনকারিণী। অবৈধ যৌনচরিতার্থতা থেকে যারা মুক্ত, তারাই চরিত্রবান ও চরিত্রবতী। আর যথানিয়মে ও যথাসময়ে যারা আদায় করে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ, তারাই আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী।

'এদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান' অর্থ— এতক্ষণ ধরে যে সকল গুণের অধিকারী ও অধিকারিণীদের কথা বলা হলো, তাদের দ্বারা কোনো পাপকর্ম সংঘটিত হলেও আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দিবেন। শুধু তাই নয়, তাদের আনুগত্যের জন্য দান করবেন মহাপ্রতিদানও।

যথাসূত্রসহযোগে কাতাদা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত জায়েদ ইবনে হারেছার পক্ষ থেকে হজরত যয়নাব বিনতে জাহাশের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু তিনি জ্ঞাপন করলেন অসম্মতি। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ؕ﴿۳۶﴾

r আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না। কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলকে অমান্য করিলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হইবে।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের অবশ্যপালনীয়। সুতরাং তাঁরা কোনো নির্দেশ প্রকাশ করলে বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীরা আর ভিন্নতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেই না। যদি এরকম কেউ করে, তবে সে অবশ্যই হয়ে যায় সত্যপথচ্যুত।

বলা বাহুল্য, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত যয়নাব প্রেরিত প্রস্তাব কবুল করেন। বাগবী লিখেছেন, রসুল স. হজরত জায়েদকে ক্রয় করেছিলেন ওকাজের মেলা থেকে। তারপর তাঁকে করে দিয়েছিলেন মুক্ত। এরপর তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন পোষ্যপুত্ররূপে। বয়োপ্রাপ্তির পর তিনি তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন হজরত যয়নাবের কাছে। হজরত যয়নাব মনে করেছিলেন প্রস্তাবটি রসুল স. এর পক্ষ থেকে। তাই প্রথমে নীরব রইলেন। কিন্তু যখন বুঝলেন এ হচ্ছে তাঁর পোষ্যপুত্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাব, তখনই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। আবার তা গ্রহণ করলেন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। প্রথমে তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ও ছিলেন প্রেরিত প্রস্তাবে অনীহ। উল্লেখ্য, হজরত যয়নাব ছিলেন রসুল স. এর ফুফাতো বোন।

ইকরামার মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে ইবনে জারীর বলেছেন, রসুল স. হজরত জায়েদ ইবনে হারেছের জন্য হজরত যয়নাবের নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠালেন। কিন্তু তিনি প্রস্তাবটি এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আমি তার চেয়ে বংশমর্যাদায় শ্রেষ্ঠা। তাঁর এমতো মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। এই আয়াতে 'মুমিন পুরুষ' এবং 'মুমিন নারী' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত জায়েদ ও হজরত যয়নাবকে, যদিও বিধানটি সার্বজনীন।

এখানে 'ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না' কথাটির অর্থ— ইচ্ছানুসারে কোন কিছু গ্রহণ অথবা বর্জন করবে সে অধিকার থাকবে না বরং এমতোক্ষেত্রে

www.eelm.weebly.com

শিরোধার্য করে নিতে হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে। আলোচ্য নির্দেশনার মধ্যে বিশ্বাসী নারী-পুরুষগণের মধ্যে রয়েছে একটি অনুপম শিক্ষা। এ শিক্ষাকে গ্রহণ করলে বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীরা সতত অনুরক্ত ও অনুগত থাকতে পারবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের।

'খিয়ারতু' ও 'খিয়ারুন' শব্দ দু'টো সমার্থক। এর অর্থ ইচ্ছাস্বাধীনতা। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌র রসুলের ইশারা-ইঙ্গিত বর্জিত একটি সাধারণ অনুজ্ঞাও অবশ্যপালনীয়। আরো প্রমাণিত হয় যে, যিনি ধর্মীয় জ্ঞানের ধারক-বাহক ও ধর্মীয় মর্যাদায় সমাসীন, তিনি সকল অবস্থায় মর্যাদাসম্পন্ন বংশীয়দের সমতুল। রসুল স. হজরত জায়েদের জন্য হজরত যয়নাবের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন একারণেই।

ইবনে জায়েদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত উম্মে কুলসুমকে কেন্দ্র করে। তিনি ছিলেন উকবা ইবনে আবী মুঈতের কন্যা। তিনিই মদীনায় হিজরতকারিণী প্রথম রমণী। তিনি তাঁর মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন রসুল স.কে এবং আশা করেছিলেন রসুল স. তাঁকে বিবাহ করবেন। কিন্তু রসুল স. যখন তাঁকে হজরত জায়েদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন, তখন মর্মাহত হলেন তিনি ও তাঁর ভ্রাতা। বললেন, আমাদের ইচ্ছা ছিলো, এ বিবাহ করবেন স্বয়ং রসুল স.। তখনই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতের শেষ বাক্যটি। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।

এখানে 'দ্বলালাম মুবীনা' অর্থ প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা। উল্লেখ্য, আদেশ আমান্য করা হয় সাধারণতঃ দু'ভাবে— ১. আদেশকে আদেশ বলে মান্য করতে অস্বীকৃত হওয়া। এরকম করা স্পষ্টতই সত্যপ্রত্যাখ্যান বা কুফরী। ২. আদেশকে আদেশ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তা পালন করার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন। অর্থাৎ এমতো অবমাননা বিশ্বাস সংযুক্ত নয়, কর্মসংশ্লিষ্ট।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত যয়নাব ও তাঁর ভ্রাতা বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। বিষয়টি তাঁরা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেন রসুল স. এর অধিকারে। রসুল স. হজরত জায়েদ ও হজরত যয়নাবের পরিণয় সম্পন্ন করলেন। নিজের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে উপহার হিসেবে দিলেন দশ দীনার, ষাট দিরহাম, একটি চাদর, একটি কুর্তা, একটি ওড়না ও একটি লুঙ্গি। আর খাদ্যশস্য হিসেবে দিলেন পঞ্চাশ সের আটা ও চার মন খেজুর। কিছুদিন পর কোনো এক কার্যোপলক্ষে রসুল স. উপস্থিত হলেন হজরত জায়েদের গৃহে। দেখলেন, হজরত যয়নাব দাঁড়িয়ে আছেন একটি কামিজ ও দোপাট্টা পরিহিত অবস্থায়। তিনি ছিলেন অনিন্দ্যরূপসী কুরায়েশ বালা। রসুল স. এর ভাবান্তর জন্মালো। মুখে কেবল

www.eelm.weebly.com

বললেন সুবহানাল্লাহ্। আল্লাহ্ই অন্তরসমূহের বিবর্তক। তারপর ফিরে এলেন স্বগৃহে। পরে হজরত জায়েদের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি স. তাঁর অন্তরের ভাবান্তরের কথা তাঁকে জানালেন। হজরত জায়েদের অন্তরে তখন থেকে হজরত জয়নাবের প্রতি সৃষ্টি হলো বীতরাগ। কিছুদিন পর তিনি রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি জয়নবের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চাই। তিনি স. বললেন, কেনো? যয়নব কি তোমার সঙ্গে অশোভন আচরণ করে? তিনি বললেন, শপথ আল্লাহ্র। আমি তাঁর নিকট ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট কিছু পাইনি। তবে জাত্যাভিমান তার প্রকট। মাঝে মাঝে সে একথা প্রকাশও করে। রসুল স. বললেন, তোমার সহধর্মিণীকে তোমার কাছেই রাখো। তার ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো। আবু জায়েদের সূত্রে ইবনে জারীর এরকমই বর্ণনা করেছেন। আরো বলেছেন, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত।

সুরা আহযাব ঃ আয়াত ৩৭

وَ اِذۡ تَقُوۡلُ لِلَّذِیۡۤ اَنۡعَمَ اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِ اَمۡسِکۡ عَلَیۡکَ
زَوۡجَکَ وَ اتَّقِ اللّٰہَ وَ تُخۡفِیۡ فِیۡ نَفۡسِکَ مَا اللّٰہُ مُبۡدِیۡہِ وَ تَخۡشَی
النَّاسَ ۚ وَ اللّٰہُ اَحَقُّ اَنۡ تَخۡشٰہُ ؕ فَلَمَّا قَضٰی زَیۡدٌ مِّنۡہَا وَطَرًا
زَوَّجۡنٰکَہَا لِکَیۡ لَا یَکُوۡنَ عَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ حَرَجٌ فِیۡۤ اَزۡوَاجِ
اَدۡعِیَآئِہِمۡ اِذَا قَضَوۡا مِنۡہُنَّ وَطَرًا ؕ وَ کَانَ اَمۡرُ اللّٰہِ مَفۡعُوۡلًا ﴿۳۷﴾

r স্মরণ কর, আল্লাহ্ যাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তুমিও যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, তুমি তাহাকে বলিতেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্কে ভয় কর।' তুমি তোমার অন্তরে যাহা গোপন করিতেছ আল্লাহ্ তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছেন; তুমি লোকভয় করিতেছিলে, অথচ আল্লাহ্কেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সহিত বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করিল, তখন আমি তাহাকে তোমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলাম, যাহাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সহিত বিবাহসূত্র ছিন্ন করিলে সেইসব রমণীকে বিবাহ করায় মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহ্র আদেশ কার্যকরী হইয়াই থাকে।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছো, তুমি তাকে বলেছিলে, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখো এবং আল্লাহ্কে ভয় করো'।

এখানে 'স্মরণ করো' বলে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। হজরত আনাস থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত জায়েদ যখন রসুল স. সকাশে তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অনুযোগ উত্থাপন করলেন, তখন রসুল স. বলেছিলেন, নিজের পত্নীকে নিজের কাছেই রাখো। আর তার সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় করো। তখনই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

এখানে 'আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছো' কথাটির অর্থ— হে আমার রসুল! আমি জায়েদকে ইসলামের মতো শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছি। আপনার অন্তরেও তার জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছি ভালোবাসা। তাই তো সে হয়েছে আপনার প্রিয়ভাজন। হয়েছে আপনার প্রিয় পোষ্যপুত্র।

'যাওজ্বাকা' অর্থ তোমার স্ত্রী। অর্থাৎ হজরত যয়নাব বিনতে জাহাশ। 'আল্লাহ্কে ভয় করো' অর্থ তার ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো। অর্থাৎ তার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ো না। কেননা সিদ্ধকর্মসমূহের মধ্যে তালাকই সর্বাপেক্ষা অসুন্দর।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছো, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন'।

হজরত আনাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত জায়েদ ও হজরত যয়নাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। হাসান বলেছেন, হজরত জায়েদ তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানোর কথা বললে রসুল স. এর অন্তরে উদ্ভূত হয়েছিলো অনিচ্ছাকৃত প্রীতির। কিন্তু লজ্জা ও আত্মসম্মানবোধের কারণে তিনি স. তা প্রকাশ হতে দেননি।

কেউ কেউ বলেছেন, রসুল স. মনে মনে এরূপ ধারণা পোষণ করতেন যে, জায়েদ যয়নাবকে ছেড়ে দিলে তিনি স. তাঁকে বিয়ে করবেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. হজরত যয়নাবের প্রতি অনুরাগ লালন করতেন অন্তরাভ্যন্তরে। কাতাদা বলেছেন, তিনি স. মনে মনে চাইতেন, হজরত জায়েদ যেনো হজরত যয়নাবকে পরিত্যাগ করেন।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, জায়েদ ইবনে জাজআন বলেছেন, একদিন আমাকে ইমাম জয়নুল আবেদীন জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছো আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন' এই আয়াত সম্পর্কে হাসান কী বলেন? আমি বললাম, তিনি বলেন, হজরত জায়েদ যখন বললেন, আমি যয়নাবকে পরিত্যাগ করতে চাই, তখন রসুল স. মনে মনে খুশী হলেন। কিন্তু মুখে বললেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও। তার

www.eelm.weebly.com

ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করো। ইমাম জয়নুল আবেদীন বললেন, তিনি ঠিক বলেননি। কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে এরকম— আল্লাহ্‌তায়ালা পূর্বাহ্নেই রসুল স.কে জানিয়ে দিয়েছিলেন, জায়েদ তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবে এবং যয়নাব হবে আপনার সহধর্মিণী। কিন্তু জায়েদ যখন তাঁর কাছে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন রসুল স. লজ্জাবশতঃ বললেন, 'তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো'। একথাটির কারণেই আল্লাহ্‌তায়ালা অপ্রসন্ন হয়েছেন এবং প্রিয়জনোচিত সংক্ষোভ প্রকাশের নিমিত্তে বলেছেন— আমি আপনাকে পূর্বাহ্নে প্রকৃত রহস্য জানিয়ে দেওয়ার পরেও আপনি কীভাবে বলতে পারলেন 'তাকে নিজের কাছে রাখো'? এরকম ব্যাখ্যাই নবী-রসুলগণের মর্যাদার অনুকূল। কোরআনের বক্তব্যও এমতো ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও সঠিক। কারণ এখানে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলেই দিয়েছেন 'আপনি আপনার অন্তরে যা গোপন করছেন, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন'। এছাড়াও পরবর্তী বাক্যে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে 'তখন আমি তাকে আপনার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম'। রসুল স. নিজে থেকে হজরত যয়নাবের প্রতি মনে মনে অনুরাগ লালন করতেন, তবে সেকথাও তো আল্লাহ্‌পাক প্রকাশ করে দিতেন। কিন্তু সেরকম কিছু তো আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। সুতরাং বুঝতে হবে প্রকৃত ব্যাপার ছিলো এরকম— আল্লাহ্‌তায়ালা যখন রসুল স.কে জানালেন, যয়নাব হবে আপনার স্ত্রী, তখন তিনি স. লজ্জিত হলেন। হজরত জায়েদ যখন যয়নাবকে ত্যাগ করবার সংকল্প প্রকাশ করলেন, তখন তিনি স. পড়ে গেলেন আরো লজ্জায়। তিনি স. নিজে পুত্রতুল্য জায়েদকে সখ করে কুরায়েশ গোত্রে বিয়ে দিয়েছেন। এখন আবার কী করে তাঁকে বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দেন। আর তাঁকে কীভাবে বলেন যে, তাই করো। যয়নাব হবে আমারই স্ত্রী। রসুল স. এর মনের অবস্থা ছিলো এরকমই।

বাগবী লিখেছেন, ইমাম জয়নুল আবেদীনের ব্যাখ্যা উত্তম ও সুসঙ্গত। পক্ষান্তরে ওই ব্যাখ্যাটিও উপেক্ষণীয় নয় এবং নয় নবুয়তের শানের জন্য মর্যাদাহানিকর। যেমন— রসুল স. এর হৃদয়ে হজরত যয়নাবের জন্য সৃষ্টি হয়েছিলো অনুরাগ এবং তিনি স. মনে মনে ভাবতেন যে, যদি কখনো জায়েদ তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তবে তিনি স. তাকে বিবাহ করবেন। এরূপ ভাবা অন্যায় নয়। কারণ তা ছিলো স্বতোৎসারিত। এরকম স্বতোৎসারিত ভাবনা তিরস্কারযোগ্য কিছু নয়। হৃদয়োৎসারিত আবেগ ও অনুরাগ একটি স্বভাবজ বিষয় যদি তা গোপনীয়তা বিমুক্ত না হয়। তিনি স. তো আমল করেছিলেন আল্লাহ্‌র বিধানানুসারে, 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ'— এই দায়িত্ব প্রতিপালনার্থে। বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো এবং তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করো। এটাতো একটি উত্তম পরামর্শ। পাপ তো কিছুতেই নয়।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, এরূপ অবশ্যই উত্তম পরামর্শরূপে গ্রাহ্য এবং এর জন্য উত্তম বিনিময়ও অর্জিত হওয়ার আশা করা যায়। কারণ স্বভাবের বিরূদ্ধাচারী হওয়াই পুণ্যকর্ম। শরিয়ত তো এরকমই নির্দেশ করেছে। সুতরাং এটা অবশ্যই পুণ্যকর্ম। আল্লাহ্পাক তো বলেই দিয়েছেন— 'আর তারা নিজেদের উপরে প্রাধান্য দেয় অন্যদেরকে, যদিও থাকে তাদের একান্ত প্রয়োজন। আর যারা রিপুর প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকে, তারাই সফলকাম'।

হাসানের ব্যাখ্যার পরিপোষকরূপে উপস্থিত করা যায় রসুল স. এর ওই বাণী, যা তিনি স. হজরত যয়নাবকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, সুবহানাল্লহ্! আল্লাহ্ই অন্তর সমূহের বিবর্তনকারী। একথাই প্রমাণ করে যে, প্রথম দিকে রসুল স. হজরত যয়নাবকে বিয়ে করার ব্যাপারে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। আগ্রহী ছিলেন প্রিয় পোষ্যপুত্র হজরত জায়েদের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতে। বিষয়টির বাস্তবায়নও তিনি ঘটিয়েছিলেন। অথচ হজরত যয়নাব চেয়েছিলেন রসুল স. এর ঘরণী হতে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আল্লাহ্তায়ালাই হজরত যয়নাবের মনোষ্কামনাকে অনুমোদন করেন এবং তাঁর প্রিয়তম রসুলের মনোভাব দেন পাল্টিয়ে। সে কারণেই তো রসুল স. এর অন্তরে জাগ্রত হয় হজরত যয়নাবকে বিয়ে করার বাসনা। সুতরাং এতে রসুল স. অভিযুক্ত হবেন কেনো? আর কেনোই বা বলা হবে, রসুল স. এর পরিবর্তিত চিন্তা নবুয়তের মর্যাদার পরিপন্থী?

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি লোকভয় করেছিলে, অথচ, আল্লাহ্কে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তো এব্যাপারে আশংকা করছিলেন লোকনিন্দার। মনে করেছিলেন, পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করলে লোকে বলবে কী? অথচ লোকনিন্দার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আপনার পক্ষে তো সমীচীন ছিলো আল্লাহ্র ভয়কে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবা। জানতে চেষ্টা করা যে, আল্লাহ্র অভিপ্রায় আসলে কী?

হজরত ওমর ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. এর জন্য আলোচ্য আয়াতাংশটি ছিলো অত্যন্ত কষ্টদায়ক। জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. যদি প্রত্যাদিষ্ট কোনো আয়াত গোপন করতেন, তবে গোপন করতেন এই আয়াতাংশখানি— 'তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্কে ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত'।

বাগবী লিখেছেন, তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, রসুল স. এর হৃদয়ে আল্লাহ্র ভয় অনুপস্থিত ছিলো। নবী-রসুলগণের হৃদয়, এমনকি প্রকৃত বিশ্বাসবানগণের হৃদয়ও কোনো মুহূর্তে আল্লাহ্র ভয়-লেশ শূন্য হয় না। তাছাড়া তিনি স. নিজেই বলেছেন, নিশ্চয় আমিই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র ভয়ে অধিক শংকিত ও সংযত।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, আল্লাহ্পাক স্বয়ং তাঁর বার্তাবাহকগণ সম্পর্কে বলেছেন— 'আর তারা শুধু ভয় করে আল্লাহ্কে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ভয় তাদের নেই'। তাই বুঝতে হবে, এখানে ভয়ের প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে সাধারণ রীতি অনুসারে, কথা প্রসঙ্গে তোলা হয়েছে লোকনিন্দাজনিত ভীতির কথা। সেই সঙ্গে এই বিষয়েও সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র ভয়ই অধিকতর প্রাধান্যপ্রাপ্তির যোগ্য। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার নবী! আপনি তো ছিলেন লোকলজ্জার ভয়ে আড়ষ্ট। কিন্তু একজন সত্য নবী হিসেবে আল্লাহ্ভীতিও ছিলো আপনার অন্তরে। লোকনিন্দার আশংকায় আপনি আপনার অন্তরে গোপন করে রেখেছেন একটি বিষয়। আর আল্লাহ্র ভয়েই জায়েদকে দিয়েছেন সৎপরামর্শ। আবার আল্লাহ্র আদেশ পালনে কোনো কার্পণ্যও তো আপনি করেননি। 'তারা এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না' কথাটির মূল বক্তব্যও এরকম। সুতরাং বুঝতে হবে আল্লাহ্র বিধান পালন করতে গিয়ে নবী-রসুলগণ মানুষের নিন্দা-মন্দের কোনো তোয়াক্কাই করেন না। কিন্তু লোকনিন্দার ভয় অন্তরে লালন করা তো নিন্দিত কিছু নয়, বরং তা নন্দিত। কারণ, লজ্জা ইমানের অঙ্গ।

হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, লজ্জা সরাসরি একটি উত্তম বিষয়। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, লজ্জা ও ইমান ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। যখন একটিকে উঠিয়ে নেওয়া হবে তখন উঠে যাবে অপরটিও। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন একটি বিলুপ্ত হবে, তখন অপরটিও করবে তার পশ্চাদ্ধাবন। হাদিসটি গ্রন্থিত হয়েছে বায়হাকীর শো'বুল ইমানে।

প্রায়োন্নত সূত্রে জায়েদ ইবনে তালহা থেকে ইমাম মালেক, 'শো'বুল ইমানে' বায়হাকী এবং হজরত আনাস ও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি বিষয়ের একটি প্রকৃতি আছে। আর ইসলামের প্রকৃতি হচ্ছে ব্রীড়া।

এই ঘটনা সম্পর্কে হজরত আনাসের বক্তব্য সংকলন করেছেন মুসলিম, নাসাঈ, আবু ইয়ালী, ইবনে আবী হাতেম, তিবরানী ও বাগবী। বাগবীর ভাষ্যটি এরকম— হজরত যয়নাবের ইদ্দতকাল যখন পূর্ণ হলো, তখন রসুল স. হজরত জায়েদকে বললেন, এবার যাও, যয়নাবকে গিয়ে আমার মনোভাব সম্পর্কে জানাও। হজরত জায়েদ নির্দেশ মতো হজরত যয়নাবের কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি আটার খামির প্রস্তুত করছেন। হজরত জায়েদ বলেন, তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে জেগে উঠলো সম্ভ্রমবোধ। আমি দৃষ্টি অবনত করতে বাধ্য হলাম। মনে পড়লো, আমি সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের বিবাহের পয়গামবাহী। তাঁর

www.eelm.weebly.com

দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে আমি কেবল এতোটুকু বলতে পারলাম, আমাকে পাঠিয়েছেন রসুল স. স্বয়ং। তিনি আপনাকে স্মরণ করেছেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, মহান প্রভুপালকের নির্দেশনা ব্যতীত আমার করার কিছুই নেই। এই বলে তিনি ঘরে গিয়ে দণ্ডায়মান হলেন নামাজের জন্য নির্ধারিত স্থানে। এরপর অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী বাক্যগুলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর জায়েদ যখন যয়নাবের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তখন আমি তাকে তোমার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম'।

'ওয়াত্বরা' অর্থ প্রয়োজন, আবশ্যকীয়তা। অর্থাৎ মন ভরে যাওয়া। পরিতৃপ্তির পর আগ্রহের তিরোহিতি। এরকমই হয়েছিলো হজরত জায়েদের ক্ষেত্রে। তিনি হজরত যয়নাবের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। হৃদয়ের অনুরাগ অন্তর্হিত হয়ে তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত হলো তিতিবিরক্তি। তিনি তাঁকে তালাক দিলেন। এরপর ইদ্দতকাল অতিবাহিত হলে তিনি পরিণয়াবদ্ধা হলেন রসুল স. এর সঙ্গে। কোনো কোনো তাফসীরকার প্রয়োজন পূরণ হওয়া থেকে ব্যতিহার অর্থে গ্রহণ করেছেন তালাক।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বাইরে থেকে শুভপদার্পণ করলেন অন্দর মহলে। অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করলেন জননী যয়নাবের প্রকোষ্ঠে। আমার ভালো মনে আছে, তাঁর বিয়েতে রসুল স. আমাদেরকে খাইয়েছিলেন গোশত-রুটি। আমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। জননী যয়নাবের প্রকোষ্ঠে তখন আলাপচারিতায় লিপ্ত ছিলেন দু'জন অতিথি। রসুল স. তাই বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে। দর্শন দিতে লাগলেন অন্যান্য সহধর্মিণীগণের দ্বারদেশে গিয়ে গিয়ে। তাঁদেরকে অভিবাদন জানালেন। কুশল জিজ্ঞেস করলেন। কেউ কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার নতুন সঙ্গিনীটি কেমন? হজরত আনাস বলেছেন, কিছুক্ষণ পর আমি অথবা অন্য কেউ বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অতিথিদ্বয় বিদায় নিয়েছেন। একথা শুনেই তিনি চলে গেলেন জননী জয়নাবের কক্ষে। আমিও অনুগামী হলাম তাঁর। ভেবেছিলাম নতুন জননীর গৃহে আমিও প্রবেশ করবো। কিন্তু তখন অবতীর্ণ হলো পর্দার আয়াত। সঙ্গে সঙ্গে আমার সম্মুখেই ঝুলিয়ে দেওয়া হলো পর্দা। বোখারী, আহমদ, তিরমিজি, হাকেম, ইবনে মারদুবিয়া, আবদ ইবনে হুমাইদ, বায়হাকী।

জননী যয়নাব তিনটি বিষয়ে তাঁর বিশেষত্ব প্রকাশ করতেন। তাঁর সপত্নীদের সামনে বলতেন, তোমাদেরকে বিয়ে দিয়েছেন তোমাদের অভিভাবকগণ। আর আমার বিবাহ ঠিক হয়েছে সপ্তাকাশের উপর থেকে আল্লাহ্‌র নির্বাচনে। সুতরাং আল্লাহ্‌ স্বয়ং আমার বিবাহের অভিভাবক।

www.eelm.weebly.com

শা'বী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, জননী যয়নাব রসুল স.কে বললেন, আপনার অন্যান্য সহধর্মিণীদের চেয়ে আমি তিনটি বিশেষত্বের অধিকারিণী। আপনার ও আমার পিতামহ এক। আপনার আমার বিবাহ ঠিক হয়েছে সপ্তাকাশে আল্লাহ্ কর্তৃক। আর আমার বিবাহের ঘটক ছিলেন জিবরাইল আমিন।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত জয়নাবের পাণিগ্রহণকালে যেমন অলিমার আয়োজন করেছিলেন, তেমন অন্য সহধর্মিণীগণের জন্য করেননি। তিনি স. তখন বিবাহের ভোজ দিয়েছিলেন একটি ছাগল জবাই করে। নিমন্ত্রিতজনেরা পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করেছিলেন গোশত ও রুটি।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীদের সঙ্গে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সেই সব রমণীকে বিবাহ করায় মুমিনদের কোনো বিঘ্ন না হয়'।

এখানকার 'আদয়ীয়া' শব্দটি একবচনবোধক। এর বহুবচন 'দায়ীয়ুন'। শব্দটির অর্থ কথিত পুত্র। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আমি যয়নাবের সঙ্গে আপনার বিবাহ দিয়ে এই বিষয়টিই প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, কথিত পুত্র বা পোষ্য পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা সিদ্ধ। ঔরষজাত পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা যদিও নিষিদ্ধ। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিধান সমগ্র উম্মতের উপরে প্রয়োগযোগ্য।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র আদেশের কার্যকারিতা সুনিশ্চিত, যেমন প্রমাণিত হয়েছে রসুল স. ও হজরত যয়নাবের বিবাহের বেলায়।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ؕ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرَا ۟ۙ ﴿٣٨﴾ الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿٣٩﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٤٠﴾

www.eelm.weebly.com

r আল্লাহ্ নবীর জন্য যাহা বিধিসম্মত করিয়াছেন তাহা করিতে তাহার জন্য কোন বাধা নাই। পূর্বে যেসব নবী অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্রেও ইহাই ছিল আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্র বিধান সুনির্ধারিত।

r তাহারা আল্লাহ্র বাণী প্রচার করিত এবং তাঁহাকে ভয় করিত, আর আল্লাহ্কে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করিত না। হিসব গ্রহণে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

r মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে; বরং সে আল্লাহ্র রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ নবীর জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন, তা করতে তার জন্য কোনো বাধা নেই'। একথার অর্থ— নবীগণের জীবনসঙ্গিনী নির্ধারণের বিষয়টি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত বিধিমালার বাইরে নয়। সুতরাং তাঁদের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বিধিসম্মত। এক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত কোনো সমস্যাই নেই।

এখানে 'হারজ্ব' অর্থ সংকীর্ণতা, সমস্যা, অন্তরায়, বাধা। 'ফীমা ফারদ্বল্লহু' কথাটির অর্থ যা বিধিসম্মত করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর নবীর জন্য যে কয়জন জীবনসঙ্গিনী গ্রহণ নির্ধারণ করেছেন। আরববাসীরা বলেন, 'ফুরিদ্বা লাহু ফীদ্ দিওয়ান' (তার জন্য যা নির্ধারিত রয়েছে পর্যায় তালিকায়)। 'ফুরুদ্বুল আসকার' অর্থ সৈনিকের নির্ধারিত বেতন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ফারদ্ব' শব্দটির অর্থ 'হালাল' বা বৈধ। অর্থাৎ নবীর জন্য যা বৈধ করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'পূর্বে যে সব নবী অতীত হয়ে গিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিলো আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্র বিধান সুনির্ধারিত'। এখানে পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মানের প্রতি। তাঁদেরও স্ত্রীর সংখ্যা ছিলো অনেক। আর তাঁদের ওই অধিকসংখ্যক স্ত্রী গ্রহণও ছিলো সম্পূর্ণত বিধিসম্মত, যা আল্লাহ্ কর্তৃক সুনির্ধারিত। উল্লেখ্য, হজরত দাউদ এক রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন এবং পরে তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। রসুল স. ও হজরত যয়নাবের বিবাহের বিষয়টি সে ধরনেরই। কালাবী তাই বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে হজরত দাউদের ওই ঘটনাটির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন এখানকার 'সুন্নত' শব্দটির অর্থ বিবাহ। কেননা বিবাহ হচ্ছে নবীগণের সুন্নত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'সুন্নত' অর্থ এখানে অধিকসংখ্যক স্ত্রী, যেমন ছিলো হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মানের।

পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্র বাণী প্রচার করতো, আর আল্লাহ্কে ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতো না'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি যেমন আল্লাহ্কে ভয় করে চলেন এবং তাঁর বাণী প্রচার করেন, আপনার পূর্ববর্তী নবী-রসুলগণও সেরকমই করতো।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্ই যথেষ্ট'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র নিকটে যখন সকলকে একদিন হিসাব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য দাঁড়াতে হবে, তখন ভয় করে চলা উচিত শুধামাত্র তাকেই। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— ভীতিসংকুল অবস্থায় পরিত্রাতা হিসেব আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন'। একথার অর্থ— ওহে সমালোচকেরা! তোমরাই বলো, আমার নবী মোহাম্মদ কি জায়েদের জন্মদাতা পিতা? তোমরা ভুলে যাচ্ছো কেনো যে, তিনি তার পালকপিতা। সুতরাং তার ছেড়ে দেওয়া স্ত্রীকে তিনি বিবাহ করতে পারবেন না কেনো। পিতা ও পিতৃতুল নিশ্চয় এক কথা নয়।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, হজরত কাসেম, হজরত তৈয়ব, হজরত তাহের ও হজরত ইব্রাহিম ছিলেন রসুল স. এর ঔরষজাত পুত্র। আর ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনও তাঁর সন্তান। তাহলে 'মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন' এরকম বলা হলো কেনো ? এর জবাবে বলা যেতে পারে, রসুল স. এর পুত্র চতুষ্ঠয় পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন অতি শৈশবে। সুতরাং তাঁদেরকে 'পুরুষ' বা পূর্ণবয়স্ক কোনো ব্যক্তি বলা যায় না। আর ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় তার সরাসরি সন্তান নন। সুতরাং তিনি তাদের পিতা— একথাও কিছুতেই বলা যায় না।

এরপর বলা হয়েছে— 'বরং সে আল্লাহ্র রসুল এবং শেষ নবী'। একথার অর্থ— নবী রসুলগণ অবশ্যই তাঁদের উম্মতের প্রতি হন পরম স্নেহপরবশ এবং তাদের কল্যাণাকাংখী। যেমন পিতা স্নেহ পরায়ণ ও কল্যাণকামী হন তাদের পুত্রদের প্রতি। এদিক থেকে তাঁরা অবশ্যই তাঁদের আপনাপন উম্মতের পিতা, বংশগত দিক দিয়ে নন।

এখানে 'খাতাম' অর্থ সমাপ্ত। আর 'খাতিম' অর্থ সমাপ্তকারী। 'খাতামান নবীয়্যীন' অর্থ সর্বশেষ নবী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হচ্ছে— নবুয়তের প্রবহমানতা যদি আমি মোহাম্মদ পর্যন্ত সমাপ্ত না করতাম, তবে তাকে করতাম কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পিতা, যে নবী হতো তাঁর মহাতিরোধানের পর। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্পাক যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, মোহাম্মদ মোস্তফা স.ই শেষ নবী, সেহেতু তিনি তাঁর কোনো পুত্রকেই প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় পৌঁছাননি। ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. তাঁর অকালপ্রয়াত পুত্র হজরত ইব্রাহিম সম্পর্কে বলেছেন, সে বেঁচে থাকলে নবী হতো।

একটি প্রশ্ন ঃ রসুল স. সর্বশেষ নবী। কিন্তু একথাও তো ঠিক যে, হজরত ঈসা পুনরাবির্ভূত হবেন। তাহলে রসুল স. আর সর্বশেষ নবী থাকলেন কী করে?

www.eelm.weebly.com

জবাব ঃ হজরত ঈসার পুনরাবির্ভাব ঘটবে ঠিকই। কিন্তু তা নবী হিসেবে নয়, বরং শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা স. এর উম্মত হিসেবে এবং তিনি জীবনযাপন করবেন রসুল স. এর শরিয়তের বিধানানুসারে। সুতরাং রসুল স. এর সর্বশেষ নবী হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অন্তরায় নন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— সকল কিছুই আল্লাহ্র জ্ঞানায়ত্ত বলেই তিনি ভালোভাবে জানেন কাকে করতে হবে সর্বশেষ নবী। কার মাধ্যমে সমাপ্ত করতে হবে নবুয়তের ধারা।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অন্যান্য নবী ও আমার দৃষ্টান্ত এরকম— যেমন নির্মিয়মান একটি প্রাসাদ। নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার শেষপ্রান্তে খালি রাখা হলো মাত্র একটি ইট বসাবার জায়গা। নবুয়তের ওই ইমারতের শূন্য স্থানটুকু পূরণ করা হলো আমাকে দিয়ে। এভাবেই আমার উপরে পরিসমাপ্ত হলো নবুয়তের প্রবহমানতা। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ওই ইটটিই আমি। আর আমিই হলাম সর্বশেষ নবী।

হজরত যোবায়ের ইবনে মুতইম বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আমার নাম অনেকগুলো। যেমন মোহাম্মদ, আহমদ, মাহী। আমার দ্বারা উৎখাত করা হয়েছে কুফরী। আমি হাশের (একত্রকারী)। মহাবিচারের দিবসে জনগণকে একত্রিত করা হবে আমারই পতাকাতলে। আমি খাতেম (পশ্চাদবর্তী)। তাই নবী হিসেবে সকলের শেষে ঘটেছে আমার আবির্ভাব। আমার পরে আর কোনো নবী আগমন করবে না।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার অনেকগুলো নাম রয়েছে। আমি মোহাম্মদ, আহমদ, মুকাফ্ফা, হাশের। আমারই নাম নবী উত্তওবা। আবার আমারই নাম নবীউর রহমত।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৪১, ৪২

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اذۡكُرُوا اللّٰهَ ذِكۡرًا كَثِيۡرًا ﴿۴۱﴾ وَّ سَبِّحُوۡهُ بُكۡرَةً وَّ اَصِيۡلًا ﴿۴۲﴾

r হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ কর,

r এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করো'। একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করো আল্লাহ্র জিকিরের সঙ্গে।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা প্রতিটি পুণ্যকর্মের সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু জিকিরের জন্য কোনো সীমা নির্ধারণ করে দেননি। অক্ষমতার ক্ষেত্রে অবশ্য বিধানটি শিথিল হলেও হতে পারে। কিন্তু জিকিরের কোনো সীমানা আসলে নেই। নেই কোনো অজুহাতও। বিষয়টি শিথিল কেবল পাগলদের ক্ষেত্রে। অন্য সকলের ক্ষেত্রে বিধানটি অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই জিকির পরিত্যাগ করা যাবে না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্‌র জিকির করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে.....'। এখানেও তেমনি বলা হয়েছে— তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো অধিক পরিমাণে। অর্থাৎ জিকির করো নিশিথে-দিবসে-জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সুস্থ-অসুস্থ-প্রকাশ্য-গোপন সকল অবস্থায়। মুজাহিদ বলেছেন, অধিক পরিমাণে জিকির করার মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্‌র কথা কখনোই বিস্মৃত না হওয়া। আমি বলি, এরকম অবস্থা লাভ হতে পারে কেবল তখন, যখন লাভ হয় ফানায়ে কলব বা আত্মিক বিনাশন। এমতাবস্থায় অন্তর্জগতে সতত জাগ্রত থাকে আল্লাহ্‌র জিকির।

পরের আয়তে (৪২) বলা হয়েছে— 'এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো'। এখানে 'সাব্বিহুহু বুকরাতান' অর্থ সমাপন করো ফজরের নামাজ। আর 'ওয়া আসীলা' অর্থ আরো সমাধা করো জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কালাবী। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'তাসবীহ' অর্থ 'সুবহানাল্লহ্‌, আলহামদুলিল্লহ্‌ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লহু আকবর ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়্যিল আ'জীম' পাঠ করা। অর্থাৎ 'তাসবীহ্‌' অর্থ এখানে সমার্থক শব্দে গঠিত বাক্যাবলী। যেমন তাসবীহ্‌ তাহমীদ, তাহলীল, তাকবীর। উল্লেখ্য এসকল কিছু সহযোগে গঠিত উপযুক্ত বাক্যাংশ অথবা সম্পূর্ণ বাক্যাংশ ওজু-বেওজু এমনি নাপাক অবস্থায়ও মনে মনে অথবা মুখে মুখে উচ্চারণ করা যায়।

আমি বলি, প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা নির্দেশ করেছেন সাধারণভাবে সকল অবস্থায় জিকিরমগ্ন থাকার কথা। এই জিকির হচ্ছে জিকরে খফি (প্রচ্ছন্ন জিকির)। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে বিশেষ বিশেষ সময়ে সম্পাদব্য জিকির অর্থাৎ নামাজ পাঠ করার কথা। এই জিকির হচ্ছে জিকরে জলি (প্রকাশ্য জিকির)। অর্থাৎ ফরজ, সুন্নত ইত্যাদি প্রকাশ্যে প্রতিপালন করতে বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে বিশেষ করে সকাল-সন্ধ্যা 'তাসবীহ' পাঠ করতে বলা হয়েছে এ কারণে যে, এই দুই সময় দায়িত্ববদল হয় দিবারাত্রির ফেরেশতা দলদ্বয়ের। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, আসরের সময় পৃথিবীতে নেমে আসে নতুন ফেরেশতার দল। তখন

www.eelm.weebly.com

বিগত দিনের ফেরেশেতারা উঠে যায় উর্ধ্বাকাশে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দারেদকে কী অবস্থায় দেখে এসেছো? ফেরেশতারা বলে, আমরা গতকাল আসরের সময় গিয়ে তাদেরকে নামাজরত অবস্থায় দেখেছি, আবার আজ আসরের সময় দেখে এলাম নামাজরত অবস্থায়। বোখারী, মুসলিম।

কোনো কোনো জ্ঞানপ্রবীণ বলেছেন, আগের আয়াতের 'উজকুর' (স্মরণ করো) এবং এই আয়াতের 'সাববিহুহু' (পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করো) দু'টো ক্রিয়াই কার্যকর হবে এখানকার 'বুকরাতাঁও ওয়া আসীলা' (সকাল-সন্ধ্যায়) কথাটির উপর এবং বক্তব্যটি দাঁড়াবে— নামাজ সমূহ এবং অন্যান্য ইবাদত সমাধা করো উদাসীনতাবিবর্জিতভাবে, নিবিষ্টচিত্তে। হজরত আবুজর গিফারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, বান্দা যতক্ষণ মনোযোগের সঙ্গে নামাজ পাঠ করে, ততক্ষণ আল্লাহ্ও মনোযোগী থাকেন তার প্রতি। আর যখন এদিকে ওদিকে মন দেয়, তখন আল্লাহ্ও তার উপর থেকে উঠিয়ে নেন তাঁর মনোযোগ। আহমদ, নাসাঈ, আবুদাউদ, দারেমী।

হজরত আনাস থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী দরূদ প্রেরণ করেন তাঁর নবীর প্রতি' তখন হজরত আবু বকর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! আল্লাহ্ আপনাকে দয়া করে যে বিশেষ মর্যাদা দান করলেন, আমাকেও অংশদানে ধন্য করুন। তাঁর এমতো নিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৪৩, ৪৪

هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿٤٣﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۖۚ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿٤٤﴾

r তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁহার ফিরিশ্তাগণও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে অন্ধকার হইতে তোমাদিগকে আলোকে আনিবার জন্য, এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

r যেদিন তাহারা আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাত করিবে, সেদিন তাহাদের প্রতি অভিবাদন হইবে 'সালাম'। তিনি তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন উত্তম প্রতিদান।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে'।

বাগবী লিখেছেন, 'সালাত' যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, তবে তার অর্থ হয় অনুগ্রহ, অনুকম্পা, করুণা, কৃপা, দয়া বা রহমত। আর যদি হয় ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে, তবে তার অর্থ হয় অনুগ্রহ প্রার্থনা বা ক্ষমা প্রার্থনা। কেউ কেউ বলেছেন, বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র সালাত অর্থ বান্দার উত্তম জিকিরকে তার স্বজাতীয়দের মধ্যে বিস্তার করা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'সালাতুল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র সালাত অর্থ আল্লাহ্ প্রশংসা করেন তাঁর বান্দার। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, 'সালাত' অর্থ করুণাকামনা, মার্জনাযাচনা, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রসুল স. এর প্রতি সাধুবাদ। আর রুকু সেজদাসহ ইবাদত। কামুস রচয়িতার বাক্যে আরো জানা যায়, সালাত শব্দটি বহু অর্থবোধক। ভাষাবিদগণের মতে একই সময়ে একই বাক্যে বহু অর্থবোধক কোনো শব্দের বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ যদি ব্যাকরণসিদ্ধ হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্ তোমাদের উপরে করেন অনুগ্রহ এবং ফেরেশতারা তোমাদের জন্য কামনা করেন মার্জনা।

জমহুর বলেন, বহু অর্থবোধক কোনো শব্দের বহু অর্থের একত্রায়ণ সিদ্ধ নয়। তাই বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতে 'সালাত' শব্দটি রূপকার্থে সাধারণভাবে সন্নিবেশিত। অর্থাৎ শব্দটি এখানে রূপকার্থক হলেও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে রূপক-তাত্ত্বিক উভয় দিক। অর্থাৎ তোমাদের কর্মের মূল্যায়ন ও প্রীতিপ্রদর্শনের বিষয়ে দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, যুগপৎ আল্লাহ্ বর্ষণ করেন করুণা এবং তাঁর ফেরেশতারা কামনা করেন মার্জনা।

অধিকাংশ ভাষা বিশারদগণ বলেন, সালাত অর্থ দোয়া করা। যেমন— 'সল্লাইতু আলাইহি' (আমি তার জন্য দোয়া করেছি)। রসুল স. নির্দেশ করেছেন, পানাহারের জন্য আমন্ত্রণ পেলে তা গ্রহণ করা উচিত। আর রোজা অবস্থায় থাকলে আমন্ত্রণকারীর জন্য করা উচিত দোয়া। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— 'সাললি আ'লাইহিম' (হে নবী! তাদের জন্য দোয়া করুন। আপনার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্ত।)।

নামাজে দোয়া প্রার্থনা করা হয় বলেই নামাজের নাম 'সালাত'। যেমন— ইহ্‌দিনাস্ সিরাত্বল মুসতাক্বীম' (আমাকে চালনা করো সরল সঠিক পথে)। এখানে আংশিক অবস্থাকে গ্রহণ করা হয়েছে সামগ্রিক অর্থে। এ রীতিটি সুপ্রচল। আর এভাবে 'সালাতুল্লাহ্' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌র দোয়া। অর্থাৎ তিনি নিজের পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য কামনা করেন রহমত ও মাগফিরাত। এভাবেই তিনি তাঁর আপন মহিমায় ও অভিপ্রায়ে নিজের উপরে আনিবার্য করে নেন বান্দার

www.eelm.weebly.com

উপরে করুণা বর্ষণ করাকে। উল্লেখ্য, 'কাতাবা আলা নাফসিহীর রহমত' কথাটির মর্মার্থও তাই। এভাবে কামনা করা ও অনিবার্য করে নেওয়ার উদ্দেশ্য দাঁড়ায় একটিই। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, দৃঢ় কামনাই পরিগ্রহ করে অনিবার্য বাস্তবরূপ। তবে একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্তায়ালা কোনো কিছু করতে বাধ্য নন। কারণ তিনি চিরঅমুখাপেক্ষী এবং তিনি তাঁর অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন, চিরমুক্ত। বরং বলা যেতে পারে, তিনি কেবল করুণাপরবশ হয়েই নিজের উপরে অনুগ্রহ বর্ষণ করার কাজটিকে আবশ্যিক করে নিয়েছেন। আর 'সালাত' অর্থ যদি 'দোয়া' বলে নেওয়া হয়, তবে শব্দটিকে বহু অর্থবোধক বলার অবকাশ বা আবশ্যক আর থাকে না। বনী ইসরাইলেরা হজরত মুসাকে প্রশ্ন করেছিলো, আমাদের পালনকর্তা কি সালাত সম্পন্ন করেন? প্রশ্নটি হজরত মুসাকে বিব্রত করেছিলো। আল্লাহ্পাক বিব্রতকর অবস্থা থেকে তাঁর প্রিয় নবীকে উদ্ধারার্থে প্রত্যাদেশ করলেন— হে আমার নবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের প্রভুপালনকর্তাও সালাত সম্পন্ন করেন, কিন্তু তাঁর ওই সালাত পরিণত হয় রহমতে, যে রহমত পরিবেষ্টন করে রয়েছে সকল কিছুকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোকে আনবার জন্য'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁর ফেরেশতাদের অনুগ্রহপ্রার্থনার বদৌলতেই তোমাদেরকে আনা হয় সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবৃত্তি ও অবাধ্যস্বভাবের অন্ধকার থেকে বিশ্বাস ও আনুগত্যের অমল আলোয়। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে দূরবর্তীতার তমসা থেকে কখনো কখনো আনেন তাঁর নৈকট্যের আলোকচ্ছটায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— এবং তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি সীমাহীন করুণাপরবশ। তাঁর অনুগ্রহ, ফেরেশতাদের দোয়া ইত্যাদিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'সেদিন তারা আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাত করবে, সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে সালাম। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উত্তম প্রতিদান'।

এখানে 'তাহিয়্যাতুহুম' অর্থ সেদিন তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লাভ করবে অভিবাদন। আর 'ইয়াওমা ইয়াল্ক্বওনাহু' অর্থ যেদিন তারা সাক্ষাত করবে আল্লাহ্র সাথে। অর্থাৎ সেদিন সমুপস্থিত হবে তাদের মৃত্যু, পুনরুত্থানপর্ব, জান্নাত গমনের লগ্ন, অথবা আল্লাহ্ দর্শনের সময়।

'সালাম' অর্থ শান্তি-সম্ভাষণ। অর্থাৎ বিশ্বাসীরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অভিবাদন হিসেবে লাভ করবে শান্তি-সম্ভাষণ। অর্থাৎ তিনি জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতে রাখবেন মহা শান্তিতে। আর 'আজরান কারীমা' অর্থ সম্মানজনক পুরস্কার, উত্তম প্রতিদান। অর্থাৎ জান্নাত। অথবা তাঁর দর্শন ও সন্তোষ।

www.eelm.weebly.com

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿٤٥﴾
وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾

r হে নবী ! আমি তো তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে,

r আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁহার দিকে আহ্‌বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

এখানে 'শাহিদান' অর্থ সাক্ষীরূপে। ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এমন কোনো দিন আসে না, যেদিন রসুল স. এর সম্মুখে তাঁর উম্মতগণকে উপস্থিত না করা হয়। তাই তিনি স. তাঁর উম্মতকে দেখলেই চিনতে পারেন। সেকারণেই তিনি তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করতে পারবেন। দেখলেই বলতে পারবেন, হ্যাঁ, এই ব্যক্তি আমার উম্মত। অথবা তিনি সাক্ষ্যদাতা হবেন এই অর্থে— মহাবিচারের দিবসে তাঁর উম্মতেরা পূর্ববর্তী নবী-রসুল সম্পর্কে এইমর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবেন যে, তাঁরা তাঁদের আপনাপন উম্মতের নিকট যথারীতি আল্লাহ্‌র বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। তখন তিনি স. সাক্ষ্য দিবেন, হ্যাঁ। আমার উম্মত সত্য সাক্ষ্য দিয়েছে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে ডাকা হবে নবী নুহকে। বলা হবে, তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে আমার বাণী যথাযথরূপে পৌঁছে দিয়েছিলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের ডেকে বলা হবে, নুহের বক্তব্য কি সত্য? তারা বলবে, না। নবী নুহকে পুনর্বার জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার বক্তব্যের পক্ষে কি কোনো সাক্ষী আছে? নবী নুহ বলবেন, হ্যাঁ। সর্বশেষ বাণীবাহক ও তাঁর উম্মতেরাই আমর সাক্ষী। উল্লেখ্য, এরকম হাদিস রয়েছে অনেক।

'মুবাশ্‌শিরান' অর্থ সুসংবাদ দাতারূপে। অর্থাৎ তাদের প্রতি জান্নাতের শুভবারতাদাতা, যারা বিশ্বাস করেছে সকল নবী-রসুলকে। আর 'নাজীরা' অর্থ সতর্ককারীরূপে বা ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে। অর্থাৎ ভীতিপ্রদর্শনকারী তাদের প্রতি যারা অস্বীকার করেছে নবী-রসুলগণকে।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক তাঁর

www.eelm.weebly.com

রসুলকে এইমর্মে প্রেরণ করেছেন, যেনো তিনি কেবল আল্লাহ্‌র আদেশানুসারে চালিয়ে যান তাঁর আহ্বানকর্ম— জান্নাতের দিকে, অথবা আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন দীদারের দিকে। উল্লেখ্য, এখানে 'তাঁর অনুমতিক্রমে' বলে আহবানকর্মকে করা হয়েছে সীমায়িত। কারণ এ দায়িত্বটি অনেক গুরু। আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ সহায় ও সামর্থ্য না থাকলে এ গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা যায় না কিছুতেই। বিশেষ করে আল্লাহ্‌র দীদারের বিষয়টি সুকঠিন। তাই এর প্রতি আহবানও অত্যন্ত গুরুতর। আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ না পেলে আল্লাহ্‌র বান্দাকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে উপনীত করানো সম্পূর্ণতই অসম্ভব। সেকারণেই এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আপনি যদি কাউকে গন্তব্যে পৌঁছাতে চান, তবে সক্ষম হবেন না। গন্তব্যে উপনীত করাতে পারেন আল্লাহ'।

হজরত রবীয়া জারাশী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম, দু'জন লোক এসে দাঁড়ালো আমার পাশে। একজন বললো, এই ব্যক্তি কি নিদ্রাভিভূত? অন্য জন বললো, হ্যাঁ, নিদ্রাভিভূত কেবল তাঁর চোখ। কিন্তু তাঁর কান ও হৃদয় জাগ্রত। তাই তিনি নিদ্রামধ্যেও শোনেন ও বোঝেন। আর একজন কে যেনো বললো, জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি নির্মাণ করলো একটি প্রাসাদ। আয়োজন করলেন অতিথি আপ্যায়নের। তারপর মানুষকে নিমন্ত্রণ জানানোর জন্য পাঠিয়ে দিলেন এক ঘোষককে। ঘোষক নির্দেশ পালন করলেন যথাযথভাবে। তাঁর আহবান শুনে কেউ এসে জড়ো হলো ওই প্রাসাদে। ভোজনপর্ব সমাধা করে হলো পরিতৃপ্ত। আমন্ত্রণকারীও খুশী হলেন খুব। বঞ্চিত হলো কেবল তারা, যারা তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো না। রুষ্টও হলেন তিনি ওই আমন্ত্রণপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে। এখানে আমন্ত্রণকারী অর্থ স্বয়ং আল্লাহ্‌, যিনি মহাবিশ্বের মহাপ্রভু-পালয়িতা। ওই প্রাসাদ হচ্ছে ইসলাম। ঘোষক হচ্ছেন নবীকুলশিরোমণি রসুলে পাক স.। আর পানাহারের আয়োজন হচ্ছে জান্নাত।

'সিরাজাম মুনীরা' অর্থ উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। এখানে উজ্জ্বল প্রদীপ বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে। অর্থাৎ পথভ্রষ্টতার ঘোর অন্ধকারে হেদায়েতের সমুজ্জ্বল প্রদীপ। প্রকৃত কথা হচ্ছে, রসুল স. মানুষের প্রতি সত্যগ্রহণের আহবান জানাতেন মৌখিকভাবে। আর আত্মিকভাবে তিনি স. হচ্ছেন সমুজ্জ্বল প্রদীপ, বিশ্বাসীরা ওই প্রদীপের আলোক দ্বারা আলোকিত করে নেয় তাদের বক্ষাভ্যন্তর। এভাবে তারাও আসত্তা রঞ্জিত হয় তাদের প্রিয়তম নবীর আভ্যন্তরীন রঙে। যেমন ধরাপৃষ্ঠকে আলোকিত করে দিবাকর। আর অন্ধকার গৃহ আলোকিত হয় প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের আলোয়। সাহাবায়ে কেরামই এমতো আলোকিত ব্যক্তিগণের পথিকৃত। অর্থাৎ

www.eelm.weebly.com

সমুজ্জ্বল প্রদীপের আলোয় সরাসরি ও সর্বপ্রথম আলোকিত হবার ও করবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁরাই। তাঁদের মাধ্যমে আলোকিত হয়েছেন তাবেয়ীগণ। তাঁদের মাধ্যমে আলোকিত হয়েছেন তাবে তাবেয়ীন। এভাবে প্রজন্মপরম্পরায় বায়াতের প্রেমময় বন্ধন ও বিশুদ্ধ আনুগত্যের মাধ্যমে এমতো আলোকায়নের আয়োজন চলতেই থাকবে মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত।

আতা ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, একবার আমি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আসকে বললাম, আপনি তওরাত পাঠ করেছেন। সেখানে নাকি রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ রয়েছে। দয়া করে তার কিছু বর্ণনা করবেন কী? তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ কিছু কিছু কোরআনেও রয়েছে। তওরাতের বিবরণ এরকম— সর্বশেষ রসুল হবেন শুভসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী, হবেন দুস্থ জনতার আশ্রয়স্থল। আরো হবেন আমার অতি অন্তরঙ্গ দাস ও প্রেরিত পুরুষ। আমি তাঁর নাম রেখেছি 'মুতাওয়াক্কিল'। তাই তিনি স্বযোগ্যতা ও স্বশক্তির উপরে নির্ভরশীল হবেন না। সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবেন কেবল আমার উপরে। তাঁকে দান করা হয়েছে অনেক সুন্দর স্বভাব। তিনি বাজারে শোরগোলকারী হবেন না। অন্যায়ের প্রতিশোধ নিবেন না অন্যায়ের দ্বারা। বরং তিনি হবেন ক্ষমাপ্রবণ। স্বসম্প্রদায়ের লোকদেরকে সম্পূর্ণ বশে না আনা পর্যন্ত তাঁর পৃথিবীর জীবন সাঙ্গ হবে না। তাঁর মহাপ্রস্থান সংঘটিত হবে তখন, যখন মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে বলবে— লা ইলাহা ইল্লাল্লহ। তাঁর দ্বারাই উন্মোচন করা হবে অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ ও পর্দাচ্ছাদিত হৃদয়ের দরোজা। বোখারী। আতা ইবনে সালাম থেকে দারেমীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত রবী ইবনে আনাসের একটি বর্ণনা বায়হাকীর 'দালায়েলুন নবুয়ত' পুস্তকে গ্রন্থিত হয়েছে এভাবে— 'আমি জানি না আমাকে নিয়ে কী করা হবে? এবং তোমাদেরকে নিয়েই বা করা হবে কী'? অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আমার কিংবা তোমাদের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে ব্যাপারে আমি কোনোকিছুই অবগত নই— এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরপর অবতীর্ণ হলো 'আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর ভুল মার্জনা করার জন্য......, তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনাকে অভিনন্দন। মহাবিচারের দিবসে আপনার সঙ্গে কী আচরণ করা হবে, তা আর অস্পষ্ট রইলো না। কিন্তু আমাদের পরিণতি সম্পর্কে তো আমরা কিছুই জানলাম না। তাদের একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

www.eelm.weebly.com

وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٨﴾

r তুমি মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে মহাঅনুগ্রহ।

r আর তুমি কাফির ও মুনাফিকদের কথা শুনিও না, উহাদের নির্যাতন উপেক্ষা করিও এবং নির্ভর করিও আল্লাহ্‌র উপর; কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি বিশ্বাসীগণকে এইমর্মে শুভবারতা প্রদান করুন যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে রয়েছে সুবিশাল অনুকম্পা।

ইকরামা ও হাসান বসরী থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, এখানে 'ফজলে কাবীরা' (মহানুগ্রহ) বা সুবিশাল অনুকম্পা অর্থ জান্নাত।

পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'আর তুমি কাফের ও মুনাফিকদের কথা শুনিও না, তাদের নির্যাতন উপেক্ষা করিও'। একথার অর্থ— হে আমার বার্তাবাহক! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটদের অপমন্তব্যসমূহের প্রতি কর্ণপাত করবেন না । উপেক্ষা করবেন তাদের দ্বারা প্রাপ্ত নিগ্রহ-নির্যাতনকে। উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয়তম রসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন সত্যপ্রত্যাখ্যান ও কাপট্যের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় অবস্থানের।

হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ— হে আমার বচনবাহক! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটাচারীদের দিক থেকে যতো বিপদই আসুক না কেনো, আপনি তার বিরুদ্ধে করুন ধৈর্যাবলম্বন।

'দায়্' অর্থ উপেক্ষা করুন, ছেড়ে দিন, পরিত্যাগ করুন। অর্থাৎ কোনো পরওয়াই করবেন না।

জুজায বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ— আপনি তাদের সঙ্গে বিতণ্ডায় লিপ্ত হবেন না। চেষ্টা করবেন না প্রতিশোধ গ্রহণের। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, আলোচ্য বিধানটি রহিত।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং নির্ভর করিও আল্লাহ্‌র উপর; কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট'। একথার অর্থ— আপনি সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করবেন কেবল আল্লাহর উপরে। দেখবেন আপনার সকল কর্মই তাঁর অপার কৌশলে সম্পন্ন হয়েছে সুচারুরূপে। কেননা কর্মবিধায়করূপে তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট। আর একথাও নিশ্চিত জানবেন যে, তিনি আপনাকে কারো মুখাপেক্ষী করেও রাখবেন না।

বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে বিভূষিত করেছেন পাঁচটি বিশেষ গুণে। যেমন— তিনি 'শাহেদ' (সাক্ষ্যদাতা), 'মুবাশশির' (সুসংবাদদাতা), 'নাজীর' (ভীতিপ্রদর্শনকারী), 'দায়ী ইল্লাল্লহ্‌' (আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী) এবং 'মুনীর' (সমুজ্জ্বল প্রদীপ)। আর আল্লাহ্‌পাক তাঁর এসকল বিশেষ গুণের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে দিয়েছেন বিভিন্ন নির্দেশ। কিন্তু 'শাহেদ' সম্পর্কে সামঞ্জস্যশীল কোনো আদেশ তিনি করেননি। সুসংবাদ দিতে বলেছেন বিশ্বাসীদেরকে, অবিশ্বাসীদেরকে করতে বলেছেন ভীতি প্রদর্শন। মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করতে বলেছেন তাঁরই অনুমতিক্রমে এবং সমুজ্জ্বল প্রদীপের প্রেক্ষিতে নির্দেশ করেছেন, আল্লাহ্‌র কর্মবিধায়নের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে। কারণ, ওই পরম সত্তাই তাঁকে দান করেছে সত্যের সুউজ্জ্বল দলিল। সুতরাং তিনিই তো কর্মবিধায়করূপে হবেন তাঁর প্রিয়তম বাণীবাহকের জন্য যথেষ্ট।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৪৯

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن
قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ
فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

r হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিন নারীগণকে বিবাহ করিবার পর উহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাহাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নাই যাহা তোমরা গণনা করিবে। তোমরা উহাদিগকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সহিত উহাদিগকে বিধায় করিবে।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ্য বিধান প্রযোজ্য হবে কেবল মুসলিম রমণীদের ক্ষেত্রে। অবশ্য গ্রন্থধারিণীরাও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদের কথা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বাসবতীকে বিবাহ করাই উত্তম।

www.eelm.weebly.com

‘ছুম্‌মা ত্বলাকতুমুহুন্‌না’ অর্থ বিবাহ করবার পর যদি তালাক দাও। একথার মাধ্যমেই বাগবী প্রমাণ করেন যে, বিবাহপূর্ব তালাক ধর্তব্য নয়। কেননা তালাকের ভিত্তিই হচ্ছে বিবাহ। অতএব কেউ যদি কোনো রমণীকে বলে, তোমাকে যদি আমি বিয়ে করি তবে তুমি তালাক, এরপর সে ওই রমণীকে বিয়ে করলেও তার উপর তালাক কার্যকর হবে না। আবার এরকম উক্তি করার পরও বিবাহের পর তালাক কার্যকর হবে না যে, আমি কোনো রমণীকে বিয়ে করলেই সে তালাক হয়ে যাবে। এরকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত মুয়াজ, হজরত জাবের, হজরত আয়েশা, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, ওরওয়া, কাসেম, তাউস, হাসান, ইকরামা, আতা, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, মুজাহিদ, শা’বী, কাতাদা প্রমুখ। ইমাম শাফেয়ীর সিদ্ধান্তও এরকমই।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, উপরে বর্ণিত দু’টি অবস্থাতেই তালাক কার্যকর হবে। ইব্রাহিম নাখয়ী, ইমাম আবু হানিফা এবং সাহেবাইনের অভিমতও এরকম। এভাবে দাসমুক্তিকেও কেউ কেউ মালিকানার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। যেমন কেউ বললো, আমি যখন দাস-দাসীর মালিক হবো, তখন তারা হবে মুক্ত। অথবা বলে, আমি যখন অমুক দাস বা দাসীর মালিক হবো, তখন সে মুক্ত। এমতাবস্থায় দাস-দাসী ক্রয় করলেও তারা মুক্ত হবে না।

রবীয়া, আওজায়ী ও মালেক বলেন, কেউ যদি কোনো মহিলাকে নির্দিষ্ট করে বলে, তাকে যদি আমি বিয়ে করি তবে সে তালাক, তবে ওই মহিলাকে বিয়ে করার পরক্ষণে সে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি এভাবে নির্দিষ্ট না করে, তবে তালাক বর্তাবে না।

ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, লোকেরা হজরত ইবনে মাসউদের সঙ্গে একটি ভুল সিদ্ধান্তের সংযোগ ঘটিয়েছে। তিনি এরকম বলতেই পারেন না যে, কোনো লোক কোনো রমণীকে নির্দিষ্ট করে বললো, তুমি তালাক হয়ে যাবে যদি আমি তোমাকে বিয়ে করি— এমতাবস্থায় ওই লোক ওই রমণীকে বিয়ে করলে সে তালাক হয়ে যাবে। এরকম বললে তো তা হয়ে যায় আল্লাহ্‌তায়ালার কথার বিপরীত। কারণ আল্লাহ্ বলেছেন ‘তোমরা বিশ্বাসবতীদেরকে বিবাহ করবার পর তাদেরকে তালাক দিলে.....’। সুতরাং তাঁর কথা কিছুতেই আল্লাহ্‌র কথার বিরুদ্ধে যেতে পারে না। কেননা তালাকের ঘোষণাতো বিবাহের আগে কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়। অতএব, লোকে তাঁর সম্পর্কে এ ব্যাপারে যা বলে তা ভুল।

ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের সমর্থনে বাগবী উপস্থাপন করেন একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিবাহের

www.eelm.weebly.com

পূর্বে তালাক হয় না। আমি বলি হাকেম হাদিসটি সংকলন করেছেন তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে। হাদিসটির সূত্রপরম্পরাগত যথার্থতাও নিরূপণ করেছেন তিনি। আরো বলেছেন, বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি কেনো যে, তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি, সে কথা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই। কেননা তাঁদের শর্তানুসারেই হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত।

ইমাম আহমদ বলেন, কেউ যদি বিবাহকে তালাকের শর্তাধীন করে, তবে বিবাহ করার পরক্ষণেই তালাক কার্যকর হবে। আর কেউ যদি দাসমুক্তিকে করে তার মালিকানার শর্তাধীন, তবে এমতোক্ষেত্রে ইমাম আহমদের পাওয়া যায় দুটি পরস্পরবিরোধী অভিমত। ইমাম মালেক বলেন, কেউ যদি বলে, আমি অমুক জায়গার অমুক গোত্রের অমুক রমণীর পাণিগ্রহণ যদি করি, তবে সে হয়ে যাবে তালাক, তবে বিবাহ করার সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে যাবে তালাক। আর এরকম নির্দিষ্ট করে কোনো কিছু না বললে তালাক বর্তাবে না।

ইবনে জাওজী ইমাম আহমদের অভিমতের প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছেন ছয়টি হাদিস। যেমন— ১. আমর ইবনে শোয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে পিতামহের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যাকে বিয়ে করা হয়নি তার উপর তালাক প্রযোজ্য নয়। তেমনি প্রযোজ্য নয় কোনো দাসের মুক্তি তাকে ক্রয় অথবা অধিকারভূত করার আগে। অধিকার করার আগে তাকে অন্য কারো কাছে বিক্রয় করার ঘোষণাও সিদ্ধ নয়। ইমাম আহমদের পদ্ধতিতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জাওজী। সুনান রচয়িতাগণও এর বর্ণনাকারী। তিরমিজি বলেছেন, এই অধ্যায়ে যতগুলো হাদিস লিপিবদ্ধ রয়েছে, তন্মধ্যে এই হাদিসটিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। বায্যারের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— বিয়ের আগে তালাক হয় না। মালিকানায় না এনেও দাসমুক্ত করা যায় না। বায়হাকী তাঁর খেলাফিয়াতে লিখেছেন, বোখারী বলেছেন, এই প্রসঙ্গে হাদিসগুলোর মধ্যে এই হাদিসটি অধিকতর যথার্থ।

২. হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে তাউসের মাধ্যমে আমর ইবনে শোয়াইব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অধিকৃত হওয়ার পূর্বে তালাক বর্তাবে না, এবং দাসকে করা যাবে না মুক্ত অথবা বিক্রয়। মানত ও অনধিকৃত বিষয়ের উপরে অচল। দারাকুতনী। অপর এক সূত্রেও দারাকুতনী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— রসুল স. বলেছেন, বিবাহ ব্যতীত তালাক সিদ্ধ নয়, যদি না নির্দিষ্ট করে কোনো রমণীর নামোল্লেখ করা হয়। হাদিসটির সূত্রপ্রবাহ এরকম ঃ দারাকুত্নী ইব্রাহিম আবু ইসহাক দ্বারীর, তিনি ইয়াজিদ ইবনে আয়াজ, তিনি জুহুরী, তিনি সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, তিনি হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল, তিনি রসুল স. থেকে। ইবনে হাজার বলেন, ইয়াজিদ ইবনে আয়াজ বর্ণনাকারী হিসেবে

www.eelm.weebly.com

পরিত্যক্ত। জাহাবী তাঁর 'ইসতিয়াব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইমাম মালেক বলেছেন, ইয়াজিদ ইবনে আয়াজ অসত্যভাষী। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, সে বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল, অকর্মণ্য। আহমদ ইবনে সার বলেছেন, সে নিজেই হাদিস তৈরী করে। বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, তার বর্ণনা অস্বীকৃত। আবু দাউদ বলেছেন, তার বিবরণ পরিহার্য। নাসাঈ বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী, তাই তার বিবৃতি পরিহরণীয়।

৩. দারাকুতনী বলেছেন, আমার নিকট বাকীয়া ইবনে ওয়ালিদ, ছওর ইবনে ইয়াজিদের মাধ্যমে খালেদ ইবনে মা'দান সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু ছা'লাবা খাশানী বলেছেন, একবার আমার পিতৃব্য আমকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে মিলেমিশে কাজকর্ম করো, আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিবো। আমি বললাম, আমি যদি তাকে বিবাহ করি, তবে আমার পক্ষ থেকে তার জন্য রইলো তিনতালাক। কিছুদিন পরে তাকে বিবাহ করার কামনা জাগলো আমার মনে। আমি তখন বিষয়টি জানালাম রসুল স.কে। তিনি স. বললেন, তুমি নির্দ্বিধায় তাকে বিবাহ করতে পারো। কেননা বিবাহপূর্ব তালাক অকার্যকর। তাঁর নির্দেশানুসারে আমি বিবাহ করলাম আমার ওই পিতৃব্যপুত্রীকে। তার উদরাভ্যন্তর থেকেই জন্ম লাভ করেছে আমার দুই পুত্র আসাদ ও সাঈদ।

জারাসী তাঁর 'মীযান' গ্রন্থে লিখেছেন, নাসাঈ প্রমুখ বলেছেন, বাকীয়া ইবনে ওয়ালিদ যদি 'হাদ্দাছনা' (আমি বর্ণনা করেছি) বলে বর্ণনা করে থাকেন, তবে তাঁর বর্ণনা নির্ভরনীয়। কিন্তু অনেক সমালোচক মন্তব্য করেছেন, বাকীয়া এক্ষেত্রে একজন বর্ণনাকারীর নাম গোপন করেছেন। সুতরাং তিনি 'আমি অমুকের নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করছি' যদি এরকম বলেনও, তবুও তাঁর বর্ণনা প্রামাণ্য হবে না। অবশ্য ছওর ইবনে ইয়াজিদ একজন বলিষ্ঠ বর্ণনাকারী। কিন্তু তিনি আবার কাদরিয়া সম্প্রদায়ভূত বলে পরিচিত। বাকীয়া এই হাদিসের সূত্রপরম্পরামধ্যে ছওর ইবনে ইয়াজিদের নামোল্লেখ করেছেন। সুতরাং বর্ণনাটি প্রামাণ্য পদবাচ্য নয়। ইবনে হুম্মামও বর্ণনাটির সমালোচনা করেছেন। আর এর সূত্রপরম্পরাভূত আলী ইবনে কারীনকে অসত্যবাদী বলে সাব্যস্ত করেছেন আহমদ। আমি বলি, ইবনে জাওজী যে সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন, দারাকুতনীর পদ্ধতি কিন্তু তা নয়। তাঁর সূত্রপ্রবাহে আলী ইবনে কারীনের নাম নেই।

৪. হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! কেউ যদি বলে, আমি অমুক রমণীকে যেদিন বিবাহ করবো, সেদিনই সে তালাক হয়ে যাবে, তবে তার পরিণতি কী? তিনি স. বললেন, তার তালাক তো অধিকারবর্হির্ভূত। দারাকুতনী।

www.eelm.weebly.com

এই হাদিসের সূত্রে আমর ইবনে খালেদের মাধ্যমরূপে এসেছে আবু খালেদের নাম। জাহাবী বলেছেন, আবু খালেদ বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। ইবনে হুম্মাম, আহমদ এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, সে অসত্যবাদী।

নাফে' সূত্রে ইবনে আদী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, বিবাহ ব্যতীত তালাক সিদ্ধ হবে না। ইবনে হাজার বলেন, হাদিসটির সূত্রপ্রবাহ সুদৃঢ়।

৫. হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তাউস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র বিধানসম্মত না হলে মানত পরিপূরণ বাধ্যতামূলক নয়। তেমনি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মানত পূরণ করতে হবে না। অধিকার স্বীকৃত নয়, এমতোক্ষেত্রে তালাক অথবা মুক্তিও অকার্যকর। দারাকুতনী। ইবনে হাজার বলেছেন, হাকেম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ভিন্ন একটি সূত্রে, যার কতিপয় বর্ণনাকারী অপরিচিত।

হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ কখনো একথা বলেননি যে, বিয়ের পূর্বে তালাক হয়। আর যদি তিনি এরকম বলেই থাকেন, তবে তার এমতো মন্তব্যকে ধরতে হবে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির অনবধানতা বলে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বিশ্বাসিনীগণকে বিবাহ করবার পর তাদের স্পর্শ করবার পূর্বে তালাক যদি দাও'। এখানে তো এমন বলা হয়নি যে, তোমরা তাদেরকে তালাক দিবে, তারপর বিয়ে করবে।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, 'বিবাহের পূর্বে তালাক বর্তে না'। এই হাদিসের কোনো একটি সূত্রও সুপরিণত অথবা যথাযথ নয়। অপরিণত সূত্রের যে বিবরণটিকে এক্ষেত্রে সর্বাধিক যথাযথ বলে ধরে নেওয়া হয়, সে হাদিসটির বর্ণনাকারী তাউস। তিনি বর্ণনাটি শুরু করেছেন 'রসুল স. বলেছেন' বলে। কিন্তু তিনি সাহাবী নন। আবার কোনো সাহাবীর নিকট থেকে শুনেও তিনি হাদিসটি বর্ণনা করেননি। তাই বিবরণটি সাহাবী পর্যন্তও উপনীত হয়নি।

৬. জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আবু সুফিয়ান ইবনে হরবকে ইয়েমেন রাজ্যের নাজরানে নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। বিদায়ের প্রাক্কালে তাকে একথাটিও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, যাকে বিয়ে করা হয়নি, লোকেরা যেনো তাকে তালাক না দেয়। আর দাস অধিকারভূত হওয়ার আগে যেনো না দেয় দাসমুক্তির ঘোষণা।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়— শর্তযুক্ত তালাক মূলতঃ তালাকই নয়। কোনো বিষয়কে শর্তযুক্ত করা হলে হেতু কিন্তু হেতুই থেকে যায়। সে হেতুর দ্বারা অবধারিত হয় না কোনো কিছুই। আর 'তুমি তালাক হয়ে যাবে যদি ঘরে প্রবেশ করো' অথবা 'তুমি তালাক হয়ে যাবে যদি আমি তোমাকে

www.eelm.weebly.com

বিয়ে করি' কথা দু'টো তো শপথের পর্যায়ের। ওই শপথই তো গৃহে প্রবেশ ও বিবাহের অন্তরায়। আবার গৃহে প্রবেশ ও বিবাহ হচ্ছে তালাকের শর্ত। একারণেই শর্তের সঙ্গে জড়িতকরণ তালাকের পথের অন্তরায়। তাই এরকম জড়িতকরণ তালাককে অবধারিত করতে পারে না। তালাক অনিবার্য হওয়া ও তালাকের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হওয়া সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি বিষয়। তবে শর্তের উপস্থিতিতে তালাক কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যায়। আর শর্তসাপেক্ষে তালাক আবার তালাকই নয়। সুতরাং এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত থেকে দলিল গ্রহণ করা ঠিক হবে না। অবশিষ্ট রইলো ওই সকল হাদিস, যে গুলোতে বলা হয়েছে— বিবাহপূর্ব তালাক অসিদ্ধ। হাদিসগুলোর মধ্যে আবার হজরত ইবনে ওমর এবং হজরত আবু ছা'লাক খাশানী থেকে বর্ণিত হাদিস দু'টো যথাসূত্রসম্বলিত নয়।

একটি সন্দেহ ঃ শর্তযুক্ত তালাক যখন তালাকই নয়, তখন কেউ যদি কোনো অপরিচিত রমণীকে বলে, তুমি তালাক হয়ে যাবে যদি গৃহে প্রবেশ করো। অথবা কোনো অপরিচিত রমণীকে বলে, তুমি তালাক হয়ে যাবে যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি, বাক্য দু'টো তো একই ধরনের। দু'টো বাক্যের মর্মার্থও এক। তাহলে প্রথমাবস্থায় তালাক বর্তাবে না এবং দ্বিতীয় অবস্থায় তালাক বর্তাবে এরকম বলা হবে কেনো?

সন্দেহর নিরসন ঃ আমরা তো ইতোপূর্বে বলেই দিয়েছি যে, তালাক ও দাসমুক্তি শর্তযুক্ত হলে কার্যকর হয় না। কার্যকর হয় শপথের রূপ পরিগ্রহ করার জন্য। সমস্যাটিকে আমরা ব্যাখ্য করি এভাবে— শপথ দু'ধরনের; পাপের আশংকায় আল্লাহ্‌র ভয়ে কৃত শপথ এবং নিজের ক্ষতির আশংকায় কৃত শপথ। এই আশংকাই কার্যকর হওয়ার পথের অন্তরায়। এখন যদি তালাক ও দাসমুক্তি ঘোষণাকারীর ক্ষতির কারণ হয়, এমতোক্ষেত্রে কার্যকর হবে শপথ। তাই তালাক যেমন বর্তাবে, তেমনি কার্যকর হবে দাসমুক্তি। কিন্তু তালাক অথবা দাসমুক্তিকে যদি কোনো অপরিচিত রমণী অথবা অপরিচিত দাসের গৃহে প্রবেশের সঙ্গে শর্তায়িত করা হয়, তবে তাতে শর্ত যুক্তকারীর কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। আর অপরিচিত রমণী অথবা দাসের গৃহে প্রবেশ করাতে কোনো প্রতিবন্ধকতাও নেই। কাজেই বিষয়টি শপথের পর্যায়ে পড়ে না। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে তালাক অথবা দাসমুক্তি কার্যকর হবে না।

ইবনে হুম্মান বলেছেন, আমাদের মত ও পথ পরিপুষ্ট হয়েছে হজরত ওমর, হজরত ইবনে ওমর ও হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা, যে হাদিসগুলো ইবনে আবী শায়বা কর্তৃক তাঁর 'মুসান্নিফ' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে মালেক, কাসেম, ইবনে মোহাম্মদ, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ, শা'বী, নাখয়ী, জুহরী, আসওয়াদ, আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান এবং মাকহুল শামীর

www.eelm.weebly.com

মাধ্যমে। তাই আমরা বলি— কেউ যদি বলে, আমি অমুককে যদি বিবাহ করি তবে সে তালাক হয়ে যাবে অথবা বলে, যে রমণীকে আমি বিয়ে করবো সে তালাক হয়ে যাবে, কিংবা বলে, অমুক মহিলাকে যদি আমি বিবাহ করি, তাহলে সে তালাক— এই তিন অবস্থাতেই তালাক কার্যকর বলে রায় দিয়েছেন উল্লেখিত আলেমগণ। আর তাঁদের এমতো অভিমত সমর্থিত হয়েছে সাইয়্যেদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আতা, হান্নাদ ইবনে আবী সুলায়মান ও শোরাইহ্ কর্তৃক।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, শর্তযুক্ত তালাকও তালাক। তাই শর্ত তালাক কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয়। বাধা সৃষ্টি হয় কেবল ফলাফলে। যেমন ইচ্ছা স্বাধীনতার শর্তে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির অন্তরায় নয়। বরং বিক্রয় চুক্তির বাস্তবায়ন বা মালিকানা অর্জিত হয় ইচ্ছা স্বাধীনতার সমাপ্তি অথবা ইচ্ছা স্বাধীনতা বাতিল করাতে। হজরত আবু ছা'লাবা খাশানীর হাদিসে একথা বলাও হয়েছে পরিষ্কার করে। আবার ওই হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইবনে জাওজীর মতো কট্টর সূত্রসমালোচক থেকেও। হাদিসটির সূত্র সম্পর্কে তাঁর কোনো বিরূপ মন্তব্যও নেই। 'বিবাহের পূর্বে তালাক নেই' এবং এর সমার্থক হাদিসগুলোতে বিবাহের সঙ্গে তালাককে শর্তযুক্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং বিবাহপূর্ব তালাক সিদ্ধ হওয়ার কোনো অর্থই হয় না। আর কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি এরকম অর্থহীন কথা বলতে পারেনও না। কথাটি যেনো এরকম— জন্মের পূর্বে নামাজ ফরজ হয় না।

এখানে 'তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোনো ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে' কথাটির অর্থ বিবাহকৃত স্ত্রীকে তালাক দিলে তাকে যে ইদ্দত পালন করতে হয়, সেই ইদ্দত প্রযোজ্য নয় ওই রমণীদের ক্ষেত্রে যাদেরকে তালাক দেওয়া হয় স্পর্শ করার পূর্বে।

এখানে 'লাকুম' অর্থ তোমাদের জন্য। কথাটির মাধ্যমে এটাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তাদের ইদ্দত গণনা করবে পুরুষ। কেননা সন্তানের বংশপরিচয় সংযুক্ত পুরুষদের সঙ্গে, নারীদের সঙ্গে নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোনো জিম্মি (জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মুসলিম রাজ্যের বিধর্মী) তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, আর তাদের ধর্মে যদি ইদ্দতের নিয়ম না থাকে, তবে ওই তালাকপ্রাপ্তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে না। আর যদি তাদের সেরকম প্রথা কিছু থাকে, তবে তা তাকে দিয়ে পালন করাতেই হবে।

মুসলমানদের যুদ্ধংদেহী প্রতিপক্ষদের দেশ থেকে কোনো বিধর্মিণী যদি মুসলমান হয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে চলে আসে, তবে তার জন্য কোনো ইদ্দতের বিধান নেই। ইচ্ছে করলেই ওই রমণী তাৎক্ষণিকভাবে বিবাহবদ্ধা হতে পারে। কেননা

www.eelm.weebly.com

শরিয়তের বিধানানুসারে মুসলমানদের আক্রমণাত্মক প্রতিপক্ষীয়রা জড়পদার্থতুল্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মতো। মুসলমানেরা তাদের জানমাল সব কিছুর মালিক। তবে ওই রমণী যদি অন্তঃসত্তা হয়, তবে তাকে বিবাহের জন্য অপেক্ষা করতে হবে তার সন্তানপ্রসব পর্যন্ত। কেননা তার গর্ভস্থিত শিশুর রয়েছে নির্দিষ্ট বংশপরিচয়। ইমাম আবু হানিফা বলেন, গর্ভবস্থাতেও ওই রমণী বিবাহবদ্ধা হতে পারবে। কিন্তু তার স্বামীর সঙ্গে তার সম্ভোগকর্ম রাখতে হবে স্থগিত। যেমন অন্তঃসত্তা ব্যাভিচারিণীকে বিবাহ করা সিদ্ধ। কিন্তু সন্তান প্রসবের পূর্বে তার স্বামী তাকে সম্ভোগ করতে পারবে না। ইমাম আবু হানিফার প্রথমোক্ত অভিমতটি সমধিক বিশুদ্ধ।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সঙ্গে তাদেরকে বিদায় করবে'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই বিধানটি প্রযোজ্য হবে মোহরানা নির্ধারিত না থাকলে। আর মোহরানা নির্ধারিত থাকলে পরিশোধ করতে হবে মোহরানার অর্ধেক। আর এমতাবস্থায় অতিরিক্ত কোনোকিছু আর দিতে হবে না। হজরত ইবনে আব্বাসের এমতো উক্তি অনুসারে বলতে হয় আলোচ্য বিধানটি প্রযোজ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। কাতাদা বলেছেন, আয়াতটি রহিত এবং তা রহিত হয়েছে এই আয়াতের মাধ্যমে—'ফানিসফু মা ফারাদ্বতুম' (যা নির্ধারিত তার অর্ধেক)। উল্লেখ্য, দু'টো সামাধানের কোনবিন্দু একটিই। সম্ভোগ বিবর্জিতারা পাবে তার নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক। এর অধিক কোনো পাওনা তার নেই। সুতরাং তাকে এর অতিরিক্ত কিছু দেওয়া ওয়াজিব তো নয়ই, মোস্তাহাবও নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এমতাবস্থায় অর্ধেক মোহরের সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু দেওয়া মোস্তাহাব। এই দৃষ্টি ভঙ্গি অনুযায়ী এখানকার 'কিছু সামগ্রী দিবে' কথাটি মোস্তাহাব অর্থ প্রকাশক।

হাসান ও সাঈদের মতে এই আয়াতের বিধানে অতিরিক্ত কিছু দেওয়া ওয়াজিব। আর অর্ধেক মোহর দেওয়া ওয়াজিব সুরা বাকারায়। 'যা নির্ধারিত তার অর্ধেক' আয়াতের মাধ্যমে। অতিরিক্ত দেওয়া আবশ্যিক না অভিপ্রেত এবং ওই অতিরিক্তের পরিমাণই বা কতটুকু সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৫০

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ
وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَٰتِ

www.eelm.weebly.com

عَمِّكَ وَ بَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَ بَنٰتِ خَالِكَ وَ بَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِیْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۫ وَ امْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِیُّ اَنْ یَّسْتَنْكِحَهَا ۗ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ ؕ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَیْهِمْ فِیْۤ اَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ لِكَیْلَا یَكُوْنَ عَلَیْكَ حَرَجٌ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا ﴿۵۰﴾

r হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাহাদের মাহ্‌র তুমি প্রদান করিয়াছ এবং বৈধ করিয়াছি ফায় হিসাবে আল্লাহ্ তোমাকে যাহা দান করিয়াছেন তন্মধ্যে হইতে যাহারা তোমার মালিকানাধীন হইয়াছে তাহাদিগকে, এবং বিবাহের জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যাহারা তোমার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করিয়াছে এবং কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজকে নিবেদন করিলে এবং নবী তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে সেও বৈধ,— ইহা বিশেষ করিয়া তোমারই জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নহে; যাহাতে তোমার কোনো অসুবিধা না হয়। মু'মিনদের স্ত্রী এবং তাহাদের মালিকানাধীন দাসিগণ সম্বন্ধে যাহা নির্ধারিত করিয়াছি, তাহা আমি জানি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাদের মোহর তুমি পরিশোধ করেছো'।

এখানকার 'উজুর' শব্দটি 'আজুর' এর বহুবচন। এর অর্থ মোহর। মোহর হচ্ছে স্ত্রী সম্ভোগের সম্মানজনক বিনিময়। রসুল স. বিবাহ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পুণ্যবতী পত্নীগণকে মোহরানা পরিশোধ করতেন। তাই এখানে বলা হয়েছে 'যাদের মোহর তুমি প্রদান করেছো'। অথবা এরকম বলা হয়েছে একারণে যে, তাৎক্ষণিকভাবে মোহরানা পরিশোধ করা উত্তম। আর ওই উত্তম পন্থাই ছিলো রসুল স. এর পন্থা। এটাই সর্ববাদীসম্মত অভিমত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বৈধ করেছি ফায় হিসেবে আল্লাহ্ যা দান করেছেন তন্মধ্যে থেকে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে'। এখানে 'মা আফাআল্লাহু আ'লাইকা' অর্থ আল্লাহ্ আপনাকে 'ফায়' হিসাবে যা দান করেছেন। যুদ্ধ ব্যতীত হস্তগত যা হয়, তাকে বলে 'ফায়'। যেমন রসুল স. এর প্রিয়

www.eelm.weebly.com

পুত্র হজরত ইব্রাহিমের জননী হজরত মারিয়া কিবতীয়াকে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিলো মিসরের সম্রাট। আবার যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে রসুল স. যাঁদেরকে পেয়েছিলেন তাঁরাও 'ফায়' এর অন্তর্ভূতা। যেমন উম্মত জননী সাফিয়্যা ও উম্মত জননী হজরত জুয়াইরীয়া।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচার কন্যা ও তোমার ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যারা তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে'। এতে করে বোঝা যায়, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কুরায়েশ ও জোহরা গোত্রের রমণীদেরকে বিবাহ করার অধিকার রসুল স. এর ছিলো। আর 'দেশত্যাগ করেছে' বলে এখানে বোঝানো হয়েছে ওই সকল কুরায়েশ ও বনী জোহরার রমণী, যাঁরা হিজরত করেছিলেন। একথায় আরো প্রমাণিত হয় যে, তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের যে সকল রমণী হিজরত করেননি, তাদেরকে বিবাহ করা রসুল স. এর জন্য বৈধ ছিলো না।

সুদ্দী ও আবু সালেহের মাধ্যমে তিরমিজি ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস উল্লেখ করেছেন, আবু তালেব তনয়া হজরত উম্মে হানী বলেছেন, মক্কাবিজয়ের পর রসুল স. আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। আমি অক্ষমতা প্রকাশ করলাম। তিনি স.ও আর অগ্রসর হলেন না। এরপর যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন আমি আর তাঁর জন্য বৈধই থাকলাম না। কারণ আমি তাঁর চাচার কন্যা হলেও হিজরতকারিণী ছিলাম না। ছিলাম তুলাকা। তিরমিজি ও হাকেম হাদিসটিকে আখ্যা দিয়েছেন যথাক্রমে উত্তমসূত্রবিশিষ্ট ও যথাসূত্রসম্বলিত বলে।

হজরত উম্মে হানীর মুক্ত ক্রীতদাস হজরত আবু সালেহ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন উম্মে হানীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি এখন স্বাস্থ্যহীনা। শিশুটিও অপ্রাপ্তবয়স্ক। এরপর তাঁর শিশু যখন বড় হলো, তখন তিনি নিজেই রসুল স. এর কাছে পাঠালেন বিবাহের প্রস্তাব। রসুল স. তখন বললেন, না, এখন আর তা সম্ভব নয়। বলেই তিনি স. পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

হজরত আবু সালেহ থেকে ইসমাইল ইবনে আবু খালেদের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত উম্মে হানী বলেছেন, রসুল স. আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'ওয়া বানাতি আম্মিকা ওয়া বানাতি আম্মাতিকা ....' এই আয়াতে রসুল স. এর সঙ্গে আমার বিবাহকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ আমি ছিলাম না হিজরতকারিণী।

বাগবী লিখেছেন, কিছুকাল পর এই বিধানটি রহিত হয়। অর্থাৎ রসুল স. এর জন্য হিজরতকারিণী নয় এমন রমণীকে বিবাহ করার নিষেধাজ্ঞাটি তুলে নেওয়া

www.eelm.weebly.com

হয়। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে 'হিজরত' অর্থ ইসলাম। এভাবে 'যারা তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— যারা আপনার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছে। রসুল স. বলেছেন, যারা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করে, তারাই হিজরতকারী। বোখারী। এই হাদিসের আলোকে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বিধর্মী রমণী, সে ইহুদী বা খৃষ্টান যেই হোকনা কেনো, তাকে বিবাহ করা রসুল স. এর জন্য ছিলো নিষিদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কোনো মুমিন নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করিলে এবং নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সে-ও বৈধ'। একথার অর্থ— কোনো বিশ্বাসবতী যদি বিনা মোহরানায় স্বতঃপ্রণোদিতা হয়ে নিজেকে রসুল স. এর নিকটে সমর্পণ করতে চান এবং রসুল স. যদি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হন, তবে তাঁকে বিবাহ করাও তাঁর জন্য বৈধ। এখানে 'বিশ্বাসবতী' বলে এই বৈধতাকে সীমায়িত করা হয়েছে। অতএব বুঝতে হবে, কোনো বিধর্মিণী যদি এভাবে সমর্পিতা হতে চায়, তবুও তাকে রসুল স. বিবাহ করতে পারবেন না। অবশ্য বিদ্বানগণ এবিষয়ে মতপ্রভেদ করেছেন।

বিবাহের জন্য প্রধান শর্ত দু'টি— ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (সম্মতি)। রসুল স. এর জন্যও এ দু'টো শর্ত কার্যকর। স্বেচ্ছাসমর্পণেচ্ছু রমণীর নিবেদন এমতোক্ষেত্রে হবে ইজাব। আর 'কবুল' হবে রসুল স. এর পক্ষ থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়, যাতে তোমার কোনো অসুবিধা না হয়'। এ কথার অর্থ— হে আমার নবী! এই বিধানটি প্রযোজ্য কেবল আপনার বেলায়। অন্যান্য বিশ্বাসীগণের ক্ষেত্রে এই নিয়ম অচল। তাদের জন্য মোহরানা প্রদান অত্যাবশ্যক। বিবাহ পড়ানোর সময় মোহরানার উল্লেখ করা হোক অথবা না হোক, সম্ভোগের পরে অথবা মৃত্যুর পরে হলেও তাদের স্ত্রীদেরকে মোহরানা পরিশোধ করতে হবে আবশ্যিকভাবে।

উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে রসুল স. এর অত্যুচ্চ মর্যাদা ও মহিমাকে। অর্থাৎ তিনিই কেবল পারেন মোহরানা ছাড়া বিবাহ করতে, অন্য কেউ নয়। এখানাকার 'খলিসাহ্' শব্দটি ধাতুমূল বিশেষণ। এখানে এর বিশেষ্য 'হিবা' বা সম্প্রদান লুপ্ত। অর্থাৎ হে নবী! বর্ণিত আত্মসম্প্রদান রীতিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য কেবল আপনার ক্ষেত্রে , অন্য কারো ক্ষেত্রে নয়।

ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উম্মে শুরাইক দৌসীয়াকে লক্ষ্য করে। মুনীর ইবনে আবদুল্লাহ্ দৌসি সূত্রে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, হজরত উম্মে শুরাইক রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে আত্মসম্প্রদান করেন। পরমা সুন্দরী ওই মহিয়সী রমণীকে রসুল স.

www.eelm.weebly.com

সানন্দে পত্নীরূপে গ্রহণও করেন। জননী আয়েশা তখন বলেন, স্বেচ্ছাসমর্পিতারা কল্যাণীয়া নয়। জননী উম্মে শুরাইক বলেন, আমি তো আত্মসমর্পিতা হয়েছি মহানতম রসুলের পবিত্রতম চরণে। আর আল্লাহ্র বাণীতেও আমি 'বিশ্বাসবতী' বলে প্রত্যয়িতা। জননী আয়েশা তখন রসুল স.কে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহ্ আপনার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না।

আবু রযীনের সূত্রে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. ইচ্ছা করলেন, তিনি তাঁর এক স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবেন। কথাটি যখন জানাজানি হয়ে গেলো, তখন তাঁর সকল সহধর্মিণী তাঁদের পালার অধিকার উঠিয়ে নিলেন। বললেন, এখন থেকে তিনি স. তাঁর ইচ্ছা মতো যে কারো ঘরে নিশিযাপন করতে পারবেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতের 'ইন্না আহ্লাল্না লাকা' থেকে পরবর্তী আয়াতের 'তুরজ্বী মানতাশাউ' পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, চারের অধিক পত্নী সংরক্ষণ বৈধ কেবল রসুল স. এর বেলায়। আর 'খলিসাতান' শব্দটি ব্যবহারের কারণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স. এর বিবাহপদ্ধতি ছিলো স্বতন্ত্রবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অর্থাৎ কোনো বিশ্বাসবতীর আত্মনিবেদন বৈধ ছিলো কেবল রসুল স. এর নিকটে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, 'বিবাহ' বা আত্মনিবেদনের পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে অন্যদের বেলাতেও। প্রথমোক্ত অভিমতের প্রবক্তা হচ্ছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, জুহুরী, মুজাহিদ, আতা, রবীয়া, মালেক ও শাফেয়ী। তাঁরা বলেন 'বিবাহ' (নিকাহ) শব্দটির স্পষ্ট উল্লেখ ব্যতিরেকে বিবাহের চুক্তি সম্পাদিত হবে না। অবশ্য রসুল স. এর ব্যতিক্রম। তাঁর বিবাহই কেবল সম্পাদিত হতে পারে কন্যার আত্মনিবেদনের পদ্ধতিতে।

আমি বলি, ইমাম আহমদও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। তবে ইমামগণের মতভেদের প্রেক্ষিতে তিনি আবার বলেছেন, 'হিবা' শব্দের দ্বারাও বিবাহ সুসম্পন্ন হতে পারে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যে বাক্যের দ্বারা স্থায়ীভাবে অধিকার হস্তান্তরিত হয়, সেই বাক্যের দ্বারা বিবাহও সুসম্পন্ন হতে পারে। যেমন— হিবা, ক্রয়-বিক্রয়, সদকা, অধিগ্রহণ ইত্যাদি।

ধার-কর্জ অথবা পারিশ্রমিকের উল্লেখে অবশ্য স্থায়ী অধিকার হস্তান্তরিত হয় না। যেমন— কোনো রমণী যদি কাউকে বলে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অথবা কর্জরূপে আমি নিজেকে সমর্পণ করলাম, তবে তার একথায় বিবাহ সম্পন্ন হবে না। কারণ এতে স্থায়ী অধিকারের বিষয়টির নিশ্চয়তা নেই। ইমাম কারখী বলেছেন, এভাবেও বিবাহ সুসম্পন্ন হতে পারে। কারণ এতে রয়েছে সুবিধা অর্জনের অধিকার। আর বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই তো হচ্ছে সুবিধা অর্জন, কারো অস্তিত্বের অধিকার অর্জন নয়। আমরা বলি, ওই শব্দ দু'টোর দ্বারা স্থায়ী সুবিধা

www.eelm.weebly.com

অর্জিত হয় না। তাই শব্দ দু'টো বিবাহের ক্ষেত্রে রূপকার্থেও প্রয়োগযোগ্য নয়। 'অসিয়ত' শব্দটিও এরকম। কেননা 'অসিয়ত' দ্বারা অধিকার হস্তান্তরিত হয় মৃত্যুর পর। তাহাবী বলেন, 'অসিয়ত' তবুও কিছুটা অধিকার নিশ্চিত করে। তাই 'অসিয়ত' শব্দটির উল্লেখের মাধ্যমে বিবাহ সুসম্পন্ন হতে পারে।

ইমাম কারখী বলেছেন, 'অসিয়ত' যদি বর্তমান প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে, তবে 'অসিয়ত' শব্দটির উল্লেখের মাধ্যমেও বিবাহ সিদ্ধ হতে পারে। যেমন কেউ বললো 'আমার কন্যাকে আমি এক্ষুণি তোমার জন্য অসিয়ত করলাম'। এ কথার অর্থ— এক্ষুণি আমি তোমার সঙ্গে আমার কন্যার বিয়ে দিয়ে দিলাম। এতাবস্থায় অসিয়তের রূপকার্থ হবে—বিবাহ। আমরা বলি, 'অসিয়ত' কথাটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে মৃত্যুর। অর্থাৎ অসিয়তের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর। আর বিবাহের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাৎক্ষণিকভাবে। সুতরাং বিবাহ এবং অসিয়তকে এক করা যায় না।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, সুনির্দিষ্টরূপে 'নিকাহ' বা 'বিবাহ' উল্লেখ ব্যতিরেকে বিবাহ সিদ্ধই নয়। এমনকি রসুল স. এর ক্ষেত্রেও নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতেই বলা হয়েছে 'এবং নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে'। এখানে রয়েছে 'নিকাহ' শব্দটির স্পষ্ট উল্লেখ। এর পূর্বের 'হিবা' (নিবেদন, সম্প্রদান) শব্দটিও রূপকার্থে বিবাহ।

শাফেয়ীর অভিমতের সমর্থনে বায়যাবী বলেছেন, শব্দ অনুসারী হয় অর্থের। তাই রসুল স. এর মোহরানা বিহীন বিবাহ অর্থগত দিক থেকে সুনির্দিষ্ট বলেই একথা মেনে নিয়েছেন গোটা আলেম সমাজ। তেমনি 'হিবা' এর মাধ্যমে শুভপরিণয় সিদ্ধ হওয়াও কেবল রসুল স. এর জন্যই সিদ্ধ। কেননা এর অর্থও বিবাহ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বায়যাবীর এমতো মন্তব্যকে সঠিক বলা যায় কি? কেননা 'হিবা' যে রূপকার্থে বিবাহ সে কথা সর্বজনবিধিত। সুতরাং এরূপ রূপকার্থ কেবল রসুল স. এর জন্য সুনির্দিষ্ট করা হবে কেনো? আবার 'হিবা' অর্থ যে 'নিকাহ' সেকথা কেবল তাঁর ক্ষেত্রে খাটবে, এরকম বলারও কোনো যুক্তি নেই। ভুলে গেলে চলবে না যে, শব্দটির মধ্যে 'নিকাহ' অর্থ নিহিত রয়েছে রূপকার্থে।

একটি সন্দেহ ঃ 'হিবা' শব্দের প্রকৃত অর্থ স্বত্বাধিকারী করে দেওয়া। কোনোকিছুর ক্রয় বিক্রয়, দান-খয়রাতও স্বত্ব হস্তান্তরের অধিকার লাভ করে। আর এখানে যে 'হিবা' উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ বিনিময় ব্যতিরেকে সুবিধা উপভোগের ইচ্ছাস্বাধীনতা দেওয়া। সুতরাং এখানে যদি কেবল রসুল স. এর খাতিরে 'হিবা' শব্দটি রূপকার্থে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তবে অন্যদের জন্য শব্দটির অর্থ 'বিবাহ' একথা কেমন করে বলা যেতে পারে?

www.eelm.weebly.com

সন্দেহের নিরসন ঃ 'হিবা' শব্দের রূপকার্থ সুবিধা উপভোগের ইচ্ছাস্বাধীনতা দেওয়া, তা বিনিময় সাপেক্ষে অথবা বিনিময়বিহীন যেভাবেই হোক না কেনো। শুধুমাত্র বিনিময়বিহীন সুবিধাভোগের ইচ্ছাস্বাধীনতা দেওয়া শব্দটির রূপক অর্থ নয়। একারণেই রসুল স. এর জন্য বিনিময় বিবর্জিত 'হিবা'র রূপক অর্থ বিবাহ, আর অন্যদের জন্য এর রূপক অর্থ বিবাহ বিনিময় বা মোহরানা সহকারে। 'হিবা'র সাধারণ অর্থ বিবাহ একথা বলার কোনো অবকাশই নেই।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, প্রকৃত কথা হচ্ছে প্রমাণ করতে হবে 'হিবা'র রূপকার্থের প্রকৃতি। ইমাম শাফেয়ীর মতে শব্দটির রূপকার্থ করার কোনো কারণই নেই। তাই তিনি বলেন, এখানে শব্দটির রূপকার্থ করতে যাওয়া অবান্তর। তাঁর এমতো দাবির প্রেক্ষিতে তিনি দাঁড় করিয়েছেন দু'টো যুক্তি— একটি সংক্ষিপ্ত এবং অপরটি বিস্তারিত।

সংক্ষিপ্ত যুক্তিটি এরকম— রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হলে উভয় প্রকার অর্থই গ্রহণীয় বলে মেনে নেওয়া উচিত। অর্থাৎ শক্যার্থ বলে মর্মার্থ এবং রূপকার্থ বলে শক্যার্থ। যেমন— 'ওয়াহাবতুকা হাজাছ্ ছওবু' অর্থাৎ আমি তোমাকে দান করলাম এই কাপড় এর অর্থ করতে হবে— এই কাপড়ের সাথে আমি তোমার বিয়ে দিলাম। আবার 'এই কাপড়ের সাথে তোমার বিয়ে দিলাম' এর অর্থ করতে হবে— আমি তোমাকে দান করলাম এই কাপড়। কিন্তু ব্যাকরণবেত্তাগণের নিকটে এরকম বাকরীতি অচল।

আর বিস্তারিত যুক্তিটি হচ্ছে— 'তাযবীজ্' বা 'নিকাহ' এর আভিধানিক অর্থ দু'টো বস্তুকে মিলিয়ে দেওয়া, একত্রিত করা। অধিকারী ও অধিকৃত এবং মালিক ও ক্রীতদাসের মধ্যে কিন্তু মিলন অথবা একত্রায়ণ সম্ভব নয়। সেকারণেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ একজন যদি মনিব হয়, তবে বিবাহ হয়ে যাবে বানচাল। সুতরাং 'হিবা' অর্থ মালিকানা বা স্বত্বাধিকারী করে দেওয়ার অর্থে বিবাহ মনে করা অবিশুদ্ধ।

এবার উপস্থাপন করা হচ্ছে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের বিপরীতে আমাদের দলিল। 'নিকাহ' ও 'হিবা' শব্দ দু'টোর মধ্যে যদি রূপক সম্পর্ক না-ই থাকে, তবে তো রসুল স. এর বিবাহ ও অবিশুদ্ধ হওয়া উচিত। সুতরাং বুঝতে হবে শব্দ দু'টোর মধ্যে রূপক অর্থ বিদ্যমান। অতএব, বিনিময় বিবর্জিত বিবাহ ও 'হিবা'র মধ্যে রূপক অর্থ বিদ্যমান থাকলে সাধারণ বিবাহ ও 'হিবা'র মধ্যেও রূপক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ বিশেষ অর্থের মধ্যে সাধারণ অর্থ বিদ্যমান থাকেই।

www.eelm.weebly.com

আমাদের দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, 'হিবা' অর্থ স্বত্বাধিকারী করে দেওয়া। আর স্বত্বাধিকারীর রয়েছে অধিকৃত বস্তু ভোগ করার অধিকার। এমতো অধিকার তার লাভ হয় বিবাহের দ্বারাই। আর এরকম হয় রূপক পদ্ধতিতেই। তবুও কথা থেকে যায়, 'নিকাহ' ও 'হিবা'র মধ্যে কারণ ও কারণিক সম্পর্ক যদি থাকে, তাহলে 'নিকাহ' এর অর্থ হবে 'হিবা'। তখন বিষয়টি হবে পূর্বনির্ণীত। এর জবাবে বলা যায়, বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে শরয়ী বিধানের সূত্র গ্রন্থে। সেখানে বলা হয়েছে কারণ বলে কারণিকের অর্থ করা যায় না। সুতরাং কারণ যদি শরিয়ত সমর্থিত হয়ে, তবে তা হবে উত্তম।

বিবাহের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে উপস্বত্ব ভোগের স্বত্ব অধিকার অর্জন, মালিকানা প্রতিষ্ঠা নয়। বরং মালিকানারও প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বত্বের অধিকার অর্জন। অথচ ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অধিকারী ও অধিকৃতের মধ্যে মিলন যেমন হয় না, তেমনি হয় না বিবাহ। তাহলে তাঁর অভিমতটির ভিত্তি আর রইলো কই?

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন, বিবাহ করেননি এরকম কোনো রক্ষিতা রমণী রসুল স. এর নিকটে ছিলো না। বরং তাঁর জীবনসঙ্গিনী হিসেবে ছিলেন তাঁর পুণ্যময়ী পত্নীগণ ও ক্রীতদাসীগণ। আর আলোচ্য আয়াতের 'নিজেকে নিবেদন করলে' কথাটি হচ্ছে মোহরবিহীন বিবাহের প্রস্তাব যা পূর্বশর্ত। শা'বীর বক্তব্যানুসারে মাত্র একজন রমণী ছিলেন রসুল স. এর প্রতি স্বেচ্ছা সমর্পিতা। তাঁর নাম হয়রত যয়নাব বিনতে খুজাইমা আনসারী। তাঁকে বলা হতো 'সর্বহারাদের জননী'। আর কাতাদার বক্তব্যানুসারে এরকম ছিলেন আরো একজন। তাঁর নাম হজরত মায়মুনা বিনতে হারেছ। ইমাম জয়নুল আবেদীন, জুহাক ও মুকাতিল বলেছেন, হজরত উম্মে শুরাইক বিনতে জাবের আসাদীয়াও ছিলেন এই পর্যায়ের।

হজরত আলী ইবনে হোসাইনের মাধ্যমে ইবনে সা'দ, ইবনে আবী শায়বা, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, তিবরানী এবং ইকরাম সূত্রে ইবনে সা'দ বলেছেন, এরূপ স্বেচ্ছা নিবেদিতা ছিলেন হজরত উম্মে শুরাইক বিনতে জাবের। ওরওয়া ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এরূপ রমণী ছিলেন বনী সুলাইম গোত্রের হজরত খাওলা বিনতে হাকীম।

এরপর বলা হয়েছে— 'মুমিনদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীগণ সম্বন্ধে যা নির্ধারণ করেছি তা আমি জানি'।

এখানে 'মা ফারদ্বনা' অর্থ আমি যা নির্ধারণ করে দিয়েছি। অর্থাৎ আমি যা করে দিয়েছি ওয়াজিব। ফী 'আয্ওয়াজ্বিহিম' অর্থ তাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে। অর্থাৎ তাদের বিবাহ, মোহর, নিশিযাপনের নির্দিষ্ট তারিখ, মোহর নির্ধারণ না করা

www.eelm.weebly.com

থাকলে সম্ভোগের পরে মোহরের অনিবার্যতা, একসঙ্গে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি ইত্যাদি। আর 'ওয়ামা মালাকাত আইমানুকুম' অর্থ তোমাদের মালিকানাধীন দাসীগণ— ক্রয়কৃত অথবা অন্য কোনো উপায়ে প্রাপ্ত, যারা তাদের মনিবদের জন্য বৈধ, কিন্তু ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিউপাসিকা ও প্রতিমাপূজারিণী যারা নয়। উল্লেখ্য, এরকম ক্রীতদাসী রাখা যাবে অনির্দিষ্ট সংখ্যক। কিন্তু তাদের জন্য নিশিযাপনের কোনো দিনক্ষণও নির্দিষ্ট থাকবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— হে আমার নবী! যে সকল স্বভাবজ আচরণ থেকে মুক্ত থাকা দুরূহ, সেগুলো আল্লাহ্পাক ক্ষমা করে দেন। কেননা তিনি ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়াবান।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা যখন বললেন, ওই ললনাদের লজ্জিত হওয়া উচিত, যারা স্বতঃপ্রণোদিতা হয়ে বিবাহবদ্ধা হতে চায়, তখন অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৫১

تُرْجِي مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَ يَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿٥١﴾

r তুমি উহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পার এবং যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার। আর তুমি যাহাকে দূরে রাখিয়াছ তাহাকে কামনা করিলে তোমার কোন অপরাধ নাই। এই বিধান এইজন্য যে, ইহাতে উহাদের তুষ্টি সহজতর হইবে এবং উহারা দুঃখ পাইবে না আর উহাদিগকে তুমি যাহা দিবে তাহাতে উহাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকিবে। তোমাদের অন্তরে যাহা আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারো এবং যাকে ইচ্ছা নিকটে টানতে পারো'।

আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন জননী আয়েশা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি দেখছি, আপনার প্রভুপালনকর্তা আপনার ইচ্ছা তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করে দেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা তখন বললেন, আমি ওই সকল রমণীদের কথা মনে করে লজ্জায় মরে যাই, যারা

www.eelm.weebly.com

উপযাচিকা হয়ে আল্লাহ্র রসুলের অঙ্কশায়িনী হবার প্রস্তাব দেয়। তিনি আরো বলেছেন, এই বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর আমি একথাও বললাম হে আল্লাহ্র রসুল! আমার চোখে গুঁতো দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হলো যে, আপনার প্রিয়তম প্রভুপালক অতি দ্রুত পূরণ করেন আপনার মনোষ্কামনা।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরবেত্তাগণের মতপ্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে এ সম্পর্কে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অভিমতটি এরকম— আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. এর মহাপুণ্যবতী পত্নীগণের গৃহে তাঁর নিশিযাপনের পালা সম্পর্কে। প্রথমদিকে নিশিযাপনে সমতারক্ষা ছিলো তাঁর জন্য আবশ্যিক। এই আয়াতের মাধ্যমে তাঁর ওই আবশ্যিকতাকে রহিত করা হয়। এই মর্মে অনুমতি দেওয়া হয় যে, তিনি স. তাঁর ইচ্ছামতো পালা নির্ধারণ করতে পারবেন। সমতা রক্ষা তাঁর উপরে আর ওয়াজিব নয়।

আবু জায়েদ ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, উম্মত জননীগণ যখন অন্যান্য বিত্তপতিদের ঘরের গৃহিণীর মতো বিলাসী জীবন যাপনের জন্য দাবি উত্থাপন করলেন, তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। ওই দাবির প্রেক্ষিতে রসুল স. অপ্রসন্ন হন এবং এক মাসের জন্য তাঁর সকল পত্নীগণ থেকে পৃথক হয়ে যান। তখন অবতীর্ণ হয় ইচ্ছাস্বাধীনতার বিধান। আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, হে আমার রসুল! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে জানিয়ে দিন, পৃথিবীর ভোগ-সামগ্রীই যদি তোমাদের কামনা হয়, তবে ইচ্ছে করলে তোমরা তোমাদের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়ে বিদায় গ্রহণ করো। আর যদি তোমাদের উদ্দেশ্য হয় আখেরাত, তাহলে আমার সঙ্গে থাকতে পারো। কিন্তু বিলাসী জীবনের দাবি আর তোমরা উত্থাপন করতে পারবে না। আমিই ইচ্ছা মতো নির্ধারণ করবো তোমাদের ভরণ-পোষণের সামগ্রীর পরিমাণ। আর আমি আমার ইচ্ছা মতো যার ঘরে যখন ও যতদিন খুশী নিশিযাপন করতে পারবো। আমার মহাপ্রস্থানের পর তোমরা আর কখনো কারো সঙ্গে বিবাহবদ্ধা হতে পারবে না। কারণ আমি সমগ্র উম্মতের জনক সদৃশ আর তোমরাও সমগ্য উম্মতের জননী। বলা বাহুল্য, উম্মতজননীগণ রসুল স. এর সকল শর্তই মেনে নিলেন সানন্দচিত্তে।

আমি বলি, এমতো ব্যবস্থাপনা কেবল রসুল স. এর জন্য নির্ধারিত নয়। 'মৃত্যুর পরে অন্য কোথাও বিবাহবদ্ধা হতে পারবে না', কেবল এই বিধানটি ছাড়া অন্য সকল বিধান তাঁর উম্মতের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য, যদি তাদের থাকে একাধিক জীবনসঙ্গিনী।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. তাঁর পত্নীগণের কাউকে নিশিযাপনের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে পরিলক্ষিত হয় বর্ণনাবৈষম্য। কেউ কেউ বলেছেন, নিশিযাপনের অধিকার থেকে

www.eelm.weebly.com

তিনি স. কাউকেই বঞ্চিত করতেন না। কেবল জননী সাওদা ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন বয়োঃপ্রবীণা। তাই তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর রাতের অধিকার দিয়ে দিয়েছিলেন জননী আয়েশাকে। তাছাড়া জননী আয়েশাকে তিনি ভালোও বাসতেন অত্যধিক। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নিশিযাপনের ইচ্ছাস্বাধীনতা লাভের পর রসুল স. তাঁর কয়েকজন পত্নীকে রাত্রিযাপনের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিলেন। মনসুরের মাধ্যমে আবু রযীন সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর উম্মতজননীগণ এই ভেবে শংকিতা হন যে, রসুল স. না আবার কাউকে পরিত্যাগ করে বসেন। তাঁরা তাই সমবেতভাবে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম বাণীবাহক! আমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন। আমরা যেনো আপনার সত্তা ও সম্পদ থেকে বঞ্চিতা না হই। আপনি আপনার ইচ্ছামতো আমাদেরকে অধিক ঘনিষ্ঠ করুন অথবা করুন অপেক্ষাকৃত কম ঘনিষ্ঠ, আমরা চাই, আপনি আমাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ যেনো না ঘটান। রসুল স. তাঁদেরকে আশ্বস্ত করলেন। তবে তাঁর রাত্রিযাপনের তালিকায় করলেন কিঞ্চিত পরিবর্তন। সমতা রক্ষা করে চলতে লাগলেন কেবল জননী আয়েশা, জননী হাফসা এবং জননী উম্মে সালমার মধ্যে। অন্যদেরকে করলেন সমতা-বহির্ভূতা। তাঁদের পালা নির্ধারণ করলেন ইচ্ছামতো অনিয়মিতভাবে। তাঁরা হলেন জননী উম্মে হাবীবা, জননী সাওদা, জননী সাফিয়্যা, জননী মায়মুনা এবং জননী জুয়াইরিয়া।

হজরত মু'আজ সূত্রে বোখারী বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. তাঁর কোনো পত্নীর পালার তারিখে অন্য কোনো পত্নীর কাছে গমন করতে চাইলে তাঁর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে নিতেন। এরকম করতেন তিনি এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। হজরত মু'আজ বলেছেন, আমি তখন বললাম, হে জননী! এরকম অবস্থায় আপনি কী বলতেন। তিনি বললেন, আমি বলতাম, আপনাকে আটকাবার অধিকার তো আমার নেই। থাকলে তো আমি আপনাকে আর কারো কাছে যেতেই দিতাম না।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার 'যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারো' কথাটির অর্থ— হে আমার নবী! আপনি ইচ্ছা করলে আপনার কোনো স্ত্রী থেকে পৃথকও থাকতে পারেন। আবার ইচ্ছা হলে হতে পারেন তাঁর শয্যাসঙ্গী। কেউ কেউ বলেছেন কথাটির অর্থ— আপনি ইচ্ছা করলে কাউকে দিতে পারেন তালাক এবং ইচ্ছা করলে তাঁকে রাখতে পারেন আপনার পরিণয়াবদ্ধা করে। হাসান বসরীর ব্যাখ্যা এরকম— আপনার উম্মতভূতাদের মধ্যে যাকে খুশী আপনি আপনার জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে না-ও করতে পারেন। উল্লেখ্য, রসুল স. কাউকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে সে প্রস্তাব প্রত্যাহার

www.eelm.weebly.com

না করা পর্যন্ত ওই রমণীকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাবার অধিকার অন্য কারো ছিলো না। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— যদি কোনো বিশ্বাসবতী উপযাচিকা হয়ে আপনার গৃহসঙ্গিনী হবার প্রস্তাব উত্থাপন করে, তবে আপনি ইচ্ছা করলে সে প্রস্তাব গ্রহণও করতে পারেন, অথবা করতে পারেন প্রত্যাখ্যান।

বাগবী লিখেছেন, যাঁরা স্বতঃপ্রণোদিতা হয়ে রসুল স. এর জীবনসঙ্গিনী হবার অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন হজরত খাওলা বিনতে হাকীম। তাঁর সম্পর্কে জননী আয়েশা বলেছেন, তার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম একজন নারী কীভাবে এরকম সম্ভ্রমবিবর্জিতা হয়? কিন্তু যখন অবতীর্ণ হলো 'তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারো এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পারো' তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আল্লাহ্ তো দেখছি আপনার কোনো বাসনাই অপূর্ণ রাখেন না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর তুমি যাকে দূরে রেখেছো, তাকে কামনা করলে অপরাধ নেই'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তালাক ছাড়াই যার কাছ থেকে পৃথক হয়ে আছেন, পুনরায় ইচ্ছে করলে তাকে সান্নিধ্য দানে ধন্য করতে পারেন। এরকম করা আপনার পক্ষে অশোভন কিছু নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এই বিধান এই জন্য যে, এতে তাদের তুষ্টি সহজতর হবে এবং তারা দুঃখ পাবে না। আর তাদেরকে তুমি যা দিবে, তাতে তাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকবে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এই বিধান অবতীর্ণ হওয়ার ফলে আপনার আচরণে আপনার পত্নীগণ আর মান-অভিমানের কষ্ট পাবে না। কারণ তারা এখন বিশ্বাস করবে, আপনি সাময়িকভাবে কাউকে কাছে টেনে নেওয়া এবং কাউকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার অধিকার আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই পেয়েছেন। সুতরাং আপনার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী হওয়া, এই উভয় অবস্থাই কল্যাণকর। বরং এই ভেবে সকলে কৃতজ্ঞচিত্ত হবে যে, সাময়িকভাবে দূরে সরিয়ে দিলেও আপনি কাউকে পরিত্যাগ তো আর করেননি। আর আপনি যা কিছু করেন, তা তো আল্লাহ্‌র বিধানানুসারেই করেন। আল্লাহ্‌র বিধানে তুষ্ট থাকাই তো বিশ্বাসী-বিশ্বাসিনীগণের স্বভাব।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ্ তা জানেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সহনশীল।

এখানে 'তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ তা জানেন' কথাটির মধ্যে রয়েছে রসুল স. এর সহধর্মিণীগণের জন্য একটি সতর্ক সংকেত। অর্থাৎ এখানে তাঁদেরকে এই মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে— হে রসুলপত্নীগণ! আল্লাহ্‌র রসুলের সকল কার্যকলাপের প্রতি তোমাদেরকে থাকতে হবে বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে প্রসন্ন। মনে রাখতে হবে তাঁর প্রতি হৃদয়ের সুপ্ত অসন্তোষও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। সরিয়ে দাও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আন্তরিক অসন্তোষ, যদি সে রকম কোনো কিছুর অস্তিত্ব তোমাদের অন্তরে এখনো থাকে। কেউ কেউ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আপনি যদি আপনার পত্নীগণের কারো কারো প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেন এবং তাঁদের মধ্যেও যদি কেউ কেউ হয় আপনার প্রতি অতিরিক্ত অনুরক্তা, তবে সে সঙ্গোপন ভাবনাটিও আল্লাহ্‌র অজানা নয়। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। সে কারণেই তো আমি দান করেছি এই ইচ্ছা স্বাধীনতা, যাতে করে আপনার গোপন অভিলাষ পরিপূরণে কোনো অন্তরায় আর না থাকে।

'আল্লাহ্ সহনশীল' অর্থ তিনি সকল কিছু জানা সত্ত্বেও সহনশীলতাকেই প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। তাৎক্ষণিকভাবে পাপের শাস্তি প্রদান করেন না। দান করেন আত্মোপলব্ধি ও তওবার অবকাশ।

ইকরামা সূত্রে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌পাক যখন তাঁর প্রিয় রসুলকে পত্নীগৃহে নিশিযাপনের ইচ্ছাস্বাধীনতা প্রদান করলেন এবং তাঁর পুতঃপবিত্রা সহধর্মিণীগণও যখন তা সানন্দে মেনে নিলেন তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৫২

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا ﴿۵۲﴾

r ইহার পর, তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নহে এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নহে যদিও উহাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে; তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নহে। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! পত্নীগণের প্রকোষ্ঠে নিশিযাপনের ব্যাপারে আজ যে ইচ্ছা স্বাধীনতার বিধান প্রবর্তন করা হলো, এরপর থেকে আপনি নতুন করে আর কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না। কাউকে তালাক দিয়েও ঘরে আনতে পারবেন না নতুন স্ত্রী। তেমনি কেউ পরলোকগতা হলেও কাউকে করতে পারবেন না তার স্থলবর্তিনী।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. যখন তাঁর সহধর্মিণীগণকে পৃথিবীর বিলাসী জীবন অথবা আখেরাতের কল্যাণ, যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিলেন, তখন তাঁরা বেছে নিলেন আখেরাতকে। আল্লাহ্ তখন তাঁর রসুলকে দিলেন সমতারক্ষার দায়িত্ব থেকে মুক্তি। সে বিধানকেও যখন তাঁরা সানন্দে মেনে নিলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁদের মর্যাদা দিলেন বাড়িয়ে। তাঁর প্রিয়তম রসুলের উপরে জারী করলেন, যা আছে তার চেয়ে অতিরিক্ত স্ত্রী গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা। এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তদস্থলে অন্য কারো পাণিগ্রহণও হয়ে গেলো তাঁর জন্য নিষিদ্ধ। হজরত ইবনে আব্বাস এবং কাতাদা এরকমই বলেছেন।

আলোচ্য বিধানটি চিরস্থায়ী ছিলো কিনা অথবা পরবর্তী সময়ে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে অধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে অনুমতি তিনি স. পেয়েছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতপৃথকতা পরিলক্ষিত হয়। আবদুর রাজ্জাক, সাঈদ ইবনে মনসুর, ইবনে সা'দ, আহমদ, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবু দাউদ, তিরমিজি ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা সূত্রে আতা বলেছেন, মহাপ্রয়াণের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো রমণীকে বিবাহ করা রসুল স. এর জন্য ছিলো সিদ্ধ। সিদ্ধ ছিলো না কেবল মুহরিম রমণী। 'যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারো এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পারো' এই আয়াতই তার প্রমাণ। এই আয়াত (৫১) অবতীর্ণ হয়েছে 'এর পর তোমার জন্য কোনো নারী বৈধ নয়' (আয়াত ৫২) এর পরে। কিন্তু আয়াত দু'টোর সন্নিবেশনে এখানে ঘটেছে অগ্র-পশ্চাৎ।

বাগবী লিখেছেন, ইকরামা ও জুহাক বলেছেন, আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থ হচ্ছে— ইতোপূর্বে যে সকল বৈশিষ্ট্যসম্পন্না রমণীকে আপনার জন্য বৈধ বলা হয়েছে, তারা ছাড়া অন্য কোনো রমণীকে বিবাহ করা আপনার জন্য সিদ্ধ নয়। হজরত উবাই ইবনে কা'বকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, রসুল স. এর প্রিয়তম জীবনসঙ্গিনীগণ যদি সকলে এক যোগে পরলোকগমন করতেন, তবে কি তিনি স. নতুন করে কোনো রমণীর পাণি গ্রহণ করতে পারতেন না? তিনি বললেন, এরকম কোনো বিধিনিষেধ তো তাঁর উপরে ছিলো না। বলা হলো, তা হলে 'এরপর তোমার জন্য কোনো নারী বৈধ নয়' কথাটির অর্থ কী? তিনি বললেন, আরে তুমি কি এই আয়াত পাঠ করোনি— 'হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি......... যারা তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে' (আয়াত ৫০)। সুতরাং বুঝতেই পারছো, এই আয়াতে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মতো বৈশিষ্ট্যসম্পন্না যারা নয়, তাদেরকে বিবাহ না করার কথাই বলা হয়েছে এখানে। আবু সালেহ বলেছেন, তিনশত জন রমণীর পাণিগ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন তিনি স.। তবে তাঁদেরকে অবশ্যই হতে হতো তাঁর চাচা, ফুফু, মামা ও খালার কন্যা, যারা তাঁর মতো হিজরত করেছিলেন।

www.eelm.weebly.com

মুজাহিদ বলেছেন, মুসলিম রমণীগণকে বিবাহ করার পর রসুল স. এর জন্য ইহুদী অথবা খৃষ্টান রমণী বিবাহ করা আর বৈধ ছিলো না। এটাও সিদ্ধ ছিলো না যে, তিনি স. তাঁর কোনো মুসলিম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তদস্থলে ঘরে আনবেন কোনো অমুসলিম রমণী। মোট কথা কোনো বিধর্মিণীই উম্মতজননী হবার যোগ্য নয়। তবে গ্রন্থধারিণীদেরকে ক্রীতদাসীরূপে রাখা তাঁর জন্য ছিলো বৈধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয়'।

জুহাক কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার নবী! এরপর থেকে আপনি আপনার কোনো পত্নীকেই পরিত্যাগ করতে পারবেন না। তাঁদেরকে তালাক দিয়ে তদস্থলে আনতে পারবেন না নতুন কাউকেও। অর্থাৎ যাঁরা এখন আপনার স্ত্রীরূপে বর্তমান, তাঁরা সকলেই বিশ্বাসবানদের জননী। সুতরাং তাঁদেরকে পরিত্যাগ করা আপনার জন্য নিষিদ্ধ। সুতরাং আপনার মহাপ্রয়াণের পরেও তাঁরা থাকবেন এই উম্মতের মাতৃস্থানীয়া। আর তখন কোনো উম্মতই তাঁদেরকে পত্নীরূপে পাবার চিন্তা করতে পারবে না। অন্য রমণীর ক্ষেত্রে তাদের জন্য এমতো নিষেধাজ্ঞা নেই।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, মূর্খতার যুগে পত্নী বিনিময়ের কুপ্রথার প্রচলন ছিলো। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে সেই প্রথাটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ক্রীতদাসী বিনিময় দোষের নয়।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুল স. এর গৃহে অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করলো উয়াইনা ইবনে হোসাইন। রসুল স. এর পাশে তখন উপবিষ্টা ছিলেন জননী আয়েশা। রসুল স. উয়াইনাকে বললেন, তুমি অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করলে কেনো? সে বললো, যুবক হবার পর থেকে আমি তো কারো ঘরে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করিনি। তারপর বললো, এই গৌরবর্ণের মহিলাটি কে? রসুল স. বললেন, বিশ্বাসীদের জনয়িত্রী আয়েশা। সে বললো, আমি কি এক সুন্দরী রমণীর সঙ্গে এঁকে বিনিময় করতে পারি? রসুল স. বললেন, ওই কুপ্রথাটিকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। একথা শোনার পর সে সেখান থেকে চলে গেলো। জননী জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কে? রসুল স. বললেন, এক মূর্খ জননেতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে'। একথার অর্থ— কোনো রমণীর রূপে যদি আপনি মুগ্ধ হন, তবুও আপনি আপনার বর্তমান স্ত্রীগণের কাউকে সরিয়ে অথবা না সরিয়ে তাকে বিবাহ করতে পারবেন না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত জাফর ইবনে আবু তালেবের স্ত্রী ছিলেন খুবই সুন্দরী। তিনি শহীদ হওয়ার পর রসুল স. তাঁর বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠালেন। তখনই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য নিষেধাজ্ঞাটি।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়'। একথার অর্থ— কিন্তু অধিকারভুক্ত দাসী বিনিময় নিষিদ্ধ নয়। আর এই বিধানটি সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, এই বিধানটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. মিসররাজ মকুকাসের পক্ষ থেকে উপঢৌকনরূপে প্রাপ্ত হলেন দু'জন দাসী। একজনের নাম মারিয়া এবং অন্যজনের নাম সিরীন। তিনি স. মারিয়াকে রাখলেন এবং সিরীনকে দিয়ে দিলেন অন্যের অধিকারে। আরো উল্লেখ্য, হজরত মারিয়াই ছিলেন রসুল স. এর প্রিয় পুত্র হজরত ইব্রাহিমের সম্মানিতা জননী।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সমস্তকিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা সর্ববিষয়ে সতত সজাগ দ্রষ্টা। তাই তাঁর বান্দাগণের আনুগত্য ও অবাধ্যতা সকল কিছুই তাঁর দর্শনায়ত্ব। সুতরাং বান্দাগণের উচিত তাঁকে ভয় করে চলা এবং শরিয়তের বিধি-বিধানের সীমা-সরহদ রক্ষা করে চলা।

সমাধান ঃ কাউকে বিয়ে করতে চাইলে তাকে দেখে নেওয়া সিদ্ধ। হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা কাউকে বিবাহ করতে চাইলে তার ওই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে নিতে পারো, যেগুলো বিবাহেচ্ছাকে করে প্রবল। আবু দাউদ।

হজরত মুগীরা ইবনে শো'বা বর্ণনা করেছেন, আমি এক মহিলার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালাম। রসুল স. একথা শুনে বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছো? আমি বললাম, না। তিনি স. বললেন, আগে তাকে দ্যাখো। দ্যাখাই হবে তোমাদের উভয়ের সমঝোতার ভিত্তি। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, এক লোক বিয়ে করতে চাইলো জনৈকা আনসার রমণীকে। রসুল স. একথা জানতে পেরে তাকে বললেন, আগে তাকে দেখে নাও। কারণ আনসার রমণীদের চাউনি কিন্তু বিশেষ এক ধরনের। মুসলিম।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত যয়নাব বিনতে জাহাশকে বিবাহ করার সময় অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করলেন। যথাসময়ে সকলে সমবেত হলো। ভোজনপর্বও সমাধা হলো যথারীতি। এরপর অনেকে চলে গেলেও কেউ কেউ সেখানেই বসে মগ্ন হয়ে গেলো আলাপচারিতায়। রসুল স. তাঁর স্বভাবগত লজ্জার কারণে মুখ ফুটে কাউকে চলে যেতেও বলতে পারছিলেন না। বরং নিজেই উঠে চলে গেলেন বাইরে। তখন কেউ কেউ তাঁর মনোভাব আঁচ করতে পেরে একে একে বিদায় নিলো। কিছুক্ষণ পর তিনি স. ফিরে এসে দেখলেন, তখনও তিনজন লোক গৃহাঙ্গনে বসেই রয়েছে।

www.eelm.weebly.com

তিনি স. তাদেরকে দেখে পুনরায় বাইরে চলে গেলেন। হজরত আনাস আরো বর্ণনা করেছেন, ওই তিন জন লোকও এবার প্রস্থান করলো। আমি একথা রসুল স. কে গিয়ে জানালাম। রসুল স. ফিরে এলেন। প্রবেশ করলেন হজরত যয়নাবের ঘরে। আমিও তাঁর পিছু পিছু সে ঘরে প্রবেশ করতে চাইলাম। তিনি স. আমার সামনেই টাঙ্গিয়ে দিলেন পর্দা। ঠিক তখনই অবতীর্ণ হলো—

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৫৩, ৫৪

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ
لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ
فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ
اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۫ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ
مِنَ الْحَقِّ ؕ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ
حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ؕ وَمَا كَانَ
لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ
اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿۵۳﴾ اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ
تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿۵۴﴾

r হে মু'মিনগণ! তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া না হইলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য না করিয়া ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করিও না। তবে তোমাদিগকে আহ্বান করিলে তোমরা প্রবেশ করিও এবং ভোজনশেষে তোমরা চলিয়া যাইও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হইয়া পড়িও না। কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদিগকে উঠাইয়া দিতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলিতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তাহার পত্নীদের নিকট হইতে কিছু চাহিলে পর্দার অন্তরাল হইতে চাহিবে। এই বিধান তোমাদের ও তাহাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কাহারও পক্ষে আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া সংগত নহে এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার পত্নীদিগকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনও বৈধ নহে। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ইহা ঘোরতর অপরাধ।

www.eelm.weebly.com

r তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ— আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবীগৃহে প্রবেশ কোরো না'।

ইবনে শিহাব জুহুরী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, যখন মদীনায় রসুল স. এর শুভপদার্পন ঘটলো, তখন আমি ছিলাম দশ বছরের বালক। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি তাঁর ঘনিষ্ট সেবার সুযোগ পেয়েছিলাম দশ বছর ধরে। যখন তাঁর মহাপ্রস্থান ঘটলো, তখন আমার বয়স হয়েছিলো কুড়ি বৎসর। যেহেতু আমি তাঁর ও উম্মতজননীগণের বিশেষ খাদেম ছিলাম, তাই পর্দার বিধান সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানি আমিই। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিলো জননী জয়নাবের শুভবিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁর ঘরে রসুল স. পদার্পন করবার পরক্ষণে। হজরত আনাসের এর পরের বর্ণনা ইতোপূর্বের বিবরণের অনুরূপ। জুহুরী সূত্রে বোখারীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সুসম্পন্ন হলো রসুল স. এবং হজরত যয়নাবের শুভবিবাহ। তিনি স. তখন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন অনেক লোককে। তারা চলে যাবার পর রসুল স. প্রবেশ করলেন তাঁর নবপরিণীতা পত্নীর প্রকোষ্ঠে। কিছু সংখ্যক লোক তখনও গৃহাঙ্গনে বসে গল্পগুজব চালিয়ে যাচ্ছিলো। এমন সময় অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

হজরত আনাসের আর এক বিবরণে এসেছে, জননী যয়নাবের বিবাহে ওলীমা করা হয়েছিলো গোশত ও রুটির। আমাকে দেওয়া হয়েছিলো লোকজনকে নিমন্ত্রণ করার দায়িত্ব। আমি লোকজনকে ডেকে আনতে শুরু করলাম। দলে দলে লোক এসে খেয়ে যেতে লাগলেন। এভাবে আপ্যায়নপর্ব শেষ হলো। আমি জানালাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে। আর কেউ বাকী নেই। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে, তাহলে সবকিছু গুটিয়ে নাও। আমি দেখলাম, তিনজন লোক তখনো সেখানে বসে কথাবার্তা বলছে। রসুল স. তাদের উপস্থিতিতে সংকোচবশতঃ তাঁর নবপরিণীতা বধুর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে পারছিলেন না। তাই সময়ক্ষেপণের জন্য তাঁর অন্যান্য পত্নীগণের সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন। প্রথমে গেলেন জননী আয়েশার গৃহদ্বারে। তাঁর সঙ্গে সালাম বিনিময় করলেন। জননী আয়েশা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার মঙ্গল হোক। আপনার নতুন বধুটি কেমন? এভাবে তিনি স. তাঁর অন্যান্য সহধর্মিণীগণের সঙ্গেও শান্তিসম্ভাষণ বিনিময় সৌজন্যালাপ করতে লাগলেন। এরপর ফিরে এসে দেখলেন তখনো ওই তিনজন আলাপচারিতায় মশগুল। তাই রসুল স. পুনরায় গমন করলেন জননী আয়েশার কাছে। সেখানে থেকে ওই

www.eelm.weebly.com

তিনজনের বিদায়ের সংবাদ যখন পেলেন, তখন এসে প্রবেশ করলেন জননী যয়নাবের কামরায়। সেখানে প্রবেশ করেই কামরার দরজায় ঝুলিয়ে দিলেন পর্দা। আর তখনই অবতীর্ণ হলো পর্দার আয়াত।

বোখারীর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, জননী যয়নাবের বিবাহে রসুল স. করেছিলেন আড়ম্বরপূর্ণ ওলীমার আয়োজন। নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করানো হয়েছিলো গোশত ও রুটি। আহারের পর অতিথিরা চলে যাবার পরেও দেখা গেলো দু'জন লোক খোশগল্পে মত্ত। তিনি স. কিছুটা অস্বস্তিবোধ করলেন। সময় কাটানোর জন্য দেখা করতে লাগলেন তাঁর অন্যান্য সহধর্মিণীগণের সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে শুভাশীষ ও শান্তি সম্ভাষণ বিনিময় করে যেতে লাগলেন। ফিরে এলেন তখন, যখন জানতে পারলেন ওই দু'জনের প্রস্থানের সংবাদ। এরপর প্রবেশ করলেন তাঁর নববধুর প্রকোষ্ঠে। ভেতরে পা রেখে গৃহদ্বারে পর্দা ঝুলিয়ে দিতে না দিতেই অবতীর্ণ হলো পর্দার আয়াত। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম পর্দার বাইরে।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, ওই বিবাহের মজলিশের আমি ছিলাম রসুল স. এর সার্বক্ষণিক পরিচারক। ভোজনপর্বের পর নিমন্ত্রিতজনেরা চলে গেলে রসুল স. তাঁর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করতে চাইলেন । দেখলেন, তখনো কিছুসংখ্যক লোক সেখানে বাক্যালাপ করে চলেছে। তিনি স. নিজেই তখন সেখান থেকে চলে গেলেন। ফিরে এলেন তাদের চলে যাবার পর। প্রবেশ করলেন জননী জয়নাবের ঘরে। তারপর আমার সামনেই ঝুলিয়ে দিলেন দরজার পর্দা। আমি সেখান থেকে ফিরে এসে কথাটা জানালাম আবু তালহাকে। তিনি বললেন, তুমি যদি ঠিক বলে থাকো, তবে দেখো, এ সম্পর্কে নিশ্চয় অবতীর্ণ হবে কোনো বিধান। তাই হলো অবতীর্ণ হলো পর্দার বিধান। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম সূত্রবিশিষ্ট।

বিশুদ্ধ সূত্রে তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, একবার রসুল স. ও আমি একই দস্তরখানায় বসে আহার করছিলাম। হঠাৎ হাজির হলেন ওমর। রসুল স. তাঁকে আহারে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। তিনিও এসে বসে পড়লেন আমাদের সঙ্গে। আহারকালে অসতর্কতাবশতঃ আমার হাতের আঙ্গুল লেগে গেলো তাঁর হাতের আঙ্গুলের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, উহ্। তারপর বললেন, নারীজাতি যদি আমার কথা শুনতো, তাহলে কেউ আপনাকে দেখতেও পেতো না। এর পরেই অবতীর্ণ হয় পর্দার বিধান। বোখারী এবং নাসাঈও এরকম বর্ণনা করেছেন।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. এর ঘরে এসে গ্যাঁট হয়ে বসে রইলো। রসুল স.

www.eelm.weebly.com

পরপর তিনবার উঠে দাঁড়ালেন। তবু সে উঠবার কোনো উদ্যোগই নিলো না। ইত্যবসরে সেখানে উপস্থিত হলেন ওমর। তিনি রোষকষায়িত নেত্রে লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আল্লাহ্র রসুলকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছো কেনো? রসুল স. বললেন, আমি তো একে একে তিনবার উঠে দাঁড়ালাম। তবু সে গাত্রোত্থানের উদ্যোগ নিলো না। ওমর তখন বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি যদি নারী জাতির ব্যাপারে একটা কিছু বিহিত করতেন, তবে তা হতো অত্যুত্তম। আর আপনার পুতঃপবিত্রা সহধর্মিণীগণ তো অপরাপর রমণীদের সমমর্যাদাসম্পন্না নন। সুতরাং তাঁদের জন্য পৃথক বিধান যদি হতো, তবে তাঁরা হতেন আরো অধিক সম্মানার্হা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পর্দার বিধান। আমি সুরা বাকারার তাফসীরে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছি। যথাস্থানে তা দ্রষ্টব্য।

হজরত ওমর প্রায়ই বলতেন, তিনটি বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত লাভ করেছিলো আল্লাহ্র বিধানের আনুকূল্য— ১. আমি নিবেদন করেছিলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি যদি মাকামে ইব্রাহিমকে নামাজের স্থান বানিয়ে দিতেন। আমার এমতো নিবেদন উপস্থাপিত হবার পরপরই অবতীর্ণ হলো 'মাকামে ইব্রাহিমকে নামাজের স্থান বানিয়ে দিন'। ২. একবার আমি বললাম, হে আল্লাহ্র বচনবাহক। আপনার গৃহে বিভিন্ন রকমের লোকসমাগম ঘটে। উম্মতজননীগণও তাদের সামনে দেখা দেন। ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হয় অশোভন। সুতরাং আপনি তাঁদেরকে পর্দার মধ্যে রাখুন। আমার এমতো প্রস্তাবের প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় পর্দার আয়াত। ৩. উম্মতজননীগণ যখন একজোট হয়ে পার্থিব স্বাচ্ছ্যন্দোপকরণের দাবি তুললেন, তখন আমি তাঁদেরকে বললাম, আপনারা ভেবেছেন কী? মনে রাখবেন, যদি আপনারা রসুল স.কে পরিত্যাগ করেন, তবে আল্লাহ্ আপনাদের চেয়েও উত্তম জীবনসঙ্গিনী দান করবেন তাঁকে। আমার একথাতেই আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন তাঁর প্রত্যাদেশিত বাণীরূপে। হজরত আনাস থেকে নাসাঈও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর সহধর্মিণীগণ রাতের বেলায় প্রকৃতির ডাকে বাড়ীর বাইরে খোলা ময়দানের দিকে চলে যেতেন। ওমর বলতেন, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! সম্মানিতা উম্মতজননীগণের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করলে ভালো হতো মনে হয়। রসুল স. তাঁর এরকম কথায় তেমন ভ্রূক্ষেপ করতেন না। একবার রাতে বাইরে গেলেন জননী সাওদা। তিনি ছিলেন স্থূলকায়। তাই স্বল্পআলোতেও তাঁকে দেখলে চেনা যেতো। ওমর পর্দার ব্যাপারে ছিলেন অত্যুৎসাহী। তাই পথে তিনি তাঁকে দেখতে পেয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি কিন্তু আপনাকে চিনে ফেলেছি। এঘটনার পর পরই অবতীর্ণ হয় পর্দার বিধান সম্বলিত আয়াত। বাগবী লিখেছেন, এই ঘটনাটিই পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার বিশুদ্ধতম প্রেক্ষিত।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, ওমরকে বিশেষভাবে মর্যাদায়িত করেছে চারটি বিষয়— ১. তিনি বদরের যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর ওই সিদ্ধান্তকে আল্লাহ্ পছন্দ করেছিলেন। অবতীর্ণ করেছিলেন 'আল্লাহ্‌র যদি আগাম সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারিত না থাকতো.........'। ২. তিনি রসুল স. এর ভার্যাগণকে পর্দায় রাখবার পরামর্শ দিতেন। তাই জননী যয়নাব বলতেন, খাত্তাবতনয় দেখি আমাদের প্রতিও ঈর্ষাপরায়ণ। অবশেষে তাঁর ঘরেই অবতীর্ণ হয় পর্দার আয়াত। বলা হয় 'যদি তোমরা তাদের নিকট কল্যাণজনক কিছু জানতে চাও, তবে জিজ্ঞেস করো পর্দার অন্তরাল থেকে'। ৩. রসুল স. তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! তুমি ওমরের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিমান করো। ৪. রসুল স. এর মহাতিরোভাবের পর তিনিই সর্বপ্রথম হজরত আবু বকরের খেলাফতের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর নিকট সর্বপ্রথম বায়াতও গ্রহণ করেছিলেন তিনিই।

হাফেজ ইবনে হাজার উপরে বর্ণিত বর্ণনাবৈষাম্যসমূহের সমন্বয়নার্থে বলেছেন, জননী যয়নাবের ঘটনার কিছুকাল পূর্বেই ঘটেছিলো হজরত ওমরের ঘটনা। সুতরাং বিষয়টি দ্বন্দ্বদীর্ণ নয়। আর একই আয়াতের অবতরণের প্রেক্ষিত অনেক হওয়াতে দোষের কিছু নেই।

এখানকার 'ইল্‌লা আঁইয়ু'জানা লাকুম' অর্থ তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে অর্থাৎ যখন তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে, কেবল তখনই তোমরা প্রবেশ করতে পারবে নবীগৃহে। মনে রাখতে হবে, কেবল আমন্ত্রণই নবীগৃহে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন পৃথক অনুমতি। কথাটি অধিকতর স্পষ্ট হয়েছে আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে, বাক্যাংশটির মাধ্যমে। আর এখানকার 'গইরা নাজিরীনা ইনাহু' (আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে) এর 'ইনা' শব্দটি ধাতুমূল। যেমন বলা হয় 'আনাত ত্বয়ামু' (আহার্য প্রস্তুত হয়েছে, সম্পন্ন হয়েছে রন্ধনকর্ম)। আবার 'আনাল হামীম' (পানি খুব গরম হয়েছে)। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে 'আনা' 'আইনান' ও 'ইনান' অর্থ প্রস্তুতির সময় সমাগত। যেমন বলা হয় 'বালাগা হাজাশ শাইয়ু ইনাহু' (বস্তুটির প্রস্তুতিপর্ব পৌঁছেছে শেষ পর্যায়ে)।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে তোমাদেরকে আহবান করলে তোমরা প্রবেশ কোরো এবং ভোজন শেষে তোমরা চলে যেয়ো; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পোড়ো না। কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না'।

www.eelm.weebly.com

বায়যাবী লিখেছেন, বক্তব্যটির মর্মার্থ— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বিনা আহ্বানে ভোজনস্থলে প্রবেশ কোরো না। আর ভোজন শেষে অনতিবিলম্বে স্থান ত্যাগ কোরো। কারণ, তোমাদের অনৌচিত্তিক উপস্থিতি আমার নবীকে বিব্রত করে। তিনি লজ্জাবশতঃ একথা বলতেও পারেন না। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে সংকোচবোধ করেন না। কারণ সুশিক্ষা দান তাঁরই দায়িত্বভূত। আর সুশিক্ষা তো তাঁর কৃপারই নিদর্শন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা তার পত্নীগণের নিকট থেকে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চেয়ো'। এখানে 'কিছু চাইলে' অর্থ নিত্য-প্রয়োজনীয় কিছু ধার বা অনুদান হিসাবে চাইলে অথবা ফেরত দিতে চাইলে ধার নেওয়া কোনো কিছু।

বাগবী লিখেছেন, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. এর সহধর্মিণীগণের দিকে দৃষ্টিপাত করা আর বৈধ ছিলো না, তাঁরা পর্দাচ্ছাদিত অবস্থায় থাকুক অথবা না থাকুক।

এরপর বলা হয়েছে— 'এই বিধান তোমাদের ও তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র'। একথার অর্থ— পর্দা রক্ষার এমতো বিধান এমনই একটি বিধান, যেখানে শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রবেশাধিকার মাত্রই নেই। তাই এই বিধান তোমাদের এবং তোমাদের ধর্মমাতাগণের আন্তরিক পবিত্রতার রক্ষাকবচ বলে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে নাও এবং তদনুযায়ী আমলও করো।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের কাহারো পক্ষে আল্লাহ্র রসুলকে কষ্ট দেওয়া সঙ্গত নয় এবং তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনো বৈধ নয়। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ'।

ইবনে জায়েদ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুল স. হঠাৎ জানতে পারলেন, কেউ একজন নাকি বলেছে, সে তাঁর পরলোকগমনের পর তাঁর কোনো এক পত্নীকে বিবাহ করবে। এর কিছুকাল পরেই অবতীর্ণ হয় উদ্ধৃত বাক্যাংশটি।

হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আয়াতের এই অংশটি অবতীর্ণ হয়েছে ওই ব্যক্তির কারণে, যে বলেছিলো, রসুলের লোকান্তরিত হওয়ার পর আমি বিয়ে করবো তার অমুক বিবিকে। সুফিয়ান বলেছেন, এমতো উক্তি সে করেছিলো জননী আয়েশাকে লক্ষ্য করে।

সুদ্দী বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ বলেছিলো, কী! মোহাম্মদ আমাদের চাচাতো বোনের সঙ্গে আমাদেরকে পর্দা করতে বলে! আবার সে বিয়ে করেছে আমাদের অনেকের প্রাক্তন বিবিকে। ঠিক আছে, সুযোগ যদি আসে তবে তার চিরবিদায়ের পর আমরাও বিবাহ করবো তাঁর বিবিদেরকে। আলোচ্য আয়াতাংশটি অবতীর্ণ হয় এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই।

www.eelm.weebly.com

আবু বকর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আমর সূত্রে ইবনে সা'দ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। সে বলেছিলো, মোহাম্মদের মৃত্যুর পর আমি বিয়ে করবো আয়েশাকে। জুয়াইবীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক লোক রসুল স. এর সহধর্মিণীগণের কোনো একজনের ঘরে বসে আলাপ করছিলো। সে ছিলো ওই উম্মতজননীর চাচাতো ভাই। রসুল স. সেখানে পৌঁছে তাকে জানিয়ে দিলেন, এখন থেকে তুমি আর তোমার চাচাতো বোনের সঙ্গে এরকম খোলামেলা আলাপ করতে পারবে না। সে বললো, আমি তো কথা বলছি আমার পিতৃব্যপুত্রীর সঙ্গে। আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো মন্দ কিছু বলিনি। রসুল স. বললেন, দ্যাখো, আল্লাহ্র চেয়ে অধিক ব্রীড়াসম্পন্ন কেউ নয়। আর আমিও নই ব্রীড়াবিবর্জিত। একথা শুনে লোকটি বিদায় নিলো। রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা হতেই বললো, আমার চাচাতো বোনের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে, তার পরলোকগমনের পর আমিও এর শোধ নিবো। বিয়ে করবো তার স্ত্রীকে। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, লোকটি তার এমতো উক্তির কারণে পরে অনুতপ্ত হয় এবং প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মুক্ত করে দেয় একটি ক্রীতদাস এবং আল্লাহ্র পথে দান করে দশটি উট। হজও করে পদব্রজে।

বাগবী লিখেছেন, জুহুরী সূত্রে মুয়াম্মার বলেছেন, রসুল স. এর পত্নীগণকে বিবাহ করার নিষিদ্ধতা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি স. আলীয়া বিনতে জুবিয়ান নাম্মী তার এক স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। পরে তিনি হন জনৈক ব্যক্তির সহধর্মিণী এবং হন বেশ কয়েকজন সন্তান-সন্ততির জননীও।

বায়যাবী লিখেছেন, রসুল স. এর ওই সকল পত্নী বিবাহনিষিদ্ধ হওয়ার বিধানের বাইরে, যারা সুযোগ পাননি তাঁর সঙ্গে একান্তবাসের। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমরের শাসনকালে আশয়াস্ ইবনে কায়েস বিয়ে করেছিলেন মুস্তায়ীজাকে। হজরত ওমর তাকে প্রস্তরনিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করতে মনস্থ করলেন। কারণ মুস্তায়ীজা ছিলেন রসুল স. এর সহধর্মিণী। কিন্তু পরে তিনি জানতে পারলেন মুস্তায়ীজার সঙ্গে রসুল স. এর একান্ত মিলন হওয়ার আগেই তিনি স. তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তখন তিনি পরিত্যাগ করলেন আশয়াসকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত।

এখানে 'আ'জীমা' অর্থ গুরুতর অপরাধ। আমি বলি, রসুল স. এর পত্নীগণকে বিবাহ করা নিষেধ একারণে যে, তিনি স. অন্যদের মতো মৃত নন। বরং তিনি স. তাঁর সমাধিতে সততজীবন্ত। সেকারণেই তাঁর সম্পত্তির ওয়ারিছ কেউ নয় এবং তাঁর পত্নীগণও নয় বিধবা। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ আমার সমাধির সন্নিকটে এসে সালাম দিলে আমি তা সরাসরি শুনি। আর দূরদেশীদের সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'তোমরা কোনো বিষয় প্রকাশ করো, অথবা গোপন রাখো— আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— যদি তোমার মনে থাকে আল্লাহ্র রসুলকে কষ্ট দেওয়ার গোপন কামনা, অথবা থাকে তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করবার অপবিত্র অভিলাষ, তবে তা কিছুতেই থাকবে না আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞানের বাইরে। কারণ তিনি যে সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানধর।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল ওই লোক, যে মনে মনে ভাবতো, রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর সে বিয়ে করবে জননী আয়েশাকে। আর এখানকার 'আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ' অর্থ মানুষের অন্তরের গোপনতম কামনাও তাঁর অবিদিত নয়। সুতরাং কেউ অন্তরে রসুল স. এর পুতঃপবিত্রা সহধর্মিণীগণের কাউকে বিবাহ করবার মতো জঘন্য লালসা লালন করলে তিনি তা অবশ্যই জানবেন এবং যথাসময়ে এমতো অপরাধীর উপরে প্রয়োগ করবেন যথোপযুক্ত শাস্তি।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. চিরসম্মানীয়া সহধর্মিণীগণের কাউকে বিবাহ করবার অভিলাষ ছিলো একটি চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সেকারণেই যে ব্যক্তি এরকম বলেছিলো, সে সানুতপ্ত মনে কাফফারারূপে মুক্ত করে দিয়েছিলো একজন ক্রীতদাস এবং আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিয়েছিলো দশটি উট। তারপর হজ সমাপন করেছিলো পায়ে হেঁটে।

বাগবী লিখেছেন, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর উম্মতজননীগণের পিতা ও ভ্রাতাগণ বলতে লাগলেন, আমরাও এখন থেকে উম্মতজননীগণের সঙ্গে কথা বলবো পর্দার অন্তরাল থেকে। তাঁদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৫৫

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٥٥﴾

r নবী-পত্নীদের জন্য তাহাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগ্নীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাহাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসিগণের ব্যাপারে উহা পালন না করা অপরাধ নহে। হে নবী-পত্নীগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর, আল্লাহ্ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

---

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— উম্মতজননীগণকে যে সকল লোকের সঙ্গে পর্দা পালন করতে হবে না, তাঁরা হচ্ছেন তাঁদের পিতাগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগ্নীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাঁদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণ। লক্ষণীয়, চাচা ও মামার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভগ্নিপুত্রের উল্লেখের পর তাঁদের উল্লেখের আর প্রয়োজন পড়ে না। আর রক্তগত সম্পর্কের দিক থেকে উম্মতজননীগণ তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্রগণের ফুফু এবং ভগ্নিপুত্রগণের খালা।

ওরওয়া ইবনে যোবায়ের সূত্রে বোখারী বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, আমার দুধপান সম্পর্কীয় চাচা আফলাহ্ একবার আমার গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখনো পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তবু আমি আমার সেই দুধ চাচাকে বললাম, রসুলুল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে আমি আপনাকে অনুমতি দিতে পারি না। তিনি চলে গেলেন। এরপর রসুল স. যখন এলেন, তখন আমি ঘটনাটি তাঁকে খুলে বললাম। তিনি স. বললেন, তুমি তাকে অনুমতি দিতে পারতে। আমি বললাম, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী। আমাকে তো দুধ পান করিয়েছিলো তাঁর ভ্রাতৃবধু। তিনি স. বললেন, আরে বোকা! তোমার হাত ধূলিধূসরিত হোক। তিনি তো তোমার চাচা, পিতৃসমতুল। ওরওয়া বলেন, একারণেই জননী আয়েশা বলতেন, বংশগতভাবে যারা মুহরিম, দুধপান সম্পর্কেও তারা মুহরিম।

এখানে 'ওয়ালা নিসাইহিন্না' (সেবিকাগণ) বলে ওই সকল রমণীর কথা বলা হয়েছে, যারা স্বাধীনা। আর 'মা মালাকাত আইমানুহুন্না' (দাস-দাসীগণ) অর্থ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীরা। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে কেবল ক্রীতদাসীগণকে। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে সুরা নুরের তাফসীরে।

শেষে বলা হয়েছে— 'হে নবীপত্নীগণ! আল্লাহ্কে ভয় করো'। একথার অর্থ— হে রসুলের সহধর্মিণীবৃন্দ! পর্দার বিধানের পরিপন্থী আমল করার ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো। মনে রেখো, এই বিধান সেই আল্লাহ্র, যিনি মহাবিশ্বের এক ও একক অধিপতি। আর তিনি তাঁর বিধানবিরোধীদেরকে শাস্তি দিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

সর্বশেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন'। একথার অর্থ— সকলের সকল কিছুই আল্লাহ্র প্রত্যক্ষগোচর। সুতরাং তিনি পুণ্যকর্মশীলাদেরকে করবেন পুরস্কৃত এবং তিরস্কৃত করবেন পাপলিপ্তাদেরকে।

www.eelm.weebly.com

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٥٦﴾

r আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁহার ফিরিশ্তাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাহাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে'।

হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুলের উপর বর্ষণ করেন করুণা এবং তাঁর ফেরেশতারাও কৃপাপ্রার্থী হন তাঁর প্রিয় রসুলের জন্য। এক বর্ণনায় এসেছে, কথাটির অর্থ— আল্লাহ্ তাঁর নবীকে দান করেন বরকত এবং ফেরেশতারাও তাঁর প্রিয় সখার জন্য করেন ক্ষমাপ্রার্থনা। হাদিস শরীফসমূহের বর্ণনাদৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, 'সালাত' শব্দটি আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে এর অর্থ দাঁড়াবে রহমত, অনুগ্রহ, করুণা, মহিমা। আর ফেরেশতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে অর্থ দাঁড়াবে দোয়া, প্রার্থনা বা ক্ষমাপ্রার্থনা। আর মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলে অর্থ হবে— তোমরা অনুগ্রহপ্রার্থী হও তোমাদের মহামহিম রসুলের জন্য, দোয়া করো, যেনো তাঁর উপরে হয় আল্লাহ্র রহমতের সীমাহীন বর্ষণ। আর তার প্রতি প্রেরণ করো শান্তি সম্ভাষণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও'।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, জীবনে অন্ততঃপক্ষে একবার রসুল স. এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা অত্যাবশ্যক। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক এরকম বলেছেন। তাহাবীর অভিমতও এরকমই। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, উদ্ধৃত বিধানটি অপরিহার্য হওয়ার দাবিদার। সুতরাং জীবনে একবারের জন্য হলেও রসুল স. এর প্রতি প্রেরণ করতে হবে দরূদ। কারণ আমাদের কাছে আদেশসূচক বাক্যের অন্তর্গত বিধানের পৌনঃপুনিকতা সুস্বীকৃত নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পরে দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। এরকম বলেছেন ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদও।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য, উম্মতের মতানৈক্যের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র করুণা। তাই দেখা যায়, নামাজের মধ্যেই দরূদ পাঠের মূল্যায়ন সূচিত হয়েছে পৃথক পৃথকভাবে। যেমন ইমাম আবু হানিফার ও ইমাম মালেকের মতে নামাজের ভিতরের দরূদ শরীফ যথাস্থানে পাঠ করা সুন্নত। ইমাম শাফেয়ীর মতে ফরজ। ইমাম আহমদের অভিমত পাওয়া যায় দু'টি— এক বর্ণনানুসারে ফরজ এবং অপর বর্ণনানুসারে সুন্নত। এরকম বলেছেন ইবনে জাওজী। অনেকে বলেন, রসুল স. এর নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ ওয়াজিব হয়ে যায়।

ইমাম কারখী বলেছেন, নামাজে দরূদ পাঠ করা ফরজ— এই অভিমতের প্রবক্তারা প্রমাণ উপস্থিত করেন হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকে দারাকুতনীর পদ্ধতিতে ইবনে জাওজী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস দ্বারা, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যারা নামাজের মধ্যে দরূদ পাঠ করে না তাদের নামাজ হয়ে যায় পণ্ড। দারাকুতনী বলেছেন, এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহভূত বর্ণনাকারী আবদুল মুহাইমিন ইবনে আব্বাস ইবনে সহল ইবনে সা'দ বর্ণনাকারী হিসেবে অবলিষ্ঠ। ইবনে হাব্বান তাই বলেছেন, বর্ণনাটি প্রামাণ্য নয়।

ইবনে জাওজীর বর্ণনায় এসেছে, ওজুবিহীন নামাজ নামাজই নয়। ওজুর পূর্বক্ষণে আল্লাহ্‌র নামোচ্চারণ না করলে ওজুই হয় না। দরূদবিহীন নামাজও নামাজ নয়। আনসারগণের প্রতি যার দরূদ নেই, তার নামাজ অগ্রাহ্য। এই হাদিসেরও এক বর্ণনাকারী অবলিষ্ঠ আবদুল মুহাইমিন। তাই তার বর্ণনা দলিলরূপে গণ্য নয়। কিন্তু উবাই ইবনে আব্বাস ইবনে সহল ইবনে সা'দ তাঁর পিতা ও পিতামহ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুপরিণতসূত্রে। আলেমগণের কেউ কেউ বলেছেন, আবদুল মুহাইমিন কর্তৃক বর্ণিত হাদিস বিশুদ্ধতার নিকটবর্তী। তাঁরা আরো বলেছেন, উবাই ইবনে আব্বাস বিতর্কাহত।

হজরত আবু মাস্‌উদ আনসারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে নামাজ পাঠ করলো, অথচ আমার প্রতি আমার বংশধরদের প্রতি দরূদ পাঠ করলো না তার নামাজ গ্রহণযোগ্য নয়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনীর পদ্ধতিতে ইবনে জাওজী। ইবনে জাওজী মন্তব্য করেছেন, হাদিসটির সূত্রপ্রবাহভূত বর্ণনাকারী জাবের জু'ফী বর্ণনাকারীরূপে অশক্ত। আরো বলেছেন, জাবের জু'ফী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দু'টি সূত্রে— একবার হজরত ইবনে মাসউদ পর্যন্ত পরিণতসূত্রে। আর একবার সুপরিণতসূত্রে। এই সূত্রবৈপরীত্যই বর্ণনাটিকে করেছে অদৃঢ়। ইবনে হুম্মাম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে এবং বলেছেন, ইবনে জাওজীর অভিমতানুসারে এই হাদিসের এক বর্ণনাকারী জাবের দুর্বল। তিনিই বর্ণনাটির সূত্রবৈষম্য ঘটিয়েছেন। বর্ণনা করেছেন পরিণত ও সুপরিণত দু'রকম সূত্রে।

www.eelm.weebly.com

হাকেম ও বায়হাকী বনী হারেছ গোত্রের ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাব্বাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন তোমরা তাশাহ্হুদ পাঠ করার পরে পাঠ কোরো— 'আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদ ওয়াবারিক আ'লা মুহাম্মাদ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদ। কামা সল্লাইতা ওয়াবারাকতা ওয়া তার হামতা আ'লা ইবরহীম ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ'। হারেছ ইবনে হাজাম বলেছেন, কেবল হারেছী ব্যতীত হাদিসটির অন্য সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। সমালোচিত শুধু হারেছ।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, 'যারা আমার উপর দরূদ পাঠ করে না, তাদের নামাজ হয় না' এই হাদিসটির সূত্রশৃঙ্খল শিথিল। হাদিসবেত্তাগণ এরকমই মন্তব্য করেছেন। যদি হাদিসটিকে যথাসূত্রসম্বলিত বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে এর মর্মার্থ দাঁড়াবে— দরূদশরীফ বিবর্জিত নামাজ অপূর্ণ। অথবা মর্মার্থ হবে— কেউ যদি তার সারাজীবনের কোনো এক ওয়াক্তের নামাজে একবারও দরূদ শরীফ না পড়ে তবে তার নামাজ বৃথা।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, এই হাদিসের সূত্র অপেক্ষা হজরত ফুজালা ইবনে উবাইদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের সূত্রপরম্পরা অধিকতর সুদৃঢ়। তিনি বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এক লোককে নামাজের মধ্যে দোয়া করতে শুনলেন। কিন্তু সে দরূদ পাঠ করলো না। নামাজ শেষে তিনি স. তাকে ডেকে অন্যান্যদেরকে শুনিয়ে বললেন, এই লোকটি তার দোয়াকে করেছে সংক্ষিপ্ত। জেনে রাখো, নামাজে প্রথমে বর্ণনা করতে হয় আল্লাহ্র স্তব-স্তুতি। তারপর দরূদ পাঠ করতে হয় আমার উপর। তারপর চাইতে হয় যা রয়েছে চাওয়ার। আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, ইবনে খুজাইমা, হাকেম।

তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এভাবে— হজরত ফুজালা বলেছেন, রসুল স. মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক লোক এসে নামাজ পড়তে শুরু করলো। নামাজ শেষে বললো, হে আল্লাহ্ আমাকে মার্জনা করো। কৃপা করো। রসুল স. বললেন, ওহে নামাজী! তুমি তো তাড়াহুড়া করলে। জেনে নাও, নামাজ শেষে তোমাকে বসতে হবে। প্রথমে প্রকাশ করতে হবে আল্লাহ্র প্রশংসা। তারপর আমার প্রতি পাঠ করতে হবে দরূদ। তারপর চাইতে হবে, যা কিছু তোমার প্রয়োজন। বর্ণনাকারী বলেছেন, কিছুক্ষণ পর সেখানে উপস্থিত হলো আর এক লোক। সে নামাজ শেষে প্রকৃষ্ট বাক্যে বর্ণনা করলো আল্লাহ্র প্রশংসা ও মহিমা। তারপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো রসুল স. এর উপর। রসুল স. বললেন, ওহে নামাজী! এবার তোমার একান্ত প্রার্থনা প্রকাশ করো। তোমার প্রার্থনা এবার গৃহীত হবে। তিরমিজি, নাসাঈ এবং আবু দাউদও এরকম বর্ণনা করেছেন।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, নামাজে তাশাহ্হুদের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা যে অত্যাবশ্যক, সে কথা প্রমাণ করা যায় এভাবে— আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নামাজের মধ্যেকার দরূদ শরীফ পাঠের। এর দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্যান্য আয়াতেও। যেমন— 'ওয়া রব্বাকা ফাকাব্বির' এই আয়াতে বলা হয়েছে নামাজের তাকবীরে তাহরীমার (প্রথম তাকবীরের) কথা। 'কুমু লিল্লাহি ক্বনিতীন' এসেছে নামাজের কিয়ামের উল্লেখ। 'ওয়াস্‌জুদু ওয়ারকাউ' তে নির্দেশ করা হয়েছে নামাজের রুকু ও সেজদাকে। আবার 'ফাক্বরাউ মা তাইয়াস্‌সারা মিনাল কুরআন' তে নির্দেশ এসেছে নামাজের ক্বেরাতের। হজরত কা'ব ইবনে উজরা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসেও রয়েছে একথার প্রমাণ। হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার প্রতি শান্তিসম্ভাষণের পদ্ধতি তো আমরা জানি। বলি, আস্‌সালামু আ'লাইকা আইয়ুহান নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লহি ওয়া বারাকাতুহু। কিন্তু দরূদ কীভাবে পাঠ করতে হয় তাতো আমরা জানি না। তিনি স. বললেন, তোমরা পাঠ কোরো 'আল্লাহুম্মা সল্লিআ'লা মুহাম্মদ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মদ........ শেষ পর্যন্ত। মতৈক্য সহকারে মুসলিম উম্মত একথা স্বীকার করে নিয়েছে যে, নামাজে তাশাহহুদ পাঠের পর দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে। তবে এরকম করা সুন্নত না ওয়াজিব কেবল সে সম্পর্কে ঘটেছে মতানৈক্য। বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমেও একথা প্রমাণিত হলো যে, দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে তাশাহ্হুদের পর। আর যারা বলেন রসুল স. এর নাম উচ্চারণ করার পরক্ষণেই দরূদ পাঠ করতে হবে, তাঁরা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তির নাসিকা ধূলিধূসরিত হোক, যে আমার নাম শুনেও দরূদ পাঠ করে না। মৃত্তিকায়িত হোক ওই ব্যক্তির নাকও, যে রমজান মাস পেলো, অথচ মাফ করিয়ে নিতে পারলো না তার পাপরাশি। আর ধূলায়িত হোক ওই লোকের নাসিকাও, যে তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার যে কোনো একজনকে পেয়েও অর্জন করে নিতে পারলো না জান্নাত। তিরমিজি, ইবনে হাব্বান।

হজরত জাবের ইবনে সামুরা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হলো, অথচ তা শুনে যে আমার উপরে দরূদ পাঠ করলো না, সে যদি নরকে প্রবেশ করতে চায় তো করুক। আল্লাহ্ যদি তাকে দূরেই রাখতে চান তো রাখুন। সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, একবার জিবরাইল আমাকে বললো, যার সামনে আপনার নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ তা শুনেও যে আপনার উদ্দেশ্যে দরূদ পাঠ করলো না, সে যদি দোজখে যেতে চায়, তবে আল্লাহ্ তাকে দূরেই রেখে দিন। হাদিসদ্বয় সংকলন করেছেন তিবরানী।

www.eelm.weebly.com

হজরত জাবের থেকে সুপরিণত সূত্রে ইবনে সুন্নী উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার নাম শ্রবণ করা সত্ত্বেও দরূদ পাঠ করে না, সে হতভাগা। হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার নাম উচ্চারিত হতে শুনেও যে ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্যে দরূদ পাঠ করে না, সে কৃপণ। হাদিসটি বর্ণনা করেছে তিরমিজি এবং বলেছেন, বর্ণনাটি উত্তম, বিশুদ্ধ ও দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর। ইমাম আহমদ ও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম হোসাইন থেকে। তাঁর নিকট থেকে আবার সুপরিণতসূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, আমার নাম শোনার পরেও যার দরূদ পরিত্যক্ত হলো, তার পরিত্যক্ত হলো জান্নাতও। হজরত আনাস থেকে যথাসূত্রে নাসাঈ উল্লেখ করেছেন, যার সাক্ষাতে আমার নাম উচ্চারিত হবে, আমার উদ্দেশ্যে দরূদ শরীফ পাঠ করা হবে তার কর্তব্য। যে আমার উদ্দেশ্যে দরূদ প্রেরণ করে একবার, আল্লাহ্ তার উপরে রহমত বর্ষণ করে দশবার।

দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলত ও তাৎপর্য ঃ আবদুর রহমান ইবনে আবী লাইলা বর্ণনা করেছেন, একবার আমার সাক্ষাত ঘটলো হজরত কা'ব ইবনে উজরা সঙ্গে। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদিস উপহার দিবো, যা আমি রসুল স. এর নিকট থেকে শুনেছি স্বকর্ণে? আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি বললেন, একবার আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! আমরা তো জানি, কীভাবে আপনাকে সালাম করতে হয়। কিন্তু আপনার প্রতি এবং আপনার অভিমত বংশধরগণের প্রতি কীভাবে দরূদ পাঠ করতে হয়, তাতো আমরা জানি না। তিনি স. বললেন, এভাবে— 'আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মদ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদ কামা সল্লাইতা আ'লা ইব্রহীম। ওয়া আ'লা আলি ইব্রহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারকতা আ'লা ইব্রহীম ওয়া আ'লা আলি ইব্রহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ'। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় 'আ'লা ইব্রহীম' এর স্থলে এসেছে 'ওয়া আ'লা আলি ইব্রহীম'।

হজরত আবু হামীদ সায়েদী বলেছেন, একবার সাহাবীগণ রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আপনার উপরে আমরা কীভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবো তা শিখিয়ে দিন। তিনি স. বললেন এভাবে— 'আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদ ওয়া আযওয়াজ্বিহী ওয়া জুররিয়্যাতিহী কামা সল্লাইতা আ'লা ইব্রহীম। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আযওয়াজ্বিহী ওয়া জুররিয়্যাতিহী কামা বারকতা আ'লা ইব্রহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপরে দরূদ পাঠ করবে একবার, আল্লাহ্ তার উপরে রহমত বর্ষণ করবেন দশবার। মুসলিম। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি আমার উপরে

www.eelm.weebly.com

একবার দরূদ পড়বে, আল্লাহ্ তার উপরে রহমত বর্ষণ করবেন দশবার। মার্জনা করবেন তার দশটি পাপ এবং তার মার্যাদা বাড়িয়ে দিবেন দশগুণ। বোখারী, আহমদ, নাসাঈ, হাকেম। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহাবিচারের দিবসে ওই ব্যক্তি হবে আমার অধিকতর নৈকট্যভাজন, যে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে অত্যধিক। তিরমিজি। তাঁর নিকট থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, ধরাপৃষ্ঠে কিছুসংখ্যক ফেরেশতা থাকে পরিভ্রমণরত। উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাদের কাজ। নাসাঈ, দারেমী।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কেউ আমার কাছে সালাম প্রেরণ করলে আল্লাহ্ আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন আমার রূহকে। তখন আমি দান করি তার সালামের প্রত্যুত্তর। আবু দাউদ, বায়হাকী। তাঁর নিকট থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমাদের গৃহগুলোকে কবর বানিয়ো না। আর অপরিচ্ছন্ন রেখো না আমার সমাধিকে। আর আমার প্রতি প্রেরণ কোরো নিরবচ্ছিন্ন দরূদ। তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো, তোমার দরূদ আমার কাছে পৌঁছানো হবে।

হজরত আবু তালহা বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. আমাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন প্রফুল্ল বদনে। বললেন, জিবরাইল এই মাত্র বলে গেলো, আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেছেন তুমি আমার প্রিয়তম রসুলকে গিয়ে বলো, তিনি কি একথা জেনে খুশী হবেন না যে, যে ব্যক্তি তার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আমি তার উপরে রহমত বর্ষণ করবো দশবার? আর যে একবার তার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার উপরে শান্তি বর্ষণ করবো দশবার? নাসাঈ, দারেমী।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আপনার প্রতি অগণিতবার দরূদ পাঠ করি। তাই জানতে চাই, এর কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে কী? তিনি স. বললেন, যতোবার ইচ্ছা ততোবারই পাঠ করতে পারো। যতবেশী পাঠ করবে ততোই উপকৃত হবে। আমি বললাম , যদি আমি আমার জিকির ও দোয়ার এক চতুর্থাংশ সময় দরূদ শরীফের জন্য নির্ধারণ করি? তিনি স. বললেন, তা-ও করতে পারো। তবে যতো করবে ততোই লাভ। বললাম, যদি নির্ধারণ করি দুই তৃতীয়াংশ সময়। তিনি স. বললেন, তা-ও করতে পারো। তবে যতো করবে ততোই মঙ্গল। পুনরায় বললাম, যদি আমার দোয়া প্রার্থনার পুরোটা সময় নির্ধারণ করি দরূদ শরীফের জন্য? তিনি স. জবাব দিলেন, তাহলে তো তিরোহিত হবে তোমার সকল দুশ্চিন্তা। পূর্ণ হবে মনোবাসনা। আর নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে তোমার যাবতীয় পাপরাশি। তিরমিজি।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার একথা জেনে যদি কেউ আনন্দিত হতে চায় তবে সে শুনে রাখুক, কেউ যদি আমার পরিবার পরিজনদের জন্য দোয়া করে তবে সে কল্যাণ লাভ করবে তার গোটা পরিবারের জন্য। আর সে যেনো দোয়া করে এভাবে— 'আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিনিন্ নবীয়্যিল উম্মি ওয়া জুররিয়্যাতিহী ওয়া আহলি বাইতিহী ওয়া আযওয়াজ্বিহী উম্মাহাতিল মু'মিনীন ওয়া জুররিয়্যাতিহী ওয়া আহলি বাইতিহী কামা সল্লাইতা আ'লা ইব্রহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আবু দাউদ।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন, যে ব্যক্তি রসুল স. এর প্রতি দরূদ পাঠ করে একবার, আল্লাহ্ এবং তার ফেরেশতারা তাঁর উপরে করুণা বর্ষণ করেন সত্তরবার।

হজরত রওয়াইফা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তির জন্য আমার শাফায়াত করা হবে ওয়াজিব, যে ব্যক্তি দরূদ পাঠকালে বলবে 'আল্লাহুম্মা আন্যিলহুল মাকআ'দাল মুক্বাররাবা ইনদাকা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ওয়াজাবাত্ লাহু শাফাআতী' (হে আল্লাহ্! মহাবিচারের দিবসে তুমি আমাকে মোহাম্মদ স. এর নৈকট্যভাজন কোরো)।

হজরত আবুদর রহমান ইবনে আউফ বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. তাঁর গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উপস্থিত হলেন একটি উদ্যানে। তারপর সেজদাবনত হয়ে কাটিয়ে দিলেন অনেকক্ষণ। তাঁর এমতো প্রলম্বিত সেজদা দেখে একবার আমার মনে হলো, তিনি স. তবে কি পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন? সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম। তিনি স. মস্তক উত্তোলন করে বললেন, কী হয়েছে? আমি আমার সংশয়ের কথা জানালাম। তিনি স. বললেন, জিবরাইল আমাকে একটি শুভবারতা জানালো। বললো, আল্লাহ্ আপনার সন্তোষ সাধনার্থে বলে পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করবে, আমি তার প্রতি অবতীর্ণ করবো রহমত এবং যে ব্যক্তি আপনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবে সালাম, আমিও তাকে প্রতিদানে দিবো শান্তিসম্ভাষণ। আহমদ।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, রসুল স. এর প্রতি দরূদ পাঠ না করা পর্যন্ত সকল প্রার্থনা আটকে থাকে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে, ঊর্ধ্বে উত্থিত হয় না এতোটুকুও। তিরমিজি।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমের ইবনে রবীয়া বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, কেউ আমার উপরে যতোবার দরূদ পাঠ করবে, ফেরেশতারাও তার উপরে করুণা বর্ষণ করবে ততোবার। এখন আল্লাহ্র বান্দাগণের ইচ্ছা, তারা দরূদ পাঠ করবে অধিক, না অনধিক। বাগবী।

www.eelm.weebly.com

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, তার আমলনামায় পুণ্য লেখা হবে এক কীরাত। আর এক কীরাত পুণ্যের পরিমাণ উহুদ পর্বতের সমান। উত্তম সূত্র সহযোগে আবদুর রাজ্জাক হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর জামে গ্রন্থে।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় দশবার করে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে, সে অর্জন করবে আমার শাফায়াত। তিরমিজি তাঁর 'কবীর' গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন উত্তমসূত্র পরম্পরা সহযোগে।

বিবেচনায়ন ঃ হজরত আবু বকর সিদ্দীক বলেছেন, একবার আমি রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে রসুল স. কে সালাম বললো। তিনি স. তার সালামের প্রত্যুত্তর করলেন। তারপর তাঁকে পাশে বসালেন। কার্য সমাধার পর লোকটি চলে গেলে রসুল স. বললেন, আবু বকর! লোকটির এক দিনের পুণ্যকর্ম সারা বিশ্বের পুণ্যকর্মের সমতুল। আমি বললাম, কীভাবে? তিনি স. বললেন প্রতিদিন সকালে যে আমার প্রতি এমনভাবে দশবার দরূদ পাঠ করে, যা হয়ে যায় সমগ্র সৃষ্টির দরূদ পাঠের সমান। আমি বললাম, আমি কি তা জানতে পারি? তিনি স. বললেন, নিশ্চয়ই। সে বলে— 'আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন নাবীয়্যী আদাদা মান সল্লা মিন খলক্বিকা ওয়া সল্লি আ'লা মুহাম্মাদ কামা ইয়ামবাগী লানা আন্ নুসাল্লি আলাইহি ওয়া সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন নাবীয়্যী কামা আমারতানা আন্ নুসাল্লি আলাইহ্।'

হজরত আবু বকর সিদ্দীক আরো বলেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, আমার প্রতি দরূদপাঠ করলে এমনভাবে পাপরাশি দূর হয়, যেমন পানি দূর করে দেয় অগ্নির অস্তিত্ব। একজন ক্রীতদাস মুক্ত করা অপেক্ষা দরূদ পাঠ উত্তম। আর রসুল স.কে ভালোবাসা আল্লাহ্র পথে বুকের তাজা খুন ঝরানো অপেক্ষা উত্তম। অথবা বলেছেন, উত্তম আল্লাহ্র পথে তরবারী চালনার চেয়েও।

মাসআলা ঃ দরূদ ও সালাম কেবল পঠিত হতে পারে নবী-রসুলগণের উদ্দেশ্যে। তবে তাঁদের সঙ্গে অন্যকে যুক্ত করেও দরূদ পাঠ করা যায়। কিন্তু তাঁদেরকে বাদ দিয়ে সরাসরি অনবী অথবা অরসুল কারো প্রতি দরূদ পাঠ বৈধ নয়। যেমন 'আয্যা' ও 'জ্বাললা' শব্দ দু'টো ব্যবহৃত হয় কেবল আল্লাহ্র মহিমা প্রকাশার্থে। কিন্তু নবী-রসুলগণ মহিমান্বিত হওয়া সত্ত্বেও কেবল তাঁদের জন্য শব্দ দু'টোর ব্যবহার সিদ্ধ নয়। তবে আল্লাহ্র নামের সঙ্গে তাঁদের নামের উল্লেখ থাকলে শব্দ দু'টোর ব্যবহার দূষণীয় নয়। বিষয়টির সবিস্তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে সুরা তওবার তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যায়।

www.eelm.weebly.com

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

r যাহারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ্ তো তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

প্রথমে বলা হয়েছে—'ইন্নাল লাজীনা ইউজূনাল্লহ'। এর অর্থ— নিশ্চয় যারা পীড়া দেয় আল্লাহ্কে। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'যারা পীড়া দেয়' বলে বুঝানো হয়েছে ইহুদী, খৃষ্টান ও অংশীবাদীদেরকে। তাদের পীড়া দেওয়ার নমুনা এরকম— ইহুদীরা বলে, 'হজরত উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র' 'আল্লাহ্র হাত ময়লাযুক্ত' 'আল্লাহ্ মুখাপেক্ষী এবং আমরা ধনী' ইত্যাদি। আর খৃষ্টানেরা বলে 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনের মধ্যে তৃতীয়'। আর অংশীবাদীরা বলে 'ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা' ' প্রতিমাগুলো আল্লাহ্র সমকক্ষ' ইত্যাদি।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন— আদম সন্তান আমার উপরে অসত্যারোপ করে। এটা তাদের অন্যায়। তারা আমাকে গালি দেয়। এটাও অপরাধ। তারা বলে 'আল্লাহ্ যেভাবে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে দ্বিতীয়বার আর সৃষ্টি করবেন না' অথচ প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি সহজ। এটাই আমার প্রতি তাদের অসত্যারোপের নমুনা। তারা আরো বলে 'আল্লাহর সন্তান আছে' 'ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা'। অথচ আমি এক, অদ্বিতীয়। কারো পিতা-পুত্র হওয়া থেকে আমি চিরপবিত্র, চির অসমকক্ষ। এভাবেই তারা গালি দেয় আমাকে। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় কথাটি এসেছে এভাবে— তারা বলে, আল্লাহ্র সন্তান-সন্ততি আছে। অথচ আমি এ সকল কিছু অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে। ভার্যা গ্রহণ থেকে আমি তো চিরপবিত্র। তারা তো আমাকে বুঝতেই পারে না। বোখারী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন— আদম সন্তানেরা কালচক্রকে অশুভ বলে আমাকে ক্লেশ দেয়। অথচ কালচক্র আমিই। আমিই একমাত্র বিধানদাতা। আমিই দিবারাত্রির বিবর্তক। বোখারী, মুসলিম। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ক্লেশ দেওয়ার অর্থ আল্লাহ্র পরম সত্তা ও গুণবত্তাকে কলুষিত করা। ইকরামা বলেছেন 'ক্লেশ দেয়' অর্থ মুর্তি নির্মাণ করে।

www.eelm.weebly.com

আবু যারআর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আমি স্বকর্ণে রসুল স.কে উল্লেখ করতে শুনেছি, আল্লাহ্ বলেন— তার চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে আমার সৃষ্টির সাদৃশ্য তৈরী করে। যদি তাদের সামর্থ্য থাকে, তবে তারা একটা পিপিলীকা সৃষ্টি করে দেখায় না কেনো? অথবা সৃষ্টি করে না কেনো একটি শস্যদানা অথবা যব। বোখারী, মুসলিম।

বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রতিমা নির্মাণকারীকে মহাবিচারের দিবসে শাস্তি প্রদান করা হতেই থাকবে, যতক্ষণ না সে প্রাণসঞ্চার করতে পারবে ওই মুর্তির। ফলে তার শাস্তি হবে প্রলম্বিত।

কোনো কোনো আলেম 'পীড়া দেয়' কথাটির অর্থ করেছেন— তারা পাপবিজড়িত হয় ও আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। কেননা সৃষ্টির মতো সুখ-দুঃখ অনুভব করা থেকে আল্লাহ্ চিরপবিত্র।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া রসূলাহু'। এর অর্থ— এবং পীড়া দেয় তাঁর রসুলকে। রসুলকে পীড়া দেওয়ার নমুনা এরকম— তারা আমার রসুলকে রক্তরঞ্জিত করেছে। উৎপাটিত করেছে তাঁর পবিত্র দন্ত। কেউ কেউ বলেছে, তিনি যাদুকর। কেউ বলেছে, উন্মাদ। কেউ বলেছে, কবি। উল্লেখ্য, এমতো ব্যাখ্যা তাদের মনোভাবের অনুকূল, যারা একই সময়ে একটি শব্দের দু'টি অর্থ গ্রহণকে সিদ্ধ মনে করেন। কিন্তু জমহুরের মতে এখানকার 'ইউজুনা' শব্দের অর্থ একটাই। আর তা হচ্ছে— তারা এমন কর্ম করে, যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের দৃষ্টিতে অপ্রীতিকর। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'পীড়া দেয় আল্লাহ্কে' কথাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে তাঁর রসুলেরই মহান মর্যাদা। অর্থাৎ এখানে রসুলকে কষ্ট দেওয়াই আল্লাহ্কে কষ্ট দেওয়া। যেনো বলা হয়েছে— তারা আল্লাহ্র রসুলকে পীড়া দিয়ে প্রকারান্তরে পীড়া দিয়েছে আল্লাহ্কেই।

আউফির সূত্রে ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. যখন হজরত সাফিয়া বিনতে হুয়াইকে বধু বেশে ঘরে তুললেন, তখন কিছুসংখ্যক লোক হয়ে উঠলো সমালোচনামুখর। তাদের ওই সমালোচনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

জুহাক সূত্রে জুয়াইবীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্যে আয়াত। পুতঃপবিত্রা জননী আয়েশার নামে তারা কলংক রটিয়েছিলো। রসুল স. তখন সকলকে সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। বলেন, যারা আমাকে ক্লেশ দেয় এবং ক্লেশদাতাদের আশ্রয় দেয় তাদের গৃহে, তাদের যদি সাহস থাকে তো আমার সামনাসামনি হয়ে প্রতিবাদ করুক। তার এমতো ভাষণ দানের পরেই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

www.eelm.weebly.com

হজরত আনাস ও হজরত আবু হুরায়রা কতৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ বলেন যে ব্যাক্তি আমার কোনো ওলীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে, বর্ণনান্তরে শত্রুতা পোষণ করে, সে যুদ্ধংদেহী হয় আমার বিরুদ্ধেই। আমার সকল কর্ম সংশয়াতীত কিন্তু আমি সংশয়াকুল হই বিশ্বাসীগণের প্রাণবিয়োগের সময়। যেহেতু মৃত্যু তাদের নিকট অপ্রিয়। আর আমি তাদেরকে অতুষ্টও করতে চাই না। কিন্তু মৃত্যু তো অবধারিত। পার্থিব অনাসক্তিই বিশ্বাসীদেরকে আমার নৈকট্য ভাজন করে। সুতরাং এরকম যারা নয়, তারা আমার নৈকট্যভাজন হওয়ার সৌভাগ্য পায় না। আর কোনো ইবাদতই ফরজ ইবাদতের সমতুল নয়।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. জানিয়েছেন মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ বলবেন, ওহে আদম সন্তানেরা! আমি পীড়িত হয়ে পড়েছিলাম । অথচ তুমি আমার শুশ্রূষা করোনি। মানুষ বলবে হে আল্লাহ! হে মহাবিশ্বের মহানতম অধিপতি। তুমি পীড়িত হও কিরূপে? আল্লাহ বলবেন, তুমি তো জানতে আমার অমুক বান্দা পীড়িত হয়ে পড়েছিলো। একথা শুনেও তুমি তার সেবাযত্ন করোনি। যদি করতে তবে দেখতে পেতে। আমি সেখানেই উপস্থিত। হে আদমের বংশধর! আমি তোমার নিকট যাচ্না করেছিলাম আহার্য। কিন্তু তুমি তা দাওনি .... শেষ পর্যন্ত। মুসলিম।

আমি বলি, যখন আল্লাহর ওলীর সঙ্গে শত্রুতা অর্থ আল্লাহর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ এবং তাঁর ওলীগণের অসুস্থতা তাঁর নিজের অসুস্থতা, তখন বুঝতে হবে বিষয়টি রীতিমত রহস্যময়। কিন্তু একথাটিও ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর ওলীর এমতো সম্পর্ক অনুমান ও অনুভবের অতীত। আর সাধারণ ওলীর সঙ্গে যদি আল্লাহ্র এরকম ঘনিষ্ঠ সর্ম্পক হয়, তবে তাঁর প্রিয়তম রসুলের সঙ্গে তাঁর সর্ম্পক কতো ঘনিষ্ঠ তা নিশ্চয় অননুমাননীয়। সুতরাং তাঁকে ক্লেশ দেওয়ার অর্থ যে আল্লাহ্কে ক্লেশ দেওয়া তা বলাই বাহুল্য। আলোচ্য আয়াতে তাই আল্লাহ্র রসুলকে পীড়া দেওয়াকেই বলা হয়েছে আল্লাহ্কে পীড়া দেওয়া।

বর্ণিত হাদিস সমুহের আলোকে কেউ কেউ 'যে আল্লাহকে পীড়া দেয়' কথাটির অর্থ করেছেন যে পীড়া দেয় আল্লাহ্র ওলীকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়াসআলুল ক্বরীয়াতা' (জনপদকে জিজ্ঞেস করো)। এর অর্থ জিজ্ঞেস করো জনপদবাসীকে। এরকম অর্থ করতে হয় সম্বন্ধপদকে অনুক্ত মেনে নিয়ে। আমি বলি, এরকম ব্যাখ্যা অযথার্থ। কারণ এতে করে রসুল স. এর প্রসঙ্গ চলে যায় নেপথ্যে। আর ওলীগণের প্রসঙ্গ পায় অগ্রাধিকার, যা অচিন্তনীয়। যদি কেউ বলে, রসুল স. ও তো আল্লাহর ওলী। তাই এখানে সাধরণভাবে ওলীগণের উল্লেখের পর বিশেষভাবে এসেছে রসুল স. এর উল্লেখ। সমষ্টির বিবরণ দানের পর একক ব্যক্তিত্বের আলোচনা সুসমঞ্জস বাকবিন্যাসের পরিপন্থী নয়। কিন্তু এরকম জবাবও অগ্রাহ্য। কারণ এতে করে পুনরাবৃত্তি ঘটবে বিশ্বাসীগণের প্রসঙ্গের, যা অযৌক্তিক ও অশোভন।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তো তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি'। আলোচ্য আয়াতাংশে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটি প্রশ্নময় বক্তব্য। যেনো বলা হয়েছে— আমরা তো আদিষ্ট হয়েছি আমাদের প্রিয়তম রসুলের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতে। কিন্তু যারা এরকম করেনা, উপরন্তু তাঁকে বিভিন্ন ভাবে ক্লেশ পৌঁছায়, তাদের প্রতিফল কী? এই প্রশ্নের জবাবই আলোচ্য আয়াতাংশে ধ্বনিত হয়েছে এভাবে— পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীতে তারা অভিশপ্ত এবং তাদের জন্যই প্রস্তুত রাখা হয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

মাসআলাঃ রসুল স. এর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, বংশ, ধর্ম অথবা গুণ সম্পর্কে সরাসরি অথবা ইঙ্গিতার্থক দোষ অন্বেষণ কিংবা সমালোচনা কুফরী। এরকম নিন্দুক ও সমালোচক ইহকাল ও পরকালে অভিশপ্ত। জাগতিক শাস্তির মাধ্যমে তার পাপক্ষয় হবে না। কবুল করা হবে না তার তওবাও। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, যে ব্যক্তি রসুল স. এর প্রতি অন্তরে বিরূপ ধারণা রাখে, সে ধর্মত্যাগী (মুরতাদ)। তাঁর প্রতি কটুক্তি যে করে, সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী (কাফের)। তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তওবা করলেও তার শাস্তি রহিত হবে না। ফেকাহ্ তত্ত্ববিদগণ বলেন, এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা, তাঁর প্রধান শিষ্যদ্বয় ও ইমাম মালেক। এক বর্ণনানুসারে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের অভিমতও এরকম।

রসুল স. এর দোষ বর্ণনাকারীর উপরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতেই হবে, যদিও সে অকপটে দোষ স্বীকার করে অথবা তওবা করে কিংবা অপরাধ অস্বীকার করে। কুফরীর অন্যান্য অপরাধ প্রদান করা হয় সাক্ষ্যের দ্বারা, যদি অপরাধী তার দোষ অস্বীকার করে। কিন্তু রসুল স.এর দোষ বর্ণনাকারী তার দোষ অস্বীকার যদি করে এবং তার সপক্ষে যদি সাক্ষীও উপস্থিত করে, তবু তার উপর থেকে মৃত্যুদণ্ড অপসারণ করা যাবে না। কারণ দোষ স্বীকার অর্থ তওবা। আর তওবা করলেও এমতাবস্থায় সে শাস্তিযোগ্য। আলেমগণ এমনও বলেছেন, নেশাপান করেও যদি কেউ মত্ততাবশতঃ রসুল স. এর নিন্দা করে, তবুও তার উপরে কার্যকর করতে হবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান। তবে এমতাবস্থায় যদি সে বলপ্রয়োগিত হয়, তবে সে ক্ষমার্হ। তখন তার অবস্থা হবে জ্ঞানবুদ্ধিবিবর্জিত পাগলের মতো।

খাত্তাবী বলেছেন, আমি বুঝতে পারি না এরূপ দুর্বৃত্তকে বধ করার ব্যাপারে আলেমগণ আবার মতোবিরোধ করেন কেনো? তবে একথা ঠিক যে, আল্লাহ্র অধিকার লংঘনের ব্যাপারে যদি কাউকে বধ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে এবং এমতাবস্থায় যদি অপরাধী তওবা করে নেয়, তবে তার উপর থেকে মৃত্যুদণ্ডের বিধান উঠিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এভাবে যদি কোনো লোক বলপ্রয়োগ ছাড়াই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অশ্লীলতাহীন কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে, তবে তাকে ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত করা যাবে না।

www.eelm.weebly.com

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٨﴾

r যাহারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে পীড়া দেয় এমন কোন অপরাধের জন্য যাহা তাহারা করে নাই; তাহারা অপবাদের ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

এখানে 'বুহতান' ও 'ইছমান' শব্দদু'টো তানভীন সহযোগে সন্নিবেশিত হয়েছে অপবাদ ও পাপের বিশালত্ব বুঝানোর জন্য। মুকাতিল বলেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আলীকে লক্ষ্য করে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্যস্থল। আমি বলি, আলোচ্য আয়াত অবতরণের প্রেক্ষিত সুনির্ধারিত হলেও এর বক্তব্য সাধারণার্থক। অর্থাৎ যে কোনো বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীর প্রতি কেউ যদি এমন পাপের কথা বলে তাদেরকে কষ্ট দেয়, যা তারা করেননি, তবে তারা অবশ্যই বহন করবে অপবাদ ও পাপের গুরুভার।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তিই মুসলমান, যার হাত ও রসনা থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ। আর ওই ব্যক্তিই ইমানদার, যার পক্ষ থেকে সংশয়মুক্ত থাকে মুসলমানের জীবন ও সম্পদ। তিরমিজি, নাসাঈ।

জননী আয়েশার সমালোচনা করা প্রকারান্তরে রসুল স. এর সমালোচনা করা, সে সমালোচনা জ্ঞানভিত্তিক হোক, অথবা যুক্তি ভিত্তিক। এমনকি বর্ণনাগত দিক থেকেও। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে জুহাকের মাধ্যমে জুয়াইবীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমার পক্ষ থেকে কে প্রতিবাদ করবে যে আমার মনে কষ্ট দেয় এবং নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয় কষ্টদাতাকে? এখানে রসুল স. 'ওই ব্যক্তি' বলে বুঝিয়েছেন মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে। আর 'আমাকে কষ্ট দেয়' বলে বুঝিয়েছেন যে কষ্ট দেয় আমার আয়েশাকে। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় আলোচ্য আয়াতে শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে তাদের প্রতি, যারা কলংক লেপন করেছিলো জননী আয়েশার পুতঃপবিত্র চরিত্রে। অনুরূপ যারা হজরত আলীকে কটুকথা বলেছিলো, তারাও কষ্ট দিয়েছিলো রসুল স.কে। কেননা হজরত আলীও ছিলেন তাঁর একান্ত প্রিয়ভাজন। তিনি স. বলেছেন, হে আলী! তুমি আমার। আমি তোমার। হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

উল্লেখ্য, সাধারণ সাহাবীগণের সমালোচনা করার অর্থও রসুল স.কে যাতনা দেওয়া। যেমন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল বর্ণনা করেছেন, রসুল স.

www.eelm.weebly.com

আজ্ঞা করেছেন, আল্লাহ্কে ভয় করো, আল্লাহ্কে ভয় করো। আমার পৃথিবী পরিত্যাগের পর তোমরা আমার সাহাবীগণকে সমালোচনার পাত্র বানিয়ো না। যে তাদেরকে ভালোবাসবে, সে ভালোবাসবে আমাকে। আর যে তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে, সে ঘৃণা পোষণ করবে আমার প্রতিও। তাদেরকে যে কষ্ট দেয়, সে কষ্ট দেয় আমাকে এবং অপ্রসন্ন করে আমার আল্লাহ্কে। আর আল্লাহ্ শীঘ্রই তাকে পাকড়াও করে শাস্তিদান করবেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি এবং বলেছেন, বর্ণনাটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর।

জুহাক ও কালাবীর বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কতিপয় ব্যভিচারী সম্পর্কে। তারা রাতের আঁধারে পথে পথে পায়চারী করতো। আর উত্যক্ত করতো ওই রমণীদেরকে যারা রাতের বেলা বের হতো প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণার্থে। শিষ্টা রমণীদের পশ্চাদ্ধাবন করতো তারা। আর মুখরা রমণীদের বেলায় করতো পশ্চাদপসরণ। ক্রীতদাসীদেরকেই সাধারণত হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরতো তারা। কেননা তাদেরকে অপকর্মে রাজি করানো ছিলো সহজ। কিন্তু সকল রমণীদের দেহবরণী যেহেতু ছিলো প্রায় একই রকম, তাই কখনো কখনো স্বাধীনা রমণীগণও পড়ে যেতো তাদের খপ্পরে। ওই সকল রমণী তাদের স্বামীদেরকে জানাতে লাগলো তাদের বিব্রতকর অবস্থার কথা। স্বামীরা জানালো রসুল স.কে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। এরপর পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে স্বাধীনা রমণী ও ক্রীতদাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদের পার্থক্য নির্ণয় করে দেওয়া হয়।

ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে হজরত আবু মালেক সূত্রে লিখেছেন, এরকম হাদিস হাসান এবং মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। রসুল স. এর মহাপুণ্যবতী সহধর্মিণীগণ যখন প্রকৃতির ডাকে রাতে বের হতেন, তখন তাঁদেরকেও ওই মুনাফিকেরা বিরক্ত করতে শুরু করলো। তাঁরা বিষয়টি রসুল স. এর গোচরে আনলেন। তিনি স. তখন ওই সকল দুরাচারকে ডেকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা বললো, আমরা তো তাঁদেরকে দাসী মনে করেছিলাম। তাদের এরকম চতুর উক্তির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৫৯

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

www.eelm.weebly.com

r হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারীগণকে বল, তাহারা যেন তাহাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টানিয়া দেয়। ইহাতে তাহাদিগকে চেনা সহজতর হইবে, ফলে তাহাদিগকে উত্ত্যক্ত করা হইবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারীগণকে বলো, তারা যেনো তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়'। এখানে 'জ্বালবাব্' অর্থ চাদর। এর বহুবচন 'জ্বালাববি'। 'জ্বালবাব' বলে ওই চাদরকে, যার দ্বারা আবৃত করা হয় কামিজ ও দোপাট্টা।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এক রাতে সাওদা গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন স্থূলাঙ্গী। সেকারণে তিনি পর্দাবৃত থাকলেও তাঁকে অনেকেই চিনতে পারতেন। ওমর ইবনে খাত্তাবও তাই তাঁকে চিনতে পেরে বললেন, হে উম্মতজননী! আপনি কিন্তু আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেননি, আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি। ভেবে দেখুন, এভাবে গৃহের বাইরে আসা কি আপনার জন্য শোভন, না সমীচীন। একথা শুনে অপ্রস্তুত হলেন সাওদা। তৎক্ষণাৎ ফিরে এলেন স্বগৃহে। জননী আয়েশা আরো বলেছেন, ওই সময় রসুল স. আমার প্রকোষ্ঠে সম্পন্ন করেছিলেন তাঁর রাতের আহার। তখন তাঁর হাতে ছিলো একটি হাড্ডি। সাওদা সোজা তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি প্রয়োজনবশতঃ বাড়ী থেকে বের হয়েছিলাম। আর ওমর কিনা আমাকে এরকম এরকম করে বললো। রসুল স. এর ভাবান্তর হলো। অবতীর্ণ হতে শুরু করলো প্রত্যাদেশ। প্রত্যাদেশের অবতরণ সমাপ্ত হলো। তিনি স. বললেন, নারীদেরকে বাইরে বেরোনোর অনুমতি দেওয়া হলো। প্রয়োজনবশতঃ তোমাদের বহির্গমন সিদ্ধ। আমি বলি 'বহির্গমন সিদ্ধ' অর্থ তোমাদের জন্য বড় চাদরে আচ্ছাদিত হয়ে বাইরে বেরুনো সিদ্ধ।

হজরত আবু উবাদা ও হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুসলমানদের পুরনারীগণকে এইমর্মে এখানে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেনো আপাদমস্তক চাদরাবৃত হয়ে বাইরে বেরোয়। খোলা রাখে যেনো কেবল চক্ষু। আর তাদের এমতো বেশভুষা দেখে যেনো তাদেরকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় ক্রীতদাসীদের থেকে। এখানকার 'মিন জ্বালাবীবিহিন্না' কথাটির 'মিন' অব্যয়টি আংশিক অর্থ প্রকাশক। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— চাদরের কিয়দংশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।' একথার অর্থ— স্বাধীনা রমণীদেরকে যেভাবে বলা হলো, সেভাবে যদি তারা পৃথক পরিচ্ছদরীতিটি মান্য করে চলে, তবে দুরাচার কপটাচারীরা আর তাদেরকে উত্যক্ত করার সাহস পাবে না।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— অসতর্কতা ও পার্থক্য নির্দেশক পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান না করার কারণে ইতোপূর্বে যে সকল অঘটন ঘটেছে, সে সকল কিছু সম্পর্কে আল্লাহ্ কাউকে অভিযুক্ত করবেন না। অর্থাৎ অতীতের অসুন্দর আচরণসমূহকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কারণ তিনি মহাক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ার্দ্র।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, একবার এক ক্রীতদাসী স্বাধীনাগণের মতো পর্দা করে হজরত ওমরের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলো। হজরত ওমর তার পর্দা উন্মোচন করলেন। বললেন, হতভাগিনী! মুক্ত রমণীদের মতো পর্দা করেছো কেনো? একথা বলে তিনি তার আবরণী ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৬০, ৬১, ৬২

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٠﴾ مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٦٢﴾

r মুনাফিকগণ এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাহারা নগরে গুজব রটনা করে, তাহারা বিরত না হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করিব; ইহার পর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশীরূপে উহারা স্বল্প সময়ই থাকিবে—

r অভিশপ্ত হইয়া; উহাদিগকে যেখানেই পাওয়া যাইবে সেখানেই ধরা হইবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হইবে।

r পূর্বে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছে তাহাদের ব্যাপারে ইহাই ছিল আল্লাহ্‌র রীতি। তুমি কখনও আল্লাহ্‌র রীতিতে কোন পরিবর্তন পাইবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! শুনে রাখুন, কপটাচারীরা যদি তাদের কাপট্য পরিত্যাগ না করে, ফিরে যদি না আসে নিরপরাধ নারীগণকে উত্যক্ত করার মতো মহাঅপরাধ থেকে, ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের অধিকারীরা যদি বিরত না হয় তাদের নিরবচ্ছিন্ন দুষ্কর্ম থেকে এবং কুৎসা রটনাকারীরা যদি না ছেড়ে দেয় তাদের কুৎসারটনাপ্রবণতা, তবে আমি তাদের

www.eelm.weebly.com

উপরে আপনাকে করে দিবো প্রবল। তখন আপনার নগরের দুরাচারেরা তাদের পৃথিবীর অভিশাপগ্রস্ত জীবনযাপনের সুযোগ আর বেশী দিন পাবে না। আমার নির্দেশেই আপনি তাদেরকে তখন সহজে শায়েস্তা করতে পারবেন। ধরতে পারবেন তাদেরকে যত্রতত্র এবং হত্যাও করতে পারবেন তাদেরকে নির্মমরূপে।

এখানকার 'মুরজিফূনা' শব্দটির ধাতুমূল হচ্ছে 'রজফাতুন'। এর অর্থ— ভূমিবাস্প, প্রচণ্ড আলোড়ন। রসুল স. যখন মদীনার আশেপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করতেন, তখন মুনাফিকেরা বলে বেড়াতো, মুসলিমবাহিনী ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। অথবা বলতো, তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে যত্রতত্র পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মদীনার বাইরে শত্রুদের এক বিশালবাহিনী আক্রমণোদ্যত। কালাবী বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে দেওয়াই ছিলো তাদের এমতো অপপ্রচারের উদ্দেশ্য। তারা চাইতো, মুসলমানদের জীবনযাত্রা হোক অশান্ত ও দুশ্চিন্তাকবলিত।

'তোমার প্রতিবেশীরূপে তারা স্বল্প সময়ের জন্য থাকবে অভিশপ্ত হয়ে' কথাটির অর্থ— আমি আমার রসুলকে নির্দেশ দিবো যুদ্ধের। অথবা তাঁর মাধ্যমে সৃষ্টি করাবো এমন পরিবেশ, যাতে তারা আর স্বজনপদে তিষ্ঠাতে না পারে। যেনো বাধ্য হয় দেশান্তরিত হতে অথবা বাধ্য হয় প্রাণদণ্ডের নির্দেশ মেনে নিতে।

'মাল্‌উ'নীন' অর্থ অভিশপ্ত। কথাটির দ্বারা সুচিহ্নিত করা হয়েছে কপটাচারীদেরকে। 'তাক্বতীলা' অর্থ নির্দয়ভাবে হত্যা।

এরপরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'পূর্বে যারা অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিলো আল্লাহ্‌র রীতি। তুমি কখনো আল্লাহ্‌র রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না' একথার অর্থ— এটাই আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি যে, তিনি তাঁর প্রিয় বাণীবাহকগণকে বিজয়ী করেন এবং তাঁদের শত্রু কপটাচারী ও দুর্বৃত্তদেরকে প্রদান করেন নির্মম শাস্তি। এমন কেউই নেই যে, তাঁর এমতো রীতিকে করতে পারে অকার্যকর। তিনি যে অজেয়।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۚ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَا
يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿٦٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ
وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿٦٤﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا
وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ

www.eelm.weebly.com

يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿٦٦﴾ وَ قَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ
اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَآ اٰتِهِمْ
ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿٦٨﴾

r লোকে তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই আছে।' তুমি ইহা কী করিয়া জানিবে? সম্ভবত কিয়ামত শীঘ্রই হইয়া যাইতে পারে।

r আল্লাহ্ কাফিরদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন জ্বলন্ত অগ্নি;

r সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে এবং উহারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না।

r যেদিন উহাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলটপালট করা হইবে সেদিন উহারা বলিবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লাহ্‌কে মানিতাম ও রাসূলকে মানিতাম!'

r তাহারা আরও বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করিয়াছিলাম এবং উহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল;

r 'হে আমাদের প্রতিপালক! উহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং উহাদিগকে দাও মহাঅভিসম্পাত।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকেরা আপনাকে বিব্রত করণার্থে উপহাসছলে আপনাকে বিভিন্নভাবে প্রশ্নবানে জর্জরিত করে। বলে, কখন সংঘটিত হবে কিয়ামত? ইহুদী ও খৃষ্টানেরা জানে তাদের আপনাপন ধর্মগ্রন্থে কিয়ামতের কোনো সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণের উল্লেখ নেই। আর পৌত্তলিকদের তো ধর্মগ্রন্থ বলে কিছুই নেই। তাই তারা সকলে মিলে আপনাকে এব্যাপারে উত্যক্ত করে আপনাকে অপদস্থ করতে চায়। আপনি তাদেরকে বলুন, কিয়ামত তো অবশ্যম্ভাবী। হয়তো তা খুব বেশী দূরেও নয়। কিন্তু তার সঠিক দিনক্ষণ কেবল আল্লাহ্ই জানেন। মানুষ, জ্বিন বা ফেরেশতা কাউকেই তিনি এ সম্পর্কে জ্ঞানদান করেননি। আমাকেও নয়।

'লাআ'ল্লা' অর্থ সম্ভবতঃ। কিন্তু আল্লাহ্‌র বাণীতে শব্দটি সবসময় সুনিশ্চিতার্থকরূপে সন্নিবেশিত হয়ে থাকে। আর আলোচ্য আয়াত হচ্ছে ওই সকল লোকের প্রতি হুমকি, যারা মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান এবং মহাবিচারদিবসকে অস্বীকার করে এবং যারা এ সম্পর্কে উপহাসমূলক প্রশ্ন করে কষ্ট দেয় রসুল স.কে।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ কাফেরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি (৬৪); সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তারা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না' (৬৫)। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অভিশপ্ত। চিরবহ্নিমান দোজখই তাদের স্থায়ী ঠিকানা। আর সেখানে তাদের কোনো সুহৃদ ও পরিত্রাতা থাকবে না।

এরপরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'যেদিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলটপালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ্কে মানতাম ও রসুলকে মানতাম'। একথার অর্থ— জ্বলন্ত উনুনে চাপানো হাঁড়িতে যেমন গোশত উলটপালট করে ভূনা করা হয়, তেমনি করে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ওলটপালট করা হবে দোজখের আগুনে। তখন তারা আক্ষেপ করে বলবে, হায়, পৃথিবীতে থাকতে আমরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করতাম, তাহলে আজ এরকম দুর্দশা আমাদের হতো না। উল্লেখ্য, এখানে 'মুখমণ্ডল' বলে অর্থ নেওয়া হয়েছে গোটা শরীরের। অর্থাৎ তখন তাদের সারা শরীরই ওলটপালট করে ভাজা হবে। অথবা বলা যেতে পারে, মুখমণ্ডলই শরীরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সুতরাং মুখমণ্ডল অগ্নিদগ্ধ হওয়ার অর্থ সমস্ত শরীর অগ্নিদগ্ধ হওয়া।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৬৭, ৬৮) মর্মার্থ হচ্ছে— ওই দগ্ধমান সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন বলবে, আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলো আমাদের সমাজপতি ও বিত্তপতিরা। তারাই ছিলো পথচ্যুতির বিভিন্ন পন্থার উদ্ভাবক। তাদের আনুগত্যের কারণেই আজ আমরা পতিত হয়েছি অন্তহীন দুর্ভোগে। সুতরাং হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তাদেরকে দাও আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ শাস্তি। তদুপরি আপতিত করো কঠিন অভিসম্পাত। এখানে 'লা'নান কাবীরা' অর্থ মহাঅভিসম্পাত বা কঠিন অভিসম্পাত।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৬৯, ৭০, ৭১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْا۟ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ
مِمَّا قَالُوا۟ ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ
فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

www.eelm.weebly.com

r হে মু'মিনগণ! মুসাকে যাহারা ক্লেশ দিয়াছে তোমরা উহাদের ন্যায় হইও না; উহারা যাহা রটনা করিয়াছিল আল্লাহ্ উহা হইতে তাহাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন; এবং আল্লাহ্র নিকট সে মর্যাদাবান।

r হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল;

r তাহা হইলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন। যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে, তাহারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! মুসাকে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের মতো হয়ো না, তারা যা রটনা করেছিলো, আল্লাহ্ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন'।

ঘটনার সবিস্তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী, তিরমিজি, আহমদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া, আবদুর রাজ্জাক ও আবদ ইবনে হুমাইদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে। যেমন— রসুল স. বলেছেন, নবী মুসা ছিলেন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও ব্রীড়াবনত ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর শরীর এমনভাবে ঢেকে রাখতেন যে, তাঁর শরীরের কোনো অংশের চামড়াও কেউ দেখতে পেতো না। তাঁর এমতো আবরণের কারণে লোকেরা মনে করতে শুরু করলো, নিশ্চয় তাঁর শরীরে কোনো বড় রকমের খুঁত আছে। অথবা তাঁর অণ্ডকোষ বৃহদাকৃতির। তাই তাঁর রাখঢাকের এতো কড়াকড়ি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলেন এমতো অপবাদ থেকে তিনি তাঁর প্রিয় নবীকে পবিত্র করবেন। একদিন এক নির্জনঘাটে তিনি গোসল করতে নামলেন। পরিধেয় বস্ত্র রেখে দিলেন তটদেশের একটি পাথরের উপর। গোসল সেরে তীরে উঠলেন। পরিধেয় বস্ত্রের দিকে হাত বাড়াতেই পাথরটি হঠাৎ চলতে শুরু করলো। তিনিও ছুটলেন তার পিছু পিছু। পাথরটি শেষে গিয়ে থামলো বনী ইসরাইলদের একটি জনসমাবেশের পাশে। তিনি তাড়াতাড়ি পাথরের উপরে রক্ষিত পরিধেয় বস্ত্রটি নিয়ে শরীর আবৃত করলেন। ইত্যবসরে বনী ইসরাইলেরা দেখে ফেললো যে, তাঁর শরীর সম্পূর্ণ নিরোগ। সেই থেকে অপসৃত হলো তাদের অপধারণাটি। নবী মুসা তখন পাথরটির উপরে হলেন ভয়ানক ক্ষিপ্ত। হাতের লাঠি দিয়ে ওই পাথরটিকে তিনি প্রহার করলেন। আল্লাহ্র শপথ! ওই প্রহারের ফলে পাথরটির উপরে মুদ্রিত হলো তিন, চার অথবা পাঁচটি অক্ষয় দাগ। উল্লেখ্য, এটাই হচ্ছে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত নির্দোষ প্রমাণের ঘটনা।

আবুল আলীয়া বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'রটনা' অর্থ কারূনের রটনা। সে এক বারবণিতাকে উৎকোচ দিয়ে বলিয়ে নিতে চেয়েছিলো যে, নবী মুসার সঙ্গে রয়েছে তার গোপন প্রণয়। আল্লাহ্ সেই অপবাদ থেকে রক্ষা

www.eelm.weebly.com

করেছিলেন তাঁর প্রিয় নবীকে। আর কারুনকে করেছিলেন ভূপ্রোথিত। সুরা ক্বসাসের তাফসীরে এসেছে ঘটনাটির সবিস্তার বিবরণ। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যায়।

তীহ্ প্রান্তরে বসবাসকালে এক সময় নবী হারুনের মহাঅন্তর্ধান ঘটলো। বনী ইসরাইলেরা তখন বলতে লাগলো, মুসাই গোপনে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে তার ভাইকে। আল্লাহ্ তখন এমতো অপবাদ থেকে তাঁর প্রিয় নবীকে মুক্ত করলেন। তাঁর নির্দেশে ফেরেশতারা হজরত হারুনের জানাযা নিয়ে উপস্থিত হলো বনী ইসরাইলদের সামনে। তখন তারা বিশ্বাস করলো, হজরত হারুনের পরলোকগমন ছিলো স্বাভাবিক নিয়মানুকূল। হজরত আলী এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে মুনী', ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া ও হাকেম।

হজরত আবদুল্লাহ্ থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার উপস্থিত জনতার মধ্যে বণ্টন করে দিলেন কিছু সম্পদ। আড়ালে একজন মন্তব্য করলো, এবারের বণ্টন আল্লাহ্র অভিপ্রায় অনুযায়ী হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, একথা আমি রসুল স. কে জানাতেই তিনি স. অপ্রসন্ন হলেন খুব। ক্রোধে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল হয়ে গেলো রক্তাভ। বললেন, আল্লাহ্ নবী মুসার উপরে সদয় হোন। তিনি তো আমার চেয়ে অধিক কষ্ট পেয়েও ধৈর্যধারণ করেছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্র নিকট সে মর্যাদাবান'। এখানে 'ওয়াজীহান' অর্থ ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্র নিকটে নবী মুসার মর্যাদা ছিলো অত্যধিক। তাই তিনি যা যাচ্না করতেন, তা-ই পেতেন। হাসান বসরীও এরকম বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন আল্লাহ্র একান্ত প্রিয়ভাজন ও অনুগ্রহধন্য।

পরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো'। একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্র নিকটে যা অপ্রিয়, তা পরিত্যাগ করো। যেমন তাঁর প্রিয়তম রসুলের উপরে অপবাদারোপ। এরকম পাপকর্মগুলোও তোমরা আল্লাহ্র ভয়ে পরিত্যাগ করো এবং কথা বলো সঠিকভাবে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'সাদীদা' কথাটির অর্থ সঠিক বচন। কাতাদা অর্থ করেছেন— ন্যায্য কথা। কেউ কেউ বলেছেন— সত্যকথা। আবার কারো কারো মতে— সত্যের গন্তব্যে উপস্থিত হওয়ার সহায়ক বক্তব্য। প্রকৃত কথা হচ্ছে, বর্ণিত অর্থগুলোর মূল মর্ম হচ্ছে— সত্যকথা, যার মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র নেই।

www.eelm.weebly.com

কেউ কেউ বলেছেন, জননী যয়নাব সম্পর্কে নিন্দুকেরা যে সকল উদ্ভট রটনা প্রস্তুত করেছিলো, আলোচ্য আয়াতে দেওয়া হয়েছে ওই উদ্ভটতা পরিত্যাগের নির্দেশ। বিরত থাকতে বলা হয়েছে ওই সকল অপবচন থেকেও যেগুলো আরোপ করা হয়েছিলো জননী আয়েশার পুণ্যময় চরিত্রের উপর। আর ইকরামা বলেছেন, এখানকার 'ক্বওলান্ সাদীদা' অর্থ পবিত্র কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্'।

এর পরের আয়াতে (৭১) বলা হয়েছে— 'তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ক্রটিমুক্ত করবেন'। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— তাহলে তিনি গ্রহণ করবেন তোমাদের পুণ্যকর্মসমূহকে। মুকাতিল অর্থ করেছেন— তিনি পুতপবিত্র করে দিবেন তোমাদের কর্মকাণ্ডসমূহকে। অর্থাৎ তিনি তোমাদের কার্যকলাপকে করে দিবেন গ্রহণোপযোগী ও প্রতিদানপ্রাপ্তির উপযোগী। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— তাহলে তিনি তোমাদেরকে সামর্থ্য দান করবেন পুণ্যকর্ম সম্পাদনের।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন'। একথার অর্থ— এবং তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোমাদের পুণ্য সংকল্প ও কার্য্যাবলীকে করবেন সুদৃঢ়। ফলে তোমরা হতে পারবে পাপমুক্ত।

শেষে বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে'। একথার অর্থ—এভাবে আল্লাহ্র বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে যারা তাঁর ও তাঁর রসুলের আনুগত্যসহ জীবন অতিবাহিত করবে, তারা অবশ্যই লাভ করবে ঐহিক ও পারত্রিক সফলতা। অধিকারী হবে পরম সৌভাগ্যের।

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৭২, ৭৩

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهٗ كَانَ
ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۙ ﴿٧٢﴾ لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ
الْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكٰتِ وَ يَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ
الْمُؤْمِنٰتِ ۖ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٣﴾

www.eelm.weebly.com

r আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত পেশ করিয়াছিলাম, উহারা ইহা বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহাতে শংকিত হইল, কিন্তু মানুষ উহা বহন করিল; সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ।

r পরিণামে আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমিতো আকাশ-পৃথিবী ও শৈলশ্রেণীর প্রতি উপস্থাপন করতে চেয়েছিলাম এই আমানত, কিন্তু তারা এ প্রস্তাবে শংকিত হলো এবং এ আমানত বহন করতে হলো অস্বীকৃত। কিন্তু মানুষ অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করলো এই গুরুভার। মানুষ তো তাই আত্মঘ্ন ও অর্বাচীন।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ জানতে গেলে চারটি বিষয়ে রাখতে হবে পরিষ্কার ধারণা। সে চারটি বিষয় হচ্ছে— ১. আমানত কী ২. আকাশ-পৃথিবী-পর্বতমালা বলে এখানে দেওয়া হয়েছে কিসের ইঙ্গিত ৩. 'পেশ করেছিলাম' বলে যে সম্বোধন করা হয়েছিলো, তা কি করণিক, না ভাবগত ৪. বহন করা এবং অস্বীকার করার স্বরূপই বা কী?

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আমানত' অর্থ আনুগত্য এবং ওই ফরজ দায়িত্বসমূহ, যেগুলোর বাস্তবায়ন আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের জন্য করেছেন অত্যাবশ্যক। আকাশ-পৃথিবী-গিরিশ্রেণীকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেছিলেন, গ্রহণ করো এ গুরুদায়িত্ব। যদি এ দায়িত্ব বাস্তবায়নে সক্ষম হও তবে পাবে উত্তম প্রতিদান, আর সক্ষম না হলে পাবে শাস্তি।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমানত অর্থ নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, জাকাত প্রদান করা, রমজানের রোজা পালন করা, আল্লাহ্র গৃহে হজ সমাধা করা, সত্য কথা বলা এবং ওজনে কম না দেওয়া। এ সকল দায়িত্ব পালন ব্যতিরেকে আমানতদারীর দাবি করা অন্যায়। মুজাহিদ বলেছেন, ফরজ দায়িত্বসমূহ সুসম্পন্ন করার অর্থই ধর্মরক্ষা করা। আবুল আলীয়া বলেছেন, সকল বিধিনিষেধই আমানতের অন্তর্ভূত।

জায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, আমানত রক্ষার অর্থ রোজা সম্পাদন, অপবিত্রতার গোসল সমাপন এবং অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন। আর অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্থ হিংসা না করা, কারো প্রতি শত্রুমনোভাবাপন্ন না হওয়া, পার্থিব সম্পদের প্রতি লালসাতুর না হওয়া এবং অহংকার না করা।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বলেছেন, আল্লাহ্ মানুষের গোপনাঙ্গ সৃষ্টি করেছেন আগে। তারপর বলেছেন, এটা তোমাদেরকে প্রদত্ত একটি আমানত। চক্ষু-কর্ণও আমানত। যার নিকট এ সকল আমানত সুসংরক্ষিত নয়, সে ইমানদার নয়।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, আমানত অর্থ গচ্ছিত সম্পদের হেফাজত করা এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করা। বিশ্বাসীগণের কর্তব্য হচ্ছে অন্যের সঙ্গে আমানত ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে প্রতারণা না করা, বৃহৎ বিষয়ে হোক, অথবা হোক ক্ষুদ্র বিষয়ে। বলা হয়ে থাকে, এমতো অভিমতের প্রবক্তা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। এমতো অভিমতের ভিত্তিতে একথাই সাব্যস্ত হয় যে, আমানত অর্থ শরিয়তের বিধি-নিষেধসমূহ।

'আকাশ-পৃথিবী ও পর্বতমালা' অর্থ এখানে পরিদৃশ্যমান আকাশ-পৃথিবী ও পর্বতরাজি, আকাশ-পৃথিবীর অধিবাসীরা নয়। আর পেশ করার অর্থ বাচনিক সম্বোধনের মাধ্যমে বলা, ইশারা ইঙ্গিত বা অনুপ্রেরণা সম্পাতের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটানো নয়। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও পরবর্তী যুগের আলেমগণ এরকম ব্যাখ্যাই করেছেন।

আল্লাহ্তায়ালা আকাশ-পৃথিবী ও পর্বতরাজির প্রতি এই মর্মে প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন যে, তোমরা আমানত কি বহন করতে চাও? তারা বললো, আমানত কী? আল্লাহ্পাক বললেন, বিশেষ গুরুদায়িত্ব, যা পালন করলে পাবে উত্তম পুরস্কার। আর পালন না করলে ভোগ করবে শাস্তি। তারা বললো, না, এরকম গুরুদায়িত্ব বহনের যোগ্যতা আমাদের নেই। হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা তো চাই কেবল তোমার অভিপ্রায় ও আদেশের বাধ্যগত প্রতিপালনকারী হতে। পুরস্কার অথবা তিরস্কার কোনোটাই আমরা চাই না। উল্লেখ্য, আকাশ-পৃথিবী-পর্বতমালার এমতো জবাব হঠকারিতামূলক ছিলো না। ছিলো আল্লাহ্র বিধানের প্রতি সম্মাননাপ্রসূত। এরকম জবাবের মাধ্যমে তারা ঘোষণা করেছে কেবল তাদের অসমর্থতাকেই। এরকমও বলা যাবে না যে, আল্লাহ্ তাদের উপর আমানতের বোঝা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ এটা তাঁর আদেশ যেমন ছিলো না, তেমনি ছিলে না আকাশ-পৃথিবী-পর্বতের অবাধ্যতাও। আর আল্লাহ্ এরকম চাইলে তারাও তা পালন করতে বাধ্য হতো। অস্বীকার করতে পারতো না।

কতিপয় বিদ্বান বলেছেন, আল্লাহ্পাক যে আমানত বহনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তা ছিলো আক্ষরিক অর্থেই বাচনিক। আর এমতো প্রস্তাবের লক্ষ্য ছিলো আকাশ-পৃথিবীর সকল সপ্রাণ সৃষ্টি। এমতো ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, আলোচ্য বাক্যে সম্বন্ধপদ রয়েছে উহ্য। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়াস্আলিল ক্বরইয়াতা' (জনপদকে জিজ্ঞেস করো)। অর্থাৎ জিজ্ঞেস করো জনপদবাসীকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে আকাশ-পৃথিবী-পর্বতমালাকেই। আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতবাসীকে নয়। এখানে পেশ করার অর্থ তাদের স্বভাবগত সামর্থ্যের উপরে আস্থা স্থাপন করা। আর এখানে অস্বীকার করার অর্থ স্বভাবগত যোগ্যতাহীনতাকে প্রকাশ করা।

www.eelm.weebly.com

আকাশ-পৃথিবী-পর্বতমালাকে আমানত বহনের যোগ্যতা দেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়েছে মানুষকে। তবুও তাদেরকে এখানে 'জালেম' (অত্যাচারী) ও 'অজ্ঞ' (জাহেল) বলা হয়েছে একারণে যে, তাদের মধ্যে রয়েছে অতিউৎসাহ ও প্রবৃত্তির প্রাবল্য। এদিক থেকে দেখতে গেলে মানুষের এদু'টো বৈশিষ্ট্য দৃশ্যতঃ সম্মানহানিকর মনে হলেও আদতে তা নয়। বরং অতিউৎসাহ ও উচ্চাকাঙ্খাই তো মহৎ কোনো কর্মকাণ্ডে মানুষকে ঝুঁকি নিতে উদ্ধুদ্ধ করে। সুতরাং এখানে আকৃতিগতভাবে 'জুলুম' ও 'জুহুল' শব্দ দু'টো নিন্দার্হ হলেও মূলতঃ প্রশংসা প্রকাশক।

বায়যাবী লিখেছেন, সম্ভবত 'আমানত' অর্থ এখানে বিবেক ও শরিয়তের দায়িত্বভার। বিবেক হচ্ছে মানুষের ক্রোধ ও কুপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রক। আর শরিয়ত প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে উগ্রতা ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটেই বায়যাবী লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আনুগত্যের যে মহামর্যাদার কথা বলা হয়েছে, এই আয়াতে করা হয়েছে তার পোষকতা। গচ্ছিত বস্তু অবশ্য ফেরতযোগ্য বলেই আনুগত্যকে বলা যায় আমানত। অপরদিকে আনুগত্যও অবশ্যবাস্তবায়নব্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্র আনুগত্য সত্যিই অত্যন্ত গুরুভার, তাই আকাশ-পৃথিবী-শৈলমালা তা বহন করতে অস্বীকৃত হয়েছিলো। হয়েছিলো ভীতশংকিত। অথচ মানুষ সে গুরুভার বহন করতে সম্মত হয়েছিলো অবলীলায়, শতসীমাবদ্ধতা ও শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও। সুতরাং মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে, সে তার অত্যুগ্র আবেগকে করবে সংযত ও সংহত এবং দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যকর্মকে রাখবে সতত জাগ্রত। আর এরকম করলে সে লাভ করবে মহাসাফল্য। ইহকালেও। পরকালেও।

আমি বলি, এরকম গুরুভারের কথা বলা হয়েছে অন্য একটি আয়াতেও। যেমন— 'আমি যদি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে দেখতে পেতে আল্লাহ্র ভয়ে পাহাড় হয়ে গিয়েছে ছিন্ন ভিন্ন। আমি এ সকল উপমা বর্ণনা করি মানুষের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে, যেনো তারা চিন্তা-গবেষণা করে। বায়যাবীর ব্যাখ্যানুসারে বলা যায়, আলোচ্য আয়াতেও সন্নিবেশিত হয়েছে এধরনের উপমা। অবশ্য আয়াতদ্বয়ের উদ্দেশ্য এক নয়। কিছুসংখ্যক বিদ্বজ্জনও মনে করেন, জড় পদার্থকে সম্বোধন ও তাদের প্রত্যুত্তর প্রদান বিবেকবহির্ভূত। সেকারণেই তাঁরা বিষয়টিকে রাখতে চান উপমার বৃত্তে। এমতো জটিলতা নিরসনার্থে তাই কেউ কেউ বলেছেন, ঊর্ধ্বমার্গ ও নিম্নমার্গ সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্পাক উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি করে দেন বোধশক্তি। এরপর বলেন, তোমাদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি অবশ্যপালনীয় একটি বিধান। যে এ বিধান পালন করবে, তার জন্য প্রস্তুত রেখেছি জান্নাত। আর যে পালন করবে না, তার জন্য

www.eelm.weebly.com

তৈরী করে রেখেছি জাহান্নাম। উভয়ে তখন জবাব দিলো, হে মহাপবিত্র মহামহিম প্রভুপালক! তুমি আমাদেরকে যেমন ইচ্ছাবিবর্জিতরূপে সৃষ্টি করেছো, আমরা সেরকমই তোমার অভিপ্রায়ক্রীড়নক হিসেবে থাকতে চাই। ইচ্ছাধিকারী হয়ে আমরা দায়িত্বপালনে অক্ষম। আর আমরা তো পুণ্যপ্রত্যাশীও নই। তখন আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করে এই গুরুভার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। হজরত আদম প্রবল প্রেমাতিশয্যবশতঃ সে গুরুভার কবুল করে নিলেন তৎক্ষণাৎ। গুরুদায়িত্ব নির্দ্বিধায় চাপিয়ে দিলেন স্বীয় সত্তার উপর। এভাবে হয়ে গেলেন নিজের উপরে জুলুমকারী। মুজাহিদের এরকম ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য সংকলন করেছেন ইবনে আবী হাতেম। সে মন্তব্যের মধ্যে একথাটিও সন্নিবেশিত হয়েছে যে, হজরত আদমের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ এবং জান্নাত থেকে নির্গমনের মধ্যবর্তী সময়ের পরিসর ছিলো জোহর থেকে মাগরিব।

কোনো কোনো জ্ঞানী বলেছেন, আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে জড়পদার্থ জ্ঞানবুদ্ধিহীন। কেননা তারা আমাদের ভাষা বুঝতে পারে না। কিন্তু তারা আল্লাহ্পাকের নির্দেশ উপলব্ধি করে ঠিকই। আনুগত্য করে বুঝে সুঝেই। তাঁর উদ্দেশ্যে হয় সেজদাবনত। আল্লাহ্তায়ালা আকাশ-পৃথিবীকে আদেশ করেছিলেন 'ই'তিয়া ত্বওয়া'ন আও কারহান' (এগিয়ে এসো অনুগত অথবা অনানুগত হয়ে)। প্রত্যুত্তরে তারা বলেছিলো 'আতাইনা ত্বয়িয়ী'ন' (আমরা এসেছি অনুগত হয়ে)। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে—'কতক প্রস্তর ফেটে যায়, তার থেকে উৎসারিত হয় প্রস্রবণ আবার কতক প্রস্তর অধঃপতিত হয় আল্লাহ্র ভয়ে)'। আর এক আয়াতে এসেছে— 'আপনি কি দেখেন নি নভোবাসী ও ভূপৃষ্ঠবাসীরা অবশ্যই আল্লাহ্কে সেজদা করে। আরো সেজদা করে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পর্বতমালা, তরু শ্রেণী ও চতুষ্পদ প্রাণীরা'।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'হামালাহাল ইনসান' কথাটির 'ইনসান' অর্থ হজরত আদম। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক তখন শুধু হজরত আদমকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমি আকাশ-পৃথিবী-পর্বতের নিকটে উপস্থাপন করেছিলাম আমার আমানত। তারা এ ভার বহন করতে অসম্মত। তুমি কি এ আমানত দায়িত্ব ও কর্তব্যসহ গ্রহণ করবে? হজরত আদম নিবেদন করলেন, হে আমার জীবন-মৃত্যুর অধিকর্তা! দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? আল্লাহ্পাক বললেন, যদি পুণ্যকর্ম করো, তবে পাবে স্বর্গ ও আমার একান্ত সন্নিধান। আর পাপ করলে প্রবেশ করবে নরকে। হজরত আদম তখন নির্দ্বিধায় তুলে নিলেন আমানতের বোঝা। বললেন, হে আমার দয়াময় প্রভুপালক! আমি আমানত গ্রহণ করলাম প্রসন্নচিত্তে। আল্লাহ্ বললেন, তুমি যখন এ গুরুভার নির্দ্বিধায় গ্রহণ করলে, তখন জেনে রেখো, আমিও হবো তোমার সাহায্যকারী। তোমার চোখের উপর ঝুলিয়ে দিবো একটি পর্দা।

www.eelm.weebly.com

ফলে পাপ চাক্ষুষ করার সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়, তবে তুমি আর সে পাপকর্ম দেখতেই পাবে না। আত্মরক্ষা করতে থাকবে পাপ থেকে। তোমার রসনা রক্ষার জন্য সৃষ্টি করে দিবো দু'টি চোয়াল ও একটি তালু। অশ্লীল অশ্রাব্য বাক্য উচ্চারণের উপক্রম হলে চোয়াল ও তালু বন্ধ করে দিয়ো। বেঁচে থাকতে পারবে অপবিত্র উচ্চারণ থেকে। আর তোমার গোপনাঙ্গের হেফাজতের জন্য ব্যবস্থা করে দিবো পরিচ্ছদের। সুতরাং যে স্থানে নগ্ন হওয়া নিষেধ, সে স্থানে কখনো বস্ত্র উন্মোচন কোরো না। তাহলে আত্মরক্ষা করতে পারবে নিজেকে অশ্লীলতা থেকে।

মুজাহিদ বলেছেন, হজরত আদমের আমানতের দায়িত্বভার গ্রহণ এবং বেহেশত থেকে নির্গমনের মধ্যের সময়ের ব্যবধান ছিলো জোহর ও আছরের নামাজের মধ্যবর্তী সময়ের সমপরিমাণ। এ সম্পর্কে আমি বলি, আমানতের প্রতিফলনের স্থান জান্নাত নয়। জান্নাত হচ্ছে আমানতের সুষ্ঠু দায়িত্বপালনের পুরস্কার। সে কারণেই আমানত গ্রহণের পর হজরত আদমকে আর জান্নাতে থাকতে দেওয়া হয়নি। পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো পৃথিবীতে। পৃথিবী যেহেতু আখেরাতের শস্যক্ষেত্র, তাই আমানতের দায়িত্ব বহনের আমল করতে হয় পৃথিবীতেই। বপন এখানে। আর কর্তন সেখানে।

বাগবী লিখেছেন, স্বসূত্রে নাক্কাশ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, অযত্নে রক্ষিত একটি পাথরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আমানতকে। সে প্রস্তর উত্তোলনের আহবান জানানো হলো প্রথমে আকাশ-পৃথিবী-পর্বতকে। কিন্তু কেউই এগিয়ে এলো না। দূরে থেকেই প্রকাশ করলো তাদের অক্ষমতা। শেষে এগিয়ে এলেন আবেগায়িত আদম। পাথরটিকে তিনি নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, আদেশ পেলে আমি ওঠাতে পারবো পাথরটিকে। আল্লাহ্ বললেন, ওঠাও তো দেখি। হজরত আদম এক ঝটকায় পাথরটিকে ওঠালেন তাঁর উরুদেশ বরাবর। তারপর রেখে দিলেন। বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি তো এটাকে আরো উপরে তুলতে পারবো। আকাশ ও পৃথিবী সমস্বরে বললো, ওঠাও। হজরত আদম এবার পাথরটি উত্তোলন করে স্থাপন করলেন আপন স্কন্ধে। তারপর ইচ্ছা করলেন মাটিতে নামিয়ে রাখতে। আল্লাহ্ বললেন, না, আর হয় না। এখন আর তুমি এ পাথর মাটিতে নামিয়ে রাখতে পারো না। মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত এ পাথর বহন করে চলবে তোমার বংশধরেরা।

জুজাষ ও অন্যান্য ভাষ্যকারেরা বলেন, এখানে 'আমানত' অর্থ আনুগত্য, সে আনুগত্য স্বভাবগত হোক অথবা হোক বাধ্যগত। আর আমানত পেশ করার অর্থ এখানে আনুগত্যের আহ্বান। সে আনুগত্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হোক, অথবা হোক আদেশারোপিত। আর আমানতের ভারোত্তলন অর্থ, আমানতের আত্মসাৎ। আমানত কার্যকর করা থেকে বিরত থাকা। যে ব্যক্তি আমানত কার্যকর করে না,

www.eelm.weebly.com

আমানত বহনের ক্ষেত্রে পরিচয় দেয় দায়িত্বহীনতার, তাকেই বলে আমানতবহনকারী। এমতাবস্থায় আমানত বহনে অস্বীকৃতি অর্থ সাধ্যানুসারে আমানত কার্যকর করা। আর আমানত বহনের ক্ষেত্রের ত্রুটিবিচ্যুতির কারণকেই এখানে বলা হয়েছে 'জুলুম' এবং 'জুহুল'। যেমন আল্লাহ্পাক স্বয়ং বলেছেন— 'ইয়াহ্মিলূনা আছক্বলাহুম' (নিজের বোঝা তার নিজেরই উপর)। এমতো ব্যাখ্যাব্যপদেশে হাসানের একটি উক্তি প্রণিধাননীয়। তাঁর মতে 'হামালাহাল ইনসান' কথাটির 'হামালা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটাচারীদেরকে, যারা আল্লাহ্র আমানত বহনের ক্ষেত্রে করে প্রতারণামূলক পশ্চাদাপসরণ।

বাগবী লিখেছেন, প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটি পরবর্তী যুগের আলেমগণের। আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, আমানত বহনকারী একমাত্র মানব জাতি। সুতরাং যদি আমানতের অর্থ করা হয় আনুগত্য ও শরিয়তের দায়িত্বভার, তবে মানুষের বিশেষত্ব আর থাকে কোথায়? কারণ জ্বিন ও ফেরেশতারাও তো শরিয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত। আর এমতাবস্থায় ফেরেশতারাই হবে অগ্রগামী। কেননা তারা নিষ্পাপ। তাই তাদের আনুগত্যও নির্ভুল। তারা সারাক্ষণ ব্যাপৃত থাকে আল্লাহ্পাকের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনায়। অপরপক্ষে মানব জাতির অনেকে আত্ম-অত্যাচারী। কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে 'জলিমুল লিনাফসিহী'। কিছু লোক আবার মধ্যপথাবলম্বী। কোরআনের ভাষায় তাদেরকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'মুকতাসিদ'। আবার কেউ কেউ কল্যাণের পথানুসারী, যাদেরকে কোরআনের পরিভাষায় বলা হয়েছে 'সবিকুম্ বিল খয়রাত'। এ সকল কারণেই সুফী দার্শনিকগণ বলেন, 'আমানত' অর্থ জ্ঞানের আলো, বিবেকের জ্যোতি এবং প্রেমানল। জ্ঞানের আলোর মাধ্যমে অর্জিত হয় যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যয়ন এবং আল্লাহ্র পরিচয়ের পথ। আর সে পথের সকল অন্তরায় দগ্ধিভূত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায় প্রেমের আগুনে। পথ হয় সুগম ও সুপরিষ্কৃত। আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন ফেরেশতাদের উন্নতির স্তর সুনির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ। উন্নততর স্তরে আরোহণের সুযোগ ও যোগ্যতা তাদের নেই। যেমন আল্লাহ্পাক বলেন— 'ওয়ামা মিন্না ইল্লা লাহু মাক্বামুম মা'লূম' (আমার দিক থেকে তাদের প্রত্যেকের মর্যাদা সুনির্ধারিত)। এমতো সীমাবদ্ধতাকে পোড়াতে পারে কেবল ভালোবাসার আগুন। আর সে প্রেম বুকে ধারণ করে কেবল মানুষ। তাই তাদের সম্মুখেই কেবল উন্মোচিত হতে পারে আল্লাহ্র রহস্যময় পরিচয়।

আমি হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির মহামূল্যবান বক্তব্য থেকে এতোটুকুই উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি যে, আমানত হচ্ছে একটি দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য বৈভব। পরমতম ও পবিত্রতম সত্তার জ্যোতিসম্পাত ধারণ করার যোগ্যতাই হচ্ছে

www.eelm.weebly.com

আমানত। আর সে যোগ্যতা আছে কেবল মানুষের। ইমান ও পুণ্যকর্ম মানুষকে স্থাপন করতে পারে ফেরেশতাদের সমান্তরালে। এমতাবস্থায় অর্জিত হতে পারে আল্লাহ্‌র গুণবত্তাজাত জ্যোতিসম্পাত ধারণের যোগ্যতা। কিন্তু তাঁর সত্তাজাত জ্যোতির প্রতিফলন ধারণ করতে পারে কেবল ওই রহস্যময় মুকুর, যা মৃত্তিকা থেকে উদ্ভূত। হজরত আদম এমতো যোগ্যতাধারী ছিলেন বলেই হতে পেরেছিলেন আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি (খলিফা)। তাঁর সৃজন সম্পন্নকালে আল্লাহ্‌পাক ফেরেশতামণ্ডলীকে বলেছিলেন, 'আমি যা জানি তোমরা তা জানো না'। এখানে 'আমি যা জানি' অর্থ আমি যে আমানত সম্পর্কে জানি। অর্থাৎ আমার সত্তা থেকে উৎসারিত জ্যোতির প্রতিবিম্ব ধারণ করতে পারে কেবল মৃত্তিকাজাত আদম, একথা আমি জানি, কিন্তু তোমরা জানো না। আবার 'জুলুম' (অত্যাচার) ও 'জুহুল' (অজ্ঞতা) শব্দ দু'টোর ইঙ্গিত এদিকেই। দু'ধরনের শক্তি দেওয়া হয়েছে মানুষকে— হিংস্র পশুর শক্তি এবং গৃহপালিত পশুর শক্তি। হিংস্র পশুশক্তি বলে মানুষ আরোহণ করতে পারে উন্নতর আধ্যাত্মিক স্তরে। আর গৃহপালিত পশুশক্তি তাকে যোগায় কঠোর তপস্যার স্পৃহা ও আল্লাহ্‌র পথে ক্লেশ সহ্য করার ক্ষমতা। এ শক্তি দু'টোর ভিত্তি বা উৎসস্থলও মৃত্তিকা। সুতরাং 'জুলুম' এবং 'জুহুল' মানুষের দু'টি প্রশংসনীয় গুণ। পরম প্রাপ্তি। এ দু'টো গুণের কারণেই সে হতে পারে খেলাফতের অধিকারী।

সূর্যালোক শোষণ ও সংরক্ষণ হচ্ছে মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য। একারণেই সূর্যালোকস্নাত মাটি থেকে উৎপন্ন হতে পারে লতাগুল্ম ও বৃক্ষরাজি। কিন্তু আলোককণার এমতো বৈশিষ্ট্য নেই। শোষণ ও সংরক্ষণ যোগ্যতা না থাকার কারণে আলো তাই মাটির মতো নিজে উপকৃত হতে পারে না। উপকার প্রদান করতে পারে না অন্যকেও। ফেরেশতারা নূরের, আর মানুষ মাটির। উভয়ের মধ্যে তাই রয়েছে মৌলিক তারতম্য। ফেরেশতারা নৈকট্যভাজন। কিন্তু তাদের নৈকট্যের পরিসর সীমিত। আর মানুষ নৈকট্যের (কুরবতের) মর্যাদায় ফেরেশতাদের সমান্তরাল না হলেও (বন্ধুত্বের বেলায়তের) মর্যাদায় ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অবশ্য নবী-রসুলগণই পরিপূর্ণ মানুষ। আর নবীগণ ও ফেরেশতাগণ উভয়েই পরিপুষ্ট ও উপকৃত হন আল্লাহ্‌র গুণবত্তার জ্যোতি থেকে, যে গুণবত্তা আবার তাঁর সত্তাসম্পৃক্ত। তাই তাঁর গুপ্ত নাম (ইসমে আলবাতেন) সমূহ থেকে ফয়েজ আহরণ করেন ফেরেশতারা। আর প্রকাশ্য নাম (ইছমে আজ্‌জাহের) থেকে ফয়েজ শোষণ করেন নবী-রসুলগণ। এটাই তাঁদের সকলের সূচনাস্থল (মাবদায়ে তা'য়ুন)। সুতরাং মনে রাখতে হবে নবুয়তের পরিপোষক হচ্ছে সত্তাজাত জ্যোতি বা জাতি নূর। ফেরেশতারা এই নুরের প্রতিবিম্ব ধারণ করতে পারে না। কেননা তাদের অস্তিত্বে মৃত্তিকার উপাদান নেই। মৃত্তিকা রয়েছে

www.eelm.weebly.com

কেবল মানুষের অস্তিত্বে। তাই সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতা অপেক্ষা এবং বিশেষ মানুষ (নবী-রসুল) বিশেষ ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার জান্নাতও নির্ধারণ করা হয়েছে কেবল মানুষের জন্য। জান্নাতের সুখ-সম্ভার আস্বাদন করার যোগ্যতা ফেরেশতাদের নেই। বেহেশতে তারা প্রবেশ করবে কেবল দায়িত্ব পালনার্থে। প্রস্থানও করবে যথারীতি। সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার ও যোগ্যতা তাদের নেই।

যাঁরা বলেন, আমানত অর্থ শরিয়তের গুরুদায়িত্ব এবং সে দায়িত্ব মানুষ ঘাড়ে উঠিয়ে নিয়েছে স্বেচ্ছায়, তাঁরা 'জুলুম' ও 'জুহুল' শব্দ দু'টোকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মানুষ অবিবেচনাপ্রসূত ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে আবেগতাড়িত অবস্থায় শরিয়তের বোঝা উঠিয়ে নিয়ে নিশ্চয় জুলুম করেছে স্বীয় সত্তার উপর। আর এ গুরুভার ওঠাতে না পারলে যে অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে, সেকথাটি সম্পর্কে সে চিন্তা-ভাবনাও করেনি। সুতরাং সে অজ্ঞ নয় তো কী? কিন্তু মনে রাখতে হবে এখানে 'অত্যাচার' ও 'অজ্ঞতা' শব্দ দু'টোর দ্বারা মানুষকে আসলে তিরস্কার করা হয়নি। বরং এ দু'টো শব্দের মাধ্যমে এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যকে।

বায়যাবী মনে করেন, আলোচ্য আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের পরিপোষক। তাই তিনি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে— আমানত হচ্ছে এক বিশাল বোঝা। কোনো বুদ্ধিমান এবং শক্তিমান ব্যক্তি এমতো বোঝা ওঠানোর দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে না। অথচ প্রেমোন্মত্ত মানুষ শতসীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই বিশাল বোঝা আল্লাহ্র দানরূপে গ্রহণ করেছে অবলীলায়। এখন এই আমানত রক্ষণাবেক্ষণ তার অত্যাবশ্যক দায়িত্বের অন্তর্ভূত। সুতরাং এ গুরুদায়িত্ব পালনে যে যত্নবান হবে, সে সফল হবে পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী উভয় স্থানে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বায়যাবী 'সেতো অতিশয় জালেম, অতিশয় অজ্ঞ' কথাটির মর্মার্থ করেছেন এভাবে— মানবজাতি কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেনি। আমানতের দাবির প্রতি দেয়নি যথাযথ মনোযোগ। সুতরাং সে সীমালংঘনকারী ও অজ্ঞ। অবশ্য তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, সকল মানুষ এরকম অপস্বভাবের। অঙ্গীকার পূরণ এবং আমানতের দাবি বাস্তবায়নে নবী-রসুল-আওলিয়া-পুণ্যবানেরা সতত সজাগ।

'বাহরে মাওয়াজ' প্রণেতা লিখেছেন, আমানত এমন এক দুর্বহ দায়িত্ব যে, আকাশ-পৃথিবীর মতো বিশাল সৃষ্টিও এ দায়িত্ব দর্শনে হয়ে পড়েছিলো ভীত-সন্ত্রস্ত। অথচ মানুষ অগ্র-পশ্চাৎ কিছু না ভেবেই আমানতকে বুকে তুলে নিলো। সুতরাং সে অবশ্যই সীমালংঘক। আর আমানতের দায়িত্ব বহন না করলে যে শাস্তি পেতে হবে, সে বিষয়টিও তার অজানা। সুতরাং অজ্ঞ সে তো অবশ্যই। আমার মতে ব্যাখ্যাটি যথার্থ নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতে 'ইনসান' (মানুষ)

www.eelm.weebly.com

বলে বোঝানো হয়েছে হজরত আদমকে। তিনিই আমানতের প্রথম বাহক। আর তিনি অবশ্যই ছিলেন নিষ্পাপ, ন্যায়নিষ্ঠ ও জ্ঞানী। আমানতের দাবিও তিনি পরিপূরণ করেছিলেন যথাযথভাবে। এখানে 'ইন্‌নাহু' (সে তো) বলে নির্দেশ করা হয় তাঁকেই।

মান্যবর সুফী-তাপসগণ বলেছেন, মানুষ আল্লাহ্‌র মারেফত বা পরিচিতি বিস্মৃত হয় বলেই সে 'জালেম' ও 'জাহেল'। পৃথিবীতে এসে সে হারিয়ে ফেলে আল্লাহ্‌র সত্তাজাত জ্যোতিসম্পাতের প্রতিবিম্ব ধারণের যোগ্যতা। সে যোগ্যতাই আল্লাহ্‌র 'ফিতরত' বা স্বভাব ধর্ম নামে পরিচিত। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ওই ফিতরতের উপরেই। অথচ অধিকাংশ মানুষ এ সম্পর্কে জানে না। হৃত বস্তুর কল্যাণ সম্পর্কে সে অনবগত। আবার অনবহিত প্রাপ্ত বস্তুর অকল্যাণের বিষয়েও।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি নবজাতক জন্মগ্রহণ করে ফিতরতের উপর। এরপরে তার পিতামাতা তাকে বানিয়ে দেয় ইহুদী, খৃষ্টান, অথবা অগ্নিউপাসক।

আমি বলি, এখানকার 'জুলুম' কথাটির অর্থ ক্রোধ এবং 'জুহুল' (মূর্খতা) অর্থ প্রবৃত্তি। বাস্তবক্ষেত্রে শুভাশুভ নির্ণীত হয় এ দু'টোর প্রায়োগিক পৃথকতার উপর। ক্রোধকে যদি আল্লাহ্‌র শত্রুনিধন, কঠোর দায়িত্ব পালন অথবা সাধনাসংকুলতার পাথেয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে তা হবে প্রশংসার্হ। যেমন আল্লাহ্‌পাক বলেছেন— 'আল্লাহ্‌ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে সুদৃঢ় দুর্গের মতো সারিবদ্ধভাবে'। একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে সুদৃঢ় সংকল্প ও তেজস্বী পদবিক্ষেপ। পক্ষান্তরে ক্রোধকে যদি ব্যবহার করা হয় দুর্বল জনতাকে দাবিয়ে রাখবার জন্য, অহংকার প্রকাশ ও অপঅভিলাষ চরিতার্থ করবার জন্য, তবে তা নিন্দার্হ তো হবেই। যেমন আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেছেন— 'জেনে রেখো, জালেমদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত'। আরো বলেছেন— 'আল্লাহ্‌ তো আত্মদর্পীদেরকে ভালোবাসেন না'।

একথাটিও মেনে না নিয়ে উপায় নেই যে, ক্রোধ ও প্রবৃত্তির কল্যাণকর ব্যবহার নির্ভর করে অন্তঃকরণের পবিত্রতার উপর। তৎসঙ্গে ভূতচতুষ্টয়ের পরিশুদ্ধতার উপরেও। যেমন রসুল স. বলেছেন, আদম সন্তানদের শরীরে রয়েছে এমন একটি গোশতপিণ্ড, যা অপরিশুদ্ধ হলে তার সমস্ত শরীর অপরিশুদ্ধ হয় এবং যা পরিশুদ্ধ হয়ে গেলে পরিশুদ্ধ হয় সমস্ত শরীর। শুনে রাখো, ওই গোশতপিণ্ডটির নাম কলব।

আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেছেন 'যে ব্যক্তি এটাকে পবিত্র করেছে, সে সফলতা লাভ করেছে। আর যে একে রেখেছে অপবিত্র, সে হয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত'। একথাও

www.eelm.weebly.com

অবিস্মরণীয় যে, শরিয়তের বিধিবিধানসমূহ প্রবর্তিত হয়েছে প্রবৃত্তি পরিশোধনার্থেই। তাই বলতে হয়, মানুষ জালেম ও জাহেল যাতে না হয়, সেকারণেই তাদের উপরে চাপানো হয়েছে আমানতের বোঝা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানবজাতি জালেম ও জাহেল। তাই আমি তাদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছি আমানতের বোঝা। সে-ও তা বরণ করে নিয়েছে সানন্দে। সুতরাং এখন সে আমানত বহনে নৈষ্ঠিক ও ঐকান্তিক হলে পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে অপকৃষ্টস্বভাব থেকে। স্বীয় যোগ্যতাকে করতে পারবে উন্নততর অনুগ্রহ অর্জনের অনুকূল। এভাবে হয়ে যেতে পারবে জালেমের বিপরীতে আদেল বা ন্যায়নিষ্ঠ এবং জাহেলের বিপরীতে আলেম বা জ্ঞানী। উভয় জগতে হতে পারবে রবাহূত ও বাঞ্ছিত। আর 'আমানত' অর্থ যদি ধরা হয় পরমসত্তাজাত জ্যোতি, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যেহেতু মানুষ জালেম ও জাহেল, তাই সে উত্তোলন করতে সমর্থ হয়েছে আমানতের গুরুভার। অর্থাৎ যে জালেম ও জাহেল, সে-ই আমানত বহনের যোগ্য (যে আঁধার, সে-ই তো আলোকিত হওয়ার অধিকারী)।

সবশেষে বলতে হয়, 'আমানত' অর্থ আনুগত্য, অবশ্যপালনীয় বিধান, আল্লাহ্‌র মারেফত, নৈকট্যভাজনতার স্তর বিশেষ যাই হোক না কেনো, সকল অবস্থায় ধরে নিতে হবে ক্রোধ ও প্রবৃত্তির রয়েছে দু'টি দিক। একটি শুভ এবং অপরটি অশুভ। আত্মশুদ্ধি ঘটলে এ দু'টোর প্রচেষ্টা ও পরিণতি হয় কল্যাণকর। আর আত্মশুদ্ধির অভাবে এ দু'টোই ডেকে আনে মহা অকল্যাণ। আর উভয় অবস্থায় ক্রোধ ও প্রবৃত্তিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে আমানতের বোঝা চাপানোর কারণরূপে।

পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'পরিণামে আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন'। এখানকার 'লিইয়ুআজ্‌জিবা' (শাস্তি দিবেন) কথাটির 'লাম' (জন্য) অব্যয়টি পরিণতি প্রকাশক। এভাবে বলতে চাওয়া হয়েছে— আমানত গ্রহণ করার পরিণতিতেই তাদের উপরে নেমে আসবে শাস্তি। যেমন একটি কবিতায় বলা হয়েছে 'লিদ্‌দু লিল মওত ওয়াব্‌নু লিল্ খরাব' (জীবনের পরিণাম মৃত্যু এবং নির্মাণের পরিণাম ধ্বংস)।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীরাই আমানতের দাবি পরিপূরণ করে যথাযথভাবে। সেকারণেই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর করুণার মেঘপুঞ্জ থেকে তাদের উপরে বর্ষণ করেন মার্জনার অপার্থিব বৃষ্টি। আর সে বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় তাদের পাপরাশির প্রভাব। এটা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বাসভাজন বান্দাগণের প্রতি ক্ষমাপরবশ ও দয়াবান।

www.eelm.weebly.com

উদ্ধৃত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে কুতাইবা বলেছেন, আল্লাহ্ বলেছেন— আমি কি শরিয়তের দায়িত্বভার এবং স্বভাবগত যোগ্যতা এমনভাবে উপস্থাপন করিনি, যাতে করে সুস্পষ্ট হয়ে যায় সত্যপ্রত্যাখ্যান ও কপটাচরণের মূল প্রকৃতি? একথাও যেনো সকলের জানা হয়ে যায় যে তারা শাস্তিযোগ্য। পক্ষান্তরে বিশ্বাস ও তার সুফল লাভের বিষয়টিকেও তো আমি করে দিয়েছি সুস্পষ্ট, যাতে করে সত্যান্বেষীরা সহজে খুঁজে পেতে পারে তাদের প্রকৃত সুহৃদ। এমতো সত্যান্বেষী বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো আল্লাহ্তায়ালা নিশ্চয় ক্ষমা করে দিবেন। আমি বলি, মারেফতের পথাভিসারী বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীরা শেষ পর্যন্ত পেয়ে যান আল্লাহ্র অন্তরালহীন ও আনুরূপ্যবিহীন সত্তাজাত জ্যোতিসম্পাতের নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণ।

উল্লেখ্য, মানুষ স্বভাবগতভাবেই জালেম ও জাহেল। তাই শতসতর্কতা সত্ত্বেও তার দ্বারা ভুলত্রুটি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাই আমানতবাহীদেরকে সবশেষে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে একথা বলে যে— আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাই তিনি আমানতবহনকারী নারী-পুরুষকে যেমন ক্ষমা করবেন, তেমনি প্রদান করবেন যথাপুরস্কার।

আলহামদুলিল্লাহ্! সুরা আহযাবের তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ পহেলা মহররম ১২০৭ হিজরী সনে।

সূরা সাবা

মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরায় রয়েছে ৬টি রুকু ও ৫৪টি আয়াত।

সুরা সাবা ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬,৭, ৮, ৯

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِىۡ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ وَ لَهُ الۡحَمۡدُ فِى الۡاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الۡحَكِيۡمُ الۡخَبِيۡرُ ۝١ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِى الۡاَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنۡزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا

www.eelm.weebly.com

يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَ هُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ۝٢ وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا
تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَ رَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا
يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ وَ لَاۤ
اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٣ ۙ لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٤
وَ الَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ
اَلِيْمٌ ۝٥ وَ يَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ
هُوَ الْحَقَّ ۙ وَ يَهْدِيْۤ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٦ وَ قَالَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ
مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝٧ ۚ اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ
جِنَّةٌ ؕ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَ الضَّلٰلِ
الْبَعِيْدِ ۝٨ اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ مِّنَ
السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ
عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٩ ع

r সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত কিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাঁহারই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত।

r তিনি জানেন যাহা ভূমিতে প্রবেশ করে, যাহা উহা হইতে নির্গত হয় এবং যাহা আকাশ হইতে নাযিল হয় এবং যাহা কিছু উহাতে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল।

www.eelm.weebly.com

r কাফিররা বলে, 'আমাদের নিকট কিয়ামত আসিবে না।' বল, 'আসিবেই, শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট উহা আসিবে।' তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁহার অগোচর নহে অণূ পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু; ইহার প্রত্যেকটি আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

r ইহা এইজন্য যে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তিনি তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন। ইহাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্ক।

r যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি।

r যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাই সত্য; ইহা পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ করে।

r কাফিররা বলে, 'আমরা কি তোমাদিগকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব যে তোমাদিগকে বলে, 'তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িলেও তোমরা নূতন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হইবেই?'

r সে কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি উন্মাদ? বস্তুত যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

r উহারা কি উহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যাহা আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে সহ ভূমি ধসাইয়া দিব অথবা উহাদের উপর আকাশখণ্ডের পতন ঘটাইব; আল্লাহ্‌র অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুরই মালিক'। একথার অর্থ— আল্লাহই যেহেতু সকলের ও সকল কিছুর একক স্রষ্টা, স্বত্বাধিকারী, পালক, ব্যবস্থাপক, নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক, সেহেতু প্রকাশ্য-গোপন সরব-নীরব সকল স্তব-স্তুতির অধিকারীও কেবল তিনিই।

লক্ষণীয়, বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, কেউ কেউ কোনো কোনো বিষয়ে কখনো কখনো হয়ে যায় প্রশংসার যোগ্য। এরকম হওয়ার কারণ এই যে, তাদের নিকটে পৌঁছে যায় আল্লাহ্‌তায়ালার কোনো কোনো অনুগ্রহ। ফলে রূপক অর্থে তারাও হয়ে যায় প্রশংসার্হ। প্রকৃত অর্থে সকল প্রশংসা কেবলই আল্লাহ্‌র।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আখেরাতেও প্রশংসা তাঁরই'। এই বাক্যটি প্রথমোক্ত বাক্যের প্রলম্বায়ন। প্রথমোক্ত বাক্যটি ছিলো সাধারণার্থক। আর এই বাক্যটি সীমিতার্থক। সুতরাং বলা যেতে পারে, ইহজগতে সাধারণভাবে সকল

www.eelm.weebly.com

প্রশংসা আল্লাহ্র এবং পরকালে প্রশংসাসমূহ বিশেষভাবে কেবলই আল্লাহ্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম বাক্যটিতে উল্লেখিত স্তুতিবাদ সাধারণার্থক নয়। বরং ইহজগতের স্তুতিবাদ হচ্ছে পার্থিব বদান্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রকাশিত স্তুতিবাদ। যেহেতু দাতা একমাত্র তিনিই, তাই প্রশংসা লাভেরও তিনি একক অধিকর্তা। আবার পরজগতের স্তুতিবাদের অধিকারীও কেবল তিনি। সুতরাং বুঝতে হবে দু'টো বাক্যই সীমিতার্থক, সাধারণার্থক কোনোটাই নয়। অর্থাৎ রূপকার্থক প্রশংসা আল্লাহ্র প্রশংসার অন্তর্ভূত হওয়া সম্ভবই নয়। তাই প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ্। আর পরের বাক্যে বলা হয়েছে 'লাহুল হামদ'। এভাবে প্রথমে প্রশংসা-বন্দনাকে রাখা হয়েছে অনির্দিষ্টার্থক এবং পরে বিষয়টিকে করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট। এভাবে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, পরকালে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রশংসা সম্পূর্ণরূপে অচল। অর্থাৎ রূপকার্থেও সেখানে কেউ প্রশংসাভাজন নয়।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেন, পরলোকের প্রশংসা অর্থ স্বর্গবাসীদের প্রশংসা। আল্লাহ্পাক স্বয়ং তাঁর বচনামৃতে স্বর্গবাসীদের প্রশংসাবন্দনার উল্লেখ করেছেন এভাবে— ১. আলহামদু লিল্লাহিললাজী হাদানা লিহাজা ওয়ামা কুন্না লি নাহতাদিয়া লাওলা আন হাদানাল্লহ্' ২. ওয়া ক্বলুল হামদু লিল্লাহিল্লাজী সদাক্বনা ওয়ায়্দাহু ৩. আলহামদু লিল্লাহিল লাজী আজহাবা আ'ন্নাল হাজানা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত'। একথার অর্থ তিনি প্রজ্ঞাময় বলেই সুদৃঢ় করেছেন ধর্মীয় বিধানাবলীকে। আর তিনি সকলের এবং সকলকিছুর প্রকাশ্য-গোপন সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। কারণ তিনি সর্বজ্ঞও।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে নাজিল হয় এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল'। একথার অর্থ— তিনি উত্তমরূপে অবগত, বৃষ্টির পানি কীভাবে প্রবেশ করে ভূগর্ভে, মৃত্তিকামধ্যে কীভাবে বিলীন হয় মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মরদেহ, কোথায় বা মৃত্তিকাগর্ভে সঞ্চিত হয়ে আছে খনিজ সম্পদ। এভাবে তিনি এ বিষয়টিও অবগত যে, কীভাবে মৃত্তিকাপৃষ্ঠে সমুদ্গত হয় সবুজ উদ্ভিদ। কীভাবে যত্রতত্র প্রবাহিত হয় নদ-নদী-ঝরণা। আবার কীভাবেই বা পরবর্তী পৃথিবীতে সমুত্থিত হবে মৃতগলিত সমাহিত মানুষ। আকাশ থেকে অবতীর্ণ অপার্থিব বাণীসম্ভার, ফেরেশতামণ্ডলী এবং জীবনোপকরণ সম্পর্কেও তিনি তো অতি উত্তমরূপে অবহিত। আরো অবহিত মানুষের প্রার্থনা, পুণ্যকর্ম ও পুণ্যবাহী ফেরেশতাগণের ঊর্ধ্বারোহণ সম্পর্কেও। পরমতম দয়াপরবশ তিনি। তাইতো অবতীর্ণ করেন মানুষের প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ। আরো অবতীর্ণ করেন যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশে অক্ষম মানুষের জন্য যাচিত ও অযাচিত অনুগ্রহ ও মার্জনা। কারণ তিনি যে নিরতিশয় মার্জনাকারী।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— কাফেরেরা বলে, আমাদের নিকট কিয়ামত আসবে না। বলো, আসবেই, শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয় তোমাদের নিকট তা আসবে। তিনিই অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত'। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, মহাপ্রলয় হবে না। আপনি বলুন, শপথ আল্লাহ্র। মহাপ্রলয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তার সঠিক দিনক্ষণ আল্লাহ্ কাউকে জানাননি। কারণ বিষয়টি অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্ভূত। আর সত্তাগতভাবে তিনিই কেবল অদৃশ্য বিষয়াবলীর পরিজ্ঞাতা।

উল্লেখ্য, সত্তাগতভাবে কেবল আল্লাহ্ই অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। কিন্তু তিনি কখনো কখনো তাঁর প্রিয়ভাজনগণের কাউকে কাউকে অদৃশ্য বিষয়সমূহের কিছু কিছু জ্ঞান দান করেন। তাই আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশনা ব্যতিরেকে বিষয়টির স্বীকৃতি অথবা অস্বীকৃতি সিদ্ধ নয়। তাই কেবল ঘটিতব্য বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়াই যথেষ্ট। যেমন আল্লাহ্পাক জানিয়েছেন, কিয়ামত হবেই। তাই অদৃশ্যের এ বিষয়টিকে স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু এর দিন তারিখ যেহেতু জানানো হয়নি, তাই এ ব্যাপারে থাকতে হবে নিশ্চুপ। নিজেদের পক্ষ থেকে দিন তারিখ অনুমান করার চেষ্টা করা যাবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণুপরিমাণ কিছু'। একথার অর্থ— অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের এমনকিছু নেই, যা আল্লাহ্র জ্ঞানায়ত্ত নয়। যারা মনে করে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে কেবল আল্লাহ্র বর্তমানকালের জ্ঞানের কথা, তাদের ধারণা ভুল। কারণ, অদৃশ্য বিষয়ের সার্বভৌম জ্ঞান যে কেবলই তাঁর, সেই বিষয়টিকেই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে চিরন্তন প্রকাশরূপে। অর্থাৎ তিনি যেহেতু 'আ'লীমুল গইব' (সকল অদৃশ্য বিষয়াবলীর পরিজ্ঞাতা), তাই কিয়ামতের সঠিক দিনক্ষণ সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবগত। অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী কিয়ামতের বিষয়েও তিনি 'আ'লীমুল গইব'।

উল্লেখ্য, ঘটমানকালের অনেক বিষয় মানুষও জানে। এ সম্পর্কে সুরা আনয়ামের 'তাওয়াফ্ফাতহু রসূলুনা' আয়াতের তাফসীরে খোলামেলা আলোচনা করা হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! যুদ্ধলিপ্ত দু'জন সৈনিক কখনো কখনো মৃত্যুবরণ করে একসাথে। আবার প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে একই সঙ্গে মৃত্যুরবণ করে বহুসংখ্যক লোক। কোনো কোনো শিশু আবার প্রাণত্যাগ করে মাতৃজঠরেই। তাহলে মৃত্যুর ফেরেশতা কীভাবে একসাথে প্রাণসংহার করে এতগুলো প্রাণীর? তিনি স. বললেন, সারাপৃথিবী মৃত্যুদূত আজরাইলের চোখের সামনে, যেমন আমার সামনে রয়েছে এই বাসনখানি। সুতরাং তার দৃষ্টি ও আওতা থেকে কেউই গোপন নয়।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সকলকিছুই আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যহীন দৃষ্টিতে সতত পরিদৃশ্যমান। কারণ তিনি কালাতীত। তেমনি সকল স্থানের সকল কিছুও তাঁর গোচরায়ত্ত। কারণ তিনি স্থানাতীত। স্থান, কাল তাঁর সৃষ্টি। আর তিনি স্থান ও কালসম্ভূত সকলকিছুর একক সৃজয়িতা ও পালয়িতা।

উপযোগ ঃ মহাকালদর্শন লাভ করেন কোনো কোনো মহামনিষীও। হাদিস শরীফেও এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একদিন সুর্যগ্রহণ দেখা দিলো। রসুল স. তাঁর সহচরবৃন্দসহ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠ করলেন। নামাজ শেষে তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! আমরা লক্ষ্য করলাম, নামাজ পাঠকালে একবার আপনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। মনে হলো আপনি যেনো কিছু ধরার চেষ্টা করছেন। এরপর একবার দেখলাম, আপনি হঠাৎ কিছুটা পিছিয়ে এলেন। তিনি স. বললেন, সহসা আমার সামনে সমুদ্ভাসিত হলো জান্নাত। ফল ভারাবনত বৃক্ষগুলিকে মনে হলো একেবারে কাছে। ফল চয়ন করার জন্য তখন আমি বাড়িয়ে দিলাম হাত। যদি ওই ফল আমি ছিঁড়ে নিতে পারতাম, তবে তা আমার গোটা উম্মত মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত খেয়ে শেষ করতে পারতো না। কিন্তু পরক্ষণে নয়নগোচর হলো জাহান্নাম। উহ্‌ কী ভয়ংকর! এরকম বীভৎস দৃশ্য আমি আগে কখনো দেখিনি। দেখলাম জাহান্নামের অধিকাংশই নারী। উল্লেখ্য, পরকালে মহাবিচারপর্ব সমাপনের পর মানুষ যাবে জান্নাতে ও জাহান্নামে। অথচ রসুল স. তা পৃথিবীতে অবস্থানের সময়েই দেখতে পেলেন। এটাই হচ্ছে মহাকাল দর্শনের একটি দৃষ্টান্ত।

একটি সন্দেহ ঃ এমনও তো হতে পারে যে, রসুল স. এর ওই দর্শন ছিলো স্বপ্নদর্শনের মতো কোনোকিছু। সম্ভবতঃ তিনি স. জান্নাত ও জাহান্নাম দর্শন করেছিলেন উপমার জগতের (আলমে মেছালের) প্রতিচ্ছবিরূপে।

সন্দেহের নিরসন ঃ রসুল স. বলেছেন, ওই ফল যদি আমি ছিঁড়ে আনতে পারতাম, তবে গোটা উম্মত তা কিয়ামত পর্যন্ত খেয়েও শেষ করতে পারতো না। তাঁর এরকম কথাতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি স. তখন দেখেছিলেন প্রকৃত জান্নাত ও জাহান্নাম। তাদের প্রতিচ্ছবি নয়।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি জান্নাত দর্শন করেছি। আবু তালহার সহধর্মিণীকেও দেখেছি সেখানে।

হজরত আনাস থেকে আহমদ, আবু দাউদ ও জিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, স্বর্গযাত্রার সময় পথিমধ্যে আমি দেখলাম কিছুসংখ্যক লোককে। তাদের হাতের নখগুলো ছিলো তাম্রনির্মিত। তারা নিজে নিজে ওই নখগুলো দিয়ে আঁচড় কাটছিলো তাদের মুখে ও বুকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভ্রাতা জিবরাইল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা মানুষের গোশত ভক্ষণকারী, নিন্দুক, মানুষের সম্ভ্রম বিনষ্টক।

www.eelm.weebly.com

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে তখন দেখানো হলো এক বনী ইসরাইলী রমণীকে। তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিলো বিড়াল হত্যার কারণে। একটি বিড়ালকে আটকে রেখেছিলো সে। তাকে সে আহার দিতো না, আবার ছেড়েও দিতো না। এমতাবস্থায় বিড়ালটি অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আরো দেখানো হলো ওমর ইবনে আমের খাযায়ীকে। সে তার নাড়িভুঁড়ি হেঁচড়িয়ে চলছিলো। সে ছিলো ধর্মের নামে ষাঁড় ছেড়ে দেওয়ার কুপ্রথাটির প্রথম প্রবর্তক।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু; এর প্রত্যেকটি আছে সুস্পষ্ট কিতাবে'।

অধিকাংশ তাফসীরবেত্তাগণ বলেন, এখানকার 'লা ইয়া'যুবু আনহু' (তাঁর অগোচর নয় অণুপরিমাণ কিছু) কথাটির অর্থ কোনোকিছুই তাঁর অবহিতির বাইরে নয়। আর 'অগোচর' বলে যদি অর্থ নেওয়া হয় জ্ঞানবহির্ভূত অদৃশ্য বিষয় এবং 'সুস্পষ্ট কিতাব' এর অর্থ যদি করা হয় আল্লাহ্‌র জ্ঞান কিংবা সুরক্ষিত ফলক, তাহলে আলোচ্য বাক্যের দ্বারা একথাই প্রকাশ পায় যে, তাঁর নিকটে অদৃশ্য বলে কোনোকিছুই নেই। আর তাঁর অদৃশ্য জ্ঞানের আংশিক প্রকাশ হচ্ছে 'সুস্পষ্ট কিতাব' বা লওহে মাহফুজ (সুরক্ষিত ফলক)।

কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রস্তুতকৃত বিষয়ের নিন্দনীয় সূচনা দ্বারা অপ্রস্তুত বিষয়ের প্রশংসা করা হয়েছে। ব্যাকরণের ভাষায় একে বলে অপ্রস্তুত প্রশংসা বা ব্যাজস্তুতি। যেমন বলা হয়— সাদেকের একটিই দোষ, তা হচ্ছে সে একজন বিজ্ঞ বিদ্বান। তেমনি এখানকার বক্তব্যটি হবে— অণুপরিমাণ কোনো কিছুই আল্লাহ্‌র অগোচর নয়, কেবল সুরক্ষিত ফলকে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— অদৃশ্য কোনোকিছুই যখন আল্লাহ্‌র অগোচর নয়, তখন সুরক্ষিত ফলকের বিবরণ আবার তাঁর অগোচর হয় কীরূপে?

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ, তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক'। একথার অর্থ— বান্দার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে প্রতিপালন করা কোনো বিশ্বাসবানের পক্ষে সম্ভব নয়। কিছু না কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি তার থাকবেই। কিন্তু আল্লাহ্ অতিশয় কৃপাপরবশ। তাই তিনি তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর তাদের সৎকর্মসমূহের প্রতিদান হিসেবে তাদেরকে দান করবেন জান্নাতের মহাসম্মানিত উপজীবিকা, যা হবে অনায়াসলব্ধ ও অন্য কারো বদান্যতাবিবর্জিত।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে, তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি'। একথার অর্থ— যারা

www.eelm.weebly.com

আমার নিদর্শনবলীকে নিষ্ক্রিয় করবার অপপ্রয়াস চালায়, এ সম্পর্কে মানুষকে করে তুলতে চেষ্টা করে বীতশ্রদ্ধ, তারা নিঃসন্দেহে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে জাহান্নামের ভয়াবহ ও মর্মন্তুদ শাস্তি। কাতাদা বলেছেন, এখনে 'রিজ্বসুন' অর্থ নিকৃষ্ট শাস্তি। আর 'আলীম' অর্থ মর্মন্তুদ, যন্ত্রণাদায়ক।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা-ই সত্য, এটা পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র প্রতি পথনির্দেশ করে'।

এখানে 'যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল গ্রন্থধারীকে যারা ইসলাম কবুল করেছিলেন। যেমন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ হজরত সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের অনুসারীগণ। যদি তা-ই হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— মহাবিচারের দিবসে সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারীগণ প্রত্যক্ষ করবেন, কোরআন সত্য। এখন তাঁরা কোরআনকে সত্য জানেন দলিলপ্রমাণের ভিত্তিতে। কিন্তু সেদিন তাঁরা চাক্ষুষ করবেন সে সত্যের স্বরূপ।

'ইয়াহ্‌দি' অর্থ পথপ্রদর্শন করেন আল্লাহ্, অথবা পথ দেখায় কোরআন। আর 'ইলা সিরাত্ব' অর্থ ইসলামের দিকে।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'কাফেরেরা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিবো, যে তোমাদেরকে বলে, তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবেই'?

এখানে 'কাফেরেরা বলে' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে। অর্থাৎ মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান ও বিচারদিবসের প্রতি যারা অবিশ্বাসী, তারা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে'। আর এমন এক ব্যক্তি' অর্থ এখানে রসুল স.। অর্থাৎ ওই ব্যক্তিই সংবাদ দেয় কিয়ামত, হাশর, নশর ইত্যাদির।

'মুয্‌যিক্বতুম কুললা মুমায্যাক্বিন' অর্থ তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও। অর্থাৎ মৃত্যুর পর তোমরা মাটির সঙ্গে মিশে গেলে, বন্যার তোড়ে কোথাও ভেসে গেলে, অথবা বায়ুতাড়িত হয়ে দিগ্বিদিকে নিক্ষিপ্ত হলেও।

'ইন্নাকুম লাফী খলক্বিন্ জ্বাদীদ' অর্থ, তোমরা উত্থিত হবে নতুন সৃষ্টিরূপে। কথাটি একটি প্রবাদবচন। কেননা 'ইবুনাব্বিউকুম' এর মধ্যেই মূল বক্তব্যটি বিদ্যমান। উল্লেখ্য, রসুল স. কুরায়েশ কুলোদ্ভব এবং তিনি স. সকলের নিকট সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ। তৎসত্ত্বেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাঁর নাম উচ্চারণ না করে এখানে বলেছে 'এমন ব্যক্তি'। এতে করে প্রকাশ পেয়েছে তাদের চরম হঠকারিতা, অজ্ঞতা ও রসুল স. এর প্রতি হেয় মনোভাব। আর মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ইত্যাদি তো ছিলো তাদের বোধবুদ্ধির বাইরে।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৮)বলা হয়েছে— 'সে কি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি উন্মাদ'? একথার অর্থ— ইচ্ছাকৃতভাবেই সে আল্লাহ্র প্রতি করে অসত্যারোপ। অথবা সে উন্মাদ। হঠাৎ যা মনে হয়, তা-ই বলে ফেলে। বক্তব্য সঠিক হোক অথবা হোক অঠিক।

উল্লেখ্য, এখানে যেহেতু মিথ্যার বিপরীতে এসেছে উন্মাদ হওয়ার কথা, তাই কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে রয়েছে আরেকটি স্তর, যা সত্য-মিথ্যা কোনোটাই নয়। তা হচ্ছে উন্মাদনা। কিন্তু এরকম ব্যাখ্যা দৌর্বল্যদুষ্ট। কেননা 'ইফতারা' (অসত্য) এবং 'ফিজর' (মিথ্যা) সমান্তরাল নয়। ইচ্ছাকৃত মিথ্যাবচনকে বলে 'ইফতারা' এবং ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যাভাষণকে বলে ফিজর'। দু'টোই মিথ্যা। কারণ দু'টোই সত্যের বিপরীত।

এরপর বলা হয়েছে— 'বস্তুত যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র রসুল আল্লাহ্ সম্পর্কে কোনো মিথ্যা উদ্ভাবন করেননি, এরকম করা তাঁর জন্য অসম্ভব। আর উন্মাদ তিনি তো মোটেও নন। সুতরাং যারা তাঁর কথা অবিশ্বাস করে, অস্বীকার করে আখেরাতকে, তারা পড়ে আছে চরম পর্যায়ের বিভ্রান্তিতে এবং লিপ্ত রয়েছে আখেরাতের শাস্তিযোগ্য কর্মকাণ্ডে। এভাবে এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপউক্তির প্রতিবাদ করা হযেছে জোরে শোরে। আর তারা যে চরম বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত সে কথাও জানানো হয়েছে অতি দৃঢ়তার সঙ্গে।

'দ্বলালিন বায়ী'দ' অর্থ ঘোর বিভ্রান্তি। এখানে 'বায়ী'দ' (ঘোর, চরম) শব্দটি বিশেষণরূপে আধিক্যপ্রকাশক। উল্লেখ্য, তাদের শাস্তির কারণ হচ্ছে 'দ্বলাল' বা বিভ্রান্তি। অথচ এখানে শাস্তির কারণের পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে 'শাস্তি'র কথা। এভাবে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তদের শাস্তি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যা আছে, তার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে সহ ভূমি ধসিয়ে দেবো অথবা তাদের উপর আকাশখণ্ডের পতন ঘটাবো'। একথার অর্থ— তারা তাদের চতুর্দিকে এবং উপরে ও নিচে দৃষ্টিপাত করে এই মহাসৃষ্টির মহাসৃজয়িতার কথা ভাবতে চেষ্টা করে না কেনো? তাঁর এমতো অতুলনীয় সৃজননৈপুণ্য দর্শন করে কেনো একথা বুঝতে চেষ্টা করে না যে, যিনি এমতো সর্বশক্তিধর তাঁর পক্ষে মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন দান করা অতি সহজ। এই মহাসত্য যিনি প্রচার করেন, সেই প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকেই বা কীভাবে প্রত্যাখ্যান করা যায়? তিনি যে আগে থেকেই সত্যবাদী বলে সুপরিচিত। আর তাঁকে উন্মাদই বা বলা যায় কীভাবে? তিনি তো পূর্ব থেকেই বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বলে সুপ্রসিদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

‘তারা কি দ্যাখেনা’ (আফালাম ইয়ারাও) কথাটির মাধ্যমে এখানে শুরু করা হয়েছে ভীতিপ্রদর্শন। যেনো বলা হয়েছে— তারা কি চক্ষুবিবর্জিত, না দৃষ্টিহীন? যেখানেই তারা যাক না কেনো, দেখবে তারা আছে আল্লাহ্র দু'টি বিশাল সৃষ্টি আকাশ-পৃথিবীর আবেষ্টনীর মধ্যে। তিনি তো তাদেরকে যে কোনো মুহূর্তে করতে পারেন ভূপ্রোথিত। অথবা আকাশ থেকে অবতীর্ণ করতে পারেন সংহারপ্রবণ শাস্তি। যেমন তিনি আকাশ থেকে প্রস্তরবর্ষণ করে নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন সাদুমবাসীদেরকে। আর তোমাদের অপরাধ তো তাদেরই মতো। তারা যেমন প্রেরিত পুরুষকে অস্বীকার করেছিলো, তোমরাও তো করে চলেছো সেরকমই।

শেষে বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্র অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে’। একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্র পথের পথিক তাদের কাছে এই মহাসৃষ্টি নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালার সৃজননৈপুণ্য ও তাঁর একক অস্তিত্বের প্রমাণ। আরো প্রমাণ মহাপ্রলয়ের, মহাপুনরুত্থানের। কেননা আল্লাহ্ অভিমুখী হওয়ার কারণে তাদের চিন্তা-চেতনা পরিশুদ্ধ ও সঠিক সিদ্ধান্তপ্রদায়ক।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ১০, ১১

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۝١٠ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۖ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝١١

r আমি নিশ্চয় দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং আদেশ করিয়াছিলাম, ‘হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সংগে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর’ এবং বিহংগকুলকেও, তাহার জন্য নমনীয় করিয়াছিলাম লৌহ—

r ‘যাহাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈয়ার করিতে এবং বুননে পরিমাপ রক্ষা করিতে পার’ এবং তোমরা সৎকর্ম কর, তোমরা যাহা কিছু কর আমি উহার সম্যক দ্রষ্টা।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আমি নিশ্চয় দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম’। একথার অর্থ— আমি অসংখ্য বিশ্বাসবানের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি আমার প্রিয় নবী দাউদকে। এখানে ‘ফাদ্বলান’ অর্থ শ্রেষ্ঠত্বরূপ অনুগ্রহ। হজরত সুলায়মানের উক্তিরূপে অন্য এক আয়াতেও বলা হয়েছে— এমতো শ্রেষ্ঠত্বের কথা। যেমন— ‘আলহামদুলিল্লাহিল লাজী ফাদ্বদ্বল্না আ'লা কাছীরিম মিন ইবাদিহীল মু'মিনীন’ (যাবতীয় প্রশংসা ওই আল্লাহ্র, যিনি আমাকে মহিমান্বিত করেছেন তাঁর অনেক বিশ্বাসবানগণের মধ্যে’।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য, নবী দাউদের এমতো শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়েছিলো তাঁর প্রতি অবতারিত যবুর শরীফের কারণে। আর তিনি ছিলেন আল্লাহ্র প্রিয় নবী। তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিলো অত্যন্ত শ্রুতিসুখকর। লোহা গলে মোমের মতো নরম হয়ে যেতো তাঁর করস্পর্শে। এসকল অনুগ্রহসম্ভারও তাঁকে করেছিলো অনন্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আদেশ করেছিলাম, হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো'।

এখানকার 'আওবিবি' শব্দটির ধাতুমূল 'ইয়াব'। এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, অনুগামী হওয়া। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি আদেশ করেছিলাম, ওহে শৈলশ্রেণী! আমার প্রিয় নবী দাউদ যখন আমার প্রশংসা-বন্দনায় নিমগ্ন হয়, তখন তোমরাও হয়ো তার অনুগামী। অথবা 'ইয়াব' অর্থ এখানে পবিত্রতা বর্ণনা। 'আওয়াবা' অর্থ 'সাব্বাহা'— তসবীহ্ পাঠ করা, পবিত্রতা বর্ণনা করা, অন্য দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহ অভিমুখী হওয়া। 'আওয়াব' এর ধাত্যর্থ দিনমান পথপরিক্রমণ এবং রাতে যাত্রাবিরতি। এরকম বলেছেন কুতাইবি। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে গিরিমালাসমূহ! তোমরা দিবাভাগে দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা বর্ণনা করো। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— তুমি দাউদের সুরে সুর মিলিয়ে আমার প্রশংসা করো।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বিহঙ্গকুলকেও'। বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি আসলে এরকম— আমার পক্ষ থেকে আমি দাউদকে দান করেছি অনুগ্রহসম্ভার। আল্লাহ্র নির্দেশেই পাহাড় ও পাখিরা সহগায়ক হতো তাঁর বন্দনাগীতির। উল্লেখ্য, স্বমহিমার উচ্ছ্বাস, প্রশাসনিক প্রতাপ ও কর্তৃত্বের প্রচণ্ডতার বিকাশের স্থলে এখানে সাধিত হয়েছে বাকরীতির অপহ্নুতির ব্যবহার। যেনো বলা হয়েছে— আমারই নির্দেশে বিবেকহীন সৃষ্টিও বিবেকবানদের মতো তসবীহ্ পাঠ করতো দাউদের সঙ্গে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত দাউদ যখন তাঁর বন্দনাকে উচ্চকিত করতেন, তখন তার প্রতিধ্বনি ভেসে আসতো গিরিকন্দর থেকে। এটাই ছিলো গিরিশ্রেণীর বন্দনা। আর উড্ডীয়মান পাখিরা পক্ষবিস্তার করে স্থির হতো তাঁর মাথার উপরে।

এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে— হজরত দাউদ গিরিগহ্বরে প্রবিষ্ট হয়ে শুরু করতেন তাঁর প্রভুপালনকর্তার বন্দনাসঙ্গীত। সে সঙ্গীতে কণ্ঠ মেলাতো গিরিমালা সমূহও। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত দাউদ যখন আল্লাহ্র প্রশংসাকীর্তন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যেতেন, তখন পর্বতশ্রেণী আল্লাহ্র হুকুমে শুরু করতো তাঁর প্রশংসাকীর্তনের প্রত্যুচ্চারণ। আল্লাহ্র প্রিয় নবীকে প্রফুল্ল রাখাই ছিলো তাদের এমতো প্রত্যুচ্চারণের উদ্দেশ্য।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তার জন্য নমনীয় করেছিলাম লৌহ'। একথার অর্থ— আমি আরো একটি অনুগ্রহ প্রদান করেছিলাম দাউদকে। তাঁর করস্পর্শে লোহা হয়ে যেতো গলিত মোম অথবা খামিরকৃত আটার মতো নমনীয়।

বাগবী লিখেছেন, ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত দাউদ বনী ইসরাইলদের রাজা থাকাকালে প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শনের জন্য মাঝে মাঝে রাতের বেলা ছদ্মবেশে রাস্তায় বের হতেন। কারো সাথে সাক্ষাত হলে জিজ্ঞেস করতেন, আপনাদের রাজা কেমন লোক বলুন দেখি। তারা জবাব দিতো, বড়ই প্রজাবৎসল। একদিন আল্লাহ্তায়ালা মানবাকৃতিতে পাঠালেন এক ফেরেশতা। তার সাথে দেখা হতেই তিনি অভ্যাস মতো জিজ্ঞেস করলেন, বলো হে পথিক! তোমাদের মহারাজ লোকটি কেমন? ফেরেশতা বললো, মন্দ না। তবে একটা ব্যাপার তাঁর জন্য বড়ই বেমানান। হজরত দাউদ চমকে উঠে বললেন, কোনটা? ফেরেশতা বললো, তিনি নিজের ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করেন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে। কুতাইবা বর্ণনা করেছেন, তখন হজরত দাউদ প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমি উপজীবিকার একটি উপলক্ষ আমাকে দান করো, যাতে স্বহস্ত উপার্জিত অর্থের মাধ্যমে আমার সংসারের ব্যয় নির্বাহ হয়। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন। তাঁকে শিখিয়ে দিলেন লৌহবর্ম তৈরীর কলাকৌশল। সঙ্গে দিলেন একটি অলৌকিক ক্ষমতা। তিনি কোনো লৌহ খণ্ড হাতে নিলেই তা হয়ে যেতো গলিত মোমের মতো মোলায়েম। তখন তিনি ওই লৌহখণ্ড হাতে নিয়ে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে লৌহবর্ম বানাতে পারতেন। তিনিই ছিলেন লৌহবর্মের প্রথম নির্মাতা। প্রতিদিন তিনি নির্মাণ করতেন একটি বর্ম এবং তা বিক্রয় করতেন ছয় হাজার দিরহামে। দুই হাজার দিরহাম ব্যয় করতেন সংসারের জন্য এবং বাকী চার হাজার বিলিয়ে দিতেন দুস্থ প্রজাসাধারণের মধ্যে।

হজরত মিকদাম ইবনে মাদী কারাব থেকে বোখারী ও আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, স্বহস্ত উপার্জন অপেক্ষা উত্তম জীবনোপকরণ আর নেই। আল্লাহ্র নবী দাউদ ভক্ষণ করতেন স্বহস্ত উপার্জনলব্ধ আহার্য। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, তিনি স্বোপার্জিত আহার্য ছাড়া অন্য কিছু ভক্ষণ করতেন না।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করতে এবং বুননে পরিমাপ রক্ষা করতে পারো এবং তোমরা সৎকর্ম করো, তোমরা যা কিছু করো আমি তার সম্যক দ্রষ্টা'। একথার অর্থ— যাতে করে হে আমার নবী! তুমি নির্মাণ করতে পারো এমন বর্ম যা সমস্ত শরীরকে রক্ষা করে এবং যে বর্মের বুনন হয় বিশেষ কৌশলে সম্পন্ন। যথাস্থানে আঁটা থাকে খিল। ফাঁকগুলো যেনো থাকে মধ্যম মাপের। যেনো বর্মটি না হয় অতি হালকা, অথবা অতি ভারী। আর

www.eelm.weebly.com

হে নবী ও নবীর পরিবারবর্গ! আল্লাহ্ প্রদত্ত কৌশলের কারণে যেহেতু তোমরা লাভ করেছো সাংসারিক স্বচ্ছলতা, তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তোমরা নিয়োজিত হও নিরবচ্ছিন্ন পুণ্যকর্মে। একথাও স্মরণে রেখো যে, তোমাদের সকল কার্যকলাপই আমার দৃষ্টিবদ্ধ। যথাসময়ে আমি দান করবো তোমাদের পুণ্যকর্মসমূহের যথাপুরস্কার।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ পবিত্র। তাই পবিত্র বস্তুই তাঁর প্রিয়। তিনি তাঁর নবীগণকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, সে নির্দেশ দিয়েছেন বিশ্বাসীদেরকেও। বলেছেন, হে নবীগণ! তোমরা ভক্ষণ করো হালাল আহার্য এবং সম্পন্ন করো উত্তম কর্ম।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ১২, ১৩, ১৪

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ
عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ
يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ
مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ
رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْۤا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ
الشَّكُوْرُ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖۤ اِلَّا
دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ
كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ؕ ﴿١٤﴾

r আমি সুলায়মানের অধীন করিয়াছিলাম বায়ুকে যাহা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করিত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত। আমি তাহার জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছিলাম। তাহার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে জিন্নদের কতক তাহার সম্মুখে কাজ করিত। উহাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাহাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নি-শাস্তি আস্বাদন করাইব।

www.eelm.weebly.com

r উহারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাওযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেক নির্মাণ করিত। আমি বলিয়াছিলাম, 'হে দাউদপারিবার! কৃতজ্ঞতার সংগে তোমরা কাজ করিতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।'

r যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটাইলাম তখন জিন্নদিগকে তাহার মৃত্যু বিষয় জানাইল কেবল মাটির পোকা যাহা তাহার লাঠি খাইতেছিল। যখন সে পড়িয়া গেল তখন জিন্নেরা বুঝিতে পারিল যে, উহারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকিত তাহা হইলে উহারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকিত না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করতো এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করতো'।

হাসান বলেছেন, সম্রাট নবী সুলায়মান বায়ুতে ভর করে উষাকালে যাত্রা করতেন। দ্বিপ্রহরে যাত্রা ক্ষান্ত দিতেন ইসতেখারে, যা অবস্থিত ছিলো দ্রুতগতিসম্পন্ন বাহনের এক মাসের পথের দূরত্বে। পরদিন দ্বিপ্রহরে আবার যাত্রা করতেন তিনি। রাতে গিয়ে থামতেন ব্যবিলনে। এ যাত্রাটির দূরত্বও ছিলো দ্রুতগামী বাহনারোহীর এক মাসের পথের দূরত্বে। বর্নিত হয়েছে, তিনি প্রাতঃরাশ সম্পন্ন করতেন বাইরে এবং সমরখন্দে করতেন সান্ধ্যভোজন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তার জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম'। এখানে 'আল ক্বিতর' অর্থ বিগলিত তাম্র। আল্লাহ্পাক তাঁর জন্য তাম্রকে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন জলস্রোতের মতো। তাই এখানে বলা হয়েছে 'আইনাল ক্বিতর' (তাম্র-প্রস্রবণ)।

বাগবী লিখেছেন, ওই তাম্র-নির্ঝর প্রবহমান ছিলো মাত্র তিন দিন। আর ঘটনাটি ঘটেছিলো ইয়েমেনে। ওই তাম্রস্রোতের মাধ্যমে সেখানকার লোকেরা উপকৃত হয় বহুল পরিমাণে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে কতিপয় জ্বিন তার সম্মুখে কাজ করতো'। এখানে 'ইজন' অর্থ আদেশে, অভিপ্রায়ে, অথবা অনুগত হয়ে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নি-শাস্তি আস্বাদন করাবো'। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'আজাবিস্ সায়ীর' অর্থ দোজখের শাস্তি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, পার্থিব বিপদাপদ। আমি বলি, 'ইজন' অর্থ যদি আদেশ হয়, তবে 'আজাবিস্ সায়ীর' কথাটির অর্থ হবে পারত্রিক শাস্তি। কারণ পরকালই হচ্ছে পুরস্কার-তিরস্কার প্রাপ্তির প্রকৃত স্থান। আর 'ইজন' অর্থ অভিপ্রায় ধরা হলে, কথাটির অর্থ ইহজাগতিক শাস্তি গ্রহণ করাই হবে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ।

www.eelm.weebly.com

একটি সন্দেহ ঃ জ্বিনদের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করা যদি আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় হয়ে থাকে, তবে জ্বিনেরা তার অন্যথা করতে পারবে কীভাবে? আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় তো অবশ্যবাস্তবায়নব্য।

সন্দেহের নিরসন ঃ 'মিনাল জ্বিননি' (জ্বিনদের কতক) কথাটির 'মিন' আংশিক অর্থপ্রকাশক। আর আংশিক অর্থ এখানে অধিকাংশ। অর্থাৎ অধিকাংশ জ্বিনই কাজ করতো। তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো একজন ফেরেশতা দ্বারা। কেউ অবাধ্য হলে ওই ফেরেশতা তাকে পিটিয়ে সোজা করে দিতো। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অধিকাংশ জ্বিন হজরত সুলায়মানের নির্দেশ অনুসারে কর্মরত থাকতো। আর এটাই ছিলো আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে 'মাঁইইয়াযিগ' অর্থ যে জ্বিন আদেশ পালনে গড়িমসি করতো, প্রকাশ করতো বিদ্রোহাত্মক মনোভাব, তাকে প্রহার করে সোজা করে দিতো ওই ফেরেশতা। অর্থাৎ 'নির্দেশ অমান্য করে' কথাটির অর্থ এখানে— নির্দেশ লংঘনের ইচ্ছা করে।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউজসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেক নির্মাণ করতো'।

এখানে 'মাহারীব' অর্থ সৃদৃঢ় প্রাসাদ, সুউচ্চ মসজিদ, সুউন্নত বসতবাটি। 'মাহারীব' শব্দটি 'মিহরাব' এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ 'হরব' (যুদ্ধ) করা, আক্রমণ প্রতিহত করা। আর সুউচ্চ প্রাসাদও বিরূপ প্রাকৃতিক প্রভাবকে প্রতিহত করে।

বাগবী লিখেছেন, বায়তুল মাকদিস মসজিদের নির্মাণ কার্য শুরু হয় হজরত দাউদের আমলে। যখন মসজিদের প্রাচীর এক মানুষ সমান নির্মাণ করা হলো, তখন প্রত্যাদেশ এলো, হে দাউদ! তোমার মাধ্যমে এ মসজিদের নির্মাণকর্ম সমাপ্ত হওয়া আমার অভিপ্রায় নয়। তোমার উত্তরসূরী সুলায়মানকে আমি দান করবো নবুয়ত ও সাম্রাজ্যাধিকার। আর সে-ই সুসম্পন্ন করবে এ মসজিদের নির্মাণ। এর কিছুকাল পরেই হজরত দাউদের মহাতিরোভাব ঘটলো। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন তাঁর প্রিয় পুত্র হজরত সুলায়মান এবং তিনিই সুসম্পন্ন করলেন বায়তুল মাকদিস মসজিদের নির্মাণপর্ব। ওই নির্মাণপর্বে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন শুভ-অশুভ উভয় প্রকার জ্বিনকে। কয়েকটি দলে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন তিনি তাদেরকে। তাদের কাজের প্রকৃতিও ছিলো বিভিন্ন রকম। আর মসজিদ নির্মাণে ব্যবহৃত শ্বেতমর্মর পাথরগুলো তিনি তাদেরকে দিয়ে উত্তোলন করিয়েছিলেন খনি থেকে।

মসজিদ নির্মাণ ছাড়াও ওই শ্বেতমর্মরগুলো দিয়ে তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন সুরক্ষিত দুর্গ, নগর-প্রাকার ও অনেক বসতবাটি। বনী ইসরাইলেরা ছিলো বারোটি গোত্রে বিভক্ত। তাদের প্রত্যেক গোত্রের জন্য তিনি জ্বিনদের দ্বারা নির্মাণ

www.eelm.weebly.com

করিয়ে নিলেন পৃথক পৃথক সুরক্ষিত নগরী। মসজিদ নির্মাণ করালেন সবার শেষে। জ্বিনদের এক এক উপদলের দায়িত্ব ছিলো এক এক রকমের। কেউ খনি থেকে পাথর তুলতে লাগলো। কেউ তুলতে লাগলো সোনারূপা। কেউ সমুদ্রাভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করে আনলো মনি-মুক্তা। কেউ আবার আনলো মেশক আম্বর ও অন্যান্য সুগন্ধিদ্রব্য। এভাবে সবগুলো নির্মাণসামগ্রী মিলে হয়ে গেলো বিশাল স্তূপ। সেগুলো গণনা অথবা পরিমাপ করার সাধ্য কারো ছিলো না।

এরপর ডেকে আনা হলো স্থপতি ও প্রকৌশলীদেরকে। তারা পাথরগুলোকে করিয়ে নিলো মসৃণ ও নির্দিষ্ট পরিমাপের। মণি-মুক্তা দিয়ে অংকন করিয়ে নিলো বিভিন্ন রকমের নয়নাভিরাম নকশা। দেয়াল ও মেঝে নির্মাণ করা হলো শ্বেত ও পীতবর্ণ মর্মরপ্রস্তর দিয়ে। মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হলো ফিরোজা বর্ণের গালিচা। এভাবে এক সময় সমাপ্ত হলো নির্মাণকর্ম। দেখা গেলো বায়তুল মাকদিসের মতো চিত্তাকর্ষক প্রাসাদ তৎকালীন পৃথিবীতে আর একটিও নেই। ঘোর অন্ধকার রাতেও মসজিদটি সমুদ্ভাসিত হতে লাগলো পূর্ণিমার চাঁদের মতো। হজরত সুলায়মান বনী ইসরাইলদের বিদ্বান ও সুধী সমাবেশে ঘোষণা করলেন, আমি এই সুদৃশ্য মসজিদ ভবনটিকে নির্মাণ করিয়েছি কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। এর বাহির ও ভিতরের সমস্তকিছু একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বায়তুল মাকদিস নির্মাণ সমাপনের পর নবী সুলায়মান আল্লাহ্ সকাশে প্রার্থী হয়েছিলেন তিনটি বিষয়ে। আল্লাহ্ তাঁকে দান করেছিলেন দু'টি। সম্ভবতঃ তৃতীয়টিও। ওই তিনটি বিষয় হচ্ছে— ১. আল্লাহ্ যেনো দান করেন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, যাতে যে কোনো জটিলতার সমাধানে তিনি গ্রহণ করতে পারেন ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত ২. যেনো তাঁর সকল সিদ্ধান্ত হয় আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের পূর্ণ অনুকূল ৩. তাঁকে যে বিশাল সাম্রাজ্য দেওয়া হয়েছে, এরকম সাম্রাজ্য যেনো ভবিষ্যতে আর কেউ না পায়। তিনি আরো নিবেদন করেছিলেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! যে আমার এই মসজিদে দুই রাকাত নামাজ পাঠ করবে, তাকে তুমি নিষ্পাপ করে দিয়ো সদ্যজাত শিশুর মতো। আমি আশা করি, আল্লাহ্ তাঁর এই নিবেদনটিও কবুল করে নিয়েছেন। বাগবী।

হজরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, স্বগৃহে পঠিত নামাজের পুণ্য একগুণ। সাধারণ মসজিদে পঠিত নামাজের পুণ্য পঁচিশ গুণ। জামে মসজিদে পাঁচশ গুণ। মাসজিদে আকসায় এক হাজার গুণ, আমার এই মসজিদে পঞ্চাশ হাজার গুণ এবং কাবাগৃহে একলক্ষ গুণ। ইবনে মাজা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তিনটি মসজিদ ব্যতীত তোমাদের বাহন অন্য কোনো স্থানে বেঁধো না— মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার মসজিদ।

www.eelm.weebly.com

সমাধান ঃ সোনারূপা ইত্যাদি দ্বারা মসজিদ অলংকৃত করা যায় কিনা, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে রয়েছে মতপৃথকতা। কেউ কেউ বলেছেন, এরকম করা মাকরূহ। কারণ এতে করে সম্পদের অপচয় হয়। রসুল স.ও এরকম করার অনুমতি দেননি। তাঁর পিতৃব্যপুত্র হজরত ইবনে আব্বাসও একবার আজ্ঞা করেছিলেন, তোমরা মসজিদকে কখনো অতিঅলংকৃত কোরো না, যেমন করে থাকে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা।

আবার কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, মসজিদ অলংকরণ পুণ্যের কাজ। কারণ এতে প্রকাশ পায় মসজিদেরই মাহাত্ম্য। হজরত সুলায়মানের আমল এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'হেদায়া' রচয়িতা লিখেছেন, কেউ যদি তার নিজস্ব সম্পদ দ্বারা মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, তবে তা হবে সিদ্ধ। কিন্তু মসজিদের তত্ত্বাবধায়কের পক্ষে এরকম করা সিদ্ধ নয়। তিনি ব্যয় করতে পারবেন কেবল জরুরী নির্মাণকর্মের জন্য। নকশা ইত্যাদি করা তার জন্য সিদ্ধ নয়। যদি কোনো তত্ত্বাবধায়ক এরকম কিছু করেই ফেলে, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ করতে হবে তার নিজস্ব সম্পদ দিয়ে। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, মসজিদ অলংকরণের চেয়ে দুস্থ জনতাকে সাহায্য করা অধিকতর উত্তম। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বজ্জন বলেন, মসজিদে রঙবেরঙের নকশা আঁকা, কাঠ অথবা চুন-সুড়কির মশলার দ্বারা চিত্রিত করা, সোনা-পানির ব্যবহার ইত্যাদি জায়েয। এতে কোনো অসুবিধা নেই। অর্থাৎ এতে পাপ-পুণ্য কোনোটাই নেই।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, মসজিদ সুসজ্জিত করা হলো। সুচিত্রিত হলো মসজিদ গাত্র, মিহরাব। অথচ সে মসজিদে নামাজ নিয়মিত হলো না। অথবা সেখানে যাওয়া আসা করে মুষ্টিমেয় নামাজী। কখনো ওঠে শোরগোল। লোকেরা সেখানে লিপ্ত হয় দুনিয়াবী কথাবার্তায়। মনে হয় যেনো কারো গৃহের বৈঠকখানা। এরকম অবস্থায় সুচিত্রিত মসজিদ নির্মাণ অবশ্যই মাকরূহ।

আমি বলি, হজরত সুলায়মানের ঘটনার প্রেক্ষিতে রসুল স. এর হাদিসকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। কারণ অতীতকালের নবী-রসুলগণের দ্বারা প্রবর্তিত প্রথা আমাদের উপরেও প্রযোজ্য, যদি না তার বিপরীতে আমাদের শরিয়তে কিছু বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানের সময়ের মানুষের মন-মানসিকতা ও সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের সময়ের পরিবেশ ও পরিস্থিতি তুলনীয় নয়। হজরত সুলায়মান ছিলেন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী নৃপতি। তাই সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিতে হতো। যেমন— তাঁর প্রজাকুলের মধ্যে জ্বিনেরা ছিলো দুর্বিনীত, সতত চঞ্চল। অবকাশ পেলেই তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করতো। তাই তাদেরকে সবসময় রাখতে হতো কাজ দিয়ে। হজরত সুলায়মান তাই তাদেরকে সারাক্ষণ লাগিয়ে রাখতেন

www.eelm.weebly.com

প্রাসাদ নির্মাণ, অলংকরণ ও অন্যান্য কাজে। রসুল স.কে এরকম বিব্রত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি। তাঁর উম্মতও এসকল কিছু থেকে মুক্ত। তাই হজরত সুলায়মানের সময়ে যা জায়েয, রসুল স. এর সময়ে তা নিরর্থক। ঐতিহাসিকেরা বলেন, বখতে নসরের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল মাকদিসের নির্মাণশৈলী ও অলংকরণ ছিলো অটুট। সে তার দুর্ধর্ষ বাহিনীকে দিয়ে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছিলো বনী ইসরাইলের প্রাসাদ, দুর্গ, নগরপ্রাকার ও অন্যান্য স্থাপনা। মসজিদও ধ্বংস করেছিলো সে। খুলে নিয়ে গিয়েছিলো মসজিদের মূল্যবান পাথর ও অন্যান্য সামগ্রী।

'তামছীল' এর বহুবচন 'তামাছীল'। এর অর্থ ভাস্কর্য, মূর্তি, বিগ্রহ, প্রতিমা। আর এখানে 'ভাস্কর্য' বলে বুঝানো হয়েছে পিতল, তামা, সীসা ও মর্মরপ্রস্তর নির্মিত মূর্তিকে। উল্লেখ্য, জ্বিনেরা হজরত সুলায়মানের উদ্দেশ্যে ইয়েমেনে নির্মাণ করেছিলো এক বিস্ময়কর স্থাপত্য। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত সুলায়মান জ্বিনদের দ্বারা নির্মাণ করাতেন সাধারণতঃ পশুপাখিদের মূর্তি। মসজিদের মধ্যেও তিনি অংকন করিয়েছিলেন ফেরেশতামণ্ডলী, নবী-রসুল ও খ্যাতনামা মনিষীগণের চিত্র। উদ্দেশ্য ছিলো, ওই সকল পুণ্যবানগণের স্মৃতি যেনো মানুষের অন্তরে জাগ্রত হয় এবং মানুষ যেনো তাঁদের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয় আল্লাহ্‌র ইবাদতে। উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানের শরিয়তে সপ্রাণ সৃষ্টির ছবিঅংকন ও মূর্তিনির্মাণ ছিলো সিদ্ধ।

আমি মনে করি, নিষ্প্রাণ বস্তুর ছবি অংকনকেই এখানে বলা হয়েছে 'তামাছীল'। কারণ তাঁর পূর্বেও মানুষের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিলো। আর তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়তে তা ছিলো নিষিদ্ধও। যেমন স্বয়ং হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতা ও তাঁর স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন— এসব কিসের মূর্তি, যেগুলোর সঙ্গে রয়েছে তোমাদের ঘনিষ্ঠতা।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, মূর্তিনির্মাতারা নরকে যাবে। তার নির্মিত মূর্তিকে পরজগতে করা হবে সপ্রাণ। আর সপ্রাণ মূর্তিই শাস্তি দিবে তাকে নরকাভ্যন্তরে। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, মূর্তি যদি নির্মাণ করতেই হয় তবে মূর্তি নির্মাণ কোরো নিষ্প্রাণ বস্তুর। বোখারী, মুসলিম। বর্ণিত হাদিসে কেবল এই উম্মতের মূর্তি-নির্মাতাদের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে সকল যুগের সকল উম্মতের মূর্তিনির্মাতাদের কথা। কেননা বাক্যটি বিবৃতিমূলক। আর বিবৃতিমূলক বক্তব্য কখনো রহিত হয় না।

সুপরিণতসূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে মূর্তি প্রস্তুত করবে, তাকে দেওয়া হবে শাস্তি। মহাবিচারের দিবসে তাকে বলা হবে, তোমার প্রস্তুতকৃত প্রতিমায় প্রাণসঞ্চার করো। কিন্তু সে তো কিছুতেই প্রাণসঞ্চার করতে পারবে না।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে অভ্যুদয় ঘটবে সুদীর্ঘ এক গ্রীবাধারীর। তার চোখ, কান, মুখ সবই থাকবে। সে বলবে, তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে শাস্তিদাতারূপে— ওই জালেম, যে সীমালংঘনকারী; ওই অংশীবাদী, যে আল্লাহ্‌র ইবাদতে সমকক্ষ নির্ধারণ করে অন্যকে এবং ওই হতভাগা, যে নির্মাণ করে মূর্তি।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন— ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে, যে নির্মাণ করে আমার সৃষ্টির অনুকৃতি।

বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মূর্তিনির্মাণের নিষিদ্ধতা কেবল এই উম্মতের উপরে প্রযোজ্য নয়, প্রযোজ্য পূর্বাপর সকল উম্মতের উপরে।

একটি সন্দেহ ঃ হজরত ঈসাও তো নির্মাণ করতেন মৃত্তিকানির্মিত পাখি। সে পাখি আবার জীবন্ত হয়ে উড়েও চলে যেতো। তাঁর এমতো কর্মটি তো আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদিতও।

সন্দেহের নিরসন ঃ যা আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদিত, তা তো কখনো দূষণীয় হতে পারে না। হজরত ঈসা যা করতেন, তাতে ছিলো আল্লাহ্‌রই আদেশ ও তার বাস্তবায়ন। হজরত ঈসা এমতোক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশপালনকারী মাত্র। অন্যান্য প্রতিমাপ্রস্তুতকারীরা তো এরকম নয়। তাদের নির্মাণকর্ম আল্লাহ্‌র নির্দেশনির্ভর নয়। তাদেরকে তো নির্দেশ দেওয়া হবে তাদের স্বহস্তনির্মিত প্রতিমাগুলোতে প্রাণ সঞ্চারের। কিন্তু তারা তা কিছুতেই পারবে না।

এখানকার 'জ্বিফান' শব্দটি 'জ্বিফনাতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ বৃহৎ পেয়ালা। 'কাল জ্বাওয়াব' কথাটির 'জ্বাওয়াব' শব্দটি 'জ্বাবিয়াতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ হাউজ বা চৌবাচ্চা। কামুস। বৃহৎ বৃহৎ চৌবাচ্চাকে 'জ্বাবিয়া' বলা হয় একারণে যে, সেখানে জমা থাকে অনেক পানি। বাগবী লিখেছেন, হজরত সুলায়মানের এক পেয়ালায় রক্ষিত আহার্য দ্বারা পরিতৃপ্ত হতে পারতো হাজার হাজার মানুষ।

আর এখানকার 'রসিয়াত' অর্থ সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেকচি। এর পায়াগুলো থাকতো ভূপ্রোথিত। আর সেগুলো আকারে এতো বিশাল ছিলো যে, সেগুলোকে নাড়াচাড়াও করা যেতো না। নামানোও যেতো না উনুনের উপর থেকে। আবার ওগুলোকে শূন্যে উত্তোলনও ছিলো অসম্ভব। ইয়েমেনে স্থাপিত ওই ডেকচিগুলোতে উঠতে হতো মই দিয়ে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি বলেছিলাম, হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ করতে থাকো'।

এখানে 'শুকরান' (কৃতজ্ঞতা) শব্দটির তানভীন ন্যূনতা প্রকাশক। অর্থাৎ ন্যূনপক্ষে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা তো প্রকাশ করো। উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌র নেয়ামতের

www.eelm.weebly.com

যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ তাঁর কোনো সৃষ্টির পক্ষেই সম্ভব নয়। অথবা বলা যেতে পারে, 'তানভীন' সন্নিবেশিত হয়েছে এখানে কর্মপদ হওয়ার কারণে। অর্থাৎ এটা উল্লেখিত ক্রিয়ার কারণ। তাই বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্র অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আনুগত্য প্রকাশ করো। জাফর সুলায়মান বলেছেন, আমি ছাবেতের নিকট থেকে শুনেছি, হজরত দাউদ তাঁর নিজের ও পরিবারবর্গের ইবাদতের জন্য দিনে ও রাতে বিভিন্ন সময় নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। ওই সময়সূচী অনুযায়ী আমল করলে দেখা যেতো দিবারাত্রির কোনো সময়ই তাঁর বসতবাটি ইবাদত-বন্দেগীশূন্য নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ'। একথার অর্থ— কায়মনবাক্যে অধিকাংশ সময় ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন, আমার এরকম বান্দার সংখ্যা অতি নগণ্য। আর সার্বক্ষণিক কৃতজ্ঞচিত্ত থাকে, তেমন বান্দার সংখ্যা তো আরো কম। এ অবস্থা আসে তখন, যখন কলব ফানা হয় এবং অর্জিত হয় হুজুরে আগাহী (সতত চৈতন্যময়তা)। উল্লেখ্য, এরকম সার্বক্ষণিক কৃতজ্ঞতাবোধ লালন করা সত্ত্বেও কৃতজ্ঞতার পুরোপুরি হক আদায় করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। কেননা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মানসিকতা এবং অনুপ্রেরণাও আল্লাহ্র একটি দান। আর এ দানের জন্যও তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা জরুরী। এভাবে উপর্যুপরি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কি কারো পক্ষে সম্ভব? সুতরাং যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়টি সবসময় মানুষের নাগালের বাইরেই থেকে যায়। একারণেই বলা হয়— ওই ব্যক্তিই প্রকৃত অর্থে কৃতজ্ঞ, যে বুঝতে পারে, সে যথাকৃতজ্ঞতা জানাতে অক্ষম।

ইব্রাহিম তাইমী বর্ণনা করেছেন, এক লোক হজরত ওমরের সাহচর্যে দোয়া করতে শুরু করলো, হে আমার আল্লাহ্! আমাকে স্বল্পসংখ্যকদের দলভূত করে দাও। হজরত ওমর বললেন, এটা আবার কোন ধরনের দোয়া। লোকটি বললো, কেনো, শোনেননি, আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র বাণীতে উল্লেখ করেছেন। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ। লোকটি তার প্রার্থনার সমর্থনে আরো একটি আয়াত উচ্চারণ করতে চাইলো। হজরত ওমর বললেন, প্রত্যেকেই ওমরের চেয়ে বেশী জানে।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন জ্বিনদেরকে তার মৃত্যু বিষয় জানালো কেবল মাটির পোকা যা তার লাঠি খেয়েছিলো।'

বাগবী লিখেছেন, বিদ্বানগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন, হজরত সুলায়মান বায়তুল মাকদিসের নির্জন প্রকোষ্ঠে গিয়ে গভীরভাবে ইবাদতে নিমগ্ন হতেন। কখনো কখনো সেখানেই রেখে আসতে হতো তাঁর খাদ্য ও পানীয়। বৎসরের পর বৎসর ধরে এটাই ছিলো তাঁর নিয়ম। এই নিয়ম পালন করতে করতেই এক সময় তিনি পাড়ি দেন পরপারে। তাঁর পরলোকগমনের বৃত্তান্তটি এরকম—

www.eelm.weebly.com

প্রতিদিন সকালে বায়তুল মাকদিসে মাথা তুলে দাঁড়াতো একটি উদ্ভিদের চারা। তিনি উদ্ভিদটিকে তার নাম ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। যদি তা বৃহৎ বৃক্ষের অংকুর হতো, তবে তিনি তা উঠিয়ে লাগিয়ে দিতেন কোনো বাগানে। আর কোনো ঔষধি হলে লিখে রাখতেন তার নাম। একবার তিনি দেখলেন মসজিদের মেহরাবে উদগত হয়েছে একটি কচি চারা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি। সে বললো, শিশু বৃক্ষ। তিনি বললেন, এখানে বিকশিত হলে কেনো? সে বললো, মসজিদ ধ্বংস করবার জন্য। তিনি বললেন, অসম্ভব। আমি বেঁচে থাকতেই কি আল্লাহ্ এ মসজিদ ধ্বংস করবেন? তবে মনে হয়, আমার পরকালযাত্রার পর তোমার কারণেই ধ্বংস হবে এই মসজিদ। একথা বলে তিনি চারাটিকে তুলে নিয়ে লাগিয়ে দিলেন সুন্দর একটি বাগানে। দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্! আমার পরলোকগমনের খবর তুমি জ্বিনদের কাছে গোপন রেখে দিয়ো, যেনো মানুষ একথা বুঝতে পারে যে, জ্বিনেরা অদৃশ্যের সংবাদ জানে না। উল্লেখ্য, তখনকার জ্বিনেরা গর্ব করে বলতো, আমরা গায়েবের খবর জানি। ভবিষ্যতের সংবাদও আমাদের জানা। কোনো কোনো মানুষ আবার তাদের এমতো দাবি স্বীকারও করে নিতো।

দোয়া শেষ করে হজরত সুলায়মান প্রবেশ করলেন তাঁর নির্জন প্রকোষ্ঠে। লাঠিতে ভর দিয়ে শুরু করলেন নামাজ। নামাজরত অবস্থাতেই মহাপ্রস্থান ঘটলো তাঁর। মানুষ ও জ্বিনেরা একথা বুঝতেও পারলো না। তারা মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখতো, হজরত সুলায়মান গভীরভাবে নামাজে মগ্ন। দীর্ঘকাল ধরে এভাবে নামাজে মগ্ন থাকা ছিলো হজরত সুলায়মানের অভ্যাস। তাই তিনি যে আর নেই, সেকথা তাদের মনে উদয়ও হলো না। তাঁর ভয়ে আগের মতোই তারা করে যেতো শ্রমসাধ্য কাজ। এভাবে কেটে গেলো পুরো একটি বৎসর। তার লাঠিতে ধরেছিলো ঘুণ অথবা উইপোকা। ফলে লাঠিটি একসময় ভেঙে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিষ্প্রাণ শরীর লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

উইপোকার বদৌলতে জ্বিনেরা মুক্তি পেয়েছিলো কঠিন শ্রম থেকে। তাই তারা উইপোকার উদ্দেশ্যে জানায় কৃতজ্ঞতা। হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। ইবনে ইয়াজিদ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, হজরত সুলায়মান মৃত্যুদূতকে বলে রেখেছিলেন, আমার বিদায়ের সময় অত্যাসন্ন হলে জানাবেন। ওইদিন মৃত্যুদুত জানালেন, চিরবিদায়ের ক্ষণ সমুপস্থিত। প্রস্তুত হোন। হজরত সুলায়মান তাঁর প্রকোষ্ঠমধ্যে নির্মাণ করালেন আর একটি কাঁচের ঘর। তারপর ওই ঘরে প্রবেশ করে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। ওই অবস্থাতেই শুরু করলেন নামাজ। কিছুক্ষণ পর ওই অবস্থাতেই পরলোকগমন করলেন তিনি। কিন্তু লাঠিকে অবলম্বন করে তাঁর শরীর দাঁড়িয়ে রইলো আগের মতোই। মানুষ ও জ্বিনেরা মনে করলো

www.eelm.weebly.com

তিনি নামাজ পাঠ করে চলেছেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে। এদিকে তাঁর লাঠিতে ধরলো ঘুণেপোকা। ফলে দীর্ঘ এক বৎসর পর লাঠিটি ভেঙে পড়লো। তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। জনতা তখন কাঁচের ঘর ভেঙে তাঁর দেহ বের করে আনলো। সৎকার করলো যথারীতি। তারা হিসেব করে দেখলো, বৎসরখানেক আগেই সম্পন্ন হয়েছে তাঁর পরকালযাত্রা।

এখানকার 'দাব্বাতুল আরদ্বি' অর্থ মাটির পোকা বা ঘুণে পোকা। এই পোকা ভক্ষণ করে শুকনো কাঠ। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ কাঠখেকো পোকা, ঘুণে পোকা জাতীয় কোনো পোকা।

'তা'কুলু মিনসাআতাহ্' অর্থ তাঁর লাঠি খাচ্ছিলো। যেমন বলা হয় 'নাসা'তুল গানামা' (আমি ছাগল তাড়িয়েছি)। এই শব্দটি থেকেই বুৎপত্তি লাভ করেছে 'মিনসাআতু' (যদ্দ্বারা তাড়ানো হয়)।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখন সে পড়ে গেলো, তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারলো যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকতো তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না'।

এখানে 'অদৃশ্য বিষয়' অর্থ হজরত সুলায়মানের পরকালযাত্রার সংবাদ। 'আল আ'জাবিল মুহীন' অর্থ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানের হুকুমে জ্বিনদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। লাঞ্ছিত করা হতো তাদেরকে। আবার দাবি করতো, তারা অদৃশ্য বিষয়াবলীর সংবাদ জানে। কিন্তু হজরত সুলায়মানের লোকান্তরিত হওয়ার সংবাদ যখন বৎসরখানেক ধরে তারা জানতেই পারলো না, তখন মানুষের কাছে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, জ্বিনেরা আসলে অদৃশ্যের বিষয়ে কিছুই জানে না।

বাগবী লিখেছেন, ইতিহাসবেত্তাগণ বলেছেন, হজরত সুলায়মান সিংহাসনে আরোহণ করেন তেরো বৎসর বয়সে। এর চার বৎসর গত হওয়ার পর তিনি শুরু করেন বায়তুল মাকদিস নির্মাণের কাজ। চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন তিনি। তারপর পরলোকগমন করেন তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে।

ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, আমার কাছে আলী ইবনে রিবাহ বর্ণনা করেছেন, আলী উল্লেখ করেছেন, একবার ফারওয়াহ ইবনে সুলাইক গাতফানী রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! মূর্খতার যুগে সাবাবাসীরা ছিলো মহাপ্রতাপশালী। আমার ধারণা তারাও ইসলামের দিকে এগিয়ে আসবে। আমি কি তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারি? রসুল স. বললেন, তাদের ব্যাপারে এখনো আমাকে প্রত্যাদেশ করা হয়নি। তাঁর এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

www.eelm.weebly.com

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

r সাবাবাসীদের জন্য তো উহাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শনঃ দুইটি উদ্যান, একটি ডান দিকে, অপরটি বাম দিকে, উহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিয্‌ক ভোগ কর এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম নগরী এবং ক্ষমাশীল প্রতিপালক।'

ফারওয়া ইবনে সুলাইক গাতফানীর মাধ্যমে আবু সুবরা নাখয়ী সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, হে প্রত্যাদিষ্টপুরুষ! দয়া করে 'সাবা' সম্পর্কে কিছু বলুন। সাবা কি পুরুষ? নারী? না কোনো স্থান? তিনি স. বললেন, সাবা একজন লোকের নাম। জন্মগতভাবে সে আরববাসী। তার ছিলো দশজন পুত্র। তার মধ্যে ছয়জন পাড়ি জমালো দক্ষিণ দিকে। বসতি গড়ে তুললো ইয়েমেনে। অবশিষ্ট চার জন চলে গেলো উত্তরাঞ্চলে। বসবাস করতে শুরু করলো সিরিয়ায়। ইয়েমেনে বসবাসকারী ছয়জনের নাম ছিলো কুন্দাহ্, আশআর, আযদ, মাদহাজ, আনমার ও হুমাইর। একজন প্রশ্ন করলো, আনমার কে? তিনি স. বললেন, যার নিকট থেকে উদ্ভব হয়েছে খাছআম ও বুজাইলার। সিরিয়ায় যারা গিয়েছিলো, তাদের নাম আমেলা, জুযাম, লাখাম ও গাছ্ছান। ইমাম আহমদ প্রমুখ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সুপরিণত সূত্রে এরকম বর্ণনা করেছেন। সাবা ছিলো ইয়াশজাবের পুত্র। ইয়াশজাব পুত্র ছিলো ইয়ারবের এবং ইয়ারব কাহ্‌তানের।

ওই সাবা সম্প্রদায়ের কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। প্রথমে বলা হয়েছে— সাবাবাসীদের জন্য তো তাদের বাসভূমিতে ছিলো এক নিদর্শন ঃ দুইটি উদ্যান, একটি ডান দিকে, অপরটি বামদিকে। তাদেরকে বলা হয়েছিলো, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকপ্রদত্ত রিজিক ভোগ করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। উত্তমনগরী এবং ক্ষমাশীল প্রতিপালক'।

এখানে 'জান্নাতাইনি' অর্থ দুই সারি বাগান। অর্থাৎ সাবা নগরীর দক্ষিণ ও উত্তর পাশে ছিলো দু'টি নয়নাভিরাম উদ্যান। অথবা বলা যায়, তাদের প্রায় প্রত্যেকের বসতবাটির ডানে ও বাঁয়ে ছিলো মনোরম কানন। অবশ্য তাদের পথের দু'ধারে বাগান থাকতোই। আর পথিকেরা ছিলো ওই সকল বাগানের ফল চয়ন ও ভক্ষণের অনুমতিপ্রাপ্ত।

www.eelm.weebly.com

‘ওয়াশকুরূলাহু’ অর্থ, এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশের একনিষ্ঠ অনুগামী হও।

‘কুলু মির রিযক্বি রব্বিকুম’ (তোমরা তোমাদের প্রতিপালকপ্রদত্ত জীবনোপকরণ উপভোগ করো) কথাটি এখানে নবীবচন। অর্থাৎ তাদের প্রতি প্রেরিত নবী তাদেরকে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা আল্লাহ্‌প্রদত্ত আহার্যসামগ্রী ভক্ষণ করো এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে তাঁরই বাধ্যানুগত হও।

‘বালদাতুন ত্বয়্যিবাতুন’ অর্থ পবিত্র বা উত্তম নগরী, সেখানে ছিলো ফল-ফসলের বিপুল সমারোহ। ছিলো চাষাবাদযোগ্য ভূমি। সুদ্দী ও মুকাতিল বলেছেন, সাবাদের ফলের বাগানগুলো ছিলো ফলে ফলে ভরা। কোনো রমণী শূন্য টুকরী মাথায় নিয়ে ওই সকল বাগানে ঘুরে বেড়ালেই তার টুকরী ভরে যেতো ফলে। আলাদা করে তাকে আর ফল পেড়ে নিতে হতো না। ইবনে জায়েদ বলেছেন, তাদের বাগানগুলোতে মাছি-মশাও ছিলো না। ছিলো না কোনো সাপ-খোপের বাসাও। উকুনবিশিষ্ট বস্ত্র পরিহিত কেউ ওই এলাকার রাস্তা ধরে গেলে উকুনগুলো আর জীবন রক্ষা করতে পারতো না। এমনই পরিচ্ছন্ন ছিলো তাদের নগরী। ওই নগরীকে এখানে ‘ত্বয়্যিবাতুন’ বলা হয়েছে সে কারণেই।

‘রব্বুন গফুর’ অর্থ ক্ষমাশীল প্রতিপালক। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ— তোমরা যদি তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তবে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক সাবা জনগোষ্ঠীর পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরণ করেছিলেন বারোজন নবী। তাঁরা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতেন আল্লাহ্‌প্রদত্ত অনুগ্রহসম্ভারের কথা। বলতেন, কৃতজ্ঞচিত্ত হও এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে পালন করো আল্লাহ্‌র বিধিবিধানসমূহ।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ১৬

فَاَعۡرَضُوۡا فَاَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ سَيۡلَ الۡعَرِمِ وَ بَدَّلۡنٰهُمۡ بِجَنَّتَيۡهِمۡ جَنَّتَيۡنِ ذَوَاتَىۡ اُكُلٍ خَمۡطٍ وَّ اَثۡلٍ وَّشَىۡءٍ مِّنۡ سِدۡرٍ قَلِيۡلٍ ﴿۱۶﴾

r পরে উহারা অবাধ্য হইল। ফলে আমি উহাদের উপর প্রবাহিত করিলাম বাঁধভাংগা বন্যা এবং উহাদের উদ্যান দুইটিকে পরিবর্তন করিয়া দিলাম এমন দুইটি উদ্যানে যাহাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছ।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পরে তারা অবাধ্য হলো। ফলে আমি তাদের উপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙা বন্যা'। একথার অর্থ— সাবাবাসীরা তাদের নবীগণের কথা শুনেই চলতো। কিন্তু পরে হয়ে পড়লো দুর্বিনীত। নবীগণকে বলতে শুরু করলো, আমাদের ফল-ফসল সকলকিছুই যে আল্লাহ্প্রদত্ত নেয়ামত, তাতো আমরা স্বীকার করতে পারি না। এগুলো তো আমাদেরই পরিশ্রমের ফসল। ঠিক আছে, এগুলো যদি আল্লাহ্রই দান হয়, তবে তাকে বলো, তিনি যেনো এগুলো উঠিয়েই নেন। তাদের এমতো অস্বীকৃতি ছিলো অনড়। তাই আল্লাহ্পাক তাদের উপরে আপতিত করলেন প্লাবনের শাস্তি। ওই প্লাবনে ভেঙে গেলো তাদের বাঁধ, বাড়িঘর, বাগান ও ক্ষেতখামার। ওই বাঁধভাঙা প্রচণ্ড বন্যাই ইতিহাসে 'সাইলাল ইরাম' নামে খ্যাত।

'আল আ'রিম' অর্থ কঠিন বিপদ, অসহনীয় যাতনা। যেমন বলা হয় 'আ'রিমার রজুলু' (লোকটি অসৎ স্বভাবের হয়েছে, হয়েছে দুবৃত্ত)। অথবা 'সাইলাল আ'রিম' অর্থ অতিবর্ষণজনিত প্লাবন। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্পাক তাদেরকে প্লাবিত করেছিলেন লাল পানির বন্যায়। কেউ কেউ শব্দটির অর্থ করেছেন— উপত্যকা। 'আ'রিম' এর বুৎপত্তি ঘটেছে 'আ'রমাতুন' থেকে। 'আ'রমাতুন' অর্থ কষ্টকর, শক্তি। কেউ কেউ বলেছেন, 'আ'রিম' অর্থ বাঁধ। এমনও পাওয়া যায়, 'আ'রিম' অর্থ জংলী ইঁদুর। রাণী বিলকিস্ কৃষিক্ষেত্রে সেচকাজের সুবিধার্থে নির্মাণ করিয়েছিলেন একটি বিশাল বাঁধবিশিষ্ট জলাধার। একটি জংলী ইঁদুর মাটি কেটে ছিদ্র করে দিয়েছিলো ওই বাঁধে। 'কামুস' রচয়িতা লিখেছেন, উপত্যকাভূমিতে সংরক্ষিত জলাশয়কে বলে 'আ'রামাতুন'। 'আ'রিম তার বহুবচন। কেউ কেউ বলেছেন, 'আ'রিম ' বহুবচন হলেও এর একবচন হয় না। যেমন এক বচন হয় না 'নিস্ওয়াতুন' এবং 'নিসাউন' এর।

বাগবী লিখেছেন, হুমাইরী ভাষায় 'আ'রিম' অর্থ বাঁধ। হজরত ইবনে আব্বাস এবং ওয়াহাব প্রমুখ বলেছেন, 'আ'রিম' ছিলো সাবাবাসীদের একটি পানি নিয়ন্ত্রক বাঁধ। সাবাবাসীরা প্রায়শ উপত্যকাভূমির পানির অধিকার নিয়ে গোত্রীয় দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তো। তাদের দ্বন্দ্ব নিরসনার্থে সাবার রাণী বিলকিস একটি স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। উপত্যকাভূমিতে প্রস্তর ও লৌহস্তম্ভ সহযোগে নির্মাণ করিয়ে দিলেন একটি বিশাল বাঁধ। বর্ষাকালের পাহাড়বিধৌত পানি জমা হয়ে থাকতো ওই বাঁধবিশিষ্ট বিশাল জলাশয়ে। বারোটি নালা ছিলো বাঁধটির। সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো সুদৃঢ় তোরণ দ্বারা। প্রয়োজনে সেগুলো খুলে জমিতে পানি সিঞ্চন করা হতো। আবার প্রয়োজন শেষে দেওয়া হতো বন্ধ করে। দীর্ঘদিন ধরে এনিয়মেই স্বচ্ছন্দে চাষাবাদ চলে আসছিলো। কিন্তু এক সময় উদ্ধত হয়ে পড়লো তারা। হয়ে পড়লো অবাধ্য ও কৃতঘ্ন। আল্লাহ্ তখন তাদেরকে শাস্তি দানের জন্য

www.eelm.weebly.com

পাঠালেন একটি জংলী ইঁদুর। ইঁদুরটি বাঁধের কোনো কোনো স্থানে ছিদ্র করে দিলো। ফলে বাঁধভাঙা প্লাবনে প্লাবিত হলো সারা দেশ। বাড়ি-বাগান-ক্ষেতখামার সবকিছু ভেসে গেলো প্রচণ্ড বন্যার তোড়ে।

ওয়াহাব বলেছেন, কোনো এক জ্যোতিষী সাবাবাসীদেরকে একবার বললো, একটি জংলী ইঁদুর তোমাদের সর্বনাশ করবে। ছিদ্র করে দিবে তোমাদের বাঁধ। তার কথা শুনে তারা প্রমাদ গুণলো। শেষে বুদ্ধি আঁটলো, প্রস্তরস্তম্ভগুলো যেখানে যেখানে মাটি দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে, সে সকল স্থানে বসিয়ে রাখতে হবে একটি করে পোষা বিড়ালকে। তাই করলো তারা। কিন্তু যখন শাস্তির সময় অত্যাসন্ন হলো, তখন আবির্ভূত হলো সেই লাল অদ্ভুত জংলী ইঁদুর। একস্থানে এসে সে আক্রমণ করে বসলো একটি প্রহরী বিড়ালকে। ভয়ে বিড়ালটি পালিয়ে গেলো সেখান থেকে। ইঁদুরটি সেখানকার মাটি কেটে কেটে মাটির ভিতরে প্রবেশ করতে লাগলো। বিড়ালগুলো সমবেত হয়ে ইঁদুরটিকে ধরার জন্য মাটি আঁচড়াতে লাগলো। ফলে বাঁধের মাটি আলগা হয়ে যেতে লাগলো অতি দ্রুত। এক সময় পানির প্রচণ্ড চাপে ধসে পড়লো সেখানকার দেয়াল। ভেঙে গেলো ঐতিহাসিক আ'রিম বাঁধ। বন্যায় ভেসে গেলো সমগ্র দেশ। বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হলো মানুষের আবাস, বাগান, ক্ষেত-খামার। কিছুসংখ্যক লোক অতি দ্রুতগতিতে পালিয়ে গিয়ে কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচালো বটে, কিন্তু অধিকাংশই জীবন হারালো বানের পানিতে ডুবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের উদ্যান দু'টিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং কিছু কুল গাছ'।

এখানকার 'উকুল' অর্থ ফলমূল। 'কামুস' গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। 'খামত্ব' শব্দটি এখানে 'উকুল' এর বিশেষণ। 'খামত্ব' অর্থ তিক্ত, বিস্বাদ। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ এরাক বৃক্ষ, যার ফল হয় বিস্বাদ। আর ফলগুলোর আকার হয় কুলের মতো। বাগবী লিখেছেন, 'উকুল' অর্থ ফল। আর 'খামত্ব' অর্থ এরাক ও পিলু ফল। অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা এরকমই বলেছেন। মুবাররাদ বলেছেন, গুটিকে বলে 'খামত্ব', যার ফল হয় তিতা। ইবনে আরাবী বলেন, খসখস ফলের মতো দেখতে 'কসওয়াতুস্‌সামাগ' কে বলে 'খামত্ব' যা ধরে আর ঝরে যায়। কোনো কাজে আসে না।

'আছল' বলে ঝাউ অথবা ঝাউয়ের মতো, বরং ঝাউ অপেক্ষা বৃহৎ এক ধরনের গাছকে। আর এখানকার 'ক্বলীল' শব্দটি 'সিদ্‌রিন' এর বিশেষণ। 'সিদ্‌রিন' অর্থ কুল বা বরই। কুল অবশ্য একটি উৎকৃষ্ট ফল। কিন্তু এখানে বলা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে কিছু কুল গাছ উৎপন্ন হওয়ার কথা, অধিক নয়। বাগবী বলেছেন, এখানে নিকৃষ্ট জংলী কুল গাছের কথা বলা হয়েছে, আস্বাদ্য উৎকৃষ্ট কুল গাছের কথা নয়। জংলী বরইয়ের স্বাদ বেমজা। আর এর পাতাও কোনো কাজে আসে না।

উল্লেখ্য, উৎকৃষ্ট বৃক্ষ এবং নিকৃষ্ট বৃক্ষের বাগান দৃশ্যতঃ একই রকম। তাই এখানে নিকৃষ্ট বৃক্ষের সমাবেশকেও বাগানই বলা হয়েছে। অথবা বলা যেতে পারে, আগাছাভরা জঙ্গলকে এখানে বাগান বলা হয়েছে উপহাসছলে।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ১৭, ১৮, ১৯

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَ هَلْ نُجٰزِىْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴿۱۷﴾ وَ جَعَلْنَا
بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّ قَدَّرْنَا
فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِىَ وَ اَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ﴿۱۸﴾ فَقَالُوْا رَبَّنَا
بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَ
مَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۱۹﴾

r আমি উহাদিগকে এই শাস্তি দিয়াছিলাম উহাদের কুফরীর জন্য। আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কাহাকেও এমন শাস্তি দেই না।

r উহাদের ও যেসব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম সেইগুলির মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করিয়াছিলাম এবং ঐসব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, 'তোমরা এইসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিবস ও রজনীতে।'

r কিন্তু উহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মন্‌যিলের ব্যবধান বর্ধিত কর।' উহারা নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছিল। ফলে আমি উহাদিগকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করিলাম এবং উহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলাম। ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে—সাবাবাসীরা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলো। সেই সঙ্গে তারা ছিলো অকৃতজ্ঞও। সত্যপ্রত্যাখ্যান ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের অবমাননার কারণেই আমি তাদেরকে বাঁধভাঙ্গা বানের পানিতে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলাম। যারা কৃতঘ্ন, তারা ছাড়া অন্যদের উপরে আমি এরকম সর্বনাশা শাস্তি অবতীর্ণ করি না।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'তাদের এবং যে সকল জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, সেগুলির মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং ওই সব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা এইসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ করো দিবস ও রজনীতে'।

এখানকার 'জাআ'লনা' শব্দটি সম্পর্কযুক্ত ১৬ সংখ্যক আয়াতের 'বাদ্দালনা' (পরিবর্তন করে দিলাম) কথাটির সঙ্গে, যদিও 'বাদ্দালনা' এর প্রতিক্রিয়া ঘটেছে পরবর্তীতে। এখানে এই যোজক অব্যয় (ওয়াও) সন্নিবেশিত হয়েছে কেবল বাকরীতির যোগসূত্র রক্ষার্থে।

'বাইনাহুম' অর্থ তাদের মধ্যে অর্থাৎ সাবাবাসীদের মধ্যে। আর 'বাইনাল কুরাল্ লাতী বারাকনা ফীহা' অর্থ, ওই জনপদসমূহ যেখানে আমি ঢেলে দিয়েছিলাম প্রাচুর্য। অর্থাৎ নদীবিধৌত জনপদ সিরিয়া। ওই জনপদ ছিলো ফল ও ফসলে ভরা। জনপদবাসীরা তাই জীবনযাপন করতো স্বাচ্ছন্দ্যে।

'কুরান জহিরাতান' অর্থ, দৃশ্যমান জনপদ। অর্থাৎ পাশাপাশি বা অগ্রপশ্চাত করে সাজানো জনপদ। 'ওয়া কদ্দারনা ফীহাস্ সায়রা' অর্থ, আমি সেখানে নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম ভ্রমণ। সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম ভ্রমণের। অর্থাৎ নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করা যাবে এক জনপদ থেকে আর এক জনপদে। সকালে এক জায়গায়। দ্বিপ্রহরে আরেক জায়গায়। এরকম ভ্রমণে পানাহারের সামগ্রী সঙ্গে নেওয়ারও প্রয়োজন পড়বে না। কারন, পথের দু'পাশে রয়েছে ফলভরা বৃক্ষ। ক্ষুধার্ত হলে অথবা যখন তখন ইচ্ছে করলে যে কোনো গাছ থেকে পছন্দ মতো ফল পেড়ে খাওয়া যায়। উল্লেখ্য, তখন সাবা থেকে সিরিয়ার পথের দু'পাশে ছিলো যেমন জনবসতি, তেমনি ছিলো অবিচ্ছিন্ন ফলের বাগান। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রাস্তার ধারের ওই জনবসতিগুলোর সংখ্যা ছিলো চার হাজার সাত শত।

কাতাদা বলেছেন, কোনো মহিলা খালি ঝাঁকা মাথায় নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ চলার পর দেখতে পেতো, গাছ থেকে পাকা ফল পড়ে পড়ে তার ঝাঁকা পূর্ণ হয়েছে। এরকম অবস্থা ছিলো সাবা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত। 'সীরু ফীহা' অর্থ পথের অবস্থা এই, কাজেই তোমরা নিঃসন্দেহে পরিভ্রমণ করো দিবারাত্রির যেকোনো সময়ে।

'আমিনীন' অর্থ নিরাপদে, নিরাপত্তার সাথে। অর্থাৎ এ পথে নেই কোনো শত্রুভীতি অথবা হিংস্র পশুর আক্রমণাশংকা। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দুর্ভাবনাও এ পথে অনুপস্থিত।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের সরাইখানার ব্যবধান বর্ধিত করো'। একথার

www.eelm.weebly.com

অর্থ— সাবাবাসীদের কাছে অতিরিক্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ক্লান্তিকর মনে হতে লাগলো। মনে হতে লাগলো, এর চেয়ে যেনো শ্রমবহুল জীবনই উত্তম। তাই তারা প্রার্থনা জানালো, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমি ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগকে করে দাও বৃক্ষগুল্মহীন ধু ধু মরুভূমি। আমরা এখন থেকে ক্লেশকর ভ্রমণে অভ্যস্ত হতে চাই। ভ্রমণকালে সাথে নিতে চাই মরুচারী পথিকদের মতো বিভিন্ন ভ্রমণসামগ্রী। এভাবে আমরা দল বেঁধে বাণিজ্য করবো। মানুষের কাছে গর্বভরে বলতে পারবো, আমাদের উপার্জন আমাদেরই বুদ্ধি ও শ্রমজাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো। আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তু করলাম এবং তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলাম। এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।' একথার অর্থ— সাবাবাসীরা ছিলো সীমালংঘনকারী। নতুবা তারা এমন বেপরোয়া ভাব কিছুতেই প্রকাশ করতে পারতো না। আমিও তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রস্তাবের যথোপযুক্ত জবাব দিলাম। তাদেরকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করলাম যে, তারা হয়ে গেলো কিংবদন্তীর পাত্র-পাত্রী। তাদের অপকীর্তির গল্প উচ্চারিত হতে থাকলো মানুষের গল্পের আসরে। কোনো জনপদবাসী বিপদগ্রস্ত হলে মানুষ মন্তব্য করতো— এদের পরিণতিতো দেখা যায় সাবাবাসীদের মতো।

শা'বী বলেছেন, সাবা জনপদ যখন বিরান হয়ে গেলো, অধিকাংশ জনতা গ্রহণ করলো মৃত্যুর আস্বাদ, তখন অবশিষ্টরা হয়ে পড়লো ছত্রভঙ্গ। এক এক দল ছড়িয়ে পড়লো এক এক দিকে। গাচ্ছানেরা গেলো সিরিয়ায়। আম্মানের দিকে গেলো আসাদ এবং তেহামায় গিয়ে বসবাস শুরু করলো খাজায়াহ্ গোত্র। ইরাকের দিকে চলে গেলো জাযীমারা। আর বনী আ'নমারের আউস খাজরাজেরা বসতি স্থাপন করলো গিয়ে ইয়াছরীবে। তাদের মধ্যে ইয়াছরীব বা মদীনায় সর্বপ্রথম আউস ও খাজরাজদের পূর্ব পুরুষ আমর ইবনে আমের আসলামী।

'সব্‌র' অর্থ ধৈর্যশীল। অর্থাৎ পাপ থেকে আত্মসংবরণকারী। বিপদাপদে সহিষ্ণু অথবা আনুগত্যের উপরে সতত প্রতিষ্ঠিত। আর 'শাকুর' অর্থ প্রাপ্ত অনুগ্রহের সবিনয় স্বীকৃতি প্রদানকারী। কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। মুকাতিল বলেছেন, উম্মতে মোহাম্মদীর বিশ্বাসবান ব্যক্তিরাই ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ। মাতরাফও এরকম বলেছেন। আমি বলি, যারা প্রকৃতই বিশ্বাসী, তারা সর্বাবস্থায়ই ধৈর্যশীল অবস্থায় কৃতজ্ঞ হয়। এ পৃথিবী পরীক্ষাগার। এখানকার সুখ ও সুখের উপকরণও পরীক্ষা। বিশ্বাসীগণকে এখানে পদে পদে পরীক্ষা করা হয়। দুঃখ ও সুখ দিয়ে মাপা হয় তার ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতাবোধকে। তাদের জন্য মৃত্যু যেমন একটি পরীক্ষা, তেমনি জীবনও। যেমন আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন— 'তিনি সৃষ্টি করেছেন জীবন ও মৃত্যু, প্রমাণ করবার জন্য তোমাদের মধ্যে কে পুণ্যকর্ম করে'। এ কারণেই

www.eelm.weebly.com

বিশ্বাসীরা পাপ থেকে আত্মরক্ষা করে। বিপদে আপদে ধারণ করে ধৈর্য। আর আল্লাহ্‌র আনুগত্যকে আশ্রয় করে সুদৃঢ়রূপে। তাই প্রতিটি বিপদই হয় তাদের অনবধানতার প্রায়শ্চিত্ত। বিপদে ধৈর্য ধারণ ও স্বাচ্ছন্দ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ইমানদারদের জন্য অত্যাবশ্যক। আর ধৈর্য ধারণের সামর্থ্যপ্রাপ্তিও আল্লাহ্‌প্রদত্ত একটি বিশেষ নেয়ামত। সুতরাং নেয়ামতেরও শোকরগোজার করা প্রয়োজন।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেন, প্রিয়তম জনের নিকট থেকে আগত বিপদ তাঁর করুণা অপেক্ষা অধিক আস্বাদ্য। তাই বিপদ-মুসিবতের সময়েও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা জরুরী। জনৈক কবি বলেছেন—

মিলন লগ্নে আমি হই আমার ক্রীতদাস
বিরহই আমাকে রাখে দাসত্বের হালে

রসুল স. বলেছেন, ইমানের দু'টি অংশ— ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা। বায়হাকী হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর শো'বুল ইমানে। আমি বলি, একজন ইমানদার সর্বাবস্থায় পূর্ণ ইমানদার— উভয় অবস্থার সমন্বয়ক। একটি নিয়ে তারা কখনো তৃপ্ত হতে পারে না।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ২০, ২১

وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ؕ وَ رَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٢١﴾

r উহাদের সম্বন্ধে ইবলীস তাহার ধারণা সত্য প্রমাণ করিল, ফলে উহাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সকলেই তাহার অনুসরণ করিল;

r উহাদের উপর শয়তানের কোনো আধিপত্য ছিল না। কাহারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কাহারা উহাতে সন্দিহান তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ে হিফাযতকারী।

প্রথমে বলা হয়েছে—'তাদের সম্বন্ধে ইবলিস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করলো'। কোনো কোনো ভাষ্যকার এখানকার 'আলাইহিম' (তাদের উপরে, তাদের সম্বন্ধে) কথাটির সংযোগ ঘটিয়েছেন সাবাবাসীদের সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সাবাবাসীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান কারী ছিলো, তাদের উপরে ফলপ্রসূ হলো শয়তানের চিন্তা-চেতনা ও পরিকল্পনা। মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার

www.eelm.weebly.com

'তাদের' সর্বনামটি সংযুক্ত হবে সাধারণভাবে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে। ইবলিস আল্লাহ্পাকের উদ্দেশ্যে বলেছিলো, 'তোমার মহামর্যাদার শপথ! অবশ্যই আমি সকল মানুষকে বিভ্রান্ত করবো। তাদের অধিকাংশকেই তুমি কৃতজ্ঞরূপে পাবে না'। তার এমতো অপচিন্তার প্রতিফলন সে ঘটায় অনেক মানুষের মধ্যে। কেবল বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা এর ব্যতিক্রম।

ইবনে কুতাইবা লিখেছেন, ইবলিস কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করলো। আল্লাহ্তায়ালা তা অনুমোদন করলেন। ইবলিস বললো, 'অবশ্যই আমি আদম সন্তানদেরকে করবো বক্র পথের পথিক'। তার এমতো অপধারণা বাস্তবরূপ লাভ করেছিলো সাবা জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের উপর।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফলে তাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সকলেই তার অনুসরণ করলো'। এখানে 'মিনাল মু'মিনীন' (তাদের মধ্যে একটি মুমিন দল) কথাটির অর্থ সাবাবাসীদের অন্তর্ভূত বিশ্বাসীদের একটি দল। অথবা গোটা মানবজাতির মধ্যে বিশ্বাসীদের দল।

সুদ্দী বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বিশ্বাসীরা ধর্মের মৌলিক বিষয়াবলীতে কখনোই শয়তানের অনুসরণ করে না। এক আয়াতে তাই ঘোষিত হয়েছে— 'নিশ্চয় আমার প্রকৃত বান্দাগণের উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই'। এমতো বাক্যের প্রেক্ষাপটে 'মিন' (মধ্যে, হতে) অব্যয়টি বিবরণার্থক। আবার কেউ কেউ বলেছেন আংশিকার্থক। অর্থাৎ কিছুসংখ্যক বিশ্বাসী এর ব্যতিক্রম, যারা আল্লাহ্র প্রতি একান্ত অনুগত, অবাধ্য নয়।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তাদের উপর শয়তানের কোনো আধিপত্য ছিলো না'। একথার অর্থ সাবা জনগোষ্ঠীভূত বিশ্বাসীদের উপরে শয়তানের কোনো প্রভাব ছিলো না। অথবা মানুষের মধ্যে যারা বিশ্বাসবান, তাদের উপরে শয়তানের কোনো প্রভাব নেই। বলাবাহুল্য, শয়তান মানুষের মধ্যে যে প্রভাব বিস্তার করে, তা-ও আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদিত। যেমন— 'তাদের মধ্যে তুই কথার দ্বারা যাকে পারিস তাকে সত্যচ্যুত কর। তাদেরকে আক্রমণ কর তোর পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে। অংশগ্রহণ কর তাদের অর্থ, সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে। আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে'।

হাসান বলেছেন, শয়তান মানুষের প্রতি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা আক্রমণ চালায় না। বরং তাদেরকে দেয় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। করে দুরাশা ও ছলনাগ্রস্ত। সে কারণেই তারা হয় প্রবঞ্চিত, প্রতারিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'কারা আখেরাতে বিশ্বাসী এবং কারা তাতে সন্দিহান, তা প্রকাশ করে দেওয়াই ছিলো আমার উদ্দেশ্য'।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'ইল্লা লি না'লামা' কথাটির শাব্দিক অর্থ যেনো আমি জেনে নিতে পারি, কে আমার অনুগত এবং কে নয়। কিন্তু এভাবে অর্থ করলে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ নন এবং তাঁর জ্ঞান নয় অনাদি ও অনন্ত। তাই কথাটির শাব্দিক অর্থ এখানে গ্রহণীয় নয়। কারণ আল্লাহ্পাক অতি অবশ্যই সর্বজ্ঞ। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সকলকিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত। অবশ্য সে জ্ঞানের প্রকাশ নিত্যনতুন। অর্থাৎ সে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে ক্রমে ক্রমে ধারাবাহিকভাবে। সুতরাং বুঝতে হবে এখানকার 'ইলম' (জানা) অর্থ প্রকাশ করা, অর্থাৎ কোনোকিছুর প্রকাশপূর্ব অবস্থা যেমন তাঁর জ্ঞানায়ত্ত, তেমনি জ্ঞানায়ত্ত তার প্রকাশপরবর্তী অবস্থাও। তাঁর অসীম ও আনুরূপ্যবিহীন জ্ঞানের অভ্যন্তরেই আবর্তিত হয় সকল স্থানসম্ভূত ও কালসম্ভূত বিষয়। কখনো অনস্তিত্বরূপে, কখনো অস্তিত্বসহকারে। যেমন জায়েদ নামক কোনো ব্যক্তির অনস্তিত্ব-অস্তিত্ব, জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন ইত্যাদি। সৃষ্টি সতত সঞ্চরণশীল ও পরিবর্তনশীল। কিন্তু তাঁর জ্ঞান অপরিবর্তনীয়। তাই তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে তাঁর জ্ঞান বাস্তবজগতে ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু সৃষ্টির কোনোপ্রকার ক্রিয়াশীলতাই তাঁর জ্ঞানের উপরে ছায়াপাত করে না। করতে পারে না। তাই 'যেনো আমি জেনে নিতে পারি' কথাটির অর্থ হবে এখানে আমি তো জানিই কে বিশ্বাসী এবং কে অবিশ্বাসী। কিন্তু আমার এই সংগুপ্ত জ্ঞান আমি বাস্তবজগতে প্রকাশ করি এজন্য যে, অন্যদের সামনেও যেনো উন্মোচিত হয় বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পরিচয়। এই বিষয়টিই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে যে— তা প্রকাশ করে দেওয়াই ছিলো আমার উদ্দেশ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে হেফাজতকারী'। একথার অর্থ— কাল ও কালজ বিষয়াবলীর সংরক্ষক কেবলই আল্লাহ্। সুতরাং বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে তিনি সকলকেই রক্ষা করে চলেছেন। কারো সম্পর্কে তিনি কখনো উদাসীন নন। সে কারণে সকলকেই তিনি দান করবেন যথোপযুক্ত প্রতিদান— পুরস্কার অথবা তিরস্কার।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ২২, ২৩

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ

www.eelm.weebly.com

اِلَّا لِمَنۡ اَذِنَ لَهٗ ؕ حَتّٰۤی اِذَا فُزِّعَ عَنۡ قُلُوۡبِهِمۡ قَالُوۡا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمۡ ؕ قَالُوا الۡحَقَّ ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡكَبِیۡرُ ﴿۲۳﴾

r বল, 'তোমরা আহ্বান কর উহাদিগকে যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে ইলাহ্ মনে করিতে। উহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নহে এবং এতদুভয়ে উহাদের কোন অংশও নাই এবং উহাদের কেহ তাঁহার সহায়কও নহে।'

r যাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহ্র নিকট কাহারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না। পরে যখন উহাদের অন্তর হইতে ভয় বিদূরিত হইবে তখন উহারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে, 'তোমাদের প্রতিপালক কী বলিলেন?' তদুত্তরে তাহারা বলিবে, 'যাহা সত্য তিনি তাহাই বলিয়াছেন।' তিনি সমুচ্চ, মহান।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদী জনগোষ্ঠীকে বলুন, আল্লাহ্র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যাদেরকে তোমরা উপাস্য বলে স্থির করেছো, তাদের কাছে তোমাদের প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা জানাও। পরিত্রাণ চাও আপতিত বিপদাপদ থেকে। কিন্তু জানোতো, আকাশ ও পৃথিবীর অণুপরিমাণ কোনোকিছুর উপরেও তাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। অধিকার নেই পিপীলিকা সদৃশ কোনো প্রাণীর মঙ্গলামঙ্গল নির্ধারণের। কারো আর্তি-আকুতি শ্রবণের ক্ষমতা থেকেও তারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। হে অপরিণামদর্শী ও অজ্ঞ জনতা! ভেবে দ্যাখো, সৃষ্টি কি কখনো স্রষ্টার সমতুল হয়? উপাসক কি কখনো হয় উপাস্যের সমকক্ষ?

আকাশ ও পৃথিবী সতত দৃশ্যমান বলেই এখানে বিশেষ করে করা হয়েছে এ দু'টোর উল্লেখ। অথবা বলা যেতে পারে, তাদের কোনো কোনো উপাস্য আকাশী— যেমন ফেরেশতামণ্ডলী, নক্ষত্রপুঞ্জ। আবার তাদের কোনো কোনো মাবুদ পৃথিবীসম্পৃক্ত। যেমন প্রস্তর অথবা মৃত্তিকাপ্রতিমা। কিংবা বলা যায়, তাদের মঙ্গল-অমঙ্গলের কিছু বাহ্যিক উপকরণ নভজ ও পার্থিব। আর 'মিন জহীর' কথাটির মর্মার্থ এখানে— তোমাদের উপাস্যগুলোর কেউও কোনোটাই আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি ও এতদুভয়ের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহ্কে অণুপরিমাণ সহায়তা করার যোগ্যতা রাখে না।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'যাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহ্র নিকট কারো শাফায়াত ফলপ্রসূ হবে না।' একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্পাক শাফায়াত করার অনুমতি দিবেন কেবল নবী-রসুল, ফেরেশতা ও আউলিয়াগণকে। আর তাঁরাও শাফায়াত করবেন কেবল বিশ্বাসীদের জন্য। অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদের জন্য নয়। কেননা তাদের শাফায়াত করার অনুমতি তাঁরা পাবেন না।

আলোচ্য বাক্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে শাফায়াতকারী ও শাফায়াতপ্রাপ্তদের যোগ্যতার কথা। অর্থাৎ যারা শাফায়াতপ্রাপ্তির যোগ্য, কেবল তাদেরকে শাফায়াত করবার অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন অনুমোদনপ্রাপ্ত শাফায়াতকারীরা। এখানকার 'লাহু' (তার জন্য) কথাটির 'হু' সর্বনামটি শাফায়াতকারীর সঙ্গে সংযোজিত হয়ে থাকতে পারে। আবার সংযোজ্য হতে পারে তার সঙ্গেও, যার জন্য শাফায়াত করা হবে।

পৌত্তলিকেরা বলতো, আমরা জানি, যে সকল ফেরেশতা ও প্রতিমার পূজা আমরা করি, তারা আল্লাহ্র সমকক্ষ নয়। কিন্তু আমরা মনে করি, তাদের পূজা করলে তারা আমাদের জন্য আল্লাহ্সমীপে সুপারিশ করবে। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

এরপর বলা হয়েছে— 'পরে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হবে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তোমাদের প্রতিপালক কী বললেন? তদুত্তরে তারা বলবে, যা সত্য তিনি তা-ই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান'।

এখানকার 'ফুয্যিয়া' শব্দটির ধাতুমূল 'তাফযীয়'। এর অর্থ আতঙ্ক দূরীকরণ। যেমন 'তামরীদ্ব' অর্থ রোগ বিতাড়ন। প্রথম বাক্যে শাফায়াতকারী ও তার যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য বাক্যের 'ক্লুলুবিহীম' (তাদের অন্তর) কথাটির 'তাদের' সর্বনামটি সংযোজ্য হবে শাফায়াতকারী এবং যাদের জন্য শাফায়াত করা হবে উভয়ের সঙ্গে। আর এখানকার 'ভয় বিদূরিত হবে' কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে। পূর্ববর্তী বাক্য দৃষ্টে এটাই অনুমিত হয়। সেখানে বলা হয়েছিলো— শাফায়াতকারী ও শাফায়াতযোগ্য উভয়েই তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে অনুমতির। একবার হৃদয়ে জাগ্রত হবে আশা, আরেকবার নিরাশা। অথবা বলা যেতে পারে, আল্লাহ্পাকের ঘোষণা শুনে এবং তাঁর প্রবল পরাক্রম প্রত্যক্ষ করে তারা তখন হয়ে পড়বে সংজ্ঞাহীন। আমি বলি, ফেরেশতাগণও আল্লাহ্র আদেশ শুনে ভয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। যেমন হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যখন আকাশগামী ফেরেশতাদের প্রতি কোনো নির্দেশ ঘোষণা করেন, তখন ভয়ে ও অক্ষমতাবোধে তারা ঝাপটাতে থাকে তাদের ডানা।

www.eelm.weebly.com

তাদের ওই ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শুনে মনে হয়, যেনো সুবিশাল কোনো প্রস্তরখণ্ডে আছাড় খাচ্ছে লৌহশৃঙ্খল। একসময় ধীরে ধীরে তাদের ভয় দূর হয়ে যায়। তখন তারা একে অপরকে বলে, তোমাদের পালনকর্তা কী বললেন? কেউ জবাব দেয়, তিনি বলেন, তিনি মহাপ্রতাপশালী। সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের সেই কথোপকথন শুনে নেয় আকাশে আড়ি পেতে থাকা শয়তান। তার কাছ থেকে জেনে নেয় তার নিম্নবর্তী শয়তানেরা। এভাবে ওই সংবাদ নেমে আসে ধরাপৃষ্ঠে। সুফিয়ান সওরী তাঁর দুই হাত ঈষৎ তেরসাকারে অঙ্গুলিগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত করে বলতেন, এভাবে শয়তানেরা সজ্জিত হয়ে ক্রমে ক্রমে উঠে যায় আকাশে। সকলের উপরে যারা থাকে, তারা যা শুনতে পায় তা তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেয় তার নিম্নবর্তীকে। সে জানিয়ে দেয় তার নিচের শয়তানকে। প্রাপ্ত সংবাদ পৃথিবীতে পৌঁছে যায় এভাবেই। তারপর তা জানানো হয় জ্যোতিষীদেরকে। জ্যোতিষীরা এর সঙ্গে মিথ্যার প্রলেপ লাগিয়ে তা প্রচার করে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে। কখনো কখনো সংবাদ নিচে নেমে আসার আগেই শয়তানেরা আক্রান্ত হয় ফেরেশতাদের ছুঁড়ে মারা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড দ্বারা। ফলে তারা কেউ হয় ভস্মীভূত, কেউ আহত।

হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে জনৈক আনসারী থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন,আমাদের মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ যখন কোনো নির্দেশ জারী করেন, তখন আরশবহনকারী ফেরেশতারা বর্ণনা করে তাঁর প্রশংসা ও মহিমা। সেই প্রশংসা ও মহিমার প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হয় নিকটবর্তী আকাশের ফেরেশতাদের কণ্ঠেও। এর মধ্যে ঘোষিত নির্দেশটি পৌঁছে যায় পৃথিবীর নিকটতম আকাশের ফেরেশতাদের কাছে। তারাও সশ্রদ্ধ স্তব-স্তুতি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে সম্মান জানায় মহিমময় নির্দেশটির প্রতি। আরশবাহী ফেরশতাদের সন্নিকটবর্তী ফেরেশতারা তখন বলে, আপনাদের পালনকর্তা কী নির্দেশ ঘোষণা করলেন? আকাশবাহী ফেরেশতারা তখন জানিয়ে দেয় ঘোষিত নির্দেশের সবিস্তার বিবরণ। এভাবে উপরের ও নিচের আকাশের ফেরেশতাদের আলাপচারিতার মাধ্যমে আল্লাহ্প্রদত্ত নির্দেশটি অবতীর্ণ হতে থাকে। আড়ি পেতে থাকা শয়তান তার কিছু কিছু শুনতে পায় এবং তা পৌঁছে দেয় নিম্নবর্তী শয়তানদের কাছে। এভাবে পৃথিবীস্থিত শয়তানের কাছে নেমে আসে ওই সংবাদ। আড়ি পাতা শয়তান ফেরেশেতাদের দৃষ্টিগোচর হলে তারা তার দিকে ছুঁড়ে মারে প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ড। ফলে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায় সে। আর তারা দেখতে না পেলে শয়তান রক্ষা পায় এবং প্রাপ্ত সংবাদ শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে জ্যোতিষী ও যাদুকরদের কাছে। আবার তারা ওই সংবাদ কিছু কিছু মিথ্যাসহ ফলাও করে প্রচার করে জনসমক্ষে।

www.eelm.weebly.com

হজরত নাওয়াস ইবনে সামআন সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যা অভিপ্রায় করেন, তা ব্যক্ত করেন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। তা শুনে প্রকম্পিত হয় আকাশ। আর আকাশবাসীরা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে হয়ে যায় সংজ্ঞাহীন। সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর সর্বপ্রথম মস্তক উত্তোলন করেন জিবরাইল। আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে কথোপকথন শুরু করেন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। এরপর জিবরাইল যখন ফেরেশতাদের কাছে ফিরে আসেন, তখন তারা বলে, আমাদের মহামহিম প্রভুপালক কী বিধান অবতীর্ণ করলেন? জিবরাইল বলেন, তিনি যা কিছু বলেন, তা-ই সত্য। তিনি সমুচ্চ, তিনি মহান। ফেরেশতারাও তখন সমস্বরে বলে ওঠে একই কথা। পরিশেষে জিবরাইল যথাস্থানে পৌঁছে দেন ওই প্রত্যাদেশ।

'ক্বালু' অর্থ বলে। অর্থাৎ শাফায়াতের অনুমতি লাভের প্রাক্কালে উদ্ভূত শংকা দূর হলে তারা বলে। 'মাজা ক্বালা রব্বুকুম' অর্থ তোমাদের প্রভুপালনকর্তা কী বললেন। এরপরের 'ক্বালু' অর্থ তারা একে অপরকে লক্ষ্য করে বলে। 'আলহাক্ব' অর্থ সত্য, মহাসত্য। 'আল আ'লীয়ুল কাবীর' অর্থ সমুচ্চ, মহান। অর্থাৎ এমন সমুচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ যে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তখন কোনো নবী অথবা ফেরেশতা তাঁর উদ্দেশ্যে কথা বলতে সাহস পাবে না।

বাগবী লিখেছেন, মহাপ্রলয়ের ভয়ে ফেরেশতারাও আতংকিত হয়। মুকাতিল, সুদ্দী ও কালাবী বলেছেন, হজরত ঈসা ও রসুল স. এর মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান ছিলো ৫৫০ বৎসর। মতান্তরে ৬০০ বৎসর। ওই সময়টা ছিলো প্রত্যাদেশশূন্য। ওই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ফেরেশতারা কোনো প্রত্যাদেশ শুনতে পায়নি। শুনতে পেলো তখন, যখন এ নশ্বর ধরাধামে মহাআবির্ভাব ঘটলো শেষ পয়গম্বর মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর। কিন্তু তখনকার প্রথম প্রত্যাদেশ শুনেই তটস্থ হলো ফেরেশতারা। তারা ধারনা করলো, নিশ্চয় কিয়ামত অত্যাসন্ন। কারণ তারা জানতো শেষ রসুল স. এর মহাআবির্ভাব মহাপ্রলয়ের একটি পূর্বাভাষ। তাই প্রত্যাদেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা ভয়ে আতংকে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো। জিবরাইল প্রত্যাদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হতে লাগলেন পৃথিবীতে। পথিমধ্যে বিভিন্ন আকাশের সংজ্ঞা ফিরে পাওয়া ফেরেশতারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, তোমাদের প্রভুপালনকর্তা কী বললেন? কেউ কেউ বললো, তিনি যা প্রত্যাদেশ করেছেন, তা সত্য। মহাসত্য।

একটি সন্দেহ ঃ মুকাতিল, কালাবী প্রমুখের অভিমতানুসারে আলোচ্য বাক্য পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে বক্তব্যগত দিক থেকে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু তা কী করে সম্ভব! আগের বাক্যটির প্রসঙ্গ শাফায়াত এবং পরবর্তী বাক্য প্রত্যাদেশসম্পর্কীয়।

সন্দেহের নিরসন ঃ উদ্ভূত জটিলতা নিরসনার্থে বলা যেতে পারে যে, ইতোপূর্বে আলোচিত 'যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা জানে যে, তোমার

www.eelm.weebly.com

প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্য; এটা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ করে' (আয়াত ৬)। এই আয়াতে 'যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতামণ্ডলীকে। এরপর থেকে এ পর্যন্ত উপস্থাপিত আয়াতগুলো ভিন্ন প্রসঙ্গের। সুতরাং এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে গ্রন্থ আপনাকে দেওয়া হয়েছে, তা সত্য। একারণেই এর অবতরণকালে ফেরেশতারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়। কেননা তারা জানে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত কিয়ামতের বিষয়টি। এক সময় তাদের আতঙ্কভাব স্তিমিত হয়, তখন তারা পরস্পর পরস্পরকে বলে, তোমাদের মহান প্রভুপ্রতিপালক কী বললেন? তাদের একদল জবাব দেয়, তিনি অবতীর্ণ করেন মহাসত্য। তিনি মহামহিমময়, মহামর্যাদাশালী।

কোরআন ব্যাখ্যাতাগণের একটি দলের অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়াতে দেওয়া হয়েছে পৌত্তলিকদের অবস্থার বিবরণ। হাসান ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, মৃত্যুকালে পৌত্তলিকেরা আপতিত হয় মহাআতঙ্কে। কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের লক্ষ্যে কিছুক্ষণের জন্য তাদের আতংক দূর করে দেওয়া হয়। বলা হয়, তোমাদের প্রভুপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর নবী-রসুলগণের মাধ্যমে যা প্রেরণ করা হয়েছে, তাতে কী বলা হয়েছে? তারা বলে, তাঁরা যা বলেছেন, তা সত্য। কিন্তু তখন অতিক্রান্ত হয় তওবার সময়। তাই তাদের এমতো স্বীকৃতি আল্লাহ্‌ কর্তৃক আর গৃহীত হয় না।

আমি বলি, এমতো ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে স্বীকার করতে হবে, আলোচ্য আয়াতের যোগসূত্র রয়েছে 'হুয়া মিনহা ফী শাককিন' আয়াতের সঙ্গে। অর্থাৎ অংশীবাদীরা সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান থাকে সারা জীবন। তাদের ওই সন্দেহ দূর হয়ে যায় মৃত্যুর পর। তখন অর্জিত হয় তাদের চাক্ষুষ প্রতীতি। কিন্তু তখনকার এমতো স্বীকৃতি বৃথা।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ২৪, ২৫, ২৬

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَ اِنَّاۤ اَوْ
اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۴﴾ قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّاۤ
اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۵﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ
يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَ هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿۲۶﴾

www.eelm.weebly.com

r বল, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে কে তোমাদিগকে রিজিক দান করেন?' বল, 'আল্লাহ্। হয় আমরা না হয় তোমরা সৎপথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।'

r বল, 'আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে না এবং তোমরা যাহা কর সে সম্পর্কে আমাদিগকেও জবাবদিহি করিতে হইবে না।'

r বল, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্র করিবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করিয়া দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদেরকে রিজিক দান করেন? বলো, আল্লাহ্'।

এখানকার প্রশ্নটি স্বীকৃতিমূলক। অর্থাৎ প্রশ্নের মাধ্যমে সম্বোধিত জনকে উৎসাহিত করাই এখানে উদ্দেশ্য, যেনো সম্বোধিতরা নির্দ্বিধায় একথা মেনে নেয় যে, আল্লাহ্ই সকলের একক ও সমকক্ষহীন জীবনোপকরণপ্রদাতা, প্রভুপালনকর্তা। ২২ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে এই আয়াতের রয়েছে বক্তব্যগত সংযোগসূত্র। অর্থাৎ অংশীবাদীদের পূজ্যপ্রতিমাগুলো অণুপরিমাণ কোনোকিছুর মালিক নয়, সুতরাং জীবিকাপ্রদাতা তো তারা হতেই পারে না— একথাটিই স্পষ্ট করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে। এখানে আল্লাহ্তায়ালা প্রশ্নের অবতারণা করে নিজেই আবার তার জবাব দিয়েছেন। যেনো বক্তব্যটি এরকম— হে আমার রসুল! অংশীবাদীদের অপধারণার প্রেক্ষিতে আপনি জানিয়ে দিন, তোমাদের জীবিকাপ্রদাতা কিন্তু আল্লাহ্ই। অন্য কেউ নয়। সুতরাং আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যের উপাসনা তোমরা করবে কেনো? আর আকাশ-পৃথিবী থেকে তোমাদেরকে জীবিকা দান করেন কে — এরকম প্রশ্নের জবাব জানা থাকা সত্ত্বেও অংশীবাদীরা নিশ্চুপ থাকতে পারে। তাই হে আমার রসুল! প্রকৃত জবাবটি আপনিই নিজ মুখে তাদেরকে জানিয়ে দিন। বলুন, 'আল্লাহ্'।

এরপর বলা হয়েছে— 'হয় আমরা, না হয় তোমরা সৎপথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে একথাও বলুন, আমরা একত্ববাদী, আর তোমরা অংশীবাদী। আমাদের বিশ্বাস পরস্পরবিরোধী। এমতাবস্থায় এরকম তো হতে পারে না যে, আমাদের উভয়েই সঠিক অথবা উভয়েই বেঠিক। বরং এরকমই অনিবার্য যে, আমাদের কোনো একটি দল সৎপথপ্রাপ্ত এবং অন্য দল পথভ্রষ্ট। আমরা কেবল আল্লাহ্কেই জীবিকাদাতা বলে মানি এবং উপাসনা করি কেবল তাঁর। তোমরাও তাঁকে জীবিকাপ্রদাতা বলে হয়তো জানো, কিন্তু উপাসনা করো অন্যের। সুতরাং যুক্তির মাপকাঠিতে কে পথপ্রাপ্ত এবং কে পথচ্যুত, তা কি আর অননুমেয় থাকে?

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'বলো, আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না এবং তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবে না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে বিষয়টি এভাবে বোঝাতে চেষ্টা করুন যে, হে মক্কার জনগোষ্ঠী! আমাদের বিশ্বাসে ও কর্মে বিঘ্ন উপস্থিত কোরো না। তোমাদের দৃষ্টিতে আমরা যদি ধর্মীয় বিষয়ে অপরাধ করেই থাকি, তবে সে অপরাধের জন্য তো তোমরা দায়ী হবে না। আবার তোমাদের বিশ্বাস ও কর্মে তোমরা যা করে থাকো, সে ব্যাপারে আমরাও অভিযুক্ত হবো না। প্রত্যেকেই ভোগ করবে তার আপনাপন কৃতকর্মের ফল।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'বলো, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্র করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ'।

এখানে 'ইয়াফতাহু' অর্থ ফয়সালা করবেন, দ্বন্দ্ব দূর করবেন সঠিক সিদ্ধান্ত প্রয়োগের মাধ্যমে। সত্যানুসারীদেরকে করবেন পুরস্কৃত এবং তিরস্কৃত করবেন অসত্যানুগামীদেরকে।

'আলফাত্তাহ' অর্থ ফয়সালাপ্রদানকারী, মীমাংসাকারী, বিচারক, মহাবিচারক, যিনি সমাধান দেন জটিল, দুর্বোধ্য ও অমীমাংসিত বিষয়ে। আর 'আলআ'লীম' অর্থ সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ কখন কাদের মধ্যে কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে হবে, সে ব্যাপারে নির্ভুল ও প্রাজ্ঞ। কেননা তাঁর জ্ঞান সর্বত্রগামী।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সমালোচনা করা হয়েছে। পরেরটিতে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে কল্যাণকামনা দ্বারা। আর শেষোক্তটিতে দেওয়া হয়েছে প্রচ্ছন্ন হুমকি। স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে, পৃথিবীতে যে যা-ই করুক না কেনো, একদিন এ পৃথিবী পরিত্যাগ করতেই হবে সকলকে। জবাবদিহির জন্য দাঁড়াতে হবে আল্লাহ্ সকাশে। তখন তিনি পথপ্রাপ্ত ও পথচ্যুতদের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কারণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন তিনিই। যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞও।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

قُلْ اَرُوْنِیَ الَّذِیْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ
الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۷﴾ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ

www.eelm.weebly.com

بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَ
يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ
يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٠﴾

r বল, 'তোমরা আমাকে দেখাও যাহাদিগকে শরীকরূপে তাঁহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছ তাহাদিগকে। না, কখনও না, বরং তিনি আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

r আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

r তাহারা জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হইবে?'

r বল, 'তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিবস, যাহা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করিতে পারিবে না, আর ত্বরান্বিতও করিতে পারিবে না'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা আমাকে দেখাও যাদেরকে শরীকরূপে তাঁর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছো তাদেরকে'। এখানে 'আরূনী' অর্থ আমাকে দেখাও। মর্মার্থ— আমাকে বলে দাও। 'ইলহাক্ব' অর্থ জুড়ে দেওয়া, মিলিয়ে দেওয়া। মর্মার্থ— কোন যোগ্যতার মাপকাঠিতে তোমরা তোমাদের অলীক উপাস্যগুলোকে আল্লাহ্র সমান্তরালে স্থাপন করেছো? তারা কি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে? কারো কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ করবার সামর্থ্য কি তাদের আছে? ক্ষমতা কি আছে কাউকে জীবনোপকরণ প্রদানের? যদি এসকল যোগ্যতা তোমরা তাদের মধ্যে না-ই পাও, তবে কী করে তাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করতে পারো?

এরপর বলা হয়েছে— 'না, কখনো নয়'। একথার অর্থ— হে মুশরিকেরা শোনো। সৃজন, কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ, জীবনোপকরণপ্রদান— এসকল কোনো একটি গুণও যখন তোমাদের পূজিত প্রতিমাগুলোর নেই, তখন নিশ্চিত জেনো, কখনোই তারা আল্লাহ্র সমকক্ষ অথবা অংশীদার নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'বরং তিনি আল্লাহ্; পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— অন্য কেউ বা কোনোকিছু নয়, কেবল আল্লাহ্ই আনুরূপ্যবিহীনভাবে মহাপ্রতিপত্তিশালী ও বিজ্ঞ। সুতরাং হে অংশীবাদীরা! এই মুহূর্তে অংশীবাদ পরিত্যাগ করো। উপাস্য হিসেবে চিরদিনের জন্য গ্রহণ করো এক আল্লাহ্র অনুগ্রহের আশ্রয়।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি'।

এখানকার 'কাফ্ফাহ্' শব্দটি একটি অনুক্ত বিশেষণের বিশেষণ। যেনো বলা হয়েছে— আপনার প্রেরণ সমগ্র মানবজাতির জন্য। এখানে 'কাফযাহ্' শব্দটি ব্যতিক্রমবিহীন সাধারণার্থক। তাই এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সমগ্র মানবজাতির জন্য আপনার রেসালাত সাধারণ। কেউই আপনার রেসালাতের বাইরে নয়। আবার এরকমও হতে পারে যে, 'কাফ্ফাহ্' এখানে আধিক্য প্রকাশক। অর্থাৎ এখানকার বক্তব্যটি হবে— একমাত্র আপনিই গোটা মানব সম্প্রদায়কে আপনার রেসালতের বলয়ে একত্র করতে সক্ষম।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে পাঁচটি বিষয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে। আমার পূর্বে আর কাউকে এই বৈশিষ্ট্যসমূহ দেওয়া হয়নি। সেগুলো হচ্ছে— ১. এক মাসের দূরত্বে অবস্থানকারী শত্রুও আমার ভয়ে ভীত হয়, ২. আমার জন্য সারা পৃথিবীর যে কোনো স্থান মসজিদ, তাই যে কোনো স্থানে তোমরা নামাজ আদায় করতে পারো এবং পানির অভাবে যে কোনো স্থানের মাটি দিয়ে করতে পারো তায়াম্মুম, ৩. আমার জন্যই হালাল করে দেওয়া হয়েছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, ৪. আমাকে দেওয়া হয়েছে শাফায়াতের অধিকার এবং ৫. পূর্ববর্তী নবীগণ প্রেরিত হয়েছিলেন বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর পথপ্রদর্শনার্থে। কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানবজাতির জন্য। বোখারী, মসুলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে দেওয়া হয়েছে এমন ছয়টি বিশেষত্ব, যা অন্য কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। যেমন— ১. অল্প কথায় গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত ভাব প্রকাশ করবার ক্ষমতা ২. আমার সম্পর্কে আমার শত্রুদের অন্তরে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রচণ্ড ভীতি ৩. আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে সমরলব্ধ সম্পদ ৪. পৃথিবীর সকল স্থানের মৃত্তিকাকে করা হয়েছে আমার জন্য নামাজ পাঠের উপযোগী ও সকল স্থানের মাটি উপযোগী করা হয়েছে তায়াম্মুমের ৫. বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শনার্থে আমি প্রেরিত এবং ৬. আমার মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়েছে প্রবহমান নবুয়ত।

আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি প্রতিরোধকারীরূপে। তাইতো আপনি ইহজগতে ভ্রষ্টপথানুগামী-দেরকে প্রতিহত করেন পথভ্রষ্টতা থেকে। আবার পরজগতে তাদের প্রতিবন্ধক হবেন নরকগমনের। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার দৃষ্টান্ত এরকম ঃ এক লোক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করলো। তার আলো যখন ছড়িয়ে পড়লো, তখন চতুর্দিক থেকে এসে ওই আগুনে ঝাঁপিয়ে

www.eelm.weebly.com

পড়তে লাগলো কীটপতঙ্গের দল। লোকটিও প্রাণপনে তাদেরকে প্রতিহত করেই চললো। আমিও তেমনি তোমাদেরকে কটিদেশ আঁকড়ে ধরে বাঁচাতে চেষ্টা করছি, আর তোমরা বার বার ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছো নরকানলে। বোখারী, মুসলিম।

'কাফফাহ্' শব্দটি এখানে 'আন্‌নাস' (মানবজাতি) এর অবস্থা প্রকাশক। গুরুত্ব প্রকাশের জন্য এখানে অবস্থাপ্রকাশক শব্দটিকে উল্লেখ করা হয়েছে আগে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরণ করেছি। সুতরাং পৃথিবীর সকল বর্ণের ও সকল গোত্রের ও সকল দেশের মানুষ— আপনার ধর্মপ্রচারের বৃত্তভূত। অবশ্য অধিকাংশ ব্যাকরণবেত্তা এরকম বাক্যবিন্যাসের সমর্থক নন।

এখানে 'বাশীরা' অর্থ জান্নাতের সুসংবাদদাতা। আর 'নাজীরা' অর্থ নরকের ভীতি প্রদর্শনকারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না'। একথার অর্থ—আপনি যে সমগ্র মানবতার পথপ্রদর্শক ও তাদের কল্যাণকামী, একথা অধিকাংশ লোক জানে না। তাই অনেকে মনে করে আপনি তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করে চলেছেন।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'তারা জিজ্ঞেস করে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে'? একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দকে প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে উপহাস ছলে বলে, তোমরা বলো, তোমাদের কথা না মানলে আমাদের উপরে আপতিত হবে শাস্তি। কিন্তু কই, শাস্তি-টাস্তি কোনোকিছুরই তো দেখা সাক্ষাত নেই। তাহলে কীভাবে আমরা তোমাদেরকে সত্যবাদী বলে মানি। সত্যবাদীই যদি তোমরা হও, তবে বলো, কখন অবতীর্ণ হবে তথাকথিত শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিবস, যা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবে না। আর ত্বরান্বিতও করতে পারবে না'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! তাদের দম্ভোক্তির জবাবে আপনি বলুন, তোমাদের জন্য শাস্তির সময় সুনির্ধারিত। ওই সুনির্ধারিত সময়কে তোমরা মুহূর্তকাল অগ্রপশ্চাত করতে পারবে না। যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি তোমরা পাবেই।

এখানে 'মীআ'দু ইয়াওমিন' অর্থ প্রতিশ্রুত দিবস বা সময়। আর 'দিবস' অর্থ এখানে মহাপ্রলয় দিবস, অথবা মহাবিচারের দিবস। আর 'নির্ধারিত দিবস বিলম্বিত অথবা ত্বরান্বিত করতে পারবে না' অর্থ তোমাদের আয়ুষ্কাল সুনির্দিষ্ট।

www.eelm.weebly.com

সুতরাং তোমরা তোমাদের আয়ুর প্রলম্বায়ন অথবা ত্বরায়ণ কোনোটাই করতে পারবে না। উল্লেখ্য, অংশীবাদীদের প্রশ্নটি ছিলো দাম্ভিকতাদুষ্ট ও ব্যঙ্গাত্মক। তাই তার জবাবও দেওয়া হয়েছে হুমকির মাধ্যমে।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ
يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚۖ يَرْجِعُ
بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ۨالْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ
اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِيْنَ
اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْۤا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى
بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ
اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ
تَاْمُرُوْنَنَاۤ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ
لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْۤ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ
يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٣﴾

r কাফিরগণ বলে, 'আমরা এই কুরআনে কখনও বিশ্বাস করিব না, ইহার পূর্ববর্তী কিতাবসমুহেও নহে।' হায়! তুমি যদি দেখিতে যালিমদিগকে যখন তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে তখন উহারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করিতে থাকিবে, যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহারা ক্ষমতাদর্পীদিগকে বলিবে, 'তোমরা না থাকিলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হইতাম।'

r যাহারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তাহারা, যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসিবার পর আমরা কি তোমাদিগকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম? বস্তুত তোমরাই তো ছিলে অপরাধী।'

www.eelm.weebly.com

r যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহারা ক্ষমতাদর্পীদিগকে বলিবে, 'প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলে যেন আমরা আল্লাহ্‌কে অমান্য করি এবং তাঁহার শরীক স্থাপন করি।' যখন তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা অনুতাপ গোপন রাখিবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরাইব। উহাদিগকে উহারা যাহা করিত তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

অংশীবাদীরা একবার গ্রন্থধারী (ইহুদী, খৃষ্টান)দেরকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি মনে করো মোহাম্মদ সত্য সত্যই নবী? গ্রন্থধারীরা বললো, হ্যাঁ। তাঁর কথা লেখা আছে আমাদের তওরাত ও ইঞ্জিলে। একথা শুনে রোষতপ্ত অংশীবাদীরা যা বলেছিলো সে কথাই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমোক্তটির প্রথমাংশে এভাবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, আমরা কোরআনকে যেমন বিশ্বাস করবো না, তেমনি বিশ্বাস করবো না পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহকেও।

এরকমও হতে পারে যে— এখানে 'আললাজী বাইনা ইয়াদাইহ্' অর্থ রসুল স. এর পুতঃপবিত্র ব্যক্তিত্ব। এক বিবৃতিতে এমনও বলা হয়েছে যে, কথাটির অর্থ মহাবিচার দিবস, স্বর্গ ও নরক।

এরপর বলা হয়েছে— 'হায়! তুমি যদি দেখতে, জালেমদেরকে যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম'।

এখানে 'লাও তারা' (তুমি যদি দেখতে) বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে। অথবা কথাটি সাধারণার্থক। অর্থাৎ যে কেউ যদি দেখতো। 'ইয়ারজ্বিউ' অর্থ পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে। একে অপরের বিরুদ্ধে হবে প্রতিবাদমুখর। অংশীবাদী জনগোষ্ঠীর ব্রাত্যজনেরা তাদের সমাজের কুলীনদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা তখন অবশ্যই হতে পারতাম বিশ্বাসবান।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'যারা ক্ষমতাদর্পী ছিলো তারা, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসবার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাই তো ছিলে অপরাধী'।

এখানে 'আল্লাজীনা তুদ্বয়ী'ফু' বলে বুঝানো হয়েছে সাধারণ জনতাকে, যারা তাদের সমাজপতিদের অনুসারী হয়। আর 'আল্লাজীনাস্ তাক্বারু' বলে বুঝানো হয়েছে প্রভাবশালী সমাজপতিদেরকে, যারা গণ্য হয় অভিজাত বলে। 'আ নাহনু সদাদ্‌নাকুম' অর্থ আমরা কি তোমাদেরকে নিবৃত্ত করেছিলাম? প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— আমরা তো তোমাদেরকে

www.eelm.weebly.com

সত্যপথ গ্রহণ করতে বাধা দেইনি। তোমরাই তো স্বেচ্ছায় হয়ে গিয়েছিলে সত্যবিমুখ। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে প্রকাশিত বক্তব্যের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের সাধারণ জনতা সত্য-মিথ্যার বিষয়টিকে যাচাই করে দেখে না। ইচ্ছাকৃতভাবে অন্ধ অনুসরণ করে তাদের নেতাদের। পরিত্যাগ করে নবী-রসুলগণের বিশুদ্ধপথ।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্রি চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে'। একথার অর্থ— অংশীবাদী জনতা তাদের প্রতাপশালী নেতাদেরকে বলবে, একথা ঠিক যে, তোমরা বলপ্রয়োগ করে আমাদেরকে সত্যবিমুখ করোনি। কিন্তু তোমরা ছিলে চক্রান্তপ্রবণ। চক্রান্তের জালে কীভাবে আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা যায়— এটাই ছিলো তোমাদের সার্বক্ষণিক পরিকল্পনা। আমাদের পক্ষে সে কঠিন চক্রান্তের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা সহজ ছিলো না। বিদ্বজ্জন বলেছেন, এখানে দিবারাত্রির চক্রান্ত অর্থ— কালচক্রের প্রতারণা, প্রলম্বিত আশার ছলনা, সুদীর্ঘ ও নিরাপদ জীবনের লালসা।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেনো আমরা আল্লাহ্‌কে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি'। একথার অর্থ— তোমরা আমাদেরকে সবসময় পরামর্শ দিতে, আমরা যেনো আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করি এবং স্থির করি তাঁর সমকক্ষ।

এখানে 'আন নাকফুরা' (যেনো আমরা অমান্য করি) কথাটির 'আন্' (যেনো) অব্যয়টি ব্যাখ্যামূলক, অথবা ধাতুমূল। এর অন্তে একটি যের প্রদায়ক 'রা' ধরে নিতে হবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফেরদের গলদেশে শৃঙ্খল পরাবো। তাদেরকে তারা যা করতো, তার প্রতিফল দেওয়া হবে'। একথার অর্থ— তাদের ইতর ও অভিজাত শ্রেণী উভয়ে যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা পথভ্রষ্ট করা এবং পথভ্রষ্ট হওয়ার আপেক্ষকে গোপন রাখবে, যেনো একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। অথবা বলা যায়, এখানে, আসাররু' (তারা গোপন করবে) শব্দটির 'আ' বর্ণটি ধাত্যর্থ বিলোপক। যেমন বলা হয় 'আশকাইতুহু' (আমি বিলুপ্ত করেছি তার অভিযোগ)। সেক্ষেত্রে 'আসাররু' শব্দটির মর্মার্থ দাঁড়াবে 'আজহারু'। অর্থাৎ গোপনীয়তা বিলুপ্ত হয়ে তখন প্রকাশ হয়ে পড়বে তাদের অনুতাপ।

এখানে 'আললাজীনা কাফারু' (যারা কুফরি করেছে) না বলে কেবল 'তাদের' সর্বনামটি ব্যবহার করলেই যথেষ্ট হতো। অর্থাৎ বলা যেতো 'তাদের গলদেশে'

www.eelm.weebly.com

কিন্তু তৎসত্ত্বেও ‘কাফারু’ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের অপপরিণতির সংবাদটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যে, তাদের কণ্ঠদেশকে তখন শৃঙ্খলিত করা হবেই।

আবু রযীন সূত্রে সুফিয়ান আসেমের মাধ্যমে ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, মক্কাবাসী দু’জন লোক ছিলো পরস্পরের বন্ধুস্থানীয়। এক সময় তাদের একজন চলে গেলো সিরিয়ায়। সেখানেই বসবাস করতে শুরু করলো সে। এরপর যখন রসুল স. নবুয়তের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন তাঁর সম্পর্কে মক্কাবাসী বন্ধু লিখে জানালো তার প্রবাসী বন্ধুকে। প্রত্যুত্তর এলো, তার নবুয়তের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কথা লিখে জানাও। সে জবাব দিলো— কুরায়েশ গোত্রের দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা তাঁর আনুগামী। জবাব পাঠ করে সে তৎক্ষণাৎ ফিরে এলো মক্কায়। বন্ধুকে বললো, আমাকে নবুয়তের দাবিদার লোকটির কাছে নিয়ে চলো। সে জানতো নবী-রসুলগণের অনুসারীরা সাধারণতঃ দরিদ্র শ্রেণীরই হয়। সে তার বন্ধুর সঙ্গে রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলো। বললো, আপনি কিসের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানান? রসুল স. বললেন, অমুক অমুক নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহের প্রতি। সে বলে উঠলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি সত্যি সত্যিই আল্লাহ্‌র রসুল। রসুল স. বললেন, কী করে বুঝলে? সে বললো, নবীগণের প্রাথমিক অনুসারীরা আসে সমাজের অবহেলিত শ্রেণী থেকে। এঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ৩৪, ৩৫, ৩৬

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ۙ إِنَّا بِمَا
أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ۙ وَ
مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَ
يَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

r যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি উহার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলিয়াছে, ‘তোমরা যাহা সহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।’

r উহারা আরও বলিত, ‘আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধিশালী; সুতরাং আমাদিগকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হইবে না।’

www.eelm.weebly.com

r বল, 'আমার প্রতিপালক যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার রিয্ক বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা জানে না।'

আলোচ্য আয়াতত্রয় অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. ওই লোকটিকে ডেকে আনলেন। বললেন, দ্যাখো, তুমি যেমন বলেছো, তেমনভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্র আয়াত। প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে—আমি যখনই কোনো জনপদে নবী-রসুল প্রেরণ করি, তখনই দ্যাখা যায় ওই জনপদবাসীদের বিত্তপতিরা তা প্রত্যাখ্যান করে বসেছে। বলেছে, তোমরা যে নবুয়তের দাবি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছো, আমরা তা অস্বীকার করি।

এখানে 'মুতরাফীন' অর্থ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাতকারী, বিত্তশালী। বিত্তশালীরা সাধারণতঃ ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে। বিত্তহীনদের প্রতি প্রদর্শন করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করলে সে প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে তাই জড়িত থাকে উপহাস ও আত্মম্ভরিতা। বলে, আমরাই আল্লাহ্র অধিক প্রিয়। নাহলে তিনি আমাদেরকে এতো ধনসম্পদ দান করতেন না।

পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'তারা আরো বলতো, আমরা ধনে জনে সমৃদ্ধিশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হবে না'। একথার অর্থ— ওই সকল বিত্তশালীরা একথাও বলতো যে, আমরা সম্পদে-স্বজনে সমৃদ্ধ। আল্লাহ্ই এই সমৃদ্ধি আমাদেরকে দিয়েছেন। তাই আমরা মনে করি, ইহকালে আমরা যেমন সম্মানিত, তেমনি সম্মানিত হবো পরকালেও।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'বলো, আমার প্রতিপালক যার প্রতি ইচ্ছা তার রিজিক বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জনতাকে জানিয়ে দিন, এই পৃথিবী হচ্ছে পরীক্ষাগার। আল্লাহ্ এখানে মানুষকে পরীক্ষা করেন সম্পদ, সুস্থতা, স্বজন ও সম্মান দিয়ে। আবার কাউকে পরীক্ষা করেন এর বিপরীতভাবে। সুতরাং পার্থিব নিশ্চিন্তি ইতর-ভদ্রের মাপকাঠি হতে পারে না। আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা এবং যাকে যতোটুকু ইচ্ছা অঢেল জীবনোপকরণ দান করেন অথবা তাদের জীবনোপকরণকে করেন সংকুচিত। বিত্তপতি হওয়া না হওয়ার বিষয়টি মানুষের অধিকারায়ত্ত নয়।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۫ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ

www.eelm.weebly.com

بِمَا عَمِلُوْا وَ هُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ
اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٨﴾ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ يَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ
شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٤٠﴾
قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ
اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ
كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا
هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَ
قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا
جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٣﴾ وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ
يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ﴿٤٤﴾ ؕ وَكَذَّبَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا
رُسُلِيْ ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٥﴾ ع

r তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নহে যাহা তোমাদিগকে আমার নিকটবর্তী করিয়া দিবে; তবে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহারাই তাহাদের কর্মের জন্য পাইবে বহুগুণ পুরস্কার; আর তাহারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকিবে।

www.eelm.weebly.com

r যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিবে তাহারা শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

r বল, 'আমার প্রতিপালক তো তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা রিয্‌ক বর্ধিত করেন এবং যাহার প্রতি ইচ্ছা সীমিত করেন। তোমরা যাহা কিছু ব্যয় করিবে তিনি তাহার প্রতিদান দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্‌কদাতা'।

r স্মরণ কর, যেদিন তিনি ইহাদের সকলকে একত্র করিবেন এবং ফিরিশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'ইহারা কি তোমাদেরই পূজা করিত?'

r ফিরিশ্‌তারা বলিবে, 'তুমি পবিত্র, মহান! তুমিই আমাদের অভিভাবক, উহারা নহে; বরং উহারা তো পূজা করিত জিন্নদের এবং উহাদের অধিকাংশই ছিল উহাদের প্রতি বিশ্বাসী।

r 'আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করিবার ক্ষমতা নাই।' যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে বলিব, 'তোমরা যে অগ্নি-শাস্তি অস্বীকার করিতে তাহা আস্বাদন কর।'

r ইহাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন ইহারা বলে, 'তোমাদের পূর্বপুরুষ যাহার ইবাদত করিত এই ব্যক্তিই তো তাহার ইবাদতে তোমাদিগকে বাধা দিতে চাহে।' ইহারা আরও বলে, 'ইহা তো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নহে' এবং কাফিরদের নিকট যখন সত্য আসে তখন উহারা বলে, 'ইহা তো এক সুস্পষ্ট যাদু।'

r আমি ইহাদিগকে পূর্বে কোন কিতাব দেই নাই যাহা ইহারা অধ্যয়ন করিত এবং তোমার পূর্বে ইহাদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করি নাই।

r ইহাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। উহাদিগকে আমি যাহা দিয়াছিলাম, ইহারা তাহার এক দশমাংশও পায় নাই, তবুও উহারা আমার রাসূলদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। ফলে কত ভয়ংকর হইয়াছিল আমার শাস্তি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে, তবে যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে'। একথার অর্থ— সম্পদ ও স্বজনের বাহুল্য ও প্রাচুর্য আমার নৈকট্যভাজন হওয়ার সহায়ক নয়। আমার নৈকট্য লাভ করা যায় কেবল বিশ্বাস ও পুণ্যকর্মের মাধ্যমে। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'বিল্‌লাতী' কথাটির 'বা' অব্যয়টি একটি অতিরিক্ত সংযোজন। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমাদের সম্পদ ও স্বজন এমন কোনো বস্তু নয়, যা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র সমীপবর্তী করতে পারে।

'ইল্‌লা মান আমানা' (তবে যারা ইমান এনেছে) ব্যতিক্রমটি এখানে পার্থক্য নির্দেশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তবে একথা ঠিক যে, যারা বিশ্বাসী ও

www.eelm.weebly.com

পুণ্যবান তারা হতে পারবে আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। অথবা বলা যেতে পারে, ব্যতিক্রমটি এখানে মিলিতার্থক। আর 'তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে' বাক্যে কর্মপদীয় সর্বনাম এখানে 'তোমাদেরকে' থেকে ব্যতিক্রম করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কাউকে আল্লাহ্‌র সন্নিকটবর্তী করতে পারে না। তবে বিশ্বাসী ও পুণ্যবানদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এরকম পারে। কারণ তারা সম্পদ ব্যয় করে পুণ্যকর্মে এবং সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দেয় পুণ্যকর্মের। এমন হওয়াও সম্ভব যে, এখানে 'যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে' বাক্যটির পূর্বে একটি সম্বন্ধপদ উহ্য আছে। যদি তা-ই থাকে তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— কিন্তু পুণ্যবান বিশ্বাসীদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে প্রিয়ভাজন করবে আল্লাহ্‌র।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারাই তাদের কর্মের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার; আর তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।' একথার অর্থ— ওই সকল পুণ্যবান বিশ্বাসীর পুণ্যকে আল্লাহ্‌পাক বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন— দশগুণ থেকে সাতশত গুণ। অথবা আরো অনেক গুণ, যেমন আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা।

এখানে 'আলগুরাফ' অর্থ ঊর্ধ্বোত্তলিত। কথাটির দ্বারা এখানে বলা হয়েছে বেহেশতের সুউন্নত প্রাসাদসমূহকে। হাদিস শরীফে ওই প্রাসাদসমূহের বিভিন্ন বিবরণ এসেছে। আমি সেগুলোকে সন্নিবেশিত করেছি সুরা ফুরক্বানের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যায়।

পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করবে তারা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে'। একথার অর্থ— আমার নিদর্শনরাজি অজেয়। সুতরাং যারা এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তারা পরাস্ত হবেই। ভোগ করতে থাকবে অন্তহীন শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'বলো, আমার প্রতিপালক তো তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা রিজিক বর্ধিত করেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন।'

এখানে বলা হয়েছে একটি ব্যক্তির জীবনোপকরণ হ্রাস-বৃদ্ধির কথা। আর ৩৬ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জীবনোপকরণের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানোর কথা। এ সম্পর্কে 'বাহরে মাওয়াজ' প্রণেতা লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বিত্তপতিদের বৈত্তিকদর্পের প্রেক্ষিতে। আর আলোচ্য আয়াতে বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে কৃপণতার। উৎসাহ দেওয়া হয়েছে পুণ্যকর্মে অর্থ ব্যয়ের প্রতি। বলা হয়েছে— তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন, তাৎক্ষণিকভাবে পৃথিবীতে, অথবা একবারে পরবর্তী পৃথিবীতে।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াল্লহু খইরুর রযিক্বীন'। এর শাব্দিক অর্থ তিনিই রিজিকদাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা। কিন্তু মর্মার্থ— দাতা আল্লাহ্ই, অন্য কেউ নয়। সুতরাং বুঝতে হবে 'রিজিকদাতাগণ' কথাটি এখানে রূপকার্থক। প্রকৃতার্থকতার সঙ্গে এর কোনো সম্পৃক্তি নেই।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৪০, ৪১) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মহাবিচারের দিবসের ওই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যেদিন আমি ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলবো, পৃথিবীতে তো একদল লোক তোমাদের পূজা করতো। করতো না? ফেরেশতারা জবাব দিবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমি পবিত্রাতিপবিত্র। মহানতম। আমাদের একমাত্র অভিভাবক তো তুমিই। ওই সকল মূর্খ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক? তারা তো আসলে জ্বিনদেরকে ফেরেশতা জ্ঞানে পূজা করতো। তারা তো তাদেরকেই উপাস্য বলে জানতো।

এখানে 'জ্বামীআ'ন' (একত্র করবেন) কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্পাক যেমন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নেতাদেরকে একত্রিত করবেন, তেমনি একত্র করবেন তাদের সাধারণ জনতাকেও। তাদেরকেও, যারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র আত্মজা জ্ঞানে পূজা করতো। মনে করতো, ফেরেশতাগণ তাদের পক্ষে আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশ করবে। আল্লাহ্তায়ালা সেদিন ফেরেশতাদেরকে এরকম প্রশ্ন করবেন তাদের পূজারীদের নিরাশ করার লক্ষ্যে। লক্ষণীয়, মূর্তিপূজারীদের মূর্তি অথবা অগ্নিপূজারীদের অগ্নিকে আল্লাহ্পাক প্রশ্ন করবেন না। প্রশ্ন করবেন কেবল ফেরেশতামণ্ডলীকে। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, জবাব দিতে পারে কেবল ফেরেশতারা। কারণ তারা সপ্রাণ। আর প্রতিমা, প্রস্তর, অগ্নি এসকলকিছু তো অপ্রাণ, নিরেট জড় পদার্থ। সুতরাং ওগুলো সম্বোধিত হবার অযোগ্য।

'আলজ্বিন' অর্থ এখানে শয়তান। অর্থাৎ ওই সকল শয়তান যারা ফেরেশতা পূজার প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলো। বুঝিয়েছিলো, আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন বলেই তো এই বিশাল সৃষ্টির শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে ফেরেশতারা। সুতরাং তাদেরকে পূজা করে সন্তুষ্ট রাখা খুবই জরুরী। এরকম করলে তারা হবে তোমাদের সুপারিশকারী। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শয়তানেরাই ফেরেশতারূপে আবির্ভূত হতো ফেরেশতাপূজারীদের কাছে। আর তারা তাদেরকে ফেরেশতা মনে করেই পূজা করতো।

'আকছারুহুম' অর্থ তাদের অধিকাংশ। অর্থাৎ অধিকাংশ অংশীবাদী। 'বিহিম' অর্থ তাদের প্রতি বিশ্বাসী। অর্থাৎ শয়তানকে উপাস্য বলে বিশ্বাসী।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করবার ক্ষমতা নেই'। একথার অর্থ— সেদিন মানুষ, জ্বিন বা ফেরেশতা কেউই একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারবে না। করতে পারবে না কেউ কারো উপকার কিংবা অপকার। কারণ তখন সকল সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষভাবে হবে কেবল আল্লাহ্‌র।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা জুলুম করেছে তাদেরকে বলবো, তোমরা যে অগ্নিশাস্তি অস্বীকার করতে তা আস্বাদন করো'। 'জুলুম' অর্থ অপাত্রে স্থাপন। অযথার্থ ব্যবহার। অংশীবাদীরা তাদের উপাসনা নিবেদন করে অযথার্থ স্থানে। আল্লাহ্‌ ভেবে অর্চনা-বন্দনা করে অন্যের। একারণেই তাদেরকে এখানে বলা হয়েছে 'জালেম'।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, তোমাদের পূর্বপুরুষ যার ইবাদত করতো এই ব্যক্তিই তো তার ইবাদতে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়'। একথার অর্থ— মক্কাবাসীদের সম্মুখে আমার প্রিয়তম রসুল যখন আমার বাণী পাঠ করে শোনায় তখন তারা বলে, দ্যাখো, মোহাম্মদ ধর্মদ্রোহী। সে আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্মপালনে সৃষ্টি করতে চায় অন্তরায়। সুতরাং বুঝে নাও, সে যা কিছু আমাদেরকে পাঠ করে শোনাচ্ছে, তা আল্লাহ্‌র বাণী নয়। তা তার নিজস্ব রচনা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা আরো বলে, এটাতো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নয় এবং কাফেরদের নিকটে যখন সত্য আসে তখন তারা বলে, এতো এক সুস্পষ্ট যাদু।'

এখানে 'হক' (সত্য) অর্থ নবুয়ত, ইসলাম, অথবা কোরআন। এমতাবস্থায় এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— নবুয়তের আলো, ইসলামের আহ্বান, অথবা কোরআনের পথনির্দেশ যখন তাদের কাছে পৌঁছলো তখন তারা চিন্তা-ভাবনা না করেই বলে ফেললো, মোহাম্মদ যা পাঠ করে শোনায়, তা তার স্বরচিত শ্লোক, সুস্পষ্ট যাদু। উল্লেখ্য, কোরআনের অর্থগত দিক লক্ষ্য করে তারা বলতো, কোরআন মোহাম্মদের নিজস্ব রচনা, আর ভাষাশৈলীর দিকে লক্ষ্য করে বলতো, এটা তো এক সুস্পষ্ট যাদু।

এরপরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'আমি এদেরকে পূর্বে কোনো কিতাব দেইনি, যা এরা অধ্যয়ন করতো এবং তোমার পূর্বে এদের নিকট কোনো সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি'।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'মিন কুতুবিন' (কোনো কিতাব) কথাটির মর্মার্থ— এমন কোনো নভজ গ্রন্থ আমি তাদেরকে দেইনি, যাতে রয়েছে অংশীবাদিতার অনুমোদন। 'মিন নাজীর' (কোনো সতর্ককারী) এর মর্মার্থ— এমন কোনো নবীও প্রেরণ করিনি, যিনি তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন অংশীবাদিতার দিকে। তারা কেউই এরকম বলেননি যে, অংশীবাদিতা পরিত্যাগের অর্থ ধর্মদ্রোহিতা। তাহলে মক্কার অংশীবাদীরা এরকম কথা বলে কেনো? কেনো অসত্যারোপ করে আমার নবী এবং আমার কোরআনের প্রতি।

এরপরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'এদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিলো'। একথার অর্থ— মক্কাবাসী অংশীবাদীরা যেমন এখন সত্যের বিরোধিতা করছে, তেমনি বিরোধিতা করতো তাদের পূর্বসূরী আ'দ, ছামুদ ইত্যাদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে আমি যা দিয়েছিলাম, এরা তার এক দশমাংশও পায়নি, তবু তারা আমার রসুলগণকে মিথ্যা বলেছিলো। ফলে কতো ভয়ংকর হয়েছিলো আমার শাস্তি'। একথার অর্থ— পূর্ববর্তী অবাধ্যরা ছিলো জ্ঞানে গুণে ধনে জনে মক্কার অংশীবাদীদের চেয়ে অনেক বেশী প্রবল। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির এক দশমাংশও মক্কার পৌত্তলিকদের নেই। কিন্তু এতো কিছু নেয়ামত পাওয়া সত্ত্বেও পূর্বযুগের অবাধ্যরা কৃতজ্ঞচিত্ত হওয়ার বদলে হয়েছিলো অহংকারী। হেয় মনে করে প্রত্যাখ্যান করেছিলো প্রেরিত পুরুষগণের সদুপদেশ। তাদের প্রতি করেছিলো অসত্যারোপ। কিন্তু এর ফল হয়েছিলো অত্যন্ত ভয়ংকর। আমাকর্তৃক আপতিত সর্বগ্রাসী শাস্তির মাধ্যমে চিরতরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো তারা। সুতরাং মক্কাবাসীরা কি ভেবেছে? এভাবে ক্রমাগত সীমালংঘন করলে কি তারা পার পেয়ে যাবে?

আলোচ্য আয়াতে 'অসত্যারোপ' (কাজ্জাবা, কাজ্জাবু) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে দু'বার। প্রথমোক্তটি আধিক্যপ্রকাশক। পরেরটি তেমন নয়। অথবা বলা যেতে পারে, প্রথমটির কর্মপদ এখানে অনুল্লেখিত। এভাবে অর্থ হয়েছে— সাধারণ ও সামষ্টিক অসত্যারোপ। আর দ্বিতীয়টির কর্মপদ উল্লেখিত এবং এভাবে শব্দটি হয়েছে সীমিতার্থক। 'বাহরে মাওয়াজ' রচয়িতা লিখেছেন, এখানে 'তারা অসত্যারোপ করেছে' অর্থ অসত্যারোপ করেছে মক্কাবাসীরা।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ

www.eelm.weebly.com

بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿٤٦﴾ قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ
ط اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٤٧﴾ قُلْ اِنَّ
رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ج عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٤٨﴾ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ
وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ﴿٤٩﴾ قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ
اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِيْ ج وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِيْٓ اِلَيَّ رَبِّيْ ط
اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ﴿٥٠﴾

r বল, 'আমি তোমাদিগকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিতেছি ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দুই-দুইজন অথবা এক-একজন করিয়া দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ— তোমাদের সংগী আদৌ উন্মাদ নহে। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।'

r বল, 'আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহি না, তাহা তো তোমাদেরই; আমার পুরস্কার তো আছে আল্লাহ্‌র নিকট এবং তিনি সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।'

r বল, 'আমার প্রতিপালক সত্যের দ্বারা অসত্যকে আঘাত করেন; তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।'

r বল, 'সত্য আসিয়াছে এবং অসত্য না পারে নুতন কিছু সৃজন করিতে, আর না পারে পুনরাবৃত্তি করিতে।'

r বল, 'আমি বিভ্রান্ত হইলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তাহা এইজন্য যে, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকট'।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি— তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দুই দুইজন অথবা এক একজন করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দ্যাখো— তোমাদের সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নয়'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদী জনগোষ্ঠীকে বলুন, হে আমার স্বজাতি! উত্তেজিত হয়ো না। শান্ত হও। আমার একটি শুভপরামর্শ শোনো। তোমরা একা একা অথবা যৌথভাবে আমার বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটনের জন্য সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করো। ভালো করে চিন্তাভাবনা করে

www.eelm.weebly.com

দ্যাখো, তাহলেই বুঝতে পারবে আমার মহান মনোবৃত্তি ও শুভ উদ্দেশ্য সম্পর্কে। ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা আমাকে বলছো উন্মাদ। কিন্তু আসলে কি আমি তাই? আমি যে তোমাদের মহাজীবনের মহাকল্যাণের পথপ্রদর্শক। আমি যে রসুল।

এখানে 'দাঁড়াও' অর্থ উদ্যোগ গ্রহণ করো, সত্যোদ্ধারের মানসে কোমর বেঁধে নেমে পড়ো। এরকম বক্তব্যভঙ্গি প্রকাশ করা হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন— 'তোমরা নিষ্ঠার সঙ্গে দাঁড়িয়ে যাও পিতৃহীনদের সঙ্গে'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করো।

'মাছনা ওয়া ফুরাদা' অর্থ চিন্তা করে দ্যাখো, উত্তেজিত হয়ো না। পরামর্শ বিনিময় করো জোড়ায় জোড়ায়, অথবা একা একা। এভাবে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই তোমাদের সামনে প্রতিভাত হবে সত্যের স্বরূপ। তখন একথা পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে, তোমাদের স্বজন মোহাম্মদ উন্মাদ কিছুতেই নয়। তিনি তো আল্লাহ্র বার্তাবাহক। তাঁর উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড মহান। না হলে এক বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রথাসর্বস্ব ও অবরুদ্ধ চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে তিনি একা প্রতিবাদ করে যেতে পারেন কীভাবে?

এরপর বলা হয়েছে— 'সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র'। এ কথার অর্থ— তিনি তো তোমাদের সুহৃদ সতর্ককারী। তোমাদেরকে তিনি বারংবার মহাসত্যের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে বলছেন। বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন মহাবিশ্বের মহাসৃজয়িতা ও মহাপালয়িতা আনুরূপ্যবিহীন এক আল্লাহ্র প্রতি। এইমর্মে সাবধানও করে দিচ্ছেন যে, মহাসত্যের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ না করলে শাস্তি অনিবার্য। আর সেই শাস্তি বেশী দূরেও নয়। আসন্ন। বরং অত্যাসন্ন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আর আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করো' এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, ওহে বনী ফিহির! ওহে বনী আদী! তাঁর এমতো উচ্চকিত আহ্বান শুনে কুরায়েশ জনতা সমবেত হলো সাফা পাহাড়ের পাদদেশে। রসুল স. বললেন, এখন আমি যদি বলি, এই পাহাড়ের বিপরীত প্রান্ত থেকে একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী আক্রমণোদ্যত, তবে তোমরা আমার একথা কি বিশ্বাস করবে? জনতা জবাব দিলো, অবশ্যই। কারণ তোমাকে আমরা কখনো অসত্য উচ্চারণ করতে দেখিনি। রসুল স. বললেন, তবে শোনো, আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত এক সুহৃদ সতর্ককারী। একথা শোনার

www.eelm.weebly.com

সঙ্গে সঙ্গে রাগে গর গর করতে লাগলো আবু লাহাব। বললো, তোমার মরণ হোক। এজন্যেই তাহলে তুমি আমাদেরকে ডেকেছিলে? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় 'তাবব্াত ইয়াদা আবী লাহাবিঁউ.......'।

পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'বলো, আমি তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাইনা, তা তো তোমাদেরই'। কোনো কোনো আলেম উদ্ধৃত আয়াতাংশটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, হে আমার স্বজন-পরিজন! মহাসত্য প্রচারের মানসে আমি যে শ্রম দিয়ে চলেছি, তার জন্য আমি তো তোমাদের কাছে পার্থিব বিনিময় প্রত্যাশী নই। এখন তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা হয়, সে তার প্রভুপালনকর্তার পথ ধরুক। তবে তোমরা পথপ্রাপ্ত হও, এটাই আমার একান্ত কামনা।

আমি বলি, সকল দ্বীনদার আলেম এবং আরেফ রসুল স. এর স্বজন পরিজন, তাঁরা রসুল স. এর বংশগত আত্মীয় হোন, অথবা না হোন। আর তাঁদের ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের উপলক্ষ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমার পুরস্কার তো আছে আল্লাহ্‌র নিকট এবং তিনি সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা'। একথার অর্থ— আমি একনিষ্ঠভাবে যে সত্যপ্রচার করে চলেছি, তার বিনিময় আল্লাহ্‌ই আমাকে দিবেন, পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী উভয় স্থানে। অথবা কেবল পরবর্তী পৃথিবীতে। আর আল্লাহ্ তো তোমাদের ও আমার আচরণ অবশ্যই প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি যে সর্বদ্রষ্টা। সুতরাং তোমরা অংশীবাদিতা পরিহার করো। পরিগ্রহণ করো মহাসত্যকে। এভাবে পরিপূরণ করো আল্লাহ্‌র অধিকার। আল্লাহ্‌ও তোমাদের অধিকার পরিপূরণ করবেন। নতুবা তোমাদের জন্য শাস্তি অবধারিত।

একবার রসুল স. হজরত মুয়াজকে বললেন, হে মুয়াজ! তুমি কি জানো, বান্দার উপরে আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র উপরে বান্দার অধিকার কী? তিনি বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই এ সম্পর্কে অধিক অবগত। তিনি স. বললেন, বান্দার উপরে আল্লাহ্‌র অধিকার হচ্ছে— তারা কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে। তাঁর সঙ্গে কাউকে বা কোনোকিছুকে অংশীদার করবে না। আর আল্লাহ্‌র উপরে বান্দার অধিকার হচ্ছে— যারা শিরিক করবে না, তাদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন না।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'বলো, আমার প্রতিপালক সত্যের দ্বারা অসত্যকে আঘাত করেন'।

এখানে 'ইয়াক্বজিফু' অর্থ ছুঁড়ে মারেন, আঘাত হানেন। অর্থাৎ পথভ্রষ্টতাকে অপসারণের নিমিত্তে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে মনোনীত করেন তাঁর বার্তাবাহক। তাঁদেরকে সাহায্য করেন প্রত্যাদেশ দ্বারা।

www.eelm.weebly.com

অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— সত্যের দ্বারা আঘাত করেন অসত্যকে। এভাবে অসত্যকে বিদূরিত করে তদস্থলে প্রতিষ্ঠা করেন সত্যের। কিংবা বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহই মহাসত্যের বাণী ছড়িয়ে দেন পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। এভাবে দূর করে দেন অসত্যের অন্ধকার।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মিকদাদ বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, এ পৃথিবীর এমন কোনো গৃহ অথবা তাঁবু থাকবে না, যেখানে আল্লাহ্ পৌঁছাবেন না ইসলামের বাণী, সম্মানিত জনদেরকে সম্মানের সঙ্গে, অথবা লাঞ্ছিতদেরকে লাঞ্ছনার সঙ্গে। অর্থাৎ সসম্মানে যারা ইসলাম কবুল করবে না, তাদেরকে ইসলাম কবুল করতে হবে লাঞ্ছনার সঙ্গে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা'। একথার অর্থ প্রকাশ্য গোপন সকল বিষয়ে সম্যক অবগত বলেই কেবল তিনিই জানেন, কে তাঁর প্রত্যাদেশের ভার বহনে অধিক যোগ্য এবং মহান ইসলামের শেষ পরিণতি গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়। কীভাবেই বা তিনি অবিশ্বাসের অমানিশা সরিয়ে পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফোটাবেন ইসলামের আলো।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'বলো, সত্য এসেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে, আর না পারে পুনরাবৃত্তি করতে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জনসমক্ষে ঘোষণা করুন, সত্য সমাগত। সুতরাং অসত্যের অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। সৃজন অথবা পুনরাবৃত্তায়ন অসত্যের ক্ষমতাভূত নয়। অপর এক আয়াতেও এরকম ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন— 'তিনি মহাসত্যকে নিক্ষেপ করেন অসত্যের উপর। পরাস্ত করেন তাকে। আর অকস্মাৎ সে অন্তর্হিত হয়'। কাতাদা বলেছেন, এখানে 'অসত্য' অর্থ ইবলিস। সে যেমন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, তেমনি মৃত্যুর পর কাউকে করতে পারে না পুনর্জীবিতও। কালাবীও এরকম বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'অসত্য' অর্থ পৌত্তলিকদের প্রতিমা।

বাগবী লিখেছেন, মক্কার অংশীবাদীরা রসুল স.কে প্রায়শ বলতো, তুমি পিতৃপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগকারী। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত (৫০)।

বলা হয়েছে— 'বলো, আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তা এই জন্য যে, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে আরো বলুন, ঠিক আছে, তোমাদের কথা অনুসারে আমার আনীত ধর্মমত যদি ভ্রষ্টই হয়ে থাকে, তবে সে ভ্রষ্টতার পরিণাম তো ভোগ করবো আমিই। কিন্তু তোমরা তো

www.eelm.weebly.com

দেখছো, আমি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন কোনো ব্যক্তি নই। নই অন্য কারো মতো পার্থিব সম্মান বা বিত্তবিলাসী। আর আমি এই ধর্মমতের প্রবক্তা মাত্র, স্রষ্টা বা নির্মাতা তো নই। কারো কাছ থেকে অক্ষরজ্ঞানও আমি গ্রহণ করিনি। আমি অক্ষরের অমুখাপেক্ষী (উম্মি)। আমি প্রত্যাদেশ আহরণ করি অক্ষরাতীত সূত্র থেকে সরাসরি। সুতরাং অক্ষরের মুখাপেক্ষীদের মতো আমি সাধারণ কোনো ব্যক্তি নই। আমি নবী। তাই তোমাদের উচিত আমার অনুগত হওয়া, যাতে করে আমার অনুসরণে তোমরাও পেয়ে যাও সুপথ।

এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াত রসুল স. এর রেসালতের একটি প্রকৃষ্ট দলিল। অন্য এক আয়াতে বিষয়টি পরিস্ফুট করা হয়েছে এভাবে— 'ইন্ দ্বলাল্তু ফাইন্নামা আদ্বিল্লু আ'লা নাফ্সী'। এর সারমর্ম হচ্ছে— যেমন কর্ম তেমন ফল। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি পথভ্রষ্ট হলে তার পরিণাম ভোগ করতে হবে আমাকেই। আর ভ্রষ্টতার আগমন ঘটে কুপ্রবৃত্তির কারণে। কুপ্রবৃত্তি স্বয়ং ভ্রষ্ট এবং অসৎকর্মের প্ররোচক। আর যদি আমি কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করি তবে আমি পেয়ে যাবো হেদায়েত। অন্য আর এক আয়াতে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে— 'যে কোনো কল্যাণ তোমার নিকট পৌঁছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং যে কোনো অকল্যাণ পৌঁছে তোমার নিজের পক্ষ থেকে'।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকট'। একথার অর্থ তিনি পথপ্রাপ্ত-পথভ্রষ্ট নির্বিশেষে সকলের সংলাপই শুনতে পান। কারণ তিনি সর্বশ্রোতা। আর আনুরূপ্যবিহীনভাবে তিনি তাঁর সৃষ্টির সন্নিকটেও।

সূরা সাবা ঃ আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾ وَ
قَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَقَدْ
كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَ
حِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ
إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿٥٤﴾

r তুমি যদি দেখিতে যখন ইহারা ভীতবিহবল হইয়া পড়িবে, তখন ইহারা অব্যাহতি পাইবে না এবং ইহারা নিকটস্থ স্থান হইতে ধৃত হইবে,

www.eelm.weebly.com

r এবং ইহারা বলিবে, 'আমরা তাহাতে ঈমান আনিলাম।' কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হইতে উহারা নাগাল পাইবে কিরূপে?

r উহারা তো পূর্বে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; উহারা দূরবর্তী স্থান হইতে অদৃশ্য বিষয়ে বাক্য ছুঁড়িয়া মারিত।

r ইহাদের ও ইহাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল করা হইয়াছে, যেমন পূর্বে করা হইয়াছিল ইহাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। উহারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি যদি দেখতে তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে'। এখানে 'ফাযিউ' অর্থ মরণকালে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ভীত হবে খুব। কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন— কবরে যখন তাদেরকে ওঠানো হয়, তখন তারা হয়ে পড়ে সাংঘাতিক সন্ত্রস্ত। 'লাও' (যদি) অব্যয়টি এখানে শর্তপ্রকাশক! এর পরিণতি এখানে অনুক্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি যদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যুকালীন অথবা কবর আযাবের সময়ের ভীত-বিহবল অবস্থা দেখতেন, তবে দেখতেন, কী বীভৎস সে দৃশ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'তখন তারা অব্যাহতি পাবে না এবং তারা নিকটস্থ স্থান থেকে ধৃত হবে'।

'ফালা ফাওতা' অর্থ আল্লাহ্‌র আক্রমণ থেকে রেহাই পাবে না। 'মিম্ মাকানিন ক্বরীব' অর্থ ভূপৃষ্ঠ থেকে তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে মৃত্তিকাভ্যন্তরে। অথবা বলা যেতে পারে, তাদেরকে হাশরের ময়দান থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে নরকের দিকে। জুহাক বলেছেন, কথাটির মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে বদর যুদ্ধের। অংশীবাদীরা তখন হয়ে পড়েছিলো আতংকগ্রস্ত এবং তাদের কাউকে কাউকে ধরা হয়েছিলো রণপ্রান্তরের আশপাশ থেকে। কিন্তু জুহাকের এমতো ব্যাখ্যা 'ফালা ফাওতা' (তখন তারা অব্যাহতি পাবে না) কথাটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা বদরযুদ্ধে বন্দী অংশীবাদীরা পরে অর্থদণ্ড প্রদানের মাধ্যমে অব্যাহতি পেয়ে গিয়েছিলো। তাছাড়া পরবর্তী আয়াতও (৫২) তাঁর ব্যাখ্যার অনুকূল নয়। যেমন— 'এবং তারা বলবে আমরা তার উপর ইমান আনলাম'। অর্থাৎ আমরা ইমান আনলাম মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর প্রতি। কিন্তু বদর যুদ্ধে নিহত ও বন্দী মুশরিকেরা এরকম কথা বলেনি। আবু জেহেল তো শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত অনড় ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানে। মারাত্মক আহত অবস্থায় যখন সে ভূতলশায়ী, তখন হজরত আবুদল্লাহ্ ইবনে মাসউদ তার দাড়ি ধরে বলেছিলেন, সেই আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যিনি লাঞ্ছিত করলেন তাঁর শত্রুকুলকে। আবু জেহেল মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিলো, আরে! আমি লাঞ্ছিত হলাম কখন। স্বগোত্রীয়রা যাকে হত্যা করে, সে কি লাঞ্ছিত?

www.eelm.weebly.com

প্রকৃত কথা হচ্ছে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা 'আমরা ইমান আনলাম' এরকম বলবে মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলে। অথবা তারা বিশ্বাসের ঘোষণা দিবে তাদের পুনরুত্থানের সময়, যখন প্রত্যক্ষ করবে মহাবিচার দিবসের মহাআতঙ্ক। সেখান থেকে তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে দোজখের দিকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু এতো দূরবর্তী স্থান থেকে তার নাগাল পাবে কীরূপে'?

এখানকার 'তানাউশ' শব্দটির ধাতুমূল 'নওশ'। এর অর্থ— হাতে নেওয়া, বাসনা, কামনা, চলা, দৃঢ়তার সঙ্গে গাত্রোত্থান করা। এরকম বলা হয়েছে 'কামুস' অভিধান গ্রন্থে। উল্লেখ্য, ইমান আনার স্থান এই পৃথিবী। পরবর্তী পৃথিবী তো ইমানের প্রতিফল প্রদানের স্থান। সুতরাং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের হাতছাড়া হয়ে যাবে ইমান গ্রহণের স্থান ও সময়। সুতরাং তারা আর শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে কীরূপে? এদিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে— এতো দূরবর্তী স্থান থেকে তারা নাগাল পাবে কীরূপে? অর্থাৎ এখন আখেরাতের এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দানের সময়ে এসে তারা কী করে আর ফিরে পাবে সুদূর অতীতের পৃথিবীর জীবন ও সময়? অতীত কি কখনো ফিরে আসে?

এরপরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'এরা তো পূর্বে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলো'। একথার অর্থ— এরাই তো তারা, যারা সময় থাকতে সাবধান হয়নি। অবিশ্বাস করেছে রসুল, কোরআন ও আখেরাতকে। আর আল্লাহ্‌কে তো অস্বীকার করেছেই। প্রকাশ্যে পূজা করেছে প্রতিমার। উল্লেখ্য, রসুল স.কে অবিশ্বাস করার কথা ৪৬ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— 'মাবি সাহিবিকুম মিন জিন্‌নাহ' (তোমাদের সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নয়)। কোরআন অস্বীকারের কথা বলা হয়েছে 'জ্বাআল হাক্বক্ব' কথাটির মাধ্যমে ৪৯ সংখ্যক আয়াতে এবং ৫১ সংখ্যক আয়াতের 'উখিজু' (ধৃত হবে) কথাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে শাস্তির ইঙ্গিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা দূরবর্তী স্থান থেকে অদৃশ্য বিষয়ে বাক্য ছুঁড়ে মারতো'। একথার অর্থ— তারা সত্য থেকে দূরে অবস্থান করতো বলে রসুল স. এবং আখেরাত সম্পর্কে মন্তব্য করতো অনুমানের ভিত্তিতে, চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকেই। যেমন কোনো লোক অদেখা বস্তুর প্রতি অনুমানে তীর নিক্ষেপ করলো, আবার এরকমও ধারণা রাখলো যে, তার নিশানা অব্যর্থ। আলোচ্য বাক্যে এরকম লোকের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের।

মুজাহিদ বলেছেন, মক্কার মুশরিকেরা আন্দাজে অনুমানে বিভিন্ন প্রকার অপমন্তব্যের মাধ্যমে রসুল স.কে আক্রমণ করতো। কখনো তাঁকে বলতো যাদুকর। কখনো বলতো পাগল। আবার কখনো বলতো কবি। এটাই হচ্ছে

www.eelm.weebly.com

তাদের দূরবর্তী স্থান থেকে অদৃশ্য বিষয়ে বাক্যবান ছুঁড়ে মারা। কাতাদা বলেছেন, তারা নিক্ষেপ করতো কল্পনার তীর। বলতো, পরকাল বলে কিছু নেই। বেহেশত-দোজখেরও কোনো অস্তিত্ব নেই।

শেষোক্ত আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'এদের এবং তাদের কামনার মধ্যে অন্তরাল করা হয়েছে, যেমন পূর্বে করা হয়েছিলো এদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। তারা ছিলো বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে'।

এখানে 'মা ইয়াশতাহুন' অর্থ তারা যা কামনা করে। অর্থাৎ মহাবিচারের দিবসে তারা কামনা করবে ইমান গ্রহণের সুফল, নরক থেকে পরিত্রাণ ও পৃথিবীতে পুনঃপ্রত্যাবর্তন। এমনও হতে পারে যে, পানাহারের সামগ্রীও তারা সেখানে কামনা করবে। কারণ পার্থিব জীবনে এগুলোই ছিলো তাদের কাম্য। সুতরাং মহাবিচার দিবসেও তারা খাদ্যপানীয়ের প্রতি অনুভব করবে স্বভাবজ আকর্ষণ।

এখানকার 'আশইয়া' শব্দটি 'শীয়া' এর বহুবচন। এর অর্থ দল। অর্থাৎ তাদের মতো যে দলগুলো অতীতায়িত হয়েছে, তারাও ছিলো এদের মতোই সমান সন্দেহপ্রবণ ও বিভ্রান্ত। 'ফী শাক্কিন' অর্থ সন্দেহের মধ্যে। অর্থাৎ মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ইত্যাদি সম্পর্কে তারা ছিলো এদের মতোই সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান। আর 'মুরীব' অর্থ বিভ্রান্তিকর, সংশয় উদ্রেককক। শব্দটি 'শাক্কিন' (সন্দেহ) শব্দের বিশেষণ এবং আধিক্যপ্রকাশক।

আলহামদু লিল্লাহ্। সুরা 'সাবা'র তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ ২০ শে মহররম ১২০৭ হিজরী সনে।

সূরা ফাতির

সুরা ফাতির সুরা মালায়িকা নামেও পরিচিত। ৬ রুকু এবং ৪৫ আয়াত বিশিষ্ট এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ جَاعِلِ الۡمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِیۡۤ اَجۡنِحَةٍ مَّثۡنٰی وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ؕ یَزِیۡدُ فِی الۡخَلۡقِ مَا یَشَآءُ ؕ

www.eelm.weebly.com

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝١ مَا یَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ
فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا یُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ
الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝٢ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ ؕ
هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللّٰهِ یَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ ۖ فَاَنّٰی تُؤْفَكُوْنَ ۝٣ وَاِنْ یُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ
مِّنْ قَبْلِكَ ؕ وَاِلَی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝٤ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ
اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَیٰوةُ الدُّنْیَا ٚ وَلَا یَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ
الْغَرُوْرُ ۝٥ اِنَّ الشَّیْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا
یَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِیَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِیْرِ ۝٦ ؕ اَلَّذِیْنَ
كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ۬ؕ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِیْرٌ ۝٧ ع

r সকল প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রই— যিনি বাণীবাহক করেন ফিরিশ্‌তাদিগকে যাহারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পক্ষবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিতে যাহা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

r আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করিলে কেহ উহা নিবারণকারী নাই এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করিতে চাহিলে তৎপর কেহ উহার উন্মুক্তকারী নাই। তিনি পরাক্রমশালী। প্রজ্ঞাময়।

r হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদিগকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে রিয্‌ক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হইতেছ।

www.eelm.weebly.com

r ইহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তোমার পূর্বেও রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হইয়াছিল। আল্লাহ্‌র নিকটই সকল বিষয় প্রত্যানীত হইবে।

r হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদিগকে প্রবঞ্চিত না করে।

r শয়তান তো তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাহাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে তো তাহার দলবলকে আহ্বান করে কেবল এই জন্য যে, উহারা যেন জাহান্নামী হয়।

r যাহারা কুফরী করে তাহাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং যাহারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আলহামদু লিল্লাহি ফাত্বিরিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি'। এর অর্থ সকল প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র।

এখানকার 'ফাত্বির' শব্দটি উৎসারিত হয়েছে 'ফিত্বরত' থেকে, এর অর্থ ফেঁড়ে ফেলা, ছিঁড়ে ফেলা। মর্মার্থ—অনস্তিত্ব বিলোপ করে তদস্থলে অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। 'ফাত্বির' কর্তৃপদীয় শব্দ এবং এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালার্থে। অর্থাৎ আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন আকাশসমূহ ও পৃথিবী। সেকারণে 'ফাত্বির' আল্লাহ্‌র গুণবাচক একটি নাম।

এরপর বলা হয়েছে— 'যিনি বাণীবাহক করেন ফেরেশতাদেরকে দুই দুই তিন তিন অথবা চার চার পক্ষবিশিষ্ট'।

এখানে 'রুসুলান' অর্থ বাণীবাহক, যারা আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দেন প্রেরিত পুরুষগণকে এবং পুণ্যবানগণকে, যথাক্রমে প্রত্যাদেশ ও অনুপ্রেরণা প্রক্ষেপণের মাধ্যমে। অথবা বলা যেতে পারে, এই বাণীবাহক ফেরেশতারাই আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যের যোগসূত্র। তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র মহিমা ও অনুগ্রহ পৌঁছানো হয় সৃষ্টিকুলকে।

'জ্বায়ি'ল' এখানে যদিও কর্তৃপদের শব্দরূপ, তথাপিও তা বর্তমান ও ভবিষ্যতকালের অর্থ প্রকাশক। শাব্দিক সম্বন্ধযুক্ত, প্রকৃত নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় শব্দটি আল্লাহ্‌র নামের বিশেষণ হবে না। হবে বিশেষণের স্থলাভিষিক্ত।

'আজ্বনিহাতিন্' (পক্ষসমূহ) এর বিশেষণ হচ্ছে 'মাছনা' (দুই দুই), 'ছুলাছা' (তিন তিন) এবং 'রুবাআ' (চার চার)। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, কোনো কোনো ফেরেশতার রয়েছে দুটি ডানা। কোনো কোনো ফেরেশতার তিনটি। আবার কারো কারো ডানা রয়েছে চারটি। তবে এ সংখ্যা সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রমাণ রয়েছে পরবর্তী বাক্যেই।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

মুসলিম তাঁর বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থে 'লাক্বদ রআ মিন আয়াতি রব্বিহীল কুবরা' আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের একটি বিবরণ, সেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. হজরত জিবরাইলকে দেখেছিলেন তাঁর আসল আকৃতিতে। দেখেছিলেন, তিনি ছয় শত পক্ষবিশিষ্ট। ইবনে হাব্বানের বিবরণে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি সিদরাতুল মুনতাহার পাশে জিবরাইলকে দেখেছিলাম তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে। দেখেছিলাম তার সাতশত পাখা। আর ওই পাখাগুলো থেকে ঝরে পড়ে মোতি, পান্না।

'আলখালক্ব' অর্থ সৃষ্টি। অর্থাৎ ফেরেশতাসহ আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টি। 'ইয়াযীদু ফীলখালক্ব' অর্থ তিনি সৃষ্টিকে বৃদ্ধি ঘটান। অর্থাৎ সৃষ্টিতে বৈচিত্র প্রবর্তিত হয় তাঁর অভিপ্রায়ানুসারেই। 'ইয়াযীদ' শব্দটি সকল প্রকার অতিরিক্ত প্রকাশক, তা আকৃতিগত হোক, অথবা হোক প্রকৃতিগত। মনোমুগ্ধকররূপ, সুমিষ্ট কণ্ঠ, উন্নত চরিত্র, প্রখর বুদ্ধি সব অতিরিক্ততাই শব্দটির অঙ্গীভূত।

জুহুরী মনে করেন, এখানে 'বৃদ্ধি করেন' বলে বুঝানো হয়েছে রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধির কথা। কাতাদা বলেছেন, লোলুপ দৃষ্টি। কারো কারো মতে জ্ঞান, পৃথকীরকণ যোগ্যতা, প্রখর বিবেক 'বৃদ্ধি করেন' কথাটির অন্তর্ভূত। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, এর কোনো নির্ধারিত কোনো সীমারেখা নেই।

'আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান' অর্থ তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিধর বলেই তাঁর বৃদ্ধি করার ইচ্ছা অবশ্য কার্যকর হয়।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণকারী নেই এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে তৎপর কেউ তার উন্মুক্তকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যা চান, তা-ই হয়। তিনি যদি কারো প্রতি অনুগ্রহের দুয়ার নিরর্গল করে দেন, তখন তা যেমন কেউ রুদ্ধ করতে পারে না, তেমনি যদি কারো প্রতি নিরুদ্ধ করেন দানের দরোজা, তবে তা উন্মোচন করবার ক্ষমতাও কেউ রাখে না।

এখানে 'ইয়াফতাহি' অর্থ উন্মুক্ত করা, খোলা। মর্মার্থ— দান করা। ওই দান পার্থিবও হতে পারে। যেমন— বৃষ্টি, উপজীবিকা, নিরাপত্তা, সুস্থতা, জ্ঞান, সম্মান, রাজত্ব, নেতৃত্ব, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি। আবার তা হতে পারে পারত্রিকও। যেমন— ইমান, ধর্মবোধ, নবুয়ত, পুণ্য কর্মের অনুপ্রেরণা, সামর্থ্য ইত্যাদি।

www.eelm.weebly.com

এখানে ‘নিবারণকারী নেই’ অর্থ আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রাহয়িত করতে চান, তাকে প্রতিহত করার শক্তি কারো নেই। কারণ তাঁর অভিপ্রায় অপ্রতিরোধ্য। আর ‘কেউ তার উন্মুক্তকারী নেই’ অর্থ আল্লাহ্র অনুগ্রহ ভাণ্ডারের দুয়ার একবার কারো জন্য রুদ্ধ করা হলে, সে দুয়ার উন্মুক্ত করবার সাধ্যও কারো নেই। এখানে ‘লাহা’ (তার) সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত হবে অনুগ্রহের সঙ্গে। আর ‘লাহু (তার) সর্বনামটি প্রযুক্ত হবে ‘মা ইয়ুমসিকু’ (কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে) এর সঙ্গে।

‘মা ইয়ুমসিকু’ কথাটির ‘মা’ (যা কিছু) অব্যয়টি এখানে সাধারণার্থক। ‘অনুগ্রহ’ যেমন এর আওতাভূত, তেমনি আওতাভূত গজবও। তবে এখানকার বক্তব্য বিন্যাস দৃষ্টে সহজেই অনুমিত হয় যে, আল্লাহ্র গজব অপেক্ষা রহমতই প্রবল।

‘তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’ অর্থ তিনি চিরস্বাধীন পরাক্রমশালী। সুতরাং তার প্রতিপক্ষ হওয়া অসম্ভব। আর তিনি যেহেতু প্রজ্ঞাময়ও, তাই তাঁর প্রতিটি পরিকল্পনা ও পরিপ্রবর্তনা হয় প্রজ্ঞাময়।

বোখারী ও মুসলিম তাঁদের আপনাপন বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত মুগীরা ইবনে শো’বা বলেছেন, রসুল স. তাঁর প্রতি নামাজ শেষে পাঠ করতেন— ’লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ’লা কুললি শাইইন ক্বদীর। লা মানিআ’ লিমা আ’ত্বইতা ওয়ালা মুয়তী লিমা মানা’তা ওয়ালা ইয়ানফাউ জাল জ্বাদদি মিনকাল জ্বাদ্দু।’

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— ‘হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো। আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোনো স্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে রিজিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছো’? একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বরক্ষাকারী সকল উপকরণই আল্লাহ্র অনুগ্রহ। সুতরাং তোমরা আমার এমতো অনুগ্রহের যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। বলো, আকাশ-পৃথিবী থেকে আমি যেমন তোমাদেরকে জীবনোপকরণ প্রদান করি, তেমন করে জীবনোপকরণ কী আর কেউ দেয়? না দিতে পারে? সুতরাং এখনো কেনো তোমরা একথা মেনে নিচ্ছোনা কেনো? এখনো আঁকড়ে ধরে রয়েছো অংশীবাদিতার মতো ঘৃণ্য অপবিত্রতা? একবারের জন্যও কি ভেবে দেখেছো তোমাদের যাত্রা কোনদিকে?

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— ‘তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তবে তোমার পূর্বেও রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিলো’। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার প্রতি অসত্যারোপ করছে বলে আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না।

www.eelm.weebly.com

কারণ এটা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চিরায়ত আচরণ। আপনার পূর্বসূরীগণের প্রতিও তাদের আপনাপন সম্প্রদায়ের অবাধ্যরা মিথ্যা আরোপ করেছিলো। তারা তখন ধৈর্যধারণ করেছিলো। সুতরাং আপনিও ধৈর্যধারণ করুন।

এখানে 'রসুলুন'(রসুলগণ) শব্দটিতে তানভীনের ব্যবহার করা হয়েছে মহামর্যাদার প্রতীক হিসেবে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী রসুলগণও ছিলেন মহামর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র ও দীর্ঘজীবনের অধিকারী এবং দৃঢ়সংকল্পক।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র নিকটই সকল বিষয় প্রত্যানীত হবে'। একথার অর্থ— অবশেষে সকলকে তো আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত হতেই হবে। তখন তিনি সকলকে যথোপযুক্ত প্রতিফল দান করবেন। তখন আপনি ধৈর্যধারণের প্রতিদান হিসেবে হবেন মহাপুরস্কারের অধিকারী। আর আপনার বিরুদ্ধবাদীরা পাবে মহাশাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেনো তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেনো কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে'। একথার অর্থ— হে মনুষ্য সম্প্রদায়! তওবা করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে মার্জনা করবেন, আল্লাহ্র এই প্রতিশ্রুতিটি অবশ্যই সত্য। তাই বলে পৃথিবীর প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে তোমরা আবার আমার কথা ভুলে বোসো না যেনো। আর শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকেও অবলম্বন কোরো সাবধানতা। সে আমার মার্জনার প্রতি তোমাদেরকে অতি আস্থাশীল করে তুলবে। এই মর্মে কুমন্ত্রণা দিবে যে, পাপ করলে ক্ষতির কিছু নেই। এক সময় তওবা করে নিলেই চলবে। আর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল। ব্যাপারটা তো বিষভক্ষণ করেও বিষের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিশ্চিত থাকার মতো।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'শয়তান তো তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করো'। একথার অর্থ— শয়তানের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা শুরু থেকেই। সুতরাং তাকে তোমরা কখনোই সুহৃদ বলে গ্রহণ কোরো না। সব সময় তাকে শত্রু হিসেবেই জেনো। কর্ম সম্পাদান কোরো তার প্ররোচনার বিপরীতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে কেবল এই জন্য যে, তারা যেনো জাহান্নামী হয়'। একথার অর্থ— মানুষকে জাহান্নামী করাই শয়তানের উদ্দেশ্য। আর পাপাচারী না হওয়া পর্যন্ত তা সম্ভব নয়। তাই সে সকলকে আহ্বান করে পাপের দিকে।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'যারা কুফরী করে, তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং যারা ইমান আণে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার।' একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যান যারা করে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে দোজখের কঠিন শাস্তি এবং বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাউপহার।

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ৮, ৯

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٨﴾ وَاللّٰهُ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ﴿٩﴾

r কাহাকেও যদি তাহার মন্দ কর্ম শোভন করিয়া দেখান হয় এবং সে ইহাকে উত্তম মনে করে, সেই ব্যক্তি কি তাহার সমান যে সৎকর্ম করে?' আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব উহাদের জন্য আক্ষেপ করিয়া তোমার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়। উহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহা জানেন।

r আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করিয়া উহা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চারিত করেন। অতঃপর আমি উহা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর আমি উহা দ্বারা ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। এইরূপেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করিয়া উঠানো হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কাউকে যদি মন্দকর্ম শোভন করে দেখানো হয় এবং সে একে উত্তম মনে করে, সেই ব্যক্তি কি তার সমান, যে সৎকর্ম করে'।

এখানে 'ফারাআহু হাসানান্' অর্থ তাকে দেখানো হয় শোভনরূপে। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক যাকে সহায়তাবিহীন অবস্থায় পরিত্যাগ করেন, তার বোধ-বুদ্ধি-বিবেক হয়ে যায় বিকৃত। তখন তার চোখে অসুন্দরকেই সুন্দর বলে মনে হয় এবং সুন্দরকে মনে হয় অসুন্দর। শয়তানই তাকে এরকম বিকৃত রুচিসম্পন্ন করে তোলে। এধরনের লোক কি ওই সকল মানুষের সমমর্যাদাসম্পন্ন কখনো হতে পারে, যারা শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত, প্রকৃতই সৎকর্মশীল?

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন'। এখানে 'ফাইন্নাললহা' কথাটির 'ফা' হয়েছে যোজক অব্যয়। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে কিছু কথা রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ত কথাসহ বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনি কখনো এমতো ধারণা করবেন না যে, আপনি ইচ্ছা করলে কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারবেন। তাহলে তো আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের আর মূল্যই রইলো না। আর সমান হয়ে গেলো আল্লাহর সাহায্যপুষ্ট এবং সাহায্যবিহীন দু'জনেই। এরকম হওয়া কি শোভন, না সম্ভব? সুতরাং মনে রাখুন, হেদায়েত ও গোমরাহী সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায়নির্ভর।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব, তাদের জন্য আক্ষেপ করে আপনার প্রাণ যেনো ধ্বংস না হয়। তারা যা করে আল্লাহ্ তা জানেন'।

এখানে 'হাসরাত' অর্থ আক্ষেপ। এর একবচন 'হসরত'। শব্দটি এখনে কর্মপদরূপে বিবেচ্য। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ইমান গ্রহণ করছে না বলে আপনি ব্যথিত হবেন না। প্রশ্রয় দিবেন না আত্মহননপ্রবণ আক্ষেপণকে। উল্লেখ্য, রসুল স. মনে প্রাণে চাইতেন মক্কাবাসীরা সকলেই ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হয়ে লাভ করুক ক্ষমার সাফল্য। কিন্তু তারা বার বার তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতো। ফলে প্রচ্ছন্ন আক্ষেপানলে নিরন্তর দগ্ধীভূত হতেন তিনি। সে কারণেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে শব্দটির বহুবচনার্থক রূপ। অথবা বলা যেতে পারে, প্রকৃতই তাদের অপকর্ম ছিলো অসংখ্য। সেকারণে তাঁর আক্ষেপও ছিলো অপরিমেয়। আর সে জন্যই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনার্থক 'হাসরাত'।

বাগবী লিখেছেন, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে আবু জেহেল ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে উপলক্ষ করে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে জুহাকের মাধ্যমে জুয়াইবীর বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. আল্লাহ সকাশে নিবেদন জানালেন, হে আমার আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আবু জেহেলের মাধ্যমে তুমি তোমার ধর্মকে শক্তিশালী করো। আল্লাহ গ্রহণ করলেন হজরত ওমরকে। আর ওই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে বেদাতী ও প্রবৃত্তিপূজকদেরকে লক্ষ্য করে। কাতাদা বলেছেন খারেজীরাও এর অর্ন্তভুক্ত, যারা মনে করে মুসলমানদের হত্যা করা এবং তাদের সম্পদ লুট করা তাদের জন্য বৈধ। অন্য মহাপাপীরা এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল নয়। কারণ তারা পাপ করলেও পাপকে পাপই জানে, খারেজীদের মতো পাপকে কখনো পুণ্য মনে করে না।

'তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন' কথাটির অর্থ এখানে— আল্লাহ্ তাদের সকল কর্মকাণ্ডের খবর রাখেন। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি নিশ্চিত থাকুন, যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি তারা পাবেই।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চারিত করেন। অতঃপর আমি তা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। অতঃপর আমি তার দ্বারা ধরিত্রীকে তাঁর মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। এইরূপেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে ওঠানো হবে'।

এখানে 'ফাতুছীরু সাহাবান' কথাটি পূর্বোক্ত প্রসঙ্গের পুনরালোচনা। যেনো জ্ঞানপূর্ণ বিষয় সরাসরি উপলব্ধি হয় মস্তিষ্কে। অর্থাৎ যে আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছামতো কাউকে বিভ্রান্ত এবং কাউকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সেই আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করেন। আর ওই বায়ু দ্বারা আকাশে সঞ্চারিত করেন মেঘমালা।

'ফা আহ্ইয়াইনা বিহী' তদ্দ্বারা আমি জীবিত করি। অর্থাৎ বৃষ্টির মাধ্যমে আমি সঞ্জিবীত করি বিশুষ্ক মৃত্তিকা। 'বিহী' অর্থ (তদ্দ্বারা) কথাটির 'তৎ' বা 'তা' সর্বনামটি এখানে পানির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কেননা বৃষ্টি বর্ষিত হয় মেঘ থেকে। অথবা সর্বনামটি এখানে মিলিত মেঘের সঙ্গে। কেননা মৃত্তিকার জীবন্ত হওয়ার নিমিত্ত পানি এবং পানির নিমিত্ত মেঘ। আর ভূমিকে সঞ্জীবিত করার অর্থ এখানে ভূমিকে শস্য শ্যামল করে দেওয়া। আর ভূমির মৃত্যু হচ্ছে তার উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা । উল্লেখ্য, এই উপমাটির মাধ্যমে এখানে বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে পুনরুত্থানের বিষয়টি। বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, মানুষের মৃত্যুপরবর্তী পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। আর ওই পুনরুত্থান বৃষ্টিস্পর্শে বিশুষ্ক ভূমির সঞ্জীবিত হওয়ার মতো।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে জীবন দানের প্রকৃত তত্ত্বের। হজরত ইবনে ওমর সূত্রে মুসলিম কতৃক বর্ণিত একটি হাদিসে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন— এরপর আল্লাহ অবতীর্ণ করবেন শিশিরপাতের মতো বারিপাত। ফলে পুনরুজ্জীবনপ্রাপ্ত হয়ে সমুত্থিত হবে দেহাবয়বগুলো।

আবু শায়েখ তাঁর 'আল উজমা' গ্রন্থে লিখেছেন, ওয়াহাব বলেছেন, অগ্নিসমূদ্রের সূচনা হবে আল্লাহর জ্ঞানসমুদ্রে। আর তার পরিণতি হবে তার অভিপ্রায়সাগরে। তন্মধ্যে থাকবে গোস্পদে রক্ষিত জমাট সলিল। আল্লাহ ওই জমাট সলিল থেকে চল্লিশ দিন যাবৎ বৃষ্টিবর্ষণ করবেন কম্পমান ভূমির উপর, যা থেকে মানুষ উত্থিত হবে উদ্ভিদের আত্মপ্রকাশের মতো। অতঃপর জান্নাত ও জাহান্নাম থেকে সকল রূহ্ এনে স্থাপন করা হবে সিঙ্গায়। এরপর ইসরাফিল আদেশ পাবেন ফুৎকারদানের। ধ্বনিত হবে সিঙ্গার মহাফুৎকার। তখন রূহ্গুলো সম্পর্ক স্থাপন করবে তাদের নিজ নিজ দেহের সঙ্গে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শিঙ্গার দুই ফুৎকারের মধ্যে ব্যবধান হবে চল্লিশ। জনতা জিজ্ঞেস করলো, হে আবু হোরায়রা, চল্লিশ আবার কী? দিন না মাস? তিনি বললেন, জানি

www.eelm.weebly.com

না। জনতা বললো, তাহলে কী চল্লিশ বৎসর? তিনি বললেন, তা-ও বলতে পারবো না। ওই সময় আল্লাহ আকাশ থেকে পানিবর্ষণ করবেন। ফলে উদ্ভিদ গজানোর মতো গজিয়ে উঠবে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত মানুষ। আর তাদের নতুন জীবন গঠিত হবে তাদের আপন আপন নিতম্বের একটি হাড়কে লক্ষ্য করে।

সুলায়মান সূত্রে ইবনে মোবারক বলেছেন, পুনরুত্থানের পূর্বে চল্লিশ দিবস যাবৎ বর্ষিত হবে জমাট পানি। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শিঙ্গার দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে আরশের মূল উপত্যকা থেকে উৎসারিত হবে জল প্রবাহ। আর দুই ফুৎকারের ব্যবধান হবে চল্লিশ বৎসর। ফলে নতুনভাবে জন্মলাভ করবে সবরকমের প্রাণী— মানুষ, পশু, পাখি। তাদের মধ্যে দিয়ে কেউ পথ অতিক্রম করলে সহজেই চিনতে পারবে তার পরিচিত জনকে। এরপর মুক্ত করে দেওয়া হবে আত্মাগুলোকে। সেগুলো তখন প্রবিষ্ট হবে আপন আপন শরীরে।

সূরা ফাতির আয়াত ১০

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ﴿۱۰﴾

r কেহ সম্মান ও ক্ষমতা চাহিলে সে জানিয়া রাখুক, সকল সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহ্‌রই। তাঁহারই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ সমুত্থিত হয় এবং সৎকর্ম উহাকে উন্নীত করে, আর যাহারা মন্দ কর্মের ফন্দি আঁটে তাহাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাহাদের ফন্দি ব্যর্থ হইবেই।

প্রথমে বলা হয়েছে — 'কেউ সম্মান ও ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক সকল সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহরই'।

এখানে 'সম্মান ও ক্ষমতা' অর্থ ইহত্রিক ও পারত্রিক সম্মান ও ক্ষমতা। আলোচ্য ব্যাক্যের ব্যাখ্যাব্যপদেশে ফাররা বলেছেন, কেউ যদি জানতে চায় যাবতীয় সম্মান কার, তবে সে যেনো জেনে নেয়, সকল সম্মান আল্লাহ্‌র। সুতরাং আলোচ্য ব্যাক্যের প্রকাশ্য অর্থ এই দাঁড়ায়— কেউ যদি সম্মানাকাঙ্খী হয়, তবে সে যেনো তা যাচনা করে সাকুল্য সম্মানাধিকারী আল্লাহ্‌ সকাশে। আর সম্মানপ্রাপ্তির যোগ্যতা হচ্ছে আনুগত্য। কারণ তিনি দাতা আর অন্যরা গ্রহিতা। অংশীবাদীরা একথা জানে না বলেই তারা সুখ্যাতি ও সুনামের জন্য প্রার্থী হয় তাদের মিথ্যা

www.eelm.weebly.com

দেব-দেবীদের কাছে। কিন্তু আল্লাহ্পাক এমতো অপপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছেন। যেমন— 'তারা যশ ও মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আল্লাহ্কে ছেড়ে দিয়ে উপাসনা করে অন্যের। না, না, কখনোই এরকম নয়'। কপটবিশ্বাসীরা আবার সম্মানিত হতে চায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দৃষ্টিতে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন— 'তারা কি তাদের নিকট সুখ্যাতি আশা করে? অবশ্যই যাবতীয় সম্মান আল্লাহ্র'।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ সমুত্থিত হয়'। এখানে পবিত্র বাক্য অর্থ— 'সুবহানাল্লহ', 'আলহামদুলিল্লাহ', 'ওয়াল্লহু আকবার', 'ওয়া লা ইলাহা ইল্লাহুয়া', 'তাবারাকাল্লহ্' ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সৎকর্ম তাকে উন্নীত করে'। এখানে উন্নীত হওয়া অর্থ গৃহীত হওয়া। এরকম বলেছেন কাতাদা। অথবা উন্নীত হয় বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ওই সকল ফেরেশতাকে, যারা বর্ণিত পবিত্র বাক্যাবলী লিখে নিয়ে উঠে যায় আরশবাহী ফেরেশতাদের কাছে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'সুবহানাল্লাহ্', 'আলহামদুলিল্লাহ্', ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লহু', 'ওয়াল্লহু আকবার', 'তাবারাকল্লহ্'— এই পাঁচটি বাক্য পাঠ করলে একজন ফেরেশতা সঙ্গে সঙ্গে তা হাতের তালুতে নিয়ে তার ডানার নিচে লুকিয়ে ফেলে। তারপর শুরু করে উর্ধ্বারোহণ। পথে যে ফেরেশতাদের সঙ্গে সাক্ষাত হয় তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করে ওই বাক্যগুলোর পাঠকের জন্য। শেষে ওই ফেরেশতা আল্লাহ্র সমীপে উপনীত হয়ে সমর্পণ করে ওই বাক্যগুলো। আল্লাহ্র বাণীতেও একথার সমর্থন রয়েছে। যেমন— 'ইলাইহি ইয়াসআ'দুল কালিমুত্ ত্বয়্যিবু' (পবিত্র বাক্যাবলী উন্নীত হয় তার সমীপে)। এরকম বর্ণনা করেছেন হাকেম, বাগবী প্রমুখ। হাদিসটি আবার সুপরিণতসূত্রে ছা'লাবী ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

'আয়্মালুস্ সালিহ্' অর্থ সৎকর্ম। 'ইয়ারফাউহু' অর্থ উহাকে উন্নীত করে। কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, এখানে কর্তৃবাচক প্রথম 'হু'(উহা) সর্বনামটি সম্পর্কিত হবে 'পবিত্র বাণীসমূহ' এর সঙ্গে। আর দ্বিতীয় 'হু'(উহা) সম্পৃক্ত হবে সৎকর্মের সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— পবিত্র বাক্যাবলী (আল্লাহ্র এককত্ব ও পবিত্রতা প্রকাশক বাক্য) গ্রহণযোগ্যতা আনয়ন করে সৎকর্মের। যতক্ষণ পর্যন্ত সৎকর্মের ভিত্তি আল্লাহ্র এককত্বের বিশ্বাসের উপরে হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, এখানকার কর্তৃবাচক সর্বনাম 'হু' সম্পর্কযুক্ত হবে আল্লাহ্র সঙ্গে এবং এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যে কর্ম কেবল আল্লাহ্র

www.eelm.weebly.com

উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় তাকেই বলে ‘আমলে সালেহ্’ বা সৎকর্ম। আর প্রচারপ্রবণহীন অথবা জনরঞ্জনবিমুক্ত ওই সৎকর্মই ঊর্ধ্বদেশে উন্নীত হয়। সুতরাং বুঝতে হবে উদ্দেশ্যের সাধুতাই পবিত্র বাক্য ও সৎকর্ম গৃহীত হওয়ার কারণ।

সাধারণ তাফসীরবেত্তাগণের মতে সৎকর্মই পবিত্র বাক্যাবলীকে গ্রহণের উপযোগী করে দেয়। আর ‘আলকালিমু’ (বাক্য) এখানে বহুবচন নয়, একবচন। তবে জাতিবাচক। এ জন্য ‘আত্ত্বয়্যিবাতু’র স্থলে উল্লেখিত হয়েছে ‘আত্ত্বয়্যিবু’। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে ‘পবিত্র বাণীসমূহ’ অর্থ কিছুসংখ্যক পবিত্র বাণী। অর্থাৎ ওই সকল বাণী যার ভিত্তি উদ্দেশ্যের (নিয়তের) সাধুতার উপর। হজরত ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, ইকরামা প্রমুখের অভিমত এরকমই।

হাসান ও কাতাদা বলেছেন, এখানে ‘পবিত্র বাণীসমূহ’ অর্থ আল্লাহ্র জিকির। আর ‘সৎকর্ম’ হচ্ছে ফরজ কর্মসমূহ। যে ব্যক্তি জিকির করে, কিন্তু ফরজ দায়িত্ব পালন করে না, তার জিকির প্রত্যাখ্যাত হয়। এভাবে কখনো ইমানের বিকাশ ঘটে না। ইমান তো হৃদয়জ বিষয়। আর সৎকর্ম তার পরিচায়ক। যার কথা পবিত্র, অথচ যে সৎকর্মশূন্য, আল্লাহ্পাক তার কথাগুলো ছুঁড়ে মারেন তার মুখের উপর। আর যার কথা ও কর্ম পুণ্যময়, আল্লাহ্পাক সেটাকে গ্রহণ করেন। আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যার্থ এটাই।

পবিত্র হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, কর্ম ব্যতীত কথা আল্লাহ্র দরবারে উন্নীত হয় না। কথা ও কর্মের সঙ্গে সংকল্পের সাধুতা অপরিহার্য। বিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া কেবল কথা ও কর্ম গ্রহণীয় নয়।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যার্থ এরকম নয় যে, কর্মবিহীন বিশ্বাস নিরর্থক। কেননা রসুল স. জানিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়— আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। তাঁর কোনো সমকক্ষ ও অংশীদার নেই, মোহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসুল, ঈসাও তাঁর বান্দা ও রসুল, তিনি আল্লাহ্র এক পুতঃপবিত্র সেবিকার সন্তান এবং তিনি আল্লাহ্র বাণী, যা আল্লাহ্ প্রক্ষিপ্ত করেছিলেন মরিয়মের প্রতি, তিনি ছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রক্ষিপ্ত রূহ এবং যে আরো সাক্ষ্য দেয় জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, তবে সে প্রবেশ করবে জান্নাতে, তার কার্যকলাপ যেরকমই হোক না কেনো। হাদিসটি বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে। সুতরাং আয়াতের অন্তরার্থ হবে— পবিত্র বাণীসমূহ সমুত্থিত হয়। গৃহীতও হয়। তার সঙ্গে যদি থাকে সৎকর্ম, তাহলে তা হয় সোনায় সোহাগা। এমতাবস্থায় উচ্চারিত পবিত্র বাণী গৃহীত হয় আরো অধিক বিনিময় সহকারে।

www.eelm.weebly.com

এখন আসা যাক, ওই হাদিসের মর্মবিশ্লেষণে, যেখানে বলা হয়েছে— 'সৎকর্ম ব্যতীত কেবল কথা নিরর্থক'। এমতোক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে কপটবিশ্বাসীদের কথা। তাদের মুখের কথা তাদের মনের বিপরীত। অনেক সময় এ-ও দেখা যায় যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াও হয় মুখের কথার বিপরীত। এমতাবস্থায় মনের বিপরীত ও কথার বিপরীত কর্মাবলী তো ছলনা বা প্রতারণা। সুতরাং তা তো নিরর্থক হবেই। এভাবে ওই সকল কর্মও নিরর্থক পদবাচ্য, যা পরিশুদ্ধ সংকল্পহীন এবং যা মনের বিশ্বাসের বিপরীত। কেউ কেউ আবার বলেছেন, সৎকর্মাবলী পবিত্র বাক্য উচ্চারণকারীর মর্যাদাকে সমুন্নত করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর যারা মন্দ কার্যের ফন্দি আঁটে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাদের ফন্দি ব্যর্থ হবেই'।

কুরায়েশ গোত্রপতিরা তাদের মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে রসুল স.কে প্রতিহত করবার জন্য বিভিন্ন ফন্দি ফিকির করতো। তাদের ওই অপকর্মের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যে। আবুল আলীয়া এরকমই বলেছেন। অন্য এক আয়াতে বিষয়টির উল্লেখ এসেছে এভাবে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আপনার বিরুদ্ধে এইমর্মে চক্রান্ত করে যে, আপনাকে তারা বন্দী করবে, হত্যা করবে, না হয় দেশান্তর করবে'। কালাবী বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে তাদের কথা, যারা অসদাচরণ করে। মুজাহিদ ও শহর ইবনে হাওশাব বলেছেন, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে অহংকারীদের প্রসঙ্গ।

'হুয়া ইয়াবূর' অর্থ ব্যর্থ হবেই। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক তা ধ্বংস করে দিবেন। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা চক্রান্ত করে। চক্রান্ত সৃষ্টি করেন আল্লাহ্‌ও। অবশেষে আল্লাহ্‌র উদ্যোগই সফল হয়'। অথবা বলা যেতে পারে, কথাটির অর্থ— আল্লাহ্‌পাক অবশ্যই নিশ্চিহ্ন করে দেন মদগর্বিতদের কার্যকলাপ।

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿۱۱﴾ وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ۖۗ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ تَسْتَخْرِجُوْنَ

www.eelm.weebly.com

حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ
وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي
الَّيْلِ ۙ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ
ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۭ وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا
يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿١٣﴾ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَ
لَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۭ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ
بِشِرْكِكُمْ ۭ وَ لَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿١٤﴾

r আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে; অতঃপর শুক্রবিন্দু হইতে, অতঃপর তোমাদিগকে করিয়াছেন যুগল! আল্লাহ্র অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না এবং তাহার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তাহা তো রহিয়াছে 'কিতাবে'। ইহা আল্লাহ্র জন্য সহজ।

r দরিয়া দুইটি একরূপ নহেঃ একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি হইতে তোমরা তাজা গোশ্ত আহার কর এবং আহরণ কর অলংকার যাহা তোমরা পরিধান কর, এবং তোমরা দেখ উহার বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

r তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করিয়াছেন নিয়মাধীন; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক। আধিপত্য তাঁহারই। এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা তো খর্জুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নহে।

r তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা তোমাদের আহ্বান শুনিবে না এবং শুনিলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাহাদিগকে যে শরীক করিয়াছ তাহা উহারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করিবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেহই তোমাকে অবহিত করিতে পারে না।

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে, অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল'।

পুনরুত্থান যে আত্মিক নয়, শরীরী, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আলোচ্য আয়াতে। কারণ প্রথম সৃষ্টির আলোচনায় আসে মানুষের জটিল অস্তিত্বের শরীরী বিকাশের কথা। প্রথম সৃজন জটিল হওয়া সত্ত্বেও যখন পরিদৃশ্যমান, তখন পরবর্তী সৃজন সহজ হওয়া সত্ত্বেও কেবল আত্মার মতো অপরিদৃশ্যমান থাকবে কেনো। সুতরাং স্বীকার করতে হবে শারীরিক পুনরুত্থানই বাস্তবসম্মত।

এখানে মানব সৃজনের উপকরণরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে দু'টি পদার্থকে— মৃত্তিকা ও শুক্রবিন্দু। একথার অর্থ, মানুষের প্রথম পিতা হজরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সরাসরি মৃত্তিকা থেকে এবং এরপরের সকল মানুষকে অস্তিত্বশীল করা হয়েছে শুক্রবিন্দু থেকে। এভাবে মানবায়নের দূরতম ও নিকটতম উৎস হয়েছে মাটি ও শুক্রকণা। আর মানুষ আগমনের নিয়ম হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে যুগলবন্দী মানব ও মানবী। যথার্থই আলোচ্য বাক্যের শেষে বলে দেওয়া হয়েছে এভাবে— 'অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল।'

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র অজ্ঞাতসারে কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসব ও করে না।' একথার অর্থ আল্লাহ্র জ্ঞান সর্বত্রগামী। সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত। নারীর গর্ভধারণ ও প্রসবও এর ব্যতিক্রম নয়।

এর পর বলা হয়েছে— 'কোনো দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধিকরা হয় না এবং তার আয়ু হ্রাস করাও হয় না। কিন্তু তা তো রয়েছে কিতাবে। এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ'। একথার অর্থ— মানুষের আয়ুষ্কাল সুনির্ধারিত ও লওহে মাহফুজে সুলিখিত। ওই নির্ধারণের কোনো হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। আর এরকম নির্ধারণ আল্লাহ্র জন্য মোটেও অসহজ নয়।

'ইল্লা ফী কিতাব' অর্থ কিতাবে বা লওহে মাহফুজে, সুরক্ষিত ফলকে। অথবা কিরামুন কাতিবীনের রোজনামচায়। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, লওহে মাহফুজে লিখিত আছে, অমুকের আয়ু হবে এতো বৎসর। তার জীবনের একদিন অতীত হলেও তার হিসাব রাখা হয়। লিখে রাখা হয়, তার এতোদিন আয়ু কমলো।

কোনো কোনো বিদ্বান আলোচ্য ব্যাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— লওহে মাহফুজে লেখা আছে, অমুকের হায়াত এতোদিন। সে যদি পুণ্যকর্ম করে তবে তার আয়ু এতোদিন করবো । আর যদি অপকর্ম করে, তবে আয়ু কমে যাবে এতোদিন। সকলকিছু পূর্বাহ্নে লিখিত রয়েছে লওহে মাহফুজে। রসুল স. এর এক হাদিসেও এসম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন— একমাত্র দোয়া

www.eelm.weebly.com

ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই লওহে মাহফুজের বিধান খণ্ডাতে পারে না। আর শিষ্ট স্বভাব ব্যতীত কোনো কিছুই বয়সের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে না। হজরত সালমান ফারসী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'দরিয়া দু'টি একরূপ নয়— একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর'। কেউ কেউ বলেছেন 'ফুরাত' অর্থ সুমিষ্ট। তৃষ্ণানিবারক। 'সাইগুন' অর্থ সুপেয়, যা সহজে গলাধঃকরণ করা যায়। 'উজাজুন' অর্থ খর লবণাক্ত। কেউ কেউ বলেছেন, এমন লোনা যে কণ্ঠনালীতে দাহ উপস্থিত করে।

আলোচ্য বাক্যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে। আর প্রমাণ প্রকাশ করা হয়েছে আল্লাহ্তায়লার পূর্ণ শক্তিমত্তার। মানবজাতি অখণ্ড হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের স্রোতরূপে পাশাপাশি অথচ পৃথকরূপে প্রবহমান। এতো তারই মহাপরাক্রমের প্রকাশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রত্যেকটি থেকে তোমরা তাজা গোশত আহার করো '। একথার অর্থ লবণাক্ত ও সুপেয় দু'টো সমুদ্রই আবার তোমাদের জন্য পার্থিব উপকরণপ্রদায়ক। সুমিষ্ট ও খর উভয় পানিতে বিচরণ করে মৎস্যকুল। তোমরা সেগুলোকে ধরো এবং ভক্ষণ করো।

উদ্ধৃত বাক্য দু'টো এখানে সমুদ্র দু'টোর বিশেষণ, যা আলোচিত হয়েছে প্রসঙ্গক্রমে। অথবা বলা যেতে পারে বিশেষণ না হয়ে বাক্য দু'টো হয়েছে এখানে দৃষ্টান্তের পরিপূরক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— দু'টো সমুদ্র পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্র হিসেবে সমতুল। তেমনি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী মানুষ হিসেবে এক। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের বিচারে তাদের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান। সেই মূল উদ্দেশ্যের কথা এক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— 'আমি মানুষ ও জ্বিনকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি'। এরকমও বলা যেতে পারে যে, অবিশ্বাসীদের চেয়েও লবণাক্ত সমুদ্র উত্তম। কেননা এর পানি সুপেয় না হলেও এর অভ্যন্তরস্থিত মৎস্য আহার করা যায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আহরণ করো অলংকার যা তোমরা পরিধান করো'। একথার অর্থ — লবণাক্ত সাগর থেকে তোমরা আহরণ করো মণি-মুক্তা, যা ব্যবহার করো অলংকাররূপে। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, মিঠা পানির সাগর থেকেও মণি-মুক্তা আহরিত হয়। লবণাক্ত সাগরে অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় মিঠা পানির অন্তর্গত প্রস্রবণ। ওই পানি লবণাক্ত পানির সঙ্গে মিশে যায়। এতে করে সৃষ্টি হয় মণি-মুক্তা।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা দেখ, তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো'।

এখানে 'ফীহি মাওয়াখিরা' অর্থ তার বুক চিরে। অর্থাৎ ওই সাগর দু'টোর বুক চিরে। এখানে 'মাওয়াখিরা' শব্দটি 'মাখিরাহ্' এর বহুবচন। এর অর্থ চিরে, বিদীর্ণ করে। অর্থাৎ সাগরের বুক বিদীর্ণ করে চলাচল করে জলযানসমূহ।

'মিন ফাদ্বলিহি' অর্থ অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো। অর্থাৎ সমুদ্র বাণিজ্যের মাধ্যমে তোমরা পেতে পারো আল্লাহ্র অনুগ্রহ রূপী পার্থিব বৈভব।

এখান কার 'লাআ'ল্লাকুম' কথাটির 'লাআ'ল্লা' আশাপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আশা করা যায়, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কিন্তু আল্লাহ্পাক আশা-দূরাশার প্রভাব থেকে চিরমুক্ত, সতত প্রবিত্র। কারো কৃতজ্ঞতার তিনি মোটেও মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং মনে করতে হবে এই বক্তব্যটির মধ্যে রয়েছে একটি শিক্ষণীয় বিষয়। আর সেটি হচ্ছে— উপকারীর প্রত্যুপকার করা উচিত। সুতরাং এই যথাবক্তব্যটি পালন করতে শিখো। আর তোমরা যেহেতু সর্ববিষয়ে আমার মুখাপেক্ষী, তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যথাবিনিময়ও তোমরা আমার কাছ থেকে আশা করতে পারো। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে 'লাআ'ল্লা' অর্থ 'লিআ'ল্লা' (যেনো)। যদি তাই হয়, তবে প্রকাশ ভঙ্গিটি হবে— যেনো তোমরা প্রকাশ করতে পারো তাঁর কৃতজ্ঞতা।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে'। একথার অর্থ দিবস ও রজনীর ক্রমাবর্তন সম্পূর্ণতই তাঁর নিয়ন্ত্রণভূত। তিনিই এ দু'টোর সময় পরিসরে ঘটান হ্রাস-বৃদ্ধি। তাই কখনো দিন হয় ছোট এবং রাত হয় বড়। আবার কখনো ঘটে এর বিপরীত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত'। এখানে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অর্থ আবর্তনের নির্ধারিত সময় সীমা অনুসারে। অথবা পরিক্রমণের সর্বশেষ সীমারেখা পর্যন্ত। কিংবা মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত। অর্থাৎ মহাপ্রলয় যখন ঘটবে তখনই পরিসমাপ্ত হবে তাদের নিয়মিত পরিক্রমণের।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। আধিপত্য তাঁরই'। একথার অর্থ— সকল কর্ম সাধিত হয় তাঁরই সদয় নির্দেশে। সুতরাং অবগত হও, তিনিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য। তিনিই পালনকর্তা, এই মহাসৃষ্টির একক অধিপতি।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ডাকো, তারা তো খেজুরের আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়'। এখানে 'কিত্‌মীর' অর্থ খেজুরের আঁটির পর্দা। অর্থাৎ তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যে সকল জড়প্রতিমার বন্দনা-অর্চনা করো, সেগুলো তুচ্ছাতিতুচ্ছ। উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা তাদের কই?

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না'। একথার অর্থ— তোমাদের অপ্রাণ প্রতিমাগুলোর তো তোমাদের আর্তি শ্রবণের যোগ্যতাও নেই। তারা আবার তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করবে কীভাবে? আবার ইবলিস ও তার দোসরদের শোনার ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু তাদেরও কিছু করার নেই। আর নবী ঈসা ও ফেরেশতারা সপ্রাণ বটে, কিন্তু তোমরা তাদেরকে যে আল্লাহ্‌র শরীক নির্ধারণ করো, তাতে করে তারাও তোমাদের প্রতি ভয়ানক অপ্রসন্ন। সুতরাং তোমাদের আর্তি-আকাঙ্খা পূরণ হওয়া কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছো তা তারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে'। একথার অর্থ— হে অংশীবাদী জনতা! তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র অংশী অথবা সমকক্ষ জ্ঞানে পূজা করো, তারা তো মহাবিচার দিবসের সময় তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে। স্পষ্ট ভাষায় সাক্ষ্য দিবে— 'মা কুনতুম ইয়্যানা তা'বুদূন' (তোমরা তো আমাদেরকে উপাসনা করোনি, তোমরা উপাসক ছিলে তোমাদের প্রবৃত্তির)। স্বকপোলকল্পিত মতাদর্শের। স্বরচিত কল্পনার।

শেষে বলা হয়েছে— 'সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না'। এখানে 'খবীর' অর্থ 'আ'লীম' (সর্বজ্ঞ)। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই সকল কিছু অবগত। এভাবে কথাটির মর্মার্থ হবে— হে অংশীবাদীরা! তোমরা যারা প্রতারণাকবলিত হয়েছো, তারা ফিরে এসো সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে। তিনি তো সকলকিছুর প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগত। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে দিতে পারেন যথার্থ দিক নির্দেশনা। অন্য কেউ নয়।

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿١٥﴾
اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٦﴾ ۚ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ

www.eelm.weebly.com

بِعَزِيْزٍ ﴿١٧﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى
حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَیْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ؕ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا
يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾

r হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ্, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

r তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসৃত করিতে পারেন এবং এক নুতন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন।

r ইহা আল্লাহ্র পক্ষে কঠিন নহে।

r কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করিবে না, কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাহাকেও ইহা বহন করিতে আহ্বান করে তবে উহার কিছুই বহন করা হইবে না— নিকট আত্মীয় হইলেও। তুমি কেবল তাহাদিগকেই সতর্ক করিতে পার যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে না দেখিয়া ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। যে কেহ নিজকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আল্লাহ্রই দিকে প্রত্যাবর্তন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'হে মানুষ! সমগ্র সৃষ্টি তাদের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও জীবনোপকরণ ইত্যাদির ব্যাপারে যেমন আল্লাহ্র সতত মুখাপেক্ষী, তেমনি তোমরাও। বরং তোমাদের মুখাপেক্ষিতা অন্যান্য সৃষ্টি অপেক্ষা আরো অনেক বেশী। কারণ তোমরা অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করেই আমানতের গুরুভারকে শিরোধার্য করেছো। সুতরাং তোমরা তো আপনাপন কর্মের হিসাব প্রদান, আমার অসন্তোষ ও নরাকাগ্নি থেকে নিষ্কৃতিপ্রাপ্তির জন্যও আমার মুখাপেক্ষী। আর আমি দ্যাখো, চিরঅভাবমুক্ত, চিরঅমুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসাভাজন।

এখানে 'আলগানিম' (অভাবমুক্ত) শব্দটির অঙ্গীভূত হয়েছে 'আলিফ লাম'। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— ওই পবিত্র সত্তাই আল্লাহ্, যাঁর অমুখাপেক্ষিতা সুবিদিত এবং তাঁর মুখাপেক্ষী সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়াবর্ষণের বিষয়টিও কারো অজানা নয়। আর 'আল হামীদ' অর্থ প্রশংসাভাজন। অর্থাৎ সত্তাগতভাবেই তিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রশংসা লাভের যোগ্য। পরের আয়াতদ্বয়ের (১৬, ১৭) মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে মুহূর্তমধ্যে তোমাদের সকলের অস্তিত্ব অবলুপ্ত করতে পারেন,

www.eelm.weebly.com

তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নতুন কোনো সৃষ্টি, যারা হবে তোমাদের চেয়ে অধিক অনুগত। আর এরকম করা তাঁর পক্ষে মোটেও অসম্ভব নয়। এখানে ‘বিখল্ক্বিন জ্বাদীদ’ অর্থ এক নতুন সৃষ্টি।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— ‘কোনো বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না’। একথার অর্থ— প্রত্যেককে অভিযুক্ত করা হবে তাদের আপনাপন কৃতকর্মের জন্য। একের পাপের দায় অপরের উপরে বর্তাবে না। তাছাড়া একজনের পাপের ভার অপরজন বহনও করবে না।

একটি সন্দেহ ঃ এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘আর তারা অবশ্যই বহন করবে তাদের পাপের বোঝা এবং তাদের বোঝার সঙ্গে বহন করবে অপরের বোঝাও’। একথার অর্থ তা হলে কী?

সন্দেহভঞ্জনঃ বর্ণিত আয়াতে বলা হয়েছে তাদের কথা, যারা নিজেরা পাপী, উপরন্তু অন্যকেও পথভ্রষ্ট করার দায়ে দায়ী। এরকম লোকেরা অবশ্যই বহন করবে একই সঙ্গে পথভ্রষ্ট হওয়ার পাপ ও পথভ্রষ্ট করার পাপ।

সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু মুসা আশআ’রী থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, মহাবিচারের দিবসে কিছুসংখ্যক লোক পর্বতপ্রমাণ পাপরাশি নিয়ে উপস্থিত হবে। আল্লাহ্ তাদেরকে মার্জনা করবেন। আর তাদের পাপগুলো ছুঁড়ে মারবেন ইহুদী-খৃষ্টানদের দিকে। তিবরানী, হাকেম।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্পাক একেকজন মুসলমানের বিপরীতে দাঁড় করাবেন একেকজন ইহুদী অথবা খৃষ্টান। এরপর বলবেন, এটা তোমার জাহান্নামের বদলী। ইবনে মাজা, তিরমিজি। হজরত আনাস থেকে ইবনে মাজা ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, মহাপুনরুত্থান দিবসে একেক জন মুসলামানের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে একেক জন পৌত্তলিককে। তাকে লক্ষ্য করে বলা হবে, এ হচ্ছে তোমার নরক থেকে নিষ্কৃতির বিনিময়।

আমি বলি, হাদিসগুলোর তাৎপর্য হচ্ছে, উম্মতে মোহাম্মদীর অন্তর্ভূত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এমন কতকগুলো পাপ আবিষ্কার করেছে, যেগুলোর দ্বারা তারা নিজেরা তো পাপী হয়েছেই তদুপরি পাপী করেছে অসংখ্য মানুষকে। প্রজন্মপরম্পরায় প্রবাহিত হয়েছে ওই জঘন্য পাপ। আবার মুসলমানেরাও তার প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। ওই সকল পাপী মুসলমান শেষ বিচারের সময় আঁকড়ে ধরবে পরম মার্জনানিধান আল্লাহ্র মার্জনার অঞ্চল। আল্লাহ্পাকও তাদেরকে নিরাশ করবেন না। এটাই হবে আল্লাহ্পাকের বৃহৎমার্জনা (মাগফিরাতে কোবরা)। কিন্তু পাপের প্রবর্তককে তিনি দান করবেন দ্বিগুণ শাস্তি— নিজের পাপের জন্য এবং অপরকে পাপী করানোর জন্য।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— ‘কোনো ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকেও এটা বহন করতে অনুরোধ করে, তবে তার কিছুই বহন করা হবে না— নিকটাত্মীয় হলেও’। একথার অর্থ— পাপভারাবনত ব্যক্তি তার কোনো স্বজন-পরিজনকে কিছুক্ষণের জন্যও যদি পাপভার বহন করবার জন্য কাকুতি মিনতি করে, তবুও তা প্রত্যাখ্যাত হবে। বাগবী লিখেছেন হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন পিতা কিংবা মাতা তাদের পুত্রকে ডেকে বলবে, আমার পাপের বোঝাটা একটু ধরো তো বাবা। সে বলবে, নিজের পাপ বহন করতেই আমি হিমশিম খাচ্ছি। অন্যের বোঝা বইবো কীভাবে?

এরপর বলা হয়েছে— ‘তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারো, যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে’। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌কে ভয় করার ও নামাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাতে থাকুন। কিন্তু আপনার এমতো উপদেশ মান্য করবে কেবল তারা, যারা আল্লাহ্‌কে না দেখেই ভয় করে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন আখফাশ।

‘বিল গইব’ অর্থ না দেখে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষ না করা সত্ত্বেও তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত থাকে, শাস্তির আলামত দর্শন না করলেও। অথবা তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এমন সময় যখন থাকে নিভৃতে, লোকচক্ষুর অন্তরালে।

শেষে বলা হয়েছে— ‘যে কেউ নিজেকে পরিশোধন করে, সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন’। এখানে ‘নিজেকে পরিশোধন করে’ অর্থ নিজেকে পাপমুক্ত রাখে।

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

وَمَا يَسۡتَوِى الۡاَعۡمٰى وَالۡبَصِيۡرُ ۙ﴿۱۹﴾ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوۡرُ ۙ﴿۲۰﴾
وَ لَا الظِّلُّ وَلَا الۡحَرُوۡرُ ۚ﴿۲۱﴾ وَمَا يَسۡتَوِى الۡاَحۡيَآءُ وَ لَا
الۡاَمۡوَاتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُسۡمِعُ مَنۡ يَّشَآءُ ۚ وَمَاۤ اَنۡتَ بِمُسۡمِعٍ مَّنۡ فِى
الۡقُبُوۡرِ ﴿۲۲﴾ اِنۡ اَنۡتَ اِلَّا نَذِيۡرٌ ﴿۲۳﴾ اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ بِالۡحَقِّ بَشِيۡرًا وَّ
نَذِيۡرًا ؕ وَاِنۡ مِّنۡ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيۡهَا نَذِيۡرٌ ﴿۲۴﴾ وَاِنۡ يُّكَذِّبُوۡكَ فَقَدۡ

www.eelm.weebly.com

كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ بِالزُّبُرِ
وَ بِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ
كَانَ نَكِيْرِ ﴿٢٦﴾

r সমান নহে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান,

r আর না অন্ধকার ও আলো,

r আর না ছায়া ও রৌদ্র,

r এবং সমান নহে জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্ই যাহাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান; তুমি শুনাইতে সমর্থ হইবে না যাহারা কবরে রহিয়াছে তাহাদিগকে।

r তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র।

r আমি তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই।

r ইহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে ইহাদের পূর্ববর্তীগণও তো মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল— তাহাদের নিকট আসিয়াছিল তাহাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ।

r অতঃপর আমি কাফিরদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। কী ভয়ংকর আমার শাস্তি!

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! শুনে রাখুন, অন্ধ-চক্ষুষ্মান, অন্ধকার-আলো যেমন বিপরীতার্থক, তেমনি বিপরীত মেরুর বাসিন্দা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী। আর ছায়া ও রৌদ্র যেমন সমান নয়, তেমনি সমপর্যায়ের নয় তাদের অবশেষ গন্তব্য। একজন গমন করবে ছায়াসদৃশ জান্নাতে এবং অপরজন প্রবেশ করবে রৌদ্র সদৃশ উত্তপ্ত জাহান্নামে। বিশ্বাসীরা জীবিত এবং অবিশ্বাসীরা মৃত। মৃতরা শুনতে পায় না। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে শুভউপদেশ শোনাতে পারবেন না। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকেই শুভউপদেশ শ্রবণ ও গ্রহণের সামর্থ্য দান করেন।

উল্লেখ্য, এখানে যারা চিরভ্রষ্ট, তাদেরকেই তুলনা করা হয়েছে কবরস্থ মৃতের সঙ্গে। তাদের পথপ্রাপ্তি তো সুদূরপরাহত, অসম্ভব।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল ! আপনার দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ্র অসন্তোষ ও জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করা । হেদায়েত প্রদান করা নয়। হেদায়েত তো সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায়নির্ভর।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে; এমন কোনো জনপদ নেই, যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আমা কর্তৃক সত্য ধর্মাদর্শসহ মানুষকে জান্নাতের শুভসমাচার প্রদান ও জাহান্নামের ভীতিপ্রদর্শনের নিমিত্তে প্রেরিত হয়েছেন। আপনি প্রেরিত সমগ্র মানবতার পথপ্রদর্শনার্থে। আর পূর্বের জামানার নিয়ম ছিলো প্রতি সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক নবী অথবা নবীর পক্ষের কোনো পুণ্যবান সতর্ককারী প্রেরণ করা। আমার প্রবর্তিত ওই নিয়মের অন্যথা আমি করিনা। সুতরাং এমন কোনো সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নেই, যাদের প্রতি প্রেরিত হয়নি আমার পক্ষ থেকে কোনো সতর্ককারী।

এখানে 'বাশীর' অর্থ শুভসমাচার প্রদাতা। অর্থাৎ সত্য অঙ্গীকারসহ বিশ্বাসীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদদাতা। আর 'নাজীর' অর্থ সতর্ককারী। অর্থাৎ সত্য শপথ সহকারে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শনকারী। 'নাজীর' অর্থ নবী, অথবা নবীর স্থলাভিষিক্ত কোনো পুণ্যবান বিদ্বান। প্রথমোক্ত বাক্যে 'বাশীর' ও 'নাজীর' উল্লেখিত হয়েছে একত্রে। তাই পরের বাক্যে 'বাশীর' আর পুনরুল্লেখ করা হয়নি। বলা হয়েছে কেবল 'নাজীর'। অথবা পরবর্তী বাক্যে কেবল 'নাজীর' উল্লেখ করার কারণ এই যে, শুভসংবাদ প্রদান অপেক্ষা ভীতিপ্রদর্শন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। লাভপ্রাপ্তি অপেক্ষা ক্ষতি থেকে মুক্তি অধিকতর লাভজনক।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপমন্তব্য ও অশুভ আচরণের কারণে ব্যথিত হবেন না। মনে করবেন যে, এটা কোনো নতুন বিষয় নয়। তাদের চিরাচরিত স্বভাব এরকমই। পূর্ববর্তী যুগের নবী-রসুলগণের সঙ্গেও তারা এরকমই করেছে। আপনি যেমন কোরআন নিয়ে আর্বিভূত হয়েছেন তারাও আর্বিভূত হয়েছিলেন আকাশী গ্রন্থ ও পুস্তিকা সহকারে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তেমনি এখনও আপনার সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রত্যাখ্যান করে চলেছে কোরআন। পূর্ববর্তী জামানার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আমি যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়েছিলাম। সে শাস্তি ছিলো অত্যন্ত ভয়ংকর। তেমনি আপনার প্রতি যারা শত্রুতা পোষণ করে চলেছে, তাদের জন্যও অপেক্ষা করছে মহাশাস্তি।

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ؕ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ

www.eelm.weebly.com

اَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيْبُ سُوْدٌ ﴿٢٧﴾ وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَآبِّ وَ
الْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ﴿٢٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَ
اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ
تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ
اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٣٠﴾ وَ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ
الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ﴿٣١﴾

r তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন; এবং আমি ইহা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্‌গত করি। আর পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ— শুভ্র, লাল ও নিকষ কাল।

r এইভাবে রং বেরং-এর মানুষ, জন্তু ও আন'আম রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী তাহারাই তাঁহাকে ভয় করে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

r যাহারা আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাহাদিগকে যে রিয্‌ক দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাহারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যাহার ক্ষয় নাই।

r এইজন্য যে, আল্লাহ্ তাহাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে আরও বেশী দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

r আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি তাহা সত্য, ইহা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের সমস্ত কিছু জানেন ও দেখেন।

প্রথম আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি তো অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, আল্লাহ্ আকাশে ভাসমান মেঘপুঞ্জ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফলে জমিনে গজিয়ে ওঠে বিভিন্ন বৃক্ষ ও লতাগুল্ম, আর সেগুলোতে ধরে বিচিত্র বর্ণের ও স্বাদের ফল ও ফসল। হাল্‌কা ও প্রগাঢ় রঙের গিরিশ্রেণী ও গিরিপথের বৈচিত্র্যও নিশ্চয় আপনার দৃষ্টি না পড়ে পারেনি।

www.eelm.weebly.com

এখানে ‘জুদ্দাদুন’ অর্থ গিরিপথ। ‘বীদুন’ ও ‘হুম্‌রুন’ অর্থ যথাক্রমে শাদা ও লাল। ‘মুখতালিফুন আলওয়ানুহা’ অর্থ বিচিত্রবর্ণের রং। আর ‘গরাবীবু সূদু’ অর্থ নিকষ কালো পর্বতসমূহ।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— ‘এইভাবে রঙ বেরঙের মানুষ, জন্তু ও আনয়াম রয়েছে। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে’।

একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বহুধা বিচিত্র। আর এই পৃথিবীতেও ঘটেছে অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টির সমারোহ। বৃক্ষরাজি, ফলমূল, বহুবর্ণের ও প্রকৃতির পর্বতশ্রেণী যেমন এখানে রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনেক রকমের ও রঙের মানুষ, বন্য জন্তু ও গৃহপালিত পশু। এসকল কিছু সম্পর্কে যারা চিন্তা ভাবনা করে, তারা জ্ঞানী। তারা বুঝতে পারে, এসকলকিছুর সৃজয়িতা নিশ্চয় কেউ একজন রয়েছেন। তিনি যে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তাঁকে বিশ্বাস করা ও তার মহাপরাক্রমকে সমীহ করে চলাই হচ্ছে জ্ঞানের দাবি। তাই যারা জ্ঞানী, তারা এ অপরিহার্য দাবী পূরণের চেষ্টায় সতত শংকিত থাকেন।

শায়েখ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিবরণদৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে না, তারা জ্ঞানী নয়। আমি বলি, আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যহীন মহিমা, পরাক্রম ও তাঁর গুণবত্তা সম্পর্কীয় পরিচিতি লাভই হচ্ছে আসল জ্ঞান। আর এমতো জ্ঞানের অধিকারী যারা তাদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় না থাকা অসম্ভব। সুতরাং বুঝতে হবে ভয়শূন্যতা অর্থই জ্ঞানশূন্যতা।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌কে ভয় করে, যে জানে আল্লাহ্‌র অতুলনীয় প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও শক্তিমত্তার কথা। সুতরাং আল্লাহ্‌র সত্তা-গুণবত্তা সম্পর্কে যার জ্ঞান যতো বেশী, সে ততো বেশী আল্লাহভীরু।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, জননী আয়েশা বলেছেন, একবার রসুল স. কিছু কর্ম সম্পাদান করলেন, অন্যকেও অনুমতি দিলেন এরকম করতে। তৎসত্ত্বেও কিছুসংখ্যক লোক ওই কর্ম থেকে বিরত রইলো। একথা রসুল স. এর কানে যেতেই তিনি স. বাইরে অপেক্ষমান জনতার সামনে গিয়ে ভাষণ দিলেন। বললেন, আমি জানতে পেলাম, কেউ কেউ আমার অনুসরণ পরিত্যাগ করেছে। শপথ আল্লাহ্‌র! আমিই আল্লাহ্ সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত এবং আমিই তাঁকে ভয় করি সবচেয়ে বেশী।

অপরিণত সূত্রে মাকহুল থেকে দারেমী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, একজন ইবাদতসর্বস্ব ব্যক্তির তুলনায় একজন জ্ঞানীর মর্যাদা তোমাদের তুলনায় আমার মর্যাদার মতো। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন ‘যারা জ্ঞানী, তারাই তাঁকে ভয় করে’।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার জীবনাধিকারী সেই পবিত্র সত্তার শপথ করে বলি, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তবে হাসতে কম, কাঁদতে বেশী।

বর্ণিত হাদিসসমূহের আলোকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্কে সবচেয়ে বেশী ভয় করেন নবী-রসুলগণ, তারপর অলী আল্লাহ্গণ, তারপর সাধারণ আলেমসমাজ। মাসরুক বলেছেন, আল্লাহ্ভীতির অধিকারী হওয়ার অর্থ বিশাল জ্ঞানের অধিকারী হওয়া। শা'বীল বলেছেন, সে-ই ব্যক্তিই আলেম, যে আল্লাহ্কে অধিক ভয় করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী বলেই শাস্তিবিধান করেন অবাধ্যদের এবং মহামার্জনাপরবশ বলেই অনুতপ্তজনকে করেন দয়ার্দ্র মার্জনা। সুতরাং অন্তরে আল্লাহ্ভীতির লালন অপরিহার্য।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্র কিতাব তেলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের— যার ক্ষয় নেই'।

এখানে 'যারা আল্লাহ্র কিতাব তেলাওয়াত করে' অর্থ যে নিয়মিত পাঠ করে কোরআন ও অন্যন্য আসমানী কিতাব। ইতো পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে কোরআন মজীদের প্রতি অসত্যরোপের অপপরিণতিসর্ম্পকে। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হলো কোরআন আবৃত্তির শুভপরিণামের কথা। প্রকারান্তরে এখানে কোরআন মজীদের বিধানানুসারে জীবন যাপনকারীদের প্রশংসাই বর্ণনা করা হয়েছে। 'সালাত কায়েম করে' অর্থ যথাগুরুত্ব সহকারে যথানিয়মে আদায় করে নামাজ। 'প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে' অর্থ, ব্যয় করে সুযোগ-সুবিধা মতো কেবল আল্লাহ্র পরিতোষ অর্জনার্থে, কেউ দেখল কিনা এমতো চিন্তা না করে। অথবা ফরজ যাকাত দেয় প্রকাশ্যে এবং নফল দান করে অপ্রকাশ্যে। 'এমন ব্যবসায়ের যার কোনো ক্ষয় নেই' অর্থ কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত কোরআন পাঠ, নামাজ, জাকাত ইত্যাদি এমন লাভজনক বাণিজ্য, যার মধ্যে ক্ষতির কোনই আশংকা নেই, আছে শুধু লাভ আর লাভ।

এর পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'এই জন্য যে, আল্লাহ্ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশি দিবেন'। একথার অর্থ— ওই সকল লোক বর্ণিত পুণ্যকর্মসমূহের পূর্ণ প্রতিফল লাভের আশায় এবং ওই আশায়ও যে, আল্লাহ তাঁর আপন অনুগ্রহে দান করবেন পুণ্যকর্মের তুলনায় অনেক বেশী। এমতোব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে 'লি ইউওয়াফ্ফিইয়াহুম' (যেনো তিনি প্রতিফল দিবেন) কথাটির সম্পৃক্তি ঘটবে

www.eelm.weebly.com

একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। ফলে অর্থ দাঁড়াবে— তারা যা করে, তার পূর্ণ প্রতিফল তারা পাবে। অথবা বলা যেতে পারে, 'লি ইউওয়াফ্‌ফিইয়াহুম' বাক্যের 'লি' (যেনো) অব্যয়টি এখানে পরিণতিসূচক। যদি তাই হয়, তবে এর সম্পৃক্তি ঘটবে পূর্ববর্তী আয়াতের 'ইয়ারজুনা' (তারা আশা করে) বাক্যর সঙ্গে। তখন বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ওই আশাবাদী ব্যবসার পরিণতি হবে, আল্লাহ্ তাদেরকে দান করবেন পূর্ণ প্রতিফল। তদুপরি দয়াপরবশ হয়ে দান করবেন আরো অনেক বেশী।

ইবনে আবি হাতেম ও আবু নাঈম উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'পূর্ণ প্রতিফল দিবেন' অর্থ আল্লাহ্ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে।

এরপর বলা হয়েছে — 'তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী'। একথার অর্থ পদস্খলন ঘটে যাওয়ার পর যারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে সত্যাভিমুখী হয়, তাদের জন্য তিনি মহাক্ষমাপরবশ। আর যারা প্রকৃতই আনুগত্যপরায়ণ, তিনি তাদের গুণগ্রাহী।

আবদুল গণির সংকলনে দেখা যায়, আলোচ্য আয়াত অবতরণের প্রেক্ষিত ছিলো হোসাইন ইবনে হারেছ ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

এরপরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তা সত্য এটা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি আপনার প্রতি যে মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি তা বিশ্বাস জ্ঞান, মূল তত্ত্ব এবং অতীতায়িত জাতিসমূহের ইতিবৃত্তের দিক দিয়ে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের অনুরূপ। এগুলোর মধ্যে মৌলিক কোনো প্রভেদ নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সবকিছু জানেন ও দেখেন'। একথার অর্থ— প্রাণি ও বস্তুনিচয়ের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। সব কিছুই তাঁর জ্ঞান ও গোচরায়ত্ত।

সূরা ফাতিরঃ ৩২

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٣٢﴾

www.eelm.weebly.com

r অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করিলাম আমার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে আমি মনোনীত করিয়াছি; তবে তাহাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্যপন্থী এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। ইহাই মহা অনুগ্রহ—

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ছুম্মা আওরাছনাল কিতাবাল্ লাজীনাস্ ত্বফাইনা মিন ইবাদিনা'। একথার অর্থ— 'অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি'।

কোনো কিছুর মালিকানা হস্তান্তর করাকে বলে 'ইরছ'। তাই 'আওরাছনা' অর্থ 'আখ্খারনা' (পরবর্তীদেরকে দিয়েছি)ও করা হয়েছে। এ কারণেই উত্তরাধিকারকে বলে 'মীরাছ'। এভাবে উদ্ধৃত বাক্যের বক্তব্যার্থ দাঁড়িয়েছে— আমি বিগত উম্মতের কিতাবের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছি পরবর্তী উম্মতকে। সকলকে নয়, বরং তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মনোনীত ব্যক্তিত্বকে। 'মিন ইবাদিনা' (আমার বান্দাদের মধ্য থেকে) কথাটির 'মিন' (থেকে, হতে) অব্যয়টি এখানে আংশিক অর্থপ্রকাশক এবং 'আমার বান্দা' কথাটির সঙ্গে এর সম্বন্ধটি এখানে আভিজাত্যপ্রকাশক।

'ইবাদ' (বান্দাগণ) অর্থ এখানে সাহাবায়ে কেরাম। তাঁদের অবর্তমানে ওলামায়ে কেরাম। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সমগ্র ইসলামী উম্মতই 'ইবাদ' এর বলয়ভূত। আল্লাহ্ এই উম্মতকে মনোনীত করেছেন মধ্যপন্থীরূপে। সেকারণেই এরা উম্মতশ্রেষ্ঠ। এদেরকে দিয়েছেন পৃথক প্রকৃতির আভিজাত্য। বানিয়েছেন সকল উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতা। আর বলা বহুল্য যে, এমতো আভিজাত্য হয়েছে এদের নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর মাধ্যমে। জনৈক কবি তাই বলেছেন—

তুবা লানা মা'শারাল ইসলামি ইন্না লানা
মিনাল ই'নায়াতি রুকনান গইর মনিহাদিমী
লাম্মা দাআ'ল্লহু দায়ীনা লি ত্বয়াতিহী
বি আকরমির রসুলি কুন্না আকরমাল উমামী।

অর্থ ঃ হে ইসলামী উম্মত! আনন্দোল্লাস করো। আমাদের জন্য রয়েছে একটি সুদৃঢ় অবলম্বন, যা প্রকাশিত হয়েছে আল্লাহ্র অপার বদান্যতায়, যা অনিঃশেষ। তিনি তাঁর আনুগত্যের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর প্রিয়তম রসুলের মাধ্যমে। সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আমরাও হয়েছি অভিজাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহ্র ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। এটাই অনুগ্রহ—'

www.eelm.weebly.com

এখানে 'নিজের প্রতি অত্যাচারী' অর্থ, ওই সকল উম্মতে মোহাম্মদী যাদের ইবাদত বন্দেগী অসুষ্ঠ ও সংক্ষিপ্ত। এদের সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আর তারা এমতো আশাপোষণ করে যে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে, অথবা গ্রহণ করা হবে তাদের অনুতাপ'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা আত্মঅত্যাচার করেছো, তারা আল্লাহ্‌র করুণা থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় তিনি তোমাদেরকে মার্জনা করবেন। তিনি যে মহামার্জনাপরবশ। পরম দয়ার্দ্র।

'মধ্যপন্থী' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ওই সকল লোককে, যারা কোরআন বাস্তবায়ন করেছে বাহ্যিক পটভূমিকার ভিত্তিতে। কোরআনের জ্ঞানসমুদ্রের গভীর গভীরতর অবগাহনে এরা অনুপস্থিত। এদের সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আর অন্যান্যরা স্বীকৃতি দিয়েছে তাদের পাপের। তারা সৎকর্মের সঙ্গে মিশ্রিত করেছে অসৎকর্ম। আশা করা যায়, আল্লাহ্ তাদের অনুতাপকে গ্রহণ করবেন। অবশ্যই আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ ও দয়াবান'।

'বিইজনিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র নির্দেশে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ানুসারে যারা নিমজ্জিত হয়েছে— কোরআনের অন্তর্নিহিত রহস্যসাগরে, মহাকল্যাণকর কর্মে। এদের সম্পর্কে ঘোষিত হয়েছে— 'আস্‌সাবিকূনাল আউয়ালূনা মিনাল মুহাজ্বিরীনা ওয়াল আনসার .....' শেষ পর্যন্ত। আরো ঘোষিত হয়েছে— 'আস্‌সাবিকূনাস্ সাবিকূন..... শেষ পর্যন্ত। এ সকল আয়াতে যে দুই দল লোকের কথা বলা হয়েছে তাঁরাই দক্ষিণ ভাগের লোক।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, 'মধ্যপন্থী' তারা, যারা কার্যকর করে কোরআনের অধিকাংশ বিধান। আর 'কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী' তারা, যারা কোরআন বাস্তবায়নের সাথে সাথে পথপ্রদর্শন করে অন্যান্যকে।

স্বসূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, আবু ওসমান নাহদী বর্ণনা করেছেন, একবার আমি হজরত ওমরকে এই আয়াত পাঠ করতে শুনলাম। পাঠ শেষে তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে অগ্রণী তারা, যারা কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী, যারা মধ্যপথাবলম্বী তারা পরিত্রাণপ্রাপ্ত। আর যারা আত্মঅত্যাচারী, তাদেরকে করা হবে মার্জনা।

হজরত সুহাইব বলেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, মুহাজিরেরা অগ্রসূরী, শাফায়াতকারী। তারা তাদের আল্লাহ্‌র নৈকট্যধন্য। যাঁর অধিকারে মোহাম্মদের জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ করে বলছি, মহাবিচারের দিবসে তারা উপস্থিত হবে কাঁধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। সোজা গিয়ে করাঘাত করবে বেহেশতের দ্বারে। দৌবারিক জিজ্ঞেস করবে, আপনারা কে? তারা বলবে, আমরা মুহাজির।

www.eelm.weebly.com

দৌবারিক বলবে, আপনাদের হিসাব কি সম্পন্ন হয়েছে? একথা শুনে মুহাজিরেরা হাঁটুমুড়ে বসে পড়বে। প্রার্থনা করবে, হে আমাদের প্রভুপালয়িতা। আমরা তোমার তুষ্টির আশায় ঘরদোর ছেড়ে পথে নেমেছি। পরিত্যাগ করেছি পিতা-মাতা, সহায়সম্পদ। তারপরেও কি আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে? এর জবাবে আল্লাহ্ তখন তাদেরকে দিবেন স্বর্ণনির্মিত পক্ষ। যা অলংকৃত থাকবে জবরজদ ও মণিমুক্তা দিয়ে। ওই পক্ষগুলোতে ভর করে তারা উড়ে চলে যাবে জান্নাতে। এক আয়াতে এমতো বিবরণের মর্ম প্রতিভাত হয়েছে এভাবে— যাবতীয় স্তব-স্তুতি আল্লাহ্র, যিনি আমাদের নিকট থেকে দূর করে দিয়েছেন দুঃখ যাতনা.......লুগুব পর্যন্ত। রসুল স. বলেছেন, নিজেদের বাড়ী ঘর যেমন অতিপরিচিত তেমনি চেনা-জানা মনে হবে বেহেশতীদের আবাস তাদের নিজেদের কাছে। হজরত ওসমান এই আয়াত শুনে আতঙ্কিত হয়ে বলেছিলেন, আমাদের অগ্রণী ছিলেন যোদ্ধাবৃন্দ। মধ্যপথাবলম্বী ছিলো নগরবাসী। আর আত্মঅত্যাচারীরা হচ্ছে বেদুইন।

আবু কোলাবা বলেছেন, আমি হাদিসটি ইয়াইয়া ইবনে মুঈন সমীপে উপস্থাপন করলে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। বাগবী হাদিসটি উপস্থাপন করেছেন সুপরিণতসূত্রে। সাঈদ ইবনে মনসুর ও বায়হাকী বলেছেন, বক্তব্যটি হজরত ওমরের।

আবু সাবেত সূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, এক লোক মসজিদে প্রবেশ করলেন। বললেন, হে আল্লাহ্! কৃপা করো আমার মতো একজন ভবঘুরের উপর। আমার অবর্তমানে তোমার কোনো পুণ্যবান বান্দাকে আমার উপলক্ষ করে দাও। তখন মসজিদে উপস্থিত ছিলেন হজরত আবু দারদা। তিনি বললেন, আমার দ্বারা যদি আপনার মহৎ বাসনা পূর্ণ হয়, তবে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো। আপনার সাক্ষাত পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. একবার এই আয়াত আবৃত্তি করার পর মন্তব্য করেছিলেন, অগ্রণীগণ তো কোনোরূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যতিরেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। মধ্যপন্থীগণের হিসাব হবে সহজ। আর যারা আত্ম-অত্যাচারী, তাদের কিছুকাল আটকে রাখা হবে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে তারা। অবশেষে তারাও প্রবেশ করবে জান্নাতে। এরকম বলায় তিনি স. আবৃত্তি করলেন, 'যাবতীয় প্রশাংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের নিকট থেকে অপসারণ করেছেন অনুতাপ। অবশ্যই আমাদের প্রভুপালয়িতা ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী'। হাদিসটি আরো বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, ইবনে জারীর, তিবরানী, হাকেম ও বায়হাকী। তবে তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— কিন্তু যারা আত্ম-অত্যাচারী তাদেরকে আটক রাখা হবে বিচারপর্বের শেষ সময় পর্যন্ত। এরপর আল্লাহ্ দয়াপরবশ হয়ে মার্জনা

www.eelm.weebly.com

করে দিবেন তাদের পাপরাশি। তখনই তারা বলে উঠবে— 'যাবতীয় স্তব-স্তুতি সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের নিকট থেকে দূর করে দিয়েছেন বিষণ্নতা। তিনি মহাক্ষমাপরবশ, গুণগ্রাহী'।

বায়হাকী লিখেছেন, হজরত আবু দারদা থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। আর যে হাদিস বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়, সে হাদিসে নিশ্চয়ই থাকে কিছু মৌলিকত্ব। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াতের প্রেক্ষিতে হজরত উসামা ইবনে জায়েদ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, এই তিন শ্রেণীর লোক আমারই উম্মতভূত। হজরত উসামা ইবনে জায়েদ থেকে বায়হাকীও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কা'ব এবং আতা থেকেও বর্ণিত হয়েছে, এই তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই তিন ধরনের লোকই উম্মতে মোহাম্মদীর অন্তর্ভূত। এদেরকেই করা হয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের উত্তরাধিকারী। এদের মধ্যে আত্মঅত্যাচারীরা পাবে ক্ষমা, মধ্যপন্থীদের জবাবদিহিতা হবে শিথিল এবং অগ্রণীরা জান্নাত পাবে উপহার হিসেবে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম আহমদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক উত্তম আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রসুল স. বলেছেন, এসকল লোক একই দলের। তারা সকলেই গমন করবে জান্নাতে। ফারইয়াবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা ইবনে আজীব 'নিজের প্রতি অত্যাচারী' কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তারাও বেহেশতে যাবে।

হজরত আবু মুসা সূত্রে ইবনে আবী আসেক ও ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ মহাপুনরুত্থান দিবসে সকলকে একত্রিত করবেন। তারপর পৃথক করে দিবেন আলেমগণকে। বলবেন, হে আলেম সমাজ! আমি জেনেশুনেই তোমাদেরকে জ্ঞানদান করেছিলাম। আর শাস্তি দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই তা দান করিনি। যাও, তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের মাধ্যমে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত ছা'লাবা ইবনে হাকাম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আরশে আনুরূপ্যবিহীনরূপে সমাসীন হয়ে আল্লাহ্‌পাক আলেম সমাজকে লক্ষ্য করে বলবেন, মার্জনা করার উদ্দেশ্যেই আমি তোমাদেরকে দান করেছিলাম এলেম ও হিকমত। শোনো, আমি কারো পরোয়াই করি না।

আবু ওমর সানআনী হাফস্ ইবনে মায়সারার বর্ণনা উল্লেখ করে ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন এভাবে— মহাবিচারের দিবসে আলেমগণকে রাখা হবে

www.eelm.weebly.com

পৃথক করে। বিচারকর্ম সমাধার পর আল্লাহ্ তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, আমি আমার প্রজ্ঞাকে একটি বিশেষ কল্যাণকর উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম। আজ তোমাদের সম্মুখে ঘটাতে চাই তার প্রকাশ। যাও, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো, যা কিছুই করে থাকো না কেনো?

বাকীয়া ইবনে সুবহান বলেছেন, একবার আমি জননী আয়েশা সকাশে নিবেদন করলাম, হে মাতঃ! 'ওয়া আওরাদ্না' থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতখানির মর্মার্থ কী? তিনি বললেন, বৎস! এরা সকলেই জান্নাতে যাবে। অগ্রণীরা হবে রসুল স. এর সমকালের লোক। তিনি তো তাদের জান্নাতী হওয়ার কথা বলেই গিয়েছেন। মধ্যপন্থীগণও অগ্রণীগণের অনুসারী। আর আত্ম-অত্যাচারীদের দৃষ্টান্ত যেমন আমি, তুমি। জননী তাঁর বিনয় প্রকাশ করেছেন এভাবেই।

আমি বলি, এই তিন শ্রেণীই এই উম্মতের ওলী শ্রেণীভূত। অর্থাৎ তাঁরা ওলীআল্লাহ্। প্রথম শ্রেণী নিজের প্রতি অত্যাচার করে। অবলম্বন করে বৈরাগ্য। সিদ্ধ কার্যাবলী থেকেও বিরত থাকে তারা। সতত লিপ্ত থাকে কঠোর সাধনায়। এ ধরনের কঠোরতা আসলে তাদের নিজেদেরই উদ্ভাবন। দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যপন্থী। তারা প্রবৃত্তির বৈধ চাহিদা পরিপূরণে পরাজ্মুখ হয় না। কিন্তু মত্ত হয় না বিলাসব্যসনে। তারা রসুল স. এর সংসারাদর্শ, উপাসনাদর্শ সবকিছু মেনে চলতে চেষ্টা করে। জননী আয়েশা এদেরকেই চিহ্নিত করেছেন— রসুলানুসারী বলে। রসুল স. এর সঙ্গেই হবে তাদের অবশেষ মিলন। আর তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে অগ্রগামী শ্রেণী। তাঁরা হচ্ছেন রসুল স. এর মহান সাহচর্যস্নাত এবং তার প্রত্যক্ষ অনুসারী সহচরবৃন্দ। তাঁরাই সাহাবী, সিদ্দীক। আর জননী আয়েশা প্রকৃত অর্থেই এক বিদূষী ছিলেন বলেই প্রকাশ করেছিলেন নন্দিত বিনয়। নিজেকে আখ্যা দিয়েছিলেন আত্ম-অত্যাচারী বলে। উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহের আলোকে এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত তিনটি শ্রেণীই হচ্ছেন এই উম্মতের জ্ঞানী সম্প্রদায় এবং তাঁরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন। সুতরাং এর পরেও যদি কেউ বলে, এখানে 'নিজের প্রতি অত্যাচারী' বলে বুঝানো হয়েছে কপটাচারীদেরকে, তাহলে বুঝতে হবে তার বক্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সুতরাং তা অবশ্য পরিত্যজ্য, আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপের উপযোগী।

ইমাম আবু ইউসুফকে একবার এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ কী? তিনি বললেন, এখানে যে তিন শ্রেণীর উম্মতে মোহাম্মদীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই বিশ্বাসী। কেননা ইতোপূর্বেই সমাপন করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটাচারীদের প্রসঙ্গ। একথা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, এখানে 'যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি' বলার পর একে একে বিবরণ দেওয়া হয়েছে মনোনীতদের তিনটি শ্রেণীর। প্রত্যেকের

www.eelm.weebly.com

মর্যাদাগত পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে পুনঃপুনঃ 'মিনহুম' 'মিনহুম' বলে। অর্থাৎ তাঁরা মর্যাদার দিক দিয়ে পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হলেও মনোনীত হওয়ার দিক থেকে এক। নিজের প্রতি অত্যাচারীদের সংখ্যা হবে সবচেয়ে বেশী। তাই তাদের উল্লেখ এসেছে সকলের অগ্রে। মধ্যমপন্থীদের সংখ্যা হবে অপেক্ষাকৃত কম। তাই তাদের উল্লেখ এসেছে দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং যেহেতু অত্যল্পসংখ্যক হবেন অগ্রগামীগণ, তাই তাঁদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সকলের শেষে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এটাই মহাঅনুগ্রহ'। একথার অর্থ— সর্বশেষ উম্মতকে মনোনীত করা এবং তাদেরকে নভজ গ্রন্থের উত্তরাধিকারী করার বিষয়টি নিশ্চয় আল্লাহ্‌র মহান অনুগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ৩৩, ৩৪, ৩৫

جَنّٰتُ عَدۡنٍ يَّدۡخُلُوۡنَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيۡهَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَهَبٍ وَّ
لُؤۡلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمۡ فِيۡهَا حَرِيۡرٌ ﴿۳۳﴾ وَقَالُوا الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِيۡۤ اَذۡهَبَ
عَنَّا الۡحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوۡرٌ شَكُوۡرُ ۙ ﴿۳۴﴾ الَّذِيۡۤ اَحَلَّنَا دَارَ الۡمُقَامَةِ
مِنۡ فَضۡلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيۡهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيۡهَا لُغُوۡبٌ ﴿۳۵﴾

r স্থায়ী জান্নাত, যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, সেথায় তাহাদিগকে স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হইবে এবং সেখানে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের।

r এবং তাহারা বলিবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করিয়াছেন; আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী;

r 'যিনি নিজ আনুগ্রহে আমাদিগকে স্থায়ী আবাস দিয়াছেন যেখানে ক্লেশ আমাদিগকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যে তিন শ্রেণীর মানুষের কথা আগের আয়াতে বলা হলো, তাদেরকে আল্লাহ্‌পাক দান করবেন 'জান্নাতে আদন' বা স্থায়ী জান্নাত। সেখানে তারা অলংকৃত হবে স্বর্ণকংকন ও মনিমুক্তা দ্বারা। আর পরিধান করবে রেশমী পোশাক।

হজরত আবু সাঈদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আলোচ্য আয়াত পাঠ করলেন, তারপর বললেন, সেখানে তারা পরিধান করবে স্বর্ণ মুকুট, স্বর্ণকংকন ও মনিমুক্তানির্মিত আভরণ। ওই আভরণের যে কোনো একটি পৃথিবীতে পতিত হলে চিরদিনের জন্য ঘুচে যাবে পৃথিবীর সকল আঁধার। তিরমিজি, হাকেম, বায়হাকী,

www.eelm.weebly.com

হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি শুদ্ধসূত্রসম্বলিত। কুরতুবী লিখেছেন, জান্নাতীদের মধ্যে এমন কেউ-ই থাকবে না, যার হাতে শোভা না পাবে তিন ধরনের অলংকার— সোনা, চাঁদি ও মোতির। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তখন বিশ্বাসীদের হস্ত অলংকার দিয়ে ভরানো হবে ওই পর্যন্ত, যে পর্যন্ত পৌঁছানো হয় ওজুর পানি। বোখারী ও মুসলিম।

হজরত হুজায়ফা বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে আজ্ঞা করতে শুনেছি, তোমরা কখনো রেশমী বস্ত্র পরিধান কোরো না। ব্যবহার কোরো না সামুদ্রিক রত্ননির্মিত অলংকার। আর আহার কোরো না স্বর্ণ-রৌপ্যনির্মিত পাত্রে। এগুলো এই পৃথিবীতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের এবং পরবর্তী পৃথিবীতে তোমাদের। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে জান্নাতী জীবনে তা পরতে পারবে না। বোখারী, মুসলিম। হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন তায়ালাদী। আর হাকেম ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। বর্ণনাটির শেষ বক্তব্যটি এরকম— সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও পরিধান করতে পারবে না রেশমী পরিচ্ছদ।

হজরত কা'ব ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, যদি কেউ দুনিয়ায় জান্নাতের অনুরূপ পোশাক পরে, তবে সে জান্নাতে তা আর পরতে পারবে না।

পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'এবং তারা জানাবে প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন'।

এখানে 'কুলু' তারা বলবে, হাদিস শরীফেও জান্নাতীদের এরকম প্রশংসা বর্ণনার কথা বলা হয়েছে। 'যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন' কথাটিও (আয়াত ৩৫) একথার পরিপোষক। বিশ্বাসীগণ সমাধি থেকে উত্থিত হওয়ার প্রাক্কালেও এরকম বলবে। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' কলেমার প্রবক্তারা মৃতুর সময় আতঙ্কগ্রস্ত হয় না। আতঙ্কগ্রস্ত হবে না কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়েও। সে সময়ের দৃশ্য আমার দৃষ্টিতে যেনো ভাসমান। শিঙ্গার ফুৎকার ধ্বনিত হচ্ছে, আর জনগণ তাদের মাথার ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াছে এবং বলছে— যাবতীয় বন্দনা প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের দুঃখদুর্দশা বিদূরিত করেছেন'। তিবরানী।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'হাযান' অর্থ নরকের দুঃখ-দুর্দশা। কাতাদা বলেছেন, মরণের আতঙ্ক। মুকাতিল বলেছেন, মৃত্যু-আতঙ্কের কারণ হচ্ছে অনিশ্চয়তা। অর্থাৎ তারা জানতে পারবে না, কী আচরণ অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। ইকরামা বলেছেন, এরকম উদ্বেগ-আতঙ্কের কারণ হচ্ছে পাপের ভয়, অবাধ্যতার শংকা, আনুগত্য গৃহীত হওয়া না হওয়ার দ্বিধা-জড়তা। সাঈদ

www.eelm.weebly.com

ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে দুঃখদুর্দশা দূর হওয়ার অর্থ অন্নবস্ত্রের চিন্তা দূর হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, ইহকালের জীবনোপকরণ-ভাবনা ও পরকালের শাস্তির সম্ভাবনাকেই এখানে বলা হয়েছে 'হাযান'। প্রকৃত কথা হয়েছে, 'হাযান' বলে যে কোনো ধরনের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ককে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী'। একথার অর্থ— যারা পীড়ন করেছে আপন সত্তার উপর, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। কারণ তিনি মহাক্ষমাপরবশ। আর তিনি মধ্যপন্থী ও কল্যাণকর কাজে অগ্রগামীদের গুণগ্রাহী।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন, সেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না'। একথার অর্থ— তারা আরো বলবে ক্লেশ ও ক্লান্তি থেকে মুক্ত এই চিরনিরাপদ ও স্থায়ী জান্নাতবাস হচ্ছে সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অনুগ্রহাগত। এই অপার ও অনির্বচনীয় অনুগ্রহ কোনোক্রমেই আমাদের অর্জনায়ত্ত নয়।

এখানকার 'মুক্বামাত' শব্দটি ধাতুমূল। এর অর্থ চিরস্থায়ী আবাস।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা থেকে নকী' ইবনে হারেছের পদ্ধতিতে বায়হাকী তাঁর 'আলবা'ছ' গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে মহাবিশ্বের রহমত! পৃথিবীতে আল্লাহ্ দিয়েছেন শ্রান্তিহারক সুষুপ্তি। বেহেশতে কি তা আমারা পাবো। তিনি স. বললেন, না। নিদ্রা তো মৃত্যুর সহোদর। বেহেশতে তো মৃত্যুর প্রবেশাধিকার নেই। সে বললো, তাহলে বেহেশতে স্বস্তি আসবে কীরূপে? রসুল স. ক্ষণকাল নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, বেহেশতে তো অস্বস্তিরও কোনো প্রবেশাধিকার নেই। সেখানে তো শুধু স্বস্তি আর স্বস্তি। শান্তি, কেবলই অনাবিল শান্তি।

এখানে 'নাসব' অর্থ অবসাদ এবং 'লুগুব' অর্থ ক্লান্তি। শব্দ দু'টো প্রায় সমার্থক। কিন্তু এখানে শব্দ দু'টো বসানো হয়েছে বেগ সৃজনার্থে।

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا

www.eelm.weebly.com

فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٣٧﴾ ع

r কিন্তু যাহারা কুফরী করে তাহাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। উহাদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হইবে না যে, উহারা মরিবে এবং উহাদিগ হইতে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হইবে না। এইভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়া থাকি।

r সেথায় তাহারা আর্তনাদ করিয়া বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে নিষ্কৃতি দাও, আমরা সৎকর্ম করিব, পূর্বে যাহা করিতাম তাহা করিব না।' আল্লাহ্ বলিবেন, 'আমি কি তোমাদিগকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করি নাই যে, তখন কেহ সতর্ক হইতে চাহিলে সতর্ক হইতে পারিতে? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও আসিয়াছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কিন্তু যারা কুফরী করে, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে, তারা মরবে'।

এখানে 'লা ইউক্বদ্বা আ'লাইহিম ফাইয়ামুতু' অর্থ তাদের উপর কার্যকর করা হবে না মৃত্যুকে। এরকমও বলা হবে না যে, তোমরা মরো। হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীরা যখন জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে রেখে চিরদিনের জন্য মৃত্যু ঘটানো হবে মৃত্যুর। একজন ঘোষক তখন ঘোষণা করবে, জান্নাতবাসীরা শোনো, মৃত্যুর আগমন আর ঘটবে না। আর হে জাহান্নামীরা, তোমরাও শোনো, মৃত্যু এখন চিরঅবলুপ্ত। এমতো ঘোষণা শুনে জান্নাতবাসীরা হবে অত্যন্ত আনন্দিত। আর জাহান্নামবাসীরা হবে দুঃখে দুঃখে জর্জরিত। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী এবং মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন, ওই বর্ণনায় একথাও এসেছে যে— চূড়ান্ত মীমাংসার দিন মৃত্যুকে আনা হবে শাদা কালো ডোরাকাটা মেঘের আকারে.....।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এইভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি'। এখানে 'লাঘব করা হবে না' অর্থ এক মুহূর্তের জন্য তাদের শাস্তি বন্ধ রাখা হবে না। বরং উপর্যুপরি শাস্তির কারণে ক্রমাগত পোক্ত ও পুরুষ্ট হতে থাকবে তাদের গাত্রত্বক। পুনঃপুনঃ উসকে দেয়া হতে থাকবে নরকানল।

এখানে 'কাফুর' অর্থ অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ্পাক প্রদত্ত নেয়ামতের অবমাননাকারী। প্রকারান্তরে আল্লাহ্কে অস্বীকারকারী।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও। আমরা সৎকর্ম করবো, পূর্বে যা করতাম তা করবো না'।

www.eelm.weebly.com

এখানে ‘সুরাখ’ অর্থ আর্তনাদ, চিৎকার, কাতর ফরিয়াদ। ‘রব্বানা’ আখরিজনা’ অর্থ হে আমাদের প্রভুপালক! আমদেরকে নরকাগ্নি থেকে নিষ্কৃতি দাও। ‘না’মাল সলিহা’ অর্থ আমরা সৎকর্ম করবো। অর্থাৎ আমাদেরকে পৃথিবীতে পুনরায় পাঠিয়ে দাও। আমরা আর ভুল করবো না। সেখানে গিয়ে শুধু সৎকর্ম করবো। অথবা তারা আক্ষেপানলে জর্জরিত হয়ে বলবে, পৃথিবীতে বসবাসের সময় আমাদের দুষ্কর্মগুলোকেই আমরা মনে করতাম সৎকর্ম। এখন সে ভুল আমাদের ভেঙেছে। সুতরাং প্রকৃত সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য আমাদেরকে আর একবার সুযোগ দাও। আগের মতো ভুল আর আমরা কিছুতেই করবো না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আমি কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে’।

এখানে ‘দীর্ঘ জীবন’ অর্থ কতো বৎসরের জীবন, সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্নরকম মন্তব্য করেছেন। আতার অভিমত উল্লেখ করে কালাবী মন্তব্য করেছেন, আঠারো বৎসর। হাসান বাসরী বলেছেন, চল্লিশ বৎসর। হজরত আলী ও হজরত ইবনে আব্বাসের মতে ষাট বৎসর। আর এটাই ওই বয়োক্রমকাল, যখন আল্লাহ্পাকের দরবারে অজুহাত উত্থাপন করার আর কোনো উপায়ই থাকে না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মানুষ যখন ষাট বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ্ সকাশে তার কোনো ওজর আপত্তি উত্থাপনের অবকাশই আর থাকে না। তাঁর নিকট থেকে বায্যার আহমদ ও আবদ ইবনে হুমাইদও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে ঘোষণা করা হবে, ষাট বৎসর বয়স যারা পেয়েছিলো, তারা কোথায়? এই বয়স সম্পর্কেই তো আল্লাহ্ বলেছেন ‘আওয়া লাম নুআ’মমির.........।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসের বক্তব্যার্থ এই যে, কেউ ষাট বৎসর বয়সে পৌঁছলে আল্লাহ্পাক লোপ করে দেন তার অনুযোগ উত্থাপনের অবকাশ। কারণ এর বয়স আর স্বাভাবিক বয়স নয়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি এবং হজরত আনাস থেকে আবু ইয়ালী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের সাধারণ বয়স হবে ষাট থেকে সত্তর বছর। সত্তর অতিক্রম করবে খুব কম সংখ্যক। কিন্তু একথার অর্থ এরকম নয় যে, ষাট বছরের পূর্বের অজুহাত গৃহীত হবে। কারণ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে উন্মেষ ঘটে মতিস্থিরতার। তখন সে পরিগণিত হয় দায়িত্বশীল বলে। তার চিন্তায় তখন আসে সদুপদেশ গ্রহণ করার প্রবৃত্তি। সুতরাং শরিয়তের বিধিবিধান পরিত্যাগ করা তার জন্য হয় তখন একান্ত অশোভন। বিশেষ করে ইমানের ব্যাপারে তার কোনো অজুহাতই আর গৃহীত হয় না। হতে পারে না।

www.eelm.weebly.com

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিলো। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন করো; জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই'।

'নাজীর' অর্থ সতর্ককারী। এখানে শব্দটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে। অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা এরকমই বলেছেন। সুদ্দীর উক্তিরূপে ইবনে আবী হাতেম এবং জায়েদের অভিমতরূপে ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীর এরকমই বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'সতর্ককারী' অর্থ আল কোরআন। শব্দটি সাধারণার্থক। তাই সকল নবী-রসুল এবং সকল প্রত্যাদেশিত গ্রন্থই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে এই উম্মতের সতর্ককারী কেবল রসুল স. এবং কোরআন মজীদ। কেননা রসুল স. এবং কোরআন মজীদ অস্বীকারকারীদের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

কেউ কেউ বলেছেন, 'নাজীর' অর্থ সাধারণ বিবেক। এরকম অভিমতের প্রবক্তা তারাই, যারা মনে করেন কেবল বিবেকই ইমান আনয়নের জন্য যথেষ্ট। তাঁরা বলেন, বয়োপ্রাপ্ত লোক যদি হয় শৈলশিখরবাসী, আর সেখানে যদি নবী রসুলের ইমানের ডাক কখনো না-ও পৌঁছে, তবুও তাকে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে এক আল্লাহ্‌র উপর ইমান আনতে হবে। যদি সে এরূপ না করে তবে অবশ্যই হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। কিন্তু এ বিষয়টিও প্রণিধাননীয় যে, 'তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিলো' কথাটি সম্পর্কযুক্ত পূর্ববর্তী বাক্যের 'আমি কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি' কথাটির সঙ্গে। এখন কথা হচ্ছে, সংযোজ্য ও সংযোজিতের মধ্যে সব সময় থাকে বিপরীত সম্পর্ক। সুতরাং এখানে 'নাজীর' অর্থ যদি 'বিবেক' ধরা হয়, তবে বয়স ও বিবেক কি বৈপরিত্যার্থক? প্রাপ্তবয়স্ক হলেই একজন মানুষ দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। আর যদি সে বিবেকবর্জিত হয়, তাহলে একথা কি বলা যাবে না, তার বয়স হয়েছে? যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তার সাক্ষাতে কেউ উপদেশ প্রদান করলে সে উপদেশ গ্রহণ করে না'।

ইকরামা, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এবং ওয়াকী বলেছেন, এখানে 'নাজীর' অর্থ বৃদ্ধাবস্থা। আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মুনজির এই অভিমতটি সংকলন করেছেন কেবল ইকরামা থেকে। আর ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকী উদ্ধার করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। বলা হয়েছে, বৃদ্ধাবস্থা ও পক্ককেশ হচ্ছে মৃত্যুর বারতা। বাগবী একটি সাহাবীবচন উল্লেখ করে বলেছেন, একটি চুল শাদা হলে সাথীদেরকে বোলো, তোমরাও তৈরী হয়ে নাও। দেখছো না মৃত্যু নিকটতর হচ্ছে। কেউ কেউ বলেছেন স্বজন সতীর্থদের মৃত্যুই 'নাজীর' বা সতর্ককারী।

'জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই' অর্থ কেউই সীমালংঘনকারীদের পক্ষাবলম্বন করবে না। কারণ সকলেই জানে, আল্লাহ্‌র শাস্তি প্রতিহত করবার সাধ্য কারো নেই। থাকতেও পারে না।

www.eelm.weebly.com

إِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ
الصُّدُوْرِ ﴿٣٨﴾ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ ؕ فَمَنْ كَفَرَ
فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ؕ وَ لَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا
مَقْتًا ۚ وَ لَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ
شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ
الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى
بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٤٠﴾ اِنَّ
اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ۬ وَلَئِنْ زَالَتَاۤ اِنْ
اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤١﴾

r নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।

r তিনিই তোমাদগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছেন। সুতরাং কেহ কুফরী করিলে তাহার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হইবে। কাফিরদের কুফরী কেবল উহাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী উহাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

r বল, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক সেই সকল শরীকের কথা ভাবিয়াছ কি? তাহারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করিয়া থাকিলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে উহাদের কোনো অংশ আছে কি? নাকি আমি উহাদিগকে এমন কোনো কিতাব দিয়াছি যাহার প্রমাণের উপর ইহারা নির্ভর করে? বস্তুত জালিমরা একে অপরকে মিথ্যাপ্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে।

r আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাহাতে উহারা স্থানচ্যুত না হয়। উহারা স্থানচ্যুত হইলে তিনি ব্যতিত কে উহাদিগকে সংরক্ষণ করিবে? তিনি তো অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অবশ্যই আল্লাহ্ জানেন অন্তরীক্ষমণ্ডল ও ধরণীর সকল অদৃশ্য বিষয়। মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে কী ভাবের উদয় হয়েছিলো, হয় ও হবে, সবকিছুই তাঁর জানা। সুতরাং হে মানুষ! সাবধান হও। তোমরা তাঁর অতুলনীয় জ্ঞান ও অপরীমেয় ক্ষমতার বাইরে যেহেতু নও, সেহেতু একান্ত অনুগত হও তাঁর, তাঁর রসুলের এবং তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম ইসলামের।

পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং কেউ কুফরী করলে তার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফেরদের কুফরী কেবল তাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে; এবং কাফেরদের কুফরী তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে'।

এখানকার 'খলাইফা' শব্দটি 'খলিফা'এর বহুবচন। যেমন 'খলীফ' শব্দের বহুবচন 'খুলাফা'। কেউ কারো স্থালাভিসিক্ত হলে তাকে বলে 'খলীফাহ'। এমতাবস্থায় 'খলাইফা' এর সম্বোধ্যস্থল হবে গোটা মানব সমাজ। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য হবে— তোমাদের পূর্বসূরিদের অতীতায়নের পর তিনি তোমাদেরকে করেছেন তাদের স্থলাভিসিক্ত। প্রতিনিধি।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'খলীফা' অর্থ প্রতিনিধিত্ব, রাজত্ব, রাষ্ট্রাধিপত্য। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন পৃথিবীর সর্বময় আধিপত্য। তাই তো তোমরা পৃথিবীকে ব্যবহার করতে পারো ইচ্ছামতো। যত্রতত্র নির্মাণ করতে পারো রাষ্ট্র, রাষ্ট্রাধিপত্য।

'মাক্বতুন' অর্থ ক্রোধ, ক্ষোভ, অসন্তোষ, বিরাগ, বিবমিষা। 'ইল্লা খসারা' অর্থ— কেবল ক্ষতি বৃদ্ধি করবে। অর্থাৎ পরলোকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রত্যাখ্যানপ্রবণতা বাড়িয়ে তুলবে তাদেরই আত্মক্ষোভ, আত্ম-ধিক্কার ও আত্ম-গ্লানি, ফলে এতে করে বৃদ্ধি হতে থাকবে তাদের ক্ষতি। কেবলই ক্ষতি।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো, সেই সকল শরীকের কথা ভেবে দেখেছো কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমণ্ডলী সৃষ্টিতে তাদের কোনো অংশ আছে কি'?

এখানে 'শুরাকাআ' অর্থ পৌত্তলিকদের দেব-দেবী, বিগ্রহ-প্রতিমা। এখানকার বক্তব্যটি বিশ্লেষিত হতে পরে দু'ভাবে— ১. তোমরা তাদেরকে নির্বাচন করেছো আল্লাহ্র সমকক্ষ ২. তোমরা তোমাদের সম্পদে তাদেরকে করে নিয়েছো অংশীদার। 'আম লাহুম শিরকুন' অর্থ, আকাশ সৃষ্টিতে তোমরা তোমাদের পূজনীয় দেব-দেবীদেরকে অংশী নির্ধারণ করেছো। আর 'আরূনী' অর্থ আমাকে দেখাও, বলো।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'না কি আমি তাদেরকে এমন কোনো কিতাব দিয়েছি, যার প্রমাণের উপর এরা নির্ভর করে'? মুকাতিল 'আমি কি তাদেরকে এমন কোনো কিতাব দিয়েছি' কথাটির অর্থ করেছেন— আমি কি মক্কার পৌত্তলিকদেরকে এমন কোনো গোপন গ্রন্থ দিয়েছি, যা তারা এখন প্রকাশ করছে? আর ওই গ্রন্থের ভিত্তিতে অংশীদার নির্ধারণ করছে তাদের বিগ্রহগুলোকে?

এরপর বলা হয়েছে— 'বস্তুত জালেমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে'। এ কথার অর্থ—সীমালংঘনকারীদের চিরাচরিত স্বভাব এই যে, তারা একজন অপর জনকে মিথ্যা আশার কথা শোনায়। যেমন তাদের পূর্বসূরীরা বলেছে, পূজিত প্রতিমারা আল্লাহ্র দরবারে তাদের পূজকদের জন্য সুপারিশ করবে। আর একথাই নির্বিবাদে ও নির্বিচক্ষণতায় মেনে নিয়েছে তাদের উত্তরসূরীরা। এভাবেই শুরু হয়েছে মিথ্যা আশা ও প্রতিজ্ঞার অপপরম্পরা।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়, তারা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে তাদেরকে সংরক্ষণ করবে'? একথার অর্থ— আল্লাহ্ যেমন আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা তেমনি এতদুভয়ের সংরক্ষণকারী। সৃজন ও সংরক্ষণ সম্পূর্ণই তাঁর অভিপ্রায় ও ক্ষমতায়ত্ত। যদি এরকম না হতো, তবে এই মহাসৃষ্টিতে সৃষ্টি হতো মহাবিপর্যয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি তো অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ'।

'হালীম' অর্থ ধৈর্যশীল, সহনশীল, সহিষ্ণু। আল্লাহ্পাক চরমতম পর্যায়ের সহনশীল বলেই পাপী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না। তারা যদি শাস্তিকে ত্বরান্বিত করতে বলে, তবুও না। যদি এরকম না হতো, তবে কেবল আকাশ-পৃথিবীর সংরক্ষণাভিপ্রায় পরিত্যাগ করলেই তো সবকিছু হয়ে যেতো বিশৃঙ্খল। কোনো প্রাণীই আর তখন রক্ষা করতে পারতো না তাদের অস্তিত্ব।

ইবনে আবী হেলালের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, রসুল স. এর মহাআর্বিভাবের পূর্বের মক্কার পৌত্তলিকেরা বলতো, আল্লাহ্ যদি আমাদের মধ্যে কোনো নবী প্রেরণ করতেন, তবে আমরা হয়ে যেতাম তাঁর একান্ত অনুগত। হয়ে যেতাম তাঁর প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থের একনিষ্ঠ অনুগামী, আমাদের পূর্বজরা যে সৌভাগ্য পায়নি। তাদের এমতোকথার সূত্রেই অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত।

সূরা ফাতির ঃ আয়াত ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۙ ﴿٤٢﴾

www.eelm.weebly.com

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ
السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا
فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا
فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا
كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

r ইহারা দৃঢ়তার সহিত আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিত যে, ইহাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসিলে ইহারা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হইবে; কিন্তু ইহাদের নিকট যখন সতর্ককারী আসিল তখন তাহা কেবল উহাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করিল—

r পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট ষড়যন্ত্র উহার উদ্যোক্তাদিগকেই পরিবেষ্টন করে। তবে কি ইহারা প্রতীক্ষা করিতেছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহ্‌র বিধানের কখনও কোনা পরিবর্তন পাইবে না এবং আল্লাহ্‌র বিধানো কোন ব্যতিক্রমও দেখিবে না।

r ইহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে ইহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হইয়াছিল তাহা দেখিতে পাইত। উহারা তো ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর বলশালী ছিল। আল্লাহ্ এমন নহেন যে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁহাকে অক্ষম করিতে পারে; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

r আল্লাহ্ মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকেন। অতঃপর তাহাদের নির্দিষ্ট কাল আসিয়া গেলে আল্লাহ্ তো আছেন তাঁহার বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. এর মহাপ্রকাশের পূর্বে মক্কার অংশীবাদীরা যখন জানতে পারলো, ইহুদী-খৃষ্টানেরা তাদের প্রতি প্রেরিত নবী-রসুলগণের প্রতি অসত্যারোপ করতো, তখন তারা বললো, তাদের উপরে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। তারা তাদের প্রতি প্রেরিত অবতারগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ্‌র শপথ। আমরা হলে নিশ্চয় ওরকম করতাম না। ভবিষ্যতে যদি আমরা আমাদের সম্প্রদায়ভূত কোনো প্রেরিত পুরষ পাই, তবে আমরা হবো তাঁর আন্তরিক অনুরাগী। এরকম আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতাম, যা তারা পারেনি। তাদের এমতো মনোভাবকেই তুলে ধরা হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতে। উল্লেখ্য, ইহুদী ও খৃষ্টানেরা ছিলো পরস্পরের প্রতি ঘোর বিদ্বেষপরায়ণ। তারা সবসময় পরস্পরকে গালি দিতো ধর্মভ্রষ্ট বলে। তাদের এরকম আচরণের কথা জানতে পেরেই মক্কার অংশীবাদীরা এরকম মন্তব্য করেছিলো।

'কিন্তু যখন সতর্ককারী এলো, তখন তা কেবল তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করলো' অর্থ, কিন্তু যখন তাদেরই সমাজে মহাঅভ্যুদয় ঘটলো সর্বশেষ রসুলের, তখন তারা ভুলে গেলো তাদের শপথের কথা। হয়ে উঠলো তাঁর ঘোর প্রতিপক্ষ। মহাসত্যের প্রতি তাদের বৈরী মনোভাব দিন দিন হয়ে উঠতে লাগলো প্রকটতর।

পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে'। একথার অর্থ— মুখে তারা যে কথাই বলুক না কেনো, তাদের সত্তাগত অবস্থান ছিলো সত্য থেকে অনেক ব্যবধানে। তাই তো প্রকাশ করতে পারতো ঔদ্ধত্য এবং রচনা করতে পারতো কূটচক্রান্ত। কালাবী বলেছেন, এখানে 'কূট ষড়যন্ত্র' অর্থ অংশীবাদিতায় ঐকমত্য পোষণ করা। আমি বলি, তারা তাদের মন্ত্রণাসভায় পারস্পরিক পরামর্শ বিনিময়ের মাধ্যমে ঠিক করেছিলো, রেসালতের দাবিদার ব্যক্তিটিকে দিতে হবে তিনটি শাস্তির যে কোনো একটি— বন্দী, হত্যা অথবা দেশান্তর। তাদের এমতো অপঐকমত্যকে এখানে বলা হয়েছে 'কূট ষড়যন্ত্র'।

এরপর বলা হয়েছে— 'কূট ষড়যন্ত্র তার উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে'। একথার অর্থ— কূট ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেরাই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়, যেমন অপরের জন্য গর্ত খননকারীরা নিজেরাই পতিত হয় স্বসৃষ্ট গর্তে। বদর যুদ্ধে তাদের সেরকমই অবস্থা ঘটেছিলো। কেউ কেউ নিহত হয়েছিলো। কেউ কেউ হয়েছিলো বন্দী। আর অবশিষ্টকে বরণ করতে হয়েছিলো পরাজয়ের গ্লানি।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে কি তারা প্রতীক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের'? একথার অর্থ— তারা কি তবে তাদের পূর্ববর্তী সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের অনুসরণেই স্থায়ী হয়ে থাকতে চায়। ধ্বংস হয়ে যেতে চায় তাদের মতো সর্বনাশা গজবে? হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, এটাই কি তাদের চূড়ান্ত অভিপ্রায়?

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তুমি আল্লাহ্র বিধানের কখনো কোনো পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহ্র বিধানের কোনো ব্যতিক্রমও দেখবে না'। একথার অর্থ— দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই হচ্ছে আল্লাহ্র চিরাচরিত রীতি। এ রীতির কোনো ব্যত্যয় নেই। সুতরাং হে আমার রসুল! অংশীবাদীদের অপকথন ও অপআচরণে ব্যথিত হবেন না। মক্কাবাসীদেরকে কিছুকাল অবকাশ দিন। নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পরেও যদি তাদের চৈতন্যোদয় না হয়, তবে আল্লাহ্র চিরন্তনরীতি বলবৎ হবেই। মহাশাস্তি নেমে আসবে অংশীবাদীদের উপর।

এর পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি? তাহলে এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিলো তা দেখতে পেতো। তারা তো এদের চেয়েও বলশালী ছিলো'।

এখানে 'এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি' প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। একটি লুপ্ত বাক্যের সঙ্গে রয়েছে এর বক্তব্যগত যোগসূত্র। ওই লুপ্ত বাক্য সহকারে এখানকার বক্তব্যার্থটি রূপ পরিগ্রহ করবে এরকম— মক্কাবাসী অংশীবাদীরা কি বিগত যুগের অংশীবাদীদের অশুভ পরিণতির চিহ্নসমূহ পরিদর্শন করেনি? অবশ্যই করেছে। বাণিজ্যব্যপদেশে সিরিয়া, ইরাক ও ইয়েমেনে যাতায়াতকালে তারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছে ওই দাম্ভিক অংশীবাদীদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ। তারা তো ছিলো এদের চেয়েও অধিক প্রতাপশালী। তৎসত্ত্বেও তাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হয়েছিলো। স্বচক্ষে তাদের শোচনীয় পরিণাম দেখেও কি এদের চৈতন্যোদয় ঘটবে না?

এরপর বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ এমন নন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোনোকিছু তাঁকে অক্ষম করতে পারে। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ চিরঅজেয়। তাঁর অভিপ্রায় ও শক্তিমত্তাকে অকার্যকর করতে পারে, এমন কেউ অথবা কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বজ্ঞ, তাই প্রতিটি বিষয়ের মূলতত্ত্ব ও চাহিদা সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে অবগত। আর তিনি সর্বশক্তিধরও। তাই তাঁর নিকটে নতি স্বীকার করা ছাড়া কারো কোনো প্রকার উপায়ই নেই।

শেষ আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোনো জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন'।

এখানে 'দাব্বাত্' অর্থ ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল প্রাণী। 'নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত' অর্থ মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়—আল্লাহ্ পাপী ও সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দিলে তো ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবীর বহু নিরপরাধ কীট-পতঙ্গ প্রাণী। তাই অবাধ্যতার ত্বরিৎ শাস্তিদান আল্লাহ্র বিধান

www.eelm.weebly.com

নয়। সেকারণেই তিনি সাধারণভাবে এই নিয়মটি বলবত করেছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যু পর্যন্ত এবং সমষ্টিগতভাবে কিয়ামত পর্যন্ত দেওয়া হবে অবকাশ। যদি কেউ এই সময়ের মধ্যে ফিরে আসে। গ্রহণ করে মহাসত্যের আশ্রয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'অতঃপর তাদের নির্দিষ্টকাল এসে গেলে আল্লাহ্ তো আছেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা'।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'ইবাদ' অর্থ আল্লাহ্র সকল বান্দা। সে অনুগত হোক, অথবা হোক অননুগত। এভাবে বক্তব্যার্থটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্পাক তাঁর দাস-দাসীগণের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সবকিছুই জানেন। সুতরাং এরকম কখনোই হবে না যে, কেউ পাপ করে পার পেয়ে যাবে অথবা কেউ পুণ্য করার পরে হবে বঞ্চিত। সবাইকে যথাসময়ে তিনি যথোপযুক্ত প্রতিফল অবশ্যই দিবেন। শাস্তি অথবা স্বস্তি।

সকল স্তব-স্তুতি আল্লাহ্র । আজ ১১ই সফর ১২০৭ হিজরী সনে সমাপ্ত হলো সুরা ফাতিরের তাফসীর।

সূরা ইয়া-সীন

এই সুরার রুকুর সংখ্যা ৫ এবং আয়াতের সংখ্যা ৮৩। সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সুরা ইয়াসীনের আর এক নাম সুরা মুয়াম্মা। এরকম নামকরণের কারণ এই যে, এই সুরা তার পাঠককে সাধারণভাবে দান করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ এবং দূর করে উভয় জগতের দুঃখ-দুর্দশা। আরো দু'টি নাম রয়েছে এই সুরার— 'দাফিয়া' ও 'ক্বদ্বীয়া'। যেহেতু এই সুরা প্রতিহত করে তার পাঠকের সকল অনিষ্টকে এবং পূরণ করে যাবতীয় প্রয়োজন, তাই এর নাম 'দাফিয়া' ও 'ক্বদ্বীয়া'। যে সুরা ইয়া-সীন পাঠ করবে, সে পুণ্যলাভ করবে কুড়িটি হজপালনের সমান। আর যে এর আবৃত্তি শ্রবণ করবে, সে অর্জন করবে আল্লাহ্র পথে এক হাজার দীনার দান করার পুণ্য। যে এই সুরা লিখবে, তার বক্ষাভ্যন্তরে ভরে দেওয়া হবে অপরিমেয় জ্যোতি, অগণীয় প্রত্যয়, অসংখ্য পুণ্য এবং অননুমেয় অনুগ্রহ। আর তার ভিতর থেকে দূর করে দেওয়া হবে অনেক হিংসা ও বহুসংখ্যক ব্যাধি। হজরত আবু বকর সিদ্দীকের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কেউ শুক্রবারে তার পিতামাতা অথবা অন্য ব্যক্তির সমাধিস্থলে সূরা ইয়া-সীন পাঠ করলে আল্লাহ্ মাফ করে দিবেন তার এই সুরার বর্ণসংখ্যাসমতুল পাপ।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে ইবনে মারদুবিয়া, খতীব ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সুরা ইয়াসীনের অপর নাম মুআ'ম্মা। কেননা এই সুরা সাধারণভাবে তার পাঠককে প্রদান করে ইহ-পারত্রিক কল্যাণ। এই সুরাকে 'দাফিয়া' এবং 'ক্বদ্বীয়া'ও বলা হয়। কারণ এই সুরা অপসারণ করে তার পাঠকের সকল প্রকার অপকৃষ্টতা এবং পূরণ করে যাবতীয় প্রয়োজন।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

يٰسٓ ۚ ﴿١﴾ وَالۡقُرۡاٰنِ الۡحَكِيۡمِ ۙ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ۙ ﴿٣﴾ عَلٰى صِرَاطٍ
مُّسۡتَقِيۡمٍ ﴿٤﴾ تَنۡزِيۡلَ الۡعَزِيۡزِ الرَّحِيۡمِ ۙ ﴿٥﴾ لِتُنۡذِرَ قَوۡمًا مَّاۤ اُنۡذِرَ اٰبَآؤُهُمۡ
فَهُمۡ غٰفِلُوۡنَ ﴿٦﴾ لَقَدۡ حَقَّ الۡقَوۡلُ عَلٰٓى اَكۡثَرِهِمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿٧﴾

r ইয়া-সীন,

r শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের,

r তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত;

r তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।

r কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নিকট হইতে,

r যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার এমন এক জাতিকে যাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে সতর্ক করা হয় নাই, যাহার ফলে উহারা গাফিল।

r উহাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হইয়াছে; সুতরাং উহারা ঈমান আনিবে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইয়া-সীন'।

আবু নাঈম তাঁর 'দালায়েল' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. প্রায়শ কাবাগৃহ প্রাঙ্গণে উচ্চস্বরে কোরআন পাঠ করতেন। মক্কার মুশরিকেরা তাঁর এ কাজকে খুবই মন্দ মনে করতো। একবার তারা ঠিক করলো রসুল স. যখন এভাবে কোরআন পাঠ করতে শুরু করবেন, তখন তারা একযোগে তাঁকে আক্রমণ করবে। একদিন তারা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। কিন্তু বিস্মৃতি হয়ে দেখলো তাদের প্রত্যেকের হাত আটকে রয়েছে তাদের কণ্ঠদেশের সঙ্গে। আর দৃষ্টিশক্তিও হয়েছে অচল। দিক ঠাহর করতে পারছিলো না তারা। বাধ্য হয়ে তারা রসুল স. এর উদ্দেশ্যে সাহায্যপ্রার্থনা করলো। দোহাই পাড়লো আত্মীয়তার। বলা বাহুল্য, তারা সকলেই ছিলো রসুল স.

www.eelm.weebly.com

এর নিকটজন। দয়াল রসুল স. তাদের দুরবস্থা দেখে ব্যথিত হলেন। দোয়া করলেন তাদের বিপদমুক্তির জন্য। তারা রেহাই পেয়ে গেলো। কিন্তু ইমান আনলো না একজনও। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরার শুরু থেকে সপ্তম আয়াত পর্যন্ত।

'ইয়া-সীন' অক্ষর দু'টি অর্থগত ও বিভক্তিগত দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজির মতো, যার মর্ম চিররহস্যাচ্ছন্ন। এধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজির মর্মার্থ জানেন কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয়তম রসুল। আরো জানেন অত্যল্পসংখ্যক বিদ্বজ্জন যাদের জ্ঞান সুগভীর। তাদেরকেই বলা হয় ওলামায়ে রসিখীন।

কেউ কেউ বলেছেন, বনী তাঈয়ের আঞ্চলিক ভাষায় 'ইয়া ইনসান' এর সংক্ষেপিতরূপ হচ্ছে ইয়া-সীন। এভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়— হে মানব। এই অর্থ গ্রহণ করলে বুঝতে হয়, এখানে 'ইয়া-সীন' বলে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'ইয়া-সীন' এর মূলরূপ ছিলো 'ইয়া ইনসীন'। অতি ব্যবহারে লোপ পেয়েছে মধ্যবর্তী 'ইন'। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যোবয়ের প্রমুখ। আবুল আলীয়া বলেছেন, 'ইয়া-সীন' অর্থ 'ইয়া রজুল' (হে মানুষ)। আবু বকর ওয়ারাক বলেছেন, এর অর্থ 'ইয়া সায়্যিদুল বাশার' (হে গণনায়ক)। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এটি একটি শপথ বাক্য। এখানে শপথ করা হয়েছে 'ইয়া-সীন' এর।

পরের আয়াতদ্বয়ের (২, ৩) মর্মার্থ হচ্ছে— শপথ ওই কোরআনের। যার বক্তব্যশৈলী অভূতপূর্ব, শ্রুতিসুখকর, চিত্তহারক ও গভীর প্রজ্ঞাময়— আপনি অবশ্যই রসুলগণের মধ্যে এক মহামর্যাদাসম্পন্ন রসুল।

এখানকার 'ওয়াও' অব্যয়টি শপথার্থক। আর যদি 'ইয়া-সীন'কে শপথবাক্য ধরা হয়, তবে 'ওয়াও' হবে এখানে যোজক অব্যয়।

একটি দ্বিধা ঃ কোনো বিজ্ঞপিত প্রকাশের পশ্চাতে উদ্দেশ্য থাকে দু'টি— শ্রোতাকে অজানা বিষয়ে জ্ঞানদান এবং বক্তারও অবহিতি লাভ। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ওই দুটি উদ্দেশ্যের একটিও নেই। কারণ, রসুল স. আগে থেকেই জানতেন যে, তিনি আল্লাহ্র রসুল। আর আল্লাহ্রও একথা অজানা নয়। কারণ তাঁকে রসুল নির্বাচন করেছেন তিনিই। তাহলে এখানে 'তুমি অবশ্যই রসুলগণের অন্তর্ভুক্ত' বলা হলো কেনো?

দ্বিধা-নিরসন ঃ এখানে রসুল স.কে সম্বোধন করে বক্তব্য উপস্থাপন করা হলেও এর উদ্দেশ্য ছিলো সত্যপ্রত্যাখানকারীদেরকে কথাটি জোরেশোরে জানান। তারা তো রসুল স.কে রসুল বলে মানতো না। তাই তাদেরকে শোনানোর জন্যই আল্লাহ্ এখানে নিঃসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য পেশ করেছেন যে, নিশ্চয়

www.eelm.weebly.com

তুমি রসুলগণের অন্যতম। অতএব বুঝতে হবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশকালে সম্বোধিত জন ও সম্বোধনকারীদের অবহিতি ছাড়া তৃতীয় আর একটি উদ্দেশ্যও থাকে। আর তা হচ্ছে অন্য মানুষকে জানানো।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তুমি সরল পথে অধিষ্ঠিত'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি একত্ববাদের পথে সুদৃঢ়রূপে অধিষ্ঠিত। অথবা অর্থ— হেদায়েতের পথ সরল। আর আপনি সেই সরল পথাধিষ্ঠিত। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াতের 'রসুলগণের অন্তর্ভূত' কথাটির মধ্যেই রয়েছে সরল পথে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে কথাটি এসেছে প্রসঙ্গক্রমে অন্য রসুলগণের সঙ্গে সাধারণভাবে। তাই এখানে পৃথকভাবে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বলা হলো রসুল স.এর সরল পথে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে পরক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নিকট থেকে'। একথার অর্থ— হে আমার সরল পথাধিষ্ঠিত রসুল! যে কোরআন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের গাত্রদাহের কারণ, সেই কোরআন তো আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছেন মহাপরাক্রমশালী ও মহামমতাময় আল্লাহ্।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদিগকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল'। এখানকার 'লিতুনজিরা' (যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো) কথাটির যোগসূত্র রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে' কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনার উপরে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে উদাসীন জনগোষ্ঠীকে সতর্ককরণার্থেই। অথবা 'লিতুনজিরা' কথাটির সংযোগ রয়েছে ৩ সংখ্যক আয়াতের 'তুমি অবশ্যই রসুলগণের অন্তর্ভুক্ত' কথাটির সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি আপনাকে রসুলরূপে একারণেই প্রেরণ করেছি। যেনো আপনি ভীতি প্রদর্শন করতে পারেন পথভ্রষ্টদেরকে।

'মা তুনজিরা' অর্থ যাদেরকে ইতোপূর্বে সতর্ক করা হয়নি। এখানকার 'মা' অব্যয়টি নেতিবাচকার্থক। উল্লেখ্য, হজরত ইসমাইলের মহাতিরোধানের পর থেকে হাজার হাজার বছর ধরে আরব উপদ্বীপ ছিলো নবীশূন্য। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'মা' হচ্ছে যোজক অব্যয়। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচারপর্ব ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভীতিপ্রদর্শনের জন্য যেমন ইতোপূর্বে নবী প্রেরণ করা হয়েছিলো, তেমনি তাদের পরবর্তী বংশধরদেরকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য পাঠানো হয়েছে আপনাকে। কিংবা

www.eelm.weebly.com

বলা যেতে পারে, 'মা' অব্যয়টি এখানে ধাতুমূল। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! তাদের পূর্বপুরুষদেরকে যেমন ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছিলো, তেমনি আপনি ভীতি প্রদর্শন করুন তাদের অধস্তন বংশধরদেরকে।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'তাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হয়েছে, সুতরাং তারা ইমান আনবে না'।

এখানে 'আল ক্বওলু' অর্থ বাণী চিরন্তন। অপর এক আয়াতে সে বাণী ধ্বনিত হয়েছে এভাবে— 'আমি জ্বিন ও মানব দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো'। আর 'ফাহুম লা ইউ'মিনুন' অর্থ তারা অধিকাংশই চিরভ্রষ্ট। তাই তারা কস্মিনকালেও ইমান আনবে না।

ইকরামা সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, একবার আবু জেহেল বললো, এবার আমি মোহাম্মদকে ঠিকমতো বাগে পেলে একটা কিছু হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বো। তার ওই কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৮, ৯

اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝٨ وَ جَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝٩

r আমি উহাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরাইয়াছি, ফলে উহারা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া গিয়াছে।

r আমি উহাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি এবং উহাদিগকে আবৃত করিয়াছি; ফলে উহারা দেখিতে পায় না।

আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে চিরভ্রষ্ট আবু জেহেলকে উদ্দেশ্য করে। অবতরণের প্রেক্ষাপটটি ছিলো এরকম— একদিন আবু জেহেলের সঙ্গীসাথীরা তাকে বললো, ওই তো কাবাপ্রাঙ্গণে মোহাম্মদ। তুমি তার সম্পর্কে যা বলো তা করে দেখাও দেখি।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবু জেহেল ও তার সুহৃদ জনৈক মাখজুমীকে লক্ষ্য করে। আবু জেহেল শপথ করে বলেছিলো, আমি এবার মোহাম্মদের দেখা পেলেই পাথরের আঘাতে তার মস্তক চূর্ণ করবো। এরপর একদিন সে রসুল স.কে দেখতে পেলো নামাজ পাঠরত অবস্থায়। সে একটি

www.eelm.weebly.com

প্রস্তরখণ্ড হাতে নিয়ে রসুল স. এর দিকে এগিয়ে পাথরটি নিক্ষেপ করতে গেলো। কিন্তু তার হাত জড়িয়ে গেলো তারই গ্রীবাদেশের সঙ্গে এবং পাথরটি পড়লো তারই অন্য হাতের উপর। সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরে এলো তার সাথীদের কাছে। বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলো তাদের কাছে। পরক্ষণেই সে ধপাস করে পড়ে গেলো মাটিতে। মাখজুমী বললো, ঠিক আছে, এবার আমিই যাচ্ছি। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে যেতেই তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে গেলো অন্তর্হিত। রসুল স. তখন নামাজে কোরআন পাঠ করছেন। কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনতে পেলো সে। কিন্তু তাঁকে দেখতে পেলো না। বাধ্য হয়ে সে ফিরে এলো তার সাথীদের কাছে। কিন্তু তাদেরকেও দেখতে পেলো না। সাথীরা বললো, কী হলো তোমার। সে বললো আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সাংঘাতিক ব্যাপার! আমি মোহাম্মদের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখলাম, এক ভয়ংকর আকৃতির উট তার এবং আমার মধ্যে আড়াল হয়ে মুখব্যাদান করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি মোহাম্মদের কোরআন পাঠ শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিলো, আর একটু অগ্রসর হলে উটটি আমাকে খেয়েই ফেলবে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো 'আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি'।

'ফাহিয়া ইলাল আজক্বানি' অর্থ চিবুক পর্যন্ত। গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি দেওয়ার কারণেই ঘাড় ঘোরাতে পারছিলো না। বাগবী লিখেছেন, এখানে কথাটি বলা হয়েছে রূপকার্থে। হাতের কথা আর বলা হয়নি। সুতরাং হাতের কথাটা ধরে নিলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তাদের হাত গলায় জড়িয়ে শিকল দিয়ে বেঁধে দিয়েছি চিবুক পর্যন্ত।

'ফাহুম মুক্বমাহুন' অর্থ ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ চিবুক পর্যন্ত শিকল থাকার কারণে তাদের মুখমণ্ডল ছিলো ঊর্ধ্বমুখী। চক্ষু ছিলো বন্ধ। সে কারণে তারা কিছু দেখতে পারছিলো না।

বায়হাকী তাঁর দারায়েল গ্রন্থে সুদ্দী সগীরের পদ্ধতিতে কালাবী থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার মাখজুম গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক ঠিক করলো, তারা রসুল স.কে হত্যা করবে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো আবু জেহেল ও ওলীদ ইবনে মুগীরা তারা সুযোগ খুঁজতে লাগলো। একদিন রসুল স. নামাজ পাঠ করছিলেন। তাঁর কোরআন পাঠ শুনতে পাচ্ছিলো ওই দুর্বৃত্তরা। তারা পরামর্শ করে ঠিক করলো, প্রথমে এগিয়ে যাবে ওলীদ। সে অগ্রসর হলো। কিন্তু রসুল স.কে দেখতে পেলো না। শ্রুত হচ্ছিলো কেবল তাঁর কোরআন পাঠের আওয়াজ। সে ফিরে এসে সাথীদেরকে সব খুলে বললো। উঠে দাঁড়ালো আর একজন। একটু অগ্রসর হতেই তার অবস্থাও হলো তথৈবচ। সেও কেবল কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনলো। কিন্তু দেখতে

www.eelm.weebly.com

পেলো না কোনো কিছু। সামনে অগ্রসর হলে মনে হতো আওয়াজ আসছে পিছনের দিকে। সে দিকে যেতে শুরু করলে শুনতো আওয়াজ আসছে বিপরীত দিক থেকে। তাই বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসা ছাড়া তারও কোনো উপায় রইলো না। সে কথাই বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (৯)।

বলা হয়েছে— 'আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদেরকে আবৃত করেছি; ফলে তারা দেখতে পায় না'।

ভাষ্যকারগণ বলেছেন, এটা একটা দৃষ্টান্ত বা উপমা। বাস্তবে তারা অন্ধ হয়নি। বরং আল্লাহ্পাক তাদের সামনে এক বিভ্রাটপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিলেন, ফলে তাদের জ্ঞানচক্ষু হয়ে গিয়েছিলো পর্দাবৃত। ফলে তারা বঞ্চিত হয়েছিলো সত্যদর্শন থেকে। হারিয়ে ফেলেছিলো ইমানের পথ। এভাবে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের পরিপূর্ণ বক্তব্য দাঁড়াবে এরকম— যেমন কোনো লোককে পরিয়ে দেওয়া হলো একটি কঠিন গলবন্ধ যা প্রসারিত ছিলো চিবুক পর্যন্ত। সে ঘাড় ঘোরাতে পারলো না। মুখমণ্ডলকে রাখতে হলো ঊর্ধ্বমুখী। ফলে তার কাছ থেকে সঠিক পথের দিশা গেলো হারিয়ে। চিরদিনের জন্য সে হয়ে পড়লো পথভ্রষ্ট। চিরসত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দৃষ্টান্ত এরকমই। অথবা কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— তারা যখন আমার রসুলকে সংহার করতে উদ্যোগী হলো, আমি তখন তাঁকে রক্ষার জন্য আততায়ীদের সম্মুখে সৃষ্টি করে দিলাম বিচিত্র বিপত্তি। এভাবে প্রতিহত করলাম তাদের অপঅভিলাষ। অথবা বলা যেতে পারে— এখানকার বক্তব্যটি হবে ভবিষ্যৎকালবোধক এবং এমতাবস্থায় মর্মার্থ দাঁড়াবে— মহাবিচারের দিবসে আমি তাদেরকে প্রবেশ করাবো নরকে। তাদের গলায় চিবুক পর্যন্ত পুরু আগুনের গলবন্ধ পরিয়ে দিব তখন। চতুর্দিকে দাঁড় করিয়ে দিবো আগুনের দেয়াল। এর কোনো অন্যথা হবে না। এই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করলে বুঝতে হবে বিষয়টি অতি নিশ্চিত। যেনো তা হয়েই গিয়েছে। এই আবহটিকে ফুটিয়ে তুলবার জন্যই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালার্থক বাকভঙ্গিমা।

সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ১০, ১১, ১২

وَسَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَاَنۡذَرۡتَهُمۡ اَمۡ لَمۡ تُنۡذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۰﴾ اِنَّمَا
تُنۡذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكۡرَ وَخَشِيَ الرَّحۡمٰنَ بِالۡغَيۡبِ ۚ فَبَشِّرۡهُ
بِمَغۡفِرَةٍ وَّاَجۡرٍ كَرِيۡمٍ ﴿۱۱﴾ اِنَّا نَحۡنُ نُحۡيِ الۡمَوۡتٰى وَنَكۡتُبُ مَا
قَدَّمُوۡا وَاٰثَارَهُمۡ ؕ وَكُلَّ شَىۡءٍ اَحۡصَيۡنٰهُ فِىۡۤ اِمَامٍ مُّبِيۡنٍ ﴿۱۲﴾

www.eelm.weebly.com

r তুমি উহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর, উহাদের পক্ষে উভয়ই সমান; উহারা ইমান আনিবে না।

r তুমি কেবল তাহাকেই সতর্ক করিতে পার যে উপদেশ মানিয়া চলে এবং না দেখিয়া দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে। অতএব তাহাকে তুমি ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের সংবাদ দাও।

r আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখিয়া রাখি যাহা উহারা অগ্রে প্রেরণ করে ও যাহা উহারা পশ্চাতে রাখিয়া যায়, আমি তো প্রত্যেক জিনিষ স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রাখিয়াছি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি তাদেরকে সতর্ক করো, অথবা না করো, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা ইমান আনবে না'। এ ব্যাপারে সবিস্তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যায়।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তুমি কেবল তাকেই সতর্ক করতে পারো, যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে। অতএব তাকে তুমি ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের সংবাদ দাও'।

এখানে 'আজ জিকরু' অর্থ সদুপদেশ। অর্থাৎ আল কোরআন। আর 'মেনে চলে' অর্থ কোরআনের মর্মার্থ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। শিক্ষণীয় বিষয়াবলীকে কার্যে রূপ দেয়। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করে' অর্থ ভয় করে তাঁর শাস্তিকে। অথবা এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— হে আমার রসুল! আপনার ভীতি-প্রদর্শন ফলপ্রসূ হবে তাদের জন্য, যারা কোরআনের অনুগামী এবং যারা ভয় করে আল্লাহ্‌র শাস্তিকে। তাদেরকেই আপনি সংবাদ দিন মহামার্জনার ও মহাপুরস্কারের।

লক্ষণীয়, এখানে প্রথমে আল্লাহ্‌কে ভয় করার কথা বলা হয়েছে। অথচ শেষে বলা হয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের কথা। অর্থাৎ বলা হয়েছে, তিনি করুণাময়। এমতাবস্থায় এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে যে করুণাময় যিনি, তাঁকে ভয় করার অর্থ আসলে কী? এর জবাবে বলা যেতে পারে, তিনি করুণাময় জানা সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে নির্ভয় হওয়া অনুচিত। চূড়ান্ত পর্যায়ের ইমান একথা স্বীকারও করে না। কেননা পরিপূর্ণ ইমানের অবস্থান হচ্ছে ভয় ও আশার মধ্যখানে।

'বিল গইব' অর্থ না দেখে। অর্থাৎ তাঁকে না দেখেই বিশ্বাস করা এবং তাঁর শাস্তির কথা স্মরণ করে নীরবে নিভৃতে রোদন করা। 'বিমাগফিরাতি' অর্থ ক্ষমা, পাপক্ষয়ের শুভসংবাদ। আর 'আজ্‌রিন কারীম' অর্থ মহাপুরস্কার, স্থায়ী জান্নাত।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখে রাখি, যা তারা আগে প্রেরণ করে ও যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়'। একথার

www.eelm.weebly.com

অর্থ— মৃত্যুর পর সকলের পুনরুত্থান ঘটাবো আমিই, অথবা মৃতসম অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা থেকে জীবনসম জ্ঞান ও পথপ্রাপ্তি দান করি আমিই। আর আমার ফেরেশতাদের দ্বারা লিখে রাখি সকলের ভালো অথবা মন্দ কর্মকাণ্ডসমূহ।

এখানে 'আছার' অর্থ কীর্তি। কীর্তি হতে পারে দু'ধরনের, সু এবং কু। সুকীর্তি হচ্ছে বিদ্যাশিক্ষাদান, অর্থদান, অপ্রচল সুন্নতের সচলায়ন, জনহিতকর কোনো রীতির প্রবর্তনা ইত্যাদি। আর কুকীর্তি হচ্ছে মিথ্যার বিস্তারণ, অত্যাচারের ভিত্তি স্থাপন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকর্মে সহায়তাদান, অপরীতির উদ্ভাবন ইত্যাদি। রসুল স. জানিয়েছেন, কেউ যদি ইসলামে কেনো সুপ্রথা প্রবর্তন করে এবং তা অনুসৃত হতে থাকে প্রজন্মপরম্পরায়, তবে নিজের প্রাপ্য পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে অনুসারীদের পুণ্যও সে পাবে। আবার অনুসারীদের পুণ্যও এতটুকু কমবে না। আবার ইসলামে কুপ্রথার প্রবর্তকেরা নিজের পাপের সঙ্গে সঙ্গে পাবে তার অনুসারীদের পাপের সমান পাপ। কিন্তু অনুসারীদের পাপও এতে করে কিছুমাত্র কমবে না।

কোনো কোনো বিদ্বান এখানকার 'আছার' শব্দটির অর্থ করেছেন— মসজিদের গমন পথের পদচিহ্ন। এমতাবস্থায় 'লিখে যা অগ্রে প্রেরণ করে' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— নামাজীদের মসজিদের গমনপথের পদচিহ্নও আমি লিখে রাখি। হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেছেন রসুল স. বলেছেন, নামাজের সর্বাধিক পুণ্য পায় সে-ই, যে মসজিদে আসে দূরবর্তী স্থান থেকে। আর যে ইমামের সঙ্গে নামাজ আদায়ের জন্য অপেক্ষমাণ থাকে, সে পায় তার চেয়ে বেশী পুণ্য, যে নামাজের পর হয়ে যায় নিদ্রাভিভূত। বোখারী, মুসলিম।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, মসজিদে নববীর কিছু অংশ ছিলো ফাঁকা। বনী সালমার লোকজন সেখানে তাদের বসতবাটি নির্মাণ করতে মনস্থ করলো। বিষয়টি রসুল স. এর কর্ণগোচর হলে তিনি তাদেরকে ডেকে বললেন, শুনলাম তোমরা নাকি মসজিদের পাশে বাড়ি বানাতে চাও? তারা বললো, আপনি ঠিকই শুনেছেন হে আল্লাহ্‌র রসুল! তিনি স. তখন বললেন, তোমরা যেখানে বসবাস করছো সেখানেই বসবাস করো। শুনে রাখো মসজিদগামী পথের পদচিহ্নও লিখে রাখা হয়। মুসলিম। হজরত আনাস সূত্রে বাগবীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন তিরমিজি ও হাকেম। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। আর হাকেম বলেছেন, যথাসূত্রবিশিষ্ট।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমি তো প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি'। একথার অর্থ আমি প্রতিটি বিষয় পূর্বাহ্নে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি সুরক্ষিত ফলকে। এখানে 'আহসানাহু' অর্থ লিপিবদ্ধরূপে সংরক্ষিত রেখেছি, অথবা রেখেছি লিপিবদ্ধ আকারে। আর 'ইমামুম মুবীন' অর্থ সুস্পষ্ট কিতাব বা লওহে মাহফুজের সুরক্ষিত ফলক।

www.eelm.weebly.com

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾

r উহাদের নিকট বর্ণনা কর এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত; যখন তাহাদের নিকট আসিয়াছিল রাসূলগণ।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি মক্কার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট দৃষ্টান্তরূপে বর্ণনা করুন এক জনপদবাসীদের একটি ইতিবৃত্ত। তাদের কাছেও প্রেরণ করা হয়েছিলো আল্লাহ্র এক রসুলকে।

এখানে 'দ্বরব' অর্থ একই রকম। অর্থাৎ ওই জনপদবাসীদের ইতিবৃত্তটির সঙ্গে তোমাদের মিল রয়েছে। আর এখানে 'আসহাবাল ক্বরিয়াহ' জনপদের অধিবাসী বলে বুঝানো হয়েছে ইনতাকিয়াবাসীদেরকে।

বাগবী লিখেছেন, ঐতিহাসিকদের বর্ণনা এরকম— হজরত ঈসা তাঁর দুজন সহচরকে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করলেন বন্দর নগরী ইনতাকিয়ায়। নগরীর উপকণ্ঠে পৌঁছে প্রতিনিধিদ্বয় সাক্ষাৎ পেলেন একজন বৃদ্ধ মেষপালকের। তার নাম ছিলো হাবীব। সে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কে? তাঁরা বললেন আল্লাহ্র প্রতিনিধি। আমরা এসেছি আপনাদেরকে সত্যধর্মের আমন্ত্রণ জানাতে। বৃদ্ধ বললো, আপনাদের নিকটে কি কোনো নিদর্শন আছে? তাঁরা বললেন, অবশ্যই। আল্লাহ্র নির্দেশে আমরা ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করি। জন্মান্ধকে করি দৃষ্টিদান। আরোগ্য করি কুষ্ঠরোগীকে। বৃদ্ধ বললো, আমার এক সন্তান দু'বছর ধরে শয্যাশায়ী, যদি পারেন, তবে তাকে সুস্থ করে দিন। তাঁরা বললেন, আমরা রাজি। বৃদ্ধ তখন তাঁদেরকে নিয়ে তার বাড়িতে গেলেন। পীড়িত বালকটির গায়ে হাত বুলালেন তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে গেলো সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই এ ঘটনা ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। শুরু হলো লোকজনের আনাগোনা। প্রতিনিধিদ্বয়ের করস্পর্শে ভালো হয়ে গেলো অনেক রোগী।

ইনতাকিয়াবাসীদের রাজা ছিলো একজন রোমীয়। সে ছিলো প্রতিমাপূজক। তার কানেও পৌঁছলো প্রতিনিধিদ্বয়ের সংবাদ। সে তখন তাঁদেরকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কে? তাঁরা বললেন, নবী ঈসার প্রতিনিধি। আপনাকে আমরা সত্যধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ত্যাগ করুন অন্ধ ও বধির প্রতিমার উপাসনা। গ্রহণ করুন ওই একক মহাসৃজয়িতা ও মহাপালয়িতা স্রষ্টাকে। যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। রাজা বললো, দেবপ্রতিমা ছাড়া আবার অন্য কোনো প্রভুপালনকর্তা আছে নাকি? প্রতিনিধিদ্বয় বললেন, নিশ্চয়ই যিনি আপনাকে, আমাদেরকে এবং আপনার পূজনীয় দেবপ্রতিমাসহ অন্য সকলকে এবং সকল

www.eelm.weebly.com

কিছুকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মহাবিশ্বের একমাত্র সৃজক ও পালক। রাজা বললো ঠিক আছে। তোমরা আজ যাও। আমি তোমাদের ব্যাপারে একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। প্রতিনিধিদ্বয় রাজ দরবার থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলেন শহরের দিকে। কতিপয় দুষ্কৃতকারী পিছু নিলো তাঁদের । শহরে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তাঁদেরকে শহীদ করে দিলো ওই দুষ্কৃতকারীরা।

ওয়াহাব বলেছেন, হজরত ঈসা রুহুল্লাহ্ তাঁর দু'জন প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন ইনতাকিয়া নামক নগরীতে। প্রতিনিধিদ্বয় ভাবলেন, প্রথমে আমন্ত্রণ জানাতে হবে রাজাকে। এই ভেবে রাজদর্শনের চেষ্টা করতে লাগলেন তাঁরা। কিন্তু কোনো উপায় বের করতে পারলেন না। দিন কাটাতে লাগলেন আশায় অপেক্ষায়। একদিন রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকের অদূরে অপেক্ষমাণ ছিলেন তাঁরা। হঠাৎ দেখতে পেলেন, রাজা বের হয়ে আসছে প্রাসাদাভ্যন্তর থেকে। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবর। অতর্কিতে উচ্চকিত তকবীর ধ্বনি শুনে রাজা চমকে উঠলো। বিরক্ত হলো পরক্ষণেই। রেগে গিয়ে বন্দী করলো প্রতিনিধিদ্বয়কে। হুকুম দিলো, এদেরকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হোক। প্রত্যেককে করা হোক একশত করে বেত্রাঘাত। এ সংবাদ পৌঁছে গেলো নবী ঈসার নিকটে। তিনি তখন বন্দী প্রতিনিধিদ্বয়ের সাহায্যার্থে প্রেরণ করলেন শামউনকে। শামউন সাধারণ জনতার বেশে গিয়ে উপনীত হলেন ইনতাকিয়ায়। রাজার পারিষদবর্গের সঙ্গে প্রথমে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করলেন তিনি। সফলও হলেন। পারিষদেরা মুগ্ধ হয়ে গেলো তাঁর বাগ্মীতায় ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। রাজ দরবারের আলোচনা প্রসঙ্গে উঠলো তাঁর কথা। রাজা কৌতূহলী হলো। ফলে রাজদরবারে তলব পড়লো তাঁর। শামউন রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে রাজার সঙ্গে বাক্যবিনিময় করলেন। তার কথা শুনে মুগ্ধ হলো রাজা। এরপর থেকে রাজার বিশেষ অতিথিশালায় স্থান পেলেন শামউন। কিছুদিন কেটে গেলো এভাবেই। একদিন সুযোগ বুঝে তিনি বললেন, মান্যবর রাজা! শুনলাম আপনি দু'জন আগন্তুককে বিনা দোষে কারারুদ্ধ করে রেখেছেন। লোকগুলো কে, কোথা থেকে কী উদ্দেশ্যে এসেছে, এসকল কিছু না জেনেই। বিষয়টি অনভিপ্রেত নয় কী? রাজা বললো, আমি তখন রাগান্বিত হয়েছিলাম। তাই রাগের চোটে তাদের সঙ্গে কথাই বলিনি। শামউন বললেন, এখন তো আর আপনার রাগ নেই। সুতরাং এখন তো তাদেরকে তলব করতে পারেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখতে পারেন তাদেরকে। রাজা বললো, ঠিক আছে। তাদেরকে এখানে ডেকে আনা হোক। অল্পক্ষণের মধ্যেই বন্দীদ্বয়কে হাজির করা হলো। শামউনই প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন, পরিচয় দাও। কে তোমরা? কে পাঠিয়েছে তোমাদেরকে। প্রতিনিধিদ্বয় বললেন, আল্লাহ্। যিনি সকলের সৃজক ও পালক। তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়। শামউন বললেন,

www.eelm.weebly.com

তোমাদের আল্লাহ্র পরিচয় বর্ণনা করো। তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ ইচ্ছাময়। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, তেমনই হয়। তিনি তাঁর অভিপ্রায় নির্ণয় ও প্রয়োগের ব্যাপারে সতত স্বাধীন ও চিরপবিত্র। শামউন বললেন, তোমাদের সঙ্গে কি কোনো নিদর্শন আছে? তাঁরা বললেন, নিশ্চয়ই। আমরা জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান করি। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ডেকে আনলো এক জন্মান্ধ বালককে। বললো, একে চক্ষুদান করো। প্রতিনিধিদ্বয় দোয়া করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে বালকটি হয়ে গেলো চক্ষুষ্মান। রাজা ও তার পারিষদবর্গের সকলেই অভিভূত হলো। শামউন বললো, হে রাজন! আপনি এবার আপনার পূজনীয় দেব-দেবীদের নিকট প্রার্থনা করে এর চেয়ে বিস্ময়কর কিছু প্রদর্শন করুন। দেখবেন আপনার মর্যাদা বেড়ে যাবে এদের চেয়ে বেশী। রাজা বললো, আপনি তো জানেনই আমাদের প্রতিমাগুলো নিঃসাড়, শ্রুতি-দৃষ্টিহীন। কারো উপকার কিংবা অপকার করবার সাধ্য তাদের আদৌ নেই। সেদিনের মতো দরবার সমাপ্ত হলো এভাবেই।

শামউন যথারীতি রাজ সান্নিধ্যেই দিনাতিপাত করতে লাগলেন। রাজা ও তার সভাসদেরা যখন পূজা-অর্চনায় লিপ্ত থাকতো তখন তিনি মগ্ন থাকতেন দোয়া কালাম পাঠে ও নামাজে। তারা মনে করতো শামউনও বিশেষ নিয়মে পূজা-অর্চনা করে চলেছেন। কিছুদিন পর রাজা কী মনে করে প্রতিনিধিদ্বয়কে পুনরায় রাজ দরবারে ডেকে আনালেন। বললো, তোমাদের আল্লাহ্ যদি মৃতকে জীবিত করতে পারে, তবে আমরা তোমাদের ধর্মমত গ্রহণ করবো। প্রতিনিধিদ্বয় বললেন, আল্লাহ্ অবশ্যই সর্বশক্তিধর। রাজা বললো, আমার নৈকট্যভাজন এক ভূস্বামীর ছেলে মারা গিয়েছে সাত দিন আগে। তার পিতা প্রবাসী। তার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় দিন গুণছে তার স্বজনেরা। এদিকে ছেলেটির লাশে ধরেছে পচন। তোমরা যদি পারো, তবে তোমাদের আল্লাহ্কে দিয়ে তাকে জীবিত করে দাও। প্রতিনিধিদ্বয় লাশ আনতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যে লাশ আনা হলো। লাশ তখন ফেটে গিয়ে গলতে শুরু করেছে। প্রতিনিধিদ্বয় উচ্চকণ্ঠে তার পুনর্জীবন দানের জন্য আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে লাগলেন। শামউন প্রার্থনা করতে লাগলেন মনে মনে। একটু পরেই মরদেহে প্রাণ সঞ্চারিত হলো। জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো ছেলেটি। বললো, সাতদিন আগে আমি মৃত্যুবরণ করেছিলাম অংশীবাদী হয়ে। এই সাতদিনে আমাকে দেখানো হয়েছে সাতটি আগ্নেয় উপত্যকা। হে উপস্থিত জনতা! আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি, এই মুহূর্তে অংশীবাদিতা পরিহার করো। ইমান আনো এক আল্লাহ্র প্রতি। নতুবা অগ্নিশাস্তি থেকে কিছুতেই রেহাই পাবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি, আকাশের উন্মুক্ত দরজায় বসে এক সৌম্যকান্তি যুবক তিনজন লোকের জন্য প্রতিক্ষমাণ। রাজা বললো, লোক তিনজন কে? ছেলেটি বললো শামউন ও এই দু'জন প্রতিনিধি। রাজা একথা শুনে বিস্মিত

www.eelm.weebly.com

হলো। শামউন দেখলেন, রাজা অনেকটা প্রভাবান্বিত। তার বিশ্বাসকে প্রবল করার জন্য শামউন বললেন, মান্যবর মহারাজা! আপনি এবার এই দু'জন লোককে বলুন, তারা যেনো আপনার মৃত কন্যাকে জীবিত করে দেখায়। রাজা উতলা হয়ে পড়লো। বললো, হে প্রতিনিধিদ্বয়! ওই দেখা যায় আমার মৃত কন্যার কবর। এবার তাকে জীবিত করো তো দেখি। প্রতিনিধিদ্বয় প্রার্থনা শুরু করলেন। মুহূর্তকাল পরেই কবর ফেটে বেরিয়ে এলো রাজকন্যা। বললো, তোমরা ভালো করে শুনে রাখো, এই প্রতিনিধিদ্বয় সত্য। তবে আমার মনে হয় তোমরা তাদেরকে মানবে না। একথা বলেই রাজকন্যা প্রবেশ করলো তার কবরে।

কা'ব ও ওয়াছারের সূত্রে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রাজা ইমান গ্রহণ করলো না। বরং সে সভাসদদের প্ররোচনায় প্রতিনিধিদ্বয়কে হত্যা করতে উদ্যোগী হলো। এ সংবাদ পৌঁছে গেলো বৃদ্ধ হাবীবের নিকট। তিনি তখন ছিলেন নগরীর উপকণ্ঠে। এক দৌড়ে তিনি মিশে গেলেন জনতার সঙ্গে। সামনে যাকে পেলেন, তাকেই দিতে লাগলেন সদুপদেশ।

সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓا إِنَّآ
إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ أَنزَلَ
الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ ۙ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ
إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا الْبَلَٰغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوٓا إِنَّا
تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ
مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَٰقَوْمِ
اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

r যখন উহাদের নিকট পাঠাইয়াছিলাম দুইজন রাসূল, তখন উহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, অতঃপর আমি তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা। তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা তো তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি।'

www.eelm.weebly.com

r উহারা বলিল, 'তোমরা আমাদের মতই মানুষ, দয়াময় আল্লাহ্ তো কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলিতেছ।'

r তাহারা বলিল, 'আমাদের প্রতিপালক জানেন— আমারা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি।

r 'স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।'

r উহারা বলিল, 'আমরা তো তোমাদিগকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তোমাদিগকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিব এবং আমাদের পক্ষ হইতে তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি অবশ্যই আপতিত হইবে।'

r তাহারা বলিল, 'তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে, ইহা কি এইজন্য যে, আমরা তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি? বস্তুত তোমর এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।'

r নগরীর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল, সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর;

r 'অনুসরণ কর তাহাদের, যাহারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহে না এবং যাহারা সৎপথপ্রাপ্ত।

ওয়াহাব বলেছেন, ওই দু'জন রসুল বা প্রতিনিধিদ্বয়ের নাম ছিলো ইয়াহ্ইয়া এবং ইউনুস এবং তৃতীয় একজনের নাম ছিলো শামউন। সাঈদ ইবনে যোবয়ের থেকে ইবনে মুনজির ও এরকম বর্ণনা করেছেন। আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, আমার কাছে এই সংবাদটি পৌঁছেছে যে, হজরত ঈসা ইনতাকিয়াবাসীদের পথপ্রদর্শনার্থে পাঠিয়েছিলেন সাদেক ও মাসদুক নামক দু'জন প্রতিনিধিকে। আর তৃতীয় জনের নাম ছিলো সালরম। প্রথমোক্ত আয়াতে ওই তিনজনের কথাই বলা হয়েছে।

প্রতিনিধ প্রেরণ করেছিলেন হজরত ঈসা। অথচ এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ্ তাঁদেরকে প্রেরণ করেছিলেন। অতএব, বুঝতে হবে, হজরত ঈসা তাঁদেরকে পাঠিয়েছিলেন আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশে।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, তোমরা আমাদের মতোই মানুষ, দয়াময় আল্লাহ্ তো কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছো'। একথার অর্থ— রাজা ও তাদের সভাসদেরা বললো, আমরা দেখছি, তোমরাও আমাদের মতো মানুষ। তাহলে তোমরা প্রেরিত পুরুষ হিসেবে দাবি করছো কেনো। দয়াময় আল্লাহ্ তো মানুষকে তাঁর রসুল বানাতে পারেন না। সুতরাং তোমরা যা শোনাচ্ছো তা মিথ্যা।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমাদের প্রতিপালক জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি'। একথার অর্থ— প্রতিনিধিদ্বয় বললেন, শপথ আল্লাহ্‌র। আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত। আমরা আল্লাহ্‌র নামে তোমাদের সামনে মিথ্যা সাক্ষ্য উপস্থিত করতে পারি না।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব'। একথার অর্থ— তাঁরা আরো বললেন, স্পষ্টভাবে সত্যধর্মের প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব। তোমরা আমাদেরকে মানো অথবা না মানো, তা যাচাই করা আমাদের কাজ নয়। যদি মানো, তবে উপকৃত হবে তোমরাই। আর না মানলে তোমরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। উপযোগী হবে মহাশাস্তির। আর তোমরা সত্যের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে না কেনো? আমরা কি আমাদের সত্যতার স্বপক্ষে নিদর্শনসমূহ উপস্থিত করিনি? তোমাদের সম্মুখেই কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দেখাইনি? জীবিত করে দেখাইনি কি মৃতকে?

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমরা তো তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও, তোমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবো এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবে'। একথার অর্থ— রাজা ও তার বশংবদেরা সকলেই ছিলো চিরভ্রষ্ট ও মূর্খশ্রেষ্ঠ। একগুঁয়েমিই এধরনের লোকের একমাত্র আরাধ্য। যথার্থ বিচারবিবেচনাবোধ এদের একেবারেই থাকে না। তাই তারা আল্লাহ্‌র সত্য বার্তাবাহকদেরকে প্রত্যাখ্যান করলো। তদুপরি হয়ে উঠলো মারমুখী। বললো, তোমাদের কোনো কথাই আমরা শুনতে চাই না। আমরা মনে করি তোমরাই অনাসৃষ্টি ও অকল্যাণের কারণ। সুতরাং বন্ধ করো অপপ্রচার। নতুবা আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবো। সেই মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে তোমাদেরকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে, এটা কি এজন্য যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি? বস্তুত, তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়'। একথার অর্থ— প্রতিনিধিদ্বয় বললেন, মঙ্গল-অমঙ্গল কীভাবে সূচিত হয়, তা তোমরা জানো না। যদি জানতে, তবে দেখতে পেতে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক যাঁরা, তাঁরা অমঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত। কারণ তাঁরা মানুষকে শুভপথ প্রদর্শনকারী। অমঙ্গল তো তাদেরই সার্বক্ষণিক সঙ্গী, যারা তাঁদেরকে অস্বীকার করে। হে ইনতাকিয়াবাসী, তোমরা দেখছি এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— কল্যাণ অথবা অকল্যাণ নির্ধারিত হবে তোমাদের দিক থেকেই। আমাদের এই শুভবারতা গ্রহণ করলেই তোমরা হবে সৌভাগ্যশালী, আর প্রত্যাখ্যান করলে হবে অমঙ্গলের প্রতিভু, চিরদুর্ভাগা।

এখানকার 'আ ইন জুক্কিরতুম' (এটা কি জন্য যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি?) প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এর সরল অর্থ দাঁড়ায়— আমরা তোমাদেরকে দিচ্ছি শুভউপদেশ। আর তোমরা একে মনে করছো অকল্যাণ। শুভ উপদেশকে মান্য করে কোথায় কৃতার্থ হবে, তা না করে উল্টো আমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে সংহার করতে চাচ্ছো। কেনো?

'বাল আন্‌তুম ক্বওমুম্‌ মুসরিফুন' অর্থ বস্তুত তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। অর্থাৎ সত্যের সরাসরি আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করে তোমরা করেছো গর্হিত অপরাধ। হয়ে গিয়েছো সীমালংঘনকারী। তোমরা কি তবে আর ফিরবে না?

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (২০, ২১) মর্মার্থ হচ্ছে— সেই বৃদ্ধ হাবীব তখন ছিলেন নগরপ্রান্তে। প্রতিনিধিদ্বয়কে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে, এই দুঃসংবাদটি তাঁর নিকটেও পৌঁছুলো। তিনি বিচলিত হলেন। যাকে সামনে পেলেন, তাকেই সতর্ক করতে লাগলেন এই বলে যে, হে আমার সম্প্রদায়! যে প্রতিনিধিদ্বয়কে হত্যা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁরা কিন্তু আল্লাহ্‌র সত্য বার্তাবাহক। সুতরাং তোমরা তাঁদের প্রচারিত ধর্মাদর্শকে গ্রহণ করো। তাঁরা তোমাদের কাছে পার্থিব বিনিময়ের প্রত্যাশী নন। সুতরাং বুঝতেই পারছো, তারা সৎপথপ্রাপ্ত এবং সৎপথের পথপ্রদর্শক।

আবদুর রাজ্জাক এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, কাতাদা বলেছেন, লোকটির নাম ছিলো হাবীব। তিনি ছিলেন কাষ্ঠ প্রকৌশলী। সুদ্দী বলেছেন, তিনি ছিলেন বস্ত্রপরিশুদ্ধক। ওয়াহাব বলেছেন, পুণ্যবান হাবীব ছিলেন বস্ত্ররচয়িতা। কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। তাই ডেরা নির্মাণ করেছিলেন শহরের উপকণ্ঠে। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও দানশীল। দিনভর যা উপার্জন করতেন, তা ভাগ করতেন দুই ভাগে। এক ভাগ রেখে দিতেন নিজের জন্য এবং অপর ভাগ ব্যয় করতেন নিকটাত্মীয়দের জন্য।

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন ওয়া সাল্লাল্লহু আ'লা খইরি খলক্বিহি মুহাম্মদিঁউ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমায়ী'ন।

নবম খণ্ড শেষ

www.eelm.weebly.com

❑ 'আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে আমি তাঁহার ইবাদত করিব না?'

❑ 'আমি কি তাঁহার পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করিব? দয়াময় আল্লাহ্ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চাহিলে উহাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসিবে না এবং উহারা আমাকে উদ্ধার করিতেও পারিবে না।

❑ 'এইরূপ করিলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়িব।'

❑ 'আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিয়াছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোন।'

হজরত ঈসা সত্যধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁর দু'জন প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন ইনতাকিয়া নামক নগরীতে। সেখানকার হাবীব নামক জনৈক বৃদ্ধ তাঁদের কথায় ইমান আনেন। কিন্তু সেখানকার রাজা তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করে। করে বন্দী। তখন হজরত ঈসা তাঁদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন শামউন নামক আর এক প্রতিনিধিকে। তিনি সুকৌশলে রাজদরবারে সম্মানজনক স্থান অধিকার করেন এবং প্রতিনিধিদ্বয়কেও রাজার সুনজরে আনতে সক্ষম হন। জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান, মৃতকে জীবন্ত করা ইত্যাদি অলৌকিকত্ব দেখে এক সময় রাজা সত্যধর্ম গ্রহণের প্রতি আগ্রহান্বিতও হয়। কিন্তু তার সভাসদদের প্ররোচনায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে। শুধু তাই নয়, প্রতিনিধিদ্বয়কে হত্যা করার মতো অপসিদ্ধান্তও গ্রহণ করে।

একথা কানে যায় নগরীর উপকণ্ঠে বসবাসরত হাবীবের। তিনি তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ছুটে আসেন নগরীর দিকে। নগরবাসীদের যাকে সামনে পান, তাকেই বলতে থাকেন, তোমরা প্রতিনিধিদ্বয়ের ধর্মমতকে গ্রহণ করো। তাঁরা আল্লাহ্র সত্যের বার্তাবাহক। তাঁরা যেহেতু তোমাদের কাছে পার্থিব কোনো কিছুর প্রত্যাশা করেন না, সেহেতু এটা নিশ্চিত যে, তাঁরা সত্যাধিষ্ঠিত প্রেরিত পুরুষ। তাঁর এমতো বক্তব্য শুরু হয়েছে পূর্ববর্তী খণ্ডে উদ্ধৃত ২০ সংখ্যক আয়াত থেকে। আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয় তাঁর ওই বক্তব্যেরই ধারাবাহিকতা।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'আমার কী যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে, আমি তাঁর ইবাদত করবো না?' এখানে সৎপথপ্রদর্শনের একটি কুশলী পদ্ধতি প্রয়োগের বিষয়টি প্রণিধাননীয়।
উপদেশদাতা হাবীব এখানে অব্যর্থ যুক্তির সাহায্যে একথাই বলতে চেয়েছেন যে, সৃষ্টিকর্তা যেহেতু এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নয় এবং তাঁর প্রতি সকলের প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি যখন সুনিশ্চিত, তখন সেই সর্বশক্তিধর মহাসৃজয়িতার উপাসনা না করার কোনো অজুহাত আর থাকতেই পারে না।

কাতাদা সূত্রে ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হাবীব উপাসনারত ছিলেন এক গিরিগহ্বরাভ্যন্তরে। সেই নিভৃতিতেই তাঁর অন্তরে সহসা এই আশংকার উদয় হলো যে, আল্লাহ্র বার্তাবাহকদ্বয়ের প্রাণ সংহার করা হবে। তিনি তাই বিচলিত হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। বুঝতে পারলেন, তাঁর আশংকা অমূলক নয়। তিনি তখন নগরবাসীদের প্রতি এই বলে উদাত্ত আহ্বান জানালেন যে, হে নগরবাসী! যারা তোমাদের নিকট পার্থিব কোনোকিছুর প্রত্যাশী নন, তাঁদেরকে আল্লাহ্র সত্য বাণীবাহকরূপে বিশ্বাস করো। তারা জবাব দিলো, তুমিও তো দেখছি আমাদের ধর্মমত পরিত্যাগ করেছো। তখনই তিনি বললেন, কেনো আমি তাঁর ইবাদত করবো না, যিনি তোমার আমার সকলের সৃষ্টিকর্তা এবং যাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন আমাদের সকলের? অর্থাৎ আমি তো অবশ্যই তাঁর সকাশে প্রত্যানীত হবো, তোমরাও তো বাদ পড়বে না।

লক্ষণীয় যে, এখানে হাবীব সৃষ্টির বিষয়টি সম্পৃক্ত করেছেন নিজের সঙ্গে। বলেছেন— 'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন'। এর কারণ হচ্ছে, সৃষ্টিকর্ম একটি নেয়ামত। আল্লাহ্পাক সৃষ্টি না করলে মানুষ কখনোই অস্তিত্বশীল হতো না। তাই আল্লাহ্র এই নেয়ামতের সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি জ্ঞাপন ইমানদারগণের একটি অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। এই অত্যাবশ্যক দায়িত্ব পালনার্থেই তাই হাবীব কথাটি বলেছেন এভাবে— 'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন'। পক্ষান্তরে চৈতন্যোদয়ার্থে অবিশ্বাসীদের প্রতি সাবধানবাণী

www.eelm.weebly.com

উচ্চারণ করা ইমানদারদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। তাই তিনি পরক্ষণেই অবিশ্বাসী জনতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি। বিষয়টিকে বিশেষ করে তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বলেছেন— 'এবং যার প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে'।

কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, হাবীব নাজ্জার যখন নগরবাসীদেরকে বললেন, তোমরা মহাসত্যের বার্তাবাহকদ্বয়ের অনুসারী হও, তখন তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গেলো রাজার সামনে। রাজা জিজ্ঞেস করলো, তুমি ওই প্রতিনিধিদ্বয়ের অনুসারী হয়েছো কেনো? তিনি বললেন, তাঁরা তো ওই পরম সত্তার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, যিনি সকলের একক স্রষ্টা এবং সকলের অবশেষ উপস্থিতি হবে তাঁরই সকাশে। সুতরাং সেই পরম সত্তার ইবাদত না করার পক্ষে কি আর কোনো যুক্তি থাকে? অর্থাৎ আমি যদি তাঁর উপাসনা না করি, তবে মহাবিচারের দিবসে তাঁর নিকটে কোন অজুহাত আমি উত্থাপন করবো, মহা পুনরুত্থান যখন নিশ্চিত? তৎসঙ্গে সুনিশ্চিত চিরস্বস্তি এবং চিরশাস্তির বিষয়টিও?

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করবো? দয়াময় আল্লাহ্ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না' (২৩)। 'এইরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়বো' (২৪)।

এখানে 'তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে না' কথাটির মর্মার্থ এরকম— তোমরা মনে করো তোমাদের অলীক উপাস্যসমূহ আল্লাহ্ সকাশে তোমাদের জন্য শাফায়াত করবে। কিন্তু তারা তো স্থবির। অপ্রাণ। সুতরাং তারা আর সুপারিশ করবে কীভাবে। সেরকম যোগ্যতা যে তাদের একেবারেই নেই। একথাটিও তোমরা জেনে রাখো যে, শাফায়াত অপেক্ষা আল্লাহ্‌র দয়াপ্রাপ্তি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যাদের শাফায়াতে শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভ সুদূর পরাহত, তাদের সুপারিশে রহমতপ্রাপ্তি আরো অধিক অসম্ভব।

'ইন্নী ইজাল্ লাফী দ্বলালিম মুবীন' অর্থ এরকম করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়বো। অর্থাৎ এমতাবস্থায়, আমি কি তবে ওই সকল কাল্পনিক দেব-দেবীর বিগ্রহগুলোর উপাসক হবো, যাদের উপকার অথবা অপকার করবার কোনো প্রকার যোগ্যতাই নেই? এরকম করলে আমি তো অবশ্যই হয়ে যাবো পুরোপুরি বিপথগামী।

পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের উপর ইমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোনো'। একথার অর্থ— হে নগরবাসী ও নগরবাসীদের রাজা! তোমরা ভালো করে শুনে রাখো, আমি কস্মিনকালেও বিভ্রান্তির অনুরক্ত হবো না। আমি ইমানদার। আমি ইমান এনেছি আমার প্রভুপ্রতিপালকের প্রতি, যিনি তোমাদেরও প্রভুপ্রতিপালক।

এখানে 'ফাস্‌মাঊ'নী' অর্থ তোমরা আমার কথা শোনো। অর্থাৎ তোমরা আমার ইমানের ঘোষণা শুনে রাখো।

এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, হাবীব নাজ্জারের উপদেশপূর্ণ বক্তব্যের যবনিকাপাত ঘটেছে এখানেই। তাঁর স্বজাতি কেবল জানতে চেয়েছিলো, তিনি প্রতিনিধিদ্বয়ের ধর্মমতকে গ্রহণ করেছেন কিনা। তাদের এমতো জিজ্ঞাসার জবাব তো তিনি দিয়েছেনই, তৎসঙ্গে তাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সুসঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায়। অবশেষে বক্তব্য সমাপ্ত করেছেন একথা বলে যে— তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক যিনি, আমি তো তাঁরই প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করেছি। আর তোমরাও আমার এই ঘোষণাটি উত্তমরূপে অবগত হও। সেই সঙ্গে একথাও অনুধাবন করতে চেষ্টা করো যে, বিষয়টি নিঃসন্দেহে অত্যুত্তম, নতুবা আমি এ পথ অবলম্বন করবো কেনো?

উল্লেখ্য, এখানে 'আমার প্রতিপালকের উপর ইমান এনেছি' না বলে বলা হয়েছে 'তোমাদের প্রতিপালকের উপর ইমান এনেছি'। এটাই বক্তব্যকে বলিষ্ঠ করার আলংকারিক পদ্ধতি। হাবীব নাজ্জার এখানে এমতো উৎকৃষ্ট পদ্ধতিকেই গ্রহণ করেছেন।

বাগবী লিখেছেন, হাবীব নাজ্জারের এরকম সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় বক্তব্য শোনার পরক্ষণেই তাঁর স্বজাতিরা তাঁর উপরে একযোগে আক্রমণ করেছিলো। শহীদ করে দিয়েছিলো তাঁকে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তারা তাঁকে এমনভাবে পদপিষ্ট করেছিলো যে, বের হয়ে গিয়েছিলো তাঁর নাড়িভুঁড়ি। সুদ্দী বলেছেন, তাঁর বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতা তাঁকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে শুরু করেছিলো পাথর। তিনি কেবল উচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার স্বজাতিকে সুপথ প্রদর্শন করো। শেষ পর্যন্ত জনতা তাঁকে টুকরো টুকরো করে ছেড়েছিলো। হাসান বসরী বলেছেন, শিরশ্ছেদ করে তাঁর ছিন্ন মস্তক তারা লটকিয়ে রেখেছিলো প্রাচীরগাত্রে। ইনতাকিয়াতেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন তিনি। পেয়েছিলেন শাহাদতের মহান মর্যাদা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হজরত ওরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী রসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। পরক্ষণেই নিবেদন জানালেন, আমাকে আমার স্বসম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে তাদের

www.eelm.weebly.com

নিকটে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হোক। রসুল স. বললেন, ওরওয়া! তারা তো তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তিনি বললেন, হে রহমতের সাগর! আমার স্বগোত্রীয়রা আমাকে ভালোবাসে। আমি নিদ্রিত হয়ে পড়লে তারা আমাকে জাগায় না। আমার প্রতি তারা এরকমই শিষ্টাচরণ করে। রসুল স. মৌন রইলেন। তিনি ফিরে গেলেন তাঁর জনপদবাসীদের কাছে। আমন্ত্রণ জানালেন ইসলামের। তাঁর স্বজাতিরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। বিদ্রূপবানে জর্জরিত করলো তাঁকে। একদিন ফজরের সময় তিনি নামাজ পাঠ করছিলেন তাঁর গৃহের ছাদে। জনৈক সাকাফী দূর থেকে তীর নিক্ষেপ করে তাঁকে শহীদ করে দিলো। সংবাদটি পৌঁছে গেলো রসুল স. এর কাছে। তিনি স. তখন বললেন, ওরওয়ার পরিণতি ওই সৌভাগ্যবান লোকটির মতো, যার কথা বলা হয়েছে সুরা ইয়া-সীনে। তিনিও তাঁর স্বজাতির সামনে ইমানের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে জানিয়েছিলেন সত্যের আহ্বান। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে পান করেছিলেন শাহাদতের অমিয় পেয়ালা।

কেউ কেউ বলেছেন, হাবীব নাজ্জার তাঁর ইমানের ঘোষণা দিয়েছিলেন ওই বার্তাবাহকদ্বয়কে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ তিনি তাঁদেরকে শুনিয়ে বলেছিলেন, সাক্ষী থাকুন, আমি আপনাদের প্রভুপালকের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করেছি।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ২৬, ২৭

❑ তাহাকে বলা হইল, 'জান্নাতে প্রবেশ কর'। সে বলিয়া উঠিল, 'হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানিতে পারিত—

❑ 'কিরূপে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হাবীব নাজ্জার শহীদ হলেন। তখন তাঁকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ করো।

অনেকে মনে করেন, হাবীব নাজ্জারকে তখন দেওয়া হয়েছিলো জান্নাতের সুসংবাদ। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে এখানে 'জান্নাত' অর্থ কবর। কারণ বিশ্বাসীগণের জন্য কবরাভ্যন্তরকে করে দেওয়া হয় জান্নাতের উদ্যান। আলোচ্য বাক্যটি একটি প্রচ্ছন্ন প্রশ্নের জবাব। ওই প্রশ্নটিসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায় এরকম— হাবীব নাজ্জার যখন অটল ইমান নিয়ে পৃথিবী পরিত্যাগ করলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁকে কী বললেন? বললেন, জান্নাতে প্রবেশ করো। তিনি তখন বললেন, হায়! আমার সম্প্রদায় যদি আমার এই সৌভাগ্যের কথা জানতে পারতো—

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'কিরূপে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন'।

এখানে 'মা গাফারালী' (ক্ষমা করেছেন) কথাটির 'মা' অব্যয়টি যোজক, প্রশ্নসূচক ও ধাতুমূল। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার স্বজাতি! তোমরা কি জানো আমার প্রভুপালক আমাকে কীরূপে বা কী কারণে ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন? তবে শোনো, তিনি ক্ষমা করেছেন আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস ও তোমাদের বৈরী আচরণের মুখে আমার ধৈর্যাবলম্বনের কারণে।

বলা বাহুল্য, প্রকৃত বিশ্বাসীগণ থাকেন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে সতত মুক্ত। হাবীব নাজ্জারও ছিলেন তেমনি বিশ্বাসী, প্রকৃত আল্লাহ্‌প্রেমিক। তাই বুঝতে হবে, ক্ষমাপ্রাপ্তি ও বিশেষ সম্মানলাভের কথা তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে জানাতে চেয়েছিলেন তাদের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনার্থে নয়। বরং তিনি তাঁর অনন্য মর্যাদার কথা একারণেই তাদেরকে জানাতে চেয়েছিলেন, যেনো এতে করে তাদের চৈতন্যোদয় হয় এবং তারাও গ্রহণ করে এমতো মর্যাদাপ্রাপ্তির সুযোগ। এরকমও বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছিলেন— দ্যাখো, দ্যাখো, আমাকে দেওয়া হয়েছে কীরূপ মার্জনাবৈভব ও অক্ষয়সম্মান। এবার তবে তোমরাই বলো, কার মতাদর্শ সত্য? তোমাদের, না আমার?

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ২৮, ২৯

তাফসীরে মাযহারী/১৯

❑ আমি তাহার মৃত্যুর পর তাহার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হইতে কোন বাহিনী প্রেরণ করি নাই এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিল না।

❑ উহা ছিল কেবলমাত্র এক মহানাদ। ফলে উহারা নিথর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

বাগবী লিখেছেন, ইনতাকিয়াবাসীরা যখন আল্লাহ্‌র প্রিয় দাস হাবীব নাজ্জারকে শহীদ করে দিলো, তখন আল্লাহ্ রোষতপ্ত হলেন। তাদের প্রতি অবতীর্ণ করলেন গজব। তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করবার আদেশ দিলেন হজরত জিবরাইলকে। মহাহুংকার ছাড়লেন হজরত জিবরাইল। সেই মহানাদে চিরস্থবির হয়ে গেলো নগরী ও নগরবাসীরা। সেকথাই আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে— 'আমি তার মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ থেকে কোনো বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিলো না। তা ছিলো কেবলমাত্র এক মহানাদ। ফলে তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেলো।'

এখানে 'আলা ক্বওমিহী' বলে বুঝানো হয়েছে হাবীব নাজ্জারের সম্প্রদায়কে। 'মিম বা'দিহী' (তারপর) অর্থ তার শহীদ হওয়ার পর। 'মিন জুনদিম্ মিনাস্ সামায়ি' অর্থ আকাশ থেকে কোনো বাহিনী প্রেরণ করিনি। অর্থাৎ তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য বহুসংখ্যক আযাবের ফেরেশতা আমি প্রেরণ করিনি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম বদর ও পরিখার যুদ্ধের সময়। বরং একজন ফেরেশতার প্রাণসংহারক বিকট আওয়াজে আমি চিরনিথর করে দিয়েছিলাম তাদের জনপদ। উল্লেখ্য, আলোচ্য বক্তব্যে ইনতাকিয়াবাসীদের অপযশ বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করা হয়েছে শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনন্যসাধারণ মর্যাদাকে। অর্থাৎ 'আকাশ থেকে কোনো বাহিনী প্রেরণ করিনি' বলে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো জনপদকে ধ্বংস করবার জন্য বহুসংখ্যক ফেরেশতাকে পাঠানো আল্লাহ্‌র রীতি নয়। তবে বদর ও পরিখার যুদ্ধে বিরাট ফেরেশতাবাহিনী প্রেরণের কারণ কেবল কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়া ছিলো না। বরং ওই সকল ফেরেশতা মূলতঃ ছিলো শুভসংবাদপ্রদাতা। তাদের প্রধান কাজ ছিলো রসুল স. এর মহান মর্যাদাকে প্রকাশ করা এবং তাঁর সহযোদ্ধাগণের হৃদয়ে জারী রাখা অনাবিল প্রশান্তিপ্রবাহ। অন্য আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এভাবে 'আল্লাহ্ তো করেছিলেন কেবল তোমাদের মনোবিনোদনার্থে যাতে করে তোমাদের অন্তর থাকে প্রশান্ত। আর তাঁর পক্ষ ছাড়া অন্য কোনো পক্ষ থেকে সাহায্য তো আসতেই পারে না'।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'মা কুন্‌না' কথাটির 'মা' হচ্ছে যোজক অব্যয়। আর 'জুনুদ' অর্থ এখানে আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ, ঝঞ্ঝাবায়ু, অথবা অতিবৃষ্টি। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— অন্যান্য অবাধ্য সম্প্রদায়কে বিনাশ করবার জন্য আমি যেমন শাস্তিপ্রদায়ক ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, হাবীব নাজ্জারের সম্প্রদায়ের অবাধ্যদের উপরে সেরকম কোনো বাহিনী প্রেরণ করিনি। বরং আমি তাদের বিনাশসাধন করেছিলাম প্রস্তরবৃষ্টি, ঝঞ্ঝাঝড় অথবা অতিবর্ষণের মাধ্যমে।

বাগবী লিখেছেন, ভাষ্যকারগণ বলেন, হজরত জিবরাইল ইনতাকিয়া নগরীর প্রবেশতোরণের দু'পাশের চৌকাঠ ধরে ছেড়েছিলেন এক কলিজাচৌচির করা চিৎকার। ওই মহানাদ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো তারা।

'খমিদূন' অর্থ কেবলমাত্র এক মহানাদ। অর্থাৎ একটি মাত্র মহানাদের ফলেই নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো তাদের কলকোলাহল। আর 'ফাইজা' কথাটির 'ফা' অব্যয়টি এখানে হেতুনির্দেশক। অর্থাৎ ওই একটি মাত্র বীভৎস আওয়াজের আঘাত হেতু নিভে গিয়েছিলো তাদের জীবনপ্রদীপ।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৩০, ৩১, ৩২

❑ পরিতাপ বান্দাদের জন্য; উহাদের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে তখনই উহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে।

❑ উহারা কি লক্ষ্য করে না উহাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠী আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহারা উহাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে না?

❑ এবং অবশ্যই উহাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অপরিণামদর্শী মানুষের জন্য আক্ষেপ! তারা কতোই না হতভাগ্য, তাদেরকে কল্যাণের পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে যখনই তাদের নিকট আমার কোনো বার্তাবাহক প্রেরণ করা হয়েছে, তখনই তারা তাদেরকে করেছে প্রত্যাখ্যান। তাদের প্রতি নিক্ষেপ করেছে বিদ্রূপ-পরিহাসের তীক্ষ্ণ তীর।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'হাস্‌রতান' (আক্ষেপ) শব্দটিকে 'তানভীন' সহকারে ব্যবহার করা হয়েছে সম্ভ্রমার্থে। অর্থাৎ তাদের প্রতি প্রযোজিত পরিতাপ বা আক্ষেপটি অত্যুচ্চ পর্যায়ের।

'ইল্‌লা কানুবিহী' কথাটির ব্যতিক্রমী অব্যয় 'ইল্‌লা' এখানে একই সঙ্গে শর্ত ও পরিণতিপ্রকাশক। তাই বলা হয়েছে— যখনই কোনো রসুল এসেছে, তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। আর এমতো বক্তব্যেই প্রকাশ পেয়েছে সম্ভ্রমার্থক আক্ষেপ। যাঁরা পরিশুদ্ধচিত্ত, কল্যাণকামী ও নিতান্ত সজ্জন, যাঁদের সদুপদেশের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ইহ-পারত্রিক সফলতা, তাঁদের বিরুদ্ধপক্ষীয়দের চরম পরিণতির উপর পরিতাপ প্রকাশ করাই সঙ্গত। তাদের জন্য আক্ষেপ করে

ফেরেশতা-জ্বিন-ইনসান সকলেই। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে প্রকাশ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঋণাত্মক আক্ষেপ। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে এখানকার আক্ষেপ অপরাধীদের অপরাধের গুরুত্বনির্দেশক।

কেউ কেউ বলেছেন, সম্বোধন অব্যয়ের সম্বোধিতজন এখানে রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে লোকসকল! ওই সকল মানুষের জন্য আক্ষেপ করো, যারা উপহাস করে তাদের কল্যাণার্থে প্রেরিত নবী-রসুলগণকে। 'হাস্‌রত' অর্থ— পরিতাপ, অনুতাপ, অনুশোচনা, আক্ষেপ।

বাগবী লিখেছেন, 'ইয়া হাস্‌রতান' (হায় আক্ষেপ) কথাটির বক্তা ও বক্তব্যের সময় সম্পর্কে রয়েছে দুটি অভিমত। একটি হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যেহেতু ব্যঙ্গবিদ্রূপের বশবর্তী হয়ে নবী-রসুলগণকে অস্বীকার করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাই পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে বলবেন, আজ আমার বান্দাদের চরম অনুশোচনা, অনুতাপ ও আক্ষেপের দিন। অপর অভিমতটি হচ্ছে— এরকম কথা বলবে ক্ষতিগ্রস্তরা। আবুল আলিয়া বলেছেন, 'ইয়া হাস্‌রতান আ'লাল ই'বাদ' এরকম বলেছিলো ইনতাকিয়াবাসীরা, যখন তারা প্রত্যক্ষ করেছিলো আসন্ন শাস্তির স্বরূপ।

'আলইবাদ' এর 'আলিফলাম' (আল) এখানে সীমিতার্থক। অর্থাৎ এখানে 'বান্দাদের জন্য' অর্থ কেবল 'ইনতাকিয়াবাসীদের জন্য'। অথবা বলা যেতে পারে, কথাটির উদ্দেশ্য সকল দেশের ও সকল কালের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, যারা তাদের নবী-রসুলগণকে বিদ্রূপ করে। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে এখানে বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে মক্কার মুশরিকদের প্রতি।

পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের পূর্বে কতো মানবগোষ্ঠী আমি ধ্বংস করেছি যারা তাদের মধ্যে ফিরে আসবে না'? এখানে 'তারা কি লক্ষ্য করে না' অর্থ মক্কাবাসীরা কি লক্ষ্য করে না। আর 'যারা তাদের মধ্যে ফিরে আসবে না' অর্থ ওই সকল বিনাশপ্রাপ্তরা পৃথিবীতে আর কখনো ফিরে আসবে না।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'এবং অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রে আমার নিকটে উপস্থিত করা হবে'। এখানকার 'সকলকে' কথাটি সম্পৃক্ত হবে 'আমার নিকট' কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ আমার নিকটে তখন উপস্থিত হতে হবে সকলকেই। অথবা 'মুহদ্বারূন' এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে 'সকলকে' কথাটি। আর সেমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তখন সকলকে উপস্থিত করানো হবে আমার সকাশে।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

❑ উহাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাহাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং উহা হইতে উৎপন্ন করি শস্য যাহা উহারা আহার করে।

www.eelm.weebly.com

❑ উহাতে আমি সৃষ্টি করি খর্জুর ও আঙুরের উদ্যান এবং উহাতে উৎসারিত করি প্রস্রবণ,

❑ যাহাতে উহারা আহার করিতে পারে উহার ফলমূল হইতে, অথচ উহাদের হস্ত উহা সৃষ্টি করে নাই। তবুও কি উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না?

❑ পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং উহারা যাহাদিগকে জানে না তাহাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়া জোড়া করিয়া।

❑ উহাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, উহা হইতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন উহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মৃত সদৃশ বিশুষ্ক মৃত্তিকাও মানুষের জন্য একটি বিশেষ নিদর্শন। আমি বিশুষ্ক মৃত্তিকাকে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি বিভিন্ন প্রকারের ফসল। ওই ফসল ভক্ষণ করেই তো তারা জীবন ধারণ করে।

এখানে 'হাব্বান' অর্থ কৃষিজাত আহার্য বস্তু। যেমন যব, গম, ধান ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকারের সবজিও এর অন্তর্ভূত। আর এখানে 'আহার করে' কথাটির পূর্বে 'তা থেকে' উল্লেখ করাতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, শস্য ও সবজিই মানুষের প্রধান আহার্য। মানুষের জীবনধারণের জন্য এগুলো অপরিহার্য।

পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'তাতে আমি সৃষ্টি করি খর্জুর ও আঙুরের উদ্যান এবং তাতে উৎসারিত করি প্রস্রবণ'।

পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত 'হাববুন' যেহেতু জাতিবাচক, সেহেতু শব্দটি সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে একবচনরূপে। কিন্তু এই আয়াতের 'নাখীল' ও 'আ'নাব' দ্বারা বুঝানো হয়েছে ফলমূলকে। তাই এখানে শব্দ দু'টো ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনরূপে। 'নাখীল' বলে খেজুর বৃক্ষকে। আর 'আ'নাব' অর্থ খেজুর। উল্লেখ্য, শস্য-সবজির সঙ্গে আঙুর ও খেজুরের উল্লেখ করা যেতো। কিন্তু এখানে খেজুর ও আঙুরের উল্লেখ করা হয়েছে পৃথকভাবে। এর হেতু নির্ণয়ার্থে এরকম বলা যেতে পারে যে, অন্যান্য ফল-ফসলের চেয়ে খেজুরের গুরুত্ব বেশী। আর খেজুরগাছ আল্লাহ্র সৃজনশৈপুণ্যের একটি অনন্যসাধারণ নিদর্শন।

এখানে 'মিনাল উয়ূ'ন' কথাটির 'মিন' অব্যয়টি আংশিক অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ কিছু প্রস্রবণ বা ঝরণা। কিন্তু আখফাশের মতে 'মিন' এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে অতিরিক্তরূপে।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'যাতে তারা আহার করতে পারে তার ফলমূল থেকে, অথচ তাদের হস্ত তা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না'? এখানে 'মিন ছামারিহী' অর্থ ওই সকল বাগান বা বৃক্ষের ফলমূল থেকে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ছামারিহী' কথাটির 'হী' (তার) সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত আল্লাহ্র সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যাতে তারা আহার করতে পারে আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট ফলসম্ভার থেকে।

'ওয়ামা আ'মিলাত্হু আইদীহিম' অর্থ অথচ তাদের হস্ত তা সৃষ্টি করেনি। এখানকার 'মা' (যা) হচ্ছে যোজক অব্যয়। শব্দটির সম্পৃক্তি ঘটেছে 'ছামারিহী'র সঙ্গে। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়ায়— তারা পান করে নিজের হাতে তৈরী করা শরবত, সিরকা ইত্যাদি। কিন্তু কারো কারো মতে এখানকার 'মা' ব্যবহৃত হয়েছে নেতিবাচক অর্থে। অর্থাৎ সকল প্রকার ফল ও ফসল সৃষ্টি করেন আল্লাহ্ স্বয়ং। সৃজনকর্মে মানুষের প্রবেশাধিকার মাত্রই নেই।

'আফালা ইয়াশ্কুরূন' অর্থ তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। 'ফা' এখানে যোজক এবং এর যোজ্য রয়েছে উহ্য। এমতাবস্থায় কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— তারা কি আল্লাহ্র নেয়ামতরাজির প্রতি কৃতজ্ঞ? মোটেও নয়। অথচ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছিলো তাদের অত্যাবশ্যক একটি কর্তব্য।

এর পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে'। এখানে 'আযওয়াজ্ব' অর্থ শ্রেণী, জাতি। 'মা তুম্বিতুল আরদ্ব' অর্থ তরুলতা, উদ্ভিদ। 'মিন আনফুসিহিম' অর্থ মানুষ, নর ও নারী। আর 'মিম্মা লা ইয়া'লামূন' অর্থ তারা যাদেরকে জানে না। অর্থাৎ আল্লাহ্র অন্য যে সকল সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষ অনবগত। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— সকল পরিদৃশ্যমান ও অদৃশ্য সৃষ্টিকে আল্লাহ্পাক দিয়েছেন যুগলরূপ— পরস্পরের পরিপূরক।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, তা থেকে আমি দিবালোক অপসারণ করি, তখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে'।

অনস্তিত্বের অন্ধকারই সৃষ্টির মূল প্রকৃতি। তার উপরে প্রতিভাসিত করা হয় অস্তিত্বের বা পরিদৃশ্যমানতার আলোক। রাত্রির অন্ধকারের উপরে দিবসের আলো প্রতিষ্ঠিত হয় সেভাবেই। তাই রাত্রি হচ্ছে আল্লাহ্র সৃজনরহস্যের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আলোচ্য আয়াতে সে বিষয়টিকেই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয়েছে— রাতের আঁধারের উপর থেকে আমি যখন দিবালোককে অপসারণ করি, তখন অন্ধকার পায় তার প্রকৃত স্বরূপ। এখানে 'সালখ' অর্থ খোলস উন্মোচন। মর্মার্থ— দিবাবসান, নিশিথের আগমন।

www.eelm.weebly.com

❑ আর সূর্য ভ্রমণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।
❑ এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করিয়াছি বিভিন্ন মন্‌যিল; অবশেষে উহা শুষ্ক বক্র, পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে।
❑ সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।

'ওয়াশ শামসু তাজ্বরী' অর্থ আর সূর্য ভ্রমণ করে। মর্মার্থ মহাশূন্যে সূর্য সঞ্চরণ করে তেমনভাবে, যেমনভাবে সলিলাভ্যন্তরে সন্তরণ করে মৎস্য। কথাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে দিবস-বিভাবরী বিবর্তনের কারণ।

'লি মুস্‌তাক্বর্‌রিল্‌ লাহা' অর্থ তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। কথাটির 'মীম' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ধাত্যর্থে। অর্থাৎ সূর্য মান্য করে চলে একটি সুনির্ধারিত পরিক্রমণ। অথবা 'মুসতাক্বর্' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ক্রিয়ার আধাররূপে। অর্থাৎ সূর্য ভ্রমণ করে একটি কেন্দ্রীয় গন্তব্যের দিকে, যেমন প্রবাসী ব্যক্তি অতিক্রম করে তার প্রবাসী জীবন। তার জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট কক্ষপথ। বর্ণনাটি উপস্থাপিত হয়েছে সাদৃশ্য হিসেবে। কিংবা 'মুসতাক্বর' অর্থ এখানে পূর্ণ দ্বিপ্রহর, যখন সূর্য থাকে দৃশ্যতঃ নিশ্চল। মনে হয় তার গতি এখন রুদ্ধ। অথবা 'মুস্‌তাক্বর' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে সূর্যের শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন পরিভ্রমণপরিধিকে। এই দুই সময়ে সূর্য অবস্থান করে উত্তর গোলার্ধের কর্কটক্রান্তি অথবা দক্ষিণ গোলার্ধের মকরক্রান্তির উপর। দিবসের পরিসর হয় প্রসারিত, কিংবা সংকুচিত। এরকমও বলা যেতে পারে যে, শব্দটির অর্থ—সূর্যের সর্বপূর্ব অথবা সর্বপশ্চিম সীমান্ত। সূর্য তার কক্ষপথ পরিভ্রমণ করে ৩৬৫ দিনে একবার। অথচ একদিনের জন্যও তার উদয় ও অস্ত হুবহু একস্থানে হয় না। কেননা তার কক্ষপথ ডিম্বাকৃতির। তাই তার পূর্বের শেষ সীমান্ত এবং পশ্চিমের শেষ সীমান্তকে এখানে 'মুস্‌তাক্বর' বলা হয়েছে। অথবা 'মুস্‌তাক্বর' বা 'গন্তব্য' বলা হয়েছে ওই স্থানকে, মহাপ্রলয়কালে যেখানে গিয়ে থেমে যাবে লক্ষ কোটি বছর ধরে কক্ষ পরিক্রমণরত বহ্নিমান সূর্য। উল্লেখ্য, সূর্যের এমন কোনো সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল

নেই, যেখানে গিয়ে সে থেমে যায়। সেজন্যই এখানে 'গন্তব্য' কথাটিকে এতোরকমভাবে ব্যাখ্যা করা হলো। হজরত ইবনে মাসউদের বক্তব্যও এরকম। তিনি বলেছেন, সূর্যের চলমানতা বিরতিবিহীন।

আমর ইবনে দীনার সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ 'মুস্‌তাক্বির্‌রিল্‌লাহা' কথাটিকে পাঠ করতেন 'মুস্‌তাক্বর্‌রল্‌লাহা'। এমতাবস্থায় কথাটির অর্থ হয়— সূর্যের পরিভ্রমণে কোনো বিরাম নেই। কিন্তু যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সূর্য স্থির হয় আরশের নিচে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু জর গিফারী বলেছেন, একবার সূর্যের অস্তগমনকালে রসুল স. বললেন, জানো, সূর্য কোথায় যায়? আমি নিবেদন করলাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই সমধিক জ্ঞাত। তিনি স. বললেন, সূর্য গমন করে আরশের নিম্নে। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়। অনুমতি প্রার্থনা করে পুনঃপরিক্রমণের। তার প্রার্থনা গৃহীত হয়। তখন সে শুরু করে পুনঃপরিক্রমণ। কিন্তু এমন এক সময় আসবে, যখন তার সেজদা গৃহীত হবে না। পুনঃ পরিক্রমণের অনুমতিও মিলবে না। আদেশ দেওয়া হবে, যেখান থেকে পরিভ্রমণ শুরু করেছো, সেখানেই ফিরে যাও। সে নির্দেশ পালন করবে। দেখা যাবে সূর্য উদিত হয়েছে পশ্চিম দিক থেকে। 'সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে' কথাটির সারমর্ম এরকমই। তিনি স. আরো বলেছেন, সূর্য থেমে যায় আরশের নিম্নদেশে। বোখারী, মুসলিম। হাদিসটির মর্মার্থ— অস্তমিত সূর্য সেজদাবনত হয় আরশের নিচে। সে অনুমতিপ্রাপ্ত হয় পুনঃউদয়ের। কিন্তু এমন একদিন অবশ্যই আসবে, যখন পুনঃউদয়ের অনুমতি সে আর পাবে না। তখন তার উদয় হবে বিপরীত দিক থেকে। উল্লেখ্য, মহাপ্রলয়ের নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটিও একটি বিশেষ নিদর্শন।

একটি সংশয় ঃ দিবা-রাত্রির উপস্থিতি সকল স্থানে এক সঙ্গে হয় না। তাই সকল স্থানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত এক রকম নয়। সূর্য যখন কর্কটক্রান্তির শিখরে শোভা পায়, তখন ধ্রুবনক্ষত্রের নিম্নে বুলগেরিয়া অতিক্রম করলেও সেখানে ইশার সময় হয় না।

www.eelm.weebly.com

তাই কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় গোধূলি, কোথাও প্রত্যুষ। তাহলে সূর্যের এমন অবকাশ কোথায় যে, সে আরশের নিচে সেজদাবনত হবে?

সংশয়ভঞ্জন ঃ আমি বলি, অস্ত ও উদয়ের মধ্যবর্তী মুহূর্তাংশই হচ্ছে সূর্যের সেজদার ক্ষণ, যদিও তা পরিদৃশ্যমান নয় (আরশ যেহেতু পরিদৃশ্যমান নয়, সেহেতু আরশের নিম্নদেশে সূর্যের সেজদাবনত অবস্থাও পরিদৃশ্যমান না হওয়াই সমীচীন)। ওই দৃশ্যাতীত ক্ষণেই দায়িত্বশীল ফেরেশতারা সূর্যকে হাজির করে আরশের নিচে। ঠিক তখনই সূর্য সেজদা করে এবং অনুমতিপ্রাপ্ত হয় পুনঃ পরিক্রমণের। অবস্থানগত তারতম্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাই রাত্রির সূচনালগ্নে এবং অবসানকালে ঘটে সংকোচন অথবা প্রসরণ। বিষয়টি মহারহস্যময় বলেই তো এরপর বলা হয়েছে— এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।

কেউ কেউ বলেছেন, 'সূর্য সেজদা করে আরশের নিচে' হাদিসটি অসংলগ্ন প্রকৃতির। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সেজদা অর্থ এখানে আনুগত্য। কিন্তু এই অভিমত দু'টো হাদিসের সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরিপন্থী।

'জালিকা তাক্দীরুল আ'যীযিল আ'লীম' অর্থ এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ সূর্য ও সৌরজগতের নিয়ন্ত্রণ এমন এক অতুলনীয় সত্তা কর্তৃক সুনিয়ন্ত্রিত, যিনি মহাপরাক্রমশালী এবং যিনি জানেন সকল কিছুর প্রকৃত তাৎপর্য।

পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল, অবশেষে তা শুষ্ক, বক্র, পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে'। একথার অর্থ— চন্দ্রের জন্যও আমি নির্ধারণ করেছি সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ এবং আটাশটি অক্ষাংশ। প্রতি রাতে সে অতিক্রম করে এক একটি অক্ষাংশ। তার এমতো যাত্রার কোনো পূর্বাপর ঘটে না। আর শেষ ঘাঁটিতে পৌঁছলে তার আকৃতি হয়ে যায় অতি ক্ষীণ, ধনুকের মতো বাঁকা এবং জীর্ণ খেজুর-শাখা সদৃশ। তারপর ঘনকৃষ্ণ অমাবস্যায় সে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায় সূর্যের আড়ালে।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে'।

'লাশ্ শামসু ইয়ামবাগী লাহা' অর্থ সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয়। 'আন্ তুদরিকাল ক্বমার' অর্থ চন্দ্রের নাগাল পাওয়া। অর্থাৎ সূর্য কখনোই চন্দ্রের মতো দ্রুত ধাবমান হতে পারবে না। এরকম বলেছেন বায়যাবী। তাঁর এমতো অভিমতের ভিত্তি হচ্ছে জ্যোতির্বিদদের মতবাদ। তারা বলে, চন্দ্রের গতি সূর্যের গতি অপেক্ষা দ্রুততর। চাঁদ তার কক্ষপথ পরিভ্রমণ করে এক মাসে। আর সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথ পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে এক বৎসরে।

আমার মতে বিষয়টির স্বরূপ অন্যরকম। প্রকৃত কথা হচ্ছে— চন্দ্রের জন্য নির্ধারিত গতিময়তা সূর্য কখনো পেতে পারে না। এরকম হওয়া সম্ভবই নয়। কারণ এতে রয়েছে মহাবিপর্যয়ের সমূহ সম্ভাবনা। অথবা আয়াতের মর্মার্থ হবে এরকম— গুরুত্ব ও উপযোগিতার দিক দিয়ে সূর্য চন্দ্রের অনুরূপ নয়। অথবা বলা যায়— সূর্য ও চন্দ্র আপনাপন কক্ষপথে চলমান। তাদের এমতো গতিপথ অপরিবর্তনীয়। তাদের কক্ষান্তর অসম্ভব। এরকমও হওয়া সম্ভব যে, এখানে 'সূর্য' অর্থ দিবস এবং 'চন্দ্র' অর্থ রজনী। এমতাবস্থায় মর্মার্থ দাঁড়াবে— দিবসের পক্ষে সম্ভব নয় রজনীকে অতিক্রম করা। তাদের আগমন ও নির্গমনের পালা সুনিয়ন্ত্রিত। বাগবীর বক্তব্য এরকমই।

'ওয়া কুল্লুন ফী ফালাকিঁই ইয়াস্বাহূন' অর্থ এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। এখানে 'প্রত্যেকে' অর্থ সূর্য ও চন্দ্র উভয়েই। বায়যাবী লিখেছেন, কথাটির অর্থ— সকল সূর্য ও সবকয়টি চন্দ্র। কারণ, তাদের উভয়ের অবস্থান সতত পরিবর্তনশীল। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে সূর্য ও চন্দ্রের

আলোচনা প্রসঙ্গে নক্ষত্রমণ্ডলীর কথাও এসে গিয়েছে। যদি তাই হয়, তবে এখানে 'প্রত্যেক' শব্দটির অর্থ দাঁড়াবে সূর্য ও চন্দ্রসহ প্রত্যেকটি নক্ষত্র। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনার্থক সর্বনাম 'কুল্লুন' (তাদের প্রত্যেকে)।

'ফী ফালাক্' অর্থ এক আকাশে। অর্থাৎ পৃথিবীর নিকটতম আকাশের পৃথক পৃথক কক্ষপথে। বিষয়টিকে অন্য আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— 'আর আমি সুশোভিত করেছি পৃথিবীর আকাশকে প্রদীপমালায়, যেগুলো মৎস্যসদৃশ সন্তরণশীল'।

আলোচ্য আয়াতের প্রকাশ্য বিঘোষণা এই যে, চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জ বাধ্যগতভাবে আকাশে সঞ্চরণশীল। কোনোটিই স্থির নয়। আকাশের সঞ্চালনেই ওগুলো সঞ্চালিত হয়। তাদের সঞ্চালন স্বকীয় নয়। আবার দার্শনিকেরাও বলে, গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন আরোপিত, স্বসৃষ্ট নয়। স্বচালিত হলে আকাশমার্গের বিপর্যয় হতো অনিবার্য। ফেটে ভেঙে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেতো সবকিছু।

প্রাচীন দার্শনিকেরা আকাশের সংখ্যা নির্ণয় করেছে নক্ষত্ররাজির আবর্তনের সংখ্যার উপর। তারা বলে, নক্ষত্রগুলোর কক্ষপথ যতগুলি, আকাশের সংখ্যাও ততো সংখ্যক। তাদের মতে আকাশের সংখ্যা নয়টি এবং পেঁয়াজের খোসার মতো আকাশগুলো

www.eelm.weebly.com

পরস্পরবিজড়িত। সর্বোচ্চ নবম আকাশকে তারা সকল আকাশের পরিবেষ্টনকারী বলে জানে, যা পূর্ব থেকে পশ্চিমে দু'টি মেরুদণ্ড ও একটি বৃত্তে আবর্তন করে। তার এক একটি চক্র সম্পন্ন হয় এক দিন এক রাতে। অন্যান্য আকাশের আবর্তন হয় দু'ধরনের, তার মধ্যে একটির আবর্তন নবম আকাশের আবর্তনানুসারী। অর্থাৎ নবম আকাশের সাথে তা আবর্তিত হয় পূর্ব থেকে পশ্চিমে। অন্য আবর্তনটি স্বকীয় ও স্বাভাবিক এবং তার গতি পশ্চিম থেকে পূর্বে। এর চক্রবৃত্ত নবম আকাশের চক্রবৃত্ত থেকে পৃথক। মেরুদণ্ড দু'টিও পৃথক। নবম ও অষ্টম আকাশের দু'টি দু'টি করে চারটি মেরু পরস্পরবিচ্ছিন্ন। সূর্য অষ্টম আকাশের চক্রবৃত্তানুসারী। তারা অষ্টম আকাশকে আবার রাশির আকাশও বলে।
কারণ অষ্টম আকাশের বৃত্তের রয়েছে বারোটি অংশ। প্রতিটি অংশের নাম রাশি। তার মধ্যে আবার সাতটি রাশি (কমর, আতারিফ, জোহরা, শামস্, মিররিখ, মুশতারী, সোহল) ব্যতীত অন্যান্য নক্ষত্ররাশির সম্পর্ক পরিবর্তিত হয় না, তাদের নৈকট্য ও দূরত্বের মধ্যে তারতম্য ঘটলেও পূর্ণ একটি দিবস ও রাত্রিতে তাদের আবর্তন সম্পন্ন হয় না। কিছুটা ঘাটতি থেকেই যায়, অত্যল্প হলেও। এ কারণেই পরিক্রমণশীল নক্ষত্র ব্যতিরেকে অন্যান্য নক্ষত্র অষ্টম আকাশ সংলগ্ন, বরং সেগুলো অর্গলাবদ্ধের মতো প্রোথিত।

এটাও নিশ্চিত যে, পরিক্রমণশীল নক্ষত্রের আবর্তন হয় একদিন-একরাত পূর্ব হওয়ার কিছু আগেই। তাই চন্দ্রের কক্ষপরিক্রমণ শেষ হয় কখনো তিরিশ দিনে, আবার কখনো ঊনতিরিশ দিনে। আবার সূর্যের কক্ষপ্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে কখনো ৩৬৫ দিন, আবার কখনো ৩৬৪ দিন। অন্যান্য নক্ষত্রের গতিবিধিও এরকম। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, সাতটি পরিক্রমণশীল নক্ষত্রের গতি পশ্চিম

থেকে পূর্বে। চন্দ্রের কক্ষপ্রদক্ষিণ এক মাসে সম্পন্ন হয় বলেই জ্যোতির্বিদেরা বলে, চন্দ্রই সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিসম্পন্ন। আর সূর্য যেহেতু কক্ষপ্রদক্ষিণ সম্পন্ন করতে সময় লাগায় এক বৎসর, তাই অবশ্যই সূর্য চন্দ্র অপেক্ষা মন্থরতর। অন্য গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধিও এরকম।

পাঁচটি গ্রহকে বলে 'খামসায়ে মুতাহায়্যেরা'। সেগুলো হচ্ছে আতারিফ, জোহরা, মুশতারী, মিররিখ এবং সোহল। এদের পরিক্রমণ কক্ষাতিরিক্ত— কখনো কম, কখনো পরিমিত। এগুলোকে 'অনির্বাহ পঞ্চক' বলে একারণেই। এগুলো নিজে নিজেই গতিশীল। তবে অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র অপেক্ষা এগুলোর গতি-প্রকৃতি পৃথক। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মোটামুটি ব্যাখ্যা এরকমই।

কিন্তু কোরআনের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, আকাশ অনধিক সাতটি। সুতরাং একথা অস্বীকারকারী কাফের। আর প্রতিটি আকাশ যে এক সময় ফেটে যাবে ও দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে যাবে সে কথাও কোরআনসম্মত। সুতরাং একথা অবিশ্বাসকারীও কাফের। কোরআন মজীদে সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করা হয়েছে— 'আকাশ যখন ফেটে যাবে', 'যখন আকাশ জড়িয়ে যাবে', 'যখন চন্দ্র হবে খণ্ডিত' ইত্যাদি।

যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে, আকাশগুলো পরস্পর মিলিত নয় এবং এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব অনেক। সুতরাং যারা বলে আকাশগুলো পরস্পরলগ্ন, তারা ফাসেক।

সূপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইমাম আহমদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের পথের দূরত্বের সমান।

হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে তিরমিজি ও আবু দাউদ কর্তৃক একটি দীর্ঘ হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবী থেকে প্রথম আকাশ এবং তারপরের এক আকাশ থেকে অপর আকাশের ব্যবধান একাত্তর, বায়াত্তর অথবা তিয়াত্তর বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। উল্লেখ্য, পথ চলার গতি দ্রুত অথবা মন্থর দু'রকমেরই হতে পারে। এটাই সম্ভবত এমতো বর্ণনাবৈষম্যের হেতু। আর বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এ সম্পর্কিত তথ্যাবলী ভুল। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের কথা বিশ্বাস করবে তার ইমান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কোরআন মজীদের অকাট্য সাক্ষ্য এই যে, আকাশ এক সময় ফেটে যাবে এবং জড়িয়ে যাবে। অতএব, একথা বলতে আর বাধা নেই যে, সকল গ্রহ-নক্ষত্র অবস্থান করছে প্রথম আকাশেই। এক আয়াতে তো স্পষ্ট করে বলাই হয়েছে 'আমি পৃথিবীর আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালায়'। অন্যত্র উক্ত হয়েছে 'আর আকাশের সবকিছুই পরিক্রমণশীল'। এরকম বলতেও কোনো দোষ নেই যে, গ্রহ-নক্ষত্রগুলো পরিক্রমণ করে একই গতিতে, সাতটি উল্লেখযোগ্য গ্রহের পরিক্রমণের সময়সীমা পৃথক পৃথক এবং পাঁচটি অসম গ্রহের কক্ষপ্রদক্ষিণ সম্পন্ন

হয় কখনো একটু আগে, আবার কখনো একটু পরে। আর এগুলোকেই আয়াতে বলা হয়েছে 'আল-খুন্নাসিল জ্বাওয়ারিল কুন্নাস....'। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

❑ উহাদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি উহাদের বংশধরদিগকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করাইয়াছিলাম;

❑ এবং উহাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে উহারা আরোহণ করে।

❑ আমি ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে নিমজ্জিত করিতে পারি; সে অবস্থায় উহাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না এবং উহারা পরিত্রাণও পাইবে না—

❑ আমার অনুগ্রহ না হইলে এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে না দিলে।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— এটাও তাদের জন্য একটি নিদর্শন যে, আমি মানুষের ঊর্ধ্বতন-অধস্তন বংশধরদের জলযানারোহণকে নিরাপদ রাখি, যেমন নিরাপদ রেখেছিলাম নবী নুহ ও তার বিশ্বাসী অনুচরবর্গকে। এরকম যানবাহন তো রয়েছে স্থলে-অন্তরীক্ষেও। যেমন মরুজাহাজ উষ্ট্র। সেগুলোও তো নিরাপত্তাপ্রাপ্ত আমা কর্তৃক।

এখানকার 'জুররিয়্যাত' এর শাব্দিক অর্থ সন্তান, যাদেরকে গ্রহণ করা হয় বাণিজ্য সহযাত্রীরূপে। কখনো অর্থ হয় সফরসঙ্গী সন্তান ও পরিবার। আবার কখনো শব্দটি ব্যবহৃত হয় কেবল 'সঙ্গিনী' অর্থে। যেমন এক হাদিসে এসেছে, যুদ্ধে নিহত এক রমণীকে দেখে রসুল স. একবার বলেছিলেন, মেয়েটি তো সমরসম্পৃক্তা নয়। তখন তিনি স. সেনাপতি হজরত খালেদ ইবনে ওলীদকে এইমর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 'জুররিয়্যাত' ও শ্রমিককে যেনো হত্যা করা না হয়।

হজরত ওমর বলেছেন, 'জুররিয়্যাতকে' সাথে নিয়ে হজ করো। তাদের অর্থ ভক্ষণ কোরো না। কিন্তু তাদের রজ্জুও ছেড়ে দিয়ো না (কোরো না পর্যবেক্ষণমুক্ত)। নেহায়া।

'আলফুলক' অর্থ জলযান, নৌকা, তরণী। জলযানারোহণ প্রসঙ্গে রমণী ও সন্তানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে একারণে যে, তাদেরকে সফরসঙ্গী করা স্বস্তিদায়ক নয়। তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করতে হয় বিশেষভাবে।

বাগবী লিখেছেন, এখানে 'আলফুলক' অর্থ নবী নুহের কিশতী। আর 'জুররিয়্যাত' বলে বুঝানো হয়েছে পূর্ব পুরুষকে। সন্তান যেমন 'জুররিয়্যাত', তেমনি 'জুররিয়্যাত' বলে বুঝানো হয় পিতামহ প্রপিতামহগণকেও। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'আলফুলক' অর্থ যদি নবী নুহের বজরাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— আল্লাহ্পাক তাদের পিতৃপুরুষদেরকে বজরায় আরোহণ করিয়েছিলেন তখন, যখন তাদের পরবর্তী বংশধরেরা ছিলো অজ্ঞ তাদের পৃষ্ঠদেশে। এমতাবস্থায় 'জুররিয়্যাত' কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হবে যুগপৎ বিস্ময় ও আশার সঞ্চার করা।

'মিম্ মিছলিহী' অর্থ অনুরূপ। অর্থাৎ নবী নুহের জাহাজের মতো। 'মা ইয়ারকাবুন' অর্থ তারা আরোহণ করে যাতে। যেমন জলে জলযান এবং স্থলে মরুজাহাজ উষ্ট্র এবং জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষের এমতো অন্যান্য বাহনসমূহ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি; সে অবস্থায় তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না—(৪৩) আমার অনুগ্রহ না হলে এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ না করতে দিলে(৪৪)।

এখানে 'ওয়া ইন্ নাশা নুগরিক্বহুম' অর্থ আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি। 'ফালা সরীখা লাহুম' অর্থ সে অবস্থায় তাদের থাকবে না কোনো সাহায্যকারী, যে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে ওই নিশ্চিত নিমজ্জন থেকে। অথবা বলা যায়, সে অবস্থায় কেউ সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করবারও অবকাশ পাবে না। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— সে অবস্থায় কেউই আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।

'ইল্লা রহমাতাম্ মিন্না' অর্থ আমার অনুগ্রহ না হলে। আর 'ওয়া মাতাআ'ন ইলা হীন' অর্থ এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে না দিলে। এখানে 'হীন' অর্থ কিছুকাল, আয়ুষ্কাল, যা আল্লাহ্ কর্তৃক সুনির্ধারিত।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

---

www.eelm.weebly.com

❑ যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'যাহা তোমাদের সম্মুখে ও তোমাদের পশ্চাতে আছে সে সম্বন্ধে সাবধান হও যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হইতে পার',

❑ এবং যখনই উহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন উহাদের নিকট আসে, তখনই উহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

❑ যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর' তখন কাফিরগণ মু'মিনদিগকে বলে, 'যাহাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে খাওয়াইতে পারিতেন আমরা কি তাহাকে খাওয়াইব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছ।'

❑ উহারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে?'

❑ ইহারা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের যাহা ইহাদিগকে আঘাত করিবে ইহাদের বাক-বিতণ্ডাকালে।

❑ তখন উহারা ওসিয়াত করিতে সমর্থ হইবে না এবং নিজেদের পরিবারপরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিতেও পরিবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যখন তাদেরকে অতীত ও ভবিষ্যতের অকল্যাণ সম্পর্কে সাবধান হতে বলা হয় এবং আহ্বান জানানো হয় আল্লাহ্র অনুগ্রহের অনুকূল জীবন যাপনের প্রতি, তখন তারা সে শুভআহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'মা বাইনা আইদীকুম' (যা রয়েছে তোমাদের সম্মুখে) অর্থ পরকাল। আর 'মা খলফাকুম' (যা আছে তোমাদের পশ্চাতে) অর্থ ইহকাল। অর্থাৎ কর্ম করো আখেরাতের জন্য এবং সতর্ক জীবনযাপন করো ইহকালে। পৃথিবীর প্রেমে নিমজ্জিত হয়ো না। কাতাদা বলেছেন, এখানে 'মা বাইনা আইদীকুম' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে অতীতের অবাধ্যদের ধ্বংসের ঘটনাবলীর দিকে এবং 'মা খলফাকুম' বলে বুঝানো হয়েছে পারলৌকিক শাস্তিকে। কেউ কেউ বলেছেন, নৈসর্গিক বিপদাপদকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা কি দ্যাখে না, তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে রয়েছে বিপদ— পৃথিবীজাত ও আকাশাগত'।

'লাআ'ল্লাকুম তুরহামুন' অর্থ যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পারো। অর্থাৎ তোমরা যেনো আশাধারী হতে পারো আল্লাহ্র করুণার।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'এবং যখনই তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর কোনো নিদর্শন তাদের নিকট আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ

ফিরিয়ে নেয়'। একথার অর্থ— তারা এতোই হতভাগা যে, আল্লাহ্র কোনো একটি নিদর্শনকেও সম্মান করতে জানে না। মান্য করে না আল্লাহ্র মহাপ্রতাপশালিতার প্রমাণকে। তারা যে চিরভ্রষ্ট।

এরপরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করো, তখন কাফেরেরা মুমিনদেরকে বলে, যাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারতেন, আমরা কি তাকে খাওয়াব'?

www.eelm.weebly.com

এখানে 'ব্যয় করো' অর্থ অভাবগ্রস্তদেরকে দান করো। 'যাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারতেন, আমরা কি তাকে খাওয়াবো' অর্থ অভাবগ্রস্তদেরকে তারা দান তো করেই না, উপরন্তু তাদের এমতো অপকর্মের পক্ষে তারা অপযুক্তি উপস্থাপন করে এভাবে— রিজিকদাতা তো আল্লাহ্ স্বয়ং। কারো রিজিক পাওয়া না পাওয়া তো সম্পূর্ণতই তাঁর ইচ্ছাধীন ব্যাপার। তিনি যাকে অন্নদান করতে চান না, সে-ই তো অভুক্ত থাকে। তাই বুঝতে হবে, অভুক্তকে আহার প্রদান আল্লাহ্র ইচ্ছা নয়। আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহলে আমরা যাবো কেনো? কেনো দান করতে যাবো তাকে, যাকে আল্লাহ্ই দান করেননি? কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, অভাবী মুসলমানেরা কাফের কুরায়েশদের কাছে কিছু যাচনা করলে তারা
এরকম বলতো। ইসমাইল ইবনে খালেদ থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির এবং হাসান বসরী থেকে ইবনে আবী হাতেম। উল্লেখ্য, 'অভিপ্রায়' ও 'নির্দেশ' নিশ্চয়ই এক কথা নয়। মানুষকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতিপালনের। আল্লাহ্র চিরদুর্জ্ঞেয় ও সততস্বাধীন অভিপ্রায়ের রহস্যোদ্ধার তাদের দায়িত্ব নয়। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা স্বচ্ছধারণাবিবর্জিত বলেই এমতো মূর্খজনোচিত উক্তি করে থাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছো'। উক্তিটি হতে পারে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের। যদি তাই হয়, তবে এর মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে মুসলমানেরা! তোমরা আমাদেরকে আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে বলছো। দান করতে বলছো তাদেরকে, যাদেরকে দান করা আল্লাহ্র ইচ্ছা নয়। অতএব তোমরাই রয়েছো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। আবার কথাটি বিশ্বাসীদেরও হতে পারে। যদি
তাই হয় তবে মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। তোমরা অজ্ঞ, তাই আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে অনীহ। দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার জন্য শুরু করেছো কুটতর্ক। সুতরাং তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্ত।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো, এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে? একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আমার প্রিয়তম নবী ও তাঁর সহচরবর্গকে লক্ষ্য করে আরো বলে, তোমরা বলো, আল্লাহ্র নির্দেশ না মানলে আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কই শাস্তি-টাস্তি তো কিছুই হয় না আমাদের। তাই বলি, তোমাদের কথা যদি সত্যিই হয়, তবে বলো, কবে আসবে তথাকথিত শাস্তি?

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'তারা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের বাকবিতণ্ডাকালে'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'মহানাদ' অর্থ মহাপ্রলয়ের প্রাক্কালের প্রথম শিঙ্গাধ্বনি।

একটি সংশয় ঃ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো শিঙ্গাধ্বনির কথা বিশ্বাসই করে না। তাহলে এখানে 'তারা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের' এরকম করে বলা হলো কেনো?

সংশয়ভঞ্জন ঃ এখানে অপেক্ষা করার অর্থ তাদের অপরাধপ্রবণতা পরিহার না করা। অর্থাৎ আমৃত্যু পাপমগ্ন থাকা। অথবা পাপকর্মে নিমগ্ন থাকা অবস্থায় মহাপ্রলয় উপস্থিত হওয়া, যাতে করে দৃশ্যতঃ মনে হয়, তারা যেনো পাপ পরিত্যাগের উদ্দেশ্যে ওই শিঙ্গাধ্বনির অপেক্ষাতেই ছিলো।

'যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের বাক-বিতণ্ডাকালে' অর্থ শিঙ্গার ফুৎকার উত্থিত হবে সহসা, যখন তারা থাকবে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যকার ঘোর পার্থিব কর্মে কোলাহলমুখর।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, বাজারে বস্ত্রবিক্রেতা ও ক্রেতা কাপড়ের দরদাম ঠিক করতে থাকবে। তাদের দরদাম, কাপড়গোছানো এসকল কিছু শেষ হতে না হতেই অকস্মাৎ শুরু হবে শিঙ্গার ফুৎকারের সুবিকট আওয়াজ। এভাবে কেউ তখন তার উষ্ট্রী দোহন করে দুধ নিয়ে ফিরতে থাকবে স্বগৃহে, কিন্তু দুধপানের অবকাশ সে পাবে না, কেউ আহারকালে আহারের গ্রাস ওঠাবে মুখের কাছে, কিন্তু অবকাশ পাবে না তা গলাধঃকরণের।

ফারইয়াবীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে হঠাৎ, যখন মানুষ বাজারে ব্যস্ত থাকবে ক্রয়-বিক্রয়ে। বস্ত্রবিক্রেতা মাপতে থাকবে কাপড়, দুগ্ধদোহন করতে থাকবে উটের রাখাল, আবার কেউ ব্যস্ত থাকবে দুনিয়ার নানা কাজে।

এর পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'তখন তারা ওসীয়ত করতে সমর্থ হবে না এবং নিজেদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে আসতেও পারবে না'।

হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম থেকে আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ তাঁর 'জাওয়াইদুজ্ জুহুদ' গ্রন্থে লিখেছেন, কিয়ামত এসে পড়বে অতর্কিতে, যখন কাপড়ের দোকানদার মেপে দিতে থাকবে বিক্রিত কাপড়, দোহনকারী দুগ্ধদোহন করতে থাকবে তার উষ্ট্রীর। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'তখন তারা ওসীয়ত করতে সমর্থ হবে না ......'। অর্থাৎ কিয়ামত শুরু হলে কেউ তার

www.eelm.weebly.com

পরিবার-পরিজনকে বৈষয়িক বিষয়ে কোনো ওসীয়ত করবার অবকাশই পাবে না। এমনকি নিজের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে মিলিত হবার সময়ও তারা পাবে না। তার আগেই ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে।

তাফসীরে মাযহারী/৩৪

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮

❑ যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে তখনই তাহারা কবর হইতে ছুটিয়া আসিবে তাহাদের প্রতিপালকের দিকে।

❑ উহারা বলিবে, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদিগকে আমাদের নিদ্রাস্থল হইতে উঠাইল? দয়াময় আল্লাহ্ তো ইহারই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলিয়াছিলেন।'

❑ ইহা হইবে কেবল এক মহানাদ; তখনই ইহাদের সকলকে উপস্থিত করা হইবে আমার সম্মুখে,

❑ আজ কাহারও প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না এবং তোমরা যাহা করিতে কেবল তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

❑ এই দিন জান্নাতবাসিগণ আনন্দে মগ্ন থাকিবে,

❑ তাহারা এবং তাহাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়া বসিবে।

❑ সেথায় থাকিবে তাহাদের জন্য ফলমূল এবং তাহাদের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু,

❑ সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সম্ভাষণ।

'ওয়া নুফিখা ফিস্ সূর' অর্থ আর যখন শিঙ্গার ফুৎকার দেওয়া হবে। বিষয়টি সুনিশ্চিত। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতীত কালার্থক শব্দ 'নুফিখা', যেনো তা হয়েই গিয়েছে।

তাফসীরে মাযহারী/৩৫

এখানে বলা হয়েছে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুৎকারধ্বনির কথা। প্রথম ফুৎকারে জীবিত সকল কিছু মৃত্যুবরণ করবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকার শুনে সকলে পুনরুত্থিত হবে তাদের আপনাপন সমাধিস্থল থেকে। ছুটে যাবে বিচারের ময়দানে। তাই এখানে বলা হয়েছে— তখনই তারা কবর থেকে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে।

দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান হবে চল্লিশ বৎসর। হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে এরকম বলেছেন ইবনে আবী হাতেম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা একবার এক সমাবেশে বললেন, রসুল স. বলেছেন, দুই ফুৎকারের মধ্যকার ব্যবধান হচ্ছে চল্লিশ।

লোকেরা বললো, চল্লিশ কী— দিন, মাস, না বৎসর? তিনি বললেন, জানি না। কেননা রসুল স. একথা স্পষ্ট করে বলেননি। কিন্তু সর্বোন্নত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ এসেছে চল্লিশ বৎসরের।

'জ্বদছ' এর বহুবচন 'আজ্বদাছ'। এর অর্থ সমাধিসমূহ। 'ইয়ান্সিলূন' অর্থ উত্থিত হবে, ছুটে আসবে। 'নাসল' এর ধাতুগত অর্থ একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া। যেমন বলা হয় 'নাসালাল ওয়াবারু মিনাল বায়ীর' (উট থেকে তার পশম পৃথক করা হয়েছে)। সন্তান যেমন এক সময় পিতা থেকে পৃথক হয়ে যায়, তেমনি তখন সমাধি থেকে পৃথক হয়ে যাবে সমাধিবাসীরা। কোনো কোনো ভাষাবিদ শব্দটির অর্থ করেছেন— দ্রুতগতিতে ছুটে আসা। অর্থাৎ কবরবাসীরা তখন ছুটে আসবে তাদের

www.eelm.weebly.com

প্রভুপ্রতিপালক সকাশে। 'কামুস' অভিধানেও শব্দটির অর্থ করা হয়েছে এভাবে। এর ধাতুমূলরূপ হচ্ছে— নাসল, নাসীল ও নুসলান।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে ওঠালো'। বিষয়টি ধ্রুবসত্য। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সুনিশ্চিতার্থক অতীতকালের ক্রিয়াপদ। কিন্তু এর অর্থ হবে ভবিষ্যতকালের। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন এরকম কথা অবশ্যই বলবে।

এখানকার 'ওয়াইল' শব্দটি ধাতুমূল হলেও এ থেকে কোনো শব্দ নিস্পন্ন হয় না। অধিকাংশ ভাষাবিশারদদের মতে এর ধাতুগত কোনো অর্থ নেই। তবে একথা সর্বজনবিদিত যে, 'ওয়াইল' হচ্ছে নরকের একটি ভয়ংকর অধিত্যকার নাম। আবার কামুস রচয়িতা বলেছেন, শব্দটির অর্থ পাঁকে পড়া, দুর্ভোগকবলিত হওয়া। তাই এখানে শব্দটির বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে আক্ষেপপ্রকাশক অভিব্যক্তিরূপে এভাবে— হায়! দুর্ভোগ আমাদের।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, তিরমিজি, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হাব্বান, হাকেম, বায়হাকী, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া ও হান্নাদ কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক প্রত্যয়িত এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম 'ওয়াইল'। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা চল্লিশ বৎসর ধরে ক্রমাবতরণ করে পৌঁছে যাবে ওই ঝুলন্ত উপত্যকায়।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে সাঈদ ইবনে মনসুর, ইবনে মুনজির ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, জাহান্নামের এক উপত্যকার নাম 'ওয়াইল'। সেখানে জমা হবে জাহান্নামীদের পুঁজ ও রক্ত। উপত্যকাটি নির্ধারণ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র রসুলের অস্বীকারকারীদের জন্য। হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান থেকে ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নরকস্থিত একটি পাহাড়ের নাম 'ওয়াইল'।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে শিথিল সূত্রে বায্যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নরকে রয়েছে একটি সুউচ্চ শৈলশিখর। আরাফবাসীরাও শৈলচূড়ায় ওঠানামা করতে থাকবে। ওই শৈলচূড়ার নাম 'ওয়াইল'।

'মাম্ বাআ'ছনা মিম্ মারক্বদিনা' অর্থ, কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে ওঠালো? হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা বলেছেন, শিঙ্গার দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তি স্থগিত থাকবে। তাই তারা তখন থাকবে ঘোর সুখনিদ্রায় সমাচ্ছন্ন। দ্বিতীয় ফুৎকার ধ্বনিত হলে তারা হতচকিত হয়ে বলবে, কে আমাদেরকে জাগালো?

মুতাজিলারা বলে, কবরে কোনো আযাব হবে না। আলোচ্য বাক্যকেই তারা তাদের অভিমতের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। বলে, কবর যদি নিদ্রাস্থলই হয়, তবে সেখানে আর আযাবের অবকাশ কোথায়? কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, তারা তো নিদ্রামগ্ন থাকবে দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে। সুতরাং তার পূর্বে কবর আযাব হবে না, একথা কীভাবে বলা যায়? তাত্ত্বিকগণ বলেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যখন পুনরুত্থিত হয়ে জাহান্নামের ভয়ংকরতা দেখবে, তখন ওই আযাবের তুলনায় তাদের কাছে কবর আযাবকে মনে হবে স্বপ্নপুরীসদৃশ। তাই তারা তখন বলবে, হায়রে! কে আমাদেরকে জাগালো স্বপ্নিল সুপ্তি থেকে?

এরপর বলা হয়েছে— 'দয়াময় আল্লাহ্ তো তারই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রসুলগণ সত্যিই বলেছিলেন'। উল্লেখ্য, সেদিন অবিশ্বাসীদের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসবে এমতো বিশ্বাসানুকূল উক্তি। কেউ কেউ বলেছেন, এমতো উক্তি উচ্চারণ করবে ফেরেশতারা এবং সেটা হবে অবিশ্বাসীদের 'কে আমাদেরকে জাগালো' প্রশ্নের জবাব। মুজাহিদ বলেছেন, অবিশ্বাসীদের এমতো প্রশ্নের জবাবে এরকম কথা বলবে বিশ্বাসীরা। তবে একথা ঠিক যে, আলোচ্য বাক্য কোনো প্রশ্নের জবাব নয়। কারণ আলোচ্য আয়াত প্রশ্নোত্তরাকারসম্পন্ন নয়। বরং আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদেরকে তাদের অপপরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেওয়াই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কথাটির মাধ্যমে তাদেরকে একথাই বলে দেওয়া হয়েছে যে, মহাপুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার এবং রসুলের বাণী সত্য। এর অন্যথা হওয়া অসম্ভব। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে আল্লাহ্‌র যে প্রতিশ্রুতি ও রসুলের যে সতর্কবাণী অস্বীকার করেছিলে, আজ দ্যাখো আল্লাহ্ তা বাস্তবায়ন করলেন। দেখালেন সত্যের স্বরূপ। সুতরাং 'কে আমাদেরকে জাগালো' এরকম প্রশ্ন এখন নিষ্ফল।

এরপরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'এটা হবে কেবল এক মহানাদ, তখনই এদেরকে উপস্থিত করা হবে আমার সম্মুখে'। একথার অর্থ— শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুৎকারধ্বনিও একটি মাত্র সুবিকট আওয়াজ। ওই আওয়াজ ফুৎকারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল মানুষকে বিচারার্থে উপস্থিত করা হবে আমার সকাশে। এরও কোনো অন্যথা ঘটবে না।

এরপরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'আজ কারো প্রতি জুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে'। একথার অর্থ— আজ প্রতিফল প্রদান দিবস। আজ দেওয়া হবে সকলের কর্মকাণ্ডের যথোপযুক্ত বিনিময়। চিরশাস্তি, অথবা চিরস্বস্তি। কারো প্রতি কোনো অন্যায়াচরণ করা হবে না।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'এই দিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে'।

এখানকার 'শুগুল'(আনন্দে মগ্ন থাকবে) কথাটির মর্মার্থ গ্রহণে ভাষাবিশারদগণ মতদ্বৈধতা করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আনন্দ' অর্থ দুই সন্তানের জননীর সঙ্গে সহবাসের মতো পুলক। ওয়াকী ইবনে জাররাদ বলেছেন, এর অর্থ সঙ্গীতানন্দ। আরো বলেছেন, জান্নাতীগণ থাকবে জাহান্নামের শাস্তি থেকে সতত নির্ভয় ও নির্লিপ্ত। সেটাই হবে তাদের আনন্দমগ্ন থাকা। কালাবী বলেছেন, জান্নাতীগণ জান্নাতের নেয়ামতসম্ভারের মধ্যে থাকবে পূর্ণরূপে নিমজ্জিত। নারকীদের কথা তাদের মনেই থাকবে না। হাসান বলেছেন, জান্নাতবাসীরা জান্নাতের আদর আপ্যায়নে থাকবে আসক্তা নিমজ্জিত। ইবনে কীসানের মতে তারা থাকবে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, জান্নাতবাসীরা যে যা পছন্দ করে তাই নিয়ে মত্ত থাকবে তখন।

আধ্যাত্মিক সাধকগণের আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। সেকারণেই তাঁরা জান্নাতে উপভোগ করবেন কেবল আল্লাহ্দর্শনের আনন্দ। ওই পবিত্র দর্শনই তাঁদের 'শুগুল'। আবার অনেক জান্নাতবাসীর 'শুগুল' হবে তখন পানাহার, রতিবিহার, সঙ্গীত ইত্যাদি। এ সম্পর্কে আবু নাঈম খাজা বায়েজীদ বোস্তামীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। উক্তিটি এরকম— আল্লাহ্র এমন অনেক বান্দা রয়েছেন, যাঁরা জান্নাতে মশগুল থাকবেন কেবল আল্লাহ্র দীদার নিয়ে। যদি কখনো তাতে ছেদ পড়ে, তবে তারা চিৎকার করে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাবার জন্য ফরিয়াদ জানাতে থাকবেন, যেমন করে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যাবার জন্য ফরিয়াদ জানাবে জাহান্নামবাসীরা।

'শুগুল' শব্দটির সঙ্গে তান্ভীন সংযোগ করে করা হয়েছে 'শুগুলিন্'। এই তান্ভীন আভিজাত্যপ্রকাশক। অর্থাৎ এরকম তান্ভীন এখানে ব্যবহার করা হয়েছে জান্নাতবাসীদের অনন্য আভিজাত্য প্রকাশার্থে। তাঁদের সেখানকার সম্ভোগসম্ভার হবে অফুরন্ত। সে সকল সম্ভোগোপকরণের পরিমাপ করার সাধ্য কারো নেই।

এখানকার 'ফাকিহুন' শব্দটি সাধিত হয়েছে 'ফাকাহাতুন' থেকে। এর অর্থ মগ্নতা, মত্ততা। অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা সেখানকার আনন্দে থাকবে পূর্ণনিমগ্ন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সীমাহীন আনন্দে তখন বুঁদ হয়ে থাকবে তারা।

এরপরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে'।

এখানে 'জিলালিন্' অর্থ সুশীতল ছায়া। 'জেল' এর বহুবচন 'জিলাল'। অথবা 'জিলাল' বহুবচন 'জুল্লাতুন' এর। 'জুল্লাতুন' অর্থ ছায়াপ্রদায়ক বস্তু, যা প্রতিহত করে সূর্যোত্তাপ। যেমন বাসগৃহ, তাঁবু, ঘনপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ।

'আরিকা'র বহুবচন 'আরাইক'। এর অর্থ অন্তরায় সৃষ্টিকারী মশারী। ছা'লাবীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বাগবী লিখেছেন, অন্তরায়বিবর্জিত মশারী 'আরিকা' নয়। হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, মশারীআচ্ছাদিত শয়নশয্যা আড়ালশূন্য হলে তাকে 'আরিকা' বলে না। অন্তরালবিবর্জিত শয্যা বা আসনও 'আরিকা' নয়। বরং অন্তরায়াচ্ছাদিত শয়নশয্যা অথবা রাজসিংহাসনকেই বলে 'আরিকা'। আর এমতো সুআবৃত ও সুসজ্জিত আসনেই হেলান দিয়ে সস্ত্রীক উপবেশন করবে জান্নাতবাসীরা। মুজাহিদের উক্তি উদ্ধৃত করে বায়হাকী বলেছেন, তাদের ওই সুখাসনগুলোর মশারী হবে ইয়াকুতবিশিষ্ট ও মনি-মুক্তার সূত্রসম্বলিত।

এরপরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফলমূল এবং তাদের জন্য বাঞ্ছিত সকলকিছু'। একথার অর্থ— সেখানে পানাহারের প্রকৃষ্ট উপকরণও মওজুদ থাকবে তাদের জন্য। এছাড়া তারা যা চাইবে, তা-ই পাবে। 'বাঞ্ছিত সকলকিছু' কথাটির অর্থ হবে এখানে— পৃথিবীর জীবনে জান্নাতের অফুরন্ত সুখ তারা যেভাবে চাইতো, সেখানে তা তেমনই পাবে।

এরপরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— 'সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সম্ভাষণ'। একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তাদেরকে সালাম জানাবেন সরাসরি। অথবা সালাম পৌঁছানো হবে তাঁর ফেরেশতাগণের মাধ্যমে। ওই শান্তিসম্ভাষণই হবে বেহেশতবাসীদের সকল সুখের সূত্র।

হজরত জাবের সূত্রে ইবনে মাজা, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, আজারী ও দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা যখন আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকবে, তখন হঠাৎ তাদের উপরে পতিত হবে একটি জ্যোতির সম্পাত। শিরোত্তোলন করতেই তারা দেখতে পাবে, আবির্ভাব ঘটেছে আল্লাহ্র উদাহরণরহিত উপস্থিতির। তখন তিনি জান্নাতবাসীদেরকে শোনাবেন শান্তিসম্ভাষণ। বলবেন, তোমাদের উপরে শান্তি, কেবলই শান্তি। ওই শান্তিবারতার কথাই বলা হয়েছে 'সালামুন ক্বওলাম্ মির রব্বির রহীম' আয়াতে। তিনি স. আরো বলেছেন, জান্নাতবাসীরা তখন অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকবে আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন জ্যোতিচ্ছটার দিকে। আল্লাহ্ও তখন অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখতে থাকবেন তাঁর প্রিয়তম বান্দাদেরকে। ওই সময় জান্নাতের অফুরন্ত সম্ভোগসম্ভারের কথা আর তাদের মনেই থাকবে না। দীদার। কেবলই দীদার। হুঁশ হবে তখন,

www.eelm.weebly.com

যখন মাঝখানে সৃষ্টি করা হবে অন্তরাল। কিন্তু দীদারের রেশ চলতে থাকবে তখনো, জান্নাতের অলি, গলি, অলিন্দে, সবখানে।

আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, আল্লাহ্পাকের দীদার সংঘটিত হবে স্থানাতীত ও কালাতীত পর্যায়ে। কেননা তিনি স্থান ও কালসম্ভূত নন।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জান্নাতবাসীদেরকে শান্তিসম্ভাষণ জানাবে ফেরেশতারা। মুকাতিল বলেছেন, জান্নাতের প্রতিটি দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করবে ফেরেশতামণ্ডলী। তারা উচ্চারণ করতে থাকবে— ওহে অক্ষয় সৌভাগ্যাধিকারী ব্যক্তিবর্গ! শোনো সম্ভাষণ— শাশ্বত শান্তির— চিরায়ত নিরাপত্তার।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭

❑ আর 'হে অপরাধিগণ! তোমরা আজ পৃথক হইয়া যাও।'

❑ হে বনী আদম! আমি কি তোমাদিগকে নির্দেশ দিই নাই যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করিও না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

❑ আর আমারই 'ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ।

❑ শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, তবুও কি তোমরা বুঝ নাই?

❑ ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

❑ আজ তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর; কারণ তোমরা ইহাকে অবিশ্বাস করিয়াছিলে।

❑ আমি আজ ইহাদের মুখ মোহর করিয়া দিব, ইহাদের হস্ত কথা বলিবে আমার সহিত এবং ইহাদের চরণ সাক্ষ্য দিবে ইহাদের কৃতকর্মের।

❑ আমি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই ইহাদের চক্ষুগুলিকে লোপ করিয়া দিতাম, তখন ইহারা পথ চলিতে চাহিলে কি করিয়া দেখিতে পাইত!

❑ এবং আমি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই স্ব স্ব স্থানে ইহাদের আকৃতি পরিবর্তন করিয়া দিতাম, ফলে ইহারা চলিতে পারিত না এবং ফিরিয়াও আসিতে পারিত না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আর হে অপরাধীগণ! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও'। মুকাতিল, সুদ্দী ও জুজায বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলা হবে— হে পাপিষ্ঠের দল! তোমরা আজ পুণ্যবানদের নিকট থেকে আলাদা হয়ে যাও। একথা বলেই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদেরকে পৃথক করে ফেলা হবে চিরতরে। তাদের জন্য নির্ধারণ করা হবে চিরকালীন জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

www.eelm.weebly.com

জুহাক বলেছেন, অবিশ্বাসীদেরকে বন্দী করা হবে দোজখের একটি প্রকোষ্ঠে। তারপর বন্ধ করা হবে তার অগ্নিতোরণ। তখন তারা কোনোকিছুই আর দেখতে পাবে না। দৃষ্ট হবে না তারাও।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবার পর জাহান্নামীদেরকে আবদ্ধ করা হবে লোহার সিন্দুকে। তারপর তার ডালা বন্ধ করে দেওয়া হবে লৌহকীলক দিয়ে। ওই সিন্দুকটি আবার আবদ্ধ করা হবে আর একটি ধাতুনির্মিত সিন্দুকের মধ্যে। তারপর সেটিকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের অন্ধকার গহ্বরে। তখন তারা নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাবে না। তাই অন্যের শাস্তিও থাকবে তাদের দৃষ্টিবহির্ভূত। সুয়াইদ ইবনে আলকামা সূত্রে আবু নাঈম ও বায়হাকীও হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব কোরো না, কারণ সে তোমাদের
প্রকাশ্য শত্রু (৬০)? আর আমারই ইবাদত করো, এটাই সরল পথ (৬১)। শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিলো, তবুও কি তোমরা বুঝনি (৬২)'?

এখানে 'আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি' অর্থ আমি কি আমার নবী-রসুলগণের মাধ্যমে শয়তানের আনুগত্যের অনিষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেইনি? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এরকম না বাচক প্রশ্নের অস্বীকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় হাঁ বাচকতা। তাই কথাটির সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— আমি তো তোমাদেরকে পূর্বাহ্নেই এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। বাক্যটি পূর্বের 'তোমরা আজ পৃথক

হয়ে যাও' নির্দেশটির কারণপ্রকাশক। অর্থাৎ হে অপরাধীরা! আজ তোমাদেরকে পুণ্যবানদের কাছ থেকে পৃথক হবার নির্দেশ দিচ্ছি এই কারণে যে, তোমরা আমা কর্তৃক প্রদত্ত পূর্বসতর্কতাকে মান্য করোনি।

'লা তা'বুদুশ্ শায়ত্বান' অর্থ শয়তানের দাসত্ব কোরো না। অর্থাৎ আল্লাহ্র আনুগত্যকে পরিহার করে গ্রহণ কোরো না শয়তানের আনুগত্যকে। 'ইন্নাহু লাকুম আদুউ্উম মুবীন' অর্থ কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। অর্থাৎ শয়তান যে তোমাদের নিশ্চিত দুশমন। সেকারণেই তো নিষেধ করেছিলাম তার দাসত্ব করতে।

'হাজা সিরাতুম্ মুসতাক্বীম' অর্থ এটাই সরল পথ। এখানে 'সিরাত' শব্দটি 'তান্ভীন' সংযোগে সন্নিবেশিত করা হয়েছে আধিক্য প্রকাশার্থে। কিংবা আংশিকতা বোঝানোর জন্য। কারণ 'তাওহীদ' (আল্লাহ্র এককত্বে বিশ্বাস) সরল পথে চলার একটি অংশ।

'জিবিল্লান' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে সৃষ্টজীব, অথবা একটি দলকে, যারা অর্জন করেছে পূর্ণজ্ঞান, অথবা পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা। 'শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিলো' কথাটি শয়তানের শত্রুতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা বিভ্রান্ত করা শত্রুতামূলক কাজ। আর এ কাজেই সে থাকে সতত সচেষ্ট। সুতরাং সে যে আদমসন্তানদের শত্রু, সেকথা সুনিশ্চিত। আল্লাহ্তায়ালাই সকল ইষ্ট-অনিষ্টের অধিকর্তা। অথচ সে পরিত্রাণ প্রাপ্তি এবং অনিষ্ট থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্য মানুষকে প্ররোচিত করে মূর্তির ইবাদত করতে। এভাবে তাদেরকে লিপ্ত করায় শিরিকের মতো অনপনেয় পাপে।

'আফালাম তাকূনূ তা'ক্বিলুন' অর্থ তবুও কি তোমরা বুঝনি? প্রশ্নটি ভর্ৎসনা ও হুমকিপ্রকাশক।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এটাই সেই জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিলো (৬৩)। আজ তোমরা এতে প্রবেশ করো, কারণ তোমরা একে অস্বীকার করেছিলে (৬৪)।

এরপরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'আমি আজ এদের মুখ মোহর করে দিবো, এদের হাত কথা বলবে আমার সঙ্গে এদের চরণ সাক্ষ্য দিবে এদের কৃতকর্মের'।

মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্পাক কাফেরদের জবান বন্ধ করে দিবেন। তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাকশক্তি দিয়ে। সেই বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। এ প্রসঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একদিন আমরা রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি স. মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, তোমরা কি জানো, কেনো আমি সস্মিত হলাম? আমরা বললাম, আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুলই তা উত্তমরূপে অবগত। তিনি স. বললেন, শোনো তাহলে, মহাবিচারের সময় এক লোক আল্লাহ্কে বলবে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা। তুমি আমাকে জুলুম থেকে রেহাই দাওনি। আল্লাহ্

বলবেন, কীভাবে? সে বলবে, আমি নিজের সাক্ষ্য ছাড়া আর কারো সাক্ষ্য মানি না। আল্লাহ্ বলবেন, তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তাহলে সাক্ষ্য দিক। এরপর তার মুখে এঁটে দেওয়া হবে কুলুপ। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে করা হবে বাকশক্তিসম্পন্ন। তারা তখন

প্রকাশ করতে থাকবে তার অপকর্মসমূহের ফিরিস্তি। শেষে যখন তার মুখের কুলুপ খুলে দেওয়া হবে, তখন সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলবে, দূর হও। নিপাত যাও। আমি তো ভেবেছিলাম, তোমরাই আমাকে রক্ষা করবে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একবার সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা পরকালে কীভাবে আল্লাহ্‌কে দেখবো? তিনি স. বললেন, নির্মেঘ আকাশে দ্বিপ্রহরের সূর্যদর্শন কি অন্তরালসম্পন্ন হয়? সাহাবীগণ বললেন, না। তিনি স. বললেন, পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশের পূর্ণচন্দ্রিমা কি দর্শনবিমুক্ত থাকে? সকলে সমস্বরে বললেন, না। তিনি স. বললেন, শপথ ওই পবিত্রাতিপবিত্র সত্তার! যার অধিকারে আমার জীবনদীপ, তোমাদের আল্লাহ্‌ দর্শনও হবে তেমনি অবাধ। আল্লাহ্‌ তখন তাঁর এক বান্দাকে ডেকে বলবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে আভিজাত্যমণ্ডিত করিনি? করিনি কি জননেতা? দান করিনি কি সহধর্মিণী? গৃহপালিত পশুগুলোকে কি করিনি তোমাদের আজ্ঞাবহ? দেইনি কি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক চতুর্থাংশ অংশের সম্ভোগাধিকার? বান্দা বলবে, নিশ্চয়। আল্লাহ্‌ বলবেন, আজকের এই মহাসম্মেলনের প্রতীতি কি তোমার ছিলো? সে বলবে, না। তখন আল্লাহ্‌ বলবেন, ঠিক আছে, তুমি যেমন আমাকে বিস্মৃত হয়েছিলে, তেমনি আজ আমিও তোমাকে বিস্মৃতিভূত করলাম।

এরপর আল্লাহ্‌পাক সাক্ষাতকার গ্রহণ করবেন তাঁর আর এক বান্দার। তার সঙ্গেও প্রশ্নোত্তর হবে এরকমই। এরপর প্রশ্ন করবেন তৃতীয় আর একজনকে। সে হবে কপটাচারী। আল্লাহ্‌র প্রশ্নের উত্তরে সে বলতে থাকবে, হে আমার পরম প্রভুপালয়িতা! আমি ইমান এনেছিলাম তোমার উপর। তোমার বাণী ও তোমার প্রেরিত পুরুষগণের উপর। নামাজ পড়েছিলাম। জাকাতও দিয়েছিলাম। এরপর সে শুরু করবে আল্লাহ্‌র উচ্ছ্বসিত স্তব-স্তুতি। আল্লাহ্‌ রোষান্বিত হবেন। বলবেন, এবার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের। সে তখন বিপাকে পড়বে। আল্লাহ্‌ তার মুখে কুলুপ এঁটে দিবেন। তার অপকর্মের ফিরিস্তি বর্ণনা করতে থাকবে তার উরুদেশ। মুসলিম। সর্বোন্নত সূত্রে হজরত উকবা ইবনে আমের থেকে তিবরানী ও আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেদিন মুখে কুলুপ লাগিয়ে দেওয়া হলে সর্বপ্রথম সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে বাম উরু। মুয়াবিয়া ইবনে হাইদাহ্‌ সূত্রে আহমদ, নাসাঈ, হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, মহাবিচারের দিবসে তোমরা হবে চরম সংকটকবলিত। তোমাদের মুখ থাকবে বন্ধ। প্রথমে কথা বলবে তোমাদের বাম উরু ও হাত।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, মহাবিচারের দিবসে পরীক্ষা করবার জন্য ডাকা হবে এক মুমিন বান্দাকে। তার প্রভুপালয়িতা নেপথ্য থেকে তার সম্মুখে উপস্থাপন করবেন তার

আমলনামা। সে সবিনয়ে স্বীকৃতি দিবে, হে আমার প্রভুপালয়িতা! আমলনামায় যা কিছু লেখা আছে, তার সবই আমি করেছি। আল্লাহ্‌ তখন তার পাপরাশির উপরে স্থাপন করবেন আবরণ। মার্জনা করবেন তাকে। তার পাপের কথা তাই কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না। কেবল তার পুণ্য নজরে আসবে সকলের। এরপর ডাকা হবে এক কপট বিশ্বাসীকে। তার সামনে তার আমলনামা হাজির করা হলে সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা। তোমার সম্মানের শপথ! আমলনামায় লেখা পাপগুলো আমি করিনি। তোমার ফেরেশতারা ইচ্ছে করে এগুলো লিখেছে। আল্লাহ্‌ বলবেন, মনে করে দ্যাখো তুমি এই অপকর্মগুলো করেছো অমুক অমুক স্থানে। সে বলবে, তোমার আভিজাত্যের কসম! আমি এগুলো করিইনি। এভাবে যখন সে অস্বীকার করতেই থাকবে তখন তাকে করা হবে বাকরুদ্ধ। হজরত আবু মুসা আশয়ারী বলেন, আমার ধারণা, এরপর রসুল স. বলেছিলেন, তখন প্রথমে বাকস্ফূরিত হবে তার উরুদেশ থেকে। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন 'আমি আজ এদের মুখ মোহর করে দিব......'।

আবু ইয়ালী কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক যাচাইকৃত হজরত আবু সাঈদ খুদরীর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের প্রাক্কালে অবিশ্বাসীদের অপকর্ম সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে তাদেরকে দেওয়া হবে ধিক্কার। কিন্তু তারা তাদের অপরাধ অস্বীকার করবে। বলা হবে, তাহলে শপথ করে বলো। তারা উচ্চারণ করতে থাকবে শপথের পর শপথ। তাই আল্লাহ্‌ তাদেরকে করবেন বাকহীন। তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাতা হিসেবে দাঁড় করাবেন তাদেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে। তারপর তাদেরকে নিক্ষেপ করবেন দোজখে।

এরপরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'আমি ইচ্ছা করলে অবশ্যই এদের চক্ষুগুলোকে লোপ করে দিতাম, তখন এরা পথ চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেতো'?

এখানে 'আস্‌সিরাত' অর্থ পথ, ওই পথ যে পথে তারা চলতে অভ্যস্ত। আর 'কি করে তারা দেখতে পেতো' প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। বাগবী লিখেছেন, হাসান ও সুদ্দী কথাটির অর্থ করেছেন— তারা দেখতে সমর্থ হতো না পথের নিশানা। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা, আতা ও মুকাতিলের অভিমত হচ্ছে, এখানে 'আ'ইয়ুন' অর্থ বিভ্রান্তির চক্ষু এবং চক্ষুগুলোকে লোপ করে দেওয়ার অর্থ এখানে চোখগুলোকে উপড়ে ফেলা। বিভ্রান্তির চক্ষুগুলোকে হেদায়েতের পথের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া। তাই তাঁদের অভিমত্যানুসারে বক্তব্যের অর্থ দাঁড়াবে— আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে তাদের চোখগুলো উপড়ে ফেলে দূরে নিক্ষেপ করতাম, যেনো তারা দেখতে না পায় বিভ্রান্তির পথ, যাতে করে তারা ফিরতে পারে সুপথের দিকে। কিন্তু আমার অভিপ্রায় তা নয়। সুতরাং তাদের পক্ষে সুপথদর্শন যে অসম্ভব।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'এবং আমি ইচ্ছা করলে অবশ্যই স্ব স্বস্থানে এদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিতাম, ফলে এরা চলতে পারতো না এবং

ফিরেও আসতে পারতো না'। একথার অর্থ— আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তো তাদেরকে তাদের বসতবাটিতেই রূপান্তরিত করে দিতে পারতাম শূকর ও বানরে। ফলে তারা হারিয়ে ফেলতো মানুষের মতো স্বাভাবিক গতিবিধি। ফিরেও পেতে পারতো না পূর্বরূপ। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— আমি তাদেরকে নিশ্চল পাথরে পরিবর্তিত করতে পারতাম। তখন তারা স্থবির হয়ে পড়ে থাকতো আপনাপন বাসগৃহে।

'ওয়ালা ইয়ারজ্বিউন' অর্থ তারা স্থানচ্যুত হতে পারতো না, হয়ে যেতো চলচ্ছক্তিরহিত। কেউ কেউ অর্থ করেছেন— আমার রসুলকে অস্বীকারের পর তারা আর ফিরে আসতে পারতো না স্বীকৃতিদাতারূপে।

হাসান বসরীর অভিমতানুসারে এই আয়াত ও এর পূর্বের আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এরকম— প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও সত্যপ্রত্যাখ্যানের কারণে তারা হয়েছে আকৃতি রূপান্তরের উপযুক্ত। কিন্তু আমি যে করুণার পারাবার, মার্জনার মহাসাগর। তাই তাদেরকে নিপতিত করিনি তাৎক্ষণিক শাস্তিতে। এটা হচ্ছে আমার পরম সহিষ্ণুতা ও নিগুঢ় প্রজ্ঞাময়তার এক অতুলনীয় নিদর্শন।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৬৮, ৬৯, ৭০

❑ আমি যাহাকে দীর্ঘ জীবন দান করি প্রকৃতিগতভাবে তাহার অবনতি ঘটাই। তবুও কি উহারা বুঝে না?

❑ আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করিতে শিখাই নাই এবং ইহা তাহার পক্ষে শোভনীয় নহে। ইহা তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন;

❑ যাহাতে সে সতর্ক করিতে পারে জীবিতগণকে এবং যাহাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হইতে পারে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি যাকে দীর্ঘ আয়ু দান করি, তাকে স্বাভাবিকভাবেই করে ফেলি বলহীন। অর্থাৎ প্রথমে তাকে দান করি যৌবনের শক্তিমত্তা, তারপর তার উপরে আরোপ করি বার্ধ্যক্যের দৌর্বল্য। এ হচ্ছে আমা কর্তৃক নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়ম।

এখানকার 'তবুও কি তারা বোঝে না' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ তাদের এতটুকু বোধ থাকাই যথেষ্ট ছিলো যে, যে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ প্রকৃতিগতভাবে তাদের রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম, তিনি তাদের দৃষ্টি শক্তি বিলোপ ও

আকৃতি পরিবর্তন করতেও নিশ্চয় সক্ষম। পার্থক্য কেবল এতোটুকু যে, প্রকৃতিগত পরিবর্তন আসে শ্লথ গতিতে, আর তাদের আকৃতি পরিবর্তনের বিষয়টি হবে এক সঙ্গে।

কালাবীর বক্তব্যের অনুসরণে বাগবী লিখেছেন, মক্কার মুশরিকেরা রসুল স.কে মনে করতো কবি। বলতো কোরআন তাঁরই রচিত কাব্য। তাদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত (৬৯)। বলা হয়—

'আমি রসুলকে কাব্যরচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার জন্য শোভনীয় নয়'। একথার অর্থ— আমি আমার রসুলকে শিক্ষা দিয়েছি আমার বাণী আলকোরআন। এ বাণী প্রত্যাদেশিত। এ বাণী তার স্বসৃষ্ট বা স্বরচিত নয়। কবিতার মতো কল্পনাবিহার এবং ছন্দসর্বস্বতা এতে নেই। কেবল চিত্তবিনোদন এর লক্ষ্য নয়। আর আমার রসুলের জন্য এটা নিতান্ত অশোভন যে, তিনি শুধু দায়িত্বহীন শিল্পসৃষ্টিতে মগ্ন থাকবেন।

একটি সংশয় ঃ হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে বোখারী ও মুসলিম তাঁদের আপনাপন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. একবার একটি ছন্দবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন এভাবে— আনান্ নাবীয়্যু লা কাজিব ঃ আনাব্নু আবদিল মুত্তালিব (আমি একজন নবী, একথা অসত্য নয়। আর আমি তো পৌত্র আবদুল মুত্তালিবের)। হজরত জুনদুব ইবনে আবু সুফিয়ানের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. একবার আবৃত্তি করেছিলেন— হাল আনতা ইল্‌লা ইসবুউ'ন রুমীতি ঃ ওয়া ফী সাবীলিল্লাহি মা

www.eelm.weebly.com

লাব্কীতি (আরে তুমি তো কেবল একটি আঙুল, আহত হয়েছো আল্লাহ্‌র পথে)। সুতরাং একথা কীভাবে বলা যায় যে, রসুল স. কাব্যরচনা করেননি?

সংশয়ের সমাধান ঃ উল্লেখিত পঙক্তিগুলো রসুল স. এর পবিত্র মুখে উচ্চারিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে। কথাগুলোকে কাব্যায়িত করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিলো না। ছিলো না তা সচেতন কাব্যকল্পনাজাত। পঙক্তিশেষের মিলও সৃষ্টি হয়েছে কাকতালীয়ভাবে, দৈবাৎ। এরকম স্বতঃস্ফূর্ত দুই একটি পঙক্তির নির্মাতাকে কবি বলা যায় না। কোনো কোনো গদ্যেও রয়েছে ছন্দের ঝংকার। তাই বলে কি তা কবিতা? কাব্য তো কবির সচেতন শিল্পপরিকল্পনার ফসল। খলিল তো জনোন্মাদনামূলক কোরাসকে কবিতা বলার পক্ষপাতিই নন।

তাছাড়া কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. প্রথমোক্ত বাণীর শেষ শব্দটি পাঠ করেছেন হরকত সহযোগে। অর্থাৎ মুত্তালিব এর স্থানে তিনি স. পাঠ করেছিলেন 'মুত্তালিবি'। আর এরকম করলে অন্ত্যমিল আর থাকে না। আবার শেষোক্ত বাণীতেও অন্ত্যমিল পরিলক্ষিত হয় না। 'রুমীতি' ও 'লাক্বীত' এর মধ্যে কোনো মিল নেই। সুতরাং রসুল স. কবিদের মতো মিল দিয়ে বাক্য রচনা করতেন, একথা কিছুতেই বলা যায় না।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. অন্যের রচিত কবিতাও নিখুঁত অন্ত্যমিলসহ আবৃত্তি করতে পারতেন না। কিছু না কিছু অমিল থেকেই যেতো। হাসান সূত্রে তিনি

লিখেছেন, একবার রসুল স. উপদেশচ্ছলে আবৃত্তি করলেন— কাফা বিল ইসলামি ওয়াশ শাইবি লিল্‌মারই মাহিয়ান। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কবিরা কবিতাটি আবৃত্তি করেন এভাবে— 'কাফাশ্‌ শাইবু ওয়াল ইসলামু বিল মারই নাহিয়ান'। রসুল স. পুনরায় আবৃত্তি করলেন। কিন্তু এবারও উচ্চারিত হলো আগের মতো। তখন হজরত আবু বকর বলে উঠলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্‌র সত্য পয়গম্বর। কবি কিছুতেই নন। আল্লাহ্‌পাক তো স্বয়ং ঘোষণা করেছেন 'আমি রসুলকে কাব্যরচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার জন্য শোভনীয় নয়'।

আবদুর রহমান ইবনে আবীয্‌ যানাদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. একবার আব্বাস ইবনে মারদাসকে বললেন, বলো, তোমরা কি এই কবিতাটি এভাবে পাঠ করো— আসবাহা নাহবী ওয়া নাহবুল আবীদ্‌ ✲ বাইনাল আকরাআ ওয়া উয়াইনাতা? হজরত আবু বকর আবৃত্তি শুনে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল স. আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক আমার জনয়িতা-জনয়িত্রী। আপনি না আবৃত্তিকার, না কবি। আর কাব্যনিষ্ঠ হওয়া আপনার জন্য সঙ্গতও নয়। কবিরা তো পঙক্তিটি উচ্চারণ করে এভাবে— বাইনা উয়াইনাতা ওয়াল আক্বরাই।

মিকদাম ইবনে শুরাইহের পিতা বর্ণনা করেছেন, আমি একবার উম্মতজননী হজরত আয়েশার নিকটে জানতে চাইলাম, মহাসম্মানিতা মাতঃ! রসুল স. কি কখনো দৃষ্টান্ত হিসেবে কোনো কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। একবার তিনি স. ইবনে রওয়াহার কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন এভাবে— ওয়া ইয়াতীকাল আখবার মাল্‌লাম তুযাওভিদী। মুয়াম্মারের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, একবার জনৈক ব্যক্তি জননী আয়েশার নিকটে জানতে চাইলেন, রসুল স. প্রসঙ্গক্রমে কবিতা থেকে কি কোনো উদ্ধৃতি দিতেন? তিনি বললেন, কবিতা ছিলো তাঁর সর্বাপেক্ষা অধিক অনাগ্রহের বিষয়। তাই তিনি তাঁর বক্তব্যকে রাখতেন সাধারণতঃ কাব্য-উদ্ধৃতিমুক্ত। তবে আমি তাঁকে একবার কায়েস ইবনে তরফ গোত্রের এক কবির কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি। কবিতাটি এরকম—

সাতুব্‌দী লাকাল আইয়্যামু মা কুনতা জ্বাহিলান
ওয়া ইয়াতিকা বিল আখবারি মাল্‌লাম তুয়াওভিদী।

কিন্তু রসুল স. শেষ চরণটি আবৃত্তি করেছিলেন এভাবে— ওয়া ইয়াতীকা মাল্‌লাম তুয়াওভিদী বিল আখবারি। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কবিতাটি এরকম নয়। তিনি স. বললেন, আমি তো কবি নই। কাব্যচর্চা আমার জন্য শোভনও নয়।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানকার 'ওয়ামা ইয়ামবাগীলাহু' কথাটির 'লাহু' সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে কোরআনের সঙ্গে। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— কোরআন কোনো কাব্যগ্রন্থ নয়। সুতরাং একে কাব্য বলা সমীচীন নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইন্‌হুয়া ইল্‌লা জিকর'ঙউ ওয়া ক্বুরআনুম্‌ মুবীন' (এটা তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কোরআন)। এখানে 'জিকরুন্‌' অর্থ সদুপদেশ, শুভসমাচার, সুপথসন্দেশ। 'মুবীন' অর্থ বর্ণনাকারী, প্রকাশক, সুস্পষ্ট বাণীসম্ভার, যাতে রয়েছে বিস্মৃত ইতিহাস, মহাসত্যের মহা-নির্দেশনা। কবিদের কাব্যকল্পনা কখনোই এরকম নয়। মানুষের পক্ষে এমতো বাণী নির্মাণ অসম্ভব।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতগণকে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে'।

এখানে 'যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতগণকে' অর্থ— যাতে আমার রসুল সাবধান হতে বলতে পারেন তাদেরকে, যারা ইমান এনেছে। প্রকৃত
ইমানদারগণের অন্তরাত্মা জীবন্ত। তাই তাদেরকে এখানে বলা হয়েছে জীবিত। পক্ষান্তরে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তারা মৃততুল্য। তাদের শাস্তি অনিবার্য। কোরআন তাই সতর্ক হতে বলে ইমানদারগণকে। আর কাফেরদেরকে শোনায় শাস্তির সংবাদ। এই শাস্তি অনিবার্য, অবশ্য-বাস্তবায়নব্য। তাই এখানে বলা হয়েছে— যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে। 'ইয়াহিক্বকাল ক্বওল' অর্থ শাস্তির কথা।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬

❑ উহারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমার হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে উহাদের জন্য আমি সৃষ্টি করিয়াছি 'আন'আম' এবং উহারাই এইগুলির অধিকারী?

❑ এবং আমি এইগুলিকে তাহাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছি। এইগুলির কতক তাহাদের বাহন এবং উহাদের কতক তাহারা আহার করে।

❑ তাহাদের জন্য এইগুলিতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞ হইবে না?

❑ তাহারা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করিয়াছে এই আশায় যে, তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে।

❑ কিন্তু এইসব ইলাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম নহে; তাহাদিগকে উহাদের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হইবে।

❑ অতএব তাহাদের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। আমি তো জানি যাহা তাহারা গোপন করে এবং যাহা তাহারা ব্যক্ত করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমার হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি আনআ'ম।

এখানে 'তারা কি লক্ষ্য করে না' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— তারা তো লক্ষ্য করেই। 'আমার হাতে সৃষ্ট' অর্থ আমা কর্তৃক সৃষ্ট। অর্থাৎ সৃজনকর্মে আমি ছাড়া আর কোনো অংশীদার নেই। সৃজন সম্পূর্ণতই আমার।

'আন্‌আ'মান' অর্থ চতুষ্পদ জন্তু। এদের মাধ্যমে মানুষ লাভ করে প্রভূত কল্যাণ। তাই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তুর কথা।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফাহুম লাহা মালিকূন' (এবং তারাই এগুলোর অধিকারী)। একথার অর্থ আমিই তাদেরকে বানিয়েছি চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মালিক, যাতে তারা তাদের প্রয়োজনমতো সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারে।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'এবং আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। এগুলোর কতক তাদের বাহন এবং এদের কতক তারা আহার করে' একথার অর্থ— এগুলোর মালিকানা আমি তো তাদেরকে দিয়েছিই, উপরন্তু এগুলোকে করে দিয়েছি তাদের সার্বক্ষণিক বশীভূত। ফলে যখন যেভাবে খুশী, এগুলোকে কাজে লাগাতে পারে তারা। কখনো কাজে লাগায় বাহনরূপে। আবার কখনো এগুলোকে করে তাদের আহার্য।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'তাদের জন্য এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু'। একথার অর্থ— তারা পশুগুলোর দ্বারা লাভ করে আরো অনেক প্রকারের উপকার। যেমন তাদের পশম ও চামড়া দ্বারা প্রস্তুত করে পোশাক, পাদুকা, তাঁবু ইত্যাদি। আবার পান করে এগুলোর দুধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না'? এই প্রশ্নটিও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক! আর এর সংযোগ রয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। এভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়— তারা কি আমা কর্তৃক প্রদত্ত এসকল নেয়ামতকে স্বীকার করে? এর জন্য যথোপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য ইলাহ্‌কে গ্রহণ করেছে এই আশায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে (৭৪)। কিন্তু এই সব ইলাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়, তাদেরকে তাদের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হবে' (৭৫)। একথার অর্থ— কী বিস্ময়! কী অবাধ্যাচরণ! আমি সকল কিছুর একমাত্র সৃজয়িতা। সকলের প্রভুপালনকর্তা। জীবনোপকরণ দাতা। অথচ মানুষ কী অবলীলায় আমাকে বিস্মৃত হয়ে বন্দনা-প্রার্থনায় রত হয় অপ্রাণ প্রতিমাসমূহের, যেগুলো নিজেই আত্মরক্ষা করতে সক্ষম নয়। অন্যের ইষ্ট-অনিষ্ট

করবার কোনো প্রকার যোগ্যতা তাদের থাকবে কীভাবে। তারা এবং তাদের উপাসকদের পরিণতি তাই হবে একই রকম। তাদের সকলকেই করা হবে এক কাতারভুক্ত এবং নিক্ষেপ করা হবে নরকাগ্নিতে।

হজরত আবু দারদা সূত্রে বায়হাকী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমার সাথে মানুষ ও জ্বিনদের আচরণ বিস্ময়কর। আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি। আমিই দান করি তাদের জীবনোপকরণ। অথচ তারা দাসত্ব করে অন্যের। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর এক জনের।

'ওয়াহুম জুনদুম মুহদ্বরুন' অর্থ তাদেরকে তাদের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হবে। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে প্রতিমাপূজারী ও তাদের পূজিত প্রতিমাগুলোকে একত্রিত করা হবে। দেখে মনে হবে তারা যেনো একই বাহিনীভূত। ওই একীভূত বাহিনীকে শেষে ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে জাহান্নামে।

এরপরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'অতএব তাদের কথা তোমাকে যেনো দুঃখ না দেয়'।

এখানে 'ফালা ইয়াহ্‌যুনকা' (যেনো দুঃখ না দেয়) কথাটির 'ফা' (যেনো) অব্যয়টি কারণ প্রকাশক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অংশীবাদীদের ভয়াবহ পরিণামের কথা তো শুনলেন। অতএব আপনি আপনার অন্তরে তাদের প্রতি আর সমবেদনা লালন করবেন কেনো? আপনি তাদের কল্যাণকামী। কিন্তু তারা তো কল্যাণ লাভের উপযোগী নয়। তাছাড়া তারা তো আপনার প্রতি সদাসর্বদা নিক্ষেপ করে অস্বীকৃতি ও বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ শর। সুতরাং তাদের প্রতি আপনার মমতা ও অনুকম্পার ছায়া তো প্রত্যাহার করে নেওয়াই সমীচীন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তো জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ব্যক্ত করে'। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি সর্বজ্ঞ। তাই আমি ভালো করেই জানি, আপনার প্রতি কী তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণা তারা পোষণ করে তাদের মনে। আর তাদের প্রকাশ্য অপকথনসমূহ সম্পর্কেও তো আমি অনবগত নই। সুতরাং আপনি ব্যথিত হবেন না। যথা সময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি আমি তাদেরকে দিবোই।

হাকেম কর্তৃক বর্ণিত ও সূত্রপরীক্ষিত এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার আস ইবনে ওয়াইল একটি ক্ষয়প্রাপ্ত অস্থি নিয়ে উপস্থিত হলো রসুল স. সকাশে। বললো, মোহাম্মদ! দ্যাখো, হাড্ডিটির অবস্থা। এরপরেও কি তুমি বলতে চাও, আল্লাহ্ এই হাড্ডিটিকে পুনর্জীবিত করবেন? রসুল স. বললেন, অবশ্যই, মহাপুনরুত্থান অনিবার্য। মনে রেখো, আল্লাহ্ তোমাকেও মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করবেন এবং প্রবেশ করাবেন জাহান্নামে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াতত্রয়। বলা হয়েছে—

www.eelm.weebly.com

❑ মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি শুক্রবিন্দু হইতে? অথচ পরে সে হইয়া পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।

❑ এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়। সে বলে, 'কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে যখন উহা পচিয়া গলিয়া যাইবে?'

❑ বল, 'উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই যিনি ইহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।'

এখানে 'আলইনসান' (মানুষ) বলে বোঝানো হয়েছে আস ইবনে ওয়াইলকে। কিন্তু ইবনে আবী হাতেম বহুসংখ্যক সূত্রপরম্পরায় মুজাহিদ, ইকরামা, ওরওয়া, ইবনে যোবায়ের ও সুদ্দীর মাধ্যমে, বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে এবং বাগবী তাঁর স্বসূত্রসম্বলিত বিবরণে উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য আয়াতত্রয় অবতীর্ণ হয়েছে উবাই ইবনে খালফকে লক্ষ্য করে। ওই হতভাগাই ক্ষয়প্রাপ্ত অস্থি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো রসুল স. সকাশে। লিপ্ত হয়েছিলো মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারদিবস সম্পর্কিত বিতণ্ডায়। বলেছিলো, এই ক্ষয়প্রাপ্ত অস্থিতে আল্লাহ্ কী করে আবার জীবনদান করবেন? রসুল স. বলেছিলেন, তোমাকেও মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে এবং নিক্ষেপ করা হবে নরকে। এভাবে 'আওয়ালাম ইয়ারল ইনসানা' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— উবাই ইবনে খালফ এবং তার মতো পুনরুত্থান অস্বীকারকারীরা কি দ্যাখে না? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সম্পৃক্তি রয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— পুনর্জীবন দানে আমি যে সম্পূর্ণ সক্ষম, সেকথা কি মানুষ অস্বীকার করে? অথচ একথাও তো তারা ভালো করে জানে যে, তাদেরকে জীবনদান করেছি আমিই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে। অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী'। একথার অর্থ— মৃতবৎ শুক্রবিন্দু থেকে আমি তাদেরকে জীবিত অস্তিত্বে পরিণত করেছি, একথা তো তারা ভালো করেই জানে। অথচ মহাপুনরুত্থানের বিষয়টিকে করে অস্বীকার। লিপ্ত হয় অজ্ঞজনোচিত ও অযথার্থ বাক-বিতণ্ডায়। প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি তো সহজতর। এই সোজা কথাটিও তারা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।

'ফাইজা হুয়া খসীমুম মুবীন' অর্থ— সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। কথাটি বলা হয়েছে রসুল স. কে সান্ত্বনা প্রদানার্থে। উদ্দেশ্য তাঁকে জানিয়ে দেওয়া যে- হে আমার রসুল! তাদের বাকবিতণ্ডা মূল্যহীন। সুতরাং আপনি মনোক্ষুণ্ন হবেন না। একই সঙ্গে বাক্যটিতে অবিশ্বাসীদের প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে প্রচণ্ড ধিক্কার। যেনো বলা হয়েছে— অবিশ্বাসীরা স্বভাবতই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি অকৃতজ্ঞ। নতুবা একথা তারা সহজেই বুঝতো যে, আল্লাহ্তায়ালা নিছক দয়া করে অনুল্লেখ্য শুক্রকণা থেকে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবজাতি।

কোনো কোনো বিদ্বান কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— নিকৃষ্টতম শুক্রবিন্দু থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্তির পর মানুষ বড় হয়েছে। লাভ করেছে জ্ঞান। এ সকল কিছু তো আমারই দয়া। অথচ তারা তাদের জ্ঞান ও বাকশক্তিকে শেষে প্রয়োগ করে আমারই বিরুদ্ধে। বচসা-বিতণ্ডা শুরু করে আমার রসুলের সঙ্গে। এতে করে কি তাদের সম্মান বাড়ে? না, বাড়েনা। বরং বিতণ্ডা রচনার কারণে তারা হয়ে পড়ে তার সূচনালগ্নের সেই অপবিত্র শুক্রকণার মতো তুচ্ছ। বিশ্বাসবিশোভিত উন্নত জীবনযাপন পরিহার করে তারা মান্য করে বিতণ্ডাবিতর্কিত অশুভ জীবনকে। বিশ্বাসবিরোধী কুটতর্ক যে জঘন্যতম, সে ধারণাটুকুও তাদের নেই।

পরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'এবং সে আমার সম্পর্কে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, কে অস্থিতে প্রাণসঞ্চার করবে যখন তা পচেগলে যাবে'? একথার অর্থ— বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে— তারা বলে, দ্বিতীয় সৃষ্টিতে আমি অক্ষম। তারা আমার ক্ষমতাকে তুলনা করে তাদের নিজেদের অক্ষমতার সাথে। মনে করে, তারা যেমন মৃতকে জীবন দান করতে অক্ষম, আমিও তেমনি। কী অপবিত্র ভাবনা! স্রষ্টা কি সৃষ্টির সমতুল হয়? আমি তো মহা স্রষ্টা। তাদেরকে তো তুচ্ছাতিতুচ্ছ শুক্রকণা থেকে সৃষ্টি করেছি আমিই। তাহলে তাদের অস্থি-চর্মকে পুনর্জীবন দান করতে পারবো না কেনো? হাড্ডিতে প্রাণ সঞ্চার করা অপেক্ষা শুক্রকণায় প্রাণসঞ্চার করা কি কম বিস্ময়ের? প্রথম বিস্ময়কে যদি আমি বাস্তবায়িত করতে পারি, তবে দ্বিতীয় বিস্ময়কে অস্তিত্বদান করতে পারবো না কেনো?

www.eelm.weebly.com

‘রমীম’ অর্থ ক্ষয়িষ্ণু অস্থি। বায়যাবী লিখেছেন, অস্থির প্রাণ আছে। তেমনি প্রাণ আছে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের। সেগুলোও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থ হচ্ছে— মৃতের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন অপবিত্র হয়ে যায়, তেমনি অপবিত্র হয়ে যায় তার অস্থিও। ইমাম শাফেয়ীও এরকম বলেছেন। ইবনে জাওজী তাঁর ‘আত্তাহ্কীক’ গ্রন্থে লিখেছেন, ইমাম আহমদও এমতো অভিমতের প্রবক্তা।

আমি বলি, প্রকৃত কথা হচ্ছে— মৃতের দাঁত ও অবিচ্ছিন্ন অস্থি পবিত্র। আর যারা মৃতের অস্থিকে অপবিত্র বলেন, তারা প্রমাণরূপে উপস্থাপন করেন এই

আয়াতকেই। এর স্বপক্ষে তাঁরা একটি হাদিসও উল্লেখ করে থাকেন। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, মৃতের অস্থি দ্বারা কোনো উপকার গ্রহণ করা যাবে না। স্বসূত্রে আবুবকর শামী আবু যোবায়েরের মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের থেকে। ‘আল মুগান্নী’ এবং ‘তানকীহুত্ তাহ্কীক’ গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন, হাদিসটির সূত্রপরম্পরা উত্তম পদবাচ্য। হাদিসটি আবার ইবনে ওয়াহাব তাঁর ‘মসনদ’ গ্রন্থে জামআ ইবনে সালেহ্ সূত্রে আবু যোবায়েরের মাধ্যমে হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন এভাবে— মৃতের কোনোকিছু থেকেই সুবিধা ভোগ করা যাবে না। সুবিধা ভোগ করা যাবে না তার অস্তিত্বের কোনো অংশ থেকেও। ‘তানকীহ্’ প্রণেতা লিখেছেন, জামআ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। তাঁর বর্ণনাটিও শিথিল সূত্রসম্পন্ন। ইবনে মা’ওয়ার তাঁর সমালোচনা করেছেন।

‘হেদায়া’ রচয়িতা লিখেছেন, মৃতের পশম ও অস্থিতে প্রাণ নেই। আর যার প্রাণ নেই, তার মৃত্যুও নেই। কাজেই তা পবিত্র। আর হাদিসে ঘোষিত হয়েছে মৃত থেকে সুবিধাভোগের নিষিদ্ধতা। অথচ আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, অস্থিতেও প্রাণ আছে। সুতরাং হেদায়া রচয়িতার অভিমত কতোটুকু সঠিক, তা প্রণিধাননীয়। তবে হানাফীগণের পক্ষ থেকে প্রাঞ্জল একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা যায়। সেটি হচ্ছে— অপবিত্রকারী বস্তু হচ্ছে প্রবাহিত রক্ত। আর অস্থি, পশম ও পুচ্ছগুচ্ছে রক্ত প্রবাহিত হয় না, যদিও তা জীবন্ত। একারণেই বলা হয়, যে জীবের মধ্যে রক্তপ্রবাহ নেই, সে জীব যদি কোনো আবদ্ধ পানিতে পড়ে মরে যায়, তবে সেই পানি অপবিত্র হয় না।

হজরত সালমান ফারসী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে খাদ্যবস্তু ও পানীয়ের মধ্যে শোণিতপ্রবাহহীন কীটপতঙ্গ পড়ে মরে থাকে, সেই খাদ্যবস্তু ভক্ষণ সিদ্ধ এবং সেই পানীয় দ্বারা ওজু গোসল জায়েয। দারাকুতনী বলেছেন, সাঈদ ইবনে সাঈদ যুবাইদী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কেবল বাকীয়া। অন্য কারো দ্বারা হাদিসটি বর্ণিত হয়নি। আর সাঈদ অপরিচিত। ইবনে আদী বলেছেন, তিনি তেমন পরিচিত নন।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, খাদ্যপাত্রে মক্ষিকা বসলে সেটিকে খাদ্যাভ্যন্তরে ডুবিয়ে দিয়ো। তারপর সেটিকে উঠিয়ে নিক্ষেপ কোরো বাইরে। কারণ মক্ষিকার এক পাখায় থাকে রোগজীবানু এবং অন্য পাখায় থাকে তার প্রতিষেধক। বোখারী।

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার একটি মৃত ছাগলকে দেখে বললেন, তোমরা এর চামড়া ব্যবহার করছো না কেনো? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ছাগলটি তো মৃত। তিনি স. বললেন, এর গোশত ভক্ষণ করা কেবল নিষিদ্ধ। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. মৃত পশুর গোশত ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন? কিন্তু তার চামড়া ও পশম ব্যবহার

করতে নিষেধ করেননি। এই হাদিসের সূত্রসংযুক্ত আবদুল জব্বার ইবনে মুসলিম বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। এরকম বলেছেন দারাকুতনী। কিন্তু ইবনে হাব্বান তাঁকে চিহ্নিত করেছেন বলিষ্ঠ বর্ণনাকারীরূপে।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, হাদিসটির সূত্রপরম্পরা তো উত্তম পর্যায়ের ঠিকই, কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে ইবনে জাওজী কী করে এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ করেন যে, মৃত পশুর পশম ও পালক পবিত্র। অথচ অস্থি’র পবিত্রতার দলিল ওই হাদিস থেকে প্রমাণ করেন না, যেখানে বলা হয়েছে, মৃত পশুর কোনো অংশ থেকে সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। মোটকথা, ‘মৃত পশুর কোনো অংশ থেকে সুবিধা ভোগ করা যাবে না’ হাদিসটির অর্থ— তার গোশত ভক্ষণ করা যাবে না। কেননা প্রবহমান রক্তসম্বলিত গোশতই কেবল ভক্ষণযোগ্য। আর অস্থি, পালক ও পশমে রক্তপ্রবাহও নেই। সেকারণে সেগুলো থেকে সুবিধা গ্রহণেও কোনো বাধা নেই। বাধা নেই মৃত পশুর চামড়া ব্যবহার করাতেও। তবে শর্ত হচ্ছে ওই চামড়াকে করতে হবে পাক। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে ফেলতে হবে তার জলীয় অংশ।

দারাকুতনীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি স্বকর্ণে রসুল স. কে বলতে শুনেছি, শুনে রাখো, ভক্ষণযোগ্য অংশগুলো ছাড়া মৃত পশুর অন্যান্য অংশ সিদ্ধ। চামড়া, পালক, পশম, অস্থি হালাল। কারণ জবাই করলেও

www.eelm.weebly.com

এগুলোর পবিত্রতা অর্জিত হয় না। দারাকুতনী হাদিসটির সূত্রসংযুক্ত আবু বকর হাজালীকে বলেছেন পরিত্যাজ্য। গুণদর বলেছেন, সে অসত্যভাষী। ইয়াহ্ইয়া ও আলী বলেছেন, সে উল্লেখযোগ্য কেউ নয়।

দারাকুতনীর বর্ণনায় আরো এসেছে, উম্মতজননী হজরত উম্মে সালমা বলেছেন, আমি নিজে রসুল স.কে বলতে শুনেছি, মৃত পশুর চামড়া পাকা করা হলে আর কোনো অসুবিধা থাকে না। বিপত্তি থাকে না তার পশম, পালক ও শিঙ ব্যবহারেও, যদি তা পানি দিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয়। দারাকুতনী বলেছেন, হাদিসটি
বর্ণিত হয়েছে শুধু ইউসুফ ইবনে সফরের মাধ্যমে। আর ইউসুফের বর্ণনা অগ্রাহ্য। কেননা সে অসত্যভাষী। রহীম বলেছেন, সে অনুল্লেখ্য। ইবনে হাব্বান বলেছেন, তার বিবৃতি প্রামাণ্য নয়।

হজরত ছওবান-আবু ইয়ালী-হুমাইদি-শামী-সুলায়মান ইবনে জাওজী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. তাঁর প্রিয়তমা কন্যা হজরত ফাতেমার জন্য ক্রয় করেছিলেন ছাগলের অন্ত্র থেকে তৈরী একটি অলংকার এবং হাতির দাঁতের দুটি চিরুনি। ইবনে জাওজী বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা হুমাইদ ও সুলায়মান পরিচিত কোনো বর্ণনাকারী নয়। ইমাম আহমদ বলেছেন, আমি হুমাইদি সম্পর্কে কিছুই জানি না। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, আমি সুলায়মানকে চিনি না। উপরন্তু আপত্তিকর বিষয় হচ্ছে, বর্ণনাটিতে উল্লেখিত 'আজ্ব' শব্দটির অর্থ ভূচর অথবা জলচর কচ্ছপের খোলস। ইবনে কুতাইবা বলেছেন, শব্দটির অর্থ কচ্ছপের খোলস নয়, বরং ওই বস্তু, যা মানুষ নির্মাণ করে অস্থি অথবা দাঁত খোদাই করে। যদি তাই হয়, তবুও তো বস্তুটি মৃত থেকে

নির্মিত, তাই তা নিষিদ্ধ। সুতরাং কী করে রসুল স. এরকম নিষিদ্ধ বস্তু তাঁর কন্যার জন্য ক্রয় করতে পারেন। আসমায়ী বলেছেন, 'আজ্ব' হচ্ছে তৈজসপত্র। শব্দটির অর্থ সর্বসাধারণ যা বোঝে, তা নয়।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, আসমায়ীর 'আজ্ব' শব্দটির সর্বজনবোধ্য অর্থ এখানে গ্রহণীয় নয়। কথাটি বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। কেননা 'আল মুহকাম' গ্রন্থে বলা হয়েছে, হস্তীদন্তকেই 'আজ্ব' বলে। অন্য অর্থে শব্দটি ব্যবহারযোগ্য নয়।

জুহুরী লিখেছেন, 'আজ্ব' হচ্ছে 'আজ্বজ্বাতুন' এর বহুবচন। আর 'আজ্ব' বলে হস্তীঅস্থিকে। সম্ভবতঃ আসমায়ীর ধারণায় হস্তীঅস্থি অপবিত্র। তাই তিনি মন্তব্য করেছেন, এই হাদিসের সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ গ্রহণীয় নয়।

'কামুস' রচয়িতা লিখেছেন, 'আজ্ব' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। এর দ্বারা হস্তীঅস্থি ও তৈজসপত্র, দু'টোই বোঝায়। জাযারী তাঁর 'নেহায়া' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আজ্ব' বলে জল ও স্থলের কচ্ছপের খোলসকে। অথবা সামুদ্রিক কোনো প্রাণীর মেরুদণ্ডকে, যার দ্বারা প্রস্তুত করা হয় অলংকার।

বাকীয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে আমর ইবনে খালেদের মাধ্যমে বায়হাকী লিখেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. হস্তীদন্তনির্মিত চিরুনি ব্যবহার করতেন। বায়হাকী মন্তব্য করেছেন, অজ্ঞাতনামা বর্ণনাকারীর মাধ্যমে পরিবেশিত বাকীয়ার এই বর্ণনাটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, হাদিসটির সূত্রশৃঙ্খল শিথিল হলেও এর প্রতিপাদ্য বিষয় উত্তম পদবাচ্য। এরকম কিছু কিছু শিথিলসূত্রবিশিষ্ট সমার্থক হাদিস বোখারী ও মুসলিমের গ্রন্থেও বিদ্যমান।

এরপরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'বলো, এর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনি, যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদেরকে বলে দিন, এই অস্থিতে যিনি একবার প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন, তিনিই পুনর্বার এতে সঞ্চার করবেন জীবন। কারণ সৃজন, পুনঃসৃজন সম্পূর্ণতঃই তাঁর অভিপ্রায়, জ্ঞান ও ক্ষমতায়ত্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত'। একথার অর্থ— সমগ্র সৃষ্টি যেহেতু তাঁর, সেহেতু তিনিই কেবল জানেন তাদের প্রকাশ্য-গোপন সকল তত্ত্ব ও রহস্য। সুতরাং সৃজন-পুনঃসৃজন সবকিছুই ঘটবে তাঁর জ্ঞাতসারে। অভিপ্রায় ও ক্ষমতানুসারে। যথানিয়মে ও যথাসময়ে। তিনি যে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩

www.eelm.weebly.com

❑ তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা উহা হইতে প্রজ্বলিত কর।

❑ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তাহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন? হাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

❑ তাঁহার ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি উহাকে বলেন, 'হও', ফলে উহা হইয়া যায়।

❑ অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁহার হস্তেই প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব; আর তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা থেকে প্রজ্জ্বলিত করো'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বৃক্ষ দু'ধরনের— 'মুরখ' ও 'ইফার'। এই দু'ধরনের বৃক্ষই একই সঙ্গে জলীয় ও অগ্নিময়। তাই দেখা যায় বৃক্ষ থেকে তাজা ডাল কেটে নিলে তা থেকে নির্গত হয় পানি। আবার দু'টো ডাল নিয়ে একসঙ্গে ঘষাঘষি করলে তা থেকে উৎপন্ন হয় আগুন। আরববাসীরা বলেন, সবধরনের গাছেই আগুন আছে। বৃক্ষবিশারদদের অভিমতও এরকম।

'ফাইজা আন্‌তুম মিনহু তু'ক্বিদূন' অর্থ— এবং তোমরা তা থেকে প্রজ্জ্বলিত করো। অর্থাৎ বৃক্ষশাখা ঘষে আগুন উৎপাদন করার সময় তোমরা এমতো সন্দেহে নিপতিত হয়োনা যে, এতে করে আগুন উৎপাদন সম্ভব কিনা। কারণ পানি ও আগুন পরস্পরকে বিলোপকারী। বিষয়টি সুনিশ্চিত। আর এমতো সুনিশ্চিতি তো দিয়েছি আমিই। তাহলে তোমরা কেনো একথা বিশ্বাস করতে চাওনা যে, আমি ক্ষয়িষ্ণু অস্থিকে করতে পারবো পূর্বের মতো সতেজ, সজীব ও প্রাণময়। আমি যে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।

পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সংযোগ রয়েছে একটি অনুক্ত বাক্যের সঙ্গে। ওই অনুক্ত বাক্যসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও পৃথিবী। একথা তো তোমরাও মানো। তাহলে একথা কেনো মানতে চাওনা যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি মৃতকে জীবন দান করতে অবশ্যই সক্ষম। তাঁর দ্বারা সুবিশাল মহাবিশ্ব সৃজন সম্ভব হলে ক্ষুদ্র মানুষের পুনঃসৃষ্টিতো অবশ্যই

সম্ভব। তিনি যে সর্বশক্তিধর। উল্লেখ্য, মানুষের মধ্যেও রয়েছে মহাবিশ্বের উপকরণসমূহের নির্যাস। পার্থক্য কেবল এতোটুকু যে, মহাবিশ্ব বিশাল। আর মনুষ্যবিশ্ব ক্ষুদ্র। একারণেই মানুষ সৃষ্টি পুনঃসৃষ্টি প্রসঙ্গে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির কথা।

এরপর বলা হয়েছে— 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জনতা! তোমাদের সম্মুখে এমতো অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেনো তোমরা এ কথা বিশ্বাস করতে চাওনা যে, আল্লাহ্ সুমহান সৃজয়িতা এবং তাঁর জ্ঞান সর্বত্রগামী?

এরপরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'তাঁর ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোনোকিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়'।

আয়াতখানি আল্লাহ্‌র অপার শক্তিমত্তার একটি অতিদূরবর্তী উপমা মাত্র। যেমন প্রতাপশালী কোনো ব্যক্তির আদেশ তার অনুচরদের দ্বারা প্রতিপালিত হয় তাৎক্ষণিকভাবে, তেমনি আল্লাহ্‌র শক্তিমত্তার প্রভাবপুষ্ট অভিপ্রায়ও বাস্তবায়িত হয় মুহূর্তমধ্যে। আর তাঁর চিরস্বাধীন অভিপ্রায়ের এমতো অবশ্যম্ভাবী বাস্তবায়ন সম্পূর্ণতঃই পরিশ্রম ও সৃজনোপকরণমুক্ত। উল্লেখ্য, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সন্দেহ-বৃক্ষের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে এই উপমাটি। নতুবা সৃষ্টির সামর্থ্য কখনোই আল্লাহ্‌র সামর্থ্যের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কারণ সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপ সকল কিছুতেই তিনি আনুরূপ্যবিহীন, আকার-প্রকারহীন।

www.eelm.weebly.com

সবশেষের আয়াতে (৮৩) বলা হয়েছে— 'অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁর হস্তেই প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব, আর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে'।

এখানকার 'সুব্হান' শব্দটি ধাতুমূল এবং সাধারণ কর্মপদ একটি অনুক্ত ক্রিয়ার। আর 'ফা' (অতএব) অব্যয়টি এখানে কারণপ্রকাশক। সুতরাং এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত মানুষ! যখন তোমরা জানতে পারলে, যে আল্লাহ্ শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে, তিনি নিশ্চয় ক্ষয়প্রাপ্ত অস্থিতে করতে পারবেন প্রাণের সঞ্চার। তাঁর সৃজনক্ষমতার স্বরূপ তোমাদের জ্ঞানায়ত্ত নয়। তবুও শোনো একটি উপমা— তিনি এমন সুমহান সৃজনকর্তা যে, 'হও' বললেই সবকিছু হয়ে যায়। এর জন্য সময়, শ্রম, নির্মাণোপকরণ কোনোকিছুরই প্রয়োজন হয় না। অতএব এখন তোমাদের অবশ্যদায়িত্ব এই যে, তোমরা তোমাদের মহামহিম প্রভুপালনকর্তার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করবে। সকলে এবং সকলকিছুই তাঁর অভিপ্রায়ভূত। আর এটাও অবশ্যম্ভাবী যে, তোমাদের সকলের অবশেষ প্রত্যাবর্তন কেবল তাঁরই সকাশে।

'মালাকূত' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'মালাক' থেকে। এর অর্থ কর্তৃত্ব, অধিকার। কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে সকলের এবং সকলকিছুর উপরে আল্লাহ্তায়ালার নিরঙ্কুশ ও সর্বময় কর্তৃত্বের কথা।

'ওয়া ইলাইহি তুরজ্বাউন' অর্থ এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। কথাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে যুগপৎ শুভ ও অশুভ সংবাদ, যথাক্রমে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের জন্য। অর্থাৎ ওই প্রত্যাবর্তনস্থলে তাদের জন্য নির্ধারিত হবে চিরস্বস্তি, অথবা চিরশাস্তি।

হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা তোমাদের মৃত নিকটজনদের স্বস্তি কামনায় সুরা ইয়া-সীন পাঠ কোরো। আহমদ, আবুদাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বানও হাকেমের অপর বর্ণনায় এসেছে, সুরা ইয়া-সীন কোরআনের হৃৎপিণ্ড। যে ব্যক্তি এই সুরা কেবল আল্লাহ্র সন্তোষার্জনার্থে ও পরকালের পুণ্য সঞ্চয়ার্থে আবৃত্তি করবে, আল্লাহ্ তাকে মার্জনা করবেন। তোমরা তোমাদের মৃত নিকটজনের শান্তির জন্য এই সুরা তেলাওয়াত কোরো।

জাযারী তাঁর 'হিসনে হাসীন' গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতের উদ্দেশ্যে সুরা ইয়া-সীন পাঠ করবে, তাকে অবশ্যই মার্জনা করা হবে। তোমরা তোমাদের মৃত আপনজনের মাগফিরাতের জন্য সুরা ইয়া-সীন পাঠ কোরো।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি বিষয়ের অন্তরাত্মা রয়েছে। আর কোরআনের অন্তরাত্মা হচ্ছে সুরা ইয়া-সীন। যে একবার এই সুরা পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাকে দান করবেন দশবার কোরআন খতমের সওয়াব। হাদিসটি শিথিল সূত্রবিশিষ্ট।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সুরা ইয়া-সীন পাঠ করবে, সে হবে ক্ষমাপ্রাপ্ত। বায়হাকী। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. শুভসংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রাতে সুরা ইয়া-সীন পাঠ করবে, প্রাতে সে হবে মার্জনাপ্রাপ্ত। শিথিল সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে আবু নাঈমের মাধ্যমে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি একবার সুরা ইয়া-সীন পাঠ করলো, সে যেনো সমগ্র কোরআন পাঠ করলো দশবার। শিথিল সূত্রশৃঙ্খলসহযোগে হাদিসটি উপস্থাপন করেছেন বায়হাকী। হজরত আনাস সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সুরা ইয়া-সীন পাঠ করবে, সে মৃত্যুবরণ করবে শহীদ হিসেবে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে দারেমী ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পরিতোষপ্রাপ্তির আশায় সুরা ইয়া-সীন আবৃত্তি করবে, সে হবে ক্ষমার পাত্র।

দায়লামী ও আবু শায়েখ ইবনে হাব্বান 'ফাজায়েল' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু জাবের বলেছেন, মৃত্যুপথযাত্রীদের সম্মুখে সুরা ইয়া-সীন পাঠ করলে তার মৃত্যুকষ্ট লাঘব হয়। মাহামেলী তাঁর 'আমালী' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন পূরণের উপলক্ষ হিসেবে সুরা ইয়া-সীনকে নির্বাচন করবে, তার প্রয়োজন পূরণ করা হবে। এই হাদিসের সমার্থক আর একটি হাদিস প্রায়োন্নত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে দারেমী কর্তৃক।

'আল মুসতাদরাক' গ্রন্থে রয়েছে, ইমাম আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে ইমাম জয়নুল আবেদীন বলেছেন, যে ব্যক্তি আত্মার কাঠিন্য অনুভব করে, সে যেনো একটি পেয়ালায় জাফরান দ্বারা সুরা ইয়া-সীন লিখে ওই পেয়ালা ধুয়ে পান করে।

ইবনে ফরীস বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, উন্মাদের উপরে সুরা ইয়া-সীন পাঠ করলে ওই উন্মাদ ভালো হয়ে যাবে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীর বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে সুরা ইয়া-সীন পাঠ করবে, তার দিবস কাটবে আনন্দে। আর সন্ধ্যায় পাঠ করলে ভোর পর্যন্ত সে থাকবে সানন্দে। অভিজ্ঞগণ এরকমই বর্ণনা করেছেন।

সূরা সাফ্‌ফাত

এই সুরা কোরআন মজীদের ৩৭ সংখ্যক সুরা। এর রুকুর সংখ্যা ৫ এবং আয়াতের সংখ্যা ১৮২। সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

- ❑ শপথ তাহাদের যাহারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান
- ❑ ও যাহারা কঠোর পরিচালক
- ❑ এবং যাহারা 'যিক্‌র' আবৃত্তিতে রত-
- ❑ নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ্‌ এক,
- ❑ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রভু এবং প্রভু সকল উদয়স্থলের।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'শপথ তাদের, যারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান'।

'সাফ্‌ফাত' অর্থ সারিবদ্ধ হওয়া। হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও কাতাদা এই আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে উপস্থাপন করেছেন একটি হাদিস। হাদিসটি এই— হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, ফেরেশতারা দাসত্বের কাঠগড়ায় তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে যেভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, তোমরাও কি সেভাবে (নামাজ পাঠকালে অথবা যুদ্ধের ময়দানে) সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে না? আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ফেরেশতারা কীভাবে সারিবদ্ধ হয়? তিনি স. বললেন, তারা পঙক্তি পূর্ণ করে এবং পঙক্তিমধ্যে গ্রহণ করে অটল অবস্থান।

তাফসীরে মাযহারী/৫৯

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফেরেশতারা তাদের ডানা শূন্যে মেলে রেখে স্থির হয়ে দাঁড়ায় এবং ওই ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ কোনো কাজের ব্যাপারে প্রকাশ করেন তাঁর অভিপ্রায়। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে 'সাফ্‌ফাত' বলে বুঝানো হয়েছে উড়ন্ত পাখিদের সারিবদ্ধতার কথা। কেননা অন্য এক আয়াতে 'আত্‌ত্বইরু সাফ্‌ফাত' বলে সারিবদ্ধ উড়ন্ত পাখির কথাই বলা হয়েছে।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'ও যারা কঠোর পরিচালক'। একথার অর্থ— এবং শপথ ওই সকল ফেরেশতার যারা মেঘপুঞ্জের নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'কঠোর পরিচালক' (আয্‌যাজ্বিরতি) বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল ফেরেশতাকে যারা মানুষের মনে পুণ্যবাসনার উদয় ঘটায় এবং তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে পাপ-পথ থেকে। কিংবা বাধাদান করে কল্যাণের পথে বিপত্তিসৃষ্টিকারী শয়তানকে। কাতাদা বলেছেন, 'আয্‌যাজ্বিরত' হচ্ছে অশুভ ভাষণ প্রতিরোধক কোরআনের আয়াত।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'ফাত্‌তালিয়াতি জিকরা' এবং যারা জিকির আবৃত্তিতে রত। একথার অর্থ— এবং শপথ ওই সকল ফেরেশতার যারা আল্লাহ্‌র জিকির করে, কিংবা পাঠ করে নবী রসুলগণের উপরে অবতারিত কিতাবসমূহের আয়াত।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানকার ১, ২ এবং ৩ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'সাফ্‌ফাত' 'যাজ্বিরত' ও 'তালিয়াত' শব্দগুলোর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, ওই সকল বিজ্ঞ মনীষী সত্তার শপথ— যারা নামাজের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে সারিবদ্ধ হয়, দলিল প্রমাণের সহায়তায় মানুষকে বিরত রাখে অবিশ্বাস ও পাপ- পঙ্কিলতা থেকে এবং তেলাওয়াত করে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশিত বাণী। অথবা এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যারা জেহাদের সময় শত্রুর সম্মুখে সীসা দিয়ে ঢালাই করা অনড় প্রাচীরের মতো সুসংহত হয়ে দাঁড়ায়, কঠোরভাবে বাধা প্রদান করে শত্রুকে, সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে যুদ্ধাশ্ব এবং জেহাদের ময়দানেও বিস্মৃত হয় না আল্লাহ্‌র জিকির, আক্রান্ত হলেও। বর্ণিত তিনটি কর্মকে এখানে একত্রিত করা হয়েছে সংযোজক অব্যয় 'ওয়াও' ও 'ফা' এর মাধ্যমে। এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, কর্ম তিনটি পৃথক প্রকৃতির।

এখানে 'ফা' ব্যবহৃত হয়েছে কর্মের ক্রম বজায়ার্থে। প্রথমত সারিবদ্ধ হওয়া, এরপর বাধা প্রদান ও পরিচালন এবং সবশেষে জিকির। সারিবদ্ধ হওয়া পূর্ণ শৃঙ্খলার প্রতীক। অমঙ্গলে বাধাদান ও মঙ্গলের দিকে পরিচালনা ওই প্রতীকের পরিপূরক। আর

www.eelm.weebly.com

জিকির হচ্ছে প্রশান্তিদায়ক। অথবা 'ফা' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে শৃঙ্খলা ও ক্রমোন্নতির জন্য। যেমন 'ছুম্মা কানা মিনাল্ লাজীনা আমানু'। এই আয়াতে 'ছুম্মা' সংযুক্তি (আতফ)টি ব্যবহৃত হয়েছে কেবল মহত্ব ও মর্যাদা প্রকাশার্থে।

এরপরের আয়াতে(৪) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ্ এক'। একথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! ভালো করে শুনে নাও, নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভুপালকের এককত্ব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অনেক ঊর্ধ্বে। উল্লেখ্য, মক্কার মুশরিকেরা বলেছিলো, কী বিস্ময়! মোহাম্মদ তাহলে কি সকল উপাস্যকে এক উপাস্যে পরিণত করলো? আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাদের এমতো অপমন্তব্যের প্রেক্ষিতে।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রভু এবং প্রভু সকল উদয়স্থলের'।

এখানকার 'মাশারীক্ব' অর্থ প্রতিটি পূর্বাচলের। কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে সূর্যের সকল উদয়স্থলকে। কেননা বৎসরের ৩৬৫ দিনে প্রতি দিন সূর্যোদয়ের ঘটতে থাকে স্থানান্তর। অস্তস্থলের পরিবর্তনও ঘটতে থাকে একইভাবে। কিন্তু এখানে কেবল উদয়স্থলের উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। অস্তস্থলের কথা আর আলাদা করে বলা হয়নি। কেননা সূর্যাস্ত অপেক্ষা সূর্যোদয়ই আল্লাহ্র অধিকতর মহিমা ও শক্তিমত্তা প্রকাশক। তাই আধিক্যের পর অনাধিক্যকে আর উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি এখানে।

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

❑ আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি,
❑ এবং রক্ষা করিয়াছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হইতে।
❑ ফলে উহারা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করিতে পারে না এবং উহাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হইতে—
❑ বিতাড়নের জন্য এবং উহাদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি।
❑ তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনিয়া ফেলিলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি পৃথিবীর আকাশকে সুশোভিত করেছি নক্ষত্রপুঞ্জের আলোকচ্ছটা দ্বারা। এখানে 'আস্সামাআদ্ দুন্ইয়া' অর্থ সেই আকাশ, যা তোমাদের সবচেয়ে নিকটে। আর 'বিযীনাতিনিল কাওয়াকিব' অর্থ

তারকারাজির সৌন্দর্য দ্বারা। অর্থাৎ পৃথিবীর আকাশকে করেছি নক্ষত্রশ্রীশোভিত।

অথবা বলা যেতে পারে— প্রথমাকাশের তারকারাজিকে আমি দান করেছি সৌন্দর্য। কিংবা— প্রথম আসমানকে সুশোভিত করেছি তারকারাজির সুষমা দ্বারা। এই সুষমা দ্বারা বুঝানো হয়েছে নক্ষত্রনিঃসৃত আলো ও সেগুলোর গঠনশৈলীকে। হজরত ইবনে আব্বাস 'নক্ষত্ররাজির সুষমা' কথাটির অর্থ করেছেন— নক্ষত্রনিঃসৃত আলোকচ্ছটা।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে'। একথার অর্থ— যে নক্ষত্রসুষমা দ্বারা আমি পৃথিবীর আকাশকে সজ্জিত করেছি, ওই নক্ষত্র নিক্ষেপ করে প্রতিহত করা হয় বিদ্রোহী শয়তানকে। এখানে 'মারিদ' অর্থ বিদ্রোহী, অবাধ্য।

আলোচিত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সকল নক্ষত্রের অবস্থান পৃথিবীর নিকটতম আকাশে এবং এই আকাশ শয়তান থেকে সুরক্ষিতও। বায়যাবী লিখেছেন, স্বস্থানে স্থির নক্ষত্রগুলোর অবস্থান অষ্টম আসমানে এবং চাঁদ ব্যতীত অবশিষ্ট ছয়টি গ্রহের অবস্থান দ্বিতীয় থেকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত। আর চাঁদ আছে প্রথম আসমানে। একথা যদি সত্য বলে ধরেও নেওয়া হয়, তবু নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা আকাশ সুশোভিত হওয়ার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হয় না। কেননা পৃথিবীবাসীদের কাছে

www.eelm.weebly.com

বিষয়টি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। রাতের আকাশের দিকে তাকালেই দেখা যায়, অসংখ্য নক্ষত্র অজস্র উজ্জ্বল মনিমুক্তার মতো ফুটে রয়েছে আকাশের গায়ে। কতোইনা অপরূপ সেগুলোর দ্যুতিচ্ছটা। বায়যাবীর বক্তব্য থেকে একথাই অনুমিত হয় যে, তিনি সম্ভবতঃ মনে করেন, প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের গ্রহ-নক্ষত্রের বিন্যাস-বিষয়ক বিবরণ অযথার্থ নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, তাদের মতবাদ সত্য নয়। কারণ কোরআন, হাদিস ও ঐকমত্য (ইজমা) এর পরিপন্থী। কোরআন মজীদে রয়েছে কেবল সাতটি আকাশের কথা। অষ্টম আকাশের উল্লেখ সেখানে নেই। আবার অষ্টম আকাশকে যদি স্থির তারকার আকাশ বা অন্য কোনো নাম দেওয়া হয়, তবুও সাতের অধিক আকাশের অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে না। শরাবকে শরাব না বলে যদি অন্য কোনো নামে অভিহিত করা হয়, তবে কি তা হালাল হয়ে যায়? আবার এ বিষয়টিও সুপ্রমাণিত যে, সকল নক্ষত্রের অবস্থান এই প্রথম আকাশেই। অন্যান্য আকাশকে নক্ষত্রায়িত করা হয়নি। তাই এখানে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে— আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি। পরক্ষণেই বলা হয়েছে— এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে। অর্থাৎ প্রথম আকাশসহ অন্য সাতটি আকাশের সুরক্ষা আমি নিশ্চিত করেছি শয়তানের অনুপ্রবেশ থেকে, প্রথমাকাশের উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে। শয়তানকে প্রথমে এবং প্রথমাকাশে প্রতিহত করাই সমীচীন। আর তা করতে প্রথমাকাশ থেকে উলকা ছুঁড়ে মারাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক।

পরবর্তী আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'ফলে তারা ঊর্ধ্বজগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক থেকে—(৮) বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি (৯)। তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে (১০)। একথার অর্থ— আমার আকাশ রক্ষাকারী ফেরেশতাদের অতন্দ্র প্রহরার কারণে শয়তান ঊর্ধ্বদেশের কোনো পরিকল্পনার কথা শুনতে পারে না। তারা তাকে বিতাড়নের জন্য সকল দিক থেকে ছুঁড়ে মারতে থাকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা এবং তাকে এবং তার অনুচরদেরকে দিতে থাকে অবিরাম শাস্তি। তবুও যদি কেউ কোনো কিছু শুনে ফেলে, তবে তার দিকে নিক্ষেপ করা হয় প্রজ্জ্বলিত উল্কাখণ্ড। ফলে সে হয়ে যায় ভস্মীভূত।

এখানে "খতিফাল খত্ফাতা' অর্থ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে। 'ফা আত্বায়াহু' অর্থ তার পশ্চাদ্ধাবন করে। আর 'শিহাবুন ছাক্বিব' অর্থ জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড। উল্লেখ্য, শয়তান চুপিসারে কোনো গোপন আকাশী সংবাদ শুনে পালাবার সময়েই কেবল তাকে ভস্মীভূত করবার জন্য ছুঁড়ে মারা হয় জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড। আর তখনই দৃষ্টি গোচর হয়, আকাশের কোনো তারা যেনো খসে পড়লো।

গ্রীসদেশীয় প্রাচীন দার্শনিকেরা উল্কাপতন সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছে। কিন্তু তাদের অভিমতগুলো অযথার্থ। কেননা সেগুলো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বাণীর খেলাফ। উল্কাপাত ঘটে আকাশ থেকেই। যেমন আকাশ থেকে পতিত হয় বৃষ্টি ও শিলা। এক আয়াতে রয়েছে 'আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি'। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমিই নামিয়ে থাকি শিলাবৃষ্টি আকাশী গিরিমালা থেকে'। কাতাদা সূত্রে বোখারী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা তারকারাজিকে সৃষ্টি করেছেন তিনটি উদ্দেশ্যে— আকাশ সুশোভিত করতে, শয়তান বিতাড়ন করতে এবং পথের দিক নির্দেশনা দিতে। সুতরাং এর অন্য উদ্দেশ্য অনুসন্ধান বাতুলতামাত্র।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন আল্লাহ্ আকাশে কোনো হুকুম জারী করেন, তখন ফেরেশতারা আতঙ্কিত হয়ে নাড়তে থাকে তাদের ডানা। তাদের ওই ডানা সঞ্চালনের শব্দ শ্রুত হয় পাথরের উপরে শিকলপতনের শব্দের মতো। যখন তাদের আতঙ্ক স্তিমিত হয়, তখন তারা একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করে, তোমার প্রভুপালয়িতা কী আদেশ করেছেন? সে জবাব দেয়, তাঁর আদেশ অতি সত্য, মহামর্যাদা ও মহিমাসম্পন্ন। তখন তাদের কথোপকথন চুরি করে শোনার চেষ্টা করে শয়তান এবং সেকথা পাচার করে তার স্বজাতিদের মধ্যে, যারা একজন আরেকজনের উপরে সওয়ার হয়ে অবস্থান গ্রহণ করে অপেক্ষায় থাকে আকাশের কাছাকাছি। বর্ণনাকারী আবু সুফিয়ান তার হাতকে তেরছাভাবে উপস্থাপন করে এবং হাতের আঙ্গুলগুলো বিস্তৃত করে শয়তানদের অবস্থান গ্রহণের বিষয়টি বুঝিয়ে দেন এবং বলেন, এভাবে অবস্থান গ্রহণকারী শয়তানেরা প্রত্যেকে ওই চুরি করা সংবাদ

পৌঁছে দেয় তাদের নিম্নবর্তীদের নিকটে। সর্বনিম্নের শয়তান সেকথা জানিয়ে দেয় যাদুকর ও গণকদের কাছে। তারা আবার সেগুলোকে অতিরঞ্জিত করে জনসমক্ষে প্রচার করে সাজে ভবিষ্যদ্বক্তা। উল্লেখ্য, শয়তানদের এমতো প্রচেষ্টা সফল হয় কচিৎ। অধিকাংশ সময়ে সংবাদ পৌঁছানোর আগেই জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে তাদেরকে ভস্মসাৎ করে দেয় প্রহরী ফেরেশতার দল।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আমাদের মহাপ্রভুপালয়িতা যখন কোনো নির্দেশ অবতীর্ণ করেন তখন আরশবহনকারী ফেরেশতারা সমস্বরে বর্ণনা করে আল্লাহ্র সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা। তারপর তা জানিয়ে দেয়

www.eelm.weebly.com

নিম্নবর্তী ফেরেশতাদেরকে। তারা জানায় তন্নিম্নবর্তীদেরকে। এভাবে সে নির্দেশ চলে আসে প্রথম আকাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের কাছে। শয়তান প্রথম আকাশে উঠে গোপনে সে সংবাদ শুনতে চেষ্টা করে এবং শুনতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয় অন্য শয়তানকে। সে আরেক শয়তানকে। এভাবে সর্বনিম্নবর্তী শয়তান তা জেনে ফেলে এবং সে কথা বলে দেয় তাদের একান্ত বশংবদ কোনো জ্যোতিষি অথবা গণককে। তারা যদি তা অবিকৃতভাবে বলতে পারে, তবে তা সত্য হয়। কিন্তু তারা তো স্বভাবতই মিথ্যাচারী ও অতিরঞ্জনপ্রিয়। তাই তাদের কথা প্রায়শই সত্য হয় না।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, উম্মত জননী হজরত আয়েশা বলেছেন, আমি নিজে রসুল স.কে বলতে শুনেছি, ফেরেশতারা মেঘপুঞ্জের উপরে এসে আল্লাহ্‌র নির্দেশাদি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে। শয়তান তা শুনে নিয়ে জানিয়ে দেয় তাদের একান্ত অনুচর জ্যোতিষিদেরকে। তারা আবার তখন প্রাপ্ত সংবাদকে জনসমক্ষে প্রচার করে তার সঙ্গে অনেক মিথ্যা মিলিয়ে।

বায়যাবী লিখেছেন, নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের আঘাতপ্রাপ্ত শয়তান আহত হয়ে পলায়ন করে, না একেবারে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণ মতদ্বৈধতা করেছেন। এক বর্ণনায় এসেছে, আড়ি পেতে থাকা শয়তানকে কখনো কখনো নিক্ষিপ্ত উল্কাঘাত স্পর্শ করে, কখনো করে না। যেমন ভাসমান নৌকার আরোহী পর্যন্ত কখনো নদীর ঢেউ পৌঁছে, আবার কখনো পৌঁছে না। ভেঙে পড়ে নৌকাগাত্রে আঘাত খেয়ে। তবে একথা ঠিক যে, তার দিকে ছুটন্ত উল্কাপিণ্ড দেখে একবার সে পলায়ন করলে তৎক্ষণাৎ আর ফিরে আসার চেষ্টা করে না।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত **১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮**

❑ উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, উহারা সৃষ্টিতে দৃঢ়তর, না আমি অন্য যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছি তাহা? উহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি আঠাল মৃত্তিকা হইতে।

❑ তুমি তো বিস্ময় বোধ করিতেছ, আর উহারা করিতেছে বিদ্রূপ।

❑ এবং যখন উহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হয় উহারা তাহা গ্রহণ করে না।

❑ উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে উপহাস করে

❑ এবং বলে, 'ইহা তো এক সুস্পষ্ট জাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে।

❑ 'আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব, তখনও কি আমাদিগকে উত্থিত করা হইবে?

❑ 'এবং আমাদের পূর্বপুরুষদিগকেও?'

❑ বল, 'হাঁ, এবং তোমরা হইবে লাঞ্ছিত।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি মক্কার অংশীবাদীদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা বেশী কঠিন, না তারা বাদে অপরাপর সৃষ্টিকে। মানুষকে তো আমি সৃষ্টি করেছি আঠালো মৃত্তিকা থেকে।

এখানে 'মান খলাক্বনা' (অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি) অর্থ মানুষ ছাড়া অন্য যা কিছু আমি সৃষ্টি করেছি। যেমন আকাশমণ্ডলী, ভূমণ্ডল, উদয়স্থল-অস্তস্থল, প্রদীপ্ত প্রদীপ সদৃশ নক্ষত্রপুঞ্জ ইত্যাদি। 'মান' (যা কিছু) অব্যয়টি ব্যবহৃত হয় সাধারণত সচেতন সৃষ্টির ক্ষেত্রে। কিন্তু এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সচেতন অচেতন সকলের ক্ষেত্রে। আর এখানকার 'তারা সৃষ্টিতে দৃঢ়তর, না অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— ক্ষুদ্রাবয়ববিশিষ্ট মানুষ ছাড়া মহাবিশ্বের অন্যান্য সৃষ্টির অস্তিত্বায়নই তো অধিক কঠিন।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে 'অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি' বলে বোঝানো হয়েছে অতীতের বিনাশপ্রাপ্ত দুর্ধর্ষ আদ, ছামুদ ইত্যাদি জাতিকে। এমতো অর্থ গ্রহণ করলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে মক্কাবাসী পৌত্তলিক জনতা! বলো, তোমরা কি অতীত যুগের আদ, ছামুদদের মতো প্রচণ্ড প্রতাপের অধিকারী? নিশ্চয় নও। অথচ দ্যাখো তারাও আমার রুদ্র রোষ থেকে রক্ষা পায়নি। তাহলে তোমরা কীভাবে ভাবতে পারো আল্লাহ্‌দ্রোহী হয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে?

www.eelm.weebly.com

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার সমার্থক আয়াতও রয়েছে। যেমন 'তোমাদেরকে সৃষ্টি করা অধিক কঠিন, না আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করা'। তাছাড়া আলোচ্য আয়াতের 'তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি আঠালো মৃত্তিকা থেকে' কথাটিও একথা প্রমাণ করে যে, এখানে 'অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি বলে বুঝানো হয়েছে মানুষ ছাড়া অপরাপর সৃষ্টিকে।

'লাযীব' অর্থ আঠালো, যা স্পর্শ করলে হাতে লেগে থাকে। মুজাহিদ ও জুহাক শব্দটির অর্থ করেছেন— গলিত। উল্লেখ্য, মানুষ এবং অপরাপর সৃষ্টির সৃজনসূচনা

একরকম নয়। মানুষের সৃজনোপকরণ গলিত কাদা। আর আকাশ-পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়েছে সৃজনোপকরণ ব্যতিরেকে, আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ও আদেশের মাধ্যমে সরাসরি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে। আরো উল্লেখ্য, এখানে মানুষের সৃজনোপকরণের কথা উল্লেখ করে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, সুবিশাল আকাশ ও বিশাল ধরিত্রি সৃষ্টির তুলনায় মানুষের ক্ষুদ্রাবয়ব সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। সুতরাং যে আল্লাহ্ অতি বৃহৎ আকাশ ও বৃহৎ বিশ্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি তো মানুষ সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির ব্যাপারে আরো অধিক সক্ষম। তাহলে মক্কার পৌত্তলিকেরা পুনরুত্থানের বিষয়টি অস্বীকার করে কীভাবে? আঠালো মৃত্তিকায় থাকে পানি ও মাটি। মানুষের মৃত্যুর পরে ওই পানি ও মাটি আপনাপন অবস্থানে রয়ে যায়। আর আল্লাহ্‌র মতো মহাশক্তিধরের পক্ষে ওই পানি ও মাটির পুনঃএকত্রকরণ তো অতি সহজ। এমতো ক্ষেত্রে উপকরণসমূহের বিদ্যমানতা এবং আল্লাহ্‌র সৃজনক্ষমতা দু'টোই তো রয়েছে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তুমি তো বিস্ময়বোধ করছো, আর তারা করছে বিদ্রূপ'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার স্বজাতি সহজ সত্যকে অস্বীকার করছে বলে আপনি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন, অথচ দেখুন, তারা এখনো আশ্রয় করে আছে বিদ্রূপপ্রবণতাকে।

আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'বাল'(বরং) এখানে অবতরনিকা স্বরূপ। শব্দটির মাধ্যমে এখানে বিষয়ান্তর ঘটানো হয়নি। ঘটানো হয়েছে ভাবান্তর। এর মাধ্যমে এখানে দেওয়া হয়েছে কেবল পরিস্থিতির বিবরণ। সত্যপ্রত্যাখ্যানের প্রতিক্রিয়া এখানে হয়েছে দু'রকমের— আল্লাহ্‌র রসুল হয়েছেন বিস্ময়াপন্ন, এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের অস্বীকৃতিতে পূর্ববৎ অনড় তো রয়েছেই, তদুপরি সত্যের প্রতি ক্রমাগত করে চলেছে উপহাস।

'আজ্বিব' অর্থ বিস্মিত হওয়া, অবাক মানা। অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক অবস্থায় মানুষ সাধারণত বিস্মিত হয়। এখানেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেই অর্থে। এক হাদিসে বলা হয়েছে 'আ'জ্বিবা রব্বুকা মিন কওমিন ইয়ুসাকক্বনা ইলাল জান্‌নাতি ফিস্ সালাসিলি' (তোমার প্রভু বিস্মিত হয়ে দেখবেন একটি দলকে, যাদেরকে শিকল পরা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে জান্নাতের দিকে)। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সুব্‌হানাহু মা আ'জামা শানুহু' (পবিত্রতা বর্ণনা করি ওই সুমহান সত্তার)। উল্লেখ্য, আশ্চর্য হওয়ার ঘটনা ঘটে অস্বাভাবিক কর্মের ক্ষেত্রেও। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমার এই কাজ মানুষের কাছে বিস্ময়কর যে, তাঁদের একজনের উপরে আমি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করি'।

সৌন্দর্যানুভূতিজনিত বিস্ময় প্রকাশার্থেও শব্দটির ব্যবহার সুপ্রচল। যেমন বলা হয় 'আ'জ্বাবানি কাজা' (এই কথা আমার খুব পছন্দ হয়েছে)। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া মিনান্‌নাসি মাঁইয়্যু'জ্বিবুকা ক্বওলুহু'(কোনো কোনো লোকের কথা আপনার কাছে খুব ভালো লাগে)। এক হাদিসে এসেছে 'আ'জ্বিবা রব্‌বুকুম মিন

শাব্‌বিন' (যুবকের এই কথা তোমার প্রভুপালকের খুব ভালো লেগেছে)। মন্দ কোনো কিছু দেখে প্রতিক্রিয়া প্রকাশকালেও শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা হয় 'আ'জ্বিবতু মিম্ বুখলিকা ওয়া শারহিকা' (তোমার এই কৃপণতা ও লোভ লালসা আমার কাছে খারাপ লাগে)। এক কবি বলেছেন—

শাইআনি আ'জ্বীবানি হুমা আব্‌রাদু মিন ইয়াখিন
শাইখুন্ ইয়াতাসব্বা ওয়া সবিয়্যুন ইয়াতাশাইয়্যাখ
বরফের চেয়ে অধিক শীতল এ দু'টি বিষয় বিস্ময়কর, বাচ্চার বুড়ো সাজা এবং বৃদ্ধের শিশু সাজা।

আবার ভালো অথবা মন্দ উভয়ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করার সময়ও শব্দটিকে ব্যবহার করার প্রচলন দেখা যায়। যেমন 'মা আকারামাহু' (সে কতোইনা দয়ালু) 'মা আজ্‌হালাহু' (সে কতো মূর্খ) 'মা আশাদ্‌দা বাইয়াদ্বহু' (এর শুভ্রতা কতো বেশী) মা আশাদ্দা ইস্‌তিখরাজ্বাহু' (এর মর্ম উদঘাটন করা কতোইনা কঠিন কাজ)। এ সকল উদাহরণ দেওয়া হলো একথা বুঝাতে যে, ওই সকল দয়া মূর্খতা, শুভ্রতা ও মর্মোদ্‌ঘাটন অস্বাভাবিক প্রকৃতির।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কোনো বিষয়ের সূত্রের অজ্ঞতার কারণে মানুষের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাকেই বলে বিস্ময়। সুতরাং শব্দটিকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা যায় না। কেননা অজ্ঞতা থেকে আল্লাহ্‌পাক সতত পবিত্র। কেউ কেউ বলেছেন, কোনো কিছুকে বিরাট কিছু মনে হলে মানুষের হৃদয়ে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সেই প্রতিক্রিয়ার নাম বিস্মিত হওয়া।

www.eelm.weebly.com

অবশ্য এখানকার উভয় ব্যাখ্যাই সমপ্রকৃতির। আর এ ধরনের ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অস্বাভাবিক বিষয়কেই মানুষ বিরাট কিছু বলে ভাবে, আবার অজ্ঞতা প্রকাশ করে সেই সকল ক্ষেত্রে, যা তার কাছে অসাধারণ।

অধিকাংশ ক্বারী বলেছেন, এখানকার 'আজ্বিব্তা' শব্দটির 'তা' বর্ণটি মধ্যম পুরুষের । আর এর দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। এভাবে বক্তব্যার্থ দাঁড়ায়— রসুল স.কে তারা সত্যবাদী বলে জানে, তাদের সামনে প্রকাশ করা হয়েছে অনেক অলৌকিকত্ব, আবার তারা শুনে চলেছে কোরআনের অপার্থিব বাণী সম্ভারের আবৃত্তি, তৎসত্ত্বেও তারা তাঁর রেসালাতের দাবি মেনে নিতে চায় না, তিনি স. তো বিস্ময়বোধ করেন একারণেই। অথবা বলা যেতে পারে— মহাবিশ্বের পরতে পরতে অংশীবাদীরা প্রত্যক্ষ করে চলেছে আল্লাহ্‌র শক্তিমত্তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত, অথচ তারা পুনরুত্থানের কথা বিশ্বাস করতে চায় না। এই সহজ কথাটিও বুঝতে চায় না যে, পূর্বের সৃষ্টি অপেক্ষা পরের সৃষ্টি অধিকতর সহজ। রসুল স. এর বিস্ময়ান্বিত হওয়ার কারণ তো এটাই।

কাতাদা বলেছেন, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরেও মানুষ যে কীভাবে পথভ্রষ্টতাকে আঁকড়ে থাকতে পারে, সে কথা ভেবে রসুল স. আশ্চর্যান্বিত হতেন। তিনি স. ভাবতেন, এই কোরআন যে শুনবে, সে-ই পথপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু মক্কার মুশরিকেরা সত্যিই দুর্ভাগা। না হলে কোরআন শুনে তারা বিদ্রূপ করতে

পারতো না। উল্লেখ্য, তারা পুনরুত্থান নিয়ে তো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতোই, তদুপরি উপহাস করতো রসুল স. এর বিস্ময় নিয়েও। তাই এখানে বলা হয়েছে— আপনি হয়ে যান বিস্মিত, আর তারা আপনার বিস্ময়ানুভূতি নিয়ে করে বিদ্রূপ।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'এবং যখন তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়, তারা তা গ্রহণ করে না'। একথার অর্থ— এবং যখন তাদেরকে কোরআনের মাধ্যমে শুভ উপদেশ দেওয়া হয়, তখন সে শুভ উপদেশকে তারা মান্য করে না। অথবা— যখন মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবসের যাথার্থ্য সম্পর্কে তাদেরকে জানানো হয়, তখন অবিমৃশ্যকারিতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে তারা তা মেনে নিতে চায় না। লাভ করতে পারে না কোনো কল্যাণ।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'তারা কোনো নিদর্শন দেখলে উপহাস করে'। একথার অর্থ— অলৌকিক নিদর্শন দেখলেও তারা ঠাট্টা-পরিহাস করে এবং এ অপকর্মে একে অপরকে আহ্বান জানায়। এখানে 'কোনো নিদর্শন' বলে এমন ঘটনার কথা বুঝানো হয়েছে, যা রসুল স. এর রেসালাতের সত্যতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। হজরত ইবনে আব্বাস ও মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'কোনো নিদর্শন' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে রসুল স. কর্তৃক চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার অলৌকিক ঘটনাকে।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'এবং বলে, এটা তো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়'। একথার অর্থ— স্বচক্ষে চন্দ্রদ্বিখণ্ডিত হওয়ার দৃশ্য দেখেও তারা রসুল স.কে সত্য নবী বলে স্বীকার করতে চায় না। বলে, মোহাম্মদ যাদুকর। আর এটা তার যাদু ছাড়া আর কিছু নয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে—'আমরা যখন মরে যাবো এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হবো, তখনও কি আমাদেরকে উত্থিত করা হবে (১৬) এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও(১৭)'?

এখানে 'আ ইন্না লা মাবৃউ'ছূন' অর্থ কী, আমাদেরকে উত্থিত করা হবে? এ হচ্ছে ক্রিয়াবাচক বাক্যের পরিবর্তে নামবাচক বাক্য দ্বারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের প্রতি জোর দেওয়ার প্রমাণ। তাছাড়া কথাটির দ্বারা তাদের এমতো মনোভাবও প্রকাশ করা হয়েছে যে, পুনরুত্থান অসম্ভব এবং মরদেহ মাটিতে মিশে যাবার পর তো তা আরো অসম্ভব।

'আওয়া আবাউনাল আউয়ালূন' অর্থ এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও? অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষদের মৃত্যু ঘটেছে তো আরো আগে। তাদেরকেও কি তাহলে আমাদের সঙ্গে এক সময়ে ওঠানো হবে? তা আবার কী করে হয়?

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'বলো, হ্যাঁ, এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, তোমাকে ও তোমাদের পূর্বপুরুষকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে এবং সেদিন তোমাদের অপদস্থ হওয়ার বিষয়টিও সুনিশ্চিত। এখানকার 'দাখিরুন' শব্দটির অর্থ চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়া।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ১৯, ২০, ২১

❑ উহা একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ— আর তখনই উহারা প্রত্যক্ষ করিবে।

www.eelm.weebly.com

❑ এবং উহারা বলিবে, 'দুর্ভোগ আমাদের! ইহাই তো কর্মফল দিবস।'
❑ ইহাই ফয়সালার দিন যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাপুনরুত্থান সূচিত হবে শিঙ্গার একটি মাত্র বিকট বজ্রনিনাদ সদৃশ ফুৎকারধ্বনির মাধ্যমে। প্রত্যেকে তখন আপনাপন সমাধিস্থলে পুনর্জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে এবং ভয়ে আতংকে একে অপরকে দেখতে থাকবে। অশুভ পরিণতির নিশ্চিতি বুঝতে পেরে বলে উঠবে, দুর্ভোগ আমাদের। এটাই তো দেখছি পৃথিবীতে শ্রুত কর্মফল দিবস। তখন ফেরেশতারা বলে উঠবে, হ্যাঁ, এটাই সেই মীমাংসার দিন, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

এখানে 'যাজ্‌রাতুন ওয়াহিদাতুন' অর্থ একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ। অর্থাৎ শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুৎকার। উল্লেখ্য, শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মৃত্যুবরণ করবে এবং আপন আপন কবরে পুনরুত্থিত হবে দ্বিতীয় ফুৎকারের সঙ্গে সঙ্গে।

'যাজ্‌রা' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হাঁকিয়ে বের করে দেওয়া, চিৎকার করে থামিয়ে দেওয়া। যেমন বলা হয় 'যাজ্‌রারার রায়ী গানামাহু' (রাখাল ধমক দিয়ে তার ছাগপালকে থামিয়ে দিলো)। শব্দটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে— দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কবরবাসীরা পুনরুত্থিত হবে, যেমন প্রথম শিঙ্গাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হবে সবাই। অর্থাৎ শিঙ্গাধ্বনির প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবে তাৎক্ষণিকভাবে, এতটুকুও বিলম্ব হবে না।

'ফা ইজাহুম ইয়ানজুরুন' অর্থ আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে। অর্থাৎ পুনরুত্থিত জনেরা দণ্ডায়মান হওয়ার সাথে সাথেই ভয়ে আতংকে এদিক ওদিক দেখতে থাকবে। অথবা 'ইয়ানজুরুন' অর্থ এখানে 'ইয়ানতাজিরুন'। অর্থাৎ তারা তখন উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করা হয়, তা বুঝবার জন্য এদিকে সেদিকে নিক্ষেপ করতে থাকবে ত্রস্ত দৃষ্টি।

'ইয়া ওয়াইলানা' অর্থ দুর্ভোগ আমাদের। শব্দটির 'ইয়া' অব্যয়টি হুমকি প্রকাশক। 'ইয়াওমাদ্ দীন' অর্থ এটাই তো সেই কর্মফল দিবস। 'ইয়াওমাল ফাস্‌লি' অর্থ ফয়সালার দিন, যেদিন চিরকালের জন্য পৃথক করে দেওয়া হবে সৌভাগ্যশালী ও দুর্ভাগাদেরকে। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, 'হাজা ইয়াওমুদ্‌দীন' (এটাইতো সেই কর্মফল দিবস) উক্তিটি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের

শেষ উক্তি। আর ২১ সংখ্যক আয়াতে উদ্ধৃত উক্তিটি ফেরেশতাদের। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সম্পূর্ণটাই কাফেরদের উক্তি। ফেরেশতাদের কোনো বক্তব্য এখানে নেই।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ২২, ২৩, ২৪

❑ ফিরিশ্‌তাদিগকে বলা হইবে, 'একত্র কর যালিম ও উহাদের সহচরগণকে এবং উহাদিগকে যাহাদের 'ইবাদত করিত তাহারা—
❑ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এবং উহাদিগকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে,
❑ 'অতঃপর উহাদিগকে থামাও, কারণ উহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে ঃ

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাপুনরুত্থান পর্ব সম্পন্ন হলে আল্লাহ্‌তায়ালা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবেন, সীমালংঘনকারী, সীমালংঘনকারীদের সহচর এবং তারা যে সকল প্রতিমা ও শয়তানের উপাসনা করতো তাদের সকলকে একত্র করো। আর তাদেরকে দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলো।

এখানে 'উহ্‌শুরু' অর্থ একত্র করো, সমবেত করো হিসাব-নিকাশ গ্রহণের স্থানে। 'জলামু' অর্থ সীমালংঘনকারী। আর 'ওয়া আযওয়াজাহুম' অর্থ তাদের সহচরদেরকে।

নোমান ইবনে শরীক থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, 'সীমালংঘনকারী ও তাদের সহচর' অর্থ জালেম এবং তাদের সমপ্রকৃতির লোক। এভাবে সেদিন একত্র করা হবে সুদখোরের সঙ্গে সুদখোরকে, ব্যভিচারীর সঙ্গে ব্যভিচারীকে এবং মদ্যপের সঙ্গে মদ্যপকে। জান্নাত হবে যেমন সমপ্রকৃতির পুণ্যবানদের বসবাস স্থল, তেমনি জাহান্নামও হবে সমপ্রকৃতির অপরাধীদের আবাস।

বায়হাকী আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আয্‌ওয়াজ্' অর্থ সমপর্যায়ভূত। বাগবী লিখেছেন, কাতাদা ও কালাবী বলেছেন, শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই সকল লোককে যাদের কার্যকলাপ সাদৃশ্যপূর্ণ, যেমন সাদৃশ্য রয়েছে এক মাতালের সঙ্গে অন্য মাতালের, এক সুদ ভক্ষণকারীর সঙ্গে অন্য সুদ ভক্ষণকারীর। জুহাক বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

'আয্ওয়াজ্বাহুম' অর্থ তাদেরকে তাদের পরামর্শদাতা শয়তানের সঙ্গে জড়ো করো। অর্থাৎ প্রতিটি কাফেরকে তার পরিচালক শয়তানের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে দাও। হাসান বলেছেন, কথাটির অর্থ তাদেরকে শৃঙ্খলিত করো তাদের পৌত্তলিক সহধর্মিণীদের সঙ্গে।

'মাকানু ইয়া'বুদূন' অর্থ যাদের ইবাদত তারা করতো। অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা যে সকল মূর্তি ও শয়তানের পূজা করতো। মুকাতিল বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ শয়তান। কেননা এক আয়াতে আজ্ঞা করা হয়েছে 'তোমরা শয়তানের পূজা কোরো না'। প্রকৃত কথা হচ্ছে, কথাটি ব্যাপকার্থক নয়, বরং বিশেষার্থক। কারণ অংশীবাদীরা কেবল মূর্তি ও শয়তানের উপাসনাই করে না, উপাসনা করে কোনো কোনো পুণ্যবানেরও। যেমন আল্লাহ্র পুত্র ভেবে কেউ উপাসনা করে হজরত ঈসা ও হজরত উযায়েরের। আবার আল্লাহ্র কন্যা মনে করে কেউ পূজা করে ফেরেশতার।

সুতরাং বুঝতে হবে সেদিন অংশীবাদীদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হবে কেবল তাদের পূজিত প্রতিমাগুলোকে এবং শয়তানকে। হজরত ঈসা ও হজরত উযায়ের তো আল্লাহ্র নবী। আর ফেরেশতারাও নিরপরাধ।

'ফাহ্দূহুম ইলা সিরাত্বিল জ্বাহীম' অর্থ এবং তাদেরকে পরিচালিত করে জাহান্নামের পথে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ— তাদেরকে দোজখের পথ বাতলে দাও। ইবনে কীসান অর্থ করেছেন— তাদেরকে দোজখের দিকে অগ্রসর করিয়ে দাও। উল্লেখ্য, পিছন দিক দিয়ে যে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, তাকে আরববাসীরা বলেন 'হাদী' (পরিচালক, পথনির্দেশক)।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে'।

ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন, বিতাড়িত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পুলসিরাতের নিকটে পৌঁছলে আল্লাহ্তায়ালা পুনঃআদেশ করবেন, ওদেরকে এখানে থামাও। তাদেরকে এখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এখানে বিবৃত হয়েছে পূর্ববর্তী আদেশের কারণ। হজরত ইবনে আব্বাস তাঁর এক বর্ণনায় বলেছেন, তখন পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেওয়া হবে তাদের সকল কথা ও কাজের। তাঁর আর এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, তাদেরকে তখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে 'লাইলাহা ইল্লাল্লহ্' (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই) কলেমা সম্পর্কে।

হজরত আবু বারযাহ্ আসলামী থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোনো বান্দা পুলসিরাত থেকে পা ওঠাতে পারবে না, যতক্ষণ না এই চারটি প্রশ্নের মীমাংসা হবে— ১. জীবন কাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? ২. শরীরকে শ্রান্ত করেছে কোন কাজে খাটিয়ে? ৩. জ্ঞানার্জনের পর সে জ্ঞান লাগিয়েছে কী ধরনের কাজে? ৪. সম্পদ অর্জন ও ব্যয় করেছে কীভাবে? এরকম হাদিস আরো বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিরমিজি ও ইবনে মারদুবিয়া এবং হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল, হজরত আবু দারদা ও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী। ইবনে মোবারক তাঁর 'জুহুদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু দারদা বলেছেন, আমি ভয় করি সে সময়ের কথা মনে করে, যে সময় আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি যা জানতে তা আমলে এনেছিলে কিনা?

ইমাম আহমদ তাঁর 'জুহুদ' গ্রন্থে বলেছেন, হজরত আবু দারদা বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে বান্দাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করা হবে, এলেম অনুসারে তুমি কী পরিমাণ আমল করেছো?

আবকা ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, জাহান্নামের উপরে রয়েছে সাতটি পুল। সবাইকে ওই পুলগুলো অতিক্রম করার হুকুম দেওয়া হবে। প্রথম পুলের কাছে পৌঁছলে ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, এদেরকে থামাও। এদেরকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রথমে হিসাব নেওয়া হবে নামাজের। ফলে যারা ধ্বংস হওয়ার উপযুক্ত তারা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যারা পরিত্রাণপ্রাপ্তির উপযোগী তারা পাবে পরিত্রাণ। দ্বিতীয় পুলের কাছে পৌঁছানোর পর জিজ্ঞেস করা হবে আমানত সম্পর্কে। তখন যারা আমানতের খেয়ানত করেছিলো তারা হয়ে যাবে ধ্বংস এবং মুক্তি পাবে তারা, যারা আমানত রক্ষা করেছিলো। তৃতীয় পুলের সন্নিকটে পৌঁছলে প্রশ্ন করা হবে আত্মীয়তার হক প্রতিপালন সম্পর্কে। ফলে আত্মীয়তার বন্ধন যারা ছিন্ন করেছিলো, তারা হয়ে যাবে শাস্তিকবলিত। আর নাজাত পাবে আত্মীয়তা বজায়কারীরা। ওই সময় আত্মীয়তার বন্ধন বলতে থাকবে, হে আল্লাহ্! যারা আমাকে অটুট রেখেছিলো, তুমিও তাদেরকে অটুট রাখো এবং যারা আমাকে ছিন্ন করেছিলো তুমিও তাদেরকে করে ফেলো ছিন্নভিন্ন।

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪

www.eelm.weebly.com

❑ 'তোমাদের কী হইল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করিতেছ না?'
❑ বস্তুত সেই দিন উহারা আত্মসমর্পণ করিবে
❑ এবং উহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে—

❑ উহারা বলিবে, 'তোমরা তো তোমাদের শক্তি লইয়া আমাদের নিকট আসিতে।'
❑ তাহারা বলিবে, 'তোমারা তো বিশ্বাসীই ছিলে না,
❑ 'এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না; বস্তুত তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।
❑ 'আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হইয়াছে, আমাদিগকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করিতে হইবে।
❑ 'আমরা তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত।'
❑ উহারা সকলেই সেই দিন শাস্তির শরীক হইবে।
❑ অপরাধীদের প্রতি আমি এইরূপই করিয়া থাকি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমাদের কী হলো যে, তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছো না'? এ কথার অর্থ— একত্রায়িত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তখন বিদ্রূপ ও ধমকের সুরে বলা হবে, সত্যের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে তোমরা ছিলে একে অপরের সহযোগী, এখন তবে তোমরা একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসছো না কেনো?

পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'বস্তুত সেই দিন তারা আত্মসমর্পণ করবে'। একথার অর্থ— আসলে তখন তারা বাধ্য হয়ে করবে আত্মসমর্পণ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মুসতাস্লিমূন' অর্থ অসহায় হয়ে পড়বে। অর্থাৎ সেদিন তারা হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ অসহায়। হাসান কথাটির অর্থ করেছেন, তখন তারা হয়ে পড়বে নিতান্ত অনুগত, একান্ত বাধ্য। যেমন ইস্তাস্লামা লিশাইইন' অর্থ কোনোকিছুর তাবেদার হয়ে পড়া, নির্দেশানুগত হওয়া।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'এবং তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে'? একথার অর্থ উপায়ন্তর না দেখে এবং কেউ কাউকে সাহায্য না করতে পেরে তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী নেতা ও জনতা মুখোমুখি ঝগড়া বিবাদ বাধাবে। দোষারোপ করতে থাকবে একে অপরকে।

বা'দুহুম আ'লা বা'দ্বিন' অর্থ একে অপরের সামনাসামনি হয়ে। আর 'ইয়াতাসাআলূন' অর্থ জিজ্ঞাসাবাদ করবে, বিবাদ বাধাবে।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, তোমরা তো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট আসতে'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জনতা তাদের ধর্মীয় গুরু, নেতা, অথবা কুমন্ত্রণাদাতা শয়তানকে লক্ষ্য করে তপ্ত স্বরে বলবে, পৃথিবীতে খুব তো দাপট দেখাতে তোমরা। এখানে তাহলে চুপ মেরে রয়েছো কেনো?

'ইয়ামীন' অর্থ দক্ষিণ হস্ত। কিন্তু এখানে শব্দটির অর্থ শক্তি বা দাপট, অখণ্ডনীয় যুক্তি, ধর্মীয় দৃঢ়তা। জুহাক ও মুজাহিদও এরকম অর্থ করেছেন। কেউ

www.eelm.weebly.com

কেউ বলেছেন 'ইয়ামীন' অর্থ এখানে শপথ। অর্থাৎ তোমরা তখন শপথ করে বলতে যে, তোমাদের ধর্মই সঠিক। কোনো কোনো আলেম শব্দটির অর্থ করেছেন জবরদস্তি। অর্থাৎ তোমরা তখন জোর-জবরদস্তি খাটিয়ে আমাদেরকে ধর্মভ্রষ্ট হতে বাধ্য করতে। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্যই দিতে না।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না'। একথার অর্থ— তাদের ধর্মীয় নেতা ও সমাজপতিরা তখন বলবে, না। আমরা তোমাদেরকে ধর্মভ্রষ্ট করিনি। তোমরা বিপথগামী হয়েছিলে স্বেচ্ছায়। বিশ্বাসী তো তোমরা ছিলেইনা।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের উপর আমাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিলো না, বস্তুত তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়'। একথার অর্থ— তাদের নেতৃস্থানীয়রা আরো বলবে, ধর্মীয় ব্যাপারে আমরা তোমাদের উপরে কোনো কর্তৃত্ব খাটাইনি। বিপথগামিতাকে পছন্দ করেছিলে তোমরাই। হয়ে গিয়েছিলে সীমালংঘনকারী।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে, আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে (৩০)। আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত (৩১)। একথার অর্থ— তাদের নেতৃবর্গ শেষে তাদের নিজেদের দোষও স্বীকার করবে। বলবে, দ্যাখো। তোমরা আমরা উভয়েই অপরাধী। এখন শাস্তিভোগ আমাদের জন্য অনিবার্য। আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম। সেজন্যই তো তোমাদেরকে আহ্বান জানাতাম পথভ্রষ্টতার দিকে। তোমরাও সে আহ্বানে হৃষ্টচিত্তে সাড়া দিয়েছো। এভাবে এখন আমাদের উপরে বাস্তবায়িত হবে আল্লাহ্র পূর্বঘোষিত বাণী, আর আল্লাহ্র বাণী তো সত্য।

উল্লেখ্য, এখানে 'আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে ওই আয়াতের দিকে, যেখানে বলা হয়েছে 'আমি জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করবো জ্বিন, ইনসান ও পাথর দ্বারা'। এভাবে তাদের একথার অর্থ দাঁড়িয়েছে— দ্যাখো, তোমাদের ও আমাদের পথভ্রষ্টতা ভাগ্যের ফের ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের নরকগমন অদৃষ্টলিপিতে পূর্বাহ্নেই লিপিবদ্ধ ছিলো। পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট করে ও হয়ে আমরা তা বাস্তবায়ন করেছি মাত্র। আমরা যে চিরভ্রষ্ট।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা সকলেই সেদিন শাস্তির শরীক হবে (৩৩) অপরাধীদের প্রতি আমি এরকমই করে থাকি' (৩৪)। একথার অর্থ— সেদিন শাস্তিভোগের অংশীদার হবে অবিশ্বাসী নেতা-জনতা সকলেই। অবিশ্বাসীদের প্রতি আমা কর্তৃক আরোপিত শাস্তি এরকমই।

তাফসীরে মাযহারী/৭৪

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯

❑ উহাদিগকে 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই' বলা হইলে উহারা অহংকার করিত
❑ এবং বলিত, 'আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহ্গণকে বর্জন করিব?'
❑ বরং সে তো সত্য লইয়া আসিয়াছে এবং সে রাসূলদিগকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।
❑ তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিবে
❑ এবং তোমরা যাহা করিতে তাহারই প্রতিফল পাইবে—

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— পৃথিবীতে ওই অবিশ্বাসীদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের প্রকৃতি ছিলো এরকমঃ তাদের সামনে আমার প্রেরিত বার্তাবাহকগণ যখন 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই' এই মহাসত্য উচ্চারণ করতেন, তখন তারা প্রত্যাখ্যান করতো দম্ভভরে। বলতো, আমরা কি উন্মাদ এক কবির কথায় আমাদের এতোদিনকার পূজা-পার্বন পরিত্যাগ করতে পারি?

এখানে 'উন্মাদ কবি' অর্থ রসুলেপাক স.! মক্কার মুশরিকেরা বিভিন্ন সময়ে তাঁকে 'কবি' 'যাদুকর' ইত্যাদি বলে উত্যক্ত করতো।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'বরং সে তো সত্য নিয়ে এসেছে এবং সে রসুলগণকে সত্য বলে স্বীকার করেছে'। একথার অর্থ— অংশীবাদীদের উল্লেখিত অপমন্তব্যের জবাবে আল্লাহ্‌তায়ালা সুনিশ্চিতার্থক ভঙ্গিতে বলেন, কস্মিনকালেও তিনি কবি নন। তিনি হচ্ছেন আমা কর্তৃক নির্বাচিত নবী। তিনি অবশ্যই সত্যসহ প্রেরিত হয়েছেন। সে কারণেই তো পূর্ববর্তী সকল নবীর তিনি প্রত্যয়নকারী। তিনি বলেন, আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত সকল নবী সত্য।

এখানে 'সে রসুলগণকে সত্য বলে স্বীকার করেছে' কথাটির মাধ্যমে এ বিষয়টিই বুঝিয়ে বলা হয়েছে যে, রসুল স. এর দাবি নতুন কোনো বিষয় নয়। ইতোপূর্বে তাঁর মতো অনেক নবী রসুল এসেছিলেন। আর তাদের প্রচারিত ধর্মমতও তাঁর আনীত ধর্মমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তাফসীরে মাযহারী/৭৫

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে (৩৮) এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে'(৩৯)। একথার অর্থ— হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমাদেরকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে মর্মন্তুদ শাস্তির স্বাদ। শাস্তি ভোগ করবে তোমরা অপরাধের গুরুত্ব ও পরিমাণানুসারে।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

❑ তবে তাহারা নয় যাহারা আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা।
❑ তাহাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিয্ক—
❑ ফলমূল; আর তাহারা হইবে সম্মানিত,
❑ সুখদ-কাননে
❑ তাহারা মুখামুখি হইয়া আসনে আসীন হইবে।

আলোচ্য আয়াত পঞ্চকের মর্মার্থ হচ্ছে— মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করবে কেবল অবিশ্বাসীরা। কিন্তু যারা একনিষ্ঠ বিশ্বাসী, তারা সম্পূর্ণরূপে হবে শাস্তির সংশ্রবমুক্ত। তাদেরকে করা হবে পুরস্কৃত। দেওয়া হবে পূর্বনির্ধারিত অফুরন্ত জীবনোপকরণ, বেহেশতের সুস্বাদু ফলমূল। তদুপরি তাদেরকে করা হবে সম্মানিত। মনোরম কুসুমকাননে সুখাসনে মুখোমুখি উপবেশন করানো হবে তাদেরকে।

এখানে 'রিয্কুম্ মা'লূম' অর্থ নির্ধারিত জীবনোপকরণ, যা চিরস্থায়ী ও পরিতৃপ্তিপ্রদায়ক, সুস্বাদু। 'ফাওয়াকিহ' অর্থ স্বাদে গন্ধে ভরপুর ফল, যা কেবল সাধারণ আহার্যের মতো ক্ষুধানিবারক নয়, চিত্তপ্রশান্তিপ্রদায়ক। শব্দটি 'ফাকিহাতুন' এর বহুবচন। আবার 'ফাকিহাতুন' অর্থ কেবল ওই সকল ফলমূল, যা কেবলই ক্ষুন্নিবৃত্তিনিবারক, মনোমুগ্ধকর কিছু নয়। 'রিয্ক' বলা হয় ওই দুই ধরনের আহার্য বস্তুকেই। উল্লেখ্য, জান্নাতবাসীদেরকে ক্ষুন্নিবৃত্তি পরিপূরণের জন্য আহার্যভক্ষণ করতে হবে না। তাদের শরীর সুরক্ষিত থাকবে পানাহার ব্যতিরেকেই। তবুও তারা পানাহার করবে কেবল আহারাস্বাদ গ্রহণের জন্য। তাই তাদের আহার্যবস্তু হবে কেবল বিচিত্র বর্ণের ও গন্ধের মনোমুগ্ধকর ফলমূল।

'ওয়াহুম মুক্‌রমূন' অর্থ আর তারা হবে সম্মানিত। অর্থাৎ তারা সেখানে রিজিক পাবে সম্মানের সঙ্গে। পৃথিবীবাসীদের মতো রিজিকের জন্য তাদেরকে কোনো দুঃশ্চিন্তায় ভুগতে হবে না। দিতে হবে না কোনো শ্রম। এমনকি মুখ ফুটে চাইতেও হবে না কোনোকিছু। আর 'ফী জান্‌নাতিন্ নাঈম' অর্থ সুখদ কাননে, চিত্তসুখকর উদ্যানে।

তাফসীরে মাযহারী/৭৬

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯

---

www.eelm.weebly.com

❑ তাহাদিগকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিবেশন করা হইবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্রে
❑ শুভ্র উজ্জ্বল, যাহা হইবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।
❑ উহাতে ক্ষতিকর কিছু থাকিবে না এবং উহাতে তাহারা মাতালও হইবে না,
❑ তাহাদের সঙ্গে থাকিবে আনতনয়না, আয়তলোচনা হূরীগণ।
❑ তাহারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— সুখদ কাননে উপবিষ্ট জান্নাতবাসীদেরকে তখন পরিবেশন করা হবে শুভ্রোজ্জ্বল শরাবপূর্ণ পান পাত্র। ওই শরাব হবে অতি স্বাদু এবং ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। যারা তা পান করবে, তারা তাই মাতালও হবে না। হবে না চৈতন্যচ্যুত।

এখানে 'কা'সিন' অর্থ সুরা, শরাব, মদ্য, অথবা সেই পানপাত্র যা থাকে সুরায় পরিপূর্ণ। জনৈক কবি বলেছেন 'ওয়া কা'সিন শারিবতু আ'লা লাজ্জাতিন'। এখানে 'কা'সিন অর্থ সুরা, সুরাভর্তি পানপাত্র নয়। কেননা পানযোগ্যবস্তু সুরা, পানপাত্র নয়। আখফাশ বলেছেন, কোরআনের সকল স্থানেই 'কা'সিন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সুরা অর্থে।

'মায়ীন' অর্থ প্রবহমান সুরা, যা দৃষ্টিগ্রাহ্য। অর্থাৎ এখানে 'মায়ীন' অর্থ 'আ'য়ীন' (পরিদৃশ্যমান)। অথবা শব্দটির অর্থ হবে ঝরণা থেকে প্রবহমান সুরা। এমতোক্ষেত্রেও 'মায়ীন' এর অর্থ হবে 'আ'য়ীন'। আর 'আ'য়ীন' অর্থ হবে ঝরণা। প্রকৃত কথা হচ্ছে, যা দেখতে পানির মতো, তা-ই 'মায়ীন'। জান্নাতে শরাব প্রবাহিত হবে পানির প্রবাহের মতো। তাই একে বলা হয়েছে 'মায়ীন'। কিংবা কথাটির দ্বারা এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জান্নাতের পানীয় বস্তু হবে অতি সুস্বাদু।

হাসান বলেছেন, জান্নাতের সুরা হবে দুধের চেয়েও অধিক শুভ্র। 'লাজ্জাত' শব্দটি হয়তো মূল ধাতু। সুতরাং শব্দটির অর্থ হবে— সুস্বাদু হওয়ার কারণে প্রকৃত অর্থেই তা উপভোগ্য। কিংবা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক, যার পুংলিঙ্গ 'লাজ্জুন'। আর 'লাজ্জুন' শব্দ গুণবাচক, যেমন গুণবাচক শব্দ 'সুস্বাদু'।

এখানকার 'লা ফীহা গউলুন' কথাটির 'ইয়াগুলু' অর্থ ক্ষতিকর। 'গালা' অর্থ সে ধ্বংস করে দিয়েছে, করে দিয়েছে পণ্ড। অর্থাৎ জান্নাতের শরাব দুনিয়ার শরাবের মতো ক্ষতিকর নয়। ওই শরাব পান করলে শারীরিক অথবা মানসিক কোনো অপপ্রতিক্রিয়াই হবে না। বিকল হবে না বুদ্ধি-বিবেক।

তাফসীরে মাযহারী/৭৭

'ইউনযাফুন' অর্থ মাতালও হবে না। 'নাযফুন' অর্থ কোনোকিছুর শেষ হয়ে যাওয়া, শব্দটি সকর্মক ও অকর্মক উভয় অবস্থাতেই ব্যবহার্য। 'কামুস' গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। 'নাযাফ' শব্দটি শব্দগঠনপ্রক্রিয়া 'ইফয়ালে' ব্যবহৃত হলে অর্থ প্রদান করে বিস্তৃতি ও গভীরতার। অর্থাৎ বেহেশতের শরাব পান করলে পানকারীর জ্ঞানবুদ্ধি বিপর্যস্ত হবে না এবং তার পানেচ্ছা ও পানীয় কখনো শেষ হবে না। উল্লেখ্য, জ্ঞানবুদ্ধির বিভ্রাট ঘটা ও শরাব শেষ হয়ে যাওয়া পানকারীর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। এরকম কষ্ট থেকে বেহেশতের শরাব পানকারীরা থাকবে মুক্ত।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়না, আয়তলোচনা হূরীগণ (৪৮)। তারা যেনো সুরক্ষিত ডিম্ব'(৪৯)। একথার অর্থ— শরাবপানকালে তাদের সঙ্গে থাকবে ব্রীড়াবনতা ও আয়তআঁখিনী ললনাকুল। তারা দেখতে হবে গোপনে সংরক্ষিত উজ্জ্বল ডিমের মতো অনিন্দ্যসুন্দর।

'ক্বসিরাতুত্ ত্বরফি' অর্থ আনতনয়না, ব্রীড়াবনতা। অর্থাৎ ওই সকল কুমারী রমণীর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে কেবল তাদের বেহেশতী স্বামীদের দিকে। অন্য কারো দিকে তারা দৃষ্টিপাত করবে না। 'য়ীন' অর্থ আয়তলোচনা, সুন্দর আঁখির অধিকারিণী। শব্দটি ব্যবহৃত হয় পুরুষ-নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই।

'বায়দুন' অর্থ ডিম, বিশেষ করে উট পাখির ডিম। শব্দটি বহুবচন 'বায়দ্বাতুন' এর। হাসান বলেছেন, উটপাখিরা তাদের ডিমগুলোকে লুহাওয়া ও ধূলাবালি থেকে বাঁচাবার জন্য তাদের ডানার নিচে লুকিয়ে রাখে। ডিমগুলোর রঙ হয় হরিদ্রাভ শুভ্র। আরববাসীরা সুন্দরী নারীকে তুলনা করে ওই সুরক্ষিত ডিমের সঙ্গে। এখানেও বেহেশতের হূরীদের ক্ষেত্রে এই উপমাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

জননী হজরত উম্মে সালমা থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন 'য়ীন' বলে পটলচেরা আঁখিবিশিষ্ট মেয়েদেরকে। পাখি যেমন তার পালক দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তেমনি বেহেশতের হূরীরাও হবে আয়তলোচনা। তাদের দেহত্বক হবে অতি সূক্ষ্ম এবং মসৃন। দেখে মনে হবে যেনো ডিমের বাহ্যিক ঔজ্জ্বল্যের উপর সেঁটে আছে এক সূক্ষ্ম ত্বকাবরণ।

'মাক্নূন' অর্থ গোপনে রক্ষিত, সুরক্ষিত— যেমন সযত্নে নিজেদের ডিম রক্ষা করে উটপাখিরা।

সূরা সাফ্ফাতঃ আয়াত ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১

---

www.eelm.weebly.com

❒ তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।
❑ তাহাদের কেহ্ বলিবে, ‘আমার ছিল এক সংগী;
❑ ‘সে বলিত, ‘তুমি কি ইহাতে বিশ্বাসী যে,
❑ ‘আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব তখনও কি আমাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে?’
❑ আল্লাহ্ বলিবেন, ‘তোমরা কি তাহাকে দেখিতে চাও?’
❑ অতঃপর সে ঝুঁকিয়া দেখিবে এবং উহাকে দেখিতে পাইবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে;
❑ বলিবে, ‘আল্লাহ্র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করিয়াছিলে,
❑ ‘আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকিলে আমিও তো হাযিরকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হইতাম।
❑ ‘আমাদের তো আর মৃত্যু হইবে না
❑ ‘প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদিগকে শাস্তিও দেওয়া হইবে না!’
❑ ইহা তো মহাসাফল্য।
❑ এইরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা,

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে’। একথার অর্থ— সুরা পানরত অবস্থায় বেহেশতবাসীরা মুখোমুখি বসে খোশগল্প করতে থাকবে। বলা বাহুল্য, এরকম খোশগল্প খুবই আনন্দদায়ক। জনৈক কবি তাই বলেছেন—

ওয়ামা বাক্বিয়াত মিনাল লাজ্জাতি ইল্লা
আহাদীছাল কিরামি আ’লাল মাদামি
ভোগের আর বাকী নেই কিছু শুধু এইটুকু ছাড়া
যা পানের আসরে মধুর আলাপনে দেয় সাড়া।

উল্লেখ্য, এখানকার ‘আক্ববালা’ শব্দটি বক্তব্যকে আরো সুদৃঢ় করেছে। যেনো ওই আলাপনের ঘটনা অতি বাস্তব।

এর পরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— ‘তাদের কেউ বলবে, আমার ছিলো এক সঙ্গী (৫১); সে বলতো, তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে (৫২), আমরা যখন মরে যাবো এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হবো, তখনও কি আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে (৫৩)’? একথার অর্থ— ওই মধুর আলাপচারিতার সময়

এক বেহেশতবাসী আর এক বেহেশতবাসীকে বলবে, পৃথিবীতে আমার এক সঙ্গী ছিলো। সে পুনরুত্থান , বেহেশত- দোজখ কিছুই বিশ্বাস করতো না। উল্টো আমাকে বলতো, তুমিও কি পরকালে বিশ্বাস করো? আমরা মরে গিয়ে পরিণত হবো মাটি ও হাড়ে। এরপরেও আমাদেরকে আবার শাস্তি পেতে হবে?

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে ‘ক্বরীন’ অর্থ শয়তান সম্পর্কিত। অর্থাৎ পৃথিবীতে শয়তান ছিলো আমার সঙ্গী। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এখানে ‘সঙ্গী’ অর্থ মানুষ সঙ্গী, শয়তান সঙ্গী নয়। আর ‘আমার ছিলো এক সঙ্গী’ অর্থ আমার ছিলো এক

www.eelm.weebly.com

ভাই। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ওই বেহেশতবাসী ও তার দুনিয়ার জীবনের সঙ্গী ছিলো একই পরিবারভূত। তাদের একজন ছিলো বিশ্বাসী এবং অপরজন অবিশ্বাসী। তাদের নাম যথাক্রমে ইয়াহুদা এবং মাতরুস। সুরা কাহাফেও এদুজনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

'লামিনাল মুতাসদ্দিক্বীন' অর্থ— তুমিও কি পরকালে বিশ্বাস করো? তুমি কি তাদের দলভূত যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাসী? ...মৃত্তিকায় পরিণত হওয়ার পরেও আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করে শাস্তি বা স্বস্তি দেওয়া হবে? এতো বিবেকবহির্ভূত আজব কথা। প্রশ্নবোধকটি বিস্ময়সূচক।

এরপরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি তাকে দেখতে চাও'। এখানকার 'তোমরা কি তাকে দেখতে চাও' কথাটি আল্লাহ্তায়ালার হতে পারে। হতে পারে ফেরেশতারও। আবার এরকমও হতে পারে যে, কথাটি বলবে ওই বেহেশতবাসী, যে ইতোপূর্বে আলাপচারিতা শুরু করেছিলো 'আমার ছিলো এক সঙ্গী' একথা বলে। শেষোক্ত অবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— আমার ওই অবিশ্বাসী সঙ্গী বা ভ্রাতা এখন জাহান্নামবাসী। তুমি কি তাকে দেখতে চাও।

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে'। একথার অর্থ— এরপর সে দৃষ্টি নিম্নমুখী করে দেখতে পাবে, তার সেই সঙ্গীটি রয়েছে দোজখের কেন্দ্রস্থলে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বেহেশতের মধ্যে কয়েকটি জানালা থাকবে। ওই জানালায় উঁকি দিলে বেহেশতবাসীরা দেখতে পাবে দোজখীদেরকে।

'সাওয়াইল জ্বাহীম' অর্থ দোজখের মধ্যস্থলে। যে স্থানের চতুর্দিকের দূরত্ব সমান তাকেই বলে 'সাওয়া'। এই আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে হান্নাদ উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, ওই ব্যক্তিটি জ্বলন্ত দোজখের দিকে ঝুঁকে পড়ে তার অন্যান্য বেহেশতী সাথিদেরকে বলবে, আমি মানুষের মাথাগুলোকে টগবগ করে ফুটতে দেখছি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'বলবে, আল্লাহ্র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে(৫৬), আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও হাজিরকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম'(৫৭)। একথার অর্থ— সে

তখন ওই দোজখবাসীকে বলবে, আল্লার শপথ! অপপ্ররোচনা দিয়ে তুমি তো আমাকে নিয়ে গিয়েছিলে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। ভাগ্যিস আল্লাহ্ আমাকে অনুগ্রহ করেছেন। না হলে তোমার কথা বিশ্বাস করে এখন আমিও তোমার মতো জ্বলতে থাকতাম দোজখের আগুনে।

এখানে 'নি'মাতু রব্বি' অর্থ আল্লাহ্র অনুগ্রহ। অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত হেদায়েত।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমাদের তো আর মৃত্যু হবে না (৫৮) প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেওয়া হবে না' (৫৯)। একথার অর্থ— সে আরো বলবে, একবার তো আমরা পৃথিবীতে মৃত্যুবরণ করেছিলাম। আর আমাদেরকে কখনো মৃত্যুবরণ করতে হবে না। আর কখনো শাস্তিও দেওয়া হবে না আমাদেরকে। সুতরাং আমাদের এই জান্নাতবাস চিরকালীন। উল্লেখ্য, এমতো বক্তব্যের মাধ্যমে ওই জান্নাতী ব্যক্তি ও তার অন্যান্য সাথীরা দোজখীদেরকে ধিক্কার দিতে থাকবে। অথবা তারা এরকম কথা বলবে নিজেদের আলাপচারিতায়। শেষোক্ত অবস্থায় তাদের এমতো বক্তব্যের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ ও দোজখীদেরকে ভর্ৎসনা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'ইহা তো মহাসাফল্য (৬০)। এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকের উচিত সাধনা করা' (৬১)।

কোনো কোনো বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকার বলেছেন, যখন মৃত্যুকে জবাই করা হবে, তখন জান্নাতবাসীরা আনন্দিত হয়ে ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, আমাদেরকে আর কখনো কি মরতে হবে? তারা বলবে, না। একথা শুনে জান্নাতবাসীরা সমস্বরে বলে উঠবে— এটাই তো মহাসাফল্য। এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা। এরকমও হতে পারে যে, এ কথাগুলো আল্লাহ্র।

জাগতিক সাফল্যের জন্য মানুষ সারাজীবন ধরে বহু চেষ্টা-সাধনা করে। অথচ তা প্রকৃত সাফল্য নয়। কারণ, পৃথিবীর সুখ-দুঃখ সব কিছুই এক সময় শেষ হয়ে যায়। আর আখেরাতের সুখ-দুঃখ অনন্ত। সুতরাং অনন্ত সুখের জীবন লাভ করার জন্যই সকলের চেষ্টা সাধনা করা উচিত। কারণ এটাই মহাসাফল্য। সেকারণেই শেষে বলা হয়েছে— এইরূপ সাফল্যের জন্য সাধকের উচিত সাধনা করা।

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ৬২, ৬৩

www.eelm.weebly.com

❑ আপ্যায়নের জন্য কি ইহাই শ্রেয় না যাক্কুম বৃক্ষ?
❑ যালিমদের জন্য আমি ইহা সৃষ্টি করিয়াছি পরীক্ষাস্বরূপ,

তাফসীরে মাযহারী/৮১

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আপ্যায়নের জন্য এটাই শ্রেয়, না যাক্কুম বৃক্ষ'?

'যাক্কুম' হচ্ছে দোজখাভ্যন্তরস্থিত দুর্গন্ধযুক্ত, বিস্বাদ ও কুৎসিৎ ধরনের গাছ। ওই গাছই হবে দোজখবাসীদের আহার্য, যা তাদেরকে জোর করে খাওয়ানো হবে। আর ভীষণভাবে অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও তারা তা গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হবে। যেমন এক প্রবাদবচনে বলা হয়েছে 'তাযাক্কামাত্ ত্বয়ামু' (সে আহার করলো বড়ই বিস্বাদ ও কষ্টের সঙ্গে)।

'নুযুল' হচ্ছে ওই বস্তু, যা আপ্যায়নের প্রথম পর্বেই অতিথিদের সামনে উপস্থিত করা হয়। এখানে 'আপ্যায়নের জন্য এটাই কি শ্রেয়' বলে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, সুরা-নারী-সুখদ কানন-খোশগল্পের আসর এসকল কিছু বেহেশতবাসীরা পাবে প্রথম পর্বেই। পরের পর্ব তো অনুমানের অতীত। সুতরাং হে মানুষ! বলো, এমতো সাদর আপ্যায়ন উত্তম, না উত্তম দোজখীদের প্রাথমিক আহার হিসেবে উপস্থিতকৃত দুর্গন্ধময়, কুৎসিৎ ও বিস্বাদপূর্ণ বৃক্ষ যাক্কুম? তাদের পরবর্তী দুর্ভোগতো অননুমাননীয়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যাক্কুমের একটি ক্ষুদ্রাংশও যদি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, তবে বিনষ্ট হয়ে যাবে পৃথিবীবাসীদের সমস্ত জীবিকা, আর যার আহার্য হবে যাক্কুম, তার অবস্থা হবে কীরূপ? তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি সঠিক। আবু ইমরান খাওলানি সূত্রে আবু নাঈম এবং 'জাওয়ায়েদুজ্ জুহুদ' গ্রন্থের সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ বর্ণনা করেছেন, মানুষ যাক্কুমকে যতো আঁচড়াবে, যাক্কুমও ততো আঁচড়াবে মানুষকে।

পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'জালেমদের জন্য আমি এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ'। একথার অর্থ— আমি এই যাক্কুম বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি সীমালংঘনকারীদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য। এখানে 'ফিত্না' অর্থ পরীক্ষা। অর্থাৎ পৃথিবীর পরীক্ষা এবং পরবর্তী পৃথিবীর মহা শাস্তি ও দুর্গতি। আর এখানে 'জলিমীন' (সীমালংঘনকারীরা) বলে বুঝানো হয়েছে অংশীবাদীদেরকে। তারা বলতো, আগুন তো গাছকে পুড়িয়ে ভস্ম করে। তাহলে দোজখের আগুনে যাক্কুম গাছের অস্তিত্ব থাকবে কীভাবে? ইবনে যাবআরী একবার এক কুরায়েশ গোত্রনায়ককে বললো, মোহাম্মদ আমাদেরকে যাক্কুমের কথা বলে ভয় দেখায়। অথচ আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় যাক্কুম অর্থ মাখন ও খেজুর। আবু জেহেল এ কথা শুনে তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলো। দাসীকে ডেকে বললো, আমাদের
জন্য যাক্কুম নিয়ে এসো। একটু পরে দাসী নিয়ে এলো মাখন ও খেজুর। আবু জেহেল বললো, খাও। এই হচ্ছে সেই যাক্কুম, মোহাম্মদ যার কথা বলে তোমাদেরকে ভয় দেখায়।

কাতাদা সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, আবু জেহেল একবার মক্কাবাসীদেরকে ডেকে বললো, তোমাদের সাথী নাকি একথা বলে যে, দোজখের

তাফসীরে মাযহারী/৮২

আগুনের ভিতরে এক গাছ থাকবে? অথচ আগুন তো গাছকে গ্রাস করে ফেলে। আল্লাহ্র শপথ! আমি তো জানি, মাখন ও খেজুরকে বলে যাক্কুম। তার এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় নিম্মের আয়াত। বলা হয়—

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪

❑ এই বৃক্ষ উদ্গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হইতে,
❑ ইহার মোচা যেন শয়তানের মাথা
❑ উহারা ইহা হইতে ভক্ষণ করিবে এবং উদর পূর্ণ করিবে ইহা দ্বারা।
❑ তদুপরি উহাদের জন্য থাকিবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।
❑ আর উহাদের গন্তব্য হইবে অবশ্যই প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে।
❑ উহারা উহাদের পিতৃপুরুষগণকে পাইয়াছিল বিপথগামী
❑ এবং তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হইয়াছিল।
❑ উহাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হইয়াছিল,
❑ এবং আমি উহাদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছিলাম।
❑ সুতরাং লক্ষ্য কর যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল, তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছিল!
❑ তবে আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যাক্কুম বৃক্ষ বেরিয়ে আসে জাহান্নামের নিম্নদেশ থেকে। এই বৃক্ষের ফল দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত, শয়তানের মাথার মতো।

'আস্লিল জাহীম' অর্থ জাহান্নামের গর্ত। এরকম বলেছেন সুদ্দী। আর হাসানের মতে কথাটির অর্থ জাহান্নামের তলদেশ বা নিম্নদেশ। অর্থাৎ যাক্কুম

বৃক্ষের মূল প্রোথিত থাকবে জাহান্নামের তলদেশে এবং এর শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে থাকবে জাহান্নামের চতুর্দিকে। 'ত্বলউ'হা' অর্থ এর মোচা বা ফল। ফলকে 'ত্বল্উ' বলা হয় এজন্য যে, তা আত্মপ্রকাশ করে গাছ থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'শয়তানের মাথা' বলে বুঝানো হয়েছে শয়তান জ্বিনদের মাথাকে। যাক্কুম গাছ অতি কুৎসিত। তাই একে তুলনা করা হয়েছে শয়তানের মাথার সঙ্গে। তাছাড়া কুৎসিত কোনো কিছুকে সাধারণতঃ শয়তানই বলা হয়ে থাকে। আর শয়তানকে সাধারণ চোখে দেখা না গেলেও কুৎসিত কোনোকিছুকে মানুষ শয়তানই ধারণা করে থাকে। সে কারণেও এখানে এই উপমাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'শায়াত্বীন' কথাটির অর্থ— এক ধরনের কদাকার বীভৎস সাপ, যার মাথায় থাকে লোম। সম্ভবতঃ ওই সাপের সঙ্গেই এখানে তুলনা করা হয়েছে যাক্কুম বৃক্ষকে। আবার কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন, মরুভূমিতে কুশ্রী ও উৎকট দুর্গন্ধযুক্ত একধরনের গাছ হয়। ওই গাছকে বলে 'শয়তানের রাজা'। আর এখানে হয়তো ওই গাছকেই করা হয়েছে যাক্কুম গাছের উপমা।

এরপরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'তারা তা থেকে ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে তা দ্বারা'। একথার অর্থ— ক্ষুধার তাড়নায় তারা ওই যাক্কুম পেটপুরে খাবে। অথবা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাদের উদর পরিপূর্ণ করা হবে যাক্কুম দ্বারা।

এরপরের আয়াতে(৬৭) বলা হয়েছে— 'তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ'। একথার অর্থ পেটভরে যাক্কুম খাবার পর তারা পিপাসার্ত হয়ে পড়বে। পানি খেতে চাইবে। তখন তাদেরকে খেতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'ছুম্মা' শব্দটি 'অতঃপর' অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে 'অধিকন্তু' বা 'তদুপরি' অর্থে। এভাবে

www.eelm.weebly.com

বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে শাস্তির তীব্রতাকে। অর্থাৎ খাদ্য হিসেবে যাক্কুম তো বিস্বাদ বটেই, তদুপরি অতি বিস্বাদ হবে ফুটন্ত পানি, যা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে তাদের উদরে।

'লা শাওবা' অর্থ মিশ্রিত করা, মিলানো। অর্থাৎ ফুটন্ত পানি তাদের পেটে প্রবিষ্ট হবার পর তা মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে।

এরপরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'আর এদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দিকে'। বাগবী লিখেছেন, প্রথমে গরম পানি পান করানোর জন্য তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানির প্রস্রবণের কাছে। সেখানে ফুটন্ত পানি
গিলিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দিকে। এতে করে বোঝা যায় ফুটন্ত পানির প্রস্রবণ ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি রয়েছে দোজখের পৃথক দু'টি স্থানে। এক আয়াতে একথার প্রমাণও রয়েছে। যেমন 'তারা ঘুরপাক খেতে থাকবে দোজখাগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিলো বিপথগামী(৬৯) এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিলো'(৭০)। একথার অর্থ— তাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলো ধর্মভ্রষ্ট। আর তারা চিন্তা-ভাবনা না করে হয়ে গিয়েছিলো তাদের ওই পথভ্রষ্ট পূর্বসুরীদের অনুগামী। জাহান্নামের শাস্তি তো তাদেরকে ভোগ করতে হবে সেকারণেই।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'তাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিলো (৭১) এবং আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম (৭২)। সুতরাং লক্ষ্য করো, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিলো, তাদের
পরিণাম কী হয়েছিলো! (৭৩) তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র (৭৪)। একথার অর্থ— তাদের পূর্বপুরুষদের পূর্বপুরুষেরাও ছিলো ধর্মভ্রষ্ট। তাদের কাছে সতর্ককারীরূপে আমি প্রেরণ করেছিলাম নবী ও রসুল। কিন্তু তারা তাদেরকে মান্য করেনি। হে আমার রসুল! শুনুন, তাদের শেষ পরিণাম কী মর্মান্তিক হয়েছিলো। তবে ওই সকল লোকের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোক ছিলো ইমানদার, সত্যাশ্রয়ী। তাদের পরিণাম অবশ্যই অশুভ হয়নি। তাদেরকে আমি রক্ষা করেছিলাম আমার রোষ ও শাস্তি থেকে।

এখানে 'আল আউয়ালীন' অর্থ সুদূর অতীতের উম্মতগণ। 'মুনজিরীন' অর্থ সতর্ককারী, নবী, রসুল, যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র রোষ ও শাস্তি থেকে সাবধান করে দেন। 'ফানজুর' অর্থ লক্ষ্য করো। শব্দটির সম্বোধ্য এখানে প্রত্যক্ষত রসুল স. এবং পরোক্ষত তাঁর পুরো সম্প্রদায়, যারা শুনেছিলো অতীতের অবাধ্যদের বিনাশপ্রাপ্তির কাহিনী এবং দেখেছিলো তাদের বিরাণ জনপদের ধ্বংসচিহ্ন।

এখানকার 'কাইফা কানা' (কী হয়েছিলো) কথাটির মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে বিস্ময়সূচক প্রশ্নবোধক বিনয়ের ভাব। এর উদ্দেশ্য অনুসন্ধিৎসার কথা বলা নয়, বরং সন্দেহাতীতরূপে একথা বলা যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানের শাস্তি ইহকাল ও পরকালে এরকমই হয়ে থাকে।

'তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র' অর্থ— যারা ওই সকল নবী-রসুলগণের সতর্কসংকেতকে মেনে নিয়ে বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্ অভিমুখী হয়েছিলো, তারা পৃথিবীতে ছিলো নিরাপদ। পরবর্তী পৃথিবীতে তাদের নিরাপত্তা তো অধিকতর নিশ্চিত। অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস থেকে তারা সতত পৃথক।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

❑ নূহ আমাকে আহ্বান করিয়াছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়াদানকারী।

www.eelm.weebly.com

❑ তাহাকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম মহাসংকট হইতে।
❑ তাহার বংশধরদিগকেই আমি বিদ্যমান রাখিয়াছি বংশপরম্পরায়,
❑ আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি।
❑ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বার্ষিত হউক!
❑ এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি,
❑ সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।
❑ অন্য সকলকে আমি নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'নুহ আমাকে আহ্বান করেছিলো, আর আমি উত্তম সাড়া দানকারী'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! এবার শুনুন আপনার পূর্ববর্তী নবী নুহের কথা। তাঁর সম্প্রদায় হয়ে গিয়েছিলো বিপথগামী। তাদের পথপ্রদর্শনার্থে আমি প্রেরণ করেছিলাম নুহকে। কিন্তু তারা নুহকে মান্য করেনি। তবুও তিনি দীর্ঘদিন ধরে আন্তরিক দরদ ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে ব্যাপৃত থেকেছিলেন পথপ্রদর্শন কর্মে। তারপর এক সময় যখন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমি তাঁকে একথা জানালাম যে, যারা ইমান আনবার তারা ইতোমধ্যেই ইমান এনেছে, আর কেউই ইমান আনবে না, তখন তিনি ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংসের জন্য আমার নিকটে প্রার্থনা জানালেন। আমি তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলাম। আমি তো তিনি ও তাঁর মতো একনিষ্ঠ পুণ্যবানগণের প্রার্থনা উত্তমরূপে মঞ্জুর করি।

উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণভাবে বলা হয়েছিলো পূর্ববর্তী উম্মতদের নিকটে সতর্ককারী বা নবী-রসুল প্রেরণের কথা। আর এই আয়াত থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ বিশেষ নবীগণের আলোচনা। আর নবী নুহের কথা এসেছে সর্বাগ্রে।

পরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট থেকে'। একথার অর্থ— তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে নিয়ে আমি তাঁর সম্প্রদায়ের অবাধ্যদেরকে সমূলে বিনাশ করলাম মহা প্লাবনের শাস্তি দিয়ে। কিন্তু তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনী তাদেরকে
রাখলাম নিরাপদে। তাই ওই মহাসংকট তাদের স্পর্শ করতে পারলো না। এখানে 'মহাসংকট' বলে আপন সম্প্রদায় কর্তৃক প্রদত্ত তাঁর অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টকেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে।

এরপরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'তাঁর বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশপরম্পরায়'। একথার অর্থ— ওই সর্বগ্রাসী মহাপ্লাবন থেকে তাঁর বংশ ছাড়া আর কারো বংশ নিস্তার পায়নি। তাই প্লাবন পরবর্তী সকল মানুষ তাঁরই বংশভূত। আর তা এখনো প্রবহমান।

তিরমিজি প্রমুখ লিখেছেন, হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে রসুল স. বলেছেন, নবী নুহের ছিলো তিন পুত্র— হাম, শাম ও ইয়াফেস। প্লাবনপরবর্তী মানববংশ প্রবহমান রয়েছে তাঁদের মাধ্যমেই। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আরবীয়গণের ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ শাম। আবিসিনীয়দের পূর্বপুরুষ হাম এবং রোমীয়দের পূর্বপুরুষ ইয়াফেস। জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহাপ্লাবনের পর নৌকা থেকে নিরাপদে অবতরণ করেছিলেন হজরত নুহ, তাঁর সন্তানগণ ও তাঁদের সহধর্মিণীগণ। আর সকলে মৃত্যুবরণ করেছিলো বানে ডুবে।

উল্লেখিত আয়াত থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়— ১. ওই মহাপ্লাবনে হজরত নুহ ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরগণ ছাড়া অন্য সকলেই ডুবে মরে গিয়েছিলো। ২. কেবল তাঁর সন্তানত্রয় ছাড়া অন্য সকলের বংশপ্রবাহ হয়ে গিয়েছিলো রুদ্ধ। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষ তাঁদেরই বংশপ্রবাহভূত।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, হজরত নুহের ওই তিন পুত্রের নাম শাম, হাম ও ইয়াফেস। আরব, পারস্য ও রোমের অধিবাসীরা শামের বংশধর। আফ্রিকার অধিবাসীরা বংশধর হামের। আর ইয়াফেসের বংশধরেরা হচ্ছে তুর্কীস্তানী, খরজী, ইয়াজুজ মাজুজ ও ভারতসহ প্রাচ্যবাসীরা।

আমি বলি, হজরত নুহের নবুয়ত পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য ছিলো না। এই বিশেষত্ব রয়েছে কেবল শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর জন্য। হজরত নুহ প্রেরিত হয়েছিলেন কেবল তাঁর স্বজাতির পথ প্রদর্শনার্থে। সুদীর্ঘ দিবস ধরে বহুভাবে অত্যাচারিত হয়েও তিনি তাদের মঙ্গল কামনা করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে অপপ্রার্থনা করেছিলেন এভাবে 'রব্বি লা তাজার আ'লাল আরদ্বি মিনাল কাফিরীনা দাইয়্যারা' (হে আল্লাহ্! অবিশ্বাসীদের কোনো বসত আর এজগতে রেখো না)। এখানে 'আরদ্ব' অর্থ— ওই ভূখণ্ড যেখানে বসবাস করতো তাঁর স্বজাতিরা। অর্থাৎ ইরাক। এমতো ব্যাখ্যার আলোকে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে— প্লাবনপরবর্তী সময়ে ওই ভূখণ্ডে হজরত নুহের বংশ ব্যতিরেকে অন্য কারো বংশ বিদ্যমান ছিলো না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি (৭৮)। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নুহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক'(৭৯)। একথার অর্থ—

www.eelm.weebly.com

আমি নুহের বৃত্তান্তকে পরবর্তী যুগের মানুষের স্মৃতিতে অম্লান রেখেছি, যাতে বিশ্ববাসীর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি নিরবচ্ছিন্নরূপে পৌঁছতে থাকে শান্তিবারতা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন ‘সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নুহের প্রতি শান্তি বর্ষিত

হোক’ এই উক্তিটি আল্লাহ্‌র। এমতাবস্থায় এখানকার ‘তারাকনা’ (স্মরণে রেখেছি) ক্রিয়াটির কর্মপদ উহ্য হবে এবং কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— আমি পরবর্তীদের মধ্যে নুহের প্রসঙ্গকে উচ্চকিত করেছি, তাদের কাছে তাঁকে করেছি খ্যাতিমান।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি (৮০), সে ছিলো আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম (৮১)। অন্য সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম (৮২)। একথার অর্থ— নুহকে আমি পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী করে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম প্রেরণ করে যেভাবে পুরস্কৃত করেছিলাম, সেভাবেই আমি পুরস্কৃত করে থাকি তাদেরকে, যারা সৎকর্মপরায়ণ, পুণ্যবান। নিঃসন্দেহে নুহ আমার উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারী বান্দাগণের অন্যতম। তাই তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে শাস্তিমুক্ত রেখেছিলাম এবং তাঁর বিরুদ্ধপক্ষীয় সকলকে দিয়েছিলাম সলিলসমাধি। উল্লেখ্য, এখানকার ৮০ ও ৮১ সংখ্যক আয়াতে উম্মতে মোহাম্মদীর জন্যও রয়েছে শুভসংবাদ। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ও পুণ্যবান, তাদেরকেও এখানে দেওয়া হয়েছে পুরস্কারের অঙ্গীকার।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭

- আর ইব্‌রাহীম তো তাহার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত।
- স্মরণ কর, সে তাহার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল বিশুদ্ধচিত্তে;
- যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ‘তোমরা কিসের পূজা করিতেছ?
- ‘তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অলীক ইলাহ্‌গুলিকে চাও?
- ‘জগতসমূহের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী?’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘আর ইব্রাহিম তো তার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত’। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র এককত্বে অটুট বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, অথবা শরিয়তের বিধানাবলীতে, কিংবা অধিকাংশ বিধানের ক্ষেত্রে নবী হজরত ইব্রাহিম ছিলেন হজরত নুহের যোগ্য উত্তরসুরী। উল্লেখ্য, হজরত ইব্রাহিম আবির্ভূত হয়েছিলেন
হজরত নূহের মহাতিরোধানের দুই হাজার ছয়শত চল্লিশ বৎসর পর। তাঁদের উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন নবী হুদ ও নবী সালেহ।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— ‘স্মরণ করো, সে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হয়েছিলো বিশুদ্ধচিত্তে’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনুন,
নবী ইব্রাহিম সকলের এবং সকলকিছুর মোহ ত্যাগ করে প্রশান্ত হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে হয়েছিলেন আমার অভিমুখী। উল্লেখ্য, পুত্রউৎসর্গ করার ঘটনা হজরত ইব্রাহিমের সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ অভিমুখী হওয়ার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এর পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলো, তোমরা কিসের পূজা করছো (৮৫)? তোমরা কী আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অলীক ইলাহ্‌গুলিকে চাও’ (৮৬) ? উল্লেখ্য, নবী ইব্রাহীম এখানকার প্রশ্ন দু’টো জবাবের প্রত্যাশায় করেননি। বরং এভাবে প্রশ্নাকারে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের পৌত্তলিকদেরকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। তাদেরকে বুঝাতে চেয়েছিলেন একথা যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে অন্য কারো অথবা অন্য কোনোকিছুর উপাসনায় লিপ্ত হওয়া মহাপাপ। অথচ তোমরা এই মহাপাপকে এখনো আঁকড়ে ধরে আছো। একান্ত নির্বোধের মতো ক্রমাগত করে চলেছো অলীক দেব-দেবী মূর্তির পূজা।

এখানকার ‘আলিহাতান্’ (উপাস্য) শব্দটি ‘তুরীদূন’ (তোমরা কামনা করো) এর ক্রিয়ার সহকর্মপদ। আর ‘দুনাল্লহি’ (আল্লাহ্‌র পরিবর্তে) বিশেষণ ‘আলিহাতান’ এর এবং ‘আইফ্‌কান’ শব্দটি ‘তুরীদূন’ এর নৈমিত্তিক কর্মপদ। এভাবে এখানে

www.eelm.weebly.com

সহকর্মপদের ক্রিয়ার উপর গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়েছে পরবর্তী কর্মপদে। আর নৈমিত্তিক কর্মপদ সর্বাগ্রে বসিয়ে একথাই প্রমাণ করা হয়েছে যে, তাদের সম্পূর্ণ পূজা-পার্বণ বিষয়ক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হচ্ছে মিথ্যা ও কল্পনা। এর মধ্যে সত্যের লেশমাত্রও নেই।

এরপরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— 'জগতসমূহের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী'? একথার অর্থ— নবী ইব্রাহিম তাদেরকে আরো বলেছিলেন, সমগ্র বিশ্বের সৃজক, নিয়ন্ত্রক, পরিচালক ও প্রতিপালক সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা তাহলে কী? তোমরা কি তাঁর ইবাদত চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেছো, না তাঁর ইবাদতে শরীক করে নিয়েছো অন্যকে? উভয়টিই তো মহা পাপ। এর জন্য শাস্তিভোগ যে অনিবার্য, সে ভয় কি তোমাদের নেই? তোমাদের এমতো অপবিশ্বাসের ভিত্তি তাহলে কী? তাঁর সম্পর্কে দৃঢ় প্রতীতি তো দূরের কথা সাধারণ ধারনাও তো তোমাদের নেই।

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ৮৮

❑ অতঃপর সে তারকারাজির দিকে একবার তাকাইল

তাফসীরে মাযহারী/৮৯

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে তারকারাজির দিকে একবার তাকালো'। একথার অর্থ— নবী ইব্রাহিম তাঁর বক্তব্য শেষ করে দৃষ্টি উত্তোলন করলেন। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন নিশিথের আকাশ ভরা নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে।

এখানে 'ফীনুনুজুম' অর্থ তারকারাজির দিকে একবার তাকালেন। কিংবা নজর নিবদ্ধ করলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত পাঁজি-পুথির দিকে। এমতো ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে বলতে হয়, পূর্ববর্তী শরিয়তে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া দু'টোই বৈধ ছিলো। নতুবা হজরত ইব্রাহিম নক্ষত্রের গতিবিধির দিকে দৃষ্টি করতেন না। আমাদের শরিয়তে কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা নিষিদ্ধ।

রযীন বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শরিয়তের বিধানে জ্যোতির্বিজ্ঞানী অপেক্ষা ভবিষ্যদ্বক্তার অপরাধ অধিকতর গুরু। ভবিষ্যদ্বক্তারা হচ্ছে যাদুকর। আর যাদুকর হচ্ছে কাফের। প্রকৃত কথা হচ্ছে এই তিন দলই কাফের। এদের সকলের উপর শরিয়তের একই শাস্তি প্রযোজ্য। নক্ষত্রের গতিবিধি দ্বারা সকল ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হয়, এরকম মনে করা নিষিদ্ধ। কালচক্র সাধিত হয় নক্ষত্রের গতিবিধির উপর, এমনটি ধারনা করা নিষিদ্ধ। তবে কালচক্রের নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল্লাহ্পাক। আর আল্লাহ্পাক কর্তৃক সৃষ্ট কালচক্রের শুভ-অশুভের সংকেত নক্ষত্রের গতিবিধি, এমনটি মনে করাতে কোন দোষ নেই। যেমন ঔষধ রোগ নিরাময়ের নিমিত্ত, বিষপান নিমিত্ত মৃত্যুর। এমতাবস্থায় এই বিশ্বাসটিই প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, আল্লাহ্তায়ালাই সকল কর্মের ও ঘটনার স্রষ্টা। মানুষের কর্মকাণ্ডও তেমনি। মানুষ ভালো বা মন্দ কর্মের ইচ্ছা করে, কিন্তু তা সৃজন করেন আল্লাহ্। মানুষ নির্মাতা মাত্র। সৃজন সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র। প্রকৃত অবস্থা এটাই। মানুষের অবস্থাই যদি এরকম হয়, তবে নক্ষত্রগুলোর অবস্থা তো সম্পূর্ণই আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণের উপরে নির্ভরশীল। সুতরাং কেউ যেনো মনে না করে যে, নক্ষত্ররাজি ভালো-মন্দ কোনো কিছুর নিয়ামক। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য সাধারণতঃ আল্লাহ্র দিকে থাকে না। আল্লাহ্তায়ালাই যে নক্ষত্রসহ সকল কিছুর স্রষ্টা ও পরিচালক সে কথা তারা ভুলেই যায়। রসুল স. জ্যোতির্বিজ্ঞানকে নিষিদ্ধ বলেছেন একারণেই।

হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ জুহনী বর্ণনা করেছেন, আমরা তখন অবস্থান করছিলাম হুদাইবিয়ায়। রাতে খুব বৃষ্টি হলো। ভোরে রসুল স. আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে আমাদের দিকে মুখ করে বসে বললেন, তোমরা কি জানো তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক কী বলেছেন? আমরা জবাব দিলাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই তা উত্তমরূপে অবগত। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে মানে, কেউ কেউ মানে না। যারা বলে আল্লাহ্ই অনুগ্রহ করে আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, তারা আমাকে মানে ও বিশ্বাস করে। আর যারা বলে, বৃষ্টি হয়েছে অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে, তাদের বিশ্বাস আমার উপরে নেই। তারা তারকাপূজারী। বোখারী, মুসলিম।

তাফসীরে মাযহারী/৯০

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখনই আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত ঘটান, তখনই একদল অবিশ্বাসী হয়ে যায়। বৃষ্টিপাত ঘটান আল্লাহ্। অথচ তারা বলে, বৃষ্টি হয়েছে অমুক অমুক তারার কারণে। মুসলিম। ইমাম গাজ্জালী তাঁর 'আলমুনকিজ্ মিনাদ্ দ্বলাল' গ্রন্থে লিখেছেন, অতীত যুগের কোনো কোনো নবীকে আল্লাহ্তায়ালা চিকিৎসাবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই দুই বিদ্যার অধিকারী হয় অবিশ্বাসীরা। বিদ্যা দু'টো ধারণাসম্ভূত। তার প্রমাণ এই যে, তারকাগণনাকারী ভবিষ্যদ্বক্তারা ফেরাউনকে নবী মুসার জন্মের সংবাদ দিয়েছিলো।

www.eelm.weebly.com

বলেছিলো, তাঁর হাতেই ধ্বংস হয়ে যাবে ফেরাউনের সাধের সাম্রাজ্য। তাদের একথা সত্য হয়েছিলো। কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে, তারা কিন্তু ওই ঘটনাকে প্রতিহতও করতে পারেনি।

স্বসূত্রে বোখারী বলেন, ইমাম জুহুরী বলেছেন, ইবনে নাতুর ছিলেন ইলিয়ার প্রশাসক এবং সিরিয়ার খৃষ্টানদের ধর্মগুরু। তিনি বর্ণনা করেছেন, একবার হিরাক্লিয়াস সিরিয়ায় এলেন। তখন একদিন সকালে দেখলাম, তিনি চিন্তান্বিত। তার অনুচরদের একজন জিজ্ঞেস করলো, মনে হচ্ছে, আপনি কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ। হিরাক্লিয়াস ছিলো বিজ্ঞ জ্যোতির্বিদ। সে বললো, গতরাতে তারকাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে আমি জানতে পারলাম, খত্‌নাকৃত সম্প্রদায়ের বাদশাহ জন্মগ্রহণ করেছেন। বলো দেখি, তারা কোন জাতি, যারা খত্‌না করায়? তার সঙ্গী-সাথিরা জবাব দিলো, ইহুদীরা। কিন্তু তাদের সম্পর্কে তো আপনার দুশ্চিন্তিত হবার কিছু দেখি না। নির্দেশ দিন, এই মুহূর্তে রাজ্যের সকল ইহুদীকে আমরা কতল করে ফেলি। এরকম আলাপচারিতা চলাকালে সেখানে উপস্থিত হলো সিরিয়ার প্রশাসক কর্তৃক প্রেরিত এক ব্যক্তি। সে এসে জানালো, আরবের এক লোক নিজেকে নবী দাবি করছে। লোকটি ছিলো আরব। হিরাক্লিয়াস আদেশ দিলো, সে খত্‌নাকৃত কিনা তা পরীক্ষা করা হোক। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। পরীক্ষাকারী বললো, সে খত্‌নাকৃত। হিরাক্লিয়াস লোকটিকে বললো, আরবরা কি সকলেই খত্‌না করায়? সে বললো, হ্যাঁ। হিরাক্লিয়াস তখন মন্তব্য করলো, ওই সম্প্রদায়ের বাদশাহ জন্মগ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে তার এক ঘনিষ্ঠ সঙ্গীকে আরো অধিক তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দিয়ে হিরাক্লিয়াস তখন গমন করলো হেমসে। সেখানে গিয়ে ওই সঙ্গীর মাধ্যমে নিশ্চিত হলো, হ্যাঁ, তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি একজন নবী।

শায়েখ ইবনে হাজার লিখেছেন, জুহুরীর এই বৃত্তান্ত প্রলম্বিত নয়, সমন্বিত সূত্র সম্ভূত। আবু নাঈম তাঁর 'দালায়েল' পুস্তকে লিখেছেন, জুহুরী স্বয়ং বলেছেন, আমি আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে দামেশকে ইবনে নাতুরের সাক্ষাত পেয়েছিলাম। আমি মনে করি, তিনি এরকম কথা প্রচার করেছিলেন তার ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে। এই ঘটনাটির দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, জ্যোতির্বিদেরাও সংঘটিতব্য কোনো কোনো ঘটনা পূর্বাহ্নে আঁচ করতে পারে। কিন্তু তবুও এই

বিদ্যা নিষিদ্ধ। কেননা এতে এই ধারণার সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে, নক্ষত্রগুলোই ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর নিয়ামক। অদৃষ্টলিপি পরিবর্তনের সাধ্য তো কারো নেই। সুতরাং এই বিদ্যার চর্চা করার অর্থ সময়েরও অপচয়। সম্ভবতঃ খৃস্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সময় এই বিদ্যার ব্যাপক চর্চা হতো এবং তা তাদের শরিয়তে বৈধও ছিলো। না হলে তাদের ধর্মগুরুরা এ বিষয়ে এতো বেশী জড়িয়ে পড়তেন না।

কেউ কেউ বলেছেন, জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে কোনোকিছুই জানা যায় না। তাই তাঁরা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে বলেন, হজরত ইব্রাহিম তখন তারকারাজির দিকে তাকিয়েছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে তার বক্তব্যকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তুলবার জন্য। কেননা তারকারাজির প্রভাব তাদের ধারণায় ছিলো অপ্রতিরোধ্য। তাই ব্যাপকভাবে চর্চিত ওই বিদ্যার আনুকূল্যকে হজরত ইব্রাহিম একারণেই আপাতমান্য করেছিলেন যে, এতে করে তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করার উপায় আর তারা খুঁজে পাবে না। অবশেষে তিনি তাদেরকে এই উপসংহারেই স্থিত করবেন যে, দ্যাখো, তোমাদের পূজ্য প্রতিমাগুলো কিন্তু অলীক।

প্রকৃত ঘটনা ছিলো এরকম— পরের দিন ছিলো তাদের বাৎসরিক উৎসবের দিন। তাদের নিয়ম ছিলো, উৎসবে যাবার আগে তারা তাদের দেব-দেবী মূর্তিগুলোর সামনে ফরাশ বিছিয়ে দিতো এবং সেগুলোর উপর রাখতো বিভিন্ন ধরনের আহার্যদ্রব্য। উৎসব থেকে ফিরে এসে তারা আবার ওই আহার্যদ্রব্যগুলোই ভক্ষণ করতো (এটাকে তারা মনে করতো অতি পুণ্যের কাজ)। তারা সেদিন এভাবে আহার্যদ্রব্যগুলো প্রতিমার সামনে সাজিয়ে দেওয়ার পর হজরত ইব্রাহিমকে বললো, চলো, মেলায় যাবে না? তিনি তখনই তাকালেন তারকারাজির দিকে।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬

❑ এবং বলিল, 'আমি অসুস্থ।'

❑ অতঃপর উহারা তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া গেল।

❑ পরে সে সন্তর্পণে উহাদের দেবতাগুলির নিকট গেল এবং বলিল, 'তোমরা খাদ্য গ্রহণ করিতেছ না কেন?'

www.eelm.weebly.com

- ❑ ‘তোমাদের কী হইয়াছে যে, তোমরা কথা বল না?’
- ❑ অতঃপর সে উহাদের উপর সবলে আঘাত হানিল।
- ❑ তখন ঐ লোকগুলি তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল।
- ❑ সে বলিল, ‘তোমরা নিজেরা যাহাদিগকে খোদাই করিয়া নির্মাণ কর তোমরা কি তাহাদেরই পূজা কর?
- ❑ ‘প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকে এবং তোমরা যাহা তৈরি কর তাহাও।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘এবং বললো, আমি অসুস্থ’। একথার অর্থ— আমার অবস্থা তেমন সুখকর নয়। হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার ‘আমি অসুস্থ’ কথাটির অর্থ করেছেন— আমি প্লেগে আক্রান্ত। উল্লেখ্য, তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা প্লেগ রোগের কথা শুনলেই কেটে পড়তো। হাসান ‘ইন্নী সাক্বীম’ অর্থ ‘আমি অসুস্থ’ই করেছেন। আর মুকাতিল অর্থ করেছেন— আমি ব্যথিত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নবী ইব্রাহিম সারাজীবনে অসঠিক কথা বলেছেন তিনবার। একবার বলেছিলেন ‘আমি অসুস্থ’। আর একবার বলেছিলেন ‘বাল ফাআ’লাহু কাবীরুহুম হাজা’ (বরং এটা করেছে তাদের পালের গোদা)। অন্য আর একবার তাঁর পত্নী সারাকে পরিচয় দিয়েছিলেন ‘ভগ্নি’ বলে। সুরা আম্বিয়ার তাফসীরেও এই হাদিসটি উদ্ধৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ণিত হাদিসের ‘অসঠিক’ অর্থ দ্ব্যর্থবোধক বাক্য, অপ্রস্তুত প্রশংসা— যে বাক্যে বক্তার উদ্দেশ্য থাকে একরকম এবং শ্রোতা তা গ্রহণ করে অন্য অর্থে। জুহাক বলেছেন, এখানকার ‘আমি অসুস্থ’ কথাটির অর্থ হবে— আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো।

এরকমও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, নবী ইব্রাহিমের ‘আমি অসুস্থ’ কথাটি প্রকৃতপক্ষে অসঠিক ছিলো না। কেননা জীবন অনিশ্চিত। মানুষের মৃত্যু হতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। এরকম ভেবে যে কেউ ‘আমি অসুস্থ’ এরকম বলতেই পারে। আবার হঠাৎ করে কেউ মারা গেলে লোকে বলে, সে কি সুস্থ অবস্থায় মরলো? জনৈক আরববাসী বলেছেন, যার গর্দানের উপরে সারাক্ষণ মৃত্যুর পরোয়ানা ঝুলছে, সেকি কখনো নিজেকে সুস্থ ভাবতে পারে? আবার কথাটির অর্থ এরকমও হওয়া সম্ভব যে— তোমাদের অংশীবাদী জীবন যাপন দেখে আমি মানসিকভাবে পীড়িত। সুরা আমবিয়াতে বর্ণিত আয়াতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

পরের আয়াতে (৯০) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর তারা তাকে পশ্চাতে রেখে চলে গেলো’। একথার অর্থ— অসুস্থতার কথা শুনে তারা আর হজরত ইব্রাহিমকে মেলায় যাবার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করলো না। তাকে রেখেই সদলবলে চলে গেলো মেলায়।

এর পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘পরে সে সন্তর্পণে তাদের দেবতাগুলির নিকটে গেলো এবং বললো, তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছো না কেনো (৯১)। তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা কথা বলো না’ (৯২)। একথার অর্থ— তারা মেলায় চলে যাবার পর হজরত ইব্রাহিম নিঃশব্দে গিয়ে উপস্থিত হলেন তাদের দেব-দেবীগুলোর সামনে। ঠাট্টাচ্ছলে বললেন, কী ব্যাপার! এতো খাবার তোমাদের সামনে। তবুও তো খাচ্ছো না। কথাও তো বলছো না। কী হলো তোমাদের?

এখানকার ‘রগা’ শব্দটির অর্থ চুপি চুপি ফেরা। শব্দটি ‘রওয়াগাতাছ্ ছায়লাবু’ (খেঁকশিয়ালের চলার নিঃশব্দতা) কথাটির ‘রগতা’ (নিঃশব্দতা) এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এর প্রকৃত আক্ষরিক অর্থ— চালাকির সঙ্গে ফিরে ফিরে যাওয়া। বাগবী লিখেছেন, ‘রগা’ বলে প্রত্যাবর্তনকারীর গোপন প্রত্যাবর্তনকে।

এরপরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর সে তাদের উপর সবলে আঘাত হানলো’। ‘রগা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এখানেও। এর পরক্ষণেই উল্লেখ এসেছে ‘আ’লা’ শব্দটির। এভাবে এখানে একথাটিই সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, হজরত ইব্রাহিম মূর্তিগুলোকে কর্তৃতায়ত্ত করলেন। এরকমও হতে পারে যে, হজরত ইব্রাহিমের ওই সন্তর্পিত পদচারণা ছিলো মূর্তিগুলোর জন্য ক্ষতিকর। সেকারণেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ‘আ’লা’।

‘দ্বরবান’ অর্থ আঘাত হানলো। ‘বিলইয়ামিন’ অর্থ সবলে, ডান হাতের প্রচণ্ড আঘাতে। অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিম তাঁর ডান হাত দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন মূর্তিগুলোকে। আবার ‘ইয়ামিন’ শব্দটি এখানে শপথ প্রকাশকরূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তিনি মূর্তিগুলোকে ভাঙবেন বলে শপথ করেছিলেন। সেই শপথ পূরণার্থে তাদের উপরে হানলেন সবল কুঠারাঘাত। তাঁর এমতো শপথ উদ্ধৃত হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে— ‘যখন তোমরা পশ্চাদ্গমন করবে, আল্লাহ্র শপথ! তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর সঙ্গে অত্যন্ত মন্দ ব্যবহার করবো’।

এরপরের আয়াতে (৯৪) বলা হয়েছে— ‘তখন ওই লোকগুলি তার দিকে ছুটে এলো’। একথার অর্থ— লোকেরা মেলা থেকে ফিরে এসে তাদের দেব-দেবীর করুণ অবস্থা দেখে মর্মাহত হলো। আক্ষেপের স্বরে একে অপরকে শুনিয়ে বলতে লাগলো, যে এরকম করেছে, সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী। এভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর হঠাৎ তাদের মনে হলো হজরত ইব্রাহিমের কথা। মনে হলো, ওই যুবককেই তো আমরা আমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করতে শুনেছি। একথা মনে হতেই তারা দৌড়ে ছুটে এলো হজরত ইব্রাহিমের কাছে। রোষতপ্ত কণ্ঠে মূর্তিভঙ্গের দায়ে দায়ী করলো হজরত ইব্রাহিমকে। বললো, নিশ্চয়, এ অপকর্ম তোমার।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ করো তোমরা কি তাদেরকেই পূজা করো (৯৫)? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী করো তা-ও' (৯৬)।

এখানকার প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লেখিত প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। পরের আয়াতের বক্তব্য সেই অস্বীকৃতিকে করেছে অধিকতর গুরুত্ববহ। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— স্বসৃষ্ট কোনোকিছু কি পূজা পাবার যোগ্য? কখনোই নয়। পূজা পাবার যোগ্য কেবল সেই আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ এবং তাদের কর্মকাণ্ডসমূহ।

এখানকার 'ওয়ামা তা'মালূন' (তোমরা যা তৈরী করো তা-ও) এর 'মা' হচ্ছে ক্রিয়ামূল। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের এবং তোমাদের কাজকর্মেরও স্রষ্টা। তাহলে তোমরা সেই একক মহাসৃজয়িতাকে ছেড়ে এমন কিছুর উপাসনা করো কেনো, যারা তোমাদেরই মুখাপেক্ষী।

আশায়েরা সম্প্রদায়ের বিজ্ঞবিদ্বানগণ বলেন— মানুষের সকল কাজ আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেন। এই আয়াত তার প্রমাণ। আর পথভ্রষ্ট মুতাজিলারা বলে, বান্দা নিজেই তার কর্মের স্রষ্টা। তাদের কাছে এখানকার 'মা তা'মালূন' এর 'মা' যোজক অব্যয়। সর্বনামটি উহ্য। নিঃসন্দেহে তাদের এরকম ধারণা অযথার্থ। কেননা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে— প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী করো তা-ও। সুতরাং বুঝতে হবে, মানুষ কেবল আকার আকৃতির নির্মাতা, অথবা আবিষ্কারক। কিন্তু স্রষ্টা কদাচ নয়। সৃজন সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র। আবার মানুষ যে বুদ্ধি ও শক্তি সামর্থ দিয়ে মূর্তি বানায় এবং যে সকল উপাদান কর্মে ব্যবহার করে সে সকল কিছুর স্রষ্টাও তো আল্লাহ্। তাই একথাও স্বীকার করতে হবে যে, সৎ ও অসৎ কর্মের নির্মাতা হিসেবেই মানুষকে চিহ্নিত করা হবে পুণ্যবান অথবা পাপীরূপে। তাদের কর্মাবলীর স্রষ্টা হিসেবে নয়।

এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'মা' ক্রিয়ামূল হলেও শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে কর্মপদীরূপে। যদি তাই হয় তবে এখানকার 'তা'মালূন' হয়ে যাবে 'তানহিতুন' (তোমাদের সহস্ত নির্মিত) এর মতো। অর্থাৎ ওই মূর্তিনির্মাতারা ছিলো কাফের এবং স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে তারা অপ্রকৃতিস্থিতপ্রায়। তা না হলে কি আর তারা স্বনির্মিত কোনো কিছুর উপাসক হয়?

আশায়েরা ইমামগণের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা সঠিক। আর মুতাজিলা সম্প্রদায়ের উভয় ব্যাখ্যাই ভুল। কেননা তাদের ধারণা অস্বচ্ছ ও অন্তঃসারশূন্য। কাজের নির্মাণনৈপুণ্যও তো আল্লাহ্র দান। সুতরাং মুতাজিলাদের ব্যাখ্যানুসারে আকৃতির সৃষ্টিও মানুষের স্বসৃষ্ট কর্ম বলে প্রমাণিত হয় না, বরং সেটা তাদের অভ্যাস, অথবা শ্রমপরিণাম। এতে করে বরং এটাই প্রমাণিত হয় যে, অন্য সকল কিছুর মতো আকার আকৃতির স্রষ্টাও আল্লাহ্ স্বয়ং।

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ৯৭, ৯৮, ৯৯

❑ উহারা বলিল, 'ইহার জন্য এক ইমারত নির্মাণ কর, অতঃপর ইহাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।'

❑ উহারা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সঙ্কল্প করিয়াছিল; কিন্তু আমি উহাদিগকে অতিশয় হেয় করিয়া দিলাম।

❑ সে বলিল, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চলিলাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করিবেন;

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা বললো, এর জন্য এক ইমারত নির্মাণ করো, অতঃপর একে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করো'। একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিমের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিতে পারলো না। তাই রেগে গেলো খুব। তাদের নেতৃস্থানীয়রা পরামর্শ দিলো, তোমরা বরং এই বিদ্রোহী যুবককে উপযুক্ত শাস্তি দাও। প্রথমে চারিদিকে পাকা দেয়াল দিয়ে প্রস্তুত করো একটি দুর্ভেদ্য আবেষ্টনী। তারপর তার ভিতর কাঠ জমা করে প্রজ্জ্বলিত করো বিশাল অগ্নিকুণ্ড। আর ওই অগ্নিকুণ্ডেই নিক্ষেপ করো তাকে।

মুকাতিল বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন নির্মাণ করলো প্রস্তরবেষ্টিত একটি মজবুত আবেষ্টনী। প্রাচীরের উচ্চতা ও ঘনত্ব ছিলো যথাক্রমে তিরিশ হাত ও দশ হাত। ওই বেষ্টনীর মধ্যে তারা জমা করলো অনেক কাঠ। তারপর তাতে ধরিয়ে দিলো আগুন।

পরের আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিলো; কিন্তু আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করে দিলাম'।

এখানে 'কাইদা' অর্থ চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ। অর্থাৎ সর্বসমক্ষে হজরত ইব্রাহিমের অকাট্য যুক্তিসমূহ যেনো প্রকাশ না হয়ে পড়ে, তাঁর সত্য আহ্বান যেনো জাগাতে না পারে বেভুল জনতাকে, তাই তার সম্প্রদায় তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইলো। হাত পা বেঁধে তাকে নিক্ষেপ করলো ওই জ্বলন্ত হুতাশনে।

www.eelm.weebly.com

‘ফাজাআ’লনা হুমুল আসফালীন’ অর্থ কিন্তু আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করে দিলাম। অর্থাৎ নস্যাৎ করে দিলাম তাদের অশুভ পরিকল্পনাকে। আগুনকে হুকুম দিলাম— শীতল ও শান্তিদায়ক হও। উল্লেখ্য, ওই লেলিহান অগ্নিকুণ্ড হজরত ইব্রাহিমের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি। পুড়ে গিয়েছিলো কেবল তাঁর হাত-পায়ের বাঁধন। আর ঘটনাটি ঘটেছিলো নমরুদের রাজত্বকালে ইরাক রাজ্যের ব্যবিলন অঞ্চলে।

এর পরের আয়াতে (৯৯) বলা হয়েছে— ‘সে বললো, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবেন’। একথার অর্থ— অগ্নিকুণ্ডে নিরাপদে বসে থাকতে দেখেও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর ধর্মমতকে গ্রহণ করলো না। তখন ব্যথিত হলেন তিনি। আপনমনে বললেন, আমি এই অবিশ্বাসীদের সংশ্রব ত্যাগ করে এমন কোনো জায়গায় চলে যাবো, যেখানে আমার ধর্মকর্ম হবে সম্পূর্ণরূপে একাগ্রতাবিমণ্ডিত ও নির্বিঘ্ন। আর আল্লাহ্ই আমাকে সন্ধান দান করবেন ওই নিরাপদ স্থানের। অথবা বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমার প্রভুপালক নিশ্চয় আমাকে ওই ভূখণ্ডের প্রতি পরিচালিত করবেন, যে ভূখণ্ডে যাবার জন্য আমি আদিষ্ট। অর্থাৎ সিরিয়ায়।

ঘটনার বিবরণ এরকম— হজরত ইব্রাহিম তাঁর প্রিয়তমা পত্নী হজরত সারাকে নিয়ে ব্যবিলন থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পথ চলতে চলতে গিয়ে পৌঁছলেন মিসর রাজ্যের সীমানায়। তখনকার মিসরের সম্রাটের নাম ছিলো সাদিফ বিন সাদিফ। ইবনে মুলকিন সংকলিত বোখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলা হয়েছে, তৎকালীন মিসররাজ ছিলো সিনান বিন উলুয়ান। সে ছিলো জোহাকের সহোদর ভ্রাতা। কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম ছিলো ওমর বিন ইমরাউল কায়েস। সেই রাজাই হজরত ইব্রাহিমের কাছ থেকে হজরত সারাকে ছিনিয়ে নিলো। ঘোড়ায় উঠিয়ে নিয়ে গেলো তার রাজমহলে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীকে প্রশান্ত রাখবার ব্যবস্থা করলেন। তুলে দিলেন তাঁর দৃষ্টির সম্মুখের পর্দা। ফলে মিসররাজ ও হজরত সারার গতিবিধি তাঁর দৃষ্টিতে ভেসে রইলো সারাক্ষণ। হজরত সারা ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ অনিন্দ্যরূপসী। মিসররাজ তাই তার অপবাসনা চরিতার্থ করতে মরিয়া হয়ে উঠলো। কিন্তু হজরত সারার দিকে একটু অগ্রসর হতেই শুরু হলো ভূমিকম্প। সমস্ত প্রাসাদ দুলতে লাগলো ভীষণভাবে। ভয়ে সে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলো। প্রবেশ করলো অন্য এক প্রাসাদে। কিন্তু সে প্রাসাদও হলো ভূমিকম্প কবলিত। এভাবে কয়েকটি প্রাসাদ ঘুরে এসে সে হজরত সারার কাছে করজোড়ে পরিত্রাণ প্রার্থনা করলো। হজরত সারা বললেন, ইব্রাহিম হচ্ছেন আল্লাহ্র নবী। তাঁর অসন্তোষকবলিত হয়েছো বলেই তুমি এখন ভূমিকম্প-কবলিত। রাজা এবার বিষয়টি পরিষ্কার বুঝতে পারলো। সসম্মানে হজরত সারাকে প্রত্যর্পণ করলো হজরত ইব্রাহিমের নিকট। অন্য এক বিবরণে ঘটনাটি এসেছে এভাবে— ফেরাউন হজরত সারাকে ধরবার জন্য হাত বাড়ালো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অবশ হয়ে গেলো তার হাত। বিপদ দেখে সে শরণ প্রার্থনা করলো হজরত সারার। বললো, আর সে এরকম করবে না। তিনি দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে গেলো তার অবশ হাত। কিন্তু আবার সে বাড়িয়ে দিলো তার কামনাতাড়িত হাত। এবারও তার হাত হয়ে গেলো অবশ। পুনরায় ক্ষমাপ্রার্থী হলো সে। তিনবার এরকম করবার পর সে বাধ্য হলো সংযত হতে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইমাম আহমদ তাঁর ‘মসনদ’ গ্রন্থে এবং বোখারী মুসলিম তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, একদিন নবী ইব্রাহিম তাঁর সহধর্মিণী সারাকে নিয়ে অতিক্রম করছিলেন এক অত্যাচারী রাজার রাজ্যসীমানা। রাজা সংবাদ পেলো, এক বিদেশী পথিক এক অনিন্দ্যসুন্দরী রমণীকে নিয়ে তার রাজ্য অতিক্রম করে যাচ্ছে। সে তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলো, ওই পথিককে ও তার সঙ্গিনীকে এক্ষুণি ধরে আনা হোক। হুকুম তামিল করা হলো। রাজা হজরত ইব্রাহিমকে একান্তে ডেকে বললো, পথিক! তোমার সঙ্গের রমণীটি কে? নবী ইব্রাহিম বললেন, আমার বোন। ফিরে এসে স্ত্রীকে বললেন, দ্যাখো সারা! এতদঞ্চলে বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনী বলতে আমাদের দু’জন ব্যতীত আর কেউ নেই।। সেকারণেই আমি ওই অত্যাচারী রাজার কাছে বলেছি, তুমি আমার বোন। তুমি জিজ্ঞাসিত হলে এরকমই বোলো। নয়তো আমি প্রমাণিত হবো অসত্যভাষী বলে। রাজা এবার তার কাছে ডেকে নিলো হজরত সারাকে। অসৎ উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালো তাঁর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত হয়ে গেলো শক্তিরহিত। নিরুপায় রাজা ক্ষমাপ্রার্থী হলো। প্রতিজ্ঞা করলো, আর কখনো সে এরকম করবে না। এখন সে শুধু চায়, তার অবশ হাত দু’টো ভালো হয়ে যাক। সারা দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে গেলো তার হাত। কিন্তু পরক্ষণেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলো সে। কিন্তু এবার তার অবস্থা হলো প্রথম বারের চেয়ে অধিক শোচনীয়। বিপদ বুঝে এবারও ক্ষমাপ্রার্থী হলো সে। প্রতিজ্ঞাও করলো আগের মতো। সারার দোয়ায় এবারও বিপদমুক্ত হতে পারলো সে। কিন্তু এবার আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলো না। বরং তাঁর সেবিকা হিসেবে দান করলো হাজেরা নাম্নী এক রমণীকে। দ্বাররক্ষককে ডেকে নির্দেশ দিলো, শিগগির এদেরকে যথাস্থানে পৌঁছে দে। তোরা যাকে ধরে এনেছিলি, সে তো মানুষ নয়, শয়তান। সারা হাজেরাকে নিয়ে হাজির হলেন নবী ইব্রাহিম সকাশে। দেখলেন, তিনি নামাজে মগ্ন। নামাজরত নবী ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন, কী সংবাদ? সারা মুখে জবাব দিলেন, ভালো। আল্লাহ্তায়ালাই দয়াপরবশ হয়ে রাজাকে প্রতিহত করেছেন। বিদায়কালে সে উপঢৌকনরূপে দিয়েছে এই সেবিকাটিকে।

‘মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া’ গ্রন্থে রয়েছে, সাদিফের হাত যখন অবশ হলো, তখন সে শরণ প্রার্থনা করলো হজরত ইব্রাহিম সকাশে। হজরত ইব্রাহিম দোয়া করলেন। সে সুস্থ হয়ে গেলো। উপঢৌকনরূপে সম্প্রদান করলো বিবি হাজেরাকে। তিনিই পরবর্তীতে হয়েছিলেন নবী ইব্রাহিমের সহধর্মিণী। ছিলেন আমানত রক্ষাকারিণী এবং রহস্যময় জ্ঞানের অধিকারিণী। উল্লেখ্য, হজরত হাজেরাকে সম্প্রদান করবার সময় সাদিফ হজরত ইব্রাহিম অথবা হজরত সারাকে বলেছিলো, ‘হাজা আজরি’ (এ হচ্ছে আমার প্রতিদান)। সেকারণেই তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিলো হাজেরা। হজরত ইব্রাহিম তাঁকে হজরত সারার অধীন করে দিয়েছিলেন। কারণ সারার প্রসন্নতাই ছিলো তাঁর অধিক কাম্য। তখন পর্যন্ত

হজরত সারা ছিলেন নিঃসন্তান। তাই একদিন তিনি তাঁর প্রিয়তম পতিকে বললেন,

হাজেরাকে আমি আপনার হাতেই দিলাম। হয়তো আপনি সন্তানের পিতা হতে পারেন তার মাধ্যমেই।
সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ১০০, ১০১

- ❑ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর।'
- ❑ অতঃপর আমি তাহাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করো'। একথার অর্থ— নতুন ভূখণ্ডে গমন করে হজরত ইব্রাহিম হজরত সারা ও হাজেরাকে নিয়ে নতুন করে সংসার পাতলেন। কিছুদিন পরেই অনুভব করলেন, সন্তানহীন জীবন শুষ্কমরুভূমির মতো। তাই তিনি সন্তান প্রার্থনা করলেন এভাবে— হে আমার প্রভুপালক! আমাকে এমন এক পুত্র সন্তান দান করো , যে হবে পুণ্যবানদের মধ্যে একজন।

মুকাতিল বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম সন্তানপ্রার্থী হয়েছিলেন সিরিয়ায় স্থিত হবার পর।

পরের আয়াতে (১০১) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম'।

এখানে 'হালীম' অর্থ স্থিরবুদ্ধি, সহিষ্ণু। আর এখানে 'স্থিরবুদ্ধি পুত্র' বলে বোঝানো হয়েছে হজরত ইসমাইলকে। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, এই অভিমতটি সঠিক। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, শা'বী, হাসান, মুজাহিদ, রবী ইবনে আনাস, মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী এবং কালাবী প্রমুখের নিকটেও এই অভিমতটি গ্রহণযোগ্য। আতা ও ইউসুফ ইবনে মালিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত
ইবনে আব্বাস বলেছেন, যাঁর পরিবর্তে অদৃশ্য জগত থেকে প্রেরিত দুম্বা কোরবানী করা হয়েছিলো তিনি ইসমাইল ব্যতীত অন্য কেউ নন। ওয়াকিদী ও ইবনে আসাকেরের উদ্ধৃতিতে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে আমের ইবনে সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত সারা তখন পর্যন্ত ছিলেন নিঃসন্তানা, তিনি মিসর থেকে আনীত কিবতী ক্রীতদাসী হাজেরাকে সম্প্রদান করেন হজরত ইব্রাহিমের নিকট। আর প্রথমে সন্তানবতী হন হজরত হাজেরাই। হজরত সারা তাই ঈর্ষান্বিতা হন। সুরা ইব্রাহিমের তাফসীরে ঘটনাটি সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত ইব্রাহিম তখন হজরত হাজেরা ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাইলকে রেখে আসেন মক্কার জনমানবহীন এক প্রান্তরে। বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিসটিও উল্লেখ করা হয়েছে সুরা ইব্রাহিমের তাফসীর ব্যপদেশে।

একথা সুনিশ্চিত যে, এখানে 'স্থিরবুদ্ধি পুত্র' বলে বুঝানো হয়েছে— হজরত ইসমাইলকে। আর তাঁকেই কোরবানী করার নির্দেশ পেয়েছিলেন হজরত ইব্রাহিম। অর্থাৎ তিনিই ছিলেন 'জবীহ'(উৎসর্গকৃত), কিন্তু ইহুদী খৃষ্টানেরা বলে, 'জবীহ' ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের অপর পুত্র সারানন্দন হজরত ইসহাক। তাদের উক্তি যে অসত্য, তা বলাই বাহুল্য।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজীর বরাত দিয়ে বাগবী লিখেছেন, খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ একবার এক পুণ্যবান নবমুসলমানকে (যিনি পূর্বে ছিলেন ইহুদী) জিজ্ঞেস করলেন, বলুন দেখি, হজরত ইব্রাহিম তাঁর কোন পুত্রকে জবেহ করবার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন? তিনি বললেন, ইসমাইলকে। তিনি আরো বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! ইহুদীরা একথা জানে। কিন্তু হিংসাবশতঃ স্বীকার করতে চায় না। বলে,'জাবীহুল্লাহ'র অনন্যসাধারণ সম্মান পেয়েছিলেন হজরত ইসহাক। তারা নিশ্চয় অসত্যভাষী। হজরত ইসমাইলই ছিলেন 'জাবীহুল্লহ্‌'। এর প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, তাঁর পরিবর্তে আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রেরিত যে দুম্বাটি জবেহ করা হয়েছিলো, সে দুম্বার শিঙ বহুকাল পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো কাবাগৃহে। অনেক পরে খলিফা হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যোবায়েরকে উৎখাত করবার জন্য দুরাচার হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যখন কাবাশরীফের দিকে উপর্যুপরি কামানের গোলা নিক্ষেপ করে, তখন কাবাগৃহে আগুন ধরে যায় এবং ওই শিঙ দু'টোও পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। বনি সালেমের জনৈক পুণ্যবতী রমণীর বরাতে সাঈদ ইবনে মনসুর ও বায়হাকী তাঁর সংকলিত গ্রন্থে হজরত তালহা ইবনে ওসমান থেকে বর্ণনা করেছেন, দুম্বার শিঙ দু'টো কাবাগৃহে টাঙানো ছিলো।

বাগবী লিখেছেন, শা'বী বলেছেন, আমি শিঙ দু'টোকে কাবায় বাঁধা অবস্থায় দেখেছি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যাঁর অধিকারে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্বে দুম্বার শিঙসহমাথা ঝুলানো ছিলো

এবং কাবার পানি নিষ্কাশনের নালা ছিলো শুষ্ক। আসমায়ী বলেছেন, আমি একবার আবু আমর ইবনে আলাকে জিজ্ঞেস করলাম, বলুন তো, 'জাবিহুল্লাহ্‌' ছিলেন কে— ইসমাইল, না ইসহাক? তিনি বললেন, তোমার কি জ্ঞান বুদ্ধি আছে? ইসহাক আবার মক্কায় ছিলেন কবে? পিতার সঙ্গে কাবা নির্মাণে তো অংশগ্রহণ করেছিলেন ইসমাইলই।

বাগবী লিখেছেন, উভয় উদ্ধৃতিই বর্ণিত হয়েছে রসুল স. থেকে। আমি বলি, তাঁর এমতো মন্তব্যে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দু'টোর একটাও রসুল স. এর বাণী নয়। কেননা, ওদু'টোর একটিকে গ্রাহ্য করলে অপরটি হয়ে যাবে অবিশ্বাস্য। আবার দু'টোকে একসঙ্গে গ্রহণ করলে বুঝতে হবে দু'টোরই সূত্রপরম্পরা অসঠিক ও অপ্রামাণ্য।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, সাহাবীগণের মধ্যে হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে আব্বাস এবং তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীনের মধ্যে কা'ব আহবার, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, কাতাদা, মাসরুক, ইকরামা, আতা,

মুকাতিল, জুহুরী ও সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে, জাবীহুল্লাহ্ ছিলেন হজরত ইসহাক। হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে এরকম বর্ণিত হয়েছে ইকরামা ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের কর্তৃক। সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইব্রাহিম যখন সিরিয়ায় বসবাসরত, তখন তাঁকে স্বপ্নে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো হজরত ইসহাককে জবেহ্ করবার জন্য। তিনি তখন তাঁর প্রিয় পুত্র ইসহাককে সঙ্গে নিয়ে গমন করেন মক্কায়। এক মাস সময়ের দূরত্ব অতিক্রম করেন সকাল থেকে দ্বিপ্রহরের মধ্যে। জবেহ্ করার স্থান নির্ধারিত হয়েছিলো মীনায়। সেখানেই উপস্থিত হন পিতা-পুত্র দু'জনে। এরপর আল্লাহ্পাক যখন হজরত ইসহাকের পরিবর্তে দুম্বা জবেহ করার নির্দেশ দেন, তখন প্রেরিত দুম্বাটিকেই জবেহ করেন তিনি। তারপর দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এক মাসের পথ অতিক্রম করে ফিরে যান সিরিয়ায়। ওই সময় আল্লাহ্পাক তাঁর জন্য পথ ও পথিমধ্যের পাহাড়গুলোকে করে দিয়েছিলেন অন্তর্হিত।

অপরদিকে হজরত ইসমাইলের 'জাবীহুলাহ্' হওয়ার কথা প্রমাণিত হয় এভাবে—

১. একথা সুপ্রমাণিত যে, সিরিয়ায় হিজরতের পর হজরত ইব্রাহিম সন্তানরূপে প্রথম লাভ করেছিলেন হজরত ইসমাইলকে।

২. আল্লাহ্ বলেছেন 'আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি সন্তানের সুসংবাদ দিলাম' (আয়াত ১০১)। আবার পরবর্তী আয়াত শুরু হয়েছে 'ফা' সহযোগে। সুতরাং একথা বলতে আর কোনো বাধা নেই যে, ঘটনাদু'টো একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এর মধ্যে কিছু সময়ের ব্যবধান থাকলেও। আর হজরত ইসহাকের
জন্ম যেহেতু হয়েছিলো তাঁর হিজরতের অনেক পরে, তাই তিনি জাবীহুল্লাহ্ নন। যাঁর জন্মই হয়নি তার উপর নিশ্চয় জবেহ করার আদেশ প্রযোজ্য হতে পারে না।

৩. এবার আসা যাক হজরত ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ প্রসঙ্গে। এখানকার 'গুলামুন হালীম' (স্থিরবুদ্ধি পুত্র) কথাটিকে যদি হজরত ইসহাক সম্পর্কে বলা হয়েছে বলে মনে করা হয়, তবে বলতে হয়, পরবর্তীতে যাকে জবেহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি হজরত ইসহাক নন, অন্য কেউ। কেননা যোজ্য ও যোজিতের মধ্যে পার্থক্য অবশম্ভাবী।

একটি সংশয় ঃ হজরত ইসহাকের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে দু'বার— একবার জন্মের এবং আর একবার নবুয়ত প্রাপ্তির। 'স্থিরবুদ্ধি পুত্র' কথাটি তাঁর নবুয়তের সুসংবাদবাহী। তাহলে তাঁর জন্মের সুসংবাদবাহী কথাটি কোথায়?

সংশয়ভঞ্জন ঃ এমতো সন্দেহ ভিত্তিহীন এবং দৃশ্যতঃ কোরআনের আয়াতের বক্তব্যের পরিপন্থী। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফাবাশ্শারনাহু বিইসহাক্বি নাবিয়্যাম্ মিনাস্ সলিহীন' (আমি ইব্রাহিমকে দিয়েছি ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ এবং বলে দিয়েছি যে, তার নবুয়ত ও নবীরূপে মনোনয়নের সিদ্ধান্ত দেওয়া

হয়েছে)। এমন কথা এখানে বলা হয়নি যে, আমি ইসহাকের নবুয়তের সুসংবাদ দিলাম। অর্থাৎ এখানকার সুসংবাদটি তাঁর জন্ম ও নবুয়তপ্রাপ্তি উভয়ের। কেবল নবুয়তপ্রাপ্তির নয়।

৪. হজরত সারাকে হজরত ইসহাক এবং হজরত ইসহাকের পুত্র হজরত ইয়াকুবের সুসংবাদ দেওয়া হয় এক সঙ্গে এভাবে 'আমি ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ প্রদান করলাম, আরো সুসংবাদ প্রদান করলাম তার পুত্র ইয়াকুবের'। তখন নিশ্চয় হজরত ইসহাক কিশোর। অর্থাৎ তখন পর্যন্ত আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত সুসংবাদানুসারে হজরত ইয়াকুবের জন্মই হয়নি। এমতাবস্থায় হজরত ইসহাক জাবীহুল্লাহ্ হতে পারেন কীভাবে?

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ১০২, ১০৩

❑ অতঃপর সে যখন তাহার পিতার সংগে কাজ করিবার মত বয়সে উপনীত হইল তখন ইব্রাহীম বলিল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবেহ্ করিতেছি, এখন তোমার অভিমত কি বল?' সে বলিল, 'হে আমার পিতা! আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন তাহাই করুন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন।'

❑ যখন তাহারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করিল এবং ইব্রাহীম তাহার পুত্রকে কাত করিয়া শায়িত করিল,

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করবার মতো বয়সে উপনীত হলো' একথার অর্থ— আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত সুসংবাদানুসারে যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হলেন হজরত ইসমাইল। বড় হতে লাগলেন ধীরে ধীরে। এভাবে এক সময় হয়ে গেলেন এক কর্মঠ কিশোর। নানা বিষয়ে হয়ে উঠলেন পিতার কর্মসহযোগী।

'সাআ' অর্থ কাজ করার চেষ্টা । হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে পাহাড় পর্যন্ত দৌড়ে বেড়াবার উপযুক্ত হওয়া। মুজাহিদ বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শব্দটির অর্থ যৌবনবান হওয়া এবং তাঁর পিতার কাজের মতো কাজের অন্বেষণ করা। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ তেরো বৎসর বয়সে উপনীত হওয়া। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর উদ্দেশ্য সাত বৎসরে পৌঁছানো।

এরপর বলা হয়েছে— 'তখন ইব্রাহিম বললো, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কী বলো'? একথার অর্থ—

হজরত ইব্রাহিম স্বপ্নে প্রাপ্ত সরাসরি নির্দেশে অথবা দর্শিত স্বপ্নের মর্মানুসারে ইসমাইলকে বললেন, প্রিয়তম পুত্র আমার! আমি স্বপ্নে দেখলাম, তোমাকে আমি জবেহ করছি। এখন বলো, এ বিষয়ে তোমার অভিমত কী?

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিম বোরাকে সওয়ার হয়ে সিরিয়া থেকে মক্কাভিমুখে যাত্রা করতেন ভোর বেলায়। আর দ্বিপ্রহরে হজরত হাজেরার গৃহে পৌঁছে পানাহারের পর উপভোগ করতেন দ্বিপ্রহরিক বিশ্রাম। ফিরতি পথে রওয়ানা করতেন দুপুরের পর এবং সিরিয়ায় ফিরতেন রাতে। ইসমাইল ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে থাকলেন। হজরত ইব্রাহিম আশা পোষণ করতেন, প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে যেনো ইসমাইল হন আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণসমর্পিত। একনিষ্ঠ হন কেবল তাঁরই ইবাদতে। এক সময় ইসমাইল হয়ে উঠলেন প্রায় যুবক। তখন এক জিলহজের ৮ তারিখে তিনি স্বপ্নাদেশ পেলেন, ইসমাইলকে জবাই করো। ভোরে নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি ভাবতে লাগলেন, স্বপ্নের মর্মার্থ কী? আর এ স্বপ্ন কি আল্লাহ্র পক্ষের প্রত্যাদেশ, না শয়তানের পক্ষের প্রক্ষেপণ? এই চিন্তার কারণেই জিলহজের ৮ তারিখকে বলা হয় 'ইয়াওমূন তারভিয়া' (চিন্তার দিন)। পরের রাতেও তিনি একই স্বপ্ন দেখলেন। সকালে উঠে নিশ্চিত হলেন, এ স্বপ্ন প্রত্যাদেশ, যা অবশ্য পালনীয়। একারণেই ৯ই জিলহজকে বলে 'ইয়াওমূল আরাফা' (পরিচিতির দিন) বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমানে' হজরত ইবনে আব্বাস থেকে কালাবী সূত্রে আবু সালেহের মাধ্যমে এরকমই বর্ণনা করেছেন।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, স্বপ্নাদিষ্ট হবার পর হজরত ইব্রাহিম তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে বললেন, তুমি রশি ও ছুরি নিয়ে অগ্রসর হও। আমি ওই গিরিপথে যাচ্ছি কাঠ সংগ্রহের জন্য। এভাবে কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে তিনি পুত্রের সঙ্গে মিলিত হলেন ছবীর গিরিপথের একান্তে। তখন তিনি পুত্রকে জানালেন স্বপ্নের বৃত্তান্ত। খুলে বললেন সব।

মুকাতিল বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম ওই স্বপ্ন দেখেছিলেন পর পর তিন রাত্রি। এরপর তিনি যখন নিশ্চিত হলেন যে, এ হচ্ছে প্রত্যাদেশ, তখন পুত্রকে তা অবহিত করলেন। বললেন— বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বলো?

সুদ্দী বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম যখন প্রার্থনা জানালেন, 'হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করো' তখন আল্লাহ্ সুসংবাদ দিলেন এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের। আর ঠিক তখনই তিনি মানত করলেন, ওই পুত্রকে তিনি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোরবান করবেন। এরপর যথাসময়ে ওই প্রতিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন। যখন তিনি বড় হলেন, তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো, এবার তোমার মানত পূর্ণ করো। কিন্তু সুদ্দীর এমতো বিবরণ

যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ এর মধ্যে পরীক্ষার বিষয়টি অনুপস্থিত। প্রকৃত কথা হচ্ছে হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসমাইলকে পরীক্ষাকরণার্থেই আল্লাহ্তায়ালা দিয়েছিলেন জবেহ করার নির্দেশ। মানত পূরণকরণার্থে নয়।

বাগবী লিখেছেন, নির্দেশপ্রাপ্তির পর হজরত ইব্রাহিম হজরত ইসমাইলকে বললেন, চলো, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোরবানী করবো। হজরত ইসমাইল তখন ছুরি ও রশি নিয়ে এলেন। তারপর পিতার সঙ্গে গমন করলেন পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের কাছে পৌঁছে বললেন, কোরবানীর পশু কোথায়? হজরত ইব্রাহিম বললেন, প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখলাম, তোমাকেই জবেহ করছি।

'ফানজুর মাজা তারা' অর্থ এখন বলো, তোমার অভিমত কী? অর্থাৎ এবার তুমিই চিন্তা-ভাবনা করে তোমার মতামত জানাও। এখানকার 'তারা' শব্দটি 'রুইয়াত' (চোখে দেখা) থেকে সাধিত নয়। বরং শব্দটি সাধিত হয়েছে 'রায়' বা পরামর্শ থেকে। অর্থাৎ তিনি 'তোমার অভিমত কী' বলে নিতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় পুত্রের আনুগত্যের পরীক্ষা। যাচাই করতে চেয়েছিলেন তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন, তা-ই করুন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন'। একথার অর্থ— হজরত ইসমাইল জবাব দিলেন, হে আমার মহাসম্মানিত জনয়িতা! আপনি যেরকম নির্দেশ পেয়েছেন, সেরকমই করুন। ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে আল্লাহ্র অভিপ্রায়ানুকূলেই পাবেন।

আলোচ্য বাক্যে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নবীগণের স্বপ্নও প্রত্যাদেশ, যা অবশ্য প্রতিপালনীয়। আবদ ইবনে হুমাইদের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, আম্বিয়াগণের স্বপ্নও ওহী। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী, হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মুসলিম, আহমদ ও ইবনে মাজা আবু রযীনের বরাতে এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে সুপরিণত সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, শুভ স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১০৩) বলা হয়েছে— 'যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলো, এবং ইব্রাহিম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করলো'।

এখানে 'ফালাম্মা আস্লামা' অর্থ যখন উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলো। অর্থাৎ যখন পিতাপুত্র দু'জনেই আল্লাহ্র আদেশের প্রতি হলো পূর্ণসমর্পিত। কাতাদা বলেছেন, 'আস্লামা' অর্থ, সমর্পণ করা। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যখন হজরত ইব্রাহিম তাঁর প্রিয়তম পুত্রকে এবং হজরত ইসমাইল তাঁর জীবনকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেলন।

'ওয়া তাল্লাহু লিল্ জ্বাবীন' অর্থ তিনি তাঁর পুত্রকে কাত করে শায়িত করলেন ভূমিতে। অর্থাৎ জবেহ করার জন্য তিনি তাঁকে শোয়ালেন কাত করে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম তখন হজরত ইসমাইলকে কাত করে

এমনভাবে শুইয়েছিলেন, যাতে করে তাঁর কপাল ছিলো দুই বাহুর মাঝখানে। বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও হাকেম। জনৈক কুরায়েশ কর্তৃক কথিত এবং আতা ইবনে শায়েরের সূত্রে বাগবী কর্তৃক পরিবেশিত এক বিবরণে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ঘটনাটি ঘটেছিলো ওই স্থানে, যেখানে এখনো কোরবানী করেন হজ পালনকারীরা।

বাগবী লিখেছেন, বর্ণনাকারীগণ বলেছেন, হজরত ইসমাইল তখন পিতাকে বললেন, পিতা! আপনি আমাকে শক্ত করে বাঁধুন, যাতে করে আমি হাত পা ছুঁড়তে না পারি। আর আপনার পরিধেয় গুটিয়ে নিন, যাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত আপনার পরিধেয় রক্তরঞ্জিত না করতে পারে। যাতে আমার সওয়াব প্রাপ্তিতে ন্যূনতা না ঘটে। আবার আপনার রক্তরঞ্জিত বস্ত্র দেখে যেনো আমার মাতা শোকাকুলা না হন। ছুরিটিও ভালো করে ধার দিয়ে নিন, যাতে আমার কণ্ঠনালী অতিদ্রুত কর্তিত হয়, আমিও যেনো মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে রেহাই পেয়ে যাই সহজে। মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চয় ভয়াবহ ও কঠিন। আর আপনি যখন আমার মায়ের কাছে যাবেন, তখন তাঁকে আমার সালাম জানাবেন। আমার গায়ের জামা নিয়ে গিয়ে যদি তাঁকে দিতে চান, তবে তা-ও করতে পারেন। তাহলে হয়তো তিনি পাবেন সান্ত্বনার একটি অবলম্বন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, হে আমার প্রাণাধিক পুত্র! আল্লাহ্র আদেশ পালন করার ক্ষেত্রে তুমিই আমার সর্বোত্তম সহযোগী। একথা
বলে তিনি জবেহ্ করার প্রস্তুতি নিলেন। ছুরি ধার দিলেন। পরিধেয় বস্ত্র গুটিয়ে নিলেন। তারপর তাঁকে কাত করে শোয়ালেন। তাঁর হাত পা বাঁধলেন শক্ত করে। শেষে অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে আদর করলেন প্রাণপ্রিয় পুত্রকে। তারপর উপর্যুপরি ছুরি চালাতে লাগলেন প্রিয়তম পুত্রের কণ্ঠনালীতে। কিন্তু ছুরি কিছুই করতে পারলো না। তিনি পুনরায় পাথরে ঘষে ছুরিতে ধার দিয়ে নিলেন। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হলো না।

সুদ্দীর বরাত দিয়ে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিম তাঁর প্রিয়তম পুত্রের কণ্ঠদেশে কয়েকবার জোরে শোরে ছুরি চালালেন। কিন্তু ছুরি তার চামড়াও কাটতে পারলো না। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তখন তাঁর কণ্ঠদেশে লাগিয়ে দিয়েছিলেন তামার পাত। বর্ণনাকারী বলেছেন, ইসমাইল তখন বললেন, হে আমার পিতা! আপনি আমাকে ঢেকে দিন। আমাকে দেখলে আপনি মমতাপরবশ হবেন। আপনার হাত হয়ে পড়বে শিথিল। ফলে আল্লাহ্র আদেশ কার্যকর করা আপনার জন্য হয়ে পড়বে কঠিন। আর আমার নজর শাণিত ছুরির প্রতি পড়লে আমিও হয়ে যেতে পারি চঞ্চল ও বিহ্বল। হজরত ইব্রাহিম তাই করলেন। কিন্তু বস্ত্রাবৃত আত্মজের উপরে যখনই ছুরি চালালেন, তখনই ছুরি হারিয়ে ফেললো তার সম্পূর্ণ ধার।

সুদ্দীর উদ্ধৃতিতে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বলেন— হজরত ইব্রাহীম ছুরি চালিয়েছিলেন প্রচণ্ড শক্তিতে, কিন্তু ছুরি অচল। হজরত ইসমাইলের কণ্ঠনালীর উপর আল্লাহ্পাক জড়িয়ে দিয়েছিলেন চামড়ার চাকতি। যদ্দরুন ছুরি

হয়েছেলো ভোঁতা। হাদিস বিশারদগণ বলেন, সে সময় হজরত ইসমাইল, হজরত ইব্রাহিমকে বলেছিলেন— পিতা! আমাকে উপুড় করে শোয়ান, নয়তো আমার মুখশ্রী আপনার অন্তরে জাগাবে অপত্য স্নেহ। আবার জবাইয়ের ছুরি দেখলে আমার মধ্যেও সৃষ্টি হতে পারে আতঙ্ক। কাজেই আমাকে উপুড় করে শুইয়ে দিন। তাই করলেন হজরত ইব্রাহিম। কিন্তু এতেও প্রমাণিত হলো ছুরিটি কর্তনক্ষম নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম এবং মুজাহিদ সূত্রে আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, জবেহ্ করার প্রাক্কালে হজরত ইব্রাহিম হজরত ইসমাইলকে শুইয়ে দিয়েছিলেন অধোবদনে। হজরত কা'ব আহবার সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা ও মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক স্বসূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিম যখন তাঁর প্রিয়পুত্রকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোরবান করতে উদ্যোগী হলেন, তখন শয়তান মনে করলো, এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ। এসময় যদি আমি ইব্রাহিমের পরিবার পরিজনকে ধোকা না দিতে পারি, তবে তার পরবর্তী বংশধরদেরকে আর কখনো ধোকায় ফেলতে পারবো না। একথা ভেবেই

www.eelm.weebly.com

সে অপরিচিত পুরুষের বেশে হজরত হাজেরার কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, তুমি কি জানো, নবী ইব্রাহিম তোমার ছেলেকে নিয়ে কোথায় গেলেন? হজরত হাজেরা বললেন, দু'জনেই তো গেলো ওই গিরিপথের দিকে কাঠ আনতে। সে বললো, তুমি তো জানো না। তিনি তো তোমার পুত্রকে জবেহ করবার জন্য নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, অসম্ভব। তিনি যে পুত্র অন্তঃপ্রাণ। শয়তান বললো, ইব্রাহিম তো বলেন, পুত্রকে জবেহ করবার জন্য তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ পেয়েছেন। হজরত হাজেরা বললেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অবশ্যপালনীয়। একথা শুনে শয়তান নিরাশ হয়ে গেলো। উপস্থিত হলো হজরত ইসমাইলের কাছে। তিনি তখন ছিলেন তাঁর মহাসম্মানিত পিতার অনুগমনরত। শয়তান বললো, এই ছেলে! তুমি কি জানো, তোমার পিতা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? বালক ইসমাইল বললেন, আমরা তো যাচ্ছি কাঠ সংগ্রহ করতে। শয়তান বললো, তুমি জানো না। তোমাকে জবেহ করার জন্যই তোমার পিতা তোমাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। তিনি বললেন, কী কারণে আমাকে জবেহ করা হবে? শয়তান বললো তিনি মনে করেন, এটা আল্লাহ্‌র আদেশ। ইসমাইল বললেন, তাহলে তো তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করবেনই। এরকম আমল যে অত্যাবশ্যক। শয়তান এবারও পরাস্ত হলো। কিন্তু দমলো না । এগিয়ে গেলো হজরত ইব্রাহিমের দিকে। বললো, হে পুণ্যবান বৃদ্ধ! আপনি কোথায় চলেছেন? তিনি বললেন, গিরিপথের দিকে। কাজ আছে। সে বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানি, আপনি শয়তানের ধোকায় পড়েছেন। সে স্বপ্নে আপনার ছেলেকে জবেহ করার হুকুম দিয়েছে। হজরত ইব্রাহিম চিনতে পারলেন, এ নির্ঘাত শয়তান। বললেন, আল্লাহ্‌র দুশমন! এই মুহূর্তে তুই চলে

যা। আল্লাহ্‌র আদেশ আমি অবশ্যই পালন করবো। শয়তান এবারেও পরাস্ত হলো। এভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা সুরক্ষিত রাখলেন হজরত ইব্রাহিম ও তাঁর পরিবার পরিজনকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু তোফায়েল বর্ণনা করেছেন, পুত্র জবেহ করার আদেশ পেয়ে হজরত ইব্রাহিম তা কার্যকর করতে অগ্রসর হলেন। শয়তান বাধা দিতে চেয়েও তাঁর গতিরোধ করতে পারলো না। যখন জামরাহে উকবাতে উপস্থিত হলেন, তখন পুনরায় শয়তান আর্বিভূত হলো। হজরত ইব্রাহিম তার প্রতি নিক্ষেপ করলেন সাতটি কংকর। ফলে সে পালিয়ে গেলো। এরপর তিনি উপস্থিত হলেন জামরাহে উস্‌তায়। সেখানেও তার দিকে ছুঁড়ে মারলেন সাতটি প্রস্তরকণা। ফলে এবারেও তাকে পলায়ন করতে হলো। শেষে যখন তিনি জামরাহে কুবরাতে গমন করলেন, তখনও উদয় হলো শয়তান। তিনিও পূর্ববৎ নিক্ষেপ করলেন সাতটি পাথরদানা। সঙ্গে সঙ্গে শয়তান পালালো। হজরত ইব্রাহিম অগ্রসর হলেন আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যকর করতে।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ১০৪, ১০৫, ১০৬

- ❑ তখন আমি তাহাকে আহ্‌বান করিয়া বলিলাম, 'হে ইব্‌রাহীম!
- ❑ 'তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করিলে!'— এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।
- ❑ নিশ্চয়ই ইহা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— ইসমাইলকে কাত করে শুইয়ে যখন তার পিতা ইব্রাহিম তার কণ্ঠদেশে ছুরি চালালেন, তখন আমি রুদ্ধ করে দিলাম ছুরির জবেহ করার শক্তি। আর ইব্রাহিমকে বললাম, হে আমার নবী! তুমি তো আমা কর্তৃক প্রদর্শিত স্বপ্ন সত্য করে দেখালে। এভাবে যারা আমার আদেশ কার্যকর করতে ব্রতী হয়, তারাই সৎকর্মপারয়ণ। আর তাদেরকে আমি এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিঃসন্দেহে এটা ছিলো এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

বাগবী লিখেছেন, এখানকার 'ওয়া নাদাইনাহু (তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম) কথাটির 'ওয়াও' অতিরিক্ত এবং কথাটি পূর্ববর্তী আয়াতের 'যখন তারা আনুগত্য প্রকাশ করলো' শর্তযুক্ত বাক্যের পরিণতি। বায়যাবী লিখেছেন, বর্ণিত বাক্যের পরিণতি এখানে রয়েছে উহ্য। ওই উহ্য কথাগুলো হবে এরকম— তখন পিতা-পুত্রের অন্তর ভরে গেলো অপার্থিব আনন্দে, যে আনন্দ আল্লাহ্‌পাক আর কাউকে দান করেননি। এভাবে আল্লাহ্‌পাক তাঁদেরকে দান করেছেন মহাসম্মান।

আর তাঁদের জন্য পরকালেও রেখে দিয়েছেন বিশেষ পুরস্কার, যা বর্ণনাতীত। আর এমতো পুরস্কার প্রাপ্তির অঙ্গীকার শ্রবণে তারাও আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে জ্ঞাপন করেছিলেন অজস্র কৃতজ্ঞতা।

আমি বলি, এরকমও হতে পারে যে, 'ওয়াও' এখানে যোজক অব্যয় এবং এর সংযোগ রয়েছে ওই উহ্য বক্তব্যের সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যখন পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অবনত মস্তকে মেনে নিলেন, হজরত ইব্রাহিম তাঁর প্রিয় পুত্রকে কাত করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন, তখন আল্লাহ্ ছুরিকে কর্তনকর্ম থেকে বিরত রাখলেন এবং প্রত্যাদেশ করলেন— হে

www.eelm.weebly.com

ইব্রাহিম তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছো। নিঃসন্দেহে এটাই আমার পুরস্কার। আর এভাবে আমি পুরস্কৃত করি তাদেরকে, যারা সৎকর্মপরায়ণ।

'ক্বদ্ সদ্‌দাক্বতার রুইয়া' অর্থ তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে। উল্লেখ্য, যে কোনো আদেশের উদ্দেশ্য থাকে তা পালিত হবে কিনা, তা পরীক্ষা করা। হজরত ইব্রাহিম সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। জবেহ করার সকল আয়োজনই তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু হজরত ইসমাইলকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ্ স্বয়ং। কারণ জীবন ও মৃত্যু দান সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র অধিকারভূত।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইব্রাহিম কেবল দেখেছিলেন, তিনি তাঁর প্রাণাধিক পুত্রকে জবেহ করছেন। রক্ত প্রবাহিত হতে তিনি দেখেননি। তাঁর দেখা ওই স্বপ্নই বাস্তবরূপ লাভ করেছিলো। অর্থাৎ জবেহ তিনি ঠিকই করেছিলেন। কিন্তু তা ছিলো রক্তপাতবিবর্জিত। এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, তাঁর স্বপ্ন ও তার বাস্তবায়ন ছিলো হুবহু এক। নতুবা তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়নকে গ্রহণ করতে হবে রূপক অর্থে।

একটি প্রশ্ন ঃ পুত্রকে জবেহ করা যদি হজরত ইব্রাহিমের উপরে অত্যাবশ্যক (ওয়াজিব) না হয়ে থাকে, যদি কেবল জবেহ করার উপকরণাদি একত্রিত করা ও ছুরি চালানোই তাঁর কর্তব্য হয়ে থাকে, তাহলে ১০৭ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'ফাদাইনাহু' (আমি তাকে ফিদিয়া দিয়েছি) কথাটির অর্থ কী দাঁড়ায়? ফিদিয়া তো অত্যাবশ্যক দায়িত্বের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

জবাবঃ জবেহ শুরু করা অর্থাৎ ছুরি চালানো পর্যন্তই ছিলো হজরত ইব্রাহিমের অত্যাবশ্যক দায়িত্ব। আর জবেহ শুরু করলে জবেহ হয়ে যাওয়াও অনিবার্য হয়ে থাকে। এজন্য জবেহ শুরু করাই পরোক্ষার্থে জবেহ হয়ে যাওয়া। তাই জবেহ শুরু করার পরেও জবেহ না হওয়াই ফিদিয়া বা পরিবর্তিত নির্দেশ।

দ্রষ্টব্যঃ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত ইসমাইলের গ্রীবাদেশে ছুরি চালানোর ওয়াজিব দায়িত্ব সম্পন্ন হওয়ার পরেও তা স্বাভাবিক পরিণতি লাভ না করার অর্থই আদেশ স্থগিত বা রহিত হওয়া।

'ইন্‌না কাজালিকা নাজ্‌যিল মুহ্‌সিনীন' অর্থ এভাবেই আমি সৎকর্ম-পরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। একথার অর্থ— ইব্রাহিমকে আমি যেভাবে

পুরস্কৃত করেছি, জবেহ এর জন্য শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিয়েছি, জবেহ হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি ইসমাইলকে এবং পিতা-পুত্র উভয়কে দান করেছি পৃথিবীবাসীদের উপরে সমুচ্চ মর্যাদা, সেভাবেই আমি পুরস্কৃত করে থাকি তাঁর অনুকূল মনোভাবের অন্যান্য সৎকর্মপরায়ণগণকে।

'ইন্‌না হাজা লাহুওয়াল বালাউল মুবীন' অর্থ নিশ্চয়ই এটা ছিলো এক স্পষ্ট পরীক্ষা। অর্থাৎ পুত্র জবেহ করার এই আদেশটি ছিলো নিঃসন্দেহে এক বিরাট পরীক্ষা। এর দ্বারা হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসমাইলের আল্লাহ্ প্রেমের গভীরতা ও তীব্রতা যাচাই করাই ছিলো মূল উদ্দেশ্য। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে 'বালাউ' এর অর্থ অনুগ্রহ। অর্থাৎ পুত্রের স্থলে দুম্বা জবেহ করার আদেশ ছিলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক বৃহৎ অনুগ্রহ।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩

❑ আমি তাহাকে মুক্ত করিলাম এক কুরবানীর বিনিময়ে।
❑ আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি।
❑ ইব্‌রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।
❑ এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।
❑ সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম;
❑ আমি তাহাকে সুসংবাদ দিয়াছিলাম ইস্‌হাকের, সে ছিল এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম,

❑ আমি তাহাকে বরকত দান করিয়াছিলাম এবং ইস্‌হাককেও; তাহাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তাকে মুক্ত করলাম এক কোরবানীর বিনিময়ে'। এখানে 'কোরবানী' অর্থ বেহেশত থেকে প্রেরিত এক দুম্বা।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইব্রাহিম যখন আওয়াজ শুনলেন 'হে ইব্রাহিম' তখন তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। দেখতে পেলেন হজরত জিবরাইলকে।

তাঁর হাতে রয়েছে একটি শিঙবিশিষ্ট দুম্বা। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! এই দুম্বাটি হচ্ছে আপনার পুত্র কোরবানীর বিনিময়। এটাকে জবেহ করুন। একথা বলেই হজরত জিবরাইল উচ্চারণ করলেন 'আল্লাহু আকবার'। দুম্বাটিও উচ্চারণ করলো আল্লাহু আকবার। সাথে সাথে 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারণ করলেন মহাপুণ্যবান পিতাপুত্রও। তারপর দুম্বাটিকে মীনার

কোরবানীগৃহে নিয়ে গিয়ে সেটিকে জবেহ করলেন হজরত ইব্রাহিম। উল্লেখ্য, হজরত ইসমাইলের পরিবর্তে জবেহ করার জন্য কোরবানীর দুম্বাটি ছিলো আল্লাহ্‌র প্রতিদান। তাই ওই প্রতিদান বা বিনিময়ের সম্পর্ক আল্লাহ্‌তায়ালা করেছেন নিজের সঙ্গে। বলেছেন— আমি তাকে মুক্ত করলাম এক কোরবানীর বিনিময়ে।

'আ'জীম' অর্থ এখানে হৃষ্টপুষ্ট, সুঠাম দেহবিশিষ্ট। অথবা পুণ্যের দিক থেকে সমুচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। হোসাইন ইবনে ফজল বলেছেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওই কোরবানী প্রেরিত হয়েছিলো বলেই এখানে প্রযুক্ত হয়েছে এমতো বিশেষণ। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এরকম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার অধিকার কোরবানীর পশুটির ছিলো। মুজাহিদ বলেছেন, তাকে 'আ'জীম' (শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট) বলা হয়েছে একারণে যে, তা ছিলো মকবুল (গৃহিত)। বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা মন্তব্য করেছেন, কোরবানীর ওই দুম্বাটি বেহেশতে অতিবাহিত করেছিলো চল্লিশটি বসন্ত। অর্থাৎ বেহেশতের চল্লিশটি বসন্তে চরে চরে সে হয়েছিলো বিশেষভাবে হৃষ্টপুষ্ট। ইবনে আবী শাইবা, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনাতেও এরকম বলা হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, দুম্বাটি ছিলো ওই দুম্বা, যাকে কোরবানী করেছিলেন হজরত আদমের পুত্র হজরত হাবিল।

হানাফীগণ আলোচ্য আয়াতের ভিত্তিতে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কেউ যদি তার আপন পুত্রকে কোরবানী করার মানত করে, তার জন্য ওয়াজিব হবে একটি ছাগল কোরবানী করা। বায়যাবী লিখেছেন, হানাফীগণের এমতো অভিমতের কোনোরূপ প্রমাণ এই আয়াতে নেই। আমি বলি, সুরা হজের 'ওয়ালি ইয়ুওফু নুজুরাহুম' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই মাসআলাটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রকৃত কথা হচ্ছে এরকম মানতের ক্ষেত্রে কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা পুত্র-কোরবানীর মানত পাপ। আর পাপযুক্ত মানত পরিপূরণ ওয়াজিব হয় না। ইমাম আবু ইউসুফও এরকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা অধিকতর সূক্ষ্মদর্শী। তাই তিনি বলেছেন, শরিয়ত অনুসারে যা পালন করা ওয়াজিব হয় না, তা-ও রূপক অর্থে নির্ধারিত হয়ে যায়। সুতরাং কেউ পুত্র কোরবানীর মানত করলে তা অবশ্যই পরিহার্য হয় বটে, কিন্তু একথাও ভাবতে অসুবিধা নেই যে, সে প্রকারান্তরে অন্ততঃ একটি ছাগল কোরবানী করাকে তো নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছে। কারণ এটাই কোরবানীর নিম্নতম পরিমাণ। আর আল্লাহ্‌ই হজরত ইসমাইলের ক্ষেত্রে এরকম পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

পরের আয়াতে (১০৮) বলা হয়েছে— 'আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি'। একথার অর্থ— আমি মহান পিতা-পুত্রের এই অনন্য কোরবানীর ঘটনাটিকে পরবর্তী সময়ের মানুষের স্মৃতিতে জীবন্ত করে রেখেছি। তাইতো তাদের চর্চিত বিষয়াবলীর মধ্যে এই কাহিনীটি সতত জাগ্রত।

এখানে 'তারক্‌না' শব্দটির কর্মপদটি রয়েছে উহ্য। এর কারণ হচ্ছে, হজরত ইব্রাহিম প্রসঙ্গে এই ঘটনাটি আপনাআপনিই স্মৃতিপটে জাগ্রত হয়। 'তার পরবর্তীদের স্মরণে' অর্থ পরবর্তী উম্মতের ধর্মাচরণে, অর্থাৎ ঈদুল আজহার কোরবানীর রীতি অত্যাবশ্যক করে দিয়ে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'ইব্রাহিমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক (১০৯)। এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি'(১১০)। একথার অর্থ— আমার নবী ইব্রাহিমের উপরে বর্ষিত হোক অফুরন্ত শান্তি। এভাবেই আমি আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের জন্য অক্ষয় শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ধারণ করে তাদেরকে করি পুরস্কৃত। উল্লেখ্য, এখানে 'কাজালিকা' এর পূর্বে নিশ্চয়তাপ্রদায়ক শব্দ 'ইন্‌না' ব্যবহৃত হয়নি পুনরাবৃত্তি পরিহারার্থে। কেননা ইতোপূর্বে এব্যাপারে ১০৫ সংখ্যক আয়াতে নিশ্চয়তা ঘোষিত হয়েছে। বলা হয়েছে 'ইননা কাজালিকা নাজ্‌যিল মুহসিনীন'।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১১১) বলা হয়েছে— 'সে ছিলো আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম'। একথার অর্থ— নিঃসন্দেহে যারা আমার বিশ্বাসী দাস, নবী ইব্রাহিম ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

এরপরের আয়াতে (১১২) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে ছিলো এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম'। একথার অর্থ— আমি ইব্রাহিমকে দিয়েছিলাম আর একজন পুণ্যবান সন্তানের শুভসমাচার। তিনিও ছিলেন আমা কর্তৃক নির্বাচিত ও প্রেরিত নবী। পুণ্যবানদের মধ্যে তাঁর মর্যাদাও ছিলো অনন্যসাধারণ। উল্লেখ্য, এখানে প্রথমে 'নবী' এবং পরে 'সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম' বলার মধ্যে ফুটে উঠেছে হজরত ইসহাকের প্রতুল প্রশংসা ও অতুল মাহাত্ম্য। তদুপরি এই ইঙ্গিতটিও প্রকাশ পেয়েছে যে, সৎকর্মপরায়ণ হওয়াই নবী হওয়ার প্রধান ভিত্তি। অর্থাৎ নবীগণের পুণ্যাত্মা হওয়া অনিবার্য।

এরপরের আয়াতে (১১৩) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও; তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী'।

এখানে 'ওয়া বারক্না আ'লাইহি' অর্থ আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম। অর্থাৎ আমি ইব্রাহিমের উপরে অবতীর্ণ করেছিলাম অপরিমেয় কল্যাণ— ইহলৌকিক ও পারলৌকিক। তাঁর বংশবৃক্ষকে করেছি সুবিস্তৃত।

'ওয়া আ'লা ইসহাক্বা' অর্থ এবং ইসহাককেও। অর্থাৎ ইসহাকের বংশকেও আমি পৃথকভাবে করেছি কল্যাণময়। নবী ইয়াকুব থেকে নবী ঈসা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রেরিত প্রায় এক হাজার নবী ওই বিশেষ কল্যাণপ্রবাহেরই প্রমাণ।

'ওয়ামিন জুররিইয়াতিহিমা মুহসিনুন' অর্থ তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপারয়ণ আর 'ওয়া জলিমুল্ লিনাফসিহী মুবীন' অর্থ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী। অর্থাৎ তাঁদের বিশাল উত্তরপুরুষদের মধ্যে সকলে এরকম অবস্থায় থাকেনি। কেউ কেউ হয়েছে পুণ্যাভিসারী। আবার কেউ কেউ হয়েছে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট। এখানে এরকম বলে এ বিষয়টিকেও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, উত্তরপুরুষদের পথভ্রষ্টতা তাদের পুণ্যবান পূর্বপুরুষের উপরে প্রভাববিস্তারক হয় না।

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২

❑ আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি,
❑ এবং তাহাদিগকে এবং তাহাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম মহাসংকট হইতে।
❑ আমি সাহায্য করিয়াছিলাম তাহাদিগকে, ফলে তাহারাই হইয়াছিল বিজয়ী।
❑ আমি উভয়কে দিয়াছিলাম বিশদ কিতাব।
❑ এবং তাহাদিগকে আমি পরিচালিত করিয়াছিলাম সরল পথে।
❑ আমি তাহাদের উভয়কে পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি।
❑ মূসা ও হারূনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হইক।
❑এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।
❑ তাহারা উভয়েই ছিলো আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতসম্ভারের মর্মার্থ হচ্ছে— আর আমি আমার নবী মুসা ও হারুনকে বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেছিলাম। তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের উপর মিসরের কুখ্যাত সম্রাট দীর্ঘদিন ধরে অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিলো। ওই অত্যাচারী ফেরাউন এবং তার অত্যাচারী অনুসারীদেরকে তাই আমি ফেলেছিলাম

www.eelm.weebly.com

মহা সংকটে। তাদেরকে দিয়েছিলাম সলিল সমাধি। আর ওই মহাবিপদ থেকে আমি উদ্ধার করেছিলাম মুসা-হারুন নবীভ্রাতৃদ্বয় ও তার অনুসারীদেরকে। আমি তাদেরকে এভাবে সাহায্য করেছিলাম বলেই তো তারা হতে পেরেছিলো বিজয়ী। এরপর আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ আকাশজ গ্রন্থ— তওরাত। যাতে ছিলো আমা কর্তৃক প্রবর্তিত বিধানাবলীর বিশদ বিবরণ। এভাবে আমি ওই নবী ভ্রাতৃদ্বয়কে পরিচালিত করেছিলাম শুভ ও সরল পথে। তাদের স্মৃতিও আমি জাগ্রত রেখেছি পরবর্তী যুগের মানুষের স্মৃতিপটে। তাদের উপরেও বর্ষিত হোক শান্তি, অনাবিল ও অফুরন্ত স্বস্তিসম্ভার। তাদেরকে যে ভাবে আমি পুরস্কৃত করেছি, সেভাবেই আমি যুগে যুগে পুরস্কৃত করে থাকি তাদের মতো পুণ্যপ্রেমিকদেরকে। হে আমার রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা! শুনে রাখুন, আপনার ওই দু'জন পূর্বসূরীও ছিলো আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্যতম।

সূরা সাফ্ফাতঃ আয়াত ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২

❑ ইল্য়াসও ছিলো রাসূলদের একজন।
❑ স্মরণ কর, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না?
❑ তোমরা কি বাআলকে ডাকিবে এবং পরিত্যাগ করিবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা—
❑ 'আল্লাহ্কে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের— প্রতিপালক তোমাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষদের।'
❑ কিন্তু উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলো, কাজেই উহাদিগকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হইবে।
❑ তবে আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।
❑ আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি।
❑ ইল্য়াসিনের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

❑ এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।
❑ সে ছিলো আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইলিয়াসও ছিলো রসুলদের একজন'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! এবার শুনুন ইলিয়াসের বৃত্তান্ত। তিনিও ছিলেন আমা কর্তৃক প্রেরিত পুরষগণের একজন।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, হজরত ইলিয়াস ও হজরত ইদ্রিস নাম দু'টো একই রসুলের। তাঁর নিকট সংরক্ষিত কোরআনের অনুলিপিতে লেখা ছিলো 'ওয়া ইন্না ইদ্রিসা লামিনাল মুরসালীন'। অর্থাৎ 'ইলিয়াস' এর স্থলে ছিলো 'ইদ্রিস'। ইকরামার অভিমতও এরকম। কিন্তু অন্যান্য বিদ্বজ্জনের অভিমত হচ্ছে, হজরত ইলিয়াস ছিলেন বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের একজন রসুল। তিনি 'ইদ্রিস' নন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ইলিয়াস ছিলেন হজরত ইয়াসা এর চাচাতো ভাই। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক তাঁর বংশানুক্রমকে উপস্থাপন করেছেন এভাবে ঃ ইলিয়াস ইবনে বশরি ইবনে কাইহাস ইবনে ইরায ইবনে হারুন ইবনে ইমরান।

বর্ণনাকারী সাহাবীগণের উদ্ধৃতি দিয়ে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হজরত ইলিয়াসের পূর্ববর্তী নবীর মহাপ্রয়াণের পর বনী ইসরাইলদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো বিভিন্ন রকমের নতুন নতুন ধর্মবিরোধী কর্মকাণ্ড। মূর্তিপূজার মতো ঘৃণ্যকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো অনেকেই। এভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পর তাদের পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরিত হন হজরত ইলিয়াস। তিনি ছিলেন হজরত মুসার পরবর্তী যুগের একজন নবী। উল্লেখ্য, হজরত মুসার পরবর্তী নবীগণের মূল দায়িত্ব ছিলো তওরাতের অনুশাসনগুলোকেই নতুন করে প্রাণবন্ত করে তোলা। নতুন কোনো বিধান প্রবর্তন করা নয়। তখন বনী ইসরাইলেরা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলো সিরিয়ায়। তারা সিরিয়া অধিকার করতে পেরেছিলো তাদের পূর্বসূরী নবী হজরত ইউশা

www.eelm.weebly.com

ইবনে নুনের নেতৃত্বে। তারা ছিলো বেশ কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত। তার মধ্যে একটি গোত্রের বসবাস নির্ধারিত হয়েছিল বাআ'লাবাক ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। হজরত ইলিয়াস ছিলেন ওই
গোত্রভূত। আর আপন গোত্রের পথপ্রদর্শনের নিমিত্তেই প্রেরণ করা হয়েছিলো তাঁকে। ওই সময় বাআ'লাবাকের বাদশাহ ছিলো উজুব। সে তার গোত্রের লোকদেরকে মূর্তিপূজা করতে বাধ্য করেছিলো। সে নিজেও ছিলো ঘোর পৌত্তলিক। সে পূজা করতো বাআল নামক এক মূর্তির। ওই মূর্তির মুখ ছিলো চারটি। হজরত ইলিয়াস আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে আহ্বান জানালেন। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করলো না। বাদশাহর কাছেও বিষয়টি ছিলো গুরুত্বহীন। আর তার স্ত্রী আজবিল ছিলো চরম নবীবিদ্বেষিণী। বাদশাহর উপরে ছিলো তার একচ্ছত্র প্রভাব। বাদশাহ কোনো যুদ্ধে গেলে পুরুষের বেশে রাজ্যশাসন করতো সে-ই। বলা হয়ে থাকে,

নবী ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে জাকারিয়াকে শহীদ করিয়েছিলো এই আজবিলই। তার ছিলো এক বিচক্ষণ মুখপাত্র। তিনি ছিলেন ইমানদার। কিন্তু তিনি বাইরে কখনো তা প্রকাশ করতেন না। তিনিই কৌশলে বিভিন্ন কথা বলে প্রায় তিন শত নবীকে আজবিলের জিঘাংসার আগুন থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আবার শত চেষ্টা করেও কাউকে কাউকে রক্ষা করতে সমর্থ হননি। বহুপুরুষের সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধা হয়েছিলো সে। সাত জন নবীও ছিলেন তাদের মধ্যে। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, তার ছেলে-মেয়ে ছিলো সত্তরটি।

বাদশাহ উজুবের নিকট প্রতিবেশী ছিলেন মাযদাকী। তিনি ছিলেন এক আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসী। তিনি মূর্তিপূজারী বাদশাহর সংশোধন কীভাবে হয়, তাই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। রাজপ্রাসাদের সন্নিকটেই ছিলো তার একটি মনোমুগ্ধকর বাগান। বাদশাহ উজুব ও বেগম আজবিল দু'জনেই বাগানটি পছন্দ করতো। তারা ফুরসত পেলেই ওই বাগানে এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো। স্নান-পানাহার করতো। উজুব মাযদাকীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করতো। কিন্তু আজবিল করতো হিংসা। কিন্তু তা বাইরে প্রকাশ করতো না। মাঝে মাঝে কেবল উজুবকে বলতো, বাগানটা হুকুমদখল করে নিলে হয় না। উজুব তার একথায় পাত্তা দিতো না বলে মনে মনে বিভিন্ন ফন্দি ফিকির আঁটতো সে। একবার উজুবকে বেরিয়ে যেতে হলো এক যুদ্ধযাত্রায়। আজবিল ভাবলো এই তো সুযোগ। সে দু'জন মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা ঠিক করলো। তাদেরকে বললো, তোমরা সাক্ষ্য দিয়ো, মাযদাকী বাদশাহকে গালি দিয়েছে। আর সে কথা তোমরা স্বকর্ণে শুনেছো। তখন ওই রাজ্যের বিধান ছিলো, বাদশাহকে যদি কেউ গালি দেয়, তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যাহোক, সাক্ষ্যদাতাদেরকে প্রস্তুত করে সে ডেকে পাঠালো মাযদাকীকে। বললো, আমি শুনতে পেলাম, তুমি বাদশাহকে গালি দিয়েছো। মাযদাকী অভিযোগ অস্বীকার করলেন। তখন উপস্থিত করানো হলো মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাদ্বয়কে। তারা মাযদাকীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলো। এভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করে আজবিল
হত্যা করলো মাযদাকীকে এবং দখল করে নিলো তার সুদৃশ্য বাগান। উজুব যুদ্ধযাত্রা থেকে ফিরে এসে এ ঘটনা শুনে মর্মাহত হলো। উজুব বললো, কাজটা তুমি ভালো করোনি। মনে হচ্ছে এর পরিণাম হবে অত্যন্ত অশুভ। সে ছিলো সৎ ও ভদ্রপ্রতিবেশী। ছিলো আমার প্রিয়ভাজন। আজবিল বললো, তোমার বিধান অনুযায়ীই তো আমি তার বিচার করেছি। সে তোমাকে গালি দিয়েছিলো বলেই তো আমি গোস্বা সম্বরণ করতে পারিনি। উজুব তবুও আশ্বস্ত হলো না। কিছুকাল পরেই আবির্ভূত হলেন নবী ইলিয়াস। তিনি বাদশাহ উজুব ও তার রাজ্যের জনতার কাছে ঘোষণা করলেন, মাযদাকী ছিলেন আল্লাহ্‌র ওলী। তাঁকে হত্যা করায় আল্লাহ্‌ অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়েছেন। তিনি জানাচ্ছেন, কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা না করলে এবং মাযদাকীর উত্তরাধিকারকে তার বাগান প্রত্যর্পণ না করলে নেমে আসবে ভয়ংকর আযাব। ওই বাগানেই পড়ে থাকবে বাদশাহ-বেগমের ছিন্ন ভিন্ন লাশ। আল্লাহ্‌তায়ালা একথা জানিয়েছেন শপথ করে।

এরকম ঘোষণা শুনে উজুব রেগে গেলো। নবী ইলিয়াসের কথা তার বিশ্বাস হলো না। তাকে ডেকে এনে বললো, মনে হচ্ছে তোমার বক্তব্য অযথার্থ। পৃথিবীতে আরো অনেক বাদশাহ তো রয়েছে। যারা দেদারছে করে চলেছে মূর্তিপূজা। করে চলেছে অনেক অন্যায়। তবুও তাদের উপরে শাস্তি অবতীর্ণ হয়নি। আমি তো তাদের মতো অতো বেশী পাপ করিনি। তাহলে আমার উপরে আযাব আসবে কেনো? শেষ পর্যন্ত উজুব সিদ্ধান্ত নিলো, ইলিয়াসকে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে হত্যা করতে হবে। হজরত ইলিয়াস উজুবের এমতো নির্দয় মনোভাবের কথা বুঝতে পেরে আত্মগোপন করলেন। আশ্রয় নিলেন এক দুর্গম পর্বতের নির্জন গুহায়। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, তিনি ওই নিভৃত গুহায় অতিবাহিত করেছিলেন সাতটি বছর। খাদ্য ছিলো তাঁর তৃণ ও অরণ্যের ফল। উজুব অনেক গুপ্তচর-সিপাই-শান্ত্রী লাগিয়েও তাঁর সন্ধান বের করতে পারেনি।

সাত বছর পর বাদশাহ উজুবের সবচেয়ে প্রিয় এক পুত্র হয়ে পড়লো পীড়িত। সে শরণাপন্ন হলো তার পরম পূজনীয় প্রতিমা বাআলের। বাআল প্রতিমাটির সেবা যত্নের জন্য উজুব নিয়োজিত করেছিলো চারশত কর্মচারী। বাআল মূর্তিটির পেটে শয়তান ঢুকে কথা বলতো। আর ওই চারশত পাণ্ডা তা কান লাগিয়ে শুনতো। কিন্তু এবার ঘটলো বিপত্তি। তারা শত চেষ্টা করেও মূর্তির অভ্যন্তর থেকে কোনো আওয়াজ শুনতে পেলো না। শেষে এক পাণ্ডা বললো, সম্রাটপ্রবর! মনে হয় বাআল আপনার প্রতি

অতুষ্ট। উজুব বললো, কেনো, আমি তো তার একনিষ্ঠ উপাসক। পাণ্ডা বললো, যে ইলিয়াস বাআল কে অস্বীকারকারী, সে ইলিয়াসকে তো আপনি এখন পর্যন্ত বধ করতে পারেননি। উজুব বললো, তাকে হত্যা তো করতামই। কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেলো না যে। চেষ্টা এখনো চলছে। কিন্তু এখন
আমার পুত্র রোগভোগে জর্জরিত। এখন তাঁর নিরাময় কামনা ছাড়া অন্য কোনো দিকে আমি মনোযোগই বা দেই কী করে? আগে আমার সন্তান সুস্থ হোক। তারপর তো বাআ'লকে আমি পরিতুষ্ট করবোই। এক পাণ্ডা প্রস্তাব দিলো, সিরিয়ায় রয়েছে বেশকিছু জাগ্রত দেবীমূর্তি। তাদের কাছে এব্যাপারে সুপারিশের আবেদন করা যেতে পারে। প্রস্তাবটি উজুবের মনোপুত হলো। সে তার চারশ পাণ্ডাকেই পাঠিয়ে দিলো সিরিয়ায়। ইত্যবসরে হজরত ইলিয়াস প্রত্যাদেশ পেলেন, এবার তুমি আত্মপ্রকাশ করো। জনসমক্ষে হাজির হও। ভয় নেই। আমি স্বয়ং তোমার রক্ষক। এবার তাদের উপরে আমি প্রতিষ্ঠিত করবো তোমার প্রতাপ ও প্রভাব।

নির্দেশ পেয়ে লোকালয়ে নেমে এলেন হজরত ইলিয়াস। দেখলেন একদল লোক কোথাও যাচ্ছে। তিনি তাদেরকে বললেন, থামো। তারা থামলো। তিনি বললেন, তোমরা যারা এখন আমার সম্মুখে উপস্থিত এবং যারা উপস্থিত নয়, তাদের সকলের প্রতি আমার একই নির্দেশ। তা হচ্ছে— তোমরা তোমাদের বাদশাহর কাছে যাও। তাকে বলো, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তিনিই বনী ইসরাইলসহ সকল মানুষের স্রষ্টা। তিনিই সকলের রিজিকদাতা এবং

জীবন-মৃত্যু প্রদাতা। তাকে একথাও জানিয়ে দিয়ো— হে উজুব! তোমার সন্তানের আরোগ্য ভিক্ষা করো কেবল আল্লাহ্র কাছে। তিনিই একমাত্র আরোগ্যদাতা। সুতরাং তুমি অংশীবাদী হয়ো না। প্রার্থনা কোরো না গায়রুল্লাহ্র কাছে। যদি তুমি এরকম না করো, তবে তোমার পুত্রের রোগভোগ হবে আরো অধিক অসহনীয় ও প্রলম্বিত। এভাবে মৃত্যুই হবে তার অশুভ পরিণাম। এভাবেই একথা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, আল্লাহ্ই একমাত্র আরোগ্যদাতা এবং জীবন-মৃত্যুপ্রদাতা।

হজরত ইলিয়াসের একথা পাণ্ডাদের কানেও পৌঁছলো। তারা উজুবের কাছে গিয়ে বললো, আমরা ইলিয়াসের দেখা পেয়েছি। সে আমাদেরকে তেজস্বীভাষায় সংযত হবার নির্দেশ দিলো। আর আপনাকে জানালো এই এই নসিহত। আমরা সংখ্যায় ছিলাম অনেক। তবুও তার কথার উপরে আমরা কোনো কথাই বলতে পারলাম না। ভয়ে আতংকে কেমন যেনো চুপসে গেলাম সকলে। অথচ সে এক শীর্ণকায় দীর্ঘদেহী মানুষ। তার মাথার চুল ঝরে পড়েছে। গায়ের চামড়াও কেমন অমসৃণ। পরনে কেবল একটি পশমী কোর্তা এবং জীর্ণ পাজামা। কাঁটা দিয়ে সেলাই করা ছিলো তার কোর্তার সম্মুখভাগ। তাদের কথা শুনে উজুবও আতংকিত হয়ে পড়লো। তাঁর উপরে শক্তিপ্রয়োগের কথা ভাবতেও পারলো না। পাণ্ডাদেরকে বললো, বুঝলাম। শক্তিপ্রয়োগ আর চলবে না। এবার খাটাতে হবে কৌশল। তোমরা এবার গিয়ে তাকে লোভ দেখাও। বলো, আমরা আপনার উপর ইমান এনেছি। আমাদের জনপদবাসীরাও আপনাকে দেখে আপনার উপরে ইমান
আনতে চায়। সুতরাং চলুন আমাদের সঙ্গে। দেখবে, একথা বললে সহজেই তিনি তোমাদের প্রতারণার ফাঁদে পা দিবেন। আর সেই সুযোগে তোমরা তাকে এনে হাজির করতে পারবে আমার সামনে।

উজুবের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে সোৎসাহে বেরিয়ে পড়লো পাণ্ডারা। গিয়ে উপস্থিত হলো ওই পাহাড়ের গুহায়, যেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন হজরত ইলিয়াস। তারা ডাকতে লাগলো, হে আমাদের নবী। দয়া করে বের হয়ে আসুন। আমরা আপনার প্রতি ইমান এনেছি। আপনি সত্যি সত্যিই আল্লাহ্র পয়গম্বর। আমাদের বাদশাহ এবং রাজ্যের সকলেই আপনার উপরে ইমান এনেছে। তারা আপনাকে সালাম বলেছে। এখন সকলেই আপনার সঙ্গ লাভের জন্য উন্মুখ। সুতরাং আপনি নির্জনবাস পরিত্যাগ করুন। বসবাস শুরু করুন আপনার অনুগত জনতার সঙ্গে। এখন আমাদের জীবন যাপিত হবে আপনার সদয় আদেশানুসারে।

হজরত ইলিয়াস তাদের কথা বিশ্বাস করলেন। ভাবলেন, এখন তাদের কথা না শুনলে হয়তো আল্লাহ্ অতুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু পরক্ষণেই খেয়াল হলো, আল্লাহ্র বিনা অনুমতিতে তিনি স্থান ত্যাগই বা করবেন কেমন করে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এখনো তো এ বিষয়ে কোনো নির্দেশ এলো না। তিনি তাই প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! ওদের কথা যদি সত্য হয়, তবে তুমি

আমাকে স্থানত্যাগের অনুমতি দান করো। আর যদি তারা অসত্যভাষী হয়, তবে তাদের উপর আপতিত করো অগ্নিবৃষ্টি। তাঁর এমতো প্রার্থনা শেষ হতে না হতেই বাইরে শুরু হলো অগ্নিবৃষ্টি এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলো সকলে।

উজুব ও তার সঙ্গী-সাথীরা যথাসময়ে এ সংবাদ পেলো। কিন্তু তবু তারা তাদের কুমতলব পরিত্যাগ করলো না। পুনরায় প্রতারণার মাধ্যমে কার্যোদ্ধার করতে চাইলো। এবার সে প্রস্তুত করলো আরো বেশী ধূর্ত ও ফন্দিবাজের একটি দল। তারা গিয়ে উপস্থিত হলো হজরত ইলিয়াসের বসতগুহার কাছাকাছি। বলতে শুরু করলো, হে আল্লাহ্র নবী! আমরা আল্লাহ্র ক্রোধ ও

www.eelm.weebly.com

কর্তৃত্ব থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইতোপূর্বে যারা আপনার কাছে এসেছিলো, আমরা তাদের মতো নই। তারা ছিলো ভণ্ড, প্রতারক। আমাদেরকে কোনো কিছু না জানিয়েই তারা আপনার কাছে এসেছিলো। আমরা যদি তাদের অসৎ উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারতাম, তবে তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতাম। আপনার কাছে তাদেরকে ঘেঁষতেই দিতাম না। ভালোই হয়েছে, আল্লাহ্ নিজেই আপনার ও আমাদের পক্ষ থেকে তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। হজরত ইলিয়াস এবারও দোয়া প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপরেও শুরু হলো অগ্নিবৃষ্টি।

এদিকে উজুবের পুত্রের অসুখ দিন দিন বেড়েই চললো। দুই দুইবার কৌশল ব্যর্থ হওয়াতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো আরো বেশী। একবার তার মনে হলো, এবার নিজেই গিয়ে তাকে শেষ করে দিয়ে আসবে। কিন্তু পুত্রের পীড়া-যন্ত্রণা তার উদ্যমকে বার বার প্রতিহত করতে লাগলো। শেষে সে ঠিক করলো, এবার পাঠাতে হবে রাণীর ওই মুখপাত্রটিকে, যে প্রকৃতই সাধু ও সজ্জন, সম্ভবত ইলিয়াসের উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারীও। হয়তো একে পাঠালে তার সঙ্গে ইলিয়াসও পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে নেমে আসবে। লোকটি বিচক্ষণ, দক্ষ ও বিশ্বস্ত। নয়তো এরকম সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে উজুব অনেক আগেই পরিত্যাগ করতো। উজুবের মনে হলো, তকে পরিত্যাগ না করে একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। এবার তার দ্বারাই উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া নিশ্চিত। উজুব তাঁকে ডেকে এনে বললো, তুমি ইলিয়াসকে জানাও, তার সঙ্গে কোনো খারাপ আচরণ করার ইচ্ছা আমার নেই। একথা বলে তাঁর সঙ্গে দিলো কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরীকে। তাদেরকে একান্তে ডেকে বুঝিয়ে দিলো, রাণীর মুখপাত্রের কথা শুনে যদি ইলিয়াস চলে আসে, তো ভালোই। যদি না আসতে চায়, তবে তোমরা তাকে জোরপূর্বক ধরে এনো। আর মুখপাত্রকে বললো, দুই দুইবার আমার লোকজন ভস্মীভূত হলো। এদিকে আমার প্রিয় পুত্রের অবস্থা করুণ। এমতাবস্থায় ক্ষমাপ্রার্থনা করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নাই। আমি বুঝতে পারলাম ইলিয়াস নবীর অসন্তোষ ও অপপ্রার্থনার ফলেই আমি আজ বিপদকবলিত। এখন আমরা তাঁর আনীত

ধর্মাদর্শই গ্রহণ করতে চাই। পরিত্যাগ করতে চাই পৌত্তলিকতাকে। কিন্তু তিনি যদি আমাদের মাঝে না আসেন, তাহলে আমরা কী করে পাবো সৎপথ ও শুভনির্দেশনা।

মুখপাত্র ও তার সঙ্গের সান্ত্রীরা গিয়ে উপস্থিত হলো পবর্ত-গহ্বরবাসী হজরত ইলিয়াসের কাছে। মুখপাত্র তাঁর নাম ধরে সম্বোধন করলেন। তিনি কণ্ঠের আওয়াজ শুনেই তাঁকে চিনতে পারলেন। প্রত্যাদেশ হলো, হে ইলিয়াস! এবার বাইরে এসো। তোমার সত্যবাদী ভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাত করো। তোমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ককে করো পুনরুজ্জীবিত। হজরত ইলিয়াস বাইরে এলেন। সালাম বিনিময় ও করমর্দন করলেন তাঁর সঙ্গে। মুখপাত্র বললেন, আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে এই অবাধ্য ও অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মহাদুরাচার রাজা। এখন যদি আপনি আমার সঙ্গে যেতে সম্মত না হন, তবে সে আমাকে হত্যা করবে। এখন আপনার যেমন ইচ্ছা, তেমনই আদেশ করুন আমাকে। যদি রাজদরবার পরিত্যাগ করে আপনার সঙ্গে থেকে যেতে বলেন, তবে আমি তাই করবো। আর যদি আমার মাধ্যমে ওই দুরাচারকে কোনো সংবাদ দিতে চান, তবে তাও আমি পৌঁছে দিতে প্রস্তুত। আবার যদি চান, আমি আপনার পক্ষাবলম্বী হয়ে রাজদ্রোহী হই,
তবে তা-ও পালন করবো আমি প্রফুল্লচিত্তে। অথবা যদি ইচ্ছা হয়, তবে আপনার মহান প্রভুপালকের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হোন, যেনো তিনিই এই জটিল সমস্যা থেকে আমাদের পরিত্রাণের পথকে করে দেন সুগম।

আল্লাহ্ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁর প্রিয় নবীকে জানালেন, বাদশাহর সকল পরিকল্পনা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। সে তোমাকে কব্‌জা করতে চায়। কিন্তু এখনকার এই প্রতিনিধিদলটিকে ফিরিয়ে দিয়ো না। যদি ফিরিয়ে দাও, তবে বাদশাহ তাদেরকে দায়িত্বে অবহেলা করার দায়ে অবিশ্বাস করবে ও হত্যা করে ফেলবে। সুতরাং এবার তুমি রাজদরবারে যাও। বাদশাহ তোমার এবং ওই মুমিনের (মুখপাত্রের) কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি তার পুত্রের রোগ আরো বাড়িয়ে দিবো। শেষে মৃত্যুকেও বিজয়ী করে দিবো তার উপর। ফলে সে এমনভাবে শোকগ্রস্ত হবে যে, অন্য কোনোকিছু আর তার মনেই থাকবে না। সুতরাং বাদশাহপুত্রের মৃত্যুর পর তুমি নির্বিঘ্নে স্বআবাসে আবার ফিরে আসতে পারবে।

হজরত ইলিয়াস নির্ভয়ে নেমে এলেন লোকালয়ে। নিশঙ্কচিত্তে সাক্ষাত করলেন বাদশাহর সঙ্গে। কিন্তু বাদশাহর মনের অবস্থা তখন শোচনীয়। পুত্র মৃত্যুপথযাত্রী। সে পুত্র ছাড়া অন্যদিকে ভালো করে মনোযোগই দিতে পারলো না। কিছুকালের মধ্যেই তার পুত্রবিয়োগ ঘটলো। ফলে আরো বেশী শোকাকুল হয়ে গেলো সে এবং তার অনুচরেরা। মৃতের সৎকার ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলো সকলে। হজরত ইলিয়াস নির্বিঘ্নে ফিরে গেলেন তাঁর আপন ডেরায়।

ক্রমে শোক প্রশমিত হলো। সম্বিত ফিরে এলো তাদের। বাদশাহরও মনে পড়লো, নবী ইলিয়াস তো এসেছিলেন। অথচ তার ব্যাপারে কিছুই করা হলো না। মুখপাত্রকে ডেকে সে এবারে জিজ্ঞাসাবাদ করলো। মুখপাত্র বললেন, রাজপুত্রের বিরহে

www.eelm.weebly.com

আমরা তো সকলেই তখন ছিলাম শোকমগ্ন। জানি না, সবার অলক্ষ্যে কখন যেনো স্থান ত্যাগ করেছেন তিনি। আর একথাও আমার জানা নেই যে, আপনি এখন তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেন কিনা।

দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলো। হজরত ইলিয়াস ভাবলেন, এখন থেকে তার লোকালয়ে বসবাস করাই উত্তম। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমতিও মিললো এ ব্যাপারে। তিনি লোকালয়ে নেমে এলেন। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলেন এক বনী ইসরাইলি রমণীর বাড়ীতে। পরবর্তীতে ওই রমণীই হয়েছিলেন মৎসোদরবাসী নবী ইউনুসের মাতা। নবী ইউনুস তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু। প্রায় ছয় মাস ওই বাড়ীতে অতিবাহিত করলেন হজরত ইলিয়াস। ইউনুসজননীর সেবাযত্নে কোনো ত্রুটি ছিলো না। কিন্তু সুদীর্ঘ দিবস ধরে পর্বতের নিভৃত গুহায় বসবাসে অভ্যস্ত হজরত ইলিয়াস লোকালয়ে বসবাস করতে স্বস্তি বোধ করছিলেন না। তাই কাউকে কিছু না জানিয়েই একদিন ফিরে গেলেন তাঁর পাহাড়ী আবাসে।

তিনি চলে যাওয়ায় ইউনুসজননী হয়ে পড়লেন চিন্তিত ও ভীত। কিছুদিনের মধ্যেই দুধ ছাড়ালেন শিশু ইউনুসকে। এর কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হলো শিশুপুত্র। তিনি হয়ে গেলেন উন্মাদিনী প্রায়। হজরত ইলিয়াসকে খুঁজতে বেরুলেন তিনি। অনেক বন-বাদাড়-পাহাড় খুঁজে খুঁজে দেখা পেলেন হজরত ইলিয়াসের । বললেন, আপনি চলে আসার পর থেকেই আমি বিপদাপন্না। আমার শিশুপুত্রটি আর নেই। আমার এই একটিই সন্তান। তার শোক যে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। তাকে আমি দাফন করিনি। তার মৃত্যুসংবাদও কাউকে জানাইনি। এখন আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেনো তাকে পুনর্জীবন দান করেন। হজরত ইলিয়াস বললেন, আমি তো আল্লাহ্‌র আদেশের একান্ত বাধ্যগত দাস। কারো পুনর্জীবনপ্রার্থনার অনুমতি তো আমি পাইনি। ইউনুস জননী আর কিছু বলতে পারলেন না। নীরবে রোদন করতে লাগলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত ইলিয়াসের অন্তরে সৃষ্টি করলেন ইউনুসজননীর জন্য অনাবিল মমতা। তিনি তাই জিজ্ঞেস না করে পারলেন না, তোমার পুত্রবিয়োগ ঘটেছে কবে? ইউনুসজননী বললেন, সাত দিন আগে। হজরত ইলিয়াস বললেন, চলো বাড়ীর দিকে যাই। দু'জনে পথ চলতে শুরু করলেন। সাতদিন একটানা পথ চলার পর তারা উপস্থিত হলেন ওই বাড়ীতে। হজরত ইলিয়াস ওজু করলেন। পূর্ণ মনোযোগ ও মহব্বতের সঙ্গে নামাজ পাঠ করলেন। তারপর রত হলেন প্রার্থনায়। প্রার্থনা গৃহীত হলো। আল্লাহ্ জীবিত করে দিলেন ইউনুস ইবনে মাতাকে। এরপর সেখানে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলেন না হজরত ইলিয়াস। চলে গেলেন তাঁর সেই পাহাড়ী ডেরায়।

সময় গড়িয়ে চললো। হজরত ইলিয়াস তাঁর পাহাড়ী আবাসে বসে ইবাদত বন্দেগীতে সময় কাটান এবং নিরবচ্ছিন্নরূপে প্রার্থনা করতে থাকেন তাঁর পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের পথ প্রাপ্তির জন্য। কিন্তু তাদের বোধোদয় ঘটে না। রয়ে যায় পূর্ববৎ ভ্রষ্ট ও নষ্ট। হজরত ইলিয়াসের হৃদয় ভরে যায় ব্যাথায়-বেদনায়। এভাবে সাত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন প্রত্যাদেশ হলো— হে ইলিয়াস! তুমি এতো বিষণ্ন হও কেনো? তুমি তো আমা কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি, সুস্পষ্ট প্রত্যাদেশবাহী প্রেরিত পুরুষ। সুতরাং তোমার যা প্রয়োজন তা আমার কাছে চাও। আমি দান করবো। আমি তো অসীম দয়ালু, সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। হজরত ইলিয়াস বললেন, হে আমার পরম প্রেমময় প্রভুপালয়িতা! তুমি আমাকে মৃত্যু দাও। মিলিয়ে দাও আমাকে আমার সম্মানিত পূর্বপুরুষগণের সঙ্গে। বনী ইসরাইলদের পথভ্রষ্টতা দেখে আমার হৃদয় বেদনা-জর্জরিত। আমিও হয়েছি তাদের চক্ষুশূল। অন্তর্দহনের আগুনে জ্বলছি নিরন্তর। আল্লাহ্ বললেন, সে সময় এখনো আসেনি, যখন তোমার মতো মানুষ থেকে আমি পৃথিবীকে শূন্য করবো। মনে রেখো, তোমার মতো নির্বাচিত জন যারা, তাদের বরকতেই আমি রক্ষা করে চলেছি পৃথিবীর অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব। তাই তোমরা সংখ্যায় কম, কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং মৃত্যু নয়, অন্য কিছু চাও। আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করবো। হজরত ইলিয়াস বললেন, তাহলে পথভ্রষ্টদের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা আমাকে দাও। আল্লাহ্ বললেন, কী রকম? হজরত ইলিয়াস বললেন, আমি চাই সাত বছরের বৃষ্টিপাতের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, যেনো আমার অনুমতি ব্যতিরেকে আকাশে মেঘ না জমে। নামেনা এক ফোঁটা বৃষ্টিও। আমি ধারণা করি, এরকম ক্ষমতা আমার হাতে থাকলে, তারা আমার নির্দেশানুগত না হয়ে পারবে না। আল্লাহ্ জানালেন, ওহে ইলিয়াস! আমি যে আমার সৃষ্টির প্রতি অপরিসীম দয়াপরবশ, তারা পাপে ও অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও। হজরত ইলিয়াস বললেন, তাহলে বৃষ্টির নিয়ন্ত্রণাধিকার দাও ছয় বৎসরের। আল্লাহ্ বললেন, তা হয় না। হজরত ইলিয়াস বললেন, তা হলে পাঁচ বৎসরের জন্য। আল্লাহ্ বললেন, এই সময়ও আমার করুণানুকূল নয়। তবে অবাধ্যদের প্রতি প্রতিশোধ প্রয়োগার্থে তোমার নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হলো তিন বৎসরের বৃষ্টির নিয়ন্ত্রণাধিকার। তুমি ইচ্ছা করলে এবার তিন বৎসর যাবত বৃষ্টিপাত বন্ধ রাখতে পারো। তিনি বললেন, তাহলে আমি জীবিত থাকবো কীভাবে? আল্লাহ্ জানালেন, একদল পাখিকে আমি তোমার সেবায় নিয়োজিত রাখবো। তারা সুদূরের কোনো সুজলা সুফলা জনপদ থেকে তোমার জন্য বহন করে আনবে ফল-ফসল ও পানীয়। এরপর থেকে বন্ধ হলো বৃষ্টিপাত। মাঠঘাট ফেটে চৌচির হলো। খরায় পুড়ে গেলো তৃণ ও উদ্ভিদ। পানীয় জল ও খাদ্যের অভাবে মরে গেলো গৃহপালিত ও বন্য জীবজন্তুরা। মানুষের জীবনযাপন হয়ে পড়লো দুর্বিষহ। হজরত ইলিয়াস পূর্ববৎ নিজেকে গোপন করে রাখলেন। তাঁর পানাহারের সরবরাহ ছিলো সুনিশ্চিত। কখনো কখনো তিনি নেমে আসতেন সমতলভূমির কোনো একান্ত ভক্তের বাড়িতে।

www.eelm.weebly.com

লোকেরা যখন টের পেতো সেই বাড়ি থেকে রুটির গন্ধ ভেসে আসছে, তখন বুঝতো, নিশ্চয় সেখানে হজরত ইলিয়াসের আগমন ঘটেছে। তখন সেই বাড়িতে হামলা করতো তারা, কিন্তু তাঁকে না পেয়ে দুর্ব্যবহার করতো ওই বাড়িওয়ালার সঙ্গে।

হজরত ইলিয়াস তাঁর মুষ্টিমেয় অনুচরদের মাধ্যমে একথা প্রচার করে দিয়েছিলেন যে, তিন বৎসর ধরে বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকবে। এর মধ্যে শত চেষ্টা করলেও কেউ দুর্ভিক্ষের কবল থেকে মুক্ত থাকতে পারবে না। একদিন তিনি এক বৃদ্ধার বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি কোনো খাদ্যদ্রব্য আছে? বৃদ্ধা বললো, হ্যাঁ। আমার কাছে রয়েছে সামান্য কিছু আটা এবং যৎসামান্য জয়তুন তেল। তিনি বললেন, আমার সামনে সেগুলো হাজির করো। বৃদ্ধা তাই করলো। তিনি সেগুলোর উপরে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার আটার বস্তা আটায় পরিপূর্ণ হয়ে গেলো এবং পূর্ণ হয়ে গেলো তার তেলের পাত্র। তিনি স্থান ত্যাগ করবার পর বরকতময় খাদ্যের গন্ধ পেয়ে লোকেরা জড়ো হলো সেখানে। বৃদ্ধাকে বললো, কী ব্যাপার! এতো কিছু তুমি কোথায় পেলে? বৃদ্ধা খুলে বললো সব। সকলেই তখন বুঝতে পারলো বৃদ্ধার কাছে যিনি এসেছিলেন, তিনি হজরত ইলিয়াস ছাড়া অন্য কেউ নন। তারা তখন হন্যে হয়ে তাঁকে খুঁজতে শুরু করলো। এক স্থানে পেয়েও গেলো তাঁকে। কিন্তু সেখান থেকে অতি দ্রুত পলায়ন করলেন হজরত ইলিয়াস। আশ্রয় নিলেন জনৈকা বনী ইসরাইল মহিলার বাড়ীতে। ওই মহিলা তাঁকে তার গৃহমধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। তার পুত্র আল ইয়াসা ইবনে উখতুব তখন অসুস্থ। হজরত ইলিয়াস তার রোগমুক্তির জন্য দোয়া করলেন। ফলে সে সুস্থ হয়ে গেলো এবং হয়ে গেলো হজরত ইলিয়াসের একান্ত অনুরক্ত ও সার্বক্ষণিক সহচর।

কিছুকাল পর প্রত্যাদেশ হলো— হে ইলিয়াস! বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিয়ে তুমি সৃষ্টিকুলকে ধ্বংস করে ফেলছো। ইতোমধ্যেই জীবনহানি ঘটেছে অনেক পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ ও গাছ-পালার। ওরা তো কোনো পাপ করেনি। হজরত ইলিয়াস নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালক! এবার আমাকে সম্মতি দাও, আমি সকলের জন্য দোয়া করি, যেনো এই চরম সংকট থেকে তারা মুক্তি পায়। হয়তো এবার অংশীবাদী জনতার চৈতন্যোদয় ঘটবে। বুঝতে পারবে সত্যের স্বরূপ। প্রত্যাদেশ হলো, সম্মতি দেওয়া হলো। একথা শোনার পর পর হজরত ইলিয়াস উপস্থিত হলেন জনতার সামনে। বললেন, শোনো হে জনতা! একথা সত্য যে, তোমরা খাদ্যাভাবে কষ্ট পাচ্ছো। কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করো, এ হচ্ছে তোমাদের পাপের ফল। তোমাদের পাপের কারণেই দেখো ইতোমধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়েছে কতো পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ-তৃণ-উদ্ভিদ। এখনো সময় আছে। বাঁচতে যদি চাও, তবে পরিহার করো পৌত্তলিকতা। ওই মূর্তিগুলো তো জড়প্রতিমা মাত্র। কারো উপকার-অপকার করার ক্ষমতা তাদের এতটুকুও নেই। প্রমাণ যদি চাও, তবে মূর্তিগুলোকে এনে এক জায়গায় জড়ো করো। তাদেরকে বলো, অবসান ঘটাক

বৃষ্টিহীনতার । যদি তা তারা না পারে, তবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে তোমরা এতদিন উপাসক ছিলে মিথ্যা মাবুদের। তাই আমি বলি, এই মুহূর্তে পরিত্যাগ করো অংশীবাদিতা। আমি তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে বৃষ্টিপ্রার্থনা করবো। আশা করি তিনি তোমাদের বিপদাপদ দূর করে দিবেন। জনতা জবাব দিলো, হে ইলিয়াস! আপনি ঠিকই বলেছেন। একথা বলেই তারা তাদের পূজ্যপ্রতিমাগুলোকে এনে এক জায়গায় জড়ো করলো। তাদের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করলো। কিন্তু কোনো সাড়া পেলো না। বাধ্য হয়ে তারা শরণাপন্ন হলো হজরত ইলিয়াসের। হজরত ইলিয়াস দোয়া করলেন। তাঁর সঙ্গে শরীক হলো আলইয়াসা। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের দিক থেকে উত্থিত হলো এক টুকরা মেঘ। মেঘখণ্ডটি প্রসারিত হতে লাগলো ধীরে ধীরে। অল্পক্ষণের মধ্যে সারা আকাশ ঢেকে গেলো মেঘে। শুরু হলো মুষলধারায় বৃষ্টি। প্রাণ ফিরে পেলো বিশুষ্ক মৃত্তিকা। তা থেকে উদগত হলো তৃণগুল্ম উদ্ভিদ। শুরু হলো শস্যের সম্ভাবনা, সমারোহ। এভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা রক্ষা করলেন ওষ্ঠাগতপ্রাণ বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীকে। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র এই বিশেষ দানের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো না। গ্রহণ করলো না হজরত ইলিয়াস কর্তৃক আনীত ধর্মমতকে। পুনরায় নিমজ্জিত হলো ঘোর পৌত্তলিকতায়।

হজরত ইলিয়াস মর্মাহত হলেন। নিবেদন জানালেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! এই দুর্বৃত্তদের হাত থেকে এবার আমাকে মুক্তি দাও। জবাব এলো, এতো তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করো। ওই নির্দিষ্ট তারিখে অমুক স্থানে গমন কোরো। দেখবে, সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে একটি বাহন। কাল বিলম্ব না করে ওই বাহনে আরোহণ কোরো।

নির্দিষ্ট তারিখ এসে পড়তেই হজরত ইলিয়াস আল ইয়াসাকে সঙ্গে নিয়ে উক্ত স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অকস্মাৎ তাঁর সামনে উপস্থিত হলো একটি অগ্নিবর্ণের ঘোড়া। হজরত ইলিয়াস এক লাফে তার উপর উঠে পড়লেন। ঘোড়াটিও চলতে শুরু করলো সঙ্গে সঙ্গে। আল ইয়াসা চিৎকার করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী ! আমার জন্য আপনার কী আদেশ? ঘোড়াটি তখন হজরত ইলিয়াসকে নিয়ে মহাশূন্যের দিকে উড়াল দিয়েছে। উড়ন্ত অবস্থায় হজরত ইলিয়াস নিচের দিকে ছুঁড়ে দিলেন একটি স্বলিখিত দলিল। আল ইয়াসা সেটিকে তুলে নিলেন। দেখলেন, তাতে লেখা রয়েছে— তোমাকে বনী ইসরাইলদের পরবর্তী পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করা হয়েছে। দু'জনের মধ্যে সেটাই ছিলো শেষ সাক্ষাত। এরপর আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত ইলিয়াসকে দান করলেন ফেরেশতাদের স্বভাব। পানাহারের প্রয়োজন থেকে মুক্ত করে দিলেন তাঁকে। দান করলেন ফেরেশতাদের মতো উড়ালপ্রবণ ডানা। তিনি হলেন একই সঙ্গে মৃত্তিকানির্মিত মানুষ এবং ডানা বিশিষ্ট আকাশচারী ফেরেশতা।

www.eelm.weebly.com

এদিকে আল্লাহ্‌তায়ালা এক অজ্ঞাত প্রতাপশালী রাজাকে চড়াও করে দিলেন বাদশাহ উজুব ও তার সম্প্রদায়ের লোকদের উপর। ওই রাজা প্রথমেই বাদশাহ

ও তার পত্নীকে হত্যা করে ফেলে রাখলো শহীদ মাযদাকীর বাগানে। সেখানেই পচে গলে মাটিতে মিশে গেলো তাদের লাশ। আল্লাহ্‌পাক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আলইয়াসাকে জানালেন, তুমিই বনী ইসরাইলদের বর্তমান নবী। এতোদিনে বোধদয় ঘটলো দুর্বিনীত বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর। এবার তারা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিলো নতুন নবী আল ইয়াসাকে। তাঁর মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত তারা অনড় রইলো তাঁর আনীত ধর্মাদর্শের উপর।

আবদুল আজিজ ইবনে আবু দারদার উদ্ধৃতি দিয়ে সারাই ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত ইলিয়াস এবং হজরত খিজির বায়তুল মাকদিসে উপস্থিত হয়ে প্রতি রমজানে রোজা রাখেন এবং একে অপরের সঙ্গে মিলিত হন হজের সময়ে। এরকমও বলা হয়ে থাকে যে, হজরত ইলিয়াস বিরাণ মরুভূমির জনশূন্য অরণ্যের এবং হজরত খিজির সমুদ্রের দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ একজন পথ দেখান মরুচারী ও অরণ্যচারী বিভ্রান্ত পথিককে এবং বিপন্ন সমুদ্রচারীকে উদ্ধার করেন অপর জন।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমরা কি সাবধান হবে না (১২৪)? তোমরা কি বাআলকে ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা— (১২৫) আল্লাহ্‌কে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের— প্রতিপালক তোমাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষদের' (১২৬)।

উল্লেখ্য, ওই সময়ের বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠী পূজা করতো 'বাআল' নামক এক বৃহৎ প্রতিমার। তার নামেই তাদের জনপদের নাম রাখা হয়েছিলো 'বাআলবাক'। মুজাহিদ, ইকরামা ও কাতাদা বলেছেন, ইয়ামিনী ভাষায় 'বাআল' অর্থ প্রতিপালক।

এরপরের আয়াতে (১২৭) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো, কাজেই তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে'।

এখানে 'মুহ্‌দ্বরূন' এর আক্ষরিক অর্থ ডেকে পাঠানো হবে। তবে এখানকার বাকভঙ্গি একথাই প্রমাণ করে যে, তাদেরকে তখন উপস্থিত করানো হবে শাস্তি প্রদানের জন্য। অর্থাৎ 'ইহ্‌দ্বর' অর্থ ডেকে পাঠানো হলেও এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শাস্তি প্রদানার্থে নিকৃষ্ট স্থানে সমবেত করানোকে।

এরপরের আয়াতে (১২৮) বলা হয়েছে— 'তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।

আগের আয়াতের 'কাজ্‌জাবু' শব্দের বহুপদী সর্বনাম থেকে একথাটি পৃথক। কিন্তু 'আল মুহ্‌দ্বরূন' (উপস্থিত করা হবে) কথাটি থেকে পৃথক নয়। নতুবা কথাটির অর্থ বাকরীতিসিদ্ধ হবে না। কেননা 'আলমুহ্‌দ্বরূন' এর উদ্দেশ্য শাস্তির জন্য হাজির করানো লোকজন। কারো কারো মতে পৃথকীকরণবোধক শব্দ এখানে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে 'আলমুহ্‌দ্বরূন' কথাটি শুরু থেকেই পৃথক। এর উদ্দেশ্য কিছু মন্দ লোক যারা আল্লাহ্‌র নবীকে মিথ্যা বলেছিলো। রূপক অর্থে

অবশ্য সকল ধরনের লোকই কথাটির উদ্দেশ্য। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কাফেলার সব লোক চোর ছিলো না, কিন্তু আহ্বানকারী সবাইকে চোর বলেছে'। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— মিথ্যাচারীদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য সমবেত করা হবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ দাস, তাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা থাকবে সতত শাস্তিমুক্ত।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি (১২৯)। ইল্‌য়াসিনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক'(১৩০)। একথার অর্থ— আমি আমার প্রিয় নবী ইলিয়াসের বৃত্তান্তকেও পরবর্তী যুগের মানুষের স্মৃতিতে জীবন্ত করে রেখেছি। তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক অফুরন্ত শান্তি ও নিরাপত্তা।

এখানে 'ইল্‌ইয়াসিন' বলে হজরত ইলিয়াসকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ 'ইল্‌ইয়াসিন' অর্থ এখানে ইলিয়াস। যেমন 'সিনীন' অর্থ সিনাই, 'সমাইন' অর্থ 'ইসমাইল', 'মিকাইন' অর্থ মিকাইল। ফাররা বলেছেন, 'ইল্‌ইয়াসিন' হচ্ছে 'ইলিয়াস' এর বহুবচন। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে 'ইল্‌ইয়াসিন' বলে বোঝানো হয়েছে হজরত ইলিয়াস ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরবর্গকে। অথবা কেবল ইলিয়াস অনুসারীগণকে। যেমন 'আশয়ারীন' অর্থ আশায়েরা মতাবলম্বীগণ।

ক্বারী ইবনে আমের ও ক্বারী নাফে' এর উচ্চারণে 'আল' ও 'ইয়াসিন' এসেছে পৃথকভাবে। এভাবে মিলিত, অথচ পৃথক উচ্চারণ করলে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— ইয়াসিনের পুত্রের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এমতোক্ষেত্রে 'ইয়াসিন' হবে হজরত ইলিয়াসের পিতার নাম। আবার এরকম হওয়াও সম্ভব যে, 'ইলিয়াস' এরই অপর নাম 'আলইয়াসিন'। এমতাবস্থায় 'আলইয়াসিন' এর উদ্দেশ্য হবে, ইলিয়াসের বিশ্বাসী সঙ্গীগণ। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, এখানে 'ইয়াসিন' অর্থ রসুলেপাক স. অথবা কোরআন মজীদ, কিংবা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত অন্য কোনো কিতাব। কিন্তু এমতো অর্থ এখানে

কিছুতেই প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ এখানে একের পর এক ক্রমাগত বর্ণিত হচ্ছে নবী-রসুলগণের বৃত্তান্ত। হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ তাই অবান্তর। পূর্বাপর বক্তব্যের যোগসূত্রটিও তাহলে আর থাকে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি (১৩১)। সে ছিলো আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম' (১৩২)। একথার অর্থ— নবী ইলিয়াসকে আমি যেভাবে অনুগৃহীত করেছিলাম, সেভাবেই আমি অনুগৃহীত করে থাকি অপরাপর পুণ্যবানগণকে। আর নিঃসন্দেহে ইলিয়াস ছিলো আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী দাসগণের অন্যতম। উল্লেখ্য, এখানে 'ইন্নাহু' কথাটির 'হু' (সে) বলে যে হজরত ইলিয়াসকেই বুঝানো হয়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮

- ❑ লূতও ছিলো রাসূলদের একজন।
- ❑ আমি তাহাকে এবং তাহার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলাম—
- ❑ এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিলো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।
- ❑ অতঃপর অবশিষ্টদিগকে আমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়াছিলাম।
- ❑ তোমরা তো উহাদের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করিয়া থাকো সকালে ও
- ❑ সন্ধ্যায়। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করিবে না?

আলোচ্য আয়াতষষ্ঠকের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! এবার শুনুন লুতের ইতিবৃত্ত। লুতও ছিলো আমা কর্তৃক প্রেরিত এক রসুল। পাপিষ্ঠ সাদুমবাসীদের পথপ্রদর্শনার্থে আমি তাকে প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু তার আহ্বানে তারা সাড়া দেয়নি। পাপমগ্ন রয়ে গিয়েছিলো পূর্ববৎ। লুতের শত চেষ্টা সত্ত্বেও যখন তাদের চৈতন্যোদয় হলো না, তখন আমি তাদের উপরে আপতিত করলাম সর্বগ্রাসী আযাব। আর ওই আযাব থেকে আমি অবশ্যই রক্ষা করেছি আমার প্রিয় নবী লুতকে এবং তার পরিবারের অন্যান্য বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনীকে। কেবল ওই বৃদ্ধাকে নয়, যে তার পরিবারভূত হওয়া সত্ত্বেও ছিলো পাপিষ্ঠদের অনুরাগিণী। আযাবের স্থান থেকে অন্যত্র গমনের নির্দেশ যখন আমি আমার নবী লুতকে দিলাম, তখন সে তার পরিবার পরিজন নিয়ে প্রভাতের পূর্বেই যাত্রা করলো স্থানান্তরে। কিন্তু ওই বৃদ্ধা, যে তার স্ত্রী হলেও ছিলো অবিশ্বাসিনী, সে রয়ে গেলো পশ্চাতে। ফলে পাপিষ্ঠ সাদুমবাসীদের সঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হলো চিরতরে। আমি তাদের সকলকে এবং তাদের জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি। হে মক্কার অংশীবাদীরা! তোমরা তো বাণিজ্য ব্যপদেশে প্রায়শঃই সাদুমবাসীদের ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের পাশ দিয়ে গমনাগমন করো। প্রত্যক্ষ করো আল্লাহ্‌র ক্রোধের নির্মম নিদর্শন। তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? সত্য বলে স্বীকার করবে না আমা কর্তৃক প্রেরিত রসুল মোহাম্মদ মোস্তফাকে? তাঁর প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশাবলীকে?

এখানে 'ইজ্ নাজ্জাইনাহু ওয়া আহ্লাহু আজ্মায়ীন' অর্থ আমি তাকে ও তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করেছিলাম। 'ইল্লা আজুযা' অর্থ এক বৃদ্ধা ব্যতীত। উল্লেখ্য, ওই বৃদ্ধা ছিলো হজরত লুতের স্ত্রী। সে ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী। সেও ধ্বংস হয়েছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সাদুম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে।

'ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করে থাকো' অর্থ— হে মক্কাবাসীরা! তোমরা যখন সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে যাও, তখন তোমাদের পথের পাশেই পড়ে সাদুমবাসীদের

বিধ্বস্ত জনপদ। 'সকালে ও সন্ধ্যায়' অর্থ— তোমরা ওই বিরাণ জনপদ কখনো অতিক্রম করো রাতে, কখনো প্রাতে। অর্থাৎ এক এক সফরে এক এক সময়ে।

'আফালা তা'ক্বিলূন' অর্থ তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? অর্থাৎ তোমরা কি একেবারেই জ্ঞানবুদ্ধিরহিত যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানের ভয়াবহ পরিণতির প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সাবধান হবে না? গ্রহণ করবে না সত্যধর্ম ইসলামকে? আলোচ্য বাক্যটি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি এক চরম সাবধানবাণী, কঠিন হুমকি।

www.eelm.weebly.com

❑ ইউনূসও ছিলো রসূলদের একজন।
❑ স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করিয়া বোঝাই নৌযানে পৌঁছিল,
❑ অতঃপর সে লটারিতে যোগদান করিল এবং পরাভূত হইল।
❑ পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাহাকে গিলিয়া ফেলিল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল।
❑ সে যদি আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করিত,
❑ তাহা হইলে তাহাকে উত্থান দিবস পর্যন্ত থাকিতে হইত উহার উদরে।
❑ অতঃপর ইউনুসকে আমি নিক্ষেপ করিলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন।
❑ পরে আমি তাহার উপর এক লাউ গাছ উদ্গত করিলাম,
❑ তাহাকে আমি এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম।
❑ এবং তাহারা ঈমান আনিয়াছিল; ফলে আমি তাহাদিগকে কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিলাম।

তাফসীরে মাযহারী/১২৭

এখান থেকে শুরু হয়েছে নবী ইউনুসের ইতিবৃত্ত। প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইউনুসও ছিলো রসুলদের একজন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আরো শুনুন ইউনুসের ইতিকাহিনী। ইউনুসও ছিলো আমা কর্তৃক নির্বাচিত ও প্রেরিত রসুলগণের একজন।

পরের আয়াতে (১৪০) বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই নৌযানে পৌঁছুলো'। এখানে 'আবাক্বা' এর আক্ষরিক অর্থ— প্রভুর কাছ থেকে ক্রীতদাসের পলায়ন। এরকম বলা হয়েছে এ কারণে যে, হজরত ইউনুস ভুল সিদ্ধান্তক্রমে আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে গোপনে চলে এসেছিলেন তাঁর জনপদবাসীদের কাছ থেকে। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অন্য কোনো দেশে চলে যাবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন নৌ ঘাটে। উঠে বসেছিলেন যাত্রী বোঝাই একটি নৌকায়।

ইমাম আহমদ তাঁর 'জুহুদ' গ্রন্থে , আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মুনজির আবদুর রাজ্জাক তাউসের বর্ণনা উদ্ধৃত করে লিখেছেন, হজরত ইউনুস তাঁর জনপদবাসীদেরকে সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান জানান। বলেন, সত্যপ্রত্যাখ্যান করলে আল্লাহ্র শাস্তি অনিবার্য। একবার তিনি প্রত্যাদেশানুসারে সকলকে আযাব আপতিত হওয়ার নির্দিষ্ট দিন ক্ষণ জানিয়ে দিলেন। কিন্তু তার পূর্বেই লোকেরা শুরু করে দিলো রোদন। ক্ষমাপ্রার্থী হলো বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে। ফলে আল্লাহ্ তাঁর আযাব প্রত্যাহার করলেন। হজরত ইউনুস ভাবলেন, এবার তিনি মানুষের সামনে প্রমাণিত হবেন অসত্যাচারী বলে। তাই তিনি মনস্থ করলেন, অন্যত্র পালিয়ে যাবেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি স্থান ত্যাগ করলেন। পৌঁছলেন সমুদ্রতীরের এক নৌ ঘাটে। একটি যাত্রীবোঝাই নৌকা দেখতে পেয়ে উঠে পড়লেন। নৌকা ছেড়ে দেওয়া হলো। চলতে চলতে মাঝ দরিয়ায় এসে নৌকা আড়াআড়ি অবস্থায় থেমে গেলো। মাঝিরা বললো, নিশ্চয় নৌকায় রয়েছে কোনো পলাতক গোলাম। কে সেই পলাতক গোলাম তা নির্ণয়ের জন্য তারা লটারীর আয়োজন করলো। পর পর তিন লটারীতেই উঠে এলো হজরত ইউনুসের নাম।

এরপরের আয়াতে (১৪১) তাই বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে লটারীতে যোগদান করলো এবং পরাভূত হলো'।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহের বর্ণনায় এসেছে, লোকেরা লটারীর গুটি চালনা করেছিলো তিনবার। আর তিনবারই উঠে এসেছিলো হজরত ইউনুসের নাম। তিনি আরো লিখেছেন, হজরত ইউনুস সমুদ্রতীরে

www.eelm.weebly.com

পৌঁছলেন তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্রকে নিয়ে। যাত্রী বোঝাই নৌকাটিতে প্রথমে উঠতে গেলেন তাঁর স্ত্রী। কিন্তু হঠাৎ একটি প্রচণ্ড ঢেউ এসে
তাঁকে নিয়ে গেলো সমুদ্রাভ্যন্তরে। বড় ছেলে অগ্রসর হতেই তাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেলো আর একটি ভয়ংকর ঢেউ। তীরে দাঁড়ানো ছোট ছেলেটিকেও অকস্মাৎ ধরে নিয়ে গেলো একটি হিংস্র বাঘ। হজরত ইউনুস তখন গিয়ে উঠলেন আর একটি

তাফসীরে মাযহারী/১২৮

www.eelm.weebly.com

www.eelm.weebly.com

মাটি নিক্ষেপ করতে করতে বললেন, দাউদ ধ্বংস হয়ে যাবে সেইদিন, যেদিন ঝুলানো হবে ন্যায়বিচারের পাল্লা। তিনি যে মহাবিচারকর্তা! তিনি যে পবিত্র নূরের স্রষ্টা। হায়! বিনাশ হবে, সবচেয়ে বেশী বিনাশ হবে দাউদের, যখন তাকে ঘাড় ধরে সোপর্দ করা হবে অত্যাচারিতের অধিকারে। আর কুঞ্চিতমুখ করে টেনে হিঁচড়ে তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে পাপিষ্ঠদের সঙ্গে। তিনিই পবিত্র। তিনিই মহামহিম। তিনিই পুতঃপবিত্র নূরের সৃজয়িতা।

আকাশ থেকে আওয়াজ ভেসে এলো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। অবিশ্রান্ত রোদনের কারণে কবুল করেছি তোমার প্রার্থনা। তিনি নিবেদন করলেন, কিন্তু যার অধিকার আমি খর্ব করেছি, তোমার সেই বান্দা তো আমাকে ক্ষমা করলো না। পুনঃ আওয়াজ ধ্বনিত হলো, বিচারের দিন আমি তাকে দিবো অনেক অনেক পুণ্য ও প্রতিদান, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। বলবো, তুমি আমার নবী দাউদের উপরে কি এখনো অপ্রসন্ন? সে বলবে, কিন্তু আমি জানতে চাই এতো বিশাল পুণ্যের অধিকারী আমি হলাম কী করে? আমি তো সেরকম কোনো পুণ্যকর্ম করিনি। আমি বলবো, আমার প্রিয়ভাজন দাউদের কারণেই তোমাকে এতো কিছু দেওয়া হয়েছে। এখন তোমার উচিত তাকে দায়মুক্ত করা। একথা শুনে সে তোমাকে মাফ করে দিবে।

এখানে 'খর্‌রা রকিয়া' অর্থ নত হয়ে লুটিয়ে পড়লো। অর্থাৎ তখন হজরত দাউদ লুটিয়ে পড়লেন সেজদায়। এখানে 'রুকু' অর্থ সেজদা। কেননা রুকু হচ্ছে সেজদার সূচনা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হজরত দাউদ তখন রুকু অবস্থায় সেজদা আদায় করেছিলেন। অর্থাৎ ইস্‌তেগফারের (ক্ষমাপ্রার্থনার) নিয়তে দুই রাকাত নামাজ পাঠ করা অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলেন সেজদায়। হানাফীগণ তাই বলেন, সেজদার আয়াত শুনে কেউ যদি রুকু করে, তবুও তার তেলাওয়াতের সেজদা আদায় হয়ে যাবে। কেননা এখানে 'রুকু' অর্থ সেজদা। আর তেলাওয়াতের সেজদার মূল উদ্দেশ্য যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালার বাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাই এমতোক্ষেত্রে রুকু করলেও সেজদা আদায় হয়ে যাবে। কারণ সম্মান প্রদর্শন করা যায় রুকু ও সেজদা উভয়টির দ্বারা।

এমতোক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অর্থ হবে— আল্লাহ্‌কে যাঁরা সম্মান করেন তাঁদের অনুসারী হয়ে যাওয়া। অথবা যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অহংকার করে তাদের শত্রু হয়ে যাওয়া। তুল্যমূল্যতার (কিয়াসের) দাবি এটাই।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন, সেজদার আয়াত পাঠ করার পরক্ষণে কেবল রুকু করলে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা অধিকতর সূক্ষ্ম কিয়াস এটাই দাবি করে যে, সম্মান প্রদর্শন ওয়াজিব হলে তা সেজদার আকারে প্রদর্শন করাও হয় ওয়াজিব। সেকারণেই সকলে এব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, নামাজের মধ্যে কোরআন পাঠ করার সময় সেজদার আয়াত এসে গেলে, তা পাঠ করার পরক্ষণে সেজদায় পতিত হয়ে তেলাওয়াতের ওয়াজিব সেজদা আদায় করতে হবে। তখন রুকুর মাধ্যমে তেলাওয়াতের সেজদা আদায় হবে না।

অবশিষ্ট রইলো আলোচ্য আয়াতের 'রুকু' সম্পর্কে। এখানে অবশ্য 'রুকু'র রূপক অর্থ সেজদাই গ্রহণীয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে রূপক ও বাস্তবের এমতো অর্থান্তর সঙ্গত ও শুদ্ধ হতে পারে না।

ইমাম আবু হানিফা কিন্তু এখানে সূক্ষ্ম যুক্তি অপেক্ষা প্রকাশ্য যুক্তিকেই অধিকতর প্রাধান্য প্রদান করেছেন। কেননা প্রকাশ্য যুক্তি ও তুল্যমূল্যতার প্রভাব কম ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। হাদিস শরীফের মাধ্যমেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত ইবনে ওমর নামাজ পাঠকালে সেজদার আয়াত পাঠ করে ফেললে রুকু করে নেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করতেন। অন্য কোনো সাহাবী তাদের এরকম আমলের প্রতি ভিন্নমত ব্যক্ত করেননি। এতে করে বুঝা যায়, বিষয়টি ঐকমত্যসম্মত।

উল্লেখ্য, সূক্ষ্ম কিয়াস কেবল সূক্ষ্মতার কারণেই প্রকাশ্য কিয়াসের উপরে প্রাধান্য প্রাপ্তির যোগ্য নয়। আবার প্রকাশ্য কিয়াসও নয় কেবল প্রকাশসর্বস্ব। বরং এমতো প্রাধান্যের কারণ নির্ণীত হয়ে থাকে ভিন্নতর প্রেক্ষিতে। উসুলে ফেকাহ্ গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার অবকাশ রয়েছে। আর এখানে বিষয়টি তেমন প্রাসঙ্গিকও নয়। তবে এতোটুকু কেবল বলা যেতে পারে যে, সূক্ষ্ম কিয়াসের বিষয়গত সীমাবদ্ধতা নেই।

মাসআলা ঃ সেজদার আয়াত পাঠ করার পরক্ষণে যদি রুকু করা হয় এবং তখন তেলাওয়াতের সেজদার নিয়ত যদি না-ও করা হয়, তবুও তাতে করে নামাজের সেজদার সাথে সাথে তেলাওয়াতের সেজদাও আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু এরকম যদি করা হয় সেজদার আয়াতের পরের আরো দু' একটি আয়াত পাঠ করার পর, তবে তাতে করেও নামাজের সেজদার সাথে সাথে তেলাওয়াতের সেজদাও আদায় হয়ে যাবে। এরকম বলেন ইমাম আবু হানিফা। কিন্তু অন্য ইমামত্রয় বলেন, এভাবে তেলাওয়াতের সেজদা আদায় হবে না, চাই এর মধ্যে তেলাওয়াতের সেজদা থাকুক অথবা না থাকুক।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফার মতে নামাজে থাকা অবস্থাতেই তেলাওয়াতের সেজদা আদায় করা ওয়াজিব। অন্যান্য হানাফীগণও এই অভিমতের প্রবক্তা।

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদ ইবনে আসলাম বলেন, নামাজের নির্ধারিত সেজদাকে তেলাওয়াতের সেজদা হিসেবে গণ্য করা সূক্ষ্ম কিয়াসের পরিপন্থী। কেননা নামাজের অঙ্গরূপে নির্ধারিত সেজদা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফরজ, যা অন্য কোনো সেজদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না, যেমন রমজানের ফরজ রোজা স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না অন্য কোনো কাজা হয়ে যাওয়া রোজার। এমতোক্ষেত্রে প্রকাশ্য কিয়াসই সূক্ষ্ম কিয়াস অপেক্ষা অধিকতর প্রাধান্য প্রাপ্তির যোগ্য, যদিও রুকুকে তেলাওয়াতের সেজদার স্থলাভিষিক্ত ভাবা কিয়াসের পরিপন্থী। আর একথাও স্পষ্ট যে, এমতোক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতেই বিষয়টির বিধিসম্মত বৈধতা নিরূপণ করা হয়েছে।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, সুরা 'সোয়াদ' এর আয়াত পাঠ করলে সেজদা ওয়াজিব হয়ে যায়। ইমাম মালেক আবার তেলাওয়াতের সিজদাকে বলেছেন সুন্নত, ওয়াজিব বলেননি। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে, তেলাওয়াতের সেজদা মূলতঃ কৃতজ্ঞতাপ্রকাশক এবং নামাজের মধ্যে এ সেজদা আদায়ের অবকাশ নেই। আর নামাজের বাইরে তেলাওয়াতের সেজদা মোস্তাহাব।

ইবনে জাওজী বলেছেন, তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব নয়। তাঁর অভিমতের পরিপোষকরূপে তিনি বর্ণনা করেছেন এই হাদিস— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি রসুল স.কে সুরা 'সোয়াদ' এর এই আয়াত পাঠ করার পর সেজদা করতে দেখেছি। কিন্তু তা ওয়াজিব সেজদার মধ্যে পরিগণিত নয়। ইবনে জাওজী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি সূত্রে এবং তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। আমি বলি, বোখারী তাঁর 'বিশুদ্ধ' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সুরা সোয়াদের সেজদা ওয়াজিব সেজদার মধ্যে গণ্য নয়। আমি অবশ্য রসুল স.কে এই সেজদা করতে দেখেছি। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, আমি একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি সুরা 'সোয়াদে'র সেজদা করবো? তিনি সঙ্গে সঙ্গে 'ফাবি হুদাহু মুক্বতাদিহ্' থেকে 'ওয়া মিন জুররিয়্যাতিহী দাঊদা ও সুলায়মানা' পর্যন্ত পাঠ করে বললেন, তোমাদের রসুল তাঁর পূর্বসূরী নবী রসুলগণের অনুসরণের জন্য আদিষ্ট। হজরত ইবনে আব্বাসের এই বর্ণনাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, এখানকার সেজদা রসুল স. এর উপরেও ছিলো ওয়াজিব। এটাই আমাদের জন্য প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যার উপর আমল করা হয়। সুতরাং বুঝতে হবে, ইতোপূর্বে বর্ণিত 'এই সেজদা ওয়াজিব সেজদারূপে গণ্য নয়' কথাটি হয়ে গিয়েছে রহিত, অথবা বিলুপ্ত। আর পরের বিবরণটি সর্বোন্নত পর্যায়ের। এখানে রসুল স. নিজে সেজদা করতেন বলে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

ইবনে জাওজী আরো উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, একদিন রসুল স. আমাদেরকে ডেকে একত্র করলেন। পাঠ করে শোনালেন সুরা সোয়াদ। যখন এই আয়াত পড়া শেষ করলেন, তখন মিম্বার থেকে নেমে এসে সেজদা করলেন। তাঁর সঙ্গে আমরাও সেজদা করলাম। এরপর পুনরায় মিম্বরে আরোহণ করে শুরু করলেন বক্তৃতা। একস্থানে এসে পুনঃ পাঠ করলেন এই আয়াত। আমরা তখন সেজদা করার জন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হতে শুরু করলাম। তিনি স. বললেন, এ হচ্ছে একজন নবীর ক্ষমাপ্রার্থনার সেজদা। কিন্তু তোমরা তো দেখছি এ সেজদা করতে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পড়লে। একথা বলার পর তিনি মিম্বার থেকে নেমে এলেন। তারপর সেজদা করলেন। আমরাও সেজদা করলাম তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। দারাকুতনী হাদিসটির বর্ণনাকারী। হাদিসটিতে অবশ্য আমাদের অভিমতের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই। বরং হাদিসটি আমাদের অভিমতের অনুকূলেই। এখানে এতোটুকুই কেবল অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য যে, সেজদার আয়াত

পাঠকালে সাধারণতঃ সেজদা ওয়াজিব নয়, বরং তা সুন্নত। আর আমাদের কাছে ফতোয়া হিসেবে এটাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। অবশ্য হানাফীগণের মধ্যে তাহতাবীর বিবরণ ইমাম আবু হানিফার বিবরণের পরিপন্থী। অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা বলেন, তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব এবং হানাফী মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও ইমাম তাহতাবী বলেন, তেলাওয়াতের সেজদা সুন্নত। অবশ্য আমাদের পক্ষে রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. সুরা সোয়াদ পাঠকালে সেজদা করেছেন। দারাকুতনী সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জাওজী। হজরত আবু সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের বিবরণও তো এরকমই। অর্থাৎ সেখানেও বলা হয়েছে রসুল স. এর সেজদা করার কথা। তাহাবী, আবু দাউদ, হাকেম।

বায়হাকী বলেছেন, বহুসংখ্যক সাহাবী সুরা সোয়াদ এর সেজদা করেছেন। ফাযের ইবনে ইয়াজিদ বলেছেন, আমি একবার হজরত ওমরের পিছনে দাঁড়িয়ে ফজরের নামাজ পড়লাম। তিনি সুরা সোয়াদ পাঠ করলেন এবং সেজদার স্থানে সেজদা করলেন। নামাজ শেষে একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আমিরুল মুমিনীন! এই তেলাওয়াতের সেজদা কি ওয়াজিব? তিনি বললেন, রসুল স. এরকম করেছেন। আবু মরিয়ম বলেছেন, হজরত ওমর একবার সিরিয়ায় এলেন। সেখানে তিনি হজরত দাউদের ইবাদতখানায় গিয়ে নামাজ পাঠ করলেন। সুরা সোয়াদ এবং সেজদার আয়াত পাঠ করার পর সেজদা করলেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. সুরা সোয়াদ পাঠকালে সেজদা করেছেন এবং বলেছেন, নবী দাউদ সেজদা করেছেন ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য, আর আমরা সেজদা করি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে। এই হাদিসটি নাসাঈ বর্ণনা করেছেন হাজ্জাজ ইবনে মোহাম্মদ থেকে ওমর ইবনে জারের সূত্রপরম্পরায় এবং দারাকুতনী ও ইমাম শাফেয়ী তাঁর 'উম্' নামক গ্রন্থে ইবনে উয়াইনা— আইয়ুব—ইকরামা—হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে সরাসরি রসুল স. থেকে। হাদিসটির অপর সূত্রপরম্পরা এরকম ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে বযঈ—ওমর ইবনে জর—জর—সাঈদ ইবনে যোবায়ের—হজরত ইবনে আব্বাস—রসুলে পাক স.। কিন্তু ইবনে বযঈর কারণে এই সূত্রপরম্পরাটি ত্রুটিপূর্ণ ও সমালোচিত। ইবনে সাকান হাদিসটিকে সনাক্ত করেছেন যথাসূত্রসম্বলিতরূপে। কিন্তু ইবনে আদী বলেছেন, বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনে হাজারের অভিমতও এরকম। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, এর দ্বারা বড় জোর এতোটুকুই বুঝা যায় যে, রসুল স. নবী দাউদের সেজদার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন এবং হেতু বর্ণনা করেছেন আমাদের সেজদা করার। অর্থাৎ আমাদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশই এই সেজদা করার হেতু। আর এতে করে এই সেজদার ওয়াজিব হওয়াও অপ্রমাণিত থাকে না। কেননা সকল ফরজ ও ওয়াজিব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

ইমাম আবু হানিফা তার 'মসনদ' গ্রন্থে হজরত আবু মুসা আশয়ারী—ইয়াজ আশয়ারী—সাম্মাক ইবনে হারব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. সুরা সোয়াদে সেজদা করেছেন। বকর ইবনে আবদুল্লাহ্ মাজানী থেকে প্রাপ্ত সূত্রানুসারে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম, সুরা সোয়াদ লিপিবদ্ধ করছি। যখন সেজদার আয়াত লিপিবদ্ধ করতে গেলাম, তখন দেখলাম আমার দোয়াত কলম ও সামনে রক্ষিত অন্যান্য সামগ্রী উল্টে পড়ে গেলো। আমি এই স্বপ্নটির বৃত্তান্ত রসুল স.কে জানালাম। কিন্তু তিনি একথা শুনে সেজদা করলেন না। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, এতে করে বুঝা যায়, সুরা সোয়াদের সেজদার আয়াত অন্য সকল সেজদার আয়াতের মতোই বাধ্যতামূলকরূপে পরিগণিত হয় এবং তা বহালও থাকে। ইতোপূর্বে তা বাধ্যতামূলক ছিলো না। এতে করে আরো জানা যায় যে, ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত আবু সাঈদের বর্ণনাটি ছিলো এই ঘটনারও আগের।

পরিচ্ছেদঃ হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, এক লোক একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! বিগত রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছি। আমি যখন সেজদা করলাম, তখন বিস্মিত হয়ে দেখলাম, গাছটিও আমার সঙ্গে সেজদা করলো এবং বললো, হে আমার প্রভুপালয়িতা! আমার জন্য এই সেজদাকে তুমি প্রতিদানের নিমিত্ত করো, এর কারণে বিলুপ্ত করো আমার পাপরাশি, আমার জন্য একে তুমি সংরক্ষণ করো তোমার সকাশে এবং এ সেজদা তুমি দয়া করে গ্রহণ করো, যেমন করে তুমি সেজদা গ্রহণ করেছিলে তোমার প্রিয় নবী দাউদের। আমি দেখলাম, এই বৃত্তান্ত শোনার পর রসুল স. সুরা সোয়াদের সেজদার আয়াত পাঠ করলেন এবং সেজদাও করলেন। তারপর ওই কথাগুলোও উচ্চারণ করলেন, যেগুলো উচ্চারণ করেছিলো ওই গাছটি। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে সনাক্ত করেছেন 'দুষ্প্রাপ্য'রূপে। ইবনে হাব্বান, হাকেম ও ইবনে মাজাও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় 'এ সেজদা তুমি দয়া করে গ্রহণ করো, যেমন করে তুমি সেজদা গ্রহণ করেছিলে তোমার প্রিয় নবী দাউদের' কথাটুকু নেই।

নিদর্শনা ঃ এই আয়াত যাঁরা আরবীতে পাঠ করেছেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সিজদা করে নিন।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম। আমার নিকট তার জন্য রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম'।

এখানে 'লা যুলফা' অর্থ বর্ণনাতীত নৈকট্যের মর্যাদা। অর্থাৎ এমন নিরুপম নৈকট্য ও উচ্চ মর্যাদা যা নবী দাউদ লাভ করেছিলেন বিশুদ্ধ অনুতাপ ও ক্ষমাপ্রার্থনার মাধ্যমে, বর্ণিত ভুল না করলে সে মর্যাদা তিনি কিছুতেই লাভ করতে পারতেন না। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে শব্দটির অর্থ হবে— ইহকালের প্রভূত কল্যাণ এবং পরকালের সমুচ্চ সম্মান।

'মাআব' অর্থ শুভ পরিণাম, যে পরিণামের দিকে তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন।

আমি বলি, হজরত দাউদ উরিয়ার মৃত্যু কামনা করতেন এবং সেজন্য বার বার তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতেন— এ সকল কথা একেবারেই ভিত্তিহীন। আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন এক নবীর প্রতি এ হচ্ছে নির্জলা অপবাদ। তিনি এমতো অপবাদ থেকে পবিত্র ছিলেন। কোরআন মজীদের বিবরণ থেকে কেবল এতোটুকুই জানা যায় যে, তিনি তাঁর অধীনস্থ কারো স্ত্রীকে বিবাহ করার জন্য আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে আগ্রহ বাস্তবায়িত হতে পারেনি। তৎপূর্বেই আল্লাহ্ তাঁকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে বাদী-বিবাদীরূপে পাঠিয়েছিলেন দু'জন ফেরেশতাকে। সাথে সাথে তিনি সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন এবং অনুতাপজর্জরিত হৃদয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন মহান আল্লাহ্ সকাশে।

'মাদারেক' রচয়িতা লিখেছেন, হজরত দাউদের সময়ের সাধারণ রীতি এই ছিলো যে, কেউ কারো স্ত্রীকে বিবাহ করতে চাইলে তাকে সরাসরি তালাক দিতে বলতে পারতো। এরকম প্রস্তাব তখন দূষণীয় ছিলো না। মদীনার কোনো কোনো আনসার সাহাবী মক্কার কোনো কোনো মুহাজির সাহাবীর জন্য নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। এটা ছিলো তাঁদের ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব ও প্রিয়ভাজনতার চরম বহিঃপ্রকাশ। হজরত দাউদ ঘটনাক্রমে উরিয়ার স্ত্রীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আর প্রচলিত রীতি অনুসারেই তাঁকে তালাক দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। উরিয়াও হয়তো নবীর প্রতি যথাবিনয়বশতঃ সে প্রস্তাবে অসম্মত হতে পারেননি। তালাক দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে। আর হজরত দাউদও তাঁর মুক্ত স্ত্রীকে পরিণয়াবদ্ধ করেছিলেন শরিয়ত সম্মতরূপে।

আমি মনে করি, হজরত দাউদ তখন সেরকম পদ্ধতি অবলম্বন করেননি, যেরকম পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন আমাদের রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.। তিনি তো হজরত জায়েদের স্ত্রী হজরত জয়নবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কারো কাছে তা প্রকাশ করেননি। বরং হজরত জায়েদকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হজরত জায়েদ তাঁর স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে পারেননি এবং রসুল স.ও পারেননি হজরত জয়নবকে বিবাহ না করে থাকতে। কারণ এটা ছিলো আল্লাহ্‌তায়ালার পরিকল্পনা ও পবিত্র অভিপ্রায়। উল্লেখ্য, হজরত দাউদ এরকম পদ্ধতি গ্রহণ করলে হয়তো আল্লাহ্ কর্তৃক ভর্ৎসিত হতেন না। তিনি তো আল্লাহর ইঙ্গিতের অপেক্ষা না করে নিজে নিজেই বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। কোরআন মজীদের বিবরণে এরকমই উল্লেখ করা হয়েছে। সেজন্যই তো আগন্তুক বাদী-বিবাদীর একজন অপরজনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছিলো যে, এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা। তবুও সে বলে, 'আমার জিম্মায় এইটি দিয়ে দাও'। সে এরকম বলেনি যে, এ লোক আমাকে হত্যা করতে চায়। হজরত দাউদও একথার উত্তরে তাকে জানিয়েছিলেন, 'তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলির সঙ্গে যুক্ত করবার দাবি করে সে তোমার উপর জুলুম করেছে'। এরকম বলেননি যে, সে তোমাকে

হত্যা করতে চেয়ে তোমার প্রতি জুলুম করেছে। সুতরাং হজরত দাউদ উরিয়াকে মেরে ফেলার জন্য বার বার তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন— এরকম অপবাদ হজরত দাউদের উপরে বর্তায় না। একজন নবীর পক্ষে এরকম করা শোভনও নয়। তিনি কেবল বিবাহ করবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। আর এরকম বাসনা প্রকাশ শরিয়তসিদ্ধ হলেও একজন নবীর পক্ষে ছিলো অশোভন। আর ওই অশোভনতা অপনোদনার্থেই আল্লাহ্ তাঁর কাছে প্রেরণ করেছিলেন ছদ্মবেশী ফেরেশতাদ্বয়কে। তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সচেতন হয়েছিলেন এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন অনুতপ্ত হয়ে। 'নৈকট্যের মর্যাদা' ও 'শুভপরিণাম'ও লাভ করেছিলেন অবশেষে। এরকম ব্যাখ্যাই সুসঙ্গত ও নবুয়তের মহান মর্যাদার অনুকূল। আল্লাহ্‌তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত।

বাগবী লিখেছেন, ওয়াহাব ইবনে মুনাববাহ্ বলেছেন, সানুতপ্ত ক্ষমাপ্রার্থনা আল্লাহ্ কর্তৃক সর্বোত্তম বিনিময়ের মাধ্যমে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও হজরত দাউদ প্রায়শঃই রোদন করতেন। প্রায় সারাক্ষণ তাঁর নয়ন থাকতো অশ্রুসিক্ত। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো সত্তর বৎসর। আর এই ঘটনার পর তিনি তাঁর দিবসসমূহকে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন চারভাগে। প্রথম দিন নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন জনগণের বিবাদ-বিসম্বাদ নিস্পত্তির জন্য, পরের দিন ব্যয় করতেন সহধর্মিণীগণের জন্য, এরপরের দিন বিশেষভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করতেন বনে-জঙ্গলে-পাহাড়ে গিয়ে। আর চতুর্থ দিবস তিনি তাঁর নিভৃত প্রকোষ্ঠে কাটিয়ে দিতেন ক্ষমা প্রার্থনা ও বিলাপ-রোদনের মাধ্যমে। তাঁর ওই ইবাদতখানায় তাঁর রোদনসঙ্গী হতো চার হাজার সংসারাসক্তিহীন দরবেশ। বনে-জঙ্গলে যাবার দিন এলেও তিনি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যেতেন রাজপ্রাসাদ পিছনে ফেলে। সেখানেও তিনি কখনো উচ্চকণ্ঠে এবং কখনো নিম্নকণ্ঠে আল্লাহ্‌র জিকির করতেন এবং কাঁদতেন। তাঁর সঙ্গে কাঁদতো পাথর-পাহাড়-অরণ্যানী-পাখপাখালি এবং বনের পশুরাও। তাদের সম্মিলিত কান্না নদী হয়ে বয়ে যেতো সমুদ্রের দিকে। পরে তিনি উপস্থিত হতেন সমুদ্রের কিনারাতে। সেখানে তাঁর রোদনসঙ্গী হতো সামুদ্রিক প্রাণীকুল। তারপর তিনি স্বগৃহে ফিরে আসতেন দিবাবসানে। স্বগৃহে ক্রন্দন ও বিলাপের দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করতো, আজ আল্লাহ্‌র নবী দাউদের রোদন-বিলাপের দিবস। যারা এই মহতী অনুষ্ঠানে যোগদান করতে চায়, তারা যেনো চলে আসে। তাঁর ইবাদতখানার মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হতো ফরাস, সেগুলোর মধ্যে ভরা থাকতো খেজুরের ছাল ও আঁশ। তিনি উপবেশন করতেন মাঝের ফরাসে। তারপর চার হাজার দরবেশ লম্বা লম্বা টুপি পরে ও হাতে লাঠি নিয়ে এসে বসতো তাঁর দু'পাশের ফরাসে। হজরত দাউদ উচ্চস্বরে ক্রন্দন শুরু করতেন। দরবেশগণও শুরু করতো উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দন। চোখের পানিতে ফরাস ভিজে যেতো। আর ওই সিক্ত ফরাসে কাটা মুরগীর বাচ্চার মতো তড়পাতে শুরু করতেন তিনি। তাঁর পুত্র সুলায়মান এসে পরম যত্নে ওঠাতেন রোরুদ্যমান পিতাকে। হজরত দাউদ তখন দু'হাতের অঞ্জলি ভরে চোখের পানি নিয়ে নিজের

মুখমণ্ডলে মুছতেন এবং বিলাপের সুরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতেন, হে আমার পরম প্রেমময় প্রভু! আমার অপরাধ মার্জনা করো। এক বর্ণনায় এরকমও এসেছে যে, হজরত দাউদের কান্না পৃথিবীর সকল মানুষের কান্নার সমান।

www.eelm.weebly.com

ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, মার্জনার শুভসমাচার প্রাপ্তির পরেও হজরত দাউদ মাথা ওঠাতেন না। ফেরেশতারা তখন বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার শুরু ভুলে হলেও সমাপ্তি তো মার্জনায়। সুতরাং আপনি মস্তক উত্তোলন করুন। এরপর থেকে তিনি মস্তক উত্তোলন করলেন। তবে তখন থেকে জীবনভর তিনি পানীয় পান করেননি এবং আহার্য গ্রহণ করেননি চোখের পানিতে না ভিজিয়ে।

আওজায়ী এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন সুপরিণত সূত্রপরম্পরাসম্পন্ন একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নবী দাউদের দুই চোখ দিয়ে মশক থেকে পানি গড়িয়ে পড়ার মতো করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তো সারাক্ষণ। ফলে তাঁর মুখমণ্ডলে সৃষ্টি হয়েছিলো নালা।

ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যখন হজরত দাউদের ক্ষমাপ্রার্থনা কবুল করলেন, তখন তিনি নিবেদন করলেন, হে আমার পরম প্রভুপালয়িতা! তুমি তো আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছো, কিন্তু এটা কি সমীচীন যে, আমি আমার কৃতকর্মের কথা বিস্মৃত হবো এবং নিজের ও অন্যদের অপরাধ মার্জনার জন্য তোমার সকাশে ক্ষমাপ্রার্থনা করবো না? এমতো আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাঁর হাতের তালুতে লিখে দিলেন 'পাপ', যা মুছে ফেলা ছিলো অসম্ভব। যখন তিনি পানাহার করতেন, তখন লেখাটি দৃষ্টিতে পড়তো তাঁর। জনসাধারণের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় যখন সামনে হাত প্রসারিত করতেন, তখন লোকেরা ওই 'পাপ' কথাটি দেখবার জন্য কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করতো। আবার যখন তিনি নিজের ও অন্যদের জন্য হাত তুলে দোয়া করতেন, তখনো 'পাপ' কথাটি দেখতেন তাঁর চোখের সামনে।

হাসানের উদ্ধৃতি দিয়ে কাতাদা বর্ণনা করেছেন, ওই ঘটনার পর হজরত দাউদ সবসময় অপরাপর অপরাধীদের সঙ্গে ওঠাবসা করতেন এবং বলতেন, হে দাউদ! তুমিও তো গোনাহগার। সুতরাং তাদেরই দলভূত হয়ে থাকো। পানিতে অশ্রু না মেশা পর্যন্ত তিনি ওই পানি পান করতেন না। শুকনো রুটিকেও তিনি করতেন অশ্রুসিক্ত। তারপর ভক্ষণ করতেন তাতে কিছু লবন ও ছাই মিশিয়ে। বলতেন, গোনাহগারদের খাদ্য এরকমই হয়। আগে তিনি অর্ধরাত্রি বিশ্রাম করতেন, বাকী অর্ধরাত্রি কাটাতেন ইবাদতে এবং রোজা রাখতেন একদিন পর একদিন। কিন্তু এই ঘটনার পর প্রায় সারারাত্রি কাটিয়ে দিতেন ইবাদতে এবং প্রায় প্রতিদিনই রাখতেন রোজা।

সাবেত বলেছেন, হজরত দাউদ যখন আল্লাহ্‌র শাস্তির কথা স্মরণ করতেন, তখন তাঁর অস্থিসন্ধিসমূহ হয়ে পড়তো শিথিল। নিজেকে তিনি আর তখন সংযত রাখতে পারতেন না। আবার রহমতের কথা স্মরণ করলে তিনি হতেন প্রকৃতিস্থ। এক বর্ণনায় এরকমও এসেছে যে, তিনি যখন যবুর শরীফ পাঠ করতেন, তখন তা

শোনার জন্য সমবেত হতো জঙ্গলের জীবজন্তু ও পাখিরা। কিন্তু এই ঘটনার পর তারা জড়ো হতো বটে, কিন্তু বলতো, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার স্খলন যে আপনার কণ্ঠস্বরের মিষ্টতাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি'। একথার অর্থ— হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধিত্ব দিয়েছি এবং করেছি তোমার পূর্ববর্তী নবী রসুলগণের যথার্থ উত্তরসূরী। এখানে 'খলিফা' অর্থ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি।

জ্ঞাতব্য ঃ একবার হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব হজরত তালহা, হজরত যোবায়ের, হজরত কাব এবং হজরত সালমান ফারসীকে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন তো, খলিফা ও বাদশাহ'র মধ্যে পার্থক্য কী? হজরত তালহা ও হজরত যোবায়ের বললেন, আমরা জানি না। হজরত সালমান ফারসী বললেন, খলিফা তিনি, যিনি জনগণের প্রতি ন্যায়বিচার করেন, সকলের জীবিকা বণ্টন করেন সমভাবে, মানুষের প্রতি দয়ামায়া প্রদর্শন করেন আপন পরিবার পরিজনের মতো এবং সকল সমস্যার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে। হজরত কা'ব একথা শুনে বললেন, আমি মনে করেছিলাম, আমি ছাড়া এই মজলিশের অন্য কেউ এতদুভয়ের পার্থক্য সম্পর্কে জানে না। হজরত সালমান বলেন, একবার হজরত ওমর জিজ্ঞেস করেন, আমি খলিফা না বাদশাহ্। আমি বললাম, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! আপনি যদি মুসলমানদের জমি থেকে এক দিরহাম অথবা এরও কম আদায় করেন এবং তা ব্যয় করেন অসিদ্ধ কোনো ক্ষেত্রে, তবে বুঝবেন আপনি খলিফা নন, বাদশাহ। একথা শোনার পর হজরত ওমরের চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

সুলায়মান ইবনে আবুল আওজা বলেছেন, একবার এক সমাবেশে হজরত ওমর বললেন, আমি জানি না, আমি খলিফা, না বাদশাহ। এক লোক বললো, হে আমিরুল মুমিনীন! এই দুই পদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। হজরত ওমর বললেন, কী রকম? লোকটি বললো, খলিফা যা নিয়ে থাকেন, তা সত্যের উপরে নিয়ে থাকেন এবং যা দিয়ে থাকেন, তা-ও দিয়ে থাকেন সত্যের উপরে। আলহামদু লিল্লাহ্। আপনি সেরকম। আর বাদশাহ হয়ে থাকে জালেম। সে একজনের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে এবং অন্যকে তা প্রদানও করে অন্যায়ভাবে। একথা শোনার পর হজরত ওমর নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

হজরত মুয়াবিয়া যখন মিম্বরে বসতেন, তখন বলতেন, হে জনমণ্ডলী! ধনসম্পদকে একত্র করা এবং বণ্টন করার নাম খেলাফত নয়, বরং খেলাফত হচ্ছে সতত সত্যাধিষ্ঠিত হওয়ার নাম। যেমন ন্যায়বিচারের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুসারে জবাবদিহিতার মাধ্যমে জনগণের দায়িত্ব পালন করা।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার করো এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কোরো না, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে

বিচ্যুত করবে'। এখানে 'বিল হাক্বক্ব' অর্থ আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে সুবিচার করো। 'ওয়ালা তাত্তাবিয়িল হাওয়া' অর্থ প্রবৃত্তির অনুসরণ বা খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কোরো না'। 'আ'ন সাবীলিল্লাহ' অর্থ আল্লাহ্‌র পথ থেকে। অর্থাৎ আল্লাহ্ যে সকল বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছেন, সেই সকল বিধি-বিধান থেকে তোমাকে বিচ্যুত করবে, করবে বিপথগামী। উল্লেখ্য, যারা প্রবৃত্তির অনুসারী, তাদের ন্যায়বিচারবোধ হয় বিপর্যস্ত। এ ধরনের প্রবৃত্তিপূজকেরাই এই উম্মতের ভ্রষ্ট ফেরকাসমূহের উদগাতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়, তদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে'। এখানকার 'বিমা নাসূ' (বিস্মৃত হয়ে আছে) কথাটির 'মা' ক্রিয়ামূলরূপে ব্যবহৃত। অর্থাৎ তাদের কঠিন শাস্তি হবে মহাবিচারের দিবসের জবাবদিহিতার কথা ভুলে যাবার জন্যই। আর ওই দিবসের কথা স্মরণ রাখা যেতে পারে কেবল আল্লাহ্‌র পথে অবিচল থেকে এবং প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করে।

সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ২৭, ২৮, ২৯

❑ আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নাই। অনর্থক সৃষ্টি করার ধারণা উহাদের যাহারা কাফির, সুতরাং কাফিরদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।

❑ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, আমি কি তাহাদিগকে সমান গণ্য করিব? আমি কি মুত্তাকীদিগকে অপরাধীদের সমান গণ্য করিব?

❑ এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে মানুষ ইহার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি জনতাকে জানিয়ে দিন, আমি আকাশ-পৃথিবীসহ এই বিশাল সৃষ্টি ক্রীড়াচ্ছলে ও শুভ উদ্দেশ্য

ব্যতিরেকে সৃষ্টি করিনি। এ সকল কিছুই হচ্ছে আমার সত্তা-গুণবত্তা-কার্যাবলীর নিদর্শন। মানুষ এ সকল কিছু দেখে আমার আনুগত্য ও দাসত্বকে স্বীকার করবে এবং আমার যথার্থ উপাসনার মাধ্যমে লাভ করবে আমার পরিতোষ ও আরো বহুবিধ অনুগ্রহসম্ভার। বেঁচে থাকবে তাদের প্রবৃত্তির অশুভ প্ররোচনা থেকে। যারা এরকম করবে না, তারা অবশ্যই দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। সুতরাং তাদের জন্য জাহান্নামের অনন্ত দুর্ভোগ অনিবার্য।

এখানে 'বাত্বিলা' অর্থ অনর্থক, উদ্দেশ্যবিহীন। অর্থাৎ যারা এই মহাসৃষ্টিকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে বলে মনে করে, তারা প্রবৃত্তিপূজক, সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধাচারী। এরকম লোকেরা অবশ্যই কাফের, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আর তাদের জাহান্নামবাসও অবধারিত। এখানে 'লিল্লাজীনা কাফারু' (যারা কাফের) কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করে তাদেরকে করা হয়েছে অধিকতর তিরস্কারার্হ ও নিন্দার্হ।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, আমি কি তাদেরকে সমান গণ্য করবো? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করবো'?

এখানে 'আম নাজ্‌আ'লু' কথাটির 'আম' অর্থ 'বাল' (বরং)। এভাবে এখানকার বক্তব্যার্থটি দাঁড়ায়— এই মহাবিশ্বকে যদি অনর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীন বলে মনে করা হয়, তবে সত্যাশ্রয়ী বিশ্বাসী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবিশ্বাসীদের মধ্যে আর কোনো মর্যাদাগত পার্থক্য থাকে না। সত্য ও মিথ্যা উভয়টি হয়ে যায় সমান। এমতো অপসমতার অপনোদনার্থেই এখানে উত্থাপিত

হয়েছে প্রথমোক্ত অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্নটি। আর 'আম' ('বাল') শব্দটির মাধ্যমেই এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীন নয় এমতো বক্তব্যটিকে করা হয়েছে সুপরিস্ফুট।

পরের প্রশ্নটিও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ পুণ্যবান ও পাপিষ্ঠরা কখনোই সমান বলে গণ্য হতে পারে না। এভাবে এখানকার শেষোক্ত অস্বীকৃতিটি হয়েছে প্রথমোক্ত অস্বীকৃতিটির পরিপূরক। আলোচ্য আয়াতে পুনরুত্থানের অবশ্যম্ভাবিতার একটি বৌদ্ধিক প্রমাণ নিহিত রয়েছে, যা প্রমান করে পুনরুত্থানের অবশ্যম্ভাবী স্বীকৃতি। কারণ, এ জগতে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মাঝে বিরাজমান রয়েছে অসমতা। ধন সম্পদ সন্তান-সন্ততিতে অবিশ্বাসীরাই সাধারণতঃ বিশ্বাসীদের চেয়ে সমৃদ্ধ। এ কারণেই এই পৃথিবীর জীবন সাঙ্গ হওয়ার পর অন্য কোন স্থানে উভয়ের চিত্তবৃত্তি অনুসারে প্রতিদান পাওয়া জ্ঞানতঃ অনিবার্য। আর সেটাই হবে পুনরুত্থানের জগত।

মুকাতিল বলেছেন, মক্কার মুশরিকেরা বিশ্বাসীগণকে বলতো, পরকালে যে সুফল তোমরা লাভ করবে, তেমনি লাভ করবো আমরাও। তাদের এমতো অপকথনের পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'এক কল্যাণময় কিতাব, এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার প্রতি অবতারিত এই কোরআন মহাকল্যাণময় এবং

সুপ্রচুর সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ। আমি এই কোরআন আপনার উপর একারণেই অবতীর্ণ করেছি যে, মানুষ যেনো এর আয়াতসমূহ পাঠ করে, শোনে ও অনুধাবন করতে চেষ্টা করে। আর যারা সুস্থ ও শুভ বোধবুদ্ধিসম্পন্ন, তারা যেনো হয়ে যায় এর পুণ্যময় উপদেশাবলীর অনুরাগী, অনুগামী ও বাস্তবায়নকারী।

এখানে 'কিতাব' অর্থ এই কোরআন, যা আকশজ বাণী বৈভবরূপে অবতীর্ণ হয়েছে মহাবিশ্বের মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। 'মুবারাকুন' অর্থ 'মহাকল্যাণময়, 'লিইয়াদ্দাব্বারূ' অর্থ যেনো অনুধাবন করে। অর্থাৎ এই উম্মতের জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেনো সচেষ্ট হয় এর আয়াতসমূহের মর্মোদ্ঘাটনে। অথবা এর অর্থ— জ্ঞানীরা যেনো গভীরভাবে একথা বুঝতে চেষ্টা করে যে, এই গ্রন্থ অবশ্যই অবতারিত হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। এই গ্রন্থ মনুষ্যরচিত অবশ্যই নয়। হওয়া সম্ভবও নয়। হাসান বলেছেন, এখানে অনুধাবন করার অর্থ কোরআনের আয়াতের অনুসরণ করা, এর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহকে সর্বান্তঃকরণে মান্য করে চলা।

'ওয়া লিইয়াতাজাক্কারা উলুল আল্‌বাব্‌' অর্থ এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ। ভ্রষ্ট খারেজীরা বলে, আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করার ক্ষেত্রে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের রয়েছে স্বভাবগত মৌলিক যোগ্যতা। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, এমতো যোগ্যতা আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রদত্ত এক বিশেষ দয়া ও দান। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতারিত গ্রন্থ সেই বিশেষ দয়া ও দানের প্রতিভূ। সুতরাং আকাশজ গ্রন্থের সহায়তা ব্যতিরেকে কেবল বোধ ও বুদ্ধি প্রকৃত সত্যের স্বরূপ উন্মোচন করতে অক্ষম। সেকারণেই এখানে এসেছে কিতাব অধ্যয়ন ও অনুধাবনের নির্দেশ। এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'অনুধাবন করে' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে প্রাথমিক জ্ঞানের সঙ্গে। আর পরিণত বা চূড়ান্ত জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে 'গ্রহণ করে উপদেশ' কথাটির।

সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯. ৪০

---

www.eelm.weebly.com

❑ আমি দাউদকে দান করিলাম সুলায়মান। সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী।

❑ যখন অপরাহ্নে তাহার সম্মুখে ধাবনোদ্যত উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হইল,

❑ তখন সে বলিল, 'আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে;

❑ 'এইগুলিকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন কর।' অতঃপর সে উহাদের পদ ও গলদেশ ছেদন করিতে লাগিল।

❑ আমি তো সুলায়মানকে পরীক্ষা করিলাম এবং তাহার আসনের উপর রাখিলাম একটি ধড়; অতঃপর সুলায়মান আমার অভিমুখী হইল।

❑ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যাহার অধিকারী আমি ছাড়া কেহ না হয়। তুমি তো পরম দাতা।'

❑ তখন আমি তাহার অধীন করিয়া দিলাম বায়ুকে, যাহা তাহার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করিত সেথায় মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইত,

❑ এবং শয়তানদিগকে, যাহারা সকলেই ছিল প্রাসাদ-নির্মাণকারী ও ডুবুরী,

❑ এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ আরও অনেককে।

❑ 'এইসব আমার অনুগ্রহ, ইহা হইতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখিতে পার। ইহার জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হইবে না।'

❑ এবং আমার নিকট রহিয়াছে তাহার জন্য নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এবার শুনুন নবী দাউদের পুত্র নবী সুলায়মানের বৃত্তান্ত। সুলায়মান ছিলো দাউদের পুত্র। সে ছিলো আমার প্রিয়ভাজন দাস এবং ছিলো আমার একান্ত অনুগত।

এখানে 'ইন্নাহু আউয়াব্' (সে ছিলো অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী) কথাটি প্রথমোক্ত বাক্যটির কারণ। অর্থাৎ সুলায়মান আমার একান্ত অনুগত অথবা আমার প্রতি অতিশয় অনুরাগী ছিলো বলেই ছিলো আমার প্রিয়ভাজন দাস।

পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'যখন অপরাহ্নে তার সম্মুখে ধাবমানোদ্যত উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হলো'। একথার অর্থ— একদিনের ঘটনা। সেদিন বিকেলে সুলায়মান যুদ্ধের জন্য সযত্নে পালিত কিছুসংখ্যক সুদৃশ্য তেজী ঘোড়া পরিদর্শন করতে করতে মশগুল হয়ে পড়লো। এভাবে সূর্য অস্তমিত হলো। বাদ পড়ে গেলো তার অপরাহ্নকালীন নির্ধারিত ইবাদত।

এখানে 'বিল আ'শিয়্যি' অর্থ অপরাহ্ন, দিবসের শেষ ভাগ। 'আস্সফিনাতু' অর্থ উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি। 'সাফিন' অর্থ ওই অশ্ব, যে দাঁড়িয়ে থাকে তার তিনটি পায়ের উপর এবং চতুর্থ পা আলতোভাবে লাগিয়ে রাখে মাটিতে। এরকম অশ্বই হয়ে থাকে অভিজাত শ্রেণীর, উৎকৃষ্ট বংশোদ্ভূত।

'আল জ্বিয়াদ' শব্দটি 'জ্বদ' অথবা 'জ্বাওয়াদ' এর বহুবচন। এর অর্থ ধাবমানোদ্যত, ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন। কারো কারো মতে শব্দটি বহুবচন 'জাইয়েদ' এর, যার অর্থ বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ— সবার আগে ছুটে চলা দূরন্ত প্রকৃতির ঘোড়া। কারো কারো মতে, 'ধাবমানোদ্যত' ও 'উৎকৃষ্ট' বলে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে ওই ঘোড়াগুলোর দুইটি বিশেষ গুণ।

কালাবী বলেছেন, হজরত সুলায়মান দামেস্ক ও নসিবাঈনবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে হস্তগত করেছিলেন এক হাজার উত্তম জাতের ঘোড়া। মুকাতিল বলেছেন, হজরত সুলায়মান হজরত দাউদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন উৎকৃষ্টজাতের এক সহস্র অশ্ব। কিন্তু তাঁর এই বিবরণটি যথার্থ নয়। কেননা তা একটি হাদিসের পরিপন্থী, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স.বলেছেন, আমরা নবী-রসুলেরা উত্তরাধিকার রাখি না, আমাদের পরিত্যক্ত সকল কিছু হয়ে যায় দান।

www.eelm.weebly.com

ইব্রাহিম তাঈমীর বরাত দিয়ে আবদ ইবনে হুমাইদ, ফারইয়াবী, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, নবী সুলায়মানের ছিলো বিশ হাজার ঘোড়া এবং সেগুলো ছিলো পাখিদের মতো ডানাবিশিষ্ট। ওই ঘোড়াগুলোকে তিনি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোরবানী করেছিলেন।

আউফের সূত্রে আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, হাসান বলেছেন, আমার কাছে এরকম তথ্য পৌঁছেছে যে, হজরত সুলায়মান যে ঘোড়াগুলোকে জবেহ করেছিলেন, সেগুলো ছিলো ডানাওয়ালা। আর ঘোড়াগুলো ধরে আনা হয়েছিলো সমুদ্রাভ্যন্তর থেকে। তাঁর পূর্বে ও পরে অন্য কেউ এরকম সামুদ্রিক ঘোড়ার অধিকারী ছিলো না। ইকরামা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, সেগুলো ছিলো বিশ হাজার ডানাযুক্ত ঘোড়া।

বর্ণনাকারীদের মতে ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে— হজরত সুলায়মান দ্বিপ্রহরে নামাজের পর তাঁর জন্য নির্ধারিত আসনে সমাসীন হলেন। তাঁকে দেখানোর জন্য সারিবদ্ধভাবে ঘোড়াগুলোকে তাঁর সামনে নিয়ে আসা হতে লাগলো। এভাবে নয় শত ঘোড়া দেখার পর তাঁর আসরের নামাজের কথা মনে পড়লো। দেখলেন, সূর্য ততোক্ষণে অস্তমিত হয়েছে। নামাজের সময় আর নেই বলে তিনি যারপরনেই মনঃক্ষুণ্ন হলেন।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'তখন সে বললো, আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্যপ্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছে'।

এখানে 'আল খইর' অর্থ প্রচুর ধন সম্পদ, প্রতুল বিত্তবৈভব। অর্থাৎ ওই সকল নয়নপ্রীতিকর অশ্ব, যার কারণে শেষ হয়ে গিয়েছিলো আসরের নামাজ পাঠের নির্ধারিত সময়। অথবা এখানে 'আল খইর' অর্থ 'আল খইল'। অর্থাৎ অশ্বরাজি। কেননা আরববাসীগণ ব্যাপকহারে 'র' এর স্থলে 'লাম' এবং 'লাম' এর স্থলে 'র' বর্ণের প্রয়োগ ঘটিয়ে থাকেন। যেমন তাঁরা 'ইখতাল্তু' এর উচ্চারণ করেন 'ইখতার্তু' (আমি তাকে ধোকা দিয়েছি)।

ঘোড়াকে 'খইর' (কল্যাণ) বলা হয়ে থাকে একারণে যে, তার কপালে রয়েছে কল্যাণের বিচ্ছুরণ। যেমন এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, রোজ কিয়ামত পর্যন্ত অশ্বের ললাটদেশে থাকবে সৌভাগ্যের জয়টিকা, যা হবে পুণ্য ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আনয়নকারী। বহুসংখ্যক সাহাবী থেকে হাদিসটি আপনাপন 'বিশুদ্ধ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

'আহবাব্তু' এর অর্থ 'আছারতু' (আমি প্রাধান্য দিয়েছি) ধরা হলে আরবী ভাষার রীতি অনুসারে 'আ'ন' এর পরিবর্তে আসে 'আ'লা'। সেই হিসেবে এখানে 'আ'ন জিকরি রব্বী' এর স্থলে হওয়া উচিত ছিলো 'আ'লা জিকরি রব্বী'। কিন্তু এখানে 'আ'ন জিকরি রব্বী'ই বলা হয়েছে। (আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়েছি) এরকম করা হয়েছে অবশ্য প্রাধান্য প্রদানের মধ্যে বিমুখতা প্রদর্শনেরও মনোভাব রয়েছে বলে।

কোনো কোনো ভাষাবিশারদ এখানকার 'আহ্বাব্তু' কথাটির অর্থ করেছেন— আমি বসে আছি এবং এখানে 'হুব্বুল খইর' হচ্ছে কর্মকারক, যার মধ্যে বিবৃত হয়েছে কর্মের কারণ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— অশ্বগুলোর মায়ায় আমি এতোক্ষণ ধরে ঠায় বসে রয়েছি

'হাত্তা তাওয়ারাত্ বিল হিজাব্' অর্থ এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সূর্য অন্তর্হিত হয়েছে পশ্চিমের দিকচক্রবালের অন্তরালে। আর ইতোপূর্বের আয়াতের 'আ'শিয়্ই' এর রূপক অর্থ যেহেতু সূর্য, তাই এই আয়াতে স্পষ্ট করে সূর্যের উল্লেখ না করে 'তাওয়ারাত' এর সর্বনামকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে সূর্যের। বাগবী লিখেছেন, 'হিজাব' একটি পাহাড়ের নাম, যার দূরত্ব ককেসাস পর্বতমালা থেকে এক বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। সূর্য অস্তগমন করে ওই পাহাড়ের অন্তরালে।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'এগুলোকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন করো। অতঃপর সে তার পদ ও গলদেশ ছেদন করতে লাগলো'। একথার অর্থ— তখন সুলায়মান ভাবলো, এই ঘোড়াগুলোর চিত্তহারী সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ার কারণেই যেহেতু আসরের নামাজ কাজা হয়ে গেলো, সেহেতু সেগুলোকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোরবানী করাই শ্রেয়ঃ। একথা ভেবেই সে তার অনুচরবর্গকে

আদেশ দিলো, ওগুলোকে আবার আমার কাছে আনো। অনুচরবর্গ যথারীতি আদেশ প্রতিপালন করলো। তখন সে আমার নাম নিয়ে কর্তন করতে লাগলো অশ্বগুলোর পদসমুদয় ও কণ্ঠদেশ।

এখানে 'মাস্হাম্ বিস্সুক্বি' অর্থ উরু ছেদন করলো। এরকম অর্থ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান, কাতাদা, মুকাতিল এবং অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণ। ইবনে জুরাইজ সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত সুলায়মান ঘোড়াগুলোর পা কেটে দিয়েছিলেন তলোয়ার দিয়ে। হজরত উবাই ইবনে কা'বের উদ্ধৃতি দিয়ে তিবরানী তার 'আল আউসাত' গ্রন্থে, ইসমাইল তার 'মুয়া'জম' গ্রন্থে এবং ইবনে মারদুবিয়া উত্তমসূত্রপরম্পরায় বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

তখন আল্লাহ্‌র আদেশে তরবারী দিয়ে ঘোড়াগুলোর পা ও গর্দান কেটে ফেলা হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ্‌র স্মরণচ্যুতির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার ক্ষতিপূরণ, তাঁর নৈকট্য লাভের প্রত্যাশা এবং তাঁরই পরিতোষার্জনের উদগ্র অনুরাগ।

হাসান বলেছেন, হজরত সুলায়মান যখন ওই অশ্বগুলো বধ করলেন, তখন আল্লাহ্‌ তাঁকে দান করলেন তদপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট ও অত্যধিক গতিসম্পন্ন বাহন। অর্থাৎ বাতাসকে করে দিলেন তাঁর নির্দেশানুগত।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, হজরত সুলায়মান জবেহকৃত ঘোড়াগুলোর গোশত দান করে দিয়েছিলেন প্রজাসাধারণকে। তাঁর শরিয়তের বিধানে ঘোড়ার গোশত হালাল ছিলো। আমাদের শরিয়তেও ঘোড়ার গোশত হালাল বলে মতপ্রকাশ করেছেন অধিকাংশ ধর্মবেত্তা। কেবল ইমাম আবু হানিফার মতে ঘোড়ার গোশত মকরুহ (অপছন্দনীয়)।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, তিনি ওই ঘোড়াগুলোকে জেহাদের জন্য ওয়াকফ (দান) করে দিয়েছিলেন এবং তলোয়ার দিয়ে সেগুলোর গলায় ও পায়ে লাগিয়ে দিয়েছিলেন বিশেষ চিহ্ন।

জুহুরীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, হজরত সুলায়মান 'এগুলিকে পুনরায় আমার সামনে নিয়ে এসো' এরকম নির্দেশ দিয়েছিলেন ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ সূর্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন অস্তমিত সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনো, যেনো আমি আসরের নামাজ আদায় করতে পারি। ফেরেশতারা তাই করলো এবং তিনি সময়মতো আসরের নামাজ আদায় করে নিলেন। জুহুরী ও ইবনে কীসান বলেছেন, হজরত সুলায়মান মায়া-মমতাবশতঃ ওই ঘোড়াগুলোর গলার ও পায়ের ধুলো নিজ হাতে সরিয়ে দিয়েছিলেন। বাগবী মন্তব্য করেছেন, তাঁদের এই অভিমতটি অদৃঢ়। এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য উক্তিগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে ইতোপূর্বেই।

আমার মতে হজরত সুলায়মান 'আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্যপ্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়েছে' এরকম কথা বলেছিলেন অতিশয় অনুশোচনার সঙ্গে। আর তাঁর এমতো উক্তিই জুহুরীর ব্যাখ্যাকে ভুল প্রমাণিত করে।

এর পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'আমি তো সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপরে রাখলাম একটি ধড়; অতঃপর সুলায়মান আমার অভিমুখী হলো'। একথার অর্থ— আমি সুলায়মানকে পুনরায় পরীক্ষা করলাম। এবার তার সিংহাসনের উপরে ফেলে রাখলাম হাত-পা ছাড়া একটি মানবশিশুর শরীর। আমার এমতো পরীক্ষার উদ্দেশ্য সে বুঝতে পারলো তৎক্ষণাৎ এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে মুখ ফেরালো অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে।

এখানে 'ফাতান্না' অর্থ পরীক্ষা করলাম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, একদিন সুলায়মান নবী বললেন, আজ রাতে আমি আমার নিরানব্বই জন (অন্য বর্ণনামতে একশ জন) সহধর্মিণীর কাছে গমন করবো। ফলে প্রত্যেকের গর্ভে জন্ম লাভ করবে একজন করে নিপুণ অশ্বারোহী মুজাহিদ। ফেরেশতাগণ একথা শুনে বললেন, 'ইনশাআল্লাহ্‌' বলবেন। কিন্তু তিনি 'ইনশাআল্লাহ্‌' বলতে ভুলে গেলেন। সেকারণেই সে রাতে তিনি তাঁর প্রত্যেক পত্নীর সঙ্গে মিলিত হওয়া সত্ত্বেও কেউই গর্ভ ধারণ করলো না। গর্ভবতী হলো কেবল একজন। সে কিছুকাল পর জন্ম দিলো একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিহীন শিশু। শপথ সেই পবিত্রতম সত্তার, যার অধিকারে মোহাম্মদের জীবন, তিনি যদি 'ইনশাআল্লাহ্‌' বলতেন, তবে তাঁর মহিষীগণ সকলেই সে রাতে গর্ভধারণ করতেন এবং যথাসময়ে তাঁদের উদর থেকে জন্মলাভ করতো এক একজন সুদক্ষ অশ্বারোহী ধর্মযোদ্ধা। বোখারী, মুসলিম। উল্লেখ্য, ওই অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন নবজাতককে ধাত্রী নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়েছিলো হজরত সুলায়মানের সিংহাসনে। সেদিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে 'তার আসনের উপর রাখলাম একটি ধড়'।

'ছুম্মা আনাব্‌' অর্থ আমার অভিমুখী হলো। অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য তিনি সাবধান হলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, আর কখনো 'ইনশাআল্লাহ্‌' বলা পরিত্যাগ করবেন না। ইমাম তাউস এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যাটি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য। কেননা এ সম্পর্কে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের ভাষ্যও এ প্রকারের।

'জ্বাসাদা' অর্থ ওই দেহ, যাতে প্রাণের স্পন্দন নেই। উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে এখানে এমতো অর্থই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়। কেননা নবী-রসুলগণের পবিত্রতা নিঃসন্দেহে কালিমামুক্ত। কিন্তু তিবরানী তাঁর 'আল আউসাত' গ্রন্থে এবং ইবনে মারদুবিয়া শিথিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, নবী সুলায়মানের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলো। জ্বিনেরা নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করলো, এই শিশু যদি জীবিত থাকে, তবে পরবর্তী সময়ে এর জবরদস্তিমূলক আনুগত্য থেকে আমরা কিছুতেই নিস্তার পাবো না। তাই আমাদের উচিত, একে হত্যা করা, অথবা পাগল বানিয়ে দেওয়া। নবী সুলায়মান তাদের এই গোপন দুরভিসন্ধির কথা জানতে পারলেন। তাই শিশুটিকে লুকিয়ে রেখে দিলেন মেঘপুঞ্জের ভিতর। পরে হঠাৎ একদিন দেখলেন, তাঁর সিংহাসনে পড়ে রয়েছে শিশুটির মৃতদেহ। এটাই ছিলো তাঁর জন্য পরীক্ষা। কেননা তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করেননি।

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক সূত্রে বাগবী লিখেছেন, ওয়াহাব ইবনে মুনাববাহ বলেছেন, হজরত সুলায়মান ছিলেন জল-স্থলের একচ্ছত্র বাদশাহ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা ছিলো তাঁর অনুগত। একদিন তিনি জানতে পারলেন, সম্পূর্ণরূপে দুর্গম সমুদ্রবেষ্টিত সায়দুন নামক এক দ্বীপরাজ্য স্বাধীনভাবে শাসন করে চলেছে এক বিধর্মী রাজা। বাতাস ছিলো হজরত সুলায়মানের নির্দেশানুগত। তাই তিনি একদিন বাতাসবাহী সিংহাসনে সমারূঢ় হয়ে বহুসংখ্যক লোকলস্কর ও জ্বিন সঙ্গে নিয়ে গমন করলেন ওই রাজ্যে। সেখানকার রাজাকে কতল করে গণিমতরূপে লাভ করলেন দ্বীপরাজ্যটির সকল ধনসম্পদ। আরো পেলেন রূপসী রাজকন্যা জারাদাহ্কে। তাকে আহ্বান জানালেন সত্য ধর্মের দিকে। রাজকন্যা জারাদাহ্ অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে আহ্বান কবুল করলো। হজরত সুলায়মান তখন তাকে পরিণয়াবদ্ধ করলেন। তাকে ভালোও বাসতে শুরু করলেন অন্য রাণীদের চেয়ে বেশী। তৎসত্ত্বেও জারাদাহ্ দিনাতিপাত করতো বিষণ্নচিত্ত হয়ে। চোখ থাকতো সারাক্ষণ অশ্রুসজল। তাই নবী-সম্রাট সুলায়মান একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, কী কারণে তুমি এতো কষ্ট পাও? জারাদাহ্ বললো, সম্রাটপ্রবর! আমার প্রয়াত পিতা ও তার রাজত্বের কথা যে আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। তিনি বললেন, কেনো, তুমি তো এখন তার চেয়ে অনেক বিশাল সাম্রাজ্যের স্বনামধন্যা সম্রাজ্ঞী। তদুপরি তুমি পেয়েছ সত্য ধর্মের পরিচয়। এই নেয়ামত তো অতুলনীয়। জারাদাহ্ বললো, সে কথা সত্যি। তবু পিতার কথা মনে হলে আমি হয়ে পড়ি শোকাকুলা। তাই আমার মিনতি, আপনি জ্বিনদেরকে দিয়ে আমার পিতার একটি মূর্তি তৈরী করিয়ে দিন। আমি সকাল-সন্ধ্যা ওই মূর্তির দিকে তাকালে হয়তো কিছুটা সান্ত্বনা খুঁজে পাবো।

হজরত সুলায়মান শিল্পী জ্বিনদেরকে হুকুম করলেন, যতো তাড়াতাড়ি পারো নিখুঁতভাবে সম্রাজ্ঞী জারাদাহের পিতার মূর্তি নির্মাণ করে দাও। জ্বিনেরা হুকুম পালন করলো। জারাদাহ্ তাজ্জব হয়ে দেখলো, মুর্তিটি অবিকল তার বাপের মতো। সে তখন মূর্তিটিকে বস্ত্রাবৃত করলো। মাথায় বেঁধে দিলো উষ্ণীষ। তার বাপ যেভাবে যে কাপড়ে সাজতো, মূর্তিটিকে সেভাবেই সাজিয়ে দিলো সে। হজরত সুলায়মান যখন তার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন তখন সে দাস-দাসীদেরকে নিয়ে মূর্তির সামনে উপস্থিত হতো। সকাল-সন্ধ্যায় সেটিকে সেজদা করতো। দাস-দাসীদেরকেও এরকম করতে বলতো। এভাবে হজরত সুলায়মানের ঘরেই শুরু হলো মূর্তি পূজা। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি এসব কিছু জানতেই পারলেন না। এ সম্পর্কে প্রথম অবহিত হলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আসফ ইবনে বরখিয়া। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ছিলো তাঁর অবাধ যাতায়াত। তাই মূর্তিপূজার ব্যাপারটি প্রথম অবলোকন করেন তিনিই। সম্রাটকে ডেকে বলেন, আমি এখন শিথিল অস্থিগ্রন্থিসম্পন্ন পরকালাভিমুখী এক বৃদ্ধ। এখন আমার মনে সাধ জেগেছে, জনসমাবেশে আল্লাহ্র নবী-রসুলগণের বৈশিষ্ট্যাবলীর সম্যক বিবরণ দেই। তাঁদের সম্পর্কে লোকে যা জানে না, তা বলি। হজরত সুলায়মান বললেন, ঠিক আছে।

তাই হবে। তিনি তখন লোকজনকে সমবেত হতে বললেন। সকলে সমবেত হলে আসফ বক্তৃতা করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। জনসমক্ষে দিতে শুরু করলেন পূর্ববর্তী যুগের নবীগণের বিভিন্ন গুণবত্তার বিবরণ। শেষে এলো বর্তমান নবী সুলায়মান প্রসঙ্গ। তাঁর প্রসঙ্গে বললেন, সম্রাট সুলায়মানও আল্লাহ্র নবী। বাল্যবেলায় তিনি ছিলেন তীক্ষ্নধীসম্পন্ন ও সহিষ্ণু। তখন তিনি সংযমীও ছিলেন। আর আদেশ দান করতেন বিজ্ঞতার সঙ্গে। নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকেও থাকতেন অনেক দূরে। হজরত সুলায়মান বললেন, আসফ! তুমি তো কেবল আমার বাল্যবেলার কথাই বললে। আমার পরিণত বয়সের কথা কিছুই বললে না। পরে অন্দর মহলে নিয়ে জানালেন তাঁর অসন্তোষের কথা। আসফ বললেন, সম্রাটপ্রবর কি জানেন, একটি নারীর রূপমুগ্ধ হওয়ার কারণে তাঁর ঘরে চল্লিশ দিন ধরে চলেছে প্রতিমাপূজা? তিনি বললেন, কী বলছো তুমি? আমার ঘরে? আসফ বললেন, হ্যাঁ, আপনারই ঘরে। তিনি উচ্চারণ করলেন 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন'। বুঝতে পারছি, তুমি না জেনে শুনে কিছুই বলোনি। একথা বলেই তিনি জারাদাহের ঘরে গেলেন। মূর্তিটি ভেঙে চুরমার করলেন। জারাদাহ্কে দিলেন কঠিন শাস্তি। তারপর রাজ পোশাক খুলে পরলেন সাধারণ পোশাক, যার সুতা কেটেছিলো ও বয়ন করেছিলো কুমারী মেয়েরা এবং যা প্রাপ্তবয়স্ক কোনো নারী-পুরুষ দ্বারা ইতোপূর্বে স্পর্শিতও হয়নি। ওই পোশাক পরে তিনি চলে গেলেন জঙ্গলে। সেখানে চুলার ছাই দিয়ে নির্মাণ করলেন বিছানা। তারপর ওই ভস্মশয্যার উপরে লুটিয়ে পড়লেন সেজদায়। ডুকরে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন মহামহিম আল্লাহ্র সমীপে। দিবাবসান হলে সাশ্রুনয়নে স্বআবাসে ফিরে এলেন আল্লাহ্র নবী হযরত সুলায়মান।

এরপর মহাবিপদ দেখা দিলো অন্য দিক থেকে। তাঁর ছিলো এক অতি বিশ্বস্ত ক্রীতদাসী। নাম তার আমিনা। ওই আমিনার কাছেই তিনি গচ্ছিত রাখতেন তাঁর নাম খচিত রাজকীয় মোহরাঙ্কিত আংটি, যখন যেতেন শৌচাগারে অথবা কোনো রাণীর একান্ত সন্নিধানে। প্রয়োজন পূরিত হবার পর পাকপবিত্র হয়ে ওই আংটিটি পুনরায় পরিধান করতেন হাতে। অর্থাৎ অপবিত্র শরীরে ওই আংটিটি তিনি পরিধান করতেন না। একদিন তিনি আংটিটি আমিনার হাতে দিয়ে প্রবেশ করলেন শৌচাগারে। একটু পরে আমিনার সামনে হজরত সুলায়মানের আকৃতি ধরে আবির্ভূত হলো সখর নামের এক সামুদ্রিক জ্বিন। তাকে দেখেই আমিনা আংটিটি দিয়ে দিলো। বুঝতেই পারলো না যে, তিনি হজরত সুলায়মান নন। সখর আংটিটি সঙ্গে সঙ্গে হাতে পরে নিলো। গিয়ে বসলো রাজসিংহাসনে। দরবারে যথারীতি সমবেত হলো মানুষ, জ্বিন ও বিহঙ্গবাহিনী। সকলেই মনে করতে লাগলো, ইনিই মহামান্য সম্রাট সুলায়মান। ওদিকে শৌচাগার থেকে পবিত্র হয়ে বেরিয়ে এলেন হজরত সুলায়মান। তাঁকে দেখেই হতচকিত হলো আমিনা।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু তার মনে হলো, এ লোক আসল সুলায়মান নন। বললো, কে তুমি? তিনি বললেন, আমি সুলায়মান ইবনে দাউদ। আমিনা বললো, তুমি মিথ্যাবাদী। তিনি তো একটু আগেই তাঁর আংটিটি নিয়ে গিয়েছেন।

তিনি এখন স্বসিংহাসনে সমারুঢ়। তাদের কথাকাটাকাটি শুনতে পেয়ে সমবেত হলো অন্দর মহলের লোকেরা। তাদের কাছেও মনে হলো, এ লোক কিছুতেই সুলায়মান ইবনে দাউদ নন। তিনি বুঝতে পারলেন, এবার শুরু হলো তাঁর ভুলের শাস্তি। তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে গেলেন। বনী ইসরাইল জনতার দ্বারে দ্বারে গিয়ে বললেন, আমিই সুলায়মান ইবনে দাউদ। লোকে মনে করলো, তিনি পাগল। তাই দেখামাত্র তাড়িয়ে দিতে লাগলো তাঁকে। কেউ ঢিল ছুঁড়তে লাগলো। কেউ দিতে লাগলো গালি। বলাবলি করতে লাগলো, দ্যাখো, দ্যাখো। এই পাগলের কাণ্ড দেখে যাও। সে নাকি দাউদপুত্র সুলায়মান। বেগতিক দেখে তিনি লোকালয় ছেড়ে চলে গেলেন সমুদ্রের দিকে। সেখানে চাকরী নিলেন এক মৎস্য ঠিকাদারের অধীনে। তিনি তার মাছের বোঝা বাজারে পৌঁছে দিতেন। মজুরী হিসেবে পেতেন দু'টি মাছ। একটি মাছ আগুনে সেঁকে নিতেন। অপরটি দিয়ে কিনতেন একটি রুটি। দিনের পর দিন ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করতে লাগলেন এভাবে। চল্লিশ দিন তাঁর ঘরে মূর্তিপূজা হয়েছিলো বলে এভাবেই তাঁকে বয়ে বেড়াতে হলো মহাবিড়ম্বনা।

ওদিকে রাজদরবারের নিয়মের পরিবর্তন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠলো আসফ ও অন্যান্য বনী ইসরাইল দরবারীদের চোখে। আসফ দরবারীদেরকে একান্তে ডেকে বললেন, তোমরা কি লক্ষ্য করেছো, রাজদরবারের রীতিপ্রকৃতি আর আগের মতো নেই? তারা বললো, হ্যাঁ। সবকিছু যেনো কেমন হয়ে গিয়েছে। আসফ তখন সাক্ষাত করলেন রাজমহিষীগণের সঙ্গে। বললেন, আমরা তো দেখছি রাজা ও রাজদরবার কেমন যেনো বিশৃঙ্খল। আপনারা তেমন কিছু লক্ষ্য করেছেন কী? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। আমরাও তো ভেবে পাচ্ছিনা এমন হচ্ছে কেনো? রাজা যে আমাদেরকে ঋতুবতী অবস্থাতেও রেহাই দেয় না। অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য ফরজ গোসলও করে না। আসফ উচ্চারণ করলেন 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন'। নিঃসন্দেহে এ যে এক সাংঘাতিক পরীক্ষা। চল্লিশ দিন গত হওয়ার পর শয়তান সখরের কারসাজি এভাবে ধরা পড়লো সকলের দৃষ্টিতে। সকলেই তাকে চিনতে পেরেছে দেখে সখর আর রাজ প্রাসাদে তিষ্ঠাতে পারলো না। পালিয়ে গেলো সমুদ্রের দিকে। হাতের আংটিটি খুলে ফেলে ছুঁড়ে মারলো সমুদ্রের অথৈ পানিতে। সঙ্গে সঙ্গে আংটিটি গিলে ফেললো একটি সামুদ্রিক মাছ। মাছটি আবার ধরা পড়লো এক জেলের জালে। মৎস্য ঠিকাদার অন্য মাছের সঙ্গে সেটিকে কিনে নিলো। সারাদিন কাজ করার পর হজরত সুলায়মান মজুরী হিসেবে ওই মাছটি পেলেন আর একটি সাধারণ মাছের সঙ্গে। সাধারণ মাছটির বিনিময়ে খরিদ করলেন রুটি। আর ওই মাছটি সেঁকে নেওয়ার আগে তার পেট চিরে ফেলতেই পেলেন হারানো আংটিটি। সাথে সাথে সেটি হাতের আঙ্গুলে পরলেন। রাজমহিমাও প্রকাশ পেতে শুরু করলো তৎক্ষণাৎ। তিনি রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। পূর্বের মতো রাজানুগত হয়ে দরবারে আগমন করলো বাধ্যানুগত মানুষ, বশীভূত জ্বিন ও একান্ত অনুরক্ত পক্ষীকুল। হজরত সুলায়মান পুনঃপুনঃ ক্ষমাপ্রার্থনা

করতে লাগলেন। প্রকাশ করতে লাগলেন আল্লাহ্‌র সকৃতজ্ঞ মহিমা ও পবিত্রতা। জ্বিনদেরকে নির্দেশ দিলেন, দূরাচার সখরকে এক্ষুণি ধরে নিয়ে এসো। তারা যথারীতি নির্দেশ পালন করলো। গভীর সমুদ্র থেকে ধরে নিয়ে এলো সখরকে। তিনি একটি প্রস্তরখণ্ডে গর্ত করে তার ভিতর ঢোকালেন তাকে। তারপর ওই গর্তের উপরে আর একটি প্রস্তরখণ্ড রেখে লোহা ও রাং দিয়ে আটকে দিলেন শক্ত করে। তারপর আদেশ করলেন, প্রস্তরবন্দী সখরকে এবার ফেলে দাও সমুদ্রের গভীর অতলে। ওহাব কর্তৃক বর্ণিত আনুপূর্বিক ইতিবৃত্তটি এরকমই।

সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, হজরত সুলায়মানের স্ত্রী ছিলো একশতজন। তাদের একজনের নাম ছিলো জারাদাহ্। সে ছিলো তাঁর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়ভাজন ও বিশ্বস্ত। তাই তার কাছেই তিনি প্রয়োজন দেখা দিলে আংটিটি গচ্ছিত রাখতেন। একদিন জারাদাহ্ বললো, মহামান্য সম্রাট! আমার ভাইয়ের সঙ্গে অমুক লোকের ঝগড়া বিবাদ আছে। সুতরাং আমার ভাই মোকদ্দমা নিয়ে হাজির হলে আপনি যেনো তার পক্ষে আপনার সদয় সিদ্ধান্ত দান করেন। তিনি বললেন, আচ্ছা। কিন্তু কার্যতঃ তিনি তাঁর এ অঙ্গীকার পালন করতে পারেননি। মহাবিপদে তিনি পতিত হয়েছিলেন সেকারণেই।

একদিন তিনি জারাদাহের কাছে মোহরাংকিত অঙ্গুরীয়টি রেখে শৌচাগারে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর আকৃতি ধরে এক জ্বিন উপস্থিত হলো জারাদাহের কাছে। জারাদাহ্ তাঁকে অঙ্গুরীয়টি দিয়ে দিলো। ওই জ্বিন অঙ্গুরীয়টি হাতে পরে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে বসলো সিংহাসনে। এদিকে শৌচাগার থেকে বেরিয়ে নবী সুলায়মান জারাদাহের কাছে গিয়ে বললেন, অঙ্গুরীয়টি দাও। জারাদাহ্ বললো, কী বলছেন আপনি! একটু আগেই তো আপনি অঙ্গুরীয়টি নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, অসম্ভব। পরক্ষণেই বুঝলেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে। তিনি তাই আশ্রয় গ্রহণ করলেন নিভৃত প্রকোষ্ঠে। সেখানেও স্বস্তি না পেয়ে বেরিয়ে পড়লেন অজানার উদ্দেশ্যে। ওদিকে ওই জ্বিন শয়তান দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যশাসন করতে লাগলো। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে দেখা দিলো বিশৃঙ্খলা। জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রমাদ গুণলেন। সাধারণ জনতা এর কোনো কারণ ঠাহর করতে পারলো না। একদল বিচক্ষণ লোক

www.eelm.weebly.com

সম্রাজ্ঞীদের সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, আপনারা বলুন তো কেনো এমন হচ্ছে? সম্রাটের নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা-সিদ্ধান্ত যে আগের মতো সুসঙ্গত নয়। ইনিই কি আমাদের স্বনামধন্য সম্রাট? যদি তাই হন, তবে তো আমাদের বলতেই হয় যে, তিনি এখন বুদ্ধিভ্রষ্ট। একথা শুনে সম্রাজ্ঞীরা কাঁদতে শুরু করলেন। বিচক্ষণ লোকেরা রাজমহল থেকে ফিরে এসে তওরাত শরীফ পাঠে মগ্ন হলেন। শয়তান সম্রাট বুঝতে পারলো, তার কারসাজি সকলের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে। তাই কোনোমতে চল্লিশ দিন এলোমেলোভাবে রাজ্য চালাবার পর সে বাধ্য হলো পালিয়ে যেতে। সমুদ্রের দিকে ঘোরাঘুরি করতে করতে একসময় তার অঙ্গুরীয়টি হাত ফসকে পড়ে গেলো সমুদ্রে। একটি মাছ সেটিকে গিলে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে। রাজ্যহারা নবী সুলায়মানও তখন মনের দুঃখে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সমুদ্রের পাড়ে।

ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করে দিনাতিপাত করছিলেন প্রায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে। তিনি একদল মৎস্য শিকারকে দেখতে পেয়ে বললেন, আমি ক্ষুধার্ত। আমাকে একটি মাছ দিতে পারো? আমি তোমাদের সম্রাট সুলায়মান। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একজন মৎস্যশিকারী তাঁর মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করলো। তাঁর মস্তক হয়ে গেলো রক্তাক্ত। সমুদ্রের পানিতে তিনি রক্ত ধুয়ে ফেলতে লাগলেন। অন্য মৎস্য শিকারীরা তখন দুষ্ট মৎস্য শিকারীটিকে ভর্ৎসনা করলো। নিতান্ত মমতাপরবশ হয়ে তাঁকে দান করলো দু'টো মাছ। তিনি মাছ দু'টো কাটতে গিয়ে একটি মাছের পেটে পেলেন তাঁর হারানো অঙ্গুরীয়টি। সঙ্গে সঙ্গে পরে নিলেন হাতের আঙুলে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে পেলেন হৃত রাজ্যাধিকার। আগের মতো আবার পূর্ণ অনুগত হয়ে গেলো মানুষ, জ্বিন ও পক্ষীবাহিনী। সকলেই বুঝতে পারলো, ইনিই হচ্ছেন আসল সুলায়মান। ভুল ধারণা ও অযথার্থ আচরণের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করলো সকলে। তিনি বললেন, তোমাদের কোনো দোষ নেই। যা ভাগ্যে ছিলো তাই ঘটেছে। এরপর নির্দেশ দিলেন, ওই দুরাচার জ্বিনটিকে এক্ষুণি আমার কাছে ধরে আনা হোক, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যেখানেই সে আত্মগোপন করুক না কেনো। সম্রাটের অনুজ্ঞা প্রতিপালিত হলো যথারীতি। তিনি ওই জ্বিনটিকে বন্দী করলেন একটি সিন্দুকের মধ্যে। তারপর তাতে শক্ত তালা এঁটে দিয়ে ফেলে দিলেন গভীর সমুদ্রে। সেখানেই সে বন্দী অবস্থায় এখনো জীবিত।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত সুলায়মান তিন দিন ধরে নির্জনে কাটালেন। তখন আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করলেন, তুমি তিন দিন ধরে আত্মগোপন করে রয়েছো, আমার বান্দাদের অভাব অভিযোগের প্রতি মোটেও দৃষ্টি দিচ্ছো না। উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌পাক তাঁর এমতো আচরণ পছন্দ করেননি বলে তাকে পরীক্ষায় নিপতিত করেছিলেন। এ কথাগুলোর আগে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব যথারীতি বিবৃত করেছেন মোহরাংকিত অঙ্গুরীয় এবং জ্বিন শয়তানের আধিপত্য বিস্তারের ঘটনা। হাসান বলেছেন, আল্লাহ্ তখন এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, যাতে করে শয়তান তাঁর পত্নীগণের উপরে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বাগবীও এ সকল কিছু বর্ণনা করেছেন।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্'র বরাতে হজরত ইবনে আব্বাসের বিবৃতিরূপে আবদ ইবনে হুমাইদ, নাসাঈ ও ইবনে মারদুবিয়াও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে জারীর এই ঘটনাকে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্'র মতো সুদ্দী সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের কতিপয় বর্ণনাসূত্রে একথাও এসেছে যে, জ্বিন সখর সিংহাসনে আরোহণ করার পর কেবল হজরত সুলায়মানের সত্তা ও তাঁর পত্নীগণ ব্যতীত অন্য সকল কিছুর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলো। হাসান সূত্রে বাগবীও এরকম ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আরো মন্তব্য করেছেন, আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তাঁর প্রিয় নবীর পত্নীগণের উপরে শয়তানকে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে দিবেন। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, মোহরাংকিত আংটি হারানো, শাহীমহলে মূর্তিপূজা এসকল কিছুই ইহুদীদের দুরভিসন্ধিমূলক রটনা।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত সুলায়মান যখন বিপদে পতিত হলেন, তখন দেখতে পেলেন মোহরাংকিত আংটিটি হঠাৎ তাঁর হাত থেকে খুলে পড়ে গেল। আংটিটি উঠিয়ে নিয়ে পুনরায় হাতে পরলেন তিনি। কিন্তু আবার সেটি খুলে পড়ে গেলো। ওই আংটিই ছিলো তাঁর শাসনাধিকারের প্রতীক। তাই তিনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন যে, রাজ্যের শাসনাধিকার আর তার নেই। আসফও বললেন, সম্রাটপ্রবর! আপনি পরীক্ষায় নিপতিত। এ পরীক্ষা চলতে থাকবে চৌদ্দ দিন। তাই এই চৌদ্দদিন আপনি এ আংটি ধারণ করতে পারবেন না। একথা শুনেই হজরত সুলায়মান দ্রুত গিয়ে আত্মগোপন করলেন ভূগর্ভস্থ এক গোপন প্রকোষ্ঠে। আংটিটি পরিধান করলেন আসফ এবং গিয়ে বসলেন রাজসিংহাসনে। তিনি ছিলেন অপ্রকৃত সম্রাট, ঠিক যেনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিহীন শরীর। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'এবং তার আসনের উপরে রাখলাম একটি ধড়'। অর্থাৎ ধড় অর্থ এখানে আসফ। উল্লেখ্য, আসফের রাজত্ব চলে চৌদ্দদিন ধরে। এই চৌদ্দ দিন তিনি সকল কিছু পরিচালনা করতেন হজরত সুলায়মানের অনুকরণেই। চৌদ্দদিন গত হলে তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন পরিত্যাগ করেন। ফিরিয়ে দেন হজরত সুলায়মানের আংটি ও সিংহাসন।

আমার মতে ওয়াহাবের বিবরণ অযথার্থ। কেননা তা কোরআনের বক্তব্যের পূর্ণ অনুকূল নয়। তিনি বলেছেন, সায়দুন নামক সমুদ্রপরিবেষ্টিত ওই দ্বীপে বাতাসবাহী সিংহাসন নিয়ে উড়ে গিয়েছিলেন তিনি। অথচ ওই সময় পর্যন্ত তিনি বাতাসের

নিয়ন্ত্রণাধিকার পানইনি। পেয়েছিলেন বর্ণিত পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার পরে। পরবর্তী আয়াতদ্বয়ের বক্তব্য একথাটিকেই প্রমাণ করে। আর ওয়াহাব বর্ণিত ঘটনাটিকে যদি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনাও করা হয়, তবুও হজরত সুলায়মানকে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে দায়ী করা যায় না। একথাও কিছুতেই বলা যায় না যে, পাপ সংঘটিত হয়েছে তাঁর দ্বারা। কেননা মূর্তি পূজা সকল নবীর শরিয়তে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শরিয়তে মূর্তি নির্মাণ করা অসিদ্ধ ছিলো না। আর রাণী জারাদাহ্ তো মূর্তিপূজা করতো তাঁর অগোচরে। সুতরাং তার জন্য তাঁকে দায়ী করা যেতে পারে না কিছুতেই।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'সে বললো হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমাকে দান করো এমন এক রাজ্য, যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়। তুমিতো পরম দাতা'।

নবী-রসুল এবং পুণ্যবানগণের রীতি হচ্ছে প্রথমে ক্ষমা প্রার্থনা করা, তারপর যা চাইতে ইচ্ছা হয়, তা চাওয়া। হজরত সুলায়মানও তেমনই করেছেন। আলোচ্য আয়াত তার প্রমাণ। আর ক্ষমা প্রার্থনার পরে এভাবে নিজের অভিলাষ জ্ঞাপন একথাই প্রমাণ করে যে, বর্ণিত পরীক্ষাটি ছিলো তাঁর ইহ-পারলৌকিক মর্যাদা বৃদ্ধির উপলক্ষ; যেমন হজরত আইয়ুবের উপরে আপতিত পরীক্ষাও ছিলো তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ। অর্থাৎ হজরত সুলায়মান তখন কোনো পাপ যেমন করেননি, তেমনি ঘটেনি তাঁর যৎকিঞ্চিত পদস্খলনও। যদি সেরকম কিছু হতো, তবে তিনি

কেবল ক্ষমাপ্রার্থনাই করতেন। কোনো কিছু চাওয়ার সাহস করতেন না। অর্থাৎ তাঁর পিতা হজরত দাউদের মতো চিন্তাগত কোনো ভুলও তিনি করেননি। করলে হজরত দাউদের ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহ্ বলেছিলেন 'অতঃপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম'— সেরকম কোনো কিছু এখানেও বলতেন।

মুকাতিল ও ইবনে কীসান এখানকার 'মিম বা'দী' কথাটির অর্থ করেছেন 'আমার জামানার পরে'। অর্থাৎ আমার জামানার পরে আমার মতো বিশাল রাজ্যের অধিকারী যেনো আর কেউ না হয়। অন্য এক আয়াতে কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে এরকম অর্থেই। যেমন 'ফামা ইয়াহ্দীহী মিম বা'দিল্লাহ্' (আল্লাহ্ ব্যতীত তাকে কে পথপ্রদর্শন করবে)। আতা ইবনে রেবাহ্ বলেছেন, এখানকার 'লা ইয়ামবাগী লিআহাদিম্ মিম্ বা'দী' কথাটির অর্থ হবে— হে আমার প্রভুপালক! যেমন তুমি আমার রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়ে দিয়েছিলে অপরকে, তেমনি করে যেনো আমাকে আর রাজ্যচ্যুত কোরো না। আমার সাম্রাজ্যকে কোরো না অন্যের অধিকারভূত। কিন্তু কথা হচ্ছে, এধরনের প্রার্থনা হজরত সুলায়মান করেছিলেন কেনো? তিনি ছিলেন আল্লাহ্র নবী। কেবল সম্রাট তো ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন নবুয়তের বিশেষ প্রতীক ও অলৌকিকত্ব। মুকাতিল বলেছেন, তিনি এমতো প্রার্থনার মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন জ্বিন জাতি ও বিহঙ্গপ্রজাতির উপর। পরের আয়াতে সেকথা স্পষ্ট করে বলাও হয়েছে।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একদিন বললেন, গত রাতে এক দুষ্ট জ্বিন থুথু ছিটাতে ছিটাতে আমার নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো। আল্লাহ্ আমাকে তার উপর ক্ষমতাবান করলেন। আমি তাকে মসজিদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখতে চাইলাম। যদি বেঁধে রাখতাম, তবে তোমরা তাকে এখন স্বচক্ষে দেখতেও পেতে ভোর বেলায়। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেলো আমার ভ্রাতা সুলায়মানের কথা। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন 'এবং আমাকে দান করো এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া অন্য কেউ না হয়'। তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। বোখারী, মুসলিম।

আমি বলি, হজরত সুলায়মানের এমতো প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিলো— যে লোক মর্যাদায় আমার চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর, সে যেনো আমার রাজ্যের মতো এতো বিশাল রাজ্যের অধিকারী না হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সতত আল্লাহ্র স্মরণ মগ্ন, সে ব্যক্তি সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হলেও ক্ষতির কিছু নেই। তার জন্য পৃথিবীর প্রাপ্তি বরং পুণ্য অর্জনের উপকরণ বা নিমিত্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্র স্মরণচ্যুত, তার জন্য পৃথিবীপ্রসক্তি তীব্র হলাহল সদৃশ ক্ষতিকর।

একটি সংশয় ঃ আল্লাহ্র নৈকট্যের দিক থেকে রসুল স. এর মর্যাদা ছিলো হজরত সুলায়মানের চেয়ে বেশী। কিন্তু তাঁকে তাহলে হজরত সুলায়মানের মতো সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি করা হলো না কেনো? আবার দেখা যায়, তিনি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দুষ্ট জ্বিনকে বেঁধে রাখলেন না। এর কারণ কী?

সংশয়ভঞ্জন ঃ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রসুল স. এর মর্যাদা হজরত সুলায়মানের মর্যাদা অপেক্ষা বেশী। কিন্তু তাই বলে একথা বলা যেতে পারে না যে, হজরত সুলায়মানের প্রার্থনার কারণে রসুল স.কে সুবিশাল সাম্রাজ্য দেওয়া হয়নি। বরং আল্লাহ্ বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছিলেন রসুল স. এর ইচ্ছার উপর। অর্থাৎ তিনি হতে পারতেন সম্রাট নবী, অথবা বিত্তহীন নবী দু'টোর যে কোনো একটি। কিন্তু তিনি হতে চেয়েছিলেন আল্লাহ্র বিত্তবৈভববর্জিত বান্দা। তাঁর কাছে বিত্তহীনতা ছিলো বাদশাহীর চেয়ে উত্তম। এখন অবশিষ্ট রইলো, দুষ্ট জ্বিনটিকে তিনি স. কেনো বাঁধেননি তার কারণ অনুসন্ধান। এ বিষয়টিও ছিলো তাঁর ইচ্ছাধীন। কিন্তু তিনি ওই জ্বিনটিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন কেবল তাঁর পূর্বসূরী নবী হজরত সুলায়মানের দোয়ার প্রতি

সম্মান প্রদর্শনার্থে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, রসুল স. ছিলেন জ্বিন-মানুষসহ সকল সৃষ্টির উপরে সমভাবে ক্ষমতাবান। তিনি যে মহাসৃষ্টির মহা রহমত। সে কারণেই জনৈক কবি বলেছে— হে মহাসম্মানিত সর্বশেষ রসুল! বৃক্ষও তো আপনার কথা শোনে। পা না থাকা সত্ত্বেও আপনার ডাকে সেজদা করতে করতে চলে আসে কাণ্ডে ভর করে আপনার সকাশে। সুতরাং বলা যায়, ফকিরী-দরবেশী ছিলো তাঁর অতি প্রিয়। ফকিরী পোশাকও ছিলো তাঁর প্রিয় পোশাক। তাঁর খলিফা চতুষ্টয়ও ছিলেন এরকম। ছিলেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর যথার্থ অনুসারী।

এরপর বলা হয়েছে 'ইন্নাকা আন্তাল ওহ্হাব'। (তুমিতো পরম দাতা)। অর্থাৎ তুমি যদি কাউকে কিছু দিতে চাও, তবে তা প্রতিহত করার সাধ্য যেমন কারো নেই, তেমনি এমন কোনো দাতাও কেউ নেই, যে দান করতে পারে তুমি না চাইলে।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'তখন আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে সে যেখানে ইচ্ছা করতো সেখানে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হতো'।

এখানে 'ফাসাখ্খার্না লাহুর রীহা' অর্থ আমি বাতাসকে তার অধীন করে দিলাম। 'রুখাআ' অর্থ মৃদুগতিসম্পন্ন বাতাস, যা উত্তপ্ত হবে না, অথবা যা চলবে না তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আর এখানকার 'আসাবা' অর্থ 'আরদা'। অর্থাৎ যেখানে যেতে সে ইচ্ছা করতো। যেমন আরববাসীগণ বলেন 'আসাবাস সাওয়াবা পাআখতাল জাওয়াবা' (সে সঠিক জবাব দিতে ইচ্ছা করলো, কিন্তু জবাবে ভুল করলো)।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এবং শয়তানদেরকে, যারা সকলেই ছিলো প্রাসাদ-নির্মাণকারী ও ডুবুরী (৩৭), এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ আরো অনেককে' (৩৮)।

এখানে 'কুল্লা বান্নায়ি' অর্থ সকলেই ছিলো প্রাসাদ নির্মাণকারী। 'ওয়া গওয়াসি' অর্থ ডুবুরী, যারা সমুদ্রে ডুব দিয়ে মনিমুক্তা সংগ্রহ করে আনে। উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানই প্রথম ব্যক্তি যিনি জ্বিন ডুবুরীদের দ্বারা সমুদ্রাভ্যন্তর থেকে মণিমুক্তা তুলে এনেছিলেন।

'মুক্বর্রানীন' অর্থ শৃঙ্খলাবদ্ধ। হজরত সুলায়মান জ্বিনজাতিকে ভাগ করেছিলেন দুইভাগে। যারা কাজের তাদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন প্রাসাদ নির্মাণ ও মণিমুক্তা আহরণের কাজে। আর অকাজের জ্বিনগুলোকে রেখেছিলেন শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, যাতে তাদের দুষ্টামি থেকে মানুষ থাকতে পারে নিরাপদ। আমি বলি, সম্ভবতঃ শয়তান জ্বিনদের নেতা ইবলিসের উপরে নবী সুলায়মানকে আধিপত্য দেওয়া হয়নি। কেননা আল্লাহ্পাক তাকে কিয়ামত পর্যন্ত স্বাধীন করে দিয়েছেন। যেমন এক আয়াতে তাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে 'নিশ্চয় তুমি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষমান'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এই সব আমার অনুগ্রহ, এটা থেকে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পারো। এর জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না (৩৯) এবং আমার নিকট রয়েছে তার জন্য নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভপরিণাম' (৪০)।

এখানে 'হাজা আ'ত্বউনা' অর্থ এসব আমার অনুগ্রহ। অর্থাৎ হে আমার নবী সুলায়মান! তোমাকে আমি এতোকিছু দান করলাম তোমার প্রতি বিশেষভাবে প্রীত ও অনুগ্রহপরবশ হয়ে। 'ফামনুন আও আমসিক্' অর্থ তুমি যাকে খুশী দিতে অথবা নিজে রাখতে পারো। 'বিগইরি হিসাব' অর্থ এর জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না। অর্থাৎ তোমাকে এরকম কখনো বলা হবে না যে, তুমি অমুককে কেনো দিয়েছো, অথবা অমুককে দাওনি কেনো? হাসান বলেছেন, বিত্ত-বৈভবই সাধারণতঃ বিত্তপতিদের অশুভ পরিণামের কারণ হয়। কেবল সুলায়মান ছিলেন এমতো অশুভতা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। কেননা তাঁকে একথা বলেই দেওয়া হয়েছিলো যে, কাউকে কিছু দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণতই তাঁর ইচ্ছাধীন। দিলে তিনি পুণ্যলাভ করবেন। না দিলে দায়ী হবেন না।

'বিগইরি হিসাব' (হিসাব ছাড়া) কথাটি আবার এখানে 'পুরস্কার' বা 'উপহার' অর্থেও প্রয়োগ করা হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি তোমাকে দিয়েছি অগণন উপহার, অপরিমেয় পুরস্কার।

মুকাতিল বলেছেন, এখানকার 'হাজা আ'ত্বউনা' (এসব আমার অনুগ্রহ) এর উদ্দেশ্য— আমি জ্বিনজাতিকে করে দিয়েছি তোমার বশীভূত। আর 'ফামনুন' অর্থ তুমি তাদের মধ্যে যাকে খুশী অধীনস্থ করে রাখতে পারো এবং ছেড়ে দিতে পারো যাকে খুশী। এর জন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না। আর 'লা যুলফা' অর্থ সুলায়মানের জন্য রয়েছে যুগপৎ পৃথিবীর প্রভাবপ্রতিপত্তি এবং পরবর্তী পৃথিবীর প্রভূত মর্যাদা। আর তার পরিণামও হবে অত্যন্ত শুভ। অর্থাৎ জান্নাত।

সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

www.eelm.weebly.com

❑ স্মরণ কর, আমার বান্দা আইয়ুবকে, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, 'শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলিয়াছে',

❑ আমি তাহাকে বলিলাম, 'তুমি তোমার পদ দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়।'

❑ আমি তাহাকে দান করিলাম তাহার পরিজনবর্গ ও তাহাদের মত আরও, আমার অনুগ্রহস্বরূপ এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ।

❑ আমি তাহাকে আদেশ করিলাম, 'একমুষ্টি তৃণ লও ও উহা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভংগ করিও না।' আমি তো তাহাকে পাইলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এবার স্মরণ করুন আমার প্রিয় নবী আইয়ুব প্রসঙ্গ। আমি তাকে পরীক্ষা করেছিলাম দুরারোগ্য ব্যধিতে নিপতিত করে। ওই অবস্থাতেও শয়তান তাকে প্রতারণায় ফেলতে চেয়েছিলো। তাই সে মর্মাহত হয়ে আমাকে ডেকে বলেছিলো, হে আমার প্রভুপালয়িতা! শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে। এখনকার 'বিনুসুবিন্' কথাটি এসেছে 'নুসুব' থেকে। এর অর্থ কষ্ট, যন্ত্রণা, পীড়া, বেদনা। মুকাতিল ও কাতাদা বলেছেন, 'নুসুব' অর্থ দৈহিক কষ্ট এবং 'আ'জাব' অর্থ আর্থিক বিপর্যয়। হজরত আইয়ুবের দুঃখকষ্টের বিশদ বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করেছি সুরা আম্বিয়ার তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করো, এইতো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়'। একথার অর্থ— যখন পরীক্ষার সুদীর্ঘ তিক্ত অধ্যায় শেষ হলো, তখন আমি রোগজর্জরিত আইয়ুবকে লক্ষ্য করে বললাম, তোমার পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করো। সে তাই করলো। সঙ্গে সঙ্গে মাটি থেকে উদ্গত হলো স্বচ্ছ সলিলবিশিষ্ট ঝর্ণা। আমি বললাম, এটা স্নানের ও পানের শীতল সলিল। এবার এই পানি দিয়ে স্নান করো এবং এর পানি পান করো পরিতৃপ্তির সঙ্গে। হজরত আইয়ুব আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করলেন। স্নানের পর দূর হয়ে গেলো তাঁর শরীরের সকল রোগ এবং পানের পর অপসৃত হলো অভ্যন্তরীণ অস্বস্তি।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করেছিলেন দু'বার। প্রথম পদাঘাতে বের হয়ে এসেছিলো শীতল পানির ঝর্ণা এবং দ্বিতীয়

পদাঘাতে নির্গত হয়েছিলো উষ্ণ প্রস্রবণ। প্রথমটির পানি দিয়ে তিনি গোসল করেছিলেন এবং পানি পান করেছিলেন দ্বিতীয়টির। মুজাহিদ সূত্রে আবদ ইবনে হুমাইদ এবং ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, হজরত আইয়ুবের ডান পায়ের আঘাতে একটি প্রস্রবণ বেরিয়ে এসেছিলো এবং ডান হাত দিয়ে পিছনের দিকের মাটিতে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলো আর একটি প্রস্রবণ। একটির পানি তিনি পান করেছিলেন এবং স্নান করেছিলেন অন্যটির পানি দিয়ে।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে দান করলাম তার পরিবারবর্গ ও তাদের মতো আরো, আমার অনুগ্রহস্বরূপ এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ'। একথার অর্থ— উপর্যুপরি বিপদাপদ অবতীর্ণ করে আমি তাকে করেছিলাম পরিজন-স্বজনহীন। কিন্তু সে সকল বিপদ অতিক্রম করলো পরম ধৈর্যের সঙ্গে। আমিও তাকে যথাপুরস্কারে ধন্য করলাম। পুনরায় দান করলাম পরিজন-স্বজন। তৎসহ আরো অধিক। এটা ছিলো তার প্রতি আমার বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন এবং বোধবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের জন্য শুভউপদেশ।

এর পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে আদেশ করলাম, এক মুষ্টি তৃণ নাও ও তা দ্বারা আঘাত করো এবং শপথ ভঙ্গ কোরো না। আমি তো তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কতো উত্তম বান্দা সে। সে ছিলো আমার অভিমুখী'।

'দ্বিগ্ছা' অর্থ এক মুঠো তৃণ, অথবা লতা-পাতা-ডাল। উল্লেখ্য, হজরত আইয়ুব ভুল বুঝে একবার এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে একশত কশাঘাত করবেন। অথচ তাঁর স্ত্রী রহিমা ছিলেন পরম পুণ্যবতী, নির্দোষ। এদিকে প্রতিজ্ঞাপূরণও অত্যাবশ্যক। তাই আল্লাহ্ তাঁকে প্রতিজ্ঞা পূরণ সহজ করে দিলেন এভাবে— তুমি এক মুঠো (এক শতের মতো) লতা-পাতা-ডাল নাও, তারপর তা দিয়ে তোমার স্ত্রীর শরীরে আঘাত করো, এভাবে পূরণ করো তোমার শপথ। বলা বাহুল্য, হজরত আইয়ুব যথারীতি এ নির্দেশ প্রতিপালন করলেন ও মুক্ত হয়ে গেলেন শপথভঙ্গের দায় থেকে।

www.eelm.weebly.com

'ইন্না ওয়াজ্বাদ্নাহু সবিরা' অর্থ আমি তো তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। অর্থাৎ পরীক্ষাস্বরূপ আমি তার উপর দৈহিক, বৈত্তিক ও পারিবারিক দুঃখ-কষ্ট অবতীর্ণ করা সত্ত্বেও তাকে ধৈর্যচ্যুত হতে দেখিনি। উল্লেখ্য, এই অনন্যসাধারণ ধৈর্যের কারণেই আল্লাহ্পাক তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পূর্বের মতো সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিজন-স্বজন বেষ্টিত জীবন। আর তাঁর 'শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে' এই উক্তিটিও ছিলো না ধৈর্যের পরিপন্থী। কেননা তা হতাশা বা হাহুতাশ জাতীয় কিছু ছিলো না। ছিলো আরোগ্যকামনামূলক প্রার্থনা।

আমি বলি, এ প্রসঙ্গে আমাদের স্বনামধন্য শায়েখ শহীদ মীর্জা জানে জানা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য করেছেন। বলেছেন, হজরত আইয়ুব দীর্ঘ দিন ধরে অসহনীয় রোগযন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে নিরাময় করতে চাইলেন। তাই তাঁর হৃদয়ে এ বিষয়টির উদ্ভাবন ঘটালেন যে, ক্ষমাপ্রার্থনা ও বিপদ থেকে মুক্তির জন্য আবেদন-নিবেদন জানানো, কেবল ধৈর্যধারণ অপেক্ষা

উত্তম। তাই তিনি স্বভাবগতভাবে সহিষ্ণু হওয়া সত্ত্বেও কেবল আল্লাহ্র পরিতোষ কামনায় শুরু করে দিলেন প্রার্থনা। এভাবে তিনি ধৈর্যের মর্যাদা থেকে উন্নীত হয়ে পৌঁছে গেলেন আল্লাহ্র পরিতোষের মর্যাদায়। তখন আল্লাহ্ তাঁর ধৈর্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ঘোষণা করলেন 'কতো উত্তম বান্দা সে'।

সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪

❑ স্মরণ কর, আমার বান্দা ইব্রাহীম, ইস্হাক ও ইয়া'কূবের কথা, উহারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।
❑ আমি তাহাদিগকে অধিকারী করিয়াছিলাম এক বিশেষ গুণের, উহা ছিল পরলোকের স্মরণ।
❑ অবশ্যই তাহারা ছিল আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।
❑ স্মরণ কর, ইসমাঈল, আল-ইয়াসা'আ ও যুল-কিফ্লের কথা, ইহারা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন।
❑ ইহা এক স্মরণীয় বর্ণনা। মুত্তাকীদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আবাস—
❑ চিরস্থায়ী জান্নাত, যাহার দ্বার তাহাদের জন্য উন্মুক্ত।
❑ সেথায় তাহারা আসীন হইবে হেলান দিয়া, সেথায় তাহারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয় চাহিবে।
❑ এবং তাহাদের পার্শ্বে থাকিবে আনতনয়না সমবয়স্কাগণ।
❑ ইহা হিসাব দিবসের জন্য তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।
❑ ইহা তো আমার দেওয়া রিয্ক যাহা নিঃশেষ হইবে না,

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! এবার আসুন আমার প্রিয় নবী ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুব প্রসঙ্গে। তারা ছিলো আমার পরম আনুগত্যপরায়ণ দাস এবং ছিলো ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে শক্তিমান ও মারেফতের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মদর্শী। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাগণ এরকম শক্তিমান ও সূক্ষ্মদর্শীই হয়ে থাকেন।

এখানে 'উলিল আইদি' অর্থ হস্তবিশিষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপাসনায় সতত প্রস্তুত, সুদৃঢ়। আর 'ওয়াল আব্‌সার' অর্থ চক্ষুবিশিষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মারেফত জ্ঞানে সূক্ষ্মদর্শী গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও মুজাহিদ এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। হাত দ্বারাই সাধারণতঃ সকল কাজ করা হয়ে থাকে। তাই এখানে শারীরিক ইবাদতের দৃঢ়তা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে 'উলিল আইদি' (হাত বিশিষ্ট)। আর আল্লাহ্‌র মারেফত লাভের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম দৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টিই যেহেতু মূল অবলম্বন, তাই এ বিষয়টিকে প্রকাশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে 'আব্‌সার' (চক্ষুবিশিষ্ট)। আবার এই ত্রয়ী নবীর এমতো গুণবত্তা প্রকাশের মাধ্যমে একথাটিকেই পরোক্ষভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, যারা তাঁদের মতো গুণবিশিষ্ট নয়, তারা প্রকৃত অর্থে ক্ষমতাহীন ও অন্ধ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ক্ষেত্রে অক্ষম ও তাঁর মারেফতের ক্ষেত্রে দৃষ্টিবিবর্জিত।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, তা ছিলো পরকালের স্মরণ (৪৬)। অবশ্যই তারা ছিলো আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত (৪৭)।

এখানে 'জিকরাদ্‌দার' অর্থ পরকালের স্মরণ। উল্লেখ্য, পরকালের স্মরণমগ্নতাই নবী-রসুলগণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁরা নিজেরা হন পরকালের স্মরণমগ্ন এবং জনগণকে আহ্বান জানান স্মরণমগ্নতার প্রতি। তাঁরা চান আল্লাহ্‌র দীদার ও নৈকট্য। আর তা হবে পরকালে। তাই পরকালের প্রতিই নিবেদিত থাকে তাঁদের সকল অভিনিবেশ। এখনে 'জিকরাদ্‌দার' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে 'জিকরি সাহিবিদ্‌দার' (পরকালের স্মরণকারী) অর্থে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাঁদেরকে বিশেষভাবে পরকালের স্মরণকারীরূপে মনোনীত করে নিয়েছেন। আর এভাবে একথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সকলের দৃষ্টি পরকালের প্রতিই সতত নিবদ্ধ হওয়া উচিত। কেননা ওই জগত চিরস্থায়ী। আর পৃথিবী হচ্ছে অস্থায়ী আবাস, যা এক সময় সকলকে ছেড়ে যেতে হবেই।

মালেক ইবনে দীনার কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি তাদের অন্তর থেকে পৃথিবীর মোহ চিরতরে মুছে দিয়েছি, তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছি পরকালের ভালোবাসা। এভাবে তাদেরকে করেছি আমার মনোনীত উত্তম স্বভাববিশিষ্ট বান্দাগণের অন্তর্ভূত। মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— তাঁরা মানুষকে পরকালের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলতেন এবং আহ্বান জানাতেন এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের। সুদ্দী অর্থ করেছেন— পরকালের প্রতি ভয় রাখার

জন্য তাঁদেরকে বিশেষভাবে মনোনীত করা হয়েছিলো। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে বাক্যের উদ্দেশ্য বা প্রথমাংশ উহ্য রয়েছে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি পরকালের উৎকৃষ্ট বিষয়াবলী স্মরণের জন্য তাদেরকে বিশিষ্ট করে নিয়েছি।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, ইসমাইল, আল ইয়াসাআ ও যুলকিফ্‌লের কথা, এরা প্রত্যেকেই ছিলো সজ্জন'।

আল ইয়াসাআ ছিলেন আখতুবের পুত্র। বনী ইসরাইলেরা তাঁকে তাদের শাসনকর্তা নির্বাচিত করেছিলো। পরে আল্লাহ্‌পাক তাঁকে নবুয়ত দান করেছিলেন। আর যুলকিফল ছিলেন আল ইয়াসাআর চাচাতো ভাই এবং বিশর ইবনে আইয়ুবের পুত্র। তবে তিনি নবী ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, তিনি নবী। আবার কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন পুণ্যবান, আল্লাহ্‌র ওলী। যুলকিফল ছিলো তাঁর পদবী। তাঁর এরকম পদবী লাভের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, একবার বনী ইসরাইলের একশত জন লোক তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলো। আর তিনি তাদেরকে আশ্রয়ও দিয়েছিলেন। আবার এরকমও বলা হয়েছে যে, একজন সৎলোক প্রতিদিন একশত বার নামাজ পাঠ করতেন। ফলে উপার্জনের ফুরসত তিনি পেতেন না। ওই লোকের উপজীবিকার ব্যবস্থাপনা তিনিই করেছিলেন। তাই সকলে তাঁকে বলতো যুলকিফল।

এর পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'এটা এক স্মরণীয় বর্ণনা। মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস' একথার অর্থ— এ পর্যন্ত যে সকল নবী-রসুল ও পুণ্যবানগণের আলোচনা করা হলো, এগুলো হচ্ছে স্মরণীয় ঘটনা, অথবা তাঁদের বিবরণসমৃদ্ধ এই কোরআন হচ্ছে একটি উৎকৃষ্ট স্মরণিকা। আর ওই মহাত্মাগণের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আবাসস্থল।

এর পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত'। এ কথার অর্থ চিরসুখময় বেহেশত, যার তোরণ রয়েছে তাদের জন্য সতত উন্মুক্ত। এখানে 'আদন' অর্থ চিরস্থায়ী। অথবা 'আদন' হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট এক বেহেশতের নাম। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'চিরস্থায়ী জান্নাত, যার অঙ্গীকার আল্লাহ্‌ তাঁর বিশেষ বান্দাগণের সঙ্গে করেছেন'। এখানেও 'আদন' অর্থ চিরস্থায়ী।

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয় চাইবে'। একথার অর্থ— তারা সেখানকার তাকিয়াবিশিষ্ট আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসবে এবং পরিচারক-পরিচারিকাদেরকে আদেশ দিবে ইচ্ছে মতো। কখনো বলবে, ফলমূল আনো, কখনো বলবে, এবার আনো সুস্বাদু পানীয়।

এখানে 'শরাব' শব্দটির সঙ্গে তানভীন যুক্ত করায় একথাই প্রকাশ পায় যে, সেখানে সুপেয় পানীয়ের থাকবে অঢেল আয়োজন। প্রথমে 'ফাকিহাতিন কাছীরাতিন'

www.eelm.weebly.com

(বহুবিধ ফল) যেহেতু বলা হয়েছে, তাই পরে 'শারাবিন' এর পরে আর 'কাছীরাতিন'(বহুবিধ, অঢেল, সুপ্রচুর) এর ব্যবহার প্রয়োজন হয়নি। আর খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে কেবল ফলমূলের উল্লেখ করায় একথাও প্রতীয়মান হয় যে, সেখানে বলবর্ধকরূপে খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। বেহেশতবাসীগণ খাদ্যগ্রহণ করবেন কেবল আস্বাদগ্রহণের জন্য।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'এবং তাদের পার্শ্বে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কাগণ (৫২)। এটা হিসাব দিবসের জন্য তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি (৫৩)। এটা তো আমার দেওয়া রিজিক যা নিঃশেষ হবে না (৫৪)'। একথার অর্থ— আর ওই বেহেশতবাসীদের সঙ্গিনী ও সহচরী হবে আয়তলোচনা হুরীগণ। তারা উভয়েই হবে যৌবনদীপ্ত ও যৌবনময়ী। হে বিশ্বাসীবৃন্দ! শোনো, এটাই হচ্ছে সেই অক্ষয় উপহার, মহাবিচারদিবসের আগমনে যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। আর এটা হচ্ছে আমা কর্তৃক প্রদত্ত অনন্য অনুগ্রহ, যা অনিঃশেষ।

এখানে 'ক্বসিরাতুত্ ত্বরফি' অর্থ আয়তনয়না, যাদের দৃষ্টি কেবল তাদের স্বামী ছাড়া অন্য কারো প্রতি পতিত হবে না। 'আত্রাব' অর্থ সমবয়স্কা। শব্দটি 'তরব' এর বহুবচন। আর সমবয়স্কা অর্থ বেহেশতবাসীরা যেমন হবে তেত্রিশ বৎসরের যৌবনদীপ্ত পুরুষ, তেমনি তাদের আনতনয়না সঙ্গিনীরাও হবে তেত্রিশ বৎসরের উষ্ণবয়সিনী রমণী। মুজাহিদ বলেছেন, তাদের নিজেদের মধ্যে থাকবে সহোদরা ভগ্নির মতো সম্প্রীতি। সপত্নীদের মতো ঈর্ষাপরায়ণা তারা হবে না।

'ইয়াওমিল হিসাব্' অর্থ হিসাব দিবস, মহাবিচারের দিবস। এখানকার 'লাম' অক্ষরটি সময়নির্ধারক। অর্থাৎ বিচার দিবসেই নির্ধারণ করা হবে বর্ণিত অনুগ্রহসম্ভার। অথবা এখানে 'লাম' অর্থ 'ফী' (মধ্যে)। অর্থাৎ বিচার দিবসের মধ্যেই নির্ধারণ করা হবে কথিত নেয়ামতরাশি।

সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪

❑ ইহাই। আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্টতম পরিণাম—

❑ জাহান্নাম, সেথায় উহারা প্রবেশ করিবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

❑ ইহা সীমালংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং উহারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ।

❑ আরও আছে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।

❑ 'এই তো এক বাহিনী, তোমাদের সংগে প্রবেশ করিতেছে।' 'উহাদের জন্য নাই অভিনন্দন, ইহারা তো জাহান্নামে জ্বলিবে।'

❑ অনুসারীরা বলিবে, 'বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যও অভিনন্দন নাই। তোমরাই তো পূর্বে উহা আমাদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছ। কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল!'

❑ উহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে ইহা আমাদের সম্মুখীন করিয়াছে, জাহান্নামে তাহার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ বর্ধিত কর।'

www.eelm.weebly.com

❑ উহারা আরও বলিবে, 'আমাদের কী হইল যে, আমরা যে সকল লোককে মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না।

❑ 'তবে কি আমরা উহাদিগকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করিতাম; না উহাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে?'

❑ ইহা নিশ্চিত সত্য— জাহান্নামীদের এই বাদ-প্রতিবাদ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হাজা'। এর অর্থ— এটাই। অর্থাৎ এই যে পরকালের পুরস্কারসমূহ, এসকল পুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে কেবল তাদের জন্য, যারা মুত্তাকী (সাবধানী, আল্লাহ্‌ভীরু)। কথাটি সম্পর্কযুক্ত ইতোপূর্বে বর্ণিত বেহেশ্‌তবিষয়ক আয়াতগুলোর সঙ্গে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম'। একথার অর্থ— পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌ভীরু নয়, যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, তাদের পরিণাম অত্যন্ত অশুভ। এখানে 'ত্বগীন' অর্থ সীমালংঘনকারী, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, কাফের। আর 'মাআব্' অর্থ পরিণাম, প্রত্যাবর্তনস্থল।

পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল'। এখানে 'মিহাদ' অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল, বিছানা। এখানে জাহান্নামকে 'বিছানা' বা 'শয্যা' বলা হয়েছে রূপকার্থে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এটা সীমালংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ (৫৭)। আরো আছে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি'(৫৮)।

এখানে 'হাজা' অর্থ এই শাস্তি, যা নির্ধারিত রয়েছে সীমালংঘনকারীদের জন্য। 'হামীম' অর্থ ফুটন্ত পানি। আর এখানকার 'গাস্‌সাক্ব' কথাটির অর্থ বিভিন্ন মনিষী করেছেন বিভিন্নভাবে। যেমন হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'গাস্‌সাক্ব' হচ্ছে বরফের চেয়ে অধিক হিম এমন এক বস্তু যা জাহান্নামীদেরকে এমনভাবে জ্বালিয়ে দিবে, যেমনভাবে জ্বালিয়ে দেয় আগুন। মুজাহিদ ও মুকাতিল বলেছেন, যে বস্তুর শীতলতা চূড়ান্ত পর্যায়ের, তাকেই বলে গাস্‌সাক্ব। কেউ কেউ বলেছেন, এটা তুর্কী শব্দ। তুর্কী ভাষায় অত্যন্ত দুর্গন্ধদায়ক বস্তুকে বলে 'গাস্‌সাক্ব'। কাতাদা বলেছেন, 'গাস্‌সাক্ব' হচ্ছে বহমান তরল পদার্থ, যেমন বলা হয় 'গাসাকক্বাত্' (ওই বস্তু বয়ে গিয়েছে)। আর এখানে শব্দটির অর্থ হবে— সেই পুঁজ ও কাঁচা রক্ত, যা বয়ে যেতে থাকবে জাহান্নামীদের চামড়া, গোশত ও গোপনাঙ্গ থেকে।

আতিয়ার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বায়হাকী বলেছেন, 'গাস্‌সাক্ব' অর্থ বয়ে যাওয়া কাঁচা রক্ত। ইব্রাহিম ও আবু রযীনের মন্তব্যও এরকম। ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আবিদ্‌দুন্‌ইয়া ও জিয়া বলেছেন, 'গাস্‌সাক্ব' হচ্ছে জাহান্নামের ভিতরের একটি ঝর্ণা যার মধ্যে থাকবে বিষাক্ত সরীসৃপসমূহ। ওই ঝর্ণায় জাহান্নামীদেরকে একবার চুবানো হলেই তাদের হাড় গোড় থেকে চামড়া গোশত আলাদা হয়ে পায়ের গোড়ালীর কাছে গিয়ে পড়বে এবং মানুষ যেভাবে লুটিয়ে পড়া কাপড় বারবার টেনে তুলতে থাকে, তেমনি তারাও চামড়া-গোশত টেনে তুলতে থাকবে বারবার।

'আরো আছে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি' অর্থ 'ফুটন্ত পানি' 'পুঁজ' ইত্যাদির মতো আরো অনেক রকম ভয়ংকর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে জাহান্নামীদের জন্য।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এই তো এক বাহিনী, তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করছে। তাদের জন্য নেই অভিনন্দন, এরাতো জাহান্নামে জ্বলবে(৫৯)। অনুসারীরা বলবে, বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যও অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো পূর্বে এটা তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছো। কতো নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল'(৬০)।

'হাজা ফাওজুম্ মুক্বতাহিমুম্ মাআকুম' অর্থ এই তো এক বাহিনী তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করেছে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জাহান্নামের ব্যবস্থাপকেরা জাহান্নামীদের দলপতিদেরকে লক্ষ্য করে এরকম বলবে। আর এরকম কথা তারা বলবে তখন, যখন জাহান্নামী নেতা-জনতা সকলেই প্রবেশ করতে থাকবে জাহান্নামে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটি হবে জাহান্নামী নেতাদের। তারা একজন আর একজনকে বলবে, এই দ্যাখো, তোমার অনুসারীরাও তোমার সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ করছে। 'ইক্বতাহিম' অর্থ আতঙ্কিত হয়ে বাধ্যগতভাবে কোনোকিছুর মধ্যে প্রবেশ করা। কালাবী বলেছেন, তাদেরকে তখন গদা দিয়ে পেটানো হবে। পিটুনির ভয়ে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে নিক্ষেপ করবে জাহান্নামে।

আমি বলি, বক্তব্যটির মর্মার্থ হতে পারে এরকমও— রসুল স. ও তাঁর খলিফাগণ মানুষের কটিদেশ পশ্চাদ্দিক থেকে আকর্ষণ করে তাদেরকে দোজখে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে চলেছেন। কিন্তু অনেকেই তা মানছে না। জোর করে ঢুকে

পড়ছে দোজখে এবং এমন সব কাজকর্মে লিপ্ত রয়েছে, যা দোজখগমনকে অবধারিত করে দেয়। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার ও তোমাদের উপমা এরকমঃ এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলো। আগুন যখন প্রচণ্ড তেজে জ্বলে উঠলো, তখন চতুর্দিক থেকে কীট পতঙ্গ এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো ওই আগুনে। লোকটি তাদেরকে প্রাণপনে বাধা দিতে থাকলো কিন্তু সে বাধা তারা মানলো না। আমিও তোমাদেরকে এভাবে দোজখে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে বাধা দেই। বলি, হে মানুষ। দোজখাগ্নি থেকে দূরে থাকো। কিন্তু তোমরা আমার কথা শুনতে চাও না। বোখারী, মুসলিম।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'এইতো এক বাহিনী তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করছে' এরকম কথা হয়তো একদল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদের অন্য এক দলকে তৃতীয় আর একদল সম্পর্কে বলবে। অর্থাৎ বলবে, দ্যাখো দ্যাখো, ওই দলটিও তোমাদের শাস্তির অংশীদার হয়েছে। তোমাদের সঙ্গেই প্রবেশ করছে দোজখে। তারা আরো বলবে, সাধুবাদের উপযোগী এরা নয়। এরা দোজখে জ্বলবেই।

উল্লেখ্য, নেতাদের এরকম মন্তব্যের প্রেক্ষিতে জনতাও পাল্টা বিবৃতি দিবে। তাদের কথা ফিরিয়ে দিবে তাদেরই দিকে। সেকথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে— অনুসারীরা বলবে, তোমরাও জ্বলবে দোজখে। অভিনন্দন পাওয়ার মতো কোনোকিছু তো তোমাদেরও নেই। তোমরাই তোমাদের নিজেদের ও আমাদের জন্য পূর্বাহ্নে ব্যবস্থা করেছো দোজখবাসের। হায়! কতো নিকৃষ্ট এই আবাস— তোমাদের জন্য। আমাদের জন্যও।

'লা মারহাবা' অর্থ নেই কোনো অভিনন্দন, সাধুবাদ। একথাটি একটি অপপ্রার্থনা বা বদদোয়া, যা প্রথমে বলবে নেতারা তাদের অনুসারীদের সম্পর্কে। তারপর বলবে— এরা তো জাহান্নামে জ্বলবে তাদের নিজেদের কর্মদোষে। অথবা কথাটি এখানে হবে 'ফাওজুন' এর বিশেষণ। অর্থাৎ এরকম অপপ্রার্থনা করা হবে দোজখে প্রবেশরত সেই দল সম্পর্কে। উল্লেখ্য, কারো শুভাগমনকে আরববাসীরা স্বাগত জানায় 'মারহাবা' বলে। আবার কারো অশুভ কামনায় বলে 'লা মারহাবা'। 'রহব' এর শাব্দিক অর্থ প্রশস্ত ও উন্মুক্ত স্থান।

এরপরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যে এটা আমাদের সম্মুখীন করেছে, জাহান্নামে তার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ করো'। এরকম বলে জাহান্নামী জনতা দ্বিগুণশাস্তি প্রার্থনা করবে তাদের নেতাদের জন্য।

এরপরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'তারা আরো বলবে, আমাদের কী হলো যে, আমরা যে সকল লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখতে

পাচ্ছি না'। একথার অর্থ— ওই জাহান্নামীরা তখন একথাও বলতে থাকবে যে, কী ব্যাপার! ওই লোকগুলোকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না কেনো, যাদেরকে আমরা পৃথিবীতে মন্দ লোক বলে ভাবতাম।

এখানকার 'আশ্‌রর' শব্দটি 'শারীর' এর বহুবচন। এর অর্থ দুষ্ট লোক বা মন্দ মানুষ। শব্দটি 'খইর' (উত্তম) এর বিপরীত অর্থ বোধক। 'উত্তম' সর্বজনকাম্য এবং 'মন্দ' সর্বজনঘৃণ্য। উল্লেখ্য, তাদের 'আমরা যে সকল লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম' কথাটির উদ্দেশ্য দরিদ্র সাহাবীবৃন্দ। যেমন হজরত আম্মার, হজরত সুহাইব, হজরত বেলাল, হজরত ইবনে মাসউদ প্রমুখ।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তবে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম; না তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে'? বাক্যের প্রথম প্রশ্নটি (তবে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম) এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— তাহলে তো আমরা বিনা কারণেই তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বলে মনে করতাম। যারা বলেছেন, পরের প্রশ্নটি (না তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে) তিরস্কারসূচক ও বিস্ময়প্রকাশক। আর এই বাক্যের একটি অংশ এখানে অনুক্তও রয়েছে। ওই অনুক্ত কথাটিসহ এখানকার পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কী বিস্ময়! ওই লোকগুলোকে আমরা এখানে দেখছি না কেনো, যাদেরকে আমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতাম। তারা কি এখানে নেই? না কি আমরাই হয়েছি দৃষ্টিহীন, অথবা ভ্রমদৃষ্টিসম্পন্ন।

এরপরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'এটা নিশ্চিত সত্য— জাহান্নামীদের এই বাদ-প্রতিবাদ'। এখানে 'ইন্‌না জালিকা' অর্থ এ সকল বিবরণ। অর্থাৎ আমি এতক্ষণ ধরে দোজখবাসীদের কথোপকথন সম্পর্কে যে বিবরণ দিলাম, তা সন্দেহাতীতরূপে সত্য। 'হাক্বকুন' অর্থ সত্য। আর 'তাখাসুমু' (বাদ-প্রতিবাদ) শব্দটি হচ্ছে 'সত্য' (হাক্বকুন) এর অনুবর্তী, অথবা অন্য কোনো উহ্য 'উদ্দেশ্য' এর বিধেয়। উল্লেখ্য, দোজখীদের নিজেদের মধ্যকার আলাপচারিতা হবে বাদানুবাদের পর্যায়ের। তাই তাদের কথাবার্তাকে এখানে বলা হয়েছে 'বাদ-প্রতিবাদ'। আর ইতোপূর্বের আয়াতগুলোতেও বিবৃত হয়েছে তাদের বাদ-প্রতিবাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ৬৫, ৬৬, ৬৭. ৬৮. ৬৯, ৭০

www.eelm.weebly.com

❑ বল, 'আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং কোন ইলাহ্ নাই আল্লাহ্ ব্যতীত, যিনি এক, যিনি প্রবল প্রতাপশালী,
❑ 'যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, যিনি মহাক্ষমাশীল।'
❑ বল, 'ইহা এক মহাসংবাদ,
❑ 'যাহা হইতে তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইতেছ।
❑ 'ঊর্ধ্বলোকে তাহাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না।
❑ 'আমার নিকট তো এই ওহী আসিয়াছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।'

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি মক্কার পৌত্তলিকদের কাছে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করুন এভাবে— হে মক্কাবাসী! আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি সেই এক, অবিভাজ্য মহাপ্রতাপশালী ও সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তির আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করণার্থে, যিনি ব্যতীত অন্য উপাস্যের অস্তিত্ব মাত্রই নেই। তিনি গগনমণ্ডল, মেদিনী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তীর সকল কিছুর সৃজয়িতা ও পালয়িতা, যিনি পাপীদের প্রতি পরাক্রম প্রকাশকারী এবং পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রতি মহাক্ষমাপরবশ।

এখানে 'ইন্নামা আনা মুনজির' অর্থ আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। পৌত্তলিকদের কতিপয় অপমন্তব্যের সঙ্গে রয়েছে কথাটির যোগাযোগ। যেমন, তারা রসুল স. কে অভিহিত করতো 'যাদুকর'। আবার কখনো বলতো 'মিথ্যাবাদী', কখনো বলতো 'কবি'। তাদের ওই সকল অপবচনের জবাব দিতে বলা হয়েছে এখানে। তাঁকে বলতে বলা হয়েছে— হে আমার নবী! আপনি তাদেরকে স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দিন যে, তোমরা যে সকল বিশেষণে আমাকে বিশেষায়িত করে চলেছো, সেগুলোর কোনোটাই আমি নই। আমি হচ্ছি মহাপরাক্রমশালী এবং মহা ক্ষমাপরবশ আল্লাহ্র অসন্তোষ ও শাস্তি সম্পর্কে একজন সতর্ককারী মাত্র।

'ওয়ামা মিন ইলাহিন ইল্লাল্লহ' অর্থ এবং কোনো ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ব্যতীত। একথাটির সম্পর্ক রয়েছে পৌত্তলিকদের আর একটি অপবচনের সঙ্গে। যেমন, তারা বলেছিলো 'সে কি বহু ইলাহ্কে এক ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে' (আয়াত ৬৫)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে—বহু ইলাহ্কে এক ইলাহ্ বানানোর প্রশ্ন আবার আসে কীভাবে? আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো 'ইলাহ্'র তো অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। আল্লাহ্ই একমাত্র, এক, একক ও অবিভাজ্য ইলাহ্। সত্তা গুণবত্তা-কার্যকলাপ সর্ববিষয়েই তিনি এক ও অংশীবিহীন।

'আল্কুহ্হার' অর্থ প্রবল প্রতাপশালী। আল্লাহ্র এই নামটি উল্লেখ করে পৌত্তলিকদেরকে দেওয়া হয়েছে প্রচণ্ড ধমক। অর্থাৎ তারা যেনো একথা মনে রাখে যে, সকলের এবং সকল কিছুর উপরে তাঁর প্রতাপ অবশ্যম্ভাবী।

'আযীযুল গাফ্ফার' অর্থ পরাক্রমশালী, মহা-ক্ষমাশীল তিনি কাউকে শাস্তি দিতে চাইলে তা প্রতিহত করার কেউ নেই। আর 'গাফফার' অর্থ এমন মহাক্ষমাপরবশ যে, যাকে খুশী তাকেই তিনি দান করতে পারেন মার্জনা। এ ব্যাপারেও বাধা দেওয়ার সাধ্য কারো নেই। এভাবে 'পরাক্রম' ও 'ক্ষমা' দু'টি গুণই এখানে প্রমাণ হয়েছে আল্লাহ্র এককত্বের এবং যুগপৎ হয়েছে কাফেরদের জন্য হুমকি এবং ইমানদারদের জন্য আশ্বাস।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'বল, এটা এক মহাসংবাদ(৬৭), যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো'(৬৮)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি মক্কার অংশীবাদীদেরকে জানিয়ে দিন, এই কোরআনে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার এককত্ব ও গুণবত্তার সংবাদ, যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও মুজাহিদ।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'হুয়া' (এটা) সর্বনামটির উদ্দেশ্য শেষ বিচারের দিবস। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আম্মা ইয়াসাআ'লূনা আ'নিন্ নাবাইল আ'জীম' (তারা একে অপরের নিকট কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? সেই

www.eelm.weebly.com

মহাসংবাদ বিষয়ে)। এখানেও ‘নাবাইল আ’জীম’ অর্থ শেষ বিচারের দিন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— আমি যে তোমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছি এবং আল্লাহ্‌র যে গুণাবলীর কথা জানাচ্ছি, এটাই হচ্ছে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সংবাদ। এরকম ব্যাখ্যা করলে কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে ‘আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং কোনো ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ব্যতীত’ (আয়াত ৬৫) এর সঙ্গে।

‘যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো’ অর্থ যারা জ্ঞানী, তাদের পক্ষে কিছুতেই উচিত হবে না এই মহাসংবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, অথচ হে মক্কার গোত্রপতিরা, তোমরা তা-ই করছো। নিজেদেরকে নিমজ্জিত রেখেছো ঔদাসীন্যের অতল গহ্বরে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘ঊর্ধ্বলোকে তাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান ছিলো না (৬৯)। আমার নিকট তো এই ওহী এসেছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী’(৭০)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক! আপনি তাদেরকে আরো বলুন, প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী আদম সৃষ্টির সূচনালগ্নে ফেরেশতারা মানুষ সৃজনের ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিলো। একথা আমাকে আগে জানানো হয়নি। আমাকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে কেবল এই বিষয়টিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে প্রচার করতে বলা হয়েছে যে, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি প্রেরিত এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী। তাই তো আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে চলেছি বার বার।

এখানে ‘আল্‌মালাইল আ’লা’ অর্থ ঊর্ধ্বলোকবাসী ফেরেশতা। ‘ইজ ইয়াখ্‌তাসিমূন’ অর্থ যখন ওই ফেরেশতারা বাদানুবাদ করছিলো। উল্লেখ্য, অদৃশ্য

জ্ঞান ফেরেশতাদের নেই। মানুষ সৃষ্টির নেপথ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার যে অনড় মহাঅভিপ্রায় ছিলো, তা-তারা জানতো না। তাই অজ্ঞতাবশতঃ তখন লিপ্ত হয়েছিলো বাদানুবাদে।

কোনো কোনো ধর্মজ্ঞ বলেছেন, এখানকার ‘ইয়াখ্‌তাসিমূন’ অর্থ বাদানুবাদ নয়, আলাপচারিতা। ফেরেশতারা ওই আলাপচারিতার মাধ্যমে জানতে চেয়েছিলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ যখন বললেন, ‘আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই’ তখন ফেরেশতারা বললো, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কোনো সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করবে, যারা ইতোপূর্বে সেখানে প্রতিষ্ঠিত জ্বিনদের মতো ঘটাবে বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত?

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ হাজরামী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি আমার মহামহিম প্রভুপালনকর্তাকে অতুলনীয় মনোহররূপে দেখলাম। তিনি শুধালেন, শোনো, ঊর্ধ্বলোকবাসীরা কোন প্রসঙ্গে বাদানুবাদ করছে। আমি নিবেদন করলাম, হে আমার পরম প্রভুপালক! তুমিই তা উত্তমরূপে জানো। তখন তিনি আমার স্কন্ধদেশের মধ্যবর্তী স্থলে তাঁর আনুরূপ্যবিহীন হস্ত স্থাপন করলেন। ওই কর স্পর্শের শীতলতা আমি অনুভব করলাম আমার বক্ষাভ্যন্তরেও। খুলে গেলো অদৃশ্য জ্ঞানের তোরণ। আমি অবগত হলাম আকাশ-পৃথিবীর সকল ঘটিত, ঘটমান ও ঘটিতব্য বিষয়। এ পর্যন্ত বলার পর তিনি স. পাঠ করলেন ‘ওয়া কাজালিকা নূরী.... মিনাল মু’ক্বিনীন’ (এভাবেই আমি ইব্রাহিমকে দেখিয়েছিলাম নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য। যাতে সে হয় দৃঢ়বিশ্বাসীগণের দলভূত)। তারপর বললেন, তখন আল্লাহ্ প্রশ্ন করলেন, এবার বলো, ঊর্ধ্বলোকে কি নিয়ে বাদানুবাদ চলছে? আমি বললাম, কী করলে পাপমোচন হয়, সে বিষয়ে। তিনি বললেন, কোন কোন বিষয় পাপ মোচন করে। আমি বললাম, পায়ে হেঁটে নামাজের জামাতের দিকে ধাবমান হওয়া, এক নামাজ শেষে পরবর্তী নামাজের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকা, হিমশীতল পানি দিয়ে ওজু করা কষ্টকর হলেও উত্তমরূপে ওজু সম্পন্ন করা। যারা এগুলো করবে, তারা কল্যাণের সঙ্গে বেঁচে থাকবে এবং মৃত্যুবরণ করবে শুভপরিণতির সঙ্গে। পাপ দূর করে তাদেরকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে, যেমন তারা ছিলো মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রাক্কালে। আবার পাপমোচনের পর মর্যাদা প্রাপ্তিরও আমল রয়েছে অনেক। যেমন নিরন্নকে অন্নদান, মুসলমানকে অগ্রে সালাম প্রদান, গভীর নিশিথের নামাজ পাঠ, যখন সকল মানুষ থাকে নিদ্রামগ্ন। আমার পরম প্রভুপালক তখন বললেন, বলো, হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছ থেকে পবিত্র বস্তুসমূহ প্রার্থনা করছি, সামর্থ্য প্রার্থনা করছি মন্দ ও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ পরিত্যাগের। আর আকাংখা পোষণ করছি দরিদ্র জনতার ভালোবাসা পাওয়ার, যাচনা করছি তোমার ক্ষমা ও দয়া। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করো ও অনুগ্রহ করো। যখন কোনো সম্প্রদায়কে তুমি পরীক্ষায় নিপতিত করতে চাও, তৎপূর্বেই ঘটিয়ো আমার জীবনাবসান। রসুল স. বলেছেন, শপথ সেই সত্তার যাঁর অধিকারে

রয়েছে আমার জীবন, এ সকল বিবরণ নিঃসন্দেহে সত্য। বাগবী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ও শরহে সুন্নাহ্’য়। দারেমীর বর্ণনায় তারপর রসুল স. পাঠ করলেন‘ ওয়া কাজালিকা..... মিনাল মু’ক্বিনীন’ পর্যন্ত পাওয়া যায়। তিরমিজি এই হাদিস হাজরামির বরাত দিয়ে বাগবীর বর্ণনা থেকে উল্লেখ করেছেন এবং হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল সূত্রে কিছু শব্দের হের ফের সহ এরকমই বর্ণনা করেছেন।

www.eelm.weebly.com

পাপমোচনের উপায় সম্পর্কে ফেরেশতাদের বাদানুবাদের অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, তাদের একদল অন্য দলের সঙ্গে বর্ণিত পুণ্যকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করবার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করে থাকে এবং কে আগে তা আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থাপন করতে পারে তাই নিয়ে করতে থাকে বাদ-প্রতিবাদ, যেমন হজরত রেফায়া ইবনে রাফে বলেছেন, আমরা রসুল স. এর পশ্চাতে নামাজ পাঠ করছিলাম। তিনি স. রুকু থেকে মস্তক উত্তোলনের প্রাক্কালে যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বললেন, সঙ্গে সঙ্গে মুসল্লীগণের একজন সশব্দে বলে উঠলেন 'রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাছীরান মুবারাকান ফীহ্'। নামাজ শেষ হলে রসুল স. বললেন, কে এরকম করে বললো? সেই ব্যক্তি বললেন, আমি। তিনি স. বললেন, আমি দেখলাম তিরিশজন ফেরেশতা এই নিয়ে ঠেলাঠেলি করছে যে, কে আগে এই বাণী লিপিবদ্ধ করবে। বোখারী।

'ইন্নামা আনা নাজীরুম্ মুবীন' কথাটি হয়তো 'ইউহা' এর কর্তার প্রতিনিধি। অর্থাৎ আমার কাছে এই প্রত্যাদেশ আসে যে, আমি যেনো আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করি। অথবা বর্ণিত বাক্যাংশ ক্রিয়ার কারণ এবং 'ইউহা' কর্মসম্পাদনকারীর প্রতিনিধি স্বরূপ সেই ক্রিয়ামূল যা কর্ম থেকে বোধগম্য হয়। অর্থাৎ আমার কাছে প্রত্যাদেশ আসে এই উদ্দেশ্যে যে, আমি হচ্ছি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। উল্লেখ্য, নবুয়ত প্রদানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে, নবীগণ তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের অবাধ্য জনতাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করবেন।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানকার 'মহাসংবাদ' কথাটির অর্থ হজরত আদম ও ইবলিসের ইতিবৃত্ত এবং কোনো কিছু না শুনেই সংবাদ প্রদান। আর 'মালাউল আ'লা' (ঊর্ধ্বলোকে তাদের বাদানুবাদ) অর্থ তাদের বেহেশতচ্যুত হওয়ার বিষয়ে বাদানুবাদ। ফেরেশতারা, হজরত আদম ও ইবলিস সকলেই একসময় ঊর্ধ্বলোকের অধিবাসী ছিলো এবং তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিলো পারস্পরিক বাদানুবাদ।

সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ৭১—৮৫

❑ স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'আমি মানুষ সৃষ্টি করিতেছি কর্দম হইতে,

❑ 'যখন আমি উহাকে সুষম করিব এবং উহাতে আমার রূহ সঞ্চার করিব, তখন তোমরা উহার প্রতি সিজ্‌দাবনত হইও।'

❑ তখন ফিরিশ্‌তারা সকলেই সিজ্‌দাবনত হইল—

❑ কেবল ইবলীস ব্যতীত, সে অহংকার করিল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

www.eelm.weebly.com

❑ তিনি বলিলেন, 'হে ইবলীস! আমি যাহাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার প্রতি সিজ্‌দাবনত হইতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?'

❑ সে বলিল, 'আমি উহা হইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন কর্দম হইতে।'

❑ তিনি বলিলেন, 'তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত।

❑ 'এবং তোমার উপর আমার লা'নত স্থায়ী হইবে, কর্মফল দিবস পর্যন্ত।'

❑ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অবকাশ দিন উত্থান দিবস পর্যন্ত।'

❑ তিনি বলিলেন, 'তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইলে—

❑ 'অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।'

❑ সে বলিল, 'আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি উহাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করিব,

❑ 'তবে উহাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদিগকে নহে।'

❑ তিনি বলিলেন, 'তবে ইহাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি—

❑ 'তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করিবই।'

এখান থেকে শুরু হয়েছে প্রথম মানুষ সৃষ্টির কাহিনী। তৎসঙ্গে বিবৃত হয়েছে ইবলিস ও তার দুর্বৃত্তপরায়ণতার বিবরণ। প্রথমে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কর্দম থেকে'।

এখানে 'ইজ্ ক্বলা' (স্মরণ করো) বলে দেওয়া হয়েছে ওই বিষয়ের বিবরণ, যে সম্পর্কে ইতোপূর্বে বলা হয়েছিলো 'ঊর্ধ্বলোকে তাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান ছিলো না'। সুরা বাকারার তাফসীরে বিষয়টির সবিস্তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে। আর এখানে বিষয়টি উপস্থাপনের উদ্দেশ্য সেই বিস্তারিত ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মূল উদ্দেশ্য এই উপদেশটি দেওয়া যে— ইবলিস অহংকারবশতঃ হজরত আদমকে অস্বীকার করেছিলো, তেমনি মক্কার মুশরিকেরাও অহমিকা ভরে প্রত্যাখ্যান করে চলেছে রসুল স.কে। সুতরাং তাদের পরিণতি হবে ইবলিসের মতোই। চিরদুর্দশাগ্রস্ত ও চিরঅপমানিত হওয়াই তাদের ললাট-লিখন।

এরকমও হতে পারে যে, এখানে আল্লাহ্ কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে ফেরেশতাদের কথিত বাদানুবাদের কথা বলেছেন। অথবা 'মালাইল আ'লা' হচ্ছে কেবলই ঊর্ধ্বলোক। আর সেখানকার কথোপকথনে আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণ সকলেই অন্তর্ভূত।

পরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'যখন আমি তাকে সুষম করবো এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করবো, তখন তোমরা তার প্রতি সেজদাবনত হয়ো (৭২)। তখন ফেরেশতারা সকলে সেজদাবনত হলো— (৭৩) কেবল ইবলিস ব্যতীত, সে অহংকার করলো এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো (৭৪)'।

এখানে 'ইজা সাওয়াইতুহু' অর্থ যখন আমি তাকে সুষম করবো, সম্পন্ন করবো তার গঠন প্রক্রিয়া। 'ইস্‌তাক্‌বারা' অর্থ সে অহংকার করলো। অর্থাৎ অহংকারবশতঃ হয়ে গেলো আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচারী। অথবা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের চেয়ে নিজস্ব চিন্তাকে মনে করলো বড়। আর এখানকার 'কানা মিনাল কাফিরীন' (এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো) কথাটির 'কানা' একথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌র অনন্ত জ্ঞানে তার সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই সে ছিলো কাফের, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

এরপরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, হে ইবলিস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সেজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিলো? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন'?

এখানে 'খলাক্বতু বিইয়াদাইয়া' অর্থ আমি সৃষ্টি করেছি নিজ হাতে। এখানকার 'হাত' কোরআন মজীদের অন্যান্য অসম(মুতাশাবিহ্) শব্দের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী যুগের আলেমগণ শব্দটির সরাসরি অর্থই গ্রহণ করেছেন। তবে বলেছেন, এর প্রকৃত অর্থ কী, তা আমরা জানি না। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা আনুরূপ্যবিহীন, আকার-প্রকারাতীত। সুতরাং আকারসম্ভূত শরীর, হাত তাঁর থাকতেই পারে না। পরবর্তী যুগের আলেমগণ অবশ্য 'নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি' কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— পিতামাতার মাধ্যমে মানব সৃজন হচ্ছে আমা কর্তৃক প্রদত্ত বিধান। কিন্তু সেই বিধানের অধীনে আমি আদমকে সৃষ্টি করিনি, সৃষ্টি করেছি সরাসরি, পিতামাতার মাধ্যম ব্যতিরেকে।

'ইয়াদাইয়া' এর শাব্দিক অর্থ দু'হাতে। এখানকার এই দ্বিত্বের কারক এ বিষয়টিই তুলে ধরেছে যে, আল্লাহ্‌পাক হজরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন নিজস্ব নৈপুণ্য ও অপার ক্ষমতায়।

www.eelm.weebly.com

'আস্তাক্‌বারতা' (তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে) কথাটি এখানে ধমক প্রদায়ক, ভর্ৎসনামূলক ও নেতিবাচক প্রশ্ন। এর মর্মার্থ— কোনো অধিকার ছাড়াই তুমি হয়ে গিয়েছিলে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

'আম কুন্‌তা মিনাল আ'লীন' অর্থ না তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? অর্থাৎ নাকি তুমি হয়ে গিয়েছো উচ্চ মর্যাদার অধিকারী?

এরপরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো এবং তাকে সৃষ্টি করেছো কর্দম থেকে'। এখানে 'সে বললো' অর্থ ইবলিস বললো। অর্থাৎ ইবলিস তার অপকর্মের পক্ষে আবার যুক্তিও উত্থাপন করলো। বললো, আগুন মৃত্তিকা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাই অনলজ আমি মৃত্তিকাজাত আদমের চেয়ে উচ্চ মর্যাদাধারী। সে কারণেই আমি তাকে সেজদা করা থেকে বিরত থেকেছি। তার এমতো যুক্তি যে অসার, অচল ও অযথার্থ তা বলাই বাহুল্য। যথার্থ যুক্তি তো এই যে, যিনি সৃজয়িতা ও পালয়িতা, তাঁর নির্দেশ অবশ্যমান্য।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত (৭৭)। এবং তোমার উপর আমার লানত স্থায়ী হবে, কর্মফল দিবস পর্যন্ত' (৭৮)।

এখানে 'বের হয়ে যাও' অর্থ বের হয়ে যাও এই বেহেশত, অথবা এই আকাশ থেকে। হাসান ও আবুল আলিয়া কথাটির অর্থ করেছেন— এই সুন্দর পরিবেশ থেকে বের হয়ে যাও, যেখানে তোমাকে সৃজন করা হয়েছিলো। হাসান ইবনে ফজল বলেছেন, এই ব্যাখ্যাটিই উত্তম। উল্লেখ্য, ইবলিসের উপরে এরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো বলেই বিতাড়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা হয়ে গিয়েছিলো কালো ও কুৎসিত।

'ফা ইন্‌নাকা রজ্বীম' অর্থ নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত। অর্থাৎ আদমকে অসম্মান করার কারণেই তুমি এবার বিতাড়িত হলে।

'লা'নত' অর্থ অভিসম্পাত, অভিশাপ। আর এখানে তোমার উপর আমার লানত স্থায়ী হবে কর্মফল দিবস পর্যন্ত কথাটির উদ্দেশ্য এরকম নয় যে, মহাবিচারের দিবসের পরে ইবলিস আর অভিসম্পাতগ্রস্ত থাকবে না। বরং কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে— মহাবিচার দিবস পর্যন্ত তুমিতো অভিসম্পাতগ্রস্ত অবস্থায় থাকবেই, তারপরেও অভিশপ্ত অবস্থায় ভোগ করতে থাকবে দোজখের অনন্ত শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অবকাশ দিন কিয়ামত দিবস পর্যন্ত'। এখানে 'ফান্‌জির্‌নী' অর্থ অবকাশ দাও। কথাটি বলা হয়েছে আগের বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে। তাই কথাটির প্রথমে সংযোজিত হয়েছে 'ফা' অব্যয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে—(৮০) অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত' (৮১)। এখানে 'ফা ইন্‌নাকা মিনাল মুন্‌জারীন' অর্থ তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে। এখানকার 'ফা' কার্যকারণ প্রকাশক। অর্থাৎ ইবলিসের নিবেদনের কারণেই দেওয়া হয়েছে এরকম জবাব। প্রকৃত কথা হচ্ছে তাকে অবকাশ প্রদানের বিষয়টি আল্লাহ্‌র অবগতিতে আগে থেকেই ছিলো। কিন্তু তার প্রকাশ ঘটলো ইবলিসের প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে। আর এখানকার 'অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত' অর্থ হজরত ইস্রাফিলের শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার পর্যন্ত। সুরা হিজরের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

এর পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সে বললো, আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করবো (৮২), তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়' (৮৩)।

এখানকার 'ফা বিই'য্‌যাতিকা' (তোমার সম্মানের শপথ) কথাটির 'ফা'অব্যয়টি কারণপ্রকাশক। অর্থাৎ ইবলিস বিভ্রান্ত করণের প্রবল বাসনা পূরণ করতে পারলো অবকাশপ্রাপ্তির কারণেই। অবকাশ না পেলে সে কিছুতেই এরকম সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে পারতো না। আর ইবলিস আল্লাহ্‌র মহাসম্মান অথবা মহাক্ষমতার শপথ করেছিলো একারণেই যে, সে যেনো আল্লাহ্‌র ওই অপার ক্ষমতা থেকে আহরণ করতে পারে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার সামর্থ্য।

'মুখলাসীন' অর্থ একনিষ্ঠ বান্দা, বিশুদ্ধচিত্ত দাস। যারা এধরনের মহাপুণ্যবান, তারা সুরক্ষিত। এদেরকে পথচ্যুত করার সাধ্য ইবলিসের নেই। সেকথা সে এখানে অকপটে স্বীকারও করেছে। বলেছে— তবে তাদের মধ্যে তোমার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়। যাদেরকে তুমি স্বীয় আনুগত্যের জন্য মনোনীত করে নিয়েছো।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি— (৮৪) তোমার দ্বারা এবং তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবোই' (৮৫)। একথার অর্থ— ইবলিসের সঙ্গে আল্লাহ্ তাঁর কথোপকথনের

পরিসমাপ্তি টানলেন এভাবে— বললেন, আমার কথা অবশ্যই সত্য। আর আমি সত্যই বলছি হে ইবলিস! তুমি ও তোমার মতো যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, আমি তাদেরকে দিয়ে জাহান্নাম পরিপূর্ণ করবোই।

এখানে 'ফাল্হাক্কু' অর্থ আমি সত্য, অথবা আমার প্রতিজ্ঞা সত্য। এখানে বাক্যের উদ্দেশ্য উহ্য রয়েছে। 'হাক্ব' হচ্ছে আল্লাহ্র একটি নাম। অথবা অর্থ হবে— সত্য আমার শপথ। সেক্ষেত্রে বিধেয় হবে উহ্য। আর এখানকার 'ওয়াল হাক্কুন আক্বলু' (আর আমি সত্যই বলি) বাক্যটি পূর্বাপর সম্পর্কবিহীন একটি বাক্য।

'জাহান্নামা মিন্কা ওয়া মিম্মান্ তাবিয়াকা মিন্হুম আজ্মায়ীন' অর্থ তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবোই। তোমাদের একজনকেও ছাড়বো না। উল্লেখ্য, এই অনুজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সকল শয়তান জ্বিন ও প্রত্যেক শয়তান- স্বভাবী মানুষ।

সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ৮৬, ৮৭, ৮৮

❑ বল, 'আমি ইহার জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না এবং যাহারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

❑ ইহা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র।

❑ ইহার সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানিবে, কিয়ৎকাল পরে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! আপনি মক্কাবাসীদেরকে জানিয়ে দিন, হে আমার স্বজাতি! এই যে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করে চলেছি, এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় প্রত্যাশা করি না।

এর পর বলা হয়েছে— 'এবং যারা মিথ্যা দাবি করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই'। একথার অর্থ— এই কোরআন আমার নিজস্ব রচনা নয়। এরকম মিথ্যা দাবিও আমি করি না। আর যারা এরকম দাবি করে, তাদের দলভূতও আমি নই। আমি প্রকৃতই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত ও প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত একজন রসুল।

হজরত ওমর থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, কপটতা ও মনগড়া সকল কিছু থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। বাগবী লিখেছেন, মাসরুক

বলেছেন, একবার আমি হজরত ইবনে মাসউদের নিকটে গেলাম। তিনি বললেন, কেউ কোনো বিষয়ে অবহিত থাকলে যেনো তা বলে। নতুবা যেনো বলে 'আল্লাহ্ জানেন'। এরকম বলাও জ্ঞানের একটি শাখা। কেননা, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয়তম রসুলকে এই মর্মে নির্দেশনা দিয়েছেন— বলো, আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই'।

আমি বলি, এখানকার দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যটির প্রতি গুরুত্বআরোপক। এভাবে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কারো কাছে কোনো প্রতিদান চান না, মিথ্যা কোনো কিছু দাবি করা তার পক্ষে অসম্ভব।

পরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— 'এটাতো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র'। একথার অর্থ— হে আমার বচনবাহক! আপনি তাদেরকে আরো জানিয়ে দিন, এই কোরআন মহামূল্যবান উপদেশে পরিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণতই প্রত্যাদেশিত। আর এই নির্ভুল বৈভবের প্রতিই আমি তোমাদেরকে অভিনিবেশী করে তুলতে চাইছি।

শেষোক্ত আয়াতে (৮৮) বলা হয়েছে— 'এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে, কিয়ৎকাল পরে'। একথার অর্থ— এই কোরআনের সকল বিজ্ঞপ্তি অবশ্যই কার্যকর করা হবে। অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে কোরআন- কথিত পুরস্কার ও তিরস্কার। আর সেই দিন বেশী দূরেও নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা এখানকার 'বা'দা হীন' (কিয়ৎকাল পরে) কথাটির অর্থ করেছেন— মৃত্যুর পরে। ইকরামা অর্থ করেছেন— শেষ বিচারের দিনে। হাসান বলেছেন, মৃত্যু সমুপস্থিত হলেই মানুষের সামনে সত্যের স্বরূপ উন্মোচিত হয়।

আল্লাহ্র অসীম রহমতে সুরা সোয়াদের তাফসীর শেষ হলো আজ ৬ই রজব ১২০৭ হিজরী সনে। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন ওয়া সাল্লাল্লাহুতায়ালা আ'লা খইরি খল্ক্বিহী মুহাম্মাদিঁউ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজ্মায়ীন।

সূরা যুমার

www.eelm.weebly.com

এই সুরার রুকু সংখ্যা ৮ এবং আয়াত সংখ্যা ৭৫। সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কেবল ৫২, ৫৩ ও ৫৪ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

❑ এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে।

❑ আমি তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করিয়াছি। সুতরাং আল্লাহ্‌র ইবাদত কর তাঁহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া।

❑ জানিয়া রাখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। যাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাহারা বলে, 'আমরা তো ইহাদের পূজা এইজন্যই করি যে, ইহারা আমাদিগকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে আনিয়া দিবে।' উহারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করিতেছে আল্লাহ্ তাহার ফয়সালা করিয়া দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ্ তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

❑ আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিতে চাহিলে তিনি তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা বাছিয়া লইতেন। পবিত্র ও মহান তিনি! তিনি আল্লাহ্, এক, প্রবল পরাক্রমশালী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তান্‌যীলুল কিতাবি মিনাল্‌লাহিল্ আ'যীযিল হাকীম'। এর অর্থ— এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। এখানে 'তান্‌যীলুল কিতাব' কথাটির উদ্দেশ্য অনুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ এটা হচ্ছে অবতীর্ণকৃত কিতাব। অথবা এই অবতীর্ণকৃত এখানে উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় হচ্ছে 'মিনাল্লহ্' (আল্লাহ্‌র নিকট থেকে)। 'তান্‌যীল' এখানে কর্মপদীয় ক্রিয়ামূল। অর্থাৎ অবতরণকৃত, অবতারিত।

'আ'যীয' অর্থ পরাক্রমশালী, সকলের এবং সকল কিছুর উপরে শক্তিমান। 'হাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়, আপন প্রজ্ঞায় নিপুণ সৃজয়িতা। আর 'কিতাব' অর্থ এখানে কেবল এই সুরা, অথবা এই কোরআন।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আমি তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি'। এ কথার অর্থ— হে আমার বচনবাহক! এই মহাগ্রন্থ আমি আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি যথাযথ পদ্ধতিতে। এখানে 'বিল হাক্বক্ব' অর্থ

সত্যের হিসেবে। 'বা' অব্যয়টি এখানে নৈমিত্তিক। অর্থাৎ আমি এই মহাগ্রন্থ আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে, প্রকাশ করতে এবং বিশদভাবে বর্ণনা করার নিমিত্তে। দৃশ্যতঃ মনে হয় এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের পুনরুক্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। প্রথম বাক্যে 'তান্‌যীলুল কিতাবি' 'গ্রন্থের অবতারণ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে গ্রন্থ অবতারণের উপক্রমণিকা। আর পরবর্তী বাক্যে বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থ অবতারণের নিমিত্ত।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং আল্লাহ্‌র ইবাদত করো তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে'। একথার অর্থ— কোরআন আমি অবতীর্ণ করেছি এ জন্যে যে, এর মাধ্যমে আপনি ও আপনার একনিষ্ঠ অনুসারীরা আল্লাহ্‌র ইবাদতের মাহাত্ম্য ও বিধানাবলী সম্পর্কে জানবেন এবং কেবল তাঁর ইবাদত করবেন তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'জেনে রেখো, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য'। এখানে 'লিল্লাহ্' শব্দটি এসেছে 'দ্বীন' এর পূর্বে। ফলে আল্লাহ্‌র সঙ্গে 'ধর্ম' বা আনুগত্যের সম্পর্কটি হয়েছে অধিকতর সুদৃঢ়। আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার বিশুদ্ধ ইবাদতের বিষয়টি এতো অধিক দলিল-প্রমাণ নির্ভর যে, বিষয়টিকে যেনো বলা যায় স্বতঃসিদ্ধ, অথবা সর্বজন-স্বীকৃত। সেকারণেই এ বাক্যের দৃঢ়তা বুঝানোর জন্য কোনো অব্যয় ব্যবহার করা হয়নি। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বিশুদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা, উপাস্য হওয়ার সকল যোগ্যতা কেবল তাঁর মধ্যেই বর্তমান। আর তিনিই জানেন কেবল সকলের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত পরিদৃশ্যমান-অদৃশ্য সকল কিছু। সুতরাং সকলের অবিমিশ্র আনুগত্য লাভ করার অধিকার রয়েছে কেবল তাঁর।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তো এদের পূজা এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে এনে দিবে'। একথার অর্থ— মক্কার পৌত্তলিকেরা বলে, আমরা আমাদের দেব-দেবীর প্রতিমাগুলোকে আল্লাহ্ ভেবে তো পূজা করি না। পূজা করি তাদেরকে সুপারিশকারী মনে করে। মনে করি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য আমরা পাবো তাদের মাধ্যমেই।

'যুলফা' এখানে ক্রিয়ামূল। এর অর্থ নৈকট্য, সান্নিধ্য। বাগবী লিখেছেন, শব্দটি নামপদ, যা ব্যবহার করা হয়েছে ক্রিয়ামূলের স্থলে। অর্থাৎ নৈকট্যের সম্পর্ক সম্পূর্ণ করা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে, আল্লাহ্ তার ফয়সালা করে দিবেন'। একথার অর্থ— এখন মক্কার পৌত্তলিক ও মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাসগত যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, তা আল্লাহ্ মীমাংসা করে দিবেন অচিরেই, মহাবিচারের দিবসে। পৌত্তলিকদেরকে প্রবেশ করাবেন নরকাগ্নিতে এবং বিশ্বাসীদেরকে দান করবেন বেহেশত।

'হুম' অর্থ তারা। এখানে এই একটি সর্বনামের মাধ্যমেই বিশ্বাসী-নির্বিশ্বাসী সকলকে সচকিত করা হয়েছে। এরকমও হতে পারে যে, পূর্ববর্তী বাক্যের 'আল্‌লাজীনা' এর উদ্দেশ্য একই সঙ্গে হজরত ঈসা, হজরত উযায়ের, ফেরেশতা, দেব-দেবীদের প্রতিমা। আর 'ইত্‌তাখাজু' এর পরে আলোচ্য বাক্যের 'হুম' সর্বনামটির ক্রিয়ার কর্ম রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ তাদের সকল পূজনীয়রাই মিথ্যা উপাস্য, যাদেরকে তারা গ্রহণ করেছে তাদের সুপারিশকারী বা অভিভাবকরূপে।

জুয়াইবিরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বনী আমর, বনী কেনানা ও বনী সালমা এই ত্রয়ী গোত্রকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তারা ছিলো পৌত্তলিক। ফেরেশতাদেরকে তারা বলতো আল্লাহ্‌র কন্যা। আরো বলতো, তাদের পূজা করলেই তো আমরা আল্লাহর সান্নিধ্যভাজন হতে পারবো।

বাগবী লিখেছেন, তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হতো, তোমাদের প্রভুপালনকর্তা কে? তোমাদের এবং এই আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা কে? তখন তারা বলতো, আল্লাহ্। তারপর যখন বলা হতো, তাহলে তোমরা প্রতিমা পূজা করো কেনো? তখন তারা বলতো, আল্লাহ্‌র মৈত্রী অর্জনার্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যে মিথ্যাবাদী ও কাফের, আল্লাহ্ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না'। 'কাজিবুন' অর্থ মিথ্যাবাদী অর্থাৎ তার ধারণা করে আল্লাহ্ সন্তানবান ও তাদের আরাধ্যরা সুপারিশ করবে আল্লাহর সকাশে। এবং 'কুফ্‌ফার' অর্থ কাফের, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, অকৃতজ্ঞ, অবিশ্বাসী, আল্লাহ্‌র নেয়ামতসম্ভারের অবমাননাকারী। উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌র সমান্তরালে অন্য কাউকে বা কোনো কিছুকে উপাস্য বলে ধারণা করাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র অনুদানসম্ভারের অবমাননা। এ ধরনের মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাসীদেরকে পথপ্রদর্শন করা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নয়। যদি ইচ্ছা করতেন, তবে মিথ্যাবাদীরা যেমন মিথ্যার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হতো, তেমনি পৌত্তলিকেরাও বিচ্যুত হতো অংশীবাদিতা থেকে। কেননা আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কোনো কিছুরই অস্তিত্ব অসম্ভব। আলোচ্য বাক্যটি সম্পূর্ণ পৃথক একটি বাক্য। পূর্বাপর বাক্যের সঙ্গে এর বক্তব্যগত কোনো যোগাযোগ নেই।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনি আল্লাহ্, এক, প্রবল পরাক্রমশালী'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যদি সন্তান গ্রহণ করতে চাইতেন তবে ঈসা, উযায়ের অথবা ফেরেশতাগণ কেনো, তিনি যাকে খুশী তাকেই বানাতে পারতেন তাঁর সন্তান-সন্ততি। কেননা সকলে ও সকলকিছুই সর্বোতভাবে তাঁর মুখাপেক্ষী এবং অধিকারভূত। কিন্তু পিতা-পুত্র যে পরস্পরের সমান্তরাল ও একে অপরের ক্ষমতা ও যোগ্যতার অংশীদার হয়। সমগ্র সৃষ্টি যে সৃজন সূত্রভূত। সৃজিত ও সৃজয়িতার মধ্যে একমাত্র সম্পর্ক হতে পারে দাস-প্রভুর, যা পিতা-পুত্র হওয়ার অন্তরায়। অথবা বলা যায়— আল্লাহ্‌পাক যদি কাউকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেন তাহলে সে-ও স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে সৃষ্টি করতে

www.eelm.weebly.com

চাইতো। তাই আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় স্রষ্টার অস্তিত্ব অসম্ভব। অধিক সংখ্যক আল্লাহ্‌র বিদ্যমানতা বাস্তবের পরিপন্থী। কাজেই খোদ আয়াতটিই তার নিঃসন্তান হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।। সুতরাং এমতো অবাস্তব ও অযথার্থ ধারণা থেকে তিনি যে পবিত্র ও মহান, তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ্ হচ্ছেন তাঁর সত্তা-গুণবত্তা কার্যকলাপ সকল কিছুতে এক, অতুল, সাদৃশ্যহীন ও আনুরূপ্যহীন।

'আল্কৃহ্হার' অর্থ প্রবল পরাক্রমশালী। অর্থাৎ তিনি এমন এক পরাক্রমশীলতার অধিকারী, যা সম্পূর্ণরূপে অংশীবাদিতানিরোধক। তিনি যে অজর, অমর, অক্ষয়, অব্যয়, চিরস্থায়ী।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৫, ৬

❑ তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করিয়াছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জানিয়া রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

❑ তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন একই ব্যক্তি হইতে। অতঃপর তিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন আট প্রকার আন'আম। তিনি তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই আল্লাহ্; তোমাদের প্রতিপালক; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহারই; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তবে তোমরা মুখ ফিরাইয়া কোথায় চলিয়াছ?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন'। একথার অর্থ— তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁর সুসমঞ্জস পরিকল্পনা অনুসারে এবং এমন শিল্পনৈপুণ্য সহকারে, যাতে করে এই সুবিশাল সৃষ্টি প্রমাণ হয় তাঁর এককত্বের, সর্বজ্ঞতার ও সর্বশক্তিধরতার।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা'। একথার অর্থ— যেমন মানুষ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হয় একটির উপর আরেকটি দিয়ে, তেমনি তিনি রাতের আঁধার দ্বারা দিবসকে এবং দিবসের আলো দ্বারা রাতকে ঢেকে দেন। ফলে পালাক্রমে আবর্তিত হতে থাকে দিন ও রাত। লেফাফা বা খাম যেমন ঢেকে রাখে তার অভ্যন্তরস্থিত বস্তুকে, তেমনি পালাক্রমে দিবস-রজনী আবৃত করে ফেলে পরস্পরকে। অথবা পাগড়ীর ভাঁজের মতো অবিরাম এক ভাঁজকে আবৃত করা হয় অপর ভাঁজ দ্বারা, এভাবেই রাত ও দিনকে ক্রমাগত একটি দ্বারা অপরটি আবৃত করা হচ্ছে। একটিকে আড়াল করে তদস্থলে প্রকাশ ঘটানো হচ্ছে অন্যটির। হাসান ও কালাবী এখানকার আচ্ছাদিত করাকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— রাতকে হ্রাস করে দিনকে বৃদ্ধি করা হয় এবং দিনকে কমিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয় রাত্রিকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। জেনে রাখো, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল'। একথার অর্থ— সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপরিক্রমণের নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন তিনিই। ওই নিয়মানুসারেই মহাপ্রলয় পর্যন্ত সূর্য-চন্দ্র আবর্তিত হতে থাকবে। জেনে রাখো, রাত্রি-দিবস, সূর্য-চন্দ্রসহ এই সুবিশাল সৃষ্টি যিনি নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণ ও পরিচালন করেন, তার পরাক্রম কতো প্রচণ্ড এবং তার ক্ষমতা কতো বিশাল।

এখানে 'আ'যীয' অর্থ অজেয়, সকল কিছুর উপর পরাক্রমশালী। আর 'গাফ্ফার' অর্থ বড়ই ক্ষমাশীল। সেকারণেই তো তিনি অপরাধীদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেন না এবং ছিনিয়েও নেন না তাদেরকে প্রদত্ত পার্থিব বিত্ত-বৈভব।

পরের আয়াতে (৬)বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে। অতঃপর তিনি তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন'। একথার অর্থ— হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের জন্ম-ইতিহাস শোনো। তোমাদের সকলের আদি পিতা একজন। আমি তাকেই প্রথম সৃষ্টি করেছি। তারপর তার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি তার স্ত্রী ও তার সন্তান-সন্ততিদেরকে। এখানে 'এক ব্যক্তি থেকে' কথাটির দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত আদমকে সৃষ্টি করা হয় পিতা-মাতা ব্যতিরেকেই।

এখানে 'অতঃপর তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন' কথাটির মাধ্যমে এমতো ধারণার অবকাশ থেকে যায় যে, তবে কি আল্লাহ্ হজরত আদমের সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি করার পরে সৃষ্টি করেছেন তাঁর পত্নী হজরত হাওয়াকে। যদি তা না-ই হবে, তবে প্রথমে 'তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন' এরকম বলার পর কেনো বলা হলো যে 'অতঃপর তিনি তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন'? (ছুম্মা) শব্দটির ব্যবহার তো এরকম ধারণারই পরিপোষণা করে। এরকম ধারণা খণ্ডনার্থে আমি বলি—

১. এখানে 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটির সংযোগক্রিয়া রয়েছে উহ্য। তাই 'খলাক্বাকুম' (সৃষ্টি করেছেন) এর সঙ্গে কথাটি সরাসরি যুক্ত নয়। অর্থাৎ প্রথমোক্ত বাক্যটির মর্মার্থ হবে এখানে এরকম— আল্লাহ্ প্রথমে একজন মানুষ সৃষ্টি করেন এবং তার নিকট থেকে সৃষ্টি করেন তার জোড়া। ২. অথবা শব্দটি যুক্ত 'ওয়াহিদাতিন' (এক) এর অর্থের সঙ্গে। অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে প্রথমে নিঃসঙ্গভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, পরে সৃষ্টি করা হয়েছিলো তার যুগল, তারপর সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদেরকে। ৩. কিংবা শব্দটি 'তোমাদেরকে 'সৃষ্টি করেছেন' এর সঙ্গেই সম্পর্কিত। কিন্তু এর দ্বারা পরবর্তী সম্পৃক্ততাকে বোঝানো হয়নি। বরং এখানে 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে দু'টো পৃথক বাক্যের বক্তব্যগত তারতম্যকে। অর্থাৎ প্রথম বাক্যে বিবৃত হয়েছে সৃষ্টির সাধারণ রীতিনীতি এবং পরের বাক্যে বলা হয়েছে পৃথক প্রকৃতির সৃষ্টির কথা। অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী সৃষ্টির কথা।

কোনো কোনো আলেমের মতে এখানকার 'তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে' কথাটির মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে আত্মার জগতে সম্পাদিত অঙ্গীকারানুষ্ঠানের প্রতি, যখন সকল আত্মাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেছিলেন 'আমি কি তোমাদের প্রভুপালনকর্তা নই'? তখন সকলে সমস্বরে বলে উঠেছিলো, 'অবশ্যই'। তখন সকল আত্মাকে নির্গত করা হয়েছিলো হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে। তাদের মধ্যে একটিকে করা হয়েছিলো তাঁর জীবন সঙ্গিনী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকারের আন'আম'।

'আনযালা' এর শাব্দিক অর্থ তিনি অবতীর্ণ করেছেন। এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'দিয়েছেন' অথবা 'সৃষ্টি করেছেন' অর্থে। সরাসরি 'অবতীর্ণ করেছেন' অর্থেও এখানে শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— লওহে মাহ্ফুজে সৃষ্টির আদি-অন্তের সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। সেখানকার নির্ধারণানুসারে পৃথিবীতে তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছেন আট প্রকারের পশু। অথবা কথাটির অর্থ হবে— যে সকল উপকরণের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রাণী সৃজন করা হয়, সে সকল উপকরণ তিনি আকাশ থেকেই অবতীর্ণ করেন। যেমন— উল্কা, বৃষ্টি, রৌদ্র ইত্যাদি। কথাটির এরকম অর্থও করা যেতে পারে যে— হজরত আদম সৃষ্টির পর বেহেশতেই তাঁর সাথে সৃজন করা হয়েছিলো গৃহপালিত পশুসমূহ। পরে তাদেরকেও তাঁর সাথে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। আর 'আট প্রকারের' অর্থ চার প্রকার নর এবং চার প্রকার নারী। যেমন উট-উটনী, গাভী-ষাঁড়, মেষ-মেষী ও ছাগ-ছাগী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন'। একথার অর্থ— তিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুসহ অন্যান্য প্রাণীকে জন্মপূর্ব অবস্থায় মাতৃগর্ভে রাখেন

অন্ধকারে তিনটি পর্যায়ে— প্রথমে শুক্রকণা, পরে মাংসপিণ্ড এবং তারপরে অস্থিসম্পন্ন অবস্থায়। এরপর গোশতের আবরণ দিয়ে তাতে করা হয় প্রাণের সঞ্চার। অর্থাৎ কথিত ত্রিবিধ অন্ধকার হচ্ছে— মাতৃজঠর, জরায়ু ও ঝিল্লির আবরণের অন্ধকার। অথবা পিতৃপৃষ্ঠের অন্ধকার, গর্ভাশয়ের অন্ধকার এবং উদরের অন্ধকার। কিংবা পিতৃপৃষ্ঠ, মৃত্তিকা ও মাতৃজঠর— এই তিন রকমের অন্ধকার।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনিই আল্লাহ্; তোমাদের প্রতিপালক; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই; তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। তবে তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছো'? একথার অর্থ— তিনিই হচ্ছেন তোমাদের আল্লাহ্, তোমাদের সৃজক, প্রতিপালক। সকলের এবং সকলকিছুর উপর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তাই তিনি ছাড়া উপাসনা গ্রহণের যোগ্য কেউ নয়। তাহলে হে

www.eelm.weebly.com

মানুষ! তাঁর অপার শক্তিমত্তা ও মহাসৃজনের যে সকল দলিল-প্রমাণ এতোক্ষণ ধরে বর্ণনা করা হলো, সে সকলকিছু জেনে শুনে বুঝে কীভাবে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যত্র গমন করতে চাও?

এখানে 'জালিকুমুল্লহু রব্বুকুম' অর্থ এই সকল কাজ করার মালিক কেবলই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। 'লাহুলমুল্‌ক্' অর্থ সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। এখানে 'জালিকুম' উদ্দেশ্য, আর 'আল্লাহ্' প্রথম বিধেয়, দ্বিতীয় বিধেয় 'রব্বুকুম', তৃতীয় বিধেয় 'লাহুল মুল্‌ক্' এবং চতুর্থ বিধেয় হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাহুয়া' (তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই)।

'লা ইলাহা ইল্লা হুয়া' অর্থ এখানে— কেউ অথবা কোনোকিছুই যেহেতু তাঁর সৃজনকর্মের অংশীদার নয়, সেহেতু ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা তিনি ব্যতীত অন্য কারো নেই।

'ফাআন্‌না তুস্‌রাফুন' (তবে তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছো) কথাটির 'ফা' এখানে কারণপ্রকাশক এবং বিস্ময়প্রকাশক প্রশ্নবোধক। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, বিশদভাবে এতো সব দলিল-প্রমাণ প্রকাশ করার পরেও কী কারণে তোমরা মহাসত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো এবং প্রকৃতউপাস্য আল্লাহ্‌র উপাসনা পরিত্যাগ করে অভিমুখী হচ্ছো ভিত্তিহীন উপাস্যসমূহের দিকে?

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৭, ৮

❑ তোমরা অকৃতজ্ঞ হইলে আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নহেন, তিনি তাঁহার বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পসন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের জন্য ইহাই পসন্দ করেন। একের ভার অন্যে বহন করিবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যাহা করিতে তিনি তোমাদিগকে তাহা অবহিত করিবেন। অন্তরে যাহা আছে তিনি তাহা সম্যক অবগত।

❑ মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তাহার প্রতিপালককে ডাকে। পরে যখন তিনি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হইয়া যায় তাহার পূর্বে যাহার জন্য সে ডাকিয়াছিল তাঁহাকে এবং সে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করায়, অপরকে তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার জন্য। বল, 'কুফরীর জীবন অবস্থায় তুমি কিছুকাল উপভোগ করিয়া লও। বস্তুত তুমি জাহান্নামীদের অন্যতম।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন'। এখানে 'গনিউন্ আ'ন্‌কুম' অর্থ আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বাস ও উপাসনার মুখাপেক্ষী তিনি মোটেও নন। 'তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে' কথাটির মধ্যে কর্মফল অনুক্ত রয়েছে, আর 'আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন' কথাটি উল্লেখিত হয়েছে অনুক্ত কর্মপদের স্থলে। সেক্ষেত্রে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ (মূর্তিপূজক) হও, তবে তোমাদের অপবিশ্বাসের দায় তোমাদের উপরেই বর্তাবে, আল্লাহ্‌র উপরে নয়। কেননা আল্লাহ্ তোমাদের এবং তোমাদের বিশ্বাসের মুখাপেক্ষী নন। বরং তোমরাই সর্বোতক্ষেত্রে তাঁরই মুখাপেক্ষী। অকৃতজ্ঞতা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ও বিশুদ্ধ বিশ্বাস দ্বারা উপকৃত হবে তোমরাই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না'। একথার অর্থ— তোমাদের কৃতজ্ঞতা-অকৃতজ্ঞতা সকল কিছুই তাঁর অভিপ্রায়ানুগত হওয়া সত্ত্বেও অকৃতজ্ঞতা তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়। আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং এরশাদ

www.eelm.weebly.com

করেছেন 'আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, ইসলামের জন্য তার বক্ষাভ্যন্তরকে করে দেন প্রশস্ত। আর যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষদেশকে করেন

সংকীর্ণ' (যাতে তার বক্ষে ইসলামের নূর প্রবেশ করতে না পারে)। আমাদের পূর্বসূরী বিদ্বজ্জন এরকমই অভিমত প্রকাশ করেছেন। এমতো বিশ্বাসই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ধর্মজ্ঞগণ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত। কিন্তু পথভ্রষ্ট মুতাজিলাদের বিশ্বাস এর বিপরীত। তারা বলে, পাপ ও অকৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র অভিপ্রায়প্রসূত হয় না। আরো বলে, আল্লাহ্র আদেশ ও অভিপ্রায় একই।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও সুদ্দী আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ তাঁর বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের জন্য অকৃতজ্ঞতাকে পছন্দ করেন না। আর তাঁর বিশুদ্ধচিত্ত বান্দা তাঁরাই, যাদের সম্পর্কে তিনি ইবলিসকে বলেছেন 'আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব নেই'। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্র 'সন্তোষ'কে রূপক অর্থে 'অভিপ্রায়' বলা যায়। অন্যথায় প্রকৃত কথা হচ্ছে, 'সন্তোষ' ও 'অভিপ্রায়' সমার্থক নয়। অর্থাৎ অভিপ্রায়ের সঙ্গে সন্তোষের সংযোগ অত্যাবশ্যক নয়। অভিপ্রায়ের সম্পর্ক তো ভালো-মন্দ উভয়ের সঙ্গেই হয়ে থাকে। আল্লাহ্র অভিপ্রায় অবশ্যবাস্তবায়নব্য। তিনি যা চান, তা হয়। যা চান না, তা হয় না। কিন্তু তাঁর 'সন্তোষ' ভালোর সঙ্গে। আর মন্দের সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁর 'অসন্তোষ'। এক আয়াতে আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের অবশ্যবাস্তবায়নব্যতার কথা বলা হয়েছে এভাবে 'আমি যা করতে ইচ্ছা করি, সে সম্পর্কে শুধু বলি 'হও' অমনি তা হয়ে যায়'।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের জন্য এটাই পছন্দ করেন'। একথার অর্থ— যদি তোমরা তোমাদের প্রভুপালকের প্রতি ইমান আনো এবং তাঁর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহ মান্য করে চলো, তবে তিনি তার যথোপযুক্ত প্রতিফল তোমাদেরকে দিবেন। পছন্দনীয় বিষয়াবলীর জন্য পুরস্কার প্রাপ্তিই সঙ্গত। তাই কোনো কোনো আলেম এখানকার 'পছন্দ' অর্থ করেছেন পুরস্কার (সওয়াব)। অর্থাৎ তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তিনি তোমাদেরকে করবেন পুরস্কৃত।

এরপর বলা হয়েছে— 'একের ভার অন্যে বহন করবে না'। একথার অর্থ— একজনের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না। অর্থাৎ তোমাদের অকৃতজ্ঞতাজনিত পাপের বোঝা বহন করবে তোমরাই, অন্য কেউ নয়। তোমরা যদি অকৃতজ্ঞই থেকে যাও, তবে তাতে আমার রসুলের কোনো ক্ষতি হবে না। তিনি তো তোমাদের মঙ্গলের জন্যই বার বার তোমাদেরকে সতর্ক করে চলেছেন। আহ্বান জানাচ্ছেন ইসলামের প্রতি।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে, তিনি তোমাদেরকে তা অবহিত করবেন'। একথার অর্থ— হে মক্কার পৌত্তলিক জনগোষ্ঠী! ভুলে যেয়ো না যে, অবধারিত মৃত্যু শেষে তোমরা তোমাদের প্রভুপালকের সকাশে প্রত্যানীত হবেই। তখন তিনি অবশ্যই তোমাদের স্বস্তি অথবা শাস্তি বিধান করবেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'অন্তরে যা আছে, তিনি তা সম্যক অবগত'। একথার অর্থ— সকলের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল। তাঁর সর্বত্রব্যাপী জ্ঞানের বাইরে যাবার সাধ্য কারোই নেই। তাই যথাসময়ে তোমাদের কর্মফলের যথোপযুক্ত প্রতিদান তিনি তোমাদেরকে দিবেনই— নির্ধারণ করবেন তোমাদের জন্য চিরস্বস্তি, অথবা চিরশাস্তি।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে, তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার প্রতিপালককে ডাকে'। পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় তার পূর্বে যার জন্য সে ডেকেছিলো তাঁকে'। একথার অর্থ— মানুষ বিপদে পড়লে সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্কে ডাকে, আবার বিপদ দূর হবার পর যে আল্লাহ্ তার বিপদ দূর করেন, সেই আল্লাহ্র কথাই ভুলে যায়। এভাবেই তারা হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ।

এখানে 'মুনীবান' অর্থ ডাকে, আহ্বান করে। 'ইজা খাওয়ালাহু' অর্থ যখন আল্লাহ্ তাকে অনুগ্রহ করেন, করেন বিত্তশালী বা দাস-দাসীর অধিকারী। 'খাওয়াল' অর্থ পরিচারক, সেবক। রসুল স. যাদের সম্পর্কে বলেছেন, এরা তোমাদের ভাই, তোমাদের সেবা করে, আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের করায়ত্ব করে দিয়েছেন। 'খাওয়ালাহু' অর্থ খবরাখবর রাখা, দেখাশোনা করা। এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। আরববাসীরা বলেন, অমুক ব্যক্তি ধনসম্পদের তত্ত্বাবধায়ক। অর্থাৎ সে ধনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ বা দেখাশোনা করে। নেহায়া, কামুস।

'মা কানা ইয়াদ্‌উ' ইলাইহি' অর্থ যে দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্কে ডেকেছিলো, সেই আল্লাহ্কেই ভুলে যায়। অথবা সে তার প্রভুপালককে ভুলে যায়, যার কাছে সে কাকুতি মিনতি করে পরিত্রাণপ্রার্থী হতো। 'মা' সাধারণতঃ বিবেকহীন সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও এখানকার 'মা কানা' এর 'মা' ব্যবহৃত হয়েছে 'মান' অর্থে, যা ব্যবহৃত হয়

www.eelm.weebly.com

বিবেকবুদ্ধিসম্পন্নগণের বেলায়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়ামা খালাক্বজ্ জাকারা ওয়াল উনছা'। এখানেও 'মা' ব্যবহৃত হয়েছে 'মান' অর্থে।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং সে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করায়, অপরকে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবার জন্য'। উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করানোর অর্থই হচ্ছে নিজে বিপথগামী হওয়া ও অন্যের বিপথগামিতার পথ প্রশস্ত করা। এমতো বাকভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে অপর এক আয়াতেও। যেমন— 'মুসাকে ফেরাউনের লোকেরা নদীবক্ষ থেকে উঠিয়ে নিলো এবং মুসা হয়ে গেলো তাদের শত্রু ও দুঃখ-দুর্দশার কারণ'।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, কুফরীর জীবন অবস্থায় তুমি কিছুকাল উপভোগ করে নাও। বস্তুতঃ তুমি জাহান্নামীদের অন্যতম'। একথার অর্থ— হে আমার

প্রিয়তম বচনবাহক! আপনি ওই অংশীবাদী জনগোষ্ঠীকে বলুন, ঠিক আছে। তোমরা অকৃতজ্ঞ অবস্থাতেই থাকো। কিছুকাল ধরে উপভোগ করো পৃথিবীর জীবন। কিন্তু জেনো, তোমাদের নরকগমন সুনিশ্চিত।

এখানে 'কিছুকাল উপভোগ করে নাও' অর্থ মৃত্যু পর্যন্ত আনন্দ স্ফূর্তি করে নাও। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, আলোচ্য বক্তব্যটি উপস্থাপন করা হয়েছে পৌত্তলিক উয়াইনা ইবনে রবীয়াকে লক্ষ্য করে। মুকাতিল বলেছেন, আবু হুজায়ফা ইবনে মুগীরা মাখজুমীকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৯

❑ যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন যামে সিজ্‌দাবনত হইয়া ও দাঁড়াইয়া আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তাঁহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তাহার সমান, যে তাহা করে না? বল, 'যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না, তাহারা কি সমান?' বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

এখানে 'ক্বানিতুন' অর্থ যে ব্যক্তি নির্ধারিত ইবাদত পূর্ণ করে। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, শব্দটির অর্থ কোরআন পাঠ ও নামাজে প্রলম্বিত দণ্ডায়মানতা।

'আম্মান' কথাটির 'আম' (কী) এখানে বিযুক্তক। সুতরাং এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— উৎসাহ-আগ্রহের সঙ্গে ইবাদতে মশগুল থাকে যে ব্যক্তি, সে কি ওই ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করে রেখেছে? অথবা 'আম' এখানে সংযুক্তক এবং পদ্ধতিগতভাবে এখানে কিছু কথা রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ততাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ওই ব্যক্তি কি উত্তম, যে আল্লাহ্‌কে অংশীদার স্থির করে রেখেছে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না; নাকি উত্তম ওই ব্যক্তি, যে রাত্রিকালে ব্যাপৃত থাকে ইবাদতে?

'আনাআল্ লাইলি' অর্থ রাতে, রাত্রির বিভিন্ন যামে। 'সাজ্বিদাঁও ওয়া ক্বয়িমান' অর্থ সেজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে। 'ইয়াহ্‌জারুল আখিরাতি' অর্থ নিজের পুণ্যকর্মের স্বল্পতাদৃষ্টে পরকালের শাস্তিকে ভয় করে, পুণ্যকর্ম বেশী হলেও তার উপরে ভরসা না করে সর্বান্তঃকরণে ও সর্বোতভাবে প্রত্যাশী হয় কেবল আল্লাহ্‌র রহমতের। অর্থাৎ হৃদয়ে লালন করে যুগপৎ ভয় ও আশা। শুধুই ভয় করে না, কারণ তাতে করে নৈরাশ্য নিশ্চিত হয়, আর নৈরাশ্য নিষিদ্ধ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয় তো কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা'।

আবার শুধু আশাকেও প্রশ্রয় দেয় না, কেননা এতে করে আল্লাহ্‌র শাস্তির প্রতি থাকে না কোনো সমীহ ও স্বীকৃতি। আর আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে নিশ্চিত ও নির্ভয়তাও অসিদ্ধ। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে কেবল ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় নিশ্চিন্ত থাকে'।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশের ব্যাখ্যা এরকমই। আর এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত কী ছিলো, সে সম্পর্কে বিভিন্ন বিদ্বজ্জন বিভিন্ন কথা বলেছেন। যেমন— ১. জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীক সম্পর্কে। ২. আবু সালেহ সূত্রে কালাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসারকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। ৩. হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে জুয়াইবির বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আম্মার ও হজরত আবু হুজায়ফার মালিক সালেম সম্পর্কে। ৪. ইকরামা সূত্রে জুয়াইবির বর্ণনা করেছেন, হজরত আম্মারই আলোচ্য আয়াতের উপলক্ষ। ৫. বাগবী লিখেছেন, জুহাক বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর প্রসঙ্গে। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, এই আয়াত হজরত ওসমান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আবী হাতেমও এরকম বর্ণনা করেছেন। ৬. কালাবীর এক বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াত হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আম্মার এবং হজরত সালমান ফারসীর সমর্থনে অবতীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ণনা-বৈষম্য সত্ত্বেও এমতোক্ষেত্রে একথা মেনে নিলে কোনো ক্ষতি নেই যে, যাদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই ছিলেন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ।

শেষাংশে বলা হয়েছে— 'বলো, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে'।

এখানে 'আল্লাজীনা ইয়া'লামূন' অর্থ যারা আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কে জানে, স্বীকার করে তাঁর কোমল-কঠিন গুণাবলীর কথা। সে কারণে শাস্তির ভয় ও অনুগ্রহের আশায় বুক বেঁধে কেবল তাঁরই আনুগত্যে-উপাসনায় নিবেদিতপ্রাণ হয় এবং আত্মরক্ষা করে পাপ থেকে।

আলোচ্য প্রশ্নটি ঋণাত্মক, অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— জ্ঞানী ও অজ্ঞ কখনো সমান হতে পারে না। বাক্যটি পূর্বে আলোচিত বাক্যের সমার্থক ও বক্তব্যকে অধিকতর স্পষ্টকারক। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বাক্যটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই, উপরন্তু এটি একটি প্রকৃষ্ট উপমাও। অর্থাৎ জ্ঞানী ও মূর্খ যেমন সমান নয়, তেমনি সমান হতে পারে না অনুগত ও অবাধ্যরা। কেউ কেউ আবার বলেছেন, পূর্ববর্তী বাক্যে কর্মসম্পাদনের শক্তির দিক থেকে দু'দলের সমতাকে অস্বীকার করা হয়েছে, আর আলোচ্য বাক্যে অস্বীকার করা হয়েছে জ্ঞানগত দিকের সমতার। এভাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে এক দলের উপরে অন্য দলের। কোনো কোনো বর্ণনাকারী মন্তব্য করেছেন, এখানকার 'আল্লাজীনা

ইয়া'লামূন'(যারা জানে) এবং 'আল্লাজীনা লা ইয়া'লামূন' (যারা জানে না) কথা দু'টোতে ইঙ্গিত রয়েছে যথাক্রমে হজরত আম্মার এবং আবু হুজায়ফা মাখজুমীর প্রতি।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

❑ বল, 'হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যাহারা এই দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাহাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহ্র যমীন প্রশস্ত, ধৈর্যশীলদিগকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হইবে।'

❑ বল, 'আমি তো আদিষ্ট হইয়াছি, আল্লাহ্র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া তাঁহার 'ইবাদত করিতে;

❑ 'আর আদিষ্ট হইয়াছি, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই।'

❑ বল, 'আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি মহাদিবসের শাস্তির।'

www.eelm.weebly.com

❑ বল, ‘আমি ‘ইবাদত করি আল্লাহ্‌রই তাঁহার প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রাখিয়া।

❑ ‘আর তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহার ইচ্ছা তাহার ইবাদত কর।’ বল, ‘ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জানিয়া রাখ, ইহাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘বলো, হে আমার মুমিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো’। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আমার পক্ষ থেকে আপনার বিশ্বস্ত অনুচরদের নিকট আমার বক্তব্যকে উপস্থাপন করুন এভাবে— হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা ভয় করো তোমাদের প্রভুপালনকর্তার অসন্তোষ ও আযাবকে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘যারা এই দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ’। এখানে ‘আহসানু’ অর্থ কল্যাণকর কাজ করে। অর্থাৎ যে ইমানদার তার ইবাদত সম্পন্ন করে পরিপূর্ণ একাগ্রতা, নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে। যেমন রসুল স. বলেছেন, ইবাদতের সৌন্দর্য (ইহ্‌সান) এই যে, তুমি তোমার প্রভুপালকের ইবাদত এমনভাবে করবে, যেনো তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো। যদি এরকম সম্ভব না হয় তবে যেনো মনে রাখতে পারো যে, তিনি তো তোমাকে দেখছেন।

আর ‘হাসানাত’ অর্থ এখানে কল্যাণ, উত্তম প্রতিদান, জান্নাত। সুদ্দী বলেছেন, এই দুনিয়ার কল্যাণ হচ্ছে সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য। কিন্তু কথাটি সর্বাংশে সত্য নয়। কেননা সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কেবল বিশ্বাসীরাই হয় না, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও হয়। আবার কখনো কখনো হয় এর বিপরীতও। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য থাকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের, বিশ্বাসীদের থাকে না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্‌র দুনিয়া প্রশস্ত’। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র এই পৃথিবী যেহেতু সুবিস্তৃত, তাই আল্লাহ্‌র ইবাদত কোনো নির্দিষ্ট স্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে না। এখানে এই ইঙ্গিতটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, যদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বাধার কারণে কোনো জনপদের মুসলমানেরা নির্বিঘ্নে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে না পারে, তবে তাদের জন্য দেশত্যাগ অত্যাবশ্যক। হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলেছেন, মক্কা ছেড়ে অন্যত্র গমন করো— এই হচ্ছে আলোচ্য বাক্যের নির্দেশনা। মুজাহিদ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্‌ বলে দিয়েছেন, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। সুতরাং তোমরা হিজরত করো। পৃথক হয়ে যাও মক্কাভূমি থেকে। সাঈদ ইবনে যোবায়ের কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— যে স্থানে পাপ করতে বাধ্য করা হয়, সে স্থান থেকে অন্যত্র গমন করো।

এরপর বলা হয়েছে— ‘ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমেয় পুরস্কার দেওয়া হবে’।

এখানে ‘আস্‌সবিরূন’ অর্থ ওই সকল লোক, যারা অটুট ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে ধর্মাধিষ্ঠিত থাকে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মচ্যুত হয় না। অথবা কথাটির উদ্দেশ্য— ওই সকল হিজরতকারী, যারা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও জন্মভূমির বিচ্ছেদে ধৈর্যধারণ করেছে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াতাংশ অবতীর্ণ হয়েছে হজরত জাফর ইবনে আবু তালেব ও তাঁর সহগামীগণ সম্পর্কে, যাঁরা মক্কা থেকে হিজরত করে

আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা অকথ্য অত্যাচার সহ্য করা সত্ত্বেও সত্যচ্যুত হননি। কিন্তু এখানকার বক্তব্যটি ব্যাপকার্থক। অর্থাৎ কেবল হিজরতকারীগণ নয়, স্বভূমিতে প্রায়বন্দী অবস্থায় বহুবিধ অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও যারা স্বধর্মে অবিচল ছিলেন, তাঁরাও এখানকার ‘ধৈর্যশীলগণ’ এর অন্তর্ভূত।

হজরত আলী বলেছেন, সকল আনুগত্যকারীকে ওজনে মেপে মেপে প্রতিদান দেওয়া হবে। কেবল ধৈর্যশীলেরা হবে এর ব্যতিক্রম। তাদের উপরে তো প্রতিদান বর্ষিত হতে থাকবে বৃষ্টির মতো।

হজরত আনাস থেকে ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দাঁড়িপাল্লা বসানো হবে, নামাজীদের ডাকা হবে এবং ওজন অনুসারে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। এরপর ডাকা হবে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দানকারীদেরকে। তাদেরকেও প্রতিদান দেওয়া হবে ওজন অনুসারে। হাজীদের প্রতিদানও দেওয়া হবে এভাবেই। শেষে ডাকা হবে বিপদে ধৈর্যধারণকারীদেরকে। কিন্তু তাদের জন্য থাকবে না কোনো তুলাদণ্ড, পুণ্যকর্মের ফিরিস্তি, অথবা আমলনামা। তাদের উপরে বর্ষিত হতে থাকবে অপরিমেয় প্রতিদান। তখন পৃথিবীতে যারা স্বাস্থ্যবান ছিলো তারা কামনা করবে, হায় দুনিয়াতে যদি আমাদের শরীর কাঁচি দিয়ে কাটতে থাকা হতো (তাহলে আমরাও হতাম এমতো অপরিমেয় সৌভাগ্যের অধিকারী)।

নির্ভরযোগ্য সূত্রপরম্পরায় হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী ও আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, মহাবিচারের দিবসে প্রতিদান প্রদানের জন্য একে একে ডাকা হবে শহীদ, জাকাতপ্রদানকারী ও দুঃখ-দুর্দশা ভোগকারীদেরকে। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তিদের জন্য না কোনো তুলাদণ্ড স্থাপন করা হবে, না খোলা হবে তাদের আমলনামা। তাদের উপর প্রতিদান বর্ষিত হতে

থাকবে অবিশ্রান্ত ধারায়। ওই দৃশ্য দেখে অন্যরা মনে মনে আক্ষেপ করতে থাকবে, আহা! দুনিয়াতে যদি তাদের দেহ কাঁচি দিয়ে টুকরো টুকরো করা হতো।

হজরত জাবের থেকে তিরমিজি ও ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দুঃখ-দৈন্য ভোগকারীদেরকে যখন পুরস্কৃত করা হবে, তখন পৃথিবীর জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ ভোগকারীরা মনে মনে এই ভেবে আফসোস করতে থাকবে যে, পৃথিবীতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বদলে যদি আমাদের গায়ের চামড়া কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হতো।

আমি বলি, এখানে 'ধৈর্যশীলগণ' অর্থ আল্লাহ্র প্রেমিকগণ। কেননা হাদিস শরীফে দুর্দশা গ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি শহীদগণকে, যদিও শহীদ হওয়া অত্যন্ত কষ্টদায়ক, শহীদেরা সে কষ্টে ধৈর্যও ধারণ করে থাকেন।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'বলো, আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে (১১), আর আদিষ্ট হয়েছি, আমি যেনো আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই' (১২)।

এখানে 'মুখলিসাল লাহুদ্ দ্বীন' অর্থ যেনো কেবল তাঁরই ইবাদত করি। 'লি আন্ আকুনা আউয়ালাল্ মুস্লিমীন' অর্থ 'পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে যেনো হই আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী'। অথবা এখানে 'আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী' অর্থ— কুরায়েশ ও তাদের সমগোত্রীয়দের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী। মুসলিম। এখানে দু'বার 'আদিষ্ট হয়েছি' (উমিরতু) বলার কারণে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এক্ষেত্রে দু'টি— একনিষ্ঠ ইবাদতের এবং ধর্মীয় বিষয়াবলীতে অগ্রগামিতা অর্জনের। উল্লেখ্য, প্রবৃত্তির বিশুদ্ধতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্র ইবাদতে একনিষ্ঠ হওয়া যায় না। আবার এমতো বিশুদ্ধতা ধর্মাগ্রগণ্য হওয়ারও মূল শর্ত। তাছাড়া এখানকার 'লিআন্ আকুনা' কথাটির 'লাম' অক্ষরটি অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। যেমন বলা হয় 'আরাদ্তু লিআন্ আফআ'লা কাজা' (আমি এরকম করার ইচ্ছা করেছি)। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে, এখানে প্রথমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পূর্ণ মুসলমান হতে এবং পরে দেওয়া হয়েছে মুসলমানদের অগ্রনায়করূপে মহান ধর্ম ইসলাম প্রচারের আদেশ। বলাবাহুল্য, ইসলাম প্রচারই ছিলো রসুল স. এর মূল কর্তব্যকর্ম। আর ওই কর্তব্য সম্পাদনার্থেই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে অন্যকে আকর্ষণ করার এই বিশেষ বাকভঙ্গি। যেনো বলতে বলা হয়েছে, দ্যাখো, ইসলাম যদি উত্তম না হতো, তবে নিশ্চয় তা আমি নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতাম না।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'বলো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি মহাদিবসের শাস্তির'।

এখানে 'ইন্ আ'সাইতু' অর্থ তবে আমি ভয় করি মহাদিবসের শাস্তির। অর্থাৎ তোমাদের মতো অংশীবাদিতা ও পাপাচরণের দিকে আমি যদি ঝুঁকে পড়ি, তবে আমার জন্যও রয়েছে শাস্তি ভোগের আশংকা। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতেও বিধৃত হয়েছে ইসলামের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করবার এক আকর্ষণীয় পদ্ধতি। অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে ভয় দেখানোই এমতো বাকভঙ্গির উদ্দেশ্য। বাগবী লিখেছেন, রসুল স.কে যখন কুরায়েশ গোত্রপতিরা বাপদাদাদের ধর্মে ফিরে যাবার আহ্বান জানায়, তখনই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'বলো আমি ইবাদত করি আল্লাহ্রই তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে (১৪)। আর তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত করো। বলো, ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জেনে রাখো, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি'(১৫)।

ইতোপূর্বে রসুল স.কে বলতে বলা হয়েছিলো 'আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে'। আর এখানে বলতে বলা হলো 'আমি ইবাদত করি আল্লাহ্রই তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে'। এরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অবশ্য কুরায়েশ গোত্রপতিদের দুরাশা ধূলিসাৎ করণার্থে। অর্থাৎ বাপদাদাদের ধর্মে রসুল স. এর ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে

তারা যে ক্ষীণ আশা হৃদয়ে পোষণ করতো, তা সম্পূর্ণরূপে বিদূরণার্থে। সঙ্গে সঙ্গে রসুল স.কে এরকম বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে— 'আর তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত করো'। একথা বলে তাদের আশাভঙ্গ করা হয়েছে সমূলে। ফলে সিদ্ধান্তটি হয়ে গিয়েছে চিরকালীন। এভাবে বক্তব্যার্থটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি মক্কার গোত্রপতিদেরকে আপনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিন। বলুন, আমি আল্লাহ্র একনিষ্ঠ ইবাদত করি, আর তোমরা ইবাদত করো আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের। এর পরিণামে তোমরা অবশ্যই হবে শাস্তিগ্রস্ত। আর অচিরেই তা তোমাদের গোচরীভূতও হবে। এখানে 'ফা'বুদু' হচ্ছে একটি অনুক্ত উদ্দেশ্যের বিধেয়। অথবা একটি উহ্য শর্তের প্রতিউক্তি।

www.eelm.weebly.com

এরপরে রসুল স.কে আরো বলতে বলা হয়েছে— 'বলো, ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে'। এখানে 'খসিরূ আন্‌ফুসাহুম' অর্থ নিজেদের ক্ষতি সাধন করে। আর 'ওয়া আহলীহিম' অর্থ এবং ক্ষতিসাধন করে নিজেদের পরিজনবর্গের। 'পরিজনবর্গ' অর্থ স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও পরিচারক-পরিচারিকা। কোনো ব্যবসায়ীর ব্যবসায় ক্ষতি হয়ে গেলে আরববাসীগণ বলেন 'খসিরাত্ তাজির'। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও তাদের আখেরাতের ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইমান-আমল বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তে জান্নাতে তাদের যে অংশ নির্ধারিত ছিলো, তা হারিয়ে গেলে তার অধিকারী হয়ে যায় জান্নাতীরা। পক্ষান্তরে বিশ্বাসীরা সত্যপ্রত্যাখ্যান ও অবাধ্যতার শর্তে তাদের জন্য নির্ধারিত দোজখ পরিত্যাগ করে দোজখীদের জন্য। 'খসিরা' হচ্ছে অকর্মক ক্রিয়া। কিন্তু এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সকর্মক ক্রিয়া হিসাবে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ প্রত্যেক মানুষের জন্য জান্নাতে বিশেষ বাসস্থান ও পরিজনবর্গ নির্ধারিত করে রেখেছেন। বান্দা বিশ্বাসী ও অনুগত হলে ওই অংশ তারা পাবে। নতুবা তা দিয়ে দেওয়া হবে অন্য কোনো জান্নাতবাসীকে।

আমি বলি, বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে এখানকার 'খসিরূ' শব্দটির অর্থ হবে 'ফাওওয়াতু'। অর্থাৎ সেই সকল লোক ক্ষতিগ্রস্ত, যারা হারিয়েছে নিজেদের নন্দিত জীবন ও পরিজনবর্গকে। কেউ কেউ বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত লোক দু'ধরনের হয়, তারা পরিজনবর্গসহ দোজখবাসী হবে, এমতাবস্থায় সে-ই হবে পরিজনবর্গকে পথভ্রষ্টকারী, অথবা পরিজনবর্গ জান্নাতী হবে এবং সে নিজে হবে দোজখী। এমতাবস্থায় সে চিরদিনের জন্য পৃথক হয়ে যাবে তাদের কাছ থেকে। অর্থাৎ এক ধরনের ক্ষতি হচ্ছে পরিজনবর্গসহ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং আর এক ধরনের ক্ষতি হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কেবল নিজে।

বলাবাহুল্য, পরকালের ক্ষতিই প্রকৃত ক্ষতি। তাই এখানে বলা হয়েছে 'আলা জালিকা হুয়াল খুসরানুম্ মুবীন' (জেনে রাখো, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি)।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

www.eelm.weebly.com

❑ তাহাদের জন্য থাকিবে তাহাদের ঊর্ধ্বদিকে অগ্নির আচ্ছাদন এবং নিম্নদিকেও আচ্ছাদন। এতদ্বারা আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।

❑ যাহারা তাগূতের পূজা হইতে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্র অভিমুখী হয়, তাহাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদিগকে—

❑ যাহারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং উহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করে। উহাদিগকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহারাই বোধশক্তিসম্পন্ন।

❑ যাহার উপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হইয়াছে; তুমি কি রক্ষা করিতে পারিবে সেই ব্যক্তিকে, যে জাহান্নামে আছে?

❑ তবে যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ যাহার উপর নির্মিত আরও প্রাসাদ, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; ইহা আল্লাহ্র ওয়াদা, আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাফ করেন না।

❑ তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর ইহা শুকাইয়া যায়। ফলে তোমরা ইহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও, অবশেষে তিনি উহা খড়-কুটায় পরিণত করেন? ইহাতে অবশ্যই উপদেশ রহিয়াছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে নিপতিত করা হবে মর্মন্তুদ শাস্তিতে। তাদের উপরে ও নিচে থাকবে জ্বলন্ত হুতাশনের আচ্ছাদন। ওই অগ্নিশাস্তি থেকে বেঁচে থাকবার জন্য আল্লাহ্ তাঁর একান্ত প্রিয়ভাজন নবী-রসুলগণের মাধ্যমে তাঁর সাধারণ বান্দাদেরকে বার বার সতর্ক করে দেন। বলেন, হে আমার উদাসীন বান্দাগণ। তোমরা সতর্ক হও। আমাকে ভয় করো।

এখানে 'জুলালুন' অর্থ আগুন ও ধোঁয়ার আচ্ছাদন, যা থাকবে নরকবাসীদের ঊর্ধ্বে ও নিম্নদেশে। নিম্নদেশের আচ্ছাদন আবার হবে তৎনিম্নের নরকবাসীদের উপরের আচ্ছাদন। তাই উপরের ও নিচের উভয় আচ্ছাদনকেই এখানে বলা হয়েছে 'জুলালুন' । অর্থাৎ ছাউনি।

এখানে 'জালিকা' অর্থ এতদ্বারা। অর্থাৎ ওই মহাশাস্তির বিজ্ঞপ্তি প্রচারের দ্বারা। 'ইয়ুখওবিফুল্লহু বিহী ই'বাদাহু' অর্থ তদ্দারা আল্লাহ্ সতর্ক করেন তাঁর বান্দাদেরকে, যাতে করে তারা পূর্বাহ্নেই বিজড়িত হয় শাস্তিবিদূরক কর্মকাণ্ডে। আর 'ফাত্তাক্বুন' অর্থ ভয় করো। অর্থাৎ এমন কাজ কোরো না, যা আমার অসন্তোষ ও শাস্তিকে করে অবধারিত।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'যারা তাগুতের পূজা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্র অভিমুখী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে—' একথার অর্থ— যারা মিথ্যা উপাস্যসমূহের পূজা অর্চনা না করে সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্র প্রতি ধাবিত হয়, তারা শুভসংবাদ প্রাপ্তির যোগ্য। অতএব হে আমার রসুল! আপনি আমার ওই সকল বান্দাকে শুভসংবাদ শুনিয়ে দিন।

এখানে 'আততাগুত' অর্থ উদ্ধত, সীমালংঘনকারী। ঔদ্ধত্যে সীমালংঘনকারীরা যেহেতু শয়তান প্রকৃতির হয়, তাই এখানে 'ত্বাগুত' অর্থ হতে পারে শয়তান। বাগবী লিখেছেন, 'ত্বাগুত' অর্থ প্রতিমাসমূহ। কেননা এখানকার 'আঁইয়াবুদূহা' কথাটিতে সংযুক্ত হয়েছে স্ত্রীলিঙ্গবাচক সর্বনাম। আর 'আনাবু' অর্থ এখানে সর্বোতরূপে আল্লাহ্-অভিমুখী হওয়া, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

'লাহুমূল বুশ্‌রা' অর্থ তাদের জন্য আছে সুসংবাদ, পৃথিবীতে নবী-রসুলগণের মুখ থেকে এবং মৃত্যুর সময়ে ফেরেশতাদের মুখ থেকে। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'লাহা সাব্‌আ'তু আব্‌ওয়াব্'

(তার সাতটি দরজা আছে), তখন জনৈক আনসারী রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমার সাতজন ক্রীতদাস ছিলো। আমি জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করার মানসে তাদের এক একজনকে পৃথক ভাবে মুক্ত করে দিয়েছি। তখন অবতীর্ণ হলো 'সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে—' ।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম, তা গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন'। এ কথার অর্থ— যারা কোরআন শোনে এবং অন্যদের কথাও শোনে, তারপর অনুসরণ করে কোরআনের উপদেশের, আবার রসুল স. এর কথা যেমন শোনে, তেমনি শোনে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথাও, কিন্তু মেনে চলে রসুল স. এর নির্দেশ, তারাই সত্যিকারের বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। এমতো ব্যাখ্যার আলোকে এখানকার 'আলক্বওলা' এর অর্থ হবে সাধারণভাবে সকলের কথাবার্তা— আল্লাহ্র, রসুলের ও অন্যের। আর এখানকার 'আহ্সান' অর্থ হবে কেবল কোরআন মজীদ ও রসুল স. এর বাণী। এমতাবস্থায় 'আহ্সান' পার্থক্য-সূচক

www.eelm.weebly.com

বিশেষণ না হয়ে হবে ক্রিয়া বিশেষণ 'হাসান' অর্থবোধক। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রে 'আহ্সান' অর্থ 'অতিউত্তম' না হয়ে হবে কেবল 'উত্তম'। কেননা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথায় 'উত্তম' কোনোকিছু থাকেই না।

এখানকার বাকভঙ্গিটির দাবি হচ্ছে পূর্বোক্ত আয়াতের (১৭) 'ফাবাশ্শির ই'বাদি' কথাটিকে বলা যেতো 'ফাবাশ্শিরহুম'। কেননা এই সর্বনামটির লক্ষ্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে 'ই'বাদি' (বান্দাগণ) বলে এখানে এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শয়তান থেকে তাদের দূরে থাকার ভিত্তি হচ্ছে এই যাচাই-বাছাই। অর্থাৎ তারা উত্তম ও অনুত্তম কথার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে, পৃথক করতে জানে ন্যায় ও অন্যায়কে। আর 'উত্তম' ও অত্যুত্তম' এর পার্থক্য সম্পর্কেও তারা সবিশেষ জ্ঞাত।

আতা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত আবু বকর যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এলেন হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্, হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদ। তাঁরা জানতে চাইলেন, এ সংবাদ সত্য কিনা। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি এখন ইমানদার। একথা শুনে তাঁরাও মুসলমান হয়ে গেলেন। তখন তাঁদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। ইবনে জায়েদ বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তিন জন মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে, যাঁরা মূর্খতার যুগেও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ' কলেমায় বিশ্বাসী ছিলেন। তখনো তাঁরা দূরে ছিলেন প্রতিমাপূজা থেকে। তাঁরা হচ্ছেন, জায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল অথবা সাঈদ ইবনে জায়েদ, আবু জর গিফারী ও সালমান ফারসী। আর আলোচ্য আয়াতের

'উত্তম কথা' অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ' (আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য কেউ নেই)। সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'আহ্সান' এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রত্যাদেশিত নির্দেশনাসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট নির্দেশনানুসারে তারা চলে এবং সৎকাজ করে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কোরআনে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ অথবা ক্ষমাপ্রদর্শন দু'টোরই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'ক্ষমা'কেই বলা হয়েছে 'সর্বোৎকৃষ্ট' (আহ্সান)। আরো বলা হয়েছে মর্যাদা অথবা প্রত্যাখ্যানের কথাও। তবে মর্যাদাকে বলা হয়েছে উত্তম।

'উলুল আলবাব্' অর্থ বোধশক্তিসম্পন্ন। অর্থাৎ ওই সকল ব্যক্তি যাদের বিবেক অপবাদ ও প্রচলিত রীতিনীতির অপপ্রভাব থেকে মুক্ত। একথাটির মধ্যে এই তত্ত্বটিও নিহিত রয়েছে যে, হেদায়েত তো করেন আল্লাহ্ই, কিন্তু মানবপ্রবৃত্তি ওই হেদায়েতকে গ্রহণ করে। যদি এরকম না হতো, তবে মানুষ কিছুতেই সৎপথপ্রাপ্ত হতো না।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'যার উপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে, তুমি কি রক্ষা করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে? যে জাহান্নামে আছে'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! বলুন তো দেখি, যে লোক চিরভ্রষ্ট, যার জন্য আল্লাহ্র চিরন্তন জ্ঞানে শাস্তি সুনির্ধারিত এবং যে আল্লাহ্র অবগতিতে দোজখের মধ্যেই আছে, তাকে রক্ষা করা কি আপনার পক্ষে সম্ভব? এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস।

এখানে 'হাক্ক্বা আ'লাইহি কালিমাতুল আ'জাব' অর্থ যার উপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য আবু লাহাব ও তার পুত্র। এখানকার 'তুমি কি রক্ষা করতে পারবে' কথাটি সম্পর্কযুক্ত আর একটি অনুক্ত শর্তের সঙ্গে। ওই অনুক্ততা সহ পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তুমি কি তার কর্মের প্রভু এবং এমন ক্ষমতাশালী যে, যার জন্য দোজখের দণ্ডাদেশ অনিবার্য হয়েছে, তাকে রক্ষা করতে পারবে?— এমতো প্রশ্নের জবাব হতে পারে একটাই— না, কখ্খনো নয়। সুতরাং প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক।

এখানে 'ইউনক্বিজু' হচ্ছে প্রশ্নের পুনরুক্তি, যা অবাস্তবতার পক্ষে দৃঢ়তাসূচক। আর 'ইউনক্বিজুহুম' এর পরিবর্তে 'তুনক্বিজু মান ফীন্নার' কথাটি এই অস্বীকৃতিকে করেছে অধিকতর সুদৃঢ়। আর 'হাক্ক্ব'(অবধারিত) শব্দটি এখানে এই ইঙ্গিত প্রদান করে যে, যার জন্য শাস্তি অনিবার্য, সে যেনো শাস্তির মধ্যেই আছে। কেননা আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্তের অন্যথা হওয়া অসম্ভব।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে এ বিষয়টিও পরিস্ফুট হয়েছে যে, মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য রসুল স. এর চেষ্টা ও পরিশ্রম ছিলো প্রাণান্ত। তিনি স. মনে প্রাণে চাইতেন যে, সকলেই দোজখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাক। কিন্তু এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে আর একটি সন্দেহ প্রশ্রয় পেতে পারে যে, তাহলে রসুল স. এর প্রচেষ্টা কি নিষ্ফল? তাঁর চেষ্টা-চরিত্র যদি একেবারেই কার্যকর না হয়, তবে তাঁর আর চেষ্টার প্রয়োজনই বা কী? এমতো সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (২০) এভাবে—

'তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ, যার উপর নির্মিত আরো বহু প্রাসাদ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এবার শুনুন তাদের কথা, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং আল্লাহ্র

www.eelm.weebly.com

চিরন্তন ও চিরস্থায়ী জ্ঞানে যাদের বেহেশতবাস সুনিশ্চিত। তাদের জন্য সেখানে রয়েছে সুরম্য প্রাসাদ। প্রাসাদ আর প্রাসাদ। আর সেগুলোর পাদদেশে বয়ে চলেছে জলবতী নদী।

এখানকার 'ইত্তাক্ব' (ভয় করে) অতীতকালসূচক ক্রিয়া। এর দ্বারা এ বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাদের সংযমী ও ধর্মভীরু হওয়া আল্লাহ্‌র সর্বত্রগামী জ্ঞান ও পূর্বসিদ্ধান্তপ্রসূত, তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করেই থাকে। এর অন্যথা হওয়া সম্ভবই নয়।

'গুরাফুন' অর্থ প্রাসাদ, বালাখানা। 'মিন ফাওক্বিহা গুরাফুন' অর্থ যার উপরে নির্মিত আরো প্রাসাদ। অর্থাৎ আরো উচ্চ ও উচ্চতর প্রাসাদমালা। আর 'মিন তাহ্‌তিহাল আন্‌হার' অর্থ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। অর্থাৎ ওই সকল প্রাসাদসমূহের নিম্নদেশে প্রবহমান রয়েছে সলিলশোভিত নদী।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্‌র ওয়াদা; আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাফ করেন না'। একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তাদেরকে তিনি বেহেশত দিবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। আর তিনি কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। কেননা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা একটি দোষ। আর তিনি সকল দোষত্রুটি থেকে সতত মুক্ত, চিরপবিত্র।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতবাসীরা তাদের ঊর্ধ্বস্থিত সুরম্য প্রাসাদ সমূহকে দেখবে নিশাকাশে প্রোজ্জ্বল তারকারাজির মতো। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! তাহলে তো নবী-রসুলগণের জন্য নির্ধারিত ঊর্ধ্বস্তরের বেহেশতে সাধারণ শ্রেণীর বিশ্বাসীরা কখনোই পৌঁছতে পারবে না। রসুল স. বললেন, কেনো পারবে না। শপথ তাঁর, যাঁর অধিকারে আমার জীবন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের উপরে ইমান এনেছে এবং সকল নবী-রসুলকে সত্য বলে জেনেছে, উচ্চস্তরের বেহেশত লাভ করবে তারাও। এ প্রসঙ্গে আরো অনেক হাদিস রয়েছে। সেগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে সুরা ফোরকানের তাফসীরের যথাস্থানে।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তুমি কি দেখো না, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন, অতঃপর তা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি তা খড়কুটায় পরিণত করেন'।

এখানে 'আলাম তারা' (তুমি কি দেখো না) প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। তাই না-সূচক বার্তার অর্থ এখানে হাঁ-সূচক। সুতরাং 'তুমি কি দেখো না' অর্থ এখানে— তুমি তো নিশ্চয় দেখেছো। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি তো নিশ্চয় দেখেছেন, কীভাবে আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি নামাই, ওই বৃষ্টির পানিতে সিক্ত মৃত্তিকায় ঘটাই

ফল ও ফসলের প্রতুল সমারোহ। পরিপক্ক ফসল আহরণের পর সেগুলোর পরিত্যক্ত উদ্ভিদগুলো যায় শুকিয়ে। তার পর তা পরিণত হয় খড়কুটার মতো অনুল্লেখ্য বস্তুতে। আপনি তো জানেন, এমতো সৃজন প্রক্রিয়ার প্রবর্তক শুধুই আমি।

'ইয়ানাবীয়া ফীল্ আরদ্ব' অর্থ ভূমিতে নির্ঝররূপে। ঝর্ণা এবং ঝর্ণার পানি উভয়কে বলা হয় 'নাবীয়া'। শা'বী বলেছেন, পৃথিবীর সকল পানিই আকাশাগত।

'আলওয়ানুহু' অর্থ বিবিধ বর্ণের ফসল। অর্থাৎ গম, যব, ধান ইত্যাদি। অথবা বিভিন্ন রঙের শাক-সবজি। 'ইয়াহীজু' অর্থ শুকিয়ে যায়। 'ফাতারাহু মুস্‌ফাররা' অর্থ তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। আর 'হুত্বমা' অর্থ খড়-কুটা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য'।

এখানে 'ফী জালিকা' অর্থ এতে, এই নিখুঁত ও সুষম রূপান্তরশীল সৃজন প্রক্রিয়ার মধ্যে। 'লা জিক্‌রা' অর্থ উপদেশ, যা স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ যা স্মরণ করিয়ে দেয় মহাসৃজয়িতা, মহাপ্রভুপালয়িতা, মহাশক্তিধর ও মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌কে। এই সঙ্গে একথাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মানুষের জীবনও মৃত্তিকায় উত্থিত শস্যান্যাসের মতো। প্রথমে প্রকাশ, পরে অন্তর্হিতি। প্রথমে জীবন, পরে মৃত্যু। সুতরাং পৃথিবীপ্রসক্তি অনভিপ্রেত।

'লি উলিল্ আলবাব্' অর্থ বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য। অর্থাৎ এমতো উপদেশ থেকে লাভবান হতে পারে কেবল তারা, যারা জ্ঞানবুদ্ধি-বিবেকাধিকারী। বুদ্ধিহীনেরা এমতো উপদেশের মর্ম বুঝতে অসমর্থ। তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো। বরং তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

www.eelm.weebly.com

❑ আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যাহার বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং যে তাহার প্রতিপালক প্রদত্ত আলোতে রহিয়াছে, সে কি তাহার সমান যে এরূপ নহে? দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যাহারা আল্লাহ্র স্মরণে পরাঙ্মুখ! উহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

❑ আল্লাহ্ অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যাহা সুসমঞ্জস এবং যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। ইহাতে, যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাহাদের দেহমন বিনম্র হইয়া আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহাই আল্লাহ্র পথনির্দেশ, তিনি উহা দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথপ্রদর্শক নাই।

❑ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাহার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাইতে চাহিবে, সে কি তাহার মত যে নিরাপদ? যালিমদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা যাহা অর্জন করিতে তাহার শাস্তি আস্বাদন কর।'

❑ উহাদের পূর্ববর্তীগণও অস্বীকার করিয়াছিল, ফলে শাস্তি এমনভাবে উহাদিগকে গ্রাস করিল যে, উহারা ধারণাও করিতে পারে নাই।

❑ ফলে আল্লাহ্ উহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করাইলেন এবং আখিরাতের শাস্তি তো কঠিনতর। যদি ইহারা জানিত!

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণের জন্য যার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার ফলে যে তার প্রভুপালক কর্তৃক প্রদত্ত জ্যোতি দ্বারা সমাবৃত রয়েছে, সেকি ওই লোকের সমতুল, যার বক্ষ-প্রকোষ্ঠ রুদ্ধ? যাদের অন্তর আল্লাহ্র স্মরণমগ্ন নয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন দুর্ভোগ। তারা স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট।

'শারাহাল্লহু সদ্‌রহু' অর্থ আল্লাহ্ যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। 'নূরিম মির্‌রব্বিহী' অর্থ প্রভুপালক প্রদত্ত নূর, জ্যোতি বা আলো। উল্লেখ্য, এই আলোই সত্য ও মিথ্যার স্বরূপপ্রদর্শক। এই আলো যে পায়, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি তার বিশ্বাস হয়ে যায় চিরঅক্ষয়। আর এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ইমান বা বিশ্বাস ধারণ করে কলব বা অন্তর। মস্তিষ্ক বা অন্য কোনো অঙ্গ ইমানের আধার নয়। আল্লাহ্ প্রদত্ত এই আলোর অধিকারীদেরকেই বলা যেতে পারে আলোকিত মানুষ। তাদের হৃদয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে ইসলামের নির্দেশাবলী।

www.eelm.weebly.com

হয়ে যায় অপরিমেয়রূপে প্রশস্ত, যেমন কোনো আধার তার আধেয়কে ধারণ করে বিনা আয়াসে প্রসারিত হয়ে। আর এখানকার 'নূর' শব্দটির প্রকৃত অর্থ দিব্যদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি।

আলোচ্য আয়াত উপস্থাপন করা হয়েছে জিজ্ঞাসার আকারে। তাই প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে 'আফামান্' এবং এর প্রবণতা রয়েছে 'ফা' সংশ্লিষ্ট বিষয়-বস্তুর দিকে। এমতাবস্থায় বক্তব্যরূপটি হয়েছে এরকম— বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে যখন পার্থক্য প্রমাণিত হলো, তখন হে আমার নবী! তাদের অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের বিষয়টিও শুনে রাখুন। প্রকৃত বিশ্বাসীদের অন্তরকে আল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন। ফলে তারা বক্ষে ধারণ করে এক বিশেষ নূর, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি। হয়ে যায় প্রকৃত অর্থে মুমিন ও সত্যাধিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যাদের অবরুদ্ধ বক্ষকে উন্মোচিত করেননি, অন্তরে মেরে দিয়েছেন চিরভ্রষ্টতার মোহর, সত্যপ্রত্যাখ্যান তাদের জন্য স্বাভাবিক। তাদের বিভ্রান্তি সুস্পষ্ট। এখন আপনিই বলুন, বিশ্বাসী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী কি তাহলে সমান? হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এই আয়াত পাঠ করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! বক্ষ উন্মুক্ত হয় কীভাবে? তিনি স. বললেন, অন্তরে প্রবেশ করে এক বিশেষ নূর, ফলে অন্তর হয়ে যায় উন্মুক্ত ও সুবিস্তৃত। আমরা বললাম, এর বাহ্যিক লক্ষণ কী? তিনি স. বললেন, পরকালের দিকে সর্বোতভাবে ঝুঁকে পড়া, প্রতারণা ও অহমিকাপূর্ণ পৃথিবী থেকে দূরে অবস্থান করা, মৃত্যু আগমনের পূর্বেই মৃত্যুর জন্য যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করা। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বাগবী ও হাকেম। আর বায়হাকী বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে।

'ফা ওয়াইলুল্ লিল্‌ক্বসিয়াতি ক্বুলুবুহুম মিন জিক্‌রিল্লাহ্' অর্থ দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহ্‌র স্মরণে পরাঙ্মুখ। এখানে 'ফাওয়াইলুন্' এর 'ফা' কারণ প্রকাশক। আর 'মিন জিকরিল্লাহ্' এর 'মিন' সময় নির্দেশক। অর্থাৎ যখন তাদের সম্মুখে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয়, অথবা পাঠ করা হয় আল্লাহ্‌র বাণী, তখন তাদের অন্তর হয়ে যায় আরো কঠোর। এভাবে দেখা যায় আল্লাহ্‌র স্মরণই তাদের অন্তর কঠোর-কঠোরতর হওয়ার কারণ।

আল্লাহ্‌র জিকির ইমানদার ও কাফেরের অন্তরে সৃষ্টি করে বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া। আর এরকম হয় তাদের সম্প্রসারিত ও সংকুচিত বক্ষের কারণেই। সেকারণেই কোরআন মজীদের যে স্থানে বক্ষসম্প্রসারণ সম্পর্কিত আলোচনা এসেছে সে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ-ই নির্ণীত হয়েছেন বক্ষ সম্প্রসারণকারী। আর যেখানে উল্লেখিত হয়েছে অন্তরের কাঠিন্য প্রসঙ্গ, সেখানে ওই কঠোরতাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে কাফেরদেরই অন্তরের সঙ্গে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'বস্তুত যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তা তাদের কলুষতাকে অধিকতর বৃদ্ধি করে এবং তারা মৃত্যুবরণ করে কাফের অবস্থায়'।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে 'জিকরিল্লাহ্' কথাটির পূর্বে 'তারকা' (পরিত্যাগ) শব্দটি উহ্য রয়েছে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সেই সকল লোকের জন্য রয়েছে অতীব দুর্ভোগ যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণ পরিত্যাগ করার কারণে কঠিন হয়ে গিয়েছে। মালেক ইবনে দীনার বলেছেন, হৃদয়ের কাঠিন্য অপেক্ষা অধিক কোনো শাস্তি বান্দার জন্য নির্ধারণ করা হয়নি। আর কোনো জাতির উপর কেবল তখনই আল্লাহ্‌র গজব পড়ে, যখন হৃদয় থেকে বের হয়ে যায় মমতা-কোমলতা।

হাকেম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, রসুল স. এর উপরে দীর্ঘদিন ধরে কোরআন অবতীর্ণ হতে থাকে। তিনি স. তা সাহাবীগণের সম্মুখে পাঠ করে শোনাতে থাকেন। একদা মান্যবর সহচরবৃন্দ আবেদন করলেন— হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি (কোরআন ব্যতীত) অন্য কিছু যদি বলতেন। ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত আউন ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, সাহাবীগণের জীবন হয়ে গিয়েছিলো কিছুটা একঘেয়েমিপূর্ণ। তাই তাঁরা একদিন নিবেদন জানালেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি যদি অন্য কিছু বলতেন। তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (২৩)।

বলা হলো— 'আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী-সম্বলিত কিতাব, যা সুসমঞ্জস এবং যা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা হয়'। এই আয়াতাংশটি ইতোপূর্বের 'আমি তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি' (আয়াত ২) এর সমার্থক অথবা পরিপোষক। আর এখানে 'অবতীর্ণ করেছি' এর পূর্বে 'আল্লাহ্' উল্লেখ করায় যা প্রমাণিত হয়েছে তা হচ্ছে— ১. কোরআনের অবতরণসূত্র হয়েছে নিঃসন্দিগ্ধ ও সুদৃঢ় ২. প্রকাশ পেয়েছে এই আকাশজ গ্রন্থটির অনন্য মর্যাদা ও মাহাত্ম্য ৩. আকাশাগত সকল বাণী, বিশেষতঃ এই কোরআনের বাণীই সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট বাণী।

'কিতাবাম্ মুতাশাবিহা' অর্থ সুসমঞ্জস কিতাব। এখানে 'মুতাশাবিহা' হচ্ছে 'কিতাব' এর বিশেষণ এবং 'আহ্সানাল হাদীছ' (উত্তম বাণী-সম্বলিত) কথাটির সমঅর্থবোধক। আর 'সুসমঞ্জস' অর্থ কোরআনের সকল আয়াত গভীর তত্ত্ব ও নির্ভুল তথ্যসমৃদ্ধ, সুন্দর ও যথাযথ ভাবে ও ভাষায়। এর কোনো আয়াতের বক্তব্য অন্য আয়াতের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করে না। বরং এর এক আয়াত হয়ে আছে অপর আয়াতের প্রত্যয়ক।

'মাছানী' (পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা হয়) কথাটিও 'কিতাবে'র গুণপ্রকাশক। শব্দটি 'মাছানাত্' এর বহুবচন এবং 'মাছানাত্' হচ্ছে ক্রিয়ার আধার। শপথ, শাস্তি, ভীতিপ্রদর্শন, শুভ-অশুভ কর্মের নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা, ইতিবৃত্তাবলী, নিদের্শনাবলী, সৃজন-নির্মাণ-নিরীক্ষা এ সকল প্রসঙ্গ কোরআনে বার বার এসেছে। তাই এখানে বলা হয়েছে 'যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়'। এরকমও বলা

www.eelm.weebly.com

যেতে পারে যে, কোরআনে রয়েছে বিভিন্ন সুরা ও বহুসংখ্যক আয়াত, যেমন মানুষের রয়েছে বিভিন্ন শিরা-উপশিরা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেগুলোকে বার বার কাজে লাগানো

হয়, তেমনি কোরআনের আয়াতাবলীও বার বার করে তোলা হয় আবৃত্তিযোগ্য। 'যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়' কথাটি বলা হয়েছে এখানে এমতো ভাবকে প্রকাশ করার জন্যই। অথবা 'মাছানী' বহুবচন 'মুছনিয়াতুন' এর। এর অর্থ প্রশংসাকারী। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— কোরআনের আয়াতসমূহ বর্ণনা করে আল্লাহ্র অবিভাজ্য সত্তা ও গুণবত্তার কথা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহমন বিনম্র হয়ে আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে'। একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্র অপরিতোষ ও আযাবসম্বলিত কোনো আয়াত শুনলে তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আর যখন তারা শুনতে পায় আল্লাহ্র ক্ষমা ও দয়ার কথা, তখন তাদের অন্তর আল্লাহ্র স্মরণে হয়ে যায় প্রশান্ত ও প্রসন্ন। উল্লেখ্য, এখানে 'আল্লাহ্র স্মরণের সঙ্গে' তাঁর রহমত বা দয়ার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। কেননা রহমতই তো মূল প্রাপ্তি। আর তাঁর রহমত তাঁর ক্রোধের উপরে জয়ী।

'ইলা জিকরিল্লাহ্' কথাটির 'ইলা'(প্রতি) এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'লাম'(জন্য) অর্থে। এভাবে কথাটির অর্থ দঁড়িয়েছে— আল্লাহ্কে স্মরণ করার কারণে। কিন্তু প্রশান্তি ও প্রসন্নতা যেহেতু স্মরণসন্নিহিত, তাই এখানে 'লাম' এর বদলে বসানো হয়েছে 'ইলা'। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— কোরআনের ভীতিপ্রদর্শনমূলক আয়াত শুনলে বিশ্বাসীদের গায়ের পশম খাড়া হয়ে যায়, শিউরে ওঠে সারা শরীর, সংকুচিত হয় গাত্রত্বক। আবার ক্ষমা ও দয়ার আশাব্যঞ্জক আয়াত শুনলে তাদের ভয় দূর হয়ে যায়। হৃদয় ভরে যায় প্রশান্তিতে ও প্রসন্নতায়।

আগের বাক্যে 'কিতাবান' এর বিশেষণরূপে এসেছে 'মাছানী' শব্দটি। এভাবে সেখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোরআনে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীদের স্বস্তি-শান্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে বার বার। আর বিশ্বাসীদের উপরে তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কী হয়, তা প্রকাশ করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যে।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র ভয়ে যখন তাঁর কোনো বান্দার লোমকূপের পশম খাড়া হয়ে যায়, তখন তার পাপরাশি ঝরে যায় এমনভাবে, যেমনভাবে গাছ থেকে ঝরে শুকনো পাতা। শিথিল সূত্রপরম্পরায় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বাগবী ও তিবরানী। বাগবীর অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্র ভয়ে যখন বান্দার শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তাকে দোজখের জন্য নিষিদ্ধ করে দেন।

একটি সন্দেহ ঃ কোনো কোনো আল্লাহ্প্রেমিক কোরআন তেলাওয়াত শুনে বেহুঁশ হয়ে যান। এটা কি কোনো পছন্দসই গুণ? ইমাম বাগবী তো একে খারাপ বলেছেন এবং এ সম্পর্কে কাতাদার উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, আল্লাহ্র ভয়ে শরীরের লোম খাড়া হয়ে যাওয়া ও শরীর শিহরিত হওয়া আল্লাহ্র ওলীগণের বৈশিষ্ট্য। তাদের এমতো বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন আল্লাহ্ স্বয়ং। তিনি এমন বলেননি যে, কোরআন শুনে তাদের বুদ্ধি লোপ পায় এবং তাঁরা অজ্ঞান হয়ে যান।

বরং এরকম অবস্থা হয় বেদাতী ও শয়তানের অনুচরদের। আমাদেরকে আরো বলা হয়েছে যে, হজরত আবুদল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আমি একবার আমার মা আসমা বিনতে আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলাম, কোরআন শুনলে রসুল স. এর সহচরবৃন্দের কী অবস্থা হতো? তিনি বললেন, তাঁদের অবস্থা হতো তেমনই, যেমন বর্ণনা করেছেন আল্লাহ্ স্বয়ং। তাঁদের চোখ অশ্রুসজল হতো এবং খাড়া হয়ে যেতো তাঁদের শরীরের পশম। আমি বললাম এখানকার কিছু লোক তো এমনও রয়েছে, যারা কোরআন শুনলে বেহুঁশ হয়ে যায়। আমার একথা শুনেই তিনি উচ্চারণ করলেন, আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় যাচনা করি।

বাগবী আরো লিখেছেন, জনৈক ইরাকবাসী একস্থানে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলো। হজরত ইবনে ওমর সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। বেহুঁশ লোকটিকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে তার? জবাব দেওয়া হলো, এ লোক কোরআন শুনলে বেহুঁশ হয়ে যায়। তিনি বললেন, আমিও আল্লাহ্কে ভয় করি। কিন্তু কোরআন শুনে বেহুঁশ হই না। আরো বললেন, কোনো কোনো লোকের ভিতরে শয়তান অনুপ্রবেশ করে। রসুল স. এর সহচরবর্গ তো এরকম করতেন না।

সংশয়ভঞ্জন ঃ আমি বলি, যখন কোনো সুফী সাধকের উপরে অত্যধিক মাত্রায় ফয়েজ ও নূর বর্ষিত হয় এবং তা আত্মস্থ করার শক্তি থাকে দুর্বল, তখন তাদের বেহুঁশ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। রসুল স. এর সান্নিধ্যধন্য হওয়ার কারণে সাহাবীগণের ধারণক্ষমতা ছিলো অত্যধিক। তাই বেহুঁশ হওয়ার অবস্থা তাঁদের হতো না। কিন্তু পরবর্তী পুণ্যবানেরা যেহেতু সাহাবী নন, তাই তাঁদের অনেকেই বেহুঁশ হওয়ার বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন না। সুতরাং বুঝতে হবে দু'টি কারণে তাঁদেরকে বেহুঁশ হতে হয়— ১. ফয়েজ-নূরের বর্ষণ সুপ্রতুল না হলে ২. ফয়েজ-নূরের বর্ষণ ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত হলে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইমাম মুহীউস্‌সুন্নাহ্ এবং সুফী সাধকগণের বেহুঁশ হওয়াকে মন্দ বলেছেন বাগবী। অথচ তিনি বিস্মৃত হয়েছেন, নৈকট্যভাজন ফেরেশতারাও আল্লাহ্‌র নির্দেশ শ্রবণ করে সম্বিতহারা হয়ে যায়। প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর তারা একে অপরকে বলে, তোমাদের প্রভুপালনকর্তা কী বললেন? অন্যজন জবাব দেয়, তিনি সত্য বলেছেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত নাওয়াস ইবনে সামআনের উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত ইমাম বর্ণনা করেছেন এই হাদিস— যখন আল্লাহ্ কোনোকিছু করার ইচ্ছা করেন ও নির্দেশ প্রদান করেন, তখন তাঁর ভয়ে আকাশ কাঁপতে থাকে। আকাশবাসীরা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে ও বেহুঁশ হয়ে যায়। হুঁশ ফিরে পাবার পর সর্বপ্রথম মস্তক উত্তোলন করেন জিবরাইল। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনার শব্দবিন্যাস এরকম— আল্লাহ্ যখন আকাশে কোনো কিছুর মীমাংসা করেন, তখন তাঁর বাণী শ্রবণ করে ফেরেশতারা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাদের পক্ষসঞ্চালন করতে থাকে। ওই পক্ষসঞ্চালনের আওয়াজ শুনে মনে হয় যেনো পাথরের চত্বরের উপরে বার বার বাড়ি খাচ্ছে

লোহার শিকল। যখন তাদের ভয় কেটে যায়, তখন তারা একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করে, তোমার প্রভুপ্রতিপালক তোমাকে কী বলেছেন? জবাবে সে বলে, তিনি যা বলেছেন, তা সঠিক। অন্য এক হাদিসে হজরত মুসার বেহুঁশ হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে 'তারপর যখন তাঁর প্রভুপালক পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতির প্রকাশ ঘটালেন, তখন পাহাড় পুড়ে গেলো এবং মুসা বেহুঁশ হয়ে গেলেন'।

অবশিষ্ট রইলো হজরত ইবনে ওমরের কথা। তিনি বলেছেন, কোনো কোনো লোকের ভিতরে শয়তান অনুপ্রবেশ করে। হজরত আসমাও বেহুঁশ হওয়ার কথা শুনে পাঠ করেছিলেন 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বনির রজীম'। তাঁদের এমতো বচন থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, তাঁরা ছিলেন রসুল স. এর সাহচর্যালোকস্নাত। তাই তাঁদের আধার ছিলো প্রশস্ত। অপরিমেয় ছিলো উদ্যম। ফলে ফয়েজ ও নূরের প্রবলতম বর্ষণও তাঁদেরকে অচৈতন্য করতে পারতো না। তাই তাঁদের চোখে অচৈতন্য হয়ে যাওয়াকে মনে হয়েছিলো প্রতারণা। ইবনে সিরীনের ঘটনাতেও রয়েছে এরকম ধারণার প্রমাণ। যেমন তাঁকে একবার বলা হলো কতিপয় লোকের কথা, যারা কোরআন শুনে চেতনা হারিয়ে ফেলে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ওদেরকে ঘরের ছাদে নিয়ে গিয়ে নিচের দিকে পা ঝুলিয়ে বসিয়ে দেওয়া হোক। তারপর তাদের সামনে কোরআন পাঠ করা হোক। এরপর যদি তারা চেতনাশূন্য হয়ে নিচে পড়ে যায়, তবে বোঝা যাবে তাদের চেতনা হারিয়ে ফেলার বিষয়টি সত্যি।

সতর্কবাণী ঃ ফেরেশতাদের চেয়ে মানুষ অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন এবং তাদের সামর্থ্য অত্যন্ত উচ্চ। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে কোরআন মজীদেই। যেমন— 'যখন তোমার প্রভুপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি। তারা বললো, তুমি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে, যে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে? আমরাই তো তোমার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, আমি জানি, যা তোমরা জানো না'। অন্য আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে— 'আমি আকাশ-পৃথিবী ও পর্বতমালার কাছে এই আমানত পেশ করেছিলাম, তারা একে বহন করতে অস্বীকৃত হলো এবং এতে ভীত হলো। কিন্তু মানুষ তা বহন করলো'।

ফেরেশতারা তাই প্রত্যাদেশ শুনলে মুর্ছা যায়, কিন্তু মানুষের অবস্থা সেরকম হয় না। সুফী সাধকগণের মধ্যে যাঁদের আত্মিক আরোহণ (উরুজ) ও অবরোহণ (নুজুল) উভয়টি পূর্ণ ও পরিণত, অচৈতন্য হওয়ার বিপদ থেকে তাঁরা সাধারণতঃ রক্ষা পেয়ে থাকেন। আর যদি তাঁদের কারো ঊর্ধ্বারোহণের তুলনায় অবরোহণ হয় অসম্পূর্ণ অথবা আংশিক, তবে অচৈতন্য হওয়ার বিপদ থেকে তাঁরা রেহাই পান না। সে কারণে তাঁরা প্রায় সারাক্ষণ ভোগেন আধ্যাত্মিক মত্ততায়। শ্লোকে সঙ্গীতে আল্লাহ্‌র মহিমাধ্বনি শুনেও তাঁরা কখনো নাচেন, কখনো লুটিয়ে পড়েন, আবার কখনো যান মুর্ছা। এ ধরনের অপরিপক্ক সুফিগণের মধ্যেই প্রচলিত হয়েছে

সামা, কাসিদা ইত্যাদি। কিন্তু বুঝতে হবে কোরআন ওই সকল নৃত্যগীত অপেক্ষা অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে কোরআনের ফয়েজ ও নূর আহরণের যোগ্যতা সবাই অর্জন করতে পারে না। সেকারণেই দেখা যায়, কোরআন পাঠ শুনে নয়, তাদের হালের পরিবর্তন হয় সামা-সঙ্গীত ইত্যাদি শুনে। কিন্তু যে সকল সুফী সাধক আধ্যাত্মিকতায় সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, যারা উপনীত হন 'দানা ফাতাদাল্লা ফাকানা ক্বাবা ক্বওসানি আও আদনা' (নিকটবর্তী হলো, তখন ছিলো দুই ধনুকের জ্যাসমান ব্যবধান, অথবা তদপেক্ষা কম) পর্যায়ে, তাঁদের হাল হয় সাহাবীগণের মতো। কোরআন শুনে তাঁদের নয়ন অশ্রুসজল হয়, খাড়া হয় শরীরের পশম এবং অন্তরে আসে আল্লাহ্‌র স্মরণস্নাত প্রশান্তি ও প্রসন্নতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটাই আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ, তিনি এর দ্বারা যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই'।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'জালিকা' অর্থ এটাই। অর্থাৎ এই ভয় ও আশা, অথবা এই কোরআন। 'ওয়া মাঁই ইউদ্বলিলিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্ যাকে অসহায়রূপে পরিত্যাগ করেন, তাকে কেউ রক্ষা করতে পারে না ভ্রষ্টতা থেকে।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে, সে কি তার মতো, যে নিরাপদ? জালেমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা অর্জন করতে তার শাস্তি আস্বাদন করো'। একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে যে ব্যক্তি তার মুখাবয়বকে ঢাল করে সুকঠিন শাস্তি ঠেকাবার বৃথা চেষ্টা করবে, সে তো তখনকার নিরাপত্তা প্রাপ্ত ব্যক্তির মতো হতেই পারে না। ওই সকল নিরাপত্তাহীন স্বেচ্ছাচারীকে তখন বলা হবে, পৃথিবীতে যে সকল শাস্তিযোগ্য অপরাধ তোমরা করতে, এখন তার যন্ত্রণাদায়ক প্রতিফল ভোগ করো। এখানে 'সে কি তার মতো, যে নিরাপদ' কথাটি উহ্য রয়েছে। আর এখানকার 'আফামান্' হচ্ছে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এর সোজাসুজি অর্থ— যা হতেই পারে না। অর্থাৎ শাস্তিগ্রস্ত ব্যক্তি কখনো শাস্তিমুক্তদের মতো হতে পারে না।

'মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে' অর্থ শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুখকে বানাতে চাইবে ঢাল। মানুষ হামলা ঠেকায় সাধারণতঃ হাত দিয়ে। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যখন দোজখে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তাদের হাত বাঁধা থাকবে গর্দানের সঙ্গে। তাই মুখ বাড়িয়ে দিয়ে শাস্তি থেকে বাঁচবার নিষ্ফল চেষ্টা করবে তারা। মুজাহিদ বলেছেন, তখন তাদের মুখের প্রতিরোধপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে আগুনের মধ্যে। সেকারণে সর্বপ্রথম আগুন লাগবে তাদের চেহারায়। মুকাতিল বলেছেন, কাফেরদের হাত গলায় বেঁধে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে এবং তখন তাদের গলায় ঝুলানো থাকবে বিরাট পাহাড়ের সমান গন্ধকের এক বিশাল প্রস্তরখণ্ড, তাতে আগুন ধরে যাবে সঙ্গে সঙ্গে এবং তা জ্বলতে থাকবে অবিরাম।

এখানে সর্বনাম (তাদেরকে) ব্যবহার না করে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে 'জালেমদেরকে'। এভাবে তাদের স্বেচ্ছাচারিতার প্রমাণকে করা হয়েছে অধিকতর সুদৃঢ় এবং সঙ্গে সঙ্গে কেনো যে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে, সুস্পষ্ট করা হয়েছে তার কারণটিকেও।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'তাদের পূর্ববর্তীগণও অস্বীকার করেছিলো, ফলে শাস্তি এমনভাবে তাদেরকে গ্রাস করলো যে, তারা ধারণাও করতে পারেনি'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, মক্কার মূর্তিপূজকেরাই কেবল আপনার বিরুদ্ধাচরণ করছে না। সকল যুগের সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের স্বভাব এরকমই। ইতোপূর্বেও আমার প্রেরিত পুরুষগণকে অস্বীকার করেছিলো সেই জামানার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। তার জন্য যথোপযুক্ত প্রতিফলও তারা পেয়েছিলো। অকস্মাৎ একদিন মহাশাস্তি এসে পড়েছিলো তাদের উপর, যা ছিলো তাদের কল্পনার অতীত।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করালেন এবং আখেরাতের শাস্তি তো কঠিনতর। যদি তারা জানতো'। একথার অর্থ— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পার্থিব শাস্তি ভোগ করতে হবেই। তদুপরি আখেরাতের শাস্তিও ভোগ করতে হবে তাদেরকে। আর আখেরাতের শাস্তি তো আরো বেশী ভয়ংকর। যদি তারা বুঝতো, তবে আমা কর্তৃক প্রেরিত বার্তাবাহকগণকে তারা মিথ্যাবাদী বলতোই না।

এখানে 'আলখিয্ইয়ুন' অর্থ লাঞ্ছনা, অপমান। যেমন চেহারা বিকৃত হওয়া, মাটি ধসে যাওয়া, মুখ থুবড়ে পড়ে মরে থাকা, মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হওয়া, বীভৎস আওয়াজে হৃদয় বিদীর্ণ হওয়া, প্রস্তরবৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হওয়া ইত্যাদি। 'ওয়া লাআ'জাবুল আখিরাতি আকবর' অর্থ আখেরাতের শাস্তিতো কঠিনতর। আর 'লাওকানু ইয়া'লামূন' অর্থ যদি তারা জানতো। অর্থাৎ যদি তারা জ্ঞানী হতো, তবে নবীগণকে অস্বীকার করার ফল কতো ভয়াবহ, তা বুঝতে পারতো এবং তাদেরকে কিছুতেই মিথ্যারোপ করতো না। অথবা এখনকার মক্কাবাসী যদি বিষয়টির পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হতো, তবে নিশ্চয় পরিত্যাগ করতো তাদের স্বেচ্ছাচারিতা।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ২৭, ২৮, ২৯

❑ আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে,

❑ আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত, যাহাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।

❑ আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেনঃ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যাহারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আর এক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন; এই দুইজনের অবস্থা কি সমান? প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য; কিন্তু উহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আর আমি মানুষের সৎপথপ্রাপ্তির জন্য এই কোরআনে সব রকমের উত্তম বিষয় বর্ণনা করেছি, যাতে করে উপদেশ গ্রহণ করে। কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে আরবী ভাষায়, যাতে সামান্যতম বক্রতাও নেই, যাতে মানুষ এই কোরআনের বাণী শুনে সাবধান হয়ে যেতে পারে।

এখানে 'মিন কুললি মাছালিন' অর্থ সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত, সব রকমের উত্তম বিষয়, যা চিন্তাশীল ধর্মানুরাগীদের জন্য আবশ্যক। 'গইরা জী ইওয়াজ্ব' অর্থ বক্রতামুক্ত, প্রতিবন্ধকতাহীন। 'সরল' (মুসতাক্বিম) অপেক্ষা 'বক্রতামুক্ত' কথাটি অধিকতর শানিত। এতে করে সব ধরনের বক্রতা ও বিশৃঙ্খলার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। সুতরাং সকল সন্দেহের অপসারণার্থে এমতো শব্দের ব্যবহারই যথাযথ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ— কোনো অনৈক্যসূচক বিবরণ এতে নেই । মুজাহিদ এর অর্থ করেছেন, এর মধ্যে নেই কোনো সংশয় অথবা সন্দেহ। সুদ্দী অর্থ করেছেন— এটা সৃষ্টি নয়। যারা সৃষ্টি, তাদের কথাতেই তো থাকে মতানৈক্য, সংশয়। আর কোরআন তো সৃষ্টিই নয়। ইমাম মালেকও কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে। বাগবী লিখেছেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা সত্তরজন তাবেয়ীর ঐকমত্যসঞ্জাত উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে, কোরআন স্রষ্টাও নয়, সৃষ্টিও নয়। অর্থাৎ কোরআন হচ্ছে আল্লাহ্র 'বাণী' নামক গুণ। আর এই গুণ স্বয়ং আল্লাহ্র সত্তা নয় যে, তাকে স্রষ্টা বলা যাবে, আবার সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নও নয় যে, একে বলা যেতে পারবে সৃষ্টি।— এই বর্ণনা একথাই প্রমাণ করে যে, তাবেয়ীনগণের মতে আল্লাহ্র বাণীভুক্ত শব্দও অনাদি এবং তা আল্লাহ্তায়ালার একটি গুণ বিশেষ। প্রকৃত বাণী গোপন ও অনুচ্চারিত অবস্থাতেই থাকে। আর ভাষা হচ্ছে শব্দের গুণ। সুতরাং আল্লাহ্র বাণী কেবল আরবী হতে পারে না। কেননা আরব-অনারব হওয়া তো শব্দের গুণ। এরকম শব্দসম্ভার প্রয়োজন হয় সৃষ্টির জন্য। তাদের জন্যই অক্ষর ও শব্দকে বিন্যস্ত করতে হয় বিশেষ বিশেষ নিয়মে। আল্লাহ্র বাণী তো তাঁর সত্তাসন্নিহিত। তাঁর বাণীতে অক্ষরসংযোজনের কল্পনাও যে ভুল। যদি এরকম করা হয়, তবে তা হবে

অদৃশ্যকে পরিদৃশ্যমান বলে ধারণা করার মতো। আল্লাহ্ মানুষের দর্শনাতীত। তৎসত্ত্বেও আখেরাতে তিনি তাঁর প্রিয়ভাজনগণকে দর্শনদানে ধন্য করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ দর্শন অসম্ভব জেনে ওই দর্শনকেও অস্বীকার করে থাকে। তারা বিষয়টিকে বিচার করে সৃষ্টির দর্শনের প্রেক্ষাপটে। সৃষ্টিকে দেখার জন্য স্থান, দূরত্ব, সময় ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তো এ সকল কিছু থেকে পবিত্র। তিনি যে আনুরূপ্যবিহীন— সত্তায়, গুণবত্তায় ও কার্যকলাপে। সকল মর্যাদা ও মহিমা কেবল তাঁর। সমূহ প্রশংসা ও পবিত্রতার অধিকারীও কেবল তিনি। তিনি যে মহা প্রতাপশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে'। একথার অর্থ— বক্রতামুক্ত এই কোরআন শুনে যেনো মূর্তিপূজারীরা পরিত্যাগ করে তাদের পূজা-অর্চনা। যেনো বেঁচে থাকে আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে। উল্লেখ্য, এটা হচ্ছে কোরআন অবতীর্ণ করার দ্বিতীয় কারণ, যা প্রথম কারণ 'যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' এর ধারাবাহিকতা, ব্যাখ্যা, অথবা পরিপূরকতা।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেনঃ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আর এক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন; এই দু'জনের অবস্থা কি সমান? এখানে একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বহুত্ববাদী ও একত্ববাদীদের অবস্থানগত বৈপরীত্যকে সুস্পষ্ট করা হয়েছে। যেমন অনেক মালিকের একজন ক্রীতদাস। এমতাবস্থায় মালিকেরা তো তাকে নিয়ে টানাটানি করবেই। বিভিন্ন জন দিবে বিভিন্ন কাজের হুকুম। ক্রীতদাসও তখন কোনটা ছেড়ে কোনটা পালন করবে, কাকে বাদ দিয়ে কাকে সন্তুষ্ট করবে, তা নিয়ে সারাক্ষণ থাকবে পেরেশান। পক্ষান্তরে একজন মালিকের দাসদের এরকম কোনো সমস্যাই নেই। সে এক ধ্যানে এক মনে প্রশান্তচিত্তে হতে পারে তার মালিকের ইচ্ছা ও নির্দেশাবলীর সতত সেবক।

'হাল ইয়াস্তাভিয়ানি মাছালা' অর্থ এই দু'জনের অবস্থা কি সমান? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— না। এ দু'জনের অবস্থা কখনোই সমান নয়। প্রশ্নটি একই সঙ্গে অব্যর্থ যুক্তিস্থাপকও বটে। যুক্তিটির দাবি এই যে— ওই দু'জনের অবস্থা যে সমান নয়, তা যেনো নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেওয়া হয়। এমতো দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের উদ্দেশ্য এটাই।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না'। একথার অর্থ— সমূহ স্তব-স্তুতি-প্রশস্তি-প্রশংসা কেবলই আল্লাহ্র। কেউ বা কোনোকিছু এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ অথবা অংশীদার নয়। হতে পারেইনা। কিন্তু মূর্তিপূজারীদের অধিকাংশই এ ব্যাপারে অজ্ঞ।

এখানে 'বাল' (বরং) হচ্ছে প্রারম্ভিক শব্দ, যা অজ্ঞ-অসভ্যদের অবস্থা বর্ণনা করছে। অর্থাৎ অধিকাংশ লোক তাদের অনপনেয় মূর্খতার কারণে আল্লাহ্র অংশীদার অথবা সমকক্ষ নির্ধারণ করে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'প্রশংসা' (আলহামদ্) এর পূর্বে উহ্য রয়েছে 'বলো' (কুল)। ওই উহ্য শব্দটিসহ এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, আল্লাহ্তায়ালাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর মহান এককত্বের (তওহীদের) ধারণা প্রত্যাদেশাকারে অবতীর্ণ করেছেন। তাই তিনি সকল প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৩০, ৩১

❑ তুমি তো মরণশীল এবং উহারাও মরণশীল।
❑ অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমরা তো পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করিবে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনাকে এক সময় নশ্বর পৃথিবী পরিত্যাগ করতেই হবে। তেমনি আপনার বিরুদ্ধবাদীদের মৃত্যুও সুনিশ্চিত। তারপর মহাবিচারের দিবসে সকলকে একত্র করা হলে আল্লাহ্ আপনার ও তাদের বিবাদ বিসম্বাদের চির অবসান ঘটাবেন। প্রদান করবেন যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত।

এখানে 'ইন্নাহুম মাইয়্যিতুন' অর্থ তারাও মরণশীল। অর্থাৎ সকলের মৃত্যু অনিবার্য। এই অনিবার্যতা বোঝাতেই এখানে ভবিষ্যতকালের ক্রিয়ার পরিবর্তে বসানো হয়েছে এমন শব্দ, যা চিরন্তনতা প্রকাশক। ফাররা ও কুসাইয়ের বক্তব্যে নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় 'মাইয়্যিতুন' বলে ওই ব্যক্তিকে যে ভবিষ্যতে মৃত্যুবরণ করবে। অর্থাৎ এখনো যে মরেনি। আর 'মায়্যিত' বলে মরদেহকে। এজন্যই দু'টো শব্দেই ব্যবহৃত হয়েছে 'তাশদীদ'যুক্ত 'ইয়া'।

জালালুদ্দিন মাহাল্লী লিখেছেন, মক্কার মুশরিকেরা মনে প্রাণে কামনা করতো, রসুল স. এর মৃত্যু হোক। তাদের এমতো মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিলো 'তুমিতো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল'।

'ছুম্মা ইন্নাকুম' অর্থ অতঃপর তোমরা অর্থাৎ রসুল স. ও তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা। অথবা সকল মানুষ। 'ইয়াখ্তাসিমূন' অর্থ বাক-বিতণ্ডা করবে। অতীতের কার্যকলাপ নিয়ে শুরু করবে বচসা। যেমন— রসুল স. বলবেন, হে আমার প্রভুপালক! আমার স্বজাতি এই কোরআনকে মনে করতো প্রলাপবাক্য। তারা আমাকে মিথ্যাবাদী তো বলতোই, তদুপরি আমাকে তারা বানিয়েছিলো উপহাসের পাত্র, যদিও আমি ছিলাম ন্যায় ও সত্যের উপরে অটল। আমি তাদেরকে ডেকেছি তওহীদের দিকে। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তোমার বিধানাবলীর অনুগত করার জন্য ও শুভপথের পথিক হওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা-

সাধনা আমি করেছি। কিন্তু তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। স্থির থেকেছে মিথ্যাচারিতার উপরেই। অংশীবাদীরা বলবে, যিনি আমাদের প্রভুপালনকর্তা, তাঁর

শপথ করে বলি, আমরা কখনো পৌত্তলিক ছিলাম না। আরো বলবে, আমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে কেউ আগমন করেনি। তাই তো আমরা আমাদের গুরুজন ও নেতৃবর্গের কথা শুনে চলেছি। অনুসরণ করেছি ওই সকল আচার আচরণের, যেগুলো করতো আমাদের পূর্বপুরুষেরা।

অন্যান্য লোকও তখন পারস্পরিক অধিকার ও দাবি প্রতিষ্ঠা নিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিবে। সবার আগে মীমাংসা করা হবে হত্যাকাণ্ডের। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শেষ বিচারের দিনে খুনের বিচার করা হবে সর্বাগ্রে।

তিরমিজি, ইবনে মাজা, তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমরা রসুল স. এর কাছ থেকে শুনেছি, নিহত ব্যক্তি তখন এক হাতে তার কর্তিত মস্তক এবং অপর হাতে খুনীকে ধরে নিয়ে হাজির হবে বিচারস্থলে। তার গর্দানের শিরা-উপশিরা থেকে ঝরতে থাকবে তাজা খুন। সে আল্লাহ্র আরশের দিকে অগ্রসর হয়ে বলবে, এই লোকটি আমাকে খুন করেছিলো। আল্লাহ্ তখন খুনীকে বলবেন, তুই ধ্বংস হয়ে যা। এরপর খুনীকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। তিবরানী এই হাদিসের মধ্যভাগে হজরত ইবনে মাসউদের বক্তব্য

www.eelm.weebly.com

উপস্থাপন করেছেন এভাবে, রসুল স. বলেছেন, নিহত ব্যক্তি খুনীকে ধরে নিয়ে আসবে। তার কণ্ঠদেশের শিরা-উপশিরা থেকে ফিনকি দিয়ে বের হতে থাকবে রক্ত। সে বলবে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো, কেনো সে আমাকে খুন করেছিলো? হত্যাকারী তখন বলবে, আমি তাকে খুন করেছিলাম অমুক ব্যক্তির সম্মান রক্ষার্থে। আল্লাহ্ বলবেন, সকল সম্মান তো আমার। হজরত ইবনে মাসউদ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হন্তারক ও নিহত ব্যক্তি দু'জনকেই হাজির করা হবে আল্লাহ্র দরবারে। আল্লাহ্ হত্যাকারীকে জিজ্ঞেস করবেন, কেনো তুমি তাকে হত্যা করেছিলে? যদি সে আল্লাহ্র জন্য হত্যা করে থাকে, তবে বলবে, ধর্মে আল্লাহ্র প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি বজায়ার্থে আমি তাকে হত্যা করেছি। আল্লাহ্ বলবেন, নিশ্চয়ই প্রভুত্ব প্রতিপত্তি কেবল আমার। অন্যথায় জবাব দিবে, আমি এ লোককে হত্যা করেছি অমুক ব্যক্তির প্রতিপত্তি রক্ষার্থে। আল্লাহ্ বলবেন, তার তো কোনো প্রতিপত্তি নেই। এরপর হত্যাকারীকে দেওয়া হবে মৃত্যু-কষ্টের শাস্তি। ওই শাস্তি চলতে থাকবে ততোকাল পর্যন্ত, যতোকাল সে নিহত ব্যক্তিকে বঞ্চিত করেছিলো পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে।

আহমদ, তিরমিজি ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন আমি রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! আমাদের নিজেদের সংঘটিত বিষয়াবলী

কি পুনরায় আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হবে? তিনি স. বললেন, অবশ্যই। প্রত্যেক হকদারের কাছে তার হক পৌঁছানো হবেই। আমি বললাম, হায় আল্লাহ্। ব্যাপারটা তো হবে খুবই কঠিন।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে হজরত আবু আইয়ুব থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নারী-পুরুষের বাদানুবাদও উপস্থিত করা হবে সেদিন। আল্লাহ্র শপথ! পুরুষ মুখে কিছুই বলবে না। বরং নারীর হাত-পা তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, এই নারী তার স্বামীকে অমুক অমুক দোষে দোষী সাব্যস্ত করতো। আর পুরুষের হাত পা সাক্ষ্য দিবে, সে তার স্ত্রীর উপর অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগ করতো। এভাবে গৃহস্বামী ও তার পরিচারক-পরিচারিকাদের মধ্যেও বাক-বিতণ্ডা চলবে। তারপর ডাকা হবে ব্যবসায়ীদেরকে। এভাবে তলব করা হবে অন্যান্যদেরকেও। শেষে সকল অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মধ্যে মীমাংসা করা হবে এভাবে— অত্যাচার ও অধিকার খর্বের মাত্রানুসারে অত্যাচারীর পুণ্য দেওয়া হবে অত্যাচারিতদেরকে, অথবা অত্যাচারীর উপরে চাপানো হবে অত্যাচারিতদের পাপের ভার। এভাবে অত্যাচারীরা পুণ্যশূন্য ও পাপবাহী হয়ে গেলে তাদেরকে আবদ্ধ করা হবে লোহার সিন্দুকে এবং আদেশ করা হবে, এদেরকে দোজখে নামিয়ে দাও।

উত্তম সূত্রপরম্পরায় হজরত উকবা ইবনে আমের থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে সর্বপ্রথম বিচারপ্রার্থী হবে দুই প্রতিবেশী।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ভ্রাতৃত্বের দাবি যেনো দুনিয়াতেই পরিশোধ করা হয়। কেননা সেখানে (দাবি পরিশোধের জন্য) দীনার-দিরহাম থাকবে না। তখন তার পুণ্য থাকলে তাই দিয়ে পরিশোধ করা হবে তার পাওনাদার ভাইয়ের পাওনা। আর তা না থাকলে বহন করতে হবে পাওনাদারের পাপ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার সাহাবীগণের এক সমাবেশে বললেন, তোমরা কি জানো, দরিদ্র কে? সাহাবীগণ বললেন, যার টাকা-পয়সা জমি-জমা নেই। তিনি স. বললেন আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র সে-ই, যে মহাবিচারের দিবসে হাজির হবে অনেক নামাজ-রোজা-জাকাত ও অন্যান্য সৎকর্ম নিয়ে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো আমানত আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্তপাত ঘটিয়েছে, অথবা কাউকে করেছে অন্যায়ভাবে প্রহার। কাজেই তাকে পাকড়াও করা হবে। আর তার পুণ্যসমূহ কিছু কিছু করে দিয়ে দেওয়া হবে তাদেরকে, যাদের অধিকার সে খর্ব করেছিলো। যদি এভাবে ক্ষতিপূরণ করার আগেই তার পুণ্য শেষ হয়ে যায়, তবে দাবিদারদের পাপ কিছু কিছু করে চাপানো হবে তার উপর। শেষে তাকে নিক্ষেপ করা হবে নরকানলে।

আমি বলি, অত্যাচারিত ব্যক্তি নিতে পারবে কেবল অত্যাচারীর পুণ্য, ইমান নয়। কেননা 'কুফর' (সত্যপ্রত্যাখ্যান) ছাড়া অন্য কোনো পাপের শাস্তি সীমাহীন সময়ের জন্য নয়। এক সময় তা শেষ হয়ে যাবে। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল

জামাতের মতাদর্শ। এই জামাতের অভিমত হচ্ছে, বৃহৎ পাপের (কবীরা গোনাহ্র) জন্যও কেউ চিরকাল দোজখে থাকবে না। আর ইমানের পুরস্কার হচ্ছে চিরস্থায়ী বেহেশত। সুতরাং বান্দার হক নষ্ট করার কারণে কোনো ইমানদার চিরকাল দোজখে থাকতে পারে না। মোট কথা ইমানদার ব্যক্তি কারো হক নষ্ট করলে তার আমলনামার পুণ্যসমূহ দেওয়া হবে কেবল দাবিদারকে। এভাবে তার সকল পুণ্য শেষ হয়ে গেলে বাকী থাকবে কেবল ইমান। এর পরেও অন্য কোনো দাবিদার যদি তাকে ক্ষমা করতে অস্বীকৃত হয়, তবে তাকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে এবং সেখানে রাখা হবে তার জন্য নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করা পর্যন্ত। এভাবে তার পাপমোচন হয়ে গেলে তাকে দেওয়া হবে বেহেশতের প্রবেশাধিকার এবং তার ওই বেহেশতবাস হবে চিরকালীন। কেননা সে ইমানদার। বায়হাকীও বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শেষ বিচারের দিনে দাবিদারদের দাবি মিটিয়ে দেওয়া হবে। এমনকি শিঙহীন ছাগলকেও দেওয়া হবে শিঙবিশিষ্ট ছাগলের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, শিঙহীন ছাগলকে শিঙবিশিষ্ট ছাগলের উপর, অত্যাচারিত লাল পিঁপড়াকে অত্যাচারী লাল পিঁপড়ার উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হবে সেদিন।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম বলেছেন, যখন 'তুমি তো মরণশীল' থেকে 'বাক-বিতণ্ডা করবে' পর্যন্ত আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হলো, তখন আমরা বলাবলি করেছিলাম, আমাদের নিজেদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা হতে পারবে কীভাবে? আমাদের আল্লাহ্, ধর্ম, কিতাব সবই তো এক। এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের কারো কারো চেহারার উপর তরবারী মারা হচ্ছে। এখন বুঝতে পারি, এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল আমরাই।

হজরত আবু সাঈদ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলেছেন, আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম, আমাদের রব এক, আমাদের নবী এক এবং আমাদের কিতাবও এক। তাহলে আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে দাবি-দাওয়া উত্থাপিত হতে পারবে কীভাবে? কিন্তু যখন সিফফিন যুদ্ধের দিন এসে গেলো এবং আমাদের একজন আর একজনকে তরবারী দিয়ে আক্রমণ করলো, তখন আমরা অনুধাবণ করতে পারলাম, হ্যাঁ, এটাই সেই বিষয় যা আমরা আগে বুঝিনি।

ইব্রাহিম বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় বলতেন, আমরা তো ভাই ভাই। তাহলে আমাদের মধ্যে আবার ঝগড়া হবে কীভাবে? কিন্তু যখন হজরত ওসমান শহীদ হলেন, তখন আমরা বুঝলাম, এটাই আমাদের বাক-বিতণ্ডা।

এ সকল বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায়, সাহাবীগণ মনে করতেন হত্যা ও খুন-খারাবীর সম্পর্ক হতে পারে কেবল মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে। মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে এরকম কিছু হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হলো, মুসলমানদের মধ্যে শুরু হলো কলহ-বচসা, তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন শত্রুতা ও বিবাদ মুসলমানদের ভিতরেও হবে।

চতুর্বিংশতম পারা

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

❑ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসিবার পর উহা অস্বীকার করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নহে?

❑ যাহারা সত্য আনিয়াছে এবং যাহারা সত্যকে সত্য বলিয়া মানিয়াছে তাহারাই তো মুত্তাকী।

❑ ইহাদের বাঞ্ছিত সমস্ত কিছুই আছে ইহাদের প্রতিপালকের নিকট। ইহাই সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার।

www.eelm.weebly.com

❑ যাহাতে ইহারা যেসব মন্দ কর্ম করিয়াছিল আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়া দেন এবং ইহাদিগকে ইহাদের সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করেন।

❑ আল্লাহ্ কি তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন? অথচ তাহারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই।

❑ এবং যাহাকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেন তাহার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নাই; আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নহেন?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপরে মিথ্যা আরোপ করে এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর রসুলের মাধ্যমে সত্য কিতাবের বাণী প্রচারিত হবার পর তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তার চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? অগ্নিময় জাহান্নামই কি তাদের প্রকৃত বসবাসস্থল নয়?

এখানকার 'ফামান আজলামু' কথাটির 'ফা' কারণপ্রকাশক। অর্থাৎ রসুল স. এর প্রতিবাদী হওয়াই তাদের জালেম বা সীমালংঘনকারী হওয়ার কারণ। এখানে উপস্থাপিত প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— এ ধরনের লোকের চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী কেউ নেই।

'কাজাবা আ'লাল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে। যেমন বলে 'ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা', 'প্রতিমাগুলো আল্লাহ্‌র সমীপে আমাদের জন্য সুপারিশকারী' ইত্যাদি। 'ওয়া কাজ্জাবা বিস্ সিদ্‌ক্বি ইজ জ্বাআহু' অর্থ সত্য আসবার পর তা অস্বীকার করে। বহু প্রমাণ-সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও চিন্তা-ভাবনা না করে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র বাণী। আর 'মাছওয়া' অর্থ আবাসস্থল, অপেক্ষাগার, অবতরণের স্থান।

উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয় ও এই আয়াতের মধ্যে রসুল স. এর জন্য রয়েছে প্রভূত প্রশান্তি। এই আয়াতত্রয়ে তাঁকে এই মর্মে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, হে আমার প্রিয়তম নবী! অংশীবাদীদের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান, অস্বীকৃতি ও উপহাস-পরিহাসের কারণে দুঃখ করবেন না। কামনা করবেন না তাদের জন্য তাৎক্ষণিক শাস্তিও। তাদের পরকালের শাস্তি যে অনিবার্য। আর সে শাস্তি হবে অন্তহীন।

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'যারা সত্য এনেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে, তারাই তো মুত্তাকী'।

রসুল স. সহ সকল নবী-রসুল ও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীবৃন্দ সকলেই আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যভূত। অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সত্য এনেছেন এবং অন্যরা সেই সত্যকে সত্য বলে মেনেছেন। তাই বলা হয়েছে 'উলায়িকা হুমুল মুত্তাকুন' (তারাই তো মুত্তাকী)। হজরত ইবনে মাসউদ আয়াতখানি পাঠ করতেন এভাবে— 'ওয়াল্‌লাজীনা জ্বাউ বিস্‌সিদক্বি'। তাঁর এমতো পাঠভঙ্গিও বর্ণিত ব্যাখ্যাটির সমর্থক। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সিদক্ব' (সত্য) অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ', যা রসুল স. এনেছেন এবং তা জনসমক্ষে প্রচারও করেছেন।

এরকম ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে 'তারাই তো মুত্তাক্বী' কথাটির অর্থ হবে রসুল স. স্বয়ং এবং তাঁর উম্মতের একনিষ্ঠ অনুসারীবৃন্দ; অন্যান্য নবী অথবা অন্যান্য নবীর একনিষ্ঠ উম্মত আলোচ্য আয়াতসংশ্লিষ্ট হবেন না। এরকম বাকভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন— 'নিশ্চয় আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি

যেনো তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়'। (ওয়া লাক্বাদ আতাইনা মুসাল কিতাবা লাআ'ল্‌লাহুম ইয়াহ্‌তাদূন)। এখানে 'হুম ইয়াহ্‌তাদূন' (তারা যেনো হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়) কথাটির অর্থ যেনো হেদায়েত প্রাপ্ত হয় কেবল হজরত মুসার অনুগামীবৃন্দ।

সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'সত্য এনেছে' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত জিবরাইলকে এবং 'সত্যকে সত্য বলে মেনেছে' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে। কালাবী ও আবুল আলিয়া বলেছেন, কোরআন এনেছেন রসুল স. এবং তাকে সত্য বলে মেনেছেন হজরত আবু বকর। জুজায হজরত আবু বকরের সঙ্গে হজরত আলীর নামও যুক্ত করেছেন। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনাতেও একথার সমর্থন বিদ্যমান।

কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, সত্য নিয়ে এসেছেন রসুল স. এবং তাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন বিশ্বাসীগণ। আতা বলেছেন, সত্য আনয়নকারী ছিলেন সকল নবী-রসুল এবং তা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের পদাঙ্ক অনুসারীগণ।

'মাদারেক' রচয়িতা এবং বায়যাবী লিখেছেন, আরবী ভাষার রীতি অনুসারে 'জ্বাআ' ও 'সদ্‌দাক্বা' এর কর্তা একজনই। অর্থাৎ যিনি এনেছেন, তিনিই মেনেছেন। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাও করতে হবে এই রীতি অনুসারে। কেননা কর্তা অভিন্ন না হলে মেনে নিতে হয় যে, এখানকার 'সদ্‌দাক্বা'র আগে লুপ্ত রয়েছে আর একটি শব্দ 'আল্‌লাজী'(যে)। কিন্তু এমতো ধারণা বিধিসম্মত নয়। অথবা মেনে নিতে হবে কর্তার সর্বনাম এখানে রয়েছে উহ্য, আবার সে সর্বনামের নামপদও সুনির্দিষ্ট নয়।

www.eelm.weebly.com

আমি বিস্মিত হই, ‘মাদারেক’ রচয়িতা এবং বায়যাবী একথা লিখতে পারলেন কীভাবে যে, একটি যোজক (আল্লাজী) কে ‘সদ্দাক্বা’র পূর্বে লুপ্ত ভাবা বিধিসম্মত নয়। কালাবী, কাতাদা, মুকাতিল ও আবুল আলিয়ার মতো বিজ্ঞ ব্যাখ্যাতাগণ তো এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। হজরত হাস্সানের কবিতাতেও তো যোজক (মাউসুল) কে বিলুপ্ত রাখার দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন—

আম্মাঁই ইয়াহজু রসুলাল্লহি মিনহুম
ওয়া ইয়ামদাহুহু ওয়া ইয়ানসুরুহু সাওয়াউন।

‘বাহরে মাওয়াজ’ রচয়িতা লিখেছেন, এখানে শব্দাবলীর মাধ্যমে ভাবের প্রকাশ করা হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন ‘ইহুদী ও খৃষ্টানেরা বলে, তারাই জান্নাতে যাবে’। অর্থাৎ ইহুদীরা বলে, জান্নাতে যাবে কেবল ইহুদীরাই এবং খৃষ্টানেরা বলে জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল খৃষ্টান।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে ‘আল্লাজী’ এর উদ্দেশ্য পক্ষ। অর্থাৎ ‘আল্লাজী জ্বাআ’ অর্থ ‘আলফারিক্বুল লাজী জ্বাআ’। কথাটির মধ্যে রয়েছে দু’টি পক্ষই। অর্থাৎ বুঝতে হবে রসুল স. এবং হজরত আবু বকর উভয় পক্ষই রয়েছেন ওই ‘আল্লাজীর’ মধ্যে। এরপর রসুল স. এর ব্যক্তিত্বকে সামনে রেখে ‘জ্বাআ’ এর সর্বনামকে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে রসুল স. এর পক্ষে এবং হজরত আবু বকরের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ‘সদ্দাক্বা’ এর সর্বনামকে প্রযুক্ত করা হয়েছে তাঁর পক্ষে। এভাবে উভয় সর্বনামের সংযোগ সাধিত হয়েছে ‘আল্লাজী’ এর সঙ্গেই।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— ‘এদের বাঞ্ছিত সমস্ত কিছুই আছে এদের প্রতিপালকের নিকট। এটাই সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার’। একথার অর্থ— ওই সকল মুত্তাকীদের আবাসস্থল হচ্ছে জান্নাত। সেখানে তারা যা চাবে, তাই পাবে। ওই চিরসুখময় জান্নাতই হচ্ছে তাদের পুণ্যকর্মপরায়ণতার প্রকৃষ্ট পুরস্কার।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— ‘যাতে এরা যে মন্দ কর্ম করেছিলো, আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দেন এবং এদেরকে এদের সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করেন’। এখানে মন্দ কর্মকে ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে। অর্থাৎ মুত্তাকীগণের বৃহৎ পাপসমূহও আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং তিনি ক্ষুদ্র পাপ তো ক্ষমা করে দিবেনই। অথচ পথভ্রষ্টরা মনে করে বৃহৎ পাপ ক্ষমার অযোগ্য।

আর এখানকার ‘আস্ওয়াল্লাজী আ’মিলু’ (যে সব মন্দ কর্ম করেছিলো) কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁরা ছোট-বড় সকল পাপকেই বড় পাপ বলে ভাবেন। সকল প্রকার পাপই তাদের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ, তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক না কেনো? এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে ‘আস্ওয়া’ (মন্দ কর্ম) দ্বারা পাপের সম্পর্কগত পার্থক্য নির্দেশ করা হয়নি, নির্দেশ করা হয়েছে পাপের প্রকৃতিগত গুণকে। অর্থাৎ পাপের তারতম্য বুঝানো এখানে উদ্দেশ্য নয়, বরং একথা বুঝানোই উদ্দেশ্য যে, প্রকৃতিগতভাবে সকল পাপই মন্দ।

‘আজ্বরহুম’ অর্থ পুরস্কার। ‘বিআহ্সানিল্লাজী’ অর্থ তাদের সৎকর্মের। অর্থাৎ আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাধারণ ভালো কাজের পুরস্কার দিবেন অসাধারণ ভালো কাজের মতো। কেননা তারা স্বল্প হলেও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে। কিংবা বলা যেতে পারে, ‘আহ্সান’ এখানে তুলনামূলক বিশেষণ হিসাবে সাধিত। অর্থাৎ এখানেও অধিক মাত্রায় সৎকর্ম বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রকৃতিগতভাবে যা সৎ ও উত্তম, তা-ই বুঝানো এখানে উদ্দেশ্য। একারণেই মুকাতিল বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁদের ভালো কাজের প্রতিদান দিবেন, কিন্তু মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দিবেন না।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন’? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্ই তাঁর বান্দার জন্য, অর্থাৎ তাঁর প্রিয় নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর জন্য যথেষ্ট।

এরপর বলা হয়েছে— ‘অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যের ভয় দেখায়’। একথার অর্থ— অথচ হে আমার রসুল! দেখুন আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ভয় তারা প্রদর্শন করে আপনাকে। বলে, আপনি পড়বেন তাদের মিথ্যা উপাস্যসমূহের কোপানলে।

বাগবী লিখেছেন, মক্কার মুশরিকেরা রসুল স.কে এই বলে ভয় দেখাতো যে, তুমি আমাদের দেব-দেবীদের নিন্দা-মন্দ বলা থেকে বিরত যদি না হও, তবে তারা তোমাকে অজ্ঞান অথবা পাগল করে দিবে। আবদুর রাজ্জাকও এরকম বর্ণনা করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোনো পথপদর্শক নেই’। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যাদেরকে সাহায্য করেন না, যারা তাঁর প্রিয়ভাজন নবীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে চায়, এমন বস্তুর ভয় দেখায়, যাদের উপকার-অপকার কোনোটাই করার সাধ্য নেই, তাদের জন্য এমন পথপ্রদর্শক থাকে না, যে তাদেরকে দেখাতে পারে সরল সঠিক পথ।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'এবং যাকে আল্লাহ্ হেদায়েত করেন, তার জন্য কোনো পথভ্রষ্টকারী নেই'। একথার অর্থ— আর যাকে আল্লাহ্ স্বয়ং পথপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে, এমন সাধ্যও কারো নেই। কেননা আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় অপ্রতিরোধ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নন'? এই প্রশ্নটিও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— আল্লাহ্ অবশ্যই মহাপরাক্রমের অধিকারী এবং তাঁর শত্রুদেরকে নির্মম দণ্ডদাতা।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১

❑ তুমি যদি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট চাহিলে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা কি সেই অনিষ্ট দূর করিতে পারিবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহিলে তাহারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করিতে পারিবে?' বল, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।' নির্ভরকারিগণ আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করে।

তাফসীরে মাযহারী/২৬০

❑ বল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করিতে থাক, আমিও আমার কাজ করিতেছি। শীঘ্রই জানিতে পারিবে—

❑ 'কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর আপতিত হইবে তাহার উপর স্থায়ী শাস্তি।'

❑ আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের জন্য; অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তাহা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয় সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য এবং তুমি উহাদের তত্ত্বাবধায়ক নহ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি আপনার স্বজাতীয় অংশীবাদীদেরকে যদি জিজ্ঞেস করেন, গগনমণ্ডল ও মেদিনীর সৃজয়িতা কে? তবে দেখবেন, তারা এক কথায় জবাব দিবে, আল্লাহ্। তখন আপনি তাদেরকে বলে দিন, তাহলে তোমরা এই বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করো তো দেখি, যদি আল্লাহ্ আমাকে দুঃখকষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তোমাদের ভিত্তিহীন উপাস্যসমূহ সে দুঃখকষ্ট কি নিবারণ করতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমাকে তাঁর অনুগ্রহধন্য করতে ইচ্ছা করেন, তবে তা প্রতিরোধ করার সামর্থ্যও কি তারা রাখে? দেখবেন, তারা আপনার এমতো প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম। তখন তাদেরকে আপনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দিন এভাবে— আমার মঙ্গলামঙ্গল নিয়ে তাহলে তোমরা ভেবে মরছো কেনো? আমার জন্য তো আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আমি তো আমার সকল বিষয়ে তাঁর প্রতিই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করি। নির্ভরকারীগণ এরকমই করে থাকে।

উল্লেখ্য, মক্কার মুশরিকেরা আল্লাহ্‌কেই আকাশ পৃথিবীর স্রষ্টা বলে জানতো। তৎসত্ত্বেও পিতৃপুরুষদের অন্ধ অনুসরণে চালিয়ে যেতো প্রতিমাপূজা এবং বিশ্বাস করতো যে, প্রতিমাগুলো তাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ করবে। এভাবে প্রতিমাগুলোকে তারা করতো আল্লাহ্‌র অপার ক্ষমতার সমকক্ষ এবং অংশীদার। অথচ এই মহাসত্যটি তারা অনুধাবন করতে

www.eelm.weebly.com

চাইতো না যে, আল্লাহ্‌কে সকল কিছুর স্রষ্টা মেনে নিলে সকল মঙ্গলামঙ্গলের নির্ধারণিয়তারূপে কেবল তাঁকেই মেনে নিতে হয়। নির্ভর করতে হয় কেবল তাঁরই উপর। বিশুদ্ধ বিশ্বাস এটাই। আর এই বিশুদ্ধতার প্রতিই বার বার তাদেরকে আহ্বান জানিয়ে চলেছেন রসুলেপাক স.। এখানে আল্লাহ্‌ তাঁর রসুলকে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্নের মাধ্যমে একথাটিই তাদের উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্পূর্ণই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়নির্ভর। আর তাঁর অভিপ্রায় প্রতিহত করার সাধ্য যেহেতু কারো নেই, সেহেতু সকল বিষয়ে তাঁকে বিশ্বাস করা ও তাঁর প্রতি নির্ভর করাই সমীচীন।

মুকাতিল বলেছেন, রসুল স. আয়াতের প্রথমাংশে উল্লেখিত প্রশ্ন উত্থাপন করলে অংশীবাদীরা তার জবাব দিতে পারেনি। তখন অবতীর্ণ হয়েছিলো 'বলো, আমার জন্য আল্লাই যথেষ্ট। নির্ভরকারীগণ আল্লাহ্‌র উপরেই নির্ভর করে'। উল্লেখ্য, যে প্রকৃত বিশ্বাসী, সে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ ক্ষতি যেমন করতে পারে না, তেমনি করতে পারে না উপকারও। আর বিশ্বাসের দাবি হচ্ছে, আল্লাহ্‌র উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হওয়া। তাই বিশ্বাসীদেরকে এখানে সরাসরি অভিহিত করা হয়েছে 'নির্ভরকারী'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'বলো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করতে থাকো, আমিও আমার কাজ করছি। শীঘ্রই জানতে পারবে—(৩৯) কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, আর আপতিত হবে তার উপর স্থায়ী শাস্তি' (৪০)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে আরো বলুন, ঠিক আছে, তোমরা যখন আমার কথা মানতেই চাও না, তখন তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও, আমিও ব্যাপৃত থাকি আমার কাজে। তবে জেনো, সেদিন বেশী দূরেও নয়, যখন তোমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করতে পারবে, এই পৃথিবীতেই কার উপর নেমে আসছে অনিবারণীয় লাঞ্ছনা এবং পরকালের স্থায়ী শাস্তিই বা আপতিত হবে কার উপর।

'মাকানাতুন' অর্থ আবাসস্থল। এখানে শব্দটি রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে অবস্থা বুঝানোর জন্য। যেমন 'হাইছু' ও 'হুনা' কালকে বুঝায়। আবার কখনো কখনো এ দু'টো শব্দের দ্বারা রূপকার্থে স্থান, পাত্রকে ও বুঝানো হয়ে থাকে।

'ইন্‌নী আ'মিলুন' অর্থ আমি আমার অবস্থানুসারে কাজ করে যাচ্ছি। এখানে 'মাকানাতি' শব্দটি অনুল্লেখ থাকায় শাস্তির প্রতিজ্ঞাটি অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে। আমি আমার কাজে সফল হবো, তোমাদের কাজ হবে তোমাদের ইহ-পরকালের ধ্বংসের কারণ। 'মাকানাতি' শব্দটি এখানে লোপ করার মধ্যে এই ইঙ্গিতটিও রয়েছে যে, রসুল স. তাদের মতো বর্তমান অবস্থায় আবদ্ধ থাকবেন না, বরং যতো বেশী সময় অতিবাহিত হতে থাকবে, তিনি ততো বেশী করে অর্জন করতে থাকবেন শক্তি ও বিজয়। এ জন্যই এখানে 'আমিও আমার কাজ করছি' বলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ধমক দেওয়া হয়েছে। দৃঢ়তার সঙ্গে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আমি আমার কাজে সফল হবোই।

এখানে 'আ'জাবুঁই ইউখ্‌যীহ্‌' অর্থ লাঞ্ছনাদায়ক পার্থিব শাস্তি। একথার মধ্যেই রয়েছে রসুল স. এর পার্থিব বিজয়ের সুসংবাদ। বদর যুদ্ধে সেরকমই ঘটেছিলো। আর 'আ'জাবুম মুক্বীম' অর্থ স্থায়ী শাস্তি। অর্থাৎ দোজখের শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য; অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে, সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয়, সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই

ধ্বংসের জন্য এবং তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও'। একথার অর্থ— হে আমার বাণীবাহক! মানুষ যাতে অক্ষয় কল্যাণের অধিকারী হতে পারে, সেজন্যই তো আমি আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছি মহাসত্যের প্রতিভূ মহাগ্রন্থ আলকোরআন। এখন যে এই কোরআনের নির্দেশনাকে মান্য করবে, সে অবশ্যই হবে মহাকল্যাণের অধিকারী। আর যে বিমুখ থাকবে সে হয়ে যাবে ধ্বংস। এখন বিষয়টি তাদের উপরেই ছেড়ে দিন। দেখুন কে আপনাকে মান্য করে এবং কে করে না। কেউ যদি এখন স্বেচ্ছায় ধ্বংসের পথ ধরে, তবে তার কোনো দায় আপনার উপরে বর্তাবে না।

আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত ২৭ ও ২৮ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে, যেখানে বলা হয়েছে 'আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে, আরবী ভাষায় এই কোরআন বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে'। এর মধ্যবর্তী আয়াতসমূহের প্রসঙ্গ ভিন্ন। আর এখানে 'মানুষের জন্য' কথাটির অর্থ মানুষের পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী উভয় ক্ষেত্রের কল্যাণ অর্জনের দিকনির্দেশনার জন্য। এখানে 'ফামানিহ্‌তাদা' অর্থ এ গ্রন্থের সহায়তায় যে সৎপথ অবলম্বন করে এবং 'মানদ্বল্‌লা' অর্থ যে বিপথগামী হয়েছে কল্যাণের পথ থেকে। আর 'ওয়ামা আন্‌তা আ'লাইহিম বি ওয়াকীল' অর্থ এবং তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও। অর্থাৎ হে আমার নবী! আপনার দায়িত্ব কেবল আল্লাহ্‌র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহের প্রচার। আপনি তা করেই চলেছেন। সুতরাং কারো বিপথগামিতার দায় আপনার উপরে নেই যে, আপনি তাদেরকে হেদায়েত গ্রহণে বাধ্য করবেন।

www.eelm.weebly.com

তাফসীরে মাযহারী/২৬৩

❑ আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাহাদের মৃত্যুর সময় এবং যাহাদের মৃত্যু আসে নাই তাহাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর তিনি যাহার জন্য মুত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তাহার প্রাণ তিনি রাখিয়া দেন এবং অপরগুলি ফিরাইয়া দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

❑ তবে কি উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সুপারিশকারী ধরিয়াছে? বল, 'উহাদের কোন ক্ষমতা না থাকিলেও এবং উহারা না বুঝিলেও?'

❑ বল, 'সকল সুপারিশ আল্লাহ্রই ইখতিয়ারে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্রই, অতঃপর তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হইবে।'

❑ শুধু এক আল্লাহ্র কথা বলা হইলে যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে উপাস্যগুলির উল্লেখ করা হইলে তাহারা আনন্দে উল্লসিত হয়।

❑ বল, 'হে আল্লাহ্, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! তোমার বান্দাগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, তুমি তাহাদের মধ্যে উহার ফয়সালা করিয়া দিবে।'

❑ যাহারা যুলুম করিয়াছে যদি তাহাদের থাকে, দুনিয়ায় যাহা আছে তাহা সম্পূর্ণ এবং ইহার সমপরিমাণ সম্পদও, তবে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হইতে মুক্তিপণস্বরূপ সেই সকলই তাহারা দিয়া দিবে এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট হইতে এমন কিছু প্রকাশিত হইবে যাহা উহারা কল্পনাও করে নাই।

❑ উহাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল উহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণ ও নিদ্রার সময়'। একথার অর্থ—

আল্লাহ্ মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর স্থায়ী প্রাণ হরণ করলে তাদের মৃত্যু ঘটে, এবং সাময়িকভাবে তা করলে তারা হয়ে পড়ে নিদ্রামগ্ন। অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় দেহের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে দেওয়া হয় বলে ওই দেহে আর কখনোই প্রাণের স্পন্দন জাগে না। এই অবস্থার নাম মৃত্যু। দ্বিতীয় অবস্থায় দেহের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় কেবল বাহ্যিকভাবে। ফলে প্রাণের বাহ্যিক প্রভাব আর দৃষ্ট হয় না। স্থগিত হয়ে যায় বোধ-বুদ্ধি ও ইচ্ছা-অনিচ্ছা। এই অবস্থায় আল্লাহ্ তার অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি উপমার জগতের (আলমে মেছালের) দিকে নিবদ্ধ করে দেন। ওই জগতেই রয়েছে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর ছবি-প্রতিচ্ছবি। এরকম অবস্থার নাম সুপ্তি বা নিদ্রা।

'তাওফ্ফা' শব্দটির প্রকৃত অর্থ মৃত্যু। আর রূপক অর্থ নিদ্রা। 'ওয়াল্লাতি লাম তামুত্' অর্থ যাদের মৃত্যু আসেনি। কথাটির পূর্বে উহ্য রয়েছে অন্য একটি ক্রিয়া। ওই উহ্য ক্রিয়াটিসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ প্রাণগুলোকে সম্পূর্ণরূপে সংহার করেন, ফলে দেহের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় চিরতরে এবং যাদের মৃত্যু ঘটানো হয় না, তাদেরকে তিনি সংহার করেন নিদ্রাকালে, ফলে তারা বাহ্যিক অনুভূতি ও গতিপ্রকৃতি থেকে হয়ে যায় সম্পূর্ণ অক্ষম।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে আত্মা ও প্রাণ। নিদ্রাকালে আত্মা দেহের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে। অবশিষ্ট থাকে কেবল প্রাণ। আর মৃত্যুর সময় প্রাণের সম্পর্কও হয়ে যায় চিরতরে বিচ্ছিন্ন। এখানে আত্মা অর্থ প্রকাশ্য জ্ঞান ও বোধশক্তি। নিদ্রাকালে এগুলো অন্তর্হিত হয়। কিন্তু তখনো বর্তমান থাকে জীবনের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বোধ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, ঘুমন্ত অবস্থায় প্রাণ বের হয়ে যায়। তখন দেহাভ্যন্তরে থাকে কেবল প্রাণের কিরণ। সেকারণেই সে স্বপ্ন দেখে। আর হৃত প্রাণ ফিরে পায় জাগ্রত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে। আমি বলি, বর্ণনাটি যদি যথাযথ হয় তবে ঘুমন্ত অবস্থায় প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার অর্থ হবে, সাধারণ আত্মার মধ্যে প্রাণ নিবিষ্ট হয়ে যায় উপমার জগতের দিকে। আর দেহে কিরণ থাকে অর্থ দেহে তখনও বজায় থাকে প্রাণের স্বাভাবিক সম্পর্ক, তাই শ্বাস-প্রশ্বাসও চলতে পারে স্বাভাবিক গতিতে। মোট কথা নিদ্রাকালে প্রাণ আলমে মেছালের দিকে ধাবিত হয় বলেই মানুষ স্বপ্ন দেখে এবং সে প্রাণ ফিরে আসে জেগে ওঠার পূর্বক্ষণে।

সালেম ইবনে আমেরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর একবার বললেন, আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কোনো কোনো মানুষ স্বপ্নে এমন কিছু দেখে, যা ধারণা করা যায় না। হস্তধৃত কোনো বস্তুর মতো তাদের স্বপ্ন হয়ে যায় বাস্তব। আবার কারো কারো স্বপ্ন একেবারেই ফলে না। একথা শুনে হজরত আলী বললেন, আপনাকে আমি এর কারণ জানাচ্ছি। একথা বলে তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করলেন। তারপর বললেন, সংহারকৃত প্রাণ আকাশে উঠিয়ে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করানো হলে ওই প্রাণধারীর দর্শিত স্বপ্ন সত্য হয়ে যায়। আর ওই প্রাণকে তার

দেহের প্রতি প্রেরণ করলে শয়তান তার উপরে প্রভাব বিস্তার করে। জানিয়ে দেয় সত্য-মিথ্যা অনেক কিছু। ফলে তার স্বপ্নও হয় মিথ্যা। হজরত আলীর এমতো ব্যাখ্যা শুনে হজরত ওমর আরো বিস্মিত হলেন।

এরপর বলা হয়েছে 'অতঃপর তিনি যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন, তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলি ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যার মৃত্যু ঘটাতে চান, তার প্রাণ আর ফিরিয়ে দেন না। আর যার মৃত্যু ঘটাতে চান না, তাদের প্রাণ ফিরিয়ে দেন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, রসুল স. শয্যাগ্রহণকালে ডান কাত হয়ে শুয়ে ডান হাত মুখমণ্ডলের নিচে রেখে বলতেন, 'আল্লাহুম্মা, বিকা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া' (হে আল্লাহ্, আমার জীবন-মরণ তোমারই হাতে)। এখানকার 'বিকা' শব্দের 'কাফ' অক্ষরটি ইঙ্গিত করছে সাহায্য ও আয়ত্তের দিকে। আর তিনি স. যখন জেগে উঠতেন তখন বলতেন, প্রশংসা করি সেই আল্লাহ্র, যিনি আমাকে মৃত্যু দেওয়ার পর জীবন দান করলেন। তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাগমন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা শয্যাগ্রহণকালে পরিধেয় বস্ত্রের একাংশ দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নিয়ো, কেননা তোমরা জানো না সেখানে কে আছে না আছে (সাপ-বিচ্ছু পোকামাকড় আছে কিনা) এরপর বোলো 'হে আমার প্রভুপালক আল্লাহ্! আমি তোমারই নামের বরকত ও সাহায্য দ্বারা আমার পার্শ্বদেশ শয্যাসংলগ্ন রাখি এবং তোমারই নামের মহিমায় করি গাত্রোত্থান। আমার জীবনকে যদি তুমি স্তব্ধ করে দাও তবে তার উপরে তুমি অনুগ্রহ কোরো এবং তাকে

www.eelm.weebly.com

যদি তুমি মুক্ত করে দিতে চাও, তবে যে সকল উপকরণ দিয়ে তুমি তোমার পবিত্র বান্দাগণের হেফাজত করে থাকো, সে সকল উপকরণসহ তুমি আমার জীবনকেও করে দিয়ো নিরাপদ। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তোমরা ডান কাতে শুয়ে এই প্রার্থনা কোরো এবং বিছানা ঝাড়া সম্পর্কে বলেছেন, পরণের কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নিয়ো তিনবার।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য'। এ কথার অর্থ— এই প্রাণ হরণ, তারপর সেগুলোর কিছু কিছু আটকে রাখা ও কিছু কিছু ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র অপার ক্ষমতার বিস্ময়কর নিদর্শন। যারা চিন্তাশীল, কেবল তারাই বুঝতে চেষ্টা করে এর মহিমা ও রহস্য। অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, যে আল্লাহ্ তাঁর চিরস্বাধীন অভিপ্রায়ানুসারে মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর স্থায়ীভাবে ও সাময়িকভাবে প্রাণহরণ করেন, তিনি অবশ্যই সকলের মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থান ঘটাতে সক্ষম। তিনি যে আনুরূপ্যবিহীনরূপে এক, একক, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বের 'নির্ভরকারীগণ আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করে' কথাটির কারণ বিধৃত হয়েছে আলোচ্য বাক্যে।

তাফসীরে মাযহারী/২৬৬

পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'তবে কি তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সুপারিশকারী ধরেছে? বলো, তাদের কোনো ক্ষমতা না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! দেখুন কতোই অজ্ঞ এই পৌত্তলিকেরা। মহাবিশ্বের মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে তারা সুপারিশকারী মনোনীত করেছে অপ্রাণ প্রতিমাসমূহকে। আপনি তাদেরকে বলুন, ক্ষমতা ও বোধবুদ্ধির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও কি তোমরা ওই প্রতিমাগুলোকে পরিত্যাগ করবে না?

এখানকার 'আমিত্তাখাজূ' কথাটির মধ্যে 'আম' ব্যবহৃত হয়েছে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক 'হামযা' অর্থে এবং বাক্যটি এখানে সূচনামূলক। অথবা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'বাল' অর্থে, যা দ্বিরুক্তিমূলক এবং এখানে যা রয়েছে অবলুপ্ত। পরের প্রশ্নটিও (আওয়া লাও কান্) অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— যাদের ক্ষমতা ও চেতনা নেই, সুপারিশ করার যোগ্যতা তো তাদের থাকতেই পারে না।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'বলো, সকল সুপারিশ আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে, আকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই, অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে'। পৌত্তলিকদের পক্ষ থেকে এরকম জবাব আগমনের সুযোগ ছিলো যে, আমরা তো নিছক প্রতিমাপূজারী নই। আমরা পূজা করি ওই সকল শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তিবর্গের, যারা আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন। ওই সকল মহান ব্যক্তিও কি তবে সুপারিশ করার যোগ্য নন? তাদের এমতো সম্ভাব্য অজুহাতের মূলোৎপাটনার্থে আলোচ্য আয়াতে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে— সকল সুপারিশ তো আল্লাহ্‌র অধিকারভূত। আর আকাশ-পৃথিবীর সর্বময় প্রভুত্বও তাঁর। সুতরাং পাপী-পুণ্যবান কারো মূর্তিই সুপারিশ করার যোগ্যতা ও অধিকার রাখে না। সুতরাং সেই আল্লাহ্‌র দিকেই তো তোমাদের মুখ ফেরানো উচিত, যাঁর সকাশে তোমাদেরকে প্রত্যানীত হতে হবেই।

এরপরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'শুধু এক আল্লাহ্‌র কথা বলা হলে যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উপাস্যগুলির উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়'।

মুজাহিদ ও মুকাতিলের বর্ণনানুসারে বাগবী লিখেছেন এবং কেবল মুজাহিদ সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, মক্কার পৌত্তলিকদের আনন্দে উল্লসিত হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছিলো তখন, যখন রসুল স. তাদের এক সমাবেশে সুরা আন্‌নজ্‌ম পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। ওই সময় রসুল স. এর আবৃত্তির সঙ্গে শয়তান প্রতিমা-প্রশস্তিমূলক কতিপয় শব্দের সংযোজন ঘটায়। ফলে তাদের আনন্দ উপচে পড়ে। বিশেষতঃ সেদিকে লক্ষ্য করেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— আল্লাহ্‌র প্রসঙ্গ তাদের কাছে বিস্বাদপূর্ণ, আর প্রতিমা-প্রশস্তি চিত্তসুখকর।

এরপরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— বলো, 'হে আল্লাহ্, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! তোমার বান্দাগণ যে বিষয়ে মতোবিরোধ করে, তুমি তাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দিবে'।

তাফসীরে মাযহারী/২৬৭

রসুল স. যখন পৌত্তলিকদের পুনঃপুনঃ সত্যপ্রত্যাখ্যানের কারণে বিচলিত হয়ে পড়েন, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে শিখিয়ে দেন আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত প্রার্থনাটি। এখানে 'আনতা তাহ্‌কুম' অর্থ মীমাংসা করে দিবে। অর্থাৎ যারা সত্যাধিষ্ঠিত, তাদেরকে করে দিবে বিজয়ী এবং প্রতিমাপূজারীদেরকে করে দিবে অসহায়।

আবু সালমা বলেছেন, আমি একবার জননী আয়েশার নিকটে জানতে চাইলাম, হে উম্মত জননী! রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর রাতের উপাসনা শুরু করতেন কোন্ বাণী উচ্চারণের মাধ্যমে। তিনি বললেন, তিনি স. পাঠ করতেন 'হে আল্লাহ্! হে জিবরাইল, মিকাইল ও ইস্রাফিলের প্রভুপালক! হে আকাশ-পৃথিবীর সৃজয়িতা! হে দৃশ্য-অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! মহাবিচারের দিবসে তুমি তোমার বান্দাদের ওই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়ো যেগুলো নিয়ে তারা বিভেদ সৃষ্টি করতো। আর আমাকে বিতর্কিত

বিষয়াবলীতে পরিচালিত করো তোমার আদেশ ও সন্তোষ সহকারে। তুমি যাকে পছন্দ করো, তাকেই তো প্রদর্শন করো সরল সহজ পথ।

এরপরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'যারা জুলুম করেছে যদি তাদের থাকে দুনিয়ায় যা আছে তা সম্পূর্ণ এবং এর সমপরিমাণ সম্পদও, তবে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তিপণ স্বরূপ সেই সকলই তারা দিয়ে দিবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি'। একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে যদি কোনো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর কাছে এই পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের দ্বিগুণ সম্পদও থাকে, তবে সে তার সমুদয় সম্পদ মুক্তিপণরূপে দিয়ে সেদিনের ভয়াবহ শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে চাইবে। কিন্তু তবুও সে রেহাই পাবে না। সম্মুখীন হবে এমন মহাশাস্তির, যা ছিলো তার কল্পনার অতীত।

মুকাতিল বলেছেন, পৃথিবীতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ধারণাও করতে পারে না যে, কতো ভয়ংকর শাস্তিভোগ করতে হবে তাদেরকে পরকালে। অথবা এখানকার 'যা তারা কল্পনাও করেনি' কথাটির অর্থ হতে পারে এখানে এরকম— তারা মনে করে তাদের পূজিত প্রতিমাগুলো তাদের পক্ষে সুপারিশ করবেই। কেউ কেউ মনে করে, মহাপ্রলয়-পুনরুত্থান-বিচার এগুলো কল্পনা মাত্র। আরো মনে করে, আখেরাত বলে কিছু যদি থেকেও থাকে, তবে ওই জগতে আমরা বিশ্বাসীদের চেয়ে ভালো অবস্থায় থাকবো। বলা বাহুল্য, তাদের এধরনের অপবিশ্বাস ধুলিসাৎ হয়ে যাবে সেদিন এবং যে মহাশাস্তির প্রসঙ্গ তারা ধারণাতেও আনতে পারতো না, অতর্কিতে তাই তখন আপতিত হবে তাদের উপর।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'তাদের কৃতকর্মের মন্দফল তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে'। একথার অর্থ— সেদিন তাদের সামনে যখন তাদের আমলনামা হাজির করা হবে তখন তারা স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারবে তাদের মন্দ কর্মের বিস্তারিত বিবরণ। দেখবে, আমলনামা পরিপূর্ণ রয়েছে অংশীবাদিতা,

বিশ্বাসীপীড়ন ইত্যাকার নানাবিধ পাপে। আর আল্লাহ্‌র বাণী, আল্লাহ্‌র রসুল ও আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে যারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো, সে ঠাট্ট-বিদ্রূপের শাস্তিও তখন ঘিরে ফেলবে তাদেরকে। এখানে 'মা কানু' কথাটির 'মা' যদি মাউসুলা (যোজক) ধরা হয় তবে শেষ বাক্যটির অর্থ হবে এবং সেই শাস্তি তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে যা সম্পর্কে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো। আর 'মা' যদি ধরা হয় মাসদারী (ক্রিয়ামূল), তাহলে অর্থ হবে— পরিহাস করার শাস্তি তখন ঘিরে ফেলবে তাদেরকে।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২

❑ মানুষকে বিপদ-আপদ স্পর্শ করিলে সে আমাকে আহ্বান করে; অতঃপর যখন আমি আমার কোন নিয়ামত দ্বারা তাহাকে অনুগৃহীত করি তখন সে বলে, 'আমাকে তো ইহা দেওয়া হইয়াছে আমার জ্ঞানের কারণে।' বস্তুত ইহা এক পরীক্ষা, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই বুঝে না।

❑ ইহাদের পূর্ববর্তীগণও ইহাই বলিত, কিন্তু উহাদের কৃতকর্ম উহাদের কোন কাজে আসে নাই।

❑ উহাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল উহাদের উপর আপতিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে যাহারা যুলুম করে উহাদের উপরও উহাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল আপতিত হইবে এবং উহারা ব্যর্থও করিতে পারিবে না।

www.eelm.weebly.com

❑ ইহারা কি জানে না, আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা রিয্ক প্রশস্ত করেন অথবা যাহার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মানুষ বিপদে পড়লে আমার কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়। এরপর আমি যখন তার বিপদ দূর করে দেই এবং অনুগ্রহ করে কিছু দেই, তখন সে বলে, আমি তো এসব পেয়েছি আমার জ্ঞান ও যোগ্যতা বলে। কিন্তু এভাবে যে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন, তা না বুঝতে পেরে তাদের অধিকাংশই হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ।

এখানে 'আল্ইন্সান' (মানুষ) এর 'লাম' অক্ষরটি লামে আহাদী বা নির্দিষ্টবাচক লাম। তাই এখানে 'আল ইন্সান' অর্থ হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ইনসান। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানকার 'আলিফ লাম' জাতিবাচক (জিনসী)। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে এখানে ঘটেছে এই জাতিবাচকতার ব্যবহার। অর্থাৎ এখানে অধিকাংশকে ধরা হয়েছে সামগ্রিক অর্থে।

'দুর্রুন' অর্থ বিপদ-আপদ। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত ৪৫ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কাজের বৈপরীত্য বোঝানোই এখানে উদ্দেশ্য। তারা যে আল্লাহ্র কথা শুনলে বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়, সেই আল্লাহ্র কাছেই আবার সাহায্যপ্রার্থী হয় বিপদে পড়লে। আবার বিপদ দূর হলে অথবা কোনো নেয়ামত পেলে বলে, আমি এটা পেয়েছি আমার জ্ঞান ও যোগ্যতা বলে।

এখানে 'খাও্ওয়াল্নাহু' অর্থ আমি কোনো নেয়ামত দ্বারা তাকে অনুগৃহীত করি। 'তাখভীল' অর্থ অনুগ্রহ করে কাউকে কিছু দেওয়া। 'আ'লা ই'ল্মিন' অর্থ আমার জ্ঞানের কারণে। অর্থাৎ এটা অর্জন করার বিদ্যা আমার জানা ছিলো। অথবা এটা পাওয়ার অধিকার আমার ছিলো। কিংবা আমি জানতাম যে, আমাকে এটা দেওয়া ছিলো আল্লাহ্র কর্তব্য। 'বাল্ হিয়া ফিত্নাতুন' অর্থ বস্তুত এটা এক পরীক্ষা। অর্থাৎ এই নেয়ামত ছিলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা-অকৃতজ্ঞতা যাচাইয়ের একটি পরীক্ষা। অথবা এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রদত্ত এমন অবকাশ, যা হয়ে যেতে পারে তাদের শাস্তির কারণ। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'হিয়া' সর্বনামটি সংশ্লিষ্ট 'আমাকে তো এটা দেওয়া হয়েছে আমার জ্ঞানের কারণে' কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ এই উক্তি এমন এক পরীক্ষা, যা অবশেষে হবে তার শাস্তির কারণ।

'ওয়া লাকিন্না আক্ছারাহুম লা ইয়া'লামূন' অর্থ কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না। বায়যাবী লিখেছেন, বাক্যটি একথাই প্রমাণ করে যে, এখানে 'আল্ইন্সান' অর্থ মানবজাতি। কেননা এখানকার 'লাকিন্না' হচ্ছে হরফে ইসতিদরাক' (গরিষ্ঠ সংখ্যক) যা প্রমাণ করেছে, মানুষের যে অজ্ঞতার ঘোষণা আল্লাহ্ দিয়েছেন, তা সকল মানুষের জন্য নয়, অধিকাংশ মানুষের জন্য।

আমি বলি, এখানে 'আল্ইন্সান' অর্থ যদি সকল মানুষ না-ও হয়, যদি এর অর্থ হয় কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, তবুও 'অধিকাংশ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী' অর্থ এখানে 'সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী'ই হবে। আবার এরকমও বলা যেতে পারে, কোনো কোনো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জেনে বুঝেও কেবল জেদ ও হঠকারিতাবশতঃ

ইমান আনতো না। আবার কেউ কেউ মনে করতো তাদের মতাদর্শই সত্য। এই শেষোক্তের সংখ্যাই অধিক। আর তাদেরকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে— কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এদের পূর্ববর্তীগণও এরকমই বলতো, কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের কোনো কাজে আসেনি (৫০)। তাদের মধ্যে যারা জুলুম করে তাদের উপরও তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল আপতিত হবে এবং তারা ব্যর্থও করতে পারবে না' (৫১)।

মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'আল্লাজীনা মিন কুব্লিহিম' (এদের পূর্ববর্তীগণ) বলে বুঝানো হয়েছে কারুন ও তার অনুচরদেরকে। কারুনই বলেছিলো, এই ধনসম্পদ আমি পেয়েছি স্ব-জ্ঞান ও স্ব-যোগ্যতাবলে। আর তার অনুচরেরা ছিলো তার একথার ঘোর সমর্থক।

'ফামা আগ্না আন্হুম মা কানূ ইয়াক্সিবূন' অর্থ কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের কোনো কাজে আসেনি। অর্থাৎ তার কোষাগারসমূহের চাবি বহন করতো যে শক্তিশালী দলটি, তারাও তার ভূপ্রোথিত সম্পদ উদ্ধারে কোনো কাজে আসেনি।

'তাদের কৃতকর্মের মন্দফল এদের উপরে আপতিত হয়েছে' কথাটির অর্থ মক্কার মুশরিকেরাও অহংকারী অকৃতজ্ঞ কারুনের দলের মতো। তাদের মন্দ ঐতিহ্য এরাও বহন করে চলেছে। ফলে এদের উপরেও আপতিত হয়েছে শাস্তি। যেমন— সাত বৎসরের প্রলম্বিত দুর্ভিক্ষ, বদরযুদ্ধ, ওই যুদ্ধে তাদের নেতৃস্থানীয়দের অনেকেই নিহত হয়েছিলো। অনেকে হয়েছিলো বন্দী। অন্যরা পলায়ন করেছিলো পরাজয়ের গ্লানি ঘাড়ে নিয়ে।

‘ওয়ামা হুম বিমু’জ্বিযীন’ অর্থ এবং তারা ব্যর্থও করতে পারবে না। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি ওই হতভাগ্যদেরকে একথা স্পষ্টবচনে জানিয়ে দিন যে, আল্লাহ্ অজেয়, তাঁকে কখনো পরাস্ত করা যায় না।

এরপরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে—‘এরা কি জানে না, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করেন অথবা যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন’? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা পরীক্ষা করবার জন্য কারো কারো উপজীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং কারো কারো উপজীবিকাকে করেন সংকীর্ণ। অহংকারী ও অকৃতজ্ঞ বিত্তপতিরা তখন বলতে থাকে, এই বিত্তবৈভব আমরা অর্জন করেছি আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও চেষ্টায়। কিন্তু অজ্ঞরা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা করে না যে, বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায়নির্ভর। রুজি-রোজগারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটান তিনিই। তাই তো দেখা যায়, এমন সব লোক কপর্দকহীন, যারা উপার্জনের বহু পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। আবার এমন লোক বিত্তশালী, যারা উপার্জনের পন্থা সম্পর্কে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। নিজস্ব যোগ্যতা বলে যাদের কোনো কিছুই নেই।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য’। একথার অর্থ— ওই সকল লোকের জন্য এখানে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যারা একথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ই রিজিকের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটান।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, কিছু সংখ্যক মূর্তিপূজক ছিলো, যারা বহু মানুষকে হত্যা করেছিলো এবং লিপ্ত ছিলো ব্যভিচারসহ অন্যান্য অনেক অপকর্মে। তারা একবার রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আপনি যা বলেন, তা সবই তো ভালো। কিন্তু একথা আপনি বলতে পারেন কি যে, তাতে করে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে কীভাবে? তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো সুরা ফোরকানের এই আয়াতগুচ্ছ— ‘এবং তারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোনো উপাস্যকে অংশীদার করে না, আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এসব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি বাড়ানো হবে এবং সেখানে তারা স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়, তারা নয় যারা তওবা করে, বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে। আল্লাহ্ তাদের পাপ ক্ষয় করে দিবেন পুণ্য দিয়ে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু’। এর সঙ্গে আরো অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত (৫৩)।

বিশুদ্ধ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সুরা যুমারের ৫৩ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মূর্তিপূজকদের সম্পর্কে। বাগবীও আতা সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন।

শিথিল সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর প্রিয় পিতৃব্য শহীদশ্রেষ্ঠ হজরত হামযার হন্তারক ওয়াহ্শীকে প্রতিনিধির মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। ওই প্রতিনিধির মাধ্যমে ওয়াহ্শী জানালেন, কীভাবে আমি আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করবো। আপনি প্রচার করেন ‘যে খুন করবে, আল্লাহ্র অংশীদার নির্ধারণ করবে, ব্যভিচার করবে, কিয়ামতের দিনে তার শাস্তি হবে দ্বিগুণ’। আর আমি তো ওই সকল দোষে দোষী। তখন অবতীর্ণ হলো সুরা ফুরকানের আয়াত ‘তারা নয়, যারা তওবা করে, বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে’। ওয়াহ্শী এই আয়াত শুনে বলে পাঠালেন, বার্তাটি তো খুবই কঠিন। সম্ভবতঃ আমি তা পালন করতে পারবো না। এ ছাড়া আর কি কোনো উপায় আছে? তখন অবতীর্ণ হলো ‘নিশ্চয় আল্লাহ্ কেবল তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে’। ওয়াহ্শী নতুন অবতীর্ণ আয়াত শুনে বলে পাঠালেন, আমি এখনো দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছি যে, তওবা করলেও অংশীবাদিতার পাপ থেকে আমাকে মুক্ত করা হবে কিনা। কেননা বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায়নির্ভর। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য সুরার ৫৩ সংখ্যক আয়াত। বাগবীর বর্ণনায় অতিরিক্ত সংযোজিত কথাগুলো হচ্ছে— তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এ আয়াতের বিধান কি কেবল ওয়াহ্শীর জন্য প্রযোজ্য, না আমাদের জন্যও? তিনি স. বললেন, সকল মুসলমানদের জন্য।

হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমরা বলতাম, মুসলমান হওয়ার পর কেউ দুঃখ-দুর্দশায় পড়ে ধর্মত্যাগ করলে তাকে আর ক্ষমা করা হয় না। কিন্তু রসুল স. যখন মদীনায় এলেন, তখন ওই ধরনের লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো ‘বলো, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছো— আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না....’। বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আয়াশ ইবনে রবীয়া, ওলীদ ইবনে ওলীদ এবং মুসলমানদের এমন এক দল সম্পর্কে, যারা মুসলমান হয়েছিলেন ইসলামের সূচনালগ্নে। পরে পৌত্তলিকদের অকথ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা নিরুপায় অবস্থায় ধর্মত্যাগ করেন। আমরা বলতাম, তাদের ফরজ-নফল কোনো কিছুই আল্লাহ্ কবুল করবেন না। তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় এই সুরার ৫৩ সংখ্যক আয়াত। হজরত ওমর তখন এই আয়াত লিখে মক্কায় আয়াশ ইবনে রবীয়া ও তাঁর মতো যারা তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা তখন পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরত করে চলে আসেন মদীনায়।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৫৩

www.eelm.weebly.com

❑ বল, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যাহারা নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছ— আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না; আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল। আমার কথা আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন এভাবে— হে আমার বান্দাগণ! সত্যপ্রত্যাখ্যান ও অংশীবাদিতাবিজড়িত হয়ে তোমরা এতোদিন ধরে যারা স্বীয় সত্তার উপরে অনাচার-স্বেচ্ছাচার করেছো, তারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। ফিরে এসো। আল্লাহ্ তোমাদের সমুদয় পাপ মার্জনা করবেন। তিনি তো মহা ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ার্দ্র।

এখানে 'আস্‌রাফূ' অর্থ অবিচার, অনাচার, স্বেচ্ছাচার, বাড়াবাড়ি। বাগবী লিখেছেন এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, 'আস্‌রাফূ' অর্থ বৃহৎ পাপ (কবীরা গোনাহ)। 'লা তাক্বনাতু' অর্থ নিরাশ হয়ো না। অর্থাৎ যদি তুমি ইমান এনে থাকো এবং সর্বান্তঃকরণে তওবা করে থাকো, তবে আল্লাহ্‌র মার্জনাপ্রাপ্তি সম্পর্কে নিরাশ হয়ো না। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, ক্ষমাপ্রাপ্তির মূল শর্ত হচ্ছে ইমান। আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং এরশাদ করেছেন 'ইন্‌নাল্‌লহা লা ইয়াগফিরু আঁই ইউশরিকা বিহী' (নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শিরিক করার গোনাহ্

ক্ষমা করেন না)। এই আয়াত অবতরণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে যে সকল বর্ণনা এসেছে, তার সঙ্গেও আলোচ্য আয়াত সাদৃশ্যপূর্ণ। 'ইয়াগফিরুজ্ জুনূবা জ্বামীয়া' অর্থ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। অর্থাৎ তোমরা যদি অংশীবাদিতাকে চিরতরে পরিহার করে এক আল্লাহ্‌র প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করো তবে আল্লাহ্ তোমাদের বিগত জীবনের বৃহৎ-ক্ষুদ্র সকল পাপ মার্জনা করে দিবেন। হজরত আমর ইবনে আস থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইসলাম পেছনের পাপরাশিকে মুছে ফেলে।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। একটি বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। ঘটনাটি হচ্ছে— কিছু সংখ্যক প্রতিমাপূজারী বড় বড় অপকর্মে ডুবে ছিলো। এরপর তারা তওবা করে এবং মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু এই আয়াতের শব্দগুলো সাধারণ। অর্থাৎ এর দ্বারা বুঝা যায়, কোনো বান্দা যদি ইমানদার হয় এবং ইসলাম গ্রহণের পরেও যদি বড় ধরনের পাপ করে থাকে, তবুও যেনো সে আশা করে যে, আল্লাহ্ তাকে মাফ করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ক্ষমার বিষয়ে সে যেনো নিরাশ না হয়, এমনকি তওবা না করলেও। কেননা এক আয়াতে আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন, শিরিক ব্যতীত অন্য যে কোনো পাপ তিনি ক্ষমা করে দিবেন। আবার এই আয়াতের শেষাংশে স্পষ্ট করে একথা বলাও হয়েছে যে 'ইন্‌নাহু হুয়াল গফুরুর রহীম' (নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু)।

এই আয়াতে অ-মূর্তিপূজক, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসীগণের সাধারণ ক্ষমা (আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ানুসারে) যে সকল কারণ ও যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয়, সেগুলো হচ্ছে—

১. 'আলগফূর' হচ্ছে মূল ধাতু থেকে নির্গত আধিক্যপ্রকাশক শব্দরূপ। অর্থাৎ তিনি এমন ক্ষমাশীল, যার কোনো তুলনা নেই।

২. 'গফূর' এর পূর্বে 'আল'(আলিফ লাম) যুক্ত হওয়ায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, ক্ষমা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন কেবলই আল্লাহ্।

৩. 'আল গফূর' এর পরে 'আর রহীম' সংযোজন করে আবার 'রহমত' প্রদানের অঙ্গীকারও করা হয়েছে।

৪. 'ই'বাদী' (আমার বান্দাগণ) শব্দটি ইমানদারদের জন্য অসহায়তাপ্রকাশক এবং এখানে 'আমার' বলে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণকে তাঁর নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন, ফলে ইমানদারদের সাধারণ ক্ষমার বিষয়টি হয়েছে অধিকতর সুনিশ্চিত।

৫. যেহেতু বান্দা নিজের উপরে অবিচার করেছে, তাই সে বান্দা হিসেবে ক্ষমার পাত্র।

৬. মার্জনার কথা তো বলা হয়েছেই, তদুপরি নিষেধ করা হয়েছে রহমত থেকে নিরাশ হতে।

৭. সাধারণ ক্ষমার কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে 'নিশ্চয় আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন' কথাটিকে।

৮. সর্বনামের স্থলে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে 'আল্লাহ্' যাতে করে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের আনুগত্য ও অবাধ্যতা থেকে চির অমুখাপেক্ষী এবং তিনি শর্তহীন অনুগ্রহকারী ও পরম দয়ালু।

www.eelm.weebly.com

৯. 'পাপ' এর পূর্বে বসানো হয়েছে 'সমুদয়' শব্দটি। এতে করে বুঝা যায় সকল পাপই তিনি ক্ষমা করে দিবেন, কোনো কোনো পাপ নয়। এটাও সাধারণ ক্ষমার একটি অকাট্য প্রমাণ।

নাফে সূত্রে মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, প্রথমদিকে আমরা মনে করতাম, আমাদের সকল পুণ্যকর্ম নিশ্চয় কবুল করা হবে। এর পর যখন অবতীর্ণ হলো 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো, তাঁর রসুলের আনুগত্য করো এবং নিজের আমলকে নষ্ট করে দিও না' তখন কাউকে বড় কোনো পাপ করতে দেখলে বলতাম, এ তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারপর অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। তখন আমরা ইতোপূর্বের উভয় অভিমত থেকে সরে যাই। এরপর থেকে আমরা কাউকে কোনো পাপ করতে দেখলে আতংকিত হতাম এবং পাপ থেকে মুক্ত থাকতে দেখলে এমতো আশা করতাম যে, তার পুণ্যকর্ম গৃহীত হবে।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ একদিন মসজিদে গিয়ে দেখলেন, জনৈক বক্তা বক্তৃতা করছে দোজখ ও দোজখের জিঞ্জির সম্পর্কে। তিনি ওই বক্তার পশ্চাতে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে বক্তৃতা প্রদানকারী! মানুষকে নিরাশ করছো কেনো? তারপর তিনি পাঠ করলেন 'কুল ইয়া ই'বাদী..... ইন্নাহু হুয়াল গফূরুর রহীম'।

হজরত আসমা বিনতে জায়েদ বর্ণনা করেছেন, আমি নিজে রসুল স.কে 'কুল ইয়া ই'বাদী' এই আয়াত পাঠ করতে শুনেছি। কিন্তু তিনি 'জ্বামীয়া' এর পরে উচ্চারণ করেছেন 'লা'
'ইয়ুবালী' (কারো পাপের পরওয়া করবেন না)। কাজেই বুঝা যায় ওই কথাটিও এই আয়াতে ছিলো। আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি এই হাদিসকে সনাক্ত করছেন 'উত্তম' ও 'দুস্প্রাপ্য' বলে। কিন্তু 'শারহে সুন্নাহ' গ্রন্থে 'পাঠ করেছেন' স্থলে উল্লেখ করা হয়েছে 'বর্ণনা করেছেন'। সেকারণেই মনে হয় বাক্যটি 'জ্বামীয়া' শব্দেই শেষ হয়েছে। তার সঙ্গে 'তিনি কারো পাপের পরওয়া করবেন না' কথাটি আয়াতের অংশ নয়।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বনী ইসরাইলের এক লোক নিরানব্বই জনকে হত্যা করেছিলো। তারপর তার অন্তরে ক্ষমাপ্রার্থনার ইচ্ছা জাগলো। তাই সে একজন সংসারত্যাগী দরবেশের কাছে গিয়ে ক্ষমাপ্রাপ্তির বিধান জানতে চাইলো। দরবেশ সব শুনে বললো, তোমার জন্য কোনো ক্ষমা নেই। একথা শুনে সে ওই দরবেশকেও হত্যা করলো। এরপর সে লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, ক্ষমার বিধান আমি কার কাছে পাবো? একজন বললো, তুমি অমুক বসতিতে যাও। সেখানে একজন বিজ্ঞ আলেম বাস

করেন। একথা শুনে সে ওই বসতির দিকে যাত্রা করলো। পথিমধ্যেই সে মৃত্যু বরণ করলো। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সে ওই বসতির দিকে বুক উঁচু করে তুললো। পরক্ষণেই ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে। সেখানে একই সঙ্গে হাজির হলো রহমতের ও আযাবের ফেরেশতারা। তাদের মধ্যে শুরু হলো বচসা। আল্লাহ্ বসতির দিকের জমিনকে আদেশ দিলেন, তুমি তোমাকে নিকটবর্তী করো এবং বিপরীত দিকের জমিনকে বললেন, তুমি দূরবর্তী হও। ফেরেশতারা দু'দিকের দূরত্ব মাপলো। দেখলো, বসতির দিকের দূরত্ব বিপরীত দিকের দূরত্বের চেয়ে এক আঙ্গুল কম। তখন ওই ব্যক্তি ক্ষমাপ্রাপ্ত হলো। বোখারী, মুসলিম।

মুসলিম ইবনে হাজ্জাজও এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষ্য এরকম— ওই হত্যাকারীকে এক সন্ন্যাসীর ঠিকানা বলা হলো। সে খুশী হয়ে ওই সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বললো, আমি নিরানব্বই জনকে খুন করেছি। এখন তওবা করতে চাই। আমার তওবা কি কবুল হবে? সন্ন্যাসী বললো, না। একথা শুনে সে সন্ন্যাসীকেও হত্যা করলো। এভাবে তার দ্বারা নিহত হলো পুরো একশত জন। তারপর সে লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, বর্তমান পৃথিবীতে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? একজন তাকে ঠিকানা বলে দিলো এক বিজ্ঞ ব্যক্তির। সে তৎক্ষণাৎ ওই বিজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হলো। বিজ্ঞ ব্যক্তিটি সব শুনে বললেন, তুমি যদি সর্বান্তঃকরণে তওবা করতে পারো তবে তোমার ক্ষমাপ্রাপ্তি ঠেকাতে পারে কে? তুমি অমুক স্থানে যাও। দেখবে সেখানে কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন। তুমিও তাদের সঙ্গে ইবাদতে মগ্ন হয়ে যাও। নিজের বসতিতে আর ফিরে যেয়ো না। কারণ তোমার বসতিটি পাপে পরিপূর্ণ। একথা শোনার পর সে যাত্রা করলো নির্দেশিত বসতিটির দিকে। অর্ধপথ অতিক্রম করতে না করতে পেলো মৃত্যুর সাক্ষাত। তার মৃত্যুর পর সেখানে উপস্থিত হলো অনুকম্পা ও শাস্তির ফেরেশতাদের দু'টো দল। তাদের মধ্যে ওই ব্যক্তির দাবি নিয়ে দেখা দিলো মতোবিরোধ। তখন আর একজন ফেরেশতা মীমাংসাকারীরূপে উপস্থিত হলো সেখানে। বললো, ঠিক আছে তার পেছনের ও সম্মুখের পথের দূরত্ব মাপো। সে তওবার দিকে ধাবিত হচ্ছিলো। সুতরাং যদি দেখো তার সম্মুখের পথের দূরত্ব কম, তবে বুঝবে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত। আর এর বিপরীত হলে বুঝবে, ক্ষমা তার ভাগ্যে জোটেনি। তাই করা হলো। দেখা গেলো, তার সামনের দিকের অর্থাৎ ইবাদতকারীদের যে বসতির দিকে সে যাচ্ছিলো, সেদিকের দূরত্ব তার আপন বসতির দিকের দূরত্ব অপেক্ষা কিঞ্চিত কম। কাজেই অনুকম্পার ফেরেশতারা ওই ব্যক্তির রূহকে নিয়ে নিলো।

বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, এমন এক লোক ছিলো, যে জীবনে কোনো পুণ্যকর্ম করেনি। যখন সে মৃত্যুর সমীপবর্তী হলো তখন তার বাড়ির লোকজনকে ডেকে বললো, তোমরা আমার শেষ ইচ্ছাটি পূরণ

www.eelm.weebly.com

কোরো। মৃত্যুর পর আমার মরদেহকে পুড়িয়ে ফেলো। তারপর তার ছাই ভস্মগুলোর কিছু অংশ নিক্ষেপ কোরো সমুদ্রে এবং বাকী অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে

উড়িয়ে দিয়ো ডাঙায়। কেননা ওই আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি আমাকে পেলে এমন শাস্তি দিবেন, যা আর কাউকে দেননি। কিছুকাল পর ওই ব্যক্তির মৃত্যু হলো। বাড়ির লোকেরা তার অন্তিম ইচ্ছাও পূরণ করলো। তারপর আল্লাহ্ সমুদ্রকে ও মাটিকে হুকুম করলেন, তার ভস্মগুলো একত্র করো। সমুদ্র ও স্থলভাগ হুকুম পালন করলো যথারীতি। তখন ওই লোককে আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, কেনো তুমি তোমার বাড়ির লোকজনকে এমন করতে বলেছিলে? সে বললো, হে আমার প্রভুপালনকর্তা। আমি তাদের এরকম করতে বলেছিলাম তোমার ভয়ে ভীত হয়ে। তুমি তো সর্বজ্ঞ। আল্লাহ্ তখন ওই ব্যক্তিকে মাফ করে দিলেন।

বাগবী লিখেছেন, জমজম ইবনে জওশ বর্ণনা করেছেন, আমি একবার মদীনার মসজিদে প্রবেশ করে এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পেলাম। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন। সাবধান! কখনো এমন কথা বোলো না যে, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করবেন না এবং তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আমি বললাম, আপনার উপর বর্ষিত হোক আল্লাহ্‌র অজস্র করুণাধারা। দয়া করে আপনার পরিচয় বলুন। তিনি বললেন, আমি আবু হোরায়রা। আমি বললাম, রেগে গেলে তো অনেকেই বলে 'আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা না করুন'। যেমন রাগান্বিত গৃহস্বামী তার পরিবার পরিজনকে, এমন কি তার স্ত্রীকে ও পরিচারক-পরিচারিকাকে। তিনি বললেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, বনী ইসরাইলদের মধ্যে দু'জন লোক ছিলো পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। একজন পুণ্যবান এবং অপরজন পাপী। পুণ্যবান লোকটি তার পাপী বন্ধুকে প্রায়শই বলতো, এবার পাপ কর্ম থেকে বিরত হও। পাপী বন্ধু বলতো, আমি যা করি সে সম্পর্কে আমার মহান প্রভুপালক ভালো করেই জানেন। সুতরাং তুমি আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। একদিন পুণ্যবান বন্ধু তাকে একটি বড় পাপ চোখের সামনে করতে দেখে বললো, এবার ক্ষান্ত হও। জবাবে সে বললো, আমাকে আমার মতোই থাকতে দাও। তোমাকে কি আমার কাজের পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়েছে? পুণ্যবান বললো, আল্লাহ্‌র শপথ। তিনি কিছুতেই তোমাকে ক্ষমা করবেন না। তারপর একসময় দু'জনেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। আল্লাহ্ দু'জনকে একত্র করে পাপীকে বললেন, তুমি জান্নাতবাসী। আর পুণ্যবানকে বললেন, তুমি কি আমার বান্দাদের রহমতপ্রাপ্তিকে প্রতিহত করতে পারো? সে বললো, না। আল্লাহ্ বললেন, তুমি জাহান্নামী। হজরত আবু হোরায়রা তাঁর বিবরণ এভাবে শেষ করার পর বললেন, সেই আল্লাহ্‌র শপথ! যার অধিকারে আমার জীবন, ওই পুণ্যবানের একটি মাত্র অপউক্তিই তার ইহ-পরকালের ধ্বংসকে অনিবার্য করেছিলো, হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইমাম আহমদ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হজরত সাওবান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল বস্তু অপেক্ষা আমার কাছে প্রিয় এই আয়াত 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো— আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

বায়হাকীর বর্ণনায় এই হাদিসের সঙ্গে আরো যা যুক্ত হয়েছে, তা হচ্ছে— এক লোক নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আর যারা শিরিক করেছে? তিনি স. কিছুক্ষণের জন্য মস্তক অবনত করে রইলেন। তারপর তিনবার বললেন, কিন্তু যারা শিরিক করেছে এবং পৃথিবী পরিত্যাগের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শিরিকে অটল থেকেছে, তারা ক্ষমা পাবে না।

হজরত জুনদুব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, একবার এক লোক বললো, আল্লাহ্‌র কসম! অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ মাফ করবেন না। আল্লাহ্ তখন বললেন, ওই লোক কে, যে আমার শপথ করে বলে যে, অমুককে আমি ক্ষমা করবো না। আমি তো তাকে ক্ষমা করেই দিয়েছি। আর হে অপউক্তি উচ্চারণকারী! তোমার সমস্ত কর্ম আমি করে দিয়েছি নিষ্ফল।

হজরত ইবনে আব্বাস 'ইল্লাল্ লামাম' (ছোট ছোট পাপ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ 'লামাম' ক্ষমা করে দিবেন। সকল পাপই (অনুতপ্ত হলে) ক্ষমা করে দিবেন। হে আল্লাহ্! তোমার এমন কোন বান্দা আছে, যে পাপ করেনি? হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি এবং বলেছেন বর্ণনাটি উত্তম, বিশুদ্ধ ও দুষ্প্রাপ্য।

হজরত আবু জর কর্তৃক এক দীর্ঘ হাদিসে কুদসীতে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ এরশাদ করেন, আমি যা চাই, তাই করি। আমার অনুগ্রহ হচ্ছে আমার বাণী এবং শাস্তিও আমার বাণী। কোনো কিছুর অস্তিত্বদান করতে চাইলে আমি তাকে (তার অনস্তিত্বকে) কেবল বলি 'হও'। অমনি তা হয়ে যায়। আহমদ, ইবনে মাজা, তিরমিজি।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কবরবাসীরা ডুবন্ত মানুষের মতো। উদ্ধারের আশায় তারা অপেক্ষা করতে থাকে মা-বাপ-ভাই-বন্ধুদের ক্ষমাপ্রার্থনার দোয়ার। এই দোয়া তাদের নিকট পৃথিবী ও পৃথিবীর সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয় ও শ্রেয়। আর পৃথিবীবাসীদের দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে পাহাড় পরিমাণ পুণ্য দান করেন। জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতদের প্রতি উপহার হচ্ছে ক্ষমাপ্রার্থনার (মাগফিরাতের) দোয়া। বায়হাকী।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের গোনাহ্ অবশ্যই মাফ করে দেন, যদি না পর্দা পড়ে যায়। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! পর্দা কী? তিনি স. বললেন আল্লাহ্র এককত্বকে অস্বীকার করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা। আহমদ, বায়হাকী।

হজরত আবু জর আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে এমন মনোভাব নিয়ে মিলিত হবে যে, কাউকে অথবা কোনোকিছুকেই সে আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করেনি, তাহলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র রহমতের এক শত ভাগের এক ভাগ বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে মানুষ, জ্বিন ও অন্যান্য প্রাণীকুলকে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেমপ্রীতি দেখা যায় সে কারণেই। সে

কারণেই হিংস্র প্রাণীও ভালোবাসে তার শাবককে। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ রহমত তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। ওই রহমত তিনি তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের মধ্যে বণ্টন করে দিবেন শেষ বিচারের দিন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, রসুল স. এর কাছে একদিন কিছুসংখ্যক বন্দী ও বন্দিনীকে হাজির করা হলো। একজন সন্তানবতী নারী চঞ্চলা হয়ে মাঝে মাঝেই তাদের মধ্যের কোনো কোনো শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরতে লাগলো এবং পান করাতে লাগলো তার দুধ। রসুল স. তাকে দেখিয়ে আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, বলতো দেখি, ওই নারী কি তার উদরের সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারে (যখন অন্যের সন্তানের প্রতিও সে এতো মমতাময়ী)? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সে তো জীবন থাকতে তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করবে না। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চেয়ে অধিক মমতাপরবশ। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, যে ব্যক্তি তার প্রভুপালনকর্তার সামনে হাজির হওয়ার ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! যদি সে ব্যভিচার কিংবা চুরি করে? তিনি স. তখন এই আয়াত পাঠ করলেন। আমি পুনরায় বললাম, যদি সে ব্যাভিচারী ও অপহারক হয়? তিনি স. পুনরায় এই আয়াত পাঠ করলেন। আমি তৃতীয়বারেও বললাম, যদি সে ব্যভিচার ও অপহরণ করে? তিনি স. বললেন, তবুও। আবু দারদার নাসিকা ধূলিধূসরিত হলেও (সিদ্ধান্তটি তার পছন্দ না হলেও)।

হজরত আমের বলেছেন, আমরা একবার রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো চাদরাবৃত এক লোক। সে তার চাদরের এক প্রান্তে কিছু একটা জড়িয়ে ধরে রেখেছিলো। সে বললো, আমি যাচ্ছিলাম এক ঝোপের পাশ দিয়ে। পাখির ডাক শুনে আমি ঝোপের ভিতরে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম একটি পাখির বাসা। সেখানে রয়েছে একটি পক্ষীশাবক। আমি সেটিকে ধরে চাদরে জড়িয়ে নিলাম। পক্ষীমাতা তখন ঘুরতে শুরু করলো আমার মাথার উপর। আমি চাদর উন্মোচন করে পক্ষীশাবকটিকে মাটিতে রাখলাম। সঙ্গে সঙ্গে পক্ষীমাতাটি ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের দু'জনকেই আমি চাদরাবৃত করে ফেললাম। এই যে, এখনো ওদু'টো রয়েছে আমার চাদরের প্রান্তে। রসুল স. বললেন, ও দু'টোকে মাটিতে রাখো। লোকটি তাই করলো। দেখা গেলো পক্ষীমাতাটি তার শাবককে বুকে জড়িয়ে রেখেছে। তিনি স. বললেন, দেখেছো, পক্ষীমাতাটি তার ছানাটির প্রতি কতো মমতাময়ী (বাচ্চাকে ফেলে উড়ে যাচ্ছে না)। যার অধিকারে আমার প্রাণ, সেই পবিত্র সত্তার শপথ করে বলি, এই পক্ষীমাতা তার বাচ্চার প্রতি যতো দয়ালু, তার চেয়ে অনেক বেশী দয়ালু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি। এরপর তিনি স. লোকটিকে বললেন, যাও। যেখানে এদেরকে পেয়েছো, সেখানে গিয়ে রেখে এসো। আবু দাউদ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, এক যুদ্ধে আমরা রসুল স. এর সঙ্গী ছিলাম। এক স্থানে আমরা কিছুসংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। রসুল স. তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা বললো, আমরা মুসলমান। তাদের মধ্যে ছিলো এক রমণী। সে রান্নাবান্না করছিলো। তার পাশে বসেছিলো তার ছোট্টো শিশুটি। সে মাঝে মাঝেই খেলাচ্ছলে এগিয়ে যাচ্ছিলো উনুনের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে সরিয়ে নিচ্ছিলো তার মা। রসুল স. এর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই সে তার শিশুটিকে কোলে নিয়ে এগিয়ে এলো। রসুল স. এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনিই কি আল্লাহ্র রসুল? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। সে বললো, আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক আমার মাতা ও পিতা। আল্লাহ্ কি পরম দাতা ও দয়ালু নন? তিনি স. বললেন, নিশ্চয়ই। সে বললো, মা তার শিশুসন্তানের প্রতি যতোটা মেহেরবান, আল্লাহ্ কি তার বান্দাদের প্রতি তার চেয়েও অনেক বেশী মেহেরবান নন? তিনি স. বললেন, অবশ্যই। সে বললো, মা তো তার শিশুকে আগুনে ফেলে দেয় না। তার একথা শুনে রসুল স. মস্তক অবনত করলেন এবং কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে শাস্তি দিবেন কেবল তাদেরকে, যারা অবাধ্য, উদ্ধত, অহংকারী ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' কলেমা অস্বীকারকারী। ইবনে মাজা।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ বলবে এবং এই বিশ্বাস নিয়ে পৃথিবী পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে? তিনি স. বললেন, তবুও। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, যদি তার দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে ব্যভিচার ও অপহরণ? তিনি স. বললেন, তথাপিও। আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, যদি সে হয় ব্যভিচারী ও অপহারক? তিনি স. বললেন, তৎসত্ত্বেও। আবু জর তার নাক মাটিতে ঘষাঘষি করলেও। বোখারী, মুসলিম।

এ প্রসঙ্গের হাদিস রয়েছে আরো অনেক। সুতরাং এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই যে, ইমানদারদের জান্নাতগমন সুনিশ্চিত। সুতরাং মুতাজিলাদের এই বক্তব্যটি ঠিক নয় যে, কবীরা গোনাহকারীরা তওবা না করলে তাদেরকে চিরকাল দোজখে থাকতে হবে। আবার এ বিষয়ে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের ধারণাটিও অযথার্থ। তারা বলে, ইমানদারদের পাপ তাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। যেমন লাভজনক নয় কাফেরদের পুণ্যকর্ম। তারা আবার এতোক্ষণ ধরে বর্ণিত হাদিসগুলোকেই তাদের অভিমতের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু তাদের কথা মানলে কোরআনের বহুসংখ্যক আয়াত এবং অনেক হাদিসকে অস্বীকার করতে হয়।, যেগুলোতে বিভিন্ন পাপ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এবং সেগুলোর জন্য বিশেষ বিশেষ শাস্তিও নির্ধারণ করা হয়েছে। সে কারণে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ওই দুই পথভ্রষ্ট দলের মতবাদকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। বলেছে— কাফের অবস্থায় কোনো পুণ্যকর্ম ফলদায়ক নয়। কেননা কর্মে তারা পুণ্যকর্মাভিলাষী হলেও বিশ্বাসগত দিক থেকে অবাধ্য। যে সকল পুণ্যকর্ম কেবল

আল্লাহ্র সন্তোষ সাধনার্থে সম্পাদিত হয়, সেগুলোই কেবল পুণ্যার্জক ও আল্লাহ্র সন্তোষার্জনের সহায়ক। অথচ কাফেরদের তো আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসই নেই। সুতরাং তাদের আনুগত্য বাহ্যিক ও অগ্রাহ্য, বিশুদ্ধ নয়। বিশুদ্ধ আনুগত্যের শর্ত ইমান, যেমন বিশুদ্ধ নামাজের শর্ত ওজু। কিন্তু বিশ্বাসীদের পাপ এরকম নয়। কেননা মূল শর্ত ইমান তাদের আছে। এমতাবস্থায় সংঘটিত পাপের কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন, অথবা করতে পারেন ক্ষমা। সে শাস্তিও আবার হবে সাময়িক, চিরকালীন নয়। কেননা তাদের ইমানই তাদের চিরকালীন শাস্তির অন্তরায়। আবার তাদের পাপ ক্ষমা হতে পারে তওবা করার কারণে, রসুল স. শাফায়াত করার কারণে, আল্লাহ্র কোনো ওলীর সুপারিশের কারণে, অথবা কেবল নিছক আল্লাহ্র দয়ায়। আল্লাহ্ ইমানদারদের প্রতিটি সৎকর্মের পুরস্কার দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। যেমন বলেছেন— 'অতঃপর কেউ অনুপরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে'। আর ইমান হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্ম। অর্থাৎ ইমানই হচ্ছে যাবতীয় সৎকর্মের সূচনা, কেন্দ্র অথবা মূল। আল্লাহ্র অঙ্গীকারবিরুদ্ধ কিছু হওয়া অসম্ভব। আর পুণ্যবানদের প্রকৃত আবাসস্থল হচ্ছে জান্নাত। সুতরাং ইমানদারেরা জান্নাতে প্রবেশ করবেই— শাস্তিভোগ ব্যতিরেকে, অথবা সাময়িক শাস্তিভোগের মাধ্যমে পাপক্ষয়ের পর। ইমানদার ও কাফেরের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি কখনো এক নয়। ইমানদারেরা পাপী হলেও পাপকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করে। ভয়ও করে অত্যধিক। ঘটনাক্রমে তাদের দ্বারা পাপ সংঘটিত হলে তাদের মনে হয় তাদের মাথায় পাহাড় ভেঙে পড়েছে। আর কাফেরেরা পাপ করলে মনে হয়, যেনো তুচ্ছ কোনো মাছি বসেছে তাদের নাকের ডগায়। আর তারা তা উড়িয়ে দিতে পারে হাতের ইশারায়।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩

---

www.eelm.weebly.com

❑ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসিবার পূর্বে; তৎপর তোমাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।

❑ অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে উত্তম যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহার, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসিবার পূর্বে—

❑ যাহাতে কাহাকেও বলিতে না হয়, 'হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করিয়াছি তাহার জন্য আফসোস! আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।'

❑ অথবা কেহ যেন না বলে, 'আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করিলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

❑ অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেন কাহাকেও বলিতে না হয়, 'আহা, যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হইতাম!'

❑ প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি এইগুলিকে মিথ্যা বলিয়াছিলে ও অহংকার করিয়াছিলে; আর তুমি তো ছিলে কাফিরদের একজন।

❑ যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাহাদের মুখ কালো দেখিবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নহে?

❑ আল্লাহ্ মুত্তাকীদিগকে উদ্ধার করিবেন তাহাদের সাফল্যসহ; তাহাদিগকে অমঙ্গল স্পর্শ করিবে না এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

❑ আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক।

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁহারই নিকট। আর যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সুতরাং হে আমার বান্দাগণ! তোমরা অংশীবাদিতা ও অবিশ্বাস পরিত্যাগ করে প্রকৃত উপাস্য এক আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবদ্ধ করো এবং ইসলাম কবুল করার মাধ্যমে তাঁর আদেশ পালনে যত্নবান হও। তোমাদের প্রকৃত কর্তব্য এটাই। আর এ কর্তব্য তোমরা অবশ্যই বাস্তবায়ন করো তোমাদের প্রতি শাস্তি এসে পড়ার আগে। কর্তব্যে অবহেলা করতে করতে শাস্তি যদি এসেই পড়ে, তবে দেখবে তোমাদের আশেপাশে তোমাদের কোনো সুহৃদ-স্বজন অথবা কোনো সাহায্যকারী নেই।

এখানে 'আসলিমু' অর্থ আত্মসমর্পণ করো, ইসলাম গ্রহণ করো। আর এখানকার 'আ'জাব' (শাস্তি) অর্থ কবরের অথবা কিয়ামতের শাস্তি। অর্থাৎ কবরের অভ্যন্তরে অথবা কিয়ামতের দিনে শাস্তি বিজড়িত হওয়ার আগেই তোমরা কৃত পাপের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করো ও অনুগত হয়ে যাও। কেননা তখন তোমাদের সাহায্যে কেউই এগিয়ে আসবে না।

পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'অনুসরণ করো তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার, তোমাদের উপরে অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসবার পূর্বে'। একথার অর্থ— আর তোমাদের প্রভুপালনকর্তার পক্ষ থেকে যে উৎকৃষ্ট উপদেশাবলী তোমাদেরই পথপ্রদর্শনার্থে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা নিবিষ্টচিত্তে তার অনুসরণ করো। এমন যেনো না হয় যে, তোমরা সাবধান হওয়ার পূর্বেই অকস্মাৎ এসে পড়েছে শাস্তি।

www.eelm.weebly.com

‘এখানে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে’ অর্থ কোরআন মজীদ। অথবা ধর্মীয় বিধিনিষেধসমূহ। অর্থাৎ তোমরা যে কোনো সময় মৃত্যুবরণ করতে পারো, হতে পারো অতর্কিত শাস্তির সম্মুখীন, একথা মনে রেখে এই মুহূর্ত থেকে আনুগত্য করতে থাকো কোরআনের অনুশাসনের, অথবা ইসলামের নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাবলীর।

এরপরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— ‘যাতে কাকেও বলতে না হয়, হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম’। একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে কাউকে যেনো এভাবে আক্ষেপ করতে না হয় যে, হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি যথাকর্তব্য প্রতিপালনে আমি তো ছিলাম উদাসীন ও বিদ্রূপপ্রবণ।

এখানে ‘আন তাকুলা’ অর্থ এমন যেনো হয় যে কেউ বলুক। অর্থাৎ এমন কথা যেনো বলতে না হয়। ‘নাফসুন’ অর্থ কাউকে। শব্দটিতে তানভীন যুক্ত করা হয়েছে আধিক্য অথবা স্বল্পতা বোঝাতে। অর্থাৎ বিচার দিবসে কেউ কেউ এরকম বলবে।

‘হাসরত’ অর্থ আক্ষেপণ, বিলাপণ, বিলাপকারীদের বিলাপ বেড়ে যাওয়া। ‘আ’লা মা ফাররাত্বতু’ (আমি যে শৈথিল্য করেছি) কথাটির ‘মা’ ধাতুমূল। ‘ফী জামবিল্লাহ্’ অর্থ আল্লাহ্‌র আনুগত্যে, আল্লাহ্‌র বিষয়ে অথবা আল্লাহ্‌র প্রতি।

এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হাসান, মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের। কারো কারো মতে ‘জামবিল্লাহ্’ এর উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র একক সত্তা এবং এখানে কথাটির সম্বন্ধ পদ রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ কথাটির অর্থ হবে— আল্লাহ্‌র একক সত্তার আনুগত্যে অথবা আল্লাহ্‌র একক অস্তিত্বের নৈকট্য অর্জনে আমি কার্পণ্য করেছি, প্রদর্শন করেছি শৈথিল্য, ঔদাসীন্য।

‘ওয়া ইন্‌কুন্‌তু লামিনাস্ সাখিরীন’ অর্থ আমিতো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। এখানকার ‘ইন’ শব্দটির ‘নূন’ অক্ষরটি সাকিনবিশিষ্ট। এমতাবস্থায় কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— নিশ্চয় পৃথিবীতে আমি ছিলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম, তাঁর অবতারিত মহাগ্রন্থ ও তাঁর একান্ত প্রিয়ভাজন বচনবাহকের প্রতি ঠাট্টা ও বিদ্রূপ বর্ষণকারী।

এরপরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— ‘অথবা কেউ যেনো না বলে, আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমিতো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম’। একথার অর্থ— অথবা শাস্তিগ্রস্ত হয়ে কেউ যেনো এরকম বলে আক্ষেপ না করতে থাকে যে, আল্লাহ্ আমাকে সৎপথ দেখালে আমিতো পৃথিবীতে হতে পারতাম পুণ্যবানদের মতো সতর্ক জীবন যাপনকারী। রক্ষা পেতে পারতাম এখনকার এই আযাব থেকে। এখানে ‘আলমুত্তাক্বীন’ অর্থ রক্ষাপ্রাপ্ত, অংশীবাদিতা ও অন্যান্য পাপ থেকে নিরাপদ।

এরপরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে ‘অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেনো কাউকে বলতে না হয়, আহা, যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটতো, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম’।

এখানে ‘ফাআকূনা মিনাল মুহসিনীন’ অর্থ তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসী হতাম।

এরপরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— ‘প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিলো, কিন্তু তুমি এগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে ও অহংকার করেছিলে, আর তুমিতো ছিলে কাফেরদের একজন’। এই আয়াতের দ্বারা ৫৭ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত ‘আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাক্বীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম’ কথাটিকে খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা ওই আয়াতে ‘হেদায়েত’ এর অর্থ যদি হয় পথপ্রদর্শন, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ অনুসারে বলতে হয়, পথপ্রদর্শন তো আল্লাহ্ করেছেনই। পথের নিদর্শনরূপে প্রেরণ করেছেন তাঁর কিতাব ও রসুল। কিন্তু তোমরা পথের সেই নিদর্শনদ্বয়কে অহমিকা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছো। এভাবে হয়ে গিয়েছো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের একজন। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আবার পূর্বোক্ত বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে— আমাদের কাছে কোনো রসুল তো কিতাব নিয়ে আসেনি। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে, মহাবিচারের দিবসে হজরত নুহকে ডেকে আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে আমার বার্তা পৌঁছে দিয়েছো? তিনি বলবেন, হ্যাঁ।

তখন আল্লাহ্ তাঁর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের কাছে কি আমার বার্তা পৌঁছানো হয়নি? তারা বলবে, না। আর ‘হেদায়েত’ অর্থ যদি হয় হেদায়েত রচনা করা, তাহলে ‘আল্লাহ্ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে’ কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— আমিতো ছিলাম দুর্বল ও অসহায়। আল্লাহ্ আমাকে হেদায়েত গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেননি। হৃদয়কে দান করেননি ইমান ও আনুগত্যকে আশ্রয় করবার যথোপযুক্ত সামর্থ্য। এমতো বক্তব্যকেও নাকচ করে দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে। যেনো বলা হয়েছে— না, প্রকৃত ঘটনা তা নয়। আমিতো বিষয়টিকে করে দিয়েছিলাম তোমার অভিপ্রায়নির্ভর। তুমি চাইলে হেদায়েত গ্রহণ করবে, অথবা করবে না। কিন্তু হেদায়েত গ্রহণের ইচ্ছা তোমার আদৌ ছিলো না। তাইতো তুমি আমার কিতাব ও রসুলকে অবমাননা করেছিলে। দর্পিত প্রত্যাখ্যানের পথ ধরে হয়ে গিয়েছিলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের একজন।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস হচ্ছে বান্দার অভিপ্রায়ের উপরেও আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ের প্রভাব ও অধিকার ক্রিয়াশীল। তৎসত্ত্বেও আলোচ্য আয়াত তাঁদের এমতো অভিমতের প্রতিকূল নয়।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! যারা 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করছেন' 'ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা' ইত্যাদি বলে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়, আপনি মহাবিচারের দিবসে তাদেরকে দেখতে পাবেন কৃষ্ণমুখবিশিষ্ট অবস্থায়। এবার আপনিই বলুন, যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও অহংকারী, তাদের ঠিকানা কি জাহান্নাম নয়? শেষোক্ত প্রশ্নটি স্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— অবশ্যই উদ্ধত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আসল ঠিকানা জাহান্নাম।

এরপরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদেরকে উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ; তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না'। এখানে 'মাফাযাহ্' অর্থ সাফল্য, সুখ। কেউ কেউ শব্দটির অর্থ করেছেন পরিত্রাণ। কেননা পরকালে পরিত্রাণপ্রাপ্তিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাফল্য। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য সৌভাগ্য ও সৎকর্ম। বলা বাহুল্য, উভয়টিই সাফল্য লাভের কারণ।

এরপরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সমস্তকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্তকিছুর কর্মবিধায়ক'। এখানে 'আল্লাহ্ সমস্তকিছুর স্রষ্টা' অর্থ এই বিশ্বের অনুকূল-প্রতিকূল সকলকিছুরই তিনি একক স্রষ্টা। যেমন ভালো-মন্দ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস। সৃজন সম্পূর্ণতই তাঁর। আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে ৪২ সংখ্যক আয়াতের 'আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের.........' এর সঙ্গে। মধ্যবর্তী বক্তব্যগুলি ভিন্ন প্রসঙ্গের।

'ওয়াকিল' অর্থ কর্মবিধায়ক, সংরক্ষক। অর্থাৎ সকলে ও সকলকিছুই তাঁর অভিপ্রায়ানুগামী ও বিধানানুগত।

এরপরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁরই নিকট। আর যারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত'।

এখানে 'মাক্বালীদু' অর্থ কুঞ্জিকা, চাবির গুচ্ছ। শব্দটি 'মিক্বলাদ' অথবা 'মাক্বলীদ' এর বহুবচন। যেমন 'মিফ্তাহুন' এর বহুবচন 'মাফাতীহু' এবং 'মানাদীলু' বহুবচন 'মিনদীলুন্' এর। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'মাক্বালীদ' এর অর্থ জীবনোপকরণ ও অনুগ্রহ (রিজিক ও রহমত)। কালাবী বলেছেন, 'মাক্বালীদুস্ সামাওয়াতি' অর্থ বর্ষণজনিত সম্পদ এবং 'মাক্বালীদুল আরদ্ব' অর্থ খাদ্যদ্রব্যের ভাণ্ডার। হজরত ওসমান বর্ণনা করেছেন, আমরা একবার রসুল স. এর কাছে 'মাক্বালীদ' এর অর্থ জানতে চাইলাম। তিনি বলেন, এর অর্থ— 'লা ইলাহা ইল্লা হুয়া ওয়াল্লহু আকবর ওয়া সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী ওয়া আস্তাগ্ফিরুল্লহা ওয়া লাহাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখিরু ওয়াজ্ জহিরু ওয়ালবাতিন বিইয়াদিহিল খইর ইয়ুহ্ই ওয়া ইয়ুমিতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন্ ক্বদীর।

হজরত ইবনে ওমর থেকে আবু ইয়ালা, ইবনে আবী হাতেম, উকাইলি, তিবরানী ও বায়হাকী যথাক্রমে তাঁদের মসনদ, তাফসীর, আদ্দুয়াফা, আদ্ দুয়া ও আল আস্মা ওয়াস্ সিফাত্ গ্রন্থে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইবনে জাওজী উল্লেখ করেছেন তাঁর মওজুয়াত গ্রন্থে।

জ্ঞাতব্য ঃ হজরত আবু হোরায়রা থেকেও হজরত ওসমান কর্তৃক বিবৃত হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাগুলো ঃ যে ব্যক্তি এই দোয়া সকাল-সন্ধ্যায় দশবার করে পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাকে দান করবেন ছয়টি বিষয়— ১. ইবলিস ও তার সাঙ্গপাঙ্গ থেকে তাকে রক্ষা করবেন ২. জান্নাতাভ্যন্তরে তাকে অঢেল পুরস্কার দানে ধন্য করবেন ৩. জান্নাতে স্ত্রী হিসেবে দান করবেন আয়তঅক্ষিণী কুমারী হুরীদের ৪. সে পরকালে থাকবে নবী ইব্রাহিমের সঙ্গে এবং ৬. মৃত্যুর সময় বারোজন ফেরেশতা এসে তাকে সুসংবাদ দিবে এবং পুনরুত্থান দিবসে তারা তাকে সসম্মানে কবর থেকে নিয়ে যাবে বিচারস্থলে এবং বলবে, তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। তুমি যে শান্তির সঙ্গে থাকবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরপর আল্লাহ্ তার হিসাব নিবেন সহজভাবে। তারপর হুকুম দিবেন জান্নাত গমনের। ফেরেশতারা তখন তাকে বিচারস্থল থেকে জান্নাতে এমন সম্মানের সঙ্গে নিয়ে যাবে, যেমন সম্মানের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় বরযাত্রীসহ বরকে।

আমি বলি, এখানে যে শব্দ দ্বারা আল্লাহ্র গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে চাবির গুচ্ছ (মাক্বালীদ)। অর্থাৎ যে সত্তা ওই গুণের সঙ্গে প্রশংসিত, তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল ধনভাণ্ডারের মালিক। ওই অপরিমেয় সম্পদরাজির

সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর এবং সেসকল কিছু ব্যয় করার বিষয়টি সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায়নির্ভর। যে ব্যক্তি একথা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্র এই গুণের আলোচনা করে, তার জন্যই উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর সকল সম্পদের দুয়ার।

'ওয়াললাজিনা কাফারু বি আয়াতিল্লাহি উলায়িকা হুমুল খসিরূন' অর্থ আর যারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। এখানে 'আয়াতিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র এককত্ব ও মহিমা-মহত্বপ্রকাশক বাণীসম্ভার। অথবা মহামর্যাদাসম্পন্ন কোরআন। কিংবা তাঁর অক্ষয় প্রতাপ ও পরাক্রমের নিদর্শনরাজি।

www.eelm.weebly.com

'হুমুল খসিরূন' অর্থ তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। এখানে 'ক্ষতি'কে বিশেষভাবে কাফেরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার কারণ এই যে, প্রকৃত অর্থেই ক্ষতিগ্রস্ত তারা। অন্যেরা তো আল্লাহ্‌র অনুকম্পা কিছু না কিছু পাবেই। পৃথিবীতে তাদের প্রাপ্তি কম হলেও ক্ষতি নেই। পরবর্তী পৃথিবীতে তারা এমন নেয়ামতরাজির অধিকারী হবে, যা কোনো কান শোনেনি, কোনো চোখ দেখেনি এবং যা কল্পনা করতে পারে না কোনো হৃদয়। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এই পৃথিবীর সম্পদের অংশ পায়, কিন্তু কৃতজ্ঞতার অংশ তারা পায় না। ফলে পরকালে করুণার অংশও তাদের ভাগ্যে জুটবে না। ফলে পৃথিবীর সম্পদ তখন তাদের কাছে মনে হবে বিশাল বোঝা। এরকমও হতে পারে যে, এই আয়াতের সংযোগ রয়েছে ৬১ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে, যেখানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ'। মধ্যবর্তী বক্তব্য ভিন্ন প্রসঙ্গের। অর্থাৎ ওই আয়াত এবং এই আয়াতের মিলিতার্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রকাশ্য গোপন সকলকিছু সম্পর্কে সতত জ্ঞাত। তাঁর ওই অনাদি ও অনন্ত জ্ঞানের নিরীখেই তিনি প্রত্যেককে দিবেন তাদের কর্মকাণ্ডের যথোপযুক্ত প্রতিফল। ফলে মুত্তাক্বীরা হবে মহা সাফল্যাধিকারী এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হবে চিরক্ষতিগ্রস্ত। আর 'আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদেরকে উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ' এই উক্তিটি একথাই প্রমাণ করে যে, তাদের এমতো সাফল্য লাভ সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র কল্যাণনির্ভর। পক্ষান্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতির কথা বলা হয়েছে ভিন্ন ভঙ্গিতে। বলা হয়েছে 'যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত'। এতে করে একথাই প্রমাণ করা হয়েছে যে, তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ তাদের কর্মদোষ— সত্যপ্রত্যাখ্যান, অংশীবাদিতা, অহংকার ইত্যাদি। এভাবে পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকারকে করা হয়েছে সুস্পষ্ট এবং শাস্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতিকে করা হয়েছে কিছুটা পরোক্ষ।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, কুরায়েশরা রসুল স.কে এতো অধিক ধনসম্পদ দিতে চেয়েছিলো যে, তিনি ওই ধনসম্পদ নিতে চাইলে হতে পারতেন মক্কার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদপতি। সেই সঙ্গে তারা একথাও বলেছিলো যে, যে নারীকে তিনি পছন্দ

করবেন, তাকেই করে দেওয়া হবে তাঁর পত্নী। কিন্তু তাদের শর্ত ছিলো, তিনি তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর নিন্দা করতে পারবেন না। তারা আরো বলেছিলো, মোহাম্মদ! এই শর্ত যদি তুমি মানতে না চাও, তবে এরকম করো— একবছর তুমি ও আমরা সকলে পূজা করবো প্রতিমার। পরের বছর আবার সবাই মিলে ইবাদত করবো আল্লাহ্‌র। এভাবে পালাক্রমে আমরা সম্মান জানাতে থাকবো উভয় ধর্মাদর্শকে। রসুল স. তাদের কথা শুনে বললেন, এ ব্যাপারে আমি এখন কোনো মন্তব্য করবো না। দেখি আমার প্রভুপালনকর্তা আমাকে কীরূপ প্রত্যাদেশ করেন। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় সুরা কাফিরূন এবং পরবর্তী আয়াতগুচ্ছ।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৬৪, ৬৫, ৬৬

❑ বল, 'হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করিতে বলিতেছ?'

❑ তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হইয়াছে, 'তুমি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করিলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হইবে এবং অবশ্য তুমি হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।

❑ 'অতএব তুমি আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি তাদের অপপ্রস্তাবের জবাব দিন এভাবে— বলুন, হে মূর্খের দল! তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে ধ্বংস হয়েছো, আবার আমাকেও জানাচ্ছো আহ্বান সেই ধ্বংসের দিকে?

হাসান বসরী সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, মূর্তিপূজকেরা রসুল স.কে বলেছিলো, মোহাম্মদ! তুমি তোমার বাপদাদাদের পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করছো। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত থেকে ৬৬ সংখ্যক আয়াতের 'শাকেরীন' পর্যন্ত। মুকাতিল সূত্রে বাগবী লিখেছেন, মক্কার মুশরিকেরা রসুল স.কে তাদের বাপদাদাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়েছিলো। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

এখানে 'আফা গইরা' এর 'হামযা' প্রশ্নটিকে করেছে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক এবং এখানে 'ফা' এর যোজ্য রয়েছে উহ্য। এরপরের 'গইরা' হচ্ছে 'আ'বুদ' এর

www.eelm.weebly.com

কর্মপদ। এরপরের 'তা'মুরুন্নী' ভিন্ন প্রসঙ্গের। আর অস্বীকৃতি প্রজ্ঞাপিত হয়েছে 'গইরুল্লহ্' সম্পর্কে। সেজন্য একে আনা হয়েছে ক্রিয়ার পূর্বে। অর্থাৎ গুরুত্বপ্রকাশার্থে এখানে কর্মপদকে উল্লেখ করা হয়েছে ক্রিয়ার আগে। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— কী, আমি মূর্তিপূজা করবো? আল্লাহ্কে ছেড়ে উপাসনা করবো অন্যের? তোমরা কি তাহলে এরকম মূর্খজনোচিত পরামর্শও দিতে চাও?

পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে, তুমি আল্লাহ্র শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্য তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার প্রতি যেমন অংশীবাদ নিষিদ্ধ হওয়ার প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতিও তেমনই প্রত্যাদেশ করা হয়েছিলো। অতএব আপনি এই বলে মানুষকে সতর্ক করতে থাকুন যে, হে জনমণ্ডলী! তোমরা যদি আল্লাহ্র অংশীদার নির্ধারণ করো, তবে তোমাদের কর্মতো নিষ্ফল হবেই, তদুপরি তোমরা হবে চিরদিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত।

উল্লেখ্য, এই বাণীর ভিত্তি উপমানের উপর। এর দ্বারা যুগপৎ সতর্ক ও নিরাশ করা হয়েছে বিশ্বাসীগণ ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। এই আয়াতের আলোকে তাই আমরা বলি, কোনো মুসলমান ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে গেলে, তার অতীতের সকল পুণ্যকর্ম নিষ্ফল করে দেওয়া হয়। ইসলাম গ্রহণ করলে যেমন ইসলামপূর্ব জীবনের সকল পাপ মুছে যায়, তেমনি ইসলাম ত্যাগ করলে নিষ্ফল হয়ে যায় পূর্ববর্তী ইসলামী জীবনের সকল পুণ্য।

যদি কোনো ব্যক্তি ধর্মত্যাগী হওয়ার পর পুনরায় মুসলমান হয়ে যায় এবং তখনো যদি সেই ওয়াক্তের নামাজের সময় অবশিষ্ট থাকে, তবে তাকে পুনরায় ওই ওয়াক্তের নামাজ পড়ে নিতে হবে। মধ্যবর্তী ধর্মত্যাগ তার আগের নামাজকে বাতিল করে দিবে, যদি সে তা ধর্মত্যাগপূর্ব সময়ে পাঠ করে থাকে। এভাবে যদি সে আগে হজ্ব করে থাকে, তারপর ধর্মত্যাগ করে, তারপর মুসলমান হয়ে যায়, তবে তাকে ফরজ হজ্ব আবার সম্পাদন করতে হবে। ইমাম ইবনে হুম্মাম এরকমই বলেছেন।

বায়যাবী লিখেছেন, অতীতের পুণ্যকর্ম নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘোষণা সম্ভবতঃ নবীগণের জন্য নির্দিষ্ট। কেননা নবীগণের অংশীবাদী হয়ে যাওয়া উম্মতের অংশীবাদী হয়ে যাওয়া অপেক্ষা অধিক গর্হিত। অথবা বলা যেতে পারে, ধর্মত্যাগ করার জন্য পূর্বের আমল বরবাদ হবে তখন, যখন সে ওই অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করবে। অন্য এক আয়াতে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এভাবে— 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, তারপর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তার আমল হয়ে যাবে নিষ্ফল'।

বায়যাবীর বক্তব্যটি ভুল। ধর্মত্যাগ করার ফলে বিগত জীবনের ভালো কাজের ফল বাতিল হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু নবীগণের ক্ষেত্রে এরকম সম্ভাবনার ধারণা

একটি নিকৃষ্ট ধারণা। কেননা আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্যস্থল উম্মতগণ, নবীগণ নন। অর্থাৎ উম্মতকে সতর্ক করাই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য। নবীগণের শানে অংশীবাদিতার কথা তো কল্পনাই করা যায় না। অবশিষ্ট রইলো 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, তারপর সত্যপ্রত্যাখ্যান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তার আমল হয়ে যাবে নিষ্ফল' এই আয়াতের প্রসঙ্গ। এই আয়াত দ্বারা কিন্তু একথা প্রমাণ করা যায় না যে, ধর্মত্যাগীর মৃত্যু যদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় না হয়, তবে তার অতীতের সুকর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে না। এই আয়াতে অবশ্য সুকর্মসমূহের নিষ্ফল হওয়া সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এরকম শর্তের উপস্থিতি নেই। সুতরাং যা শর্তের আওতা বহির্ভূত, তাকে শর্তভূত করা যায় না। শর্তহীনতার ব্যাপকতা তো তার নিজস্ব নিয়মেই বহমান।

এরপরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'অতএব তুমি আল্লাহ্রই ইবাদত করো এবং কৃতজ্ঞ হও'। একথার দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে কুরায়েশ গোত্রপতিদের অপপ্রস্তাবকে। বলা হয়েছে 'বালিল্লাহা ফা'বুদ্' (অতএব তুমি আল্লাহ্রই ইবাদত করো)। এখানে 'আল্লাহ্' শব্দটি 'ফা'বুদ্' এর পূর্বে ব্যবহার করা হয়েছে সীমাবদ্ধতা বুঝানোর জন্য।

'ওয়া কুম মিনাশ্ শাকিরীন" অর্থ এবং কৃতজ্ঞ হও। অর্থাৎ আল্লাহ্ যে সকল অনুগ্রহ দ্বারা তোমাকে সম্মানিত করেছেন, তার জন্য আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে প্রকাশ করো অকুণ্ঠচিত্ত প্রশংসা।

হজরত ইবনে মাসউদ সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, একবার এক ইহুদী রসুল স. এর কাছ দিয়ে যেতে যেতে বললো, হে আবুল কাসেম! আল্লাহ্ তো একসময় আকাশ-পৃথিবী-সমুদ্র-পাহাড় ইত্যাদিকে তাঁর একটি আঙ্গুলের উপরে রাখবেন। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তার একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত। বলা হয়—

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০

❑ উহারা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকিবে তাঁহার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকিবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁহার দক্ষিণ হস্তে। পবিত্র ও মহান তিনি, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।
❑ এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, ফলে যাহাদিগকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তাহারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হইয়া পড়িবে। অতঃপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তৎক্ষণাৎ উহারা দণ্ডায়মান হইয়া তাকাইতে থাকিবে।
❑ বিশ্ব উহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবে, আমলনামা পেশ করা হইবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষিগণকে উপস্থিত করা হইবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হইবে ও তাহাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।
❑ প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হইবে। উহারা যাহা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আর এই সকল লোক আল্লাহ্ যেমন অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অধিকারী, সেরকম যথোপযুক্ত ধারণা রাখে না। তারা আল্লাহ্‌র অংশীদার বানায়, বিশ্বাস করে না যে তিনি সত্তাগত, গুণগত, কার্যকলাপগত সকল বিষয়েই আনুরূপ্যবিহীন। ফলে তারা তেমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না, যেমন ইবাদত পাওয়ার তিনি অধিকারী, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না তাঁর দানের, যেমন কৃতজ্ঞ হওয়া ছিলো অত্যাবশ্যক। পুনরুত্থান পর্বের কথাও তারা প্রকারান্তরে অস্বীকার করে। হে আমার রসুল! তাহলে শুনুন, আল্লাহ্ মহাপ্রলয়কালে সমস্ত পৃথিবীকে রাখবেন তাঁর আনুরূপ্যবিহীন হাতের আওতায়, আর আকাশমণ্ডলীকে ভাঁজ করা অবস্থ্য়ায় রাখবেন তাঁর আনুরূপ্যহীন দক্ষিণ হস্তে। তিনি যে অতুলনীয়রূপে পবিত্র ও মহান। তাঁকে তুলনীয় কিছু ভেবে যারা তাঁর অংশীদার বানায়, তিনি তো তাদের সকল অপধারণার অতি ঊর্ধ্বে।

এখানে 'ওয়াল আরদ্বু জ্বামীয়া' অর্থ সমস্ত পৃথিবী। অর্থাৎ পৃথিবীর সাত স্তরসহ পৃথিবী-সংশ্লিষ্ট সকলকিছু।

'ক্ববদ্বতুহু' অর্থ কবজায়, আয়ত্তে, মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় (ধাতুমূল কর্মপদী শব্দরূপ অর্থে)। অথবা এখানে সম্বন্ধপদ রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ কথাটি দাঁড়ায়— তাঁর হাতের মুষ্টিতে বা তাঁর আওতাধীনে।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, এটা এমন এক আয়াত যার প্রকৃত মর্ম জানেন কেবল আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তিত্ব, যারা জ্ঞানে সুগভীর (ওলামায়ে রসিখীন)। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র অতুলনীয় মর্যাদা ও অপরিমেয় শক্তিমত্তা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রদান। আর একথাটিও জানিয়ে দেওয়া যে, এই বিশাল কর্মকাণ্ড মানুষের কল্পনার অতীত হলেও আল্লাহ্‌র জন্য তা অতি সহজ। কোনোকিছুই তাঁর অভিপ্রায় ও ক্ষমতাবহির্ভূত নয়। আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ভাঁজ করা, চূর্ণবিচূর্ণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন কিছুও নয়। অলংকার শাস্ত্রজ্ঞরা বলেন, এই বাণী উপমা ও কল্পনামূলক। অর্থাৎ এর প্রকৃত অথবা অপ্রকৃত কোনো অর্থ নেই। যেমন আরববাসীরা বলেন 'রাতের কেশরাশি শাদা হয়েছে'।

এই আয়াত দৃষ্টে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, ওই ইহুদী আলেম আসমান-জমিন-পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে যা বলেছিলো, তা ছিলো তওরাতের ভাষ্য। এই আয়াত দ্বারা তা প্রত্যয়িতও হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হয়, আসমানী কিতাবসমূহ একে অপরের

www.eelm.weebly.com

প্রত্যয়নকারী, পরস্পরবিরুদ্ধ নয়। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় হজরত ইবনে মাসউদের এই হাদিসটি এসেছে এভাবে— একবার এক ইহুদী রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ আকাশসমূহকে এক আঙ্গুলে, পৃথিবীকে এক আঙ্গুলে, পানি ও ভূগর্ভস্থ পানির স্তরকে এক আঙ্গুলে এবং অন্য সকল সৃষ্ট বস্তুকে এক আঙ্গুলে রাখবেন। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গুলে বর্ণিত বস্তুসমূহকে তিনি নাড়াচাড়া করবেন এবং বলবেন, আমিই প্রকৃত বাদশাহ্। আমিই আল্লাহ্। রসুলেপাক স. তার কথা শুনে মৃদু হাসলেন এবং পাঠ করলেন 'তারা আল্লাহ্র যথোচিত সম্মান করে না ......'। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত তিরমিজি, মুসলিম ও বোখারীর বিবরণে দৃশ্যত বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, ওই ইহুদী আলেমের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আর বোখারী-মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, ইহুদীর বক্তব্য শুনে রসুল স. এই আয়াত পাঠ করেন। এমতো বৈসাদৃশ্য নিরসনার্থে বলা যেতে পারে যে, ওই ইহুদীর বক্তব্যের পর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারপর তিনি স. ওই ইহুদীকে সদ্য অবতীর্ণ আয়াত পাঠ করে শোনান।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পৃথিবীকে হাতের মুঠায় নিয়ে নিবেন এবং আকাশকে ডান হাতে নিয়ে বলবেন, আজ আমি মহাসম্রাট। পৃথিবীর সম্রাটেরা আজ কোথায়?

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাপ্রলয়কালে আল্লাহ্ আকাশসমূহকে তাঁর ডান হাতে ধরে বলবেন, কোথায় আছে সব ক্ষমতাবান ও শক্তিধরেরা, কোথায় আছে অহংকারীরা। তারপর পৃথিবীকে বাম হাতে (অন্য বর্ণনায় অপর হাতে) নিয়ে বলবেন, আজ আমিই একমাত্র বাদশাহ্। কোথায় আছে ক্ষমতাশালীরা! কোথায় আছে অহংকারীরা! হজরত ইবনে ওমর থেকে আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যেদিন

মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে, সেদিন আল্লাহ্ পৃথিবীর সপ্তস্তর ও আকাশসমূহকে মুষ্টিবদ্ধ করে বলবেন, আমিই আল্লাহ্। আমি দয়ালু। আমি রাজাধিরাজ। আমি সকল অপবাদ থেকে মুক্ত, পবিত্র। আমি শান্তিদাতা, আমি সংরক্ষক। আমি মহাপ্রতাপশালী। আমি সর্বশক্তিধর। আমি মহান। আমিই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছি প্রারম্ভে, যখন তার অস্তিত্বই ছিলো না। আমিই আবার এর পুনরাবৃত্তি ঘটাবো (দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করবো) আজ রাজ-রাজড়ারা সব কোথায়? কোথায় বিশাল ক্ষমতাদর্পীরা?

কাযী আয়াজ বলেছেন, 'কব্জ', 'ত্বই' ও 'আখজ' এই শব্দত্রয়ের অর্থ একত্রিত করা। যখন আকাশ আছে বিস্তৃত হয়ে এবং জমিন আছে বিছানো অবস্থায়, তখন এ শব্দের অর্থ হবে ওঠানো, সরানো অথবা পরিবর্তন করা। কুরতুবী বলেছেন, 'ত্বই' শব্দের অর্থ ধ্বংস করে দেওয়া।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হাসান বসরী বলেছেন, ইহুদীরা প্রথমে সৃষ্টবস্তুকে গণনা করে এবং তারপর চিন্তা করে আকাশ, পৃথিবী ও ফেরেশতার সৃষ্টির বিষয়ে। যখন ওই চিন্তা থেকে অবকাশ পায়, তখন ধারণা করতে থাকে আল্লাহ্ সম্পর্কে। তাদের এমতো অপধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ইহুদীরা আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে এমন কথা বলে, যে সম্পর্কে তাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। তাদের ওই সকল অযথার্থ জ্ঞান ও অপকথনের প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, রবী ইবনে আনাস বলেছেন, যখন 'ওয়াসিয়া কুরসিয়্যুহুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কুরসির অবস্থাই যদি এরকম হয়, তবে আরশ না জানি কেমন হবে। তাঁদের এমতো বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

'সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আ'ম্মা ইউশরিকূন' অর্থ পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে। অর্থাৎ আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা বহু উর্ধ্বে। অথবা— অংশীবাদের যে সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে করা হয়, তিনি তা থেকে পবিত্র ও সমুচ্চ।

পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মুর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে'।

'ওয়া নুফিখা ফিস্ সূর' অর্থ এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। অর্থাৎ যখন উত্থিত হবে শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারধ্বনি। 'ফাসায়িক্বা মান ফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মান ফিল আরদ্ব' অর্থ ফলে মুর্ছিত হয়ে পড়বে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে। 'ইল্লা মান শাআল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্ যাদেরকে ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছায় তারা তখন মুর্ছিত হবে না, সেকথা এখানে স্পষ্ট করে বলা

হয়নি। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে সুরা নমলের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। হাসান বলেছেন, এখানে 'মান শাআল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্র একক সত্তা। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া সকলেই সেদিন হয়ে যাবে বেহুঁশ।

'ছুম্মা নুফিখা ফিহি উখ্রা' অর্থ অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। অর্থাৎ পুনরায় শিঙ্গায় ফুৎকার ধ্বনিত হবে দ্বিতীয় বারের মতো। 'ফা ইজা হুম ক্বিয়ামুঁই ইয়ানজুরূন' অর্থ তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। অর্থাৎ তখন

www.eelm.weebly.com

সকল লোক তাদের নিজ নিজ কবরে দাঁড়িয়ে যাবে এবং বিস্ময়-বিস্ফোরিত নেত্রে তাকাতে থাকবে এদিকে ওদিকে। অথবা 'ইয়ানজুরূন' অর্থ পরবর্তী নির্দেশ কী হয় তা বুঝবার জন্য তারা তখন ফ্যাল ফ্যাল চোখে চাইবে। উল্লেখ্য, প্রথম ও দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনির ব্যবধান হবে চল্লিশ বৎসর। সুরা নাজিয়ার তাফসীরে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক হাদিসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'বিশ্ব তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না'।

'ওয়া আশ্‌রাক্বতিল আরদ্বু বিনূরি রব্বিহা' অর্থ সেদিন পৃথিবী তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে। বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্ যখন তাঁর বান্দাগণের বিচার-মীমাংসা করার জন্য আবির্ভূত হবেন, তখন দৃষ্ট হবে তাঁর নূর। উন্মুক্ত আকাশে সূর্য যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনি সেদিন নিঃসন্দিগ্ধরূপে দৃষ্ট হবে আল্লাহ্‌র নূর।

হাসান বসরী ও সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'প্রভুপালকের নূর" অর্থ সুবিচার। যেমন জুলুম (অন্যায়) কে বলা হয় জুলমত (অন্ধকার)। অর্থাৎ সেদিন ন্যায়বিচারের নূর দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাগণকে দান করবেন তাদের যথাপ্রাপ্য। রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের প্রান্তরে মানুষের পুঞ্জীভূত জুলুম দাঁড়িয়ে থাকবে অন্ধকার হয়ে। হজরত ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

'ওয়া উদ্বিয়াল কিতাব্' অর্থ আমলনামা পেশ করা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের হাতে তখন দেওয়া হবে তাদের নিজ নিজ আমলনামা। হজরত আনাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমলনামাসমূহ সুরক্ষিত আছে আল্লাহ্‌র আরশের নিচে। যখন সকলকে একত্র করা হবে, তখন আল্লাহ্ প্রবাহিত করবেন এক বাতাস। ওই বাতাস আমলনামাগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে আসবে বিচারের ময়দানে এবং সেগুলোকে পৌঁছে দিবে প্রত্যেকের ডান অথবা বাম হাতে। আমলনামাগুলোর উপরে লেখা থাকবে 'আমলনামা পড়ো। তুমি নিজেই আজ তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট'। পরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আবু নাঈম এবং সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে দায়লামী বর্ণনা করেছেন, মহাবিচারের দিবসে বিশ্বাসীগণের আমলনামার শিরোনাম থাকবে 'হুসনু ছানাউন নাস্' (প্রশংসনীয় তালিকা)।

'ওয়া জ্বীআ বিন্ নাবীয়্যিনা' অর্থ এবং নবীগণকে উপস্থিত করা হবে। সুয়ূতী লিখেছেন, আলেমগণের বর্ণনানুসারে নবীগণের সামনেই গ্রহণ করা হবে সকলের হিসাব। ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, এমন কোনো দিন নেই, যেদিন রসুল স. এর সম্মুখে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর উম্মতগণকে হাজির না করা হয়। সেকারণেই তিনি স. সকল উম্মতকে চিনেন। আর চিনেন বলেই বিচার দিবসে তিনি তাদের সম্পর্কে উপস্থাপন করবেন তাঁর সাক্ষ্য।

'ওয়াশ্ শুহাদায়ি' অর্থ সাক্ষীগণকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সাক্ষীগণ' অর্থ তারা, যারা রসুল স. এর একনিষ্ঠ অনুসারী ও প্রতিনিধিরূপে পৌঁছে দেন আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ। আতা বলেছেন, এখানে 'সাক্ষীগণ' অর্থ আমললেখক ফেরেশতাগণ।

'সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না' অর্থ সেদিন যার যা প্রাপ্য, তাই দেওয়া হবে তাকে। যৎকিঞ্চিতও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো হবে না কারো পাপ অথবা পুণ্যের।

এর পরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত'।

আতা বলেছেন, 'তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত' অর্থ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। জ্ঞানাহরণে তিনি আমললেখক ফেরেশতা বা অন্য কারো মুখাপেক্ষী নন। বরং ফেরেশতাসহ সকল সৃষ্টি সর্ববিষয়ে তাঁরই মুখাপেক্ষী। সুতরাং বুঝতে হবে আমলনামার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাঁর বান্দাদের সুবিধার্থে। তাদের পুণ্যকর্ম অথবা পাপ প্রত্যক্ষ করণার্থে।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫

---

www.eelm.weebly.com

❑ কাফিরদিগকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। যখন উহারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হইবে তখন ইহার প্রবেশদ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা উহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হইতে রাসূল আসে নাই যাহারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করিত এবং এই দিনের সাক্ষাত সম্বন্ধে তোমাদিগকে সতর্ক করিত?' উহারা বলিবে, 'অবশ্যই আসিয়াছিল।' বস্তুত কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হইয়াছে।

❑ উহাদিগকে বলা হইবে, 'জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর উহাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল!'

❑ যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করিত তাহাদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। যখন তাহারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হইবে ও ইহার দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের প্রতি 'সালাম', তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।'

❑ তাহারা প্রবেশ করিয়া বলিবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে অধিকারী করিয়াছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা বসবাস করিব।' সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম!

❑ এবং তুমি ফিরিশ্‌তাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, উহারা আরশের চতুস্পার্শ্বে ঘিরিয়া উহাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে। আর তাহাদের বিচার করা হইবে ন্যায়ের সহিত। বলা হইবে, সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রাপ্য।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ওয়াসীকুল লাজীনা কাফারু ইলা জাহান্নামা যুমারা'। একথার অর্থ— ওই সময় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। 'যুমারা' অর্থ দলে দলে, অসংখ্য ভাগে ভাগ করে, এক এক দলের পশ্চাতে আরেক দলকে। অর্থাৎ তাদেরকে শ্রেণীবদ্ধ করা

www.eelm.weebly.com

হবে তারে পথভ্রষ্টতার তারতম্যানুসারে। আবু উবায়দা ও আখফাশ বলেছেন, 'যুমার' হচ্ছে 'যুমারাহ্' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ আওয়াজ। যে কোনো দলে শ্রুত হয় আওয়াজ অথবা গুঞ্জন। এই বিবেচনায় বলা হয়েছে, শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে 'যুমারাহ' থেকে। আর এখানে 'যুমার' অর্থ একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশ। এরকমও হতে পারে যে, 'যুমারাহ্' (মানুষের ছোট দল) শব্দটি এসেছে 'শাতুন যামিরাতুন' থেকে। আবার স্বল্প পশমবিশিষ্ট ছাগীকে বলা হয় 'যামিরাতুন' এবং 'রজুলুন যামিরুন' বলে সেই লোককে, যার মানবতাবোধ কম। এই বিবেচনাতেই অল্পসংখ্যক লোকের দলকে বলে 'যুমারাহ্'।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে, তখন তার প্রবেশদ্বারগুলি খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে,
তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে রসুল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের বাণী আবৃত্তি করতো এবং এই দিনের সাক্ষাত সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করতো'।

বায়যাবী এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ীর অভিমত প্রমাণার্থে বলেছেন, এই আয়াত একথাই প্রমাণ করে যে, নবী-রসুল প্রেরণ না করে কোনো সম্প্রদায়কে সত্যপ্রত্যাখ্যানের দায়ে অভিযুক্ত করা যায় না। নতুবা ফেরেশতারা জাহান্নামীদেরকে বিশেষ করে নবী-রসুলের কথা উল্লেখ করতো না।

আমি বলি, এ আয়াতে সেরকম কোনো প্রমাণ নেই। অর্থাৎ কোনো সম্প্রদায়ের নিকটে নবী-রসুল ও কিতাব না পৌঁছলেই সেই সম্প্রদায়ের জন্য সত্যপ্রত্যাখ্যান অথবা অংশীবাদিতা বৈধ হয়ে যায় না। এরকমও বলা যায় না যে, ওরকম অবস্থায় তাদেরকে শাস্তির উপযুক্ত গণ্য করা যাবে না। এখানে ফেরেশতাদের উক্তির মর্মার্থ হবে এরকম— নবী-রসুলগণ সতর্ক হওয়ার কথা বলা সত্ত্বেও তোমরা সতর্ক হওনি কেনো? অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধিবলেই তো তোমরা বুঝতে পারতে এই বিশাল সৃষ্টির স্রষ্টা কেউ একজন নিশ্চয়ই রয়েছেন। আর তিনি যে অদ্বিতীয়, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কেননা একাধিক স্রষ্টার পক্ষে এরকম সুশৃঙ্খলভাবে এই মহাবিশ্ব পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তার সাথে আবার তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিলো নবী-রসুলগণকে। ফলে তোমাদের অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতার সর্বশেষ অজুহাতের মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো পাকাপোক্তভাবে। বলো, তৎসত্ত্বেও তোমরা সাবধান হলে না কেনো?

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, অবশ্যই এসেছিলো। বস্তুত কাফেরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে'। একথার অর্থ— তারা জবাব দিবে, হ্যাঁ নবী-রসুল তো এসেছিলেন। আর আমরা স্বেচ্ছায় তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যানও করেছি। বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালা সত্যাপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য যে শাস্তি অবধারিত করেছেন, তা বাস্তবায়িত হলো আজ আমাদেরই উপর। আল্লাহ্র ওই বাণীও আজ কার্যকর হলো আমাদেরই উপরে, যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন, 'আমি জ্বিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করবো'।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে বলা হবে, জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ করো তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কতো নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল'।

এখানে 'ক্বীলাদ্খুলু' অর্থ তাদেরকে বলা হবে প্রবেশ কোরো। বক্তার নাম এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ এই যে, যে কথা তাদেরকে তখন বলা হবে, তা হবে খুবই ভীতিপ্রদ।

'আলমুতাকাব্বিরীন' অর্থ উদ্ধতরা। এখানে 'আলিফ লাম' হচ্ছে হরফে জিনসী বা জাতিবাচক অব্যয়। আর 'ফাবি'সা' (কতো নিকৃষ্ট)শব্দে 'ফা' অব্যয়টি হচ্ছে কারণপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যারা উদ্ধত, তাদের জন্যই এই সর্বনিকৃষ্ট আবাস, জাহান্নাম। এতে করে আর একটি বিষয়ও প্রতীয়মান হয় যে, তাদের জন্য ওই নিকৃষ্টতম আবাস নির্ধারণ করা হয়েছে কেবল সত্যের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের কারণেই।

একটি সংশয় ঃ পূর্বের আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে আল্লাহ্র শাস্তির অঙ্গীকার পরিপূরণার্থে। আর এখানে বলা হলো, তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে তাদেরই ঔদ্ধত্যের কারণে। এরকম বৈপরীত্যের কারণ তাহলে কী?

সংশয়ভঞ্জন ঃ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ঔদ্ধত্য ও পাপিষ্ঠদের পাপ তো সংঘটিত হয়ে থাকে আল্লাহ্র অঙ্গীকারের অনুকূলেই। তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্য বাস্তবায়নব্য বলেই তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সত্যের বিরুদ্ধে চরম উদ্ধত হয়ে ওঠে, হয়ে যায় আল্লাহ্, তাঁর কিতাব এবং তাঁর প্রিয়ভাজনগণের শত্রু। সুতরাং বৈপরীত্যের অবকাশ এখানে নেই।

হজরত ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর এক দীর্ঘ বিবৃতির একস্থানে বলেছেন, আল্লাহ্ যে বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে দিয়ে পৃথিবীতেই জান্নাতের অনুকূল আমল করিয়ে নেন। ওই অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে এবং জান্নাতে প্রবেশ

করে। আর তাঁর যে বান্দাকে তিনি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাকে দিয়ে করান জাহান্নামের অনুকূল কাজ। ওই অবস্থায় সে মৃতুবরণ করে এবং জাহান্নামে চলে যায়।

এর পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে'। এখানে 'ওয়াসীক্বাল লাজিনাত্ তাক্বাও রব্বাহুম' অর্থ যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো তাদেরকে। 'ইলাল জান্নাতি যুমারা' অর্থ দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। 'দলে দলে' অর্থ পুণ্যের মর্যাদানুসারে বিভিন্ন দলে অন্তর্ভূত করে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, তাদের জান্নাতযাত্রা হবে অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন। কেননা তারা তখন প্রত্যেকেই থাকবে দ্রুতগামী বাহনে সওয়ার হয়ে।

'ওয়া ফুতিহাত আব্ওয়াবুহা' অর্থ এবং এর দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হবে। কথাটি অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ তারা যখন জান্নাতের দ্বারদেশে পৌঁছবে তখন দরোজাগুলো পাবে উন্মুক্ত অবস্থায়, দরোজা খোলা পর্যন্ত তাদেরকে অপেক্ষাও করতে হবে না। বলা বাহুল্য, এরকম করা হবে তাদের সম্মানার্থে।

'সালামুন আলাইকুম' অর্থ তোমাদের প্রতি সালাম। অর্থাৎ তোমাদের প্রতি এমন শান্তি বর্ষিত হোক, যার পরে আর কোনো অপ্রীতিকর অবস্থা আসবে না।

'ত্বিবতুম' অর্থ তোমরা সুখী হও। অর্থাৎ পাপপঙ্কিলতা থেকে হও চিরমুক্ত। উল্লেখ্য, জান্নাতীরা এরকম সুখ লাভ করবে একারণে যে, হয়তো তারা শাস্তিযোগ্য কোনো কোনো পাপ করেইনি। অথবা, সেরকম কিছু করলেও আল্লাহ্ তা মার্জনা করেছেন, কিংবা শাস্তি দিয়ে তাদেরকে করেছেন পবিত্র। কাতাদা বলেছেন— তারা জাহান্নামের স্থান অতিক্রমকালে তাদেরকে থামানো হবে একটি সেতুর কাছে। সেখানে মিটিয়ে দেওয়া হবে পারস্পরিক দাবি-দাওয়া। তারপর সকলে দায়মুক্ত হয়ে পৌঁছবে জান্নাতের উন্মুক্ত দরজার সামনে। দ্বাররক্ষী ফেরেশতা রেজওয়ান তখন তাদেরকে স্বাগতম জানিয়ে বলবে 'তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ করো স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য'।

হজরত আলী বলেছেন, তাদেরকে যখন জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তারা জান্নাতের দরোজার কাছে পাবে একটি গাছ। ওই গাছের তলদেশে থাকবে দু'টি প্রবহমান ঝর্ণা। এক ঝর্ণায় গোসল করার সঙ্গে সঙ্গে বিদূরিত হবে তাদের বাহ্যিক আবিলতা এবং অপরটিতে গোসল করলে মুক্ত হবে অভ্যন্তরীণ কলুষতা থেকে। এভাবে পরিপূর্ণ পবিত্রতাসহ যখন তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন ফেরেশতারা বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি সম্ভাষণ, তোমরা আনন্দিত হও এবং চিরদিনের জন্য প্রবেশ করো চিরসুখময় বেহেশতে। জুজায বলেছেন, এখানে 'ত্বিব্তুম' অর্থ তোমরা পৃথিবীতে পবিত্র ছিলে অংশীবাদিতা ও অবাধ্যতার পাপ-পঙ্কিলতা থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ— তোমাদের এই আবাসস্থল পবিত্র।

'ফাদ্খুলূহা' অর্থ প্রবেশ করো। এখানকার 'ফা' অক্ষরটি নৈমিত্তিক অব্যয়, যা থেকে এ বিষয়টিই প্রতীয়মান হয় যে, তাদের পবিত্র হওয়াটাই জান্নাতে প্রবেশ করার এবং সেখানে চিরকাল বসবাস করার কারণ। যেমন দোজখবাসীদের দোজখে প্রবেশের কারণ ঠিক এর বিপরীত। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনানুযায়ী তাই এর মর্মার্থ হবে— যেহেতু বেহেশত পবিত্র স্থান, তাই পবিত্র মানুষেরাই সেখানে বসবাস করার উপযুক্ত। আর 'খলিদীন' অর্থ স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় তার সামগ্রীর জোড়া (একই রকমের দু'টি জিনিস) দান করবে, তবে জান্নাতের দরোজা থেকে স্বাগতম জানানো হবে। জান্নাতের দরোজা রয়েছে অনেক। নামাজীকে আহ্বান জানানো হবে নামাজের দরোজা থেকে, রোজাদারকে

রোজার দরোজা থেকে, দানশীলদেরকে দানের দরোজা এবং মুজাহিদদেরকে জেহাদের দরোজা থেকে। হজরত আবু বকর তখন বললেন, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! এমন ব্যক্তি কি হবে, যাকে আহ্বান জানানো হবে সকল দরোজা থেকে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আমি আশা করি তুমিও হবে তাদের একজন।

এরপরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'তারা প্রবেশ করে বলবে, প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির, আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো'।

এখানে 'সাদাক্বনা ওয়াদাহু' অর্থ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং এমন নেয়ামত দান করেছেন, যা দৃষ্টিনন্দন ও পরিতৃপ্তিপ্রদায়ক।

'ওয়া আওরাছানাল আরদ্ব' অর্থ এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির। অর্থাৎ করেছেন এই ভূমির ওয়ারিশ, উত্তরাধিকারী বা স্বত্বাধিকারী।

'নাতাবাওওয়াউ মিনাল জান্নাতি হাইছু নাশাউ' অর্থ আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের অংশে যেহেতু জান্নাতের সুবিস্তীর্ণ ভূমি দেওয়া হয়েছে, তখন আমরা এই বিশাল এলাকার যে কোনো স্থানে

www.eelm.weebly.com

ইচ্ছামতো বসবাস করতে পারবো। ইচ্ছামতো গিয়ে দেখা সাক্ষাত করতে পারবো নবী, ওলী এবং অন্যান্য উচ্চ মর্যাদাধারী জান্নাতীদের সঙ্গেও। জননী আয়েশা থেকে তিবরানী, আবু নাঈম ও জিয়া বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আমার কাছে আমার জীবন, পরিবার-পরিজন ও অন্যান্য আপনজন অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আমি স্বগৃহে অবস্থানের সময়ও আপনার মহান সাহচর্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকি। আপনার দর্শন লাভ না করা পর্যন্ত শান্তি পাই না। আমার মৃত্যু ও আপনার মহাপ্রয়ানের কথা মনে হলেও আমি অস্থির হয়ে যাই। মনে হয় আমি জান্নাতে যেতে পারলেও হয়তো আপনার দেখা আর পাবো না। তখন আপনি তো থাকবেন উন্নততম জান্নাতে। রসুল স. তার কথার জবাব দিলেন না, যতোক্ষণ না অবতীর্ণ হলো এই আয়াত 'আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে, তারা থাকবে সেই সকল নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও পুণ্যত্মাগণের সঙ্গে, যাদেরকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কার দানে ধন্য করবেন। তারা সকলেই হবে উত্তম সঙ্গী'।

এরপর বলা হয়েছে— 'সদাচারীদের পুরস্কার কতো উত্তম'। একথার অর্থ— যারা ভালো কাজ করবে, তাদের জন্য রয়েছে কতোই না উত্তম প্রতিদান'।

শেষোক্ত আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— 'এবং তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুস্পার্শ্ব ঘিরে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি ওই সময় আরো দেখতে পাবেন, আরশকে বৃত্তাকারে ঘিরে তখন আরশের ফেরেশতারা মুহুর্মুহু ঘোষণা করছে তাদের প্রভুপালনকর্তার প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা।

এখানে 'হাফ্ফীনা' অর্থ চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘিরে। 'ইউসাব্বিহুনা বিহাম্দি রব্বিহিম' অর্থ তাদের প্রভুপালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা। উল্লেখ্য, ফেরেশতাদের ওই আমল অত্যাবশ্যক ইবাদতমূলক হবে না। বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষিত আল্লাহ্র ওই প্রশংসা-পবিত্রতা-মহিমা হবে ফেরেশতাদের জন্য আনন্দ উৎসব।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সঙ্গে'। একথার অর্থ— তখন মানুষ ও জ্বিনদের বিচার সম্পন্ন করা হবে সম্পূর্ণতই ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে। একদলকে জাহান্নাম ও আর একদলকে জান্নাত দেওয়া হবে পুরোপুরি ইনসাফের নিরীখে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, একথা বলা হবে তখন ফেরেশতাদের সম্পর্কে। তাই কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে তখন ফেরেশতাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে যথাস্থানে। যথার্থ অধিকার থেকে কাউকেও বঞ্চিত করা হবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'বলা হবে, সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রাপ্য'। একথার অর্থ— এভাবে যখন আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে, তখন জান্নাতবাসীরা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে বলে উঠবে, সকল প্রশংসা বিশ্বসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যখন আল্লাহ্ তাঁর মিত্রদেরকে জান্নাতে এবং শত্রুদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তখন ফেরেশতারা খুশীতে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বলে উঠবে, আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।

জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. প্রতি রাতে সুরা বনী ইসরাইল ও সুরা যুমার পাঠ করতেন।

আলহামদুলিল্লাহি আ'লা জালিক। সুরা যুমারের তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ পহেলা রমজান ১২০৭ হিজরী সনে।

সূরা মু'মিন

মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরার রুকু-সংখ্যা ৯ এবং আয়াত-সংখ্যা ৮৫।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, কোরআনের উপমা এরকম ঃ এক ব্যক্তি তার পরিবার পরিজন ও স্বজনদের প্রয়োজনে বিশাল জনশূন্য প্রান্তরে পানির সন্ধানে বের হলো। চলতে চলতে একস্থানে দেখলো বর্ষণসিক্ত আদ্রতার চিহ্ন। সে বিস্মিত হলো। একটু এগিয়ে যেতেই আরো আশ্চর্যান্বিত হয়ে দেখতে পেলো একটি সুদৃশ্য বাগান। মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাগানে প্রবেশ করলো সে। আপন মনে বলে উঠলো, আমি তো বর্ষণের চিহ্ন দেখেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বাগানে ঢুকে তো আরো অবাক হয়ে গেলাম। হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, বর্ষণের চিহ্ন হচ্ছে কোরআন মজীদ। আর তার মধ্যের বাগান হচ্ছে কোরআন মজীদের 'হা-মীম'সম্বলিত সুরা সমূহ। তিনি আরো বলেন,
যখন আমি 'হা-মীম' চিহ্নিত সুরাসমূহ আবৃত্তিতে মগ্ন হই, তখন মনে হয়, আমি যেনো কোনো মনোহর বাগিচায় চিত্তবিনোদনের জন্য অবকাশ যাপন করছি।

www.eelm.weebly.com

বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রতিটি বিষয়ের সারবস্তু (মগজ) থাকে। আর কোরআনের সারবস্তু হচ্ছে 'হা-মীম' শিরোনাম সম্বলিত সুরাসমূহ। বাগবী একথাও লিখেছেন যে, ইব্রাহিম বলেছেন, 'হা-মীম' হচ্ছে নববধুদের পুষ্পালংকার সদৃশ। পরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন 'হা-মীম' শিরোনামবিশিষ্ট সুরাগুচ্ছ হচ্ছে কোরআনের সৌন্দর্য।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ১, ২, ৩

❑ হা-মীম।

❑ এই কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে—

❑ যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তাওবা কবূল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'হা মীম'। এর উপক্রমণিকা বিবৃত হয়েছে ইতোপূর্বেই। সুদ্দীর বর্ণনা উল্লেখ করে বাগবী লিখেছেন, 'হা মীম' হচ্ছে আল্লাহ্‌র মহানতম নাম (ইসমে আজম)। ইকরামা বলেছেন, 'আর রহমান' হচ্ছে মিশ্র যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট শব্দ। পৃথকভাবে শব্দরূপটি এরকম— 'আর রহমান' (আলিফ লাম র হা মীম ও নূন)। সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও আতা খোরাসানী বলেছেন, 'হামীম' দ্বারা ইশারা করা হয়েছে আল্লাহ্‌র নামাবলীর দিকে। 'হা' অক্ষরটি রয়েছে আল্লাহ্‌র কয়েকটি নামের সূচনায়। যেমন— হাকীম, হামীদ, হাই ও হাইয়্যান (প্রজ্ঞাময়, উচ্চ প্রশংসিত, চিরঞ্জীব ও অবিনশ্বর)। আর 'মীম' রয়েছে তাঁর এই নামগুলোর শুরুতে— মালিক, মাজীদ, মান্নান (মহাসম্রাট, খ্যাতিমান, কল্যাণময়)।

ক্বারী কুসাই বলেছেন, 'হা মীম' এর অর্থ— অনাগতকালে যা কিছু ঘটবে, তার মীমাংসা হয়েই গিয়েছে। তাঁর বক্তব্যে সম্ভবত এমন ইঙ্গিতও রয়েছে যে, 'হামীম' 'হুম্মা'র সমঅর্থসম্পন্ন।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে (২) যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট'।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'তান্‌যীলুল কিতাব' অর্থ এই কিতাবের অবতারণ। 'মিনাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। 'আল আ'যীযুল আ'লীম' অর্থ যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। আল্লাহ্‌তায়ালা অতুলনীয়রূপে পরাক্রমশালী তো বটেই, তদুপরি সকল বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত। আর কোরআন মজীদের বিস্ময়কর ও অলৌকিক ঘটনাবলী, বিভিন্ন রহস্যের বিচিত্র উপস্থাপনা তাঁর পরাক্রম ও জ্ঞানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেকারণেই সম্ভবতঃ এখানে 'আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব' এর সঙ্গে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তাঁর এই দুই গুণ— পরাক্রম ও প্রজ্ঞা।

'গাফিরিজ্ জাম্‌বি ও ক্বাবিলিত্ তাওবি' অর্থ, যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী। 'তাবা' ও 'ইয়াতুবু' এর মূল শব্দ হচ্ছে 'তাওবুন'। কারো কারো মতে এগুলো হচ্ছে 'তাওবাতুন' এর বহুবচন। যেমন 'দা'ওমাতুন' এর বহুবচন 'দাওয়াম' এবং 'হাওমাতুন' এর বহুবচন 'হুউম'। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' কলেমায় বিশ্বাসী, তিনি তাদের পাপ ক্ষমা করেন এবং যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্' এই বাণীতে আস্থাশীল তিনি তাদেরই তওবা কবুলকারী। 'ক্ষমা' ও 'তওবা' কথা দু'টোর পরস্পরসম্পৃক্ততা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আর কোনো বিশেষ কালের সঙ্গে আল্লাহ্‌র এই গুণ দু'টো সীমাবদ্ধ নয়। বরং আল্লাহ্‌র সত্তা ও অন্যান্য গুণের মতো এই দু'টো গুণও চিরন্তন। আর এখানে গুণ দু'টো বিবৃত হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রশংসা প্রকাশার্থে।

দু'টো কথার মধ্যে আবার সন্নিবেশিত হয়েছে সংযোজক অব্যয় 'ওয়াও' (এবং)। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র ক্ষমা করা ও তওবা কবুল করার এই গুণ দু'টো পৃথক বৈশিষ্ট্যসহ সদাবিদ্যমান। অথবা বলা যেতে পারে, কিছুসংখ্যক লোক ভাবে, ক্ষমা করা ও ক্ষমাপ্রার্থনাকে গ্রহণ করা একই জিনিস। কিন্তু তাদের এমতো ধারণা অসঠিক। আর সে কারণেই এদু'টো গুণের পার্থক্য নির্ণয়ার্থে মাঝখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে 'ওয়াও' (এবং)। কিংবা বলা যেতে পারে, আল্লাহ্‌র এই গুণ দু'টোর প্রকাশ ঘটে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়। যে বিশ্বাসী তওবা করেনি এবং তওবা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করেছে, আল্লাহ্ তার জন্য 'গাফিরিজ্ জাম্‌বি' (পাপ মার্জনাকারী), অর্থাৎ আখেরাতে তার পাপের উপরে আবরণ প্রদানকারী, তার অপরাধকে সকলের দৃষ্টি থেকে লোপনকারী। 'গাফারা' এর প্রকৃত অর্থ ঢেকে দেওয়া, গোপন করা। আর যে ব্যক্তি তওবা করে (কৃত পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে), তার তওবাও তিনি কবুল করে থাকেন। উল্লেখ্য, তওবাকারীরা নিরপরাধীদের মতো। এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে মাজা, হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে হাকেম, হজরত আলী থেকে ইবনে নাজ্জার এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আসাকের ও বায়হাকী কর্তৃক।

ইয়াজিদ ইবনে আসেম বর্ণনা করেছেন, সিরিয়াবাসী এক লোক ছিলো খুবই বীরপুরুষ। খলিফা হজরত ওমর তার সাহসিকতার জন্য তাকে পছন্দ করতেন।

কিছুকাল পরে লোকটি হঠাৎ হারিয়ে গেলো। হজরত ওমর লোকজন মারফত তার খোঁজখবর নিতে লাগলেন। শেষে লোকের মাধ্যমে সংবাদ পেলেন, লোকটি মদ্যপান নিয়েই সবসময় মেতে থাকে। হজরত ওমর তখন তাঁর পত্রলেখককে বললেন, ওই লোকের নামে লেখো। শুরুতে উল্লেখ করো 'যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট'। এরপর তিনি উপস্থিত লোকজনকে নিয়ে তার জন্য এইমর্মে দোয়া করলেন যে, আল্লাহ্ যেনো তাকে তওবা করার সামর্থ্য দান করেন এবং তার তওবা কবুল করেন। ওই লোকের কাছে যখন পত্রটি পৌঁছানো হলো তখন সে তা বার বার পড়তে লাগলো এবং কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, যিনি 'পাপ ক্ষমা করেন' অর্থ তিনি আমাকে আমার পাপ ক্ষমা করার সুসংবাদ ঘোষণা করছেন, 'তওবা কবুল করেন' অর্থ তিনি আমার তওবা কবুল করার অঙ্গীকার করছেন। 'যিনি শাস্তিদানে কঠোর' অর্থ তাঁর শাস্তি সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে সতর্ক করছেন। আর 'প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট' অর্থ আমার এখন তওবা করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। শেষে সে সর্বান্তঃকরণে তওবা করলো। পাপ থেকে মুক্তিলাভ করলো চিরদিনের জন্য। হজরত ওমর এ সংবাদ পেয়ে তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে বললেন, তোমরাও তোমাদের বিপদগ্রস্ত ভ্রাতাদের সঙ্গে এরকম নম্র আচরণ কোরো এবং দোয়া কোরো, যেনো আল্লাহ্ তাকে ক্ষমাপ্রার্থনা করার সামর্থ্য দেন। তার বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী যেনো তোমরাও না হও। কাতাদা বর্ণনা করেছেন, মদীনায় বসবাস করতো এক নিবিষ্টচিত্ত ইবাদতকারী। হজরত ওমর তাকে খুব স্নেহ করতেন। ঘটনাক্রমে সে মিসরে চলে গেলো। সেখানে গিয়েই সে পড়লো শয়তানের খপ্পরে। ফলে সে কোনো খারাপ কাজ করতে পিছপা হতো না। হজরত ওমর তার এক নিকটাত্মীয়ের কাছে তার বিষয়ে জানতে চাইলেন। সে বললো, হে আমিরুল মু'মিনীন! তার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। হজরত ওমর বললেন, কেনো? সে বললো, সে এখন পৌঁছে গিয়েছে চরিত্রহীনতার চরম পর্যায়ে। তিনি তখন তার নামে একটি চিঠি লিখলেন। শুরুতে উল্লেখ করলেন খলীফা ওমরের পক্ষ থেকে অমুকের নামে। তারপর উল্লেখ করলেন এই সুরার প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়। চিঠিটি পেয়ে ওই লোক বার বার তা পাঠ করতে লাগলো। শেষে আন্তরিক তওবা করে চিরদিনের জন্য ফিরে এলো শুভপথে। ইসহাক সাবেয়ী বর্ণনা করেছেন, এক লোক হজরত ওমরের কাছে এসে বললো, হে বিশ্বাসীদের অধিনায়ক! আমি খুনী। এখন আমার পরিত্রাণের কোনো পথ কি উন্মুক্ত আছে? তিনি তখন পাঠ করলেন এই সুরার প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াত। তারপর বললেন, পুণ্যকর্ম করে যেতে থাকো। নিরাশ হয়ো না।

'শাদীদিল ই'ক্বব' অর্থ যিনি শাস্তিদানে কঠোর। অর্থাৎ যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' কলেমায় বিশ্বাসী নয়, তাকে তিনি কঠিন শাস্তি দিবেন। 'জিত্‌ত্বউলি' অর্থ শক্তিশালী। মুজাহিদ বলেছেন, 'ত্বওল' অর্থ আরাম-আয়াশ, ধনদৌলত। কাতাদা

www.eelm.weebly.com

অর্থ করেছেন— অনুগ্রহরাজি। কেউ কেউ বলেছেন, 'জিত্ত্বওলি' অর্থ ক্ষমতাবান। হাসান বলেছেন, দানশীল। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, 'যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন' এবং 'যিনি শাস্তিদানে কঠোর' এই কথাগুলো গুণবাচক নয়। এগুলো হচ্ছে অনুবর্তী। এগুলোর তিনটিতেই রয়েছে অতিরিক্ত শব্দ-সমাহার, যা কেবলই প্রশংসাসূচক নয়। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, 'জিত্ত্বওলি' কথাটিও অনুবর্তী, গুণপ্রকাশক নয়। কেননা শব্দটিকে গুণবাচক ধরা হলে এর পূর্বে অনুবর্তী না আসা জরুরী হয়ে পড়ে, যা রীতিসম্মত নয়। জমখ্শারী ও বায়যাবী লিখেছেন, এগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত 'আ'যীযিল আ'লীম' (পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ) এর বিশেষণ এবং এগুলোর মধ্যে রয়েছে অন্তর্গত সম্পর্ক এবং এ ধরনের বিশেষায়ণের মূল উদ্দেশ্য থাকে প্রশস্তি বর্ণনা। 'শাদীদিল ই'ক্বব' কথাটিকে এর অন্তর্গত সম্পর্কভূত বলে যদি ধরে নেওয়া হয়, তবে কেবল এককভাবে 'জিত্ত্বওলি'কেও অনুবর্তী মনে করা যাবে না। কেননা তাতে করে দেখা দিবে বিন্যাস-বৈষম্য। জুজায বলেছেন, 'শাদীদিল ই'ক্বব' হচ্ছে বদল, সিফাত বা গুণবাচক নয়। 'মাদারেক' প্রণেতাও এরকম বলেন। এমতাবস্থায় 'জিত্ত্বওলি'কেও অনুবর্তীই ধরতে হবে, গুণবাচক ধরা যাবে না। অর্থগত দিক থেকে অবশ্য বায়যাবীর ব্যাখ্যাই অধিকতর গ্রাহ্য। কেননা কথাগুলো হচ্ছে মূল কথার অনুগামী এবং এগুলোর মধ্যে সেসকল ভাবই প্রকাশ পেয়েছে, যা রয়েছে তাদের মূল কথায়। আর এসকল বিশেষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র প্রশংসা করা, তাঁর প্রতি উৎসাহিত করা এবং তাঁর দিকে ধাবিত করা।

'লা ইলাহা ইল্লা হুয়া' অর্থ তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য যখন নেই-ই, তখন তো কেবল তাঁর উপাসনাতেই নিবেদিত হওয়া উচিত। 'মাদারেক' প্রণেতা লিখেছেন, এই বাক্যটিও 'জিত্ত্বওলি' এর মতো আর একটি বিশেষণ। কিন্তু বাহ্যত মনে হয় এটি একটি পৃথক বাক্য।

'ইলাইহিল মাসীর' অর্থ প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকটে। অর্থাৎ তাঁর নিকটে সকলের প্রত্যাবর্তন অতিনিশ্চিত। আর ওই প্রত্যাবর্তনের সময়েই তিনি সকলের জন্য নির্ধারণ করবেন যথোপযুক্ত প্রতিফল— স্বস্তি অথবা শাস্তি।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৪, ৫, ৬

❑ কেবল কাফিররাই আল্লাহ্র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে; সুতরাং দেশে দেশে তাহাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।

❑ ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাহাদের পরে অন্যান্য দলও অস্বীকার করিয়াছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছিল এবং উহারা অসার তর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, উহা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য। ফলে আমি উহাদিগকে পাকড়াও করিলাম এবং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি!

❑ এইভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রে সত্য হইল তোমার প্রতিপালকের বাণী— ইহারা জাহান্নামী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কেবল কাফেরেরাই আল্লাহ্র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে'। এখানে 'বিতর্ক করে' অর্থ আল্লাহ্র বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তা প্রত্যাখ্যান করা, অথবা তার মধ্যে বৈপরীত্য ও প্রভেদ সৃষ্টিতে অনড় থাকা, কিংবা রহস্যাচ্ছন্ন (মুতাশাবিহাত) আয়াতসমূহের এমন জটিল ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করা, যা হয়ে যায় 'মুহকিমাত' (সুস্পষ্ট) আয়াত এবং সুবিদিত হাদিসের পরিপন্থী।

আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহের বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুল স. কিছুসংখ্যক লোককে কোরআন নিয়ে তর্কবিতর্ক করতে দেখে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা তোমাদের মতো এভাবে আল্লাহ্র কিতাবের আয়াতসমূহের দ্বান্দ্বিকতাদুষ্ট ব্যাখ্যা করতো বলেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। অথচ আল্লাহ্র কিতাবের এক আয়াত অন্য আয়াতের প্রত্যয়ক, সমর্থক, অথবা পরিপূরক। সুতরাং তোমরা কোরআনের কিছুসংখ্যক আয়াতের মাধ্যমে অন্য কিছুসংখ্যক আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কোরো না। যা জানো তা বলো, আর না জানলে শরণাপন্ন হও ধর্মতত্ত্বজ্ঞদের। বাগবী।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহ বলেছেন, রসুল স. এর দরবারে একদিন আমি উপস্থিত হলাম দ্বিপ্রহরে। তিনি স. দু'জন লোককে একটি আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে তর্কবিতর্ক করতে শুনে এগিয়ে এলেন। তাঁর পবিত্র

www.eelm.weebly.com

মুখমণ্ডলে তখন পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো রোষতপ্ততা। তিনি স. তৎসত্ত্বেও সংযত হয়ে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কিতাবে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোরআন নিয়ে ঝগড়া করার অর্থ কাফের হওয়ার নামান্তর। হাদিসটি বায়হাকী লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে তায়ালাসীও বর্ণনা করেছেন এরকম। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, কোরআন নিয়ে বিবাদ-বিভেদ করার অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হয়ে যাওয়া।

বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহ্ ইতোপূর্বে প্রমানসিদ্ধ সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়েছেন 'এই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট

থেকে'। তৎসত্ত্বেও যারা কোরআনের ব্যাখ্যা নিয়ে ঝগড়া-ফাসাদ করে এবং সত্যকে মিথ্যার মাধ্যমে হেনস্থা করতে চায়, তাদেরকে এখানে বলা হয়েছে কাফের। বায়যাবী বলেছেন, কথিত 'ঝগড়া' অর্থ ওই একদেশদর্শিতা, যা করা হয়ে থাকে বিদ্যা প্রদর্শন অথবা অন্য কোনো অসৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থে। কিন্তু কোরআনের বাণীর মর্মোদ্‌ঘাটনে দ্বীনদার আলেমগণের মধ্যে উদ্ভূত মতোবিরোধ ও বিতর্ক দূষণীয় কিছু নয়। বরং তা প্রশংসার্হ। একারণেই হাদিস শরীফে 'জিদালান' শব্দটিকে অনির্দিষ্ট বাচক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেটাকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে 'কুফর' বলে।

'ইনায়াহ্' প্রণেতা লিখেছেন, যে সকল আয়াতের বাহ্যিক বৈসাদৃশ্য নিয়ে বিতর্ক করাকে এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যান (কুফরী) বলা হয়েছে, ওই সকল আয়াত হচ্ছে ভাগ্য ইত্যাদি বিষয়ক। ইলমে কালামের (আকিদা সম্পর্কিত বিষয়ের) আলেমগণ ও বেদাতীদের মধ্যে এসকল আয়াত নিয়ে বিস্তর তর্কবিতর্ক হয়ে থাকে। কিন্তু নির্দেশনা-নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াতগুলো নিয়ে এরকম মতানৈক্য ও বিরোধ সাধারণত দৃষ্ট হয় না। মর্মোদ্‌ঘাটনে সংক্রান্ত বিতর্ক তো ছিলো সাহাবীগণের মধ্যেও। পরবর্তী যুগের আলেমগণও এমতো বিরোধ থেকে মুক্ত নন। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর বিজয়লাভ ও কৌশলে তাদেরকে কোনঠাসা করার মতো কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে তারা ভিন্নমত প্রকাশ করতেন না। ভিন্নমত প্রকাশ করতেন কোরআনের বক্তব্যের মূল তত্ত্ব উন্মোচনার্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেনো তোমাকে বিভ্রান্ত না করে'। এখানে 'তাক্বল্লুবুহুম' অর্থ অবাধ বিচরণ। অর্থাৎ আল্লাহ্ই পৃথিবীতে তাদেরকে অবাধ বিচরণের সুযোগ করে দিয়েছেন। তাইতো তারা সিরিয়ায় ও ইয়েমেনে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাদের বিত্তার্জনকে করতে পেরেছে নির্বিঘ্ন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! ওইসকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সাময়িকভাবে অবাধ চলাচল ও নির্বিঘ্ন বাণিজ্যাধিকার দিয়েছি আমিই। সুতরাং আপনি একথা ভাববেন না যে, তাদেরকে আমি ছেড়ে দিবো? সাময়িক অবকাশ শেষে তাদেরকে পাকড়াও তো আমি করবোই, যেমন পাকড়াও করেছিলাম অতীতের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

সুদ্দী ও আবু মালেকের বর্ণনানুসারে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হারেছ ইবনে কায়েস সাহামী সম্পর্কে।

পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'এদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায় এবং পরে অন্যান্য দলও অস্বীকার করেছিলো'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এখানকার মক্কার এই মুশরিকেরা যেমন আপনাকে প্রত্যাখ্যান করে চলেছে, তেমনই ইতোপূর্বে নবী নুহের অবাধ্য সম্প্রদায়ও তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। তার পরের জামানার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ও ছিলো একই স্বভাবের। তারাও তাদের নিজ নিজ নবীকে প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধাবোধ করেনি। যেমন

আদ, ছামুদ ইতাদি জনগোষ্ঠী। অতএব আপনি ব্যথিত হবেন না। কী করবেন? মানবতার প্রকৃত সুহৃদ নবীগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা যে সত্যাপ্রত্যাখ্যান-কারীদের চিরাচরিত রীতি।

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রসুলকে আবদ্ধ করবার অভিসন্ধি করেছিলো এবং ওরা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিলো, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দিবার জন্য'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তারা হত্যা বা বিনাশ করতে চেয়েছিলো তাদের নিজ নিজ পয়গম্বরগণকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, তারা তাদের নবীগণকে করতে চেয়েছিলো বন্দী। আরববাসীরা কয়েদীকে বলেন 'আখীজ' (আবদ্ধকৃত)। এভাবে 'লিইয়াখুজূ' কথাটির দ্বারা আবদ্ধ করাই বুঝায়।

'ওয়া জ্বাদালূ বিল বাত্বিল' অর্থ এবং তারা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিলো। যেমন বলেছিলো 'তুমি তো আমাদের মতো একজন মানুষ' 'তোমার কাছে ফেরেশতা আসে না কেনো' 'আমরা তোমার প্রভুপ্রতিপালককে দেখতে চাই' ইত্যাদি।

'লিইউদ্‌হিদ্বূ বিহিল হাক্ব' অর্থ তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দিবার জন্য। অর্থাৎ দুরভিসন্ধি ও অসার তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে তারা নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছিলো মহাসত্যের অগ্রযাত্রাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফলে তাদেরকে আমি পাকড়াও করলাম এবং কতো কঠোর ছিলো আমার শাস্তি'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! দেখুন তাদেরকে শেষে কতো ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে আমি বাধ্য করেছি। কঠোর শাস্তির মাধ্যমে

তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করেছি পৃথিবী থেকে, তাদের বিরাণ জনপদের ধ্বংসচিহ্ন তো মক্কার মুশরিকদের বাণিজ্যপথের পাশে এখনো পরিদৃশ্যমান। তবু কি তাদের চৈতন্যোদয় হবে না? সতর্ক হবে না কি তারা একথা ভেবে যে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে তেমনি ভয়ঙ্কর পরিণাম।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'এভাবে কাফেরদের ক্ষেত্রে সত্য হলো তোমার প্রতিপালকের বাণী— এরা জাহান্নামী'। একথার অর্থ হে আমার রসুল! ওইসকল সত্যপ্রত্যাখানকারীদের বিনাশ সাধনের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কার্যকর করা হলো আল্লাহ্‌র এই পূর্ব সিদ্ধান্ত যে— পরকালেও তারা হবে দোজখের বাসিন্দা।

এখানে 'কাজালিকা' অর্থ এভাবে। অর্থাৎ এভাবে সত্যপ্রত্যাখানকারীদেরকে ধ্বংস করা যেমন জরুরী ছিলো, সেভাবে পরকালেও তাদের জন্য অপেক্ষা করছে শাস্তি। অথবা— বিগত উম্মতদের উপরে শাস্তি যেভাবে কার্যকর করা হয়েছিলো, সেভাবে শাস্তি কার্যকর করা হবে এদের (মক্কার মুশরিকদের) উপরেও।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯

❑ যাহারা 'আর্‌শ ধারণ করিয়া আছে এবং যাহারা ইহার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া আছে, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সহিত এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যাহারা তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা কর।'

❑ 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাহাদিগকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদিগকে দিয়াছ এবং তাহাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

❑ 'এবং তুমি তাহাদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা কর। সেই দিন তুমি যাহাকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তো অনুগ্রহই করিবে; ইহাই তো মহাসাফল্য!'

আলোচ্য আয়াতত্রয়ে বিবৃত হয়েছে আরশবাহী এবং আরশকে পরিবেষ্টনকারী ফেরেশতাগণের কথা। প্রথমে বলা হয়েছে—'যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সঙ্গে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে'।

এখানে 'মান হাওলাহু' অর্থ আরশকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণরত ফেরেশতাগণ। উল্লেখ্য, আরশ বহনকারী ও আরশ প্রদক্ষিণরত ফেরেশতারা হচ্ছে ফেরেশতাদের নেতা। তাদেরকে বলা হয় নৈকট্যভাজন (মুকার্‌রবীন)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আরশ বহনকারীদের পায়ের গ্রন্থি থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত দূরত্ব পাঁচশ' বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। এক বর্ণনায় এসেছে, তাদের পা জমিনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এবং আকাশের উচ্চতা তাদের কোমর পর্যন্ত। তাদের সার্বক্ষণিক জিকির হচ্ছে 'সুবহানা যিল ইয্‌যাতি ওয়াল জ্বাবারুত সুবহানা জিল মুলকি ওয়াল মালাকুত সুবহানাল হাইয়্যিল্‌লাজী লা ইয়ামুতু - সুব্‌বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুনা ও রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ্ (পবিত্র ওই সত্তা, যিনি সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী, পবিত্র ওই সত্তা, যিনি যাবতীয় সাম্রাজ্যের মালিক, পবিত্র ওই অস্তিত্ব, যিনি চিরঞ্জীব, অমর, মহাপবিত্র, ফেরেশতা ও আত্মাসমূহের প্রভুপালক)।

মাইসারা ইবনে আদুবিয়া বলেছেন, তাদের পা রয়েছে সর্বনিম্ন ভূমিতে এবং তাদের মস্তক ভেদ করেছে আরশকে। তারা সর্বক্ষণ বিনীত ও অবনতমস্তক। ঊর্ধ্বদেশের প্রতি তারা দৃষ্টিপাত করে না এবং তারা সপ্তম আকাশে অবস্থানকারীদের চেয়ে অধিক ভীত থাকে। আবার সপ্তম আকাশের ফেরেশতারা অধিক ভীত থাকে ষষ্ঠ আকাশের ফেরেশতাদের চেয়ে। এভাবে

www.eelm.weebly.com

প্রত্যেক দল সন্ত্রস্ত থাকে তাদের নিম্নে অবস্থিতদের চেয়ে। মুজাহিদ বলেছেন, ফেরেশতাগণ ও আরশের মধ্যে রয়েছে সত্তরটি নূরের পর্দা। হজরত জাবের থেকে মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের কোনো একজনের সামান্য অবস্থা বর্ণনা করার অনুমতি আমাকে দেওয়া হয়েছে। সেই ফেরেশতার কানের লতি থেকে কাঁধের দূরত্ব সাতশ' বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। বিশুদ্ধ সূত্রে জিয়া এবং আবু দাউদও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হজরত জাফর ইবনে মোহাম্মদ তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর পিতামহের উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, আরশের পায়াগুলোর একটি থেকে অপরটির ব্যবধান হচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত উড্ডয়ন-ক্ষমতাসম্পন্ন পাখির তিন হাজার বৎসরের উড়ে যাওয়া পথের দূরত্বের সমান। আরশকে প্রতিদিন সত্তর হাজার রকম রঙের নূরানী পোশাক পরিধান করানো হয়। সে নূরের দিকে দৃষ্টিপাত করার সাধ্য কোনো সৃষ্টজীবের নেই। আল্লাহ্তায়ালা সমস্ত সৃষ্টিকে আরশের আওতায় এভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে, এই মহাসৃষ্টি দেখে মনে হয় সুবিশাল প্রান্তরে পড়ে থাকা একটি আংটি। মুজাহিদ বলেছেন, সপ্তম আকাশ ও আরশের মধ্যে রয়েছে সত্তর হাজার সুবিন্যস্ত নূরের ও জুলমতের আবরণ। একটি আলোর, একটি অন্ধকারের। আবার আলোর, আবার অন্ধকারের— এভাবে। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ বলেছেন, আরশের চারিদিকে ফেরেশতাদের সত্তর হাজার কাতার রয়েছে। কাতারের পর কাতার, কাতারের পিছনে কাতার, সকলেই আরশের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত। যখন এক কাতার অন্য কাতারের সামনে চলে আসে, তখন এক কাতারের ফেরেশতারা বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্', সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাতারের ফেরেশতারা সমস্বরে বলে ওঠে 'আল্লাহু আকবার'। তাদের পরের কাতার তখন উচ্চস্বরে বলে ওঠে 'আমরা তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি, তোমার সত্তা মহান, মহিমময়, তুমিই আল্লাহ্। তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তুমিই মহান। সকল সৃষ্ট জীব তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে'। পরের কাতারের ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান থাকে। তাদের হাত থাকে গর্দানের দিকে কাঁধের উপর। তাদেরও রয়েছে সত্তর হাজার কাতার। তাদের পিছনের ফেরেশতাদের এক লক্ষ কাতার। তারা দাঁড়িয়ে আছে জোড়হাত করে বিনয়াবনত অবস্থায়। তাদের কারো কারো বাম হাতের উপরে রক্ষিত আছে ডান হাত। সকলেই মশগুল থাকে আল্লাহ্র প্রশংসায় ও জয়গানে। ওই ফেরেশতাদের প্রত্যেকের দুই হাতের মধ্যবর্তী দূরত্ব তিনশ' বৎসরের রাস্তার ব্যবধানের সমান। আর কানের লতি থেকে কাঁধের দূরত্ব

হচ্ছে চারশ' বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। যেসকল ফেরেশতা আরশের চারপাশে রয়েছে, তাদের ও আল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে সত্তরটি আগুনের, সত্তরটি নূরের, সত্তরটি অন্ধকারের, সত্তরটি শুভ্র মোতির, সত্তরটি লাল ইয়াকুতের, সত্তরটি সবুজ জমরূদের, সত্তরটি বরফের পাহাড়ের, সত্তরটি স্থির পানির এবং সত্তরটি বৃষ্টির পর্দা। এছাড়াও আরো এমন অনেক পর্দা রয়েছে, যার সংবাদ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। আরশ বহনকারী ও আরশের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের গঠনাকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কারো চেহারা ষাঁড়ের মতো, কারো চেহারা বাঘের মতো, কারো চেহারা গাধার মতো এবং কারো চেহারা মানুষের মতো। প্রত্যেকের হাত রয়েছে চারটি করে। তাদের দুই পাখা দিয়ে তারা তাদের মুখমন্ডল এমনভাবে ঢেকে রাখে যেনো আরশের দিকে তাদের দৃষ্টি না যায় এবং তার ফলে যেনো তারা বেহুঁশ হয়ে না পড়ে। এই বিনয় প্রদর্শনের জন্য পাখা দু'টো রাখা আছে নিম্নমুখী করে। আর আল্লাহ্র প্রশংসা, জয়ধ্বনি ও পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা ছাড়া তাদের মুখে আর কোনো কথা নেই।

এখানে 'ইউসাব্বিহূনা' অর্থ পবিত্রতা বর্ণনা করে। 'বিহামদি রব্বিহীম' অর্থ প্রতিপালকের মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সঙ্গে। বায়যাবী লিখেছেন, তসবীহ্কে মূল এবং হামদকে অভিব্যক্তি হিসেবে এজন্যই নির্ণয় করা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের সত্তা হচ্ছে প্রশংসারত থাকার উপযোগী। কিন্তু তসবীহ্ সেরকম নয়। অর্থাৎ হামদ বর্ণনা করা তাদের মৌলিক কর্তব্য।

'ওয়া ইউ'মিনূনা বিহী' অর্থ এবং তাতে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ তারা সর্বান্তঃকরণে এমতো বিশ্বাস রাখে যে, তুমি সতত বিদ্যমান, তুমি চিরঞ্জীব, তুমি সকল কিছুর স্রষ্টা, তুমি এক, একক, অবিভাজ্য ও চির অমুখাপেক্ষী। তুমি কারো পিতা অথবা পুত্র কোনোটাই নও। তোমার সমকক্ষ অথবা অংশীদারও কেউ নয়। উল্লেখ্য, 'তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে' বলে এখানে ফেরেশতাদেরকে অভিহিত করা হয়েছে বিশ্বাসী (মুমিন) বলে। আর এরকম করা হয়েছে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রকাশার্থে। আর এই ইঙ্গিতটিকেও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, দাসত্ব (বন্দেগী), অসহায়ত্ব (আজিযি) ও অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসের দিক থেকে তারাও অন্যান্য সৃষ্টির মতো। অর্থাৎ তারাও একথা বিশ্বাস করে আল্লাহ্ সন্তান-সন্ততি গ্রহণ থেকে পবিত্র। সুতরাং মক্কার মুশরিকদের এই ধারণাটি কিছুতেই ঠিক নয় যে, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। আর একথার দ্বারা ওইসকল বিকৃত বিশ্বাসীদের ধারণাও অপসারিত হয়ে যায়, যারা মনে করে আল্লাহ্ আকৃতিবিশিষ্ট।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষ করো'।

শহর ইবনে হাওশাব বলেছেন, আরশকে ধারণ করে আছে আটজন ফেরেশতা। তাদের মধ্যে চারজন বলে 'হে আল্লাহ্! আমরা তোমার পবিত্রতা

www.eelm.weebly.com

বর্ণনা করি, তোমার প্রশংসা বর্ণনা করি; তুমিই প্রশংসার যোগ্য এজন্য যে, স্বীয় সত্তার মহামহিমত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তুমি কার্যোদ্ধার করো কোমলতার সঙ্গে'। অন্য চারজন ফেরেশতা বলে 'হে আল্লাহ্! তুমি প্রশংসার দাবিদার একথার কারণে যে, সর্বশক্তিধর হয়েও তুমি ক্ষমা করে থাকো'। তিনি আরো বলেছেন, ওই সকল ফেরেশতা হয়তো আদম সন্তানের পাপরাশি অবলোকন করে। তাই তারা তাদের জন্য দয়া ও ক্ষমা কামনার্থে মুহুর্মুহু আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে থাকে।

আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে এই বিষয়টি অবগত হওয়া যায় যে, মানুষ ও ফেরেশতা ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি হলেও 'মুমিন' হওয়ার সূত্রে তারা পরস্পরের সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। সেকারণেই তারা মানুষের কল্যাণ কামনা করে এবং তাদের জন্য আল্লাহ্ সকাশে দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করে। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'বিশ্বাসীরা পরস্পরের ভাই'।

'তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী' কথাটির মধ্যে 'জ্ঞান' এর পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে 'দয়া'র কথা। এর কারণ হচ্ছে সৃষ্টির জন্য দয়াই অধিক প্রয়োজন। সর্ববিষয়ে দয়াপ্রাপ্তিই তাই তাদের প্রকৃত কাম্য।

'ফাগ্‌ফির' অর্থ ক্ষমা করো। শব্দটির 'ফা' অক্ষরটি কারণপ্রকাশক। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপী দয়াই হচ্ছে তাদের ক্ষমাপ্রাপ্তির মূল কারণ। 'তাবূ' অর্থ তওবা করে, অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতা থেকে ফিরে আসে ইসলামের দিকে। 'ওয়াত্‌তাবাউ সাবীলাকা' অর্থ তোমার পথ অবলম্বন করে। অর্থাৎগ্রহণ করে তোমার প্রেরিত পুরুষগণ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মমত। 'ওয়াক্বিহিম আ'জাবাল জাহীম' অর্থ এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। একথার মাধ্যমে ইতোপূর্বে প্রার্থিত ক্ষমার দাবিকে করা হয়েছে অধিকতর সংহত। মাতরুফ বলেছেন, মুমিনদের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক শুভাকাঙ্ক্ষী হচ্ছে ফেরেশতাবৃন্দ এবং সর্বাপেক্ষা অধিক অমঙ্গলকামী হচ্ছে শয়তান।

এরপরের আয়াতে (৮)বলা হয়েছে— 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে দাখিল করো স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছো'।

এখানে 'আদন' অর্থ চিরশান্তিময়। কাতাদা বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ওমর হজরত কা'বকে জিজ্ঞেস করলেন, বলোতো কা'ব! 'আদন' কী? তিনি জবাব দিলেন আদন হচ্ছে বেহেশতের ভিতরের সোনার মহল, যেখানে চিরকাল বসবাস করবেন নবী ও সিদ্দীকগণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও'।

এখানে 'ওয়া মান সলাহা' অর্থ এবং যারা সৎকর্ম করেছে। 'সলাহ্' শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় 'ইমান' অর্থে, আমলের শোধন বা শুদ্ধি অর্থে নয়। এখানেও 'যারা সৎকর্ম করেছে' কথাটির মর্মার্থ হবে— যারা ইমান এনেছে। আর ইমানদারেরা যতো বড় পাপীই হোক না কেনো, জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকার রাখে। আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে শাস্তি ব্যতীত ক্ষমা করে দিবেন। অথবা ক্ষমা করে

দিবেন তাদেরকে স্বল্পকালীন শাস্তিদানের পর। তখন তারা হবে পরিশুদ্ধ। এরকম পরিশুদ্ধতার কথাই রয়েছে এখানকার 'ওয়ামান সলাহ' কথাটির মধ্যে। আর যদি এখানে 'সলাহ' বলে পুণ্যবান ইমানদারদের কথা বলা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে বলতে হয়, তাদের কথা তো পূর্বের আয়াতের 'অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে' বাক্যটির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছেই। পুনঃ পুনঃ তাদের কথা উল্লেখের প্রয়োজন তো নেই। সুতরাং বুঝতে হবে আগের আয়াতে বলা হয়েছে পুণ্যবান ইমানদারদের কথা, যারা শাস্তি ব্যতিরেকে অথবা শাস্তি ভোগসহ আল্লাহ্ কর্তৃক ক্ষমাপ্রাপ্ত।

বাগবী লিখেছেন, সা'দ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, বিশ্বাসী ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করবে, আমার পিতা কোথায়? আমার সন্তান-সন্ততি কোথায়? কোথায় আমার স্ত্রী? ফেরেশতা বলবে, তারা তো আপনার মতো সৎকর্ম করেননি। তাই লাভ করতে পারেননি আপনার মতো সুউন্নত বেহেশত। সে বলবে, আমি তো সৎকর্ম করতাম আমার ও তাদের জন্য। তখন আদেশ ঘোষিত হবে, তাদেরকে এই বেহেশতে প্রবেশ করানো হোক। এই হাদিস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, এখানকার 'সলাহ' অর্থ কেবল ইমান। হাদিসটি যেহেতু পরকালের পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট, তাই তা পরিণত পর্যায়ের হওয়া সত্ত্বেও সুপরিণত পদবাচ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। এখানে 'আল আ'যীয' অর্থ পরাক্রমশালী, সবার উপরে বিজয়ী ও প্রভাবশালী। অর্থাৎ যার অভিপ্রায় অপ্রতিরোধ্য। আর 'আল হাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'এবং তুমি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করো। সেদিন তুমি যাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে, তাকে তো অনুগ্রহই করবে; সেটাই তো মহাসাফল্য'।

এখানে 'আস্‌সাইয়্যিআত' অর্থ শাস্তি, দণ্ড, দুর্গতি, অথবা মন্দ কর্মের প্রতিফল। আর এখানকার 'তুমি যাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে' কথাটির অর্থ হতে পারে— তুমি যাকে পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ থেকে। এভাবে এখানকার 'ইয়াওমাইজিন' (সেদিন) কথাটির অর্থ দাঁড়াবে শেষ বিচারের দিন, অথবা এই পৃথিবীর জীবনে।

'ওয়া জালিকা হুয়াল ফাওযুল আ'জীম' অর্থ এটাই তো মহাসাফল্য। অর্থাৎ তোমার দয়া করা কিংবা তোমা কর্তৃক শাস্তি থেকে অব্যাহতি দান, অথবা এ দু'টোই হচ্ছে তোমার বান্দাদের জন্য মহাসফলতা।

একটি জিজ্ঞাসা ঃ ফেরেশতারা জানে যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে বেহেশত দানের অঙ্গীকার করেছেন। একথাও ভালো করে জানে যে, তাঁর অঙ্গীকারের অন্যথা অসম্ভব। তৎসত্ত্বেও তারা আবার বিশ্বাসীদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করার জন্য দোয়া করে থাকে কেনো? প্রসঙ্গত এ প্রশ্নটিও জাগে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর

প্রিয়তম রসুলকে 'মাকামে মাহমুদ' দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্বাসীরা একথা জানা সত্ত্বেও কেনো তাহলে এমতো প্রার্থনা করেন যে, 'হে আল্লাহ্! তুমি তাঁকে উন্নীত করো প্রশংসিত স্থানে'?

www.eelm.weebly.com

জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ফেরেশতাদের অন্তরে রয়েছে বিশ্বাসীগণের জন্য ভালোবাসা। তাদের জন্য তারা প্রার্থনা করেন ওই ভালোবাসার টানেই। প্রিয়জনগণের জন্য এমতো কল্যাণকামনা ও প্রার্থনা অতি স্বাভাবিক। আর একথাও বলা বাহুল্য যে, বিশ্বাসীদের নিকটে তাদের প্রিয়তম রসুল প্রাণাধিক প্রিয়। তাঁর জন্য প্রার্থনা তাই তাদের হৃদয়োৎসারিত প্রেম-ভালোবাসাজাত। তাছাড়া আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজনগণের জন্য প্রার্থনা করলে প্রকৃত অর্থে উপকৃত হয় প্রার্থনাকারীরাই। আবার প্রার্থনা করার বিনিময়ে আল্লাহ্‌পাক প্রার্থনাকারীদেরকে বঞ্চিত করেন না তাঁর করুণা ও তুষ্টি থেকে। কারণ আল্লাহ্‌ তাদেরকে তো ভালোবাসবেনই, যারা ভালোবাসে তাঁর প্রিয়ভাজনগণকে।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ১০, ১১, ১২, ১৩

❑ নিশ্চয় কাফিরগণকে উচ্চ কণ্ঠে বলা হইবে, 'তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র অপ্রসন্নতা ছিল অধিক— যখন তোমাদিগকে ঈমানের প্রতি আহ্‌বান করা হইয়াছিল আর তোমরা তাহা অস্বীকার করিয়াছিলে।'

❑ উহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে প্রাণহীন অবস্থায় দুইবার রাখিয়াছ এবং দুইবার আমাদিগকে প্রাণ দিয়াছ। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করিতেছি; এখন নিষ্ক্রমণের কোন পথ মিলিবে কি?'

❑ 'তোমাদের এই শাস্তি তো এইজন্য যে, যখন এক আল্লাহ্‌কে ডাকা হইত তখন তোমরা তাঁহাকে অস্বীকার করিতে এবং আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করা হইলে তোমরা তাহা বিশ্বাস করিতে।' বস্তুত সমুচ্চ, মহান আল্লাহ্‌রই সমস্ত কর্তৃত্ব।

❑ তিনিই তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হইতে প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য রিয্‌ক, আল্লাহ্‌-অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— নিশ্চয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে মহাবিচারের দিবসে উচ্চস্বরে ডেকে বলা হবে, আজ নিজেদের প্রতি তোমরা যেভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছো, পৃথিবীতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অপ্রসন্নতা ছিলো এর চেয়ে বেশী, ওই সময়, যখন তোমাদেরকে বিশ্বাসী হতে বলা হয়েছিলো, আর তোমরা তা করেছিলে প্রত্যাখ্যান।

আলোচ্য আয়াতের যোগসূত্র রয়েছে ৪ সংখ্যক আয়াতের 'কেবল কাফেরেরাই আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে' কথাটির সঙ্গে। এর মধ্যবর্তী বাক্যসমূহ ভিন্ন প্রসঙ্গের।

এখানে 'ইউনাদাওনা' অর্থ উচ্চকণ্ঠে ডেকে বলা হবে। অর্থাৎ দোজখের শ্রমিক ফেরেশতাগণ তখন উচ্চস্বরে ডেকে বলবে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন থাকবে দোজখের ভিতর। নিজ নিজ অপরাধের জন্য তখন তারা হতে থাকবে ক্ষোভে দুঃখে জর্জরিত।

'ইজ তুদ্‌আ'ওনা ইলাল ঈমানি' অর্থ যখন তোমাদেরকে ইমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিলো। এই বাক্যটির সঙ্গে 'মাক্বতুল্লহ্‌' (আল্লাহ্‌র অপ্রসন্নতা) এর কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা 'মাক্বতু' হচ্ছে এখানে মূল ও উদ্দেশ্য। আর 'আকবার' (সর্বাধিক) হচ্ছে এর বিধেয়। এভাবে বাক্যটি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এভাবে উদ্দেশ্য-বিধেয় মিলিতরূপে বাক্যটি হয়ে গিয়েছে পূর্ণ, তখন এ প্রসঙ্গের সম্পর্ক ওই মূলের সঙ্গে হতে পারে না, যা উল্লেখ করা হয়েছে স্বতন্ত্র যোজকরূপে। এমতাবস্থায় এ বাক্যের সম্পর্ক 'মিন মাক্বতিকুম আনফুসাকুম' (তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ) কথাটির সঙ্গেও হতে পারে না। কেননা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো নিজেদের প্রতি ক্ষোভিত হবে শাস্তিতে বিজড়িত হওয়ার পর, পরকালে। আর আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি অপ্রসন্ন পৃথিবীতে। এ কারণে 'যখন তোমাদেরকে ইমানের প্রতি আহ্বান করা হতো' বাক্যটির সম্পর্ক হবে একটি উহ্য

www.eelm.weebly.com

ক্রিয়ার সঙ্গে। যার প্রমাণ হচ্ছে 'মাক্বতুল্লাহ্' (আল্লাহ্র অপ্রসন্নতা) ও 'মাক্বতিকুম' (তোমাদের ক্ষোভ) এর সমকাল একই। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়, শাস্তিগ্রস্ত অবস্থায় তারা একই সঙ্গে শিকার হবে আত্মধিক্কারের এবং আল্লাহ্র অপরিতোষের, কেননা পৃথিবীতে ইমানের আহ্বান শোনা সত্ত্বেও তারা তা অহমিকাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলো।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দু'বার রেখেছো এবং দু'বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছো। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি, এখন নিষ্ক্রমণের কোনো পথ মিলবে কী'?

হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও জুহাক এখানকার দুই মৃত্যু ও দুই জীবনের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ মানুষকে তাদের আপনাপন পিতার পৃষ্ঠদেশে রাখেন প্রাণহীনভাবে। তারপর মাতৃগর্ভে জীবনদান করে প্রেরণ করেন পৃথিবীতে। পুনরায় প্রাণহীন করেন পৃথিবীর আয়ু শেষ হলে। পুনরায় পুনর্জীবিত করবেন

মহাপুনরুত্থান দিবসে। ব্যাখ্যাটি সমর্থিত এ আয়াত দ্বারা— 'তোমরা ছিলে মৃত(শুক্রবিন্দু হিসাবে) অতঃপর তিনি জীবিত করলেন তোমাদেরকে (তোমাদের মাতৃজঠরে) অতঃপর তিনি মৃত্যু দিবেন তোমাদেরকে (আয়ুষ্কালের পরিসমাপ্তিতে) অতঃপর তিনি পুনর্জীবিত করবেন তোমাদেরকে (পরলোকে)'। সুদ্দী বলেছেন, এই পৃথিবীর জীবন শেষে হয় প্রথম মৃত্যু। তারপর কবরে জীবনদান করে সম্পন্ন করা হয় সওয়াল-জওয়াব পর্ব। তারপর পুনরায় রাখা হয় প্রাণহীন অবস্থায়। আবার সকলকে জীবনদান করা হবে পুনরুত্থানের দিন। এটাই হচ্ছে দুই মৃত্যু ও দুই জীবনের বয়ান। সুদ্দীর এই বিবরণ দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, তিনি মনে করেন মৃত্যুর পূর্বে জীবন থাকা জরুরী। পিতৃপৃষ্ঠের শুক্রকণা যেহেতু জীবন্ত নয়, তাই জীবনের সূচনা হয় মাতৃগর্ভ থেকে। তাই তিনি প্রথম জীবন ধরেছেন পৃথিবীর জীবনকে। সুদ্দীর এই ধারণাটি ভুল। কেননা এখানে 'আমাত্তানা' অর্থ মৃত্যু নয়, প্রাণহীনতা। অর্থাৎ কাউকে নিষ্প্রাণ অবস্থায় রাখা, তা শুরুতেই হোক, অথবা জীবনদানের পর জীবন হরণ করে। যেমন বলা হয়— 'পবিত্র সেই আল্লাহ্, যিনি মশাকে ক্ষুদ্রাকারে এবং হাতীকে বৃহদাকারে সৃষ্টি করেছেন'। কথাটির অর্থ এরকম নয় যে, প্রথমে মশা বৃহদাকারে এবং হাতী ক্ষুদ্রাকারে ছিলো, পরে মশাকে করে দেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্র এবং হাতীকে বৃহৎ। এখন অবশিষ্ট রইলো কবরে জীবিত করার বিষয়টি। কবরের জীবন তো পৃথিবী অথবা পরকাল কোনো জীবনের মতো নয়। বরং ওই জীবন হচ্ছে মধ্যবর্তী (বরজখী) জীবন। আর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সেখানকার জীবনকে যদি জীবন হিসেবে স্বীকারও করা হয়, তবে বুঝতে হবে ওই জীবন তো দেওয়া হবে কেবলই শাস্তি প্রদানের জন্য। আর তিনি যে বলেছেন, জিজ্ঞাসাবাদের পর পুনরায় কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে রাখা হবে মৃত অবস্থায়— একথাটিও ঠিক নয়। কারণ তা প্রকৃত অবস্থার পরিপন্থী। হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, কবরে তাদের শাস্তি হতেই থাকবে।

'ফা'তারাফনা বিজুনূবিনা' অর্থ আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। এখানকার 'ফা' কারণসূচক। অর্থাৎ দ্বিতীয় মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জীবনকে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়ার কারণেই তারা স্বীকার করতে বাধ্য হবে তাদের অপরাধ।

'ফাহাল ইলা খুরূজিম্ মিন সাবীল' অর্থ এখন নিষ্ক্রমণের কোনো পথ মিলবে কী? অর্থাৎ কোনো রকমে একবার কোনো না কোনো উপায়ে আমরা পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবো কী? বক্তব্যটি হবে তাদের আক্ষেপ সূচক। অর্থাৎ আহা এমন যদি হতো।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'তোমাদের এই শাস্তি তো এ জন্য যে, যখন এক আল্লাহ্কে ডাকা হতো তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহ্র শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে'। একথার অর্থ— তাদেরকে তখন আরো বলা হবে, না, এ শাস্তি থেকে তোমরা কখনোই মুক্ত হতে পারবে না। সুতরাং পৃথিবীতে পুনঃ প্রত্যাবর্তনের কল্পনা পরিত্যাগ করো। আর

শোনো, এই অনন্ত শাস্তিতে তোমাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে এজন্য যে, যখন তোমাদের সম্মুখে মহাসত্যের বাণী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' উচ্চারিত হতো, তখন তোমরা তা অমান্য করতে, অথচ সাদরে বরণ করে নিতে অংশীবাদিতাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'বস্তুত সমুচ্চ, মহান আল্লাহ্রই সমস্ত কর্তৃত্ব'। একথার অর্থ— হে দোজখীরা, ভালো করে শুনে নাও, আল্লাহ্ তোমাদের অংশীবাদিতাদুষ্ট অপবিত্র ধারণা অপেক্ষা অতি উচ্চ, অতীব মহান। সকলের এবং সকলকিছুর উপর সর্বময় কর্তৃত্ব কেবল তাঁর। সেকারণেই তো তিনি তোমাদেরকে নিপতিত করেছেন মর্মন্তুদ শাস্তিতে, যা পুনরাবৃত্ত হতে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ্ ব্যতীত আর যদি কেউ উপাস্য থাকতো তাহলে সে তোমাদেরকে উদ্ধার করতো এ শাস্তি থেকে। কেউ অথবা কোনোকিছুই তোমাদেরকে এ শাস্তি থেকে মুক্ত করতে পারবে না।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ থেকে প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য রিজিক'। একথার অর্থ— তাঁর এককত্বের যাবতীয় দৃষ্টান্ত তিনি দেখিয়েছেন তোমাদেরকে। আরো তিনি দেখিয়েছেন সেগুলিকে, যেগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। তিনিই তো তোমাদের আল্লাহ্, তোমাদের জীবনোপকরণদাতা। তিনিই আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন। ফলে সঞ্জীবিত হয় মৃত্তিকা। উৎপন্ন হয় কতো বিচিত্র বর্ণের, গন্ধের ও স্বাদের ফল-মূল-শাক-সবজী ও ফসল। ওগুলোই তো তোমাদের অত্যাবশ্যক জীবনোপকরণ। এগুলোও তো তাঁর এককত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং স্বচক্ষে এসকল কিছু প্রত্যক্ষ করার পর আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে কীভাবে?

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে'। একথার অর্থ— শুভ উপদেশকে মান্য করে সেই ব্যক্তিই, যে সতত মনোনিবদ্ধ রাখে কেবল আল্লাহ্র প্রতি। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জীবনোপকরণের আয়োজন ইত্যাকার নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে পথপ্রাপ্ত হতে পারে কেবল তারাই, যারা হঠকারিতা, একগুঁয়েমি ও অহংকারমুক্ত মনে মনোযোগী হয়ে যায় কেবল আল্লাহ্র দিকে।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০

❑ সুতরাং আল্লাহ্কে ডাক তাঁহার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া, যদিও কাফিররা ইহা অপসন্দ করে।

❑ তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, 'আরশের অধিপতি, তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ, যাহাতে সে সতর্ক করিতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে।

❑ যেদিন মানুষ বাহির হইয়া পড়িবে সেদিন আল্লাহ্র নিকট উহাদের কিছুই গোপন থাকিবে না। আজ কর্তৃত্ব কাহার? আল্লাহ্রই, যিনি এক, পরাক্রমশালী।

❑ আজ প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হইবে; আজ কোন যুলুম করা হইবে না। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

❑ উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখ-কষ্টে উহাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে। যালিমদের জন্য কোন অন্তরংগ বন্ধু নাই, যাহার সুপারিশ গ্রাহ্য হইবে এমন কোন সুপারিশকারীও নাই।

❑ চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যাহা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।

❑ আল্লাহ্ই বিচার করেন সঠিকভাবে। আল্লাহ্র পরিবর্তে উহারা যাহাদিগকে ডাকে তাহারা বিচার করিতে অক্ষম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল ও তাঁর উম্মত! তোমরা শুনলে তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম হবে কতো ভয়াবহ। সুতরাং তোমরা কোনোদিকে আর দৃকপাত না করে মগ্ন হও এক আল্লাহ্র একনিষ্ঠ ইবাদতে, যদিও তা হয় তাদের কাছে তিক্ত, অনভিপ্রেত। অর্থাৎ বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদের নিবিষ্টচিত্ত উপাসনা সকল যুগের সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে করে ক্ষুব্ধ ও অপ্রসন্ন।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ, যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে'।

'রফিউ'দ্ দারাজ্বাত' অর্থ তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী। অর্থাৎ তাঁর মর্যাদার পূর্ণত্ব অত্যন্ত উন্নত, অতীব মহান, যার সমান্তরাল অন্য কারো পূর্ণত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, কথাটির অর্থ তিনি তাঁর নবী ও ওলীগণকে তাঁদের নৈকট্যের স্তরানুসারে বেহেশতে উচ্চ-উচ্চতর মর্যাদা প্রদান করবেন।

'জুল আ'রশ' অর্থ আরশের অধিপতি। 'ইউল্ক্বির রূহা' অর্থ ওহী বা প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য, 'ওহীকে' এখানে বলা হয়েছে 'রূহ'। কেননা 'রূহ' বা আত্মা দ্বারা যেমন শরীর জীবিত হয়, তেমনি প্রত্যাদেশ দ্বারা জীবিত হয় মৃত আত্মা।

'মিন্ আম্রিহী' অর্থ স্বীয় আদেশে। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'আদেশ' অর্থ 'অনুগ্রহ'। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— তিনি নিজ অনুগ্রহে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন। এমতাবস্থায় এখানকার 'মিন্' হবে সূচনামূলক। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বর্ণনামূলক। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে আল্লাহ্র তিনটি বিশেষ গুণ— সমুচ্চ মর্যাদাধারী, আরশাধিপতি এবং প্রত্যাদেশপ্রদাতা। শেষোক্ত গুণটি আবার নবুয়তের পদমর্যাদার উপক্রমণিকাও বটে।

'লিইউন্জিরা ইয়াওমাত্ তালাক্ব' অর্থ যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে। এখানে 'লিইউন্জিরা' এই কর্তৃকারক সর্বনামটি সম্পৃক্ত রয়েছে আল্লাহ্, ওহী অথবা 'যার প্রতি ইচ্ছা', অর্থাৎ নবীগণের সঙ্গে। শেষোক্তটিকে গ্রহণ করলে এখানকার বক্তব্যটি হতে পারে অধিকতর স্পষ্ট ও বোধগম্য। আর 'ইউন্জিরা' এর কর্মকারক এখানে রয়েছে উহ্য। এভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ব্যাপকভিত্তিক আহ্বানকর্মের দিকে। অর্থাৎ আল্লাহ্র নবীগণ যেনো সকলকেই আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানান।

'ইয়াওমাত্ তালাক্ব' অর্থ কিয়ামত দিবস। অর্থাৎ যেদিন আকাশ-পৃথিবীসহ সকল সৃষ্টিকে একত্র করা হবে। মুকাতিল ও কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ পরস্পর সাক্ষাতের দিন। অর্থাৎ সেই দিন, যেদিন সাক্ষাতকার ঘটবে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। মায়মুন ইবনে মেহরান বলেছেন, যেদিন সমবেত হবে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত এবং অভিযুক্ত ও অভিযোগকারীরা। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ— যেদিন উপস্থিত করা হবে মূর্তিপূজকদেরকে তাদের মূর্তিগুলোর সঙ্গে। কেউ কেউ আবার অর্থ করেছেন—প্রত্যেককে মিলিত করা হবে সেদিন তাদের নিজ নিজ কর্মফলের সঙ্গে।

হাকেম, ইবনে যোবায়ের, যোবায়ের ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস একবার 'যেদিন আকাশসমূহ মেঘমালাসহ চৌচির হয়ে যাবে' এই আয়াত পাঠ করলেন। তারপর বললেন, মহাবিচারের দিবসে একটি সুবিশাল প্রান্তরে আল্লাহ্ তাঁর সকল সৃষ্টিকে সমবেত করবেন। ওই সমাবেশে থাকবে মানুষ, জ্বিন, জন্তু-জানোয়ার, পাখি-পতঙ্গ সকলেই। তারপর নিম্নতম আকাশ বিদীর্ণ হবে। ওই আকাশের বাসিন্দারা নিচে

নেমে যাবে। তাদের সংখ্যা হবে জ্বিন ও মানুষের সম্মিলিত সংখ্যার চেয়ে বেশী। হাদিসটি সুদীর্ঘ। এর পরে ওই হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে অন্যান্য আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন দ্যুতিচ্ছটার প্রকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে। হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে সুরা বাক্বারার তাফসীরের যথাস্থানে।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে, সেদিন আল্লাহ্র নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবে না'। একথার অর্থ যেদিন মানুষ তাদের আপনাপন কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে, সেদিন তাদেরকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহ্ সকাশে। আত্মগোপন করার উপায় তখন তাদের থাকবেই না। সামনে থাকবে না কোনো পাহাড়-পর্বত-টিলা-অট্টালিকার আড়াল। দেহের পর্দাও গোপন রাখতে পারবে না তার আত্মাকে। কথাটির উদ্দেশ্য এরকম হতে পারে যে, তখন গোপন থাকবে না অপরাধীদের ব্যক্তিক, অবয়বিক ও পরিস্থিতি সংক্রান্ত কোনো বিষয়। এখানে 'তাদের কিছুই গোপন থাকবে না' বাক্যটি পূর্বের বাক্যের (যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে) এর সমার্থকও বটে এবং এভাবে পৃথিবীবাসীদের গোপনীয়তা সংক্রান্ত ধারণাকেও বিদূরিত করা হয়েছে পুরোপুরিভাবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আজ কর্তৃত্ব কার? আল্লাহ্রই, যিনি এক, পরাক্রমশালী'। একথার অর্থ— সকল সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিয়ে তাঁর অতুলনীয় মহাপরাক্রমের প্রকাশ যখন তিনি ঘটাবেন, তখন বলবেন, কর্তৃত্ব আজ কার? যেহেতু জবাব দেওয়ার মতো তখন কেউই থাকবে না, তাই তাঁর এমতো প্রশ্নের জবাব দিবেন তিনি নিজে। বলবেন, আল্লাহ্রই, যিনি এক, মহাপরাক্রমশালী।

'আল ওয়াহিদ' অর্থ এক, একক, একাকী, অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য। উল্লেখ্য, তিনি এক ও একক যেমন তাঁর সত্তায়, তেমনি গুণবত্তায়, তেমনি কার্যকলাপেও। কোনো কিছুতেই কেউ তাঁর অংশী অথবা সমকক্ষ নয়। আর 'ক্বাহ্হার' অর্থ মহাপরাক্রমশালী। অর্থাৎ তিনি সকলের ও সকলকিছুর উপরে প্রভাবশালী, বিজয়ী। তিনি সকলকিছুর উপরে যে কোনোভাবে শক্তিপ্রয়োগ করতে পারেন। সৃষ্টির অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায়নির্ভর। হজরত আবু হোরায়রা থেকে এ সম্পর্কে সুপরিণত পর্যায়ের একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেছেন তিবরানী, আবুল আলিয়া ও বায়হাকী। আরো কিছুসংখ্যক ব্যক্তিও হাদিসটির বর্ণনাকারী।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু সাঈদ থেকে আবু দাউদ তাঁর 'আল বাআ'স গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তখন জনৈক ঘোষক উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবে, হে মানবজাতি! এখন তোমাদের উপর সেই সময় সমুপস্থিত। তার ওই ঘোষণা নিকটবর্তী দূরবর্তী সকলেই শুনতে পাবে। এরপর নিকটতম আকাশে মহাআড়ম্বরে অবতরণ করবেন আল্লাহ্। তখন আর এক ঘোষক ঘোষণা করবে, এখন কার আধিপত্য? কার শাসন? তারপর নিজেই জবাবে বলবে, কেবল আল্লাহ্র, যিনি আনুরূপ্যবিহীনরূপে এক এবং অতুলনীয়রূপে মহাপরাক্রমশালী।

'নুফিখা ফিস্সূর' আয়াতের ব্যাখ্যায় সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, তখন তিন জন ফেরেশতা বেহুঁশ

হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবেন। তাঁরা হচ্ছেন— জিবরাইল, মিকাইল ও আজরাইল। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও আজরাইলকে বলবেন, হে মৃত্যুদূত! এখন কে কে রয়েছে অবশিষ্ট? আজরাইল বলবেন, তোমার মহামহিম সত্তা। আর তোমার বান্দা জিবরাইল, মিকাইল ও আজরাইল। আল্লাহ্ আদেশ দিবেন, মিকাইলের প্রাণ সংহার করো। তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করবেন তিনি। আল্লাহ্ পুনঃ প্রশ্ন করবেন, এখন? আজরাইল বলবেন, তোমার পবিত্রতম সত্তা। আর তোমার বান্দা জিবরাইল ও আজরাইল। আল্লাহ্ বলবেন জিবরাইলের জীবনাবসান ঘটাও। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ কার্যকর করবেন তিনি। আল্লাহ্ বলবেন, এবার? আজরাইল উত্তর দিবেন, তোমার পাক জাত। আর তোমার মৃত্যুভয়ে তটস্থ বান্দা আজরাইল। আল্লাহ্ আদেশ করবেন, মরে যাও। সঙ্গে সঙ্গে আজরাইল মৃত্যুমুখে পতিত হবে। আল্লাহ্ বলতে থাকবেন, আমিই মহাসৃষ্টির স্রষ্টা। পুনরায় সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করবো আমিই। আজ অত্যাচারী-অহংকারীরা সব কোথায়? আজ হুকুমত কার? জবাব দেওয়ার মতো তখন কেউই অবশিষ্ট থাকবে না। তাই তিনি নিজেই বলবেন, আল্লাহ্রই, যিনি এক, পরাক্রমশালী। পরে পুনরায় শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। তখন পুনরুত্থিত হবে সকলে।

আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, কবর থেকে সকলকে বের করার পর আল্লাহ্ বলবেন 'আজ কর্তৃত্ব কার'। অর্থাৎ তখন তাঁর সকল সৃষ্টির অসহায়ত্বকেই এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে এভাবে। অথবা বলা যেতে পারে, তখন সমস্ত পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ থাকবে ধ্বংসের আড়ালে। থাকবে না সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার যোগাযোগের কোনো মাধ্যমও। ফলে দৃশ্যত দণ্ডদাতা বা শাসকদের অস্তিত্বও হবে অবলুপ্ত। ওই অবস্থাকেই চিত্রিত করা হয়েছে এখানে। নতুবা এ জগতেও প্রকৃত কর্তৃত্ব আল্লাহ্রই। তাঁর কর্তৃত্বমুক্ত কোনো সৃষ্টির অস্তিত্বই নেই। থাকা সম্ভবও নয়।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হবে, আজ কোনো জুলুম করা হবে না'।

এখানে 'আল ইয়াওমা' অর্থ আজ, এই দিনে, এই মহাবিচারের দিবসে, যখন আল্লাহ্ ছাড়া রূপকার্থক কর্তৃত্ব বলেও কারো কোনোকিছু থাকবে না। আর 'আজ কোনো জুলুম করা হবে না' অর্থ আজ কারো প্রতি যৎকিঞ্চিত অবিচারও করা হবে না। বিন্দুবৎ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো হবে না কারো পাপ-পুণ্যের।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র ইচ্ছায় এই দুনিয়ার অর্ধদিবস সময়কালের মধ্যেই সমাপ্ত হবে সেদিনের হিসাব-নিকাশ পর্ব, যদিও তিনি সবকিছু সম্পন্ন করার ক্ষমতা রাখেন মুহূর্তাংশের মধ্যে। কিন্তু এমন কোনো ব্যস্ততাও তাঁর নেই, যা তাঁর কর্মের প্রতিবন্ধক। তাই তিনি মুহূর্তমধ্যে নয়, সকলের হিসাব নিকাশ শেষ করবেন এই দুনিয়ার অর্ধদিবস পরিমাণ সময়-পরিসরের মধ্যে। আর তিনি অবসাদ-ক্লান্তি থেকে চিরমুক্ত, সেকথাটিকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই এখানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর'।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখকষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে সেই ভয়ংকর দিবস সম্পর্কে সাবধান করে দিন, যেদিন কণ্ঠদেশে উঠে আসতে চাইবে হৃৎপিণ্ড। দম বন্ধ হবার উপক্রম হবে ভয়ে-আতংকে-দুশ্চিন্তায়। এখানে 'প্রাণ কণ্ঠাগত' অর্থ হৃৎপিণ্ড তার আপন স্থান ত্যাগ করে উঠে আসবে কণ্ঠদেশে। আটকে থাকবে সেখানেই। ফলে তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত অস্বস্তিদায়ক। হৃৎপিণ্ড নিচে নামবে না, যাতে তারা আরাম পায়, অথবা বাইরেও বেরিয়ে যাবে না, যাতে ঘটতে পারে মৃত্যু। আর এখানকার 'কাজিমীন' শব্দটির অর্থ দুঃখ-কষ্ট, অস্থিরতা-ভয়-দুশ্চিন্তা, যা অসহনীয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'জালেমদের কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোনো সুপারিশকারীও নেই'। এখানে 'জালেম' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, কাফের।

'হামীম' অর্থ অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এখানকার 'যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোনো সুপারিশকারীও নেই' কথাটির অর্থ এরকম নয় যে, তাদের জন্য কেউ তখন সুপারিশ করবে, অথচ তা গৃহীত হবে না। বরং কথাটির অর্থ হবে— তাদের জন্য

www.eelm.weebly.com

তখন সেখানে সুপারিশকারী থাকবেই না। সুতরাং এখানে 'ইউত্বউ' বিশেষণটির কোনো কার্যকারিতাই নেই। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে বিশেষণটি বসানো হয়েছে অংশীবাদীদের লালিত বিশ্বাসের আনুকূল্য বজায়ার্থে। কেননা, পূজিত প্রতিমাগুলো তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে, এটাই ছিলো তাদের বিশ্বাস। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়বে— তাদের অপবিশ্বাসানুসারে যদি তখন তাদের পক্ষের কোনো সুপারিশকারী থাকেও, তবুও তাদের সুপারিশ গ্রাহ্য হবে না।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরে যা গোপন আছে, সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত'।

'খায়িনাতাত্ আয়ুয়ুনি' অর্থ চক্ষুর অপব্যবহার, দৃষ্টির চৌর্যতা। 'খায়িনাতা' হচ্ছে এখানে কর্তৃকারক, কর্তৃপদীয় শব্দরূপ। এর বিশেষ্য রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ আত্মসাৎকারী দৃষ্টি। যেমন গোপনে নিষিদ্ধ কিছু অবলোকন করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবহিত। অথবা ধাতু মূল 'খায়িনাহ্'। যেমন 'আ'ফীয়াহ্' অর্থাৎ চোখের কুদৃষ্টির কথাও আল্লাহ্ জানেন।

'ওয়ামা তুখ্ফিস্ সুদূর' অর্থ অন্তরে যা গোপন আছে, সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। কেউ কেউ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— কোনো সুন্দরী রমণীকে কুদৃষ্টিতে দেখার পর অন্তরে লালিত কাম-লালসার কথাও আল্লাহ্র অজানা নয়।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই বিচার করেন সঠিকভাবে। আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, তারা বিচার করতে অক্ষম'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ই সকলের স্রষ্টা, পালক। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর, ন্যায়বিচারক।

সকলের ও সকলকিছুর প্রকাশ্য-গোপন সবকিছুই তাঁর জানা। তাই সঠিকভাবে বিচার-মীমাংসা করতে পারেন কেবল তিনিই। অন্যদের এসকল গুণ যেহেতু নেই, তাই তারা সঠিক বিচার করতে অক্ষম। এখানে 'আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে' অর্থ প্রতিমা, শয়তান অথবা প্রবৃত্তিপূজক কোনো শাসক। বিচার করার যোগ্যতাই তাদের নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'। একথা আগের বাক্যের 'চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি জানেন' কথাটির পরিপোষক। তাছাড়া এ কথার মধ্যে রয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তিদানের প্রচ্ছন্ন অঙ্গীকারও। আর তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদের শরণাপন্ন হয়, তাদের বিচার-যোগ্যতার অন্তরায়ও সৃষ্টি করা হয়েছে আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে। পরোক্ষভাবে একথা বলেই দেওয়া হয়েছে যে, তারা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা যেহেতু নয়, তাই বিচার করার যোগ্যতাও তাদের নেই।

সূরা মু'মিনঃ আয়াত ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭

---

www.eelm.weebly.com

❑ ইহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করিলে দেখিত— ইহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হইয়াছিল। পৃথিবীতে উহারা ছিল ইহাদের অপেক্ষা শক্তিতে এবং কীর্তিতে প্রবলতর। অতঃপর আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলেন উহাদের অপরাধের জন্য এবং আল্লাহ্র শাস্তি হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ ছিল না।

❑ ইহা এইজন্য যে, উহাদের নিকট উহাদের রাসূলগণ নিদর্শনসহ আসিলে উহারা তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিলেন। তিনি তো শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর।

❑ আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম,

❑ ফির'আওন, হামান ও কারূনের নিকট। কিন্তু উহারা বলিয়াছিল, 'এই লোকটা তো এক জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।'

❑ অতঃপর মূসা আমার নিকট হইতে সত্য লইয়া উহাদের নিকট উপস্থিত হইলে উহারা বলিল, 'মূসার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহাদের পুত্র-সন্তানদিগকে হত্যা কর এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখ।' কিন্তু কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবেই।

❑ ফির'আওন বলিল, 'আমাকে ছাড়িয়া দাও আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দীনের পরিবর্তন ঘটাইবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে।'

❑ মূসা বলিল, 'যাহারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, সেই সকল উদ্ধত ব্যক্তি হইতে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হইয়াছি।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মক্কার এই অংশীবাদীরা কি দেশ বিদেশে ভ্রমণ করে না? ভ্রমণ করলে তো স্বচক্ষে দেখতে পেতো তাদের পূর্ববর্তী আদ-ছামুদ ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর বিরাণ জনপদসমূহ। তারা তো ছিলো এদের চেয়েও অধিক শক্তিশালী ও কীর্তিমান। কিন্তু তারা তাদের পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরিত নবীগণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো। সেই অপরাধে আল্লাহ্ তাদের উপরে আপতিত করেছিলেন ধ্বংসাত্মক শাস্তি। যেমন মহাপ্লাবন, জীবন-সংহারক মহানাদ, প্রস্তর-বৃষ্টি ইত্যাদি। ফলে পৃথিবী থেকে সমূলে উৎপাটিত হয়েছে তারা। বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে তাদের কীর্তিচিহ্নসমূহ। আল্লাহর ওই সকল মহাশাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে, এরকম ত্রাণকর্তাও তাদের ছিলো না। আল্লাহ্র মহা অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে সেরকম কোনো ত্রাণকর্তার উপস্থিতি তো সম্ভবও নয়।

এখানে 'আওয়া লাম ইয়াসীরু ফীল আরদ্ব' অর্থ তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে না? বক্তব্যটির সংযোগ রয়েছে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই অনুক্ততাসহ

পুরো অর্থ দাঁড়ায়— তারা কি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অশুভপরিণতির কথা অবিশ্বাস করে? তাহলে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদগুলোর অবস্থা স্বচক্ষে দেখে আসে না কেনো?

'কুওওয়াতা' অর্থ শক্তি, প্রতিপত্তি। 'আছারন ফীল আরদ্ব' অর্থ কীর্তিতে প্রবলতর। অর্থাৎ দুর্গ, প্রাসাদ, প্রাচীরবিশিষ্ট সুরক্ষিত শহর ইত্যাদি কীর্তিতে তারা ছিলো অত্যন্ত প্রতাপশালী। 'ফা আখজাহুমুল্লহু বিজুনুবিহিম' অর্থ অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন তাদের অপরাধের জন্য। আর 'ওয়ামা কানা লাহুম মিনাল্লহি মিঁউওয়াক' অর্থ এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করবার কেউ ছিলো না।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— এটা এজন্য যে, তাদের নিকট তাদের রসুলগণ নিদর্শনসহ এলে তারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিলেন। তিনি তো শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর। এখানে 'আল বাইয়্যিনাত' অর্থ অলৌকিক নিদর্শনসমূহ, সেই সকল নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহ, যা শুভ ও কল্যাণকর। 'ক্বভিউন' অর্থ শক্তিশালী, পূর্ণ ক্ষমতাবান, অভিপ্রায়ানুসারে কর্ম করতে পূর্ণরূপে সক্ষম।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি আমার স্পষ্ট প্রমাণসহ মুসাকে প্রেরণ করেছিলাম (২৩), ফেরাউন, হামান ও কারুনের নিকট। কিন্তু তারা বলেছিলো, এই লোকটা তো যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী'(২৪)।

কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, এখানকার 'আয়াতিনা' (নিদর্শন) অর্থ ওই নয়টি মোজেজা বা অলৌকিকত্ব, যা আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে দিয়েছিলেন। আর 'সুলত্বনিম্ মুবীন' (স্পষ্ট প্রমাণ) অর্থ বিশেষ কোনো অলৌকিকত্ব— যেমন তাঁর যষ্টি। প্রথম অবস্থায় 'আয়াত' ও 'সুলত্বনিম্ মুবীন' পৃথক এবং দ্বিতীয় অবস্থায় 'সুলতানিম্ মুবীন'ও 'আয়াতে'র অন্তর্ভূত।

www.eelm.weebly.com

যেহেতু তাঁর কোনো কোনো অলৌকিকত্ব (যেমন যষ্টি, শুভ্রোজ্জ্বল হাত) বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছিলো, তাই প্রথমে সাধারণভাবে সবগুলোর কথা উল্লেখ করার পরে ঘটানো হয়েছে বিশেষ অলৌকিকত্বের সংযোজন।

'ফা ক্বলু সাহিরুন' অর্থ তারা বলেছিলো, লোকটা তো এক যাদুকর। আর 'কাজ্জাবুন' অর্থ মিথ্যাবাদী। আলোচ্য আয়াতের মধ্যে রসুলেপাক স. এর জন্য রয়েছে সান্ত্বনার বাণী। জনান্তিকে যেনো বলা হয়েছে, হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিকেরা 'যাদুকর' 'মিথ্যাবাদী' ইত্যাদি বলে আপনাকে উত্যক্ত করে। এতে করে আপনি ব্যথিত হবেন না। কেননা সকল যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যাকারীদের স্বভাব এরকমই। ইতোপূর্বে আপনার পূর্বসূরী রসুল মুসাকে তারা এরকমই বলেছিলো। আর তারা ছিলো এদের চেয়ে অনেক বেশী প্রতাপশালী। তৎসত্ত্বেও তাদের পরিণতি হয়েছিলো অত্যন্ত অশুভ। সুতরাং আপনিও এব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন যে, আপনার প্রতিপক্ষীয়রাও যথাসময়ে হবে ভয়ংকর পরিণতির শিকার— ইহকালে ও পরকালে।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর মুসা আমার নিকট থেকে সত্য নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হলে তারা বললো, মুসার সঙ্গে যারা ইমান এনেছে, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করো এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখো। কিন্তু কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই'। একথার অর্থ— অতঃপর যখন নবী মুসা তাদের কাছে সত্য ধর্মের মহান বাণী নিয়ে উপস্থিত হলো, তখন ফেরাউনের অনুসারীরা হলো মহাক্ষিপ্ত। বললো, মুসার জন্মের প্রাক্কালে যেমন বনী ইসরাইলদের শিশুপুত্রদেরকে হত্যা করা হতো এবং খেদমতের জন্য বাঁচিয়ে রাখা হতো তাদের শিশুকন্যাদেরকে, সেই নিয়মটি তোমরা আবার চালু করো। যাতে মুসার অনুসারীদের দল শক্তিশালী না হতে পারে। আমি বললাম, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কখনো সফল হয় না। কারণ তা আমার অভিপ্রায়ানুকূল নয়। সুতরাং তারা ব্যর্থ হবেই।

এখানে 'দ্বলাল' অর্থ ব্যর্থ, নিষ্ফল, অকৃতকার্য।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মুসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনের পরিবর্তন ঘটাবে, অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে'।

বাগবী লিখেছেন, ফেরাউন 'আমাকে ছেড়ে দাও' এরকম বলেছিলো এজন্য যে, নিশ্চয় তার মন্ত্রকদের কেউ তাকে একাজে বাধা দিয়েছিলো। কারণ সে বুঝেছিলো, সিদ্ধান্তটি ধ্বংসাত্মক। ফেরাউনকে সে একথাই বুঝাতে চেয়েছিলো যে, মুসা হচ্ছে মস্তবড় যাদুকর। আপনি যদি তাকে হত্যা করেন, তবে লোকে ভাববে যাদু প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হওয়ার ফলেই আপনি পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলবার জন্য অনর্থক মুসাকে হত্যা করেছেন। ফলে একারণে জনবিক্ষোভও তো দেখা দিতে পারে।

বায়যাবী লিখেছেন, ফেরাউনের উদ্ধৃত উক্তি দ্বারা একথাই বুঝা যায় যে, সে হজরত মুসাকে ভিতরে ভিতরে সত্য পয়গম্বর বলে জানতো। তাই সে তাঁকে হত্যা করতে ভয় পাচ্ছিলো। অথবা সে বুঝতে পেরেছিলো হজরত মুসাকে হত্যা করা তার পক্ষে সহজ নয়। এরকম উদ্যোগ ব্যর্থ হবেই। তাই সে একথাও বলেছিলো যে 'সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক'। এরকম বলে সে তার দ্বিধাদ্বন্দ্বকে কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিলো। অর্থাৎ তার অন্তর্গত দুর্বলতা দূর করতেই সে এরকম বলতে চেয়েছিলো যে, মুসাকে তার প্রতিপালক সাহায্য করতে এগিয়ে আসলেও আমি তার পরওয়া করি না। আর 'আমাকে ছেড়ে দাও' কথাটি ছিলো বাকচাতুর্য। সে জনসাধারণকে একথাই বুঝাতে চাইছিলো যে, তাকে তার সঙ্গীসাথীরাও বাধা দিচ্ছে। নতুবা মুসাকে বধ করা তার জন্য কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিলো ভিন্ন। হজরত মুসার হস্তধৃত যষ্টির অলৌকিকত্ব তাকে ভিতরে ভিতরে ভীত-সন্ত্রস্ত করে ফেলেছিলো।

এখানে 'ইন্নী আখাফু আঁইইয়ুবাদ্দিলা দীনাকুম' অর্থ আমি আশংকা করি, সে তোমাদের ধর্মাদর্শের পরিবর্তন ঘটাবে। আর 'আও আঁই ইউজহিরা ফীল্ আরদ্বিল ফাসাদ' অর্থ অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, সেই সকল উদ্ধত ব্যক্তি থেকে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হচ্ছি'।

এখানে 'ইন্নী' (নিশ্চয়) শব্দটি গুরুত্বপ্রকাশক। বাক্যের শুরুতে একথা বসানো হয়েছে এই বিষয়টিকেই পরিস্ফুট করার জন্য যে, সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও পাপ পরিহার করার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে কায়মনোবাক্যে কেবল আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ। আর ওই সঙ্গিন অবস্থায় হজরত মুসার নিরাপত্তার উপরে নির্ভরশীল হওয়া তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য যেহেতু শিক্ষামূলকও ছিলো, তাই 'আমার' উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে 'তোমাদের'। অর্থাৎ এখানে হজরত মুসার 'আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হচ্ছি' কথাটির মধ্যে তাঁর অনুসারীদের জন্য এই উপদেশটিও নিহিত রয়েছে যে, তোমরাও উদ্ভূত বিপদ থেকে মুক্তির জন্য এভাবে আমার সঙ্গে আল্লাহ্র শরণ গ্রহণ কোরো। উল্লেখ্য, এরকম সম্মিলিত প্রার্থনাই অধিক ফলপ্রসূ হয়।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য, হজরত মুসা এখানে ফেরাউনের নাম নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেননি। বরং সাধারণভাবে পরকালে অবিশ্বাসী সকল অহংকারীর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র শরণ যাচনা করেছেন। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, ফেরাউনের ধ্বংসের কারণ দু'টি— পরকালে অবিশ্বাস ও ঔদ্ধত্য বা অহংকার। আবার এখানকার 'রব্বিকুম' (প্রতিপালক) অর্থ কেবল হজরত মুসা ও তাঁর অনুসারীদের প্রতিপালক নয়। বরং ফেরাউন ও তার অনুসারীদের প্রতিপালকও। অর্থাৎ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের প্রভুপালনকর্তা হচ্ছেন এক আল্লাহ, অন্য কেউ নয়, অবিশ্বাসীরা একথা না মানলেও।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

www.eelm.weebly.com

❑ ফির'আওন বংশের এক ব্যক্তি, যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখিত, বলিল, 'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এইজন্য হত্যা করিবে যে, সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ্,' অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে

সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছে? সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হইবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, সে তোমাদিগকে যে শাস্তির কথা বলে, তাহার কিছু তো তোমাদের উপর আপতিত হইবেই।' নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

❑ 'হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি আসিয়া পড়িলে কে আমাদিগকে সাহায্য করিবে?' ফির'আওন বলিল,'আমি যাহা বুঝি, আমি তোমাদিগকে তাহাই বলিতেছি। আমি তোমাদিগকে কেবল সৎপথই দেখাইয়া থাকি।'

❑ মু'মিন ব্যক্তিটি বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশংকা করি—

❑ 'যেমন ঘটিয়াছিল নূহ, 'আদ, ছামূদ এবং তাহাদের পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে। আল্লাহ্ তো বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করিতে চাহেন না।

www.eelm.weebly.com

❑ 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি আর্তনাদ দিবসের,

❑ 'যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরিয়া পলায়ন করিতে চাহিবে। আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না। আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই।'

❑ পূর্বেও তোমাদের নিকট ইউসুফ আসিয়াছিল স্পষ্ট নিদর্শনসহ; কিন্তু সে তোমাদের নিকট যাহা লইয়া আসিয়াছিল তোমরা তাহাতে বারবার সন্দেহ পোষণ করিতে। পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হইল তখন তোমরা বলিয়াছিলে, 'তাহার পরে আল্লাহ্ আর কোন রাসূল প্রেরণ করিবেন না।' এইভাবে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদিগকে—

❑ যাহারা নিজেদের নিকট কোন দলীল-প্রমাণ না থাকিলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, তাহাদের এই কর্ম আল্লাহ্ এবং মু'মিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এইভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করিয়া দেন।

❑ ফির'আওন বলিল, 'হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাহাতে আমি পাই অবলম্বন—

❑ 'অবলম্বন আসমানে আরোহণের, যেন দেখিতে পাই মূসার ইলাহ্‌কে; তবে আমি তো উহাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।' এইভাবে ফির'আওনের নিকট শোভনীয় করা হইয়াছিল তাহার মন্দ কর্মকে এবং তাহাকে নিবৃত্ত করা হইয়াছিল সরল পথ হইতে এবং ফির'আওনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছিল সম্পূর্ণরূপে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরাউন যখন নবী মুসাকে হত্যা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো, তখন ফেরাউনের বংশের এক লোক ফেরাউন ও তার অন্ধ সমর্থকদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, একাজ করা ঠিক হবে না। তিনি ছিলেন মু'মিন। কিন্তু তখন পর্যন্ত তিনি প্রকাশ্যে তাঁর বিশ্বাসের ঘোষণা দেননি।

তিনি বললেন, একজন লোক বলছে যে, তার প্রভুপালক আল্লাহ্ এবং সে তার দাবির সমর্থনে সুস্পষ্ট প্রমাণও প্রদর্শন করেছে। অথচ তোমরা তাকে বলছো মিথ্যাবাদী। ঠিক আছে, মিথ্যাবাদী যদি সে হয়েই থাকে তবে সেজন্য তো সে-ই দায়ী হবে। তোমাদের তাতে কী? কিন্তু যদি সে সত্যবাদী হয়, তখন তোমাদের পরিণতি কী হবে, তা কি ভেবে দেখেছো? সে যে শাস্তির কথা বলে, তার কিছু অংশও যদি তোমাদের উপরে নেমে আসে, তবুও তোমরা কেউই আত্মরক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা ক্ষান্ত হও। বাড়াবাড়ি কোরো না। যারা বাড়াবাড়ি করে এবং অসত্য কথা বলে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো সৎপথে পরিচালিত করেন না।

মুকাতিল ও সুদ্দী বলেছেন, ওই মুমিন ব্যক্তির নাম ছিলো কিবতী। তিনি ছিলেন ফেরাউনের পিতৃব্যপুত্র। সুরা আলকিসাসের একস্থানেও তাঁর প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন বলা হয়েছে 'এ সময় শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এলো'। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাঁর নাম ছিলো হাবীব। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, তিনি ছিলেন বনী ইসরাইল বংশোদ্ভূত এবং তাঁর নাম ছিলো 'জযইল'। হজরত ইবনে আব্বাস এবং অধিকাংশ আলেম এরকমই উল্লেখ করেছেন। ইবনে ইসহাক বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো খবুল।

'রব্বিয়াল্লহ্' অর্থ আমার প্রভুপালক আল্লাহ্। এখানে 'আল্লাহ্' এর পূর্বে 'রব্বি' উল্লেখিত হয়ে বক্তব্যটির চূড়ান্ত সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউই আমার 'রব' নয়। যেমন 'সদিক্বী যায়দুন' (জায়েদ ব্যতীত আমার বন্ধু আর কেউ নেই)। 'বিল বাইয়্যিনাত' অর্থ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি। 'মির্ রব্বিকুম' অর্থ প্রভুপালকের নিকট থেকে। অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বা অলৌকিকত্ব প্রদান করতে পারেন কেবল আল্লাহ্, যিনি সকলের ও সকল কিছুর স্রষ্টা এবং তাদের উপরে পরিপূর্ণ ক্ষমতাশালী। আর 'রব' এর সঙ্গে 'কুম' যোগ করার মধ্যে এই ইঙ্গিতটিও রয়েছে যে, যিনি তোমাদের সৃজয়িতা ও পালয়িতা, তিনি কেবল তোমাদের উপরে শাস্তি অবতীর্ণ করার ক্ষমতাধারী।

'মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হবে' অর্থ মিথ্যাবাদীই যদি সে হয়, তবে তাকে আর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ভেবে লাভ কী? কী দরকার একজন মিথ্যাবাদীকে হত্যা করে তাকে গুরুত্ব দেওয়ার? এরকম ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়াই তো উত্তম। এর পরের বাক্যটির অর্থ— আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে তো তার সম্পর্কে সতর্ক ও সংযত হওয়া তোমাদের জন্য জরুরী। কারণ তাকে না মানলে যে শাস্তি আপতিত হওয়ার কথা সে বলে, সেই শাস্তির অতিসামান্য অংশ তোমাদের ধ্বংস হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এভাবে উপস্থাপিত নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত এই বাক্যটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃত ন্যায়ানুগতা, সুবিচার। কেননা এখানে 'যদি সে সত্যবাদী হয়' বলার আগেই উল্লেখ করা হয়েছে 'সে মিথ্যাবাদী হলে'। শুভযুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার এটাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

'ইন্নাল্লহা লা ইয়াহ্দী মান্ হুয়া মুস্রিফুন্ কাজ্জাব' অর্থ নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। এটা হচ্ছে তৃতীয়

www.eelm.weebly.com

সতর্কতা, যা করা হয়েছে দু'টি পন্থায়— ১. যদি সে সীমালংঘনকারী হতো, নবী না হয়েও নবুয়তের মিথ্যা দাবী করে বসতো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দান করতেন না, অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের উপায়ও তার জানা থাকতো না ২. আর মিথ্যাবাদী যদি সে হয়, তবে আল্লাহ্ই তো তাকে ধ্বংস করে দিবেন। সুতরাং তাকে হত্যা করার দরকারই বা কী? ওই ব্যক্তিটি হয়তো প্রথমোক্ত পন্থাকেই সতর্কীকরণ কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করেছিলেন। পরের পন্থাটি তো ছিলো ফেরাউন ও তার বশংধরদের ক্রোধ প্রশমনমূলক। আর একথাটি ফেরাউনের প্রতিও ছিলো প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষ হুমকি। কারণ প্রকৃতপক্ষে সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদী তো ছিলো সে-ই।

ওরওয়া ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আমি একবার আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আসকে বললাম, আমাকে বলুন, অবিশ্বাসীরা রসুল স.কে সবচেয়ে মারাত্মক নির্যাতন করেছিলো কখন? তিনি বললেন, তিনি স. একবার কাবা শরীফের চত্বরে নামাজ পাঠ করছিলেন। এমন সময় উকবা ইবনে আবু মুঈত এসে তাঁর দুই কাঁধ থাবা দিয়ে ধরলো এবং তাঁর গায়ের চাদর গলায় জড়িয়ে দিয়ে তাঁকে জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিতে শুরু করলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হলেন আবু বকর। তিনি উকবার দুই কাঁধ ধরে সজোরে ছাড়িয়ে আনলেন রসুল স. এর কাছ থেকে। বললেন, 'তোমরা কি এই ব্যক্তিকে এজন্য হত্যা করবে যে, তিনি বলেন, আমার প্রভুপালক আল্লাহ্'।

হজরত আলী একদিন এক জনসমাবেশে বললেন, উপস্থিত জনতা ! বলতো, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ কে? জনতা বললো, জানি না। তিনি বললেন, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ হচ্ছেন আবু বকর। আমি তাঁর বীরত্বের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। একদিন দেখেছি, কুরায়েশ পৌত্তলিকেরা রসুল স. এর উপর আক্রমণ করলো। একজন তাঁকে জোরপূর্বক অবনত করাতে চেষ্টা করছিলো, আর একজন তাঁকে নিয়ে করছিলো টানা হেঁচড়া। বলছিলো, কী, তুমি নাকি সকল উপাস্যকে এক উপাস্য বানাতে চাও? এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর হজরত আলী আবেগভরে বলে উঠলেন, আল্লাহ্র শপথ! তখন আমাদের কেউ তাঁকে সাহায্য করতে যায়নি। গিয়েছিলেন কেবল আবু বকর। তিনি তাদের একজনকে ধাক্কা দিয়ে একদিকে সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং অন্যজনকে টেনে ধরে বলেছিলেন, তোমরা কি একজন লোককে কেবল এজন্যেই হত্যা করতে চাও, যে বলে, আমার প্রভুপালনকর্তা আল্লাহ্। এ পর্যন্ত বলার পর হজরত আলী পুনরায় থামলেন। চেহারা থেকে সরিয়ে ফেললেন চাদর। তারপর এমনভাবে কাঁদতে শুরু করলেন যে, ভিজে গেলো তার শ্মশ্রু। কান্না কিছুটা প্রশমিত হলে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, এবার তোমরা বলো, ফেরাউন বংশের ওই মুমিন ব্যক্তিটি উত্তম, না আবু বকর? জনতা নির্বাক। তিনি বললেন, তোমরা জবাব দিচ্ছো না কেনো? আল্লাহ্র কসম! আবু বকরের জীবনের একটি মুহূর্ত ওই মুমিনের সমস্ত জীবন অপেক্ষা উত্তম। কেননা তিনি তাঁর ইমানকে গোপন রেখেছিলেন, আর আবু বকর তার ইমান প্রকাশ করেছিলেন অত্যন্ত তেজস্বিতার সঙ্গে।

হজরত আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, একদিনের ঘটনা। রসুল স. মাত্র কাবা প্রদক্ষিণ শেষ করেছেন। এমন সময় কয়েকজন এসে আক্রমণ করে বসলো তাঁকে। তাঁর পবিত্র উত্তরীয়ের প্রান্ত আকর্ষণ করে বললো, তুমি নাকি আমাদের পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ধর্মাদর্শের বিরুদ্ধে কথা বলো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। হঠাৎ সেখানে হাজির হলেন হজরত আবু বকর। তিনি তাঁকে ছাড়িয়ে নিলেন দুর্বৃত্তদের কবল থেকে। উচ্চকণ্ঠে পাঠ করতে লাগলেন 'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এজন্য হত্যা করবে, যে বলে, আমার প্রভুপ্রতিপালক আল্লাহ্'। তাঁর দু'চোখ থেকে তখন অশ্রু ঝরে পড়ছিলো।

হজরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, একবার লোকেরা রসুল স.কে এমনভাবে প্রহার করলো যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। অকস্মাৎ সেখানে আবু বকর উপস্থিত হয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত। তোমরা কি একজনকে কেবল একারণেই হত্যা করতে চাও, যে বলে, আমার প্রভুপালয়িতা আল্লাহ্। তাদের কেউ কেউ বললো, এ আবার কে? অন্যরা জবাব দিলো, আবু কোহাফার পুত্র।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন বললো, আমি যা বুঝি, আমি তোমাদেরকে তা-ই বলছি। আমি তোমাদেরকে কেবল সৎপথই দেখিয়ে থাকি'।

এখানে 'জহিরীনা ফীল আরদ্ব' অর্থ দেশে তোমরাই প্রবল। অর্থাৎ এই মিসররাজ্য এখন তোমাদেরই করতলগত। তাই ক্ষমতা-মদমত্ততার কারণে দর্পান্ধ হয়ো না। ভেবে দেখো, আল্লাহ্র গজব যদি আসে তবে ছারখার হয়ে যাবে তোমাদের এই সাধের সাম্রাজ্য। বলো, তখন কে সাহায্য করবে আমাদেরকে?

'কে আমাদেরকে সাহায্য করবে' মুমিন ব্যক্তির একথায় বুঝা যায়, তিনিও ছিলেন ফেরাউন বংশের। অর্থাৎ কিবতী। তাই তিনি 'তোমাদেরকে' না বলে বলেছেন 'আমাদেরকে'।

'আমি যা বুঝি, আমি তোমাদেরকে তা-ই বলছি' ফেরাউনের একথার অর্থ— দ্যাখো হে মিসরবাসী! তোমরা এরকম মনে কোরো না যে, না বুঝেসুঝে আমি তোমাদেরকে এরকম বলছি। 'মুসাকে হত্যা করতে হবে' একথা বলছি আমি গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করে এবং ভালোভাবে বুঝেসুঝে। আর এখানে 'সাবিলার রাশাদ' অর্থ সৎপথ।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'মুমিন ব্যক্তিটি বললো, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশংকা করি—(৩০) যেমন ঘটেছিলো নুহ, আদ, ছামুদ এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে। আল্লাহ্ তো বান্দাদের প্রতি কোনো জুলুম করতে চান না (৩১)। একথার অর্থ— বিশ্বাসী ব্যক্তিটি তখন বললেন, হে আমার স্বজাতি! মুসাকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলছো, তাকে বধ করতে চাইছো, কিন্তু আমি তো

তোমাদের এরকম আচরণের সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছি অতীত যুগের দুর্বিনীত জাতিগোষ্ঠীগুলোর। যেমন নবী নুহের সম্প্রদায়, আদ, ছামুদ ইত্যাদি। তারাও তো তাদের প্রতি প্রেরিত বার্তাবাহকগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো, হত্যা করতে চেয়েছিলো তাঁদেরকে। ফলে তাদের উপরে এসে পড়েছিলো আল্লাহ্‌র গজব। আমার তো আশংকা হচ্ছে, তোমরাও তাদের মতো গজব ডেকে আনতে চাও। মনে রেখো, আল্লাহ্ কখনো কারো উপরে জুলুম করতে চান না।

'ওয়া মাল্লহু ইউরীদু জুল্‌মাল্‌লিল্ ইবাদ' অর্থ আল্লাহ্ তো বান্দাদের উপর কোনো জুলুম করতে চান না। এখানে 'লিল্ ই'বাদ' এর 'লাম' অক্ষরটি অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত এবং 'আলই'বাদ' হচ্ছে এখানে ক্রিয়ার কর্ম। অতিরিক্ত 'লাম' অক্ষরটি 'জুলুম' এর শক্তি যোগানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্ তার কোনো বান্দার উপরেই জুলুম করতে চান না, কেউ বিনা দোষে শাস্তি পাক এবং কোনো অত্যাচারী তার প্রাপ্য শাস্তি ছাড়াই রেহাই পেয়ে যাক, অথবা কারো লঘু পাপে গুরুদণ্ড, কিংবা কারো গুরুপাপে লঘুদণ্ড হোক, এরকম অভিপ্রায় তাঁর নেই।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি আর্তনাদ দিবসের (৩২), যেদিন তোমরা পেছন ফিরে পলায়ন করতে চাইবে। আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবার কেউ থাকবে না। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই'(৩৩)।

এখানে 'ইয়াওমা তুওয়াল্‌লূনা মুদ্‌বিরীন' অর্থ সেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাইবে। মুজাহিদ বলেছেন, এর অর্থ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা, কিন্তু পালাতে না পারা। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে 'যেদিন' অর্থ শিঙ্গার অজ্ঞানকারী ফুৎকারের আগের ভীতিসঞ্চারক ফুৎকারের দিন। ওই দিনের শিঙ্গাধ্বনি শুনে লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তারপর ধ্বনিত হবে অজ্ঞানকারী ফুৎকার। তখন সকলে বেহুঁশ হয়ে ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। ইবনে জারীর তাঁর 'মোতাওয়ালাত্' গ্রন্থে, আবু ইয়া'লী তাঁর 'মুসনাদ' পুস্তকে, বায়হাকী তাঁর 'আল বা'ছ' কিতাবে, আবু শায়েখ তাঁর 'কিতাবুল উজমাহ'তে এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবদ ইবনে হুমাইদ এক দীর্ঘ হাদিসে বর্ণনা করেছেন, যাতে বলা হয়েছে শিঙ্গার ফুৎকার ধ্বনিত হবে তিনবার। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ ইস্রাফিলকে প্রথমবার আদেশ দিবেন, ভীতিসঞ্চারক ফুৎকার দাও। ইস্রাফিল তাই করবেন। ফলে আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা ভয়ে আতঙ্কে কাঁপতে থাকবে থর থর করে। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করবেন সে থাকবে আতঙ্কমুক্ত। ইস্রাফিল শিঙ্গায় ফুৎকার দিতে থাকবেন বিরতিহীনভাবে। মাঝে মাঝে থেমে দম নিবেন, এমনভাবে নয়। তখন ভয়ে-আতংকে অধীর হয়ে কোলের সন্তানকে দুধ পান করাতে ভুলে যাবে স্তন্য-দায়িনী জননীরা। ভয়ের চোটে গর্ভপাত ঘটবে গর্ভবর্তীদের। শিশুদের মাথার চুল হয়ে যাবে শাদা। শয়তান তখন ভয়ে অস্থির

হয়ে পালিয়ে বেড়াবে আড়ালে আবডালে। পৃথিবীর প্রান্তসীমায় পৌঁছলে ফেরেশতারা মুষ্টাঘাত করবে তার চেহারায়। মানুষজন পিছন ফিরে পালাতে থাকবে। শুরু করবে শোরগোল, হইহুল্লোড়।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানকার 'ইয়াওমাত্ তানাদ' অর্থ আহবান দিবস অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন, যখন সকল মানুষকে ডাকা হবে তাদের নেতাদের সঙ্গে। আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, আবু হাসেম আরাজ নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন, আরাজ! বিচারের দিন যখন বলা হবে, হে অমুক অমুক পাপিষ্ঠ! তখন তুই দাঁড়াবি গিয়ে পাপিষ্ঠদের দলে। পুনরায় যখন ঘোষণা করা হবে, হে অমুক অমুক প্রকৃতির অপরাধী! তখন সে দলেও তো তুই ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়বি। আমি তো দেখছি, তুই সব ধরনের অপরাধীদের দলভূত হতে চাস। হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে আবী আসেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে আল্লাহ্‌র দুশমনেরা! ওই সময় দোজখী ও বেহেশতীরা একে অপরকে ডাকবে। বেহেশত-দোজখের মধ্যবর্তী স্থানের অধিবাসীরাও ডাকাডাকি করতে থাকবে তাদেরকে। সুরা আ'রাফে এরকমই বর্ণনা করা হয়েছে। আর ওই সময়েই ঘোষণা করে দেওয়া হবে সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগা কারা? বলা হবে, শোনো সকলে, অমুকের পুত্র অমুক সৌভাগ্যশালী। সে আর কোনো দিনও দুর্ভাগ্যকবলিত হবে না। আরো শোনো, অমুকের পুত্র অমুক হচ্ছে হতভাগা। সে আর কখনো সৌভাগ্যের দেখা পাবে না।

হজরত আনাস সূত্রে বায্যার ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শেষ বিচারের দিন আদম সন্তানদেরকে সমবেত করা হবে মীযানের দুই পাল্লার মাঝামাঝি জায়গায়। তাদের পাপ-পুণ্য ওজন করবার জন্য সেখানে নিযুক্ত করা হবে এক ফেরেশতাকে। সে ফলাফল ঘোষণা করবে এমন উচ্চস্বরে যে, তা কর্ণকুহরে পৌঁছবে সকল সৃষ্টির। কারো পুণ্যের পাল্লা

www.eelm.weebly.com

অধিকভারী হলে সে বলবে, অমুক ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী। সে আর কখনো দুর্ভাগ্যের শিকার হবে না। আর পাপের পাল্লা ভারী হলে বলবে, অমুক ব্যক্তি হতভাগা। আর কখনোই সে সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারবে না। তখন অদৃশ্য থেকে ভেসে আসবে এই ঘোষণাটি— আমি তোমার জন্য একটি সম্পৃক্ততা প্রস্তুত রেখেছিলাম। অথচ তুমি গ্রহণ করেছো অন্য এক সম্পৃক্ততাকে। তিবরানী তাঁর 'আল আওসাত' গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিনে আল্লাহ্ ঘোষণা করবেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা শোনো, আমি তোমাদের জন্য এক সম্পৃক্ততা স্থির করে রেখেছিলাম, অথচ তোমরা বেছে নিয়েছো ভিন্ন এক সম্পৃক্ততাকে। আমি পুণ্যবানগণকে করেছিলাম সবচেয়ে সম্মানার্হ। অথচ তোমরা তাদেরকে মান্য করোনি। বলেছিলে, অমুকের পুত্র অমুকই উত্তম। আজ আমি আমা কর্তৃক মনোনীত সম্পৃক্তিকে করবো সমুচ্চ। আর তোমাদের সম্পৃক্তিকে করবো অবনত। কোথায় আছো বিশ্বাসী ও ধর্মানুরাগীরা! এখন তো মৃত্যুর মৃত্যু ঘটানো হয়েছে।
সুতরাং হে বেহেশতবাসী! তোমাদের বেহেশতবাস হবে চিরকালীন। আর হে দোজখবাসী! তোমাদের দোজখবাসও চিরদিনের জন্য।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যখন বেহেশতবাসীরা বেহেশতে এবং দোজখবাসীরা দোজখে চলে যাবে, তখন মৃত্যুকে জবাই করা হবে বেহেশত-দোজখের মধ্যবর্তী স্থানে। তারপর এক ঘোষক ঘোষণা করবে, হে বেহেশতের অধিবাসীরা, শোনো, আর কোনোদিন তোমাদেরকে মৃত্যু স্পর্শ করবে না। আর হে দোজখের বাসিন্দারা! তোমরাও শোনো, তোমরাও মৃত্যুমুখে পতিত হবে না আর কোনোদিন। ওই ঘোষণা শোনার পর বেহেশতবাসীদের আনন্দ যাবে বেড়ে এবং বেড়ে যাবে দোজখবাসীদের দুঃখ। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাকেম এবং ইবনে হাব্বান এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস ও জুহাক এখানকার 'ইয়াওমাত্ তানাদ' কথাটিকে উচ্চারণ করতেন 'ইয়াওমাত্ তানাদ্দু'। অর্থাৎ তাঁরা শেষ অক্ষর 'দাল' কে উচ্চারণ করতেন 'তাশদীদ' সহযোগে। এভাবে পাঠ করলে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— বিক্ষিপ্তভাবে ছুটাছুটি করার দিন। অর্থাৎ দড়ি ছিঁড়ে উট যেমন তার মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে এদিক সেদিক ছুটে বেড়ায়, সেভাবে সেদিন লোকেরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে। ইবনে জারির ও ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, জুহাক বলেছেন, কিয়ামত আসন্ন হলে আল্লাহ্ প্রথম আকাশকে আদেশ করবেন, ফেটে যাও। সঙ্গে সঙ্গে তা ফেটে যাবে। ফেরেশতারা অবস্থান গ্রহণ করবে একপ্রান্তে। এরপর আল্লাহ্র নির্দেশানুসারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে তারা ঘিরে ফেলবে পৃথিবীবাসীদেরকে। অন্যান্য আকাশ ও আকাশবাসীদেরকে সমবেত করা হবে এভাবে। অর্থাৎ তাদের আকাশও আল্লাহ্র আদেশে ফেটে যাবে এবং তাদেরকেও শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে অন্যান্যদের মতো। অবশেষে আবির্ভূত হবেন মহানতম প্রভুপালনকর্তা আল্লাহ্। দোজখ থাকবে বামদিকে এবং বেহেশত ডান দিকে। দোজখকে দেখে পৃথিবীবাসীরা সভয়ে ছুটে পালাতে থাকবে। কিন্তু যে প্রান্তেই তারা যাকনা কেনো সম্মুখীন হবে ফেরেশতাদের দুর্ভেদ্য বেষ্টনীর। অনন্যোপায় হয়ে তারা ফিরে আসবে পূর্বের স্থানে। এরকম পরিস্থিতির কথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে 'আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি আর্তনাদ দিবসের, সেদিন তোমরা পেছন ফিরে পলায়ন করতে চাইবে। আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবার কেউ থাকবে না'। অন্যান্য আয়াতেও অবতারণা করা হয়েছে প্রসঙ্গটির। যেমন— 'এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন', 'হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! নভোমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠের সীমানা অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম করো' এবং 'সেদিন আকাশ বিদীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হবে এবং ফেরেশতারা থাকবে আকাশের প্রান্তদেশে। অবস্থা এরকম হবে যে, লোকজন এক আওয়াজ শুনবে এবং চলতে থাকবে হিসাবের দিকে'। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এখানকার 'সেদিন তোমরা পেছন ফিরে পলায়ন করতে চাইবে' কথাটির অর্থ করেছেন— সেদিন লোকজন হিসাবের স্থান থেকে দোজখের দিকে ফিরে যাবে।

'মা লাকুম মিনাল্লহি মিন আ'সিম' অর্থ আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবার কেউ থাকবে না। অর্থাৎ তখন আল্লাহ্র শাস্তি প্রতিহত করবার ক্ষমতা কারো থাকবে না। আল্লাহ্র শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারে কেবল তাঁর অনুকম্পা (রহমত)। কিন্তু সে অনুকম্পা তোমাদের ভাগ্যে জুটবে না। আর 'ওয়া মাঁই য়ুদ্বলিলিল্লাহু ফামা লাহু মিন হাদ্' অর্থ আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'পূর্বেও তোমাদের প্রতি ইউসুফ এসেছিলো স্পষ্ট নিদর্শনসহ; কিন্তু তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছিলো, তোমরা তাতে বার বার সন্দেহ পোষণ করতে। পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হলো, তখন তোমরা বলেছিলে, তার পরে আল্লাহ্ আর কোনো রসুল প্রেরণ করবেন না। এভাবে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদেরকে—'। একথার অর্থ— মুসা তোমাদের প্রতি প্রেরিত প্রথম পয়গম্বর নন। এর আগেও তোমাদের নিকট আল্লাহ্র এককত্বের ও নবুয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন নবী ইউসুফ। কিন্তু তোমরা সেগুলোকে সব সময়

সন্দেহের চোখে দেখতে। যখন তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটলো, তখন তোমরা মনে করলে, বাঁচা গেলো। আর আমাদের কাছে কোনো প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ করা হবে না। কিন্তু তোমাদের এমতো ধারণা বিভ্রান্তিমূলক। আর আল্লাহ্ই এভাবে বিভ্রান্ত হতে দেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়পন্থীদেরকে।

এখানে 'ইউসুফ' বলে যদি নবী ইয়াকুবের পুত্র ও নবী ইব্রাহিম তনয় নবী ইসহাকের প্রপৌত্র নবী ইউসুফকে মনে করা হয়, তবে বুঝতে হবে নবী ইউসুফের সমকালীন ফেরাউন নবী মুসার জামানাতেও জীবিত ছিলো। কিন্তু নবী ইউসুফের মহাতিরোধানের চারশ' বছর পর আবির্ভূত হয়েছিলেন নবী মুসা। সুতরাং তথ্যটি ইতিহাসসম্মত নয়। সেকারণেই কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে নবী ইউসুফ তনয় আফরাইমের পুত্র ইউসুফের কথা। এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে ইয়াকুবপুত্র ইউসুফের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু পূর্বপুরুষদের উপযুক্ত উত্তরপুরুষকেও তাদের স্বনামধন্য পূর্বপুরুষদের অভিধায় সম্বোধন করার রীতিটি সুপ্রচল, তাই বুঝতে হবে, এখানে তোমাদের নিকট কথাটির অর্থ হবে তোমাদের পূর্বপুরুষদের নিকট।

এখানে 'মিন ক্বাবলু' অর্থ পূর্বেও। 'বিল্বাইয়্যিনাত' অর্থ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ। 'মিম্মা জ্বাআকুম বিহী' অর্থ তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন, তিনি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন বিশুদ্ধভাবে এক আল্লাহ্র ইবাদত করার যে আদেশ। 'হাত্তা ইজা হালাক' অর্থ নবী ইউসুফের মহাপ্রয়াণের পর। 'মুসরিফুন' অর্থ সীমালংঘনকারী এবং 'মুরতাব্' অর্থ সংশয়বাদী।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'যারা নিজের নিকট কোনো দলিল প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, তাদের এই কর্ম আল্লাহ্ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এইভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও

স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন'। একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কোনো প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহ্র বাণীর বিষয়ে বাক-বিতণ্ডা শুরু করে দেয়, আল্লাহ্ তাদের এমতো স্থূল তর্ক-বিতর্ককে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন। বিশ্বাসীগণও ঘৃণা করেন তাদের এ ধরনের অপকর্মকে। এভাবেই আল্লাহ্ অবশেষে মোহরাঙ্কিত করে দেন প্রত্যেক অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীদের হৃদয়।

এখানে 'আল্লাজিনা ইউজ্বাদিলূনা' (বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়) হচ্ছে প্রথমোক্ত যোজকের পরিবর্ত। কেননা পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত প্রথম যোজক 'মানহুয়া' (কে সে) বহুবচনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 'সুলত্বন' অর্থ দলিল-প্রমাণ।

'কাবুরা মাক্বতান' (অতিশয় ঘৃণার্হ) কথাটির 'কাবুর' এর সর্বনাম কেবল 'মান' এর দিকে সংযোজিত। কেননা 'মান' শব্দটি বহুবচনার্থক হলেও একবচন। এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'আল্লাজীনা ইউজ্বাদিলূনা' এর পূর্বে একটি সম্বন্ধপদ রয়েছে উহ্য। আর 'কাবুর' এর সর্বনাম ওই উহ্য কথাটির সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— জ্বিদালুল্ লাজীনা ইউজ্বাদিলূনা'। বক্তব্যটির অনুবাদ করা হয়েছে অবশ্য সেভাবেই।

'এভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন' কথাটির অর্থ এভাবে অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীদের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর করে দেন বলেই তাদের অন্তরে সত্যের আলো প্রবেশের পথ হয়ে যায় রুদ্ধ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ করো এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি পাই অবলম্বন—(৩৬) অবলম্বন আসমানে আরোহণের। যেনো দেখতে পাই মুসার ইলাহ্কে, তবে আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি'। এভাবে ফেরাউনের নিকট শোভনীয় করা হয়েছিলো তার মন্দ কর্মকে এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিলো সরল পথ থেকে এবং ফেরাউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিলো সম্পূর্ণরূপে'(৩৭)।

এখানে 'সারহা' অর্থ সুউচ্চ প্রাসাদ, মিনার— যা বহুদূর থেকেও দৃষ্ট হয়। এই হিসেবে 'তাসরীহ' অর্থ 'প্রকাশিত'ও হয়। 'আস্বাবাস্ সামাওয়াত্' অর্থ আকাশে আরোহণের অবলম্বন, আকাশের দরোজা। অর্থাৎ এক আকাশ থেকে অন্য আকাশ পর্যন্ত পৌঁছানের পথ। 'সবব' বলা হয় কোনো বস্তু পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যমকে। পানি পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম বলে রশি ও বালতিকে 'সবব' বলা হয় একারণেই। উল্লেখ্য, নমরুদও ফেরাউনের মতো এরকম সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলো। তার সেই প্রাসাদ নির্মাণের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সুরা নমলের তাফসীরে।

বায়যাবী লিখেছেন, অনেক উপরে উঠে নক্ষত্ররাজির অবস্থান ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্যই হয়ত সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলো ফেরাউন। কেননা নক্ষত্র সমূহের গতিবিধির অবস্থাই হচ্ছে 'আস্বাবাস্ সামাওয়াত্' (আকাশ সম্পর্কীয় উপকরণ), যা ভূপৃষ্ঠের ঘটনাসমূহকে সুস্পষ্ট করে। আকাশের উপকরণসমূহ দেখে সে হয়তো জানতে চেয়েছিলো, হজরত মুসাকে কি সত্যি

www.eelm.weebly.com

সত্যি আল্লাহ্ই পাঠিয়েছেন, না অন্য কেউ। এরকমও হতে পারে যে, সে জনসমক্ষে হজরত মুসার উক্তিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলো। কেননা সে হয়তো মনে করতো, এভাবে আকাশে না উঠে আকাশের আল্লাহ্র সংবাদ কোনো মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, এসকল কিছুই ছিলো তার মূর্খজনোচিত চিন্তা। অর্থাৎ সে ছিলো নিরেট স্থূলদর্শী। সে না জানতো আল্লাহ্কে, না জানতো নবুয়তপ্রাপ্তির নিয়মাবলী।

'এভাবে ফেরাউনের নিকট শোভনীয় করা হয়েছিলো তার মন্দ কর্মকে' কথাটির অর্থ— যেভাবে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করে আল্লাহকে দেখার হাস্যকর চিন্তাকে তার দৃষ্টিতে শোভন করা হয়েছিলো, সেভাবে তার চোখে সুন্দর করে দেওয়া হয়েছিলো তার সকল অপকর্মকে। অর্থাৎ ফেরাউনের দৃষ্টিভঙ্গিকেই আল্লাহ্ পর্যুদস্ত করে দিয়েছিলেন। তাই তার মন্দ কাজগুলোও তার দৃষ্টিতে মনে হতো ভালো।

'এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিলো সরল পথ থেকে' কথাটির অর্থ সত্য সরলপথাভিসারী হওয়া থেকে আল্লাহ্ই তাকে নিরস্ত রেখেছিলেন। তাই সে পুরোপুরিভাবে ছিলো সৎপথপ্রাপ্তির চিন্তাচ্যুত। এতে করে একথাটিও প্রমাণিত হয় যে, সৎপথ প্রাপ্তি ও বিভ্রান্তি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র চিরস্বাধীন ও চিরঅমুখাপেক্ষী অভিপ্রায়নির্ভর। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন পথ দেখান। যাকে ইচ্ছা করেন না সে থেকে যায় পথভ্রষ্ট। একথাটিও এখানে সুপ্রমাণিত যে, পথভ্রষ্টদের সকল প্রচেষ্টা অবশ্যই অসফল হয়। তাই শেষে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে— এবং ফেরাউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিলো সম্পূর্ণরূপে।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

❑ মু'মিন ব্যক্তিটি বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিব।

❑ 'হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হইতেছে চিরস্থায়ী আবাস।

❑ 'কেহ মন্দ কর্ম করিলে সে কেবল তাহার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাইবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যাহারা মু'মিন হইয়া সৎকর্ম করে তাহারা দাখিল হইবে জান্নাতে, সেথায় তাহাদিগকে দেওয়া হইবে অপরিমিত জীবনোপকরণ।

❑ 'হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য! আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকিতেছ অগ্নির দিকে!

www.eelm.weebly.com

❑ 'তোমরা আমাকে বলিতেছ আল্লাহ্কে অস্বীকার করিতে এবং তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে, যাহার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নাই; পক্ষান্তরে আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দিকে।

❑ নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে আহ্বান করিতেছ এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আহ্বানযোগ্য নহে। বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্র নিকট এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।

❑ 'আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি, তোমরা তাহা অচিরেই স্মরণ করিবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্তে অর্পণ করিতেছি; আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।'

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— বিশ্বাসী ব্যক্তিটি তখন ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে লক্ষ্য করে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃ-ভগ্নিবৃন্দ! তোমরা আমার কথা শোনো। অনুসরণ করো আমার শুভ উপদেশের। আমি তোমাদেরকে মুসা-হারুন নবী ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুসরণের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। এই পথই সরল সঠিক পথ। হে আমার জাতিগোষ্ঠী! এই পৃথিবীর সাময়িক সাফল্যের প্রতি দৃকপাত কোরো না। পার্থিব জীবন ও ভোগসম্ভার তো মাত্র কিছুদিনের জন্য। পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন। সুতরাং পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত হও। মন্দ কর্মের পরিণাম অত্যন্ত মন্দ। যারা মন্দ কর্ম করবে তারা তাদের কর্মানুপাতে শাস্তি পাবেই। আর যে সকল নারী-পুরুষ বিশ্বাসী হয়ে পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত হবে, তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে। সেখানে তাদেরকে দেওয়া হবে অপরিমেয় সম্ভোগসম্ভার।

এখানে 'সাবিলার রাশাদ' অর্থ সরল সঠিক পথ, যে পথের শেষে রয়েছে সফল গন্তব্য। 'মাতাউ'ন' অর্থ অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। 'দারুল ক্বরার' অর্থ চিরস্থায়ী আবাস। 'ওয়া হুয়া মু'মিনুন' অর্থ বিশ্বাসী হয়ে। ইমান বা বিশ্বাসই হচ্ছে সকল পুণ্যকর্মের পুরস্কারপ্রাপ্তির শর্ত। কেননা আল্লাহ্ই হচ্ছেন সকল কর্মের প্রতিফলপ্রদাতা। কাজেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী না হয়ে পুণ্যকর্মের প্রতিদান আশা করা যায় না। আর পুণ্যকর্মসমূহের প্রকৃত উদ্দেশ্যই তো হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তোষসাধন। সুতরাং পুণ্যকর্ম সম্পাদনের পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তো করতেই হয়। আর 'বি গইরি হিসাব' অর্থ অপরিমিত। অর্থাৎ আল্লাহ্র একান্ত অনুগ্রহে জান্নাতবাসীদেরকে দেওয়া হবে অফুরন্ত সম্ভোগোপকরণ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'হে আমার সম্প্রদায়! কী আশ্চর্য! আমি তোমাদেরকে আহবান করছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকছো অগ্নির দিকে (৪১)! তোমরা আমাকে বলছো আল্লাহ্কে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে, যার সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই; পক্ষান্তরে আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দিকে' (৪২)।

এখানে 'মালী' অর্থ কী আশ্চর্য! অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধির পরিপন্থী অপবিশ্বাস তোমরা এখনো আঁকড়ে ধরে রয়েছো, আশ্চর্য! 'ইলান্ নাজাতি' অর্থ মুক্তির দিকে। 'ইলান্ নার' অর্থ অগ্নির দিকে। আর এখানকার 'তাদ্উনানী লিআক্ফুরা বিল্লাহ্ (তোমরা আমাকে বলছো আল্লাহ্কে অস্বীকার করতে) কথাটি পূর্বের বাক্যের 'তাদউনানী ইলান্ নার' (আমাকে ডাকছো অগ্নির দিকে) কথাটির অনুবর্তন। অথবা বিবরণ। শুভপ্রার্থনার অভিপ্রায় প্রকাশের ক্ষেত্রে আরবী ভাষায় সাধারণতঃ 'ইলা' এবং 'লাম' অব্যয় ব্যবহৃত হয়। হেদায়েত শব্দ এবং তার থেকে উদ্গত শব্দাবলীও সাধারণতঃ এভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

'মা লাইসা লি বিহী ই'লম' অর্থ যার সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই। অর্থাৎ অংশীবাদিতার পক্ষের কোনো প্রমাণ আমার কাছে নেই। বরং আমার হাতে রয়েছে এর বিপরীত অকাট্য প্রমাণ। ইমানের পক্ষে এমন প্রমাণ থাকবে যা, যার উপরে ইমান আনতে হবে তার উপাস্য ও প্রভুপালক হওয়াকে সুস্পষ্ট করতে পারে। কেননা প্রমাণ ব্যতিরেকে বিশ্বাস জন্মাতে পারে না এবং সে বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ছাড়া বিশ্বাসও বিশুদ্ধ হয় না।

'আলআ'যীয' অর্থ পরাক্রমশালী, যিনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। আর 'আল গাফ্ফার' অর্থ ক্ষমাশীল, যিনি তাঁর ইচ্ছামতো বিশ্বাসীদের পাপ মার্জনা করেন। অর্থাৎ সর্বময় প্রভুত্ব ও প্রতিপালকত্বের সকল গুণাবলীই তাঁর রয়েছে। তিনি যেমন পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী, তেমনি জ্ঞানে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারেও সম্পূর্ণ স্বাধীন।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে আহ্বান করছো এমন একজনের দিকে, যে দুনিয়া ও আখেরাত কোথাও আহবানযোগ্য নয়। বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্র নিকট এবং সীমালংঘনকারীরাই

জাহান্নামের অধিবাসী (৪৩)। আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা তা অচিরেই স্মরণ করবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্তে অর্পণ করছি; আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন' (৪৪)।

'লা জ্বারমা' অর্থ নিঃসন্দেহে। 'লা' হচ্ছে না সূচক। অর্থাৎ সন্দেহ নেই যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আমন্ত্রণ অযৌক্তিক। এভাবে প্রথমোক্ত বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— তোমরা আমাকে যে মূর্তিপূজার দিকে আহ্বান জানাচ্ছো, ইহ-পরকালে তার

www.eelm.weebly.com

ভিত্তিহীন ও তুচ্ছ হওয়া অনিবার্য। কেননা তা অপ্রাণ, জড়পদার্থ, সে না পৃথিবীতে কাউকে তার উপাসনার দিকে আহ্বান করে, না পরকালে সে তার উপাসকদের পক্ষে থাকবে, বরং তাদের প্রতি সে তখন প্রকাশ করবে তার ঘোর অসন্তোষ। অর্থাৎ অংশীবাদিতার পক্ষের আমন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য। সুদ্দী বলেছেন, বক্তব্যটির অর্থ— প্রতিমারা পৃথিবীতে কারো প্রার্থনা যেমন পূরণ করতে পারে না, তেমনি পূরণ করতে পারবে না আখেরাতেও।

এরকমও বলা হয়ে থাকে যে, 'জারমা একটি ক্রিয়াপদ। এর ক্রিয়ামূল 'জ্বারমুন'। এর অর্থ— বিসংবাদ, খণ্ডন। 'লা' যুক্ত হয়েছে এখানে না-সূচক অর্থে। এমতোক্ষেত্রে 'লা জ্বারমা' বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— অখণ্ডনীয়, অবিসংবাদিত, অবশ্যই। যেমন 'লা বুদ্দা বাক্যে 'লা' অর্থ না। আর 'তাব্দীদ ক্রিয়ামূল থেকে সাধিত 'বুদ্দা' ক্রিয়াপদের অর্থ সংশয়, সন্দেহ। আর 'লা বুদ্দা' অর্থ— নিঃসংশয়ে, নিঃসন্দেহে। কামুস। এছাড়াও বক্তব্যকে সুদৃঢ় করবার জন্য শপথ অর্থেও এর ব্যবহার হয়ে থাকে। সেজন্যই এর জবাবে 'লাম' এর উল্লেখ জরুরী বলে বিবেচিত হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে 'লা জ্বারমা লা আতিইয়ান্নাকা' (আমি অবশ্য অবশ্যই তোমার কাছে যাবো)।

'বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্র নিকট' অর্থ আমাদের সকলকেই একদিন আল্লাহ্ সকাশে আপনাপন কর্মফলের জবাবদিহি করবার জন্য দাঁড়াতেই হবে। তখন তিনি প্রদান করবেন আমাদের যথাযথ প্রাপ্য— পুরস্কার, অথবা তিরস্কার। 'সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী' অর্থ যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অসংখ্য নিরপরাধ শিশুর হত্যাকারী এবং নবী-রসুলগণের শত্রু, তারা অবশ্যই জলন্ত নরকের বাসিন্দা।

'আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তা অচিরেই স্মরণ করবে' অর্থ সেদিন বেশী দূরেও নয়, যেদিন তোমরা হাড়ে হাড়ে একথা উপলব্ধি করতে পারবে যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত আমার এই উপদেশাবলী কতো সত্য, কতো অমোঘ। কিন্তু তখন তো তোমাদের সামনে প্রতিকারের পথ আর খোলা থাকবে না, এবং 'আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্তে অর্পণ করছি; আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন' অর্থ আমি আমার সত্তা ও সত্তাসম্পৃক্ত সকল কিছু আল্লাহ্কে সোপর্দ করলাম, তিনি নিশ্চয় আমাকে রক্ষা করবেন তোমাদের অনিষ্ট ও জিঘাংসা থেকে।

তাফসীরে মাযহারী/৩৪১

কেননা আমি একথা জানি ও সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। তিনি যে সর্বদ্রষ্টা। উল্লেখ্য, বিশ্বাসী ব্যক্তিটির এমতো স্পষ্ট ভাষণ শুনে ফেরাউন ও তার সঙ্গী-সাথীরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলো। ভয় দেখালো কঠোর শাস্তির। তখনই তিনি বলে উঠলেন— আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ একথা ভালো ভাবেই জানেন যে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে কে সত্যাশ্রয়ী এবং কে মিথ্যানুরাগী। একথা বলার পর তিনি ফেরাউনের দরবার থেকে চলে গিয়েছিলেন। কেউ তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

www.eelm.weebly.com

❑ অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে উহাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিলেন এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করিল ফির'আওন সম্প্রদায়কে।

❑ উহাদিগকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটিবে সেদিন বলা হইবে, 'ফিরআওন-সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।'

তাফসীরে মাযহারী/৩৪২

❑ যখন উহারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হইবে তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদিগকে বলিবে, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদিগ হইতে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করিবে?'

❑ দাম্ভিকেরা বলিবে, 'আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের বিচার তো করিয়া ফেলিয়াছেন।'

❑ অগ্নিবাসীরা জাহান্নামের প্রহরীদিগকে বলিবে, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদিগ হইতে লাঘব করেন এক দিনের শাস্তি।'

❑ তাহারা বলিবে, 'তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রাসূলগণ আসে নাই?' জাহান্নামীরা বলিবে, 'অবশ্যই আসিয়াছিল।' প্রহরীরা বলিবে, 'তবে তোমরাই প্রার্থনা কর; আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা ওই মুমিনকে হত্যা করতে চাইলো। তখন তিনি আত্মগোপন করলেন। ফেরাউন তার লোকদেরকে হুকুম দিলো তাঁকে ধরে আনতে। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে নিরাপদে রাখলেন। এর পর ফেরাউনের সম্প্রদায়ই নিপতিত হলো কঠিন শাস্তিতে।

এখানে বলা হয়েছে 'কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করলো ফেরাউনের সম্প্রদায়কে'। ফেরাউনের কথা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। অবশ্য তার দরকারও ছিলো না। কেননা অপরাধীরা শাস্তিগ্রস্ত হলে তাদের নেতা তো হবে আরো অধিক শাস্তিগ্রস্ত। তাই এমতো ক্ষেত্রে নেতার উল্লেখ না করলেও চলে। আর এখানে 'কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করলো' অর্থ ইহকালের সমুদ্রসমাধি ও পরকালের দোজখবাস। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা আবার বলেছেন, ঘটনাটি ছিলো এরকম— ফেরাউন তার লোকজনকে আদেশ দিলো, যেখানে পাও, সেখান থেকে তাকে ধরে আনো। তারা খুঁজতে খুঁজতে তাঁকে পেয়ে গেলো এক পাহাড়ের উপর। দেখলো, তিনি নামাজে মশগুল। আর তাঁর চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে তাঁর নিরাপত্তা রক্ষা করছে জঙ্গলের হিংস্রপশুরা। অনন্যোপায় হয়ে তারা ফিরে গেলো। রাগে ক্ষোভে ফেরাউন তখন তাদেরকেই হত্যা করে ফেললো। এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে এখানকার 'কঠিন শাস্তি' কথাটির অর্থ হবে মৃত্যুদণ্ড, যা ফেরাউন কার্যকর করেছিলো তার লোকদের উপর।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে, ফেরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ করো কঠিন শাস্তিতে'। একথার অর্থ— ফেরাউন ও তার অনুসারীরা এখন শাস্তিগ্রস্ত অবস্থায় আছে আলমে বরজখে। সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে হাজির করা হয় আগুনের সামনে। বিচার দিবসে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, এবার তাদেরকে প্রবেশ করাও দোজখের আগুনে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, ফেরাউন ও তার লোকদের আত্মাগুলোকে কালো পাখির উদরে প্রবেশ করিয়ে তাদেরকে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় হাজির করানো হয় দোজখের দ্বারপ্রান্তে। বলা হয়, এটাই তোমাদের আসল

ঠিকানা। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের কারো মৃত্যু হলে তার আবাসস্থলকে সকাল সন্ধ্যায় তার সামনে নিয়ে আসা হয়— জান্নাতীদের সামনে জান্নাত এবং জাহান্নামীদের কাছে জাহান্নাম এবং তাকে বলা হয়, এখানেই তোমাকে থাকতে হবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

আলোচ্য আয়াত থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর পর সকলকে বেঁচে থাকতে হয় কবরে। ওই জীবনের নাম বরজখী জীবন। সেখানেও চলতে থাকে শাস্তি অথবা শান্তি। এরকম বিবরণ এসেছে বহুসংখ্যক হাদিসে। আলেমগণের ঐকমত্যও এরকম।

'ফেরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ করো কঠিন শাস্তিতে' এরকম হুকুম করা হবে আযাবের ফেরেশতাদেরকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'কঠিন শাস্তি' অর্থ এমন শাস্তি, যা ইতোপূর্বের শাস্তির চেয়ে পরিমাণগত ও প্রকারগত দিক থেকে হবে অধিকতর।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে (৪৭) দাম্ভিকেরা বলবে, আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বান্দাদের বিচার তো করে ফেলেছেন'(৪৮)।

এখানে 'তাব্য়ান' অর্থ অনুসারী। শব্দটি ব্যবহৃত হয় একবচন বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে। যেমন 'খাদামা' হচ্ছে 'খাদেম' এর বহুবচন। এমতো অভিমতের প্রবক্তা বসরার বিদ্বানগণ। আর কুফার ধর্মজ্ঞগণের মতে এটা বহুবচনের রূপ। কিন্তু এর বহুবচন হয় না। বরং বহুবচনার্থক শব্দরূপ হচ্ছে 'আত্বাউন'।

'ফাহাল' আনতুম মুগ্নূনা' অর্থ তোমরা কি নিবারণ করবে? কথাটি প্রশ্নবোধক হলেও এখানে এটা ব্যবহৃত হয়েছে আদেশার্থে। 'নাসীবাম মিনান্ নার' (আগুনের কিয়দংশ) কথাটি এখানে 'মুগ্নূন' (নিবারণ করবে) ক্রিয়ার কর্ম, অথবা মূল শব্দ। এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এক আয়াতে উল্লেখিত 'শাইয়ান' শব্দটির ব্যবহার রীতিতে। যেমন— 'লান তুগ্নী আ'নহুম আম্ওয়া.....মিনাল্লাহি শাইয়া'।

'আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি' অর্থ দাম্ভিকেরা দুর্বলদের প্রশ্নের জবাবে বলবে, কী যে বলো তোমরা, দেখছো আমরা সকলেই এখন বিপন্ন। এ দূরবস্থায় কেমন করে সাহায্য করবো তোমাদেরকে। সেরকম ক্ষমতা থাকলে আমরা নিজেদেরকেই তো শাস্তিমুক্ত করতাম সর্বাগ্রে। 'নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের বিচার তো করেই ফেলেছেন' অর্থ আল্লাহ্ তো জান্নাত ও জাহান্নামের স্থায়ী সিদ্ধান্ত দিয়েই ফেলেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'অগ্নিবাসীরা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করো তিনি যেনো

আমাদের থেকে লাঘব করেন এক দিনের শাস্তি'। একথার অর্থ— দুঃখ কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নামীরা জাহান্নামের প্রহরীদের কাছে কাকুতি মিনতি করে নিবেদন করবে, তোমরা আমাদের প্রতি একটু কৃপাপ্রদর্শন করো। তোমাদের প্রভুপালকের কাছে অন্তত এই নিবেদনটি কোরো, যেনো তিনি আমাদেরকে একদিন অথবা একদিনের কিছুটা সময়ের জন্য হলেও শাস্তিমুক্ত রাখেন।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রসুলগণ আসেনি? জাহান্নামীরা বলবে, অবশ্যই এসেছিলো। প্রহরীরা বলবে, তবে তোমরাই প্রার্থনা করো, আর কাফেরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়'।

প্রথমোক্ত প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর মাধ্যমে ধমকের সুরে জাহান্নামীদেরকে একথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজেরাই তো প্রার্থনার উপযুক্ত সময় ও প্রার্থনা গৃহীত হওয়ার উপকরণাদি বিনষ্ট করে ফেলেছো। এখন অপেক্ষা করলে আর কী হবে? 'তোমরাই প্রার্থনা করো' কথাটি এখানে উপস্থাপিত হয়েছে বিদ্রূপার্থে। অর্থাৎ জাহান্নামের দৌবারিকেরা তখন তাদের

www.eelm.weebly.com

প্রতি বিদ্রূপবান ছুঁড়ে দিবে যে, তবে তোমরাই প্রার্থনা করে দেখো না, কী হয়? ‘আর কাফেরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়’ কথাটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দোয়া কবুল করা হয় না। আবার এরকমও হতে পারে যে, কথাটি জাহান্নামের দ্বারওয়ানদের বক্তব্যাংশ।

সূরা মু’মিন ঃ আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬

❑ নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদিগকে ও মু’মিনদিগকে সাহায্য করিব পার্থিব জীবনে এবং যেই দিন সাক্ষিগণ দণ্ডায়মান হইবে।

❑ যেদিন যালিমদের ‘ওযর-আপত্তি কোন কাজে আসবে না, আর উহাদের জন্য রহিয়াছে লা’নত এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্ট আবাস।

❑ আমি অবশ্যই মূসাকে দান করিয়াছিলাম পথনির্দেশ এবং বনী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম সেই কিতাবের,

❑ পথনির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য।

❑ অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সকাল ও সন্ধ্যায়।

❑ যাহারা নিজেদের নিকট কোন দলীল না থাকিলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, উহাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, যাহারা এই ব্যাপারে সফলকাম হইবে না। অতএব আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হও; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি অবশ্যই আমার বার্তাবাহক ও তাদের বিশ্বাসী অনুচরবর্গকে তাদের পার্থিব জীবনে সাহায্য করে থাকি। তাদেরকে আমি বিশেষভাবে সাহায্যদানে ধন্য করবো সেইদিনও, যেদিন সারিবদ্ধভাবে হয়ে সাক্ষ্য দিতে দাঁড়িয়ে থাকবে সাক্ষ্যদাতা ফেরেশতারা, যেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কোনো বাহানা অজুহাত ফলদায়ক হবে না। তারা তখন হবে আল্লাহ্‌র অনুকম্পাচ্যুত। তাদের জন্য রয়েছে অভিসম্পাত এবং নিকৃষ্টতম আবাস— জাহান্নাম।

জুহাক বলেছেন, এখানে ‘পার্থিব জীবনে সাহায্য করা’র অর্থ দলিল প্রমাণ দ্বারা সাহায্য করা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ‘সাহায্য করবো’ অর্থ প্রতাপশীল করবো। বায়যাবী লিখেছেন, যদিও পার্থিব জীবনে কখনো কখনো দৃশ্যত সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে বিজয়ী করা হয়, কিন্তু প্রকৃত বিজয় দেওয়া হয় নবী-রসুল ও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকেই, কিন্তু তা ধর্তব্য হয় কর্মের শেষ পরিণাম ও আধিক্য হিসাবে। কেউ কেউ বলেছেন, নবীগণকে বিজয়ী করার অর্থ আল্লাহ্‌র শত্রুদের উপরে প্রতিশোধ কার্যকর করা।

‘যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে’ অর্থ মহাবিচারের দিবসে আমল লেখক ফেরেশতারা এই মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, সকল পয়গম্বর তাঁদের আপনাপন উম্মতের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন এবং অবাধ্যরা তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ‘জালেম’ অর্থ এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। ‘লা’নাত’ অর্থ অভিসম্পাত, অভিশাপ, আল্লাহ্‌র অনুকম্পাচ্যুত। আর ‘সূউদ্‌দার’ অর্থ নিকৃষ্ট আবাস, জাহান্নাম।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি অবশ্যই মুসাকে দান করেছিলাম পথনির্দেশ এবং বনী ইসরাইলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম সেই কিতাবের (৫৩), পথনির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য'। আলোচ্য

আয়াতদ্বয়ের সম্পর্ক রয়েছে ইতোপূর্বে বর্ণিত নবী মুসার প্রসঙ্গের সঙ্গে। মধ্যবর্তী আয়াতগুলোর অনুসঙ্গ ভিন্ন। উল্লেখ্য, হজরত মুসাকে তওরাত দেওয়া হয়েছিলো উদ্ধত ফেরাউন ও তার অনুসারীদের সমুদ্রসমাধিপ্রাপ্তির পর।

এখানে 'হুদাঁও ওয়া জিকরা' অর্থ— পথনির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ। অথবা শব্দটি ধাতুমূল, ব্যবহৃত হয়েছে কতৃকারকার্থে এভাবে— সত্যপথপ্রদর্শনকারী ও উপদেশাত্মক।

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ করো; নিশ্চয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস মহিমা ঘোষণা করো সকাল সন্ধ্যায়'। একথার অর্থ— অতএব হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি আপনার প্রতিপক্ষীয়দের অশিষ্ট আচরণে ধৈর্য অবলম্বন করুন। জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্র অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হওয়া অনিবার্য। সুতরাং আপনি ত্রুটিমগ্ন যাতে না হন, সেজন্য আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন এবং আপনার প্রভুপালকের প্রশংসায়িত পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন প্রত্যুষে ও সায়াহ্নে।

এখানে 'আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য' একথার দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে হজরত মুসা ও ফেরাউনের কাহিনী। এভাবে ইঙ্গিতে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ফেরাউন যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলো, তেমনি বিনাশপ্রাপ্ত হবে আপনার প্রতিপক্ষীয়রাও। কেননা আল্লাহ্ তাঁর এবং তাঁর প্রিয়ভাজন বার্তাবাহকগণের শত্রুকে ধ্বংস করবার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

'ওয়াস্‌তাগফির লিজাম্‌বিকা' অর্থ তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রসুল স. তো সকল প্রকার গোনাহ থেকে সতত সুরক্ষিত, নিস্পাপ। তাহলে তাঁকে এখানে এভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বলা হলো কেনো? এমতো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, এ আদেশ দেওয়া হয়েছে যুক্তিতর্ক ব্যতিরেকে, কেবল মেনে নেওয়ার জন্য। অর্থাৎ নিস্পাপ হওয়া সত্ত্বেও কেবল নির্দেশ মেনে নেওয়ার ফলস্বরূপ তিনি স. যেনো হতে পারেন আরো অধিক প্রিয়ভাজন। এমতো নির্বিবাদ মান্যতার নামই দাসত্ব, যা সৃষ্টিকুলের জন্য সর্বোচ্চ বিষয়ে অনুসরণীয়, তাই উম্মতের জন্য প্রকৃষ্ট আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পেও কথাটি এভাবে এখানে বলা হয়ে থাকতে পারে।

'ওয়া সাব্‌বিহ্ বিহাম্‌দি রব্বিকা বিল আ'শিয়্যী ওয়াল ইব্‌কার' অর্থ তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সকাল ও সন্ধ্যায়। অর্থাৎ আপন প্রভুপালকের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে নামাজ পাঠ করো। হাসান বলেছেন, এখানে সকাল ও সন্ধ্যায় পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার অর্থ আসর ও ফজরের নামাজ পাঠ করা। হজরত ইবনে আব্বাসের মতে এর অর্থ পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ।

এরপরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'যারা নিজের নিকট কোনো দলিল না থাকলেও আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, যারা এ ব্যাপারে সফলকাম হবে না। অতএব আল্লাহ্র শরণাপন্ন হও; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'।

এখানে 'কিবরুন' অর্থ অহংকার। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স.কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে তারা তাদের অন্তরে লালন করতো চরম ঔদ্ধত্য ও তীব্র অহংকার। নিজেদেরকে তারা রসুল স. এর চেয়ে বড় মনে করতো। সেকারণেই তাঁর অনুগামী হতে চাইতো না।

'মা হুম বিবালিগীহি' অর্থ যারা এ ব্যাপারে সফলকাম হবে না। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ— তারা নিজেদের বড় হওয়ার যে দাবি করে, সেই দাবির স্তরে পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহ্ তাদেরকে অপদস্থ করবেনই। ইবনে কুতাইবা অর্থ করেছেন— তাদের অন্তরে যার অহংকার ছিলো এবং রসুল স. এর উপরে প্রভাব বিস্তার করার যে অপবাসনাকে তারা প্রশ্রয় দিতো, সেই অপবাসনা পর্যন্ত তারা পৌঁছতে পারবে না।

'ফাস্‌তায়িজ বিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র শরণাপন্ন হও। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য কেবল আল্লাহ্র শরণ গ্রহণ করুন। 'ইন্‌নাহু হুয়াস্ সামীউ'ল বাসীর' অর্থ তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। অর্থাৎ হে আমার রসুল! নিঃসন্দেহে আপনি ও আপনার বিরুদ্ধবাদীরা সতত রয়েছে আল্লাহ্র শ্রুতি ও দৃষ্টির আওতায়। তিনি সকলের সব কথাবার্তা যেমন শোনেন, তেমনি দেখেন সকলের সব রকমের কার্যকলাপ।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০

❑ মানব সৃজন অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা জানে না।

❑ সমান নহে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যাহারা দুষ্কৃতিপরায়ণ। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক।

❑ কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না।

তাফসীরে মাযহারী/৩৪৮

www.eelm.weebly.com

❑ তোমাদের প্রতিপালক বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যাহারা অহংকারবশে আমার 'ইবাদতে বিমুখ, উহারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে লাঞ্ছিত হইয়া।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই যে, মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা অনেক বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করে না। যদি করতো তবে, পুনরুত্থান দিবসকে তারা অস্বীকার করতে পারতো না। বিনা নমুনায় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মতো বিশাল সৃষ্টিকে যিনি অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম, তিনি তো মৃত্যুর পর মানুষকে পুনর্জীবিত করতে আরো অধিক সক্ষম। সে কারণেই তো কোরআন পুনরুত্থান দিবসকে বিশ্বাস করবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বোধবুদ্ধি বিবর্জিত বলেই পুনরুত্থান দিবসকে করে চলেছে অস্বীকার। উল্লেখ্য, পুনরুত্থান দিবসের প্রতি সন্দেহের অপনোদন ঘটানো হয়েছে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ, অহংকারী ও স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন বলেই বিষয়টি বুঝতে সমর্থ হয় না।

আবুল আলিয়া সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার এক ইহুদী রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে দাজ্জালের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলো এবং দাজ্জালের খুব প্রশংসা করে বললো, সে আমাদের মধ্যেই কেউ হবে। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য সুরার ৫৬ ও ৫৭ সংখ্যক আয়াত। আর আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুলকে এই আদেশও করলেন যে, 'আল্লাহ্র শরণাপন্ন হোন'। হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, ৫৬ ও ৫৭ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই ইহুদীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যে দাজ্জালের আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলো।

হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আদম সৃষ্টির পর থেকে কোনো দুর্ঘটনা দাজ্জালের ঘটনার গুরুত্বকে অতিক্রম করবে না। মুসলিম। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের কাছে একথা গোপন থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহ্ এক চোখ বিশিষ্ট নন, কিন্তু দাজ্জালের এক চোখ কানা। তার ডান চোখে আঙ্গুরের মতো ফুলে থাকা পাতলা চামড়ার আবরণ থাকবে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, এমন কোনো নবী ছিলেন না যিনি তাঁর অনুসারীদেরকে একচক্ষুবিশিষ্ট মিথ্যাবাদী দাজ্জাল থেকে সতর্ক করে যাননি। ভালোভাবে জেনে নাও, সে হবে এক চক্ষুবিশিষ্ট। আর তোমাদের প্রভুপালক সেরকম নন। তার দু'চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে 'কাফের'। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে একটা কথা জানাবো না? প্রত্যেক নবী তাঁদের উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে কিছু না কিছু বলেছেন। নিঃসন্দেহে সে হবে কানা। তার সঙ্গে থাকবে বেহেশত ও দোজখ। সে যেটাকে বেহেশত বলবে, সেটাই দোজখ। আর যেটাকে বলবে দোজখ, সেটাই বেহেশত। আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের হাঙ্গামা থেকে সতর্ক করছি, যেমন এ ব্যাপারে নবী নুহ সতর্ক করেছিলেন তাঁর সম্প্রদায়কে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত হুজায়ফা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দাজ্জাল আবির্ভূত হবে পানি ও আগুন নিয়ে। লোকেরা যেটাকে আগুন মনে করবে সেটাই হবে শীতল সুপেয় পানি। তোমরা যদি তাকে পাও, তবে তোমাদের উচিত হবে তার আগুনের মধ্যে পড়ে যাওয়া। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় আরো এসেছে, দাজ্জালের চোখ হবে ধূসর বর্ণের এবং তার উপরে থাকবে একটি মোটা দাগ। তার দু'চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে 'কাফের'। নিরক্ষর হলেও প্রত্যেক বিশ্বাসী সে লেখা পড়ে নিতে পারবে। হজরত হুজায়ফা কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দাজ্জালের বাম চোখ হবে কানা। কেশ হবে কুঞ্চিত। তার সঙ্গে জান্নাত থাকবে, থাকবে জাহান্নামও। যেটা তার জাহান্নাম, সেটাই হবে আসলে জান্নাত। মুসলিম।

হজরত নাওয়াজ ইবনে সাময়া'ন বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর সম্মুখে একবার দাজ্জালের আলোচনা উত্থাপন করা হলো। তিনি স. বললেন, যদি আমার জীবদ্দশায় তার আবির্ভাব ঘটে, তবে তোমাদের পক্ষ থেকে আমি তাকে প্রতিহত করবো। আর আমার পৃথিবী পরিত্যাগের পর যদি সে আসে, তাহলে আল্লাহ্ হবেন তোমাদের রক্ষক। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে তার সঙ্গে যুঝবে। সে হবে ছন্নছাড়া ভবঘুরে এক যুবক। তার চোখ হবে স্ফীত। আমার ধারণায় তার চেহারা হবে আবুল উজ্জা ইবনে কাতানের চেহারার মতো। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার সাক্ষাত পায়, তবে সে যেনো সুরা কাহাফের প্রথম আয়াত পড়ে তার প্রতি ফুঁ দেয়। এই আয়াত দাজ্জালের হাঙ্গামা থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম। সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী এক উপত্যকা অথবা শ্যামল প্রান্তর থেকে তার আবির্ভাব ঘটবে এবং সে তার বামে ও দক্ষিণে ঘটাবে অনেক ধ্বংসাত্মক কর্ম। হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা তখন দৃঢ়চেতা থেকো। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! পৃথিবীতে সে কতোদিন থাকবে? তিনি স. বললেন, চল্লিশ দিন। যার প্রথম এক দিনের ব্যবধান হবে এক বৎসরের সমান। দ্বিতীয় দিন হবে এক মাসের সমান। তারপরের দিন এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট দিনগুলো হবে সাধারণ দিবসের মতো। আমরা বললাম, যে দিন এক বৎসরের সমান হবে, সেদিনে কি আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই পড়বো? তিনি স. বললেন, না। তোমরা নামাজের সময় অনুমান করে নিয়ো। মুসলিম।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দাজ্জাল বের হলে এক ইমানদার ব্যক্তি তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাবে। তাকে প্রথমে আটকাবে দাজ্জালের দেহরক্ষীরা। জিজ্ঞেস করবে? কোথায় যেতে চাও। সে বলবে, ওই ব্যক্তির কাছে, যে সদ্যআবির্ভূত। দেহরক্ষী বলবে, তিনিই তো প্রতিপালক। তার প্রতি কি তোমার বিশ্বাস নেই? সে বলবে, আমার

www.eelm.weebly.com

প্রভুপালকের কাছে কোনো কথাই গোপন নেই। এক দেহরক্ষী বলবে, একে কতল করো। অন্যজন বলবে, আমাদের প্রতিপালক তার আদেশ ব্যতীত কাউকে কতল করতে কি নিষেধ করেননি? একথা শুনে প্রথম জন নিরস্ত হবে। তাকে নিয়ে গিয়ে হাজির হবে

দাজ্জালের সামনে। সে দাজ্জালকে দেখেই বলে উঠবে, হে জনতা! এ হচ্ছে সেই দাজ্জাল, যার কথা রসুল স. বলেছেন। দাজ্জাল বলবে, একে হত্যা করো। তার প্রহরীরা সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার দিয়ে চিরে ফেলবে তার পেট ও পিঠ। দাজ্জাল বলবে, এখনো কি তুমি আমার উপরে ইমান আনবে না? সে বলবে, তুমি প্রতারক, মিথ্যাবাদী। দাজ্জাল বলবে, একে করাত দিয়ে চিরে ফেলো। প্রহরীরা তার মস্তকের মাঝখান থেকে দু' পায়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত চিরে ফেলবে। দাজ্জাল তার চিরে ফেলা দুই অংশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলবে, উঠে পড়ো। সে জীবিত হয়ে উঠবে। দাজ্জাল বলবে, এখনো কি তুমি আমার উপরে ইমান আনবে না? সে বলবে, এখন তো তোমার বিষয়ে আমার অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত হয়েছে। এরপর সে সমবেত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবে, হে জনতা! সে আমার পরে আর কারো সঙ্গে এমন আচরণ করতে পারবে না। দাজ্জাল তাকে ধরে জবাই করার অনেক চেষ্টা করবে। কিন্তু পারবে না। আল্লাহ্ তার স্কন্ধদেশ করে দিবেন তাম্রআবৃত। ব্যর্থ দাজ্জাল তখন তার লোকদেরকে হুকুম করবে, একে হাত পা বেঁধে আগুনে ফেলে দাও। তারা হুকুম মতো আমল করবে। মনে করবে তাকে আগুনে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু সে গিয়ে পড়বে জান্নাতে। আল্লাহ্র কাছে সে গৃহীত হবে শ্রেষ্ঠ শহীদ হিসেবে। মুসলিম।

হজরত আনাস থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দাজ্জালের সঙ্গে থাকবে ইসপাহানের সত্তর হাজার ইহুদী। তাদের সকলের পরনে থাকবে রাজকীয় উত্তরীয়। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, দাজ্জাল গিরিপথ ধরে মদীনায় প্রবেশ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু মদীনায় তার প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাই সে অবস্থান করবে মদীনার নিকটবর্তী এক গোলোযোগপূর্ণ স্থানে। মদীনা থেকে এক উত্তম ব্যক্তি তার কাছে সাক্ষাত করতে যাবে। দাজ্জাল উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলবে, আমি যদি এই লোকটিকে হত্যা করার পর পুনরায় জীবিত করি, তবে তোমরা কি আর আমার কথায় সন্দেহ করতে পারবে? জনতা বলবে, না। দাজ্জাল তখন ওই উত্তম ব্যক্তিকে হত্যা করার পর পুনরায় তাকে জীবিত করবে। ওই ব্যক্তি তখন উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠবে, শপথ আল্লাহ্র! তুমি কাফের। তোমার বিষয়ে আগে আমি এতো সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারিনি। দাজ্জাল তাকে আবার হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু পারবে না। হজরত আবু বকর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, দাজ্জাল ভয়ে মদীনায় প্রবেশ করবে না। তখন মদীনার সাতটি প্রবেশপথের প্রতিটিতে প্রহরীরূপে নিযুক্ত থাকবে দু'জন করে ফেরেশতা।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পূর্ব দিকের খোরাসান নামক এক দেশ থেকে দাজ্জালের আগমন ঘটবে। বহু লোক থাকবে তার পশ্চাতে। তাদের চেহারা হবে এমন, যেনো হাতুড়ি দিয়ে পেটানো কোনো ঢাল। হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ ইবনে সাকান থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন— দাজ্জাল পৃথিবীতে চল্লিশ বৎসর থাকবে, যার প্রতিটি

বৎসর হবে এক মাসের সমান, এক মাস হবে এক সপ্তাহের সমান এবং প্রতিটি দিন হবে খেজুর গাছের ডাল সদৃশ, যা পুড়ে যায় স্বল্প সময়ের মধ্যে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার তাজবিশিষ্ট লোক (রাজা, নবাব) তার পেছনে থাকবে। হজরত আবু উমামা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেদিন সত্তর হাজার মুকুটশোভিত ইহুদী সুদৃশ্য তরবারীসজ্জিত অবস্থায় অবস্থান গ্রহণ করবে দাজ্জালের পশ্চাতে।

হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ আনসারিয়া বর্ণনা করেছেন, একদিন আমার গৃহে রসুল স. এর শুভ পদার্পণ ঘটলো। তখন দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বললেন, তার আবির্ভাবের পর পরস্পরলগ্ন তিনটি বৎসর হবে এরকম— প্রথম বৎসর বৃষ্টির এক তৃতীয়াংশ আটকে রাখবে আকাশ এবং ফল-ফসল উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ আটকে রাখবে মাটি। পরের বৎসরে তারা বৃষ্টি ও ফল-ফসল আটকে রাখবে দুই তৃতীয়াংশ করে। এর পরের বৎসর বৃষ্টিপাত একেবারেই হবে না। মাটিতে উৎপাদিত হবে না কোনো শস্য। ফলে দেখা দিবে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। খুর ও শ্মশ্রুবিশিষ্ট পশুরা সকলেই মরে যাবে। দাজ্জাল শুরু করবে প্রতারণা। সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করবে সে এক আরববাসীর সঙ্গে। তাকে গিয়ে বলবে, আমি যদি তোমার মৃত উটগুলোকে জীবিত করে দেই তবে কি তুমি আমাকে প্রতিপালক বলে স্বীকার করবে না? আরববাসী জবাব দিবে, অবশ্যই করবো। সে তখন শয়তানদেরকে উটের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেখাবে। সেই উটগুলোর থাকবে বড় বড় ওলান ও কুঁজ। পিতা ও ভাই হারানো আর এক লোকের কাছে গিয়ে সে বলবে, তোমার মৃত পিতা ও ভাইকে যদি আমি পুনর্জীবিত করি, তবুও কি তুমি আমাকে প্রতিপালক বলে মানবে না? লোকটি বলবে, নিশ্চয় মানবো। দাজ্জাল তখন দু'জন শয়তানকে তার পিতা ও ভ্রাতার আকৃতিতে হাজির করবে। এ পর্যন্ত বলবার পর রসুল স. কোনো এক কাজে বাইরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে এসে দেখলেন, সমবেত সাহাবীগণ বিষণ্ন ও মৌন হয়ে বসে আছেন। তিনি স. দরজার দুই প্রান্ত ধরে বললেন, আসমা! কী ব্যাপার, সকলে এরকম চুপচাপ কেনো? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি যা বললেন, তা শুনে আমরা ভয়ে-আতংকে স্তম্ভিত।

www.eelm.weebly.com

তিনি স. বললেন, আমার পৃথিবীবাসের সময়ে সে এলে আমি তাকে প্রতিহত করবো। অন্যথায় বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছেন আল্লাহ্। আমি না থাকলেও আল্লাহ্ তো থাকবেন। আমি বললাম, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আমরা আটা দিয়ে খামির তৈরী করি। রুটি পাক হওয়ার আগেই হয়ে পড়ি ক্ষুধার্ত। তাহলে মুমিনদের তখন কী হাল হবে? তিনি স. বললেন, তখন আল্লাহ্র স্মরণ ও তসবীহ পাঠই হবে তাদের জন্য যথেষ্ট, যেমন তা যথেষ্ট হয় আকাশবাসীদের জন্য। আহমদ, বাগবী।

বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত মুগীরা ইবনে শোবা বলেছেন, আমিই রসুল স.কে দাজ্জাল সম্পর্কে সর্বাধিক প্রশ্ন করেছি। তিনি স. বলেছেন, সে তোমাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। আমি একবার বলেছিলাম, হে

আল্লাহ্র বার্তাবাহক! লোকে বলে, তার সঙ্গে নাকি থাকবে রুটির পাহাড় ও পানির সমুদ্র? তিনি স. বলেছিলেন, এ বিষয়টি তো আল্লাহ্র কাছে আরো বেশী সহজ (রুটি-পানির প্রয়োজন থেকে যিনি চিরঅমুখাপেক্ষী)।

পরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— 'সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুস্মান এবং যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যারা দুষ্কৃতিপরায়ণ। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো'।

এখানে 'আ'মা' অর্থ অন্ধ, মূর্খ। 'বাসীর' অর্থ চক্ষুস্মান, জ্ঞানী। 'ওয়াল্লাজীনা আমানু ওয়া আ'মিলুস সলিহাতি' অর্থ যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে। আর 'মুসীউ' অর্থ দুষ্কৃতিপরায়ণ। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিসম্পন্নরা যেমন সমান নয়, তেমনি সমমর্যাদা সম্পন্ন নয় পুণ্যবান— বিশ্বাসী ও দুষ্কৃতিকারীরা। কিন্তু এই দৃষ্টান্তটি থেকে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে চাও না। দূর করতে চাও না দৃষ্টিহীনতা ও অবিশ্বাস।

এরপরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না'।

এখানে 'আতিয়াতুন' অর্থ অবশ্যম্ভাবী। 'লা রইবা ফীহা' অর্থ এতে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন বলেছেন কিয়ামত হবে, তখন তা হবেই। এর অন্যথা হওয়া অসম্ভব। 'ওয়া লাকিন্না আকছারান্ নাসি লা ইউ'মিনূন' অর্থ কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ অধিকাংশ লোক অজ্ঞ, পাপিষ্ঠ। তাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনা আড়ষ্ট ও সীমাবদ্ধ। সে কারণেই তারা আল্লাহ্র বাণীর মাহাত্ম্য, অনিবার্যতা ও মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না।

এরপরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। যারা অহংকার বশে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে'।

কোনো কোনো ধর্মজ্ঞ বলেছেন, এখানে 'তোমরা আমাকে ডাকো' অর্থ তোমরা আমার ইবাদত করো। এখানে 'উদ্উ'নী' অর্থ 'দোয়া' 'প্রার্থনা' বা ডাক, ব্যবহৃত হয়েছে 'ইবাদত' অর্থে। সেকারণেই পরক্ষণে 'পুণ্যদান করবো' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 'আস্তাজিব্ লাকুম'। অর্থাৎ এখানে 'আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো' অর্থ আমি দান করবো তোমাদের ইবাদতের সওয়াব। এরকম অর্থকেই পরবর্তী বাক্যে স্পষ্ট করা হয়েছে এভাবে 'যারা অহংকারবশে আমার ইবাদতে বিমুখ' বাক্যে 'ইবাদত' শব্দটির দ্বারা।

তবে এ বিষয়টিও অস্পষ্ট নয় যে, প্রার্থনা ও ইবাদতের উদ্দেশ্য অভিন্ন। প্রার্থনা হচ্ছে নিজেকে দীনহীন ভেবে আল্লাহ্র কাছে চাওয়া, আর ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ্র স্মরণমগ্ন হয়ে নিজের মুখাপেক্ষিতাকে প্রকাশ করা। দু'টোতেই ঘটে দাসত্বের বহির্প্রকাশ। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা তাদের সকল প্রয়োজনে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থী হয়, এমনকি তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও। ছাবেত বুনানীর বর্ণনায়

একথাগুলিও এসেছে— এমনকি তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে লবনটিও চেয়ে নিয়ো। জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও তার জন্য প্রার্থী হয়ো আল্লাহ্র নিকট। হজরত নোমান ইবনে বশীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, প্রার্থনাই ইবাদত। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। যারা অহংকার বশে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়'। আহমদ, হাকেম, আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান, তিরমিজি, নাসাঈ।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত নোমান বলেছেন, রসুল স. মিম্বরে আসীন ছিলেন। আমি স্বকর্ণে শুনলাম, তিনি স. বললেন 'ইন্নাদ্ দুয়া হুয়াল ইবাদাহ্'। এখানে 'হুয়া' হচ্ছে সর্বনাম। 'আল ইবাদাত' হচ্ছে বিধেয়, এর সঙ্গে 'আলিফ লাম' (আল) যুক্ত হওয়ায় বিষয়টি হয়ে পড়েছে সীমাবদ্ধ। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যবর্তীতে সর্বনাম যদি থাকে এবং বিধেয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে 'আলিফ লাম' তবে ওই বাক্যের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে বিধেয়ের সীমাবদ্ধতা বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন 'ইন্নাল্লহা হুয়ার রাজ্জাক' অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো রিজিকদাতাই নেই। রিজিকদাতা কেবল তিনিই। কখনো কখনো আবার বিধেয়ের ক্ষেত্রে বুঝানো হয় উদ্দেশ্যের সীমাবদ্ধতাকে। যেমন এক হাদিসে এসেছে, 'আল করম হুয়াত্ তাক্বওয়া ওয়াল হাসাবু হুয়াল ইমান'। অর্থাৎ তাক্বওয়াই হচ্ছে ইজ্জত, তাক্বওয়া ছাড়া কোনো ইজ্জত নেই এবং ইমানই হচ্ছে মূল কৌলিন্য, ইমান

ব্যতীত কোনো সম্পদ নেই। সুতরাং আলোচ্য হাদিসটি উভয় অর্থেই প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন— ১. দোয়াই ইবাদত এবং ২. ইবাদতই দোয়া। এই সীমাবদ্ধতা আধিক্য পর্যায়ের। হয়তো এর উদ্দেশ্য একথা বলা যে— দোয়া ও ইবাদতের মূলতত্ত্ব একই। প্রতিটি দোয়াই ইবাদত। প্রতিটি প্রার্থনাই দাসত্ব। প্রার্থনার মধ্যে প্রকাশ পায় প্রার্থনাকারীর বিনয়, অসহায়তা ও মুখাপেক্ষিতা। অভিধানে দাসত্ব বলা হয়েছে বিনয়, অসহায়তা ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশকেই। আর 'ইবাদত' শব্দটি 'উবুদিয়াত' এর চেয়ে অধিক ব্যঞ্জনাময়। নম্রতা, উপায়বিহীনতা ও মুখাপেক্ষিতার চূড়ান্ত প্রকাশই হচ্ছে ইবাদত। আর এমতো ইবাদত পাওয়ার যোগ্য কেবলই আল্লাহ্। আল্লাহ্ স্বয়ং এরশাদ করেছেন 'তোমার পালনকর্তা স্বয়ং আদেশ করছেন, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত কোরো না'। আবার একথাও ঠিক যে, সকল দাসত্বই প্রার্থনা পদবাচ্য। রসুল স. বলেছেন, নবীগণের এবং অধিকাংশ প্রার্থনাকারীর আরাফাতের প্রার্থনা ছিলো এরকম— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহ্দাহু লা শরীকা লাহু লাহুল মুল্ক্ ওয়া লাহুল হামদ্ ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বদীর'। (তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, সাম্রাজ্য কেবল তাঁর, প্রশংসাপ্রাপ্তিও তাঁর এবং সকল ক্ষমতাও তাঁর)। ইবনে আবী শাইবা। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন' (তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি ঘটে সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্র, এই বলে)।

'নেহায়া' গ্রন্থে জযরী লিখেছেন, তাহলীল (লাইলাহা ইল্লাল্লহ্) ও তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ্) পাঠকেও দোয়া বলা হয়েছে এজন্য যে, এর দ্বারাও সওয়াব লাভ হয়। যেমন এক হাদিসে বলা হয়েছে, বান্দা যখন দোয়া করার বদলে আমার প্রশংসায় রত থাকে, তখন আমি প্রার্থনাকারীর চেয়ে বেশী দান করি প্রশংসাকারীকে। তিরমিজি ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ বলেন, কোরআনপাঠ যাকে আমার জিকির ও আমার কাছে দোয়া করা থেকে বিরত রাখে, আমি তাকে দান করি যাঞ্চাকারীর চেয়েও বেশী। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ বলেন, কোরআনপাক ও জিকির, যা আমার কাছে যাঞ্চা করা থেকে বিরত রাখে, তাই-ই উত্তম।

দোয়ার ব্যাখ্যাঃ কোনো কোনো দোয়া অত্যাবশ্যক (ফরজ) কর্তব্যরূপে পালনীয়। যেমন নামাজে সুরা ফাতেহার 'ইহ্দিনাস্ সিরত্বল মুসতাক্বীম' (আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো)। কোনো কোনো দোয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা পর্যায়ভূত। যেমন নামাজের শেষ বৈঠকে পঠিতব্য দোয়া। অথবা হজ পালনরত অবস্থায় পঠিতব্য দোয়াসমূহ। আবার কোনো কোনো দোয়া হারাম। যেমন দুনিয়ার আনন্দফূর্তির উপকরণাদি প্রাপ্তির দোয়া, অথবা এমন কিছু চাওয়া, যা পাপ কিংবা অসম্ভব। যেমন আল্লাহ্ বলেন, কিছু কিছু লোক বলে 'রব্বানা আ'তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও'— এ ধরনের প্রার্থনাকারীদের জন্য আখেরাতে কোনো অংশ থাকে না। আল্লাহ্ এরকমও বলেন, কোনো কোনো ব্যক্তিকে কোনো কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে, তোমরা সকল শ্রেষ্ঠত্বের আশা কোরো না।

অভাবী ব্যক্তি তার প্রয়োজন পূরণার্থে এবং কেউ পাপ থেকে আশ্রয় যাচনার্থে প্রার্থনা করলে তা হবে মোস্তাহাব। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু কোনো কোনো সুফীসাধক বলেছেন, আল্লাহ্র কাছে কিছু না চাওয়াই উত্তম। এতে করে আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রতি এবং তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার দৃঢ়তা প্রকাশ পায় অধিক। আবার বিদ্বানগণের আর এক দল এরকমও বলেন যে, অন্যের জন্য দোয়া করা উত্তম। নিজের জন্য নয়। আমাদের দলিল হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব এবং রসুল স. এর হাদিস এবং উম্মতের ঐকমত্য। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাসান বসরী ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দোয়া অপেক্ষা অন্য কোনো কিছু আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয় নয়। ইবনে মাজা এবং হাকেমও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত আনাস থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, দোয়া হচ্ছে ইবাদতের নির্যাস।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, আল্লাহ্র কাছ থেকে তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য যাচনা করো। কেননা এরকম যাচনা তাঁর পছন্দ। সুতরাং স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীক্ষা হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থী হয় না, আল্লাহ্ তাঁর উপর অতুষ্ট হন। তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, হাকেম।

তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর। এধরনের হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দম্ভবশতঃ যারা প্রার্থনা থেকে বিমুখ থাকে আল্লাহ তাদের প্রতি নারাজ। সে কারণেই তিনি এরশাদ করেছেন 'যারা অহংকারবশে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে'।

হজরত আনাস থেকে ইবনে হাব্বান ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, প্রার্থনা করতে কার্পণ্য কোরো না। প্রার্থনারত অবস্থায় আল্লাহ্ কাউকে ধ্বংস করেন না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দোয়া হচ্ছে বিশ্বাসীর আত্মরক্ষাস্ত্র, ধর্মের স্তম্ভ এবং আকাশ-পৃথিবীর আলোকবর্তিকা। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল

www.eelm.weebly.com

স. বলেছেন, যার জন্য যাচনার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে, তার জন্য উন্মুক্ত হয়েছে অনুগ্রহের দরোজাও। আর নিরাপত্তা যাচনাই আল্লাহ্‌র কাছে যাচিত বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম। তিরমিজি। হাকেমের 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে 'অনুগ্রহের দরোজা'র পরিবর্তে বলা হয়েছে 'জান্নাতের দরোজা'।

প্রার্থনা পূরণের অঙ্গীকার ঃ হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যার জন্য অনুগ্রহের দুয়ার উন্মোচন করা হয়েছে তার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে দোয়া কবুল হওয়ার দুয়ারও। ইবনে আবী শায়বা।

হজরত সালমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের প্রভুপালনকর্তা বড়ই ব্রীড়াশীল ও মমতাময়। প্রার্থনাকারীর প্রসারিত শূন্য হস্ত ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জা পান। তিরমিজি, আবু দাউদ, বায়হাকী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে মুসলমান এমন দোয়া করে যাতে নেই কোনো পাপপ্রবণতা, নেই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী কোন বিষয়,— আল্লাহ্‌ তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটি অবশ্যই করেন— ১. তাৎক্ষণিকভাবে প্রার্থনা পূরণ করেন ২. প্রার্থনাকে স্থগিত রাখেন পরকালের জন্য ৩. বিলোপ করে দেন প্রার্থনার সমপরিমাণ পাপ। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আমরা যদি অত্যধিক প্রার্থনা করি। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে অনেক কিছু আছে। আহমদ।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রার্থনায় যদি পাপ না থাকে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যদি ছিন্ন না করা হয়, তবে বান্দার প্রার্থনা অবশ্যই কবুল করা হয়, যদি প্রার্থনাকারী তার প্রার্থনা পূরণের ব্যাপারে ত্বরাপ্রবণ না হয়। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! ত্বরাপ্রবণতা আবার কী রকম? তিনি স. বললেন, যেমন প্রার্থনাকারী বলে, আমি এতো দোয়া করছি, কিন্তু কবুল হচ্ছে না। শেষে সে ক্লান্ত হয়ে দোয়া করাই ছেড়ে দেয়। মুসলিম।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দোয়া সেই সকল বিপদাপদ থেকে বাঁচায়, যেগুলো ইতোমধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে এবং পরিত্রাণ দিয়ে থাকে ওই সকল বিপদ-মুসিবত থেকে, যা অদূর ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হতো। সুতরাং হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! প্রার্থনার প্রতি মনোযোগী হও। তিরমিজি।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল এবং হজরত জাবের থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ আল্লাহ্‌র কাছে চাইলে আল্লাহ্‌ তা মঞ্জুর করেন। অথবা তার চাহিদা মতো স্থগিত করে দেন তার দুঃখ-কষ্ট, অবশ্য তার ওই প্রার্থনা যদি হয় পাপমুক্ত ও আত্মীয়তার বন্ধনছিন্নবিবর্জিত। তিরমিজিও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

কারো প্রার্থনাই অগ্রাহ্য হয় না ঃ হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিন রকম প্রার্থনা কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই— ১. পিতার ২. শোষিতের এবং ৩. মুসাফিরের। তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা। হজরত আবু হোরায়রা আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিন ধরনের প্রার্থীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হয় না— ১. ইফতারের সময় রোজাদারের প্রার্থনা ২. ন্যায়পরায়ণ সম্রাটের প্রার্থনা ৩. অত্যাচারিতের প্রার্থনা। অত্যাচারিতের অপপ্রার্থনা আকাশে উঠে যায় এবং তার জন্য খুলে দেওয়া হয় আকাশের দরোজা। মহান প্রভুপালনকর্তা তখন তার সম্মানের শপথ করে বলেন, আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো, কিছুটা বিলম্ব হলেও। তিরমিজি।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অনুপস্থিত মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভ্রাতার দোয়া কবুল করা হয়। সে যখন তার ভ্রাতার কল্যাণ প্রার্থনা করে, তখন ফেরেশতারা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলে 'আমিন' (তাই হোক)। মুসলিম।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. শুভ সংবাদ দিয়েছেন, পাঁচ ধরনের প্রার্থনা কবুল করা হয়ে থাকে— ১. অত্যাচারিতের প্রার্থনা, যে পর্যন্ত তার প্রতিশোধ পূর্ণ না হয় ২. হাজীর প্রার্থনা, যে পর্যন্ত না গৃহে প্রত্যাবর্তন করে ৩. রোগীর প্রার্থনা, যতক্ষণ না সে সুস্থ হয় ৪. অনুপস্থিত মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভ্রাতার প্রার্থনা ৫. এর পরেই তিনি স. বললেন সবচেয়ে দ্রুত যে প্রার্থনা কবুল করা হয়, তা হচ্ছে মুসলমান ভ্রাতার জন্য মুসলমানের দোয়া, যা করা হয় তার অসাক্ষাতে। তিরমিজি, আবু দাউদ।

দোয়া কবুল হওয়ার শর্তসমূহ ঃ ১. পানাহার ও পরিধেয় পবিত্র হতে হবে। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দীর্ঘ সফরের ধুলিধূসরিত কেশযুক্ত মুসাফির যদি আকাশের দিকে হস্ত উত্তোলনে চিৎকার করে প্রার্থনা করতে থাকে 'হে আমার প্রভুপালনকর্তা' 'হে আমার প্রভুপালক' তবু তার প্রার্থনা কবুল করা হবে না, যদি তার পানাহারের সামগ্রী ও পরিধেয় বস্ত্র হয় হারাম উপার্জনের। মুসলিম। ২. প্রার্থনা হতে হবে নিবিষ্টচিত্ত ও একাগ্র। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা রেখে প্রার্থনা কোরো। এ বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করতে চেষ্টা কোরো যে, মনোযোগবিহীন প্রার্থনা আল্লাহ্‌ কবুল করেন না। ৩. প্রার্থনা উপস্থাপন করতে হয় দৃঢ়তার সঙ্গে। হজরত আবু হোরায়রা বলেন— রসুল স. বলেছেন, কেউ

www.eelm.weebly.com

যেনো তার প্রার্থনায় এরকম না বলে যে, হে আল্লাহ্! তুমি যদি চাও, তবে আমাকে ক্ষমা করো। বরং সে যেনো অন্তরে দৃঢ় আশা পোষণ করে যে, আল্লাহ্ তাকে বিমুখ করবেন না। কেননা বান্দাকে কিছু দান করা তাঁর জন্য অতি সহজ। মুসলিম।

প্রার্থনার শিষ্টাচার ঃ হজরত ফুজালা ইবনে উবাইদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একদিন মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক লোক সেখানে ঢুকে নামাজ পাঠ করতে শুরু করলো। নামাজ সমাপনের পর সে দোয়া করতে শুরু করলো, হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার উপর অনুগ্রহ করো। রসুল স. তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে নামাজী! তুমি তোমার প্রার্থনায় তড়িঘড়ি করছো। প্রথমে উচ্চারণ করো ওই সকল বাক্য যেগুলোতে রয়েছে আল্লাহ্র প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমার ঘোষণা, এরপর আমার উপরে দরূদ পাঠ করো, তারপর চাও, যা চাওয়ার। কিছুক্ষণ পর আর এক লোক মসজিদে ঢুকে নামাজ পাঠ করলো। তারপর আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা এবং রসুল স. এর প্রতি দরূদ পাঠের পর শুরু করলো তার দোয়া। রসুল স. তা দেখে মন্তব্য করলেন, এবার তোমার প্রার্থনা গৃহীত হবে। তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, একবার আমি রসুল স. এর সন্নিকটে নামাজ পাঠ করলাম। এরপর সম্পন্ন করলাম আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা ও দরূদ পাঠ পর্ব। তারপর শুরু করলাম প্রার্থনা। রসুল স. বললেন, হ্যাঁ, চেয়ে নাও। তোমাকে দেওয়া হবে। তিরমিজি।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, দোয়াকে আটকে রাখা হয় আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে, প্রার্থনাকারী দরূদ শরীফ পাঠ না করা পর্যন্ত তার দোয়া উর্ধ্বলোকে উত্থিত হয় না। তিরমিজি। হজরত মালেক ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, প্রার্থনার সময় তোমরা হাতের তালুদ্বয়কে আকাশের দিকে প্রসারিত অবস্থায় রেখো। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা হাতের তালু প্রসারিত করে প্রার্থনা উপস্থিত করো, হাতের বিপরীত দিক প্রসারিত কোরো না এবং প্রার্থনা শেষে হাতের তালুদ্বয় বুলিয়ে নিয়ো মুখমণ্ডলের উপর।

হজরত ওমর বলেছেন, রসুল স. প্রার্থনার সময়ের উত্তোলিত হাত মুখমণ্ডলে বুলিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত নিচে নামাতেন না। তিরমিজি। জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. প্রার্থনাকালে পছন্দ করতেন গভীর অর্থবহ শব্দসমূহকে। অন্যান্য শব্দাবলীর দিকে দৃকপাত করতেন না। আবু দাউদ।

হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. প্রার্থনার সময় তাঁর দু'হাত এতোদূর পর্যন্ত ওঠাতেন, তাঁর পবিত্র বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হতো। সায়েব ইবনে ইয়াজিদ বলেছেন, রসুল স. দোয়া করার পর দুই হাত মুখের উপর বুলিয়ে নিতেন। বায়হাকী। ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস আমাকে বলেছেন, তুমি দোয়া করার সময় তোমার দুই হাত তুলবে কাঁধ পর্যন্ত, অথবা কাঁধের

কাছাকাছি। আবু দাউদ। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, দোয়া করার সময় অধিক উপরে হাত ওঠানো বেদাত। রসুল স. বুকের চেয়ে বেশী উপরে হাত ওঠাতেন না। আহমদ। হজরত উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, রসুল স. যখন কারো কথা বলতেন ও তার জন্য দোয়া করতেন, তখন তিনি দোয়া শুরু করতেন নিজের থেকে। তিরমিজি।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

তাফসীরে মাযহারী/৩৫৯

❑ আল্লাহ্ই তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রিকে এবং আলোকোজ্জ্বল করিয়াছেন দিবসকে। আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

❑ তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; সুতরাং তোমাদিগকে কোথায় ফিরাইয়া নেওয়া হইতেছে?

❑ এইভাবেই বিপথগামী করা হয় তাহাদিগকে যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।

❑ আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করিয়াছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করিয়াছেন এবং

তোমাদের আকৃতি করিয়াছেন সুন্দর এবং তোমাদিগকে দান করিয়াছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক; তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ কত মহান!

❑ তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। সুতরাং তোমরা তাঁহাকেই ডাক, তাঁহার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই।

❑ বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহাদের ইবাদত করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে যখন আমার প্রতিপালকের নিকট হইতে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে। এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে।

www.eelm.weebly.com

❑ 'তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে, পরে শুক্রবিন্দু হইতে, তারপর 'আলাকাঃ হইতে, তারপর তোমাদিগকে বাহির করেন শিশুরূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও তোমাদের যৌবনে, তারপর হইয়া যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু ঘটে ইহার পূর্বেই! যাহাতে তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যেন তোমরা অনুধাবন করিতে পার।

❑ 'তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি উহার জন্য বলেন, 'হও', আর উহা হইয়া যায়।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! আল্লাহ্ই তো রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন তোমাদের উপকারের জন্য, যেনো রাতে তোমরা আরাম করতে পারো এবং আলোকিত দিবসে সম্পন্ন করতে পারো পার্থিব কাজকর্ম। দ্যাখো, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কতো অনুকম্পাপরবশ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র অনুকম্পায় শ্রদ্ধাবনত নয়। তাই তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অত্যাবশ্যকতা পরিত্যাগ করে হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ।

এখানে 'লা ইয়াশ্কুরূন' অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। অর্থাৎ আল্লাহ্র দানের গুরুত্ব ও মহিমা বুঝতে পারে না। 'মানুষ' (আন্নাস) শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে এখানে দু'বার। এখানে অধিকাংশ মানুষের অকৃতজ্ঞ হওয়ার বিষয়টিকে অধিকতর

গুরুত্ববহ ও নিন্দার্হ করা হয়েছে। অন্য এক আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন 'ইন্নাল ইন্সানা লা জলুমুন কাফ্ফার' (নিশ্চয় মানুষ অত্যধিক অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ)।

পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, সবকিছুর স্রষ্টা; তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই; সুতরাং তোমাদেরকে কোথায় ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে'? একথার অর্থ— তোমাদের প্রভুপালনকর্তা আল্লাহ্ই সকল কিছুর সৃজক। তিনি ব্যতীত উপাস্য আর কেউই নেই। অথচ হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমরা তাঁর ইবাদতে সমর্পিত না হয়ে প্রতিমাপূজাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছো কেনো? কেনো হয়ে যাচ্ছো বিপথগামী?

এরপরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'এভাবেই বিপথগামী করা হয় তাদেরকে, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে'। একথার অর্থ— এভাবেই মক্কার মুশরিকেরা তাদের অধীনস্থ ও অনুগতদেরকে এক আল্লাহ্র ইবাদত থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। অস্বীকার করে আল্লাহ্র বাণীসম্ভারকে।

এরপরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন সুন্দর এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিজিক; তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ কতো মহান'।

এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে আল্লাহ্র সৃজন ও প্রতিপালনের কয়েকটি প্রমাণ। যেমন— পৃথিবীকে বাসোপযোগী করা, আকাশকে ছাদস্বরূপ করা, মানুষের আকৃতি নির্ণয় এবং সে আকৃতিকে সুন্দর করা এবং তাদেরকে জীবনোপকরণ দান করা। শেষে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দ্যাখো, যিনি এতোকিছু করেন, তিনি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ নন। তিনিই সকলকিছুর একমাত্র সৃজয়িতা ও পালয়িতা। সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী। সুতরাং তোমরা বোঝো এবং স্বীকার করো যে, তিনিই মহান এবং তিনিই উপাস্য।

এখানে 'ক্বরর' অর্থ বাসস্থান, বাসোপযোগী স্থান। 'বিনাআন 'অর্থ ছাদ। 'ফা আহ্সানা সুওয়ারা কুম' অর্থ তোমাদের আকৃতি করেছেন সুন্দর। করেছেন পরিমিত উচ্চতা, সুসঙ্গত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৃষ্টিনন্দন গাত্রচর্ম, সুঠাম ও সৌকর্যমণ্ডিত অবয়ববিশিষ্ট। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ মানুষকে করেছেন আকর্ষণীয় দেহ-সৌষ্ঠব ও সুষম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী। সে হাত দিয়ে খাবার গ্রহণ করে। আর অন্যান্য প্রাণী আহার গ্রহণ করে মুখ দিয়ে। 'রযাক্বাকুম্ মিনাত্ ত্বইয়্যিবাত্' অর্থ উৎকৃষ্ট রিজিক, সুস্বাদু পানাহারের সামগ্রী।

এরপরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। সুতরাং তোমরা তাকেই ডাকো, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই'।

এখানে 'হাইউ' অর্থ চিরঞ্জীব, আনুরূপ্যবিহীন, শাশ্বত ও স্বতিষ্ঠরূপে আয়ুস্মান, যা সত্তাগত, স্বভাবজ ও অনিবার্য।

'ফাদ্উ'হু মুখলিসীনা লাহুদ্ দীন' অর্থ সুতরাং তোমরা তাঁকেই ডাকো, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। এখানে 'ফাদ্উ'হু' এর 'ফা' হচ্ছে নৈমিত্তিক। অর্থাৎ এর পূর্ববর্তী বাক্য পরবর্তী বাক্যের নিমিত্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্র বর্ণিত গুণাবলীতে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে যে, একনিষ্ঠভাবে কেবল তাঁর ইবাদত করো। 'আদ্দ্বীন' অর্থ এখানে বশ্যতা, ভক্তি। আর বশ্যতা ও ভক্তিকে একনিষ্ঠ করার অর্থ হচ্ছে অংশীবাদিতা ও কপটতা থেকে ইবাদতকে পবিত্র করা।

'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন' অর্থ সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ— তোমরা এই বাক্যটি উচ্চারণ করে আল্লাহ্‌কে আহ্বান করো। ফাররা বলেছেন, বাক্যটি বিধেয় এবং এই বিধেয়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে আদেশ। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি জগতসমূহের প্রভুপালক।

মুজাহিদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' পাঠ করার পর বলা উচিত 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন'। আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থ এটাই। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, একবার ওলীদ ইবনে মুগীরা, শায়বা ইবনে রবীয়া প্রমুখ রসুল স. সকাশে হাজির হয়ে বললো, মোহাম্মদ! তুমি তোমার কথা পরিত্যাগ করো এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মমতানুসারী হও। তাদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত (৬৬)।

বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান করো, তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, যখন আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন এসেছে এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক! আপনি তাদের অপপ্রস্তাবের জবাব দিন এভাবে— বলুন, না। আমি তোমাদের প্রস্তাব মান্য করতে পারি না। কেননা আমি এই মর্মে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি যে, প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণও রয়েছে আমার কাছে। আর আমাকে এরকম প্রত্যাদেশও করা হয়েছে যে, আমি যেনো পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত হই কেবল বিশ্বসমূহের প্রভুপ্রতিপালকের প্রতি।

এখানে 'আলবাইয়্যিনাত' অর্থ সুস্পষ্ট প্রমাণ, নির্দশন— যার সমর্থন পাওয়া যায় জ্ঞানবুদ্ধির সহায়তায় এবং যা বিরত রাখে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনা থেকে। 'আন উসলিমা' অর্থ আত্মসমর্পণ করতে, আনুগত্য ও ইবাদতকে অংশীবাদিতা থেকে পবিত্র রাখতে।

এরপরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে, পরে শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর 'আলাক' থেকে, তারপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা যেনো উপনীত হও

তোমাদের যৌবনে, তারপর হয়ে যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটে এর পূর্বেই। যাতে তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও; এবং তোমরা অনুধাবন করতে পারো'।

এখানে 'ত্বিফলান্' অর্থ শিশু। শব্দটি এখানে একবচনরূপে উল্লেখ করে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে 'শিশু জাতি'দের। 'ইউখরিজুকুম' অর্থ বের করেন। অর্থাৎ তোমাদেরকে বহির্গত করেন মায়ের পেট থেকে। 'ছুম্মা লিতাব্লুগূ' এর 'লাম' এর সম্পর্ক রয়েছে এখানে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— তারপর তোমাদেরকে জীবিত রাখা হয়, যাতে তোমরা যৌবনে উপনীত হতে
পারো। 'মিন ক্বাবলূ' অর্থ এর পূর্বেই। অর্থাৎ যৌবনকাল, অথবা বার্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছানোর পূর্বেই। 'আজ্বালাম্ মুসাম্মা' অর্থ নির্ধারিত কাল, আয়ুষ্কাল। আর 'লাআ'ল্লাকুম তা'ক্বিলূন' অর্থ যেনো তোমরা অনুধাবন করতে পারো।

এরপরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন, তখন তিনি তার জন্য বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়'। এখানে 'ফা ইজা ক্বদ্বা' অর্থ যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন। এখানে 'ফা ইজা' এর 'ফা' এটাই প্রমাণ করে যে, এই বাণী পূর্বোক্ত বাণীর ফল। পূর্বে বলা হয়েছে— তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই করতে সক্ষম। কোনো কিছুর সৃজন তাঁর পক্ষে অতি সহজ। 'কুন্' অর্থ হও। আর 'ফা ইয়াকুন' অর্থ আর তা হয়ে যায়। কোনো উপকরণ বা মৌলের কোনো প্রয়োজন হয় না।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮

www.eelm.weebly.com

❑ 'তুমি কি লক্ষ্য কর না উহাদিগকে যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? কিভাবে উহাদিগকে বিপথগামী করা হইতেছে?'

❑ যাহারা অস্বীকার করে কিতাব ও যাহা সহ আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা; শীঘ্রই উহারা জানিতে পারিবে—

❑ যখন উহাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকিবে, উহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে

❑ ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর উহাদিগকে দগ্ধ করা হইবে অগ্নিতে।

❑ পরে উহাদিগকে বলা হইবে, 'কোথায় তাহারা যাহাদিগকে তোমরা শরীক করিতে,

❑ 'আল্লাহ্ ব্যতীত?' উহারা বলিবে, 'উহারা তো আমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়াছে; বস্তুত পূর্বে আমরা এমন কিছুকে আহ্বান করি নাই।' এইভাবে আল্লাহ্ কাফিরদিগকে বিভ্রান্ত করেন।

❑ ইহা এই কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করিতে এবং এইজন্য যে, তোমরা দম্ভ করিতে।

❑ তোমরা জাহান্নামের বিভিন্ন দরজা দিয়া প্রবেশ কর উহাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য, আর কতই না নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল!

❑ সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি উহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি তাহার কিছু যদি তোমাকে দেখাইয়াই দেই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই— উহাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

www.eelm.weebly.com

❑ আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম। আমি তাহাদের কাহারও কাহারও কথা তোমাদের নিকট বিবৃত করিয়াছি এবং কাহারও

কাহারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করি নাই। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নহে। আল্লাহ্‌র আদেশ আসিলে ন্যায়সংগতভাবে ফয়সালা হইয়া যাইবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আল্লাহ্‌র বচনসম্ভারের বিষয়ে যারা কুটতর্কের অবতারণা করে, আপনি তাদের অবস্থা কি পর্যবেক্ষণ করেননি? দেখেননি কি যে, কীভাবে তারা আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত গ্রন্থাবলী ও আমার বার্তাবাহকগণের পথনির্দেশনাকে অগ্রাহ্য করে। ক্রমশঃ তলিয়ে যায়, যেতে থাকে বিপথগামিতার অতলে? কিন্তু তাদের এ অবস্থা তো চিরকালীন নয়। বরং এ পৃথিবীতে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে উপভোগের সাময়িক অবকাশ। শীঘ্রই তারা প্রত্যক্ষ করবে সত্যের স্বরূপ, যখন দেখবে তাদের গলায় পরানো হয়েছে লোহার বেড়ি ও শিকল। তাদেরকে তখন জোরপূর্বক টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে। তারপর করা হবে অগ্নিদগ্ধ।

এখানে 'আলাম তারা' (তুমি কি লক্ষ্য করো না) প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও বিস্ময়বোধক। এভাবে প্রশ্নটির সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! দেখুন তারা কতো অপরিণামদর্শী! তাই তো আল্লাহ্‌র বাণীসম্ভার নিয়ে শুরু করে কুটতর্ক। কী বিস্ময়! অথবা তারা বিরোধিতা করে আল্লাহ্‌র, রসুলের ও বিশ্বাসীগণের। পরের প্রশ্নটি (কীভাবে তাদেরকে বিপথগামী করা) হচ্ছে ভীতিপ্রদর্শনমূলক ও তিরস্কারসূচক। কুটতর্কের কুফলকে আরো স্পষ্ট করা হয়েছে এই প্রশ্নটির মাধ্যমে। অথবা ওই কুটতর্ককারীরা ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। তাই প্রশ্নও করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন করে। মোহাম্মদ ইবনে সিরীন বলেছেন, এখানকার ৬৯ এবং ৭০ সংখ্যক আয়াত দু'টো অবতীর্ণ হয়েছে যথাক্রমে প্রতিমাপূজক ও কাদ্‌রিয়া সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। উল্লেখ্য পথভ্রষ্ট কাদ্‌রিয়া সম্প্রদায় মানুষকে মনে করে সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতাধর ও স্বাধীন।

একটি জিজ্ঞাসা ঃ কাদ্‌রিয়া সম্প্রদায় তো আল্লাহ্‌র কিতাব মানে এবং সকল পয়গম্বরকে সত্য বলে মানে, তাহলে তাদের সম্পর্কে এরকম বলা যায় কীভাবে যে তারা বিতণ্ডাকারিদের অন্তর্ভুক্ত?

জবাব ঃ কাদ্‌রিয়া সম্প্রদায় এই উম্মতের অগ্নিপূজকতুল্য। আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসুল স. এর বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা, তিনি সর্বশক্তিধর। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তার অপরাধ মার্জনা করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তার অপরাধের কারণে শাস্তি দেন। ছোট বড় সব ধরনের পাপই তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করে দিতে পারেন। তিনি যেমন চান, তেমনই করেন, যেমন আদেশ করতে চান, তেমনই আদেশ প্রবর্তন করেন। তিনি সকলের কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর কাজের বিশ্লেষণ করার অধিকার ও সামর্থ্য কারোই নেই। অথচ কাদ্‌রিয়া সম্প্রদায় এসকল কথা বিশ্বাস করে না। তদুপরি তারা পুলসিরাত, মিজান, শাফায়াত ইত্যাদিকেও অস্বীকার করে। সেকারণেই এখানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 'যারা অস্বীকার করে কিতাব ও যা সহ আমার রসুলগণকে প্রেরণ করেছিলাম তা'।

এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'আল্লাজিনা কাজ্‌জাবু' (যারা অস্বীকার করে) থেকে শুরু হয়েছে পৃথক বাক্য। অর্থাৎ এটা বাক্যের উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় হচ্ছে 'ফা সাওফা ইয়া'লামূন' (তারা খুব শীঘ্র জানতে পারবে)।

'ইউস্‌হাবূন' অর্থ শিকল থাকবে। অর্থাৎ শিকল দিয়ে বেঁধে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। 'ফীল্ হামিম' অর্থ ফুটন্ত পানিতে। 'ফীন্ নারি ইউস্‌জারুন' অর্থ তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে। 'সাজার' অর্থ জ্বলন্ত চুল্লী।

মুকাতিল বলেছেন, তাদেরকে দিয়ে আগুনকে করা হবে অধিকতর তেজোদীপ্ত। মুজাহিদ বলেছেন তাদেরকে করা হবে জ্বালানী। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে বিভিন্নভাবে। কখনো ফুটন্ত পানির শাস্তি, কখনো প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হাব্বান, হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার মাথার উপরের দিকে ইশারা করে বললেন, সীসার কোনো গোলা প্রথম আকাশ থেকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হলে তা রাত ভোর হওয়ার আগেই পৃথিবীতে পতিত হবে। কিন্তু দোজখের কিনার থেকে শিকলের কোনো গোলা নিক্ষেপ করলে তা দোজখের তলদেশে পৌঁছতে সময় লাগবে চল্লিশ বছর। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'পরে তাদেরকে বলা হবে, কোথায় তারা, যাদেরকে তোমরা শরীক করতে (৭৩), আল্লাহ্ ব্যতীত? তারা বলবে, তারা তো আমাদের নিকট থেকে উধাও হয়েছে; বস্তুত পূর্বে আমরা এমনকিছুকে আহ্বান করিনি। এভাবে আল্লাহ্ কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করেন (৭৪)। এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে এবং এজন্য যে, তোমরা দম্ভ করতে (৭৫)। তোমরা জাহান্নামের বিভিন্ন দরোজা দিয়ে প্রবেশ করো তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য, আর কতোইনা নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল'(৭৬)।

www.eelm.weebly.com

‘দ্বল্‌লু’ অর্থ উধাও হয়েছে আমাদের দৃষ্টির বাইরে। এ প্রত্যুৎত্তর তারা করবে তখন, যখন তাদের উপাস্যগুলো তাদের সাথে থাকবে না । অথবা অর্থ হবে— তাদের নিকট থেকে আশাহত হলাম আমরা। হারিয়ে গেলো তারা।

কোনো কোনো আলেম এখানকার ‘বস্তুত পূর্বে আমরা এমন কিছুকে আহ্বান করিনি’ কথাটির অর্থ করেছেন— প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক করিনি। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না’। আবার কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য হবে এরকম— আমরা এমন কোনোকিছুর উপাসনা করিনি, যা না পারে আমাদের কোনো উপকার করতে, না পারে কোনো কষ্ট লাঘব করতে। হাসান ইবনে ফজল এর অর্থ করেছেন— আমাদের পূর্বের সকল উপাসনা হয়েছে নিষ্ফল।

‘এভাবে আল্লাহ্ কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করেন’ অর্থ যে রীতিতে আল্লাহ্ মূর্তিপূজারী ও কাদ্‌রিয়া সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেন, সেই রীতিতেই বিভ্রান্তিতে নিপতিত করেন অন্যান্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে, যাতে তারা নির্দিষ্ট গন্তব্যে

পৌঁছানোর পথ না পায়। পেলেও সে পথে যেনো তারা না চলে। এর কারণ কী, তা-ও এখানে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— এটা একারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে এবং এজন্য যে, তোমরা দম্ভ করতে। অর্থাৎ পৃথিবীর ভোগোন্মত্ততা ও অহংকারই হচ্ছে তোমাদের এমতো সর্বনাশের কারণ।

‘উদ্‌খুলু আব্‌ওয়াবা জাহান্নাম’ অর্থ তোমরা জাহান্নামের বিভিন্ন দরোজা দিয়ে প্রবেশ করো। ‘খলিদীনা ফীহা’ অর্থ স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। আর এখানকার ‘আর কতোই না নিকৃষ্ট জাহান্নামীদের আবাসস্থল’ অর্থ জাহান্নামে প্রবেশ করাটাই হবে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করার কারণ। তাই জাহান্নাম হচ্ছে অতীব নিকৃষ্টতম আবাসস্থল।

এরপরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— ‘সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য’। একথার অর্থ— সুতরাং হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি অংশীবাদীদের অপমন্তব্য ও অপব্যবহার প্রতিহত করুন ধৈর্য দিয়ে। তাদের উপরে বিজয়ী করার যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ আপনাকে দিয়েছেন, তা যথাসময়ে অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি, তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই— তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট’। এখানে ‘ফাইম্‌মা’ এর ‘ইম্‌মা’ এর মূলরূপ ছিলো ‘ইন্ মা’। ইন্ হচ্ছে শর্তসাপেক্ষ এবং ‘মা’ অতিরিক্ত। শর্তকে বলিষ্ঠরূপে প্রকাশ করার জন্যই গুরুত্ববহ ‘নুন’ (নুনে তামীজ)কে এখানে ক্রিয়াসন্নিহিত করা হয়েছে। ‘তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই’ অর্থ তাদের নিধনপর্ব ও বন্দীত্ব যদি এখনই আপনাকে দেখিয়ে দেই। ‘অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই’ অর্থ তাদেরকে শাস্তিগ্রস্ত করার আগেই যদি আপনার জীবনাবসান করা হয়। ‘তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট’ অর্থ তাদের পার্থিব শাস্তি দানে যদি আমি ত্বরা করি, অথবা ঘটাই প্রলম্বায়ন, তবুও শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন? তখন তো তাদেরকে যথোপযুক্ত প্রতিফল দেওয়াই হবে। অর্থাৎ হে আমার নবী! আপনার পার্থিব জীবনে আপনি তাদের শাস্তি দেখতে পান, অথবা না-ই পান, শাস্তি তাদের হবেই।

এরপরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— ‘আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রসুল প্রেরণ করেছিলাম। আমি তাদের কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি’। এখানে ‘রসুলান’ শব্দের তানভীন আধিক্যপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনপদবাসীদের পথপ্রদর্শনার্থে আমি বহুসংখ্যক নবী-রসুল প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু তাদের সকলের কথা আমি আপনাকে জানাইনি। জানিয়েছি কিছুসংখ্যকগণের কথা।

‘রসুলান’ শব্দে তানভীন যুক্ত হয়েছে সংখ্যাধিক্যের কারণে। হজরত লুবাবা থেকে আহমদ ও ইবনে রহওয়াই্ তাঁদের মসনদে, ইবনে হাব্বান তাঁর ‘সহীহ্’তে এবং হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স.কে একবার নবী-রসুলগণের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানিয়েছিলেন এক লাখ চব্বিশ হাজার। তাঁদের মধ্যে রসুল কতোজন ছিলেন জানতে চাইলে বলেছিলেন, তিনশত তেরো জন। হজরত আবু জর গিফারী থেকেও ইবনে হাব্বান এরকম বর্ণনা করেছেন। অবশ্য কোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে কেবল সাতাশ জন নবী-রসুলের কথা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা কোনো রসুলের কাজ নয়’। একথার অর্থ নবী-রসুলগণ অলৌকিক নিদর্শন বা মোজেজা প্রদর্শন করেন আল্লাহ্‌র অনুমোদনক্রমে। স্বেচ্ছায় ও স্বশক্তিতে মোজেজা প্রদর্শন করার অধিকার অথবা ক্ষমতা তাদের নেই।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্‌র আদেশ এলে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে’। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র শাস্তির আদেশ যখন অবতীর্ণ হবে তখন সবকিছুরই মীমাংসা হয়ে যাবে। আর তখন মিথ্যাধিষ্ঠিতরা

www.eelm.weebly.com

হবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত। সে ক্ষতি থেকে আর কোনোদিনও তারা পরিত্রাণ পাবে না। এখানে 'আম্‌রুল্লহ্' বলে বুঝানো হয়েছে নবীগণ এবং তাদের উম্মতের মধ্যেকার শেষ সিদ্ধান্তকে। আর 'বিলহাক্ব' অর্থ— অবিশ্বাসীদের শাস্তি হচ্ছে নবীগণ ও বিশ্বাসীদের বিজয় ও সহায়তা। 'মিথ্যাশ্রয়ী' বা মিথ্যাধিষ্ঠিত (মুব্‌ত্বিলূন) অর্থ ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, যারা যখন তখন বিভিন্ন প্রকার মোজেজা দেখতে চায়, কিন্তু মোজেজা দেখালেও ইমান আনে না।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫

❑ আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য আন'আম সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে উহাদের কতকের উপর তোমরা আরোহণ কর এবং কতক তোমরা আহার কর।

❑ ইহাতে তোমাদের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকার। তোমরা অন্তরে যাহা প্রয়োজন বোধ কর, ইহা দ্বারা যেন তাহা পূর্ণ করিতে পার, আর ইহাদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদিগকে বহন করা হয়।

❑ তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?

❑ উহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ও দেখে নাই উহাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হইয়াছিল? পৃথিবীতে তাহারা ছিল উহাদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। তাহারা যাহা করিত তাহা তাহাদের কোন কাজে আসে নাই।

❑ উহাদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের রাসূল আসিত তখন উহারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করিত। উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহাই উহাদিগকে বেষ্টন করিল।

❑ অতঃপর উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন বলিল, 'আমরা এক আল্লাহ্‌তেই ঈমান আনিলাম এবং আমরা তাঁহার সহিত যাহাদিগকে শরীক করিতাম তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম।'

❑ উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন উহাদের ঈমান উহাদের কোন উপকারে আসিল না। আল্লাহ্‌র এই বিধান পূর্ব হইতেই তাঁহার বান্দাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্‌ই তোমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তু সমূহকে। তোমরা সেগুলোর মধ্যে কোনো কোনো গুলোকে ব্যবহার করো বাহনরূপে। যেমন উট, ঘোড়া, গাধা। আবার কোনো কোনো গুলো হয় তোমাদের আহারের আমগ্রী। যেমন উট, গাভী, ভেড়া, ছাগল। ওগুলো থেকে তোমরা পাও আরো অনেক ধরনের উপকারী সামগ্রী।

www.eelm.weebly.com

যেমন দুধ, পনির, মাখন, ঘি, পশম, চুল, চামড়া, শিঙ। তোমরা যেভাবে চাও সেভাবেই তো ব্যবহার করতে পারো সেগুলোকে। ইচ্ছা মতো পূর্ণ করতে পারো তোমাদের প্রয়োজন। আবার জলপথের বাহনরূপে তোমাদের জন্য রয়েছে নৌকা, জাহাজ। এগুলোর নির্মাণ কৌশল তো তোমরা আয়ত্ত করেছো আল্লাহ্‌র দেওয়া জ্ঞান-বুদ্ধি থেকেই।

ভ্রমণ কখনো কখনো করা হয় ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থে। এরকম ভ্রমণ ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক)। আবার কখনো সফর হয় মোস্তাহাব পর্যায়ের। অর্থাৎ যা করলে পুণ্য সঞ্চিত হয়, না করলে পাপ হয় না। আর পানাহার করতে হয় কখনো জীবনধারণের অত্যাবশ্যক তাগিদে, আবার কখনো তা হয় কেবল আস্বাদনের ব্যাপার । সেজন্য এখানে শব্দব্যবহারে ঘটানো হয়েছে তারতম্য। আরোহণ করা ও অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে 'লি তার্‌কাবু' ও 'লিতাব্‌লুগু' এবং আহার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'ওয়া মিনহা তা'কুলুন'।

পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোন কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। সুতরাং সোজাসুজি বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌ তাঁর সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপের অসংখ্য নিদর্শন সতত পরিদৃশ্যমান করে রেখেছেন এই মহানিসর্গের পরতে পরতে। তদুপরি তিনি বিশেষ বিশেষ নিদর্শন প্রদর্শন করেন তাঁর বচনবাহকগণের মাধ্যমে। অতএব হে মানুষ! তোমরা এই বিপুল নিদর্শনসম্ভারের কোনো একটিকেও তো প্রত্যাখ্যান করতে পারো না।

এরপরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ও দেখেনি, তাদের পূর্ববর্তীদের কী অবস্থা হয়েছিলো? পৃথিবীতে তারা ছিলো এদের চেয়ে সংখ্যায় অধিক এবং কীর্তিতে ও শক্তিতে অধিক প্রবল। তারা যা করতো তা তাদের কাজে আসেনি'। একথার অর্থ— মক্কার অংশীবাদীরা তো নিতান্তই
অপরিণামদর্শী ও একদেশদর্শী। নতুবা তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে পূর্ববর্তী অংশীবাদীদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদগুলো দেখে সতর্ক হতে পারতো। সহজেই একথা বুঝতে পারতো যে, ওই সকল অবাধ্য জাতিগোষ্ঠীগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ, কীর্তিমান, শক্তিমান, দুর্ধর্ষ ও প্রতাপশালী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ ও তাঁর নবী রসুলগণকে অমান্য করে নিপাত হয়েছিলো। সুতরাং এদের সামনেও রয়েছে ভয়ংকর বিপদ। এরাও তো আত্মরক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং সত্যের আহ্বানকে উপেক্ষা করা অনুচিত। কিন্তু তাদের মতো এরাও যে চিরহতভাগা।

এখানে 'আফালাম্‌ ইয়াসীরু ফীল্‌ আরদ্ব' অর্থ তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? অর্থাৎ মক্কাভূমির বাইরে বের হয়ে পূর্ববর্তী জামানার আদ, ছামুদ ইত্যাদি অবাধ্য জনগোষ্ঠীর বিনাশপ্রাপ্ত জনপদের ধ্বংসচিহ্নগুলো কি স্বচক্ষে অবলোকন করেনি? 'আকছারা মিনহুম' অর্থ সংখ্যায় অধিক। 'আশাদ্দা কুওয়া'তাও ও আছারা' অর্থ শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। 'কীর্তি' অর্থ তাদের দুর্ভেদ্য অট্টালিকাবিশিষ্ট শহর, নগর প্রাকার, দুর্গ ইত্যাদি। 'ফামা আগ্‌না আনহুম' অর্থ তা তাদের কোনো কাজে আসেনি। কথাটির 'মা' অংশটুকু না সূচক, অথবা অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন।

এরপরের আয়াতে (৮৩) বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রসুল আসতো, তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করতো। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, তা-ই তাদেরকে বেষ্টন করলো'।

এখানে 'জ্ঞানের দম্ভ করতো' অর্থ তারা মনে করতো তাদের অংশীবাদিতাপূর্ণ ধর্মমতই শ্রেষ্ঠ। এই নিয়ে তাদের অহংকারেরও সীমা-পরিসীমা ছিলো না। অথচ তারা

ছিলো এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। সুস্থ ও শুভ বিবেক-বুদ্ধি বিবেচনা তাদের ছিলোই না। আল্লাহ্‌র সত্তা-গুণবত্তা কার্যকলাপ সম্পর্কে, প্রকৃতি সম্পর্কে, নক্ষত্ররাজির গতিবিধি ও প্রভাব সম্পর্কে তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো সীমাহীন কুসংস্কার ও অপবিশ্বাস। যেমন মক্কার মুশরিকদের বাপ-দাদা থেকে প্রাপ্ত বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিলো, পুনরুত্থান অসম্ভব। বিভ্রান্ত ইহুদীদের ধারণা ছিলো, বেহেশতে যাবে কেবল তারাই, খৃস্টানেরা বলতো, তারাই বেহেশতী ইত্যাদি। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন মুজাহিদ।

এরকমও হতে পারে যে, তারা বড়াই করতো পার্থিব বিষয়সমূহের জ্ঞানের। মনে করতো দৈহিক শক্তি, স্থাপত্য, বিভিন্ন সম্ভোগোপকরণ— এগুলোই আসল। নবীগণ তাদেরকে আখেরাতের প্রতি মনোযোগী হতে বলতেন। এই বলে উপদেশ দিতেন যে, সাময়িক সম্ভোগাকর্ষণ ছিন্ন করে মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতার প্রতি মনোযোগী হও। নতুবা তোমাদের উপরে নেমে আসবে সর্বনাশা শাস্তি। কিন্তু তারা তাদের সদুপদেশাবলীর প্রতি দৃকপাত মাত্র করতো না । তাঁদেরকে মনে করতো তুচ্ছ ও বিদ্রূপের পাত্র। মনে করতো পার্থিব সাফল্যই মানুষের মূল আরাধ্য হওয়া সমীচীন, মনে করতো তাদের জ্ঞানই সঠিক। আবার কথাটির অর্থ এরকম হওয়াও সম্ভব যে, তারা এমন সব বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে অহমিকা প্রদর্শন করতো, যে জ্ঞান পরকালে কোনো কাজে আসবে না। যেমন জ্যোতির্বিদ্যা, যাদুবিদ্যা এবং এমন সব আধিভৌতিক বিদ্যা যেগুলোর চর্চা করে গ্রীক দার্শনিকেরা, অথবা হিন্দুস্তানের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। কোনো এক কাহিনীতে বলা হয়েছে, আফ্‌লাতুন নামের গ্রীক দর্শনের এক পণ্ডিত হজরত ঈসাকে পরীক্ষা করার জন্য একবার প্রশ্ন করলো, যদি আকাশ ধনুক হয়, কালের বিপর্যয়সমূহ যদি হয় সেই ধনুকের তীর, মানুষ যদি হয় লক্ষ্যবস্তু এবং আল্লাহ্‌ যদি হন তীর নিক্ষেপকারী; তাহলে পালাবে কোনদিকে? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্‌র দিকেই। এ জবাব শুনে সে বুঝলো যে, তিনি প্রকৃতই আল্লাহ্‌র

www.eelm.weebly.com

রসুল। তৎসত্ত্বেও সে ইমান আনলো না। অধিকন্তু সে মন্তব্য করলো, নবীগণ তো প্রেরিত হয় দরিদ্র বুদ্ধিহীনদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা তো মুক্তবুদ্ধির অধিকারী।

এক বর্ণনায় এসেছে, সাকরাত নামের গ্রীক দার্শনিককে একবার বলা হলো, রসুল মুসার নিকট যাও না কেনো? সে জবাব দিলো, আমি তো পথপ্রাপ্ত। আমার জন্য কোনো পথপ্রদর্শনকারীর প্রয়োজন নেই।

কোনো কোনো আলেম 'তারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করতো' কথাটির ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলেছেন, পয়গম্বরগণের কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত যে জ্ঞান ছিলো, তা নিয়ে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হাসি-তামাশা করতো, ভাবতো, তাদের ওই জ্ঞান অতি তুচ্ছ। এরকম ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করলে বলতে হয় এখানকার 'ফারিহু' (দম্ভ করতো) অর্থ 'দ্বাহিকু' (হাস্য-তামাশা) এবং 'ইয়াস্তাহ্যিযূ' অর্থ উপহাস এবং 'ইন্দাহুম' এর 'তারা' সর্বনাম 'রসুল' এর। পরের বাক্যটি (তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, তা-ই তাদেরকে বেষ্টন করলো) এ কথাকেই সমর্থন করে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার মনে করেন, এখানকার 'ফারিহু' সন্নিহিত সর্বনামও রসুলগণের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ রসুলগণ যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অজ্ঞতা, পথভ্রষ্টতা ও মন্দপরিণাম লক্ষ্য করেন, তখন তাঁরা এই ভেবে প্রীত ও কৃতজ্ঞ হন যে, আল্লাহ্ তাঁর দয়ায় তাঁদেরকেই দান করেছেন প্রকৃত জ্ঞান। নবুয়তরূপ অনুগ্রহ সম্ভার। তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের হাসি-ঠাট্টা তাদেরকেই বেষ্টন করে ফেলে।

এরপরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন বললো, আমরা এক আল্লাহ্তেই ইমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সঙ্গে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম'। একথার অর্থ— যখন তারা শাস্তির মুখোমুখি হলো, তখন তারা শাস্তির ভয়াবহতা দেখে আঁতকে উঠে বললো, আমরা স্বীকার করছি আমাদের জ্ঞান ছিলো মিথ্যা অহমিকায় ভরা, রসুলগণই সত্য বলেছেন, তাঁদের কথামতো আমরা এবার এক আল্লাহ্র উপরে ইমান আনলাম, পরিত্যাগ করলাম অপবিত্র অংশীবাদিতাকে।

এরপরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো, তখন তাদের ইমান তাদের কোনো উপকারে এলো না'। একথার অর্থ— শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার সময় বিশ্বাস স্থাপনের সময় নয়। সে সময় তো মৃত্যুর পূর্বক্ষণে শেষ হয়ে যায়। তাই ওই সকল মৃত্যুপথযাত্রী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অসময়ের ইমান তখন তাদের কোনো কাজে আসেনি।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র এই বিধান পূর্ব থেকে চলে আসছে তাঁর বান্দাদের মধ্যে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফেরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়'। একথার অর্থ— মৃত্যু আগমনের পূর্বে তওবা করলে সে তওবা আল্লাহ্ গ্রহণ করেন এবং তওবা (সানুতপ্ত ও সলজ্জিত প্রত্যাবর্তন) ব্যতিরেকে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সময়ের ক্ষমাপ্রার্থনা তিনি কিছুতেই গ্রহণ করেন না। এটা হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শাশ্বত রীতি। আর এ রীতি অনুসৃত হয়ে আসছে আবহমানকাল থেকে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এই রীতিটিকে যথাযথরূপে মান্য করে না বলেই চিরদিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এখানে 'সুন্নাতাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্র এই বিধান বা রীতি। জুজায বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সব সময় ক্ষতির মধ্যেই থাকে। কিন্তু সেই ক্ষতির স্বরূপ তাদের কাছে উদ্ভাসিত হয় তখন, যখন তারা দাঁড়ায় মৃত্যুর মুখোমুখি।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। সকল উৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর নবী-রসুল ভ্রাতৃবৃন্দ, পবিত্র বংশধর পরিবার-পরিজন ও সম্মানিত সহচরবৃন্দের প্রতি। আমিন।

সূরা হা-মীম, আস্-সাজ্‌দা

মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরা ৬ রুকু ও ৫৪ আয়াতবিশিষ্ট।

সূরা হা-মীম, আস্সাজ্‌দাঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

www.eelm.weebly.com

❑ হা মীম!
❑ ইহা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হইতে অবতীর্ণ।
❑ এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে ইহার আয়াতসমূহ, আরবী ভাষায় কুরআন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য,
❑ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, সুতরাং উহারা শুনিবে না।
❑ উহারা বলে, 'তুমি যাহার প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত, আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল; সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি।'
❑ বল, 'আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। অতএব তোমরা তাঁহারই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য—
❑ যাহারা যাকাত প্রদান করে না এবং উহারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।
❑ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

প্রথমে উল্লেখিত হয়েছে 'হা-মীম, তানযীলুম্ মিনার রহমানির রহীম'। এখানে 'হা-মীম' হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং 'তানযীল' (অবতীর্ণ) হচ্ছে বিধেয়। কিন্তু 'হা-মীম' যদি হয় বর্ণের বিন্যাস, তবে এখানকার 'তানযীল' হবে একটি উহ্য উদ্দেশ্য এর বিধেয়। আখফাশ এর মতে 'তানযীল' যেহেতু বিশেষ্য; তাই তা অনির্দিষ্টবাচক হওয়া সত্ত্বেও উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় হচ্ছে 'কিতাব'।

'হা-মীম' দিয়ে শুরু হয়েছে, কোরআন মজীদের এরকম সুরার সংখ্যা সাতটি। সেগুলোর সব কয়টিতে 'হা-মীম' উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে কোরআন

অবতীর্ণ হওয়ার কথা। সেগুলোর মধ্যে প্রারম্ভিক মিল যেমন রয়েছে, তেমনি মিল রয়েছে বাক-ভঙ্গির দিক থেকেও। অর্থগত দিক থেকেও তা সম্মিল। আর এখানে বলা হয়েছে— এই বাণী অবতীর্ণ হয়েছে সেই পবিত্রতম সত্তার পক্ষ থেকে, যিনি 'দয়াময়' (রহমান) এবং পরম দয়ালু (রহীম)।

'মুসতাদরাক' গ্রন্থে হাকেম এবং হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুসার ফলক থেকে আমাকে দেওয়া হয়েছে 'তোয়াহা' 'ত্ব সীন মীম'সম্বলিত সুরা এবং 'হা-মীম' শিরোনামসম্বলিত সুরাসমূহ।

আর আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষাংশে 'রহমান' ও 'রহীম' আল্লাহ্‌র এই দুই নাম উল্লেখিত হওয়ায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, কোরআন হচ্ছে পার্থিব ও ধর্মীয় কল্যাণসমূহের কেন্দ্র। অর্থাৎ দ্বীন-দুনিয়ার সকল মঙ্গলের নির্যাস।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এই কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ, আরবী ভাষায় কোরআন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য (৩), সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সুতরাং তারা শুনবে না (৪)।

এখানে 'বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ' অর্থ এই কোরআনে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাদি, অতীত যুগের গুরুত্বপূর্ণ ইতিবৃত্তসমূহ ও অন্যান্য উপদেশাবলী। 'আরবী ভাষায় কোরআন' অর্থ যাঁর উপরে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেই রসুল ও তাঁর সম্প্রদায় যেহেতু আরবীভাষী, তাই কোরআনও অবতীর্ণ হয়েছে আরবীতেই, যাতে করে আরবীয়রা এই কোরআনকে 'অবোধ্য' 'অস্পষ্ট' ইত্যাদি বলার অজুহাত খুঁজে না পায়। সহজে যেনো এর অর্থ বুঝতে পারে এবং সাদরে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে করে যেনো এর যথাঅনুসরণ । অর্থাৎ এটা আরবীয়গণের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার এক বিশেষ অনুগ্রহ। 'জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য' অর্থ কোরআন থেকে মহাকল্যাণ অর্জন করতে পারে কেবল

www.eelm.weebly.com

তারাই যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেক-বিবেচনা সুস্থ, শুভ ও স্বাভাবিক। যারা এরকম নয়, কোরআনের মূল্যায়ন তাদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব।

'সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী' অর্থ জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্যই এই কোরআন উপকারী। তাঁরাই কল্যাণায়িত হতে পারেন এর শুভসংবাদ ও সতর্কবাণী থেকে। অন্যেরা নয়। তাই শেষে বলে দেওয়া হয়েছে— অনেকেই এই কোরআনের প্রতি বিমুখ। এর শুভ উপদেশাবলী শ্রবণের যোগ্যতাও তাদের নেই। এখানে 'সুতরাং তারা শুনবে না' অর্থ অন্ধ কুসংস্কারজনিত জেদ ও বিদ্বেষের কারণে তারা কোরআনের বক্তব্যব্যঞ্জনার প্রতি শ্রুতিবিমুখ। অথবা এখানে 'শুনবে না' অর্থ গ্রহণ করবে না বা মানবে না। যেমন আরবী প্রবাদবচনরূপে বলা হয় 'আমি অমুক লোকের জন্য অমুকের কাছে সুপারিশ করি, কিন্তু সে শোনে না। অর্থাৎ সে আমার কথা মানে না।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'তারা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছো, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত, আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল; সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো এবং আমরা আমাদের কাজ করি'।

এখানে 'কুলূবুনা ফী আকিণ্নাত্' অর্থ আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত। 'আকিন্নাত্' অর্থ পর্দা। শব্দটি 'কিনান' এর বহুবচন। 'মিম্মা তাদ্উ'না ইলাইহি' অর্থ তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছো। 'ফী আজানিনা ওয়াক্বরুন' অর্থ আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা। অর্থাৎ তোমার কথা যে আমরা শুনতেই পাই না। 'মিম্ বাইনিনা ওয়া বাইনিকা হিজাব্' অর্থ তোমার ও আমাদের
মধ্যে আছে অন্তরাল। শেষে বলা হয়েছে 'সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো এবং আমরা আমাদের কাজ করি'। একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা বলে, সুতরাং হে মোহাম্মদ! তুমি তোমার বিশ্বাস নিয়ে থাকো, আর আমাদেরকে থাকতে দাও আমাদের বিশ্বাস নিয়ে। অযথা আমাদেরকে উত্যক্ত কোরো না। অথবা অর্থ— তুমি তোমার ধর্ম প্রচার করতে চাও করো, আমরাও তোমার প্রচেষ্টাকে প্রাণপনে বাধা দিয়ে যাব। তোমাকে বিজয়ী হতে আমরা দিবোই না। উল্লেখ্য, ইসলামের প্রতি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চূড়ান্ত অস্বীকৃতি ঘোষিত হয়েছে এই আয়াতের বক্তব্যে।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার কিছুসংখ্যক কুরায়েশ গোত্রপতিকে রসুল স. জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার তোমরা ইসলাম গ্রহণ করছো না কেনো? ইসলাম গ্রহণ করলে তো সমগ্র আরবের নেতৃত্ব এসে পড়বে তোমাদেরই হাতে। তারা বললো, আমরা তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না, বুঝতেও পারছি না। আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত। আবু জেহেল আবার একটি বস্ত্রখণ্ড দিয়ে তার নিজের এবং রসুল স. এর মধ্যে পর্দা তৈরী করলো এবং বললো, মোহাম্মদ! তুমি যে বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছো, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর পর্দা-আচ্ছাদিত, আমাদের শ্রুতি এ বিষয়ে বধির, আর তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে আড়াল। রসুল স. বললেন, আমি চাই, তোমরা কেবল আমার দুটি কথা মেনে নাও— বলো, এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্র রসুল। একথা শুনে তারা পশ্চাদপসরণ করলো। যেতে যেতে বলতে লাগলো, সে কি সকল উপাস্যের অধিকার দিতে চায় একজনকে। আশ্চর্য তো! এমন কথা তো আমরা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কখনোই শুনিনি। আর আমাদের মধ্যে এতো এতো গুরুত্বপূর্ণ লোক থাকতে তার কাছেই বা এসকল কথা অবতীর্ণ হবে কেনো? চলো চলো, আমরা আমাদের উপাস্য সমূহের বন্দনা-অর্চনা নিয়েই থাকি। এমন সময় রসুল স. সকাশে আবির্ভূত হলো জিবরাইল। বললো, ভ্রাতঃ মোহাম্মদ! আল্লাহ্ আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন। আরো বলেছেন, ওরা বলে, ওরা নাকি বধির। যদি তাই হবে, তবে তারা কোরআন শুনে পালাবে কেনো? নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। তারা সবকিছু শুনেও না শোনার ভান করে। কেননা কোরআনের প্রতি এবং আপনার উপরে কোরআন অবতীর্ণ হয় বলে আপনার প্রতিও রয়েছে তাদের সীমাহীন অবজ্ঞা। পরের দিন তাদের দলের সত্তর জন লোক মিলে হাজির হলো রসুল স. সকাশে। বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করুন। রসুল স. তাদেরকে ইসলামের দীক্ষা দিলেন। পরে মৃদু হেসে বললেন, গতকাল তোমরা যে বললে, তোমাদের অন্তর

আবরণ-আচ্ছাদিত? তারা বললো, কাল আমরা ঠিক কথা বলিনি। যদি তাই হতো, তবে কি আমরা মহান ইসলাম ধর্মের আশ্রয় লাভ করতে পারতাম। আমরা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করছি, আল্লাহ্র বাণী সত্য। আর আমাদের কথা ছিলো অসত্য। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অপরিসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী, আমরা নিঃস্ব এবং সর্ববিষয়ে তাঁরই অনুকম্পাপ্রার্থী।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'বলো, আমি তো তোমাদের মতো একজন মানুষই, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। অতএব তোমরা তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো এবং তাঁরই নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য— (৬) যারা জাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখেরাতেও অবিশ্বাসী' (৭)।

www.eelm.weebly.com

হাসান বসরী বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুলকে বিনয় শিক্ষা দিয়েছেন। তাই এখানে বলতে বলেছেন, হে আমার প্রেমাস্পদ! আপনি তাদেরকে বলুন, আমি তোমাদের মতোই তো মানুষ। কিন্তু আমি মহাসত্যের সন্ধান পেয়েছি একারণে যে, আমাকে এ সম্পর্কে জ্ঞানদান করা হয়েছে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। সুতরাং তোমরা জাগতিক ও পারত্রিক কল্যাণ অর্জনের জন্য আমার প্রতি প্রত্যাদেশিত নিদর্শনকে মান্য করো। এটা তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। অথবা এখানকার 'আমি তো তোমাদের মতো একজন মানুষই' কথাটির অর্থ হবে— আমি মানব সম্প্রদায়ভূত, জ্বিন অথবা ফেরেশতাদের মধ্য থেকে কেউ নই যে, তোমরা সহজে মহাসত্যের শিক্ষা নিতে পারবে না। এরকমও নয় যে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত কোনো বিশ্বাসের দিকে আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমি তো আহ্বান জানাচ্ছি সহজ সরল পথের দিকে, একমাত্র উপাস্য মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতা এক আল্লাহ্র দিকে, যা সম্পূর্ণতই স্বাভাবিক, যুক্তিসঙ্গত ও বিধিসম্মত।

'অতএব তোমরা তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো এবং তাঁরই নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো' অর্থ কাজেই যিনি তোমাদের সৃজক ও পালক, তাঁর মনোনীত ধর্মাদর্শকেই তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং ইতোপূর্বের অংশীবাদিতা ও পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হও কেবল তাঁর সকাশে।

'ওয়াইলুল্ লিল্মুশরিকীন' অর্থ দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য। 'ওয়াইলুন' হচ্ছে শাস্তিবাচক শব্দ। এখানকার 'যারা জাকাত প্রদান করে না' কথাটিকে হজরত ইবনে আব্বাস ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' কলেমায় বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ এই কলেমায় বিশ্বাস স্থাপন করাই হচ্ছে নফসের জাকাত বা প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধতা। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— তারা আল্লাহ্র এককত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের প্রবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করে না। হাসান ও কাতাদা বলেছেন, এখানে 'জাকাত' অর্থ শরিয়ত নির্ধারিত ফরজ জাকাত, অংশীবাদীরা যার অপরিহার্য হওয়াকে স্বীকার করে না। এক বর্ণনায় এসেছে, জাকাত হচ্ছে ইসলামের সাঁকো। এই সাঁকো যে অতিক্রম করতে পেরেছে সে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে পতন থেকে এবং যে তা পারেনি, সে হয়ে গিয়েছে বরবাদ। মুকাতিল ও

জুহাক কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— তারা আল্লাহ্র পথে তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে না। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'জাকাতে'র উদ্দেশ্য আসলে পবিত্রতা। অর্থাৎ তারা তাদের কর্মকাণ্ডকে পবিত্র করে না।

বায়যাবী লিখেছেন, ৭ সংখ্যক আয়াতের বক্তব্যে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জন্য মূল বিশ্বাস যেমন অপরিহার্য, তেমনি অপরিহার্য শাখাগত আমলসমূহও। সুরা মুদ্দাছ্ছিরের 'আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না' আয়াতের ব্যাখ্যায় এ প্রসঙ্গে বলাও হয়েছে। অর্থাৎ জাকাত না দেওয়ার অর্থই হচ্ছে পরকালকে অস্বীকার করা। সেকারণেই পরকালে অবিশ্বাসী ও জাকাত প্রদানে অনীহ ব্যক্তিরা দুঃস্থ জনতাকে সাহায্য করাকে মনে করে অপচয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্র অংশীদার সাব্যস্ত করা ও পরকালের বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করার সঙ্গে জাকাত না দেওয়ার প্রসঙ্গটিকে একারণেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, স্বভাবতই ধনসম্পদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে প্রবল। সুতরাং আল্লাহ্র পথে অর্থব্যয় হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর ইমানের লক্ষণ। তাই বুঝতে হবে এখানে 'যারা জাকাত প্রদান করে না' বলে পরোক্ষভাবে ইমানদারদেরকেই জাকাত প্রদানের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে এবং জাকাত না দেওয়াকে প্রতিপন্ন করা হয়েছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার'।

এখানে 'আজ্রুন্ গইরু মাম্নূন' অর্থ নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— যা অপ্রতুল নয়। মুকাতিল বলেছেন— যা অপূর্ণ নয়। মুজাহিদ বলেছেন— যা অগণন। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন— যা পর্যাপ্ত।

সুদ্দী বলেছেন, যারা পঙ্গু, বয়োবৃদ্ধ ও অসুস্থ, যারা যৌবনকালে ইবাদত করতো তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। বলা হয়েছে, যৌবনকালের মতো ইবাদত না করতে পারলেও তাদেরকে আগের মতোই সওয়াব দেওয়া হবে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যৌবনে উত্তম আমলকারীরা অসুস্থ হয়ে পড়লে আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাকে হুকুম দেওয়া হয়, তারা যেনো তাদের জন্য সেরকমই নেক আমল লিখতে থাকে, যা তারা করতো সুস্থ অবস্থায়। এই আদেশ বলবৎ থাকে ততোদিন পর্যন্ত, যতোদিন তারা রোগমুক্ত না হয়।

হজরত আবু মুসা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোনো বান্দা পীড়িত হয়ে পড়লে অথবা সফররত অবস্থায় থাকলে তার জন্য ওই সকল পুণ্যকর্মের প্রতিফল লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে, যা তারা করতো সুস্থ অথবা গৃহবাসী অবস্থায়।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন কোনো মুসলমান শারীরিক দুঃখকষ্টে পতিত হয়, তখন আল্লাহ্ ফেরেশতাকে আদেশ করেন ওই সকল পুণ্য তাদের আমলনামায় লেখার জন্য, যেগুলো তারা অর্জন করতো সুস্থ অবস্থায়। এরপর যখন সে সুস্থ হয়, তখন আল্লাহ্ তার পাপসমূহও ধুয়ে মুছে

www.eelm.weebly.com

পবিত্র করে দেন। আর জীবন হরণ করলে তাকে ক্ষমা করে দেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে তাকে করেন পুরস্কৃত। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, অসুস্থ অবস্থায় বান্দার জন্য সেই সকল পুণ্যকর্ম লেখা হয়, যা তারা করতো সুস্থ অবস্থায়।

সূরা হা-মীম, আস্ সাজ্দা ঃ আয়াত ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

তাফসীরে মাযহারী/৩৭৮

❑ বল, 'তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা কি তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতেছ? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক!

www.eelm.weebly.com

❑ তিনি স্থাপন করিয়াছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং উহাতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চারি দিনের মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য।

❑ অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, 'তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।' উহারা বলিল, 'আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া।'

❑ অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন, এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলাম সুরক্ষিত। ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র ব্যবস্থাপনা।

❑ তবুও ইহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে বল, 'আমি তো তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, 'আদ ও ছামুদের শাস্তির অনুরূপ।'

❑ যখন উহাদের নিকট রাসূলগণ আসিয়াছিল উহাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে এবং বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও 'ইবাদত করিও না।' তখন উহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের প্রতিপালকের এইরূপ ইচ্ছা হইলে তিনি অবশ্যই ফিরিশতা প্রেরণ করিতেন। অতএব তোমরা যাহা-সহ প্রেরিত হইয়াছ, আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিলাম।'

❑ আর 'আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, উহারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করিত এবং বলিত, 'আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে?' উহারা কি তবে লক্ষ্য করে নাই যে, আল্লাহ্, যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি উহাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ উহারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিত।

❑ অতঃপর আমি উহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাইবার জন্য উহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভ দিনে। আখিরাতের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং উহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।

❑ আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে তো এই যে, আমি উহাদিগকে পথনির্দেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করিয়াছিল। অতঃপর উহাদিগকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্র আঘাত হানিল উহাদের কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ।

❑ আমি রক্ষা করিলাম তাহাদিগকে, যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে বলুন, তোমরা কি সেই সার্বভৌম ও একক সত্তাকে অস্বীকার করতে চাও, এবং নির্ধারণ করতে চাও তার সমকক্ষ, যিনি এই বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে? অথচ তিনি কেবল এই পৃথিবীরই সৃজনকর্তা নন, তিনি সৃজনকর্তা সমগ্র সৃষ্টির।

এখানকার প্রশ্নটি উপস্থাপন করা হয়েছে অংশীবাদীদেরকে ধমক দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে। বক্তব্যটি একটি অনুক্ত প্রশ্নের জবাব। ওই অনুক্ত প্রশ্নটি হচ্ছে— রসুল স. যখন এই মর্মে জানতে চাইলেন যে, হে আমার প্রভুপালক! ওরা যদি সত্য গ্রহণ করতে অনীহ হয়, পাপসমূহ থেকে তওবা না করে, তবে আমি তাদেরকে কী বলবো?

'ফী ইয়াওমাইন' অর্থ দুই দিনে। ওই দুই দিন হচ্ছে রবিবার ও সোমবার। 'রব্বুল আ'লামীন' অর্থ জগতসমূহের প্রতিপালক। অর্থাৎ অস্তিত্বশীল সকল সৃষ্টির যিনি স্রষ্টা। বিশ্বজগতের জাতিগোষ্ঠী, শ্রেণী বহুপ্রকারের। সেকারণেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে মূল ধাতুর বহুবচন 'আ'লামীন' এবং এর বর্ণনায় বিবেকহীন সৃষ্টি অপেক্ষা বিবেকবান সৃষ্টিকেই দেওয়া হয়েছে অধিকতর প্রাধান্য।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'তিনি স্থাপন করেছেন পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং এতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন— খাদ্যের সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য'। একথার অর্থ— আর তিনি ভূপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শৈলশ্রেণী, ভূমিতে রেখে দিয়েছেন উপকারপ্রদায়ক সামগ্রীসমূহ। পৃথিবীবাসীদের জন্য আহার্যের ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। আর এ সকল কিছুর ব্যবস্থাপনা তিনি সম্পন্ন করেছেন চারদিনে। সৃষ্টিরক্ষার এই সুষম ব্যবস্থার রহস্য জানতে পারে কেবল তারা, যারা অনুসন্ধিৎসু।

এখানে 'এতে রয়েছে কল্যাণ' অর্থ এই ভূপৃষ্ঠেই রয়েছে কতো গ্রাম-জনপদ-সাগর-নদী-ফল-ফসল-পশু-পাখি, যা মানুষের জন্য কল্যাণকর। 'এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের' অর্থ এই পৃথিবী সকল প্রাণীর খাদ্য ও পানীয়ের উৎপাদন ক্ষেত্র। হাসান বলেছেন, আল্লাহ্ পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর আহারের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন পৃথক পৃথক রীতিতে। ইকরামা ও জুহাক বলেছেন, আল্লাহ্ বিভিন্ন স্থানকে উপযোগী করেছেন বিভিন্ন প্রকার আহার্যবস্তুর উৎপাদনস্থলরূপে। ফলে এক স্থানের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে চলে অন্য অঞ্চলের মানুষের পণ্যবিনিময়। এই পণ্যবিনিময়ই আবার হয় বহুসংখ্যক লোকের জীবিকার্জনের মাধ্যম। কালাবী বলেছেন, বিভিন্ন জনপদের মানুষের খাদ্যাভ্যাসও একরকম নয়। তাই কেউ ভক্ষণ করে যব, গম, ধান, কেউবা খেজুর, অথবা অন্য কোনো খাদ্যবস্তু। 'চার দিন' অর্থ আগের দুই দিন যোগ এই দুই দিন। আগের

www.eelm.weebly.com

দুই দিন ছিলো রবিবার ও সোমবার। আর এই দুই দিন হচ্ছে মঙ্গলবার ও বুধবার। এভাবে হিসাব করলে মোটমাট সময় লাগে চারদিন। যেমন বলা হয়ে থাকে— আমরা বসরা থেকে বাগদাদ যেতে সময় লাগে দু'দিন এবং কুফা যেতে লাগে তিনদিন। অর্থাৎ প্রথম দুই দিন যোগ আর একদিন। আর 'সায়িলীন' অর্থ এখানে যাচনাকারী, অনুসন্ধানকারী। অর্থাৎ পৃথিবী ও পৃথিবীর সকল কিছুর নির্মাণে ও ব্যবস্থাপনায় কতোদিন সময় লেগেছে, এ সম্পর্কে যদি কেউ অনুসন্ধিৎসু হয়, তবে তার জন্য জবাব হচ্ছে— মোটমাট চার দিন। অথবা কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি অনুক্ত শব্দ 'কুদ্দারা' এর সঙ্গে। যদি তাই হয়, তবে অনুসন্ধিৎসুদেরকে জবাব দেওয়া যেতে পারে, পৃথিবীর প্রাণীকুলের খাদ্য ব্যবস্থাপনাতেই সময় লেগেছে চারদিন।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিলো ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো, আমরা এলাম অনুগত হয়ে'।

এখানে 'ছুম্মাস্ তাওয়া' অর্থ অতঃপর মনোনিবেশ করেন। এখানে 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটি কালক্ষেপণের জন্য ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে পৃথিবী ও আকাশ এই দুই সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য।

'দুখান' অর্থ ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। বাগবী লিখেছেন, আকাশ সৃষ্টির মূল উপকরণ ছিলো বাস্প, অর্থাৎ জলীয় বাস্প। গ্রীক দার্শনিক ও শরীরবিজ্ঞানীদের মতে মাটি ও আগুনের মূল মিশ্রণের নাম 'দুখান' এবং পানি ও বাতাসের মূল মিশ্রন হচ্ছে 'বুখার'। কিন্তু বাগবী 'দুখান' বলেছেন জলীয় বাস্পকেই।

'তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়' অর্থ আল্লাহ্ আকাশ-পৃথিবী উভয়কে নির্দেশ দিলেন, তোমরা চাও বা না চাও, নিকটবর্তী হও তোমাদের সকল প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও বৈচিত্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে, যেগুলো আমি গচ্ছিত রেখেছি তোমাদের অভ্যন্তরে। অথবা কথাটির অর্থ হবে— তোমাদের ভিতর থেকে আমি যা কিছু সৃষ্টি করতে চাই, তা তোমরা প্রকাশ করো। তাউসের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি আমার বান্দাদের জন্য যে সকল কল্যাণকর বস্তু তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছি, সেগুলোকে প্রকাশ করো। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ্ তখন আকাশকে আদেশ দিলেন, হে আকাশ! তুমি প্রকাশ করো তোমার সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জকে। আর পৃথিবীকে নির্দেশ দিলেন, আর হে পৃথিবী! তুমি তোমার সমুদ্রসমূহকে সলিলিত ও তরঙ্গময় করো এবং স্থলভাগকে করো বৃক্ষময়, পুস্পময়, শস্যময় ও তৃণগুল্মবিশিষ্ট।

'ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়' অর্থ তোমরা স্বেচ্ছায় যদি আসতে চাও তো এসো, আর অনিচ্ছুক যদি হও, তবে তোমাদেরকে আমি আসতে বাধ্য করবো। আর 'ত্বয়িয়ীন' অর্থ অনুগত হয়ে। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে পুংলিঙ্গবাচক বহুবচন। দ্বিবচনের স্ত্রীলিংঙ্গবাচক শব্দরূপ এখানে ব্যবহার করা হয়নি। এর কারণ হচ্ছে

নির্দেশানুগত হওয়ার সম্মতি প্রদানের মধ্যে শামিল ছিলো আকাশ-পৃথিবীসহ অন্যান্য জগতও। তাছাড়া এখানে উল্লেখ করা হয়েছে 'তারা বললো'। বলা কওয়া করতে পারে কেবল বিবেকবান সৃষ্টি। অথচ এখানে কথা বলার সম্পর্ক করা হয়েছে আকাশ-পৃথিবীর সঙ্গে, যারা বাহ্যত বিবেকবান নয়। অতএব বুঝতে হবে এখানে আকাশ-পৃথিবীকে বিবেকবান বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আকাশ-পৃথিবীর কথা বলাকে এখানে বুঝতে হবে রূপকার্থে, প্রকৃতার্থে নয়। আর আকাশ-পৃথিবীর 'আতাইনা' (আমরা এলাম) কথাটির মধ্যে ঘটেছে আল্লাহ্তায়ালার অপার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ তাঁর সকল সৃষ্টিই তাঁর নির্দেশ তাৎক্ষণিকভাবে পালন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে বাধ্য। এরকম তাৎক্ষণিকভাবে নির্দেশ কার্যকর হওয়ার কথা এসেছে 'কুন্ ফা ইয়াকুন' আয়াতে।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে এর বিধান ব্যক্ত করলেন, এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র ব্যবস্থাপনা'।

এখানে 'ফা কৃদ্বা হুন্না সাবআ' সামাওয়াতিন ফী ইয়াওমাইন' অর্থ অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দুইদিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন। এখানে 'হুন্না' সর্বনামটির দ্বারা ইশারা করা হয়েছে আকাশের দিকে। কেননা 'সামাআ' অর্থের দিক দিয়ে বহুবচন। আর এর সর্বনাম রয়েছে এখানে প্রচ্ছন্ন। 'সাবআ' সামাওয়াতি' (সপ্তাকাশ) হচ্ছে এর পরিষ্কার ব্যাখ্যা। এর উদ্দেশ্য আল্লাহ্ই সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ সাত আকাশকে অস্তিত্বায়িত করেছেন অনস্তিত্ব থেকে। আর এখানকার 'দুইদিনে' অর্থ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। জালালুদ্দিন মাহাল্লী বলেছেন, শুক্রবারের অন্তিম সময়ে আল্লাহ্তায়ালা আকাশ সৃজন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ওই অন্তিম সময়ে তিনি সৃষ্টি করেন হজরত আদমকে। সেকারণেই এখানে 'সৃজন পূর্ণ করেন' এরকম বলা হয়নি। আমি বলি, জালালুদ্দিন মাহাল্লীর এমতো উক্তির ভিত্তি সম্ভবতঃ ওই হাদিস, যা বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক। যেমন তিনি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ্ মাটি সৃষ্টি করেছেন শনিবারে, পাহাড় সৃষ্টি করেছেন রবিবারে, গাছপালা সৃষ্টি করেছেন সোমবারে, দুঃখকষ্ট ও বিপদাপদ সৃষ্টি করেছেন মঙ্গলবারে, নূর সৃষ্টি করেছেন বুধবারে, চতুস্পদ জন্তু সমূহ বৃহস্পতিবারে এবং আদম সৃষ্টি করেছেন শুক্রবারের বিকেলে, আসরের পর, সকলের শেষে। অন্তিম ক্ষণ হচ্ছে আসর-মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়। প্রকাশ থাকে যে, এই হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে বর্ণনাকারী অনবধান

www.eelm.weebly.com

হয়েছেন। কোরআনের ভাষ্য হচ্ছে— আল্লাহ্ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অথচ এখানে বর্ণনাকারী বলেছেন সাতদিনের কথা। প্রকৃত কথা হচ্ছে সৃজনপর্ব শুরু হয়েছে রবিবার থেকে। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে শনিবারের কথা। আবার কোরআনে বলা হয়েছে পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সৃজিত হয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে (মঙ্গল ও বুধবারে)। অথচ এই

হাদিসে বলা হয়েছে, পাহাড় সৃষ্টি করা হয়েছে রবিবারে এবং গাছপালা সোমবারে। আবার কোরআনে বর্ণিত আদম সৃষ্টির কাহিনী একথাই প্রকাশ করে যে, হজরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির বহুকাল পরে। যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন— যখন আপনার প্রভুপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করবো। এছাড়া আদম সৃষ্টি সম্পর্কিত অন্য এক বিবরণে পাওয়া যায়, তাঁর শরীর নির্মাণের মাটিকে মালিশ করা হয় চল্লিশ দিন ধরে।

এখানে 'এবং প্রত্যেক আকাশে তার বিধান ব্যক্ত করলেন' কথাটির অর্থ— এবং তিনি প্রত্যেক আকাশে প্রবর্তন করলেন ফেরেশতাদের মানোপযোগী আদেশ। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ প্রতিটি আকাশে ফেরেশতা, সাগর, পর্বত, বায়ুপ্রবাহের স্তর ইত্যাদি কতোকিছু যে সৃষ্টি করে রেখেছেন, তার প্রকৃত সংবাদ তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। কাতাদা ও সুদ্দী বলেছেন, আকাশে তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও অসংখ্য তারকা। মুকাতিল বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাদি প্রথম অবতীর্ণ করেন আকাশে। কেউ কেউ বলেছেন, আকাশের সকল সৃষ্টিকে তিনি আনুগত্যের আদেশ দেন। আর 'আমি নিকটবর্তী আকাশকে করলাম সুশোভিত প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত' একথাটির মধ্যে ঘটেছে আল্লাহ্র অপরিসীম পরাক্রমের বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ নিকটবর্তী আকাশকে তিনি করেছেন সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রালোক শোভিত, যা করার সাধ্য অন্য কারো নেই। আবার ফেটে যাওয়া, ক্ষয় হওয়া, ভেঙে যাওয়া অথবা অন্য কোনোরকম দুর্ঘটনাকবলিত হওয়া থেকে তিনি আকাশকে করেছেন সুরক্ষিত। এরকম করার সামর্থ্যও অন্য কেউ রাখে না।

শেষে বলা হয়েছে 'জালিকা তাক্বদীরুল্ আ'যীযিল আ'লীম' (এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র ব্যবস্থাপনা)। এখানে 'আ'যীয' অর্থ মহাপরাক্রমশালী, আপন সৃষ্টির ব্যবস্থাপনায় পরিপূর্ণরূপে প্রভাবশালী। আর 'আ'লীম' অর্থ সর্বজ্ঞ, আপন সৃষ্টির সকল কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তবুও এরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলো, আমিতো তোমাদেরকে সতর্ক করেছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, আদ ও ছামুদের শাস্তির অনুরূপ'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এতোক্ষণ ধরে আলোচিত আল্লাহ্র একক সত্তা এবং তাঁর সর্বজ্ঞতা-সর্বশক্তিধরতা ও সৃজননৈপুণ্যের অভাবিতপূর্ব বিবরণ শোনার পরেও যদি আপনার স্বজাতীয় অংশীবাদীদের চৈতন্যোদয় না ঘটে থাকে, তবে তাদেরকে চূড়ান্তকথাটি জানিয়ে দিন এভাবে— আমি তাহলে তোমাদেরকে সতর্ক করতে বাধ্য হচ্ছি এমন ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক শাস্তি সম্পর্কে, যেরকম শাস্তি আপতিত হয়েছিলো অবাধ্য আদ ও ছামুদ জাতির উপর।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'যখন তাদের নিকট রসুলগণ এসেছিলো তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ থেকে এবং বলেছিলো, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত কোরো না। তখন তারা বলেছিলো, আমাদের প্রতিপালকের এরূপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। অতএব তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম'।

এখানে 'তাদের নিকট তাদের রসুল এসেছিলো তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ থেকে' কথাটির অর্থ— তাদের প্রতি প্রেরিত রসুলগণ তাদের পথপ্রদর্শনার্থে অবলম্বন করেছিলেন সর্ববিধ উপায়, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। অথবা এখানে 'সম্মুখ' ও 'পশ্চাৎ' অর্থ অনাগতকাল ও অতীতকাল। অর্থাৎ অতীতের অবাধ্য উম্মতের পরিণতি কী হয়েছিলো, সেকথা যেমন তাদেরকে বার বার বলা হয়েছিলো, তেমনি তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিলো ভবিষ্যতে অবাধ্যতা করলে কী ঘটবে, সে সম্পর্কে। এভাবে তাদেরকে সাবধান করার কোনো প্রচেষ্টাই তাদের নবীগণ বাকী রাখেননি। কিংবা 'সম্মুখ' ও 'পশ্চাৎ' অর্থ এখানে পূর্বাপর। অর্থাৎ আগের যুগের লোকদের সংবাদ আদ ও ছামুদ জাতি জানতো। আবার হজরত হুদ ও হজরত সালেহ তাদেরকে জানিয়েছিলেন পরবর্তী যুগের লোকদের অবস্থা সম্পর্কেও। এভাবে তারা হৃদয় গলানো ভাষায় তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলেন সত্যধর্মের দিকে। কিংবা 'সম্মুখ' ও 'পশ্চাৎ' অর্থ এখানে সুপ্রচুর, অনেক। অর্থাৎ অনেক নবীই আ'দ, ছামুদ ও তাদের মতো দুর্বিনীত সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শণার্থে প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'তাদের কাছে তাদের রিজিক পর্যাপ্ত পরিমাণে আসতো প্রত্যেক স্থান থেকে'।

'আমাদের প্রতিপালকের এরকম ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। অতএব তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম' কথাটির অর্থ— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদের প্রতি নবীগণকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করতো যে, আমরা যেমন, তেমনি তোমরাও। সমমর্যাদাসম্পন্ন যারা, তারা কেউ কারো পথপ্রদর্শক হতে পারে না। সুতরাং তোমাদেরকে এবং তোমরা যে প্রত্যাদেশ নিয়ে এসেছো বলছো, তাকে আমরা অমান্য করলাম। আমাদেরকে হেদায়েত করাই যদি আমাদের প্রতিপালকের ইচ্ছা হতো, তবে তিনি অবশ্যই আমাদের কাছে পাঠাতেন কোনো ফেরেশতাকে। কিন্তু ফেরেশতা তো তোমরা নও। তোমরা তো আমাদেরই স্বগোষ্ঠীভূত।

www.eelm.weebly.com

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, একবার আবু জেহেল কতিপয় কুরায়েশ গোত্রপতিকে বললো, মোহাম্মদের ব্যাপারটা তো আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারছি না। তোমরা বরং তাকে পরীক্ষা করবার জন্য এমন একজন লোককে ঠিক করো যে কাব্য, ভবিষদ্বাণী ও যাদুবিদ্যা সম্পর্কে পারদর্শী। সে মোহাম্মদের সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ করবে, তারপর আমাদের কাছে এসে সব বুঝিয়ে বলবে। একথা শুনে উত্বা ইবনে রবীয়া বলে উঠলো, আল্লাহ্র শপথ! আমি তো কবিতা, ভবিষ্যদ্বাণী ও যাদু সম্পর্কে অনেক কিছু জানি। আমিই বরং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনা করে দেখি। সেরকম কিছু হলে আমার কাছে তার প্রকৃত রহস্য অনুদঘাটিত থাকবে না। এই বলে সে গিয়ে সাক্ষাত করলো রসুল স. এর সঙ্গে। বললো, মোহাম্মদ! তুমি না অভিজাত হাশেমী কুলোদ্ভব। বলো, তুমি উত্তম, না উত্তম তোমার শ্রদ্ধার্হ পিতামহ আবদুল মুত্তালিব? অথবা শ্রেষ্ঠ কি তুমি, না শ্রেষ্ঠ তোমার সম্মানার্হ পিতা আবদুল্লাহ্?

তাহলে বলো, কেনো তুমি তোমার শ্রদ্ধাভাজন পিতৃপুরুষদের ধর্মমতকে ভ্রান্ত বলছো? নেতা হওয়ার আকাংখা যদি তোমার থাকে, তাহলে বলো, আমরা আমাদের নেতৃত্বের পতাকা তোমাকেই দিয়ে দেই। আর যদি বাসনা থাকে নারীর, তবে তা-ও খুলে বলো। তোমার পছন্দমতো দশজন পরমাসুন্দরী কুরায়েশ নারীর সঙ্গে আমরা তোমার বিবাহ দিয়ে দেই। আর যদি কামনা করো ধন-সম্পদ, তবে তোমাকে আমরা করে দেই সর্বাপেক্ষা অধিক ধনাঢ্য, যাতে করে তোমার উত্তরপুরুষেরাও হয়ে যেতে পারে শ্রেষ্ঠ বিত্তপতি, উত্বার কথা রসুল স. নীরবে শুনে যেতে থাকলেন। জবাব দিলেন তার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর। প্রথমে পড়তে শুরু করলেন 'হা-মীম। এটা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট থেকে অবতীর্ণ, এক কিতাব বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াত সমূহ, আরবী ভাষায় কোরআন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য.....'। এভাবে পাঠ করতে করতে এসে শেষ করলেন ১৩ সংখ্যক আয়াতের— 'আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, আ'দ ও ছামুদের শাস্তির অনুরূপ' পর্যন্ত। এ পর্যন্ত শুনেই উত্বা ভয় পেয়ে গেলো। রসুল স. এর মুখে হাত দিয়ে আত্মীয়তার কসম দিয়ে অনুরোধ করলো চুপ থাকতে। তারপর সোজা চলে গেলো তার নিজের বাড়িতে। সঙ্গী সাথীদের কাছে না গিয়ে ঘরের মধ্যে বসে রইলো চুপচাপ। তার এরকম ভাবান্তর দেখে আবু জেহেল তার সঙ্গীদেরকে বললো, হে কুরায়েশ গোত্রাধিনায়কেরা! আল্লাহ্র কসম! আমার তো মনে হয়েছে উত্বা মোহাম্মদের অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। এর কারণ কেবল এই-ই হতে পারে যে, সে মোহাম্মদের বাকচাতুর্যের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। চলো, তার সঙ্গে সকলেই গিয়ে একটু দেখা করে আসি। সকলে তখন গিয়ে হাজির হলো উত্বার বাড়িতে। আবু জেহেল বললো, উত্বা। আল্লাহ্র কসম! আমাদের তো মনে হচ্ছে তুমি এখন মোহাম্মদাসক্ত। সেজন্যই তুমি আমাদের সঙ্গে দেখা করোনি। তোমার যদি ধনসম্পদের প্রয়োজন থাকে তো বলো, আমরা তোমাকে এতো ধনসম্পদ দিবো, যা তোমার মোহাম্মদাসক্তিকে দূর করতে সমর্থ। উত্বা একথা শুনে রেগে গেলো এবং শপথ করে বললো, ভবিষ্যতে মোহাম্মদের সঙ্গে আমি আর কথাই বলবো না। আরো বললো, তোমরা তো জানোই কুরায়েশদের মধ্যে আমি একজন সম্পদপতি। কিন্তু আসল ব্যাপার শোনো, আমি তো তার কাছে গিয়ে অনেক কিছু বললাম। প্রত্যুত্তরে সে আমাকে এমন কথা শোনালো যে আমি অভিভূত না হয়ে পারিনি। তবে এ ব্যাপারে আমি এখন নিঃসন্দিগ্ধ যে, সে কবি, ভবিষ্যদ্বক্তা বা যাদুকর কোনোটাই নয়। শোনো তাহলে— একথা বলে সে রসুল স. এর কাছ থেকে যা শুনেছিলো তা সবাইকে আবৃত্তি করে শোনালো। তারপর বললো, এ পর্যন্ত শুনে আমি তার মুখে হাত রেখে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তার পাঠ বন্ধ করিয়েছি। তোমরা তো জানোই, মোহাম্মদ কখনো মিথ্যা বলে না। সে কারণেই আমি আশংকা করছি, তোমাদের উপর কখন জানি শাস্তি আপতিত হয়।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী বলেছেন, আমার কাছে এই তথ্যটি পৌঁছেছে যে, উত্বা ছিলো খুব বুদ্ধিমান জননেতা। একদিন সে তার লোকজনদেরকে নিয়ে কাবাগৃহের প্রাঙ্গণে বসেছিলো। এমন সময় রসুল স. সেখানে একাকী আগমন করলেন। উত্বা বললো, হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! আমি কি মোহাম্মদের সঙ্গে কিছু বাক্যালাপ করবো? হতে পারে সে হয়তো আমাদের কোনো প্রস্তাবকে গ্রাহ্য করবে। আমরাও হয়তো তার কোনো কথা মেনে নিতে পারবো। ফলে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিসম্বাদ আর থাকবে না। ঘটনাটি সেই সময়ের যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন রসুল স. এর প্রিয় পিতৃব্য বীরকেশরী হামযা এবং রসুল স. এর বিশ্বাসী অনুচরবর্গের সংখ্যাও তখন ক্রমবর্ধমান। কুরায়েশরা বললো, হে আবুল ওয়ালিদ! তাই করো। মোহাম্মদের কাছে যাও এবং তার সঙ্গে কথা বলো। উত্বা এগিয়ে গেলো। কিছু দূরে উপবিষ্ট রসুল স. এর সামনে গিয়ে সে-ও বসে পড়লো। বললো, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমাদের গোষ্ঠী সুবিস্তৃত। তোমাদের কৌলিন্যও বিশেষ পর্যায়ের। কিন্তু তুমি এমন কথা বলতে শুরু করেছো যে, তোমার আপনজনদের মধ্যেই সৃষ্টি হচ্ছে বিভেদ। তুমি সবাইকে মূর্খ সাব্যস্ত করছো। তাদের উপাস্য প্রতিমাগুলোর নিন্দা করছো এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে বলছো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এবার আমার কথা একটু কান লাগিয়ে শোনো। আমি তোমার সম্মুখে কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থাপন করছি। সেগুলো ভালো করে শোনো। তারপর চিন্তা-

www.eelm.weebly.com

ভাবনা করে দ্যাখো। রসুল স. বললেন, আবুল ওয়ালিদ! বলো, কী বলতে চাও? উত্‌বা বললো, দ্যাখো ভাতিজা! তুমি যা বলছো, তার দ্বারা সম্পদার্জন যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমরা তোমার উদ্দেশ্য পূরণ করতে রাজী। আমরা তোমাকে এতো ধনদৌলত দিব, যাতে করে তুমি হতে পারবে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধনী। আর যদি হতে চাও দলপতি, তবে আমরা তোমাকে সাদরে বরণ করে নিবো আমাদের প্রধান দলপতিরূপে। একথাও তুমি খুলে বলোতো দেখি, তুমি জ্বিন বা প্রেতাত্মা জাতীয় কিছু দ্যাখো কিনা। যদি সেরকম কিছুর প্রভাব তোমার উপর থেকেই থাকে, তবে তোমার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করতেও আমরা অরাজী নই। সেরকম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। কারণ তুমি তোমার বক্ষ্যাভ্যন্তর থেকে উদগীরিত কবিতার মতো কথাগুলো রুখতে পারো না কেনো? অতএব হে আবদুল মুত্তালিবের প্রিয় পৌত্র। তুমি নিঃসন্দেহে কাব্যনির্মাণে হতে পারবে সফল। অন্যদের মধ্যে এরকম যোগ্যতাই যে নেই।

রসুল স. বললেন, তোমার কথা কি শেষ হয়েছে? উত্‌বা বললো, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, এবার শোনো আমার কথা। এই বলে তিনি স. পাঠ করতে শুরু করলেন আলোচ্য সুরা। উত্‌বা পেছনের দিকে দু'হাতে ভর দিয়ে বসে মুগ্ধ হয়ে শুনে যেতে লাগলো। সেজদার আয়াত (৩৮) পর্যন্ত পাঠ করে তিনি স. সেজদা করলেন। তারপর বললেন, হে আবুল ওয়ালিদ! এই হচ্ছে তোমার কথার জবাব। উত্‌বা আর দেরী না করে উঠে পড়লো। এগিয়ে গেলো তার সঙ্গী সাথীদের

দিকে। তাদের মধ্যে একজন দূর থেকে তাকে দেখে মন্তব্য করলো, আবুল ওয়ালিদ তো মনে হয় বিপরীত ধারণা নিয়ে ফিরে আসছে। উত্‌বা তাদের বৈঠকে গিয়ে বসলো। সঙ্গীরা বললো, কী খবর? সে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! যা শুনলাম, তা আমি জীবনেও শুনিনি। ওই বাণী অভূতপূর্ব। তা না কাব্য, না গণকের বাণী, না যাদু। শোনো হে কুরায়েশ ভ্রাতৃবর্গ! মোহাম্মদকে তোমরা আর ঘাঁটিয়ো না। তার কাছ থেকে তোমরা দূরে দূরেই থাকো। যে সকল কথা আমি তার মুখ থেকে শুনলাম, তা কিছু না কিছু বাস্তবে প্রতিফলিত না হয়েই পারে না। জানি না কার ভাগ্যে রয়েছে বিজয়। তোমরা সফল যদি হও তো হলেই। আর যদি মোহাম্মদ বিজয়ী হয়, তবে মনে কোরো তার রাজত্বই তোমাদের রাজত্ব, তাঁর মর্যাদাই তোমাদের মর্যাদা। স্বগোত্রীয় বলে তার সৌভাগ্যে তোমরাও নিজেদেরকে করতে পারবে সৌভাগ্যশালী। লোকেরা বললো, মোহাম্মদ তো দেখছি তোমাকে যাদু করেছে। উত্‌বা বললো, এটাই তোমাদের প্রতি আমার পরামর্শ। এখন তোমরা যা খুশী তা-ই করতে পারো।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'আর আ'দ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করতো এবং বলতো, আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তবে লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ্, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করতো'।

এখানে 'ফাস্‌তাক্‌বারূ ফীল আরদ্বি বি গইরিল হাক্বক্বি' অর্থ তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ প্রকাশ করতো। 'মান্ আশাদ্দু মিন্না ক্বুওয়াতা' অর্থ আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে? উল্লেখ্য, আ'দ সম্প্রদায় দৈহিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ছিলো। তারা পাহাড়ের বড় বড় পাথর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে পারতো। এটাই ছিলো তাদের গর্বের কারণ। তাদের নবী যখন তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় দেখালেন, তখন তারা মনে করলো দৈহিক শক্তি দিয়েই তারা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ঠেকাতে পারবে। আল্লাহ্‌র শাস্তি যে অপ্রতিরোধ্য, সে কথা তারা স্বীকার করতে চাইতো না। তাই এখানে বলা হয়েছে, তাদের শক্তির দর্প নিরর্থক। তাছাড়া যৌবনকালের পর দৈহিক শক্তি এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে। তারপর একসময় হারিয়ে যায় জীবন। সুতরাং দৈহিক, বৈত্তিক, বৌদ্ধিক কোনো প্রকার শক্তির অহংকারই মানুষ করতে পারে না। অর্থাৎ মানুষের সকল দম্ভই অসার, অনর্থক ও অযথার্থ।

'আওয়া লাম ইয়ারাও' অর্থ তারা কি তবে লক্ষ্য করেনি? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ তারা ভালো করেই জানে। কথাটির সংযোগ রয়েছে অন্তরালবর্তী এক ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই আন্তরিক ক্রিয়া সহযোগে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কী! তারা এমন করে বলে, অথচ তারা একথা জানে না যে, তাদের সৃজয়িতা আল্লাহ্ তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী।

শেষে বলা হয়েছে 'ওয়া কানূ বিআয়াতিনা ইয়াজ্‌হাদূন' (অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করতো)। একথার অর্থ— তারা ছিলো দম্ভান্ধ। তাই আল্লাহ্‌র সত্য নিদর্শনাবলীকে জেনে বুঝেও হয়ে যেতো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝন্‌ঝাবায়ু অশুভ দিনে'।

এখানে 'রীহান সার্‌সারা' অর্থ ঝঞ্ঝাবায়ু, যা হয় ভয়ংকর ঠাণ্ডা এবং বিকট আওয়াজবিশিষ্ট। 'সার্‌সারা' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'সার্' থেকে। এর অর্থ ঠাণ্ডা। অথবা শব্দটির সম্পর্ক রয়েছে 'সার্‌তুন' থেকে, যার অর্থ বিকট চিৎকার, বীভৎস আওয়াজ।

www.eelm.weebly.com

'আইয়ামিন নাহিসাত্' অর্থ অশুভ দিনে। অর্থাৎ ওই দিনটি ছিলো তাদের জন্য ভয়ানক অমঙ্গলের দিন। জুহাক বলেছেন, তিন বছর পর্যন্ত আল্লাহ্ তাদেরকে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন এবং তখন বৃষ্টিহীন বায়ুপ্রবাহ অব্যাহত ছিলো। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, ওই তুফান শাওয়াল মাসের শেষ দিকের বুধবার শুরু হয়ে তার পরের বুধবার পর্যন্ত ছিলো। আর তাদের অন্যান্য অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি নেমে এসেছিলো বুধবারেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আখেরাতের শাস্তি অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না'। এখানে 'আখযা' অর্থ লাঞ্ছনাদায়ক। আর 'ওয়াহুম লা ইউন্সরূন' অর্থ এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। অর্থাৎ তখন তাদের কাছে এমন সাহায্য আসবে না, যা তাদেরকে ওই অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'আর ছামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি তাদেরকে পথনির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিলো। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্র আঘাত হানলো তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ'। একথার অর্থ— আর আমি ছামুদ সম্প্রদায়কেও আমা কর্তৃক প্রেরিত নবীর মাধ্যমে সরল সত্য পথের সন্ধান দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই পথনির্দেশনাকে তারা মান্য করেনি। পূর্ববৎ আঁকড়ে ধরে রয়েছিলো অন্ধত্ব ও অজ্ঞানত্বকে। ফলে তাদের উপরে পতিত হয়েছিলো বীভৎস বজ্রনিনাদ। সেটা ছিলো তাদের কুকীর্তিরই অনিবার্য পরিণাম।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'পথ নির্দেশ করেছিলাম' অর্থ তাদের সামনে উন্মোচন করেছিলাম ভালো-মন্দ উভয় পথের স্বরূপ। সেই সঙ্গে বলেছিলাম, আমার পয়গম্বরের অনুসারী হতে। আর এখানকার 'লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্র আঘাত হানলো' অর্থ তাদেরকে আঘাত করলো অন্তরীক্ষ থেকে আগত ক্রমবর্ধমান এক ধ্বংসাত্মক মহানাদ।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'আমি রক্ষা করলাম তাদেরকে, যারা ইমান এনেছিলো এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করতো'। একথার অর্থ— ওই লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে আমি রক্ষা করেছিলাম কেবল তাদেরকে যারা ছিলো বিশ্বাসী ও সাবধানী।

সূরা হা-মীম, আস্‌সাজ্দা ঃ আয়াত ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

www.eelm.weebly.com

❑ যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদিগকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হইবে সেদিন উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইবে বিভিন্ন দলে,

❑ পরিশেষে যখন উহারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছিবে তখন উহাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক উহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে, উহাদের বিরুদ্ধে।

❑ জাহান্নামীরা উহাদের ত্বককে জিজ্ঞাসা করিবে, 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছ কেন?' উত্তরে উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্‌, যিনি আমাদিগকে বাকশক্তি

দিয়াছেন তিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন প্রথমবার এবং তাঁহারই নিকটে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।'

❑ 'তোমরা কিছু গোপন করিতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না— উপরন্তু তোমরা মনে করিতে যে, তোমরা যাহা করিতে তাহার অনেক কিছুই আল্লাহ্‌ জানেন না।'

❑ 'তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস আনিয়াছে। ফলে তোমরা হইয়াছ ক্ষতিগ্রস্ত।'

❑ এখন উহারা ধৈর্য ধারণ করিলেও জাহান্নামই হইবে উহাদের আবাস এবং উহারা অনুগ্রহ চাহিলেও উহারা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে না।

❑ আমি উহাদের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলাম সহচর, যাহারা উহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা আছে তাহা উহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়া দেখাইয়াছিল এবং উহাদের ব্যাপারেও উহাদের পূর্ববর্তী জিন্ন ও মানুষদের ন্যায় শাস্তির বাণী বাস্তব হইয়াছে। উহারা তো ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন, যেদিন আল্লাহ্‌র অরিকুলকে নরকে নিক্ষেপ করবার উদ্দেশ্যে একত্র করা হবে, সেদিন তাদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে-উপদলে। এভাবে সকলকে একসঙ্গে হাঁকিয়ে যখন নরকের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করানো হবে, তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও গাত্র-ত্বক তাদেরই বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্মের বিবরণ দিতে শুরু করবে।

এখানে 'ইউযাউন' অর্থ নরকের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে ধাক্কাতে ধাক্কাতে, হাঁকিয়ে। কাতাদা ও সুদ্দী বলেছেন, তাদের প্রথম দলকে থামিয়ে দেওয়া হবে, যাতে করে তাদের পরবর্তী দল এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এভাবে সকলকে একত্র করে নিক্ষেপ করা হবে নরকে। বায়যাবী লিখেছেন, এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে নরকবাসীদের সংখ্যাধিক্যকে। 'জ্বাউহা' অর্থ এর সন্নিকটে। অর্থাৎ জাহান্নামের সন্নিকটে।

'জুলূদুহুম' অর্থ গাত্র-ত্বক। সুদ্দী ও একদল ব্যাখ্যাকার বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য এখানে লজ্জাস্থান। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'ত্বক সাক্ষ্য দিবে' অর্থ সাক্ষ্য দিবে তাদের হাত পা। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, আমরা রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ তিনি মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, তোমরা কি জানো আমি হাসলাম কেনো? আমরা বললাম, আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসুলই ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্‌কে সম্বোধন করে তাঁর এক বান্দা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! তুমি কি আমাদেরকে জুলুম থেকে অব্যাহতি দাওনি? আল্লাহ্‌ বলবেন, নিশ্চয়ই। সে বলবে, তাহলে আমরা আজ আমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাক্ষ্য দিতে দিবো না। আল্লাহ্‌ বলবেন, আজ তো তোমাদের সত্তাই তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। আরো সাক্ষ্য দিবে তোমাদের আমল লেখক ফেরেশতারা। এরপর আল্লাহ্‌ তাদের

মতো অন্যদের মুখে লাগিয়ে দিবেন সীলমোহর। বাকশক্তি খুলে দিবেন তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের। তখন তাদের হাত পা তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে। পরে তাদের মুখের সীলমোহর উঠিয়ে নেওয়া হলে তারা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে বলবে, দূর হও। ধ্বংস হও। তোমরাও তো ছিলে আমাদের কৃতকর্মসমূহের অংশীদার। মুসলিমের বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আল্লাহ্‌ তখন তাদের মুখে সীলমোহর করে বন্ধ করে দিবেন এবং সাক্ষ্য দিতে বলবেন তাদের উরুদেশকে। সাথে সাথে তাদের উরুদেশের গোশত, হাড় দিতে শুরু করবে তাদের কার্যকলাপের বিবরণ।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'জাহান্নামীরা তাদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছো কেনো? তারা উত্তরে বলবে, আল্লাহ্‌, যিনি আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন'। এভাবেই তখন প্রশ্নোত্তরপর্ব সম্পন্ন হবে নারকী ও তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের মধ্যে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথম বার এবং তারই নিকটে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে'। এই বাক্যটি তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও হতে পারে। অথবা এটা হতে পারে নতুন এক বাক্য।

বোখারী ও মুসলিমের গ্রন্থের বরাত দিয়ে এবং হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বাগবী লিখেছেন, একবার কাবাপ্রাঙ্গণে সমবেত হলো দু'জন কুরায়েশ এবং একজন সাক্বাফী। অথবা একজন কুরায়েশ, দু'জন সাক্বাফী। তারা তিনজনই ছিলো স্ফীত উদরবিশিষ্ট। উদরের স্তরে স্তরে তাদের জমে উঠেছিলো চর্বির স্তূপ। জ্ঞানবুদ্ধিও ছিলো তাদের স্বল্প। তাদের একজন বললো,

www.eelm.weebly.com

বলতে পারো, আল্লাহ্ আমাদের কথা শুনতে পান কিনা? দ্বিতীয় জন বললো, চীৎকার করে বললে শোনেন, কিন্তু আস্তে কথা বললে শোনেন না। তৃতীয় জন বললো, চীৎকার করে কথা বললে যদি তিনি শুনতে পান, তবে আস্তে বললেও নিশ্চয় শুনবেন। বাগবী লিখেছেন, কুরায়েশ দু'জনের নাম ছিলো রবীয়া ও সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং সাক্বাফীর নাম ছিলো আবদ অথবা লাইল। তাদের কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এরপরের আয়াত (২২)।

বলা হয়— 'তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ চক্ষু ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না — উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না'।

বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ বিদ্বান এখানকার 'তোমরা কিছু গোপন করতে না' কথাটির অর্থ করেছেন— তোমরা কিছুই গোপন করতে সক্ষম হতে না। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— তোমরা ভয় করতে না। কাতাদা বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হবে— তোমরা ধারণাও করতে পারোনি যে, তোমাদের হাত-পা তোমাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। মনে করো, আল্লাহ্ তোমাদের অনেক কাজ কর্মের খবর রাখেন না। সে কারণেই তোমরা নির্ভয়ে চালিয়ে যেতে তোমাদের অপকর্মসমূহ।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'তোমাদের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা হয়েছো ক্ষতিগ্রস্ত'। একথার অর্থ— তোমরা তোমাদের প্রভুপালককে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অজ্ঞ মনে করতে বলেই আজ তোমাদের উপরে নেমে এসেছে শাস্তি এবং তোমরা হয়েছো ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'এখন তারা ধৈর্য ধারণ করলেও জাহান্নামাই হবে তাদের আবাস এবং তারা অনুগ্রহ চাইলেও তারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে না'। একথার অর্থ— নরকবাসীরা নরকে যদি ধৈর্য ধারণ করেও তবুও সেখানে ধৈর্যের সুফল তারা পাবে না। কেননা নরকই হচ্ছে তাদের স্থায়ী ঠিকানা। আর যদি তারা ক্ষমাপ্রার্থনাও করতে থাকে, তবুও হতে পারবে না ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূত।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর, যারা তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে, তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিলো এবং তাদের ব্যাপারেও তাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষের ন্যায় শাস্তির বাণী বাস্তব হয়েছে। তারা তো ছিলো ক্ষতিগ্রস্ত'। একথার অর্থ— তাদের পৃথিবীর জীবনে আমি তাদের জন্য সহচররূপে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম কতিপয় শয়তানকে। ওই শয়তানেরাই তাদের সকল কার্যকলাপকে তাদের দৃষ্টিতে মনোহররূপে প্রতিভাত করতো। পূর্ববর্তী যুগের ওই জ্বিন ও মানব বংশোদ্ভূত শয়তানগুলোকেও আমি প্রবেশ করাবো নরকে। আর তাদের প্ররোচিত ও প্ররোচক সকলেই ছিলো ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূত।

এখানে 'ক্বয়্যাদ্বনা' অর্থ নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম। মুকাতিল এর অর্থ করেছেন— মিলিয়ে দিয়েছিলাম। 'ক্বুরনাআ' অর্থ সহচর। শব্দটি 'ক্বরীন' এর বহুবচন। যেমন 'কুরামাআ' এর বহুবচন 'কারীম'। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে শয়তান এমনভাবে পরিবেষ্টন করে রাখে, যেমন ডিমের উপরে থাকে আবরণ। 'ক্বয়্যাদ্ব' বলে ডিমের আবরণ বা খোসাকে। কেউ বলেছেন, এখানে শব্দটির প্রকৃত অর্থ— প্রভাবশীল ও পরিবেষ্টনকারী। যেমন 'বাইউ'ন মাক্বইদ্বাহ্ অর্থ বস্তুর বিনিময় দেওয়া হয় বস্তুর দ্বারা। 'সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিলো' অর্থ লালসা পরিবেষ্টিত অস্থায়ী পার্থিব ভোগসম্ভারকে ওই শয়তানেরা করে দিয়েছিলো তাদের বাসনার অনুকূল। অর্থাৎ তারা তাদেরকে বানিয়ে দিয়েছিলো ঘোর পৃথিবীপ্রসক্ত। আর 'তারা তো ছিলো ক্ষতিগ্রস্ত' অর্থ তারা অর্জন করেছে ওই সকল বিষয় যা অনিবার্য করে শাস্তিকে এবং পরিত্যাগ করেছে ওই সকল কিছু যা তাদেরকে করতে পারতো অনুগ্রহের পাত্র। আর 'মা খলফাহুম' অর্থ— যা তাদের পশ্চাতে অর্থাৎ আখেরাতে। শয়তানই তাদেরকে অস্বীকার করতে শিখিয়েছিলো পরলোককে।

সূরা হা-মীম, আস্ সাজদা ঃ আয়াত ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

www.eelm.weebly.com

❑ কাফিররা বলে, 'তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করিও না এবং উহা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাহাতে তোমরা জয়ী হইতে পার।'

❑ আমি অবশ্যই কাফিরদিগকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাইব এবং নিশ্চয়ই আমি উহাদিগকে উহাদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দিব।

❑ জাহান্নাম, ইহাই আল্লাহ্র শত্রুদের প্রতিফল; সেথায় উহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী আবাস, আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফলস্বরূপ।

❑ কাফিররা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যেসব জিন্ন ও মানব আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল উহাদের উভয়কে দেখাইয়া দাও, আমরা উভয়কে পদদলিত করিব, যাহাতে উহারা লাঞ্ছিত হয়।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কোরআনের ধ্বনিব্যঞ্জনা সহজেই মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। সরে যেতে শুরু করে সন্দেহ-অবিশ্বাসের জমাট অন্ধকার। একথা মক্কার পৌত্তলিকেরা জানতো। তাই তারা কোরআনের আবৃত্তি শুনতে চাইতো না। তারা একে অপরকে বলতো, খবরদার! কোরআন আবৃত্তির প্রতি তোমরা কখনো আকৃষ্ট হয়ো না। মোহাম্মদ যখন কোরআন পাঠ করতে থাকে, তখন তোমরা শুরু করে দিয়ো শোরগোল। এরকম করতে পারলেই তোমরা জয়ী হতে পারবে। না করতে পারলে হবে পরাজিত।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কার মুশরিকেরা একে অপরকে বলতো, মোহাম্মদকে কোরআন পাঠ করতে দেখলেই তোমরা উচ্চস্বরে শুরু করে দিয়ো কবিতা পাঠ ও আজে বাজে কথাবার্তা। মুজাহিদ বলেছেন, রসুল স. কোরআন পাঠ শুরু করলে তারা সিটি বাজাতো ও হাততালি দিতো। জুহাক বলেছেন, তারা

বলতো, তোমরা তখন শুরু করে দিয়ো হৈ-হট্টগোল, গোলমাল। সুদ্দী বলেছেন, তারা বলতো, তোমরা তখন শুরু করে দিয়ো হৈ-চৈ, চীৎকার ও চেঁচামেচি।

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাবো এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে তাদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দিবো'।

এখানে বলা হয়েছে— 'আল্লাজীনা কাফারূ' (কাফেরদেরকে)। এভাবে সর্বনামের পরিবর্তে নামবাচক বিশেষ্য প্রয়োগ করা হয়েছে দুই কারণে— প্রথমতঃ তাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে এবং দ্বিতীয়তঃ অঙ্গীকারটিকে করতে সাধারণ পদবাচ্য। অর্থাৎ মক্কার এই কাফেরদেরকে এবং সকল যুগের সকল কাফেরদেরকে আমি আস্বাদন করাবো কঠিন শাস্তি। 'আর আমি তাদেরকে তাদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দিবো' অর্থ পৃথিবীর জীবনে কুফরী বা সত্যপ্রত্যাখ্যানই ছিলো সর্বনিকৃষ্ট কার্য। আর ওই কার্যের যথোপযুক্ত প্রতিফল আমি তাদেরকে দিবোই।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'জাহান্নাম, এটাই আল্লাহ্র শত্রুদের প্রতিফল, সেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস; আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ'। এখানে 'আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি অস্বীকৃতি' অর্থ কোরআনের বাণীসম্ভারের প্রতি অবজ্ঞা। অর্থাৎ কোরআন পাঠের সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। যারা এরকম করে, তারাই আল্লাহ্র শত্রু এবং তাদের জন্যই রয়েছে স্থায়ী নরকবাস।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— ‘কাফেরেরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যে সকল জ্বিন ও মানব আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলো, তাদের উভয়কে দেখিয়ে দাও, আমরা উভয়কে পদদলিত করবো, যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়’। একথার অর্থ— নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রাক্কালে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আবেদন জানাবে, হে আমাদের প্রভুপালক! জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যারা আমাদেরকে পাপের প্রতি প্ররোচিত করে আমাদের বিপথগামিতাকে সুগম করেছিলো, তাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে এসো। আমরা তাদেরকে পদপিষ্ট করবো, যাতে তারা হয় অধিকতর অবমানিত।

কেউ কেউ বলেছেন, ‘যে সকল জ্বিন ও মানব আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলো’ বলে এখানে প্রধানতঃ ইঙ্গিত করা হয়েছে ইবলিস ও আদমপুত্র কাবিলের দিকে। তারাই হচ্ছে সত্যপ্রত্যাখ্যান ও পাপের ভিত্তি স্থাপয়িতা। আর এখানকার ‘যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়’ কথাটির অর্থ যাতে তারা হয়ে যায় নরকের সবচেয়ে নিম্নস্তরের অধিবাসী। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— যাতে তাদের শাস্তি হয় আমাদের শাস্তির চেয়ে অনেক বেশী।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্বদা ঃ আয়াত ৩০, ৩১, ৩২

❑ যাহারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্’, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাহাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশ্তা এবং বলে, ‘তোমরা ভীত হইও না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য আনন্দিত হও।

❑ ‘আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। সেথায় তোমাদের জন্য রহিয়াছে যাহা কিছু তোমাদের মন চাহে এবং সেথায় তোমাদের জন্য রহিয়াছে যাহা তোমরা ফর্মায়েশ কর।’

❑ ইহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আপ্যায়ন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই সকল বিশ্বাসীর অবস্থা তখন হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিপরীত, যারা বলে, আমাদের একমাত্র নির্ভর হচ্ছেন আমাদেরই প্রভুপালক আল্লাহ্, অতঃপর এমতো বিশ্বাসেই যারা থাকে অটল, তাদের জীবনাবসানকালে অবতীর্ণ হয় রহমতের ফেরেশতা। ওই ফেরেশতা তাদেরকে তখন এই বলে সান্ত্বনা দিতে থাকে যে, ভয় কোরো না, দুঃখ কোরো না। এখন তোমরা পেতে যাচ্ছো প্রতিশ্রুত জান্নাত। সুতরাং আনন্দিত হও।

জালালুদ্দিন মাহাল্লী বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীক সম্পর্কে। এখানে ‘ছুম্মাস্ তাক্বামু’ অর্থ অতঃপর অবিচলিত থাকে। ‘ছুম্মা’ এখানে কালপরম্পরা প্রকাশক নয়, বরং শব্দটি এখানে প্রকাশ করেছে শৃঙ্খলাবিন্যাসের অনুক্রমনিকা। ‘ইস্তিক্বামাত’ অর্থ এখানে চিত্তের অবিচলতা, কোনোক্রমেই সত্যচ্যুত না হওয়া। বিশ্বাসে, অভিব্যক্তিতে ও কাজেকর্মে বাঁকা পথ অবলম্বন না করা। ‘কামুস’ অভিধানে বলা হয়েছে ‘ইস্তিক্বম’ হচ্ছে মধ্যম পথ। ‘ক্বওয়ামতুহু’ অর্থ আমি তাকে সরল করে দিয়েছি। ‘ক্বভীম’ ও ‘মুস্তাক্বীম’ সমার্থক। এর অর্থ সেই সুমসৃণ পথ, যা তার পথিককে পৌঁছে দেয় সফল গন্তব্যে। এই হিসেবেই ‘সিরত্বল মুসতাক্বীম’ এর অর্থ করা হয় সরল পথ। ‘ইস্তিক্বামাত’ শব্দটি সংক্ষিপ্ত ও সমাবদ্ধ; এর অর্থ ধর্মীয় বিধি-বিধানের আবেষ্টক— আদিষ্ট দায়িত্ব সম্পাদনার্থেই হোক, অথবা নিষিদ্ধ ও রহিত বিষয়াবলী থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে হোক। এ সকল দায়িত্ব নিয়মানুবর্তীতা ও

দৃঢ়তার সঙ্গে করা হলেই তাকে বলা যাবে ‘ইস্তিক্বামাত’। অর্থাৎ ইস্তিক্বামাত’ বলতে এর সবকিছুই বোঝায়। হজরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ সাক্বাফী একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ইসলামের বিষয়ে আপনি আমাকে এমন উপদেশ দিন, যাতে করে আপনার পরলোকগমনের পরে আমাকে আর কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে না হয়। তিনি স. বললেন, বলো ‘আমি আল্লাহ্কে বিশ্বাস করলাম’ তারপর এতে অবিচল থাকো। মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীককে একবার 'ইস্তিক্বামাত' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, 'ইস্তিক্বামাত' হচ্ছে— কোনোকিছুতেই আল্লাহ্‌র অংশীদারিত্ব স্থির না করা। একই বিষয়ে হজরত ওমরকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এর অর্থ তোমরা মেনে চলো নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞার নিয়মানুবর্তীতাকে, খেঁকশিয়ালের মতো এদিকে ওদিকে মোড় নিয়ো না।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক একবার উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এই দুই আয়াত সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী— 'যারা বলে, আমাদের প্রভুপালক আল্লাহ্; অতঃপর অবিচলিত থাকে' এবং 'যারা ইমান এনেছে ও ইমানের সঙ্গে জুলুমকে বিজড়িত করেনি'? লোকেরা বললো, প্রথমটির অর্থ বিশ্বাসাধিষ্ঠিত থাকা, আদেশ-নিষেধের অনুবর্তী হওয়া এবং পাপ না করা। আর দ্বিতীয়টির অর্থ ইমান আনার পর ইমানকে গোনাহ্ থেকে মুক্ত রাখা। হজরত আবু বকর বললেন, তোমরা আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট শ্রমদান করেছো। এবার আমার ব্যাখ্যা শোনো। প্রথমোক্ত বাণীর অর্থ, যারা আল্লাহ্‌র এককত্বকে মনে প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে। তারপর মূর্তিপূজার দিকে আর ফিরে যায়নি। আর দ্বিতীয় বচনের অর্থ, যারা ইমান আনার পর তাদের ইমানকে অংশীবাদিতার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেনি। এরকম উল্লেখ রয়েছে শাহ্‌ওয়ালীউল্লাহর 'ইযালাতুল খাফা' গ্রন্থে। নাসাঈ, বাযযার ও আবুল আলিয়া হজরত আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার এই আয়াত পাঠ করার পর বললেন, কেউ কেউ ভয়ে অথবা চাপে পড়ে বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়, পরে তাদের অধিকাংশই হয়ে যায় অবিশ্বাসী। যারা মৃত্যু পর্যন্ত এক আল্লাহ্‌র বিশ্বাসে অটল থাকে, তারাই 'সাহেবে ইস্তিক্বামাত' বা অবিচল বিশ্বাসী।

হজরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান বলেছেন, এখানকার 'অতঃপর অবিচল থাকে' অর্থ যারা বিশুদ্ধ চিত্তে কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই আমল করে। হজরত আলী অর্থ করেছেন— যারা আল্লাহ্‌র অবশ্যপালনীয় বিধি-বিধান পালন করে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একথার অর্থ— যারা ফরজ দায়িত্বসমূহ পালনে থাকে অটল। হাসান অর্থ করেছেন— যারা আল্লাহ্‌র বিধানে সুস্থির থাকে, বরণ করে আনুগত্যকে এবং বর্জন করে অবাধ্যতাকে। মুজাহিদ ও ইকরামা বলেছেন, কথাটির অর্থ এরকম— যারা মৃত্যু পর্যন্ত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ' এই কলেমার সাক্ষ্যের উপরে কায়েম থাকে। মুকাতিল এর অর্থ করেছেন— যারা মারেফতের উপরে অচঞ্চল থাকে এবং কিছুতেই সেখান থেকে সরে না আসে।

এসব অভিমত উপরোক্ত ব্যাখ্যারই বিভিন্ন দৃষ্টিপট। হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হাম্মাদের অভিমত এই সকল বিধিবিধানকে অন্তর্ভুক্ত করেছে যা বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক (ফরজ) করে দিয়েছেন আল্লাহ্‌পাক। আবার ওই সব বিধিবিধানকেও সীমাবদ্ধ করেছে— যা থেকে বিরত থাকা আল্লাহ্‌রই আদেশ। সে বিধি-নিষেধগুলো বিশ্বাসবিষয়ক হোক বা চরিত্রগত হোক অথবা হোক আনুষ্ঠানিক।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হজরত ওসমানের বক্তব্য থেকে একথাই অনুমিত হয় যে, তাঁরা প্রচার ও লোক দেখানো আমল করতেনই না। মুজাহিদ ও ইকরামার উক্তিতেও একই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃত কথা হচ্ছে, হৃদয়ের প্রশান্তি ও অপপ্রবৃত্তির ধ্বংসসাধন ছাড়া কিছুতেই অচঞ্চল ইমানের অধিকারী হওয়া যায় না। আর শান্ত হৃদয় (ক্বলবিন সালিম) এবং প্রশান্ত প্রবৃত্তি (ইত্‌মিনানে নফস) অর্জনের শিক্ষা রয়েছে কেবল পীর মাশায়েখগণের শিক্ষায়। কাতাদা বলেছেন, হাসান বসরী যখন এই আয়াত পাঠ করতেন তখন বলতেন, হে আমার প্রভুপালক! আমাকে ইস্তিক্বামাত দান করো। তিনি ছিলেন আউলিয়াকুল শিরোমণি। তাঁর সঙ্গে রয়েছে বহুসংখ্যক আধ্যাত্মিক সূত্রপরম্পরার সংযোগ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলে, ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো, তার জন্য আনন্দিত হও'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা' অর্থ তাদের কাছে ফেরেশতা নেমে আসে তাদের মৃত্যুর সময়। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, যখন তাদেরকে কবর থেকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে তখন। ওয়াকী ইবনে জাররাহ বলেছেন, তারা ফেরেশতা কর্তৃক সুসংবাদ পাবে তিনবার— মৃত্যুর প্রাক্কালে, কবরে এবং পুনরুত্থান দিবসে— কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়।

'আল্‌লা তাখাফু' অর্থ ভীত হয়ো না। কথাটি বর্ণনামূলক। কেননা এর অর্থ নিহিত রয়েছে 'তাতানায্‌যাল' (অবতরণ) এর মধ্যে। অথবা 'আল্‌লা' এর 'আন্' (যে) হচ্ছে মূল শব্দ। অর্থাৎ পরকালের যে পরিস্থিতি তোমাদের সন্নিকটবর্তী হচ্ছে, সে ব্যাপারে ভয় কোরো না।

'ওয়া লা তাহ্‌যানু' অর্থ চিন্তিত হয়ো না। অর্থাৎ স্বজন-বিচ্ছেদের কারণে দুঃখ কোরো না। এখন তাদের স্থান পূরণ করবো আমরা। 'ভয়' যেমন সৃষ্টি হয় আসন্ন বিপদকে কল্পনা করে, তেমনি 'দুঃখ' জাগে কল্যাণকর কোনো কিছু ধ্বংস হয়ে গেলে, অথবা ক্ষতিকর কোনো কিছুর সম্মুখীন হলে। আতা ইবনে রেবাহ্ বলেছেন, এখানে 'তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না' অর্থ আপন পাপের জন্য ভীত-বিমর্ষ হয়ো না এবং শাস্তির ভয়ে দুশ্চিন্তিতও হয়ো না। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর এখানকার 'তোমাদেরকে জান্নাতের যে

www.eelm.weebly.com

তাফসীরে মাযহারী/৩৯৭
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো তার জন্য আনন্দিত হও' অর্থ পৃথিবীতে পয়গম্বরগণের জবানীতে যে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিলো, সে প্রতিশ্রুতি এখন বাস্তবায়নের পথে, এ কথা ভেবে আনন্দ প্রকাশ করো।

আবু নাঈম লিখেছেন, সাবেত বুনানী একবার এই সুরা পাঠ করতে শুরু করলেন। এই আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে তিনি বললেন, আমি এক হাদিসে পেয়েছি, বিশ্বাসী বান্দাকে যখন কবর থেকে ওঠানো হবে, তখন তার পৃথিবীর জীবনের সহচর ফেরেশতারা সেখানে তার সাথে মিলিত হবে এবং বলবে, 'ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে বেহেশতের যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিলো তার জন্য আনন্দিত হও'। এরপর আল্লাহ্ তাকে ভয় থেকে চিরমুক্ত করবেন এবং তার নয়নযুগলকে করবেন শীতল।

এরপরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে', একথার অর্থ— ওই সকল ফেরেশতা তাদেরকে আরো বলবে, পৃথিবীতে যখন তোমরা ছিলে, তখন আমরা ছিলাম তোমাদের সুহৃদ-সহচর। তোমাদের হৃদয়ে আমরা প্রক্ষেপ করতাম শুভচিন্তা, রক্ষা করতাম তোমাদেরকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে। আর এখনও আমরা তোমাদেরকে দান করবো অন্তরঙ্গ সাহচর্য, যতোক্ষণ না তোমরা প্রবেশ করো বেহেশতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ করো'। একথার অর্থ— আর বেহেশতে তোমরা যা চাইবে, তা-ই পাবে। সেখানে রয়েছে তোমাদের কাম্য বস্তুসমূহের সুপ্রচুর সমাহার।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'এটা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপ্যায়ন'। একথার অর্থ বেহেশতের ওই সুপ্রচুর সম্ভোগসম্ভার হচ্ছে মহাক্ষমাপরবশ এবং মহান দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রীতিকর আতিথেয়তা। অর্থাৎ তোমরা সেখানে হবে আল্লাহ্‌র অতিথি।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বায্যার, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতীরা সেখানকার পাখি দেখে গোশত খেতে ইচ্ছা করলে সঙ্গে সঙ্গে ওই পাখির গোশত ভূনা করা অবস্থায় হাজির করানো হবে তাদের সামনে। হজরত আবু উমামা থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, জান্নাতের পাখিরা হবে হৃষ্টপুষ্ট উটের মতো তাজা। তারা ওই সকল পাখির গোশত খাওয়ার ইচ্ছা করলে সঙ্গে সঙ্গে ওইগুলোর রান্না করা গোশত আহার্যাকারে উপস্থিত করা হবে তাদের সম্মুখে। তাতে তারা না পাবে ধোঁয়ার গন্ধ, না পাবে আগুনের আঁচ। তারা পরিতৃপ্তির সঙ্গে ওই গোশত খাবে। তারপর পাখিরাও তাদের পূর্বের অবয়ব নিয়ে উড়ে চলে যাবে। বায়হাকী ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক 'উত্তম' আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতীদের কেউ সন্তানাকাংখা করলে সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিবে তার বাসনাজাত সন্তান। ওই সন্তানের গর্ভাবস্থা থেকে জন্মকালীন সময় সুসম্পন্ন হবে মুহূর্তমধ্যে।

তাফসীরে মাযহারী/৩৯৮
হান্নাদ তাঁর 'আজজুহুদ' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু সাঈদ বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! শিশুসন্তান তো চোখের শান্তি। জান্নাতে কি কেউ সন্তানাধিকারী হবে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, যখন সে কামনা করবে। হজরত আবু সাঈদ থেকে ইসপাহানী সুপরিণত নয়, এমন এক হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁর আত্তারগীব গ্রন্থে, যেখানে বলা হয়েছে, জান্নাতীরা যখনই বাচ্চা চাইবে, তখনই পেয়ে যাবে ফুটফুটে বাচ্চা। গর্ভমেয়াদ, দুধপান, দুধপানত্যাগ সবকিছুই সম্পন্ন হবে এক মুহূর্তের মধ্যে। সুপরিণত সূত্রে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন বায়হাকীও। তবে তাঁর বর্ণনায় 'যখনই বাচ্চা চাইবে' এর স্থলে উল্লেখিত হয়েছে 'যখনই তারা সন্তান কামনা করবে'।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা ঃ আয়াত ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮

❑ কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, 'আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।'

❑ ভাল ও মন্দ সমান হইতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সহিত যাহার শত্রুতা আছে, সে হইয়া যাইবে অন্তরংগ বন্ধুর মত।

❑ এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকেই, যাহারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকেই, যাহারা মহাভাগ্যবান।

❑ যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র শরণ লইবে, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীরে মাযহারী/৩৯৯

❑ তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজ্‌দা করিও না, চন্দ্রকেও নহে; সিজ্‌দা কর আল্লাহ্‌কে, যিনি এইগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁহার ইবাদত কর।

❑ উহারা অহংকার করিলেও যাহারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রহিয়াছে তাহারা তো দিবস ও রজনীতে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাহারা ক্লান্তি বোধ করে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কেউ-ই নয়, যে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকে, নিজে পুণ্যকর্মে ব্যাপৃত থাকে এবং বলে, আমি তো মুসলমানদের অন্তর্গত।

এখানে 'ক্বওলান্' অর্থ গর্ব করা, অথবা ইসলামকে ন্যায়নীতির ধর্ম বানানো। অর্থাৎ এর প্রকৃত অর্থ হবে ধর্ম ও বিশ্বাস। মোহাম্মদ ইবনে সিরীন ও সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'যে আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে ডাকে' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে। হাসান বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে ওই সকল মুসলমানের কথা, যারা আল্লাহ্‌র রসুলের আহ্বানে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে।

উম্মত জননী হজরত আয়েশা বলেছেন, আমি মনে করি, এই আয়াতে প্রশংসা করা হয়েছে মুয়াজ্জিনদের। হজরত আবু উমামা বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্‌র দিকে
মানুষকে আহ্বান করে' অর্থ আজান দেয় এবং 'সৎকর্ম করে' অর্থ ফরজ নামাজে
দণ্ডায়মান হওয়ার পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নেয়। কায়েস ইবনে হাযেম বলেছেন, এখানে 'সৎকাজ' অর্থ আজান ও ফরজ নামাজের মধ্যবর্তীতে নামাজ পাঠ। হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তিনবার বলেছেন, প্রতি দুই আজানের মধ্যবর্তীতে নামাজ রয়েছে তার জন্য, যে তা পাঠ করতে চায়। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, আমি এরকম শুনিনি। তবে একথা ঠিক যে, আজান ও ফরজ নামাজের মধ্যবর্তী নামাজের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হয় না। আবু দাউদ, তিরমিজি।

আজানের মাহাত্ম্য ঃ হজরত মুয়াবিয়া বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, মহাবিচারের দিবসে মুয়াজ্জিনদের গ্রীবাদেশ হবে অন্যাপেক্ষা দীর্ঘ। মুসলিম। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুয়াজ্জিনদের

www.eelm.weebly.com

আজানের ধ্বনি যারা শুনবে, শেষ বিচারের দিনে তারা হবে তার পক্ষের সাক্ষ্যদাতা— মানুষ, জ্বিন, প্রাণী-পাখি যেই হোক না কেনো।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইমাম জিম্মাদার এবং মুয়াজ্জিন আমানতদার। হে আল্লাহ! ইমামদের হেদায়েত করো এবং মুয়াজ্জিনদের মার্জনা করো। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, শাফেয়ী। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পুণ্যের আশায় সাত বছর ধরে আজান দিবে, তাকে দেওয়া হবে দোজখমুক্তির সনদ। তিরমিজি, ইবনে মাজা, আবু দাউদ।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তিন ধরনের মানুষ জান্নাতের উচ্চ স্তরে অবস্থান করবে— ১. সেই ক্রীতদাস, যে আল্লাহ্র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে, সাথে সাথে অনুগত থাকে তার মনিবের ২. সেই ইমাম যার ইমামতির প্রতি জনসাধারণ সন্তুষ্ট ৩. সেই মুয়াজ্জিন যে দিবস-রজনীতে আজান দেয় পাঁচবার। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন বর্ণনাটি দুস্প্রাপ্য শ্রেণীর।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যতোদূর পর্যন্ত মুয়াজ্জিনের আজানের আওয়াজ যায়, ততোদূর পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা হতে থাকে। আর সিক্ত-শুষ্ক সকলেই তার পক্ষে সততার সাক্ষ্য প্রদান করে। তার ডাক শুনে যারা নামাজের জামাতে উপস্থিত হয়, তাদেরকে দেওয়া হয় পঁচিশ গুণ বেশী পুণ্য এবং ক্ষমা করে দেওয়া হয় তাদের দুই নামাজের মধ্যবর্তী সময়ের পাপ। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

হজরত সহল ইবনে সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দুইটি বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হয় না, অথবা বলেছেন, খুব কমই প্রত্যাখ্যান করা হয়— আজানের সময়ের এবং জেহাদের সময়ের প্রার্থনা, যখন আমাদের এক হাত মিলিত হয় অন্য হাতের সঙ্গে।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে বারো বৎসর পর্যন্ত আজান দিয়েছে, তার জন্য জান্নাত অবশ্য প্রাপ্য। প্রতি ওয়াক্তে আজান
দেওয়ার কারণে প্রতিদিন তার জন্য পুণ্য লেখা হয় ষাটটি এবং প্রতি বারের ইকামতের জন্য পুণ্য দেওয়া হয় তিরিশটি। ইবনে মাজা।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, যদি খেলাফতের গুরুদায়িত্ব আমার স্কন্ধে না থাকতো, তবে আমি আজান দিতাম। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, মাগরিবের আজানের সময় আমাদেরকে দোয়া করার জন্য আদেশ দেওয়া হতো।

আজানের জবাব ঃ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মুয়াজ্জিন যা উচ্চারণ করে, তোমরাও তা-ই বোলো। তারপর আমার উপর পাঠ কোরো দরূদ। যে আমার জন্য দোয়া করবে, আল্লাহ্ তার উপর রহমত অবতীর্ণ করবেন দশটি। আর আমার জন্য তোমরা আল্লাহ্র কাছে 'অসিলা'র প্রার্থনা কোরো। জান্নাতের মধ্যে 'অসিলা' হচ্ছে এক বিশেষ স্তর। ওই স্তরের অধিকারী হবে আল্লাহ্র এক বান্দা। আমি আশা করি, সে বান্দা আমিই। যে আমার জন্য 'অসিলা' প্রাপ্তির প্রার্থনা জানাবে, তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে আমার শাফায়াতের দরোজা। মুসলিম।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের কথার প্রতিধ্বনি করবে, বলবে মুয়াজ্জিনের কথার অনুরূপ কথা এবং 'হাইয়্যা আ'লাস্সলাহ্' ও 'হাইয়্যা আ'লাল ফালাহ' বলার পর কেবল বলবে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্', সে গমন করবে জান্নাতে। মুসলিম।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, আজানের ফযীলতের কথা শুনে একবার এক লোক রসুল স. এর নিকটে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! মুয়াজ্জিন তো তাহলে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাবে। তিনি স. বললেন, তোমরাও তার কথার পুনরাবৃত্তি কোরো এবং আজান শেষে দোয়া কোরো। তারপর যা চাও, তা-ই পাবে। আবু দাউদ।

পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না'। একথার অর্থ সৎকর্ম ও অসৎকর্মের প্রতিফল কখনো একরকম নয়। এখানে দ্বিতীয় 'লা' (নয়) না সূচকের গুরুত্ব প্রকাশক। এভাবে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের উচিত শুভকে আশ্রয় করা অশুভকে পরিহার করা, অবলম্বন করা ক্রোধের বদলে সহিষ্ণুতা, প্রতিশোধের বদলে ক্ষমা, অজ্ঞতার বদলে জ্ঞান, গোড়ামির বদলে সুবিবেচনা, ঔদ্ধত্যের বদলে বিনয়, কৃপণতার পরিবর্তে বদান্যতা, দোদুল্যমানতার বদলে দৃঢ়তা এবং কাপুরুষতার বদলে পৌরুষ।

এরপর বলা হয়েছে— 'মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সঙ্গে যাদের শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো'। এখানকার 'আহ্সান' (উৎকৃষ্ট) শব্দটি তুল্যমূল্যার্থে ব্যবহৃত হয়নি। অর্থাৎ মন্দের তুলনায় অধিক হওয়া শব্দটির

www.eelm.weebly.com

উদ্দেশ্য নয়। কেননা মন্দের মধ্যে কম অথবা বেশী কোনোরকম ভালো থাকে না। বরং 'আহ্সান' অর্থ এখানে বিশুদ্ধ প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তির অভ্যন্তরস্থিত উত্তম স্বভাব।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার নির্দেশনাটি এরকম— ক্রোধকে প্রতিহত করো ধৈর্যের দ্বারা, মূর্খতাকে প্রতিহত করো ক্ষমার দ্বারা, আর কেউ

খারাপ আচরণ করলে তাকে মাফ করে দাও। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য বক্তব্যের উদ্দেশ্য এরকম— সব মন্দ কাজ সমপর্যায়ের নয়, তেমনি সব ভালো কাজও সমমর্যাদাবিশিষ্ট নয়। শত্রুর মন্দ কাজের মোকাবিলা করতে হবে সর্বোৎকৃষ্ট কাজের দ্বারা। যেমন— কেউ তোমার সঙ্গে মন্দ আচরণ করলে তুমি তাকে উপেক্ষা করো, অথবা ক্ষমা করে দাও। এটাও এক পর্যায়ের ভালো কাজ। কিন্তু তার মন্দ ব্যবহারের বিপরীতে তুমি যদি তার সঙ্গে উত্তম আচরণ প্রকাশ করো, তবে তা হবে 'আহ্সান' (অত্যুত্তম কর্ম)।

'ফা ইজাল্লাজী বাইনাকা ওয়া বাইনাহু আ'দাওয়াতুন্ কাআন্নাহু ওয়ালীয়্যুন হামীম' অর্থ— ফলে তোমার সঙ্গে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। এখানকার 'ইজা' পরিণামসূচক। অর্থাৎ যখনই তুমি উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত করবে, তখনই অকস্মাৎ দেখতে পাবে তোমার শত্রু পরিণত হয়েছে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে। মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবু সুফিয়ানের পক্ষে। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। কেননা এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো রসুল স. এর মক্কাবাসের সময়। আর আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ঘটেছিলো মক্কাবিজয়ের পর।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা মহাভাগ্যবান'। একথার অর্থ— শত্রুকে বন্ধু বানানোর এই দুর্লভতম গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই, যারা ধীর, স্থির-শান্ত স্বভাববিশিষ্ট এবং যারা মহাসৌভাগ্যবান। অর্থাৎ যারা অপপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অনড় অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম, তারাই উৎকৃষ্ট দ্বারা প্রতিহত করতে পারে মন্দকে। অপস্বভাবের অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে তারা তখন চলে আসতে পারে বিশুদ্ধতার অমল আলোয়।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহ্র শরণ নিবে, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'। এখানকার 'ইন্নামা' (যদি) কথাটির 'ইন্' শর্তপ্রকাশক এবং 'মা' হচ্ছে অতিরিক্ত।

'নায্গুণ' অর্থ কুমন্ত্রণা। শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে এবং প্ররোচিত করে পাপের দিকে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'নাযাগ্' অর্থ তীর বা বর্শা বিদ্ধ করা।'নাযাগ্' অর্থ দূরত্ব সৃষ্টিকারী, বিশৃঙ্খলা আরোপকারী, সন্দেহ সৃষ্টিকারী। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনাকে প্ররোচিত করবার চেষ্টা করা হয়, মন্দ দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করার জন্য যদি শয়তান আপনাকে প্ররোচিত করে, তবে আপনি তার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্য আল্লাহ্র আশ্রয় যাচনা করবেন। তাহলে আল্লাহ্ আপনাকে নিরাপদ রাখবেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। সুতরাং আপনার ও অন্য সকলের প্রার্থনা তিনি শোনেন এবং জানেন সকলের প্রার্থনার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদা কোরো না, চন্দ্রকেও নয়। সেজদা করো আল্লাহ্কে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদত করো'। একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদেরকে যেমন আমি সৃষ্টি করেছি, তেমনি সৃষ্টি করেছি দিবস-রজনী-সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদিকেও। সুতরাং তোমরা সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদত কোরো না। ইবাদত করো কেবল আল্লাহ্র, যিনি সকলের এবং সকলকিছুর একক সৃজক।

আলোচ্য আয়াতে বিধৃত হয়েছে আল্লাহ্র একক সত্তা ও গুণবত্তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উত্তমরূপেও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যা অন্যের সৃজন-মুখাপেক্ষী, তা কখনো উপাসনার যোগ্য নয়। উপাসনা করতে হবে কেবল তাঁর, যিনি চিরঅমুখাপেক্ষী ও সকলকিছুর একক স্রষ্টা। উল্লেখ্য, এখানে সেজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে কেবল সূর্য ও চন্দ্রকে। অথচ বলা হয়েছে 'যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন'। অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন দিবস-রজনী-সূর্য-চন্দ্রকে। দিবস-রজনীকে কেউ সেজদা করে না। তাই নিষেধ করা হয়েছে কেবল সূর্য ও চন্দ্রকে সেজদা করতে। আবার এর মধ্য দিয়ে এই যুক্তিটিকেও স্পষ্ট করা হয়েছে যে,

দিবস-রজনীও তো আল্লাহ্তায়ালারই সৃষ্টি এবং এদু'টোকে যখন কেউ সেজদা করে না, তখন সূর্য-চন্দ্রকে সেজদা করবে কেনো? মুখাপেক্ষিতার দিক দিয়ে সূর্য-চন্দ্রও তো দিবস-রজনীর অনুরূপ।

ইমাম শাফেয়ীর মতে আলোচ্য আয়াত পাঠ করে সেজদা করতে হবে। কেননা এখানে বলা হয়েছে 'সেজদা করো আল্লাহ্কে'। হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত ইবনে ওমর থেকেও এরকম অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে

www.eelm.weebly.com

ইয়াজিদ সূত্রে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ 'হা-মীম' সুরার প্রথম আয়াত পাঠ করে সেজদা করতেন। নাফে সূত্রে তাহাবী উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে ওমরও এরকম করতেন।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'তারা অহংকার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে, তারা তো দিবস-রজনীতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এরকম প্রকৃষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদানের পরেও যদি মানুষ ঔদ্ধত্য প্রকাশার্থে আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে চিরঅমুখাপেক্ষী। সৃষ্টির ইবাদত ও প্রশংসা বর্ণনার প্রয়োজন থেকে তিনি সতত মুক্ত। তাছাড়া আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন ফেরেশতারা তো দিবা-রাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে চলেছেই। আর এ ব্যাপারে তাদের ক্লান্তি-শ্রান্তিও নেই।

এখানে 'ফাল্লাজীনা' কথাটির 'ফা' শার্তিক। আর শর্তের প্রতিফল এখানে রয়েছে উহ্য। তাই প্রতিফলের স্থলে এখানে প্রকাশিত হয়েছে প্রতিফলের নিমিত্ত। অর্থাৎ ওই সকল লোক যদি দম্ভ প্রকাশ করে, তবে তাতে করে আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। কেননা তাঁর সান্নিধ্যধন্য ফেরেশতাদের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা চলতে থাকে নিরবচ্ছিন্নরূপে। আর এ ব্যাপারে তাদের শ্রান্ত-ক্লান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

'ইন্‌দা রব্বিকা' অর্থ প্রভুপালকের সান্নিধ্যে। উল্লেখ্য, এরূপ সান্নিধ্যের স্বরূপ অজ্ঞাত। কেননা আল্লাহ্ আনুরূপ্যবিহীন। সুতরাং তাঁর সান্নিধ্যও সকল অনুরূপতার অতীত। তাই এর প্রকৃতি নির্ণয়ে জ্ঞান অসহায়। আর এখানে 'যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতা, আম্বিয়া ও আউলিয়া সম্প্রদায়কে।

'লা ইয়াস্‌আমূন' অর্থ তারা ক্লান্তি বোধ করে না। কেননা ফেরেশতাদের ক্লান্তি-শ্রান্তি নেই। তাছাড়া আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণন তাদের জন্য অতীব আনন্দদায়ক। রসুল স.ও এরকম আনন্দের কথা প্রকাশ করতেন। বলতেন! বেলাল আমাকে আনন্দ দাও (আজান দাও, আমি নামাজ পাঠ করি)।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এই আয়াত পাঠ করলে তেলাওয়াতের সেজদা করতে হবে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকমই অভিমত এসেছে। ইবনে
আবী শায়বা তাঁর গ্রন্থে এবং মুজাহিদ সূত্রে তাহাবী উল্লেখ করেছেন, হজরত

ইবনে আব্বাস 'হা-মীম' সুরার শেষ আয়াত পাঠ করে সেজদা করতেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস একবার এক লোককে 'যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদত করো' পড়বার পর সেজদা করতে দেখে বললেন, তুমি তাড়াতাড়ি করলে। সেজদার আয়াত আসার আগেই সেজদা করে নিলে।

তাহাবীর বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, আমি একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে 'হা-মীম' বিশিষ্ট সুরার সেজদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, দু'টি আয়াতের মধ্যে শেষ আয়াতে সেজদা কোরো। স্বসূত্রে তাহাবী একথাও বলেছেন যে, হজরত আবু ওয়ায়েল 'হা-মীম' এর শেষ আয়াতে সেজদা করতেন। ইবনে সিরীনের বর্ণনা এবং কাতাদার উদ্ধৃতিও এরকম। 'হেদায়া' প্রণেতা লিখেছেন, হজরত ওমরও এরকম বলতেন। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, হজরত ওমরের উদ্ধৃতিটি দুস্প্রাপ্য শ্রেণীর । ইমাম আবু হানিফার মন্তব্যটি যথেষ্ট সতর্কতাশোভিত। কেননা সেজদা যদি 'তা'বুদূন' (ইবাদত করো) বলার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াজিব হয়, তবে পরের আয়াত পাঠ করার পর সেজদা করলে ক্ষতি নেই। কিন্তু 'লা ইয়াস্‌আমূন' (ক্লান্তিবোধ করে না) বলার পর যদি সেজদাকে আবশ্যিক মনে করা হয়, তবে আগের আয়াত পাঠের পর সেজদা করলে তা যথেষ্ট হবে না।

তাহাবী লিখেছেন, তেলাওয়াতের সেজদা আদায় কোন স্থলে জরুরী সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। সর্বসম্মত অভিমতানুসারে কোরআনে সেজদার আয়াত রয়েছে দশটি। ওই দশটি আয়াত রয়েছে এসকল সুরায়— ১. আরাফ ২. রা'দ ৩. নহল ৪. বনী ইসরাইল ৫. মারিয়াম ৬. হাজ্জ ৭. ফোরকান ৮. নমল ৯. আলিফ লাম তানযীল ১০. হা-মীম। আস্‌সাজ্দা। এসকল সুরায় উল্লেখিত সেজদার আয়াতগুলোর কোনোটাই আদেশমূলক নয়, বরং
বিজ্ঞপ্তিমূলক। সেগুলোতে দেওয়া হয়েছে অহংকারীদের অহংকার এবং বিনয়ীদের বিনয়ের সংবাদ। অবশ্য অহংকারীদের বিরুদ্ধতা এবং বিনয়ের সম্মান আমাদের জন্যও জরুরী। আর যে সকল আয়াতে সেজদার আয়াত হওয়া সম্পর্কে বিদ্বানগণের মিলিত মত নেই, সেগুলোতে দেওয়া হয়েছে সেজদার আদেশ এবং সেগুলো নামাজের রুকু-সেজদা সম্পর্কিত। আর যেখানে বলা হয়েছে কেবল মস্তক অবনত করার কথা, সেখানেও কেউ কেউ সেজদা করার কথা বলেছেন। নামাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে সেজদা ওয়াজিব হয় না— এটাকেই যদি সাধারণ রীতি বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে প্রশ্ন জাগে, তাহলে সুরা হাজ্জ এর 'তোমার প্রভুপালককে রুকু করো, সেজদা করো ও তার ইবাদত করো' এই আয়াতকে সেজদার আয়াত বলা হবে কেনো? কেননা এগুলো তো সবই আদেশ। আর এখানে পৃথকভাবে সেজদা করার হুকুমও দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, পৃথক ভাবে সেজদা করার কথা বলা হলেও সেখানকার 'সেজদা করো' অর্থ নামাজে সেজদা করো। বক্তব্যের

পদ্ধতিগত দাবিও সেরকমই। কেননা পূর্বের ‘রুকু করো’ নির্দেশটি সর্বসম্মতিক্রমে নামাজে রুকু করো। সুতরাং পরক্ষণে উল্লেখিত ‘সেজদা’ নামাজের সেজদা হওয়াই সমীচীন। আর এটাও বিবেচনাভূত

হওয়ার দাবি রাখে যে, আলোচ্য সুরার প্রথম আয়াতে তেলাওয়াতের সেজদার হুকুম বিদ্যমান। কাজেই মর্মার্থ হবে নামাজের সেজদা। আর পরবর্তী আয়াত বিজ্ঞপ্তিমূলক। কাজেই তেলাওয়াতে সেজদা দিতে হবে। আবার সুরা সোয়াদের আয়াতটিও সেজদার আয়াত হওয়া উচিত। কেননা সেখানেও রয়েছে বিজ্ঞপ্তিমূলক সেজদার কথা। এসকল বিষয় লক্ষ্য করে তাই ইমাম আবু হানিফা উক্ত আয়াতকে সেজদার আয়াত বলে চিহ্নিত করেছেন। সুরা ইনশিকাকের ২১ সংখ্যক আয়াত পাঠ করেও তাই সেজদা করা জরুরী। কেননা ওই আয়াতটি বিজ্ঞপ্তিমূলক। অবশ্য এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, ইমাম আবু হানিফা তাহলে সুরা আন্‌নজম এর ৬২ সংখ্যক আয়াত এবং সুরা আলাক এর শেষ আয়াতকে সেজদার আয়াত বলেন কেনো? ওই আয়াত দু’টি বিজ্ঞপ্তিমূলক নয়, বরং আদেশমূলক। এই আপত্তিটির জবাবে বলতে হয়, এই দুই আয়াত সম্পর্কে তিনি প্রমাণ পেয়েছেন, রসুল স. স্বয়ং এই দুই আয়াত পাঠ করে সেজদা করেছেন। যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসের উপরে সাধারণ রীতিটি তিনি পরিহার করেছেন সেকারণেই। আমার মতে সুরা হাজ্জ এ রয়েছে দু’টি সেজদা। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ওই সুরার তাফসীরেই।

নির্দেশনা ঃ যারা এই আয়াত আরবীতে পাঠ করেছেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সেজদা আদায় করে নিবেন।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্বদা ঃ আয়াত ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

❑ এবং তাঁহার একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখিতে পাও শুষ্ক উষর, অতঃপর যখন আমি উহাতে বারি বর্ষণ করি তখন উহা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই তো মৃতের জীবনদানকারী। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

www.eelm.weebly.com

❑ যাহারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তাহারা আমার অগোচর নহে। শ্রেষ্ঠ কে— যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকিবে সে? তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর; তোমরা যাহা কর তিনি তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

❑ যাহারা উহাদের নিকট কুরআন আসিবার পর উহা প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে; ইহা অবশ্যই এক মহিমময় গ্রন্থ—

❑ কোন মিথ্যা ইহাতে অনুপ্রবেশ করিতে পারে না— অগ্র হইতেও নহে, পশ্চাত হইতেও নহে। ইহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ।

❑ তোমার সম্বন্ধে তো তাহাই বলা হয়, যাহা বলা হইত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণ সম্পর্কে। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা।

❑ আমি যদি আজমী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করিতাম তবে উহারা অবশ্যই বলিত, 'ইহার আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত হয় নাই কেন?' কি আশ্চর্য যে, ইহার ভাষা আজমী, অথচ রাসূল আরবীয়! বল, 'মু'মিনদের জন্য ইহা পথনির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার।' কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা এবং কুরআন হইবে ইহাদের জন্য অন্ধত্ব। ইহারা এমন যে, ইহাদিগকে যেন আহ্বান করা হয় বহুদূর হইতে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— তাঁর সর্বময় এককত্বের আর একটি নিদর্শন এই যে, তোমরা অহরহ অবলোকন করছো, বিশুষ্ক মৃত্তিকায় আমি যখন বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা হয় প্রাণবন্ত এবং শস্য-শ্যামল। যিনি মৃত ভূমিকে এভাবে জীবন্ত করতে সক্ষম, তিনিই মৃত মানুষকে পুনর্জীবিত করবেন পুনরুত্থান দিবসে। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিধর।

এখানে 'মিন আয়াতিহী' অর্থ তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে। অর্থাৎ সবকিছুর মধ্যে রয়েছে তাঁর অপার ক্ষমতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'খশিয়াতা' অর্থ শুষ্ক উষর। 'রবাত' অর্থ স্ফীত। 'আহ্ইয়া হা' অর্থ জীবিত করেন। আর 'আ'লা কুল্লি শাইইন' অর্থ তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

তাফসীরে মাযহারী/৪০৭

পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে, তারা আমার অগোচর নয়'।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে আয়াতসমূহকে বিকৃত করার অর্থ কোরআন পাঠকালে শিস দেওয়া, তালি বাজানো, আজে বাজে কথা বলা অথবা শোরগোল করা। কাতাদা বলেছেন 'আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে' অর্থ আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথবা প্রত্যাখ্যান করে। সুদ্দী বলেছেন, শত্রুতা ও বিরোধিতা করে। মুকাতিল বলেছেন, একথা বলা হয়েছে আবু জেহেলকে লক্ষ্য করে। 'ইউল্‌হিদূন' এর সাধারণ অর্থ মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, অনর্থক বিতর্ককারী, কোরআন পাঠ করার সময় শিস বাজানো, কোরআনের শব্দ অথবা অর্থের বিকৃতি সাধনকারী। আর 'তারা আমার অগোচর নয়' অর্থ— সকলের সকল কিছুই রয়েছে আমার অবলোকনের আওতায়। কেননা আমি সর্বদ্রষ্টা। সুতরাং আমার অসন্তোষ ও শাস্তির ব্যাপারে তোমরা নির্ভয় থেকো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'শ্রেষ্ঠ কে যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদ থাকবে সে'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— দোজখীদের চেয়ে ওই সকল ব্যক্তি অবশ্যই উত্তম, যারা কিয়ামতের মহাশাস্তি থেকে থাকবে নিরাপদ। বশীর ইবনে ফতেহ সূত্রে ইবনে মুনজির বলেছেন, এই বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে আবু জেহেল ও হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের পক্ষে। কেউ কেউ হজরত আম্মারের স্থলে বলেছেন হজরত হামযা অথবা হজরত ওসমানের নাম। তবে এখানকার বক্তব্যটি ব্যাপকভিত্তিক। তাই বলা যেতে পারে, আবু জেহেলের মতো সকল দোজখী এবং হজরত আম্মারের মতো সকল জান্নাতী ব্যক্তিই আলোচ্য বক্তব্যভূত।

প্রকাশ্যতঃ বক্তব্যটি উপস্থাপিত করা যেতো এভাবে— কী? জাহান্নামে যে পতিত হবে সে উত্তম, না উত্তম ওই লোক যে শান্তিমুক্ত হয়ে প্রবেশ করবে জান্নাতে। এভাবে বললে অবশ্য জাহান্নামী জান্নাতীর পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়। কিন্তু বক্তব্যটি জোরালো হয় না। সুতরাং বুঝতে হবে বক্তব্যকে শানিত ও শক্তিশালী করবার জন্যই বাক্যটি এখানে বিন্যস্ত করা হয়েছে এভাবে। ফলে এর মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— জাহান্নামী ব্যক্তি যখন কিয়ামতের ভয়াবহতামুক্ত ব্যক্তিরই সমতুল নয়, তখন জান্নাতে যে প্রবেশ করেছে তার সঙ্গে তার তুলনা করার কথা তো চিন্তাই করা যায় না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের যা ইচ্ছা করো; তোমরা যা করো, তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা'। একথার অর্থ— অতএব হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জনগোষ্ঠী! তোমরা যা খুশী তা-ই করো। কিন্তু একথাটিও জেনে রেখো যে, তোমরা যা করো, তিনি তা দেখেন। সুতরাং তোমাদের কর্মফলের শাস্তি তিনি তোমাদেরকে দিবেনই। উল্লেখ্য, আল্লাহ্ এভাবে এখানে প্রকাশ করেছেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তিদানের দৃঢ় অঙ্গীকার।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'যারা তাদের নিকট কোরআন আসবার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে'। বাক্যটির বিধেয় এখানে রয়েছে উহ্য। ওই উহ্য বিধেয় সহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যারা তাদের কাছে কোরআনের আহ্বান উপস্থাপিত হবার পর, সেই আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে, তারাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। ওই অপরাধের কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন, অথবা আস্বাদন করাবেন কঠিন শাস্তি। কারো কারো মতে এখানকার উহ্য বিধেয়টি এরকম— তাদেরকে আহবান করা হবে দূরবর্তী স্থান হতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া ইন্নাহু লা কিতাবুন আযীয' এর অর্থ 'নিঃসন্দেহে এই কোরআন হচ্ছে এক মহিমময় গ্রন্থ'। কালাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট এই কিতাব মর্যাদার্হ। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ— আল্লাহ্ এই গ্রন্থকে এমতো মর্যাদামণ্ডিত করেছেন যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তা স্পর্শ করতে পারে না।

এরপরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না— সম্মুখ থেকেও নয়, পশ্চাৎ থেকেও নয়'। এ কথার অর্থ— সম্মুখ-পশ্চাৎ কোনো দিক থেকেই শয়তান এই কোরআনের সন্নিকটবর্তী হতে পারে না।

কাতাদা ও সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'মিথ্যা' অর্থ শয়তান। আর 'অনুপ্রবেশ করতে পারে না' অর্থ শয়তান কোরআনে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে বা একে রূপান্তরিত করতে পারে না, সে শয়তান জ্বিনরূপী হোক, অথবা ভ্রষ্টতারূপী। পথভ্রষ্ট শিয়ারা কোরআনের তিরিশ পারার সঙ্গে আরো দশ পারা যোগ করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তাদের সে অপচেষ্টা সফল হয়নি। সুতরাং তাদের কাছে এখন যে কোরআন আছে, তা তিরিশ পারাতেই আছে।

জুজায বলেছেন, এখানে 'সম্মুখ থেকে অনুপ্রবেশ করতে পারে না' অর্থ কোরআনে ঘটাতে পারে না কোনো বিয়োজন। আর 'পশ্চাতে থেকে অনুপ্রবেশ করতে পারে না' অর্থ কোরআনের সঙ্গে করতে পারে না নতুন কোনো কিছুর যোজনা। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এখানকার 'সম্মুখ-পশ্চাৎ' অর্থ দাঁড়ায় হ্রাস-বৃদ্ধি। মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— পূর্বের কোন কিতাবের দ্বারা যেমন কোরআনকে মিথ্যা প্রত্যয়ন করা যায় না, তেমনি পরবর্তীতেও এমন কোনো কিতাব অবতীর্ণ হবে না, যার দ্বারা হতে পারে কোরআনের অপ্রত্যয়ন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ'। একথার অর্থ— যিনি মহাপ্রজ্ঞাময় স্বয়ংপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, যিনি সৃষ্টির সকলকিছু থেকে চির-অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অনুকম্পা দ্বারা পরিপূর্ণ ও পরিপুষ্ট সৃষ্টি যার প্রশংসা করে কৃতার্থ হয়, সেই মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতাই এই কোরআনের অবতরণকারী।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'তোমার সম্বন্ধে তো তা-ই বলা হয়, যা বলা হতো পূর্ববর্তী রসুলগণ সম্পর্কে'। এখানে রসুল স.কে এই মর্মে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের রূঢ় ও অনন্দিত আচরণ নতুন কোনো ঘটনা নয়। সত্যের প্রতি তারা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এসেছে আবহমান কাল থেকে। আপনাকে যেমন তারা 'যাদুকর' 'উন্মাদ' ইত্যাদি অপ-অভিধায় অভিহিত করে, তেমনি পূর্ববর্তী যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও তাদের নবীদেরকে বিভিন্ন অপমন্তব্য দ্বারা আঘাত করতো। ওই নবীগণ তখন ধৈর্যধারণ করতেন। প্রার্থনা করতেন তাদের চৈতন্যোদয়ের জন্য। আপনিও তেমনই করুন। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আপনার পূর্বসূরীদের উপর যেমন আল্লাহ্‌র এককত্ব এবং ধর্মের মূলনীতি সম্পর্কিত প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হতো, আপনার উপরেও প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়ে চলেছে সেভাবেই। এটা কোনো নতুন নিয়ম নয়। একথাটিকেও সকল যুগের সকল নবীগণের মাধ্যমে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ এবং অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠিন শাস্তিদাতা। কেউ কেউ বলেছেন, পরবর্তী বাক্যে কথাটি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে 'তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল ও কঠিন শাস্তিদাতা'।

সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা একবার তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বললো, আসমানী কিতাব তো অবতীর্ণ হয়ে থাকে আজমী ভাষায়। যেমন তওরাত ও ইঞ্জিল। কোরআন যদি আসমানী কিতাবই হয়, তবে তা আজমী ভাষায় অবতীর্ণ না হয়ে আবার আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হলো কেনো? তাদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এরপরের আয়াত (৪৪)।

বলা হয়েছে— 'আমি যদি আজমী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করতাম, তবে তারা অবশ্যই বলতো, এর আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত হয়নি কেনো? কী আশ্চর্য যে, এর ভাষা আজমী, অথচ রসুল আরবীয়'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! কুটতর্কপ্রবণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মন্তব্য অযৌক্তিক ও সরলতার পরিপন্থী। তাই তারা বলে, অন্যান্য কিতাবের মতো কোরআন আজমী ভাষায় না হয়ে আরবী ভাষায় হলো কেনো? আজমী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করলে তারা উত্থাপন করতো আরো অনেক অজুহাত। বলতো, আমরা আরবীভাষী জেনেও আমাদের কাছে আজমী ভাষায় কোরআন দেওয়া হলো কেনো?

www.eelm.weebly.com

বিদেশী ভাষা বলেই তো আমরা কোরআনের বিবরণ বিশদভাবে অনুধাবন করতে পারছি না। আরো বলতো, দ্যাখো, দ্যাখো, কী আশ্চর্যের ব্যাপার! কোরআন নাজিল হচ্ছে অনারব ভাষায়, আর যার উপর নাজিল হচ্ছে সে আবার আরবীয়।

মুকাতিল বলেছেন, আমের হাজরামীর এক ইহুদী আজমী গোলাম ছিলো। তার নাম ছিলো ইয়াসার এবং পদবী ছিলো আবু ফাকীহা। রসুল স. তার কাছে যাওয়া আসা করতেন দেখে মুশরিকেরা বলাবলি করতে লাগলো, ইয়াসিরই

মোহাম্মদকে শিক্ষা দেয়। তার মনিব একদিন তাকে খুব মারধোর করলো। বললো, তুই-ই মোহাম্মদকে কুশিক্ষা দিস। ইয়াসার বললো, না, তিনিই আমাকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, কুরায়েশেরা বলাবলি করতে লাগলো, এই কোরআন আরবী ও আজমী উভয় ভাষায় অবতীর্ণ হলো না কেনো? তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। ইবনে জারীর আরো বলেছেন, অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্নাকারবর্জিত অবস্থায় এই আয়াতের পাঠভঙ্গি প্রচলিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, মুমিনদের জন্য এটা পথনির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী, তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কোরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব'।

এখানে 'শিফাউন' অর্থ ব্যাধির প্রতিকার, পীড়ার নিরাময়ক। শব্দটির সঙ্গে 'তানভীন' যুক্ত করা হয়েছে বিরাটত্ব বোঝানোর জন্য। অর্থাৎ কোরআন হচ্ছে বড় ধরনের আরোগ্য, যা দূর করে অন্তর ও বাহিরের সকল পীড়া। কেউ কেউ বলেছেন, কোরআন আরোগ্য কেবল শারীরিক রোগের।

'আ'মা' অর্থ অন্ধত্ব, বোধহীনতার অন্ধকার। কাতাদা বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কোরআনের স্বরূপদর্শন থেকে অন্ধ এবং এর মর্মবাণী শ্রবণ থেকে বধির। তাই কোরআন পঠন ও শ্রবণ তাদের কোনো উপকারে আসে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এরা এমন যে, তাদেরকে যেনো আহ্বান করা হয় বহুদূর থেকে'। একথার অর্থ— বহুদূর থেকে কাউকে কিছু বললে সে যেমন শুনতে পায় না, কিছুটা আওয়াজ শুনতে পেলেও যেমন সে তা বুঝতে পারে না, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দেখে সেরকমই মনে হয়। তাদের সামনে কোরআন পাঠ করলেও মনে হয় তারা যেনো শুনছে বহুদূর থেকে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬

❑ আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, অতঃপর ইহাতে মতভেদ ঘটিয়াছিল। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদের মীমাংসা হইয়া যাইত। উহারা অবশ্যই ইহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে।

❑ যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই উহা করে এবং কেহ মন্দ কর্ম করিলে উহার প্রতিফল সে-ই ভোগ করিবে। তোমার প্রতিপালক তাঁহার বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর এতে তাদের মতভেদ ঘটেছিলো'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনাকে আমি যেমন কোরআন দিয়েছি, তেমনি মুসাকে দিয়েছিলাম তওরাত। আবার কোরআন সম্পর্কে যেমন আপনার স্বজাতির মধ্যে তীব্র মতপ্রভেদ দেখা দিয়েছে, কেউ মানছে, কেউ মানছে না, তেমনি মুসার উম্মতের মধ্যেও ঘটেছিলো। সশ্রদ্ধচিত্তে কেউ কেউ তওরাতকে গ্রহণ করেছিলো, আবার কেউ কেউ করেছিলো প্রত্যাখ্যান।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মীমাংসা হয়ে যেতো'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ আখেরাতে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে চিরস্থায়ী শাস্তিতে নিপতিত করবেন— এই বিধানটি পূর্বস্থিরীকৃত। আর নির্ধারিত সময়ে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া আল্লাহ্র অভিপ্রায় নয়। এরকম যদি না হতো, তবে তাদেরকে এই মুহূর্তে ধ্বংস করে দিয়ে আল্লাহ্ বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটাতেন। পৃথিবীর জীবনে অবকাশ পেয়ে যাচ্ছে তারা একারণেই।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা অবশ্যই এর সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে'। একথার অর্থ— আবার আল্লাহ্‌র রসুলের বিরুদ্ধে তথা কোরআনের বিরুদ্ধে এতো শত্রুতা করা সত্ত্বেও তাদের উপরে তাৎক্ষণিক শাস্তি নেমে না আসার কারণেই তারা এমতো বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত হয়েছে যে, হয়তো এই কোরআনের বাহক অথবা এই কোরআন সত্য নয়। যদি তা-ই হতো তবে অবশ্যই আপতিত হতো কথিত শাস্তি।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'যে সৎকর্ম করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কর্ম করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না'। একথার অর্থ— সৎকর্মশীলেরা সৎকর্মাবলী করে যেতে থাকে তাদের নিজেরই মঙ্গলের জন্য। আর মন্দকর্ম সম্পাদনকারীরা তাদের মন্দ কর্মের প্রতিফল ভোগ করবে নিজেরাই। কেউ কারো কর্মের দায় অন্যের উপরে চাপাতে পারবে না। আর একথাও শুনে রাখুন হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার প্রভুপালক হচ্ছেন প্রকৃত ন্যায়বিচারক। তিনি তাঁর কোনো বান্দার উপরেই জুলুম করেন না। পুণ্য কমিয়ে অথবা বাড়িয়ে কারো প্রতি করেন না সামান্যতম অবিচার।

একটি সংশয় ঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে জুলুম বা অত্যাচার-অবিচারের কথা তো কল্পনাও করা যায় না। জুলুম বলে অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করাকে। আল্লাহ্
সম্পর্কে অন্যের মালিকানার হস্তক্ষেপের বিষয়টি তো কল্পনার অতীত। কেননা সমগ্র সৃষ্টির তিনিই মালিক। তাহলে এখানে তাঁর সম্পর্কে 'জল্লামিল্ লিল্ আ'বীদ' (বড় জালেম নন) এরকম বলা হলো কেনো? এর অর্থ কি এই-ই দাঁড়ায় না যে, তিনি অল্পমাত্রার জালেম?

সংশয় খণ্ডন ঃ এখানে 'বড় জালেম নন' বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে চরম জুলুমবাজ প্রমাণ করার জন্য। অর্থাৎ একথা বলার জন্য যে, বড় জুলুমবাজ হচ্ছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। আল্লাহ্ কখনোই সেরকম নন।

পঞ্চবিংশতিতম পারা

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা ঃ আয়াত ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১

www.eelm.weebly.com

❑ কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌তেই ন্যস্ত, তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ হইতে বাহির হয় না, কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ্‌ উহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, 'আমার শরীকেরা কোথায়?' তখন উহারা বলিবে, 'আমরা আপনার নিকট নিবেদন করি যে, এই ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।'

❑ পূর্বে উহারা যাহাদিগকে আহ্বান করিত তাহারা উধাও হইয়া যাইবে এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করিবে যে, উহাদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নাই।

❑ মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তি বোধ করে না, কিন্তু যখন তাহাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ ও হতাশ হইয়া পড়ে;

❑ দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর যদি আমি তাহাকে অনুগ্রহের আস্বাদন দেই তখন সে অবশ্যই বলিয়া থাকে, 'ইহা আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হইবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইও তাঁহার নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকিবে।' আমি কাফিরদিগকে উহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করিব এবং উহাদিগকে আস্বাদন করাইবই কঠোর শাস্তি।

❑ যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় ও দূরে সরিয়া যায় এবং তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করিলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌তেই ন্যস্ত। তাঁর অজ্ঞাতসারে কোনো ফল আবরণ থেকে বের হয় না, কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না'। একথার অর্থ— কিয়ামত সংঘটিত হবে কবে, তা জানেন কেবলই আল্লাহ্‌। সুতরাং এরকম কথাই বলতে হবে তাকে, যে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। আর আল্লাহ্‌র অজ্ঞাতসারে কোনোকিছুই ঘটে না। যেমন আবরণ মুক্ত হয় না কোনো ফল। গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব করে না কোনো নারী।

এখানে 'আক্‌মাম' অর্থ ফল, ফলের খোসা। আর এখানকার 'মা তাহ্‌মিলু মিন উন্‌ছা' অর্থ গর্ভধারণ করে না কোনো নারী। এখানে 'মা' না-সূচক এবং 'মিন' হচ্ছে অতিরিক্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'যেদিন আল্লাহ্‌ তাদেরকে ডেকে বলবেন, আমার শরীকেরা কোথায়? তখন তারা বলবে, আমরা আপনার নিকট নিবেদন করি যে, এই ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না'। একথার অর্থ— যেদিন আল্লাহ্‌ প্রতিমাপূজারীদেরকে ডেকে বলবেন, বলো, পৃথিবীতে তোমরা যাদেরকে আমার শরীক বানিয়েছিলে তারা আজ কোথায়? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! এখন আমাদের নিবেদন এই যে, আমরা কেউ-ই এখন অংশীবাদিতায় বিশ্বাস করি না।

মহাবিচারের দিবসে অংশীবাদীদেরকে ডেকে আল্লাহ্‌ 'আমার শরীকেরা কোথায়' এরকম বলবেন তাদেরকে উপহাস করে। 'আজান্‌নাকা' অর্থ নিবেদন করি। 'মা মিন্না মিন শাহীদ' অর্থ আমাদের মধ্যে অংশীবাদিতার পক্ষের কোনো সাক্ষ্যদাতা এখন কেউ-ই নেই। অর্থাৎ এখন আমরা এ ব্যাপারে কোনো কিছু জানিই না। উল্লেখ্য, চোখের সামনে ভয়াবহ শাস্তি দেখতে পেয়েই তারা তখন এভাবে অংশীবাদিতার প্রতি প্রকাশ করবে চরম অসন্তোষ। অথবা এখানে কথাটির অর্থ হবে— আমাদের মধ্যে এখন কেউ-ই তো ওই সকল শরীককে দেখতে পাচ্ছি না। তারা সকলেই তো এখন অদৃশ্য। সুতরাং এ ব্যাপারে এখন কিছু বলতেও পারবো না।

পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'পূর্বে তারা যাদেরকে আহ্বান করতো, তারা উধাও হয়ে যাবে এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করবে যে, তাদের নিষ্কৃতির কোনো উপায় নেই'। একথার অর্থ— পৃথিবীতে তারা যে সকল প্রতিমার পূজা করতো, তারা তখন উধাও হয়ে যাবে। ফলে তারা ভালোভাবেই বুঝতে পারবে যে, শাস্তি থেকে বাঁচবার কোনো রাস্তাই এখন তাদের জন্য উন্মুক্ত নেই।

এখানে 'দ্বল্‌লা আন্‌হুম' অর্থ উধাও হয়ে যাবে। অথবা উপকার করতে পারবে না। 'ইয়াদ্‌উ'না' অর্থ আহ্বান করতো। 'ওয়া জন্‌নূ' অর্থ উপলব্ধি করবে। আর 'মাহীস্‌' অর্থ উপায়, আশ্রয়স্থল, পালাবার জায়গা।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'মানুষ ধনসম্পদ প্রার্থনায় কোনো ক্লান্তিবোধ করে না, কিন্তু যখন তাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে, তখন সে নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে'।

এখানে 'ক্লান্তি বোধ করে না' অর্থ বিপুল বিত্তবৈভবের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীপূজকদের মন ভরে না। বরং এতে করে তাদের বিত্ত-তৃষ্ণা আরো বাড়ে। আল্লাহ্‌র কাছে তারা আয়ু, শারীরিক সুস্থতা ও ধনদৌলত চাইতেই থাকে। 'নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে' অর্থ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও নিরাপত্তার ব্যাপারে তারা হয়ে যায় নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত, যখন তারা পতিত হয় দুঃখ-কষ্টে। এখানে 'মাস্‌সাহুশ শার্‌রু' অর্থ দুঃখ-কষ্টে পড়ে।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করবার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদন দেই, তখন সে অবশ্যই বলে থাকে, এটা আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইও, তাঁর নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে'।

এখানে 'অনুগ্রহ' অর্থ স্বাস্থ্য, সম্পদ। 'হাজা লী' অর্থ এটা আমার প্রাপ্য। অর্থাৎ এই স্বাস্থ্য ও সম্পদ আমি পেয়েছি আমারই প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা বলে। অথবা এরকম স্বাস্থ্য-সম্পদ তো আমি পেতেই থাকবো। 'তাঁর নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে' অর্থ এখানে যদি আমি সবদিক থেকে ভালো থাকতে পারি, তবে সেখানে এরকম থাকতে পারবো না কেনো? প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা কি কারো হস্তচ্যুত হয়? অধিকার কি কেউ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে?

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করবো এবং তাদেরকে আস্বাদন করাবোই কঠোর শাস্তি'। এখানে 'বিমা আ'মিলু' অর্থ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করবো। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— আমি অবশ্যই তাদের কৃতকর্মের দুর্ভোগ তাদের উপরেই চাপিয়ে দিবো। আর 'আস্বাদন করাবোই কঠোর শাস্তি' অর্থ তাদেরকে আমি এমন কঠিন শাস্তিতে নিপতিত করবো, যার থেকে পরিত্রাণপ্রাপ্তি অসম্ভব।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়'।

একথার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের স্বভাব কী বিচিত্র! তারা আমার অনুগ্রহ পেলে আমার আদেশ নিষেধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দম্ভভরে দূরে সরে যায়। আবার বিপদে পড়লে রত হয় প্রলম্বিত প্রার্থনায়।

এখানে 'আল্ইনসান' (মানুষ) অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। 'আ'রদ্ব' অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেয়। 'ওয়া নাআ বিজ্বানিবিহী' অর্থ দূরে সরে যায়, পার্শ্বপরিবর্তন করে। অর্থাৎ বের হয়ে যায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অত্যাবশ্যক দায়িত্ব থেকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'জ্বানিবি' (পার্শ্ব, দিক) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে রূপকার্থে। অর্থাৎ এখানে এর অর্থ সত্তা। যেমন বলা হয় 'জ্বানিবিল্লাহ্' (আল্লাহ্র দিকে)। এভাবে এখানকার 'পার্শ্বপরিবর্তন করে' অথবা 'দূরে সরে যায়' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— তারা বিপদে পড়লে তাদের সত্তাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

'আ'রীদ্ব' অর্থ দীর্ঘ, লম্বা-চওড়া, প্রচুর, প্রলম্বিত। আরববাসীরা লম্বা-চওড়াকে ''অধিক' অর্থে প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন বলা হয়ে থাকে 'আত্বলা ফীল্ কালাম ওয়া দাআ' ওয়া আয়্রাদ্ব' (সে অনেক কথা বলেছে এবং অনেক প্রার্থনা করেছে)। তাই শব্দটি অনেক অথবা সুবিস্তৃত অর্থপ্রকাশক। কেননা দীর্ঘ বলা হয় সবচেয়ে বেশী দূরত্বকে এবং যখন তার প্রস্থ বা বিস্তার সমপরিমাণ হয় তখন তার আকৃতি হয়ে যায় সুবৃহৎ চতুর্ভুজের মতো। তখন তার বিস্তারণের বিরাটত্ব সম্পর্কে আর সন্দেহ মাত্র থাকে না। সেকারণেই এক আয়াতে জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'আ'রদ্বুহাস্ সামাওয়াত্' (আকাশের মতো বিস্তৃত)।

একটি সংশয় ঃ ৪৯ সংখ্যক আয়াতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 'যখন তাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে, তখন সে নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে'। আর এই আয়াতে বলা হলো 'সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়'। কথা দু'টো বিপরীতার্থক নয় কি? নৈরাশ্যজনক অবস্থায় দীর্ঘ প্রার্থনার বিষয়টিকে কীভাবে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যায়?

সংশয় খণ্ডন ঃ উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের বক্তব্যদু'টো ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত। সম্ভবতঃ ৪৯ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথা। কেননা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া তাদেরই স্বভাব। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয় কেবল কাফেরেরা। আবার উদাসীন বিশ্বাসীদের নিরাশ হওয়ার কথাও এসেছে অন্য এক আয়াতে। যেমন 'গাফেল মুমিনেরাই আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে থাকে'। সুতরাং বলা যেতে পারে, প্রথমোক্ত ব্যক্তব্যটি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং শেষোক্তটি সম্পৃক্ত উদাসীন বিশ্বাসীদের সঙ্গে।

এরকম হওয়াও সম্ভব যে, উভয় বক্তব্যই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এমতাবস্থায় পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে, তখন তারা আল্লাহ্র দিকে পূর্ণ মনোযোগী হয়ে দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। কিন্তু কোনো বিশেষ উপযোগিতার কারণে যদি তাদের প্রার্থনা কবুল করতে বিলম্ব হয়ে যায়, তবে তারা হয়ে পড়ে নিরাশ ও হতাশ। প্রকৃত বিশ্বাসীগণের অবস্থা এর বিপরীত। তারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহ্র রহমতের দৃঢ় আশা বুকে নিয়ে প্রার্থনা করে যেতে থাকে। প্রার্থনা কবুল হতে বিলম্ব ঘটলেও তারা নিরাশ হয় না। মনে করে নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিহিত রয়েছে পারলৌকিক কল্যাণ। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ প্রার্থনাকারীকে তার প্রার্থিত বস্তু তো দুনিয়াতেই দান করেন, অথবা তা জমা রেখে দেন আখেরাতের জন্য।

আবার এরকম হওয়াও অসম্ভব নয় যে, বিপদগ্রস্ত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হয়তো মনে মনে লালন করে নৈরাশ্য এবং মুখে মুখে করতে থাকে লম্বা-চওড়া প্রার্থনা। অথবা পূজিত প্রতিমাগুলো থেকে তারা নিরাশ হয়ে যায় এবং দীর্ঘ প্রার্থনা জানাতে থাকে আল্লাহ্র কাছে।

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি চায়, তার বিপদগ্রস্ত অবস্থার প্রার্থনা কবুল করা হোক, তার জন্য উচিত সুখের সময়েও প্রলম্বিত প্রার্থনা করা। এক হাদিসে এরকমই বলা হয়েছে।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা ঃ আয়াত ৫২, ৫৩, ৫৪

www.eelm.weebly.com

❑ বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, যদি এই কুরআন আল্লাহ্র নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে আর তোমরা ইহা প্রত্যাখ্যান কর তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে, তাহার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে?'

❑ আমি উহাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিব বিশ্বজগতে এবং উহাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে উহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, উহাই সত্য। ইহা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নহে যে, তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত?

❑ জানিয়া রাখ, ইহারা ইহাদের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাতকারে সন্দিহান, জানিয়া রাখ, সব কিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! কোরআন যে মহাসত্য, আপনি তা অংশীবাদী জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে চেষ্টা করুন এভাবে— আল্লাহ্ই যদি কোরআনের অবতারণা করে থাকেন, তবে কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে আর সন্দেহ করা যেতে পারে কি? তোমরা একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, এই মহাগ্রন্থটি মানবরচিত কোনো গ্রন্থ নয়। এমতাবস্থায় তোমরা কোরআনকে অস্বীকার করতে পারো কীভাবে? তবু যদি তোমরা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হও, প্রতিপক্ষ হও আল্লাহ্র শাশ্বত বাণীসম্ভারের, তবে তোমাদের চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর হতে পারে কে?

আলোচ্য আয়াতের সঙ্গে মিল রয়েছে ৪৪ সংখ্যক আয়াতের 'বলো, মুমিনদের জন্য এটা পথনির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার' কথাটির। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আপনি বলুন, হে আমার স্বজাতি! কোরআন এর বিশ্বাসীর জন্য শুভপথনির্দেশ ও অন্তর-বাহিরের ব্যাধির প্রতিষেধক। সুতরাং এই কোরআন যে বিশ্বাস করবে, সে হয়ে যাবে ঐহিক-পারত্রিক উভয় প্রকার কল্যাণের অধিকারী। আর যে এর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত থাকবে, প্রত্যাখ্যান করবে এর মর্মস্পর্শী আহ্বানকে, সে হয়ে যাবে সর্বাধিক বিভ্রান্ত।

পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করবো বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে'।

এখানে 'আয়াতিনা ফীল্ আফাক্ব' অর্থ আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করবো বহির্জগতে বা বিশ্বজগতে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে বহির্জগতের নিদর্শনাবলী হচ্ছে পূর্ববর্তী যুগের অবাধ্য জনগোষ্ঠীগুলোর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ। আর 'ফী আনফুসিহিম' (তাদের নিজেদের মধ্যের নিদর্শনাবলী) অর্থ বদর যুদ্ধের ঘটনাবলী, যে যুদ্ধে নিহত ও বন্দী হয়েছিলো বহুসংখ্যক মুশরিক। কাতাদাও এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। তবে কেউ কেউ বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ হবে— দুঃখ-দুর্দশা ও শারীরিক রোগব্যাধি। মুজাহিদ ও সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'ফীল্ আফাক্ব' অর্থ রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দের বিভিন্ন জনপদ বিজয় এবং 'ফী আনফুসিহিম' অর্থ মক্কাবিজয়।

আতা এবং ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে 'ফীল্ আফাক্ব' অর্থ আকাশ-পৃথিবী-গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সুবৃহৎ নিদর্শনরাজি এবং 'ফী আনফুসিহিম' অর্থ বিস্ময়কর ও সূক্ষ্ম সৃষ্টিসমূহ।

বায়যাবী লিখেছেন, 'ফীল্ আফাক্ব' অর্থ ১. ভবিষ্যতের ঘটনাবলী সম্পর্কে রসুল স. এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং 'ফী আনফুসিহীম' অর্থ ১. ওই সকল ঘটনাবলী, যা ঘটেছিলো মক্কাবাসীদের চোখের সামনে, যেমন বদর যুদ্ধ, মক্কা বিজয় মানুষের শারীরিক গঠন ও অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির বিস্ময়কর নিদর্শন। ২. অতীতকালের ঘটনাবলী ও দুর্ঘটনার নিদর্শনসমূহ ৩. রসুল স. ও তাঁর উত্তরসূরীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলোর উপর একচ্ছত্র শাসন।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটাই সত্য'। একথার অর্থ— যেনো তাদের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোরআন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত এবং তাঁর রসুল তাঁর বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত। অথবা যেনো প্রমাণিত হয় আল্লাহ্র ধর্ম সত্য এবং এ ধর্মের পৃষ্ঠপোষণা হয়ে থাকে আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক এবং উহ্য একটি ক্রিয়ার সঙ্গে রয়েছে এর সংযোগ। ওই উহ্যতা সহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ন্যস্ত দায়িত্বের শুভপরিণতি সম্পর্কে কি আপনার সন্দেহ আছে? আর আপনার জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে, আপনার প্রভুপ্রতিপালক সবকিছু দেখেন? সুতরাং নিদর্শনসমূহ প্রদর্শনের যে অঙ্গীকার তিনি আপনার সঙ্গে করেছেন, তা অবশ্যই পরিপূরিত হবে। অথবা শাহীদ' বা প্রত্যক্ষদর্শী অর্থ এখানে 'অবগত'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের ও আপনার অবস্থা সম্পর্কে ভালো করেই জানেন কিংবা এখানকার বক্তব্যার্থটি দাঁড়াবে— পাপ থেকে মানুষকে থামাবার জন্য এই বিশ্বাসটিই কি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে অবহিত? কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়। সুতরাং যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি তাদেরকে পেতেই হবে।

মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— কোরআন সত্য হওয়ার ব্যাপারে এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার সাক্ষী তিনি নিজে। অর্থাৎ কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহ্র সাক্ষ্য প্রমাণই যথেষ্ট, এবং এর প্রমাণ হচ্ছে তিনি কোরআনকে করেছেন অলৌকিক। জুজায বলেছেন, এখানে 'যথেষ্ট' অর্থ— আল্লাহ্ এমন সকল প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, যা বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্র সাক্ষ্য প্রমাণই যথেষ্ট, কেননা তিনি সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেন। কোনোকিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়।

এখানে 'বিরব্বিকা' অর্থ তোমার প্রতিপালক। 'বা' অক্ষরটি এখানে অতিরিক্ত হিসেবে সন্নিবেশিত। 'রব্বিকা' এখানে কর্তা। আর 'কাফা' শব্দমূল থেকে সাধিত ক্রিয়ার কর্তার সাথে ব্যবহৃত হয় যে 'বা' সেই 'বা' অব্যয়টি অতিরিক্তই হয়ে থাকে।

এরপরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'জেনে রাখো, এরা এদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতকারে সন্দিহান। জেনে রাখো সবকিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে রয়েছেন'। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! জেনে রাখুন ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদের প্রভুপালকের সাক্ষাতকারের বিষয়টিকে মোটেও বিশ্বাস করে না। আরো শুনে রাখুন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর আনুরূপ্যবিহীন জ্ঞান দ্বারা সকল কিছুকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

এখানে 'প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতকারে সন্দিহান' অর্থ মহাবিচারের দিবস অথবা কর্মফল প্রাপ্তি সম্পর্কে সন্দিহান। আর সবকিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে

রয়েছেন' অর্থ সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি তাঁর আনুরূপ্যবিহীন সত্তা এবং জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। ওই পরিবেষ্টনের প্রকৃতি মানুষের ধারণাও কল্পনার অতীত।

সুরা হা-মীম আস্ সাজ্দার তাফসীর শেষ হলো আজ ২৮ শে সফর ১২০৮ হিজরী সনে। আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন ওয়া সাল্লাল্লহু আ'লা খইরি খলক্বিহী মুহাম্মাদিঁউ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজ্মায়ীন।

সূরা শূরা

এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। এর রুকুর সংখ্যা ৫ এবং আয়াতের সংখ্যা ৫৩।

সূরা শূরা ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

www.eelm.weebly.com

❑ হা-মীম।

❑ 'আইন-সীন-ক্বাফ।

❑ এইভাবেই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্।

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। তিনি সমুন্নত, মহান।

❑ আকাশমণ্ডলী ঊর্ধ্বদেশ হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয় এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্তবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, জানিয়া রাখ, আল্লাহ্, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❑ যাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখেন। তুমি তাহাদের কর্মবিধায়ক নহ।

❑ এইভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায়, যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার মক্কা ও উহার চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করিতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

❑ আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে মানুষকে একই উম্মাত করিতে পারিতেন; বস্তুত তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন; আর যালিমরা, উহাদের কোন অভিভাবক নাই, কোন সাহায্যকারীও নাই।

❑ উহারা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্, অভিভাবক তো তিনিই, এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'হা-মীম' (১) 'আঈন সীন ক্বফ' (২) বাগবী লিখেছেন, একবার হাসান ইবনে ফজলকে জিজ্ঞেস করা হলো, এই সুরায় 'হা-মীম' ও 'আঈন সীন ক্বফ'কে আলাদা করা হয়েছে কেনো? অন্য সুরায় তো 'কাফ হা ইয়া আঈন সোয়াদ'কে এরকমভাবে পৃথক করা হয়নি। তিনি বললেন, 'হা-মীম' দিয়ে যে সকল সুরা শুরু হয়েছে, এই সুরাটি সেগুলোর অন্যতম। অন্যগুলোর মতো এখানেও 'হা-মীম' প্রয়োগ করা হয়েছে অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে। কিন্তু শুধু 'কাফ হা' দিয়ে কোনো সুরা শুরু হয়নি। শুরু হয়েছে 'ইয়া আঈন সোয়াদ' সহযোগে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে 'হা-

www.eelm.weebly.com

মীম' হচ্ছে উদ্দেশ্য ও বিধেয় আইন সীন ক্বফ। এরকম পৃথকভাবে লিখলেও বিধেয়কে খণ্ডিত করা হয় না। কিংবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'হা-মীম' ও 'আঈন সীন ক্বফ' দু'টি পৃথক আয়াত এবং অন্য সুরায় উল্লেখিত 'কাফ হা ইয়া আঈন সোয়াদ' একটি আয়াত।

আবার বিষয়টিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, 'কাফ হা ইয়া আঈন সোয়াদ' এবং এ ধরনের অন্যান্য সুরার অবোধ্য শিরোনামগুলোকে আলেমগণ 'বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি'র অন্তর্ভূত করেন। সেগুলোর বিভিন্ন ব্যাখ্যাও তাঁরা দিয়ে থাকেন।

কিন্তু 'হা-মীম' এর বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি হওয়ার ব্যাপারে তাঁরা একমত নন। কেউ কেউ আবার 'হা-মীম'কে বর্ণনা করেছেন ক্রিয়া অর্থে। অর্থাৎ তাঁরা বলেন, 'হা-মীম' অর্থ 'হুম্মাল আমরু' (যা মীমাংসাযোগ্য তা মীমাংসিত হয়েছে)।

ইকরামা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'হা' অর্থ আল্লাহ্‌র হুকুম। 'মীম' অর্থ 'মাজ্বীদ' (আল্লাহ্ মহামহিম)। 'আঈন' হচ্ছে 'ই'ল্‌ম' (আল্লাহ্‌র জ্ঞান), 'সীন' হচ্ছে 'সানা' (আল্লাহ্‌র নূর বা মাহাত্ম্য) এবং 'ক্বফ' অর্থ 'কুদরত' (আল্লাহ্‌র পরাক্রম)। আর এখানে আল্লাহ্ এগুলোর শপথ করেছেন। এটাও হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে পরিচিত যে, প্রত্যেক গ্রন্থধারী নবীকে 'হা-মীম আঈন সীন ক্বফ' প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে অবশ্য এর সমর্থনও রয়েছে।

পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এভাবেই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্'।

এখানে 'আ'যীয' অর্থ পরাক্রমশালী এবং 'হাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়, আপন সিদ্ধান্তে ক্রটি-বিচ্যুতি মুক্ত। আর 'ইউহা' অর্থ প্রত্যাদেশ করেন। এটি একটি চলমান ক্রিয়াপদ, যাতে অতীতকালের অবস্থাকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যাদেশ করার ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র রীতি। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! এই সুরায় যে সকল বিষয় আপনাকে প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, অথবা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে যেভাবে এই সুরা আপনাকে দেওয়া হয়েছে, সেভাবে প্রত্যাদেশ করা হয়েছিলো আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকে।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা তাঁরই। তিনি সমুন্নত, মহান'। এখানে 'আ'লীয়্যু' অর্থ সমুন্নত, শীর্ষাধিকারী। আর 'আ'জীম' অর্থ মহান, শ্রেষ্ঠ।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ঊর্ধ্বদেশ থেকে ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়'। একথার অর্থ— অসম্ভব কিছু নয় যে, ভারবহনে অক্ষম হয়ে যে কোনো মুহূর্তে আকাশ ভেঙে পড়বে। অথবা ভেঙে পড়বে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও মহত্ত্বের প্রভাবে। কিংবা আকাশ ভেঙে পড়বে অংশীবাদীদের 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেন' এরকম অপভাষণের কারণে। অন্য এক আয়াতে এরকম বলাও হয়েছে। যেমন— 'নিশ্চয় তোমরা এক অদ্ভূত কাণ্ড করেছো, হয়তো সে কারণে এখনই নভোমণ্ডল ভেঙে পড়বে'। এরকমও অর্থ করা যেতে পারে যে— ফেরেশতাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে যদি আকাশ ভেঙে পড়ে, তবে তা-ও অসম্ভব কিছু নয়। হজরত আনাস থেকে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আকাশে মড়মড় আওয়াজ হয়। আর সেখানে এরকম আওয়াজ হওয়াই স্বাভাবিক। যার অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, সেই আল্লাহ্‌র শপথ! আকাশে এমন এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও খালি নেই, যেখানে সেজদারত

অবস্থায় নেই কোনো ফেরেশতা, যারা জয়গান করে কেবল আল্লাহ্‌র। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, আসমানে পা ফেলার মতো এমন কোনো শূন্য স্থান নেই, যেখানে দণ্ডায়মান, রুকু অথবা সেজদা অবস্থায় না আছে কোনো ফেরেশতা।

'মিন ফাওক্বিহিন্না' অর্থ ঊর্ধ্বদেশ থেকে। অর্থাৎ আকাশ ভাঙতে শুরু করবে উপরের দিক থেকে। এরকম বলার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে— আকাশ উপর থেকে ভেঙে পড়লে তা হবে আল্লাহ্‌র মহাপরাক্রমের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। দ্বিতীয়তঃ 'পড়া' বা 'পতিত হওয়া'ও তাঁর মহামর্যাদার পরিচায়ক। তৃতীয়তঃ ফেরেশতাদের ডাকে ভেঙে পড়াও আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচয়বাহী। কারণ আল্লাহ্‌ই তাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং থাকতে দিয়েছেন আকাশের উপরে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে'। একথার অর্থ অংশীবাদীরা যখন আল্লাহ্‌র মহান মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এরকম অপবিত্র বাক্য উচ্চারণ করতে থাকে, বলতে থাকে 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেন' 'ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা' ইত্যাদি, তখন ফেরেশতারা অবস্থান গ্রহণ করে ওই সকল অপবিত্র মন্তব্যের বিরুদ্ধে। তারা তখন ঘোষণা করতে থাকে আল্লাহ্‌র সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা। বিশেষ করে তারা যখন প্রত্যক্ষ করতে থাকে আল্লাহ্‌র মহিমার উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাবচ্ছটা, তখন তারা তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকে আরো বেশী বেশী করে। এখানে 'বিহাম্‌দি রব্বিহিম' অর্থ প্রভুপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং মর্ত্যবাসীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে'। একথার অর্থ— এবং ওই ফেরেশতারা পৃথিবীবাসী বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনাও করে। ক্ষমাপ্রার্থনা করে এজন্য যে, বিশ্বাসগত দিক থেকে তারা একে অপরের নিকটজন। আর নিকটজনের কল্যাণকামনা করাইতো স্বাভাবিক। এখানে 'ইয়াস্‌তাগ্‌ফিরূন' অর্থ ক্ষমাপ্রার্থনা করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'জেনে রাখো, আল্লাহ্, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ তাঁর বন্ধুদের প্রতি বড়ই ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ার্দ্র।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! যারা প্রতিমা, শয়তান অথবা স্ব-প্রবৃত্তিকে অভিভাবক ও পরিচালক বলে মানে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। তাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র সতত পর্যবেক্ষণ। সুতরাং যথাসময়ে যথোপযুক্ত প্রতিফল তারা পাবেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও'। একথার অর্থ— এ ব্যাপারে আপনাকে এমতো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি যে, আপনি তাদেরকে আপনার নিজস্ব অভিপ্রায়ানুসারে সরল পথে নিয়ে আসবেন। অথবা— তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য আপনাকে দায়ী করা হবে। কিংবা— তাদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ধারণ আপনার উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। আপনার দায়িত্ব তো কেবল সত্যের প্রচার।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'এভাবে আমি তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায়, যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো মক্কা ও তার চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পারো কিয়ামত দিবস সম্পর্কে, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।

এখানে 'উম্মাল কুরা' অর্থ পল্লীমাতা। যেহেতু আরবের অধিকাংশ জনপদের উৎপত্তি হয়েছে মক্কানগরী থেকে। উপরন্তু আরবভূমিতে আদি জনপদের পত্তন হয়েছিলো মক্কাতে। তাই মক্কা নগরীকে ভূষিত করা হযেছে পল্লীমাতা অভিধায়।

এখানে 'মান হাওলাহা' অর্থ তার চতুর্দিকের জনগণকে। অর্থাৎ মক্কার চতুর্দিকের নিকট ও দূরের সকল জনপদবাসীদেরকে। উল্লেখ্য, এখানে প্রথমে সতর্ক করতে বলা হয়েছে মক্কা ও মক্কা-সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীদের। তারপর বলা হয়েছে অবশিষ্ট পৃথিবীবাসীদের কথা। এর কারণ হচ্ছে নিকটবর্তীরাই সত্যের আহবান শ্রবণের প্রথম হকদার এবং প্রচার সহযোগী হবার দায়িত্বও প্রথমে বর্তায় তাদের উপরেই।

রসুল স. বলেছেন, অন্যান্য নবীর উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে পাঁচটি বিষয়ে— ১. আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানবতার পথপ্রদর্শনার্থে। ২. আমার উম্মতের জন্য আমার শাফায়াতের অধিকার সুসংরক্ষিত। ৩. এক মাসের পথের দূরত্বের শত্রুদের মনেও প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় আমার ত্রাস। ৪. পুরো পৃথিবীর মাটিকে আমার জন্য করে দেওয়া হয়েছে জায়নামাজ এবং ৫. গণিমতের মাল ভক্ষণ আমার জন্য করে দেওয়া হয়েছে বৈধ, যা ইতোপূর্বে অন্য কারো জন্য বৈধ করা হয়নি। বিশুদ্ধ সূত্রে তিবরানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত শোয়াইব ইবনে ইয়াজিদ থেকে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ছয়টি বিষয়ে আমি অন্যান্য পয়গম্বর অপেক্ষা বিশেষ মর্যাদায় মর্যাদায়িত— ১. আমাকে দেওয়া হয়েছে সমাবদ্ধ এমন বাণী, যা সংক্ষিপ্ত, অথচ গভীর অর্থবহ ২. সাহায্যমণ্ডিত করা হয়েছে আমাকে দুশমনদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতাপ দিয়ে ৩. যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে আমার জন্য করা হয়েছে হালাল ৪. আমার জন্য সমস্ত পৃথিবীর জমিনকে করা হয়েছে মসজিদ। ৫. আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সকল মানুষের নবী হিসাবে ৬. নবুয়তের প্রবহমানতার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে আমাকে দিয়েই।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, একদিন রসুল স. তাঁর পবিত্র দুই হাতের মুঠিতে দু'টি লিখিত দলিল নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। বললেন, এই দলিল দু'টো নির্ধারণ করা হয়েছে বিশ্বসমূহের প্রভুপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে। এর একটিতে আছে জান্নাতবাসীদের নাম-ধাম, সংখ্যা ও গোত্রপরিচয়। তারা জান্নাতবাসী তখন থেকেই, যখন তারা থাকে পিতৃপৃষ্ঠে অথবা

মাতৃগর্ভে। এটাই হচ্ছে আগত-অনাগত সকল জান্নাতবাসীর পূর্বনির্ধারিত দলিল। এরপর তিনি অপর দলিলটি দেখিয়ে বললেন, আর এই দলিলটি হচ্ছে জাহান্নামবাসীদের। এটাও বিশ্বসমূহের মহান প্রভুপালক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ণয়িত। এতে রয়েছে জাহান্নামবাসীদের নাম-ধাম, সংখ্যা ও গোত্রপরিচয়। তারা জাহান্নামবাসী তখন থেকেই যখন তারা অবস্থান করছিলো তাদের পিতৃস্কন্ধে অথবা মাতৃ-উদরে। এটাই হচ্ছে আগত-অনাগত সকল জাহান্নামবাসীদের চূড়ান্ত দলিল। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! তাহলে আর আমলের প্রয়োজন কী? তিনি স. বললেন, আমল করে

যেতে থাকো। সোজা পথে চলতে থাকো। যে জান্নাতবাসী, তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে জান্নাতবাসীদের মতো শুভ কর্মকাণ্ডের উপর, তা সে সারা জীবন যেমন আমলই করুক না কেনো। আর যে জাহান্নামী হবে, তার জীবন সাঙ্গ হবে জাহান্নামবাসীদের মতো অশুভ কর্মকাণ্ডের উপর, তা সে সারা জীবন ধরে যা কিছু করে থাকুক না কেনো। এরপর তিনি তেলাওয়াত করলেন 'সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই উম্মত করতে পারতেন; বস্তুতঃ তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন; আর জালেমেরা, তাদের কোনো অভিভাবক নেই, কোনো সাহায্যকারীও নেই'।

এখানে 'উম্মাতান ওয়াহিদাতান' অর্থ একই উম্মত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'একই উম্মত করতে পারতেন' অর্থ— করতে পারতেন একই ধর্মাবলম্বী। মুকাতিল বলেছেন, এর অর্থ— সকলকে ইসলাম ধর্মের অন্তর্গত করতে পারতেন। অন্য এক আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন 'যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে সকলকেই সত্য পথের উপরে একত্রিত করতেন'।

'আজ্‌জলিমূন' অর্থ জালেম, স্বেচ্ছাচারী, সীমালংঘনকারী। 'মা লাহুম মিঁউ ওয়ালীয়্যুঁ ওয়ালা নাসীর' অর্থ তাদের কোনো অভিভাবক নেই।,কোনো সাহায্যকারীও নেই। অর্থাৎ এমন কোনো অভিভাবক এবং সাহায্যকারী তারা পাবে না, যারা তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারে। ভীতিপ্রদর্শনকে জোরালো করবার জন্যই এখানে বক্তব্যটি পরিবেশন করা হয়েছে ভিন্ন ভঙ্গিতে। তাই এখানে জান্নাতীদের বিপরীতে 'যাকে ইচ্ছা তাকে স্বীয় অনুগ্রহ থেকে করেন বঞ্চিত' এরকম বলে বলা হয়েছে, আর জালেমেরা, তাদের কোনো অভিভাবক নেই, কোনো সাহায্যকারীও নেই'। এরকম বলা হয়েছে অসন্তোষের আতিশয্যবশতঃ।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তারা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করেছে? কিন্তু আল্লাহ্, অভিভাবক তো তিনিই, এবং তিনি মৃতুকে জীবিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

প্রশ্নাকারে উপস্থাপিত এখানকার প্রথম বাক্যটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— ওই সকল স্বেচ্ছাচারীরা তো আল্লাহ্‌কে অভিভাবক নির্ধারণ

করেনি। অভিভাবক নির্ধারণ করেছে আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে— প্রতিমা, শয়তান অথবা অপপ্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে। অথবা কথাটির অর্থ হবে— তারা যাকে বা যাদেরকে অভিভাবক বলে মেনেছে, মহাবিচারের দিবসে তারা আর অভিভাবক থাকবেই না। বরং প্রকৃত অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ্! যিনি কর্মফলপ্রদানার্থে পুনরুত্থান দিবসে মৃতকে জীবিত করবেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ রসুল স. এর অভিভাবক এবং অভিভাবক তাদের, যারা তাঁর রসুলের একনিষ্ঠ অনুসারী।

সূরা শূরা ঃ আয়াত ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

তাফসীরে মাযহারী/৪২৬

❑ তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন— উহার মীমাংসা তো আল্লাহ্‌রই নিকট। তিনিই আল্লাহ্— আমার প্রতিপালক; তাঁহারই উপর আমি নির্ভর করি আর তাঁহারই অভিমুখী আমি।

❑ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আন'আমের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন উহাদের জোড়া। এইভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁহারই নিকট। তিনি যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিয্‌ক বর্ধিত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

❑ তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন দীন যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহ্‌কে, আর যাহা আমি ওহী করিয়াছি তোমাকে এবং যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম ইব্‌রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এই বলিয়া যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না। তুমি মুশরিকদিগকে যাহার প্রতি আহ্বান করিতেছ তাহা উহাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁহার অভিমুখী, তাহাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন।

www.eelm.weebly.com

❑ উহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশত উহারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদের বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত। উহাদের পর যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছে, তাহারা সেই সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে।

❑ সুতরাং তুমি উহার দিকে আহ্বান কর ও উহাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেইভাবে তুমি আদিষ্ট হইয়াছ এবং উহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না। বল, 'আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন আমি তাহাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিতে। আল্লাহ্ই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ নাই। আল্লাহ্ই আমাদিগকে একত্র করিবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো না কেনো, তার মীমাংসা তো আল্লাহ্‌রই নিকট'। একথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! তোমরা যে সকল ধর্মীয় বিষয় নিয়ে বিশ্বাসীদের সঙ্গে বচসা-বিতর্ক করো, সে সকল বিষয়ের মীমাংসা আল্লাহ্ই করবেন। মহাবিচারের দিবসে তোমাদের উভয়

দলকে চিরদিনের জন্য পৃথক করে দিবেন। কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন— হে বিশ্বাসীরা 'মুতাশাবিহাত' (রহস্যাচ্ছন্ন) আয়াতসমূহ নিয়ে তোমরা নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হও, সে সকল বিষয়কে 'মুহকামাত' (সুস্পষ্ট) আয়াতের অনুকূল করে নাও।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনিই আল্লাহ্— আমার প্রতিপালক! তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি, আর তাঁরই অভিমুখী আমি'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, শত্রুদের সঙ্গে মতভেদের বিষয়ে এবং সকল কাজকর্মে আমি তাঁরই প্রতি নির্ভর করি এবং অনুকূল-প্রতিকূল সকল অবস্থায় তাঁরই প্রতি অভিনিবেশী থাকি।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং আনআ'মের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তাদের জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন'।

এখানে 'মিন আন্‌ফুসিকুম আয্‌ওয়াজ্বা' অর্থ তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া। 'মিনাল আনআ'মি আয্‌ওয়াজ্বা' অর্থ আনআ'মের মধ্য থেকে তাদের জোড়া। অর্থাৎ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন নারী ও পুরুষ। 'ইয়াজ্‌রাউ কুম' অর্থ বংশবিস্তার করেন। আর 'ফীহ্' অর্থ এভাবে, এই নিয়মে। কেউ কেউ 'ফীহি' এর অর্থ করেছেন তার গর্ভাশয় এবং 'ফী' এর আগে যোগ করেছেন 'বা'। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে আল্লাহ্ তোমাদের বংশবিস্তার ঘটিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— এভাবেই আল্লাহ্ প্রত্যেকের জোড়া বানিয়ে বানিয়ে তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'লাইসা কামিছ্‌লিহী শাইউন' (কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়)। এখানে 'মিছাল' শব্দটি সন্নিবেশিত হয়েছে অতিরিক্তরূপে। এভাবে উদ্দেশ্য দাঁড়িয়েছে— তিনি কোনো কিছুর মতো নন। 'মিছাল' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে যথাযথ গুরুত্ব আরোপণার্থে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফাইন্ আমানু বিমিছ্‌লি মা আমানতুম বিহী' (তারা যদি ইমান আনতো যেরূপ তোমরা ইমান এনেছো)। কারো কারো কাছে 'কামিছ্‌লিহী' এর 'কা' অতিরিক্ত। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— এমন কিছুই নেই, যা তাঁর অনুরূপ। অর্থাৎ তিনি আনুরূপ্যবিহীন। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— তাঁর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'মিছাল' এখানে রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে অতিশয়োক্তির জন্য। না-সূচক শব্দ ক্রিয়ার অতিশয়োক্তি হিসেবে বিবেচিত হলে যেমন বলা হয়, তোমার মতো মানুষ একাজ করে না। অর্থাৎ তুমি একাজ করো না। সম্বোধনকারীর 'মিছাল' বা দৃষ্টান্ত যদি সম্বোধিত জনের অনুরূপ বা সমান হয় এবং বলে, সে এ কাজ করে না, তবে সম্বোধিত ব্যক্তির না করাটা মর্যাদার দিক থেকে উত্তম বলে প্রমাণিত হবে। রূপকের জন্য বাস্তব অস্তিত্ব বা তার সম্ভাবনা প্রয়োজনীয় হয়। যেমন কোনো দীর্ঘদেহী লোককে রূপক অর্থে বলা হয় অমুক ব্যক্তি নিজাদ এর মতো লম্বা, তবে এমতোক্ষেত্রে সে যে দীর্ঘদেহী সেটাই

বুঝায়। দুজনের আবার আকৃতি অবিকল একরকম হতে হবে, তার কোনো অর্থ নেই। এভাবে 'বাল ইয়াদাহু মাব্‌সুত্বতান' এই আয়াতে হাত লম্বা হওয়া অর্থ দানশীল হওয়া। বাস্তবে হাত লম্বা হওয়া এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য নয়। আর তা সম্ভবও নয়। আবার কারো কারো মতে 'মিছাল' অর্থ এখানে গুণ। অর্থাৎ তাঁর গুণাবলীর মতো অন্য কারো গুণাবলী নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'। একথার অর্থ— যা কিছু শ্রবণ ও দর্শনের যোগ্য তা তিনি শোনেন ও দেখেন। আর তাঁর শোনা ও দেখার বিষয়টিও আনুরূপ্যবিহীন। অর্থাৎ অন্য কারো মতো নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই হচ্ছেন শ্রোতা

www.eelm.weebly.com

ও দ্রষ্টা। অন্য সকল শ্রোতা ও দ্রষ্টা তাঁর শ্রুতি ও দৃষ্টির মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ তাঁর দয়ায়, অথবা তাঁর শ্রুতি ও দৃষ্টির প্রতিচ্ছায়ারূপে অন্যেরা শুনতে ও দেখতে পায়। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ সত্তাগত দিক থেকে যেমন অন্য কোনোকিছুর সদৃশ নন, তেমনি সদৃশ নন গুণাবলী এবং কার্যাবলীর দিক থেকেও। তাঁর সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপ সকল কিছুই আনুরূপ্যবিহীন।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁরই নিকট। তিনি যার জন্য ইচ্ছা তার রিজিক বর্ধিত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে আকাশ-পৃথিবীর সকল সম্পদের নিয়ন্ত্রণ। তিনি তাঁর ইচ্ছা মতো সে সম্পদ বন্টন করেন। কারো জীবনোপকরণ বাড়িয়ে দেন এবং কারো জীবনোপকরণকে দেন কমিয়ে। এরকম করেন এ বিষয়টি পরীক্ষা করবার জন্য যে, তারা সুখে কৃতজ্ঞ এবং দুঃখে ধৈর্যশীল হয় কিনা। আর নিঃসন্দেহে তিনি সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাই যা করা সমীচীন, তাই-ই করে থাকেন।

এখানে রিজিক অর্থ জীবনোপকরণ, পানাহারের সামগ্রী। কালাবী এর অর্থ করেছেন— বৃষ্টি ও শস্যভাণ্ডার।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নুহকে। আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং এতে মতভেদ কোরো না'। এ কথার মর্মার্থ হচ্ছে— মোহাম্মদ যে ধর্মমত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, তা নতুন কোনো ধর্মমত নয়। এটাই ছিলো সকল যুগের সকল নবী-রসুল কর্তৃক আচরিত ও প্রচারিত শাশ্বত ধর্মাদর্শ। নুহ, ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা সকল প্রত্যাদিষ্ট পুরুষই এই চিরন্তন ধর্মাদর্শ প্রচারে আজীবন নিয়োজিত থেকেছেন। কেননা এটা হচ্ছে মহাসত্য। আর যা সত্য তা সকল স্থানে ও কালেই সত্য। এ সত্যের পরে ভ্রষ্টতা ছাড়া যে আর কিছুই নেই। সুতরাং এই মহাসত্য সম্পর্কে মতভেদ করার কিছুই নেই। তৎসত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে এই মহাসত্য ইসলামের বিরুদ্ধতা করে চলেছে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকেরা। এর কারণ এই যে, তারা মিথ্যাশ্রয়ী, শাশ্বত ধর্মাদর্শের প্রতি সীমাহীন বিদ্বেষপরায়ণ।

নাসাঈ, আহমদ ও দারেমী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. একবার মাটিতে লম্বা একটি সরল রেখা এঁকে বললেন, মনে করো এটা আল্লাহ্র পথ। এরপর সরল রেখাটির ডানে বামে আরো অনেক দাগ কেটে বললেন, আর ভ্রান্তপথ হচ্ছে এগুলো, যার প্রত্যেকটিতে বসে আছে একটি করে শয়তান, সে তার নিজের দিকে আহ্বান করে। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন 'এই হচ্ছে আমার সোজা পথ, সুতরাং এর অনুসরণ করো'।

আল্লাহ্র সত্তা-গুণবত্তা-কার্যাবলীর আনুরূপ্যবিহীন এককত্ব, নবী-রসুল, আকাশাগত গ্রন্থসমূহ, ফেরেশতা, মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, বিচার দিবস, নবী-রসুল কর্তৃক প্রচারিত নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাদি ইত্যাদিতে বিশ্বাস করার নাম ইসলাম। এই বিশ্বাস ও বিধিবিধান সাধারণভাবে সকল নবী-রসুলের ধর্মাদর্শের অন্তর্ভূত। এর মধ্যে শাখা-প্রশাখাগত কোনো কোনো বিধানের প্রতিষ্ঠা অথবা অবলুপ্তি কখনোই মূল বিষয়াবলীকে মতদ্বৈধতাধীন করতে পারে না। এরকম ঘটনা তো কখনো কখনো একই নবীর শরিয়তে ঘটানো হয়ে থাকে। রহিত বিধানের স্থলে বলবত করা হয় নতুন বিধান। যেমন রসুল স. প্রথমদিকে নামাজ পাঠ করতেন বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে। পরে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয় কাবামুখী হতে। কিন্তু নামাজ পাঠের বিধান তৎসত্ত্বেও থাকে অক্ষুণ্ন। সুতরাং এরকম ঘটনা শাশ্বত ধর্মাদর্শে কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। এভাবে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন নবীর শরিয়তের শাখা-প্রশাখাগত বিধানে যদি সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তন করা-ও হয়, তবুও একথা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে না যে, তাঁদের ধর্মাদর্শের মৌলিকত্ব মতভেদপূর্ণ।

এখানে 'আন্ আক্বীমুদ্ দীন' অর্থ তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো। মর্মার্থ— হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্র রসুল যে বিধান তোমাদেরকে দান করেন নির্দ্বিধচিত্তে তা পালনে যত্নবান হও। এভাবে 'আন' শব্দটি হবে এখানে বর্ণনামূলক এবং শব্দটি এখানে মূল শব্দ হিসেবে বিবেচনা করলেও তা সঠিক হবে।

'ওয়ালা তাতাফার্‌রাকু ফীহ্' অর্থ এবং এতে মতভেদ কোরো না। মর্মার্থ— স্বধারণার বশবর্তী হয়ে, অথবা কেবল গোড়ামী ও গোঁয়ার্তুমির বশবর্তী হয়ে ধর্মের মধ্যে মতপৃথকতার সৃষ্টি কোরো না। ইতোপূর্বে বর্ণিত রসুল স. কর্তৃক অংকিত সরল রেখা অংকন সম্পর্কিত হাদিসেও এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও রসুল স. এর উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তিয়াত্তরটি দল-উপদল। আর এর সঙ্গে ইহুদী-খৃষ্টান অংশীবাদীদের তীব্র বিদ্বেষপূর্ণ মতভেদ তো রয়েছেই।

হজরত আলী বলেছেন, বিভেদ সৃষ্টি কোরো না। ঐক্য হচ্ছে শান্তি এবং অনৈক্য হচ্ছে শাস্তি। হজরত আবু জর থেকে আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, একতা থেকে যে অঙ্গুলি পরিমাণ দূরে সরে যায়, সে যেনো গলা থেকে খুলে ফেলে ইসলামের সুদৃঢ় রজ্জু। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যুথবদ্ধতার উপরে রয়েছে আল্লাহ্র হাত। হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বর্ণনা করেছেন, রসুল স.

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে বাঘের মতো। দূরে দূরে থাকা এবং একা একা চলা দলছুট ছাগীকে যেমন নেকড়ে সহজেই ধরে ফেলে, তেমনি করে শয়তান কুক্ষিগত করে যুথবিবর্জিত মুসলমানকে। অতএব তোমরা ইসলামের প্রশস্ত রাজপথ ছেড়ে গলিপথের দিকে ধাবিত হয়ো না। যুথবদ্ধ থেকো।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছো, তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী, তাকে দ্বীনের দিকে চালিত করেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ও আপনার আহ্বান অংশীবাদীদের নিকট দুঃসহ। আর আল্লাহ্ ইচ্ছাময়। তিনি যাকে চান, তাকে তাঁর প্রিয়ভাজনরূপে গ্রহণ করেন এবং যে তাঁকে চায়, তার প্রত্যাগমনের পথকে করেন সুগম।

সুফী সাধকগণ বলেন, আল্লাহ্ যাঁদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন, তাঁরাই হন তাঁর মনোনীত জন— নবী-রসুল ও সিদ্দীক। আর যাঁরা স্বেচ্ছায় আল্লাহ্মুখী হতে চান, তাঁরা হন নবী-রসুল ও সিদ্দীকগণের একনিষ্ঠ অনুসারী। তাঁদেরকেই আল্লাহ্ সামর্থ্যদান করেন সৎপথে পরিচালিত হতে। তাঁরা হচ্ছেন আউলিয়া ও পুণ্যবান সম্প্রদায়।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট জ্ঞান আসবার পর কেবল মাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশতঃ তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, গ্রন্থধারীরা ততক্ষণ পর্যন্ত বিভক্ত হয়নি, যতক্ষণ না এ বিষয়ে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে যে, সকল নবীর ধর্মাদর্শ অভিন্ন এবং মোহাম্মদ স. এর উপরে যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করা হয়েছে, সেই প্রত্যাদেশই অবতীর্ণ করা হয়েছিলো নবী নুহ, নবী ইব্রাহিম, নবী মুসা ও নবী ঈসার উপর।

এখানে 'বাগ্ইয়াম্ বাইনাহুম' অর্থ মতভেদ ঘটায়। আতা বলেছেন, রসুল স. এর বিরুদ্ধে তারা প্রদর্শন করতো চূড়ান্ত পর্যায়ের অহংকার। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে 'বাগা আলাইহি বাগ্ইয়ান্' অর্থ উপরে উঠেছিলো, অত্যাচার করেছিলো, বড় বেশী বেড়ে গিয়েছিলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেতো'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ আখেরাতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে চূড়ান্ত শাস্তি দিবেন— এটা যদি তিনি পূর্বাহ্নে স্থির করে না রাখতেন, তাহলে পৃথিবীতেই বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটাতেন। এখানেই মূলোৎপাটন করতেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের এবং বিশ্বাসীদেরকেও দিতেন তাৎক্ষণিক বিজয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা সে সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে'। 'তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মক্কার মুশরিকদেরকে। অর্থাৎ ইহুদী-

খৃস্টানদের পর মক্কার মুশরিকেরা কোরআন পেয়ে পড়েছে ঘোর দ্বন্দ্বে। বুঝতে পারছে না, কী করে এর আওতা থেকে বের হওয়া যায়। অথবা কথাটির লক্ষ্য এখানে ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়। তারাও কিতাব পেয়েছে তাদের পূর্ববর্তী উম্মতের পর। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা এ ব্যাপারে পতিত হয়েছে বিভ্রান্তির দোদুল্যমানতায়। ভেবে পাচ্ছে না কী করবে এখন। অথবা তাদের নিজেদের কিতাবের ব্যাপারেও এখন তারা সন্দেহপ্রবণ। কারণ সেখানেও রয়েছে সর্বশেষ রসুলের সত্যতার সাক্ষ্য।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি তার দিকে আহ্বান করো ও তাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকো যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো এবং তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ কোরো না'। একথার অর্থ— সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে ধর্মাশ্রয়ী হতে বলুন। আরো বলুন ধর্মের মধ্যে মতভেদ না করতে এবং উপদেশ দিন কোরআনের অনুসরণে চলতে। তাদের অপধারণা ও অপপ্রস্তাবকে প্রশ্রয় দিবেনই না।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে। আল্লাহ্ই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহ্ই আমাদেরকে একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট'।

এখানে 'আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস করি' অর্থ আমার বিশ্বাস আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত মহাগ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুকূল। ইহুদী-খৃষ্টানদের মতো অপবিশ্বাস আমার মোটেই নেই। তারা তো আল্লাহ্র কিতাবসমূহের মধ্যে কোনো কোনোটিকে মানে, আবার কোনো কোনোটিকে মানে না। 'আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে' অর্থ আমার দায়িত্ব হচ্ছে তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে দেওয়া, তোমাদের কাছে আল্লাহ্র বিধান (শরিয়ত) পৌঁছে দেওয়া। উল্লেখ্য, নবীগণের ইমান ও আমল সর্বাধিক পরিপূর্ণ। রসুল স. এর জন্য এমতো পরিপূর্ণতার প্রকাশ ঘটেছে 'বিশ্বাস করি' ও 'ন্যায়বিচার করতে' কথা দু'টোর মাধ্যমে। অর্থাৎ আল্লাহ্র কিতাবে বিশ্বাসই হচ্ছে পরিপূর্ণ ইমান এবং ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই প্রকাশ পায় আমলের পূর্ণত্ব। 'আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের' অর্থ তোমাদের

www.eelm.weebly.com

সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত বচসা তো নেই। আমাদের কাজে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই, আবার তোমাদের কাজের মধ্যেও নেই আমাদের জন্য ক্ষতি। আমরা কেবল শুভাকাঙ্খী হিসেবে তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি ইসলামের দিকে। সুতরাং শত্রুতা অবশ্যই পরিহার্য। 'আল্লাহ্ আমাদেরকে একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট' অর্থ আর আমাদের সকলের অবশেষ প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্রই নিকটে। মহাবিচারের দিবসে তিনি আমাদের সকলকেই সমবেত করবেন। তারপর যা করার, তা তিনিই তো করবেন।

তাফসীরে মাযহারী/৪৩২

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়, হিজরতের পূর্বে এবং জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে। পরে এই আয়াতের বিধান রহিত হয়ে যায় এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশা করাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন— হে বিশ্বাসীগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কোরো না'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকবে, এক আল্লাহ্র প্রতি তোমরা বিশ্বাস না করা পর্যন্ত'।

ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি দলে দলে লোকজনকে আল্লাহ্র ধর্মে প্রবেশ করতে দেখবেন' তখন মক্কার লোকেরা তাদের আওতাভূত মুসলমানদেরকে বললো, তোমরা তবে আর এখানে পড়ে থাকবে কেনো? যাও, দলবৃদ্ধি করো। তাদের এমতো কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত। বলা হয়েছে—

সূরা শূরা ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

❑ আল্লাহ্কে স্বীকার করিবার পর যাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে তাহাদের যুক্তি-তর্ক তাহাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার এবং উহারা তাঁহার ক্রোধের পাত্র এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

❑ আল্লাহ্ই অবতীর্ণ করিয়াছেন সত্যসহ কিতাব এবং তূলাদণ্ড। তুমি কী জান— সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন?

❑ যাহারা ইহা বিশ্বাস করে না তাহারাই ইহা ত্বরান্বিত করিতে চাহে। আর যাহারা বিশ্বাসী তাহারা উহাকে ভয় করে এবং জানে উহা সত্য। জানিয়া রাখ, কিয়ামত সম্পর্কে যাহারা বাক-বিতণ্ডা করে তাহারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

তাফসীরে মাযহারী/৪৩৩

❑ আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু; তিনি যাহাকে ইচ্ছা রিয্ক দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আর যারা আল্লাহ্কে মুখে মুখে স্বীকার করে, অথচ আল্লাহ্র ধর্ম সম্পর্কে যারা মুসলমানদের মধ্যে সূত্রপাত করে কুটবিতর্কের, তাদের যুক্তি আল্লাহ্র কাছে মূল্যহীন, তাদের উপরে পতিত হবে আল্লাহ্র ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

কাতাদা সূত্রে আবদুর রাজ্জাক উল্লেখ করেছেন, 'বিতর্ক করে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে। কেননা তারা বলতো, আমাদের কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তোমাদের কিতাবের পূর্বে এবং আমাদের নবীও এসেছেন তোমাদের নবীর আগে। সুতরাং আমরা তোমাদের চেয়ে শ্রেয়। আর এখানকার 'তাদের যুক্তি তর্ক তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার' অর্থ তাদের কুযুক্তি আল্লাহ্র কাছে মূল্যহীন, অগ্রাহ্য।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ কিতাব এবং তুলাদণ্ড। তুমি কী জানো— সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন(১৭)? যারা এটা বিশ্বাস করে না, তারাই এটাকে ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী, তারা এটাকে ভয় করে এবং জানে এটা সত্য। জেনে রাখো, কিয়ামত সম্পর্কে যারা বাক-বিতণ্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে' (১৮)।

এখানে 'আলকিতাবা বিল হাক্বক্বি' অর্থ সত্যসহ কিতাব। অর্থাৎ এই কিতাব সম্পূর্ণতই ন্যায়সঙ্গত, ভ্রান্তি থেকে সতত মুক্ত, সত্যিকারের বিশ্বাস ও নির্ভুল নির্দেশাবলীবিশিষ্ট।

'আল মীযান' অর্থ তুলাদণ্ড। কাতাদা, মুজাহিদ ও মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'মীযান' অর্থ ন্যায়বিচার। তুলাদণ্ড হচ্ছে সুবিচারের প্রতীক। তাই এখানে ন্যায়বিচারকেই বলা হয়েছে তুলাদণ্ড বা পুণ্য-পাপের পরিমাপক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ এখানে সঠিকভাবে ওজন করার আদেশ দিয়েছেন এবং মাপে কম দিতে নিষেধ করেছেন। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে 'মীযান' অর্থ শরিয়ত। কেননা শরিয়তের মাধ্যমেই পাপ-পুণ্য নির্ণয় করা হয় এবং মানুষের পারস্পরিক প্রাপ্য নিশ্চিত করা হয়।

'ওয়ামা ইউদ্‌রীকা লাআ'ল্লাস্ সাআ'তা ক্বরীব্' অর্থ তুমি কী জানো— সম্ভবতঃ কিয়ামত আসন্ন। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি নিশ্চয় জানেন, কিয়ামত খুব বেশী দূরে হয় তো বা নয়। সুতরাং আপনি এই মহাগ্রন্থ কোরআন অনুযায়ী চলুন, সকল বিষয় নিষ্পন্ন করুন শরিয়তের বিধানানুসারে। সর্বাধিক গুরুত্ব দিন ন্যায়পরায়ণতার। কেননা এমনও তো হতে পারে, কিয়ামত হঠাৎ এসেই পড়লো, অথচ আপনার যথাপ্রস্তুতি বিপর্যস্ত। তখন তো পুণ্য সঞ্চয়ের সুযোগ আর থাকবে না। তখন তো দেওয়া হবে কেবল প্রতিফল। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কাসাঈ। এখানকার 'আস্‌সাআ'ত' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ এবং 'ক্বরীব' পুংলিঙ্গ। এ দু'টোর মধ্যে সামঞ্জস্য নেই বলেই কাসাঈ 'ক্বরীব' (আসন্ন) শব্দের কর্তা সুপ্ত

হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ কিয়ামতের আগমন অত্যাসন্ন। কেউ কেউ বলেছেন, 'ক্বরীব' যদিও পুংলিঙ্গবাচক, তবুও এর উদ্দেশ্য আসন্ন, অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন এরকম যারা বলেন, তাদের কাছে ফায়িলের ওজনে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। আবার কারো কারো মতে 'সাআ'ত' এর অন্তর্নিহিত অর্থ 'বাআ'ছ' এবং 'বাআ'ছ' পুংলিঙ্গ। সেকারণেই এখানে 'ক্বরীব'কে পুংলিঙ্গ হিসেবে আনা হয়েছে।

মুকাতিল বলেছেন, রসুল স. একবার কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সেখানে কয়েকজন মূর্তিপূজক বসেছিলো। তারা বললো, বলুন, কিয়ামত কখন হবে? তাদের একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

'ইউমারূন' অর্থ বাক-বিতণ্ডা করে, কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে 'মির্‌ইয়াতুন' এবং 'মুর্‌ইয়াতুন' অর্থ সন্দেহ করা, বাকবিতণ্ডা করা। যেমন বলা হয় 'মার্‌হু মু মার্‌তা' (এতে সন্দেহ কী, দুগ্ধদোহনকালে উষ্ট্রীর স্তন জোরে টিপতে হয়)। তর্ক-বিতর্ক করবার সময় দুই দলই কড়া জবাব প্রত্যাশা করে। সেজন্য এধরনের তর্কবিতর্ককে বলা হয় 'মির্‌ইয়াতুন'।

'লাফী দ্বলালিম্ বায়ীদ' অর্থ ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। কিয়ামত যদিও পরিদৃশ্যমান নয়, তবুও কোরআন, হাদিস এবং সঠিক বিচারবোধ একথাই সাক্ষ্য দেয় যে, কিয়ামত অতিবাস্তব। যথাসময়ে অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচার। কেননা মানুষের পৃথিবীর জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্তির বিষয়টি অতি জরুরী। একারণেই বলা যেতে পারে, কিয়ামত প্রত্যক্ষগোচর ও অনুভূতিগোচর না হওয়া সত্ত্বেও তা সুনিশ্চিত, যেনো তা চোখের সামনেই রয়েছে। এতদসত্ত্বেও যে ব্যক্তি কিয়ামত সম্পর্কে অজ্ঞ এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি মনে করে কিয়ামত তাঁর ক্ষমতাবহির্ভূত, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে, হারিয়ে ফেলেছে প্রকৃত পথ।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্, তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু, তিনি যাকে ইচ্ছা রিজিক দান করেন। তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী'।

'লাত্বীফ' অর্থ অতি দয়ালু। হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। ইকরামা বলেছেন, এর অর্থ— বান্দাদের প্রতি কল্যাণপরবশ। সুদ্দী বলেছেন, করুণাকারী। মুকাতিল বলেছেন, পাপী ও পুণ্যবান সকলের প্রতি দয়াশীল। পাপীদের প্রতি দয়াশীল এই অর্থে যে, পাপের কারণে তিনি তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস করেন না, তওবার সুযোগ দান করেন। কেউ কেউ শব্দটির অর্থ করেছেন— লাভ প্রদানকারী। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ— তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে কল্যাণকে বিস্তৃত করেন এবং দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন, তাদেরকে দান করেন তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং নির্দেশ প্রদান করেন যথাযথ সহনশীলতার, আনুগত্যের।

'তিনি যাকে ইচ্ছা রিজিক দান করেন' অর্থ তিনি তাঁর নির্ভুল ব্যবস্থাপনায় যেমন চান, তেমনই অনুকম্পা বিতরণ করেন। আহার্য দিয়ে থাকেন বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মানুষ ও প্রাণীকুলকে। ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

সৃষ্টির জীবনোপকরণ নির্ধারণার্থে আল্লাহ্ দু'টি পন্থা অবলম্বন করেন— তোমাদেরকে দান করেন পবিত্র আহার এবং সম্পূর্ণ আহার কাউকে একসঙ্গে তুলে দেন না। 'আল ক্বভীয়্যু' অর্থ প্রবল, পরাক্রান্ত, সর্বময় ক্ষমতা প্রকাশকারী। আর 'আ'যীয্' অর্থ এমন মহাপরাক্রমের অধিকারী, যা অতিক্রান্ত করার সাধ্য কারোই নেই।

সূরা শূরা ঃ আয়াত ২০, ২১, ২২, ২৩

❑ যে কেহ আখিরাতের ফসল কামনা করে তাহার জন্য আমি তাহার ফসল বর্ধিত করিয়া দেই এবং যে কেহ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাহাকে উহারই কিছু দেই, আখিরাতে তাহার জন্য কিছুই থাকিবে না।

❑ ইহাদের কি এমন কতকগুলি দেবতা আছে যাহারা ইহাদের জন্য বিধান দিয়াছে এমন দীনের, যাহার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নাই? ফয়সালার ঘোষণা না থাকিলে ইহাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হইয়াই যাইত। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

❑ তুমি যালিমদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখিবে উহাদের কৃতকর্মের জন্য; আর ইহা আপতিত হইবেই উহাদের উপর। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা থাকিবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাই পাইবে। ইহাই তো মহাঅনুগ্রহ।

তাফসীরে মাযহারী/৪৩৬

❑ এই সুসংবাদই আল্লাহ্ দেন তাঁহার বান্দাদিগকে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। বল, 'আমি ইহার বিনিময়ে তোমাদের নিকট হইতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাহি না।' যে উত্তম কাজ করে আমি তাহার জন্য ইহাতে কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যে ব্যক্তি পরকালের সাফল্য চায়, আমি তার সাফল্যসম্ভারকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দেই এবং যে পৃথিবীর সফলতা চায়, আমি ইচ্ছা করলে তার কিছু কিছু তাকে দান করি, কিন্তু তার পরকালের ভাণ্ডার করে রাখি শূন্য।

'হারছা' অর্থ জমিতে বীজবপন করা। ওই বীজ থেকে উৎপন্ন ফসলকেও বলে 'হারছা'। 'কামুস' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এর অর্থ উপার্জন, মালপত্র সঞ্চয়, চাষাবাদ। কিন্তু এখানে শব্দটির অর্থ হবে— পরকালের পুণ্য, সফলতা। ওই পুণ্য ও সফলতাকে এখানে তুলনা করা হয়েছে ফসলের সঙ্গে। কেননা তা হবে, পৃথিবীর কর্মকাণ্ডের ফল বা ফসল। এজন্যই হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। এরকমও বলা যেতে পারে যে, ফসল অর্থ এখানে উপার্জন, যা পৃথিবীতেই অর্জন করতে হয় পুণ্যপ্রচেষ্টার দ্বারা। 'আমি তার ফসল বর্ধিত করে দেই' অর্থ আমি তার উপার্জনে বা চাষাবাদে উন্নতি দান করি। দান করি দশগুণ, সাতশ গুণ অথবা এর চেয়েও বেশী। যেমন একটি শস্যদানা থেকে যে চারা উৎপন্ন হয়, সে চারা থেকে পাওয়া যায়

www.eelm.weebly.com

বহুসংখ্যক শস্যদানা। যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমি তাকে তারই কিছু দেই। পৃথিবীকামীদের কাম্যবস্তুও আমিই দেই, তবে পুরোপুরি দেই না, দেই যৎকিঞ্চিত।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন— ফলাফল প্রাপ্তি ঘটে উদ্দেশ্যানুসারে। মানুষ যা নিয়ত করে, তা-ই পায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পরিতোষার্জনার্থে দেশত্যাগ (হিজরত) করে, তার দেশত্যাগ হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের জন্যই। আর যে দেশত্যাগী হয় কোনো রমণীকে বিবাহ করার জন্য অথবা অন্য কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে, তার দেশত্যাগ হয় তার অপউদ্দেশ্য পরিপূরণার্থেই।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতদেরকে শুভসংবাদ দাও সমুজ্জ্বল হওয়ার, উন্নত হওয়ার, বিজয়ী হওয়ার এবং পৃথিবীতে কর্তৃত্ব লাভ করার। যে ব্যক্তি দুনিয়ার লাভের জন্য আখেরাতের কাজ করবে, আখেরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'এদের কি এমন কতকগুলো দেবতা আছে, যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেতো'। এখানে 'এদের কি এমন কতকগুলো দেবতা আছে' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। 'লাহুম শুরাকাউ' অর্থ কতকগুলো শরীক বা দেবতা। হজরত ইবনে আব্বাস

বলেছেন, এখানকার 'এমন দ্বীনের বিধান দিয়েছে' অর্থ শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের, অংশীবাদিত্বের, আখেরাতের অস্বীকৃতির ও কেবল পার্থিব সাফল্যের। আর এখানকার 'ফয়সালার ঘোষণা' অর্থ মহাবিচার দিবসের মীমাংসার ঘটনা। অর্থাৎ মহাবিচার দিবসে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে চূড়ান্তভাবে শায়েস্তা করা হবে— এই বিষয়টি যদি আল্লাহ্ পূর্বে নির্ধারণ করে না রাখতেন, তবে তাদের অংশীবাদিতার শাস্তি দিতেন তাৎক্ষণিকভাবে, এই পৃথিবীতেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় জালেমদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি'। এখানে 'তাদের' সর্বনাম ব্যবহার না করে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে 'জালেমদের'। এরকম করা হয়েছে একথা বুঝানোর জন্য যে, তাদেরকে আখেরাতে অনন্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে তাদের 'জুলুম' (স্বেচ্ছাচারিতা, সীমালংঘন, অংশীবাদিতা) এর জন্যই। অন্যান্য ছোট-খাটো পাপের কারণে নয়।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'তুমি জালেমদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে তাদের কৃতকর্মের জন্য, আর এটা আপতিত হবেই তাদের উপর'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! মহাবিচারের দিবসে আপনি দেখবেন, অংশীবাদিতার মহাপাপের কারণে ওই সকল সীমালংঘনকারী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, তৎসত্ত্বেও তাদের কৃত অপরাধের শাস্তি সেদিন তাদেরকে ভোগ করতেই হবে, ভীতসন্ত্রস্ত হলেও কোনো লাভ হবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তারা যা কিছু চাইবে, তাদের প্রতিপালকের নিকট তা-ই পাবে। এটাই তো মহাঅনুগ্রহ'। এখানে 'রওদ্বতিল জান্নাত' অর্থ জান্নাতাভ্যন্তরস্থিত সর্বাধিক সুন্দর স্থান। আর 'আলফাদ্বলুল কাবীর' অর্থ মহাঅনুগ্রহ। অর্থাৎ ওই মহাঅনুগ্রহ জান্নাতের তুলনায় পৃথিবী তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এই সুসংবাদই আল্লাহ্ দেন তাঁর বান্দাদেরকে যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনুন, এই মহাঅনুগ্রহের শুভসমাচারই আল্লাহ্ দেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীকে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়ের সৌহার্দ ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাই না'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি আপনার স্বজনদের মধ্যে যারা মুশরিক, তাদেরকে বলুন! হে আমার নিকটজনেরা! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে পথ প্রদর্শন করে চলেছি কেবল তাঁরই পরিতোষণার্থে। তোমাদের কাছে এর জন্য আমি বিত্ত-বৈভব-সম্মান-নেতৃত্ব কোনোকিছুই চাই না। চাই শুধু এতোটুকু যে, তোমরা আমার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখো।

তাউসের উক্তি উল্লেখ করে বোখারী লিখেছেন, একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলো, আত্মীয়ের সৌহার্দ অর্থ কী? সাঈদ ইবনে যোবায়ের বললেন, 'আত্মীয়ের সৌহার্দ' অর্থ রসুল স. এর জ্ঞাতিকুটুম্ব। হজরত ইবনে আব্বাস

তাঁর কথা শুনে বললেন, প্রত্যুত্তর করতে তড়ি ঘড়ি করলে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, কুরাইশদের সকল গোত্রই ছিলো রসুল স. এর আত্মীয়। সুতরাং তাদের সকলকে লক্ষ্য করেই তাঁকে আল্লাহ্ একথা বলতে বলেছিলেন যে, আমি যে ধর্মপ্রচার করছি, তার কোনো বিনিময় আমি তোমাদের কাছ থেকে চাই না। চাই শুধু এতোটুকু যে, তোমরা আমার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন কোরো না।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে শা'বী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, এখানকার 'আত্মীয়ের সৌহার্দ ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাই না' কথাটির অর্থ তোমরা আমার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্মান রক্ষা করো, অক্ষুণ্ন রাখো আপনজনোচিত সুসম্পর্ক। মুজাহিদ, ইকরামা, সুদ্দী, মুকাতিল ও জুহাকও এরকম বলেছেন। ইকরামা অর্থ করেছেন— আমি তোমাদের কাছ থেকে সত্যপ্রচারের জন্য কোনো প্রতিদান চাই না কেবল এইটুকু ছাড়া যে, আমার ও তোমাদের মধ্যে যে আত্মীয়তা রয়েছে তা বজায় রাখো।

বাগবী লিখেছেন, কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াত রহিত হয়ে গিয়েছে। ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে কুরায়েশরা রসুল স.কে নানাভাবে দুঃখ-যাতনা দিতো। তখন এই আয়াতে আল্লাহ্ রসুল স.কে 'আত্মীয়তা বজায় রাখো' এই নির্দেশটি কুরায়েশদের কাছে প্রচার করতে বলেছিলেন। পরে যখন তিনি স. হিজরত করলেন এবং মদীনার আনসারগণ রসুল স.কে হৃদয়াসনে চিরদিনের জন্য অধিষ্ঠিত করলেন, তখন এই আয়াতকে আল্লাহ্তায়ালা রহিত করলেন এই আয়াত দিয়ে 'আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো জমা রয়েছে আল্লাহ্র নিকট'। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী সকল নবীকেই আল্লাহ্পাক এরকম কথা জনসমক্ষে প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। জুহাক ইবনে মুজাহিদ এবং হোসাইন ইবনে ফজলও এই আয়াতকে রহিত আয়াত বলে মনে করেন। বাগবী লিখেছেন, অভিমতটি গ্রহণযোগ্য। কেননা রসুল স.কে ভালোবাসা, তাঁকে প্রাণাধিক প্রিয় মনে করাই পূর্ণ ইমান। প্রত্যেক বিশ্বাসীকেই এরকম মনে করতে হবে। মদীনাবাসী সাহাবীগণ সেরকমই মনে করতেন।

আমি বলি, রসুল স. এর বংশধর ও সহচরবৃন্দকে ভালোবাসা ইসলামের অপরিহার্য একটি কর্তব্য, যা কখনো রহিত হতে পারে না। যেমন হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও প্রিয়বস্তুসমূহ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হই। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিনটি বিষয় এমন, যেগুলোতে ইমানের আস্বাদ অনুভব করা যায়। যেমন— ১. আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসুলকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসা ২. কাউকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভালোবাসা ৩. ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় সত্যপ্রত্যাখ্যানে ফিরে যাওয়ার কল্পনাকে আগুনে পতিত হওয়া অপেক্ষা অধিক অপছন্দ মনে হওয়া। বোখারী, মুসলিম। উল্লেখ্য, প্রতিদান চাওয়ার বিষয়টি অবশ্যই রহিত।

আলোচ্য আয়াতাংশের হজরত ইবনে আব্বাস কৃত ব্যাখ্যাকে মুজাহিদ উল্লেখ করেছেন এভাবে— তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাসো এবং আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করো। হাসানের বর্ণনাও অনুরূপ। তিনি বলেছেন, 'কুরবা' (সৌহার্দ) অর্থ এখানে আল্লাহ্র নৈকট্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা আনুগত্য ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন ও প্রিয়ভাজন হও। হাসান বলেছেন 'কুরবা' থেকে মর্মার্থ হবে আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, বক্তব্যটির উদ্দেশ্য এরকম— তোমাদের কাছে আমি এতোটুকু আশা রাখি যে, তোমরা আমার আপনজন ও সন্তানদেরকে ভালোবাসো এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে আমাকে সম্মান করো। সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং ওমর ইবনে শোয়াইব এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আপনার আপনজন কারা? তিনি স. বললেন, আলী, ফাতেমা ও তাদের পুত্রদ্বয়।

পথভ্রষ্ট শিয়ারা এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চায় যে, আগের তিন খলিফার খেলাফত সঠিক ছিলো না। প্রকৃত খলিফা ছিলেন কেবল হজরত আলী। তারা আরো বলে, এই আয়াতের মাধ্যমে হজরত আলীকে ভালোবাসা অত্যাবশ্যক প্রমাণিত হয়েছে। অন্যান্যদেরকে ভালোবাসা অত্যাবশ্যক নয়। আর ভালোবাসার অপরিহার্য দাবি হচ্ছে, প্রিয়তমজনের আনুগত্য করা। একারণেই হজরত আলীর খেলাফত ছাড়া অন্য কারো খেলাফতের প্রতি অনুগত থাকা সমীচীন নয়। কিন্তু তাদের এমতো ধারণা অবিশুদ্ধ। কেননা— ১. বর্ণিত হাদিসের সূত্র পরম্পরাভূত হাসান আশারী একজন গোঁড়া শিয়া। তদুপরি এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়, যখন হজরত আলী ছিলেন কুমার, সুতরাং তিনি তখন কারো স্বামী বা পিতা ছিলেন না। ২. একথা ঠিক যে, হজরত আলী, হজরত ফাতেমা ও তাঁদের দুই পুত্রকে ভালোবাসা ওয়াজিব। কিন্তু এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, অন্যদের প্রতি ভালোবাসা ওয়াজিব হতে পারে না। হজরত আনাস থেকে ইবনে আদী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আবু বকর ও ওমরকে ভালোবাসা ইমান এবং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা কুফর। তিনি স. আরো বলেছেন, আবু বকর ও ওমরকে ভালোবাসাই বিশ্বাসের চিহ্ন এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা সত্যপ্রত্যাখ্যানের নিদর্শন। আর আনসারদেরকে মহব্বত করাও ইমানের লক্ষণ এবং তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া কুফরীর আলামত। আর যারা আমার সাহাবীগণকে গালি দেয়, তাদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত। তাদের ব্যাপারে যে আমাকে সম্মান করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার সম্মান রক্ষা করবো। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আসাকের।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. বলেছেন, আনসারদের প্রতি ভালোবাসা বিশ্বাসী হওয়ার নিদর্শন এবং তাদেরকে ঘৃণা করা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হওয়ার লক্ষণ। হজরত আনাস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন নাসাঈ। তিনি স. আরো বলেছেন, কুরায়েশ

সম্প্রদায়কে মহব্বত করার অর্থ ইমান এবং তাদের সঙ্গে দুশমনী রাখার অর্থ কুফর। আরবীয়দেরকে ভালোবাসার অর্থ বিশ্বাসী হওয়া এবং তাদেরকে শত্রু মনে করা অবিশ্বাসী হওয়া। যে আরববাসীকে ভালোবাসে, সে আমাকে ভালোবাসে এবং তাদের সঙ্গে যারা শত্রুতা করে, তারা আমার সঙ্গে শত্রুতা করে। হজরত আনাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী।

যার ভালোবাসা ওয়াজিব, তিনি ছাড়া অন্য কেউ খলিফা হতে পারবেন না— শিয়াদের এই অভিমতটিও ভুল। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেন, এখানে 'কুরবা' (নিকটজন) বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর ওই সকল আপনজনকে, জাকাত গ্রহণ যাদের জন্য ছিলো নিষিদ্ধ। অর্থাৎ তাঁরা হচ্ছেন বনী হাশেম ও বনী আবদুল মুত্তালিব। এই দুই গোত্রের লোকেরা ইসলাম পূর্ব সময়ে যেমন একাত্ম ছিলেন, তেমনি একাত্ম ছিলেন ইসলাম আগমনের পরেও।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে রসুল স. এর আত্মীয় অর্থ হজরত আলী, হজরত আকিল, হজরত জাফর ও হজরত আব্বাসের বংশধরগণ। তাঁদের সম্পর্কেই রসুল স. বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারী জিনিষ রেখে যাচ্ছি। একটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব, যার মধ্যে রয়েছে পথনির্দেশনা ও জ্যোতি। অপরটি হচ্ছে— আমার পরিবার-পরিজন। তোমরা এ দু'টোকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধোরো। বাগবী লিখেছেন, হজরত জায়েদ ইবনে আরকামকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, রসুল স. এর পরিবার-পরিজন কারা? তিনি বললেন, আলী, আকীল ও আব্বাসের সন্তানগণ।

একটি সংশয় ঃ সত্যধর্মের প্রচার ছিলো রসুল স. এর জন্য ফরজ। আর কারো কাছে প্রতিদান চাওয়া তাঁর জন্য বৈধও ছিলো না। তাহলে তিনি এরকম বলতে পারেন কীভাবে যে, আমি এর বিনিময়ে চাই কেবল আত্মীয়তার সৌহার্দ। তাছাড়া ইতোপূর্বের আয়াতেও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দেই, আখেরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না।

সংশয়ভঞ্জন ঃ এখানে আত্মীয়তার সৌহার্দকে ধর্মপ্রচারকর্মের বিনিময় সাব্যস্ত করা হয়েছে রূপক অর্থে। প্রকৃত অর্থে নয়। সৌহার্দ, সম্প্রীতি 'প্রতিদান' এর অনুরূপ বলেই এখানে আত্মীয়তার সৌহার্দকে প্রতিদান বলা হয়েছে। কেননা বাস্তব ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক বা প্রতিদান বলে তাকেই যার দ্বারা প্রতিদানপ্রাপকেরা উপকৃত হতে পারে। কিন্তু এখানে উপকৃত হওয়ার বিষয়টিতে রসুল স. এর তো কোনো উপকার নেই। উপকার রয়েছে তাদের, যারা তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত আত্মীয়তার সম্মান করবে, তারা হয়ে যেতে পারবে আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন ও পূর্ণ ইমানের অধিকারী। ফলে লাভবান হবে তারাই। সেকারণেই আমি বলি, আলোচ্য বক্তব্যের মর্মার্থ হবে— আমি কেবল তোমাদের কাছে এতোটুকুই প্রত্যাশা করি যে, তোমরা আমার পরিবার পরিজন, আপনজন ও সন্তান-সন্ততিকে ভালোবাসো।

রসুল স. সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। তাই তাঁর পক্ষে ধর্মপ্রচারের মহান দায়িত্ব পালন করতে থাকবে বিদ্বজ্জন— তাফসীরবেত্তা, হাদিসবেত্তা, ফকীহ্ ও আধ্যাত্মিক সাধকগণ। তাঁদের উপরেও এ

দায়িত্বটি রয়েছে যে, তাঁরা রসুল স. এর পরিবার পরিজনকে ভালোবাসতে বলবেন। বলবেন, আমরাও ধর্মপ্রচারের জন্য কোনো বিনিময় চাই না। চাই এতোটুকু যে, সকলে যেনো রসুল স. এর পরিবার পরিজনকে ভালোবাসে। তাছাড়া বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক ছিলেন হজরত আলী। তাঁর বংশোদ্ভূত ইমামগণও ছিলেন আল্লাহ্‌র বিশেষ নৈকট্যভাজন। রসুল স. স্বয়ং বলেছেন, আমি হচ্ছি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার তোরণ। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বাযযার ও তিবরানী। এই হাদিসের সমর্থনে আরো হাদিস রয়েছে যেগুলো বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর ও হজরত আলী। হাকেমও এই হাদিসকে নির্ভুল বলে সাব্যস্ত করেছেন। একারণেই দেখা যায়, পরবর্তী আউলিয়াগণের অনেকেরই আধ্যাত্মিক সূত্রপরম্পরা আহলে বাইতের ইমামগণের সঙ্গে সংযুক্ত। হজরত আলী ও হজরত ফাতেমার বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন অসংখ্য আউলিয়া দরবেশ। যেমন— গাউসুস্ সক্বলাইন আবদুল কাদের জিলানী, খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি, খাজা বাকী বিল্লাহ্, শায়েখ আবুল হাসান শাজালী প্রমুখ। একারণেই হাদিসে উল্লেখিত দু'টি ভারী জিনিসের একটি হচ্ছে এই আহলে বাইত। অর্থাৎ রসুল স. এর বংশধর বা পরিবার পরিজন। অধিকাংশ ব্যাখ্যাতাগণ তাই লিখেছেন, এখানে 'আত্মীয়তার সৌহার্দ ব্যতীত' কথাটি হচ্ছে বিকর্তিত ইসতেস্না। অর্থাৎ এখানে 'ইল্লা' অর্থ 'লাকিন্না' এবং 'প্রতিদান' উল্লেখ করা হয়েছে এখানে বাস্তব অর্থে। ফলে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আত্মীয়বর্গ! আমি তোমাদের পথপ্রদর্শনার্থে যে শ্রম দান করি, তার বিনিময় হিসেবে চাই কেবল এতোটুকুই যে, তোমরা আমার সঙ্গে রক্ষা করে চলো আত্মীয়সুলভ সম্প্রীতি। হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম কর্তৃক হাদিসটিতেও এই বক্তব্যটি

www.eelm.weebly.com

প্রতিফলিত হয়েছে। রসুল স. এর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর পরিবারের প্রতি সোহার্দশীল হলে তার উত্তম বিনিময় প্রাপ্তি সমর্থিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতেই।

বলা হয়েছে— 'যে উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য এতে কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী'। এখানে 'উত্তম কাজ' (হাসানা) অর্থ রসুল স. এর পরিবার-পরিজন ও বংশধরগণকে ভালোবাসা। এরকম অর্থ না করলে পূর্বাপর বাক্যের মধ্যে আর সামঞ্জস্য থাকে না। অবশ্য 'হাসান' বলতে সকল প্রকার সৎকর্মকেই বোঝায়। কিন্তু এখানে শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে রসুল স. এর নিকটজনদের ভালোবাসা বোঝাতে। এই ভালোবাসার কল্যাণ আল্লাহ্তায়ালা বর্ধিত করতেই থাকেন। সেকারণেই দেখা যায়, রসুল স. এর রূহানী পরিবারের সদস্য তরিকতের পীর মাশায়েখগণের ভালোবাসার ফলস্বরূপ রসুল স. এর ভালোবাসাও বৃদ্ধি পায়। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় আল্লাহ্র মহব্বত, যা মানব জীবন লাভের মূল উদ্দেশ্য। সুফীসাধকগণ তাই বলেন, ফানার পূর্ণত্ব লাভ হয় এভাবেঃ ফানা ফিশ শায়েখ— ফানা ফিররসুল— ফানা ফিল্লাহ্। ফানা অর্থ এমন আত্মবিলুপ্তি, যাতে বন্ধু-সুহৃদ-প্রিয়জন, এমন কী নিজের অস্তিত্বের স্মরণও হয়ে যায় অন্তর্হিত। জেগে থাকে কেবল এক আল্লাহর আনুরূপ্যহীন অস্তিত্বের সতত সম্মোহন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীক সম্পর্কে। বোখারী লিখেছেন, হজরত আবু বকর বলেছেন, তোমরা আহলে বাইতের ব্যাপারে রসুল স. এর সম্মান রক্ষা কোরো।

'ইন্নাল্লহা গফুর' অর্থ নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল' অর্থাৎ যে ব্যক্তি রসুল স.কে ও তাঁর একান্ত প্রিয়জন আউলিয়া কেরামকে ভালোবাসে তার প্রতি তিনি সবিশেষ ক্ষমাপরবশ। 'লিইয়াগ্ফিরা লাকাল্লহু মা তাক্বদ্দামু মিন জাম্বিকা ওয়ামা তাআখ্খর' (যাতে আল্লাহ্ আপনার অতীত-ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন)— এই আয়াতের উদ্দেশ্যও সম্ভবতঃ এরকমই। এখানে 'মা তাআখ্খার' এর উদ্দেশ্য— যারা রসুল স.কে ভালোবাসে, তাদের এবং তাদের মিত্রদের গোনাহ্। 'শাকুর' অর্থ— কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী এখানে মর্মার্থ হবে— আল্লাহ্পাক যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে জানেন অনুগত ও প্রেমিকদের।

সূরা শূরা ঃ আয়াত ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

❑ উহারা কি বলে যে, সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে, যদি তাহাই হইত তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমার হৃদয় মোহর করিয়া দিতেন। আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যাহা আছে সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত।

www.eelm.weebly.com

❑ তিনিই তাঁহার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন ও পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যাহা কর তিনি তাহা জানেন।

❑ তিনি মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাহাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বর্ধিত করেন; কাফিরদের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

❑ আল্লাহ্ তাঁহার সকল বান্দাকে জীবনোপকরণের প্রাচুর্য দিলে তাহারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করিত; কিন্তু তিনি তাঁহার ইচ্ছামত পরিমাণেই নাযিল করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে সম্যক জানেন ও দেখেন।

❑ উহারা যখন হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁহার করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার্হ।

❑ তাঁহার অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়াইয়া দিয়াছেন সেইগুলি। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই উহাদিগকে সমবেত করিতে সক্ষম।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিকেরা আপনাকে তো যথামর্যাদা দিলোই না, উল্টো বরং এই বলতে শুরু করলো যে, আপনি অসত্যভাষী। তাদের মতে আপনার নবুয়ত ও আপনার উপরে প্রত্যাদেশিত কোরআন সত্য নয়। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। যদি সেরকম হতো, তবে তাদের বলার অপেক্ষা না রেখে আল্লাহ্তায়ালাই সত্যের অনুপ্রবেশ থেকে আপনার হৃদয়কে রুদ্ধ করে দিতেন। কেননা মিথ্যাকে বিলুপ্ত করা এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত করাই আল্লাহ্র কাজ। কার অন্তরে কী আছে, তা তিনি ভালো করেই জানেন। সুতরাং একথাও আমার অবগতির আওতাভূত যে, আপনি আমার সত্য রসুল এবং আপনার উপরে অবতরণরত প্রত্যাদেশাবলীও সত্য। আর মিথ্যা হচ্ছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর দল, যারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্য সচেষ্ট।

এখানে 'ফা ইঁয়্যাশা আল্লাহু ইয়াখতিমু আ'লা কুলবিকা' অর্থ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয় মোহর করে দিতেন। অর্থাৎ মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর মতো সুমহান ব্যক্তিত্বের পক্ষে মিথ্যাচারী হওয়া অসম্ভব। মিথ্যার আশ্রয় তো গ্রহণ করতে পারে কেবল সে-ই যার হৃদয়ে আল্লাহ্ বিভ্রান্তির মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। যিনি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবং আল্লাহ্র পরিচয়লাভে ধন্য, তিনি কখনোই মিথ্যাশ্রয়ী হতে পারেন না।

মুজাহিদ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনার হৃদয়ে লাগিয়ে দিবেন সহিষ্ণুতার মোহর, ফলে মুশরিকের দল কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখ কষ্টে আপনি বিচলিত হবেন না এবং তাদের মিথ্যা দুর্ণাম শুনেও আপনার কোনো দুঃখবোধ থাকবে না। কাতাদা অর্থ করেছেন এরকম— আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে আপনার অন্তরে স্থাপন করতেন বিস্মৃতির মোহর। তাহলে কোরআন আপনার স্মৃতি থেকে মুছে যেতো। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্র বাণী নয় এমন বাণীকে যদি আমি আল্লাহ্র বাণী বলে প্রচার করতাম, তবে তো আল্লাহ্ই আমার হৃদয়ে বসিয়ে দিতেন অনড় বিস্মৃতির মোহর। ফলে কোনোকিছু আমি আর মনে রাখতে পারতাম না।

'আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন' এই বাক্যটি অবশ্য পৃথক। অর্থাৎ এর দ্বারা মুশরিক জনগোষ্ঠী কর্তৃক প্রদত্ত মিথ্যা অপবাদকে অস্বীকার করা হয়েছে প্রামাণ্য দৃষ্টিতে। একথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মিথ্যার বিলোপন ও সত্যের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে আল্লাহ্র বিধান। তাই তো তিনি তাঁর রসুল ও কোরআনকে প্রতিষ্ঠিত করবেনই। যেহেতু তা সত্য। নিশ্চিহ্ন করে দিবেন বিরুদ্ধ পক্ষীয়দেরকে। এটা হচ্ছে আল্লাহ্র অঙ্গীকার। আবার তাঁর অঙ্গীকার অবশ্য বাস্তবায়নব্য।

'ইন্নাহু আ'লীমুম্ বিজাতিস্ সুদূর' অর্থ অন্তরে যা আছে, সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে দুষ্প্রাপ্য সূত্রসহযোগে বাগবী ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, 'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়তার সৌহার্দ ছাড়া অন্য কোনো প্রতিদান চাই না'— এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন কিছুসংখ্যক লোকের মনে এই শয়তানী ধারণার উদয় হলো যে, রসুল স. তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে আমাদের নেতা বানিয়ে যেতে চান। তৎক্ষণাৎ হজরত জিবরাইল অবতীর্ণ হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আপনার সম্পর্কে কিছু লোকের মনে এই অপধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি তাই তাদেরকে সতর্ক করণার্থে অবতীর্ণ করেছেন 'অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত'। রসুল স. তখন জনসমক্ষে সদ্য অবতীর্ণ এই বাণী পাঠ করে শোনালেন। তখন অন্তরে অপধারণা লালনকারীরা তওবা করে এবং বলে, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি সত্যিই আল্লাহ্র রসুল। তখন অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত (২৫)। বলা হয়— 'তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন ও পাপমোচন করেন এবং তোমরা যা করো, তিনি তা জানেন'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন' অর্থ তিনি তওবা কবুল করেন তাঁর প্রতি অনুগতজনদের, প্রিয়ভাজনদের। যেমন আরববাসীরা বলেন 'ক্বিলতু মিনহুশ্ শাইআ' (তার কাছ থেকে আমি অমুক বস্তু নিয়ে নিয়েছি) 'ক্বিলতু আ'নহুশ্ শাইআ' (আমি বস্তুকে তার কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছি)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটির অর্থ— আল্লাহ্ তওবা কবুল করেন তাঁর ওই সকল বান্দার, যারা পাপ পরিত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্প করে এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহ্র অনুগত হয়ে যায়। হজরত সুহাইল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, তওবা অর্থ মন্দকে পরিত্যাগ করে ভালোর দিকে প্রত্যাবর্তন। বায়যাবী লিখেছেন হজরত আলী বলেছেন, পাপ থেকে তওবা করার অর্থ

www.eelm.weebly.com

ছয়টি— ১. ফরজ নির্দেশ লংঘিত হওয়ার কারণে অনুশোচনা ২. বাদ পড়ে যাওয়া ফরজ পুনরায় সম্পন্ন করা ৩. অন্যের অধিকার ও ন্যায়-দাবিকে প্রত্যর্পণ করা ৪. ইতোপূর্বে প্রবৃত্তি যেভাবে পাপলিপ্ত হয়েছিলো, সেভাবে প্রবৃত্তিকে পুণ্যমগ্ন করা ৫. পূর্বে যেভাবে পাপকে আস্বাদন করা হয়েছিলো, সেভাবে
বর্তমানে ও ভবিষ্যতে প্রবৃত্তিকে আনুগত্যের তিক্ততা অনুভব করানো ৬. আগের হাসির বদলে প্রতিষ্ঠিত করা রোদন। শরহে সুন্নাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, অনুশোচনাই তওবা এবং তওবাকারী নিষ্পাপ হয়ে যায়।

একটি উপযোগ ঃ বাগবী লিখেছেন, হারেছ ইবনে সুয়াইদ বলেছেন, আমি একবার হজরত আবদুল্লাহ্কে তাঁর অসুস্থ অবস্থায় দেখতে গেলাম। তিনি বললেন, এক লোক জনমানবহীন বিশাল মরুপ্রান্তরে উট চরাচ্ছিলো। উটের পিঠে ছিলো তার পানাহারের সামগ্রী। এক সময় শ্রান্তি নিবারণের জন্য সে একস্থানে নেমে পড়লো। মাটিতে শুয়ে পড়তেই অল্পক্ষণের মধ্যে ঢলে পড়লো গভীর নিদ্রায়। ঘুম ভাঙতেই দেখলো, উটটি আর নেই। সে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তার হারানো উট খুঁজতে শুরু করলো। ঘোরাফিরা করতে করতে হয়ে পড়লো পিপাসার্ত। উপায়ন্তর না দেখে ঠিক করলো, যেখান থেকে তার উটটি হারিয়েছে, সেখানেই ফিরে যাবে। অপেক্ষা করবে মৃত্যু পর্যন্ত। তাই করলো সে। আগের স্থানে ফিরে গিয়ে বসে পড়লো মাটিতে। আবার ক্ষুধায় পিপাসায় এবং শ্রান্তিতে দুচোখ বন্ধ হয়ে এলো তার। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলতেই দেখতে পেলো উটটি শুয়ে রয়েছে তার একেবারে কাছে। আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো তার অন্তরাত্মা। শোনো, এরকম লোক যেমন তার হারানো উটটি পেয়ে খুশী হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী খুশী হন আল্লাহ্, যখন তার কোনো বান্দা ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তওবা করে।

হজরত আনাস ইবনে মালেক থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জনশূন্য মরুভূমিতে গিয়ে হাজির হও, এমতাবস্থায় যদি তোমার পানাহার সামগ্রীবাহী উটটি হঠাৎ হারিয়ে যায় এবং অনেক খোঁজাখুঁজি করেও উটটি না পেয়ে যদি হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় সেখানকার কোনো বৃক্ষচ্ছায়ায় শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণতে গুণতে ঘুমিয়ে পড়ো। তারপর সহসা চোখ মেলতেই যদি দেখো উটটি সশরীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তোমার সামনে। ওই খুশীতে আত্মহারা হয়ে যদি বলতে থাকো, হে আল্লাহ্! তুমি সত্যি সত্যিই আমার বান্দা এবং আমি তোমার প্রভুপালক। তোমাদের এমতাবস্থার খুশীর চেয়ে অনেক বেশী খুশী হন আল্লাহ্ তাঁর পাপী বান্দা পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বান্দা যখন তার গোনাহ্ স্বীকার করে এবং তওবা করে, তখন আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন। তিনি স. আরো বলেছেন, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বের সকল তওবাকারীর তওবা আল্লাহ্ কবুল করে নেন। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে মাজা ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তি নিষ্পাপ ব্যক্তির মতো।

'ওয়া ইয়া'ফূ আনিস্ সাইয়্যিআত' অর্থ এবং পাপ মোচন করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার ছোট বড় সব পাপ মাফ করে দেন— সে তওবা করুক, অথবা না করুক।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এমন এক লোক ছিলো, যে জীবনে কখনো ভালো কাজ করেনি। মৃত্যুকালে সে তার আপনজনদেরকে ডেকে বললো, আমি মরে গেলে তোমরা আমার মরদেহ পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ো। আর দেহভস্মগুলোর অর্ধেক ফেলে

দিয়ো সমুদ্রে এবং বাকী অর্ধেক ছড়িয়ে দিয়ো ডাঙ্গায়। কেননা আমার ভয় হচ্ছে, আল্লাহ্ আমাকে এমন শাস্তি দিবেন, যে শাস্তি তিনি আর কাউকে দেননি। এর পরক্ষণে তার মৃত্যু হলো। তার আপনজনেরাও তার অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করলো। তারপর আল্লাহ্ দেহভস্মগুলোকে একত্রিত করে তাকে পুনর্জীবিত করলেন। শুধালেন, তুমি তোমার আপনজনদেরকে এমন করতে বলেছিলে কেনো? সে বললো, হে আমার প্রভুপালক! আমি তো এমন করতে বলেছিলাম কেবল তোমার ভয়ে। একথা শুনে আল্লাহ্ তাকে মার্জনা করলেন।

হজরত আবু দারদা থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার তাঁর মিম্বরে আরোহণ করলেন। বললেন, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায়, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে? তিনি স. বললেন, তবুও। আমি পুনরায় একই প্রশ্ন করলাম এবং তিনিও জবাব দিলেন একইভাবে। পুনরায় তিনি স. ঘোষণা করলেন, ভালো করে শুনে নাও, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সম্মুখীন হতে ভয় পায়, তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে দু'টি জান্নাত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! সে যদি হয় ব্যভিচারী ও অপহারক, তবুও কী? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, তবুও। আবু দারদার নাক ধূলিধুসরিত হলেও।

www.eelm.weebly.com

'ওয়া ইয়া'লামু মা তাফআ'লূন' অর্থ এবং তোমরা যা করো, তিনি তা জানেন। উল্লেখ্য, একথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা তওবা করতে আগ্রহী নও, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'তিনি মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণগণদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ধিত করেন'।

এখানে 'ওয়া ইয়াস্তাজীবুল্ লাজীনা' কথাটির 'আল্লাজীনা' এর 'লাম' অক্ষরটি রয়েছে উহ্য। শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'লিল্লাজীনা'। যেমন 'লাম' উহ্য রয়েছে 'ওয়া ইজা ক্বলূহুম' কথাটিতে। সেখানেও শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'ওয়া ইজা ক্বলূ লাহুম'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সাড়া দেন' অর্থ প্রতিদান প্রদান করেন। বায়যাবী লিখেছেন, এই প্রতিদান হচ্ছে অনুগত থাকার প্রতিদান। কেননা আনুগত্যমণ্ডিত হওয়াও প্রার্থনা করা বা আহবান করার অনুরূপ। এক হাদিসে এসেছে, শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা হচ্ছে 'আলহামদুলিল্লাহ্'। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা। ইবনে হাববান বলেছেন, একবার তাপসপ্রবর ইব্রাহিম ইবনে আদহামকে এক লোক জিজ্ঞেস করলো, আমরা দোয়া করি, কিন্তু আমাদের দোয়া কবুল হয় না। কারণ কী? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে অনুগত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। অথচ তোমরা অননুগত। এটাই তোমাদের দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ।

'তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ধিত করেন' অর্থ আল্লাহ্ তাদের ভ্রাতা-বন্ধুদের জন্য তাদের সুপারিশ গ্রহণ করেন। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। বলেছেন আবু সালেহ।

এরপর বলা হয়েছে— 'কাফেরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অবস্থা এর বিপরীত। অর্থাৎ বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ্ যেমন অত্যধিক অনুকম্পামণ্ডিত করবেন, তেমনি অত্যধিক শাস্তিদান করবেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাঁর সকল বান্দাকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করতো; কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছামতো পরিমাণেই নাযিল করে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন'।

বাগবী লিখেছেন, হজরত খাব্বাব ইবনে আরত বলেছেন, এই আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের কয়েকজনকে লক্ষ্য করে। আমরা একবার মনে মনে ভাবলাম, বনী কুরায়জা, বনী নাজির ও বনী কাইনুকা গোত্রভূত ইহুদীরা কতো স্বচ্ছল, আমাদের অবস্থাও যদি সেরকম স্বচ্ছল হতো। তখনই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

এখানে 'বিপর্যয় সৃষ্টি করতো' অর্থ সম্পদশালী হলে তারা অহংকারে মেতে থাকতো। কিংবা অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতো অন্যের উপরে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'বিপর্যয় সৃষ্টি করতো' অর্থ নির্মাণ করতো একের পর এক প্রাসাদ, সংগ্রহ করতো একের পর এক যানবাহন এবং প্রস্তুত করতো একের পর এক পোশাক। 'বিপর্যয়' এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— যে সকল জিনিস পরিমাণ ও গুণগত দিক দিয়ে কম-বেশী রাখা সমীচীন, সে সকল কিছুকে অর্জন করবার অপচেষ্টা। ভারসাম্যমূলকতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন।

'কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছামতো পরিমাণেই নাযিল করেন' অর্থ অনিবার্য বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা থেকে মানবতাকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই রিজিক বিতরণের এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি নিজে। রিজিক বণ্টন তাই সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায়াধীন। আর 'তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন' অর্থ তিনিই কেবল জানেন, কার জীবনোপকরণ কখন কীভাবে কতোটুকু বন্টন করতে হবে। কেননা তাঁর সকল বান্দার অভ্যন্তরীণ ও প্রকাশ্য অবস্থা তাঁর সর্বময় জ্ঞান ও সর্বত্রগামী দর্শনের সতত আওতাভূত।

হজরত আলী বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আসহাবে সুফ্ফাগণ সম্পর্কে। ওই সকল সাহাবী ছিলেন বিত্তহীন ও গৃহহীন। রসুল স. তাঁদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মসজিদের বাইরের চত্বরে। জ্ঞানার্জন ও আল্লাহ্র উপাসনা-বন্দনাই ছিলো তাঁদের সার্বক্ষণিক কর্ম। প্রায়শ দেখা দিতো তাঁদের অন্ন সংকট। তাই একবার তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবলেন, আহ্ আমাদের অবস্থা যদি স্বচ্ছল লোকদের মতো হতো। হাকেম, তিবরানী। হজরত ওমর থেকে ইবনে হারেছও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত আনাস থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীকে অপবাদ দিলো, সে যেনো যুদ্ধ করতে দাঁড়ালো আমারই বিরুদ্ধে। আমি আমার আউলিয়াগণকে রক্ষার জন্য এমন ভয়ংকর; যেমন ভয়ংকর হয়ে ওঠে ক্রোধান্বিত সিংহ। আমার বান্দারা অন্য কোনো উপায়ে আমার এমন নিকটবর্তী হতে পারে না,

www.eelm.weebly.com

যতোখানি নিকটবর্তী হতে পারে ফরজ ইবাদতের মাধ্যমে। আর নফল ইবাদতের মাধ্যমেও তারা আমার নৈকট্য অর্জন করে। সে নৈকট্য এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। তখন আমি হয়ে যাই তাদের কান, চোখ ও হাত, যা দিয়ে তারা শোনে, দ্যাখে ও কর্ম করে। তারা তখন আমার কাছে প্রার্থী হলে আমি তাদের প্রার্থনা কবুল করি। দান করি, যদি তারা কিছু চায়। আর আমি সর্বাধিক উদ্বিগ্ন হই তাদের প্রাণ হরণকালে। মৃত্যু যদি পরিহারযোগ্য কিছু হতো, তবে আমিও তাদেরকে কষ্ট দিতে চাইতাম না। কিন্তু মৃত্যু তো অমোঘ। কারণ তা আমা কর্তৃক প্রদত্ত এক বিধান। আর আমার এমন কিছুসংখ্যক বান্দা রয়েছে, যারা সতত উন্মুক্ত রাখতে চায় ইবাদত বন্দেগীর তোরণ। কিন্তু আমি তাদেরকে সংযত রাখি। কেননা অসংযম তাদেরকে নিয়ে যাবে অহমিকার পথে। ফলে তারা হয়ে যাবে স্খলিত। আবার আমার কিছুসংখ্যক বান্দা এমনও রয়েছে যে, তাদের বিশ্বাসকে ঠিক করতে সাহায্য করে ধন-সম্পদ, অভাবগ্রস্ত হলে তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে বিপর্যস্ত। তাই আমি তাদেরকে দান করি বিত্ত-স্বাচ্ছল্য। আবার এমন কিছুসংখ্যক বান্দাও আমার রয়েছে, যাদের বিশ্বাসের রক্ষাকবচ হচ্ছে দারিদ্র। বিত্তপতি হলেই বরং তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে বিশৃঙ্খল। তাই আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করি বিত্তহীনতা। এরকম শারীরিক সুস্থতাই হয় কারো কারো ইমান রক্ষার বর্ম। তাদেরকে যদি আমি পীড়াগ্রস্ত করি, তবে তাদের ইমান রক্ষা করা হয়ে যাবে কঠিন। তাই তাদেরকে আমি সুস্থই রাখি। আবার আমার এমন বান্দাও কিছু রয়েছে, যারা সুস্থ হলেই বরং বিপদে পড়বে। তখন তাদের ইমান রক্ষা করা হয়ে পড়বে দুষ্কর। সুতরাং আমি আমার বান্দাগণের বিষয়াবলী সম্পন্ন করি আমার মহাপ্রজ্ঞা অনুসারে। তাদের সকল কিছু সম্পর্কে আমি জ্ঞাত এবং তাদের সকল কর্মের আমি দ্রষ্টা।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখনই তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার্হ'।

এখানে 'হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে' অর্থ তুমুল খরার সময় যখন মানুষ বৃষ্টি চেয়ে চেয়ে হয়ে পড়ে ক্লান্ত, নিরাশ। 'করুণা বিস্তার করেন' অর্থ অবতীর্ণ করেন এমন পরিমিত বৃষ্টি, যাতে করে ভূমিতে উৎপন্ন হয় ফল ও ফসল। জীবন রক্ষা পায় উদ্ভিদ, প্রাণী ও পাখির। 'অভিভাবক' অর্থ বান্দাদের রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, ব্যবস্থাপক। আর 'প্রশংসার্হ' অর্থ যেহেতু তিনি তাঁর অপার দয়ায় বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁর সৃষ্টিকুলকে, সেহেতু তিনিই প্রকৃত অর্থে প্রশংসা প্রাপ্তির অধিকারী।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'তাঁর অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে রেখেছেন সেইগুলি। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই তাদেরকে সমবেত করতে সক্ষম'। একথার অর্থ— প্রতিটি সৃষ্ট প্রাণী ও পদার্থই তাদের একক সৃজয়িতা আল্লাহ্‌র সত্তা-গুণবত্তা ও কার্যকলাপের প্রমাণ। আর এই প্রমাণপঞ্জির মধ্যে অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে সুবৃহৎ ও নিখুঁত আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়স্থিত অন্যান্য প্রাণী। যেগুলোকে তিনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন। এই বিশাল প্রাণীকুল রয়েছে তাঁর সতত প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার আওতায়। তাই তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় এদেরকে সমবেত করতে সক্ষম। মহাবিচারের দিবসে তিনি তা করবেনও।

এখানে 'মিন আয়াতিহী' অর্থ নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। 'মিন দাব্বাতিন' অর্থ সকল প্রাণী— মানুষ, ফেরেশতা, জ্বিন, জীবজন্তু সবকিছুই এর অন্তর্ভূত। কেননা 'দাব্বাত' বলে সকল প্রাণবন্ত ও বিচরণশীল প্রাণীকে। অথবা 'দাব্বাত' অর্থ এখানে কেবলই পৃথিবীতে বিচরণশীল জীবজন্তুসমূহ। এমতাবস্থায় এখানকার 'ফীহিমা' (এই দুইয়ের মধ্যে) দ্বিত্ব সর্বনামটি আকাশ-পৃথিবী উভয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কথাটি সম্পৃক্ত হবে কেবল পৃথিবীর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে, পৃথিবীর মতো আকাশেও রয়েছে প্রাণীর অস্তিত্ব— যেমন ফেরেশতা। আর তাদের সকলকেই তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে সমবেত করতে সক্ষম, যেমন করবেন শেষ বিচারের কালে।

সূরা শূরা ঃ আয়াত ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮

www.eelm.weebly.com

❑ তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

❑ তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

❑ তাঁহার অন্যতম নিদর্শন পর্বতসদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযানসমূহ।

❑ তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হইয়া পড়িবে সমুদ্রপৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

❑ অথবা তিনি তাহাদের কৃতকর্মের জন্য সেইগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন;

❑ আর আমার নিদর্শন সম্পর্কে যাহারা বিতর্ক করে তাহারা যেন জানিতে পারে যে, তাহাদের কোন নিষ্কৃতি নাই।

❑ বস্তুত তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে তাহা উত্তম ও স্থায়ী তাহাদের জন্য, যাহারা ঈমান আনে ও তাহাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে,

❑ যাহারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হইলে ক্ষমা করিয়া দেয়,

❑ যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাহাদিগকে আমি যে রিয্‌ক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! মনে রেখো, তোমাদের উপরে যে সকল বিপদ-মুসিবত আপতিত হয়, তা তোমাদেরই অর্জন, তোমাদেরই কৃত পাপের ফল। আর অতীব মমতাপরবশ বলে তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি এমনিতেই ক্ষমা করে দেন। নতুবা তোমরা তো হতে আরো অধিক বিপদগ্রস্ত।

এখানে 'ফাবিমা কাসাবাত্ আইদীকুম' অর্থ তোমাদের স্বহস্ত অর্জিত পরিণতি, তোমাদের কৃতকর্মের ফল। 'মা আসবাকুম' এর 'মা' এখানে শর্তপ্রকাশক। অথবা যোজক অব্যয়, যার মধ্যে রয়েছে শর্তের অর্থ। আর 'অনেক অপরাধ ক্ষমা করেছেন' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে আগের নামপদীয় বাক্যের সঙ্গে। অথবা তা প্রসঙ্গবর্জিত।

www.eelm.weebly.com

হাসান বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. বলতেন, আমার জীবনাধিকারী সেই পবিত্র সত্তার শপথ! পাপ ব্যতীত পায়ে বিঁধে না কোনো কাঁটা,
স্খলিত হয় না কোনো পদবিক্ষেপ, এমনকি পেশী সঞ্চালনও হয় না অস্বাভাবিক। আর অধিকাংশ পাপ তো সেগুলোই, যেগুলোকে আল্লাহ্ মার্জনা করেন। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীদের অসুখ-বিসুখ তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্যস্বরূপ। হাকেম, বায়হাকী।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী একবার উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব থেকে একটি অতীব সুন্দর আয়াত পাঠ করে শোনাবো, যা আমাকে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন রসুল স. স্বয়ং। তা হচ্ছে 'তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃত কর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করে দেন'। এবার এর ব্যাখ্যা শোনো— 'মা আসবাকুম মিম্ মুসিবাতুন' অর্থ পার্থিব কষ্ট, বিপদাপদ, অসুখ-বিসুখ। আর 'ফাবিমা কাসাবাত্ আইদীকুম' অর্থ কৃতকর্মের পার্থিব কষ্ট, যা ভোগ করলে পরকালে এজন্য তাকে আর শাস্তি দেওয়া হবে না। বরং দেওয়া হবে পুরস্কার। আর যে অপরাধগুলো তিনি এমনিতেই ক্ষমা করে দেন, সেগুলোর জন্যও আখেরাতে তার কোনো শাস্তি নেই। আর তিনি হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, চূড়ান্ত বিচারক।

বাগবী লিখেছেন, ইকরামা বলেছেন, বিশ্বাসীদের গায়ে সামান্য আঁচড় লাগলেও বুঝতে হবে এটা তার পাপের ক্ষতিপূরণ। এই কষ্টটুকু ছাড়া আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করতেন না। আবার কষ্টভোগ হতে পারে উন্নততর মর্যাদাপ্রাপ্তির জন্যও, যে কষ্ট না পেলে ওই উচ্চ মর্যাদা আল্লাহ্ তাদেরকে দান করতেন না।

পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই'। একথার অর্থ— যে বিপদাপদ নির্ধারণ করা হয়েছে, সেই বিপদ-আপদ তোমরা কিছুতেই অপসারণ করতে পারবে না। ব্যর্থ করতে পারবে না তাঁর অভিপ্রায়। সুতরাং বুঝে নাও, আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের এমন কোনো রক্ষাকর্তা নেই, যে তোমাদেরকে স্থিরীকৃত বিপদ-মুসিবত থেকে রক্ষা করতে পারে, নেই এমন কোনো সাহায্যকারীও, যার সাহায্যে তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে যেতে পারো।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'তাঁর অন্যতম নিদর্শন পর্বতসদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযানসমূহ (৩২)। তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্রপৃষ্ঠে। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য (৩৩)। অথবা তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য সেগুলোকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন (৩৪); আর আমার নিদর্শন সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে তাদের কোনো নিষ্কৃতি নেই' (৩৫)।

এখানে 'আল জ্বাওয়ারি ফীল বাহরি' অর্থ সমুদ্রে চলমান জলযানসমূহ। 'কাল আ'লাম' অর্থ এমন জাহাজ, যা সমুদ্রে ভেসে থাকে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে। 'রওয়াকিদা' অর্থ নিশ্চল, স্তব্ধ। 'আ'লা জহরিহী' অর্থ সমুদ্রপৃষ্ঠে। 'সব্বারিন শাকুর' অর্থ ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ। অর্থাৎ বিশ্বাসীগণ। রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসের দু'টি অংশ— ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা। হজরত আনাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী।

'আও ইউবিক্বহুন্না' অর্থ অথবা বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন। কথাটির সম্পর্ক রয়েছে আগের আয়াতের 'নিশ্চল হয়ে পড়বে' কথাটির সঙ্গে, অথবা 'বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন' এর সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বায়ূকে স্তব্ধ করে দেওয়া, ফলে জাহাজ নিশ্চল হয়ে যাওয়া এবং অবশেষে জাহাজ ও জাহাজের যাত্রীদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া এসকল কিছুই তো তিনি ইচ্ছা করলে করতে পারেন। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির যোগাযোগ রয়েছে আগের আয়াতের কেবল 'তিনি ইচ্ছা করলে' কথাটির সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তিনি ইচ্ছা করলে বাতাস থামিয়ে দিয়ে জাহাজের গতি যেমন রুদ্ধ করে দিতে পারেন, তেমনি তুফান-টাইফুন দ্বারা জাহাজকে নিমজ্জিতও তো করতে পারেন।

'ওয়া ইয়া'ফু আ'ন কাছীর' অর্থ এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন। বাক্যটি জুমলা প্রসঙ্গ বর্জিত। অর্থাৎ কিন্তু অনেককেই ক্ষমা করে দেন এবং রক্ষা করেন। অথবা কথাটির সংযোগ রয়েছে আগের বক্তব্যগুলোর সঙ্গে। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তিনি ইচ্ছে করলে বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন। যদি তাই করেন, তবে জাহাজ স্থবির হয়ে থাকবে। অথবা সমুদ্রে ঝড় উঠিয়ে জাহাজকে ডুবিয়ে দিতে পারেন। যদি তা করেন, তবে জাহাজারোহীরা ডুবে যাবে, কিংবা উড়ে যাবে হাওয়ার অনুকূলে। তখন অধিকাংশ আরোহীকে তিনি ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

'আমার নিদর্শন সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মক্কার মুশরিক এবং তাদের মতো অন্যান্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে, যারা আল্লাহ্র বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চায়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যারা আল্লাহ্র বাণী সম্পর্কে তর্ক-সন্দেহের সৃষ্টি করে, তাদের সমুদ্রযাত্রাকালে আল্লাহ্ তো তাদের উপর সহজেই প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন বাতাস স্তব্ধ করে দিয়ে, অথবা ঝড় উঠিয়ে। তখন তো তারা জানতে পারবে যে, এই বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার পাওয়ার আর কোনো উপায়ই নেই। অথবা বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যারা আল্লাহ্র বাণীকে কুটতর্কের মাধ্যমে প্রতিহত করে, তারা যখন

www.eelm.weebly.com

মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত হবে, তখন জানতে পারবে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনো পথই আর তাদের নেই।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'বস্তুত তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহ্র নিকট যা আছে, তা উত্তম ও স্থায়ী তাদের জন্য— যারা ইমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে'। এ কথার অর্থ— হে মানুষ! বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে তোমাদের সকলকেই দেওয়া হয়েছে পৃথিবীর এই অস্থায়ী জীবনের প্রয়োজনীয় রসদ-সম্ভার। এগুলো তোমরা সাময়িকভাবে সকলেই ভোগ করে থাকো। কিন্তু মনে রেখো, এগুলোর কোনোটিই স্থায়ী নয়। সুতরাং পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করো এবং পরিত্যাগ করো ওই সকল বস্তুকে যা পরকাল সম্পর্কে উদাসীন করে দেয়। তোমাদের

পরকালের পুণ্য প্রচেষ্টার ফল জমা রয়েছে আল্লাহ্র কাছে, যা পরিমাণগত ও প্রকৃতিগত উভয় দিক থেকে পৃথিবীর সাফল্য অপেক্ষা অনেক অনেক উত্তম এবং তা চিরস্থায়ীভাবে দেওয়া হবে তাদেরকে, যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে এবং তাঁরই প্রতি সতত নির্ভরশীল হয়।

হজরত আলী বলেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীক যখন তাঁর যথাসর্বস্ব ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেন তখন কিছুসংখ্যক লোক তাঁর এ কাজের সমালোচনা করতে থাকে। আর তখনই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধবিশিষ্ট হলে ক্ষমা করে দেয় (৩৭), যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে' (৩৮)। আয়াতদ্বয়ের বক্তব্যগত সংযোগ রয়েছে পূর্বের আয়াতের 'যারা ইমান আনে' কথাটির সঙ্গে। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— যারা ইমান আনে, তাদের প্রভুপালকের উপরে নির্ভর করে, বেঁচে থাকে মহাপাপ ও ঘৃণ্যকর্ম থেকে, ক্রোধান্বিত হওয়া সত্ত্বেও অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ্র ডাকে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়, নামাজ পাঠ করে, সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় এবং অভাবগ্রস্তদের জন্য অর্থ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয় না, তাদের জন্যই রয়েছে পরকালের পুরস্কার, যা অত্যুত্তম ও চিরস্থায়ী।

মুকাতিল বলেছেন, এখনে 'গুরুতর পাপ' অর্থ ওই সকল অন্যায় কর্ম, যেগুলোর জন্য শরিয়তে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। সুরা নিসার তাফসীরে গুরুতর পাপ কবীরা গুনাহসমূহ সম্পর্কে সবিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আর 'অশ্লীল কার্য' অর্থ এখানে ব্যভিচার। এরকম বলেছেন সুদ্দী। এখানকার 'ক্রোধবিশিষ্ট হলে' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে আগের বাক্যের 'বেঁচে থাকে' কথাটির সঙ্গে এবং 'ক্ষমা করে দেয়' (হুম ইয়াগ্ফিরূন) এর 'হুম' সর্বনাম এটাই প্রমাণ করে যে, রাগের সময়েও তারা অপরাধীকে মাফ করে দেওয়ার মতো মানুষ। আর 'প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়' অর্থ প্রভুপ্রতিপালকের আদেশানুসারে চলে। 'আমরু হুম শূরা বাইনাহুম' অর্থ নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে। অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে তারা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করে না। করে সুহৃদ-স্বজনদের পরামর্শক্রমে। একথা বলাই বাহুল্য যে, যে বিশ্বাসী ব্যক্তি তার সমবিশ্বাসী বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শক্রমে চলে, সে লাভ করে ইহ-পারত্রিক কল্যাণ। আর বিশ্বাসী ভ্রাতাকে শুভপরামর্শ দান এবং অপসিদ্ধান্ত থেকে বাধা প্রদান বিশ্বাসীগণেরই বৈশিষ্ট্য। রসুল স. বলেছেন, শুভপরামর্শপ্রদানকারীরা বিশ্বাসভাজন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম, হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে মাজা এবং জননী উম্মে সালমা থেকে তিরমিজি।

তিবরানী তাঁর 'আল আওসাত' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, যার কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া হয়, সে বিশ্বাসভাজন। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভ্রাতাকে সেই পরামর্শ দিয়ো, যা তোমার নিজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করো, সেরকম পরামর্শই দিয়ো অন্যকে।

সূরা শূরা ঃ আয়াত ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩

www.eelm.weebly.com

❑ এবং যাহারা অত্যাচারিত হইলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

❑ মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করিয়া দেয় ও আপোস-নিষ্পত্তি করে তাহার পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট আছে। আল্লাহ্ যালিমদিগকে পসন্দ করেন না।

❑ তবে অত্যাচারিত হইবার পর যাহারা প্রতিবিধান করে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না;

❑ কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে যাহারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করিয়া বেড়ায়, উহাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

❑ অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করিয়া দেয়, উহা তো হইবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা অত্যাচারিত তারা ইচ্ছা করলে অত্যাচারের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। আর প্রতিশোধ গ্রহণ না করে যদি তারা অভিযুক্ত অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে তা আরো উত্তম। তার এমতো উদারতার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহ্র কাছে। এজন্য আল্লাহ্ স্বয়ং তাকে পুরস্কৃত করবেন। তবে একথাও ঠিক যে, আল্লাহ্ অত্যাচারীকে পছন্দ করেন না।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, বিশ্বাসীরা হয় দু'রকম স্বভাবের। একদল অত্যাচারের বদলা না নেওয়া পর্যন্ত শান্ত হতে পারেন না। আর এক দল বদলা না নিয়ে তার অধিকার হরণকারীকে মার্জনা করে দেন। এখানে 'যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে' বলে বলা হয়েছে প্রথম দলভূতদের কথা।

ইব্রাহিম বলেছেন, এধরনের বিশ্বাসীরা অপমানকে সহ্য করেন না। অপমানিত হওয়া তাদের কাছে খুবই অপ্রীতিকর। কিন্তু তাঁরা যদি তাঁদের অধিকার খর্বকারী অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান হন, তবে অভিযুক্তদেরকে উপেক্ষা করেন এবং ক্ষমাও করে দেন। আতা বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে ওই সকল বিশ্বাসীদের কথা, যাদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিলো কেবল একথা বলার জন্য যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য আর কেউ নেই'। মক্কাবিজয়ের পর তাঁরা তাদের প্রতি অত্যাচারকারীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন।

বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহ্পাক এখানে উত্তম-অত্যুত্তম সকল প্রকার ইমানদারগণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, অত্যাচারের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ বৈধ এবং ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম। তাই এতে করে একথা বলা যেতে পারে না যে, এখানে দু'রকম কথা বলা হলো কেনো? আর 'যে ক্ষমা করে দেয়' কথাটি এখানে একথাই প্রমাণ করে যে, তারা প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অপরাধীকে ক্ষমা করে দেন। নতুবা ক্ষমতাহীনদের ক্ষমার তো কোনো মূল্যই নেই। আবার 'প্রতিশোধ গ্রহণ করে' কথাটিও একথা প্রমাণ করে, তাদের ক্ষমতা অত্যাচারীদের সমকক্ষ। তৎসত্ত্বেও তারা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। সুতরাং বুঝতে হবে দু'টো গুণই প্রশংসনীয়। ক্ষমা করা নিঃসন্দেহে অত্যুত্তম। কিন্তু সমকক্ষদের প্রতি যুদ্ধ করে প্রতিশোধ গ্রহণ করাও অনুত্তম নয়। বরং তা প্রশংসনীয়। কেননা এমতাবস্থায় ক্ষমা করলে তাদের সাহস যাবে বেড়ে এবং আবারো তারা ঘটাবে অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি।

আমি বলি, অত্যাচারী যদি আল্লাহ্র আদেশ লংঘন করে এবং আল্লাহ্-অভিমুখী হওয়ার কারণে অত্যাচার চালায়, তবে তাদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করাই উত্তম। বরং এমতাবস্থায় প্রতিশোধ গ্রহণ হবে অত্যাবশ্যক, যাতে করে এরকম অত্যাচারের দরোজা হয়ে যেতে পারে রুদ্ধ। আর যদি সে অত্যাচার করে ব্যক্তিগত কোনো কারণে, তবে এমতোক্ষেত্রে সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ বৈধ। কিন্তু ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম। কেননা অশুভকে শুভ দ্বারা প্রতিহত করা সর্বোৎকৃষ্ট।

www.eelm.weebly.com

‘মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ’— এরকম বলা হয়েছে কেবল বাহ্যিক সাযুজ্যের কারণে। অথবা প্রতিশোধ গ্রহণকে এজন্যে ‘মন্দ’ বলা যেতে পারে যে, বিষয়টি অপরাধীর কাছে অনভিপ্রেত। কিংবা বলা যেতে পারে, প্রতিশোধ গ্রহণ মন্দ, ক্ষমা করার চেয়ে।

ইবনে আউন বর্ণনা করেছেন, আমি একবার আলী ইবনে জায়েদ ইবনে জারআনকে জিজ্ঞেস করলাম ‘মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ’ এই আয়াতের অর্থ কী? তিনি বললেন, তাহলে একটি ঘটনা শোনো। ঘটনাটি আমি শুনেছি আমার সৎমা উম্মে মোহাম্মদের কাছ থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, একদিন জাহাশের কন্যা জয়নাব আমার কাছে বসেছিলেন। এমন সময় গৃহে প্রবেশ করলেন রসুল স.। তিনি একটা কিছু করতে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে

ইশারায় জয়নাবের উপস্থিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি স. সংযত হলেন। জয়নাব তখন আমাকে বললেন, তুমি খুব অলস। তিনি স. তাঁকে চুপ থাকতে বললেন। কিন্তু তিনি থামলেন না। রসুল স. আমাকে বললেন, তুমিও তাকে ভালো-মন্দ কিছু বলো। তখন আমি জয়নাবকে বললাম, তুমিও অলস। এরপর জয়নাব উঠে চলে গেলেন ফাতেমাদের বাড়িতে। তাকে বললেন, আয়েশা আমাকে অলস বলেছে। এরপর ফাতেমা এলো রসুল স. এর নিকট। অভিযোগ পেশ করলো আমার বিরুদ্ধে। রসুল স. বললেন, ফাতেমা! আয়েশা যে তোমার পিতার প্রিয়পাত্রী। ফাতেমা ফিরে গেলো তার বাড়িতে। আলীর নিকট খুলে বললো গোটা বৃত্তান্ত। এরপর আলী এলো রসুল স. এর নিকট। তাঁর সাথে মতবিনিময় করলো এ ব্যাপারে। আবু দাউদ এরকম বর্ণনা করেছেন।

মুকাতিল বলেছেন, ‘মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ’ অর্থ খুনের বদলা খুন। মুজাহিদ ও সুদ্দী বলেছেন, এখানে ‘প্রতিশোধ’ অর্থ মন্দ কথার মন্দ প্রত্যুত্তর। যেমন কেউ বললো, আল্লাহ্ তোমাকে অপমানিত করুন। সম্বোধিত ব্যক্তি জবাব দিলো, আল্লাহ্ অপমানিত করুন তোমাকেও। অর্থাৎ গালিগালাজের প্রতিফল হচ্ছে অনুরূপ গালিগালাজ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত আবু বকরকে নিয়ে একস্থানে বসেছিলেন। এমন সময় এক লোক এসে আবু বকরকে গালি দিলো। তিনি কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না। রসুল স. মৃদু হাসলেন। লোকটি পুনরায় আরো বেশী খারাপ ভাষায় আবু বকরকে গালি দিলো। এবার আবু বকরও কিছুটা উত্তেজিত হয়ে তার কথার প্রত্যুত্তর করলেন। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি তার কথার প্রত্যুত্তর করলাম বলে কি আপনি অতুষ্ট? উঠে পড়লেন যে। তিনি স. বললেন, তার গালির প্রত্যুত্তর দিচ্ছিলো একজন ফেরেশতা। কিন্তু তুমি প্রত্যুত্তর করার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হলো শয়তান। এখন শয়তানের সঙ্গে আমি বসি কী করে? তিনটি কথা মনে রেখো— ১. অত্যাচারিত কেউ যদি তার প্রতি অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দেয় তবে আল্লাহ্ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন এবং তাকে সাহায্য করেন ২. যে অন্যের সাহায্যার্থে দানের দরোজা উন্মুক্ত করে, আল্লাহ্ বাড়িয়ে দেন তার সম্পদ ৩. ধনার্জনের আশায় যে অন্যের কাছে প্রার্থী হয়, আল্লাহ্ কমিয়ে দেন তার সম্পদ।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, আমি একবার সুফিয়ান সওরীকে জিজ্ঞেস করলাম ‘মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ’ কথাটির অর্থ কি এই যে, কেউ গালি দিলে তাকে অনুরূপ গালি দিতে হবে? অথবা কেউ মন্দ আচরণ করলে তার প্রতি প্রদর্শন করতে হবে অনুরূপ মন্দ আচরণ? তিনি আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না। এরপর আমি গেলাম হিশাম ইবনে হুজায়েরের কাছে। তিনি আমার কথা শুনে বললেন, না, তুমি যেমন বলছো সেরকম নয়। বরং কথাটির অর্থ— কেউ তোমাকে আহত করলে তুমিও তাকে অনুরূপ আহত করতে পারবে। গালিগালাজের কথা এখানে বলা হয়নি। হিশামের একথার সমর্থন রয়েছে হাদিস

শরীফেও। যেমন— রসুল স. একবার দু’জন লোককে কুৎসিৎ কথা বলে বচসা করতে দেখে বললেন, লোকদু’টো শয়তান। তাই অনর্থক বাজে কথা বলে চলেছে। আহমদ এবং বোখারী আয়াজ ইবনে হেমার সূত্রে।

রসুল স. এরকমও বলেছেন যে, অধিক পরিমাণ অভিশাপ প্রদানকারী মহাবিচারের দিবসে সাক্ষ্য দিতে পারবে না, আর তাদের সুপারিশ কবুলও করা হবে না। আরো বলেছেন, গালিগালাজে লিপ্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে সেই ব্যক্তিই প্রধান অপরাধী, যে প্রথমে গালি দিতে শুরু করে। প্রতিশোধ গ্রহণকারী সীমালংঘন করলে হয়ে যায় মুখ্য অপরাধী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, মুসলিম ও আবু দাউদ।

‘ফামান আ’ফা ওয়া আস্‌লাহা’ অর্থ ‘ক্ষমা করে দেয় ও আপোস-নিষ্পত্তি করে’। আর ‘ফাআজ্‌রুহূ আ’লাল্লহ্’ অর্থ তার পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট আছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন। যদিও তিনি সকল প্রকার বাধ্যতা ও ঔচিত্য থেকে পবিত্র।

বাগবী লিখেছেন, হাসান বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে এক ঘোষক ঘোষণা করবে, আল্লাহ্র কাছে যাদের পুরস্কার জমা আছে, তারা দাঁড়িয়ে যাও। এ ঘোষণার পর দাঁড়াবে কেবল তারাই, যারা তাদের প্রতি অত্যাচারকারীকে ক্ষমা করেছিলো।

একথা বলার পর তিনি পাঠ করতেন 'আল্লাহ্ জালেমদেরকে পছন্দ করেন না'। অর্থাৎ যারা গালির সূচনা করে কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে, তারা আল্লাহ্র পছন্দের পাত্র নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একথার অর্থ— যারা জুলুমের সূচনা করে, তাদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

এরপরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'তবে অত্যাচারিত হবার পর যারা প্রতিবিধান করে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না'। একথার অর্থ— অত্যাচারিত ব্যক্তি যদি তার প্রতি অত্যাচারের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায়, তবে তাকে মন্দ যেমন বলা যাবে না, তেমনি কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যাবে না তার বিরুদ্ধে। আর এর জন্য তাকে কোনো জবাবদিহিও করতে হবে না।

এরপরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, যারা মানুষের উপরে অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি'। একথার অর্থ— ইহকালের ভর্ৎসনা, জাবাবহিদি, বিরুদ্ধব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরকালের শাস্তিযোগ্য হওয়ার কথা তো কেবল বলা যেতে পারবে তাদের সম্পর্কে, যারা মানুষের জানমালের ক্ষতি করে এবং প্রদর্শন করে অনর্থক ঔদ্ধত্য। তাদের জন্যই পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এখানে 'ইয়াব্গুণ' অর্থ বিদ্রোহাচরণ করে, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে, জুলুম করে, সত্য থেকে দূরে চলে যায়। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, 'বাগা' হচ্ছে অতীতকালবোধক এবং 'ইয়াব্গি' বর্তমান ও ভবিষ্যতকাল-জ্ঞাপক ক্রিয়াপদ। আর 'বাগ্ইয়ুন' হচ্ছে মূল শব্দ।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, তা তো হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ'। একথার অর্থ— অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দিলে এবং প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ধৈর্য অবলম্বন করলে তা হবে অত্যন্ত বীরত্বব্যঞ্জক কাজ। মহৎ মানুষেরা এরকমই করে থাকেন। কেননা ধর্মে এরকম আচরণই অধিকতর বাঞ্ছিত।

জুজায বলেছেন, ধৈর্যধারণকারীকে সওয়াব দেওয়া হবে এবং সওয়াব প্রাপ্তিই হচ্ছে পরিপূর্ণ প্রাপ্তি। মুকাতিল বলেছেন, এটা সেই সকল কাজের অন্তর্গত, যে সকল কাজের জন্য আল্লাহ্ আদেশ প্রদান করেছেন।

সূরা শূরা ঃ আয়াত ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

www.eelm.weebly.com

❑ আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তৎপর তাহার জন্য কোন অভিভাবক নাই। যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন তুমি উহাদিগকে বলিতে শুনিবে, 'প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?'

❑ তুমি উহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, উহাদিগকে জাহান্নামের সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে; তাহারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনিমীলিত নেত্রে তাকাইতেছে। মু'মিনরা কিয়ামতের দিন বলিবে, 'ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করিয়াছে।' জানিয়া রাখ, যালিমরা অবশ্যই ভোগ করিবে স্থায়ী শাস্তি।

❑ আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য উহাদের কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার কোন গতি নাই।

❑ তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সেই দিবস আসিবার পূর্বে, যাহা অপ্রতিরোধ্য; যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না এবং তোমাদের জন্য উহা নিরোধ করিবার কেহ থাকিবে না।

❑ উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে তোমাকে তো আমি ইহাদের রক্ষক করিয়া পাঠাই নাই। তোমার কাজ তো কেবল বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে ইহাতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন উহাদের কৃতকর্মের জন্য উহাদের বিপদ-আপদ ঘটে তখন মানুষ হইয়া পড়ে অকৃতজ্ঞ।

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্রই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন,

❑ অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে করিয়া দেন বন্ধ্যা; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! শুনে রাখুন, আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার পথভ্রষ্ট হওয়া সুনিশ্চিত। এরকম লোক তখন আর এমন অভিভাবক, সুহৃদ বা পথপ্রদর্শক খুঁজে পায় না, যে তাকে আখেরাতের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। এদের পৃথিবীর জীবনও হয় বিপর্যস্ত। এরাই সীমালংঘনকারী। পরকালে এরা যখন অনিবার্য শাস্তির সম্মুখীন হবে, তখন ভয়ে-আতংকে আঁতকে উঠে বলবে, এখন পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় আছে কী? সেখানে যেতে পারলে আমরা আর ভুল করবো না।

এখানে 'লাম্মা রআউল আ'জাব' অর্থ যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। ওই শাস্তি অবধারিত। তাই ভবিষ্যতের ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সুনিশ্চিতার্থক অতীতকালের ক্রিয়া। আর 'উপায় আছে কী' প্রশ্নবোধক হলেও এটা হবে তাদের মিনতি অর্থাৎ একথা বলে তারা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের আবেদন জানাবে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে; তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনিমীলিত নেত্রে তাকাচ্ছে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তখন আরো দেখবেন, তাদেরকে দলে দলে জাহান্নামের লেলিহান আগুনের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় অবনত মস্তকে আধবোঁজা চোখে তাকাচ্ছে।

এখানে 'মিন ত্বরফিন খফিয়্যি' অর্থ অর্ধনিমীলিত নেত্রে তাকাবে, গোপনে বা চোরাদৃষ্টিতে দেখবে, যে ভাবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকায় জল্লাদের তলোয়ারের দিকে। কারো কারো মতে এখানকার 'মিন' প্রারম্ভিক এবং 'বা' নৈমিত্তিক অর্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'মুমিনরা কিয়ামতের দিন বলবে, ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করেছে'। বিশ্বাসীরা তখন অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদের এরকম দুরবস্থা দেখে বলবে, আমরা আগেই বলেছিলাম, সত্যপ্রত্যাখ্যানের শাস্তি অনিবার্য। এখন দেখলে তো। এখন তো এই ভয়াবহ শাস্তি থেকে পরিত্রাণ প্রাপ্তির উপায় এদের নেই। আর এদের নেতারা এখন তাদের অনুসারীদের চেয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা তারাই ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জনগোষ্ঠীর পুরোধা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অর্থ জান্নাতের সুন্দরী হুরীদেরকে হারানো, ইমান আনলে তারা যাদেরকে পেতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'জেনে রাখো, জালেমরা অবশ্যই ভোগ করবে স্থায়ী শাস্তি'। কথাটি বিশ্বাসীদের বক্তব্যের শেষাংশও হতে পারে, আবার এমনও হতে পারে যে, কথাটি আল্লাহ্র, যা তিনি বলেছেন বিশ্বাসীদের পূর্বোক্ত বক্তব্যের সত্যয়নার্থে।

এরপরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ব্যতীত তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোনো গতি নেই'। একথার অর্থ— ওই অনিবার্য জাহান্নামযাত্রা ঠেকাতে পারে, এরকম কোনো সাহায্যদাতা অভিভাবক তাদের তখন থাকবেই না। তারা দুনিয়া-আখেরাত উভয় স্থানে কল্যাণচ্যুত।

এরপরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সেই দিবস আসবার পূর্বে, যা অপ্রতিরোধ্য; যেদিন তোমাদের কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের জন্য তা নিরোধ করবার কেউ থাকবে না'। এ কথার অর্থ— হে মানুষ! এখনো সময় আছে, সাবধান হও। তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক তাঁর রসুলের মাধ্যমে যে ধর্মমতের দিকে তোমাদেরকে আহ্বান জানিয়ে চলেছেন, সেই মহা কল্যাণকর ধর্মমতকে গ্রহণ করো, অপ্রতিরোধ্য মৃত্যু অথবা মহাপ্রলয় আগমনের পূর্বেই। যদি এরকম না করো, তবে মহাবিচারের দিবসে তোমাদের কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তখন তোমাদের উপরে আপতিত শাস্তি প্রতিহত করার সাধ্যও কারো হবে না।

এখানে 'লা মারাদ্দা লাহু মিনাল্লা'হ্ অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফিরাতে পারবে না কেউ। অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন সেই দিবস আগমনের আদেশ দিবেন, তখন সে আদেশ আর ফিরিয়ে নিবেন না। এই অর্থে 'মিনাল্লহ্' কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে 'লা মারাদ্দা' এর সঙ্গে। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির সম্পর্ক রয়েছে 'ইয়াতী' এর সঙ্গে। যদি তাই হয় তবে, বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সে দিন যখন আসবে, তখন তাকে আর ফিরিয়ে রাখা হবে না। 'দিবস' অর্থ এখানে মৃত্যুলগ্ন, অথবা মহাপ্রলয়কাল। 'মাল্জ্বা' অর্থ আশ্রয়স্থল। আর 'মা লাকুম মিন নাকীর' অর্থ নিরোধ করবার কেউ থাকবে না। অর্থাৎ তোমাদের পক্ষে তখন কেউই থাকবে না। এমনকি তোমাদের বিরুদ্ধে সেদিন সাক্ষ্য দিবে তোমাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গও (আমল লেখকেরাও সাক্ষ্যদাতা হবে তোমাদের অপকর্মসমূহের)।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমাকে তো আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তোমার কাজ তো কেবল বাণী পৌঁছে দেওয়া'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে যদি তারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, তবে তাদেরকে তা-ই করতে দিন। আর এ জন্য আপনার মনোকষ্ট পাওয়ারও কোনো কারণ নেই। কেননা আমি আপনাকে তাদের জন্য এমতো রক্ষক নিযুক্ত করিনি যে, আপনাকে তাদের ঔদ্ধত্য অবজ্ঞার বিচার-

www.eelm.weebly.com

বিশ্লেষণ করতে হবে, অথবা করতে হবে জবাবদিহি। আপনার কর্তব্য কেবল আমার বাণী পৌঁছে দেওয়া। আর সে কাজ তো আপনি করেই চলেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে এতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের বিপদ-আপদ ঘটে, তখন মানুষ হয়ে পড়ে অকৃতজ্ঞ'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'অনুগ্রহ' অর্থ ধন-সম্পদ, সুস্বাস্থ্য। আর 'বিপদ-আপদ' অর্থ দুর্ভিক্ষ, অভাব, অসুখ-বিসুখ।

'বিমা ক্বদ্দামাত্ আইদীহিম' অর্থ স্বহস্তার্জিত কৃতকর্ম। মানুষ অধিকাংশ কাজ হাত দ্বারাই করে, তাই তাদের কৃতকর্মকে এখানে বলা হয়েছে 'ক্বদ্দামাত্ আইদীহিম' (স্বহস্তার্জিত)। আর 'কাফুর' অর্থ অকৃতজ্ঞ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অধিকাংশ মানুষের স্বভাব এই যে, আল্লাহ্ তাদেরকে বিত্ত-স্বাস্থ্য-সম্মান ইত্যাদির উপকরণ আস্বাদন করালে তারা হয়ে পড়ে গর্বোৎফুল্ল। আবার তাদের অপকর্মের কারণে তাদের উপর অভাব-দারিদ্র-অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি নেমে এলে তারা হয়ে যায় ধৈর্যহারা, অকৃতজ্ঞ।

'ইজা' শব্দটি ব্যবহৃত হয় সুপ্রমাণিত বিষয়ে। এখানেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সে অর্থেই। আল্লাহ্র সত্তাগত অনুগ্রহ এটাই দাবি করে যে, তাঁর বান্দারা তাঁর প্রদত্ত অনুকম্পা আস্বাদন করুক। সেকারণেই এখানে 'আজাক্বনা' (আস্বাদন করাই) কথাটির পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইজা'। কিন্তু বিপদাপদের আগমন যেহেতু তাঁর অনুগ্রহের দাবি নয়, এবং এটাও তাঁর বিধান নয় যে, মানুষ অহেতুক বিপদ-মুসিবতে জাড়িয়ে পড়ুক, তাই এখানকার 'তুসিব্হুম' এর পূর্বে বসেছে সন্দিগ্ধসূচক 'ইন্'(যদি, যখন)।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৪৯, ৫০) মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় অধিপতি। তাঁর অভিপ্রায় সতত স্বাধীন। তাই তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই সৃজন করেন। ইচ্ছামতো কাউকে দান করেন কন্যা, কাউকে দান করেন পুত্র, আবার কাউকে দান করেন কন্যা-পুত্র উভয়ই। কাউকে আবার করেন বন্ধ্যা। ফলে তারা হয় সন্তানহীন। এরকম করতে পারেন তিনি একারণেও যে, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'তিনি যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন' এবং 'তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন' বাক্য দু'টো সমার্থক। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, এখানে 'পুত্রে'র পূর্বে এসেছে 'কন্যা'র কথা। সুতরাং বলতেই হয় যে, ওই রমণীরা বিশেষ সৌভাগ্যশালিনী, যদি তাদের প্রথম সন্তান হয় কন্যা।

বাগবী লিখেছেন, ইহুদীরা একবার রসুল স.কে বললো, নবী মুসা তো আল্লাহ্র সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন, তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। আপনি দাবি করেছেন, আপনিও নবী। তাহলে আপনি আল্লাহ্র সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না কেনো? কেনোই বা তাঁকে দেখতে পান না? তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা শূরা ঃ আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩

❑ মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ্ তাহার সহিত কথা বলিবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যেই দূত তাঁহার অনুমতিক্রমে তিনি যাহা চাহেন তাহা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।

❑ এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমি তো জানিতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি ইহাকে করিয়াছি আলো যাহা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি; তুমি তো প্রদর্শন কর কেবল সরল পথ—

www.eelm.weebly.com

❑ সেই আল্লাহ্র পথ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার মালিক। জানিয়া রাখ, সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্রই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্র বক্তব্যগুণ (সিফাতুল কালাম) এর সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার মতো যোগ্যতা মানুষের নেই। তাই মানুষের মধ্যে যাঁরা নবী, তাদেরকে তাঁর বক্তব্য জানিয়ে দেওয়া হয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে, অথবা পর্দার অন্তরালের মাধ্যমে কিংবা প্রত্যাদেশবাহী ফেরেশতার মাধ্যমে। ওই ফেরেশতারা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে ব্যক্ত করেন কেবল সেই বাণীটুকুই, যা তাঁর অভিপ্রায়ানুকূল।

এখানে 'ওয়া মা কানা লিবাশারিন আঁইয়্যুকাল্লিমা হুল্লহ' অর্থ মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ্ তার সঙ্গে কথা বলবেন। আর 'ইল্লা ওয়াহ্ইয়া' অর্থ প্রত্যাদেশ ব্যতিরেকে। আভিধানিক অর্থে 'ওহী' বা 'প্রত্যাদেশ' অর্থ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ইঙ্গিত করা। এখানে উদ্দেশ্য, সেই অন্তরালবর্তী অখণ্ড বাক্য (সিফাতুল কালাম) যা অক্ষরনির্ভর নয়, অথবা যা অক্ষরাতীত। এধরনের আনুরূপ্যবিহীন বক্তব্য জাগ্রত অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় নবী-রসুলগণের অন্তরে প্রক্ষেপ করা হয়। আর এটাই হচ্ছে তাঁদের প্রতি প্রক্ষিপ্ত প্রত্যাদেশ। এই প্রত্যাদেশ আবার দুই প্রকার— ১. সামনাসামনি, যেমন বিবরণ রয়েছে মেরাজ বিষয়ক হাদিসে। পরকালে আল্লাহ্ দর্শনের কথাও ওই হাদিসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। ২. অদৃশ্য আওয়াজ শ্রুত হওয়া, যেমন হজরত মুসা শুনতে পেয়েছিলেন তুর পর্বতের উপত্যকায়। কিন্তু এখানে 'পর্দার অন্তরালে'র কথা পরে উল্লেখিত হওয়ায় প্রথমোক্ত 'ওহী'র অর্থ হবে প্রথম প্রকারের, অর্থাৎ সামনাসামনি এবং 'পর্দার অন্তরাল' হবে দ্বিতীয় প্রকারের। তবে এমতো ব্যাখ্যাকে মান্য করলে 'পৃথিবীতে আল্লাহ দর্শন অসম্ভব' একথা প্রমাণ করা যায় না। বরং আয়াতখানি আল্লাহ্ দর্শন সম্ভব হওয়ার অনুকূলে।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বাগবী যা লিখেছেন, তাতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যাদেশকালে পৃথিবীতে আল্লাহ্ দর্শন সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় এখানকার 'ওহী'র অর্থ হবে হৃদয়াভ্যন্তরে অবিমিশ্রমূল বক্তব্যের উল্লেখ এবং 'পর্দার অন্তরাল' এর অর্থ হবে ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় বা মাধ্যম এবং দর্শন ব্যতীত শুনতে পাওয়ার মতো বাণী, যেমন হজরত মুসা শুনতে পেয়েছিলেন তুর পাহাড়ের তুয়া উপত্যকায়।

'দূত প্রেরণ করেন' অর্থ প্রেরণ করেন ফেরেশতা, হজরত জিবরাইল, অথবা অন্য কেউ। আর এখানকার 'ফাইউহা বিইজ্নিহী মাইঁইয়াশাউ' অর্থ তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান, তা ব্যক্ত করেন। নাফে'র ক্বেরাতে এসেছে দু'ধরনের প্রত্যাদেশের কথা— ফেরেশতার মাধ্যমে এবং ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়া।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, হারেছ ইবনে হিশাম একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! আপনার কাছে প্রত্যাদেশ আসে কীভাবে? তিনি স. বললেন, কখনো কখনো আসে ঘণ্টার ঝনঝন ধ্বনি সহযোগে। এধরনের প্রত্যাদেশ আমার জন্য বড়ই কষ্টদায়ক। কষ্টদায়ক অবস্থা শেষ হলে

আমার স্মৃতিপটে প্রতিভাত হয় সদ্য অবতীর্ণ বাণী। আবার কখনো কখনো আমার কাছে প্রত্যাদেশ আনে ফেরেশতা এবং সে যা বলে তা আমার স্মরণে থাকে স্পষ্টভাবে। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, একবার আমি দেখলাম, রসুল স. এর উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর প্রত্যাদেশের প্রভাব কেটে গেলো। তখন ছিলো প্রচণ্ড শীত। তৎসত্ত্বেও আমি দেখলাম, তাঁর পবিত্র ললাট থেকে ঘাম নির্গত হচ্ছে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত বলেছেন, রসুল স. এর উপরে যখন প্রত্যাদেশ শুরু হতো, তখন তাঁর চেহারা হয়ে যেতো ফিকে। মুসলিম। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবুয়ত প্রাপ্তির পর রসুল স. মক্কায় অবস্থান করে ছিলেন পনেরো বৎসর। প্রথম সাত বৎসর তিনি আওয়াজ শুনতে পেতেন। আলোও দৃষ্টিগোচর হতো, কিন্তু কোনোকিছু দেখা যেতো না। অবশিষ্ট আট বছর প্রত্যাদেশ আসতো। এর পর তিনি স. মদীনায় চলে যান এবং সেখানে অবস্থান করেন দশ বৎসর। মহাতিরোধানের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো পঁয়ষট্টি বৎসর। বোখারী, মুসলিম।

জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. এর প্রতি প্রত্যাদেশ সূচিত হয়েছিলো শুভস্বপ্নের মাধ্যমে। তখন তিনি শায়িত অবস্থায় স্বপ্নদর্শন করতেন। বোখারী, মুসলিম।

'ইন্নাহু আ'লিয়্যুন হাকীম' অর্থ তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ সৃজিতদের বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে তিনি বহু বহু উর্ধ্বে এবং তাঁর আনুরূপ্যহীন বিজ্ঞতা যে রকম দাবি রাখে, তিনি সেরকম প্রজ্ঞাধিকারী। তাঁর প্রজ্ঞার দাবি অনুসারেই তিনি তাঁর অভিপ্রায় পূরণ করতেন। কখনো বাণীর মাধ্যমে, কখনো মাধ্যম বিহনে।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ, তুমি তো জানতে না কিতাব কী এবং ইমান কী'! একথার অর্থ— হে আমার রসুল! যেভাবে আমি আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি, সেভাবেই এখন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আপনাকে জানাচ্ছি আমার আদেশাবলী। এমতো প্রত্যাদেশের পূর্বে কিতাব কী জিনিস আপনি তা জানতেন না। একথাও জানতেন না যে, প্রকৃত বিশ্বাস কাকে বলে।

www.eelm.weebly.com

কালাবী ও মালেক ইবনে দীনার বলেছেন, এখানে 'রূহ' অর্থ কিতাব, কোরআন মজীদ। সুদ্দী বলেছেন, দেহ যেমন আত্মানির্ভর, হৃদয়ের সজীবতাও তেমনি কোরআননির্ভর। অর্থাৎ কোরআন আত্মাকে প্রাণবন্ত করে। সেকারণেই কোরআনকে বলা হয় রূহ। রবী ইবনে আনাস বলেছেন, এখানে 'রূহ' অর্থ জিবরাইল এবং 'আওহাই্না' অর্থ 'আর্সালনা' (আমি প্রেরণ করেছি)। অর্থাৎ আমি প্রেরণ করেছি জিবরাইলকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'রূহ' অর্থ নবুয়ত। হাসান বলেছেন, এর অর্থ অনুগ্রহ। এই উভয় অর্থের উদ্দেশ্য আবার 'কোরআন' ও হয়। অর্থাৎ কোরআন হচ্ছে নবুয়ত ও রহমতের নিদর্শন।

'মিন্ আমরিনা' অর্থ আমার নির্দেশ। অর্থাৎ রূহ প্রেরিত হয় আমার নির্দেশানুসারেই। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— 'রূহ' হচ্ছে আমাদের নির্দেশের ফল। 'মা কুনতা তাদ্রী' অর্থ আপনি জানতেন না। 'মালকিতাব' অর্থ কিতাব কী এবং 'ওয়ালাল্ ঈমান' অর্থ ইমান কী? অর্থাৎ ধর্মের ওই সকল বিধিবিধান সম্পর্কে আপনি জানতেন না, যা বুদ্ধির অতীত। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, এখানে 'ইমান' অর্থ নামাজ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'মা কানাল্লহু লিইয়ূদ্বিআ' ঈমানাকুম' (আল্লাহ্ এরকম নন যে, তিনি তোমার নামাজসমূহকে নিস্ফল করে দিবেন)। এমতো ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বিদ্বানগণ সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নবীগণের ইমান অন্তর থেকে স্বতোৎসারিত, প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত। আত্মিক প্রক্ষেপণ বা ইলহামের মাধ্যমে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, সমগ্র সৃষ্টির সৃজয়িতা একজন। তিনি সকল দোষত্রুটি থেকে পবিত্র এবং সর্বগুণে গুণান্বিত।

কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির পূর্বে রসুল স. ইবাদত করতেন হজরত ইবরাহিমের ধর্মমতানুসারে। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। কেননা অভিমতটির পক্ষে কোনো দলিল প্রমাণ নেই। রসুল স. ছিলেন অক্ষরের অমুখাপেক্ষী, তাই তিনি কোনো কিতাব পাঠ করেননি। আর তার পারিপার্শ্বিকতা ছিলো পৌত্তলিকতাদুষ্ট। এমতাবস্থায় হজরত ইবরাহিমের ধর্ম সম্পর্কে তিনি কীভাবে জানতে পারবেন। সুতরাং একমাত্র প্রত্যাদেশই ছিলো ধর্মীয় বিধানাদি প্রাপ্তির উপায়। তবে একথা সত্যি যে, প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির পূর্বে তিনি নির্জনতা পছন্দ করতেন। আর আমি মনে করি প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির পূর্বে তিনি পরিপূর্ণ মুমিনও ছিলেন। ইমানের মূল তত্ত্বের উপরে তিনি প্রতিষ্ঠিতও ছিলেন। কিন্তু তিনি একথা তখন বুঝতে পারেননি যে, হৃদয়ের এমতো বিশ্বাসের নাম ইমান। বুঝলেন তখন, যখন অবতীর্ণ হতে শুরু করলো প্রত্যাদেশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো, যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি, তুমি তো পথনির্দেশ করো কেবল সরল পথ—'

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'নূর' বা 'আলো' অর্থ 'বিশ্বাসের আলো'। সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'একে' অর্থ এই কোরআনকে। অর্থাৎ আমি এই কোরআনকে করেছি আলো, যা অজ্ঞতার অন্ধকারে জ্ঞানের আলো ফোটায়। 'যার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি' অর্থ যে কোরআন দ্বারা আমি আমার সেবকগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও পরিশুদ্ধ ধর্মমতের দিকে চালিত করি। ফলে তারা হতে পারে আমার নৈকট্যভাজন এবং যোগ্য হয় জান্নাতের। 'তুমি তো প্রদর্শন করো কেবল সরল পথ' অর্থ হে আমার রসুল! আপনি তো কেবল সকল মানুষকে সোজা পথে চলবার জন্য উপদেশ দিয়ে চলেছেন। অর্থাৎ প্রচার করে চলেছেন সরল পথের শিক্ষা, যার নাম ইসলাম, যে ইসলাম পৌঁছে দেয় জান্নাতে'। এখানে 'হেদায়েত' অর্থ পথ দেখানো।

শেষোক্ত আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'সেই আল্লাহ্র পথ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার মালিক'। একথার অর্থ— এই ইসলাম হচ্ছে সেই মহান আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত ও প্রবর্তিত, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর এক ও অংশীবিহীন অধিকর্তা। অর্থাৎ সকলে ও সকল কিছুই যাঁর অধিকারায়ত্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'জেনে রাখো, সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্রই দিকে প্রত্যাবর্তন করে'। একথার অর্থ— সকলকেই একদিন আপনাপন কর্মফলের জবাবদিহির জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হতেই হবে। আর তখন তিনি সকলের জন্য নির্ধারণ করবেন যথোপযুক্ত প্রতিফল— পুরস্কার, অথবা তিরস্কার। বাক্যটিতে যুগপৎ প্রকাশ পেয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য শুভসমাচার এবং অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির ভীতি। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অধিক অবহিত।

আলহামদুলিল্লাহ্! সুরা 'শূরার' তাফসীর শেষ হলো আজ ১৩ই রবিউল আউয়াল শনিবার আসরের সময়ে, ১২০৮ হিজরী সনে। ওয়াসল্লাল্লহু তায়ালা আ'লা খইরি খলক্বিহী মুহাম্মদিঁউ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজ্মায়ীন। আমিন।

সূরা যুখ্রুফ

www.eelm.weebly.com

এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। এর রুকুর সংখ্যা ৭ এবং আয়াতের সংখ্যা ৮৯।

সূরা যুখ্‌রুফ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

❑ হা-মীম।
❑ শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের;
❑ আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় কুরআন, যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

তাফসীরে মাযহারী/৪৬৭

❑ ইহা তো রহিয়াছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে; ইহা মহান, জ্ঞানগর্ভ।
❑ আমি কি তোমাদিগ হইতে এই উপদেশবাণী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করিয়া লইব এই কারণে যে, তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?
❑ পূর্ববর্তীদের নিকট আমি বহু নবী প্রেরণ করিয়াছিলাম।
❑ এবং যখনই উহাদের নিকট কোন নবী আসিয়াছে উহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিয়াছে।
❑ যাহারা ইহাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল, তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম; আর এইভাবে চলিয়া আসিয়াছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হা-মীম। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের'। এখানে 'সুস্পষ্ট কিতাব' অর্থ কোরআন মজীদ। কেননা কোরআন সত্য পথের সন্ধান দেয় এবং সে পথচিহ্নকে করে সুপরিস্ফুট। আর কোরআনের অলৌকিকত্বের একমাত্র দাবি হচ্ছে কোরআনকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া এবং এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারা যে, এই কোরআনেই রয়েছে ইহ-পারত্রিক কল্যাণ।

'ওয়াল কিতাব' এর 'ওয়াও' বর্ণটি এখানে শপথমূলক। আর 'হা-মীম'কে যদি সে শপথের মাধ্যম ধরা হয়, তবে বলতে হয়, 'ওয়াও' হচ্ছে এখানে সংযোজক এবং এর পরবর্তী অংশটুকু হচ্ছে শপথের জবাবমূলক।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— আমি এটা অবতীর্ণ করেছি, আরবী ভাষায় কোরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো'। প্রকৃত কোরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র বক্তব্য-গুণ (সিফাতুল কালাম), যা ভাষার অমুখাপেক্ষী, অসৃষ্ট, অনাদি, আনুরূপ্যবিহীন ও বোধগম্যতার অতীত। সেকারণেই আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— অবতারিত কোরআনকে আমি দিয়েছি আরবী ভাষার রঙ, পোশাক বা প্রকাশ, যাতে তোমরা পাঠ করতে পারো এবং হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হও।

আল্লাহ্‌তায়ালা বিভিন্ন বিষয়ের শপথ করেছেন। অর্থাৎ সেগুলোকে বানিয়েছেন তাঁর আনুরূপ্যবিহীন এককত্বের স্বাক্ষ্য-প্রমাণ। আরবী ভাষার এই কোরআনের শপথও তিনি করেছেন। এটা এক অনন্যসাধারণ শপথ। কেননা শপথের মাধ্যমে (সুস্পষ্ট কোরআন) ও শপথকৃত বিষয় (আরবীতে কোরআন) এর মধ্যে এখানে জোরালো সম্পর্ক বিদ্যমান।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এটা তো রয়েছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে, এটা মহান, জ্ঞানগর্ভ।

এখানে 'উম্মুল কিতাব' অর্থ 'লওহে মাহফুজ। অন্য এক আয়াতে কথাটি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। যেমন 'বাল হুয়া কুরআনুম মাজীদ ফী লাওহিম্ মাহফুজ' (বরং তা হলো এমন সম্মানিত কোরআন, যা সুসংরক্ষিত রয়েছে লওহে মাহফুজে)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ সবার আগে সৃষ্টি করেছেন কলম। তারপর তাকে নির্দেশ দিয়েছেন লিখতে, যা কিছু তিনি সৃষ্টি করতে চান।

'লাদাইনা' অর্থ আমার নিকট। অর্থাৎ আল্লাহ্ যেমন আনুরূপ্যবিহীন, তেমনি আনুরূপ্যহীন তাঁর নৈকট্যও। সুতরাং তা বোধাতীত, জ্ঞানাতীত ও কল্পনাতীত।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো বিজ্ঞজন বলেছেন, এখানে 'লাদাইনা'র পূর্বে আর একটি শব্দ উহ্য রয়েছে 'মাহফুজান' (সংরক্ষিত)। অর্থাৎ কোরআন আমা কর্তৃক সুসংরক্ষিত বলে এর ভাব ও ভাষা সকল প্রকার পরিবর্তন, পরিযোজন ও পরিবিয়োজন থেকে মুক্ত।

'লাআ'লিয়্যুন' অর্থ এমন মহান ও মহামর্যাদাসম্পন্ন যে, জ্ঞান-বুদ্ধি তাকে স্পর্শ করবার ক্ষমতা রাখে না। অথবা এখানে কথাটির উদ্দেশ্য, এই কোরআন পূর্ববর্তী আকাশাগত গ্রন্থাবলীর তুলনায় অধিকতর অজেয়। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেছেন, আত্মিক উদ্ভাসনের (কাশফের) মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় যে, পূর্ববর্তী মহাগ্রন্থসমূহ যেনো বৃত্তের বিস্তৃতি, আর কোরআন হচ্ছে তার সুমহান কেন্দ্র। বলাই বাহুল্য যে, বিস্তারের মহিমা প্রকাশ করা সত্ত্বেও বৃত্ত তার কেন্দ্র অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাসম্পন্ন। যেমন চন্দ্র তার আলোকপরিমণ্ডল অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতির দৃষ্ট হলেও আলোকিত পরিপার্শ্ব অপেক্ষা মহত্ব ও মাহাত্ম তারই অধিক। আর 'হাকীম' অর্থ বিজ্ঞতা ও নিপুণতায় পরিপূর্ণ, অথবা এমতো অক্ষয়, যা অন্য কোনো বাণী দ্বারা আর রহিত হবে না' অর্থাৎ কোরআনই হচ্ছে সর্বশেষ মহাগ্রন্থ।

এরপরের আয়াতে (৫)বলা হয়েছে— 'আমি কি তোমাদের থেকে এই উপদেশবাণী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে নিবো এ কারণে যে, তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— না, উপর্যুপরি সীমালংঘন করে যাওয়া সত্ত্বেও আমি এই প্রত্যাদেশাবলী প্রত্যাহার করবো না।

'সফহান' হচ্ছে তাগিদপ্রদায়ক শব্দ। এর অর্থ পার্শ্বপরিবর্তন করা, মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, প্রত্যাহার করা।

'ইন্ কুনতুম ক্বওমাম্ মুস্রিফীন' অর্থ একারণে যে, তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? উল্লেখ্য, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সীমালংঘনের কারণে তাদের প্রতি বিমুখ না হওয়াই সমীচীন। কিন্তু এখানে অতিমাত্রায় কুফরী কাজে সীমালংঘন করাটাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করার কারণ স্থির করা হয়েছে। সেকারণেই প্রয়োগ করা হয়েছে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক বাক্য। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তোমরা কুফরীতে অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছো বলে কি আমি প্রত্যাদেশ প্রেরণ স্থগিত করবো? কোরআনের অবতরণপ্রবাহ বন্ধ করে দিবো? শুভ কাজের আদেশ দিবো না? অশুভ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলবো না?

কাতাদার ব্যাখ্যা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, অংশীবাদীরা যখন কোরআনকে মানতে অস্বীকার করলো, তখন যদি কোরআন প্রত্যাহার করে নেওয়া হতো, তবে ধ্বংস হয়ে যেতো সকল মানুষ। আল্লাহ্ তাই এরকম করেননি। বরং তার অপার করুণাবশে বিশ বৎসরেরও অধিক সময় ধরে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। মুজাহিদ ও সুদ্দী কথাটির অর্থ করেছেন এরকম— আমি তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবো, আর তোমরা পার পেয়ে যাবে— কী ভেবেছো তোমরা? যথোপযুক্ত শাস্তি দান ছাড়া তোমাদেরকে কি এমনি এমনি ছেড়ে দেবো?

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'পূর্ববর্তীদের নিকট আমি বহু নবী প্রেরণ করেছিলাম (৬) এবং যখনই তাদের নিকট কোনো নবী এসেছে, তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে (৭)। যারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিলো, তাদেরকে আমি ধ্বংস করে ছিলাম; আর এভাবে চলে এসেছে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত' (৮)। কথাগুলোর মাধ্যমে সান্ত্বনার বাণী শোনানো হয়েছে রসুল স.কে। যেনো বলা হয়েছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পীড়াদায়ক আচরণ দর্শনে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। এটা তাদের চিরাচরিত রীতি। আপনাকে যেমন এরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে চলেছে, তেমনি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো পূর্ববর্তী যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। তারাও বিদ্রূপবানে জর্জরিত করতো আমা কর্তৃক প্রেরিত নবী-রসুলগণকে। আর তারা মক্কাবাসী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চেয়েও ছিলো শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিকতর প্রবল। সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন। ধর্মপ্রচারের দায়িত্বপালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করবেন না। নিশ্চিত জানবেন, ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যেমন আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম, তেমনি আমার ইচ্ছামতো আমি এদেরকেও যে কোনো মুহূর্তে করবো পর্যুদস্ত। আর পূর্ববর্তী নবী-রসুলকে যেমন বিজয়ী করেছিলাম, তেমনি আপনাকেও দান করবো বিজয়।

'ওয়ামাদ্বা মাছালুল্ আউয়ালীন' অর্থ এভাবে চলে এসেছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত। বাক্যটির মাধ্যমে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যুগপৎ রসুল স. এর বিজয়ের শুভসংবাদ এবং তাঁর বিরুদ্ধপক্ষীয়দের ধ্বংসের হুমকি। অর্থাৎ পূর্ববর্তী জামানায় যেমন নবী-রসুলগণ ও তাদের শত্রুদের বিজয় ও পরাজয়ের ঘটনা ঘটেছিলো, তেমনি ঘটবে রসুল স. ও তাঁর শত্রুদের ক্ষেত্রেও।

সূরা যুখ্রুফ ঃ আয়াত ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

❑ তুমি যদি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে?' উহারা অবশ্যই বলিবে, 'এইগুলি তো সৃষ্টি করিয়াছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্',

❑ যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন শয্যা এবং উহাতে করিয়াছেন তোমাদের চলিবার পথ, যাহাতে তোমরা সঠিক পথ পাইতে পার;

❑ এবং যিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে। অতঃপর আমি তদ্দ্বারা সঞ্জীবিত করি নির্জীব জনপদকে। এইভাবেই তোমাদিগকে বাহির করা হইবে।

❑ আর যিনি সকল প্রকারের জোড়া যুগল সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও আন'আম, যাহাতে তোমরা আরোহণ কর,

❑ যাহাতে তোমরা উহাদের পৃষ্ঠে স্থির হইয়া বসিতে পার, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা উহার উপর স্থির হইয়া বস; এবং বল, 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি ইহাদিগকে আমাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না ইহাদিগকে বশীভূত করিতে।

❑ 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিব।'

❑ উহারা তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে তাঁহার অংশ সাব্যস্ত করিয়াছে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি মক্কার মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কে, দেখবেন তারা নির্দ্বিধায় জবাব দিচ্ছে, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্। অথচ দেখুন, সেই আল্লাহ্র সমকক্ষরূপে তারা পূজা-অর্চনা করে চলেছে তাদের প্রতিমাগুলোর। উল্লেখ্য, মক্কার মুশরিকেরা আল্লাহ্কেই সৃষ্টিকর্তা বলে জানতো, কিন্তু প্রতিমাপূজা করতো এই বিশ্বাসে যে, সেগুলো তাদের পক্ষে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবে। অথচ এটা যে স্পষ্টতই অংশীবাদিতা, তা তারা স্বীকার করতে চাইতো না।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যা এবং এতে করেছেন তোমাদের চলবার পথ, যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পারো'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ইতো তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যাসদৃশ স্বচ্ছন্দ বিচরণ ক্ষেত্র, যাতে তোমাদের বসবাস হয় স্বস্তিদায়ক; এবং এখানে তিনি পথচারীদের জন্য রেখেছেন সুগম পথের ব্যবস্থা, যাতে তোমরা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারো সহজে। এখানে 'সুবুলান' অর্থ যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পারো, যে পথ নির্ভুল গন্তব্যাভিমুখী।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'এবং যিনি আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন পরিমিতভাবে অতঃপর আমি তদ্দারা সঞ্জীবিত করি নির্জীব জনপদকে। এভাবে তোমাদেরকে বের করা হবে'।

এখানে 'বিক্বদরিন' অর্থ পরিমিতভাবে। আর এখানকার 'বের করা হবে' অর্থ বের করা হবে কবর থেকে। অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবসে যখন হজরত ইসরাফিল শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন, তখন প্রত্যেককে জীবিত করে বের করা হবে তাদের আপনাপন কবর থেকে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইস্রাফিলের প্রথম ও দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনির মধ্যেকার ব্যবধান হবে চল্লিশ। হাদিসটি শুনে লোকেরা হজরত আবু হোরায়রাকে জিজ্ঞেস করলো, হে রসুল-সহচর! 'চল্লিশ' মানে কী চল্লিশ দিন? তিনি বললেন, আমি তা বলতে পারবো না। তারা পুনঃ জিজ্ঞেস করলো, তাহলে কী চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, তা-ও জানি না। তারা আবার বললো, তাহলে কী চল্লিশ বৎসর? তিনি জবাব দিলেন, সে কথা বলার ক্ষমতাও আমার নেই। তবে রসুল স. বলেছেন, ওই সময় আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করবেন। তার ফলে কবরবাসীরা তাদের নিজ নিজ কবরে এমনভাবে উত্থিত হতে থাকবে, যেমনভাবে মাটিতে উদ্গত হয়ে থাকে শাক-সবজী। কেবল একটি হাড় ছাড়া মানুষের শরীরের অন্যান্য অংশ বিলীন হয়ে যায়। ওই হাড় হচ্ছে মেরুদণ্ডের হাড়। ওই হাড়ের সঙ্গেই নতুন শরীরকে জোড়া দেওয়া হবে পুনরুত্থানকালে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম ও সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তখন আরশের তলদেশ থেকে বের হয়ে আসবে এক উত্তম মরুদ্যান, ফলে মাটিতে মাথা তুলে দাঁড়াবে সকল বিচরণশীল প্রাণী, যেভাবে তরুশ্রেণী উদগত হয় মৃত্তিকাপৃষ্ঠে। তারপর আত্মাসমূহকে আদেশ করা হবে, দৃষ্টির অগোচরে নিজ নিজ দেহে অভ্যন্তরস্থিত হও। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন 'হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি! তুমি তোমার প্রতিপালনকর্তার দিকে ফিরে যাও পরিতুষ্ট ও পরিতোষভাজন হয়ে'।

হজরত আনাস থেকে আহমদ ও আবুল আলীয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান পর্বে সকলকে কবর থেকে ওঠানো হবে এবং আকাশ থেকে তাদের উপর বর্ষিত হবে হালকা বৃষ্টি।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আর যিনি সকল প্রকারের জোড়া যুগল সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও আনআ'ম যাতে তোমরা আরোহণ করো'। এখানে 'আযওয়াজ্বা' অর্থ যুগল সৃষ্টি। বিভিন্ন প্রজাতির জোড়া।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'যাতে তোমরা তাদের পিঠে স্থির হয়ে বসতে পারো, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন তোমরা তার উপর স্থির হয়ে বসো এবং বলো, পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে'।

'আ'লা জুহূরিহী' বাক্যে সর্বনামটি একবচন হলেও এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনার্থে। কেননা সর্বনামটির সম্পৃক্তি রয়েছে এখানকার 'যার উপর তোমরা স্থির হয়ে বসো' কথাটির সঙ্গে। আর 'যার উপর' অর্থ ওই সকল জলযান ও ভারবাহী পশুসমূহের উপর। বাহন যেহেতু একাধিক, তাই সেগুলোর আরোহীও নিশ্চয় হবে একাধিক। সেজন্যেই এখানে 'জুহূরিহী' অর্থ 'এর' না হয়ে হবে 'এদের'। অনুবাদে অবশ্য সেরকমই করা হয়েছে।

'ছুম্মা তাজকুরু' অর্থ অতঃপর স্মরণ করো। 'ওয়া তাকুলূ' অর্থ এবং বলো। অর্থাৎ মৌখিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বলো। আর 'মুক্বরিনীন' অর্থ বশীভূত করে দিয়েছেন। 'আক্বরানা' অর্থ বশীভূত করে দেওয়া। এর আক্ষরিক অর্থ সঙ্গী করে নেওয়া এবং সঙ্গী হতে পারে সে, যে অবাধ্য নয়। উল্লেখ্য, যে বলবান, তাকে দুর্বলের সঙ্গী বানানো যায় না। অথচ দ্যাখো মানুষের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন পশুরাও মানুষের বশীভূত। নিঃসন্দেহে তাদেরকে আল্লাহ্ই বশীভূত করে দিয়েছেন।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবো'।

পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমরা তাদের পিঠে স্থির হয়ে বসতে পারো। অর্থাৎ স্থির হয়ে বসে গমন করতে পারো নির্ধারিত গন্তব্যে। এভাবে সেখানে পার্থিব যাত্রার কথা বলে এই আয়াতে বলা হয়েছে পরকালীন যাত্রার কথা, যে যাত্রা অনিবার্য। অর্থাৎ শেষ যাত্রা হচ্ছে আল্লাহ্র নিকটে গমন।

আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী একবার তাঁর অশ্বের রেকাবে পা রেখে পাঠ করলেন বিস্মিল্লাহ্। এরপর অশ্বের পিঠে আরোহণ করে স্থির হয়ে বসে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্। তারপর পাঠ করলেন 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবো'। এরপর তিনবার করে উচ্চারণ করলেন 'আলহামদুলিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবর'। তারপর বললেন, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো প্রভুপালক নেই। নিশ্চয়ই আমি অপরাধী। তুমি আমার অপরাধ মার্জনা করো, কেননা তুমিই একমাত্র পাপমার্জনাকারী। এরপর তিনি মৃদু হাসলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! আপনার হাসির হেতু কী? তিনি বললেন, আমি রসুল স.কে এরকম করতে দেখেছি। বলতে শুনেছি, বান্দার এমতো মার্জনা প্রার্থনা আল্লাহ্ পছন্দ করেন।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ'।

এখানে বান্দাকে আল্লাহ্‌র অংশ সাব্যস্ত করার অর্থ— ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলা। মক্কার মুশরিকেরা এরকম বলতো। উল্লেখ্য, সন্তানেরা হয় তাদেরই পিতার ঔরসজাত। সেকারণেই পিতা-সন্তানেরা হয় একে অপরের অংশ। যেমন

হজরত মাসউদ ইবনে মাখরামা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ফাতেমা আমার অংশ। সুতরাং তাকে যে অতুষ্ট করবে সে আমাকেও অতুষ্ট করবে। আহমদ ও হাকেমের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— ফাতেমা আমার টুকরা। তাকে যে দুঃখ দেয়, সে আমাকে দুঃখ দেয়। আর তাকে যে তুষ্ট করে, সে আমাকেও তুষ্ট করে।

কথাটির সম্পর্ক রয়েছে ৯ সংখ্যক আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে। অর্থাৎ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা কে? এরকম জিজ্ঞাসার জবাবে তারা বলে, আল্লাহ্। অথচ ফেরেশতাদেরকে সাব্যস্ত করে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে। সুতরাং তাদের ধারণা অস্বচ্ছ, অপবিত্র ও স্ববিরোধী। কেননা সৃষ্টি কখনো আল্লাহ্‌র পিতা-পুত্র-কন্যা-ভার্যা হতেই পারে না। এরকম অপবিত্র বিশ্বাসের নামই তো অংশীবাদিতা, যা সম্পূর্ণতই নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য।

'মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ' অর্থ যে মানুষ আল্লাহ্‌র অংশীদার নির্ধারণ করে, তার চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ আর কেউ নয়। তার অজ্ঞতা সীমাহীন এবং ক্ষমার অযোগ্য। এখানে 'মুবীন' অর্থ সুস্পষ্ট। অর্থাৎ অংশীবাদীদের অজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতা দিবালোক অপেক্ষা অধিক দৃষ্টিগ্রাহ্য। সুতরাং তার শাস্তির অনিবার্যতার বিষয়টিও অস্পষ্ট কিছু নয়।

সূরা যুখ্‌রুফ ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

---

www.eelm.weebly.com

❑ তিনি কি তাঁহার সৃষ্টি হইতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বিশিষ্ট করিয়াছেন পুত্র সন্তান দ্বারা?

❑ দয়াময় আল্লাহ্‌র প্রতি উহারা যাহা আরোপ করে উহাদের কাহাকেও সেই সন্তানের সংবাদ দেওয়া হইলে তাহার মুখমণ্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে দুঃসহ মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়।

❑ উহারা কি আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ককালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ?

❑ উহারা দয়াময় আল্লাহ্‌র বান্দা ফিরিশ্‌তাদিগকে নারী গণ্য করিয়াছে; ইহাদের সৃষ্টি কি উহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল? উহাদের উক্তি অবশ্য লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

❑ উহারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে আমরা ইহাদের পূজা করিতাম না।' এ বিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান নাই; উহারা তো কেবল মনগড়া বলিতেছে।

❑ আমি কি উহাদিগকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করিয়াছি যাহা উহারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া আছে?

❑ বরং উহারা বলে, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি।'

❑ এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই আমি কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি তখন উহার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলিত, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি।'

❑ সেই সতর্ককারী বলিত, 'তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে যে পথে পাইয়াছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ আনয়ন করি তবুও কি তোমরা তাহাদের পদাংক অনুসরণ করিবে?' তাহারা বলিত, 'তোমরা যাহা সহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।'

❑ অতঃপর আমি উহাদিগ হইতে প্রতিশোধ লইলাম। দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হইয়াছে!

প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লেখিত প্রশ্নটি একই সঙ্গে ভীতিপ্রদর্শক ও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। তদুপরি এতে রয়েছে বিস্ময়াত্মক অভিব্যক্তি। তাছাড়া এর মধ্যে

ধ্বনিত হয়েছে অংশীবাদীদের অপবিত্র বিশ্বাসের জোর প্রতিবাদ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— অংশীবাদীরা কতোই না মূর্খ! তারা আল্লাহ্‌র অংশ সাব্যস্তকেই যথেষ্ট মনে করে না, উপরন্তু তাঁর জন্য নির্ধারণ করে এমন সন্তান, যা তারা নিজেরা পছন্দ করে না। আল্লাহ্ কি তবে তাদের সমকক্ষও নন যে, পুত্রাধিকারী হওয়াও তাঁর সাজেনা। সাজে কেবল কন্যাধিকারী হওয়া?

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'দয়াময় আল্লাহ্‌র প্রতি তারা যা আরোপ করে, তাদের কাউকে সেই সন্তানের সংবাদ দেওয়া হলে তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃসহ মর্মযাতনায় ক্লিষ্ট হয়'। একথার অর্থ— তারা নিজেরা কন্যা সন্তানের জনক হওয়াকে মনে করে অগৌরবের বিষয়। তাই কেউ তার কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণের সংবাদ পেলে তার মুখমণ্ডল অপমানের প্রভাবে হয়ে যায় কৃষ্ণবর্ণ। আর তারা দগ্ধ হতে থাকে অসহনীয় মর্মযাতনানলে।

এখানে 'দয়াময় আল্লাহ্‌র প্রতি তারা যা আরোপ করে' কথাটিকে উপস্থাপন করা হয়েছে উপমারূপে। 'মাছালা' বা সৃদশ শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সে কারণেই। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র সদৃশ হওয়াকেও মনে করে অপমানজনক। হতে চায় তাঁর চেয়ে উৎকৃষ্ট। সে কারণেই আল্লাহ্‌কে বানায় কন্যাসন্তানের জনক। আর নিজেরা পছন্দ করে পুত্রসন্তানের জনয়িতা হতে। সুতরাং তারা যে কোন পর্যায়ের অজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ তা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। এখানে 'কাজীম' অর্থ দুঃসহ মর্মযাতনাক্লিষ্ট।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'তারা কি আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলংকারে মণ্ডিত হয়ে লালিত পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ককালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ'? নারীরা সাধারণতঃ হয় সাজসজ্জাসর্বস্বা ও তীক্ষ্নধীবিচ্যুতা। মন এবং দেহও তাদের পুরুষাপেক্ষা কোমল ও দুর্বল। আরবীয়রা ছিলো যুদ্ধপ্রিয় জাতি। তাই তারা সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিতো পুরুষকে। একারণেই কন্যাসন্তানের জনক হওয়াকে তারা মনে করতো অপমানজনক। অথচ আল্লাহ্‌কে সৃজয়িতা ও পালয়িতা জানা সত্ত্বেও তাঁকে বানাতো কন্যাসন্তানের জনক। তাদের এমতো মূর্খতার চিত্রটির প্রতিই এখানে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সাথে সাথে এ বিষয়টির দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো পুরুষের জন্যই সমীচীন নয় যে, সে নারীর মতো সাজসজ্জাপ্রবণা হবে এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে করে রাখবে অকর্মণ্য অথবা অশাণিত। তাদের অন্তর-বাহির উভয় দিকই হতে হবে ধর্মবিধানসম্মত।

'তর্কবিতর্ককালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ' এরকম বলে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে মেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তিক অপরিণত অবস্থাকে। কাতাদা বলেছেন, কোনো রমণী তার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করাতে যেয়ে যখন তার পক্ষের প্রমাণ উপস্থাপন করতে শুরু করে, তখন সাধারণতঃ দেখা যায়, উপস্থাপিত প্রমাণ শেষ পর্যন্ত চলে গিয়েছে তারই বিপক্ষে।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতের প্রশ্নবোধক বাক্যটি একই সঙ্গে ভীতিপ্রদর্শক, বিস্ময়প্রকাশক ও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তারা বলে কী? আল্লাহ্ কি তবে তার সৃষ্টিকুলের মধ্যে এমন এক সৃষ্টিকে সন্তান করে নিলেন, যা তাদের ঘৃণার পাত্রী, যাদের জন্মসংবাদ শুনলে তাদের চেহারা কালো হয়ে যায়, তাদের মন হয়ে যায় দুঃখ-ভারাক্রান্ত এবং যারা হয় অলংকারসর্বস্বা- অবলা ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্না? আল্লাহ্র আযাবের সম্ভাবনা থেকে তারা কি এতোই নির্ভয়?

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তারা দয়াময় আল্লাহ্র ফেরেশতাদেরকে নারী গণ্য করেছে; এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিলো'? একথার অর্থ— আল্লাহ্র অংশীদার নির্ণয় করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ফেরেশতাদের সম্মানকে কলুষিত করতেও তারা পিছপা হয়নি। ফেরেশতারা আল্লাহ্র বিশেষ সৃষ্টি। তারা না নারী, না পুরুষ। তারা আল্লাহ্র সতত অনুগত এবং নির্ভুল ইবাদত-বন্দেগীতে রত। তারা পানাহারের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তারা নিষ্পাপ। তারা আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন বান্দা। অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কই নেই। অংশীবাদীরা এতোই অবিমৃশ্য, দুর্বিনীত ও দুর্বৃত্ত যে, আল্লাহ্র এমতো পবিত্র সৃষ্টিকে তারা সাব্যস্ত করে তার কন্যা বলে। অথচ তারা এদের সম্পর্কে কিছুই জানে না। জানবে কীভাবে? কখন কীভাবে আমি ফেরেশতাদের সৃষ্টি করি, তারা কি তা দেখেছে? তাহলে এমতো অপবিত্র বচন উচ্চারণ করে কোন সাহসে, যার সঙ্গে তাদের শ্রুতি, দৃষ্টি ও জ্ঞানের কোনো যোগসূত্রই নেই? আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে কি তারা এতোটাই নিঃশঙ্ক?

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের উক্তি অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে'। একথার অর্থ— তাদের এ সকল অংশীবাদদুষ্ট উক্তি অবশ্যই আমার আমল লেখক ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করে রাখবে এবং মহাবিচারের দিবসে তাদেরকে এজন্য কঠোর জবাবদিহি করতে হবে। এর অন্যথা হওয়া অসম্ভব।

কাতাদা সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, কিছুসংখ্যক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বলে বেড়াতো, জ্বিন জতির সঙ্গে রয়েছে আল্লাহ্র বৈবাহিক সম্পর্ক এবং ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। তাদের এমতো অপমন্তব্য খণ্ডনার্থে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

কালাবী ও মুকাতিল সূত্রে বাগবী লিখেছেন, মক্কার পৌত্তলিকরা 'ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা' এরকম বলাতে একদিন রসুল স. তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা একথা জানলে কীভাবে? তারা বললো, আমরা এরকম শুনেছি আমাদের গুরুজনদের কাছ থেকে। আর আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের গুরুজনবচন নির্ভুল। তাদের এমতো মূর্খোক্তির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে ওই আয়াত।

এর পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা করতাম না'।

এখানে 'এদের পূজা করতাম না' অর্থ ফেরেশতাদের পূজা করতাম না। এরকম বলেছেন কাতাদা, মুকাতিল ও কালাবী। মুজাহিদ কথাটির অর্থ করেছেন— পূজা করতাম না মূর্তির।

এরপর বলা হয়েছে— 'এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই; তারা তো মনগড়া কথা বলছে'। একথার অর্থ— ফেরেশতা অথবা প্রতিমার পূজা যে নিষিদ্ধ, অবশ্যপরিহার্য এবং শাস্তিযোগ্য, সে বিষয়ে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-সুস্থবিবেকবোধ কোনোটাই নেই। আল্লাহ্ তো কখনোই কাউকে এরকম বলেননি। এ হচ্ছে তাদের স্বকপোলকল্পনা। তারা যা খুশী তাই বলে এবং মনগড়া পথে চলে। এখানে 'ইয়াখ্রুসূন' অর্থ চিন্তা-ভাবনা না করেই যা খুশী তাই মন্তব্য করে, মনগড়া কথা বলে।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে কোনো কিতাব দান করেছি, যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে'? আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিলো' কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা কি ফেরেশতাদের সৃজনপ্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছিলো, অথবা তাদের কাছে কি কোরআনের আগে অন্য কোনো কিতাব আমি অবতীর্ণ করেছিলাম, যার মাধ্যমে তারা একথা প্রমাণ করতে পারবে যে, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা এবং প্রতিমাদের কাজ তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশ করা?

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'বরং তারা বলে, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি'। একথার অর্থ— অংশীবাদিতার পক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণই তাদের নেই। ফেরেশতাদেরকে তারা আল্লাহ্র কন্যা বলে, পূজা করে প্রতিমার, অথচ তারা ফেরেশতাদের সৃষ্টি যেমন প্রত্যক্ষ করেনি, তেমনি তাদের প্রতি ইতোপূর্বে কোনো কিতাবও অবতীর্ণ হয়নি, তাই তাদের অপধর্মাদর্শের পক্ষে তারা কেবল এতটুকুই বলতে পারে যে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এরকম করতে দেখেছি। সুতরাং একথা বলতে আর কোনো বাধা নেই যে, তাদের মতাদর্শ ও কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণতই কুসংস্কার ও অন্ধ-অনুকরণ নির্ভর।

এখানে 'আ'লা উম্মাতিন' অর্থ এক মতাদর্শের অনুসারী। এভাবে এখানে অংশীবাদীদের ইচ্ছাকে চিহ্নিত করা হয়েছে সমমতাদর্শানুসারী একটি সম্প্রদায়রূপে। যেমন রাহবার বলে ওই ব্যক্তিকে, যার দিকে লোকেরা ছুটে যায়। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'উম্মাত' অর্থ পরিচালক (ইমাম)। আর এখানকার 'আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি' অর্থ আমরা আমাদের

www.eelm.weebly.com

পূর্বপুরুষদের মতাদর্শকেই মনে করি অভ্রান্ত। তাই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি হৃষ্টচিত্তে। বলাবাহুল্য, তাদের এমতো অপবচনে ফুটে উঠেছে তাদের অযৌক্তিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয়।

তাফসীরে মাযহারী/৪৭৮

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এভাবে তোমার পূর্বে কোনো জনপদে যখনই আমি কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখন তাদের সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলতো, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি'। কথাটির মধ্যে রয়েছে রসুল স. এর জন্য সান্ত্বনার বাণী। যেনো বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! আপনার সম্প্রদায়ের অংশীবাদীরা তাদের অংশীবাদিতার সমর্থনে যেমন তাদের বাপ-দাদাদের দোহাই দেয়, পূর্ববর্তী যুগের অংশীবাদী সম্প্রদায়গুলোও সেরকম করতো। সুস্থ বিচার-বুদ্ধিকে কাজে না লাগিয়ে প্রত্যাখ্যান করতো তাদের প্রতি প্রেরিত নবী-রসুলগণকে। আর তাদের মধ্যে যারা বিত্তবান, তারাই এ ব্যাপারে ছিলো অগ্রণী। জেনে রাখুন, এটাই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চিরাচরিত স্বভাব। সুতরাং আপনি ব্যথিত হবেন না। সহিষ্ণুতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করে চলুন সত্যধর্ম প্রচারের দায়িত্ব। ফলাফল নির্ধারক তো আমি।

এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করায় একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ঐশ্বর্যপ্রিয়তাই হচ্ছে সকল মিথ্যাচারের ভিত্তি। বিত্তলিপ্সুরা হারিয়ে ফেলে সুস্থ বিবেচনা বোধ। হয়ে যায় অন্ধ অনুকরণের পুরোধা।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'সেই সতর্ককারী বলতো, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছো, আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে'? একথার অর্থ— তাদের প্রতি প্রেরিত নবী-রসুলগণ তাদের শুভবোধ জাগ্রত করবার জন্য অনেক চেষ্টা করতো। বলতো, না জেনে, না শুনে, না বুঝে কোনো কাজ করা কি ঠিক? অথচ তোমরা তো সেরকমই করে চলেছো। সত্যমিথ্যার প্রভেদ নির্ণয়ের জন্য সামান্য ভাবনা-চিন্তাও করতে চাইছো না। এক কথায় বলে দিচ্ছো, বাপদাদাদের ধর্মাদর্শ ছাড়া অন্য কোনো ধর্মাদর্শ আমরা মানিই না। কেনো? বিচার বিশ্লেষণ করে কোনোকিছু গ্রহণ করা কি দোষের, না প্রশংসার ভেবে চিন্তে দ্যাখো, আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মমত অপেক্ষা উত্তম কোনো ধর্মমত এনেছি কিনা? যদি আনি, তবুও কি তোমরা আগের মতোই নিকৃষ্টতাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে? জবাবে তারা বলতো, তুমি কী নিয়ে এসেছো, না এসেছো তা আমরা জানতেও চাই না। আমরা তোমাকে মানিই না। আর তোমার মতো যারা, তাদের সকলকেই আমরা প্রত্যাখ্যান করি।

এখানে 'সেই সতর্ককারী' বলে বুঝানো হয়েছে পূর্ববর্তী যুগের কোনো একজন নবীকে অথবা সকল নবীর পথপ্রদর্শন পদ্ধতির দৃষ্টান্তরূপে তাঁদের যে কোনো একজনকে। অর্থাৎ তাঁদের আহ্বান ছিলো এরকম। কিংবা কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে কেবল রসুল স.কে। বক্তব্যের গতিপ্রবাহ অবশ্য প্রথমোক্ত অভিমতটিকে সমর্থন করে। কেননা পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম'। কথাটি অতীতকালবোধক। সুতরাং প্রথমোক্ত মতটিই সঠিক।

তাফসীরে মাযহারী/৪৭৯

'তবুও কি তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে' প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ উৎকৃষ্টতর পথনির্দেশ যদি আমি এনেই থাকি, তবে তো তোমাদের উচিত তাদের অন্ধঅনুকরণ থেকে সরে আসা। আর এখানকার 'উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ' অর্থ অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য ও শুদ্ধ ধর্মমত। এখানে বিশেষ্য রয়েছে উহ্য।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম। দ্যাখো, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কী হয়েছে'? একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! ওই সকল উদ্ধত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে কিন্তু আমি রেহাই দেইনি। যথাসময়ে কার্যকর করেছি প্রতিশোধ। ফলে পৃথিবীতেই তারা হয়েছে লাঞ্ছিত ও ধ্বংস। পরবর্তী পৃথিবীর লাঞ্ছনা ও মর্মন্তুদ শাস্তি তো রয়েছেই। দেখুন, মিথ্যাচারীরা এভাবেই বিনাশ হয়ে যায়। সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকুন যে, আপনার বিরুদ্ধাচারীদের বিনাশও অবধারিত।

সূরা যুখ্‌রুফ ঃ আয়াত ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

---

www.eelm.weebly.com

❑ স্মরণ কর, ইবরাহীম তাহার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা যাহাদের পূজা কর তাহাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই;

❑ 'সম্পর্ক আছে শুধু তাঁহারই সহিত, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিবেন।'

❑ এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রাখিয়া গিয়াছে তাহার পরবর্তীদের জন্য, যাহাতে উহারা প্রত্যাবর্তন করে।

❑ বরঞ্চ আমিই উহাদিগকে এবং উহাদের পূর্বপুরুষদিগকে দিয়াছিলাম ভোগের সামগ্রী, অবশেষে উহাদের নিকট আসিল সত্য এবং স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল।

❑ যখন উহাদের নিকট সত্য আসিল, উহারা বলিল, 'ইহা তো জাদু এবং আমরা ইহা প্রত্যাখ্যান করি।'

❑ এবং ইহারা বলে, 'এই কুরআন কেন নাযিল করা হইল না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর?'

❑ ইহারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বন্টন করে? আমিই উহাদের মধ্যে উহাদের জীবিকা বন্টন করি, পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে; এবং উহারা যাহা জমা করে তাহা হইতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

❑ সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হইয়া পড়িবে, এই আশংকা না থাকিলে দয়াময় আল্লাহ্কে যাহারা অস্বীকার করে, উহাদিগকে আমি দিতাম উহাদের গৃহের জন্য রৌপ্য-নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি যাহাতে উহারা আরোহণ করে,

❑ এবং উহাদের গৃহের জন্য দরজা ও পালঙ্ক— যাহাতে উহারা হেলান দিয়া বিশ্রাম করিতে পারে,

❑ এবং স্বর্ণ নির্মিতও। আর এই সকলই তো শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার। মুত্তাকীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে আখিরাতের কল্যাণ।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এবার শুনুন নবী ইব্রাহিমের বৃত্তান্ত। তিনিও তাঁর পৌত্তলিক পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়ের পৌত্তলিক জনতাকে সত্যের আহ্বান জনিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমাদের প্রতিমাপূজার সঙ্গে আমার

www.eelm.weebly.com

বিশ্বাসগত ও কর্মগত কোনো প্রকার যোগসাজশ নেই। আমার বিশ্বাস ও উপাসনার সম্পর্ক রয়েছে কেবল সেই মহসৃজয়িতার সঙ্গে, যিনি আমাকে সৃজন করেছেন। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আমাকে শুভপথে পরিচালিত করবেনই।

এখানকার 'বারাউ' শব্দটি একটি ধাতুমূল। তাই এর দ্বিবচন, বহুবচন কোনোটাই হয় না। এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষণীয় শব্দরূপে এবং

আধিক্য প্রকাশক হিসেবে। আর এখানকার 'মিম্মা তা'বদূন' এর 'মা' ধাত্যর্থে ব্যবহৃত। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— তোমার এই পূজায় আমি অপরিতুষ্ট। অথবা এখানকার 'মা' হচ্ছে যোজক অব্যয়। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— তোমাদের মিথ্যা উপাস্যগুলোর প্রতি আমি ত্যক্ত-বিরক্ত। অর্থাৎ এগুলোর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। উল্লেখ্য, মক্কার পৌত্তলিকেরা দাবি করতো, তারা তাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মমতানুসারী। তাই এখানে হজরত ইব্রাহিমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে। এভাবে তাদেরকে এটাই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, দ্যাখো, নবী ইব্রাহিম তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়ের লোকদেরকে কী বলেছিলেন। তিনি তো তাঁর পিতার অন্ধ অনুকরণ করেননি। সুতরাং তোমরা তোমাদের সেই প্রধান পিতৃপুরুষের অনুসরণ করো না কেনো? অথবা এখানে রসুল স.কেই অনুসরণ করতে বলা হয়েছে হজরত ইব্রাহিমের আদর্শের। যেনো বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! নবী ইব্রাহিম তাঁর পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের সম্মুখে যেমন পৌত্তলিকতার প্রতি প্রকাশ করেছিলেন চরম অসন্তোষ, আপনিও তেমন করুন। বলুন, পৌত্তলিকতার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। আমার বিশ্বাস তো সম্পৃক্ত মহাবিশ্বের মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতা আল্লাহ্‌র সঙ্গে। অবশ্যই তিনি আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন'।

'ইল্লাল্ লাজী ফাত্বরাণী' অর্থ যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি ব্যতীত। ব্যতিক্রমী অব্যয়টি এখানে যুক্তক অথবা বিযুক্তক। কারণ, পূর্ববর্তী বাক্য 'মা তা'বুদূ' এর 'মা' অব্যয়টি সেখানে ব্যাপকার্থক, অথবা বিশেষণার্থক। আর 'সাইয়াহ্‌দীন' অর্থ সৎপথে পরিচালিত করবেন। অর্থাৎ তাঁর মারেফাতের ক্রমোন্নতির মর্যাদাপূর্ণ স্তরসমূহ দান করবেন।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গিয়েছে তাঁর পরবর্তীদের জন্য, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে'। একথার অর্থ— নবী ইব্রাহিমের এমতো উপপ্লবাত্মক বাণীটি মহামানবতার জন্য একটি অক্ষয় আদর্শ হয়ে রয়েছে, যাতে যুগে যুগে মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে আল্লাহ্‌র এককত্বসম্ভূত বিশ্বাসকে এবং পৌত্তলিকতার প্রতি প্রকাশ করতে পারে তাদের চরম বিরাগ। একইভাবে যেনো ঘোষণা দিতে পারে— তোমরা যাদের পূজা করো, তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমার সম্পর্ক আছে শুধু তাঁর সঙ্গে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।

এখানকার 'জ্বাআ'লাহা' কথাটির 'হা' সর্বনাম হজরত ইব্রাহিমের ঘোষণাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কাতাদা বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের বংশধারায় সর্বযুগে একত্ববাদিতাসম্ভূত বিশ্বাস ও সাধনা উচ্চকিত হতে থাকবে। কুরতুবী আবার এখানকার 'জ্বাআ'লা' এর কর্তা সাব্যস্ত করছেন আল্লাহ্‌কে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্ হজরত ইব্রাহিমের বিপ্লবী বাণীকে স্থায়ী করে রেখেছেন পরবর্তীদের জন্য। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানকার 'বাণী' (কলিমাতুন)

অর্থ 'আমি নতি স্বীকার করি বিশ্বসমূহের প্রভুপালয়িতার নিকটে'। কথাটি হজরত ইব্রাহিমের। তিনি তাঁর বর্ণনাকালে 'সাম্মাকুমুল মুস্‌লিমীন' এই আয়াতখানিও পাঠ করেছেন।

'লাআ'ল্লাহুম ইয়ারজ্বিউন' অর্থ যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি নবী ইব্রাহিমের অক্ষয় বচনটি আপনার সম্প্রদায়ভূতদেরকে পাঠ করে শোনান, যাতে তাদের চৈতন্যোদয় ঘটে এবং কায়মনোবাক্যে ফিরে আসতে পারে চিরন্তন বিশ্বাসের ছায়ায়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'বরঞ্চ আমিই তাদেরকে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে দিয়েছিলাম ভোগের সামগ্রী, অবশেষে তাদের নিকট এলো সত্য এবং স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসুল (২৯) যখন তাদের নিকট সত্য এলো, তারা বললো, এটা তো যাদু এবং আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করি' (৩০)। একথার অর্থ— বরং আমি মক্কার পৌত্তলিক ও তাদের পৌত্তলিক পূর্বপুরুষদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি না দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি। পৃথিবীসম্ভোগ করতে দিয়েছি কয়েক পুরুষ ধরে। শেষে তাদের মধ্যে প্রেরণ করলাম শেষ প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ কোরআন, কিন্তু তারা তা গ্রহণ করলো না। উল্টো কোরআনকে বললো যাদু। সরাসরি একথাও জানিয়ে দিলো যে, আমরা এ গ্রন্থকে অগ্রাহ্য করি।

এখানে 'সত্য' অর্থ কোরআন মজীদ। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'সত্য' অর্থ ইসলাম। 'হাজা সিহ্‌রুন' অর্থ এটা তো যাদু। উল্লেখ্য, কোরআনের অনুরূপ বাণী নির্মাণে তারা অক্ষম ছিলো বলেই বিদ্বেষবশতঃ কোরআনকে বলতো যাদু। আর 'রসূলুম্ মুবীন' অর্থ স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসুল। অথবা এমন রসুল, যিনি অলৌকিকত্ব প্রদর্শক, দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র এককত্ব প্রমাণক, কিংবা আল্লাহ্‌র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা প্রকাশক।

www.eelm.weebly.com

জুহাক সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. যখন মক্কাবাসীদের কাছে নিজেকে রসুল বলে প্রকাশ করলেন, তখন তাদের অধিকাংশই তাঁর দাবিকে অস্বীকার করলো। বলতে শুরু করলো, আল্লাহ্‌র মহিমা অতি উচ্চ। তাই তিনি কোনো মানুষকে রসুল করে পাঠাতে পারেন না। তখন অবতীর্ণ হলো 'মানুষের কাছে এটা কী আশ্চর্যের যে, আমি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি তাদেরই মধ্য থেকে একজনের কাছে। অথচ আপনার পূর্বে আমি যাদেরকে রসুল করে পাঠিয়েছি, তারা সকলেই ছিলো পুরুষ ও মনুষ্যসম্প্রদায়ভূত'। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা কিছুটা দমে গেলো। তারপর উত্থাপন করলো নতুন বাহানা। বললো, ঠিক আছে, মানুষের মধ্য থেকেই যদি রসুল প্রেরণ করতে হয়, তবে তো রসুল করা উচিত প্রবীণ ও নেতৃস্থানীয় কাউকে। পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের এমতো অপমন্তব্য ও তার জবাব।

বলা হয়েছে— 'এবং তারা বলে, এই কোরআন কেনো নাজিল করা হলো না দুই জনপদের কোনো প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর (৩১)? তারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বন্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি, পার্থিব

জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; এবং তারা যা জমা করে তা থেকে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর' (৩২)।

এখানে 'দুই জনপদ' অর্থ মক্কা ও তায়েফ। আর প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি অর্থ প্রভাবে-প্রতাপে ও ধনসম্পদে অগ্রণী। পৌত্তলিকেরা মনে করতো, রেসালাত যেহেতু একটি অত্যন্ত উচ্চপদমর্যাদা, সেহেতু তা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরই পাওয়া উচিত। কিন্তু তারা একথা বুঝতে পারতো না, পদমর্যাদাটি পার্থিব প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ আধ্যাত্মিকতা ও পার্থিবতা সমতুল নয়। আর আল্লাহতায়ালাই ভালো জানেন, রেসালতের মতো গুরুদায়িত্ব বহনের উপযোগী কে? তাই তিনি যোগ্য ব্যক্তিকেই দান করেন তাঁর রেসালত। অথবা এ ব্যাপারে তাঁর অভিপ্রায়ই মূল কথা। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাঁকেই তাঁর রসুল করে নেন। যুগপৎ তাঁকে দান করেন যোগ্যতা ও দায়িত্ব এবং দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত সামর্থ্য। ফলে মানুষ হয়েও তাঁরা হন স্বতন্ত্র ধরনের মানুষ, যাঁরা সত্যপ্রিয়, অসমসাহসী, দৃঢ়চেতা, অজেয় ও নিষ্পাপ।

ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা বলতো, কোরআন যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ হতো, তবে তা মোহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ না হয়ে অবতীর্ণ হতো আমার উপর, অথবা ইবনে মাসউদ সাকাফীর উপর। তাদের এমতো অপবচনটিই উল্লেখ করা হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতখানিতে। বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, মুশরিকেরা মনে করতো, মক্কার উতবা ইবনে রবীয়া অথবা তায়েফের আবদে ইয়ালীল এর উপরে কোরআন অবতীর্ণ হওয়াই ছিলো সমীচীন। কেউ কেউ বলেছেন, তারা মনে করতো, কোরআন অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিলো মক্কার ওলীদ ইবনে মুগীরা, অথবা তায়েফের হাবীব ইবনে আমর ও ইবনে উবায়েদ সাকাফীর উপর। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় সমর্থন রয়েছে শেষোক্ত অভিমতটির।

'এরা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বন্টন করে' কথাটির অর্থ হে আমার রসুল! ওই সকল লোক বলে কী? তারা কি আল্লাহ্‌র সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ রেসালাতকে নিজেরাই ইচ্ছেমতো ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে চায়? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের স্বকপোলকল্পনার মূলোৎপাটন এবং তাদের অজ্ঞতার উপর বিস্ময়প্রকাশ।

'আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করি' অর্থ— আমিই বণ্টন করি তাদের জীবনোপকরণ। অথচ নবুয়ত বণ্টন করবে অন্য কেউ, এ-ও কি হয়? না হওয়া সমীচীন? ইহ-পারত্রিক কল্যাণসমূহের আমিই তো একমাত্র বণ্টনকারী। আমিই তো একমাত্র দাতা। আর অন্য সকলে তো গ্রহীতা মাত্র।

'একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে' অর্থ বিদ্যায়, ধনে এবং অন্যান্য বিষয়ে আমিই মানুষকে করি এককে অন্যের চেয়ে উন্নত, যাতে করে উন্নত ব্যক্তিরা হতে পারে পৃথিবীর ব্যক্তিক

ও সামষ্টিক কর্মকাণ্ডের পরিচালক এবং অনুন্নতরা হতে পারে তাদের সহায়ক। এভাবে সচল, সবল ও সফল হতে পারে মানুষের সমাজ। সবাই সমান হলে তো কেউ কারো কথা শুনতো না। ফলে জীবনযাত্রা হয়ে যেতো স্থবির। কাতাদা ও জুহাক বলেছেন, মানুষ অর্থ ও প্রতিপত্তি বলে অন্যকে অধীনস্থ করতে পারে বটে, কিন্তু তাতে করে নিজের বা অন্যের রিজিক কমবেশী করতে পারে না। কেবল আল্লাহ্ই করতে পারে জীবনোকরণের সংকোচন ও প্রসরণ।

'তারা যা জমা করে, তা থেকে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর' অর্থ পার্থিব বিত্ত-অর্থ-প্রভাব-প্রতিপত্তি, যা মানুষ কুক্ষিগত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, তা থেকে নবুয়ত অসংখ্য গুণ উৎকৃষ্ট। অর্থাৎ পার্থিব শ্রেষ্ঠত্ব যেমন আল্লাহ্ না দিলে কেউ পায় না, তেমনি নবুয়তও আল্লাহ্ না দিলে কারো পাবার উপায় নেই। সুতরাং নবুয়ত কাকে দিতে হবে, না হবে সে সম্পর্কে তারা কথা বলতে চায় কোন যুক্তিতে। কোন সাহসে মন্তব্য করে, প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর কোরআন নাজিল করা হলো না কেনো?

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, এই আশংকা না থাকলে দয়াময় আল্লাহ্‌কে যারা অস্বীকার করে, তাদেরকে আমি দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্যনির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যাতে তারা আরোহণ করে (৩৩) এবং তাদের গৃহের জন্য দরোজা ও পালঙ্ক— যাতে তারা হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে পারে (৩৪) এবং স্বর্ণনির্মিতও। আর এই সকলই তো পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার। মুত্তাক্বীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে আখেরাতের কল্যাণ' (৩৫)।

এখানে 'আন্‌নাস্‌' অর্থ মনুষ্যজাতি। 'উম্মাতান ওয়াহিদাতান' অর্থ এক মতাবলম্বী। 'সুক্বুফান্‌' অর্থ ছাদ। শব্দটি 'সাক্বফুন'এর বহুবচন। যেমন 'দাহনুন' এর বহুবচন 'দুহুনুন'। আবু উবায়দা বলেছেন, এরকম তৃতীয় কোনো দৃষ্টান্ত আর নেই। কেউ কেউ বলেছেন, 'সুক্বুফুন' বহুবচন 'সাক্বীফুন' এর। আবার কারো কারো কাছে 'সুক্বুফুন্‌' হচ্ছে বহুবচনের বহুবচন। 'মাআ'রিজ' অর্থ সিঁড়ি, সোপান। 'আ'লাইহা ইয়াজহারুন' অর্থ তার উপর আরোহণ করে। 'ওয়া সুরুরা' অর্থ পালঙ্ক, রৌপ্যনির্মিত শয্যা। 'সুরুরুন' হচ্ছে 'সারীর' এর বহুবচন। 'যুখ্‌রুফান' অর্থ স্বর্ণনির্মিত। অন্য এক আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'সৌন্দর্য' অর্থে। এভাবে এখানকার বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— স্বর্ণ-রৌপ্য ও পার্থিব সুখোপকরণসমূহ আল্লাহ্‌র কাছে অতি তুচ্ছ। এসকলকিছু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দেওয়াই ছিলো সমীচীন। কিন্তু এতে করে সকল মানুষেরই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আমি বিশ্বাসীদেরকেও এগুলোর মধ্যে অংশ দিয়েছি। তৎসত্ত্বেও বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদেরকে একথা ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, এসবকিছু হচ্ছে পার্থিব ভোগোপকরণ, যা অবক্ষয়প্রবণ, অস্থায়ী। প্রকৃত কল্যাণ হচ্ছে আখেরাতের কল্যাণ। যা আল্লাহ্‌ জমা করে রেখেছেন মুত্তাকীদের জন্য।

এখানকার 'মুত্তাকিদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে আখেরাতের কল্যাণ' কথাটির মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মর্যাদাধারী যে ব্যক্তি আখেরাতে মর্যাদাসম্পন্ন। আর কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিতটিও রয়েছে যে, পৃথিবীর সুখোপকরণসমূহ বিশ্বাসী কিংবা অবিশ্বাসী কাউকেই এককভাবে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকেও এর অংশীদার করা হয়েছে। পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহ্‌র কাছে কিছুটা মূল্যবান হলেও নিশ্চয় এতে তিনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কোনো অংশ রাখতেন না।

হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকে তিরমিজি ও জিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়ার ওজন যদি মাছির পাখার সমানও হতো, তাহলে তিনি এখানে কাফেরদেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না। অন্য এক বর্ণনায় 'এক ঢোক পানি'র স্থলে এসেছে 'এক বিন্দু পানি'র কথা।

হজরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ ফাহরী বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর সঙ্গে একই বাহনে আরোহী হয়েছিলাম। পথ চলতে চলতে আমরা এক স্থানে দেখলাম, মাটিতে পড়ে রয়েছে একটি বকরীর মৃত বাচ্চা। তিনি স. সেটার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তোমরা কি বুঝতে পারছো, মূল্যহীন বলেই গৃহকর্তা এটাকে গৃহের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, গৃহকর্তার নিকটে এটা যেমন মূল্যহীন, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে দুনিয়া তদপেক্ষাও অধিক মূল্যহীন।

আবু নাঈম লিখেছেন, দাউদ ইবনে হেলাল হানবী বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের আকাশী পুস্তিকায় লেখা আছে, হে পৃথিবী! তুমি পুণ্যবানদের সম্মুখে লজ্জিত হয়ে আসো। তৎসত্ত্বেও তুমি তাদের দৃষ্টিতে খুবই তুচ্ছ। তাদের হৃদয়ে আমি তোমার জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছি ঘৃণা। তাইতো তারা তোমার প্রতি বিমুখ। আমার সৃষ্টির মধ্যে তোমার চেয়ে হীন আমি কাউকে করিনি। সেকারণেই তুমি সর্বাবস্থায় তুচ্ছ এবং ক্রমান্বয়ে তুমি এগিয়ে যাচ্ছো ধ্বংসের দিকেই। তোমার সৃষ্টির সূচনালগ্নেই আমি একথা স্থির করে দিয়েছিলাম যে, তুমি কারো জন্য চিরকাল থাকবে না এবং তোমার জন্যও কেউ চিরদিন অপেক্ষা করবে না, সে তোমার প্রীতিভাজন অথবা বিরাগভাজন, যে-ই হোক না কেনো। যারা আমার সন্তোষাধিষ্ঠিত হয়ে অন্তরের অন্তঃস্থল দিয়ে আমাকে দ্যাখে, তাদের জন্য সেই প্রতিদানই উত্তম, যা আমার কাছে রয়েছে। তারা যখন কবর থেকে উঠে আমার কাছে আসবে, তখন তদের ইমানের নূর চলতে থাকবে তাদের আগে আগে। ফেরেশতারাও তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে। তখন আমি তাদেরকে পৌঁছে দিবো আমার ওই অনুগ্রহ পর্যন্ত, যার কামনা তারা করতো।

হজরত জাবের থেকে জিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দুনিয়া অভিশপ্ত এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে, তা-ও, কেবল ওই সকল বিষয় ছাড়া, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (যেমন ইমান, ইসলাম, কিতাব, রসুল, পুণ্যকর্ম)। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মাজা এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিবরানী

হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— কেবল আল্লাহ্‌র জিকির, জিকিরের উপকরণসমূহ, ধর্মীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ছাড়া। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বাযযারের বর্ণনায় এসেছে এভাবে— কেবল শুভকর্মের নির্দেশ-অশুভকর্মের নিষেধ এবং আল্লাহ্‌র জিকির

www.eelm.weebly.com

ছাড়া। আবু দাউদ সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন এভাবে— কেবল ওই সকল সৎকর্ম ও সৎবাণী ব্যতীত, যা আল্লাহ্‌র পরিতোষ অর্জনের সহায়ক।

জননী আয়েশা থেকে আহমদ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, পৃথিবী হচ্ছে তার কর্মস্থান, পরকালে যার কোনো আবাসস্থল নেই। আর পৃথিবী হচ্ছে তার সম্পদ, পরকালে যার কোনো সম্পদ নেই। আর পৃথিবীর সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখতে ভালোবাসে তারা, যাদের কোনো জ্ঞান নেই। পরিণতসূত্রে বায়হাকী হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবী হচ্ছে বিশ্বাসীগণের জন্য কারাগার এবং কারাগারের ছোট-খাট স্বপ্ন। যখন সে পৃথিবী পরিত্যাগ করে, তখনই ঘটে তার কারামুক্তি এবং স্বপ্নমুক্তি। আহমদ, তিবরানী, হাকেম, আবু নাঈম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ, তিরমিজি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দুনিয়া হচ্ছে মুমিনদের কয়েদখানা এবং কাফেরদের জান্নাত। হজরত সালমান থেকে বায়হাকী, হাকেম এবং হজরত ইবনে ওমর থেকে বাযযারও এরকম বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসের মর্মার্থ হচ্ছে— পরকালে যে সকল সুখসুবিধা বিশ্বাসীদের জন্য জমা আছে, তার তুলনায় পৃথিবীর আরাম আয়েশ তাদের কাছে বন্দী জীবনে কোনো রকম বেঁচে থাকার মতো। পক্ষান্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পৃথিবীতে যতোই দুঃখযাতনা ভোগ করে থাকুক না কেনো, পরকালের দুঃখকষ্টের তুলনায় তা জান্নাতের মতো। আল্লাহ্‌ই সর্ববিষয়ে অবগত।

একটি প্রশ্ন ঃ 'মসনদ-উল-ফেরদাউস' রচয়িতা হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবী পরকালপ্রত্যাশীদের জন্য নিষিদ্ধ, পরবর্তী পৃথিবী পৃথিবীপ্রত্যাশীদের জন্য নিষিদ্ধ এবং উভয় পৃথিবী নিষিদ্ধ আল্লাহ্‌প্রত্যাশীদের জন্য। এ কথার অর্থ কী?

জবাব ঃ আমি বলি, হাদিসটির মর্মার্থ এরকম নয় যে, পৃথিবীর ধন-সম্পদ বৈধভাবে অর্জন করা নিষিদ্ধ। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, পৃথিবীর ধন-সম্পদের জন্য হৃদয়ের আকর্ষণ নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ্‌ এরশাদ করেছেন 'আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের জন্য পৃথিবীর সাজসজ্জা এবং পবিত্র আহার্যকে হারাম করেননি'। তবে হ্যাঁ, প্রকৃত ভোগাস্বাদ অবশ্য আখেরাতের জন্যই নির্দিষ্ট। সুতরাং বুঝতে হবে দুনিয়ার মহব্বতে যে জড়িয়ে পড়বে, সে পরকালের সুখ-শান্তি হারাবে। রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালোবাসবে, সে পরকালকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর যে আখেরাতকে ভালোবাসবে সে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তার দুনিয়াকে। তোমরা কিন্তু অক্ষয়তাকেই ধ্বংসশীলতার উপরে গুরুত্ব দিয়ো। হজরত আবু মুসা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও হাকেম।

তাফসীরে মাযহারী/৪৮৭

'পরকাল' উদ্দেশ্য পরকালের সৌভাগ্য ও আনন্দ। অবিশ্বাসীরা কেবল দুনিয়াকেই চায়। তাই পরকালের সুখভোগ তাদের জন্য হারাম। তাদের কথা বলা হয়েছে এক আয়াতে এভাবে 'যারা বলে, হে প্রভুপালনকর্তা! আমাদেরকে যা দেওয়ার দুনিয়াতেই দিয়ে দাও। বস্তুতঃ তাদের জন্য পরকালে কিছু নেই'।

এখন অবশিষ্ট রইলো 'আল্লাহ্‌প্রত্যাশীদের জন্য দুনিয়া-আখেরাত উভয়টিই হারাম' কথাটি। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌প্রত্যাশীদের অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ থাকে আল্লাহ্‌র ভালোবাসায়। তাদের সে ভালোবাসা এতো গভীর যে, তাদের সমস্ত সত্তাকে তা পরিপ্লাবিত করে রাখে। ফলে তারা পৃথিবীর আকর্ষণ থেকে হয়ে যায় চিরদিনের জন্য সম্পর্কচ্যুত। আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো প্রতি তাদের প্রকৃত মনোযোগ আর থাকেই না। এক বর্ণনায় এসেছে, তাপসীপ্রবরা রাবেয়া বসরী একবার এক হাতে পানিপূর্ণ পাত্র এবং অপর হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ভদ্রে! এভাবে আপনি কোথায় চলেছেন। তিনি বললেন, পানি দিয়ে আমি দোজখ নিভিয়ে ফেলবো এবং আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবো বেহেশত, যাতে মানুষ আর যেনো দোজখের ভয়ে এবং বেহেশতের লোভে আল্লাহ্‌র ইবাদত না করে। ইবাদত যেনো করে কেবল আল্লাহ্‌র জন্য।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেছেন, রাবেয়া বসরীর উক্তিটি ছিলো মত্ততাসম্ভূত। পৃথিবীর পথে বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্যকর্তব্য তো এই যে, তারা বেহেশত পাবার আকাঙ্খায় আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তা করবে কেবল এই কারণে যে, বেহেশত হচ্ছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। আর দোজখ থেকে পরিত্রাণ কামনাও তাদের জন্য অত্যাবশ্যক। কেননা দোজখ হচ্ছে আল্লাহ্‌র ক্রোধ। সুতরাং বুঝতে হবে, এমতাবস্থায় তাদের 'লোভ' ও 'ভয়' দুষণীয় কিছু নয়।

একটি প্রশ্ন ঃ পৃথিবীর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হওয়া সিদ্ধ, যদি এতে করে আল্লাহ্‌ এবং তাঁর বান্দাগণের অধিকার খর্বিত না হয়। আর বৈধ জীবিকার অনুসন্ধান বৈধ তো বটেই, তদুপরি তা অত্যাবশ্যক। রসুল স. বলেছেন, হালাল রিজিকের সন্ধান করা আল্লাহ্‌র ফরজসমূহ পূরণের পরবর্তী ফরজ। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী ও বায়হাকী। তাহলে দুনিয়াকে মহব্বত করা হারাম কথাটির অর্থ কী?

www.eelm.weebly.com

উত্তর ঃ দুনিয়াকে মহব্বত করার অর্থ দুনিয়াকে পরকালের উপরে গুরুত্ব দেওয়া। কেউ কেউ অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে দুনিয়ার মহব্বতে এতোই বিভোর হয়ে পড়ে যে, পুণ্যকর্ম সম্পাদন ও আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে হয়ে পড়ে অমনোযোগী। তার অন্তরে প্রয়োজন পরিপূরণ অপেক্ষা লোভ-লালসা হয়ে পড়ে প্রবল। সে তখন হয়ে যায় অপকামনার হাতে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বন্দী। তার দৃষ্টিতে বিত্তহীনদের চেয়ে বিত্তপতিরা হয়ে যায় অধিক সম্মানার্হ। ন্যায়-অন্যায় বোধ তখন তার আর থাকেই না। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও যে লোক আল্লাহ্‌র স্মরণ, নামাজ, জাকাত ইত্যাদি পুন্যকর্ম সম্পর্কে সতত সচেতন

থাকে, ভয় করে মহাবিচার দিবসের জবাবদিহিতাকে, সে কিন্তু দুনিয়াদার নয়। এরকম লোক অর্থ উপার্জনে ব্যপৃত থাকে পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণের জন্য, দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তদেরকে দান করবার জন্য, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়, প্রতিবেশীদের অধিকার পূরণ ইত্যাদি শুভ উদ্দেশ্যে। এমতো ব্যক্তির ধনোপার্জন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওয়াজিব। আবার ক্ষেত্রবিশেষে কমপক্ষে মোস্তাহাব তো বটেই। আবার কোনো ক্ষেত্রে তো মোবাহ। হারাম কিছুতেই নয়। হজরত আবু সাঈদ থেকে ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল পথে উপার্জন করে এবং ওই উপার্জন থেকে নিজে খায়, পরিধান করে, ব্যয় করে পরিবার পরিজন-আত্মীয়-স্বজনের জন্য, তার এ সকল কিছুই তখন হয় তার পাপ থেকে পবিত্র হওয়ার অবলম্বন।

একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবী-কামনায় সংযম প্রদর্শন সুন্নত। রসুল স. বলেছেন, তোমরা পৃথিবীতে সংযত থাকো। অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত হয়ো না। কেননা যার জন্য যা সৃষ্টি করা হয়েছে, তা প্রাপ্তি সহজ। আহমদ, ইবনে মাজা, হাকেম।

সূরা যুখ্‌রুফ ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫

❑ যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণে বিমুখ হয় আমি তাহার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সেই হয় তাহার সহচর।

❑ শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে।

❑ অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হইবে, তখন সে শয়তানকে বলিবে, 'হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকিত! কত নিকৃষ্ট সহচর সে!

❑ আর আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের কোন কাজেই আসিবে না, যেহেতু তোমরা সীমালংঘন করিয়াছিলে; তোমরা তো সকলেই শাস্তিতে শরীক।

❑ তুমি কি শুনাইতে পারিবে বধিরকে অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, তাহাকে কি পারিবে সৎপথে পরিচালিত করিতে?

❑ আমি যদি তোমাকে লইয়া যাই, তবু আমি উহাদিগকে শাস্তি দিব;

❑ অথবা আমি উহাদিগকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি, আমি তোমাকে তাহা প্রত্যক্ষ করাই, বস্তুত উহাদের উপর আমার তো পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে।

❑ সুতরাং তোমার প্রতি যাহা ওহী করা হইয়াছে তাহা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি সরল পথেই রহিয়াছ।

❑ কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু; তোমাদিগকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হইবে।

❑ তোমার পূর্বে আমি যে সকল রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদিগকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করিয়াছিলাম যাহার ইবাদত করা যায়?

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার আকাশজ বাণীসম্ভার এই কোরআনের প্রতি বৈমুখ্য প্রদর্শন করে, মগ্ন থাকে ঘোর পার্থিবতায়, ফলে হয়ে পড়ে আল্লাহ্র স্মরণবিচ্যুত, আমি তার সহচররূপে নিযুক্ত করি সেই এক শয়তানকে। ওই শয়তান তাকে তখন শুভপথানুসারী হতে দেয়ই না। ভ্রষ্টতাকেই তার দৃষ্টিতে করে তোলে শোভন। সেকারণেই ভ্রষ্ট পথে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও সে তখন মনে করে, তার পথই সঠিক পথ।

এখানে 'নুক্বাইয়্যেদ্ব লাহু শাইত্বানা' অর্থ নিয়োজিত করি এক শয়তান। 'ফাহুয়া লাহু ক্বরীন' অর্থ সেই হয় তার সহচর। উল্লেখ্য, ওই শয়তান সহচরটিই তখন আল্লাহ্বিমুখ ব্যক্তিকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আর অপবিশ্বাস ও পাপকে তার চোখে প্রতিভাত করায় সুন্দররূপে। আর সে-ও তখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, তার আচরিত মতাদর্শই হচ্ছে সৎ মতাদর্শ।

মোহাম্মদ ইবনে ওসমান মাখজুমী বর্ণনা করেছেন, কুরায়েশরা একবার নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে ঠিক করলো যে, মোহাম্মদের প্রত্যেক সহচরের জন্য এমন একজন করে লোক নিযুক্ত করা হোক, যে তাদেরকে বিভিন্নভাবে পর্যুদস্ত করতে পারবে। তাই করা হলো। হজরত আবু বকরকে নাজেহাল করার জন্য নিযুক্ত করা

হলো তালহা ইবনে উবাইদকে। তালহা হজরত আবু বকরের কাছে গিয়ে দেখলো, তিনি তাঁর কয়েকজন সতীর্থকে নিয়ে বসে আছেন। তিনি তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তালহা! কিছু বলতে চাও? তালহা বললো, হ্যাঁ, আমি তোমাকে লাত উজ্জার উপাসনার দিকে আহ্বান জানাতে চাই। তিনি বললেন, লাত কে? তালহা বললো, আমাদের পালনকর্তা। হজরত আবু বকর পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, উজ্জা তাহলে কে? তালহা বললো, মেয়েরা। তিনি পুনঃপ্রশ্ন করলেন, তাদের মা কে ছিলো? তালহা একথার কোনো জবাব দিতে পারলো না। তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললো, এবার তোমরা জবাব দাও। সকলেই নির্বাক। তালহা বললো, আবু বকর! উঠুন। আমার সাক্ষ্য শুনুন। আমি ঘোষণা দিচ্ছি 'আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর প্রেরিত রসুল'। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকতো। কতো নিকৃষ্ট সহচর সে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এধরনের লোক যখন মহাবিচারের দিবসে অপরাধীরূপে দণ্ডায়মান হবে, তখন সে তার ওই সহচর শয়তানকে দেখে ক্ষোভে দুঃখে ফেটে পড়বে। বলবে, পৃথিবীতে তোর সঙ্গে যদি আমার সূর্যোদয়স্থান ও সূর্যাস্তস্থানের ব্যবধানের সমান ব্যবধান থাকতো, তাহলে আজ আমি এই মহাসংকটে পড়তাম না। তোর মতো নিকৃষ্ট সহচর আর হয়ই না।

এখানে 'ইয়ালাইতা' কথাটির 'ইয়া' শব্দটি হয় সতর্কসূচক, না হয় সম্বোধনমূলক এবং সম্বোধিত জন এখানে রয়েছে উহ্য। এখানে পুরো সম্বোধনটি দাঁড়ায় 'ইয়া ক্বরীন' হে সহচর! 'মাশরিক্বাইন' অর্থ দুই পূর্ব এবং 'মাগরিবাইন' অর্থ দুই পশ্চিম। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে সূর্যোদয়স্থল ও অস্তস্থলে ঘটে তারতম্য। সে কারণেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিবচনবোধক শব্দরূপ 'মাশরিক্বাইন 'ও 'মাগরিবাইন'।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, কাফেরদেরকে যখন কবর থেকে ওঠানো হবে, তখন তাদের শয়তানকেও তাদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। এভাবে উভয়কে এক সঙ্গে প্রবেশ করানো হবে দোজখে।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'আর আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের কোনো কাজে আসবে না, যেহেতু তোমরা সীমালংঘন করেছিলে; তোমরা তো সকলেই শাস্তিতে শরীক'। একথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! তোমরা মহাবিচারের দিবসে আক্ষেপে ও অনুতাপে জর্জরিত হতে থাকবে বটে, কিন্তু তোমাদের সে অনুতাপ তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। কারণ ওই স্থান সংশোধনের স্থান নয়। ওই স্থান হচ্ছে প্রতিফল প্রদানের স্থান। তাই তখন তোমাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, পৃথিবীতে তোমরা শয়তানের সঙ্গে যোগসাজশ করে প্রতিমাপূজার মতো ঘৃণ্য অপকর্মে লিপ্ত ছিলে,

www.eelm.weebly.com

ছাড়িয়ে গিয়েছিলে সভ্যতা-ভব্যতা ও শুভবোধের সকল সীমানা। তাই তোমরা সকলে এবার মহাশাস্তি ভোগ করতে থাকো। অর্থাৎ স্বেচ্ছারিতার ক্ষেত্রে যখন একজোট হয়েছিলে, তখন শাস্তিও ভোগ করো একজোট অবস্থায়। বক্তব্যটি এরকমও হতে পারে যে— তোমরা তখন সকলে মিলে একজোট হলেও তোমাদের উপরে আপতিত শাস্তিকে রোধ অথবা লঘু করতে পারবে না। সাধারণতঃ লক্ষ্য করা যায় অনেক বিপদগ্রস্ত লোক একসাথে হলে তাদের দুঃখবোধ কিছুটা হাল্কা হয়ে যায়। কিন্তু সেরকম কোনো অনুভূতি তখন তাদের হবেই না। কেননা তখন শাস্তি হবে অতীব তীব্র।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'তুমি কি শোনাতে পারবে বধিরকে অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, তাকে কি পারবে সৎপথে পরিচালিত করতে'?

এখানকার 'তাকে কি পারবে সৎপথে পরিচালিত করতে' বাক্যটির বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে 'যে অন্ধ' কথাটির সঙ্গে। কেননা অন্ধ হওয়া এবং পথভ্রষ্ট হওয়া দু'টি পৃথক ধরনের বৈশিষ্ট্য। আর প্রশ্নটি (তাকে কি পারবে) এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও বিস্ময়াত্মক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! ওই সকল লোক অবিশ্বাস ও পৌত্তলিকতায় আসক্ত নিমজ্জিত। তাদের দৃষ্টি অজ্ঞতা ও মূর্খতার পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত, শ্রবণেন্দ্রিয়ও সত্যের বাণী শুনবার যোগ্যতারহিত। এমতাবস্থায় আপনি তাদেরকে পথ দেখাবেন কেমন করে? কেমন করেই বা তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাবেন মহাগ্রন্থ এই কোরআনের সুললিত বাণী?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি যদি তোমাকে নিয়ে যাই তবু আমি তাদেরকে শাস্তি দিবো (৪১), অথবা আমি তাদেরকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি, আমি তোমাকে তা প্রদর্শন করাই, বস্তুত তাদের উপর তো আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে' (৪২)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! তাদেরকে শাস্তি দিবো বলে আমি যে অঙ্গীকার করেছি, তা আমি যথাসময়ে পরিপূর্ণ করবোই। কেননা তাদের উপর এবং মহাবিশ্বের উপর আমি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আমার অভিপ্রায়নির্ভর। আমি হয়তো তাদেরকে শাস্তি দিবো আপনি পৃথিবীতে থাকতেই, অথবা আপনার পৃথিবী পরিত্যাগের পর।

এখানকার 'ফাইম্মা' (আমি যদি) কথাটির মূল রূপ ছিলো 'ফা ইন্ মা'। এর মধ্যে 'ইন্' হচ্ছে শর্তপ্রকাশক এবং 'মা' অতিরিক্ত ও দৃঢ়তাপ্রকাশক। সেকারণেই এখানকার 'নাজহাবান্না' কথাটির 'নুন' অক্ষরটি আনা হয়েছে অধিকতর দৃঢ়তা জ্ঞাপনার্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার নবী! আপনি কোনো চিন্তা
করবেন না। আমি আপনার শত্রুদের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করবোই। আপনার জীবদ্দশায়, অথবা আপনার মহাতিরোভাবের পর। তাছাড়া তাদের জন্য পরকালের স্থায়ী শাস্তি তো রয়েছেই। তারা তো কখনোই আমার আওতার বাইরে যেতে পারবে না। তাই আমি যখন ইচ্ছা, তখনই তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি। উল্লেখ্য, আল্লাহ্পাক এখানে উল্লেখিত শাস্তি তাদের উপরে অবতীর্ণ করেছিলেন বদর যুদ্ধের সময়। অধিকাংশ তাফসীরবেত্তাগণের অভিমত এরকমই।

হাসান ও কাতাদা বলেছেন, রসুল স. এর জীবদ্দশায় মুসলমানদের মধ্যে এমন কোনো তিক্ত ঘটনা ঘটেনি যা তাঁর মনোবেদনার কারণ হতে পারতো। কিন্তু তাঁর মহাতিরোধানের পর এই উম্মতের মধ্যে দেখা দেয় অনেক বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে ওই সকল ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স.কে স্বপ্নযোগে তাঁর উম্মতের পরবর্তী আত্মকলহ ও যুদ্ধবিগ্রহের দৃশ্যগুলো দেখিয়ে দেওয়া হয়। তাই ওই স্বপ্নদর্শনের পর পৃথিবী পরিত্যাগ অবধি তাঁকে আর প্রফুল্লচিত্ত দেখা যায়নি। আমি মনে করি, রসুল স.কে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিলো ইমাম হোসেনের কারবালায় শাহাদত বরণ এবং বনী উমাইয়ার উদ্ধত অভ্যুদয়ের ঘটনা। আবদুর রহমান ইবনে মাসউদ আবদী বলেছেন, হজরত আলী এই আয়াত পাঠ করার পর বলতেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি চলে গেলেন, আর আল্লাহর শাস্তি অবশিষ্ট রয়ে গেলো তাঁর দুশমনদের জন্য।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে, তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো। তুমি সরল পথেই রয়েছো'। একথার অর্থ— সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি নিমগ্ন থাকুন আপনার কর্তব্যকর্মে। জিবরাইলের মাধ্যমে আপনার অন্তরে আমি যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করে চলেছি, সেই প্রত্যাদেশানুসারে আপনি চলুন। কেননা আপনি সরল সঠিক পথে রয়েছেন, যে পথে বক্রতার লেশমাত্রও নেই।

এখানকার 'ফাস্তাম্সিক' কথাটির 'ফা' নৈমিত্তিক। এর সম্পর্ক রয়েছে ৩ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায়' কথাটির সঙ্গে। মধ্যবর্তী আয়াতসমূহ ভিন্ন প্রসঙ্গের এবং এখানকার 'তুমি সরল পথেই রয়েছো' কথাটিতে বিধৃত হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যটির কারণ।

এরপরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'কোরআন তো তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এই কোরআন আপনার এবং আপনার নিজ সম্প্রদায় কুরায়েশদের জন্য অতীব সম্মানের।

হজরত আদী ইবনে হাতেম বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি স. বললেন, আমার হৃদয়ে আমার সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য যে প্রগাঢ় ভালোবাসা রয়েছে, তা আল্লাহ্ জানেন। তাই তিনি আমার সঙ্গে আমার সম্প্রদায়কেও সম্মান দান করেছে। একথা বলে তিনি পাঠ করলেন, 'কোরআন তো তোমার ও তোমার

www.eelm.weebly.com

সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু'। তারপর পাঠ করলেন 'তোমার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও এবং তোমার বিশ্বাসী অনুগামীদের প্রতি সদয় হও'। এরপর তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট আরো কৃতজ্ঞতা জানাই একারণে যে, তিনি আমার সম্প্রদায় থেকেই প্রকাশ করেছেন সিদ্দীক, শহীদ ও ইমামগণকে। অবশ্যই আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের অবস্থা পরিবর্তন করে দেন। তিনি সমগ্র আরব জাহানের মধ্যে কুরায়েশদেরকে করেছেন সর্বোত্তম। কুরায়েশ সম্প্রদায় হচ্ছে ওই প্রাচুর্য ভরা বৃক্ষ সমতুল্য যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন 'পবিত্র বাক্য হচ্ছে পবিত্র

বৃক্ষের মতো। তার শিকড় সুপ্রোথিত এবং ডালপালা আকাশে সুবিস্তৃত'। আর এখানে 'সম্মান' অর্থ ইসলামের সম্মান, যার প্রতি আল্লাহ্ কুরায়েশদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন এবং তাদেরকে এই সম্মানের উপযুক্ত করেছেন। তাদেরকে সম্মানিত করণার্থেই আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন সুরা কুরায়েশ।

হজরত আদী ইবনে হাতেম আরো বর্ণনা করেছেন, আমি এমন কখনো দেখিনি যে, রসুল স. এর সম্মুখে কুরায়েশ প্রসঙ্গে কল্যাণকর আলোচনা উত্থাপন করলে তিনি স. এতে করে আনন্দিত হননি। এই প্রসঙ্গটির আলোচনা তাঁর নিকট এতো প্রীতিকর ছিলো যে, তাঁর চেহারার আনন্দের ছাপ সকলেরই চোখে পড়তো এবং তিনি আনন্দের আতিশয্যে প্রায়শই পাঠ করতেন 'কোরআন তো তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের সম্মানের বস্তু'।

জুহাক সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর কাছে যখন জানতে চাওয়া হতো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার পরে আপনার স্থলাভিষিক্ত হবেন কে? তখন তিনি স. কোনো জবাব দিতেন না। কিন্তু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এরকম প্রশ্ন শুনে তিনি স. জবাব দিতেন, আমার স্থলাভিষিক্তি অর্জিত হবে কুরায়েশদের। হজরত আলী থেকেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হজরত ইবনে ওমর উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন মাত্র দু'জন মানুষ থাকবে তখনও নেতৃত্ব থাকবে কুরায়েশদের। অথবা বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে মাত্র দু'জন অবশিষ্ট থাকলেও নেতৃত্ব থাকা প্রয়োজন কুরায়েশদের।

হজরত মুয়াবিয়া বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, প্রশাসক কুরায়েশদের মধ্যেই থাকবে। যে কেউ এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে, আল্লাহ্ তার শক্তি খর্ব করবেন, যে পর্যন্ত সেই কুরায়েশ ধর্মকে সোজা রাখবে।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'সম্প্রদায়' অর্থ আরব সম্প্রদায়। কোরআন যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাই সমগ্র আরববাসী একারণে শ্রদ্ধার্হ। এর মধ্যে যে আরববাসী কোরআনের সেবায় অধিকতর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, তার মর্যাদা অন্যাপেক্ষা অধিক। এভাবে দেখা যায়, কুরায়েশ সম্প্রদায় অন্যাপেক্ষা অধিক উত্তম এবং তাঁর মধ্যে বনী হাশেম অত্যুত্তম। কেননা রসুল স. স্বয়ং কুরায়েশ এবং বনী হাশেম।

আলোচ্য বাক্যটিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, রসুল স. মহাসম্মান লাভ করেছেন আল্লাহ্ প্রদত্ত গভীর জ্ঞান ও মহাপ্রজ্ঞার কারণে এবং তাঁর সম্প্রদায়, অর্থাৎ বিশ্বাসীগণ সম্মানলাভ করেছেন ইসলাম প্রাপ্তির কারণে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে'। একথার অর্থ— হে ইসলামের অনুসারীরা! শুনে রাখো, মহাবিচারের দিবসে অবশ্যই তোমাদেরকে এই কোরআন বা এই ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বলা হবে, তোমরা এই কোরআনের নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা পালনে কতোটুকু যত্নবান ছিলে?

এরপরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'তোমার পূর্বে আমি যে সকল রসুল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা করো, আমি কি দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো দেবতা স্থির করেছিলাম, যার ইবাদত করা যায়'?

বাগবী লিখেছেন, এ বিষয়ে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন যে, এখানে কাকে জিজ্ঞেস করতে বলা হয়েছে? সরাসরি পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকে, না তাঁদের অনুসারীদেরকে। আতা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স.কে মেরাজ রজনীতে যখন ঊর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, তখন পূর্ববর্তী সকল নবী-রসুলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত ঘটেছিলো। বায়তুল মাকদিসের ওই আম্বিয়া সমাবেশে হজরত জিবরাইল আজান ও ইকামত বলেছিলেন। একথাও রসুল স.কে বলেছিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল! আপনিই ইমাম। রসুল স. এর ইমামতিতে নামাজ সম্পন্ন হওয়ার পর হজরত জিবরাইল পাঠ করে শুনিয়েছিলেন এই আয়াত। রসুল স. তখন বলেছিলেন, আপনার আবৃত্তি তো আমরা সকলেই শুনলাম। এতোটুকুই যথেষ্ট।

জুহুরী, সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও ইবনে জায়েদ বর্ণনা করেছেন, শবে মেরাজে আল্লাহ্‌তায়ালা রসুল স. সহ সকল পয়গম্বরকে একত্র করলেন। অবতীর্ণ হলো 'তোমার পূর্বে যে সকল রসুল ..... ইবাদত করা যায়'। রসুল স. আয়াতখানি আবৃত্তি করে শোনালেন বটে, কিন্তু কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কারণ তিনি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, সকল নবীই এ ব্যাপারে একই কথা বলবেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করা যায় না।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এখানকার 'মান আরসালনা' কথাটির পূর্বে উহ্য রয়েছে 'উমাম' শব্দটি। ওই উহ্যতা সহ সম্বোধনটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের আলেমগণকে জিজ্ঞেস করুন। আর যে সব আলেম সুশোভিত হয়েছিলেন ইসলাম রূপ অমূল্য সম্পদে। আতা ব্যতীত অন্য সকল বর্ণনাকারীর বর্ণনায় এসেছে তেমনই, যেমন ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। মুজাহিদ, কাতাদা, জুহাক, সুদ্দী, হাসান ও মুকাতিলও এরকম অভিমত প্রকাশ করেছেন। হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত উবাই ইবনে কা'ব আয়াতখানি পাঠ করতেন এভাবে 'ওয়াস্আলিল্ লাজীনা আরসালনা ইলাইহিম ক্বাবলাকা মির রসুলিনা' (এবং জিজ্ঞেস করুন ওই সকল লোককে যাদের কাছে আমি ইতোপূর্বে রসুল প্রেরণ করেছিলাম)। এমতো পাঠটিও হজরত ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যার অনুকূল। এভাবে এখানকার এই প্রশ্নটির মূল উদ্দেশ্য হয়েছে মূর্তিপূজকদেরকে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া যে, সকল যুগের সকল নবীই ছিলেন মূর্তিপূজার ঘোর বিরুদ্ধে। তারা সকলেই মানুষকে এক আল্লাহ্র ইবাদত করতে বলেছেন। নিষেধ করেছেন আল্লাহ্র সমকক্ষ অথবা অংশীদার হিসাবে কাউকে অথবা কোনো কিছু দাঁড় করাতে।

সূরা যুখ্রুফ ঃ আয়াত ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬

❑ মূসাকে তো আমি আমার নিদর্শনসহ ফির'আওন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত।'

❑ সে উহাদের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসিবামাত্র উহারা তাহা লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতে লাগিল।

❑ আমি উহাদিগকে এমন কোন নিদর্শন দেখাই নাই যাহা উহার অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম যাহাতে উহারা প্রত্যাবর্তন করে।

❑ উহারা বলিয়াছিল, 'হে জাদুকর! তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি আমাদের জন্য তাহা প্রার্থনা কর যাহা তিনি তোমার সহিত অংগীকার করিয়াছেন, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করিব।'

www.eelm.weebly.com

❑ অতঃপর যখন আমি উহাদিগ হইতে শাস্তি বিদূরিত করিলাম তখনই উহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া বসিল।

❑ ফির'আওন তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলিয়া ঘোষণা করিল,'হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নহে? আর এই নদীগুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত; তোমরা ইহা দেখ না?

❑ 'আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি হইতে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলিতেও অক্ষম!

❑ 'মূসাকে কেন দেওয়া হইল না স্বর্ণ-বলয় অথবা তাহার সঙ্গে কেন আসিল না ফিরিশ্‌তাগণ দলবদ্ধভাবে?'

❑ এইভাবে সে তাহার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করিয়া দিল, ফলে উহারা তাহার কথা মানিয়া লইল। উহারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

❑ যখন উহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিল আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহাদের সকলকে।

❑ তৎপর পরবর্তীদের জন্য আমি উহাদিগকে করিয়া রাখিলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে দুঃখিত হবেন না। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এরকমই করে থাকে। আপনার পূর্বে প্রেরিত মুসা নবীর ক্ষেত্রেও এরকমই ঘটেছিলো। আমি তাকে অলৌকিক যষ্টি ও শুভ্রোজ্জ্বল হাতের নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। মুসা তাদেরকে বলেছিলেন, আমি মহাবিশ্বের মহাপ্রভুপ্রতিপালক আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত রসুল। কিন্তু তারা তাঁর কথা বিশ্বাস করলো না। বরং তাঁর কথা নিয়ে, অথবা তাঁর নিদর্শনসমূহ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা শুরু করে দিলো। উল্লেখ্য, এখানে হজরত মুসার ইতিবৃত্তের অবতারণা করা হয়েছে রসুল স.কে সান্ত্বনা প্রদানার্থেই। আর এ ঘটনার মাধ্যমে ৩১ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত মক্কার মুশরিকদের এই কোরআন কেনো নাজিল করা হলো না শ্রেষ্ঠ দু'টি জনপদের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর' কথাটিকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ নবুয়ত ফেরাউনের মতো প্রতাপশালী নৃপতিদের ভাগ্যে জোটে না। মহৎহৃদয় মুসার মতো মহান ব্যক্তিত্বই নবুয়তের পবিত্র গুরুভার বহন করতে পারেন। এটাই আল্লাহ্‌র শাশ্বত রীতি। হজরত মুসার একত্ববাদসম্ভূত সাক্ষ্য উপস্থাপন করাও আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের আর একটি উদ্দেশ্য।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে এমন কোনো নিদর্শন দেখাইনি, যা অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে'। একথার অর্থ— আমি তখন তাদেরকে আরো অনেক নিদর্শন দেখালাম। তাদের শুভবোধকে জাগ্রত করবার জন্য শাস্তিও দিলাম ওই সকল অলৌকিক নিদর্শনগুলোর মাধ্যমে। যেমন তাদেরকে করলাম দুর্ভিক্ষকবলিত, কখনো প্রবাহিত করলাম প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝা, অতিষ্ঠ করলাম তাদের শস্যক্ষেত্রে পঙ্গপালের আক্রমণ দিয়ে। আরো আপতিত করলাম ভেক, রক্ত ইত্যাদির আযাব। এ সকল কিছুর উদ্দেশ্য ছিলো, তারা যেনো সত্য পথে ফিরে আসে।

এখানে 'আকবারু মিন উখ্‌তিহা' অর্থ তার অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ ওই সকল অলৌকিকত্বের প্রতিটিই ছিলো চূড়ান্ত বিস্ময়ের। ফেরাউন ও তার লোকেরা তাই প্রতিটি নিদর্শনকে শ্রেষ্ঠ না ভেবে পারতো না। যেমন জনৈক কবি বলেছেন— যার সঙ্গেই তোমার সাক্ষাত ঘটুক না কেনো, তুমি সাক্ষাত করলে তাদের নেতার সঙ্গে। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে নেতার মতো গুণাবলী। যেমন নক্ষত্রের আলোর দিকনির্দেশনায় চলে পথিক। কিংবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, ওই নিদর্শনগুলোর প্রতিটির প্রকৃতি ও বিশেষত্ব ছিলো অনন্যসাধারণ।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'তারা বলেছিলো, হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি আমাদের জন্য তা প্রার্থনা করো, যা তিনি তোমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন, তা হলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করবো'। একথার অর্থ— যখন তাদের উপরে দুর্ভিক্ষ, পঙ্গপাল ইত্যাদির শাস্তি শুরু হলো, তখন তারা হজরত মুসাকে বললো, হে অজেয় যাদুকর! তোমার ক্ষমতাকে আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি। তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করো, তিনি যেনো আমাদের কষ্ট দূর করে দেন। আমরা কথা দিচ্ছি, বিপদমুক্ত হলে আমরা তোমার ধর্মমতের অনুসারী হবো। উল্লেখ্য, প্রতিটি বিপদেই তারা হজরত মুসার কাছে এরকম আবেদন জানাতো। হজরত মুসা প্রতিবার দোয়া করতেন। ফলে বিপদ সরে যেতো। কিন্তু তারা তাদের কথা রাখতো না। বরং পূর্বাপেক্ষা আরো অধিক দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতো সত্যপ্রত্যাখ্যানকে। আর তাঁকে নবী বলে স্বীকার না করে বার বার তাঁকে সম্বোধন করতো যাদুকর বলে।

কেউ কেউ বলেছেন, হজরত মুসাকে তারা 'যাদুকর' বলতো শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে। কেননা তাদের দৃষ্টিতে যাদু ছিলো অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জ্ঞান। তাই 'হে যাদুকর' বলে তারা যেনো এটাই বোঝাতে চাইতো যে, হে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও নিপুণ বিদ্যার অধিকারী। আমার কাছে ব্যাখ্যাটি সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা হজরত মুসা কর্তৃক প্রদর্শিত মোজেজাকে যাদু বললে তিনি তার প্রতিবাদ করেছিলেন। এক আয়াতে সে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এভাবে— 'সত্য তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবার পরেও তোমরা একথা বলছো? একি যাদু? যারা যাদুকর, তারা তো সফল হতে পারে না'। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তাদের 'যাদুকর' বলার উদ্দেশ্য ছিলো এরকম— ওই লোক তো যাদু দ্বারাই আমাদেরকে প্রভাবান্বিত করেছে। এই ব্যাখ্যাটিও পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার সমতুল। সুতরাং এই ব্যাখ্যাটিকেও সঠিক বলা যায় না।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে শাস্তি বিদূরিত করলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসলো'। একথার অর্থ— আমি আমার নবীর দোয়া কবুল করলাম। বিপদ অপসারিত করলাম তাদের উপর থেকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা ইমান আনয়নের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, তা ভঙ্গ করে বসলো।

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলে ঘোষণা করলো, হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? আর এই নদীগুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত; তোমরা কি এটা দেখ না'? একথার অর্থ— বিপদ বিদূরিত হওয়ার পর ফেরাউন তার লোকজনদেরকে একত্র করলো। তার আশংকা হলো, লোকেরা আবার না হজরত মুসার আনুগত্য স্বীকার করে বসে। তাই সে তার প্রতাপ পুনঃপ্রতিষ্ঠার্থে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! আমিই কি মিসরাধিপতি নই? আর এই নহরগুলো, যেগুলো প্রবাহিত হচ্ছে আমার রাজপ্রাসাদের তলদেশ দিয়ে, এগুলো কি আমার কর্তৃত্বভূত নয়? এগুলো তো তোমাদের চোখের সামনেই। তোমরা কি দেখছো না?

এখানে 'আনহার' অর্থ নদী, নহর। উল্লেখ্য, নীলনদের ছিলো অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা। সেগুলোর প্রধান শাখা ছিলো চারটি— নহরে শাহী, নহরে তুলুন, নহরে দিমিয়াত ও নহরে তিনস্। 'তাজ্বরি মিন তাহ্তী' অর্থ আমার মহলের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত, অথবা বয়ে চলেছে আমার আদেশে, কিংবা প্রবাহিত হচ্ছে শাহী উদ্যানসমূহের মধ্য দিয়ে। আর 'আফালা তুব্সিরূন' অর্থ তোমরা কি এসব দ্যাখো না?

এরপরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি থেকে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতেও অক্ষম'।

হজরত মুসার উচ্চারণে আড়ষ্টতা ছিলো। তিনি এজন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন 'আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও— যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে'। এরকম প্রার্থনার পর তাঁর উচ্চারণের আড়ষ্টতা অনেকাংশে দূর হয়ে গিয়েছিলো। তৎসত্ত্বেও কিছুটা আড়ষ্টতা ছিলোই। সেদিকে ইঙ্গিত করেই ফেরাউন তার লোকজনকে বলেছিলো— মুসা তো স্পষ্ট করে কথা বলতেও অক্ষম। সুতরাং সে হীন। কিন্তু দ্যাখো, আমার কথায় কোনো জড়তা নেই। সুতরাং আমি কি তার চেয়ে উত্তম নই। আর উত্তম যে, তার অনুসারী হওয়াই কি তোমাদের কর্তব্য নয়?

এখানকার 'মাহীন' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'মুহানাত' থেকে। এর অর্থ অপূর্ণতা, অসম্পূর্ণতা, হীনতা, দুর্বলতা, যা অধিনায়ক হওয়ার অন্তরায়। প্রথমে উল্লেখিত 'আম' শব্দটি এখানে মুনকাতিয়া বা বিচ্ছিন্নকারী। আর 'হামযা' অক্ষরটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে জিজ্ঞাসাবোধক অর্থে এবং এই জিজ্ঞাসা স্বীকৃতিজ্ঞাপক। এভাবে এখানকার 'আম্‌আনা খইর' কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— আমিই তো শ্রেষ্ঠ।

বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারের মতে এখানকার 'আম' অর্থ 'বাল'। ফাররা বলেছেন, এখানে 'আম' হয়েছে 'মুত্তাসিলা' বা সংযোজক। এবং শব্দটির পরেই রয়েছে যতিচিহ্ন। অর্থাৎ তোমরা কি দ্যাখো না, বা তোমরা তো দেখছোই। এমতাবস্থায় 'আম' এর পরে শুরু হয় নতুন বাক্য বা পরবর্তী বাক্য। এখানে 'কারণে'র স্থলে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ পরবর্তী ফলাফলকে। এভাবে বক্তব্যটি

দাঁড়িয়েছে— তোমরা তো জানোই যে, আমি তার চেয়ে শ্রেয়ঃ। এমতাবস্থায় শ্রেয়ঃ হওয়ার জ্ঞান হচ্ছে কারণের ফল এবং দেখাটা হচ্ছে কারণ। যেনো বলা হয়েছে— তোমরা কি দ্যাখো না, বা তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছো, এবং দেখার পরে জানছো যে, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এরপরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'মুসাকে কেনো দেওয়া হলো না স্বর্ণবলয়, অথবা তার সঙ্গে কেনো এলো না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে'?

মুজাহিদ বলেছেন, মিসরবাসীদের রীতি ছিলো, কাউকে জনপতি করা হলে, নেতৃত্বের নিদর্শন স্বরূপ তাকে সোনার কাঁকন ও গলাবন্ধ পরিয়ে দেওয়া হতো। এগুলোই ছিলো তার জনপতি হওয়ার নিদর্শন। ফেরাউন তাই বলেছিলো— মুসা যদি জননেতাই হবে, তবে যিনি তাকে এরকম দায়িত্ব দিয়েছেন, তিনি তাকে সোনার বালা পরালেন না কেনো?

'তার সঙ্গে কেনো এলোনা ফেরেশতারা দলবদ্ধভাবে' কথাটির অর্থ আমরা তো তাকে জননায়ক বানাইনি। সুতরাং তার জননায়ক হওয়ার সাক্ষ্য দেওয়া উচিত ফেরেশতাদের। কিন্তু তাদেরকেও তো আমরা অনুপস্থিত দেখছি। সুতরাং তাকে আমরা নেতা বা নবী বলে মানতে পারি কীভাবে?

এরপরের আয়াতে(৫৪) বলা হয়েছে— 'এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিলো, ফলে তারা তার কথা মেনে নিলো। তারা তো ছিলো এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়'। একথার অর্থ— ফেরাউনের এরকম যুক্তিপ্রমাণ শুনে তার লোকেরা নির্বাক

হয়ে গেলো। ফেরাউনের কথাকেই মেনে নিলো সর্বান্তঃকরণে। এর কারণ এই যে, তাদের হৃদয় ছিলো চিররুদ্ধ। তাই সত্যের আলো সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি। সত্তাগতভাবেই তারা সত্যের সঙ্গে ছিলো সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত।

এখানে 'ফাস্তাখাফ্ফা ক্বওমাহ' অর্থ এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিলো। 'ইসতাখফ্ফা রায়া' অর্থ কারো সিদ্ধান্তকে অশুদ্ধ করে দেওয়া এবং সঠিক পথ থেকে হটিয়ে দেওয়া। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছ থেকে আশা করেছিলো ত্বরিৎ ও দৃঢ় আনুগত্য। আর বিভিন্ন অপযুক্তি প্রদর্শন করে সে তা পেয়েছিলোও। হজরত মুসাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা সত্ত্বেও তারা তা ভঙ্গ করেছিলো নির্দ্বিধায়। আর এখানকার 'তারা ছিলো এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়' কথাটির অর্থ নিঃসন্দেহে তারা সত্তাগতভাবে ছিলো পাপাসক্ত। তাই অনুগত হয়েছিলো পাপিষ্ঠের।

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করলো, আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সকলকে'। একথার অর্থ— যখন তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেলো, তখন আমি ক্রোধান্বিত হলাম এবং তাদেরকে ডুবিয়ে মারলাম সমুদ্রগর্ভে।

এখানে 'আসাফূনা' অর্থ আমাকে ক্রোধান্বিত করলো। যেমন বলা হয় 'আসাফা ফুলানুন' (অমুক ব্যক্তি ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়েছে)।

এরপরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'তৎপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত'।

এখানে 'সালাফান্' অর্থ ইতিহাস। শব্দটি একটি ধাতুমূল। অথবা শব্দটি 'সালিফুন' এর বহুবচন, যেমন 'খাদামা' বহুবচন 'খাদিমুন' এর। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এভাবে আমি তাদেরকে ইতিহাস করে রাখলাম, যাতে পরবর্তী যুগের মানুষেরা এ ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের জন্য এই ঘটনাটি হয় একটি দৃষ্টান্ত।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে দোজখের দিকে অগ্রগামী করে রেখেছি এবং তাদেরকে করেছি তাদের পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত ও উপদেশ। কেউ কেউ বলেছেন, 'মাছালা' শব্দটির উদ্দেশ্য এখানে— তাদের এমতো বিস্ময়কর ঘটনাকে আমি প্রবাদতুল্য করে রেখেছি, যেনো চিরন্তন প্রবাদবচনরূপে তাদের এই মর্মান্তিক ঘটনাটি মানুষের মধ্যে আলোচিত হতে থাকে। এদের মতো কাউকে অবাধ্যতা করতে দেখলে যেনো লোকে বলে, তোমরা তো দেখছি ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তদের মতো।

যথাসূত্রপরম্পরায় আহমদ ও তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার রসুল স. কুরায়েশদেরকে বললেন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। তারা বললো, তাহলে তুমি যে বললে ঈসা আল্লাহ্র নবী এবং আল্লাহ্র একজন প্রিয় বান্দা। আল্লাহ্র পুত্র হিসেবে তাকেও তো খৃষ্টানেরা পূজা করে থাকে। তাহলে তার মধ্যেও কি কোনো কল্যাণ নেই? তাদের এমতো অপবচনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত—

সূরা যুখ্রুফ ঃ আয়াত ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২

❑ যখন মারইয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায় তাহাতে শোরগোল আরম্ভ করিয়া দেয়,

❑ এবং বলে, 'আমাদের উপাস্যগুলি শ্রেষ্ঠ না 'ঈসা?' ইহারা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এই কথা বলে। বস্তুত ইহারা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়।

❑ সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত।

❑ আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদের মধ্য হইতে ফিরিশ্‌তা সৃষ্টি করিতে পারিতাম, যাহারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হইত।

❑ 'ঈসা তো কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ করিও না এবং আমাকে অনুসরণ কর। ইহাই সরল পথ।

❑ শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি যখন আপনার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে ঈসা ইবনে মরিয়মের প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, তখন তারা আনন্দে অধীর হয়ে হৈ-চৈ শুরু করে দেয়। বলে, কোরআনেই বলা হয়েছে— এক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য কারো উপাসনা করা হলে, ওই উপাস্যও হবে জাহান্নামের ইন্ধন। খৃষ্টানেরা তো ঈসার উপাসনা করে। তাহলে সে-ও তো জাহান্নামের ইন্ধন হবে। আর আমাদের উপাস্য প্রতিমাগুলোর তুলনায় ঈসা তো শ্রেষ্ঠও নয়। হে আমার রসুল! আপনি তাদের এমতো হৈ-চৈ শোরগোলকে উপেক্ষা করুন। কেননা ওই লোকেরা সত্যান্বেষী নয়। বরং অযথা বিতর্ক করাই তাদের স্বভাব।

ইবনে মারদুবিয়া ও জিয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার আবদুল্লাহ্ ইবনে যাবআরী রসুল স.কে বললো, হে মোহাম্মদ! 'এক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের উপাসনা করা হয়, তারা দোজখের ইন্ধন হবে' এই আয়াত কি আপনার উপর অবতীর্ণ হয়নি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। সে বললো, চন্দ্র, সূর্য, ফেরেশতা, ঈসা, উযায়েরের যে পূজা করা হয়, তাহলে তারাও কি দোজখের ইন্ধন হবে? তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় 'যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে, তারা দোজখ থেকে দূরে থাকবে' এবং তৎসহ অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতদ্বয়।

এখানে 'ইয়াসিদ্‌দূন' অর্থ শোরগোল, হৈ-চৈ। 'ইয়াসিদ্‌দূন' ও 'ইয়াসুদ্‌দূন' শব্দ দু'টো সমঅর্থসম্পন্ন। ক্বারী কাসাই বলেছেন, শব্দটি দু'রকমভাবেই ব্যবহারযোগ্য, যেমন একই অর্থে ব্যবহারযোগ্য 'ইয়া'রিশূন' ও 'ইয়া'রুশূন'। তিনি একথাও বলেছেন যে, 'ইয়াসিদ্‌দূন' অর্থ চেঁচামেচি করা। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবও এরকম বলেছেন। জুহাক বলেছেন, এর অর্থ আশ্চর্যান্বিত করে। কাতাদা বলেছেন, তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে। কুরতুবী বলেছেন, তাদের অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ— তারা বলে, মোহাম্মদ চায়, খৃষ্টানেরা যেমন ঈসার উপাসনা করে, তেমনি আমরাও যেনো উপাসনা শুরু করে দিই।

ইবনে জায়েদ ও সুদ্দী বলেছেন, এখানকার 'হুয়া' অর্থ হজরত ঈসা। অর্থাৎ 'হুয়া' সর্বনামটি এখানে রসুল স.কে চিহ্নিত করে না, চিহ্নিত করে হজরত ঈসাকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, হে মোহাম্মদ! তুমি বলো, আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে পূজা করা হয়, তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। এটা তো আমাদের জন্য ভালোই। আমরাও চাই, ঈসা, উযায়ের ও ফেরেশতাদের সঙ্গে আমাদের দেবতারাও দোজখে চলে যাক।

'মা দ্বরাবূহু লাকা ইল্লা জ্বাদালা' অর্থ এরা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে একথা বলে। অর্থাৎ সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করবার উদ্দেশ্যে নয়, তারা এরকম কুটতর্কের অবতারণা করে শুধুই বিতণ্ডা সৃষ্টির জন্য। আর তারা একথাও ভালো ভাবে জানে যে, আপনি তাদের দ্বারা উপাসিত হবেন, সেরকম কোনো উদ্দেশ্যও আপনার নেই। অথবা তারা ভালোভাবে জানে 'আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা করো, তারা হবে দোজখের ইন্ধন' আয়াতের অর্থ দোজখের ইন্ধন হবে তাদের অপ্রাণ বিগ্রহসমূহ— প্রাণবন্ত ঈসা, উযায়ের এবং ফেরেশতারা নয়। আর 'বালহুম ক্বওমুন খসিমুন' অর্থ বস্তুত তারা তো এক বিতণ্ডা সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়।

হজরত আবু উমামা থেকে আহমদ, বাগবী, তিরমিজি, ইবনে মাজা ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সৎপথ প্রাপ্তির পর কোনো জাতি পথভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু তাদেরকে দেওয়া হয়েছে বিতণ্ডা সৃষ্টির স্বভাব(একারণেই তারা পথভ্রষ্ট হয়)। এরপর তিনি স. পাঠ করেন 'এরা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে একথা বলে। বস্তুত তারা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়'।

এরপরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'সে তো ছিলো আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বনী ইসরাইলের জন্য দৃষ্টান্ত'। একথার অর্থ— ঈসা আমার পুত্র কদাচ নয়। এরকম হওয়া সম্ভবও নয়। বরং ঈসা হচ্ছে আমার বান্দাগণের মধ্যে এক বান্দা, যাকে আমি নবুয়ত দ্বারা বিশেষভবে অনুগ্রহায়িত করেছি। বানিয়েছি বনী ইসরাইলদের জন্য আমার অপার ক্ষমতার এক অবাক নিদর্শন।

এরপরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হতো'। একথার অর্থ— আমি ইচ্ছা করলে মানুষের মধ্য থেকে অথবা মানুষকে ধ্বংস করে দিয়ে তৎপরিবর্তে পৃথিবীতে প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম ফেরেশতাদেরকে। তারা পৃথিবীতে বসবাস করতো এবং

www.eelm.weebly.com

একনিষ্ঠভাবে আমার ইবাদত বন্দেগী করতো। অর্থাৎ ঈসাকে যেভাবে আমি সৃষ্টি করেছি তার চেয়েও বিস্ময়করভাবে তো আমি ফেরেশতাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। কিন্তু এতে করে কি আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের বংশগত সম্পর্ক প্রমাণিত হবে? বরং প্রমাণিত হবে তো এটাই যে, আল্লাহ্‌ই সকল লৌকিক ও অলৌকিক বিষয়াবলীর একমাত্র স্রষ্টা। আর তাঁর জ্ঞান ও শক্তির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

তাফসীরে মাযহারী/৫০৩

এরপরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— 'ঈসাতো কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ কোরো না এবং আমাকে অনুসরণ করো। এটাই সরল পথ'। একথার অর্থ— আমার প্রিয় নবী ঈসাকে আমি সশরীরে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছি। তাকে আমি করেছি কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন। তাকে আমি পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করবো। তার আবির্ভাব তখন একথাই প্রমাণ করবে যে, কিয়ামত আর বেশী দূরে নয়। সুতরাং হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দিগ্ধচিত্ত হয়ো না। কেননা সরল পথ এটাই।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ভেবে দ্যাখো, তখন তোমাদের অবস্থা কী রকম হবে, যখন মরিয়মতনয় তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন এবং তোমাদের ইমাম হবেন তোমাদের মধ্য থেকেই। হজরত হুজায়ফা ইবনে উসাইদ গিফারী বলেছেন, আমরা কয়েকজন মিলে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিলাম। এমন সময় রসুল স. উপস্থিত হলেন। বললেন, কোন বিষয়ে তোমরা আলাপ করছিলে? আমরা বললাম, কিয়ামতের বিষয়ে। তিনি স. বললেন, মনে রেখো, দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। সে দশটি নিদর্শন হচ্ছে— ১. ধোঁয়া ২. দাজ্জাল ৩. দাব্বাতুল আরদ্ব ৪. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ৫. মরিয়মতনয় ঈসার পুনরাবির্ভাব ৬. ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাদুর্ভাব ৭. পৃথিবীর তিনটি স্থানে ভূমি ধস—পূর্বাঞ্চলে ৮. পশ্চিমাঞ্চলে ৯. আরব উপদ্বীপে ১০. ইয়েমেন থেকে উদ্ভূত হবে এক অভিনব আগুন, ওই আগুনই মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে হাশর-প্রান্তরের দিকে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, দশম নিদর্শন হবে প্রচণ্ড বাতাস, যা মানুষজনকে নিক্ষেপ করবে সাগরে। মুসলিম।

হজরত নাওয়াস ইবনে সামআন বর্ণনা করেছেন, রসুল স. দাজ্জাল বিষয়ক এক দীর্ঘ হাদিসে উল্লেখ করেছেন, মরিয়মপুত্র ঈসাকে আল্লাহ্‌ পুনরায় প্রেরণ করবেন। তিনি দামেস্ক শহরের পূর্বদিকের শ্বেতশুভ্র মিনারের উপর নামবেন জরদ রঙের পোশাক পরে, দুই ফেরেশতার কাঁধে ভর দিয়ে। যখন তিনি মস্তক অবনত করবেন, তখন তাঁর বদন থেকে রৌপ্যমিশ্রিত মোতির মতো ঝরে পড়তে থাকবে স্বেদবিন্দু। আর এরকম ঘটবে তখনও যখন উত্তোলন করবেন মস্তক। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মরিয়মপুত্র ঈসা ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক হয়ে অবশ্যই তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন। অবশ্যই ভেঙে ফেলবেন ক্রুশ। বধ করবেন বরাহকুলকে। রহিত করবেন জিযিয়া। উষ্ট্রীকে এমন অকার্যকর করবেন যে, সেগুলো আর উপকারে আসবে না। দূর করে দিবেন মানুষের পারস্পরিক শত্রুতা। ধন-সম্পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাবেন। কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করবে না।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের দলপতি মরিয়মপুত্রকে বলবে, আসুন, আপনি আমাদের নামাজের জামাতের ইমাম হন। তিনি এই উম্মতের অভূতপূর্ব মর্যাদা দেখে বলবেন, তোমাদের দলপতি তোমাদের মধ্য থেকেই হোক।

তাফসীরে মাযহারী/৫০৪

বাগবী লিখেছেন, হজরত ঈসা বায়তুল মাকদিসে গিয়ে দেখবেন, আসরের নামাজ শুরু হয়েছে। তাঁর পদশব্দ শুনে ইমাম পিছনে সরে আসবে। তিনি তাঁকে ইশারায় পূর্বস্থানে গিয়ে দাঁড়াতে বলবেন এবং মোহাম্মদ স. এর শরিয়ত অনুসারে সকলের সঙ্গে মিলে নামাজ সম্পন্ন করবেন। তিনি শূকর নিধন করবেন, ক্রুশ ভাঙবেন, ইহুদী-খৃষ্টানদের উপাসনালয়গুলোকে ধ্বংস করে দিবেন এবং তাঁকে যারা বিশ্বাস করবে, তাদেরকে ছাড়া অবশিষ্ট ইহুদী-খৃষ্টানকে হত্যা করবেন।

হাসান এবং ব্যাখ্যাকারগণের অভিমত হচ্ছে, এখানকার 'ইন্‌নাহু লা ই'লমুল লিস্‌সাআ'ত' কথাটির সর্বনাম 'হু' এর সম্বন্ধ কোরআনের দিকে। অর্থাৎ 'হু' অর্থ এখানে 'ঈসা' না হয়ে হবে কোরআন এবং এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— কোরআন তো কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন। অর্থাৎ কোরআন কিয়ামতের কথাই বলে। জানিয়ে দেয় কিয়ামতের ভয়াবহতার বিভিন্ন বিবরণ।

'ফালা তামতারুন্না বিহা ওয়াত্‌তাবিউ'নী'' অর্থ সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ কোরো না। অর্থাৎ হজরত ঈসা অথবা কোরআন যখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে, তখন তোমরা এমতো সন্দেহে নিপতিত হয়ো না যে, কিয়ামত হবে না। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— সুতরাং তোমরা কিয়ামতকে মিথ্যা বলে প্রমাণ কোরো না।

'এবং আমাকে অনুসরণ করো' অর্থ জীবনযাপন করো আমা কর্তৃক প্রেরিত রসুল এবং আমা কর্তৃক প্রবর্তিত কোরআনের অনুসারী হয়ে। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটি রসুল স. এর। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে কথাটির পূর্বে উহ্য রয়েছে 'বলো'। অর্থাৎ

www.eelm.weebly.com

হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, তোমরা আমার অনুসরণ করো। আর 'হাজা সিরত্বুম্ মুস্তাক্বীম' অর্থ এটাই সরল পথ।

এরপর বলা হয়েছে— 'শয়তান যেনো তোমাদেরকে কিছুতেই নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে আরো উপদেশ দিন, তোমরা এই সরল পথেই থাকো। শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে কখনো এ পথ থেকে সরে যেয়ো না। জেনে রেখো, শয়তান তোমাদের চিরশত্রু। একথা গোপন কিছু নয়। সে-ই তোমাদের জান্নাত হারাবার কারণ। এখনো সে তোমাদেরকে এই সরল পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। সুতরাং সাবধান।

সূরা যুখ্রুফ ঃ আয়াত ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭

❑ 'ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিল তখন সে বলিয়াছিল, 'আমি তো তোমাদের নিকট আসিয়াছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে কতক বিষয়ে মতভেদ করিতেছ, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।

❑ 'আল্লাহ্ই তো আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, অতএব তোমরা তাঁহার 'ইবাদত কর; ইহাই সরল পথ।'

❑ অতঃপর উহাদের বিভিন্ন দল মতানৈক্য সৃষ্টি করিল, সুতরাং যালিমদের জন্য দুর্ভোগ মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির!

❑ উহারা তো উহাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামত আসিবারই অপেক্ষা করিতেছে।

❑ বন্ধুরা সেই দিন হইয়া পড়িবে একে অপরের শত্রু, মুত্তাকীরা ব্যতীত।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! ওই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন ঈসা তার সম্প্রদায়ের কাছে অলৌকিক নিদর্শনসমূহ নিয়ে আবির্ভূত হলো। বললো, হে আমার সম্প্রদায়। আমি তোমাদের কাছে আবির্ভূত হয়েছি প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে, তোমাদের মতানৈক্যমণ্ডিত বিষয়াবলীর সঠিক সমাধান করতে। সুতরাং তোমরা আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহ্কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার, তোমাদের এবং সমগ্রবিশ্বের সকলকিছুর সৃজয়িতা ও পালয়িতা। অতএব, তোমরা ইবাদত করো কেবল তাঁর। এটাই সরল সঠিক পথ।

এখানে 'স্পষ্ট নিদর্শন' অর্থ ইঞ্জিল শরীফ, অথবা ইঞ্জিল শরীফের সুস্পষ্ট বিধানাবলী। আর 'মতভেদ' বলে বুঝানো হয়েছে এখানে বনী ইসরাইলের একাত্তরটি দল-উপদলের মতভেদের কথা। উল্লেখ্য, হজরত ঈসা আবির্ভূত হয়েছিলেন ওই সকল মতভেদ দূর করে দিয়ে এক ও অবিভাজ্য শাশ্বত সরল পথরেখাকে সুস্পষ্ট করে দিবার জন্য।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইহুদীরা একাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। খৃষ্টানেরা বিভক্ত হয়েছিলো বায়াত্তরটি দলে। আর আমার উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি হবে তিয়াত্তরটি দল। জুজায বলেছেন, হজরত ঈসা ইঞ্জিলে যা কিছু নিয়ে এসেছিলেন, তার মধ্যে একটি বিষয় ছিলো ইহুদীদের ধর্মীয় মতভেদ বিষয়ক।

'ফাত্তাকুল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্কে ভয় করো। এখানকার 'ফা' অক্ষরটি নৈমিত্তিক। অর্থাৎ হজরত ঈসার প্রজ্ঞা ছিলো আল্লাহ্ভীতির ভিত্তি। 'আ'ত্বীউন' অর্থ আমার অনুসরণ

www.eelm.weebly.com

করো। অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যে সকল বিধি-বিধান নিয়ে এসেছি, সেগুলো প্রতিপালন করো আমার অনুসরণে। 'ফা'বুদুহু' অর্থ তাঁর ইবাদত করো। অন্য কারো ইবাদতে কখনোই আগ্রহান্বিত হয়ো না। আর এখানকার 'এটাই সরল পথ' কথাটি আল্লাহ্‌র, অথবা কথাটি হজরত ঈসার বক্তব্যের প্রলম্বায়ন বা জের।

এরপরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তাদের বিভিন্ন দল মতানৈক্য সৃষ্টি করলো, সুতরাং জালেমদের জন্য দুর্ভোগ মর্মান্তিক দিবসের শাস্তির'। একথার অর্থ— কিন্তু তারা নবী ঈসার সদুপদেশাবলীকে মান্য করলো না। প্রত্যাখ্যান করলো তাঁর সরল পথের দিক নির্দেশনাকে। পুনর্বার ধর্মীয় বিষয়ে সৃষ্টি করলো প্রচণ্ড মতভেদ। তাই তাদের জন্য অবধারিত হয়েছে পরকালের মর্মন্তুদ শাস্তি। কতোই না দুর্ভাগা তারা।

এখানে 'তাদের বিভিন্ন দল' অর্থ হজরত ঈসার উম্মতের মাধ্যমে বিভিন্ন দল। অথবা ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিভিন্ন দল। 'ফাওয়াইলুন' অর্থ দুর্ভোগ। 'জলামু' অর্থ জালেমেরা, স্বেচ্ছাচারী বা সীমালংঘনকারীরা, যারা স্বপ্রবৃত্তির পূজক। আর 'মিন আ'জাবি ইয়াওমিন আ'লীম' অর্থ মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, ধীরে ধীরে আমার উম্মতের অবস্থাও হয়ে যাবে বনী ইসরাইলদের মতো। তাদের মধ্যে কেউ যদি জননীগমন করে থাকে, তবে আমার উম্মতেরও কেউ সেরকম করবে। তারা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো বায়াত্তরটি দলে। আর আমার উম্মতের মধ্যে হবে তিয়াত্তরটি দল। তার মধ্যে জান্নাতে গমন করতে পারবে কেবল একটি দল। অন্যেরা হবে জাহান্নামী। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ওই সঠিক দল কোনটি? তিনি স. বললেন, যে পথে রয়েছি আমি এবং আমার সহচরবৃন্দ।

হজরত মুয়াবিয়া সূত্রে আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, বায়াত্তরটি দল দোজখে যাবে। কেবল একটি দল যাবে বেহেশতে। সেই দল হচ্ছে যুথবদ্ধ দল (আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত)।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা তো তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামত আসবার অপেক্ষাই করছে (৬৬)। বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, মুত্তাকীরা ব্যতীত' (৬৭)। একথার অর্থ মক্কার মুশরিকেরা কিয়ামত বিশ্বাস না করা সত্ত্বেও তারা অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের অপেক্ষাতেই রয়েছে। কেননা কিয়ামত যে অবধারিত। আর সেদিনের ভয়াবহতা এমন হবে যে, সুহৃদ-স্বজন কেউ কাউকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। বরং একে অপরকে শত্রু বলে ভাববে। কেবল বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা হবে এর ব্যতিক্রম। তাদের মধ্যের পারস্পরিক হৃদ্যতা কখনো বিনষ্ট হবে না— না দুনিয়ায়, না আখেরাতে।

বাগবী লিখেছেন, 'বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু মুত্তাকীরা ব্যতীত' এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে হজরত আলী তাঁর মন্তব্য করেছেন। বলেছেন, বিশ্বাসীগণের মধ্যে যেমন বন্ধুত্ব হয়, তেমনি বন্ধুত্ব হয় অবিশ্বাসীদের

মধ্যেও। বিশ্বাসী বন্ধু পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তার পৃথিবীবাসী বন্ধুর জন্য দোয়া করে এভাবে— হে আমার প্রভুপালক! আমার বন্ধুটি আমাকে তোমার ও তোমার রসুলের আনুগত্য করতে বলতো। আমাকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করতো, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করতো। সুতরাং তুমি তাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়ো না। আর তুমি যেমন আমাকে শুভকর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য দিয়েছিলে, তেমনি তাকেও দিয়ো। তাকে রেখো সতত সত্যাধিষ্ঠিত। যেভাবে আমাকে তুমি সম্মানিত করেছো, সেভাবে সম্মানিত কোরো তাকেও। মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌পাক তাদের দু'জনকেই একত্র করে বলেন, তোমরা পরস্পরের প্রশস্তি বর্ণনা করো। তারা তখন একজন অন্যজনের প্রশস্তি করে এভাবে— সে ছিলো আমার উত্তম ভ্রাতা, উত্তম সুহৃদ এবং উত্তম সহচর। অবিশ্বাসীদের অবস্থা হবে এর বিপরীত। তাদের মধ্যে যার আগে মৃত্যু হয় সে নিবেদন জানায়, হে আমার প্রভুপালক! আমার ওই বন্ধুটি আমাকে মন্দ কর্মে উদ্বুদ্ধ করতো, নিষেধ করতো ভালো কাজ করতে। তোমার ও তোমার রসুলের আনুগত্য করতে সে-ই তো আমাকে বারণ করতো। বলতো, পরকাল বলে কিছু নেই। সে তো ছিলো আমার অত্যন্ত নিকৃষ্ট ভ্রাতা, অতি নিকৃষ্ট বন্ধু এবং অতি মন্দ সাথী।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, পৃথিবীর সর্বপূর্বে অবস্থিত কোনো বিশ্বাসী যদি সর্বপশ্চিমের কোনো বিশ্বাসীকে ভালোবাসে, মহা বিচারের দিবসে আল্লাহ্ তাদেরকে মিলিয়ে দিবেন। বলবেন, এবার দেখলে তো। এই-ই হচ্ছে তোমার প্রিয়জন, যাকে তুমি ভালোবাসতে আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার কারণে যারা পরস্পরকে ভালোবাসতো তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দান করবো। কেননা আজ আমার ছায়ার আশ্রয় ব্যতীত আর কোনো আশ্রয় নেই। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আল্লাহ্‌র দুই বান্দা পরস্পরকে মহব্বত করলে তারা যদি পৃথিবীর সর্বপূর্ব ও সর্বপশ্চিমের অধিবাসীও হয়, তবুও তাদেরকে পরকালে আল্লাহ্ এক জায়গায় আনবেন। বলবেন, দ্যাখো, এই হচ্ছে তোমার সেই বন্ধু, যাকে তুমি আমার জন্য মহব্বত করতে।

সূরা যুখরুফ ঃ আয়াত ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯

www.eelm.weebly.com

❑ হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না।

❑ যাহারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছিল—

❑ তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।

❑ স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র লইয়া তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করা হইবে; সেথায় রহিয়াছে সমস্ত কিছু, যাহা অন্তর চাহে এবং যাহাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেথায় তোমরা স্থায়ী হইবে।

❑ ইহাই জান্নাত, তোমাদিগকে যাহার অধিকারী করা হইয়াছে, তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ।

❑ সেথায় তোমাদের জন্য রহিয়াছে প্রচুর ফলমূল, তাহা হইতে তোমরা আহার করিবে।

❑ নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকিবে স্থায়ীভাবে;

❑ উহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং উহারা উহাতে হতাশ হইয়া পড়িবে।

❑ আমি উহাদের প্রতি যুলুম করি নাই, বরং উহারা নিজেরাই ছিল যালিম।

❑ উহারা চীৎকার করিয়া বলিবে, 'হে মালিক, তোমার প্রতিপালক যেন আমাদিগকে নিঃশেষ করিয়া দেন।' সে বলিবে, 'তোমরা তো এইভাবেই থাকিবে।'

❑ আল্লাহ্ বলিবেন, 'আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্যবিমুখ।'

❑ উহারা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে? বরং আমিই তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— মহবিচারের দিবসে মহাসংকটকালে আল্লাহ্ স্বয়ং মুত্তাকীগণকে অভয় দান করবেন। বলবেন, হে আমার প্রিয়ভাজন দাসগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই। দুঃখ-কষ্ট তোমাদেরকে আজ স্পর্শ

করবেই না। কেননা তোমরা আমার নিদর্শনসমূহকে বিশ্বাস করেছিলে এবং আমার প্রতি ছিলে পূর্ণসমর্পিত। আজ তো তোমাদের পুরস্কৃত হওয়ার সময়। তোমরা এখন তোমাদের বিশ্বাসবতী সহধর্মিণীগণকে নিয়ে চিরসুখময় বেহেশতে প্রবেশ করো। উল্লেখ্য, এরকম ঘোষণা শুনে মুত্তাক্বীগণ উৎফুল্ল হবে এবং সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে অবিশ্বাসীরা।

এখানে 'ইয়া ই'বাদী' থেকে শুরু হয়েছে নতুন বক্তব্য। আর এখানে উহ্য রয়েছে 'ইয়াক্বুলু' (আল্লাহ্ বলবেন) কথাটি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তখন তাঁর বিশ্বাসীবান্দাগণকে (মুত্তাক্বীগণকে) বলবেন, আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'তুহ্বারূন' অর্থ সানন্দে, উৎফুল্ল হয়ে। বলাবহুল্য, জান্নাতগমনের আদেশে তারা অবশ্যই উৎফুল্ল হবে। সে উৎফুল্লতা ফুটে উঠবে তাদের মুখাবয়বে। শব্দটি উৎসারিত হয়েছে 'হিবার' থেকে, যার অর্থ প্রভাব, লক্ষণ। অথবা এখানে 'তুহবারূন' শব্দটির অর্থ হবে সুসজ্জিত করে। এমতাবস্থায় 'তুহবারূন' এর ধাতুমূল হবে হিব্রূন' এবং হিব্রূন' অর্থ সৌন্দর্য, কমনীয়তা। কিংবা শব্দটির অর্থ হবে এখানে সসম্মানে। অর্থাৎ তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীরা এখন সসম্মানে বেহেশতে প্রবেশ করো।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে, সেখানে রয়েছে সমস্ত কিছু, যা অন্তর চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে (৭১)। এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ (৭২)' সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমুল, তা থেকে তোমরা আহার করবে' (৭৩)।

এখানে 'ইউত্বফু আ'লাইহিম' অর্থ জান্নাতের চিরকিশোর পরিচারকগণ প্রদক্ষিণ করবে। তারাই সোনার বাসন ও পানপাত্র নিয়ে নির্দেশ লাভের আশায় জান্নাতবাসীদের চতুস্পার্শ্বে ঘুরাফিরা করতে থাকবে। এখানে তাই বলা হয়েছে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে'।

এখানকার 'সিহাফ' অর্থ বড় পেয়ালা, থালা, বা বাসন। শব্দটি 'সাহাফাত' এর বহুবচন। আর 'আকওয়াব' অর্থ পানপাত্র, কুঁজো, বা সুরাহী। অর্থাৎ এমন পাত্র, যার গলদেশ গোলাকার এবং যাতে কোনো হাতল থাকে না।

'সেখানে রয়েছে সমস্তকিছু, যা অন্তর চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়' একথার অর্থ জান্নাতবাসীদের অভাব বলে কিছুই থাকবে না। যা কিছু চিত্তসুখকর ও নয়নতৃপ্তকারী, তার সকল কিছুই তারা সেখানে যখন ইচ্ছা করবে তখনই পাবে। উল্লেখ্য, সুফীসাধকগণ যেহেতু আল্লাহ্র প্রেম ও দীদার ছাড়া আর কিছুই চান না, সেহেতু সেখানে তাঁদের প্রেমমগ্নতা ও দীদার হবে নিরবচ্ছিন্ন।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে সাবেত থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর পবিত্র সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে এক ব্যক্তি একবার নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! ঘোড়া আমার পছন্দ। বেহেশতে কি ঘোড়া পাওয়া যাবে? তিনি স.

বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি জান্নাতবাসী হও। তুমি তোমার পছন্দ মতো লাল অথবা যে কোনো বর্ণের তেজস্বী ঘোড়ায় চড়ে জান্নাতের যে কোনো স্থানে গমন করতে পারবে। সেখানে উপস্থিত আর একজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমি ভালোবাসি উট। বেহেশতে কি উট পাওয়া যাবে? তিনি স. বললেন, হে আরবী! আল্লাহ্ যদি তোমাকে বেহেশতবাসী করেন, তবে তুমি তা-ই পাবে, যা তোমার হৃদয় চায় এবং যাতে তৃপ্ত হয় তোমার নয়ন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি এবং বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন। বিশুদ্ধ সূত্রে এরকম হাদিস আরো বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুর রহমান থেকে তিবরানী ও বায়হাকী এবং হজরত আবু আইয়ুব থেকে বায়হাকী। তবে তাদের বর্ণিত হাদিসে রয়েছে কেবল ঘোড়ার কথা। উটের উল্লেখ সেগুলোতে নেই।

আল্লাহ্ প্রত্যেক মানুষের জন্য কর্মফলস্বরূপ নির্ধারণ করে রেখেছেন জান্নাত অথবা জাহান্নাম। কিন্তু মানুষ কর্মদোষে অথবা কর্মগুণে হয়ে যায় জাহান্নামী, অথবা জান্নাতী। তাই এখানে বলা হয়েছে এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জাহান্নামীদেরকে জান্নাতের ওই স্থান দেখানো হবে, যা তারা পুণ্যবান হলে পেতো। তখন তারা আক্ষেপে-অনুতাপে জর্জরিত হয়ে বলবে, আল্লাহ্ যদি আমাকে হেদায়েত দান করতেন, তবে আমিও হতে পারতাম মুত্তাকীদের দলভূত। আর জান্নাতবাসীদেরকেও দেখানো হবে জাহান্নামের ওই স্থান, যেখানে তারা প্রবেশ করতো ইমানদার না হলে। তারা তখন আনন্দিত হয়ে বলে উঠবে, ওই পবিত্র সত্তার প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা, যিনি আমাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেকের জন্য বাসস্থান রাখা হয়েছে বেহেশত ও দোজখ উভয় জায়গায়। কাফেরদের জান্নাতের কর্মস্থানের উত্তরাধিকারী হবে মুমিনেরা এবং মুমিনদের জাহান্নামের উত্তরাধিকারী হবে দোজখীরা। এই বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে বলা হয়েছে তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে'।

'সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল' একথা প্রসঙ্গে বাযযার ও তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাওবান বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, বেহেশতবাসীরা সেখানকার কোনো গাছ থেকে ফল পেড়ে নিলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সৃষ্টি করে দেওয়া হবে নতুন ফল। হজরত আবু মুসার উদ্ধৃতি দিয়ে বাযযার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যখন আদমকে জান্নাত থেকে চলে যেতে বললেন, তখন তাঁর সঙ্গে কিছু ফলমূলও দিলেন এবং সেগুলোর গুণাগুণও তাঁকে জানিয়ে দিলেন। পৃথিবীর সকল ফল ওই ফলগুলোরই প্রজন্মনায়ন। তবে বেহেশতের ফল পচনমুক্ত এবং পৃথিবীর ফল পচনশীল।

ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বলেছেন, সিরিয়াবাসীরা একবার হজরত ইবনে মাসউদের কাছে জান্নাত সম্পর্কে জানতে চাইলো। তিনি বললেন, সেখানকার

www.eelm.weebly.com

ফলের গুচ্ছ অনেক বড়। যেনো তা এখান থেকে সিনাই পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, জান্নাতের এক একটি ফল হবে বারো হাত লম্বা এবং সেগুলোর মধ্যে কোনো আঁটি থাকবে না।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকবে স্থায়ীভাবে (৭৪); তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়বে (৭৫)। আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিলো জালেম' (৭৬)। একথার অর্থ— নিশ্চয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা দোজখে শাস্তিভোগ করতে থাকবে স্থায়ীভাবে এবং ওই শাস্তি এতোটুকুও লাঘব করা হবে না। ফলে মুক্তির আশা তারা চিরতরে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে। এরকম হবে তাদেরই কর্মফলের কারণে। আমার পক্ষ থেকে সামান্যতম অন্যায় ও তাদের সঙ্গে করা হবে না। বরং তারাই তো অন্যায়কারী। এখানে 'অপরাধী' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বা কাফের,পাপী বিশ্বাসী নয়। কেননা অন্য আয়াতে তাদেরকে অপরাধী বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, পাপী বিশ্বাসীরা দোজখে প্রবেশ করলেও পাপক্ষয়ের পর মুক্তিলাভ করবে। অবশেষে প্রবেশ করবে বেহেশতে।

এরপরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'তারা চীৎকার করে বলবে, হে মালেক! তোমার প্রতিপালক যেনো আমাকে নিঃশেষ করে দেন। সে বলবে, তোমরা তো এভাবেই থাকবে'। একথার অর্থ মর্মন্তুদ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে দোজখীরা দোজখের তত্ত্বাবধায়ক মালেক ফেরেশতাকে বলবে, হে মালেক! তোমার প্রভুপালককে বলো, তিনি যেনো আমাদেরকে মৃত্যু দিয়ে এই নিদারুণ কষ্টের চির অবসান ঘটান। আল্লাহ্ অথবা মালেক উত্তরে বলবে, তোমাদেরকে এভাবেই থাকতে হবে। তোমরা মরবেও না, স্বস্তিও পাবে না। উল্লেখ্য, দোজখীদেরকে এরকম বলা হবে তাদের নিবেদন উপস্থাপনের এক হাজার বৎসর পর। ইবনে যোবায়ের, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আবিদ্ দুনইয়া এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস এই আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলেছেন, দোজখীদের 'তোমার প্রভুপালক যেনো আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন' এরকম কাকুতি মিনতির জবাবে 'তোমরা তো এভাবেই থাকবে' বলা হবে এক হাজার বৎসর পর।

'জাওয়াইদুজ জুহুদ' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, হান্নাদ, তিবরানী, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম, বায়হাকী ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বলেছেন, দোজখবাসীরা মালেককে চীৎকার করে ডেকে বলবে, হে মালেক! তোমার প্রভুপালককে বলে আমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দাও। মালেক একথা শুনেও চল্লিশ বৎসর যাবত চুপ করে থাকবে। তারপর বলবে, তোমরা চিরকাল এভাবেই থাকবে। এরপর তারা তাদের প্রভুপালককে ডেকে ডেকে বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা ছিলাম মহাদুর্ভাগা, পথভ্রষ্ট। আমাদেরকে আর একবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও। এরপরেও যদি আমরা সত্যপ্রত্যাখ্যান করি, তবে অবশ্যই আমরা হবো অপরাধী। পৃথিবীতে তারা

যতোদিন বেঁচে ছিলো, তার দ্বিগুণ সময় পর্যন্ত তাদের একথার জবাব দেওয়া হবে না। তারপর বলা হবে— তোমরা চিরধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো। কথা বোলো না। এর পর থেকে তারা হয়ে যাবে চিরনির্বাক।

সাঈদ ইবনে মনসুর ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেছেন, দোজখবাসীরা পাঁচবার মুক্তিপ্রার্থনা করবে। চারবার তিনি জবাব দিবেন। পঞ্চমবার থাকবেন নির্জবাব। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছো, জীবনও দিয়েছো দু'বার। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। এখন আমাদের নিষ্কৃতি প্রাপ্তির কোনো উপায় আছে কী? জবাবে আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের এ বিপদ একারণে যে যখন তোমাদেরকে আমার দিকে ডাকা হতো, তখন তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে। আর আমার সঙ্গে যখন কাউকে শরীক করা হতো, তখন তোমরা তা স্বীকার করে নিতে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও। আমরা এবার সৎকর্ম করবো। আমরা এখন দৃঢ় বিশ্বাসী। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা আজকের এই পরিণতির কথা ভুলে গিয়েছিলে, সেকারণে আমিও আজ তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি তোমরা এখন আস্বাদন করতে থাকো। দোজখবাসীরা পুনরায় নিবেদন করবে, হে আমাদের পালয়িতা! আমাদেরকে অন্তত কিছুদিনের জন্য অবকাশ দাও, যাতে আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে পারি এবং অনুসরণ করতে পারি তোমার রসুলের। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি ইতোপূর্বে শপথ করে একথা বলতে না যে, তোমাদেরকে পৃথিবী ছেড়ে পরকালে আসতে হবে না? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও। আমরা আগে যা করতাম, তা আর করবো না। আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এতোটা বয়স দিইনি যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম সতর্ককারী। অতএব এখন আস্বাদন করো মর্মন্তুদ শাস্তি। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই। দোজখবাসীরা আবার নিবেদন জানাবে, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে ঢেকে ফেলেছিলো এবং আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা লাঞ্ছিত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো। আমার সঙ্গে কথা বোলো না। এরপর থেকে আল্লাহ্ও তাদের সঙ্গে আর কথা বলবেন না।

এরপরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বলবেন, আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলো সত্যবিমুখ'। একথার অর্থ— 'তোমরা তো এভাবেই থাকবে' এরকম বলার পর আল্লাহ্ পুনরায় ঘোষণা করবেন, আমি তো তোমাদের নিকট আমা কর্তৃক প্রেরিত বার্তাবাহক এবং আমার পক্ষ থেকে অবতারিত গ্রন্থের

www.eelm.weebly.com

মাধ্যমে সত্য ধর্মের সংবাদ জানিয়েছিলাম। কিন্তু তখন তোমাদের অধিকাংশই সে সত্যকে অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করে বসেছিলে। এখানে 'কারিহূন' অর্থ সত্য-বিমুখ। অর্থাৎ সত্যবিমুখতা ছিলো তোমাদের সত্তাসন্নিহিত প্রবৃত্তি। তাই তোমরা সত্যপ্রত্যাখ্যান করতে এতোটুকুও দ্বিধান্বিত হতে না।

এরপরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'তারা কি কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? বরং আমিই তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কি আমার রসুলের বিরুদ্ধে কোনো গোপন অভিসন্ধি ঠিক করে রেখেছে? অথবা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্য তারা কি কোনো গোপন পরিকল্পনা স্থির করেছে। বরং সকল বিষয়ে চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নকারী তো আমিই। আমি তো তাদের জন্য করে রেখেছি শাস্তির ব্যবস্থা।

এখানে 'আম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'বাল' (বরং) অর্থে। এভাবে এখান থেকে শুরু হয়েছে নতুন বক্তব্য। আর 'আব্‌রমূ' অর্থ এখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, গোপন অভিসন্ধি।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী বলেছেন, একবার কাবা গৃহের আড়ালে গোপনে তিনজন লোক সমবেত হলো। তাদের মধ্যে দু'জন ছিলো কুরায়েশ এবং একজন সাক্বাফী, অথবা দু'জন সাক্বাফী ও একজন কুরায়েশ। তাদের মধ্যে একজন বললো, তোমাদের কী মনে হয়, আল্লাহ্ কি আমাদের কথা শোনেন? অন্যজন বললো, চেঁচিয়ে বললে শোনেন। চুপি চুপি বললে শোনেন না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

সূরা যুখ্‌রুফ ঃ আয়াত ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯

❑ উহারা কি মনে করে যে, আমি উহাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না? অবশ্যই রাখি। আমার ফিরিশ্‌তাগণ তো উহাদের নিকট থাকিয়া সবকিছু লিপিবদ্ধ করে।

❑ বল, 'দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকিলে আমি হইতাম তাহার উপাসকগণের অগ্রণী;

❑ 'উহারা যাহা আরোপ করে তাহা হইতে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং 'আরশের অধিকারী পবিত্র মহান।'

www.eelm.weebly.com

❑ অতএব উহাদিগকে যে দিবসের কথা বলা হইয়াছে তাহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তুমি উহাদিগকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতে দাও।

❑ তিনিই ইলাহ্ নভোমণ্ডলে, তিনিই ইলাহ্ ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

❑ কত মহান তিনি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধিপতি! কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁহারই আছে এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

❑ আল্লাহ্র পরিবর্তে উহারা যাহাদিগকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাহাদের নাই, তবে যাহারা সত্য উপলব্ধি করিয়া উহার সাক্ষ্য দেয়, তাহারা ব্যতীত।

❑ যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে, উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' তবুও উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে?

❑ আমি অবগত আছি রাসূলের এই উক্তিঃ 'হে আমার প্রতিপালক! এই সম্প্রদায় তো ঈমান আনিবে না।'

❑ সুতরাং তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং বল, 'সালাম'; উহারা শীঘ্রই জানিতে পারিবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই লোকেরা কী ভেবেছে? আমি কি তাদের অন্তরের কথা এবং একান্ত শলাপরামর্শের কথা জানি না? আমি তো সর্বজ্ঞ। তাছাড়া তাদের সকলের সঙ্গে আমি রেখে দিয়েছি আমল লেখক ফেরেশতাদেরকে। তারাও তাদের সকল কার্যকলাপের বিবরণ লিখে রাখে।

এখানকার 'আম'ও ব্যবহৃত হচ্ছে 'বাল' অর্থে। এভাবে ঘটানো হয়েছে বক্তব্যান্তর। 'সিররহুম' অর্থ গোপন বিষয়। 'নাজ্ওয়াহুম' অর্থ মন্ত্রনা, কানাঘুষা, শলাপরামর্শ। 'রুসুলুনা' অর্থ আমার ফেরেশতাগণ, যারা মানুষের ভালো ও মন্দ আমলসমূহ লিখে রাখে। আর 'লাদাইহিম' অর্থ তাদের নিকটে থাকে, কখনো পৃথক হয় না। অর্থাৎ ওই আমল লেখক ফেরেশতারা কখনোই তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে না।

পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— বলো, দয়াময় আল্লাহ্র কোনো সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! যারা আল্লাহ্র পুত্র আছে বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকে বলে দিন, তা-ই যদি হতো তবে আমিই তো সবার আগে তার উপাসনা শুরু করতাম। কিন্তু তা যে অসম্ভব ও চরমতম মিথ্যাচার। সুতরাং আমি তো একথা মানতেই পারি না। কেননা আমি আল্লাহ্র সত্য রসুল।

পিতাকে সম্মান করলে তার সন্তানকেও সম্মান করতে হয়। যেমন রসুল স. বলেছেন, ফাতেমা আমার অংশ। তাই যা তাকে বিষণ্ন করে, তা আমাকেও বিষণ্ন করে দেয়। বোখারী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে। এখানে বিজ্ঞজনোচিত বাককুশলতা দ্বারা আল্লাহ্র পুত্র কল্পনা করার মতো জঘন্য অংশীবাদিতাকে খণ্ডন করা হয়েছে। একথাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র পুত্র হওয়ার কথা ধারণাও করা যায় না। সুতরাং যা অসম্ভব, তাকে পূজনীয় ভাবা তো আরো অসম্ভব। অন্য এক আয়াতে এরকম অসম্ভাব্যতাকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে, যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য থাকতো, তাহলে উভয়েই অনাসৃষ্টি উৎপাদন করতো, 'লাওকানা ফীহিমা আলিহাতুন ইল্লাল্লহু লাফাসাদাতা' এই আয়াত দু'টোর মধ্যে পার্থক্য এই যে, সেখানকার 'লাও' অস্বীকার করেছে শর্ত ও পরিণতি উভয়কে। আর এই আয়াতের 'ইন' প্রযোজ্য হয় কেবল শর্তের ক্ষেত্রে। এর দ্বারা উভয় দিকে (আয়াতের প্রথম ও শেষ অংশে) সমর্থন রয়েছে নাবোধকতার এবং এই না-বোধকতা দাঁড়িয়েছে হ্যাঁ-বোধকতার বিরুদ্ধে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— রসুল স. যে আল্লাহ্র পুত্র হওয়াকে অস্বীকার করেন, তা কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষনির্ভর নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র পুত্রকে তিনি বিদ্বেষবশতঃ মেনে নিচ্ছেন না, বিষয়টি এরকম নয়। বরং এরকম হওয়াই যে অসম্ভব। সুতরাং অসম্ভবকে সম্ভব মনে করার মতো মিথ্যাচারকে তিনি প্রশ্রয় তো দিতে পারেনই না। তিনি যে সতত সত্যাধিষ্ঠিত নিষ্পাপ ও ন্যায়বান রসুল।

সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরকম— তোমরা যদি মনে করো আল্লাহ্র সন্তান রয়েছে, তবে তা তোমাদের ব্যাপার। কিন্তু আমি তো জানি মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতা সন্তান গ্রহণের মতো মুখাপেক্ষিতা থেকে চিরপবিত্র। আমার বক্তব্য তোমাদের ধারণার বিপরীত।

এখানে 'আ'বাদুন' অর্থ উপাসক। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, উন্নাসিক। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— আমিই সর্বাগ্রে তোমাদের অপবিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করছি। আবার কেউ কেউ বলেছেন 'আ'বাদুন' অর্থ প্রচণ্ড ক্রোধ। অর্থাৎ আমি তোমাদের বিশ্বাস ও বক্তব্যের প্রতি ভীষণ অতুষ্ট। এরকম কথা শুনলেই আমার ভীষণ রাগ হয়। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, 'আ'বাদুন' অর্থ প্রচণ্ড রোষ, ভীষণ যুদ্ধ, অনুতাপ, ভর্ৎসনা, লোভ-লালসা, প্রত্যাখ্যান। আ'বিদা শব্দটি 'ফারিহা' শব্দটির মতো বাবে সামীয়ার নিয়মে সঙ্গতিপূর্ণ অর্থ হচ্ছে প্রত্যাখ্যান ও প্রচন্ড রোষ।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! তাদেরকে স্পষ্টভাবে একথা জানিয়ে দিন, দয়াময়ের কোনো সন্তান থাকতে পারে না— আমিই একথার সর্বাগ্রগণ্য সাক্ষ্যদাতা। এখানে 'ইন্' অর্থ 'যদি' না হয়ে হবে না-সুচক। 'আবেদীন' অর্থ— সাক্ষ্যদাতা।

এরপরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'তারা যা আরোপ করে, তা থেকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী পবিত্র, মহান'। একথার অর্থ— যিনি গগন-ভূবনের একচ্ছত্র অধীশ্বর এবং মহান আরশের একক অধিকর্তা, তিনি ওই সকল অপবিশ্বাস থেকে পবিত্র, যা বর্ণনা করে মূর্তিপূজকেরা। অর্থাৎ আকাশসমূহ, পৃথিবী ও আরশের মতো সুবৃহৎ অস্তিত্বও যখন আল্লাহ্র অংশ নয়, তখন অন্যেরা তার অংশ হতে পারবে কেমন করে? তাঁর সঙ্গে সকলের ও সকল কিছুর সম্পর্ক স্রষ্টা ও সৃষ্টির। পিতা-পুত্র, পুত্র-পিতা, পতি-ভার্যা, ভার্যা-পতি এসকল সম্বন্ধ তো সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, স্রষ্টার কদাচ নয়।

এরপরের আয়াতে (৮৩) বলা হয়েছে— 'অতএব, তাদেরকে যে দিবসের কথা বলা হয়েছে, তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তুমি তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়াকৌতুক করতে দাও'। এখানে 'ইয়াখূদ্বু' অর্থ নিরর্থক কর্ম, অনর্থক বাক-বচসা। 'ইয়ালআ'বূ অর্থ ক্রীড়া- কৌতুক। আর 'ইয়াওমাহুম' অর্থ যে দিবস। অর্থাৎ মহাপ্রলয় দিবস।

এরপরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'তিনিই ইলাহ্ নভোমণ্ডলে, তিনিই ইলাহ ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— অন্তরীক্ষে হোক, অথবা ভূপৃষ্ঠে, উপাস্য হওয়ার অধিকার আর কারো নেই। থাকতে পারেই না। তিনি যে আনুরূপ্যবিহীনরূপে প্রজ্ঞাধিকারী এবং সর্বপরিজ্ঞাতা। অন্য কেউ যেহেতু এরকম গুণসম্পন্ন নয়, তাই তিনি ছাড়া ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতাও কারো নেই।

এখানে 'আলহাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়, জগতসমূহের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সুবিজ্ঞ, সকলের ও সকলকিছুর পরিণাম নির্ণায়ক। আর 'আ'লীম' অর্থ এমন অতুলনীয় জ্ঞানী, যাঁর জ্ঞানের বাইরে কারো বা কোনোকিছুর অস্তিত্বই নেই।

এরপরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'কতো মহান তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্তকিছুর সার্বভৌম অধিপতি! কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে'। এখানে 'ওয়াই'নদাহু ই'লমুস্ সায়াত' অর্থ কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে। অর্থাৎ মহাপ্রলয় কখন সংঘটিত হবে, তা জানেন কেবল তিনিই, অন্য কেউ নয়। সুতরাং সকলের এবং সকল কিছুর অধিকার রয়েছে কেবল তাঁর।

এরপরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে তাঁর সাক্ষ্য দেয়, তারা ব্যতীত'। একথার অর্থ— পৌত্তলিকেরা মনে করে তাদের পূজনীয় প্রতিমাগুলো তাদের পক্ষে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবে। কিন্তু তা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। কারণ ওগুলো অপ্রাণ। যাদের মধ্যে প্রাণের উপস্থিতিই

নেই, তাদের আবার সুপারিশ করার অধিকার থাকেই বা কী করে? তবে ওই সকল ব্যক্তিত্ব সুপারিশ করার যোগ্যতাসম্পন্ন, যারা বিশ্বাসী ও আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন।

এখানে 'যারা সত্য উপলব্ধি করে তার সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত' অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ' কলেমার মর্ম যারা বোঝে এবং এই মহাসত্যের সাক্ষ্য যারা দেয় তারা ব্যতীত। ব্যতিক্রমীটি বিযুক্ত, অথবা সংযুক্ত। সংযুক্ত এই অর্থে যে, ফেরেশতা এবং হজরত ঈসা-হজরত উযায়েরের উপাসনাও তারা করে। আর বিযুক্ত হওয়ার কারণ, তাঁরা কিন্তু তাদের অন্যান্য পূজনীয় প্রতিমাগুলোর মতো অপ্রাণ ও সুপারিশ ক্ষমতাহীন নন। কেননা তারা মহাকলেমায় বিশ্বাসী এবং সাক্ষ্যদাতা। শেষে তাই বলে দেওয়া হয়েছে 'তারা ব্যতীত'।

এরপরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— 'যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্'। তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি অবগত আছি রসুলের এই উক্তি ঃ হে আমার প্রতিপালক! এই সম্প্রদায় তো ইমান আনবে না (৮৮)। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো এবং বলো, সালাম; তারা শীঘ্রই জানতে পারবে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি আপনার এই অভিমতটি সম্পর্কে সম্যক অবগতঃ হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমি এই দুর্বিনীত সম্প্রদায়ের ইমান আনয়নের ব্যাপারে আশাবাদী নই। অতএব এ ব্যাপারে আমার নির্দেশ শুনুন। তাদের আচরণে আর ব্যথিত না হয়ে তাদের সঙ্গে উপেক্ষার সম্পর্ক গড়ে তুলুন 'সালাম' বলে দিয়ে। যথাশীঘ্র আমি তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবোই। যথাসময়ে তারা তা জানতেও পারবে। কিন্তু তখন পবিত্রাণের পথ তাদের জন্য হয়ে যাবে চিররুদ্ধ।

এখানে 'এই সম্প্রদায় তো ইমান আনবে না' অর্থ শত চেষ্টা করলেও এরা কিয়ামত দিবসে আর বিশ্বাস স্থাপন করবে না। 'আমি অবগত আছি' কথাটি এখানে মূল আয়াতে রয়েছে উহ্য। 'উপেক্ষা করো' অর্থ তারা ইমান আনবে, এমতো দুরাশা আর কোরোই না, তাদের প্রতি হয়ে যাও সম্পূর্ণরূপে বিমুখ। 'বলো, 'সালাম' অর্থ তাদেরকে জানিয়ে দাও চূড়ান্ত অভিবাদন। বলো,

তোমাদের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। আমি তোমাদেরকে ত্যাগ করেছি, তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ করো। আর 'শীঘ্রই তারা জানতে পারবে' অর্থ অচিরেই তারা পেয়ে যাবে তাদের ভুল ধারণা, মিথ্যাচারিতা ও অপকর্মের শাস্তি। মুকাতিল বলেছেন,পরবর্তীতে জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে আলোচ্য আয়াতদ্বয় রহিত হয়ে গিয়েছে।

সকল প্রশংসা স্তব-স্তুতি প্রশস্তি আল্লাহ্‌র। সকল দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। তৎসহ তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজন-বংশধর ও সম্মানার্হ সহচরবৃন্দের প্রতি। সুরা যুখ্‌রুফের তাফসীর শেষ হলো আজ ২৪ শে রবিউল আউয়াল বুধবার, ১২০৮ হিজরী সনে।

সূরা দুখান

মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরায় রয়েছে ৩ রুকু এবং ৫৯ আয়াত।
সূরা দুখান ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

❑ হা-মীম।
❑ শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।
❑ আমি তো ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি এক মুবারক রজনীতে; আমি তো সতর্ককারী।
❑ এই রজনীতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়,
❑ আমার আদেশক্রমে, আমি তো রাসূল প্রেরণ করিয়া থাকি
❑ তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ—
❑ যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হা-মীম। শপথ মহাগ্রন্থ কোরআনের, যে গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে বৈধ ও অবৈধের প্রভেদরেখাকে। এই মহাগ্রন্থ আমি অবতীর্ণ করেছি সৌভাগ্যমণ্ডিত রজনীতে। আমি তো দয়ার্দ্র সতর্ককারী।

এখানে সৌভাগ্যমণ্ডিত রজনী অর্থ রমজান মাসের কদরের রাত্রি। এই রাতেই বর্ষিত হয় ইহ-পারত্রিক কল্যাণ। এ রাতে ফেরেশতাগণের দ্বারা রহমত অবতীর্ণ হয় এবং গৃহীত হয় প্রার্থীদের প্রার্থনা। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কাতাদা ও ইবনে জায়েদ। তাঁদের মতে কদরের রাতেই লওহে মাহফুজ থেকে কোরআন আনা হয় পৃথিবীর নিকটতম আকাশে। তারপর সেখান থেকে বিশ বৎসর ধরে বিভিন্ন প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপটে রসুল স. এর কাছে হজরত জিবরাইলের মাধ্যমে অবতীর্ণ হতে থাকে আল কোরআন।

কেউ কেউ বলেছেন, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে শাবান মাসের মধ্যবর্তী এক রাত্রিতে। কিন্তু তাদের এমতো ধারণা সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্ স্বয়ং বলেছেন, 'রমজান এমন একটি মাস, যে মাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে'। অন্যত্র বলেছেন, 'নিশ্চয় আমি এটা অবতীর্ণ করেছি লাইলাতুল কদরে'।

কাসেম ইবনে মোহাম্মদ তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অর্ধশাবানের রাতে আল্লাহ্ পৃথিবীর নিকট আকাশে আনুরূপ্যহীন অবতরণ করেন এবং সকলকে মার্জনা করেন। মার্জনা করেন না কেবল হিংসুক ও মূর্তিপূজককে। বাগবী। এই হাদিস কিন্তু অর্ধশাবানের রাতে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। আর এখানকার 'আমি তো সতর্ককারী' অর্থ নিশ্চয় আমি এই কোরআনের মাধ্যমে আমার শাস্তি সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছি।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে (৪,৫) বলা হয়েছে— 'এই রজনীতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় আমার আদেশক্রমে'। একথার অর্থ— আমার আদেশে কদরের রাতে আগামী এক বৎসরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর সিদ্ধান্ত বলবত করা হয়। উল্লেখ্য, এমতো গুরুত্বের কারণেই এই রাতে কোরআন মজীদ অবতীর্ণ করা হয়েছে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কদরের রাত্রিতে পরবর্তী বৎসরের যাবতীয় ঘটিতব্য বিষয় লওহে মাহফুজ থেকে অনুলিপি করে নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় কল্যাণ-অকল্যাণ, জীবনোপকরণ, আয়ু-জীবনাবসান ইত্যাদির। এমনকি একথাও লিখে দেওয়া হয় যে, অমুক ব্যক্তি এ বৎসর হজব্রত পালন করবে।

হাসান, কাতাদা ও মুজাহিদ বলেছেন, রমজান মাসের কদর রাত্রিতে প্রত্যেকের পরবর্তী বৎসরের মৃত্যু, জন্ম, পানাহার এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডসমূহের মীমাংসা করে দেওয়া হয়।

ইকরামা বলেছেন, শাবান মাসের মাঝামাঝি রাতে (১৫ই শাবান রাতে) সারা বৎসরের কাজকর্মের ফয়সালা করে দেওয়া হয়। জীবিতদেরকে পৃথকভাবে লিখে দেওয়া হয় মৃতদের থেকে। এ ফয়সালার কোনো পরিবর্তন করা হয় না। বাগবী লিখেছেন, মোহাম্মদ ইবনে মাইসারা আখফাশ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শাবান মাসে পরবর্তী শাবান পর্যন্ত মৃত্যুর ফয়সালা করে দেওয়া হয়। এমন কি ওই সকল শিশুদের নামও পৃথক করা হয়; যাদের পিতা বিয়ে করে ১৫ই শাবানের পরে। আর যে সব শিশু জন্ম গ্রহণ করে সে সময়ে। আবার মৃত্যু বরণও করে ওই বৎসরে।

আবুজ্ জোহার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, অর্ধশাবানের রাতে (শবে বরাতে) আল্লাহ্ সবকিছু মীমাংসা করে দেন এবং রমজানের কদর রাত্রিতে সেই মীমাংসা দেওয়া হয় মীমাংসা বাস্তবায়নকারীদের হাতে।

'আম্রাম্ মিন ইনদিনা' অর্থ আমার আদেশক্রমে। এই আদেশ হচ্ছে সেই আদেশ, যা উৎসারিত হয় আমার অতুলনীয় প্রজ্ঞা থেকে। অথবা আদেশ অর্থ এখানে কেবলই আদেশ। এমতাবস্থায় 'স্থিরীকৃত হয়' কথাটি হবে একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্ম।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তো রসুল প্রেরণ করে থাকি'। পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ'। একথার অর্থ, আমি অতীব অনুগ্রহপরবশ বলেই নিয়ম করেছি, আমার বান্দাগণকে পূর্বাহ্নে সতর্ক করবো। পয়গম্বর প্রেরণ ও কিতাব অবতরণ সেই নিয়মেরই ফল।

'রহমাতাম্ মির রব্বিক' অর্থ তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্বরূপ। এখানকার 'রব' (প্রতিপালক) শব্দটি এ কথাই জানিয়ে দেয় যে, আল্লাহ্ সকলের দয়ার্দ্র পালনকর্তা। সেকারণেই তিনি মানুষের কাছে প্রেরণ করেন তাঁর বার্তাবাহক। অন্য কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে নয়। বাধ্যতা ও ঔচিত্য থেকে তিনি সতত পবিত্র। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি বার্তাবাহক প্রেরণ করি সৃষ্টির উপরে আমার অনুগ্রহের তাগিদে এবং অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি প্রদানার্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ—' এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও'। একথার অর্থ— তিনি তাঁর বান্দাদের সকল উক্তি শ্রবণ করেন এবং তাদের সর্ববিষয়ে জানেন। এসকল গুণ কোনো সৃষ্টির মধ্যে থাকতে পারে না। অতএব হে বিশ্বাসের দাবিদারগণ! যদি তোমরা সত্যিকারের বিশ্বাসী হয়েই থাকো, তবে নির্বিবাদে একথা মেনে নাও যে, কেবল আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও সকল সৃষ্টির একক প্রভুপালনকর্তা।

'ইন্ কুন্তুম মূক্বিনীন' অর্থ যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। অর্থাৎ তোমরা প্রকৃত বিশ্বাসী হলে একথাটিও সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নাও। বলো, আল্লাহ্ই আকাশ-পৃথিবী এবং এতদুভয়স্থিত সকল কিছুর স্রষ্টা। অথবা অর্থ হবে— তোমরা আল্লাহ্কে আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা যখন বলোই, তখন তা অন্তর দিয়েও বিশ্বাস করো। সেই সঙ্গে একথাও বিশ্বাস করো যে, মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল।

সূরা দুখান ঃ আয়াত ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

❑ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।
❑ বস্তুত উহারা সন্দেহের বশবর্তী হইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতেছে।
❑ অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হইবে আকাশ,
❑ এবং উহা আবৃত করিয়া ফেলিবে মানব জাতিকে। ইহা হইবে মর্মন্তুদ শাস্তি।
❑ তখন উহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগ হইতে শাস্তি দূর কর, অবশ্যই আমরা ঈমান আনিব।'
❑ উহারা কি করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিবে? উহাদের নিকট তো আসিয়াছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাতা এক রাসূল;
❑ অতঃপর উহারা তাহাকে অমান্য করিয়া বলে, 'সে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক পাগল!'
❑ আমি কিছু কালের জন্য শাস্তি রহিত করিব— তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবে।
❑ যেদিন আমি তোমাদিগকে প্রবলভাবে পাকড়াও করিব, সেদিন নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে শাস্তি দিবই।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদী জনগোষ্ঠীকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিন যে, আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য আর কেউই নয়। আর তোমরা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছো তাঁর অপার প্রজ্ঞাময়তা ও শক্তিমত্তার দু'টি বিস্ময়কর নিদর্শন— জীবন ও মৃত্যু। আরো দেখতে পাচ্ছো, তিনি সকলের ও সকল কিছুর প্রভুপালয়িতা। তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও। কিন্তু তারা তো অবরুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী। তাই মহাসত্যের বিষয়ে সন্দিহান হয়। আপনাকে ও আপনার দয়ার্দ্র আহ্বানকে নিয়ে করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পরিহাস।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অতএব, তুমি অপেক্ষা করো সেই দিনের, যেদিন স্পষ্ট ধুম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ (১০), এবং তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে। তা হবে মর্মন্তুদ শাস্তি'(১১)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদের অপ-আচরণদৃষ্টে ব্যথিত হবেন না। তাদেরকে পৃথিবীতে যেহেতু সাময়িক অবকাশ আমি দিয়েছি, তাই কিছু কালের জন্য আপনি অবলম্বন করুন উপেক্ষা ও অপেক্ষা। মহাপ্রলয় দিবস তো সুনিশ্চিত। সেদিন থেকেই শুরু হবে তাদের মহামর্মন্তুদ নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি, যেদিন আকাশ ধুম্রকুণ্ডলীতে ছেয়ে যাবে, আর ওই ধুম্রমণ্ডলী ঢেকে ফেলবে সকল মানুষকে।

এখানে 'দুখান' ধুম্রকুণ্ডলী বা ধুম্রপুঞ্জ। এ সম্পর্কে আলেমগণ অবশ্য বিভিন্নরকম মন্তব্য করেছেন। হাদিস শরীফেও এ সম্পর্কে এসেছে বিভিন্ন রকমের বিবরণ। যেমন হজরত হুজায়ফা ইবনে জারীর, ছা'লাবী ও বাগবী

বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের প্রথম লক্ষণ হবে ধোঁয়া, মরিয়ম পুত্র ঈসার পুনরাবির্ভাব এবং অভিনতুন এক অগ্নিকুণ্ড, যা উদ্ভূত হবে এডেনের কোনো এক গিরিগহ্বর থেকে। ওই আগুনই মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে হাশর প্রান্তরে। সেখানে দ্বিপ্রহরে সকলে সমবেত হলে আগুনটিও থেমে যাবে।

হজরত হুজায়ফা বলেছেন, আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! ওই ধোঁয়া কী ধরনের হবে? তিনি স. প্রথমে পাঠ করলেন 'অতএব তুমি অপেক্ষা করো সেই দিবসের যেদিন স্পষ্ট ধুম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ'। তারপর বললেন, চল্লিশ

www.eelm.weebly.com

দিন ও চল্লিশ রাত পর্যন্ত সেই ধোঁয়া পূর্ব পশ্চিমের পুরো আকাশ আবৃত করে রাখবে। বিশ্বাসীদের উপর তার প্রভাব হবে যৎকিঞ্চিত শ্লেস্মার মতো এবং অবিশ্বাসীরা তার প্রভাবে হয়ে যাবে মাতালের মতো উদভ্রান্ত। ওই ধোঁয়া প্রবেশ করবে তাদের নাসিকারন্ধ্র ও কর্ণগহ্বর দিয়ে এবং নির্গত হতে থাকবে তাদের পায়ুপথ দিয়ে।

হজরত আবু মালেক আশয়ারী থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের প্রভুপালক তোমাদেরকে তিনটি বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। প্রথমটি হচ্ছে ওই ধুম্রপুঞ্জ, মুমিনদের উপরে যার প্রভাব হবে শ্লেস্মার মতো এবং যার প্রভাবে কাফেরেরা ফুলে ফেঁপে উঠবে, তাদের কান দিয়েও বের হতে থাকবে ধোঁয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে দাব্বাতুল আরদ্ব এবং তৃতীয়টি হচ্ছে দাজ্জাল।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে শাস্তি দূর করো, অবশ্যই আমরা ইমান আনবো' একথার অর্থ— ওই ধুম্রপুঞ্জের কষ্টকর প্রভাবে যখন তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে, তখন মিনতি জানাবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! এই ভয়াবহ শাস্তি থেকে আমাদেরকে মুক্তি দাও। এবার আমরা অবশ্যই ইমানদার হবো।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা কী করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের নিকট তো এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাতা এক রসুল (১৩), অতঃপর তাকে অমান্য করে বলে, সে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক পাগল'(১৪)।

'তারা কী করে উপদেশ গ্রহণ করবে' এই প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ তারা তো উপদেশ গ্রহণ করতে পারবেই না। কেননা তারা তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী নবীকে পেয়েছিলোই। তৎসত্ত্বেও তো তারা ইমান আনেনি। উল্টো বরং তাকে অপবাদ দিয়েছে 'উন্মাদ' বলে। বলেছে, কোরআন তাকে শিক্ষা দেয় এক অনারব ক্রীতদাস। উল্লেখ্য, মক্কার পৌত্তলিকদের মধ্যে কেউ কেউ বলতো, মোহাম্মদকে তো কোরআন শিখিয়ে দেয় বনী সাক্বিফের এক অনারব গোলাম।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'আমি কিছুকালের জন্য শাস্তি রহিত করবো— তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে'। এখানে 'কিছুকালের জন্য' অর্থ তাদের পৃথিবীর জীবনের অবশিষ্ট আয়ুর জন্য। অর্থাৎ শাস্তি দিলে তারা ইমান আনতে চাইবে, আবার শাস্তি স্থগিত করলে পুনরায় ফিরে যাবে পৌত্তলিকতায়। এমনই তাদের স্বভাব।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবো, সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবোই'।

এখানে 'যে দিন' অর্থ কিয়ামতের দিন। কিন্তু হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, বদরের দিন।

আবুজ্জোহা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, মাসরুক বলেছেন, এক লোক একবার কুন্দা গোত্রের জনপদে বসে বলতে শুরু করলো, কিয়ামতের সময় একটি ধোঁয়া এসে ভণ্ড কপটদের চোখ ও কান দিয়ে ঢুকে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে নষ্ট করে দিবে। অবশ্য প্রকৃত বিশ্বাসীদের উপরে তার প্রতিক্রিয়া হবে মামুলী ধরনের, শ্লেস্মার প্রভাবের মতো। তার কথা শুনে আমরা সকলে ভীত হয়ে পড়লাম। পরে হজরত ইবনে মাসউদের কছে গিয়ে এ সম্পর্কে জানালাম। তিনি একথা শুনে ত্রস্তে উঠে বসলেন। রাগত স্বরে বললেন, কেউ কিছু জানলে তা বলা উচিত। আর না জানলে বলা উচিত, আল্লাহ্ই ভালো জানেন। এরকম উক্তি জ্ঞানের নিদর্শন। যেমন আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে বলেছেন, 'বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আর আমি লৌকিকতাসর্বস্বও নই'। প্রকৃত ঘটনা এরকম— দীর্ঘদিন ধরে আহ্বান জানানো সত্ত্বেও যখন কুরায়েশরা ইসলাম গ্রহণ করলো না, তখন রসুল স. অপপ্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! নবী ইউসুফের জামানায় তুমি যেমন সাতবছর ধরে একটানা দুর্ভিক্ষ দিয়েছিলে, তেমনি এদের উপরেও দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দাও। তাঁর এমতো অপপ্রার্থনার কারণে কুরায়েশদের উপরে নেমে এলো ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। আহারাভাবে জীবন ধারন করা দুষ্কর হলো কুরায়েশদের। মৃত পশুর গোশত, হাড়-হাড্ডি ইত্যাদি খেয়ে তারা জীবন ধারণ করতে লাগলো কোনো রকমে। ক্ষুধার প্রকোপে তাদের দৃষ্টি শক্তি হয়ে পড়লো ঝাপসা। ফলে তাদের দৃষ্টিতে আকাশ-পৃথিবীকে মনে হতে লাগলো ঝাপসা ধোঁয়ার মতো। অনন্যোপায় হয়ে একদিন আবু সুফিয়ান এসে বললো, মোহাম্মদ! আল্লাহ্ তো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে শুভআচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্যাখো, তোমার সম্প্রদায় এখন মরতে বসেছে। এদেরকে বাঁচাও। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করো। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো সুরা দুখানের ১০ থেকে ১৫ সংখ্যক আয়াতের শেষ পর্যন্ত। রসুল স. সদ্য প্রত্যাদেশিত আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনালেন। তারপর দুর্ভিক্ষ অপসারণের আবেদন জানিয়ে দোয়াও করলেন। দুর্ভিক্ষ সরে গেলো। কুরায়েশরা ঠিকই ফিরে গেলো তাদের আগের পৌত্তলিকতায়। তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন 'যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবো, সেদিন নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবোই'। এই অঙ্গীকারের অনুসরণেই আল্লাহ্ তাদেরকে শক্তভাবে পাকড়াও করেছিলেন বদর যুদ্ধের দিনে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, পাঁচটি বিষয় অতিক্রান্ত হয়েছে— বদর যুদ্ধের শাস্তি, রোমকদের পরাজয়, চন্দ্র দ্বিখণ্ডন এবং ক্ষুধার কারণে ধোঁয়া দেখতে পাওয়া।

www.eelm.weebly.com

বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, কুরায়েশদের অবাধ্যতা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেলো, তখন রসুল স. তাদেরকে শায়েস্তা করবার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে হজরত ইউসুফের সময়ের দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষ কামনা করলেন। তার ফলে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো যে, তাদেরকে মৃত প্রাণীর হাড়গোড় খেয়ে জীবন ধারণ করতে হলো। ক্ষুধার চোটে তাদের দৃষ্টি হয়ে গেলো ঝাপসা। মনে হতে লাগলো সবকিছু যেনো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। তখন অবতীর্ণ হলো 'অতএব তুমি অপেক্ষা করো সেই দিনের, যেদিন ধুম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ....'। জনতা বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! দুর্ভিক্ষকবলিতদের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। মানুষ তো মরণাপন্ন। রসুল স. বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। শুরু হলো দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বস্তিদায়ক বৃষ্টি। তখন অবতীর্ণ হলো 'আমি কিছুকালের জন্য শাস্তি রহিত করবো— তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে'। তাই হলো। তারা পুনরায় নিমজ্জিত হলো ঘোর পৌত্তলিকতায়। তারপর অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। আর এই আয়াতে 'প্রবলভাবে পাকড়াও করবো' বলে বদর যুদ্ধের দিবসে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কথাই বলা হয়েছে।

সূরা দুখানঃ আয়াত ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪,২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

❑ ইহাদের পূর্বে আমি তো ফির'আওন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং উহাদের নিকটও আসিয়াছিল এক সম্মানিত রাসূল,

❑ সে বলিল, 'আল্লাহ্‌র বান্দাদিগকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

❑ 'এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিও না, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি স্পষ্ট প্রমাণ।

❑ 'তোমরা যাহাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতে না পার, তজ্জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণ লইতেছি।

❑ 'যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে তোমরা আমা হইতে দূরে থাক।'

❑ অতঃপর মূসা তাহার প্রতিপালকের নিকট নিবেদন করিল, 'ইহারা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়।'

❑ আমি বলিয়াছিলাম, 'তুমি আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনী যোগে বাহির হইয়া পড়, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে।'

❑ সমুদ্রকে স্থির থাকিতে দাও, উহারা এমন এক বাহিনী যাহা নিমজ্জিত হইবে।

❑ উহারা পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ;

❑ কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ,

❑ কত বিলাস-উপকরণ, উহাতে তাহারা আনন্দ পাইত।

❑ এইরূপই ঘটিয়াছিল এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে।

❑ আকাশ এবং পৃথিবী কেহই উহাদের জন্যে অশ্রুপাত করে নাই এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হয় নাই।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— এখন যেমন আমি একজন মহাসম্মানিত রসুল প্রেরণ করে মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষা করছি, তেমনি আমি পরীক্ষা করেছিলাম ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে একজন স্বনামধন্য রসুল প্রেরণ করে। সেই সম্মানিত রসুল তাদেরকে সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, দীর্ঘদিন ধরে তোমরা বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীকে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য করছো। এখন তাদেরকে মুক্তি দাও। তাদের দায়-দায়িত্ব অর্পণ করো আমার কাছে। কেননা আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত একজন বিশ্বস্ত রসুল।

এখানে 'ফাতান্না' অর্থ পরীক্ষা করেছিলাম'। 'ক্বাবলাহুম' অর্থ এদের পূর্বে, এই মক্কাবাসীদের আগে। 'রসুলুন কারীম' অর্থ সম্মানিত রসুল। 'রসুল' এর সঙ্গে এখানে তানভীন যুক্ত করা হয়েছে বিশেষ আভিজাত্য প্রকাশার্থে। অর্থাৎ রসুলগণের মধ্যে তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। আবার 'কারীম' অর্থও বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন— আল্লাহ্‌র কাছে, অথবা বিশ্বাসীদের কাছে, কিংবা বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যের দিক দিয়ে। আর এখানকার 'সে বললো' অর্থ হজরত মুসা বললেন।

ই'বাদাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে। অর্থাৎ বনী ইসরাইল জনতাকে। এখানে উহ্য রয়েছে একটি সম্বোধনসূচক 'শব্দ'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আমার আহ্বানকে কবুল করে নাও। আল্লাহ্‌র দাবি (ঈমান)

পূর্ণ করো। 'ইন্নী লাকুম রসূলুন আমীন' অর্থ নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত বিশ্বস্ত রসুল। 'আমীন' অর্থ আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের বিশ্বস্ত বাহক। আর এ বিশ্বস্ততার প্রমাণ হচ্ছে আমা কর্তৃক প্রদর্শিত মোজেজাসমূহ, যা কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ কোরো না, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করছি স্পষ্ট প্রমাণ (১৯)। তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না পারো, তজ্জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণ গ্রহণ করছি (২০)। যদি আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করো, তবে তোমরা আমার কাছ থেকে দূরে থাকো' (২১)। একথার অর্থ— হজরত মুসা তাদেরকে আরো বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে দুর্বিনয় প্রকাশ কোরো না। আমাকে আল্লাহ্‌র রসুল বলে মেনে নাও। আমি আমার রেসালতের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করছি, যা অনস্বীকার্য। তোমরা হয়তো আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারো। তা-ই যদি করো, যদি আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হও, তাহলে আমি গ্রহণ করছি আল্লাহ্‌র শরণ। হে মিসরবাসী! এখন তোমরা কী করবে ভেবে দ্যাখো। যদি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস না করো, তবে আমার কাছ থেকে দূরেই থাকো। আমার সঙ্গে আর সম্পর্কই রেখো না।

এখানে 'ওয়া আল্‌লা তা'লূ আ'লাল্লহ্' অর্থ এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ কোরো না। বিসুলত্বনিম্ মুবীন' অর্থ স্পষ্ট প্রমাণ। উল্লেখ্য, প্রত্যর্পণ করা একটি কাজ। এর সঙ্গে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রয়েছে। তাই আগের আয়াতে 'প্রত্যর্পণ করো' বলার পর ব্যবহৃত হয়েছে 'বিশ্বস্ত রসুল' কথাটি। আর এখানে 'ঔদ্ধত্যপ্রকাশ কোরো না' বলার পরে ব্যবহৃত হয়েছে স্পষ্ট প্রমাণের কথা। কেননা স্পষ্ট প্রমাণ দর্শনের পর ঔদ্ধত্য অশোভন এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

হজরত মুসা যখন এভাবে ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানান, তখন তারা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। হজরত মুসাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে বলে হুমকি দেয়। সেকারণেই হজরত মুসা বলেন, তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না পারো, সেজন্য আমি আমার ও তোমাদের প্রভুপালকের শরণ গ্রহণ করছি।

কাতাদা বলেছেন, এখানকার 'আন্ তারজুমূনী' এর 'রজ্বম' অর্থ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর উদ্দেশ্য গালি দেওয়া, যাদুকর বলা। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা হজরত মুসা যদি তাদের গালিগালাজ থেকে রক্ষা পাওয়ার মানসে আল্লাহ্‌র শরণ কামনা করতেন, তবে তারা আর কখনো তাঁকে গালি দিতে পারতো না। অথচ দেখা যায়, তারা তাঁকে বহুবার 'যাদুকর' বলে সম্বোধন করেছে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা বললো, সে তো এক স্পষ্ট যাদুকর'।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'অতঃপর মুসা তার প্রতিপালকের নিকট নিবেদন করলো, এরা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়'। একথার অর্থ— দীর্ঘকাল ধরে হজরত মুসা তাদেরকে পথপ্রদর্শনের চেষ্টা করলেন। তাদের চৈতন্যোদয়ের আশায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা তাঁর সত্য আহ্বানকে স্বীকার করলো না। শেষে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, হে আমার প্রভুপালক! এরা তো চিরভ্রষ্ট বলেই মনে হয়। এরা তো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী। সুতরাং তুমি তাদের এবং আমার মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করে দাও। এখানে 'অপরাধী' অর্থ মূর্তিপূজক। কিছুটা অপ্রত্যক্ষ হলেও হজরত মুসার এমতো বক্তব্য হচ্ছে বদ দোয়া। আর মূর্তিপূজকেরা তো বদদোয়ারই উপযুক্ত, যদি তারা সত্যের আহ্বানে সাড়া না দেয়।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি বলেছিলাম, তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রজনীযোগে বের হয়ে পড়ো, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে (২৩)। সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, তারা এমন এক বাহিনী, যা নিমজ্জিত হবে (২৪)।

এখানে 'ফাআস্‌রি' অর্থ নিশি যোগে প্রস্থান কোরো। অর্থাৎ আল্লাহ্ হজরত মুসার দোয়া কবুল করার পর বললেন। 'ইন্নাকুম মুত্তাবাঊন' অর্থ তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। অর্থাৎ ফেরাউন ও তার লোকেরা যখন তোমাদের চলে যাওয়ার খবর পাবে, তখনই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে। আর 'সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও' অর্থ হে মুসা! তুমি ও তোমার অনুসারীরা সমুদ্রাভ্যন্তরের পথ অতিক্রম করে যখন সমুদ্রের অপর পাড়ে চলে যাবে, তখনও সমুদ্রকে আগের মতো পথবিশিষ্ট অবস্থায় থাকতে দিয়ো। অর্থাৎ তোমার যষ্টির আঘাতে সমুদ্রকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ো না। ঘটনাটি ছিলো এরকম— আল্লাহ্‌র নির্দেশে হজরত মুসা বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। পরদিন সকালে এ খবর রাষ্ট্র হয়ে গেলে ফেরাউন ও তার লোকেরা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলো। ঠিক করলো, পলাতক বনী ইসরাইলদেরকে ধরে নিয়ে আসতেই হবে। সকলে মিলে তখন তারা বনী ইসরাইলদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। ওদিকে হজরত মুসা ও তাঁর অনুগামীরা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়ে যাত্রা স্থগিত করতে বাধ্য হলেন। পশ্চাতের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ফেরাউন ও তার বাহিনী দ্রুত এগিয়ে আসছে। ধরা পড়ার ভয়ে তাঁরা অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু আল্লাহ্ অলৌকিকভাবে তাদেরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর প্রিয় নবী মুসাকে নির্দেশ দিলেন, তোমার হাতের লাঠি দিয়ে সমুদ্রের পানিতে আঘাত করো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নির্দেশ পালন করলেন। সমুদ্রবক্ষে সৃষ্টি হলো বারোটি পথ। ওই পথগুলো দিয়ে তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে নির্বিঘ্নে সমুদ্রের ওপারে গিয়ে উঠলেন। ভাবলেন, পুনর্বার যষ্টির আঘাতে সমুদ্রকে আগের মতো সমান করে দিবেন, যাতে ফেরাউন ও তার লোকেরা অপর পাড়ে যাত্রা স্থগিত করতে বাধ্য হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিলো অন্যরকম। তাই প্রত্যাদেশ করলেন 'সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও'। এর পরের ঘটনা সহজেই অনুমেয়। ফেরাউন ও তার লোকেরা সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছে আর দেরী করলো না। সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেলো সমুদ্রপথে। সমুদ্রের মাঝামাঝি যেতে না যেতেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ভেঙে পড়লো বিশালাকৃতির পানির দেওয়ালগুলো। সলিল সমাধি ঘটলো তাদের এভাবেই।

এরপরের আয়াতচতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিলো কতো উদ্যান ও প্রস্রবণ (২৫); কতো শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ (২৬), কতো বিলাস উপকরণ, তাতে তারা আনন্দ পেতো (২৭)। এরূপই ঘটেছিলো এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে' (২৮)। একথার অর্থ— ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে আমি এভাবে পানিতে ডুবিয়ে মারলাম। পশ্চাতে পড়ে রইলো তাদের স্থাবর—অস্থাবর সকল বিত্ত-বৈভব। পড়ে রইলো কতো বাগান, প্রস্রবণ, শস্যস্নাত প্রান্তর, সুরম্য ভবন এবং আরো কতো বিলাস সামগ্রী যা ছিলো তাদের চিত্তবিনোদনের উপকরণ। এভাবেই আমি ঘটিয়েছি মিথ্যার তিরোধানায়ন এবং সত্যের অভ্যুদয়ন। আর তাদের ওই পরিত্যক্ত বিত্ত-বৈভবের অধিকারী করে দিয়েছি আমি বনী ইসরাইলদেরকে।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'আকাশ ও পৃথিবী কেউই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হয়নি'।

এখানে আকাশ-পৃথিবীর অশ্রুপাত না করার কথা বলা হয়েছে রূপকার্থে। প্রকৃত কথা হচ্ছে তাদের জীবনের তেমন কোনো গুরুত্বই ছিলো না। তাই তাদের মৃত্যুও হয়েছে অন্যের কাছে অতি তুচ্ছ। যেমন কোনো সজ্জন ব্যক্তি পরলোকগমন করলে লোকে বলে, তার বিয়োগ ব্যাথায় আকাশ বাতাস কাঁদছে। কোনো কোনো বিদ্বান আবার বলেছেন, বাস্তব অর্থেই এখানে বলা হয়েছে আকাশ-পৃথিবীর অশ্রুপাত না করার কথা। কেননা হাদিস শরীফে বলা হয়েছে বিশ্বাসীরা পৃথিবী পরিত্যাগ করলে তাদের বিরহে অশ্রুপাত করে আকাশ ও মৃত্তিকা।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র প্রত্যেক বান্দার জন্য আকাশে দু'টি দরোজা রয়েছে। একটি দিয়ে তার পুণ্যকর্ম উর্ধ্বে উত্থিত হয় এবং অপরটি দিয়ে নেমে আসে তার রিজিক। তার মৃত্যু সংঘটিত হলে তার জন্য উভয় দরোজাই কাঁদে।

বায়হাকীর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে এবং ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত ইবনে আব্বাসের কাছে 'আকাশ এবং পৃথিবী কেউই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি' এই আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হলো। তিনি বললেন, প্রত্যেকের জন্য আকাশে একটি দরোজা রয়েছে। ওই দরোজা দিয়ে তার জীবনোপকরণ আগমন করে এবং তার কৃতকর্মসমূহ উপরে ওঠে। কোনো মুমিন মৃত্যুবরণ করলে ওই দরোজাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন দরোজা দু'টি তার জন্য কাঁদে। আর যে স্থানে সে নামাজ পড়তো, জিকির করতো , সেই স্থানও যখন তাকে আর পায় না, তখন কাঁদে। সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে বাগবী, আবুল আলিয়া ও ইবনে আবী হাতেমও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদিস বর্ণনার পর তিরমিজি লিখেছেন, শেষে তিনি পুনরায় 'আকাশ ও পৃথিবী কেউই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি' এই আয়াত পাঠ করলেন।

www.eelm.weebly.com

হজরত শোরাইহ্ ইবনে উয়াইনা হাজরামী থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন কোনো মুমিন সফররত অবস্থায় স্বজন-বান্ধবহীন অবস্থায় মারা যায়, তখন আকাশ-পৃথিবী তার জন্য বিলাপ করে। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন 'আকাশ এবং পৃথিবী কেউই তাদের জন্য অশ্রুপাত করে না'। তারপর বললেন, কাফেরদের জন্য কেউ কাঁদে না।

সূরা দুখান ঃ আয়াত ৩০ — ৪২

❑ আমি তো উদ্ধার করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হইতে
❑ ফির্'আওনের; সে তো ছিল পরাক্রান্ত সীমালংঘনকারীদের মধ্যে।
❑ আমি জানিয়া শুনিয়াই উহাদিগকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম,
❑ এবং উহাদিগকে দিয়াছিলাম নির্দশনাবলী, যাহাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা;
❑ উহারা বলিয়াই থাকে,
❑ 'আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং আমরা আর উত্থিত হইব না।
❑ 'অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে উপস্থিত কর।'

তাফসীরে মাযহারী/৫৩০

❑ শ্রেষ্ঠ কি উহারা, না তুব্বা' সম্প্রদায় ও ইহাদের পূর্ববর্তীরা? আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলাম, অবশ্যই উহারা ছিল অপরাধী।
❑ আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই;
❑ আমি এই দুইটি অযথা সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।
❑ নিশ্চয়ই সকলের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে উহাদের বিচার দিবস।
❑ সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসিবে না এবং উহারা সাহায্যও পাইবে না।
❑ তবে আল্লাহ্ যাহার প্রতি দয়া করেন তাহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আর আমি বনী ইসরাইলদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম ফেরাউনের লাঞ্ছনাদায়ক কঠিন অত্যাচার থেকে। ফেরাউন তো ছিলো সীমালংঘনকারীদের মধ্যে এক চরম সীমালংঘনকারী।

এখানে 'লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি' অর্থ বনী ইসরাইলদের শিশুপুত্রদেরকে বধ করা এবং শিশু কন্যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা। প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে ক্রীতদাসীর মতো খাটানো ইত্যাদি। আর 'পরাক্রান্ত' অর্থ উদ্ধত, অথবা উচ্চ শ্রেণীভূত। আর 'সীমালংঘনকারী' অর্থ অহংকার ও অনিষ্টকামিতার দিক দিয়ে সীমালংঘনকারী।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি জেনে শুনে তাদেরকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম (৩৩), এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম নিদর্শনাবলী, যাতে ছিলো সুস্পষ্ট পরীক্ষা' (৩৪)। একথার অর্থ— আমি জানতাম যে, নবী মুসার সাহচর্যধন্য বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠী তৎকালীন পৃথিবীতে অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভের উপযোগী। তাই তাদেরকে তখন সেরকমই করেছিলাম। আর তাদেরকে দিয়েছিলাম বিশেষ বিশেষ নিদর্শন— যেমন সমুদ্রভ্যান্তরের বারোটি পথ, তীহ্ প্রান্তরের মেঘের ছায়া এবং 'মান্না' ও 'সালওয়া' নামক বেহেশতী আহার্য ইত্যাদি। কিন্তু ওই নিদর্শনসমূহ ছিলো তাদের জন্য সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

এখানে 'বালাউম্ মুবীন' অর্থ সুস্পষ্ট পরীক্ষা। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ প্রকাশ্য অনুগ্রহ। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে 'পরীক্ষা' অর্থ সুখশান্তি, বিপদ-আপদের মাধ্যমে যাচাই বাছাই। একথা বলার পর তিনি পাঠ করেছেন, 'আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা বলেই থাকে (৩৪), আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নেই এবং আমরা আর উত্থিত হবো না' (৩৫)। একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা বলে, পরকাল বলে কিছু নেই। আমরা জন্মেছি একবার, মরবও একবার। আমাদেরকে আর জীবিত করা হবেই না। উল্লেখ্য, ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং মক্কার মুশরিকেরা সমস্বভাবসম্পন্ন। উভয়ে ছিলো

পথভ্রষ্টতার উপরে দণ্ডায়মান। তাই এখানে প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত হয়েছে মক্কার মুশরিকদের কথা। তবে তখন পর্যন্ত তাদের মধ্যে একটি মাত্র পার্থক্য ছিলো। পার্থক্যটি হচ্ছে— ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মক্কার মুশরিকেরা তখন পর্যন্ত শাস্তি পায়নি। তবে শাস্তির হুমকি তাদেরকে তখন দেওয়া হচ্ছিলো বার বার।

এখানে 'আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নেই' অর্থ পুনরুত্থান বলে কোনো কিছুই নেই। কোনো কোনো আলেম কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— যখন পৌত্তলিকদেরকে বলা হলো, তোমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে, যেমন জন্মের পূর্বে তোমরা মৃত অর্থাৎ নিষ্প্রাণ ছিলে, তারপর পেয়েছো এই জীবন, তখন তারা বললো, জন্ম পূর্ববর্তী মৃত্যু তো ছিলো প্রথম মৃত্যু, দ্বিতীয় মৃত্যুর পর আর জীবন পাওয়া যাবে না। সুতরাং আমরা আর কখনো পুনরুত্থিত হবো না।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত করো'। একথার অর্থ— পৌত্তলিকেরা রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করে আরো বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত করে দেখাও না কেনো?

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'শ্রেষ্ঠ কি তারা, না তুব্বা সম্প্রদায় ও এদের পূর্ববর্তীরা? আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, অবশ্যই তারা ছিলো অপরাধী'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! তাদেরকে বলুন, তারা কি অতীতের দুর্ধর্ষ তুব্বা এবং আদ-ছামুদ ইত্যাদি দুর্ধর্ষ সম্প্রদায়ের চেয়েও শৌর্যবীর্যে-কীর্তিতে অধিক শক্তিমান? নিশ্চয়ই নয়। তবুও তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম। তাহলে তোমরা ধ্বংস হওয়া থেকে নির্ভয় হও কীভাবে?

'তুব্বা' ছিলো এক লোকের নাম। বহুসংখ্যক লোকের অধিনায়ক ছিলো সে। তাকে তুব্বা বলা হতো সেকারণেই। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের ধারণা, তুব্বা নামের অনেক নৃপতি ছিলো। আর তারা একে একে সকলেই শাসনক্ষমতায় এসেছিলো। তাদের রাজ্য শাসনের মাঝখানে কোনো ছেদ পড়েনি। সেকারণে তাদেরকে 'তাতাবিয়'ও বলা হতো। হজরত ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য বিদ্বজ্জনের উদ্ধৃতি দিয়ে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, সর্বশেষ তুব্বা ছিলো আস্‌আদ আবু কুরাইব ইবনে মালিক কুরব। বাগবী এই আয়াতের টীকাভাষ্যে এ বিষয়ে অনেককিছু লিখেছেন। আমি ওই বিবরণ উদ্ধৃত করেছি সুরা কাফে'র তাফসীরে।

তুব্বা ছিলেন মুসলমান। তাই আলোচ্য আয়াতে তাঁকে তিরস্কার করা হয়নি, বরং তিরস্কার করা হয়েছে তাঁর সম্প্রদায়কে, যারা তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিলো।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক তাঁর 'আল মুবতাদা' গ্রন্থে এবং ইবনে হিশাম তাঁর 'আত্‌তীজান' গ্রন্থে লিখেছেন, মদীনায় আগমন করে রসুল স. প্রথমে হজরত আবু আইয়ুবের যে বাড়িতে উঠেছিলেন, ওই বাড়িটি ছিলো প্রথম তুব্বা কর্তৃক নির্মিত। ওই প্রথম তুব্বার নাম ছিলো তাবান ইবনে সা'দ। সুরা জুমআর তাফসীরে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

এখানকার এদের পূর্ববর্তীরা' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে আ'দ ছামুদ ইত্যাদি মূর্তিপূজক জনগোষ্ঠীকে। আর মুর্তিপূজাই ছিলো তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার কারণ। একথার দিকেই মক্কার মূর্তিপূজকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, অবশ্যই তারা ছিলো অপরাধী।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে কোনো কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি; (৩৮) এবং তাদের মধ্যে কোনো কিছুই বৃথা সৃষ্টি করিনি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না' (৩৯)। একথার

www.eelm.weebly.com

অর্থ— তারা পরকাল, শেষ বিচার ইত্যাদি অস্বীকার করে, অথচ একথাও জানে যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আমিই। আর আমি এগুলোকে অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এগুলোই তো আমার সত্তা-নাম-গুণাবলীর প্রমাণ। আর এগুলোর দ্বারা মানুষকে এমতো পরীক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য যে, তাদের মধ্যে কে আমাকে বিশ্বাস করে এবং কে করে না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আমার এই মহা উদ্দেশ্যের খবর রাখে না। কেননা তারা পৃথিবীপূজক এবং প্রজ্ঞা-ভাবনাহীন।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয়ই সকলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে তাদের বিচার দিবস (৪০)। সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোনো কাজে আসবে না এবং তারা সাহায্যও পাবে না (৪১)। তবে আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করেন, তার কথা স্বতন্ত্র। তিনি তো পরাক্রমশালী, দয়ালু' (৪২)। একথার অর্থ— নিশ্চয়ই পুনরুত্থান দিবসে সকলকে তাদের আপন আপন সমাধিস্থল থেকে ওঠানো হবে। তারপর শুরু হবে বিচার। নির্ধারণ করা হবে সকলের জন্য চিরস্থায়ী পুরস্কার, অথবা তিরস্কার। আর ওই দিন হবে মহাসংকটের। তখন আত্মীয় অথবা অনাত্মীয়, এক বন্ধু অন্য বন্ধুর কোনো উপকার করতে পারবে না, ক্ষতি থেকে একে অপরকে বাঁচাতেও পারবে না। তবে যারা বিশ্বাসী ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত তাদের কথা আলাদা। তাদেরকে আল্লাহ্ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ক্ষমা করবেন, কিংবা তাদেরকে ক্ষমা করা হবে তাদের একজনের জন্য অন্যজনের সুপারিশক্রমে। আল্লাহ্ তো মহাপরাক্রমশালী। তাই তিনি কাউকে শাস্তি দিতে চাইলে সে শাস্তিকে প্রতিহত করার সাধ্য কারো হবে না। আবার তিনি পরম দয়ালুও। তাই যাকে দয়া করবেন, সে অবশ্যই হবে তাঁর মার্জনাভাজন।

আবু মালেক সূত্রে সাঈদ ইবনে মনসুর বর্ণনা করেছেন, একবার আবু জেহেল শুষ্ক খেজুর ও মাখন নিয়ে সঙ্গী-সাথীদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বললো, নাও, যাক্কুম খাও। এই হচ্ছে সে-ই যাক্কুম, মোহাম্মদ যার ভয় তোমাদেরকে দেখায়। তার এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াতসমূহ। বলা হলো—

সূরা দুখান ঃ আয়াত ৪৩ - ৫৯

- ❑ নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হইবে—
- ❑ পাপীর খাদ্য;
- ❑ গলিত তাম্রের মত, উহাদের উদরে ফুটিতে থাকিবে
- ❑ ফুটন্ত পানির মত।
- ❑ উহাকে ধর এবং টানিয়া লইয়া যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে,
- ❑ অতঃপর উহার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও—

www.eelm.weebly.com

❑ এবং বলা হইবে 'আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত!
❑ 'ইহা তো উহাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করিতে।'
❑ মুত্তাকীরা থাকিবে নিরাপদ স্থানে—
❑ উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে,
❑ তাহারা পরিধান করিবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখামুখি হইয়া বসিবে।
❑ এইরূপই ঘটিবে; আমি উহাদিগকে সঙ্গিণী দান করিব আয়তলোচনা হূর,
❑ সেথায় তাহারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনিতে বলিবে।
❑ প্রথম মৃত্যুর পর তাহারা সেথায় আর মৃত্যু আস্বাদন করিবে না। আর তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন—
❑ তোমার প্রতিপালক নিজ অনুগ্রহে। ইহাই তো মহাসাফল্য।

❑ আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।
❑ সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, উহারাও প্রতীক্ষমান।

প্রথমোক্ত আয়াতচতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— নিশ্চয়ই জাহান্নামবাসী পাপিষ্ঠশ্রেষ্ঠদের খাদ্য হবে যাক্কুম। অতীব কদর্যাকার ওই খাদ্য দেখতে হবে গলিত তামা, অথবা তেলের গাদের মতো, ভক্ষণের পর যা তাদের পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মতো।

এখানে 'আলআছীম' অর্থ ঘোর পাপী, পাপিষ্ঠশ্রেষ্ঠ। 'আল্‌মুহলি' অর্থ গলিত ধাতু, কিংবা তেলের কালো গাদ। আর 'ফী বুতুন' অর্থ উদরে, পেটের মধ্যে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হে জনমণ্ডলী! আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যতোটা ভয় করা উচিত। শোনো, যাক্কুমের একটি টুকরা যদি পৃথিবীতে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে সকল পৃথিবীবাসীর জীবন হয়ে যাবে তিক্ত ও বিস্বাদপূর্ণ। তাহলে অনুমান করো, ওই সকল লোকের অবস্থা হবে কেমন, যাক্কুমই হবে যাদের আহার্য। তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হাব্বান, হাকেম, বায়হাকী প্রমুখও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি মন্তব্য করেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'তাকে ধরো এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে (৪৭), অতঃপর তার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে শাস্তি দাও— (৪৮) এবং বলা হবে, আস্বাদ গ্রহণ করো, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত (৪৯)। এটা তো তা-ই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে' (৫০)। একথার অর্থ— দোজখের প্রহরীদেরকে লক্ষ্য করে তখন বলা হবে, এই কাফেরকে ধরো এবং একে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাও দোজখের মধ্যে, তারপর তার মাথায় ঢেলে দাও উত্তপ্ত পানি। এভাবে তাকে উপর্যুপরি শাস্তি দিতেই থাকো এবং বলো, দ্যাখো, এখন কেমন লাগে। তুমি তো পৃথিবীতে মানী-গুণী বলে গর্ব করতে। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছো, এটা হচ্ছে সেই শাস্তি, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

এখানে 'সাওয়ায়িল জাহীম' অর্থ দোজখের মধ্য স্থলে। আর এখানকার 'তুমি তো ছিলে সম্মানিত', অভিজাত কথাটির অর্থ তুমিতো পৃথিবীতে নিজেকে মনে করতে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত। বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল বলেছেন, দোজখরক্ষীরা কাফেরদের মাথায় জোরে আঘাত করবে। ফলে তাদের মাথা ফেটে বেরিয়ে পড়বে মগজ। তখন তারা তাদের মাথায় ঢালতে থাকবে ফুটন্ত পানি এবং বলতে থাকবে— আস্বাদ গ্রহণ করো। তুমি না সম্মানিত, অভিজাত। উল্লেখ্য, আবু জেহেল এরকমই দাবি করতো। বলতো, আমি এই জনপদের সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও অভিজাত ব্যক্তি। আর অবজ্ঞাভরে রসুল স.কে দেখিয়ে বলতো— আর এ হচ্ছে দোজখের রক্ষী।

'মাগাজী' গ্রন্থে ইকরামা সূত্রে উমুবী লিখেছেন, রসুল স. একবার আবু জেহেলের সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাকে একথা বলতে— তুমি ধ্বংস হও, হও বিধ্বস্ত। আবু জেহেল তার কাঁধের পরিধেয় বস্ত্র নামিয়ে বললো, তুমি ও তোমার সাথী আল্লাহ্ আমার কিছুই করতে পারবে না। তুমি তো জানোই, আমি মক্কাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কুলীন ও শ্রদ্ধেয়। উল্লেখ্য, আবু জেহেলের এমতো অহংকারকে আল্লাহ্ চুর্ণবিচুর্ণ করেছেন বদর যুদ্ধের সময় এবং বলেছেন 'আস্বাদ গ্রহণ করো, তুমি না সম্মানিত, অভিজাত'! কাতাদা সূত্রে ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন। আর এখানকার 'ইন্‌না হাজা মা কুনতুমবিহী তামতারূন' কথাটির অর্থ— এটা তো তা-ই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে (৫১), উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে (৫২), তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে (৫৩)। এরূপই ঘটবে; আমি তাদেরকে সঙ্গিনী দান করবো,

www.eelm.weebly.com

আয়াতলোচনা হুর' (৫৪)। একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তারা থাকবে চিরনিরাপদ বেহেশতের এমন স্থানে যেখানে রয়েছে মনোরম উদ্যান ও প্রবহমান নদী। তাদের পরিধেয় হবে মসৃণ ও পুরুষ্ট রেশমের। আর আমি তাদেরকে পত্নীরূপে দান করবো আয়তআখিনী সুন্দরী হুর। আমি যেরকম বর্ণনা করলাম সেরকমই ঘটবে সেখানে।

এখানে 'মাক্বমিন আমীন' অর্থ নিরাপদ স্থান। 'ফী জান্নাতিঁউ ওয়া উ'য়ুন' অর্থ উদ্যান ও ঝর্ণাধারার মাঝামাঝি। অর্থাৎ এমন বাগানের মধ্যে, যেখানে রয়েছে প্রবহমান নদী। 'সুন্দুস' অর্থ রেশমী বস্ত্র। আর 'ইস্তাবরাক্ব' অর্থ মিহি ও পুরু। মোহাম্মদ ইবনে কা'ব সূত্রে ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, পৃথিবীর কেউ যদি বেহেশতের পোশাক পরে, তবে তাকে যারা দেখবে তারা বেহুঁশ হয়ে যাবে। ওই সৌন্দর্য তাদের চোখে সহ্য করতে পারবে না। 'মিআতাইন' গ্রন্থে ইকরামা সূত্রে সাবুনী লিখেছেন, বেহেশতীদের পোশাকের রঙ ক্ষণে ক্ষণে সত্তর রকম রঙে বদলাতে থাকবে।

'মুতাক্বাবিলীন' অর্থ মুখোমুখি হয়ে বসবে। 'কাজালিকা' অর্থ এরকমই ঘটবে। আর 'আমি তাদেরকে সঙ্গিনী দান করবো আয়তলোচনা হুর' অর্থ আমি তাদের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দিবো বেহেশতের মদিরনয়না সুন্দরী হুরদের। অবশ্য এখানকার 'যাওওয়াজনাহুম' অর্থ বিবাহ দেওয়া নয়, বরং এর অর্থ জোড়া মিলিয়ে দেওয়া। সেকারণেই এখানকার 'হুরিন' এর পূর্বে 'বা' অক্ষর সংযুক্ত করে বলা হয়েছে 'বিহুরিন'। 'বিবাহ' বোঝাতে চাইলে বলা হতো 'হুরান আ'ইনা' অর্থাৎ 'বা' অক্ষর ব্যবহার করা হতো না। আরবী ভাষায় কোনো মেয়েকে বিবাহ করার কথা বলা হলে বলতে হয় 'যওয়াজ্তুহু ফুলানাতুন' (আমি তাকে অমুকের সঙ্গে বিবাহ দিলাম)। এরকম বলা হয় না যে 'যওয়াজ্তুহু বি ফুলানাতিন্'। অর্থাৎ 'বা' ব্যবহার করা হয় না। সেকারণেই আবু উবায়দা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি আয়াতলোচনা বেহেশতী ললনাদের সঙ্গে তোমাদেরকে যুগলবন্দী করবো জোড়ায় জোড়ায়, যেমন একটি পাদুকা হয় অন্যটির জোড়া।

'হুরিন' অর্থ সুন্দরী, যাদের রঙ ও রূপ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আর এখানকার 'ঈন' অর্থ আয়তলোচনা টানা টানা চক্ষুধারিণী। 'হুরিণ' শব্দটি 'হাইরউ' এর বহুবচন।

হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সুলোচনা হুরীদেরকে তৈরী করা হয়েছে জাফরান দিয়ে। সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন। পরিণত সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম হাদিস এসেছে এবং মুজাহিদও এরকম হাদিসের বর্ণনাকারী। জায়েদ ইবনে আব্বাস সূত্রে ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ হুরীদেরকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেননি, সৃষ্টি করেছেন মেশক ও জাফরান দিয়ে।

হজরত আনাস থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যদি কোনো হুর সমুদ্রে থুথু নিক্ষেপ করে, তবে সমুদ্রের সমস্ত পানি হয়ে যাবে সুমিষ্ট। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বলেছেন, কোনো হুরী যদি আকাশ অথবা পৃথিবীতে তার বাহু প্রদর্শন করে, তবে তার বাহুর রূপ দেখেই মানুষ পাগল হয়ে যাবে। আর যদি সে তার ঘোমটা খুলে দেয়, তবে তার রূপের ছটায় তেজস্কর সূর্যকেও মনে হবে নিষ্প্রভ বাতির মতো। আর যদি সে উঁকি দেয়, তবে এক সঙ্গে হতচকিত হয়ে উঠবে আকাশ ও পৃথিবীর সকলেই। হান্নাদ বর্ণনা করেছেন, হুব্বান ইবনে আহীলাহ্ বলেছেন, পৃথিবীবাসী রমণীদের মধ্যে যারা বেহেশতে যাবে, তারা হবে হুরীদের চেয়েও সুন্দর।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে (৫৫)। প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন—(৫৬) তোমার প্রতিপালক নিজ অনুগ্রহে। এটাই তো মহাসাফল্য' (৫৭)। একথার অর্থ— বেহেশতবাসীরা সেখানকার পুষ্পোদ্যানে বসে নিশ্চিন্ত মনে পরিচারকদেরকে ইচ্ছা মতো বিভিন্ন রকমের ফলমূল আনতে বলবে। এভাবে তারা সেখানে সুখভোগ করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। আর তাদের ওই বেহেশতী জীবন হবে মৃত্যুহীন, অনন্ত। এভাবে দোজখের শাস্তি থেকে আল্লাহ্ই তাদেরকে দয়া করে বাঁচাবেন। এটাই হচ্ছে মহাসফলতা।

এখানে 'বিকুল্লি ফাকিহাতিন্' অর্থ বিবিধ ফলমূল, যা খেতে ইচ্ছে করবে। 'আমিনীন' অর্থ প্রশান্ত চিত্তে। অর্থাৎ এমতো দুশ্চিন্তা মোটেও প্রশ্রয় পাবে না যে, তাড়াতাড়ি না খেলে ফলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, অথবা বেশী বেশী খেলে সবই তো শেষ হয়ে যাবে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, পৃথিবীর তিক্ত-মিষ্ট সকল প্রকার ফলই বেহেশতে পাওয়া যাবে। এমনকি বিবেরক ফলও। ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন বেহেশতের জিনিষপত্রের নাম পৃথিবীতেও চালু রয়েছে।

'প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না' ব্যতিক্রমীটি এখানে হবে সংযুক্ত অথবা বিযুক্ত। আর কথাটিতে মৃত্যুর উল্লেখ করা হয়েছে রূপকার্থে। কেননা পরকালে কারো মৃত্যু হবে না। পরকালের জীবন মৃত্যুহীন। বেহেশতেও

www.eelm.weebly.com

মৃত্যুর প্রবেশাধিকার নেই। সুতরাং পৃথিবীর মৃত্যুই প্রথম এবং শেষ মৃত্যু। বরং মৃত্যুর পরেই পুণ্যবান বিশ্বাসীরা জান্নাত অবলোকন করতে থাকে। মনে হতে থাকে তারা যেনো বেহেশতেই রয়েছে। আর এখানকার 'নিজ অনুগ্রহে' কথাটির অর্থ— বিশ্বাসীরা যা কিছু পাবে, তা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই পাবে। দোজখাগ্নি থেকে পরিত্রাণও তারা লাভ করবে আল্লাহ্‌র দয়াতেই। কেননা আল্লাহ্‌র উপরে কারো কোনো অধিকার খাটে না।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুণ্যকর্ম কাউকে স্বর্গে যেমন নিয়ে যেতে পারবে না, তেমনি রক্ষা করতে পারবে না নরক থেকে। আল্লাহ্‌র অনুকম্পা ব্যতিরেকে আমিও হতে পারবো না স্বর্গাধিকারী। মুসলিম।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে (৫৮, ৫৯) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা করো, তারাও প্রতীক্ষমান'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি যাতে সহজে কোরআন বুঝতে পারেন এবং এর মাধ্যমে সদুপদেশ দিতে পারেন পথবিভ্রান্ত মানুষকে, তাই আমি এই মহান গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি আপনার মাতৃভাষায়। এরপরেও যদি তারা আপনার সুস্পষ্ট আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে আপনি ধৈর্য ধরে তাদের উপরে শাস্তি আরোপণ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তারাও স্বধারণার বশবর্তী হয়ে এই মর্মে প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে থাকুক যে, অবশেষে আপনিই হতোদ্যম হয়ে পড়বেন। অথবা আপনি অপেক্ষা করুন কাংখিত বিজয়ের এবং তারা আশা করতে থাকুক আপনার পরাজয়ের।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে শিথিল সূত্রে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি নিশীথে সুরা দুখান পাঠ করে, প্রভাতে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে সত্তর হাজার ফেরেশতা। শিথিল সূত্রসহযোগে তিরমিজি এরকমও বর্ণনা করেছেন যে, জুমআর রাতে যে ব্যক্তি নিয়মিত সুরা দুখান পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিবেন। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হাসান বলেছেন, জুমা রজনীতে যে ব্যক্তি সুরা দুখান তেলাওয়াত করবে, তার অতীতের অপরাধসমূহ মার্জনা করে দেওয়া হবে। অদৃঢ় সূত্রপরম্পরায় হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার রাতে অথবা দিনে 'হা-মীম দুখান' আবৃত্তি করবে, আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।

সকল প্রশংসাই আল্লাহ্‌র। সুরা দুখানের তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ ২৮শে রবিউল আউয়াল, ১২০৮ হিজরী সনে। ওয়াল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন। ওয়া সল্লাল্লহু তায়ালা আ'লা খইরি খলক্বিহী মুহাম্মাদিঁউ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজ্বমায়ীন। আমিন।

সূরা জ্বাছিয়া

এই সুরাটিও অবতীর্ণ হয়েছে পুণ্যভূমি মক্কায়। এর রুকু ও আয়াতের সংখ্যা যথাক্রমে ৪ এবং ৩৭।

সূরা জ্বাছিয়া ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

www.eelm.weebly.com

❑ হা-মীম।
❑ এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ।
❑ নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিনদের জন্য।
❑ তোমাদের সৃজনে এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রহিয়াছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য;
❑ নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে

এবং আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে ও বায়ুর পরিবর্তনে।

❑ এইগুলি আল্লাহ্‌র আয়াত, যাহা আমি তোমার নিকট তিলাওয়াত করিতেছি যথাযথভাবে। সুতরাং আল্লাহ্‌র এবং তাঁহার আয়াতের পরিবর্তে উহারা আর কোন বাণীতে বিশ্বাস করিবে?

❑ দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর,

❑ যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের তিলাওয়াত শোনে অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে যেন সে উহা শোনে নাই। উহাকে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির;

❑ যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় তখন উহা লইয়া পরিহাস করে। উহাদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

❑ উহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে জাহান্নাম; উহাদের কৃতকর্ম উহাদের কোন কাজে আসিবে না, উহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে অভিভাবক স্থির করিয়াছে উহারাও নহে। উহাদের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।

❑ এই কুরআন সৎপথের দিশারী; যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে, উহাদের জন্য রহিয়াছে অতিশয় মর্মন্তুদ শাস্তি।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— 'হা-মীম'। এই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে, যাঁর পরাক্রম অপ্রতিরোধ্য এবং যাঁর জ্ঞান অপরিমেয়। সেকারণেই তাঁর শত্রুকুল শাস্তি পাবেই পাবে এবং সেকারণেই মহাবিশ্বের পরিকল্পনা পরিচালনা এতো নিখুঁত এবং সুশৃঙ্খল।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্য'। একথার অর্থ— নিশ্চয় যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য আকাশে ও পৃথিবীতে রয়েছে আল্লাহ্‌র এককত্বের বহুসংখ্যক নিদর্শন। আর 'খলক্ব' (সৃষ্টি) শব্দটি এখানে উহ্য রয়েছে মনে করলে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করার মধ্যে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে মহৎ নিদর্শনাবলী।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তোমাদের সৃজনে ও জীবজন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য'।

এখানে 'ওয়া ফী খলক্বিকুম' অর্থ তোমাদের সৃজনে। অর্থাৎ মানুষের সৃজন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও এককত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যেমন শুক্রবিন্দু থেকে মানুষের জন্ম, প্রবৃদ্ধি ও পরিণতির বিভিন্ন স্তরসমূহ। 'ওয়া মা ইয়াবুছ্ছু মিন দাব্বাতিন' অর্থ এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে। কথাটির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে জেরপ্রদানকারী একটি সর্বনামের সাথে। তৎসত্ত্বেও 'খলাক্বকুম' (তোমাদের সৃজনে) কথাটির সঙ্গে একে সম্পর্কযুক্ত করাই অধিকতর সমীচীন। কেননা জন্তু-জানোয়ারদের বিভিন্ন প্রজাতি সৃজন, তাদের বংশবিস্তার এবং তাদের জীবনোপকরণ নিশ্চিতকরণ এসকল কিছুই হচ্ছে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, এককত্ব এবং পূর্ণতার প্রমাণ।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে ও বায়ুর পরিবর্তনে'।

এখানে 'ওয়াখ্‌তিলাফিল্ লাইলি ওয়ান্ নাহার' অর্থ রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে। অর্থাৎ শীত ও গ্রীষ্মকালের দিন রাতের সংকোচন-প্রসরণের মধ্যে। 'মির রিজক্বিন' অর্থ এখানে বৃষ্টি। কেননা বৃষ্টিই হচ্ছে রিজিক উৎপন্ন হওয়ার কারণ। 'ফাআহ্ইয়া বিহিল্ আরদ্ব 'বা'দা মাওতিহা' অর্থ ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। অর্থাৎ বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে নিষ্ফলা মৃত্তিকাকে করে তোলেন শস্যপ্রজননক্ষম। 'ওয়া তাস্‌রীফির রিয়াহি' অর্থ এবং বায়ুর পরিবর্তনে। আর 'আয়াতুল্ লিক্বওমি ইয়া'ক্বিলূন' অর্থ নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। অর্থাৎ সেই সকল লোকদের জন্য, যারা এ সকল কিছুকে আল্লাহ্‌র এককত্বের নিদর্শন বলে চিহ্নিত করতে পারে এবং তাঁকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে। অথবা 'চিন্তাশীল সম্প্রদায়' অর্থ এখানে বিশ্বাসী ও জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। কেননা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো জন্তু-জানোয়ার সদৃশ। বরং তাদের চেয়েও অধিক পথচ্যুত।

বায়যাবী লিখেছেন, তিনটি আয়াতে যে নিদর্শনরাজির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো দৃশ্যমানতা এবং ঋতুর দিক থেকেও বিভিন্ন প্রকৃতির। তাই সেগুলোর রহস্য বুঝতে গেলে প্রয়োজন গভীর চিন্তা ও অনুধ্যানের। আবার ওই তিনটি আয়াতের অনিবার্যতা প্রকাশ করা হয়েছে বিভিন্ন আঙ্গিকে। একস্থানে বলা হয়েছে 'ক্বওমিঁই ইয়া'ক্বিলূন'। আর এক জায়গায় বলা হয়েছে 'ক্বওমিঁই ইউক্বিণু'। আবার অন্য স্থানে বলা হয়েছে 'মু'মিনীন'। এরকম করা হয়েছে কেবল বক্তব্যকে স্মরণ করার জন্য। নতুবা 'ইমান' 'ইয়াক্বিন' এগুলো সমার্থক এবং উভয়ই চিন্তাশীলতা ও বোধগম্যতার ফল। অর্থাৎ বুদ্ধির দাবি এই যে, বুদ্ধিমানেরা যেনো অবশ্যই এক আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'এগুলি আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমি তোমার নিকট তেলাওয়াত করছি যথাযথভাবে। সুতরাং আল্লাহ্‌র এবং তাঁর আয়াতের পরিবর্তে তারা আর কোন্ বাণীতে বিশ্বাস করবে'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! কোরআনের এই বাণীসম্ভার আল্লাহ্‌রই আয়াত, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ভুলভাবে আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। তাই মানুষের উচিত নির্বিবাদে ও সর্বান্তঃকরণে এই আয়াতসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। যদি তারা এরকম না করে তাহলে তো অবশ্যই হয়ে পড়বে সত্যপথচ্যুত। কেননা যা তাঁর বাণীর পরিপন্থী, তার সকল কিছুই মিথ্যা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর (৭), যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের তেলাওয়াত শোনে, অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে, যেনো সে তা শোনেনি, তাকে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির' (৮)। একথার অর্থ যারা ঘোর মিথ্যাবাদী, পাপী, তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে চরম দুর্ভোগ।

আর যে আল্লাহ্‌র বাণী শুনেও শোনে না, অহংকার বশে আগের মতোই অটল থাকে সত্যপ্রত্যাখ্যানের উপর, হে আমার রসুল! আপনি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ প্রদান করুন।

এখানে 'আছীম' অর্থ ঘোর পাপী । আর পরের বাক্যে বলা হয়েছে ঘোর পৌত্তলিক নজর ইবনে হারেছের কথা। 'ছুম্মা ইউসিররু মুস্তাক্‌বিরান' অর্থ অথচ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে অটল থাকে। 'ছুম্মা' অর্থ অতঃপর (এখানে অর্থ করা হয়েছে 'অথচ')। শব্দটি ব্যবহার করা হয় সাধারণতঃ কালক্ষেপণার্থে। আয়াত শ্রবণের পর কালক্ষেপণ করা জ্ঞানের উর্ধ্বে। অর্থাৎ সময়ান্তর বুঝানোর জন্য। অথবা ব্যবধান প্রকাশার্থে। এখানে ব্যবধান নির্দেশ করার জন্যই বলা হয়েছে 'অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে'। অর্থাৎ নজর ইবনে হারেছ সত্যের আহ্বান শুনেও শোনে না। প্রত্যাখ্যান করে অহংকারের সঙ্গে।

www.eelm.weebly.com

'মুস্তাক্বিরূন' অর্থ তারা উদ্ধত। অর্থাৎ নজর ইবনে হারেছ ইমানকে তুচ্ছ বিষয় মনে করে অহংকারের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করে। 'ফাবাশ্শির' অর্থ সুসংবাদ দাও। এখানকার 'ফা' নৈমিত্তিক। অর্থাৎ 'ফা' এর পূর্ববর্তী বাক্যে বর্ণিত হয়েছে তার পরবর্তী বাক্যের কারণ। আর শাস্তির সংবাদ দানের ক্ষেত্রে এখানে 'সুসংবাদ' ব্যবহার করা হয়েছে বিদ্রূপার্থে, পরিহাসচ্ছলে। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! যারা নজর ইবনে হারেছের মতো ঘোর মিথ্যাবাদী পাপী, তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে চরম দুর্ভোগ। কেননা তারা আল্লাহ্‌র বাণী শুনেও অবজ্ঞা ও অহমিকাবশতঃ প্রত্যাখ্যান করে। এমন ভান করে যে, যেনো কিছু শোনেইনি। অতএব আপনি নজরকে মর্মন্তুদ শাস্তির অনিবার্যতার কথা জানিয়ে দিন।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'যখন আমার কোনো আয়াত সে অবগত হয়, তখন তা নিয়ে পরিহাস করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি (৯)। তাদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম, তাদের কৃতকর্ম তাদের কোনো কাজে আসবে না, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক স্থির করেছে, তারাও নয়। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি (১০)। এই কোরআন সৎপথের দিশারী; যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় মর্মন্তুদ শাস্তি' (১১)। একথার অর্থ— নজর ইবনে হারেছ এবং তার মতো মিথ্যাবাদী পাপীরা আল্লাহ্‌র বাণী কেবল প্রত্যাখ্যানই করে না, বরং তা নিয়ে ঠাট্টা-উপহাসও করে। এধরনের অপরাধীদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। জাহান্নাম তাদের পশ্চাদানুসরণ করে চলেছে। পরকালে তাদের পৃথিবীর কোনো অর্জন কাজে আসবে না। আর যাদেরকে তারা সুপারিশকারীরূপে পূজা করতো, তারাও তাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। কেননা তাদের উপাস্যদের জন্যও রয়েছে কঠোর শাস্তি। ওই সকল অপমান্যও মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে কেবল কোরআন। কারণ কোরআন হচ্ছে সত্য পথের দিশারী। সুতরাং যারা এই কোরআনকে মানবে না, তাদেরকে তো অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করতে হবেই।

তাফসীরে মাযহারী/৫৪২

এখানে 'লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি' অর্থ কবরের আযাব। 'তাদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম' অর্থ তাদের সামনে পিছনে সবদিকেই রয়েছে জাহান্নাম। অর্থাৎ পরকালে জাহান্নামের আযাব শুরু হলেও তারা যেনো এখন থেকেই জাহান্নামের আগুন দ্বারা পরিবেষ্টিত। 'তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক স্থির করেছে' অর্থ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তারা পূজা করেছে যে সকল প্রতিমার, অথবা আনুগত্য করেছে যে সকল অংশীবাদী দলপতির। 'তাদের কৃতকর্ম তাদের কোনো কাজে আসবে না' অর্থ তাদের ধনবল, জনবল কোনোকিছুই সেদিন তাদের কাজে আসবে না। 'আর এই কোরআন সৎপথের দিশারী' অর্থ এই কোরআন হচ্ছে নির্ভুল পথপ্রদর্শক।

সূরা জ্বাছিয়া ঃ আয়াত ১২, ১৩

❑ আল্লাহ্‌ই তো সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার আদেশে উহাতে নৌযানসমূহ চলাচল করিতে পারে ও যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার এবং যেন তোমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

❑ আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে তো রহিয়াছে নিদর্শন।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! আল্লাহ্‌ই তো তোমাদের জন্য সমুদ্রকে করেছেন কল্যাণার্জনের মাধ্যম। সমুদ্রযাত্রাকে করেছেন সুগম। সে কারণেই তো তোমাদের জলযানগুলো বন্দর থেকে বন্দরে চলাচল করতে পারে নির্বিঘ্নে, যাতে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবনোপকরণ আহরণ করতে পারো এবং সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো তাঁর। এভাবে সমুদ্রই কেবল নয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু দয়া করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তোমাদেরই কল্যাণে রেখেছেন সতত নিয়োজিত। যারা চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান, কেবল তারাই এ সকল নিদর্শনের মর্ম বোঝে এবং পথিক হয় বিশ্বাসী পথের।

এখানে 'সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন' অর্থ সমুদ্রপৃষ্ঠকে করেছেন সমতল, মসৃণ ও সুনাব্য। 'যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো' অর্থ যাতে তোমরা বিভিন্ন সমুদ্রবন্দরে পণ্যবিনিময়ের মাধ্যমে অর্জন করতে পারো অর্থ-বিত্ত, প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ। 'তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত

www.eelm.weebly.com

রেখেছেন পৃথিবীর সমস্ত কিছু' অর্থ তিনি আকাশের সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র, বায়ুপ্রবাহ-মেঘমালা এবং পৃথিবীর ফল-ফসল, নদী-বৃক্ষ-পর্বতমালা সকল কিছুই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের উপকারার্থে। হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'সমস্ত কিছু' কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সমগ্র সৃষ্টিই মানুষের জন্য কল্যাণকর। আর আল্লাহ্ এ সকল কিছুই দিয়েছেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, অনুগ্রহ করে। জুজাযও এরকম বলেছেন। 'আর চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে তো রয়েছে নিদর্শন' অর্থ যারা জ্ঞানী ও তত্ত্বানুসন্ধানী তারাই কেবল আল্লাহ্র এ সকল নিদর্শন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয় এবং ইমান আনে মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতা আল্লাহ্র উপর।

হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা থেকে বাগবী লিখেছেন, একবার মক্কায় গিফারী গোত্রের এক লোক হজরত ওমরকে গালি দিলো। হজরত ওমর তখন তার উপর হামলা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। সে সময় অবতীর্ণ হলো নিম্নবর্ণিত আয়াত। বলা হলো—

সূরা জ্বাছিয়া ঃ আয়াত ১৪, ১৫

❑ মু'মিনদিগকে বল, 'তাহারা যেন ক্ষমা করে উহাদিগকে, যাহারা আল্লাহ্র দিবসগুলির প্রত্যাশা করে না । ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিবেন।'

❑ যে সৎকর্ম করে সে তাহার কল্যাণের জন্যই উহা করে এবং কেহ মন্দ কর্ম করিলে উহার প্রতিফল সে-ই ভোগ করিবে, অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি আপনার বিশ্বাসী সহচরবর্গকে এই মর্মে সদুপদেশ দিন যে, তারা যেনো ওই সকল লোকের মূর্খজনোচিত আচরণকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে, যারা আল্লাহ্কেই বিশ্বাস করে না, আস্থা রাখে না পরকালের প্রতি। কেননা আল্লাহ্ তায়ালাই পরকালে বিষয়টির চূড়ান্ত নিস্পত্তি ঘটাবেন। প্রত্যেককেই দিবেন তাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিফল— পুরস্কার, অথবা তিরস্কার। পুণ্যবানেরা পুণ্যকর্ম করে তাদের নিজেদের ভালোর জন্য। আর যে মন্দকর্মপ্রবণ, সে তার মন্দকর্মের ক্ষতিকর প্রতিফল ভোগ করবে নিজেই। আর একথাও নিশ্চিত যে, পুণ্যবান-পাপী সকলকেই প্রত্যাবর্তিত হতে হবে তাদের প্রভুপ্রতিপালক সকাশে।

এখানে 'ইয়াগ্ফির' অর্থ ক্ষমা করে। 'লা ইয়ারজুন' অর্থ প্রত্যাশা করে না। 'আই্ইয়ামাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্র দিবসগুলির। অর্থাৎ বিশ্বাসীদেরকে প্রদত্ত বিজয়ের সুসংবাদসম্বলিত শুভ দিবসগুলির।

বাগবী লিখেছেন, কারাজী ও সুদ্দী বলেছেন, প্রথমদিকে বিধর্মীরা মক্কার মুসলমানদেরকে খুবই কষ্ট দিতো। অত্যাচারিত সাহাবীগণ প্রায়শ এ বিষয়ে রসুল স. এর কাছে অনুযোগ উপস্থাপন করতেন। তখন অবতীর্ণ হয়েছিলো আলোচ্য আয়াতদ্বয়। পরে যখন জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন রহিত হয়ে গেলো আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের বিধান।

'বিমা কানূ ইয়াক্সিবূন' অর্থ কৃতকর্মের জন্য পুরস্কার দিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ ভালো-মন্দ উভয় প্রকার কর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করবেন। 'ফালি নাফ্সিহী' অর্থ তার কল্যাণের জন্যই করে। 'ওয়া মান আসাআ ফাআ'লাইহা' অর্থ কেউ মন্দ কর্ম করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। আর 'ছুম্মা ইলা রব্বিকুম তুরজ্বাউ'ন' অর্থ অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। অর্থাৎ তোমাদেরকে অবশেষে আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত করানো হবে তোমাদের সুকর্ম ও কুকর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল প্রদানের উদ্দেশ্যে।

সূরা জ্বাছিয়া ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

❑ আমি তো বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নুবুওয়াত দান করিয়াছিলাম এবং উহাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দিয়াছিলাম এবং দিয়াছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বজগতের উপর।

❑ আমি উহাদিগকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করিয়াছিলাম দীন সম্পর্কে। উহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর উহারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত বিরোধিতা করিয়াছিল। উহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন উহাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করিয়া দিবেন।

❑ ইহার পর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি উহার অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না।

❑ আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় উহারা তোমার কোনই উপকার করিতে পারিবে না; যালিমরা একে অপরের বন্ধু; আর আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের বন্ধু।

❑ এই কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত।

❑ দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়া উহাদিগকে তাহাদের সমান গণ্য করিব, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে? উহাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! এবার বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠী সম্পর্কে কিছু শুনুন, আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম আকাশজ গ্রন্থ, শাসনক্ষমতা ও ধর্মীয় জ্ঞান। তাদের মধ্যে অনেককে করেছিলাম নবী। সম্প্রদায়গত শ্রেষ্ঠত্বও দিয়েছিলাম তাদেরকে তখনকার অপরাপর জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে। আরো দিয়েছিলোম উত্তম আহার্যসম্ভার। ধর্ম সম্পর্কেও দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট প্রমাণাদি। কিন্তু এতো কিছু পাবার পরেও জ্ঞাতসারে তারা হয়ে গিয়েছিলো নিজেদের মধ্যেই বিদ্বেষপরায়ণ। মতানৈক্য পৌঁছেছিলো তাদের চরমে। সন্ধি তাদের কখনো হয়নি। হবেও না। তাই আল্লাহ্‌ই মহাবিচারের দিবসে তাদের অনাপোষ মতোবিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিবেন।

এখানে 'কিতাব' অর্থ তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর। 'হুকামা' অর্থ কর্তৃত্ব, শাসনক্ষমতা। 'আন্নুবুও্ওয়াহ্' অর্থ নবুয়ত। উল্লেখ্য, বনী ইসরাইলদের মধ্যে আল্লাহ্ প্রেরণ করেছিলেন বহুসংখ্যক নবী। 'রযাক্বনাহুম মিনাত্ ত্বইয়্যিবাত' অর্থ উত্তম জীবনোপকরণ, সুস্বাদু আহার্যসম্ভার। 'ফাদ্বদ্বল্‌নাহুম আ'লাল আ'লামীন' অর্থ দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বজগতের উপর'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাদের জামানায় আল্লাহ্‌র নিকটে তারা ছাড়া আর কেউ প্রিয়ভাজন ও সম্মানার্হ ছিলো না।

'দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বজগতের উপর' কথাটির দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, বিশেষ মানুষ বিশেষ ফেরেশতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কেননা 'বিশ্বজগত' (আ'লামীন) এর মধ্যে ফেরেশতারা রয়েছে। অর্থাৎ বনী ইসরাইলদের নবীগণ অবশ্যই বিশিষ্ট ফেরেশতাবৃন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

www.eelm.weebly.com

'বাইয়্যিনাতিম্ মিনাল আমরি' অর্থ ধর্মীয় বিষয়সমূহের সুস্পষ্ট প্রমাণ। উল্লেখ্য, ওই সকল বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা বনী ইসরাইলদের জন্য ছিলো অত্যাবশ্যক। শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর বিবরণও লিপিবদ্ধ ছিলো তাদের কিতাবে। তাই তাঁর উপর ইমান আনাও ছিলো তাদের জন্য অত্যাবশ্যক। একারণেই তারা রসুল স.কে চিনতো, যেমন চিনতো নিজেদের সন্তানকে। আর এখানে তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করতো কথাটির অর্থ তারা তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে করতো প্রচণ্ড মতোবিরোধ, অথবা মতানৈক্য করতো রসুল স. এর প্রতি ইমান আনা না আনার ব্যাপারে, যার ভিত্তি ছিলো কেবলই বিদ্বেষ, অহমিকা ও শত্রুতা, আর যার পক্ষে তাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণও ছিলো না। কথাটির মাধ্যমে এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয় যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের একাত্তর ও বায়াত্তর দলের মধ্যে কোনো দলের অভিমতই প্রামাণ্য ছিলো না। তারা এরকম দল-উপদল সৃষ্টি করেছিলো কেবলই আপনাপন জেদ বজায়ার্থে। এই উম্মতের বায়াত্তর দলের মধ্যে একটি দল ছাড়া বাকী দলগুলোর অবস্থাও তেমনি। তারা কোরআনের আয়াতকে করেছে খণ্ডিত, অপব্যাখ্যাদুষ্ট, অথবা বিকৃত। যেমন মুতাজিলারা ইসলামকে বুঝতে যেয়ে আশ্রয় করেছে জড়বাদী বুদ্ধি ও ভ্রান্ত দর্শনশাস্ত্রের। আবার মুজাস্‌সিমা সম্প্রদায় মনে করে আকারাতীত বলে কোনোকিছু নেই, এমনকি আল্লাহ্‌ও অবয়ববিশিষ্ট। এদিকে রাফেজী, খারেজী ইত্যাদি সম্প্রদায় সম্পূর্ণই বিদ্বেষ ও ঈর্ষানির্ভর।

'ইয়াওমাল কিয়ামাহ্' অর্থ কিয়ামতের দিন। আর 'ফীমা কানূ ফীহি ইয়াখ্‌তালিফূন' অর্থ তাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন। অর্থাৎ পুরস্কৃত করবেন সত্যাশ্রয়ীদের এবং শাস্তি দিবেন মিথ্যাধিষ্ঠিতদেরকে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি তার অনুসরণ করো, অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কোরো না (১৮)। আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় তারা তোমার কোনোই উপকার করতে পারবে না; জালেমরা একে অপরের বন্ধু; আর আল্লাহ্ তো মুত্তাক্বীদের বন্ধু'(১৯)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনাকে তো আমি প্রতিষ্ঠিত করেছি স্বতন্ত্র শরিয়তের উপর, যা সর্বশেষ, সর্বোৎকৃষ্ট ও পূর্ণতম। সুতরাং আপনি এই শরিয়তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকুন। সদুদ্দেশ্যে হলেও অজ্ঞদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ্‌র বিধানের তোয়াক্কা না করে অনুসরণ করে স্ব-অভিমতের। আরো শুনুন, আল্লাহ্‌র বিপরীতে কারো কোনো উপকার করবার অধিকার ও সামর্থ্য নেই। থাকতে পারেও না। সুতরাং নিশ্চিত জানবেন, স্বেচ্ছাচারীরা পরস্পরের সখা, আর আল্লাহ্‌র প্রতি সমর্পিতদের সখা হচ্ছেন আল্লাহ্ স্বয়ং।

'শরীআ'তিন' অর্থ শরিয়ত, বিশেষ ধর্মীয় বিধান, নিজের ও অন্যদের জীবনে যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় নবীগণকে। 'মিনাল আমরি' অর্থ বিধান, বা বিধিনিষেধ। আর এখানকার 'সুতরাং, তুমি তার অনুসরণ করো, অজ্ঞদের

খেয়ালখুশীর অনুসরণ কোরো না' নির্দেশটি রসুল.কে লক্ষ্য করে দেওয়া হলেও এর উদ্দেশ্য তাঁর উম্মত। কেননা আল্লাহ্‌র বিধিবিধানের অনুসরণ না করা এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবই নয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে যারা অজ্ঞ, সেই সকল প্রবৃত্তিপূজারীদের অনুসরণ যেনো আপনার উম্মত না করে। আবার 'অজ্ঞ' বলে এখানে আল্লাহ্‌র কিতাবের জ্ঞানবিবর্জিত দার্শনিকদের কথাও বলা হয়ে থাকতে পারে। অথবা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী কুরায়েশ গোত্রপতিদেরকে এখানে 'অজ্ঞ' বলা হয়ে থাকতে পারে। কেননা তারাই খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করতো এবং রসুল স.কে আহবান জানাতো তাদের পৌত্তলিক পিতৃপুরুষদের অপবিত্র ধর্মমতের দিকে। কিংবা এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'অজ্ঞ' বলে বোঝানো হয়েছে ওই সকল ইহুদী বিদ্বানকে যারা আল্লাহ্‌র কিতাব তওরাতের জ্ঞান রাখা সত্ত্বেও ধর্মীয় রীতিনীতির বিকৃত ব্যাখ্যা করতো। অর্থাৎ তারা ছিলো পণ্ডিতমূর্খ, অজ্ঞদের চেয়েও অধিক মন্দ।

'জালেমরা একে অপরের বন্ধু' অর্থ সমমতাদর্শী বলেই স্বেচ্ছাচারীরা নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব বজায় রাখে। একজোট হয়ে বিরোধিতা করে শুভ ও সত্য ধর্মাদর্শের । আর 'আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের বন্ধু' অর্থ হে আমার রসুল! আল্লাহ্ যেহেতু আল্লাহ্‌ভীরুদের বন্ধু, তাই আপনিও তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখুন। নিশ্চয় জানবেন স্বেচ্ছাচারীদের বন্ধুত্ব এবং আল্লাহ্‌অন্তপ্রাণগণের বন্ধু কখনো একত্রিত হতে পারে না। আর আল্লাহ্‌দ্রোহীরাও কখনো ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহ্‌প্রেমিকগণের ।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'এই কোরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত'। একথার অর্থ— মহাগ্রন্থ কোরআন মহামানবতার জন্য জ্ঞানসিন্ধু এবং সত্যপথপ্রাপ্তির মাধ্যম এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথের দিশারী ও অফুরন্ত অনুগ্রহ আহরণের উপায়।

এখানে 'হাজা' (এটা) অর্থ এই কোরআন, অথবা এই শরিয়ত। 'বাসায়িরু' অর্থ সত্যদৃষ্টি লাভ করার মাধ্যম, বা সুস্পষ্ট দলিল। 'লিন্নাস' অর্থ মানবজাতির জন্য। কথাটির মাধ্যমে এ বিষয়টিও প্রতীয়মান হয় যে, কোরআনে রয়েছে ইহকাল পরকাল

www.eelm.weebly.com

উভয় জগতের কল্যাণ। 'হুদাঁও ওয়া রহমাহ্' অর্থ পথনির্দেশ ও রহমত। আর 'ক্বওমিঁই ইউক্বিনূন' অর্থ নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে এদেরকে তাদের সমান গণ্য করবো, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে? তাদের সিদ্ধান্ত কতো মন্দ'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ভেবেছে কী? সত্য ও মিথ্যা কি সমতুল? যারা বিশ্বাসী ও পুণ্যকর্মপরায়ণ, তারা কি জীবনে ও মৃত্যুতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপিষ্ঠদের মতো শুভপরিণতিহীন হতে পারে? কখনোই নয়। হায়, দুর্বৃত্তদের মনোভাব ও সিদ্ধান্ত কতোইনা অজ্ঞজনোচিত ও অশুভ।

এখানকার 'আম্ হাসিবা' এর 'আম' 'মুনকাতিয়া' বা বিয়োজক এবং 'আম' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'বাল' (বরং) অর্থে। এখানকার প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও পরিহাসব্যঞ্জক। আর এখানকার 'ইজ্বতারহূ' অর্থ যারা দুষ্কৃতিকারী।

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কার ওই সকল দুষ্কর্মপরায়ণ মূর্তিপূজকদেরকে লক্ষ্য করে, যারা মুসলমানদের কাছে গর্ব করে বলতো, তোমাদের কথা মতো যদি মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচার ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েই যায়, তবে দেখো, সেখানেও আমরা তোমাদের চেয়ে ভালো থাকবো, যেমন এখন আমরা তোমাদের চেয়ে অধিক বিত্তাধিকারী ও প্রতাপশালী। তাদের এমতো অপবচনকেই প্রশ্নাকারে ও পরিহাসচ্ছলে খণ্ডন করা হয়েছে এখানে।

'সাআ মা ইয়াহ্কুমূন' অর্থ তাদের সিদ্ধান্ত কতো মন্দ। অর্থাৎ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীকে সমমর্যাদাসম্পন্ন ভাববার ধারণাটি কতোইনা অসত্য।

মাসরুক বলেছেন, একবার মক্কার এক লোক আমাকে একটি বাড়ির সামনে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললো, দেখুন এটাই হচ্ছে আপনার ভ্রাতা মহাত্মা তামীমদারীর বাসভবন। তিনি একবার সারারাত ধরে রুকু সেজদা করেছিলেন এবং বার বার পাঠ করেছিলেন 'দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে এদেরকে তাদের সমান মনে করবো, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে? তাদের সিদ্ধান্ত কতো মন্দ'।

সূরা জ্বাছিয়া ঃ আয়াত ২২, ২৩

❑ আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবে এবং যাহাতে প্রত্যক ব্যক্তিকে তাহার কর্মানুযায়ী ফল দেওয়া যাইতে পারে আর তাহাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

❑ তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ তাহাকে, যে তাহার খেয়াল-খুশীকে নিজ ইলাহ্ বানাইয়া লইয়াছে? আল্লাহ্ জানিয়া শুনিয়াই উহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন এবং উহার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহার চক্ষুর উপর রাখিয়াছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ্র পরে কে তাহাকে পথনির্দেশ করিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছেন এজন্য যে, এ সকল কিছু দেখে মানুষ যেনো মুগ্ধ হয়। চিন্তাভাবনা করে এবং বুঝতে পারে, এই বিশাল সৃষ্টির সৃজয়িতা এক ও অতুলনীয়রূপে পরাক্রমশালী। এভাবে জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেচনার সঠিক প্রয়োগ করে অবলম্বন করে বিশ্বাসের পথ এবং নিজেদের কর্মকাণ্ডকে করে তোলে শুভ ও পুণ্যকর্মময়। এই উদ্দেশ্যেই এই মহাসৃষ্টিকে বানানো হয়েছে তাঁর সত্তা-গুণবত্তা ও কার্যকলাপের নিদর্শন বা প্রমাণ। তারপর একদিন তিনি এই হিসাবও অবশ্যই গ্রহণ করবেন যে, কে তাঁর উদ্দেশ্য সফল করলো এবং কে করলো না। তখন প্রত্যেকের কৃতকর্মের যথাযথ ফলাফলও তিনি প্রদান করবেন। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীকে দিবেন তাদের যথাপ্রাপ্য— পুরস্কার, অথবা তিরস্কার। এ ব্যাপারে তাদের উপরে কোনোপ্রকার জুলুম করা হবে না। পুণ্য ও পাপ কম-বেশী করা হবে না এতটুকুও। অর্থাৎ মানুষের পুণ্য ও পাপের যথাপ্রতিফল ইহকালে যদি না-ও হয়, তবে তা পরকালে দেওয়া হবেই। আকাশ-পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে একারণেই। উল্লেখ্য আল্লাহ্র কোনো কাজই জুলুম নয়। কেননা সকলে ও সকলকিছুই

www.eelm.weebly.com

তাঁর অধিকারায়ত্ব। তাই পুণ্যকর্মশীলদেরকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত করা যেমন তাঁর জন্য জুলুম নয়, তেমনি জুলুম নয় পাপীদেরকে পাপের অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করা। কিন্তু তাঁর বান্দারা এরকম করলে তা হবে জুলুম। এদিক থেকে চিন্তা করেই এখানে বলা হয়েছে— তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সকল দিক থেকে জুলুমের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন।

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'তুমি লক্ষ্য করেছো তাকে; যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজ ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ্ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ্র পরে কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, প্রকাশ্যত প্রতিমাপূজা করলেও ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদের প্রবৃত্তিজাত কামনাবাসনার উপাসক। অর্থাৎ তারা আসলে আত্ম-পূজক। আল্লাহ্তায়ালা তাই তাদেরকে জ্ঞাতসারেই বিভ্রান্ত থাকতে দিয়েছেন। তাদের শ্রুতি দৃষ্টি ও হৃদয়কে করে দিয়েছেন আড়ষ্ট ও অবরুদ্ধ। সুতরাং তাদেরকে পথ দেখাবার সাধ্য কারো নেই। এরপরেও কি মানুষ আল্লাহ্র অপ্রতিরোধ্য অভিপ্রায়কে মান্য করবে না? গ্রহণ করবে না তাঁর পথনির্দেশনাকে?

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান ও কাতাদা বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের প্রবৃত্তির কামনা-লালসা এবং অপবিবেচনাকেই তাদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। তাই উপাস্য নির্ধারণ করে তারা নিজেরাই। খেয়ালখুশীমতো দেব-দেবীদেরকে কল্পনা করে বিভিন্ন শক্তির আধাররূপে। একারণেই প্রকৃত উপাস্য এক আল্লাহ্র উপরে তাদের বিশ্বাস নেই। নেই তাঁর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের অপপ্রবৃত্তিই তাদের উপাস্য। আর তারা যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবেই উপাসনা করে চলে তার।

ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এবং সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, মক্কার পৌত্তলিকেরা পাথর ও সোনারূপার পূজা করতো। আবার আগের চেয়ে ভালো পাথর পেয়ে গেলে ওই পাথরের মূর্তি নির্মাণ করে তার পূজা শুরু করতো, পূর্বের পাষাণমূর্তিটি দিতো ফেলে। তাদের এমতো অপআচরণের প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

শা'বী বলেছেন, 'হাওয়া' অর্থ গড়িয়ে পড়া, পতিত হওয়া। খেয়াল-খুশী বা কামনা-বাসনাও মানুষকে দোজখের মধ্যে নিক্ষেপ করে। সেকারণেই কামনা-বাসনাকে বলা হয় 'হাওয়া'। 'আল্লাহ্ জেনে শুনে তাকে বিভ্রান্ত করেছেন' অর্থ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। তাই তার স্বভাবগত ভ্রষ্টতার কথা তার অজানা নয়। অথবা সে পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য বলেই আল্লাহ্ তাকে পথভ্রষ্ট করে রেখেছেন। আর কে বিভ্রান্ত হবে এবং কে হবে না, তা তো তিনি জানেনেই। তিনি যে সর্বজ্ঞানধর। কিংবা তার সৃষ্টির আগে থেকেই তাঁর একথা জানা আছে যে, সে পথভ্রষ্ট হবেই। তাই তার বিভ্রান্তি তাঁর জ্ঞানবহির্ভূত বিষয় নয়। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কারো বা কোনোকিছুর অস্তিত্ব থাকা তো সম্ভবই নয়। তাঁর জ্ঞান যে আনুরূপ্যবিহীনরূপে সর্বত্রগামী।

হজরত আবু আবদুল্লাহ্ একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। লোকেরা তাঁকে দেখতে গেলো। দেখলো, তিনি কাঁদছেন। তারা জিজ্ঞেস করলো, হে রসুল- সহচর! আপনি কাঁদছেন কেনো? রসুল স. তো আজ্ঞা করেছেন, মূল বাক্য গ্রহণ করো এবং তার উপরে অবিচল থাকো। তারপর মৃত্যুর মাধ্যমে মিলিত হয়ো আমার সঙ্গে। হজরত আবু আবদুল্লাহ্ বললেন, তাতো আমি জানিই। কিন্তু আমি রসুল স.কে একথাও বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তাঁর আনুরূপ্যবিহীন দক্ষিণ হস্তের ও বাম হস্তের মুঠিতে আত্মাগুলোকে আবদ্ধ করে রাখেন এবং বলেন, এগুলো জান্নাতী এবং এগুলো জাহান্নামী। আর আমি সর্বময় অভিপ্রায়ধারী। একথা মনে পড়ছে বলেই আমি কাঁদছি। কেননা আমি তো জানি না আমি তাঁর কোন মুষ্টিতে আবদ্ধ।

'তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ' অর্থ আল্লাহ্ তাকে করে রেখেছেন সত্যশ্রবণ, সত্যদর্শন ও সত্য-উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত। আর এখানকার 'অতএব আল্লাহ্র পরে কে তাকে পথনির্দেশ করবে' প্রশ্নটি হচ্ছে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তাকে পথ দেখাবার সাধ্য কারো নেই।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, মক্কার পৌত্তলিকেরা বলতো, রাত ও দিনই আমাদেরকে ধ্বংস করেছে। তাদের এমতো অপমন্তব্যের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত। বলা হয়েছে—

সূরা জ্বাছিয়া ঃ আয়াত ২৪, ২৫, ২৬

---

www.eelm.weebly.com

❑ উহারা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি আর কাল-ই আমাদিগকে ধ্বংস করে।' বস্তুত এই ব্যাপারে উহাদের কোন জ্ঞান নাই, উহারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।

❑ উহাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন উহাদের কোন যুক্তি থাকে না কেবল এই উক্তি ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হইলে আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে উপস্থিত কর।

❑ বল, 'আল্লাহ্ই তোমাদিগকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে কিয়ামত দিবসে একত্র করিবেন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, পৃথিবীর জীবনই হচ্ছে জীবন। এর পরে আর কিছুই নেই। সুতরাং আমাদের জীবন ও মরণ সম্পূর্ণতই পৃথিবীসম্পৃক্ত। আর আমাদের এই মহামূল্যবান জীবনকে দিবা-রাত্রির আবর্তনই ক্ষয় করে ফেলে। কিন্তু হে আমার রসুল! আপনি নিশ্চয় একথা বুঝতে পারেন যে, জীবন-মৃত্যুর রহস্য ও মহাজীবনের তত্ত্ব সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ। তাদের অভিমত তো সম্পূর্ণতই তাদেরই স্বকপোলকল্পিত।

এখানে 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন' অর্থ পার্থিবতাই সবকিছু। এরপরে আর কিছুই নেই। 'আমরা মরি ও বাঁচি' অর্থ আমরা কখনো মৃত্যু বরণ করি, আবার কখনো আমাদের সন্তানেরা জন্মগ্রহণ করে। এভাবে পৃথিবীর এই মরা বাঁচাই আমাদের সবকিছু। পরকালের ধারণা কেবলই কল্পনা। বাক্যটির উদ্দেশ্য এরকম নয় যে, আমাদের মৃত্যুর পর আবার আমরা জীবন ফিরে পাব। কেননা এখানে 'ওয়াও' (ও) এসেছে কেবল সংযোজক হিসেবে, অনুবর্তনের জন্য আসেনি। জুজায এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা একথাই বলতে চেয়েছে যে, পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমাদের মরা-বাঁচা সবকিছুরই শেষ এখানেই।

'ওয়ামা ইউহ্লিকুনা ইল্লাদ্ দাহ্রু' অর্থ আর কালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। অর্থাৎ প্রবহমান সময়ের আঘাতেই মানুষ ক্ষয় হতে হতে ধ্বংস হয়ে যায়। এখানে 'দাহ্র' অর্থ কাল। পৃথিবীর মোট বয়সকেও বলা হয় 'দাহ্র'। আর 'জামানা' অর্থ সকল জামানা, সকল সময়, তা সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তৃত, যা-ই হোক না কেনো।

'বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই' অর্থ তাদের জ্ঞানার্জনের কোনো পথই খোলা নেই। উল্লেখ্য, জ্ঞান অর্জনের পন্থা দু'টি— ১. স্বভাবজ জ্ঞান, যা লাভ হয় চিন্তা-চেতনা ব্যতিরেকেই এবং ২. চিন্তাজাত জ্ঞান, যার ভিত্তি হচ্ছে বাস্তব প্রমাণ। সময় যে সবকিছুকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়— এমতো জ্ঞান বর্ণিত পন্থা দু'টোর একটিতেও পড়ে না। তাই এখানে বলা হয়েছে— এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। অর্থাৎ জীবন অর্থ মহাজীবন, মৃত্যু তার চলার পথের একটি তোরণ মাত্র। এই জ্ঞান লাভ করেছেন কেবল নবী-রসুলগণ এবং তাঁদের বিশ্বাসী অনুগামীগণ। যারা এরকম নন, তারা যে সত্যি সত্যিই অজ্ঞ, সে ব্যাপারে সন্দেহ মাত্র নেই।

'ইন্ হুম ইল্লা ইয়াজুন্নূন' অর্থ তারা তো কেবল মন গড়া কথা বলে। অর্থাৎ তারা কোনো জ্ঞান ও প্রমাণ ছাড়াই সময়কে সর্বশক্তিধর বলে বিশ্বাস করে। সময়ের স্রষ্টার কথা ভুলেও উচ্চারণ করে না। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা কালকে মন্দ বোলো না। কেননা আল্লাহ্ই কাল (মহাকালের নিয়ন্ত্রয়িতা)। বাগবীর বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— আল্লাহ্ বলেন, হে আদম সন্তানেরা! তোমরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে 'হায়রে যুগ'! এরূপ বোলো না। কেননা আমিই সময়। আমিই আবর্তন ঘটাই দিবস-নিশিথের। আবার আমিই একসময় এমতো আবর্তনকে রহিত করবো। হাদিসটির প্রকৃত অর্থ এরকম— মানুষ সাধারণতঃ বলে জামানা খারাপ। সময়ই যতো সব বিপদ-আপদ টেনে আনে। অথচ তারা ভুলে যায় যে, আল্লাহ্ই সুখ ও দুঃখের একমাত্র নির্ধারয়িতা। সুতরাং সময়কে মন্দ বলার অর্থ আল্লাহ্কে মন্দ বলা। অথচ তিনি সকল প্রকার দোষত্রুটি থেকে সতত মুক্ত ও চিরপবিত্র। কোনো কোনো আলেম আবার কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ই সময়প্রবাহের একমাত্র সৃজয়িতা। সুতরাং সময়কে মন্দ বলা অংশীবাদিতা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সুতরাং তোমরা এরকম অপমন্তব্য থেকে সতর্ক হও।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয়, তখন তাদের কোনো যুক্তি থাকে না কেবল এই উক্তি ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত করো (২৫)। বলো, আল্লাহ্ই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্র করবেন, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' (২৬)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি যখন আপনার স্বগোত্রীয় পৌত্তলিকদের সামনে আমার বাণী আবৃত্তি করে শোনান, তখন তাদের বলার এবং করার আর কিছুই থাকে না। তবুও তারা স্বভাবগত বক্রতা হেতু এই বলে পাশ কাটাতে চায় যে, ঠিক আছে, তুমি ও তোমার অনুচরেরা সত্যবাদী যদি হয়েই থাকো, তবে আমাদের পৌত্তলিক পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত করে দেখাও তো দেখি। আমরা তাদের মুখেই শুনি, তোমরা সত্যবাদী, না প্রতারক। হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি তাদের এমতো

কুবচনের জবাবে বলে দিন, জীবন ও মৃত্যু সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায়নির্ভর। তিনিই তো তাঁর ইচ্ছামতো জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের বলার কিছু নেই। তবে আমরা একথা অবশ্যই বলবো যে, আল্লাহ্কে অস্বীকার করার মন্দ প্রতিফল একদিন পেতেই হবে। মহাবিচারের দিবসে তিনি সকলকে একত্রিত করবেনই। তারপর সকলকে দিবেন যথোপযুক্ত প্রতিফল— বিশ্বাসীদেরকে বেহেশত এবং দোজখ অবিশ্বাসীদেরকে। আমরা সেই দিবসের সফলতার জন্যই এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়ে অজ্ঞ, অসতর্ক ও প্রত্যাখ্যানপ্রবণ।

এখানে 'আয়াতুনা বাইয়্যিনাত' অর্থ সুস্পষ্ট আয়াত। 'হুজ্জাতাহুম' অর্থ এমন যুক্তি, যা প্রামাণ্য। 'ইউহ্ঈ' অর্থ জীবন দান করেন। 'ইউমীতুকুম' অর্থ তোমাদেরকে মৃত্যু ঘটান। 'ইয়াজ্মাউকুম' অর্থ একত্র করবেন। আর 'ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ' অর্থ কিয়ামত দিবসে। এখানে 'ইলা' শব্দটি অতিরিক্ত। অথবা এখানে 'ইলা' ব্যবহৃত হয়েছে 'লাম' অর্থে। এভাবে কথাটির অর্থ 'কিয়ামতের দিকে' না হয়ে হয়েছে 'কিয়ামত দিবসে'।

'লা রইবা ফীহ্' অর্থ যাতে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচার অবশ্যই সংঘটিত হবে। কেননা আল্লাহ্র অঙ্গীকার অবশ্যবাস্তবায়নব্য। পুনরুত্থান দিবসে তিনি সকলকে পুনর্জীবিত করবেনই। কেননা সকল বিষয়ে তিনি সর্বশক্তিধর। আর প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি অধিকতর সহজও। তাছাড়া পৃথিবীতে পাপ-পুণ্যের সামগ্রিক বিচার হয় না। তাই বুদ্ধি-বিবেচনার দাবিও এই যে, মানুষ তাদের কৃতকর্মের চূড়ান্ত প্রতিফল পাক। আর তা বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব কেবল পরকালে। পৃথিবী হচ্ছে কর্মক্ষেত্র। আর পরকাল হচ্ছে ফলাফল লাভের স্থান। ফলাফল তো দেওয়া হয় কর্ম সমাপনের পরেই।

'ওয়ালা কিন্না আকছারান্ নাসি লা ইয়া'লামূন' অর্থ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। অর্থাৎ আল্লাহ্র শক্তিমত্তা সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ জ্ঞান রাখে না। তাই তারা জীবন যাপন করে অসতর্কভাবে, উদাসীনতাকে আশ্রয় করে।

সূরা জ্বাছিয়া ঃ আয়াত ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

---

www.eelm.weebly.com

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই, যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হইবে ক্ষতিগ্রস্ত,

❑ এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখিবে ভয়ে নতজানু, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার 'আমলনামার প্রতি আহ্‌বান করা হইবে ও বলা হইবে, 'আজ তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।

❑ 'এই আমার লিপি, ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। তোমরা যাহা করিতে তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম।'

❑ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে দাখিল করিবেন স্বীয় রহমতে। ইহাই মহাসাফল্য।

❑ পক্ষান্তরে যাহারা কুফরী করে তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় নাই? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।'

❑ যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি তো সত্য, এবং কিয়ামত— ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, তখন তোমরা বলিয়া থাক, 'আমরা জানি না কিয়ামত কী; আমরা মনে করি ইহা একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত নহি।'

❑ উহাদের মন্দ কর্মগুলি উহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

❑ আর বলা হইবে, 'আজ আমি তোমাদিগকে বিস্মৃত হইব যেমন তোমরা এই দিবসের সাক্ষাতকারকে বিস্মৃত হইয়াছিলে। তোমাদের আবাসস্থল হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।

❑ 'ইহা এইজন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করিয়াছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল।' সুতরাং সেই দিন উহাদিগকে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে না এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হইবে না।

❑ প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক এবং জগতসমূহের প্রতিপালক।

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁহারই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র। যেদিন মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর হে আমার রসুল! আপনি দেখবেন, মহাবিচারের দিবসে সকলেই ভয়ে শংকায় নতজানু হয়ে থাকবে। সকলের সামনে উন্মোচন করা হবে তাদের আমলনামা। বলা হবে, তোমাদের আপনাপন কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে আজ। দ্যাখো, এই হচ্ছে তোমাদের কৃতকর্মের বিবরণবিশিষ্ট পুস্তিকা। এই পুস্তিকা এখন তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে, যদি তোমরা অপরাধী হও। আমি আমার আমল লেখক ফেরেশতাদের মাধ্যমে তোমাদের কৃতকর্মসমূহের কথা পৃথিবীতেই লিপিবদ্ধ করিয়ে রেখেছিলাম।

www.eelm.weebly.com

‘সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত’ অর্থ মিথ্যাশ্রয়ীদেরকে সেদিন প্রেরণ করা হবে দোজখে। ‘জ্বাছিয়াতান’ অর্থ ভয়ে নতজানু হয়ে থাকবে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন বাগবী। অর্থাৎ বিচার চলাকালে অভিযুক্তরা যেমন অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকবে, তেমনি তারা নতজানু হয়ে অপেক্ষা করবে শেষ সিদ্ধান্তের। হজরত আলী বলেছেন, তখন আমি হবো প্রথম ব্যক্তি, যে নতজানু হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করবে। সুরা হজের যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

হজরত সালমান ফারসী বলেছেন, মহাবিচারের দিবসের একটি মুহূর্ত হবে দশবৎসরের সময়পরিসরের সমান। সকলেই তখন নতজানু হয়ে থাকবে। এমনকি হজরত ইব্রাহিম পর্যন্ত ‘হায় আমার কী হবে’ বলে চিৎকার করতে থাকবেন। আরো বলবেন, হে আমার প্রভুপালক! আমি কেবল আমার আত্মার মুক্তির জন্য নিবেদন জানাই।

কোনো কোনো বিদ্বান এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ‘কুল্লু উম্মাতিন জ্বাছিয়াতান’ (প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু) কথাটির ‘জ্বাছিয়াতান’ অর্থ সমবেত হবে। অর্থাৎ সকলেই তখন বিচারস্থলে সমবেত হবে। এরকম অর্থ করা হলে বুঝতে হবে, শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে ‘জ্বাছাওয়াহ্’ থেকে। আর

‘জ্বাছাওয়াহ্’ অর্থ দলবদ্ধ হওয়া। জাযারী তাঁর নেহায়া গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে লোকেরা তাদের আপনাপন নবীর পশ্চাতে দলবদ্ধ হবে। ‘জাওয়াহিদুজ্‌জুহুদ’ গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ও আবদ ইবনে ছানিয়াহ্ সুত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেই দৃশ্য আমার চোখে ভাসছে, যখন তোমরা সমবেত হবে জাহান্নামের পশ্চাতের ‘করম’ নামক এক উচ্চ স্থানে। এরপরে সুফিয়ান পাঠ করলেন এই আয়াত। শায়েখ ইবনে হাজার লিখেছেন, ‘করম’ অর্থ উচ্চ স্থান, যেখানে রসুল স. এর উম্মতগণ সমবেত হবে।

‘ইলা কিতাবিহা’ অর্থ আমলনামার দিকে। অর্থাৎ সকলকে তখন হিসাবের প্রতি মনোযোগী করে তোলা হবে। হজরত আনাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সকলের আমলনামা জমা করা হয় আরশের নিচে। যখন হিসাব গ্রহণের জন্য সকলকে বিচারস্থলে দাঁড় করানো হবে, তখন হঠাৎ এক দমকা হাওয়া এসে আমলনামাগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে সকলের ডান অথবা বাম হাতে এনে ফেলবে। আমলনামাগুলোর প্রথমে লেখা থাকবে ‘আজ তুমিই তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট’। কাজেই পাঠ কোরো তোমার পুস্তিকা।

‘ইন্‌না কুন্‌না নাসতানসিখু’ অর্থ তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করিয়েছিলাম অর্থাৎ আমি এসকল কিছু পৃথিবীতেই লিপিবদ্ধ করিয়েছিলাম আমার আমল লেখক ফেরেশতাদের দ্বারা। কোনো কোনো আলেম ‘নাস্‌তানসিখু’ কথাটির অর্থ করেছেন আমলের বিবরণগুলোর অনুলিপি করিয়েছিলাম। উল্লেখ্য, ওই ফেরেশতারা মানুষের সকলকিছুই উপস্থিত করে আল্লাহ্‌র সমক্ষে। তারপর যেগুলো শাস্তি অথবা পুরস্কারের যোগ্য, সেগুলো ছাড়া অন্যগুলোকে মুছে ফেলা হয়। অর্থাৎ যেসকল বিষয়ে পাপ-পুণ্য কোনোটাই নেই, সে সকল বিষয়কে আমলনামা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দাখিল করবেন তাঁর রহমতে। এটাই মহাসাফল্য (৩০)। পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়নি? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়’ (৩১)। একথার অর্থ— বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ যারা, তাদেরকে আল্লাহ্ প্রবেশ করাবেন জান্নাতে। আর এটাই হচ্ছে সুস্পষ্ট সাফল্য। পক্ষান্তরে যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের কাছে আমার বার্তা তো পৌঁছেই গিয়েছিলো। কিন্তু তখন তো তোমাদের শুভবোধ জাগ্রত হয়নি। তোমরা ছিলে স্বভাবগতভাবে সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণ। তাই ঔদ্ধত্যভরে তোমরা তখন সত্যের আহ্বানকে দিয়েছিলে ফিরিয়ে। সে মহাঅপরাধের সাজা আজ তোমাদেরকে ভোগ করতেই হবে।

এখানে ‘দাখিল করবেন স্বীয় রহমতে’ অর্থ প্রবেশ করাবেন জান্নাতে। আর ‘তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়নি’— এই প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ তো পাঠ করা হয়েছিলোই। তৎসত্ত্বেও তো তোমরা তা বিশ্বাস করোনি।

‘আর তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়’ একথার অর্থ তোমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যান ও অপরাধপ্রবণতা। সারকথা হলো, আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে শাস্তিকবলিত করবেন। যেহেতু অপরাধপ্রবণতা ছিলো তাদের অভ্যাসগত।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— ‘যখন বলা হয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি তো সত্য এবং কিয়ামত, এতে কোনো সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলে থাকো, আমরা জানি না কিয়ামত কী; আমরা মনে করি এটা একটা ধারণামাত্র এবং আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত নই’। একথার অর্থ— আর যখন তোমাদেরকে বলা হতো আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার সত্য, সুতরাং কিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ মাত্রই নেই, তখন তোমরা বিষয়টিকে আমলেই আনতে না। বলতে কিয়ামত আবার কী জিনিস? আমরা তো মনে করি, বিষয়টি একটি কল্পনা মাত্র। সুতরাং কী করে এরকম কল্পনাকে বাস্তব বলে মানি?

www.eelm.weebly.com

এখানে 'ওয়া'দুন' অর্থ প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ কিয়ামতের অঙ্গীকার। 'ওয়া'দুন' শব্দটি ক্রিয়ামূল। এভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় অঙ্গীকৃত। অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিশ্রুত। 'লা রইবা ফীহা' অর্থ এতে কোনো সন্দেহ নেই। 'মাস্ সাআ'ত' অর্থ কিয়ামতের বিষয়ে। আর 'ইন্নাজুন্নু ইল্লা জন্না' অর্থ আমরা মনে করি এটা একটা ধারণা মাত্র। এখানে 'জন্নান' শব্দে তানভীন যুক্ত করা হয়েছে তুচ্ছার্থে। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কিয়ামতের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতো। বলতো, কিয়ামত আবার কী! এই 'জন্' শব্দটি আবার কখনো কখনো জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন 'আল্খশিয়ীনাল্ লাজীনা ইয়াজুন্নুনা আন্নাহুম মুলাকু রব্বাহুম' (বিনয়ীরা একথা মনে রাখে যে, তাদেরকে তাদের প্রভুপালকের কাছে ফিরে যেতে হবেই)। আবার কখনো কখনো এর অর্থ হয় 'সন্দেহ'। যেমন এখানে হয়েছে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'তাদের মন্দ কর্মগুলি তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে (৩৩)। আর বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হবো যেমন তোমরা এই দিবসের সাক্ষাতকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না (৩৪)। এটা এজন্য যে, তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করেছিলে, পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারণা করেছিলো। সুতরাং সেই দিন তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হবে না' (৩৫)। একথার অর্থ— আর মহাবিচারের দিবসে তাদের যাবতীয় কুকর্মের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে শাস্তি সম্পর্কে তারা ঠাট্টা-তামাশা করতো সেই শাস্তিই তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। তখন আমি তাদেরকে বলবো, পৃথিবীতে তোমরা এই মহাবিচারদিবসের কথা শোনা সত্ত্বেও তা বিশ্বাস করোনি, তাই আমিও আজ তোমাদের মুক্তির প্রসঙ্গ মনে রাখবো না। আরো শোনো, এখন থেকে তোমাদের আবাসস্থলরূপে নির্ধারণ করা হলো চিরকালীন দোজখ এবং সেখানে তোমাদেরকে

সাহায্য করবে, এমন কেউই নেই। স্মরণে রেখো, তোমাদের এমতো সহায়হীন হওয়ার কারণ এই যে, তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিলে। সুতরাং তোমাদেরকে আর কখনো দোজখের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হবে না এবং আল্লাহ্র পরিতোষ প্রার্থনার কোনো সুযোগও তোমাদেরকে দেওয়া হবে না।

এখানে 'আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হবো' অর্থ আজ আমি তোমাদেরকে শাস্তিকবলিত করে ছেড়ে দেবো। আল্লাহ্পাক সর্বজ্ঞ। তাঁর ভুল হওয়া সম্ভব নয়। তাই এখানে ভুলের অর্থ করা হয়েছে— 'পরিত্যাগ বা প্রত্যাখ্যান'। 'তোমরা এই সাক্ষাতকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে' অর্থ তোমরা আজকের এই মহাবিচারের জন্য কোনো প্রকার পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করোনি। আর 'তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না' অর্থ এমন সাহায্যকারী তোমরা তখন পাবে না, যারা তোমাদেরকে দোজখ থেকে মুক্ত করতে পারে।

'আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করেছিলে' অর্থ আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করেই অবজ্ঞাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলে। আর এখানে 'ওয়া লা হুম ইউস্তা'তাবূন' অর্থ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হবে না। এখানে 'উতবা' অর্থ সন্তুষ্টি, পরিতুষ্টি। 'কামুস' অভিধানে এরকম বলা হয়েছে। আর 'ইসতা'তাব' অর্থ পরিতুষ্টি প্রার্থনা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তাদেরকে তখন এরকম বলা হবে না যে, তোমরা ক্ষমাপ্রার্থনা করে আল্লাহ্র পরিতুষ্টি চেয়ে নাও। কেননা তখন তো ক্ষমাপ্রদর্শনের সময় নয়। তখন কেবল প্রতিফল প্রদানের সময়।

'নেহায়া' প্রণেতা লিখেছেন 'উত্বা' অর্থ পাপ ও অশ্লীলতা থেকে ফিরে আসা, তওবা করা। এমতো অর্থের ভিত্তিতে বাগবী কথাটির মর্মার্থ করেছেন— তাদেরকে তখন এরকম বলা হবে না যে, তোমরা এখন আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে ফিরে এসো। আর এখানে 'ইয়াসতা'তাবূন' এর পূর্বে 'হুম' (তাদের) সর্বনামটি বসানো হয়েছে বৈশিষ্ট্য প্রকাশার্থে। অর্থাৎ আল্লাহ্র অসন্তোষ দূর করার জন্য তখন তাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিকার চাওয়া হবে না। উল্লেখ্য, বিশ্বাসীগণের অবস্থা হবে এর বিপরীত।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক এবং জগত সমূহের প্রতিপালক (৩৬)। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'(৩৭)।

এখানে 'ফালিল্লাহিল্ হাম্দ' অর্থ প্রশংসা আল্লাহ্রই। যিনি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন। তাদেরকে দান করবেন জান্নাত ও জাহান্নাম। আর আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও জগতসমূহের প্রভুপালক বলে

এখানে একথাই বোঝানো হয়েছে যে, এই মহাসৃষ্টি টিকে রয়েছে কেবল তাঁরই দয়ার্দ্র প্রতিপালনে। কথাটির মধ্যে তাঁর অপার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিষয়টিও প্রকাশ পেয়েছে পুরোপুরি। কেননা সর্বশক্তিধর ও সর্বময় কর্তৃত্ব যার নেই, তিনি কখনো মহাপ্রভুপালয়িতা হতে পারেন না। সেকারণেই পরক্ষণে বলা হয়েছে তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরব-গরিমার কথা এবং শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়'। অর্থাৎ তিনি এমন আনুরূপ্যবিহীনরূপে পরাক্রমময় যে, তাঁর উপরে প্রভাব বিস্তারের অধিকার ও সামর্থ্য কারো নেই এবং তিনি এমন প্রজ্ঞাময় যে, তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত হয় এমন বিজ্ঞতামণ্ডিত, যার সমতুল হবার যোগ্যতা কারো নেই।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, শ্রেষ্ঠত্ব আমার উত্তরীয় এবং গৌরব-গরিমা আমার পরিধেয়। এ দু'টোর কোনো একটিকে যে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করবে, আমি তাকে দোজখে প্রবেশ করাবো।

সুরা জ্বাছিয়ার তাফসীর শেষ হলো আজ ২২ শে রবিউস্সানি, হিজরী ১২০৮ হিজরী সনে। আল্হাম্দুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি আ'লা খইরি খলক্বিহী মুহাম্মদিঁউ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহী আজ্মাঈন। আমিন।

ষষ্ঠবিংশতিতম পারা

সূরা আহ্ক্বাফ

মক্কায় অবতীর্ণ এই সূরায় রয়েছে ৪টি রুকু এবং ৩৫টি আয়াত।

সূরা আহ্ক্বাফ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

❑ হা-মীম।
❑ এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ;

তাফসীরে মাযহারী/৫৬১
❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু কাফিররা, উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।
❑ বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহাদের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ইহারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও অথবা
আকাশমণ্ডলীতে উহাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোন
কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকিলে তাহা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'
❑ সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও উহাকে সাড়া দিবে না? এবং এইগুলি উহাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নহে।
❑ যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হইবে তখন ঐগুলি হইবে উহাদের শত্রু এবং ঐগুলি উহাদের ইবাদত অস্বীকার করিবে।
❑ যখন উহাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় এবং উহাদের নিকট সত্য উপস্থিত হয়, তখন কাফিররা বলে, 'ইহা তো সুস্পষ্ট জাদু।'
❑ তবে কি উহারা বলে যে, 'সে ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে।' বল, 'যদি আমি ইহা উদ্ভাবন করিয়া থাকি, তবে তোমরা তো আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে—'হা-মীম'। এই মহাগ্রন্থ সেই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাধিকারী। যে আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি, সেই আমিই আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়স্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছি যথাযথভাবে। আমার অভিপ্রায়ানুসারে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এগুলো স্থায়ী থাকবে। তারপর মহাপ্রলয়কালে ধ্বংস হয়ে যাবে আমার অভিপ্রায়ানুযায়ীই। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে এসব কথা বলে বিশ্বাসী জীবনকে বরণ করে নিতে বলা হয়। এই মর্মে সতর্ক করা হয় যে, বিশ্বাসী না হলে তারা হয়ে পড়বে আমার রোষ ও শাস্তিকবলিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা সতর্ক হয় না। অবলীলায় হয়ে যায় সত্যবিমুখ।

এখানে 'তান্‌যীল' অর্থ অবতীর্ণ। আর 'আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু আমি সৃষ্টি করেছি যথাযথভাবে' অর্থ আকাশ-পৃথিবী ও এতদূভয়স্থিত সকল কিছুকে আমি উদ্দেশ্যহীনরূপে সৃষ্টি করিনি। বরং এগুলোকে আমি করেছি আমার সত্তা-নাম-গুণবত্তা ও কার্যকলাপের নিদর্শন। এই মহা সৃষ্টি নিরবচ্ছিন্নরূপে একথাই প্রকাশ করছে যে, এগুলোর স্রষ্টা নিশ্চয়ই কেউ একজন রয়েছেন, যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর ও মমতাপরবশ। সুতরাং মানুষ যেনো এসকল কিছু দেখে, বুঝে ও চিন্তা ভাবনা করে, তাঁকেই একমাত্র উপাস্য ও প্রভুপ্রতিপালক বলে মেনে নেয়। একথাও স্বীকার করে যে, এই পৃথিবী, এই আকাশ চিরদিন থাকবে না। একদিন অবশ্যই এগিয়ে আসবে মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবস। সেদিন যথোপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া হবে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীকে। জ্ঞান ও ন্যায়বিচার তো এরকমই সাক্ষ্য দেয়। দিতে থাকে।

'ওয়াল্ লাজীনা কাফারূ আ'ম্‌মা উনজিরূ' অর্থ তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এখানে 'আ'ম্‌মা' এর 'মা' হচ্ছে ক্রিয়ামূল। অর্থাৎ সতর্ক করা হয়েছে। অথবা এখানকার 'মা' হচ্ছে যোজক অব্যয়। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের শাস্তি, যা থেকে অবিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

মু'রিদ্বূন' অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেয়। অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা করে দেখে না যে, কিয়ামত দিবসের আগমন অসম্ভব কিছু নয়। বরং তা অপরিহার্য। কেননা কিয়ামত সংঘটিত না হলে মহাবিচার তো অনুষ্ঠিত হবে না। আর বিচার না হলে মানুষের পৃথিবীর কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত প্রতিফলও তো দেওয়া যাবে না। প্রতিষ্ঠিত হবে না ন্যায়। এসকল কিছুর চিন্তা তারা করতেই চায় না। উপরন্তু বিনা বিবেচনায়, বিনা প্রমাণে পূজা করতে থাকে পুতুলের। আর এভাবে হয়ে যায় শাস্তির উপযোগী।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাকে ডাকো, তাদের কথা ভেবে দেখেছো কী? এরা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও, অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে কী? পূর্ববর্তী কোনো কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান থাকলে, তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরাই বলো, যে স্রষ্টা নয়, সে কি কখনো উপাস্য হতে পারে? তোমরা যে সকল পুতুলের পূজো করো, তারা কবে কোথায় কখন কী সৃষ্টি করেছে। পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টিতে তারা কি কখনো অংশগ্রহণ করেছিলো? না কোনো প্রকার সৃজনকর্মে তাদের অংশগ্রহণের কথা কল্পনা করা যায়? যা অপ্রান, তা কি কখনো মানুষের উপকার অথবা ক্ষতি করতে পারে? নিশ্চয় পারে না। আর তা-ই যদি না পারে, তবে তারা অন্যের উপাসনা গ্রহণের যোগ্যই বা হয় কী করে? অথচ তোমরা তাদেরই উপাসনা করে চলেছো বিনা বিচারে, বিনা প্রমাণে। কেনো? পূর্ববর্তী কোনো আসমানী কিতাব, অথবা যথাযথপরম্পরাসূত্রে তোমাদের পৌত্তলিকতার স্বপক্ষে কি তোমরা কোনো প্রমাণ দেখাতে পারবে? যদি পারো, তবে দেখাও।

এখানে 'মা জা খলাক্বূ' অর্থ কী সৃষ্টি করেছে? এখানকার 'মা' জিজ্ঞাসামূলক এবং 'জা' হচ্ছে যোজক এবং এখানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে 'আল্‌লাজী (যা) অর্থে। অর্থাৎ কোন সে বস্তু, যা তারা সৃষ্টি করেছে? 'মিনাল আরদ্বি' অর্থ পৃথিবীতে। 'ফীস্ সামাওয়াত' অর্থ আকাশে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— পৃথিবী ও আকাশের কোনো সৃজনকর্মে তোমাদের ওই প্রতিমাগুলো অংশগ্রহণ করেছিলো কি? না এরকম করা তাদের পক্ষে সম্ভব? তাহলে বলো, কোন যুক্তিতে তোমরা তাদের পূজো অর্চনা করো? উল্লেখ্য, অংশীবাদীরা মনে করে পৃথিবীর ঘটনা-দুর্ঘটনা আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভাবেই ঘটে থাকে। এ ধারণাটিকেও এখানে খণ্ডন করা হয়েছে আলোচ্য বক্তব্যটির মাধ্যমে।

'পূর্ববর্তী কোনো কিতাব' অর্থ পূর্বের কোনো আকাশীগ্রন্থ।'আছারতিম্ মিন্ ই'ল্‌ম' অর্থ পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান। রসুল স. এর উক্তিরূপে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, 'আছারাতিন্' অর্থ লিপিবদ্ধকৃত জ্ঞান। মুজাহিদ ও ইকরামা শব্দটির অর্থ করেছেন— অনুলিপিকৃত বিবরণ। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ— বিশেষ। কালাবী বলেছেন— অবশিষ্টাংশ। 'কামুস' অভিধানে রয়েছে, 'আছারা' অর্থ কোনো কিছুর বাকী অংশ। আর, এখানে 'ই'লম' (জ্ঞান) অর্থ নবীগণের জ্ঞান, যা তাঁরা লাভ করেন প্রত্যাদেশবলে।

'ইন্‌কুন্‌তুম সদিক্বীন' অর্থ যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদেরকে মূর্তিপূজা করতে বলেছেন, তোমাদের এই দাবি যদি সত্য হয়, তবে তার প্রমাণ দেখাও।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তাকে সাড়া দিবে না? এবং এগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয় (৫)। যখন কিয়ামতের দিনে মানুষকে একত্র করা হবে, তখন ওইগুলি হবে তাদের শত্রু এবং ওইগুলি তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে'(৬)। একথার অর্থ— ওই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ঠ আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন জড়প্রতিমার পূজা করে, যারা নিঃসাড়। প্রার্থনাকারীরা কিয়ামত

www.eelm.weebly.com

পর্যন্ত ডাকলেও তারা সাড়া দিতে পারবে না। বরং কেউ তাদেরকে ডাকে, কি না ডাকে, তা-ও তারা বুঝবার সামর্থ্য রাখে না। মহাবিচারের দিবসে ওই সকল জড়প্রতিমাই যখন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রাণপ্রাপ্ত হবে, তখন তারাও শত্রু হয়ে যাবে তাদের পূজারীদের। তাদের উপাসনাকেও করে বসবে অস্বীকার।

এখানে 'সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কেউ-ই নেই। 'এইগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়' অর্থ জড়প্রতিমাগুলি তাদের উপাসকদের প্রার্থনা-অপ্রার্থনা সম্পর্কে জানেই না। আর হজরত ঈসা, হজরত উযায়ের এবং ফেরেশতাদেরকে যে তারা আল্লাহ্র পুত্র-পুত্রী জ্ঞানে ডাকে, তাঁরাও তাদের প্রার্থনা সম্পর্কে জানেন না। কেননা তাঁরা পুণ্যবান। তাই সতত আল্লাহ্ অভিমুখী থাকাই তাদের কাজ। কেউ তাঁদের উপাসনা করবে, তা তো তাঁরা চিন্তাই করতে পারেন না। আর 'ওইগুলি হবে তাদের শত্রু এবং ওইগুলি তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে' অর্থ তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলো, অথবা হজরত ঈসা, হজরত উযায়ের এবং ফেরেশতারা মহাবিচারের দিনে হয়ে যাবে তাদের বিরুদ্ধপক্ষ। বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমরা এদের প্রতি অপরিতুষ্ট। এরা আসলে আমাদের উপাসনা করতো না। উপাসনা করতো তাদের অপপ্রবৃত্তিজাত কামনা বাসনার। এভাবে তাদের উপাস্যরা পৃথিবীতে যেমন তাদের কোনো কাজে আসে না, তেমনি কাজে আসবে না পরকালেও। বরং পরকালে তারা সরাসরি হবে তাদের ক্ষতির কারণ। সুতরাং অংশীবাদীদের চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত হতে পারে আর কে? কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে বক্তব্যার্থটি হবে এরকম— মহাবিচারের দিবসে মূর্তিপূজারীরাই তাদের অপকর্মের কথা অস্বীকার করে বসবে। বলবে, শপথ সেই শাশ্বত উপাস্যের, যিনি আমাদের একমাত্র প্রভুপালনকর্তা, আমরা কখনোই মূর্তিপূজক ছিলাম না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয়, এবং তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হয়, তখন কাফেরেরা
বলে, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু (৭)। তবে কি তারা বলে যে, সে এটা উদ্ভাবন করেছে। বলো, যদি আমি এটা উদ্ভাবন করে থাকি, তবে তোমরা তো আল্লাহ্র শাস্তি থেকে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায়

লিপ্ত আছো, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (৮)। একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকদের কাছে যখন কোরআনের স্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, তখন তারা বলে, এতো দেখছি স্পষ্ট যাদু। আরো বলে, মোহাম্মদই এসকল বাণীর রচয়িতা। হে আমার রসুল! তাদের এমতো মিথ্যাবচনের জবাব দিন এভাবে— এরকম করলে আমি তো আল্লাহ্র রোষকবলিত হবো। হবো শাস্তির উপযুক্ত। সে শাস্তি থেকে তোমরা তো আমাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তাই তিনি নিশ্চয় শোনেন ও জানেন তোমরা তাঁর সম্পর্কে কী বলো। তিনিই তোমাদের ও আমার মধ্যে প্রকৃত সাক্ষী। আর তিনি ক্ষমাশীল এবং পরম দয়াপরবশও।

এখানে 'লিলহাক্বক্বি' অর্থ সত্যের জন্য, সত্যকে। অর্থাৎ কোরআনের আয়াত। 'কাফারূ' (কাফেরেরা) এর সঙ্গে শব্দটি উল্লেখ করায় এখানে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, কোরআনের আয়াত অভ্রান্ত। আর যারা একে অস্বীকার করে, তারা নিঃসন্দেহে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।'লাম্মা জ্বাআহুম হাজা সিহ্রুম মুবীন' অর্থ তারা বলে, এতো সুস্পষ্ট যাদু। অর্থাৎ কোনো রকম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তারা এরকম বলে দেয়। 'তবে কি তারা বলে যে, সে এটা উদ্ভাবন করেছে' বাক্যটি এখানে প্রশ্নবোধক ও বিস্ময়জ্ঞাপক। 'তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছো, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত' অর্থ— আল্লাহ্ই জানেন কে সত্যবাদী— আমি, না তোমরা? 'সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট' অর্থ নিশ্চয় জেনো, তোমাদের মিথ্যাচারিতার জন্য তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। কেননা তিনি এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জানেন। আর 'তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' অর্থ তিনি মার্জনাশীল ও পরম দয়ার্দ্র বলেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের এমতো গর্হিত অপরাধের জন্য তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি প্রদান করেন না।

সূরা আহ্ক্বাফ ঃ আয়াত ৯, ১০

www.eelm.weebly.com

তাফসীরে মাযহারী/৫৬৫

❑ বল, 'আমি কোন নূতন রাসূল নহি। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হইবে; আমি আমার প্রতি যাহা ওহী করা হয় কেবল তাহারই অনুসরণ করি। আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র'।

❑ বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি এই কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে আর তোমরা ইহাতে অবিশ্বাস কর, অথচ বনী ইসরাঈলের একজন ইহার অনুরূপ কিতাব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়াছে এবং ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে; আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমাদের পরিণাম কি হইবে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিমদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে একথাও বলুন যে, আমি তো নিজেকে প্রথম পয়গম্বর বলে দাবি করছি না। ইতোপূর্বেও তো অনেক পয়গম্বর এসেছিলেন। তারা যেমন সত্যাধিষ্ঠিত ছিলেন, আমিও তেমনই। তাদের মতো আমার দাবির স্বপক্ষেও রয়েছে অলৌকিক নিদর্শন। সুতরাং তোমরা আমাকে পয়গাম্বর বলে স্বীকার করবে না কেন? আল্লাহ্‌ই তোমাদের ও আমার মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত দাতা। আমাকে একথাও বলা হয়নি যে, আমাদের ব্যাপারে অবশেষে কী করা হবে। আমি তো কেবল অনুসরণ করি আমার প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশাবলীর । আর আমিতো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ভিন্ন অন্য কেউ নই।

'আমি কোনো নতুন রসুল নই'কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, আমি একক কোনো পয়গম্বর নই যে, তোমাদের ইচ্ছা ও দাবিসমূহ পূর্ণ করে দিবো, যা আগের যুগের পয়গম্বগণ করতেন, বা করতে পারতেন। আর 'আমি জানিনা, আমার ও তোমাদের মধ্যে কী করা হবে' একথার অর্থ কোনো কোনো আলেম করেছেন এভাবে— আমি জানি না, মহাবিচারের দিনে তোমাদের সঙ্গে এবং আমার সঙ্গে কেমন আচরণ করা হবে। উল্লেখ্য, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা খুবই খুশী হয়েছিলো। বলেছিলো, লাত ও উজ্জার শপথ! আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের ও মোহাম্মদের মর্যাদা একই রকমের। এই বাণী যদি তার স্বরচিত না হতো, তবে আল্লাহ্ তার শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতা সম্পর্কে জানিয়ে দিতেন। তাদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় 'যাতে আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের অনবধানতা মার্জনা করেন, আপনার প্রতি তার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং আপনাকে চালিত করেন সরল পথে'। তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আপনার কল্যাণ হোক। আমরা তো জানলাম, আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করবেন। কিন্তু একথা তো জানতে পারলাম না যে, আমাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করা হবে। তখন অবতীর্ণ হলো 'যাতে তিনি বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান, যার পাদদেশের রয়েছে জলবতী নদী। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে এবং যাতে মোচন করেন তাদের পাপ। এটাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য'।

তাফসীরে মাযহারী/৫৬৬

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও ইকরামা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির পূর্বে। পরে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে যখন তাঁর অগ্রপশ্চাতের সকল অনবধানতাকে মার্জনা করার সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন এই আয়াতটি রহিত হয়ে যায়। আমার কাছে কিন্তু এই অভিমতটি সঠিক মনে হয় না। কেননা মক্কা-মদীনা উভয় স্থানে অবতীর্ণ আয়াতসমূহে বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা এবং অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির অঙ্গীকার করা হয়েছে। যেমন সর্বপ্রথমে নিকটাত্মীয়দেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানোর যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো, সেখানেও স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছিলো যে, ইমান না আনলে শাস্তি অনিবার্য। আর ইমান যারা আনবে, তারা হবে ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তামুক্ত এবং অবশেষে লাভ করবে জান্নাত। যেমন 'আর এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে আরবী ভাষায়, যা স্বেচ্ছাচারীদেরকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে দেয় শুভসংবাদ, যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্। অতঃপর এতে অবিচল থাকে, তাদের কোনো

www.eelm.weebly.com

ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী'। আর এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র রসুল বিশ্বাসীদের শুভপরিণাম এবং অবিশ্বাসীদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে জানবেন না। আল্লাহ্‌ তাঁর কিতাবে বিষয়টি উল্লেখ করবেন না, তা-ই ভাবা যেতে পারে কীভাবে? এরকম হলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই বা তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ছাড়তে যাবে কোন্‌ দুঃখে? সত্যধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দেওয়ার দশ বৎসর পরে যদি রসুল স. ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরবর্গের শুভপরিণতির কথা জানানো হয়, তৎসঙ্গে জানানো হয় অবিশ্বাসীদের অপপরিণতির কথা, তবে বিষয়টি বিসদৃশ, বিতর্কিত ও বিলম্বিত হয়ে যায় নাকি? তাই বর্ণিত মন্তব্যটি অঠিক হওয়াই সমীচীন।

একটি সন্দেহ ঃ খারেজা ইবনে জায়েদ থেকে এবং স্বসূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, একজন আনসারী রমনী হজরত উম্মে আলা বলেছেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আসেন, তখন আনসারগণ লটারী করে ঠিক করেন যে, তাঁরা কে কাকে আশ্রয় দিবেন। আমার ভাগে পড়লেন ওসমান ইবনে মাজুন। অর্থাৎ আমি হলাম তাঁর আশ্রয়দাত্রী। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তাঁর অনেক সেবা শুশ্রূষা করলাম। কিছুকাল পরেই তিনি পরলোকগমন করলেন। সংবাদ শুনে উপস্থিত হলেন রসুল স. স্বয়ং। আমি আড়ালে গিয়ে ওসমানের মরদেহকে লক্ষ্য করে বললাম, আবু সায়িব! আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্‌ আপনাকে মর্যাদায়িত করেছেন। রসুল স. বললেন, তুমি একথা কী করে জানলে? আমি বললাম, তাই তো। তিনি স. বললেন, তার প্রভুপালক তাকে ডেকে নিয়েছেন। আমি তার কল্যাণ আশা রাখি। আমি তো আল্লাহ্‌র রসুল হওয়া সত্ত্বেও একথা জানি না যে, আমার সঙ্গে কী আচরণ করা হবে? হজরত উম্মে আলা আরো বলেছেন, এরপর থেকে আমি আর কারো সম্পর্কে এরকম নিশ্চিতার্থক মন্তব্য করতাম না। কিছু দিন পর আমি স্বপ্নে

দেখলাম, ওসমান ইবনে মাজুনের পাশ দিয়ে একটি ঝর্ণাধারা বয়ে চলেছে। রসুল স.কে একথা জানালে তিনি মন্তব্য করলেন, ওটা হচ্ছে তার পুণ্যকর্ম। এই হাদিসটি আলোচ্য আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ কার সঙ্গে কী আচরণ করবেন তা কেউই জানে না। 'এমনকি আল্লাহ্‌র রসুলও নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত নন' যদি এরকম না হয়, তবে বর্ণিত হাদিসটির মর্মার্থ কী হবে?

সন্দেহভঞ্জন ঃ আমি বলি, হাদিসটির মর্মার্থ এরকম— কোনো নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির মুক্তি অথবা শাস্তির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ঠিক নয়। কেননা এতে করে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার দাবি করা হয়। অথচ সত্তাগতভাবে অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র। তবে কোনো ব্যক্তির বাহ্যিক পূণ্যকর্ম দৃষ্টে তার সম্পর্কে কল্যাণের আশা করা যেতে পারে। আর রসুল স. এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হবে এরকম— আমি আল্লাহ্‌র রসুল হওয়া সত্ত্বেও এবং আল্লাহ্‌ আমাকে অতীত-ভবিষ্যতের জ্ঞান দান করা সত্ত্বেও আমি সঠিক ভাবে জানি না যে, কার কোন কাজের কী প্রতিদান কখন কীভাবে এবং কী পরিমাণে দেওয়া হবে। তাহলে তুমি আবু সায়িব সম্পর্কে এরকম নিশ্চিতার্থক মন্তব্য করলে কেনো?

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার আলোচ্য বক্তব্যটির ব্যাখ্যা এভাবেও করেছেন যে— ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্‌ তোমাদের ও আমার বিষয়ে কখন কীরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, তার বিস্তারিত বৃত্তান্ত আমি জানি না। কেননা সত্তাগতভাবে আমি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা নই। কিন্তু এমতো ব্যাখ্যা আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়। কেননা এখানে বক্তব্যের গতি-প্রকৃতি একথাই বলে দিতে চায় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা রসুল স.কে তাদের স্বধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতো। লোভ দেখাতো ধন-সম্পদের, কর্তৃত্বের এবং সুন্দরী ললনার। আবার কখনো প্রদর্শন করতো হুমকি। নির্যাতনও চালাতো বিভিন্নভাবে। তৎসত্ত্বেও রসুল স.কে তারা সত্যধর্ম ইসলাম থেকে একটুও টলাতে পারেনি। তিনি বারংবার তাদেরকে একথাই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমাদের কাছে কোনো কিছুরই প্রত্যাশী আমি নই। মঙ্গলামঙ্গলের নির্ধারয়িতা কেবলই আল্লাহ্‌। তিনি যেমন চাইবেন, তেমনই হবে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি জানি না, আমার ও তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পরিতোষ ও রোষ হবে কতোটা তীব্র। আমরা কে কতোটা হবো কৃতকার্য, অথবা অকৃতকার্য! আর আমি তো তোমাদের প্রস্তাবানুগত হতে পারিই না। কেননা আমি আল্লাহ্‌র সত্য রসুল।

'আমি আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, কেবল তারই অনুসরণ করি' কথাটির অর্থ— আমি তো কোরআনের বিধানানুসারেই চলবো। এই কোরআনকে এক মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ করবো না। বায়যাবী লিখেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এমন কিছু অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো, যে সম্পর্কে রসুল স.কে তখনো জানানো হয়নি। এই আয়াত তাদের ওই জিজ্ঞাসারই জবাব। আবার সাহাবীগণের নিবেদনের প্রেক্ষিতেও আয়াতাংশটি অবতীর্ণ হয়ে থাকতে পারে।

অর্থাৎ তাঁরা কাফেরদের অত্যাচার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে যখন রসুল স. এর কাছে এর প্রতিকার কামনা করলেন, আল্লাহ্‌ তখন তাঁর রসুলকে বলতে বললেন— 'আমি আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করা হয়, কেবল তারই অনুসরণ করি'। সুতরাং তোমরা

www.eelm.weebly.com

প্রত্যাদেশের আশায় ও অপেক্ষায় থাকো। দেখো, আল্লাহ্ কীভাবে এর বিহিত করেন, অথবা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে কী নির্দেশ দেন। বাগবী এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন।

কোনো কোনো বিদ্বজ্জন আবার কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি জানি না পৃথিবীতে আমার ও তোমাদের মধ্যে কী আচরণ করা হবে। তাঁরা বলেন, কথাটির সঙ্গে পরকালের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা পরকালে রসুল স. যে সর্বোচ্চ জান্নাতের অধিকারী হবেন এবং তাঁর শত্রুরা যে দোজখবাসী হবে, সেকথা তো সকলেরই জানা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কাবাসীদের অত্যাচারে যখন সাহাবীগণ অতিষ্ঠ হয়ে গেলেন, তখন রসুল স. এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন খেজুর গাছ বিশিষ্ট এক সমতল ভূখণ্ড। তিনি ওই ভূখণ্ডেই তাঁর নতুন আবাস গড়েছেন। সাহাবীগণকে তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা জানালেন। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি সেখানে গমন করবেন কবে? রসুল স. নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। তখনই অবতীর্ণ হলো 'আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে'।

আবার কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বক্তব্যটিকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে— আমি অবগত নই, এ পৃথিবীতে আমার অবস্থা পূর্ববর্তী যুগের কোনো নবীর মতো হবে কিনা। যেমন নবী ইব্রাহিমকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিলো। হে বিশ্বাসবানেরা! আমি একথাও জানি না যে, তোমাদেরকে আমার সঙ্গে দেশত্যাগ করতে হবে কিনা, না আমার সঙ্গে তোমাদেরকেও হত্যা করা হবে। আর হে অবিশ্বাসীরা! তোমাদের বিরুদ্ধেই বা অবলম্বন করা হবে কী ব্যবস্থা। জানি না, অতীত যুগের অবাধ্যদের মতো তোমাদের পরিণতি হবে কি না। যেমন নবী লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়কে প্রস্তরবৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছিলো, ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে দেওয়া হয়েছিলো সলিল সমাধি। কিংবা কারুনকে করা হয়েছিলো ভূপ্রোথিত। এরপর আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে অবতীর্ণ করলেন 'তিনিই তাঁর রসুলকে হেদায়েত ও সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে অন্য সকল ধর্মের উপরে আপনার ধর্ম বিজয়ী হয়'। আর মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে জানালেন 'অথচ আল্লাহ্ কখনোই তাদের উপর আযাব নাজিল করবেন না, যতোক্ষণ আপনি অবস্থান করবেন তাদের মধ্যে। আর তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকলে আল্লাহ্ও তাদেরকে শাস্তি দিবেন না'। এরকম ব্যাখ্যাই করেছেন সুদ্দী।

'আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র' অর্থ— আমি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা বলে যেমন দাবি করি না, তেমনি আমাকে এমতো অধিকার দেওয়া হয়নি যে, আমি তোমাদেরকে ইমান আনার জন্য জবরদস্তি করবো। বরং ইমান না আনলে যে আল্লাহ্র বিরাগভাজন হতে হবে এবং শাস্তি ভোগ করতে হবে অনন্তকাল ধরে, এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়াই আমার কাজ।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, যদি এই কোরআন আল্লাহ্র নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, আর তোমরা এতে অবিশ্বাস করো, উপরন্তু বনী ইসরাইলের একজন এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এতে বিশ্বাসস্থাপন করলো; আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো, তাহলে তোমাদের পরিণাম কী হবে? নিশ্চয় আল্লাহ্ জালেমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না'।

এখানে 'বনী ইসরাইলের একজন' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ইবনে হারেছকে। তিনি ছিলেন নবী ইব্রাহিম—নবী ইসহাক—নবী ইয়াকুব—নবী ইউসুফ— এই বংশপরম্পরাভূত।

হজরত আনাস থেকে বোখারী, বায়হাকী; হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামের জনৈক পুত্র থেকে মোহাম্মদ ইবনে সালাম; হজরত মুসা ইবনে উক্বা এবং জুহুরী সূত্রে বায়হাকী এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেছেন, তওরাত পড়ার কারণে আমি রসুল স. এর নাম, গুণাবলী ও আকার আকৃতি সম্পর্কে জানতাম। তিনি মদীনায় এসে বনী আমর ইবনে আউফের মহল্লায় অবস্থান গ্রহণ করলেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণা করলেন। আমি তখন চড়েছিলাম একটি খেজুর গাছে। আর ওই গাছের নিচে বসে ছিলেন আমার ফুফু খালেদা বিনতে হারেছ। আমি রসুল স. এর আগমন বার্তা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে 'আল্লাহু আকবর' উচ্চারণ করলাম। ফুফু বললেন, মনে হচ্ছে নবী মুসা ইবনে ইমরানের আগমনবার্তা শুনতে পেলেও তুমি এরকম সোচ্ছ্বাসে আনন্দ প্রকাশ করতে না। আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! ইনি মুসা ইবনে ইমরানের ভ্রাতা এবং একই ধর্মের অনুসারী। মুসা যা নিয়ে এসেছিলেন, ইনিও তাই নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। ফুফু বললেন, এতো কেবল জনশ্রুতি। এরপর আমি রসুল স. এর মজলিশে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তাঁকে দেখা মাত্র বুঝতে পারলাম যে, এই পবিত্র মুখাবয়ব কোনো মিথ্যাশ্রয়ীর হতে পারে না। তিনি স. নসিহত করলেন, হে জনতা! অন্নহীনদের অন্নদান করো, সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটাও। স্বজন বন্ধন অটুট রাখো এবং রাতে যখন সকলে নিদ্রিত থাকে, তখন শয্যাত্যাগ করে নামাজে দণ্ডায়মান হও এবং এভাবে প্রবেশ করো জান্নাতে। বললাম, আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করবো, যার জবাব নবী ছাড়া অন্য কেউ জানে না। প্রথম প্রশ্ন — কিয়ামতের সর্বপ্রথম নিদর্শন কী? দ্বিতীয় প্রশ্ন— জান্নাতবাসীদেরকে সর্বপ্রথম কী খেতে দেওয়া হবে? আর তৃতীয় প্রশ্ন— সন্তানেরা মাতা-পিতার আকৃতি পায় কেনো? আরও একটি কথা জানতে চাই আমি। তা হচ্ছে— চাঁদের মধ্যে কলংক দৃষ্ট হয় কেনো? তিনি স. বললেন, তোমার প্রশ্নের জবাব

www.eelm.weebly.com

এইমাত্র জিবরাইল আমাকে বলে গেলেন। আমি বললাম, তিনি তো ইহুদীদের দুশমন। তিনি স. বললেন, কিয়ামতের সর্বপ্রথম নিদর্শন হবে একটি আগুন, যা মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। জান্নাতবাসীদেরকে

প্রথমে খেতে দেওয়া হবে মাছের ভূনা কলিজা। পুরুষের শুক্র অধিকতর প্রবল হলে সন্তান হয় পিতার মতো এবং মাতার মতো হয় নারীর বীর্য অধিকতর প্রভাবশালী হলে। আর চাঁদের কালোদাগের কারণ ঘটেছে তাকে নিস্প্রভ করে দেওয়ার কারণে। প্রথমে চাঁদও ছিলো সূর্যের মতো আলোকদীপ্ত। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন 'আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি; তারপর নিস্প্রভ করে দিয়েছি রাতের নিদর্শনটিকে'। আমি একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করলাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্র রসুল। এরপর আমি স্বগৃহে ফিরে এসে গৃহবাসীদেরকে ইসলাম গ্রহণের পরামর্শ দিলাম। ইসলাম গ্রহণ করলো পরিবারের সবাই। তবে বিষয়টি থাকলো গোপন। পুনরায় রসুল স. এর কাছে ফিরে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! ইহুদীরা জানে যে আমি তাদের ধর্মীয় নেতা। কিন্তু তারা মিথ্যাচারাসক্ত। তাই প্রথমেই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ প্রচার করতে চাই না। এ সংবাদ এখনই জানাজানি হয়ে গেলে তারা আমার নামে অনেক অলীক অপবাদ প্রচার করবে। তাই আমি চাই, আপনি আমাকে এখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখুন। তারপর তাদের সকলকে ডেকে এনে আমার সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলুন। তিনি স. এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। আমি আত্মগোপন করে রইলাম পাশের প্রকোষ্ঠে। তিনি স. তাদেরকে ডেকে এনে বললেন, হে বনী ইসরাইল! আল্লাহ্কে ভয় করো। শপথ সেই আল্লাহ্র, যিনি আমাকে তাঁর রসুল করে পাঠিয়েছেন। আমি তোমাদের জন্য নতুন শরিয়ত নিয়ে এসেছি। সুতরাং তোমরা আমার ধর্মাদর্শকে গ্রহণ করো। আশ্রয় গ্রহণ করো ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। ইহুদীরা বললো, আমরা আপনার ধর্মকে সত্য বলে জানি না। তিনি স. বললেন, তোমাদের মধ্যের আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম কেমন মানুষ? তারা বললো, নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের চেয়ে উত্তম। আর তিনি আমাদের নেতা ও নেতার পুত্র। রসুল স. বললেন, তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে তোমরাও কি ইসলাম ধর্মকে মেনে নিবে? তারা বললো, আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করুন। রসুল স. এরপর আমাকে লক্ষ্য করে ডাকলেন, বাইরে এসো। সঙ্গে সঙ্গে আমি বাইরে এলাম এবং ঘোষণা করলাম, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়া আশহাদুআন্না মুহাম্মদান আ'বদুহু ওয়া রসুলুহু। হে বনী ইসরাইল! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সর্বশেষ রসুলকে মেনে নাও। উত্তমরূপে অবগত হও যে, তওরাত শরীফে সর্বশেষ রসুল হিসেবে যাঁর নাম ও বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে, ইনিই তিনি। তারা একথা শুনে রেগে গেলো। বললো, তুমি মিথ্যাবাদী। আর তুমি আমাদের মন্দ গোত্রপতির ততোধিক মন্দ সন্তান। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আমি তো আপনাকে প্রথমেই বলেছিলাম যে, এরা মিথ্যাশ্রয়ী। এরপর আমি আমার পরিবারের লোকজনদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলাম। আমার ফুফু খালেদাও গ্রহণ করলেন ইসলাম। আজীবন তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণা।

বিশুদ্ধ সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত আউফ ইবনে আশজায়ী বলেছেন, একদিন রসুল স. ইহুদীদের বস্তিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমি ছিলাম তাঁর সঙ্গে। সেদিন ছিলো ইহুদীদের ঈদের দিন। তাই তারা রসুল স.কে দেখে অপ্রসন্ন হলো। রসুল স. তাদেরকে বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে বারো জন লোক আমার সম্মুখে হাজির করো, যারা সাক্ষ্য দিবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্'। যদি এরকম করতে পারো, তবে তোমাদের উপরে আপতিত আল্লাহ্র ক্রোধ অপসারিত হয়ে যাবে। একথা শুনে তারা নীরব হয়ে গেলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোনো কথাই বললো না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর রসুল স. ফিরে আসবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন। তাদের একজন এগিয়ে এসে বললো, একটু দাঁড়ান। রসুল স. দাঁড়ালেন। লোকটি জনতার দিকে মুখ করে বললো, হে বনী ইসরাইল! তোমরা আমাকে কেমন মনে করো? জনতা জবাব দিলো, আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্র কিতাব তোমার চেয়ে বেশী বুঝতে পারে, এমন কেউ-ই আমাদের মধ্যে নেই। তোমার পূর্বে তোমার পিতা ও পিতামহও ছিলেন তখনকার সময়ের বড় আলেম। লোকটি বললো, তাহলে শোনো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, ইনিই সেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বর, যার কথা তোমরা তওরাতে পাঠ করে থাকো। জনতা এগিয়ে এসে তাকে সরিয়ে দিলো। বললো, তুমি মিথ্যাবাদী। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ছাড়া এখানকার কারো সম্পর্কে রসুল স.কে এরকম বলতে শুনিনি যে, সে জান্নাতবাসীদের মধ্যে একজন। তাঁর সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় সুরা আহ্কাফের ১০ সংখ্যক আয়াত। এ হাদিসটির বর্ণনাকারী ইমাম বোখারীর উস্তাদ আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ বলেন— হাদিসটির বর্ণনাকারী মালেক। আরো বলেন— আমি জানি না মালেক কি নিজের থেকে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছেন, না হাদিস হিসাবেই তা বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম স্বয়ং বলেছেন, আমার সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে 'অথচ বনী ইসরাইলের একজন এর অনুরূপ কিতাব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে' আয়াতটি।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু মাসরুক বলেছেন, এই আয়াত হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়নি। কেননা আলোচ্য সুরায় সকল আয়াতই অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। আর হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ইসলাম গ্রহণ করেছেন রসুল স. এর মদীনায় হিজরতের পরে। সুতরাং বুঝতে হবে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কুরায়েশদের সঙ্গে রসুল স. এর বাদানুবাদের প্রেক্ষিতে। তাই যদি হয়, তবে বুঝতে হবে এখানকার 'সাক্ষ্য দিয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে নবী মুসাকে। আর এখানকার 'এর অনুরূপ কিতাব' কথাটির অর্থ হবে এই কোরআনের অনুরূপ অন্য এক আসমানী কিতাব। অর্থাৎ তওরাত। আর সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হবে তওরাতের ওই সকল আয়াতের সাক্ষ্য যেগুলোতে বর্ণিত হয়েছে শেষ রসুলের নাম-ধাম-গুণাবলীর বিবরণ।

'ওয়াস্তাক্বার্তুম' অর্থ আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো। অর্থাৎ অহংকারবশতঃ তোমরা সত্যের আহ্বানকে স্বীকার করতে চাও না।

আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে 'ইন্ কানা মিন্ ইন্দিল্লাহ্' এর অর্থ যদি এই কোরআন আল্লাহ্র নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। বাক্যটি শর্তযুক্ত। এখানে শর্তের প্রতিফল রয়েছে উহ্য। এভাবে তোমাদের পরিণাম কী হবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— যদি এই কোরআন আল্লাহ্র বাণী হয়েই থাকে, আর তোমরা যদি তা ঔদ্ধত্যবশতঃ অস্বীকার করো, তবে তোমরাই হবে সর্বাপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ট। সুতরাং ভেবে দেখোছো কী, তোমাদের শেষ পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

একটি সন্দেহ ঃ কোরআন আল্লাহ্র বাণী হওয়া, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কোরআন অস্বীকার করা, বনী ইসরাইলের একজনের এসম্পর্কে সাক্ষ্যপ্রদান— এসকল কিছুই তো নিঃসন্দিগ্ধ বিষয়। তাহলে এখানে সন্দেহযুক্ত শব্দ 'ইন্' (যদি) ব্যবহার করা হলো কেনো?

সন্দেহভঞ্জন ঃ এখানে 'ওয়াও' (এবং) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কেবলই সংযোজকরূপে। তাই 'এবং' এর পূর্বের বাক্যের প্রতিক্রিয়া এখানে পরবর্তী বাক্যের উপরে পড়বে না। তাছাড়া 'যদি' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে ভর্ৎসনা ও সতর্কতা জ্ঞাপনার্থে। এভাবে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, কোরআন যখন আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত, তখন কোনো সুস্থ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে কোরআনের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন বৈধ নয়। তাছাড়া এর সপক্ষে যখন জ্ঞানী একজন বনী ইসরাইলের সাক্ষ্য রয়েছে, তখন কোরআনকে না মানার কোনো কারণই থাকতে পারে না। এরপরেও ঔদ্ধত্য ও অস্বীকৃতি পরিত্যাগ না করা নিশ্চয়ই অপরিণামদর্শিতার কাজ। তাহলে তোমরা এবার ভেবে দেখতে চেষ্টা করো যে, এর পরিণাম হবে কতো ভয়াবহ। 'ইন' এর এরকম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন 'ইন কুনতুম ক্বওমাম্ মুসরিফীন' (যদি তোমরা হও সীমালঙ্ঘনকারী)।

সূরা আহ্ক্বাফ ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

---

www.eelm.weebly.com

❑ মু'মিনদের সম্পর্কে কাফিররা বলে, 'যদি ইহা ভাল হইত তবে তাহারা ইহার দিকে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিত না। আর যখন উহারা ইহা দ্বারা সৎপথপ্রাপ্ত হয় নাই। তখন তাহারা অবশ্য বলিবে, 'ইহা তো এক পুরাতন মিথ্যা।'

❑ ইহার পূর্বে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ। আর এই কিতাব ইহার সমর্থক, আরবী ভাষায়, যেন ইহা যালিমদিগকে সতর্ক করে এবং যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদিগকে সুসংবাদ দেয়।

❑ যাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ্' অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

❑ তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে, তাহারা যাহা করিত তাহার পুরস্কার স্বরূপ।

❑ আমি মানুষকে তাহার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সহিত এবং প্রসব করে কষ্টের সহিত, তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে ও তাহার স্তন্য ছাড়াইতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয়, তখন বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি যাহা তুমি পসন্দ কর; আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হইলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

❑ 'আমি ইহাদেরই সুকৃতিগুলি গ্রহণ করিয়া থাকি এবং মন্দ কর্মগুলি ক্ষমা করি, তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা সত্য।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলে, কোরআন যদি কল্যাণজনক কিছু হতো, তবে তাদের আগেই আমরা কোরআনকে মেনে নিতাম। কেননা তারা প্রতিপত্তিহীন, আর আমরা প্রতিপত্তিশালী। প্রকৃত কথা হচ্ছে, কোরআন দ্বারা তারা পথপ্রাপ্ত হয়নি। সেকারণেই তারা কোরআন সম্পর্কে 'এটা তো এক পুরাতন মিথ্যা' এরকম জঘন্য মন্তব্য করতে পারে।

ইবনে জারীর বর্ণনা করেন, কাতাদা বলেন, মক্কার অংশীবাদীরা বলতো, আমরা উচ্চ মর্যাদাশালী। তাই আমরা মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যদি তাদের ধর্ম ভালো হতো, তবে অমুক অমুক প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন ব্যক্তি আমাদের আগে ইসলাম গ্রহণ করতে পারতো না।

ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, আউন ইবনে আবী শাদ্দাদ বলেছেন, হজরত ওমরের যানীন নাম্নী এক ক্রীতদাসী ছিলো। তিনি তাঁর মনিবের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাই ভীষণভাবে প্রহৃত হয়েছিলেন মনিবের দ্বারা। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এদৃশ্য দেখে মন্তব্য করেছিলো, ইসলাম যদি ভালো কিছু হতো, যানীন কিছুতেই এ ব্যাপারে অগ্রগামিনী হতে পারতো না। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। জুহাক ও হাসান সূত্রে ইবনে সা'দও এরকম বর্ণনা করেছেন।

বাগবী লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতখানি যদি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়ে থাকে তবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে—ইহুদী অবিশ্বাসীরা ইহুদী বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলে, মোহাম্মদের ধর্ম যদি উত্তম হতো, তবে আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামের মতো লোক আমাদেরকে টেক্কা দিতে পারতো না।

'ওয়া ইজ লাম ইয়াহ্তাদূ বিহী' অর্থ যখন তারা এর দ্বারা (কোরআন দ্বারা) সৎপথ প্রাপ্ত হয়নি হয়েছে ইমানদারগণ। অর্থাৎ পথপ্রাপ্ত না হওয়াই কোরআনের প্রতি তাদের বীতস্পৃহ হওয়ার কারণ। আর 'ফা সাইয়াক্বুলূনা হাজা ইফকুন্ ক্বদীম' অর্থ তখন তারা অবশ্যই বলবে, এটা তো এক পুরাতন মিথ্যা। একথার অর্থ— যেহেতু তারা পথভ্রষ্ট, তাই একথা তো বলবেই যে, এটা হচ্ছে সনাতন কিংবদন্তিতুল্য, যা মোহাম্মদকে কেউ না কেউ শিখিয়ে দিয়েছে।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'এর পূর্বে মুসার কিতাব ছিলো আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ। আর এই কিতাব তার সমর্থক, আরবী ভাষায়, যেনো এটা জালেমদেরকে সতর্ক করে এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয়'। একথার অর্থ— কোরআনের পূর্বে তওরাতও ছিলো মানুষের জন্য আদর্শ ও রহমতস্বরূপ, যা অবতীর্ণ হয়েছিলো নবী মুসার উপর। সুতরাং তওরাত ও কোরআন

একে অপরের প্রত্যয়নকারী। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তওরাত অবতীর্ণ হয়েছে হিব্রু ভাষায় এবং কোরআন আরবীতে। তবে উভয় কিতাবের মূল উদ্দেশ্য এক। আর তা হচ্ছে— স্বেচ্ছাচারীদেরকে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ককরণ এবং সুসংবাদ প্রদান তাদেরকে, যারা সৎকর্মপরায়ণ।

এখানে 'ইউন্‌জিরা' অর্থ সতর্ক করে এবং 'বুশরা' অর্থ সুসংবাদ দেয়। কথাটি এখানে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার কারণ। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— এটা হচ্ছে সেই কিতাব, যা পুণ্যবানদেরকে মহাসাফল্যের শুভসংবাদ দেয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ্, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না (১৩)। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তারা যা করতো তার পুরস্কারস্বরূপ' (১৪)। একথার অর্থ— যারা বলে আল্লাহ্ই আমাদের প্রভুপালনকর্তা এবং এই বিশ্বাসের উপরে যারা অবিচল থাকে, পরকালে তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা সেখানে দুশ্চিন্তিতও হবে না। তারা তাদের শুভ কর্মসমূহের প্রতিফলরূপে অধিকারী হবে জান্নাতের। আর সেখানে চিরকাল বসবাস করবে।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভধারণ করে কষ্টের সঙ্গে এবং প্রসব করে কষ্টের সঙ্গে, তাকে গর্ভেধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে তিরিশ মাস, ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয়, তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছো, তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি, যা তুমি পছন্দ করো; আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করো, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত'।

এখানে 'ওয়া ওয়াস্‌সাইনাল ইন্‌সানা' কথাটির 'আল ইন্‌সানে'র 'আলিফ্‌লাম' হচ্ছে 'আহ্‌দী' (নির্দিষ্টার্থক)। অর্থাৎ এখানে 'মানুষ' অর্থ বিশেষ কোনো মানুষ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'মানুষ' অর্থ হজরত আবু বকর সিদ্দীক। তাঁর সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। তাঁর মাতা-পিতা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্য কোনো মুহাজির সাহাবীর এরকম সৌভাগ্য লাভ হয়নি। আবার সুদ্দী ও জুহাক বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে লক্ষ্য করে। সুরা আন্‌কাবুতের তাফসীরে হজরত সা'দের এসম্পর্কিত ঘটনার সবিস্তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'আল ইন্‌সানে'র 'আলিফ্‌লাম' হচ্ছে 'জিনসী' (জাতিবাচক), হজরত আবু বকর অথবা হজরত সা'দ যার সম্পর্কেই অবতীর্ণ হোক না কেনো। কিন্তু এমতো অভিমত আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের গতিপ্রকৃতির অনুকূল নয়।

'বিওয়ালিদাইহি ইহ্‌সানা' অর্থ যেনো মাতাপিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে। উল্লেখ্য, হজরত আবু বকরের মাতার নাম ছিলো হজরত উম্মুল খায়ের বিনতে খায়ের ইবনে সখর ইবনে ওমর এবং পিতার নাম ছিলো হজরত আবু কোহাফা ইবনে ওসমান ইবনে ওমর।

'কুরহান' অর্থ কষ্ট। সদ্ব্যবহার করার কারণ হিসেবে এখানে 'কষ্ট' কেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'কুরহান' অর্থ কষ্ট, শ্রম, বোঝা। 'কুরহা' ও 'কারহা' সমার্থক। কেউ কেউ বলেছেন 'কুরহান' হচ্ছে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এবং 'কারহান' হচ্ছে ক্রিয়ামূল।

এখানে জননীর কষ্টের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকার মায়েরই বেশী। রসুল স. বলেছেন, সুন্দর আচরণ করো মায়ের সঙ্গে, তারপরেও মায়ের সঙ্গে, তারপরেও মায়ের সঙ্গে, তারপরে বাপের সঙ্গে এবং তারপরে আত্মীয়তার নৈকট্যানুসারে।

'ওয়া ফিসলুহু' অর্থ স্তন্য ছাড়ানো, মাতৃ দুগ্ধপান বন্ধ করানো। এখানে গর্ভধারণ ও মাতৃস্তন্য ছাড়ানোর মোট সময়সীমা ধরা হয়েছে তিরিশ মাস। এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সর্বনিম্ন গর্ভধারণ কাল ছয়মাস। কেননা অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, মাতৃস্তন্য ছাড়াতে হবে দুই বছরের মধ্যে। সুতরাং তিরিশ মাসের মধ্যে দুই বছর বা চব্বিশ মাস বাদ দিলে থাকে মাত্র ছয় মাস। আলেমগণ অবশ্য সর্বনিম্ন গর্ভধারণকাল যে ছয় মাস, সে ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। কিন্তু গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময় নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা দু'বছর পর্যন্ত গর্ভধারণের সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালেক বলেছেন চার, পাঁচ, সাত বৎসরের সময়সীমা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন চার বছরের কথা। আর ইমাম আহমদের অভিমত সম্পর্কে দু'টি বিবরণ পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের অনুকূল এবং অন্যটি অনুকূল ইমাম আবু হানিফার মতের।

আবুল হরব আসওয়াদ দুয়ালী সূত্রে কাতাদা বর্ণনা করেছেন, ছয়মাস গর্ভবতী থাকার পর সন্তান প্রসব করেছে, এরকম এক মহিলাকে একবার নিয়ে আসা হলো খলিফা ওমরের দরবারে। তিনি এব্যাপারে তাঁর সতীর্থদের নিকট থেকে পরামর্শ কামনা করলেন। হজরত আলী বললেন, হে বিশ্বাসীদের অধিনায়ক! এই মহিলার ব্যভিচারিণী হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন 'তাকে গর্ভধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে তিরিশ মাস'। অন্যত্র বলেছেন, 'দুধ ছাড়ানোর সময় দুই বৎসর'। হজরত ওমর একথা শোনার পর মহিলাটিকে ছেড়ে দিলেন। কিছু কাল পর আবার সংবাদ পাওয়া গেলো, মহিলাটি পুনরায় ছয়মাসের বাচ্চা প্রসব করেছে।

নাফে ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই মহিলা সম্পর্কে আমি জানতাম। তার সম্পর্কে লোকজনের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিলো। আমিই তো তখন খলিফাকে বলেছিলাম, আপনি কীভাবে জুলুম

করতে পারেন? তিনি বললেন, তার মানে? আমি বললাম, পাঠ করুন 'গর্ভধারণ ও মাতৃস্তন্য ছাড়াতে সময় লাগে তিরিশ মাস'। আর 'স্তন্যপানের সময় কাল দুই বৎসর'। বলুন, বছরে কতো মাস হয়? তিনি বললেন, বারো মাস। আমি বললাম, এভাবে দু'বছরের হিসেবে চব্বিশ মাস বাদ গেলে থাকে কতো? তিনি বললেন, ছয়মাস। আমি বললাম, 'আল্লাহ্ গর্ভধারণকালের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটান তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে'। একথা শোনার পর খলিফার সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

আবু উবায়দা বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বলেছেন, খলিফা ওসমানের দরবারে একবার এক স্ত্রীলোককে নিয়ে আসা হলো। অনেকের সন্দেহ হয়েছিলো, সে হয়তো ব্যভিচারিণী। কিন্তু ইবনে আব্বাস দলিল দিলেন এভাবে 'ওয়া হামলুহু ওয়া ফিসলুহু ছালাছূনা শাহ্‌রা'। খলিফা ওসমান একথা শুনে স্ত্রীলোকটিকে অব্যাহতি দিলেন।

ইমাম আবু হানিফা জননী আয়েশার উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, গর্ভধারণের সময়সীমা যতোই দীর্ঘ হোক না কেনো, দুই বৎসরের বেশী সে গর্ভরক্ষা করতে পারে না। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যতোই কেনো না সে দ্বিগুণ গর্ভাশয়ের অধিকারিণী হয়। বিষয়টি অবশ্য জটিল। নিজস্ব বিবেচনায় এরকম জটিলতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করা দুরূহ। জননী আয়েশা হয়তোবা রসুল স. এর কাছ থেকে এরকম শুনে থাকবেন। অথবা এটা তাঁর নিজস্ব অভিমত। আমি মনে করি, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর অভিমত যেরকম অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, তেমনি জননী আয়েশার মন্তব্যটিও অনভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়। তিনি হয়তো তাঁর জীবদ্দশায় দুই বৎসরের অধিক গর্ভধারণ করতে কাউকে দেখেননি। সেজন্যেই সাধারণভাবে তিনি যা দেখেছেন, শুনেছেন, মন্তব্যও করেছেন ঠিক সেভাবেই। আর আলোচ্য আয়াতে গর্ভধারণের যে সময়সীমা নির্দেশ করা হয়েছে, তা সঠিক বলে গ্রহণ করা যেতে পারবে তখনই যখন এখানকার 'আলইন্‌সানে'র 'আলিফ্ লাম'কে ধরা হবে জাতিবাচক। আর এখানকার 'আলিফ লাম'কে যদি নির্দিষ্টার্থক ধরা হয়, তবে বুঝতে হবে, এখানকার সময়সীমা একটি সুনির্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ইমাম আবু হানিফা দুধপান ছাড়ানোর সময়সীমা আড়াই বৎসর বা তিরিশ মাসের বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিমতের সঙ্গে আবার এই আয়াতের কোনো সঙ্গতি নেই। সুরা নিসার তাফসীরের যথাস্থানে এ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। আবার হজরত ইবনে আব্বাসকে উদ্ধৃত করে ইকরামা বলেছেন, নয় মাসে সন্তান প্রসব করলে মাতা তার সন্তানকে দুধপান করাবে একুশ মাস। আর ছয় মাসে সন্তান প্রসব করলে সে তার সন্তানকে দুধ পান করাবে চব্বিশ মাস।

এখানকার 'ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হয়' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই অনুক্ততাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মাতা-পিতার সাদর প্রতিপালনের মাধ্যমে যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পৌঁছে এবং এভাবে উপনীত হয় চল্লিশ বৎসর বয়সে, যখন তার জ্ঞান

www.eelm.weebly.com

বুদ্ধি হয় পরিপূর্ণ ও পরিণত। উল্লেখ্য, রসুল স. এবং হজরত আবু বকরের বয়স যখন ছিলো যথাক্রমে বিশ ও আঠারো, তখন তাঁরা বাণিজ্য ব্যপদেশে একসঙ্গে সিরিয়া গমণ করেছিলেন । তাঁরা অধিকাংশ সময় একত্রে সময়াতিপাত করতেন। আর হজরত আবু বকরের বয়স যখন চল্লিশ, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু বর্ণনাকারী সম্ভবতঃ এরকম কথা বলেছেন ভুল করে। কেননা রসুল স. অপেক্ষা তিনি বয়সে ছিলেন দুই বৎসরের ছোট। আর চল্লিশ বৎসর ছয় মাস বয়সে যখন রসুল স. নবুয়তের গুরুদায়িত্ব লাভ করেন, তখন তাঁর বয়স হওয়ার কথা আটত্রিশ বৎসর ছয় মাস। অর্থাৎ বেশী হলে সাড়ে আটত্রিশ। অবশ্য রসুল স. চল্লিশ না সাড়ে চল্লিশ বৎসরে নবুয়ত পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে এ পর্যন্ত মতানৈক্য রয়েই গিয়েছে।

'আওযি'নী' অর্থ সামর্থ্য দাও, দাও তোমার পক্ষ থেকে প্রেরণা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন 'ওয়ায্উন' অর্থ থামিয়ে দেওয়া। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রভুপালক! আমাকে এমন করে দাও, যাতে আমি আমার প্রবৃত্তির কৃতজ্ঞতাহীনতার গতিকে থামিয়ে দিতে পারি। আর এখানে 'আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছো' অর্থ আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে ইসলামে অনুপ্রবেশ করার যে সৌভাগ্য তুমি দান করেছো। অবশ্য সকল প্রকার শুভপ্রাপ্তিই এখানকার 'অনুগ্রহে'র অন্তর্ভূত হতে পারে।

'সলিহান' অর্থ সৎকর্ম। শব্দটিতে 'তানভীন' যোগ করা হয়েছে এখানে সম্মান প্রকাশার্থে। এর দ্বারা সাধারণভাবে বুঝানো হয়েছে সকল সৎকর্মকে। অর্থাৎ ওই সকল কর্মকে, যা আল্লাহ্র পরিতোষআহরক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত সিদ্দীক শ্রেষ্ঠ আবু বকরের প্রার্থনা আল্লাহ্ কবুল করেছিলেন। তাঁকে দিয়েছিলেন বহুসংখ্যক সৎকর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য। যেমন তিনি চেয়েছিলেন অত্যাচারিত হয়ে সত্যধর্ম প্রচারে অটল থাকতে, দাসমুক্ত করতে, সন্তান-সন্ততিকে পুণ্যবান পূণ্যবতী করে গড়ে তুলতে। এসকল কিছুই তিনি করতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছিলো বলেই তিনি তাঁর পরিবারের সকল সদস্যসহ ইসলাম গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, দাস-দাসী সকলেই হয়েছিলেন রসুল স. এর সম্মানার্হ সাহাবী। এরকম সৌভাগ্য আর কোনো সাহাবীর ভাগ্যে জোটেনি।

'ইন্নী তুব্তু ইলাইকা' অর্থ কুফরী থেকে, তোমার অতুষ্টি থেকে এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের অন্তরায় ঔদাসীন্য থেকে আমি তোমারই অভিমুখী হলাম। আর 'ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমীন' অর্থ আমি অবশ্যই আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভূত। এভাবে সমাপ্ত পূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমেও একথা প্রমাণিত হয় যে, এখানকার 'আল ইন্সানে'র আলিফ লাম নির্দিষ্টার্থক। অর্থাৎ এখানে 'মানুষ' অর্থ নির্দিষ্ট মানুষ। কেননা, সকল মানুষ নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে এতো সুন্দরভাবে গুছিয়ে প্রার্থনা করে না। করতে পারেও না। আর সেই নির্দিষ্ট মানুষটি যে হজরত আবু বকর ছাড়া

অন্য কেউ নন, তা বলাই বাহুল্য। আর চল্লিশ বছরের কাছাকাছি বয়সে ইমান এনেছিলেন তিনিই। যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশের আবেদনও জানিয়ে ছিলেন ওই বয়সে। সুতরাং ধরা যেতে পারে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর্তিও আল্লাহ্ কবুল করে নিয়েছিলেন।

একটি সন্দেহ ঃ হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত আবু বকরের পিতা হজরত আবু কোহাফা ইমান এনেছিলেন মক্কাবিজয়ের পর। তখন হজরত আবু বকরের বয়স হয়েছিলো ষাট বৎসর। আর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো তাঁর মদীনা গমনের পূর্বে। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, চল্লিশ বৎসর বয়সে যখন তিনি ইমানদার হয়েছিলেন, তখন তাঁর পিতা ছিলেন কাফের। তাহলে কাফের পিতার প্রতি ইমানদার পুত্রের সদ্ব্যবহার প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়ার অর্থ কী? আর হজরত আবু বকরের একথা বলারই বা কী যুক্তি থাকতে পারে যে, 'আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছো'। অর্থাৎ তাদেরকে দিয়েছো ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য। কেননা তখন পর্যন্ত তো তাঁর পিতা ইসলাম গ্রহণ করেনইনি।

সন্দেহের অপনোদন ঃ আমি বলি, কোনো কোনো বর্ণনায় এরকম কথাও এসেছে যে, হজরত আবু বকর ইসলাম গ্রহণ করেন আটত্রিশ বৎসর বয়সে। দু'বছর পর যখন তাঁর বয়স চল্লিশ হয়, তখন তাঁর মাতা-পিতাও ইসলাম গ্রহণ করেন। এই বিবরণটিই সঠিক বলে মনে হয়। আর যদি আগের বর্ণনা মতো একথা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, হজরত আবু কোহাফা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন মক্কাবিজয়ের পর, তবুও আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো হেরফের ঘটে না। আর কাফের পিতামাতার সঙ্গে ইমানদার পুত্রের শোভন আচরণ বৈধ। কেননা সুরা আনকাবুতের এক আয়াতে এসেছে, 'আমি মানুষকে পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাদেরকে আমার সঙ্গে শরীক করার আদেশ দেয়, যার সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য কোরো না'। এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতের 'অনুগ্রহ' কথাটির অর্থ হবে ব্যাপক অনুগ্রহ— পার্থিব অথবা ধর্মীয়। আবার এখানকার 'আলইন্সানে'র আলিফ লামকে জাতিবাচক ধরে নিলেও আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ঠিক থাকবে। এমতাবস্থায় 'পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয়' কথাটির অর্থ হবে দৈহিকভাবে হয় সুঠাম এবং 'চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয়' কথাটির অর্থ হবে যখন আগমন করে তার জ্ঞানবুদ্ধির পরিপক্কতা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানুষ যখন দৈহিক ও মানসিকভাবে পূর্ণ ও পরিণত হয়, তখন সে প্রাপ্ত অনুগ্রহসমূহের জন্য আল্লাহ্র দরবারে কামনা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্য। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'আমি এদেরই সুকীর্তিগুলি গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দকর্মগুলি ক্ষমা করি, তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা সত্য'।

এখানে 'এদেরই' বলে যদি সাধারণ মানুষকে ধরা হয়, তবে সকল সুকীর্তিধারীরাই হবে এর অন্তর্ভূত। আর এর উদ্দেশ্য যদি হয় কেবল হজরত আবু বকর, অথবা হজরত সা'দ, তবুও পরোক্ষভাবে ওই সকল সুকীর্তিধারীরা এর অন্তর্ভূত হবে, যারা তাঁদের মতো গুণসম্পন্ন। আর এমতাবস্থায় 'এদেরই' কথাটি হবে রূপক বা পরোক্ষার্থক। আর শব্দের এরূপ পরোক্ষার্থক ব্যবহার বক্তব্যকে করে অধিকতর শানিত ও অলংকারসমৃদ্ধ। কেননা এতে করে দাবির সঙ্গে সঙ্গে দলিলও উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

'আহ্সানা মাআ'মিলু' অর্থ সুকীর্তিসমূহ। সিদ্ধ বা 'মোবাহ্' কর্মসমূহ যদিও 'সু' পদবাচ্য, তবুও তা পুণ্যার্জক নয়। তাই বুঝতে হবে, এখানে 'সুকীর্তিগুলি গ্রহণ করে থাকি' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল অধিক সুকর্মসমূহকে যেগুলো পুণ্যার্জক। কেননা মূল্য বা বিনিময় দেওয়া হয় তারই, যা গ্রহণ করা হয়। অথবা কথাটির মাধ্যমে হজরত আবু বকর, অথবা হজরত সা'দের সুর্কমসমূহ যে অন্যাপেক্ষা উত্তম, সে কথাই বোঝানো হয়েছে এবং সেই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে, তা কবুল করার প্রতিশ্রুতিও। 'মন্দকর্মগুলি ক্ষমা করি' অর্থ আমি তাদের ভুল-ত্রুটির জন্য তাদেরকে শাস্তিযোগ্য বিবেচনা করি না। বরং সেগুলো মার্জনা করে দেই। 'তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত' অর্থ অন্য জান্নাতবাসীদের মতো, অথবা তার চেয়েও বেশী পুরস্কৃত করা হবে তাদেরকে। আর এখানকার 'এদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা সত্য' অর্থ পৃথিবীতে হজরত আবু বকর, হজরত সা'দ এবং এদের মতো পুণ্যবানদেরকে সুকীর্তি গ্রহণের, ক্ষমার এবং জান্নাতের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই পরিপূরণ করা হবে। কথাটি সাধারণ কর্মপদ এবং এখানে কথাটি প্রযুক্ত হয়েছে মূল বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানার্থে।

সূরা আহ্ক্বাফ ঃ আয়াত ১৭, ১৮, ১৯, ২০

❑ আর এমন লোক আছে, যে তাহার মাতা-পিতাকে বলে, 'আফসোস তোমাদের জন্য! তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাইতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হইব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হইয়াছে'? তখন তাহার মাতা-পিতা আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করিয়া বলে, 'দুর্ভোগ তোমার জন্য! তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে, 'ইহা তো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।'

❑ ইহাদের পূর্বে যে জিন্ন ও মানব সম্প্রদায় গত হইয়াছে তাহাদের মত ইহাদের প্রতিও আল্লাহ্‌র উক্তি সত্য হইয়াছে। ইহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

www.eelm.weebly.com

❑ প্রত্যেকের মর্যাদা তাহার কর্মানুযায়ী, ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে না।

❑ যে দিন কাফিরদিগকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হইবে সেদিন উহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পাইয়াছ এবং সেইগুলি উপভোগও করিয়াছ। সুতরাং আজ তোমাদিগকে দেওয়া হইবে অবমাননাকর শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আবার এমন দুর্বৃত্ত আছে, যে তার মাতা-পিতাকে বলে, তোমাদের প্রতি অক্ষেপ! অনর্থক তোমরা আমাকে কিয়ামতের ভয় দেখাও। বলো, পুনরুত্থান দিবসে সবাইকে পুনর্জীবিত করা হবে। তারপর বিচার করা হবে সকলের কৃতকর্মের। কই? কতো মানুষ তো মৃত্যুমুখে পতিত হলো। কেউই তো পুনর্জীবিত হলো না। ওই দুর্বৃত্তের বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী পিতা-মাতা তখন আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে এবং পুত্রকে বলে, তোমার কপালে রয়েছে দুর্ভোগ। শীগগির তওবা করো। বিশ্বাস স্থাপন করো পুনরুত্থান দিবসের প্রতি। কেননা আল্লাহ্ একথা বিশ্বাস করতে বলেছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। এরকম কথা শোনার পরেও ওই দুর্বৃত্ত সংযত হয় না। বলে, এ সমস্ত হচ্ছে অতীতের কিংবদন্তি, যার কোনো বাস্তবতাই নেই।

ইউসুফ ইবনে মালেক সূত্রে বোখারী বর্ণনা করেছেন, তখন চলেছে হজরত মুয়াবিয়ার শাসনকাল। হেজাজের শাসনকর্তা মারোয়ান একদিন ভাষণ দানকালে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার বশ্যতা স্বীকারের জন্য জনগণকে আহ্বান জানালো। তখন হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর তাকে কিছু কটু কথা শুনিয়ে দিলেন। মারোয়ান বললো, একে গ্রেফতার করো। হজরত আবদুর রহমান তখন তাঁর বোন উম্মত জননী হজরত আয়েশার গৃহে আশ্রয় নিলেন। তাই মারোয়ান তাঁকে গ্রেফতার করতে পারলো না। কিন্তু জনগণের উদ্দেশ্যে বললো, এই সে-ই

লোক, যার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে 'আর এমন লোকও আছে যে তার মাতাপিতাকে বলে........ অতীতকালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়'। জননী আয়েশা তখন বলেন, আল্লাহ্ আমার সম্পর্কে মন্দ কিছু অবতীর্ণ করেননি। বরং কিছুসংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন আমার নিষ্কলুষতার সমর্থনে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, মারোয়ানের কথা শুনে হজরত আবদুর রহমান রাগান্বিত হন। বলেন, পুত্রকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করা তো রাজ-রাজড়াদের রীতি। সুদ্দী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। তার সঙ্গে এই মন্তব্যটিও করেছেন যে, আবদুর রহমান সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো তাঁর মুসলমান হওয়ার পূর্বে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, সুদ্দী ও মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে। কোনো কোনো বর্ণনায় হজরত আবদুল্লাহ্র স্থলে এসেছে হজরত আবদুর রহমানের নাম। হজরত আবদুর রহমানকে যখন তাঁর পিতা-মাতা ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান, তখন তিনি বলেন, আমাকে তাহলে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাদান, আমের ইবনে কা'ব এবং প্রয়াত কুরায়েশ গুরজনদেরকে জীবিত করে দেখাও। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখি, তারা তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেন কিনা।

আমার মনে হয়, মারোয়ানের মন্তব্যের কারণেই এমতো ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, এই আয়াত হজরত আবদুর রহমানকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। আর মারোয়ানের উক্তিটি ছিলো বিদ্বেষপ্রসূত। বাগবী লিখেছেন, জননী আয়েশা মারোয়ানের মন্তব্যকে খণ্ডন করেছেন এবং জনৈক ব্যক্তির নাম নিয়ে বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তার সম্পর্কে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, যে বর্ণনায় জননী আয়েশা কর্তৃক মারোয়ানের উক্তি খণ্ডন করার কথা এবং হজরত আবুদর রহমান সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ধারণা নাকচ হওয়ার কথা এসেছে, সে-ই বর্ণনাটির সূত্রপরম্পরা অধিকতর যথার্থও গ্রহণ যোগ্য।

বাগবী আরো লিখেছেন, অধিকতর বিশুদ্ধ ধারণা এই যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্পর্কে, যে ছিলো তার মাতাপিতার অবাধ্য। হাসান এবং কাতাদাও এরকম বলেছেন। জুজায বলেছে, হজরত আবদুর রহমান সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ধারণা পরবর্তী আয়াতেই অপনোদনিত হয়ে যায়।

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'এদের পূর্বে যে জ্বিন ও মানবসম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের মতো এদের প্রতিও আল্লাহ্র উক্তি সত্য হয়েছে। এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত'। একথার অর্থ— অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সকল সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের ধারণা ও কর্মকাণ্ড একই রকম। আল্লাহ্র উক্তি তাদের সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। এরা চিরহতভাগ্য ও চিরক্ষতিগ্রস্ত।

এখানে 'এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত' অর্থ এরাই হচ্ছে দোজখবাসী। একথাতেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পূর্ববর্তী আয়াত হজরত আবদুর রহমান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়নি। কেননা তিনি ছিলেন সম্মানিত সাহাবী এবং শ্রেষ্ঠ মুসলমানদের অন্যতম। তাই 'ক্ষতিগ্রস্ত' শব্দটি তাঁর সম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারেই না।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে(১৯) বলা হয়েছে— 'প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্মানুযায়ী, এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, পুণ্যবানদের মধ্যেও মর্যাদাগত তারতম্য রয়েছে। তাই তাদের প্রতিফলপ্রাপ্তির মধ্যেও ঘটবে তারতম্য। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যারা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁরা পরবর্তী সময়ের ইসলাম গ্রহণকারী অপেক্ষা উত্তম, সে ব্যবধান সামান্য সময়ের জন্য হলেও। মুকাতিল বলেছেন, পুণ্যকর্মের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে প্রতিফলের প্রকৃতি। এই নিয়মেই আল্লাহ্ সকলকে প্রতিফল প্রদান করবেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে থাকবে কর্মগত ও কর্মের প্রতিফলগত তারতম্য। ইবনে জায়েদ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, দোজখীদের শ্রেষ্ঠত্ব নিম্নমুখী এবং বেহেশতীদের শ্রেষ্ঠত্ব ঊর্ধ্বমুখী। অর্থাৎ অধিকতর পাপীরা হবে অধিক শাস্তির উপযোগী এবং অধিক মর্যাদার অধিকারী হবে অধিকতর পুণ্যবানেরা।

আর এখানে 'তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না' অর্থ আল্লাহ্পাক তাঁর অতুলনীয় বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা অনুসারে প্রত্যেককে তার কর্মফল প্রদান করবেন। পুণ্যবানদের পুণ্য যেমন এতটুকুও কম করবেন না, তেমনি এতটুকুও অধিক করবেন না পাপিষ্ঠদের পাপ।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পেয়েছো এবং সেগুলি উপভোগও করেছো। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেওয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী'।

এখানে 'ওয়া ইয়াওমা ইউ'রাদুল্ লাজীনা কাফারূ আ'লান্নার১ অর্থ যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে। এভাবে এখানে বক্তব্যকে অস্বীকার করার জন্য বাক্যের গঠনভঙ্গিতে আনয়ন করা হয়েছে পরিবর্তন। 'আজ্হাব্তুম ত্বয়্যিবাতিকুম ফী হায়াতিকুমুদ্ দুন্ইয়া' অর্থ তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পেয়েছো। 'ওয়াস্তাম্তা'তুম বিহা' অর্থ এবং সেগুলো উপভোগও করেছো। অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাদেরকে আল্লাহ্ যে সকল সুখোপকরণ দিয়েছিলেন, তার কোনোকিছুই তোমরা উপভোগ করতে বাকী রাখোনি। 'আ'জাবাল হূনি' অর্থ অবমাননাকর শাস্তি। আর 'বিমা কুন্তুম তাফ্সুকুন' অর্থ তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী। এখানকার 'মা' হচ্ছে ক্রিয়ামূল। অর্থাৎ 'সত্যদ্রোহী' হওয়ার কারণেই আজ তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে অবমাননাকর শাস্তি।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াতে পার্থিব সুখ-সম্ভারের মধ্যে ডুবে থাকার কুফল সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সেকারণেই রসুল স. এবং তাঁর সাহাবীগণ পার্থিব সুখ-সম্ভারের প্রতি অত্যাসক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতেন। বোখারী ও মুসলিম।

বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়ে দেখলাম, তিনি স. শুয়ে রয়েছেন একটি খালি চাটাইয়ের উপর। মাথায় দিয়েছিলেন খেজুরের আঁশ ভর্তি চামড়ার বালিশ। তাঁর পবিত্র শরীরে চাটাইয়ের দাগ দেখে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! প্রার্থনা করুন, আল্লাহ্ যেনো আপনার উম্মতকে স্বচ্ছলতা দান করেন। পারস্য ও রোমের অধিবাসীরা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তবুও আল্লাহ্ তাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছেন। তিনি স. বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! তুমি এরকম ভাবছো কেনো? তাদেরকে তো কেবল দুনিয়াই দেওয়া হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন বললেন, ওমর! তুমি কি এটা পছন্দ করো না যে, তাদের জন্য পার্থিবতা এবং আমাদের জন্য পরকাল? বোখারী ও মুসলিম আরো বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. এর পরিবার পরিজন তাঁর মহাতিরোধান পর্যন্ত কখনো পরপর দুদিন উদর পূর্তি করে আহার করেননি।

বোখারী বর্ণনা করেছেন, আবু সাঈদ মকবরী বলেছেন, কিছুসংখ্যক লোক এক স্থানে বসে আহারের আয়োজন করছিলেন। হজরত আবু হোরায়রা সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তিনি সেখানে বসলেন না। যেতে যেতে বললেন, রসুল স. পৃথিবী পরিত্যাগ করেছেন। তিনি স. যবের রুটিও কখনো পেটভরে খাননি। জননী আয়েশা বলেছেন, কখনো কখনো এমন হতো, মাসাধিককাল পর্যন্ত আমাদের ঘরের উনুন জ্বলতো না। আমাদের দিন কেটে যেতো কেবল খেজুর ও পানি খেয়ে। আল্লাহ্ আনসার রমণীগণের মঙ্গল করুন। তারা কখনো হাদিয়া হিসেবে আমাদের কাছে দুধ পাঠাতো। আহমদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোনো কোনো রাতে রসুল স. অনাহারে থাকতেন। তাঁর পরিবার পরিজনদের অবস্থাও সেরকমই ছিলো। আর অধিকাংশ সময় তাঁদের ভাগ্যে জুটতো কেবল শুকনো রুটি।

হজরত আনাস থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমনভাবে সতর্ক করা হয়েছে, যে রকম সতর্ক আর কাউকে করা হয় না। আর আমাকে যেভাবে দুঃখ যাতনা দেওয়া হয়েছে, সেরকম দুঃখ যাতনাও দেওয়া হয় না অন্য কাউকে। একবার আমাদের উপর দিয়ে তিরিশটি দিবা-রাত্রি এমনভাবে অতিবাহিত হলো যে, আমরা প্রায় অন্নহীন অবস্থাতেই কাটালাম। এমন খাদ্য আমাদের জুটলো না, যা খেয়ে জীবন ধারণ করা যায়। অবশ্য বেলাল মাঝে মাঝে আমাদের জন্যই কিছু খাদ্য লুকিয়ে রাখতো। তিরমিজি বলেছেন, ঘটনাটি ওই সময়ের, যখন রসুল স. হজরত বেলালকে নিয়ে

www.eelm.weebly.com

মদীনার বাইরে কোনো এক স্থানে চলে গিয়েছিলেন। তখন সামান্য খাদ্যবস্তু ছিলো তাঁদের সঙ্গে, যা হজরত বেলাল তাঁর বগলের নিচে লুকিয়ে রাখতে পারতেন।

বোখারী লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আমি সত্তরজন এমন সাহাবীকে দেখেছি, যাদের কাছে ঊর্ধ্বাঙ্গে আবৃত করার মতো বস্ত্র ছিলো না'। নিম্নাঙ্গের পরিধেয়ও ছিলো হ্রস্ব, যা কোনো রকমে পায়ের অর্ধাংশ পর্যন্ত পৌঁছতো।

কেউ আবার গলায় এমনভাবে কম্বল জড়িয়ে রাখতেন যে, তাতে করে কোনো রকমে তাদের লজ্জা নিবারণ হতো। আবার নিম্নাংগের হ্রস্ব বসন তাঁরা হাত দিয়ে জড়িয়ে থাকতেন, যাতে গোপনাঙ্গ উন্মোচিত না হয়।

বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর জন্য যবের রুটি প্রস্তুত করলাম। তিনি তা নিয়ে ছিলেন এক ইহুদীর কাছ থেকে তাঁর যুদ্ধের পোশাক বন্ধক রেখে। আমি নিজে দেখেছি, অধিকাংশ দিন তাঁর পরিবার পরিজনদের জন্য গম অথবা যবও থাকতো না। থাকতো না কোনো ব্যঞ্জনও। অথচ তখন তাঁর সঙ্গে বসবাস করতেন তাঁর নয়জন সহধর্মিণী।

তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু তালহা বলেছেন, আমরা কয়েকজন একবার রসুল স. এর কাছে গিয়ে জানালাম, আমরা ক্ষুধার্ত। দেখালাম, আমাদের প্রত্যেকের পেটে বাঁধা রয়েছে একটি করে পাথর। তিনি স. দেখালেন, তাঁর পেটে বাঁধা রয়েছে দু'টি পাথর। তিরমিজি একথাও বলেছেন যে, হাদিসটি দুস্প্রাপ্য শ্রেণীর।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান বলেছেন, আমি একবার হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের কাছে বসেছিলাম। এমন সময় তিনজন লোক এসে বললো, হে আবু মোহাম্মদ! আল্লাহ্র শপথ! আমরা খুবই অসমর্থ। আমাদের না আছে কোনো আহার্য, না আছে বাহন। হজরত আবদুল্লাহ্ বললেন, তোমরা কি আমার কাছে কিছু চাও? যদি চাও, তবে আমি তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারবো। সে রকম সামর্থ্য আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন। যদি পছন্দ করো, তবে আমি তোমাদের কথা স্থানীয় প্রশাসককেও জানাতে পারি। আর যদি ভালো মনে করো, তবে ধৈর্যধারণ করো। কেননা আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, মহাবিচারের দিবসে বিত্তহীনেরা বিত্তপতিদের চল্লিশ বৎসর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। একথা শুনে তারা বললো, আমরা তাহলে ধৈর্যই ধারণ করলাম। কারো কাছে কিছু চাইবো না।

আহমদ বর্ণনা করেছেন, হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বলেন, রসুল স. আমাকে যখন ইয়েমেনের শাসক নিযুক্ত করলেন, তখন বললেন, আরাম আয়েশ থেকে দূরে থেকো। আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দারা কখনো সুখ-সম্ভোগে মগ্ন থাকতে পারে না। বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অল্প উপার্জনে আল্লাহ্র প্রতি পরিতুষ্ট থাকে, তার অল্প আমলেই আল্লাহ্ পরিতুষ্ট হন। বাগবী লিখেছেন, একবার হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রোজা রাখলেন, সন্ধ্যায় যখন তাঁর সামনে আহার্য উপস্থিত করা হলো, তখন তিনি বললেন, আমার চেয়ে কতোইনা উত্তম ছিলেন মাসআব ইবনে উমায়ের। শহীদ হওয়ায় তাকে কাফনরূপে দেওয়া হয়েছিলো একটি চাদর। চাদরটি এতো ছোটো ছিলো যে, মাথা ঢেকে দিলে পা অনাবৃত হয়ে পড়তো। আবার পা ঢেকে দিলে উন্মোচিত হয়ে পড়তো মস্তক। বর্ণনাকারী আরো বলেছেন, আমার মনে আছে, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ তখন একথাও

বলেছিলেন যে, শহীদ হামযাও ছিলেন আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর আমাদের জন্য দুনিয়াকে করে দেওয়া হয়েছে প্রশস্ত। কিংবা বলেছেন, আমার তো ভয় হয় যে, আমাদের পুণ্যকর্মসমূহের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হলো কিনা। একথা বলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। আহার করলেন না।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, একবার ওমর ইবনে খাত্তাব আমার হাতে গোশত দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? আমি বললাম, গোশত। খেতে ইচ্ছে করেছিলো, তাই কিনলাম। তিনি বললেন, যা মনে চাইবে, তা-ই ক্রয় করবে? তোমার কি এই আয়াতের ভয় নেই? একথা বলেই তিনি পাঠ করলেন সুরা আহ্কাফের ২০ সংখ্যক আয়াত। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, ওমর তখন আরো বললেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই, যে তার স্বজন-বান্ধবদের জন্য নিজে অভুক্ত থাকে? সম্পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে হজরত ইবনে ওমরের এক বিবৃতিতে। রজীন বর্ণনা করেছেন, হজরত জায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, একবার ওমর ইবনে খাত্তাব পানি পান করতে চাইলেন। তাকে পানি ভর্তি একটি পাত্র এনে দেওয়া হলো। বলা হলো, পানিতে কিছু মধু মেশানো হয়েছে। তিনি বললেন, অবশ্যই এই পানীয় পবিত্র। কিন্তু আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি পার্থিব সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত হবে, সে বঞ্চিত হবে পরকালের সুখ-সম্ভোগ থেকে। এই বলে তিনি পাঠ করলেন 'তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পেয়েছো এবং সেগুলো উপভোগও করেছো। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেওয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি'। আমার তো ভয় হয়, আমাদের পুণ্যকর্মসমূহের প্রতিদান এখানেই দেওয়া হচ্ছে কিনা। এরপর তিনি আর মধুর শরবত পান করলেন না।

www.eelm.weebly.com

সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, জীবন ভোগ করার অর্থ কেবল এরকম নয় যে, আমরা ছোট ছোট ছাগলের গোশত্ ভুনা করবো, ময়দার নরম রুটি তৈরী করবো এবং শুষ্ক আঙ্গুর এতো বেশী সময়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখবো যে, তা হয়ে যাবে চন্দ্রমুখী বকরীর চোখের মতো। তারপর সবগুলোকে একত্র করে সম্পন্ন করবো ভোজন। বরং আমরা চাই যে, সম্ভোগেচ্ছাকে আমরা লালন করবো পরকালের জন্য। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন 'তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পেয়েছো এবং সেগুলো সম্ভোগও করেছো। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেওয়া হবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি'।

কাতাদা বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, এখন আমি চাইলে সবচেয়ে সুস্বাদু খাবার খেতে পারি, পরতে পারি সুন্দর পোশাক। কিন্তু আমি আমার সম্ভোগ প্রবৃত্তিকে পরকালের জন্য প্রতীক্ষারত রাখতে চাই। এক বর্ণনায় এসেছে, খলিফা হজরত ওমর যখন সিরিয়ায় গেলেন, তখন তাঁর জন্য এমন সব সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করা হলো, যা তিনি আগে কখনো চোখেও দেখেননি। তিনি বললেন, এই দরিদ্র মুসলমানদের তাহলে কী হবে যারা জীবনভর যবের রুটিও পেট ভরে খেতে পায় না। হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ বললেন, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

হজরত ওমরের চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। তিনি রোদনজড়িত কণ্ঠে বললেন, তাহলে তো আমার অংশে রইলো তুচ্ছ পদার্থ। আর তারা জান্নাতের অধিকারী হলে তো আমার চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। হামিদ ইবনে হেলাল বলেছেন, জননী হাফসা প্রায় রাতে তাঁর পিতা খলিফা ওমরের গৃহে রাত্রি যাপন করতেন। কিন্তু তাঁর সামনে রাতের খাবার আনা হলে তিনি তা খেতে অস্বীকার করতেন। হজরত ওমর একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার! তুমি আমাদের খাবার খেতে চাও না কেনো? তিনি বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আমার গৃহবাসীরা যে খাবার তৈরী করে তা আপনার খাবারের চেয়ে অনেক নরম। আমি আবার সেই সুস্বাদু খাবার পছন্দ করি। হজরত ওমর তাঁকে স্নেহসিক্ত ভর্ৎসনার স্বরে বললেন তোমার মা তোমার জন্য রোদন করুক! তুমি কি জানো না যে, আমি চাইলে একটা আস্ত মোটা তাজা ছাগল ভুনা করে খেতে পারি। আরো হুকুম দিতে পারি এক সা কিসমিস পানিতে ততোক্ষণ পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখতে, যতোক্ষণ না তা হয়ে যায় হরিণের রক্তের মতো লাল। সেই সত্তার শপথ! যাঁর অলৌকিক অধিকারে রয়েছে আমার জীবন! পরকালের পুণ্য কমে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি নিজের ও তোমাদের জন্য মুখরোচক আহার্যের আয়োজন করতাম।

হাসান বর্ণনা করেছেন, আমি একবার বসরার প্রশাসক হজরত আবু মুসার সঙ্গে খলিফা ওমরের সাহচর্যে উপস্থিত হলাম। কিছুদিন অবস্থান করলাম তাঁর সান্নিধ্যে। দেখলাম, প্রতিদিন তাঁর রুটির সঙ্গে কখনো দেওয়া হয় দুধ, কখনো গোশতের কিমা, আবার কখনো গোশতের ঝোল, কিন্তু সবকিছুর পরিমাণ হতো খুব অল্প। তিনি আমাদেরকে তখন বলেছিলেন, আমার মনে হয়, তোমরা আমার খাবার পছন্দ করো না। আমি চাইলে তো তোমাদের চেয়েও অধিক সুস্বাদু ও মুখরোচক খাদ্য খেতে পারি। জীবন যাপন করতে পারি আরাম আয়াশে। আল্লাহ্র শপথ! আমি জলচর পাখি ও অন্যান্য পাখির গোশতের গুণাগুণ সম্পর্কেও জানি। কিন্তু আল্লাহ্ যে লজ্জায় ফেলে দিয়েছেন ভোজনবিলাসীদের। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'তোমরা তোমাদের পার্থিব সুখ-সম্ভার পেয়েছো এবং সেগুলো উপভোগও করেছো। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেওয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি'।

সূরা আহ্কাফ ঃ আয়াত ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

www.eelm.weebly.com

❑ স্মরণ কর, 'আদ্ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা, যাহার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা আসিয়াছিল। সে তাহার আহ্কাফ্বাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছিল এই বলিয়া, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিও না। আমিতো তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি।'

❑ উহারা বলিয়াছিল, 'তুমি কি আমাদিগকে আমাদের দেব-দেবীগুলির পূজা হইতে নিবৃত্ত করিতে আসিয়াছ? তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।'

❑ সে বলিল, 'ইহার জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্রই নিকট আছে। আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি কেবল তাহাই তোমাদের নিকট প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়।'

❑ 'অতঃপর যখন উহারা উহাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসিতে দেখিল তখন বলিতে লাগিল, 'উহা তো মেঘ আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে।' হূদ বলিল, 'ইহাই তো তাহা, যাহা তোমরা ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছ, এক ঝড়, ইহাতে রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

❑ 'আল্লাহ্র নির্দেশে ইহা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করিয়া দিবে।' অতঃপর উহাদের পরিণাম এই হইল যে, উহাদের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি।

❑ আমি উহাদিগকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলাম তোমাদিগকে তাহা দেই নাই; আমি উহাদিগকে দিয়াছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু উহাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় উহাদের কোন কাজে আসে নাই; কেননা উহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছিল। যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত, উহাই উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল।

তাফসীরে মাযহারী/৫৮৯

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! স্মরণ করুন আপনার পূর্ববর্তী নবী হুদের কথা। তাঁর পূর্বে ও পরে আরো অনেক নবী তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরিত হয়েছিলেন। আর হুদ প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁর আ'দ জাতির জ্ঞাতিভ্রাতা আহ্কাফ্বাসীদের পথপ্রদর্শনার্থে। দুর্বিনীত ও অবাধ্য আহ্কাফ্বাসীদেরকে তিনি বলেছিলেন, অংশীবাদিতা থেকে সতর্ক হও। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উপাসনা কোরো না। আমি তো আশংকা করছি কখন না জানি তোমাদের উপরে এসে পড়ে ভয়ংকর আযাব।

এখানে 'আ'দ সম্প্রদায়ের ভ্রাতা' অর্থ নবী হুদ। 'যার পূর্বে ও পরে সতর্ককারী এসেছিলো' অর্থ তাঁর পূর্বে ও পরে এসেছিলেন আরো অনেক নবী। যেমন পূর্বে নবী নুহ। পরে নবী সালেহ্, নবী ইব্রাহিম, নবী লুত প্রমুখ। 'সতর্ক করেছিলো' অর্থ তাদের অনিষ্ট সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলেন। আর 'ইয়াওমিন আ'জীম' অর্থ মহাদিবস, ভীষণ বিপদের দিন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আহ্কাফের অবস্থান ইয়েমেন ও মেহরার মধ্যবর্তী স্থানে। মুকাতিল বলেছেন, আদ সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ছিলো ইয়েমেন এলাকার মেহরা অঞ্চলের হাজরা মাউত নামক স্থানে। মেহরার উট পৃথিবী প্রসিদ্ধ। আর ওই স্থানের অধিবাসীরা ছিলো ইরম সম্প্রদায়ভূত। কাতাদা বলেছেন, আমাদেরকে জানানো হয়েছে, ইয়েমেনে বসবাস করতো আ'দ নামক এক সম্প্রদায়। সমুদ্রের উপকুলবর্তী উঁচুনিচু বালুকাভূমিতে ছিলো তাদের বসবাস। তাদেরকে ইয়াশজরও বলা হতো।

www.eelm.weebly.com

‘আহ্কাফ্’ শব্দটি ‘হকফ্’ এর বহুবচন। আর ‘হকফ্’ বলা হয় বালুকাময় অঞ্চলকে, যা ক্রমাগত বাঁক খেতে খেতে হয়ে যায় বিস্তীর্ণ প্রান্তর। ইবনে জায়েদ বলেছেন, ‘হকফ্’ হচ্ছে বিস্তীর্ণ বালুকাময় মালভূমি। ক্বারী কাসাই বলেছেন, বিস্তির্ণ বালুকাময় উপকুলকে বলে ‘হকফ্’।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— ‘তারা বলেছিলো, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবীগুলোর পূজো থেকে নিবৃত্ত করতে এসেছো? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছো, তা আনয়ন করো’। একথার অর্থ— হুদের কথা শুনে তারা ক্ষেপে গেলো। বললো, তোমার মতলব কী? তুমি কি আমাদেরকে দিয়েই আমাদের দেব-দেবীগুলোর পূজা অর্চনা বন্ধ করিয়ে দিতে চাও? তোমাকে তো আমরা বিশ্বাসই করি না। ঠিক আছে, সত্যবাদী যদি তুমি হয়েই থাকো, তবে যে শাস্তির ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছো, তা শীগগির নিয়ে এসো। এখানে ‘তুমি নিবৃত্ত করতে এসেছো’ কথাটি ঠিক প্রশ্নবোধক নয়। বরং কথাটি সিদ্ধান্তমূলক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়—বুঝেছি। তুমি চাও, আমরা আমাদের দেব-দেবীদের পূজো পার্বণ বন্ধ করে দেই। ‘ইন্ কুন্তা মিনাস সদিক্বীন’ অর্থ তুমি সত্যবাদী হলে। কথাটি পূর্বোক্ত আয়াতের ‘মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করছি’ এর অনুগামী। সেজন্যেই এখানে ‘ইন্ কুন্তা’ এর জবাবকে প্রচ্ছন্ন রাখার কোনো প্রয়োজন পড়েনি।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— ‘সে বললো, এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্র নিকটে আছে। আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, কেবল তা-ই তোমাদের নিকটে প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়’। একথার অর্থ— হুদ তখন বললেন, বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায়নির্ভর। তিনিই জানেন, কোথায় কখন কীভাবে তিনি তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। সুতরাং তোমাদের কথামতো, অথবা আমার ইচ্ছামতো শাস্তি আসতে পারে না। আমার দায়িত্ব কেবল সত্যের প্রচার। আর তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সত্য গ্রহণ। অথচ তোমরা দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছো। তোমরা তো দেখছি নিতান্তই মূঢ়, অপরিণামদর্শী।

এখানে ‘এর জ্ঞান’ অর্থ কখন শাস্তি আপতিত হবে, তার নির্ধারিত দিনক্ষণ ও প্রকৃতির অবহিতি। অর্থাৎ শাস্তি আসবে আল্লাহ্র ইচ্ছায় নির্ধারিত সময়ে। আমার ইচ্ছায়, অথবা তোমাদের প্রস্তাবানুসারে নয়। আর ‘তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়’ অর্থ তোমরা সত্যি সত্যিই মূর্খ। নতুবা জানতে নবীগণের দায়িত্ব হচ্ছে কেবল সত্যের প্রচার। কাউকে শাস্তি দান, অথবা শাস্তি থেকে অব্যাহতি প্রদান তাদের দায়িত্বভূত কোনো বিষয় নয়। এ সম্পর্কে জানেন কেবল আল্লাহ্।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘অতঃপর তারা যখন তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখলো, তখন বলতে লাগলো, ওই মেঘ তো আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে। হুদ বললো, এটা তো সে-ই, যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছো, এক ঝড়, এতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি(২৪)। আল্লাহ্র নির্দেশে এটা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দিবে। অতঃপর তাদের পরিণাম এই হলো যে, তাদের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রইলো না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি’ (২৫)।

আহ্কাফ্বাসীদেরকে কীভাবে ধ্বংস করা হয়েছিলো, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে। ঘটনাটি ছিলো এরকম— তাদের অঞ্চলে দেখা দিলো খরার প্রচণ্ড প্রকোপ। দীর্ঘ দু'টি বৎসর ধরে চললো একটানা অনাবৃষ্টি। ফলে খাদ্যাভাবে ও গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো তারা। হঠাৎ একদিন তারা দেখতে পেলো আকাশে ভাসছে একখণ্ড কালো মেঘ। ওই মেঘ দেখে তাদের আবালবৃদ্ধবনিতা খুশী হলো খুব। বললো, যাক বাঁচা গেলো। বৃষ্টিপাতের আর বিলম্ব নেই। নিশ্চয় এবার কেটে যাবে দাবদাহ ও অজন্মা। নবী হুদ বললেন, উৎফুল্ল হয়ো না। এই মেঘই তোমাদের সর্বনাশ ঘটাবে। যে শাস্তিকে তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে, এ হচ্ছে সেই শাস্তি। এই মেঘপুঞ্জ থেকেই সৃষ্টি হবে প্রচণ্ড ঝড়। আর ওই ঝড় হবে মারাত্মক ও মর্মন্তুদ। আল্লাহ্র ইচ্ছায় এই ঝড় তোমাদেরকে এবং তোমাদের সবকিছুকে ধ্বংস করে ফেলবে। তাই হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত্যা। তাদের বসতবাটির তৈজসপত্র, গৃহপালিত পশু সবকিছু পঙ্গপালের মতো ঘুরপাক খেতে থাকলো আকাশে। সভয়ে

তারা নিজ নিজ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। তবুও আত্মরক্ষা করতে পারলো না। তুফান অর্গলাবদ্ধ দরজাগুলোকে ভেঙে ফেললো। তারপর তাদেরকে বার বার আছড়াতে লাগলো মাটিতে। এরপর আল্লাহ্র নির্দেশে ঝঞ্ঝাবাহিত বালুকারাশি এসে পড়তে লাগলো তাদের উপর। এভাবে এক সময় বালির স্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে মরে রইলো তারা। ঝড়তুফান তবুও বন্ধ হলো না। প্রবল বেগে বয়ে চললো একটানা সাতদিন আটরাত্রি পর্যন্ত। সাতদিন পর তাদের লাশের উপর থেকে উড়ে গেলো বালুর স্তূপ। তারপর তুফানের শেষ আঘাত তাদের মরদেহগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করলো সমুদ্রে। এক বর্ণনায় এসেছে, নবী হুদ তখন তাঁর বিশ্বাসী অনুচরবর্গকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন অদূরের দুর্ভেদ্য দুর্গসদৃশ এক উপত্যকায়।

বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, মুখগহ্বরে আলজিহ্বা পরিদৃশ্যমান হয়, এভাবে আমি রসুল স.কে কখনো জোরে হাসতে দেখিনি। তাঁর হাসি ছিলো স্মিত। আর তাঁর চেহারায় ভয়ের ছাপ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হতো তখন,

যখন তিনি আকাশে মেঘ জমতে দেখতেন। বাগবী বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, একবার আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! মেঘ দেখলে লোকে খুশী হয়, আশা করে বৃষ্টিপাতের। আর আপনি মেঘ দেখলেই হয়ে যান বিষণ্ন ও চিন্তিত। কারণ কী? তিনি স. বললেন, আয়েশা! মেঘ দেখলেই আমার সেই মেঘের কথা মনে পড়ে। আশংকা হয়, এই মেঘেও না জানি কোন শাস্তি লুকিয়ে রয়েছে। আহ্‌কাফ্‌বাসীরাও তো মেঘ দেখে বৃষ্টি আশা করেছিলো। জননী আয়েশা আরো বলেছেন, ঝড় উঠলে রসুল স. বলতেন, হে আল্লাহ্‌! এ থেকে আমি তোমার কাছে কামনা করি তোমার কল্যাণের। কামনা করি, এর অভ্যন্তরস্থিত কল্যাণেরও। এই বাতাস যা বহন করে এনেছে, আমি প্রার্থনা করি, তা-ও কল্যাণময় হোক। আর আশ্রয় যাচনা করি এর অনিষ্টতা থেকে। মেঘ দেখলে তাঁর মুখমণ্ডলের বর্ণ বদলে যেতো, অস্থির হয়ে গমনাগমন করতেন ঘরে বাইরে। তাঁর এমতো অস্থিরতা শুরু হতো তখন, যখন শুরু হতো বৃষ্টিপাত। আমি একবার তাঁর এরকম অস্থির হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি স. বললেন, আয়েশা! এরকম মেঘ দেখেই তো আহ্‌কাফ্‌বাসীরা বলেছিলো, এই মেঘ আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে? বলেনি? কিন্তু তাদের আশা কি পূরণ হয়েছিলো?

এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বৃষ্টি দেখলে বলতেন, আমি আল্লাহ্‌র অনুকম্পা-প্রত্যাশী। বোখারী, মুসলিম। আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও শাফেয়ী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. মেঘ অথবা ঝড়ের আগমনাভাস দেখতে পেলে সব কাজ ফেলে রেখে সেদিকে মুখ করে বলতেন, হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার কাছে আশ্রয় যাচনা করি ওই অনিষ্টতা থেকে, যা এর মধ্যে রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ঝড়ঝঞ্ঝা শুরু হলে রসুল স. নতজানু হয়ে বলতেন, হে আল্লাহ্‌! একে তুমি তোমার অনুগ্রহে পরিণত করো, একে শাস্তির কারণ বানিয়ো না। শাফেয়ী, বায়হাকী।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দেইনি; আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোনো কাজে আসেনি; কেননা তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলো। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করলো'।

এখানে 'আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম' অর্থ তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম প্রতুল শক্তি ও সম্পদ। 'ইম্‌ মাক্‌কান্‌নাকুম ফীহি' অর্থ তোমাদেরকে তা দেইনি। এখানকার 'ইন্‌' হচ্ছে না-সূচক। অর্থাৎ তোমাদেরকে সেরকম শক্তি ও সম্পদ দেওয়া হয়নি। অথবা 'ইন্‌' এখানে শর্তসূচক, যার প্রতিফল রয়েছে উহ্য। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— তোমাদেরকে তাদের মতো শক্তি-সম্পদ দান করলে তোমাদের ঔদ্ধত্য যেতো অনেক বেড়ে। কিংবা 'ইন্‌' এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— আমি তাদেরকে যে বিষয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন করেছি, তোমাদেরকেও ক্ষমতাসম্পন্ন করেছি সেই বিষয়েই। তবে 'ইন্‌'কে এখানে না-সূচক অর্থে গ্রহণ করাই হবে অধিকতর সঙ্গত। কেননা তাদের বিপুল বিত্তপ্রতিপত্তির কথা অন্য আয়াতে বিধৃত হয়েছে স্পষ্টভাবে। যেমন— জনবল, ধনবল ও চাষাবাদের দিক দিয়ে তারা শক্তিশালী ছিলো। 'কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় তাদের কোনো কাজে আসেনি' অর্থ তারা কান, চোখ, হৃদয় থাকা সত্ত্বেও শুনতে, দেখতে ও বুঝতে চেষ্টা করেনি সত্যকে। এভাবে হয়ে গিয়েছে মহাশাস্তির উপযোগী। আর 'যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করলো' অর্থ নবী হুদ তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় দেখাতেন। কিন্তু তারা ভয় তো করতোই না, উল্টো বরং এই নিয়ে মেতে যেতো হাসি-তামাশায়। অথচ যা নিয়ে তারা মশকরা করতো, সেই ভীষণ শাস্তিই একদিন আপতিত হলো তাদের উপর। ফলে তারা চিরতরে উৎপাটিত হলো এই পৃথিবী থেকে।

সূরা আহ্‌ক্বাফ ঃ আয়াত ২৭, ২৮

❑ আমি তো ধ্বংস করিয়াছিলাম তোমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি উহাদিগকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়াছিলাম, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।

❑ উহারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা উহাদিগকে সাহায্য করিল না কেন? বস্তুত

উহাদের ইলাহ্‌গুলি উহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িল। উহাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এইরূপই।

---

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মক্কাবাসী! ছামুদ সম্প্রদায়, সাদুমবাসী ইত্যাদি দুর্বিনীত জনগোষ্ঠী তো বসবাস করতো তোমাদেরই পাশ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে। আমি তাদের প্রতি সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম। তাদের মাধ্যমে প্রদর্শন করেছিলাম অলৌকিক নিদর্শনাবলী। তবুও তারা সতর্ক হয়নি। ফিরে আসেনি বিশুদ্ধ বিশ্বাসের পথে। সেকারণেই তো আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। কই, তখন তো তাদের মিথ্যা উপাস্যসমূহ তাদেরকে সাহায্য করতে আসেনি, যাদের উপাসনা তারা করতো আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তির মাধ্যম হিসেবে। বরং তাদের সবকিছুই ছিলো কল্পনা ও মিথ্যাচার। আর কল্পনাচরণ ও মিথ্যা উদ্ভাবনের পরিণাম এরকমই হয়।

মূর্তিপূজারীরা তাদের পূজ্য মূর্তিগুলোকে আল্লাহ্ জ্ঞানে পূজা করে না। পূজা করে এই বিশ্বাসে যে, এই দেবীপ্রতিমাগুলো তাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে। তাই এখানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করেছিলো'। তাদের এমতো অপবিশ্বাসের কথা অন্য এক আয়াতে বিবৃত হয়েছে এভাবে 'এসকল প্রতিমা আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ করবে আমাদের মুক্তির জন্য'।

'বস্তুত তাদের ইলাহ্‌গুলি তাদের নিকট থেকে অন্তর্হিত হয়ে পড়লো' কথাটির অর্থ তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলো ছিলো প্রাণহীন। সুতরাং কারো উপকার কিংবা অপকার করবার সাধ্য তো তাদের ছিলোই না। কিন্তু প্রমিতাপূজারীদের ধারণা ছিলো, তারা তাদেরকে সাহায্য করবে। কিন্তু বাস্তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যখন আযাব এসে পড়লো তখন তাদের এমতো অপবিশ্বাস হয়ে গেলো অন্তর্হিত। বিষয়টি তাদের কাল্পনিক দেব-দেবীদের অন্তর্হিত হওয়ার মতোই। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে 'ইলাহ্‌গুলি তাদের নিকট থেকে অন্তির্হিত হয়ে পড়লো' অর্থ আযাব আসার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়ে গেলো তাদের দীর্ঘদিনের পৌত্তলিকতাদুষ্ট অপবিশ্বাস। উল্লেখ্য, কল্পনা ও মিথ্যা ভাবনা বাস্তবের আঘাতে এভাবেই চিরতরে উবে যায়। তাই শেষে বলা হয়েছে— তাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এরূপই (ওয়া জালিকা ইফ্‌কুহুম ওয়ামা কানূ ইয়াফ্‌তারূন)। এখানে 'ইফ্‌কুম' অর্থ মিথ্যা, সত্যদ্রোহিতা। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, এখানে 'জালিকা' (এরূপই) কথাটিতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, মিথ্যাচারিতাই ছিলো তখন তাদের সাহায্য না পাওয়ার কারণ। অর্থাৎ সত্যদ্রোহিতার পরিণতিতেই তারা তখন হয়ে পড়েছিলো আল্লাহ্‌র রোষকবলিত। আর এখানকার 'মা কানু' এর 'মা' হচ্ছে ক্রিয়ামূল।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার নাখলা উপত্যকায় বসে কোরআন আবৃত্তি শুরু করলেন। কয়েকটি জ্বিন

পাশ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে তাঁর কোরআন পাঠ শুনে মুগ্ধ হলো। নিচে নেমে এসে অবাক হয়ে শুনতে লাগলো আল্লাহ্‌র কালাম। তারা সংখ্যায় ছিলো নয়জন। তার মধ্যে একজনের নাম ছিলো রাজবাআ'। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

সূরা আহ্‌ক্বাফ ঃ আয়াত ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

❑ স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম একদল জিন্নকে, যাহারা কুরআন পাঠ শুনিতেছিল। যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল, উহারা বলিল, 'চুপ করিয়া শ্রবণ কর।' যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হইল উহারা উহাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল সতর্ককারীরূপে।

www.eelm.weebly.com

❑ উহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করিয়াছি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে মূসার পরে, ইহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।

❑ 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।'

❑ কেহ যদি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ব্যর্থ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না। উহারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! শুনুন, একবার আমি জ্বিন সম্প্রদায়ের একটি দলকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করে দিলাম। তারা আপনার কাছে এসে আপনার কোরআন পাঠ শুনতে লাগলো। একে অপরকে বললো, চুপ

করে শুনো। আপনার কোরআন পাঠ তারা খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগলো এবং মুগ্ধ হয়ে গেলো। তারপর তাদের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে কোরআনের প্রচার করতে লাগলো।

এখান থেকে শুরু হয়েছে নতুন প্রসঙ্গ এবং এমতো প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে রসুল স.কে সান্ত্বনা প্রদানার্থে। যেনো বলা হয়েছে, হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিকেরা বার বার কোরআনকে প্রত্যাখ্যান করলে কী হবে, জ্বিন সম্প্রদায়ের একটি দল আপনার কোরআন পাঠ শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, কোরআনের এবং আপনার নবুয়তের সংবাদ তারা পৌঁছে দিয়েছে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে।

এখানে 'নাফার' অর্থ দশের কম সংখ্যক ব্যক্তির দল। এর বহুবচন হচ্ছে 'আনফার'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নাসিবীনে ছিলো সাতটি জ্বিন। রসুল স. তাদেরকে ইসলাম প্রচারকরূপে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে তাদের সংখ্যা ছিলো নয়জন। বাগবী লিখেছেন, হজরত যর ইবনে হুবাইশ সূত্রে আসেম বর্ণনা করেছেন, হজরত রাজবাআও ছিলেন ওই নয়জনের মধ্যে। উল্লেখ্য, এ সম্পর্কে সবিস্তার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে সুরা জ্বিনের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'তারা বলেছিলো, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি, যা অবতীর্ণ হয়েছে মুসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে'।

আতা বলেছেন, ওই জ্বিনগুলি ছিলো ইহুদীসম্প্রদায়ভূত। আমি মনে করি, 'যা অবতীর্ণ হয়েছে মুসার পরে', সেই কিতাবের মাধ্যমে তওরাত শরীফের বিধি বিধানসমূহ রহিত করা হয়েছে। এর পূর্বে যবুর, তওরাত ও ইঞ্জিল শরীফের অধিকাংশ বিধান অরহিত অবস্থায় ছিলো। যেমন হজরত ঈসা সম্পর্কে বলা হয়েছে 'যিনি তাকে কিতাব, হেকমত এবং তওরাত-ইঞ্জিলের জ্ঞান দান করেছিলেন' আবার হজরত ঈসার উক্তিরূপে আর এক আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে 'আমি তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছি ওই সকল বস্তু, যা ইতোপূর্বে তোমাদের জন্য অবৈধ ছিলো'।

এখানে 'ইয়াহ্‌দি ইলাল হাক্ক' অর্থ সত্যের দিকে পথপ্রদর্শন করে এবং 'ওয়া ইলা ত্বরীকিম্ মুসতাক্বীম' অর্থ পরিচালিত করে সরল পথের দিকে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে—'হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীদের প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন (৩১)। কেউ যদি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয়, তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। এরাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে' (৩২)।

এখানে 'আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও' অর্থ শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. কর্তৃক আনীত ধর্মমত গ্রহণ করো। 'আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন' অর্থ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আল্লাহ্‌র যে সকল অধিকার লংঘিত হয়েছে, তা তিনি মাফ করে দিবেন। উল্লেখ্য, তওবা করলে বান্দার অধিকার লংঘিত হওয়ার পাপ ক্ষমা করা হয় না। উল্লেখ্য, ওই ধর্মপ্রচারক জ্বিনদের আহ্বানে তাদের সম্প্রদায়ের সত্তর জন একযোগে ইসলাম গ্রহণ করে এবং সকলে মিলে রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়। তিনি স. তখন ছিলেন বুতহায়। তিনি স. তাদেরকে কোরআন পাঠ করে শোনান। ফরজ হুকুমসমূহ পালন করে যেতে বলেন এবং বিরত থাকতে বলেন নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে। আর এই ঘটনার দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. প্রেরিত হয়েছেন জ্বিন ও মানুষ উভয় সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে।

সূরা আহ্‌ক্বাফ ঃ আয়াত ৩৩, ৩৪, ৩৫

---

www.eelm.weebly.com

❑ উহারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সকলের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নাই, তিনি মৃতের জীবন দান করিতেও সক্ষম? বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❑ যেই দিন কাফিরদিগকে উপস্থিত করা হইবে জাহান্নামের নিকট, সেই দিন উহাদিগকে বলা হইবে, 'ইহা কি সত্য নহে?' উহারা বলিবে, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ! ইহা সত্য।' তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, 'শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ তোমরা ছিলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।'

❑ অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর তুমি উহাদের জন্য ত্বরা করিও না। উহাদিগকে যেই বিষয়ে

সতর্ক করা হইয়াছে তাহা যেই দিন উহারা প্রত্যক্ষ করিবে, সেই দিন উহাদের মনে হইবে, উহারা যেন দিবসের এক দণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করে নাই। ইহা এক ঘোষণা, পাপাচারী সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করা হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এই সকল সৃষ্টিতে কোনো ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক এবং এর সংযোগ রয়েছে একটি প্রচ্ছন্ন বাক্যের সঙ্গে। ওই প্রচ্ছন্নতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বিনা চিন্তা-ভাবনায় আল্লাহ্ যে মৃতকে জীবিত করেন, তা অস্বীকার করে কেনো, কেনো এ বিষয়ে ভাবতে চায় না যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আর এমতো মহাস্রষ্টা যিনি, তার কোনো প্রকার ক্লান্তি শ্রান্তি থাকা সম্ভব নয়?

এরপর বলা হয়েছে— 'বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'। একথার অর্থ— সত্তাগতভাবে সর্ববিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলেই তিনি যখন যা ইচ্ছা, তা-ই করতে পারেন। সৃষ্টি করতে পারেন রহস্যময় আকাশসমূহ ও বিশাল পৃথিবীকে। আর এই সুবিশাল কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করলেও তিনি ক্লান্তি-শ্রান্তির সঙ্গে থাকেন সতত সম্পর্কচ্যুত।

পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'যেদিন কাফেরদেরকে উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের নিকট, সেদিন তাদেরকে বলা হবে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ! এটা সত্য। তখন তাদেরকে বলা হবে, শাস্তি আস্বাদন করো। কারণ তোমরা ছিলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী'। একথার অর্থ— যেদিন অবিশ্বাসীদেরকে দোজখের তটদেশে উপস্থিত করানো হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে, এবার বলো, দোজখ কি সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রভুপালনকর্তার শপথ! নিশ্চয়ই দোজখ সত্য। তখন তাদেরকে আদেশের ভঙ্গিতে বলা হবে, কিন্তু তোমরা ছিলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। সুতরাং এখন শাস্তি ভোগ করতে থাকো।

বলা বাহুল্য, 'আমাদের প্রভুপালকের শপথ! এটা সত্য' এরকম স্বীকৃতি তখন তাদের কোনো কাজে আসবে না। কেননা পৃথিবী হচ্ছে ইমান আনার স্থান, আখেরাত নয়। আখেরাতে দেওয়া হবে কেবল কৃতকর্মসমূহের প্রতিফল।

এখানে 'ফা জুকুল আ'জাব' (শাস্তি আস্বাদন করো) কথাটির 'ফা' নৈমিত্তিক। অর্থাৎ 'ফা' এর আগের বাক্য এর পরের বাক্যের নিমিত্ত। দোজখ সত্য হওয়া সত্ত্বেও তারা পৃথিবীতে দোজখকে অস্বীকার করতো। তাই তাদের ওই অস্বীকৃতিই হবে তখন তাদের শাস্তিগ্রস্ত হওয়ার নিমিত্ত। আর ' জুকু' হচ্ছে নির্দেশজ্ঞাপক শব্দরূপ, যার মধ্যে দিয়ে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তীব্র ঘৃণা ও তিরস্কারের।

শেষোক্ত আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'অতএব তুমি ধৈর্যধারণ করো, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রসুলগণ। আর তুমি তাদের জন্য ত্বরা কোরো

www.eelm.weebly.com

না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা যে দিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেই দিন তাদের মনে হবে, তারা যেনো দিবসের একদণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা এক ঘোষণা, পাপাচারী সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করা হবে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! সত্যের পথ বন্ধুর। এটাই আমার শাশ্বত বিধান। সুতরাং আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অসুন্দর আচরণ দৃষ্টে ব্যথিত ও হতোদ্যম হবেন না। বরং আপনার পূর্বের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রসুলগণের মতো সহিষ্ণুতা ও সাহসের সঙ্গে আপন কর্তব্যে অটল থাকাই হবে আপনার জন্য শোভন ও সমীচীন। সুতরাং প্রতিশোধেচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করুন। পৃথিবীর সাময়িক সুখভোগের অবকাশ আমিই তাদেরকে দিয়েছি। অবশেষে শাস্তি তো তাদেরকে পেতেই হবে। তাই বলে, এব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। মহাবিচারের দিবসে আমি তো তাদেরকে যথোপযুক্ত দণ্ডদান করবোই। ওই দিবসের উপায়বিহীনতা দৃষ্টে তাদের মনে হবে, পৃথিবীতে তাদের অবস্থান ছিলো মাত্র এক মুহূর্তের জন্য। অতএব, আপনি কেবল পুনঃপুনঃ তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করতে থাকুন যে, আল্লাহ পাপিষ্ঠদেরকে অতি অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করাবেন। বিশেষ করে অংশীবাদী ও অবিশ্বাসীদের শাস্তি হবে অনন্তকালীন।

এখানে 'উলুল আ'য্মি' অর্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সুদৃঢ় ধৈর্যধারী, নির্ভিক, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। এই 'উলুল আযম' পয়গম্বর কারা, সে বিষয়ে বিদ্বজ্জন তুমুল মতভেদ করেছেন। যেমন ইবনে জায়েদ বলেছেন, প্রত্যেক পয়গম্বরই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, ছিলেন জ্ঞান-বুদ্ধি-সাহসে পূর্ণ ও পরিণত। এমতাবস্থায় এখানকার 'মিনার রসুল' এর 'মিন' হবে বিবৃতিমূলক। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, একমাত্র হজরত ইউনুস ছাড়া অন্য সকল নবীই ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি একবার প্রত্যাদেশ আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেননি। তাই রসুল স.কে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ একস্থানে বলেছেন 'আপনি ইউনুসের মতো হবেন না'। কোনো কোনো আলেম আবার হজরত আদমকেও 'উলুল আযম' পয়গম্বরগণের তালিকা থেকে বাদ দেন। কেননা আল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন 'আমি তাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাইনি'। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'উলুল আযম' হচ্ছেন ওই সকল বার্তাবাহক, যাদের নামোল্লেখ করা হয়েছে সুরা আল ইমরানে। তাঁদের সর্বমোট সংখ্যা আঠারো— যেমন ১. ইব্রাহিম ২. ইসহাক ৩. ইয়াকুব ৪. নুহ ৫. দাউদ ৬. সুলায়মান ৭. আইয়ুব ৮. ইউসুফ ৯. মুসা ১০. হারুন ১১. জাকারিয়া ১২. ইয়াহ্ইয়া ১৩. ঈসা ১৪. ইলিয়াস ১৫. ইসমাইল ১৬. আল ইয়াসা ১৭. ইউনুস এবং ১৮. লুত আলাইহিমুস্ সালাম। আল্লাহ্ তাঁদের সকলের নামোল্লেখের পর বলেছেন 'তারা ওই সকল ব্যক্তি, যাঁদেরকে আল্লাহ্ সঠিক পথ দেখিয়েছেন, আপনি তাঁদের পথের অনুসরণ করুন'।

কালাবী বলেছেন, যাঁদেরকে জেহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো, তাঁরাই উলুল আযম রসুল। কেউ কেউ বলেছেন, এরকম রসুল ছিলেন ছয়জন— ১. নুহ ২. হুদ ৩. সালেহ ৪. লুত ৫. শোয়াইব এবং ৬. মুসা আলাইহিমুস সালাম। সুরা আরাফ ও সুরা শুয়ারায় তাঁদের নাম বিন্যস্ত হয়েছে এভাবেই।

মুকাতিল বলেছেন, 'উলুল আযম' নবী ছিলেন এই ছয় জন— ১. হজরত নুহ । তাঁর সম্প্রদায়ের অকথ্য অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন। ২. হজরত ইব্রাহিম। নমরুদ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলো। তৎসত্ত্বেও তিনি অধৈর্য হননি। ৩. হজরত ইসহাক। তিনি জবেহ হওয়ার আদেশ পেয়েও ধৈর্যচ্যুত হননি। (মুকাতিলের এই মতটি আলেমগণের ঐকমত্যের পরিপন্থী। কেননা জবেহ হওয়ার আদেশ পেয়েছিলেন হজরত ইসমাইল, হজরত ইসহাক নয়)। ৪. হজরত ইয়াকুব। পুত্রবিরহে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি অধৈর্য মনোভাব প্রকাশ করেননি। ৫. হজরত ইউসুফ। তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন কূপে ও কারাগারে অন্তরীণ থাকার সময়। ৬. হজরত আইয়ুব । তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন দীর্ঘ রোগভোগ করা সত্ত্বেও।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং কাতাদার মতে 'উলুল আযম' বাণীবাহকের সংখ্যা পাঁচ জন— যাঁদেরকে দেওয়া হয়েছিলো পৃথক পৃথক শরিয়ত। তাঁরা হচ্ছেন— ১. হজরত নুহ ২. হজরত ইব্রাহিম ৩. হজরত মুসা ৪. হজরত ঈসা এবং ৫. হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স.।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্ উলুল আযম বচনবাহকগণের বিবরণ দিয়েছেন এই আয়াতে 'যখন আমি নবীগণ থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, তোমার কাছ থেকে, নুহ, ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসা থেকে'। এই পাঁচজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে 'আমি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সেই পথই নির্ধারণ করেছি, যার নির্দেশ করেছি নুহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসার প্রতি এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি কোরো না।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি বলেছেন, 'উলুল আযম' পয়ম্বরের সংখ্যা ছয়জন— আদম, নুহ, ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদ আলাইহিমুস সালাম। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন স্বতন্ত্র শরিয়তধারী। তাঁদের পরবর্তী নবীগণ ছিলেন তাঁদেরই শরিয়তের বাহক ও প্রচারক। এদের সকলের পূর্বে ছিলেন কেবল হজরত আদম। তিনি চলতেন তাঁর নিজস্ব শরিয়তানুসারে। বাগবী লিখেছেন, মাসরুক বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা সূত্রে আমি জানতে পেরেছি, রসুল স. বলেছেন, আয়েশা! মোহাম্মদ ও তাঁর পরিবার পরিজনের জন্য পৃথিবীপ্রসক্তি সমীচীন নয়। আল্লাহ্ পূর্ববর্তী উলুল আযম রসুলগণের পৃথিবীবিরাগ পছন্দ

www.eelm.weebly.com

করেছেন। আমাকেও করেছেন তাঁদের মতো। বলেছেন 'সুতরাং আপনিও ধৈর্যধারণ করুন, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ রসুলগণ'। আল্লাহ্‌র শপথ! আমাকে এ নির্দেশ মানতেই হবে। এর অন্যথা হতে পারেই না। সত্যপ্রচারে তাঁরা যেমন শ্রমশীল ছিলেন, আমাকেও শ্রমশীল হতে হবে সেরকমই। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, সেই দৃশ্য এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে, রসুল স. এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করছেন। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা

তাঁকে প্রহারে প্রহারে রক্তাক্ত করলো। আর তিনি তাঁর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছতে মুছতে দোয়া করতে লাগলেন, হে আমার আল্লাহ্‌! তুমি এদেরকে ক্ষমা করে দাও। এরা যে অবুঝ। বোখারী ও মুসলিম।

'তুমি তাদের জন্য ত্বরা কোরো না' অর্থ হে আমার রসুল! আপনি অত্যাচারী কুরায়েশদের দ্রুত শাস্তি কামনা করবেন না। শাস্তি আসবে নির্ধারিত সময়ে। একথার মাধ্যমে অনুমিত হয় যে, দুর্বৃত্ত কুরায়েশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রসুল স. মনে মনে তাদের তাৎক্ষণিক শাস্তির কথা ভাবছিলেন। তাই 'ত্বরা কোরো না' বলে আল্লাহ তাঁকে এমতো ভাবনা থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন।

'সেই দিন তাদের মনে হবে, তারা যেনো দিবসের এক দণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি' অর্থ সেদিনের ভয়াবহতা ও উপায়বিহীনতা দৃষ্টে তাদের পৃথিবীর জীবনের স্মৃতি উবেই যাবে প্রায়। মনে হবে পৃথিবী বলে যেনো কোনোকিছু ছিলোই না।

'এটা এক ঘোষণা' অর্থ এই কোরআন প্রচার করতে হবে। অথবা প্রচার করতে হবে এই কোরআনানুযায়ী ধর্মমত ইসলাম। এখানে 'বালাগুন' (ঘোষণা, সংবাদ) শব্দে তানভীন যুক্ত করা হয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশার্থে। অর্থাৎ এই সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার কাজটি শ্রেষ্ঠ কাজ। আর 'পাপাচারী সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করা হবে' অর্থ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে অনন্তকালের জন্য শাস্তিগ্রস্ত করা হবে না। অবশিষ্টরা হবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহভাজন। একারণেই কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসংশ্লিষ্ট যে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো এই আয়াতের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

সূরা আহ্‌কাফের তাফসীর শেষ হলো আজ ১৩ই জমাদিউল আউয়ালে, ১২০৮ হিজরী সনে। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন, ওয়া সালল্লহু তায়ালা আ'লা খইরি খলক্বিহী মুহাম্মাদিঁউ ওয়া আ'লা আ'লিহী ওয়া আস্‌হাবিহী আজ্‌মায়ীন। আমিন।

সূরা মুহাম্মাদ

এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এতে রয়েছে ৪ রুকু এবং ৩৮ আয়াত।

সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

---

www.eelm.weebly.com

❑ যাহারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে তিনি তাহাদের কর্ম ব্যর্থ করিয়া দেন।

❑ যাহারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করে, আর উহাই তাহাদের প্রতিপালক হইতে প্রেরিত সত্য, তিনি তাহাদের মন্দ কর্মগুলি বিদূরিত করিবেন এবং তাহাদের অবস্থা ভাল করিবেন।

❑ ইহা এইজন্য যে, যাহারা কুফরী করে তাহারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যাহারা ঈমান আনে তাহারা তাহাদের প্রতিপালক প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এইভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাহাদের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন।

❑ অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সহিত যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে তখন উহাদিগকে কষিয়া বাঁধিবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাইবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ইহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে। ইহাই বিধান। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে শাস্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি চাহেন তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করিতে। যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাহাদের কর্ম বিনষ্ট হইতে দেন না।

❑ তিনি তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাহাদের অবস্থা ভাল করিয়া দেন।

❑ তিনি তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার কথা তিনি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যের সৎপথ প্রাপ্তির প্রচেষ্টার অন্তরায় হয়, তাদের ভালো-মন্দ সকল কর্মই আল্লাহ্ নিষ্ফল করে দেন।

এখানে 'আয়্‌মালা' অর্থ ভালো-মন্দ উভয় প্রকার কর্ম। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও সাধারণতঃ ভালো ভালো কাজ করে। যেমন অন্নহীনকে অন্নদান করে, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করে, দাসমুক্ত করে, সজাগ থাকে প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে। কিন্তু তাদের এসকল শুভকর্মগুলোকেও আল্লাহ্ পণ্ড করে দিবেন। তাই পরকালে এসকলের শুভপ্রতিফল তারা পাবে না। কেননা তারা এসকল কর্ম আল্লাহ্‌র পরিতোষ অর্জনার্থে করে না। করে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে। কারণ আল্লাহ্‌কে তো তারা পুণ্যপ্রদাতা এবং শাস্তিদাতা বলে স্বীকারই করে না। অবশ্য আল্লাহ্ সাধারণতঃ তাদের শুভকর্মাবলীর প্রতিফল এই পৃথিবীতেই দিয়ে দেন সুনাম অথবা বিত্তপ্রাচুর্যের আকারে, কিংবা তাদের অহমিকার ইন্ধনরূপে। আর জুহাক এখানকার 'ব্যর্থ করে দেন' কথাটির অর্থ করেন এভাবে— আল্লাহ্ তাদের গোপন অভিসন্ধি অকার্যকর করে দেন। রসুল স. এর বিরুদ্ধাচারীদেরকে তিনি এরকমই করেছিলেন, তাদের প্রতারণার জালে জড়িয়ে দিয়েছেন তাদেরকেই।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যারা ইমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মোহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, আর এটাই তাদের প্রভুপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য, তিনি তাদের মন্দ কর্মগুলি বিদূরিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করবেন (২)। এটা এজন্য যে, যারা কুফরী করে তারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যারা ইমান আনে, তারা তাদের প্রতিপালক প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন' (৩)।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'আললাজীনা আমানু' অর্থ যারা ইমান আনে। একথা বলে ইসলামের সকল বিশ্বাস্য বিষয়াবলীর প্রতি ইমান আনয়নের কথা বলা হয়েছে। বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়েছে রসুল স. কর্তৃক আনীত বিধানাবলীর উপরেও। অর্থাৎ বিশ্বাস্য বিষয় ও শরিয়তের বিধান উভয়ের প্রতি বিশ্বাস না রাখা পর্যন্ত ইমান পূর্ণ হয় না।

'আর এটাই তাদের প্রতিপালক থেকে প্রেরিত' কথাটি এখানে প্রসঙ্গান্তর এবং বাক্যটি প্রয়োগ করা হয়েছে সীমিতকরণ অর্থে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ হবে— শরিয়তে মোহাম্মদী পূর্ববর্তী সকল শরীয়তী বিধানকে রহিতকারী। কিন্তু এই শরিয়ত অন্য শরিয়ত দ্বারা রহিত নয়।

'তাদের অবস্থা ভালো করবেন' অর্থ পৃথিবীতে তাদেরকে নিরাপদ রাখবেন শয়তানের আক্রমণ থেকে। দান করবেন পুণ্যকর্মাবলী সম্পাদনের সামর্থ্য। শত্রুদের উপরে করবেন বিজয়ী এবং পরকালে দান করবেন আল্লাহ্র সন্তোষ ও বেহেশতের সুখ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ আল্লাহ্ তাদেরকে সারাজীবন নিরাপদে রাখবেন।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'যারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহ্র পথ হতে নিবৃত্ত করে' কথাটি বলা হয়েছে মক্কার পৌত্তলিকদের উদ্দেশ্যে, আর 'যারা ইমান আনে তারা তাদের প্রতিপালক প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে' একথা বলা হয়েছে আনসারগণের উদ্দেশ্যে। আমার মতে, কথাটি সাধারণভাবে সকল ইমানদার সম্পর্কেই বলা হয়েছে। তেমনি 'যারা কুফরী করে তারা মিথ্যার অনুসরণ করে' কথাটি মধ্যেও সাধারণভাবে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অন্তর্ভুক্ত। এখানে 'মিথ্যার অনুসরণ করে' অর্থ শয়তানের অনুসরণ করে। আর এখানকার 'এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তার দৃষ্টান্ত প্রদান করেন' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যানুসারী এবং বিশ্বাসীরা সত্যানুগামী— এই দৃষ্টান্তটির দ্বারাই আল্লাহ্ এভাবে বুঝিয়ে দেন সত্য-মিথ্যার প্রভেদ।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'অতএব যখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে মুকাবিলা করো, তখন তাদের গর্দানে আঘাত করো। পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জেহাদ চালাবে, যতক্ষণ না যুদ্ধ এদের অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এটাই বিধান। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়, তিনি কখনো তার কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না'।

এখানে 'গর্দানে আঘাত করো' অর্থ একেবারে শেষ করে দাও। কেননা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আঘাত করলে তাদের মৃত্যু না-ও হতে পারে। অর্থাৎ যুদ্ধকালে কাফেরদেরকে একেবারে হত্যা করে ফেলাই আল্লাহ্র পছন্দ। 'হাত্তা ইজা আছখানতুমূহুম' অর্থ যখন তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে। 'আছ খানতুম' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'ছাখীন' থেকে। 'ছাখীন' অর্থ মজবুত, মোটা। 'ফাশুদ্দুল ওয়াছাক্বা' অর্থ কষে বাঁধবে, যাতে তারা পালাতে না পারে। 'ভীছাক্ব' এবং 'ওয়াছাক্ব' অর্থ এমন বন্ধন, যা কোনো কিছু দিয়ে রচনা করা হয়। 'অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ' অর্থ এরপর ইচ্ছে করলে তাদেরকে দয়া করে মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দিয়ো, অথবা ছেড়ে দিয়ো মুক্তিপণ নিয়ে।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াতের বিধান রহিত হওয়া না হওয়া সম্পর্কে আলেমগণ মতপৃথকতা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াত রহিত হয়েছে অপর দুইটি আয়াতের মাধ্যমে— ১. 'অংশীবাদীদেরকে হত্যা করো, যেখানে তাদেরকে পাও' ২. 'সুতরাং তুমি যদি কখনো তাদেরকে যুদ্ধে পেয়ে যাও, তবে তাদেরকে এমন শাস্তি দাও, যেনো তাদের অনুগামীরা তা দেখে পালিয়ে যায়'। কাতাদা, জুহাক, সুদ্দী ও ইবনে জুরাইজও এরকম বলেছেন। আওযায়ীও এ মতের প্রবক্তা। এক বর্ণনায় এই অভিমতের যোগসূত্র ইমাম আবু হানিফার সঙ্গেও করা হয়েছে। আমার মতে উদ্ধৃত আয়াত দু'টো দ্বারা এই আয়াত রহিত হয়নি।

কেননা এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কেবল প্রায়োগিক পার্থক্য। আর এগুলোর কোনোটি সাধারণার্থক, আবার কোনোটি বিশেষার্থক। কেননা যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী বানানো আলেম ওলামাগণের মতানুসারে এখনো বৈধ। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক। আর সাধারণ বিধানাবলীর মধ্যে যখন কিছুসংখ্যক বিধানকে বিশেষ বিধানরূপে নির্ধারণ করা হয়, তখন অন্য বিধানগুলোও আর সুদৃঢ় থাকে না এবং ধারণপ্রসুত অদৃঢ় বিধান সুদৃঢ় বিধানকে অকার্যকরও করতে পারে না।

অন্যান্য আলেমের মতে আলোচ্য আয়াত রহিত নয়। কেননা বন্দী কাফের পুরুষ ও মানসিক ভারসাম্যসম্পন্ন না হলে খলিফা এই অধিকার সংরক্ষণ করেন যে, তিনি তাকে হয় হত্যা করবেন, না হয় গোলাম বানাবেন, না হয় বন্দী বিনিময় করবেন, নয়তো মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দিবেন। হজরত ইবনে ওমর এবং অধিকাংশ সাহাবী এই অভিমতের প্রবক্তা। হাসান, আতা, সওরী, শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাকেরও সিদ্ধান্ত তাই।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং তাদের শাসনক্ষমতা সুদৃঢ় হয়, তখন অবতীর্ণ হয় 'অতঃপর হয় অনুকম্পা, না হয় মুক্তিপণ'। সুতরাং এ বিধানকে রহিত বলা যায় না। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ। তাছাড়া রসুল স. এবং তাঁর পরবর্তী খলিফাগণ এই বিধানই কার্যকর করেছেন। অর্থাৎ তারা বন্দীদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাদের নিজস্ব অভিপ্রায়ানুসারে। তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন মুক্তিপণ না নিয়ে, অথবা নিয়ে।

আমি বলি, রহিত হয়েছে এই আয়াত 'নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদেরকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশে প্রচুর রক্তপাত ঘটবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো। আর আল্লাহ্ চান আখেরাত। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। কিন্তু 'অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ' এই আয়াত এখানে রহিতকারী। কেননা পূর্ববর্ণিত আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছিলো বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, দ্বিতীয় হিজরীতে। আর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে অনেক পরে, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের বছরে। তখন তিনি স. মুক্তিপণ ছাড়াই কিছু বন্দীকে মুক্ত করে দেন। হজরত আনাস বলেছেন, বর্মসজ্জিত আশিজন তামীম গোত্রীয় লোক রসুল স. ও সাহাবীগণকে পাহাড়ের আড়াল থেকে আক্রমণ করতে চেয়েছিলো। রসুল স. তাদেরকে বন্দী করেন এবং পরে ছেড়ে দেন বিনা মুক্তিপণে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তাদেরকে শেষ পর্যন্ত মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় 'তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন, তাদের উপরে তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ্ তা দেখেন'। মুসলিম। বন্দীদের বিধান সম্পর্কিত হাদিস ও এব্যাপারে আলেমগণের মতভেদসমূহের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে সুরা আনফালের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

'হাত্তা তাদ্বআ'ল হারবু আওযারহা' অর্থ যতোক্ষণ না যুদ্ধ এর অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এখানে 'আওযারাহা' অর্থ অস্ত্রের বোঝা, অস্ত্রশস্ত্র। কথাটির অর্থ— যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর থাকে কেবল মুসলমান। অথবা তখন সন্ধি করার মতো কেউ থাকে না। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'আওযারাহা' অর্থ পাপ। আর 'অস্ত্র নামিয়ে ফেলে' অর্থ যুদ্ধে পরাজিত হলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের পাপের বোঝা নামিয়ে ফেলে। তওবা করে এবং মুসলমান হয়ে যায়। অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে ভালোমতো কতল করো এবং বন্দী করো, যাতে তারা সকলেই নিরুপায় হয়ে হলেও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়।

নিহত হওয়া, আহত হওয়া, বন্দী হওয়া, বিনা পণে বা পণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া এসকল কিছুকে আল্লাহ্ যুদ্ধের বিয়োগফল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যুদ্ধের গতানুগতিক পরম্পর্য যেনো শেষ হয়ে যায়। আর বিধর্মীদের শক্তি খর্ব হয়ে গেলে ধর্মযুদ্ধ এমনিতেই শেষ হয়ে যায়। হজরত ঈসার পুনরাবির্ভাবের পর এরকমই ঘটবে। হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সব সময় সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে। আর যুদ্ধে জয়লাভ করবে তারাই। এমনকি এই দলের শেষ ব্যক্তিটিও যুদ্ধ করবে দাজ্জালের সাথে। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার আবির্ভাবের পর জেহাদ শুরু হয়েছে। এমনকি আমার উম্মতের শেষ ব্যক্তিটিও দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

'এটাই বিধান এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন' কথাটির অর্থ হে বিশ্বাসীগণ! আযাব-গজব নামিয়ে দিয়ে অথবা যে কোনোভাবে যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ধ্বংস করে দিতে তো পারেনই। কিন্তু তাতে তোমাদের লাভ কী? তোমরা তাহলে জেহাদের সওয়াব ও মিথ্যা নিশ্চিহ্ন করার আনন্দ পাবে কেমন করে? আর 'তিনি চান, তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে' কথাটির অর্থ— কিন্তু জেহাদকে তিনি চান উভয়ের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করতে। অর্থাৎ বিশ্বাসীরা যেনো যুদ্ধের পরীক্ষার মাধ্যমে লাভ করতে পারে পুণ্য। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কারো কারো যেনো চৈতন্যোদয় ঘটে, মিথ্যার অসারতা ও সত্যের শক্তিমত্তা দেখে তারা যেনো হয়ে যেতে পারে মুসলমান, আর অবশিষ্টরা যেনো হয় দোজখের শাস্তির উপযোগী। সারকথা, আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যে কোনো মুহূর্তে ধ্বংস করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও জেহাদের হুকুম দিয়েছেন একটি মহৎ উদ্দেশ্যে। আর ওই মহৎউদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়কে পরীক্ষা করা। আর এখানকার 'যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়, তিনি কখনো তার কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না' অর্থ তাদের পাপের কারণে তাদের পুণ্যকর্মসমূহকে আল্লাহ্ নষ্ট করেন না। বরং তাদের পাপসমূহকে তিনি মার্জনা করেন এবং দান করেন পুণ্যকর্মসমূহের প্রতুল পুরস্কার।

ইস্পাহানীর 'তারগীব' নামক পুস্তকে এবং হজরত আনাস থেকে বাযযার ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, শহীদ তিন রকমের— ১. ওই

লোক, যে তার জীবন ও সম্পদ নিয়ে পুণ্যের আশায় লড়াই করবার জন্য মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্র পথে জীবন উৎসর্গ করতে বের হয়। সে নিহত হলে তার পাপসমূহ মার্জনা করা হবে, তাকে রক্ষা করা হবে কবরের শাস্তি ও কিয়ামতের দিবসের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা থেকে, তাকে পরানো হবে মর্যাদাপূর্ণ পোশাক, মস্তকে পরানো হবে সম্মানের মুকুট

এবং তাকে যুগলবন্দী করা হবে বেহেশতের সুলোচনা হুরীদের সঙ্গে। ২. ওই ব্যক্তি, যে তার জানমাল নিয়ে পুণ্যলাভ ও জয়ের আশায় যুদ্ধ যাত্রা করে, তৎপর নিহত হয়। তাকে সঙ্গী করা হবে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্‌র। বিশ্বস্ত মজলিসে তাকে দান করা হবে রাজকীয় আসন। আর সে সন্নিধান পাবে আল্লাহ্‌র। ৩. ওই জন, যে তার জান-মাল নিয়ে পুণ্য অর্জনার্থে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয় এই মনোভাব নিয়ে যে, প্রথমে শত্রুনিধন করবে, তারপর নিহত হবে নিজে। এরকম শহীদ যারা, তারা মহাবিচারের দিবসে উপস্থিত হবে তাদের কাঁধের উপর তলোয়ারের ঝনঝৎকার শব্দ তুলে। লোক সকল উপবিষ্ট থাকবে নতজানু হয়ে। তখন সে তেজস্বী কণ্ঠে বলবে, আমি আল্লাহ্‌র পথে রক্ত ও সম্পদ দিয়েছি। সুতরাং আমার জন্য সুপ্রশস্ত জায়গা ছেড়ে দাও। এরপর সকল শহীদ মিলে আরশের নিচে উপস্থিত হবে এবং উপবেশন করবে নূরের মিম্বরে। নিশ্চিন্তে অবলোকন করতে থাকবে অন্যদের বিচার। কোনো ভয়ভীতি তাদের থাকবে না। মৃত্যুচিন্তা, শাস্তির আশংকা, ইসরাফিলের শিঙ্গাধ্বনি, মীযান, হিসাব, পুলসিরাত কোনো কিছুই তাদেরকে দুশ্চিন্তিত করতে পারবে না এতোটুকুও। তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। কবুল করা হবে প্রার্থনা। তাদেরকে থাকতে দেওয়া হবে তাদের পছন্দমতো স্থানে জান্নাতের যে কোনো জায়গায়।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, আমার কাছে এই সংবাদটি পৌঁছেছে যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উহুদ যুদ্ধের সময়, যখন মুসলমানদের অনেকেই শহীদ হয়েছিলেন এবং শত্রুদের অর্তকিত আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিলো মুসলিম সেনারা, আর মুশরিকেরা বিজয়ের আনন্দে চীৎকার করে বলতে শুরু করেছিলো 'হুবল দেবতার জয়' 'হুবল দেবতার জয়'। মুসলমানেরা তাদের হতোদ্যমতা তাৎক্ষণিকভাবে কাটিয়ে উঠে জবাব দিয়েছিলো আল্লাহ্‌ মহান, আল্লাহ্‌ই সর্বোচ্চ। তারা বলেছিলো, আমাদের উজ্জা দেবী রয়েছে, তোমাদের কোনো উজ্জা নেই। রসুল স. তখন তাঁর সাহাবীগণকে বলেছিলেন, তোমরা বলো আল্লাহ্‌ আমাদের অভিভাবক, তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'তিনি তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌ তাদেরকে পৃথিবীতে সৎপথে পরিচালিত করবেন এবং পরকালে দান করবেন সমুচ্চ মর্যাদা। আর ইহ-পরকাল উভয় স্থানে তাদেরকে রাখবেন উত্তম অবস্থায়। পৃথিবীর উত্তমতা এই হবে যে, যে সকল ধর্মযোদ্ধা শহীদ হয়নি, তাদেরকে করা হবে শহীদগণের তালিকাভূত এবং শাহাদতের পুণ্যও দেওয়া হবে তাদেরকে। কেননা

তারাও শহীদ হওয়ার ইচ্ছা নিয়েই গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলো। শেষে এমন হবে যে, যারা শহীদ হয়েছিলো এবং যারা তা হয়নি, তাদের উভয়ের পাপসমূহ আল্লাহ্‌ ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের পুণ্যকর্মসমূহকে কবুল করে নিবেন। আর তাদের উপর যদি কারো দাবি দাওয়া থাকে তবে আল্লাহ্‌ তাদেরকে নিজ উদ্যোগে পুণ্য ও প্রতিদান দিয়ে রাজী করাবেন।

আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' পুস্তকে হজরত সহল ইবনে সা'দ সূত্রে, বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে এবং বায্যার হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে তিন ধরনের লোকের পক্ষ হয়ে আল্লাহ্‌ তাদের ঋণ পরিশোধ করবেন— ১. ওই ব্যক্তি যে আশংকা করে শত্রুরা মুসলিম দেশে আক্রমণ করবে, এমতাবস্থায় অস্ত্র ক্রয় করার সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও যে ঋণ করে অস্ত্র কিনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে, তারপর ঋণ পরিশোধ করার আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে। আল্লাহ্‌ তার ঋণ পরিশোধ করবেন নিজে। ২. ওই ব্যক্তি, যে তার মৃত ভ্রাতার কাফন ঋণ করে কেনার পর ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য লাভের আগেই মৃত্যুরবণ করে, তাঁর ঋণও শোধ করে দিবেন আল্লাহ্‌ এবং ৩. ওই লোক, যে ব্যভিচারের ভয়ে ঋণ করে বিবাহ করে, কিন্তু মরে যায় ঋণ শোধ হওয়ার আগেই, তার ঋণও পরিশোধ করবেন আল্লাহ্‌ স্বয়ং।

উত্তম সূত্রপরম্পরায় তিবরানী তাঁর 'আল আওসাত' পুস্তকে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচার দিবসের বিচারপর্ব শেষ হওয়ার পর যখন জান্নাতী ও জাহান্নামীদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়ে যাবে, তখন এক ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ! পরস্পরের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে আপোষ করে নাও। তোমাদের দাবি দাওয়া সম্পর্কিত প্রতিদান রয়েছে এখন আল্লাহ্‌র দায়িত্বে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন'।

জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে কোনো পথপ্রদর্শক ছাড়াই। তাদের আবাসভবনগুলোই তাদেরকে যেনো হাতছানি দিয়ে ডাকবে। যখন তারা আপন আপন এলাকায় প্রবেশ করে, তখন তাদের মনে হবে, এখানে তারা জন্মের পর থেকেই বসবাস করে আসছে। পৃথিবীবাসীরা যেমন পথ প্রদর্শক ছাড়াই নিজ বাড়িতে পরিবার পরিজন ও দাস-দাসীদের কাছে পৌঁছে যায় এবং সকলকেই মনে হয় ঘনিষ্ট ও পরিচিত, তার চেয়েও অধিক ঘনিষ্ট ও চেনা মনে হবে তাদের বেহেশতের বসতবাটি, হুর ও পরিচারকগণকে। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার জান্নাতে দাখেল হওয়ার বিষয়ে এরকমই বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যিনি আমাকে সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ! দুনিয়াতে তোমরা নিজেদের স্ত্রী ও পরিজনবর্গের নিকটে ততোবেশী পরিচিত নও, যতো বেশী পরিচিত একজন জান্নাতবাসী তাদের সেখানকার সঙ্গিনী ও স্বজন সম্পর্কে। একটি দীর্ঘ হাদিসের

www.eelm.weebly.com

সূত্রে ইবনে যোবায়ের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আল বাআ'ছ' পুস্তকে। আরো বর্ণনা করেছেন তিবরানী, আবুল আলিয়া প্রমুখ।

সূরা মুহম্মাদ ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

❑ হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করিবেন।

❑ যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাহাদের কর্ম ব্যর্থ করিয়া দিবেন।

❑ ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহা অপসন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ্ উহাদের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দিবেন।

❑ উহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই এবং দেখে নাই উহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হইয়াছে? আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন এবং কাফিরদের জন্য রহিয়াছে অনুরূপ পরিণাম।

❑ ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ তো মু'মিনদের অভিভাবক এবং কাফিরদের তো কোন অভিভাবকই নাই।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্র মনোনীত ধর্মকে শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং ইসলামে তোমাদের অবস্থানকে করবেন অধিকতর সুদৃঢ়।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন'।

এখানে 'ফাতা'সাল্ লাহুম' অর্থ তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে অনেক দূরে। আবুল আলিয়া বলেছেন, 'তা'সান' অর্থ পরাজিত, পতিত। জুহাক অর্থ করেছেন— ব্যর্থতা,

অকৃতকার্যতা। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এর অর্থ বিক্ষিপ্ত, বিস্রস্ত, পরাজিত। ফার্‌রা বলেছেন, শব্দটি ক্রিয়ামূল এবং এই বাক্য প্রার্থনামূলক। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এর অর্থ পৃথিবীতে হোঁচট খাওয়া এবং পরকালে দোজখে পতিত হওয়া। যে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, তাকে সাধারণতঃ কেউ ওঠাতে চায় না। একেই বলে 'তা'সান'। কামুস অভিধানে বলা হয়েছে, শব্দটির অর্থ বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া, হোঁচট খাওয়া, পতিত হওয়া, পাপমগ্ন হওয়া, দূরে সরে যাওয়া। আর এখানকার 'আদ্বল্লা আ'মালাহুম' অর্থ তিনি তাদের কর্ম বা অর্জন ব্যর্থ করে দিবেন।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন'। একথার অর্থ— তারা দুর্ভোগকবলিত ও অসফল হবে একারণে যে, তারা কোরআন পছন্দ করে না। এর কারণ হচ্ছে, এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র আনুরূপ্যহীন এককত্বসমৃদ্ধ বিশুদ্ধ বিশ্বাসের কথা, রয়েছে এমন আদেশ-নিষেধ, যা তাদের অপবিত্র ও স্থূল কামনা বাসনার বিরুদ্ধে।

উল্লেখ্য, আগের আয়াতে বলা হয়েছে 'তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন' আর এখানে বলা হলো 'আল্লাহ্ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন'। পুনঃপুনঃ একথা উল্লেখ করায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, তাদের ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টি অনিবার্য।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফেরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম (১০)। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ তো মুমিনদের অভিভাবক এবং কাফেরদের তো কোনো অভিভাবক নেই' (১১)।

এখানে 'তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি' অর্থ মক্কার অংশীবাদীরা কি বিদেশ ভ্রমণ করেনি? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর যোগ রয়েছে একটি অনুক্ত বক্তব্যের সঙ্গে। ওই অনুক্ততাসহ কথাটি দাঁড়ায়— তারা কি কখনো ঘর থেকে বের হয়নি, ভ্রমণ করেনি কি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে? 'দাম্মারল্লহু আ'লাইহিম' অর্থ আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। 'কাফেরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম' অর্থ আগের যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের যে দুর্দশা হয়েছিলো, তার চেয়ে অধিক দুর্দশাগ্রস্ত হবে মক্কার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। 'বি আন্নাল্লহা মাওলাল্ লাজীনা আমানূ' অর্থ আল্লাহ্ তো বিশ্বাসীদের অভিভাবক। আর 'আন্নাল কাফিরীনা লা মাওলা লাহুম' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের তো কোনো অভিভাবকই নেই। উল্লেখ্য, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক বলেই বিশ্বাসীরা ইসলামের উপরে দৃঢ়পদে থাকতে পারে। বেঁচে থাকতে পারে শয়তানের প্ররোচনা থেকে। যেমন এক আয়াতে শয়তানকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেছেন, 'আমার প্রকৃত বান্দাদের উপর তোমার কোনো প্রভাব খাটবে না'।

সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ১২, ১৩, ১৪, ১৫

❑ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যাহারা কুফরী করে উহারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে; আর জাহান্নামই উহাদের নিবাস।

❑ উহারা তোমার যে জনপদ হইতে তোমাকে বিতাড়িত করিয়াছে তাহা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল; আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি এবং উহাদিগকে সাহায্যকারী কেহ ছিল না।

❑ যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালক প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তাহার ন্যায় যাহার নিকট নিজের মন্দ কর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যাহারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে?

❑ মুত্তাকীদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্তঃ উহাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেথায় উহাদের জন্য থাকিবে বিবিধ ফলমূল আর তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ

www.eelm.weebly.com

হইতে ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাহাদের ন্যায় যাহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে এবং যাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি যাহা উহাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং পুণ্যকর্ম করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতের এমন উদ্যানবিশিষ্ট আবাস দান করবেন, যার পাদদেশে রয়েছে বহমান নদী। আর অবিশ্বাসীদের পরিণতি হবে ঠিক এর বিপরীত। তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জাহান্নামের জ্বলন্ত হুতাশনে। কেননা তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে, ভোগ বিলাসে মগ্ন থাকে এবং উদরপূর্তি করে চতুস্পদ জন্তুদের মতো।

এখানে 'ইয়াতামাত্তাউ'না' অর্থ ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে। 'কামা তা'কুলুল আনআ'ম' অর্থ জন্তু-জানোয়াররের মতো উদরপুর্তি করে। আর 'মাছওয়ান' অর্থ নিবাস, আবাস, বাসস্থান।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তারা তোমার যে জনপদ থেকে তোমাকে বিতাড়িত করেছে, তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কতো জনপদ ছিলো; আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে সাহায্যকারী কেউ ছিলো না'।

মক্কার পৌত্তলিকেরা রসুল স.কে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করতে থাকে। এক সময় তাদের অত্যাচার এমন চরমে পৌঁছে যায় যে, তিনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। হিজরত করে চলে যান মদীনায়। সেকারণেই আলোচ্য আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে 'তারা তোমার যে জনপদ থেকে তোমাকে বিতাড়িত করেছে'।

'কা আয়্যিম্ মিন ক্বরইয়াতিন হিয়া আশাদ্দু কুওওয়াতান' অর্থ তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কতো জনপদ ছিলো। এখানে 'ক্বরইয়াতি' অর্থ জনপদের অধিবাসী। এখানে সম্বন্ধ পদকে লোপ করা হয়েছে এবং সম্বন্ধ পদের বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে সম্বন্ধকৃতের উপর। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— মক্কার পৌত্তলিকদের চেয়েও ওই সকল জনপদের অধিবাসীরা অধিক শক্তিশালী ছিলো। যেমন আ'দ, ছামুদ, সাদুমবাসী প্রভৃতি। 'আহলাকনাহুম' অর্থ আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি। আর 'ফালা নাসিরা লাহুম' অর্থ তাদেরকে সাহায্যকারী কেউ ছিলো না।

আবু ইয়ালা সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, গভীর নিশিথে যখন রসুল স. মক্কা ত্যাগ করে ছওর গুহার দিকে যাত্রা করলেন, তখন পুনঃপুনঃ কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগলেন, হে আমার জন্মভূমি! তুমি আমার কাছে পৃথিবীর সকল শহরের চেয়ে অধিক প্রিয়। পৌত্তলিকেরা বাধ্য না করলে আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতাম না। তাঁর এমতো বিলাপের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তার ন্যায়, যার নিকট নিজের মন্দকর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে'।

এখানে 'সে কি তার ন্যায়' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ বর্ণিত দল দু'টো কখনো একরকম হতে পারে না। কেননা বিশ্বাসীদের অভিভাবক আল্লাহ্ এবং অবিশ্বাসীরা অভিভাবকহীন। বিশ্বাসীরা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং অবিশ্বাসীরা প্রতিষ্ঠিত কুপ্রবৃত্তিজাত বাসনা কামনার উপর। সে কারণেই তাদের চোখে তাদের নিজেদের কর্মাবলীকেই সুন্দর বলে মনে হয়। সুতরাং কস্মিনকালেও এই দু'টো দল সম্মিলিত হতে পারে না।

এখানে 'বাইয়্যিনাত' অর্থ সুস্পষ্ট প্রমাণ— প্রত্যাদেশাগত, পরম্পরাগত, অথবা শুভ বুদ্ধিসম্ভূত, যেরকমই হোক না কেনো। 'যার নিকট মন্দকর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয়' অর্থ যার কাছে মূর্তিপূজা ও অন্যান্য অশ্লীল কর্ম সুন্দর বলে মনে হয় প্রবৃত্তি অথবা শয়তানের প্ররোচনায়। আর 'যারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে' অর্থ যারা ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভ এবং সত্য-অসত্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না। জীবন যাপন করে মন যেভাবে চায়, সেভাবে।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'মুত্তাকীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত, তাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর'।

এখানে 'মাছালুল জান্নাতি' অর্থ জান্নাতের দৃষ্টান্ত বা বেহেশতের বিস্ময়কর অভিব্যক্তি। বাক্যটি এখানে উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ইতোপূর্বে বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, এখন উপস্থাপন করা হয়েছে সেই জান্নাতের বিবরণ।

পৃথিবীতে পানি, দুধ, মধু কোথাও বেশীদিন আবদ্ধ করে রাখলে তা দূষিত হয়ে পড়ে এবং হয়ে যায় পানের অযোগ্য। কিন্তু বেহেশতের পানি ও দুধের নহর কখনোই সেরকম হবে না। সব সময় থাকবে পবিত্র, নির্মল ও সুস্বাদু। সুরা ও মধুর নহরগুলোর অবস্থাও হবে সেরকমই। তাই এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে— বেহেশতে আছে এমন পানি, দুধ ও মধুর নহর যেগুলো থাকবে সতত নির্মল। অর্থাৎ সেখানকার পানি, দুধ, সুরা ও মধু হবে অত্যন্ত স্বাদবিশিষ্ট, সুস্বাদু ও পরিশোধিত।

www.eelm.weebly.com

এখানকার 'লাজ্‌জাতিন' হচ্ছে উপমিত বিশেষণ। তাই 'লাজিজ' অর্থ দাঁড়ায় স্বাদু বা সুস্বাদু। এর পুংলিঙ্গ হচ্ছে 'লাজ্বজুন'। অথবা ক্রিয়ামূল এবং সম্বন্ধপদ রয়েছে উহ্য। এভাবে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় স্বাদবিশিষ্ট, আনন্দদায়ক। অর্থাৎ স্বাদে গন্ধে ভরপুর। উল্লেখ্য, বেহেশতের সুরা হবে পবিত্র ও চিত্তপ্রফুল্লকর, পৃথিবীর সুরার মতো অপবিত্র, ক্ষতিকর ও মত্ততা আনয়নকারী নয়।

'আসালিম্‌ মুসাফ্‌ফা' অর্থ পরিশোধিত মধু, যাতে থাকবে না মৃত মৌমাছি, মোম অথবা অন্য কোনো কিছুর গন্ধ অথবা মিশ্রণ। হজরত মুয়াবিয়া ইবনে হিদাহ্‌ বলেছেন, আমি নিজে রসুল স.কে বলতে শুনেছি, বেহেশতে রয়েছে পানি, দুধ,

সুরা ও মধুর দরিয়া। তিরমিজি, বায়যাবী। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতের নহরগুলো হবে মেশকের সুরভিযুক্ত এবং সেগুলো প্রবাহিত হবে সেখানকার পর্বতমালা ভেদ করে। ইবনে হাব্বান, হাকেম, বায়হাকী, তিবরানী, ইবনে আবী হাতেম। মাসরুক বলেছেন, জান্নাতের নদীগুলো গর্ত বা নালা দিয়ে প্রবাহিত হবে না, প্রবাহিত হবে সমতল ভূমির উপর দিয়ে। ইবনে মোবারক, বায়হাকী।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা ভাববে জান্নাতের নদীগুলো খাদে প্রবাহিত। আসলে তা নয়। আল্লাহ্‌র শপথ! ওই নদীগুলো প্রবাহিত হবে সমতলভূমির উপর দিয়ে। ওগুলোর দু'পাশে থাকবে মোতির তাঁবু এবং সেখানকার মাটি হবে মেশকের সুরভিসংযুক্ত।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সিহুন, জিহুন, নীল ও ফোরাত নদী বেহেশত থেকেই এসেছে। মুসলিম। হজরত আমর ইবনে আউফ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, চারটি নদী এসেছে জান্নাত থেকে— নীল, ফোরাত, জিহুন ও সিহুন। আর চারটি পাহাড় হচ্ছে জান্নাতের পাহাড়— উহুদ, তুর, লবনান ও উরকান। হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, জান্নাতের নীল হচ্ছে মধুর নহর, দজলা দুধের, ফোরাত সুরার এবং সিহুন পানির। বায়হাকী। কা'ব আহবারের এমতো বিবৃতি উল্লেখ করার পর বাগবী মন্তব্য করেছেন, জান্নাতের সব কয়টি নহর কাওসার থেকে প্রবহমান।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিভিন্ন ফলমূল, আর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দুনিয়ায় এমন কোনো ফল নেই যা জান্নাতে পাওয়া যাবে না— তিক্ত-মিষ্ট যেরকমই হোকনা কেনো। এমনকি মাকাল ফলও সেখানে পাওয়া যাবে। ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মুনজির। তিনি আরো বলেছেন, পৃথিবীতে রয়েছে কেবল জান্নাতের ফলগুলোর নাম। এখানকার বর্ণ-গন্ধ-স্বাদ কোনোটাই সেখানকার ফলের বর্ণ-গন্ধ-স্বাদের মতো নয়। হজরত সওবান বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, জান্নাতবাসীরা সেখানকার কোনো গাছ থেকে ফল পেড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দেখা দিবে নতুন ফল।

'ওয়া মাগফিরাতুম্‌ মির রব্বিহিম' অর্থ আর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাদের উপর আর কখনো অপরিতুষ্ট হবেন না। এরকম কখনোই হবে না যে, তিনি কখনো পরিতুষ্ট হবেন, আবার কখনো হবেন অপরিতুষ্ট।

এরপর বলা হয়েছে— 'মুক্তাক্বীরা কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিবে'।

এখানে 'যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে' কথাটি একটি উহ্য উদ্দেশ্যের বিধেয়। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়াবে— চিরকাল যে জান্নাতে থাকবে, সে কি এমন ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে চিরকাল থাকবে জাহান্নামে। এখানে 'কামান হুয়া' শাব্দিক দিক দিয়ে, বা শব্দ হিসেবে একবচন। সেকারণেই 'হুয়া' (সে) সর্বনামটি একবচন শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে 'মান' হচ্ছে বহুবচন। সেজন্যই 'সুকু' এর সর্বনাম আনা হয়েছে বহুবচনে। আর এখানকার 'যা তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে' অর্থ ফুটন্ত পানি পান করার ফলে তাদের নাড়ি-ভূঁড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে বের হয়ে যাবে পায়ুপথ দিয়ে।

ইবনে জুরাইজ সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, রসুল স. সকাশে মুমিন-মুনাফিক সকলেই সমবেত হতো। মুমিনেরা তাঁর কথা শুনতো খুব মনোযোগের সঙ্গে এবং মুনাফিকেরা হয়ে যেতো অমনোযোগী। তাই তারা রসুল স. এর বক্তব্য মনে রাখতে পারতো না। পরে তারা মুমিনগণকে জিজ্ঞেস করতো, আজ কী বিষয়ে যেনো আলোচনা হলো? এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত। বলা হয়েছে—

সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

❑ উহাদের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করে, অতঃপর তোমার নিকট হইতে বাহির হইয়া যাহারা জ্ঞানপ্রাপ্ত তাহাদিগকে বলে, 'এইমাত্র সে কী বলিল?' ইহাদের অন্তর আল্লাহ্ মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারা নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে।

❑ যাহারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাহাদের সৎপথে চলিবার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে মুত্তাকী হইবার শক্তিদান করেন।

❑ উহারা কি কেবল এইজন্য অপেক্ষা করিতেছে যে, কিয়ামত উহাদের নিকট আসিয়া পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো আসিয়াই পড়িয়াছে। কিয়ামত আসিয়া পড়িলে উহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে কেমন করিয়া!

❑ সুতরাং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! কিছুসংখ্যক লোক এরকম ঃ যারা আপনার মজলিশে বলে আপনার কথা শোনে, তারপর বাইরে গিয়ে আপনার খাঁটি সহচরবর্গকে বসে, একটু আগে কী বিষয়ে যেনো আলোচনা হলো? মনে রাখবেন, ওই লোকগুলো কপটাচারী। আল্লাহ্ তাদের হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তারা অনুসরণ করে তাদের কুপ্রবৃত্তিজাত কামনা বাসনার।

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। তারা রসুল স, এর পবিত্র সান্নিধ্যে বসে তাঁর বক্তব্য শুনতো বটে, কিন্তু প্রদর্শন করতো প্রচ্ছন্ন উন্নাসিকতা এবং অবহেলা। তাই তারা ইচ্ছে করেই রসুল স. এর কথা মনে রাখতো না। অথবা তারা তাদের খেয়াল-খুশী মতো রসুল স. এর কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতো না।

এখানে 'আনিফা' অর্থ এইমাত্র, এখনই, 'আনিফা শাইউন' অর্থ কোনোকিছুর অগ্রাংশ। নাসিকাকে 'আন্‌ফ্' বলা হয় একারণেই। উল্লেখ্য, মুনাফিকদের 'এইমাত্র সে কী বললো' এরকম বলতো জ্ঞানার্জনের জন্য নয়, বরং এরকম বলতো তারা উপহাসার্থে।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের সৎপথে চলবার শক্তিবৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাক্বী হবার শক্তিদান করেন'। এ কথার অর্থ— যারা সঠিক পথে থাকে আল্লাহ্ তাদেরকে সঠিক পথে চলবার শক্তি বাড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌ভীরু বা সাবধানী হবার সামর্থ্য দান করেন।

এখানে 'মুত্তাক্বী হবার শক্তিদান করেন' অর্থ তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেন দোজখ থেকে মুক্ত থাকার উপায়সমূহ। সাঈদ ইবনে যোবায়ের কথাটির অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ তাদেরকে দান করেন তাদের সৎকর্ম ও সতর্কতার পুরস্কার।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'তারা কি কেবল এজন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে! কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে'?

এখানে 'তারা কি কেবল এজন্য অপেক্ষা করছে' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। আর এখানে 'তারা বলে' বুঝানো হয়েছে মক্কার পৌত্তলিকদেরকে, যারা কিয়ামত বিশ্বাস করতো না। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মক্কার পৌত্তলিকেরা কিয়ামত

www.eelm.weebly.com

বিশ্বাস করে না। তাই বার বার প্রশ্ন করে, কিয়ামত কখন আসবে? হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, কিয়ামত চাক্ষুষ করলে কি তোমরা ইমান আনবে? কিন্তু তখন তো ইমান আনলেও তো কোনো লাভ হবে না। কেননা তখন বন্ধ হয়ে যাবে তওবার তোরণ। আর তখন আনুগত্য করার অবকাশও তো তোমরা পাবে না। তওবা করার সময় তো এখনই। এখনো সময় আছে, সাবধান হও। কারণ কিয়ামতের লক্ষণসমূহের মধ্যে কিছু কিছু তো ইতোমধ্যে প্রকাশ পেয়েছেই, অন্যগুলোও প্রকাশের বিলম্ব আর নেই।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক অপেক্ষা করতে থাকে এমন বিত্তশালী হবার যা উদ্ধত করে দেয়, এমন দারিদ্রের, যা অত্যাবশ্যক ধর্মীয় কর্তব্যাবলীকে ভুলিয়ে দেয়, এমন পীড়ার, যা সমস্ত স্বস্তিকে বিলোপ করে দেয়, এমন বার্ধক্যের, যা করে দেয় মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন, এমন মৃত্যুর, যা সতত প্রস্তুত, অথবা অপেক্ষা কর দাজ্জালের, সে এমনই নিকৃষ্ট, যে এখনো অদৃশ্য এবং অপেক্ষা করে কিয়ামতের। আর কিয়ামত হচ্ছে কঠিন বিস্বাদ ও বিপদ।

'কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে' অর্থ কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ তো এসেই পড়েছে প্রায়। অর্থাৎ কিছু লক্ষণ তো প্রকাশিত হয়েছেই। অন্য লক্ষণগুলোও প্রকাশ পাওয়ার পথে। প্রকাশিত লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে চন্দ্রদ্বিখণ্ডিত হওয়া এবং রসুল স. এর মহাআবির্ভাব ও ধুম্র। যেমন আল্লাহ্ বলেন 'কিয়ামত নিকটে এসে পড়েছে এবং চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে'। আবার হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকে মুসলিম ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. তাঁর হাতের তর্জনী ও আঙটিপরিহিত মধ্যমা আঙুল একত্র করে বললেন, আমার আবির্ভাব ও কিয়ামত এরকম, পাশাপাশি। হজরত আনাস থেকে আহমদ, ইবনে মাজা এবং তিরমিজিও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি এমন একটি হাদিস তোমাদের কাছে বর্ণনা করবো, যা আমি ব্যতীত আর কেউ বলবে না। আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্ব আলামত হচ্ছে এগুলো— জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়া হবে, অজ্ঞতার বিস্তার ঘটবে, বেড়ে যাবে ব্যভিচারী ও মদ্যপদের সংখ্যা, নারীরা সংখ্যায় বেড়ে যাবে, আর কমতে থাকবে পুরুষদের সংখ্যা, এমন কী তাদের অনুপাত দাঁড়াবে পঞ্চাশ জনে একজন। অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে, জ্ঞান কমে যাবে, বেড়ে যাবে অজ্ঞতা। বোখারী মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একবার এক বেদুইন রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলো, কিয়ামত কখন আসবে? তিনি স. বললেন, যখন আমানতের খেয়ানত করা হবে, তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষায় থেকো। লোকটি বললো, আমানত খেয়ানত করা হবে কীভাবে? তিনি স. জবাব দিলেন, রাষ্ট্রীয় শাসনাধিকার চলে যাবে অযোগ্যদের হাতে। বোখারী।

হজরত আবু হোরায়রা আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন গণিমতের মালকে স্বীয় সম্পদ, আমানতকে প্রাপ্য এবং জাকাতকে জরিমানা

সাব্যস্ত করা হবে, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা হবে পার্থিব উদ্দেশ্যে, পুরুষেরা হবে মায়ের অবাধ্য ও স্ত্রীর বাধ্য, মানুষ বন্ধুকে ভাববে আপন পিতার চেয়ে অধিক সুহৃদ, মসজিদে শুরু হবে শোরগোল, জাতির নেতা হবে ফাসেক লোকেরা এবং শাসক হবে সে, যে সবচেয়ে অধম, সম্মান করা হবে কেবল তার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার্থে, বেড়ে যাবে গান-বাজনা, মদ্যপান, নিন্দা-মন্দ করতে থাকবে পরবর্তীরা তাদের পূর্ববর্তীদেরকে— তখন তোমরা অপেক্ষা কোরো লাল ঝঞ্ঝার, ভূমিকম্পের, ভূমিধসের, চেহারা বিকৃত হওয়ার এবং প্রস্তরবৃষ্টির। তখন এমন ভাবে এই ঘটনাগুলো প্রকাশ পেতে থাকবে যে, মনে হবে সূত্রবিচ্ছিন্ন তসবী থেকে যেনো একের পর এক ছিঁড়ে পড়ছে তসবীদানা। তিরমিজি।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মত যখন পনেরটি অপকর্মে লিপ্ত হবে, তখন তাদের উপরে নেমে আসবে মহাবিপদ। এরপর তিনি একে একে সবগুলোর কথা জানিয়ে দিলেন। তার মধ্যে ছিলো এই কথাগুলোও— ধর্মপরায়ণ হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অর্জন করা হবে ধর্মীয় জ্ঞান, বন্ধুরা হবে পিতা অপেক্ষা অধিক প্রিয়ভাজন, মদ্যপানের প্রসার ঘটবে, প্রচলন ঘটবে রেশমী বস্ত্রের। তিরমিজি।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'সুতরাং জেনে রাখো, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই, ক্ষমাপ্রার্থনা করো তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের ক্রটির জন্য। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এই চির অক্ষয় ও সত্যটিকে কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া সমীচীন নয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্যই নেই। সুতরাং দাসত্বের আনুকূল্য রক্ষার্থে মার্জনা প্রার্থনা করুন নিজের জন্য এবং পাপমার্জনার জন্য প্রার্থনা করুন আপনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুগামী ও অনুগামিনীদের জন্য, যারা বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। তাই সকলের প্রকাশ্য গোপন সকল প্রকার গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞাত।

এখানে 'ফা'লামু' (জেনে রাখো) কথাটির 'ফা' হচ্ছে নৈমিত্তিক অব্যয়। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি যখন জেনে গেলেন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ফলাফল, তখন আপনি আল্লাহ্র এককত্ব সম্পর্কীয় জ্ঞান ও প্রবৃত্তির

www.eelm.weebly.com

সংশোধায়ন এবং তদনুযায়ী তা পালন করার জ্ঞানের উপরেই অটল থাকুন; পরকালে এই জ্ঞানই আপনার অশেষ উপকারে আসবে।

'ওয়াস্‌তাগফির লিজাম্‌বিকা' অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করো নিজের জন্য। উল্লেখ্য, অন্যান্য নবীর মতো রসুল স.ও নিস্পাপ, বরং তিনি নিস্পাপশ্রেষ্ঠ। তবুও এখানে এমন করে বলা হয়েছে এই কারণে যে, তিনি স.ও সম্ভাব্যের বৃত্তের (দায়রায়ে ইমকানের) অন্তর্ভূত। মহিমময় আল্লাহ্‌পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহামর্যাদার যথাযোগ্য ইবাদত বান্দাদের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। কিছুনা কিছু অপূর্ণতা থেকেই যায়। এজন্যই রসুল স.কে আদেশ করা হয়েছে নিজেকে যথাযোগ্য ইবাদতের অযোগ্য মনে করে

তাঁর সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হতে। অর্থাৎ সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ হলেও তিনি সৃষ্টি, স্রষ্টা কদাচ নন। তাই আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চমর্যাদার তুলনায় তাঁর নিজের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া নিতান্তই শোভন। কেননা তিনিও আল্লাহ্‌র বান্দা। আর আল্লাহ্‌ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার মধ্যেই রয়েছে তাঁর দাসগুণের সম্মান। এরকম শ্রেষ্ঠ ক্ষমাপ্রার্থী যিনি, তার পক্ষেই কেবল সম্ভব ও শোভন অন্যের পক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা করা। তাই এখানে পরক্ষণেই বলা হয়েছে 'এবং মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য'। অর্থাৎ বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের ত্রুটির জন্যও আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কেননা আপনি তাদের সকল শুভকর্মের শিক্ষাদাতাও বটে। এভাবে ব্যাখ্যা করলে একথাটিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রসুল স.কে নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ এখানে দেওয়া হয়েছে মূলতঃ তাঁর উম্মতকে শিক্ষা প্রদানার্থে। উল্লেখ্য, যিনি আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা, তাঁর কাছে নির্দেশ পালন করাই দাসত্বের মূল দাবি। তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সর্বোচ্চ সৌভাগ্য। তাই আল্লাহ্‌র প্রিয়তম হওয়া সত্ত্বেও রসুল স. এ নির্দেশ মেনে নিয়েছেন নির্দ্বিধায়। কেননা তিনি যে অন্য কারো মতো নন। তিনি যে দাস হিসেবেও অতুলনীয়। 'আ'বদুহু ওয়া রসুলুহু' কথাটির মর্মার্থও তাই। সেকারণেই রসুল স. এমনও বলেছেন যে, আমার হৃদয়ও তমসাচ্ছন্ন হয় এবং আমিও প্রতিদিন সত্তর বার আল্লাহ্‌ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থনা করে থাকি। মুসলিম, আবু দাউদ, আহমদ, নাসাঈ।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্‌'র পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা এবং আল্লাহ্‌ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। কেননা ইবলিস বলে, আমি পাপকর্ম দ্বারা মানুষকে ধ্বংস করি, আর তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্‌' ও ক্ষমাপ্রার্থনা দ্বারা আমাকে ধ্বংস করে। আমি তখন অন্য বুদ্ধি আঁটলাম। তাদের হৃদয়ে জাগিয়ে দিলাম কামনা-বাসনা । তারা তখন নিজেদেরকে সৎপথপ্রাপ্ত বলেই মনে করতে লাগলো (ক্ষমাপ্রার্থনার প্রয়োজন আর বোধ করলো না)।

হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্‌র পুত্র ইয়াহ্‌ইয়া বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত তালহাকে চিন্তিত দেখে হজরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে তোমার? হজরত তালহা বললেন, আমি একবার রসুল স.কে বলতে শুনেছিলাম, আমি এমন একটি কথা জানি, যা মৃত্যুকালে পাঠ করলে মৃত্যুকষ্ট লাঘব হয় এবং মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির মুখোমণ্ডল হয়ে উঠে উজ্জ্বল। কথাটি কী তা আমি তখন জিজ্ঞেস করিনি। ভেবেছিলাম পরে কখনো জেনে নিবো। কিন্তু সে সুযোগ আমি পাইনি। তার আগেই তিনি স. এর মহাপ্রস্থান ঘটেছে। হজরত ওমর বললেন, আমি জানি কথাটি কী? রসুল স. বলেছেন, এই বাক্যটির চেয়ে অন্য কোনো বাক্যই শ্রেষ্ঠ নয়। তিনি স. তাঁর প্রিয় পিতৃব্য আবু তালেবকে তাঁর পরলোকগমনের সময় এই বাক্যটিই উচ্চারণ করতে বলেছিলেন। বাক্যটি হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্‌'। হজরত তালহা একথা শুনে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। হজরত ওসমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি 'লা

ইলাহা ইল্লাল্লহ্‌' এই বিশ্বাস বুকে নিয়ে মরবে সে জান্নাতে যাবে (শুরুতেই, অথবা পাপ মোচনের পর)। আমি বলি, হৃদয় তমসাচ্ছন্ন হওয়ার অর্থ প্রবৃত্তি অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া। সুফী সাধকগণ তাই নিজেদের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বজ সকল কিছুই আল্লাহ্‌কে সমর্পণ করেন। ফলে আসক্ত হয়ে ওঠেন আল্লাহ্‌র আলোর ঔজ্জ্বল্যের।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি একবার বললেন, যে ব্যক্তি নিজেকে ফিরিঙ্গি কাফেরের চেয়ে উত্তম ভাবে, তার জন্য আল্লাহ্‌র মারেফত নিষিদ্ধ। প্রশ্ন করা হলো, তা কী করে সম্ভব? সুফীগণ তো কমপক্ষে নিজেকে খাঁটি ইমানদার বলে জানবে এবং কাফেরকেও জানবে নিশ্চিত কাফের বলে। কুফরীর উপরে তো ইমানের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। জবাবে তিনি বললেন, সম্ভাবনার অন্ধকার থেকে কোনো সম্ভাব্য বিষয়ই মুক্ত নয়। অস্তিত্ব ও অস্তিত্বজ নূর তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঋণরূপে প্রাপ্ত এবং তা হচ্ছে আমানত, যার সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেনো প্রাপকের প্রাপ্য আমানত তার নিকটে সমর্পণ করো'। সুফীগণ তো এই নির্দেশটিই পালন করেন। তাঁরা তাই জানেন যে, শুভ ও পবিত্র যা তার সকল কিছুই আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রদত্ত। সুতরাং সকল কৃতিত্ব-গৌরব তাঁরই। আর তাঁদের নিজেদের সত্তাকে তারা মনে করেন সম্ভাব্যের বৃত্তভূত। তাই দেখতে পান, তার মতো নিকৃষ্ট আর কেউ নয়। এমনকি ফিরিঙ্গি কাফেরও নয়। এরকম আত্মপরিচিতি লাভ করা সহজ কথা নয়। বরং এটা হচ্ছে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের মারেফাত। আর এরকম মনোভাব ইমান-

কুফরের বৈপরীত্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিকও নয়। অবশ্য যারা অপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ও উদাসীন, তারা নিজেদেরকেই উৎকর্ষাধিকারী বলে জানে। তাদের সত্তায় নীরবে সরবে উচ্চারিত হতে থাকে 'আনা খইরুম মিনহু' (আমি তার চেয়ে উত্তম)।

'ওয়ালিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাত' অর্থ এবং মুমিন নর-নারীদের জন্য। অর্থাৎ হে আমার নবী! বিশ্বাসী-বিশ্বাসিনীদের পাপের জন্যও আপনি আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন এবং তাদেরকে এমন কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করুন, যা হতে পারে তাদের ক্ষমাপ্রাপ্তির নিমিত্ত। বাগবী লিখেছেন, এই উম্মত বড়ই সৌভাগ্যশালী। কেননা তাদের গোনাহ মাফের জন্য তাদের নবীকে আল্লাহ্ স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন। রসুল স.ও এ নির্দেশ পালন করেছেন এবং একথা বলাই বাহুল্য যে, ইনশাআল্লাহ্ তার প্রার্থনা পৃথিবীতে কবুলও করা হয়েছে এবং পরকালেও কবুল করা হবে শাফায়াত আকারে।

'ওয়াল্লহু ইয়া'লামু মুতাক্বাল্লাবাকুম ওয়া মাছওয়াকুম' অর্থ আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'গতিবিধি' অর্থ পৃথিবীর অস্থায়ী প্রাপ্তির প্রতি ধাবিত হওয়া। আর 'অবস্থান' অর্থ পরকালীন অবস্থান— বেহেশত, অথবা দোজখ। মুকাতিল ও ইবনে জারীর বলেছেন, এখানে 'গতিবিধি' অর্থ দিবসের কর্মচাঞ্চল্য এবং

'অবস্থান' অর্থ নিশিথের শয্যাসুখ। ইকরামা বলেছেন, এখানে শব্দ দু'টোর অর্থ যথাক্রমে— পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে মাতৃউদরে গমন এবং পৃথিবীর জীবন যাপন। ইবনে কীসান বলেছেন, এখানে 'মুতাক্বল্লাব' (গতিবিধি) অর্থ পিতা থেকে মাতার গর্ভে আসা এবং 'মাছওয়া' (অবস্থান) অর্থ কবরে অবস্থান। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্র নিকটে গোপন বলে যখন কিছুই নেই তখন তোমরা সতর্ক হও, ভয় করো কেবল তাঁকেই।

সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

❑ মু'মিনরা বলে, 'একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন?' অতঃপর যদি দ্ব্যর্থহীন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং উহাতে যুদ্ধের কোন নির্দেশ থাকে তুমি দেখিবে

www.eelm.weebly.com

যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাইতেছে। শোচনীয় পরিণাম উহাদের।

❑ আনুগত্য ও ন্যায়সংগত বাক্য উহাদের জন্য উত্তম ছিল; সুতরাং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইলে, যদি উহারা আল্লাহ্‌র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করিত তবে তাহাদের জন্য ইহা অবশ্যই মঙ্গলজনক হইত।

❑ তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিবে।

❑ আল্লাহ্ ইহাদিগকেই লা'নত করেন আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।

❑ তবে কি উহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না উহাদের অন্তর তালাবদ্ধ?

❑ যাহারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হইবার পর উহা পরিত্যাগ করে, শয়তান উহাদের কাজকে শোভন করিয়া দেখায় এবং উহাদিগকে মিথ্যা আশা দেয়।

❑ ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহা যাহারা অপসন্দ করে তাহাদিগকে উহারা বলে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করিব।' আল্লাহ্ উহাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।

❑ ফিরিশ্‌তারা যখন উহাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে, তখন উহাদের দশা কেমন হইবে!

❑ ইহা এইজন্য যে, উহারা তাহার অনুসরণ করে, যাহা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁহার সন্তুষ্টিকে অপ্রিয় গণ্য করে; তিনি ইহাদের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— জেহাদের জন্য বিশ্বাসীদের অন্তরে রয়েছে সুতীব্র আগ্রহ। তাই তারা বলে, নতুন একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেনো, যার মধ্যে থাকবে মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ। তারপর যখন জেহাদের বিধান সম্পর্কিত নতুন কোনো প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়, তখন প্রকৃত বিশ্বাসীরা উৎফুল্ল হলেও বিষণ্ন হয় কপটাচারীরা। কেননা তাদের হৃদয় ব্যাধিগ্রস্ত। হে আমার রসুল! একটু ভালো করে দেখলেই আপনি চিনতে পারবেন তাদের। দেখবেন, তারা যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ পেয়ে মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষের মতো আপনার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। নিঃসন্দেহে ওই সকল মুনাফিকদের জন্য অপেক্ষা করছে শোচনীয় পরিণাম।

কাতাদা বলেছেন, যে সকল সুরায় জেহাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে, ওই সকল সুরা সুরক্ষিত ও অরহিত। আর জেহাদের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে তৎপূর্ববর্তী শান্তিসমঝোতাপ্রকাশক আয়াতগুলোকে রহিত করে দিয়ে। কিন্তু জেহাদের আয়াতগুলোর বিধান কার্যকর থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। এই সকল আয়াত মুনাফিকদের কাছে সমগ্র কোরআন অপেক্ষা অধিক ভারী ও ভয়াবহ।

এখানে 'ফীকুলুবিহিম মারাদ্বুন' অর্থ তাদের অন্তরে ব্যাধি আছে অর্থাৎ তারা দুর্বল, ভীরু, কাপুরুষ। আর 'ফাআওলা লাহুম' অর্থ তাদের জন্য উত্তম।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'আনুগত্য ও ন্যায়সঙ্গত বাক্য তাদের জন্য উত্তম ছিলো; সুতরাং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলে, যদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করতো, তবে তাদের জন্য এটাই মঙ্গলজনক হতো'। একথার অর্থ— যখন জেহাদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়, তখন ওই সকল কপটাচারী যদি সাগ্রহে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে যত্নবান হতো, তবে তা তাদের জন্য হতো হিতকর।

এখানে 'আ'যামাল আম্‌রু' অর্থ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এখানে কিছু কথা উহ্য রয়েছে। ওই উহ্যতাসহ কথাটি দাঁড়ায়— যাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যখন যুদ্ধেযাত্রার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অথবা 'আ'যামা' অর্থ এখানে গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, অবশ্যকরণীয় হয়েছে। অর্থাৎ জেহাদ যখন সাব্যস্ত হয়েছে অবশ্যকর্তব্য বলে। 'ফালাও সাদাকুল্লহ্' অর্থ যদি তারা তাদের অঙ্গীকার পূরণ করতো। অর্থাৎ অপরিহার্যতা মনে প্রাণে সত্য বলে বিশ্বাস করতো। আর এখানকার 'লাকানা খইরল্‌লাহুম' (তবে তাদের জন্য এটা অবশ্যই মঙ্গলজনক হতো) কথাটি আগের বাক্যের ধারাবাহিকতা বা বিধেয়। কোনো কোনো তাফসীরকারের মত, শর্তের প্রতিফল এখানে রয়েছে উহ্য এবং এখানকার শেষ বাক্যটি খণ্ডিত। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— জেহাদ যখন অত্যাবশ্যক কর্তব্য বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে, তখন তারা সত্যে পরিণত করে দেখায়নি তাদের কথা। এ সিদ্ধান্তকে তাদের কাছে মনে হয়েছে বিস্বাদ; কিন্তু তারা যদি এ সিদ্ধান্তকে কার্যকর করে দেখাতে পারতো, তা তাদের জন্য হতো কতোইনা কল্যাণকর।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে (২২)। আল্লাহ্ এদেরকেই লানত করেন, আর করেন বধির, দৃষ্টিহীন' (২৩)। একথার অর্থ— ওহে কাপুরুষ ভীরুর দল! যদি তোমরা রসুল স. এর অনুগত্য থেকে বিমুখ হও, তাহলে কি আমরা ধরে নিবো, দেশে তোমরা সৃষ্টি করবে ভয়ঙ্কর অনাসৃষ্টি। বিরোধ করতে থাকবে সংগ্রামী বিশ্বাসী স্বজনদের সাথে। প্রশ্নবোধকটি এখানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপক।

www.eelm.weebly.com

অর্থাৎ না তা হতেই পারে না। বিপর্যয় সৃষ্টি করবে না দেশে। স্বজন বন্ধনও ছিন্ন করা যাবে না। সাবধান! তোমাদের যেনো কখনো এই ধারণার উদয় না হয় যে, তোমরা যা খুশী তাই করবে, ছিন্ন করবে স্বজনবন্ধন। যারা এরকম করে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। তিনি তাদেরকে করেন সত্যশ্রবণ থেকে বধির এবং শুভদর্শন থেকে অন্ধ। অর্থাৎ ক্ষমতাসীনদের জন্য দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি ও স্বজনবন্ধন ছিন্ন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

হজরত বুরাইদা বলেছেন, আমি একবার খলিফা ওমরের কাছে বসেছিলাম। এমন সময় শোনা গেলো একটি চীৎকারের আওয়াজ। তিনি সচকিত হলেন।

বললেন, দ্যাখো তো, কে এরকম করে? ইয়ারফা বললো, এক বালিকার মাকে বিক্রয় করা হচ্ছে। তিনি বললেন, মুহাজির ও আনসারগণকে ডেকে আনো। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক লোক সমবেত হলো। হজরত ওমর আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, তোমরা বলোতো দেখি, রসুল স. যা কিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছিলেন, তার মধ্যে কি আত্মীয়তা ছিন্ন করার কোনো অনুমোদন আছে? জনতা জবাব দিলো, না। তাহলে দ্যাখো, ইতোমধ্যে তোমাদের ভিতরে আত্মীয়তা ছিন্ন করা শুরু হয়ে গিয়েছে। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে'। তারপর বললেন, তোমাদের মধ্যে একজনের মাকে বিক্রয় করা হচ্ছে, যদিও আল্লাহ্ বিকল্প ব্যবস্থার অবকাশ রেখেছেন। জনতা বললো, তাহলে আপনি এর একটা বিহিত করুন। হজরত ওমর তখন এইমর্মে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রশাসকের কাছে নির্দেশ পাঠালেন যে, 'কোনো স্বাধীন ব্যক্তির মাতাকে যেনো বিক্রয় না করা হয়। কারণ এটা অন্যায়'।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ২০ সংখ্যক আয়াতের 'আল্লাজীনা ফীকুলুবিহিম মারাদ্ব' (তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে) এর উদ্দেশ্য মুনাফিকেরা বা কপটাচারীরা। 'মারাদ্ব' উদ্দেশ্য সংশয়, কাপট্য। আর 'আওলা' অর্থ শোচনীয় পরিণাম, কঠিন শাস্তি, ধ্বংস, বিনাশ। 'আওলা' শব্দটি 'আফআ'লু' শব্দরূপে পার্থক্যসূচক বিশেষণের শব্দরূপ। এর আক্ষরিক মূল শব্দ 'ওয়াইল'। অথবা 'ওয়ালী' অর্থ নৈকট্য এবং ২১ সংখ্যক আয়াতের 'ত্বয়াতুঁউ ওয়া ক্বওলুম্ মা'রূফ' (আনুগত্য ও ন্যায়সঙ্গত বাক্য) হচ্ছে উদ্দেশ্য, যার বিধেয় 'খইরুল্লাহুম' (তাদের জন্য উত্তম ছিলো) এখানে রয়েছে উহ্য। এভাবেও বলা যেতে পারে যে, মুনাফিকেরা বলতো, 'আমরা আনুগত্য ও ন্যায়সঙ্গত বাক্য সম্পর্কে অবগত আছি'। আল্লাহ্ তাদের কথাটিকেই হুবহু এখানে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, যদি তারা তাদের একথা সত্যে পরিণত করে দেখাতো, তবে উত্তম হতো। কিন্তু তারা মিথ্যা বলেছে। এমতাবস্থায় যদি তারা জনগণের শাসক হয়, তবে তারা দেশে বিপর্যয় ঘটাবেই, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবেই। এমতাবস্থায় এখানকার 'লাইতুম' শব্দটির অর্থ হবে— প্রশাসক, জনশাসক। উল্লেখ্য, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বনী উমাইয়া ও বনী হাশেমের উদ্ধত শাসকদের সম্পর্কে। কথাটির গুরুত্ব এভাবেও প্রমাণিত হয় যে, হজরত আলী এখানকার 'তাওয়াল্লাইতুম' কথাটি পাঠ করেছেন কর্মবাচ্যরূপে 'ওয়াল্লাইতুম'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা যদি কোনো অত্যাচারীকে জনশাসক নিযুক্ত করো, তাহলে সে দেশে বিপর্যয় ডেকে আনবে, ফলে কলহ-হাঙ্গমা হবে নিত্যদিনের ঘটনা। আর তারা ছিন্ন করে দিবে আত্মীয়তার বন্ধনও।

ইবনে জাওজী লিখেছেন, কাজী আবু ইয়ালী তাঁর 'মুতামাদ' কিতাবে লিখেছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের পুত্র বর্ণনা করেছেন, আমি একবার আমার স্বনামধন্য পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকে যে বলে, আমরা শাসক ইয়াজিদকে

ভালোবাসি। তিনি বললেন, বৎস! যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে, তার পক্ষে কি ইয়াজিদের আনুগত্য করা সম্ভব? তবে সেই ব্যক্তিকে কেনো অভিশাপ করা ঠিক হবেনা, যাকে আল্লাহ্ নিজেই অভিশাপ দিয়েছেন। আমি বললাম, তিনি কি তাঁর কিতাবের কোথাও ইয়াজিদকে অভিশাপ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াতদ্বয়।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'তবে কি তারা কোরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? তাদের অন্তর কি তালাবদ্ধ'?

এখানে 'আফালা ইয়াতাদাব্বারূনাল কুরআন' অর্থ তবে কি তারা কোরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও তিরস্কারসূচক। এর সোজাসুজি অর্থ— আক্ষেপ! তারা কোরআনের প্রতি মোটেও মনোযোগী নয়। তাই অনুসন্ধান করে দেখে না কী রয়েছে এর মধ্যে। যদি অনুসন্ধান করতো, তবে নিশ্চয় এর মধ্যে খুঁজে পেতো ইহ-পারত্রিক কল্যাণের দিক নির্দেশনা। আর এখানকার 'না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ' কথাটি রূপকার্থক। 'কুলব' বা অন্তরকে এখানে উপমা দেওয়া হয়েছে ধনাগারের সঙ্গে। ধনাগার তালাবদ্ধ করা অপরিহার্য না হলেও সমীচীন। উপমার প্রয়োজনীয়তাকে এখানে উপমিতের সঙ্গে সুদৃঢ় করা হয়েছে। তারপর তালাবদ্ধ কথাটিকে যুক্ত করা হয়েছে অন্তরের সঙ্গে, যাতে করে এ বিষয়টি জানা যায় যে, অন্তরে যে তালা পড়েছে, তা বাহ্যিকভাবে ব্যবহারযোগ্য কোনো তালা নয়, বরং তা হচ্ছে এক অদৃশ্য ও অপ্রচলিত তালা, যা অন্তরের জন্যই উপযোগী। অর্থাৎ তা হচ্ছে উদাসীনতা ও অমনোযোগিতার তালা। এভাবে এখানে একথাটি

www.eelm.weebly.com

ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই অবরুদ্ধ হৃদয়ের লোকদের কোরআন থেকে উপকার আহরণের কোনো যোগ্যতাই নেই, কোরআনের প্রতি যদি তারা মনোযোগীও হয়, তবুও সম্ভবতঃ তারা তা বুঝতে পারবে না।

এখানে 'কুলুবিন' এর 'তানভীন' আংশিকার্থক। অর্থাৎ সকলেই নয়, কোনো কোনো লোক এরকম তালাবদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী। অথবা 'তানভীন' এখানে অনির্দিষ্টার্থক এবং এর ব্যবহার ঘটেছে এখানে 'অজ্ঞাত' অর্থে। অর্থাৎ তাদের হৃদয়ের কঠোরতার প্রকৃতি অজ্ঞাত।

বাগবী লিখেছেন, হিশাম ইবনে ওরওয়া বর্ণনা করেছেন, ওরওয়া বলেন— রসুল স. একবার এই আয়াত পাঠ করলেন। এক ইয়েমেনী যুবক তাঁর পাঠ শুনে বললো, তালা তো পড়বেই। আল্লাহ্ না খোলা পর্যন্ত ওই তালা খোলার সাধ্যও কারো হবে না। হজরত ওমর যুবকটির কথা শুনে মুগ্ধ হলেন। পরে খলিফা হওয়ার পর ওই যুবককে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন একান্ত সচিবরূপে। কিন্তু অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত সহল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর এই আয়াতের আবৃত্তি শুনে ইয়েমেনী এক যুবক বলেছিলো, অন্তরে যে তালা পড়ে, তা খুলে দিতে পারেন কেবল আল্লাহ্। হজরত ওমর যখন খলিফা হলেন, তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য ওই যুবকটির খোঁজ করলেন। কিন্তু জানা গেলো, সে আর বেঁচে নেই।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হবার পর তা পরিত্যাগ করে, শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়'।

এখানে 'সৎপথ ব্যক্ত হবার পর তা পরিত্যাগ করে' অর্থ ইসলামের আহ্বান শোনার পরেও আবার ফিরে যায় প্রতিমাপূজা ও পাপাচারের দিকে। হজরত ওরওয়া বলেছেন, এ সকল লোক হচ্ছে কোরআন প্রত্যাখ্যানকারী ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়। তাদের কাছে তওরাতের মাধ্যমে শেষ রসুল এবং তার প্রতি অবতীর্ণ কোরআন সম্পর্কে প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে। সেকারণেই তারা রসুল স. এর বিষয়ে অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক জানতো। কিন্তু তিনি স. যখন তাদের কাছে এলেন, তখন তারা তাঁকে পরিত্যাগ করলো। হজরত ইবনে আব্বাস, জুহাক ও সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে মুনাফিকদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের কথা।

'আশ্শাইত্বনু 'সাও্ওয়ালা লাহুম' অর্থ শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায়। এখানাকার 'সাও্ওয়ালা' শব্দটি 'সও্ওয়াল' শব্দ হতে গঠিত। আর 'সও্ওয়াল' অর্থ সহজসাধ্য। অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে কবীরা গোনাহ্ করাকে সহজ করে দেয়। কেউ কেউ মনে করেন, অর্থের দিক দিয়ে 'সাও্ওয়ালা' সঙ্গতিপূর্ণ 'সাও্ওয়াল' এর সঙ্গে। অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে কামনা বাসনার দিকে প্রবৃত্ত করে। 'সাও্ওয়াল' অর্থ বাসনা। আর 'আম্লা লাহুম' অর্থ এখানে তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। অর্থাৎ তাদের কামনা-বাসনার আগুনকে অধিকতর প্রজ্জ্বলিত করে।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা যারা অপছন্দ করে, তাদেরকে তারা বলে, আমরা কোনো কোনো বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো। আল্লাহ্ তাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন'। একথার অর্থ— শয়তান কর্তৃক প্রদত্ত মিথ্যা আশা তাদের উপরে একারণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে যে, আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট এই কোরআনের প্রতিই তারা বীতশ্রদ্ধ। তাই মুনাফিকেরা ইহুদীদেরকে, অথবা ইহুদীরা মুনাফিকদেরকে, অথবা তাদের এক দল অন্য দলকে বলে, কোনো কোনো বিষয়ে আমরা তোমাদের কথা মতো চলবো। কেননা মোহাম্মদ ও তার অনুচরেরা আমাদের উভয় দলের শত্রু। তাই যুদ্ধের সময় তোমরা যেমন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করো না, তেমনি আমরাও তখন পশ্চাপসরণ করবো। আল্লাহ্ কিন্তু তাদের এরকম গোপন শলাপরামর্শ ও যড়যন্ত্রের কথা ভালো করেই জানেন।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'ফেরেশতারা যখন তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের দশা কেমন হবে (২৭)। এটা এ জন্য যে, তারা তার অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্র অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপ্রিয় গণ্য করে; তিনি এদের কর্ম নিষ্ফল করে দেন' (২৮)। একথার অর্থ— ওই ইহুদীরা ও মুনাফিকেরা ভেবেছে কী, তাদেরকে কি

এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে? মৃত্যুকাল থেকেই তাদের উপরে শুরু হবে তাদের শাস্তি, যা আর কখনো বন্ধ হবে না। হে আমার রসুল! ভাবুন তো দেখি, তখন তাদের দুর্দশা কোন পর্যায়ে পৌঁছবে মৃত্যুকালে যখন শাস্তির ফেরেশতারা এসে তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে তাদের প্রাণ বের করে নিয়ে যাবে! তাদেরকে এরকম শাস্তি দেওয়া হবে একারণে যে, যে পথ আল্লাহ্র অশান্তির উদ্রেক করে, তারা ছিলো সেই অশুভ পথের পথিক। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথের প্রতি ছিলো তারা চিরবৈরী। তাই আল্লাহ্ তাদের সকল কর্ম অবশ্যই ব্যর্থ করে দেন।

এখানকার 'ফা কাইফা' (কেমন হবে) কথাটি বিস্ময়সূচক। অর্থাৎ কী বিস্ময়ের ব্যাপারই না তখন ঘটবে, যখন ফেরেশতারা তাদেরকে মারতে মারতে খতম করে ফেলবে। 'জালিকা' অর্থ এজন্যে। অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে এজন্যই যে, তারা

ওই পথে চলতো, যে পথে রয়েছে আল্লাহ্র বিরাগ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তওরাতে রসুল স. এর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা তারা গোপন রেখেছে। এভাবে হয়ে গিয়েছে আল্লাহ্র অসন্তোষভাজন। আর এখানকার 'তাঁর সন্তুষ্টিকে অপ্রিয় গণ্য করে' অর্থ তারা এমন সব কাজকে ঘৃণা করে, যেগুলো আল্লাহ্র সন্তোষার্জনের সহায়ক। একারণেই তো আল্লাহ্ তাদের সকল প্রচেষ্টা বিফল করে দেন।

সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

❑ যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ কখনো উহাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন না?

❑ আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে উহাদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি উহাদের লক্ষণ দেখিয়া উহাদিগকে চিনিতে পারিতে, তবে তুমি অবশ্যই কথার ভংগিতে উহাদিগকে চিনিতে পারিবে। আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত।

❑ আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব, যতক্ষণ না আমি জানিয়া লই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদিগকে এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি।

❑ যাহারা কুফরী করে এবং মানুষকে আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হইবার পর রাসূলের বিরোধিতা করে, উহারা আল্লাহ্র কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। তিনি তো তাহাদের কর্ম ব্যর্থ করিবেন।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মুনাফিকেরা মনে করে, তাদের গোপন দুরভিসন্ধির সংবাদ চিরদিনই গোপন থেকে যাবে। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তো যেকোনো মুহূর্তে তাদের পরিচয় প্রকাশ করে দিতে পারেন। অথবা প্রকট করে দিতে পারেন তাদের মুনাফিকির লক্ষণসমূহ। তাহলে আপনিও তাদেরকে সনাক্ত করতে পারেন সহজে। অবশ্য তাদের কথাবার্তা শুনে আপনিও তাদেরকে চিনে নিতে পারেন। আর তারা না জানলেও আপনি তো জানেন যে, আমি সর্বজ্ঞ। আমি তো আপনার ও অন্যান্যদের সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কেই সম্যক অবগত।

প্রথমোক্ত আয়াতের প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। আর 'আম হাসিবাল্ লাজীনা' (তারা কি মনে করে) এর 'আম' এখানে বিয়োজক। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে রয়েছে এর বিপরীতধর্মী বক্তব্য। শুরু হয়েছে নতুন বাক্য। আর 'মারাদ্বুন' (ব্যাধি) অর্থ এখানে কপটতা।

'ওয়ালাও নাশাউ লাআরইনাকাহুম' অর্থ আমি ইচ্ছে করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম। 'ফা লাআ'রাফতাহুম বিসীমাহুম' অর্থ ফলে তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতে। বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. এর কাছে মুনাফিকদের পরিচয় আর গোপন থাকেনি।

'ওয়া লাতা'রিফান্নাহুম ফী লাহ্নিল ক্বউলি' অর্থ তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। বাক্যকে তার মূল গতি থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়াকে বলে 'লাহ্নি ক্বওলি'। মুনাফিকেরা এরকমই করতো। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে রসুল স. ও সাহাবীগণের দোষক্রটি বর্ণনা করতো। কখনো আবার পরোক্ষাভাবে করতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ। আবার কখনো নিন্দা করতো প্রশংসাচ্ছলে। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে রসুল স. মুনাফিকদের কথাবার্তার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারতেন।

'আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত' অর্থ আল্লাহ্ পুণ্যবান-পাপী, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলের প্রকাশ্য-গোপন আমল সম্পর্কে অবশ্যই জানেন। সেকারণেই তিনি সকলকে দিতে পারবেন উপযুক্ত প্রতিফল— পুরস্কার, অথবা তিরস্কার।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যতোক্ষণ না আমি মেনে নেই তোমাদের মধ্যে জেহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি'। একথার অর্থ—

আমি জেহাদের আদেশ দেই বিশ্বাসীদেরকে এই মর্মে পরীক্ষা করবার জন্য যে, তাদের মধ্যে সর্বসমক্ষে কে জেহাদের মাধ্যমে তার অন্তরস্থিত বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং চরম সংকটপন্ন সময়েও অবলম্বন করে ধৈর্য।

'হাত্তা না'লাম' অর্থ যতোক্ষণ না আমি জেনে নেই। অর্থাৎ তাদের গোপন ইমানকে তো আমি জানিই, তৎসত্ত্বেও পরীক্ষার মাধ্যমে মেনে নিতে চাই তাদের প্রকাশ্য আমল। অথবা 'না'লাম' অর্থ এখানে 'নুমায়্যিয' (ছেঁটে দেই, আলাদা করে দেই)। অর্থাৎ বাস্তবেও যেনো জেহাদের পরীক্ষার মাধ্যমে আমি আলাদা করে ফেলি প্রকৃত বিশ্বাসী ও কপটদেরকে। অথবা 'না'লাম' এর উদ্দেশ্য এখানে— যেনো জেনে নেই প্রকৃত বন্ধুকে? 'সবিরীন' অর্থ ধৈর্যশীল। আর 'আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি' অর্থ বিশ্বাস ও কথা অনুসারে তোমরা কার্য করো কিনা, তা আমি এভাবেই পরীক্ষা করে থাকি। উল্লেখ্য, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয় তাকে, যে পরীক্ষার ফলাফল কী হবে তা জানে না। কিন্তু আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ। পূর্বাপর সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ব। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এখানে তিনি 'যতোক্ষণ না আমি জেনে নেই' 'পরীক্ষা করি', এরকম বললেন কেনো? এর জবাবে আমি বলি, প্রকাশ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্য ভিন্ন। কোনো বিষয়ের অস্তিত্বপূর্ব এবং অস্তিত্বপরবর্তী অবস্থা নিশ্চয় এক নয়। আল্লাহ্ সকলকিছুর অনস্তিত্ব অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগত। কিন্তু তাঁর নির্দেশ বলবত হতে পারে কেবল অস্তিত্ববান কোনো কিছুর উপরে। পরীক্ষা করার কথা এখানে বলা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই। এভাবে 'যতোক্ষণ না আমি জেনে নেই' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— যেনো আমি তাদের উপরে আমার নির্দেশ বাস্তবায়ন করি। 'পরীক্ষা করি' কথাটির অর্থও এরকম। অর্থাৎ যেনো আমি বাস্তবে তাদের উপরে কার্যকর করি আমার নির্দেশ, যেনো তারা তা মেনে সৌভাগ্যশালী হয়।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— যারা কুফরী করে এবং মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হবার পর রসুলের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ্র কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তো তাদের কর্ম ব্যর্থ করবেন'।

এখানে 'রসুলের বিরোধিতা করে' বলে বুঝানো হয়েছে ইহুদী বনী নাজির, বনী কুরায়জাকে এবং মক্কার ওই বারো জন সর্দারকে যারা বদর যুদ্ধের সময় মুশরিক বাহিনীকে পালাক্রমে উট জবাই করে খাইয়েছিলো। 'তারা আল্লাহ্র কোনো ক্ষতি করতে পারবে না'। অর্থ তারা তাদের কুফরী দ্বারা নিজেদেরই ক্ষতিসাধন করবে। কেননা আল্লাহ্র ক্ষতিসাধন তো অকল্পনীয়। আর 'তিনি তো তাদের কর্ম ব্যর্থ করবেন' অর্থ আল্লাহ্ তাদের ইহকালীন প্রচেষ্টাকে যেমন নিষ্ফল করে দিবেন, তেমনি পরকালেও তারা হবে পুণ্যবঞ্চিত।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতে ওই সকল লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধের সময় মুশরিক সৈন্যদেরকে ভূরিভোজন করাতো। অন্য এক আয়াতেও প্রসঙ্গটি উল্লেখিত হয়েছে। যেমন 'নিঃসন্দেহে তারা কাফের, যারা

নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত করে। বস্তুত তারা এখন আরো ব্যয় করবে। তারপর সেটাই হবে তাদের আক্ষেপের কারণ এবং শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হবে'।

সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ৩৩

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের কর্ম বিনষ্ট করিও না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আর তোমাদের কর্ম বিনষ্ট কোরো না' অর্থ সংশয়, কপটতা ও অহংকার দ্বারা পুণ্যকর্মকে বরবাদ কোরো না। কালাবী অর্থ করেছেন— কপটতা, অথবা বাগাড়ম্বর দ্বারা নিজেদের পুণ্যকর্মকে ব্যর্থ করে দিয়ো না। হাসান অর্থ করেছেন— কবীরা গোনাহ্র মতো বড় গোনাহ্ করে নিজেদেরকে ধ্বংস করো না।

প্রথমদিকে সাহাবীগণের ধারণা ছিলো শিরিক করলে যেমন পুণ্যকর্ম কোনো কাজে আসে না, তেমনি ইমানদারদের ক্ষতি করতে পারে না কোনো পাপ। তাদের এমতো ধারণাকে খণ্ডনার্থে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। অবতীর্ণ হওয়ার এই প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিতাবুস সালাওয়াতে আবুল আলিয়াকে উদ্ধৃত করে আবী হাতেম ও মোহাম্মদ ইবনে নসর মারুজি বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীগণ বুঝতে পারলেন, পাপ করলে পুণ্যকর্ম পণ্ড হয়ে যায়। আবুল আলিয়ার এই উদ্ধৃতিটি বাগবীও বর্ণনা করেছেন। আর মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— তোমরা ইমান এনেছো ও

www.eelm.weebly.com

সৎকর্ম করে যাচ্ছো বলে একথা কখনো মনে কোরো না যে, তোমরা রসুল স. এর কোনো উপকার করছো। এরকম মনে করলে তোমাদের সকল শুভপ্রচেষ্টা বিফলে যাবে।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও ওমরা, যে কোনো ইবাদত শুরু করলে তা সুসম্পন্ন করা অত্যাবশ্যক। শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়া মাঝপথে কোনো ইবাদত স্থগিত করা সমীচীন নয়। 'হেদায়া' ও 'কুদরী' প্রণেতা প্রমুখও এরকম বলেছেন। তবে কেউ নিমন্ত্রণ করলে নফল রোজাদার তার রোজা ভঙ্গ করে ওই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারবে কী না, সে সম্পর্কে মতপৃথকতা রয়েছে। এরকম করাকে কেউ বলেছেন জায়েয, আবার কেউ একে আখ্যা দিয়েছেন নাজায়েয বলে। কারো কারো মতে দিনের প্রথমাংশে এরকম দাওয়াত কবুল করা যায়। দ্বিপ্রহরের পর কবুল করা যায় না। তবে দিনের দ্বিতীয়াংশে রোজা ভঙ্গ না করলে যদি পিতামাতার অবাধ্যতা হয় তবে তখন রোজা ভাঙ্গা যাবে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, নফল ইবাদত শুরু করে শেষ

হওয়ার আগে ছেড়ে দিলে তার কাযা আদায় করা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা একথাও বলেছেন যে, ওজর ছাড়াও নফল রোজা ভাঙা যাবে, কিন্তু পরে তার কাযা আদায় করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন, হজ ও ওমরা শুরু করার পর শেষ করা ওয়াজিব। শেষ না করা হলে তার কাযা আদায় করাও হবে ওয়াজিব। কিন্তু নফল নামাজ ও রোজার ক্ষেত্রে পরে কাযা আদায় করার বিষয়টি ওয়াজিব নয়, বরং মোস্তাহাব।

আমাদের প্রমাণ ঃ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এরকম বলা যে— তোমরা সন্দেহ, ভণ্ডামী, কপটতা, কৃত্রিমতা, বাহ্যাড়ম্বর, খ্যাতির বাসনা ও অন্যান্য পাপ দ্বারা তোমাদের ভালো কাজকে পণ্ড করে দিয়ো না। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, 'বিনষ্ট কোরো না' কথাটি সাধারণ অর্থসম্পন্ন। কোনো ভালো কাজ শুরু করার পর তা সম্পূর্ণ করার আগে ভঙ্গ করাও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভূত। কেননা এমতো ভালো কাজের যতোটুকু সম্পাদিত হয়েছে, তা যেমন ইবাদত, তেমনি যেটুকু বাকী আছে, সেটুকুও ইবাদতই । সুতরাং ওই কাজকে যদি কোনো কবীরা গোনাহ্, অর্থাৎ কপটতা, অহংকার, যশস্পৃহা ইত্যাদির দ্বারা ভঙ্গ করা হয়, তবে ওই কাজটি নিজেই হয়ে পড়বে সৎকার্যাবলী বিনাশকারী। আমাদের, অর্থাৎ হানাফীগণের এই বিধানটির সমর্থন রয়েছে হাদিস শরীফেও।

যেমন ওরওয়ার বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, হাফসার নিকটে কিছু বকরীর গোশত হাদিয়ারূপে এসেছিলো। আমরা দু'জনেই রোজা ছিলাম। তবুও ওই গোশত খেয়ে রোজা ভঙ্গ করলাম। কিছুক্ষণ পর রসুল স. এলেন। আমরা তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। তিনি স. বললেন, এই রোজা তোমরা পরে আদায় করে নিয়ো। সুফিয়ান ইবনে হাসীন থেকে আহমদ এবং জাফর ইবনে বরকান সূত্রে তিরমিজিও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজির বর্ণনাটি এরকম— জননী আয়েশা বলেছেন, আমি ও হাফসা দু'জনেই রোজা ছিলাম। কিছু আহার্যদ্রব্য হাদিয়া হিসেবে এলো। আমাদের দু'জনেরই তা খেতে ইচ্ছে হলো তাই খেয়ে নিলাম। একটু পরে রসুল স. এলে হাফসা-ই তাঁকে ঘটনাটি জানালো। তিনি স. বললেন, এর বদলে তোমরা পরে আর একদিন রোজা করে নিয়ো। জামিল ইবনে ওরওয়া সূত্রে আবু দাউদ ও নাসাঈও এরকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বোখারী বর্ণনাটিকে বলেছেন অপ্রচ্ছন্ন। কেননা ওরওয়া থেকে জামিলের শোনা প্রমাণিত হয় না এবং জামিল থেকে ইয়াজিদের শোনার বিষয়টিও প্রমাণহীন। তিরমিজি লিখেছেন, হাদিসটি সালেহ ইবনে আবু আখজার এবং মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবী হাফসা বর্ণনা করেছেন, যা জুহুরী পেয়েছিলেন ওরওয়ার মাধ্যমে জননী আয়েশা থেকে। হজরত মালেক ইবনে আনাস, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর, জিয়াদ ইবনে সা'দ ও অন্যান্য হাফেজে হাদিসগণও জুহুরীর মাধ্যমে জননী আয়েশা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন অপরিণত সূত্রে। এই সূত্রে আবার

ওরওয়ার নাম আসেনি। এটাই অধিক বিশুদ্ধ। কেননা ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আমি একবার ইমাম জুহুরীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এই হাদিস জননী আয়েশা থেকে ওরওয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, এ সম্পর্কে আমি ওরওয়ার কাছ থেকে কিছু শুনিনি। সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেকের শাসনামলে কিছুসংখ্যক লোক এ ধরনের কোনো কোনো ব্যক্তির নামোল্লেখ করেছেন, যারা হাদিসটি শুনেছেন জননী আয়েশা থেকে। ওই ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ওরওয়া-ও।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, বোখারী তাঁর হাদিস চয়নের রীতি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই নিয়মের উপর— হাদিস বর্ণনাকারী ও শ্রবণকারীর মধ্যে সাক্ষাত হওয়া ও সরাসরি হাদিস শ্রবণ করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে বর্ণনাকারী ও শ্রবণকারীর সমসাময়িক হওয়ার প্রমাণ পাওয়াটাই যথেষ্ট, দু'জনের মুখোমুখি দর্শন ও শ্রবণের প্রমাণ থাকা জরুরী নয়। আর বোখারী ও তিরমিজির মতানুসারে যদি বর্ণিত হাদিসটিকে মুয়াল্লাল অপ্রচ্ছন্ন বলে ধরেও নেওয়া হয়, তাহলে এটা প্রযোজ্য হবে কেবল বর্ণনার এই পদ্ধতিটির উপরে, অন্য কোনো পদ্ধতির উপরে নয়।এ সম্পর্কে জারীর ইবনে হাজেমের বরাত দিয়ে ইবনে হাব্বান তাঁর 'সহীহ্'

পুস্তকে একটি হাদিস লিখেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ ওরওয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন জননী আয়েশা বলেছেন, আমি ও হাফসা সকাল থেকে নফল রোজা ছিলাম।

অন্য এক পদ্ধতিতে জননী আয়েশা থেকে সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে খাসিফের সূত্রে ইবনে আবী শায়বাও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস—ইকরামা—খাসিফ সূত্রের হাদিস তিবরানী তাঁর 'মুয়াজ্জম' পুস্তকে বর্ণনা করেছেন এভাবে, জননী আয়েশা ও জননী হাফসা দু'জনেই সেদিন রোজা ছিলেন। অন্য আর এক পদ্ধতিতে এরকম বর্ণনা করেছেন বায্যার, নাফেয়ের মাধ্যমে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে এবং হাম্মাদ ইবনে ওয়ালিদের মাধ্যমে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে। সকল পদ্ধতি অপেক্ষা স্বতন্ত্র এক পদ্ধতি তিবরানী তাঁর 'আল আওসাত' পুস্তকে লিখেছেন, মুসা ইবনে হারুন—মোহাম্মদ ইবনে মেহরান জামাল মোহাম্মদ ইবনে আবু সালমা মক্কী এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, জননী আয়েশা ও জননী হাফসার কাছে উপহার হিসেবে কিছু খাদ্যসামগ্রী এলো। দু'জনেই রোজা ছিলেন। তৎসত্ত্বেও তাঁরা ওই খাদ্য গ্রহণ করে রোজা ভাঙলেন। পরে রসুল স.কে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন, তোমরা এ রোজার কাযা করে নিয়ো। আর কখনো এরকম কোরো না।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, এই হাদিসের সূত্রীয় প্রমাণ খণ্ডনযোগ্য নয়। এর কোনো কোনো পদ্ধতি দুর্বল হলেও বহু সূত্র থেকে প্রাপ্ত এই হাদিস অখণ্ডনীয়। তাছাড়া সব পদ্ধতিগুলো আবার শিথিল পদবাচ্যও নয়। কোনো কোনো পদ্ধতি তো রীতিমতো আস্থাযোগ্য এবং প্রমাণরূপে সেগুলো উপস্থাপন করাতেও কোনো অসুবিধে নেই। আর আমার মতে, অপরিণত বা মুরসাল হাদিসও প্রমাণ্য।

ইবনে জাওজী বলেছেন, বর্ণিত হাদিসে যে পুনরায় রোজা রাখতে বলা হয়েছে, তা মোস্তাহাব পর্যায়ের। কিন্তু তাঁর এমতো অভিমত হাদিসের বর্ণনাভঙ্গির পরিপন্থী। কেননা রসুল স. এখানে সরাসরি উম্মতজননীদ্বয়কে ভঙ্গকৃত রোজা পরে আদায় করে নিতে বলেছেন। আর তাঁর নির্দেশ পালন তো ওয়াজিবই হবে। মোস্তাহাব হওয়ার কোনো কারণ তো এখানে নেই। মোস্তাহাব হলে তো তার কাযা পূরণ করতে আদেশের সুর ধ্বনিত হতো না। এরপরেও যদি তাঁর নির্দেশকে মোস্তাহাব বলা হয়, তবে তাঁর কথাটিকে মনে করতে হবে রূপকার্থক। কিন্তু এমতো সুস্পষ্ট নির্দেশকে রূপকার্থক ভাবারও কোনো যুক্তি নেই। তাছাড়া আলোচ্য আয়াতের নির্দেশটিও বর্ণিত হাদিসের পরিপোষণা করে। কেননা এখানে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে তোমাদের কর্ম বিনষ্ট কোরো না'।

একটি সংশয় ঃ এখানে কোরআনের আয়াত এবং হাদিসের বিবরণে তো সাযুজ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আয়াতে বলা হয়েছে 'বিনষ্ট কোরো না'। অর্থাৎ রোজা রাখলে তা ভঙ্গ কোরো না। এখানে রোজা ভাঙ্গাই তো নিষেধ করা হয়েছে। ভঙ্গ রোজার কাযা করার কথা তো এখানে নেই। কিন্তু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ, যদি পরে তার কাযা আদায় করা হয়।

সংশয়ভঞ্জন ঃ আমি বলি, আয়াতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে কাযার সমর্থনেই। অর্থাৎ 'বিনষ্ট কোরো না' অর্থ বিনষ্ট বা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রেখে দিয়ো না, অত্যাবশ্যক দায়িত্বরূপে তা পরবর্তীতে পরিপূরণ করো। আর এমতো ব্যাখ্যার মাধ্যমে ভঙ্গকৃত রোজার কাযা ওয়াজিবই প্রমাণিত হয়। কোনো আমলের ওয়াজিব হওয়ার যে প্রকৃতি তা হচ্ছে, যদি তা অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে, তবে তার পরিবর্তে এমন কাজ করতে হবে, যা শরিয়তসমর্থিত। অবশিষ্ট রইলো হাদিসের বিজ্ঞপ্তি। সেখানেও এমন কোনো কথা নেই, যা রোজা ভঙ্গ করাকে সমর্থন করে। সেখানে রয়েছে কেবল কাযা করার প্রতি সমর্থন। আর কাযা করার প্রশ্ন ওঠে ওই আমলের ক্ষেত্রে, যা ওয়াজিব। তাছাড়া হাদিসে রোজা ভঙ্গ করাকে স্পষ্টভাবে সমর্থনও তো করা হয়নি। ইমাম আবু হানিফা বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেই।

এ প্রসঙ্গে আরো কিছুসংখ্যক হাদিস রয়েছে। যেমন— দারাকুতনী লিখেছেন, তালহা ইবনে ইয়াহ্ইয়া তাঁর ফুফুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, একদিন রসুল স. বাইরে থেকে গৃহে প্রবেশ করেই বললেন, আজ আমি রোজা রাখতে চাই। কিন্তু তাঁর সামনে হাদিয়াস্বরূপ যখন কিছু হালুয়া আনা হলো তখন তিনি বললেন, এখন আমি আহার করবো। আর আজকের বদলে অন্য একদিন রোজা রেখে নিবো। দারাকুতনী বলেছেন, শেষের কথাটি মোহাম্মদ ইবনে আমর আবুল আব্বাস বাহেলী ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেনি। হয়তো মোহাম্মদ ইবনে আমরেরও এ ব্যাপারে সংশয় ছিলো। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, মোহাম্মদ ইবনে মনসুর, ইবনে উয়াইনা সূত্রে প্রাপ্ত বিবরণটি এই বাড়তি উক্তিসহ বর্ণনা করেছেন নাসাঈ। ইমাম শাফেয়ীও বাড়তি উক্তিসহ বর্ণনা করেছেন ইবনে উয়াইনার বিবরণটি এবং বলেছেন, ইবনে উয়াইনা এই হাদিসের

বাড়তি বাক্যটি সংযোগ করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর এক বৎসর আগে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, শেষ বয়সে ইবনে উয়াইনার স্মৃতি হয়ে গিয়েছিলো কিছুটা বিপর্যস্ত।

স্বসূত্রে দারাকুতনী মোহাম্মদ ইবনে আবী হুমাইদ ও ইব্রাহিম ইবনে উবাইদের বক্তব্য উল্লেখ করে বলেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী একবার কিছু খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করলেন এবং নিমন্ত্রণ করলেন রসুল স. এবং তাঁর সাহাবীগণকে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন বললেন, আমি তো আজ রোজাদার। রসুল স. বললেন, তোমার ভ্রাতা তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। রোজা ভেঙে ফেলো। এর পরিবর্তে রোজা রেখো অন্য আর একদিন। দারাকুতনী বলেছেন, বর্ণনাটি অপরিণত শ্রেণীর। ইবনে জাওজী লিখেছেন, মোহাম্মদ ইবনে আবী হুমাইদ কিছুই জানে না। নাসাঈ বলেছেন, বর্ণনাটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। ইবনে হাব্বান বলেছেন, এটা আলোচনায় আনা যায় না।

দারাকুতনী আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, এক লোক রসুল স. ও কয়েকজন সাহাবীর জন্য পানাহারের আয়োজন করলো। যখন সবাই তাঁর বাড়িতে সারিবদ্ধভাবে বসে পড়লো, তখন একজন হাত গুটিয়ে বসে থাকলো। রসুল স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো? সে বললো, আমি রোজা। তিনি স. বললেন, তোমার ভাই তোমার জন্য কতো কষ্ট করে খাবার তৈরী করলো, আর তুমি কিনা বলছো, আমি রোজা। নাও, এবার আহারে অংশ গ্রহণ করো। এর বদলে আর একদিন রোজা রেখো। এই হাদিসের বর্ণনাসূত্রভূত একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন ওমর ইবনে হালিফ। ইবনে আদী এবং ইবনে হাব্বান বলেছেন, তাকে হাদিস বানানোর অপরাধে অভিযুক্ত করা হতো। দারাকুতনী আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত সাওবান বলেছেন, রমজান নয় এমন এক মাসের এক দিনে রসুল স. রোজা ছিলেন। কোনো অসুবিধার কারণে সেদিন তাঁর কষ্ট হতে লাগলো। বার বার দেখা দিলো বমির ভাব। শেষে বমিও আর আটকানো গেলো না। বমি করার পর তিনি ওজু করলেন এবং রোজা ভেঙে ফেললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! বমি করার পর কি ওজু করা ফরজ? তিনি স. বললেন, যদি ফরজ হতো, তবে তোমরা কোরআনে একথা দেখতে পেতে। পরদিন রসুল স. পুনরায় রোজা রাখলেন এবং বললেন, আজ রোজা রেখেছি গতকালের ভাঙা রোজার বদলে। এই হাদিসের সূত্রপরম্পরাভূত এক জনের নাম উত্বা ইবনে সাকান। দারাকুতনী তার হাদিস পরিত্যাজ্য বলে মন্তব্য করেছেন।

স্বসূত্রে দারাকুতনী উল্লেখ করেছেন, জুহাক ইবনে হামযা ও মনসুরকে উদ্ধৃত করে মোহাম্মদ ইবনে আবী হুমাইদ বলেছেন, জননী উম্মে সালমা একদিন রোজা রেখে ভেঙে ফেললেন। রসুল স. তাঁকে এর পরিবর্তে আর একদিন রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, জুহাকের কথা ঠিক নয়। আবু জারআ বলেছেন, মোহাম্মদ ইবনে আবী হুমাইদ অসত্যভাষী।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ তাঁদের অভিমতের সমর্থনে উল্লেখ করেছেন এই হাদিস— জননী জুয়াইরিয়া বলেছেন, জুমআর দিন আমি রোজা

রেখেছিলাম। রসুল স. আমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি গতকাল রোজা রেখেছিলে? আমি বললাম, না। তিনি স. পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন, আগামীকাল কি রোজা রাখবে? আমি বললাম, না। তিনি স. বললেন, তাহলে রোজা ভেঙে ফেলো। আবু ওমর সূত্রে ইমাম আহমদ বলেছেন, রসুল স. তখন জননী জুয়াইরিয়ার প্রকোষ্ঠে অবস্থান করেছিলেন।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কখনো কখনো সকালে আমার কাছে এসে বলতেন, খাবার মতো কি কিছু আছে? আমি বলতাম, না। তিনি স. তখন বলতেন, তাহলে আজ আমি রোজাদার। এরপর হাদিয়ার কোনো খাদ্যদ্রব্য আমার কাছে এলে আমি তাঁকে ডেকে বলতাম, কিছু হাদিয়া এসেছে। আপনার জন্য আমি লুকিয়ে রেখেছি, আসুন! তিনি স. জিজ্ঞেস করতেন, কী এসেছে? আমি বলতাম, হায়িস (এক ধরনের উৎকৃষ্ট হালুয়া)। তিনি স. বলতেন, সকাল থেকে তো আমি রোজা। এরপর তিনি আহার করতেন। মুসলিম। দারাকুতনী ও বায়হাকীর বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— জননী আয়েশা বলেছেন, একদিন রসুল স. আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে আহার্য কি কিছু আছে? আমি বললাম, না। তিনি স. বললেন, তাহলে আমি রোজা। আর একদিন তিনি স. আমার কাছে এসে বললেন, তোমার কাছে খাওয়ার মতো কি কিছু আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, যদিও আমি রোজা রাখতে মনস্থ করেছিলাম, তবুও আমি এখন আহার করবো।

হজরত উম্মে সুলাইম বলেছেন, রসুল স. রাতেই রোজার নিয়ত করতেন। ভোরবেলায় যখন আমার কাছে আসতেন, তখন জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি? আমি বলতাম, আপনি না রাতেই রোজার নিয়ত করেছেন। তিনি স. বলতেন, তাতো করেছিই। কিন্তু এ রোজা যেহেতু রমজানের কাযা রোজা অথবা মানতের রোজা নয়, সেহেতু এ রোজা ভাঙলে কোনো ক্ষতি নেই। দারাকুতনীর এই সূত্রপরম্পরার এক জনের নাম মোহাম্মদ ইবনে উবায়দুল্লাহ্ আজরামী, যিনি বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

হজরত আবু জুহাইফা বলেছেন, রসুল স. হজরত সালমান ও হজরত আবু দারদাকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। তারপর একদিন হজরত সালমান হজরত আবু দারদার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, তিনি বাড়ি নেই। আরো দেখলেন, তাঁর স্ত্রীর পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ও মলিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এ অবস্থা কেনো? উম্মে দারদা বললেন, আপনার ভাইটির কি দুনিয়ার খেয়াল আছে? সেজেগুজে থাকবো তাহলে কার জন্য? ইত্যবসরে সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত আবু দারদা স্বয়ং। কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরী করা খাবার এসে গেলো। হজরত আবু দারদা বললেন, আমি রোজা,

আপনি খান। হজরত সালমান বললেন, আপনি না খেলে আমিও খাবো না। হজরত আবু দারদা আর দ্বিরুক্তি করলেন না। পানাহার করলেন একসাথে। রাতেও দু'জনে শুয়ে পড়লেন এক স্থানে। কিছুক্ষণ পর নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে শয্যাত্যাগ করলেন

হজরত আবু দারদা। হজরত সালমান বললো, এখন শুয়ে পড়ুন। হজরত আবু দারদা পুনরায় উঠে পড়লেন। হজরত সালমান এবারেও তাঁকে বাধা দিলেন, বললেন, শুয়ে পড়ুন, এখনো নামাজের সময় হয়নি। হজরত আবু দারদা পুনরায় শুয়ে পড়লেন। রাত্রি গভীর, গভীরতর হলো। তারপর দু'জনেই উঠে পড়লেন এবং নামাজ পাঠ করলেন। তার পরে হজরত সালমান হজরত আবু দারদাকে বললেন, আপনার উপরে রয়েছে আপনার প্রভুপালনকর্তার হক, শরীরের হক, এবং স্ত্রীর হক। সুতরাং মেটাতে হবে প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার। পরদিন সকালে হজরত আবু দারদা রসুল স.কে সকল কথা জানালেন। রসুল স. বললেন, সালমান ঠিকই বলেছে।

আমার মতে এই হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, নফল রোজা ভঙ্গ করা জায়েয। কিন্তু এটা প্রমাণিত হয় না যে, ভঙ্গকৃত রোজার কাযা আদায় করা ওয়াজিব নয়। জননী জুয়াইরিয়ার হাদিস দ্বারা কেবল এতোটুকু জানা যায় যে, পূর্বের অথবা পরের দিনের সঙ্গে না মিলিয়ে কেবল শুক্রবার রোজা রাখা ঠিক নয়। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসেও একথার সমর্থন রয়েছে। যেমন তিনি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জুমআর দিন রোজা রেখো না, যদি তার আগের দিন রোজা না রেখে থাকো অথবা রোজা না রাখতে চাও তার পরের দিন। বোখারী, মুসলিম। অন্য এক হাদিসে কথাটি বলা হয়েছে এভাবে— রসুল স. শুধুমাত্র জুমআর দিন রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। মুসলিম।

ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের পক্ষে আরো কিছু শিথিলসূত্রবিশিষ্ট হাদিস রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে হজরত উম্মে হানী কর্তৃক বর্ণিত হাদিস পাওয়া যায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রপরম্পরায়। যেমন হাম্মাদ ইবনে সালমা—সাম্মাক ইবনে হারব—হারুন ইবনে উম্মে হানী, এই সূত্রে নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, হজরত উম্মে হানী বলেছেন, একবার রসুল স. শরবত পান করলেন। আমাকেও বললেন, পান করো। আমি বললাম, আমি রোজা আছি। অথচ আপনার উচ্ছিষ্টের লোভও সামলাতে পারছি না। তিনি স. বললেন, তোমার এই রোজা যদি রমজানের কাযা রোজা হয়, তবে এর বদলে একটি রোজা পালন কোরো অন্য কোনো দিন। আর যদি নফল হয়, তবে তোমার ইচ্ছা— অন্য কোনো দিন এর কাযা আদায় করবে, অথবা করবে না।

হারুন থেকে সাম্মাক সূত্রে এই হাদিস প্রাপ্তির উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম আহমদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, হজরত উম্মে হানী বলেছেন, আমি রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে আনা হলো শরবত। তিনি কিছু শরবত নিজে পান করলেন। আমাকেও কিছু দিলেন। আমি পান করার পর বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার দ্বারা একটি গোনাহ্‌র কাজ হয়ে গেলো। তিনি স. বললেন, কীরকম? আমি বললাম, আমি তো রোজা রেখেছিলাম। তিনি স. বললেন, তুমি কি কোনো রোজার বদলে রোজা রেখেছিলে? আমি বললাম, না। তিনি স. বললেন, তাহলে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। সাম্মাক ইবনে হারব যদি এই বর্ণনাটির একক বর্ণনাকারী হন, তবে তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না। বায়হাকী

বলেছেন, তাঁর সূত্রটি সমালোচিত। ইবনে কাতান বলেছেন, হারুন অপরিচিত। হারুনকে কেউ হজরত উম্মে হানীর পুত্র, কেউ প্রপৌত্র, আবার কেউ বলেছেন দৌহিত্র। আর ইমাম আহমদ ও তিরমিজি বর্ণিত হাদিসে প্রমাণিত হয় না যে, কাযা ওয়াজিব নয়।

আবদুল্লাহ্‌ ইবনে হারেছ—ইয়াজিদ ইবনে যিয়াদ—জারীর এই সূত্রপরম্পরায় আবু দাউদ, দারেমী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হজরত উম্মে হানী বলেছেন, মক্কাবিজয়ের দিবসে ফাতেমা এসে রসুল স. এর বাম পাশে বসে পড়লো। আমি ছিলাম তাঁর ডান পাশে। একজন সেবিকা উপস্থিত হলো এক পাত্র শরবত নিয়ে। আমি ওই শরবতের কিছু অংশ পান করে ফেললাম। তারপর মনে হলো, আমি না রোজা। বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল স! আমি যে রোজা ভেঙে ফেললাম। তিনি স. বললেন, তুমি কি কাযা রোজা রেখেছিলে? আমি বললাম, না। তিনি স. বললেন, নফল রোজা ভাঙলে কোনো দোষ নেই।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত উম্মে হানী-হুজ্জাত-শো'বা-মোহাম্মদ ইবনে জাফর এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, মক্কাবিজয়ের দিবসে রসুল স. আমার গৃহে এলেন। তাঁর সামনে এক পাত্র শরবত উপস্থিত করা হলো। তিনি স. তা পান করলেন। আমাকেও কিছু পান করতে দিলেন। আমি বললাম, আমি তো রোজা। তিনি স. বললেন, নফল রোজা নিজের ইচ্ছাধীন। ইচ্ছে করলে রাখা যায়, আবার ইচ্ছে করলে ভেঙে ফেলা যায়।

হজরত উম্মে হানী থেকে আবু সালেহ, তাঁর কাছ থেকে জায়দা এবং তাঁর কাছ থেকে আবু দাউদ তায়ালাসী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত উম্মে হানীর গৃহে গেলেন এবং কিছু পানীয় পান করলেন। অবশিষ্ট কিছু অংশ হজরত উম্মে হানীকে দিলেন। তিনি তা পান করার পর বললেন, আমি তো রোজা ছিলাম। রসুল স. বললেন, নফল রোজার ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন। সে ইচ্ছা করলে রাখতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে ভাঙতেও পারে। জাহাবী বলেছেন, জায়দার সাথে আবু সালেহের সাক্ষাত ঘটেনি। বোখারী বলেছেন, বিষয়টি

www.eelm.weebly.com

চিন্তাসাপেক্ষ। তাছাড়া এই ঘটনাটিকে বিজয় দিবসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করাও সমীচীন নয়। কেননা মক্কা বিজিত হয়েছিলো রমজান মাসে। সুতরাং ওই মাসে কাযা রোজা রাখা এবং নফল রোজার প্রসঙ্গ তোলা যুক্তি-বিবেচনা বহির্ভূত।

ইবনে হুম্মাম এ সব বিবরণকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম আবু হানিফার মতে, নফল রোজা ওজর ছাড়াও ভেঙে ফেলা যায় এবং এর পক্ষের প্রমাণ হচ্ছে ওই সকল হাদিস, যে গুলো ইমাম শাফেয়ী সমর্থন করেছেন। তবে এমতাবস্থায় ভেঙে ফেলা রোজার কাযা আদায় করা ওয়াজিব। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে হাদিসও উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বিভিন্ন হাদিস থেকে সামঞ্জস্যের উপায়ও বের হয়ে এসেছে। ইবনে হুম্মাম একথাও লিখেছেন যে, 'ওয়া লা তুবত্বিলূ আয়্‌মালাকুম' (তোমাদের কর্ম বিনষ্ট কোরো না) কথাটির অর্থ তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। অর্থাৎ এর কোনো সুফল তোমরা পাবে না। এর থাকা না থাকা এক বরাবর। কিন্তু 'কাযা' আদায় করার ইচ্ছা যদি পরিত্যাগ করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে এই আয়াত নিষেধ করে না।

আমি বলি, এখানে বিনষ্ট কোরো না বলে কোনো বিশেষ আমলকে বিনষ্ট করার কথা বলা হয়নি। বরং কথাটি ব্যাপকার্থক এবং এখানে 'বিনষ্ট' হচ্ছে অনির্দিষ্টবাচক ও না-বোধক। সুতরাং বুঝতে হবে, 'বিনষ্ট কোরো না' কথাটি এখানে বলা হয়েছে সকল আমলের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নফল নামাজ, নফল রোজা বা অন্য কোনো নফল ইবাদত শুরু করে যদি তা সম্পন্ন না করে, তবে তার ওই আমল হবে অসম্পূর্ণ। বাকী রইলো, কাযা প্রসঙ্গ। কাযা হচ্ছে স্বতন্ত্র একটি আমল, যার দ্বারা বিনষ্ট আমলের প্রতিকার করা হয়ে থাকে। আর কোনো ওজর ছাড়া নফল কোনো ইবাদত শুরু করা এবং ভাঙা তো এই আয়াত দ্বারাই নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। কিন্তু হাদিসের দ্বারা ভেঙে ফেলা বা বিনষ্ট করার বৈধতাও প্রমাণিত। এমতোক্ষেত্রে কোরআনকেই প্রাধান্য দেওয়া জরুরী। সুতরাং মানতে হবে, আমল ভঙ্গ করা বৈধ না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। সেকারণেই নফল হজ ও ওমরা ভঙ্গ করা কারো কাছেই বৈধ নয়। তাই তা কেউ ভেঙে ফেললে পুনরায় তার কাযা আদায় করা অত্যাবশ্যকই তো হবে। আর এনিয়মটিই প্রযোজ্য হবে সকল নফল ইবাদতের বেলায়।

সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮

❑ যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহ্‌র পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না।

❑ সুতরাং তোমরা হীনবল হইও না এবং সন্ধির প্রস্তাব করিও না, তোমরাই প্রবল; আল্লাহ্ তোমাদের সংগে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনও ক্ষুণ্ন করিবেন না।

❑ পার্থিব জীবন তো কেবল ক্রীড়া-কৌতুক, যদি তোমরা ঈমান আন, তাকওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে তোমাদের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাহেন না।

❑ তোমাদের নিকট হইতে তিনি তাহা চাহিলে ও তজ্জন্য তোমাদের উপর চাপ দিলে তোমরা তো কার্পণ্য করিবে এবং তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন।

www.eelm.weebly.com

❑ দেখ, তোমরাই তো তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিতে বলা হইতেছে অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করিতেছে। যাহারা কার্পণ্য করে তাহারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করিবেন; তাহারা তোমাদের মত হইবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, এরপর মৃত্যুমুখে পতিত হয় সত্যাপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায়, আল্লাহ্ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

৩২ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে রয়েছে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যগত সংযোগ। আর সেখানে ও এখানে 'যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল কাফেরকে, যারা বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিলো। রসুল স. তাদের লাশগুলোকে একটি গর্তে জমা করিয়েছিলেন। কিন্তু ওই বিশেষ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও আলোচ্য আয়াত ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ কাউকেই আল্লাহ্ মার্জনা করবেন না, যারা কাফের অবস্থায় মারা যায়।

পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব কোরো না, তোমরাই প্রবল; আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ন করবেন না'।

এখানে 'হীনবল হয়ো না' অর্থ যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখিয়ো না। 'সন্ধির প্রস্তাব কোরো না' অর্থ প্রথমেই সন্ধির প্রস্তাব করে বোসো না। এভাবে এখানকার 'তাহীনু' ও 'তাদউ' উভয় ক্রিয়াই নিষেধাজ্ঞাসূচক 'লা' (না) এর আওতায় পড়ে যায়। আর এখানে প্রথমে সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব দিতে নিষেধ করা হয়েছে একারণে যে, এরকম প্রস্তাবে প্রকাশ পায় দুর্বলতা।

'তোমরাই প্রবল' অর্থ যেহেতু তোমরা আল্লাহ্‌র সৈনিক, তাই তোমরা তাঁর বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত। সেকারণে তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র শত্রুদের চেয়ে অধিক শক্তিধর। 'আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন' অর্থ আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসেন। আর যে যাকে ভালোবাসে সে তার সঙ্গেই থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ সঙ্গে থাকার বিষয়টি আনুরূপ্যবিহীন। কেননা তাঁর সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপ

সবকিছুই অনুরূপতার অতীত। আর 'ওয়া লাঁই ইয়াতিরাকুম আয়মালাকুম' অর্থ তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ন করবেন না'। 'ওয়াত্‌র' অর্থ ক্ষুণ্ন করা, বা কম করা। হজরত ইবনে আব্বাস, মুকাতিল, কাতাদা ও জুহাক কথাটির অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ তোমাদের পুণ্যকর্মের প্রতিদান পূরণে কম করবেন না এবং নিষ্ফলও করে দিবেন না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'পার্থিব জীবন তো কেবল ক্রীড়া-কৌতুক, যদি তোমরা ইমান আনো, তাক্বওয়া অবলম্বন করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চান না (৩৬)। তোমাদের নিকট থেকে তিনি তা চাইলে ও তজ্জন্য তোমাদের উপরে চাপ দিলে তোমরা তো কার্পণ্য করবে এবং তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দিবেন'(৩৭)।

'পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক' অর্থ আল্লাহ্‌র স্মরণচ্যুত পার্থিবতা মূল্যহীন ও ক্ষতিকর। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র জিকির ছাড়া পৃথিবীর সবকিছুই অভিশপ্ত। 'যদি তোমরা ইমান আনো, তাক্বওয়া অবলম্বণ করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে পুরস্কার দিবেন'। অর্থ— তোমরা যদি বিশ্বাসী ও সাবধানী (মুত্তাক্বী) হও, তবে তোমাদের পুণ্যকর্মসমূহের যথোপযুক্ত প্রতিফল তিনি তোমাদেরকে দিবেন। এমতাবস্থায় তোমাদের পৃথিবীর এই জীবন ক্রীড়া-কৌতুক তুল্য নিরর্থক ও ক্ষতিকর হবে না, হবে আখেরাতের সফল শস্যক্ষেত্রতুল্য। আর 'তিনি তোমাদের ধনসম্পদ চান না' অর্থ তিনি তোমাদের ধনসম্পদের মুখাপেক্ষী নন। বরং সকল বিষয়ে তোমরা তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি তোমাদেরকে ইমান আনতে ও সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছেন তো তোমাদেরকে উপকৃত করবার জন্যই। এরকম করলে জান্নাতের সুখভোগ করবে তো তোমরাই। অন্য এক আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন 'আমি তাদের কাছ থেকে রিজিক চাই না'। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— আমি তোমাদের উপরে অতিরিক্ত দানকে বাধ্যতামূলক করিনি। অত্যাবশ্যক দানরূপে নির্ধারণ করেছি অত্যল্প অংশ— চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার এর চেয়েও কম। যেমন ১২০টি ছাগলের মধ্যে একটি ছাগল। কাজেই তোমাদের দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। ইবনে উয়াইনা এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। আয়াতের গতিধারাও এমতো ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে। কেননা ইমান ও মিতাচারের প্রেরণা ও পার্থিব জীবনের তুচ্ছতা-অসারতার কথা শুনে সংকীর্ণচিত্তদের মনে এমতো ধারণার উদ্ভব হওয়াও সম্ভব যে, আল্লাহ্ হয়তো তাঁর রাস্তায় সকল সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতো অপধারণার মূলোৎপাটনার্থেই এখানে বলা হয়েছে 'তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চান না'।

'ফাইয়ুহ্‌ফিকুম' অর্থ তোমাদের উপরে চাপ দিলে। 'ইহ্‌ফাআ' অর্থ কোনো কাজকে শেষ সীমায় উপনীত করা, আতিশয্য প্রদান করা, চরম চাপ প্রদান।

যেমন এক হাদিসে এসেছে— উহ্‌ফুশ্ শাওয়ারিবা অর্থ গোঁফকে গোড়া থেকে

www.eelm.weebly.com

কেটে ফেলো। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্ যদি তোমাদের সকল সম্পদ দান করে দেওয়ার জন্য চাপ প্রদান করতেন, তবে তা দিতে গড়িমসি করতে। আর তা দিতে বাধ্য হলেও দিতে আন্তরিক অসন্তোষের সঙ্গে। আর 'তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দিবেন' অর্থ তদবস্থায় তোমার অভ্যন্তরীণ অসন্তোষও তোমরা গোপন রাখতে পারবে না। প্রকাশ করবে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া, যা আল্লাহ্র আনুগত্যবিরোধী। কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্র বাণী সত্য। তিনি একথা ভালো করেই জানেন যে, তাঁর এরকম নির্দেশ সন্তোষের সঙ্গে পালন করা মানুষের জন্য দুরূহ। তাই বলেছেন— তোমরা এমতাবস্থায় আন্তরিকভাবে অপ্রসন্ন তো হবেই, আর আল্লাহ্ও সে গোপন অসন্তোষকে প্রকাশ করে দিবেন।

শেষোক্ত আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'দ্যাখো, তোমরাই তো তারা, যারা যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে। যারা কার্পণ্য করে, তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মতো হবে না'।

এখানে 'হা আনতুম হাউলায়ি তুদআ'উনা লি তুনফিক্বু ফী সাবীলিল্লাহ' অর্থ দ্যাখো, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে। এখানে 'হাআনতুম হাউলায়ি' কথাটির 'হা' সতর্কতাসূচক। 'আনতুম' (তোমরা) এখানে উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় হচ্ছে 'হাউলায়ি' (তারা)। অথবা 'হাউলায়ি' এখানে সম্বোধিত শব্দ এবং এখানে সম্বোধনসূচক অব্যয় রয়েছে উহ্য এবং 'তাদঊনা' (যাদেরকে) এখানে বিধেয়। কিংবা 'হাউলায়ি' হচ্ছে যোজক, 'তাদঊনা' যোজ্য এবং যোজক ও যোজ্য মিলে তা হয়েছে 'আনতুম' এর বিধেয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তোমাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে আল্লাহ্র পথে সেই পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করার জন্য, যে পরিমাণ ব্যয় করা আল্লাহ্ তোমাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন। যেমন জাকাত, যুদ্ধের জন্য জরুরী ব্যয়। কিন্তু কেউ কেউ এব্যাপারে প্রদর্শন করে কার্পণ্য, যা নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

'যারা কার্পণ্য করে,তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি' অর্থ আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করার প্রতিফল তো ভোগ করতে তাদেরকেই। অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে ব্যয় করার সুফল এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করার কুফল ভোগ করতে হবে তোমাদেরকেই, অন্যদেরকে নয়। সুতরাং সাবধান! হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আমাদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে নিজের জন্য উপকারী ধনসম্পদের চেয়ে উত্তরাধিকারীদের ধনসম্পদকে অধিক পছন্দ করে? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো প্রত্যেকেই অধিক পছন্দ করি ওই ধন-সম্পদকে যা আমাদের কাজে লাগে। তিনি স. বললেন, তাহলে শোনো, নিজের উপকারে আসে ওই সম্পদ, যা ব্যয় করা হয় পরকালের কল্যাণার্থে। আর উত্তরাধিকারীদের সম্পদ সেগুলোই, যেগুলো পৃথিবীতে ছেড়ে চলে যেতে হয়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতি প্রভাতে আকাশ থেকে দু'জন ফেরেশতা নেমে আসে। তাদের একজন বলে, সত্যের পথে যারা খরচ করে, তাদেরকে তুমি প্রতিদান দাও। অন্যজন বলে, হে আল্লাহ্! যারা সম্পদ ধরে রাখে, তাদের সম্পদ তুমি ধ্বংস করে দাও।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আসমা বলেছেন, রসুল স. আমাকে আজ্ঞা করেছেন, খরচ করো। গননা কোরো না। নচেৎ আল্লাহ্ও গুনে গুনে দিবেন। সম্পদকে বেঁধে রেখো না, নতুবা আল্লাহ্ও তোমাকে বেঁধে রাখবেন। বরং অল্প অল্প করে দান করতে থাকো, যতদূর পারো। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক আরো উল্লেখিত হযেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, হে আদম কুলোদ্ভরা! খরচ করো, আমিও তোমাদের জন্য খরচ করবো।

'আল্লাহ্ অভাব মুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত' অর্থ তোমাদের ইবাদত এবং দানখয়রাতের মুখাপেক্ষী আল্লাহ্ মোটেও নন। বরং তোমরা ইহ-পরকাল সর্বত্রই সর্ববিষয়ে তাঁরই মুখাপেক্ষী। এজন্যই আদেশ তাঁর এবং তা প্রতিপালনের দায়িত্ব তোমাদের।

'যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মতো হবে না' কথাটির অর্থ— হে শেষ রসুলের সহচরবৃন্দ! হুঁশিয়ার হও। তোমরা যদি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার ব্যাপারে অনীহ হও, তবে তোমাদের স্থলে আল্লাহ্ অন্য এক সম্প্রদায়কে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যারা আমার নির্দেশাদি পালনে অনীহা প্রকাশ করবে না।

কালাবী বলেছেন, এখানে 'অন্য জাতি' অর্থ বনী কিনদাহ্ এবং নাখা। হাসান বলেছেন, কথাটির অর্থ অনারব কোনো সম্প্রদায়। আর ইকরামা বলেছেন, এর অর্থ পারস্যবাসী ও সিরিয়াবাসী।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার এই আয়াত পাঠ করলে সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! ওই জাতি কারা, আমরা বিমুখ হলে যাদেরকে আমাদের স্থলাবর্তী করা হবে? তিনি স. পাশে উপবিষ্ট সালমান ফারসীর উরুদেশ চাপড়িয়ে বললেন, এই ব্যক্তি এবং তার সম্প্রদায়। সত্যধর্ম যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলেও চলে যায়, তবুও পারস্যের কিছু লোক সেখান থেকে তাকে ছিনিয়ে আনবে। বাগবী, তিরমিজি, হাকেম, ইবনে হাব্বান। তিরমিজি ও হাকেম এই হাদিসকে সনাক্ত করেছে শুদ্ধসূত্রসম্বলিত হাদিস বলে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী, মুসলিম এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইমান যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলীতে গিয়ে লুকায়, তবুও পারস্যের কিছুসংখ্যক লোক তাকে খুঁজে পাবে। শিরাজী তাঁর 'আলকাব' গ্রন্থে কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদার বর্ণনা থেকে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিবরানী এই হাদিসকে বর্ণনা করেছেন আরো কিছু কথা সহযোগে।

অতিরিক্ত বিবরণটুকু হচ্ছে— আরবেরা তখন তাকে পাবে না, পাবে পারস্যের কিছু লোক। মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী শাফেয়ী শায়েখ জালালুদ্দিন সুয়ূতির বক্তব্যরূপে উল্লেখ করেছেন, এই হাদিসের উদ্দেশ্য ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সহচরবর্গ। কেননা আর কোনো পারস্যবাসী তাঁর মতো ধর্মজ্ঞ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেননি। তাঁর পিতামহ ছিলেন পারস্যবাসী। ইমাম আবু হানিফার সন্তানগণও ছিলেন উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। যেমন তাঁর বংশধরগণের মধ্যেই আবির্ভূত হয়েছিলেন আবু আলী কলন্দর পানিপথী, কুতুবে জামান বোরহান হাঁশুবী ও শায়েখ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী।

সুরা মুহাম্মাদের মাযহারী ব্যাখ্যা শেষ হলো আজ ২৭ শে জমাদিউস আউয়াল, ১২০৮ হিজরী সনে। আল্লাহ্ সকাশে এইমর্মে প্রার্থনা জানাই যে, এই সুরার তাফসীর সেরকম কল্যাণকর হোক, যেরকম কল্যাণকর হয়েছিলো রসুল স. এর প্রিয়ভাজনগণের উপর। হে আল্লাহ্! এই সুরার ব্যাখ্যা সমাপ্ত হওয়ার সওয়াব তুমি প্রেরণ করো তোমার প্রেমাস্পদ মোহাম্মদ মোস্তফা স., তাঁর সহচরবৃন্দ, বংশধরবর্গ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার পরিজন, তাঁর পবিত্র পত্নীগণের প্রতি এবং উম্মতের আউলিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি, বিশেষ করে শায়েখ শামসুদ্দীন হাবীবুল্লাহ্ মাযহারে শহীদ জানে জাঁনা ও তাঁর উর্ধ্বতন পীর-মাশায়েখগণের প্রতি। আমিন।

সূরা ফাতাহ্

এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এতে রয়েছে ৪টি রুকু এবং ২৯টি আয়াত।

সূরা ফাতাহ্ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

❑ নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়,

❑ যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন,

❑ এবং আল্লাহ্ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।

www.eelm.weebly.com

❑ তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তাহারা তাহাদের ঈমানের সহিত ঈমান দৃঢ় করিয়া লয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

❑ ইহা এইজন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং তিনি তাহাদের পাপ মোচন করিবেন; ইহাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ইন্না ফাতাহ্‌না লাকা ফাত্‌হাম্ মুবীনা'। এর অর্থ— নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।

ইমাম আহমদ, বোখারী, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, আমি এক সফরে রসুল স. এর সঙ্গী ছিলাম। তখন আমি তাঁকে একটি বিষয়ে পর পর তিনবার জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনি স. নিরুত্তর রইলেন। আমি মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললাম, ওমর! তোমার জন্য আক্ষেপ! তিনবার প্রশ্ন করেও তুমি জবাব পেলে না। এরপর আমি আমার উটকে আগে বাড়ালাম এবং অন্যদের চেয়ে অনেক আগে চলে গেলাম। ভাবতে লাগলাম, মনে হয় আমাকে তিরস্কার করে কোনো আয়াত অবতীর্ণ হবে। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই শুনতে পেলাম পেছন থেকে কে যেনো আমার নাম ধরে ডাকছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হলাম। তিনি স. বললেন, আজ রাতে আমার উপরে এমন একটি সুরা নাজিল হয়েছে, যা ওই সকল সামগ্রী অপেক্ষা আমার কাছে অধিক প্রিয়, যেগুলোর উপরে সূর্যালোক পতিত হয়। এরপর তিনি স. পাঠ করতে শুরু করলেন ইন্না ফাতাহ্‌না লাকা ফাত্‌হাম্ মুবীনা......'।

হজরত মুসাওয়ার ইবনে মাখরিমা ও মারোয়ান ইবনে হাকাম থেকে হাকেম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, সুরা ফাতাহ্ আদ্যোপান্ত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কামদীনার মধ্যবর্তী হুদায়বিয়া নামক স্থানে। কিন্তু 'বিজয়' বলে এখানে কোন্ বিজয়ের কথা বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রয়েছে। হজরত আনাস সূত্রে কাতাদার মাধ্যমে আবু জাফর রাজী বর্ণনা করেছেন, এখানে বলা হয়েছে মক্কাবিজয়ের কথা। কেননা মক্কাবিজয় ছিলো সুনিশ্চিত। সেই নিশ্চিতিকে বুঝানোর জন্যই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালবাচক বক্তব্যভঙ্গি, যেনো মক্কাবিজয় ইতোমধ্যে সুসম্পন্ন হয়েই গিয়েছে। নিশ্চিত বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী এখানে করা হয়েছে এভাবেই।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তিকেই এখানে বলা হয়েছে 'ফাতহে মুবীন' বা প্রকাশ্য বিজয়। ইমাম আহমদ, ইবনে সা'দ, আবু দাউদ, হাকেম, ইবনে মুনজির, ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত মাজমা ইবনে হারেছিয়া আনসারী বলেছেন, আমরা হুদায়বিয়া থেকে কুরাউলগামীমের দিকে ফিরতেই রসুল স. এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি স. আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমরা সকলে যখন তাঁর কাছে সমবেত হলাম, তখন তিনি স. আমাদেরকে পাঠ করে শোনালেন 'নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়'। আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এটাই কি বিজয়! তিনি স. বললেন, যাঁর অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! নিঃসন্দেহে এটাই সুস্পষ্ট বিজয়। হজরত সিদ্দিকে আকবর বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির চেয়ে বড় কোনো বিজয় ইসলামে হয়নি। হজরত বারা থেকে বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলার কারণ এইযে, এটা হচ্ছে বিজয়ের অবতরণিকা। কথাটিকে আবার এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়— কোনো কিছুর বাঁধন খুলে দেওয়ার নামই তো বিজয়। হুদায়বিয়ার সন্ধি হওয়ায় সেই বাঁধনই খুলে গিয়েছিলো। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা বাঁধা পড়েছিলো নিজ নিজ সীমানায়। সন্ধির পরে যখন তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে মেলামেশা শুরু হলো, তখন ইসলামের ঔদার্য ও মহত্বের জয়যাত্রা হয়ে পড়ে অপ্রতিরোধ্য।

কারো কারো মন্তব্য হচ্ছে, এখানে বিজয় দান করার অর্থ সিদ্ধান্ত দেওয়া। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আমি মক্কা বিজয়ের সিদ্ধান্ত দিয়েই দিয়েছি। আগামী বছর আপনি মক্কায় প্রবেশ করবেন বিজয়ীর বেশে।

শা'বী লিখেছেন, এই বিজয় হুদায়বিয়ার সন্ধিজাত বিজয়। কেননা এতে রসুল স. এর অগ্র-পশ্চাৎ সকল অনবধানতাকে মার্জনা করার শুভ সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এর পরে দেওয়া হয়েছে খায়বরের খর্জুরোদ্যানের কর্তৃত্ব। আরো দেওয়া হয়েছে কোরবানীর পশু জবেহ করার স্থান পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হওয়ার কথা। সম্মুখসমরে রোমীয়রা বিজয়ী হয় ইরানীদের উপর। গ্রন্থধারী রোমীয়দের বিজয় হয়েছিলো অগ্নিউপাসকদের উপর। এরপর বিজয়ী হলো মুসলমানেরাও।

জুহরী লিখেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধি অপেক্ষা বড় কোনো বিজয় কখনো হয়নি। এর ফলে ইমানদার ও কাফেরেরা ব্যাপকভাবে মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে ইমানদারদের শুভচিন্তা, উন্নত চরিত্র কাফেরদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাই দেখা যায়, বছর তিনেকের মধ্যে অধিকাংশ কাফের স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়ে যায়। মুসলমানেরা সংখ্যায় হতে থাকে গরিষ্ঠতর।

জুহাক বলেছেন, এই মহাবিজয় সংঘটিত হয়েছিলো যুদ্ধ ব্যতিরেকেই। বায়যাবী লিখেছেন, রসুল স. যখন বিরুদ্ধপক্ষীয়দের উপরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তখনই সম্পাদিত হয়েছিলো এই সন্ধিচুক্তিটি। তাই এই সন্ধির নাম দেওয়া হয়েছে 'সুস্পষ্ট বিজয়'। উল্লেখ্য, সন্ধিরপ্রস্তাব এসেছিলো

www.eelm.weebly.com

সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট থেকে এবং এই চুক্তিই হয়ে গিয়েছিলো মক্কাবিজয়ের কারণ বা মাধ্যম। এভাবে মক্কাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত করতে পেরেছিলেন বলেই রসুল স. মনোযোগ দিতে পেরেছিলেন আরবের অন্যান্য গোত্রের দিকে। ফলে অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরাও সৌভাগ্য লাভ করতে পেরেছিলো ইসলাম গ্রহণের।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'যেনো আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন'।

এখানে 'লিইয়াগ্ফির' অর্থ মার্জনা করেন। অর্থাৎ মার্জনা করেন ওই সকল অনবধানতা ও অনুত্তমতা, যেগুলো সংঘটিত হয়েছে এবং হবে অংশীবাদিতার মূলোৎপাটনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কিছু করতে গিয়ে— তাদের কবল থেকে দুর্বল মুসলমানদেরকে মুক্ত করতে গিয়ে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'লিইয়াগ্ফির' কথাটির 'লাম' পরিণামপ্রকাশক। কথাটির অর্থ হবে— যাতে করে তিনি মার্জনা করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে দিতে পারেন পরিপূর্ণ অনুগ্রহ ও সামগ্রিক বিজয়।

হোসাইন ইবনে ফজল বলেছেন, এখানে 'লিইয়াগ্ফির' এর 'লাম' এর সম্পর্ক রয়েছে 'ওয়াস্তাগফির লিজাম্বিকা ওয়াল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাতি' (ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ও বিশ্বাসবান-বিশ্বাসবতীদের ত্রুটির জন্য) আয়াতের সঙ্গে। যেমন 'লিইলাফি কুরাইশ' এর 'লাম' এর সম্পর্ক রয়েছে 'ফাজ্বাআ'লাহুম কাআ'স্ফিম্ মা'কূল' আয়াতের সঙ্গে। কিন্তু হোসাইন ইবনে ফজলের এমতো ব্যাখ্যার কোনো যুক্তি নেই।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে উহ্য রয়েছে 'ফাশ্কুর'(কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোরো) ক্রিয়াটি এবং ওই ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে 'মার্জনা করেন' কথাটির। অথবা এখানে উহ্য রয়েছে 'ফাস্তাগ্ফির' এবং এর সম্পর্ক রয়েছে, 'লাম' এর সাথে। এরকম বলেছেন, মোহাম্মদ ইবনে জারীর। তিনি আরো বলেছেন, এখানকার 'লিইয়াগ্ফির' এর ঝোঁক রয়েছে 'ইজা জ্বাআ নাস্‌রুল্লহি ওয়াল ফাত্হ্' আয়াতের দিকে। অর্থাৎ সুরা নসরের এই আয়াতেও আল্লাহ্ সাহায্য ও বিজয়ের অঙ্গীকার প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করেছেন ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার কথা। তাই বুঝতে হবে, এখানেও যেনো 'মার্জনা করেন' কথাটির মধ্যে রয়েছে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার নির্দেশ।

'তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ' অর্থ যে সকল ভুল সম্পাদিত হয়েছে আপনার নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে এবং যে সকল ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার পর। কিন্তু এ কথা বলা যেতে পারবে না যে, রসুল স. কোনো পাপ করেছেন। পাপ ও ভুল নিশ্চয় এক কথা নয়। বরং মনে করতে হবে এখানে 'ত্রুটি' অর্থ অনুত্তমতা। অর্থাৎ আপনার সকল কিছু অত্যুত্তম হওয়াই সমীচীন। কেবল উত্তম আপনার জন্য অশোভন। তাই সেরকম কিছু যদি হয়ে থাকে, অথবা ভবিষ্যতে হয়ে যায়, তাই আপনি নিরবচ্ছিন্ন অত্যুত্তমতা প্রার্থনা করুন আমার কাছে। 'পুণ্যবানগণের পুণ্য নৈকট্যভাজনগণের নিকটে পাপ' কথাটি স্মরণীয়।

সুফিয়ান সওরী বলেছেন, এখানে 'মা তাক্বাদ্দাম' অর্থ সেই সকল ভুল, যা ঘটেছিলো তাঁর নবুয়ত লাভের পূর্বে এবং 'মা তাআখ্খার' অর্থ যে ভুল এখনো হয়নি, অথচ ভবিষ্যতে যা হওয়া সম্ভব। এটা হচ্ছে আরবীয় এক বিশেষ বাগধারা। যেমন তারা বলে থাকেন— জায়েদ যাকে দেখেছে তাকেও দিয়েছে, দিয়েছে তাকেও যাকে সে কখনো দেখেইনি। অথবা— যাকে সে পেয়েছে, তাকেই মেরেছে, আবার তাকেও মেরেছে, যাকে পায়নি।

আতা খোরাসানি বলেছেন, এখানে 'অতীত ত্রুটি' হচ্ছে আদি পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার অনবধানতা আর ভবিষ্যত ত্রুটি' হচ্ছে তাঁর উম্মতের ভুলভ্রান্তি ও পাপ, যা মার্জনা করা হয়েছে আপনার দোয়ার বরকতে।

'তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন' এই কথাটির মধ্যে রয়েছে রসুল স.কে প্রদত্ত সকল অনুগ্রহের অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারানুসারেই ক্রমে ক্রমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরিপূর্ণরূপে। দূর হয়েছে অজ্ঞতার অন্ধকার, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতাপ। এর পর থেকেই বিশ্বাসীরা পেয়েছে পূর্ণ নিরাপত্তা, নিরুপদ্রব চলাচল এবং হজ-ওমরা শান্তির সঙ্গে সম্পাদন করার সুযোগ। সুরা মায়েদার 'আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম' এই আয়াতে কথাটি বলা হয়েছে আরো স্পষ্ট করে। এ সকল কিছুই অর্জিত হয়েছে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির অনুসরণে।

'তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন' কথাটির মধ্যে রয়েছে নবুয়ত, সুশাসন ও সকল কিছুর সুব্যবস্থা নিশ্চিত করে দেওয়ার অঙ্গীকার। কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— আপনার মাধ্যমেই আল্লাহ্পাক দান করবেন সরল পথের বিবরণ। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— সরল পথে সুদৃঢ় রাখবেন, অথবা— বিজয়ের সঙ্গে মার্জনা যেমন আপনাকে দান করবেন, তেমনি দান করবেন এমন মত ও পথ, যার বিধিবিধান কখনো রহিত হবে না।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন'।

একটি সংশয় ঃ প্রথমে বিজয়, তারপর ক্ষমা প্রদানের ঘোষণা দেওয়ার পর এসেছে বলিষ্ঠ সাহায্য প্রদানের কথা। সুতরাং এখানে বক্তব্যের ধারাবাহিতা ক্ষুণ্ন হলো না কি। সাহায্যের প্রশ্ন তো ওঠে বিজয়ের পূর্বে। কেননা সাহায্যই হচ্ছে বিজয়ের ভিত্তি।

সংশয় খণ্ডন ঃ এখানে 'বিজয়' অর্থ যদি হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়, তাহলে বলা যেতে পরে যে, সন্ধিটি তো সম্পাদিত হয়েছিলো আল্লাহ্‌র নির্দেশানুসারে। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনই তো সকল সাহায্যের ভিত্তি। আর এখানে 'বিজয়' অর্থ যদি মহাবিজয় হয়, তাহলে বুঝতে হবে এখানে বিজয় প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। প্রতিশ্রুতিই সাহায্যের মূল ভিত্তি। আর সাহায্য, বিজয়ের পূর্বগামী।

'নাসরন আ'যীযা' অর্থ বলিষ্ঠ সাহায্য। উল্লেখ্য, এরকম বলিষ্ঠ সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণই হতে পারেন সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। এখানে কথাটি বলা হয়েছে

অধিকতর দৃঢ়তা প্রকাশনার্থে। কিংবা 'আ'যীযা' (বলিষ্ঠ) অর্থ এখানে অপ্রতিরোধ্য। অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে দান করেন অপ্রতিরোধ্য সাহায্য, যাতে কেউই আপনার উপরে জয়ী না হতে পারে।

বোখারী ও মুসলিমের স্বরচিত গ্রন্থদ্বয়ে এবং তিরমিজি ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সাহাবীগণ ছিলেন বিষণ্ন ও বিমর্ষ। তখন অবতীর্ণ হয় 'ইন্‌না ফাতাহ্‌না লাকা ফাত্‌হাম মুবীনা'। তখন তিনি স. উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, আজ আমার উপরে এমন এক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমার কাছে সমস্ত দুনিয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয়। জনৈক সাহাবী বলে ওঠেন, আল্লাহ্‌র রসুলের জয় হোক। আল্লাহ্‌ যা করবেন তাই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন এই আয়াতে। এরপর অবতীর্ণ হয় 'আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য' (৫ম সংখ্যক আয়াতের শেষ) পর্যন্ত।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন, যেনো তারা তাদের ইমানের সঙ্গে দৃঢ় করে নেয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌ই বিশ্বাসীগণের হৃদয়ে অপার্থিব এক শান্তিপ্রবাহ জারী করে দেন, ফলে তাদের বিশ্বাস হয় অধিকতর উজ্জ্বল, সবল ও পরিণত। আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সুব্যবস্থাপনা যে সকল ফেরেশতা নিশ্চিত করে চলেছে, ওই সকল ফেরেশতাবাহিনী সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন। এই মহাব্যবস্থাপনা ও মহানিয়ন্ত্রণ একথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ ও মহাপ্রজ্ঞাধারী।

এখানে 'মুমনিদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন' অর্থ তাদেরকে প্রদান করেন ধৈর্য, স্থৈর্য ও অটলতা, যেনো যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের অন্তরে সৃষ্টি না হতে পারে কোনো উদ্বেগ, শংকা, অথবা নৈরাশ্য। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের অন্তরে সৃষ্টি করে দেন অযৌক্তিক ক্রোধ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌ তাঁর রসুলকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু'র সাক্ষ্য দিতে, এর প্রচার করতে। মানুষ যখন এই বাক্যে আস্থা স্থাপন করলো, তখন আল্লাহ্‌ এর সমন্বয়ে নির্দেশ দান করতে লাগলেন নামাজের, জাকাতের, রোজার ও হজের। এরপর যোগ করলেন জেহাদের অত্যাবশ্যকতা। শেষে ঘোষণা করলেন ধর্মকে পরিপূর্ণ করার কথা। এভাবে ক্রমান্বয়ে বিশ্বাসীগণের বিশ্বাসকে করা হয়েছে বর্ধিত, বিস্তৃত ও বলিষ্ঠ। উল্লেখ্য, মুসলমানদের দুর্বলতার কারণে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়নি। বরং চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিলো আল্লাহ্‌র নির্দেশে ও প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্বাবধানে। সেকারণেই এখানে বলা হয়েছে— এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, তিনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করবেন, এটাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌ জেহাদের নির্দেশ দিয়েছেন এজন্য যে,

তিনি ইমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে প্রবেশ করাবেন বেহেশতে, যার পাদদেশে রয়েছে প্রবহমান নদী। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে এবং তিনি তাদেরকে চিরদিনের জন্য ক্ষমা করে দিবেন। আর এটাই আল্লাহ্‌র বিবেচনায় তাদের জন্য মহাসাফল্য।

এখানকার 'দাখিল করবেন' এবং 'পাপমোচন করবেন' কথা দু'টোর সম্পর্ক রয়েছে আগের আয়াতের 'ইমান দৃঢ় করে নেয়' কথাটির সঙ্গে। অথবা কথা দু'টো 'ইমানকে দৃঢ় করে নেয়' এর 'বদলে ইশতেমাল' বা যুগপৎ অনুবর্তী। কিংবা সংযোজক শব্দটি এখানে রয়েছে উহ্য এবং ওই উহ্য শব্দটি সম্পর্কযুক্ত আগের আয়াতের 'প্রশান্তি দান করেন' কথাটির সঙ্গে। কিংবা বাক্য দু'টি ২ সংখ্যক আয়াতের 'মার্জনা করেন' এর যুগপৎ অনুবর্তী এবং সম্পর্কযুক্ত প্রথম আয়াতের 'সুস্পষ্ট বিজয়' এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে, মাঝখানের 'তিনিই মুমিনদের অন্তরে শান্তিদান করেন' কথাটি ভিন্ন প্রসঙ্গের। আর এখানকার 'এটাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য' অর্থ এই যে জান্নাতে প্রবেশ করা এবং পাপমুক্ত হতে পারার বিষয়টি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তার বান্দাদের জন্য এক মহাসফলতা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কেননা চিরকালীন ক্ষতি থেকে চিরমুক্তি এবং স্থায়ী নিরাপত্তা লাভই যে চূড়ান্ত পর্যায়ের কৃতকার্যতা, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই।

সূরা ফাতাহ্‌ ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯

❑ আর তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। অমঙ্গল চক্র উহাদের জন্য, আল্লাহ্ উহাদের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন এবং উহাদিগকে লা'নত করিয়াছেন এবং উহাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন, উহা কত নিকৃষ্ট আবাস!

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

❑ আমি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে,

❑ যাহাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে শক্তি যোগাও ও তাহাকে সম্মান কর; সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— জেহাদের নির্দেশদানের আর একটি কারণ এই যে, যারা ধর্মযুদ্ধে আল্লাহ্‌র বাহিনীর প্রতিপক্ষ হয়, সেই সকল মুনাফিক নারী পুরুষ ও পৌত্তলিক নারী-পুরুষকে আল্লাহ্ শাস্তিদান করবেন। কেননা সৃষ্টির প্রতি অসীম মমতাপরবশ আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের ধারণা অতি মন্দ। পরকালে তারা সম্মুখীন হবে চরম অমঙ্গলের। আল্লাহ্ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তাদেরকে করেছেন অভিসম্পাতগ্রস্ত। আর তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন দোজখকে। আহা, তারা যদি জানতো, কতোইনা নিকৃষ্ট সেই আবাস।

এখানকার 'শাস্তি দিবেন' কথাটির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে আগের আয়াতে 'প্রবেশ করাবেন' এর সঙ্গে। অর্থাৎ কপটাচারী ও অংশীবাদীদের অবস্থা হবে বিশ্বাসীদের বিপরীত। বিশ্বাসীগণকে যেমন স্বর্গে প্রবেশ করানো হবে, তেমনি অবিশ্বাসীদেরকে প্রবেশ করানো হবে নরকে। আবার উভয় দলের স্বস্তি ও শাস্তি হবে চিরকালীন। আর এখানে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে। নির্ধারণ করে তাঁর অংশীদার ও সমকক্ষ। আবার আল্লাহকে ছেড়ে তারা ওই সকল মিথ্যা অংশীদারগুলোর উপাসনাও করে নির্দ্বিধায়। আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করার বিষয়টি এরকমও হতে পারে যে, তারা মনে করে, আল্লাহ্ তাঁর রসুল ও রসুলের সহচরবর্গকে সাহায্য করবেন না। ফলে তাঁর রসুল নিরাপদে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন না। এভাবে এখানকার 'যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেকে শাস্তি দিবেন' কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসুল এবং রসুলের বিশ্বস্ত অনুগামীগণের প্রতি অসৎ ধারণা পোষণ করার প্রতিফল শাস্তিরূপে প্রত্যাবর্তিত হবে তাদের দিকেই। আর এখানাকার 'আল্লাহ্ তাদেরকে লানত করেছেন' অর্থ আল্লাহ্ তাদেরকে পরকালে শাস্তি তো দিবেনই, উপরন্তু শাস্তি দিয়েছেন এই দুনিয়ায়। সেকারণেই তারা আল্লাহ্‌র বাহিনীর হাতে বার বার হয়েছে নিহত, বন্দী এবং শেষে হতে চলেছে চূড়ান্তরূপে পরাজিত।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।

এখানে 'ওয়া লিল্লাহি জুনদুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' অর্থ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই। অর্থাৎ সকল ক্ষমতাই তাঁর। আর তিনি প্রজ্ঞাময়ও। তাই তিনি তাঁর চিরস্বাধীন অভিপ্রায় ও প্রজ্ঞানুসারে যেভাবে চান সেভাবেই সবকিছু পরিচালনা করেন। নস্যাত করে দেন তাঁর রসুল ও রসুলের

অনুগামীদের বিরুদ্ধাচরণ যারা করে, তাদের সকল ষড়যন্ত্র। আর যখন তাদেরকে শাস্তিদান করেন, তখন কেউ অথবা কোনোকিছুই তাঁর শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে না।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে (৮), যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান আনো এবং রসুলকে শক্তি যোগাও ও তাঁকে সম্মান করো; সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো' (৯)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি আমার নিরঙ্কুশ এককত্বের সাক্ষ্যদাতারূপে, বিশ্বাসীগণকে বেহেশতের শুভসমাচারদাতা এবং অবিশ্বাসীদেরকে দোজখ সম্পর্কে সতর্ককারীরূপে। অতএব হে মানুষ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো আমার প্রতি, আমার বার্তাবাহকের প্রতি। সুতরাং তোমরা সহায়তা করো তাঁকে তাঁর বার্তাবহনকর্মে, প্রদর্শন করো তাঁর প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান এবং এই মহাসৌভাগ্যপ্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বিশুদ্ধচিত্তে সকাল-সন্ধ্যায় বর্ণনা করো আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা।

এখানে 'তুয়ায্যিরূহু' অর্থ তাঁকে সাহায্য কোরো, 'তুয়াক্কিরূহু' অর্থ তাঁকে সম্মান করো এবং 'সাব্বিহূহু' অর্থ আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। অথবা পাঠ করো নামাজ।

এখানকার তিনটি 'হু' সর্বনামই আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তিত। এখানে 'সাহায্য করো' বা 'শক্তি যোগাও' অর্থ সাহায্য করো আল্লাহ্র মনোনীত ধর্মের এবং তাঁর রসুলের। আবার 'শক্তিযোগাও' কথাটির অর্থ এখানে এরকমও হতে পারে যে, সর্বশক্তি দিয়ে তোমরা অভিমুখী হও কেবল আল্লাহ্র প্রতি, মনোযোগী হয়ো না অন্য কারো অথবা কোনো কিছুর দিকে এবং বলো, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো দিক থেকে কোনো সাহায্যও নেই, কোনো শক্তিও নেই)। বাগবী লিখেছেন, 'তাঁকে সাহায্য কোরো', 'তাঁকে সম্মান কোরো' বাক্যদু'টিতে কর্মপদীয় সর্বনাম (হু) 'তাকে' মিলিত হবে রসুল স. এর সাথে। আর 'তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কোরো' বাক্যে 'তাঁর' যুক্ত হবে আল্লাহ্র সাথে। এ ব্যাখ্যার পেক্ষাপটে সর্বনামের বিশৃঙ্খলার কারণে জমখশারী বলেন, ব্যাখ্যাটি অসঙ্গতিপূর্ণ। আমরা বলি—রীতি বিরুদ্ধ না হলে অথবা ভাবের সঙ্গতি থাকলে কোনোই অসুবিধা নেই।

সূরা ফাতাহ্ ঃ আয়াত ১০

তাফসীরে মাযহারী/৬৫১

❑ যাহারা তোমার হাতে বায়'আত করে তাহারা তো আল্লাহ্রই হাতে বায়'আত করে। আল্লাহ্র হাত তাহাদের হাতের উপর। অতঃপর যে উহা ভঙ্গ করে, উহা ভঙ্গ করিবার পরিণাম তাহারই এবং যে আল্লাহ্র সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি অবশ্যই তাহাকে মহাপুরস্কার দেন।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! এই হুদায়বিয়া প্রান্তরে যারা এখন আপনার হাতে হাত রেখে জেহাদ ও ধর্মপারায়ণতার বায়াত গ্রহণ করছে, তারা প্রকৃত অর্থে বায়াত গ্রহণ করছে আল্লাহ্র কাছে। এরপর যদি কেউ এই বায়াত ভঙ্গ করে, তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে এর ভয়াবহ প্রতিফল। আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে শাস্তিদান করবেনই। আর যারা এই বায়াত অনুসারে তার কৃত অঙ্গীকার যথারীতি পালন করে চলবে, তিনি অবশ্যই তাকে দান করবেন অক্ষয় পুরস্কার।

এখানে 'যারা তোমার হাতে বায়াত গ্রহণ করে' অর্থ হে রসুল! যারা আপনার কাছে এই মর্মে জেহাদের অঙ্গীকার করে যে, তারা কোনোক্রমেই জেহাদের ময়দান থেকে পশ্চাপসরণ করবে না, মৃত্যু অথবা বিজয় পর্যন্ত প্রাণপনে লড়াই করে যাবে। 'তারা তো আল্লাহ্র হাতে বায়াত গ্রহণ করে' অর্থ হে আমার রসুল! আমার কাছে বায়াত গ্রহণ করতে হলে তো অবশ্যই বায়াত গ্রহণ করতে হবে আপনার কাছেই, কেননা আপনিই আমার নিযুক্ত প্রতিনিধি, আমার রসুল।

'ইয়াদুল্লহি ফাওক্বা আইদীহিম' (আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর) এই বাক্যটির ভিত্তি এখানে ইস্তেআ'রায়ে তাখলিয়া (সংবেদী উপমার) উপর। অর্থাৎ রসুল স. এর হাতে বায়াত হওয়াকে যখন এখানে আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন হাতে বায়াত হওয়ারূপে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখন এরকম ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, তাহলে রসুলের হাতই আল্লাহ্র হাত। তাই অপধারণা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাটুকুকে তিরোহিত করার উদ্দেশ্যে এখানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর'। অর্থাৎ রসুল ও তাঁর কাছে বায়াত গ্রহণকারীদের হাতের চেয়ে আল্লাহ্র হাত ভিন্ন। কেননা তিনি আকারসম্ভূত নন। অর্থাৎ বায়াতকারী ও বায়াত গ্রহণকারীদের বায়াত অনুমোদন করে যে হাত সে হাত আল্লাহ্র এবং অবশ্যই সে হাত অন্য কারো মতো হওয়া থেকে পবিত্র। সে হাত আনুরূপ্যবিহীন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ তাদের কল্যাণদানের যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তা পরিপূর্ণ করবার জন্য আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন হাত তাঁদের হাতের উপরে ছিলো। আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তখন

www.eelm.weebly.com

তাঁদের হাতের উপরে রেখেছিলেন তাঁর অঙ্গীকার সম্পন্ন করার হাত। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র হাতকে মনে করতে হবে তাঁর এক বিশেষ গুণ, আর সে গুণও হবে তাঁর অন্যান্য গুণের মতো আনুরূপ্যবিহীন, যা কল্পনার অতীত।

কালাবী বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্‌র হাত' অর্থ তাঁর পক্ষ থেকে সৎপথ প্রাপ্তির অনুগ্রহ। আর তাঁর এমতো অনুগ্রহের অর্থ হবে, সাহাবীগণ রসুল স. এর নিকটে আনুগত্যের যে শপথ নিয়েছিলেন, তদপেক্ষা অনেক উত্তম নেয়ামত সৎপথপ্রাপ্তি বা হেদায়েত তিনি তাঁদেরকে দান করেছিলেন।

মুজাহিদ ও কাতাদা সূত্রে আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে জারীর, কেবল মুজাহিদ সূত্রে বায়হাকী এবং ইবনে ইয়াজিদ ও মোহাম্মদ ইবনে আমর সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়া যাত্রার আগে রসুল স. মদীনায় এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি স. তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে শান্তির সঙ্গে মক্কায় প্রবেশ করছেন। তার সঙ্গীগণের কারো কারো মস্তকের কেশ ছিলো মুণ্ডিত এবং কারো কারো মস্তকের কেশ ছিলো ছাঁটা। এমতাবস্থায় কাবাগৃহের চাবি তাঁর হস্তগত হলো এবং তিনি প্রবেশ করলেন কাবাভ্যন্তরে। বাগবী, মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ। মুজাহিদ সূত্রে প্রাপ্ত কোনো কোনো বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, তিনি স. স্বপ্নটি দেখেছিলেন হুদায়বিয়ায়। কিন্তু প্রথমোক্ত বর্ণনাটিই অধিকতর যথাযথ।

ইবনে সা'দ, মোহাম্মদ ইবনে ওমর ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন মরুপ্রান্তরবাসীদেরকে তাঁর সঙ্গী হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেনি। তিনি আশংকা করছিলেন যে, নিশ্চয় কুরায়েশরা বিনা যুদ্ধে রসুল স. ও তাঁর বাহিনীকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না।

জুহুরী সূত্রে আহমদ, বোখারী, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ এবং মারোয়ান ইবনে হাকাম মুসাওয়ার ইবনে মাখরিমা ওরওয়া—জুহুরী এই সূত্রপরম্পরায় মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়া যাত্রার পূর্বে রসুল স. বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে প্রথমে গোসল করলেন। তারপর পরিধান করলেন সাহাবীগণ দ্বারা বয়নকৃত নতুন লুঙ্গি ও চাদর। গৃহদ্বারে অপেক্ষা করছিলো তাঁর কাসওয়া নাম্নী উষ্ট্রীটি। তিনি ওই উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। সহ-আরোহিণীরূপে সঙ্গে নিলেন জননী উম্মে সালমাকে। অন্য উটে আরোহণ করে তাঁর সহযাত্রিণী হলেন হজরত উম্মে মুনী, হজরত আসমা বিনতে আমর এবং হজরত উম্মে আম্মারা আশহালীয়া। যাত্রা শুরু হলো। তাঁর সহগামী হলো তখন মুহাজির, আনসার ও অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরাও। রসুল স. এর স্বপ্ন ছিলো সন্দেহাতীতরূপে সত্য। তাই যাত্রার সাফল্য সম্পর্কে কারো মনে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিলো না। নিরাপত্তার জন্য তাঁদের সঙ্গে ছিলো কেবল তরবারী। আর সেগুলোও ছিলো কটিদেশে কোষাবদ্ধ। রসুল স. তাঁর কোরবানীর পশুগুলোকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে পহেলা যিলক্বদ, ৬ষ্ঠ হিজরী, সোমবারে তিনি স. তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কাভিমুখে যাত্রা করলেন। দ্বিপ্রহরে জুলহুলায়ফায় পৌঁছে জোহরের নামাজ পাঠ করলেন। কোরবানীর জন্য তিনি স. সঙ্গে নিয়েছিলেন সত্তরটি উট। সেগুলোকে বিশেষ পোশাক পরানো হলো। তাদের কয়েকটিকে তিনি স. কেবলামুখী করে দাঁড় করিয়ে নিজে হাতে সেগুলোতে চিহ্ন করে দিলেন। অবশিষ্টগুলোকে চিহ্ন করে দিবার জন্য তিনি স. নির্দেশ দিলেন হজরত নাজ্‌আহ্‌ ইবনে জুনদুবকে। এরপর উটগুলোর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হলো মালা, যাতে সবাই চিনতে পারে যে, এগুলো কোরবানীর উট। রসুল স. এর দেখা দেখি সাহাবীগণও তাঁদের আপনাপন কোরবানীর পশুগুলোকে এভাবে চিহ্নিত করে

নিলেন। এ ছাড়া তাঁদের সঙ্গে দুই শত ঘোড়াও ছিলো। এরপর রসুল স. কুরায়েশদের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন হজরত বিশর ইবনে সুফিয়ানকে। আর হজরত উব্বাদ ইবনে বিশরের নেতৃত্বে কুড়িজনের একটি দলকে পাঠালেন অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. ওই অগ্রগামী বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন হজরত সা'দ ইবনে জায়েদ আশহালীকে। এরপর রসুল স. ইহরামের পোশাক পরে দুই রাকাত নামাজ পাঠ করলেন। তারপর মসজিদের দরোজা থেকেই উঠে পড়লেন তাঁর উষ্ট্রীর উপর। উষ্ট্রীটি চলতে শুরু করলো কেবলামুখী হয়ে। তিনি স. এভাবে ইহরাম পরে রওয়ানা হলেন একারণে যাতে তাঁকে দেখে সবাই সহজে বুঝতে পারে যে, তাঁর এই যাত্রা চলেছে হজ্ব প্রতিপালনের জন্য, যুদ্ধযাত্রার উদ্দেশ্যে তিনি স. বের হননি।

চলতে চলতে তিনি স. উচ্চারণ করতে লাগলেন 'লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক'। জননী সালমাসহ অধিকাংশ সাহাবীই জুলহুলায়ফাতে ইহরাম বেঁধে নিয়েছিলেন। অবশিষ্ট সাহাবীগণ ইহরাম বাঁধলেন জুহ্‌ফায় গিয়ে। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতো বনী বকর, মুজাইনা ও জুহুনিয়া সম্প্রদায়। রসুল স. তাদেরকেও সহযাত্রী হওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তারা তাঁর আহ্বানে তেমন কর্ণপাত করলো না। উল্টো বরং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, মোহাম্মদ আমাদেরকে এমন সব লোকের সঙ্গে লড়বার জন্য নিয়ে যেতে চায়, যারা অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ব নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে। মোহাম্মদ ও তার সাথীরা তাদের গ্রাসে পরিণত হবে। এদেরকে আর জ্যান্ত ফিরে আসতে হবে না। কেননা এদের তো সেরকম যুদ্ধপ্রস্তুতিই নেই। সংখ্যায়ও যে এরা খুব বেশী, তা-ও নয়। রসদপত্রও তথৈবচ। এই যাত্রায় আর একটি ঘটনা ঘটিয়েছিলেন হজরত আবু কাতাদা। তিনি ইহরাম পরিহিত ছিলেন। ওই অবস্থায় তিনি শিকার করলেন একটি বন্য গর্দভ এবং তার কিছু অংশ

www.eelm.weebly.com

হাদিয়া হিসাবে পেশ করলেন রসুল স. সকাশে। ঘটনাটি ঘটেছিলো আব্ওয়া নামক স্থানে। সুরা মায়িদার তাফসীরে ঘটনাটির বিবরণ দেওয়া হয়েছে সবিস্তারে।

রসুল স. জুহ্ফায় পৌঁছে যাত্রা বিরতির নির্দেশ দিলেন। অবস্থান গ্রহণ করলেন একটি গাছের নিচে। বিশ্রাম গ্রহণের পর সকলকে সমবেত করে বললেন, মনে হয় তোমাদের আগেই আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবো। তবে দু'টো জিনিস রেখে যাবো তোমাদের জন্য। ওই দু'টোকে যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকো, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টো জিনিস হচ্ছে, আল্লাহ্র কিতাব এবং আল্লাহ্র রসুলের সুন্নত।

ওদিকে মক্কায় যখন রসুল স. এর হজ ও ওমরা যাত্রার সংবাদ পৌঁছলো, তখন কুরায়েশেরা নিজেদের মধ্যে শুরু করলো শলাপরামর্শ। শেষে ঠিক করলো, মোহাম্মদ ও তার বাহিনীকে বাধা দিতেই হবে, যুদ্ধ তাদের উদ্দেশ্য না হলেও। কেননা তাকে ওমরা পালন করতে দিলেও কথা উঠবে। জনসমক্ষে প্রচার হয়ে

পড়বে যে, আমরা দুর্বল তাই বাধা দিতে পারিনি। তাদের সঙ্গে আমাদের যে দীর্ঘদিনের বিবাদ, সেকথা তো সকলেই জানে। তারা খালেদ ইবনে ওলীদের নেতৃত্বে প্রস্তুত করলো দুইশত সৈনিকের একটি বাহিনী। খালেদ তার বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলো। বনী ছাক্বিফ ও অন্যান্য পৌত্তলিক গোত্রও যোগ দিলো তার সঙ্গে। এভাবে প্রথমে কুরাউলগামীমে এবং পরে বলদাহ্ গিয়ে তাঁবু ফেললো পৌত্তলিক বাহিনী। নারী ও শিশুরাও ছিলো তাদের সঙ্গে। সেখানে প্রধান প্রধান নেতারা খালেদের সঙ্গে শলাপরমর্শ করলো। শেষে সকলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলো যে, পথিমধ্যেই মোহাম্মদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। তাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না কোনোক্রমেও। দশজন গুপ্তচরের একটি দল আরো অগ্রসর হয়ে বসে রইলো গিয়ে একটি পাহাড়ের চূড়ায়। ওই চূড়া থেকে তারা রসুল স. এর গতিবিধি দেখতে পাচ্ছিলো। তাই তাঁর গতিবিধির সংবাদ তাদের পশ্চাতের লোকদের কাছে সরবরাহ করতে তাদের কোনো বেগ পেতে হলো না।

রসুল স. হজরত বিশর ইবনে সুফিয়ানকে গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসে গাদীরে আশতাত নামক স্থানে রসুল স. এর সঙ্গে মিলিত হলেন। বললেন, কুরায়েশেরা আপনার যাত্রার কথা জেনে ফেলেছে। তারা অধিকাংশই মক্কা থেকে বের হয়ে এসেছে। নারী ও শিশুদেরকেও রেখেছে সঙ্গে। এখন তারা আছে জীতাওয়া নামক স্থানে। আল্লাহ্র নামে শপথ করে নিজেদের মধ্যে তারা এই মর্মে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে যে, আপনাকে তারা কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। তাদের অগ্রগামী বাহিনীর অধিনায়ক হয়েছে খালেদ ইবনে ওলীদ। সে তার বাহিনী নিয়ে এখন কুরাউলগামীমে। রসুল স. বললেন, আক্ষেপ কুরায়েশদের জন্য। যুদ্ধ যুদ্ধ করেই তারা শেষ হতে চলেছে। কী এমন ক্ষতি হতো, যদি তারা আমাকে স্বাধীনভাবে ধর্মপ্রচার করতে দিতো। তাদের ধর্ম যদি জয়যুক্ত হতো, তবে তাদের বাসনা তো পূর্ণই হয়ে যেতো। আর আল্লাহ্ যদি আমাকে জয়যুক্ত করতেন, তাহলে তারা ও আমরা হয়ে যেতাম একই দলের। এভাবে হয়ে যেতো একটি বৃহৎদল। তারা স্বধর্ম ত্যাগ না করলেও তো আরবীয় হিসেবে শক্তিশালীই থাকতো। বহিঃশত্রুকে ঠেকাতে পারতো সহজে। কী মনে করেছে তারা? ইসলামকে কি আল্লাহ্ বিজয়ী করবেন না? আল্লাহ্র শপথ! আমি এই ইসলামের পক্ষেই আজীবন যুদ্ধ করে যাবো, তারা বিজয়ী হয়ে গেলেও এবং পৃথিবীতে কেবল আমি একা বেঁচে থাকলেও। এরপর রসুল স. সকলকে ডাকলেন। সবাই সমবেত হওয়ার পর শুরু করলেন আল্লাহ্র প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি। তারপর বললেন, হে বিশ্বাসী জনতা! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। কী করবো আমি? তাদের সঙ্গের নারী ও শিশুদেরকে কি আমরা বন্দী করে তাদেরকে যিম্মী বানাবো? না সংযত হবো। তারা যদি আক্রমণ করে বসে, তবে তো তাদের একদল লোক বেঘোরে প্রাণ হারাবে। আল্লাহ্ তাদেরকে ছাড়বেন না। আর যদি বলো, তবে আমরা আগে তাদেরকে আক্রমণ না করে কেবল ওমরা পালনের জন্য অগ্রসর হই। এরপর যে বাধা দিবে তাদের বিরুদ্ধে কেবল অস্ত্রধারণ করি।

হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আপনি তো কাবা জিয়ারাতের উদ্দেশ্যে পথ চলেছেন। যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তো আপনি যাত্রা করেননি। সুতরাং আপনি কেবল কাবামুখী হয়ে অগ্রসর হন। পথে যারা বাধা দিবে তাদের বিরুদ্ধে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করবো। হজরত উসায়েদ হজরত আবু বকরের এই অভিমতের প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করলেন।

ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকরের বক্তব্য শেষ হবার পর উঠে দাঁড়ালেন হজরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ। বললেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! বনী ইসরাইলেরা তাদের পয়গম্বরকে বলেছিলো, তুমি এবং তোমার প্রতিপালক গিয়ে শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করো, আমরা এখানেই বসে থাকলাম। আমি আপনাকে সেরকম কিছুতেই বলবো না। বলবো, আপনি ও আপনার প্রভুপালক অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেনই। আমরাও হবো আপনার সহযোদ্ধা। রসুল স. বললেন, তাহলে অগ্রসর হও। এমন সময় খালেদ তার বাহিনী নিয়ে অনেক কাছে এসে পড়লো। সাহাবীগণ তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তাই তাঁরা রসুল স.কে ঘিরে ব্যূহ রচনা করলেন। রসুল স. হজরত উব্বাদ ইবনে বিশরকে এগিয়ে গিয়ে সকলকে সারিবদ্ধ করতে বললেন। হজরত উব্বাদ সারিবদ্ধ সৈন্য নিয়ে দাঁড়ালেন খালেদ বাহিনীর মুখোমুখী। ইত্যবসরে জোহরের

নামাজের সময় হয়ে গেলো। হজরত বেলাল আজান দিলেন। রসুল স. সাহাবীগণকে নিয়ে জোহরের নামাজ সমাপন করলেন। খালেদ তার লোকদেরকে বললো, ওরা নামাজে মগ্ন ছিলো। ওই অবস্থায় আক্রমণ করা সহজ ছিলো। যাহোক, একটু পরে আবার তারা নামাজে দাঁড়াবে। তাদের কাছে তাদের প্রাণ ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের প্রাণ অপেক্ষা নামাজ অধিক প্রিয়। কিন্তু তাদের পরিকল্পনা সফল হলো না। আসরের আগেই হজরত জিবরাইল নিয়ে এলেন এই আয়াত। 'ওয়া ইজা কুনতা ফীহিম ফাআক্বামতা লাহুমুস্ সলাতা ফালতাক্বুম ত্বয়িফাতুম মিনহুম'। এই বিধানানুসারে রসুল স. আসর নামাজ পড়লেন। এই বিধানের নাম 'সালাতে খওফ'। এ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে সুরা নিসার তাফসীরে। বিশ্বস্ত সূত্রে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে মোহাম্মদ ইবনে ওমর ও বায্যার বর্ণনা করেছেন, সন্ধ্যা হলে রসুল স. বললেন, বাম দিকে হেমসের সামনের রাস্তা দিয়ে চলো। কেননা খালেদ কুরায়েশদেরকে নিয়ে এখন অবস্থান করছে কুরাউলগামীমে। সাহাবীগণকে রসুল স. অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাই অযথা সংঘর্ষ কামনা করতেন না। বললেন, হানজল ঘাটি সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে কে জানে? হজরত বুরাইদা ইবনে হাসিব জবাব দিলেন, আমি।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম এবং হজরত আবু সাঈদ থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়ার বছরে আমরা রসুল স. সহযাত্রী হলাম। পৌঁছলাম আসফানে। আগের রাতে আমরা ছিলাম হানজল ঘাটিতে। রসুল স. তখন বলেছিলেন, আজ রাতে এই ঘাটির উপমা সেই নগরতোরণের মতো, যাতে প্রবেশ করার আদেশ দিয়েছিলেন আল্লাহ্ বনী ইসরাইলদেরকে। বলেছিলেন

'তোমরা নতশির হয়ে ওই তোরণমধ্যে প্রবেশ করো, আমি তোমাদের সকল দোষত্রুটি ক্ষমা করে দিবো। আজ রাতেও তেমনি যে এই ঘাটি অতিক্রম করবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। সাহাবীগণ বললেন, আমাদের আশংকা হয় আমরা আগুন জ্বালালেই তারা আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি স. বললেন, তারা তোমাদেরকে কোনোভাবেই দেখতে পাবে না। শপথ তাঁর, যাঁর আনুরূপ্যবিহীন অধিকারে রয়েছে আমার জীবন, আজ সকলকেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে, কেবল ওই লোক ছাড়া, যে সওয়ার হয়ে আছে তার লাল উটের পিঠে। ওই দুর্ভাগা কে, তা জানার জন্য সাহাবীগণ অনুসন্ধান চালালেন। শেষে দেখতে পেলেন লোকটি বনী জমরা গোত্রের। সাহাবীগণ তাকে বললেন, রসুল স. এর কাছে চলো। তিনি তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। লোকটি বললো, আমি খুঁজছি আমার হারিয়ে যাওয়া উট। উটটি যদি আমি পেয়ে যাই, তবে তা হবে আমার কাছে তোমাদের সাথীর দোয়ার চেয়ে অধিক মূল্যবান। ইত্যবসরে আমরা পৌঁছে গেলাম সুরাদা ঘাটির সামনে। তখন হঠাৎ ওই লোকটির উটের পা পিছলে গেলো। উটটি পড়েই মারা গেলো সঙ্গে সঙ্গে। আর কোত্থেকে একটি হিংস্র জন্তু এসে তাকে যখন ভক্ষণ করলো, তখন সকলে জেনে গেলো তার করুণ পরিণতি।

হজরত মুসাওয়ার ইবনে মাখরিমা এবং মারোয়ান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. যখন হুদায়বিয়ার সন্নিকটে পৌঁছলেন, তখন তাঁর উষ্ট্রীটি থেমে গেলো। দেখা গেলো, সে তার সামনের পা মাটিতে গুটিয়ে বসে পড়েছে। সাহাবীগণ বললেন, হট হট। কিন্তু উটনীটি আর উঠলো না। বরং আরো ভালোভাবে বসে গেলো। সাহাবীগণ বলাবলি করতে লাগলেন, কাসওয়া ধুঁকে পড়েছে। রসুল স. বললেন, না, সে ইচ্ছে করে থামেনি। বরং তাকে থামিয়ে দিয়েছেন সেই সত্তা, যিনি থামিয়ে দিয়েছিলেন আবরাহার হস্তীযুথকে। শপথ তাঁর, যার হাতে রয়েছে আমার জীবন, কুরায়েশেরা আজ আল্লাহ্র মহামর্যাদার কথা তুলে যদি কোনো দাবি জানায়, তবে আমি তা মেনে নিবো। এরপর তিনি স. কাসওয়াকে মৃদু ধমক দিলেন। অমনি সে উঠে পড়লো। এরপর যাত্রা শুরু করলো দিক পরিবর্তন করে। হুদায়বিয়া প্রান্তরের একপাশে যেখানে সামান্য পানি ছিলো, সেখানে গিয়ে যাত্রাবিরতি করলেন তিনি স.। সাহাবীগণ দেখলেন, কূপটিতে পানি রয়েছে সামান্যই। তাঁদের আশংকা হলো, অল্পক্ষণের মধ্যেই পানি শেষ হয়ে যাবে। হলোও তাই। পানির প্রয়োজন ছিলো সকলেরই। কিছু কিছু করে পানিও ওঠাতে লাগলেন তাঁরা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি শুকিয়ে গেলো। সাহাবীগণ রসুল স. সকাশে কথাটি জানালেন। তিনি স. সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তূণীর থেকে একটি তীর বের করে এনে বললেন, এই তীরটি ওই জায়গায় পুঁতে দাও যেখানে এখনো কিছু পানি জমা হয়ে আছে। আদেশ প্রতিপালিত হলো। তীরপ্রোথিত স্থান থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করলো পানির ফোয়ারা। সকলে প্রয়োজন মতো পানি সংগ্রহ করতে লাগলেন সেখান থেকে। হজরত মুসাওয়ার বর্ণনা করেছেন, কূপ ভরে গেলো কানায় কানায়। সকলে কূপের কিনারা থেকেই পানি সংগ্রহ করতে

লাগলেন। যিনি রসুল স. এর তীরটি মাটিতে গেঁথে দিয়েছিলেন তাঁর নাম ছিলো নাহিয়াহ্ ইবনে জুনদুব। তিনিই রসুল স. এর কোরবানীর উঠগুলি পরিচালনা করছিলেন। মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, আবু মারোয়ান বলেন, আমার কাছে চৌদ্দজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, তীর পুঁতে দিয়েছিলেন নাহিয়াহ্ ইবনে আজম। তিনি বলেছেন, লোকেরা যখন রসুল স.কে পানিসংকটের কথা জানালেন, তখন রসুল স. আমাকে ডেকে তাঁর তীরাধার থেকে একটি তীর বের করে দিলেন। বললেন, সেখান থেকে এক পাত্র পানি নিয়ে এসো। আমি নির্দেশ প্রতিপালন করলাম। তিনি স. ওই পানি দিয়ে ওজু করলেন। তারপর

মুখভর্তি পানি নিয়ে তা কুলি করে ফেলে দিলেন ওই পাত্রটির মধ্যেই। তখন ছিলো গ্রীষ্মকাল। তাই সেখানকার একমাত্র কূপটির পানি গিয়েছিলো কমে। আশে পাশের কূপগুলো দখল করে নিয়েছিলো কুরায়েশেরা। রসুল স. পানির পাত্র ও তীরটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, পাত্রটি নিয়ে কূপে নেমে যেয়ো এবং সেখানে এই তীরটি পুঁতে দেওয়ার পর পাত্রের পানিটুকু ফেলে দিয়ো। আমি যথারীতি এই আদেশটিও পালন করলাম। শপথ তাঁর যিনি রসুল স.কে তাঁর সত্য বাণীবাহক করে পাঠিয়েছেন, আমি কূপ থেকে উঠে আসার আগেই কূপটি কানায় কানায় ভরে গেলো। পানি নির্গত হচ্ছিলো ফুটন্ত পানির মতো টগবগ করে। লোকেরা অনায়াসে কূপের পাড় থেকেই পানি সংগ্রহ করে নিতে লাগলো। হজরত বারা থেকে আহমদ, বোখারী প্রমুখ, হজরত সালমা ইবনে আকওয়া থেকে মুসলিম এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু নাঈম, ওরওয়া ও ভিন্ন সূত্রে বায়হাকী ও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় তীর প্রোথিত করার কথা নেই।

হজরত জাবের থেকে বোখারী এবং হজরত সালমা ইবনে আকওয়া থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়ায় পৌঁছে লোকেরা পিপাসিত হয়ে পড়লো। এমন সময় রসুল স. এর সামনে রাখা হলো একটি চর্মনির্মিত পানপাত্র। বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের পান করা এবং ওজু করার মতো জল নেই, কেবল আপনার পাত্রটিতে রক্ষিত জলটুকু ছাড়া। রসুল স. এর সামনে ছিলো আর একটি জলশূন্য বড় পাত্র। আমরা তাঁর নির্দেশে জলটুকু ঢেলে দিলাম বড় পাত্রটিতে। তিনি স. তখন ওই পাত্রে রাখলেন তাঁর পবিত্র হস্তদ্বয়। সাথে সাথে দেখা গেলো তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে ঝর্ণার মতো জলপ্রবাহ জারী হয়েছে। আমরা সকলে ওই পাত্র থেকে জল সংগ্রহ করলাম। পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করলাম। ওজুও সম্পন্ন করলাম। হজরত জাবেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আপনারা তখন কতোজন ছিলেন? তিনি বললেন, পনেরো শত। কিন্তু আমরা যদি তখন এক লাখও থাকতাম, তবু আমাদের মধ্যে কেউ জলসংকটে ভুগতো না।

রসুল স. যখন হুদায়বিয়ায় এসে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলো বুদাইল ইবনে ওরাকার নেতৃত্বে খাজাআ সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক (পরে বুদাইল ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন)। তার সাথীদের মধ্যে ছিলো আমর ইবনে সালেম, হারাস ইবনে উমাইয়া, খারেজা ইবনে করয এবং

ইয়াজিদ ইবনে উমাইয়া। তারা সকলে এসে রসুল স.কে সালাম বললো। বুদাইল বললো, আমরা এসেছি আপনার সম্প্রদায় কা'ব ইবনে লুয়াই এবং আমের ইবনে লুয়াইয়ের পক্ষ থেকে। তারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের সম্প্রদায়ের সকল লোককে সমবেত করেছে। আরো সমবেত করেছে তাদের মিত্রগোত্রগুলোকে। হুদায়বিয়ার জলকূপগুলো তাদের কবজায়। তাদের সঙ্গে রয়েছে নারী ও শিশুরাও। তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করেছে যে, আপনাকে তারা কিছুতেই কাবাগৃহ পর্যন্ত অগ্রসর হতে দিবে না। রসুল স. বললেন, কিন্তু আমরা তো যুদ্ধ করতে আসিনি। এসেছি কেবল কাবাগৃহ তাওয়াফ করতে। আমাদের পুণ্যপ্রচেষ্টায় যারা বাদ সাধবে আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। কুরায়েশেরা কি আমাদেরকে ঠেকাতে পারবে? যুদ্ধ করতে করতে তারা তো পর্যুদস্তপ্রায়। তবে কুরায়েশেরা যদি চায়, তবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমরা তাদের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করতে সম্মত আছি। শর্ত আমাদের একটাই যে, তারা আমাদের এবং অন্য লোকদের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না। অন্যান্য সম্প্রদায়গুলো অবশ্য কুরায়েশ সম্প্রদায় অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং তাদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজন নেই। তারা যদি আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তবে কুরায়েশদের মনোবাঞ্ছা তো পূর্ণ হবেই। আর আমাদের কথা যদি তাদেরকে প্রভাবান্বিত করে, তাহলে কুরায়েশেরাও ইচ্ছে করলে ইসলামে দীক্ষিত হতে পারবে। আর যদি তারা চায়, তবে সকলে মিলে আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। কিন্তু তারা যদি আমাদের কোনো কথাই না মানে, তাহলে আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি আমার উদ্দেশ্য পরিপূরণার্থে ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রচেষ্টা করে যাবো, যতোক্ষণ স্কন্ধদেশে অটুট থাকবে আমার মস্তক। হে আল্লাহ্! তোমার নির্দেশকে প্রকাশ করে দাও। বুদাইল বললো, আমি আপনার কথাগুলো কুরায়েশদের কাছে পৌঁছে দিবো। একথা বলেই সে তার সাথীদেরকে নিয়ে প্রস্থান করলো। কুরয়েশদের কাছে গিয়ে বললো, আমি মোহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাত করে এলাম। তাঁর বক্তব্য আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। ইকরামা ইবনে আবু জেহেল এবং হাকেম ইবনে আ'স (পরবর্তীতে দু'জনেই মুসলমান হয়েছিলেন) বললো, তাঁর বক্তব্য আমাদেরকে জানানোর দরকার নেই। তুমি বরং আমাদের কথা তাকে গিয়ে জানাও। বলো, এ বৎসর যতোক্ষণ আমাদের মধ্যে একজনও অবশিষ্ট থাকবে, ততোক্ষণ সে মক্কায় প্রবেশ করতে সমর্থ হবে না। ওরওয়া ইবনে মাসউদ সাক্বাফী পরামর্শ দিলো, আগে বুদাইলের কথা তো শোনো। তারপর মানতে চাইলে মেনো, না মানতে চাইলে মেনো না। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং হারেছ ইবনে হিশাম (এরাও পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন) বললো, ঠিক আছে, তুমি যা কিছু শুনে এসেছো, তা বলো। বুদাইল রসুল স. এর বক্তব্যের আদ্যপান্ত সবই উল্লেখ করলো। এবার ওরওয়া বললো, হে আমার সম্প্রদায়! আমি বয়োজ্যেষ্ঠ! তোমরা কি আমার সন্তানতুল্য নও? সকলে সমস্বরে বললো, অবশ্যই। ওরওয়া বললো, আমি কি তোমাদের পিতৃতুল্য নই?

www.eelm.weebly.com

সবাই বললো, নিশ্চয়ই। ওরওয়া পুনরায় বললো, তোমরা কি জানো যে, তোমাদের সাহায্যার্থে আমি উকাজ গোত্রের লোকদেরকে বের করে এনেছি? কিন্তু তাদের কাছে আমি যখন কিছুই পাইনি, তখনই তো নিজের লোকজন ও সন্তানদের এবং এই সকল লোকদেরকে তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি, যারা আমার কথা মানে। সকলে বললো, আপনি যথার্থই বলেছেন। ওরওয়া বললো, তাহলে শোনো, এই লোকটিতো তোমাদের কাছে উত্তম প্রস্তাবই নিয়ে এসেছে। তাই আমি বলি, তোমরা তার প্রস্তাব মেনে নাও। আর আমাকে অনুমতি দাও, আমি মোহাম্মদের সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাতে কথা বলি। সকলে তার কথায় সায় দিলো। ওরওয়া সাক্ষাত করলো রসুল স. এর সঙ্গে। রসুল স. ইতোপূর্বে যা বলেছিলেন, তা-ই বললেন। ওরওয়া বললো, দ্যাখো মোহাম্মদ! তুমি যদি তোমার আপন সম্প্রদায়ের মূলোৎপাটন করো, তাহলে কি তা ঠিক হবে? তুমি কখনো শুনেছো যে, কোনো আরব ইতোপূর্বে তার স্ববংশীয়দেরকে উৎখাত করেছে? আর এমনও তো হতে পারে যে, তুমিই পরাজিত হয়েছো। তখন? শপথ আল্লাহ্‌র! আমি তোমার আশে পাশে কিছু সংখ্যক মন্দ লোকের চেহারা দেখতে পাচ্ছি, যারা বিপদ দেখলে তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তার কথা শুনে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, যাও, তোমার লাত দেবতার লজ্জাস্থান চুষতে থাকো। কী ভেবেছো তুমি? আমরা কি আল্লাহ্‌র রসুলকে ছেড়ে পালিয়ে যাবার লোক? ওরওয়া জিজ্ঞেস করলো, এই লোকটি কে? সাহাবীগণ বললেন, আবু বকর ইবনে আবু কোহাফা। সে বললো, শপথ তাঁর, যার হাতে রয়েছে আমার জীবন, যদি আমি কোনো এক ব্যাপারে তোমার কাছে ঋণী না থাকতাম, তবে তোমার কথার উপযুক্ত জবাব দিতে ছাড়তাম না। ওরওয়া একবার কোনো এক হত্যাকাণ্ডের রক্তপণ পরিশোধ করার ভার নিজের ঘাড়ে নিয়েছিলো। কিন্তু সে তা পরিশোধ করতে ছিলো অপারগ। তখন কেউ এক দুই অংশ করে তাকে সাহায্য করেছিলো। আর হজরত আবু বকর একাই তাকে দিয়েছিলেন দশ অংশ। ওই উপকারের দিকেই ইঙ্গিত করেছিলো ওরওয়া। এরপর রসুল স. এর সঙ্গে তার কথোপকথন চলতে লাগলো। একবার সে কথা বলতে বলতে স্পর্শ করলো রসুল স. এর পবিত্র শ্মশ্রু। হজরত মুগীরা সশস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলেন রসুল স. এর পেছনে। ওরওয়া রসুল স. এর শ্মশ্রু স্পর্শ করতেই তিনি তাঁর তলোয়ারের অগ্রভাগ তার হাতে ঠেকিয়ে বললেন, খবরদার! হাত সরাও। কোনো পৌত্তলিক আল্লাহ্‌র রসুলের পবিত্র শ্মশ্রু স্পর্শ করতে পারে না। ওরওয়া মাথা উঁচু করে জিজ্ঞেস করলো, এ-কে? সাবাহীগণ বললেন, মুগীরা ইবনে শোবা। ওরওয়া বললো, ও তুমি? কদিন আগেই তো তুমি মলত্যাগের পর তোমার নাপাক পশ্চাদ্দেশ ধুয়েছিলে ওকাযের মেলায়। আর তুমিই তো বনী ছাকিফের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা সৃষ্টি করার হোতা। ঘটনাটি ছিলো এরকম— অজ্ঞতার যুগে হজরত মুগীরা কিছু পথচারীকে হত্যা করেন এবং তাদের মালপত্র লুট করে নেন।

তারপর ইসলাম গ্রহণ করেন। রসুল স. তখন বলেন, আমি তোমার ইসলাম গ্রহণকে অনুমোদন করলাম। কিন্তু ওসব মালপত্রের সঙ্গে আমার কোনো সংশ্রব নেই।

ওরওয়া এবার অন্যান্য সাহাবীগণকেও পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। দেখলো রসুল স. তাঁর নাসিকা থেকে নির্গত তরল পদার্থ ঝেড়ে ফেলার সময় তা মাটিতে পড়ার আগেই তাঁদের কেউ না কেউ তা ধরে ফেলছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা মেখে নিচ্ছেন নিজেদের মুখে, গায়ে। তিনি স. কোনো আদেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এক সঙ্গে ছুটে আসছেন তাঁরা। আর তিনি স. যখন ওজু করতে শুরু করলেন, তখন তাঁর ওজুর ব্যবহৃত পানি হাতে নেওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে লাগিয়ে দিচ্ছেন হুটোপুটি। তিনি স. কথা বলতে শুরু করলেই সকলে নিশ্চুপ ও উৎকর্ণ হয়ে যান। আর সব সময় তাঁর সামনে তাঁদের থাকে অবনতমস্তক ও আনত দৃষ্টি। এ সকল কিছু দেখে শুনে ওরওয়া ফিরে গেলো তার আপন লোকদের কাছে। বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি রোম, পারস্য ও নাজ্জাশীর রাজদরবারেও গিয়েছি। কিন্তু ওই সকল রাজদরবারের অনুচরদেরকে তাদের আপনাপন রাজাদেরকে এতো গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা করতে দেখিনি, যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মোহাম্মদের প্রতি তাঁর সহচরেরা। তারা তাঁকে এতো ভক্তি করে যে, চোখ তুলে তার দিকে সোজাসুজি তাকাবারও সাহস পায় না। সকলেই তার আদেশ প্রতিপালনের জন্য সদাপ্রস্তুত। সে কথা বললে সকলে নির্বাক হয়ে শোনে। আর তারা মাটিতে পড়বার আগেই হাতে তুলে নিয়ে গায়ে মুখে চোখে মেখে নেয় তাঁর নাসিকানির্গত তরল পদার্থ ও ওজুর পানি। এবার শোনো, সে একটি ভালো প্রস্তাবই দিয়েছে। প্রস্তাবটি তোমাদের মেনে নেওয়াই উচিত। কুরায়েশরা নিশ্চুপ। ওরওয়া পুনরায় বললো, তোমরা তাঁকে এ বছর ফিরে যেতে বলতে পারো। কিন্তু আগামী বছর তাঁকে আসতে দিতেই হবে। আমার তো মনে হয় তোমাদের উপরে বিপদ অত্যাসন্ন। একথা বলেই সে তার সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে চলে গেলো তায়েফে।

কুরায়েশদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো বেশ কয়েকটি পৌত্তলিক সম্প্রদায়। একটি দলের অধিনায়ক ছিলো জালিস ইবনে আলকামা। ওরওয়া চলে যাবার পর সে উঠে পড়লো। রওয়ানা হলো রসুল স. এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। রসুল স. দূর থেকে তাকে আসতে দেখে বললেন, জালিস এগিয়ে আসছে। সে এমন ধরনের মানুষ, যে কোরবানীর পশুদের খুবই সম্মান করে। আর সে আল্লাহ্‌ভক্তও বটে। তোমরা কোরবানীর উটগুলো তাঁর চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে যাও। তাই করা হলো। জালিস বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলো সারিসারি কোরবানীর পশু। সবগুলোই কোরবানীর বিশিষ্ট চিহ্নবিশিষ্ট। অনেক দিন ধরে গলায়

www.eelm.weebly.com

বেড়ি দেওয়ার কারণে সে গুলোর গলার পশমও উঠে গিয়েছে। এসব দেখে সে আর অগ্রসর হলো না। ফিরে গিয়ে তার দলের লোকদেরকে বললো, হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম তাদের কোরবানীর পশুগুলোর গলায় কিলাদাহ্ ঝুলছে। দীর্ঘদিন ধরেই পশুগুলো কোরবানীর জন্য লালিতপালিত ও সুচিহ্নিত। সুতরাং তাদেরকে

বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। কুরায়েশেরা একথা শুনে তাকে ধমক দিলো। বললো, তুমি নির্বোধ। তুমি কিছুই জানো না। চুপচাপ বসে থাকো। জালিসও রেগে গেলো। বললো, হে কুরায়েশ গোত্রপতিরা! আমি তোমাদের সঙ্গে এরকম কোনো চুক্তি করিনি যে, কেউ কাবাগৃহের সম্মান প্রদর্শনার্থে এগিয়ে এলে আমি তাকে বাধাদান করবো। শপথ তাঁর, যার হাতে আমার জীবন, মোহাম্মদের উদ্দেশ্য শুভ। সুতরাং তাঁকে বাধা দিতে যেয়ো না। যদি দাও, তবে তোমাদের পুরো দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। কুরায়েশেরা বললো, হয়েছে থামো। আমাদের ব্যাপারে নাক গলিয়ো না। আমরা যা ভালো মনে করি, তাই করবো। মাকরয ইবনে হাফস নামক এক লোক এবার উঠে দাঁড়ালো। বললো, আমাকে তোমরা মোহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দাও। সকলে তার প্রস্তাবে সায় দিলো। রসুল স. তাকে আসতে দেখে সাহাবীগণকে বললেন, এবার এগিয়ে আসছে মাকরয। সে লোক হিসেবে অত্যন্ত অসৎ। রসুল স. মাকরযকেও একই কথা বললেন, যা ইতোপূর্বে বলেছিলেন ওরওয়া ও জালিসকে। মাকরয চলে গেলো। রসুল স. বললেন, সে-ও নিশ্চয় সঠিক সংবাদই পৌঁছাবে।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও মোহাম্মদ ইবনে ওমরসহ অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর উটের উপর খারাশ ইবনে উমাইয়াকে আরোহণ করিয়ে কুরায়েশদের কাছে পাঠালেন। উদ্দেশ্য, তিনি কুরায়েশদেরকে রসুল স. এর মনোভাব সম্পর্কে পুনরায় বিবরণ প্রদান করবেন। কিন্তু কুরায়েশেরা তাকে কথাই বলতে দিলো না। ইকরামা ইবনে আবু জেহেল তাঁর উটের পা কেটে দিলো। তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে রক্ষা করলো। তিনি তাদের কবল থেকে ছাড়া পেয়ে রসুল স. সকাশে ফিরে এলেন। খুলে বললেন তাদের অপআচরণের কথা।

হজরত ওরওয়া থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন হুদায়বিয়ায় অবস্থান গ্রহণ করলেন, তখন কুরায়েশেরা ঘাবড়ে গেলো। রসুল স. সাহাবীগণের মধ্যে একজনকে তাদের কাছে দূত হিসেবে পাঠাতে মনস্থ করলেন। এই ভেবে ডাকলেন হজরত ওমরকে। হজরত ওমর সব শুনে বললেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! কুরায়েশেরা তো আমার কথা শোনার আগেই আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কেননা তারা তো জানে যে, আমি তাদের কতো বড় শত্রু। বনী আদী সম্প্রদায়ের কেউই আমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না। আমি বরং নাম প্রস্তাব করছি এমন এক জনের, যিনি কুরায়েশদের চোখেও সাম্মানার্হ ও নিরাপদ। তিনি হচ্ছেন ওসমান ইবনে আফ্‌ফান। প্রস্তাবটি রসুল স. এর মনঃপুত হলো। তিনি স. হজরত ওসমানকে ডেকে বললেন, তুমিই যাও। গিয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে বলো যে, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। এসেছি কেবল ওমরা পালন করতে। তারপর তাদেরকে ইসলামের প্রতিও আহ্বান জানিয়ো। আর অসহায় মুসলমানদেরকে দিয়ো বিজয়ের সুসংবাদ। বোলো, আল্লাহ্ মক্কার ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। ফলে মক্কার কেউ আর তাদের ইমানকে গোপন করবে

না। হজরত ওসমান যথারীতি যাত্রা শুরু করলেন। পথিমধ্যে বলদাহ্ নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানকার লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবেন? হজরত ওসমান বললেন, রসুল স. আমাকে প্রেরণ করেছেন সবাইকে ইসলামের আহ্বান জানাতে। তাই আমি বলি, তোমরাও ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হও। কেননা আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত ধর্মকে অবশ্যই জয়যুক্ত করবেন এবং তাঁর রসুলকে করবেন মর্যাদায়িত। এরপর আর একটু এগিয়ে গিয়ে কুরায়েশদেরকে জানালেন, তোমরা আমাদেরকে বাধা দিতে চাইছো কেনো? আমাদেরকে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে দাও। অন্য সম্প্রদায় যদি আমাদের উপরে প্রবল হয়ে যায়, তবে তো তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেই। আর রসুল স. যদি অন্যান্য গোত্রগুলোর উপরে বিজয়ী হন, তবে তোমরা তাঁর ধর্মে চলে আসতে পারবে। কিংবা আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করতে পারবে। এখনো তোমাদের সংখ্যা অনেক থাকলেও তোমরা যুদ্ধে পর্যুদস্তপ্রায়। তোমাদের প্রধান প্রধান নেতারাও ইতোমধ্যে প্রাণ হারিয়েছে। আর একথাটিও তোমরা অনুধাবন করতে চেষ্ট করো যে, রসুল স. এখানে যুদ্ধ করতে আসেননি। এসেছেন কেবল ওমরা পালন করতে। তাঁর সঙ্গে রয়েছে কোরবানীর জন্য অনেক চিহ্নিত উট। ওমরা ও কোরবানী সম্পন্ন করার পর তিনি স. মদীনায় ফিরে যাবেন। পৌত্তলিকেরা বললো, তোমার কথা আমরা শুনলাম। কিন্তু একথাও তুমি শুনে রাখো যে, আমরা তাঁর অভিপ্রায় পূর্ণ করতে দিবো না। ফিরে গিয়ে তাঁকে জানাও, আমরা তাঁকে আর মক্কার দিকে অগ্রসর হতে দিবোই না। হজরত ওসমানের সঙ্গে আব্বাস ইবনে সাঈদের সাক্ষাত হলো। তিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি হজরত ওসমানকে দেখেই বললেন, মারহাবা। আপনি যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন, তা-ই করুন। আমি আপনাকে নিরাপত্তা প্রদান করলাম। এরপর আব্বাস তাঁর ঘোড়া থেকে নামলেন। হজরত ওসমানকে প্রথমে তাঁর ঘোড়ায় চড়িয়ে নিজে উঠে বসলেন তাঁর পিছনে। বললেন, আপনি এখানে নিশ্চিন্তে আসা-যাওয়া করে আপনার দৌত্যকর্ম করে যেতে পারেন। কাউকে ভয় করার প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য, আব্বাস ইবনে সাইদ ছিলেন কাবাগৃহের সেবক। তাই সকলেই তাঁকে সম্মান করতো। তিনি হজরত ওসমানকে মক্কায় নিয়ে গেলেন। তিনি একে একে সকল কুরায়েশ নেতার সঙ্গে সাক্ষাত

করে রসুল স. এর বক্তব্য জানালেন। কিন্তু সকলেই প্রকাশ করলো নেতিবাচক মনোভাব। বললো, মোহাম্মদকে কখনোই মক্কায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। হজরত ওসমান শেষে সাক্ষাত করলেন মক্কার বন্দীপ্রায় মুসলমান নারী-পুরুষদের কাছে। তারা কুরায়েশদের বাধার কারণে হিজরত না করতে পেরে মক্কাতেই রয়ে গিয়েছিলেন। হজরত ওসমান তাদেরকে এই মর্মে সান্ত্বনার বাণী শোনালেন যে, রসুল স. জানিয়েছেন, আমি খুব শীগ্গিরই বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করবো। তখন অবস্থা এমন হবে যে, কাউকে আর ইমান গোপন রাখতে হবে না। তাঁর এই সংবাদ শুনে খুব খুশী হলেন তাঁরা। বললেন, রসুল স. কে আমাদের অভিবাদন জানাবেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত শেষ করে যখন হজরত ওসমান কুরায়েশ

নেতাদের কাছে ফিরে এলেন, তখন তারা বললো, আপনি যদি চান তবে কাবা তাওয়াফ করতে পারেন। হজরত ওসমান বললেন, আল্লাহ্র রসুল তওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তাওয়াফ করতে পারি না। তিনি মক্কায় অবস্থান করলেন তিন দিন। এরমধ্যে তিনি কুরায়েশদেরকে ইসলামের প্রতি পুনঃপুনঃ আহ্বান জানালেন।

ওদিকে রসুল স. এর সঙ্গী সাথীদের মধ্যে কেউ কেউ বলাবলি করতে লাগলেন, ওসমান নিশ্চয় কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। রসুল স. বললেন, কখনোই নয়। সে যদি সেখানে বছরের পর বছর অবস্থান করে, তবুও আমি তাওয়াফ করার আগে সে তাওয়াফ করবে না। রসুল স. হুদায়বিয়ায় প্রহরীরূপে নিযুক্ত করেছিলেন হজরত আউস ইবনে আওবা, হজরত উব্বাদ ইবনে বিশর এবং হজরত মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমাকে। তাঁরা পালাক্রমে শিবির পাহারা দিতেন।

হজরত ওসমান যখন মক্কায়, তখন একরাতে পাহারায় ছিলেন হজরত মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমা। গভীর রাতে মাকরয ইবনে হাফসের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জনের একটি দল এলো আক্রমণ করতে। তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছিলো, তারা অতি সন্তর্পণে রসুল স. এর শিবিরের চতুস্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করবে। মুসলমানদের অসতর্ককতার সুযোগ হয়তো পাওয়া যেতেও পারে। কিন্তু অতন্দ্র প্রহরী মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমার হাতে ধরা পড়ে গেলো মাকরয। রসুল স. যে তাঁকে অত্যন্ত অসৎ বলেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেলো হাতে হাতে। ওদিকে রসুল স. এর অনুমতিক্রমে কয়েকজন মুসলমান হজরত ওসমানের নিরাপত্তারক্ষা অথবা তাঁর কুশলবার্তা সংগ্রহের জন্য গোপনে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তাঁরা হলেন সর্বহজরত করযবিন জাবের ফাহরি, আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইল ইবনে আমর ইবনে আবদুস শামস্, আবদুল্লাহ্ ইবনে হুজাফা সাহমী আবুর রুম ইবনে উমায়ের ইবনে আমর, উমায়ের ইবনে ওহাব জামুহী, হাতেব ইবনে আবী বালতা এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়া। কুরায়েশরা তাঁদের অনুপ্রবেশের সংবাদ জানতে পেরে তাদেরকে বন্দী করে ফেললো। কুরায়েশরা এ সংবাদও পেলো যে মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমা তাদের লোককে আটক করে রেখেছে। তাদের উদ্ধারের জন্য তারাও গোপনে পাঠালো একটি সশস্ত্র বাহিনী। মুসলমানেরাও তাদের গতিবিধি টের পেয়ে গেলো। দুই দল মুখোমুখিতেই তাদের মধ্যে শুরু হলো তীর ও পাথরবর্ষণ। মুসলমানেরা গ্রেফতার করতে সমর্থ হলো শত্রুপক্ষের বারোজনকে। হজরত ইবনে জানীম এক পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন। শত্রুরা হঠাৎ তাঁকে তীরবিদ্ধ করে শহীদ করলো। ইত্যবসরে সংবাদ এসে পৌঁছলো, হজরত ওসমান ও তাঁর সঙ্গীগণকে শহীদ করা হয়েছে। সংবাদ শুনে রসুল স. মর্মাহত হলেন। আনুগত্যের বায়াত গ্রহণের জন্য ডেকে পাঠালেন সবাইকে।

হজরত সালমা ইবনে আকওয়া থেকে ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম; হজরত ওরওয়া থেকে বায়হাকী, জুহুরী সূত্রে ইসহাক এবং স্বীয় শিক্ষক সূত্রে

মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, হজরত সালমা বলেছেন, তখন দ্বিপ্রহর। আমি শায়িত ছিলাম। এমন সময় ঘোষণা কানে এলো, হে লোকসকল! রুহুল কুদ্দুস অবতীর্ণ হয়েছে। এসো, আনুগত্যের শপথ সম্পন্ন করো। বহিস্কৃত হও এবং এগিয়ে এসো আল্লাহ্র নামে। মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত সালমা বলেছেন, সর্বপ্রথম রসুল স. এর কাছে বায়াত গ্রহণ করলাম আমি। এরপর একে একে বায়াত হতে লাগলো অন্যান্যরা। এভাবে প্রায় অর্ধেক লোক বায়াত গ্রহণ করার পর রসুল স. আমাকে বললেন, সালমা। আনুগত্যের বায়াত গ্রহণ করো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমিতো বায়াত গ্রহণ করেছি। তিনি স. বললেন পুনরায় গ্রহণ করো। আমি পুনরায় রসুল স. এর পবিত্র হস্তে বায়াতের শপথ উচ্চারণ করলাম। এরপর রসুল স. সম্পন্ন করলেন অবশিষ্টদের বায়াত। যখন সকলের বায়াত শেষ হলো, তখন রসুল স. পুনরায় আমাকে বললেন, তুমি কি শপথ করবে না? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আমি তো দু'বার শপথ উচ্চারণ করেছি— প্রথমে ও মধ্যভাগে। তিনি স. বললেন, আরো একবার করো, অধিকতর শুদ্ধভাবে। কাজেই আমি বায়াত গ্রহণ করলাম তৃতীয় বারের মতো। 'সহীহ বোখারী' গ্রন্থে এসেছে, হজরত সালমাকে পরবর্তীতে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আপনারা কিসের উপরে শপথ নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মৃত্যুর উপর।

'সহীহ্ মুসলিম' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত জাবের বলেছেন, একটি ফলবান বৃক্ষের নিচে যখন ওমর বায়াত গ্রহণ করছিলেন, তখন আমরাও অগ্রসর হলাম। তাঁর বায়াতের পর বায়াত গ্রহণ করলাম আমরা। তখন কেবল জদ ইবনে কায়েস ছাড়া সকলেই বায়াত গ্রহণ করে। জদ তখন লুকিয়েছিলো তার উটের পিছনে।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে ওমর থেকে তিবরানী, শা'বী সূত্রে বায়হাকী এবং জায়েদ ইবনে হুবাইশ সূত্রে ইবনে মানদাহ্ বর্ণনা করেছেন, ওই সময় সর্বপ্রথম রসুল স. এর কাছে এগিয়ে গেলেন আবু সানান আসাদী। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! হস্ত প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে আনুগত্যের শপথ করতে ইচ্ছুক। রসুল স. বললেন, তুমি সেই কথার উপর আনুগত্যের শপথ করো, যা তোমার অন্তরে রয়েছে। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, আবু সানান তখন শুধালেন, আমার অন্তরে কী আছে? রসুল স. বললেন, হয় বিজয়, নয় মৃত্যু। আর তা হতে হবে আল্লাহ্র রসুলের সামনে। আবু সানান আর দ্বিরুক্তি না করে শপথ গ্রহণ করলেন। এরপর একে একে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন অন্যেরাও।

হজরত আনাস থেকে বায়হাকী এবং হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. সাহাবীগণকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করলেন তখন, যখন হজরত ওসমান দূত হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন কুরায়েশদের কাছে। সকলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তিনি স. তাঁর এক হাত দিয়ে অন্য হাত আঁকড়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহ্! এই হাতটি ওসমানের হাত। আর এই হাত নিশ্চয় অন্যান্যদের হাতের চেয়ে উত্তম।

কুরায়েশেরা সুহাইল ইবনে ওমর, হুয়াইতাব ইবনে উজ্জা এবং মাকরয ইবনে হাফসকে রসুল স. এর কাছে পাঠালো। প্রথমোক্ত দু'জন পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সুহাইল বললো, আপনার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিলো, তারা এরকম করেছিলো আমাদের অজান্তে। তাদের এরকম অপউদ্যোগকে আমরা সমর্থনও করি না। আমরা তাদের অপকীর্তির সংবাদ পেয়েছি পরে। তারা যে নিতান্ত মূর্খ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় আপনি যাদেরকে বন্দী করে রেখেছেন, তাদেরকে ছেড়ে দিন। আর ইতোমধ্যে আপনি নিশ্চয় জানতে পেরেছেন যে, ওসমানের শহীদ হওয়ার তথ্যটি ভিত্তিহীন। রসুল স. বললেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার সাথীদেরকে ছাড়বে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমিও তোমাদের লোকদেরকে ছাড়বো না। সুহাইল ও তার সাথীরা বললো আপনি ঠিকই বলেছেন। একথা বলে তারা শুতাইহাম ইবনে আবদে মানাফ তাঈমীকে কুরায়েশদের কাছে পাঠালো। কিছুক্ষণ পরে তারা কুরায়েশদের কাছ থেকে নিয়ে এলো হজরত ওসমান ও তাঁর সঙ্গীগণকে। রসুল স.ও বন্দী শত্রুদেরকে ছেড়ে দিলেন। ছাড়া পাওয়া হজরত ওসমানের সঙ্গীরা ছিলেন দশজন।

সুহাইল ইবনে হানিফ সূত্রে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এবং মারোয়ান ইবনে হাকাম সূত্রে সুনান রচয়িতাবৃন্দের বিবরণে এসেছে, হজরত ওসমান ও তাঁর সঙ্গীগণ যখন মক্কা থেকে ফিরে এলেন, তখন সুহাইল, হুয়াইতাব ও মাকরয ফিরে গেলো কুরায়েশদের কাছে। জানালো, মুসলমানেরা যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত। কুরায়েশেরা এ সংবাদ শুনে মুষড়ে পড়লো। প্রবীণেরা বললো, সবচেয়ে উত্তম হয় এই শর্তে সন্ধি করলে যে, এ বছর তাকে ফিরে যেতে হবে এবং আগামী বছর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করে ওমরা ও কোরবানী শেষে ফিরে গেলে আমরা তাঁর অন্তরায় হবো না। এভাবে সন্ধি করতে পারলে জনসমক্ষে প্রচার হয়ে যাবে যে, আমরা তাকে থামিয়ে দিতে পেরেছি। ফলে আমাদেরকে আর অপমানিত হতে হবে না। সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মত হলো। সুহাইল তখন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হলো রসুল স. এর দিকে। দূর থেকে তাকে দেখেই রসুল স. সাহাবীগণকে বললেন, কুরায়েশেরা সন্ধি করতে চায়। সুহাইলকে পাঠিয়েছে তারা সে কারণেই। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন সুহাইলকে এগিয়ে আসতে দেখে বললেন, তোমাদের কাজ এবার সহজ হয়ে গেলো। রসুল স. হাঁটু মুড়ে বসেছিলেন। তাঁর মাথার দিকে দাঁড়িয়েছিলেন সশস্ত্র উববাদ ইবনে বিশর, সালমা ও আসলাম। প্রথম দু'জন ছিলেন বর্মবেষ্টিত। সুহাইল এসেই রসুল স. এর সম্মুখে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো এবং রসুল স. এর সঙ্গে শুরু করলো কথপোকথন। কখনো উচু গলায়, কখনো নিম্নকণ্ঠে। ইবাদ ইবনে বিশর একবার সুহাইলকে সাবধান করে দিলেন, রসুল স. এর সঙ্গে মার্জিতভাবে কথা বলো। শেষ পর্যন্ত দু'জনে একমত হলেন। সুহাইল বললো, তাহলে এবার সন্ধিপত্রের মুসাবিদা করা হোক।

রসুল স. হজরত আলীকে ডাকলেন। হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে বোখারী এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন হজরত আলীকে নির্দেশ দিলেন, লেখো, বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম (পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ্র নামে)। সুহাইল বললো 'রহমান' ও 'রহীম' কে তাতো আমরা জানি না। সুতরাং তাকে লিখতে বলুন 'বিস্মিকাল্লহুম্মা' (আল্লাহ্র নামে)। সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্র শপথ এরকম আমরা লিখতে পারি না। রসুল স. বললেন, তাহলে লিখে দাও 'বিইসমি কাল্লহুম্মা' (আল্লাহ্র নামে শুরু করছি)। এরপর লেখো— এটা হচ্ছে সেই চুক্তি, যার মীমাংসা করছেন মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্। সুহাইল বললো, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্র রসুলই মানতাম, তবে তো আপনার কাবাদর্শনের পথে প্রতিবন্ধকতা রচনা করতাম না। সুতরাং তাকে লিখতে বলুন কেবল মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্। রসুল স. হজরত আলীকে বললেন, তাহলে 'রসুলুল্লাহ্' কথাটি কেটে দাও। হজরত আলী বললেন, আমি তো একথা কেটে দিতে পারি না (কেননা এটাই তো আমার হৃদয়জ বিশ্বাস)। মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, তখন হজরত উসাইদ ইবনে হুজায়ের এবং হজরত সা'দ ইবনে আবী উবাদা হজরত আলীর হাত টেনে ধরলেন এবং বললেন, মোহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্ ছাড়া অন্য কিছু

www.eelm.weebly.com

লিখো না, নতুবা তাদের ও আমাদের মধ্যে মীমাংসা করবে তরবারী। তারা এরকম প্রতিবাদ করলেন অত্যন্ত উচ্চস্বরে। রসুল স. তখন শান্তস্বরে বললেন, ঠিক আছে আমাকে জায়গাটি দেখিয়ে দাও, আমি নিজে হাতে কেটে দিচ্ছি। হজরত আলী নির্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে দিলেন। রসুল স. 'মোহাম্মাদুর রসুলুল্লহ' নিজ হাতে মুছে দিলেন। তারপর বললেন, এবার লেখো মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা বলেছেন, রসুল স. তখন সন্ধিপত্রটি হাতে নিলেন এবং 'রসুলুল্লহ' কথাটি বিলোপ করে দিলেন স্বহস্তে। শেষে লেখা হলো, এটা সে-ই চুক্তি, যা সম্পাদিত হচ্ছে আবদুল্লাহ্র পুত্র মোহাম্মদ এবং সুহাইল ইবনে আমরের মধ্যে। আমরা এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছি যে, দশ বছর পর্যন্ত আমরা কোনো যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হবো না। এক পক্ষ অপর পক্ষকে কোনো বিষয়ে উত্যক্তও করবো না। আমাদের লোকেরা প্রত্যেকে চলাচল করতে পারবে নিরাপদে। রসুল স. তখন বললেন, তাহলে তোমরা সরে দাঁড়াও। আমাদেরকে ওমরা পালন ও কোরবানী করতে দাও। সুহাইল বললো, আল্লাহ্র শপথ! এবছর আপনাকে ফিরে যেতে হবে। নির্বিঘ্নে আপনারা ওমরা পালন করতে পারবেন আগামী বছর থেকে। একথাও চুক্তিপত্রে লিপিবদ্ধ করা হোক। আরো লিপিবদ্ধ করা হোক যে, আমাদের কোনো লোক তাদের অভিভাবকদের বিনা অনুমতিতে আপনার কাছে গেলে আপনি অবশ্যই তাকে আমাদের কাছে ফেরত পাঠাবেন, যদি সে মুসলমান হয়ে যায়, তবুও। কিন্তু আপনাদের কোনো লোক যদি আমাদের দলে এসে মিশে, তবে আমরা তাকে ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবো না। সাহাবীগণ বললেন, সুবহানাল্লহ্!

তা কী করে সম্ভব। কেউ আমাদের কাছে মুসলমান হয়ে এলেও কি আমরা তাকে বিধর্মীদের কাছে ফিরিয়ে দিবো? রসুল স. বললেন, যেতে দাও। আমাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ যদি আবার ধর্মত্যাগ করে চলে যায়, তবে আমাদের তাতে কী ক্ষতি হবে? যারা মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করবে না, তারা চলে গেলেই তো ভালো। আর তাদের কেউ মুসলমান হয়ে এলে আমরা তাকে ফেরত দিতেও রাজী। মনে হয়, এমতাবস্থায় আল্লাহ্ই নিশ্চয় কোনো না কোনো উপায় বের করে দিবেন।

হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন তিনটি শর্তের উপর সন্ধি করেছিলেন। ১. অংশীবাদীদের মধ্য থেকে পালিয়ে এসে যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাকে তাদের কাছে ফেরত দিতে হবে। ২. মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ যদি ধর্মত্যাগ করে তাদের দলে গিয়ে মিশে, তবে তারা তাকে ফেরত পাঠাবে না। ৩. এ বছর রসুল স.কে এই হুদায়বিয়া থেকেই মদীনায় ফিরে যেতে হবে। তিনি স. ওমরা পালন করতে পারবেন আগামী বছর এবং মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন মাত্র তিন দিন। ওই সময় রসুল স. ও তাঁর সহাগামীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে হবে আপনাপন তরবারী কোষাবদ্ধ করে রেখে। চুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে এই বিষয়েও অঙ্গীকার করা হলো যে, উভয় পক্ষ চুক্তির শর্তাবলী অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে। এর মধ্যে গোপনীয়তা বলে কিছু থাকবে না। আর এখন যে কেউ যোগ দিতে পারবে যে কোনো এক পক্ষে। সঙ্গে সঙ্গে বনী খাজাআ লাফিয়ে সামনে এসে বললো, আমরা যোগ দিলাম মোহাম্মদের দলে। পরক্ষণে বনী বকর ঘোষণা দিলো, আমরা পক্ষ হলাম কুরায়েশদের। এভাবে চুক্তির সমস্ত কিছুই চূড়ান্ত হয়ে গেলো। বাকী রইলো কেবল উভয় পক্ষের স্বাক্ষর। হজরত ওমর দ্রুতগতিতে রসুল স. এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আপনি কি আল্লাহ্র সত্য রসুল নন? রসুল স. বললেন, অবশ্যই। হজরত ওমর বললেন, তাহলে আপনি এরকম অবমাননাকর চুক্তি স্বাক্ষর করতে চলেছেন কেনো? এখনো তো তাদের সঙ্গে আমাদের শক্তি পরীক্ষা হলো না। তবু কি আমরা ফিরে যাবো? রসুল স. বললেন, আমি আল্লাহ্র সেবক ও তাঁরই বচনবাহক। সুতরাং আমি আল্লাহ্র আদেশের পরিপন্থী কিছু করতে পারবো না। আল্লাহ্ নিশ্চয় আমাকে ধ্বংস করবেন না। তিনিই আমার সাহায্যকর্তা। হজরত ওমর বললেন, আপনি কি আমাদেরকে একথা বলেননি যে, আমরা অবশ্যই কাবাগৃহ পর্যন্ত পৌঁছবো এবং তাওয়াফ করবো? তিনি স. বললেন, তাতো বলেছিই। কিন্তু একথা কি কখনো বলেছি যে, এই বছরই আমরা সেখানে পৌঁছতে পারবো? হজরত ওমর বললেন, তা অবশ্য বলেননি। রসুল স. বললেন, তোমরা অবশ্যই কাবাগৃহ পর্যন্ত পৌঁছবে এবং তাওয়াফও করবে। হজরত ওমর তবুও প্রশমিত হলেন না। দেখা করলেন গিয়ে হজরত আবু বকরের কাছে। বললেন, আপনি বলুন, তিনি কি আল্লাহ্র সত্য রসুল নন? হজরত আবু বকর বললেন, অবশ্যই। হজরত ওমর বললেন, আমরা সত্যের উপরে, আর অংশীবাদীরা মিথ্যার উপরে কি প্রতিষ্ঠিত নয়? হজরত আবু বকর

বললেন, অবশ্যই। হজরত ওমর বললেন, আমাদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে, তারা বেহেশতে এবং তাদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে, তারা কি দোজখে প্রবেশ করবে না? হজরত আবু বকর বললেন, নিশ্চয়ই। হজরত ওমর বললেন, তাহলে বলুন, কেনো তিনি এরকম অবমাননাকর এক চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছেন? অথচ এখনো তাদের সঙ্গে আমাদের শক্তি পরীক্ষা হলো না। তবুও কি আমরা ফিরে চলে যাবো? হজরত আবু বকর বললেন, ওমর! সংযত হও। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্র সত্য বার্তাবাহক। তাঁর প্রভুপালনকর্তার পরিতোষের পরিপন্থী কোনোকিছু তিনি করতে পারেনই না। আল্লাহ্ই তাঁর সাহায্যকর্তা। তুমি আমৃত্যু তাঁর অনুসরণে অটল থাকো। নিঃসন্দেহে তিনি সত্যাধিষ্ঠিত। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর তখন বলেছিলেন, নিঃসন্দেহে তিনি

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌র সত্য রসুল। হজরত ওমর বলেছিলেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ্‌র সত্য রসুল। হজরত ওমর তখন এই প্রশ্নটিও করেছিলেন যে, তিনি কি আমাদেরকে একথা বলেননি যে, আমরা কাবা গৃহে পৌঁছে যাবো এবং তাওয়াফও করবো? হজরত আবু বকর জবাব দিয়েছিলেন, তাতো বলেছেনই। কিন্তু একথা কি কখনো বলেছেন যে, এই বছরেই আমরা কাবাগৃহ পর্যন্ত পৌঁছবো ও তাওয়াফ করবো? হজরত ওমর বলেছিলেন, না, তাতো বলেননি। হজরত আবু বকর বলেছিলেন, তাহলে জেনে রেখো, অবশ্যই আমরা কাবাগৃহ পর্যন্ত পৌঁছবো, তাওয়াফও করবো।

যথাসূত্রপরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে, বাহ্যত অবমাননাকর হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তিটি হজরত ওমরের নিকটে হয়েছিলো দুঃসহ। তিনি নিজেই বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের পর আমি আর কখনো রসুল স. এর সম্মুখে এরকম চাঞ্চল্য প্রকাশ করিনি। সেকারণেই আমি রসুল স.কে ওই অশিষ্ট প্রশ্নগুলি করেছিলাম। কেনো যেনো আমি তখন সংযম প্রদর্শন করতে পারছিলামই না। আমার এরকম অবস্থা দেখে আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ বলেছিলো, হে খাত্তাবতনয়। সংযত হতে না যদি পারো, তবে পড়ো 'আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম'। আমি তাই করলাম। ইবনে ইসহাক ও ইবনে আমর আসলামী বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, আমার সেদিনের সেই অশিষ্ট আচরণের কথা মনে হলে আজো আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হই। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দান-খয়রাত করি, রোজা রাখি ও দাসমুক্ত করে দেই।

আহমদ, নাসাঈ ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মুগাফফাল বলেছেন, আমরা কিঞ্চিত অসতর্ক অবস্থায় ছিলাম। অতর্কিতে তিরিশ জন বর্মপরিহিত শত্রুসেনা পাহাড়ের দিক থেকে এসে আমাদেরকে আক্রমণ করে বসলো। রসুল স. তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। ফলে আল্লাহ্‌ তাদেরকে বধির করে দিলেন এবং রসুল স. তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি কারো নির্দেশে এখানে এসেছো? তোমাদেরকে কি কেউ নিরাপত্তা প্রদান করেছে? তারা বললো, না। রসুল স. তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। তখন অবতীর্ণ হলো 'তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপরে তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর'।

হজরত আনাস থেকে আহমদ, মুসলিম ও ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, মক্কার আশিজন বর্মবেষ্টিত লোক তান্ঈম নামক পাহাড়ের দিক থেকে রসুল স. এর দিকে ধেয়ে আসে। উদ্দেশ্য ছিলো, সুযোগ পেলেই তারা রসুল স.কে আক্রমণ করে বসবে। রসুল স. তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রার্থনা করলেন। ফলে তারা হয়ে গেলো অন্ধ ও স্মৃতিশক্তিহীন। তাদেরকে তাই বন্দী করা সহজ হয়। রসুল স. তাদেরকে ছেড়েও দেন।

মারোয়ান ও মুসাওয়ার মাধ্যমে জুহুরীর বর্ণনায় এবং আহমদ, মুসলিম এবং আবদ ইবনে হুমাইদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সালমা বলেছেন, যখন আমি ইবনে যানীমের শহীদ হওয়ার সংবাদ শুনলাম, তখন তরবারী হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলাম চারজন পৌত্তলিকের সামনে। তারা শায়িত ছিলো। আমি ক্ষিপ্রগতিতে তাদের অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করলাম এবং তাদেরকেও হাঁকিয়ে নিয়ে এলাম রসুল স. এর কাছে। তখনই অবতীর্ণ হলো 'তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে.....'।

ইত্যবসরে হজরত আবু জনদল ইবনে সুহাইল ইবনে আমর হাতকড়া পরা অবস্থায় নিম্নভূমির দিক থেকে এসে আমাদের মুখোমুখি দাঁড়ালো। সে মুসলমান হয়েছিলো বলে তার পিতা তাকে বন্দী করে রেখেছিলো। হজরত আবু জনদলকে দেখেই সাহাবীগণ আনন্দিত হলেন। তাঁকে অভিবাদন জানালেন এবং এভাবে চলে আসতে পারাতে তাঁকে সাধুবাদও দিলেন। সুহাইল তার ছেলেকে এভাবে দেখতে পেয়ে ভয়ানক রেগে গেলো। সামনে এগিয়ে গিয়ে তাকে প্রহার করলো কাঠের ধারালো টুকরা দিয়ে। তারপর তার গায়ের জামা টেনে ধরে রসুল স. এর দিকে তাকিয়ে বললো, মোহাম্মদ! এই হচ্ছে প্রথম ঘটনা; এখন চুক্তি অনুযায়ী আপনি একে আমার কাছে ফেরত দিবেন। রসুল স. বললেন, এখনো আমরা স্বাক্ষর করিনি। সে বললো, শপথ আল্লাহ্‌র! তাহলে তো আমি স্বাক্ষর করবো না। রসুল স. বললেন, একে আমার কাছে জামানত রাখো। সুহাইল বললো, না, আমি তা করবো না। মাকরজ ও হুয়াইতাব রসুল স.কে বললো, আমরা আপনার কারণে একে আমাদের জিম্মাদারীতে গ্রহণ করছি। একথা বলেই তারা হজরত আবু জনদলকে তাদের দায়িত্বে নিয়ে নিলো এবং তাঁবুর দিকে অগ্রসর হলো। হজরত আবু জনদল যেতে যেতে সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, হে ইসলামের অনুসারীরা! আমাকে কি মূর্তিপূজকদের কাছেই প্রত্যর্পণ করা হচ্ছে? কিন্তু আমি তো মুসলমান হয়ে তোমাদের কাছেই এসেছি। দ্যাখো, আমার উপর কী রকম অত্যাচার করা হয়েছে। রসুল স. উচ্চকণ্ঠে বললেন, আবু জনদল! ধৈর্য ধরো। পুণ্যের আশা রাখো। আল্লাহ্‌ নিশ্চয় তুমি ও তোমার মতো অসহায় মুসলমানদের রক্ষার সুব্যবস্থা করবেন। কিন্তু এখন যে আমরা তাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ। হজরত ওমরও হজরত আবু জনদলের দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন, রসুল স. তোমাকে ধৈর্য ধরতে বলেছেন। সুতরাং ধৈর্য অবলম্বন করো। সওয়াবের আশা রাখো। ওরা মূর্তিপূজক। ওদের রক্ত কুকুরের রক্তের মতো। হজরত ওমর এভাবে

www.eelm.weebly.com

কথা বলতে বলতে তাঁর তরবারী হজরত আবু জনদলের কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, আমি ভেবেছিলাম, হজরত আবু জনদল হয়তো আমার তরবারী ছিনিয়ে নিয়ে তার বাপকে মেরে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত আবু জনদলকে তার পিতা সুহাইলের হাতেই সমর্পণ করা হলো।

সাহাবীগণ রসুল স. এর প্রতি সতত সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর যখন শুনলেন, তাঁরা এবার কাবাদর্শন করতে পারবেন না, তখন তাঁরা হয়ে গেলেন ব্যথিত, বিমর্ষ ও মর্মাহত। তার উপর হজরত আবু জনদলের ঘটনা তাদের অন্তর্জ্বালাকে আরো বেশী বাড়িয়ে দিলো। সন্ধিপত্রে রসুল স. ও সুহাইল ছাড়াও স্বাক্ষর করলেন উভয় পক্ষের আরো কয়েকজন। মুসলমানদের পক্ষে স্বাক্ষর করলেন হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সুহাইল ইবনে আমর, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, হজরত মাহমুদ ইবনে সালমা এবং হজরত আলী ইবনে আবী তালেব রদ্বিআল্লহু আলাইহিম আজমাঈন। সন্ধিচুক্তি সম্পাদন শেষে রসুল স. ঘোষণা দিলেন, এবার সকলে গাত্রোত্থান করো। কোরবানী করো। মাথা মুণ্ডন করো। এই চুক্তিতে সাহাবীগণ কেউই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কাবাগৃহের দর্শন থেকে বঞ্চিত হতে হলো বলে সকলেই মনমরা হয়ে বসেছিলেন। তাই রসুল স. এর নির্দেশ পালন করতে তাঁরা মন থেকে সাড়া পেলেন না। রসুল স.ও তাঁদের আচরণ দর্শনে দুঃখিত হলেন। তাঁবুর ভিতরে জননী উম্মে সালমাকে গিয়ে বললেন, মুসলমানেরা কি ধ্বংস হয়ে যেতে চায়? আমি তাদেরকে কোরবানী করতে বললাম। কিন্তু কেউ তা করলো না। জননী উম্মে সালমা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তাদের আচরণে দুঃখিত হবেন না। আপনি সন্ধি করে ওমরা করতে ব্যর্থ হয়েছেন ভেবেই তারা মর্মাহত হয়েছে। আপনার দুঃখই তাদের দুঃখিত হওয়ার কারণ। আপনি বরং বাইরে যান। নিজ হাতে আপনার কোরবানী শুরু করুন এবং কাউকে দিয়ে আপনার মস্তক মুণ্ডন করুন। রসুল স. তাই করলেন। বাইরে গিয়ে কাউকে কিছু না বলে নিজ হাতে তাঁর কোরবানীর পশু জবেহ করলেন। তারপর একজনকে ডাকিয়ে নিয়ে মুণ্ডিত মস্তক হলেন। সাহাবীগণ আর বসে থাকতে পারলেন না। রসুল স. এর অনুকরণে প্রত্যেকেই জবেহ করলেন নিজ নিজ কোরবানীর পশু এবং মুণ্ডিত মস্তক হলেন একে অপরের সাহায্যে।

হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়ায় কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডন করেন এবং কেউ কেউ করেন কেশকর্তন। রসুল স. তা দেখে বললেন, হে আল্লাহ্! যারা মস্তক মুণ্ডন করেছে, তাদের উপরে তোমার রহমত বর্ষণ করো। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আর যারা চুল ছেঁটেছে? রসুল স. বললেন, তাদের উপরেও। এরপর রসুল স. পুনরায় প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ্! মুণ্ডিত মস্তকদের উপরে তোমার অনুকম্পা বর্ষণ করো। সাহাবীগণ আরজ করলেন, আর কেশকর্তনকারীদের উপর? তিনি স.

বললেন, তাদের উপরেও। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহী! আপনি যে দুই দুইবার মুণ্ডিতমস্তকদের জন্য দোয়া করলেন? তিনি স. বললেন, নিশ্চিন্ততা প্রকাশার্থে। অর্থাৎ ইহরাম শেষ হয়েছে। এখন আর সামনে অগ্রসর হতে হবে না। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, কিছুসংখ্যক সাহাবী তখনো ভাবছিলেন, হয়তো আমাদেরকে পুনরায় কাবা অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দেওয়া হবে। সেকারণেই তারা মস্তক মুণ্ডন না করে কেশ কর্তন করেছিলেন। রসুল স. পুনঃপুনঃ মস্তকমুণ্ডিতদের জন্য দোয়া করেছিলেন সেকারণেই।

রসুল স. হুদায়বিয়ায় অবস্থান করেছিলেন উনিশ অথবা কুড়ি দিন। তখন ইহরাম পরিত্যাগ করা ও কোরবানী করার আগে রসুল স. হজরত কা'ব ইবনে আজরাকে বলেছিলেন, মাথার পোকার কারণে কি তোমার কষ্ট হচ্ছে? হজরত কা'বের মাথা থেকে উকুন পড়তে দেখেই রসুল স. তাকে এরকম প্রশ্ন করেছিলেন। জবাবে হজরত কা'ব বলেছিলেন, হ্যাঁ। তিনি স. বলেছিলেন, মস্তক মুণ্ডন করো এবং ফিদিয়া দাও। ফিদিয়ার পদ্ধতি ছিলো তিনটি— রোজা রাখা, দান-খয়রাত করা এবং কোরবানী করা। ওই সময় অবতীর্ণ হয় 'আর তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরা পরিপূর্ণরূপে পালন করো। যদি বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে কোরবানীর জন্য যা সহজলভ্য, তাই তোমাদের জন্য ধার্য করা হলো। আর তোমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত মস্তক মুণ্ডন করবে না, যতোক্ষণ না কোরবানী পৌঁছে যাবে যথাস্থানে'। সুরা বাকারার তাফসীরে এ প্রসঙ্গে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। হজরত সালমা ইবনে আকওয়া থেকে মুসলিম, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকী, হজরত আবু হায়েশ থেকে তিবরানী, বায্যার, বায়হাকী এবং স্বশিক্ষকসূত্রে মোহাম্মদ ইবনে আমর বলেছেন, হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রসুল স. প্রথমে মাররুজ জাহরানে এবং পরে আসফানে বিশ্রামের জন্য যাত্রাবিরতি করেন। শেষোক্ত স্থানে পৌঁছানোর পর দেখা দিলো খাদ্যসংকট। সাহাবীগণ রসুল স. এর কাছে গাধা জবেহ করার অনুমতি চাইলেন। তিনি স. সম্মতি দিলেন। কিন্তু হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহক! এমন না করাই সমীচীন। বাহন থাকা বাঞ্ছনীয়। হঠাৎ যদি আমাদেরকে কোনো শত্রুবাহিনীর মোকাবিলা করতে হয়, তবে আমরা একই সঙ্গে অন্নহীন ও বাহনহীন হয়ে কীভাবে প্রতিহত করতে সমর্থ হবো তাদেরকে? তাই আমি বলি, আপনি নির্দেশ দিন, যার যার কাছে যৎকিঞ্চিত কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে তা সকলে এনে আপনার সামনে জমা করুক। আর আপনি তার উপর বরকতের জন্য দোয়া করুন। আমরা

www.eelm.weebly.com

আশা রাখি, আপনার দোয়ার বরকতে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত আমাদের আর খাদ্যসংকট দেখা দিবে না। প্রস্তাবটি রসুল স. এর মনঃপুত হলো। তিনি স. তাঁর সামনে একটি চামড়ার দস্তরখানা বিছিয়ে দিলেন। আজ্ঞা করলেন, যার কাছে যতোটুকু আহার্যদ্রব্য আছে, তা এখানে এনে জমা করো, সকলেই আজ্ঞা প্রতিপালন করলেন। সবচেয়ে বেশী খাদ্য নিয়ে আসতে

পারলেন একজনই। আর তার পরিমাণ হচ্ছে চার সেরের মতো শুকনো খেজুর। রসুল স. দাঁড়িয়ে দোয়া করতে শুরু করলেন। ফলে প্রচুর বরকত বর্ষিত হলো জমানো খাদ্যদ্রব্যের উপরে। সকলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন এবং নিজেদের পাত্র ভর্তি করে নিয়েও গেলেন। তারপরেও দেখা গেলো, খাদ্যদ্রব্য রয়ে গিয়েছে আগের মতোই। এতো বরকত দেখে রসুল স. হেসে ফেললেন। উন্মোচিত হলো তাঁর সামনের সবকটি দাঁত। হজরত সালমা বলেছেন, তখন আমাদের লোকসংখ্যা ছিলো প্রায় চৌদ্দশত। রসুল স. তখন বলেছিলেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্র রসুল— একথার উপরে যে বিশ্বাস রাখবে সে দোজখ থেকে থাকবে নিরাপদ।

জুহুরীর বর্ণনায় এসেছে, এরপর অবতীর্ণ হয় এই আয়াত— 'হে বিশ্বাসীগণ! যখন বিশ্বাসবতীরা হিজরত করে তোমাদের নিকটে আগমন করে, তখন তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ্ তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন। যদি তোমরা জানো যে, তারা প্রকৃতই বিশ্বাসবতী, তাহলে তাদেরকে আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কাছে ফেরত পাঠিয়ো না। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে দিয়ে দাও। আর ওই বিশ্বাসবতীদেরকে যথোপযুক্ত মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না'। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত ওমর তাঁর এমন দু'জন স্ত্রীকে তালাক দেন, যাদেরকে তিনি বিবাহ করেছিলেন ইসলাম গ্রহণের আগে। পরে ওই দু'জনের একজনকে বিবাহ করেন মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং আর একজনকে বিবাহ করেন সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া। বর্ণনাকারী আরো বলেছেন, তখন আল্লাহ্ ইমানদার নারীকে তার কাফের স্বামীর কাছে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করেন এবং যে মোহরানা তারা পরিশোধ করেছিলো, তা-ও দিয়ে দিতে নির্দেশ দেন।

হজরত মুসাওয়ার ইবনে মাখরিমা থেকে আহমদ, বোখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং জুহুরী সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেন, রসুল স. হুদায়বিয়া থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তন করার কিছুকাল পরে আবু বসীর উতবা ইবনে আসাদ ছাক্বাফী মক্কা থেকে মদীনায় পালিয়ে এসে মুসলমান হয়ে যান। বনী ছাক্বিফ ছিলো বনী জোহরার মিত্র। আহ্বাস ইবনে শরীফ ছাক্বাফী এবং আজহার ইবনে আবদে আউফ জোহরা রসুল স. এর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করলো। পত্রবাহক ছিলো খনিস ইবনে জাবের আমেরী। পত্রটিতে সন্ধির স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছিলো, আবু বসীরকে যেনো অতি অবশ্যই ফেরত পাঠানো হয়। পত্রবাহক আমেরীর সঙ্গে মদীনায় এসেছিলো তার ক্রীতদাস কাওছার। রসুল স. আবু বসীরকে তাদের দু'জনের সঙ্গে ফেরত যেতে বললেন। বোঝালেন, দ্যাখো আমরা তাদের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আর অঙ্গীকারভঙ্গ নিষিদ্ধ। তুমি যাও। তুমি ও তোমার মতো যারা, তাদের সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ্ একটা উপায় বের করে দিবেন। আবু বসীর তাদের দু'জনের সঙ্গে যেতে সম্মত হলেন। পথ চলতে চলতে তারা আবু বসীরকে নিয়ে উপনীত হলো জুলহুলাইফায়।

তিনি তাদেরকে বলে সেখানকার মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন। নামাজের পর তিনি তাঁর সঙ্গের খাবারের পুটলি খুলে খেজুর খেতে শুরু করলেন। তাদের দু'জনকেও খেতে ডাকলেন। তারাও তাঁর সঙ্গে খেতে শুরু করলো। আমেরীর সঙ্গে ছিলো তরবারী। সে খেতে খেতে হজরত আবু বসীরের সঙ্গে বাক্যালাপও করে যাচ্ছিলো। ওরওয়ার বর্ণনায় এসেছে, আমেরী তখন কোষ থেকে তরবারী বের করে বললো, আমি এই তরবারী দিয়ে আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকদেরকে হত্যা করবো। আবু বসীর বললেন, তোমার খঞ্জরটি কি খুব ধারালো? আমেরী বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, দেখি দেখি। আমেরী তার তরবারীটি বাড়িয়ে দিলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তরবারীটির হাতল মজবুত করে ধরে সজোরে ঘা বসালেন আমেরীর উপর। অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্গত হলো তার প্রাণবায়ু। কাওছার প্রাণ ভয়ে দিলো দৌড়। দৌড়াতে দৌড়াতে মদীনায় পৌঁছে আশ্রয় গ্রহণ করলো মসজিদে। রসুল স. তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? কী হয়েছে? সে বললো, আমার মনিবের দফা রফা হয়েছে। আর আমি কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। রসুল স. তাকে আশ্রয় দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমেরীর উটে সওয়ার হয়ে এসে পড়লেন আবু বসীর। উটটিকে মসজিদের বাইরে বসিয়ে রেখে তিনি ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করলেন মসজিদে। নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তো আপনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। আমাকে ফেরত পাঠিয়েছেন তাদের প্রতিনিধির সঙ্গে। কিন্তু আমি নিজেকে নিরাপদ রাখতে পেরেছি আমার ধর্মবিশ্বাসের জোরে। রসুল স. বললেন, আক্ষেপ! এরকম করলে আবার জ্বলে উঠবে যুদ্ধের আগুন। এখন মক্কা থেকে কেউ এসে যদি একে নিয়ে যেতে পারতো। আবু বসীর নিহত আমেরীর মালমাত্তাসমূহ রসুল স. এর সামনে উপস্থিত করলেন, যাতে তিনি স. যুদ্ধলব্ধ সম্পদবণ্টনরীতি অনুসারে সেগুলো থেকে নিয়ে নিতে পারেন তাঁর এক পঞ্চমাংশ প্রাপ্য। রসুল স. বললেন, আমি যদি এর এক

www.eelm.weebly.com

পঞ্চমাংশ গ্রহণ করি, তবে তারা ভাববে আমি অঙ্গীকারভঙ্গকারী। সুতরাং এগুলো থেকে আমি কিছুই গ্রহণ করবো না। এখন তুমি তোমার এসব মালমাত্তা নিয়ে যেখানে খুশী সেখানে চলে যেতে পারো।

বিশুদ্ধসূত্রপরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর মন্তব্য ও মনোভাব বুঝতে পেরে আবু বসীর বুঝলেন, মক্কা থেকে কেউ এলে রসুল স. তাঁকে ফেরত পাঠাবেনই, তখন তিনি পালিয়ে গিয়ে পৌঁছলেন ঈস্ ও জিল মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে কুরায়েশদের বাণিজ্য গমনাগমনের পথে। তাঁর সঙ্গে পালিয়ে এসেছিলেন এরকম আরো পাঁচজন। তাঁরাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। এখবর মক্কায় পৌঁছলে আরো কয়েকজন নতুন মুসলমান কুরায়েশদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সন্তর্পণে গিয়ে পৌঁছলেন সেখানে।

মোহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর আবু বসীর সম্পর্কে মক্কার মুসলমানদের নিকট পত্র প্রেরণ করলেন। লিখলেন, রসুল স. চুক্তির

অনুসারে তাকে কীভাবে মক্কায় ফেরত পাঠালেন এবং কীভাবে সে তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করলো। কিন্তু সে এখন মদীনাতে নেই। সমুদ্রোপকুলবর্তী ঈসের জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছে। সুতরাং তাকে ফেরত পাঠানোর দায় আর আমাদের উপরে নেই। এদিকে হজরত আবু জনদল, যাকে রসুল স. হুদায়বিয়ায় সন্ধিচুক্তি সম্পাদনকালে ফেরত পাঠিয়েছিলেন, তিনি ও তাঁর মতো ৭০ জন নবমুসলমানকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে মিলিত হলেন হজরত আবু বসীরের দলের সঙ্গে। ফলে তাদের শক্তিবৃদ্ধি হলো আরো। আর হজরত আবু বসীর তখন দলের নেতৃত্ব অর্পণ করলেন হজরত আবু জনদলকে। কারণ তিনি ছিলেন কুরায়েশ। নামাজেও তিনিই ইমামতি করতে শুরু করলেন। হজরত আবু জনদলের সংবাদ শুনে গিফার, আসলাম, জুহাইনা ও অন্যান্য গোত্রের কিছুসংখ্যকও যোগ দিলেন তাঁর সাথে। এভাবে হজরত আবু জনদলের লোকসংখ্যা হয়ে গেলো তিনশত জনের মতো। জুহুরী সূত্রে বায়হাকী এরকমই বর্ণনা করেছেন। কুরায়েশেরা বাণিজ্য করতে গেলে এই দলটি তাদের মালমাত্তা লুট করে নিতে লাগলেন। আবার কাউকে কাউকে করতে লাগলেন হত্যা। কুরায়েশেরা পড়লো ঘোর বিপদে। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রধান নেতা আবু সুফিয়ানকে তারা প্রেরণ করতে বাধ্য হলো মদীনায়। আবু সুফিয়ান মদীনায় গিয়ে রসুল স.কে বললো, তিনি স. যেনো হজরত আবু জনদলের বাহিনীকে মদীনায় ডেকে আনেন এবং এখানেই তাদের বসবাসের অনুমতি দেন। আমরা আর কাউকে ফেরত চাই না। চুক্তির এই শর্তটিকে তিনি স. যেনো কেটেই দেন। রসুল স. হজরত আবু বসীর এবং হজরত আবু জনদলকে লিখে জানালেন, তোমরা দু'জন আমার কাছে চলে এসো। অন্যান্যদেরকে বলো, তারা যেনো তাদের আপনাপন জনপদে ফিরে যায়। এখন থেকে আর কুরায়েশদের বাণিজ্যবাহিনীর উপরে আক্রমণ কোরো না। হজরত আবু বসীর তখন মৃত্যুপথযাত্রী। তিনি শুয়ে শুয়েই রসুল স. এর পত্রখানি পড়ে যেতে লাগলেন এবং পড়তে পড়তেই ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। হজরত আবু জনদল তাঁকে সেখানেই সমাধিস্থ করলেন এবং তাঁর সমাধির কাছে নির্মাণ করলেন মসজিদ। এরপর হজরত আবু জনদল কয়েকজনকে নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হলেন। অন্যরা চলে গেলেন তাঁদের আপনাপন বসতিতে। যে সকল সাহাবী হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিকালে পালিয়ে আসা হজরত আবু জনদলকে ফেরত দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন, তারা এবার বুঝতে পারলেন; সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র রসুলের আনুগত্য নির্বিবাদে মেনে নেওয়ার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। তিনি স. তখন বলেছিলেন, আল্লাহ্ নিশ্চয় এসকল অসহায় ও অত্যাচারিত মুসলমানদের জন্য একটা উপায় বের করে দিবেন। এখনতো সেরকমই ঘটলো। কুরায়েশেরা নিজেরাই রহিত করলো চুক্তির এই অবমাননাকর ধারাটি। আর মক্কাবিজয়ের দিন যখন রসুল স. কাবা শরীফের চাবি হস্তগত করলেন, তখন তিনি স. হজরত ওমরকে বললেন, আমি বলেছিলাম কাবাগৃহের চাবি আমার করায়ত্ত হবে। এবার দেখলে তো। রসুল স. বলেছিলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির চেয়ে বড় কোনো বিজয়

আর হয়নি। তাই-ই ঘটেছিলো বাস্তবে। আল্লাহ্‌র বান্দাগণ ত্বরাপ্রবণ। তাই গভীর গভীরতর রহস্যের কথা এবং আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞাময়তার তত্ত্ব তারা স্বাভাবিক বুদ্ধি জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারে না। হুদায়বিয়ার ব্যাপারটিও ছিলো সেরকম। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা ছিলো মুসলমানদের জন্য অপমানজনক। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তা বিজয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, বিদায় হজের সময় সুহাইল ইবনে আমর কোরবানীর উটগুলো রসুল স. এর কাছে নিয়ে যাচ্ছিলো, আর তিনি স. সেগুলোকে নিজ হাতে জবেহ করছিলেন। এরপর তিনি স. একজনকে ডাকিয়ে নিয়ে তাঁর মস্তক মুণ্ডন করালেন। সুহাইল ইবনে আমর তাঁর কর্তিত চুলগুলো নিয়ে চোখের উপরে রাখতে শুরু করলেন। অথচ হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনকালে তিনি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' লিখতে দেননি। আল্লাহ্‌র প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। তিনি তাঁকে ইসলাম দানে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করবার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দেন'। একথার অর্থ— এভাবে বায়াতের অঙ্গীকার সম্পন্ন করবার পর যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তার দায়ভার বহন করতে হবে তাকেই, ভোগ করতে হবে অনন্তকালীন শাস্তি। আর যে অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, আল্লাহ্ তাকে দান করবেন মহাপুরস্কার— জান্নাত, নৈকট্য ও দীদার।

www.eelm.weebly.com

❑ যে সকল মরুবাসী পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছে তাহারা তোমাকে বলিবে, 'আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদিগকে ব্যস্ত রাখিয়াছে, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' উহারা মুখে তাহা বলে যাহা উহাদের অন্তরে নাই। উহাদিগকে বল, 'আল্লাহ্ তোমাদের কাহারও কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করিলে কে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে? বস্তুত তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

❑ না, তোমরা ধারণা করিয়াছিলে যে, রাসূল ও মু'মিনগণ তাহাদের পরিবার-পরিজনের নিকট কখনই ফিরিয়া আসিতে পারিবে না এবং এই ধারণা তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হইয়াছিল; তোমরা মন্দ ধারণা করিয়াছিলে, তোমরা তো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়!

❑ যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেই সব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রাখিয়াছি।

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্রই, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি আহ্বান জানানো সত্ত্বেও যে সকল আরব গোত্র আপনার হুদায়বিয়াভিমুখী যাত্রায় অংশগ্রহণ করেনি, দেখবেন খুব শীঘ্র তারা আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করে আপনার সহগামী হওয়া থেকে বিরত থাকার নানাবিধ অজুহাত প্রদর্শন করবে। বলবে, সাংসারিক কাজকর্ম, দারা-পুত্র-পরিজন এসকলকিছুর জন্যই আমরা তখন আপনার সঙ্গী হতে পারিনি। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। হে আমার প্রত্যাদেশবাহক! আপনি কিন্তু তাদের একথা বিশ্বাস করবেন না। কেননা তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য মনে মনে এতোটুকুও অনুতপ্ত নয়। তাই আপনি তাদেরকে বলে দিন, সকল মঙ্গলামঙ্গলের নির্ধারয়িতা যে আল্লাহ্, তাতো তোমরা বিশ্বাসই করতে চাও না। তাই তো মৃত্যুভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তোমরা আমাদের সঙ্গ পরিহার করেছিলে। অথচ তোমরা একথা কেনো বুঝতে চাও না যে, আল্লাহ্ কারো অনিষ্ট করতে চাইলে তা প্রতিহত করার সাধ্য যেমন কারো নেই, তেমনি তিনি যদি কাউকে কল্যাণায়িত করতে চান, তবে তা থেকে নিবৃত্ত করার সামর্থ্যও কেউ রাখে না। আর একথাও তোমরা মনে করো না কেনো যে, তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে ছলচাতুরী করে তোমাদের প্রকাশ্য-গোপন দুরভিসন্ধিসমূহকে ঢেকে রাখতে পারবে। কেননা তাঁর জ্ঞানাতীত কিছুই নেই। সকলের সকল বিষয়ই তাঁর জানা।

হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'মরুবাসী' বলে বুঝানো হয়েছে গিফার, মুজাইনা, জুহাইনা, নাখা ও আসলাম গোত্রের লোকদেরকে। হুদায়বিয়া গমনকালে রসুল স. তাদেরকে সহযাত্রী হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা ভেবেছিলো কুরায়শদের সম্মিলিত আক্রমণের সামনে মুসলিম বাহিনী টিকে থাকতে পারবেই না। তাই তারা নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচবার

www.eelm.weebly.com

জন্যই রসুল স. এর সাহচর্য পরিহার করেছিলো। কিন্তু রসুল স. ও সাহাবীগণকে শান্তির সঙ্গে ফিরে আসতে দেখে তারা নিরুপায় হয়ে রসুল স. এর কাছে নানাপ্রকার মিথ্যা অজুহাত প্রদর্শন করেছিলো।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ভবিষ্যতের সংবাদ। আল্লাহ্ এখানে তাঁর প্রিয়তম রসুলকে আগাম সংবাদ দিয়েছেন এইমর্মে যে, তারা কিন্তু এভাবে কৃত্রিম ওজর-অজুহাতের কথা বলবে এবং নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে জানাবে ক্ষমাপ্রার্থনার আবেদন। কিন্তু মন তাদের বিশুদ্ধতাবিবর্জিত। তারা আপনার অথবা আল্লাহ্র সন্তোষ-অসন্তোষের পরওয়াই করে না। আর এখানকার 'তোমরা যা করো, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত' কথাটির অর্থ— হে কাপুরুষ ও মিথ্যাবাদীরা! তোমরা মুখে যা কিছুই বলো না কেনো, তোমাদের কোনো কিছুই আল্লাহ্র অজানা নয়। তোমরা যে সাংসারিক ব্যস্ততার জন্য নয়, মৃত্যুর আশংকায় আমার রসুলের আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে সে কথা আল্লাহ্ ভালোভাবেই জানেন।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'না, তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রসুল ও মুমিনগণ তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট কখনোই ফিরে যেতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিলো; তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে, তোমরা তো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়'।

এই আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'বাল' শব্দটি আগের আয়াতের শেষ বাক্যের 'বাল' এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এভাবে আগের আয়াতের বক্তব্যগত ধারা প্রবাহিত হয়েছে এই আয়াতেও।

এখানে 'এই ধারণা তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিলো' কথাটির অর্থ রসুল স. ও তাঁর সাহাবীগণ এ যাত্রায় আর আত্মরক্ষা করতে পারবেন না— এমতো ভাবনাটি ভাবতে তোমাদের ভালোই লাগছিলো। নিঃসন্দেহে শয়তানই তোমাদের এই চিন্তাটিকে তোমাদের হৃদয়ে আকর্ষণীয় করে প্রতিভাত করেছিলো। আর তোমরা তো শয়তানদেরই সতীর্থ। 'তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে' অর্থ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল সম্পর্কে অনেক খারাপ ধারণা তোমাদের অন্তরে লালন করেছিলো। বাসনাও করেছিলে যে, আল্লাহ্র বাহিনী মূর্তিপূজকদের গ্রাসে পরিণত হোক। আর 'তোমরা তো ধ্বংসরূপী এক সম্প্রদায়' অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল সম্পর্কে এরকম মন্দ ধারণা পোষণ করার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তোমরা অপরিণামদর্শী ও অবরুদ্ধ হৃদয়বিশিষ্ট। নচেৎ তোমরা বুঝতে পারতে যে, ধ্বংসের দিকেই চলেছে তোমাদের ক্রমাগত পদচারণা।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান আনে না, আমি সেই সব কাফেরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি'। একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রত্যাদেশবাহককে বিশ্বাস করতে চায় না, ঐসকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি নরকের লেলিহান আগুন, যার আয়ত্ত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনো উপায় তাদের নেই। অতএব,

সকলেই একথা ভালো করে বুঝে নিক যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস না করলে কোনো অনিষ্টই তাঁদের হয় না, অনিষ্ট হয় প্রত্যাখ্যানকারীদের।

এখানে 'সায়ীর' (জ্বলন্ত অগ্নি) শব্দটিতে সংযুক্ত তানভীন ভীতিপ্রকাশক। অর্থাৎ তাদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে ভয়ংকর অগ্নি। আর সর্বনাম ব্যতীত এখানে 'লিল্‌কাফিরীনা' উল্লেখ করে এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস না করাই হবে তাদের নরকাগ্নিতে প্রবেশ করার কারণ। আর নরকই তাদের চিরকালীন বসবাস হওয়ার উপযুক্ত।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্রই, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব যেহেতু আল্লাহ্র এবং তিনি যেহেতু সতত স্বাধীন অভিপ্রায়ধারী, সেহেতু তাঁর অভিপ্রায়কে প্রতিহত করতে পারে এমন কেউ, অথবা কোনোকিছুই নেই। ক্ষমা ও শাস্তি তাঁর অপ্রতিরোধ্য অভিপ্রায়াধীন। তাই যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা, তাকে দেন শাস্তি। আর তিনি ক্ষমাপরায়ণ ও দয়াপরবশ। ক্ষমা ও দয়ার দিকটিই তাঁর প্রবল এবং অপেক্ষাকৃতভাবে অপ্রবল শাস্তির দিকটি।

সূরা ফাতাহ্ ঃ আয়াত ১৫, ১৬, ১৭

www.eelm.weebly.com

❑ তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাইবে তখন যাহারা পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছিল, তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে তোমাদের সঙ্গে যাইতে দাও।' উহারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করিতে চায়। বল, 'তোমরা কিছুতেই আমাদের সংগী হইতে পারিবে না। আল্লাহ্ পূর্বেই এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন।' উহারা অবশ্যই বলিবে, 'তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেছ।' বস্তুত উহাদের বোধশক্তি সামান্য।

❑ যেসব মরুবাসী পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে বল, 'তোমরা আহূত হইবে এক প্রবল-পরাক্রান্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে; তোমরা উহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে যতক্ষণ না উহারা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এই নির্দেশ পালন করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করিবেন। আর তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, তিনি তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন।

❑ অন্ধের জন্য কোন অপরাধ নাই, খঞ্জের জন্য কোন অপরাধ নাই এবং পীড়িতের জন্য কোন অপরাধ নাই; এবং যে কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে আল্লাহ্ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে তিনি তাহাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! দেখবেন, হুদায়বিয়া যাত্রার সময় যে সকল মরুবাসী পশ্চাদপসরণ করেছিলো, তারা খায়বর অভিযানের সময় যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লোভে বলবে, আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গী করে নাও। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি বদলে ফেলাই তাদের উদ্দেশ্য। আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, তোমরা কোনোক্রমেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। আল্লাহ্র আদেশ এরকমই। দেখবেন, তারা তখন বলবে, তোমরা তো বিদ্বেষবশতঃ এরকম বলছো। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, তারা নিজেরাই বিদ্বেষপরায়ণ। আপাদমস্তক বিদ্বেষাচ্ছাদিত বলে তাদের বোধশক্তিও অন্তর্হিত প্রায়।

এখানে 'আমাদেরকে তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও' অর্থ আমাদেরকেও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য তোমাদের অভিযানে অংশগ্রহণ করতে দাও। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ' বলে বুঝানো হয়েছে খায়বর অভিযানের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের কথা।

মোহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. সাহাবীগণকে খায়বর অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। যারা হুদায়বিয়াতে গিয়েছিলেন,তাঁরা যথাসত্বর প্রস্তুত হয়ে গেলেন। যারা হুদায়বিয়ায় যায়নি, তারাও গণিমতের লোভে খায়বর গমনের জন্য প্রস্তুত হলো। কেননা হুদায়বিয়া থেকে মুসলিম বাহিনীর অক্ষত অবস্থায় মদীনায় ফিরতে দেখে তাদের মনে হয়েছিলো মুসলমানেরা বিজয়ী হবে এবং লাভ করবে অনেক গণিমত। তারা মনে করতো, গণিমত লাভ করাই যুদ্ধ করার

আসল উদ্দেশ্য। একারণেই আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে পূর্বাহ্নে জানিয়ে দেন যে, ওই সকল লোক মুজাহিদ নয়। তাই তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

'তারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি বদলে দিতে চায়' কথাটির অর্থ আল্লাহ্ আগেই তাঁর রসুলকে এই মর্মে নির্দেশ করেছেন যে, তাদেরকে খায়বর অভিযানে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। তারা আল্লাহ্র এমতো সিদ্ধান্তটি বদলে দিতে চায়। অন্য এক আয়াতেও এধরনের পূর্ব সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন 'অতঃপর তারা আপনার কাছে অভিযানে যাওয়ার অনুমতি কামনা করে। আপনি বলুন, তোমরা কখনোই আমার সঙ্গে যাবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোনো শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না। তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকাই পছন্দ করেছো'। এরকম বলেছেন ইবনে জায়েদ ও কাতাদা।

আমি বলি, যারা হুদায়বিয়ায় যায়নি, তারা যখন জানতে পারলো যে, মুসলমানেরা যুদ্ধ করতে পিছপা নয়। তারা জেহাদের বায়াতও গ্রহণ করেছে। তাদের এরকম অনড় মনোভাবের কারণেই কুরায়েশদের মতো যুদ্ধপ্রিয় গোত্রও তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছে। ফলে মূল আরবভূখণ্ডে নেমে এসেছে শান্তি। এখন মুসলমানেরা নিশ্চয় নতুন কোনো ভূখণ্ডের যুদ্ধলব্ধ সম্পদাধিকারী হবে। এসকল কথা ভেবে তাদের অনুশোচনা হলো। ইত্যবসরে রসুল স. নতুন করে খায়বর যাত্রার ঘোষণা দিলেন, যদিও তিনি স. একথা ভালো করেই জানতেন যে, খায়বরবাসীরা মক্কাবাসীদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। দশ হাজার রণনিপুণ যোদ্ধা তাদের প্রস্তুত থাকতো সব সময়। তৎসত্ত্বেও তিনি স. যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা দেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, মুসলিম বাহিনী যদি এতোই শক্তিশালী ছিলো, তাহলে তাঁরা জোর করে মক্কায় প্রবেশ করতে পারলেন না কেনো? এর কারণস্বরূপ বলা যেতে পার যে, এটা ছিলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মক্কাবাসীদের প্রতি করুণা। তিনি মক্কাবাসীদেরকে ইতোপূর্বেও এভাবে আবরাহার হস্তিবাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাছাড়া আল্লাহ্ তো একথা জানতেনই যে, পরবর্তীতে তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করবে। তাদের বংশধরগণের মধ্যেও আগমন করবে বহুসংখ্যক পুণ্যবান বিশ্বাসী। আর একটি কারণ এরকমও হতে পারে যে, তুমুল যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনী ভুলক্রমে ওই সকল মুসলমানদেরকেও হত্যা করে ফেলতেন, যারা তাদের ইমানকে গোপন রেখে অথবা নিগৃহীত হয়ে কোনোক্রমে মক্কায় নিজেদের জীবন রক্ষা করে যাচ্ছিলেন।

'বলো, তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না' এই কথাটিও একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যা আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে আগাম জানিয়ে দিয়েছেন, যেমন ইতোপূর্বেও আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তারা কিন্তু খায়বরে যেতে পারবে না। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার লিখেছেন, কথাটি কেবল না-সূচক হলেও এটি একটি নিষেধাজ্ঞা। 'আল্লাহ্ পূর্বেই এরকম ঘোষণা দিয়েছেন' অর্থ হে রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, এই নিষেধাজ্ঞাটি আমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নয়, এই সিদ্ধান্তটি আমি পেয়েছি প্রত্যাদেশযোগে। আর সে প্রত্যাদেশের মর্ম এই যে, খায়বর অভিযানে অংশগ্রহণ করতে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করতে পারবে কেবল তারা, যারা ইতোপূর্বে হুদায়বিয়ায় গিয়েছিলো। অথবা, হুদায়বিয়ায় যারা যায়নি তারা আর কোনো অভিযানে অংশগ্রহণ করতে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করতে পারবে না।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য ওই সকল লোক নয়, যাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলো 'ফাছতা'জানুকা' (তারা আপনার নিকট অনুমতি চেয়ে নিক) আয়াত। কেননা ওই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো আরো একবছর পরে নবম হিজরীতে তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে। আর আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত মরুবাসীদের ঘটনা ঘটেছিলো অষ্টম হিজরীতে হুদায়বিয়া যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে।

'তোমরা তো বিদ্বেষ পোষণ করছো' অর্থ তারা বললো, আল্লাহ্ এরকম প্রত্যাদেশ করেননি, তোমরা আমাদেরকে সঙ্গে নিতে চাইছো না কেবল হিংসে করে। আর 'বস্তুত তাদের বোধশক্তি সামান্য' কথাটির অর্থ— ওই সকল মরুবাসী একথা জানেই না যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোনটা কল্যাণকর এবং কোনটা অকল্যাণকর। ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভবোধ তাদের একেবারেই নেই। কেননা তারা ঘোর পৃথিবীপ্রসক্ত। তাদের বোধ-বুদ্ধি সম্পূর্ণতই পার্থিবতাপ্রভাবিত।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'যেসব মরুবাসী পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিলো, তাদেরকে বলো, তোমরা আহূত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে যতোক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এই নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো, তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! যারা আপনার হুদায়বিয়া যাত্রায় অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে বলে দিন, এরপর তোমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে মক্কাবাসীদের চেয়েও অধিক শক্তিশালী এক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। ওই যুদ্ধ তোমাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত, যতোক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এই নির্দেশটি পালন করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে জান্নাত দান করবেন। আর তোমরা যদি পুনরায় পিছিয়ে যাও, তবে তিনি তোমাদেরকে দিবেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

এখানে 'কুলিল্ মুখল্লাফীন' কথাটিতে প্রথম পুরুষ (তারা) সর্বনাম ব্যবহার করার পরিবর্তে 'মুখল্লাফীন' কথাটি মোট দু'বার উল্লেখ করে তিরস্কারের বিষয়টিতেই জোর দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধকালে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা যে জঘন্য অপরাধ, সে কথাকে সুস্পষ্ট করাই এমতো শব্দ ব্যবহারের কারণ। আর এখানকার 'প্রবল পরাক্রান্ত জাতি' অর্থ রোমীয়গণ। অর্থাৎ তাবুক সমর। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে তাবুক অভিযানের কথা। এরকম বলেছেন কা'ব।

আমি বলি, এখানে এরকম বলা হয়েছে যে 'তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে ততোক্ষণ, যতোক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে'। সুতরাং এখানকার 'প্রবল পরাক্রান্ত জাতি' অর্থ রোমবাসী হতে পরে না। কেননা তাবুকে না তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে, না তারা গ্রহণ করেছে ইসলাম। রসুল স. তাবুকে অপেক্ষা করেছিলেন দশদিন। কিন্তু রোমপ্রশাসক হেরাক্লিয়াস তার অবস্থান থেকে একটুও এগিয়ে আসেনি। তাই শেষ পর্যন্ত রসুল স.কে সেখান থেকে যুদ্ধ না করেই ফিরে আসতে হয়েছিলো।

সাঈদ ইবনে জোবায়ের ও কাতাদা বলেছেন, এখানে 'প্রবল পরাক্রান্ত জাতি' বলে বুঝানো হয়েছে হাওয়াযেন, ছাক্বিফ ও গাতফান গোত্রকে। তাদের সাথে যুদ্ধ হয়েছিলো হুনায়েন প্রান্তরে। আমার মতে, এই অভিমতটিও সঠিক নয়। কেননা নির্ভুল সূত্রপরম্পরায় এরকম কথা আসেনি যে, রসুল স. ওই মরুবাসীদেরকে হুনায়েন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বলেছিলেন। তাছাড়া হাওয়াযেন ইত্যাদি গোত্রগুলো 'প্রবল পরাক্রান্ত'ও ছিলো না। বরং সংখ্যায় ও শক্তিতে তারা ছিলো মুসলমানদের চেয়েও দুর্বল।

জুহ্‌রী ও মুকাতিল বলেছেন, বনী হুনাইফা, অর্থাৎ ইয়ামামাবাসী, যারা মুসাইলামা কাজ্জাবের অনুসারী হয়ে গিয়েছিলো, তাদের কথাই বলা হয়েছে এখানে। হজরত রাফে ইবনে খাদিজ বলেছেন, আমি এই আয়াত পাঠ করি, কিন্তু একথা জানি না যে, এখানে 'প্রবল পরাক্রান্ত জাতি' বলে কাকে বোঝানো হয়েছে। এরপর যখন খলিফা হজরত আবু বকর আমাদেরকে বনী হুনাইফার লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানালেন, তখন আমরা জানতে পারলাম 'প্রবল পরাক্রান্ত জাতি' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে হুনাইফা সম্প্রদায়কে। অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত এটাই। বায়যাবীও এই অভিমতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর 'যতোক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে' অর্থ যতোক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে। অর্থাৎ হয় যুদ্ধ, না হয় ইসলাম। তৃতীয় কোনো পন্থা প্রয়োগের অবকাশ এখানে রাখা হয়নি। 'জিযিয়া' কর নিয়ে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দানের সুযোগও এখানে রাখা হয়নি। 'জিযিয়া' প্রযোজ্য কেবল আরবের অবিশ্বাসী, মূর্তিপূজক ও ধর্মত্যাগীদের ক্ষেত্রে। রোমবাসী ও অন্যান্য অনারব অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেও এই তিনটি পন্থার যে কোনো একটি অবলম্বন করা যায়— যুদ্ধ, ইসলাম অথবা জিযিয়া।

বর্ণিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে হজরত আবু বকরের খেলাফতের সত্যতাও প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা তিনিই যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিলেন ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, আতা ও ইবনে জুরাইজের মতে এখানকার 'প্রবল পরাক্রান্ত জাতি' অর্থ পারস্য জাতি। এমতাবস্থায় প্রমাণিত হয় যে, হজরত ওমরের খেলাফত সত্য এবং সেই সঙ্গে সত্য হজরত আবু বকরের খেলাফত। কেননা হজরত ওমরকে খলিফা নির্বাচিত করেছিলেন তিনিই। আর হজরত ওমরই যুদ্ধপরিকল্পনা করেছিলেন পারস্যবাসীর বিরুদ্ধে। আর এমতাবস্থায় 'যতোক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে' কথাটির অর্থ যতোক্ষণ না তারা পরাভব মানে এবংজিযিয়া দিতে সম্মত হয়।

'উত্তম পুরস্কার দান করবেন' অর্থ এখানে— দান করবেন জান্নাত। আর 'যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো' অর্থ যদি পিছটান দাও সেভাবে, যেভাবে পিছটান দিয়েছিলে হুদায়বিয়া যাত্রার প্রাক্কালে।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন পাঁচজন প্রতিবন্ধী রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! তাহলে আমাদের অবস্থা কী হবে? তখন অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত (১৮)। বলা হয়—

'অন্ধের জন্য কোনো অপরাধ নেই, খঞ্জের জন্য কোনো অপরাধ নেই এবং পীড়িতদের জন্য কোনো অপরাধ নেই এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ্ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, তিনি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন'।

এখানে অন্ধ, খঞ্জ ও পীড়িতদের জন্য কোনো অপরাধ নেই, অর্থ তারা যেহেতু যুদ্ধ করতে অসমর্থ, তাই যুদ্ধে না গেলেও আল্লাহ্ তাদেরকে অভিযুক্ত করবেন না।

সুরা ফাতাহ্ আয়াত ১৮, ১৯, ২০

---

www.eelm.weebly.com

❑ আল্লাহ্ তো মু'মিনগণের উপর সন্তুষ্ট হইলেন যখন তাহারা বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিল, তাহাদের অন্তরে যাহা ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন; তাহাদিগকে তিনি দান করিলেন প্রশান্তি এবং তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়

❑ ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে লভ্য সম্পদ, যাহা উহারা হস্তগত করিবে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

❑ আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের যাহার অধিকারী হইবে তোমরা। তিনি ইহা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদিগ হইতে মানুষের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন যেন ইহা হয় মু'মিনদের জন্য এক নিদর্শন এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরিচালিত করেন সরল পথে;

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে—নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসবানদের উপরে পরিতুষ্ট হলেন, যখন তারা হুদায়বিয়ার এই বৃক্ষতলে আপনার নিকট জেহাদের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো, তাদের অন্তরে যে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল এবং ইসলামের জন্য বিশুদ্ধ ভালোবাসা ছিলো, তা তো তিনি জানেনই। তাই তাদেরকে প্রতিফলরূপে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন খায়বরের অত্যাসন্ন বিজয় ও সুপ্রতুল যুদ্ধলভ্য সম্পদ, যা তাদের হস্তগত হবেই। আর এটা হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ্রই নির্ধারণ।

এখানে 'বৃক্ষতলে' অর্থ হুদায়বিয়া প্রান্তরের সেই বৃক্ষটির নিচে, যেখানে সম্পন্ন হয়েছিলো অঙ্গীকারপর্ব। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণেই হুদায়বিয়ার বায়াতানুষ্ঠানকে বলা হয়ে থাকে 'বায়াতে রিদ্বওয়ান' বা সন্তুষ্টির শপথ। আর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বায়াত গ্রহণকারী সাহাবীগণের প্রশংসা বর্ণনার্থে এবং আগের আয়াত ছিলো বায়াতের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণার্থে।

'বোখারী' ও 'মুসলিম' গ্রন্থে এসেছে, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, হুদায়বিয়ায় আমরা বায়াত গ্রহণ করেছিলাম চৌদ্দশতজন। রসুল স. তখন বলেছিলেন, পৃথিবীতে তোমরাই সর্বোত্তম। ইমাম মুসলিম কর্তৃক সুপরিণতসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত উম্মে বিশর বলেছেন, ওই গাছের নিচে যারা আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলো, তারা দোজখে যাবে না।

এখানে তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি, অর্থ তাদের অন্তরে সৃষ্টি করলেন একাগ্রতা এবং তাদের প্রবৃত্তিকে করে দিলেন শান্তিমগ্ন। 'আসন্ন বিজয়' অর্থ খায়বর বিজয়। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আয়েজ বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রসুল স. মদীনায় অবস্থান করেছিলেন দশ দিন। তারপর যাত্রা করেন খায়বরের দিকে। সুলায়মান তাঈমি বলেছেন, তিনি স. মদীনায় ছিলেন পনেরো দিন। উকবার বর্ণনায় এসেছে, জুহুরী বলেছেন, তখন মদীনায় ছিলেন তিনি কুড়ি দিন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, মুসাওয়ার ও মারোয়ান থেকে এসেছে, রসুল স. জিলহজ মাসে হোদাইবিয়া থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে অবস্থান করেন মহররম পর্যন্ত। মহররমেই তিনি স. খায়বর অভিযানে রওয়ানা হয়ে যান এবং খায়বর বিজয় সম্পন্ন হয় ৭ হিজরী সনের সফর মাসে। এরকম বলা হয়েছে ওয়াকেদি কর্তৃক রচিত মাগাজী গ্রন্থে। হাফেজ বলেছেন এবর্ণনাটিই সমধিক প্রকৃষ্ট।

'বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলভ্য সম্পদ' অর্থ প্রচুর পরিমাণ গণিমতের মাল। জননী আয়েশা বলেছেন, খায়বর বিজয় সুসম্পন্ন হওয়ার পর আমি বলেছিলাম, এখন থেকে আমরা পেট ভরে খেজুর খেতে পারবো। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, খায়বর বিজিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখনো পেট পুরে আহার করতে পারিনি। হাফেজ মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী বলেছেন, খায়বরে ছিলো কৃষিক্ষেত্র, বহুসংখ্যক খেজুরের বাগান। আর তা ছিলো হুদায়বিয়া থেকে তিন দিনের পথের দূরত্বে ইরাকী হজযাত্রীদের যাতায়াত-পথের বামপ্রান্তে।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি এটা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করেছেন এবং তিনি তোমাদের থেকে মানুষের হস্ত নিবারণ করেছেন, যেনো এটা হয় মুমিনদের জন্য এক নিদর্শন এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে'।

এখানে 'প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের' বলে বুঝানো হয়েছে সমুদয় যুদ্ধলভ্য সম্পদকে, যা মুসলমানেরা লাভ করতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

হুদায়বিয়া থেকে মুসলমানগণ ফিরে আসেন মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে। কেননা দৃশ্যতঃ হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিটি ছিলো মুসলমানগণের জন্য অবমাননাকর। তাই তাঁদের সান্ত্বনা প্রদানার্থে তখন অবতীর্ণ হয়। 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের'।

'তিনি তোমাদের থেকে মানুষের হস্ত নিবারণ করেছেন' অর্থ আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন শত্রুদের আক্রমণাশংকা থেকে। বাগবী লিখেছেন, রসুল স. যখন খায়বর অবরোধে ব্যস্ত ছিলেন, তখন গাতফান গোত্রের লোকেরা মদীনা আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিলো। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেন। ফলে তারা আর অগ্রসর হওয়ার সাহস পায়নি।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, গাতফান গোত্র রসুল স. এর প্রতিপক্ষ ছিলো। তারা গোপনে গোপনে মদীনার ইহুদীদেরকে সাহায্য সহযোগিতাও করতো। তারা যখন শুনলো রসুল স. খায়বর গিয়েছেন, তখন তারা ইহুদীদেরকে সাহায্য করবার জন্য মদীনার দিকে যাত্রা করলো। কিছুদূর অগ্রসর হতেই সংবাদ পেলো, তাদের পরিবারের মধ্যেই শুরু হয়েছে গণ্ডগোল। বুঝতে পারলো, রসুল স. ও তাঁর সাহাবীগণ এসে পড়েছেন। তখন ভয়ে তারা আপন জনপদে ফিরে গিয়ে পরিবার পরিজনের নিরাপত্তার কাজে মন দিলো। ফলে রসুল স. এর খায়বর যাত্রা হলো অধিকতর সুগম।

সাঈদ ইবনে শুতাইম সূত্রে ইবনে কানে', বাগবী ও আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, সাঈদের পিতা উয়াইনা ইবনে হিস্‌ন গাতফান বাহিনীর সঙ্গে ছিলো, সে বলেছে, আমরা হঠাৎ আওয়াজ শুনতে পেলাম, হে জনতা! পরিবার পরিজনের খবর নাও। তাদের উপরে হামলা করা হয়েছে। ওই আওয়াজ শোনামাত্র সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেলো। কেউ কারো দিকে তাকিয়েও দেখলো না। আমার মনে হলো, আওয়াজটি ভেসে এসেছিলো আকাশের দিক থেকে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার আবার বলেছেন, এখানকার 'তোমাদের থেকে মানুষের হস্ত নিবারণ করেছেন', অর্থ হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির কারণে আল্লাহ্ তোমাদের উপর শত্রুর আক্রমণাশংকা দূরীভূত করেছেন। আর তিনি তা করেছেন এজন্য যে, তোমরা যেনো নিরাপদে থাকো, কিংবা তোমরা যেনো সহজে লাভ করতে পারো গণিমতের মাল। এটাই হচ্ছে তোমাদের থেকে মানুষের হস্ত নিবারিত করা, যা হয়ে রইলো রসুল স. গণিমতের মাল সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তার সত্যতার একটি নিদর্শন। আর এখানাকার 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে' অর্থ আল্লাহ্ তোমাদেরকে চালনা করেন ইসলামের আদর্শে, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং যাতে করে তোমরা তোমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে করতে পারো অধিকতর প্রসারিত।

খায়বর যুদ্ধের বিবরণঃ হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ ইবনে খুজাইমা ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, খায়বর যাত্রার প্রাক্কালে রসুল স. মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্তরূপে রেখে যান সাবা ইবনে আরফাতাহ্‌কে। তিনি স. যখন খায়বর

অভিযানের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন, তখন ইহুদীরা পড়লো বিপাকে। তারা তখন সাহাবীগণকে প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য ওঠে পড়ে লেগে গেলো। নাছোড় বান্দার মতো ঋণী সাহাবীগণকে বলতে লাগলো, আগে আমাদের ঋণ পরিশোধ করো, তারপর কোথায় যাবে যাও।

আহমদ ও তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু জদর বর্ণনা করেছেন, আবু শাহম ইহুদী আমার কাছে পেতো পাঁচ দিরহাম। সে আমাকে ধরলো। আমি তাকে বললাম, ফিরে আসার পর আমি তোমার পাওনা অবশ্যই পরিশোধ করবো। কটা দিন সময় দাও আমাকে। রসুল স. বলেছেন, খায়বর যুদ্ধ থেকে আমরা অনেক গণিমত পাবো। আবু শাহম বললো, কী মনে করেছো তোমরা। খায়বর যুদ্ধ কি সেরকম হবে, যেমন করে তোমাদের উপরে চড়াও হয় গ্রাম্য লোকেরা? শপথ তওরাতের। খায়বরে রয়েছে দশ হাজার রণনিপুণ যোদ্ধা। এরপর সে আমাকে নিয়ে হাজির হলো রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে। সব শুনে রসুল স. আমাকে বললেন, তার পাওনা মিটিয়ে দাও। আমি তখন একটি বস্ত্র বিক্রয় করে তাকে দিলাম তিন দিরহাম।

রসুল স. খায়বরের সন্নিকটবর্তী সুহবা নামক স্থানে পৌঁছে নির্দেশ দিলেন, তোমাদের কাছে যা কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে, তা নিয়ে এসো। সকলে এনে জমা করতে লাগলো কেবল ছাতু। কেননা অন্য কোনো প্রকার খাদ্য তখন কারো ছিলো না। রসুল স. পানি দিয়ে ছাতু ভেজালেন। নিজে খেলেন। আমাদেরকেও খেতে বললেন। এরপর তিনি স. নামাজ পড়ালেন ওজু না করে। বোখারী, বায়হাকী। মোহাম্মদ ইবনে আমর বলেছেন, এরপর তিনি স. সেখান থেকে যাত্রা করে পৌঁছলেন খায়বরের এক বাজারে। ওই জায়গাটি খায়বর বিজয়ের পরে হজরত জায়েদ ইবনে সাবেতের ভাগে পড়েছিলো। তিনি স. সেখানে পৌঁছেন

www.eelm.weebly.com

রাতে। খায়বরের ইহুদীরা চিন্তাও করতে পারেনি যে, রসুল স. এতো দূরে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবেন। কেননা তারা সংখ্যায় ও শক্তিতে ছিলো মুসলমানদের চেয়ে বেশী শক্তিমান। যখন তারা এই সংবাদ জানতে পারলো, তখন থেকে প্রতিদিন তাদের দশহাজার যুদ্ধবাজ সৈন্য প্রতিদিন খায়বরের বাইরে এসে টহল দিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর দেখা না পেয়ে ভাবতো, নাহ্। সংবাদটা মনে হয় ঠিক নয়। এতো বড় সাহস তাদের হবেই না। এরকম ভাবতে ভাবতে তারা হয়ে পড়লো অসতর্ক।

তাই যে রাতে রসুল স. সেখানকার বাজারে গিয়ে পৌঁছলেন, সে রাতে তাদের কোনো গতিবিধিই পরিলক্ষিত হলো না। তারা তখন ছিলো নিজ নিজ আবাসে নিদ্রাসুখে বিভোর। কিন্তু সকালে উঠেই বুঝতে পারলো বিপদ একেবারে নিকটে। ভয়ে ও আতংকে কাঁপতে লাগলো তারা। বেরিয়ে এলো দুর্গ থেকে। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. খায়বরের উপকণ্ঠে পৌঁছলেন রাতে। তাঁর নিয়ম ছিলো, রাতে কোথাও পৌঁছে গেলেও তিনি শহরবাসীদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসতেন না। অপেক্ষা করতেন ভোর পর্যন্ত। তারপর শহর থেকে

আজান ধ্বনিত হলে আর আক্রমণ করতেন না। আক্রমণ করতেন তখনই, যখন সেখানে ভোরের আজান শোনা যেতো না। আমরা ভোরে সেখানে নামাজ পড়লাম। আজান শোনা গেলো। তিনি স. অশ্বারূঢ় হলেন। নিজ নিজ বাহনে উঠে পড়লেন সাহাবীগণও। দেখা গেলো শহরবাসীরা টুকরী কাস্তে কোদাল ইত্যাদি নিয়ে নিজ নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে আসছে। হঠাৎ তারা সম্মুখীন হলো সুসজ্জিত মুসলিম বাহিনীর। সভয়ে পিছিয়ে গেলো তারা। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে শুরু করলো, মোহাম্মদ এসে গিয়েছে। সাথে সাথে উপস্থিত হয়েছে তাঁর পুরো বাহিনী। রসুল স. তাঁর উভয় হস্ত ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন 'আল্লাহু আকবার'। খায়বর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমরা যখন কোনো সম্প্রদায়ের অঙ্গণে প্রবেশ করি, তখন প্রথমে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি। তবু যদি তারা নম্র না হয়, তখন তাদের ওই সকাল হয় নিতান্তই অমঙ্গলের (অর্থাৎ তাদেরকে লুণ্ঠন করা হয়)। রসুল স. নগরবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। মুসলমানদেরকে সারিবদ্ধ করে বললেন, শোনো, কেউ যেনো আমার অনুমতি ব্যতিরেকে যুদ্ধ শুরু না করে। কিন্তু কী এক আশংকায় এক লোক এক ইহুদীকে আক্রমণ করেই বসলো। ইহুদীও শুরু করলো পাল্টা আক্রমণ এবং কিছুক্ষণের মধ্যে হত্যাও করে ফেললো তাকে। কেউ কেউ বলতো লাগলো, অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়ে গিয়েছেন। রসুল স. বললেন, আমি তো তাকে আমার অনুমতি ছাড়া যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলাম। সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, এক ঘোষককে ঘোষণা করে দিতে বলো যে, যারা অবাধ্য, তাদের জন্য জান্নাত বৈধ নয়।

হজরত জাবের থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. সেদিন বলেছিলেন, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার আকাঙ্খা করবে না। বরং আল্লাহ্র কাছে সর্বাবস্থায় কামনা করবে নিরাপত্তা। কেননা একথা তোমাদের জানা নেই যে, যুদ্ধে কার পরিণতি কেমন হবে। কিন্তু যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য হলে প্রার্থনা করবে, হে আমাদের আল্লাহ্। আমাদের ও তাদের প্রভুপালনকর্তা! আমাদের ও তাদের তকদীর সম্পূর্ণতই তোমার কর্তৃত্বাগত। তাদেরকে কতল তুমিই করো। এবার তোমরা মাটি আঁকড়ে ধরে বসে পড়ো। শত্রুরা যখন তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তখন দাঁড়িয়ে যেয়ো এবং উচ্চারণ কোরো 'আল্লাহু আকবর'।

ইবনে ইসহাক ও মোহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নিশান বণ্টন করে দিলেন। অনুমতি দিলেন যুদ্ধ শুরু করার। উপদেশ দিলেন, সর্বাবস্থায় মনোবল অটুট রাখতে হবে। সর্বপ্রথম অবরোধ করা হলো নাতাত এলাকার নায়েম দুর্গ। তুমুল যুদ্ধ হলো। নাতাতবাসীরা আক্রমণ প্রতিহত করলো প্রচণ্ড সাহসিকতার সঙ্গে। রসুল স. নাজিয়াতে ফিরে এলেন। পরদিন পুনরায় যুদ্ধ হলো। কিন্তু তাদেরকে পরাস্ত করা গেলো না। এভাবে কয়েকদিন চলার পর কেল্লার পতন ঘটলো।

বায়হাকী, আবু নাঈম ও মোহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, মুসলিম বাহিনী যখন খায়বরে পৌঁছলো, তখন সেখানকার খেজুর ছিলো কাঁচা। কাঁচা খেজুর

খেয়ে মুসলমানদের মধ্যে দেখা দিলো জ্বরের প্রকোপ। সমস্যাটি উত্থাপন করা হলো রসুল স. সকাশে। তিনি স. বললেন, তোমরা মশকগুলো পানি দিয়ে ভরে নাও এবং সকালের দিকে দুই আজানের মধ্যবর্তী সময়ে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে শরীরে ঢেলে নিয়ো। সকলে তাই করলো। লাভ করলো সুস্থতা ও সবলতা। তাঁদের মনে হলো, চোখের সামনে যেনো খুলে গেলো কারাগারের দরোজা। মুক্তি ঘটলো বন্দীদশা থেকে, যেমন উটের পায়ের বাঁধন খুলে দিলে সে সতেজে উঠে দাঁড়ায়।

নায়েম কেল্লা বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী অবরোধ করলো সুয়াব ইবনে মুয়াজের কেল্লা। হজরত আবু ইয়াসির ও কা'ব ইবনে ওমর থেকে মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, ওই কেল্লাটি ছিলো অত্যন্ত মজবুত। মুসলমানেরা তিন দিন পর্যন্ত ওই কেল্লা অবরোধ করে রাখে।

www.eelm.weebly.com

আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তির বরাত দিয়ে ইসহাক ও মাতাব আসলামী সূত্রে মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, আসলাম গোত্রের লোকটি বলেছেন, আমাদের গোত্রের লোকেরা ক্ষুধায় খুব কাতর হয়ে পড়েছিলো। তবুও আমরা খায়বর পৌঁছে দশদিন পর্যন্ত নাতাত দুর্গ অবরোধে অংশগ্রহণ করলাম, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, এমন কোনো উপায় আমরা বের করতে পারলাম না। লোকেরা আসমা ইবনে হারেছাকে রসুল স. এর কাছে পাঠালো। আসমা তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের গোত্রের লোকেরা আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন এবং বলতে বলেছেন, আমরা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর। রসুল স. বললেন, খাদ্যের ব্যবস্থা তো এখানেও নেই। পরক্ষণে বললেন, হে আল্লাহ্‌। সবচেয়ে বড় দুর্গটির পতন ত্বরান্বিত করো, যে দুর্গের মধ্য রয়েছে সবচেয়ে বেশী খাদ্যসম্ভার। এরপর তিনি স. নিশান তুলে দিলেন হজরত হাব্বাব ইবনে মুনজিরের হাতে। বললেন, হাব্বাবের নিশানের নিচে সকলে সমবেত হও। বর্ণনাকারী বলেছেন, আমরা রসুল স. এর নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন করবার আগেই শুনতে পেলাম সুয়াব ইবনে মুয়াজের দুর্গের পতন ঘটেছে। ওই দুর্গের মধ্যে ছিলো সর্বাপেক্ষা অধিক খাদ্যশস্যের মওজুদ। হজরত হাব্বাবকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এসেছিলো ইহুদী ইউশা। হজরত হাব্বাব তাকে কতল করে ফেলেন। এরপর বের হয়ে এলো জিয়াল। তাকে কতল করলেন হজরত আম্মারা ইবনে উকবা গিফারী। এসব দেখে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, তার যুদ্ধ একেবারে বিফলে গেলো। রসুল স. বললেন, এর জন্য তার কোনো পাপ হবে না। বরং এতে করে সে পুণ্য লাভ করবে।

হজরত জাবের থেকে মোহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, সুয়াব দুর্গে মুসলমানেরা এতো বেশী খাদ্যসামগ্রী লাভ করে, যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি, সেখানে জমা করা ছিলো বিপুল পরিমাণ খেজুর, ঘি, জয়তুনের তেল ও চর্বি। রসুল স. নির্দেশ দিলেন পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানাহর করো। কিন্তু নিয়ে যেয়ো না।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, মোহাম্মদ ইবনে ওমর বলেছেন, ইহুদীরা নায়েম ও সুয়াব দুর্গের পতনের পর চলে যায় যোবায়েরের দুর্গে। ওই দুর্গের চূড়ায়

অবস্থান নিয়েছিলো এক ইহুদি পুরোহিত। মুসলমানেরা ওই দুর্গটিও অবরোধ করলেন। অবরোধ চললো তিন দিন ধরে। গাজ্জাল নামক এক ইহুদী গোপনে রসুল স. এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আবুল কাসেম! আমি আপনাকে একটি পরামর্শ দিচ্ছি, যার দ্বারা আপনি দুর্গবাসীদের ঝামেলা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। তবে শর্ত হচ্ছে, আমার পরিবার পরিজনকে নিরাপত্তা দিতে হবে। তাদেরকে নিয়ে যেতে দিতে হবে শাকেতে। কেননা আমি জানি যে, সেখানকার লোকেরা আপনার কথায় জীবন দিতে পারে। রসুল স. অঙ্গীকার করলেন, ঠিক আছে, তুমি যেমন বলছো, সেভাবেই নিরাপত্তা দেওয়া হলো তোমার পরিবার পরিজনকে। ইহুদী বললো, তাহলে শুনুন। আপনি এক মাস ধরে তাদেরকে অবরোধ করে রাখলেও তারা কাবু হবে না। কেননা তাদের আওতায় রয়েছে ভূগর্ভস্থ পানি। রাতে তারা সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করে। আপনি যদি তাদের পানি সংগ্রহের সংযোগসূত্রটি বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারেন, তাহলে তারা বেকায়দায় পড়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে। রসুল স. তাই করলেন। ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো তাদের পানি সংগ্রহের পথ। মরিয়া হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো তারা। যুদ্ধ করলো প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে। মুসলমানদের মধ্যে কয়েকজন শহীদ হলেন। আর তাদের লোক নিহত হলো দশ জন। অবশেষে ওই দুর্গটিও মুসলমানদের অধিকারে এলো। এটাই ছিলো নাতাতের সর্বশেষ দুর্গ।

রসুল স. এবার মনোযোগ দিলেন শাকের দিকে। সেখানকার দুর্গের একটি ছাউনিকে বলা হতো সামুয়ান। রসুল স. প্রথম নজর দিলেন সেদিকেই। ছাউনিটির লোকদের সঙ্গে শুরু হলো যুদ্ধ। গাজাওয়াল নামক এক ইহুদী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য দুর্গের বাইরে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করলেন হাব্বাব ইবনে মুনজির। বের হলো আর এক ইহুদী। তাকে হত্যা করলেন হজরত আবু দুজানা। তারপর তার তলোয়ার ও বর্ম নিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. সকাশে। রসুল স. তলোয়ার ও বর্মটি তাকেই দিয়ে দিলেন। এরপর এক সঙ্গে বেরিয়ে এলো সকল ইহুদী। দাঁড়িয়ে রইলো আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। মুসলিম বাহিনী পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করতে লাগলো 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার'। তারপর ঢুকে পড়লো দুর্গাভ্যন্তরে। পুরোভাগে ছিলেন হজরত আবু দুজানা। সেখানেও মুসলমানেরা লাভ করেন বহুসংখ্যক ছাগল, ভেড়া এবং প্রচুর খাদ্যসামগ্রী। সেখানকার যোদ্ধারা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো বানযাল দুর্গে। নাতাত্‌ থেকে সেখানে পালিয়ে গিয়েছিলো কেউ কেউ। রসুল স. এবার ওই দুর্গটিও অবরোধ করলেন। সেখানেও শুরু হলো প্রচণ্ড যুদ্ধ। তাদের দিক থেকে ছুটে আসতে লাগলো অসংখ্য তীর। দু'টি তীর ছুটে এলো রসুল স. এর দিকেও এবং সেগুলো জড়িয়ে গেলো তাঁর পরিধেয় বসনে। তিনি সেগুলো একত্র করলেন। তারপর এক মুঠো কাঁকর নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন দুর্গের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গটি কাঁপতে শুরু করলো। দেওয়ালগুলো ভেঙে পড়লো। মুসলমানেরা প্রবেশ করলো দুর্গের ভিতরে। বন্দী করে ফেললো সকল ইহুদীকে। সেখান থেকে কিছুসংখ্যক ইহুদী পালিয়ে যেতেও সমর্থ হলো। তারা চলে গেলো কাছীবা ছাউনির দিকে।

www.eelm.weebly.com

সেখানকার সবচেয়ে বড় ঘাঁটি ছিলো কামুস। ঘাঁটিটি ছিলো সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত। ইবনে আবী উকবা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কামুস অবরোধ করে রাখলেন কুড়ি দিন ধরে। এভাবে অবরোধের পর অবরোধ পরিচালনা করতে গিয়ে রসুল স. কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকে বোখারী, হজরত সালমা ইবনে আকওয়া থেকে বোখারী ও আবু নাঈম, হজরত ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে আবু নাঈম, হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম, বায়হাকী, হজরত আলী থেকে আহমদ, আবু ইয়ালী, বায়হাকী এবং হজরত বুরাইদাহ্ থেকে আবু নাঈম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর ছিলো আধ কপালী ব্যথা। ফলে তিনি স. দুই একদিন বাইরে যেতে পারতেন না। মস্তকের অর্ধাংশের ব্যথা শুরু হলো নিয়মিত। তিনি একদিন ঝাণ্ডা তুলে দিলেন হজরত আবু বকরের হাতে। ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে হজরত আবু বকর শুরু করলেন তুমুল যুদ্ধ। পুনঃপুনঃ আক্রমণ করলেন। তৎসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে হলো ব্যর্থ হয়ে। হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, পর পর দুই দিনের যুদ্ধে ইহুদীরাই ছিলো প্রবল। পরিস্থিতি দেখে রসুল স. বললেন, আগামীকাল ঝাণ্ডা তুলে দিবো এমন লোকের হাতে, যার মাধ্যমে ঘটবে দুর্গের পতন। সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছু হটবে না। সে-ও আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে ভালোবাসে। প্রাণপণে যুদ্ধ করে সে বিজয় ছিনিয়ে আনবেই। হজরত বুরাইদাহ্ বলেছেন, রসুল স. এর এমতো ঘোষণা শুনে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, আগামীকাল আমরা বিজয়ী হবোই। কিন্তু সারারাত ধরে আমরা এই চিন্তাই করতে লাগলাম যে, রসুল স. আগামীকাল কোন সৌভাগ্যবানের হাতে তুলে দিবেন পতাকা। সকাল হলো। রসুল স. সকাশে সমবেত হলো সবাই। মনে মনে প্রত্যেকেই কামনা করছিলাম, আহা, আমিই যদি হতে পারতাম আজকের যুদ্ধের পতাকাবাহী। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, কেবল ওই দিনই আমার অন্তরে জেগেছিলো নেতৃত্বের আকাঙ্খা। ফজরের নামাজের পর রসুল স. পতাকা আনতে নির্দেশ দিলেন। কিছুক্ষণ শুভ উপদেশাবলী প্রদান করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আলী কোথায়? সাহাবীগণ বললেন, তার তো চোখে অসুখ। হজরত সালমা বলেছেন, আমি আলীকে হাত ধরে নিয়ে এলাম। রসুল স. বললেন, কী হয়েছে তোমার? তিনি বললেন, আমার চোখ ব্যথা করছে। সামনের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী নিজেই বলেছেন, রসুল স. আমার মাথা তাঁর কোলে তুলে নিলেন। নিজ হাতে তাঁর মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন আমার চোখে। সাহাবীগণ বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে গেলো তার চোখের অসুখ। পরে আর কখনোই তাকে চোখের পীড়ায় ভুগতে হয়নি।

এরপর রসুল স. পতাকা দিলেন হজরত আলীর হাতে। হজরত আলী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবো ততোক্ষণ পর্যন্ত

যতোক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। রসুল স. বললেন, ধীরে ও দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হও। তাদের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার পর তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ো। জানিয়ে দিয়ো তাদের উপরে কী অধিকার রয়েছে আল্লাহ্র এবং তাঁর রসুলের। তোমার মাধ্যমে যদি একজনও পথপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তুমি হবে লোহিত উষ্ট্রাধিকারী অপেক্ষা অধিক লাভবান। পতাকা হাতে নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলেন হজরত আলী। দুর্গের কাছাকাছি গিয়ে পতাকাটি পুঁতে দিলেন মাটিতে। এক ইহুদী দুর্গের খিড়কি দিয়ে মাথা বের করে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি আলী। তাঁর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীটি বললো, শপথ তাঁর, যিনি মুসার উপরে তওরাত অবতীর্ণ করেছিলেন, তুমি জয়ী হবে। শেষ পর্যন্ত হজরত আলী সেদিনের যুদ্ধে বিজয়ী হয়েই ফিরেছিলেন।

হজরত জাবের থেকে মোহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, হজরত আলীর সঙ্গে খায়বর দুর্গ থেকে সর্বপ্রথমে যে ইহুদী মুকাবিলা করতে এলো, সে ছিলো মারহাবের ভাই হারেছ। হজরত আলী তাকে বধ করলেন। তার সঙ্গের লোকটি ভয়ে পালিয়ে গেলো দুর্গের ভিতর। এরপর দুর্গ থেকে বের হয়ে এলো আমের। সে ছিলো বিশাল বপুধারী। রসুল স. বললেন, আমের বেরিয়ে এসেছে। দ্যাখো দ্যাখো, সে প্রায় পাঁচ হাত লম্বা। সে মুকাবিলা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। হজরত আলী অল্পক্ষণের মধ্যে চিরদিনের জন্য মিটিয়ে দিলেন আমেরের যুদ্ধের সাধ। এরপর এগিয়ে এলো ইয়াসির। হজরত আলী তার সামনে অগ্রসর হলেন। হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। হজরত আলী তাঁর কথা মেনে নিলেন। অগ্রসর হলেন হজরত যোবায়ের। তখন তাঁর পিতা রসুল স.কে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার ছেলে তো মরেই যাবে। তিনি স. বললেন, না, মরবে না। বরং মারবে। তাই হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই হজরত যোবায়েরের অস্ত্রাঘাতে নিহত হলো ইয়াসির। রসুল স. হজরত যোবায়েরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার জন্য আমার পিতৃব্য উৎসর্গীকৃত হোক। সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, প্রত্যেক নবীর থাকে একজন অন্তরঙ্গ সখা। আর আমার অন্তরঙ্গ সখা হচ্ছে যোবায়ের। হজরত সালমা ইবনে আকওয়া বলেছেন, মারহাব বেরিয়ে এলো রণোন্মত্ত কবিতা আওড়াতে আওড়াতে। হজরত আলী তাকে কতল করে ফেললেন। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, মারহাবকে কতল করার পর তার ছিন্নমস্তক নিয়ে আমি হাজির হলাম রসুল স. সকাশে। বায়হাকী ও মোহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, মারহাবকে কতল করেন মোহাম্মদ ইবনে সালমা। কিন্তু মুসলিম কর্তৃক যথাসূত্রপরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে, তাকে হত্যা করেন হজরত আলী।

ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু রাফে' বলেছেন, রসুল স. যখন আলীকে পতাকা দিয়ে পাঠালেন, তখন আমিও ছিলাম তার সঙ্গে। আমরা দুর্গের কাছে উপস্থিত হলে দুর্গবাসীরা বাইরে বেরিয়ে এলো। এক ইহুদী প্রচণ্ড আঘাত করলো। পড়ে গেলো আলীর হাতের ঢাল। সামনেই পড়ে

ছিলো দরজার একটা কপাট। সঙ্গে সঙ্গে কপাটটি উঠিয়ে নিলো আলী এবং ওই কপাটকেই বানিয়ে নিলো তার ঢাল। অবশেষে আল্লাহ্ বিজয় দান করলেন। যুদ্ধ শেষে কপাটটি ফেলে দিলো আলী। সেই দৃশ্য এখনো আমার চোখে ভাসে। আমি সহ সেখানে আমরা ছিলাম আটজন। আমরা আটজন মিলে ওই বিশাল কপাটটিকে ওঠাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না।

বায়হাকী দু'রকম পদ্ধতিতে মোহাম্মদ হানাফিয়া সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, খায়বর বিজয়ের দিন হজরত আলী সেই কপাটটি উঠিয়ে দুর্গের দেওয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে দেন। যাতে করে মুসলমানেরা তার উপরে চড়ে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে এবং খুলে দিতে পারে দুর্গের সকল দরোজা। পরে আমরা ওই কপাটটি চল্লিশ জন মিলেও ওঠাতে পরিনি। এই বর্ণনাপরম্পরার সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। নির্ভরযোগ্য নন কেবল লাইস ইবনে সলিম।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের বলেছেন, সত্তর জন মিলে চেষ্টা করেছিলো ওই কপাটটিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু পারেনি। সালেহী বলেছেন, হাকেমও এরকম বর্ণনা করেছেন। কামুসে আবদুল হাকিক কেল্লার ভিতর থেকে কিছুসংখ্যক রমণী বন্দী হয়ে এলো। হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়্যাও ছিলেন তাদের মধ্যে। পরবর্তীতে তিনি হন উম্মতজননী। রাস্তায় যেখানে ইহুদীদের লাশ পড়েছিলো, সেখান থেকে তাঁকে ও তাঁর আর একজন সহচরীকে নিয়ে আসেন হজরত বেলাল। সাফিয়্যার সহচরীটি রসুল স.কে দেখেই চীৎকার শুরু করে। নিজের মুখে নিজেই মাখতে থাকে ধূলোবালি এবং আঘাত করতে থাকে নিজের মুখে। রসুল স. তাকে দেখে বললেন, এই শয়তানীটিকে এক্ষুণি এখান থেকে নিয়ে যাও। এরপর সাফিয়্যাকে বললেন তাঁর পিছনে পিছনে আসতে। একটি চাদর দিয়ে বললেন, শরীরে জড়িয়ে নাও। এ দৃশ্য দেখেই সাহাবীগণ বুঝতে পারলেন, রসুল স. তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করে নিয়েছেন। হজরত বেলালকে তিনি স. তখন একথাও বলেছিলেন যে, তোমার অন্তরে কি দয়ামায়া নেই, তুমি এই দুই রমণীকে সেখান দিয়ে নিয়ে এসেছো, যেখানে রয়েছে তাদের পুরুষদের লাশ?

প্রথমে হজরত সাফিয়্যার বিবাহ হয়েছিলো কেনানা ইবনে রাবী ইবনে আবীল হাকিকের সঙ্গে। ওই সময় তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাঁর কোলের উপরে এসে পড়েছে চাঁদ। এই স্বপ্নের কথা তিনি কেনানাকে জানালেন। কেনানা মন্তব্য করলো, তার মানে তুমি আরবশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদের আকাংখার পাত্রী। একথা বলেই সে তাঁর মুখে চপেটাঘাত করলো। নীল হয়ে গেলো তাঁর চোখের চতুষ্পার্শ্ব। রসুল স. এর সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধা হওয়ার পরেও তাঁর মুখমণ্ডলে ওই নীল দাগের চিহ্ন ছিলো। রসুল স. যখন এর কারণ জানতে চেয়েছিলেন তখন তিনি খুলে বলেছিলেন সব।

এক বর্ণনায় এসেছে, তখন হজরত দাহিয়া কালবী রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! বন্দিনীগণের মধ্য

থেকে আমাকে একটি বাঁদী দান করুন। রসুল স. বললেন, দ্যাখো, দেখে যাকে পছন্দ হয়, নিয়ে নাও। হজরত দাহিয়া পছন্দ করলেন হজরত সাফিয়্যাকে। জনৈক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! হুয়াই ইবনে আখতাব বনী কুরায়জা ও বনী নাজির উভয় গোত্রের সর্বজনমান্য জননায়ক। আপনি তাঁর কন্যাকে দাহিয়ার হাতে তুলে দিলেন? কিন্তু তিনি তো ছিলেন কেবল আপনার জন্যই উপযুক্তা। রসুল স. আদেশ দিলেন, ওদেরকে ফিরিয়ে আনো। হজরত দাহিয়া তাঁকে নিয়ে ফিরে এলেন। রসুল স. বললেন, একে ছাড়া অন্যান্যদের মধ্য থেকে যাকে খুশী তাকে নিয়ে নাও। এরপর রসুল স. যুদ্ধবন্দিনী সাফিয়্যাকে স্বাধীন করে দিলেন এবং তাঁর সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধ হলেন। ফিরে আসার পথে জননী উম্মে সালমা তাঁকে সাজিয়ে গুছিয়ে রসুল স. এর বাসর যাপনের আয়োজন করলেন। সেদিন সকালেই রসুল স. বললেন, খাদ্যদ্রব্য কিছু থাকলে নিয়ে এসো। এই বলে তিনি স. চামড়ার দস্তরখানা বিছিয়ে দিলেন। সাহাবীগণ ওই দস্তরখানে জমা করতে লাগলেন খেজুর, ঘি, ছাতু ইত্যাদি। রসুল স. সবকিছু এক সাথে মিশিয়ে হালুয়া প্রস্তুত করলেন। এই হলো বরপক্ষের পক্ষ থেকে ওলীমার ভোজ। হজরত সাবেত একবার হজরত আবু হামযাকে জিজ্ঞেস করলেন, রসুল স. হজরত সাফিয়্যাকে দেনমোহর বাবদ কী দিয়েছিলেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন, তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং বিবাহ করেছিলেন। ওই মুক্তিই ছিলো তাঁর দেনমোহর।

'বোখারী' ও 'মুসলিম' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা বলেছেন, খায়বর অভিযানের সময় একদিন আমরা খাদ্যসংকটে পড়লাম। এমন সময় কিছুসংখ্যক গৃহপালিত গর্দভ হস্তগত হলো আমাদের। আমরা সেগুলোকে জবাই করে সেগুলোর গোশত রান্না করতে শুরু করলাম। রান্না প্রায় শেষ, এমন সময় রসুল স. এর পক্ষ থেকে এক ঘোষক এসে ঘোষণ করলো, হাঁড়ি পাতিল উল্টিয়ে দাও। গাধার গোশত হালাল নয়।

www.eelm.weebly.com

দারা কুতনীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. বন্টনের পূর্বে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিক্রয় করতে এবং গর্ভবতী ক্রীতদাসীর সঙ্গে সহবাস করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন, অন্যের শস্যক্ষেত্রকে কী তোমরা নিজেদের পানি দ্বারা প্লাবিত করবে? এছাড়া তিনি স. পালিত গাধার গোশত ও যে কোনো তীক্ষ্ম ও ধারালো দাঁতবিশিষ্ট জন্তুর গোশত ভক্ষণও নিষেধ করেছেন। মোহাম্মদ ইবনে আমর বলেছেন, তখন জবেহ করা হয়েছিলো বিশ অথবা তিরিশটি গাধা।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একের পর এক কেল্লা ফতেহ করে যাচ্ছিলেন এবং লাভ করছিলেন প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। বাকী ছিলো কেবল ওতিহ ও সালালাম নামক কেল্লা দু'টো। ওই কেল্লা দু'টো জয় করা দুরূহ হয়ে পড়লো। ইহুদীরা ওই কেল্লার দরোজা খুবই মজবুত করে বন্ধ করে রাখলো। রসুল স. স্থির করলেন, তাদের দুর্গ ভাঙার জন্য ব্যবহার করবেন প্রস্তরনিক্ষেপক কামান, যাতে দেয়ালগুলো ভেঙে ফেলা যায়। এভাবে গত হয়ে গেলো একচল্লিশ দিন। শেষে নিরুপায় হয়ে কেল্লাবাসীরা সন্ধির প্রস্তাব পাঠালো। কেনানা ইবনে আবীল

হাকীক শামমাস নামক এক ইহুদী সন্ধিপত্র নিয়ে উপস্থিত হলো রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। রসুল স. তাদের সন্ধি-প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ওই সন্ধিপত্রে লেখা ছিলো এরকম— দুর্গের অভ্যন্তরে যারা অবরুদ্ধ হয়ে আছে, তাদের ও তাদের পরিবার পরিজনদের জীবনরক্ষা করতে হবে। তারা খায়বর ছেড়ে অন্য কোনো দূরদেশে চলে যাবে, আর ছেড়ে যাবে সোনাচাঁদি, পোশাক-আশাক, জমি-জমা, অস্ত্র-অশ্ব সমস্ত কিছু। পরিধেয় বসন ছাড়া তাদের কাছে আর কিছুই থাকবে না। রসুল স. তাদের দূতকে বললেন, তোমরা যদি কিছু লুকিয়ে রাখো, তবে শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ্ ও রসুলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। সন্ধিপত্র অনুযায়ী রসুল স. তাদের সকল সামগ্রী বুঝে নিলেন। তারাও রওয়ানা হয়ে গেলো দূরদেশের দিকে। দেখা গেলো তারা ছেড়ে দিয়েছে একশত লৌহবর্ম, চারশত তরবারী এবং তীরসহ চারশত আরবী ধনুক। আর কসিবাতে আগেই পাওয়া গিয়েছিলো তীরসহ পাঁচশত ধনুক।

হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে সা'দ, বায়হাকী এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে সা'দ ওই সন্ধিপত্রের বিষয়াবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। সেখানেও একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে এই বলে শপথ করতে হবে যে, তারা কোনো জিনিস লুকিয়ে রাখবে না। যদি কেউ এরকম করে তবে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত সাফিয়্যার আগের স্বামীর নাম কেনানা ইবনে আবুল হাকীক। তাঁর ভাই ভাবী ও তার পিতৃব্যপুত্রকে রসুল স. এর কাছে আনা হলে তিনি স. তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, হুয়াইয়ের সেই সোনা ভর্তি চামড়ার থলিটি কোথায়, যা বনী নাজির নিয়ে এসেছিলো? দুই ভাই জবাব দিলো, যুদ্ধসরঞ্জাম কিনতে গিয়ে তা শেষ হয়ে গিয়েছে। রসুল স. বললেন, কিন্তু সোনা তো ছিলো অনেক। তোমরা দু'জনে নিশ্চয় তা লুকিয়ে রেখেছো। শোনো, যদি তোমরা তা গোপন করে রাখো এবং তা খুঁজে যদি পাওয়া যায়, তবে তোমাদের দু'জনকে হত্যা করা এবং তোমাদের স্ত্রী-পুত্র পরিজনকে দাস বানানো আমার জন্য হবে বৈধ। কেনানা বললো, হ্যাঁ, তা তো হবেই। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, ওরওয়া ও মোহাম্মদ ইবনে ওমর বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর নবীকে সেই লুক্কায়িত সম্পদের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। রসুল স. তখন কেনানাকে বললেন, আসমানী আদেশ অনুসারে তোমরা মিথ্যাবাদী। তারপর জনৈক আনসারীকে ডেকে বললেন, প্রান্তরে যাও। সেখানে দেখবে, ডানে ও বাঁয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'টো খেজুর গাছ। ওই দুই গাছের মাঝখানেই মাটিতে পোঁতা রয়েছে ওই স্বর্ণভর্তি থলিটি। থলিটি যথাসত্বর আমার কাছে নিয়ে এসো। ওই আনসারী যথারীতি নির্দেশ প্রতিপালন করলেন। দেখা গেলো থলিতে রক্ষিত ওই সোনার মূল্য দশ হাজার দীনারের মতো। রসুল স. ওই দুই ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলেন। তাঁদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে করে দিলেন দাসদাসী।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী এবং হজরত ইবনে ওমর থেকে মুসা ইবনে উকবা ও ওরওয়া সূত্রে বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. যখন খায়বর জয়

করে নেন, তখন ইহুদীরা বলে, হে আবুল কাসেম! আমাদেরকে এখানেই থাকতে দিন। আমরা এখানেই থাকবো এবং চাষাবাদ করবো। রসুল স. তাদের প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন। ঠিক করে দিলেন, উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক পাবে তোমরা, আর অর্ধেক দিতে হবে আল্লাহ্র রসুলকে। মুসলমানেরা চাষাবাদে অনভিজ্ঞ ছিলো বলেই রসুল স. এই ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছিলেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন আরো বললেন, আমি যতোদিন চাইবো, ততোদিন এই ব্যবস্থা বহাল থাকবে। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি স. তখন বললেন, যতোদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ এই ব্যবস্থা বহাল রাখবেন, ততোদিন পর্যন্ত আমিও তা বহাল রাখবো। এরপর থেকে প্রতি বছর হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা খায়বরে গিয়ে উৎপাদিত ফসল এক জায়গায় জমা করতেন এবং তা থেকে অর্ধেক নিয়ে আসতেন মদীনায়। ইহুদীরা তাঁকে ঘুষ দিয়ে বশ করতে চেয়েছিলো। তাঁর বিরুদ্ধে রসুল স. এর কাছে নালিশও দিয়েছিলো তারা। ঘুষের কথা শুনে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র শত্রুরা! তোমরা কি আমাকে হারাম ভক্ষণ করাতে চাও? আমি যাঁর কাছ থেকে এসেছি, তিনি আমার কাছে সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয়। আর তুমি আমার কাছে অধিক অপ্রিয় শূকর ও বানরের চেয়েও। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি অবিচারপ্রবণ নই। ইহুদীরা

www.eelm.weebly.com

তখন বলেছিলো, এই ন্যায়বিচারের উপরেই তো টিকে আছে আসমান ও জমিন। এভাবেই ইহুদীরা তাদের স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলো দীর্ঘ দিন। কিন্তু হজরত ওমরের শাসনামলে তারা প্রতারণা শুরু করে। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে ফেলে দেয় বাড়ির ছাদ থেকে। তাঁর হাতের কবজিও মচকে দেয় তারা। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর সেখানে রাত্রিযাপনকালে যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তখন তারা তাঁর উপরে যাদু করে। সকালে উঠে তিনি দেখতে পান তাঁর কবজি বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে এমনভাবে ফেরানো যে, দেখলে মনে হয়, যেনো তা আলাদা করে বাঁধা। তাঁর সফরসঙ্গী যিনি ছিলেন, তিনিই এসে শেষে তাঁর হাত ঠিক করে দিলেন। ইহুদীদের এমতো অপআচরণ দৃষ্টে হজরত ওমর অপ্রসন্ন হন এবং জনসমক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেন, খায়বরের ফসলী বন্দোবস্ত সম্পর্কে রসুল স. বলেছিলেন, আল্লাহ্ যতোদিন পর্যন্ত তোমাদেরকে বহাল রাখবেন, আমিও ততোদিন পর্যন্ত তোমাদেরকে বহাল রাখবো। আবদুল্লাহ্ সেখানে ফসলের অংশ আনতে গিয়েছিলো। তার উপরে তারা রাতে হামলা করেছে। মুচড়ে দিয়েছে তার হাতের কবজি। সেখানে ওই ইহুদীরা ছাড়া আমাদের আর কোনো শত্রু নেই। আমাদের প্রতি রয়েছে তাদের চরম বিদ্বেষ। এমতাবস্থায় আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, আমি তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবো। খায়বরে যার যার অংশ রয়েছে, তারা তাদের নিজেদের জমি-জমা বুঝে নিক। যখন হজরত ওমর তাদেরকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত করলেন, তখন বনী আল হাকীক সম্প্রদায়ের এক জননেতা এসে বললেন, হে মুসলমানদের অধিনায়ক! আপনি আমাদেরকে দেশান্তর করবেন না। যেভাবে আপনাদের রসুল এবং আপনার

পূর্বসূরী আবু বকর আমাদেরকে বহাল রেখেছিলেন, সেভাবে আপনিও আমাদেরকে রেখে দিন। হজরত ওমর বললেন, তুমি সম্ভবতঃ একথা বিস্মৃত হয়েছো যে, রসুল স. তোমাকে বলেছিলেন, সে সময় তোমার কী অবস্থা হবে, যখন দ্রুতগতিসম্পন্ন উষ্ট্রী রাতারাতি তোমাকে নিয়ে পলায়ন করতে থাকবে। ইহুদী জননেতা বললো, সেটা তো ছিলো আবুল কাসেমের একটি রসিকতা। হজরত ওমর বললেন, তুমি মিথ্যাবাদী। শেষ পর্যন্ত তিনি ইহুদীদেরকে খায়বর থেকে বিতাড়িত করলেনই।

হজরত আনাস থেকে বোখারী, মুসলিম, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে সা'দ, হজরত আবু নাঈম, হজরত জাবের, হজরত আবু সাঈদ এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে জুহুরীসহ কয়েকজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, তখন মারহাবের ভাইয়ের মেয়ে ও সালাম ইবনে মাশকামের স্ত্রী জয়নাব সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলো, রসুলুল্লাহ্ ছাগলের কোন্ অংশের গোশত পছন্দ করেন? তাঁরা বললেন, রানের গোশত। জয়নাব একটি বকরীর গোশত রান্না করে সবগুলো টুকরাতেই বিষ মিশিয়ে রাখলো এবং রানের গোশতে বেশী করে বিষ মিশিয়ে হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করলো হজরত সাফিয়্যার কাছে। হজরত সাফিয়্যা সমস্ত গোশতই রসুল স. এর সামনে উপস্থিত করলেন। সেখান থেকে তিনি স. উঠিয়ে নিলেন রানের গোশত এবং তাঁর পাশে উপবিষ্ট হজরত বিশ্‌র তুলে নিলেন অন্য একটি টুকরা এবং তা মুখে দেওয়ার পর গলাধঃকরণও করলেন। কিন্তু রসুল স. গোশত মুখে দেওয়ার পর পর তা উগলে ফেলে দিলেন। জুহুরী বলেছেন, রসুল স. ও হজরত বিশর দু'জনেই ওই গোশত মুখে পুরেছিলেন। হজরত বিশর তা গলাধঃকরণ করলেন এবং রসুল স. তা তৎক্ষণাৎ মুখ থেকে ফেলে দিয়ে বললেন, বিশর সংযত হও। বকরিটি আমাকে খবর দিচ্ছে, এর মধ্যে মেশানো রয়েছে বিষ। হজরত বিশর বললেন, শপথ তাঁর, যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন। আমি তো গোশতের টুকরাটি গিলে ফেলেছি। আমিও গোশত মুখে দেওয়ার সাথে সাথে ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছি। কিন্তু হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি তো আপনার চেয়ে আমার জীবনকে অধিক মূল্যবান মনে করি না। আমি ভেবেছিলাম, তেমন কিছু যদি হয়, তবে আপনি নিশ্চয় বলবেন। কিন্তু এর মধ্যেই যে আমি টুকরাটি গিলে ফেলেছি। এরপর হজরত বিশর কিছু বলতে পারলেন না। সেখান থেকে উঠতেও পারলেন না আর। তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে হজরত আবু হিন্দকে ডেকে নিজের কাঁধে সিঙ্গা লাগালেন, যাতে বিষাক্ত রক্ত বের করে ফেলা যায়। এভাবে রসুল স. সে যাত্রা রক্ষা পেলেন। কিন্তু বিষের মন্দক্রিয়া তাঁকে বয়ে বেড়াতে হয়েছিলো আজীবন। রসুল স. কখনো কখনো বলতেন, খায়বরের সেই বিষের ক্রিয়া কখনো কখনো আমাকে কষ্ট দেয়। এরপর রসুল স. ওই ইহুদী রমণীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তুমি কি বকরীর গোশতে বিষ মিশিয়েছিলে? সে বললো, আপনাকে কে বলেছে? রসুল স. বললেন, আমার হাতে যে ছিলো। সে বললো, হ্যাঁ,

আমিই বিষ মিশিয়েছিলাম। তিনি স. বললেন, কেনো? সে বললো, আমার সম্প্রদায়ের যে দুর্গতি আপনি করেছেন, তা তো আপনার অজানা নয়। আমি ভেবেছিলাম, আপনি যদি রাজা-বাদশাহ জাতীয় কেউ হন, তাহলে আপনার অত্যাচার থেকে আমরা মুক্তি পাবো। আর যদি আপনি সত্যি সত্যিই নবী হয়ে থাকেন, তবে তো আগাম খবর আপনি পাবেনই। তার এ রকম অকপট স্বীকৃতি শুনে রসুল স. তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

মুয়াম্মার সূত্রে জুহুরীর বর্ণনানুসারে আবদুর রাজ্জাক তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে লিখেছেন, সেই ইহুদী রমণী মুসলমান হয়ে যায় এবং রসুল স. তাকে মুক্তি দেন। সুলায়মান তাঈমি বর্ণনাটি সমর্থন করেছেন এবং আরো যোগ করেছেন— ওই রমণী আরো বলেছিলো, আপনি যদি প্রকৃত নবী না হন, তবে মানুষ আমার মাধ্যমে আপনার অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি, আপনি সত্যি সত্যিই আল্লাহ্‌র নবী। আমি আপনাকে এবং এখানে যারা উপস্থিত আছেন, তাদের সকলকে সাক্ষী মেনে বলছি, আমি আপনার ধর্মকে কবুল করলাম। আমি স্বীকার করছি 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসুল'। বর্ণনাকারী আরো বলেছেন, রসুল স. আর তাকে অপরাধিনী সাব্যস্ত করেননি।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বায্যার বলেছেন, সেই ইহুদী রমণীকে জিজ্ঞাসাবাদের পর রসুল স. তার রান্না করা গোশতের দিকে হাত বাড়ালেন এবং সঙ্গীগণকে বললেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাও। সকলেই 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে খেলেন। কিন্তু কারোই কোনো ক্ষতি হলো না। হাফেজ ইমাদুদ্দীন বলেছেন, বর্ণনাটি দুষ্প্রাপ্য ও পরিত্যক্ত।

মোহাম্মদ ইবনে ওমর বলেছেন, তখন রসুল স. এর আদেশে সমস্ত গোশত জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। হজরত জাবের বলেছেন, হজরত বিশর যখন মৃত্যুবরণ করলেন, তখন রসুল স. ওই ইহুদী রমণীকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। মোহাম্মদ ইবনে আমেরের নিজস্ব সূত্র থেকে আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তখন সেই ইহুদী রমণীকে হজরত বিশরের কাছে সোপর্দ করা হলো এবং তার মৃত্যুর পর লোকেরা তাকে বধ করে ফেললো।

বায়হাকী বলেছেন, এরকমও হতে পারে যে, প্রথমে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়, তারপর করা হয় হত্যা। সুহাইলি বলেছেন, রসুল স. নিজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাননি। তাই প্রথমে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে হজরত বিশরের মৃত্যুর বদলা হিসেবে তার উপরে কার্যকর করেছিলেন মৃত্যুদণ্ড।

হজরত জাফর ইবনে আবু তালেবের আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন ঃ হজরত আবু মুসা আশয়ারী বলেছেন, আমরা ইয়েমেনে ছিলাম। সেখানে সংবাদ পেলাম, রসুল স. মক্কা থেকে মদীনায় চলে গিয়েছেন। আমরাও হিজরত করে তাঁর কাছে যাবো মনস্থ করলাম। কিন্তু যে নৌকায় আমরা আরোহণ করলাম, তা আমাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো আবিসিনিয়ার দিকে। সেখানে জাফর ইবনে

আবু তালেবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত ঘটলো। জাফর বললেন, রসুল স.ই আমাকে এখানে প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেন, আমাদেরকে এখানেই থাকতে হবে। তোমরাও এখানে থেকে যাও। আমরা সেখানেই বসবাস করতে শুরু করলাম। বেশ কিছুকাল পর রসুল স. যখন খায়বর জয় করেন, তখন আমরা আবিসিনিয়া থেকে তাঁর কাছে চলে যাই। তিনি স. আমাদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদেও অংশীদার করেন। আবিসিনিয়ার হিজরতকারীদের ছাড়া আর এমন কাউকে রসুল স. খায়বরের গণিমতের অংশ দান করেননি, যারা ওই যুদ্ধে শরীক ছিলো না। জাফরকে পেয়ে তিনি স. এতোই খুশী হন যে আবেগপ্রবণ হয়ে বলে উঠেন, আল্লাহ্ই ভালো জানেন, কোন ঘটনায় আমি বেশী খুশী হয়েছি— খায়বর বিজয়ে, না জাফরের আগমনে। জাফর এক দৃষ্টিতে রসুল স. এর দিকে তাকিয়ে রইলেন। রসুল স. কিঞ্চিত লজ্জিত হলেন। তাঁর সঙ্গীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের জন্য রয়েছে দু'টি হিজরত করার সওয়াব— আবিসিনিয়ার ও মদীনার। এরপর রসুল স. চুম্বন করলেন জাফরের দুই চোখের মাঝখানে। বায়হাকী।

হজরত আবু হোরায়রা ও দওস সম্প্রদায়ের লোকদের আগমন ঃ হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, দওস সম্প্রদায়ের আশিটি পরিবার নিয়ে আমি মদীনায় এলাম। তারপর খায়বর পৌঁছলাম ওই সময়, যখন রসুল স. নাতাত জয় করেছেন এবং অবরোধ করে রেখেছেন কসিবা। আমরা কসিবা দুর্গের পতন না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করলাম। সেখানকার যুদ্ধলব্ধ সম্পদে রসুল স. আমাদেরকেও অংশীদার করে নিয়েছিলেন। আহমদ, বোখারী, হাকেম, বায়হাকী, ইবনে খুজাইমা।

ফিদাকের ঘটনা ঃ খায়বরবাসীদের সঙ্গে রসুল স. কী করেছিলেন তা পৌঁছে গিয়েছিলো ফিদাকবাসীদের কানে। তাই তারাও এই মর্মে সন্ধি-প্রস্তাব পাঠালো যে, আমাদের জীবন রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। চলে যেতে দিতে হবে দূরদূরান্তরে। বিনিময়ে আমরা ছেড়ে চলে যাবো সকলকিছু। রসুল স. তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং বললেন, আপাততঃ এখানেই বসবাস করো। পরে আমরা তোমাদের চলে যাবার বন্দোবস্ত করবো। ফিদাকবাসীরা হৃষ্টচিত্তে এ প্রস্তাবটিকে মেনে নিলো। উল্লেখ্য, খায়বর বিজিত হয়েছিলো যুদ্ধের মাধ্যমে। তাই রসুল স. খায়বরের জমি জমা সবকিছু যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ফিদাক হস্তগত হয়েছিলো বিনা যুদ্ধে। তাই রসুল স. ফিদাকের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পদ রেখেছিলেন নিজের অধিকারে। পরে হজরত ওমর তাঁর খেলাফতের সময় খায়বরবাসীদের মতো ফিদাকবাসীদেরকেও বহিষ্কার করেছিলেন।

খায়বরের গণিমত বণ্টন ঃ ওতিহ্ ও সালালামের যুদ্ধে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ জমা করে রাখা হলো আপৎকালের জন্য। হজরত আবু মুসা আশয়ারী, সফিনাহ'র সঙ্গীগণ ও দওস সম্প্রদায়ের লোকদেরকে রসুল স. ওই তহবিল থেকে

www.eelm.weebly.com

কিছু কিছু দান করেন। হজরত মুসা ইবনে উকবা বলেছেন, খায়বরের কিছু অংশের বিজয় সম্পন্ন হয়েছে সন্ধির মাধ্যমে। অর্থাৎ সন্ধির মাধ্যমে হস্তগত হয়েছে ওতিহ্ ও সালালাম। এখন যা বাকী রইলো, তা হচ্ছে 'ওয়া শাভিরহুম ফীল আমরি' এই আয়াতের আদেশ মোতাবেক সাধারণ আলোচনা। তাতে কারো অধিকার খর্ব করার কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, খায়বরে কেবল শাক, নাতাত ও কসিবা'র ধনসম্পদের ভাগ-বন্টন করা হয়েছিলো। রসুল স. কসিবা'র ধনসম্পদের এক পঞ্চমাংশ দিয়েছিলেন আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন, মুসাফির, পবিত্র সহধর্মিণীগণ এবং ওই সকল লোকদেরকে যারা চিঠি পত্র আদান প্রদান করতো রসুল স. ও ফিদাকবাসীদের মধ্যে। এর মধ্যে হজরত মাহীসা ইবনে মাসউদও ছিলেন। রসুল স. তাঁকে দিয়েছিলেন তিরিশটি উটের বোঝা পরিমাণ যব এবং তিরশটি উটের বোঝা পরিমাণ খেজুর। নাতাত ও শাক এই দুই জায়গার ধনসম্পদ বন্টন করে দেওয়া হয় কেবল যোদ্ধাদের মধ্যে। রসুল স. নাতাতের সম্পত্তির পাঁচটি এবং শাকের তেরোটি অংশ করেন। এভাবে সর্বমোট অংশ হয় আঠারোটি। এই আঠারো অংশ বন্টন করে দেওয়া হয় চৌদ্দশ' যোদ্ধার মধ্যে। এদের মধ্যে কেবল হুদায়বিয়ায় থাকা সত্ত্বেও খায়বরে অনুপস্থিত ছিলেন হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্। অন্যান্যরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন উভয় স্থানে। হজরত জাবের খায়বরে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে দেয়া হয়েছিলো একজনের সমপরিমাণ। পদাতিকের জন্য এক অংশ, ঘোড়ারোহীদের জন্য দুই অংশ— এক অংশ নিজের, অন্য অংশ তার ঘোড়ার, বন্টন করা হয়েছিলো এভাবে। ঘোড়ার সংখ্যা ছিলো দুই শত। এই সম্পত্তিতে রসুল স. এর অংশও ছিলো একজন যোদ্ধার সমপরিমাণ।

কুরা উপত্যকা বিজয়ের ঘটনা ঃ রসুল স. যাত্রা করলেন কুরা উপত্যকার দিকে। সেখানে পৌছে তিনি ওই উপত্যাকাবাসীদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। কিন্তু তারা তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলো। রসুল স. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করলেন এবং তাদের ধনসম্পদ গণিমতের মাল হিসেবে যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দেন এবং এক পঞ্চমাংশ (খুমুস) রাখেন নিজের জন্য। আর সেখানকার জমিজমা সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যেই খায়বরের বন্দোবস্তের নিয়মে বন্দোবস্ত দেন।

সুরা ফাতাহ্ঃ আয়াত ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

www.eelm.weebly.com

❑ এবং আরও রহিয়াছে যাহা এখনও তোমাদের অধিকারে আসে নাই, উহা তো আল্লাহ্ আয়ত্তে রাখিয়াছেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❑ কাফিররা তোমাদের মুকাবিলা করিলে উহারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত, তখন উহারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইত না।

❑ ইহাই আল্লাহ্র বিধান— প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তুমি আল্লাহ্র বিধানে কোন পরিবর্তন পাইবে না।

❑ তিনি মক্কা উপত্যকায় উহাদের হস্ত তোমাদিগ হইতে এবং তোমাদের হস্ত উহাদিগ হইতে নিবারিত করিয়াছেন উহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর, তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

❑ উহারাই তো কুফরী করিয়াছিল এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদিগকে মসজিদুল-হারাম হইতে ও বাধা দিয়াছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছিতে। তোমাদিগকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইত যদি না থাকিত এমন কতক মু'মিন নর ও নারী যাহাদিগকে তোমরা জান না, তোমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিতে অজ্ঞাতসারে, ফলে তাহাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই এইজন্য যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন। যদি উহারা পৃথক হইত, আমি উহাদের মধ্যে কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম।

❑ যখন কাফিররা তাহাদের অন্তরে পোষণ করিত গোত্রীয় অহমিকা— অজ্ঞতার যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদিগকে স্বীয় প্রশান্তি দান করিলেন; আর তাহাদিগকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করিলেন, এবং তাহারাই ছিল ইহার অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আল্লাহ্র রসুলের সহচরবৃন্দ! তোমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে আরো বিজয়, যা এখানো রয়েছে তোমাদের সম্মুখে। আল্লাহ্ ওই বিজয়কে এখনো তোমাদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। তাই তা অনির্ধারিত। কেননা তিনি যে সর্বশক্তিধর। তাঁর নির্ধারণের বিপরীতে কিছু হওয়া অসম্ভব।

এখানে 'আরো রয়েছে' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদ' কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্ তোমাদেরকে আরো অনেক অমূল্য সম্পদ প্রদানের অঙ্গীকার তোমাদের সঙ্গে করে রেখেছেন। অথবা কথাটির সম্পর্ক রয়েছে 'হাজিহী'(এই) শব্দের সঙ্গে। অর্থাৎ আল্লাহ্ এরপরে অন্যান্য স্থানের যুদ্ধলব্ধ সম্পদও তোমাদেরকে দান করবেন। অথবা কথাটি এখানে উহ্য থাকা কোনো একটি ক্রিয়ার কারক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অন্যান্য যুদ্ধলভ্য সম্পদও নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

www.eelm.weebly.com

'লাম তাক্বদিরু আ'লাইহা' অর্থ যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে বহু রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়েছিলো। ইসলামের আবির্ভাবের আগে আরবীয়রা পারস্য ও রোমের মতো বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চিন্তাও করতে পারতো না। ইসলামই তাদেরকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। হজরত ইবনে আব্বাস ও মুকাতিল এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। কাতাদার মতে এখানে 'যা কখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি' বলে বুঝানো হয়েছে মক্কা বিজয়ের কথা। ইকরামা বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হুনায়েন বিজয়। মুজাহিদ বলেছেন, পরবর্তী সময়ের সকল বিজয়ই কথাটির উদ্দেশ্য।

'তা তো আল্লাহ্ আয়ত্তে রেখেছেন' অর্থ আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাফল্যমণ্ডিত করবেনই। 'আহাতা' অর্থ বেষ্টন বা আয়ত্তে রাখা। অর্থাৎ তোমাদেরকে বিজয়দানের বিষয়টি যেহেতু আল্লাহ্র জ্ঞানায়ত্ত, তাই বিজয় তোমাদের হবেই। আর 'আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান' অর্থ যেহেতু তোমরা কোনো বিষয়েই আল্লাহ্র ক্ষমতাকে খর্ব করবার যোগ্যতা, ক্ষমতা ও অধিকার রাখো না, সেহেতু বিশ্বাস করো কেবল তাঁকে, নির্ভর করো কেবল তাঁরই উপর এবং ইবাদত করো শুধু তাঁর।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে—'কাফেরেরা তোমাদের মুকাবিলা করলে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতো, তখন তারা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেতো না'। একথার অর্থ— মক্কাবাসীরা যদি হুদায়বিয়ায় তোমাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ না হতো, তবে তারা অবশ্যই হেরে যেতো। কোনো বন্ধু অথবা সাহায্যকারী তারা পেতোই না।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এটাই আল্লাহ্র বিধান— প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে, তুমি আল্লাহ্র বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবে না'। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, এটাই আল্লাহ্র চিরাচরিত রীতি যে, অবশেষে তিনি বিজয় দান করেন তাঁর প্রিয়ভাজনগণকে। এই শাশ্বত রীতিতে আপনি কোনো হের ফের দেখতে পাবেন না। এরকম বিজয়ের অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়েছে অন্যান্য আয়াতেও। যেমন— ১. 'আমি ও আমার রসুল নিঃসন্দেহে বিজয়ী হবো' ২. 'আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে' ৩. 'আল্লাহ্র দলই হবে বিজয়ী' ৪. 'আল্লাহ্র এই বিধান বিগত যুগের উম্মতদের ক্ষেত্রেও কার্যকর ছিলো'।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হস্ত তোমাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবার পর, তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ্ তা দেখেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তো জানেনই যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে আপনার দল ও আপনার বিপক্ষদল উভয়কেই আল্লাহ্ নিরাপদ রেখেছেন আক্রমণ— প্রতিআক্রমণ থেকে এবং পরবর্তীতে আপনার দলকেই করেছিলেন বিজয়ী। আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা। তাই তিনি আপনাদের ও তাদের ও অন্যান্য সকলের সকল কর্মকাণ্ডই প্রত্যক্ষ করেন।

হজরত আনাস বলেছেন, সত্তুর অথবা আশিজনের একটি দল মুসলমানদেরকে আক্রমণ করার জন্য তান্ঈম পর্বতের দিক থেকে নেমে আসে। কিন্তু তারা মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে যায়। রসুল স. তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল বলেছেন, তান্ঈম পর্বতের দিক থেকে আমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য নেমে এসেছিলো তিরিশ জনের একটি দুর্ধর্ষ নওজোয়ানের দল। হজরত মুসলিম ইবনে আকওয়া বলেছেন, আমি তখন আমার তরবারী উন্মুক্ত করেছিলাম তাদের চারজনের বিরুদ্ধে।

আর এখানকার 'তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ্ তা দেখেন' অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের সকল কিছুই আল্লাহ্র পর্যবেক্ষণভূত। সুতরাং জেনে রেখো, তোমাদের কার্যাবলীর উপযুক্ত প্রতিফল তিনি যথাসময়েই প্রদান করবেন।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'তারাই তো কুফরী করেছিলো এবং নিবৃত্ত করেছিলো তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে ও বাধা দিয়েছিলো কোরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে। তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হতো, যদি না থাকতো এমন কতক মুমিন নর ও নারী যাদেরকে তোমরা জানো না, তোমরা তাদেরকে পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে, ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়নি— এজন্যই যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন। যদি তারা পৃথক হতো, আমি তাদের মধ্যে কাফেরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম'।

এখানে 'তারাই তো কুফরী করেছিলো' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিলো তো মক্কাবাসীরাই। 'আ'নিল্ মাসজিদিল হারাম' অর্থ নিবৃত্ত করেছিলো তোমাদেরকে কাবাগৃহ গমন থেকে। 'হাদ্ইয়া' অর্থ কোরবানীর জন্য আবদ্ধ পশু। আর 'মাহিল্লাহ্' অর্থ মহল বা স্থান, এখানে যথাস্থান, অর্থাৎ হেরেমের অভ্যন্তরে। হানাফীগণ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন যে, হারামভুক্ত এলাকায় কোরবানী করা বৈধ। কিন্তু কাউকে যদি পথিমধ্যে বলপূর্বক থামিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে যেনো অন্যের মাধ্যমে তার কোরবানীর পশুকে হেরেম এলাকায় পৌঁছিয়ে দেয়। সুরা বাকারার যথাস্থানে এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

‘এমন অনেক মুমিন নর-নারী যাদেরকে তোমরা জানো না’ অর্থ মক্কাবাসী নিগৃহীত বিশ্বাসী নারী-পুরুষদের সকলকে তোমরা চিনো না। যুদ্ধ লাগলে মুশরিক মনে করে তোমরা তাদেরকেও হত্যা করে ফেলতে। সেকারণেই তো যুদ্ধের আদেশ না দিয়ে দেওয়া হয়েছে সন্ধির আদেশ।

‘মাআ’র্রতুন’ অর্থ গোনাহ বা পাপ। অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে তোমরা মুসলমান নারী-পুরুষকে হত্যা করলেও গোনাহগার হতে। একারণেই ভুলবশতঃ হত্যা করার কারণেও প্রায়শ্চিত্ত করা অত্যাবশ্যক। আর এখানে ‘বিগইরি ইলম’ অর্থ অজ্ঞাতসারে।

তিবরানী ও হজরত আবুল আলিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু জামআ জুনাইদ ইবনে সাবা বলেছেন, দিবসের শুরুতে যখন আমি কাফের ছিলাম, তখন আমি যুদ্ধ করেছিলাম রসুল স. এর বিরুদ্ধে এবং দিবসের শেষাংশে যখন আমি মুসলমান হয়ে যাই, তখন আমি রসুল স. এর সাথী হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করি। আমরা এরকম অবস্থায় ছিলাম তিনজন পুরুষ এবং সাতজন নারী। আমাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে ‘এমন কতক মুমিন নর ও নারী যাদেরকে তোমরা জানো না’।

‘লিইউদ্খিলাল্লহু ফী রহমাতিহী মাঁইয়াশাউ’ অর্থ তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন। অর্থাৎ যাকে খুশী তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে। মক্কায় প্রবেশ করা না করার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বাক্যটির গতিপ্রকৃতি এখানে এই ইঙ্গিত দেয় যে, কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। অর্থাৎ জোর করে মক্কায় প্রবেশ করা নিষেধ করার এটাই হচ্ছে কারণ যে, এর সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করা না করার কোনো সম্পর্ক নেই। বিষয়টি তো সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অনুগ্রহনির্ভর। আর ‘যাকে ইচ্ছা তাকে’ অর্থ মক্কাবাসীদের মধ্যে যাকে খুশী তাকে। এজন্যই দেখা গিয়েছিলো, মক্কাবিজয়ের পরক্ষণে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো বহুসংখ্যক মুশরিক। অথবা এখানে ‘অনুগ্রহ দান করবেন’ অর্থ মক্কার অত্যাচারিত মুসলমানদেরকেই তিনি আরো অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখবেন। অতর্কিত যুদ্ধে প্রাণ হারাতে দিবেন না। আর ‘যদি তারা পৃথক হতো, আমি তাদের মধ্যে কাফেরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম’ কথাটির অর্থ যদি ওই অত্যাচারিত মুসলমানেরা মক্কার মুশরিকদের নিকট থেকে পৃথক কোনো স্থানে সরে যেতে

পারতো এবং পৃথক হয়ে যেতে পারতো তারাও, যারা নিকট ভবিষ্যতে ইসলাম গ্রহণ করবে, তাহলে সেখানে সমবেত থাকতো কেবল কাফেরেরা। আর তখনই কেবল আমি তোমাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে তোমাদের মাধ্যমেই তাদেরকে শায়েস্তা করতে পারতাম। তখন তারা তোমাদের হাতে হতো নিহত, অথবা বন্দী।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— ‘যখন কাফেরেরা তাদের অন্তরে পোষণ করতো গোত্রীয় অহমিকা— অজ্ঞতার যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ্ তাঁর রসুল ও মুমিনদেরকে স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন; আর তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন। এবং তারাই ছিলো এর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন’।

এখানে ‘ইজ জ্বাআ’লা’ হচ্ছে ক্রিয়ার কালাধার বা সময়। এর সম্পর্ক রয়েছে, আগের আয়াতের ‘আ’জ্জাব্না’ অথবা ‘সদ্দু’ এর সঙ্গে। কিংবা এটা হচ্ছে উহ্য থাকা একটি ক্রিয়ার কর্মপদ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! ওই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আঁকড়ে ধরে রেখেছিলো অজ্ঞতার যুগের অনর্থক অহংকার। আল্লাহ্র রসুলকে তারা আল্লাহ্র গৃহে যেতে দেয়নি, সন্ধিপত্রের শুরুতে লিখতে দেয়নি ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম’। ‘মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্’ কথাটিকেও তারা বিলোপ করার জন্য জেদ ধরেছিলো। মুকাতিল বলেছেন, মুশরিকেরা তখন বলেছিলো, তারা আমাদের পুত্র ও ভ্রাতাদেরকে হত্যা করেছে। এখন আবার আমাদের উপরে চড়াও হতে চায়। আরববাসীরা বলবে, তারা আমাদেরকে বের করে মক্কায় অনুপ্রবেশ করেছে। লাত্ ও উজ্জার শপথ! এ বছর তাদেরকে আমরা মক্কায় প্রবেশ করতে দিবোই না। এসকল কিছুই ছিলো তাদের অজ্ঞতার যুগের তীব্র গোত্রীয় অহমিকাপ্রসূত বাক্য।

‘আল্লাহ্ তাঁর রসুল ও মুমিনদেরকে স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন’ অর্থ তাদের অহমিকার বিপরীতে আল্লাহ্ই তাঁর রসুল ও রসুলের সহচরবর্গকে তখন দান করলেন বিশেষ আত্মিক প্রশান্তি। ফলে তাঁরা ধৈর্য ধারণ করতে এবং আল্লাহ্র অভিপ্রায় পূরণ করতে পেরেছিলেন। যুদ্ধ করবার মতো যথেষ্ট শক্তিমত্তা থাকা সত্ত্বেও কেবল শান্তির জন্য বিরত থাকতে পেরেছিলেন যুদ্ধংদেহী মনোভাব থেকে।

হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা, জুহাক, ইকরামা, সুদ্দী, ইবনে জায়েদ ও অধিকাংশ তাফসীরকারগণ বলেছেন, এখানকার ‘তাদেরকে তাক্ওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় রাখলেন’ অর্থ তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখলেন ‘লাইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার’ এই বাক্যের উপর। আতা ইবনে আবী রেবাহ বলেছেন, এখানে ‘তাকওয়ার বাক্য’ অর্থ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহ্দাহু লা শরীকা লাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ’লা কুল্লি শাইইন ক্বদীর।

তাক্ওয়ার বাণী অর্থ— সংযমীদের বাণী। কলেমায়ে তাওহীদ। আর কালেমায়ে তাওহীদই হচ্ছে তাক্ওয়ার ভিত্তি ও নিমিত্ত। মক্কার কাফের কুলের চেয়ে সংযমী মুসলমানগণই তাক্ওয়ার সমধিক যোগ্য। তারা সমধিক যোগ্য বলে

www.eelm.weebly.com

বিবেচিত আল্লাহ্পাকের অনন্ত-অনাদি জ্ঞানে। একারণেই আল্লাহ্পাক তাঁর স্বীয় দ্বীন ও রসুলের সহায়তাকল্পে মনোনীত করেছেন তাঁর প্রিয় সহচরবৃন্দকে। রাফেজীদের মতবাদ— মান্যবর সাহাবায়ে কেরাম কাফের, মুনাফিক (আল্লাহ্ রক্ষা করুন)। তাদের ঔদ্ধত্য ধরা পড়েছে এই আয়াতে— আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হলেন বিশ্বাসীদের উপর। যখন তারা বায়াত করেছিলো আপনার সাথে গাছের নিচে।

রসুল স. হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বেই দর্শন করেছিলেন একটি স্বপ্ন। স্বপ্নে তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছেন এবং সুসম্পন্ন করেছেন ওমরা। সম্মানিত সহচরবৃন্দ তাঁর এ স্বপ্ন-বৃত্তান্তের কথা জানতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনের পর তিনি যখন মদীনাতে প্রত্যাবৃত হলেন, তখন হজরত সাহাবায়ে কেরাম তাঁর নিকট নিবেদন জানালেন— তাহলে দৃষ্ট স্বপ্নের তাৎপর্য কী? তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা ফাতাহ্ ঃ আয়াত ২৭, ২৮, ২৯

❑ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করিয়া দেখাইয়াছেন, আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করিবে নিরাপদে— তোমাদের কেহ কেহ মস্তক মুণ্ডিত করিবে আর কেহ কেহ কেশ কর্তন করিবে। তোমাদের কোন ভয় থাকিবে না। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যাহা জান না। ইহা ছাড়াও তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন এক সদ্য বিজয়।

❑ তিনিই তাঁহার রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন, অপর সমস্ত দীনের উপর ইহাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

❑ মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল; তাহার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাহাদিগকে রুকূ' ও সিজ্দায় অবনত দেখিবে। তাহাদের লক্ষণ তাহাদের মুখমণ্ডলে সিজ্দার প্রভাবে পরিস্ফুট থাকিবে; তওরাতে তাহাদের বর্ণনা এইরূপ এবং ইঞ্জীলেও তাহাদের বর্ণনা এইরূপই। তাহাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যাহা হইতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর ইহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যাহা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এইভাবে আল্লাহ্ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে রসুলের সহচরবর্গ! শোনো, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রসুল যে স্বপ্ন দেখেছেন, সে স্বপ্নটি সত্য। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তোমরা সকলে তাঁর সঙ্গে ইহ্‌রাম পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করছো, তাওয়াফ করছো আল্লাহ্‌র গৃহ। এভাবে ওমরা সম্পন্ন হলো। তোমরা কোরবানী করলে, তারপর ইহ্‌রাম খুলে ফেললে মস্তকমুণ্ডন অথবা মস্তকের কেশকর্তনের পর। সকল কিছুই তোমরা সম্পন্ন করলে নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে। তাঁর এই স্বপ্নটি যথাসময়ে বাস্তবরূপ লাভ করবেই। সুতরাং তোমরা এ বছরে ওমরা করতে পারলে না বলে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না। কেননা আল্লাহ্ যা জানেন, তা তোমরা জানো না। তাই তিনিই কেবল জানেন, কখন কীভাবে বিকাশ ঘটাতে হবে সত্যের, বিজয়ের, সাফল্যের। তাছাড়া অত্যাসন্ন আর একটি মহাবিজয়ের শুভসংবাদ তো তিনি ইতোমধ্যে দিয়েছেনই। তিনিই তাঁর রসুলকে পথনির্দেশ করে থাকেন এবং তাঁকে সত্য ধর্মাদর্শসহ তো প্রেরণ করেছেন তিনিই। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি অন্য সকল ধর্মাদর্শের উপরে ইসলামকে বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করাবেন। আরো শোনো, সাক্ষী হিসেবে যেহেতু আল্লাহ্ই যথেষ্ট, সেহেতু তোমরা তাঁর সাক্ষ্যকেই চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস করো এবং অনর্থক মনঃক্ষুণ্ন না হয়ে প্রশান্তচিত্তে জীবন যাপন করো এমতো বিশ্বাসানুসারেই। মুজাহিদ, বায়হাকী প্রমুখ বলেছেন, হুদায়বিয়ার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ও।

'সদাক্ব' অর্থ যথাযথ। 'লাক্বদ সদাক্ব' বলে কথাটিকে প্রকাশ করা হয়েছে অতীত কালের ক্রিয়াসহযোগে, যদিও স্বপ্নটি বাস্তবায়িত হয়েছে ভবিষ্যতে। এরকম করা হয়েছে কেবল ঘটনাটির নিশ্চিতার্থকতা বোঝাতে। যেনো স্বপ্নটি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েই গিয়েছে।

জাওহারী বলেছেন, 'সিদক্ব' (সত্য) ও 'কিজ্‌ব' (মিথ্যা) যেমন কথায় ব্যবহৃত হয়, তেমনি ব্যবহৃত হয় কাজেও। কোনো সংবাদ ঘটনার অনুকুল হলে, তাকে বলা হয় সত্য, না হলে বলে মিথ্যা। তেমনি কোনো কর্ম ঘটনানুগ হলে তা হয় সত্য, আর এর ব্যত্যয় ঘটলে তা হয় মিথ্যা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা এমন লোক, যারা আল্লাহ্‌র কাছে কৃত অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে নিয়েছে, দেখিয়েছে সত্য করে'। এমতাবস্থায় এখানকার 'আররুইয়া' শব্দটি 'রসুলাহু' শব্দ থেকে হবে পূর্ণ অনুবর্তী। অর্থাৎ স্বপ্নটি সত্য করে দেখিয়েছেন। মর্মার্থ— রসুলকে দেখিয়েছেন সত্যবাদীরূপে। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'রসুলাহু' শব্দটির মূল রূপ ছিলো 'লিরসুলিহী'। জের প্রদানকারী অব্যয় লোপ করে হয়েছে রসুলাহু।

জাওহারী আরো লিখেছেন, 'সদাক্ব' কখনো দুই কর্মপদবিশিষ্টও হয়। যেমন 'লাক্বদ সদাক্বকুমুল্লহু ওয়া'দাহু'। এখানে 'কুম' প্রথম কর্মপদ এবং দ্বিতীয় কর্মপদ হচ্ছে 'ওয়া'দাহু'। এমতাবস্থায় এখানে 'রসুলাহু' ও 'আররুইয়া' হবে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় কর্মপদ। বায়যাবী লিখেছেন, বক্তব্যটির অর্থ— আল্লাহ তাঁর রসুলের স্বপ্নকে সত্য করে দিয়েছেন। 'মাদারেক' রচয়িতা লিখেছেন, এখানে জের প্রদানকারী অব্যয়কে লোপ করার পরে জের প্রদত্তকে করা হয়েছে কর্মপদ।

'বিল হাক্ব' অর্থ যথাযথভাবে, গভীর প্রজ্ঞার সঙ্গে। আর সেই গভীর প্রজ্ঞা হচ্ছে সুদৃঢ় বিশ্বাসকে শিথিল বিশ্বাস থেকে পৃথকরূপে প্রদর্শন। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'বিল হাক্ব' এর 'বা' হচ্ছে শপথপ্রকাশক। অর্থাৎ শপথ সত্যের। আল্লাহ্‌রও এক নাম 'হাক্ব' এবং 'হাক্ব' (সত্য) বলা হয় বাতিলের (মিথ্যার) বিপরীত হওয়াকেও।

'আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে'— ইবনে কীসান বলেছেন, কথাটি রসুল স. এর। আল্লাহ্ এখানে কথাটি উদ্ধৃত করেছেন। রসুল স. তাঁর সাহাবীগণকে এভাবেই বিবৃত করেছিলেন। আবার এরকমও হতে পারে যে, কথাটি ছিলো স্বপ্নের ফেরেশতার কথা। আর এখানে আল্লাহ্ তা উদ্ধৃত করেছেন আল্লাহ্।

'ইনশাআল্লাহ্' অর্থ যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। 'ইন্' (যদি) অব্যয়টি ব্যবহৃত হয় সন্দেহজনক বাক্যে। কিন্তু এখানে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতি আদব প্রদর্শনার্থে। অর্থাৎ আল্লাহ্ যে সতত স্বাধীন অভিপ্রায়ধারী সে কথা বোঝাতে। কিন্তু কথাটি এখানে নিশ্চিতার্থক। এমতো আদব প্রদর্শনের জন্য অন্য এক আয়াতে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। যেমন 'ইন্শাআল্লাহ্' উচ্চারণ ব্যতিরেকে আপনি এরকম বলবেন না যে, আমি এটা আগামীকাল করবো'। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, 'ইন্' এখানে শর্তসূচক নয়। বরং 'ইন্' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইজ্' (স্থান-কাল) অর্থে। যেনো বলা হয়েছে— যখন আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন।

হোসাইন ইবনে ফজল বলেছেন, এখানে 'ইন' ব্যবহৃত হয়েছে তার আসল অর্থেই। অর্থাৎ 'ইন' এখানে সম্ভাব্য। কেননা দর্শিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটেছিলো দীর্ঘ এক বছর পরে, আর ওই বছরেই রসুল স. পাড়ি দেন অনন্তধামের দিকে। এমতাবস্থায় কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তোমরা প্রত্যেকে 'ইনশাআল্লাহ্' মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে।

'মুহাল্‌লিক্বীনা রুঊসাকুম ওয়া মুক্বস্‌সিরীন' অর্থ তোমাদের কেউ কেউ মস্তকমুণ্ডন করবে, আর কেউ কেউ করবে কেশ কর্তন। 'তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না' কথাটিতে প্রকাশ পেয়েছে নিঃশংক থাকার গুরুত্ব। অথবা বাক্যটি একটি পূর্ণ বাক্য ও ভবিষ্যৎকালবোধক। অর্থাৎ ভবিষ্যতে আর কখনো তোমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে না। 'আল্লাহ্ যা জানেন, তোমরা তা জানো না' অর্থ বিজয় বিলম্বিত করার প্রকৃত রহস্য ও উপযোগিতা সম্পর্কে আল্লাহ্ই কেবল জানেন; তোমরা তা জানো না।

www.eelm.weebly.com

'সত্য দ্বীন' অর্থ দ্বীন ইসলাম। 'আবার সমস্ত দ্বীনের উপর' অর্থ অন্যান্য ধর্মগুলোর উপর, যেগুলো একদা বলবৎ ও কার্যকর ছিলো। অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত পূর্ববর্তী ধর্মগুলোকে রহিত করে সর্বশেষ ধর্মমত ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই অবতারিত হয়েছে শেষোক্ত ধর্মমতটি। আর 'কাফাবিল্লাহি শাহীদা' অর্থ আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। অর্থাৎ মক্কাবিজয়ের শপথ সত্য হওয়া সম্পর্কে, অথবা মোহাম্মদ মোস্তফা স. যে আল্লাহ্‌র সত্য রসুল— সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কথাটি গুরুত্ব আরোপ করছে বিশেষ করে মসজিদে হারামে প্রবেশ করার বিষয়টিকেই।

শেষোক্ত আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল ঃ তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সেজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সেজদার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে; তওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপ এবং ইঞ্জিলেও তাদের বর্ণনা এরূপই। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় নবকিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ্ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফেরদের অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের'।

এখানে 'তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর' অর্থ শেষ রসুলের সাহাবীগণও তাঁদের রসুলের মতোই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি ইমানের ব্যাপারে নিরাপোষ। বলা বাহুল্য, এমতো কঠোরতা আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রেত। এক আয়াতে এরকম কঠোরতার নির্দেশও তিনি দিয়েছেন। যেমন 'হে আমার নবী! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটাচারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন এবং তাদের উপর

বলপ্রয়োগ করুন'। অন্যত্র এরশাদ করেছেন 'আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর করতে তাদের প্রতি আপনার মনে যেনো মমতার উদ্রেক না হয়'। আরো বলেছেন 'তোমাদের মধ্যে যে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভূত'।

'নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল' অর্থ রসুল স. এর প্রতি তীব্র ভালোবাসার কারণে তাদের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে গভীর মমত্ববোধ। প্রিয়জনের প্রিয়জন তো প্রিয়জনই হয়ে থাকে। হাদিসে কুদসিতে এসেছে মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ বলবেন, আমার শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাবে যারা নিজেদের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলে, তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আশ্রয় দান করবো আমার অনুগ্রহের ছায়ায়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয় নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে রূঢ়'। বিভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায় বলে, সাহাবীগণ একে অপরের প্রতি পোষণ করতেন শত্রুতা ও বিদ্বেষ। তাদের ভাগ্যে জুটুক অপমানের বোঝা। আলোচ্য আয়াত তাদের অপবিশ্বাসের বিরুদ্ধের দলিল।

'রুকু ও সেজদায় অবনত দেখবে' অর্থ তারা নামাজে মশগুল থাকতে ভালোবাসে। কেননা হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, নামাজ মুমিনগণের মেরাজ। 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ও সন্তুষ্টি কামনায়' অর্থ তারা নামাজে মশগুল থাকতে ভালোবাসে আল্লাহ্‌র উপহার জান্নাত ও মহাউপহার দীদারের আশায়।

'তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সেজদার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে' অর্থ মহাবিচারের দিবসে তাঁদের মুখমণ্ডলে নূর চমকাতে থাকবে, যাতে করে সর্বসমক্ষে সুস্পষ্ট হবে যে, তাঁরা সেজদা করতে ভালোবাসতেন এবং সেজদা করতেন বেশী বেশী করে। আতা ইবনে আবী রেবাহ এবং রবী ইবনে আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যারা নামাজ পড়তে পছন্দ করে, তাদের চেহারা পৃথিবীতেই জ্যোতির্ময় হয়। শাহর ইবনে হাওশাব বলেছেন, পরকালে তাদের ললাটদেশ হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল। কেউ কেউ বলেছেন, 'সী-মা' (লক্ষণ) অর্থ এখানে বিশেষ নিদর্শন। অর্থাৎ বিনয় ও নম্রতার সৌন্দর্য, অথবা বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ। ওয়ালেবির বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাসের এরকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মুজাহিদও এরকম বলেছেন। জুহাক বলেছেন, তাঁদের চেহারা হলুদাভ ছিলো রাত জেগে নামাজ পাড়ার কারণে।

হাসান বলেছেন, এখানে 'লক্ষণ' অর্থ তাদের চেহারা এমন ছিলো যে, দেখলে মনে হতো অসুস্থ, প্রকৃত প্রস্তাবে অসুস্থ ছিলেন না।। ইকরামা এবং সাইদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এর অর্থ তাদের কপালে ছিলো মাটির দাগ। আবুল আলিয়া বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে— তাঁরা অধিকতর আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশ করার জন্য মাটির উপরেই সেজদা করতেন। কাপড় বা জায়নামাজের উপরে সেজদা করতেন না।

'তওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপ এবং ইঞ্জিলেও তাদের বর্ণনা এরূপই' অর্থ শেষে রসুলের সাহাবীগণের এ সকল গুণাবলী ইতোপূর্বে অবতারিত তওরাত

শরীফ ও ইঞ্জিল শরীফেও এভাবেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'ফীত্ তাওরাত' এর পরে পড়বে যতিচিহ্ন। এরপরে শুরু হয়েছে নতুন বাক্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আর ইঞ্জিলে তাদের প্রসঙ্গ এসেছে এভাবে ঃ তারা যেনো

www.eelm.weebly.com

একটি চারাগাছ, যা থেকে উদ্গত হয় নবকিশালয়, তারপর এক সময় তা হয় দৃঢ় ও পরিপুষ্ট এবং শেষে তা দাঁড়িয়ে যায় স্বকাণ্ডের উপরে সুস্থিরভাবে, যা দেখে তার কৃষক হয় আনন্দিত। এভাবেই আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণকে করেন শুভ, শুভ্র ও সমৃদ্ধ, যার ফলে কলুষ অন্তরবিশিষ্ট সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে।

বিষয়টি রীতিসম্মত না হওয়ার কোনো কারণ নেই যে, তওরাতের সঙ্গে ইঞ্জিলের বিবরণ হবে পরস্পরসম্পৃক্ত। অর্থাৎ বিশ্বাসীগণের এ সকল গুণাবলী বিবৃত হয়েছে তওরাত ও ইঞ্জিল উভয় গ্রন্থে। এমতাবস্থায় নতুন বাক্য শুরু হবে 'কা যার্‌ই'ন' থেকে। এরকমও হতে পারে যে, 'জালিকা' (এইরূপ) এখানে ইঙ্গিতময়তা এবং 'কা যার্‌ই'ন' থেকে শুরু হয়েছে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা।

'শাত্বআহু' বলে বীজের অভ্যন্তর থেকে সর্বপ্রথম উদগত অংকুরকে। 'ফাস্‌তাগ্‌লাজা' অর্থ পরিপুষ্ট। আর 'ইউ'জ্বিবুয্ যুর্‌রাআ' অর্থ চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। উভয় বর্ণনাতে এখানে সাহাবীগণের গুণবত্তাই বর্ণিত হয়েছে। প্রথম উপমা সমগ্র উম্মতের জন্য শান্তি। কেননা এর অন্তর্ভূত হয়েছেন এই উম্মতের আউলিয়াগণও। কিন্তু দ্বিতীয় উপমার অন্তর্ভূত রয়েছেন কেবল সাহাবীগণই।

আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে এককভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে বলেছেন। তারপর তৎসঙ্গে মিলিয়েছেন তাঁর প্রিয়ভাজন সহচরবৃন্দকে যেমন কোনো কৃষক জমিতে বৃক্ষরোপন করে ক্রমাগত দেখে দেখে আনন্দিত হতে থাকে যে, উত্তরোত্তর এই বৃক্ষের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এভাবে একে একে এসেছেন হজরত আবু বকর, হজরত আলী, হজরত বেলাল। তাঁদের পরে হজরত ওসমান, হজরত তালহা, হজরত যোবায়ের, হজরত সা'দ' হজরত সাঈদ, হজরত হামযা, হজরত জাফর প্রমুখ। এভাবে চল্লিশতম ক্রমিকে যুক্ত হন হজরত ওমর। শুরুতে ইসলাম ছিলো কচি কিশলয়ের মতো দুর্বল, অথচ সম্ভাবনা-উন্মুখী ওই সতেজ উন্মেষকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা চিরতরে ধূলিসাৎ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। কিন্তু যা আল্লাহ্‌র দয়া ও সাহায্যপুষ্ট, তাকে মুছে ফেলতে পারে কে? ইসলামের ক্রমোণ্নতি ঘটতে থাকে শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও। মুহাজির ও আনসারগণ মিলে ইসলাম রূপ বৃক্ষকে ক্রমশঃ করতে থাকেন সুদৃঢ় ও পরিপুষ্ট। রসুল স. এর মহাতিরোভাবের পূর্ব পর্যন্ত এভাবেই তাঁরা এ বৃক্ষকে পরিপুষ্ট করেন নিজেদের রক্ত দ্বারা সিঞ্চন করে। তাঁর মহাপ্রস্থানের পরেও তাঁরা এ সিঞ্চনকর্ম প্রবহমান রাখেন। বিশেষ করে এ বৃক্ষকে সতেজ ও সফল রাখার চেষ্টা করা হয় হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরের খেলাফতকালে। এভাবেই ক্রমে ক্রমে এই বৃক্ষ বিস্তৃত হয়েছে দেশে দেশে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে। ইসলামের এমতো পরিণতি ও পূর্ণত্ব

সম্পর্কে আল্লাহ্ স্বয়ং ঘোষণা করেছেন 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম, তোমাদের প্রতি সমাপ্ত করলাম আমার অনুগ্রহায়ন এবং ইসলামকেই পছন্দ করলাম তোমাদের আচরিত ধর্মাদর্শরূপে'।

রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মত কখনো ভ্রষ্টতার উপরে ঐকবদ্ধ হবে না। তিনি স. আরো বলেছেন, আমার উম্মতের একটি অংশ চিরকাল আল্লাহ্‌র বিধানকে সমুন্নত রাখবে। কারো সাহায্যহীনতা, অথবা বিরুদ্ধাচরণ তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। বলাবহুল্য, এমতো বিশেষত্বের ক্ষেত্রে সাহাবীগণই সর্বাগ্রগামী। পরবর্তীদের কেউই তাঁদের মর্যাদায় কখনো পৌঁছতে পারবে না। রসুল স. বলেছেন, আমার সহচরগণকে তোমরা মন্দ বোলো না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, তবু সে আমার কোনো সাহাবীর অর্ধ সের যব দান করার সমান পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাস থেকে ইমাম আহমদও এরকম বর্ণনা করেছেন।

রসুল স. আরো বলেছেন, আমার সাহাবীগণ যে দেশে সমাধিস্থ হবে, মহাবিচারের দিবসে সেই দেশের জান্নাতবাসীগণের জন্য তাকেই বানানো হবে অগ্রণী ও জ্যোতি। এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত বুরাইদা থেকে তিরমিজি। সাহাবীগণের মধ্যে আবার এই সোহবতের বরকত ও মর্যাদার তারতম্যও রয়েছে। যেমন হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং প্রথম দিকের সাহাবীগণ ইসলামের সেবা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন অনেক বেশী। তাঁরা ছিলেন পরবর্তী সময়ের সাহাবীগণ অপেক্ষা রসুল স. এর অধিক সংসর্গধন্য। তাঁদের মর্যাদাগত শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয়েছে এই নিরিখেই। এক আয়াতে তাই তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 'তোমাদের মধ্যে যে মক্কাবিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, সে অন্যদের মতো নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে, যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে পরে। তবে আল্লাহ্ উভয়কে কল্যাণের অঙ্গীকার প্রদান করেছেন'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারগণের মধ্যে প্রবীণ এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রীত'। আমি আমার 'আস সাইফুল মাসলুল' গ্রন্থে বিশেষ ও সাধারণ সাহাবীগণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি। যে সকল হাদিসে তাঁদের গুনাবলীর কথা এসেছে, সেগুলো সেখানে উল্লেখ করেছি প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্‌পাক ইঞ্জিল শরীফে সাহাবীগণ সম্পর্কে বলেছেন— শুরুতে তারা হবে স্বল্প সংখ্যক। তারপর ক্রমান্বয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকবে তাদের। কাতাদা বলেছেন, রসুল স. ও তাঁর সাহচর্যধন্যগণের সম্পর্কে ইঞ্জিলে বলা হয়েছে— তাদের বাড়-বাড়ন্ত হবে জমির ফসলের চারার মতো। তারা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং নিষেধ করবে মন্দ কাজ করতে। কারো কারো কাছে এখানকার 'চারাগাছ' অর্থ রসুল স. স্বয়ং এবং সেই গাছের ফুলকলি হচ্ছেন তাঁর অনুচরবর্গ ও অন্যান্য বিশ্বাসীগণ।

www.eelm.weebly.com

মুবারক ইবনে ফজল সূত্রে হাসান বলেছেন, এখানে 'আল্লাজীনা মাআ'হু' অর্থ হজরত আবু বকর, 'আশিদ্দাউ আ'লাল কুফ্ফার' অর্থ হজরত ওমর, 'রুহামাউ বাইনাহুম' অর্থ হজরত ওসমান 'তারাহুম রুক্কাআ'ন সুজ্জাদান' অর্থ হজরত আলী এবং 'ইয়াব্তাগুনা ফাদ্বলাম মিনাল্লহি ওয়া রিদ্বওয়ানা' এর অন্তর্ভূত আশারা মুবাশ্শারাগণ (দশজন বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী)। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে সাহাবীগণের যে সকল গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, সে সকল গুণাবলীর অগ্রনায়ক হচ্ছেন আ'শায়েরা মুবাশ্শারাগণ। অর্থাৎ রসুল স. একটি বীজ বপণ করেছেন, হজরত আবু বকর ঘটিয়েছেন তার অঙ্কুরোদ্গম। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব তাকে শক্তি যুগিয়েছেন এবং হজরত আলীর সাহায্যে সে গাছ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে শক্ত কাণ্ডের উপর। 'মাদারেক' রচয়িতা লিখেছেন, হজরত আবু বকরের কারণে ইসলাম বৃক্ষের অঙ্কুরোদগম ঘটতে পেরেছে। বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর ইসলাম গ্রহণের পরক্ষণেই বলেছেন, এখন থেকে আল্লাহ্র ইবাদত আর গোপনে করা হবে না।

এখানকার 'লিইয়াগীজা বিহিমুল কুফ্ফার' (কাফেরদের প্রতি কঠোর) এর 'বিহিম' সর্বনাম দ্বারা 'আল্লাজীনা মাআ'হুম' (যারা তাঁর সাহচর্য পেয়েছেন) কে বুঝায় কিংবা অর্থের দিক দিয়ে এর দ্বারা 'শাত্বআহু' (ফসলের ক্ষেত) কে বুঝানো হয়েছে। কেননা এখানে 'যা থেকে উদ্গত হয় কিশলয়' অর্থ এখানে তাঁরা, যাঁরা ইমান এনেছিলেন ইসলামের সূচনালগ্নে। এভাবে তাঁদেরকে এবং পরবর্তীকালে সকল সাহাবীগণকেই আল্লাহ্ 'কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভুতিশীল' এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি দান করেছিলেন। হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, এখানে যারা সাহাবীবিদ্বেষী, তাদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে 'এভাবে আল্লাহ্ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন'।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, আমার সাহাবীগণ সম্পর্কে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো! আল্লাহ্কে ভয় করো! আমার পৃথিবীত্যাগের পর তোমরা তাদেরকে তিরস্কারের লক্ষ্যবস্তু কোরো না। যে তাদেরকে ভালোবাসবে, সে তাদেরকে ভালোবাসবে আমাকে ভালোবাসে বলেই। আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করবে, কষ্ট দিবে, সে কষ্ট দিবে আমাকেই। আর যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহ্কে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাকে অচিরেই পাকড়াও করবেন। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুস্প্রাপ্য।

সবশেষে বলা হয়েছে— 'ওয়াআ'দাল্লাহুল লাজীনা আমানু ওয়া আ'মিলুস্ সলিহাতি মিনহুম মাগফিরাতাঁও ওয়া আজ্বরন আ'জীমা' (যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের)। অর্থাৎ বিশ্বাসী ও পুণ্যকর্মশীল যারা তারা আল্লাহ্র মার্জনাভাজন ও প্রীতিধন্য। এটা হচ্ছে তাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্র অনুগ্রহস্নাত প্রতিশ্রুতি। এখানে 'মিনহুম' এর 'মিন' বর্ণনামূলক। অর্থাৎ এখানে 'হুম' ও 'বিহিম' সর্বনাম দ্বারা বুঝানো হয়েছে সাহাবীগণকেই। আর 'মাগফিরাতান' (ক্ষমা) ও 'আজ্বরন' (মহা পুরস্কার) শব্দ দু'টোতে সংযুক্ত 'তানভীন' মর্যাদাপ্রকাশক। অর্থাৎ এর মাধ্যমে এখানে বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়েছে সাহাবীগণের অনন্যসাধারণ মর্যাদার।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য এই যে, সাহাবীগণ প্রত্যেকেই ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ এবং সত্যাধিষ্ঠিত। আর সকলেই ছিলেন আল্লাহ্র মার্জনাধন্য ও সন্তোষভাজন।

দশম খণ্ড সমাপ্ত

www.eelm.weebly.com

ষষ্ঠবিংশতিতম পারা

তোমারই প্রশংসা করি। হে পরমতম অব্যয়, অক্ষয়, আনুরূপ্যবিহীন সত্তা! সাক্ষ্য দেই, তুমি ছাড়া উপাস্য কেউ নেই। তোমা সকাশে প্রার্থনা করি শরন, মার্জনা ও পরিত্রাণ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি কেবল তোমার। মিনতি জানাই ইহ-পারত্রিক কল্যাণের। আমাকে সঙ্গদানে ধন্য করো তাঁদের, যাঁরা তোমার পুণ্যবান দাস, ভয় ও দুশ্চিন্তা যাদের নেই। তুমিই সৃজয়িতা ও পালয়িতা আমাদের, নভোমণ্ডল ও ধরিত্রির, সে সকল কিছুরও, যারা বিচরণরত ভূ-অভ্যন্তরে ও ভূপৃষ্ঠে। নিশ্চয় সর্ববিষয়ে তুমি সর্বশক্তিমান। নিবেদন করি দরূদ ও সালাম তোমার প্রত্যাদেশবাহী, প্রেমাস্পদ, সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ মহাযশস্বী পুরুষ, আমাদের সকলের সঠিক গন্তব্যের দিশারী, আমাদের দয়াময় অভিভাবক, প্রাণ-সখা মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজন, বংশধর ও তাঁর সম্মানিত সহচরবর্গের প্রতি। তাঁদের প্রতিও, যাঁরা তাঁদের অনুসরণ করেছিলেন, করছেন এবং করবেন মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত। হে আমাদের দয়াময় প্রভুপালয়িতা! অনুগ্রহ করে আমাদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন সহজ করে দাও। দাও পরিসমাপ্তি কল্যাণময়, জ্যোতির্ময়। আমিন।

সূরা হুজুরাত

এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এর রুকুর সংখ্যা ২ এবং আয়াতের সংখ্যা ১৮।

ইবনে জুরাইজ এবং আবু মুলাইকা সূত্রে ইমাম বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের রা. বলেছেন, একবার বনী তামীম গোত্রের একটি দল রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলো। হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বললেন, কা'ব ইবনে মা'বাদকে তাদের অধিনায়ক নিযুক্ত করলে ভালো হয়। হজরত ওমর ফারুক রা. বললেন, না। বরং আকরা ইবনে হাবেসকে তাদের দলপতি বানানোই উত্তম। হজরত আবু বকর বললেন, ওমর! সব সময় তুমি আমার বিরুদ্ধমত প্রকাশ করে থাকো। হজরত ওমর বললেন, আপনার বিরুদ্ধাচরণ করা আমার উদ্দেশ্যে নয়। এভাবে কিছুক্ষণ ধরে তাঁদের বাদানুবাদ চললো। দু'জনেরই কণ্ঠস্বর ক্রমশ উঠতে লাগলো উচ্চগ্রামে। তখন অবতীর্ণ হলো

নিম্নোক্ত আয়াত—

সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

www.eelm.weebly.com

❑ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হইও না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাহার সহিত সেইরূপ উচ্চস্বরে কথা বলিও না; কারণ ইহাতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যাইবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে।

❑ যাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

❑ যাহারা ঘরের বাহির হইতে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাহাদের অধিকাংশই নির্বোধ,

❑ তুমি বাহির হইয়া উহাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি উহারা ধৈর্য ধারণ করিত, তাহাই উহাদের জন্য উত্তম হইত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আমানু লা তুক্বদ্দিমূ বাইনা ইয়াদাইল্লাহি ওয়া রসুলিহী' (হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সমক্ষে তোমরা কোনো বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না)।

এখানে 'লা তুক্বদ্দিমূ' অর্থ অগ্রণী হয়ো না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটি সকর্মক ক্রিয়া। আর এখানে এর কর্মপদটি রয়েছে উহ্য। কর্মপদটি উল্লেখ করা হলে এখানকার বক্তব্যটি হয়ে পড়তো সীমাবদ্ধ। বক্তব্যকে ব্যাপকার্থক করার উদ্দেশ্যেই এখানকার কর্মপদটিকে রাখা হয়েছে অনুক্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে বিশ্বাসীগণ! কথায় অথবা কাজে কোনো অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলকে অতিক্রম করার চেষ্টা কোরো না। আবার এরকমও হতে পারে যে, এখানে কর্মপদটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে সকর্মক ক্রিয়াকেই ধরা হয়েছে অকর্মক ক্রিয়া হিসেবে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— কোনো ক্ষেত্রেই তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল অপেক্ষা অগ্রগামী হয়ো না।

'বাইনা ইয়াদাই' অর্থ দুই বাহুর মধ্যবর্তী স্থান। একথা বলে বুঝানো হয়ে থাকে ডান ও বামের মধ্যবর্তী কোনো কিছুকে, যা উভয় দিক থেকে সমদূরত্বসম্পন্ন। এখানে কথাটির মাধ্যমে কালের অগ্রগামিতাকে স্থানের অগ্রগামিতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বে নিজেদের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত প্রকাশ কোরো না। কথা অথবা কাজ কোনো বিষয়েই নয়। জুহাক কথাটির অর্থ করেছেন— জেহাদ এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নির্দেশনাদানের পূর্বে নিজেরা কোনো কিছুর ফয়সালা কোরো না।

আবু উবায়দা বলেছেন, আরববাসীরা বলেন 'লা তুক্বদ্দিম্ বাইনা ইয়াদাইল ইমাম— 'লা তুক্বদ্দিম্ বাইনা ইয়াদাইল আব্' (নির্দেশ দেওয়া, নিষেধ করা এবং ধমক দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা নেতা অথবা পিতার আগে ভাগে কিছু কোরো না)। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, আলোচ্য বক্তব্যের উদ্দেশ্য, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আগে কোনো কিছু করাকে নিষেধ করা। আর এখানে রসুলেপাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুরুত্ব ও মহত্বকে প্রকাশ করার জন্যই তাঁর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে

www.eelm.weebly.com

'আল্লাহ্'। এভাবে এখানে এই ইঙ্গিতটিই দেওয়া হয়েছে যে, রসুল স. এর অগ্রগামী হওয়ার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্র অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করা। কেননা তাঁর রসুলের সম্মান বজায় রাখার অর্থ, আল্লাহ্র সম্মান অক্ষুণ্ন রাখা। অর্থাৎ আল্লাহ্র রসুলের অসম্মান প্রকারান্তরে আল্লাহ্রই অসম্মান। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'নিশ্চয় যারা আপনার হাতে বায়াত করে, তারা তো আল্লাহ্রই হাতে বায়াত করে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর।'

ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, হাসান বসরী বলেছেন, একবার কোরবানীর দিনে কেউ কেউ রসুল স. এর আগে কোরবানী করে ফেললেন। রসুল স. একথা জানতে পেরে পুনরায় কোরবানী করার নির্দেশ দিলেন। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়াও তাঁর 'আল আদ্বহা' গ্রন্থে এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে তাঁর বিবরণে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত হয়েছে এই কথাটুকু— তাঁরা রসুল স. এর নামাজ সম্পন্ন করার আগেই কোরবানী করেছিলেন।

হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, কোরবানীর দিবসে রসুল স. আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আজ আমরা প্রথমে নামাজ পড়বো। তারপর করবো কোরবানী। যে এরকম করবে তার কর্ম হবে ধর্মসম্মত। আর যে তার কোরবানীর পশু জবাই করবে নামাজের আগে, সে সম্পন্ন করবে কেবল তার ও তার পরিবার পরিজনের জন্য গোশত ভক্ষণ অনুষ্ঠান। কোরবানীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। বোখারী, মুসলিম। হজরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, রসুল স. সে দিন প্রথমে নামাজ পাঠ করলেন। তারপর ভাষণ দান করলেন। তারপর করলেন কোরবানী। অতঃপর বললেন, যে নামাজের আগে কোরবানী করেছে, সে যেনো পুনরায় কোরবানী করে। বোখারী, মুসলিম।

বর্ণিত হাদিসসমূহের আলোকে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম মোহাম্মদ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, নামাজ আদায়ের আগে কোরবানী করা সিদ্ধ নয়। আর ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সূর্যোদয়ের পর ইমামের নামাজ ও খোতবা পাঠ করতে যতোটুকু সময় লাগে, ততোটুকু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোরবানী করা সিদ্ধ ওই সময়ের মধ্যে ইমাম তাঁর নামাজ খোতবা সম্পন্ন করুক অথবা না করুক। আতা বলেছেন, সূর্যোদয়ের পরেই কোরবানী করা যায়। বর্ণিত হাদিসসমূহ অবশ্য তাঁদের অভিমতের বিরুদ্ধেই। ইমাম মালেক বলেছেন, নামাজ ও ইমামের কোরবানীর পূর্বে কোরবানী করা যে জায়েয নয়, সে কথা বর্ণিত হাদিসদ্বয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় না। সম্ভবতঃ তিনি এমতোক্ষেত্রে দলিলরূপে গ্রহণ করেছেন আলোচ্য আয়াতকে। অর্থাৎ 'কোনো বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না' কথাটির মাধ্যমেই তিনি এমতো অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ইমামের কোরবানীর পূর্বে সাধারণ মুসলমানগণের কোরবানী অসিদ্ধ। কেননা ইমাম হচ্ছেন রসুল স. এর প্রতিনিধি। আমি বলি, হাদিস হচ্ছে কোরআনের ব্যাখ্যা। সুতরাং হাদিসের দ্বারা যে শর্ত যুক্ত করা অসঙ্গত, তা যুক্ত করা সমীচীন নয়।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গ্রামাঞ্চলে যেহেতু ঈদের নামাজ পড়া হয় না (আমাদের দেশে সেরকম গ্রাম অবশ্য নেই বললেই চলে), তাই সেখানে সুবহে সাদেক হওয়ার পরে কোরবানী করা জায়েয। অন্য ইমামত্রয় আবার এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন। ইমাম আহমদ বলেছেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত শহরাঞ্চলের ইমামের নামাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে দৃঢ় প্রতীতি না জন্মাবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত কোরবানী করা জায়েয হবে না। ইমাম মালেক বলেছেন, শহরাঞ্চলের ইমামের ঈদের নামাজ ও কোরবানী সম্পন্ন হয়েছে বলে যতোক্ষণ দৃঢ় প্রত্যয় না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কোরবানী করা যাবে না। আর ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সূর্যোদয়ের পর যতোক্ষণ নামাজ ও দুই খোতবা পাঠ পরিমাণ সময় অতিবাহিত না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত গ্রামে কোরবানী করা যাবে না। ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের স্বপক্ষে উপস্থাপন করেন এই যুক্তিটি— কোরবানীকে নামাজের পরে সম্পন্ন করার বিধান দেওয়া হয়েছে এজন্য যে, এতে করে কোরবানীর কাজে মগ্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। ফলে নামাজের

বিলম্ব ঘটে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। গ্রামাঞ্চলে এই সমস্যাটি নেই। কেননা সেখানে ঈদের নামাজই নেই। সুতরাং সেখানে কোরবানী বিলম্বিত করার কোনো স্বার্থকতাও অনুপস্থিত।

তিবরানী তাঁর 'আল আওসাত' গ্রন্থে লিখেছেন, উম্মত-জননী হজরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন, কিছুসংখ্যক লোক রমজান মাস শুরু হওয়া এবং রসুল স. এর রোজার পূর্বেই রোজা রাখতে শুরু করতো। তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। আর এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. বলেছিলেন, তোমরা রমজান শুরু হওয়ার দুই এক দিন আগে রোজা রাখতে শুরু কোরো না। তবে ওই ব্যক্তি দুই একদিন আগেও রোজা রাখতে পারবে, যে আগে থেকেই ধারাবাহিকভাবে রোজা রাখতে অভ্যস্ত। 'সহীহ্' ও 'সুনান' রচয়িতাগণ কর্তৃক বর্ণিত এবং বোখারী কর্তৃক তা'লিক পদ্ধতিতে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, হজরত আম্মার বলেছেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে (২৯শে শাবানে) রোজা রাখলো, সে আবুল কাসেম (রসুল স. এর) এর বিরুদ্ধাচরণ করলো। তিনি স. বলেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোজা শুরু কোরো এবং রোজা শেষও কোরো চাঁদ দেখে। মেঘাচ্ছন্নতার কারণে চাঁদ না দেখতে পেলে রমজান পূর্ণ কোরো তিরিশ দিনে। বোখারী, মুসলিম। আবু দাউদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক 'উত্তম' আখ্যায়িত

এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমাদের ও চাঁদের মধ্যে যদি মেঘমালার প্রতিবন্ধকতা রচিত হয়, তবে রমজান পূরণ করে নিয়ো তিরিশ দিনের হিসেবে।

ইবনে জারীর লিখেছেন, হজরত কাতাদা বর্ণনা করেছেন, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ একবার বলাবলি করতে শুরু করলো যে, অমুক অমুক বিষয়ে যদি বিধি-বিধান অবতীর্ণ হতো তবে উত্তম হতো। তাদের এমতো কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো'। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে শংকিত হও। তাঁদের অধিকার খর্ব কোরো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের কথোপকথন শ্রবণ করেন এবং তোমাদের অন্তরের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে জানেন।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু কোরো না'। এখানে বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্যই পুনরায় সম্বোধন করা হয়েছে 'হে মুমিনগণ' বলে। এভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রসুল স. এর কণ্ঠস্বরের চেয়ে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে নিম্নগামী করার নির্দেশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং নিজেদের মধ্যে যে ভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো, তার সঙ্গে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বোলো না, কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে'। একথার অর্থ— আর তোমরা নিজেদেরকে

যেভাবে ডাকাডাকি করো, সেভাবে তাঁকে সরাসরি নাম ধরে ডেকো না। ডেকো 'হে আল্লাহ্‌র রসুল' এরকম সম্মানজনক সম্বোধনে। আর সম্বোধনকালেও তোমাদের কণ্ঠস্বরকে রেখো যথারীতি নিম্নগামী ও শিষ্ট। নতুবা তোমাদের অশিষ্টবচনের কারণে তোমাদের অজ্ঞাতসারেই তোমাদের পুণ্যকর্মসমূহ হয়ে যাবে নিষ্ফল। কেননা আল্লাহ্‌র বার্তাবাহকের প্রতি অতিদূরবর্তী তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং বেআদবীও কুফরী। আর যারা বেআদব ও কাফের তাদের সকল কর্মকাণ্ড তো নিষ্ফল হবেই। যদি তোমরা এরকম করো অজ্ঞতা অথবা অনবধানতার কারণে, তবুও তোমরা হবে তাঁর মহান সংসর্গের বরকত থেকে বঞ্চিত।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে হজরত আবু বকর রসুল স. এর সংসর্গে কথা বলতেন অত্যন্ত নিচুস্বরে। বোখারী লিখেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে হজরত ওমর রসুল স. এর সামনে এতো আস্তে কথা বলতেন যে, তিনি স. তা প্রায়শ শুনতেই পেতেন না। সেজন্য তাঁকে তাঁর বক্তব্যের পুনরুক্তি করতে হতো। মুসলিম লিখেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর হজরত ছাবেত ইবনে কায়েস তাঁর ঘরেই বসে থাকতে শুরু করেছিলেন। রসুল স. এর দরবারে আসা বন্ধই করে দিয়েছিলেন। আপন মনে কেবল বলতেন, আমি তো তাহলে জাহান্নামী। রসুল স. তখন হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু ওমর! ছাবেতের খবর কী? সে কি অসুস্থ? হজরত সা'দ বললেন, সেরকম কিছু হলে তো আমি জানতামই। কেননা সে আমার প্রতিবেশী। এরপর হজরত সা'দ গেলেন হজরত ছাবেতের বাসায়। জানালেন, রসুল স. তোমার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। হজরত ছাবেত বললেন, তোমরা তো জানোই যে, আমি কথা বলি উচ্চ স্বরে। আর এ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে ভয়ানক সাবধানবাণী। কাজেই আমি তো দোজখী। হজরত সা'দ একথা গিয়ে জানালেন রসুল স.কে। তিনি স. বললেন, না, সে দোজখী নয়, সে তো বেহেশতী।

বাগবী লিখেছেন, মোহাম্মদ ইবনে ছাবেত ইবনে কায়েস থেকে ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন হজরত ছাবেত রাস্তায় বসে ক্রন্দন শুরু করলেন। হজরত আসেম ইবনে আদী সেদিক দিয়েই কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলেন, কী হয়েছে? তিনি বললেন, নতুন আয়াত নাজিল হয়েছে এবং সম্ভবত তা নাজিল হয়েছে আমার সম্পর্কেই। কেননা সকলের চেয়ে আমিই অধিক উচ্চকণ্ঠ। তাই আমার ভয় হচ্ছে, আমি বোধ হয় জাহান্নামী। আমার সকল আমলই তো তাহলে বরবাদ। হজরত আসেম রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে হজরত ছাবেতের দুরবস্থার কথা জানালেন। ওদিকে হজরত ছাবেতের আহাজারি বেড়েই চললো। তিনি ঘরে গিয়ে তাঁর স্ত্রী হজরত উম্মে জামীলা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলুলকে বললেন, আমি এখন আমার ঘোড়ার আস্তাবলে প্রবেশ করবো। তুমি আমার ঘোড়ার রশিটি আমার

পায়ে লাগিয়ে খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দাও। বলেই তিনি তাঁর ঘোড়ার আস্তাবলে প্রবেশ করলেন। তাঁর স্ত্রীও তাঁকে যথারীতি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিলেন। তিনি বললেন, এভাবেই থাকবো আমি। রসুল স. যদি দয়া করে প্রসন্ন হন তো ভালোই, নয়তো এভাবেই মরে যাবো। রসুল স. এর কানে একথা পৌঁছতে বিলম্ব হলো না। তিনি স. হজরত আসেমকে আজ্ঞা করলেন, যাও, ছাবেতকে আমার কাছে নিয়ে এসো। হজরত আসেম গিয়ে দেখলেন, হজরত ছাবেত আগের স্থানে নেই। গেলেন তাঁর বাড়ীতে।

www.eelm.weebly.com

তারপর ঘোড়াশালে গিয়ে দেখলেন, তিনি খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় কেঁদেই চলেছেন। বললেন, নাও, এবার বাঁধন খুলে ফেলো। রসুল স. তোমাকে ডেকেছেন। এরপর দু'জনে যখন রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? তুমি এতো কাঁদছো কেনো? হজরত ছাবেত বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম বচনবাহক! আমার ভয় হচ্ছে, মনে হচ্ছে, এই আয়াতে আমার কথাই বলা হয়েছে। কারণ উচ্চস্বরে কথা তো বলি আমিই। রসুল স. বললেন, প্রিয় ছাবেত! তুমি কি একথা জেনে প্রসন্ন হতে চাওনা যে, তুমি প্রশংসনীয় জীবন-যাপন করে শহীদ হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম বাণীবাহক! আমি প্রসন্ন। আমি প্রসন্ন। আমি আল্লাহ্‌র রসুলের সামনে আর কখনো উচ্চকণ্ঠে কথা বলবো না। তখন অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত (৩)।

বলা হয়— 'যারা আল্লাহ্‌র রসুলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তঃকরণকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার'।

এখানে 'ইয়াগুদ্দূনা' অর্থ যারা কণ্ঠস্বর নিচু করে। 'ইনদা রসুলিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র রসুলের সম্মুখে, সম্মানপ্রদর্শনবশত। আর 'আম্‌তাহানাল্লহু কুলূবাহুম্ লিত্ তাক্বওয়া' অর্থ আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। অভিধানবেত্তাগণ কথাটির অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে তাকওয়ার জন্য উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তাঁরা এরকমও লিখেছেন যে, 'ফাতাহা' ও 'দ্বরাবা' প্রক্রিয়া অনুসারে 'মাহান' এবং 'ইমতিহান' ধাতুমূলদু'টি 'ইখতিবার'— পরীক্ষা নেওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ খবর নেওয়া, যাচাই করা। বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহ্ তাঁদের মনের যাচাই করে ফেলেছেন তাকওয়া আহরণের উদ্দেশ্যে। মনে সৃজন করে দিয়েছেন অনুকম্পন। তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন নমনীয়তা। তাই তাঁরা হয়ে গিয়েছেন সাবধানতা বা তাকওয়ার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত।

পরীক্ষা করা হয় যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে। আর পরীক্ষার মাধ্যমেই পরীক্ষক জানতে পারেন, পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কে যোগ্য এবং কে যোগ্য নয়। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক তো সর্বজ্ঞ। সুতরাং যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁকে পরীক্ষা করতে হবে কেনো? এমতো প্রশ্নের উত্তরে কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, আল্লাহ্ পরীক্ষা করেন সর্বসমক্ষে পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য। নতুন কিছু জানার জন্য নয়। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রে পরীক্ষার আকার আকৃতিই উদ্দেশ্য। অন্তর্নিহিত কোনো কিছু এখানে উদ্দেশ্য নয়। অথবা কথাটির অর্থ এখানে এরকমও হতে

পারে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা জেনে নেন যে, তার পূর্ব ধারণা মতোই তার অন্তঃকরণ তাকওয়ায় অভ্যস্ত। আর পরীক্ষা এমতোক্ষেত্রে একটি বাহ্যিক মাধ্যম মাত্র। কিংবা আল্লাহ্ তাদেরকে এজন্যই বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন যে, যাতে করে বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাদের অন্তরস্থিত তাকওয়ার। অথবা কথাটির অর্থ এরকমও হওয়া সম্ভব যে, আল্লাহ্ তাদের হৃদয়সমূহকে 'তাকওয়া' বা আল্লাহ্‌র ভয়ে সাবধানতার জন্যই বিশুদ্ধ করে দিয়েছেন। যেমন আরববাসীগণ বলেন, 'ইমতাহানায্ যাহাবা' (স্বর্ণকে বিগলিত করে নিখাদ করা হয়েছে)।

এখানে 'মাগফিরাতুন' অর্থ ক্ষমা এবং 'আজ্বরুন্ আ'জীম' অর্থ মহাপুরস্কার। দু'টো শব্দেই যুক্ত করা হয়েছে তানভীন। এরকম করা হয়েছে কেবল ক্ষমা ও পুরস্কারের মহিমা প্রকাশার্থে। অর্থাৎ তারা যে ক্ষমা ও পুরস্কার লাভ করবে, তা হবে অতি বৃহৎ ও মহৎ। কেননা এ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র রসুলের মহান মর্যাদার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের বিনিময়। 'তাদের জন্য' এখানে উদ্দেশ্য এবং পরবর্তী বাক্যাংশ (রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার) হচ্ছে বিধেয়। এভাবে এখানে একথাটিই প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর সম্মান প্রদর্শনার্থে নিচু আওয়াজে কথা বলা আল্লাহ্‌তায়ালার খুবই পছন্দ। আর এরকম আমল যারা করেন, তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের সফল ও সৌভাগ্যশালী। সুতরাং এর বিপরীত আমল যে আল্লাহ্‌র অপ্রসন্নতা উদ্রেককারী, তা বলাই বাহুল্য।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, আমরা আমাদের সামনেই জান্নাতী ছাবেত ইবনে কায়েসকে চলাফেরা করতে দেখতাম। তাঁর সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। আমরা তাঁকে দেখলেই মনে পড়তো তাঁর সম্পর্কে রসুল স. এর সুসংবাদটি— তুমি প্রশংসনীয় জীবন যাপন শেষে শহীদ হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে।

রসুল স. এর মহাতিরোধানের পর হজরত আবু বকর সিদ্দীক হলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। আবির্ভূত হলো ভণ্ড নবী মুসায়লামা কাজ্জাব। খলিফা হজরত আবু বকর তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন। যুদ্ধ শুরু হলো ইয়ামামায়। প্রথমদিকে মুসলিম বাহিনী কিছুটা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলো। হজরত ছাবেত এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না। সহযোদ্ধা হজরত সালেমকে বললেন, আল্লাহ্‌র রসুলের সঙ্গে যখন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হতাম, তখন তো এভাবে আমরা পশ্চাদপসরণ করতাম না। এরপর দু'জনেই বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুসেনাদের উপর। এভাবে যুদ্ধ করতে করতেই একসময় শহীদ হয়ে গেলেন হজরত ছাবেত। তিনি তখন ছিলেন বর্মপরিহিত। তাঁর শাহাদাতের পর জনৈক সাহাবী স্বপ্নে দেখলেন, তিনি বলছেন, জনৈক মুসলমান আমার বর্মটি রেখে দিয়েছে যুদ্ধ প্রান্তরের এক প্রান্তে, যেখানে রশি দিয়ে একটি ঘোড়া বাঁধা আছে। বর্মটি চাপা দেওয়া আছে একটি পাথর দিয়ে। তুমি সেনাপতি খালেদ ইবনে ওলীদকে একথা জানাও। আরো জানাও, তিনি যেনো আমিরুল মুমিনীন আবু বকরকে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছান যে, অমুকের কাছে আমার কিছু ঋণ আছে।

www.eelm.weebly.com

তিনি যেনো তা পরিশোধ করেন। আর আমার অমুক গোলামকে আমি মুক্ত করে দিলাম। ওই সাহাবী সেনাপতি হজরত খালেদকে তাঁর স্বপ্নবৃত্তান্ত জানালেন। তিনিও সব কথা খুলে বললেন হজরত আবু বকরকে। হজরত আবু বকরও যথারীতি তাঁর ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। হজরত মালেক ইবনে আনাস বলেছেন, স্বপ্নে প্রাপ্ত এরকম অন্য কোনো অছিয়ত পুরা করার কথা আমি আর শুনিনি।

উত্তম সূত্রে তিবরানী ও আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম বলেছেন, একবার কয়েকজন বেদুইন রসুল স. এর গৃহের সামনে এসে উচ্চ স্বরে তাঁকে ডাকাডাকি শুরু করে দিলো। বলতে লাগলো, হে মোহাম্মদ! বাইরে আসুন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (৪)।

বলা হলো— 'যারা ঘরের বাইরে থেকে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ'।

এখানকার 'হুজুরাত' অর্থ ঘর। 'হুজুারাত' অর্থও তাই। শব্দ দু'টো 'হুজুরা' এর বহুবচন। বাগবী লিখেছেন, 'হুজুরাত' বহুবচন 'হুজুার'এবং 'হুজুরাতুন' এর বহুবচন হচ্ছে 'হুজুার'। 'হুজুরা' অর্থ এমন ভূমিখণ্ড, যার চতুষ্পার্শ্ব দেয়াল-পরিবেষ্টিত। শব্দটির ব্যুৎপত্তি ঘটেছে 'হাজুার' থেকে। আর 'হাজুার' অর্থ বাধা প্রদান করা, নিষেধ করা, ত্যাগ করা। কিন্তু এখানে 'হুজুরাত' বলে বুঝানো হয়েছে উম্মতজননীগণের প্রকোষ্ঠসমূহকে। আর এখানকার 'মিন' অব্যয়টি হচ্ছে প্রারম্ভিকা। অর্থাৎ তারা ডাকাডাকি করেছিলো গৃহের বাইরের দিক থেকে। এতে করে অনুমিত হয়, তিনি স. তখন অবস্থান করছিলেন উম্মতজননীগণের কোনো একজনের কক্ষে। এখানে ডাকাডাকির ঘটনা যদি হয়ে থাকে ভিন্ন ভিন্ন, তবে বুঝতে হবে, তারা এক একবার রসুল স.কে নাম ধরে ডাকছিলো উম্মতজননীগণের এক একজনের কক্ষের বাইরে থেকে। আবার এরকমও হতে পারে যে, ঘটনাটি অভিন্ন, তাদের মধ্যে এক একজন এক এক হুজরার বাইরে থেকে 'মোহাম্মদ' 'মোহাম্মদ' বলে চেঁচাচ্ছিলো।

'আক্ছারুহুম লা ইয়া'ক্বিলূন' অর্থ তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। অর্থাৎ তারা ছিলো মরুচারী বেদুইন। তাই রসুল স. এর প্রতি শিষ্টাচারবোধ তাদের ছিলো না। আর এখানে 'অধিকাংশ' শব্দটি ব্যবহারের ফলে একথাও অনুমিত হয় যে, তাদের মধ্যে আবার দুই একজনের সৌজন্য জ্ঞান ছিলো। সেকারণেই এখানে 'সকলেই' না বলে বলা হয়েছে 'অধিকাংশই'।

হজরত জাবের থেকে ছা'লাবী বর্ণনা করেছেন, তখন রসুল স.কে তাঁর ঘরের বাইরে থেকে ডাকাডাকি করেছিলো উয়াইনা ইবনে হোসাইন এবং আকরা ইবনে হাবেস। তাদের সঙ্গে ছিলো আরো সত্তরজন বেদুইন। তারা মদীনায় রসুল স. এর গৃহের সামনে উপস্থিত হয়েছিলো দুপুর বেলায়। রসুল স. তখন উম্মতজননীগণের কোনো একজনের প্রকোষ্ঠে বিশ্রামরত ছিলেন। তাদের মধ্যে 'হে মোহাম্মদ! বাইরে আসুন' বলে জোরেশোরে ডাকাডাকি করছিলো কেবল উয়াইনা ও আকরা। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের বলেছেন, আকরা ইবনে হাবেস তখন 'হে মোহাম্মদ! বাইরে আসুন' বলে উচ্চকণ্ঠে ডাকছিলো। আর তখনই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

মুয়াম্মারের মাধ্যমে কাতাদার উক্তি আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. সকাশে হাজির হয়ে বলতে লাগলো, হে মোহাম্মদ! আমি যদি কারো প্রশংসা করি, তবে তার সুখ্যাতি বেড়ে যায় এবং যদি কারো দুর্নাম করি তবে সে হয়ে যায় কুখ্যাত। রসুল স. বললেন, এরকম গুণ তো রয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। বর্ণনাটি প্রায়োন্নত পর্যায়ের হলেও এরকম কথা এসেছে হজরত বারা ইবনে আজীব কর্তৃক বর্ণিত একটি সর্বোন্নত পর্যায়ের হাদিসেও। হাসান বসরী সূত্রে ইবনে জুরাইজও এরকম বর্ণনা করেছেন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত কাতাদা ও হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বনী তামীম গোত্রের কতিপয় বেদুইন সম্পর্কে। তারাই রসুল স. এর গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে তাঁর নাম ধরে জোরে জোরে ডাক দিয়েছিলো। বলেছিলো, মোহাম্মদ! মোহাম্মদ! বাইরে আসুন। আমরা কারো প্রশংসা করলে সে বিখ্যাত হয় এবং কারো দুর্নাম করলে সে হয়ে যায় কুখ্যাত। রসুল স. এ কথা বলতে বলতে বাইরে এলেন— আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কারো প্রশংসা করলে সে প্রশংসাভাজন হয় এবং তাঁর পক্ষ থেকে নিন্দা যার করা হয়, সে হয় নিন্দার্হ। বেদুইনেরা বললো, আমরা আমাদের কবি ও কথকদেরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। রসুল স. তখন হজরত ছাবেত ইবনে কায়েসকে বললেন, ওদের কথার জবাব দাও। নির্দেশ মোতাবেক তিনি তাদের কথকদের কথার জবাব দিলেন। এরপর তাদের কবিরা কিছু কবিতা আবৃত্তি করলো। রসুল স. তাঁর সভাকবি হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেতকে বললেন, এর জবাব দিতে হবে তোমাকে। হজরত হাস্‌সানও কিছুসংখ্যক পঙক্তি আবৃত্তি করলেন। আকরা ইবনে হাবেস বললো, বাহ! আপনার দরবারে দেখছি সব সম্পদই জমা আছে। কথার প্রত্যুত্তরে কথা এবং কবিতার প্রত্যুত্তরে কবিতা। আপনারই তো জিত হলো। একথা বলেই সে রসুল স. এর দিকে অগ্রসর হয়ে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রসুল। রসুল স. বললেন, এই সাক্ষ্যের সাথে সাথে মুছে গেলো তোমার পূর্ববর্তী পাপসমূহ। বিগত পাপের জন্য তোমাকে আর অভিযুক্ত করা হবে না। একথা বলার পর তিনি স. তাদের সকলকে দান করলেন কিছু অর্থ ও পোশাক-পরিচ্ছদ। তাদের সঙ্গে ছিলো এক অল্পবয়স্ক কিশোর। তাকে তারা নিয়ে এসেছিলো তাদের জিনিস পত্তর পাহারা দেওয়ার জন্য। রসুল স. তাকেও দান করলেন বড়দের সমপরিমাণ। তাদের

www.eelm.weebly.com

মধ্যে কেউ কেউ রসুল স. এর এ কাজটিকে পছন্দ করলো না। শুরু করলো শোরগোল। তখন অবতীর্ণ হলো 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু কোরো না'।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বনী আম্বর জনপদের দিকে উয়াইনা ইবনে হোসাইনের নেতৃত্বে প্রেরণ করলেন একটি সশস্ত্র বাহিনী। সেখানকার লোকেরা একথা জানতে পেরে ভয়ে তাদের

পরিবার-পরিজন ফেলেই পালিয়ে গেলো। উয়াইনা তাদের পরিবার-পরিজনকে নিয়ে এলেন রসুল স. এর সামনে। তাদের পালিয়ে যাওয়া পুরুষগুলোও কিছুক্ষণ পর হাজির হলো সেখানে। তখন দ্বিপ্রহর। রসুল স. তাঁর কোনো এক সহধর্মিণীর প্রকোষ্ঠে দ্বিপ্রহরিক বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। বনী আম্বরের শিশুরা তাদের পিতাদেরকে দেখতে পেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিলো। পিতারাও অস্থির হয়ে ডাকতে শুরু করলো, হে মোহাম্মদ! জলদি বাইরে আসুন। রসুল স. এর বিশ্রাম বিঘ্নিত হলো। তিনি স. বাইরে এলেন। তারা বললো, হে মোহাম্মদ! মুক্তিপণ গ্রহণ করে আমাদের পরিবার-পরিজনদেরকে ছেড়ে দিন। এমন সময় হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে জানালেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, এ ব্যাপারে তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে মধ্যস্থ নিযুক্ত করুন। রসুল স. তাদেরকে বললেন, সুবরা ইবনে আমর তো তোমাদেরই গোত্রভূত। তাকেই এ ব্যাপারে মধ্যস্থ নিযুক্ত করা হোক। তোমরা কী বলো? তারা বললো, আমরা রাজী। সুবরা বললো, আমার পিতৃব্য আয়্ওয়ার ইবনে বিশামা এখানে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ ব্যাপারে কোনো মীমাংসা করতে পারবো না। রসুল স. তার একথায় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। আয়্ওয়ার দাঁড়িয়ে বললো, তাদের অর্ধসংখ্যককে ছেড়ে দেওয়া হোক মুক্তিপণ ছাড়া। আর মুক্তিপণ নেওয়া হোক অবশিষ্ট অর্ধসংখ্যকদের জন্য। রসুল স. বললেন, আমি সম্মত। তখন অবতীর্ণ হলো 'যারা ঘরের বাইরে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করতো, তা তাদের জন্য উত্তম হতো'। একথার অর্থ— হে আমার নবী! আপনি যে আমার কতোখানি প্রিয়ভাজন, তা ওই লোকেরা জানে না। তাই অসময়ে তারা আপনার বিশ্রামকে বিপর্যস্ত করেছে। যদি আপনার মর্যাদা তারা বুঝতে পারতো, তবে নিশ্চয়ই ধৈর্যধারণ করতো। আপনি যথাসময়ে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনতেন এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে প্রসন্ন করতেন। ফলে তাদের আকাংখা পূরণ তো হতোই, তার সঙ্গে লাভ হতো আল্লাহ্র রসুলের প্রতি যথাযোগ্য আদব প্রদর্শনের পুরস্কার। তারাও জনসমক্ষে ও আল্লাহ্র দৃষ্টিতে হতো সৌজন্যবান ও প্রশংসার্হ। মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— যদি তারা এ ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করতো, তবে তিনি স. তাদের সকলকেই ছেড়ে দিতেন বিনা মুক্তিপণে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ প্রকৃতই ক্ষমাপরবশ। সেকারণেই তো তিনি ওই সকল লোকের ধৃষ্টতার শাস্তি দিলেন না। এমনিতেই ক্ষমা করে দিলেন। আর তিনি তো পরম দয়ালুও। তাই দয়াবশত তাদেরকে বললেন কেবল 'নির্বোধ'।

মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী বর্ণনা করেছেন, বনী তামীম গোত্রের লোকেরা যখন জাকাত দিতে অস্বীকার করলো, তখন রসুল স. নবম হিজরীর

মুহররম মাসে তাদের বিরুদ্ধে হজরত উয়াইনা ইবনে হোসাইনের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। মোহাম্মদ ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, ওই যুদ্ধে বন্দী করে আনা হয়েছিলো এগারোজন মহিলা ও তিরিশজন শিশুকে।

উত্তম সূত্রপরম্পরায় ইমাম আহমদ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হজরত হারেছ ইবনে দ্বরার খাযায়ী বলেছেন, আমি রসুল স. এর মহান সংসর্গে উপস্থিত হলাম। তিনি স. আমাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। আমি সে আহ্বানে সাড়া দিলাম। গ্রহণ করলাম ইসলাম। তিনি স. আমাকে জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন। আমি তা-ও মেনে নিলাম। বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! এখন আমি আমার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাবো। তাদেরকে বলবো ইসলাম গ্রহণ করতে এবং জাকাত দিতে। তারা যদি আমার কথা মেনে নেয়, তবে আমি তাদের জাকাত আমার কাছে জমা করে রাখবো। অমুক সময়ে আপনি কাউকে পাঠিয়ে দিবেন। সে সংগৃহীত জাকাতের মাল নিয়ে আসবে। একথা বলে আমি ফিরে এলাম আমার সম্প্রদায়ের কাছে। তারা আমার আহ্বানে সাড়া দিলো। জাকাতও দিলো। আমি সেগুলো জমা করে রাখলাম। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে রসুল স. এর পক্ষ থেকে কোনো সংগ্রহকারী এলো না। আমি ভাবলাম, রসুল স. হয়তো অতুষ্ট হয়েছেন। আমি লোকদেরকে ডেকে বললাম, নির্ধারিত সময় তো পেরিয়ে গেলো। এখনো মদীনা থেকে কেউ এলো না। রসুল স. তো কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করতেই পারেন না। আমার ভয় হচ্ছে, তিনি স. হয়তো কোনো কারণে আমাদের প্রতি বিরাগভাজন হয়েছেন। কাজেই চলো, জাকাতের মালসহ সকলে মিলে তাঁর কাছে যাই। ওদিকে রসুল স. নির্ধারিত সময়ে ঠিকই লোক পাঠিয়েছিলেন। পাঠিয়েছিলেন ওলীদ ইবনে উকবাকে। কিন্তু সে কী মনে করে ভয়ে মাঝপথ থেকে ফিরে গিয়েছিলো। বলেছিলো, হে আল্লাহ্র রসুল! হারেছ জাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে। আমি তাই পালিয়ে এসেছি। রসুল স. তখন আমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ

www.eelm.weebly.com

করলেন একটি বাহিনী। ওই বাহিনীর সঙ্গে রাস্তায় আমার দেখা হয়ে গেলো। সালাম বিনিময়ের পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কোথায় চলেছো? তারা বললো, তোমার কাছে। আমি বললাম, কেনো? তারা বললো, রসুল স. তোমার কাছে জাকাতসংগ্রাহকরূপে পাঠিয়েছিলেন ওলীদ ইবনে উকবাকে। সে তো যেয়ে বললো, তোমরা নাকি জাকাত দিতে চাও না। উপরন্তু তাকে হত্যা করতে চাও? আমি বললাম, শপথ সেই পবিত্র সত্তার, যিনি মোহাম্মদ মোস্তফাকে তাঁর বার্তাবাহক করে প্রেরণ করেছেন, আমি তো ওলীদকে দেখিইনি। সে তো আমার কাছে আসেইনি। রসুল স. এর কাছে উপস্থিত হয়ে আমি তখন প্রকৃত ঘটনা জানালাম। আর তখনই অবতীর্ণ হলো নিম্নোক্ত আয়াত—

সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯

❑ হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া বস, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হয়।

❑ তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল রহিয়াছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনিলে তোমরাই কষ্ট পাইতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করিয়াছেন এবং উহাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করিয়াছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। উহারাই সৎপথ অবলম্বনকারী,

❑ আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহস্বরূপ; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

❑ মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলে তোমরা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবে; আর তাহাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করিলে যাহারা বাড়াবাড়ি করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করিবে যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে-যদি তাহারা ফিরিয়া আসে তাহাদের মধ্যে ন্যায়ের সহিত ফয়সালা করিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদিগকে ভালবাসেন।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে তিবরানীও উপরে বর্ণিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তিনি এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত আলকামা ইবনে নাহিয়া এবং উম্মতজননী হজরত উম্মে সালমা থেকেও। ইবনে জারীরও

আওফীর মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত উম্মে সালমা থেকে তিবরানী, এমনকি বাগবীও বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওলীদ ইবনে উকবা ইবনে আবী মুঈত সম্পর্কে। রসুল স. তাঁকে বনী

www.eelm.weebly.com

মুস্তালিকদের কাছে জাকাত সংগ্রাহকরূপে পাঠিয়েছিলেন। মূর্খতার যুগে তাঁর সঙ্গে বনী মুস্তালিকদের শত্রুতা ছিলো। তাই তিনি যখন তাদের জনপদের দিকে গমন করলেন, তখন দূর থেকে দেখলেন তাদের একদল লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বশত্রুতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে শয়তান তখন তাঁকে এই মর্মে কুমন্ত্রণা দিলো যে, তারা তাঁকে হত্যা করতে চায়। অথচ তারা দাঁড়িয়ে ছিলো রসুল স. কর্তৃক প্রেরিত সংগ্রাহককে স্বাগতম জানানোর জন্য। তারা তাঁকে দেখে এগিয়ে আসতে লাগলো। ওলীদ ভয় পেয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ ফিরে এলেন মদীনায়। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তারা জাকাত দিতে চায় না। তারা আমাকে হত্যা করার জন্যও এগিয়ে আসছিলো। রসুল স. একথা শুনে রাগান্বিত হলেন। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন বলে মনস্থ করলেন। ওদিকে বনী মুস্তালিকের লোকেরা ওলীদকে ফিরে যেতে দেখে নিজেরাই দল বেঁধে হাজির হলো রসুল স. এর দরবারে। বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি একজন জাকাত সংগ্রাহককে পাঠাচ্ছেন জানতে পেরে আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু তিনি আমাদেরকে দেখে কেনো যে ফিরে এলেন তা বুঝতে পারলাম না। ভাবলাম রাস্তায় জাকাতের মাল লুণ্ঠতরাজ হওয়ার আশঙ্কাতেই হয়তো তিনি ফিরে এসেছেন। অথবা ফিরে এসেছেন আপনার পরবর্তী কোনো নির্দেশ পেয়ে। আর সে নির্দেশে বিবৃত হয়েছে হয়তো আপনার কোনো অসন্তোষ। হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! আমরা আপনার অসন্তোষভাজন হওয়া থেকে আপনার ও আল্লাহ্‌র নিকটে পরিত্রাণার্থী। বাগবী লিখেছেন, রসুল স. তাদের বক্তব্যে পুরোপুরি আস্থাশীল হতে পারেননি। তাই তারা ফিরে যাওয়ার পর তিনি স. বিষয়টিকে পরীক্ষা করার জন্য গোপনে প্রেরণ করলেন হজরত খালেদ ইবনে ওলীদকে। বললেন, যদি তাদের মধ্যে মুসলমান হওয়ার আলামত দেখতে পাও, তবে তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ কোরো এবং তাদের জাকাত গ্রহণ করো। নতুবা তাদের সঙ্গে ওরকম আচরণই কোরো, যে রকম আচরণ করা হয় কাফেরদের সঙ্গে। নির্দেশ পেয়ে হজরত খালেদ তাদের জনপদে পৌঁছলেন সন্ধ্যায়। জনান্তিকে থেকে মাগরিব ও ইশা এই দুই ওয়াক্তের আজান পরীক্ষা করে দেখলেন, কল্যাণ ও আনুগত্য ছাড়া তাদের মধ্যে অশুভ কিছু নেই। তাই তিনি তাদের জাকাতের মাল গ্রহণ করলেন। এরপর মদীনায় ফিরে এসে রসুল স.কে জানালেন সবকিছু। তখনই অবতীর্ণ হলো 'হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের নিকট কোনো বার্তা আনয়ন করে........'।

এখানে 'পাপাচারী' (ফাসিক্বুন) বলে বুঝানো হয়েছে ওলীদ ইবনে উকবাকে। আর 'নাবাইন' (বার্তা) অর্থ এখানে বনী মুস্তালিকদের সংবাদ। অর্থাৎ 'তারা জাকাত দিতে চায়না'— এই সংবাদ। অবশ্য এখানকার নির্দেশনাটি ব্যাপকার্থক।

তাই এখানকার প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে বিশ্বাসীগণ! পাপিষ্ঠ কাউকে কোনো সংবাদ প্রচার করতে দেখলে তোমরা সঙ্গে সঙ্গে তার কথা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস কোরো না। বরং তা ভালোভাবে যাচাই করে দেখো। নতুবা তোমরা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ক্ষতি করে বসতে পারো কোনো ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের। ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে অনুশোচনা।

এখানে 'ফাতাবাইয়্যানূ' অর্থ পরীক্ষা করে দেখো। উল্লেখ্য, এখানে পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে পাপাচারী কর্তৃক আনীত সংবাদের। সুতরাং বুঝতে হবে, যারা পুণ্যবান, তাদের কথা বিনা পরীক্ষায় বিশ্বাসযোগ্য।

'ফিসক্ব' অর্থ পাপ। এর অভিধানিক অর্থ বের হওয়া। যেমন আরববাসীরা বলেন, 'ফাসাক্বতির রুত্বাবাতু আন্ ক্বিশ্‌রিহা' (খেজুর খোসা থেকে বেরিয়ে পড়েছে)। শরিয়তের পরিভাষায় কখনো কখনো 'কাফের'কেও 'ফাসেক্ব' বলা হয়, কেননা কাফেরও ইমান থেকে বেরিয়ে যায়। কোরআন মজীদে অধিকাংশ স্থানে 'ফাসেক্ব' ব্যবহৃত হয়েছে 'কাফের' অর্থে। কখনো কখনো আবার বৃহৎ পাপে পাপীকেও বলা হয়েছে 'ফাসেক্ব'। আবার কখনো কখনো এমন লোককেও 'ফাসেক্ব' বলা হয়, যারা উপর্যুপরি ক্ষুদ্র পাপ করে চলে, অথচ তওবা করে না। তাফসীরকারগণের ঐকমত্য এই যে, এখানে 'ফাসেক্ব' (পাপাচারী) বলা হয়েছে 'বৃহৎ গোনাহ্‌কারী' অর্থে।

আমি বলি, হজরত ওলীদ ইবনে উকবা একজন সাহাবী ছিলেন। আর এ ক্ষেত্রে কেবল অবান্তর সংবাদ পরিবেশন করা ছাড়া অন্য কোনো সময় তাঁর দ্বারা 'ফাসেকী' প্রকাশ পায়নি। বনী মুস্তালিকেরা ছিলো তাঁর ইসলামপূর্ব জীবনের শত্রু। সে কথা মনে হওয়ার কারণেই তাদের প্রতি তাঁর খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিলো। তাই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'ফাসেক' শব্দটির অর্থ হবে, যার সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা সুস্পষ্ট নয়। অথবা 'ফাসেক' অর্থ এখানে এমন ব্যক্তি, যার পরিবেশিত সংবাদ সঠিক না হওয়ার যথেষ্ঠ প্রমাণ বিদ্যমান, ওই ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও। বনী মুস্তালিকের লোকেরা সর্বান্তঃকরণে ইমান এনেছিলো। মেনে নিয়েছিলো ইসলামের বিধানাবলীকেও। তাদের মুরতাদ হওয়া ছিলো সুদূরপরাহত। পক্ষান্তরে হজরত ওলীদের অনিচ্ছাকৃত অথবা স্বেচ্ছাকৃত অযথার্থ সংবাদ পরিবেশন তত্তুল্ল্য সুদূরপরাহত নয়।

'আন তুসীবূ ক্বাও্মাম্ বিজ্বাহালাতিন' অর্থ পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বসো। অর্থাৎ শেষে যেনো এরকম না হয়ে যায় যে, তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দাও, অথবা তাদেরকে হত্যা করে ফেলো। 'ফাতুস্‌বিহূ' অর্থ তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয় তোমাদের কৃতকর্মের জন্য। 'নাদামাত' অর্থ অনুতাপ, অনুশোচনা, আক্ষেপ। অর্থাৎ এমন ধারণা, কথা অথবা কাজ, যার জন্য পরে মনোকষ্ট ভোগ করতে হয়। আক্ষেপ করতে হয় এই বলে যে, হায়, এরকম যদি আমি না করতাম।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যপ্রবাহ দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, কিছুসংখ্যক সাহাবী হজরত ওলীদ ইবনে উকবা কর্তৃক বিবৃত সংবাদটিকে সত্য মনে করেছিলেন। তাই তারা রসুল স.কে বনী মুস্তালিকের উপরে আক্রমণ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু রসুল স. তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেননি। প্রকৃত ঘটনা কী, তা যাচাই করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন হজরত খালেদ ইবনে ওলীদকে। আর রসুল স. এর প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশও ছিলো এরকম। এভাবে এখানে এই বিষয়টিরই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, এক পক্ষের কথা শুনে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান সমীচীন নয়। আর রসুল স. এর একনিষ্ঠ অনুগত হওয়া বিশ্বাসীগণের জন্য অত্যাবশ্যক, তাঁর সিদ্ধান্ত মনঃপুত হোক অথবা না হোক। তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রসুল রয়েছেন, তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে'। এখানে 'লাআ'নিত্তুম' অর্থ তোমরাই কষ্ট পেতে, নিপতিত হতে পাপে, ফলে হয়ে যেতে ক্ষতিগ্রস্ত।

কিছুসংখ্যক সাহাবী বনী মুস্তালিকের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার সংবাদ বিশ্বাস করে ছিলেন। তাই বনী মুস্তালিকের প্রতি সৃষ্টি হয়েছিলো তাঁদের ভীষণ ক্রোধ। তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কেবল ধর্মীয় কারণে। কিন্তু তাঁদের এমতো ক্রোধকে আলোচ্য আয়াতে 'পাপ' বলেই সাব্যস্ত করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে। তাই সে ধারণাকে দূর করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে এভাবে—'তোমরা জেনে রাখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রসুল রয়েছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ইমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী (৭), আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহস্বরূপ; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'(৮)।

এখানে 'কুফরা' (সত্যপ্রত্যাখ্যান), 'ফুসুক্ব' (পাপাচার) ও 'ই'স্ইয়ান' (অবাধ্যতা) এর উল্লেখ করা হয়েছে পৃথক পৃথকভাবে। আর এভাবে একথাটিকেই স্পষ্ট করতে চাওয়া হয়েছে যে, 'পাপাচারে'র স্তর 'অবাধ্যতা'র ঊর্ধ্বে, কিন্তু 'সত্যপ্রত্যাখ্যানে'র নিম্নে। অর্থাৎ এখানে 'ফাসিক্ব' অর্থ সত্যপন্থী দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে বেদাতীদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করা, কিন্তু কুফর পর্যন্ত পৌঁছে না যাওয়া। আর 'ই'স্ইয়ান' অর্থ কর্মগত পাপ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবাধ্যতা, কিন্তু বিশ্বাসগত দিক থেকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পূর্ণ অনুকূল থাকা। এভাবে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একথা ভুলে যেয়ো না যে, তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহ্র রসুল। সুতরাং তাঁর অনুগামী হও। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিছু করতে যেয়ো না। তবে একথাও ঠিক যে, প্রাপ্ত সংবাদ পরীক্ষা না করে তোমরা মস্তবড় কোনো অন্যায়ও করোনি। কেননা তোমাদের বিশ্বাস অমলিন। আল্লাহ্ই তোমাদের কাছে ইমানকে প্রিয় করেছেন এবং সত্যপ্রত্যাখ্যান, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন ঘৃণ্য। এটা তোমাদের প্রতি তাঁর অযাচিত দান ও অপার অনুগ্রহ। আর এমতো দান ও অনুগ্রহ হচ্ছে তাঁর সর্বজ্ঞতা ও প্রজ্ঞাময়তার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

এখানকার 'তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী' বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। বাক্যটির মাধ্যমে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এধরনের স্বভাববিশিষ্ট যারা, তারাই সৎপথপ্রাপ্ত। 'ফাদ্বলাম মিনাল্লাহি ওয়া নি'মাতান' অর্থ আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহ স্বরূপ। বলা বাহুল্য, সাহাবীগণ ইমানকে ভালোবাসতেন এবং কুফরীকে ঘৃণা করতেন আল্লাহ্র এমতো দান ও অনুগ্রহের কারণেই। সুতরাং এখানকার 'দান' ও 'অনুগ্রহ' কথা দু'টো সম্পর্কযুক্ত হবে 'হাব্বাবা' (প্রিয়) এবং 'কাররহা (অপ্রিয়) ক্রিয়াদ্বয়ের সঙ্গে। সৎপথ অবলম্বন'(রাশীদূন) বর্ণিত ক্রিয়াদ্বয়ের কারণে নয়। কেননা 'দান' ও 'অনুগ্রহ' হচ্ছে আল্লাহ্র কাজ। আর 'রাশীদূন' হচ্ছে ওই কাজের ফলাফল।

কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা বলেছেন, এখানকার 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রসুল রয়েছেন' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্র রসুলের সামনে তোমরা অযথার্থ ও অসত্য বক্তব্য উত্থাপন কোরো না। আল্লাহ্ তাঁকে সঠিক তত্ত্ব অবগত করাবেনই। ফলে অবশ্যই উন্মোচিত হবে অসত্যের কুজ্ঝটিকা। আর এখানকার 'তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে' বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। এর অর্থ— তিনি যদি বিনা পরীক্ষায় তোমাদের কথা মেনে নিতেন, তবে তোমরাই নিপতিত হতে কঠিন বিপদে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে অনুমিত হয় যে, পূর্ববর্তী আয়াতে 'হে মুমিনগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে হজরত ওলীদ ও তাঁর সঙ্গী সাথীগণকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরা এখানকার সম্বোধিতজন নন। কেননা সত্যাসত্য যাচাই করার নির্দেশ 'পাপাচারী'দেরকে দেওয়া হয় না। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে প্রাপ্ত সংবাদ পরীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংবাদ শ্রবণকারীগণকে।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রসুল রয়েছেন' কথাটির মর্মার্থ হবে— তোমরা আল্লাহ্র রসুলের সম্মুখে অসত্য বোলো না। আর 'তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে' বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। আর এখানে 'হে ইমানদারগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে তাঁদেরকে, যারা রসুল স.কে বনী মুস্তালিকের উপরে হামলা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিলেন। 'আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ইমানকে প্রিয় করেছেন'। কথাটিতে বলা হয়েছে তাদের কথা, যারা বাস্তব অবস্থা পরীক্ষা করতে আগ্রহী। আর 'তারাই সৎপথপ্রাপ্ত' বলে বুঝানো হয়েছে সকল বিশ্বাসীকে। ব্যাখ্যাটি প্রাঞ্জল হলেও প্রামাণ্য

www.eelm.weebly.com

নয়। কেননা এভাবে— এখানকার সর্বনামসমূহ হয়ে যায় অগোছালো। সুতরাং মেনে নিতে হয় যে, এমতোক্ষেত্রে বায়যাবীর ব্যাখ্যাই হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

শেষে বলা হয়েছে 'ওয়াল্লহু আ'লীমুন হাকীম' অর্থ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণের সকল অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত এবং তিনিই তাঁদেরকে দান করেন পুণ্যকর্মসমূহ সম্পাদনের সামর্থ্য। কেননা তিনি প্রজ্ঞাময়ও।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আনাস বলেছেন, একবার রসুল স. একটি গাধার উপরে আরোহণ করে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কাছে

গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বললো, আপনার গাধাটিকে ওদিকে বেঁধে আসুন। ওর দুর্গন্ধে আমার কষ্ট হচ্ছে। জনৈক আনসারী বললেন, আল্লাহ্র শপথ! রসুল স. এর গাধা তোমার চেয়ে অধিক সুগন্ধময়। একথা শুনে ইবনে উবাই খুব রেগে গেলো। দু'জনের মধ্যে শুরু হলো জুতা ছোঁড়াছুঁড়ি, হাতাহাতি। ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (৯)।

বলা হলো— 'মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; আর তাদের এক দল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে'।

এখানে 'ইক্বতাতালূ' অর্থ পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে। 'ফাআস্লিহূ' অর্থ মীমাংসা করে দিবে।

'ইস্লাহ্' অর্থ এখানে অত্যাচারীকে প্রতিহত করা, তার ভুল ধারণা দূর করে দেওয়া, বিবদমান দুই দলকে শত্রুতা ও হিংসা পরিত্যাগ করতে বলা অথবা বাধ্য করা। আর একথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া অত্যাবশ্যক। 'ফাইম বাগাত' অর্থ এক দল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে। অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহ্র বিধান মেনে নিতে অস্বীকৃত হলে। উল্লেখ্য, যদি ইমানদারদের দু'টি দলকে শুভ উপদেশের মাধ্যমে বিবাদ থেকে নিবৃত্ত করা না যায়, তবে তাদের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করা এবং যুদ্ধ করা যাবে। আর 'হাত্তা তাফীআ' অর্থ যতোক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।

হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তুমি তোমার ভ্রাতাকে সাহায্য করো, সে অত্যাচারিত অথবা অত্যাচারী যেই হোক না কেনো। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! অত্যাচারিতকে সাহায্য করার কথা তো আমরা বুঝি, কিন্তু অত্যাচারীকে সাহায্য করার বিষয়টি তো আমাদের বোধগম্য হলো না। তিনি স. বললেন, তাকে অত্যাচার করা থেকে নিবৃত্ত রেখো।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তারা ফিরে আসে, তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে'।

এখানে 'ফাইন্ ফাআত্' অর্থ অবাধ্য দলটি যদি আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে। অর্থাৎ যুদ্ধে পরাস্ত হবার পর যদি তারা আল্লাহ্র বিধান মেনে নিতে চায়। 'ফাআস্লিহূ বাইনাহুমা বিল আ'দলি' অর্থ তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে ফয়সালা করবে, তাদের অতীতের অবাধ্যতার জন্য কঠোর হবে না। মীমাংসা করবে নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে। 'ওয়া আক্বসিতু' অর্থ এবং সুবিচার করবে। আর 'ইন্নাল্লহা ইউহিব্বুল মুক্বসিত্বীন' অর্থ আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন। 'ক্বিস্তুন' শব্দটি মূল তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ থেকে পরিগঠিত হয়েছে ধরা হলে এর অর্থ হবে— জুলুম করা। আর শব্দ গঠন ইফ্আ'ল প্রক্রিয়া থেকে হলে শব্দরূপটি হবে 'ইক্বসাতুন'। এমতাবস্থায় ধাত্যর্থ লুপ্ত হিসেবে অর্থ হবে— জুলুম দূর করা, ইনসাফ করা, সুবিচার করা।

সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১০

❑ মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহ্কে ভয় কর যাহাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

'ইন্নামাল মু'মিনূনা ইখ্ওয়াতুন' অর্থ বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাই ভাই। অর্থাৎ 'ইমান' যেহেতু সকল বিশ্বাসীর চিরস্থায়ী ঐক্যের সম্পদ, তাই তারা একে অপরের ভ্রাতৃতুল্য। আর এই 'ইমান' আহরণের মূল সূত্র যেহেতু রসুলেপাক স. সেহেতু তিনিই সকল বিশ্বাসীর রূহানী পিতা। আর তাদের মাতা হচ্ছেন রসুল স. এর প্রিয়তম সহধর্মিণীগণ।

'ফাআস্লিহূ বাইনা আখাওয়াইকুম' অর্থ সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন করো। এখানে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিবচনবোধক 'আখওয়াই্কুম'। এর কারণ হচ্ছে দ্বন্দ্ব মতানৈক্য অথবা বিবাদ সংঘটিত হয়ে থাকে অন্ততঃপক্ষে দু'জনের

www.eelm.weebly.com

সঙ্গে। 'ওয়াত্তাকুল্লহ' অর্থ আর আল্লাহ্কে ভয় করো, তাঁর বিধানের পরিপন্থী কিছু করতে যেয়ো না। 'লাআ'ল্লাকুম তুরহামূন' অর্থ যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। অর্থাৎ এমন 'তাক্বওয়া' (আল্লাহ্ভীতি) অবলম্বন করো, যাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র দয়া হয়। ঐক্য ও ভালোবাসা 'তাক্বওয়া'র কারণেই হয়। আর এমতো তাকওয়া আল্লাহ্র অনুকম্পা প্রাপ্তিকে করে অত্যাবশ্যক। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ রহমকারী বান্দাকে রহম করেন। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহ্ তাকে দয়া করেন না। বর্ণিত হয়েছে হজরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ কর্তৃক।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. সকলকে তা পাঠ করে শোনালেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীগণ মিটিয়ে ফেললেন তাঁদের পারস্পরিক বিবাদ।

হজরত আবু মালেক সূত্রে সাঈদ ইবনে মনসুর এবং ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, একবার দু'জন মুসলমানের মধ্যে প্রচণ্ড বাদানুবাদ হলো। তাদের গোত্রের লোকেরাও পক্ষাবলম্বন করলো তাদের। এক পর্যায়ে শুরু হয়ে গেলো পাদুকানিক্ষেপ, হাতাহাতি, মারপিট। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

ইমাম সুদ্দী সূত্রে ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও বাগবী উল্লেখ করেছেন, জনৈক আনসারীর নাম ছিলো ইমরান। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিলো উম্মে জায়েদ। তিনি একবার তাঁর পিত্রালয়ে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাঁর

স্বামী ইমরান বাধা দিলেন। তাঁকে আবদ্ধ করে রাখলেন একটি ঘরে। উম্মে জায়েদ এ সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন তাঁর পিতৃগৃহে। সংবাদ পেয়ে তাঁর পিত্রালয় থেকে তাঁকে উদ্ধারের জন্য এসে পড়লো তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা। তাঁর স্বামী তখন কার্যোপলক্ষে বাড়ির বাইরে ছিলেন। তাই বাধা প্রদান করতে এগিয়ে এলো তাঁর চাচাত ভাই। তারপর এগিয়ে এলো আরো কয়েকজন। দু'দলের মধ্যে শুরু হলো বাদানুবাদ, বচসা, শেষে ধাক্কাধাকি-মারামারি। ওই ঘটনার সূত্র ধরে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। রসুল স. তাদের মধ্যে সন্ধি করে দিয়েছিলেন। তারাও ফিরে এসেছিলেন আল্লাহ্তায়ালার বিধানের দিকে।

ইবনে জারীর ও বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, আমাদের কাছে এই বর্ণনাটি পৌঁছেছে যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে দু'জন আনসারী সম্পর্কে। ওই দু'জনের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিলো বচসা, ধাক্কা-ধাক্কি এবং জুতা ছোঁড়াছুঁড়ি। কিন্তু তলোয়ার যুদ্ধ হয়নি। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হাসান বসরী বলেছেন, দু'টি গোত্রের মধ্যে ঝগড়া বেধেছিলো। রসুল স. তাদের শরিয়তের বিধানের দিকে আহ্বান করলেন। কিন্তু তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলো না। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। সম্ভবত হাসানের এই বর্ণনাটি কাতাদার বর্ণনার রূপান্তর।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, সালেম তাঁর পিতা হজরত আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুসলমানেরা একে অপরের ভাই। সুতরাং কেউ যেনো কারো হক নষ্ট না করে। কেউ কাউকে যেনো গালি না দেয়। একজন অপরজনের প্রয়োজন মিটালে আল্লাহ্ তার প্রয়োজন মিটান। কেউ কারো একটি কষ্ট দূর করলে আল্লাহ্ তার কিয়ামতের দিনের কষ্টসমূহের কোনো একটি কষ্ট দূর করে দিবেন। কেউ যদি কারো দোষ গোপন রাখে, তবে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন গোপন করে রাখবেন তার পাপ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সুতরাং কেউ যেনো কারো উপর অত্যাচার না করে, সাহায্যহীন অবস্থায় যেনো কেউ কাউকে ছেড়ে না দেয় এবং তাঁকে যেনো অবজ্ঞা না করে। এরপর তিনি স. তাঁর পবিত্র বক্ষদেশের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আল্লাহ্ভীতি থাকে এখানে। একজন মুসলমানের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা করে। এক মুসলমানের রক্ত, সম্মান ও সম্পদ অপর মুসলমানের জন্য হারাম। উল্লেখ্য, পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হলেও মুসলমানেরা ইমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায় না। এজন্যই এখানে বলা হয়েছে 'মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে'।

বাগবী লিখেছেন, এমতো অভিমতের সমর্থন রয়েছে হারেছ আয়্ওয়ার কর্তৃক বর্ণিত হাদিসেও। তিনি বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত আলীকে জিজ্ঞেস করা হলো, জামাল ও সিফ্ফিন যুদ্ধে যারা আপনার প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা কি মুশরিক ছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, না। তাঁরা শিরিক থেকে পলায়ন করে

ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন। পুনঃ প্রশ্ন করা হলো, তাহলে তারা কি মুনাফিক ছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, না। মুনাফিকেরা তো আল্লাহ্কে স্মরণ করে না। আবারো জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে কী ছিলেন তারা? তিনি বললেন, তাঁরা আমার ভাই, আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন।

মাসআলা ঃ মুসলমানদের কোনো সম্প্রদায় যদি তাদের খলিফা বা শাসকের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে যায় এবং তারা যদি মোকাবিলার শক্তিও অর্জন করে, তবে এমতাবস্থায় খলিফা বা শাসক তাদেরকে আনুগত্যের দিকে আহ্বান জানাবে এবং বিরোধিতার কারণগুলো অপসারণ করে দিবে। এমতাবস্থায় জালেম শাসকের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা যদি একত্র হয়ে যায়,

www.eelm.weebly.com

তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শাসকের জন্য জায়েয হবে না। আর তখন সাধারণ জনতার অনুচিত হবে বিদ্রোহীদেরকে সমর্থন করা, যাতে শাসক সংশোধিত হতে বাধ্য হয়। জুলুম থেকে বিরত হয়ে, হয়ে যায় ন্যায়নিষ্ঠ। এরকম বলেছেন ইবনে হুম্মাম। কিন্তু বিদ্রোহীরা যদি তাদের বিদ্রোহের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করতে না পারে, তবে শাসক তাদের বিদ্রোহদমন করার নিমিত্তে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এবং তাদেরকে হত্যা করতে পারবে। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা যুদ্ধ না করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত কেবল বিরুদ্ধবাদী হওয়ার কারণে শাসক তাদেরকে হত্যা করতে পারবে না। কেননা মুসলমানেরা অন্যকে হত্যা করতে পারে কেবল আত্মরক্ষার্থে। আর এমতাবস্থায় উভয় দল তো মুসলমানই। সুতরাং আল্লাহ্‌র বিধানের অধীনে উভয় দলের সমঝোতা করে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। আর বাড়াবাড়ি যে করবে তাকে থামিয়ে দিতে হবে যুদ্ধের মাধ্যমে। সে কারণেই এখানে বলা হয়েছে 'যারা বাড়াবাড়ি করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে'।

আমরা বলি, 'বাগা' এর আভিধানিক অর্থ অন্বেষণ করা, অনুসন্ধান করা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'জালিকা মা কুন্‌না নাবগি' (ওই বস্তু, যার অন্বেষণ আমরা করছিলাম)। সুতরাং এখানে 'বাগা' অর্থ এমন বিষয়ের অন্বেষণ, যা শান্তি, নিরাপত্তা ও ইসলামের জন্য ক্ষতিকর। যেমন শরিয়তের বিধিবিধান লংঘন করে জুলুম বা অত্যাচার করা। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফাইন্ আত্বা'নাকুম ফালা তাব্‌গু আ'লাইহিন্‌না সাবীলা' (নারীরা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তোমরা তাদের প্রতি জুলুম করার পথ অনুসন্ধান কোরো না)। সুতরাং এমতাবস্থায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার শর্ত এটা হতে পারে না যে, তারা প্রথমে যুদ্ধ শুরু করবে। আর যুদ্ধ করার জন্য তাদের যথেষ্ট যুদ্ধাস্ত্র, সৈন্য সামন্ত থাকা অত্যাবশ্যক। বিদ্রোহীদের যদি এসকল কিছু না থাকে, তবে তো যুদ্ধের প্রয়োজনই নেই। সুতরাং তাদের যুদ্ধায়োজনের পূর্বে শাসক তাদেরকে বন্দী করতে পারে। প্রয়োজনবোধে করতে পারে হত্যাও। নতুবা বিদ্রোহীরা ক্রমশঃ সংগঠিত হতে থাকবে এবং অবকাশ পাবে সশস্ত্র যুদ্ধ প্রস্তুতির। ফলে তাদেরকে দমন করা আর সম্ভবই হবে না।

মাসআলা ঃ বিদ্রোহীদের একটি দল যদি আহত হয়, তবে তাদের উপর হামলা করা যাবে। আর যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নপর হবে, তাদেরকেও ধাওয়া করা যাবে, যাতে তারা তাদের মূল দলে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ বলেন, এমতাবস্থায় আহত বিদ্রোহীদের উপরে হামলা করা যাবে না। যারা পালিয়ে যেতে থাকবে, তাদের পিছনে ধাওয়াও করা যাবে না। কেননা তখন তারা আর যুদ্ধরত নয়। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো বৈধ ছিলো তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই। আবদে খায়ের সূত্রে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, যারা পালিয়ে যাবে, তাদের পশ্চাদ্ধাবন কোরো না। হামলা কোরো না তাদের উপরেও যারা অস্ত্রসংবরণ করে। তারা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, যে বন্দী, তাকে হত্যা করা যাবে না।

আমরা বলি, আহত অথবা পলায়নকারী বাহিনী তাদের মূল বাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতেও তো পারে। আক্রমণ করতে পারে পুনঃ সংগঠিত হয়ে। সুতরাং তারা চিরতরে রণে ভঙ্গ দিবে একথা ভাবা যায় না। তবে জামাল যুদ্ধের বিষয়টি ছিলো স্বতন্ত্র। ওই যুদ্ধে বিদ্রোহীদের নির্দিষ্ট কোনো ঘাঁটি ছিলো না, যেখানে তাদের সকলের মিলিত হওয়া ছিলো সম্ভব। তাই হজরত আলী পলায়নপর বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করতে তখন নিষেধ করেছিলেন।

হাকেম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে, বাযযার তাঁর 'মসনদ' গ্রন্থে, কাওসার ইবনে হাকামের মাধ্যমে নাফেয়ের সূত্রে, তিনি হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেন— রসুল স. একবার আমাকে বললেন, হে উম্মে আব্‌দা তনয়! এই উম্মতের বিদ্রোহীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ কী বিধান দিয়েছেন? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর বার্তাবাহকই এ বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত। তিনি স. বললেন, তারা আহত হলে তাদের উপর হামলা করা যাবে না। বন্দীদেরকে হত্যা করা যাবে না। তাদের মালমাত্তাকে গণিমতের মাল মনে করে বণ্টন করা যাবে না। এই হাদিসের সূত্রপরম্পরাভূত এক বর্ণনাকারী কাওসার ইবনে হাকীম। তার কারণে বায্‌যার এই বর্ণনাটিকে সাব্যস্ত করেছেন 'মুয়াল্লাল' (বিপর্যস্ত) বলে।

মাসআলা ঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, বিদ্রোহী মুসলমানদের স্ত্রী ও ছেলে- মেয়েদেরকে দাস-দাসী বানানো যাবে না। তাদের সম্পত্তি গণিমত হিসেবে বণ্টন করা যাবে না, রেখে দিবে বাজেয়াপ্ত করে। কিন্তু যতোক্ষণ তারা তওবা না করবে, ততোক্ষণ তাদেরকে বন্দী করে রাখতে হবে এবং সম্পদও রাখতে হবে আটক। ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী যখন হজরত তালহা ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে পরাজিত করলেন, তখন তিনি জনৈক ঘোষককে এই মর্মে ঘোষণা দিতে বললেন যে, এখন থেকে সম্মুখ অথবা পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী কাউকে হত্যা করা যাবে না। অর্থাৎ যেহেতু বিদ্রোহীরা পরাভব মেনেছে, তাই তাদেরকে আর আক্রমণ করা যাবে না, তাদের সম্পত্তিকে যুদ্ধলভ্য সম্পদ হিসেবে গণ্য করা

যাবে না এবং ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী বানানো যাবে না তাদের সন্তান-সন্ততিকে। আবদুর রাজ্জাকের বিবরণে অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— হজরত আলী নিহত বিদ্রোহীর সম্পদ গ্রহণ করতেন না। বলতেন, নিহত ব্যক্তির

www.eelm.weebly.com

সম্পদের মধ্যে যদি কেউ তার নিজের সম্পদ সনাক্ত করতে পারে, তবে সে যেনো তার ওই সম্পদটুকু নিয়ে নেয়। 'তারিখে ওয়াসেত' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, পলায়নপরদের পশ্চাদ্ধাবন কোরো না। আহতদের উপরে হামলা কোরো না। বন্দীকে হত্যা কোরো না। তাদের স্ত্রীগণ থেকে দূরে থাকো, চাই তোমাকে কেউ অকর্মণ্য বলুক, অথবা তোমাদের নেতাকে গালিগালাজ করুক।

মাসআলা ঃ বিদ্রোহীদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হাতিয়ার প্রয়োজনবোধে খলিফা বা শাসক অথবা তার প্রতিনিধি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে। এতে কোনো দোষ নেই। তদ্রূপ তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বাহনও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেন, বিদ্রোহীদের অস্ত্র বা বাহন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা জায়েয নয়। আমাদের অভিমতের সমর্থনে রয়েছে ইবনে আবী শায়বা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, জামাল যুদ্ধে বিদ্রোহীরা যে সকল উট ও ঘোড়ায় আরোহন করে এসেছিলেন এবং যে সকল অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, হজরত আলী সেগুলো তাঁর বাহিনীর লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, তিনি ওই সকল অস্ত্র ও বাহন বণ্টন করে দিয়েছিলেন ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে, তাদেরকে সেগুলোর মালিক বানানোর উদ্দেশ্যে নয়। কেননা আলেমগণের সর্বসম্মত মত এই যে, বিজয়ীরা বিদ্রোহীদের সম্পদের মালিক হতে পারবে না।

মাসআলাঃ বিদ্রোহীরা যুদ্ধের মাধ্যমে শাসকবাহিনীর সম্পদের ক্ষতি করলে তাদের এমতো ক্ষতিসাধনের শরিয়তসম্মত কোনো কারণ যদি থেকে থাকে এবং তাদের সৈন্য ও সমরায়োজন যদি অটুট থাকে, তবে এমতাবস্থায় ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সর্বশেষ মত এবং ইমাম মোহাম্মদের বক্তব্য হচ্ছে, এর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। ভিন্ন বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের বক্তব্য এর বিপরীত। ইবনে শিহাব জুহরী লিখেছেন, এমতাবস্থায় যদি উভয় বাহিনীর সংঘর্ষে ব্যাপক খুন-খারাবি হয়ে যায় এবং হন্তারক ও নিহতদেরকে যদি সনাক্ত করা সম্ভব না হয়, ধ্বংস হয়ে যায় যদি বিপুল সম্পদ, এভাবে যুদ্ধ সমাপ্ত হবার পর যদি দেখা যায় শাসক বাহিনীর বিজয় হয়েছে, তবে একথা আমার জানা নেই যে, এমতাবস্থায় কে কার কিসাস গ্রহণ করেছে, আর সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার ক্ষতিপূরণই বা নিয়েছে কে কার কাছ থেকে।

মাসআলা ঃ কোনো বিদ্রোহী যদি শাসকের কোনো সমর্থককে হত্যা করে এবং নিজ মুখে এর দায় স্বীকার করে এরকম দাবি করে যে, তার এমতো কাজ সঠিক, তবে সে-ই হবে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ। আর যদি সে এরকম বলে যে,

তার এমতো কাজ সঠিক নয়, তবে সে ওই নিহত ব্যক্তির সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না। আর শাসক বাহিনীর কেউ যদি বিদ্রোহীদের কাউকে হত্যা করেছে বলে দাবি করে, তবে সে-ই হবে ওই নিহত বিদ্রোহীর সম্পদের উত্তরাধিকারী।

মাসআলা ঃ শাসকের আনুগত্যবিচ্যুত বিদ্রোহীরা যদি শরিয়ত সম্মত কারণ ছাড়াই খুন, লুণ্ঠতরাজ ও রাহাজানি করে, তবে তাদের সমরশক্তি থাকলেও তাদেরকে সাব্যস্ত করতে হবে খুনী, লুটেরা ও ডাকাত বলে। তাদের বিধান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে সুরা মায়িদার তাফসীরে। তাদেরকে হত্যা করতে হবে, শূলীতে চড়াতে হবে, কেটে দিতে হবে হাত-পা, অথবা বিতাড়ন করতে হবে লোকালয় থেকে।

মাসআলা ঃ বিদ্রোহীদের যদি সৈন্য ও সমরায়োজন না থাকে, তবে আল্লাহ্‌র বিধানানুসারে তাদেরকে বন্দী করা যাবে, তাদেরকে দেওয়া যাবে শারীরিক নির্যাতন, অথবা এজাতীয় অন্যান্য শাস্তি। কিন্তু তাদেরকে হত্যা করা জায়েয হবে না। বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী একবার শুনতে পেলেন, এক লোক মসজিদের এক কোণে বসে উচ্চারণ করছে 'লা হুক্‌মা ইল্লা লিল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র শাসন ছাড়া আর কারো শাসনাধিকার নেই)। হজরত আলী তাকে লক্ষ্য করে বললেন, কথাতো সত্যই। কিন্তু তোমরা এর ভুল অর্থ প্রচার করছো। শোনো, আমাদের কাছে তোমাদের হক রয়েছে তিনটি— ১. মসজিদে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা থেকে আমরা (শাসকেরা) তোমাদেরকে (জনগণকে) বাধা দিবো না, যতোক্ষণ তোমাদের হাত মিলিত থাকবে আমাদের হাতের সাথে ২. গণিমতের মালে অংশগ্রহণ করতে আমরা তোমাদেরকে বাধা প্রদান করবো না ৩. প্রথমেই আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবো না। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, হজরত আলীর এমতো বাণী আমার নিকটেও পৌঁছেছে।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, ছাবেত ইবনে কায়েস কানে কম শুনতেন। তাই রসুল স. এর মজলিশের সকলেই তাঁকে সামনের দিকে বসবার ব্যবস্থা করে দিতেন, যাতে তিনি রসুল স. এর কথা ভালোমতো শুনতে পান। একদিন তিনি ফজরের নামাজের জামাতে শরীক হলেন এক রাকাত হয়ে যাবার পর। নামাজ শেষে সাহাবীগণ আপন আপন স্থানেই ঘন হয়ে বসে পড়লেন। স্থানাভাবে কেউ কেউ পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হলেন। ছাবেত বাদ পড়ে যাওয়া রাকাত শেষ করে পূর্ব অভ্যাস অনুসারে সকলের সামনে এগিয়ে যেতে শুরু করলেন। মুখে বলতে লাগলেন, দেখি, দেখি, জায়গা দাও, জায়গা দাও। এভাবে তিনি পৌঁছে গেলেন একেবারে সামনে। তখন তাঁর এবং রসুল স. এর মধ্যে বসেছিলেন মাত্র একজন। তিনি তাঁকেও বললেন, জায়গা দাও তো দেখি। তিনি বললেন, জায়গা তো পেয়েছেনই। ওখানেই বসে পড়ুন। ছাবেত তাঁর কথা শুনে ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু আর উচ্চবাচ্য না করে সেখানেই বসে পড়লেন। একটু পরে যখন চারিদিক ফর্সা হয়ে গেলো তখন ছাবেত তাঁকে

www.eelm.weebly.com

বললেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি অমুক। ছাবেত বললেন, ও! তুমি অমুক মহিলার পুত্র? এই বলে তিনি তাঁর মায়ের সম্পর্কে তাঁর ইসলামপূর্ব জীবনের কিছু দোষ বর্ণনা করলেন। লোকটি লজ্জিত হলো। তখনই অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

তাফসীরে মাযহারী/৩৮

সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১১

❑ হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডাকিও না; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যাহারা তওবা না করে তাহারাই যালিম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে বিশ্বাসীগণ! কোনো পুরুষ যেনো অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে'। এখানকার 'ক্বওম' শব্দটি অভিধানানুসারে ব্যবহৃত হতে পারে পুরুষ ও রমণী মিলিত দলের ক্ষেত্রে অথবা শুধু পুরুষের ক্ষেত্রে। আর নারীরা সাধারণতঃ অনুগামিনী হিসেবে পুরুষদের প্রতি প্রবর্তিত বিধানের অন্তর্ভূতা। 'সিহাহ্' রচয়িতা লিখেছেন, পুরুষদের দলকেই মূলতঃ 'ক্বওম' বলা হয়, নারীদের দলকে নয়। একথার প্রমাণ হিসেবে জাওহারী এই আয়াতকেই উল্লেখ করে থাকেন। কেননা এখানে 'নিসা' শব্দের মাধ্যমে নারীদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বুঝতে হবে 'ক্বওম' অর্থ কেবল পুরুষ এবং 'নিসা' অর্থ কেবলই নারী। জনৈক কবি বলেছেন— 'আমি জানি না, হোসেন বংশের এই সকল লোক 'ক্বওম' (পুরুষ), না 'নিসা' (রমণী)।

কোরআনের অনেক আয়াতে আবার 'ক্বওম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে পুরুষ-রমণী উভয়কে বোঝাতে। 'মাদারেক' রচয়িতা বলেছেন, 'ক্বওম' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত হয় পুরুষদের বেলায়। বায়যাবী লিখেছেন, 'ক্বওম' শব্দটি 'মাসদার' বা ক্রিয়ামূল। বিশেষণ হিসেবে বহুবচনার্থকরূপে শব্দটির ব্যবহার ব্যাপক। অথবা শব্দটি বহুবচন 'ক্বয়িমূন' এর। যেমন 'যাউর' বহুবচন 'যায়িরূন' এর। উল্লেখ্য, বৃহৎ বৃহৎ কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব সাধারণত ন্যস্ত থাকে পুরুষদের উপরেই। সে কারণেই শব্দটি ব্যবহৃত হয় পুরুষদের দলের বিশেষণরূপে। আবার কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে ক্বওমে নুহ, ক্বওমে লুত, ক্বওমে হুদ ইত্যাদি বলে বুঝানো হয়েছে ওই ক্বওমের (সম্প্রদায়ের) পুরুষ-রমণী উভয়কে। এর কারণ

তাফসীরে মাযহারী/৩৯

সম্ভবতঃ এই যে, এমতাবস্থায় অর্থগত প্রাবল্য আরোপ করে রমণীদেরকেও করা হয়েছে পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত। অথবা ওই সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের উল্লেখ করাকেই মনে করা হয়েছে যথেষ্ট, আর অনুগামিনী কিংবা সহগামিনীরূপে রমণীরা স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে এর অন্তর্গতা। উল্লেখ্য, পরবর্তী আয়াতে এই মর্মে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, এক দল যেনো অন্য দলকে বিদ্রূপ না করে। মানুষের মজলিশগুলো সাধারণত এরকমই হয়। দলগতভাবে এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে করতে থাকে আলোচনা-সমালোচনা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেনো উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে'।

প্রথমে 'ক্বওমূন' এর উল্লেখের পরে এখানে সংযোগ করা হয়েছে নারীদের কথা। বলা হয়েছে 'কোনো নারী যেনো অপর কোনো নারীকে উপহাস না করে'। সুতরাং এখানে 'ক্বওম' (সম্প্রদায়) অর্থ পুরুষ সম্প্রদায়। আর যদি 'ক্বওম' (সম্প্রদায়) অর্থ পুরুষ রমণী উভয়কে বলা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে বুঝতে হবে পরবর্তীতে নারীদের কথা বলা হয়েছে বিশেষভাবে। কেননা পুরুষজাতি অপেক্ষা নারী জাতির মধ্যে পরিহাসপ্রবণতা পরিদৃষ্ট হয় অধিক।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল উম্মতজননীগণকে লক্ষ্য করে, যারা উম্মতজননী হজরত উম্মে সালমার হ্রস্বাকৃতির কারণে তাঁকে নিয়ে কৌতুক করতেন। ইকরামা বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত (১১) অবতীর্ণ হয়েছে উম্মতজননী হজরত সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব

www.eelm.weebly.com

সম্পর্কে। অন্যান্য উম্মতজননীগণ তাঁকে 'ইহুদীর বেটি' বলে ঠাট্টা করতেন। তিনি একবার কথাটা রসুল স. এর কানে দিলেন। তিনি স. বললেন, তুমি তাদেরকে একথা বললে না কেনো যে, আমার পিতা হারুন, আমার পিতৃব্য মুসা এবং আমার পতি মোহাম্মদ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কোরো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না'। এখানে 'লামযুন' অর্থ কারো দোষ বর্ণনা করা। অর্থাৎ হে রমণীকুল! তোমরা অন্য রমণীর এমন দোষ বর্ণনা কোরো না, যাতে তারা লজ্জা পায়। 'তানবুযুন' এর 'নাবযুন' অর্থ অপ-উপাধি। ইমাম বায়যাবী লিখেছেন, 'নাবযুন' বলা হয় কেবল মন্দ অভিধাকে। অভিধানজ্ঞগণ লিখেছেন, 'তানাবুয' অর্থ একে অপরকে লজ্জা দেওয়া, মন্দ কোনো উপাধি ধরে ডাকা। এভাবে আলোচ্য বক্তব্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— তোমরা কাউকে মন্দ উপাধি ধরে ডেকো না।

বাগবী লিখেছেন, ইকরামা বলেছেন 'তানবুয বিল আলক্বাব' অর্থ কাউকে বলা— হে ফাসেক! হে মুনাফিক! হে কাফের! হাসান বলেছেন, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে কেউ মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর কোনো কোনো মুসলমান তাদেরকে 'হে ইহুদী' 'হে নাসারা' বলে ডাকতো। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে

এরকম সম্বোধনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আতা বলেছেন, কাউকে 'হে গর্দভ' 'হে শূকর' এরকম করে কাউকে ডাকার নাম 'তানবুযে আলকঃক্বাব'। কেউ কোনো মন্দ আমল করার পর তওবা করা সত্ত্বেও, কোনো কোনো লোক তাকে বিগত মন্দ আমলের কথা বলে লজ্জা দেয়, এমতো অপআচরণকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে।

'সুনান' রচয়িতা চতুষ্টয় লিখেছেন, হজরত জোবাইর ইবনে জাহ্হাক বলেছেন, কোনো কোনো লোকের দুই তিনটি উপনাম ছিলো। তার মধ্যে মন্দ উপনাম ধরে কেউ কেউ তাদেরকে সম্বোধন করতো। এ সম্পর্কেই বিধান দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বর্ণনাটিকে উত্তম পদবাচ্য বলেছেন তিরমিজি। ইমাম মোহাম্মদের বিবরণে হজরত আবু জোবাইরার বক্তব্যটি এসেছে এভাবে— এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বিশেষ করে আমাদের বনী সালমা'র লোকদেরকে লক্ষ্য করে। রসুল স. যখন মদীনায় শুভাগমন করলেন, তখন মদীনার প্রত্যেকেরই উপনাম ছিলো দু'তিনটি করে। ওই সকল উপনাম ধরে ডাকলে তারা অতুষ্ট হতো। কেউ কেউ তখন অভিযোগ করতে শুরু করলো, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! অমুক অমুক লোককে তাদের উপনাম ধরে ডাকলে তারা মনঃকষ্ট পায়। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা তওবা না করে, তারাই জালেম'।

হজরত আবু জর গিফারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ কাউকে 'কাফের' বা 'ফাসেক' বললে, ওই লোক যদি তা না হয়, তবে সেই ব্যক্তিই হয়ে যাবে 'কাফের' অথবা ফাসেক। বোখারী। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ কাউকে 'কাফের' বললে 'কাফের' সাব্যস্ত হবে তাদের দু'জনের যে কোনো একজন। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু জর আরো বর্ণনা করেছেন, কেউ যদি কাউকে কুফরীর সঙ্গে সম্বন্ধিত করে, অথবা তাকে বলে 'আল্লাহ্র দুশমন' আর ওই ব্যক্তি যদি তা না হয়, তবে কাফের অথবা আল্লাহ্র দুশমন সাব্যস্ত হবে সে, যে এরকম বলেছে। বোখারী, মুসলিম।

কোনো কোনো তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— কারো দোষ বর্ণনা দ্বারা রসিকতা করা, কাউকে মন্দ নামে সম্বোধন করা ফাসেকী। ইমান আনার পর এরকম ফাসেকী স্বভাব আঁকড়ে ধরে থাকা অনভিপ্রেত। সুতরাং তোমরা এরকম কাজ কখনো কোরো না, যাতে করে তোমাদেরকে 'ফাসেক' সাব্যস্ত হতে হয়।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী, কবীরা গোনাহ্। আর মুসলমানকে হত্যা করা কুফরী। বোখারী, মুসলিম। হাদিসটি আরো বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত সা'দ থেকে ইবনে মাজা। আর তিবরানী বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল এবং হজরত ওমর ইবনে নোমান ইবনে মাকরান থেকে। আর দারা

কুতনী হজরত জাবের থেকে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিবরানীর বিবরণে অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— এক মুসলমানের মাল যেমন অন্য মুসলমানের জন্য হারাম, তেমনি হারাম তার জান।

'যারা তওবা না করে তারাই জালেম' অর্থ যারা অপরকে মন্দ নামে ডাকার মতো গর্হিত অপরাধ থেকে তওবা না করে, এমতো অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত না হয়, তারা নিশ্চয়ই আত্ম-অত্যাচারী, ফলে শাস্তিযোগ্য।

মাসআলা ঃ কেউ যদি কোনো স্বাধীন মুসলিম পুরুষ বা রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, কিন্তু তা প্রমাণ না করতে পারে, তবে তার শাস্তি আশি বেত্রাঘাত। কিন্তু কাফের অথবা ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে এরকম অপবাদ দিলে আশি বেত্রাঘাতের শাস্তি অত্যাবশ্যক হয় না। তবে তাকে শাসন করা যাবে কঠোরভাবে। কেননা অমুসলিমের মর্যাদা মুসলমানের চেয়ে কম। ব্যভিচারের বদনাম স্বাধীন মুসলিম নর-নারীর সামাজিক সম্মান চরমভাবে ক্ষুণ্ন করে। আর স্বাধীন মুসলিম নর-নারীকে যদি অন্য কোনো বদনাম দেওয়া হয়,

www.eelm.weebly.com

তবে এমতোক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে তাযীর (সামাজিক শাস্তি)। যদি তার প্রদত্ত অপবাদ শরিয়তে হারাম এবং সমাজে মর্যাদাহানিকর হয়, তাহলে বদনাম দাতার উপরে তাযীর হবে অত্যাবশ্যক। যেমন কেউ কোনো পুণ্যবান মুসলমানকে আখ্যা দিলো চোর, ফাসেক, কাফের, খবীস, দুরাচার, নপুংসক, আত্মসাৎকারী, বেদীন, লুটেরা, দাইয়ুস, মদ্যপ বা সুদখোর।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, এক লোক অন্য এক লোককে 'নপুংসক' বলেছিলো। রসুল স. তার উপরে তাযীর জারী করেছিলেন। কেউ কাউকে 'গাধা' 'শূকর' 'কুকুর' 'ভেড়া' ইত্যাদি বললেও তার উপর তাযীর প্রয়োগ করতে হবে। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এরকম বললে তাযীর প্রয়োগ করা যাবে না। তাযীর প্রয়োগ করা যাবে তখন, যখন এরকম অপবচন উচ্চারণ করা হবে বিদ্বান, মর্যাদাবান ও পুণ্যবান মুসলমানকে লক্ষ্য করে। কেউ যদি কাউকে বলে দাবাড়ু, 'জুয়াড়ী' অথবা চাঁদাবাজ তবুও তাযীর জারী করা যাবে না, যদিও এধরনের আচরণ শরিয়তসম্মত নয়। কিন্তু এমতো অপবচন কারো সামাজিক মর্যাদা খর্ব করে না।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তাযীরের শাস্তি হবে শরিয়তনির্ধারিত শাস্তি (হদ) অপেক্ষা কম। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, শরিয়তের নিম্নতম শাস্তি হচ্ছে— একজন মদ্যপানকারী গোলামের শাস্তি— চল্লিশ বেত্রাঘাত। তাই তাযীরের শাস্তি হবে তার চেয়ে কম। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, শরাব পানের হদ হচ্ছে একজন স্বাধীন মুসলমানের জন্য আশি বেত্রাঘাত। তাই তাযীরের শাস্তি হতে হবে এর চেয়ে কম। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে শরিয়তের নিম্নতম শাস্তি কুড়ি বেত্রাঘাত। সুতরাং তাযীর হবে এর চেয়ে কম। ইমাম মালেক বলেছেন, তাযীর নির্ধারিত হবে সমকালীন বিচারকের সিদ্ধান্তের নিরীখে। তিনি যেমন সমীচীন মনে করবেন, বেত্রাঘাতের সংখ্যা নির্ধারণ করবেন সেভাবে।

যথাঅঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গে সঙ্গম করলে তাযীরের শাস্তি নির্ধারণ করতে হবে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হদের মাঝামাঝি। পরনারীকে চুম্বন করা, কাউকে গালি দেওয়া এবং চুরির নেসাবের চেয়ে কম পরিমাণ চুরি করা— এসকল অপরাধের তাযীর নির্ধারণ করতে হবে হদের পরিমাণের চেয়ে কম। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. ভ্রমণে অথবা জেহাদে বহির্গত হলে দু'জন ধনী ব্যক্তির সেবা করার জন্য নির্ধারণ করতেন একজন দরিদ্রকে। অর্থাৎ প্রতি দু'জন বিত্তপতির সঙ্গে মিলিয়ে দিতেন একজন বিত্তহীনকে। ওই বিত্তহীন ব্যক্তি পূর্বাহ্নে গমন করে তার দুই বিত্তপতি সঙ্গীর জন্য ঠিক করতেন অবতরণের স্থান এবং পানাহারায়োজন। একবার রসুল স. এরকম সেবকরূপে নির্ধারণ করলেন হজরত সালমান ফারসীকে। তিনি আগে ভাগে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ঘুমিয়ে পড়লেন। ফলে পানাহারের বন্দোবস্ত করতে পারলেন না। তাঁর সঙ্গী দু'জন সেখানে পৌঁছে বললেন, কী ব্যাপার! পানাহারের কোনো ব্যবস্থাই তো করোনি। তিনি বললেন, কী করবো? এমন ঘুম চেপে বসলো যে, আমি জেগেই থাকতে পারলাম না। সঙ্গীদ্বয় বললো, তাহলে তুমি রসুল স. এর কাছে গিয়ে দেখো, খাবারের কোনো ব্যবস্থা করতে পারো কিনা। তিনি রসুল স. এর কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বললেন। তিনি স. বললেন, তুমি উসামা ইবনে জায়েদের কাছে যাও। রুটি-তরকারী যদি কিছু থাকে, তবে সে তোমাকে তা দিবে। হজরত উসামা তখন ছিলেন রসুল স. এর তাঁবু ও পানাহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। হজরত উসামা বললেন, আমার কাছে তো কিছুই নেই। বিফলমনোরথ হয়ে তিনি ফিরে এলেন তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের কাছে। সঙ্গীদ্বয় বললো, উসামার কাছে আহারের ব্যবস্থা না থাকার কথা নয়। সে মনে হয় কার্পণ্য করেছে। এরপর তারা হজরত সালমানকে পাঠালেন সাহাবীগণের আর একটি দলের কাছে। কিন্তু সেখান থেকেও কিছু পাওয়া গেলো না। তখন হজরত সালমানের সঙ্গীদ্বয় তাঁকে বললেন, তোমাকে পানিভর্তি কোনো কূপের কাছে পাঠালেও দেখছি ওই কূপের পানি শুকিয়ে যাবে। একথা বলে তারা নিজেরাই গিয়ে উপস্থিত হলো হজরত উসামার কাছে। তাদের এমতো গমনের উদ্দেশ্য ছিলো আসলেই তার কাছে খাদ্যবস্তু কিছু আছে কিনা তা যাচাই করা। কিন্তু কিছু না পেয়ে উপস্থিত হলো রসুল স. সকাশে। তিনি স. তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, কী ব্যাপার। তোমাদের মুখ থেকে যে গোশতের ঘ্রাণ বের হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তারা বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা তো আজ গোশত খাইইনি। তিনি স. বললেন, তোমরা ভুল বলছো। তোমরা গোশত ভক্ষণ করেছো সালমান ও উসামার। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১২

www.eelm.weebly.com

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হইতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোশত খাইতে চাহিবে? বস্তুত তোমরা তো ইহাকে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর; আল্লাহ্ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

আল্লামা সুয়ূ্যতী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার যে প্রেক্ষিত উপরে বর্ণিত হয়েছে, তা বর্ণনা করেছেন ছা'লাবীও, কিন্তু তিনি বর্ণনা করেছেন সূত্রপরম্পরা ব্যতিরেকেই। ইসপাহানী তাঁর 'তারগীব' গ্রন্থে ঘটনাটির অর্থগত বিবরণ উল্লেখ করেছেন আবুদর রহমান ইবনে আবী লায়লা সূত্রে। আর ইবনে মুনজির ঘটনাটির বিবরণ দিয়েছেন ইবনে জুরাইজ সূত্রে। বর্ণনাকারীগণের সকলের ধারণা, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত সালমান ফারসী সম্পর্কে। তিনিই পূর্বাহ্নে কথিত গন্তব্যে পৌঁছে খেয়ে দেয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন গভীর ঘুমে। আর তাঁর সঙ্গীদ্বয় তাঁর এমতো আচরণের সমালোচনা করেছিলো।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাকো; কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান কোরো না'।

এখানে 'ইছমুন' অর্থ ওই পাপ যার জন্য নির্ধারিত রয়েছে শাস্তি। এখানকার 'ইছমুন' শব্দটির মূল রূপ ছিলো 'ভিছমূন'। এর মুজারের রূপ হয় 'ইয়াছিমু'। উল্লেখ্য, পাপকর্ম পুণ্যকর্মকে দুর্বল করে দেয়। আর 'জন্' অর্থ এখানে অনুমান, অ-দৃঢ় ধারণা, প্রকৃতপক্ষে তা দৃঢ় হোক অথবা না হোক। শব্দটির মধ্যে দৃঢ় ধারণা, সন্দেহ, কল্পনা সকল কিছু সমীভূত। তাই এর প্রকার ও প্রকৃতি হতে পারে বিভিন্ন রকম। যেমন— ১. ওই ধারণা, যার অনুকরণ করা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিশ্বাস, মুসলমান নর-নারীর উপরে সুধারণা। শরিয়তের অকাট্য দলিলের প্রতি সুধারণা রাখা এবং তার অনুসরণ করাও ওয়াজিব, যদি তা হয় জ্ঞানগত মাসায়েল সংক্রান্ত ও বিশ্বাসগত এবং তার বিপরীতে যদি না থাকে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ। ২. ওই সকল ধারণা, যেগুলোর লালন ও অনুসরণ হারাম। যেমন বিশ্বাসী নর-নারীর প্রতি অপঅনুমান। বিশেষ করে যারা পুণ্যবান ও পুণ্যবতী তাদের প্রতি কুধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণতই নিষিদ্ধ। ওই সকল বিষয়ের অনুসরণ করাও হারাম, যেগুলোর বিরুদ্ধে রয়েছে শরিয়তের

অকাট্য প্রমাণ। ৩. এই দুই প্রকারের ধারণা ছাড়াও ধারণা রয়েছে আরো এক প্রকারের। আর এই তৃতীয় প্রকারের ধারণা বা অনুমানের কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বলা হয়েছে— কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরকম ধারণা পাপ। সুতরাং বিশ্বাসী নর-নারী সম্পর্কে সকল প্রকার অপঅনুমান পরিহার করাই সাবধানতার দাবি। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে এমতো সাবধানতার কথাই। হাদিস শরীফে এসেছে, হালাল সুস্পষ্ট। হারামও সুস্পষ্ট। আর এই দু'য়ের মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা সন্দেহযুক্ত (দূরে থাকতে হবে এগুলো থেকেই)।

'ওয়ালা তাজ্বাস্সাসূ' অর্থ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কোরো না। 'জ্বাস্সুন' অর্থ হাত দ্বারা স্পর্শ করা। আর 'তাজ্বাস্সুন' অর্থ গোপন সংবাদ আহরণের উদ্দেশ্যে ব্যাপৃত থাকা, গুপ্তচরবৃত্তি করা। আর 'তালাম্মুন' অর্থ বার বার অনুসন্ধান করা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানুষের দোষত্রুটি অন্বেষণ কোরো না। কারো গোপন কোনো বিষয় জানার জন্য তার পিছনে লেগে থেকো না। আল্লাহ্ যেহেতু তার দোষত্রুটি গোপন রেখেছেন, সেহেতু তুমি তা গোপন রাখো।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা কুধারণা পরিত্যাগ কোরো। কেননা কুধারণা মিথ্যা। কারো দোষ অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়ো না। একে অপরকে ঘৃণা কোরো না। হিংসা বিদ্বেষ পোষণ কোরো না পরস্পরের প্রতি। কোরো না একে অপরের প্রতি বৈমুখ্য প্রদর্শন। সকলেই আল্লাহ্র বান্দা, পরস্পরের ভাই হয়ে যাও। একজনের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অপরজন বিবাহের প্রস্তাব দিয়ো না। তার প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে, আবার হতে পারে প্রত্যাখ্যানও। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সর্ব ইমাম মালেক, আহমদ, ইবনে মাজা, আবু দাউদ ও তিরমিজি। তিরমিজি মন্তব্য করেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, হে ওই সকল কপটাচারী! যারা মুখে মুখে ইমান এনেছে, এখনো যাদের হৃদয়ে ইমান প্রবেশ করেনি, তারা শোনো, মুসলমানদের গীবত কোরো না। তাদের গোপন বিষয় অনুসন্ধানে লেগে থেকো না। যে ব্যক্তি অন্যের গোপন বিষয় প্রকাশ করতে চাইবে, আল্লাহ্ তাদের গোপন বিষয় প্রকাশ করে

www.eelm.weebly.com

দিবেন। অতঃপর তাকে করবেন লাঞ্ছিত। সে যদি গোপন অপকর্ম করে উটের হাওদার ভিতরে অতি সঙ্গোপনে, তবুও তা আর গোপন থাকবে না। তিরমিজি, ইবনে হাব্বান। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি 'উত্তম' শ্রেণীভূত।

জায়েদ ইবনে ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, ওলীদ ইবনে উকবার ওই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে আপনি জানেন কি, যখন তার দাড়ি বেয়ে ফোটায় ফোটায় ঝরে পড়ছিলো মদ্য? তিনি জবাব দিলেন, আমাকে তো গুপ্তচরবৃত্তি পরিহার করতে বলা হয়েছে। চর্চা করতে বলা হয়েছে কেবল প্রকাশ্য বিষয়ে।

'ওয়ালা ইয়াগতাব্ বা'দ্বুকুম বা'দ্বন' অর্থ এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কোরো না। অর্থাৎ কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা কোরো না। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার আমাদেরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো, পরচর্চা কী? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর বার্তাবাহকই এ বিষয়ে উত্তমরূপে অবহিত। তিনি স. বললেন, তোমাদের কোনো ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে তার অপছন্দনীয় কিছু বলার নামই পরচর্চা। আমি বললাম, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! যদি বাস্তবেও তার মধ্যে ওই দোষ থাকে, তবুও? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আর যদি তার মধ্যে ওই দোষ না-ই থাকে, তবে তুমি তো তাকে অপবাদ দিলে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহ বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর সামনে এক লোক বললো, অমুককে খাইয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সে খায় না। বাহনে আরোহণ না করিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আরোহণও করে না। রসুল স. বললেন, তুমি তো তার গীবত করলে। উপস্থিত সাহাবীগণের একজন বললেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! লোকটি তো সত্য কথাই বলেছে। তিনি স. বললেন, অসাক্ষাতে কারো সত্য দোষ বর্ণনা করার নামই তো গীবত। বাগবী।

এরপর বলা হয়েছে 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার গোশত খেতে চাইবে বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে করো'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিসূচক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— তোমাদের মধ্যে কেউ নিশ্চয় তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করতে সম্মত হবে না। গীবত বা পরচর্চার ঘৃণ্যরূপ ফুটিয়ে তোলার জন্যই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এমতো অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। এখানে 'হুব্ব' অর্থ মহব্বত, ভালোবাসা। এখানে মহব্বতকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এমন বিষয়ের সঙ্গে, যা অতিশয় ঘৃণ্য। একেতো মৃত ব্যক্তির মাংস, তদুপরি ওই মাংস আবার আপন ভাইয়ের। এরকম মাংস খেতে নিশ্চয় কেউ পছন্দ করবে না।

মুজাহিদ বলেছেন, বক্তব্যটির মর্মার্থ যেনো এরকম— আল্লাহ্ বললেন, তোমরা কি তোমাদের মৃত ভ্রাতার গোশত খেতে ভালোবাসো? শ্রোতারা জবাব দিলো, না, না। আল্লাহ্ বললেন, গীবত তো মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ তুল্যই। সুতরাং গীবত পরিহার করো।

হজরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মেরাজ রজনীতে আমি এক স্থানে যেতে যেতে দেখলাম একদল লোককে। তাদের হাতের নখ তাম্রনির্মিত। আর তাদের ওই নখগুলো দিয়ে তারা তাদের মুখমণ্ডল ও শরীরের গোশত টেনে টেনে ছিঁড়ছিলো। আমি জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা ওই সকল লোক, যারা পৃথিবীতে তাদের মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করতো, মানুষের অসাক্ষাতে তাদের দোষ বর্ণনা করে তাদের সম্মানহানি করতো। বোখারী।

হজরত মায়মুন বলেছেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম, একজন হাবশীর মৃতদেহ আমার সামনে আনা হলো। কে যেনো আমাকে লক্ষ্য করে বললো, এর

গোশত ভক্ষণ করো। আমি বললাম, কেনো? সে বললো, তুমি অমুকের এই গোলামের গীবত করেছিলে। আমি বললাম, না। আমি তো তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলিনি। সে বললো, এক সমাবেশে এর দোষ বর্ণনা করা হয়েছিলো। তুমি তা শুনেছিলে এবং মনে মনে খুশী হয়েছিলে। ওই ঘটনার পর থেকে আমি কখনো গীবত তো করতামই না, আমার সামনে কাউকে গীবতও করতে দিতাম না।

জননী আয়েশা বলেছেন, আমি একদিন আমার সপত্নী সাফিয়্যা সম্পর্কে বললাম, সে-তো এরকম। অর্থাৎ বেঁটে। রসুল স. বললেন, তুমি তার গীবত করলে। তোমার এ কথা যদি সমুদ্রের পানিতে মিশানো হয়, তবে সমুদ্রের পানি হয়ে যাবে তিক্ত। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, গীবত ব্যভিচার অপেক্ষা ঘৃণ্য। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কী কারণে? তিনি স. বললেন, মানুষ ব্যভিচার করার পর তওবা করলে আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেন। কিন্তু গীবতকারী তওবা করলেও আল্লাহ্ তাকে মাফ করেন না, যতোক্ষণ না যার গীবত করা হয়েছে, সে তাকে মাফ করে।

গীবতের কাফ্ফারা ঃ হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, গীবতের কাফ্ফারা হচ্ছে, যার গীবত করা হয়েছে, তার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা। এরকম বলা— হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা করো এবং তাকেও ক্ষমা করে দাও।

www.eelm.weebly.com

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে খালেদ ইবনে মা'দান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভ্রাতার এমন পাপের কথা বলে তাকে লজ্জিত করে, যা থেকে সে তওবা করেছে, ওই ব্যক্তিও মৃত্যুর পূর্বে জড়িত হয়ে পড়ে ওই পাপে। তিরমিজি। উল্লেখ্য, খালেদ ইবনে মা'দানের সঙ্গে হজরত মুয়াজের সাক্ষাত ঘটেনি। সুতরাং বুঝতে হবে, তাঁদের দু'জনের মধ্যে রয়েছেন আর একজন বর্ণনাকারী, যার নাম অনুল্লেখিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌কে ভয় করো; আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক হও। বেঁচে থাকো নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে। আর ইতোমধ্যে গীবতের মতো গর্হিত অপরাধ যদি তোমাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েই যায়, তবে তার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হও। তওবা করো সর্বান্তঃকরণে। আল্লাহ্ সানুতপ্ত ও সলজ্জিত তওবাকারীদের তওবা কবুল করেন। আর তিনি তাঁর দাসগণের প্রতি অতিশয় দয়ালু। তাই তাদের কারো সম্মানহানি হোক, তা তিনি একদম পছন্দ করেন না। উল্লেখ্য, বিশুদ্ধচিত্ত তওবাকারী পাপবিমুক্ত ব্যক্তির মতো।

বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল বলেছেন, মক্কাবিজয়ের দিন রসুল স. এর নির্দেশে হজরত বেলাল কাবা গৃহের ছাদে উঠে আজান দিলেন। উব্বাদ ইবনে উসায়েদ তাঁকে আজান দিতে দেখে বললেন, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, এই দৃশ্য দেখার আগেই আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন। হারেছ ইবনে হিশাম বললো,

মোহাম্মদ এই কালো কাকটি ছাড়া কি আর কোনো মুয়াজ্জিন পেলো না? সুহাইল ইবনে আমর বললো, আল্লাহ্ চান তো এ অবস্থার পরিবর্তন হবেই। আবু সুফিয়ান বললো, আমি কোনো মন্তব্য করবো না। কেননা আমার ভয়, আকাশের প্রভু মোহাম্মদকে সেকথা জানিয়ে দিবেন। তাদের এসকল কথাবার্তা সম্পর্কে হজরত জিবরাইল রসুল স.কে অবহিত করলেন। রসুল স. তাদেরকে ডেকে বললেন, বলো তোমরা কি এই কথাগুলো বলোনি? তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করলো। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১৩

❑ হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।

এখানে 'হে বিশ্বাসীগণ' না বলে বলা হয়েছে 'হে মানুষ'! এরকম করার কারণ এই যে, তখন পর্যন্ত আবু সুফিয়ান ও তার বর্ণিত সঙ্গী সাথীরা ইসলাম গ্রহণ করেননি। অর্থাৎ এখানে প্রধানতঃ তাদেরকে লক্ষ্য করেই সম্বোধন করা হয়েছে 'হে মানুষ'! আবু মুলাইকার বরাত দিয়ে এই ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা। কিন্তু ইবনে আসাকের তাঁর 'মুবহামাত' গ্রন্থে লিখেছেন, আমি ইবনে বশকওয়ালের রচনায় পেয়েছি, আবু বকর ইবনে আবু দাউদ তাঁর তাফসীরগ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. বনী বিযাযাকে একবার হুকুম করলেন, তোমরা এর (জনৈক মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের) সঙ্গে তোমাদের গোত্রের এক রমণীর বিবাহ দিয়ে দাও। তারা বললো, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! আপনি কি আমাদেরই মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের সঙ্গে আমাদের বংশজাতার বিবাহ দিতে বলছেন? তাদের এমতো আপত্তির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে ছাবেত ইবনে কায়েস এবং তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের সম্পর্কে। একবার এক লোক তাকে সামনে অগ্রসর হতে বাধা প্রদান করলো। তিনি ওই লোককে বললেন, তুমি তো অমুক রমণীর পুত্র? রসুল স. একথা শুনতে পেয়ে বললেন, অমুক রমণীর নাম কে উচ্চারণ করলো? তিনি বললেন, আমি। রসুল স. বললেন,

www.eelm.weebly.com

তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের দিকে তাকাও। তিনি হুকুম তামিল করলেন। রসুল স. বললেন, কী দেখলে? তিনি জবাব দিলেন, দেখলাম, কেউ ফর্সা, কেউ কালো, আবার কেউ লাল। রসুল স. বললেন, মনে রেখো, তাদের উপরে তোমার মর্যাদা ধর্ম ও আল্লাহ্‌ভীতির কারণে। তখন তাঁর সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত এবং যে লোক তাঁকে সামনে অগ্রসর হতে দিচ্ছিলো না তার সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো 'হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হলো প্রস্তুত করো সমাবেশ'।

এখানে প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে'। একথার অর্থ— হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছি তোমাদের প্রথম পিতা আদম এবং তোমাদের প্রথম মাতা হাওয়া থেকে। অথবা অর্থ— হে মনুষ্যসমাজ! তোমাদের সকলকেই আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদের আপন পিতা ও আপন মাতা থেকে, তারা ছিলো এক জন পুরুষ ও একজন নারী। এভাবে অর্থ করলে হজরত আদম, হজরত হাওয়া এবং হজরত ঈসাকে ধরতে হবে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা তাঁদের প্রথমোক্তদ্বয়কে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন পিতা ব্যতিরেকে। সে যাই হোক, আলোচ্য বাক্যের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— মানুষের জন্মগত ও বংশগত মর্যাদার কোনো ভিত্তি নেই। কেননা তারা সকলে একই বংশোদ্ভূত। অথবা আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন সুদৃঢ় করবার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আর এমতো ভ্রাতৃত্ববোধই মানুষকে গীবতের মতো অপস্বভাব থেকে রক্ষা করতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে'। উল্লেখ্য, বংশের দিক দিয়ে আরবদের ছিলো ছোটো বড় ছয়টি পরিমণ্ডল। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ পরিমণ্ডলকে বলা হয় শাআ'ব। আর এই শাআ'ব হচ্ছে সকল বংশের মূল। সকলগোত্রই এর অন্তর্ভুক্ত। শাআ'ব অপেক্ষা ছোটো পরিমণ্ডলকে বলা হয় কবীল বা গোত্র। কবীলার শাখাগোত্র হচ্ছে আ'ম্মারা। আর আ'ম্মারার উপশাখা বতুন। প্রত্যেক বতুনের রয়েছে একাধিক আফখায। আফখাযগুলোর আবার রয়েছে বিভিন্ন আ'শায়ের। এই আ'শায়েরের চেয়ে ছোট পরিমণ্ডলের কোনো নাম নেই। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সম্মানার্হ জনমণ্ডলীকে বলা হয় আ'শীরা।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, গোত্রপরিচিতি হিসেবে 'শুউ'ব' ব্যবহৃত হয় অনারব জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে, 'কাবায়েল' ব্যবহৃত হয় আরব এবং 'আসবাত' ব্যবহৃত হয় বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের মধ্যে। আবু রওয়াক বলেছেন, 'শুউ'ব' পরিচিহ্নিত করা হয় ব্যক্তিবিশেষের নামে। কখনো আবার আখ্যায়িত হয় কোনো শহর অথবা জনপদের নামেও। আর 'কাবায়েল' হয় ঊর্ধ্বতন কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির নামে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো'। একথার অর্থ— বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী আমি সৃষ্টি করেছি এজন্য যে, যাতে করে তোমাদের একের অপরের সাথে পরিচিত হওয়া সহজ হয়, গোষ্ঠীগত গৌরব প্রকাশের জন্য নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট ওই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাক্বী'। একথার অর্থ— সর্বাপেক্ষা অধিক নিন্দনীয় যেমন 'ফাসেকী', তেমনি সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানজনক হচ্ছে 'তাক্বওয়া'। তাই যারা 'তাক্বওয়া' (আল্লাহ্‌ভীতি) অবলম্বনকারী তারাই আল্লাহ্‌র বিবেচনায় অধিক সম্মানসম্পন্ন।

হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব থেকে আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীপূজকদের কাছে সবচেয়ে সম্মানের বস্তু হচ্ছে বিত্তসম্পদ, আর আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে মর্যাদার বিষয় হচ্ছে তাক্বওয়া। তিরমিজি মন্তব্য করেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দুনিয়ার ইজ্জত হচ্ছে ধন-সম্পদ এবং আখেরাতের মর্যাদা হচ্ছে তাক্বওয়া।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, মক্কাবিজয়ের দিবসে রসুল স. তাঁর উষ্ট্রীতে আরোহণ করে কাবাগৃহ তাওয়াফ করলেন। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন হাতের যষ্টি দ্বারা। লোকজনের এতো ভীড় ছিলো যে, তিনি অবতরণের জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শেষে লোকজন ধরাধরি করে কোনোমতে তাঁকে উষ্ট্রী থেকে নামালো। এভাবে ভীড়ের মধ্যেই একস্থানে দাঁড়িয়ে তিনি ভাষণ দান করলেন। বললেন, সকল প্রশংসা-স্তুতি-স্তব সেই আল্লাহ্‌র, যিনি তোমাদেরকে মূর্খতার যুগের গোষ্ঠীগৌরবপ্রবণতা থেকে মুক্ত করেছেন। মানুষ দু'ধরনের। একধরনের মানুষ তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ সম্মানিত করেছেন। আর একধরনের মানুষকে তিনি করেছেন চিরদুর্ভাগা। তারা আল্লাহ্‌র নিকটে লাঞ্ছিত। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন 'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে......'। এভাবে এই আয়াতখানি সম্পূর্ণ পাঠ করার পর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে প্রকৃত কথা জানিয়ে দিলাম। আর তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করলাম। তিরমিজি, বাগবী।

www.eelm.weebly.com

তিবরানী তাঁর 'আলআওসাত' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ তাঁর জনৈক ঘোষকের মাধ্যমে ঘোষণা করাবেন, শোনো হে মনুষ্যসমাজ। আমি তোমাদের জন্য একটি মর্যাদার বিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম। তোমরা নির্ধারণ করে নিয়েছিলে অন্য একটি মর্যাদার বিষয়। আমি মুত্তাকীগণকে সর্বাধিক সম্মানিত সাব্যস্ত করেছিলাম। কিন্তু তোমরা তা মান্য করোনি। তোমরা সচরাচর বলতে অমুকের পুত্রের চেয়ে অমুকের পুত্র উত্তম। আজ আমি আমা কর্তৃক নির্ধারিত মর্যাদাকে করবো সমুন্নত এবং অবমানিত করবো তোমাদের নির্ধারিত মর্যাদাকে। এরপর ঘোষক আহ্বান করতে থাকবে, হে মুত্তাকীগণ! তোমরা কোথায়?

হজরত আবু হোরায়রা আরো বর্ণনা করেছেন, একদা রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে অধিক সম্মানিত কে? তিনি স. বললেন, যে অধিক মুত্তাকী। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, আমরা তো এ বিষয়টি জানতে চাইনি। তিনি স. বললেন, ব্যক্তি ও বংশ পরিচিতি অনুসারে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ এর অন্তর্ভূত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমরা এ বিষয়েও প্রশ্নের অবতারণা করিনি। আমরা জানতে চেয়েছি, আরব বংশোদ্ভূতদের সম্পর্কে। তিনি স. জবাব দিলেন, মূর্খতার যুগে যে আরব উত্তম ছিলো, ইসলামী যুগেও সে উত্তম, যদি সে শুভবুদ্ধিবিবেকসম্পন্ন হয়। বোখারী।

মুসলিম ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের চেহারা ও বিত্তবৈভবের প্রতি লক্ষ্য করেন না, লক্ষ্য করেন তোমাদের হৃদয় ও শুভকর্মসমূহের প্রতি।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। তাই সকলের প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত।

বাগবী লিখেছেন, বনী আসাদ গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক দুর্ভিক্ষের বৎসর রসুল স. এর দরবারে হাজির হলো। বাইরে বাইরে তারা মুসলমান ছিলো। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা তখন পর্যন্ত ইসলামকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের আচার আচরণও ছিলো অশিষ্ট। তারা যত্রতত্র মলমুত্র ত্যাগ করে মদীনার রাস্তাঘাট করে তুললো দুর্গন্ধময়। তাদের জন্য বাজারের দ্রব্যমূল্যও হয়ে গেলো ঊর্ধ্বগতি। তারা সকাল-সন্ধ্যায় রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বলতে শুরু করলো, অন্যান্য লোক আপনার দরবারে আসে উটের পিঠে চড়ে একা একা। আর আমরা দেখুন, আপনার কাছে হাজির হয়েছি আমাদের মালপত্র, পরিবার পরিজন সবকিছু নিয়ে। অমুক অমুক গোত্র আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলো। কিন্তু আমরা কখনোই সেরকম করিনি। এভাবে তারা এমন এমন কথা বলতে শুরু করলো, যাতে করে মনে হতে লাগলো, তারা যেনো ইসলাম গ্রহণ করে রসুল স. এর মহাউপকার করেছে। আর সে কারণে তাঁর দান-অনুদান পাওয়ার তারাই অধিক যোগ্য। তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াতসমূহ। বলা হলো—

সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

www.eelm.weebly.com

❑ বেদুঈনরা বলে, 'আমরা ঈমান আনিলাম'। বল, 'তোমরা ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, 'আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি', কারণ ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হইবে না। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

❑ তাহারাই মু'মিন যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তাহারাই সত্যনিষ্ঠ।

❑ বল, 'তোমরা কি তোমাদের দীন সম্পর্কে আল্লাহ্কে অবহিত করিতেছ? অথচ আল্লাহ্ জানেন যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যাহা কিছু আছে পৃথিবীতে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।'

❑ উহারা আত্মসমর্পণ করিয়া তোমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করে। বল, 'তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করিও না, বরং আল্লাহ্ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়া তোমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

❑ আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

ইমাম সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল মরুচারী সম্পর্কে, যাদের কথা আল্লাহ্ বিবৃত করেছেন সুরা আল ফাতাহ্তে। তারা ছিলো জুহায়না, মুযায়না, আসলাম, আশ্জাআ ও গিফার গোত্রের বেদুইনগণ। মুসলমানদের উপর্যুপরি বিজয় দর্শনে তারা প্রভাবিত হয় এবং তাদের

জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য মুখে মুখে বলতে থাকে 'আমরা ইমান আনলাম' 'আমরা ইমান আনলাম'। কিন্তু রসুল স. যখন তাদেরকে তাঁর হোদায়বিয়া যাত্রার সঙ্গী হতে বললেন, তখন তারা অবলম্বন করলো পশ্চাদপসরণ নীতি।

এখানে প্রথমে বলা হয়েছে— 'বেদুইনেরা বলে, আমরা ইমান আনলাম। বলো, তোমরা ইমান আনোনি, বরং তোমরা বলো, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। কারণ, ইমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! যে সকল মরুচারী মুখে মুখে 'আমরা ইমান আনলাম' বলে, আপনি তাদেরকে বলুন, না, তোমরা ইমান আনোনি। মুখে মুখে ইমানের ঘোষণা দিচ্ছো মাত্র বরং তোমরা বলতে পারো— আমরা ইসলামের অব্যাহত জয়-যাত্রার নিকটে নতি স্বীকার করেছি। ইমান বলে হৃদয়ের বিশুদ্ধ বিশ্বাসকে। মৌখিক ঘোষণা ওই ইমানের বাহ্যিক অনুষঙ্গ মাত্র। অবশ্য ইসলামের বিধি-বিধান প্রয়োগ করা হয়ে থাকে মৌখিক ঘোষণার উপরেই। আর তোমরা তো এখন পর্যন্ত ইমানের মৌখিক ঘোষণাই দিয়ে যাচ্ছো। তোমাদের অন্তর এখন পর্যন্ত ইমানের স্পর্শচ্যুত।

রসুল স. বলেছেন, ইমান হচ্ছে আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাবৃন্দ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসুলবর্গ ও কিয়ামত দিবসকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা। আর বিশ্বাস স্থাপন করা তাকদীরের ভালোমন্দের উপরে। হজরত জিবরাইলের এক প্রশ্নের জবাবে রসুল স. এরকমই বলেছিলেন। হাদিসটি হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে সুপরিণত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো, তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণেও লাঘব করা হবে না। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— ঠিক আছে, অতীতে তোমরা যা কিছু করেছো, তাতো করেছোই। এবার তোমাদের মৌখিক ঘোষণাটিকে বাস্তবরূপ দাও। সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের আনুগত্য করো। যদি এরকম করো, তবে তোমাদের কর্মফল হবে উত্তম। লাভ করবে তোমরা তোমাদের পুণ্যপ্রচেষ্টাসমূহের পূর্ণ

www.eelm.weebly.com

প্রতিদান। আল্লাহ্ যেমন তোমাদের অতীতের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন, তেমনি প্রোজ্জ্বল করবেন তোমাদের ভবিষ্যত। কারণ, তিনি ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়াময়।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ'। একথার অর্থ— তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি যাদের আস্থা নিঃসন্দিগ্ধ। যারা রসুলের আনীত ধর্মাদর্শ সম্পর্কে বিন্দুপরিমাণ সন্দেহকেও প্রশ্রয় দেয় না এবং আল্লাহ্র পথে যারা জেহাদ করে তাদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা, তারাই সত্যাধিষ্ঠিত। উল্লেখ্য, এখানে 'পরে' (ছুম্মা) শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে একথাটিই

বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ইমানের প্রারম্ভিক অবস্থা যেমন সন্দেহবিমুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক, তেমনি সন্দেহমুক্ত হওয়া অপরিহার্য তার শেষ অবস্থাও। অর্থাৎ আজীবন ইমানকে সন্দেহবিবর্জিত রাখতেই হবে। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'ছুম্মাস্ তাক্বমু' (অতঃপর অবিচলিত থাকে)। অর্থাৎ ইমান আনার পর ওই ইমানেই দৃঢ়পদ থাকো।

'ওয়া জ্বাহাদু বিআম্ওয়ালিহিম্ ওয়া আন্ফুসিহিম্' অর্থ এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। 'ফী সাবীলিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র পথে। অর্থাৎ যারা তাদের জানমাল দিয়ে সশস্ত্র বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ্র শত্রুদের, অথবা জিকির ও ইবাদতে তাদের জীবন, সময় ও সম্পদ ব্যবহার করে অনড় প্রতিপক্ষ হয় কুপ্রবৃত্তির এবং শয়তানের। এরকমও হতে পারে যে, এখানে কর্মকারক উহ্য নয়। আর অকর্মক ক্রিয়ার মধ্যে এখানে প্রাবল্য সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যারা আল্লাহ্র পথে সফল হবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা চালায়। আবার 'জেহাদ' অর্থ এখানে শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত—নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি হয়ে থাকতে পারে।

সাধারণ অর্থ গ্রহণ করা হলে এখানে 'জেহাদ করে' অর্থ হবে আল্লাহ্র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহ যথাযথভাবে পালন করে। আর বিশেষ অর্থ গ্রহণ করা হলে বুঝতে হবে, এখানে 'জেহাদ করে' অর্থ যারা আল্লাহ্র প্রতি আক্রমণপ্রবণ শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এরকম অর্থ গ্রহণ করলেও অভ্যন্তরীণ জেহাদের (নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ) বিষয়টিও প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ্র পথের বীর মুজাহিদেরা ব্যক্তিস্বার্থে কখনো যুদ্ধ করে না। যুদ্ধ করে কেবল আল্লাহ্র সন্তোষসাধনার্থে মহাসত্য ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য, পৃথিবীবাসীকে সংশোধনের জন্য, উৎখাতের জন্য নয়। এমতাবস্থায় মুজাহিদেরা হয়ে যায় নিজের নফসকে উৎসর্গকারী এবং শরিয়তের বিধিবিধানের একান্ত অনুগত। আর এখানে 'হুমুস্ সদিক্বীন' অর্থ তারাই সত্যনিষ্ঠ। অর্থাৎ ইমানের দাবিতে তারাই সত্যনিষ্ঠ।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা কি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহ্কে অবহিত করছো? অথচ আল্লাহ্ জানেন, যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত'। উল্লেখ্য, ১৪ ও ১৫ সংখ্যক আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হওয়ার পরেও ওই মরুচারীরা মৌখিকভাবে বলতে লাগলো, সত্যি সত্যিই আমরা ইমানদার। তখন অবতীর্ণ হলো ১৬ ও ১৭ সংখ্যক আয়াত। প্রথমোক্তটিতেই নাকচ করা হলো তাদের দাবিকে। শাসানো হলো— তোমরা মনে করেছো কী? তোমরা কি আল্লাহ্কেই জ্ঞানদান করতে চাও? অথচ তিনি সর্বজ্ঞ। আকাশ-পৃথিবীর সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত। তিনি যে সর্বজ্ঞ। সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞানী। প্রকাশ্য গোপন সকল কিছুই তাঁর জানা। সুতরাং এখনো সময় আছে, সংশোধিত হও। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'তারা আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলো, তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করেছে মনে কোরো না, বরং আল্লাহ্ই ইমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। একথার অর্থ হে আমার রসুল! তারা ভাবছে, ইমান আনলে আপনাকে কৃতার্থ করা হবে। আপনি তাদেরকে বলুন, হে ইমানের মৌখিক দাবিদারেরা! তোমরা যদি আন্তরিক ইমানও এনে থাকো, তবে এরকম ধারণা কোরো না যে, তোমরা আমাকে কৃতার্থ করেছো। বরং মনে রেখো যে, ইমানের পথে পরিচালিত করে আল্লাহ্ই তোমাদেরকে অনুগৃহীত ও কৃতার্থ করেছেন। যদি তোমরা সত্যি সত্যিই ইমানের দাবিতে সত্যনিষ্ঠ হও, তবে এরকম শুভধারণা রাখা তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। কেননা প্রকৃত অবস্থা এরকমই।

উত্তম সূত্রপরম্পরায় হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা থেকে তিবরানী, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে বায্যার এবং হাসান বসরী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, কতিপয় যাযাবর একবার রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বলতে শুরু করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা মুসলমান হয়েছি। ইতোপূর্বেও কখনো আমরা আপনার

www.eelm.weebly.com

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি। যুদ্ধ করেছে অমুক অমুক গোত্রের লোকেরা। পরবর্তীতে অবশ্য তারা সকলেই মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। হাসান বলেছেন, ঘটনাটি ঘটেছিলো মক্কাবিজয়ের পূর্বে।

'আন হাদাকুম লিল ঈমান' অর্থ আল্লাহ্ই ইমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন। অর্থাৎ ইমানের এই অনুপ্রেরণা হচ্ছে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার অযাচিত করুণা। আর 'ইন কুনতুম সদিক্বীন' অর্থ যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অর্থাৎ ইমানের দাবিতে তোমরা সত্যবাদী যদি হয়েই থাকো, তবে নিশ্চয় একথা বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ্তায়ালাই তাঁর অপার করুণাবশে তোমাদেরকে ইমানের মতো অমূল্য সম্পদ দানে ধন্য করেছেন। 'জুমলায়ে শরতিয়া' বা শর্তযুক্ত এই বাক্যটির মাধ্যমে এখানে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ওই সকল যাযাবরদের সকলেই ইমানের দাবিতে সত্যবাদী ছিলো না।

শেষোক্ত আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন'। একথার অর্থ— আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সকল অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ। সুতরাং তোমরা কস্মিনকালেও এমনটি ভেবোনা যে, আন্তরিকভাবে বিশ্বাস না আনলেও তোমাদেরকে তিনি ইমানদাররূপে গণ্য করবেন।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী সূত্রে ইবনে সা'দ এবং সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে সাঈদ ইবনে মনসুর বর্ণনা করেছেন, নবম হিজরী সনে বনী আসাদ গোত্রের দশজন লোক রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হলো। তালহা ইবনে খুয়াইলিদও ছিলেন তাদের মধ্যে। রসুল স. কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে সালাম বললো। তারপর তাদের মধ্যে একজন বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো

উপাস্য নেই এবং আপনি তাঁর বান্দা ও রসুল। আপনি আমাদের কাছে কোনো প্রতিনিধি প্রেরণ করেননি। আপনার পবিত্র দরবারে আমরা হাজির হয়েছি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। আমরা আমাদের আপনাপন গোত্রের পক্ষ থেকে আপনার নিকটে নিয়ে এসেছি সন্ধির প্রস্তাব। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতসমূহ।

সূরা ক্বফ

এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে পুণ্যভূমি মক্কায়। এর মধ্যে রয়েছে ৩টি রুকু এবং ৪৫ টি আয়াত।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ১

❑ ক্বফ্, শপথ সম্মানিত কুরআনের

এই কথাটিই সমধিক শুদ্ধ যে, এখানকার 'ক্বফ' বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজির অন্তর্ভূত। অন্যান্য সুরার বিচ্ছিন্ন বর্ণসমূহের মতো এই বর্ণটিও রহস্যাচ্ছন্ন ও দুর্জ্ঞেয়। এর প্রকৃত মর্ম জানেন কেবল আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং অতি নগণ্যসংখ্যক বিদ্বান, যাদেরকে বলা হয় 'জ্ঞানে সুগভীর' (ওলামায়ে রসিখীন) কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, 'ক্বফ' হচ্ছে সুরার নাম। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কোরআন মজীদেরই এক নাম 'ক্বফ'।

ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, 'ক্বদীর' 'ক্বহির' 'ক্বরীব' ও 'ক্ববিদ্ব'— এই নামগুলো আল্লাহ্র গুণবত্তাপ্রকাশক নাম। আর এগুলোর কুঞ্জি হচ্ছে 'ক্বফ' বর্ণটি। কেউ কেউ বলেছেন, 'ক্বফ' অক্ষরটির দ্বারা এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে 'ক্বদ্বীয়াল আমরু' (প্রকৃত বিষয় সংঘটিত হয়েই গিয়েছে) অথবা বলা হয়েছে 'ক্বদ্বীয়া মাহুয়া কায়িনূন' (যা হবার তা হয়েই গিয়েছে)। এতদসত্ত্বেও প্রকৃত কথা এটাই যে, এখানকার 'ক্বফ' বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি বা হরফে মুক্বাত্তায়া'তের অন্তর্ভূত।

'ওয়াল কুরআনিম মাজীদ' অর্থ শপথ সম্মানিত কোরআনের। 'ওয়াও' অক্ষরটি এখানে শপথপ্রকাশক অব্যয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'ক্বফ' একটি শপথপ্রকাশক ক্রিয়াপদ। আর 'ক্বফ' এর পরের 'ওয়াও' হচ্ছে সংযোজক অব্যয়। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— শপথ 'ক্বফ' এর এবং কোরআন মজীদের।

'আল মাজ্বীদ' অর্থ মহাসম্মানিত। অর্থাৎ মহাগ্রন্থ আল কোরআন অন্যান্য আসমানী কিতাব অপেক্ষাও অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন। অথবা এর অর্থ— যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করে, এর মর্মার্থ বোঝে এবং এর বিধি-বিধানানুসারে চলে, সে

হয়ে যায় প্রভূত মর্যাদার অধিকারী। এখানে শপথের প্রত্যুত্তর রয়েছে প্রচ্ছন্ন। ওই প্রচ্ছন্নতাসহ মর্মার্থ দাঁড়ায়— শপথ কোরআন মজীদের, যিনি কিয়ামত দিবস সম্পর্কে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে চলেছেন, নিঃসন্দেহে তিনি সত্য রসুল। কারো কারো

www.eelm.weebly.com

মতে কসমের জবাব হচ্ছে এই আয়াত 'মা ইয়ালফিজু মিন ক্বওলিন ইল্লা লাদাইহি রক্বীবুন আ'তীদ'। কুফাবাসী ক্বারীগণ এরকম বলেন। আবার কারো কারো মতে শপথের জবাব হচ্ছে 'ক্বদ্ আলীম্না মা তানক্বুসুল আরদ্ব'।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ২, ৩, ৪, ৫

❑ বরং তাহারা বিস্ময় বোধ করে যে, উহাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হইয়াছে, আর কাফিররা বলে, 'ইহা তো এক আশ্চর্য ব্যাপার!

❑ 'আমাদের মৃত্যু হইলে এবং আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হইলে আমরা কি পুনরুত্থিত হইব? সুদূরপরাহত সেই প্রত্যাবর্তন।'

❑ আমি তো জানি মৃত্তিকা ক্ষয় করে উহাদের কতটুকু এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত কিতাব।

❑ বস্তুত উহাদের নিকট সত্য আসিবার পর উহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ফলে, উহারা সংশয়ে দোদুল্যমান।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বরং তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হয়েছে'। এখানে 'বাল্' (বরং) এর প্রকৃত অর্থ হবে— 'ক্বদ' (নিশ্চয়)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— নিশ্চয় মক্কার পৌত্তলিকেরা একথা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছে যে, তাদের মধ্য থেকেই কেউ একজন রসুল হতে পারে কীভাবে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণই নেই। কেননা যিনি রসুল বলে দাবি করছেন, তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। এযাবতকাল পর্যন্ত তারা দেখে এসেছে তিনি সতত সত্যভাষী ও সার্বক্ষণিক বিশ্বাসভাজন। আর তিনি সর্ববিষয়ে তাদের সুহৃদ ও কল্যাণকামী। যে কারণে আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করাই তো তার পক্ষে স্বাভাবিক। আর যিনি এরকম করেন, তিনিই তো আল্লাহ্র রসুল। সুতরাং তাদের তাজ্জব বনে যাওয়ার কিছু তো এখানে নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, একবার কুরায়েশ গোত্রের সকলকে একত্র করে রসুল স. বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে এখন একথা বলি যে,

তাফসীরে মাযহারী/৫৭

পাহাড়ের অপর প্রান্ত থেকে একদল শত্রুসেনা তোমাদেরকে আক্রমণ করতে উদ্যত, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা বললো, হ্যাঁ। কারণ আমরা জানি তুমি সত্যবাদী। তিনি স. বললেন, তাহলে শোনো, আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি আল্লাহ্র আযাব থেকে। বোখারী, মুসলিম।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফা ক্বলাল কাফিরূনা হাজা শাইউন আ'জ্বীব' (আর কাফেরেরা বলে, এটা তো এক আশ্চর্য ব্যাপার)। এখানকার 'ফা' হচ্ছে বর্ণনামূলক অব্যয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যান- কারীদের বিস্ময়াপন্নতাকে। আর 'হাজা' (এটা) হচ্ছে এখানে ইঙ্গিতসূচক। অর্থাৎ এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে রসুল স. এর রেসালতের দাবির দিকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— এটা (রসুল স. এর রসুল হওয়াটা) যে বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার। আর এখানে সর্বনাম (তারা) না বসিয়ে সরাসরি 'কাফিরূনা' (কাফেরেরা) বলে এটাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র রসুলকে যারা অস্বীকার করে, তারা যে কাফের, সেকথা বলাই বাহুল্য। আবার এরকমও হতে পারে যে, 'ফা' অক্ষরটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অনুক্রম বুঝানোর জন্য। আর 'হাজা' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে মৃত্যুপরবর্তী জীবনের দিকে। অর্থাৎ পুনুরুত্থান তো এক আশ্চর্য ব্যাপার। অথবা এখানকার 'হাজা'র অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত এখানে রয়েছে প্রচ্ছন্ন, যা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (৩)।

বলা হয়েছে— 'আমাদের মৃত্যু হলে, আমরা কি পুনরুত্থিত হবো? সুদূরপরাহত সেই প্রত্যাবর্তন'। এখানকার 'আমাদের মৃত্যু হলে' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই উহ্যতা সহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমরা মরার পর যখন মাটিতে মিশে যাবো, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা সম্ভব হবে? বিষয়টি তো স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের দিক থেকে সুদূরপরাহত।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আমি তো জানি মৃত্তিকা ক্ষয় করে তাদের কতোটুকু'। একথার অর্থ— আমি সর্বজ্ঞ। সুতরাং মৃত্যুর পর মানুষের মরদেহের কী পরিণতি হয়, দেহের অণুপরমাণুগুলো কোথায় কীভাবে কিসের সঙ্গে

কতোটুকু একিভূত হয়ে থাকে, তা আমি জানি। সুতরাং সেগুলোকে একত্র করা এবং তাতে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার করা আমার কাছে অসহজ ও অসম্ভব কিছু নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত কিতাব'। একথার অর্থ— তাছাড়া আমার তো রয়েছে সুরক্ষিত ফলক লওহে মাহফুজে। ওই ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে সমগ্র সৃষ্টির সকল বিষয়ের আদি অন্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, যা সৃষ্টির দিকের কারো বা কোনোকিছুর পরিযোজনা ও পরিবিয়োজনা থেকে চিরমুক্ত। সুতরাং মানুষের মৃত্যু অথবা জীবন কোনোকিছুই তো আমার হিসাবের বাইরে নয়। সুতরাং তাদের সমাহিতি ও পুনরুত্থিতি সম্পূর্ণরূপে আমার অভিপ্রায়, জ্ঞান ও ক্ষমতায়ত্ত।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'বস্তুত তাদের নিকট সত্য আসবার পর তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে তারা সংশয়ে দোদুল্যমান'। একথার অর্থ—প্রত্যাদেশ ও মোজেজা দ্বারা যে রেসালত সুসাব্যস্ত, তাকে তারা বিনা বিচারে প্রত্যাখ্যান করছে। এরকম সুসাব্যস্ত বিষয়ের অস্বীকৃতি জ্ঞান ও বুদ্ধিবিরোধী। তাই তারা সত্য থেকে পতিত হয়েছে ঘোর সংশয়ে, দ্বিধাদ্বন্দ্বে ও দোদুল্যমানতায়।

'মারীজ্ব' অর্থ এখানে দোদুল্যমানতা, বিশ্বাসবিচ্যুতি অর্থাৎ তারা এরকম সংশয়াচ্ছন্নতায় নিপতিত হয়েছে রেসালতকে অবিশ্বাস করার কারণেই। কাতাদা ও হাসান বলেছেন, যে ব্যক্তি সত্য পরিত্যাগ করে, তার আচরণ ও ধর্মপরায়ণতা হয়ে পড়ে সন্দেহাচ্ছন্ন। জুজায বলেছেন, দৃঢ়তা বলতে তাদের কিছুই ছিলো না। তাই রসুল স.কে তারা কখনো বলতো কবি, কখনো বলতো যাদুকর, কখনো বলতো 'অমুক লোক তাকে কোরআন শিক্ষা দেয়'। আবার কখনো তাকে বলতো মিথ্যাবাদী, কখনো বলতো উন্মাদ। এভাবে মুহুর্মুহু ঘটাতো তাদের ধারণান্তর।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

❑ উহারা কি উহাদের ঊর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে না, আমি কিভাবে উহা নির্মাণ করিয়াছি ও উহাকে সুশোভিত করিয়াছি এবং উহাতে কোন ফাটলও নাই?

❑ আমি বিস্তৃত করিয়াছি ভূমিকে ও তাহাতে স্থাপন করিয়াছি পর্বতমালা এবং উহাতে উদগত করিয়াছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ,

❑ আল্লাহ্‌র অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ।

❑ আকাশ হইতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি,

❑ ও সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ যাহাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর—

❑ আমার বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এইভাবে উত্থান ঘটিবে।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে—মক্কার মুশরিকেরা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, মনে করে আমি পুনঃসৃষ্টিতে অক্ষম। অথচ তাদের সামনেই সতত পরিদৃশ্যমান রয়েছে আমার ক্ষমতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবী। সুতরাং তারা আকাশের দিকে অভিনিবেশী দৃষ্টিপাত করে না কেনো? কেনো ভাবে না যে, আমার নির্মাণশৈলী কীরূপ পরিপূর্ণ ও নিখুঁত? আর কীভাবে আমি আকাশকে সুসজ্জিত করেছি সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা। এই সুবিশাল আকাশের কোথাও কোনো ছিদ্র অথবা ফাটলও তো নেই। পৃথিবীও তো আমার অপার শক্তিমত্তার অনন্য নিদর্শন। আমি পৃথিবীপৃষ্ঠকে বিস্তৃত, বাসযোগ্য করেছি এবং এর

www.eelm.weebly.com

উপরে স্থাপন করেছি পাহাড়-পর্বত। তদুপরি নয়নমুগ্ধকর বৃক্ষরাজি দ্বারা আমি এই পৃথিবীকে করেছি ছায়াময়, মায়াময়। এসকল কিছুই হচ্ছে তাদের জন্যই জ্ঞানোপকরণ ও সদুপদেশসম্ভার, যারা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসে।

৬ সংখ্যক আয়াতের শুরুর 'হামযা'টি এখানে প্রশ্নবোধক ও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। আর এর পরের বর্ণ 'ফা' এর সংযোগ রয়েছে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করে, অথচ আমার অপার ক্ষমতার পরিদৃশ্যমান নিদর্শন আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিশৈলীর প্রতি অভিনিবেশী হয় না কেনো? এভাবে মক্কার মুশরিকদেরকে শাসানোও হয়েছে এখানে।

'কাইফা বানাইনাহা ওয়া যাইয়্যান্‌নাহা' অর্থ আমি কীভাবে তা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি। 'ওয়া মা লাহা মিন ফুরূজ্ব' অর্থ এবং এতে কোনো ফাটলও নেই। 'ওয়া আলক্বইনা ফীহা রওয়াসিয়া' অর্থ এবং তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা। 'মিন কুল্‌লি যাওজ্বিম বাহীজ্ব' অর্থ তাতে উদগত করেছি নয়নপ্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ। 'বাহিজ' অর্থ নয়নপ্রীতিকর, দৃষ্টিসুখকর। আর 'তাব্‌সিরাতাও ওয়া জিক্‌রা' অর্থ জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— আকাশ থেকে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি (৯), ও সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ-গুচ্ছ খেজুর— (১০) আমার বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এভাবে উত্থান ঘটবে'(১১)।

এখানে 'মুবারকান' অর্থ কল্যাণকর, উপকারপ্রদায়ক। 'ফা আমবাতনা বিহী জ্বান্‌নাতিন' অর্থ এবং তদ্দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান। আর এখানকার 'হাব্‌বাল হাসীদ' অর্থ পরিপক্ক শস্যরাজি। অর্থাৎ ওই সকল শস্য, যা কর্তন করা যায় এবং পরবর্তীতে যা ব্যবহার করা যায় খাদ্যরূপে। যেমন গম, যব, ধান ইত্যাদি। শস্যকে এখানে 'পরিপক্ক' এর সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বন্ধিত করা হয়েছে সে কারণেই। কেননা শস্য বপনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে খাদ্য সামগ্রী আহরণ করা। এরকম বিশেষ সম্বন্ধ সৃষ্টি করার দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। যেমন 'হাক্কুল ইয়াক্বীন' 'কুল্‌লুদ্‌দারাহিমা' 'আইনাশ শাই' ইত্যাদি। আবার এরকমও হতে পারে যে, সম্বোধন পদের বিশেষণটি এখানে রয়েছে উহ্য। কেননা 'মাসজ্বিদুল' জ্বামিউ অর্থ

জামে মসজিদ অর্থাৎ 'মসজ্বিদুস সালাতিল জ্বামিঈ' অর্থ নামাজের জামে মসজিদ। আবার 'সালাতুল উলা' অর্থ প্রথম নামাজ, অর্থাৎ 'সালাতুস সাআ'তিল উলা' অর্থ প্রথম সময়ের নামাজ। তেমনি 'হাব্‌বাল হাসীদ' অর্থ 'হাব্‌বায্ যারআল হাসীদ'। অর্থাৎ ওই শস্য সম্ভার যা পরিপক্ক, কর্তনের উপযুক্ত।

'নাখলা বাসিক্বাতিন' অর্থ সমুন্নত খর্জুরবৃক্ষ, লম্বা লম্বা খেজুরের গাছ। খেজুরের গাছ সাধারণত দীর্ঘই হয়। তাই এখানে খেজুরের গাছের কথা উল্লেখ করা হয়েছে পৃথকভাবে, বিশেষত্বের সঙ্গে। অথবা অর্থ হবে বোঝা বহনকারী। যেমন গর্ভবতী ছাগীকে বলা হয় 'বাসাক্বতিশ্ শাত'। রসুল স. একবার বললেন, মুসলমানের উপমা এমন বৃক্ষ, যার পাতা ঝরে না। বলতো দেখি, সে বৃক্ষ কোনটি? তাঁর কথা শুনে সাহাবীগণ প্রান্তরের বৃক্ষরাজির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তিনি স. তখন নিজেই বললেন, সে বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ। বোখারী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে।

রসুল স. আরো আজ্ঞা করেছেন, তোমরা তোমাদের ফুফুর (খেজুর গাছের) সম্মান করো। খেজুর গাছকে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের পিতা আদমের শরীরের মাটির অবশিষ্টাংশ থেকে। আর খেজুর গাছের নিচেই পবিত্র মাতা মরিয়ম বিনতে ইমরানের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তাঁর পবিত্র পুত্র ঈসা। তাই আল্লাহ্‌র কাছে সকল বৃক্ষের চেয়ে খেজুর বৃক্ষের সম্মান অধিক। তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গকে তাজা খেজুর খাওয়াও। না পেলে খাওয়াও শুকনো খেজুর। হাদিসটি 'মসনদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ইবনে আবী হাতেম ও আবী ইয়ালা। ইবনে আদী লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'আলকামিল' কিতাবে এবং ইবনে আনাস ও আবু নাঈম 'আত্‌তিব্' পুস্তকে। আর ইবনে মারদুবিয়া হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আলী থেকে।

'লাহা তাল্‌উ'ন্ নাদ্বীদ্' অর্থ গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর। 'তাল্‌উ'ন' বলে ফল বা গাছের ওই অংশকে, যেখান থেকে ফলের সূচনা হয়। 'নাদ্বীদ্' অর্থ গুচ্ছ গুচ্ছ, সুবিন্যস্ত। অর্থাৎ সুপ্রচুর। 'রিয্‌কাল্ লিল্‌ই'বাদ' অর্থ আমার বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। কথাটি 'আমবাত্ না' ক্রিয়ার 'মাফউলে লাহু' (তৎসন্নিবিষ্ট কর্মপদ)। অর্থাৎ শস্য-রাজিকে পরিপক্ক করা হয় আমার বান্দাদের জীবিকা সরবরাহের উদ্দেশ্যে। অথবা 'জীবিকাস্বরূপ' কথাটি এখানে 'মাফউলে মুতলক' (সাধারণ কর্মপদ)ও হয়ে থাকতে পারে। এভাবে 'আমবাত্' ও 'রিজিক' পৃথক পৃথক শব্দ হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের বিষয়বস্তু হবে অভিন্ন। 'ওয়া আহ্‌ইয়াইনা বিহী বাল্‌দাতাম্ মাইতা' অর্থ বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃতভূমিকে। আর 'কাজালিকাল খুরুজ্ব' অর্থ এভাবে উত্থান ঘটবে। অর্থাৎ যেভাবে আমি মৃত সদৃশ বিশুষ্কভূমিকে সঞ্জীবিত করি, সেভাবেই পুনরুত্থান দিবসে মৃতদেরকে করবো জীবিত।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা একবার এক জনসমাবেশে বললেন, রসুল স. বলেছেন, শিঙ্গার দুই ফুৎকারের ব্যবধান হবে চল্লিশ। উপস্থিত জনতা জিজ্ঞেস করলো, হে রসুল-সহচর! চল্লিশ মানে কি চল্লিশ

www.eelm.weebly.com

দিন? তিনি বললেন, জানি না। তারা আবার জিজ্ঞেস করলো, তাহলে কি চল্লিশ মাস? তিনি জবাব দিলেন, তা-ও জানি না। তারা পুনরায় প্রশ্ন করলো, তবে কি আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন চল্লিশ বৎসরের কথা? তিনি বললেন, তা-ও না। রসুল স. এ বিষয়টি নির্দিষ্ট করে বলেননি। কেবল বলেছেন, অতঃপর আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ফলে মানুষ তাদের আপনাপন কবরে এমনভাবে উঠে দাঁড়াবে, যেমন ভাবে মৃত্তিকায় মাথা তুলে দাঁড়ায় বৃক্ষের চারা। অথচ তৎপূর্বে নিতম্বের এক অস্থি ছাড়া তাদের অন্য সকল কিছুই মিশে থাকবে মাটিতে। পুনরুত্থান দিবসে মানুষকে পুনর্জীবন দান করা হবে ওই একটি মাত্র অস্থির ভিত্তিতে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবী দাউদও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় স্পষ্ট করে একথা বলা হয়েছে যে, দুই শিঙ্গাধ্বনির মধ্যবর্তী ব্যবধান হবে চল্লিশ বৎসরের।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, দুই শিঙ্গাধ্বনির মধ্যবর্তী সময়ে আরশের তলদেশ থেকে নেমে আসবে পানির প্রবাহ। আর ওই মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ বৎসরের। আরশাগত ওই পানিপ্রবাহে সিক্ত হয়ে তখন পুনরুজ্জীবিত হবে সকল মৃত ও বিনাশপ্রাপ্ত মানুষ, চতুস্পদ জন্তু ও পক্ষীকুল। মনে হবে যেনো মাটিতে অঙ্কুরিত হচ্ছে নতুন বৃক্ষচারা। তখন পুনরুজ্জীবিত মানুষেরা চেনা লোকদেরকেও চিনতে পারবে না। তাদের দেহের সঙ্গে আত্মার সম্পৃক্তি ঘটানো হবে দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনির পর। অন্য এক আয়াতে 'ইজান্নুফূসু যুব্যিজ্বাত্' বলে সেকথাই বোঝানো হয়েছে।

হজরত আনাস থেকে আবু ইয়ালা ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে মানুষকে কবর থেকে ওঠানো হবে। তখন আকাশ থেকে তাদের উপরে পতিত হবে পানির ঝর্ণা।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ১২, ১৩, ১৪, ১৫

❑ উহাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস্ ও ছামূদ সম্প্রদায়,

❑ 'আদ, ফির'আওন ও লূত সম্প্রদায়

❑ এবং আইকার অধিবাসী ও তুব্বা' সম্প্রদায়; উহারা সকলেই রাসূলদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, ফলে উহাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হইয়াছে।

❑ আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি! বস্তুত সৃষ্টি বিষয়ে উহারা সন্দেহে পতিত।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মাধ্যমে রসুল স.কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী যুগের নবী-রসুল ও তাঁদের অবাধ্য উম্মতের শোচনীয় পরিণতির উল্লেখ করে যেনো একথাই বলতে চাওয়া হয়েছে যে, হে আমার প্রিয়তম রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দুর্বিনীত আচরণে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। সত্যবিদ্বেষীদের চিরাচরিত স্বভাব এরকমই। তাদের পূর্বসূরীরাও তাদের নিজ নিজ নবীগণকে বিভিন্নভাবে ক্লেশ প্রদান করতো। ওই দুর্বৃত্তদেরকে আমি কঠোর শাস্তি দিয়েছি। সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকুন যে আপনার বিরুদ্ধাচারীরাও যথাসময়ে অবশ্যই শাস্তিগ্রস্ত হবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তাদের পূর্বেও সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিলো নুহের সম্প্রদায়, রাস্ ও ছামুদ সম্প্রদায়'। এখানে 'তাদের পূর্বে' অর্থ মক্কাবাসী মুশরিকদের পূর্বে। আর 'ক্বওমু নূহিন' অর্থ নুহের সম্প্রদায়। তাঁর বৃত্তান্তটি এরকম— সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শ বৎসরের আয়ু পেয়েছিলেন নবী নুহ। সারাজীবন ধরেই তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে ব্যাপৃত ছিলেন সত্যধর্ম প্রচারের কাজে। এর মধ্যে তার প্রতি ইমান এনেছিলো অল্পসংখ্যক নর-নারী। অবশিষ্ট সকলেই অনড় অবস্থান গ্রহণ করেছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানে। শেষে নবী নুহের অপপ্রার্থনার ফলে মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো তাদের সকলেই। তাঁর কিশতীতে আরোহণ করে জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলো কেবল তাঁর বিশ্বাসী অনুচরেরা।

অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন 'রাস্' বলে কোনোকিছুর প্রারম্ভকে। আবার 'রাস্' হচ্ছে ওই কূপ যার চতুস্পার্শ্ব থাকে প্রস্তরবেষ্টিত। ছামুদ জাতিরই একটি শাখাগোত্র পাথরের দেয়াল দেওয়া এরকম একটি কূপ নির্মাণ করেছিলো। তাদের প্রতি প্রেরিত পয়গম্বরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো তারা। পয়গম্বরগণই তাদেরকে কূপ খনন, মৃতকে দাফন ইত্যাদি শিখিয়ে ছিলেন। বাগবী লিখেছেন, পাথরের দেয়াল ঘেরা কুয়াকে 'রাস্' বলা হয় না। কেউ কেউ বলেছেন 'রাস্' বলে খনিকে। এর বহুবচন হচ্ছে 'রাসায়েস'।

www.eelm.weebly.com

'আসহাবে রাস' কারা ছিলেন, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ ব্যাপারে অভিধানবেত্তাগণের মন্তব্যই সঠিক। অর্থাৎ ছামুদ জাতির এক শাখা গোত্রই আসহাবে রাস নামে পরিচিত। আবু রওয়াক সূত্রে বাগবী লিখেছেন, জুহাক বলেছেন, হাজরা মাউত জনপদে একটি কূপ ছিলো। ওই কূপের নাম ছিলো হাসুরা। নবী সালেহের বিশ্বস্ত অনুচরবর্গের সংখ্যা ছিলো চার হাজার। তারা ছামুদ জাতির উপরে আপতিত আযাব থেকে সুরক্ষিত ছিলো। নবী সালেহের সঙ্গে তারাই বসতি স্থাপন করেছিলো হাজরামাউতে। নবী সালেহ পরলোকগমন করেন ওই জনপদেই। সেকারণেই ওই জনপদটির নাম হয় হাজরামাউত। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর

অনুসারীরা ওই স্থানে নির্মাণ করে একটি বেষ্টনী এবং সেখানেই তারা বসবাস করতে থাকে স্থায়ীভাবে। একজন নেতাও তারা নির্বাচন করে নেয় নিজেদের জন্য। এভাবে দীর্ঘদিন গত হয়। তাদের বংশবৃদ্ধি হয় ব্যাপকভাবে। ক্রমে ক্রমে তারা হয়ে যায় মূর্তিপূজক। আল্লাহ্ তখন তাদের পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরণ করেন নবী হানযালা ইবনে সাফওয়ানকে। নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে তিনি ছিলেন একজন বোঝাবহনকারী শ্রমিক। নবী হওয়ার পর তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। লোকেরা তাঁকে বাজারের মধ্যে শহীদ করে দেয়। তারপর তাদের কূপটি যায় শুকিয়ে। ফলে বিরাণ হয়ে যায় তাদের এককালের কোলাহলমুখর জনপদ। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ এক আয়াতে এরশাদ করেন 'অচল কূপও সুদৃঢ় প্রাসাদ'।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হজরত হানযালা ইবনে সাফওয়ান ছিলেন আসহাবে রাসের নবী। তারা তাঁকে শহীদ করে দেয়। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। ওয়াহাব ইবনে মুনাববাহ বলেছেন, আসহাবে রাসের অধিকারে ছিলো একটি কূপ। তাদের পেশা ছিলো পশুপালন। প্রতিমাপূজার মতো ঘৃণ্য অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো তারা। আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েত করার জন্য প্রেরণ করেন নবী শোয়াইবকে। তিনি তাদেরকে ধর্মের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। কিন্তু ক্রমশই তারা হয়ে যেতে থাকে অধিকতর অবাধ্য। শেষে আল্লাহ্ তাদেরকে নিপতিত করলেন ভয়ংকর শাস্তিতে। হঠাৎ তাদের কূপটি প্রশস্ত হতে থাকলো। এভাবে গ্রাস করে ফেললো তাদের সকলকে। বিনাশ হয়ে গেলো ভূপ্রোথিত হয়ে।

কাতাদা ও কালাবী বলেছেন, 'রাস' হচ্ছে ইয়ামামার একটি জলাধারের নাম। সেখানকার অধিবাসীরা তাদের নবীকে হত্যা করেছিলো। ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো আল্লাহ্র প্রবল রোষে। কা'ব, মুকাতিল ও সুদ্দী বলেছেন, 'রাস' নামে একটি জলকূপ ছিলো ইনতাকিয়ায়। সেখানকার অধিবাসীরা ওই কূপে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিলো মহাপুণ্যবান হাবীব নাজ্জারকে। তাঁর বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হয়েছে সুরা ইয়াসিনে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'আসহাবুল উখদুদ'ই হচ্ছে আসহাবে রাস। কথিত কূপটি তারা নিজেরাই খনন করেছিলো। ইকরামা বলেছেন, তারাই তাদের নবীকে কূপে ফেলে দিয়েছিলো।

'ওয়া ছামূদ' অর্থ এবং ছামুদ সম্প্রদায়। তাদের জ্ঞাতি ভ্রাতা হজরত সালেহ তাদেরকে বলেছিলেন, হে আমার ভ্রাতৃগোষ্ঠী! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আমার অনুসরণ করো। আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত একজন বিশ্বস্ত রসুল। জবাবে তারা বলেছিলো, তুমি তো যাদুগ্রস্ত। তুমি তো আমাদের মতোই মানুষ। যদি তোমার কথা সত্যি হয়ে থাকে, তবে তোমার দাবির স্বপক্ষে অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করো। তিনি আল্লাহ্ সকাশে অলৌকিকত্ব প্রার্থনা করেন। ফলে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড ফেটে তা থেকে বেরিয়ে আসে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী। অল্পক্ষণের মধ্যেই উষ্ট্রীটি প্রসব করে তার শাবক। ওই উষ্ট্রীটি একদিন পরপর ওই

কূপের পানি নিঃশেষে পান করতো। মধ্যবর্তী দিনগুলোতে কূপের পানি পান করতো ছামুদেরা। হজরত সালেহ বললেন, পানি পানের এই নিয়মটিই তোমাদেরকে পালন করতে হবে। অন্যথায় তোমরা হবে আল্লাহ্র রোষকবলিত। কিছুদিন ধরে তারা এই নিয়মটিকে মান্য করে চললো। তারপর শুরু করলো ষড়যন্ত্র। একদিন তারা উষ্ট্রীটির পা কেটে দিলো। এভাবে হত্যা করলো তাকে এবং তার শাবকটিকে। হজরত সালেহ তাদেরকে বললেন, তোমাদেরকে সময় দেওয়া হয়েছে মাত্র তিনদিন। এই তিন দিন তোমরা নিজ নিজ বাড়িঘরে যা খুশী তা করে নাও। তিন দিন পর তোমাদের উপরে নেমে আসবে জীবনসংহারক শাস্তি। তার এমতো সাবধানবাণীকে কোনো পাত্তাই দিলো না তারা। ফলে যথাসময়ে বিনাশপ্রাপ্ত হলো চিরতরে। রক্ষা পেলেন কেবল হজরত সালেহ ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরেরা।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'আদ, ফেরাউন ও লুত সম্প্রদায়'।

এখানে 'ওয়া আ'দুন' অর্থ এবং আদ সম্প্রদায়। আদ সম্প্রদায়ও তাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। তাদের বংশীয় ভ্রাতা হজরত হুদ তাদেরকে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আমার অনুগত হও। আমি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত একজন বিশ্বস্ত রসুল হিসেবে তোমাদের পথপ্রদর্শন করছি। কিন্তু তাঁর এমতো শুভ আহবানের কোনো মূল্যই দিলো না। ফলে আল্লাহ্ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ুর মাধ্যমে ধ্বংস করে দিলেন তাদেরকে। ওই ভয়াবহ তুফান চলেছিলো

www.eelm.weebly.com

ক্রমাগত সাত রাত আট দিন ধরে। তুফান তাদেরকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে পুনরায় আছড়ে ফেলেছিলো মাটিতে। খেজুর গাছের কাণ্ডের মতো মাটিতে পড়েছিলো তাদের অসংখ্য লাশ।

'ওয়া ফিরআ'উনা' অর্থ আর ফেরাউনের সম্প্রদায়। তাদেরকে হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন নবী ভ্রাতৃদ্বয় মুসা ও হারুন। আল্লাহ্ তাঁদেরকে বলেছিলেন, তোমরা মিসরের মহাসম্রাটের কাছে যাও। কেননা সে হয়ে পড়েছে আমার অবাধ্য। তাকে বলো, আল্লাহ্কে মান্য করো এবং আমাদের পথনির্দেশনা মেনে নাও। তাহলে হতে পারবে আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন। নবী ভ্রাতৃদ্বয় ফেরাউনের কাছে আল্লাহ্র আহ্বান পৌঁছে দিলেন। হজরত মুসা তাঁর দাবির সমর্থনে প্রদর্শন করলেন মোজেজা। তাঁর হাতের লাঠিটি তিনি ছেড়ে দিলেন মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিটি হয়ে গেলো বিরাট এক অজগর। ছুটাছুটি করতে লাগলো তীব্রগতিতে। আবার যখন সেটিকে হাতে তুলে নিলেন, তখন সেটি হয়ে গেলো পূর্ববৎ একটি লাঠি। এছাড়াও তিনি তাকে দেখালেন শুভ্রোজ্জ্বল হস্তের মোজেজা। তৎসত্ত্বেও ফেরাউন তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। বললো, এতো দেখছি যাদুর খেলা। তারপর পারিষদবর্গের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, আমিই তোমাদের বড় প্রভুপালক। শেষে এক সময় আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীকে জানালেন, তুমি আমার বান্দাগণকে নিয়ে গভীর নিশিথে মিসর ছেড়ে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করো। হজরত মুসা তাই করলেন। বনী ইসরাইল জনতাকে নিয়ে রাতের আঁধারে সঙ্গোপনে

বেরিয়ে গেলেন মিসর ছেড়ে। সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছে বাধ্য হলেন যাত্রা স্থগিত করতে। আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন, তোমার হাতের লাঠি দিয়ে সমুদ্রবক্ষে আঘাত করো। তিনি তাই করলেন। অমনি সমুদ্রবক্ষে সৃষ্টি হলো বারোটি শুষ্কপথ। পানির দেয়াল দাঁড়িয়ে রইলো পথগুলোর উভয় পার্শ্বে। হজরত মুসার সঙ্গে বনী ইসরাইলের বারোটি গোত্র সমুদ্রপাড়ি দিলো ওই বারোটি পথ ধরে। ওদিকে ফেরাউন তার বিশালবাহিনী নিয়ে এসে উপস্থিত হলো সমুদ্রের পাড়ে। দেখলো সমুদ্রাভ্যন্তরের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে বনী ইসরাইল জনতা। তারাও কালবিলম্ব না করে নেমে পড়লো সমুদ্রাভ্যন্তরের পথে। বনী ইসরাইলেরা যখন সমুদ্রের অপরপাড়ে পৌঁছে গেলো, তখন ফেরাউন ও তার বাহিনী মাঝ দরিয়ায়। হঠাৎ ভেঙে পড়লো পানির দেয়ালগুলো। ডুবে মরলো ফেরাউন ও তার অনুসারীরা। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে ফেরাউন চিৎকার করে বলে উঠলো, আমি স্বীকার করছি আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহ্ বললেন, এখন তো স্বীকৃতি দানের সময় নয়। কেননা এখন শুরু হয়েছে সর্বনাশা শাস্তি। তুমি নিশ্চিত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পুরোধা। তাই তোমার মরদেহকে আমি পৃথিবীতে রক্ষা করবো পরবর্তী যুগের মানুষের জন্য একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে।

'ওয়া ইখওয়ানু লূত্ব' অর্থ এবং লুত সম্প্রদায়। হজরত লুতের সম্প্রদায়ও তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিলো। তিনিও আহ্বান জানিয়েছিলেন, হে আমার জাতিগোষ্ঠী! তোমরা পৌঁছে গিয়েছো নির্লজ্জতার চরম সীমায়। লিপ্ত হয়েছো সমকামের মতো ঘৃণ্য অপকর্মে। নারী জাতিকে পরিত্যাগ করে তোমরা নির্দ্বিধায় উপগত হও পুরুষের উপর। এখনো সময় আছে। তওবা করো। আল্লাহ্র আযাবকে ভয় করো। মান্য করো আমার আনুগত্যকে। তারা বললো, হে লুত! তুমি আমাদেরকে অযথা উপদেশ দিতে এসো না। সংযত যদি না হও, তবে আমরা তোমাকে দেশ থেকে বের করে দিবো। হজরত লুত বললেন, আমি তোমাদের দুর্বৃত্তিকে অতিশয় ঘৃণা করি। শেষে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীকে নির্দেশ দিলেন, ভোর হওয়ার আগেই তুমি তোমার পরিবার পরিজন নিয়ে এই শহর ছেড়ে অন্যত্র গমন করো। হজরত লুত তাই করলেন। তিনি শহর ছেড়ে চলে যাবার পর ওই শহরে শুরু হলো প্রাণঘাতী প্রস্তর বৃষ্টি। ফলে সমূলে উৎপাটিত হয়ে গেলো তারা। হজরত লুতের এক স্ত্রীও ধ্বংস হয়ে গেলো তাদের সঙ্গে। কেননা সে ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— এবং আইকার অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়; তারা সকলেই রসুলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো। ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছে'।

'আইকার অধিবাসী' অর্থ অরণ্যের অধিবাসী। তারাও তাদের প্রেরিত রসুল হজরত শোয়াইবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। তিনি যখন তাদেরকে বললেন, হে লোকসকল! তোমাদের কি আল্লাহ্র আযাবের ভয় নেই? শোনো, আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত একজন বিশ্বাসভাজন বার্তাবাহক। সুতরাং আমার কথা

শোনো। আল্লাহ্কে ভয় করো এবং মেনে নাও আমার আনুগত্যকে। কেনা বেচার সময় মাপে ও ওজনে কম দিয়ো না। পৃথিবীতে বিভ্রাট সৃষ্টি কোরো না। তখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, তুমি একজন যাদুকবলিত লোক ছাড়া অন্য কেউ নও। তোমার মধ্যে বিশেষত্বও কিছু নেই। কেননা তুমি আমাদের মতোই মানুষ। তোমার কথা যদি সত্যই হয়, তবে এই মুহূর্তে আনয়ন করো তোমার কথিত আযাব। এভাবে তারা যখন সীমালংঘন করলো, তখন তাদের উপরে নেমে এলো ভয়ানক আযাব। শুরু হলো অসহ্য গরম। তারা আশ্রয় নিলো তাদের পর্বতাভ্যন্তরস্থিত নিরাপদ নিবাসে। সেখানেও শুরু হলো অসহনীয় উত্তাপ। প্রচণ্ড দাবদাহে অতিষ্ঠ হয়ে তাই তারা পুনরায় বেরিয়ে এলো উন্মুক্ত প্রান্তরে। সহসা দেখতে পেলো আকাশে ভাসছে

www.eelm.weebly.com

একখণ্ড মেঘ। ছায়ার আশায় তারা ছুটে গেলো ওই মেঘের নিচে। কিন্তু মেঘ থেকে শুরু হলো অগ্নিবৃষ্টি। ফলে তাদের সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো অগ্নিস্পৃষ্ঠ হয়ে।

'ওয়া ক্বওমু তুব্বা' অর্থ এবং তুব্বা সম্প্রদায়। বাগবী লিখেছেন, কাতাদা বর্ণনা করেছেন, তুব্বা ছিলো ইয়েমেনের হিমিয়ারী বংশের এক সম্রাট। সে তার অভিযান পরিচালনা করেছিলো হীরা থেকে সমরখন্দ পর্যন্ত। তার অনুসারী ছিলো অনেক। তাকে তুব্বা বলা হতো সেকারণেই। আবার তুব্বাদের সংখ্যাও ছিলো অনেক। বিরতিহীনভাবে তারা সম্রাট হতো একজনের পর আর একজন। তাই তাদের সকল সম্রাটেরই সাধারণ উপাধি ছিলো তুব্বা। তাদের পূর্বসূরীরা ছিলো অগ্নিউপাসক। কিন্তু উত্তরসূরীরা ছিলো সত্য ধর্মের অনুসারী।

ইকরামা সূত্রে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস প্রমুখ সাহাবীগণ বলেছেন, সর্বশেষ তুব্বা ছিলেন আসআদ ইবনে আবু কুরাব ইবনে মালিক ইবনে ইয়াক্রিব। আসআদ পূর্ব দিক থেকে মদীনা পর্যন্ত এসেছিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি তাঁর প্রতিনিধিরূপে মদীনায় রেখে যান তাঁর একপুত্রকে। তার ওই পুত্র নিহত হয় অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি কর্তৃক। তুব্বা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মদীনায় আগমন করলেন। সংকল্প করলেন, মদীনাকে তিনি ধূলিসাৎ করে দিবেন। মদীনাবাসী তার এ সংকল্পের কথা জানতে পেরে তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। তার বাহিনীকে প্রতিহত করলো মদীনার উপকণ্ঠে। তারা দিনের বেলায় যুদ্ধ করতো, আর রাতে করতো মেহমানদারী। এই বিষয়টি আসআদকে বিস্মিত করলো। মনে মনে বললো, এরা তো দেখছি বড়ই সম্ভ্রান্ত। এমতাবস্থায় মদীনার দু'জন ইহুদী আলেম আসআদের সঙ্গে দেখা করে বললো, সম্রাটপ্রবর! আপনার সংকল্প পরিহার করুন। কেননা আপনি যা চাইছেন, তা কস্মিনকালেও হবে না। কোনো না কোনো অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতা আসবেই। আর অদৃশ্য বিপদ থেকে নিরাপদ থাকা আপনার পক্ষে সম্ভবও হবে না। কেননা এই স্থান অতি পবিত্র। এখানেই আগমন করবেন আল্লাহ্‌র সর্বশেষ বার্তাবাহক। তিনি জন্মগ্রহণ করবেন কুরায়েশ বংশে। তাঁর পবিত্র নাম হবে মোহাম্মদ। মক্কা হবে তাঁর জন্মস্থান এবং হিজরতের স্থান হবে মদীনা। আপনি

এখন যেখানে রয়েছেন, সেখানেই তাঁর এবং তাঁর সহচরবর্গের সঙ্গে যুদ্ধ হবে তাঁর শত্রুদের। ওই যুদ্ধে কিছুসংখ্যক লোক হবে নিহত এবং কিছুসংখ্যক আহত। আসআদ বললো, তিনি তো হবেন আল্লাহ্‌র নবী। তাহলে তার সঙ্গে আবার যুদ্ধ করার সাহস করবে কারা? আলেমদ্বয় বললেন, তার সম্প্রদায়ের লোকেরা সুদূর মক্কা থেকে এসে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আলেমদ্বয়ের কথা শুনে আসআদের ভাবান্তর ঘটলো। আলেমগণ তাঁকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানালেন। আসআদও হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করলেন তাঁদের আহ্বান। তিনি তাঁদের উভয়কে যথোপযুক্ত সম্মানও প্রদর্শন করলেন। রণে ভঙ্গ দিয়ে যাত্রা করলেন স্বরাজ্যের দিকে। আলেমদ্বয়কেও নিলেন তাঁর সহযাত্রীরূপে। পথিমধ্যে হুজায়েল গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলো। বললো, আমরা আপনাকে এমন এক ঘরের সন্ধান দিতে পারি, যার মধ্যে রয়েছে মোতি, জবরজদ ও রূপার খনি। সে ঘরটি রয়েছে মক্কায়। তারা আসআদকে এরকম কথা বলেছিলো অসৎ উদ্দেশ্যে। তারা জানতো সেখানে রয়েছে কাবাগৃহ। আর কাবাগৃহে অশুভ উদ্দেশ্যে গমনকারীদের ধ্বংস অনিবার্য।

আসআদ আলেম দু'জনের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা বললেন, কাবাগৃহ ছাড়া সেখানে আর কোনো বৃহৎ গৃহ রয়েছে বলে তো আমরা জানি না। আপনি ওই গৃহের তাওয়াফের নিয়তে সেখানে গমন করুন। হজ পালন করুন। সেখানে কোরবানী করুন ও মস্তক মুণ্ডন করুন। আসআদ তখন হুজায়েল গোত্রের লোকদের দুরভিসন্ধির কথা বুঝতে পারলেন। তাদেরকে বন্দী করে তাদের হাত পা কর্তন করালেন। তারপর তাদের চোখ বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন শূলীতে। এরপর মক্কায় গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন শি'বে মাসালেহতে। কাবাগৃহকে পরিধান করালেন গিলাফ। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি কাবাগৃহকে গিলাফ পরিধান করিয়েছিলেন। শি'বে মাসালেহ নামক স্থানে কোরবানী করলেন ছয় হাজার উট। ছয় দিন অবস্থান করলেন সেখানে। তাওয়াফ করলেন। মস্তক মুণ্ডন করলেন। তারপর ফিরে গেলেন নিজ দেশে। কিন্তু ইয়েমেনের লোকেরা তাকে রাজধানীতে প্রবেশ করতে বাধা দিলো। বললো, আপনি আমাদের ধর্ম ছেড়ে দিয়েছেন। তাই এ রাজ্য শাসন করার অধিকার আপনার নেই। আসআদ হিমিয়ারীদেরকে সত্য ধর্ম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। হিমিয়ারীরা বললো, ঠিক আছে কোন ধর্ম উত্তম, তার পরীক্ষা নেওয়া হোক। আমরা আগুনের আরাধনা করি। সুতরাং আগুনের কাছেই দেওয়া হোক বিচারের ভার। তুব্বা আসআদও তাদের কথায় সম্মত হলেন। বললেন, তোমরা ন্যায্য কথাই বলেছো। চলো আগুনের কাছেই যাওয়া যাক।

ইয়েমেনের এক পাহাড়ের পাদদেশে ছিলো হিমিয়ারীদের অগ্নিমন্দির। বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড সারাক্ষণ প্রজ্জ্বলিত থাকতো সেখানে। ওই অগ্নিকুণ্ডের সামনে মাঝে মাঝে বিচার সালিশ নিয়ে হাজির হতো তারা। বাদী বিবাদীকে হাজির করতো তার সামনে। তখন আগুন এগিয়ে এসে গ্রাস করতো অপরাধীকে। কিন্তু নিরাপরাধ

ব্যক্তির কেশাগ্রও সে স্পর্শ করতো না। সেই অগ্নিকুণ্ডের সামনেই উপস্থিত হলো সকলে। হিমিয়ারীরা সঙ্গে নিলো বিভিন্নরকমের নৈবেদ্য ও অর্ঘ। আর তুব্বা আসআদ সঙ্গে নিলেন আলেমদ্বয়কে। আলেমদ্বয় গলায় ঝুলিয়ে নিলেন ধর্মগ্রন্থ। সকলেই সামনে

বসলো অগ্নিকুণ্ডটির। অল্পক্ষণ পরেই অগ্নিশিখা এগিয়ে এসে গ্রাস করলো হিমিয়ারীদের অর্ঘসামগ্রীগুলোকে। তারপর ফিরে গেলো স্বস্থানে। আলেমগণ তাঁদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে লাগলেন। আগুনের উত্তাপে কেবল ঘাম নির্গত হতে লাগলো তাদের কপাল থেকে। আর কোনো ক্ষতি তাদের হলো না। হিমিয়ারীরা এদৃশ্য দেখে সম্বিত ফিরে পেলো। মন থেকে মুছে গেলো তাদের অগ্নিপূজার প্রভাব। সত্য ধর্মকে তারা গ্রহণ করলো মনে প্রাণে।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, রাককাশী বলেছেন, আবু কুরাব আসআদ হিমিয়ারী ছিলেন তুব্বা সম্প্রদায়ভূত। তিনি রসুল স. এর প্রতি ইমান এনেছিলেন তাঁর মহাআর্বিভাবের সাত শত বৎসর পূর্বে। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেছেন, আল্লাহ্ তুব্বা সম্প্রদায়ের নিন্দা করেছেন, কিন্তু তুব্বা আসআদকে মন্দ বলেননি। উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, তোমরা তুব্বা আসআদের নিন্দা কোরো না। কেননা সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি জানি না তুব্বা নবী ছিলেন কিনা।

'তারা সকলেই রসুলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো'— একথার অর্থ ওই সকল বিনাশপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই ছিলো নবী-রসুলগণকে অস্বীকারকারী। কেননা একজন নবীকে অস্বীকার করার অর্থ সকল নবীকেই অস্বীকার করা। সেজন্যই এখানে বলা হয়েছে রসুলগণকে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, তারা সকলেই ছিলো আল্লাহ্র এককত্বে ও সর্বময়ত্বে অবিশ্বাসী। আর আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস যাদের নেই, কোনো রসুলেই তাদের বিশ্বাস থাকার কথা নয়। সেজন্যই এখানে বলা হয়েছে— তারা সকলেই মিথ্যাবাদী বলেছিলো রসুলগণকে।

'ফাহাক্বক্বা ওয়াঈদ' অর্থ ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছে। অর্থাৎ তারা আমার বার্তাবাহকগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো বলেই তাদের উপরে নেমে এসেছিলো সর্ববিধ্বংসী শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? বস্তুত সৃষ্টি বিষয়ে তারা সন্দেহে পতিত'। এখানে 'আফাআ'য়ীনা' অর্থ আমি কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? অভিধানগ্রন্থে রয়েছে 'আইয়্যা বিল আমরি' অর্থ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনো পথ পায়নি। অথবা উদ্দেশ্য সফল করতে সে অক্ষম, শক্তিহীন। 'আফাআ'য়ীনা'র 'হামযা' অক্ষরটি এখানে অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। এর পরের 'ফা' অক্ষর হচ্ছে সংযোজক অব্যয়। এখানকার 'প্রথমবার সৃষ্টি' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১ সংখ্যক আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে। মধ্যবর্তী আয়াতগুলো ভিন্ন প্রসঙ্গের। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আমিই সৃষ্টি করেছি অটুট আকাশ। ভূপৃষ্ঠকে সুবিস্তৃত করে তার উপরে স্থাপন

করেছি শৈলমালা। মৃত্তিকায় উদগত করেছি শ্যামল তরুশ্রেণী। আর আমিই আকাশ থেকে বর্ষণ করি কল্যাণকর বারিপাত। এভাবে নিশ্চিত করি প্রাণীকুলের জীবিকাকে। এতোকিছু সৃষ্টি করেও যখন আমি পরিশ্রান্ত হইনি, তখন ধ্বংস করার পর এগুলোকে পুনরায় সৃষ্টি করতে আমি পরিশ্রান্ত হবো কেনো? প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি তো অধিকতর সহজ। সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণ তো নেই। অথচ তারা জ্ঞানহীনদের মতো এখনো সন্দেহকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে।

'ফী লাবসিন' অর্থ সন্দেহে পতিত। 'লাবসুন' অর্থ মিশ্রিত হওয়া, সদৃশ হওয়া। মর্মার্থ— সন্দেহ। আর এর অভিধানগত অর্থ— কোনো কিছু গোপন করা। সন্দেহের মধ্যে মিশ্রিত ও গোপন থাকে সত্য-মিথ্যা দু'টোই। তাই সন্দেহকে বলা হয় 'লাবস'।

'খলক্বিন জ্বাদীদ্' অর্থ দ্বিতীয় সৃষ্টির বিষয়ে। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আদমসন্তানেরা আমার বিষয়ে মিথ্যা আরোপ করে। অথচ এটা তাদের জন্য নিতান্তই অসমীচীন। তারা আমাকে গালি দেয়। এটাও তাদের জন্য অতিশয় অসঙ্গত। তারা মিথ্যা আরোপ করে এভাবে— বলে, আল্লাহ্ আমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বার আর সৃষ্টি করতে পারবেন না। অথচ দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টির চেয়ে সহজ। আর তারা গালি দেয় এভাবে— বলে আল্লাহ্র সঙ্গিনী ও সন্তান-সন্ততি আছে। অথচ আমি চির অমুখাপেক্ষী আমি কারো দ্বারা জাত যেমন নই, তেমনি নই কারো জন্মদাতা। ভার্যা ও সন্তান-সন্ততি গ্রহণ থেকে আমি চিরপবিত্র। আমি এক, একক, অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য, আনুরূপ্যবিহীন, অংশীহীন ও অসমকক্ষ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ১৬

❑ আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা আমি জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি যে কুমন্ত্রণা দেয়, তা আমি জানি'। এখানে 'মা তুওয়াসবিসু' অর্থ কুমন্ত্রণা দেয়। 'ওয়াস্ওয়াসা' অর্থ কুমন্ত্রণা, অন্তরস্থিত কল্পনা। এর আভিধানিক অর্থ গোপন আওয়াজ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যেহেতু আমিই মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তাই তার সবকিছুই আমি জানি। জানি তার প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা সম্পর্কেও।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর'। এখানে 'হাবলুন' অর্থ ধমনী, রগ। আর 'ওয়ারীদ' হচ্ছে এর বিবরণ। যেমন 'শাজ্বারাতুল ইরাক' (নিমগাছ) 'ইয়াওমুল জুমআ' (জুমআর দিন)। একথা দু'টোর মধ্যেও রয়েছে বিবরণের সম্পর্ক। 'ওয়ারীদ' বলে কণ্ঠনালীর ডান ও বামের রগ দু'টিকে, যেগুলোর সম্পর্ক রয়েছে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে। রগ দু'টি মাথা থেকে ঘাড়ের দিকে নেমে এসেছে। কেউ কেউ বলেছেন, যন্ত্রণা এই দুই রগ বেয়ে অবতরণ করে।

'নাহনু আক্বরাবু' অর্থ আমি নিকটতর। আলেমগণ এই 'নিকটতর' কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্নভাবে। কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্র এই নৈকট্য হচ্ছে জ্ঞানগত নৈকট্য। অবয়বগত নৈকট্যের কল্পনা আল্লাহ্র জন্য অসম্ভব। কেননা তিনি অবয়বের অতীত। তিনি যে আনুরূপ্যবিহীন। তাই স্থানগত দূরত্ব ও নৈকট্যের ধারণা থেকে তিনি সতত মুক্ত ও পবিত্র। বায়যাবী এই অভিমতটিকেই পছন্দ করেছেন। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানুষ তার নিজের যতখানি নিকটে, আল্লাহ্র জ্ঞান তার তদপেক্ষাও নিকটতর। অথবা— গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষা অধিক নৈকট্যও যদি ধরা হয়, তবু তা হবে রূপকার্থক, প্রকৃতার্থক নয়। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রেও কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে— জ্ঞানগত নৈকট্যই। এখানে কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে উপমা হিসেবে। যেমন আরববাসীরা বলেন 'মৃত্যু আমার কাছে গ্রীবাদেশের ধমনী অপেক্ষা নিকটতর'।

বাগবী কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি মানুষ সম্পর্কে এতো বেশী জানি, যা তারা নিজেরাও নিজেদের সম্পর্কে জানে না। কেননা মানুষের এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের জানার অন্তরায় হয়, কিন্তু আল্লাহ্র ক্ষেত্রে এরকম কোনো অন্তরায়ই নেই। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এরকমও বলা যেতে পারে যে, চিকিৎসক রোগীর গ্রীবাদেশের রগের চেয়েও নিকটতর। কেননা রোগের ব্যাপারে রোগী অপেক্ষা চিকিৎসক অধিক অভিজ্ঞ। এটা একটা যুক্তির কথা বটে, কিন্তু আল্লাহ্র জ্ঞান যুক্তিরও অতীত, আনুরূপ্যবিহীন। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়ায়— মানুষ তার নিজের সম্পর্কে কিছু না জানালেও আল্লাহ্ তার সবকিছু জানেন। এরকম ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও সৃষ্টির জ্ঞানের সঙ্গে আল্লাহ্র অসীম জ্ঞানের এক ধরনের তুলনার উপস্থিতি থেকেই যায়, তাই আমার মতে এধরনের ব্যাখ্যাও বিশুদ্ধ নয়। কেননা তাঁর জ্ঞান যে তুলনারহিত, আনুরূপ্যের অতীত।

সুফি-আউলিয়াগণ বলেন, সৃষ্টির সঙ্গে আল্লাহ্র নৈকট্য সত্তাগত— স্থান, কাল বা অবস্থাগত নয়। আর এমতো নৈকট্য অনুভূত হতে পারে কেবল অন্তর্দৃষ্টির (ফেরাসাতের) দ্বারা! ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান এ বিষয়টি অনুধাবন করতে অক্ষম। তাই এর ভাষাগত ব্যাখ্যা হয়ই না।

তবে বিষয়টিকে বুঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে এভাবে— সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের (ওয়াজিবুল অজুদের) অবশ্যই প্রয়োজন। যেমন ছায়ার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন মূল বস্তুর। ছায়া সব সময় তার

মূল বস্তুর মুখাপেক্ষী। মূল না থাকলে তার প্রতিবিম্বও থাকতে পারে না। আর মূল বস্তু তার ছায়ার যতখানি নিকটে, ছায়াও তার নিজের ততখানি নিকটে নয়। তেমনি সম্ভাব্য অস্তিত্ব (মুম্কিনুল অজুদ) অর্থাৎ সৃষ্টিও তার সত্তার ততোটা নিকটে নয়, যতোটা নিকটে অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব, অর্থাৎ আল্লাহ্। অতএব বুঝতে হবে, সৃষ্টিকে অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব পেতে গেলে তার স্রষ্টাকে নির্ভর করতেই হবে। নতুবা তার বিদ্যমানতাই থাকবে না। যেমন 'জায়েদ' নামক কোনো ব্যক্তিকে 'জায়েদ' বলা যেতে পারবে তখনই, যখন তার বিদ্যমানতা থাকবে। সুতরাং কাউকে যদি 'জায়েদ' বলা হয়, তবে বুঝতে হবে তার অস্তিত্ব রয়েছে। আর একথাও বুঝে নিতে হবে যে, সে তার সত্তার যতোখানি নিকটে, তার চেয়ে অধিক নিকটে তার স্রষ্টা। সুতরাং জাতে মুমকিনের (সম্ভাব্য সত্তার) চেয়ে অজুদে মুমকিন এতো কাছে যে, মুম্কিন তার সত্তারও এতো কাছে নয়। কেননা সম্ভাব্যের দ্বারা সম্ভাব্যের অপসৃতি সিদ্ধ। এরকম অপসৃতি অসম্ভব হতে পারে কেবল তখন, যখন ওই বস্তু হয় স্বাধিষ্ঠ বা স্বতিষ্ঠ। এরকম না হলে তার অপসৃতি অসম্ভব হতে পারে না। অতএব, একথা আর বুঝতে বাকী থাকে না যে, আল্লাহ্তায়ালার সত্তা তাঁর সৃষ্টির নিজস্ব সত্তা অপেক্ষা সমীপতর। বোধগম্যতার দিক থেকে যদিও বিষয়টি সুদূরবর্তী, তথাপিও সত্তাগত দিক থেকে সন্নিকটতর। স্মর্তব্য যে, অজুদ বা সত্তা এখানে ক্রিয়ামূলগত অর্থবিশিষ্ট নয়। বরং অজুদ এখানে এমন সিফাত বা গুণ, যার দ্বারা প্রকাশ পায় বস্তুর বিদ্যমানতা।

সুফী-দরবেশগণ সমগ্র সৃষ্টিকে সম্বন্ধিত করেন প্রতিবিম্বের বৃত্তের (দায়রায়ে জেলালের) সঙ্গে। এভাবে প্রতিবিম্বকে আল্লাহ্র সিফাতের সঙ্গে এবং সিফাতকে তাঁর জাতের সঙ্গে। প্রতিবিম্বের বৃত্তে আবার রয়েছে বহুতর স্তর। যেমন রসুল স. বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌র রয়েছে আলো ও আঁধারের সত্তর হাজার পর্দা। ওই পর্দা উন্মোচিত হলে তাঁর জ্যোতির ঝলকে ভস্মীভূত হয়ে যাবে সমগ্র সৃষ্টি।

আবার আল্লাহ্‌র সিফাতের স্তরও অপরিমেয়। যেমন তিনি এরশাদ করেন 'ওয়ালাও আন্‌না মাফীল আরদ্বি মিন শাজ্বরাতিন আক্বলামুন ওয়াল বাহরু ইয়ামুদ্দুহু মিম বা'দিহী লিসাব্‌আতি আবহুরিন মা নাফিদাত কালিমাতুল্লহ্‌' (ভূপৃষ্ঠের সকল বৃক্ষকে যদি কলম বানানো হয়, আর সমুদ্রের পানিকে করা হয় কালি, যুক্ত করা হয় আরো সাতটি সমুদ্রকে এবং এভাবে যদি আল্লাহ্‌র বাণী লিপিবদ্ধ হতে থাকে, তবে দেখা যাবে সমুদ্র নিঃশেষ হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র বাণী অনিঃশেষ)। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'মা ইনদাকুম ইয়ানফাউ ওয়ামা ইন্‌দাল্লহি বাক্‌' (তোমাদের কাছে যা আছে, তার সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে, অবশিষ্ট থাকবে কেবল তা, যা রয়েছে আল্লাহ্‌র নিকটে)।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা পরের পরে, আরো পরে, তার পরেরও পরে। এই পরবর্তীতা নৈকট্যের দিক থেকে, দূরত্বের দিক থেকে নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সিফাতের (গুণবত্তার) প্রতিবিম্ব সৃষ্টির এতো কাছে যে, সৃষ্টি নিজেও তার সত্তার ততো কাছে নয়। এভাবে প্রতিবিম্ব অপেক্ষা তাদের আরো কাছে তাঁর মূল সিফাত এবং সিফাত অপেক্ষাও নিকটতর তাঁর জাত (সত্তা)।

তাফসীরে মাযহারী/৭২

উপযোগ ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালার যে অবোধ্য নৈকট্যের উল্লেখ করা হয়েছে, সে নৈকট্য হচ্ছে সাধারণ নৈকট্য। এর মধ্যে মুমিন-কাফের, সকলেই এক বরাবর। আর তাঁর বিশেষ নৈকট্যাধারী কেবল বিশ্বাসীগণ। এ দু'টো নৈকট্য কখনো এক নয়। বরং এ দু'টোর মধ্যে রয়েছে কেবল নামের সাদৃশ্য। প্রকৃতার্থে কোনো মিলই এ দু'টোর মধ্যে নেই। উভয়ের পার্থক্য অনুভূত হতে পারে কেবল অন্তর্দৃষ্টির নূর এবং কোরআন-সুন্নাহ্‌ দ্বারা। বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ্‌র বিশেষ নৈকট্যের কথা বিবৃত হয়েছে এভাবে— ১. সেজদা করো ও নৈকট্য লাভ করো ২. আল্লাহ্‌ আমাদের সঙ্গে ৩. নিশ্চয় আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার প্রভুপালনকর্তা ৪. আরশাধিপতির নিকটে অবস্থিত ৫. ক্ষমতাবান মালিকের নিকট ৬. তিনি আরো নিকটবর্তী হলেন, উপনীত হলেন দুই ধনুকের জ্যা এর সমদূরত্বে, অথবা হলেন আরো অধিক সন্নিকটবর্তী।

রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌ বলেন, বান্দারা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটতর হতে থাকে। এই নৈকট্যকেই বলা হয় বেলায়েত। বেলায়েতের মর্যাদা ও স্তর রয়েছে অসংখ্য। এই বিশেষ নৈকট্যের বিপরীত যে দূরত্ব, তা নির্ধারিত কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য। যেমন আল্লাহ্‌ এরশাদ করেন— ১. দূরত্ব হচ্ছে আদ জাতির জন্য ২. ছামুদ জাতির জন্যই দূরবর্তীতা ৩. সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ই দূরবর্তী।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ১৭, ১৮

❑ স্মরণ রাখিও, 'দুই গ্রহণকারী' ফিরিশ্‌তা তাহার দক্ষিণে ও বামে বসিয়া তাহার কর্ম লিপিবদ্ধ করে;
❑ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তাহার জন্য তৎপর প্রহরী তাহার নিকটেই রহিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! ভুলে যেয়ো না যে, তোমার সকল কর্মকাণ্ডের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে আমা কর্তৃক নিযুক্ত তোমাদের দক্ষিণ ও বাম স্কন্ধের ফেরেশতা। তারা সতত জাগ্রত, সতর্ক। তৎপর তোমাদের কোনো উচ্চারণ ও আচরণই তাদের বিবরণ থেকে বাদ পড়ে না।

এখানে 'ইজ ইয়াতালাক্বক্বাল মুতালাক্বক্বিয়ান' অর্থ দুই গ্রহণকারী ফেরেশতা। 'ইয়াতালাক্বক্বা' ক্রিয়ার কর্মকারক এখানে রয়েছে উহ্য। ওই উহ্য কর্ম হচ্ছে মানুষের কথা ও কাজ। তারা তা অবলোকন করে ও লিখে নেয়।

তাফসীরে মাযহারী/৭৩

'আ'নিল ইয়ামীনি ওয়া আনিশ্‌ শিমালি ক্বয়ীদ্‌' অর্থ তার দক্ষিণে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। জেরদাতা ও জেরবিশিষ্ট মিলে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে 'ক্বয়ীদ' এর সাথে। আর 'ক্বয়ীদ' হয়েছে 'আল মুতালাক্বক্বিয়ান' এর অনুবর্তী। 'আ'নিল ইয়ামিন' এর পরেও একটি 'ক্বয়ীদ' উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ তাদের একজন বসে আছে ডানে, আর একজন বামে। 'ক্বয়ীদুন' হচ্ছে 'ক্বয়িমুন' এর বিপরীতার্থক শব্দ। এর অর্থ উপবেশনকারী, দৃঢ় অবস্থান গ্রহণকারী। মুজাহিদ বলেছেন, 'ক্বয়ীদুন' অর্থ অপেক্ষমান। আর এখানকার 'ইজ ইয়াতালাক্বক্বা কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়া 'উজকুর' (স্মরণে রেখো) এর সঙ্গে। অথবা কথাটি সম্পর্কযুক্ত

আগের আয়াতের 'আক্বরাবু' (নিকটতর) এর সঙ্গে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি তো মানুষের স্কন্ধস্থিত ধমনী অপেক্ষা নিকটতর। তাই তাদের কোনোকিছুই আমার অজানা নয়। ফেরেশতাদের মুখাপেক্ষী আমি মোটেও নই। আমি তা-ও জানি, যা ফেরেশতারা জানে না। তবুও আমি তাদেরকে নিযুক্ত করেছি কেবল বিচার-সাক্ষাৎ প্রমাণ ইত্যাদির নিয়ম রক্ষার্থে। কেননা মহাবিচারের দিবসে আমি সর্বসমক্ষে ওই ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাবো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে। মানুষের ডানে বামে আমি তাদেরকে বসিয়ে দিয়েছি সেকারণেই।

'মা ইয়াল্‌ফিজু মিন ক্বওলিন্' অর্থ মানুষ যে কথা উচ্চারণ করে। 'রক্বীবুন আ'তীদ্' অর্থ পর্যবেক্ষণ-তৎপর প্রহরী। 'রক্বীব' অর্থ পর্যবেক্ষক, যে সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে মানুষের কর্মকাণ্ডের উপর। 'আ'তীদ' অর্থ সতত বিদ্যমান, সদাতৎপর।

হাসান বলেছেন, ফেরেশতারা মানুষের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায় তাদের দুই অবস্থায়, মলত্যাগের সময় এবং রতিক্রিয়াকালে। মুজাহিদ বলেছেন, ওই দুই ফেরেশতা মানুষের সকল আমলের বিবরণ লিখে নেয়। লিখে নেয় তাদের পীড়িত অবস্থার বিবরণও। ইকরামা বলেছেন, যে সকল কাজ পুরস্কার অথবা তিরস্কারের সঙ্গে সম্পৃক্ত, ওই ফেরেশতাদ্বয় লিখে রাখে কেবল সেগুলোই। বাগবী তাঁর 'মসনদ' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু উমামা বাহেলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুণ্যলেখক ফেরেশতা থাকে মানুষের ডান দিকে এবং পাপ লেখক ফেরেশতা থাকে বাম দিকে। পুণ্য লেখক ফেরেশতা পাপ লেখক ফেরেশতাকে সব সময় শাসনে রাখে। মানুষ একটি পুণ্য করলে ডান দিকের ফেরেশতা পুণ্য লিখে রাখে দশটি। আর পাপ করলে সে বাম দিকের ফেরেশতাকে বলে, এখনই লিখো না। সাত ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। এর মধ্যে সে হয়তো তওবাও করে ফেলতে পারে। ইবনে রহ্‌ওয়াইহ্ তাঁর 'মসনদ' পুস্তকে এবং বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থেও হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

❑ মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যই আসিবে; ইহা হইতেই তোমরা অব্যাহতি চাহিয়া আসিয়াছ।

❑ আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, উহাই শাস্তির দিন।

❑ সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হইবে, তাহার সঙ্গে থাকিবে চালক ও সাক্ষী।

❑ তুমি এই দিবস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন আমি তোমার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচন করিয়াছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর।

❑ তাহার সঙ্গী ফিরিশ্‌তা বলিবে, 'এই তো আমার নিকট 'আমলনামা প্রস্তুত।'

❑ আদেশ করা হইবে, তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে—

❑ কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী।

❑ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করিত তাহাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।

❑ তাহার সহচর শয়তান বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাহাকে অবাধ্য করি নাই। বস্তুত সে-ই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।

www.eelm.weebly.com

❑ আল্লাহ্ বলিবেন, 'আমার সম্মুখে বাকবিতণ্ডা করিও না; তোমাদিগকে আমি তো পূর্বেই সতর্ক করিয়াছি।

❑ 'আমার কথার রদবদল হয় না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করি না।'

আলোচ্য আয়াতসমূহের সবগুলো ক্রিয়াই ব্যবহার করা হয়েছে অতীতকালের। এভাবে এখানে একে একে উপস্থাপন করা হয়েছে মৃত্যু, কিয়ামত এবং মহাবিচারের

দিবসে সংঘটিতব্য বিষয়াবলীর কথা। সন্দেহাতীত ও সুনিশ্চিতার্থক বিষয়ে এভাবেই বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। এভাবে এখানে একথাটি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অতীতের ঘটনাবলী যেমন নিঃসন্দিগ্ধ, তেমনি নিঃসন্দিগ্ধ হচ্ছে মৃত্যু, কিয়ামত, পুনরুত্থান, বিচারানুষ্ঠান ইত্যাদি।

এখানে 'সাকরাতুল মাউত' অর্থ মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা। 'বিল হাক্বক্বি' অর্থ সত্যই। কথাটির 'বা' হচ্ছে একটি সকর্মক বাচক। সুতরাং 'বিল হাক্বক্বি' হচ্ছে 'জ্বাআত' ক্রিয়ার কর্মপদ। এভাবে এখানে একথাই বলতে চাওয়া হয়েছে যে, প্রকৃত অর্থে পৃথিবী ও পৃথিবীর বস্তুনিচয়ের কোনো মূল্য নেই। সুতরাং তা কল্পনা সদৃশ। বাস্তব জগত হচ্ছে মৃত্যুপরবর্তী জগত। মৃত্যুর মাধ্যমে সে জগতে প্রবেশ সকলের জন্য অনিবার্য। সুতরাং মৃত্যুই বাস্তব এবং মৃত্যুযন্ত্রণাও চরম সত্য। অথবা 'বিল হাক্বক্বি' কথাটির অর্থ হবে এখানে— মৃত্যুর অঙ্গীকার সত্য, যার অন্যথা হওয়া অসম্ভব। কিংবা 'সত্যই' কথাটির অর্থ হবে— মৃত্যুপরবর্তী যে পুরস্কার ও তিরস্কারের অঙ্গীকার করা হয়েছে, তা অবশ্যই সত্য। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তো সেই উদ্দেশ্যেই। সুতরাং সত্য মৃত্যুযন্ত্রণাও। আবার এরকমও হতে পারে যে, 'বিল হাক্বক্বি' এর 'বা' বর্ণটি এখানে সঙ্গতার অর্থ প্রদায়ক। অর্থাৎ মৃত্যুর তিক্ততা মৃত্যুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেই। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মৃত্যুযাতনা ও মৃত্যু যেমন সত্য, তেমনি সত্য মৃত্যুপরবর্তী অবস্থাসমূহও।

'জালিকা' অর্থ এটা। অর্থাৎ এই মৃত্যু যন্ত্রণা, মৃত্যু, অথবা মৃত্যু পরবর্তী অবস্থাসমূহ। 'তাহীদ্' অর্থ অব্যাহতি চাও, পলায়ন করতে চাও। অর্থাৎ তোমরা ছিলে মৃত্যুর প্রতি পরান্মুখ। ছিলে কৃতকর্মের প্রতিফল অস্বীকারকারী। এর পূর্বে এখানে উহ্য রয়েছে 'ইউক্বালু' ক্রিয়াটি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মহাবিচারের দিবসে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে— দ্যাখো মৃত্যু ও মৃত্যু সম্পর্কিত সকলকিছুই তো ঘটলো, যেগুলোকে তুমি অস্বীকার করেছিলে।

আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোনো মানুষ যদি সমুদ্রে ডুবে মারা যায়, তার রক্ত-গোশত খেয়ে ফেলে সমুদ্রের মৎস, অবশিষ্ট থাকে কেবল হাড়-হাডডি। জোয়ারের জলে সেগুলো ভাসতে ভাসতে চলে আসে তটভূমিতে, ক্রমে ক্রমে হতে থাকে জীর্ণ, জীর্ণতর। এরপর কোনো উট যদি সেগুলো খেয়ে ফেলে, তারপর সেগুলো পরিণত হয় উটের বিষ্ঠায়। কোনো মুসাফির সেখানে এসে শুকনো বিষ্ঠাকে যদি ব্যবহার করে জ্বালানীরূপে। আগুন নিভে যাবার পর সেগুলো হয়ে যায় ছাই। ওই ছাইগুলো যদি বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে ছড়িয়ে যায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, তবুও সেগুলো একত্রিত হবে। পুনর্জীবিত হবে ওই মানুষ, যখন ফুৎকার ধ্বনিত হবে ইস্রাফিলের শিঙ্গায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে সেই শিঙ্গার ফুৎকার ধ্বনি ও তৎপরবর্তী পরিস্থিতির বিবরণ।

২০ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ওটাই শাস্তির দিন'। এখানে 'নুফিখা ফিস্সূর' অর্থ আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। 'জালিকা' অর্থ ওই দিন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আর যখন শিঙ্গার ফুৎকার ধ্বনিত হবে, তখন পুনরুত্থান ঘটবে সকলের। ওই দিন হবে মহাআতঙ্কের দিন।

২১ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে— 'সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সঙ্গে থাকবে চালক ও সাক্ষী'। এখানে 'ওয়া জ্বাআত কুল্লু নাফ্সিন' অর্থ সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে। অর্থাৎ সেদিন বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, পুণ্যবান-পাপী সকলকেই সমবেত করা হবে বিচারের ময়দানে। 'তার সঙ্গে থাকবে চালক ও সাক্ষী' অর্থ ফেরেশতারা তখন হবে তাদের পরিচালক ও পক্ষ-বিপক্ষের সাক্ষী।

সাঈদ ইবনে মনসুর, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে উল্লেখ করেছেন, হজরত ওসমান ইবনে আফফান বলেছেন, সেদিন প্রত্যেককে তাড়া করে নিয়ে যাবে একজন ফেরেশতা এবং আর একজন ফেরেশতা সাক্ষ্য প্রদান করবে তার কৃতকর্মের। ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, সেই তাড়নাকারী হবে ফেরেশতা এবং সাক্ষী হবে তার আমল। ইমাম সুয়ূতী তাঁর 'আলবারযাখ' পুস্তকে সুপরিণত সূত্রে উল্লেখ করেছেন, যখন মহাপুনরুত্থান ঘটবে, তখন পুণ্য ও পাপ লেখক ফেরেশতাদ্বয় পুনঃউপস্থিত হবে প্রত্যেকের কাছে। তাদের গলায় ঝুলানো আমলনামাসমূহ তারা হস্তগত করবে তখন এবং তাদের সঙ্গে উপস্থিত হবে হাশরের ময়দানে। ফেরেশতাদ্বয়ের একজন হবে তখন তাড়নাকারী এবং অন্যজন হবে সাক্ষী। আবু নাঈম, ইবনে আবী হাতেম এবং

www.eelm.weebly.com

ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়াও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। জুহাক বলেছেন, তখন তাড়নাকারী হবে ফেরেশতা এবং সাক্ষী হবে মানুষের হাত-পা। আউফীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন।

২২ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তুমি এই দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে, এখন আমি তোমার সম্মুখ থেকে পর্দা উন্মোচন করেছি। আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর'।

এখানে 'গিত্বআকা' অর্থ আখেরাতের বিষয়াদি গোপন রাখার আচ্ছাদন। অর্থাৎ উদাসীনতা, অন্যমনস্কতা, পৃথিবীর সম্ভোগপকরণে মত্ত হয়ে শুভবিবেচনাকে অবরুদ্ধ করে রাখা। ঔদাসীন্যের এই পর্দাকে আল্লাহ্পাক নাম দিয়েছেন 'গিশাওয়াহ্' (পর্দা) এবং 'রইন' (জং)। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'খতামাল্লহু আ'লা কুলুবিহিম ওয়া আ'লা সামই'হিম ওয়া আ'লা আব্সরিহিম গিশাওয়াহ্'। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'কাল্লা বাল্ রানা আ'লা কুলুবিহিম'।

'ফাবাসারুকাল ইয়াওমা হাদীদ' অর্থ আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর। অর্থাৎ দুনিয়ার মোহে অন্ধ ছিলে বলে আখেরাতের বিষয়ে তোমার অন্তর্দৃষ্টি তখন ছিলো

অন্ধ, কিন্তু আজ তো তুমি স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছো সবকিছু। বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ—আজ তোমার ও সকলের পাপ-পুণ্য ওজন করা হচ্ছে নিখুঁত নিক্তিতে, আর তা তো তুমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছোও।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে—'তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে, এই তো আমার নিকট 'আমলনামা প্রস্তুত'। এখানে 'ক্বরীনুহু' অর্থ ওই ফেরেশতা, যে ব্যক্তি মানুষের কৃতকর্মের বিবরণ লেখার কাজে নিয়োজিত। 'হাজা মা লাদাইয়্যা আ'তীদ' অর্থ এই তো আমার নিকটে আমলনামা প্রস্তুত'। 'হাজা' (এইতো) এখানে ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্য। এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি, অথবা তার আমলনামার প্রতি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর সঙ্গে যে আমললেখক ফেরেশতা থাকে, সে তখন বলবে, যার আমল আমি লিখতাম, সে তো এখানে উপস্থিত। অথবা— এই তো আমার কাছে তার আমলনামা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আদেশ করা হবে, তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ করো জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত কাফেরকে— (২৪) কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধা প্রদানকারী, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী (২৫)।

এখানে 'আলক্বীয়া' অর্থ তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ করো। 'উভয়ে' অর্থ এখানে তাড়নাকারী ও সাক্ষ্যদাতা ফেরেশতা। অথবা দোজখে নিযুক্ত ফেরেশতাদের মধ্যে দু'জন ফেরেশতা। কিংবা সম্বোধিত জন প্রকৃতপক্ষে এখানে একজন। আর দ্বিবচন বিশিষ্ট ক্রিয়াটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে কাজটি দু'বার করবার জন্য। অর্থাৎ 'নিক্ষেপ করো' 'নিক্ষেপ করো'। অথবা 'আলক্বীয়া' ক্রিয়ার 'আলিফ' এখানে দ্বিবচন নয়। বরং এটি হচ্ছে 'নূনে খফীফা' থেকে পরিবর্তিত 'আলিফ'। এর প্রকৃত রূপ ছিলো 'আলক্বীয়ান'। কোনো কোনো উচ্চারণরীতিতে কথাটি 'আলক্বীয়ান' রূপেই এসেছে। আর 'আ'নীদ' অর্থ উদ্ধত, উন্নাসিক।

'লিল খইর' (কল্যাণকর কাজ) অর্থ এখানে ফরজ জাকাত। অথবা এমন সম্পদ, যা দান করা ওয়াজিব। 'মু'তাদিন' অর্থ ওই সীমালংঘনকারী, যে আল্লাহ্র এককত্বে আস্থাশীল নয়। আর 'মুরীব' অর্থ আল্লাহ্র সত্তা, গুণবত্তা ও ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করতো, তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করো'। একথার অর্থ— তখন তাদের সম্পর্কে এরকম আদেশও দেওয়া হবে যে, যারা আল্লাহ্র অংশীদার নির্ধারণ করতো, তাদেরকে কঠিন শাস্তিতে নিপতিত করা হোক। 'কঠিন শাস্তি' অর্থ এখানে— দোজখের আগুনের শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তার সহচর শয়তান বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাকে অবাধ্য করিনি। বস্তুত সে-ই ছিলো ঘোর বিভ্রান্ত'। হজরত ইবনে আব্বাস, মুকাতিল ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন,

এখানে 'ক্বরীন' (সহচর) অর্থ ওই ফেরেশতা, যে মানুষের আমল লেখার কাজে নিয়োজিত। সাঈদ ইবনে যোবায়ের আরো বলেছেন, ওই ফেরেশতা একথা বলবে ওই সময়, যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলবে, ফেরেশতারা আমাদের আমল লেখার ব্যাপারে অতিরিক্ত করেছে।

'মা আত্বগইতুহু' অর্থ আমি তাকে অবাধ্য করিনি। অর্থাৎ আমি আমার পক্ষ থেকে তাকে অবাধ্য সাব্যস্ত করিনি। আমল লেখার ব্যাপারে অতিরঞ্জিতও করিনি।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে 'ক্বরীন' অর্থ ওই শয়তান, যাকে নিযুক্ত করা হয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তখন বলবে, শয়তানই আমাকে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। জবাবে শয়তান বলবে, না। আমি তাকে পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য করিনি। আমি তো দিয়েছিলাম কেবল প্রচ্ছন্ন প্ররোচনা। বস্তুত সে নিজেই ছিলো ঘোরতর ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। সেকারণেই তো সে আমার প্ররোচনাকে মনে করেছিলো গ্রহণযোগ্য। অবশ্য প্রকৃত অবস্থা এরকমই। যখন আকিদা-

www.eelm.weebly.com

বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়, তখনই জেগে ওঠে পাপপ্রবণতা। আর শয়তানের প্ররোচনা কার্যকর হতে পারে কেবল তখনই। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে— শয়তান সেদিন বলবে, আমি তো তোমাদের উপরে বলপ্রয়োগ করিনি। পাপের দিকে আহ্বান করেছিলাম কেবল। আর তোমরা আমার সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। কাজেই আজ তোমরা আমাকে দোষারোপ কোরো না। বরং দোষ দাও নিজেদেরকে। উল্লেখ্য, একারণেই সূফী-সাধকগণ আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ করেন। ফলে ছিন্ন হয়ে যায় শয়তানের প্ররোচনারসূত্র। কেননা প্রবৃত্তির পথ ধরেই শয়তান অনুপ্রবেশ করে মানুষের দেহ নামক গৃহে।

আরবভাষী আলেমগণ বলেন, একের পর এক যদি দু'টি নির্দিষ্টবাচক শব্দ উল্লেখ করা হয়, তবে দ্বিতীয়টির অর্থ তা-ই হবে, যা অর্থ হয় প্রথমটির। একথাও তাঁরা বলেন যে, সম্বন্ধ পদের মূল হচ্ছে বাহ্যিকভাবে সীমিতকরণ। তাঁদের এমতো ব্যাখ্যার আলোকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ২৩ সংখ্যক আয়াতের 'ক্বরীন' এর অর্থ যেমন সঙ্গী ফেরেশতা করা হয়েছে, এখানকার 'ক্বরীন' অর্থও হবে তেমনি সহচর ফেরেশতা। অর্থাৎ আমল লেখার জন্য নিযুক্ত ফেরেশতা। সাঈদ ইবনে যোবায়ের এরকমই বলেছেন। অলংকারশাস্ত্রবেত্তাগণ তাই বলেন, 'ফা ইন্না মাআ'ল উ'স্রি ইউস্রান্ ইন্না মাআ'ল উ'স্রি ইউস্রান' এই আয়াতের প্রথম 'উ'স্র' এবং দ্বিতীয় 'উ'স্র' সমঅর্থসম্পন্ন।

পরবর্তী যুগের কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা বলেছেন, উভয় স্থানেই 'ক্বরীন' এর অর্থ হবে 'সহচর শয়তান' যাকে নিযুক্ত করে দেওয়া হয় কাফেরদের জন্য। এমতাবস্থায় উভয় আয়াতের সম্মিলিত অর্থ দাঁড়াবে— এই তো আমার কাছে উপস্থিত সেই লোক, পৃথিবীতে যে ছিলো আমার নিয়ন্ত্রণে। সে এখন দোজখগামী। তাকে দোজখের রাস্তায় পরিচালিত করেছি আমিই। কিন্তু আমি তাকে বলপ্রয়োগ করে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বানাইনি। আমি তাকে আহ্বান জানিয়েছিলাম মাত্র। আর সে স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই আমার আহ্বানকে গ্রহণ করেছে। পছন্দ করেছে আমার কুমন্ত্রণাকে, ফেরেশতার অনুপ্রেরণাকে নয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বলবেন, আমার সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা কোরো না; তোমাদেরকে আমি তো পূর্বেই সতর্ক করেছি (২৮)। আমার কথার রদবদল হয় না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোনো অবিচার করি না' (২৯)।

এখানে 'লা তাখতাসিমু লাদাইয়্যা' অর্থ আমার সম্মুখে বাকবিতণ্ডা কোরো না। অর্থাৎ এখন বিচারের সময়। সুতরাং এখানে অযথা বাদানুবাদ কোরো না। এখন এসকল কিছুর আর প্রয়োজনই নেই।

'ওয়াক্বদ ক্বদ্দাম্তু ইলাইকুম বিল ওয়ারীদ্' অর্থ তোমাদেরকে তো আমি পূর্বেই সতর্ক করেছি। অর্থাৎ যখন তোমরা পৃথিবীতে ছিলে, তখনই তো আমি আমার বার্তাবাহকগণের মাধ্যমে তোমাদেরকে এ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। তোমরা তো তখন অবজ্ঞাভরে সেই সতর্কবাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে।

'মা ইউবাদ্দালুল ক্বওলু লাদাইয়্যা' অর্থ আমার কথার রদবদল হয় না। অর্থাৎ আমার উক্তির অন্যথা হতে তো পারেই না। আমি তো বলেই দিয়েছি 'নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনা করেন না শিরিক। এছাড়া তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন'। কালাবী বলেছেন ক্বারীগণ কথাটির এরকম অর্থই পছন্দ করেছেন— আমার সামনে মিথ্যা বলা যায় না। আমার বাণী অপরিবর্তনীয়। কেননা আমি অদৃশ্য সম্পর্কে জানি। তাই আমার কাছে কোনো কিছুই গোপন নয়।

'ওয়ামা আনা বি জল্লামিলালিলা আ'বীদ' অর্থ আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোনো অবিচার করি না। 'জল্লাম' যদিও আধিক্যসূচক, তবুও একথা মনে রাখতে হবে যে, জুলুম বা অবিচারের আধিক্যকে এখানে রহিত করা হয়নি, রহিত করা হয়েছে খোদ জুলুমকেই। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উক্তিকে খণ্ডন করার জন্যই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এমতো আধিক্যবাচক শব্দরূপ। কেননা তারা তখন বলবে, এ হচ্ছে আমাদের উপরে জুলুম। এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন 'আম্ ইয়াখাফূনা আঁইয়্যাখীফাল্লাহ্ আ'লাইহিম ও রসুলুহু বাল উলায়িকা হুমুজ্জলিমূন'।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ৩০

❑ সেই দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করিব, 'তুমি কি পূর্ণ হইয়া গিয়াছ?' জাহান্নাম বলিবে, 'আরও আছে কি?'

আতা, মুজাহিদ ও মুকাতিল ইবনে সুলায়মান বলেছেন, এখানকার 'হালমিম মাযীদ' (আরও আছে কি) এই প্রশ্নটি অস্বীকারার্থক। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সকল জাহান্নামীকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর যখন আমি জাহান্নামকে বলবো, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গিয়েছো, তখন সে বলবে, আরো আছে নাকি? আমার

মধ্যে আর তো কোনো খালি জায়গা নেই। আমি তো ভরপুর। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এখানে 'আরো আছে কি' বলে আরো অধিক কামনা করা হয়েছে। কেননা বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন জাহান্নামীদেরকে অনবরত জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে থাকবে তখন সে বলতে থাকবে, আরো অধিক আছে কি? অবশেষে

www.eelm.weebly.com

বিশ্বজগতের মহাপ্রভুপালয়িতা তাঁর আনুরূপ্যবিহীন চরণ স্থাপন করবেন তার উপর। তখন সে কুঞ্চিত হতে থাকবে। ভয়ে জড়সড় হয়ে বলতে থাকবে— হয়েছে, হয়েছে। তোমার মহামর্যাদার শপথ! আমি এখন ভরপুর হয়ে গিয়েছি। কিন্তু জান্নাতের অবস্থা হবে অন্যরকম। সকল জান্নাতীকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর দেখা যাবে তার কিছু অংশ শূণ্য। তখন আল্লাহ্ এক বিশেষ জাতি সৃষ্টি করবেন। তারাই বসবাস করবে ওই শূন্য স্থানে।

ইবনে আবী আসেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জাহান্নাম যখন তখন অধিক খোরাক চাইতে থাকবে। তখন আল্লাহ্ তার আনুরূপ্যহীন কদম তার উপরে স্থাপন করবেন। সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ণ হতে থাকবে তার বিভিন্ন অংশ এবং সে বলতে থাকবে, বাস্ বাস্। হয়েছে। হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত পূর্বাহ্নেই স্থিরীকৃত। তিনি বলে দিয়েছেন জান্নাত ও জাহান্নামকে পূর্ণ করা হবে জ্বিন ও মানুষকে দিয়ে। মহাবিচার পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর জাহান্নামীদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামাভ্যন্তরে। এভাবে সকল জাহান্নামী জাহান্নামে প্রবেশ করার পরও সে অপূর্ণ থাকবে। বলবে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি কি আমাকে ভরপুর করে দেওয়ার অঙ্গীকার করোনি? তখন আল্লাহ্ তাঁর কুদরতী কদম রাখবেন তার উপর। বলবেন, এখন কি তুমি পরিপূর্ণ হয়েছো? সে বলবে, হ্যাঁ। আমি এখন ভরপুর।

বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহ্ ও জাহান্নামের মধ্যের এমতো সংলাপ রূপকার্থক, প্রকৃতার্থক নয়। প্রকৃত কথা হচ্ছে জাহান্নাম সুবিশাল হওয়া সত্ত্বেও মানুষ, জ্বিন ও পাথর দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আমি বলি, কথাটিকে রূপকার্থক ভাববার কোনো প্রয়োজনই নেই। প্রশ্নোত্তরের বিষয়টি যদি প্রকৃতই হয়, তবে তাতে অসুবিধার তো কিছু নেই। সেদিন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও তো আল্লাহ্ বাকশক্তিসম্পন্ন করবেন। সুতরাং জাহান্নামের তখন বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু হবে না।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

- ❑ আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হইবে মুত্তাকীদের— কোন দূরত্ব থাকিবে না।
- ❑ ইহারই প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল— প্রত্যেকে আল্লাহ্-অভিমুখী, হিফাযতকারীর জন্য—
- ❑ যাহারা না দেখিয়া দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়—
- ❑ তাহাদিগকে বলা হইবে, 'শান্তির সহিত তোমরা উহাতে প্রবেশ কর; ইহা অনন্ত জীবনের দিন।'
- ❑ এখানে তাহারা যাহা কামনা করিবে তাহাই পাইবে এবং আমার নিকট রহিয়াছে তাহারও অধিক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে মুত্তাকীদের'। এখানে 'মুত্তাক্বীন' অর্থ সাবধানী, আল্লাহ্‌ভীরু, অংশীবাদিতামুক্ত। 'গইরা বায়ীদ' অর্থ কোনো দূরত্ব থাকবে না। এখানে উহ্য রয়েছে একটি বিশেষ্য। ওই উহ্য বিশেষ্যসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— 'গইরা মাকানিম্ বায়ীদ' (স্থানগত কোনো দূরত্ব থাকবে না। অথবা 'গইরা জামানিন বায়ীদ' (থাকবে না কোনো সময়গত দূরত্ব)। অধিকতর নৈকট্য বুঝানোর জন্যই কথাটি এখানে বলা হয়েছে এভাবে, যদিও এখানকার 'উয্লিফাত' কথাটিও নৈকট্যের অর্থ প্রকাশক। যেমন বলা হয়— 'অমুকের বাড়িটি কাছেই, দূরে নয়' 'জায়েদ অভিজাত, অনভিজাত নয়'।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিলো— প্রত্যেক আল্লাহ্ অভিমুখী, হেফাজতকারীদের জন্য'। এখানে 'আউয়াব' অর্থ আল্লাহ্ অভিমুখী, পাপ পরিত্যাগ করে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী— বাহ্যিকভাবে, অভ্যন্তরীণভাবেও।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, 'আউয়াব' বলে ওই ব্যক্তিকে, যে পাপমগ্ন হওয়ার পরে তওবা করে। শা'বী ও মুজাহিদ বলেছেন, যে ব্যক্তি নির্জনে বসে কৃত পাপের কথা স্মরণ করে আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তাকেই বলে 'আউয়াব'। জুহাক 'আউয়াব' এর অর্থ করেছেন 'তাওয়াব' (অধিক তওবাকারী)। হজরত ইবনে আব্বাস 'আউয়াব' এর অর্থ করেছেন— আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনাকারী। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ইয়া জিবালূ আউয়্যিবী'। এখানে 'আউয়্যিবী' অর্থ পবিত্রতা

www.eelm.weebly.com

বর্ণনা করো। কাতাদা বলেছেন, 'আউয়াব' অর্থ নামাজ পাঠকারী। হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আউয়াবীনের নামাজ পড়তে হয় ওই সময়ে, যখন উষ্ট্রীমাতা থেকে আলাদা করা হয় তার শাবককে। মুসলিম।

'হাফীজ' অর্থ হেফাজতকারী। মর্মার্থ— হুজুরে কলবধারী বা একাগ্রচিত্তবিশিষ্ট, যে সার্বক্ষণিক সতর্কতা অবলম্বন করে পাপ থেকে, তুচ্ছ মনে করে না ক্ষুদ্রতম পাপকেও। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ— যে সকল অধিকারপূরণকে অত্যাবশ্যক করা হয়েছে, সে সমস্ত অধিকার পরিপূরণের বিষয়ে যে সজাগ। জুহাক অর্থ করেছেন— যে নিজের নফসের প্রতি হয় সুবিচারপ্রবণ। শা'বী বলেছেন, 'হাফীজ' অর্থ মোরাকাবাকারী। সুহাইল ইবনে আবদুল্লাহ্ অর্থ করেছেন— ইবাদতের পাবন্দ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়— (৩৩) তাদেরকে বলা হবে, শান্তির সঙ্গে তোমরা এতে প্রবেশ করো; এটা অনন্ত জীবনের দিন' (৩৪)।

এখানে 'মান খশিয়ার রহমানা বিল গইব' অর্থ যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে না দেখেই যারা ভয় করে আল্লাহ্‌র আযাবকে। অথবা অর্থ হবে— আল্লাহ্‌র আযাব থেকে যে নিজেকে রাখে মুক্ত, অদৃশ্য। কিংবা মূল পুণ্যকর্মকে যারা আড়াল করে রাখে জনগণের দৃষ্টি সীমানা থেকে। জুহাক, সুদ্দী ও হাসান বলেছেন, কথাটির অর্থ— যখন কেউ তাকে দেখতে পায় না, তখনও যে আল্লাহ্‌র ভয়ে থাকে ভীত। উল্লেখ্য এখানে 'নির্মম' (কাহ্হার) 'প্রতিশোধ গ্রহণকারী' (মুনতাক্বিম) এ সকল গুণবাচক নাম ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে 'দয়াময়' (রহমান)। এরকম করে এখানে ইঙ্গিতে এই কথাটিই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, যারা প্রকাশ্যে গোপনে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে, তারা করে তাঁর দয়ার প্রত্যাশাও। অথবা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে—আল্লাহ্‌র দয়া অপরিমেয় জানা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ্‌র অতুষ্টি ও শাস্তির ব্যাপারে থাকে শংকিত, মুক্ত থাকে দুর্বিনয় ও দুঃসাহস থেকে। এরকম প্রতারণায় পড়ে না যে, পাপ করলেও ক্ষতি নেই, আল্লাহ্ তো দয়ালু।

'বি সালামিন' অর্থ শান্তির সঙ্গে, আযাব, অসন্তোষ ও অনুগ্রহবিচ্যুত হওয়া থেকে আশংকামুক্ত অবস্থায়। 'উদখুলূহা' অর্থ প্রবেশ করো। অর্থাৎ প্রবেশ করো জান্নাতে। অথবা বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা এখন আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে শান্তিসম্ভাষণসহ প্রবেশ করো চিরসুখময় স্থান বেহেশতে। আজ থেকে সূচিত হলো তোমাদের অনন্ত শান্তির জীবন।

'জালিকা' অর্থ এই দিন। অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের দিন। 'ইয়াওমাল খুলুদ' অর্থ অনন্তজীবনের দিন। অর্থাৎ ওই দিন হুকুম দেওয়া হবে চিরকাল জান্নাতে বসবাসের জন্য। অন্য এক আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন 'ফাদখুলূ হা খলিদীন' (জান্নাতে প্রবেশ করো চিরকালের জন্য)।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতীরা বেহেশতে এবং দোজখীরা দোজখে প্রবেশ করার পর জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, হে দোজখীরা! শোনো, আর কোনোদিন তোমাদের মৃত্যু হবে না। আর হে বেহেশতীরা! তোমরাও শোনো, তোমাদেরও

মৃত্যু হবে না আর কখনো। তোমরা আপন আপন অবস্থানে চিরকাল থাকবে। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেদিন বলা হবে, হে বেহেশতের অধিবাসীরা! তোমাদের বেহেশতবাস চিরকালীন। তোমাদের আর মৃত্যু নেই। আর হে দোজখের বাসিন্দারা! তোমাদের দোজখবাসও চিরস্থায়ী। তোমরাও আর মরবে না।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'এখানে তারা যা কামনা করবে, তা-ই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে তারও অধিক'।

এখানে 'ওয়া লাদায়না মাযীদ্' অর্থ এবং আমার নিকট রয়েছে আরো অধিক। অর্থাৎ বেহেশতবাসীরা যা চাইবে, তা-ই পাবে। তদুপরি পাবে এমন নেয়ামত, যা তাদের চোখ কখনো দেখেনি, শোনেনি কান। ওই অকল্পনীয় দান আমি বিশেষভাবে জমা করে রেখেছি তাদেরই জন্য।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতবাসীদের মর্যাদা অন্ততপক্ষে হবে এরকম— আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা তোমাদের হৃদয়ের বাসনা নিবেদন করো। তারা নিবেদন করবে মনে মনে। আল্লাহ্ বলবেন, কী চাও, তাকি স্থির করেছো? তারা বলবে, হ্যাঁ। বলা হবে, তোমাদের বাসনা পরিপূরিত তো হবেই, তদুপরি দেওয়া হবে অনুরূপ আরো। মুসলিম। হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে একথাগুলিও এসেছে যে, আল্লাহ্ বলবেন, আমি আমার প্রকৃত দাসগণের সঙ্গে এই অঙ্গীকার করেছি যে, আমি তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবো। সেখানে তারা যা চাবে, তা-ই পাবে। আরো পাবে দ্বিগুণ।

হজরত জাবের ও হজরত আনাস বলেছেন, এখানে 'তারো অধিক' (মাযীদ) অর্থ আল্লাহ্‌র দীদার। মুসলিম ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত সুহাইব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি

www.eelm.weebly.com

কামনা করো যে, আমি তোমাদেরকে আরো কিছু দেই? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আপনি তো আমাদেরকে সবকিছুই দিয়েছেন। দিয়েছেন জান্নাত, রক্ষা করেছেন জাহান্নাম থেকে। আর আমরা কী চাইবো? আল্লাহ্ তাঁর আবরণ উন্মোচন করবেন। দয়া করে দান করবেন দীদার। তখন জান্নাতীদের মনে হবে দীদারের চেয়ে সুখকর কিছুই নেই। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন 'যারা পুণ্যকর্ম করেছে, তাদের জন্য থাকবে আরো অধিক'। হাদিসটি আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস থেকে ইবনে খুজাইমা, ইবনে মারদুবিয়া, আবু শায়েখ এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে কেবল আবু শায়েখ। বহুসংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীক, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত হুজায়ফা ও হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও। বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্র নির্দেশে এক ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীরা! আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার ও অধিক কিছু প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ওই উত্তম পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত এবং অধিক কিছু হচ্ছে তাঁর দীদার। ওই ঘোষণা শুনতে পাবে সামনের এবং পিছনের সকলেই।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭

❑ আমি তাহাদের পূর্বে আরও কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা ছিল উহাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল, উহারা দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত; উহাদের কোন পলায়নস্থল রহিল কি?

❑ ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে তাহার জন্য যাহার আছে অন্তঃকরণ অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তাদের পূর্বে আরো কতো মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, যারা ছিলো তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল'। এখানে 'তাদের পূর্বে' অর্থ রসুল স. এর স্বজাতি কুরায়েশদের পূর্বে। আর 'যারা ছিলো তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল' অর্থ কুরায়েশদের চেয়ে ওই সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি ছিলো অধিকতর শক্তিমত্তা ও শৌর্য-বীর্যের অধিকারী। যেমন আদ, ছামুদ, ফেরাউনের সম্প্রদায় ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াত'। একথার অর্থ— ওই সকল দুর্বিনীত জাতিগোষ্ঠী বুক ফুলিয়ে যত্রতত্র প্রদর্শন করতো তাদের দাপট। 'নাক্বক্বাবু' অর্থ ঘুরে বেড়াতো। উল্লেখ্য, 'আনক্বাবা' ও 'নাক্বাবা' শব্দ দু'টো সমঅর্থসম্পন্ন। আমি বলি, এখানে 'বাবে তাফয়ীলের' প্রক্রিয়ায় সাধিত ক্রিয়া ব্যবহারের দ্বারা ক্রিয়ার আধিক্যকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা দেশে দেশে ঘুরে জাগতিক দিক দিয়ে খুবই লাভবান হয়েছিলো। এরকম ব্যাখ্যা করা হলে বুঝতে হবে, এখানকার 'ফা' অব্যয়টি কারণপ্রকাশক। অর্থাৎ তারা লাভবান হয়েছিলো পৃথিবী পরিভ্রমণের কারণে। কেননা তারা যেখানেই যেতো সেখানেই প্রভাব বিস্তার করতো। অথবা কথাটির অর্থ হবে তারা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতো মৃত্যুর ভয়ে। এরকম ব্যাখ্যা করলে এখানকার 'ফা' অর্থ হবে— 'তা'কীব' বা অনুক্রম উদ্দেশ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের কোনো পলায়নস্থল রইলো কি'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। আর 'মিম্ মাহীস' এর 'মিন' এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— দেশে দেশে তারা ঘুরে বেড়ালো তো ঠিকই, কিন্তু কোনো আশ্রয়স্থল পেলো কি? বাঁচতে পারলো কি আল্লাহ্র আযাব থেকে? তাহলে মক্কার মুশরিকেরা কেনো একথা চিন্তা করে না যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানে অনড় থাকলে তাদেরও তো কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না।

এরকমও হতে পারে যে, 'নাক্বক্বাবু' (তারা ঘুরে বেড়াতো) ক্রিয়ার 'তারা' সর্বনামটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে মক্কার মুশরিকদেরকে। অর্থাৎ মক্কাবাসীরা দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। পর্যবেক্ষণ করে অতীতের বিনাশপ্রাপ্ত জাতিগুলির বিরাণ জনপদসমূহ। স্বচক্ষে দেখতে পায় আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণের শাস্তি কতো ভয়াবহ। এতদসত্ত্বেও তারা কীভাবে এমতো আশা পোষণ করতে পারে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা নিস্তার পাবে?

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'এতে উপদেশ আছে তার জন্য, যার আছে অন্তঃকরণ, অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে'। এখানে 'এতে' অর্থ এই সুরায়, এই কোরআনে, অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর এই ঘটনায়। 'লাজিক্রা' অর্থ উপদেশ, শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। আর 'যার আছে অন্তঃকরণ' অর্থ যার রয়েছে সুস্থ বিচার-বিবেচনা, বিশুদ্ধ ও বিনীত হৃদয়, যে হৃদয় ধারণ

www.eelm.weebly.com

করতে পারে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর জ্যোতিচ্ছটা, আল্লাহ্‌র জিকিরে যে মন থাকে সতত জাগ্রত, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের বা অন্য কোনোকিছুর মোহ যে অন্তঃকরণে থাকেই না। এরকম বিশুদ্ধ হৃদয়ের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে হাদিসে কুদসীতেও। যেমন— রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌ বলেন, আকাশ-পৃথিবী কেউই আমাকে ধারণ করতে পারে না, ধারণ করতে পারে কেবল বিশ্বাসীদের বিশুদ্ধচিত্ত। সূফী-দরবেশগণ বলেন, এরকম বিশুদ্ধচিত্ত লাভ হতে পারে তখন, যখন সাধিত হয় আত্মবিলোপ বা ফানা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'অন্তঃকরণ' অর্থ সুস্থ জ্ঞান ও শুভ বিবেক। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, শুভউপদেশ গ্রহণ করতে পারে কেবল সেই অন্তঃকরণ, যে হৃদয় প্রতিটি বিষয়ে তীক্ষ্ণ তত্ত্বসন্ধানী।

'যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে' অর্থ এতে শুভ উপদেশ রয়েছে তার জন্যও যার হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে হয় প্রশান্ত। অর্থাৎ যে কোরআনের বাণী শ্রবণ করে একাগ্রচিত্তে। অন্যমনস্ক হয় না এতটুকুও। অথবা 'শাহীদ' অর্থ নিবিষ্ট চিত্তধারী না হয়ে হবে, সাক্ষ্যদাতা। অর্থাৎ যে উৎকর্ণ হয়ে কোরআন শোনে এবং হৃদয় দ্বারা তার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। বিশ্বাস করে মনেপ্রাণে। আর যাপন করে কোরআনানুগ সতর্ক জীবন।

আমি বলি, প্রশান্তচিত্তধারী হন কামেল ব্যক্তিগণ। আর বিশুদ্ধ মুরিদ যাঁরা, তাঁরা হন হৃদয় দ্বারা প্রত্যক্ষকারী। হাদিস শরীফে এরকমই বলা হয়েছে। যেমন রসুল স. বলেছেন, ইবাদতের সৌন্দর্য এই যে, তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে, যেনো তুমি আল্লাহ্‌কে দেখছো। যদি তা না পারো, তবে অন্তত এতটুকু খেয়াল রেখো যে, তিনি তো তোমাকে দেখছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাকেম কর্তৃক বর্ণিত ও 'যথার্থ' আখ্যায়িত এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, একবার কতিপয় ইহুদী রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্নের অবতারণা করলো। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্‌ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন রবিবারে, সমুদ্র সোমবারে, পাহাড়-পর্বত ও তৎমধ্যবর্তী কল্যাণকর বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন মঙ্গলবারে,তরুশ্রেণী, লোকালয় ও

বিরাণ প্রান্তর সৃষ্টি করেছেন বুধবারে, আকাশ বৃহস্পতিবারে, তারকাপুঞ্জ, চন্দ্র-সূর্য ও ফেরেশতা শুক্রবারের তিন ঘণ্টা অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত। সেই তিন ঘন্টার প্রথম ঘণ্টায় সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু, দ্বিতীয় ঘণ্টায় মানুষের জন্য কল্যাণকর বস্তুসমূহ এবং তৃতীয় ঘণ্টায় আদম। তৎপর আদমকে জান্নাতে স্থান দিয়ে ইবলিসকে নির্দেশ দিলেন, আদমকে সেজদা করতে। আর ওই তৃতীয় ঘণ্টার শেষ পাদেই জান্নাত থেকে বহিস্কার করলেন আদমকে। ইহুদীরা বললো, তারপর? তিনি স. বললেন, তারপর আল্লাহ্‌ আনুরূপ্যহীনভাবে সমাসীন হলেন তাঁর মহাআরশে। তারা বললো, তারপর পরিশ্রান্ত আল্লাহ্‌ বিশ্রাম গ্রহণ করলেন— এরকম বললে ঠিক হতো। তাদের এমতো অপবচন শুনে রসুল স. রাগান্বিত হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নোক্ত আয়াতত্রয়। বলা হলো—

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০

❑ আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছি ছয় দিনে; আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই।

❑ অতএব উহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে,

❑ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং সালাতের পরেও।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি 'হও' বললেই সবকিছু হয়ে যায়। তৎসত্ত্বেও মানুষকে ধারাবাহিকতার নিয়ম শিক্ষা প্রদানার্থে আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে। আর এ সকল কিছু সৃষ্টি করতে আমি ক্লান্ত হইনি। ক্লান্তি ও শ্রান্তি আমাকে তো স্পর্শ করতে পারেই না। অতএব হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি ওই ইহুদীদের কথায় অসহিষ্ণু হবেন না। বরং তাদেরকে আপনি উপেক্ষা করে চলুন। তারা তো আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। আমি তাদেরকে প্রথমবার যখন সৃষ্টি করেছি, তখন তাদেরকে নিশ্চয় দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করতে পারবো এবং তখন তাদেরকে কঠোর শাস্তিও দিতে পারবো। তাই আপনি তাদের বিষয়ে বিচলিত না হয়ে অবলম্বন

www.eelm.weebly.com

করুন ধৈর্য। রত থাকুন আমার সপ্রশংসা মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনায়— বিশেষভাবে সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে ও পরে এবং রাতের একাংশে। সালাতের পরেও।

এখানে 'মিল্লুগুব' অর্থ ক্লান্তি, শ্রান্তি, অবসাদ। 'তারা যা বলে' অর্থ ওই সকল পাপিষ্ঠ ইহুদী যে সকল অপমন্তব্য করে।

এ প্রসঙ্গে হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিমের মাধ্যমেও একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ওই হাদিসে ইহুদীদের প্রশ্ন করার কথাটি নেই। হাদিসটি এরকম— হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. আমার হাত ধরলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ শনিবারে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা, রবিবারে পাহাড়-পর্বত। সোমবারে বৃক্ষরাজি, মঙ্গলবারে বিপদাপদ, বুধবারে নূর, বৃহস্পতিবারে চতুষ্পদ প্রাণীসমূহ। আর সবশেষে শুক্রবারে আসরের পর মুহূর্তে আদমকে। আমি বলি, শনিবারে মাটি সৃষ্টি করার কথাটি বর্ণনাগত ভুল। প্রকৃত কথা এই যে, বিশ্বজগত সৃষ্টির সূত্রপাত হয় রবিবারে এবং শেষ হয় শুক্রবারে। আর আলোচ্য আয়াতেও বলা হয়েছে ছয় দিনে বিশ্বজগত সৃষ্টি করার কথা। সুতরাং শনিবারের উল্লেখ তো আসতেই পারে না। কেননা শনিবার হচ্ছে সপ্তাহের সপ্তম দিবস।

একটি সন্দেহ ও তার অপনোদন ঃ বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে আসমান জমিন জ্বিন ফেরেশতা সৃষ্টির অনেক পরে। হজরত আদমের পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে এখানে রাজত্ব করতো জ্বিনেরা। ইবলিস ছিলো ফেরেশতাদের দলভূত। পৃথিবী, পৃথিবীর নিকটতম আকাশ ও জান্নাতে ছিলো তার অবাধ যাতায়াত। সর্বত্রই সে লিপ্ত থাকতো ইবাদত-বন্দেগীতে। 'হাল আতা আ'লাল ইনসানি হীনুম্ মিনাদ্ দাহ্রি লাম ইয়াকুন শাইআম্ মাজকুরা' এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, আদমের দেহ সৃষ্টির পর তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের পূর্বে দেহটি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত রেখে দেওয়া হয়েছিলো মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে। তখন কেউ তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতো না। কেউ জানতো না তাঁর নাম-ধাম, পরিচয়। তাঁকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য যে কী, তার খবরও কেউ রাখতো না। এরকম লিখেছেন বাগবী। কিন্তু ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে জানা গেলো, শুক্রবারের শেষ মুহূর্তে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন ফেরেশতাবৃন্দ ও নভোমণ্ডলকে। এরকম বৈপরীত্যের সমাধান তাহলে কী? এমতো প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতে চাই, সম্ভবত ওই হাদিসসমূহে বর্ণিত আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্য হবে লওহে মাহফুজে আদম সৃষ্টির বিশেষ পরিকল্পনা এবং সেখানে তাঁর উদাহরণগত উপস্থিতি। আর ওই হাদিসগুলোতে এরকম ইঙ্গিতও রয়েছে যে, প্রথম মুহূর্তে সৃষ্টি করা হয়েছে মৃত্যুর এক নির্ধারিত সময়, যখন মরণশীলেরা মৃত্যুবরণ করবে। এরপর সৃষ্টি করেছেন বিপদাপদ, যা অবতীর্ণ হয় মানুষের কল্যাণার্থে। সৃষ্টির অর্থ যদি সেখানে সৃষ্টির পরিকল্পনা না ধরা হয়, তবে এরকম ব্যাখ্যা সম্ভব হবে না।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'সাব্বিহ' (পবিত্রতা ঘোষণা কোরো) অর্থ নামাজ পাঠ করো। আর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ফজর ও আসরের নামাজকে। ইমাম মালেকও এরকম বলেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন 'কব্‌লাল গুরুব' অর্থ জোহর ও আসরের নামাজ। সম্ভবতঃ হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতের ভিত্তি হচ্ছে নামাজ দু'টির জরুরী ওয়াক্ত একটিই।

'তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো রাত্রির একাংশে' অর্থ সন্ধ্যায় ও রাতে পাঠ করো মাগরিব ও এশা। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ— রাতের বেলায় পাঠ করো নফল নামাজ। আর 'ওয়া আদ্‌বারাস্‌ সুজুদ' অর্থ এবং সালাতের পরেও। হজরত ওমর, হজরত আলী, হাসান, শা'বী, নাখয়ী ও আওজায়ী বলেছেন, কথাটির অর্থ— দুই রাকাত নামাজ পাঠ করো মাগরিবের পূর্বে। 'ইদবারান্‌ নুজুম' অর্থ যেমন ফজরের পূর্বের দুই রাকাত নামাজ। আউফির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজিও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকার এরকমই তাফসীর করেছেন। কিন্তু আমি বলি, 'আদবারাস্‌ সুজুদ' এর এরকম অর্থ করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা সূর্য অস্ত যাওয়ার প্রাক্কালে সেজদা দেওয়াই জায়েয নয়। ওই সময় নামাজ পাঠ নিষিদ্ধ। তাই আমার মতে, কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে ওই সকল নফল নামাজকে, যে নামাজ পাঠ করা হয় প্রত্যেক ফরজের পরে।

এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'সাব্‌বিহ্‌হু' অর্থ পাঠ করো 'সুবহানাল্লহ্‌' (আল্লাহ্‌ পবিত্র)। যেমন 'ফাসাব্‌বিহ্‌ বিহামদি রব্বিকা' আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতা বর্ণনা করার কথা।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সকাল সন্ধ্যায় যে ব্যক্তি একশ' বার করে 'সুবহানাল্লহ্‌' পাঠ করে মহাবিচারের দিবসে তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আর কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। তবে ওই ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, যে অন্যান্য আমলের সঙ্গে করে এই আমলও। সুপরিণত সূত্রে বোখারী ও মুসলিম আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশ' বার করে 'সুবহানাল্লাহ্‌ ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করে, তার পাপসমূহ ঝরে পড়ে যায়, যদিও সে পাপ হয় সমুদ্র পরিমাণ। তাঁরা আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দু'টি বাক্য উচ্চারণে সহজ, কিন্তু ওজনে ভারী, এবং তা আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত প্রিয়। বাক্য দু'টি হচ্ছে— 'সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী' ও 'সুবহানাল্লহিল আ'জীম'।

মুজাহিদ বলেছেন, 'ফাসাব্‌বিহ্‌হু ওয়া আদ্‌বারাস্‌সুজূদ' অর্থ ফরজ নামাজের পর মুখে মুখে 'সুবহানাল্লহ' বলা। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ফরজ নামাজের পর তেত্রিশ বার 'সুবহানাল্লহ্‌' তেত্রিশ বার

'আলহামদুলিল্লাহ্‌' ও তেত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করার পর বলে 'লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদ ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাই্‌ইন ক্বদীর' তার গোনাহ সমুদ্র পরিমাণ হলেও তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। বোখারী, মুসলিম।

সূরা ক্বফ ঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫

❑ শোন, যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান হইতে আহবান করিবে,

❑ যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনিতে পাইবে মহানাদ, সেই দিনই বাহির হইবার দিন।

❑ আমিই জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে।

❑ যেদিন তাহাদের উপরস্থ যমীন বিদীর্ণ হইবে এবং মানুষ ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিবে, এই সমবেত সমাবেশকরণ আমার জন্য সহজ।

❑ উহারা যাহা বলে তাহা আমি জানি, তুমি উহাদের উপর জবরদস্তিকারী নহ; সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাহাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'ওয়াস্তামি'। এর অর্থ— শোনো। এভাবে সম্বোধন করে এখানে কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা ও বিশালতা সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— যেদিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে।

মুকাতিল বলেছেন, কিয়ামতের দিন হজরত ইস্রাফিল ডাক দিয়ে বলবেন, হে প্রাচীন অস্থিসমূহ! হে পৃথক পৃথক গ্রন্থিসমূহ! হে বিচ্ছিন্নকৃত টুকরা টুকরা গোশতসমূহ! হে বিক্ষিপ্ত কেশরাশি! তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তোমরা বিচারপর্বের জন্য প্রস্তুত হও। মিলিত হও পরস্পরের সঙ্গে। ইবনে আসাকের, জায়েদ ইবনে জাবের ও শাফেয়ী এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিন হজরত ইস্রাফিল বায়তুল মাকদিসের প্রস্তরে দাঁড়িয়ে বলবেন, হে পুরাতন হাড়! হে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চুল! আল্লাহ্ তোমাদেরকে হুকুম করছেন, তোমরা একত্রিত হও। প্রস্তুত হও বিচারের জন্য।

'মিম্ মাকানিন্ ক্বরীব' অর্থ নিকটবর্তী স্থান থেকে। অর্থাৎ বায়তুল মাকদিসের প্রস্তর থেকে। উল্লেখ্য, তখন বায়তুল মাকদিসের প্রস্তরটি হবে কবরসমূহের নিকটে। কালাবী বলেছেন, তখন প্রস্তরটি হবে আকাশের তুলনায় পৃথিবীর আঠারো মাইল কাছে।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনতে পাবে মহানাদ, সেই দিনই বের হবার দিন।' 'ইয়াওমা ইয়াস্মাউ'না' অর্থ আল্লাহ্র হুকুমে সেদিন মৃত মানুষেরাও ইস্রাফিলের সেই ডাক শুনতে পাবে। জড়পদার্থও সে ডাক শুনবে সচেতন সৃষ্টিকুলের মতো। কেননা তারা দৃশ্যত জড় হলেও এক ধরনের জীবনের অধিকারী। সুরা মুল্কের 'খলাক্বল মাউতা ওয়াল হায়াতা' আয়াতের তাফসীরে আমি এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছি।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, কবরের আযাব হবে দেহ ও আত্মা দু'টোর উপরেই। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বদর যুদ্ধে শহীদগণের সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, তোমাদের প্রভুপালক তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা-কি তোমরা বাস্তবরূপে পেয়েছো? আমাদেরকে তো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো বিজয়ের। আমরা তো-তা চাক্ষুষ করেছি। হজরত ওমর তখন বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! যাদের প্রাণ নেই, তারা কি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছে? তিনি স. বলেছিলেন, হ্যাঁ। শুনতে পাচ্ছে তোমাদের চেয়ে অধিক সুস্পষ্টরূপে। কিন্তু জবাব দেওয়ার অধিকার তাদের নেই।

কুরতুবী বলেছেন, শিঙ্গার প্রথম আওয়াজ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ওই আওয়াজ শুনে জীবিতরা মরে যাবে। দ্বিতীয় আওয়াজ ধ্বনিত হবে কবরবাসীদেরকে কবর থেকে বাইরে আনার জন্য। ওই আওয়াজ শুনতে পাবে জড়-অজড় সকলেই। ইমাম সুয়ুতী বলেছেন, এরকমও হতে পারে যে, হজরত ইস্রাফিলের শিঙ্গার ভিতরে যে সকল রূহ থাকবে, তারা প্রথম আওয়াজও শুনতে পাবে। আমি বলি, ইতোপূর্বে আমরা জানতে পেরেছি, হজরত ইস্রাফিল তখন সম্বোধন করবেন অস্থিসমূহ, কেশগুচ্ছ ও চর্ম-মাংসকে, রূহকে নয়। আর রূহসমূহের তো শ্রবণেন্দ্রিয়ই নেই।

'আস্সইহাতা' অর্থ মহানাদ, হজরত ইস্রাফিলের শিঙ্গার বিকট আওয়াজ। বায়যাবী লিখেছেন, দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনির সময় যে আহ্বান জানানো হবে, সম্ভবতঃ তা হবে 'কুন' (হয়ে যাও) নির্দেশের মতো। অর্থাৎ তা হবে সৃষ্টিমূলক আদেশ। সে আদেশ শ্রবণ করা জরুরী কিছু নয়। আমি বলি, এখানে তো 'যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনতে পাবে' কথাটি স্পষ্ট করেই বলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শোনার বিষয়টি তো জরুরীই। আর এখানকার 'অবশ্যই' (বিল হাক্ব) কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'আস্সইহাতু' বা মহানাদের সাথে। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সেই মহানাদ শুনতে পেয়ে মানুষ অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে বিচারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য। তারপর হবে পুরস্কৃত অথবা তিরস্কৃত।

'জালিকা ইয়াওমুল খুরূজ' অর্থ সে দিনই বের হবার দিন। অর্থাৎ সেই দিনই পুনরুত্থানের দিবস।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে'। একথার অর্থ জীবন ও মৃত্যু দু'টোই আমার অভিপ্রায়ের অধীন। আমি যেমন ইচ্ছামতো জীবনদান করি, তেমনি ইচ্ছামতো ঘটাই মৃত্যু। আর শেষে তো সকলকে আমার কাছে জবাবদিহীর জন্য হাজির হতে হবেই।

এরপরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'যেদিন তাদের উপরস্থ জমিন বিদীর্ণ হবে এবং মানুষ ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে ছুটাছুটি করবে, এই সমবেত সমাবেশকরণ আমার জন্য সহজ'। একথার অর্থ— সে দিন স্ব স্ব সমাধিক্ষেত্র থেকে পুনরুত্থান ঘটবে সকলের। ধসে পড়বে সমাধির উপরাংশের মাটি। সকলে কিছুক্ষণ ছুটাছুটি করবে দিকভ্রান্তদের মতো। তারপর একত্রিত হবে বিচারের ময়দানে। আর সকল মানুষের এমতো একত্রায়ণ আমার জন্য সহজ। এখানে 'ইয়াসির' শব্দটির পূর্বে 'আ'লাইনা' উল্লেখ করে বিষয়টিকে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিশেষ করে এই সমবেত সমাবেশকরণের বিষয়টি আমার জন্য অত্যন্ত সহজ। উল্লেখ্য, এরকম অসম্ভব কর্মকে

সম্ভব করতে পারেন কেবল সেই সত্তা, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। যার এক কাজ অন্য কাজের অন্তরায় নয়। অর্থাৎ যিনি সতত সচেতন ও সদাসতর্ক। যার একের প্রতি মনোযোগ অন্যের প্রতি মনযোগকে আড়াল করে না। আর নিঃসন্দেহে এরকম গুণ রয়েছে কেবল আল্লাহ্র। সেজন্যেই এখানে তিনি বলেছেন 'এই সমবেত সমাবেশকরণ আমার জন্য সহজ'। এরকম বক্তব্যের দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্যান্য আয়াতেও। যেমন 'তোমাদের সৃজন ও পুনরুত্থান কেবল একটি ফুৎকারের ব্যাপার'।

শেষোক্ত আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'তারা যা বলে, তা আমি জানি, তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও; সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে উপদেশ দান করো কোরআনের সাহায্যে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! মক্কার মুশরিকেরা আপনাকে যে সকল অপঅভিধায় অভিহিত করে, সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবগত। সুতরাং যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি আমি তাদেরকে দিবোই। অতএব, আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। একথাও ভাববেন না যে, তাদেরকে বলপূর্বক হেদায়েত করার দায়িত্ব আমি আপনাকে দিয়েছি। আপনার কর্তব্য শুধু এতটুকু যে, আপনি কোরআনের সদুপদেশসমূহ শোনাবেন কেবল তাদেরকে, যারা বিশ্বাসী এবং যারা আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় করে চলে।

মক্কার পৌত্তলিকেরা রসুল স. এর আহ্বানকে বার বার প্রত্যাখ্যান করতো। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করতো তাঁকে। আর তিনি স. মনে প্রাণে চাইতেন তারা সত্য ধর্ম ইসলামকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিক। এভাবে দিনের পর দিন ব্যর্থতার কষ্ট বুকে নিয়ে দিনাতিপাত করতে হতো তাঁকে। তাই তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে এবং তাঁর প্রতিপক্ষীয়দেরকে শাসাতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

তাফসীরে মাযহারী/৯২

আমর ইবনে কায়েসের মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার কিছুসংখ্যক লোক রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি যদি আমাদেরকে বেশী বেশী করে আল্লাহ্র আযাবের ভয় দেখান, তবে আমাদের উপকার হবে। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— কোরআনের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করতে পারে কেবল তারা, যারা আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় করে চলে। যাদের অন্তরে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় নেই, কোরআন পড়ে, শুনে ও গবেষণা করে, তাদের কোনোই উপকার হতে পারে না। ওয়াল্লুহু আ'লাম।

সূরা জারিয়াত

৩ রুকু এবং ৬০ আয়াতবিশিষ্ট এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে পুণ্যভূমি মক্কায়।
সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩

❑ শপথ ধূলিঝঞ্ঝার,
❑ শপথ বোঝাবহনকারী মেঘপুঞ্জের,
❑ শপথ স্বচ্ছন্দগতি নৌযানের,
❑ শপথ কর্মবণ্টনকারী ফিরিশ্তাগণের—
❑ তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।

www.eelm.weebly.com

❑ কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী।
❑ শপথ বহু পথবিশিষ্ট আকাশের,

❑ তোমরা তো পরস্পরবিরোধী কথায় লিপ্ত।
❑ যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই উহা পরিত্যাগ করে,
❑ অভিশপ্ত হউক মিথ্যাচারীরা,
❑ যাহারা অজ্ঞ ও উদাসীন!
❑ উহারা জিজ্ঞাসা করে, 'কর্মফল দিবস কবে হইবে?'
❑ বল, 'সেই দিন যখন উহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে অগ্নিতে।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়াজ্‌জারিইয়াতি জার্‌ওয়া' (শপথ ধূলিঝঞ্ঝার)। এখানকার 'জার্‌ওয়া' শব্দটি ক্রিয়ামূল। এর অর্থ— ধূলি উড়ায় যে বাতাস, বংশবৃদ্ধি করতে পারে যে রমণী; অথবা ফেরেশতা, কিংবা আকাশ অথবা পৃথিবীর এমন সব পদার্থ, যা প্রভাব বিস্তার করতে পারে পৃথিবীর প্রাণীকুলের উপর।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'ফাল হামিলাতি বিক্‌রা' (শপথ বোঝা বহনকারী মেঘপুঞ্জের)। এখানে 'বিকরা' অর্থ বোঝা, ভার। মর্মার্থ— ওই বাতাস, যা বহন করে মেঘের ভার, অথবা ওই গর্ভবতী নারী, যে বহন করে ভ্রূণের ক্রমবর্ধমান ভার। কিংবা ওই মেঘমালা, যা উত্তোলন করে বৃষ্টির পানি।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'ফাল জরিয়াতি ইউস্‌রা'। এর অর্থ— শপথ স্বচ্ছন্দগতি নৌযানের। অর্থাৎ ওই বাতাস যা ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়, ফলে জলযানসমূহের গতি হয় স্বচ্ছন্দ। অথবা, ওই সকল স্ত্রী, যারা গর্ভধারণের কারণে তাদের স্বামীদের সেবাযত্ন করে ধীর গতিতে। কিংবা ওই সকল জাহাজ, যা আস্তে আস্তে সন্তরণ করে সমুদ্রে, অথবা ওই সকল নক্ষত্র, যেগুলো ধীরে ধীরে ধাবিত হতে থাকে স্ব স্ব কক্ষপথে।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'ফাল মুক্বাস্‌সিমাতি আমরা'। এর অর্থ— শপথ কর্মবণ্টনকারী ফেরেশতাগণের। অর্থাৎ ওই বায়ুপ্রবাহ, যা মেঘমালাকে ছড়িয়ে দিয়ে বণ্টন করে বৃষ্টি। অথবা, ওই সকল ফেরেশতা, যারা বণ্টন করে বৃষ্টি বা জীবনোপকরণ। কিংবা ওই সকল প্রাকৃতিক বস্তু, যা বিন্যস্ত করে অন্যান্য বস্তুসমূহকে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে বিভিন্ন বিষয়ে যদি আলাদা আলাদাভাবে শপথ করা হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে, এখানে 'ফা' শব্দটি বসানো হয়েছে সেগুলোর স্তর বিন্যাসার্থে। কেননা আল্লাহ্‌র অপার ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাতে গেলে ওই সকল বিষয়ের অবস্থা এরকম হতে পারে না। এমতোক্ষেত্রে পারস্পরিক পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। আর যদি মনে করা হয়, এখানে বাক্যগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা করা হয়নি, বরং পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে একই বিষয়ের, তাহলে মনে করতে হবে, এখানে 'ফা' বসানো হয়েছে ক্রিয়ার স্তর চিহ্নিত করণার্থে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য' (৫)। কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী' (৬)। একথার অর্থ— কিয়ামত দিবস সম্পর্কে তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্যই ঘটবে। তারপর

দেওয়া হবে সকলকে তাদের স্ব স্ব কর্মের উপযুক্ত প্রতিফল— পুরস্কার, অথবা তিরস্কার। উল্লেখ্য, কিয়ামত যে অনিবার্য, সে কথা বুঝাতেই এখানে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে করা হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের শপথ। এভাবে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যিনি এতোকিছু বিস্ময়কর বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি অবশ্যই সক্ষম কিয়ামত ঘটাতে এবং প্রতিফল দিবসে সকলকে যথার্থ প্রতিফল দিতে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'শপথ বহু-পথবিশিষ্ট আকাশের, (৭) তোমরা তো পরস্পরবিরোধী কথায় লিপ্ত (৮)। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট, সে-ই তা পরিত্যাগ করে' (৯)।

এখানে 'জাতিল হুবুক' অর্থ বহু পথ, বা বহু কক্ষবিশিষ্ট। 'হুবুক' হচ্ছে 'হাবীকাতুন' এর বহুবচন। যেমন 'ত্বুরুক্ব, বহুবচন 'ত্বারীক্বাতুন' এর। অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন, 'হুবুক' অর্থ সুদৃঢ় গঠন। 'হুবুকুস্ ছাওব' অর্থ কাপড় বোনানোর পর তা অলংকৃত করা। 'হুবুকুর রামাল' অর্থ বালুর স্তূপ। 'হুবুক' এর একবচন 'হিবাক'ও হয়। যেমন 'কুতুব' এর একবচন 'কিতাব'। 'হুবুকুল মাআ' অর্থ জলতরঙ্গ। 'হুবুকুশ শোর' অর্থ কোঁকড়ানো চুল। তেমনি 'হুবুকুস্ সামা' অর্থ নক্ষত্ররাজির কক্ষপথসমূহ, বা বহু পথবিশিষ্ট আকাশ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও ইকরামা বলেছেন, 'জাতুল হুবুক' অর্থ সৌন্দর্যমণ্ডিত। মাপে বুননের সুন্দর কাপড়কে আরববাসীরা বলে থাকেন 'মা আহসানা হুবুকাহুম'। সাঈদ ইবনে যোবায়ের কথাটির অর্থ করেছেন—

www.eelm.weebly.com

সুসজ্জিত। হাসান বলেছেন, এর অর্থ— নক্ষত্রশোভিত আকাশ। মুজাহিদ বলেছেন, 'জাতুল হুবুক' অর্থ সুদৃঢ় গঠনবিশিষ্ট। মুকাতিল, জুহাক ও কালাবী বলেছেন, বাতাস প্রবাহিত হলে যেমন পানিতে ঢেউ জাগে, বালিতে সৃষ্টি হয় স্তূপ এবং চুল হয়ে যায় অবিন্যস্ত, তেমনি আকাশেও তৈরী হয় বিভিন্ন তোরণ। তবে দৃষ্টিসীমার ঊর্ধ্বে বলে তা দৃষ্টিগোচর হয় না। বায়যাবী 'জাতুল হুবুক' এর অর্থ করেছেন— পথবিশিষ্ট, এমন পথ, যা বাস্তব, কাল্পনিক নয়। অর্থাৎ তারকারাজির চলাচলের পথ। অথবা জ্ঞানের পথ, যে পথে চলে অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা পৌঁছতে পারেন মারেফাতের মাকামে। অথবা এর অর্থ— তারকাপুঞ্জ, আকাশে রয়েছে যেগুলোর নির্ধারিত কক্ষপথ এবং যেগুলোর দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে আকাশকে। যেমন কাপড়ে ছাপ দিয়ে কাপড়কে করা হয় অলংকৃত।

'তোমরা তো পরস্পরবিরোধী কথায় লিপ্ত' অর্থ হে মক্কার পৌত্তলিকেরা! তোমরা তো আমার রসুলকে অবমাননা করে চলেছো বিভিন্ন রকমের পরস্পরবিরোধী অপমন্তব্যের মাধ্যমে। কখনো তাকে বলো 'কবি', কখনো 'যাদুকর'। আবার কখনো বলো 'উন্মাদ'। কোরআন সম্পর্কেও তোমরা এরকম পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করো। যেমন কোরআনকে কখনো বলো যাদু, কখনো কল্পকাহিনী। আবার কখনো বলো, এসকল কিছুতো জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী ছাড়া

অন্য কিছু নয়। আবার কেউ কেউ বলো, কোরআন তো মোহাম্মদের স্বরচিত কাব্য। অথবা কথাটির অর্থ— মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারেও তোমরা ঘোর সন্দেহ পোষণকারী। তাই এ সম্পর্কেও তোমাদের অভিমত বিভিন্ন রকমের। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে শপথ সম্বলিত বাক্যগুলোর মধ্যেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতানৈক্য ও বৈপরীত্যের দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই সেগুলোকে তুলনা করা হয়েছে আকাশের কক্ষপথ সমূহের সঙ্গে। কেননা আকাশের পথসমূহও যেমন সুদৃঢ়, তেমনি বহুতল বিশিষ্ট। এরকমও হতে পারে যে, কথাটি বলা হয়েছে এখানে মক্কার বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলকে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ হে মক্কাবাসী! তোমরা ধারণ করে আছো পরস্পরবিরোধী বিশ্বাস। তাই তোমাদের কথাও পরস্পরবিরোধী।

'ইউফাকু আ'নহু মান উফিক্' অর্থ যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট, সে-ই তা পরিত্যাগ করে। একথার অর্থ— সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই তারা পথভ্রষ্ট। তাই তারা পরিত্যাগ করে রসুল, অথবা কোরআনকে। অর্থাৎ আল্লাহ্ যাদেরকে সত্য রসুল ও মহাবাণী কোরআনের আনুগত্য থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন তারা অবশ্যই হয় সত্যভ্রষ্ট। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'আ'নহু' এর 'আ'ন' ব্যবহৃত হয়েছে 'মিন' অর্থে এবং 'হু' (উহা) সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'ক্বওলিম্ মুখতালিফীন' এর সঙ্গে। এর নৈপথ্যিক পটভূমিকাটি এরকম— কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে মক্কার মুশরিকেরা তাদের পথরোধ করে দাঁড়াতো। বলতো, তোমরা কার কাছে যাচ্ছো? সে তো একজন মিথ্যাবাদী, যাদুকর, গণক ও উন্মাদ। মুজাহিদ এরকমই বর্ণনা করেছেন।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা, (১০) যারা অজ্ঞ ও উদাসীন (১১)! তারা জিজ্ঞেস করে কর্মফল দিবস কবে হবে (১২)? বলো, সেই দিন যখন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে অগ্নিতে' (১৩)।

এখানে 'আল খররাসুন' অর্থ জঘন্য মিথ্যাচারী। কথাটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে ওই সকল অংশীবাদীকে যারা রসুল স. এবং কোরআন সম্পর্কে বিভিন্ন অপমন্তব্য করতো। 'খরাস' অর্থ বিনা প্রমাণে কোনো বিষয়ে কল্পনা পোষণ করা, বা অমূলক ধারণা রাখা। পরস্পরবিরোধী অপমন্তব্য উচ্চারিত হয় এরকম অপধারণার কারণেই। যে ধারণা বিশ্বাসযোগ্য দলিল-প্রমাণনির্ভর, সে ধারণার ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী মন্তব্যের কোনো অবকাশই নেই।

এখানকার 'কুতিলাল খর্‌রসূন' কথাটিকে বাহ্যত বদদোয়া বা অপপ্রার্থনা বলেই মনে হয়। সাধারণত যে অক্ষম সে-ই দোয়া বা বদদোয়া করে। কিন্তু আল্লাহ্ তো সকলের ও সকল কিছুর অক্ষমতা, সমতুল্যতা ও সমকক্ষতার ঊর্ধ্বে। তাই এখানে কথাটির অর্থ দোয়া না হয়ে হবে, অভিশাপ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা। অর্থাৎ মিথ্যাচারীরা হয়ে যাক আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বিচ্যুত।

'আল্লাজীনা হুম ফী গম্‌রাতিন সাহূন' অর্থ যারা অজ্ঞ ও উদাসীন। এখানে 'গমরাতিল' অর্থ এমনই মূর্খতা ও ঔদাসীন্য যা আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাদেরকে, আর 'সাহূন' অর্থ উদাসীন, আল্লাহ্‌র আহ্বান সম্পর্কে অন্যমনস্ক।

'ইয়াস্আলূনা' অর্থ তারা জিজ্ঞেস করে। অর্থাৎ ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে তারা রসুল স.কে জিজ্ঞেস করে 'আইয়্যানা ইয়াওমুদ্ দীন' অর্থ কর্মফল দিবস কবে হবে?

'ইয়াওমা হুম আ'লান্ নারি ইউফ্তানূন' অর্থ বলো, সেইদিন যখন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে অগ্নিতে। এখানে 'আ'লা' অর্থ হবে, সাথে, ইতে, তে।

সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩

www.eelm.weebly.com

- ‘তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছিলে।’
- সেদিন নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকিবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে,
- উপভোগ করিবে তাহা যাহা তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে দিবেন; কারণ পার্থিব জীবনে তাহারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ,
- তাহারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করিত নিদ্রায়,
- রাত্রির শেষ প্রহরে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত,
- এবং তাহাদের ধন-সম্পদে রহিয়াছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।
- নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে ধরিত্রীতে
- এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করিবে না?
- আকাশে রহিয়াছে তোমাদের রিয্ক ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু।
- আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমাদের বাক্-স্ফূর্তির মতই এই সকল সত্য।

প্রথমোক্ত আয়াতের বলা হয়েছে— ‘তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন করো, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে’। এখানে ‘তোমাদের শাস্তি’ অর্থ তোমরা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে যে মহাপাপ করেছিলে, তার শাস্তি। ‘এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে’ অর্থ— পৃথিবীতে এই শাস্তিকেই তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে। আমার রসুলকে বলেছিলে, সত্যবাদী যদি তুমি হও, তবে এই মুহূর্তে আমাদের উপরে শাস্তি আপতিত করাও না কেনো।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— যারা মুত্তাকী, তারা পরকালে বসবাস করবে প্রস্রবণবিশিষ্ট বেহেশতে। আল্লাহ্ তাদেরকে দান করবেন উৎকৃষ্ট ও পবিত্র অপরিমেয় সম্ভোগসম্ভার। ওই সকলকিছু হবে তাদের সৎকর্মসমূহের পুরস্কার, যে সৎকর্মসমূহ তারা পৃথিবীতে সম্পাদন করেছিলো। এখানে ‘উয়ূন’ অর্থ প্রস্রবণ, ঝর্ণা। ‘মা আতাহুম রব্বুহুম’ অর্থ যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দিবেন। বলা বাহুল্য যে, ওই সকল দান হবে অত্যুৎকৃষ্ট। কেননা আল্লাহ্র দান কখনো অনুত্তম হয় না। ‘ক্বলা জালিকা’ অর্থ বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে, পৃথিবীতে। আর ‘মুহ্সিনীন’ অর্থ সৎকর্মপরায়ণ, বিশুদ্ধচিত্ত ইবাদতকারী, সকল সৎকর্ম আল্লাহ্র সন্তোষসাধনার্থে সম্পন্নকারী।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— ‘তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করতো নিদ্রায়’। এখানকার ‘মা ইয়াহ্জাউন’ কথাটির ‘মা’ অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। ‘হুজুউন’ অর্থ রাতের নিদ্রা। ‘ক্বলীলান’ কথাটি এখানে তৎসন্নিহিত কর্মপদ অথবা সাধারণ কর্মপদ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা রাতে সামান্য সময় ঘুমাতো। অথবা তারা ঘুমাতো রাতের সামান্য এক অংশে। অর্থাৎ রাতের অধিকাংশ সময় তারা জেগে জেগে নামাজ পড়তো।

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— তাদের জীবনে এমন রাত খুব কমই অতিবাহিত হতো, যে রাতের কোনো না কোনো অংশে তারা নামাজ পাঠ করতো না। তারা নামাজ পড়তো রাতের প্রথমাংশে, মধ্যমাংশে অথবা শেষাংশে অর্থাৎ এরকম কখনোই হয়নি যে সারা রাত তারা ঘুমে কাটিয়েছে।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— ‘রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো’। ‘সাহার’ বলে রাতের ষষ্ঠতম অংশকে। অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন, সুবহে সাদেকের কিছু পূর্বের সময়কে বলে ‘সাহার’। অথবা ‘সাহার’ বলে কোনো কিছুর

www.eelm.weebly.com

প্রান্তসীমাকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— রাতের অধিকাংশ অংশ ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে অতিবাহিত করা সত্ত্বেও তারা নিজেদের আমলকে মনে করতো নগণ্য। আরো মনে করতো, আমাদের ইবাদত বন্দেগী নিশ্চয় ত্রুটিমুক্ত নয়। ইবাদতের হকও আমাদের দ্বারা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়নি। তাই রাতের শেষভাগে তারা আল্লাহ্‌র সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হতো। ভাবতো, ক্ষমাপ্রার্থনার মাধ্যমে তাদের আমলের ক্ষতিপূরণ করা অত্যাবশ্যক। হাসান

তাফসীরে মাযহারী/৯৮

কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— তারা রাতের নিদ্রাসুখউপভোগ করতো খুব কমই। অধিকাংশ রাত কাটিয়ে দিতো আল্লাহ্‌র ইবাদতে। তারপর করতো ক্ষমাপ্রার্থনা।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতি রাতে রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে আল্লাহ্ প্রথম আকাশে আনুরূপ্যহীন অবতরণ করেন। বলেন, আমিই তো মহাসম্রাট। কে আছো প্রার্থনাকারী; প্রার্থনা করো। আমি তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করবো। কে আছো যাঞ্চাকারী, যাঞ্চা করো। আমি তোমাদের যাঞ্চা পূরণ করবো। কে আছো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী, ক্ষমাপ্রার্থনা করো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করবো। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় এ কথাগুলোও এসেছে যে, তারপর আল্লাহ্ তাঁর আনুরূপ্যহীন হস্ত প্রসারিত করে বলেন, কে আছো এমন, যে প্রতিহত করতে পারে এমন সত্তাকে, যিনি অস্তিত্বহীন ও জালেম নন। এভাবে তিনি একথা বলতে থাকেন প্রভাতের উন্মেষকাল পর্যন্ত। যথাসূত্রপরম্পরায় হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামাজ পাঠ করতেন, ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন এবং বলতেন 'আল্লাহুম্মা লাকাল হাম্‌দ আন্‌তা কৃইয়্যামাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব ওয়া মান ফীহিন্‌না ওয়া লাকাল হামদ আন্‌তা মালিকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব ওয়া মান ফীহিন্‌না ওয়া লাকাল হামদ........'।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি গভীর নিশিথে গাত্রোত্থান করে পাঠ করে 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহ্‌দাহু লা শরীকা লাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বদীর ওয়া সুবহানাল্লহি ওয়াল্ হাম্‌দুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা ক্বুও্‌ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আ'লিয়্যিল আ'জীম'। তারপর বলে 'রব্বিগ্‌ফিরলি' অথবা পাঠ করবে অন্য কোনো দোয়া, তারপর ওজু করে পাঠ করে নামাজ, তবে তার নামাজ কবুল করা হয়। বোখারী।

জননী আয়েশা সিদ্দীকা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. রাতে জাগ্রত হয়ে এই দোয়া পাঠ করতেন 'লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহানাকা আল্লহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়াস্‌তাগ্‌ফির লিজুনূবি ওয়াস্‌আলুকা রহ্‌মাতিকা আল্লহুম্মা জিদ্‌নী ইলমা ওয়ালা তুযিগ্ ক্বলবি বা'দা ইজ্ হাদাইতানি ওয়া হাবলি মিল্‌লাদুন্‌কা রহ্‌মাতাকা ইন্নাকা আন্‌তাল ওয়াহ্‌হাব্'। আবু দাউদ।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক'। একথার অর্থ— তারা অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিত যাঞ্চাকারীকে তো দান করেই, তদুপরি দান করে তাদেরকেও, যারা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও হাত পাততে লজ্জা পায়। তাই লোকে তাদেরকে অভাবগ্রস্ত বলে মনে করে না। কিন্তু পুণ্যবান বিশ্বাসীরা সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী বলে তাদের চেহারা দেখেই তাদের প্রকৃত দুরবস্থার কথা বুঝে নিতে পারে। তাই

তাফসীরে মাযহারী/৯৯

তাদের অভাবও তারা মোচন করে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। কাতাদা ও জুহুরী বঞ্চিতদের ব্যাখ্যা এরকমই করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস ও সাইয়্যেদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, 'বঞ্চিত' ওই ব্যক্তি, যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদেরও কোনো অংশ পায় না। অংশ পায়না 'ফাই' (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত শত্রু সম্পদ)থেকেও।

ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হাসান ইবনে হানাফিয়া বলেছেন, একবার রসুল স. এক স্থানে মুজাহিদদের একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। গণিমতের কিছুসংখ্যক ছাগল তাদের হস্তগত হলো। তারা ছাগলগুলো নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেওয়ার পর সেখানে উপস্থিত হলো কিছু দরিদ্র লোক। তখন তাঁরা তাদেরকে কিছু দান করলেন। তাঁদের এমতো কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

জায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, 'বঞ্চিত' ওই ব্যক্তি, যার ফলবান বাগানে, ক্ষেতের ফসলে অথবা পশুর উপরে পতিত হয়েছে কোনো আসমানী দুর্যোগ। মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরতুবীও এরকম বলেছেন এবং তাঁর এমতো মন্তব্যের সমর্থনে তিনি পাঠ করেছেন এই আয়াত 'ইন্না লামুগরামূন বাল নাহনু মাহরুমূন'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে (২০) এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না' (২১)?

অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের সম্পর্ক রয়েছে ইতোপূর্বের 'তোমরা তো পরস্পরবিরোধী কথায় লিপ্ত' (আয়াত ৮) বাক্যের সঙ্গে। মধ্যবর্তী আয়াতগুলোর প্রসঙ্গ ভিন্ন। আমার মতে কথাটি ঠিক নয়। বরং ইতোপূর্বের মুত্তাকীগণের বৈশিষ্ট্যপ্রকাশক আয়াতগুলোর সঙ্গেই রয়েছে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের বক্তব্যগত যোগাযোগ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— উপরে বর্ণিত

www.eelm.weebly.com

বৈশিষ্ট্যধারী মুত্তাকীরা যখন ধরিত্রী ও ধরিত্রীর মানবকুলের মধ্যে আল্লাহ্‌র অসংখ্য বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ অবলোকন করে, তখন অন্ধ ও বধিরদের মতো সেগুলোকে উপেক্ষা করে না। বরং অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ওই সকল নিদর্শনের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে মগ্ন হয় অনুসন্ধিৎসু গবেষণায়। ভাবে, পৃথিবীর সৃজনরহস্য ও বিন্যাসশৈলী সম্পর্কে। চিন্তা করে, আল্লাহ্‌তায়ালা এ ভূবনকে সাজিয়েছেন কতো ভাবে, কতো রূপে, কতো রহস্যে। কোথাও দিকচক্রবাল ছোঁয়া সুবিস্তীর্ণ শস্য প্রান্তর, কোথাও চোখ ধাঁধানো ধুধু মরুভূমি, কোথাও উত্তাল তরঙ্গশোভিত অথৈ সমুদ্র, কোথাও অরণ্য, কোথাও শৈলশ্রেণী। কোথাও আঁকাবাকা অসংখ্য স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী। প্রাণী পাখি উদ্ভিদ লতাগুল্ম কতোকিছু। আবার এর অভ্যন্তরে রয়েছে কতো না মূল্যবান বাণিজ্য সম্পদ। এ সকলকিছুই একথা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করে যে, এগুলোর সৃজয়িতা নিশ্চয় কেউ একজন রয়েছেন, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। তাঁর রহমত ও রহস্যের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। পৃথিবী ও সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও প্রজন্মায়ন যে তাঁর অপার অনুকম্পার নিদর্শন ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর তিনি যে 'কুল্‌লা ইয়াওমিন হুয়া ফী শান' (নিত্যনতুন মহিমময়)।

'ওয়া ফী আনফুসিহীম' অর্থ এবং তোমাদের মধ্যেও। অর্থাৎ হে মানুষ! তোমাদের সত্তামধ্যেও রয়েছে আল্লাহ্‌র অগণিত-অসংখ্য নিদর্শন। উল্লেখ্য, মানব অস্তিত্বকে বলা হয় ক্ষুদ্র জগত (আলমে ছগীর)। বৃহৎজগতে (আলমে কবীরে) যা কিছু আছে, তার সকল কিছুরই নির্যাস রয়েছে মানব অস্তিত্বে। অর্থাৎ বৃহৎ জগতে যেমন রয়েছে আল্লাহ্‌র সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিধরতার অসংখ্য প্রমাণ, তেমনি রয়েছে ক্ষুদ্র জগতেও। মানুষ প্রথমে লুক্কায়িত থাকে তার পিতৃপৃষ্ঠে। সেখান থেকে শুক্রবিন্দুরূপে আগমন করে মাতৃগর্ভে। তারপর সেখানে সে হতে থাকে ক্রমাগত জমাটরক্ত, মাংস ও অস্থিবিশিষ্ট, আবৃত হয় ত্বকাবরণে। তারপর পায় আত্মা, পায় জীবন। তারপর আল্লাহ্‌ই তাকে শিক্ষা দেন দুগ্ধপানের কৌশল। ক্রমে ক্রমে ঘটতে থাকে তার জ্ঞান ও শক্তির প্রবৃদ্ধি। এভাবে পৌঁছে যায় পরিণত মানবে। পায় জ্ঞান, বিবেক। তারপর আল্লাহ্‌ই তো তাদেরকে দান করেন সুস্থতা, স্বাস্থ্য ও পথপ্রাপ্ত হওয়ার সকল উপকরণ। প্রেরণ করেন তাদের প্রকৃত সুহৃদ নবী-রসুলগণকে। অবতীর্ণ করেন আকাশজ গ্রন্থসমূহ, যেনো তারা তার অনুসরণ করে পেতে পারে পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর সকল কল্যাণ। লাভ করতে পারে তাদের পরম প্রেমময় প্রভুপালয়িতার পরিচয়। তখন তারা বুঝতে পারে, প্রকৃত মানুষ কতো সুন্দর। নিজের অজান্তেই তখন তাদের বিস্ময়াপন্নতা চিরে উচ্চারিত হতে থাকে 'ফা তাবারাকাল্লহু আহ্‌সানাল খলিক্বীন' (আল্লাহ্‌ কতোই না কল্যাণময়, কতোই না সুন্দর স্রষ্টা)।

কোনো কোনো মানুষ আবার এমনও রয়েছে যে, তাদের দৃষ্টির সামনে থেকে উন্মোচিত হয়ে যায় রহস্যের যবনিকাসমূহ। অপসারিত হয়ে যায় প্রতিবিম্বের নুরের পর্দা। উদ্ভাসিত হয় তাজাল্লিয়ে সিফাতি ও তাজাল্লিয়ে জাতি। তারা লাভ করে নৈকট্য ও প্রেমের মাকাম। এদিকে লক্ষ্য করেই হাদিসে কুদসিতে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌ বলেন, বান্দারা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করে। তখন আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। আর এমতাবস্থায় আমি হয়ে যাই তার শ্রুতি ও দৃষ্টি, যার দ্বারা সে শোনে ও দ্যাখে। এমতো স্তরে পৌঁছে আল্লাহ্‌র পরিচয়ধন্য ব্যক্তিবর্গ স্বতঃস্ফূর্ত স্বরে উচ্চারণ করেন— কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি ওই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন। তিনি পথ প্রদর্শন না করলে আমি কখনোই পথ প্রাপ্ত হতাম না। আমার প্রভুপালনকর্তার বার্তাবাহকগণ সত্যসহই আগমন করেছেন।

'আফালা তুবসিরূন' অর্থ তোমরা কি অনুধাবন করবে না? অর্থাৎ হে ভিত্তিহীন বচনের প্রবক্তারা? তোমরা কি আমার নৈকট্যধারী ও প্রিয়ভাজন দাসগণের মর্যাদা উপলব্ধি করবে না? কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি উহ্য বক্তব্যের সঙ্গে। ওই উহ্যতাসহ এর মর্মার্থ দাঁড়ায়— তোমরা কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র শক্তিমত্তা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করো। কেনো? এতোক্ষণ ধরে বর্ণিত বিষয়াবলী কি তাঁর অনন্য ও অপরিমেয় ক্ষমতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন নয়? তোমরা এখনও কি একথা বুঝবে না?

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'আকাশে রয়েছে তোমাদের রিজিক ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'রিজিক' অর্থ জীবনোপকরণ সৃষ্টির উপকরণ। অর্থাৎ বৃষ্টি। মুকাতিলও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হলে মৃত্তিকায় উদ্‌গত হয় ফল ও ফসলের চারা। ওই ফল ও ফসলই মানুষের রিজিক। এমতো ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেকারণেই। বাহ্যিক শরিয়ত একথাই বলে। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'আকাশ' অর্থ মেঘপুঞ্জ এবং 'রিজিক' অর্থ বৃষ্টি। এমতো ব্যাখ্যা দর্শনশাস্ত্রের যুক্তির অনুকূল। বায়যাবী একথাও লিখেছেন যে, এখানে 'রিজিক' অর্থ রিজিকের উপকরণ। 'রিজিক' অর্থ আবার 'অংশ'ও হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া তাজ্বআ'লুনা রিয্‌ক্বাকুম আন্নাকুম তুকাজ্‌জিবুকুন' (তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকেই তোমাদের কর্মতৎপরতার অংশ বানিয়েছো)। 'রিজিক' অর্থ যদি এখানে 'অংশ'ই ধরা হয়, তবে বুঝতে হবে, এখানে 'আকাশে রয়েছে তোমাদের রিজিক'। অর্থ আকাশে রয়েছে আল্লাহ্‌র অপার ক্ষমতার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিদর্শনাবলী। অর্থাৎ আকাশে পরিভ্রমণরত সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রপুঞ্জ এবং সেগুলোর প্রভাব-

www.eelm.weebly.com

প্রতিক্রিয়ারূপী রৌদ্র-জ্যোৎস্না, জোয়ারভাটা, ঋতুবিবর্তন ইত্যাদি। আর আকাশ-পৃথিবীর এসকল নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে বিশ্বাসী ও পুণ্যবানগণের জ্ঞানচর্চার অংশ। তাঁরা এমতো জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অসীম ও আনুরূপ্যহীন অভিপ্রায়, প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে অভিভূত হন এবং রত হন তাঁর সকৃতজ্ঞ প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায়। এভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হন প্রভূত অনুকম্পা ও কল্যাণ। এভাবে তাঁরা হন আল্লাহ্‌র পরিচয় ধন্য। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁদের উপর বিরতিহীন তাজাল্লির যে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তা-ও হয় তাঁদের বিশ্বাসের জ্যোতির অংশ। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যাদের হৃদয় অবরুদ্ধ করেছেন, মূর্খতা ও উদাসীনতার পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত করেছেন যাদের শ্রুতি, দৃষ্টি ও বিবেককে, তারা বর্ণিত কল্যাণসম্ভারের কোনো অংশই প্রাপ্ত হয় না। কস্মিনকালেও পায় না আল্লাহ্‌র সত্তা-গুণবত্তা ও কার্যকলাপের পরিচয়।

অথবা 'রিজিক' অর্থ এখানে হতে পারে আহার্য, যার দ্বারা শরীর পরিপুষ্ট হয়। এমতো অর্থ গ্রহণ করলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে মানুষ! তোমাদের জীবিকা আল্লাহ্‌র হাতে। তোমরা কতোটুকু পাবে ও খাবে, তা পূর্বাহ্নে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে ঊর্ধ্বাকাশে। তাই তোমরা তাঁর কাছে রিজিক চাও। আর রত হও তাঁর বিশুদ্ধচিত্ত উপাসনায়। লৌকিকতা ও খ্যাতির কামনা নিয়ে ইবাদত কোরো না। এরকম ব্যাখ্যা করলেও এর মধ্যে প্রকাশ পায় বিশ্বাসী ও মুত্তাকীদের অনন্য বৈশিষ্ট্য। কেননা তারাই রিজিক ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণার্থে কেবল আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থী হন।

'ওয়ামা তূআ'দূন' অর্থ এবং প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু। বাগবী লিখেছেন, আতা খোরাসানী বলেছেন, এখানে 'প্রতিশ্রুত সমস্তকিছু' অর্থ সওয়াব ও আযাব। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— মঙ্গল ও অমঙ্গল। জুহাক বলেছেন— বেহেশত ও দোজখ। আমি বলি, তিনটি ব্যাখ্যাই করা হয়েছে বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ থেকে। আর তা হচ্ছে— এখানকার সম্বোধনটি সামগ্রিক। অর্থাৎ— তোমাদের রিজিক, সওয়াব-আযাব, মঙ্গল-অমঙ্গল অথবা জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর ওই প্রতিশ্রুতির কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে আকাশে। কিন্তু এমতাবস্থায় একথা বলা যেতে পারবে না যে, এসকল কিছু রয়েছে আকাশে। কেননা কথাটি অসঠিক। সকলেই জানে যে, জান্নাতের অবস্থান সপ্তম আকাশের ঊর্ধ্বে, কিন্তু জাহান্নাম রয়েছে মৃত্তিকার সপ্তস্তর নিচে। বিভিন্ন হাদিসে এ সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলাও হয়েছে। কিন্তু এরকম যদি বলা হয় যে, এখানে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে কেবল বিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে, তাহলে কোনোরূপ ভাবার্থের প্রয়োজন আর পড়েই না। কেননা কেবল তাঁদেরকেই দেওয়া হয়েছে সওয়াব, মঙ্গল ও জান্নাত প্রদানের প্রতিশ্রুতি। আর ওই সকল প্রতিশ্রুত বিষয়াবলী রয়েছে আকাশেই। 'আকাশে রয়েছে' এরকম বলা হয়েছে এখানে একারণেই।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমাদের বাক্-স্ফূর্তির মতোই এ সকল সত্য'।

বাগবী লিখেছেন, একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র বর্ণিত নিদর্শনাবলী তোমাদের সত্য বচন এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ' উচ্চারণের মতোই সত্য। তাঁর মতে এখানে 'নুত্বক' অর্থ 'মানত্বক' (কথিত বক্তব্য)। এমতাবস্থায় এখানে 'বাক্-স্ফূর্তি' অর্থ যদি কেবল ইমানদারদের বচন হয়, তবে কথাটির অর্থ হবে— ইমানদারদের মূল কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' এর মতোই সত্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনরাজি। আর যদি 'বাক্-স্ফূর্তি' বলে এখানে বুঝানো হয় বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মানুষের কথাবার্তা, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমাদের সকলের বাক্যালাপ যেমন স্বাভাবিক, বোধগম্য ও বাস্তব, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত, দৃষ্টিগ্রাহ্য ও নিঃসন্দিগ্ধ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী।

আসমায়ী বর্ণনা করেছেন, আমি একবার বসরার জামে মসজিদের দিক থেকে আসছিলাম। পথে দেখা হলো এক বেদুইনের সঙ্গে। সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোন গোত্রের লোক? আমি বললাম, আসমা গোত্রের। সে পুনঃ জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোত্থেকে আসছো? আমি জবাব দিলাম, সেখান থেকে, যেখানে আল্লাহ্‌র কালাম পাঠ করা হয়। সে বললো, তাহলে আমাকে কিছু পাঠ করে শোনাও। আমি সুরা জারিয়াত পাঠ করতে শুরু করলাম। যখন পাঠ করলাম 'আকাশে রয়েছে তোমাদের রিজিক' তখন সে বলে উঠলো, থামো থামো। আমি থামলাম। সে চলে গেলো তার উটনীটির কাছে। তারপর সেটিকে জবেহ করলো এবং তার

মাংস বন্টন করে দিলো পথচারীদের মধ্যে। এরপর নিজের তলোয়ার ও তীর ধনুক ভেঙে ফেলে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলো। এই ঘটনার কিছুদিন পর আমি খলিফা হারুনুর রশীদের সঙ্গে এক সফরে বের হলাম। গেলাম মক্কায়। একদিন মক্কার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে শুনলাম, কে যেনো ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকছে। আমি মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেলাম সেই বেদুইনকে। কাছে যেতেই সে আমাকে সালাম জানালো। তারপর বললো, ওই সুরাটি আবার আমাকে পাঠ করে শোনাও তো দেখি। পাঠ করতে করতে যখন

'আকাশে রয়েছে তোমাদের রিজিক' আয়াতে পৌঁছলাম, তখন সে চীৎকার করে বললো, আমার প্রভুপালক আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন, তা সত্য। এরপর সে বললো, তুমি কি আমাকে আরো কিছু পাঠ করে শোনাবে? আমি পাঠ করতে শুরু করলাম 'আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমাদের বাক্-স্ফূর্তির মতোই এ সকল সত্য'। এ পর্যন্ত শুনেই সে চীৎকার করে বলতে শুরু করলো, 'সুবহানাল্লহ' আমার প্রভুপালকের রোষকে জাগ্রত করলো কে? তিনি শপথ করে বললেন, অথচ মানুষ তাঁর কথা অবিশ্বাস করলো। পুনঃপুনঃ কথাগুলো উচ্চারণ করতে করতেই নিভে গেলো তার জীবনপ্রদীপ। মাদারেক।

অলংকারশাস্ত্রের নিয়ম হচ্ছে— সম্বোধিত ব্যক্তির অস্বীকারের মাত্রানুসারে বক্তব্যকে করতে হয় বলিষ্ঠ, বলিষ্ঠতর। মক্কার মুশরিকেরা ছিলো চূড়ান্ত পর্যায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাই আল্লাহ্ এখানে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন শপথ সহকারে, অত্যন্ত জোরের সঙ্গে। প্রথমে ব্যবহার করেছেন শপথসূচক শব্দ এবং পরক্ষণে ব্যবহার করেছেন তাগিদপ্রকাশক 'ইন্না' ও বেগবান 'লাম'। তারপর আবার বলেছেন, এসকল কিছুই সত্য। পরিশেষে একথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের স্বাভাবিক সংলাপ যেমন সত্য, তেমনি সত্য আল্লাহ্ কর্তৃক কৃত রিজিকের অঙ্গীকার। অথচ মানুষ এই মহাসত্যটিকে অস্বীকার করে ভুগতে থাকে স্বসৃষ্ট কষ্টে। জীবিকা লাভের জন্য হয়ে যায় অস্থির, চঞ্চল ও পেরেশান। মানুষের চিন্তিত হওয়া উচিত তো ছিলো কেবল একটি বিষয়ে। তা হচ্ছে— কী করে লাভ করা যেতে পারে আল্লাহ্র সন্তোষ ও সওয়াব। নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে নির্ভর করা উচিত ছিলো আল্লাহ্র ওই প্রতিশ্রুতির উপর, যেখানে তিনি বলেছেন 'পৃথিবীতে যতো প্রাণী আছে, সকল প্রাণীর রিজিকের দায়দায়িত্ব আল্লাহ্র'।

সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

❑ তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত আসিয়াছে কি?
❑ যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'সালাম।' উত্তরে সে বলিল, 'সালাম'। ইহারা তো অপরিচিত লোক।
❑ অতঃপর ইব্রাহীম তাহার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মাংসল গো-বৎস ভাজা লইয়া আসিল
❑ ও তাহাদের সামনে রাখিল এবং বলিল, 'তোমরা খাইতেছ না কেন?'
❑ ইহাতে উহাদের সম্পর্কে তাহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল। উহারা বলিল, 'ভীত হইও না।' অতঃপর উহারা তাহাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।
❑ তখন তাহার স্ত্রী চীৎকার করিতে করিতে সম্মুখে আসিল এবং গাল চাপড়াইয়া বলিল, 'এই বৃদ্ধা-বন্ধ্যার সন্তান হইবে?'
❑ তাহারা বলিল, 'তোমার প্রতিপালক এইরূপই বলিয়াছেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমার নিকট ইব্রাহিমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কী'? প্রশ্নটি স্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— হে আমার রসুল! নবী ইব্রাহিম এবং তাঁর সম্মানিত অতিথিবর্গ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আপনাকে তো প্রত্যাদেশ করা হয়েছেই। এমতো বাকভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে ওই বিশেষ ঘটনার গুরুত্ব ও মাহাত্মকে। আর একথাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ঘটনাটি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই রসুল স.কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

এখানে ‘হাদীছু দ্বইফি’ অর্থ মেহমানদের বৃত্তান্ত। ‘দ্বইফুন’ শব্দটি এখানে ক্রিয়ামূল। এর ব্যবহার ঘটে থাকে একবচন বহুবচন উভয়ক্ষেত্রে। বাগবী লিখেছেন, ওই মেহমানদের সংখ্যা সম্পর্কে মতপ্রভেদ রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস ও আতা বলেছেন, ওই অতিথিরা ছিলেন তিনজন ফেরেশতা— জিবরাইল, মিকাইল ও ইস্রাফিল। মোহাম্মদ ইবনে কা’ব বলেছেন, তাঁরা ছিলেন হজরত জিবরাইল ও আরো সাতজন ফেরেশতা। জুহাকের মতে, তাঁদের সংখ্যা ছিলো নয়। মুকাতিল বলেছেন বারো জন ফেরেশতার কথা। সুদ্দী বলেছেন, এগারো জন ফেরেশতা। আর তাঁরা সকলেই ছিলেন শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট বালকের মতো।

‘আল মুক্‌রমীন’ অর্থ সম্মানিত। অর্থাৎ ওই অতিথিগণকে দেখামাত্র নবী ইব্রাহিম তাঁদেরকে সসম্মানে বরণ করেছিলেন। তাঁদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন সস্ত্রীক। আয়োজন করেছিলেন উপাদেয় আহার্যের। উল্লেখ্য, পয়গম্বরগণ ও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণের স্বভাবই এরকম। তাঁরা সকলেই হয়ে থাকেন অতিথিবৎসল।

রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেনো শিষ্ট আচরণ প্রদর্শন করে প্রতিবেশী ও অতিথির সঙ্গে। হাদিসে উল্লেখিত ‘জ্বার’ অর্থ ‘প্রতিবেশী’ ও ‘অতিথি’ দু’টোই হয়। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সে যেনো তার প্রতিবেশী ও অতিথিকে ক্লেশ না দেয়। যদি সে বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি, তবে যেনো বলে উত্তম কথা। নতুবা যেনো থাকে নিশ্চুপ। হাদিসটি বোখারী, মুসলিম, আহমদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। হজরত আবু শোরাইহ্ কা’বী সূত্রে বোখারী ও মুসলিম কৃত বিবরণটি এরকম— যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও মহাবিচার দিবসের প্রতি প্রত্যয়ী হয়, সে যেনো সম্মান করে মেহমানকে। মেহমানদারী করে কমপক্ষে একদিন এক রাত এবং ঊর্ধ্বপক্ষে তিনদিন তিনরাত। এরপরেও যদি সে মেহমানদারী করে, তবে তা হবে সদকা ও খয়রাত। মেহমানদের জন্যও তিন দিনের বেশী কারো গৃহে মেহমান হিসেবে থাকা সমীচীন নয়। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, এক বার এক লোক জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ইসলামের কোন আচরণ সর্বোত্তম? তিনি স. বললেন, আহার করানো এবং পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান।

মেহমানদেরকে এখানে ‘সম্মানিত’ বলার কারণ এরকমও হতে পারে যে, ওই মেহমানেরা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ছিলেন মর্যাদাবান। আর ফেরেশতারা সকলেই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সম্মানার্হ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘বরং তারা আল্লাহ্‌র সম্মানিত বান্দা’।

পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— ‘যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, সালাম। উত্তরে সে বললো, সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক’।

‘ফাক্বলু সালাম’ অর্থ— ফেরেশতারা বললেন, সালাম। ‘ক্বলা সালাম’ অর্থ— হজরত ইব্রাহিমও জবাবে বললেন সালাম। এখানে সালামের প্রত্যুত্তরটি ক্রিয়াবাচক না হয়ে হয়েছে বিশেষ্যবাচক। অর্থাৎ ‘সালাম’ বা শান্তিবারতাকে এখানে কোনো বিশেষ কালের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়নি। এভাবে এখানে শান্তিসম্ভাষণকে করা হয়েছে সর্বকালীন। অর্থাৎ শান্তিবারতা আগত অনাগত সকলের প্রতি। এর আর একটি উদ্দেশ্য ছিলো, ফেরেশতাদের শান্তিসম্ভাষণ অপেক্ষা হজরত ইব্রাহিমের শান্তিসম্ভাষণ যেনো হয় অধিকতর সুন্দর। অপর এক আয়াতে এরকম সুন্দর প্রত্যুত্তর দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। যেমন ‘যখন তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হয়, তখন তোমরা তার উত্তম প্রত্যুত্তর দিয়ো। অন্যথায় উচ্চারণ কোরো তার উচ্চারণের অনুরূপ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল কিছুর মহা হিসাব রক্ষাকারী’।

‘ক্বওমুম্ মুনকারূন’ অর্থ এরা তো অপরিচিত লোক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী ইব্রাহিম একথা বলেছিলেন মনে মনে। আবুল আলিয়া বলেছেন, ওই জনপদে সালাম দেওয়ার প্রচলন ছিলো না। সেকারণেই নবী ইব্রাহিম সালামের জবাব দেওয়ার পর এরকম বিস্ময়প্রকাশক স্বগতোক্তি করেছিলেন। মনে মনে ভেবেছিলেন, এরা কি তাহলে মুসলমান?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘অতঃপর ইব্রাহিম তার স্ত্রীর নিকট গেলো এবং একটি মাংসল গোবৎস ভাজা নিয়ে এলো (২৬) ও তাদের সামনে রাখলো এবং বললো, তোমরা খাচ্ছো না কেনো’ (২৭)? একথার অর্থ— তারপর নবী ইব্রাহিম অতিথি আপ্যায়নের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে একটি গোবৎস জবেহ করলেন। রান্নার পর ওই গোবৎসের গোশত হাজির করলেন অতিথিদের সামনে। বললেন, এবার অনুগ্রহ করে আহার করুন। কিন্তু অতিথিরা আহার করলেন না। নবী ইব্রাহিম বিস্মিত ও শংকিত হয়ে বললেন, কী ব্যাপার! আপনারা খাচ্ছেন না কেনো?

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— ‘এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হলো। তারা বললো ভীত হয়ো না। অতঃপর তারা এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলো’।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'ফা আওজ্বাসা' অর্থ তার মনে ভীতির সঞ্চার হলো। 'লা তাখফ' অর্থ ভীত হয়ো না। 'বিগুলামিন আ'লীম' অর্থ জ্ঞানী পুত্র সন্তান। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী ইব্রাহিম তাদেরকে আহারে অসম্মত হতে দেখে অনুমান করলেন, এরা সম্ভবত ফেরেশতা। এবং মনে হয় এরা কোনো আযাব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। ভীত হয়েছিলেন তিনি সেকারণেই। আর ফেরেশতারা তাঁকে এভাবে ভীত হতে দেখে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, হে নবী! ভীত হবেন না। আমরা ভয় পাবার মতো কোনো কিছু নিয়ে আবির্ভূত হইনি। আমরা আপনাকে এই সুসংবাদটি দিতে এসেছি যে, আপনি হবেন এমন এক সৌভাগ্যশালী পুত্র সন্তানের পিতা, পরিণত বয়সে যিনি হবেন যশস্বী ও জ্ঞানী। উল্লেখ্য, ওই সুসন্তান ছিলেন পরবর্তী সময়ের নবী ইসহাক।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'তখন তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সম্মুখে এলো এবং গাল চাপড়িয়ে বললো, এই বৃদ্ধা-বন্ধ্যার সন্তান হবে'?

এখানে 'ফা আক্ববালাত' অর্থ সম্মুখে এলেন। 'ফী সর্‌রতিন' অর্থ চীৎকার করতে করতে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'আক্ববালাত' অর্থ স্থানগতভাবে সামনে এগিয়ে আসা নয়। বরং এর অর্থ এরপর তিনি চীৎকার শুরু করলেন। অর্থাৎ তাঁর অবস্থান্তর ঘটলো চীৎকারের মাধ্যমে। যেমন বলা হয় 'আক্ববালা ইয়াশতিমুনী' (আমাকে গালি দিতে শুরু করলো)। আর 'ফী সর্‌রতিন' রয়েছে এখানে যবরযুক্ত স্থানে, অবস্থান বা কর্মপদ যে অবস্থাই হোক না কেনো।

'ফা সক্‌কাত' অর্থ গাল চাপড়ালেন, দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। বিস্ময়কর কিছু শুনলে বা দেখলে মেয়েরা সাধারণত এরকমই করে থাকে। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, তিনি বৃদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও তখন ঋতুস্রাবের উষ্ণতা অনুভব করেছিলেন। তাই লজ্জায় মুখ ঢেকেছিলেন।

'ওয়া ক্বলাত আ'জুযুন আ'ক্বীম' অর্থ এই বৃদ্ধা বন্ধ্যার কি সন্তান হবে? উল্লেখ্য নবীজায়া হজরত সারার বয়স তখন হয়েছিলো নব্বই বৎসর এবং তিনি তখনো ছিলেন নিঃসন্তানা। এরকম করে তিনি বলেছিলেন সেকারণেই।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, তোমার প্রতিপালক এরকমই বলেছেন' একথার অর্থ— অতিথি ফেরেশতারা তখন বললেন, হ্যাঁ। এটাই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়। তাঁর অভিপ্রায় অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়। আর আমরা সেই শুভসংবাদ দিতেই এখানে উপস্থিত হয়েছি। শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— তাঁর সৃজন মহাবিজ্ঞানময় এবং তিনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সকল কিছুই জানেন। তাই তাঁর শুভবার্তা সত্য ও কর্ম সুদৃঢ়। এর অন্যথা কখনোই হয় না।

সপ্তবিংশতিতম পারা

সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

❑ ইব্‌রাহীম বলিল, 'হে ফিরিশ্‌তাগণ! তোমাদের বিশেষ কাজ কী?
❑ উহারা বলিল, 'আমাদিগকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে।
❑ 'উহাদের উপর নিক্ষেপ করিবার জন্য মাটির শক্ত ঢেলা,
❑ 'যাহা সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে।'
❑ সেথায় যেসব মু'মিন ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম,
❑ আর সেথায় আমি একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী পাই নাই।
❑ যাহারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে আমি তাহাদের জন্য উহাতে একটি নিদর্শন রাখিয়াছি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইব্রাহিম বললো, হে ফেরেশতাগণ! তোমাদের বিশেষ কাজ কী'? একথার অর্থ— অতিথি ফেরেশতারা বললো, আরো একটি কাজ করতে এসেছি আমরা। নবী ইব্রাহিম বললেন, কী কাজ? এখানে 'খত্বুবুকুম' অর্থ বিশেষ কাজ কী?

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে'। এখানে 'অপরাধী সম্প্রদায়' অর্থ হজরত লুতের সম্প্রদায়। তারা এমন এক ঘৃণ্য ও জঘন্য কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো, যা ইতোপূর্বে আর কেউ করেনি। সমকামের মতো লজ্জাহীন পাপের

প্রবর্তন করেছিলো তারা। ওই কুকর্ম তারা করতো প্রকাশ্যে। পুং মৈথুনে তারা এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়েছিলো যে, নারীদেরকে পরিত্যাগ করেছিলো প্রায়। আল্লাহ্ তাদেরকে পথপ্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেছিলেন লুত নবীকে। তিনি তাদেরকে তওবার আহ্বান জানালেন। বললেন, তওবা না করলে তোমাদের উপরে অবশ্যই আপতিত হবে আল্লাহ্র গজব। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না। উল্টো বললো, তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তবে এখনই আল্লাহ্র গজব নিয়ে এসো। নবী লুত প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! সীমালংঘনকারীদের হাত থেকে আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করো। আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করলেন। প্রেরণ করলেন গজবের ফেরেশতা। তাঁরাই পৃথিবীতে এসে প্রথমে মেহমান হয়েছিলেন নবী ইব্রাহিমের।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তাদের উপর নিক্ষেপ করবার জন্য মাটির শক্ত ঢেলা (৩৩) যা সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে' (৩৪)। এখানে 'মাটির শক্ত ঢেলা' অর্থ ওই মৃত্তিকাখণ্ড, যা উত্তপ্ত হতে হতে পরিণত হয়েছে শক্ত পাথরে।

'মুসাওওয়ামাতান' অর্থ চিহ্নিত, অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের প্রাণ সংহারের জন্য প্রস্তরখণ্ডগুলো ছিলো চিহ্নিত। সেগুলোতে তাদের প্রত্যেকের নাম লেখা ছিলো। আর 'লিল মুসরিফীন' অর্থ সীমালংঘনকারীদের জন্য। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— অংশীবাদীদের জন্য। কেননা অংশীবাদিতার চেয়ে বড় পাপ আর নেই।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেখানে যে সব মুমিন ছিলো, আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম (৩৫), আর সেখানে আমি একটি পরিবার ব্যতীত কোনো আত্মসমর্পণকারী পাইনি' (৩৬)। একথার অর্থ— ওই জনপদে বিশ্বাসীদের পরিবার ছিলো মাত্র একটি। আর সে পরিবার ছিলো তাঁর পরিবার। আমি ওই পরিবার ব্যতীত অন্য সকলকে গজবে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। ঘটনাটি ছিলো এরকম— নবী ইব্রাহিমের সঙ্গে সাক্ষাতপর্ব সমাপনের পর ওই ফেরেশতারা চলে গেলেন নবী লুতের জনপদে। নবী লুতের সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, আমরা আপনার প্রভুপালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত। আমরা এসেছি আপনার জনপদের সকল অবাধ্যকে বিনাশ করতে। আপনি আজ রাত ভোর হওয়ার আগে এ স্থান ছেড়ে অন্যত্র গমন করুন। আপনার পরিবার পরিজনকে নির্দেশ দিন, কেউ যেনো পিছনে ফিরে না তাকায়। নবী লুত তাই করলেন। তিনি ওই স্থান ছেড়ে চলে যাবার পর শুরু হলো গজব। ওই গজবে ধ্বংস হয়ে গেলো সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। উল্লেখ্য, নবী লুতের স্ত্রী ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী। যেতে যেতে সে পিছন ফিরে তাকিয়েছিলো। ফলে সে-ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো ওই গজবে। তাই এখানে 'একটি পরিবার' অর্থ হবে নবী লুত ও তাঁর কন্যাগণ।

তাফসীরে মাযহারী/১১০

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'যারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্য এতে একটি নিদর্শন রেখেছি'। একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে ও তাঁকে ভয় করে চলে, তাদের জন্য আমি নবী লুতের জনপদের অবাধ্যদের বিনাশ প্রাপ্তির ঘটনাকে করে রেখেছি একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত।

সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০

❑ এবং নিদর্শন রাখিয়াছি মূসার বৃত্তান্তে, যখন আমি তাহাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফির'আওনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম,

❑ তখন সে ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'এই ব্যক্তি হয় এক জাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।'

❑ সুতরাং আমি তাহাকে ও তাহার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং উহাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম, সে তো ছিল তিরস্কারযোগ্য।

প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'ওয়া ফী মূসা' (মুসার বৃত্তান্তকে) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'তারক্না' (নিদর্শন রেখেছি) কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি লুত নবীর সম্প্রদায়ের বিনাশ হওয়ার ঘটনার মধ্যে যেমন নিদর্শন রেখেছি, তেমনি নিদর্শন রেখেছি মুসা নবীর বৃত্তান্তেও, যাতে মানুষ সতর্কতামূলক শিক্ষা গ্রহণ করে। যেমন আরবী প্রবচনে বলা হয় 'ওয়া আল্লাফ্‌তুহা তিবনান ওয়া মাআন বারিদান' (আমি পশুকে ঘাসভুষি খাইয়েছি ও ঠাণ্ডা পানি পান করিয়েছি)। এখানেও কথাটির সম্পর্ক ঘটেছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'মুসার বৃত্তান্তে' কথাটির সম্পর্ক ঘটেছে ২০ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে' কথাটির সঙ্গে। কিন্তু তাঁদের এমতো উক্তি অসমীচীন। কেননা এই দুই আয়াতের মধ্যে বক্তব্যগত ব্যবধান তো রয়েছেই, তদুপরি রয়েছে প্রসঙ্গগত অসামঞ্জস্য। আর এখানকার 'বিসুল্‌তানিম্ মুবীন' অর্থ স্পষ্ট প্রমাণ। অর্থাৎ যষ্টির সর্পাকার ধারণ, শুভ্রোজ্জ্বল হস্ত ইত্যাদি মোজেজাসমূহ। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যখন আমি আমার নবী মুসা ইবনে ইমরানকে বিভিন্ন অলৌকিকত্বসহ মিসরাধিরাজের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, ওই সময়ের ঘটনাবলীর মধ্যেও রয়েছে সতর্কতাজ্ঞাপক শুভ উপদেশ।

তাফসীরে মাযহারী/১১১

পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'তখন সে ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললো, এই ব্যক্তি হয় এক যাদুকর, না হয় উন্মাদ'। একথার অর্থ— মিসরাধিরাজ ছিলো দর্পান্ধ এবং সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে সত্যবিমুখ। তাই সে নবী মুসার অলৌকিক নিদর্শনাবলী অবলোকন করেও ইমান আনলো না। উল্টো বরং বললো, এ লোক হয় যাদুকর , নয়তো পাগল।

'সাহিরুন আও মাজ্নূন' অর্থ হয় যাদুকর, নয়তো পাগল। ক্বারী আবু উবায়দা বলেছেন, এখানকার 'আও' অর্থ 'ওয়াও' (এবং)। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— এ লোক যাদুকর এবং পাগল। উল্লেখ্য, ফেরাউনের এমতো উক্তি ছিলো পরস্পরবিরুদ্ধ। কেননা যাদুকর কখনো পাগল হতে পারে না। তেমনি পাগলও কখনো হতে পারে না যাদুকর। কারণ যাদুকর

www.eelm.weebly.com

হয় চতুর ও বুদ্ধিমানেরা, আর পাগল হয়ে থাকে বুদ্ধিহীন। অতএব, প্রমাণিত হয়, ফেরাউন ছিলো প্রকৃত অর্থে অজ্ঞ ও অন্ধ। সেকারণেই সত্যদর্শন তার ভাগ্যে জোটেনি।

বায়যাবী লিখেছেন, ফেরাউনের তখনকার ব্যাপারটি ছিলো এরকম— চোখের সামনে অলৌকিক কাণ্ড ঘটতে দেখে সে ভাবতে শুরু করলো, এটা যাদু ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। মুসা নিশ্চয় যাদুকর। পরক্ষণে আবার ভাবলো, মুসার এই অলৌকিকত্ব কী স্বেচ্ছাকৃত? না কি অন্য কারো প্রভাবে সে প্রভাবিত। অন্যের প্রভাবেই যদি তার মাধ্যমে এরকম অলৌকিকত্ব প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে সে বৈশিষ্ট্য ও বুদ্ধিবিবর্জিত পাগল ছাড়া আর কী? অর্থাৎ ফেরাউন তখন এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছিলো না যে, মুসা আসলে কী? যাদুকর, না পাগল। তাই সে বলে ছিলো, এ লোক হয় যাদুকর, নয়তো উন্মাদ।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'সুতরাং আমি তাকে ও তার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং তাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, সে তো ছিলো তিরস্কারযোগ্য'। একথার অর্থ— তবুও আমি মহাদুর্বৃত্ত ফেরাউনকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি প্রদান করলাম না। কিন্তু যখন সে সীমা ছাড়িয়ে গেলো, তখন তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে ডুবিয়ে মারলাম সমুদ্রের অথৈ জলে। এরকম অবমাননাই ছিলো তার উপযুক্ত শাস্তি। কেননা সে ছিলো নিন্দিত, তিরস্কারার্হ।

এখানে 'ফা নাবাজ্‌নাহুম ফীল ইয়াম্মি' অর্থ তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। আর 'ওয়া হুয়া মুলীম' অর্থ সে তো ছিলো তিরস্কারযোগ্য।

সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬

❑ এবং নিদর্শন রহিয়াছে 'আদের ঘটনায়, যখন আমি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম অকল্যাণকর বায়ু;

❑ ইহা যাহা কিছুর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল তাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল,

❑ আরও নিদর্শন রহিয়াছে ছামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'ভোগ করিয়া লও স্বল্পকাল।'

❑ কিন্তু উহারা উহাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল; ফলে উহাদের প্রতি বজ্রাঘাত হইল এবং উহারা উহা দেখিতেছিল।

❑ উহারা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল না এবং উহা প্রতিরোধ করিতেও পারিল না।

❑ আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, উহারা তো ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আর মহাদুর্বৃত্ত আদ জাতির বিনাশ বিষয়ক বৃত্তান্তে রয়েছে নিদর্শন, শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। তারাও ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আমি তাদেরকে বিনাশ করেছিলাম ভয়ংকর ঝঞ্ঝাবাত্যার আঘাতে। তাদের গোটা জনপদের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিলো সেই জীবনসংহারক ঝড়। ফলে তারা সকলে হয়ে গিয়েছিলো বিধ্বস্ত, নিঃসাড়।

এখানে 'আর রীহাল আক্বীম' অর্থ অকল্যাণকর বায়ু, যে বায়ু বৃষ্টির আগমন ঘটায় না, কল্যাণ করে না প্রাণী ও বৃক্ষের। অর্থাৎ ওই বাতাস ছিলো ঘুর্ণিঝড়, পশ্চিমা বিনাশী বাতাস। রসুল স. বলেছেন, পূবাল বাতাস দ্বারা আমার উম্মতকে সাহায্য করা হয়েছে। আর পশ্চিমা বাতাস দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে আদ জাতিকে।

'আর রমীম' অর্থ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলো। এখানকার 'রমীম' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'রম্‌মুন' থেকে। এর অর্থ পুরাতন হওয়া, টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ ওই পশ্চিমা বাতাস আদ জাতি ও তাদের জনপদকে তছনছ করে দিয়েছিলো।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আরো নিদর্শন রয়েছে ছামুদের বৃত্তান্তে যখন তাদেরকে বলা হয়েছিলো, ভোগ করে নাও স্বল্পকাল (৪৩)। কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো, ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হলো এবং তারা তা দেখছিলো' (৪৪)। একথার অর্থ— ছামুদ জাতির নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনার মধ্যেও রয়েছে আল্লাহ্‌র অপার শক্তিমত্তার অনন্য নিদর্শন। তারা আমার প্রিয় নবী সালেহের অবাধ্য হয়েছিলো। তার কথা অমান্য করে বধ

www.eelm.weebly.com

করেছিলো প্রস্তরাভ্যন্তরাগত অলৌকিক উষ্ট্রী ও তার নিরীহ শাবককে। আমার নবী তখন তাদেরকে বলেছিলো, মাত্র তিনদিন সময় দেওয়া হলো তোমাদেরকে। এর মধ্যে আমোদ প্রমোদ যা করবার তা করে নাও। তিন দিন পর তাদের উপর নেমে এলো আমার সর্ববিনাশী শাস্তি। ধ্বনিত হলো একটি মাত্র সুবিকট আওয়াজ। ফলে স্ব স্ব আবাসে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে রইলো তারা। স্বচক্ষে সে শাস্তি অবলোকন করা সত্ত্বেও তারা ছিলো নিরুপায়, নিঃসহায়।

এখানে 'ইজ ক্বীলা লাহুম' অর্থ তাদের বলা হয়েছিলো। অর্থাৎ নবী সালেহ তাদেরকে বলেছিলেন। 'তামাত্তাউ' হাত্তাহীন' অর্থ ভোগ করে নাও স্বল্পকাল, মাত্র তিন দিন। 'ফাআখাজাত্হুমুস্ সয়ি'ক্বাতু' অর্থ ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হলো, ধ্বনিত হলো মহানাদ, সুবিকট আওয়াজ। অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন, 'সয়ি'ক্বাতু' অর্থ মৃত্যু, মৃত্যু আনয়নকারী আওয়াজ। 'সয়াক্ব' অর্থ বজ্রনিনাদ। আর 'ওয়াহুম্ ইয়ানজুরূন' অর্থ এবং তারা তা দেখছিলো। অর্থাৎ ওই মহাশাস্তি তারা তখন স্বচক্ষে অবলোকন করছিলো।

এরপরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'তারা উঠে দাঁড়াতে পারলো না এবং তা প্রতিরোধ করতেও পারলো না'। একথার অর্থ— ওই বিকট বজ্রনিনাদাঘাতে তারা এমনভাবে ভূতলশায়ী হয়ে পড়লো যে, সেখান থেকে উঠে কোথাও পালিয়ে যেতে পারলো না। পারলো না তা প্রতিহত করতেও।

'ফামাস্তাত্বাউ' অর্থ তারা উঠে দাঁড়াতে পারলো না। অর্থাৎ ভূলুণ্ঠিত হওয়ার পর তারা উঠে কোথাও পালিয়ে গিয়ে যে আত্মরক্ষা করবে, সে সুযোগ আর পেলো না। কাতাদা বলেছেন, তারা এমনভাবে ধরাশায়ী হলো যে, উঠে দাঁড়াবার সামর্থ্য আর পেলো না। আর 'প্রতিরোধ করতে পারলো না' অর্থ তারা শেষরক্ষা করতে সমর্থ হলো না। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— তারা কোনো প্রতিশোধ নিতে পারলো না।

এরপরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'আমি ধ্বংস করেছিলাম এদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায়কে, তারা তো ছিলো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়'। একথার অর্থ— নবী নুহের অবাধ্য সম্প্রদায়কে আমি মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম লুতের সম্প্রদায়, ফেরাউন, আদ ও ছামুদ জাতির ধ্বংসসাধনের আগে। তারাও ছিলো তাদের উত্তরসূরীদের মতো দুর্বিনীত, দুর্বৃত্ত ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫

❑ আমি আকাশ নির্মাণ করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী।

❑ আর ভূমি, আমি উহাকে বিছাইয়া দিয়াছি, আমি কত সুন্দর প্রসারণকারী।

❑ আর প্রত্যেক বস্তু আমি সৃষ্টি করিয়াছি জোড়ায় জোড়ায়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

❑ অতএব তোমরা আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।

❑ তোমরা আল্লাহ্র সংগে কোন ইলাহ্ স্থির করিও না; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।

❑ এইভাবে উহাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে উহারা তাহাকে বলিয়াছে, 'তুমি তো এক জাদুকর, না হয় এক উন্মাদ!'

❑ উহারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছে? বস্তুত উহারা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

❑ অতএব তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর, ইহাতে তুমি অভিযুক্ত হইবে না।

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি মহা সৃজয়িতা। আমিই স্বশক্তিবলে সুপ্রশস্ত পরিসরে নির্মাণ করেছি আকাশ। কেননা আমি মহাসম্প্রসারক। আর আমি পৃথিবীকেও করেছি সুপ্রসারিত, যাতে মানুষের চলাচল, বসবাস ও রিজিকাহরণ হয় নির্বিঘ্ন। আমি তো সুন্দর প্রসারক।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'ওয়া ইন্না লামূসিউন' অর্থ আমিই মহাক্ষমতাধর। এখানকার 'মূসি' শব্দটির উদগম ঘটেছে 'ওয়াসা' থেকে। আর 'ওয়াসা' অর্থ ক্ষমতা, শক্তি। যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন 'লা ইউকাল্লিফুল্লহু নাফ্সান ইল্লা বুস্আ'হা' (আমি কাউকে তার সামর্থ্যের অতীত কিছু চাপিয়ে দেই না)। জুহাক এখানকার 'আমি অবশ্যই সম্প্রসারণকারী' কথাটির অর্থ করেছেন— আমি সম্পদপতি, চির অমুখাপেক্ষী। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আ'লাল মূসিয়ি' কৃদ্রুহু' (ধনীদের জন্য তাদের সামর্থ্যানুসারে করণীয়)। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— আমি সৃষ্টির জীবিকা সম্প্রসারণকারী। কোনো কোনো আলেম এর অর্থ করেছেন— আমিই আকাশ-পৃথিবীর প্রসারক।

'ফারাশ্না' অর্থ বিছিয়ে দিয়েছি, প্রসারিত করেছি। অর্থাৎ পৃথিবীপৃষ্ঠকে আমি এমনভাবে বিছিয়ে দিয়েছি, যাতে করে মানুষ এখানে জীবনযাপন করতে পারে শান্তিতে।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'আর প্রত্যেক বস্তু আমি সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো'। এখানে 'যাওজ্বাইনি' অর্থ জোড়ায় জোড়ায়। যেমন নর-নারী, ভালো-মন্দ, উঁচু-নিচু, আলো-আঁধার, রাত-দিন, জ্ঞানী-মূর্খ। আমি বলি, সংখ্যাগত দিক থেকে এখানে জোড়ায় জোড়ায় বলা হয়নি। বরং কথাটির অর্থ হবে এখানে বহু প্রকারের। যেমন ভালো-মন্দ। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু একদিক দিয়ে ভালো, অন্য দিক দিয়ে মন্দ। এভাবে প্রত্যেক বস্তু স্বয়ং অস্তিত্বহীন হলেও অন্যের দ্বারা অস্তিত্ববান। আবার কখনো সে স্বয়ং অসমান্তরাল, আবার অন্যের দ্বারা সমান্তরাল।

'লাআ'ল্লাকুম তাজাক্কারুন' অর্থ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। অর্থাৎ যাতে করে তোমরা একথা বুঝতে পারো যে, সংখ্যায়িত হওয়া সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, স্রষ্টার নয়। তিনি এক, একক। একাধিকতাবদ্ধ হওয়া ও বিভক্ত হওয়া থেকে তিনি পবিত্র। তাঁর সত্তা-গুণবত্তা-কার্য অনস্তিত্বরহিত, সকল দুর্বলতা ও সমান্তরালের অতীত।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'অতএব তোমরা আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী'। একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমরা যখন একথা জানতে পারলে যে, সৃষ্টি আল্লাহ্কর্তৃক অস্তিত্বপ্রাপ্ত, তখন সেই মহান সত্তার দিকে মুখ ফিরাও, যিনি চিরঅমুখাপেক্ষী। এভাবে কেবল তাঁর প্রেমে ও আরাধনায় মগ্ন হয়ে লাভ করতে চেষ্টা করো তাঁর অক্ষয় ভালোবাসা ও নৈকট্য। কেননা সৃষ্টি নশ্বর, আর তিনি অবিনশ্বর।

'ইন্নী লাকুম মিন্হু নাজীরুম্ মুবীন' অর্থ আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী। 'মুবীন' অর্থ স্পষ্ট। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট মোজেজাসমূহের মাধ্যমে ভীতিপ্রদর্শনকারী। অথবা— আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি প্রকাশ্যে।

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কোনো ইলাহ্ স্থির কোরো না; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ই অবশ্যম্ভাবী সত্তা। সুতরাং ইবাদত পাওয়ার অধিকার রয়েছে কেবল তাঁরই। অথবা— আল্লাহ্ই মূল উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত প্রেমাস্পদ। সুতরাং তোমরা তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত কোরো না।

'আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী' কথাটির পুনরুক্তি করা হয়েছে এই আয়াতেও। এরকম করা হয়েছে বক্তব্যকে অধিকতর দৃঢ়তা প্রদর্শানার্থে। অথবা প্রথমোক্তটিতে বিশেষভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যেনো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে প্রকৃত প্রেমাস্পদ বলে গ্রহণ না করে। আর

শেষোক্তটিতে বলা হয়েছে, তারা যেনো তাঁর সঙ্গে কাউকে অথবা কোনোকিছুকে অংশীদারিত্ব না দেয়। বর্জন করে যেনো এই মহাপাপ সহ অন্য সকল পাপ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে মানুষ! তোমরা যদি আল্লাহ্র ভালোবাসায় নিজেদেরকে বিলীন করে দিতে না পারো, তবে অন্ততঃ তোমাদের বিশ্বাস ও উপাসনায় আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক কোরো না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোনো রসুল এসেছে, তারা তাঁকে বলেছে, তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ (৫২)! তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে? বস্তুত তারা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়' (৫৩)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপআচরণে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। এটা তাদের চিরাচরিত স্বভাব। তাদের পূর্বসূরীরাও এরকম করতো। তাদের প্রতি প্রেরিত রসুলগণকে তারা

www.eelm.weebly.com

প্রায়শই বলতো যাদুকর অথবা উন্মাদ। তাই বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয়, তারা বুঝি একে অপরের মন্ত্রণাদাতা। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তারা সকলেই সীমালংঘনকারী। সেকারণে ভ্রষ্ট ও শাস্তিযোগ্য।

এখানে 'আ তাওয়াসাও বিহী' অর্থ তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রণাই দিয়েছে? অর্থাৎ তাদের পূর্বসূরীরাই উত্তর সূরীদেরকে সত্যপ্রত্যাখ্যানের এই পাঠ দিয়েছে নাকি? তাদের মধ্যে হুবহু মিল দেখে তো সেরকমই মনে হয়। এখানকার 'হামযা' অক্ষরটি প্রশ্নবোধক, অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও সতর্কতাসূচক।

'বালহুম ক্বওমুন ত্বগূন' অর্থ বস্তুত তারা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। অর্থাৎ তারা কেউই তাদের স্বমতাবলম্বীদেরকে শুভ উপদেশ প্রদান করেনি। অথচ মনে হয়, তারা যেনো অশুভ মন্ত্রণাসূত্রে একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এরকম হওয়ার কারণ এই যে, তারা সকলেই চিরভ্রষ্ট। তাই তাদের সকলের বচন, আচরণ ও স্বভাবচরিত্র এক, তারা যে যুগেরই হোক না কেনো। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতাংশের মাধ্যমে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে রসুল স.কে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অতএব, তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো, এতে তুমি অভিযুক্ত হবে না (৫৪)। তুমি উপদেশ দিতে থাকো, কারণ উপদেশ মুমিনদেরই কাজে আসে'(৫৫)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি তো আপনার উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেই চলেছেন। বার বার মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেন সত্যধর্মের দিকে। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আপনার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেই চলেছে। সুতরাং আপনি তাদেরকে এড়িয়ে চলুন। এর জন্য আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। কিন্তু আপনার শুভউপদেশ কর্মপ্রবাহে কোনো ছেদ ঘটাবেন না। কেননা তারা আপনার কথা না মানলেও বিশ্বাসীরা তো মানে এবং এতে করে তারা উপকৃতও হয়।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মুনী, ইবনে রহওয়াইহ্, ইবনে হায়ছাম ইবনে কুলাইব মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন,

যখন অবতীর্ণ হলো 'অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো' তখন আমরা ভাবলাম, আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। কেননা আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর রসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন জনগণকে উপেক্ষা করতে। এরপর অবতীর্ণ হলো 'তুমি উপদেশ দিতে থাকো, কারণ উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে' তখন আমরা হলাম শান্ত ও আনন্দিত। ইবনে জারীর লিখেছেন, হজরত আবু কাতাদা বলেছেন, যখন 'তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো' আয়াত নাজিল হলো, তখন সাহাবীগণ বলতে লাগলেন, এবার মনে হয় প্রত্যাদেশপ্রবাহ বন্ধই হয়ে গেলো। এরপর অবতীর্ণ হলো 'তুমি উপদেশ দিতে থাকো, কারণ উপদেশ মুমিনদেরই উপকারে আসে'। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

'ফা ইন্নায্ জিক্‌রা তান্‌ফাউল মু'মিনীন' অর্থ কারণ উপদেশ মুমিনদের কাজে আসে। অর্থাৎ হে আমার নবী! আপনার উপদেশ কাফেরদের কাজে না এলেও, কাজে লাগে মুমিনদের। সুতরাং শুভ উপদেশ প্রদানের কাজটিকে আপনি নিরবচ্ছিন্ন রাখুন। অথবা কথাটির অর্থ হবে— আপনি উপদেশ প্রদান করতে থাকুন। আপনার উপদেশ বিশ্বাসীদের উপকারে আসবে এবং এতে করে খুলে যাবে তাদের অন্তর্দৃষ্টি।

সূরা জারিয়াত ঃ আয়াত ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০

❑ আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন্ন এবং মানুষকে এইজন্য যে, তাহারা আমারই 'ইবাদত করিবে।

❑ আমি উহাদের নিকট হইতে জীবিকা চাহি না এবং ইহাও চাহি না যে, উহারা আমার আহার্য যোগাইবে।

❑ আল্লাহ্ই তো রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।

❑ যালিমদের প্রাপ্য তাহাই যাহা অতীতে উহাদের সমমতাবলম্বীরা ভোগ করিয়াছে। সুতরাং উহারা ইহার জন্য আমার নিকট যেন ত্বরা না করে।

❑ কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ তাহাদের সেই দিনের, যেইদিনের বিষয়ে উহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে— আমার ইবাদত করে মহাসাফল্য লাভ করবে, এই উদ্দেশ্যেই আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন জাতি ও মানবগোষ্ঠীকে।

একটি সন্দেহ ঃ আলোচ্য আয়াতের ভাষ্যে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, জ্বিন ও মানুষ আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, এটাই ছিলো আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়। আর আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় অপ্রতিরোধ্য। তাহলে বহুসংখ্যক জ্বিন ও মানুষের অবাধ্য হওয়ার ঘটনা কীভাবে ঘটে চলেছে? এর রহস্য তাহলে কী?

সন্দেহের নিরসন ঃ হজরত আলী আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি জ্বিন ও ইনসানকে এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, আমি তাদেরকে ইবাদতের নির্দেশ দান করবো। এরকম বক্তব্যের উল্লেখ রয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন 'তাদেরকে কেবল এক উপাস্যের ইবাদতের হুকুম দেওয়া হয়েছে'। বাগবীও এরকম ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন। আর মুজাহিদ 'লিইয়া'বুদূন' (ইবাদত করবে) কথাটির অর্থ করেছেন 'লিইয়া'রিফূন' (আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করবে)। কিন্তু আল্লাহ্‌র পরিচয় তো কাফেরেরাও জানে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'হে আমার রসুল! আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছে কে? তারা বলবে, আল্লাহ্'। তাহলে বুঝতে হবে, আল্লাহ্ সম্পর্কে কাফেরদের ধারণা আর আল্লাহ্‌র মারেফত এক কথা নয়। কোনো কোনো আলেম 'লিইয়া'বুদূন' এর অর্থ করেছেন— যেনো তারা আমার সম্মুখে প্রকাশ করে তাদের অক্ষমতা। হয় অনুগত ও বাধ্য। ইবাদতের আভিধানিক অর্থ অক্ষমতা প্রকাশ করা, বিনয়ী হয়ে যাওয়া। এখানেও 'ইবাদত' এর অর্থ এরকমই হবে। বলা বাহুল্য, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলেই আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের সম্মুখে একই রকম অক্ষম ও অসহায়। কেউ অথবা কোনোকিছুই তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত করতে পারে না।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে 'ইবাদত' অর্থ আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যহীন এককত্বের স্বীকৃতি। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার অসমকক্ষ এককত্বের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য। উল্লেখ্য, বিশ্বাসীরা তো সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে ডাকে। কিন্তু দুঃখ-কষ্টে পড়লে অবিশ্বাসীরাও আল্লাহ্‌কে না ডেকে পারে না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'যখন তারা নৌযানে আরোহণ করে, তখন যথার্থভাবেই আল্লাহ্‌কে ডাকতে শুরু করে'।

'মাদারেক' প্রণেতা লিখেছেন, সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীই পরকালে আল্লাহ্‌র তওহীদের (এককত্বের) স্বীকৃতি প্রদান করবে। এক আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলাও হয়েছে। যেমন 'অতঃপর তাদের আর কোনো ফেতনা থাকবে না। তারা কেবল বলবে, 'আল্লাহ্ই আমাদের প্রভুপালনকর্তা। আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা কখনো অংশীবাদী ছিলাম না'। সুতরাং তওহীদের স্বীকৃতিদান ব্যতিরেকে জ্বিন ও মানুষের কোনো উপায়ই নেই।

আমি বলি, এ প্রসঙ্গে হজরত আলীর বক্তব্যটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। অন্যান্য বিশ্লেষণগুলো দুর্বল। এ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদানকারীগণ উপস্থাপন করে থাকেন

আরো একখানা আয়াত ও একটি হাদিস। আয়াতখানা হচ্ছে 'আমি বহুসংখ্যক জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য'। আর হাদিসটি হচ্ছে— রসুল স. বলেন, প্রত্যেকের জন্য ওই কাজটিই সহজ, যা সম্পাদনার্থে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কালাবী, জুহাক ও সুফিয়ান সওরী উদ্ভূত দ্বন্দ্বের বাইরে থাকার মানসে বলেছেন, এখানে 'ইবাদত করবে' বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র বিশেষ বিশেষ বান্দাকে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ জ্বিন ও মানুষের মধ্যে ইবাদত করবে তারা, যারা কামেল। হজরত ইবনে আব্বাসের পাঠে এমতো অর্থই প্রতিধ্বনিত হয়। তিনি পাঠ করতেন 'ওয়ামা খলাক্বতুল জ্বিন্না ওয়াল ইন্সা মিনাল মু'মিনীনা লিইয়া'বুদূন'। তাই আমার মতে আলোচ্য আয়াতের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা এরকম— আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি ইবাদত সম্পাদনের যোগ্য করে। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে দিয়েছি ইবাদতপ্রবণতা ও তা যথাসম্পাদনের ক্ষমতা। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসও এমতো ব্যাখ্যার সমর্থক। যেমন— রসুল স. একবার বললেন, প্রত্যেক মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে ইসলামের স্বভাব (ফিতরত) নিয়ে। পরে তার পিতা-মাতা তাকে বানায় ইহুদী, খৃষ্টান, অথবা অংশীবাদী। যেমন পশুশাবকেরা ভূমিষ্ঠ হয় নিখুঁত দেহাবয়ব নিয়ে। তোমরা কি সেগুলোকে নাসিকা-কর্ণ কর্তনকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করতে দ্যাখো? এরপর তিনি স. পাঠ করলেন 'ফিতরাতাল্লহিল্ লাতী ফাতারান্ নাসা আ'লাইহা লা তাবদীলা লিখল্‌ক্বিল্লাহ্' হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে। ব্যাখ্যাটি হজরত আলীর বক্তব্যের সঙ্গেও মিলে। অতএব বুঝতে হবে, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নিন্দা করাই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য। তারাও জন্মসূত্রে 'ফিতরাতে সালিমা' বা অবিপর্যস্ত স্বভাব নিয়ে পৃথিবীতে আসে। কিন্তু তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানের আঘাতে সে স্বভাবকে নষ্ট করে দেয়।

পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'আমি তাদের নিকট থেকে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমার আহার্য যোগাবে'।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে একথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যে, মনিব ও গোলামের মধ্যে যে সম্পর্ক, আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর দাসগণের সম্পর্ক সেরকম নয়। মনিবেরা ক্রীতদাসের মালিক হলেও তারা একদিক থেকে ক্রীতদাসের মুখাপেক্ষী।

www.eelm.weebly.com

ক্রীতদাসেরা যা উপার্জন করে, তা দিয়ে পূরণ করে তাদের মনিবদের প্রয়োজন। মনিবদের আহারায়োজন নিশ্চিত করে তারাই। কিন্তু আল্লাহ্র অবস্থা সেরকম নয়। তিনি সর্বোতভাবেই তাঁর সৃষ্টি থেকে চিরঅমুখাপেক্ষী।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি এটা কখনোই চাইনা যে, মানুষ তার নিজের জন্য, অন্যের জন্য, অথবা আমার জন্য আহার যোগাক। এই ব্যাখ্যাটিকে মান্য করলে আবার একটি দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। সন্দেহ জাগে, তাহলে কি আল্লাহ্ চান না যে, মানুষ অন্য মানুষ কিংবা প্রাণীর জন্য আহারায়োজন করুক। দ্বন্দ্ব-সন্দেহটির সমাধান করা যেতে পারে এভাবে—

হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ বলেন, সমগ্র সৃষ্টি আমার পরিবার। যে আমার পরিবারের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে, আমি তাকে অনুগ্রহ করবো। সুতরাং যে মানুষকে আহার করায়, সে যেনো আল্লাহ্কে আহার করায়। আর এক হাদিসে এসেছে, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ তাঁর কোনো এক বান্দাকে বলবেন, তুমি আমাকে আহার করাওনি। বান্দা বলবে, আমি তোমাকে আহার করাবো কীভাবে? তুমি যে মহাবিশ্বের প্রাণীকুলের আহার্যের যোগানদাতা। আল্লাহ্ বলবেন, মনে করে দ্যাখো, অমুক দিন আমার এক বান্দা তোমার কাছে খেতে চেয়েছিলো। তুমি তাকে খেতে দাওনি। যদি তুমি তাকে খাওয়াতে, তবে আমাকেই খাওয়াতে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম। আর এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ আরো বলবেন, আমি পীড়িত হয়েছিলাম, তুমি আমার সেবা করোনি। আমি তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিলাম। তুমি আমাকে পানি পান করাওনি।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্র সঙ্গে জীবিকা'র সম্পর্ক করা হয়েছে রূপকার্থে। আর সৃষ্টির জীবিকার প্রসঙ্গটিই এখানে প্রকৃত। এভাবে ব্যাখ্যা করলে আবার এই সন্দেহটিও প্রকট হয় যে, তাহলে আল্লাহ্ জাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন কেনো? কেনো এরকম বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের উপার্জন নিজেরা খাও এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে খাওয়াও। আর তাদেরকেও দান করো, যাদের প্রতিপালন তোমাদের উপরে ওয়াজিব। এই যদি হয় প্রকৃত অবস্থা, তবে একথা কীভাবে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ এটা চান না, কেউ তাঁর সৃষ্টির জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করুক। এমতো সন্দেহের নিরসনে বলা যেতে পারে যে, জাকাত ওয়াজিব করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতিপালন, আহার সরবরাহ নয়। একারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেন, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলদের উপরে জাকাতের হুকুম বর্তায় না, যেমন বর্তায় না শরিয়তের অন্যান্য নির্দেশ। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটিকেও যথার্থ বলা যায় না। কেননা জাকাত, ওশর, খেরাজ সবকিছুরই উদ্দেশ্য দুস্থ মানুষের কাছে জীবিকা পৌঁছে দেওয়া। আর এ সকলকিছু পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করারও বিধান রয়েছে। তবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষ থেকে তাদের অভিভাবক জাকাত-ওশর আদায় করলেও তা আদায় হয়ে যায়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াতের শুরুতে উহ্য রয়েছে 'ক্বুল' শব্দটি। ওই উহ্যতাসহ অর্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন, আমি তাদের কাছে রিজিকের প্রত্যাশা করি না, আর এটাও আশা করি না যে, তারা আমার সৃষ্টিকে রিজিক দান করবে।

এরপরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই তো রিজিক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত'। 'হুয়ার রয্যাক্ব' অর্থ তিনিই রিজিক দাতা। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিকে রিজিক দান করেন আল্লাহ্, কিন্তু তিনি রিজিক ও অন্যান্য সকল বিষয়ে অন্য কারো বা কোনোকিছুর মুখাপেক্ষী নন। আর 'জুল ক্বুওওয়াতিল মাতীন' অর্থ প্রবল, পরাক্রান্ত। অর্থাৎ তিনি রিজিক ও অন্যান্য সকল বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রবল ও প্রতাপশালী।

এরপরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'জালেমদের প্রাপ্য তা-ই, যা অতীতে তাদের সমমতাবলম্বীরা ভোগ করেছে। সুতরাং তারা এর জন্য আমার নিকট যেনো ত্বরা না করে'।

এখানে 'জলামূ' অর্থ জালেম, অংশীবাদী ও পাপিষ্ঠ, যারা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত ইবাদত সম্পাদনের যোগ্যতাকে নষ্ট করে অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসী হয়ে যায়। 'জানুবান' অর্থ আযাবের একাংশ, যা তাদের পূর্বসূরীরা ইতোপূর্বে ভোগ করেছে। এর শাব্দিক অর্থ— বড় বালতি। আর রূপক অর্থ— পানির ওই অংশ যা বালতি দ্বারা তোলার পর উত্তোলনকারীরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। জুজায বলেছেন, 'জানুব' এর শাব্দিক অর্থ— অংশ। আর এখানে 'সমমতাবলম্বীরা' অর্থ অতীতের শাস্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়সমূহ। যেমন— আদ' ছামুদ, নবী লুতের সম্প্রদায় ইত্যাদি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মক্কার মুশরিকেরাও যথাসময়ে আল্লাহ্র গজব কবলিত হবে, যেমন গজবে ধ্বংস হয়েছিলো তাদের পূর্বসূরীরা। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, তারা যেনো এব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে।

শেষোক্ত আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'কাফেরদের জন্য দুর্ভোগ তাদের সেই দিনের, যে দিনের বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! নির্ধারিত সময়ে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দেওয়া হবেই। সুতরাং আপনি উতলা হবেন না। আপনার অনুগামীদেরকেও একথা জানাবেন, যেনো তারা বার বার অংশীবাদীদের জন্য শাস্তি প্রার্থনা

না করে। অথবা বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে হুমকি দিতো 'ঠিক আছে, তোমরা যদি তোমাদের দাবিতে সত্য হও, তবে বলো, কখোন আসবে আযাব'। তাদের ওই অপবচনের জবাবে বলা হয়েছে— সুতরাং তারা যেনো এর জন্য ব্যতিব্যস্ত না হয়। নির্ধারিত দিনে তাদের উপরে শাস্তি নেমে আসবেই। যে দিন সম্পর্কে তাদেরকে বার বার সতর্ক করা হচ্ছে। এখানে 'সেই দিন' অর্থ মহাবিচারের দিন।

সূরা তুর

২ রুকু এবং ৪৯ আয়াতবিশিষ্ট এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে পুণ্যভূমি মক্কায়।
সূরা তুর ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

- ❑ শপথ তূর পর্বতের,
- ❑ শপথ কিতাবের, যাহা লিখিত আছে
- ❑ উন্মুক্ত পত্রে;
- ❑ শপথ বায়তুল মা'মূরের,
- ❑ শপথ সমুন্নত আকাশের,
- ❑ এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের—
- ❑ তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো অবশ্যম্ভাবী,
- ❑ ইহার নিবারণকারী কেহ নাই।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ওয়াত্তুর'। এর অর্থ শপথ তুর পর্বতের। এখানে তুর বলে বুঝানো হয়েছে সিনাই পর্বতকে। পর্বতটি অবস্থিত মাদিয়ানে। ওই পর্বতের উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছিলো আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় প্রেমিক নবী মুসার কথোপকথন।

এরপরের আয়াত সপ্তকে বলা হয়েছে— 'শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে (২) উন্মুক্ত পত্রে (৩); শপথ বায়তুল মা'মুরের (৪), শপথ সমুন্নত আকাশের (৫), এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের (৬)— তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো অবশ্যম্ভাবী (৭), তার নিবারণকারী কেউ নেই' (৮)।

এখানে 'মাস্তুর' অর্থ যা লিখিত আছে। 'সত্বর' বলে লিখিত অক্ষরাবলীর বিন্যস্ততাকে। উভয় শব্দের অর্থ এখানে একই। 'রক্কিন' অর্থ চামড়া, যার উপরে লেখা হয়। কিন্তু এখানে শব্দটির অর্থ— ওই পত্র, যাতে বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা যায়। যেমন কাগজ। 'মানশূর' অর্থ উন্মুক্ত। অর্থাৎ যা পাঠ করবার জন্য উন্মুক্ত অবস্থায় আছে। তবে একথা ঠিক যে এর দ্বারা এখানে লওহে মাহফুজকে বোঝানো হয়নি। কেননা 'রক্কিন' 'মানশূর' ইত্যাদি প্রকাশ্য অর্থবোধক। কিন্তু 'লওহে মাহফুজ' প্রকাশ্য নয়। সেকারণেই কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা মনে করেন, একথা বলে এখানে কোরআন মজীদকেই বোঝানো হয়েছে, যার মধ্যে শরিয়তের বিধি-বিধান পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কালাবী বলেছেন, এখানে 'কিতাব' দ্বারা বুঝানো হয়েছে তওরাত শরীফকে, যা লিপিবদ্ধ করেছিলেন আল্লাহ্ স্বয়ং। আর মুসা নবী তখন কলমের আওয়াজও শুনতে পেয়েছিলেন। এখানে 'তুর' পর্বতের কথা উল্লেখিত হওয়ায় এরকম ব্যাখ্যা হওয়াই স্বাভাবিক। কারো কারো মতে এখানে 'কিতাব' অর্থ কিরামুন-কাতেবীন ফেরেশতাদ্বয় কর্তৃক লিখিত আমলনামা, যা উন্মুক্ত করা হবে মহাবিচারের দিবসে।

'বায়তিল মা'মুর' হচ্ছে কাবা শরীফের সোজা উপরে সপ্তম আকাশে অবস্থিত মসজিদ। ওই মসজিদের আর এক নাম সাররাখ। পৃথিবীতে কাবা শরীফকে যেভাবে সম্মান করা হয়, তেমনি আকাশজগতে সম্মান করা হয় বায়তুল মামুরকে।

www.eelm.weebly.com

হজরত আনাস থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত মেরাজ সম্পর্কিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সপ্তম আকাশে আমি নবী ইব্রাহিমকে দেখলাম। তিনি বায়তুল মামুরে হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন। প্রতিদিন বায়তুল মামুরে প্রবেশ করে সত্তর হাজার ফেরেশতা। তারা সেখানে ইবাদত করে বেরিয়ে গেলে আর কখনো সেখানে প্রবেশের সুযোগ পায় না। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, ওই ফেরেশতা বায়তুল মামুর তাওয়াফ করে এবং তার ভিতরে ঢুকে নামাজ পড়ে। তারপর বেরিয়ে যায়। আর কখনো সেখানে প্রত্যাবর্তন করে না। ফেরেশতারা ওই গৃহ সারাক্ষণ বেষ্টন করে রাখে। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'বায়তুল মা'মুর' অর্থ কাবাগৃহ। কেননা হজ ও এতেকাফকারীরা এই গৃহকে সব সময় সজীব (মা'মুর) রাখে। অথবা 'বায়তুল মা'মুর' এর উদ্দেশ্যে এখানে— বিশ্বাসী দাসগণের অন্তঃকরণ, যা সারাক্ষণ সমুদ্ভাসিত থাকে মারেফাত ও ইখলাসের আলোয়।

'আস্‌সাক্বফিল মারফূয়ি' অর্থ সমুন্নত আকাশ। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র এরশাদ করেছেন 'ওয়া জায়াল নাস্ সামাআ সাক্বফাম্ মাহফূজা' (আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদস্বরূপ)। আর 'আলবাহ্‌রিল মাসজুর' অর্থ উদ্বেলিত সমুদ্র। অভিধান গ্রন্থে রয়েছে 'সাজ্বারাতুন্ নূর' (চুল্লি উত্তপ্ত হয়েছে)' 'সাজারান্ নাহ্‌রা' (নদী ভরপুর হয়েছে)। মোহাম্মদ ইবনে কা'ব ও জুহাক বলেছেন, 'আল বাহরিল মাসজুর' অর্থ ওই সমুদ্র যাকে আগুনের মতো উত্তপ্ত করা হবে। হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, মহাপ্রলয়ের দিন আল্লাহ্ সকল সমুদ্রকে আগুনে পরিণত করবেন, যাতে করে দোজখের আগুন অধিকতর উত্তপ্ত হয়। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুজাহিদ, হাজী ও ওমরা পালনকারী ছাড়া আর কেউ যেনো সমুদ্র ভ্রমণ না করে। কেননা সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে আগুন। অথবা বলেছেন, আগুনের নিচে রয়েছে সমুদ্র। হজরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সমুদ্র হচ্ছে জাহান্নাম।

আবু শায়েখ তাঁর 'আল আজমত' গ্রন্থে এবং বায়হাকী হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, আমি অমুক ইহুদীর চেয়ে সত্যবাদী ইহুদী আর দেখিনি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র বিশাল অগ্নিকুণ্ড হচ্ছে সাগর। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজিকে একীভূত করে সাগরে নিক্ষেপ করবেন। অতঃপর সেখানে প্রবাহিত করবেন উত্তপ্ত বাতাস। এভাবে সমগ্র সাগর পরিণত হবে অগ্নিতে।

কালাবী বলেছেন, 'মাসজুর' অর্থ ভরপুর। যেমন আরববাসীগণ বলেন, 'সাজ্বার্‌তুল্ ইনাআ' (আমি পাত্র ভরপুর করেছি)। হাসান, কাতাদা ও আবুল আলিয়া বলেছেন, এর অর্থ— শুকিয়ে যাওয়া, পানিশূণ্য হওয়া। রবী ইবনে আনাস বলেছেন, এর অর্থ— নোনা ও মিষ্টি পানি একত্রিত হওয়া। নাযাল ইবনে সুবরার মাধ্যমে জুহাক বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, 'বাহরে মাসজুর'

(মৃতসঞ্জীবনী সাগর) হচ্ছে আরশের নিচের একটি সমুদ্র, যার গভীরতা সাত আকাশ ও সপ্তস্তর পৃথিবীর সমান। তার পানি প্রগাঢ়। ওই সমুদ্রের আর এক নাম 'বাহরে হাইওয়ান'। কিয়ামতের দিবসে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুৎকার উত্থিত হওয়ার পর চল্লিশ সকাল ধরে সমগ্র সৃষ্টির উপর ওই সমুদ্র থেকেই পানি বর্ষিত হবে। ফলে মানুষেরা পুনরুত্থিত হবে তাদের আপন আপন কবর থেকে। মুকাতিলও এরকম বর্ণনা করেছেন।

'ইন্‌না আ'জাবা রব্বিকা লাওয়াক্বিউন' অর্থ তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শাস্তি কাফেরদের উপরে অবশ্যই আপতিত হবে। আর 'মা লাহু মিন দাফিয়ীন' অর্থ তার নিবারণকারী কেউ নেই। অর্থাৎ ওই শাস্তি প্রতিহত করার সামর্থ্য কারো নেই। হজরত যোবায়ের ইবনে মুতয়ীম বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধের পরে বন্দীদের সম্পর্কে আলাপ করার উদ্দেশ্যে আমি মদীনা গেলাম। তখনও আমি ছিলাম অমুসলমান। যখন আমাকে রসুল স. এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন তিনি স. মাগরিবের নামাজ পাঠ করছিলেন। মসজিদের বাইরে থেকে তাঁর কোরআন পাঠের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো। তিনি স. পাঠ করছিলেন সুরা তুর। যখন তিনি স. পাঠ করলেন 'তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো অবশ্যম্ভাবী, তার নিবারণকারী কেউ নেই' তখন ভয়ে আমার বুক কাঁপতে শুরু করলো। আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে তৎক্ষণাৎ আমি কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলাম। আমার তখন মনে হচ্ছিলো, এখান থেকে উঠে গেলেই আমি আল্লাহ্‌র আযাব কবলিত হবো।

সূরা তুর ঃ আয়াত ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

www.eelm.weebly.com

❑ যেদিন আকাশ আন্দোলিত হইবে প্রবলভাবে

❑ এবং পর্বত চলিবে দ্রুত;

❑ দুর্ভোগ সেই দিন সত্য অস্বীকারকারীদের,

❑ যাহারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।

❑ যেদিন উহাদিগকে ধাক্কা মারিতে মারিতে লইয়া যাওয়া হইবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে

❑ 'ইহাই সেই অগ্নি যাহাকে তোমরা মিথ্যা মনে করিতে।'

❑ ইহা কি জাদু? না কি তোমরা দেখিতে পাইতেছ না?

❑ তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর অথবা ধৈর্য ধারণ না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যাহা করিতে তাহারই প্রতিফল তোমাদিগকে দেওয়া হইতেছে।

'ইয়াওমা তামূরুস্ সামাউ' অর্থ যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে। অর্থাৎ আকাশ যেদিন ঘুরতে থাকবে চাকার মতো। কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন— যে দিন আকাশ নড়েচড়ে উঠবে। আতা খোরাসানী বলেছেন, সেদিন আকাশের একাংশ অনুপ্রবিষ্ট হবে অন্য অংশের মধ্যে। কোনো কোনো তাফসীরকার অর্থ করেছেন— যেদিন আকাশ থর থর করে কাঁপবে। অভিধানে রয়েছে, 'তামূরু' অর্থ আসা-যাওয়া, ঘূর্ণন্য, কম্পন, থর থর করে কেঁপে ওঠা। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের বক্তব্যদৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে, মাটি ও পাহাড়ের মতো আকাশও নিশ্চল, চলমান নয়। অথচ প্রাচীন দার্শনিকেরা বলে, আকাশ চলমান।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'এবং পর্বত চলবে দ্রুত'। একথার অর্থ— পর্বতসমূহ তখন ধূলিকণার মতো উড়তে থাকবে বাতাসে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে—'দুর্ভোগ সেই দিন সত্য অস্বীকারকারীদের (১১), যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে' (১২)। একথার অর্থ— পরকালকে ভুলে যারা পৃথিবীতে হাস্য-কৌতুক ও নিরর্থক কাজে মগ্ন থাকে, কিয়ামতের দিন তাদের উপরে নেমে আসবে চরম দুর্ভোগ।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ের (১৩, ১৪, ১৫, ১৬) মর্মার্থ হচ্ছে— সেদিন দোজখের প্রহরীরা তাদের হাত তাদেরই ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে এবং মস্তককে পায়ের সঙ্গে মিলিয়ে ধনুকের মতো করে ধাক্কাতে ধাক্কাতে দোজখের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে। বলবে, দ্যাখো, ভালো করে চেয়ে দ্যাখো, এটা হচ্ছে ওই আগুন যাকে তোমরা পৃথিবীতে থাকতে অস্বীকার করতে। এখন বলো, এটা কি যাদু? তোমরা আল্লাহ্‌র বাণীকে তখন 'যাদু'ই বলতে। দ্যাখো, কী দেখতে পাচ্ছো না নাকি? তোমরা তো আল্লাহ্‌র নবীগণের মাধ্যমে প্রকাশিত অলৌকিক নিদর্শনকে তখন দেখেও না দেখার ভান করতে। এখন তোমরা দোজখে প্রবেশ করো। তারপর ভোগ করো দোজখের মর্মন্তুদ শাস্তি। তোমাদের ধৈর্য অথবা অধৈর্যের কোনো প্রতিক্রিয়াই এখানে হবে না। যা কিছুই তোমরা করতে চাওনা কেনো, তোমাদের উপরে শাস্তি হতে থাকবে নিরবচ্ছিন্নভাবে। আর একথাও জেনে রাখো যে, এ হচ্ছে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল, আরোপিত কোনো কিছু নয়।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'আফা সিহ্‌রুন' অর্থ এটা কি যাদু? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক এবং এর মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে ধমকের সুর। আর এখানকার 'ফা' ব্যবহৃত হয়েছে পরবর্তী তা প্রকাশার্থে। অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা ওহী ও মোজেজাকে যাদু বলতে। এখন তো তোমরা বাস্তবের মুখোমুখি। তাহলে বলো, সামনে যা দেখছো, তা কি যাদু?

'আম্ আন্‌তুম্ লা তুব্‌সিরূন' অর্থ না কি তোমরা দেখতে পাচ্ছো না, যেমন দুনিয়ায় দেখতে পেতে না মোজেজা? বলতে, যাদু দ্বারা আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানো হয়েছে।

'সাওয়াউন' শব্দটি ক্রিয়ামূল। কিন্তু এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কর্তৃকারকরূপে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে তোমরা এখানে ধৈর্য অবলম্বন করো, অথবা অধৈর্য হও, দু'টোই তোমাদের জন্য সমান। এ হচ্ছে তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল, যা তোমাদেরকে অনন্তকাল ধরে ভোগ করতে হবেই।

সূরা তুর ঃ আয়াত ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

❑ মুত্তাকীরা তো থাকিবে জান্নাতে ও আরাম-আয়েশে,

❑ তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা দিবেন তাহারা তাহা উপভোগ করিবে এবং তাহাদের রব তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন জাহান্নামের 'আযাব হইতে,

❑ 'তোমরা যাহা করিতে তাহার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার করিতে থাক।'

❑ তাহারা বসিবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়া; আমি তাহাদের মিলন ঘটাইব আয়তলোচনা হূরের সংগে;

❑ এবং যাহারা ঈমান আনে আর তাহাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাহাদের অনুগামী হয়, তাহাদের সহিত মিলিত করিব তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাহাদের কর্মফল আমি কিছু মাত্র হ্রাস করিব না; প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।

❑ আমি তাহাদিগকে দিব ফলমূল এবং গোশ্‌ত যাহা তাহারা পসন্দ করে।

❑ সেথায় তাহারা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করিতে থাকিবে পানপাত্র, যাহা হইতে পান করিলে কেহ অসার কথা বলিবে না এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হইবে না।

❑ তাহাদের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে কিশোরেরা, সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ।

❑ তাহারা একে অপরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে,

❑ এবং বলিবে, 'পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শঙ্কিত অবস্থায় ছিলাম।

www.eelm.weebly.com

❑ 'অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে অগ্নিশাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন।
❑ 'আমরা পূর্বেও আল্লাহ্‌কে আহ্বান করিতাম, তিনি তো কৃপাময়,পরম দয়ালু।'

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— নিশ্চয় বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা তখন থাকবে বেহেশতে অফুরন্ত সুখসম্ভারের মধ্যে। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত ওই সর্বশ্রেষ্ঠ দান তারা উপভোগ করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। এভাবে আল্লাহ্ তাদেরকে দোজখাগ্নি থেকে রাখবেন চিরমুক্ত।

এখানকার 'জান্নাতিন' ও 'নায়ীমিন' শব্দ দু'টোতে তানভীন যুক্ত করা হয়েছে মর্যাদা প্রকাশার্থে। অর্থাৎ ওই জান্নাত ও জান্নাতের সুখ-শান্তি হবে মহামর্যাদামণ্ডিত।

'ফাকিহীনা' অর্থ তারা তা উপভোগ করবে। 'বিমা আতাহুম রব্বুহুম' অর্থ তাদের প্রভুপালক তাদেরকে যা দিবে'। কথাটি অস্পষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে তখন কী কী দিবেন, তা এখানে স্পষ্ট করে বলেননি। এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তখন তাদেরকে দিবেন অসংখ্য সুখসম্ভার। অর্থাৎ ওই দান হবে দাতার মর্যাদা ও ক্ষমতা অনুসারে অফুরন্ত, অপরিমেয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সঙ্গে পানাহার করতে থাকো' (১৯)। তারা বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে; আমি তাদের মিলন ঘটাবো আয়তলোচনা হুরের সঙ্গে' (২০)।

এখানে 'কুলূ ওয়াশরবূ' অর্থ তাদেরকে তখন বলা হবে, খাও এবং পান করো। 'হানিয়াম্' অর্থ পান করো। অর্থাৎ তোমরা পানাহার করতে থাকো পরিতৃপ্তির সঙ্গে। অথবা কথাটির অর্থ হবে—গ্রহণ করো তৃপ্তিপ্রদায়ক আহার্য ও পানীয়। প্রথমাবস্থায় 'হানিয়াম' কথাটি হবে মাফউলে মুতলাক (সাধারণ কর্মপদের) এবং দ্বিতীয় অবস্থায় কথাটি হবে একটি উহ্য মাফউলে বিহীর (তৎসম কর্মপদ) বিশেষণ। আসলে 'হানিয়াম' বলে ওই পানাহারের সামগ্রীকে যার গলাধঃকরণ ক্লেশকর নয়, আর ভোজনের পর যা পাকস্থলীতে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি করে না।

'বিমা কুনতুম্ তা'মালূন' অর্থ তোমরা যা করতে। অর্থাৎ এ হচ্ছে তোমাদের পৃথিবীর পুণ্যকর্মের প্রতিফল। আর 'যাওওআজ্নাহুম' ক্রিয়াটির অর্থ হবে এখানে— মিলন ঘটাবো। ক্রিয়াটি অতীতকালবোধক হলেও এখানে এর ব্যবহার ঘটেছে ভবিষ্যতকালবোধকরূপে।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'এবং যারা ইমান আনে, আর যাদের সন্তান-সন্ততি ইমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সঙ্গে মিলিত করবো তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবো না; প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।

এখানে 'জুর্‌রিইয়্যাত' অর্থ সন্তান-সন্ততি, বংশধর। শব্দটি ব্যবহৃত হয় একবচন বহুবচন উভয়ক্ষেত্রে। 'বিঈমানি' অর্থ ইমানে, ইমানের ক্ষেত্রে। শব্দটিতে সংযুক্ত তানভীন অনির্দিষ্টবাচক। অর্থাৎ বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ইমানদার পিতা-মাতার দলভূত হতে গেলে তাদের সন্তান-সন্ততিকে সাধারণ ইমানদার হলেও চলবে। এমনকি এমতোক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে প্রবিধানগত ইমানও। অর্থাৎ শিশু ও পাগলেরাও ইমানদার পিতা-মাতার অনুগামী হিসেবে তখন হবে তাদেরই দলভূত। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণের চক্ষু শীতল করণার্থে তাদের নিম্নমর্যাদাধারী সন্তান-সন্ততিদের সম্মানও বৃদ্ধি করে দিবেন। তারপর তিনি স. পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাকেম, ইবনে মুনজির, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম। আরো বর্ণনা করেছেন বায়হাকী তাঁর 'আস্সুনান' গ্রন্থে এবং বায্যার ও আবু নাঈম 'হুলিয়া' নামক পুস্তকে।

হজরত আলী বলেছেন, একবার উম্মতজননী খাদিজা তাঁর ওই দুই শিশু সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যারা মৃত্যুবরণ করেছিলো মূর্খতার যুগে। রসুল স. জবাব দিলেন, তারা দোজখে যাবে। জবাব শুনে উম্মত জননীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি স. বললেন, তুমি তাদের অবস্থান অবলোকন করলে তাদের প্রতি তোমার ঘৃণার উদ্রেক ঘটবে। উম্মতজননী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার ওই দুই প্রয়াত শিশু সন্তানের কী হবে, যারা আপনার ঔরসজাত? তিনি স. বললেন, তারা বেহেশতী। বিশ্বাসীগণের শিশুসন্তান বেহেশতী, আর অবিশ্বাসীদের শিশুসন্তান দোজখী। এরপর রসুল স. পাঠ করলেন এই আয়াত। হাদিসটি আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'জাওয়ায়েদ' পুস্তকে। হাদিসটির কতিপয় বর্ণনাকারী অপরিচিত। তাছাড়া এর বর্ণনাপরম্পরাও বিপর্যস্ত।

দ্রষ্টব্য ঃ বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অংশীবাদীদের অকাল প্রয়াত শিশুসন্তানেরা সকলেই দোজখী। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। কেননা হাদিসটি প্রামাণ্য নয়।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, উম্মতজননী হজরত আয়েশা একবার রসুল স.কে মুশরিকদের মৃত শিশুসন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি স. বললেন, তুমি যদি চাও, তবে আমি তাদের দোজখাভ্যন্তরের চীৎকারের আওয়াজ শুনিয়ে দিতে পারি। এই হাদিসটির সূত্রপরম্পরাও দুর্বলতাদুষ্ট। কেউ কেউ বলেছেন, মুশরিকদের মৃত শিশুসন্তান সম্পর্কিত সকল হাদিস রহিত হয়ে গিয়েছে। কেননা শিথিল সূত্রপরম্পরায় ইবনে আবদুল বার বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেন, খাদিজা

বিনতে খুওয়াইলিদ একবার রসুল স. এর কাছে মুশরিকদের পরলোকগত শিশু সন্তানদের কী পরিণতি হবে তা জানতে চাইলেন। তিনি স. বললেন, তাদের পরিণতি হবে তাদের পিতা-মাতার মতো। কিছুদিন পর মহাপুণ্যবতী খাদিজা পুনরায় একই প্রশ্নের অবতারণা করলেন। তখন তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ই জানেন, বড় হলে তারা কী হতো। এর কিছুদিন পর পুনরায় এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলো। তখন অবতীর্ণ হলো 'একজনের পাপের বোঝা অন্য জন বহন করবে না'। রসুল স. তখন বললেন, তারা থাকবে ইসলামী স্বভাবের উপর। অথবা বললেন, তারা বেহেশতেই থাকবে।

হজরত আনাস থেকে ইবনে আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি আমার প্রভুপালনকর্তার কাছে ওই সকল মানবসন্তানের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যারা খেলাধুলায় লিপ্ত থাকে। আল্লাহ্ তাদেরকে আমাদেরকেই দান করলেন (জান্নাতী হিসেবে কবুল করলেন)। ইবনে আব্দুল বার বলেছেন, এখানে খেলাধুলায় লিপ্ত বলে বুঝানো হয়েছে অবুঝ শিশুদেরকে। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সামুরা বলেছেন, আমি একবার রসুল স.কে মুশরিকদের শিশু সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি স. বললেন, তারা জান্নাতীদের খাদেম হবে। ইবনে জারীর সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও এরকম বর্ণনা করেছেন। তায়ালাসী হজরত আনাস থেকে। কোনো কোনো বিদ্বানের ধারণা, ওই শিশুদেরকে যাচাই বাছাই করা হবে। কেননা রসুল স. বলেছেন, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

'মা আলাত্নাহুম' অর্থ তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবো না। অর্থাৎ বিশ্বাসীদের সন্তান-সন্ততিকে তাদের মহাপুণ্যবান পিতা-মাতার সঙ্গে মিলিত করার কারণে পিতা-মাতার পুণ্য কম করা হবে না। উল্লেখ্য, বিশ্বাসীদের সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কে এই আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। কিন্তু অবিশ্বাসীদের সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

'কুল্লুম্ রিইম্ বিমা কাসাবা রহীন' অর্থ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। মুকাতিল বলেছেন, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অর্থ প্রত্যেক কাফের। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়ায়— প্রত্যেক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী দোজখের শাস্তি চিরকাল ভোগ

করবে তাদের অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতার কারণে। এরকম অন্তহীন শাস্তি আর কারো হবে না। সুতরাং বুঝতে হবে কাফের ও ফাসেকদের সঙ্গে তাদের অকাল প্রয়াত শিশুসন্তানদেরকে মিলিত করা হবে না। কেননা তারা পৃথিবীতে আমল করার বয়স পর্যন্ত পৌঁছেইনি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে দিবো ফলমূল এবং গোশত, যা তারা পছন্দ করে (২২)। সেখানে তারা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করতে থাকবে পানপাত্র, যা থেকে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপকর্মেও লিপ্ত হবে না'(২৩)।

এখানে 'আম্দাদ্নাহুম' অর্থ দিবো, দান করবো, তাদের জন্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে থাকবো আমার অনুগ্রহসম্ভার, দিবো তাদের পছন্দমতো ফলমূল, গোশত ইত্যাদি। 'মিম্মা ইয়াশ্তাহুন' অর্থ যা তারা পছন্দ করবে।

'ইয়াতানাযাউ'না' অর্থ পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করতে থাকবে। শব্দটি সাধিত হয়েছে 'নাযউ'ন' ক্রিয়ামূল থেকে। 'নাযউ'ন' অর্থ কারো হাত থেকে কিছু ছিনিয়ে নেওয়া। ক্রিয়াটি এখানে শব্দগঠন 'তাফ্য়ীল' প্রক্রিয়ায় মূল তিন অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের অর্থপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তারা নিজেদের মধ্যে পানপাত্র বিনিময় করবে পানপাত্র পরিবেশকের মাধ্যমে। 'কা'সান' অর্থ পানীয় ভর্তি পাত্র বা পেয়ালা। পানীয় ভর্তি পেয়ালাকে যেমন 'কা'স' বলা হয়, তেমনি কেবল পানপাত্রকেও বলা হয় 'কা'স'।

'লা লাগ্বুন' অর্থ অসার বাক্য। কাতাদা শব্দটির অর্থ করেছেন— মিথ্যাবচন। মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, এর অর্থ নিরর্থক বাক্যালাপ। আর 'ওয়ালা তা'ছীম' অর্থ এবং পাপকর্মেও লিপ্ত হবে না। জুজায বলেছেন, পৃথিবীতে মদ্যপেরা মদ্যপান করার পর নানাপ্রকার বাজে কথা বলে এবং জড়িত হয় বিভিন্ন ধরনের অন্যায়কর্মে। জান্নাতীরা জান্নাতী সুরা পান করার পর সেরকম কিছু করবে না। কোনো কোনো তাফসীরকার কথাটির অর্থ করেছেন— বেহেশতে শরাব পান করার কারণে বেহেশতীরা অপরাধী বলে গণ্য হবে না। কেননা ওই শরাব হবে পবিত্র।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা, মুক্তাসদৃশ'। একথার অর্থ— কিশোর সেবকেরা সেবাযত্ন করবে বেহেশতীদের। তাদের নাম গেলেমান। তারা হবে স্বচ্ছ মুক্তা সদৃশ সুদর্শন।

এখানে 'গিল্মানুল্ লাহুম' অর্থ তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোর সেবকেরা। হজরত আনাস থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সর্বনিম্ন মর্যাদাধারী বেহেশতীর সেবায় সদাপ্রস্তুত থাকবে দশ হাজার সেবক। ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, ন্যূনতম সম্মানাধিকারী বেহেশতীর জন্য সকাল-সন্ধ্যায় নিয়োজিত থাকবে পাঁচ হাজার পরিচারক। তাদের প্রত্যেকের হাতে এমন পানপাত্র থাকবে যা অন্যের হাতে থাকবে না।

www.eelm.weebly.com

‘মাকনূন’ অর্থ মুক্তাদানা সদৃশ; আচ্ছাদিত, শুভ্র, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। বাগবী লিখেছেন, হজরত হাস্‌সান বলেছেন, একবার সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সেখানকার সেবকেরা যদি মুক্তাসদৃশ হয়, তবে তাদের কর্তারা কীরকম হবে? কাতাদা বলেছেন, আমাদের কাছে এই মর্মে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক লোক একবার রসুল স.কে বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! খাদেমদের হাল যদি এরকম হয়, তবে তাদের মখদুমদের হাল কিরকম হবে? তিনি স. বললেন, খাদেমদের তুলনায় তারা হবে তারকারাজির তুলনায় পূর্ণ শশীসদৃশ। আবদুর রাজ্জাক ও ইবনে জারীরও তাদের আপন আপন তাফসীর গ্রন্থে কাতাদা থেকে অপরিণতসূত্রে এরকম বর্ণনা করেছেন।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— ‘তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে (২৫), এবং বলবে, পূর্বে আমরা পরিবার পরিজনদের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম (২৬)। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নিশাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন’ (২৭)।

এখানে ‘ইয়াতাসাআলূন’ অর্থ জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অর্থাৎ একে অপরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবে পৃথিবীর জীবনধারা সম্পর্কে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৃথিবীতে তারা যে সকল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলো, সে সকল বিষয়ে তারা স্মৃতিচারণ করবে তখন। ‘আক্ববালা’ ক্রিয়াটি অতীতকালবোধক হলেও এখানে এর অর্থ হবে ভবিষ্যতকালজ্ঞাপক।

‘ক্বলূ’ অর্থ বলবে। ‘ইন্‌না কুন্‌না ক্ববলু ফী আহ্‌লিনা মুশফিক্বীন’ অর্থ পূর্বে আমরা পরিবার পরিজনদের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম। অর্থাৎ দুনিয়াতে আমরা পরিবার পরিজন নিয়ে আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে ভীত থাকতাম।

‘ফামান্‌নাল্লহু আ’লাইনা’ অর্থ অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন’। আর ‘আ’জাবাস্ সামূম’ অর্থ অগ্নিশাস্তি। ‘ওয়াক্বানা’ অর্থ রক্ষা করেছেন। অর্থাৎ লু হাওয়ার মতো উত্তপ্ত শাস্তিতে প্রবেশ করা থেকে আল্লাহ্‌ই আমাদেরকে বাঁচিয়েছেন।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— ‘আমরা পূর্বে আল্লাহ্‌কে আহ্বান করতাম। তিনি তো কৃপাময়, পরম দয়ালু’। একথার অর্থ— পৃথিবীতে থাকতে আমরা আল্লাহ্‌কে ডাকতাম, তাঁর সকাশে ক্ষমা ও কৃপাপ্রার্থী হতাম। আর আল্লাহ্ তো কৃপাপরবশ, পরম দয়ার্দ্র।

এখানে ‘নাদউ’ অর্থ আহ্বান করতাম, ডাকতাম, প্রার্থনা করতাম। জাহান্নামের শাস্তি থেকে পরিত্রাণার্থী হতাম। ‘আল বার্‌রু’ অর্থ কৃপাময়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ— অনুকম্পাপরবশ। জুহাক অর্থ করেছেন— প্রতিশ্রুতিপূরণকারী। আর ‘রহীম’ অর্থ পরম দয়ালু।

সূরা তুর ঃ আয়াত ২৯—৪৩

www.eelm.weebly.com

❑ অতএব তুমি উপদেশ দান করিতে থাক, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি গণক নহ, উন্মাদও নহ।
❑ উহারা কি বলিতে চাহে সে একজন কবি? আমরা তাহার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি।'
❑ বল, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।'
❑ তবে কি উহাদের বুদ্ধি উহাদিগকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না উহারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?
❑ উহারা কি বলে, 'এই কুরআন তাহার নিজের রচনা?' বরং উহারা অবিশ্বাসী।
❑ উহারা যদি সত্যবাদী হয় তবে ইহার সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক না!
❑ উহারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হইয়াছে, না উহারা নিজেরাই স্রষ্টা?

❑ না কি উহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে? বরং উহারা তো অবিশ্বাসী।
❑ তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি উহাদের নিকট রহিয়াছে, না উহারা এই সমুদয়ের নিয়ন্তা?
❑ না কি উহাদের কোন সিঁড়ি আছে যাহাতে আরোহণ করিয়া উহারা শ্রবণ করে? থাকিলে উহাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক!
❑ তবে কি কন্যা সন্তান তাঁহার জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য?
❑ তবে কি তুমি উহাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, উহারা ইহাকে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করে?
❑ না কি অদৃশ্য বিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান আছে যে, উহারা এই বিষয়ে কিছু লিখে?
❑ অথবা উহারা কি কোন ষড়যন্ত্র করিতে চাহে? পরিণামে কাফিররাই হইবে ষড়যন্ত্রের শিকার।
❑ না কি আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদের অন্য কোন ইলাহ্ আছে? উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র!

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিকেরা আপনাকে 'গণক' 'উন্মাদ' যাই বলুক না কেনো, আপনি হতোদ্যম হবেন না। আপনি সত্য নবী। সুতরাং আপনি নবুয়তের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করুন। সকলকে দিতে থাকুন শুভ উপদেশ।

এখানে 'ফা জাক্‌কির' (অতএব তুমি উপদেশ দান করতে থাকো) কথাটির 'ফা' হেতুপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আপনি যেহেতু আল্লাহ্‌র সত্য রসুল, সেহেতু আপনার দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে উপদেশ প্রদান করা। কে কী বললো না বললো, সেদিকে তাকানো আপনার কাজ নয়। 'ফামা আন্‌তা বিনি'মাতি' কথাটির 'ফা' ও কারণপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়—

আপনি মানুষকে নসিহত করতেই থাকুন। কেননা আপনি 'নবুয়তে'র মতো মহান অনুগ্রহপ্রাপ্ত। আপনি শুভ ও সুস্থ ধীশক্তিসম্পন্ন। গণক ও উন্মাদ তো নবী হতে পারে না। তাদের কার্যকলাপ নবুয়তবিরোধী। সুতরাং আপনি গণক অথবা উন্মাদ হতে পারেনই না।

মক্কার অংশীবাদীরা আশেপাশের পাহাড়ে আড্ডা দিতো, আর রসুল স. এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতো। তাঁকে অভিহিত করতো 'গণক' 'উন্মাদ' 'কবি' ইত্যাদি বলে। তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার কুরায়েশেরা তাদের পরামর্শ সভায় সমবেত হয়ে রসুল স. সম্পর্কে শলাপরামর্শ করতে লাগলো। কেউ কেউ বললো, নাবেগা ও জুহায়েরের মতো মোহাম্মদও একজন কবি। তাকে বন্দী করে রাখাই উচিত। এরকম করলে সে ধুঁকে ধুঁকে এক সময় মরেই যাবে। তাদের এমতো কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াতদ্বয়। বলা হয়—

'তারা কি বলতে চায়, সে একজন কবি? আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি (৩০)। বলো, তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি' (৩১)।

এখানে 'রয়বাল মানূন' অর্থ কালের দুর্বিপাক, বা মৃত্যুর ঘটনা। অর্থাৎ অংশীবাদীরা তাঁর মৃত্যু কামনা করতো। বলতো, মোহাম্মদ একজন কবি ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাই অন্যান্য কবিদের মতো সে-ও স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। আর তার মৃত্যুতে তার অনুসারীরা আপনা আপনিই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। তার পিতা যুবক বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে। মনে হয়, সে-ও মৃত্যুবরণ করবে যুবক অবস্থায়। অথবা এখানকার 'মানূন' এসেছে 'মিন্নাতুন' থেকে কর্মবাচক বিশেষ্যের শব্দরূপে। 'মানূনাহ্' অর্থ তাকে কর্তন করেছে। অর্থাৎ সময় তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। কিংবা মৃত্যু কর্তন করে দেয় কালকে বা জীবনকে।

'কুল' অর্থ বলো। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলে দিন। 'তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি'। অর্থ— ঠিক আছে, তাহলে অপেক্ষা করো। দ্যাখো, তোমাদের ও আমার মৃত্যুর ব্যাপারে আল্লাহ্ কী ফায়সালা করেন।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'তবে কি তাদের বুদ্ধি তাদেরকে এ বিষয়ে প্ররোচিত করে, না তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়'? একথার অর্থ— কুরায়েশেরা তো নিজেদেরকে খুব বুদ্ধিমান বলে ভাবে। তাহলে তারা এরকম অসংলগ্ন কথা বলতে পারে কীভাবে? তারা আমার রসুলকে কখনো বলে গণক, কখনো কবি, আবার কখনো পাগল। তাদের কোন্ কথাটা তাহলে ঠিক? গণকেরা তো হয় অত্যন্ত চতুর। কবিরা হয় আবেগতাড়িত। আর পাগলেরা হয় বুদ্ধিবিবেকহীন। চতুর ব্যক্তি কখনো আবেগতাড়িত ও বুদ্ধিহীন হয় না। আবেগতাড়িতেরা হতে পারে না চতুর। আর বুদ্ধিহীনদের মধ্যে উন্মাদনা থাকতে পারে বটে, কিন্তু চাতুর্য কিংবা সৃজনশীল আবেগ থাকতে পারেই না। সুতরাং কুরায়েশরা আর বুদ্ধিমান বলে পরিচয় দিতে পারে কীভাবে? অতএব তাদেরকে এমতো প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া নিতান্তই সঙ্গত যে, তোমাদের কি তাহলে বুদ্ধিবিভ্রাট ঘটেছে? জ্ঞান কি তোমাদেরকে শেষে এভাবেই বিভ্রান্ত করে ফেললো? এরকম তো হওয়ার কথা নয়। তাহলে কি এটাই ধরে নেওয়া সমীচীন নয় যে, তারা আসলে জেনে শুনে বুঝে সত্যকে অস্বীকার করে চলেছে? আসলে তারা সীমালংঘনকারী?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা কি বলে, এই কোরআন তার নিজের রচনা ? বরং তারা অবিশ্বাসী (৩৩)। তারা যদি সত্যবাদী হয়, তবে তার সদৃশ কোনো রচনা উপস্থিত করুক না' (৩৪)! একথার অর্থ— বলে কী তারা! কোরআন কি তাঁর স্বরচিত? এরকম মহান বাণী কি কোনো মানুষ রচনা করতে পারে? পারে যে না, তা তারা নিজেরাও জানে। কিন্তু বিদ্বেষবশতঃ সেকথা মুখে স্বীকার করে না। বরং তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। সত্যবাদী যদি তারা হয়, তবে

কোরআনের কোনো একটি আয়াতের মতো আয়াত, অথবা কোনো সুরার মতো একটি সুরা তারা রচনা করে দেখাতে পারে না কেনো? তাদের মধ্যে কবি, গণক ও উন্মাদের তো কোনো অভাব নেই।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা (৩৫)? নাকি তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো অবিশ্বাসী' (৩৬)।

এখানে 'আম খুলিক্বু মিন গইরি শাইইন' অর্থ তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্ট হয়েছে? হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— তারা কি আপনা-আপনি অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয়েছে? এটা কি সম্ভব? অনস্তিত্বের অস্তিত্বপ্রাপ্তি অস্তিত্বদাতার হস্তক্ষেপ ছাড়া কি কল্পনা করা যায়? কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন— মানুষ ও জ্বিন যাতে আল্লাহ্র ইবাদত করে, এই উদ্দেশ্যেই তো তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাহলে কুরায়েশেরা কি মনে করে, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে বিনা উদ্দেশ্যে?

www.eelm.weebly.com

অনর্থক? শরিয়তের বিধান মানতে হবে না, পরকালে জবাবদিহী করতে হবে না, এরকমই তারা ভেবে বসে আছে নাকি? ইবনে কীসান এবং জুজায কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেই।

'আম হুমুল খলিক্বুন' অর্থ না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? অর্থাৎ নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা বলে ভাবে? এরকম ভাবনা কি যুক্তিসম্মত? হজরত ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যা এরকমই।

'আম খলাক্বুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' অর্থ না কি তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? অর্থাৎ তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে এরকম ধারণাকেও মেনে নেওয়া যায় না। কেননা এরকম দাবিও অযৌক্তিক, অবাস্তব ও অজ্ঞজনোচিত। বরং আল্লাহ্ তাদেরকে যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টি করেছেন আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে। সৃজন সম্পূর্ণতই তাঁর। তবুও তো তারা তাঁর উপরে ইমান আনছে না। অতএব, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা আসলে অবিশ্বাসী, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি তাদের কাছে রয়েছে, না তারা সকলকিছুর নিয়ন্তা? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমাদের অধিকারে কি রয়েছে আল্লাহ্র ধনভাণ্ডার, যে তোমরা তোমাদের ইচ্ছামতো যাকে খুশী তাকে দান করবে জ্ঞান, অথবা নবুয়ত?

'না তারা এসকল কিছুর নিয়ন্তা' অর্থ নাকি তারা মনে করে, সবকিছু চলবে তাদের হুকুমে, অথচ তাদের উপরে কারো হুকুমই বর্তাবে না।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'নাকি তাদের কোনো সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা শ্রবণ করে? থাকলে তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক'। একথার অর্থ— তাদের কাছে এমন কোনো সিঁড়ি আছে নাকি,

যাতে আরোহণ করে তারা আকাশমার্গে উঠতে পারবে এবং সেখান থেকে শুনে নিতে পারবে অদৃশ্য প্রত্যাদেশ, অথবা ফেরেশতাদের আলাপচারিতা। এভাবে জেনে নিতে পারবে ভবিষ্যতের জ্ঞান, আল্লাহ্র রসুল এবং তাঁর উপরে অবতারিত কিতাব সত্য কিনা। এরকম ক্ষমতা কি তাদের আছে? থাকলে তা তারা প্রমাণ করে দেখাক।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'তবে কি কন্যাসন্তান তাঁর জন্য, আর পুত্রসন্তান তোমাদের জন্য'? একথার অর্থ— তারা বলে, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি থাকলে এরকম কথা কি তারা বলতে পারতো? তারা সৃষ্টি, আর আল্লাহ্ তাদের স্রষ্টা, এই মহাসত্যের ধারণা যদি তাদের থাকতো, তবে এভাবে তারা কাউকে আল্লাহ্র অংশীদার সাব্যস্ত করতে পারতো না। আর যে কন্যাসন্তানের পিতা হওয়াকে তারা অবমাননাকর মনে করে, সেই কন্যাসন্তানের জনক আল্লাহ্, আর পুত্রসন্তানদের জনক তারা, এরকম অপবিত্র ও অযথার্থ ধারণা তাদের মনে স্থানই পেতো না।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'তবে কি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাইছো যে, তারা একে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করে'? একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! বলুন তো দেখি, কী কারণে কুরায়েশরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না? আপনার অনুগামী হয়ে লাভ করছে না পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ? আপনি কি সত্যধর্ম প্রচারের কারণে তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান, যাতে করে মনে হতে পারে আপনি তাদের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছেন অর্থদণ্ডের বোঝা?

এরপরের আয়াতে (৪১)বলা হয়েছে— 'না কি অদৃশ্য বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান আছে যে, তারা এ বিষয়ে কিছু লিখে'? একথার অর্থ— তাহলে তারা কি লওহে মাহফুজের অনুলিপি করে নিয়ে কথা বলছে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'অদৃশ্য বিষয়ে' অর্থ লওহে মাহফুজের বিষয়ে।

কোনো কোনো বিদ্বান কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্র রসুল তাদেরকে শোনাচ্ছেন মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান এবং মহাবিচারের দিবসের পুরস্কার ও তিরস্কারের কথা, যা অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা এসকল কিছু সুসাব্যস্তও। তাহলে তারা এসকল কিছু বিনা প্রমাণে অস্বীকার করছে কেনো? তাদের কাছে কী তাহলে গায়েবী এলেম আছে? কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপবচন 'আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি' (আয়াত ৩০) এর প্রত্যুত্তরে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা কি তাহলে গায়েবী এলেমের মাধ্যমে একথা জেনে ফেলেছে যে, তাদের আগেই আমার রসুল পরলোকগমন করবেন? আর তাঁর মহাপ্রস্থানের পর তাঁর সহচরবর্গ ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে? এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার 'তারা এ বিষয়ে কিছু লিখে' কথাটির অর্থ হবে— তাহলে কি তারা এটাই নির্দেশ করছে? কেননা কিতাব অর্থ কখনো কখনো নির্দেশ দেওয়াও হয়। এরকম বলেছেন কা'নাবী।

এরপরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'অথবা তারা কি কোনো ষড়যন্ত্র করতে চায়? পরিণামে কাফেরেরাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার'।

www.eelm.weebly.com

পরামর্শ সভায় (দারুন নাদওয়ায়) মিলিত হয়ে কুরায়েশরা রসুল স.কে সংহারের ষড়যন্ত্র করেছিলো। সেই ষড়যন্ত্রের সংবাদ আল্লাহ্ ফাঁস করে দিয়েছেন আলোচ্য আয়াতে। অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন 'ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে, আর তাদের ষড়যন্ত্রের শাস্তি ভোগ করতে হবে তাদেরকেই'। উল্লেখ্য, কথিত শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছিলো বদর যুদ্ধে। তদুপরি তাদের জন্য পরকালের অন্তহীন শাস্তিভোগ অনিবার্য। অথবা এখানকার 'পরিণামে কাফেরেরাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার' কথাটির অর্থ হবে— অবশেষে স্বসৃষ্ট ষড়যন্ত্রই তাদেরকে গ্রাস করবে।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'না কি আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের অন্য কোনো ইলাহ্ আছে? তারা যাকে আল্লাহ্র শরীক স্থির করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র'। এ কথার অর্থ— না কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য রয়েছে তাদের। যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে, জীবনোপকরণ দিতে পারবে এবং রক্ষা করতে পারবে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে। তাদের এ সকল অপধারণা থেকে আল্লাহ্ তো সতত পবিত্র।

খালিল বলেছেন, ৩২ সংখ্যক আয়াত থেকে এ পর্যন্ত প্রত্যেক আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে 'আম'। মনে রাখতে হবে, এ সকল 'আম' এখানে সংযোজক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্নরূপে।

সূরা তুর ঃ আয়াত ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯

❑ উহারা আকাশের কোন খণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিলে বলিবে, 'ইহা তো এক পুঞ্জীভূত মেঘ।'

❑ উহাদের উপেক্ষা করিয়া চল সেই দিন পর্যন্ত যেদিন উহারা বজ্রাঘাতে হতচেতন হইবে।

❑ সেদিন উহাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে সাহায্যও করা হইবে না।

❑ ইহা ছাড়া আরও শাস্তি রহিয়াছে যালিমদের জন্য। কিন্তু উহাদের অধিকাংশই তাহা জানে না।

❑ ধৈর্য ধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চক্ষুর সামনেই রহিয়াছ। তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর,

❑ এবং তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও তারকার অস্তগমনের পর।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মক্কার পৌত্তলিকেরা সত্যপ্রত্যাখ্যানে এতো অনড় যে, আল্লাহ্র আযাব শুরু হয়ে গেলেও তাদের চেতনা ফিরে আসবে না। আকাশের কোনো খণ্ডও যদি তাদের উপরে আপতিত হতে থাকে, তবুও তারা তা দেখে বলবে, এতো একটি মেঘের টুকরা। আদ জাতির মতোই তাদের মনোবৃত্তি ও স্বভাব। আদেরাও আযাবের মেঘ দেখে বলে উঠেছিলো, ওইতো ভেসে আসছে বৃষ্টিবাহী মেঘ।

এখানে 'কিস্ফান' অর্থ কোনো একটি খণ্ড বা টুকরা। পৌত্তলিকেরা রসুল স.কে বলতো, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে যে শাস্তির ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছো, তা আনয়ন করো। তাদের এমতো অপভাষণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তাদের উপেক্ষা করে চলো সেই দিন পর্যন্ত, যেদিন তারা বজ্রাঘাতে হতচেতন হবে (৪৫)। সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোনো কাজে আসবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না' (৪৬)।

এখানে 'ফা জারহুম' অর্থ তাদের উপেক্ষা করে চলো। অর্থাৎ হে আমার নবী! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আপনাকে উত্যক্ত করলেও আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, তাদের প্রতি প্রদর্শন করুন উপেক্ষার মনোভাব, বিরত থাকুন তাদের জন্য ত্বরিৎ শাস্তিপ্রার্থনা থেকে। 'ইয়াওমাহুম' অর্থ সেই দিন পর্যন্ত, যে দিন তাদেরকে দেওয়া হবে চূড়ান্ত শাস্তি। বায়যাবী কথাটির অর্থ করেছেন— শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার পর্যন্ত। আমি বলি, কথাটি ঠিক নয়। কেননা ওই সময় পর্যন্ত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা শাস্তিমুক্ত থাকতে

www.eelm.weebly.com

পারবে না। বরং এখানে কথাটির অর্থ হবে— তাদের মৃত্যু পর্যন্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন তাদের মৃত্যুলগ্ন পর্যন্ত।

'শাইয়ান' শব্দটি এখানে মাফউলে মুতলাক (সাধারণ কর্মপদ)। অর্থাৎ তখন কোনোকিছুই তাদের কাজে আসবে না। এখানে 'ইয়াওমা ইউগ্নী' কথাটি বসেছে এখানকার আগের আয়াতের 'ইয়াওমা' এর অনুবর্তী হিসেবে। আর এখানকার 'ওয়া হুম লা ইউন্সারূন' অর্থ এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

এরপরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'এছাড়া আরো শাস্তি রয়েছে জালেমদের জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না'।

এখানে 'জালেম' বলে বুঝানো হয়েছে কোনো বিশেষ সীমালংঘককে, অথবা সাধারণভাবে সকল সীমালংঘনকারীকে। উভয় ব্যাখ্যাই যথার্থ। আর 'এছাড়া আরো শাস্তি রয়েছে তাদের জন্য' অর্থ এই পৃথিবীতেই তাদের কারো কারো কপালে রয়েছে চরম দুর্ভোগ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই দুর্ভোগ তাদের উপরে নেমে এসেছিলো বদর যুদ্ধের সময়। তখন তাদের অনেকেই হয়েছিলো নিহত। মুজাহিদের মতে ওই দুর্ভোগ ছিলো দুর্ভিক্ষজনিত। হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, এখানে 'আরো শাস্তি' অর্থ কবরের আযাব। আমি বলি, এমতো মন্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারবে তখন, যখন আগের আয়াতের 'সেই দিন পর্যন্ত' কথাটির অর্থ করা হবে— শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার পর্যন্ত।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'ধৈর্যধারণ করো তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চক্ষুর সামনেই রয়েছো। তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো যখন তুমি শয্যাত্যাগ করো (৪৮), এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো রাত্রিকালে ও তারকার অস্তগমনের পর' (৪৯)।

'ওয়াস্‌বির্ লি হুক্‌মি রব্বিকা' অর্থ ধৈর্য ধারণ করো তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আল্লাহ্‌র হুকুমের উপর নিজেকে ছেড়ে দিন। কেননা আল্লাহ্‌ই তাদেরকে সাময়িক অবকাশ দিয়েছেন। কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন— আমি তাদের উপরে যথোপযুক্ত সময়ে শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ তো দিয়েই দিয়েছি। অতএব হে আমার বাণীবাহক! আপনি যথাসময় আগমন পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করুন।

'ফা ইন্নাকা বিআ'ইউনিন' অর্থ তুমি আমার চক্ষুর সামনেই রয়েছো। অর্থাৎ হে আমার রসুল! বিচলিত হবেন না। আপনি তো আমার দৃষ্টিবহির্ভূত নন। বিশেষভাবে আপনাকে তো রক্ষা করে চলেছি আমিই। সুতরাং নিশ্চিত জানুন, কেউ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। এখানকার 'আ'ইউন' শব্দটি 'আইনুন' এর বহুবচন। এখানে শব্দটির বহুবচনরূপ ব্যবহার করা হয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশার্থে। অথবা এরকম করা হয়েছে আধিক্য প্রকাশার্থে। অর্থাৎ আমার কাছে আপনার হেফাজতের বহুসংখ্যক উপকরণ বিদ্যমান।

'ওয়া সাব্‌বিহ্ বিহামদি রব্বিকা হীনা তাকুম' অর্থ তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করো যখন তুমি শয্যাত্যাগ করো। সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও আতা খোরাসানী বলেছেন, কথাটির অর্থ— হে আমার বার্তাবাহক! সমাবেশস্থল থেকে প্রস্থানোদ্যত হওয়ার সময় আপনি পাঠ করবেন 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা'। এরকম করলে ওই সমাবেশ হবে অধিকতর কল্যাণমণ্ডিত, যদি তা হয় উত্তম সমাবেশ। আর অনুত্তম সমাবেশ হলে এরকম পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা হবে তার ক্ষতিপূরণ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কেউ যদি কোনো বিশৃঙ্খল

পরিবেশে বসে থাকে, তবে সে যেনো সেস্থান পরিত্যাগের পূর্বে পাঠ করে নেয় 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশ্‌হাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়াতূবু ইলাইকা'। এরকম করলে তা হবে তার ওই পরিবেশে অবস্থানের পাপের ক্ষতিপূরণ। বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'দা'ওয়াতুল কবীর' গ্রন্থে। আর তিরমিজির বর্ণনায় 'কানা কাফ্‌ফারাতান' এর পরিবর্তে উল্লেখিত হয়েছে 'গফিরা লাহু মা কানা ফী মাজালিসিহী'। অর্থাৎ তার ওই বৈঠকে বসার পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। হজরত রাফে' ইবনে খদীজ বর্ণনা করেছেন, পৃথিবীর জীবনের শেষদিকে একবার রসুল স. সাহাবীগণের এক সমাবেশ থেকে প্রস্থানের সময় পাঠ করলেন 'সুবহানাকা আন্তা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা আ'মিল্‌তু সূআ'। অথবা বললেন 'জলামতু নাফ্‌সি ফাগ্‌ফিরলি ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ্ জুনূবা ইল্লা আনতা আস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা আ'মিলতু সূআ'। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! এরকম দোয়া তো আমরা নতুন শুনলাম। তিনি স. বললেন, এইমাত্র জিবরাইল এসে আমাকে এই দোয়া পাঠ করতে বললেন। আরো জানালেন, এই দোয়া হচ্ছে মজলিসের কাফ্‌ফারা। নাসাঈ। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর

www.eelm.weebly.com

ইবনে আস বলেছেন, কিছুসংখ্যক বাক্য কল্যাণকর সমাবেশে অথবা জিকিরের মজলিশে পাঠ করলে তা হয় মোহরস্বরূপ, যেমন মোহরাংকিত করা হয় কোনো লিখিত বক্তব্যে। ওই বাক্যগুলো হচ্ছে— সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা। আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে বৈঠক আল্লাহ্র স্মরণ, রসুল স. এর প্রতি দরূদ পাঠবিবর্জিত, সেই বৈঠকে বসা পাপ। ওই পাপের জন্য আল্লাহ্ শাস্তি দিতে পারেন, অথবা করতে পারেন মার্জনা। আবু দাউদ, তিরমিজি। ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া ও বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি উত্তম সূত্রবিশিষ্ট। আবু দাউদের এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্র স্মরণহীন সমাবেশে উপবেশন করলে ওই উপবেশন হয় শাস্তিযোগ্য। এরকম জায়গায় শয়ন করলে, সে শয়নও হয়ে যায় শাস্তির উপযোগী। আবার যাত্রাপথে জিকিরবিহীন অবস্থায় পথ চললে ওই চলাচলও হয়ে যায় শাস্তির যোগ্য।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'যখন তুমি শয্যাত্যাগ করো' কথাটির অর্থ হবে— যখন তুমি নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে ঘুম থেকে জেগে ওঠো। জুহাক এবং রবী ইবনে আনাস কথাটির অর্থ করেছেন— যখন তোমরা নামাজে দণ্ডায়মান হবে তখন পাঠ করবে 'সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা ওয়া তাবারাকাস্মুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গইরুক'। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজা। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি আমি শুনেছি কেবল হারেছার মাধ্যমে। আর

হারেছার স্মৃতিসংরক্ষণতা বিতর্কিত। কালাবী বলেছেন, কথাটির অর্থ— ঘুম থেকে উঠে নামাজ আরম্ভ করার পূর্বে আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির করো। কালাবী বলেছেন, শয্যাত্যাগের পর থেকে নামাজে দণ্ডায়মান পর্যন্ত আল্লাহ্র জিকিরে রসনা সিক্ত রাখাই আয়াতের মর্মকথা।

হামেদ ইবনে হুমায়েদ বলেছেন, আমি একবার জননী আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে মাতঃ! রসুল স. ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম কী করতেন? তিনি বললেন, দশবার করে পাঠ করতেন 'আল্লাহু আক্বার' 'আলহাম্দু লিল্লাহ্' ও 'আস্তাগ্ ফিরুল্লাহ্'। তারপর পাঠ করতেন 'আল্লাহুম্মাগ্ফির্লি ওয়ার্যুক্বনি ওয়া আ'ফিনী'। এরপর পরিত্রাণ প্রার্থনা করতেন হাশর প্রান্তরের স্থানের সংকীর্ণতা থেকে। শুরাইক হাওযালীর মাধ্যমে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, মাতা আয়েশা বলেছেন, রসুল স. রাতে জাগ্রত হয়ে পাঠ করতেন দশবার 'আল্লাহু আকবর' দশবার আলহামদু লিল্লাহ্' দশবার 'সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহাম্দিহী' দশবার 'সুব্হানাল মালিকিল কুদ্দুস' দশবার 'আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্' এবং দশবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'। এরপর দশবার বলতেন আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা মিন্ দ্বিইক্বি ইফ্ইয়া ওয়া দ্বিইক্বি ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ্।

'এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো রাত্রিকালে' অর্থ রাতে পাঠ করো নামাজ। মুকাতিল বলেছেন, একথা বলে এখানে দেওয়া হয়েছে মাগরিব ও ইশার নামাজ পাঠের নির্দেশ। আমি বলি, এখানে বলা হয়েছে তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠ করার কথা। এমতো ব্যাখ্যাই অধিকতর উত্তম। আর বিশেষভাবে এখানে রাতে নামাজ পাঠ করা হয়েছে একারণে যে, ঘুম থেকে উঠে গভীর রাতে নামাজ পাঠ করা নফসের নিকটে বড়ই কষ্টকর। আর এরকম সঙ্গোপন ইবাদত নফসের পছন্দনীয়ও নয়।

'ওয়া ইদ্বারান্ নুজুম' অর্থ এবং তারকার অস্তগমনের পর। অর্থাৎ প্রত্যুষের উন্মেষকালে। জুহাক বলেছেন, একথা বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ফজরের নামাজ পাঠের কথা। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার অভিমত প্রকাশ করেছেন, এখানে বুঝানো হয়েছে ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নত নামাজকে। মাতা আয়েশা সিদ্দীকা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ দুনিয়া ও আখেরাতের চেয়ে উত্তম। মুসলিম। মাতা মহোদয়া আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজকে যতোখানি গুরুত্ব দিতেন, অন্যান্য সুন্নত নামাজকে ততোখানি গুরুত্ব দিতেন না। বোখারী, মুসলিম। হজরত যোবায়ের ইবনে মুতঈম বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে মাগরিবের নামাজে সুরা তুর পাঠ করতে শুনেছি। বাগবী।

সূরা নাজ্ম

এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে পুণ্যনিকেতন মক্কায়। এর রুকুর সংখ্যা ৩ এবং আয়াতের সংখ্যা ৬২।

সূরা নাজ্ম ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

---

www.eelm.weebly.com

❑ শপথ নক্ষত্রের, যখন উহা হয় অস্তমিত,
❑ তোমাদের সংগী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়,
❑ এবং সে মনগড়া কথাও বলে না।
❑ ইহা তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়,
❑ তাহাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী,
❑ প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিল,
❑ তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে,
❑ অতঃপর সে তাহার নিকটবর্তী হইল, অতি নিকটবর্তী,
❑ ফলে তাহাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল অথবা উহারও কম।
❑ তখন আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার প্রতি যাহা ওহী করিবার তাহা ওহী করিলেন।

'ওয়ান্নাজ্মি ইজা হাওয়া' অর্থ শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়। ওয়ালেবি ও আউফীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ— শপথ সপ্তর্ষিমণ্ডলের, যখন তা ডুবে যায়। আরববাসীগণ সপ্তর্ষিমণ্ডলকেই 'আন্নাজ্ম' বলে। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সপ্তর্ষিমণ্ডলের উদয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর বালা মুসিবত দূর হয়ে যায়। ইমাম আহমদের এক বর্ণনায় এসেছে, এমন কখনো হয় না যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল উদিত হয়েছে, অথচ ধরাপৃষ্ঠের বিপদ-আপদসমূহ ধ্বংস অথবা দুর্বল হয়নি। এই হাদিসের সূত্রপরম্পরা অবশ্য শিথিল।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'নাজ্ম' বলে বুঝানো হয়েছে আকাশের সকল তারকাকে। 'আন্নাজ্ম' এর আলিফ লাম জাতিবাচক। এর শাব্দিক অর্থ আগমন

করা। আকাশে তারকাপুঞ্জের আগমন ঘটে বলেই তারকাসমূহের নাম 'নাজ্ম'। যেমন আরববাসীগণ বলে থাকেন 'নাজ্মামাস্ সিন্নু' (দাঁত এসেছে, দাঁত উঠেছে)। কোরআন ও সুন্নাহকেও বলে 'নাজ্ম'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নাজ্ম অর্থ 'রজ্মুশ্ শাইয়াত্বীন' অর্থাৎ শয়তান ফেরেশতাদের কথোপকথন আড়ি পেতে শোনার জন্য আকাশে উঠে গেলে তাকে বিতাড়নের জন্য তার প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়। ওই উল্কানিক্ষেপণকেই এখানে বলা হয়েছে নাজ্ম। আবু হামযা বলেছেন, এখানে নাজ্ম দ্বারা বুঝানো হয়েছে ওই সকল তারকাকে, যেগুলো কিয়ামতের সময় খসে পড়বে বিক্ষিপ্তভাবে। আতা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আন্নাজ্ম' অর্থ কোরআন। কেননা কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে অল্প অল্প করে তেইশ বছরে। আর 'তানজ্বীম' অর্থ 'তাফরীক' (বিভক্তিকরণ)।

'হাওয়া' অর্থ অস্তমিত হয়। কালাবী বলেছেন, ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নে কোনো কিছুর পতিত হওয়াকে বলে 'হাওয়া'। আখফাশ বলেছেন, 'নাজ্ম' হলো ওই উদ্ভিদ, যার এখনো কাণ্ড বের হয়নি। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, 'ওয়ান নাজ্মু ওয়াশ্ শাজ্বারু ইয়াস্জুদান'। আর 'হাওয়া' অর্থ মাটিতে পতিত হওয়া। ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে রসুল স. এর কথা। যেহেতু তিনি স. মেরাজ শেষ করে পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে 'নাজ্ম' অর্থ মুসলমান। আর 'হাওয়া' অর্থ তাদের সমাধিস্থ হওয়া। আর 'নাজ্ম' এর সঙ্গে 'হাওয়া'কে এখানে শপথ প্রকাশকরূপে আনার সার্থকতা হচ্ছে, 'নাজ্ম' এর সময়সমূহ সর্বাধিক ফযীলতবিশিষ্ট। যেমন—

১. 'নাজ্ম' দ্বারা যদি বিশেষভাবে সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং সাধারণভাবে সকল নক্ষত্রকে বুঝানো হয়ে থাকে এবং 'হাওয়া' অর্থ যদি হয় তারকার বিচ্ছুরিত কিরণ এবং শয়তানের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপণ, তাহলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, শয়তান বিতাড়নই নাজ্ম সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যে। আর 'হাওয়া' দ্বারা যদি বুঝানো হয় কিয়ামত দিবসের তারকারাজির খসে পড়াকে, অথবা তারকার অস্তমিত

www.eelm.weebly.com

হওয়াকে, তবে এর উদ্দেশ্যও হয়ে যায় অধিকতর সুস্পষ্ট। অর্থাৎ নক্ষত্র অস্তমিত হওয়া হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার আনুরূপ্যবিহীন অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নবী ইব্রাহিম নক্ষত্রের অস্তমিত হওয়াকেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণরূপে পেয়েছিলেন। বলেছিলেন 'যারা ডুবে যায়, তাদেরকে আমি ভালোবাসি না'।

২. 'নাজ্‌ম' দ্বারা যদি কোরআনের নাজ্‌ম বা ছন্দ বুঝানো হয়ে থাকে এবং 'হাওয়া' দ্বারা যদি বুঝানো হয়ে থাকে কোরআনের ক্রমাবতরণকে, তাহলে একথাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানুষেরই পথপ্রদর্শনার্থে।

৩. যদি 'নাজ্‌ম' অর্থ হয় রসুল স. এর পবিত্র ব্যক্তিত্ব এবং 'হাওয়া' অর্থ হয় তাঁর মেরাজের রহস্যময়তা থেকে প্রত্যাবর্তনাবতরণ, তাহলে তাঁর ওই অবতরণও হয়ে যায়, সৃষ্টিজগতের জন্য অনন্য নেয়ামত। কারণ রসুল স. এর এমতো অবতরণের উদ্দেশ্যও হচ্ছে মানুষকে সৎপথপ্রদর্শন। আর আল্লাহ্‌র এই বিরাট অনুগ্রহের তো তুলনাই হতে পারে না।

৪. আর 'নাজ্‌ম' ও 'হাওয়া' অর্থ যদি হয় মুসলমান ও তাদের কবর, তাহলেও সেটা হবে আল্লাহ্‌তায়ালার অনন্যসাধারণ অনুকম্পা। কেননা শয়তানের প্রবঞ্চনামুক্ত খাঁটি মুসলমান হওয়া এবং ইমান সহ মৃত্যুবরণ করে সমাধিস্থ হতে পারার মতো সৌভাগ্য আর কীই বা হতে পারে।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয় (২), এবং সে মনগড়া কথাও বলে না' (৩)। এখানে 'দ্বল্‌লা' অর্থ বিভ্রান্ত এবং 'গাওয়া' অর্থ বিপথগামী। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'দ্বলালাত' (বিভ্রান্তি) 'হেদায়েত' (পথপ্রাপ্তি) এর বিপরীতার্থক। আর 'গাই' (বিপথগামিতা) বিপরীতার্থক 'রুশদ' (পথাধিষ্ঠিত) এর। আর 'হাওয়া' অর্থ মনগড়া। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে কুরায়েশ জনগোষ্ঠী! তোমরা তোমাদের স্বজন ও একান্ত সুহৃদ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌কে অযথা অপবাদ দিচ্ছো। তাকে কখনো বলছো কবি, কখনো গণক। আবার কখনো বলছো, কোরআন তাঁর স্বরচিত বাণী। কিন্তু তোমাদের এ সকল অপমন্তব্যের কোনোটাই ঠিক নয়। কেননা তিনি আমা কর্তৃক নির্বাচিত রসুল। আর কোনো রসুল কখনোই বিভ্রান্ত অথবা বিপথগামী হন না। মনগড়া কোনো কিছু প্রচার করার কোনো অধিকার ও ক্ষমতা তার নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটাতো ওহী, যা তার উপরে প্রত্যাদেশ হয় (৪), তাকে শিক্ষাদান করে শক্তিশালী (৫), প্রজ্ঞাসম্পন্ন (৬) একথার অর্থ— তিনি প্রচার করেন ওই সকল বাণী, যা আমার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। আর তাঁর প্রত্যাদেশদাতা আল্লাহ্ সর্বশক্তিধর, সর্বজ্ঞানবান।

আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. সারা জীবন ধরে যা কিছু বলেছেন, তার সকলকিছুই ছিলো আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত প্রত্যাদেশ। মনগড়া কোনো কিছুই তিনি বলতেন না। আর এখানকার 'কুওয়া' শব্দটি 'কুওয়াত' এর বহুবচন' এর অর্থ অত্যন্ত শক্তিশালী' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গ্রেফতারী বড়ই শক্ত এবং তিনিই সবকিছুর ভিত্তিকে সুদৃঢ় রাখেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফাস্‌তাওয়া' (তিনি নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিলেন)। কথাটি রহস্যাচ্ছন্ন আয়াতসম্ভারের (আয়াতে মুতাশাবিহাতের) অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কথাটির মূল মর্ম জানেন কেবল আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং অতি নগণ্য সংখ্যক বিদ্বান, যাদেরকে বলা হয় 'ওলামায়ে রসিখীন' (জ্ঞানে সুগভীর)। অবশ্য সলফে সালেহীন সুরা তোয়া-হা'র 'আররহমানু আ'লাল আরশিস্‌তাওয়া' আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা কিছুটা হলেও বোধগম্য। কিন্তু 'ইস্‌তাওয়া' বা আল্লাহ্‌র আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টি তবুও অবোধ্যই থেকে যায়। সুহাইল ইবনে আবদুল্লাহ্ তস্তরী বলেছেন, এরকম প্রশ্ন কারো পক্ষেই করা জায়েয নয় যে, আল্লাহ্‌র আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টি আসলে কীরকম? সুতরাং আল্লাহ্ যেরূপ আনুরূপ্যবিহীন, তেমনি আনুরূপ্যহীন তাঁর সমাসীন হওয়া এবং তা বোধের অতীত— একথা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকাই আমাদের

কর্তব্য। ইমাম মালেক ইবনে আনাস বলেছেন 'ইস্‌তাওয়া'র অর্থ অবোধ্য। সুতরাং এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বেদাত। অতএব, এমতো সিদ্ধান্তে পরিতুষ্ট থাকাই আমাদের জন্য শোভন ও সমীচীন যে, রসুল স.কে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ্ স্বয়ং। সুতরাং বুঝতে হবে, কোরআন মজীদ এবং কাবা শরীফের সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালার সম্পর্কের ধরন যেমন অজ্ঞাত, তেমনি অজ্ঞাত আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর রসুলের সম্পর্কের ধরন বা প্রকৃতি।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'তখন সে উর্ধ্বদিগন্তে'। একথার অর্থ— মেরাজের সময়, অথবা যখন তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়, তখন তিনি অবস্থান করেন সম্ভাব্যের বৃত্তের (দায়রায়ে এমকানের) সর্বোচ্চ বা সর্বোর্ধ্ব প্রান্তে, যে প্রান্তের পরে রয়েছে অবশ্যম্ভাবিতার (দায়রায়ে উজুবের) বৃত্ত, যে বৃত্তে পদার্পণের বা উন্নতির যোগ্যতা, ক্ষমতা এবং অধিকার কোনো সৃষ্টিরই নেই। এখানকার 'উফুক' অর্থ প্রান্ত, কিনারা বা সীমা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী (৮), ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইলো, অথবা তারও কম' (৯)। এখানকার 'ক্বাবা' ও 'আদ্‌না' উভয় শব্দের মুজাফ (সম্বন্ধ পদ) রয়েছে

www.eelm.weebly.com

উহ্য। উহ্য শব্দটি হচ্ছে 'মিকদারু' (পরিমাণ)। 'ক্বাবা' অর্থ এখানে 'নৈকট্য' অর্থাৎ নৈকট্যের পরিমাপ। এর অর্থ— নৈকট্যের পরিমাণ। আর সে পরিমাণটি হচ্ছে দুই ধনুকের সমপরিমাণ। বরং তার চেয়েও অধিক নিকটে।

বাগবী লিখেছেন, মেরাজ প্রসঙ্গে শুরাইক ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তখন আল্লাহ্ নিকটবর্তী হলেন, অবতরণ করলেন এবং রসুল স. এর এমন নিকটবর্তী হলেন যে, ব্যবধান রইলো দুই ধনুকের ব্যবধানের সমান, কিংবা তদপেক্ষাও কম। শায়েখ মোহাম্মদ হায়াত সিন্ধি তাঁর পুস্তিকায় লিখেছেন, হাদিসটি দুস্প্রাপ্য। এভাবে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে আবু সালমা বর্ণনা করেছেন, এখানকার 'আও' শব্দটির অর্থ অথবা এবং তা সন্দেহজনিত 'অথবা' অর্থে নয়, 'বরং' অর্থে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফা আর্সাল্না ইলা মিয়াতি আলফিন আও ইয়াযীদুন'। এখানেও 'আও' ব্যবহৃত হয়েছে 'বরং' অর্থে। এভাবে বক্তব্যটির অর্থ হবে— একলক্ষ, বরং তারও অধিক লোকের সঙ্গে আমি তাকে প্রেরণ করলাম। সুফী দার্শনিকগণ বলেন, এখানে 'দুই ধনুক' অর্থ কওছে এমকান (সম্ভাব্যের বৃত্ত) ও অবশ্যম্ভাবী বৃত্তের ধনুক। অর্থাৎ এক ধনুক সৃষ্টির দিকের এবং আর এক ধনুক আল্লাহ্র দিকের। আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমণের এক পর্যায়ে মারেফতের সাধকগণ ওই স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হন। তখন তাঁদের দৃষ্টি থাকে উভয় বৃত্তের দিকে। তারপর যখন তাঁরা 'আদ্না' এর স্তরে পৌঁছে যান, তখন বিলীন হয়ে যায় কওসে এমকানীর বৃত্ত। ফলে হারিয়ে যায় তাদের নাম-নিশানা। পরিপূর্ণ 'ফানা' সংঘটিত হয় ওই স্তরেই।

'ক্বাবা' 'ক্ব'বাতুন' 'ক্বদ্ব' শব্দগুলো সমঅর্থসম্পন্ন। এগুলোর অর্থ পরিমাণ। কিন্তু এখানে 'ক্বাবা' অর্থ চূড়ান্ত নৈকট্য।

আরবীয়গণের প্রচলিত রীতি ছিলো, তারা কারো সঙ্গে বিশুদ্ধ বন্ধুত্বের অঙ্গীকার করতে চাইলে নিজেদের তীর-ধনুক নিয়ে হাজির হতো এবং তাদের ধনুক মিলিয়ে রাখতো পরস্পর মুখোমুখি করে বৃত্তাকারে। যাদের সঙ্গে তারা বন্ধুত্ব করতে চায়, তাদের এমতো কর্মের অর্থ দাঁড়াতো— দ্যাখো, আমরা তোমাদের সর্বাধিক নিকটে, আমরা তোমাদের বন্ধু, সাহায্যকারী। এখানেও সম্ভবতঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বন্ধুত্ব বোঝাতে এই রীতিটিকে দৃষ্টান্তরূপে প্রয়োগ করা হয়েছে। এভাবে 'ক্বাবা ক্বাও্সাইনি আও আদ্না' কথাটির মাধ্যমে এখানে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্র চূড়ান্ত নৈকট্যকে, যা উপলব্ধি করতে পারেন কেবল আল্লাহ্র পরিচয় প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ। অন্যদের জন্য বিষয়টি উপলব্ধি করা দুরূহ বৈকি। উল্লেখ্য, এলমে তাসাওফের গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে সবিশদ আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়।

জুহাক বলেছেন, এখানকার 'দানা ফাতাদাল্লা' কথাটির সর্বনাম রসুল স. এর প্রতি প্রত্যাবর্তিত। অর্থাৎ রসুল স. আল্লাহ্র সমীপবর্তী হলেন এবং সেজদার উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করলেন। কিন্তু এমতো ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা এতে করে সর্বনামের প্রয়োগ হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করবার, তা ওহী করলেন'। এখানকার 'আওহা' (তিনি প্রত্যাদেশ করলেন) এবং 'আবদিহী' (তাঁর বান্দা) শব্দদ্বয়ের তিনি ও তাঁর সর্বনামদ্বয়ের সম্পৃক্তি রয়েছে ৫ সংখ্যক আয়াতের 'শাদীদুল ক্বুওয়া' (শক্তিশালী) এর সাথে। হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত আনাস এরকম বলেছেন। আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুসারে এতে কোনো অসুবিধাও নেই। মাতা আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'শাদীদুল ক্বুওয়া' অর্থ হজরত জিবরাইল। আর ৬ সংখ্যক আয়াতের 'ফাস্তাওয়া' কথাটির সর্বনাম হজরত জিবরাইলের স্থলাভিষিক্ত। এক বর্ণনায় এসেছে, 'যু মির্রাতিন' অর্থ সুন্দর। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন—প্রশস্ত সৌন্দর্য। আর এখানকার 'হুয়া' সর্বনামটি স্থলাভিষিক্তি হয়েছে রসুল স. এর।

বাগবী লিখেছেন, মেরাজ রজনীতে হজরত জিবরাইল রসুল স. এর সহযাত্রী হয়েছিলেন। সেকারণেই কোনো কোনো আলেম বলেন এখানকার 'হুয়া' সর্বনামটি হজরত জিবরাইলের প্রতি প্রযুক্ত। হজরত জিবরাইল নবী রসুলগণের নিকটে আবির্ভূত হতেন মানুষের আকৃতিতে। রসুল স. এর নিকটেও তিনি এভাবেই আসতেন। একদিন রসুল স. তাঁকে বললেন, আপনার আসল আকৃতি আমাকে দেখান। হজরত জিবরাইল তাঁর নিকট আসল আকৃতিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন দু'বার। একবার পৃথিবীতে, আরেকবার আকাশে। পৃথিবীতে তিনি আসল আকারে উপস্থিত হয়েছিলেন হেরা পর্বতের গুহার পূর্ব দিক থেকে। এখানে 'ঊর্ধ্বদিগন্তে' বলে ওই পূর্ব প্রান্তকেই বুঝানো হয়েছে। তখন রসুল স. তাঁর বিশাল অবয়ব দেখে মুর্ছা গিয়েছিলেন। হজরত জিবরাইল তৎক্ষণাৎ ধারণ করেছিলেন মনুষ্যরূপ।

তারপর বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন সজ্ঞাহীন নবীকে। পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন তাঁর পবিত্র শরীরের ধূলাবালি। দ্বিতীয়বার তিনি প্রকৃত আকার ধারণ করেছিলেন মেরাজের রাতে সিদ্রাতুল মুনতাহার নিকটে। আর রসুলে পাক স. ছাড়া অন্য কোনো নবী তাঁকে আসল আকৃতিতে দেখেননি।

'ছুম্মা দানা ফাতাদাল্লা' বলে এখানে রসুল স. এর ওই মুর্ছা যাওয়ার ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ওই সময় হজরত জিবরাইল রসুল স. এর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়েছিলেন। অথবা তিনি তখন হয়েছিলেন রসুল স. এর আরো অধিক

www.eelm.weebly.com

নিকটবর্তী। আর 'ক্বওছ' বলে এখানে ওই ধনুককেই বুঝানো হয়েছে, যা থেকে তীর নিক্ষেপ করা হয়। মুজাহিদ, ইকরামা ও আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন রসুল স. ও হজরত জিবরাইলের ব্যবধান ছিলো দুই ধনুকের ব্যবধানের সমান। আর এক ধনুক অর্থ অর্ধবৃত্ত। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'দুই ধনুকের ব্যবধান' অর্থ দুই হাতের ব্যবধান। 'সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং শাকিক ইবনে সলিমার অভিমতও এরকম। অর্থাৎ এক ধনুক মানে এক হাত। ইমাম বোখারী কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদ্ধৃত করেছেন মাতা আয়েশা সিদ্দীকার বক্তব্যটি। বাগবী বলেছেন, এই অভিমতের প্রবক্তা হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান ও কাতাদা।

কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, এখানে ঘটেছে বক্তব্যগত অগ্র-পশ্চাৎ। প্রকৃত বক্তব্যটি ছিলো 'তাদাল্লা ফাদানা'। কেননা তখন নিম্নে অবতরণই ছিলো নৈকট্যের কারণ। কিন্তু প্রকাশ্য বক্তব্য এমতো অভিমতের পরিপন্থী। কারণ 'নৈকট্যে'র ভাবটি এখানে ব্যাপকার্থক। আর নিম্নাবতরণ ছাড়াও নৈকট্য হওয়া সম্ভব। উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়াকেই বলে 'দানু' বা 'ক্বুরব'। অবশ্য তা নিম্নাবতরণের মাধ্যমেও সংঘটিত হওয়া সম্ভব। আর 'তাদাল্লা' অর্থ ঝুলন্ত। কথাটি এসেছে 'তাদাল্লা দাল্বুন' থেকে, যার অর্থ কূপের ভিতরে ঝুলন্ত বালতি। তাছাড়া কোনোকিছু শেষপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার পরেও প্রারম্ভস্থলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা অবস্থাকেও 'তাদাল্লা' বলা যায়। যেমন কূপের ভিতরের ঝুলন্ত বালতির রশি হাতেই থেকে যায়। আরববাসীগণ বলেন 'আদ্লা রিজ্বলাহু' (সে তার পা ঝুলিয়ে দিয়েছে)। তাঁরা আরো বলেন 'আদ্লা দাল্ওয়াহু' (সে তার বালতি ঝুলিয়ে দিয়েছে)। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে যে প্রত্যাদেশ করলেন, হজরত জিবরাইল তা পৌঁছে দিলেন যথাস্থানে। কিন্তু এমতো ব্যাখ্যা ব্যাকরণশাস্ত্রসম্মত নয়। আবার বুদ্ধিগত বিবেচনাও এর বিরুদ্ধে।

এখানকার প্রথম 'আওহা' (ওহী করবার) অর্থ সমগ্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে 'ওহী' বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। এর কোনো একটি বাক্যও রসুল স. এর স্বরচিত নয়। এখানকার 'আওহা' এর সর্বনাম হচ্ছে 'যুলহাল' (অবস্থিত জন)। এর পরের পুরো বাক্যটি 'হাল' (অবস্থা)। এভাবে দেখা যায় ৫ সংখ্যক আয়াত থেকে ৯ সংখ্যক আয়াতের সকল বাক্যই 'হাল'। আরবী ব্যাকরণের একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হচ্ছে, অবস্থিতজন ও অবস্থার কাল হতে হবে এক। কাজেই এ সকল বাক্যের

সমন্বিত অবস্থা কোরআন অবতরণের সময় বিদ্যমান থাকা জরুরী। অর্থাৎ কোরআনের সকল আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় হজরত জিবরাইলের সমাসীন থাকা, ঊর্ধ্বদিগন্তে উপস্থিত থাকা, নিকটবর্তী হওয়া এবং দুই ধনুকের ব্যবধানের চেয়ে কম ব্যবধানে চলে আসা অপরিহার্য। একটি আয়াতের ক্ষেত্রেও যদি এ সকল কিছুর যে কোনো একটির ব্যত্যয় ঘটে, তবে হাল ও যুলহালের মধ্যে পার্থক্য হয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবী। তখন এটাও প্রমাণিত হয়ে যায় যে, কোরআনের কোনো কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে 'ওহী' বা প্রত্যাদেশ ব্যতিরেকে। আর তখন 'আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করবার তা ওহী করলেন ' কথাটি হয়ে যায় অসত্য।

দ্বিতীয়তঃ 'আওহা' (তিনি ওহী করলেন) এর ফায়েলের (কর্তার) সর্বনাম তিনি এবং 'আবদিহী' (তাঁর বান্দার প্রতি) বাক্যে সর্বনাম তাঁর উভয়টির দ্বারাই বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্কে। কেননা প্রথম 'আওহা' ক্রিয়ার কর্তা আল্লাহ্, জিবরাইল নন। এরকম না হলে সর্বনামবিভ্রাট হয়ে পড়বে অনিবার্য।

তৃতীয়তঃ হজরত জিবরাইলের রসুল স. এর নিকটে আসা, অবতরণ করা এবং দুই ধনুকের সমব্যবধানে আগমন করা— এ সকল কিছুর মধ্যে রসুল স. এর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। কেননা রসুল স. এর মর্যাদা আরো উচ্চ। রসুল স. বলেছেন, আকাশে রয়েছে আমার দু'জন মন্ত্রী— জিবরাইল ও মিকাইল।

এবার আসা যাবে উপসংহারে। উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায়, দ্বিতীয় 'আওহা' শীর্ষক ব্যাখ্যাকে অনেকে এড়িয়ে যেতে চান। এর কারণস্বরূপ তারা বলেন 'ফাস্তাওয়া' থেকে পরের বাক্যগুলি আল্লাহ্র সঙ্গে সম্বন্ধিত করলে তা হয়ে যায় পুরোপুরি অবোধ্য। কিন্তু কথা হচ্ছে কোরআন মজীদে অবোধ্যবাক্য তো এই একটি নয়। এরকম রহস্যাচ্ছন্ন (মুতাশাবিহাত) আয়াত রয়েছে আরো অনেক, যেগুলোর মর্মার্থ জানেন কেবল আল্লাহ্ তাঁর রসুল এবং তাঁরা, যাঁরা জ্ঞানে সুগভীর। সুতরাং আলোচ্য আয়াতগুলোকে যদি দুর্বোধ্য আয়াতসমূহের অর্ন্তভূত করা হয়, তাহলে অসুবিধা কোথায়? সমাসীন হওয়া, নিকটবর্তী হওয়া, অবতরণ করা ইত্যাদির অর্থ তো আমরা জানিই। জানি না কেবল একথা যে, আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে এসকল শব্দের মর্ম কী দাঁড়ায়? অবশ্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন যাঁরা, তাঁরা এসকল কিছুর অন্তর্নিহিত স্বরূপ দর্শন করতে সক্ষম। তাঁদের কাছে এর প্রকৃত তত্ত্ব পূর্ণিমার শশীসদৃশ সমুজ্জ্বল। এমতো প্রেক্ষিতে প্রথম 'আওহা' শীর্ষক ব্যাখ্যাটি অধিকতর গ্রাহ্য। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের আল্লাহ্ তখন তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করবার তা ওহী করলেন' কথাটির অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ তখন রসুল স. এর প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন সুরা দুহা'র 'তিনি কি তোমাকে এতিম অবস্থায় পাননি' থেকে সুরা আলাম নাশ্রাহ্'র 'এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি' পর্যন্ত। কোনো কোনো পণ্ডিত কথাটির অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ তখন তাঁর প্রিয় রসুলকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করলেন যে, হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! আপনি যতোক্ষণ

www.eelm.weebly.com

পর্যন্ত না জান্নাতে প্রবেশ করবেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো নবী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর আপনার উম্মতের জান্নাতে প্রবিষ্ট হওয়ার আগে জান্নাতে প্রবিষ্ট হতে পারবে না অন্যান্য উম্মতেরা। তবে প্রকাশ থাকে যে, এখানে 'ওহী করলেন' কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। তাই বর্ণিত বিষয়ে একে সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন নয়। আর এভাবে এখানকার 'ওহী'কে সীমিত করার কোনো প্রয়োজনই নেই।

সূরা নাজ্‌ম ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

❑ যাহা সে দেখিয়াছে, তাহার অন্তঃকরণ তাহা অস্বীকার করে নাই;
❑ সে যাহা দেখিয়াছে তোমরা কি সে বিষয়ে তাহার সংগে বিতর্ক করিবে?
❑ নিশ্চয়ই সে তাহাকে আরেকবার দেখিয়াছিল
❑ প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট,
❑ যাহার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান।
❑ যখন বৃক্ষটি, যদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হইবার তদ্দ্বারা ছিল আচ্ছাদিত,
❑ তাহার দৃষ্টিবিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই।
❑ সে তো তাহার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখিয়াছিল;

এখানে 'তাঁর অন্তঃকরণ' অর্থ রসুল স. এর অন্তঃকরণ। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. হজরত জিবরাইলকে দেখেছিলেন তাঁর ছয়শত পাখাবিশিষ্ট অবস্থায়। জননী আয়েশাও এরকম বর্ণনা করেছেন। 'যা সে দেখেছে' বলে এখানে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মেরাজ রজনীতে রসুল স. আল্লাহ্‌কে দেখেছেন— জননী আয়েশা একথা স্বীকার করেননি। মাসরুক বর্ণনা করেছেন, একবার আমি জননী আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, জননী! রসুলে পাক স. কি ওই রজনীতে আল্লাহ্‌কে দেখেছিলেন? তিনি বললেন, তোমাদের এরকম কথা শুনে তো ভয়ে আমার শরীরের পশম খাড়া হয়ে যায়। শোনো, তিনটি বিষয় এমন, যা কেউ জানে না। যদি কেউ ওই বিষয় তিনটি জানে বলে দাবি করে, তবে বুঝবে সে মিথ্যাবাদী। যেমন— ১, যদি কেউ বলে যে, রসুল স. তাঁর প্রভুপালনকর্তাকে দেখেছেন। একথা বলেই তিনি পাঠ করলেন 'লা তুদ্‌রিকুহুল্ আব্‌সর্ ওয়া হুয়া ইউদ্‌রিকুল আব্‌সরা ওয়া হুয়াল লাতিফুল খবীর' (কোনো অন্তর্দৃষ্টিই তাঁকে অর্জন করতে পারবে না, আর তিনি অর্জন করবেন সাকুল্য অন্তর্দৃষ্টি। আর তিনি

সূক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্ম সাংবাদিক)। তারপর পাঠ করলেন 'ওয়ামা কানা লি বাশারিন আঁইয়্যুকাল্‌লিমাল্লুহু ইল্লা ওয়াহ্‌ইয়ান আও মিন ওয়ারাই হিজ্বাব' (আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে অথবা অন্তরালের অন্তরাল থেকে)। ২. যে বলবে, রসুল স. ভবিষ্যত সম্পর্কে জানেন। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'ওয়া মা তাদরী নাফ্‌সুম মাজা তাকসিবু গাদা' (আগামীকল্য কী উপার্জন করবে তা কেউই জানে না)। ৩. যে ব্যক্তি বলবে, রসুল স. ওহীর কোনো অংশ গোপন রেখেছেন। এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন 'ইয়া আইয়্যুহার রসুলু বাল্‌লিগ মা উন্‌যিলা ইলাইকা মির্ রব্বিকা' (হে রসুল! তোমার পালয়িতার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছিয়ে দাও)। তবে একথা ঠিকই যে, তিনি স. জিবরাইলকে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দেখেছিলেন দু'বার।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'যা সে দেখেছে, তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি' এবং 'নিশ্চয় সে তাঁকে আরেকবার দেখেছিলো' বাক্য দু'টোর অর্থ— রসুল স. তাঁর মহান প্রভুপালনকর্তাকে দু'বার দেখেছেন অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা। মুসলিম। তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস একবার বললেন, রসুল স. আল্লাহ্‌কে দেখেছেন। ইকরামা তখন বললেন, কিন্তু আল্লাহ্ যে বলেছেন, 'লা তুদরিকুহুল্ আব্‌সর্' (কোনো অন্তর্দৃষ্টিই অর্জন করতে পারবে না তাঁকে)? তিনি বললেন, আরে এটা তো ওই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ্ সমুদ্ভাসিত হয়েছিলেন বিশেষ নূরে। নিশ্চয় রসুল স. তাঁর রবকে দু'বার দেখেছেন। হজরত আনাস, হাসান ও ইকরামা বলেছেন, মোহাম্মদ স. তাঁর রবকে দেখেছেন দু'বার। ইকরামার মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে

www.eelm.weebly.com

আব্বাসও এরকম অভিমত প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, আল্লাহ্ নবী ইব্রাহিমকে খুল্লাতের (বন্ধুত্বের) জন্য, নবী মুসাকে কালামের (বাক্যালাপের) জন্য এবং মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে রুইয়াতের (দর্শনদানের) জন্য মনোনীত করেছেন। ইবনে জারীরও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তমজন! আপনি কি আপনার প্রভুপালনকর্তাকে দেখেছেন? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। অন্তর্চক্ষে। শা'বীর মাধ্যমে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, একবার কা'ব আহবার এ বিষয়ে হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্ আলাপন ও দর্শনকে ভাগ করে দিয়েছেন, হজরত মুসা ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর মধ্যে। তিনি হজরত মুসার সঙ্গে কথা বলেছিলেন দু'বার এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে দেখা দিয়েছিলেন দু'বার।

আমি বলি, বিদ্বজ্জন মতানৈক্য করেছেন চাক্ষুষ দর্শনের ব্যাপারে, আত্মিক দর্শনের বিষয়ে তাঁদের কোনো মতপৃথকতা নেই। আর আত্মিক দর্শন বা মুশাহিদা কেবল আম্বিয়া কেনো, আউলিয়াগণেরও অর্জিত হয়ে থাকে। কোনো কোনো আউলিয়া তো এরকম দর্শনের দাবিও করেছেন। কিন্তু তাঁদের দাবি বিদ্বানগণের ঐকমত্যের পরিপন্থী। তাঁদের ঐকমত্য এই যে, চাক্ষুষ দর্শন রসুল স. ছাড়া আর

কারো অর্জিত হতে পারে না। প্রকৃত কথা হচ্ছে, কোনো কোনো ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থাতেই আত্মিক দর্শনের দ্বারা আসত্তা প্রভাবিত হন। তখন তাদের চোখের দৃষ্টি হয়ে যায় অকার্যকর। তাঁরা তখন দেখেন অন্তরের চোখে। কিন্তু তাঁদের মনে হয়, তাঁরা যেনো চর্মচক্ষে দেখছেন।

রসুল স. এর বাণী 'আমি আমার প্রভুপালককে হৃদয় দিয়ে দেখেছি' কথাটি সুসাব্যস্ত হলেও এর দ্বারা চর্মচক্ষুর দর্শন রহিত হয় না। অবশ্য হজরত ইবনে মাসউদ এবং জননী আয়েশার বক্তব্য চর্মচক্ষুর দর্শনকে রহিত করে। কিন্তু দর্শন হওয়ার প্রমাণ দর্শন না হওয়ার প্রমাণের উপরে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

সুরা আনআ'মের 'লা তুদ্‌রিকুহুল আব্‌সরু' আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, 'ইদ্‌রাক' 'রুইয়াত' থেকে ভিন্ন। সুতরাং 'ইদ্‌রাক' রহিত হলেও 'রুইয়াত' রহিত হওয়া অবধারিত হয় না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'মুসার সাথীগণ বলেছিলো আমরা তো সাক্ষাত পেয়েই গেছি (ফেরাউনী সেনাবাহিনীর), বলো কক্ষনো না, আমার পালনকর্তা আমার সাথেই আছেন। তিনিই দেখাবেন আমাকে পথ'। এখানে নবী মুসার 'ইদ্‌রাক'কে অস্বীকার করা হয়েছে, যদিও তাঁর অনুগামীগণ তখন ফেরাউন বাহিনীকে আসতে দেখছেন। এখানেও 'রুইয়াতে'র অন্তর্নিহিতি সম্ভব হয়নি। তাছাড়া আয়াতের অর্থ এরকমও হতে পারে যে, সকলে তাঁকে 'ইদ্‌রাক' করতে পারবে না। এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, কেউই তাঁকে দেখতে পারবে না। আর এখানে 'যা সে দেখেছে, তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি' দ্বারা প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির দু'টি পদ্ধতি বিবৃত হয়েছে— একটি প্রকাশ্যে অন্যটি অপ্রকাশ্যে। সুতরাং এই আয়াত 'রুইয়াত' অসিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু জর গিফারী বলেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র হাবীব! আপনি কি আপনার প্রভুপালককে দেখেছেন? তিনি স. জবাব দিলেন, তিনি তো নূর। আমি তাঁকে কীভাবে দেখবো হুয়া নূরুন আন্‌না আরাহু? এখানকার 'আন্‌না' শব্দটি প্রশ্নবোধক, ব্যবহৃত হয়েছে 'কাইফা' (কীভাবে) অর্থে। কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে 'নূরানিউন আরাহু আন্‌না'। এই বর্ণনাটির দ্বারা অবশ্য 'রুইয়াত' সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু প্রসিদ্ধ বিবরণগুলির দ্বারা সাধারণভাবে 'রুইয়াত' রহিত করা যায় না।

আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাস এবং কা'ব ইবনে আহবারের আলোচনার মাধ্যমে চাক্ষুষ দর্শন প্রমাণিত হলেও বলতে হয় আলোচ্য আয়াতে চাক্ষুষ দর্শনের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে অন্তরের দর্শনের কথা। কেননা প্রতিটি প্রত্যাদেশ অন্তর্দৃষ্টিজাত। প্রত্যাদেশের সঙ্গে চাক্ষুষ দর্শনের সম্পর্ক নেই। চাক্ষুষ দর্শনের বিষয়টি বিশেষভাবে সম্পর্কিত কেবল মেরাজ রজনীর সঙ্গে। আর এখানকার 'কাজাবা' শব্দটি ক্বারী আবু জাফর ও ক্বারী হিশামের ক্বেরাতে পঠিত হয়েছে 'কাজ্‌জাবা'। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— রসুল স. স্বচক্ষে যা অবলোকন

করলেন, তা তাঁর অন্তর মেনে নিয়েছে, অস্বীকার করেনি। প্রকৃত কথা হচ্ছে, সত্তা সম্পর্কিত সকলকিছুর উপলব্ধি 'ক্বলব' বা অন্তঃকরণেই সূচিত হয়। তারপর তার অনুভূতি সঞ্চারিত হয় চোখে ও দিব্যদৃষ্টিতে। সুতরাং ক্বলবী 'ইদ্‌রাক' (অনুভব) চোখের 'ইদরাকে'র অনুকূল হলে ক্বলব তাকে বিশ্বাস করে নেয়। কিন্তু কেবল চোখের দৃষ্টি ক্বলবী ইদরাক পর্যন্ত পৌঁছে না। বরং তা অননুকূল হলে ক্বলব তাকে 'তাক্‌জীব' বা মিথ্যা প্রমাণ করে। স্মর্তব্য, আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান এবং অপকল্পনা ও শয়তানী কল্পচিত্রের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। কখনো কখনো এগুলো এমনভাবে পরস্পরসম্পৃক্ত হয়ে যায় যে, সুফী সাধকগণ এগুলোর পার্থক্য নির্ণয় করতে অসমর্থ হন। তখন তাঁরা দেখেন দর্শিত ও শ্রুত বিষয়াবলী তাঁদের অন্তরকে প্রশান্ত করে কিনা। হৃদয় প্রশান্ত থাকলে তাঁরা বুঝতে পারেন তাঁদের কাশ্‌ফ ও ইল্‌হাম রহ্‌মানী (আল্লাহ্‌প্রদত্ত), আর হৃদয় অশান্তি অনুভব করলে

www.eelm.weebly.com

তাঁরা বুঝতে পারেন, সেগুলো নিছক কল্পনা অথবা শয়তানী প্রক্ষেপণ মাত্র। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, কোনো বিষয়ে হৃদয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হলে তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কোরো। হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ। রসুল স. একথাও বলেছেন যে, মুফতী ফতোয়া দিলেও নিশ্চিতির জন্য তুমি ফতোয়া নিয়ো হৃদয়ের কাছে।

আত্মিক বিশ্বাস ও আত্মিক দর্শন কি অভিন্ন, না ভিন্নভিন্ন ঃ নিঃসন্দেহে 'একিন' (বিশ্বাস) ও 'কাশ্ফ' (অন্তর্দর্শন) পৃথক। বিশ্বাসীগণের সত্তার সঙ্গে যখন আল্লাহ্র সত্তাসন্নিহিত ভালোবাসা স্থাপিত হয়, তখন সে লাভ করে আল্লাহ্র নিরুপম সত্তাগত সাহচর্য। অনায়াসে উপলব্ধি করে আল্লাহ্র সত্তা ও গুণবত্তা। কিন্তু 'রুইয়াত' বা দর্শন তাদের হয় না। কেননা দর্শনের সম্পর্ক ঘটে প্রতিবিম্বের স্তরে। আর ক্বলব তো সৃষ্টি জগতের কোনোকিছুও দেখতে পায় না। দেখতে পায় কেবল সৃষ্ট বস্তুসমূহের প্রতিবিম্ব ও সাদৃশ্যকে। কেননা হৃদয়ে সত্তাগতভাবে কোনো কিছু প্রবেশ করে না। তাই কোনো কিছু দেখতে গেলে লাগে দৃষ্টি। আর আল্লাহ্কে দেখার মতো দৃষ্টি পৃথিবীবাসীদেরকে দেওয়াই হয়নি। এরকম দৃষ্টি তাদেরকে দেওয়া হবে আখেরাতে। তাই তখন সকল বিশ্বাসী লাভ করবে আল্লাহ্র দীদার। আর 'ইদরাকে'র সম্পর্ক যেহেতু কেবলই হৃদয়ের সঙ্গে, তাই পৃথিবীতে যেমন আল্লাহ্কে বোঝা যায় না, তেমনি বোঝা যাবে না পরকালেও। অর্থাৎ আল্লাহ্ চিরকালই অননুভব্য। সুতরাং বুঝতে হবে, 'কাশ্ফ' বা দর্শন, বাহ্যিক বা নৈপথ্যিক যেভাবেই হোক না কেনো, তার মধ্যে নিজস্ব ধারণা, কিংবা শয়তানের প্রভাব ঘটে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। সেকারণেই 'কাশ্ফ' 'ইল্হাম' বা 'স্বপ্নে' সত্যাসত্য মিশ্রিত হবার রয়েছে সমূহ সম্ভাবনা। দৃষ্টিশক্তির অতীক্ষ্ণতা, খর্বতা, স্খলন ইত্যাদি বিপদ এড়িয়ে চলা সম্পূর্ণরূপে সম্ভবও নয়। এমতাবস্থায় বিশুদ্ধ 'ইদ্রাক' অনিশ্চিত। তাই প্রয়োজন আত্মিক প্রশান্তির। বিশুদ্ধ ক্বলবই সত্যকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নেয়, এবং ঘৃণাভরে দূরে সরিয়ে দেয় অসত্যকে। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'সে যা দেখেছে, তোমরা কি সে বিষয়ে তার সঙ্গে বিতর্ক করবে'? এখানে 'তুমারূনা' অর্থ বিতর্ক করবে। শব্দটি এসেছে 'মিরাউন' থেকে। 'মিরা' অর্থ বিতর্ক, বাদানুবাদ, বচসা। যেমন বলা হয় 'মারান্ নাকাতা' (দুগ্ধ দোহনের জন্য উষ্ট্রীর স্তনে গুঁতো দিয়েছে)। বিতর্কে লিপ্ত ব্যক্তিরা প্রতিপক্ষীয়দের নিকট থেকে দলিল প্রমাণ বের করে নিতে চায় গুঁতো মেরে। বিতর্ক শুরু করে তারা একারণেই। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে মক্কাবাসী! আমার রসুল যা বলেন, সে সম্পর্ক সন্দেহ-বিতর্কের অবতারণা করতে চাও? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও শাসনমূলক। আর এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালবোধক শব্দরূপ। অর্থাৎ প্রশ্নটি করা হয়েছে অতীতের কোনো ঘটনাকে লক্ষ্য করে, অথবা অতীতের প্রসঙ্গ বর্তমানে টেনে আনাই ছিলো এমতো শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য। কিংবা এখানে ধমক দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তাঁর অতীত ও ভবিষ্যতের সকল দর্শিত বিষয়াবলী সম্পর্কে।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিলো'। একথার অর্থ— অবশ্যই রসুল স. দ্বিতীয়বার দেখেছিলেন তাঁর প্রভুপালককে, অথবা জিবরাইলকে। 'নায্লাতান উখ্রা' অর্থ আর একবার, দ্বিতীয় বার। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— তাঁর দ্বিতীয় দর্শন ছিলো প্রথম দর্শনের অনুরূপ। এরকম দর্শন সংঘটিত হতে পারে তখন, যখন সৃষ্টি উপস্থিত হয় তার বৃত্তের সর্বশেষ বা সর্বোর্ধ্ব সীমায়, আর স্রষ্টার আনুরূপ্যবিহীন অবতরণ ঘটে সৃষ্টির বৃত্তের সন্নিকটে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র গুণবত্তার ছায়া, অথবা প্রতিচ্ছায়ার অন্তরাল থেকে দর্শন লাভ সম্ভব। এমতাবস্থায় আবার একথা ভাবা যাবে না যে, আল্লাহ্র সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপে তখন পরিবর্তন কিংবা নতুনত্ব সূচিত হয়। তিনি তো সকল পরিবর্তন-বিবর্তন ও নতুনত্ব-আদিত্ব থেকে চিরমুক্ত, সতত পবিত্র। বরং বুঝতে হবে তখন আনুরূপ্যবিহীন জ্ঞানে ঘটে অবোধ্য ঊর্ধ্বারোহণ ও অবরোহণ। বিষয়টি আমি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছি সুরা বাকারা'র 'হাল ইয়ান্জুরুনা ইল্লা আঁইয়াতিয়া হুমুল্লাহ' আয়াতে।

'উখ্রা' (আরেকবার) শব্দ দৃষ্টে একথাও বলা যেতে পারে না যে, রসুল স. আল্লাহ্র দীদার লাভ করেছিলেন মাত্র দু'বার। বরং এখানে 'আরেকবার' অর্থ হবে—একাধিকবার, যার নিম্নতম সংখ্যা হচ্ছে দুই। এরকম উল্লেখ করা হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস ও কা'ব আহবারের কথোপকথনেও। বলা হয়েছে, রসুল স. তাঁর প্রভুপালককে দেখেছেন দু'বার। সেখানেও 'দু'বার' অর্থ একাধিকবার। অর্থাৎ অগণিত সংখ্যক। আর আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে কেবল মেরাজ রজনীর দর্শনের কথা।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট'। এখানে বদরী বা কুল বৃক্ষ হচ্ছে 'সিদ্রাতুল মুন্তাহা'। প্রকাশ থাকে, হজরত ইবনে আব্বাস ও কা'ব আহবারের সংলাপে একথাও উল্লেখিত হয়েছে যে, রসুল স.

তাঁর প্রভুপালককে দেখেছিলেন 'সিদরাতুল মুনতাহার' নিকটে। এখানে 'সিদ্রাতুল মুন্তাহা' কথাটির সম্পর্ক ঘটেছে 'মাঁইয়ারা' ক্রিয়ার সঙ্গে। এভাবে বিশেষণকে সম্পর্ক করা হয়েছে বিশেষণধারীর সঙ্গে। এরকম সম্পর্ক সৃষ্টির রীতি প্রযুক্ত হয়েছে 'জ্বানিবুল গায়বি' এবং 'মাসজিদুল হারাম' বাক্যদ্বয়ে। কিন্তু বসরার বিদ্বানগণের মতে এখানে 'মাউসুফ' (বিশেষ্য) রয়েছে উহ্য। বাক্যটির প্রকৃত রূপ ছিলো এরকম— 'সিদরাতুল মাকানিল মুনতাহা' (সীমান্তবর্তী স্থানের বদরী বৃক্ষ)।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'সিদ্‌রাতুন' (বৃক্ষ)কে 'মুন্‌তাহা' (প্রান্তবর্তী) বলার কারণ হচ্ছে, ওই বৃক্ষটি সৃষ্টির আমলসমূহ পৌঁছার শেষসীমা। মানুষের আমল নিয়ে ফেরেশতারা ওই স্থানে পৌঁছে। সেখান থেকে আমলসমূহ আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয়। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেক নির্দেশাদিও নেমে আসে এখানে। তারপর সে সকল নির্দেশ নিয়ে তারা নেমে আসে নিচে। সিদরাতুল মুনতাহার ঊর্ধ্বের সকল কিছুই অদৃশ্য। হজরত ইবনে আব্বাস ও কা'ব আহবারের সংলাপে একথাই প্রমাণিত হয়।

মেরাজের বিবরণ ঃ মালেক ইবনে সা'সা'র মাধ্যমে হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি কাবা শরীফের হাতিমে শায়িত ছিলাম। একজন আগন্তুক এলেন। তিনি আমার কণ্ঠদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত চিরে ফেললেন। আনা হলো ইমানে ভরপুর একটি সোনার তশতরী। ওই তশতরীতে ক্বলবকে রেখে ধৌত করা হলো। তারপর ক্বলব ইমানে পরিপূর্ণ করে দিয়ে পুনঃ সংস্থাপন করা হলো যথাস্থানে। এক বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর ক্বলব পূর্ণ করে দেওয়া হলো ইমান ও হেকতম দিয়ে। এরপর আনা হলো খচ্চরের চেয়ে বড় ও গাধার চেয়ে ছোট একটি চতুষ্পদ জন্তু। জন্তুটির নাম বোরাক। দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত ছিলো তার এক একটি পদবিক্ষেপ। ওই জন্তুটির উপরে আমাকে আরোহণ করানো হলো। তারপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। প্রথমে আমরা পৌঁছলাম পৃথিবীর নিকটতম আকাশে। আকাশের প্রহরী ফেরেশতা বললো, কে? জিবরাইল বললেন, আমি জিবরাইল। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে যিনি, তিনি কে? তিনি বললেন, মোহাম্মদ। পুনঃ প্রশ্ন করা হলো, তাঁকে আনবার জন্যই কি আপনাকে পাঠানো হয়েছিলো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে দরোজা খুলে দেওয়া হলো। বলা হলো, স্বাগতম! স্বাগতম! আমরা প্রথম আকাশে প্রবেশ করলাম। সাক্ষাত ঘটলো প্রথম পিতার সঙ্গে। জিবরাইল বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম। এঁকে সালাম বলুন। আমি তাঁকে সালাম বললাম। তিনি আমার সালামের প্রত্যুত্তর দিলেন। বললেন, মহাপুণ্যবান সন্তানকে স্বাগতম। জিবরাইল এবার আমাকে নিয়ে উপনীত হলেন দ্বিতীয় আকাশের দ্বারপ্রান্তে। সেখানকার প্রহরীর সঙ্গেও আমাদের প্রথম আকাশের মতো প্রশ্নোত্তর পর্ব সম্পন্ন হলো। দ্বিতীয় আকাশে আমি দেখা পেলাম নবী ইয়াহ্‌ইয়া ও নবী ঈসার। তাঁরা দু'জন পরস্পরের খালাতো ভাই। আমি উভয়কে সালাম বললাম। তাঁরাও সালামের প্রত্যুত্তর দিলেন এবং বললেন, মহাপুণ্যবান ভ্রাতা-নবীর জন্য স্বাগতম। সেখানে নবী মুসার সঙ্গে সাক্ষাত ঘটলো আমার। তিনিও আমাকে

ভ্রাতা-নবী বলে স্বাগতম জানালেন। তারপর শুরু করলেন ক্রন্দন। ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, কাঁদছি এজন্য যে, এমন তরুণকে আমার পরে নবী বানানো হলো, যাঁর উম্মতের মধ্যে জান্নাতবাসী হবে অধিকসংখ্যক। এভাবে একে একে সকল আকাশ অতিক্রম করে আমরা পৌঁছলাম সপ্তম আকাশে। সেখানে সাক্ষাত পেলাম নবী ইব্রাহিমের। জিবরাইল বললেন, ইনি আপনার পিতৃপুরুষ! এঁকে সালাম বলুন। সালাম প্রতিসালাম সম্পন্ন হওয়ার পর নবী ইব্রাহিম বললেন, হে আমার মহাপুণ্যবান সন্তান! মারহাবা! মারহাবা! এরপর আমরা উপনীত হলাম প্রান্তবর্তী বৃক্ষের নিকটে। বৃক্ষটি ছিলো কুল বৃক্ষ। তার বরইগুলো ছিলো মটকার মতো এবং পাতাগুলো ছিলো হাতীর কানের মতো বড়। জিবরাইল বললেন, এটাই 'সিদরাতুল মুনতাহা'। দেখলাম বৃক্ষটির গোড়া থেকে চারটি নদী উৎসারিত হয়েছে— দু'টি ভিতরের দিকে এবং দু'টি বাইরের দিকে। ভিতরের দিকের নদী দু'টো জান্নাতের এবং বাইরের দু'টো পৃথিবীর নীল ও ফোরাত। এরপর আমরা উপস্থিত হলাম বায়তুল মামুরের সামনে। সেখানে আমার সামনে আনা হলো তিনটি পানীয়ভর্তি পাত্র— শরাবের, মধুর ও দুধের। আমি গ্রহণ করলাম দুধের পাত্রটি। জিবরাইল বললেন, আপনি যা করলেন, তা স্বভাবধর্মসম্মত। এর উপরেই আপনার উম্মত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর আমার উপর ফরজ করা হলো প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ। ওই নেয়ামত নিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে মুসা বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ! আপনার উম্মত এতো কঠিন দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারবে না। আমি এরকম বলছি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে। আপনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এ দায়িত্বকে লাঘব করে আনুন। আমি ফিরে গেলাম। দায়িত্ব লাঘবের নিবেদন জানালাম। আল্লাহ্ দশ ওয়াক্ত রহিত করে দিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে নবী মুসা আমাকে পুনরায় বললেন, চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ পাঠও আপনার উম্মতের জন্য হবে অসম্ভব। সুতরাং নামাজের ওয়াক্তের সংখ্যা আরো কমিয়ে আনুন। আমি পুনরায় আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত হলাম। এবার কমিয়ে দেওয়া হলো আরো দশ ওয়াক্ত। আমি নীরবে তা মেনে নিলাম। ফিরতি পথে নবী মুসা বললেন, তিরিশ ওয়াক্ত নামাজ পাঠ করাও অসম্ভব। আমি পুনরায় গমন করলাম। নিবেদন জানালাম সহজ দায়িত্বের। এবার কমানো হলো আরো দশ ওয়াক্ত। এভাবে কয়েকবার আল্লাহ্ সকাশে আসা-যাওয়া করতে হলো আমাকে। সব শেষে পেলাম পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাঠের নির্দেশ। নবী মুসা তবুও বললেন, আপনার উম্মতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও অত্যন্ত কঠিন। বনী ইসরাইল তো দুই ওয়াক্ত নামাজ পাঠের দায়িত্বও নিয়মিত পালন করতে পারতো না। আমি বললাম, পুনর্গমন করতে আমি লজ্জা পাচ্ছি। আমি কৃতজ্ঞতা ও সন্তোষের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশ মেনে নিলাম। তখন অদৃশ্য থেকে ঘোষিত হলো 'আমি আমার ফরজ হুকুম বলবত রেখেছি, তৎসঙ্গে শিথিল করে দিয়েছি বান্দাদের দায়িত্ব'।

সাবেত বুনানীর মাধ্যমে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, আমার কাছে বোরাক আনা হলো। সেটি ছিলো একটি

শাদা বর্ণের চতুস্পদ প্রাণী, গাধার চেয়ে ছোট এবং খচ্চরের চেয়ে বড়। দৃষ্টির শেষসীমায় পড়তো তার প্রতিটি পদক্ষেপ। আমি তার উপরে আরোহণ করে পৌঁছলাম বায়তুল মাকদিসে। মসজিদের বাইরে নবীগণ যেখানে তাঁদের বাঁধনসমূহ বাঁধতেন, আমিও সেখানে বেঁধে রাখলাম বোরাককে। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, আমরা বায়তুল মাকদিসে পৌঁছলাম। জিবরাইল মসজিদের বাইরে রক্ষিত একটি পাথরে ইশারা করে ফাটল সৃষ্টি করলেন। ওই ফাটলে রশি দিয়ে বেঁধে রাখলেন বোরাকটিকে। এরপর আমি প্রবেশ করলাম মসজিদের ভিতরে। পাঠ করলাম দুই রাকাত নামাজ। যখন বেরিয়ে এলাম, তখন জিবরাইল আমার সামনে আনলো দুধ ও সুরাভর্তি দু'টি পাত্র। আমি দুধের পাত্রটিকে গ্রহণ করলাম। তিনি বললেন, আপনি স্বাভাবিকতাকেই পছন্দ করেছেন। এরপর শুরু হলো ঊর্ধ্বারোহণ। এরপরের বিবরণ পূর্বোল্লিখিত হাদিসের অনুরূপ। রসুল স. বলেছেন, প্রথম আকাশে মুখোমুখি হলাম প্রথম পিতার। তিনি 'মারহাবা' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন এবং আমাকে করলেন আশিসসিক্ত। তৃতীয় আকাশে দেখা হলো নবী ইউসুফের সঙ্গে। সৃষ্টির সমগ্র রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেকটাই তাঁকে দেওয়া হয়েছে। তিনিও আমার জন্য জয়ধ্বনি দিলেন এবং দোয়া করলেন। এই বর্ণনাটিতে নবী মুসার ক্রন্দনের উল্লেখ নাই। এরপর বলা হয়েছে, তিনি সপ্তমাকাশে গমন করে মিলিত হলেন নবী ইব্রাহিমের সঙ্গে। তিনি বায়তুল মামুরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। ওই বায়তুল মামুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ ক'রে ইবাদত করে, তারপর বেরিয়ে যায় চিরতরে, দ্বিতীয়বার আর সেখানে ফিরে আসতে পারে না। রসুল স. বললেন, এরপর আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো প্রান্তবর্তী কুলবৃক্ষের কাছে। ওই গাছের পাতাগুলো হাতীর কানের মতো এবং ফলগুলো মটকার মতো বৃহদাকৃতির। বৃক্ষটিকে তখন আচ্ছাদিত করে রেখেছিলো রঙবেরঙের অসংখ্য ফেরেশতা। সৌন্দর্যের চোখ ধাঁধানো ছটা উপচে পড়ছিলো যেনো। কোনো ভাষাতেই ওই অতুল সৌন্দর্যের প্রকাশ সম্ভব নয়। এরপর আল্লাহ্ আমাকে যা প্রত্যাদেশ করতে চেয়েছিলেন, তা করলেন। দিবা-রাত্রির জন্য ফরজ করলেন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ। ফিরতি পথে নবী মুসা আমাকে নামাজের ওয়াক্তের সংখ্যা কমিয়ে আনার পরামর্শ দিলেন। আমি পুনঃগমন করলাম আল্লাহ্ সকাশে। আল্লাহ্ কমিয়ে দিলেন দশ ওয়াক্ত। নবী মুসা পুনরায় আমাকে নামাজ কমিয়ে আনার উপদেশ দিলেন। এভাবে তাঁর উপদেশ মতো বার বার আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত হতে থাকলাম আমি। শেষে নির্ধারণ করে দেওয়া হলো, দিনে-রাতে নামাজ পাঠ করতে হবে পাঁচ ওয়াক্ত। নবী মুসা তবুও বললেন, আরো কমিয়ে আনুন। আমি তো জানি, নিয়মিত নামাজ পাঠ কতো কঠিন। আমার উম্মত তো দুই ওয়াক্ত ফরজ নামাজও ঠিকমতো পড়তে পারেনি। আমি পুনরায় ফিরে গেলাম। নিবেদন জানালাম, হে আমার পরম প্রভুপালক! নামাজের বিধান সহজতর করে দিন। আল্লাহ্ বললেন, আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকেই কবুল করুন। আর আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে গ্রহণ করবো পঞ্চাশ ওয়াক্তরূপে। কেননা

প্রতিটি পুণ্যকর্ম আমি বাড়িয়ে দেই কম পক্ষে দশগুণ করে। আর কোনো ব্যক্তি পুণ্যকর্মের ইচ্ছা প্রকাশ করার পরে তা সম্পাদনে সক্ষম না হলেও সে পাবে একগুণ প্রতিদান। আর সম্পাদন করলে পাবে দশগুণ। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি পাপ কর্মের ইচ্ছা করলে তার কোনো পাপ হবে না, আর যদি সে ওই পাপ করেই ফেলে, তবে তার পাপ হবে একগুণ। নবী মুসা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ব্যাপারেও আপত্তি উত্থাপন করলেন। আমি বললাম, আমি লজ্জিত। আমি হৃষ্টচিত্তে এই বিধানকেই মান্য করলাম।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার জন্য তখন গৃহের ছাদ ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। (আমি ঊর্ধ্বারোহণ করেছিলাম ওই ফাটল দিয়ে)। তখন ছিলাম আমি মক্কায়। এরপর তিনি স. উল্লেখ করলেন তাঁর বক্ষবিদারণের কথা। কিন্তু বোরাকের কথা বললেন না। বললেন, জিবরাইল আমার হাত ধরে আকাশে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। প্রথম আকাশে পৌঁছলে জিবরাইল প্রহরী ফেরেশতাকে দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে বললেন। দ্বার খুলে দেওয়া হলো। আমরা প্রথম আকাশের উপরে উঠে জনৈক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। দেখলাম তাঁর ডানে ও বামে অনেক লোক। তিনি ডানে তাকালে হাসেন এবং কাঁদেন বাঁয়ে তাকালে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, মারহাবা! মারহাবা! মহাপুণ্যবান সন্তান, মারহাবা! আমি জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? জিবরাইল বললেন, আপনার প্রথম পিতৃপুরুষ আদম। তাঁর ডানে বামে রয়েছে তাঁর পুণ্যবান ও পাপী সন্তানেরা। তাই তিনি ডানে-বামে তাকালে হাসেন ও কাঁদেন। এরপর আমরা আরো কয়েকটি আকাশ অতিক্রম করলাম। দেখা পেলাম ইদ্রিস, ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা প্রমুখ নবীগণের সঙ্গে। উল্লেখ্য, এই বিবরণটিতে কোন নবীর সঙ্গে কোন আকাশে তাঁর সাক্ষাত ঘটেছিলো তার উল্লেখ করা হয়নি। কেবল বলা হয়েছে, পৃথিবীর নিকটতম আকাশে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো হজরত আদম ও হজরত ইব্রাহিমের।

জুহুরী উল্লেখ করেছেন, আমার নিকটে ইবনে হাযাম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত আবু হাইয়্যা আনসারী কর্তৃক বিবৃত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, অতঃপর আমাকে অনেক উপরে এক স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে আমি শুনতে পেলাম কলমের লেখার আওয়াজ। হজরত আনাস থেকে ইবনে হাযাম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অতঃপর আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হলো। ফিরতি পথে মুসা নবী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী নিয়ে এলেন? আমি বলালাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ। তিনি বললেন, আপনার উম্মত এই গুরুভার বহন করতে পারবে না।

www.eelm.weebly.com

আপনি ফিরে গিয়ে গুরুভার লাঘব করার আবেদন জানান। আমি আল্লাহ্ সকাশে পুনঃগমন করলাম। আল্লাহ্ অর্ধেক নামাজ রহিত করে দিলেন। মুসা নবী আমাকে পুনরায় আল্লাহ্র কাছে দায়িত্ব লাঘবের নিবেদন নিয়ে ফিরে যেতে বললেন। আল্লাহ্ আমার নিবেদনের প্রত্যুত্তরে জানালেন, আপনার উম্মতের জন্য ফরজ করা হলো পাঁচ ওয়াক্ত

তাফসীরে মাযহারী/১৫৮

নামাজ। আমি ওই পাঁচ ওয়াক্ত গ্রহণ করবো পঞ্চাশ ওয়াক্তরূপে। কেননা আমার বাণী অপরিবর্তনীয়। আমি ফিরে এলাম। পথে মুসা নবী পুনরায় বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং আপনি পুনরায় যান। আমি বললাম, আমি লজ্জা পাচ্ছি। এরপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে গেলেন সিদরাতুল মুনতাহার কাছে। ওই সময় বিভিন্ন বর্ণের নূরে ঝলমল করছিলো গাছটি। আমি বুঝতে পারছিলাম না, সেগুলো কী? এরপর আমাকে প্রবেশ করানো হলো বেহেশতে। সেখানকার প্রকোষ্ঠগুলো মোতি নির্মিত এবং সেখানকার মাটি মেশকের।

কাতাদা সূত্রে মুয়াম্মার বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, মেরাজের রাতে রসুল স. এর সামনে বোরাক আনা হলো। বোরাকটি ছিলো জিনসজ্জিত ও লাগামপরিহিত। তাকে কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করতে দেখে জিবরাইল বললেন, থামো। দেখছো না তোমার সামনে কে? এঁর চেয়ে অধিক মর্যাদাধারী আর কেউ ইতোপূর্বে তোমার উপরে আরোহণ করেনি। একথা শুনে বোরাক লজ্জায় ঘর্মাক্ত হয়ে গেলো।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, মেরাজ রজনীতে রসুল স.কে সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে পৌঁছানো হলো। ওই প্রান্তবর্তী বরই বৃক্ষটি রয়েছে সপ্তম আকাশে। পৃথিবীবাসীদের কর্মবিবরণী পৌঁছানো হয় সেখানে; আর সেখান থেকে প্রেরিত হয় আল্লাহ্তায়ালার মহান দরবারে। আর আল্লাহ্র নির্দেশাবলীও নেমে আসে সেখানে। তারপর ফেরেশতা সেগুলো নিয়ে নেমে আসে নিম্নে।

বাগবী লিখেছেন, হেলাল ইবনে ইয়াসার বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত কা'ব আহবার যখন সিদরাতুল মুনতাহা প্রসঙ্গে আলাপ করছিলেন তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কা'ব বললেন, সিদরাতুল মুনতাহা আরশের গোড়ায় অবস্থিত। ওই পর্যন্তই পৌঁছতে পারে সৃষ্টির জ্ঞান। তারপর সকল কিছুই অদৃশ্য, যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না।

আমি বলি, এখানে 'সৃষ্টি' বলে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতাদেরকে। অর্থাৎ ফেরেশতারা ওই পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম। এর ঊর্ধ্বে গমনের অধিকার ও যোগ্যতা তাদের নেই। এরপর সকল কিছুই গায়েব। উল্লেখ্য, সিদরাতুল মুনতাহা অধিকাংশ মানুষের জন্য গায়েব হলেও ফেরেশতাদের জন্য গায়েব নয়।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আসমা বিনতে হজরত আবু বকর বলেছেন, আমি রসুল স.কে সিদরাতুল মুনতাহা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি স. বলেছেন, ওই বৃক্ষটির শাখা-প্রশাখা এতো বিস্তৃত যে, তার ছায়া একজন অশ্বারোহী একশ বছর পথ চলেও শেষ করতে পারবে না। আর এক লক্ষ অশ্বারোহী তার ছায়ায় ক্রমাগত পথ চলতে পারবে। ওই গাছে উপবিষ্ট প্রজাপতিগুলো স্বর্ণের। আর তার ফলগুলো মটকার মতো বৃহৎ।

মুকাতিল বলেছেন, বৃক্ষটি সুন্দর অলংকার, পোশাক, ফল ও লাল জ্যোতি দ্বারা আচ্ছাদিত। তার একটি পাতা যদি পৃথিবীতে খসে পড়ে, তবে সারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাবে। বৃক্ষটির আর এক নাম তুবা।

তাফসীরে মাযহারী/১৫৯

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান'। এখানে জান্নাতুল মাওয়াকে বলা হয়েছে বাসোদ্যান বা বেহেশতবাসীদের বসবাসের জায়গা। কুফাবাসী আলেমগণের মতে এখানে কথাটি হয়েছে 'ইজাফাতুল মাউসুফ ইলাস্ সিফাত'(বিশেষ্যকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে বিশেষণের প্রতি)। আর বসরাবাসী ব্যাকরণজ্ঞগণ বলেছেন, এখানে 'মাউসুফ' (বিশেষ্য) রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ কথাটি দাঁড়ায়— 'জান্নাতুল মাকানিল মাওয়া' (বসবাসস্থল জান্নাত)। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত জিবরাইল ও হজরত মিকাইলের জন্য নির্ধারিত স্থানের নাম জান্নাতুল মাওয়া। মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, জান্নাতুল মাওয়ায় পরিভ্রমণ করে শহীদগণের আত্মা।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'যখন বৃক্ষটি, যদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হবার, তদ্দ্বারা ছিলো আচ্ছাদিত'। এখানে 'ইয়াগ্শা' (আচ্ছাদিত) শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে দু'বার। প্রথম 'ইয়াগ্শা' এখানে ক্রিয়ার কর্তা। এভাবে এখানে একথাই প্রকাশ করা হয়েছে যে, যদ্দ্বারা বৃক্ষটি আচ্ছাদিত ছিলো তার সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। অর্থাৎ ওই সৌন্দর্যের বিবরণ কোনো ভাষা ধারণ করতে পারে না।

ইতোপূর্বে হজরত আনাস কর্তৃক পরিবেশিত এক হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র আদেশে সিদরাতুল মুনতাহাকে যা বেষ্টন করার ছিলো, তা বেষ্টন করে নিলো। তখন তার অবস্থান্তর ঘটলো। ওই সৌন্দর্য এতো অপরূপ যে, কোনো সৃষ্টি তার বর্ণনা দিতে অক্ষম। ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এখানে 'মা ইয়াগ্শা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে স্বর্ণপতঙ্গযুথকে। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। বাগবী আরো লিখেছেন, হাসান

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, তখন মহাসম্মানিত আল্লাহ্‌র নূর ওই বৃক্ষটিকে আবেষ্টন করে রেখেছিলো, সেজন্যই সৌন্দর্য হয়ে গিয়েছিলো অনির্বচনীয়। এক হাদিসে এসেছে, আল্লাহ্‌র প্রেমাতিশয্যে ফেরেশতারা তখন ওই বৃক্ষটিকে পাখিদের মতো ঘিরে ফেলেছিলো। তাই তখন বৃক্ষটি হয়ে গিয়েছিলো সুতীব্র নূরের ছটায় সমুজ্জ্বল। বাগবীর বিবরণে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি সিদরাতুল মুনতাহার প্রতিটি পাতায় এক একজন ফেরেশতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তারা সমস্বরে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছিলো।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি'। একথার অর্থ— এতো কিছু দেখেও তখন আমার রসুলের দৃষ্টিবিভ্রাট ঘটেনি, ঘটেনি কোনো দর্শনজনিত স্খলনও। ওই সময়ের অবস্থাকে জনৈক কবি প্রকাশ করেছেন এভাবে—

আহু মিনাল ইশ্‌কি ওয়া হালাতিহী
আহরাকা কৃলবী বিহারারাতিহী
মা নাজ্বারাল আইনু ইলা গইরিকুম
উকসিমু বিল্লাহি ওয়া আয়াতিহী।

তাফসীরে মাযহারী/১৬০

অর্থঃ ভালোবাসার আঘাতে ও যন্ত্রণায় আমার হৃদয় ভস্মীভূত। হে আমার আল্লাহ্! তোমার বাণীর শপথ! আমার দৃষ্টি তো তুমি ভিন্ন অন্য দিকে পলকপাত করেনি।

'ওয়ামা ত্বগা' অর্থ দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুত হয়নি। কোনো কোনো পণ্ডিত কথাটির অর্থ করেছেন— যে সকল বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী দেখবার জন্য আমার রসুলকে আমার একান্ত সন্নিধানে আনা হয়েছিলো, সেগুলো ছাড়া অন্যদিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেননি।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিলো'। এখানে 'আয়াতি রব্বি হিল্ কুব্‌রা' অর্থ তার প্রভুপালকের মহান নিদর্শনাবলী। যেমন বোরাক, আকাশসমূহ, নবী-রসুলগণের সঙ্গে সাক্ষাত, ফেরেশতাবৃন্দ, সিদরাতুল মুনতাহা ইত্যাদি।

মুসলিমের বিবৃতিতে এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ একবার 'সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিলো' আয়াত পাঠ করে বললেন, রসুল স. তখন হজরত জিব্রাইলকে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দেখেছিলেন। তাঁর শরীরে তখন ছিলো ছয়শ' ডানা। বোখারীর বিবৃতিতে এসেছে, একবার হজরত ইবনে মাসউদ এই আয়াত পাঠ করলেন এবং বললেন, রসুল স. তখন দেখেছিলেন সবুজ রঙের রফরফ, যা দৃষ্টিদিগন্তকে বেষ্টন করে ফেলেছিলো।

বিস্ময়কর নিদর্শনাবলীকে এখানে 'কুব্‌রা' (মহান) বলা হয়েছে একারণে যে, ওই নিদর্শনসমূহ ছিলো আল্লাহ্‌র অপার ক্ষমতা, কল্যাণ ও দয়ার প্রকাশস্থল। ওই সকল নিদর্শনের উপরে তখন মুহুর্মুহু বর্ষিত হচ্ছিলো আল্লাহ্‌র নূর ও তাজাল্লিসমূহ। অন্যথায় আল্লাহ্‌র প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর নিদর্শন পদবাচ্য। কোনো সৃষ্টিই অনুল্লেখ্য নয়। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'একটি মাছিও তুচ্ছ নয়। বরং সৃজননৈপুণ্যের দিক দিয়ে তা এতোই মহান যে মানুষের মতো সম্মানার্হ সৃষ্টিও একক অথবা সম্মিলিতভাবে একটি মাছি সৃজন করতে পারে না'।

একটি সন্দেহ ঃ এখানে 'নিদর্শন' (আয়াত) শব্দটি একথাই প্রমাণ করে যে, রসুল স. তখন আল্লাহ্‌কে দেখেননি, দেখেছিলেন হজরত জিবরাইলকে। কেননা তিনি 'মহান নিদর্শন' বটে। কিন্তু আল্লাহ্‌র সত্তাকে 'নিদর্শন' বলা যায় না। সুতরাং 'নিদর্শন' দর্শনকে হুবহু আল্লাহ্ দর্শন বলা যেতে পারেই না।

সন্দেহখণ্ডন ঃ 'নিদর্শন' দর্শন তো আল্লাহ্ দর্শনের অন্তরায় নয়। 'আয়াত' বা 'নিদর্শন' আল্লাহ্‌র সত্তার আবির্ভাব যেমন প্রতিবিম্বিত দর্পন। আর 'মা তাগা' আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা লিখেছি যে, রসুল স. এর পবিত্র দৃষ্টি আল্লাহ্-দর্শন থেকে বিচ্যুত হয়নি। এমতাবস্থায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. তখন আল্লাহ্‌দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র 'নিদর্শন'ও দর্শন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্যই ছিলো আল্লাহ্ দর্শন। তখন তিনি স. প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে পৌঁছেছিলেন মূল দর্শনের দিকে। এভাবে শেষ অবস্থায় তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে ছিলেন কেবলই আল্লাহ্।

তাফসীরে মাযহারী/১৬১

মাসআলা ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য এই যে, রসুল স. এর মেরাজ সম্পন্ন হয়েছিলো সশরীরে, জাগ্রত অবস্থায়। তবে তার স্থান ও পরিধি নিয়ে রয়েছে মতপ্রভেদ। আলেমগণ বিষয়টিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত যে তিনি স. সশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায় গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে কারো বলার কিছু নেই। কেননা তা কোরআনের আয়াত দ্বারা সুপ্রমাণিত। যেমন— 'পবিত্র ও মহিমময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন আল মাসজিদুল হারাম থেকে আল মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত'। সুতরাং এমতো নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণকে যদি কেউ অস্বীকার করে, সে হবে কাফের। কিন্তু সপ্তম আকাশ পর্যন্ত ও তদূর্ধ্বে গমনের বিষয়টি কোরআনের আয়াতদ্বারা প্রমাণিত নয়, প্রমাণিত যথাসূত্রসম্বলিত হাদিস দ্বারা। তাই এ বিষয়টি যে অস্বীকার করবে সে কাফের না হলেও

www.eelm.weebly.com

হবে ফাসেক। তবে প্রকৃত কথা এই যে, সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত রসুল স. এর গমন করার বিষয়টিও আলোচ্য আয়াতসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত। তাই রসুল স. এর আকাশভ্রমণের অস্বীকারকারীও হবে কাফের।

একটি সংশয় ঃ শুরাইক ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. কাবাপ্রাঙ্গণে শায়িত ছিলেন। স্বপ্নে দেখলেন, তিন জন আগন্তুক তাঁর সামনে উপস্থিত। ঘটনাটি ঘটেছিলো মেরাজের রাতে। এরপর রসুল স. পৃথিবীর নিকটতম আকাশে পৌঁছলেন। দেখলেন, সেখানে প্রবহমান রয়েছে দু'টি নদী। জিবরাইল বললেন, এই নদী দু'টো হচ্ছে নীল ও ফোরাত। এরপর তিনি গমণ করলেন অন্য আকাশে। সেখানে দেখতে পেলেন একটি প্রবহমান নদী। ওই নদীর পাড়ে রয়েছে মোতি ও জবরজদ নির্মিত একটি প্রাসাদ। রসুল স. নদীর পানিতে হাত রাখলেন। দেখলেন, তার পানি বিশুদ্ধ মেশকের মতো সুরভিত। তিনি স. বললেন, ভ্রাতা জিবরাইল! এটা কী? জিবরাইল বললেন, হাউজে কাওছার, যার অধিকারী করা হয়েছে আপনাকে। রসুল স. বলেন, এরপর আমাকে সপ্তম আকাশে ওঠানো হলো। এক বর্ণনায় এসেছে, নবী মুসা তখন তাঁর এই মহাআরোহণ দেখে বললেন, আমার তো ধারণাই ছিলো না যে, আমার উপরের স্তরে কাউকে ওঠানো হবে। এরপর রসুল স.কে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া হলো। এমন ঊর্ধ্বে যে, তার জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। শেষে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত। সেখানে মহাপ্রভুপালক তাঁর কাছে এলেন। সমীপবর্তী হলেন আরো। রসুল স. এর সঙ্গে তখন তাঁর ব্যবধান রইল দুই ধনুকের মিলিত ব্যবধানের মতো। অথবা তদপেক্ষাও কম। তারপর আল্লাহ্ তাঁকে যা প্রত্যাদেশ করবার তা প্রত্যাদেশ করলেন। দিবা-রাত্রির জন্য আল্লাহ্ ফরজ করলেন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ। ফেরার পথে হজরত মুসা তাঁকে নামাজ কম করিয়ে আনবার পরামর্শ দিলেন। বললেন, আমি বনী ইসরাইলকে সংশোধন করতে গিয়ে বুঝেছি, বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। তারা দুই ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পাঠ করতেও গড়িমসি করেছিলো। আর আপনার

উম্মত তো শারীরিক মানসিক উভয় দিক থেকে দুর্বল। সুতরাং তারা এতো কঠিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। রসুল স. বলেন, আমি জিবরাইলের দিকে তাকালাম। মনে হলো, তিনিও নবী মুসার পরামর্শকে সমর্থন করছেন। আমি তখন আল্লাহ্ সকাশে গমন করে আমার নিবেদন জানালাম। এভাবে নবী মুসার পুনঃ পুনঃ পরামর্শক্রমে আমি মোট পাঁচ বার আল্লাহ্ সকাশে গুরুভার লাঘবের প্রার্থনা জানালাম। শেষ বার আমার পরমপ্রভুপালক বললেন, মোহাম্মদ! আমি বললাম, এই যে আমি। আমার রব বললেন, আমি লওহে মাহফুজে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের কথাই লিখে রেখেছি। আমার বাণী অপরিবর্তনীয়। কিন্তু দয়া করে আমি আপনার উম্মতের জন্য নির্ধারণ করলাম পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ। তারা পাঁচ ওয়াক্তই পড়বে, আর আমি তা দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে গ্রহণ করবো পঞ্চাশ ওয়াক্ত হিসেবে। কেননা প্রতিটি পুণ্য কর্ম আমি দশগুণ বাড়িয়ে দেই। ফেরার সময় পুনরায় সাক্ষাত হলো নবী মুসার সঙ্গে। তিনি আমাকে আবার আগের মতো পরামর্শ দিলেন। আমি বললাম, আর আমি যাবো না। আমার লজ্জা করে। এরপর আমার প্রতি নির্দেশ হলো, বিস্মিল্লাহ্ বলে নিম্নে অবতরণ করুন। এরপর আমি জাগ্রত হলাম। দেখলাম, আমি শুয়ে আছি কাবাপ্রাঙ্গণে। এরকম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন বোখারী। মুসলিম ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন কিছুটা সংক্ষেপে। তবে তাঁর বর্ণনার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর মেরাজ সংঘটিত হয়েছিলো স্বপ্নযোগে, জাগ্রত অবস্থায় নয়।

সংশয়ভঞ্জন ঃ কোনো কোনো হাদিসবেত্তা উপরে বর্ণিত হাদিসকে সনাক্ত করেছেন 'দোষযুক্ত' (মাজরুহ) বলে। তাঁরা একথাও বলেছেন যে, বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত উপরোল্লিখিত হাদিসে যে স্বপ্নের বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে দোষযুক্ত বলা ছাড়া কোনো উপায় নেই। বর্ণনাটিতে প্রথমে ভুল করেছেন শুরাইক ইবনে আবদুল্লাহ্। আর তার ভুলটি হচ্ছে, তিনি ঘটনাটিকে মনে করেছেন রসুল স. এর নবুয়তের দায়িত্বপ্রাপ্তির পূর্বের। অথচ সকল বিদ্বানগণের ঐকমত্য হচ্ছে, রসুল স. এর মেরাজের ঘটনা ঘটেছিলো তাঁর নবুয়তের দায়িত্বপ্রাপ্তির প্রায় বারো বৎসর পরে, হিজরতের কিছুকাল পূর্বে।

কোনো কোনো হাদিসবেত্তা বলেছেন, রসুল স. এর মেরাজ হয়েছিলো দু'বার একবার নবুয়তের দায়িত্বলাভের পূর্বে স্বপ্নযোগে এবং আর একবার নবুয়তের দায়িত্বলাভের বারো বছর পরে, জাগ্রত অবস্থায়, সশরীরে, হিজরতের আগে। এভাবে তাঁর পূর্বে দেখা স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় পরে। যেমন হুদায়বিয়ার বছরে রসুল স.কে দেখানো হয় মক্কাবিজয়। আর তা বাস্তবরূপ লাভ করে পরের বছরে, অষ্টম হিজরী সনে। কোরআন মজীদে একথা বলা হয়েছে এভাবে 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমরা মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে—'।

সূরা নাজ্‌ম ঃ আয়াত ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

www.eelm.weebly.com

❑ তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ 'লাত' ও উয্যা' সম্বন্ধে

❑ এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে?

❑ তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান?

❑ এই প্রকার বণ্টন তো অসংগত।

❑ এইগুলি কতক নাম মাত্র যাহা তোমাদের পূর্বপুরুষগণ ও তোমরা রাখিয়াছ, যাহার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই। তাহারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ আসিয়াছে।

❑ মানুষ যাহা চায় তাহাই কি সে পায়?

❑ বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্‌রই।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মক্কাবাসী! তোমরা তো নিতান্ত আগ্রহভরে লাত, উজ্জা ও মানাত নামক প্রতিমাত্রয়ের পূজা করো। কিন্তু একটি বারের জন্যও তোমরা একথা ভেবে দেখেছো কি যে, এগুলো সম্পূর্ণতই অলীক, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা?

এখানকার 'তোমরা কি ভেবে দেখেছো' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও সতর্ককারক। এর সংযোগ রয়েছে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা কি তোমাদের প্রকৃত উপাস্য সম্পর্কে চিন্তা করেছো, সেই শুভ চিন্তার আলোকে এ বিষয়টি কি প্রত্যক্ষ করেছো যে— লাত, উজ্জা, মানাত— একেবারেই অলীক, ভিত্তিবিবর্জিত? উল্লেখ্য, মক্কার পৌত্তলিকেরা মনে করতো ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা এবং লাত-উজ্জা-মানাত তাদের প্রতিকৃতি। কেউ কেউ আবার এরকমও ধারণা করতো যে, জ্বিনদের স্ত্রী বা পরীরা আল্লাহ্‌র কন্যা। তাই তারা তাদের প্রতিমাগুলোকে কল্পনা করতো নারীরূপে। তারা নির্ধারণ করেছিলো, 'আল্লাহ্'র স্ত্রীলিঙ্গ আল্লাত। আর পার্থক্যসূচক বিশেষণের শব্দরূপে 'তাআজ্জু' এর স্ত্রীলিঙ্গ উজ্জা।

কোনো কোনো অভিধানবেত্তার মতে 'আল্লাত' শব্দটি ধাতু মূল। শব্দটি মূলত ছিলো 'ফা'লাতুন' এর ওজনে 'লাওয়াতুন' আর 'লাওয়াতুন' 'লাওয়াইয়ালতি' এর মূল, যার অর্থ 'তাওয়াফ' বা প্রদক্ষিণ করা। পৌত্তলিকেরা মূর্তিটিকে তাওয়াফ করতো, তাই তারা তার নামকরণ করলো 'লাত'। 'লাওয়াতুন' এর 'ওয়াও' বর্ণটিকে 'আলিফ' দ্বারা পরিবর্তন করে রীতিবহির্ভূতভাবে 'ইয়া' বর্ণটিকে তারা বাদ দিয়ে দিলো। আর 'তা' বর্ণটিকে রেখে দিলো স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন হিসেবে এবং 'তা বর্ণটিকে পড়া হলো দীর্ঘ লয়ে। এভাবে গঠিত হলো তাদের 'লাত' শব্দটি। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, রহওয়াইহ্ এবং আবু সালেহ 'লাত' শব্দটি পাঠ করতেন এর 'তা' বর্ণে তাশদীদ যোগ করে। তাঁরা এর নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, এটা একটি পুরুষমূর্তি। ওই কল্পিত পুরুষটি তার জীবদ্দশায় ঘি ও ছাতু দ্বারা হাজীদেরকে আপ্যায়ন করতো। লোকটির মৃত্যু হলে লোকেরা তার কবরের চতুর্দিকে তাওয়াফ শুরু করে দিলো। পরবর্তী সময়ে তার মূর্তি বানিয়ে শুরু হলো পৌত্তলিকদের মতো পূজা-অর্চনা।

কাতাদা বর্ণনা করেছেন, তায়েফের বনী সাক্বিফের একটি প্রতিমার নাম ছিলো লাত। ইবনে জায়েদ বলেছেন, নাখলা নামক স্থানে ছিলো লাত নামের একটি কুঠুরী। কুরায়েশেরা ওই কুঠরিটির পূজা করতো। মুজাহিদ বলেছেন, উজ্জা ছিলো গাতফান গোত্রের আবাসভূমিতে অবস্থিত একটি বৃক্ষের নাম। গাতফানীয়রা ওই বৃক্ষের পূজা করতো। ইবনে ইসহাক বলেছেন, নাখলার একটি কুঠুরীর নাম ছিলো উজ্জা। কুঠরিটি রক্ষণাবেক্ষণ করতো বনী শায়বানের লোকেরা। আর বনী শায়বান ছিলো কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ। কুরায়েশ ও বনী কেনানাদের এটাই ছিলো সর্ববৃহৎ মূর্তি। আমর ইবনে লুহাই বনী কেনানা ও কুরায়েশদেরকে বলেছিলো, তোমাদের প্রভু শীতকালে তায়েফে এসে লাতের সঙ্গে এবং গ্রীষ্মকালে উজ্জার সঙ্গে কালযাপন

www.eelm.weebly.com

করে। লোকেরা তাই দু'টো প্রতিমাকেই সম্মান করতো এবং প্রতিমা দু'টোর জন্য তারা একটি করে কামরাও নির্মাণ করে দিয়েছিলো। সেকালে কাবাগৃহের উদ্দেশ্যে যেমন কোরবানীর পশু প্রেরণ করা হতো, তেমনি তারা কোরবানীর পশু প্রেরণ করতো ওই প্রতিমা দু'টোর উদ্দেশ্যেও।

হজরত আবুত্ তোফায়েল সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, মক্কাবিজয়ের দিবসে রসুল স. হজরত খালেদ ইবনে ওলীদকে সেখানে পাঠালেন। তিনি সেখানে পৌঁছে সেখানকার বাবলা বৃক্ষগুলোকে কেটে ফেললেন এবং ভেঙে ফেললেন উজ্জা প্রতিমাটিকে। তারপর ফিরে এলেন রসুল স. সকাশে। রসুল স. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে তুমি কি কিছু দেখতে পেয়েছো? হজরত খালেদ বললেন, না। তিনি স. বললেন, তাহলে তো তুমি কিছুই ভাঙতে পারোনি। হজরত খালেদ পুনরায় সেখানে গেলেন। দেখলেন, প্রতিমা রক্ষণাবেক্ষণকারীরা সেখানে জড়ো হয়ে কী যেনো শলাপরামর্শ করছে। হজরত খালেদকে দেখে তারা পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেলো। চীৎকার করে বলতে বলতে গেলো, ওহে উজ্জা! ওকে ধরো, হত্যা করো, নচেৎ অপদস্থ হয়ে মরে যাও। তাদের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

মাথা ও মুখে ধূলি ওড়াতে ওড়াতে সামনে এগিয়ে এলো আলুথালু কেশবিশিষ্ট এক বিরাট নারীমূর্তি। হজরত খালেদ অসি উত্তোলন করে বলে উঠলেন, আমি তোমাকে মানি না। তোমাকে পবিত্রও মনে করি না। আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। একথা বলেই তিনি তাঁর হস্তধৃত অসি দ্বারা ওই কুৎসিতদর্শনা নারীকে দুই টুকরো করে ফেললেন। রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে যখন তিনি সবকিছু খুলে বললেন, তখন তিনি স. বললেন, ওটাই ছিলো উজ্জা। তোমাদের শহরে তার উপাসনা হওয়ার ব্যাপারে আজ থেকে সে চিরদিনের জন্য নিরাশ হয়ে গেলো।

জুহাক বর্ণনা করেছেন, উজ্জা ছিলো বনী গাতফান জনপদের একটি প্রতিমার নাম। প্রতিমাটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলো সাঈদ ইবনে সালেস গাতফানী নামক এক ব্যক্তি। সে একবার মক্কা শরীফে দেখতে পেলো, লোকজন সাফা ও মারওয়া পাহাড় দু'টোর মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করছে। আপন জনপদে ফিরে এসে সে তাদের গোত্রের লোকদেরকে বললো, মক্কাবাসীদের রয়েছে সাফা ও মারওয়া। তোমাদের সেরকম কিছু নেই, তারা একজনের উপাসনা করে। তোমাদের তো কোনো উপাস্য নেই। লোকেরা বললো, তাহলে আমরা কী করতে পারি? সাঈদ বললো, আমিই সবকিছু ঠিকঠাক করে দিবো। একথা বলে সে সাফা ও মারওয়া পাহাড় থেকে একটি করে পাথর আনলো। কিছুটা দূরত্ব রেখে পাথর দু'টো স্থাপন করলো একটি খোলা ময়দানে। বললো এদু'টো পাথরই তোমাদের সাফা ও মারওয়া। এরপর মধ্যবর্তী এক বৃক্ষের নিচে তিনটি বৃহৎ পাথর সাজিয়ে দিয়ে বললো, আর এটা হচ্ছে তোমাদের প্রভু। তখন থেকে লোকেরা সেখানে দৌড়াদৌড়ি করতে শুরু করলো এবং পূজা করতে লাগলো মধ্যবর্তী পাথর তিনটির। রসুল স. যখন মক্কাবিজয় করলেন, তখন হজরত খালেদকে সেখানে প্রেরণ করে ধ্বংস করে দিলেন তাদের সবকিছু।

'ওয়া মানাতাছ্ ছালিছাতা' অর্থ এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত। ইমাম ইবনে কাছীরের ক্বেরাতে 'মানাত' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে 'মদ' ও হামযা সহযোগে। সে হিসেবে 'মানাত' শব্দটির ওজন হবে 'মাফআলাতুন'। শব্দটি নির্গত হয়েছে 'নাওউন' থেকে। লোকেরা মূর্তিটির কাছে উপস্থিত হয়ে কল্যাণ কামনা করতো। আর 'নাওউন' এর বহুবচন 'আন্ওয়া। অর্থাৎ তারা তারকারাজির কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করতো। এমতো প্রেক্ষিতে শব্দটির মূল ছিলো 'মানওয়াতুন'। অর্থাৎ 'ওয়াও' বর্ণের ধ্বনিচিহ্ন পরিবর্তন করে 'নূন' বর্ণে দিয়ে 'ওয়াও'কে 'আলিফ' দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হলো। অন্যান্য ক্বারী 'মানাত'কে 'মাদ' ও 'আলিফ' ছাড়াই পড়েছেন। এ হিসেবে তার ওজন হবে 'ফা'লাতুন'। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে শব্দটির ব্যুৎপত্তি ঘটেছে 'মান্নাহ্' থেকে। 'মান্নাহ্' অর্থ তাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। পৌত্তলিকেরা কোরবানীর পশুকে মানাত মূর্তির কাছে নিয়ে গিয়ে জবাই করতো। কাতাদা বলেছেন, মানাত ছিলো কাদীদ নামক স্থানে রক্ষিত বনী যাজাআ গোত্রের একটি বিগ্রহ। জননী আয়েশা বলেছেন, মানাত ছিলো আনসারদের প্রতিমা।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আনসারেরা মানাতকে সম্মান প্রদর্শন করতো। আর 'মানাত' ছিলো কাদীদের কাছে। ইবনে জায়েদ বলেছেন, মানাত ছিলো মুকাল্যাল নামক স্থানের একটি প্রকোষ্ঠ। কা'ব গোত্রের লোকেরা তার পূজা-অর্চনা করতো। জুহাক বলেছেন, বনী যাজাআ এবং বনী হুজায়েলের একটি প্রতিমা ছিলো। মক্কাবাসীরা তার বন্দনা করতো। কেউ কেউ বলেছেন, লাত, উজ্জা ও মানাত তিনটি বিগ্রহমূর্তিই ছিলো মক্কায় কাবা প্রাঙ্গণে। মুশরিকেরা সেগুলোর পূজা-আরাধনা করতো। মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী তাঁর 'সাবিলুর রাশাদ' পুস্তকে লিখেছেন, রসুল স. মক্কাবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সা'দ ইবনে জায়েদ আশহালীকে মানাত প্রতিমা ধ্বংসের জন্য প্রেরণ করলেন। প্রতিমাটি ছিলো মুশাললাল পাহাড়ে। আর মুশাললাল হচ্ছে ওই পাহাড়, যা অতিক্রম করে কাদীদ উপত্যকায় যেতে হয়। মদীনার আউস, খাজরাজ ও গাস্সান গোত্রের প্রতিমার নামও ছিলো মানাত। একজন পুরোহিতের উপরে ছিলো প্রতিমাটির দেখাশোনার ভার। হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদ বিশ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন। পুরোহিত জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী চাও? সা'দ বললেন, মানাতকে ধ্বংস করতে চাই। লোকটি বললো, সে তুমি জানো, আর সে জানে। হজরত সা'দ পায়ে হেঁটে

www.eelm.weebly.com

মানাত প্রতিমাটির দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন কৃষ্ণমুখী বিবসনা উস্‌কো খুসকো কেশবিশিষ্ট এক কুৎসিতদর্শনা রমণী বুক চাপড়াতে চাপড়াতে মৃত্যু কামনা করতে করতে এগিয়ে আসছে। হজরত সা'দ তাঁর তলোয়ার দিয়ে সজোরে তাকে আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার দফা রফা হয়ে গেলো। এরপর তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন বিগ্রহটির দিকে এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তার ধ্বংস সাধন করলেন।

এখানকার 'লাত' ও 'মানাত' শব্দ দু'টোতে যতিপাত ঘটানোর ব্যাপারে ক্বারীগণ মতানৈক্য করেছেন। কেউ কেউ শব্দ দু'টো যতিপাত ঘটান 'তা' সহযোগে এবং কেউ 'হা' সহযোগে। আবার কেউ কেউ বলেন ওসমানী লিপিতে যেখানে 'তা' দীর্ঘাকারে লেখা হয়েছে, সেখানে যতিপাত ঘটাতে হবে 'তা' সহযোগে। আর এখানকার 'উখরা' শব্দটি 'ছালিছা' এর গুরুত্ব আরোপক এবং মানাত এর দ্বিতীয় বিশেষণ। অথবা 'আল উখরা' দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে— মর্যাদার দিক দিয়ে যা পরবর্তী।

কালাবী বলেছেন, মক্কার মুশরিকেরা তাদের পূজনীয় প্রতিমাসমূহ ও ফেরেশতাবৃন্দকে মনে করতো আল্লাহ্‌র কন্যা। অথচ তারা নিজেদের কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে অসন্তুষ্ট হতো। এভাবে প্রকারান্তরে তারা আল্লাহ্‌র চেয়ে নিজেদেরকেই শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতো। তাদের এমতো অপমনোভাবের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াতদ্বয়।

বলা হয়— 'তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান (২১)? এ প্রকার বণ্টন তো অসঙ্গত' (২২)।

হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা এখানকার 'ক্বিসমাতুন দ্বীযা' কথাটির অর্থ করেছেন 'ক্বিসমাতুন জায়েরাহ' (অসঙ্গত বণ্টন)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়—

তোমরা নিজেদের জন্য যা পছন্দ করো না, তা-ই সাব্যস্ত করো আল্লাহ্‌র জন্য। মুজাহিদ ও মুকাতিল 'দ্বীযা' শব্দের অর্থ করেছেন— বক্র। হাসান অর্থ করেছেন— অস্বাভাবিক। ইবনে কাছীর 'দ্বীযা' শব্দটিকে পাঠ করেছেন 'হাম্‌যা' সহযোগে। শব্দটি এসেছে 'দ্বাআযাহ্‌' থেকে। 'দ্বাআযাহ্‌' অর্থ সে তার উপর অত্যাচার করেছে। এমতাবস্থায় কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— অন্যায় বণ্টন। অন্যান্য ক্বারী 'দ্বীযা'কে পড়েছেন 'ইয়া' দ্বারা। ক্বারী কাসায়ী বলেছেন, 'ইয়াদ্বীব' এসেছে 'দ্বরাবা' বাব থেকে। যেমন—'দ্বযা' 'ইয়াদ্বীযু' 'দ্বরাবা' বাব থেকে 'দ্বযা', 'ইয়াদ্বীযু' থেকে 'দ্বযা' এবং 'সামিআ' 'ইসমাউ' বাব থেকে 'দ্বআযা' 'ইয়াদ্বযু'। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— জুলুম করা, অন্যের অধিকার খর্ব করা। আমি বলি, 'দ্বযা' শব্দটি বাবে 'নাসারার' 'নসর' থেকে আসেনি। বরং শব্দটি এসেছে 'ইয়াসআ' 'বাআ' এর ওজনে 'দ্বরাবা' ইয়াদ্বরীবু' রূপে, অথবা বাবে 'ফাতাহা' 'ইয়াফতাহু' থেকে 'নালা' 'ইয়ানালু' এর ওজনে। আর এখানকার 'দ্বীযা' শব্দটির মূলরূপে 'দোয়াদ' বর্ণটি ছিলো 'পেশ' ধ্বনিচিহ্নযুক্ত, যেহেতু শব্দটি বিশেষণ। আর বিশেষণের শব্দরূপে 'ফা'তে 'কাসরা' 'ফী'লা' এর ওজনে আসে না। অথবা 'ফা' তে পেশ থাকলে 'উনছা' এর ওজনে, অথবা 'ফা' তে 'ফাতাহা' 'ফায়ালা'এর ওজনে আসে। যেমন 'গদ্ববা' 'সাকরা' 'আ'ত্বসা' ইত্যাদি। তবে হ্যাঁ, বিশেষ্যের মধ্যে শব্দটি কাসরাসহ আসতে পারে। যেমন 'জিক্‌রা' 'শি'রা'। এখানে 'দোয়াদ' বর্ণে কাসরা প্রদান করা হয়েছে। এখানে যদি 'দোয়াদ' বর্ণে 'যবর' অথবা পেশ দেওয়া হতো, তবে এখানকার 'ইয়া' বর্ণটিকে 'ওয়াও' বর্ণে পরিবর্তিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়তো। আর তখন শব্দরূপটি হতো 'দ্বুযওয়া'। এমতাবস্থায় একথা বুঝা সম্ভব হতো না যে, আসলে শব্দটিতে কোন্‌ বর্ণটি ছিলো 'ওয়াও' না 'ইয়া'।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এগুলি কতক নাম মাত্র, যা তোমাদের পূর্বপুরুষগণ ও তোমরা রেখেছো। যার সমর্থনে আল্লাহ্‌ কোনো দলিল প্রেরণ করেননি'।

এখানকার 'ইনহিয়া' (এগুলি) ক্রিয়াটি 'আস্‌মা' (কতক নাম) এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— ওই প্রতিমাগুলো তো কেবলই পাথর। তোমরাই ওগুলোর নামকরণ করেছো এবং আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো দলিল-প্রমাণ ব্যতিরেকেই ওগুলোকে তোমাদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছো। অথচ উপাস্য হওয়ার কোনো যোগ্যতা, ক্ষমতা ও অধিকার তাদের নেই। অথবা— তোমরা যে প্রতিমাগুলোকে আল্লাহ্‌র কন্যা এবং আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের পক্ষের সুপারিশকারী বলে গ্রহণ করেছো, সেগুলো আসলে কিছুই নয়। তোমরাই ওগুলোর নাম দিয়েছো। লাত, উয্‌যা, মানাত বিভিন্ন নামে ডাকছো। অথচ ওগুলোর পক্ষে আল্লাহ্‌র কোনো দলিল প্রমাণগত সমর্থন নেই। এভাবে বিভ্রান্ত হয়েছো তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার

www.eelm.weebly.com

‘হিয়া’ (এগুলি) সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত ‘আসমা’ (নামমাত্র) এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা এবং তোমাদের পথভ্রষ্ট পুরুষেরাই ওই প্রতিমাগুলোর বিভিন্ন নাম ও গুণাবলী নির্ধারণ করেছো। যেমন উপাসনা গ্রহণের যোগ্য মনে করে ওগুলোর মধ্যে একটির নাম রেখেছো লাত। মহামর্যাদাধারী মনে করে আর একটির নাম রেখেছো উজ্জা। আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যমরূপে অন্য আর একটির নাম নির্ধারণ করেছো মানাত। এভাবে তোমরা দিনের পর দিন ওগুলোকে পূজা দিচ্ছো, সম্মান করছো এবং তাদের নামে পশু বলি দিচ্ছো। অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে ওগুলো কিছুতেই এরকম বন্দনা-অর্চনার উপযোগী নয়। সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই তোমাদের মনগড়া। লাত যেমন উপাস্য হওয়ার অযোগ্য, উজ্জাও তেমনি মর্যাদাহীন এবং মানাতও আল্লাহ্র নৈকট্যের মাধ্যম হওয়ার এবং পশু বলি পাবার অনুপযোগী। আল্লাহ্ ওগুলোর মধ্যে এরকম কোনো গুণই সৃষ্টি করেননি। ফলে তোমাদের বিশ্বাস ও কর্ম সম্পূর্ণতই দলিল-প্রমাণহীন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ এসেছে’।

এখানে ‘জন্’ অর্থ অনুমান, অযথার্থ বিশ্বাস, মিথ্যা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— পথভ্রষ্ট পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসারী তারা, অনুগামী স্বপ্রবৃত্তিজাত কুধারণার, তাদের প্রতি সত্য রসুল এবং নির্ভুল কিতাব প্রেরণ করা সত্ত্বেও। অথবা— রসুল তাদেরকে সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন করা সত্ত্বেও তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কুসংস্কার ও কুপ্রবৃত্তিজাত একদেশদর্শিতা পরিত্যাগ করছে না, ছুটে চলেছে মিথ্যার পশ্চাতে।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— ‘মানুষ যা চায়, তাই কি পায়’? এখানকার ‘আম্ লিল্ইন্সানি’ (মানুষ যা) কথাটির ‘আম’ (কি) অব্যয়টি বিচ্ছিন্নকারী। একই সঙ্গে আয়াতখানি প্রশ্নবোধক ও অস্বীকৃতিজ্ঞাপকও বটে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ভাবনা ও বাসনা কখনোই পূরণ হবে না। যেমন তারা বলে ‘আমাদেরকে যদি আমাদের প্রভুপালনকর্তার কাছে উপস্থিত হতেই হয়, তবুও সেখানে আমরা ভালো অবস্থায় থাকবো’। অথবা এই কোরআন মক্কা ও তায়েফের কোনো প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হলে ভালো হতো’। তাদের এসকল ভাবনা ও বাসনা চিরকালই অপরিপূরিত থেকে যাবে।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— ‘বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্রই’। একথার অর্থ— দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতই সম্পূর্ণত আল্লাহ্র কর্তৃত্বভূত। তিনি যাকে যখন যা ইচ্ছা, তাকে তখন তা-ই দান করেন। আর যাকে চান না, তাকে কিছুই দান করেন না। তিনি চিরমুক্ত ও চিরপবিত্র অভিপ্রায়ধারী। তাঁর অভিপ্রায়ের উপর কারো ভাবনা-বাসনার কোনো প্রকার প্রভাবই নেই। আর তাঁর অভিপ্রায়ের সমর্থন ব্যতিরেকে অন্য কারো অভিপ্রায়ের ভিত্তিও নেই।

সূরা নাজ্‌ম ঃ আয়াত ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

www.eelm.weebly.com

❑ আকাশে কত ফিরিশতা রহিয়াছে; উহাদের সুপারিশ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হইবে না, তবে আল্লাহ্‌র অনুমতির পর; যাহার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন ও যাহার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।

❑ যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারাই নারীবাচক নাম দিয়া থাকে ফিরিশ্‌তাদিগকে;

❑ অথচ এই বিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান নাই, উহারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে; কিন্তু সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নাই।

❑ অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চল; সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে।

❑ উহাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন কে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত, তিনিই ভাল জানেন কে সৎপথপ্রাপ্ত।

❑ আকাশমণ্ডলীতে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহ্‌রই। যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদিগকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদিগকে দেন উত্তম পুরস্কার।

❑ উহারাই বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হইতে, ছোটখাট অপরাধ করিলেও। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম; আল্লাহ্ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত— যখন তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন মৃত্তিকা হইতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করিও না, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন বান্দা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিনা অনুমতিতে কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না। তাহলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কোন দুরাশায় একথা ভেবে বসে আছে যে, তাদের মিথ্যা উপাস্যসমূহ তাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবে? বাগবী বক্তব্যটির অর্থ করেছেন এভাবে— তারা যে সকল ফেরেশতাকে আল্লাহ্‌র কন্যা ভেবে আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের পক্ষের সুপারিশকারীরূপে পূজা করে থাকে, তারা সুপারিশ করার কোনোই যোগ্যতা রাখে না। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে 'প্রতিমাগুলো এবং ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। অংশীবাদীদের এই অপধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না। তারাই নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে ফেরেশতাদেরকে; (২৭) অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে; কিন্তু সত্যের মোকাবিলায়

www.eelm.weebly.com

অনুমানের কোনোই মূল্য নেই'(২৮)। একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা পরকালের পুরস্কার-তিরস্কারে আস্থা রাখে না, সেকারণেই তারা অবলীলায় ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলতে পারে। অথচ এটা সম্পূর্ণতই অপধারণা ও অশুভ অনুমান। তারা এমতো অপধারণা লাভ করেছে তাদের পথভ্রষ্ট পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ সূত্রে। কিন্তু সত্যের সম্মুখে এমতো অজ্ঞতার কোনো মূল্যই নেই।

এখানে 'এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই' অর্থ মক্কার মুশরিকেরা প্রকৃত সত্য সম্পর্কে জানেই না। 'তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে' অর্থ ফেরেশতাদেরকে তারা আল্লাহ্‌র কন্যা বলে সম্পূর্ণতই অনুমানের উপরে ভিত্তি করে। আর 'সত্যের মোকাবিলায় অনুমানের কোনোই মূল্য নেই' অর্থ জ্ঞানের সামনে তাদের অজ্ঞতা মূল্যহীন। আর 'জ্ঞান' অর্থ এখানে নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস, সুদৃঢ় প্রত্যয়, যা সম্পূর্ণতই বাস্তবসম্মত, অনুমাননির্ভর নয়। অর্থাৎ নিছক অনুমানজাত ধারণা কখনো সুদৃঢ় ও সুপ্রমাণিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারে না। উল্লেখ্য, এ কারণেই জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য অন্ধানুসরণ বৈধ নয়। প্রকৃত বিশ্বাস ও জ্ঞানের অন্বেষণ তাদের জন্য অত্যাবশ্যক।

'ইন্‌নাজ্‌ জন্‌না লা ইউগ্‌নী মিনাল হাক্কিক্বি শাই্‌আঁ' অর্থ সত্যের মোকাবিলায় অনুমানের কোনোই মূল্য নেই। বাক্যটি 'জুমলায়ে মু'তারিদ্বা' বা সূত্র বিচ্ছিন্নকারী ভিন্ন প্রসঙ্গের বাক্য। বাক্যটির মাধ্যমে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অনুমানজাত অনুসরণের মন্দ দিকটি প্রকাশ করা হয়েছে। তারা তাদের অন্ধ বিশ্বাসকে প্রকৃত বিশ্বাসের সমকক্ষ জ্ঞান করতো। অথচ তারা ছিলো প্রকৃতই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাই তাদের অপবিশ্বাস খণ্ডনার্থে এখানে বাক্যটিকে শক্তি প্রদান করা হয়েছে 'ইন্‌না' শব্দটির মাধ্যমে।

একটি সন্দেহ ঃ এলেম ও আমলের ক্ষেত্রে ধারণার অনুসরণ শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। ইলমে ফেকাহ্‌'র বিভিন্ন মাসআলা উদ্ধার করার বেলায় 'জন্‌নি দলিল' বা ধারণাগত প্রমাণ গ্রাহ্য। তাছাড়া 'খবরে ওয়াহিদ' ইত্যাদির মাধ্যমেই তো জানা যায় বিগত যুগের বিভিন্ন দুর্বিনীত সম্প্রদায় এবং তাদের পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরিত নবী-রসুলগণের বিস্তারিত ইতিবৃত্ত। আরো জানা যায় কিয়ামত, বেহেশত-দোজখ, হাশর-নশর ইত্যাদির অনেক কথা। এমতাবস্থায় ধারণাগত প্রমাণকে যদি স্বীকৃতি না দেওয়া হয়, তবে তো বিশ্বাস, এলেম, আমল সবকিছুই হয়ে পড়বে নিরর্থক। এসকলকিছু তাহলে শেখা ও শেখানোও হয়ে যাবে অবৈধ।

সন্দেহভঞ্জন ঃ যে ধারণা সুপ্রমাণিত নয়, কেবল সেই ধারণাই ক্ষতিকর ও পরিত্যাজ্য। যা কেবলই ধারণা বা অনুমান, তার অনুসরণ কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। এভাবে সুপ্রমাণিত বিষয়াবলী অপেক্ষাকৃত শিথিল প্রমাণনির্ভর বিষয়াবলীর উপরে প্রাধান্যপ্রাপ্তির যোগ্য। মোট কথা ধারণা হতে হবে প্রমাণনির্ভর। এরকম হলে তা নাজায়েয হওয়ার কোনো কারণ নেই। আর আলোচ্য বাক্যে সেরকম কিছু বলাও হয়নি। বলা হয়েছে কেবল ওই ধারণার মূল্যহীনতার কথা, যা অকাট্য দলিল-নির্ভর নয়।

জ্ঞানীজনের জন্য অকাট্য দলিল অনুসন্ধান করা ওয়াজিব। অকাট্য দলিল যেখানে পাওয়া যাবে না, সেখানে বুদ্ধিগত সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। আর ধারণাপ্রসূত দলিলের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী। ধারণাপ্রসূত দলিল বলা যাবে তাকেই, যা বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে ধারণাকে প্রবল করে। যেমন ধারণাপ্রসূত দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, বেতের নামাজ ওয়াজিব, ইশরাকের নামাজ সুন্নত এবং মাদকদ্রব্য হারাম। আবার ক্রয়-বিক্রয় যদি অযথার্থ শর্তসম্পৃক্ত হয়, তবে তা কার্যকর করা নিষিদ্ধ। এসবের বিরুদ্ধে কোনো অকাট্য দলিল পাওয়া যায় না। সুতরাং বুদ্ধিগত সাবধানতার দৃষ্টিতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এমতাবস্থায় বিতির নামাজ পরিত্যাগ করা যাবে না, সেবন করা যাবে না মাদক জাতীয় কোনোকিছু এবং করা যাবে না সন্দিগ্ধ ক্রয়-বিক্রয়। আর পুণ্য অর্জনের নিমিত্তে ইশরাক পড়া যাবে। কেননা নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর কোনো দলিলের অনুপস্থিতিই যথেষ্ট। আর বিরুদ্ধ প্রমাণের সম্ভাবনা দেখা দিলে ওই আমল পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। যেমন ওই গর্তে হাত ঢোকানো যাবে না, যেখানে রয়েছে সাপ থাকার সমূহ সম্ভাবনা।

অকাট্য দলিল ও ধারণাগত দলিলের মধ্যে যদি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয়, দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যদি খবরে ওয়াহিদ (একক বর্ণনা) ও কিয়াসের (তুল্যমূল্যতার) মধ্যে, তবে আমল করতে হবে খবরে ওয়াহিদের ভিত্তিতে। এভাবে বুঝে শুনে কাজ করার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে সুবিদিত হাদিসসমূহে এবং আলেমগণের ঐকমত্যে। আবার কোরআনের আয়াত দ্বারাও বিষয়টি প্রমাণিত। যেমন 'তাদের দল থেকে কিছুসংখ্যক লোক কেনো দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানাহরন করে না'। আরো বলা হয়েছে 'ওহে দূরদৃষ্টিসম্পন্নগণ! চিন্তা করো'।

ফেকাহ্‌'র মাসআলার ক্ষেত্রে আলেমগণের বুদ্ধিগত সিদ্ধান্তের পদ্ধতিটিই শেষ পর্যন্ত কার্যকর থাকে। আর পদ্ধতিটি যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে অকাট্য দলিল অনুসারেই তার উপর আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তদ্রূপ সৃষ্টির সূচনা ও পরিণতিবিষয়ক বিবরণগুলি এককবিবরণনির্ভর হলেও বহুব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণিত হওয়ার কারণে অকাট্য দলিলের পর্যায়ভূত হয়ে যায় এবং

সেগুলোর প্রতি প্রতীতি স্থাপনও হয়ে পড়ে অত্যাবশ্যক। আর যে সকল হাদিস নস এ ক্বেতঈর (অকাট্য বচনের) বিরুদ্ধ নয়, 'তারগীব' (চিত্তৌৎসুক্য) ও তারহীবের (চিত্তবিক্ষেপ) ক্ষেত্রে সেগুলোর উপরে আমল করাও জায়েয।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'হাক্ব' (সত্য) কথাটির অর্থ আযাব। আর এখানকার 'আজ্জন' (অনুমান) শব্দটির 'আলিফলাম' হচ্ছে আহ্দী (সীমিতার্থক)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— পিতৃপুরুষসূত্রে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা যে অপধারণা পেয়েছে, অথবা যে ধারণা তারা নিজেরা আবিষ্কার করেছে, তা অমূলক। আর ওই অমূলক ধারণা তাদেরকে আসন্ন আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ, তুমি তাকে উপেক্ষা করে চলো; সে-তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! যারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, আমার বাণী, অথবা আমার জিকির সম্পর্কে অনাসক্ত, আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করে চলুন। কেননা তারা ঘোর পৃথিবীপূজক। পার্থিব সাফল্য ছাড়া তারা আর কোনোকিছুই চায় না। অর্থাৎ হে আমার রসুল! এতোক্ষণের আলোচনায় যখন একথা প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, ওই পৌত্তলিকেরা কেবল অনুমানের উপরে চলে, অন্ধভাবে অনুসরণ করে তাদের পিতৃপুরুষদের, আল্লাহ্র বাণী ও তাঁর রসুলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না, অজ্ঞ ও অন্ধের মতো বন্দনা-অর্চনা করে চলে প্রস্তরপ্রতিমাগুলোর, সেগুলো কারো উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না একথা জেনেও, তারা নিশ্চয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে পুরোপুরি বিমুখ। সুতরাং তাদের পথপ্রাপ্তির চিন্তাকে আপনি আর মোটেও গুরুত্ব দিবেন না। তাদেরকে পথপ্রদর্শনের চেষ্টা এখন নিরর্থক। তারা তো চতুষ্পদ জন্তুতুল্য জ্ঞানহীন, বরং তার চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট। আর তাদেরকে

সাময়িক অবকাশ যখন আমিই দিয়েছি, তখন আপনিও তাদেরকে সাময়িকভাবে উপেক্ষা করে চলুন। তারা কিছুদিনের জন্য পৃথিবীর প্রেমে মজে থাকুক। অবশেষে তাদের উপযুক্ত শাস্তিবিধান তো আমি করবোই।

বাহ্যত দেখা যায়, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বিভিন্ন জাগতিক বিষয়ে তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন। আবার পার্থিব অনেক সাফল্যই তাদের হাতের মুঠায়। এতে করে বোঝা যায়, জ্ঞানবুদ্ধিতে তারাও কম যায় না। বরং তাদের জ্ঞানবুদ্ধি যেনো বেশীই। এমতো ধারণা যে অযথার্থ, সেকথাই বলে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (৩০) এভাবে— 'তাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত; তিনিই ভালো জানেন, কে সৎপথ প্রাপ্ত'।

'তাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত' অর্থ তাদের জ্ঞান কার্যকর হয় পার্থিব জীবনের আওতায়। মহাজীবনের মহাসাফল্যের ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। বিষয়টি উত্তমরূপে অনুধাবন করা উচিত। বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে, মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলো রেখে দিয়েছেন তাঁর অভিপ্রায়ের অধীনে। এগুলো হচ্ছে বাহ্যিক উপকরণ মাত্র, প্রকৃত উপকরণ এগুলো নয়, যদিও দার্শনিকেরা এগুলোকেই মনে করে প্রকৃত ও চূড়ান্ত। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ই জ্ঞান ও বুদ্ধিদাতা। তাই তিনি চাইলে মানুষ অক্ষয় জ্ঞান ও বুদ্ধি পায়। নয়তো জ্ঞান-বুদ্ধির বাহ্যিক উপকরণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মূল বিষয়ে মানুষ থাকে অজ্ঞ ও অন্ধ। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জ্ঞান-বুদ্ধির অবস্থা এরকমই। পার্থিব দৃষ্টিতে তা প্রখর বলে অনুভূত হলেও প্রকৃত অর্থে তা অকার্যকর। এধরনের হতভাগাদেরকে আল্লাহ্ চিরকল্যাণকর ও মহাসাফল্যসম্পর্কিত জ্ঞান দান করেন না। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এভাবেই নির্ণীত হয় জ্ঞান ও অজ্ঞতার প্রভেদ।

উল্লেখ্য, আল্লাহ্তায়ালাই চিরস্বস্তি ও চিরশাস্তির বিষয়টি নির্ধারণ করবেন। প্রকৃত জ্ঞানীকে তিনি পুরস্কৃত করবেন এবং তিরস্কৃত করবেন অপ্রকৃত জ্ঞানীকে। আর মহা জীবনের প্রেক্ষিতে কে সত্যজ্ঞানচ্যুত এবং কে সত্যজ্ঞানসমৃদ্ধ সে সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত কেবল আল্লাহ্ই। সেকথাই এখানে বলে দেওয়া হয়েছে এভাবে— হে আমার রসুল! আপনার প্রভুপালনকর্তাই ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত এবং তিনিই ভালো জানেন কে সৎপথপ্রাপ্ত। সুতরাং আপনি বিচলিত হবেন না। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি আমি দিবোই।

এরপরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে—'আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে ও যা কিছু পৃথিবীতে আছে, তা আল্লাহ্রই। যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার'। একথার অর্থ— আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়স্থিত সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণয়িতা ও অধিকর্তা কেবলই আল্লাহ্। তিনিই প্রকৃত উপাস্য। তিনি তাঁর আনুরূপ্যবিহীন প্রজ্ঞানুসারে যা

www.eelm.weebly.com

অভিপ্রায় করেন, তা-ই করেন। তিনিই পথভ্রষ্ট এবং পথপ্রাপ্তদেরকে পৃথক করে দিয়েছেন। পথভ্রষ্টদের অশুভ পরিণতি এবং পথপ্রাপ্তদের শুভপরিণাম তাঁরই নির্ভুল ও চূড়ান্ত নির্ধারণ। তিনিই মানুষের অশুভ ও শুভ কর্মাবলীকে রক্ষা করেন এবং যথাসময়ে দিবেন তার যথোপযুক্ত প্রতিফল। অশুভ কর্মাধিকারীদেরকে নিক্ষেপ করবেন দোজখে এবং বেহেশতে প্রবেশ করাবেন শুভকর্মসম্পাদনকারীদেরকে।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'তারাই বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য থেকে, ছোটখাট অপরাধ করলেও। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম'।

এখানে 'কাবাইরাল ইছমি' অর্থ গুরুতর পাপ। 'আল ফাওয়াহিশা' অর্থ অশ্লীল কার্য এবং 'লামাম' অর্থ ছোটখাট অপরাধ। কবীরা গুনাহ্ বা গুরুতর পাপ সম্পর্কে সুরা আনআ'মের 'ইন্ তাজ্তানিবু কাবাইরা মা তুনহাওনা' আয়াতের তাফসীরে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। 'অশ্লীল কার্য'ও কবীরা গোনাহ্ হতে পারে, আবার হতে পারে তদপেক্ষা অধিক গর্হিত পাপ। কারো কারো মতে 'অশ্লীল কার্য' বলে এখানে 'কবীরা গোনাহ্'র সর্বোচ্চ সীমাকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর 'লামাম' হচ্ছে ওই সকল পাপ, যা হঠাৎ হয়ে যায় এবং যা স্থায়ী থাকে না, তওবার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধিত হয়ে যায়। অর্থাৎ যে পাপ অভ্যাসে পরিণত হয় না, অসতর্কভাবে হয়ে যায় কখনো কখনো, হঠাৎ হঠাৎ। জাওহারী এরকম বলেছেন। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা, মুজাহিদ ও হাসানের বক্তব্যও এরকম। আতা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন।

সুদ্দীর বর্ণনায় এসেছে, আবু সালেহ বলেছেন, আমাকে একবার 'ইল্লাল্ লামাম' (ছোট খাট অপরাধ করলেও) কথাটির তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। আমি বললাম, মানুষ যে অপরাধের সঙ্গে অতর্কিতে যুক্ত হয়, কিন্তু বারংবার যা করে না। পরে আমি যখন হজরত ইবনে আব্বাসকে একথা জানালাম, তখন তিনি বললেন, সম্মানিত ফেরেশতাগণ তোমাকে এই আয়াতের তাৎপর্য বুঝতে সহায়তা করেছে। বাগবী লিখেছেন, আতা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. একবার এই কবিতাটি পাঠ করলেন—

'ইন্ তাগ্‌ফির আল্লাহুম্মা তাগ্‌ফিরু জাম্মা ওয়া আইয়্যু আবদিন লাকা লা আলাম্মা'।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তুমি যদি ক্ষমা করে দাও, তবে অনেক পাপই তো ক্ষমা করে দিতে পারো। তোমার এমন কোনো দাস কি আছে, যে পাপ করেনি?

উপরে বর্ণিত আলোচনার মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এখানকার 'ইল্লা' 'ইস্তেসনা'টি (ব্যতিক্রমীটি) 'মুত্তাসিল' (সংযুক্ত)। আসল 'ইস্তেসনা' এটাই। অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন, 'লামাম' অর্থ ক্ষুদ্র পাপ বা সগীরা গোনাহ্। যেমন বিবাহসিদ্ধা কোনো রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত, তাকে চোখের ইশারা করা বা তাকে চুম্বন করা ইত্যাদি। অর্থাৎ যে পাপ ব্যভিচার অপেক্ষা কম গর্হিত। এরকম মন্তব্য করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আবু হোরায়রা, মাসরুক

ও শা'বী। তাউস বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতও এরকম। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'লামাম' শব্দের অর্থ সম্পর্কে হজরত আবু হোরায়রার চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ বক্তব্য আমি আর শুনিনি। তিনি বলেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, আল্লাহ্ আদম সন্তানদের জন্য ব্যভিচারের কোনো না কোনো অংশ নির্ধারণ করেছেন, যা তারা অবশ্যই করবে। যেমন চোখের ব্যভিচার হচ্ছে বিবাহবদ্ধা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত, রসনার ব্যভিচার হচ্ছে ব্যভিচার বিষয়ক বচন। নফস যা আকাংখা করে, তা বাস্তবায়ন করে তার বিশেষ অঙ্গ, অথবা করে অস্বীকার। সহল ইবনে আবী সালেহও এরকম বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, চোখের যেনা দৃষ্টি করা, কানের শোনা, মুখের বলা, হাতের স্পর্শ করা এবং পায়ের যেনা হচ্ছে ব্যভিচার বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পদচারণা করা।

হাসান ইবনে ফজল বলেছেন, 'লামাম' অর্থ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবৈধ দৃষ্টিপাত। এধরনের প্রথম দৃষ্টিতে পাপ নেই। দ্বিতীয় দৃষ্টিও 'লামাম' নয়। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, 'লামাম' হচ্ছে বিশেষ অবস্থা এবং সগীরা গোনাহ্ সাধারণ। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, হৃদয়ে উদিত অপধারণার নাম 'লামাম'। বক্তব্যটি জাওহারীর বক্তব্যের সমীপবর্তী। কেননা তাঁর মতে 'আলমামতু' অর্থ আমি সমীপবর্তী হয়েছি। অর্থাৎ ধারণায় পাপের নিকটবর্তী হয়েছি, তবে কার্যত নয়। এ জাতীয় সকল বক্তব্য অনুসারে এখানকার ইস্তেসনাটি হবে বিযুক্ত।

কালাবী বলেছেন, দু'টি প্রকৃতি রয়েছে 'লামাম' এর। ১. এমন পাপ যার জন্য পৃথিবীতে শাস্তির বিধান নেই। আখেরাতেও যার শাস্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। এধরনের পাপ গুরুতর পাপ এবং অশ্লীলতার পর্যায়ে পৌঁছলেও নামাজ দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। ২. এমন অপরাধ, যাতে কোনো মুসলমান লিপ্ত হলেও পরক্ষণে তওবা করে নেয়। এটাও 'লামাম' এর অন্তর্ভূত।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, কালাবীর এমতো বক্তব্য ইতোপূর্বে প্রদত্ত ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। যদি তা-ই হয়, তবে তো বিশেষ-সাধারণ অথবা প্রকৃত-অপ্রকৃত বিষয়াদি একাকার হয়ে যাওয়া অনিবার্য হয়ে যায়। বরং বুঝতে হবে, প্রথম দু'টিকে গ্রহণ করা হয়েছে সম্ভাব্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন বলা হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিতে।

'ইন্না রব্বাকা ওয়াসিউ'ল মাগফিরাহ্' অর্থ তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম। অর্থাৎ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকল পাপ মাফ করে দিতে পারেন, সে পাপ গুরুতর হোক, অথবা লঘু। আবার তার জন্য তওবা করা হোক, অথবা না হোক। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াতে 'যারা মন্দ কর্ম করে, তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল' একথা বলে শাসানো হয়েছিলো। আর এই আয়াতে 'তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম' বলে বান্দাগণের হৃদয়ে করা হয়েছে আশার সঞ্চার, যেনো গুরুতর পাপে পাপীরাও আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ না হয়ে যায়। আর একথাও যেনো মনে না করে যে, আল্লাহ্র জন্য প্রতিটি পাপের দণ্ডদান অত্যাবশ্যক। বিকৃতবিশ্বাসী মুতাজিলা ও খারেজীরা এরকমই ধারণা করে থাকে।

হজরত আলী থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বনী ইসরাইলের জনৈক নবীকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করেছিলেন যে, তুমি তোমার উম্মতের ইবাদতপ্রিয় বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও, তারা যেনো তাদের পুণ্যকর্মের উপরে ভরসা না করে। কেননা মহাবিচারের দিবসে আমি যাকে চাইবো, তাকেই শাস্তি দিবো। আর তোমার উম্মতের মধ্যে যারা পাপী, তাদেরকে জানিয়ে দাও, তারা যেনো নিরাশ না হয়। কেননা আমি তখন অনেকের গুরুতর পাপও মার্জনা করে দিবো। এ ব্যাপারে আমি কারো পরওয়াই করবো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত— যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মৃত্তিকা থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে'। একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমার পরিণতি কী হবে, তা আমি তখন থেকেই জানি, যখন তোমাদের প্রথম পিতাকে সৃষ্টি করেছিলাম মৃত্তিকা থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ছিলে ভ্রূণাকারে।

এখানকার 'আ'লামু' (সম্যক অবগত) কথাটি যদিও পার্থক্যসূচক বিশেষণের শব্দরূপ, তবুও এখানে এর অর্থ এরকম হবে না যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ ভবিষ্যতের ঘটনাবলী সম্পর্কে জানে। বরং অর্থ হবে এরকম— এ সম্পর্কে কেবল আল্লাহ্ই উত্তমরূপে অবহিত। কোনো মানুষই তার জন্মপূর্ববর্তী এবং মৃত্যুপরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে জানে না। পূর্ববর্তী বাক্য থেকেও এরকম আভাস পাওয়া যায়।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ্পাক লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর সৃষ্টির নিয়তি। তখন তাঁর সিংহাসন ছিলো পানির উপর। হজরত উবাদা ইবনে সামেত সূত্রে তিরমিজি বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করলেন কলম। তাকে নির্দেশ দিলেন, লেখো। কলম বললো, কী লিখবো? আল্লাহ্ বললেন, তকদীর। নির্দেশানুসারে কলম লিখে ফেললো যা কিছু ঘটবে তার সকল বিবরণ। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য। হজরত ওমর থেকে ইমাম মালেক, তিরমিজি ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ নবী আদমকে সৃষ্টি করার পর তাঁর পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ করে বের করলেন কিছুসংখ্যক আদম-সন্তানকে। বললেন, এদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি জান্নাতের জন্য। এরা জান্নাতীদের মতোই পুণ্যকর্ম করবে। এরপর বাম হাত তাঁর পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করে বের করলেন কিছুসংখ্যক আদম-সন্তান। বললেন, এদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। এরা পৃথিবীতে করবে জাহান্নামীদের মতো আমল। জনৈক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! তাহলে আর চেষ্টা-সাধনা করে কী হবে। তিনি স. বললেন, জান্নাতীদের জন্য জান্নাতের অনুকূল আমল সহজসাধ্য হবে। এমনকি তারা মৃত্যুও বরণ করবে জান্নাতী আমলের উপর। আর জাহান্নামীদের জন্য সহজ হবে জাহান্নামের অনুকূল কর্ম। ওই কর্মকাণ্ডের উপরেই মৃত্যু ঘটবে তাদের। অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে ও জাহান্নামে।

'ওয়া ইজ আন্তুম্ আজ্বিন্নাতুন ফী বুতূনি উম্মাহাতিকুম' অর্থ এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র সত্য বার্তাবাহক আমাদেরকে জানিয়েছেন, মানব সৃষ্টির মূল উপাদান শুক্রবিন্দুরূপে চল্লিশ দিন পর্যন্ত মায়ের পেটে থাকে। এরপর চল্লিশ দিন থাকে জমাট রক্তরূপে। আরো চল্লিশ দিন থাকে মাংসপিণ্ডের আকারে। তখন আল্লাহ্ তার চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন একজন ফেরেশতাকে। ওই ফেরেশতা লিখে দেয় তার আমল, আয়ুষ্কাল, রিজিক এবং সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য। তারপর তার মধ্যে প্রক্ষেপ করা হয় আত্মা। যিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ জান্নাতীদের মতো আমল করতে করতে পৌঁছে যায় জান্নাতের এক হাত দূরত্বে, এমতাবস্থায় তার উপরে প্রবল হয় তকদীর, তখন সে জাহান্নামীদের মতো আমল শুরু করে এবং পরিশেষে প্রবেশ করে জাহান্নামে। আবার কেউ কেউ জাহান্নামীদের মতো আমল করতে করতে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে, যখন তার ও জাহান্নামের মধ্যে ব্যবধান থাকে মাত্র এক হাত, এমন সময়

www.eelm.weebly.com

তার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে তকদীর। তখন সে শুরু করে জান্নাতীদের মতো আমল এবং অবশেষে উপনীত হয় জান্নাতে। বোখারী ও মুসলিম।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা কোরো না, তিনিই সম্যক জানেন, মুত্তাকী কে'। একথার অর্থ— অতএব হে পুণ্যবানেরা। তোমরা তোমাদের পুণ্যকর্মের প্রচার কোরো না। পাপ পরিহার করতে পেরেছো বলে এবং সদা সর্বদা পুণ্যকর্ম করো বলে আত্মগর্বিত হয়ো না। কেননা তোমাদের শেষ পরিণাম কী, তা তোমরা জানো না। হাসান কথাটির অর্থ করেছেন, কেবল আল্লাহ্ই উত্তমরূপে অবগত যে, অবশেষে বান্দা কেমন আমল করতে শুরু করবে এবং তার পরিশেষ পরিণতি কী হবে। সুতরাং তোমরা নিজেকে পাপ থেকে পবিত্র মনে কোরো না এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছো বলে আত্মপ্রশংসায় লিপ্ত হয়ো না। হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম ব্যাখ্যা করেছেন।

কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, লোকেরা পুণ্যকর্ম করতো এবং বলতো, আমাদের নামাজ, আমাদের রোজা, আমাদের হজ ইত্যাদি। তাদের এমতো আত্মপ্রচারের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। হজরত ছাবেত ইবনে হারেছ আনসারী থেকে ওয়াহেদী, তিবরানী, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, ইহুদীরা তাদের অকালপ্রয়াত শিশুসন্তানদেরকে বলতো 'সিদ্দীক' (সত্যবাদী)। একথা জানতে পেরে রসুল স. বললেন, তারা মিথ্যাবাদী। কেননা শিশুরা মায়ের পেটে থাকতেই আল্লাহ্ তাদের লিখে দেন, তারা সৌভাগ্যবান হবে, না হবে দুর্ভাগা। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় 'আল্লাহ্ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত— যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন.....'।

সূরা নাজ্বম ঃ আয়াত ৩৩—৪৮

www.eelm.weebly.com

❑ তুমি কি দেখিয়াছ সেই ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরাইয়া লয়;

❑ এবং দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করিয়া দেয়?

❑ তাহার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে প্রত্যক্ষ করে?

❑ তাহাকে কি অবগত করা হয় নাই যাহা আছে মূসার কিতাবে,

❑ এবং ইব্রাহীমের কিতাবে, যে পালন করিয়াছিল তাহার দায়িত্ব?

❑ উহা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না,

❑ আর এই যে, মানুষ তাহাই পায় যাহা সে করে,

❑ আর এই যে, তাহার কর্ম অচিরেই দেখান হইবে—

❑ অতঃপর তাহাকে দেওয়া হইবে পূর্ণ প্রতিদান,

❑ আর এই যে, সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট,

❑ আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান,

❑ আর এই যে, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান,

❑ আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল— পুরুষ ও নারী

❑ শুক্রবিন্দু হইতে, যখন উহা স্খলিত হয়,

❑ আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটাইবার দায়িত্ব তাঁহারই,

❑ আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন,

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার সুপ্রিয় রসুল! আপনি তো ওই হতভাগাকে জানেনই, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর ওই লোক সম্পর্কেও তো আপনি অনবহিত নন, যে দান করবে বলে অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও কিছু দিয়েছে, কিছু দেয়নি।

এখানে 'আফা রআইতা' (তুমি কি দেখেছো) প্রশ্নটি বিস্ময়প্রকাশক। আর এর মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে রসুলেপাক স.কে। 'আল্লাজী তাওয়াল্লা' অর্থ যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ যে সত্য থেকে বিমুখ হয়েছে। কথাটির দ্বারা এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে ওলীদ ইবনে মুগীরার দিকে। সে প্রথমে রসুল স. এর অনুসারী হয়েছিলো। তখন তার সঙ্গীসাথীরা তাকে এই বলে লজ্জা দিতে লাগলো যে, তুমি তোমার বাপদাদাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেছো। কেনো তুমি এরকম জঘন্য কাজ করলে? সে বললো, আমি আল্লাহ্র আযাবকে ভয় পাই। তার এক সঙ্গী বললো, তুমি যদি বাপ-দাদাদের ধর্মে ফিরে আসো, তবে তোমাকে আমি এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করবো, আর তোমার উপর যদি আযাব আসে তবে আমি তা মাথা পেতে নিবো। একথা শুনে ওলীদ আবার তার পূর্ব ধর্মমতে ফিরে গেলো। পরিত্যাগ করলো রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গ।

'ওয়া আ'তা কূলীলান' অর্থ এবং দান করে সামান্যই। 'ওয়া আক্দা' অর্থ পরে বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ ওলীদের ওই সঙ্গী অঙ্গীকৃত অর্থের কিছু দিয়েছিলো, অবশিষ্টাংশ আর দেয়ইনি। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন বাগবী। ইবনে জায়েদ সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, মক্কার মুশরিকদের একজন ইসলাম গ্রহণ করলো। তার এক ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বললো, তুমি তোমার মহান পিতৃপুরুষদেরকে অপমান করলে। তাদেরকে পথভ্রষ্ট ও দোজখী বানালে। লোকটি বললো, আমি ভয় করি আল্লাহ্র শাস্তির। সঙ্গীটি বললো, তুমি আমাকে কিছু অর্থ সম্পদ দিতে যদি সম্মত হও, তবে আমি তোমার উপরে শাস্তি নেমে এলে তা মাথা পেতে নিবো। লোকটি তখন তার সঙ্গীকে কিছু অর্থসম্পদ দান করলো। সঙ্গীটি আরো কিছু চাইলো। সে তা-ও দিলো। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। সুদ্দী বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আ'স ইবনে ওয়ায়েল সাহামীকে লক্ষ্য করে। সে কোনো কোনো বিষয়ে রসুল স. এর অনুসরণ করতো। মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবু জেহেল সম্পর্কে। সে বলতো, মোহাম্মদ তো আমাদেরকে ভালো কথাই বলে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে ইসলাম গ্রহণ করতো না। আর এখানকার 'এবং দান করে সামান্যই' অর্থ সে কিছু কিছু বিষয়ে রসুল স. এর অনুসরণ করে। 'পরে বন্ধ করে দেয়' অর্থ বাকীগুলো আর মানে না। অর্থাৎ সে ইমান আনে না। এখানকার 'আকদা' এর শাব্দিক অর্থ— বিচ্ছিন্ন করে দেয়। শব্দটির বুৎপত্তি ঘটেছে 'কুদ্ইয়াতুন' থেকে। আর 'কুদ্ইয়াতুন' বলা হয় ওই অবস্থাকে, যখন কূপ খনন করতে করতে কোনো

পাথরে গিয়ে ঠেকে এবং যে পাথর হয় খননের অন্তরায়। পাথরটি খননকার্য থেকে খননকারীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাই ওই পাথরকে বলা হয় 'কুদ্‌ইয়াতুন'। যেমন আরববাসীগণ বলেন, 'আকদাল হাফিরা ওয়াল জাবাল' (পাহাড় বা পাথর কূপ খননকারীকে বাধা প্রদান করেছে)। মুকাতিল বলেছেন, ওলীদ একজনকে কিছু অর্থ সম্পদ দিতে চেয়ে ছিলো, কিন্তু তার কিছু দিয়েছিলো এবং অবশিষ্টাংশ আর দেয়নি।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে প্রত্যক্ষ করে'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। আর এখানকার 'ফাহুয়া' কথাটির 'ফা' অব্যয়টি কারণপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তার কি অদৃশ্য বিষয়ে কোনো জ্ঞান আছে, যে কারণে সে একথা জানে যে, একজনের আযাব অপরজন বহন করতে পারবে? একথা সে বলতে পারে কী করে? সে কি প্রকৃত তত্ত্ব জানে, না প্রকৃত অবস্থা দেখতে পায়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তাকে কি অবগত করা হয়নি, যা আছে মুসার কিতাবে (৩৬) এবং ইব্রাহিমের কিতাবে, যে পালন করেছিলো তার দায়িত্ব' (৩৭)? এখানে 'মুসার কিতাব' অর্থ তওরাত শরীফ আর 'ইব্রাহিমের কিতাব' অর্থ হজরত ইব্রাহিমের সহিফা (আকাশী পুস্তিকা)। 'আল্লাজী ওফ্‌ফা' অর্থ যে পালন করেছিলো তার দায়িত্ব। অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রদত্ত পুত্রোৎসর্গের দায়িত্ব পালন করেছিলেন যথাযথভাবে। জনগণকে শুনিয়েছিলেন সত্যের বাণী। অকাতরে সহ্য করেছিলেন পৌত্তলিকদের দেওয়া দুঃখকষ্ট। এমনকি অহংকারী নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েও তিনি ধৈর্যহারা হননি। এভাবে তিনি অম্লান বদনে পালন করেছিলেন আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রদত্ত সকল বিধি-বিধান।

'ওয়াফা'র মূল ধাতু 'তাওফীয়ূন' অথবা 'তাওফীয়াতুন'। এর অর্থ প্রাপ্ত দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করা। স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. 'ওয়া ইব্‌রহীমাল্‌ লাজী ওয়াফ্‌ফা' আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলেছেন, তিনি দিবসের প্রথমভাগে চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয়নবী ইব্রাহিম সম্পর্কে 'আল্‌লাজী ওয়াফ্‌ফা' কেনো বলেছেন, তা কি আমি তোমাদেরকে বলবো না? শোনো, তিনি প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠ করতেন 'ফাসুব্‌হানাল্লহি হীনা তুমসুনা ওয়া হীনা তুস্‌বিহুন' আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

হজরত আবু জর ও হজরত আবু দারদা থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌ বলেন, হে আদম কুলোদ্ভবগণ! তোমরা দিবসের শুরুতে আমার উদ্দেশ্যে চার রাকাত নামাজ যদি পাঠ করো, তবে আমি তোমাদের সারা দিনের সকল কাজ সহজসাধ্য করে দিবো। আবু দাউদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন নাঈম, গাতফানী সূত্রে দারেমী ও ইমাম আহমদ।

লক্ষণীয়, এখানে 'ইব্রাহিমের কিতাবে'র পূর্বে এসেছে 'মুসার কিতাব' এর উল্লেখ। এরকম করা হয়েছে 'মুসার কিতাব' অর্থাৎ তওরাত শরীফের প্রসিদ্ধির কারণে। আর এখানে শুরুতেই 'আম্‌' অব্যয়টি প্রযুক্ত হয়েছে বিযুক্তকরূপে। কেননা 'আম' যুক্তক হওয়ার অবস্থায় এরকম হওয়া জরুরী যে, দু'টি সমান্তরাল বিষয়ের একটিতে 'হামযা' মিলিত হবে প্রশ্নবোধকের সঙ্গে এবং 'আম' মিলিত হবে অপরটির সঙ্গে। কিন্তু এখানে সেরকম হয়নি।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের ভাবার্থ এরকমও হয়ে থাকতে পারে যে— আল্লাহ্‌র কিতাবের মাধ্যম অথবা মাধ্যম ছাড়াই কি তাদের এই অদৃশ্য বিষয়টি উন্মোচিত হয়েছে যে, একজনের পাপের বোঝা অপরজন বহন করতে পারে, অথবা পারে না। অথচ একথা তো সুবিদিত, যে একজনের পাপের বোঝা আর একজনের উপরে চাপানো যায় না। তাহলে তারা এরকম অপ-উক্তি করে কেনো?

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'তা এই যে, কোনো বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না'। একথার অর্থ— একজনের পাপ সম্পর্কে অন্য জনকে অভিযুক্ত করা হবে না। ইকরামা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী ইব্রাহিমের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ অপরাধীর পরিবর্তে নিরপরাধ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করতো। কোনো ব্যক্তির পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী অথবা ক্রীতদাস কাউকে খুন করলে হত্যা করা হতো ওই ব্যক্তিকে। নবী ইব্রাহিম তাদেরকে এরকম করতে নিষেধ করে দেন। বলেন, একের অপরাধের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না।

আমি বলি, নবী ইব্রাহিমের পূর্বের লোকেরা শরিয়তের রীতিনীতি মানতো না। তাদের রীতিনীতি ছিলো মূর্খজনোচিত। যেমন রসুল স. এর আবির্ভাবের পূর্বে আউস ও খাজরাজ গোত্রের রীতি ছিলো এরকম— ধনে-সম্মানে-প্রতিপত্তিতে অগ্রগামীদের কোনো রমণীকে কম প্রতিপত্তিশালীদের কেউ হত্যা করলে তারা হত্যা করতো হত্যাকারী গোত্রের কোনো পুরুষকে। এভাবে নিহত ক্রীতদাসের পরিবর্তে জীবন সংহার হতো স্বাধীন ব্যক্তির। আবার কখনো একজনের নিহত হওয়ার প্রেক্ষিতে হত্যা করা হতো

www.eelm.weebly.com

দু'জনকে। তাদের এমতো অপরীতির মূলোৎপাটনার্থেই অবতীর্ণ হয়েছে 'আল হুর্‌রু বিল হুররি ওয়াল আ'ব্‌দু বিল আব্‌দি ওয়াল উন্‌ছা বিল উন্‌ছা' এই আয়াত। সুরা বাকারায় এই আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

একটি সন্দেহ ঃ এক আয়াতে বলা হয়েছে 'কাতাবনা আলা বানী ইসরাঈলা আন্‌নাহু মান ক্বতালা নাফ্‌সান বিগইরি নাফসিন্‌ আও ফাসাদিন ফীল আরদ্বি ফাকা আন্‌নামা ক্বাতালান্‌ নাস জামীআ' (বনী ইসরাইলদের জন্য আমি বিধিবদ্ধ করেছিলাম— কারো হত্যার বিনিময় ছাড়াই যদি কেউ কাউকে হত্যা করে অথবা হত্যা করে ভূপৃষ্ঠে অনাসৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে, তাহলে সে হত্যা করলো গোটা মানবগোষ্ঠীকে)। আয়াতখানি বাহ্যত আলোচ্য আয়াতের বিরোধী। আবার হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ থেকে আহমদ ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কেউ কোনো মন্দ রীতির প্রচলন ঘটালে তার সকল অনুসারীদের পাপের বোঝা তাকেই বহন করতে হবে। এই হাদিসটিও তো আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের পরিপন্থী।

সন্দেহের অপনোদন ঃ উদ্ধৃত আয়াত ও হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানিয়ে দেওয়া যে, হত্যাকারী ও অপরীতি প্রচলনকারীরা নিজেদের পাপ বহন করবেই, কিন্তু তাদের পাপ যেহেতু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তাদের অনুসারীদের মধ্যেও পাপের ব্যাপক বিস্তার ঘটে, তাই তাদের অনুসারীদের

সমপরিমাণ পাপও তাদেরকে বহন করতে হবে। আর উদ্ধৃত হাদিসের শেষাংশে একথাও বলা হয়েছে যে, তাদের অনুসারীদের পাপও এতে করে কিছুমাত্র কমবে না। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওই আযাবকে ভয় করো, যা কেবল জালেমদের উপরেই আসবে না, আসবে ব্যাপকভাবে, জালেম এবং জালেম নয়, সকলের উপরে'। এক হাদিসেও বলা হয়েছে, যখন আল্লাহ্‌ কোনো জাতির উপর আযাব নাজিল করেন, তখন সে আযাবের শিকার হয় ভালো-মন্দ সকলেই। অবশ্য কিয়ামতের দিন তাদের আমল অনুসারে তারা পৃথক পৃথকভাবে পুনরুত্থিত হবে। বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়ও বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অত্যাচারিত অবস্থায় অত্যাচারীকে প্রতিহত না করলে ব্যাপকভাবে সকলের উপরেই আযাব এসে যেতে পারে। বর্ণিত আয়াত ও হাদিসদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— নিজেরা পাপকাজে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ 'সৎকাজের আদেশ-অসৎকাজে নিষেধ' এই দায়িত্ব পালন না করে, তবে ব্যাপকভাবে আল্লাহ্‌র আযাবের অন্তর্ভূত হবে সকলেই।

মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির শোকে তার স্বজনেরা বিলাপ করলে ওই মৃতের উপরে কী আযাব হয়? পূর্ববর্তী যুগের আলেমগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মুলাইকা বলেছেন, মক্কায় ওছমান ইবনে আফফানের এক কন্যার মৃত্যু হলো। আমরা জানাযায় অংশ গ্রহণের জন্য তাঁর বাড়িতে গেলাম। ইবনে ওমর এবং ইবনে আব্বাসও সেখানে উপস্থিত হলেন। ইবনে ওমর, ওমর ইবনে ওসমানকে বললেন, তোমরা কি বিলাপ বন্ধ করবে না? রসুল স. বলেছেন, গৃহবাসীরা বিলাপ করলে মৃত ব্যক্তির উপরে আযাব হয়। ইবনে আব্বাস বললেন, রসুল স. তো বলেছেন এরকম। একথা বলেই তিনি একটি হাদিস বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, ওমর যখন আহত হলেন, তখন সুহাইব ক্রন্দন করতে শুরু করলেন 'হে আমার ভ্রাতা' 'হে আমার ভ্রাতা' বলে। ওমর বললেন, তুমি কি আমার দুঃখে কাঁদছো? শোনোনি, রসুল স. বলেছেন, গৃহবাসীদের কারো কারো কান্নায় কবরবাসীদের আযাব হয়। ইবনে আব্বাস আরো বললেন, যখন ওমরের ইন্তেকাল হলো, তখন আমি এই হাদিস প্রসঙ্গে জননী আয়েশার সঙ্গে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ ওমরের উপরে রহম করুন। আল্লাহ্‌র শপথ! রসুল স. এরকম বলেননি। তিনি স. বলেছেন, কাফেরদের পরিবার পরিজনদের কান্নার কারণে আল্লাহ্‌ কাফেরদের আযাব বাড়িয়ে দেন। এরপর জননী বললেন, তোমাদের জন্য তো কোরআনের এই আয়াতই যথেষ্ট 'কোনো বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না'। ইবনে আব্বাস শেষে বললেন, আল্লাহ্‌ই হাসান এবং কাঁদান। ইবনে ওমর তাঁর বক্তব্য আদ্যোপান্ত শুনলেন, কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করলেন না।

আমি বলি, এ প্রসঙ্গে হজরত ওমরের বক্তব্য অপেক্ষা জননী আয়েশার বক্তব্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল। কেননা হজরত ওমর তাঁর চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন। আর হজরত ওমরের বক্তব্যটি ইতিবাচকও। অন্যান্য হাদিসও তাঁর বক্তব্যের পক্ষে।

হজরত মুগীরা ইবনে শো'বা বর্ণনা করেছেন আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মৃত প্রিয়জনের জন্য রোদন করবে, তার রোদন অনুপাতে মৃত প্রিয়জনের উপরে আযাব হবে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে মৃতের জন্য তার পরিবার-পরিজন ক্রন্দন করে, সেই মৃতের উপরে ঢেলে দেওয়া হয় উত্তপ্ত পানি। এরকম আরো হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইবনে হাব্বানের 'সহীহ্‌' পুস্তকে হজরত আনাস ও হজরত হুসাইন ইবনে ইমরান থেকে, তিবরানী হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব থেকে এবং আবু ইয়ালা হজরত আবু হোরায়রা থেকে। এসকল হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, হজরত ওমরের বিবরণটি বিশুদ্ধ।

www.eelm.weebly.com

উপরে বর্ণিত আলোচনায় পরিদৃষ্ট হয়, আলোচ্য আয়াত ও বর্ণিত হাদিসসমূহের মধ্যে রয়েছে পরস্পরবিরুদ্ধতা। এমতো বিরুদ্ধতা নিরসনার্থে কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, রোদন-বিলাপের অসিয়ত করার কারণে মৃত ব্যক্তির উপর আযাব হয়, না এরকম আযাব কেবল কাফেরদের জন্য নির্ধারিত, সেকথা পরিষ্কার নয়। তবে বিষয়টি পর্যালোচনান্তে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, কেবল রোদন মৃত ব্যক্তির আযাবের কারণ হতে পারে না। আর হাদিসে উল্লেখিত 'বিবুকাই আহলিহী' (তার পরিবারের রোদনের অবস্থায়) কথাটির 'বা' অব্যয়টি অবস্থাজ্ঞাপক। অর্থাৎ পরিবার পরিজনের রোদন করার কালে আযাব হয়। 'বা' এখানে কারণপ্রকাশক নয়। অর্থাৎ রোদনের কারণে আযাব হবে এমন নয়। লক্ষণীয়, জননী আয়েশার দু'টো বক্তব্যের একটিও তেমন সুস্পষ্ট নয়। রোদনের কারণে আযাব যদি কেবল কাফেরদের জন্য নির্ধারিত বলে মেনে নেওয়া হয়, তবুও আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। কেননা আলোচ্য আয়াতের 'কোনো বহনকারী অপরের বোঝা বহণ করবে না' বিধানটি তো বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলের উপরে সমভাবে প্রযোজ্য। বিধানটিকে এখানে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা দলের সঙ্গে বিশেষায়িত করা হয়নি। আবার কোনো কোনো হাদিসের ভাষ্যে 'বিবুকাই' এর 'বা' কে অবস্থাজ্ঞাপকও বলা যায় না। পরিবার পরিজনের কান্নার কারণে যদি মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়, তবে সে শাস্তি তো হবে আখেরাতে। যেমন বলা হয়েছে, তাদের উপরে ঢেলে দেওয়া হবে উত্তপ্ত পানি। আর পরিবার পরিজনের রোদনের কারণে দোজখে শাস্তি দেওয়ার কথাটিও সঙ্গতিহীন। কেননা যখন বেহেশতবাসীরা বেহেশতে এবং দোজখবাসীরা দোজখে চলে যাবে, তখন পৃথিবীতে আর কেউ থাকবেই না। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে শাস্তি দেওয়ার অর্থ কবরের ফেরেশতাদের ধমক দেওয়া। অর্থাৎ ফেরেশতারা তখন ওই কবরবাসীকে শাসাতে থাকে। যেমন সুপরিণত সূত্রে তিরমিজি, হাকেম ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মৃত ব্যক্তির নাম ধরে যখন তার স্বজন নারী পুরুষেরা বিলাপ করতে থাকে, বলে 'হে মহান নেতা' 'হে মহাপুরুষ' তখন আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত দু'জন ফেরেশতা ওই মৃত ব্যক্তিকে বলে, ঠিক করে বলো, তুমি কি সেরকম ছিলে?

আমি বলি, এমতো ব্যাখ্যাতেও বিষয়টি জটিলই থেকে যায়। কেননা একজনের অপকর্মের কারণে অপরজনকে শাসানোও 'কোনো বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না' কথাটির পরিপন্থি। কোনো কোনো বিদ্বান বলেন, এখানে আযাব হওয়ার অর্থ পরিবার-পরিজনের মন্দ কর্মের কারণে মৃত ব্যক্তির দুঃখ হয়। তিবরানী ও ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, হজরত কাইলা বিনতে মুহতারামা বলেছেন, আমি রসুল স. সকাশে আমার মৃত সন্তানের প্রসঙ্গ তুলে কাঁদতে শুরু করলাম। তিনি স. বললেন, এমন কী কেউ আছে, যে এই বিলাপকারিণীর কান্না জোরপূর্বক থামিয়ে দিতে পারে? হে আল্লাহ্র দাস-দাসীগণ! তোমরা মৃতদেরকে কষ্ট দিয়ো না। ইবনে জারীর এই বিবরণটি পছন্দ করেছেন। ইবনে তাইমিয়াও বিবরণটি গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিয়েছেন।

সাঈদ ইবনে মনসুর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ একবার এক জানাযার কাছে কতিপয় মহিলাকে সমবেত অবস্থায় পেয়ে বললেন, হে পাপ বহনকারিণীরা! হে পুণ্য বঞ্চিতারা! ফিরে যাও। জীবিতদের অগ্রগামিনী হয়ে মৃতদেরকে কষ্ট দিয়ো না।

উদ্ভূত জটিলতা নিরসনের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা সম্ভবত একথা বলা যে, আযাব হয় ওই মৃতের উপরে, যে তার পরিবার-পরিজনকে বিলাপ করার জন্য অসিয়ত করে যায় এবং যে নিজেও জীবিত অবস্থায় বিলাপ করতে অভ্যস্ত। অথবা যে তার বিলাপ করতে অভ্যস্ত পরিবার পরিজনকে তার মৃত্যুর পর বিলাপ করতে নিষেধ করে না যায়। এমতোক্ষেত্রে সে আযাব ভোগ করে নিজের কৃতকর্মের কারণে, অন্যের পাপের কারণে নয়। ইমাম বোখারী এই ব্যাখ্যাটিকেই মান্য করেছেন।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'আর এই যে, মানুষ তা-ই পায়, যা সে করে'। একথার অর্থ—প্রত্যেকে পাবে তার প্রচেষ্টার প্রতিফল। অন্যের পাপের কারণে যেমন শাস্তি ভোগ করবে না, তেমনি লাভ করতে পারবে না অন্যের পুণ্য।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কেউ অন্যের পুণ্যের অংশ যে পাবে না, এই আয়াতই তার প্রমাণ। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেছেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ও পূর্বাপর যুগের সকল ধর্মবেত্তা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত রহিত হয়েছে এই আয়াতের মাধ্যমে 'যারা ইমান এনেছে ও তাদের সন্তান-সন্ততি তাদের অনুসরণ করেছে ইমানসহ, আমি তাদের সাথে মিলিয়ে দিয়েছি তাদের সন্তানদেরকে'। ইকরামা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিধান কার্যকর ছিলো হজরত ইব্রাহিম ও হজরত মুসার উম্মতের জন্য। মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর উম্মতের বিধান এমতোক্ষেত্রে ভিন্ন। তারা নিজেদের পুণ্যকর্মের প্রতিদান তো পাবেই, তদুপরি পাবে ওই সকল পুণ্যকর্মের প্রতিদানও, যা তাদের পক্ষে অন্য কেউ করে দেয়। রবী ইবনে আনাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'মানুষ' অর্থ অবিশ্বাসী মানুষ। তারা পরকালে নিজেদের পুণ্যকর্মের প্রতিদানও পাবে না।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'লিল্ ইনসানি' (মানুষের জন্য) এর 'লাম' অর্থ 'আ'লা' (উপর)। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মানুষের জন্য তার

মন্দকর্মই ক্ষতিকর। এমতো ব্যাখ্যা নিলে বুঝতে হবে এই আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের বিশ্লেষণ। আর এমতাবস্থায় এই আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে গ্রথিত হবে ব্যাখ্যাসূত্রে। জমহুরের মতে মানুষ অন্যের পুণ্যকর্মের প্রতিদানও পেতে পারে। এই অভিমতটি উম্মতের ঐকমত্যসম্মত। তাছাড়া এই অভিমতকে পরিপুষ্ট করেছে নিম্নোক্ত হাদিসসমূহ—

আবু নাঈম লিখেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ যখন তাঁর কোনো বিশ্বাসী বান্দার মৃত্যু ঘটান, তখন দু'জন ফেরেশতা তার আত্মা নিয়ে আকাশে উঠে যায় এবং নিবেদন করে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমি তোমার এই প্রিয় বান্দার পুণ্যের হিসাব লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলে আমাদেরকে। এবার তুমি তো তাকে তোমার কাছে ডেকে নিলে। এখন আমাদেরকে অনুমতি দাও, আমরা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে যাই। আল্লাহ্ বলেন, পৃথিবীতে তো রয়েছে আমার বহুসংখ্যক সৃষ্টি। তারা সেখানে আমার প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করছে। তোমরা বরং আমার এই বান্দার কবরে অবস্থান করো। সেখানে বসে কিয়ামত পর্যন্ত পাঠ করতে থাকো 'সুবহানাল্লহ্' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' ও 'আল্লাহু আকবার' এবং তোমাদের এই আমলের পুণ্য তার আমলনামায় লিখতে থাকো।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষ মৃত্যু বরণ করলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তখনো জারী থাকে তার তিনটি আমল— ১. সদকায়ে জারিয়া ২. এমন জ্ঞান, যদ্দ্বারা অন্যেরা উপকৃত হয় ৩. পুণ্যবান সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। হজরত আবু উমামা থেকে ইমাম আহমদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। সদকায়ে জারিয়া (প্রবহমান দান) এবং উপকারপ্রদায়ক জ্ঞান মানুষের স্বপ্রচেষ্টাজাত। কিন্তু পুণ্যবান সন্তান মানুষ নিজের চেষ্টায় পায় না। তৎসত্ত্বেও তাদের দোয়ার ফল সে লাভ করতে পারে। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আল্লাহ্ বেহেশতে তাঁর পুণ্যবান দাসদের মর্যাদা সমুন্নত করে দিবেন। দাস তখন নিবেদন করবে, হে আমার প্রভুপালক! এরকম উচ্চ মর্যাদা আমি পেলাম কী করে? আল্লাহ্ বলবেন, তোমার সন্তানদের ক্ষমাপ্রার্থনার কারণে। তারা তোমার ক্ষমার জন্য দোয়া করেছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কবরবাসীরা ডুবন্ত মানুষের মতো। তারা পিতা-মাতা সন্তান ও সুহৃদগণের দোয়ার অপেক্ষায় থাকে। যখন তাদের দোয়া তাদের নিকটে পৌঁছে, তখন তা তাদের কাছে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত সকল কিছু অপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে হয়। আর আল্লাহ্ পৃথিবীবাসীদের দোয়া কবরবাসীদের কাছে পৌঁছে দেন পর্বতের মতো বিশাল আকারে। কবরবাসীদের কাছে পৃথিবীবাসীদের উপকার হচ্ছে তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা। এরকম বর্ণনা করেছেন বায়হাকী ও দায়লামী। তিবরানী তাঁর 'আল আওসাত' পুস্তকে সুপরিণতসূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। তারা গোনাহসহ কবরে গেলেও কবর থেকে বের হবে গোনাহ্মুক্ত অবস্থায়। পৃথিবীবাসী বিশ্বাসীরা তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবে। তাই তারা গোনাহ্ থেকে পবিত্র হয়ে যাবে।

আল্লামা সুয়ূ্যতী বলেছেন, বহুসংখ্যক মনীষি এ বিষয়ে একমত যে, জীবিতদের দোয়া মৃতদের জন্য উপকারী হয়। কোরআন মজীদেও এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন 'আর যারা তাদের পরে আসবে, তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, আর ক্ষমা করে দাও আমাদের ওই সকল ভ্রাতাকে, যারা আমাদের পূর্বে গত হয়েছে'।

আমি বলি, জীবিতদের দোয়া মৃত-জীবিত সকলের জন্যই উপকারী। কথাটি সর্বজনবিদিত। আর এটা কেবল এই উম্মতের জন্যই বিশিষ্ট নয়, পূর্ববর্তী উম্মতের ক্ষেত্রেও ছিলো একই বিধান। যেমন হজরত নুহ প্রার্থনা করেছিলেন, 'রব্বিগ্ফির্লি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়া লিমান দাখালা বাইতি'। হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, 'আমি আমার পালনকর্তার নিকট তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবো'। হজরত ইউসুফ তাঁর ভ্রাতাদেরকে বলেছিলেন 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন'। হজরত ইউসুফের ভ্রাতাগণ তাঁদের পিতার কাছে নিবেদন করেছিলেন 'হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আমরা তো অপরাধী'। হজরত মুসা বলেছিলেন 'রব্বিগফিরলি ওয়ালি আখী ওয়া আদ্খিলনা ফী রহমাতিকা'।

প্রকৃত কথা এই যে, হজরত ইব্রাহিম ও হজরত মুসার কিতাবে উল্লেখিত 'মানুষ তা-ই পায়, যা সে করে' এই বিধানের অর্থ হচ্ছে— নামাজ, রোজা, দান ও হজের সওয়াব পাবে কেবল আমলকারীরা, অন্যেরা নয়। বিধানটি তাঁদের উম্মতদের জন্যই বিশিষ্ট। উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য বিধানটি রহিত করে দেওয়া হয়েছে। রহিতকারী আয়াত হচ্ছে 'আলহাক্না বিহিম জুর্রিয়্যাতাহুম' (তাদের সাথে মিলিয়ে দিয়েছি তাদের সন্তানদেরকে)।

www.eelm.weebly.com

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি একবার নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার মা অসিয়ত করার আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তিনি যদি মৃত্যুশয্যায় কথা বলতে পারতেন, তবে অবশ্যই কিছু দান খয়রাত করে যেতেন। এখন আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু দান খয়রাত করে যাই, তবে তিনি কি তার সওয়াব পাবেন? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। বোখারী, মুসলিম। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, সা'দ ইবনে উবাদার অনুপস্থিতিতে তাঁর মা পরলোকগমন করলেন। তিনি রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! আমার অনুপস্থিতিতে আমার মাতার ইন্তেকাল হয়েছে। এখন আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু দান-খয়রাত করি, তবে তিনি কি তার প্রতিদান পাবেন? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। সা'দ বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার মাতার পক্ষ থেকে আমি আমার বাগানটি দান করে দিলাম। বোখারী। ইমাম আহমদ ও সুনান রচয়িতাগণ লিখেছেন, এরকম হজরত সা'দ ইবনে উবাদা নিবেদন করলেন, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আমার জননী পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এখন তাঁর পক্ষ থেকে কী দান করলে তা উত্তম হবে? তিনি স. বললেন, পানি। একথার পর তিনি মানুষের

জলকষ্ট নিবারণার্থে খনন করালেন একটি কূপ। বললেন, এটা সা'দের জননীর। হজরত আনাস থেকে যথাসূত্রে তিবরানীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা নফল সদকা করতে চাইলে মা-বাবার পক্ষ থেকে কোরো। এরকম করলে তোমাদের মা-বাবা সওয়াব তো পাবেই, তোমরাও সওয়াব থেকে এতটুকু বঞ্চিত হবে না। হজরত মুয়াবিয়া ইবনে জুনদুব থেকে দায়লামীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত আনাস বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, কোনো বাড়িতে কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হলে সেই বাড়ির কেউ যদি তার পক্ষ থেকে কিছু দান করে, তবে জিবরাইল একটি নূরের পাত্রে ওই দান নিয়ে ওই লোকের সমাধিতে হাজির হয় এবং বলে, হে সমাধিবাসী! এই নাও তোমার উপহার। তোমার ঘরের লোক এ উপহার পাঠিয়েছে। গ্রহণ করো প্রফুল্লচিত্তে। কিন্তু তার পাশের সমাধিবাসী হয়ে যায় বিমর্ষ। তিবরানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আল আওসাত' পুস্তকে। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার পিতামাতার পক্ষ থেকে হজ করে আল্লাহ্ তাঁর পিতামাতাকে দোজখ থেকে মুক্তিদান করেন। হজ পালনকারীও পুণ্য থেকে বঞ্চিত হয় না।। তিনি স. একথাও বলেছেন যে, সবচেয়ে বড় হৃদ্যতা হচ্ছে নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর পর তার পক্ষ থেকে হজ করা। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইসপাহানী। তবে তাঁর সূত্রপরম্পরাভূত দু'জন বর্ণনাকারী অপরিচিত।

আবু আবদুল্লাহ ছাকাফী বর্ণনা করেছেন, হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম বলেছেন, একবার আমি নিবেদন করলাম, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আমার পিতা-মাতা যদি হজ না করে মরে যায়, তবে আমি কি তাদের পক্ষ থেকে হজ করতে পারবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। এরকম করলে তারা মুক্তি পাবে। আকাশে তাদের আত্মাদ্বয়কে শুভসংবাদ দেওয়া হবে, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের পুণ্যজমা থাকবে। হজরত উকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেছেন, একবার এক রমণী রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আমার মাতা পৃথিবীর মায়া পরিত্যাগ করেছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ করতে পারবো? তিনি স. বললেন, আগে বলো, তোমার মায়ের ঋণ যদি তুমি শোধ করে দাও, তবে কি তা পরিশোধিত হবে? রমণীটি বললো, নিশ্চয়। তিনি স. বললেন, তাহলে তার পক্ষ থেকে হজও তো করতে পারবে। আর একবার এক লোক নিবেদন করলো, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আমার পিতা চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি হজ করে যেতে পারেন নি। তিনি স. বললেন, তোমার পিতা যদি কোনো ঋণ রেখে যান, তবে তুমি কি তা পরিশোধ করবে না? সে বললো, নিশ্চয়ই। তিনি স. বললেন, তাহলে মনে করো এটাও ঋণ। তুমি এ ঋণ পরিশোধ করে দাও। উত্তম সূত্রপরম্পরায় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায্যার ও তিবরানী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ সম্পাদন করবে, সে-ও পাবে ওই মৃত ব্যক্তির সমান

সওয়াব। তিবরানী হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'আল আওসাতে'। আতা ও জায়েদ ইবনে আসলাম অপরিণতসূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি একবার আবেদন জানালো, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আমার পিতা কবরবাসী হয়েছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে গোলাম আজাদ করতে পারি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। ইবনে আবী শায়বাও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, হজের সময় রসুল স. এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, 'লাব্বাইকা আন শুবরামা' (শুবরামার পক্ষ থেকে আমি উপস্থিত)। রসুল স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, শুবরামা কে? সে বললো, আমার প্রিয় ভ্রাতা। তিনি স. বললেন, তুমি তোমার হজ আগে আদায় করো। তারপর আদায় কোরো শুবরামার হজ। আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারাকুতনী, বায়হাকী। বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, হজরত আমর ইবনে

আ'স একবার রসুল স. এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার পিতা তাঁর পক্ষ থেকে দাসমুক্তির অসিয়ত করে গিয়েছেন। হিশাম তাঁর পক্ষ থেকে পঞ্চাশজন দাসকে মুক্ত করে দিয়েছে। তিনি স. বললেন, না। দান করা, হজ করা ও দাস মুক্ত করা যায় কেবল মুসলমানদের পক্ষ থেকে। হজরত হাজ্জাজ ইবনে দীনার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নেকির উপরে নেকি হচ্ছে এরকম আমল— নিজের জন্য নামাজ যেমন পড়বে, তেমনি নামাজ পড়বে মা-বাবার জন্য। নিজের জন্য যেমন রোজা করবে, তেমনি রোজা পালন করবে তাদের জন্যও এবং দানও করবে তাদের জন্য নিজের জন্য দান করার সঙ্গে সঙ্গে। ইবনে আবী শায়বা।

হজরত বুরাইদা বর্ণনা করেছেন, এক রমণী একবার নিবেদন জানালো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার মা যদি দুই মাসের রোজা অনাদায়ী রেখে মারা যায়, তবে আমি কি তার পক্ষ থেকে তার রোজাগুলি আদায় করতে পারবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। রমণীটি বললো, তিনি হজও করেননি। আমি কি তার হজ আদায় করে দিতে পারবো? তিনি স.জবাব দিলেন, হ্যাঁ। মুসলিম। মাতা আয়েশা সিদ্দীকা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রয়াত ব্যক্তির উপরে যদি রোজা ফরজ থাকে, তবে তার ওলী তার পক্ষ থেকে ওই রোজা সম্পাদন করবে। বোখারী, মুসলিম। হজরত আলী থেকে সুপরিণতসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কোনো কবরস্থান অতিক্রমকালে যদি কেউ এগারো বার সুরা এখলাস পাঠ করে, তবে তার সওয়াব আল্লাহ্ দান করবেন কবরবাসীদের সংখ্যানুপাতে। আবু মোহাম্মদ সমরখন্দি। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ যদি কোনো কবরস্থানে প্রবেশ করে সুরা ফাতেহা, সুরা এখলাস ও সুরা তাকাছুর পাঠ করে বলে, হে আল্লাহ্। আমি যা পাঠ করলাম, তার সওয়াব তুমি বিশ্বাসী কবরবাসী ও কবরবাসিনীদেরকে দান করো, তবে কবরবাসীরা তার জন্য শাফায়াত করবে। আবুল কাসেম, সাঈদ ইবনে আলী। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ কবরস্থানে গিয়ে সুরা ইয়াসিন পাঠ করলে আল্লাহ্ ওই কবরের বাসিন্দাদের

শাস্তি লাঘব করে দেন। আর ওই ব্যক্তিকে নেকি দেন কবরবাসীদের সংখ্যানুসারে। স্বসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবদুল আজিজ তাঁর 'আল খিলাল' পুস্তকে।

আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, দাফনের সময় মৃত ব্যক্তির শিয়রে সুরা ফাতেহা এবং পায়ের দিকে সুরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ পাঠ করার কথা হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত ইবনে ওমর থেকে সুপরিণতসূত্রেও এরকম হাদিস এসেছে। তবে হজরত আলা ইবনে জালাহ'র বর্ণনায় এসেছে পায়ের দিকে সুরা বাকারার প্রথম কয়েকটি আয়াত এবং শেষ কয়েকটি আয়াত পাঠ করার কথা। এক হাদিসে বলা হয়েছে, তোমরা মৃতদের জন্য সুরা ইয়াসিন পাঠ কোরো। কুরতুবী বলেছেন, জমহুরের মতানুসারে এ কথার অর্থ— মৃত্যুপথযাত্রীর পাশে বসে সুরা ইয়াসিন পাঠ করতে হবে। আবদুল ওয়াহেদ মুকাদ্দেসি বলেছেন, কথাটির অর্থ— সুরা ইয়াসিন পাঠ করতে হবে গোরস্থানে প্রবেশের সময়। মুহিব তাবারী বলেছেন, একথা বলে উভয় অবস্থায় সুরা ইয়াসিন পাঠ করতে বলা হয়েছে। ইবনে শায়বার বর্ণনায় এসেছে, আতা বলেছেন, যদি কারো মৃত্যুর পরে তার পক্ষ থেকে ক্রীতদাস মুক্ত করা হয় এবং হজ বা দান খয়রাত করা হয়, তবে তার সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যায়। ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, কাসেম ইবনে মোহাম্মদ উল্লেখ করেছেন, মাতামহোদয়া আয়েশা সওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তাঁর পরলোকগত সহোদর হজরত আবদুর রহমানের জন্য একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

হাফেজ শামসুদ্দিন ইবনে আবদুল ওয়াহেদ বলেছেন, লোকেরা সচরাচর শহরে একত্রিত হয়ে আপন আপন মৃত স্বজনদের জন্য কোরআন পাঠ করে থাকে। কেউই যেহেতু এই প্রথাটিকে অসিদ্ধ বলেননি, তাই এটা যেনো পরিণত হয়েছে ঐকমত্যে। খালালীর বর্ণনায় এসেছে, শা'বী বলেছেন, আনসারগণের মধ্যে কেউ পরলোকগমণ করলে লোকেরা তাঁদের কবরে যাতায়াত করতো এবং সেখানে কোরআন পাঠ করতো। 'এহ্‌ইয়াউল উলুম' গ্রন্থে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তোমরা যখন কবরস্থানে প্রবেশ করো, তখন সুরা ফাতেহা, সুরা ফালাক ও সুরা এখলাস পাঠ করে কবরের বাসিন্দাদের জন্য সওয়াব বখশিস করে দিয়ো। তোমাদের এমতো আমল তাদের উপকারে আসবে। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম বায়যাবী লিখেছেন, কেউ হজ ও দান খয়রাত করার নিয়ত করে তা পালন করার আগেই যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে হয়ে যায় তওবাকারীর মতো। তার সুহৃদদের মধ্যে কেউ যদি ওই হজ এবং দান-খয়রাত করে দেয়, তবে তা হবে তার নিজের আমলের মতোই। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরকম হওয়াও সম্ভব যে— মুমিন ব্যক্তি অপর কারো আমল দ্বারা উপকৃত হতে পারে তখনই, যখন আমলকারী ব্যক্তিটিও হয় মুমিন। ইমান হচ্ছে নিজের কাজ। আর অন্যের জন্য আমল করা নির্ভর করে নিজেরই ইমানের উপর।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আর এই যে, তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে—(৪০) অতঃপর তাকে দেওয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান' (৪১)। একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে সকলকে দেখানো হবে তাদের কৃতকর্মের স্বরূপ। বিশ্বাসীদের ভালো কাজের উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে সেদিন। আর অবিশ্বাসীদের ভালো কাজগুলো হবে নিষ্ফল। কেননা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে হয় আল্লাহ্‌র পরিতোষ সাধনের উদ্দেশ্যে। অবিশ্বাসীদের সেরকম উদ্দেশ্য থাকেই না। তাদের আমল বরবাদ হয়ে যাওয়ার একটি কারণ এরকমও হতে পারে যে, তাদের ভালো কাজের প্রতিদান তাদেরকে দেওয়া হয়ে থাকে এই পৃথিবীতেই।

আমি বলি, তাহলে এখানকার 'সা'ইয়া' শব্দটির অর্থ 'ইচ্ছা করা' হওয়াই সমীচীন। অভিধানবেত্তাগণ 'সা'আ' ও 'সা'ইয়ান' শব্দের অর্থ করেছেন— ইচ্ছা করা, আমল করা, যাওয়া, দৌড়ানো, পূর্ণ হওয়া, অর্জন করা। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞ বলেছেন, শব্দটির আভিধানিক অর্থ— দ্রুতগতিতে চলা। কোনো কাজে চেষ্টা করা অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানুষ তা-ই পায়, যা সে আমল করার ইচ্ছা করে। আর ওই আমলের প্রতিফল তাদেরকে দেখানো হবে মহাবিচারের দিবসে। সেদিনই সকলকে দেওয়া হবে যথোপযুক্ত ও পরিপূর্ণ প্রতিদান— পুরস্কার, অথবা তিরস্কার। যথাসূত্রসম্বলিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমলের ফলাফল নিয়তের উপরে নির্ভরশীল। মানুষ তেমনই পাবে, যেমন সে নিয়ত করবে। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের জন্য হিজরত করলে, তার হিজরত হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের জন্য। আর পার্থিব লাভ অথবা কোনো নারীকে বিবাহ করার জন্য যদি কেউ হিজরত করে, তবে তার হিজরত হবে তাদেরই জন্য। বোখারী, মুসলিম। আলোচ্য আয়াতের ভাবার্থ এই হাদিসেরই অনুরূপ। বর্ণিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আবার একথা বলা যাবে না যে, একজনের নেক আমল দ্বারা অন্য জন ফায়দা পাবে না। লক্ষণীয়, জানাযার নামাজ পাঠ ও রসুল স. এর প্রতি দরূদ পাঠ করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। এরকম তো করা হয়েছে অন্যকে উপকার প্রদানার্থেই।

এরপরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'আর এই যে, সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট'।

এখানকার 'আলমুন্‌তাহা' শব্দটি ক্রিয়ামূল, ব্যবহৃত হয়েছে 'পরিসমাপ্তি' অর্থে। আর এই আয়াতখানি পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মাধ্যমে 'মুসার কিতাবে এবং ইব্রাহিমের কিতাবে' কথাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, মহাপ্রভুপালয়িতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ নেই। অর্থাৎ তিনিই সমস্ত চিন্তার পরিসমাপ্তি। চিন্তার যাত্রা সেখানে গিয়েই শেষ হয়ে যায়। বাগবী হাদিসটির মর্মপ্রসঙ্গকে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসের সঙ্গে মিলিয়েছেন। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করো, স্রষ্টা

সম্পর্কে চিন্তা কোরো না। কেননা কোনো জ্ঞান তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না। আবু শায়েখ তাঁর 'আল আজমত' গ্রন্থে এবং বাগবী হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বস্তু সম্পর্কে গবেষণা করো, আল্লাহ্ সম্পর্কে গবেষণা কোরো না। কেননা সপ্তম আকাশের ঊর্ধ্বে আল্লাহ্‌র কুরসী পর্যন্ত রয়েছে সাত হাজার নূরের স্তর। আর আল্লাহ্ তো সকল কিছুর আনুরূপ্যবিহীন ঊর্ধ্বে।

আমি বলি, একথার অর্থ— মানুষের চিন্তা আল্লাহ্‌র কুরসী পর্যন্তই যখন পৌঁছতে পারে না, তখন আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছবে কীভাবে? তিনি যে ঊর্ধ্বেরও ঊর্ধ্বে স্থানাতীত, কালাতীত, ধারণাতীত, কল্পনাতীত, আনুরূপ্যবিহীন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, মাখলুক সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো, খালেক সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কোরো না। কেননা তিনি অননুমানীয়। আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়ায়' লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করো, আল্লাহ্‌র সত্তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা কোরো না। আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু জর বলেছেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হও, তাঁর সত্তা নিয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়ো না।

আমি বলি, চিন্তা-গবেষণার অর্থ— অজ্ঞাত পরিণামকে জানার জন্য উদ্যোগসমূহকে বিন্যস্ত করা। আর একথা সর্ববাদীসম্মত যে, এমতো উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব কেবল আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর বিষয়ে। আর এ সকল কিছুর মূল আয়োজক যেহেতু আল্লাহ্, তাই সকল চিন্তা-গবেষণা তাঁর সমীপে সমাপ্ত ও সমর্পিত হতে বাধ্য। তিনি যে চির অমুখাপেক্ষী, চিরঅজ্ঞেয়।

'আল্লাহ্‌র সত্তা (জাত) সম্পর্কে চিন্তা করা নিষেধ' একথা থেকে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, আল্লাহ্‌র জাত পর্যন্ত প্রকারবিহীন চিন্তা পৌঁছা সম্ভব নয়। 'সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট' একথাটিই তো প্রমাণ করে যে,

www.eelm.weebly.com

সায়েরের (পথপরিক্রমণের) শেষ সীমা আল্লাহ্‌র জাত। সুফী সাধকগণ যে 'সায়েরে ফিল্লাহ্'র কথা বলেন, তা আল্লাহ্‌র শূয়ুন, এতেবারাত ও আসমা-সিফাতের সায়ের, জাতে মহয (শুধুই সত্তা) যাকে 'লা তাইয়ুন' বলা হয়, তার সায়ের নয়। অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন— সৃষ্টির সমাপ্তি ও সর্বশেষ প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌রই দিকে। কেউ কেউ বলেছেন, অনুগ্রহের প্রারম্ভ আল্লাহ্‌র দিক থেকে এবং শেষ উদ্দেশ্যও সেই পর্যন্তই।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান'। একথার অর্থ— সৃজন সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র। এ বিষয়ে অন্য কারো অংশ মাত্রই নেই। বান্দার হাসি-কান্নাও সৃজন করেন তিনিই। আতা ইবনে আবী মুসলিম কথাটির অর্থ করেছেন— বান্দাকে তিনিই প্রসন্ন করেন এবং চিন্তিত করেন। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— তিনিই জান্নাতীদেরকে জান্নাতে হাসাবেন এবং দোজখে কাঁদাবেন দোজখীদেরকে। জুহাক বলেছেন, কথাটির অর্থ— বৃষ্টিবর্ষণের মাধ্যমে তিনিই মৃত্তিকাকে করেন হর্ষোৎফুল্ল এবং রোদনার্ত করেন আকাশকে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত জাবের ইবনে সামুরা বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণ রসুল স. এর সঙ্গে বসে কবিতা আবৃত্তি করতেন, মূর্খতার যুগের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতেন, আবার কখনো মেতে উঠতেন হাস্য-কৌতুকে। রসুল স.ও তখন মৃদু মৃদু হাসতেন। মুসলিমের বর্ণনায় কথাগুলো এসেছে এভাবে— লোকেরা কথাবার্তা বলতো, জাহেলী যুগের কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিতো এবং হাসাহাসি করতো। রসুল স. তখন মৃদু হাসতেন। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, তাঁরা কবিতা আবৃত্তি করতেন। বাগবী তাঁর 'শরহে সুন্নাহ্'য় লিখেছেন, কাতাদা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমরকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, রসুল স. এর কোনো সাহাবী কী হাসতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু ইমান তাদের হৃদয়ে ছিলো পর্বতের মতো সুদৃঢ়। বেলাল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনামুখর হতেন। কিন্তু রাত হলে তাঁরা হয়ে যেতেন পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, মাতা মহোদয়া আয়েশা বলেছেন, আমি রসুল স.কে কখনো এমনভাবে হাসতে দেখিনি, যাতে করে তাঁর কণ্ঠতালু দৃষ্ট হয়। তাঁর হাসি ছিলো মৃদু হাসি। বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত জারীর বলেছেন, মুসলমান হওয়ার পর আমি কখনো রসুল স.কে আমার উপরে মেজাজ করতে দেখিনি। বরং তিনি আমাকে দেখলেই মৃদু হাসতেন। তিরমিজি উল্লেখ করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হারেছ বলেছেন, আমি রসুল স. এর চেয়ে অধিক সস্মিত হতে আর কাউকে দেখিনি। বোখারী উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যার অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তবে কাঁদতে বেশী, হাসতে কম। আহমদ, তিরমিজি এবং ইবনে মাজাও হজরত আবু জর থেকে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে এসেছে এই কথাটুকু— আর তোমরা তোমাদের পত্নীদের সঙ্গে আনন্দমগ্ন হতে না। আল্লাহ্‌র শরণ গ্রহণের জন্য তোমরা চলে যেতে সুউচ্চ কোনো শৈলমালায়।

এরপরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'আর এই যে, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান'। একথার অর্থ— তিনিই প্রাণবানকে করেন প্রাণহীন এবং নিষ্প্রাণকে দান করেন প্রাণ। যেমন মৃতবৎ শুক্রবিন্দুকে করেন প্রাণী এবং নিশ্চেতন বীজকে বৃক্ষ। কোনো কোনো জ্ঞানবেত্তা কথাটির অর্থ করেছেন— তিনি পিতৃপুরুষদের জীবনে যতিপাত ঘটান এবং তাদের উত্তরপুরুষদের জীবনকে রাখেন সচল। কথাটির অর্থ এরকমও হয়ে থাকতে পারে যে— তিনিই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দান করেন মূর্খতারূপ মৃত্যু এবং মারেফতসমৃদ্ধ জীবন দান করেন বিশ্বাসীগণকে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল— পুরুষ ও নারী (৪৫) শুক্রবিন্দু থেকে, যখন তা স্খলিত হয় (৪৬), আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্ব তাঁরই (৪৭)। এখানে 'যাওজ্বাইন' অর্থ

যুগল। 'জাকারা ওয়াল উনছা' অর্থ পুরুষ ও নারী। 'ইজা তুম্না' অর্থ যখন স্খলিত হয়। কথাটি এসেছে 'মানার রজুল' অথবা 'আমনার রজুল' থেকে। অর্থাৎ লোকটি ফোঁটা ফেলেছে। এরকম অর্থ করেছেন জুহাক ও আতা ইবনে আবী রিবাহ্। অন্যান্যরা অর্থ করেছেন 'মানাইতুশ্ শাই' থেকে। অর্থাৎ আমি বস্তুটির পরিমাপ করেছি। এভাবে কথাটি দাঁড়াবে— ওই শুক্রবিন্দু, যখন তার পরিমাপ করা হয়। আর 'আন্না আলাইহিন্ নাশ্আতাল্ উখ্রা' অর্থ পুনরায় ঘটাবার দায়িত্ব তাঁরই। উল্লেখ্য, এমতো দায়িত্ব পালন করতে আল্লাহ্ বাধ্য নন। কেননা তিনি সকল ঔচিত্য ও বাধ্যতা থেকে পুতঃপবিত্র। তাই বুঝতে হবে এখানকার 'আন্না' অব্যয়টি অত্যাবশ্যকতাবোধক নয়। বরং অঙ্গীকারপূরক। অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ্ মহাপুনরুত্থান ঘটাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেহেতু তিনি তা ঘটাবেনই। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ই স্খলিত ও সুপরিমিত শুক্রকণা থেকে সৃষ্টি

www.eelm.weebly.com

করেন মানব-মানবী। আর তিনি যেহেতু মহাপুনরুত্থান ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেহেতু তিনি তা ঘটাবেনই। কেননা প্রতিশ্রুতিভঙ্গের মতো অপবিত্রতা থেকে তিনি সততমুক্ত।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন'।

এখানে 'আগ্না' (অভাবমুক্ত করেন) অর্থ দান করেন প্রয়োজনের অধিক সম্পদ, যা থেকে সঞ্চয় করা যায়। অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন 'তাগান্না' অর্থ সে বিত্তপতি হয়েছে। অর্থাৎ সে তার প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করা সত্ত্বেও রয়ে গিয়েছে তার সঞ্চয়।

এখানকার 'আক্বনা' (সম্পদ দান করেন) কথাটিও প্রায় সমঅর্থসম্পন্ন। এরপরে অনুক্ত রয়েছে আর একটি শব্দ 'আফক্বার'। শব্দটি অনুক্ত থাকা সত্ত্বেও বক্তব্যটি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। জুহাক বলেছেন, 'আগ্না' অর্থ সোনা-রূপা ও অন্যান্য সম্পদ দিয়ে কাউকে সম্পদপতি করে দেওয়া। আর 'আগ্না' অর্থ স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য সম্পদ দিয়ে কাউকে অবস্থাপন্ন করা। কাতাদা বলেছেন, এখানে 'সম্পদ দান করেন' (আক্বনা) অর্থ তিনিই মানুষকে দান করেন সেবক-সেবিকা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আগ্না' ও 'আক্বনা' অর্থ কাউকে ধনী ও প্রশস্তহস্ত বানিয়ে দেওয়া। মুজাহিদ ও মুকাতিল বলেছেন, 'আক্বনা' অর্থ সম্পদ দানের সঙ্গে সঙ্গে দান করেন পরিতুষ্টি। ইবনে জায়েদ বলেছেন, 'আগ্না' অর্থ তিনি দান করেন অঢেল। আর 'আক্বনা' অর্থ দান করেন পরিমিত। এরকম অর্থ করার পর তিনি প্রমাণরূপে পাঠ করেন 'তিনি যাকে ইচ্ছা সুপ্রশস্ত করে দেন তার উপজীবিকা। আবার পরিমিতও করেন'। আখফাশ বলেছেন, 'আক্বনা' অর্থ তিনিই সকলকে করেন কেবল তাঁর মুখাপেক্ষী।

সূরা নাজ্‌ম ঃ আয়াত ৪৯—৬২

---

www.eelm.weebly.com

❑ আর এই যে, তিনি শি'রা নক্ষত্রের মালিক।

❑ আর এই যে, তিনিই প্রাচীন 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছিলেন

❑ এবং ছামূদ সম্প্রদায়কেও; কাহাকেও তিনি বাকী রাখেন নাই—

❑ আর ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও, উহারা ছিল অতিশয় যালিম ও অবাধ্য।

❑ উল্টানো আবাসভূমিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন

❑ উহাকে আচ্ছন্ন করিল কী সর্বগ্রাসী শাস্তি!

❑ তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিবে?

❑ অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এই নবীও এক সতর্ককারী।

❑ কিয়ামত আসন্ন,

❑ আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই ইহা ব্যক্ত করিতে সক্ষম নহে।

❑ তোমরা কি এই কথায় বিস্ময় বোধ করিতেছ!

❑ এবং হাসি-ঠাট্টা করিতেছ! ক্রন্দন করিতেছ না?

❑ তোমরা তো উদাসীন,

❑ অতএব আল্লাহ্কে সিজ্দা কর এবং তাঁহার 'ইবাদত কর।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ই লুব্ধক নক্ষত্রের সৃজক, নিয়ন্ত্রক ও অধিকারক। 'শি'রা' অর্থ লুব্ধক। নক্ষত্রটি থাকে জাওযা তারকার পশ্চাতে। 'শি'রা নক্ষত্র আসলে দু'টি। একটির নাম উবুর এবং অপরটির নাম কামীস। এখানে 'শি'রা' বলে বুঝানো হয়েছে উবুরকে। বনী খাজাআ এর পূজা করতো। তাদের এক গোত্রপতি ছিলো কাবশা। সে-ই প্রবর্তন করেছিলো কুপ্রথাটির। সে আবার কুরায়েশদের প্রতিমাপূজার ঘোর বিরোধিতা করতো। রসুল স. প্রতিমাপূজার বিরোধী ছিলেন। সে কারণে অংশীবাদী কুরায়েশরা তাঁকে বলতো ইবনে আবী কাবশা' (কাবশার পিতার পুত্র)। অথচ তিনি স. বিরোধী ছিলেন নক্ষত্রপূজারও। সেকারণেই আল্লাহ্ তাঁর পক্ষে প্রত্যাদেশ করলেন 'তিনি শি'রা নক্ষত্রের মালিক'। একথার অর্থ— শি'রা নক্ষত্রও আল্লাহ্র সৃষ্টিসমূহের মধ্যে একটি সৃষ্টি। সুতরাং উপাসনা গ্রহণের যোগ্যতা ও অধিকার তারও নেই। মিথ্যা

উপাস্য হিসেবে ওই নক্ষত্রটিও লাত, উয্যা ও মানাত প্রতিমার সমান্তরাল। সম্ভবত হজরত ইব্রাহিমের যুগেও নক্ষত্রপূজার প্রচলন ছিলো। তাই তাঁর ও হজরত মুসার কিতাবেও শি'রা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'আর এই যে, তিনিই প্রাচীন আ'দ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন'। এখানে 'আ'দানিল্ উলা' অর্থ প্রাচীন আ'দ সম্প্রদায়। তারা ছিলো নবী হুদের সম্প্রদায়। হজরত নুহের সম্প্রদায়ের মহাপ্লাবনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর। আল্লাহ্ তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন ভয়ংকর ঝঞ্ঝাবাত্যার মাধ্যমে। পরে আ'দ নামে আর একটি জাতির উদ্ভব ঘটেছিলো। তাদেরকে বলা হয় আ'দে ছানি বা দ্বিতীয় আ'দ।

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'এবং ছামুদ সম্প্রদায়কেও, কাউকেই তিনি বাকী রাখেননি'। ছামুদ জাতি ছিলো হজরত সালেহের সম্প্রদায়। তাদেরকে আল্লাহ্ বিনাশ করেছিলেন বিকট ও বীভৎস আওয়াজের দ্বারা। ওই ছামুদ জাতিই ছিলো দ্বিতীয় আ'দ। 'ফামা আব্ক্বা' অর্থ কাউকেই তিনি বাকী রাখেননি। ওই সর্বগ্রাসী আযাবে তাদের সকলকেই বিনাশ হতে হয়েছিলো।

এরপরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'আর এদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায়কেও, তারা ছিলো অতিশয় জালেম ও অবাধ্য'। একথার অর্থ— আ'দ ও ছামুদ জাতির পূর্বে নবী নুহের সম্প্রদায়কেও মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত করে বিনাশ করা হয়েছিলো। তারা ছিলো খুবই অত্যাচারী এবং চরম অবাধ্য। নবী নুহ দীর্ঘকাল ব্যাপী তাদের শত অত্যাচার সহ্য করেও তাদেরকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতো। যখন তখন প্রহার করতো।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'উল্টানো আবাসভূমিকে নিক্ষেপ করেছিলেন (৫৩) তাকে আচ্ছন্ন করলো কী সর্বগ্রাসী শাস্তি' (৫৪)। এখানে 'আল মু'তাফিকাতা' অর্থ ওই লোকালয়সমূহ, যা আকাশে উঠিয়ে উল্টো করে ভূমিতে প্রোথিত করা হয়েছিলো। 'মা গাশ্‌শা' অর্থ কী সর্বগ্রাসী শাস্তি। অর্থাৎ ভূমিতে প্রোথিত করার পর তাদের উপর আকাশ থেকে বর্ষণ করা হয়েছিলো প্রস্তর। এখানে 'মা' (কী) বলে উহ্য রাখা হয়েছে শাস্তির বিবরণকে। এরকম করা হয়েছে এখানে ওই শাস্তির ভয়াবহতা প্রকাশার্থে।

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে'? প্রশ্নটি সকলের প্রতিই প্রযোজ্য। অর্থাৎ কারো পক্ষেই এটা সমীচীন নয় যে, তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ করে অকৃতজ্ঞ ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হয়ে যায়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের প্রশ্নটি করা হয়েছে ওলীদ ইবনে মুগীরাকে লক্ষ্য করে। 'তাতামারা' অর্থ এখানে সন্দেহ করবে, বচসা করবে।

এরপরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এই নবীও এক সতর্ককারী'। একথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! অতীত যুগের নবী

রসুলগণ যেমন তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করতেন, তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিতেন, মোহাম্মদ মোস্তফা স. ও তেমনি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন মহাকল্যাণের দিকে। এখানে 'মিনান্ নুজুরি' অর্থ সতর্ককারীদের ন্যায়। আর 'উলা' (অতীতের) শব্দটি এখানে স্ত্রীলিঙ্গবাচকরূপে ব্যবহার করা হয়েছে এ কারণে যে, এখানে 'নুজুর' (সতর্ককারী) অর্থ সতর্ককারীদের দল বহুবচন।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'কিয়ামত আসন্ন (৫৭), আল্লাহ্ ব্যতীত কেউই তা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়' (৫৮)।

এখানে 'আযিফাতিল্ আযিফাহ্' অর্থ কিয়ামত আসন্ন। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ইক্বতারাবাতিস্‌সাআহ্' (সময় সন্নিকট)। 'কাশিফাহ্' অর্থ ব্যক্তকারী, প্রকাশকারী। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 'লা ইউজ্বাল্লিহা লি ওয়াক্বতিহা ইল্লা হুয়া' (আল্লাহ্ই যথাসময়ে কিয়ামতকে প্রকাশ করে দিবেন)। এখানে 'কাশিফাতুন' এর 'তা' অক্ষরটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক। আর এখানকার 'মাউসুফ' (বিশেষ্য) রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ততাসহ বাক্যটি দাঁড়ায়— 'নাফসুন কাশিফাহ্' (ব্যক্তকারী লোক)। অথবা 'তা' অক্ষরটি এখানে আধিক্যপ্রকাশক। কিংবা এখানকার 'কাশিফা' হচ্ছে ক্রিয়ামূল। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কিয়ামতকে কেউ প্রকাশ করতে পারবে না। আতা, কাতাদা ও জুহাক কথাটির অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ বিশ্বাসীগণকে মহাপ্রলয়ের ভয়াবহতা ও কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'তোমরা কি একথায় বিস্ময়বোধ করছো (৫৯)! এবং হাসি-ঠাট্টা করছো! ক্রন্দন করছো না (৬০)? তোমরা তো উদাসীন' (৬১)।

এখানে 'এই কথায়' অর্থ কোরআনের বাণী শুনে। 'আফা' প্রশ্নটি বিস্ময়বোধক, অস্বীকৃতিজ্ঞাপক এবং সাবধানতাসূচক। 'ওয়া তাদ্বহাকূন' অর্থ এবং হাসি-ঠাট্টা করছো। 'ওয়ালা তাবকূন' অর্থ ক্রন্দন করছো না? অর্থাৎ তোমরা পৃথিবীর প্রেমে মত্ত, অথচ পরকাল সম্পর্কে উদাসীন। আবার পুণ্যের স্বল্পতা ও পাপের প্রাচুর্যের কারণে তোমাদের কোনো চিন্তা-ভয়-ডর নেই।

'সামিদূন' অর্থ উদাসীন। 'সামুদূন' অর্থ কোনো বিষয়ে অমনোযোগী হওয়া। আরববাসীগণ বলেন 'দা' মিন্না সামুদাকা' (আমাদের পক্ষ থেকে তোমার ঔদাসীন্য দূর করো)। ওয়ালেবী ও আওফির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। ইকরামা বলেছেন, ইয়েমিনীদের ভাষায় 'সামুদ' অর্থ গান গাওয়া। মক্কার মুশরিকেরা কোরআন শুনলে গান গাইতো এবং হাসি-ঠাট্টা করতো। জুহাক বলেছেন, 'সামিদূন' অর্থ অহংকারী। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— ক্রোধান্বিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ— দর্পী, আত্মগর্বী। মাথা উঁচু করে পদবিক্ষেপকারী উটকে আরববাসীরা বলেন—

সামাদাল বায়ী'রু। ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, এরকম অর্থ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। তিনি আরো বলেছেন, রসুল স. যখন নামাজে কোরআন পাঠ করতেন, তখন অংশীবাদীরা সেখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতো। তাদের এমতো গর্হিত কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

www.eelm.weebly.com

শেষোক্ত আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'অতএব আল্লাহ্‌কে সেজদা করো এবং তাঁর ইবাদত করো'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার এক জনসমাবেশে সুরা নাজ্‌ম পাঠের পর রসুল স. সেজদা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সেজদা করেছিলো মুসলমান-অমুসলমান জ্বিন-ইনসান সকলেই। বোখারী। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, এক বৈঠকে রসুল স. সুরা ওয়ান্‌ নাজ্‌ম পাঠ করে সেজদা করলেন। সমবেত লোকেরাও তাঁর সাথে সাথে সেজদা করলো। সেজদা করলো না কেবল এক কুরায়েশ বৃদ্ধ। সে কেবল এক খণ্ড পাথর বা মাটি নিয়ে কপালে লাগালো এবং বললো, আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি দেখেছি কিছুদিন পর ওই বৃদ্ধ কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। বোখারী, মুসলিম। এক বর্ণনায় এসেছে, বোখারী বলেছেন, ওই বৃদ্ধটি ছিলো উমাইয়া ইবনে খলিফ। বোখারী আরো বলেছেন, সেজদার আয়াতসম্বলিত সুরারূপে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে সুরা 'ওয়ান্‌ নাজ্‌ম'। রসুল স. এই সুরা তেলাওয়াত করার পর সেজদা করেছেন।

হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত বলেছেন, আমি রসুল স. এর সামনে সুরা 'ওয়ান্‌ নাজ্‌ম' আবৃত্তি করেছি। কিন্তু তিনি সেজদা করেননি। উল্লেখ্য, যারা তেলাওয়াতের সেজদাকে ওয়াজিব মনে করেন না, সুন্নত মনে করেন, তাঁরা তাঁদের অভিমতের পক্ষে এই হাদিসকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে অবশ্য এরকম বলা যেতে পারে যে, রসুল স. হয়তো সে সময় ওজু অবস্থায় ছিলেন না। তাই তাৎক্ষণিকভাবে সেজদা করেননি। অথবা অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা হয়তো তখন তাঁর ছিলো। তাছাড়া পরবর্তীতে যে তিনি স. ওই সেজদা আদায় করেননি, সেকথারও তো কোনো প্রমাণ নেই। এরকম বলার সুযোগও কিন্তু নেই। কেননা পরবর্তী সময়ে সেজদা না করলে তিনি স. নিশ্চয় সেকথা বলে দিতেন। গোপন করতেন না। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে হজরত ওমরের বক্তব্যও প্রণিধাননীয়। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌ আমাদের উপর তেলাওয়াতের সেজদা অপরিহার্য করেননি। তবে আমরা চাইলে সেজদা করতে পারবো। উল্লেখ্য, তেলাওয়াতের সিজদার বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে সুরা ইনশিকাকের তাফসীরে।

সূরা ক্বমার

মহাতীর্থ মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরায় রয়েছে ৩টি রুকু এবং ৫৫ টি আয়াত।

'আল ক্বমার' অর্থ চন্দ্র। বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, মক্কাবাসীরা একবার রসুল স. এর কাছে মোজেজা বা অলৌকিকত্ব

দেখতে চাইলো। তিনি স. তাদেরকে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করে দেখিয়ে ছিলেন। চন্দ্রের দুই টুকরার মাঝখানে দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো হেরা পর্বত। বোখারী এবং মুসলিমও হজরত আনাস থেকে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। শা'বী ও কাতাদা সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার ঘটনা রসুল স. এর জীবনে দু'বার ঘটেছিলো। তিরমিজি লিখেছেন, মক্কা শরীফে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছিলো দু'বার। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছিলো আলোচ্য সুরার প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়। বোখারী, মুসলিম ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. এর হিজরতের পূর্বে চাঁদ ফেটে গিয়ে দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিলো। এরকম অলৌকিক দৃশ্য দেখে মক্কার পৌত্তলিকেরা বলেছিলো, চাঁদের উপরে যাদু করা হয়েছে। তখন অবতীর্ণ হয়েছিলো 'কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে, আর চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে'। বোখারীর সূত্রসহযোগে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. এর জামানায় চাঁদ ভেঙে দুইভাগ হয়ে গিয়েছিলো। তিনি স. তখন বলেছিলেন, তোমরা সাক্ষী থেকো। বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্‌ থেকে মাসরুক সূত্রে আবুদ দোহা বর্ণনা করেছেন, মক্কায় সকলের সম্মুখে চাঁদ ভেঙে দুই টুকরা হলো। পরে আবার জোড়া লেগে গেলো। এই সূত্রে আর এক হাদিসে এসেছে, মক্কা শরীফে চাঁদ ফেটে গেলো। লোকেরা বলতে লাগলো ইবনে আবী কাবশা তোমাদের উপর যাদু করেছে। তোমরা পর্যটকদেরকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো। পরে পর্যটকদেরকে জিজ্ঞেস করে জানা গেলো, তারাও চন্দ্রদ্বিখন্ডিত হওয়ার দৃশ্য দেখতে পেয়েছে। তখন অবতীর্ণ হলো সুরা আল ক্বমারের আয়াতসমূহ।

সূরা ক্বমার ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

❑ কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে, আর চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে,

❑ উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, 'ইহা তো চিরাচরিত জাদু।'

❑ উহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, আর প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যে পৌঁছিবে।

❑ উহাদের নিকট আসিয়াছে সুসংবাদ, যাহাতে আছে সাবধান বাণী;

❑ ইহা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্কবাণী উহাদের কোন উপকারে আসে নাই।

❑ অতএব তুমি উহাদের উপেক্ষা কর। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করিবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে,

❑ অপমানে অবনমিত নেত্রে সেদিন উহারা কবর হইতে বাহির হইবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়,

❑ উহারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটিয়া আসিবে ভীত-বিহ্বল হইয়া। কাফিররা বলিবে, 'কঠিন এই দিন।'

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। আর চন্দ্রের এই বিদীর্ণ হওয়া কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। এখানে 'ইক্বতারবাত' অর্থ নিকটবর্তী হয়েছে।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'তারা কোনো নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এতো চিরাচরিত যাদু'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের স্বভাব হচ্ছে আল্লাহ্র সত্য নিদর্শনকে বিনা বিবেচনায় অস্বীকার করা। তাই আল্লাহ্র রসুলের রেসালতের প্রমাণরূপে যখন তাদের কাছে কোনো মোজেজা প্রদর্শন করা হয়, তখন তারা চিন্তা-ভাবনা না করেই তা প্রত্যাখ্যান করে। উপরন্তু বলে, এতো যাদু ছাড়া অন্য কিছু নয়। অন্যান্য যাদুর মতোই এর প্রভাবও অচিরেই দূরীভূত হয়ে যাবে।

এখানে 'সিহরুম মুসতামির' অর্থ চিরাচরিত যাদু। 'মাররা' ও ইস্তামার্রা' শব্দ দু'টো সমার্থক। যেমন সমার্থক 'ক্বর্রা' ও ইস্তাক্বর্রা'। মুজাহিদ ও কাতাদা এরকম বলেছেন। তবে আবুল আলিয়া ও জুহাক বলেছেন, 'মুস্তামির' অর্থ শক্তিশালী বা সুদৃঢ় যাদু, এমন কাজ, যা যাদুর উপরে প্রতিষ্ঠিত। আরববাসীগণ বলেন, 'ওয়াস্তামার্রল হাব্লু' (রশি মজবুত হয়েছে) 'আসতামার্তুল হাব্লা' (আমি রশি পাকিয়েছি মজবুত করে) 'ইস্তামার্রাশ্ শাই' (বস্তুটি সুদৃঢ়)। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'মুস্তামার' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'মার্রত' (তিক্ততা) থেকে। এভাবে 'সিহরুম্ মুস্তামির' এর অর্থ দাঁড়ায়— তিক্ত যাদু, বিস্বাদ যাদু।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তারা তো সত্যপ্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল খুশির অনুসরণ করে। আর প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যস্থলে পৌছবে'। একথার অর্থ— তারা কোরআন, রসুল এবং রসুল কর্তৃক প্রদর্শিত

মোজেজাসমূহ স্বচক্ষে দেখার পর আল্লাহর এ সকল নির্দশনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, অনুসরণ করে কুপ্রবৃত্তির, কিন্তু একথা বুঝতে চেষ্টা করে না যে, সত্য ও মিথ্যা এক সময় তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীদের কী দুর্গতি না হবে।

এখানকার 'কাজ্জাবু' এবং 'ওয়াত্তাবাউ' শব্দদু'টো অতীতকালবোধক। এরকম করা হয়েছে তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিতে যে, সত্যপ্রত্যাখ্যান করা এবং খেয়ালখুশির অনুসরণ করা তাদের পুরোনো স্বভাব।

'ওয়া কুল্লু আমরিম্ মুস্তাক্বির' অর্থ প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবে। অর্থাৎ সকল কিছুই শেষ সীমায় পৌছে সুস্থির হয়ে যাবে— পৃথিবীর ব্যর্থতা-সফলতা, আখেরাতের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য সবকিছুই। 'ইসতিক্বরার' অর্থ— শেষ সীমায় পৌছে যাওয়া। প্রত্যেক বিষয়ই তার পরিণত প্রান্তে গিয়ে স্থবির হয়ে যায়। কোনো কোনো বিদ্বান কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— প্রত্যেক সুনিশ্চিত বিষয় একদিন না একদিন বাস্তবায়িত হবে। তারপর তা হয়ে যাবে অনড়। আল্লাহর অঙ্গীকারও বাস্তবায়িত হবে যথাযথভাবে। কালাবী অর্থ করেছেন— প্রতিটি বিষয়েরই রয়েছে যথাযথ তত্ত্ব। পৃথিবীতে মানুষের পক্ষ থেকে যা প্রকাশ হওয়ার তা প্রকাশ পাবে, আর আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কার্যকর হওয়ার তা-ও এক সময় আসবে শ্রুতি, দৃষ্টি ও অনুভবের আওতায়। কাতাদা অর্থ করেছেন— যে বিষয়ের পরিসমাপ্তি ভালোর সঙ্গে হবে, তা হয়ে যাবে চিরকালীন ভালো এবং যে বিষয়ের শেষ অবস্থা মন্দের সঙ্গে হবে, তা হয়ে যাবে অনন্ত মন্দ। কেউ কেউ বলেছেন, ভাল-মন্দ উভয়ের সমাপ্তি হবে তাদের নিজ নিজ পর্যায়ে। সুতরাং পুণ্য নিয়ে যাবে জান্নাতে আর জাহান্নামে নিয়ে যাবে পাপ। কেউ কেউ বলেছেন, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদের স্ব স্ব অবস্থানে। আর তা জানা যাবে সওয়াব ও আমলের আকারে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট এসেছে সুসংবাদ, যাতে আছে সাবধান বাণী (৪), এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান। তবে এই সতর্কবাণী তাদের কোনো উপকারে আসেনি' (৫)।

এখানে 'তাদের নিকট এসেছে সুসংবাদ' অর্থাৎ, কোরআন এসেছে তাদের জন্য বিশ্বাসের সৌরভ, পুণ্যময় জীবন এবং বেহেশতের শুভসমাচার নিয়ে। 'যাতে আছে সাবধান বাণী' অর্থ যে কোরআনে বিবৃত হয়েছে অতীতের অবাধ্য সম্প্রদায়গুলোর মর্মান্তিক পরিণতির বিবরণ, যাতে তারা সাবধান হতে পারে। সত্যপ্রত্যাখানের অপবিত্র পথ ছেড়ে গ্রহণ করতে পারে বিশ্বাসের পবিত্র পথ। এখানে 'মুযদাজ্বার' (সাবধান বাণী) এর 'মীম' অক্ষরটি বসেছে ধাতুমূলের অর্থ প্রকাশার্থে। এভাবে শব্দটি দাঁড়াবে — সাবধান করণার্থে, হুঁশিয়ারি জ্ঞাপনার্থে।

'হিকমাতুন বালিগাতুন' অর্থ এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রজ্ঞা, যা ত্রুটিবিচ্যুতিহীন, অপকর্ষহীন। আর 'ফামা তুগনিন্ নুজুর' অর্থ কিন্তু এই সতর্কবাণী তাদের কোনো কাজে আসেনি। এখানকার 'মা' অব্যয়টি নেতিবাচক। অর্থাৎ নবী রসুল প্রেরণ,

www.eelm.weebly.com

ভীতি প্রদর্শন, কোনো কিছুই তাদের জন্য ফলদায়ক নয়। অথবা 'মা' এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। অর্থাৎ নবী-রসুল অথবা সাবধানবাণী কি তাদের জন্য ফলদায়ক হলো? 'নুজূর' হচ্ছে 'নাজীর' এর বহুবচন। আর 'নাজীর' অর্থ সতর্ককারী, ভীতি প্রদর্শনকারী। অথবা এর অর্থ 'ইনজার' (ভয় প্রদর্শন করা)।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো, যেদিন আহবানকারীরা আহবান করবে। এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে (৬), অপমানে আনত নেত্রে সেদিন তারা কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় (৭), তারা আহবানকারীদের নিকটে ছুটে আসবে ভীতবিহ্বল হয়ে। কাফেরেরা বলবে, কঠিন এই দিন' (৮)।

এখানে 'ফাতাওয়াল্লা আন্‌হুম' অর্থ অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো। অর্থাৎ হে আমার বাণীবাহক! তারা কী বললো, বা করলো সে নিয়ে আপনি আর মাথা ঘামাবেন না। কালাতিপাত করবেন না তাদের পথপ্রাপ্তির দুশ্চিন্তায়। তারা সংশোধনের অযোগ্য। উল্লেখ্য, বিধানটি পরবর্তীতে রহিত হয়েছে জেহাদের আয়াতের মাধ্যমে।

'যেদিন' অর্থ কিয়ামতের দিন। 'আহ্বানকারী আহ্বান করবে' অর্থ পুনরুত্থান দিবসে ইসরাফিল ফেরেশতা বায়তুল মাকদিসের পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে বলবে, হে প্রাচীন অস্থি! ছিন্নভিন্ন গাত্রচর্ম! হে বিক্ষিপ্ত-বিপ্রস্ত কেশ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা শেষ বিচারের জন্য সমবেত হও। এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন জায়েদ ইবনে জাবের সূত্রে ইবনে আসাকের। 'শাইইন নুকুর' অর্থ এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে। অথবা এর অর্থ এমন নিকৃষ্ট অবস্থার দিকে, যার কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। চূড়ান্ত পর্যায়ের ঘৃণিত হওয়ার কারণে মানুষ যার সম্পর্কে জানতেও চায় না।

'খুশ্‌শাআ'ন আবসারুহুম' অর্থ অপমানে অবনমিত নেত্রে, লজ্জায় অবনত দৃষ্টিতে। মিনাল আজ্দাছি কাআন্‌না হুম জ্বারাদুম মুনতাশির' অর্থ কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো। 'মুহত্বিয়ীনা ইলাদ্ দায়ী' অর্থ তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীতবিহ্বল হয়ে। কথাটির অর্থ এরকমও হয়ে থাকতে পারে যে— তারা তখন আহ্বানকারীর দিকে লক্ষ্য রেখেই দ্রুতগতিতে তার কাছে ছুটে যেতে থাকবে। আর 'ইয়াকুলুল্ কাফিরূনা হাজা ইয়াওমুন আ'সীর' অর্থ কাফেরেরা বলবে, কঠিন এই দিন।

সূরা ক্বমারঃ আয়াত ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

❑ ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও অস্বীকার করিয়াছিল— অস্বীকার করিয়াছিল আমার বান্দাকে আর বলিয়াছিল, 'এ তো এক পাগল।' আর তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

❑ তখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, 'আমি তো অসহায়, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর।'

❑ ফলে আমি উন্মুক্ত করিয়া দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে,

❑ এবং মৃত্তিকা হইতে উৎসারিত করিলাম প্রস্রবণ; অতঃপর সকল পানি মিলিত হইল এক পরিকল্পনা অনুসারে।

❑ তখন নূহকে আরোহণ করাইলাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে,

www.eelm.weebly.com

❑ যাহা চলিত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে; ইহা পুরস্কার তাহার জন্য, যে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।
❑ আমি ইহাকে রাখিয়া দিয়াছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?
❑ কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!
❑ কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার উম্মতের পূর্বে আমার প্রিয়নবী নুহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো তার সম্প্রদায়ের লোকেরা। এভাবে তারা তিন পুরুষ ধরে সাড়ে নয়শত বৎসর তাঁকে ক্রমাগত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলো। তাঁকে তারা সাব্যস্ত করেছিলো 'পাগল' বলে। তাঁকে হত্যা করবে বলে ভয়ও দেখাতো তারা। শেষে নুহ অতিষ্ট হয়ে আমার কাছে প্রর্থনা করেছিলো, হে আমার প্রভুপালক! আমি তো অসহায়। তুমি তো জানোই, সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বৎসর তাদের শুভবোধ জাগ্রত হবার অপেক্ষায় কাটিয়ে দিলাম। তবুও তারা সত্য ধর্মের দিকে মুখ ফিরালো না। অতএব তুমি এবার এর প্রতিবিধান করো।

এখানে 'ওয়া ক্বলু মাজ্‌নূন' অর্থ তারা বলেছিলো, এতো এক পাগল। কথাটির সম্পর্ক রয়েছে 'ওয়ায্‌দুজ্বির' (আর তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো)

এর সঙ্গে। অর্থাৎ তারা এরকমও বলতো যে, কোনো অশুভ জ্বিন তার উপরে ভর করে তার জ্ঞানবুদ্ধি বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন মুজাহিদ। অথবা কথাটির সম্পর্ক রয়েছে এখানকার 'ক্বলু' (বলেছিলো) এর সাথে। অর্থাৎ তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে কেবল পাগল বলেই ক্ষান্ত হতো না, বিভিন্নভাবে ভয়ও দেখাতো তাঁকে। চালাতো অকথ্য অত্যাচার। আরো বলতো, নুহ, তুমি যদি তোমার ধর্ম প্রচার থেকে বিরত না হও, তবে আমরা তোমাকে পাথর মেরে ধ্বংস করে দিবো। মুজাহিদ সূত্রে আবদ ইবনে হুমাইদ বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে রাস্তায় পেলে তাঁর গলা চেপে ধরতো। তিনি অচৈতন্য হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতেন। জ্ঞান ফিরে পেলে বলতেন, হে আমার পরম মমতাপরবশ প্রভুপালক! আমার কারণে আমার সম্প্রদায়কে তুমি মার্জনা করো। এরা তো অবুঝ। ইমাম আহমদও তাঁর 'আজ জুহুদ' গ্রন্থে মুজাহিদ ও ওবায়েদ ইবনে উমায়ের সূত্রে এরকম বর্ণনা করেছেন।

'ফাদাআ' রব্বাহু' অর্থ তখন সে তার প্রতিপালককে ডেকে বললো 'ইননী মাগলুবুন ফানতাসির' অর্থ আমি তো অসহায়, অতএব তুমি প্রতিবিধান করো। অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করলেন, তোমার সম্প্রদায়ের কোনো লোক আর ইমান আনবে না। সুতরাং তুমি তাদের সম্পর্কে আর আশাবাদী হয়ো না। তখন নবী নুহ প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালক! আমি তো তাদের কাছে পরাভূত। ইমান যখন তারা আনবেই না, তখন তুমি তোমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করো। পৃথিবী থেকে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দাও চিরতরে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে (১১), এবং মৃত্তিকা থেকে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ, অতঃপর সকল পানি মিলিত হলো এক পরিকল্পনা অনুসারে' (১২)। একথার অর্থ আমি তখন চল্লিশ দিন ধরে এক নাগাড়ে আকাশ থেকে মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। মাটি থেকেও উৎসারণ ঘটালাম অসংখ্য প্রস্রবণের। এভাবে আকাশাগত ও মৃত্তিকাউৎসারিত পানির পাহাড় মিলে সৃষ্টি হলো মহাপ্লাবন। বিশ্বচরাচর ডুবে গেলো অথৈ পানির নিচে। এভাবে আমার পরিকল্পনা অনুসারে ডুবে মরে, পচে, গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

এখনে 'মুনহামির' অর্থ প্রবল বারিবর্ষণ অর্থাৎ চল্লিশ দিনের একটানা মুষলধারায় বৃষ্টিপাত। কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা বলেছেন, ওই বৃষ্টিপাতে ডুবে গিয়েছিলো আকাশ পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান। 'ওয়া ফাজ্জারনাল্ আরদ্বা উয়ূন' অর্থ মৃত্তিকা থেকে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ। 'মাউ' অর্থ পানি। শব্দটি একবচন বহুবচন উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে শেষোক্ত অর্থটি গ্রহণীয়। তাই বলা হয়েছে 'সকল পানি'। আর এখানকার 'আ'লা আমরিন ক্বদ্ কুদিরা' অর্থ মিলিত হলো এক পরিকল্পনা অনুসারে। অর্থাৎ লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ বিধানানুসারে। অথবা কথাটির অর্থ এখানে এরকমও হয়ে থাকতে পারে যে, আকাশের ও মাটির পানি তখন মিলিত করা হয়েছিলো সমপরিসরে। কিংবা আল্লাহ্ তখন আকাশাগত ও মৃত্তিকাউত্থিত পানি এমনভাবে মিলিত করেছিলেন, যাতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সকলেরই সলিল সমাধি ঘটে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে—'তখন নুহকে আরোহণ করলাম কাষ্ঠ ও কিলক নির্মিত এক নৌযানে (১৩), যা চলতো আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, এটা প্রতিফল তার জন্য, যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলো (১৪)। এখানে 'কাষ্ঠ ও কিলক নির্মিত' অর্থ কাঠের তক্তায় পেরেক গেঁথে গেঁথে প্রস্তুতকৃত। 'যা চলতো আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে' অর্থ লোহার পেরেক দিয়ে গাঁথা ওই

www.eelm.weebly.com

কাঠের নৌকাটির গতি ও যতি নিয়ন্ত্রিত হতো আমার ইশারায়। আর এটা পুরস্কার তার, যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলো, অর্থ এভাবেই আমি আমার প্রিয় নবী নুহকে বিজয়ী করেছিলাম তার অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপরে। এটা ছিলো তার প্রতি আমা কর্তৃক প্রদত্ত অনন্য উপহার। উল্লেখ্য, পৃথিবীবাসীদের জন্য নবী রসুলগণ হন আল্লাহ্‌র অনন্যসাধারণ অনুকম্পা। হজরত নুহের সম্প্রদায় এই অনুকম্পার প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। অবজ্ঞাভরে দূরে ঠেলে দিয়েছে। আল্লাহ্ তাই তাকে কাছে টেনে নিয়ে তাকে পুরস্কৃত করেছেন। নিরাপদ রেখেছেন মহাপ্লাবনের মহাবিপদ থেকে। আর অকৃতজ্ঞদেরকে করে দিয়েছেন চিরপরাভূত। ডুবিয়ে মেরেছেন অথৈ তুফানের তলায়। কোনো কোনো তাফসীরকার 'লিমান কানা কুফির' (যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলো) কথাটির 'মান' এর অর্থ করেছেন এভাবে— তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলো। তাই তিনি তাদেরকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন মহাপ্লাবনের পানিতে। অথবা কথাটির অর্থ হবে— অবাধ্যদেরকে নিমজ্জিত করা হলো এবং হজরত নুহ ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরবর্গকে নৌকায় উঠিয়ে উদ্ধার করা হলো। এটা ছিলো যেনো অবাধ্যদের প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে গৃহিত প্রতিশোধ।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'আমি একে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি'?

এখানে 'তারকনাহা' অর্থ একে রেখে দিয়েছি, 'আয়াতান' এক নিদর্শনরূপে। অর্থাৎ নবী নুহ ও তার সম্প্রদায়ের বৃত্তান্তকে আমি পৃথিবীবাসীদের স্মৃতিতে রেখে দিয়েছি একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তরূপে, যাতে উপদেশ অন্বেষণকারীরা এই বৃত্তান্ত থেকে সুশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কাতাদা বলেছেন, এখানকার 'তারাকনাহা' এর 'হা' (একে) সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত হয়েছে 'নৌকা'র সাথে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— নুহের ওই নৌকাটিকে আমি রেখে দিয়েছি পৃথিবীবাসীদের উপদেশ গ্রহণের নিমিত্তরূপে। উল্লেখ্য হজরত নুহের নৌকাটি দীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যমান ছিলো। এমনকি এই উম্মতের পূর্বসূরীদের অনেকে তা প্রত্যক্ষও করেছেন।

'ফা হাল মিন মুদ্দাকির' অর্থ অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি ? প্রশ্নটি এখানে তারগীব, অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'কী কঠোর ছিলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী'। এখানকার 'নুজুর' (সতর্কবাণী) 'নাজীর' এর বহুবচন। ফাররা বলেছেন, 'নুজুর' ও 'ইন্‌জার' দু'টোই ক্রিয়ামূল। যেমন 'ইনফাক্ব' 'নাফক্ব' 'ইয়াক্বীন' 'ঈক্বান'।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'কোরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি'? একথার অর্থ— উপদেশ গ্রহণার্থে কোরআনের মর্মবাণী স্মৃতিস্থ করাকে আমি সহজ, সুমিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছি। এতে রয়েছে শুভ উপদেশের অজস্র সমাবেশ। আছে বিশুদ্ধ বিশ্বাসবিষয়ক বিবরণ, বিধি-বিধানের উল্লেখ, অতীত যুগের নবী-রসুল ও তাদের অবাধ্য সম্প্রদায়ের করুণ পরিণতির কাহিনী। এসকল কিছুই তো শুভ উপদেশাবলীর প্রকৃষ্ট উপকরণ। অতএব, কে আছে এমন, যে এই কোরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করবে?

সূরা ক্বমার ঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

❑ 'আদ সম্প্রদায় সত্য অস্বীকার করিয়াছিল, ফলে কিরূপ ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

❑ উহাদের উপর আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে,

❑ মানুষকে উহা উৎখাত করিয়াছিল উন্মুলিত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়।

❑ কী কঠোর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

❑ কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! চরম অবাধ্য আ'দ সম্প্রদায়ের কথাও স্মরণ করুন। তাদের পথপ্রদর্শনার্থে আমি প্রেরণ করেছিলাম আমরা প্রিয় নবী হুদকে। কিন্তু তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। দেখুন, অবাধ্যতার শাস্তি সম্পর্কে আমি পূর্বাহ্ন যে সতর্কবাণী প্রেরণ করেছিলাম, তা শেষে কীভাবে বাস্তবায়িত হলো। অথবা কথাটির অর্থ হবে— দেখুন, তাদের উপরে আপতিত সর্বগ্রাসী আযাব পরবর্তী যুগের মানুষের জন্য কীরূপ সতর্ককারী ও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তাদের উপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে'। একথার অর্থ— আমি যথাসময়ে তাদেরকে শায়েস্তা করেছিলাম। তাদের জনপদের উপরে একটানা সাতদিন আট রাত যাবত প্রবাহিত করেছিলাম জীবনসংহারক প্রচণ্ড ঝড়। আর শেষ দিনটি ছিলো তাদের জন্য চরম দুর্ভাগ্যের।

এখানে 'সরসরান' অর্থ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু। 'নাহসিন মুস্তামির' অর্থ নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিন। সম্ভবত ওই সময়টি প্রলম্বিত হয়েছিলো সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা উৎপাটিত হয় সমূলে। 'নিরবচ্ছিন্ন' কথাটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সেকারণেই। কথাটির অর্থ এরকমও হয়ে থাকতে পারে যে, ওই দিনটি তাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের জন্যই ছিলো মহাঅমঙ্গলের। অথবা 'মুস্তামির' অর্থ হবে এখানে— চূড়ান্ত পর্যায়ের তিক্ততা, বিস্বাদযুক্ততা। বাগবী লিখেছেন, ওই মহাঅমঙ্গলের দিনটি ছিলো বুধবার।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'মানুষকে তা উৎখাত করেছিলো উন্মুলিত খেজুরকাণ্ডের ন্যায় (২০)। কী কঠোর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী' (২১)। একথার অর্থ— ওই ভয়ংকর ঝঞ্ঝাঝড় তাদের ঘাড় মটকে দিয়েছিলো, পৃথিবী থেকে তাদেরকে সমূলে উৎখাত করে দিয়েছিলো উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের মতো করে। বায়যাবী লিখেছেন, ঝড় যখন শুরু হলো তারা আশ্রয় গ্রহণ করলো আশেপাশের গিরিকন্দরে। কিন্তু তীব্র-তীক্ষ্ণ ঝঞ্ঝাবায়ু তাদেরকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে এসে মাটিতে আছড়ে আছড়ে শেষ করে দিলো। এভাবে সকলেই গ্রহণ করতে বাধ্য হলো সুতিক্ত মৃত্যুর স্বাদ। বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এরকম কথাও এসেছে যে, ওই বিকট তুফান তখন তাদের কবরবাসীদেরকে কবর থেকে টেনে বের করে এনেছিলো।

'কাআন্না হুম আয়্জ্বাযু নাখ্লিম্ মুনক্বায়ি'র' অর্থ উৎখাত করেছিলো উন্মুলিত খেজুর কাণ্ডের ন্যায়। 'আয়্জ্বায্' অর্থ শিকড়। 'মুনাকায়ির' অর্থ শিকড়সুদ্ধ উৎপাটিত। 'নাযলিন' অর্থ খেজুর গাছের কাণ্ড। শব্দটি পুংলিঙ্গবাচক। সেজন্য তার বৈশিষ্ট্য অনুসারে এখানে 'মুনকায়ির' শব্দটিকেও নেওয়া হয়েছে পুংলিঙ্গবাচকরূপে। কিন্তু অর্থগতভাবে 'নাখলুন' স্ত্রীলিঙ্গবাচক। কেননা 'নাখলুন' দ্বারা খেজুর গাছের বাগানকেও বুঝানো হয়। আর বহুবচনের স্থলে স্ত্রীলিঙ্গের বিধান প্রচলিত। অন্যান্য আয়াতেও এই বিধানটিকে মান্য করা হয়েছে। যেমন 'আয়্জ্বাযু নাখলিন খভিয়্যাহ্' 'আন্নাখলু নাসিকাতুন'। বাগবী লিখেছেন, 'আয়্জ্বায' বলে ওই গাছের শিকড়কে, যার শাখা প্রশাখা কেটে ফেলা হয়েছে। ওই বীভৎস তুফান তাদের মস্তক তাদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলো। তাদের মুণ্ডহীন দেহগুলো পড়েছিলো যত্রতত্র। এখানে উন্মুলিত খেজুর কাণ্ডের তুলনা উপস্থাপন করা হয়েছে সেকারণেই। অর্থাৎ কাটা খেজুর গাছ যেমন ভূতলশায়ী হয়ে থাকে, তেমনিভাবে তারা মুখ থুবড়ে মরে পড়েছিলো তাদের জনমানবহীন জনপদে। এতো গেলো পৃথিবীর শাস্তি। পরবর্তী পৃথিবীর শাস্তিতো রয়েছেই।

'ফা কাইফা কানা আ'জাবি ওয়া নুজুর' অর্থ কী কঠোর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। এখানে সতর্কবাণী অর্থ সতর্ককারী। অর্থাৎ যিনি বা যাঁরা মানুষকে আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ও আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে—'কোরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি'? একথার অর্থ— কোরআনের বিধান ও বক্তব্য সহজ ও সাবলীল। কে আছে এমন যে এই কোরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে?

সূরা ক্বামার ঃ আয়াত ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

---

www.eelm.weebly.com

❑ ছামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল,

❑ তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করিব? তবে তো আমরা পথভ্রষ্টতায় এবং উন্মত্ততায় পতিত হইব।

❑ 'আমাদের মধ্যে কি উহারই প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে? না, সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।'

❑ আগামীকল্য উহারা জানিবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

❑ আমি উহাদের পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছি এক উষ্ট্রী, অতএব তুমি উহাদের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও।

❑ এবং উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, উহাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হইবে পালাক্রমে।

❑ অতঃপর উহারা উহাদের এক সংগীকে আহ্বান করিল, সে উহাকে ধরিয়া হত্যা করিল।

❑ কিরূপ কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

❑ আমি উহাদিগকে আঘাত হানিয়াছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে উহারা হইয়া গেল খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়।

❑ আমি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক! এবার শুনুন ছামুদ সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত। তারাও তাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো।

পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'তারা বলেছিলো, আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করবো'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিমূলক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— আমরা তো আমাদের মতো একজন সাধারণ লোকের কথা শুনে পিতৃপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারি না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে তো আমরা পথভ্রষ্টতায় ও উন্মত্ততায় পতিত হবো'। একথার অর্থ— এরকম অর্থবিত্তহীন ও সামাজিকভাবে গুরুত্বহীন ব্যক্তির অনুসরণ যদি আমরা করি, তবে তো আমরা ভুল করে ফেলবো, নিমগ্ন হবো উন্মাদজনোচিত কর্মে।

এখানে 'ওয়াহিদান' অর্থ সে তো একজন, তার কোনো অনুসারী নেই। 'ইন্না ইজান্' অর্থ যদি আমরা তার অনুসরণ করি তাহলে তো আমরা পতিত হবো ভ্রমে। পর্যবসিত হবো উন্মাদে। 'ওয়াসসুউ'র' অর্থ উন্মত্ততায়, সত্য থেকে দূরে। ফাররা বলেছেন, 'সুউ'র' অর্থ উন্মাদনা, পাগলামী। রাখালহীন অবস্থায় যত্রতত্র বিচরণরত উষ্ট্রীকে আরববাসীগণ বলেন 'নাকাতুন মাসউ'রাতুন'। কাতাদা বলেছেন, 'সুউ'র' অর্থ দুঃখ, দুরবস্থা, আযাব। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'সুউ'র' অর্থ আযাব। হাসান অর্থ করেছেন— আযাবের প্রাকট্য। কোনো কোনো ভাষাবিদ বলেছেন, 'সুউ'র' হচ্ছে 'সাইর' এর বহুবচন। ছামুদ জাতির লোকেরা তার প্রতি প্রেরিত নবী সালেহকে অস্বীকার করেছিলো। তিনি তাদেরকে সতর্ক করে বলেছিলেন, তোমরা আমাকে অনুসরণ না করলে তোমরা হয়ে যাবে পথভ্রষ্ট। অবশেষে উপনীত হবে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। তারা তাঁর কথার প্রতিবাদ করেছিলো। বলেছিলো, তাহলে তো আমরা পিতৃপুরুষদের পথ থেকে বিচ্যুত হবো এবং আক্রান্ত হবো উন্মত্ততায়।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'আমাদের মধ্যে কি এরই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সেতো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক'। একথার অর্থ— তারা আরো বললো, আমাদের মধ্যে এতো ভালো ভালো লোক থাকতে প্রত্যাদেশ হলো কি শেষে হুদের উপর? না, না। এরকম তো হতে পারেই না। বরং সে মিথ্যা কথা বলেছে এবং প্রকাশ করেছে দম্ভ। এভাবে সে আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে হতে চায় জননায়ক, অথবা প্রশাসক।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক'। এখানে 'আগামীকাল' অর্থ আযাব আপতিত হওয়ার সময়। কালাবী কথাটির অর্থ করেছেন— কিয়ামতের সময়।

ছামুদ জাতি হজরত হুদের কাছে মোজেজা দেখতে চাইলো। বললো, তুমি যদি ওই প্রকাণ্ড পাথর থেকে লাল রঙের একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী বের করে দেখাতে

পারো, তাহলে আমরা তোমাকে নবী বলে মেনে নিতে পারবো। তাদের এমতো প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত চতুষ্টয়। বলা হয়েছে—

'আমি তাদের পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি একটি উষ্ট্রী, অতএব, তুমি তাদের আচরণ লক্ষ্য করো এবং ধৈর্যশীল হও (২৭)। এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে (২৮)। অতঃপর তারা তার এক সঙ্গীকে আহ্বান করলো, সে তাকে ধরে হত্যা করলো (২৯)। কীরূপ কঠোর ছিলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী' (৩০)। একথার অর্থ— আমি তাদের প্রস্তাব মেনে নিলাম। প্রস্তরখণ্ডের ভিতর থেকে বের করে দিলাম লাল রঙের একটি গর্ভবতী উটনী। অল্পক্ষণের মধ্যে সে শাবক প্রসব করলো। এরপর হুদকে বললাম, তোমার সম্প্রদায়কে বলে দাও, তারা যেনো উটনীটি ও তার বাচ্চাটিকে সম্মান করে এবং তাদের কূপের পানি যেনো তাদের ও উটনীটির মধ্যে বণ্টন করে একদিন পর একদিন নিয়মে। কিছুদিন

তারা এই বিধান মেনে চললো। তারপর হয়ে উঠলো অসহিষ্ণু। শেষে শলাপরামর্শ করে তারা তাদের মধ্য থেকে কেজার ইবনে সালেফকে ঠিক করলো উটনীটির হন্তারকরূপে। সে অবলীলায় প্রাণসংহার করলো উটনী ও তার বাচ্চার।

উল্লেখ্য, তাদের কূপের পানিবণ্টন করা হয়েছিলো এভাবে— ছামুদদের পালা যেদিন পড়বে সেদিন তারা হাজির হবে কূপের কাছে এবং উটনীর পালার দিন কূপের কাছে উপস্থিত হবে সে ও তার শাবক। নিয়মটি ছিলো এরকম— উটনীটি পানি পান করে গেলে কূপের কাছে উপস্থিত হবে ছামুদেরা। তারা পানি নিয়ে চলে যাবার পর পানির কাছে গমন করবে উটনীটি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা, ফলে তারা হয়ে গেলো খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায় (৩১)। আমি কোরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি' (৩২)?

এখানে 'সারহাতাঁও ওয়াহিদা' অর্থ এক মহানাদ, একটি বিকট আওয়াজ। 'ফাকানু কা-হাশীমিল মুহ্তাজির' অর্থ তারা হয়ে গেলো খোয়াড় প্রস্তুতকারী বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মুহতাজির' বলা হয় ওই লোককে, যে তার ছাগপালের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গাছের ডালা ও কাঁটা দ্বারা বানিয়ে নেয় ভয় দেখানো কোনো অস্ত্র। যদি তা থেকে কিছু কাঁটা খসে যায়, আর ছাগলেরা যদি তা পদপিষ্ট করে, তবে তাকে বলে 'হাশীম'। কেউ কেউ বলেন, শুকনো কাঠ দ্বারা যদি ভয় দেখানো কোনো অস্ত্র তৈরী করা হয়, তবে তাকে বলে 'হাশীম'। কাতাদা বলেছেন, 'হাশীমিল মুহতাজির' অর্থ পুরানো হাড়। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, যে মাটি দেয়াল থেকে খসে পড়ে, অর্থাৎ দেয়ালে লোনা ধরে যা ঝরে যায়, তাকে বলা হয় 'হাশীম'।

সূরা ক্বমার ঃ আয়াত ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

www.eelm.weebly.com

❑ লূত সম্প্রদায় অস্বীকার করিয়াছিল সতর্ককারীদিগকে,

❑ আমি উহাদের উপর প্রেরণ করিয়াছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নহে; তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম রাত্রির শেষাংশে

❑ আমার বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ; যাহারা কৃতজ্ঞ, আমি এইভাবেই তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

❑ লূত উহাদেরকে সতর্ক করিয়াছিল আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে; কিন্তু উহারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করিল।

❑ উহারা লূতের নিকট হইতে তাহার মেহমানদিগকে অসদুদ্দেশ্যে দাবি করিল, তখন আমি উহাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করিয়া দিলাম এবং আমি বলিলাম, 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।

❑ প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাহাদিগকে আঘাত করিল।

❑ এবং আমি বলিলাম, 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।'

❑ আমি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— নবী লুতের সম্প্রদায়ও নবী রসুলগণকে অস্বীকার করতো। তাদের পথপ্রদর্শনার্থে আমি প্রেরণ করেছিলাম লুতকে। কিন্তু তারা তার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। পরিণামে তারাও আক্রান্ত হয়েছিলো সর্বগ্রাসী শাস্তিতে। আমি তাদের উপরে আপতিত করেছিলাম প্রস্তরবৃষ্টি। কিন্তু আমার প্রিয় নবী লুত ও তাঁর পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করেছিলাম। বলেছিলাম, রাতের শেষভাগে তোমরা স্থান ত্যাগ করো। তারা তাই করেছিলো এবং এভাবেই

রক্ষা পেয়েছিলো প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা থেকে। এটাই ছিলো তাদের প্রতি আমার মহাঅনুগ্রহ ও বিশেষ পুরস্কার। যারা আমার অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাদের আমি এভাবেই যুগে যুগে পুরস্কৃত করে থাকি।

এখানে 'হাসিব' অর্থ ওই প্রভঞ্জন, যা পাথর উড়িয়ে নিয়ে বর্ষণ করে। 'হাসবা' বলে ছোট ছোট পাথরকে। কেউ কেউ বলেছেন, এক মুষ্টির চেয়ে ছোট প্রস্তরকণাকে বলা হয় 'হাসবা'। কখনো কখনো আবার প্রস্তরনিক্ষেপকারীকেও 'হাসিব' বলা হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় 'হাসিব' শব্দটির অর্থ হবে— প্রস্তর বর্ষণকারী পবন। 'সাহারিন' অর্থ রাতের শেষাংশে। 'নি'মাতান' অর্থ বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ, সবিশেষ অনুকম্পা প্রদানার্থে। আর 'মান শাকার' অর্থ যারা কৃতজ্ঞ। অর্থাৎ যারা স্বীকৃতি দেয় আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন এককত্বের এবং সেই সঙ্গে আনুগত্য করে তাঁর বিধানের। মুকাতিলের ব্যাখ্যানুসারে বক্তব্যটি দাঁড়ায় এরকম— যারা আমার নেয়ামতের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাদের আমি নবী লুত ও তাঁর পরিবারবর্গের মতো বিশেষভাবে পুরস্কৃত করে থাকি। পৃথক করে থাকি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে আপতিত আযাব থেকে।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'লুত তাদেরকে সতর্ক করেছিলো আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে, কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বিতণ্ডা শুরু করলো'। একথার অর্থ— অথচ লুত তাদেরকে আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে দিয়েছিলো। কিন্তু তারা তাঁকে বিশ্বাস করেনি, উল্টো বরং গর্বভরে বলেছে, সত্যবাদী যদি তুমি হও, তবে কথিত শাস্তি আনয়ন করো।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'তারা লুতের নিকট থেকে তার মেহমানদেরকে অসদুদ্দেশ্যে দাবি করলো, তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম, আস্বাদন করো আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম'।

হজরত লুতের জনপদের লোকেরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো পুংমৈথুনের মতো ঘৃণ্য পাপকর্মে। তিনি শত চেষ্টা করেও যখন তাদেরকে ওই জঘন্য পাপ থেকে ফেরাতে পারলেন না, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। সেজন্য হজরত লুতের গৃহে প্রেরণ করলেন কতিপয় আযাবের ফেরেশতা। হজরত জিবরাইলও ছিলেন তাদের সঙ্গে। তারা সুদর্শন কিশোরের আকৃতি ধরে হজরত লুতের গৃহে অতিথি হিসেবে গমন করলেন। জনপদবাসীরা তাদেরকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো। তাদের বিকৃত কামরিপু চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অতিথি কিশোরদের দিকে এগিয়ে গেলো। হজরত লুত মহা সমস্যায় পড়লেন। অতিথিদের সম্মান রক্ষার জন্য তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ শুরু করলেন এবং গৃহের দরজা করে দিলেন অর্গলাবদ্ধ। তবুও লোকেরা অনড় রইলো তাদের অশুভ দাবিতে। এক পর্যায়ে দরজা ভেঙে গৃহমধ্যে প্রবেশ করলো তারা। হজরত লুত নিরুপায় হয়ে পড়লেন। অতিথিরা অভয় দিলো, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি শংকিত হবেন না। তাদেরকে এগিয়ে আসতে দিন। আমরা প্রেরিত হয়েছি তাদের

www.eelm.weebly.com

সংহার সাধনার্থে। আল্লাহ্ তখন ওই দুর্বৃত্তদেরকে শাস্তি দিলেন। তাঁর হুকুমে হজরত জিবরাইল তাদের উপরে হানলেন তাঁর ডানার আঘাত। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ হয়ে গেলো তারা। ফেরেশতারা বললেন, এবার বোঝো মজা, ভোগ করো সতর্কবাণী উপেক্ষা করার অশুভ পরিণাম। এ ঘটনাটির এরকম বর্ণনা করেছেন বাগবী হজরত জারীর থেকে জুহাক সূত্রে ইবনে ইসহাক, ইবনে আসাকেরের মাধ্যমে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী লুত তখন অতিথিদের সামনে এগিয়ে গিয়ে বাড়িতে ঢোকার দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং দুর্বৃত্তদের সঙ্গে বাদানুবাদ করতে শুরু করলেন। তারা গৃহের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। নবী লুত অস্থির হয়ে পড়লেন। অতিথি ফেরেশতারা বললেন, হে আল্লাহ্র প্রিয় নবী! আপনি পেরেশান হবেন না। আমরা আপনার প্রভুপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত। তারা আমাদের কাছে আসতে পারবে না। এরপর জিবরাইল ফেরেশতা তাঁর পাখা দিয়ে এক ঝাপটা মারলেন তাদেরকে। সঙ্গে সঙ্গে তারা দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেললো। ভয়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসতে চাইলো। কিন্তু পথ খুঁজে পেলো না।

'ফাত্বামাসনা আ'ইউনাহুম' অর্থ আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম। অর্থাৎ তাদের চোখের স্থান তাদের মুখমণ্ডলের সঙ্গে সমান করে দিলাম। ফলে তাদের চক্ষু কোটরও আর অবশিষ্ট রইলো না। অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা এরকমই বলেছেন। জুহাক বলেছেন, আল্লাহ্ যখন তাদের দৃষ্টি ছিনিয়ে নিলেন, তখন তারা বলতে লাগলো, কী ব্যাপার! ছেলেগুলোকে দেখছিনা কেনো? একটু পরেই বুঝলো তাদের দৃষ্টি লোপ করা হয়েছে। তখন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলো তারা। আল্লাহ্ই যেহেতু সকল ঘটনার মূল নিয়ন্ত্রক, তাই তিনি ফেরেশতাদের কথাকে নিজের কথা হিসাবে উদ্ধৃত করে এখানে বলেছেন, আমি বললাম, আস্বাদন করো আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম। অর্থাৎ নবী লুত তো তোমাদেরকে আগেই আমার সর্বনাশা শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলো। কিন্তু তোমরা তাকে পাত্তাই দাওনি। তার অপপরিণতি এখন আস্বাদন করো।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত করলো'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র প্রত্যাদেশক্রমে রাতের শেষাংশে নবী লুত তাঁর পরিবার পরিজন নিয়ে অন্যত্র গমন করলেন। রজনী প্রভাত হলো। ছামুদবাসীদের উপর শুরু হলো পাথরের বৃষ্টি ও ঝড়। এখানে 'আ'জাবুম মুসতাক্বির' অর্থ বিরামহীন শাস্তি। অর্থাৎ প্রস্তরবৃষ্টিই তাদের শেষ শাস্তি নয়। বরং তা শাস্তির শুরু। এর পরে রয়েছে কবরের আযাব, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচারের দিবসের আতংক, হিসাব-পুলসিরাত, অবশেষে দোজখের অনন্ত দণ্ডভোগ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এবং আমি বললাম, আস্বাদন করো আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম (৩৯)। আমি কোরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি (৪০)। উল্লেখ্য, আয়াতদ্বয়ের বক্তব্য এভাবে পুনরাবৃত্তি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরআনের শুভ উপদেশাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার বিষয়ে অধিকতর অনুপ্রাণিত করা।

সূরা ক্বমার ঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮

www.eelm.weebly.com

❑ ফির'আওন সম্প্রদায়ের নিকটও আসিয়াছিল সতর্ককারী;

❑ কিন্তু উহারা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিল, অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানরূপে আমি উহাদিগকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম।

❑ তোমাদের মধ্যকার কাফিরগণ কি উহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না কি তোমাদের অব্যাহতির কোন সনদ রহিয়াছে পূর্ববর্তী কিতাবে?

❑ ইহারা কি বলে, 'আমরা এক সঙ্ঘবদ্ধ অপরাজেয় দল?'

❑ এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হইবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে,

❑ অধিকন্তু কিয়ামত উহাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হইবে কঠিনতর ও তিক্ততর;

❑ নিশ্চয়ই অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত।

❑ যেদিন উহাদের উপুড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে জাহান্নামের দিকে; সেই দিন বলা হইবে, 'জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়া লাক্বদ জ্বাআ আলা ফিরআ'ওনান্ নুজুর' (ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকটও এসেছিলো সতর্ককারী)। এখানে সতর্ককারী বলে বুঝানো হয়েছে হজরত মুসা ও হজরত হারুনকে। অথবা ওই সকল মোজেজা, যেগুলোর মাধ্যমে ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো। আর এখানে 'ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট' না বলে কেবল বলা হয়েছে 'ফেরাউন সম্প্রদায়ের নিকট'। এরকম করার কারণ এই যে, ফেরাউনের পথভ্রষ্টতার বিষয়টি ঐতিহাসিক ও সুবিদিত। তাই তার নামের উল্লেখকে এখানে মনে করা হয়েছে নিস্প্রয়োজন।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করলো, অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানরূপে আমি তাদেরকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম'।

এখানে 'আয়াত' (নিদর্শন) অর্থ হজরত মুসার প্রতি অবতীর্ণ নয়টি বিশেষ বিধি-বিধান। হজরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল থেকে আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, একবার এক ইহুদী তার সাথীকে বললো, চলো আমরা নতুন নবীর কাছে একদিন যাই। তার সাথী বললো, নবী নবী বোলো না। কথাটা কানে গেলে সে হয়ে যাবে চার চক্ষুবিশিষ্ট। একদিন তারা দু'জনে উপস্থিত হলো রসুল স. এর মহান সাহচর্যে। বললো, বলুন তো দেখি, মুসা নবীর উপরে অবতারিত নয়টি বিধান কী কী? তিনি স. বললেন— ১. কাউকে অথবা কোনোকিছুকে আল্লাহ্র অংশীদার অথবা সমকক্ষ সাব্যস্ত করবে না ২. চুরি করবে না ৩. ব্যভিচার করবে না ৪. যাকে হত্যা করা হারাম, তাকে হত্যা করবে না ৫. কোনো অন্যায়াচারীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বিচারকের কাছে নিয়ে যাবে না ৬. যাদু করবে না ৭. সুদ খাবে না ৮. সতী-সাধ্বী রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিবে না ৯. সমরপ্রান্তর থেকে পালিয়ে যাবে না। এরপর তিনি স. আরো বললেন, তবে শোনো, আর একটি বিধানও রয়েছে তোমাদের জন্য। সেটি হচ্ছে— শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন করবে না। একথা শুনেই তারা রসুল স. এর হাতে ও পায়ে চুম্বন করলো। বললো, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্র নবী। রসুল স. বললেন, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করছো না কেনো? তারা বললো, দাউদ নবী দোয়া করেছিলেন, হে আমার প্রভুপালক! আমার বংশ থেকেই সব সময় নবী প্রেরণ কোরো। আমাদের ভয়, আপনার অনুসারী হলে ইহুদীরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে।

'ফা আখাজনাহুম আখ্জা' অর্থ আমি তাদেরকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম। ডুবিয়ে মারলাম সমুদ্রে। কবর-কিয়ামত-হাশর-নশর- দোজখ পর্যন্ত তাদের শাস্তি হতে থাকবে কঠিন থেকে কঠিনতর। আর 'আ'যীযিম মুক্বতাদীর' অর্থ পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান।

এরপরের আয়াতত্রয়ের (৪৩, ৪৪, ৪৫) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে বলুন, তোমরা তো হজরত নুহের সম্প্রদায়, আ'দ, ছামুদ, সাদুমবাসী, ফেরাউন ইত্যাদি প্রতাপশালী সম্প্রদায়ের মতো নও। শৌর্য-বীর্য অর্থ-বিত্ত সব দিক দিয়েই তোমরা তাদের চেয়ে দুর্বল। সত্যপ্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও তোমরা পরিত্রাণ পাবে, এরকম কোনো দলিল প্রমাণও তো পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে নেই। আমরা সুসংহত, অপরাজেয়— এরকম দাবিও তো তোমরা করতে পারো না। তাহলে কোন্ সাহসে তোমরা ক্রমাগত সত্যপ্রত্যাখ্যান করে চলেছো? তোমাদের পরিণতি যে অশুভ সে কথা নিশ্চিত। অতি শীঘ্রই তোমরা পরাস্ত হবে এবং সত্যের মোকাবিলা না করতে পেরে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করবে।

www.eelm.weebly.com

উদ্ধৃত আয়াতত্রয়ের প্রথম দু'টিতে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে প্রশ্নাকারে। আর সবকটি প্রশ্নই অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এভাবে প্রশ্নাকারে এখানে অস্বীকার করা হয়েছে মক্কার মুশরিকদের প্রমাণহীন বিশ্বাস এবং ভিত্তিহীন দাবি-আপত্তির কথা। শেষে আবার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের পরাজয় পর্ব অত্যাসন্ন এবং তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শনও সুনিশ্চিত।

এখানে 'মুনতাসির' অর্থ অপরাজেয়, সুদৃঢ়, সুরক্ষিত। অর্থাৎ আমরা এমনভাবে সংঘবদ্ধ যে, আমাদের কাছে আসার সাহস কারো হবে না। এখানকার 'জামিউ'ন' (সংঘবদ্ধ) শব্দটি একবচনবোধক। তাই তার বিশেষণ 'মুনতাসির'ও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একবচনরূপে। ইবনে জারীর লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কার মুশরিকেরা বদর যুদ্ধের দিন বলেছিলো 'আমরা সংঘবদ্ধ, অপরাজেয়'। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে রসুল স. তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করে দোয়া করতে শুরু করলেন। এক পর্যায়ে বললেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার অঙ্গীকারের শপথ করে বলছি, তোমার যদি এরকম ইচ্ছা হয় যে, আজকের দিনের পর এ পৃথিবীতে তোমার ইবাদত আর করা হবে না—। তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁর হাত ধরে ফেললেন। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! যথেষ্ট হয়েছে, আপনি আপনার প্রভুপালকের কাছে যথেষ্ট প্রার্থনা করেছেন। এবার ক্ষান্ত হোন। প্রশান্ত হোন। রসুল স. ক্ষান্ত হলেন। একটু পরেই 'আমরা সংঘবদ্ধ, অপরাজেয়' একথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন তাঁবু থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর বলেছেন, আমি জানি না 'আমরা সংঘবদ্ধ, অপরাজেয়' বলে রসুল স. কোন্ দলকে বুঝিয়েছেন। বাগবী অবশ্য বলেছেন, শেষের কথাটি বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের নিজের কথা। তিনি আবার বলেছেন, আমি এরকম শুনেছি হজরত ওমরের কাছ থেকে। এই বিবরণটিকে আবার ইকরামার অপরিণত বিবরণ বলে সনাক্ত করেছেন আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া। তিবরানী বিবরণটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'আল আওসাতে'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর (৪৬); নিশ্চয়ই অপরাধীরা বিভ্রান্ত, বিকারগ্রস্ত (৪৭)। একথার অর্থ— যুদ্ধে পরাস্ত বা নিহত হওয়া তো তাদের আসল শাস্তি নয়। তাদের আসল শাস্তি শুরু হবে কিয়ামতের সময় থেকে। আখেরাতের শাস্তিই হচ্ছে তাদের জন্য প্রকৃত শাস্তি। ওই শাস্তি পৃথিবীর শাস্তির তুলনায় অনেক কঠিন, অতীব তিক্ত। বরং আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি যেনো কোনো শাস্তিই নয়। লক্ষণীয়, অনেক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী পৃথিবীতে নিরুপদ্রব জীবন যাপন করে। পৃথিবীর শাস্তি যে প্রকৃত শাস্তি নয়, এ হচ্ছে তার প্রমাণ।

'আদ্‌হা ওয়া আমার' অর্থ কঠিনতর, তিক্ততর। অর্থাৎ পৃথিবীর শাস্তির তুলনায় পরকালের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর, অতীব বিস্বাদযুক্ত। 'আল মুজ্‌রিমীন' অর্থ অপরাধীরা। কথাটির মাধ্যমে এখানে সাধারণভাবে বুঝানো হয়েছে কুরায়েশ কাফেরসহ সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে। আর 'ফী দ্বলালিউঁ ওয়া সুউ'র অর্থ বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত। অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট এবং পরকালে শাস্তিগ্রস্ত।

এরকম অর্থ করেছেন হাসান ইবনে ফজল। কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন— দুঃখকষ্টে নিপতিত ও শাস্তিকবলিত। অর্থাৎ তাঁর মতে এখানে 'দ্বলালিন' অর্থ দুঃখ কষ্ট এবং সুউ'র অর্থ শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; সেদিন বলা হবে, জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন করো'। এখানে 'জুক্বু মাস্‌সা সাক্বার' অর্থ জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন করো। 'মাস্‌স' এর শাব্দিক অর্থ স্পর্শ করা। অর্থাৎ জাহান্নামের অগ্নির স্পর্শই হবে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

সূরা ক্বমার ঃ আয়াত ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫

❑ আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করিয়াছি নির্ধারিত পরিমাপে,

www.eelm.weebly.com

❑ আমার আদেশ তো একটি কথায় নিস্পন্ন, চক্ষুর পলকের মত।
❑ আমি ধ্বংস করিয়াছি তোমাদের মত দলগুলিকে; অতএব উহা হইতে উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?
❑ উহাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে 'আমলনামায়,
❑ আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ।
❑ মুত্তাকীরা থাকিবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে,
❑ যোগ্য আসনে, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইন্না কুল্লা শাইইন খলাক্বনাহু বি ক্বদার' (আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে)। এই আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরের কথা। অংশীবাদীরা তকদীর সম্পর্কে রসুল স. এর সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলো। তাই প্রসঙ্গান্তর ঘটিয়ে তাদের কথার জবাব দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে।

মুসলিম ও তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একবার কতিপয় কুরায়েশ রসুল স. এর সঙ্গে ঝগড়া করার উদ্দেশ্যে এলো। তখন অবতীর্ণ হলো 'নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত' এবং 'আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে'। এখানে 'ক্বদার' অর্থ পূর্বপরিকল্পনা। অথবা লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ অদৃষ্টলিপি, যা প্রস্তুত করা হয়েছে মহা সৃষ্টির অস্তিত্ব

লাভের পূর্বেই। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা তার সমগ্র সৃষ্টির অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সকলকিছুই জানেন। তিনিই নির্ধারণ করে দিয়েছেন সকলেরও সকলকিছুর অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও চাহিদা। ওই নির্ধারণের বাইরে কোনো কিছুই ঘটবে না। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন সমস্ত মাখলুকের তকদীর। ওই সময় আল্লাহ্‌র আরশ ছিলো পানির উপর। হাদিসটি স্বসূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন তাউস ইবনে মুসলিম সূত্রে। তিনি বলেছেন, আমি রসুল স. এর এমন কয়েকজন সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছি, যাঁরা বলতেন, সবকিছুই তকদীর অনুসারে হয়, এমনকি মূর্খতা ও জ্ঞানও।

হজরত আলী ইবনে আবু তালেব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, চারটি বিষয়ে প্রত্যয়ী না হওয়া পর্যন্ত কেউ ইমানদার হতে পারবে না— ১. 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই' কলেমার সাক্ষ্য ২. আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসুল ৩. মহাপুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী ৪. অদৃষ্টলিপি অনিবার্য। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যারা তকদীর অস্বীকার করবে, তাদের উপরে নেমে আসবে ভূমিধস ও আকৃতি রূপান্তরণের আযাব। তিরমিজি, আবু দাউদ। হজরত ইবনে ওমর এরকমও বর্ণনা করেছেন যে, রসুল স. বলেছেন, কদরিয়ারারা (তকদীর অস্বীকারকারীরা) এই উম্মতের অগ্নিপূজক। তারা পীড়িত হলে তোমরা তাদের সেবা কোরো না। আর তারা মারা গেলে তাদের জানাযায়ও অংশগ্রহণ কোরো না। আহমদ, আবু দাউদ। হজরত আবু খুজাইমা বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র বাণীবহক! আমরা দোয়া কালাম দ্বারা যে চিকিৎসা করি, পীড়িত হলে ঔষধ সেবন করি, আত্মরক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা-তদবির করি; এসকল কিছু কি তকদীর পরিবর্তন করতে পারে? তিনি স. বললেন, এগুলোও তকদীরের অংশ। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা। এ প্রসঙ্গে আরো অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আর বিষয়টিতে সাহাবীগণ ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেমগণ একমত।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'আমার আদেশ তো একটি কথায় নিস্পন্ন, চক্ষুর পলকের মতো'। এখানে 'আমরুনা' অর্থ আদেশ, কোনো কিছু সৃষ্টি, ধ্বংস ও তার পূর্ণ অস্তিত্বায়নের হুকুম। 'ইল্লা ওয়াহিদাহ্' কেবল একটি কথায় নিস্পন্ন। 'কালামহিম বিলবাসর' অর্থ চক্ষুর পলকের মতো। অর্থাৎ আমার নির্দেশ কেবল একটি নির্দেশ 'কুন' (হও), ধ্বংস করার জন্যও তেমনি একটি আওয়াজ, যা ধ্বনিত হবে ইস্রাফিল ফেরেশতার শিঙ্গায়। আর 'চক্ষুর পলকের মতো' অর্থ দ্রুততার দিক দিয়ে আমার নির্দেশ বাস্তবায়িত হয় অতিদ্রুত, চোখের পলক ফেলার মতো সময়ের চেয়েও। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আমার নির্দেশ চোখের পলকের

মতো অতিদ্রুত উচ্চারিত ও বাস্তবায়িত হবে। অন্য এক আয়াতে একথা বলা হয়েছে এভাবে 'ওয়ামা আমরুস্ সাআতি ইল্লা কালামহিল বাসার' (মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি কেবল একটি চোখের পলকের মতো, অথবা তার চেয়েও কম সময়ের)।

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মতো দলগুলিকে, অতএব তা থেকে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি'? এ কথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! তোমাদের মতো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী দলগুলোকে আমি ইতোপূর্বে ধ্বংস করে দিয়েছি। তোমাদেরকেও তেমনি ধ্বংস করে দেওয়া হবে, যদি না তোমরা তওবা করো। এখনো সময় আছে, গ্রহণ করো আল্লাহ্‌র

www.eelm.weebly.com

বাণী কোরআন এবং আল্লাহ্র রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে। এখানে 'আশইয়ায়াকুম' বলে সম্বোধন করা হয়েছে মক্কার অংশীবাদীদেরকে। 'আশইয়া' শব্দটি 'শিয়াউন' এর বহুবচন। আর 'শিয়া' (দল) অর্থ এখানে ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী দলের অনুরূপ। অভিধানগ্রন্থেও এরকম বলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের আগের যুগে যারা তোমাদের মতো সত্যপ্রত্যাখ্যান করতো, আমি তাদের বিনাশসাধন করেছি।

'ফাহাল মিন মুদ্দাকির' অর্থ অতএব এ থেকে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? প্রশ্নটির মাধ্যমে এখানে মক্কার অংশীবাদীদেরকে ইমান আনার প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যেনো বলা হয়েছে— হে মক্কাবাসী। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগোষ্ঠীদের ইতিবৃত্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। শুভউপদেশ গ্রহণ করো। ইমান আনয়নের ব্যাপারে স্বতঃপ্রণোদিত হও।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে—'তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায় (৫২), আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্তকিছুই লিপিবদ্ধ' (৫৩)। এ কথার অর্থ— শরিয়ত বহনের দায়িত্ব যাদের উপরে ন্যস্ত, তাদের সকলের ক্ষুদ্র বৃহৎ পাপ ও পুণ্য আমারই নির্দেশে আমলনামায় লিখে রাখে আমা কর্তৃক নিযুক্ত আমল লেখক ফেরেশতাদ্বয় এবং তাদের এবং অন্য সকল সৃষ্টির 'হায়াত' 'মউত' ক্রমবিকাশ-ক্রমপরিণতি সকল কিছু লিপিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহফুজে। এখানে 'মুসতাত্বার' (লিপিবদ্ধ) অর্থ ফেরেশতাদ্বয় কর্তৃক আমলনামায় (কর্মবিবরণীতে) লিপিবদ্ধ, অথবা লিপিবদ্ধ লওহে মাহফুজের সুরক্ষিত ফলকে। এখানকার পরবর্তী আয়াতের বক্তব্যটি অধিকতর দৃঢ়তা দান করেছে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যটিকে। অর্থাৎ আমলনামায় সবকিছু তো লিপিবদ্ধ রয়েছেই, তদুপরি সবকিছুই পূর্বাহ্নে লিপিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহফুজে।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'মুত্তাকীরা থাকবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে (৫৪), যোগ্য আসনে, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ্র সান্নিধ্যে'(৫৫)।

এখানকার 'নাহার' (স্রোতস্বিনী) হচ্ছে জাতিবাচক বিশেষ্য। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে বেহেশতের সকল স্রোতস্বিনীকে। অর্থাৎ সকল দুধ, মধু, শরাব ও পানির

নহরকে। জুহাক 'নাহার' শব্দটির অর্থ করেছেন— আলো, অথবা প্রশস্ততা। যেমন আলোকিত হওয়ার কারণেই দিবসকে বলা হয় নাহার। বাগবী লিখেছেন, ক্বারী আ'য়াজ এখানকার 'নাহার' শব্দটিকে পাঠ করতেন 'নুহুর'। 'নুহুর' 'নাহার' এর বহুবচন। অর্থাৎ বেহেশতবাসীগণ সদা-সর্বদা থাকবে দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকার সেখানে থাকবেই না।

'মাক্বআ'দি সিদক্ব' অর্থ যোগ্য আসনে। অর্থাৎ এমন স্তরে, যেখানে নিরর্থক বাক্যালাপ ও পাপ বলে কিছু থাকবে না। আর ওই 'যোগ্য আসন' বা 'যথার্থ স্তর' হচ্ছে বেহেশত। অথবা কথাটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে পছন্দনীয় স্থানকে। জাওহারী লিখেছেন, যে কাজ উন্নতমানের এবং যা প্রকাশ্য-গোপন সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত, তাকেই বলে 'সিদক্ব'। অন্যান্য আয়াতেও 'সিদক্ব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থে। যেমন ১. 'ফী মাক্বআ'দি সিদক্ব' ২. 'লাহুম ক্বদামু সিদ্বক্ব' ৩. 'আদ্খিলনী মুদখালা সিদক্ব ওয়া আখ্রিজনী মুখরাজ্বা সিদক্ব'। বাগবী লিখেছেন, ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'সিদক্ব' ব্যবহৃত হয়েছে একটি বিশেষ স্তর বা অধ্যায়ের বিশেষণ হিসেবে। সুতরাং বুঝতে হবে যারা 'সত্যবাদী' (সিদ্দীক) তারাই অধিষ্ঠিত হবে ওই বিশেষ আসনে, স্তরে বা অধ্যায়ে। আর 'ইনদা মালীকিম্ মুক্বতাদির' অর্থ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ্র সান্নিধ্যে। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপ যেমন রকমপ্রকারহীন, আনুরূপ্যবিহীন, তেমনি আনুরূপ্যবিহীন তাঁর নৈকট্য। বিষয়টি জ্ঞান ও বোধের অতীত। এমতো নৈকট্য অবশ্য অনুভব করতে পারেন কেবল তাঁরা, যাঁরা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, দিব্যজ্ঞানধারী। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

সূরা আররহমান

পুণ্যভূমি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এর মধ্যে রুকু ও আয়াত রয়েছে যথাক্রমে ৩ ও ৭৮টি।

সূরা আররহমান ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

- ❑ দয়াময় আল্লাহ্,
- ❑ তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন কুরআন,
- ❑ তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ,
- ❑ তিনিই তাহাকে শিখাইয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে,
- ❑ সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে,
- ❑ তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তাঁহারই সিজ্দায় রত রহিয়াছে,
- ❑ তিনি আকাশকে করিয়াছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করিয়াছেন মানদণ্ড,
- ❑ যাহাতে তোমরা সীমালংঘন না কর মানদণ্ডে।
- ❑ ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আররহ্মান' (দয়াময় আল্লাহ্)। মক্কার পৌত্তলিকেরা বলতো, 'রহমান' আবার কে? আমরা তো তাকে চিনি না। তাদের এমতো গর্হিত বচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়। বলা হয়েছে 'রহমান' হচ্ছে ওই সত্তা, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত অনুগ্রহ প্রদানকারী। 'রহমান' শব্দটি আধিক্যপ্রকাশক।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আ'ল্লামাল কুরআন' (তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন)। অর্থাৎ 'রহমান' তিনিই, যিনি মানুষকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। উল্লেখ্য, আলোচ্য সুরায় আল্লাহ্র বহুসংখ্যক অনুগ্রহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সর্বাগ্রে বলা হয়েছে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার কথা। কেননা কোরআন হচ্ছে পৃথিবী ও পরকালের সকল অনুগ্রহের মূল।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তিনিই সৃষ্টি করেছেন 'মানুষ' (৩), তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে' (৪)। একথার অর্থ— মানুষ সৃষ্টি করেছেন তিনি কোরআনের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত দান করতে এবং মানুষকে বাকশক্তিও দিয়েছেন সেই উদ্দেশ্যেই।

মক্কার মুশরিকেরা বলতো, 'রহমান' আবার কে? আমরা তাকে চিনি না। তাদের এরকম কথায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র অসংখ্য নেয়ামতে ডুবে থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁর নেয়ামতের প্রতি অবিশ্বাসী ও বিমুখ। সেকারণেই তাদের চৈতন্যোদয়ের জন্য আল্লাহ্ আলোচ্য সুরায় একত্রিশ বার তাঁর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন 'অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুপালনকর্তার কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে'? উদ্দেশ্য এই যে, এসকল নেয়ামতের বিবরণ শুনে এবং আল্লাহ্র শাসনমূলক প্রশ্ন 'কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে' এমতো প্রশ্নে সচকিত হয়ে তারা যেনো আল্লাহ্কে 'রহমান' (দয়াময়) বলে মেনে নেয়, নেয়ামতসমূহের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য নেয়ামত লাভের জন্য আশাধারী হয়ে যায়।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, পৌত্তলিকেরা বলতো, কেউ একজন মোহাম্মদকে কোরআন শিখিয়ে দেয়। কোরআন আল্লাহ্র বাণী নয়। একথার

প্রতিবাদেই আল্লাহ্ এখানে বলেছেন 'দয়াময় আল্লাহ্, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন'। অর্থাৎ কোরআন মানব রচিত বাণী নয়। আল্লাহ্ই দয়া করে এই কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। আর সকল নেয়ামতের মধ্যে এই কোরআনই শ্রেষ্ঠ। সে কোরআন তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকেই। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ মানুষের প্রতি তাঁর দয়া-রহমতের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা বলেছেন, এখানে মানুষ' বলে বোঝানো হয়েছে হজরত আদমকে। আল্লাহ্ তাঁকে সকল বস্তুর নাম শিখিয়েছেন। সাত লক্ষ ভাষাও জানা ছিলো তাঁর। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষা হচ্ছে আরবী। আবুল আলিয়া ও হাসান

বলেছেন, এখানে 'মানুষ' বলে বোঝানো হয়েছে মানব জাতিকে। আল্লাহ্ মানুষকে লেখা, পড়া, বলা, অনুভব করা ও ভাবপ্রকাশ করার যোগ্যতা দান করেছেন। তাই মানুষ অন্যান্য সৃষ্টির চেয়ে স্বতন্ত্র, মহিমান্বিত। মানুষই কেবল বহন করতে পারে প্রত্যাদেশের ভার, কোরআন গ্রহণ ও তার প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব। সুদ্দী বলেছেন, আল্লাহ্ প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীকে তাদের আপনাপন ভাব প্রকাশের ক্ষমতা দান করেছেন। এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'মানুষ' দ্বারা বোঝানো হয়েছে কেবল রসুলে পাক স.কে। আর 'আ'ল্লামাহুল বায়ান' বলে বোঝানো হয়েছে, মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন। এভাবে কোরআন হয়েছে রসুল স. এর রেসালতের দলিল এবং মানব জাতির পথ প্রদর্শক। আর এই কোরআনে বিধৃত হয়েছে আদি-অন্তের সকল কিছুর বিবরণ। এই কোরআন অতীতের নবী-রসুলগণের শিক্ষারও প্রত্যয়নকারী। ইবনে কীসান বলেছেন, আলোচ্য আয়াতচতুষ্টয়ের শেষ আয়াত দু'টি প্রথম আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা। সেকারণেই উদ্ধৃত বাক্যগুলোর মধ্যে কোনো সংযোজক অব্যয় (এবং, ও ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়নি। আর এগুলো সবই প্রথমোক্ত শব্দ 'আর রহমান' এর বিধেয় অথবা প্রতিধ্বনি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে (৫), তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তাঁরই সেজদায় রত রয়েছে (৬)।

এখানকার 'হুসবান' শব্দটি ক্রিয়ামূল। যেমন ক্রিয়ামূল গুফরান, সুবহান, কুরআন, নুকসান ইত্যাদি। অথবা শব্দটি 'হিসাবুন' এর বহুবচন। যেমন 'শুব্বান' বহুবচন 'শাব্বুন' এর। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সূর্য ও চন্দ্রের গতির হিসাব সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্ধারিত। ও দু'টো আবর্তিত হয়ে চলেছে হিসাব অনুসারে। আর সেই হিসাবে নিশ্চিত হচ্ছে পৃথিবীর নিয়ম-শৃঙ্খলা। হচ্ছে ঋতু ও সময়ের বিবর্তন-পরিবর্তন। গণনা করা সম্ভব হচ্ছে দিন, মাস ও বৎসর। আবার নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি ফরজ হুকুম প্রতিপালনের সময়।

'ওয়ান্নাজ্মু ওয়াশ শাজ্বারু' অর্থ তৃণলতা ও বৃক্ষাদি। 'ইয়াসজুদান' অর্থ সেজদারত। অর্থাৎ তৃণ-তরুও আল্লাহ্র নির্দেশানুগত। মানুষ যেমন সেজদার মাধ্যমে আল্লাহ্র বিধানে সমর্পিত হয়, তেমনি তারা মেনে চলে আল্লাহ্ কর্তৃক

নির্ধারিত নিয়ম। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে তৃণরাজি ও উদ্ভিদের সেজদা করার অর্থ তাদের ছায়া অবনত হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'দক্ষিণে ও বামে ছড়িয়ে পড়েছে তার ছায়া, আল্লাহ্কে সেজদা করার উদ্দেশ্যে। আর তারা তো ইতর'।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড'। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'মীযান' (মানদণ্ড) অর্থ ইনসাফ বা ন্যায়বিচার। অর্থাৎ আল্লাহ্ যেমন আকাশকে সমুন্নত করেছেন, তেমনি আকাশসহ অন্য সকল সৃষ্টিকে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসৃত হয় বলেই এই মহাসৃষ্টি এতো সুষম ও সুশৃঙ্খল। কাতাদা ও জুহাক বলেছেন, এখানে 'মীযান' অর্থ মানদণ্ড, বা তুলাদণ্ড, তা যেমন ওজনের পাল্লা হতে পারে, তেমনি হতে পারে কোনোকিছুর দৈর্ঘ-প্রস্থ-আয়তনের পরিমাপযন্ত্র। কেননা তুলাদণ্ড ও পরিমাপ যন্ত্রের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের ব্যাপারে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ওযন' এর আভিধানিক অর্থ অনুমান করা।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'যাতে তোমরা সীমালংঘন না করো মানদণ্ডে'। এখানকার 'আন' হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। আর 'লা তাত্বগাও' হচ্ছে নিষেধাজ্ঞাসূচক শব্দরূপ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন এজন্য, যাতে তোমরা সীমালংঘন না করো, পরিমাপযন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত রাখো এবং খর্ব না করো কারো যথাঅধিকার। অথবা 'আন্' শব্দটি এখানে ব্যাখ্যামূলক। আর 'লা তাত্বগাও' হচ্ছে নিষেধাজ্ঞাসূচক ক্রিয়া। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ তোমাদেরকে এইমর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেনো কখনো ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে সীমালংঘন না করো।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কোরো এবং ওজনে কম দিয়ো না'। একথার অর্থ— ওজনে ও পরিমাপে তোমরা এতটুকুও কমবেশী কোরো না। ওজন ও মাপ কোরো ঠিকঠাকভাবে। আগের আয়াতে বলা হয়েছে— ওজনে সীমালংঘন না করার কথা, আর এই আয়াতে দেওয়া হলো ঠিকঠাক ওজন করার নির্দেশ। আর আগের দুই আয়াতসহ এখানে পর পর 'মীযান' (মানদণ্ড) উল্লেখ করা হয়েছে তিনবার। বিষয়টির গুরুত্ব বর্ধিত করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে এরকম।

মাসআলা ঃ জায়েদ কোনো সামগ্রী ক্রয় করার পর তা বিক্রয় করে দিলো বকরের কাছে, এমতাবস্থায় বকর যদি ওই সামগ্রী খালেদের কাছে বিক্রয় করে, তবে তাকে পুনরায় ওজন করে বিক্রয় করতে হবে। যদি নিজে সে ওই সামগ্রী ব্যবহার করতে চায়, তবুও তাকে ব্যবহার করার আগে ওই সামগ্রী ওজন করে নিতে হবে। কেননা এমনও হতে পারে যে, আগের ওজন ভুল হয়েছিলো তাই মেপে দেখতে হবে ওজন ঠিক আছে কিনা। ওজন যদি বেশী হয়, তবে বাড়তিটুকুর

www.eelm.weebly.com

মালিক হবে জায়েদ। এমতাবস্থায় সঠিক মালিকের মালিকানা ফেরত দিতে হবে। ওজনের অধিক ভোগ করা ক্রেতার জন্য হারাম। আর হারাম থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

লেনদেন সম্পন্ন হতে হবে দুই ওজনের (ক্রেতার ও বিক্রেতার) মাধ্যমে। অর্থাৎ বিক্রেতা যেমন ওজন করে বিক্রয় করবে। তেমনি ক্রেতাও কিনবে ওজন করে। এভাবে কেনা বেচা না করলে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। রসুল স. এরকমই বলেছেন। বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা ও ইবনে ইসহাক। ইবনে ইসহাক আবার বলেছেন, বর্ণনাটি বিপর্যস্ত বায়যার এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রার মাধ্যমে। হজরত আনাস এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীর সূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, হজরত ওসমান ও হজরত হাকিম ইবনে হাসান দু'জনে মিলে ফলের ব্যবসা করতেন। তাঁরা ওজন করে ফল কিনে নিয়ে পাত্রে ভরে রাখতেন। বেচতেন আগের মাপ অনুসারে। রসুল স. একথা জানতে পেরে এভাবে কেনা বেচা করতে নিষেধ করে দিলেন। বললেন, পুনঃওজন না করে বিক্রয় করা যাবে না। ইবনে ওসমান বলেছেন, বহুসংখ্যক সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। ইমামগণও হাদিসটিকে প্রামাণ্যরূপে মেনেছেন। এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের অভিমতও আমাদের মতের অনুরূপ।

মাসআলা ঃ পণ্য বিক্রয়ের সময়ের পূর্বে বিক্রয়কারী যদি পণ্য ওজন করে রেখে থাকে, তবে সেই ওজন যথেষ্ট হবে না, ক্রেতাকে সামনে করে মেপে থাকলেও। কেননা তা বিক্রয়ের সময়ের ওজন নয়। আর ওই ওজন ও মাপকেও যথেষ্ট মনে করা যাবে না, যা ক্রয়-বিক্রয়কালে বিক্রেতা ওজন করে আসে আড়ালে। কেননা ক্রেতার সামনেই ওজন ও পণ্য সমর্পণ হওয়া জরুরী। কিন্তু ক্রেতার সামনে বিক্রেতার একার ওজন যথেষ্ট কিনা, সে সম্পর্কে দ্বিধা-সংশয়ের অবকাশও বাহ্যত রয়েছে। কেননা হাদিস শরীফে বলা হয়েছে দুই ওজনের (ক্রেতা ও বিক্রেতার) কথা। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ক্রেতার সামনে বিক্রেতার ওজন যথেষ্ট হওয়াই সমীচীন। এতে করে দুই ওজনের উদ্দেশ্যও সফল হয়ে যায়। কেননা এমতাবস্থায় ওজন যদিও এক পক্ষের, তবুও উভয় পক্ষ তা প্রত্যক্ষকারী। এমতো ওজন দুই পক্ষের ওজন হিসেবেই গণ্য। আর ওজন ও সমর্পণ দু'টো অবস্থাই এর মধ্যে রয়েছে।

বর্ণিত হাদিসের আলোকে আর একটি মাসআলাও বেরিয়ে আসে। তা হলো— জায়েদ বকরের সঙ্গে 'সলম' প্রকৃতির ক্রয় করে তাকে অগ্রিম মূল্য প্রদান করলো। সাব্যস্ত হলো সে পণ্য গ্রহণ করবে দু'মাস পর। এমতাবস্থায় জায়েদ হলো 'রববুস সলম' অর্থাৎ মূল্য পরিশোধকারী ও পণ্য গ্রহণকারী। আর বকর হলো 'মুসাল্লাম ইলাইহি' অর্থাৎ মূল্য গ্রহণকারী ও পণ্য হস্তান্তরকারী। দু'মাস অতিবাহিত হওয়ার পর বকর জায়েদকে দেওয়ার জন্য কিছু পণ্য ক্রয় করলো,

কিন্তু নিজে তা হস্তগত করলো না, বললো, তুমি খালেদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে নাও। এরকম করা না জায়েয। কেননা খালেদের কাছ থেকে বকরের পণ্য ক্রয় করার সময় একবার ওজন করা অত্যাবশ্যক। আবার জায়েদের নিকট হস্তান্তরকালেও ওজন করা অপরিহার্য। এমতাবস্থায় একটি ওজন যথেষ্ট হবে না।

সূরা আররহ্মান ঃ আয়াত ১০—২৫

❑ তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছেন সৃষ্ট জীবের জন্য;
❑ ইহাতে রহিয়াছে ফলমূল এবং খর্জুর বৃক্ষ যাহার ফল আবরণযুক্ত,
❑ এবং খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ ফুল।
❑ অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ মানুষকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে,
❑ এবং জিন্নকে সৃষ্টি করিয়াছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হইতে।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

❑ তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যাহারা পরস্পরমিলিত হয়,
❑ কিন্তু উহাদের মধ্যে রহিয়াছে এক অন্তরাল যাহা উহারা অতিক্রম করিতে পারে না।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ উভয় দরিয়া হইতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বতপ্রমাণ নৌযানসমূহ তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন;
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ই পৃথিবীকে সুবিস্তৃত করেছেন প্রাণীকুলের বসবাসস্থলরূপে। তাদের জীবনধারণের জন্য এখানে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল এবং খেজুরের গাছ, যেগুলোর কোনো কোনোটির ফল আবরণযুক্ত। কোনো কোনোটি খোসাবিশিষ্ট আহার্য, আবার কোনো কোনোটি সুবাসিত পুষ্প। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করবে?

এখানে‘ লিল আনাম’ অর্থ সৃষ্টজীব বা প্রাণীকুলের জন্য। অভিধানে রয়েছে, ‘আনাম’ শব্দটি এসছে ‘সাহাব’ বা ‘সাবাত’ এর ওজনে। এর অর্থ— মাখলুক বা সৃষ্টজীব— জ্বিন ও মানুষ, অথবা ওই সকল প্রাণী, যারা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে। বায়যাবী লিখেছেন, কোনো কোনো বিদ্বান মন্তব্য করেছেন ‘আনাম’ অর্থ সকল সৃষ্ট প্রাণী। আমি বলি, এখানে ‘আনাম’ বলে বোঝানো হয়েছে কেবল জ্বিন ও মানুষকে। কেননা এখানকার ‘অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে’ কথাটি বলা হয়েছে তাদেরকে লক্ষ্য করেই।

www.eelm.weebly.com

'ফীহা ফাকিহাতুন' অর্থ এতে রয়েছে ফলমূল। ইবনে কীসান বলেছেন 'ফাকিহা' অর্থ ওই অপরিমেয় অনুগ্রহসম্ভার, যা আস্বাদনার্থে ভক্ষণ করা হয়। 'আল্আক্মাম্' অর্থ যার ফল আবরণবিশিষ্ট। শব্দটি 'কিম্মুন' এর বহুবচন। 'কিম্মুন' অর্থ ফলের আবরণ। 'ওয়াল হাবর্বু' অর্থ এবং খোসাবিশিষ্ট দানা, অর্থাৎ গম, যব এবং এরকম অন্যান্য শস্য, যা আহার্যরূপে গ্রহণ করা হয়। 'জুল আসফি' অর্থ খোসাবিশিষ্ট। 'আস্ফ' বলে শস্যপত্র বা শুকনো ঘাসকে। যেমন ভূষি। আর 'ওয়ার রয়হান' অর্থ সুগন্ধ ফুল। আবার 'রয়হান' অর্থ শস্যাভ্যন্তরের দানাও হয়, যা ভক্ষণ করা হয়। অধিকাংশ তাফসীরকার এরকমই বলেছেন। আরববাসীগণ বলেন 'খরাজ্তু আতলুবু রয়হানাল্লহি' (আমি আল্লাহ্র দেওয়া রিজিক অন্বেষণে বের হয়েছি)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোরআন মজীদে উল্লেখিত সবকয়টি 'রয়হান' শব্দের অর্থ রিজিক। হাসান ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, 'রয়হান' অর্থ ওই সুবাস, যার আঘ্রাণ গ্রহণ করা হয়। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'রওহুন' থেকে। শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'রুওয়ায়হান। পরে 'ওয়াও' অক্ষরটির স্থলে 'ইয়া' প্রযুক্ত

হয়েছে। তারপর আবার 'ইয়া' অক্ষরটিকে নিয়ে আসা হয়েছে লঘু উচ্চারণে। কোনো কোনো অভিধানবেত্তা বলেছেন, শব্দটি মূলতঃ ছিলো 'রওহান'। উচ্চারণকে লঘু করার মানসে পরে 'ওয়াও' কে পরিবর্তন করা হয়েছে 'ইয়া' দ্বারা।

'ফা বিআয়্যি আলায়ি রব্বিকুমা তুকাজ্জিবান' অর্থ অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? কথাটি বলা হয়েছে জ্বিন ও মানুষকে লক্ষ্য করে। কেননা এর পরে ৩১ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে 'আইয়্যুহাছ্ ছাক্বালান' যার অর্থ— হে মানুষ ও জ্বিন! কোনো কোনো বিদ্বান আবার বলেছেন, এখানে দ্বিবচনবোধক শব্দ ব্যবহার করা হলেও মূলতঃ সম্বোধনটি করা হয়েছে কেবল মানুষকে। আরববাসীগণের মধ্যে এরকম সম্বোধনরীতি সুপ্রবল। এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে 'আলক্বিয়া ফী জাহান্নাম'। এখানেও ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিবচনবোধক শব্দরূপ। আর এখানকার 'ফা বিআইয়্যি' প্রশ্নটির 'ফা' কারণপ্রকাশক। এর দ্বারা গুরুত্ব বর্ধন করা হয়েছে আল্লাহ্র অনুগ্রহের। আর একই সঙ্গে 'আলা' অব্যয় দ্বারা অনুগ্রহের অস্বীকৃতিকে করা হয়েছে নিষিদ্ধ এবং একই সঙ্গে শাসানো হয়েছে অনুগ্রহ-অস্বীকারকারীদেরকে।

মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির সূত্রে হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, রসুল স. একবার আমাদের সামনে সুরা আররহমান আবৃত্তি করলেন। শেষে বললেন, কী ব্যাপার! তোমরা চুপচাপ কেনো? এ ব্যাপারে জ্বিনেরাই তো ছিলো উত্তম। আমি তাদেরকে সুরা আররহ্মান তেলাওয়াত করে শুনিয়েছি। যতবার বলেছি 'ফা বিআয়্যি আলায়ি রব্বিকুমা তুকাজজিবান' ততোবার তারা বলেছে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা তোমার কোনো অনুগ্রহই অস্বীকার করি না। সকল প্রশংসা তোমার।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে—'মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মতো শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে (১৪) এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধুম অগ্নিশিখা থেকে (১৫)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (১৬)?

এখানে 'মানুষকে সৃষ্টি করেছেন' অর্থ সৃষ্টি করেছেন আদমকে। 'সলসলিন' অর্থ শুষ্ক মৃত্তিকা, শুকনো মাটি, যা বাড়ি খেলে ঠন ঠন আওয়াজ করে। কেউ কেউ বলেছেন, খামির করা কাদাকে বলে 'সল্সল'। 'কাল ফাখ্খর' অর্থ পোড়া মাটি। অর্থাৎ আগুনে পোড়ানো মাটি। কারো কারো মতে 'ফখর' অর্থ অদৃশ্য বস্তু, সম্পদ বা পদমর্যাদার কারণে গর্ব প্রকাশ করা। কলসীতে বাড়ি দিলেও ঠন ঠন শব্দ হয়, যেনো তা গর্ব প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, মানুষের সৃষ্টি-উপাদান সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন 'ত্বিনুল্ লাজিব' 'তুরাব' ইত্যাদি। শব্দগুলো বিপরীতার্থক নয়। কেননা শব্দগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাটি। মাটিকেই পানি মিশিয়ে বানানো হয়েছে কর্দম। এরপর ওই কর্দমকে বানানো হয়েছে খামির। তারপর ওই খামিরকে এমনভাবে শুকানো হয়েছে, যাতে তাতে বাড়ি দিলে ঠন ঠন আওয়াজ নির্গত হয়।

'ওয়া খলাক্বল্ জ্বান্না' অর্থ এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, 'জ্বান' জ্বিন জাতির পূর্বপুরুষের নাম। জুহাক বলেছেন, এখানে 'জ্বান' বলে বোঝানো হয়েছে ইবলিসকে। আর মিম্ মারিজ্বিম্ মিন্নার' অর্থ নির্ধুম অগ্নিশিখা থেকে। 'মারিজ্ব' এর অভিধানগত মৌলিক অর্থ হচ্ছে দোদুল্যমানতা। শব্দটির ব্যুৎপত্তি ঘটেছে 'মারাজ্ব' থেকে। 'মারাজ্ব' অর্থ দোদুল্যমান বস্তু। মুজাহিদ বলেছেন, 'মারিজ্ব' অর্থ মিশ্রিত। আরববাসীগণ বলেন 'মারাজ্বা আমরুল কাওম' (গোত্রগত বিষয়টি হয়ে গিয়েছে সংমিশ্রিত)। আগুনের লাল, হলুদ ও সবুজ রঙের স্ফুলিঙ্গ যখন এক সাথে মিশে যায়, তখন তাকে বলে 'মারিজ্ব'। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— সৃজনায়নের বিভিন্ন স্তর ও সময় অতিক্রান্তির পর মানুষ ও জ্বিন জাতিকে দেওয়া হয়েছে কতো সুন্দর, সুষম ও সুঠাম রূপ। অতএব তারা কী করে অস্বীকার করতে পারে আল্লাহ্র এমতো অনন্য অনুগ্রহ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা (১৭)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (১৮)? এখানে 'দুই উদয়স্থল' ও 'দুই অস্তস্থল' অর্থ গ্রীষ্ম ও শীতকালে

সূর্যের পৃথক পৃথক উদয়স্থল ও অস্তস্থল। এভাবে এখানে এই কথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সূর্যের উদয়স্থল ও অস্তস্থলের এহেন তারতম্য ঘটিয়ে আল্লাহ্ মানুষের অনেক উপকার সাধন করেছেন। এর ফলে বজায় থাকে ঋতুচক্র ও আবহাওয়ার চিরাচরিত ভারসাম্য, বৈচিত্র। অতএব মানব-জ্বিনের পক্ষে এমতো অনুপম অনুকম্পাকে উপেক্ষা করা সম্ভব কী?

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া, যারা পরস্পরমিলিত হয় (১৯), কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না (২০)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে'(২১)?

এখানে 'মারাজ্বাল বাহ্‌রাইন' অর্থ তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া। 'মারজ্ব' শব্দটি এসেছে এই কথাটি থেকে 'মারজ্বতুদ্ দাব্বাহ' (আমি প্রাণীকে চারণভূমিতে ছেড়ে দিয়েছি)। আর 'দুই দরিয়া' হচ্ছে দুই সমুদ্র— একটি মিঠা পানির। অপরটি লোনা পানির। 'ইয়ালতাক্বিয়ান' অর্থ যারা পরস্পরমিলিত হয়। অর্থাৎ মিঠা ও লোনা পানির দুই সমুদ্র পাশাপাশি মিলিতাবস্থায় থাকে। 'বাইনা হুমা বারযাখুন' অর্থ কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে এক অনড় অন্তরাল। 'বারযাখুন' অর্থ পর্দা, প্রাচীর, অন্তরাল, অন্তরায়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌রই অপার ক্ষমতার নিদর্শনরূপে ওই দুই সমুদ্রের মধ্যে বিরাজ করে এমন এক অনড় বাধা, যাতে করে তারা পরস্পরমিলিত হওয়া সত্ত্বেও স্ব স্ব সীমানায় তাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রবহমান থাকে, একে অপরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে একাকার হয়ে যেতে পারে না। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ— তারা মানুষের দিকে ছুটে এসে তাদেরকে ডুবিয়ে দেয় না। হাসান বলেছেন, এখানকার 'দুই দরিয়া' অর্থ পারস্য উপসাগর ও

ভারত মহাসাগর। কাতাদা বলেছেন, এখানে 'বারযাখ' অর্থ উপত্যকাসমূহ। আর 'দুই দরিয়া' হচ্ছে পারস্য উপসাগর ও রোম সাগর। মুজাহিদ ও জুহাক 'দুই দরিয়া'র অর্থ করেছেন— আকাশের সমুদ্র ও পৃথিবীর সমুদ্র। এই দুই সমুদ্র বৎসরে একবার পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে তরঙ্গমান সমুদ্রসমূহের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে আল্লাহ্‌র সর্বশক্তিধরতার অবাক নিদর্শন, যা মানুষের জন্য বহন করে অপরিমেয় কল্যাণ। এ অনন্যসাধারণ দানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কী মানুষ ও জ্বিনদের জন্য সমীচীন?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল (২২)। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে (২৩)?

এখানে 'উভয় দরিয়া থেকে' অর্থ কেবল মিঠাপানির সমুদ্র থেকে। কেউ কেউ মনে করেন, মুক্তা উৎপন্ন হয় কেবল লবনাক্ত সমুদ্রে, মিঠা পানির সমুদ্রে মুক্তা উৎপন্ন হয় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিবচনবোধক সর্বনাম 'মিন হুমা' (উভয় সমুদ্র থেকে)। সুতরাং কথাটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবে— যেস্থানে মিঠা পানি ও লোনা পানি মিলিত হয়, সেখানেই উৎপন্ন হয় মুক্তা। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার কথাটিকে মিলিয়েছেন এভাবে— দুই সমুদ্র যখন পরস্পরমিলিত, তখন তারা যেনো একটি সাগর। এমতাবস্থায় একটি থেকে মুক্তা উৎপন্ন হওয়ার অর্থ যেনো উভয়টি থেকে উৎপন্ন হওয়া। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, দু'টি বিষয়কে এক সঙ্গে উল্লেখ করার পর বিশেষভাবে তাদের একটির অবস্থা বর্ণনা করার রীতি আরবী ভাষায় রয়েছে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ইয়া মা'শারাল জ্বিননি ওয়াল ইনসি আলাম ইয়াতিকুম রসুলুম মিনকুম' (হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য থেকে কি রসুল আগমন করেননি?) অথচ রসুল স. তো ছিলেন মানব সম্প্রদায়ভূত। এই রীতিটিই প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে।

মুজাহিদ ও জুহাকের মতানুসারে যদি 'দুই দরিয়া' অর্থ আকাশ ও পৃথিবীর সাগর হয়, তবে কথাটির অর্থ করা যেতে পারে এভাবে— আকাশ থেকে যখন বৃষ্টি পতিত হয়, তখন পৃথিবীর সাগরের ঝিনুকগুলো তাদের মুখগহ্বর উন্মুক্ত করে। বৃষ্টিবিন্দু যার মুখে পড়ে, সে মুখ বন্ধ করে। তার পেটেই উৎপন্ন হয় মুক্তা। ইবনে জারীর এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন।

এখানে 'আল্‌লু'লুউ' অর্থ বড় মুক্তা। আর 'আলমারজ্বান' অর্থ ছোট মুক্তা, প্রবাল। মুকাতিল ও মুজাহিদ অর্থ করেছেন এর বিপরীত। কোনো কোনো অভিধানবিশারদ বলেছেন, 'মারজ্বান' অর্থ লাল মোতি। এটা মুক্তারই একটি প্রকার, যা দৃশ্যতঃ উদ্ভিদ, অথবা পাথরসদৃশ। অর্থাৎ প্রবাল। আতা বলেছেন, 'মারজ্বান' বলে মোতির মূলকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে মানুষ ও জ্বিন! সমুদ্রের মনি-মুক্তাও তো আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছেন নিতান্ত কৃপাপরবশ হয়ে। কৃপার এ বিরল নিদর্শনটিকেও কি তোমরা অবজ্ঞা করতে পারবে?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বতপ্রমাণ নৌযানসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন (২৪); সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (২৫)? একথার অর্থ— হে মানুষ ও জ্বিন! দৃকপাত

www.eelm.weebly.com

করো জলধিতরঙ্গে বিচরণমান বিশালাকৃতির অর্ণববহরের প্রতি। দ্যাখো, সেগুলোর যতি ও যাত্রা কেমন শৃঙ্খলাশোভিত ও সুনিয়ন্ত্রিত।

তোমাদের কল্যাণের জন্য এমতো শৃঙ্খলা তো নিশ্চিত করি আমি। তাহলে বলো, তোমাদের প্রতি আমার এমতো কৃপাকে অস্বীকার করা কি তোমাদের জন্য শোভন, না সমীচীন?

সূরা আররহমান ঃ আয়াত ২৬— ৪৫

❑ ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর,

❑ অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালাকের সত্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব;

❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে সকলেই তাঁহার নিকট প্রার্থী, তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত।

❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

❑ হে মানুষ ও জিন্ন! আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করিব,

❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

❑ হে জিন্ন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করিতে পারিবে না সনদ ব্যতিরেকে।

❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

❑ তোমাদের প্রতি প্রেরিত হইবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

❑ যেই দিন আকাশ বিদীর্ণ হইবে সেই দিন উহা রক্ত-রঙ্গে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করিবে;

www.eelm.weebly.com

❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ সেই দিন না মানুষকে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে, না জিন্নকে!
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাইবে উহাদের লক্ষণ হইতে, উহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে মাথার ঝুঁটি ও পা ধরিয়া।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহা অপরাধীরা অবিশ্বাস করিত,
❑ উহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাফসীরে মাযহারী/২৩১

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— পৃথিবীপৃষ্ঠের সচেতন-নিশ্চেতন সকল সৃষ্টি নশ্বর। অনশ্বর কেবল আল্লাহ্, যিনি মহামহিম, সুমহান। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ মানুষ ও জ্বিনকে তাঁর প্রতি মনোযোগী হওয়ার সামর্থ্য দান করেছেন, দয়া করে দিয়েছেন আপাত নশ্বরতার পর অনন্ত অবিনশ্বরতা। মৃত্যু ও মহাপ্রলয় শেষে তাই তাদের পুনরুত্থান ঘটানো হবে। দেওয়া হবে অনন্ত জীবন— পুরস্কারধন্য, অথবা তিরস্কারধিকৃত। এই ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যটি কি আল্লাহ্র অবিসংবাদিত করুণা নয়? সুতরাং হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তাঁর কোন করুণার প্রতি বৈমুখ্য প্রদর্শন করতে পারো?

'কুল্লুমান আলাইহা' অর্থ ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে। লক্ষণীয়, ভূপৃষ্ঠে আছে চেতনাবান ও চেতনাহীন উভয় প্রকার সৃষ্টি। আবার চেতনাহীন সৃষ্টিই এখানে অধিক। অথচ এখানে উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে 'মান' (যা কিছু) যা সচরাচর ব্যবহৃত হয় চেতনশীল প্রাণীদের ক্ষেত্রে। এর কারণ হচ্ছে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কেবল মানুষ ও জ্বিন জ্ঞান-বিবেকসম্পন্ন। সৃষ্টির মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ। সেকারণেই অন্যান্যদের উপরে তাদের প্রাধান্য বজায়ার্থে এখানে তাদের ও সকলের জন্য 'মান' ব্যবহারকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

'ফান' অর্থ নশ্বর। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। অথবা আল্লাহ্ যখনই ইচ্ছা করবেন, তখনই বিনাশ করবেন সমগ্রসৃষ্টি। কিংবা প্রত্যেক সৃষ্টিই অস্তিত্বগতভাবে ধ্বংসশীল। তাদের অস্তিত্ব প্রদত্ত, নিজস্ব নয়। 'ইয়াবক্ব ওয়াজ্বহু রব্বিকা' অর্থ অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা। 'ওয়াজ্বহু' এর শাব্দিক অর্থ চেহারা, অবয়ব, মুখমণ্ডল। কিন্তু আল্লাহ্ হচ্ছেন অবয়াতীত ও অনুভবের উর্ধ্বে। তাই বুঝতে হবে এই আয়াত মুতাশাবিহাতের (রহস্যাচ্ছন্ন আয়াতের) অন্তর্ভূত। 'জুল জ্বালালি ওয়াল ইকরম' অর্থ মহিমময়, সকল কিছু থেকে চির অমুখাপেক্ষী। 'ওয়াল ইকরম' অর্থ মহানুভব, প্রভূত মর্যাদাধারী। উল্লেখ্য, এখানকার 'ওয়াজ্বহু রব্বিকা' (প্রভুপালকের সত্তা) কথাটি সম্পৃক্ত আগের আয়াতের 'ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর' এর সঙ্গে। সুতরাং এখানে 'ওয়াজ্বহু' শব্দটির মর্মার্থ হবে— দিক। অর্থাৎ নশ্বরতা সৃষ্টির দিক এবং আল্লাহ্র দিক হচ্ছে অবিনশ্বরতা। এরকম অর্থই সম্পৃক্তক ও সম্পৃক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

একটি সন্দেহ ঃ এখানকার সংযোজনাটি পরস্পরের বিরোধী। একটি সৃষ্টির নশ্বরতা— অপরটি স্রষ্টার অবিনশ্বরতা। সম্পর্ক দু'টি সমন্বিত নয়।

সন্দেহের নিরসন ঃ যদি সেরকমই হতো, তবে 'নশ্বরতা'কে তো সৃষ্টির জন্য বিশেষায়িত করা হতো না। আর 'ওয়াজ্বহু' অর্থ 'দিক' ধরা হলে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ভূপৃষ্ঠের সকল সৃষ্টিই সত্তাগত হিসেবে ধ্বংসশীল, অবিনশ্বরতার কোনো দিক তাদের নেই। সবদিক থেকে নশ্বরতা তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে, কিন্তু আল্লাহ্র দিক ধ্বংস থেকে চিরসুরক্ষিত। আর সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ মানুষ ও জ্বিন যদি বিশ্বাস ও সমর্পণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে, তবেই কেবল তারা বের হয়ে আসতে পারবে নশ্বরতার বেষ্টন থেকে। পাবে চিরকালীন অনুপদ্রব জীবন। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'কুল মা ইয়াবাউবিকুম রব্বি দুআ'উকুম'।

তাফসীরে মাযহারী/২৩২

আর এখানকার 'জুলজ্বালালি ওয়াল ইকরম' হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার মহামর্যাদাপ্রকাশক নামসমূহের অন্তর্গত দু'টি নাম। হজরত আনাস থেকে তিরমিজি এবং হজরত রবীয়া ইবনে আনাস থেকে আহমদ, নাসাঈ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'জুলজ্বালালি ওয়াল ইকরমের' প্রতি সতত-অনুরাগী থেকো। 'হিসনে হাসীন' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুল স. কোথাও যাচ্ছিলেন। এমন সময় শুনতে পেলেন, এক ব্যক্তি উচ্চারণ করলো 'ইয়া জালজ্বালালি ওয়াল ইকরম'। তিনি স. তাঁকে বললেন, এখন তোমার দোয়া কবুল করা হবে। দোয়া করো। মানুষের সর্বাধিক বিনয় প্রকাশ পায় 'ইয়া জালজ্বালালি' উচ্চারণে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে—'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই তাঁর নিকট প্রার্থী, তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত (২৯)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৩০)? একথার অর্থ মানুষ, জ্বিন ফেরেশতাসহ সকলেই তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ্ সমীপে প্রার্থী হয়। চায় জীবনোপকরণ, সুস্থতা,

www.eelm.weebly.com

শান্তি, ইবাদত সম্পাদনের সামর্থ্য, ক্ষমা, দয়া, নূর, বরকত, মহব্বত। তিনি প্রত্যহ এ সকল কিছুর মীমাংসা করেন। সুতরাং হে মানুষ ও জ্বিন! আল্লাহ্ যে এভাবে প্রতিনিয়ত তোমাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষা করে তোমাদেরকে অনুকম্পায়িত করে চলেছেন, এই অপরিমেয় অনুগ্রহকে তোমরা অস্বীকার করবে কেমন করে?

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, এখানে 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে' বলে বুঝানো হয়েছে সকল সৃষ্টিকে। কেননা সকলেই এবং সকল কিছুই তাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য সতত আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। এমতাবস্থায় এখানকার 'প্রার্থী' কথাটির অর্থ হবে মুখাপেক্ষী। আর প্রার্থনা অর্থ ওই প্রার্থনা, যা মুখাপেক্ষিতাপ্রকাশক, তা সবাক হোক, অথবা হোক নির্বাক।

'কুল্লু ইয়াওমিন হুয়া ফী শা'ন' অর্থ তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত। অর্থাৎ সৃষ্টি প্রত্যহ প্রার্থনা করে, তিনিও প্রত্যহ তাদের প্রার্থনা পূরণ করেন। সৃজন করেন নতুন নতুন সৃষ্টি। তাঁর প্রতিদিনের নির্ধারণও নিত্য নতুন। প্রত্যহ কাউকে জীবন দান করেন, কারো মৃত্যু ঘটান, কাউকে সম্মানিত করেন, কাউকে করেন অসম্মানিত। কারো জীবিকা প্রশস্ত করেন, কারো করেন সংকুচিত। আরো করেন পীড়িত, সুস্থ, বিপদগ্রস্ত, বিপদমুক্ত, ক্ষমা, শাস্তিগ্রস্ত ইত্যাদি। এভাবে তিনি যখন যা অভিপ্রায় করেন, তা-ই করেন।

রসুলেপাক স. বলেছেন, এটাও আল্লাহ্পাকের শান যে, তিনি পাপ মার্জনা করেন, বিপদ দূর করেন, কোনো জাতিকে উচ্চাসনে আসীন করেন, আবার কোনো জাতিকে করেন হেয়। হজরত আবু দারদা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা ও ইবনে হাব্বান। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুনীর থেকে। আর বায্যার বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে। বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ যা কিছু

সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে একটি শাদা বর্ণের মোতির ফলক, যার দু'টি পক্ষ লাল বর্ণের ইয়াকুতের তৈরী। তাঁর কলম নূরের এবং তাঁর লেখাও নূর। আল্লাহ্ প্রতিদিন ওই ফলকের লিপির উপর দৃষ্টিপাত করেন তিনশত ষাট বার। তিনিই সৃষ্টি করেন, রিজিক দান করেন, জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান। আরো করেন সম্মানিত ও অসম্মানিত। তিনি যা অভিপ্রায় করেন তা-ই করেন। 'প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত' কথাটির অর্থ এরকমই। হোসাইন ইবনে ফজল বলেছেন, আল্লাহ্পাকের শান হচ্ছে, তিনি তাঁর নির্ধারিত বিষয়সমূহকে নির্দিষ্ট স্থানে যথাসময়ে পৌঁছে দেন। সুলায়মান দারানী 'কুল্লু ইয়াওমিন হুয়া ফী শা'ন' (প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত) কথাটির অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ তাঁর দাসগণের নিকট প্রতিদিন নিত্য নতুন কল্যাণ পৌঁছে দেন।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, আল্লাহ্পাকের সৃষ্ট অনন্তকাল দু'টি দিনে বিভক্ত— একদিন দুনিয়ার এবং আরেক দিন আখেরাতের। দুনিয়ার দিনে আল্লাহ্র শান হচ্ছে— তিনি কোনো কোনো কাজের আদেশ দেন এবং নিষেধ করেন কোনো কোনো কাজ করতে। যেমন জীবন দান করেন, মৃত্যু ঘটান, দান করেন জীবিকা, আবার তা প্রতিহতও করেন। আর আখেরাতের দিনে তাঁর শান হচ্ছে, আমলের প্রতিফল প্রদান করা, হিসাব গ্রহণ করা, সওয়াব ও আযাব দেওয়া। কোনো কোনো জ্ঞানী বলেছেন, আল্লাহ্ প্রতিদিন তিনটি বাহিনী এক জগত থেকে বের করে অন্য জগতে নিয়ে যান। একটি বাহিনীকে পিতৃপৃষ্ঠ থেকে মার্তৃগর্ভে, একটিকে মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে এবং আর একটিকে পৃথিবী থেকে কবরে। এরপর সকলেই এক সঙ্গে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

মুকাতিল বলেছেন, ইহুদীরা বলতো, আল্লাহ্ শনিবারে কোনো কিছু মীমাংসা করেন না। তাদের এমতো অপকথন খণ্ডনার্থে অবতীর্ণ হয়— তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'হে মানুষ ও জ্বিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করবো (৩১), সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৩২)?

এখানে 'সা নাফ্রুগু লাকুম' অর্থ আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করবো। কথাটির অর্থ হতে পারে আরো কয়েক রকমের। যেমন—১. অচিরেই আমি তোমাদের পুরস্কার ও শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করবো। অর্থাৎ কিয়ামত সন্নিকটবর্তী। কিয়ামতের পর আমি কৃতকর্মের প্রতিফল ছাড়া অন্য কোনো কিছু সৃষ্টি করবো না। ২. সত্বর আমি তোমাদেরকে শাসন করবো। যেমন আরববাসীগণ বলেন 'সা আফ্রুগু লাকা' (সত্বর আমি তোমাকে শায়েস্তা করবো)। সব কাজ থেকে পৃথক হয়ে মানুষ যখন একটি কাজের দিকে মনোযোগী হয়, তখন সে ওই কাজ করে পূর্ণাঙ্গরূপে। কিন্তু এখানে 'ফারেগ' হওয়া বা পৃথক হওয়ার অর্থ ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হওয়া নয়, বরং শাসন করা বা শায়েস্তা করা।

হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। ৩. অতিসত্বর আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত অবকাশ ও শৈথিল্য স্থগিত করবো। চূড়ান্ত মীমাংসা করবো তোমাদের কৃতকর্মের। ৪. তোমাদেরকে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের যে প্রতিজ্ঞা আমি করেছি, খুব শীঘ্রই সে কাজ আমি সম্পন্ন করবো। অর্থাৎ তোমাদের কৃতকর্মের হিসাব বুঝে নিয়ে তোমাদেরকে আমি যথাপ্রতিফল দিবো অচিরেই। এভাবে আমি পৃথক হয়ে যাবো আমার প্রতিজ্ঞাপূরণের পরিকল্পনা থেকে। এরকম বলেছেন হাসান ও মুকাতিল।

www.eelm.weebly.com

আর এখানকার ‘আছ্‌ছাক্বলান’ অর্থ মানুষ ও জ্বিন। ‘ছাক্বল’ অর্থ ভার। জীবিত ও মৃত মানুষ ও জ্বিনের একটা প্রভাব বা ভার পৃথিবীতে থাকেই। তাই মানুষ ও জ্বিনকে এখানে বলা হয়েছে ‘ছাক্বলান’। ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, মানুষ ও জ্বিন উভয়েই পাপের ভারে পূর্ণ। কেউ কেউ বলেছেন, মানুষ ও জ্বিনকে শরিয়তের ভার বহন করতে হয়। তাই তারা ‘ছাক্বলান’। আল্লাহ্‌র পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ হয় মানুষ ও জ্বিনের উপরেই। তাই তাদেরকে হয়তো বলা হয়েছে ‘ছাক্বলান’।

ভাষাবিশারদগণ বলেছেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে যে মর্যাদা ও মহিমা লাভের উপযোগী, তাকে বলে ‘ছাক্বল’। রসুল স. বলেছেন ‘ইন্‌নী তারিকু ফীকুম ছাক্বলাইনি কিতাবাল্লাহি ওয়া ই্‌রতি’ (আমি তোমাদের জন্য দু’টি ভারী বিষয় রেখে যাচ্ছি— আল্লাহ্‌র কিতাব ও আমার পরিবারবর্গ)। তিনি স. এখানে গুরুত্ব প্রদানার্থে কিতাবুল্লাহ্‌ ও তাঁর পরিবারবর্গকে বলেছে ‘ছাক্বলাইন’। এই অর্থটিকে মেনে নিলে ‘আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করবো’ কথাটির অর্থ হবে— অচিরেই তোমাদের প্রতি আমার আচরণ সম্পন্ন হবে সঠিক পথের আলোকে। তার মধ্যে ভিন্নতর কিছুর অনুপ্রবেশ মাত্র থাকবে না। উকাইলির বিবরণে এসেছে, হজরত আবু জর বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! মহাবিচারের দিবসে আমরা কি আমাদের প্রভুপালয়িতাকে সরাসরি দেখতে পাবো? তিনি স. বললেন, কেনো পারবে না? আমি বললাম, সৃষ্টির সেরকম যোগ্যতা কি রয়েছে? তিনি স. বললেন, চাঁদকে কি তোমরা সরাসরি দেখতে পাওনা? আমি বললাম, অবশ্যই পাই। তিনি স. বললেন, চন্দ্রও তো আল্লাহ্‌র এক সৃষ্টি। আর আল্লাহ্‌র মর্যাদার প্রাচুর্য ও মহিমার অভিপ্রকাশ তো সর্বাধিক। আবু দাউদ। জনৈক কবি তাই বলেছেন— আমি এমন একটি ভূবন চাই, যেখানে থাকবে কেবল তুমি আর আমি। এভাবে এখানকার পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে মানুষ ও জ্বিন! আমার অনুগ্রহসম্ভারের যথামর্যাদা বজায় রাখো। হও কৃতজ্ঞ। মনে রেখো, আমার কোনো একটি অনুগ্রহকেও তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারবে না। নিশ্চিত জেনো, অচিরেই আমি এই মর্মে হিসাব গ্রহণ করবো যে, কে আমার অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ, কে নয়। সুতরাং সাবধান!

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা যদি তোমরা অতিক্রম করতে পারো, অতিক্রম

করো, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না সনদ ব্যতিরেকে (৩৩)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে (৩৪)? একথার অর্থ— হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা যদি আল্লাহ্‌র বিধানের দায়-দায়িত্ব থেকে বেরিয়ে যেতে চাও, অতিক্রম করতে চাও তার আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা, তবে তা-ই করো। কিন্তু তোমরা তা পারবে না, আল্লাহ্‌র দেওয়া শক্তি ব্যতিরেকে। যেখানেই তোমরা যাও না কেনো, মৃত্যু তোমাদেরকে অধিকার করবেই। সুতরাং জীবনরূপ এই যে অনুগ্রহ আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, তা তোমরা অস্বীকার করবে কী করে?— এখানকার নির্দেশটি অক্ষমক। অর্থাৎ এরকম করতে তোমরা কখনোই সক্ষম হবে না।

কোনো কোনো জ্ঞানী বলেছেন, এরকম নির্দেশ ঘোষণা করা হবে মহাপ্রলয় দিবসে। ইবনে মুবারক ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, জুহাক বলেছেন, মহাপ্রলয় শুরু হলে যখন পৃথিবীর নিকটতম আকাশ ভেঙে পৃথিবীবাসীদের উপরে পতিত হবে, তখন ঘোষিত হবে এই নির্দেশ। ফেরেশতারা তখন দাঁড়িয়ে থাকবে আকাশের প্রান্তে। এরপর নির্দেশ পেয়ে তারা নেমে আসবে নিচে। ঘিরে ফেলবে পৃথিবীবাসীদেরকে। তখন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আকাশের অবস্থাও হবে সেরকম। সাত আসমানের সকল ফেরেশতা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। এরপর আল্লাহ্‌ তাঁর মহিমান্বিত জ্যোতির প্রকাশ ঘটাবেন। বাম প্রান্তে থাকবে জাহান্নাম। জাহান্নামকে দেখে পৃথিবীবাসীরা এদিক ওদিক পলায়ন করতে চাইবে। কিন্তু সবদিকেই তারা দেখতে পাবে ফেরেশতাদের সাতটি সুশৃঙ্খল সারি। বাধ্য হয়ে তারা পলায়নের চেষ্টা পরিত্যাগ করবে। অন্যান্য আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন—

’আমি তোমাদের উপর আগত মহাপ্রলয় দিবসের আশংকা করছি। সেদিন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে’।

‘সেদিন তোমার পালনকর্তা আসবেন ও ফেরেশতামণ্ডলী আসবে সারিসারি। আর সেদিন আনীত হবে জাহান্নাম’।

‘হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! যদি তোমরা আকাশমণ্ডলীর ও ভূমির স্তর ভেদ করে ঊর্ধ্বারোহণ করতে সক্ষম হও, তাহলে অতিক্রম কোরো’।

‘আর ফেটে যাবে সেদিন আকাশ। সেদিন তা হবে ছিদ্রিত। আর ফেরেশতারা থাকবে তার শেষ প্রান্তে’।

এমতাবস্থায় ভেসে আসবে একটি ঘোষণা— ‘তোমরা হিসাব বুঝে নেওয়ার জন্য এসো’।

‘লা তানফুযুনা’ অর্থ তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না। অর্থাৎ তোমরা বের হয়ে যাবার কোনো শক্তিই পাবে না। আর ‘ইল্‌লা বি সুলত্বান’ অর্থ সনদ ব্যতিরেকে। অর্থাৎ সেরকম শক্তি থাকলে তো তোমরা বের হয়ে যেতে পারবে। কিন্তু তোমাদের নিজস্ব শক্তি বলে তো কিছু নেই। অথবা— তোমরা আকাশ ও

www.eelm.weebly.com

পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করতে পারবে আল্লাহ্‌র দেওয়া শক্তির মাধ্যমে। কিন্তু তোমাদের না আছে আল্লাহ্‌প্রদত্ত শক্তি, না আছে নিজস্ব ক্ষমতা। মানুষ যে সামর্থ্যবলে কর্ম করে, তা তো 'আতায়ী' (আল্লাহ্‌প্রদত্ত) এবং 'আরেজী' (বাহ্যিক)। 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো দিক থেকে কোনো শক্তি যেমন নেই, তেমনি সাহায্যও নেই)।

রসুল স. সশরীরে মেরাজ করেছিলেন। সপ্ত আকাশ ভেদ করে পৌঁছেছিলেন 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত, তা-ও তো ছিলো আল্লাহ্‌র দয়া ও দান। সুফীগণও আল্লাহ্‌র দেওয়া ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়ে পৌঁছে যান 'মাদারেজে কুরব' বা নৈকট্যের সোপানে। কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন— তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাবে, সেদিকেই তো আল্লাহ্‌র সাম্রাজ্য। এমতো অর্থকে মান্য করলে এখানকার 'বিসুলত্বান' এর 'বা' হবে 'ইলা' (প্রতি) অর্থপ্রকাশক। যেমন আরববাসীগণ বলেন 'যায়েদুন আহসানা বী' (জায়েদ আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে) অর্থ জায়েদ ভালো আচরণ করেছে আমার প্রতি। হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা জানার শক্তি যদি তোমাদের থাকে, তাহলে তা জেনে নাও, তবে ওই সকল নিদর্শনরাজি 'সুলত্বান' ব্যতীত, যা আল্লাহ্ বিশেষভাবে রহস্যাচ্ছন্ন করে রেখেছেন আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে, তা তোমরা জানতে সক্ষম হবে না।

আর এখানকার 'কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' অর্থ তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কোরো না। এমতো গর্হিত কার্য আল্লাহ্‌র শাস্তিকে অনিবার্য করে। তোমরা তো আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে পলায়ন করার সামর্থ্যও রাখো না। কোনো কোনো জ্ঞানীজন বলেছেন, সাবধান করা, ভয় প্রদর্শন করা ও সর্বশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌পাক তো ক্ষমাও করেন। আর ক্ষমা হচ্ছে আল্লাহ্‌পাকের অন্যতম অনুগ্রহ। মেরাজ, আত্মিক উন্নতির উপকরণাদি এসকল কিছুও তো আল্লাহ্‌পাকের অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত, যে অনুগ্রহের মাধ্যমে মানুষ আকাশসমূহ অতিক্রম করতে পারে। এ সকল কিছুও আল্লাহ্‌র অনুকম্পা। বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেদিন সকল সৃষ্টিকে ফেরেশতামণ্ডলী ও অগ্নিশিখার বেষ্টনী দ্বারা ঘিরে রাখা হবে। অতঃপর ঘোষণা করা হবে— হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায়! তোমরা যদি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করে বেরিয়ে যেতে পারো, তবে বেরিয়ে যাও।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না (৩৫)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে (৩৬)?

এখানে 'তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা' অর্থ কবর থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার সময় তোমাদের উপর ছুঁড়ে মারা হবে আগুন। 'শুওয়াজুন' অর্থ ধূম্রপুঞ্জহীন অগ্নিশিখা। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার এরকমই বলেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, শুওয়াজ'

হচ্ছে সবুজ বর্ণের ওই অগ্নিশিখা, যা অগ্নি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়। অর্থাৎ অগ্নিশিখা। সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও কালাবী এখানকার 'নুহাস' শব্দটির অর্থ করেছেন— ধুম্র। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতও এরকম। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হবে কখনো অগ্নিশিখা, কখনো ধুম্র। আবার এরকমও হতে পারে যে, দু'টোই একসঙ্গে নিক্ষেপ করা হবে তাদের প্রতি, কিন্তু একটি আর একটির সঙ্গে মিশ্রিত হবে না। ইবনে জারীর বলেছেন, তাদের প্রতি প্রধানত নিক্ষেপ করা হবে অগ্নি, তৎসহ কিছু ধুম্রকুণ্ডলী। আবার এরকমও বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'শুওয়াজ' অর্থ আগুন ও ধোঁয়ার মিশ্রণ। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, এখানকার 'নুহাস' অর্থ বিগলিত পিতল। অর্থাৎ তখন তাদের মাথায় ঢেলে দেওয়া হবে তরলোত্তপ্ত পিতল। আউফির বিবৃতিতে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'নুহাস' অর্থ উত্তপ্ত তেল, অথবা গলিত তামা।

'ফালা তানতাসিরান' অর্থ তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না। অর্থাৎ ওই সময় তোমাদের এমন কোনো সাহায্যকারী থাকবে না, যে তোমাদেরকে বিচারের ময়দানে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে। আর এখানকার 'কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' অর্থ আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়াও আল্লাহ্‌র একটি নেয়ামত। আর এমতো সতর্কবাণীকে মান্য করা অত্যাবশ্যকও। আবার আল্লাহ্‌র অনুগত ও অবাধ্য বান্দাদের প্রতিদানে পার্থক্য করাও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসমূহের মধ্যে একটি অনুগ্রহ। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই এখানে বাধ্য-অবাধ্য নির্বিশেষে সকল জ্বিন ও মানুষকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে— সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, সেদিন তা রক্তরঙে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করবে (৩৭); সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৩৮)?

এখানে 'ফা ইজান শাক্কাক্বতিস সামাউ' (যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে) অর্থ যেদিন আকাশ বিদীর্ণ করে ফেরেশতাদের আগমনের পথ প্রস্তুত করা হবে। 'ফা ইজা' (যেদিন) এর 'ফা' অক্ষরটি এখানে একথাই বোঝাচ্ছে যে, অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করার ঘটনাটি ঘটবে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার পূর্বে। সুতরাং বুঝতে হবে, তখন আকাশ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আকাশ বিদীর্ণ করা হবে না, বিদীর্ণ করা হবে কেবল ফেরেশতাদের অবতরণের পথ প্রস্তুত করার জন্য। আর এরকম হবে পুনরুত্থান পর্ব শেষ হওয়ার

www.eelm.weebly.com

পর, যেমন ইতোপূর্বে বলা হয়েছে জুহাক কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে। 'ওয়ারদাতান' অর্থ রক্তরঙে রঞ্জিত, লাল গোলাপের মতো। কেউ কেউ শব্দটির অর্থ করেছেন লাল রঙের ঘোড়া। বাগবী লিখেছেন, এর অর্থ— শাদা-লাল, অথবা শাদা-হলুদ রঙ। কাতাদা বলেছেন, আকাশ এখন সবুজ, কিন্তু সেদিন তা হবে লোহিতাভ হরিৎ। কেউ কেউ বলেছেন, সেদিন আকাশ রঙ

বদলাতে থাকবে। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, সেদিন আকাশ হবে রঙীন। কখনো তা হবে তেলচিটার রঙের মতো, আবার কখনো হবে লাল চামড়ার মতো।

আর এখানকার 'কাদ্দিহান শব্দটি 'দিহান' অথবা 'দাহান' এর বহুবচন। এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'ওয়ারদাতান' এর বিশেষণরূপে। এর অর্থ— বিভিন্ন রূপ ধারণ করবে। অর্থাৎ তখন আকাশ দেখতে হবে তেলতেলে রঙের ঘোড়ার মতো। জুহাক, মুজাহিদ, কাতাদা ও রবী এরকম বলেছেন। আতা ইবনে আবী রেবাহ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আকাশ সেদিন হবে বহুরূপী জয়তুন তেলের মতো, আর ক্ষণে ক্ষণে তার রঙ পরিবর্তিত হতে থাকবে। মুকাতিল বলেছেন, 'দিহান' অর্থ ফুলের স্বচ্ছ তেল। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আকাশ তখন হবে জয়তুন তেলের মতো, আর তা হবে ওই সময়, যখন দোজখাগ্নির উত্তাপ তার উপর ক্রিয়া করবে। কালাবী বলেছেন, 'দিহান' অর্থ লাল চামড়া। 'দিহান' এর বহুবচন 'আদহানাতুন' বা 'দুহুনূন'ও হয়। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'কাদ্দিহান' পদটি 'কানাত' এর দ্বিতীয় বিধেয়। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আকাশ তখন হবে তেলের মতো বিগলিত এবং তার বর্ণ হবে লাল গোলাপ, অথবা লাল ঘোড়ার মতো। আর এখানকার 'ইজা' (যখন) এর 'জাযা' (প্রতিফল) এখানে রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ততাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যখন তা ধারণ করবে লাল চামড়া বা লাল গোলাপের বর্ণ, তখন সে দৃশ্যটি হবে কতোইনা ভয়ংকর।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেদিন না মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, না জ্বিনকে (৩৯)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৪০)? একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে মানুষ ও জ্বিনকে এরকম প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অপরাধ করেছো কিনা। এরকম প্রশ্ন নিরর্থক। কেননা তারা অপরাধী কিনা, তা আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। আমল লেখক ফেরেশতারাও তাদের অপরাধের বিবরণ লিখে রাখে। তাছাড়া তখন চেহারা দেখেও তাদেরকে সহজেই অপরাধী বলে সনাক্ত করা যাবে। কিন্তু তাদেরকে এরকম প্রশ্ন অবশ্যই করা হবে যে, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তুমি অপরাধ করেছো কেনো? কেনো মান্য করোনি আমার হুকুম। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'অতঃপর তোমার প্রভুপালকের শপথ! আমি অবশ্যই তাদের সকলকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো'। সুতরাং আলোচ্য আয়াত ও এই আয়াতের মধ্যে বিপরীতার্থক কিছু নেই। মুজাহিদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। হাসান ও কাতাদার ব্যাখ্যাও এরকম। আয়াত দু'টোর বাহ্য-দ্বন্দ্ব দূর করণার্থে হজরত ইবনে আব্বাস এরকমও বলেছেন যে, তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপিষ্ঠদেরকে আল্লাহ্ রহমত ও শাফায়াতের দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। সেকারণেই এখানে বলা হয়েছে 'সেদিন না

মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, না জ্বিনকে'। তবে রোষতপ্ততার সঙ্গে তাদের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হবে ঠিকই। সেজন্যই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি অবশ্যই তাদের সকলকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো'। ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে অতিক্রম করতে হবে অনেক স্থান। কোনো কোনো স্থানে প্রশ্ন করা হবে না, আবার কোনো কোনো স্থানে হতে হবে প্রশ্নের সম্মুখীন। ওই দুই অবস্থার কথাই বলা হয়েছে দুই আয়াতে দু'রকমভাবে। আবুল আলিয়া কথাটির অর্থ করেছেন— তখন অপরাধীদের অপরাধ সম্পর্কে অনপরাধীকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণ থেকে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে মাথার ঝুঁটি ও পা ধরে (৪১)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৪২)?

এখানে উত্তর দেওয়া হয়েছে একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের। প্রশ্নটি হচ্ছে— মানুষ ও জ্বিন অপরাধীদেরকে যখন কোনো প্রশ্নই করা হবে না, তখন আযাবের ফেরেশতারা তাদেরকে সনাক্ত করতে পারবে কীভাবে? এর উত্তরেই এখানে একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের চেহারায় পাপের ছাপ দেখেই তারা চিনে নিতে পারবে তাদেরকে। তখন তাদের চেহারা হবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের এবং চোখগুলো হবে গাঢ় নীল। এক আয়াতে একথা বলা হয়েছে এভাবে 'সেদিন কতিপয় অবয়ব হবে শুভ্রোজ্জ্বল এবং কতিপয় চেহারা হবে কৃষ্ণকায়। মুখতাফী তাঁর 'দীবাজ' গ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এইমাত্র আমাকে জিবরাইল জানালেন, আল্লাহ্ বলেন, বিশ্বাসীদের জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' শান্তির কারণ হবে তার মৃত্যুতে, কবরে ও পুনরুত্থানে। এরপর জিবরাইল বললেন, ভ্রাতঃ মোহাম্মদ! পুনরুত্থানকালে আপনি দেখবেন, কেউ কেউ মাথা থেকে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে কবর থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে, আর বলছে 'লাইলাহা ইল্লাল্লহ' 'ওয়াল হামদুলিল্লাহ্'। তাদের চেহারা হবে শুভ্র। আবার কেউ কেউ কবর

www.eelm.weebly.com

থেকে উঠতে থাকবে 'হায় আক্ষেপ' 'হায় আক্ষেপ' বলে বিলাপ করতে করতে। তাদের চেহারা হবে কালো। আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস 'অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণ থেকে' এই আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে সুদখোরকে দেখলেই চেনা যাবে। তারা হবে তখন ভাবলেশহীন যাদুগ্রস্ত লোকের মতো। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবী শায়বা ও ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার বললেন, আল্লাহ্ সেদিন কোনো কোনো লোককে প্রজ্জ্বলিত মুখমণ্ডলবিশিষ্ট অবস্থায় ওঠাবেন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! তাদের পরিচয়? তিনি স. বললেন, তারা ওই সকল লোক, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 'যারা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, তারা তাদের উদর পুর্তি করে আগুন দিয়ে'।

বায্‌যার বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত জাবের বর্ণনা করেন, অহংকারীরা পুনরুত্থিত হবে পিপীলিকার মতো ক্ষুদ্র আকৃতি নিয়ে। এ প্রসঙ্গে হাদিস রয়েছে অনেক। সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় ও হাকেম সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি স্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও যাচনা করে, শেষ বিচারের দিন সে উপস্থিত হবে তার মুখমণ্ডলে আঘাতের চিহ্ন নিয়ে। বোখারী ও মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ কোনো বিশ্বাসীর হত্যাকাণ্ডে অর্ধেক কথা বলেও সাহায্য করবে, হাশর প্রান্তরে উপস্থিত কালে তার কপালে লেখা থাকবে 'আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ'। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন আবু নাঈম হজরত ওমর থেকে এবং বায়হাকী হজরত ইবনে ওমর থেকে। ইবনে খুজাইমা ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কেবলামুখী হয়ে মসজিদের দেয়ালে নাকের শ্লেষ্মা নিক্ষেপ করলে তার ময়লা থাকবে তার মুখাবয়বে, যখন সে উপস্থিত হবে হাশর প্রান্তরে। তিবরানী তাঁর 'আলআওসাত' গ্রন্থে সুপরিণত সূত্রে হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীতে যে লোক দু'মুখো নীতি নিয়ে চলবে, পরবর্তী পৃথিবীতে সে উত্থিত হবে দু'টি অগ্নিময় মুখ নিয়ে। তিবরানী ও ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে দু'রকম কথা বলে, শেষ বিচারের সময় সে উপস্থিত হবে জ্বলন্ত দু'টি জিহ্বা নিয়ে। সুনান রচয়িতা, হাকেম ও ইবনে হাব্বান সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দুই স্ত্রীধারী ব্যক্তি স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করলে, শেষ বিচারের প্রান্তরে তার অর্ধাঙ্গ হবে ঝুলন্ত। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তখন তার শরীরের এক পাশ ঝুলে থাকবে। আর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মত মহাবিচারের দিবসে উপস্থিত হবে দশ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। তার মধ্যে এক শ্রেণীর আকৃতি হবে বানরের মতো। 'সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে' সূরা নাবার এই আয়াতের তাফসীরে এ বিষয়ে আরো অনেক হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। যথাসূত্রপরম্পরাবিশিষ্ট হাদিসসমূহে এসেছে, অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকৃত সম্পদ মহাবিচারের দিন চাপিয়ে দেওয়া হবে আত্মসাৎকারীর কাঁধে। সুপরিণত সূত্রে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, সেদিন গণিমতের অপহৃত সামগ্রী আরোহণ করবে তার অপহারকের স্কন্ধে।

'ফা ইউখাজু বিন্নাওয়াসী ওয়াল আক্বদাম' অর্থ তাদেরকে পাকড়াও করা হবে মাথার ঝুঁটি ও পা ধরে। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন তাদের মাথা ও পা একসাথে মিলিয়ে ভাঙা হবে লাকড়ির মতো করে। হান্নাদ বর্ণনা করেছেন, জুহাক বলেছেন, তাদের কপাল তখন মিলিয়ে দেওয়া হবে তাদেরই পায়ের সঙ্গে। তার পর পিঠের দিক থেকে শিকল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হবে শক্ত করে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'এটাই সেই জাহান্নাম। যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করতো (৪৩), তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে (৪৪)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৪৫)?

এখানে 'হাজিহী জাহান্নামু' অর্থ এটাই জাহান্নাম। 'আল্ লাতী ইউকাজ্জিবু বিহাল মুজ্বরিমূন' অর্থ যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করতো। 'ইয়াতূফুনা' অর্থ ছুটাছুটি করবে, চক্কর দিতে থাকবে। আর 'বাইনাহা ওয়া বাইনা হামীমিন আন' অর্থ জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে। 'হামীম' অর্থ ফুটন্ত পানি। আর 'আন' অর্থ চূড়ান্ত পর্যায়ের উত্তপ্ত।

তিরমিজি ও বায়হাকী সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জাহান্নামীরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অতিষ্ঠ হয়ে চীৎকার করে ফরিয়াদ জানাতে থাকবে। তখন তাদেরকে খেতে দেওয়া হবে কণ্টক বৃক্ষ। সে বৃক্ষ ভক্ষণ করলে তাদের তৃপ্তি অথবা ক্ষুধা-নিবৃত্তি কোনোটিই ঘটবে না। ওই খাদ্য তাদের কণ্ঠনালীতে আটকে যাবে। তখন তাদের মনে হবে, পৃথিবীতে তারা গলায় খাদ্য আটকে গেলে পানি পান করতো। সে কথা মনে করে তারা প্রার্থনা করবে পানির জন্য। তখন তাদের সামনে দেওয়া হবে লোহার কড়াই ভর্তি ফুটন্ত পানি। তারা তা পান করার জন্য মুখের কাছে আনলে ঝলসে যাবে তাদের মুখমণ্ডল। আর তা পান করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নাড়িভুঁড়ি গলে গিয়ে বেরিয়ে যাবে পশ্চাদ্দেশ দিয়ে। ইমাম আহমদ, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, হাকেম এবং বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। রসুল স. ওয়াইঁ

www.eelm.weebly.com

'ইয়াছ্তাগীছু ইয়্গছু বি মাইন কাল মুহ্লি'— এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, পানীয় হিসেবে তখন তাদেরকে দেওয়া হবে যয়তুন তেলের গাদ, যা তাদের মুখের কাছে আনার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড উত্তাপে তাদের মুখমণ্ডল ঝলসে গিয়ে খসে খসে পড়বে মুখের চামড়া।

কা'ব আহবার বলেছেন, দোজখের একটি উপত্যকায় জমা হবে দোজখীদের দেহের রক্ত। ওই রক্তে তাদেরকে নিমজ্জিত করা হবে। তখন তাদের দেহের গ্রন্থিগুলো আলগা হয়ে যাবে। পরে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে নতুন করে গড়ে দেওয়া হবে তাদের শরীর। পুনরায় নিক্ষেপ করা হবে দোজখে। এটাই হচ্ছে 'তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে' আয়াতের ব্যাখ্যা।

কোনে কোনো আলেম বলেছেন, ২৬ সংখ্যক আয়াত থেকে এ পর্যন্ত আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার সবগুলোই হুঁশিয়ারি বা ধমক হিসেবে আল্লাহ্র অনুগ্রহের অন্তর্ভূত। কেননা সেগুলোর সবই আল্লাহ্র আযাব থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যম। কথাটি কিন্তু ঠিক নয়। কেননা এমতো অভিমত তাদেরই চিন্তা প্রসূত। কেননা 'ফাবি আইয়্যি আলায়ি রব্বিকুমা তুকাজ্জিবান' কথাটির 'আলা' অর্থ অনুগ্রহসমূহ— যেমন সৃষ্টির অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব, রিজিক ইত্যাদি। তাছাড়া ক্ষমা, ধ্বংস, শাস্তি থেকে পরিত্রাণ প্রদানও অনুগ্রহ পদবাচ্য।

কিন্তু শাস্তির ভয় প্রদর্শন, হুমকি-ধমকি এগুলো কোনো অনুগ্রহ নয়। 'ফাবি আইয়্যি আলায়ি রব্বিকুমা তুকাজ্জিবান' আয়াতখানি এই সুরায় উল্লেখ করা হয়েছে মোট একত্রিশ বার। এর মধ্যে আল্লাহ্পাকের মূল আটটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে আটটি স্থানে। ওগুলোর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর সৃজন রহস্যের দুর্লভ বিবরণ। এভাবে 'কুল্লা ইয়াওমিন হুয়া ফী শা'ন' (আয়াত ২৯) পর্যন্ত আলোচনা করার পর এই মর্মে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যিনি এমন অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব সৃজয়িতা, তাঁর দানের অবমাননা করা কোনোক্রমেই সঙ্গত নয়। সাতটি স্থানে 'কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' আয়াতের পূর্বে সাতটি জাহান্নামের সংখ্যা অনুসারে সাতবার দেওয়া হয়েছে শাস্তির ধমক। এভাবে আলোচনা করা হয়েছে ৩১ সংখ্যক আয়াত থেকে ৪৪ সংখ্যক আয়াত পর্যন্ত। আর বর্ণিত সাতটি স্থানে 'কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' বলে একথাই বলে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, যে আল্লাহ্ এমন মহাশক্তিধর ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী, তাঁর অসন্তোষ ও শাস্তিকে ভয় করা এবং তাঁর অনুগ্রহের প্রতি যথাকৃতজ্ঞ থাকা অত্যাবশ্যক। এরপর আবার আট বেহেশতের সংখ্যা অনুসারে পরবর্তী আট আয়াতের পরও উল্লেখ করা হয়েছে 'কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' কথাটি। এভাবে বিবৃতি প্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ যেনো ওই আট বেহেশতের বর্ণিত অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি আগ্রহান্বিত হয় এবং অনুগ্রহদাতার প্রতি থাকে সতত কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

ইবনে আবী হাতেমের বিবৃতিতে এবং আবু শায়েখের 'আল উজমা' গ্রন্থে এসেছে, আতা বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত আবু বকর সিদ্দীক কিয়ামত-মীযান-বেহেশত-দোজখ ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। আপন মনে বলতে শুরু করলেন, হায়! পৃথিবীতে আমি যদি ভূমিষ্ঠ না হতাম। অথবা জন্মাতাম যদি ঘাস হয়ে, চতুষ্পদ পশুরা আমাকে খেয়ে ফেলতো। তাহলে আমাকে আর হিসাব দিতে হতো না। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াতসমূহ। বলা হলো—

সূরা আররহ্মান ঃ আয়াত ৪৬—৭৮

---

www.eelm.weebly.com

❑ আর যে আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তাহার জন্য রহিয়াছে দুইটি উদ্যান।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ উভয়ই বহু শাখা-পল্লববিশিষ্ট।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ;
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ সেথায় উহারা হেলান দিয়া বসিবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হইবে নিকটবর্তী।

❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ সেই সকলের মাঝে রহিয়াছে বহু আনত নয়না, যাহাদিগকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন্ন স্পর্শ করে নাই।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ তাহারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কী হইতে পারে?
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরও দুইটি উদ্যান রহিয়াছে।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ ঘন সবুজ এই উদ্যান দুইটি।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

www.eelm.weebly.com

❑ উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ সেথায় রহিয়াছে ফলমূল— খর্জুর ও আনার।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ সেই উদ্যানসমূহের মাঝে রহিয়াছে সুশীলা, সুন্দরীগণ।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ তাহারা হূর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ ইহাদিগকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন্ন স্পর্শ করে নাই।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ উহারা হেলান দিয়া বসিবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে।
❑ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
❑ কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব!

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আর আল্লাহ্‌র যে দাস তাঁর কাছে জবাবদিহির ভয় রাখে, তার জন্য বেহেশতে রয়েছে দু'টি পুষ্পোদ্যান। সুতরাং হে মানুষ ও জ্বিন জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র সুপ্রতুল অনুগ্রহসম্ভারের মধ্যে কোনো একটিকেও অসত্য প্রতিপন্ন করতে পারবে কি?

ইবনে সাওজাব থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীক সম্পর্কে। এখানে 'মাক্বামা রব্বিহী' অর্থ আল্লাহ্‌র সম্মুখে। 'মাক্বম' অর্থ দণ্ডায়মান হওয়ার স্থান। অর্থাৎ ওই স্থান, যেখানে দাস দাঁড়াবে তার কৃতকর্মের হিসাব প্রদানের জন্য। অথবা যে স্থানে সে দাঁড়াবে হিসাব বুঝে নেওয়ার জন্য। কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ দাসগণ ওই স্থানকে ভয় করে। তাই পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষ সাধনার্থে। আর শুধু তাঁরই আনুগত্যে থাকে সতত সজ্জিত। অথবা এখানকার

'মাক্বম' শব্দটির 'মীম' অক্ষরটি ক্রিয়ামূল। এমতাবস্থায় 'মাক্বম' এর অর্থ হবে— 'ক্বিয়াম' (দৃষ্টিপাত করা, দৃষ্টির আওতায় রাখা)। যেমন আরববাসীগণ বলেন 'ক্বমা আলাইহি' (সে এর উপর লক্ষ্য রেখেছে)। 'ক্বিয়াম' এর অর্থ যে লক্ষ্য রাখা তার প্রমাণ রয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন 'যে ব্যক্তি প্রত্যেকের উপার্জনের উপর লক্ষ্য রাখে সে কী'? কিংবা 'মাক্বম' অর্থ আপন প্রভুপালকের সামনে হিসাব দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, 'মাক্বাম' শব্দটি এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— যে তার প্রভুপালককে ভয় করে।

জুহাক বলেছেন, দু'টি উদ্যান বা দু'টি বেহেশত পাবে ওই ব্যক্তি যে প্রকাশ্যে ও গোপনে পুণ্যকর্ম করে ও আল্লাহ্‌কে ভয় করে, বেঁচে থাকে পাপকর্ম থেকে। আর এরকম সে করে কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। সে মনে মনে এরকমও চায় যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ তার আমল সম্পর্কে অবগত না হোক। দু'টি অর্থ হতে পারে আলোচ্য বক্তব্যটির। একটি তো প্রকাশ্যই। তা হচ্ছে— আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে যারা ভয় করে, তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে দান করা হবে দু'টি বেহেশত। 'মুকাতিল বলেছেন, ওই দু'টি বেহেশত হচ্ছে জান্নাতে আদন ও জান্নাতে নাঈম। এরকমও বলা হয়ে থাকে যে, মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাদেরকে দেওয়া হবে একটি বেহেশত, আর একটি দেওয়া হবে ওই সকল জ্বিনকে, যারা আল্লাহ্‌ভীরু। যেহেতু এই সুরার সকল সম্বোধনের লক্ষ্য মানুষ ও জ্বিন, তাই তাদের মধ্যে বেহেশত বণ্টন করা হবে এভাবে। আর একটি অর্থ এরকমও হওয়া সম্ভব যে, আল্লাহ্‌ভীরু যারা তাদের প্রত্যেককেই দেওয়া হবে বেহেশতের দু'টি করে বাগিচা। এমতো ব্যাখ্যার আলোকে এরকম না বলারও কোনো কারণ নেই যে, তাদের প্রত্যেকের জন্য তখন থাকবে চারটি করে উদ্যান, দুইয়ের দ্বিগুণ চার— এই হিসেবে। কেননা পূর্বের আয়াত 'এ দু'টো ছাড়াও তাদের জন্য রয়েছে আরো দু'টি উদ্যান' এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতকে। এভাবে প্রত্যেকের ভাগে পড়বে চারটি করে উদ্যান। হাদিস শরীফেও এরকম বলা হয়েছে। সুতরাং এখানকার 'জান্নাতান' অর্থ দুই ধরনের উদ্যান বা বেহেশত এবং তার সংখ্যা হবে মোট চারটি। একটি রূপার— তার পানপাত্র ও অন্যান্য আসবাবপত্রও হবে রূপার। আর একটি সোনার, তার তৈজসপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীও হবে সোনার। বেহেশতবাসী ও আল্লাহ্‌র মধ্যে তখন বিরাজ করবে আল্লাহ্‌র মহামর্যাদার চারটি পর্দা। আর তারা আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করবে জান্নাতে আদনে। বোখারী ও মুসলিম এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে। বাগবী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস থেকে এবং আহমদ, তায়ালাসী ও বায়হাকী হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে। হাদিসের ভাষ্য এরকম— রসুল স. বলেছেন, জান্নাতুল ফেরদাউস মোট চারটি। দু'টি স্বর্ণের, তার অট্টালিকা, পানপাত্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সবকিছুই স্বর্ণনির্মিত। আর দু'টি হবে রৌপ্যের, তার পানপাত্র, আসবাবপত্রও রৌপ্যনির্মিত।

www.eelm.weebly.com

বাগবী হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ভয় করে, সে রাতে সচল হয়। আর যে রাতে সচল হয়, সে পৌঁছে যায় তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে। ভালো করে শুনে নাও, আল্লাহ্‌পাক পণ্যরূপে যা বিক্রয় করেন, তা হচ্ছে অমূল্য সম্পদ জান্নাত। হজরত আবু দারদা বলেছেন, রসুল স. একবার আমার সামনে পাঠ করলেন 'যে আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান'। আমি নিবেদন করলাম, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! সে যদি ব্যভিচার করে এবং চুরি করে? তিনি স. বললেন, তবুও। এরপরও আমি দু'বার একই প্রশ্ন করলাম। তিনি স.ও দিলেন একই উত্তর। তারপর বললেন, আবু দারদার নাসিকা ধূলিধূসরিত হলেও (পছন্দ না করলেও)।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'উভয়ই বহু শাখা পল্লববিশিষ্ট (৪৮)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে'(৪৯)?

'জাওয়াতা আফ্‌নান' অর্থ উভয়ই বহুপত্রবিশিষ্ট। 'জু' পুংলিঙ্গবাচক। এর মূল রূপ 'জূউ'। 'জাতা' স্ত্রীলিঙ্গবাচক। এর মূলরূপ 'জাওয়াত'। দ্বিবচন 'জাওয়াতা'। সহজ করার জন্য বহুবচনেও ব্যবহৃত হয় 'জাওয়াতা' (বহু)। আর এখানকার 'আফ্‌নান' এর বহুবচন 'ফানান' এবং বৃক্ষশাখা থেকে উদগত নরম প্রশাখাকে বলে 'ফানান'। প্রশাখা থেকেই পাওয়া যায় পুষ্পকলি ও ছায়া। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— প্রশাখা পল্লববিশিষ্ট। মুজাহিদ ও কালাবী 'আফ্‌নান' এর অর্থ করেছেন এরকমই। ইকরামার মতে 'ফানান' হচ্ছে বৃক্ষপ্রশাখার ওই ছায়া— যা পতিত হয় বাগানের দেওয়ালে। হাসান বলেছেন 'জাওয়াতা আফ্‌নান' অর্থ ছায়াবিশিষ্ট। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'আফ্‌নান' অর্থ রঙ বেরঙের ফুল, নানা প্রকারের প্রশাখাপত্র। যেমন আরববাসীগণ বলেন 'আফ্‌নানা ফুলানুন্ ফী হাদীছিহী' (অমুক ব্যক্তি বলেছে নানা রকমের কথা)। সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও জুহাকও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। এক বর্ণনানুসারে হজরত ইবনে আব্বাসের মতও এরকম।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ (৫০); সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে'(৫১)?

এখানে 'আ'ইনানি তাজ্‌রিইয়ান' অর্থ বহমান দুই প্রস্রবণ— উপর দিক থেকে, অথবা নিচের দিক থেকে। অর্থাৎ বেহেশতবাসীরা যেরকম ইচ্ছা করবে সেরকমভাবে যে কোনো দিক থেকে বইতে থাকবে প্রস্রবণ দু'টো। আয়াতের মর্ম এরকম নয় যে, দু'টি বেহেশতে রয়েছে কেবল দু'টি নদী। বরং দু'টি করে নদী প্রবহমান থাকবে প্রতিটি বেহেশতে। অর্থাৎ নদী হবে সেখানে দু'রকমের, তার সংখ্যা যতো বেশী হোক না কেনো। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুগ্ধস্রোতস্বিনী, যার আস্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নদী, আছে পরিশুদ্ধ মধুর তটিনী'।

এই আয়াতের আলোকে প্রতীয়মান হয় পানি, দুধ, মধু ও শরাব— এই চার প্রকারের বহুসংখ্যক স্রোতস্বিনী রয়েছে সেখানে। হাসান বসরী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতে রয়েছে চারটি নহর। তার মধ্যে দু'টি প্রবাহিত হয় আরশের তলদেশ থেকে, যার একটি সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া ইউফাজ্জিরুনাহা তাফ্‌জ্বিরা' (আর তা বহমান থাকবে প্রবাহিত অবস্থায়)। দ্বিতীয়টির নাম 'যানজাবীল'। অপর দুটি হচ্ছে সালসাবিল ও তাস্‌নীম। এর পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার (৫২)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৫৩)?

এখানে 'যাওজ্বান' অর্থ দুই দুই প্রকার— এক প্রকার এমন, যার সম্পর্কে পৃথিবীবাসীরা জানেই না, আর এক প্রকার সম্পর্কে তারা জানে। কেউ কেউ বলেছেন, দুই দুই প্রকারের— একটি শুকনো, অপরটি সরস। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৃথিবীর সব ফলই বেহেশতে থাকবে। এমনকি 'হানযাল' নামক তিক্ত ফল। কিন্তু সেখানকার হানযাল তিক্ত হবে না। ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মুনজিরও এরকম বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর ও বায়হাকী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জান্নাতের ফলগুলোর নাম রয়েছে কেবল পৃথিবীতে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট ফরাশে। দুই উদ্যানের ফল হবে নিকটবর্তী (৫৪)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৫৫)?

এখানে 'ফুরুশিম্ বাত্বায়িনুহা মিন ইস্‌তাব্‌রাক্ব' অর্থ পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট ফরাশ। 'ইস্‌তাব্‌রাক্ব' অর্থ পুরু। ইবনে জারীর ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমাদেরকে ওই রেশমী ফরাশের ভিতরের দিকের সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তাহলে বোঝো তার বাইরের দিকটি হবে কীরকম। বাগবী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে। আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ওই ফরাশের বাইরের অংশ হবে নূরের। বাগবী বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ভিতরের অবস্থা যদি এরূপ

হয়, তবে ভাবতে চেষ্টা করো বাইরের অবস্থা হবে কীরকম। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'ফালা তা'লামু নাফ্সুম্ মা উখ্ফিয়া লাহুম মিন কুররাতি আ'ইউন' (কাজেই তোমরা জানো না, যা গোপন করা হয়েছে তোমাদের দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে)। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ভিতরের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে এখানে। বাইরের অবস্থা উল্লেখ করা হয়নি। কেননা ভূপৃষ্ঠে তার কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

'জ্বানাল জ্বান্নাতাইনি দান' অর্থ দুই উদ্যানের ফল হবে নিকটবর্তী। এখানকার 'জ্বানা' হচ্ছে বিশেষ্য। কিন্তু এখানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে কর্মকারকরূপে। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— বৃক্ষ থেকে আহরিত ফল। বেহেশতবাসীরা বেহেশতের বৃক্ষ থেকে ফল আহরণ করতে পারবে বিনা শ্রমে। কেননা ফলের গুচ্ছগুলো থাকবে তাদের হাতের নাগালের মধ্যে। সাঈদ ইবনে মনসুর, বায়হাকী এবং হান্নাদ বর্ণনা করেছেন, 'ওয়া জুল্লিলাত কুতুফুহা তাজলীলা' আয়াতের ব্যাখ্যা সূত্রে হজরত বারা ইবনে আজিব বলেছেন, বেহেশতবাসীরা দাঁড়িয়ে শুয়ে বসে সর্বাবস্থায় ফল ভক্ষণ করতে পারবে। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বেহেশতের বৃক্ষ শাখাগুলো এতো নিকটে এসে যাবে যে, আল্লাহ্র দাসগণ দাঁড়িয়ে বসে যে ভাবে ইচ্ছা তা থেকে ফল আহরণ করতে পারবে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেই সকলের মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না, যাদেরকে পূর্বে কোনো মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি (৫৬)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে (৫৭)?

এখানে 'ফীহিন্না' অর্থ সেই সকলের মাঝে। অর্থাৎ বেহেশতের সেই প্রাসাদমালার মাঝে, অথবা সেখানকার অনুগ্রহসম্ভারের মধ্যে। 'ক্বাসিরাতুত্ব ত্বরফি' অর্থ আনতনয়না, যাদের দৃষ্টি তাদের স্বামী ছাড়া অন্য কারো প্রতি পতিত হবে না। বায়হাকী বলেছেন, এরকম ব্যাখ্যা করেছেন মুজাহিদ। 'লাম ইয়াত্বমিছ্হুন্না ইন্সুন ক্বব্লাহুম ওয়ালা জ্বান' অর্থ যাদেরকে ইতোপূর্বে কোনো মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি। অর্থাৎ তারা হবে কুমারী ও অনাঘ্রাতা। 'ত্বিমছুন' এর শাব্দিক অর্থ রক্ত। সেকারণেই ঋতুস্রাবকেও 'ত্বিমছ' বলা হয়। আবু তালহা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'লাম ইয়াত্বমিছ্হুন্না' অর্থ তাদেরকে কখনো রতিকর্মের মাধ্যমে রক্তাক্ত করা হয়নি। উল্লেখ্য, এই আয়াতদ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মতো জ্বিনেরাও রতিকর্ম করে। মুজাহিদ বলেছেন, 'বিস্মিল্লাহ্' বলে সঙ্গম শুরু না করলে ওই সঙ্গমে শয়তান অংশগ্রহণ করে। মুকাতিল বলেছেন, বেহেশতের আনত নয়না নারীরা হবে কুমারী ও অনাঘ্রাতা। কেননা তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে বেহেশতে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে এরকম বলা যেতে পারে যে, এখানে 'আনতনয়না' বলে বোঝানো হয়েছে বেহেশতের হুরীদেরকে। সাঈদ ইবনে মনসুর ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, শা'বী বলেছেন, পৃথিবীতে বিশ্বাসবতীদেরকে পুনঃ সৃষ্টি করা হবে কুমারীরূপে। তাদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'যাদেরকে পূর্বে কোনো মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি'। কালাবীও এরকম বলেছেন। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে, 'আমি জান্নাতি রমণীগণকে সৃষ্টি করেছি বিশেষ রূপে। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, কামিনী, সমবয়স্কা'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা যেনো পদ্মরাগ ও প্রবাল (৫৮)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৫৯)?

এখানে 'কাআন্না হুন্নাল ইয়াকুতু ওয়াল্ মার্জ্বান' অর্থ তারা যেনো পদ্মরাগ ও প্রবাল। আবু সালেহ্ ও সুদ্দীর উক্তি উল্লেখ করে বায়হাকী বলেছেন, 'ইয়াকুত' ও 'মারজ্বান' অর্থ পদ্মরাগ মনির শুভ্রতা ও প্রবালের স্বচ্ছতা। আর এক বর্ণনায় এসেছে, ঝিনুকের ভিতরের মুক্তা যেমন অস্পর্শিত, স্বচ্ছ ও অম্লান থাকে, বেহেশতের হুরীরা হবে সেরকম। কাতাদা বলেছেন, হুরীরা হবে ইয়াকুতের স্বচ্ছতা ও মারজানের শুভ্রতার মিলিত সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি মনিকাঞ্চন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা প্রথমে বেহেশতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুউজ্জ্বল। থুথু, শ্লেষ্মা, মলত্যাগের প্রয়োজন এসব কিছু তাদের থাকবেই না। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা পীড়িত হবে না। তাদের আহারের পাত্র ও চিরুনী হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের। হাতের অঙ্গুরীয় হবে মোতির। শরীরের স্বেদকণা হবে মেশকের সুরভিমাখা। প্রত্যেকে পাবে দু'জন স্ত্রী, যাদের উরুদেশ এতো বেশী স্বচ্ছ হবে যে, তার ভিতরের অংশ দেখা যাবে বাইরে থেকে। তাদের মধ্যে মতানৈক্য, হিংসা-বিদ্বেষও থাকবে না। সকলেই তারা হবে সমমতাবলম্বী। তারা সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় বিভোর থাকবে আল্লাহ্র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনায়। তিরমিজি ও বায়হাকী হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিরমিজি ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল তিরমিজি কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি হবে পূর্ণিমার শশী সদৃশ সুন্দর। দ্বিতীয় দলটি হবে আকাশের অধিকতর প্রোজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির মতো। তারা প্রত্যেকে সেখানে পাবে দু'জন করে সঙ্গিনী। তাদের প্রত্যেকের পরিধানে থাকবে সত্তর স্তরের স্বচ্ছতর বসন। তবুও ওই

www.eelm.weebly.com

বসন ভেদ করে বিচ্ছুরিত হবে তাদের জানুদ্বয়ের সৌন্দর্যচ্ছটা। তিবরানী ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদও বলেছেন, রক্তিম সোমরস যেমন স্বচ্ছ কাঁচের বোতলের বাইরে থেকেও লক্ষ্যগোচর হয়, জান্নাতের হরিণীআখিনী হুরীদের পায়ের গোছাও তেমনি তাদের সত্তর স্তরবিশিষ্ট বস্ত্রভেদ করে প্রত্যক্ষগোচর হবে। দেখা যাবে পায়ের ভিতরের গোশত ও হাড়। হজরত আমর ইবনে মায়মুন থেকে বাগবীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. 'তারা যেনো পদ্মরাগ ও প্রবাল' এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, জান্নাতের হুরদেরকে পর্দার আড়াল থেকে আয়নার চেয়ে অধিক পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে। আর তাদের অলংকারগুলোর মধ্যে যেটি হবে অপেক্ষাকৃত কম সৌন্দর্যের, সেটির সৌন্দর্যও এমন হবে যে, পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত উজালা করে দিবে এক সাথে। আর তাদের শরীরে থাকবে সত্তর স্তরের অতিস্বচ্ছ বসন। তৎসত্ত্বেও সে বসন ভেদ করে নয়নগোচর

হবে তাদের উরুদেশের সৌন্দর্য। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সত্তরটি রেশমী বস্ত্রের ভিতর দিয়ে জান্নাতের হুরদের পায়ের গোছার অস্থি পরিদৃষ্ট হবে। আল্লাহ্ তাই বলেছেন 'কাআন্না হুন্নাল ইয়াকুতু ওয়াল মার্জ্বান'। ইয়াকুত হচ্ছে এমন পাথর, যা ছিদ্র করে ওই ছিদ্রে সুতা ঢুকিয়ে দিলে বাইরে থেকে সুতা দেখা যায়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কী হতে পারে (৬০)? সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৬১)? এখানে 'উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার' অর্থ পৃথিবীর পুণ্যকর্মের জন্য পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, একবার রসুল স. এই আয়াত পাঠ করলেন। তারপর বললেন, তোমরা কি জানো একথার মাধ্যমে আল্লাহ্ কী বলতে চেয়েছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর বার্তাবাহকই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ বলতে চেয়েছেন, আমি যাকে তওহীদ দান করে ধন্য করেছি, তার প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ'র স্বীকৃতি দিয়েছে, অনুসরণ করেছে রসুল স. এর শরিয়তের, তার বিনিময় জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরো দু'টি উদ্যান রয়েছে (৬২)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৬৩)? উল্লেখ্য, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে মোট চারটি জান্নাত। তন্মধ্যে দু'টি সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এবার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে অবশিষ্ট দু'টির। এক সঙ্গে চারটির আলোচনা করা হয়নি এজন্য যে, প্রথমোক্ত দু'টি জান্নাত, শেষোক্ত দু'টি অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। তাই উন্নততর দু'টি জান্নাতের বিবরণ পৃথকভাবে দিয়ে এই আয়াত থেকে শুরু হয়েছে বাকী দু'টির আলোচনা।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রথমে উক্ত জান্নাতের চেয়ে এই আয়াতে উল্লেখিত জান্নাত অপেক্ষাকৃত কম উন্নত। ইবনে জায়েদ বলেছেন, প্রথম দু'টির চেয়ে এ দু'টির মর্যাদা অপেক্ষাকৃত কম। হজরত আবু মুসা আশয়ারী বলেছেন, প্রথমোক্ত বেহেশত দু'টো স্বর্ণের। ওদু'টো লাভ করবে অগ্রবর্তী বিশ্বাসীগণ। আর পরোক্ত বেহেশত দু'টো পাবে তাদের একনিষ্ঠ অনুগামীগণ। রৌপ্যনির্মিত হবে ওদু'টো। হাদিসটি বায়হাকী সূত্রে বর্ণনা করেছেন হাকেম। হজরত আবু মুসা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, প্রথমে উল্লেখিত বেহেশতে থাকবেন 'সাবেক্বীন'। আর শেষে বিবৃত বেহেশত দু'টোতে থাকবে 'আস্হাবুল ইয়ামীন' (ডান দিকের দলভূক্তরা)। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রথমে আল্লাহ্র আরশ ছিলো পানির উপর। তারপর আল্লাহ্ তাঁর নিজের জন্য জান্নাত তৈরী করলেন। তার উপর পুনরায় তৈরী করলেন আর একটি জান্নাত। তারপর তা

আচ্ছাদিত করলেন মনিমুক্তা দিয়ে। তারপর বললেন 'এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরো দু'টি উদ্যান রয়েছে'। বাগবীর বক্তব্যানুসারে কাসায়ী কথাটির অর্থ করেছেন— দু'টি জান্নাতের সম্মুখে রয়েছে আরো দু'টি জান্নাত। জুহাক বলেছেন, দু'টি বেহেশত সোনার এবং অপর দু'টি ইয়াকুতের। এমতো বক্তব্য অনুসারে প্রতীয়মান হয়, বর্ণিত বেহেশত দু'টো রয়েছে মুখোমুখি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'ঘন সবুজ এই উদ্যান দু'টি (৬৪)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৬৫)? 'মুদহাম্মাতান' অর্থ ঘন সবুজ। অর্থাৎ যে সবুজ কৃষ্ণাভ। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে এ দু'টো বেহেশত গাঢ় সবুজ বন-বনানীতে পূর্ণ, যেমন প্রথম দু'টো পূর্ণ ফলবান বৃক্ষরাজিতে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দু'টি প্রস্রবণ (৬৬)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে' (৬৭)? এখানে 'নাদ্দ্বখতান' অর্থ উচ্ছলিত, উদ্বেলিত। কথাটির মাধ্যমে এখানে একথাটিই পরিস্ফুটিত হয় যে, প্রথমোক্ত জান্নাত দু'টির প্রস্রবণ আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত প্রস্রবণ অপেক্ষা হবে উন্নতমানের। কেননা আগের দু'টো প্রবাহিত হবে উপর থেকে নিচের দিকে, আর এ দু'টো প্রবাহিত হবে নিচ থেকে উপরের দিকে। সেজন্যই আগে বলা হয়েছে

www.eelm.weebly.com

‘প্রবহমান দু’টো প্রস্রবণ’ (৫০), আর এখানে বলা হলো ‘উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ’। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, ভাটির দিকে প্রবহমান ঝর্ণা উজানগামী ঝর্ণা অপেক্ষা উন্নত মানের।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘সেখানে রয়েছে ফলমূল— খেজুর ও আনার (৬৮)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে’(৬৯)?

কোনো কোনো পণ্ডিত আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে বলেন, খেজুর ও আনার ফল নয়। কেননা যোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয় যোজ্য ও যোজিতের মাঝে পার্থক্য নিরূপণার্থে। উভয়টি হয় সাধারণত পরস্পরবিরোধী। কাজেই খেজুর ও আনার এক জিনিস, আর ফল হচ্ছে ভিন্ন। খেজুর খাদ্য, আনার পথ্য। আর ফল বলে ওগুলোকে, যেগুলো ভক্ষণ করা হয় প্রধানতঃ আস্বাদ গ্রহণার্থে। সেকারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেন,‘ফল খাবো না’ এরকম শপথ করার পর যদি কেউ খেজুর বা আনার খায়, তবে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিত খেজুর ও আনারকে ফলই বলেন। আর এখানকার ‘ফাকিহা’ (ফলমূল) ব্যাপক অর্থবোধক, খেজুর ও আনার তার পৃথক দু’টি প্রকার। সাধারণার্থক শব্দের পরে বিশেষার্থক শব্দ সংযোজন করা হয় সংযোজিতের মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্যই। যেমন ‘মালায়িকা’ এর পরে যোগ করা হয় জিবরাইল ও মিকাইল।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জান্নাতের খেজুর গাছের কাণ্ড সবুজ জমরুদের এবং তার পাতার বর্ণ হবে লাল। আর তার আঁশ দিয়ে

বানানো হবে জান্নাতবাসীদের পরিচ্ছদ। জান্নাতের ফল মটকা অথবা বালতির মতো বড়, দুধের চেয়েও শাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং মাখনের চেয়ে নরম। তার ভিতরে কোনো আঁটি থাকবে না। ইবনে আবীদ্ দুন্ইয়া লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বেহেশতের খেজুর হবে বারো হাত লম্বা এবং তার ভিতরে কোনো আঁটি থাকবে না। তিনি আরো বলেছেন, একটি আনারের চারপাশে বসে তা ভক্ষণ করবে কয়েকজন বেহেশতবাসী। আর খাওয়ার সময় যদি অন্য কিছু ভক্ষণের কথা মনে পড়ে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তা চলে আসবে তাদের হাতের মুঠোয়। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি বেহেশতের মধ্যে আনার দেখেছি। আনারগুলো পালান খাটানো উটের মতো বড়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘সেই উদ্যানসমূহের মাঝে রয়েছে সুশীলা, সুন্দরীগণ (৭০)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে’ (৭১)? এখানে ‘ফীহিন্না’ অর্থ ওগুলোর মাঝে। অর্থাৎ ওই উদ্যানসমূহের মধ্যে, অথবা ওই উদ্যানসমূহের বালাখানাগুলোর অভ্যন্তরে। ‘খইরাতুন হিসান’ অর্থ সুশীলা, সুন্দরীগণ। বাগবী লিখেছেন, হাসান তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, উম্মত জননী হজরত উম্মে সালমা বলেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! ‘ফীহিন্না খইরাতুন হিসান’ এর অর্থ কী? তিনি স. বললেন, তারা হবে সতীসাধ্বী ও সুন্দরী। তিবরানী। ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, ইমাম আওযায়ী বলেছেন, তারা হবে রূপসী, সুমন্দভাষিণী, দম্ভিনী নয়। তারা কাউকে ক্লেশ দিবে না।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— ‘তারা হুর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা (৭২)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে (৭৩)? এদেরকে ইতোপূর্বে কোনো মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি (৭৪)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে’(৭৫)?

‘হুর’ অর্থ ‘হাওরারা’ আর ‘হাওরা’ বলে ওই সকল রমণীকে, যাদের চোখের মনি খুব কালো এবং শাদা অংশ খুব শাদা। চোখের পাতা বা পালকও খুব সুন্দর। অথবা যাদের চোখ হরিণীর চোখের মতো টানা টানা। কৃষ্ণকাজল আঁখি। এমন চোখ সাধারণত মানুষের হয় না। রূপক অর্থে মেয়েদের চোখের বেলাতেই সাধারণত এরকম বিশেষণ ব্যবহার করা হয়। অভিধানগ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে।

হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হুরদের দেহবল্লরী গঠন করা হয়েছে জাফরান দ্বারা। সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে বায়হাকী এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মুজাহিদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, জায়েদ ইবনে আস্লাম বলেছেন, আল্লাহ্পাক হুরদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেননি, করেছেন মেশক, জাফরান ও কর্পুর দ্বারা। রসুল স. বলেছেন, কোনো হুর সমুদ্রে থুথু ফেললে সমুদ্রের সমস্ত পানি হয়ে যাবে মধুর চেয়ে অধিক মিষ্ট। হজরত ইবনে আব্বাস

বলেছেন, বেহেশতের রমণীরা সাগরে থুথু নিক্ষেপ করলে সপ্তসাগরের পানি হয়ে যাবে মধুর চেয়ে অধিক সুস্বাদু। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতের মধ্যকার ধনুকের ফিতার সমান সামান্য জায়গাও পৃথিবী ও তৎমধ্যবর্তী সকল কিছু থেকে উত্তম। আর বেহেশতের নারীরা পৃথিবীর দিকে একবার তাকালে সারা পৃথিবী হয়ে যাবে আলোকিত ও সুবাসিত। তাদের মাথার ওড়না পৃথিবী ও সমগ্র সৃষ্টিজগত থেকে উত্তম। বোখারী, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়ার বর্ণনায় এসেছে,

www.eelm.weebly.com

কা'ব আহবার বলেছেন, কোনো হুর যদি তার করপল্লব দু'টি পৃথিবীর দিকে ঝুলিয়ে দেয়, তবে পৃথিবী আলোকময় হবে এমনভাবে, যেমনভাবে প্রথিবী আলোকিত হয় সূর্যালোকে।

'মাক্বসূরাতুন, ফীল্ খিয়াম' অর্থ তাঁবুতে সুরক্ষিতা। বাগবী লিখেছেন, তাঁবুতে সুরক্ষিতা ওই সকল হুর যারা স্বামী ছাড়া আর কারো দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, 'মাক্বসূরাত' অর্থ সুরক্ষিতা। আর 'খিয়াম' অর্থ তাঁবু। ওই তাঁবু হবে মোতি ও রৌপ্যনির্মিত। হজরত আনাস থেকে বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মেরাজ রজনীতে আমি জান্নাতের বাইদাহ্ নামক স্থানে পৌঁছলাম। সেখানে দেখলাম জবরজদ, লাল ইয়াকুত ও মোতি নির্মিত অনেক তাঁবু। তাঁবুবাসিনী হুরেরা আমাকে বললো, আস্সালামু আ'লাইকুম ইয়া রসুলাল্লহ্। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভ্রাতঃ জিবরাইল! কারা এভাবে আমাকে সালাম প্রদান করলো? তিনি বললেন, তাঁবুতে সুরক্ষিতা হুরগণ। তারা আপনার প্রভুপালকের কাছে আপনাকে সালাম প্রদানের অনুমতি চেয়েছিলো। তিনি তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। এরপর হুরেরা বলতে লাগলো, আমরা চির আনন্দময়ী, বেদনাবিচ্যুতা। আমরা এখানে চিরউপস্থিতিনী, প্রস্থানবিগর্হিতা। এ পর্যন্ত বলে রসুল স. পাঠ করলেন 'তারা হুর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা'। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতের প্রতিটি তাঁবু ষাট হাত চওড়া। তাঁবুগুলো উজ্জ্বল মোতির, সেগুলোর এক প্রান্তের অধিবাসিনীরা অপর প্রান্তবর্তিনীদেরকে দেখতে পাবে না। ওই তাঁবুগুলো থাকবে বিশ্বাসীগণের অধিকারে। হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে বোখারী এবং মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাঁবুগুলো হবে উজ্জ্বল মোতির। ওগুলোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে এক ফরসখ করে। সেগুলোতে থাকবে চারশ' করে স্বর্ণের কপাট। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তাঁবুগুলো হবে চমকদার মোতির। পরিণতসূত্রে হজরত ইবনে ওমর থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। অপরিণত সূত্রে আবু মাজলায থেকে ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু দারদা থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, তাঁবুগুলো হবে মোতিনির্মিত। সেগুলোতে থাকবে সত্তরটি করে দরোজা। সেগুলোও মোতিরই হবে। হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আমর ইবনে মায়মুন বলেছেন, তাঁবুটি

হবে চকচকে মোতির। মুজাহিদ এবং ইবনে আহওয়াসও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত মিসওয়ার বলেন, প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য একটি পছন্দনীয় জায়গা থাকবে। ওই জায়গায় থাকবে একটি করে তাঁবু। তাঁবুর দরজা থাকবে চারটি। সেগুলো দিয়ে প্রতিদিন প্রবেশ করবে নতুন নতুন উপঢৌকন। বেহেশতের ললনারা হবে উন্নাসিকতা ও দর্পবিবর্জিতা। তাদের মুখে ও বগলে কোনো দুর্গন্ধ থাকবে না। তারা হবে 'হুরুন ঈন কাআন্নাহুন্না বাইদুম মাক্বনূন' (তথায় থাকবে কৃষ্ণকাজল আনতনয়না হুরগণ, যেনো সেগুলি সুরক্ষিত ডিম্ব)।

উপযোগ ঃ পৃথিবীর বিশ্বাসবতীরা হবে হুরবালাদের চেয়ে উত্তমা। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, জননী উম্মে সালমা বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে নবীপ্রবর! পৃথিবীর পত্নীরা উত্তম, না হুর বালারা? তিনি স. বললেন, পৃথিবীর পত্নীরা, যেমন অন্তর্বাস উত্তম হয় বহির্বাসের চেয়ে। আমি বললাম, কারণ? তিনি স. বললেন, তাদের নামাজ- রোজার কারণে। আল্লাহ্ তাদের অবয়ব সমুজ্জ্বল করে দিবেন নূরের ছটায়। আর তাদেরকে পরতে দিবেন রেশমী পরিচ্ছদ। তারা হবে গৌরবর্ণা। বসনের রঙ হবে সবুজ এবং আভরণ হবে হরিদ্রাভ। অঙ্গুরীয় মোতির এবং চুড়ি স্বর্ণের। তারা সেখানে বলতে থাকবে, আমরা শান্তিময়ী, দুঃখনাশিনী। এখানে আমাদের চিরকালীন নিলয়। এখান থেকে আমরা কখনো প্রস্থান করবো না। আমরা সতত সন্তোষিণী, অসন্তোষবিবর্জিতা। তাদেরকে স্বাগতম, যারা আমাদের জন্য এবং আমরা যাদের জন্য। আমি নিবেদন করলাম, হে রসুলপ্রবর! একাধিকবার বিবাহবদ্ধা নারী যদি বেহেশতবাসিনী হয় এবং তার সকল স্বামীও যদি হয় বেহেশতবাসী, তবে সে কোন স্বামীর সঙ্গে থাকবে? তিনি স. বললেন, সেটা নির্ভর করবে তার ইচ্ছার উপর। তবে তখন সে তাকেই পছন্দ করবে, যে পৃথিবীতে ছিলো অন্যাপেক্ষা অধিক চরিত্রবান। আমি বললাম, তাহলে পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীতে সচ্চরিত্ররাই অধিক অগ্রগামী। হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, হাব্বান ইবনে জাবালা বলেছেন, বেহেশতীগণের স্ত্রী বেহেশতে প্রবেশ করলে তারাই হবে হুরললনাদের চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্না। আর এরকম মর্যাদা তারা পাবে পৃথিবীর জীবনের শুভ কৃতকর্মের কারণে।

শেষোক্ত আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে (৭৬)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে (৭৭)? কতো মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব' (৭৮)। এখানে 'রফরফিন খুদ্বরি' অর্থ সবুজ তাকিয়ায়।

অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন 'রফরফ' অর্থ সবুজ বর্ণের কাপড়, যার দ্বারা প্রস্তুত করা হয় গদি, বিছানা, ফরাশ, তাকিয়া, বালিশ ইত্যাদি। নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীতে রয়েছে, 'রফরফ' হচ্ছে বিশেষ ধরনের বস্ত্র, যা বাগানের মতো চিত্রময়। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁবু বা ঝালরের প্রান্ত, যা মাটির দিকে ঝুলে থাকে, তার নাম

www.eelm.weebly.com

রফরফ। আবু তালহা সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'রফরফিন খুদ্বরি' অর্থ আসন বা উপবেশনের স্থান। হান্নাদ ও বায়হাকী লিখেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এর অর্থ— বেহেশতের বাগান। বাগবী লিখেছেন, কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন— বিছানা। হাসান, মুকাতিল ও কুরতুবীর বক্তব্যও এরকম। আউফির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রফরফ হচ্ছে আসন ও শয্যার অতিরিক্ত অংশ, অর্থাৎ ঝালর। কাতাদা বলেছেন, ফরাশের উপর যে সবুজ চাদর বিছানো হয়, তাকে বলে 'রফরফি খুদ্বরি'। ইবনে কীসান কথাটির তরজমা করেছেন— কনুই রেখে হেলান দেওয়ার বালিশ। ইবনে উয়ায়না বলেছেন, এর অর্থ— সিংহাসন। কেউ কেউ বলেছেন, চওড়া বস্ত্রকে আরববাসীগণ বলেন 'রফরফ'।

'ওয়া আব্ক্বারিয়্যিন হিসান' অর্থ এবং সুন্দর গালিচার উপরে। অভিধান প্রণেতাগণ লিখেছেন, 'আবক্বর' হচ্ছে জ্বিন অধ্যুষিত একটি বিখ্যাত স্থানের নাম। সেখানে ছিলো শ্যামল অরণ্যানী। আর সেখানকার তৈরী পোশাক ছিলো খুব সুন্দর। সাধারণত 'আব্ক্বারি' অর্থ পরিপূর্ণ কোনো বস্তু, গোত্রনেতা এবং এমন জিনিস, যার চেয়ে উত্তম কোনো বস্তু নেই এবং বিশেষ ধরনের পরিচ্ছদ বা বিছানা। বায়যাবী লিখেছেন, 'আব্ক্বারি' শব্দটি সম্পর্কযুক্ত 'আব্ক্বার' নামক স্থানের সঙ্গে। আরববাসীগণ মনে করতেন 'আবক্বার' এমন এক জনপদ, যেখানে জ্বিনেরা বসবাস করে। সেকারণেই তারা বিস্ময়কর উৎকৃষ্ট কোনো কিছুকে বলে 'আবক্বারী'। বায়হাকী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আবক্বারিয়্যিন হিসান' অর্থ সিংহাসনে। কুরতুবী বলেছেন, চিত্রিত বস্ত্রকে আরববাসীগণ বলেন 'আবক্বারী'। আবু উবায়দা বলেছেন, 'আবক্বারী' দ্বারা এমন এক বিশেষ স্থানকে বোঝানো হয়, যেখানে এককালে কাপড়ে নকশা করা হতো। খলিল বলেছেন, সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে আরবীয়গণ বলেন 'আবক্বারী'। রসুল স. হজরত ওমর সম্পর্কে বলেছেন, আমি এমন কোনো আবক্বারী (মর্যাদাশালী) দেখিনি, যে ওমরের মতো কর্মপটু।

'তাবারাকাস্মু' অর্থ কতো মহান। এর দ্বারা আল্লাহ্কে বোঝানো হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ অতীব মহান। কেউ কেউ বলেন, 'ইস্ম' দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্র গুণবত্তাকে। আবার কেউ কেউ বলেন 'ইস্ম' শব্দটি এখানে অতিরিক্ত। স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. ফরজ নামাজের সালাম ফিরাবার পর এতোটুকু সময় বসে থাকতেন, যতোটুকু সময়ের মধ্যে পাঠ করা যায় এই দোয়া— 'আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালাম ওয়া মিন্কাস্ সালাম তাবারাকতা ইয়া জালজ্বালালি ওয়াল ইকরাম'। মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন।

সূরা ওয়াক্বিয়াহ্

মহাপুণ্যধাম মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এর মধ্যে রয়েছে ৩টি রুকু এবং ৯৬টি আয়াত।
সূরা ওয়াক্বিয়াহ্ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

❑ যখন কিয়ামত ঘটিবে,
❑ ইহার সংঘটন অস্বীকার করিবার কেহ থাকিবে না।
❑ ইহা কাহাকেও করিবে নীচ, কাহাকেও করিবে সমুন্নত;
❑ যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হইবে পৃথিবী
❑ এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িবে,
❑ ফলে উহা পর্যবসিত হইবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়;

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— কিয়ামত অনিবার্য। যখন কিয়ামত ঘটবে তখন তাকে অস্বীকার অথবা প্রতিহত করার কেউই থাকবে না।

www.eelm.weebly.com

'ওয়াক্বিয়াহ' অর্থ ঘটনা, সংঘটন। বিষয়টি সন্দেহাতীত। তাই একে বলা হয়েছে 'ওয়াক্বিয়াহ্ (অবশ্য সংঘটিতব্য)। আর 'লাইসা লি ওয়াক্বয়াতিহা কাজিবাহ্' অর্থ এর সংঘটন অস্বীকার করবার কেউ থাকবে না। এখানকার 'লাইসা' (কেউ নেই) এর 'লা' অক্ষরটি সময়জ্ঞাপক। অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটনের সময়টিকে অস্বীকার করতে পারে এমন কেউই নেই। তার মানে যিনি কিয়ামত ঘটাবেন, তাঁকে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী কেউ নেই। অথবা তার ব্যাপারে মিথ্যা বলবার কেউ নেই। এরকমও হতে পারে যে, 'লাম' অক্ষরটি এখানে কারণপ্রকাশক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে কিয়ামত বাস্তবায়িত হওয়ার কারণে কারো মিথ্যাবাদী হওয়ার সুযোগ থাকবে না। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা যে বলবে, সে সঠিক কথাই বলবে। অথবা 'কাজিবাহ্' কথাটির অর্থ এখানে— ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহতা সহ্য করতে পারবে, এমন ধৃষ্টতা কেউ প্রদর্শন করতে পারবে না। আরবী প্রবাদে বলা হয় 'কাজ্জাবাত ফুলানান নাফসুহু ফীল খত্বিল আ'জীম' (বড় বিপদ অমুককে দুঃসাহসী বানিয়ে দিয়েছে)। এরকম হওয়াও সম্ভব যে, 'আফিয়াহ' 'নাযিলাহ্' 'লাগিয়াহ্' ইত্যাদি শব্দের মতো 'ওয়াক্বিয়াহ্'ও ক্রিয়ামূল। যদি তাই হয়, তবে কথাটি দাঁড়াবে— কিয়ামত সত্য। এর মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র নেই।

পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এটা কাউকে করবে নিচ, কাউকে করবে সমুন্নত'। একথার অর্থ— যারা অহংকারী, তাদের অহংকার চূর্ণ করবে কিয়ামত, আর মর্যাদা প্রদান করবে তাদেরকে, যারা বিনয়ী।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'যখন প্রবল কম্পনে কম্পিত হবে পৃথিবী (৪) এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে (৫), ফলে তা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় (৬)।

এখানে 'রুজ্জ্বাত' অর্থ প্রবল কম্পন, সজোরে নাড়া দেওয়া, এমনভাবে কাঁপানো, যাতে ধূলিসাৎ হয়ে যায় অট্টালিকা ও পাহাড় পর্বত। 'বুস্সাতিল জ্বিবালু বাস্সা' অর্থ পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। কথাটি 'বাস্সাল গনাম' (ছাগপাল বিতাড়ন) থেকে এসেছে। হাসান, কালাবী ও ইবনে কীসান এরকম বলেছেন। কিন্তু আতা ও মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে পাহাড়সমূহ। 'ফা কানাত্ হাবাআম মুম্বাছ্ছা' অর্থ ফলে তা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়, যা সূর্যকিরণের কারণে উড়তে দেখা যায়। আর 'মুম্বাছ্ছা' অর্থ বিক্ষিপ্ত।

সূরা ওয়াক্বিয়াহ ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২

❑ এবং তোমরা বিভক্ত হইয়া পড়িবে তিন শ্রেণীতে—
❑ ডান দিকের দল; কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!
❑ এবং বাম দিকের দল; কত হতভাগ্য বাম দিকের দল!
❑ আর অগ্রবর্তিগণই তো অগ্রবর্তী,
❑ উহারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত—
❑ নি'আমতপূর্ণ উদ্যানে;

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে সর্বশেষ রসুলের উম্মত! মহাপ্রলয়ের পর যখন মহাপুনরুত্থান ঘটবে, তখন মহাবিচারের স্থানে তোমরা উপস্থিত হবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে। ডান দিকে থাকবে যারা, তারা ভাগ্যবান। হতভাগ্য হবে কেবল বাম দিকের লোকগুলো। আর মহামর্যাদার অধিকারী হবে তারা, যারা থাকবে সম্মুখে। তারাই অগ্রবর্তী, পুণ্য ও নৈকট্য উভয় দিক থেকে।

এখানে 'আয্ওয়াজ্বান ছালাছাহ্' অর্থ তিন শ্রেণীতে। এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণীর সঙ্গে যখন উল্লেখ করা হয়, তখন তাকে বলে 'যাওজ্ব'। 'ফা আস্হাবুল

মাইমানাহ্' অর্থ ডান দিকের দল। অর্থাৎ যাদেরকে বেহেশতে নিয়ে যাওয়া হবে ডান দিক থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পিতা আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সকল সন্তানকে বের করে দু'টি দলে বিভক্ত করা হয়েছিলো। একটি ছিলো ডানে, অন্যটি বামে। ডানের দল সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছিলেন 'এরা জান্নাতের জন্য'। এখানে 'ডান দিকের দল'বলে তাদেরকেই

www.eelm.weebly.com

বুঝানো হয়েছে। অপর দলটি ছিলো বামে। তারা জাহান্নামী। পরবর্তী আয়াতে তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে 'বাম দিকের দল'। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তখন বলেছিলেন 'এরা দোজখের জন্য'।

জুহাক বলেছেন, ডান দিকের দল তারা, যাদেরকে আমলনামা দেওয়া হবে ডান হাতে। বর্ণিত অর্থানুসারে বলা যায় 'মাইমানাহ্' শব্দটি এসেছে 'ইয়ামিন' থেকে, যার অর্থ ডান দিক। এর বিপরীতার্থক শব্দ ইয়াসির' (বামদিক)। রবী ইবনে আনাস ও হাসান বসরী বলেছেন, 'আস্হাবুল মাইমানাহ্' অর্থ কল্যাণময় ব্যক্তিবর্গ, যারা জীবন যাপন করেন আল্লাহ্র অনুগত হয়ে। এমতো অর্থের প্রেক্ষিতে বলতে হয়, এখনাকার 'মাইমানাহ্' শব্দটি নির্গত হয়েছে 'ইউম্‌নূন' থেকে। এর বিপরীতার্থক শব্দ 'শাওমূন' (কল্যাণচ্যুত)। এই 'শাওমূন' থেকেই সাধিত হয়েছে 'মাশআ'মাহ' (হতভাগ্য)। আর এখানকার 'মা আস্হাবুল মাইমানাহ্' (কতো ভাগ্যবান ডান দিকের দল) কথাটি বিস্ময়প্রকাশক ও প্রশ্নসূচক। এর সোজাসুজি অর্থ— দক্ষিণ প্রান্তের লোকগুলি কতোইনা ভাগ্যবান, কতোইনা কল্যাণাধিকারী।

'আস্হাবাল মাশআমাহ্' অর্থ বাম দিকের দল। আরববাসীগণ বাম হাতকে বলেন 'শাওমী'। সিরিয়াকে শাম এবং ইয়েমেনকে ইয়েমেন এজন্যই বলা হয় যে সিরিয়া কাবা শরীফের বামে এবং ইয়েমেন ডানে। বলাবাহুল্য, বাম দিকের দলটিকেই দোজখে নিয়ে যাওয়া হবে। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ পূর্বাহ্নে ঘোষণা দিয়েছিলেন 'এরা দোজখের জন্য'। এরা জীবন যাপন করে আল্লাহ্র অবাধ্য হয়ে। বাম হাতে আমলনামা পাবে এরাই।

'ওয়াস্ সাবিক্বূনাস্ সাবিক্বূন' অর্থ আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী। অর্থাৎ ইসলাম, ইবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্যভাজনতার দিক দিয়ে এরাই অগ্রগামী। বলাবাহুল্য, এ পথের নেতৃস্থানীয় হচ্ছেন নবী-রসুলগণ। তাঁদের একান্ত অনুগামী হচ্ছেন সাহাবীগণ ও তাঁদের কিছুসংখ্যক অনুসারী। তাঁরা আল্লাহ্র সত্তাসঞ্জাত জ্যোতিচ্ছটায় স্নাত এবং নবুয়তের উৎকর্ষতার উত্তরাধিকারধন্য। সেকারণেই হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যারা হিজরতে অগ্রগামী, তারা পরকালেও অগ্রগামী। ইকরামা বলেছেন, অগ্রবর্তী বলে এখানে বুঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সর্বাগ্রে। অর্থাৎ রসুল স. এর সম্মানিত সহচরবৃন্দ। ইবনে সিরীন বলেছেন, তাঁরা ছিলেন মুহাজির এবং আনসার, যাঁরা নামাজ পাঠ করেছিলেন উভয় কেবলার দিকে মুখ করে। রবী ইবনে আনাস বলেছেন, রসুল স. এর প্রতি বিশ্বাসে যারা পৃথিবীতে অগ্রগামী, তারাই অগ্রগামী জান্নাতের পথে।

হজরত আলী বলেছেন, এখানে 'অগ্রবর্তী' বলে বুঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা নামাজের বিষয়ে অন্যাপেক্ষা অগ্রগামী। বর্ণিত বক্তব্যগুলো দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এখানে 'অগ্রবর্তী' অর্থ সাহাবায়ে কেরাম রেদ্বওয়ানুল্লহি তায়ালা আলাইহিম আজ্মাঈন। হজরত আলী বলেছেন, আমি যখন বালক, তখনও আমি ছিলাম ইসলামে অগ্রবর্তী।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেছেন, সাহাবীগণ সকলেই ছিলেন কামালিয়তে নবুয়তের নূরে স্নাত। তাবেয়ীগণের মধ্যেও অধিকাংশ ছিলেন এরকম। তাবে তাবেয়ীগণের মধ্যে এরকম ছিলেন কেউ কেউ। এরপর থেকে কামালিয়তে নবুয়তের নূর অন্তরালবর্তী হতে থাকে। বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে কামালাতে বেলায়েতের। এভাবে হাজার বছর গত হওয়ার পর এই উম্মতের কোনো এক ব্যক্তিকে নবীর চরিত্রে চরিত্রবান করে সৃষ্টি করা হলো। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে কামালতে নবুয়তের নূরে স্নাত হবার সৌভাগ্য দান করলেন। এভাবেই শেষ যুগ হয়ে গেলো প্রথম যুগ সদৃশ। রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতেরা বৃষ্টি সদৃশ। তাই অনুমান করা কঠিন যে, এদের কোন যুগ শ্রেষ্ঠ— প্রথম না শেষ। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে। ইমাম জাফর সাদেক তাঁর পিতা ও পিতামহের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শুভসংবাদ গ্রহণ করো। শোনো সুসমাচার, আমার উম্মত বৃষ্টির মতো, তাই বুঝা যায় না যে, এর প্রথমাংশ উৎকৃষ্ট, না শেষাংশ। অথবা আমার উম্মত উদ্যানের মতো। হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, আমার উম্মতের উত্তম অংশ হচ্ছে প্রথম ও শেষ অংশ। মধ্যমাংশে রয়েছে অমসৃণতা। হাকেম, তিরমিজি।

উল্লেখ্য, এখানকার প্রথম 'আস্সাবিক্বূন' এর 'আলিফ' জাতিবাচক এবং পরেরটির 'আলিফ' সীমিতার্থক। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— অগ্রবর্তী অর্থ ওই সকল অগ্রবর্তী, যাদের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে তোমরা সম্যক অবগত। অথবা 'সাবিক্বূন' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে কেবল তাদেরকে যারা অগ্রগামী জান্নাতের দিকে।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'উলায়িকাল মুক্বার্‌রবূন'। এর অর্থ তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত। অর্থাৎ অগ্রবর্তীগণই আল্লাহ্র বিশেষ নৈকট্যভাজন।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'ফী জ্বান্নাতিন্ নায়ী'ম' (নেয়ামতপূর্ণ উদ্যানে)। অর্থাৎ ওই বিশেষ নৈকট্যভাজন ব্যক্তিবর্গই অলংকৃত করবেন জান্নাতের মহাকল্যাণময় উদ্যানসমূহ।

সূরা ওয়াক্বিয়াহ ঃ আয়াত ১৩, ১৪

www.eelm.weebly.com

❑ বহু সংখ্যক হইবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হইতে;
❑ এবং অল্প সংখ্যক হইবে পরবর্তীদের মধ্য হইতে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ছুললাতুম মিনাল আউয়ালীন' (বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে)। এখানে 'পূর্ববর্তীগণ' অর্থ প্রথম যুগের মুসলমানগণ। অর্থাৎ সাহাবায়েকেরাম, তাবেয়ীন এবং তাবে তাবেয়ীন।

রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে আমার যুগ। তৎপর তাদের যুগ, যারা আমার যুগের লোকদেরকে পেয়েছে। অতঃপর তাদের যুগ, যারা দ্বিতীয় যুগের লোকদের সঙ্গে মিলিত। এরপর আসবে এমন যুগ, যে যুগের লোকেরা ডাকার আগেই সাক্ষ্য দিতে আসবে। তারা গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাত করবে এবং মানত পূর্ণ করবে না। বোখারী, মুসলিম। মুসলিম ও নাসাঈও যথাক্রমে হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত ওমর থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি ও হাকেম হজরত ইমরান থেকে যে বর্ণনা করেছেন, তাতে 'খইরুল ক্বুরুনি ক্বরনী' এর স্থলে উল্লেখ করা হয়েছে 'খইরুন্নাসি ক্বরনী'। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম কৃত বর্ণনায় 'খইরুল ক্বুরুনী' (শ্রেষ্ঠ যুগ) এর বদলে উল্লেখিত হয়েছে 'খইরুন্নাস' (শ্রেষ্ঠ মানুষ)। জননী আয়েশা থেকেও মুসলিম এরকম বর্ণনা করেছেন। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার সাহাবীগণকে মন্দ বোলো না। তোমাদের উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণদানও তাদের একসের অথবা অর্ধসের খাদ্যদানের সমতুল হবে না।

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'ওয়া ক্বলীলুম্ মিনাল আখিরীন' (এবং অল্পসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে)। এখানে পরবর্তী বলে বুঝানো হয়েছে এক হাজার হিজরী সনের পরের মুসলমানদেরকে। তাদের মধ্যেও অল্পসংখ্যক হবেন কামালতে নবুয়তের নূরে স্নাত। তবে অধিকাংশ তাফসীরকার হজরত আদম থেকে শেষ রসুল স. এর পূর্বের সকলকে বলেছেন 'পূর্ববর্তী' এবং পরবর্তী বলেছেন রসুল স. এর পরে সকলকে। অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীকে। জুহাক বলেছেন, যারা হজরত আদম থেকে শেষ রসুল স. এর পূর্ব পর্যন্ত নবী রসুলগণকে দেখেছেন, তাদের সংখ্যা রসুল স. এর সাহাবীগণের সংখ্যার চেয়ে অধিক।

আমি বলি, এমতো ব্যাখ্যা শুভবোধের অনুকূল নয়। তাই তা উদ্ধৃতির অযোগ্য। কেননা এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণ রসুল স. এর উম্মতের তুলনায় অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু এরকম ধারণা কোরআন মজীদ এবং যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসসমূহের পরিপন্থী। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'কুনতু খইরা উম্মাতি' (তোমাদের অভ্যুদয় ঘটানো হয়েছে উত্তম উম্মত হিসেবে)। আর এক আয়াতে এসেছে 'যেনো তোমরা হও মানবজাতির জন্য সাক্ষ্যদাতা এবং রসুল হবেন তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা' । হাদিস শরীফে এসেছে, তোমরা হবে সত্তর উম্মত থেকেও অধিকতর। তোমরা তাদের চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাশীল হবে আল্লাহ্‌পাকের নিকট। বাহায ইবনে হাকিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তার পিতামহ থেকে। তিরমিজি ও ইবনে মাজা হাদিসটির বর্ণনাকারী। আর তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম শ্রেণীর। আহমদ, বাযযার ও তিবরানী যথাসূত্রপরম্পরায়

বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. একবার বললেন, আমি আশা করি বেহেশতের এক তৃতীয়াংশ হবে আমার উম্মত। একথা শুনেই আমি উচ্চারণ করলাম 'আল্লাহু আকবর'। তিনি স. বললেন, আমার মনে এরকমও আশা জাগে যে, তিনভাগের একভাগ বেহেশতবাসী হবে আমার উম্মতভূত। আমি পুনরায় তকবীর ধ্বনি দিলাম। তিনি স. বললেন, আমার উম্মতের বেহেশতবাসীদের সংখ্যা সকল বেহেশতবাসীদের অর্ধেক হবে বলে মনে হয়। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. একবার বললেন বেহেশতবাসীদের অর্ধেক হবে তোমাদের মধ্য থেকে, সংবাদটি কি তোমাদের মনঃপুত নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়। তিনি স. বললেন, শপথ ওই পবিত্রতম সত্তার, যাঁর আনুরূপ্যবিহীন অধিকারে আমার জীবন, আমি দৃঢ় আশা করি তোমরা হবে বেহেশতবাসীদের অর্ধসংখ্যক। হজরত বুরায়দা থেকে তিরমিজি, হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতীদের সারি হবে একশত কুড়িটি। তন্মধ্যে আশিটি সারি হবে আমার উম্মতের। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম পর্যায়ের। আর হাকেম একে সনাক্ত করেছেন যথাসূত্রসম্বলিত বলে। তিবরানী এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবু মুসা, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত মুয়াবিয়া ইবনে জায়েদা এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে।

সূরা ওয়াক্বিয়াহ ঃ আয়াত ১৫—২৬

www.eelm.weebly.com

❑ স্বর্ণ-খচিত আসনে
❑ উহারা হেলান দিয়া বসিবে, পরস্পর মুখামুখি হইয়া।
❑ তাহাদের সেবায় ঘোরাফিরা করিবে চির-কিশোরেরা
❑ পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা লইয়া।
❑ সেই সুরা পানে তাহাদের শিরঃপীড়া হইবে না, তাহারা জ্ঞানহারাও হইবে না—

❑ এবং তাহাদের পসন্দমত ফলমূল,
❑ আর তাহাদের ঈপ্সিত পাখীর গোশ্‌ত লইয়া,
❑ আর তাহাদের জন্য থাকিবে আয়তলোচনা হূর,
❑ সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ,
❑ তাহাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ।
❑ সেথায় তাহারা শুনিবে না কোন অসার অথবা পাপবাক্য,
❑ 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ব্যতীত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আ'লা সুরুরিম মাওদূনাতিন' (স্বর্ণখচিত আসনে)। একথার অর্থ— ওই নৈকট্যভাজনগণ জান্নাতে প্রবেশ করে উপবেশন করবে স্বর্ণখচিত সিংহাসনে। এখানকার 'মাওদুনাতিন' এসেছে 'ওয়াদ্বনূন' (বর্মের নির্মাণশৈলী) থেকে। প্রতিটি সুদৃঢ় বস্তুর নির্মাণকৌশলকে বলে 'ওয়াদ্বনূন'। সাঈদ ইবনে মনসুর, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী, মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মাওদূনাতুন' স্বর্ণনির্মিত কোনোকিছু। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এর অর্থ— স্বর্ণ ও মুক্তা মিলিয়ে প্রস্তুতকৃত কিছু। জুহাক অর্থ করেছেন— সারিবদ্ধ। পরের আয়াতে (১৬)বলা হয়েছে— 'মুত্তাক্বীঈনা আ'লাইহা মুতাক্বাবিলীন' (তারা হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে)। একথার অর্থ— ওই নৈকট্যভাজনগণ স্বর্ণখচিত সিংহাসনে বসবে মুখোমুখি হয়ে। হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, তারা সেখানে উপবেশন করবে সামনাসামনি হয়ে, কেউ কারো পশ্চাৎভাগ দেখবে না। বাগবীও এরকম বলেছেন। মুখোমুখি হয়ে বসা সম্প্রীতির নিদর্শন। জান্নাতবাসীরা সকলেই হবে সজ্জন ও একে অপরের একান্ত সুহৃদ। তাই এখানে বিশেষ করে বলা হয়েছে তাদের মুখোমুখি হয়ে বসার কথা।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'ইয়াতুফু আ'লাইহিম ভিলদানুম মুখল্লাদুন' (তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির-কিশোরেরা) এখানে 'ইয়াতুফু' অর্থ ঘোরাফিরা করবে, যাওয়া আসা করবে। 'ভিল্দানুন' অর্থ ওই সকল কিশোর যারা রত থাকবে জান্নাতবাসীদের সেবায়। আর 'মুখল্লাদূন' অর্থ চিরকালীন। অর্থাৎ ওই সকল কিশোর পরিচারক সবসময় কিশোরই থাকবে। বার্ধক্য ও মৃত্যু তাদেরকে স্পর্শ করবে না। ফাররা বলেছেন, কেউ প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছলে তার মস্তকের কেশ হয়ে যায় শাদাভ কালো। এরকম লোককে আরববাসীগণ বলেন 'মুখল্লাদ'। ইবনে কীসা বলেছেন, ওই কিশোর সেবকেরা সবসময় কিশোরই রয়ে যাবে। তাদের শরীরে পরিদৃষ্ট হবে না বয়সজনিত কোনো পরিবর্তন। সাঈদ ইবনে যোবায়ের 'মুখল্লাদূন' এর অর্থ করেছেন, কানে বালা পরিহিত। অর্থাৎ তাদের কানে বালি পরানো থাকবে। কোনো নারী অথবা কোনো ক্রীতদাসীকে বালি পরানো হলে তাকে বলে 'খল্লাদা জারিয়্যাতান'। হাসান বলেছেন, তারা হবে পৃথিবীবাসীদের পাপ-পুণ্যবিহীন শিশুসন্তান। অর্থাৎ পুণ্য কর্মবিচ্যুত ও পাপবিবর্জিত

www.eelm.weebly.com

বলে সে সকল শিশুসন্তানের সওয়াব ও আযাব কোনোটাই নেই, তারাই হবে জান্নাতবাসীদের চিরকিশোর সেবক। ইবনে মোবারক, হান্নাদ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, সবচেয়ে নিম্ন মর্যাদাধারী জান্নাতবাসীর সেবকের সংখ্যা হবে হাজারের বেশী। তারা তার নির্দেশ পালনের জন্য সব সময় তার কাছে ঘোরাফিরা করতে থাকবে। আর তারা নিয়োজিত থাকবে কেবলমাত্র একটি কাজের দায়িত্বে। অন্য কাজের জন্য অন্যখাদেম। সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, সবচেয়ে কম মর্যাদাধারী জান্নাতবাসী যে হবে, তার খেদমতের জন্য সতত প্রস্তুত থাকবে দশ হাজার খাদেম। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, সর্বাপেক্ষা নিম্ন সম্মানধারী জান্নাতবাসীর কাছে সকাল-সন্ধ্যায় আনাগোনা করতে থাকবে পাঁচ সহস্র সেবক। আর প্রত্যেকের হাতে থাকবে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আহার্য ও ফলভর্তি পাত্র। একজনের পরিবেশিত আহার্যসামগ্রীর সঙ্গে অন্যজনের পরিবেশিত আহার্যসামগ্রীর কোনো মিল থাকবে না। আর জান্নাতবাসীরা কেউ নিম্নমানের নয়। তবে তাদের মধ্যে থাকবে মর্যাদার ন্যূনাধিক্য।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণনিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে'। এখানে 'বিআকওয়াবিন' অর্থ পানপাত্র। শব্দটি 'কুবুন' এর বহুবচন। 'কুবুন' ওই পানপাত্র যার মুখ গোলাকার এবং যাতে কোনো হাতল থাকে না। হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, এরকম বলেছেন মুজাহিদ। তবে আউফি সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আক্ওয়াব' বলে রূপার ঘটিকে। 'আবারিক্ব' অর্থ কুঁজো। অর্থাৎ ওই লোটা, যার হাতল থাকে। রঙের স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্যের কারণে এরকম পাত্রকে বলা হয় 'আবারিক্ব'। 'বারক্বুন' অর্থ বিদ্যুত, বিদ্যুতের ঝলক। 'কা'সিন' অর্থ সুরাপূর্ণ পেয়ালা। সুরাবিহীন পেয়ালাকে 'কা'সিন' বলা হয় না। আর ঝর্ণা থেকে অনবরত নিঃসৃত সুরাকে বলে 'মায়ীন'।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞানহারাও হবে না'। একথার অর্থ— বেহেশতবাসীদের সুরা হবে অতি আস্বাদ্য। ওই সুরা পান করলে মাথা ঘোরা, সংজ্ঞালোপ এরকম কিছু হবে না. যেমন হয় পৃথিবীর সুরা পান করলে।

'ওয়ালা ইউন্যিফূন' অর্থ এবং জ্ঞানহারা হবে না। কুফাবাসীগণ শব্দটির 'যা' অক্ষরে যের যুক্ত করে উচ্চারণ করেন। আর অন্যান্য ক্বারীগণ উচ্চারণ করেন 'ইউনযাফূন' 'যা' অক্ষরে যবর যুক্ত করে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ— জ্ঞান অন্তর্হিত হওয়া, মাতাল হওয়া। 'সিহাহ্' নামক অভিধানে লেখা রয়েছে 'আনযাফাল ক্বওমু মাআ বি'রিহিম' (গোত্রের লোকেরা তাদের কূপের পানি তুলে নিয়েছে)। 'আনযাফা' শব্দটিই অধিক অলংকারসমৃদ্ধ। আর কুফাবাসীদের উচ্চারণানুসারে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ওই সুরা কখনো নিঃশেষ হবে না। আর অন্যান্য ক্বারীর ক্বেরাতানুসারে অর্থ দাঁড়াবে— তাদের জ্ঞান কখনো বিপর্যস্ত হবে না।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'এবং তাদের পছন্দমতো ফলমূল'। একথার অর্থ— সেখানে যে ফল তারা খেতে চাইবে, তা-ই পাবে।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'আর তাদের ঈপ্সিত পাখির গোশত নিয়ে'। এখানে 'ওয়া লাহ্মি ত্বইরিন' অর্থ ঈপ্সিত পাখির গোশত। অর্থাৎ যে পাখির গোশত তারা খেতে চাবে, তা-ই খেতে পারবে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জান্নাতবাসীরা কোনো পাখির গোশত মনে মনে খেতে ইচ্ছে করলে সঙ্গে সঙ্গে সেই পাখি সশরীরে তার সামনে এসে যাবে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বায্যার, ইবনে আবিদ দুন্ইয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতে যে পাখি তোমরা খেতে চাইবে, সঙ্গে সঙ্গে সেই পাখির ভুনা করা গোশত হাজির করা হবে তোমাদের সামনে। ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু উমামা বলেছেন, বেহেশতবাসী যে পাখির গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে, সেই পাখি সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে বেহেশতী উটের মতো বড়। পরক্ষণেই তার গোশত ভুনা করা অবস্থায় হাজির করা হবে তার দস্তরখানায়। অথচ ওই গোশত হবে ধোঁয়া ও আগুনের স্পর্শহীন। পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহারের পর ওই পাখিটি আবার উড়ে চলে যাবে। হজরত হুজায়ফা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, বেহেশতের পাখি হবে উটের মতো বৃহদাকৃতির। একথা শুনে হজরত আবু বকর বললেন, তাহলে তো সে উট থাকবে খুবই আরাম আয়াশে। তিনি স. বললেন, তার চেয়েও অধিক আরাম আয়াশে থাকবে ওই সকল লোক, যারা তাকে ভক্ষণ করবে। তিনি স. বললেন, আবু বকর! ওই উট যারা ভক্ষণ করবে, তুমিও তাদের একজন। হজরত আনাস থেকে আহমদ এবং তিরমিজিও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হাসান বসরী সূত্রে হান্নাদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতের পাখিরা হবে বুখতী উটের মতো বড়। তারা বেহেশতবাসীদের কাছে চলে আসবে। তারা তার গোশত ভক্ষণ করবে। তারপর আবার সে উড়ে চলে যাবে। তাকে দেখে তখন এরকম মনে হবে না যে, তার শরীরের কোনো অংশ ঘাটতি হয়েছে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হান্নাদ ও ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতে রয়েছে সত্তর হাজার পাখাবিশিষ্ট অসংখ্য পাখি। তারা নিজেরাই উড়ে এসে বেহেশতবাসীদের আহার্যাধারে পড়বে এবং ঝাপটাতে থাকবে পাখা। তখন তাদের প্রতিটি পাখা থেকে বিচ্ছুরিত

www.eelm.weebly.com

হতে থাকবে এক ধরনের বরফশুভ্র বর্ণ। আর তার গোশত হবে মাখনের চেয়ে নরম এবং স্বাদ হবে মধুর চেয়ে মিষ্ট। বেহেশতীদের আহারপর্ব শেষে আবার তারা উড়াল দিবে।

হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, মুগীছ ইবনে সামাহী বলেছেন, বেহেশতে এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে তুবা বৃক্ষের পাতার ছায়া পড়ে না। ওই বৃক্ষে শোভা পাবে বিভিন্ন রঙের ফল। আর ওই বৃক্ষশাখায় এসে বসবে বুখতি উটের মতো বড় বড় পাখি। বেহেশতবাসীরা তাদের গোশত খেতে চাইলে ইশারায় তাদেরকে

ডাকবে। সঙ্গে সঙ্গে ওই পাখি এসে বসবে তাদের দস্তরখানায়। তারা তখন তার ভুনা গোশত খাবে। তার দুই পার্শ্ব ভক্ষণ করার পর আবার সে পূর্বরূপ ধারণ করবে এবং উড়ে চলে যাবে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'আর তাদের জন্য থাকবে আয়তলোচনা হুর (২২), সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ (২৩), তাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ' (২৪)।

মুজাহিদ বলেছেন, ওই আয়তলোচনা হুরীদের জানুর সৌন্দর্য ঠিকরে বেরোবে তাদের পরিধেয় বসন ভেদ করে। তাই বাইরে থেকেও তা দেখা যাবে। এখানে 'হুরুন্ ঈন' বলে বুঝানো হয়েছে আয়তআঁখিনী হুরীদেরকে। তারা হবে কালো ও ডাগর চোখের অধিকারিণী। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, জননী উম্মে সালমা বলেছেন, আমি একদিন নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! 'হুরুন ঈন' অর্থ কী? তিনি স. বললেন, গৌরবর্ণা বেহেশতী বালা, যাদের চোখের পাতা শকুনীর পালকের মতো। আমি বললাম, আর 'কাআম্‌ছালি লু'লুইল' অর্থ? তিনি স. বললেন, ঝিনুকের ভিতরে লুক্কায়িত স্পর্শমুক্ত মুক্তার মতো পরিচ্ছন্ন। বেহেশতের হুরীরা হবে সেরকম।

বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, বেহেশতে এক ধরনের বিশেষ আলো চমকাতে থাকবে। তখন বেহেশতবাসীরা বলাবলি করবে, হুরীদের কেউ তার দয়িতার সামনে হেসে ফেলেছে। এটা হচ্ছে তার দাঁতের ঝলক। এরকমও বর্ণনা করা হয়েছে যে, হুরীদের পদবিক্ষেপের সময় তাদের পায়ের অলংকারগুলোও আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করবে। পবিত্রতা বর্ণনা করবে তার হাতের চুরি, কণ্ঠের হার। পায়ে থাকবে তাদের স্বর্ণের পাদুকা। তার ফিতা হবে মোতির। তার সকল কিছুই মুখরিত থাকবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা শুনবে না কোনো অসার অথবা পাপবাক্য (২৫), 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ব্যতীত' (২৬)।

এখানে 'লাগ্‌ওয়ান' অর্থ অসার বাক্য। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, এর অর্থ— মিথ্যাবচন। হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, জুহাক বলেছেন, এর অর্থ— নিরর্থক বাক্য। 'তা'ছীমা' কথাটির উদ্দেশ্য— তাদেরকে পাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে না। তাদেরকে এমন কথাও বলা হবে না যে, তোমরা মন্দ কাজ করছো। হজরত ইবনে আব্বাস ও হান্নাদের উক্তি উল্লেখ করে বায়হাকী লিখেছেন, 'তা'ছীমান' অর্থ— মিথ্যা কথা। 'ক্বীলান' অর্থ কথা, বাণী। আর 'সালামান' অর্থ সালাম, শান্তি, নিরাপত্তা। হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ, বাযযার ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে ওই সকল মুহাজির, যাদের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র নিরাপদ ছিলো এবং দূর হয়ে গিয়েছিলো অনভিপ্রেত কর্মকাণ্ড। তারা তাদের অভিলাষ বুকে চেপে রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। বৈধ বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ কখনো পায়নি। আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা

তাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিবেন, তোমরা ওই মুহাজিরদের কাছে যাও এবং তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে জানাও শান্তিসম্ভাষণ। ফেরেশতারা নিবেদন করবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমরা আকাশবাসী, নিষ্পাপ। তৎসত্ত্বেও আমাদেরকে তাদের কাছে যেয়ে শান্তিসম্ভাষণ জানানোর নির্দেশ দিচ্ছো যে? আল্লাহ্ বলবেন, তারা আমার একনিষ্ঠ উপাসক। তারা তাদের উপাসনায় অন্য কাউকে অংশীদার করেনি। তাদের কারণে সুরক্ষিত ছিলো বিশ্বাসীদের রাষ্ট্রীয় সীমানা। তাদের দ্বারা বিদূরিত হয়েছিলো অপবিত্র কার্যকলাপ। তারা দায়িত্ব পালন করতে সময়াভাবে তাদের অভিবাসনা চরিতার্থ করতে পারেনি। বুকের আকাংখা বুকে চেপে রেখেই পৃথিবীর জীবন সাঙ্গ করেছে। ফেরেশতারা তখন ওই মুহাজিরের কাছে যাবে। প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে করতে বলতে থাকবে, তোমাদের প্রতি শান্তি, তোমাদের প্রতি নিরাপত্তা। কেননা তোমরা ধৈর্য অবলম্বন করেছিলে। আজ দ্যাখো, তোমাদের সর্বশেষ বসত কতোইনা উত্তম।

সাঈদ ইবনে মনসুর তাঁর 'সুনানে' এবং বায়হাকী তাঁর 'আলবা'ছে' লিখেছেন, আতার বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, তায়েফবাসীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যখন তাদের উপত্যকার মধু কেবল তাদের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হলো, তখন কেউ কেউ বলতে লাগলো জান্নাতে থাকবে এরকম এরকম সামগ্রী। সম্ভবত সেখানে এই উপত্যকার মতো কোনো উপত্যকাও থাকতে পারে আমাদের জন্য। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

www.eelm.weebly.com

- ❑ আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!
- ❑ তাহারা থাকিবে এমন উদ্যানে, সেখানে আছে কন্টকহীন কুলবৃক্ষ,
- ❑ কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ,
- ❑ সম্প্রসারিত ছায়া,
- ❑ সদা প্রবহমান পানি,
- ❑ ও প্রচুর ফলমূল,

- ❑ যাহা শেষ হইবে না ও যাহা নিষিদ্ধও হইবে না।
- ❑ আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ;
- ❑ উহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি বিশেষরূপে—
- ❑ উহাদিগকে করিয়াছি কুমারী,
- ❑ সোহাগিনী ও সমবয়স্কা,
- ❑ ডানদিকের লোকদের জন্য।

'আসহাবুল ইয়ামীন' বা ডান দিকের লোকদের জন্য জান্নাতে কী কী সুখোপকরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে উদ্ধৃত আয়াতসমূহে। যারা বিশুদ্ধচিত্ত ও প্রশান্ত প্রবৃত্তির অধিকারী, তারাই ডান দিকের দল। মহাবিচারের দিবসে তাঁদেরকেও নবী-রসুলগণের মতো পাপী বিশ্বাসীগণের সুপারিশকারী বানানো হবে। আর তাঁদের সুপারিশে সেদিন অনেক পাপী বিশ্বাসীকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অথবা কারো সুপারিশ ছাড়াই আল্লাহ্ কোনো কোনো পাপী বিশ্বাসীকে তখন মার্জনা করবেন। কিংবা তাদেরকে শাস্তি দিয়ে নিষ্পাপ করে দিবেন। শেষে তাদেরকে মিলিয়ে দিবেন পুণ্যবান ও আল্লাহ্ভীরু বান্দাদের সঙ্গে। শাস্তির মাধ্যমে তাদেরকে তখন এমনভাবে পাকসাফ করে দেওয়া হবে, যেমন করে আগুনে ঝলসিয়ে দূর করে দেওয়া হয় লোহার মরিচা।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়া আস্হাবুল ইয়ামীন মা আস্হাবুল ইয়ামীন'। এর অর্থ— আর ডান দিকের দল, কতোই না সৌভাগ্যবান তারা।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'ফী সিদ্রিম মাখদুদ'। একথার অর্থ— তারা অবস্থান করবে এমন কাননে, যেখানে থাকবে কন্টকহীন কুলবৃক্ষ। এখানে 'মাখদুদ' অর্থ কাঁটাবিহীন। অর্থাৎ যে গাছের কাঁটা কেটে ফেলা হয়েছে। অথবা ওই ডাল, যা ফলভারে ভারাবনত হয়ে বাতাসে দোল খেতে থাকে। অভিধানজ্ঞগণ লিখেছেন 'খাদ্বাদাশ্ শাজারা' (গাছের কাঁটা কেটে ফেলেছে)।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, একবার এক বেদুইন রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্ তাঁর কালামে এমন গাছের উল্লেখ করেছেন কেনো, যা স্পর্শ করলে মানুষের কষ্ট হয়। তিনি স. বললেন, কোন গাছ? সে বললো, কুল গাছ। কুল গাছে তো কাঁটা থাকে। তিনি স. বললেন, কিন্তু ওই কুলগাছগুলোতে যে কাঁটা থাকবে না, সে কথাও তো বলে দিয়েছেন তিনি। কাঁটাগুলোকে কেটে সেখানে সৃষ্টি করে দিবেন ফল। ওই ফল ফেটে যাবে এবং তার মধ্য থেকে প্রস্তুত হয়ে আসবে বায়াত্তর রকম রঙের রঙীন খাবার। আর এক রঙের সঙ্গে অন্য কোনো রঙের সাদৃশ্যও থাকবে না। উতবা ইবনে আবদ সূত্রে তিবরানীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'ওয়া ত্বল্হিম মানদুদ্'। এর অর্থ— কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, 'মানদূদ' অর্থ ঝুলন্ত এবং 'ত্বল্হিম মানদুদ্' অর্থ স্তরে স্তরে সজ্জিত কলা, বা কাঁদি কাঁদি

www.eelm.weebly.com

কলা। ফাররা ও আবু উবায়দা বলেছেন, আরবীতে 'ত্বালহুন' বলা হয় এক প্রকার প্রকাণ্ড বৃক্ষকে, যার গায়ে থাকে কাঁটা। অভিধানানুসারে 'ত্বলহুন' অর্থ বৃহৎ বৃক্ষ, অথবা কদলী বৃক্ষ। 'সিহাহ্' পুস্তকে বলা হয়েছে, 'ত্বলহুন' হচ্ছে এক প্রকার উদ্ভিদ। এর একবচন 'ত্বলাহা'। বায়যাবী লিখেছেন, 'ত্বলহুন' মানে কলা অথবা বাবলা বৃক্ষ।

'মানদ্বুদ' অর্থ স্তরে স্তরে সজ্জিত ফল। ইবনে মোবারক, হান্নাদ ও বায়হাকী লিখেছেন, মাসরুক বলেছেন, বেহেশতের খেজুর গাছ আগাগোড়া ফলে ভরপুর থাকবে। আর তার এক একটি ফল হবে মটকার মতো বৃহদাকৃতির। একটি ফল ছিঁড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তদস্থলে সৃষ্টি হবে আর একটি ফল। ফলের এক একটি গুচ্ছ হবে বারো হাত লম্বা। বাগবী লিখেছেন, মাসরুক বলেছেন, বেহেশতের গাছগুলোর গোড়া থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত ফলে ভর্তি হয়ে থাকবে। অভিধানে এসেছে, দ্রব্য-সামগ্রী যখন স্তরে স্তরে সাজানো হয়, তখন তাকে বলে 'নাদ্বীদুন মাতাউহু'। 'সিহাহ্' পুস্তকে উল্লেখিত হয়েছে, 'নাদ্বীদ' বলা হয় ওই তক্তাকে, যার উপরে রাখা হয় তৈজসপত্র। এদিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে রূপকভাবে বলা হয়েছে 'ত্বলহিন্ নাদ্বীদ'।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'ওয়া জিল্লিম্ মাম্দূদ'। একথার অর্থ— সম্প্রসারিত ছায়া। 'মাম্দূদ' অর্থ সুবিস্তৃত, সম্প্রসারিত। আর 'জিল' অর্থ ছায়া। অর্থাৎ ওই ছায়া, সূর্যোদয়ের পূর্বে যা চরাচর জুড়ে বিস্তৃত থাকে। অথবা কথাটির অর্থ স্থায়ী ছায়া, যা সূর্যকিরণের কারণে অপসারিত হয় না। আরবী ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন সকলকিছুকেই বলা হয় 'মামদূদ'। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতে একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়া কোনো অশ্বারোহী একশত বৎসর তার ঘোড়া ছুটিয়েও অতিক্রম করতে পারবে না। যদি এর প্রমাণ চাও, তবে পাঠ করো 'ওয়া জিল্লিম্ মামদূদ'। ইমাম আহমদও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু 'সে গাছের পাতাসমূহ বেহেশতকে ছেয়ে ফেলবে'। হান্নাদ তাঁর 'আয্ যুহ্দ' পুস্তকে লিখেছেন, এই হাদিসের সংবাদ যখন কা'বের কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন, শপথ ওই সত্তার, যিনি মুসার উপরে তওরাত ও মোহাম্মদের উপরে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, কেউ যদি পাঁচ বছর অথবা চার বছর বয়সী উটে চড়ে ওই গাছের চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে চায়, তবে বৃদ্ধ হয়ে গেলেও তার প্রদক্ষিণ শেষ হবে না। বরং সে তার উট থেকে পড়ে যাবে। আল্লাহ্ তাঁর আনুরূপ্যবিহীন হাতে বৃক্ষটি বপন করেছেন। আর তার শাখা প্রশাখা বেহেশতের সীমানা ছড়িয়েও বিস্তৃত হয়ে আছে। বেহেশতের সাগর ওই বৃক্ষের গোড়া থেকেই উৎসারিত। ইকরামা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আরশের পাশে বেহেশতের মধ্যে একটি সুবিশাল বৃক্ষ রয়েছে। বেহেশতবাসীরা ওই বৃক্ষের গোড়ায় বসে কথাবার্তা বলতে থাকবে। তখন তাদের মধ্যে কারো কারো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার সঙ্গীতের কথা মনে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ সেখানে একটি বাতাস প্রবাহিত করবেন। ওই বাতাসে বৃক্ষটি আন্দোলিত হতে থাকবে। আর তার মধ্য থেকে উৎসারিত হতে থাকবে মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের আওয়াজ।

এরপরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'ওয়া মাইম্ মাস্কূব'। একথার অর্থ— সদাপ্রবহমান পানি, যা প্রবাহিত হতে থাকবে খন্দক-নালা ব্যতীত সমতলভূমিতে।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'ওয়া ফাকিহাতিন কাছীরাহ্' (ও প্রচুর ফলমূল)। এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— লা মাক্তুআ'তিউ ওয়ালা মাম্নূআ'হ্' (যা শেষ হবে না ও যা নিষিদ্ধও হবে না)। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফল ছিঁড়ে নেওয়া সত্ত্বেও বেহেশতের গাছগুলো ফলশূন্য হবে না। শূন্য স্থান পূর্ণ হবে সঙ্গে সঙ্গে। আর ইচ্ছামতো ফল ছিঁড়ে নেওয়ার ব্যাপারে সেখানে নিষেধাজ্ঞাও থাকবে না। এমতো বক্তব্যের সমর্থনে রয়েছে হজরত সাওবান কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কোনো বেহেশতবাসী বেহেশতের গাছ থেকে ফল ছিঁড়লে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সৃষ্টি করে দেওয়া হবে নতুন ফল। বাযযার, তিবরানী। বাগবী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— বেহেশতের গাছ থেকে কোনো ফল ছিঁড়ে নেওয়া হলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ সেখানে দ্বিগুণ ফল সৃষ্টি করে দিবেন। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন এভাবে— সেখানে মওসুম বলে কিছু থাকবে না বিধায় ওই ফল কখনো দুষ্প্রাপ্য হবে না এবং মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে হবে না বলে ওই ফল আহরণ তাদের কারো জন্য নিষিদ্ধও হবে না।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'ওয়া ফুরুশিম্ মার্ফূআ'হ্' (আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ)। বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী কথাটির অর্থ করেছেন— মশারীর উপরে স্থাপিত চাদর। কোরআন ব্যাখ্যাতাগণের একটি দল বলেছেন 'মার্ফূআ'তিন' অর্থ উঁচু-নিচু। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল তিরমিজি কর্তৃক উত্তম আখ্যায়িত এক হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. জানিয়েছেন, ওই শয্যাগুলোর একটি থেকে অপরটির ব্যবধান হবে আকাশ-পৃথিবীর ব্যবধানের সমান। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে এরকম— ওই শয্যাসমূহের উচ্চতা হবে পৃথিবী থেকে আকাশের উচ্চতার সমান। আর একটির সঙ্গে অপরটির ব্যবধান হবে পাঁচ শত বৎসরের দূরত্বের সমান। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি লিখেছেন, কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলেছেন, মানের দিক দিয়ে শয্যাগুলোর একটির সঙ্গে অপরটির পার্থক্য হবে আসমান-জমিনের পার্থক্যের মতো। হজরত আবু উমামা থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, সেখানকার সবচেয়ে ঊর্ধ্বের শয্যা যদি সবচেয়ে নিম্নের শয্যার উপরে পড়ে যায়,

তবে তার পতন সমাপ্ত হবে চল্লিশ বৎসরে। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, সেখানকার সবচেয়ে উঁচু ফরাশ যদি নিচের দিকে নিক্ষেপ করা হয়, তবে তার যথাস্থানে পৌঁছতে সময় লাগবে একশত বৎসর। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা আবার বলেছেন, এখানে ফুরুশ'

বা শয্যা অর্থ রমণী। কেননা আরববাসীগণ রমণীদেরকে শয্যা, পরিচ্ছদ ইত্যাদিও বলে থাকেন। এমতাবস্থায় এখানকার 'মারফূআ'হ্' কথাটির অর্থ হবে— সুন্দর ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আর সুন্দরী ও উচ্চ মর্যাদাধারিনী রমণীকূল।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'ইন্না আন্‌শা'না হুন্না ইন্‌শাআ' (তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষভাবে)। পূর্ববর্তী আয়াতের 'ফুরুশ' অর্থ যদি রমণী হয়, তবে বুঝতে হবে এখানকার 'হুন্না' (তাদেরকে) সর্বনামটির সম্পর্ক রয়েছে 'ফুরুশ' এর সঙ্গে। আর 'ফুরুশ' অর্থ যদি রমণী না হয়ে কেবল 'শয্যা' হয়, তবে বুঝতে হবে সর্বনামটি অন্য কারো স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু পাঠক সাধারণ সর্বনামকে সূত্রায়িত করেন পূর্বোল্লিখিত বক্তব্যের সঙ্গে। এভাবেও একথা প্রতীয়মান হয় যে, এখানে 'তাদেরকে' বলে ওই বিশেষ রমণীদেরকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বুঝানো হয়েছে বেহেশতের হুরীদেরকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি হুরীদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষ পদ্ধতিতে, প্রজনন্মানয়নের নীতি-নিয়ম ছাড়া, নতুন ও অভাবিতপূর্বভাবে। 'ইন্‌শাআন' অর্থ নতুনভাবে, বিশেষভাবে, স্বাভাবিক নিয়ম ছাড়া। অথবা কথাটির অর্থ হবে— নতুন সৃষ্টিরূপে, অথবা পুনঃসৃষ্টিরূপে। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যে সকল বিশ্বাসবতী পৃথিবীতে বৃদ্ধা হয়ে যায়, মাথার কেশ হয়ে যায় কালো-শাদা মিশ্রিত, তাদেরকে তখন আল্লাহ্ বিশেষরূপে সৃষ্টি করবেন। তাদেরকে দান করবেন নতুন যৌবন।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— ফাজ্বাআ'ল্‌না হুন্না আব্‌কারা' (তাদেরকে করেছি কুমারী)। 'আব্‌কারা' অর্থ কুমারী। তাদের স্বামীরা তাদেরকে সব সময় কুমারী অবস্থাতেই পাবে। বিষণ্ণতা তাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না। শা'বী সূত্রে সাঈদ ইবনে মনসুর, বায়হাকী এবং হজরত আনাস থেকে তিরমিজি ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এ সম্পর্কে বলেছেন, বয়োবৃদ্ধা, লোলচর্মা ও চোখে ছানি পড়ে যাওয়া বিশ্বাসিনীদেরকে আল্লাহ্ তখন কুমারী বানিয়ে দিবেন। ইবনে জারীর ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুসলিমা ইবনে ইয়াজিদ বলেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, 'তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে' কথাটির অর্থ দুনিয়ায় যে সকল নারী বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলো, আল্লাহ্ বেহেশতে তাদেরকে করে দিবেন কুমারী। হাসান বসরী সূত্রে বায়হাকী ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, বেহেশতে কোনো বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। একথা শুনে জনৈক বৃদ্ধা কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি স. সাহাবীগণকে বললেন, তাকে বলে দাও, বৃদ্ধা তখন আর বৃদ্ধা থাকবে না। হয়ে যাবে যুবতী ইন্‌শাআল্লাহ্। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন 'তাদেরকে আমি সৃষ্টি করবো বিশেষ রূপে'।

উম্মত জননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. আমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। এক বৃদ্ধা বসেছিলেন আমার পাশে। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? আমি বললাম, আমার মায়ের এক বোন। তিনি স. বললেন, শুনে নাও, বেহেশতে কোনো বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। বৃদ্ধা একথা শুনে মুষড়ে পড়লেন। তিনি স. তখন পাঠ করলেন 'তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে, তাদেরকে করেছি কুমারী'। তিবরানী তাঁর 'আল্ আওসাত' গ্রন্থে ভিন্ন সূত্রপরম্পরায় জননী আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার এক বৃদ্ধা রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেনো আমাকে জান্নাত দান করেন। তিনি স. বললেন, কোনো বৃদ্ধাই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জননী আয়েশা বলেন, আমি বললাম, আপনার কথায় উনি মনঃকষ্ট পেয়েছেন। তিনি স. বললেন, ইন্‌শাআল্লাহ্ এরকমই হবে। আল্লাহ্ কোনো বৃদ্ধাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে চাইলে তাকে প্রবেশ করাবেন যুবতী বানিয়ে। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'তাদেরকে করেছি কুমারী' বলে বুঝানো হয়েছে জান্নাতের হুরীগণকে। তারা মানুষের মতো জন্মরীতিভূতা নয়, বরং সৃষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কুমারীরূপে। তারা সেখানে কখনো বেদনাবিধুরা হবে না।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'উ'রুবান আত্‌রাবা' (সোহাগিনী ও সমবয়স্কা)। এখানকার 'উ'রুবান' শব্দটি 'আরুব' এর বহুবচন। এর অর্থ সোহাগিনী। অর্থাৎ তারা হবে তাদের স্বামীদের একান্ত প্রিয়তমা। হজরত জাফর ইবনে মোহাম্মদ থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'উ'রুবান ' অর্থ আরবী ভাষিণী। অর্থাৎ ওই সকল কুমারীদের ভাষা হবে আরবী।

'আত্‌রাবা' অর্থ সমবয়স্কা। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, উম্মতজননী হজরত উম্মে সালমা বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে মান্যবর রসুল! 'উ'রুবান আত্‌রাবান' অর্থ কী? তিনি স. বললেন, জটাধারিণী ও ক্ষীণদৃষ্টি বিশ্বাসবতী বৃদ্ধা। পরকালে আল্লাহ্ তাদেরকে কুমারীরূপে সৃষ্টি করবেন। 'উ'রুবান' অর্থ সোহাগিনী এবং আত্‌রাবান' অর্থ সমবয়স্কা। তারা জান্নাতে হবে তাদের স্বামীদের

সমবয়সিনী। উভয়ের অনন্তকালীন বয়স হবে ত্রেত্রিশ। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা থাকবে নগ্ন শরীরে ও পশমবিহীন অবস্থায়। তারা হবে গৌরবর্ণের ও কুঞ্চিত কেশবিশিষ্ট। সকলেরই বয়স তখন হবে তেত্রিশ। তাদের শরীরের আকার হবে পিতা আদমের শরীরের মতো— ষাট হাত লম্বা এবং সাত হাত চওড়া। আহমদ, তিরমিজি। উত্তম সূত্রপরম্পরায় হাদিসটি আরো বর্ণনা করেছেন ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া ও বাগবী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বালক অথবা বৃদ্ধ যে কোনো বয়সে পৃথিবী পরিত্যাগকারী বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যুবক-যুবতী করে। তাদের সকলেরই বয়স সেখানে হবে তেত্রিশ। তাদের বয়স কখনো বাড়বে না, কমবেও না। জাহান্নামীরাও হবে তেত্রিশ বৎসর বয়সের। তিরমিজি, আবু ইয়ালা, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে খালি গায়ে, শ্মশ্রু-গুম্ফবিহীন বদনে এবং খতনাবিহীনরূপে ও চোখে সুরমা লাগিয়ে। সকলের বয়স সেখানে হবে তেত্রিশ। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাদের শরীর হবে পিতা আদমের মতো ষাট হাত লম্বা এবং তাদের শরীর হবে নবী ইউসুফের মতো সুন্দর। আর তাদের বয়স হবে নবী ঈসার পৃথিবীর আয়ুষ্কালের সমান। অর্থাৎ তেত্রিশ বৎসর। তাদের ভাষা হবে আরবী। খালি গায়ে থাকবে তারা। তাদের মুখমণ্ডল হবে শ্মশ্রু-গুম্ফবিহীন। তাদের চোখ থাকবে সুরমাশোভিত। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আল্আওসাত' গ্রন্থে উত্তমসূত্রপরম্পরায়। সুপরিণতসূত্রে হজরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মানুষের হাশর হবে শিশু ও বৃদ্ধের মাঝামাঝি অবস্থায়। অর্থাৎ তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবস্থায়। আর তখন তাদের শরীরের আকৃতি হবে পিতা আদমের মতো। দৈহিক সৌন্দর্য হবে নবী ইউসুফের মতো এবং হৃদয় হবে নবী আইয়্যুবের মতো কোমল। তিবরানী।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'লি আসহাবিল ইয়ামীন' (ডানদিকের লোকদের জন্য)। বাক্যটির সম্পর্ক রয়েছে ৩৫ সংখ্যক আয়াতের 'তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে' কথাটির সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হুরীদেরকে আমি বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি ডানদিকের লোকদের জন্য। অথবা ৩৬ সংখ্যক আয়াতের 'তাদেরকে করেছি কুমারী'— এর সাথে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তাদেরকে আমি কুমারী করেছি ডান দিকের লোকদের মনোরঞ্জনের জন্য। কিংবা কথাটি ৩৭ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত বক্তব্যের বিশেষণ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ডান দিকের লোকদের সমবয়স্কা হবে ওই সকল আয়তলোচনারা এবং হবে তাদের প্রিয়তমা। আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি একটি অনুক্ত উদ্দেশ্যের বিধেয়, এরকমও ভাবা যেতে পারে। এমতাবস্থায় কথাটি দাঁড়াবে 'হুন্না লি আস্হাবিল ইয়ামীন' (তারা কেবল ডান দিকের লোকদের জন্যই নির্ধারিত)।

সূরা ওয়াকিয়াহ্ ঃ আয়াত ৩৯, ৪০

- ❑ তাহাদের অনেকে হইবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হইতে,
- ❑ এবং অনেকে হইবে পরবর্তীদের মধ্য হইতে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা অগ্রবর্তী, আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন এবং যারা ডান দিকের দলের অন্তর্ভূত, তারা যেমন এই উম্মতের পূর্বসূরীদের মধ্যে সংখ্যায় অনেক হবে, তেমনি উত্তরসূরীদের মধ্যেও হবে অনেক। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, আতা ইবনে আবী রেবাহ ও জুহাক।

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বরাত দিয়ে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, উভয় দলই হবে আমার উম্মতের অন্তর্ভূত। মুসাদ্দাদ তাঁর মসনদ পুস্তকে এবং হজরত আবু বকর থেকে তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'পূর্ববর্তী ও পরবর্তী' (আউয়ালীন ওয়া আখিরীন) সকলেই হবে আমার উম্মতের মধ্য থেকে। দারা কুতনী 'হাদিসটিকে 'পরিত্যজ্য' বলেছেন এমতো কারণ দর্শিয়ে যে, হজরত আবু বকরই যে হাদিসটির বর্ণনাকারী, সে কথা প্রামাণ্য নয়। বরং আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হবে এরকম— এই উম্মতের প্রথম যুগ শেষ যুগ কোনো যুগই 'আস্হাবুল ইয়ামীন' (ডান দিকের দল) শূন্য হবে না। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুয়াবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সব সময় আল্লাহ্র বিধানে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদেরকে সাহায্য না করে বিরুদ্ধাচারী হবে, তারা তাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবেই একসময় এসে পড়বে মহাপ্রলয়।

একটি সন্দেহ ঃ ওরওয়া ইবনে রুয়াইম সূত্রে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত এক অপরিণত বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর প্রতি যখন 'বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্পসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে' (আয়াত ১৩, ১৪) অবতীর্ণ হলো, তখন হজরত ওমর কেঁদে ফেললেন। নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! আমরা তো আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের উপরে ইমান এনেছি। তৎসত্ত্বেও আমাদের মধ্যেকার উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা হবে অল্প। তখন অবতীর্ণ হলো 'তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে'। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে হজরত ওমরকে ডেকে বললেন, শোনো তোমার উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ বাণী অবতীর্ণ করেছেন। হজরত ওমর সদ্য অবতীর্ণ আয়াত শুনে বললেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আমরা আমাদের প্রভুপালক ও তাঁর রসুলের উপরে বিশ্বাস নিয়ে পরিতুষ্ট। রসুল স. বললেন, পিতা আদম থেকে আমার আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত হবে একটি 'ছুল্লাহ্‌' (দল) এবং আমার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত হবে আর একটি 'ছুল্লাহ্‌'। পরের দলের সর্বশেষ কলেমা পাঠকারী হবে এক হাবশী উষ্ট্রারোহী। ওরওয়া সূত্রে ইবনে আবী হাতেমও এরকম একটি অপরিণতসূত্রসম্বলিত হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আসাকের তাঁর 'তারিখে দামেশক' গ্রন্থে ওরওয়া ইবনে রুয়াইমের মাধ্যমে হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ থেকে এবং ইমাম আহমদ, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম কোনো কোনো অপ্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীর মাধ্যমে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্পসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে' তখন সাহাবীগণের কাছে ঘোষণাটি মনে হলো অত্যন্ত গুরুভার। এর পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো তাদের অনেকেই হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে'। এসকল হাদিস থেকে জানা যায় যে, এখানে পূর্ববর্তী অর্থ পিতা আদম থেকে রসুল স. পর্যন্ত।

আমি বলি, ১৩-১৪ সংখ্যক আয়াত ও আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রকৃত অর্থে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কেননা রসুল স. বলেছেন, পিতা আদম থেকে আমার যুগ পর্যন্ত একটি বড় দল থাকবে এবং আমার যুগ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে আর একটি বড় দল। এমতো বক্তব্য ওই বক্তব্যের পরিপন্থী নয়, যেখানে বলা হযেছে, রসুল স. বলেছেন, উভয় দলই আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এখানে দু'টি দলকে উম্মতে মোহাম্মদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর বিষয়টিকে পরিষ্কার করে এভাবেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। হতে পারে ওই দলটিরই থাকবে দু'টি অংশ। তন্মধ্যে এক বিরাট দল হবে প্রথম যুগের বিশ্বাসীগণের মধ্য থেকে এবং আর একটি বিরাট দল হবে শেষ যুগের বিশ্বাসীগণের মধ্য থেকে। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে সম্ভবতঃ একথাটিই বলে দেওয়া হয়েছে।

অতিরিক্ত সন্দেহ ঃ যদি 'আউয়ালীন' ও আখেরীন' এর অর্থ এই উম্মতেরই দু'টি অংশ হয়, তবে হজরত ওমর 'ক্বলীলুম মিনাল আখিরীন' (অল্পসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে) আয়াত শুনে কেঁদেছিলেন কেনো? আর সাহাবীগণের কাছেও এই আয়াত গুরুভার মনে হয়েছিলো কেনো?

সন্দেহের নিরসন ঃ এই উম্মতের প্রতি অপার মমতাবশতঃই হজরত ওমর তখন কেঁদেছিলেন। আর সাহাবীগণের কাছেও আয়াতখানি ভারী মনে হয়েছিলো সেকারণেই। অর্থাৎ এই উম্মতেরই শেষ অংশের অল্পসংখ্যক সৌভাগ্যবান হওয়ার সংবাদই তাঁদেরকে দুঃখ দিয়েছিলো। সেজন্যই পরে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতদ্বয়। তখন তাঁরা এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করেন যে, আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজনগণের সংখ্যা শেষ যুগের উম্মতের মধ্যে কম হলেও, যারা ডান হাতে আমলনামা পাবে, তাদের সংখ্যা পরবর্তীদের মধ্যে হবে অনেক। অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের মধ্যে ডানের দিকের দলভূতদের সংখ্যা যেমন অনেক হবে, তেমনি হবে পরবর্তীদের মধ্যেও। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াত দ্বারা ১৩-১৪ সংখ্যক আয়াত রহিত হয়নি। কেননা উভয় স্থানে দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তি। কোথাও কোনো বিধান বলবত করা হয়নি। উল্লেখ্য, এক বিজ্ঞপ্তি অন্য বিজ্ঞপ্তিকে রহিত করে না। তাছাড়া রহিত করা বা হওয়ার আর একটি শর্ত হচ্ছে— উভয়ের ক্ষেত্র হতে হবে এক। এখানে কিন্তু ক্ষেত্র এক নয়। অর্থাৎ ১৩—১৪ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে নৈকট্যভাজন (মুক্বার্‌রবীন) বা প্রিয়ভাজনদের সম্পর্কে। আর এখানে বলা হয়েছে ডান দিকের দল (আসহাবুল ইয়ামীন) সম্পর্কে। আবার এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'পূর্ববর্তীগণের মধ্যে রয়েছেন শেষ রসুল স.সহ সকল নবী-রসুল ও তাঁর সকল সাহাবী ও সাহাবীগণের অনুসারীগণ। আর তাঁরা পরবর্তীগণের চেয়ে অগ্রগামী। এমতো অভিমতের সমর্থনে রয়েছে এই আয়াতখানি 'আস্‌সবিক্বুনাল আউয়ালুনা মিনাল মুহাজ্বিরীনা ওয়াল আনসার ওয়াল্‌ লাজীনাত্‌ তাবাউ'হুম' (অগ্রগামীগণের প্রথম দল হবে মুহাজির ও আনসারগণের। আর যারা অনুসরণ করেছে তাঁদের)। আর 'পরবর্তী'দের মধ্যে রয়েছে কিয়ামতের

নিকটবর্তী যুগের লোকেরা। সুতরাং তাদের সংখ্যা তো কম হবেই। আর 'ডান দিকের দল' এই উম্মতের মধ্যে যেমন অনেক হবে, তেমনি অনেক হবে অন্যান্য উম্মতগণের মধ্যেও। এমতো অভিমতের সপক্ষে রয়েছে একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি আশা রাখি জান্নাতবাসীদের মধ্যে তোমরা হবে অর্ধসংখ্যক। আর এক হাদিসে এসেছে, সেদিন

www.eelm.weebly.com

কাতার হবে একশত কুড়িটি। তার মধ্যে আশিটি কাতার হবে আমার উম্মতের। আর বাকী চল্লিশ কাতার হবে অন্যান্য উম্মতের।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার রসুল স. আমাদের কাছে এসে বললেন, আমার সামনে সকল উম্মতকে একত্র করা হলো। নবী-রসুলগণ ছিলেন তাঁদের আপনাপন উম্মতের সঙ্গে। দেখলাম কোনো নবীর সঙ্গে রয়েছে একজন, কোনো নবীর সঙ্গে দু'জন, কোনো নবীর সঙ্গে একটি দল, আবার কোনো কোনো নবীর সঙ্গে কোনো লোকই নেই। এরপর হঠাৎ দেখলাম অসংখ্য লোক। মনে হলো, তারা যেনো দিকচক্রবাল রুদ্ধ করে ফেলেছে। তখন আমাকে বলা হলো, এরা আপনার উম্মত। এদের সঙ্গে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। আর এরা তারা, যারা ভাগ্য গণনা করে না, মন্ত্র পড়ে না, শরীরে উলকি আঁকে না। তারা সর্বাবস্থায় নির্ভর করে তাদের পরম প্রভুপালনকর্তার উপর। একথা শুনে এগিয়ে এলেন উক্কাশা ইবনে মুহসীন। নিবেদন করলেন, হে রসুলপ্রবর! আমি কি ওই দলে থাকতে পারবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। এরকম আর একজন দাঁড়িয়ে একই প্রশ্ন করলেন। তিনি স. বললেন, উক্কাশা তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, গত রাতে আমার সামনে আনা হয়েছিলো নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীগণকে। এমনকি নবী মুসাও বনী ইসরাইলদের ভিড়ের মধ্য থেকে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললাম, হে আমার প্রভুপালক! ইনি কে? আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেন, আপনার ভ্রাতা মুসা! আর তার সঙ্গের লোকেরা বনী ইসরাইল। আমি বললাম, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমার উম্মত কোথায়? প্রত্যুত্তর হলো দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করুন। পরক্ষণেই দেখলাম, মক্কার সকল প্রান্তর মানুষে মানুষে ভরপুর। ঘোষণা দেওয়া হলো, এরা আপনার উম্মত। আপনি কি পরিতুষ্ট? আমি নিবেদন করলাম, হ্যাঁ। বলা হলো, বাম দিকে তাকান। আমি বাম পাশে তাকালাম। দেখলাম দিগন্তবিস্তৃত অসংখ্য মানুষ। বলা হলো, এরাও আপনার উম্মত। আপনি কি পরিতৃপ্ত? আমি বললাম, হ্যাঁ। বলা হলো, এদের সঙ্গে রয়েছে আরো সত্তর হাজার, যারা হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর রসুল স. আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা যদি ওই সত্তর হাজারের সঙ্গে শামিল হতে চাও, তবে হয়ে যাও। যদি তা না হতে পারো, তবে হও ডান দিকের দলের অন্তর্ভূত। আর তাদের সঙ্গে মিশতে না পারলে মিশে যাও দিগন্তবিস্তৃত সম্মুখবর্তী সুবিশাল দলটির সঙ্গে। আমি দেখতে পাচ্ছি সম্মুখবর্তী দলের লোকদের মধ্যে ভালো মন্দ মিশ্রিত।

❑ আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল!
❑ উহারা থাকিবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে,
❑ কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়ায়,
❑ যাহা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়।
❑ ইতিপূর্বে উহারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে

www.eelm.weebly.com

❑ এবং উহারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে।
❑ আর উহারা বলিত, 'মরিয়া অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হইলেও কি উত্থিত হইব আমরা?
❑ 'এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও?'
❑ বল, 'অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ—
❑ সকলকে একত্র করা হইবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।
❑ অতঃপর হে বিভ্রান্ত অস্বীকারকারীরা!
❑ তোমরা অবশ্যই আহার করিবে যাক্কুম বৃক্ষ হইতে,
❑ এবং উহা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করিবে,
❑ পরে তোমরা পান করিবে উহার উপর অত্যুষ্ণ পানি—
❑ আর পান করিবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়।

❑ কিয়ামতের দিন ইহাই হইবে উহাদের আপ্যায়ন।

প্রথমোক্ত আয়াতষষ্ঠকের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! অগ্রবর্তী ও ডান দিকের দলের কথা তো শুনলেন, এবার শুনুন বাম দিকের দলের বৃত্তান্ত। তারা বাম হাতে আমলনামা পাবে এবং প্রবেশ করবে জাহান্নামে। সেখানে তারা থাকবে অত্যন্ত উত্তপ্ত বাতাস ও ফুটন্ত পানিতে, ঘোর কালো ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত অবস্থায়। শীতলতা অথবা স্বস্তির লেশমাত্রও তার মধ্যে থাকবে না। এরকম পরিণতি হবে তাদের অনপনেয় পৃথিবীপ্রসক্তি ও কুপ্রবৃত্তিপ্রীতি এবং বিরামহীন পাপকর্মের কারণে।

এখানে 'সামুম' অর্থ অত্যুষ্ণ বায়ু, লু হাওয়া, যা শরীরে জ্বালা সৃষ্টি করে। 'হামীম' অর্থ অত্যুপ্ত পানি। 'ইয়াহ্‌মূম' অর্থ কৃষ্ণবর্ণের ধোঁয়া। শব্দটি ইয়াফ্‌উলের ওজনে 'হামাতুন' থেকে সাধিত। খুব ঘন কালো কোনোকিছুকে আরববাসীরা বলেন 'আসওয়াদে ইয়াহ্‌মূম'। জুহাক বলেছেন, 'ইয়াহ্‌মূম' মানে কালো আগুন। তার মধ্যে যে অবস্থান করবে সে-ও হবে কালো। অর্থাৎ তার সবকিছুই হবে কালো। 'লা বারিদিঁউ ওয়ালা কারীম' অর্থ যা শীতল নয়, স্বস্তিদায়কও নয়। 'মুতরাফীন' অর্থ ভোগমগ্ন, আসক্ত পৃথিবীপ্রসক্ত, আল্লাহ্‌র আনুগত্যে অনীহ। আর 'আ'লা হিনছিল আ'জীম' অর্থ লিপ্ত ছিলো ঘোরতর পাপকর্মে। শা'বী বলেছেন, 'হিনছিল আ'জীম' অর্থ মিথ্যা শপথ। অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা শপথ করে এরকম বলতো যে, পুনরুত্থান অসম্ভব। কিন্তু তাদের এমতো শপথ ছিলো মিথ্যা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আর তারা বলতো, মরে গিয়ে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি উত্থিত হবো আমরা (৪৭) এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণ'(৪৮)? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে আমাদের পূর্বপুরুষেরা মরে গিয়ে মাটিতে মিশে গিয়েছে। আমরা মরে গেলেও সেরকমই হবো। সুতরাং পুনরুত্থান অসম্ভব।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হযেছে— 'বলো, অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ (৪৯)— সকলকে একত্র করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে' (৫০)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে জানিয়ে দিন, আল্লাহ্‌র কাছে অসম্ভব বলে কোনো কিছুই নেই। তিনি পুনরুত্থান ঘটাবেনই। হিসাব গ্রহণের জন্য যথাসময়ে ও যথাস্থানে সকলকে একত্র করবেনই। তাঁর অভিপ্রায় ও প্রতিজ্ঞা অবাস্তবায়িত থাকা অসম্ভব।

এখানে 'লা মাজ্‌মূঊ'না' অর্থ সকলকে একত্র করা হবে। 'মীক্বাতি ইয়াওমিম্ মা'লূম' অর্থ এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে। 'মীক্বাতি ইয়াওমিন্' এর মধ্যে 'মিন' উহ্য রয়েছে। যেমন 'মিন' উহ্য রয়েছে 'খতামু ফিদ্দ্বতিন' এর মধ্যে। কোনোকিছুর নির্ধারিত সীমাকে বলা হয় 'মীক্বাত' যেমন ইহরামের মীক্বাত। অর্থাৎ ইহরাম পরিহিত না হয়ে যে সীমানা অতিক্রম করা যায় না। এখানে 'ইলা মীক্বাত' এর 'ইলা' ব্যবহৃত হয়েছে 'লাম' অর্থে। আর 'ইয়াওমিম্ মা'লূম' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মহাবিচারদিবসকে, যা সর্বজনবিদিত ও নিঃসন্দিগ্ধ।

এরপরের আয়াতষষ্ঠকের মর্মার্থ হচ্ছে— অতএব হে বিভ্রান্ত! হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী! তোমাদেরকে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তোমাদেরকে খেতে দেওয়া হবে অতি বিস্বাদপূর্ণ ও অতিকুৎসিত যাক্কুম বৃক্ষ। প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় তোমরা তখন ওই ভয়ংকর খাদ্যই গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তা আটকে যাবে তোমাদের গলায়। ফলে পিপাসায় ছটফট করতে থাকবে তোমরা। চীৎকার করবে 'পানি' 'পানি' বলে। দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। তৃষ্ণার্ত উটের মতো তোমরা তখন ওই অসম্ভব গরম পানিও পান করতে বাধ্য হবে। জাহান্নামে এভাবেই তোমাদেরকে আপ্যায়ন করা হবে। আর ওই আপ্যায়ন হবে বিরতিবিহীন, অশেষ।

এখানকার 'মিন শাজ্বারিন' (বৃক্ষ থেকে) কথাটির 'মিন' হচ্ছে প্রারম্ভিকা। আর 'মিন যাক্কুম' এর 'মিন' বর্ণনামূলক। অর্থাৎ বৃক্ষটি হচ্ছে 'যাক্কুম' বৃক্ষ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যাক্কুম বৃক্ষের এক ফোটা রস পৃথিবীর সমুদ্রে পড়লে স্তব্ধ হয়ে

যাবে পৃথিবীর জীবন যাত্রা। তাহলে বলো, কী দুরবস্থাই না তখন তাদের হবে, যারা বাধ্য হবে 'যাক্কুম' গলাধঃকরণ করতে। তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, হাকেম। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি যথাসূত্রসম্বলিত। আমর খওলানী বলেছেন, আমাদের কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, মানুষ যাক্কুম বৃক্ষ থেকে যতোটুকু গ্রহণ করবে, কষ্ট পাবে ততোটুকু। আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ, আবু নাঈম। 'ফামালিউনা মিনহাল বুতূন' অর্থ এবং ক্ষুধার তাড়নায় তা দ্বারা তোমরা উদর পূর্তি করতে বাধ্য হবে। 'আলহীম' অর্থ পিপাসিত উট। 'শারিবূন' অর্থ পান করবে। 'শুরবুন' এবং শিরবুন' শব্দদু'টো সমঅর্থসম্পন্ন। বাগবী লিখেছেন, 'শারবুন' হচ্ছে ক্রিয়ামূল এবং 'শুরবুন' ইসমে মাসদার (ধাতুমূল নামপদ)। যেমন 'দ্বা'ফুন' এবং 'দু'ফুন'। আবু তালহা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'হীমান' পুংলিঙ্গবাচক এবং 'হাইমা' স্ত্রীলিঙ্গবাচক। যেমন 'আতশান' এবং 'আতশা'। কেউ কেউ বলেছেন, 'আলহীম' বলা হয় ওই উটকে, যে পিপাসা রোগে আক্রান্ত। অনবরত পানি পান করলেও তার পিপাসা মেটে না। শেষে পিপাসা নিয়েই সে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। বায়হাকী, মুজাহিদ, বাগবী, ইকরামা ও কাতাদা এরকম বলেছেন। জুহাক বলেছেন 'হীমূন' অর্থ নরম ও বালুকাময় মাটি। বায়যাবী লিখেছেন, 'হাইমুন' হচ্ছে 'হিয়াম' এর বহুবচন, যার অর্থ এমন বালি, যা একে অপরের সঙ্গে এতোটুকুও লেগে থাকে না।

'হাজা নুযুলুহুম' অর্থ এটাই হবে তাদের আতিথ্য। 'নুযুল' বলা হয় অতিথিভোজকে। এখানে কথাটি বলা হয়েছে উপহাসচ্ছলে। যেমন অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে 'তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও'। এই আয়াতেও উপহাসচ্ছলে বলা হয়েছে 'সুসংবাদ'। কেননা যা যন্ত্রণাদায়ক, তা কখনো 'সুসংবাদ' হতে পারে না। আর এখানকার 'ইয়াওমাদ্ দীন' অর্থ কিয়ামতের দিন। অর্থাৎ পরকালে, দোজখে।

সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২

❑ আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করিতেছ না?

❑ তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে?

❑ উহা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?

❑ আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছি এবং আমি অক্ষম নহি—

❑ তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করিতে এবং তোমাদিগকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করিতে যাহা তোমরা জান না।

❑ তোমরা তো অবগত হইয়াছ প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! তোমরা তো কিছুই ছিলে না। আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। একথা তোমরা স্বীকারও করো। তাহলে একথা আবার অস্বীকার করে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হয়ে যাও কেনো যে, মৃত্যুর পরে আমি তোমাদের পুনরুত্থান ঘটাবো। এটাই কি তোমাদের বিবেচনা? দ্বিতীয় সৃষ্টি কি প্রথম সৃষ্টির চেয়ে কঠিন। না তোমরা মনে করো আমি অক্ষম? অক্ষম হলে কি তোমাদেরকে এবং বিশ্বকে আমি সৃজন করতে পারতাম?

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমরা কি ভেবে দেখেছো তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে (৫৮)? ওটা কি তোমরা সৃষ্টি করো, না আমি সৃষ্টি করি' (৫৯)? একথার অর্থ— যে শুক্রকণা থেকে তোমাদের জীবনের সূত্রপাত ঘটে, তার সৃজয়িতা তো আমিই। বলো, আমি নই? সৃজন তো সম্পূর্ণই আমার।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই (৬০)— তোমাদের মধ্যে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করতে, যা তোমরা জানো না (৬১)। তোমরা তো অবগত হয়েছো প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তবে তোমরা অনুধাবন করো না কেনো' (৬২)?

www.eelm.weebly.com

এখানে 'আমি তোমাদের মৃত্যু নির্ধারণ করে দিয়েছি' কথাটির অর্থ— আমি যেমন তোমাদের জীবনোপকরণ নির্ধারণ করে দিয়েছি, তেমনি নির্ধারণ করে দিয়েছি মৃত্যুকে। আমার এমতো নির্ধারণানুসারেই তোমাদের কেউ কেউ হও দীর্ঘজীবি, কেউ ক্ষণজীবি, আবার কেউ কেউ পাও মধ্যম ধরনের হায়াত। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আমি তোমাদের জন্য যে আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করে দিয়েছি, তা লংঘন করার সাধ্য কারো নেই। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি যেমন সকলের জীবন দান করি, তেমনি মৃত্যুও ঘটাই। আর এতদুভয়ের নিয়ন্ত্রয়িতাও আমিই।

'ওয়ামা নাহনু বিমাস্‌বূক্বীন' অর্থ এবং আমি অক্ষম নই। বাক্যটি অবস্থাজ্ঞাপক। কথাটির অর্থ হতে পারে দু'রকমের— ১. আমিই নির্ধারণ করেছি মৃত্যু, অন্য কেউ নয় ২. আমিই পরাভূত নই, আমি চিরঅপরাভূত। যেমন আরবী প্রবাদে রয়েছে 'সাবাকতুহু আ'লা কাজা' (আমি তার উপরে প্রাধান্য লাভ করেছি)। অথবা এটি একটি পৃথক বাক্য। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে কেউ আমাকে এই কর্মে অক্ষম করতে পারে না যে, সে মৃত্যু থেকে পলায়ন করবে অথবা মৃত্যুর সময় পরিবর্তন করে দিবে।

'আ'লা আন্ নুবাদ্‌দিলা আমছালাকুম' অর্থ তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে। এই বাক্যটি পূর্বের আয়াতের 'ক্বদ্‌দার্‌না' (নির্ধারিত করেছি) ক্রিয়ার অবস্থা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি যেমন তোমাদের মধ্যে মৃত্যুকে নির্ধারণ করেছি, তেমনি আমি তোমাদের স্থলে অন্য কোনো সৃষ্টিকেও সৃষ্টি করতে পারি। অথবা বাক্যটি 'মৃত্যু নির্ধারিত করেছি' ক্রিয়াটির সঙ্গে একীভূত। এমতাবস্থায় এখানকার 'আ'লা' (উপর) এর অর্থ হবে 'লাম' (জন্য)। এবং তা হবে 'ক্বদ্‌দারনা' এর কারণ, অর্থাৎ আমি মৃত্যু নির্ধারণ করেছি এজন্য যে, আমি তোমাদের স্থলে অন্য কাউকে নিয়ে আসবো। সেকারণেই তোমরা যখন পরলোকগমন করো, তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় তোমাদের পরবর্তী প্রজন্ম। কিংবা বাক্যটি আগের আয়াতের 'আমি পরাজিত নই' কথাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমাদের স্থলে তোমাদের মতো অন্য কাউকে নিয়ে আসার ব্যাপারে আমি এতটুকুও অক্ষম নই! আবার এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'আমছাল' (সদৃশ) এর অর্থ হবে— বৈশিষ্ট্য। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— তোমাদের বৈশিষ্ট্যাবলীর পরিবর্তন করানোর ব্যাপারেও আমি অক্ষম নই।

'ওয়া নুন্‌শিয়াকুম ফী মা লা তা'লামূন' অর্থ এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করতে যা তোমরা জানো না। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুরস্কৃত করবো, না তিরস্কৃত করবো, তা তোমরা জানো না। 'মিছাল' (সদৃশ) অর্থ যে 'সিফাত' (বৈশিষ্ট্য) হয়, তার প্রমাণ রয়েছে এই আয়াত সমূহে— ১. মাছালুল জান্‌নাতিল্‌লাতী ২. আল্‌লাজীনা লা ইউ'মিনুনা ৩. ওয়াল্‌লাজী মাছালুল আ'লা।

'ওয়ালা ক্বদ আ'লিম্‌তুমুন নাশ্‌আতাল উ'লা' অর্থ তোমরা তো অবগত আছো প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে। অর্থাৎ শুক্রকণার মাধ্যমে যে সর্বপ্রথম মানুষের জীবনের উন্মেষ ঘটে, সেকথা তো তোমরা জানোই। আর 'ফালাও লা তাজাক্‌কারুন' অর্থ তবে তোমরা অনুধাবন করো না কেনো? এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— প্রথমে আমিই তোমাদেরকে আমা কর্তৃক সৃষ্ট শুক্রকণার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি, একথা যখন তোমরা জানোই, তখন একথা কেনো বুঝতে চাওনা যে, পুনঃ সৃষ্টি করতেও আমি সম্পূর্ণ সক্ষম। আর দ্বিতীয় সৃষ্টি তো প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা সহজতর। কেননা দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টিরই অনুকরণ, অথবা ধারাবাহিকতা। উল্লেখ্য, এখানকার 'অনুধাবন করো না কেনো' কথাটির মাধ্যমে এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয় যে 'কিয়াস' বা তুল্যমূল্যবিবেচনাও শরিয়তের একটি প্রমাণ।

সূরা ওয়াকিয়াহ্ ঃ আয়াত ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭

❑ তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছ কি?
❑ তোমরা কি উহাকে অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি?
❑ আমি ইচ্ছা করিলে ইহাকে খড়-কুটায় পরিণত করিতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে তোমরা;
❑ 'আমরা তো দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি,'
❑ বরং 'আমরা হৃত-সর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছি।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বৃক্ষরাজির বিষয়েও একবার চিন্তা করে দ্যাখো। তোমরা মাটিতে তো বীজ বপন করো ঠিকই, কিন্তু বলো, তার অংকুরোদ্‌গম ঘটায় কে? আমি ইচ্ছা না করলে কখনোই বীজ থেকে বৃক্ষ সৃষ্টি হবে না। আবার ইচ্ছা

www.eelm.weebly.com

করলে আমি বৃক্ষকে করে দিতে পারি নিষ্ফলা অথবা দুর্যোগকবলিত। তখন তো তোমাদের বৃক্ষ বপনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। তোমরা তখন বিপর্যস্ত হয়ে বলো, আমরা তো দায়গ্রস্ত, হৃতসর্বস্ব।

এখানে 'হুত্বামান' অর্থ খড়কুটা। আতা বলেছেন, 'হুত্বাম' অর্থ শস্যকণাহীন গমের শীষ। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— ওই ভূষি, যা খাদ্য হিসেবে গ্রহণের অনুপযোগী। 'তাফাক্কাহুন' অর্থ হতবুদ্ধি হয়ে যাও, যখন দ্যাখো তোমাদের শস্যহানি ঘটেছে। এরকম অর্থ করেছেন আতা, কালাবী ও মুকাতিল। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— তোমরা তখন অর্থ ও শ্রমের যথাবিনিময় না পেয়ে অপেক্ষা করতে থাকো। ইয়ামান কথাটিকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু

হাসান অর্থ করেছেন— তোমরা তখন অনুতাপ ও আক্ষেপ করতে থাকো তোমাদের কৃত পাপের কারণে। ইকরামা বলেছেন— তোমরা তখন পরস্পরকে করতে থাকো তিরস্কার। ইবনে কীসান বলেছেন— তোমরা তখন চিন্তিত হয়ে যাও। ক্বাসায়ী বলেছেন, 'তাফাক্কাহু' অর্থ হৃত সম্পদের জন্য আফসোস করা। সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন আরববাসীগণ বলেন 'তাফাক্কাহতু' (আমি ভীত হয়েছি) আবার এর অর্থ আমি চিন্তিত হয়েছিও হয়।

আমি বলি, 'তাফাক্কাহু' এর প্রকৃত অর্থ ফল ভোগ করা, অথবা বঞ্চিত হওয়া। এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে রূপকার্থে। অভিধান বিশারদগণ লিখেছেন, 'তাফাক্কাহা' অর্থ সে অস্থির হয়েছে। আর 'তাফাক্কাহা বিহী' অর্থ সে এর ফল ভোগ করেছে, মজা উড়িয়েছে।

'ইন্না লামুগ্রামূন' অর্থ আমরা তো দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছি, আমাদের অর্থ, শ্রম, সময় সবকিছুই তো নিষ্ফল হয়ে গেলো। 'মুগরাম' বলে ওই ব্যক্তিকে, যার সহায় সম্পদ সহসা বিনষ্ট হয়ে যায়। এরকম অর্থ করেছেন জুহাক ও ইবনে কীসান। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন— আমরা তো শাস্তিকবলিত হয়েছি, আমাদেরকে গ্রাস করেছে আযাব। অর্থাৎ 'গরাম' অর্থ এখানে আযাব। আর এখানকার 'বাল নাহনু মাহরুমূন' অর্থ বরং আমরা হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েছি। হারিয়েছি রিজিক। অন্নাভাব তো আমাদেরকে ঠেলে দিবে মৃত্যুর দিকে।

সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত ৬৮, ৬৯, ৭০

❑ তোমরা যে পানি পান কর তাহা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করিয়াছ?
❑ তোমরা কি উহা মেঘ হইতে নামাইয়া আন, না আমি উহা বর্ষণ করি?
❑ আমি ইচ্ছা করিলে উহা লবণাক্ত করিয়া দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— এবার ভাবতে চেষ্টা করো সুপেয় সলিল সম্পর্কে, যা পান করে তোমরা জীবন বাঁচাও। আকাশ থেকে সলিল বর্ষণ করি তো আমিই। এমতো কর্মে তোমাদের কোনো অংশগ্রহণ আছে কী? আমি তো বৃষ্টির পানিকেও সমুদ্রের পানির মতো লবনাক্ত করে দিতে পারতাম। দিইনি যে, সে তো আমার দয়া। এতদসত্ত্বেও তোমরা কি কৃতজ্ঞচিত্ততার সঙ্গে আমার এই অনন্য দয়ার প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

এখানে 'মাআল্ লাজী তাশ্‌রাবূন' অর্থ তোমরা যে পানি পান করো। অর্থাৎ মিঠা পানি। 'আল মুযনি' অর্থ মেঘ। কেউ কেউ বলেছেন, ওই শাদা মেঘ, যার

পানি সুপেয়। শব্দটির বহুবচনীয়রূপ হচ্ছে 'মুযুন্'। আর এর এক বচন 'মুযনাতুন'। 'উজ্বাজ্বান' অর্থ লবনাক্ত। অর্থাৎ ওই পানি যা সুপেয় নয়, তিক্ত, অথবা লবনাক্ত। অভিধানগ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। আবার এরকমও বলা হয়েছে যে, 'উজ্বাজ্ব' শব্দটি এসেছে 'আজ্বিজ্ব' থেকে। 'আজ্বিজ্ব' অর্থ অগ্নিদহনজনিত জ্বালা। লোনা পানিও মুখগহ্বরে জ্বালা সৃষ্টি করে। সেকারণেই লবনাক্ত পানিকে এখানে বলা হয়েছে 'উজ্বাজ্বা'। আর 'ফালাও লা তাশকুরূন' অর্থ তবুও কেনো তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না? অর্থাৎ তোমার সৃজন, প্রতিপালন সবকিছুই তো যথাযথ, সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন আল্লাহ্। তাহলে তোমরা তাঁর এমতো অনুকম্পার প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না কেনো?

সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪

---

www.eelm.weebly.com

❑ তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি?
❑ তোমরাই কি উহার বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?
❑ আমি ইহাকে করিয়াছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু।
❑ সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আফা রাআইতুমুন্ নারাল্ লাতী তু'রূন' (তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করো, তা লক্ষ্য করে দেখেছো কী?)। এখানে 'তু'রূন' অর্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করো, আলোকিত করো। কথাটি এসেছে 'ওয়ারান্ নারা ওয়ারইয়ান' (সে যথাযথ আগুন জ্বালিয়েছে) থেকে। আর বাবে ইফয়াল থেকে এসেছে 'আওরাইতুন্ নার' (আমি আগুন জ্বালিয়েছি)। আরববাসীগণ দু'টি লাকড়ি ঘসে আগুনের তেজ সৃষ্টি করতো। তখন একটি লাকড়িকে রাখতো অপরটির নিচে। উপরের লাকড়িটিকে তারা বলতো 'যানাদ' এবং নিচেরটিকে বলতো 'যানাদাহ'।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'তোমরাই কি তার বৃক্ষ সৃষ্টি করো, না আমি সৃষ্টি করি? এখানে 'শাজারাতাহা' অর্থ আগুন জ্বালানো বৃক্ষ। অর্থাৎ 'মারাখ' ও 'ইফার' বৃক্ষ। আরববাসীগণ 'মারাখ' বৃক্ষকে উপর থেকে ঘষতো। উভয় লাকড়িই থাকতো তাজা। উভয়টিকে একসঙ্গে ঘষলে তা থেকে পানি বের হতো এবং আগুন হয়ে উঠতো অধিকতর প্রোজ্জ্বল।

এরপরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু'। এখানে 'তাজকিরাতান' অর্থ নিদর্শন। এমন নিদর্শন,

যা কিয়ামতের কথা মনে করিয়ে দেয়। বিষয়টি ভাবতে শেখায় এভাবে— যে আল্লাহ্ তাজা কাঠ থেকে আগুন সৃষ্টি করেন, তিনি তো শুকনো হাড় থেকে পুনরায় মানুষকে সৃষ্টি করতে পারবেনই। আগুন ও পানি পরস্পরকে বিলোপ করে দেয়। কেননা ওদু'টো সম্পূর্ণতই বিপরীতধর্মী। অথবা মানুষের হাড় একসময় সরস থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর পর ক্রমে ক্রমে তা হয়ে যায় সম্পূর্ণ বিশুষ্ক। আর শুষ্ক অস্থিতে পুনরায় আদ্রতা সৃষ্টি করা নিশ্চয় পানি থেকে আগুন সৃষ্টি করা অপেক্ষা সহজ। সুতরাং পুনরুত্থান সংঘটিত হতে পারবে না কেনো? অথবা আগুন জ্বালানো বৃক্ষের 'নিদর্শন' হওয়ার বিষয়টিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, আগুন আঁধার রাতের পথিককে পথপ্রদর্শনে সাহায্য করে। কিংবা পৃথিবীর আগুন দেখলে পরকালের দোজখের আগুনের কথা স্মরণ হয়। আগুন মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হওয়ার কারণে যত্রতত্র তা দৃষ্ট হয়। আর এখানকার আগুন যেহেতু দোজখের আগুনের একটি উদাহরণ, তা-ই স্বভাবতই অগ্নিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে দোজখের স্মরণ জাগ্রত হয়। সুতরাং তা পরকালের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শনও বটে। সেকারণেই এখানে আগুনকে বলা হয়েছে 'নিদর্শন' ও 'প্রয়োজনীয় বস্তু'। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, পৃথিবীর আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ। জিজ্ঞেস করা হলো, হে নবীপ্রবর! পৃথিবীর মতো আগুনই তো ভস্মসাৎ করার জন্য যথেষ্ট। তিনি স. বললেন, তবুও জাহান্নামের আগুন পৃথিবীর আগুনের সত্তর গুণ অধিক তেজস্কর। তার একটি অংশ পৃথিবীর সকল আগুনের সমান। বোখারী, মুসলিম।

'মাতাআ'ন' অর্থ প্রয়োজনীয় বস্তু। আর 'লিলমুক্বভীন' অর্থ— মরুচারী বা পথিকদের জন্য। শব্দটি এসেছে 'কুওয়া' থেকে, যার অর্থ বিরাণ ভূমি, মরুভূমি, যেখানে লোকালয়ের চিহ্ন নেই। উল্লেখ্য, গৃহবাসীদের তুলনায় মুসাফির বা পথিকদেরই আগুনের প্রয়োজন হয় অধিক। মরু অঞ্চল অথবা বনাঞ্চলে তাদেরকে হিংস্রপ্রাণী থেকে আত্মরক্ষার মানসে রাতে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়। আগুনের মাধ্যমে পথ খুঁজে পাওয়াও হয় সহজ। শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্যও আগুন জ্বালাতে হয় তাদেরকে। তাই আগুনকে এখানে বলা হয়েছে 'মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু'। অধিকাংশ তাফসীরকার 'মুক্বভীন' এর অর্থ এভাবেই করেছেন। মুজাহিদ ও ইকরামার মতে 'মুক্বভীন' অর্থ উপকার লাভকারী যেকোনো ব্যক্তি। কেননা গৃহবাসী-পথচারী সকলের কাছেই আগুন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রন্ধনকর্ম, শৈত্য নিবারণ, গৃহ কিংবা পথ আলোকিতকরণ এসকল কিছু গৃহবাসী পথচারী উভয়ের জন্য অনিবার্য। ইবনে জায়েদ বলেছেন, 'মুক্বভীন' অর্থ ক্ষুধার্ত ব্যক্তি, যার উদর অন্নশূন্য। আরববাসীগণ বলেন 'আক্বওয়াতিদ্ দার' (গৃহবাসীশূন্য গৃহ)।

কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, মুক্বভীন' অর্থ সম্পদপতি। কেউ সম্পদপতি হলে তার প্রতাপ বৃদ্ধি পায়। তখন তাকে বলা হয় 'আক্বওয়ার রজুলু' (লোকটির প্রতাপ বেড়েছে)। একথাটিও তো অতি বাস্তব যে, আগুন বিত্তপতি-বিত্তহীন সকলেরই প্রয়োজনীয় বস্তু। এতদসত্ত্বেও এখানে বিশেষভাবে একে সম্পদপতিদের প্রয়োজনীয়

www.eelm.weebly.com

বস্তু বলার কারণ এই হতে পারে যে, সম্পদপতিদের গৃহেই সাধারণতঃ বহুব্যঞ্জনের আয়োজন করা হয়। আলোরও প্রয়োজন হয় তাদেরই অধিক। একারণেই অতিথি আপ্যায়নপ্রিয় লোকদেরকে বলা হয় 'কাছীরুর রামাদ' (অধিক ছাইওয়ালা)।

এরপরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো'।

এখানে 'ফাসাব্বিহ্' (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো) কথাটির 'ফা' কারণপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রত্যাদেশবাহক! যখন আপনি আল্লাহ্র সৃজনক্ষমতা ও নির্মাণনৈপুণ্য সম্পর্কে এতোক্ষণ ধরে অনেক কিছু জানলেন, তখন আপনি আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা অস্বীকারীদের বিপরীতে অনড় অবস্থান গ্রহণ করুন। প্রকাশ্য ও গোপনে বর্ণনা করুন কেবল তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা। অথবা— আপনি আপনার প্রভুপালনকর্তার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে। কিংবা— সীমালংঘনকারীরা আপনার প্রভুপালকের অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি অকৃতজ্ঞ। তাই আপনি তাদের মূর্খতা ও অবিমৃশ্যকারিতার প্রতি বিস্ময় প্রকাশার্থে প্রকাশ করুন আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা।

'বিস্‌মি রব্বিকা' অর্থ— মহান প্রভুপালকের নামের। 'ইসম' শব্দটি এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। এর অর্থ আল্লাহ্র সত্তা বা জাত। অর্থাৎ আপনি পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন আল্লাহ্র সত্তার। 'বা' অক্ষরটিও এখানে অতিরিক্ত।

সূরা ওয়াকিয়াহঃ আয়াত ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০. ৮১, ৮২

- ❑ আমি শপথ করিতেছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের,
- ❑ অবশ্যই ইহা এক মহাশপথ, যদি তোমরা জানিতে—
- ❑ নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কুরআন,
- ❑ যাহা আছে সুরক্ষিত কিতাবে।
- ❑ যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করে না।
- ❑ ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।
- ❑ তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করিবে?
- ❑ এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীব্য করিয়া লইয়াছ!

আলোচ্য আয়াতসম্ভারের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মক্কাবাসী! আমার বাণীর সত্যতা কোনো শপথের মুখাপেক্ষী নয়। তবুও আমি তোমার প্রতি একান্ত দয়াপরবশ হয়ে নক্ষত্রপুঞ্জের অস্তাচলের শপথ করে বলছি, যে শপথ অবশ্যই এক মহাশপথ, যদি তোমরা বুঝতে পারতে— নিশ্চয়ই মহাসম্মানিত এই কোরআন লিপিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহফুজে। আর যারা পুতঃপবিত্র নয়, তারা কোরআনের প্রকৃত রহস্য শুভবোধ দ্বারা স্পর্শ করতে পারে না। শোনো, এই মহাগ্রন্থের অবতারক হচ্ছেন বিশ্বজগতের একমাত্র সৃজয়িতা ও পালয়িতা আল্লাহ্। একথা জেনেও কি তোমরা এমতো সু-মহান বাণীসম্ভারকে মূল্যহীন জ্ঞান করবে? তোমরা তো দেখছি মিথ্যাচারকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছো। কেনো? মিথ্যা কি শাশ্বত সত্যের চেয়ে শোভন, সুন্দর, না শক্তিশালী?

এখানে 'ফালা উকসিমু' অর্থ আমি শপথ করি না। অর্থাৎ যা স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক ও চিরন্তন, তা কোনো শপথের মুখাপেক্ষী তো নয়। অথবা এখানকার 'লা' অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে 'লা' এখানে প্রযুক্ত হয়েছে বক্তব্যকে দৃঢ়তা প্রদানার্থে, যেমন 'লি আল্লা ইয়া'লামা' কথাটির 'লা'। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি দৃঢ় শপথ করে বলছি। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, এখানকার 'লা' 'শপথ করছি' ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত নয়। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে 'লা' ব্যবহৃত হয়েছে অংশীবাদীদের অপবিশ্বাস ও অপভক্তিকে অপসারণার্থে। তারা বলতো, কোরআন যাদু, কল্পকাহিনী, মানবরচিত ইত্যাদি। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা যেমন বলো, তেমন কখনোই নয়। আমি শপথ করে বলছি কোরআন সত্য।

‘মাওয়াক্বিই’ন্‌ নুজুম’ অর্থ নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের। নক্ষত্রপুঞ্জের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনাকে প্রকাশ করণার্থেই এখানে শপথ করা হয়েছে তার অস্তাচলের। আর এর মাধ্যমে একথাটিও বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, পৃথিবীতে এমন কিছুও বিদ্যমান, নক্ষত্র অস্তগমনের কারণে যার প্রভাব প্রতিক্রিয়া দূরীভূত হয় না।

আতা ইবনে আবী রেবাহ বলেছেন, কথাটির অর্থ— তারকারাজির কক্ষপথ ও বিরতিস্থল। হাসান অর্থ করেছেন— সেই কিয়ামতের শপথ! যখন নক্ষত্রপুঞ্জ হয়ে যাবে বিক্ষিপ্ত, উৎক্ষিপ্ত ও জ্যোতিহীন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার ‘নুজুম’ অর্থ ‘নুজুমুল কোরআন’ (কোরআনের আয়াতের ক্রমে ক্রমে অবতরণ) আর ‘মাওয়াক্বিই’ অর্থ কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময়সমূহ। অর্থাৎ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিলো ‘নজ্‌মান নজ্‌মান’ (অল্প অল্প করে বিভিন্ন সময়ে)।

‘লাও তা’লামূন’ অর্থ যদি তোমরা জানতে। বাক্যটি ভিন্ন প্রসঙ্গের। এখানে বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে শপথের মাহাত্ম্যকে বোঝাতে। এর মধ্যে আবার ‘লাও’ আকাংখাজ্ঞাপক অব্যয়। অর্থাৎ হায়! যদি তোমরা কোরআনের মহিমময়তা

সম্পর্কে অবহিত হতে পারতে। ‘আ’জীম’ অর্থ মহা, মহান। অর্থাৎ যে বিষয় সম্পর্কে শপথ করা হয়েছে, তা আল্লাহ্‌র অপার প্রজ্ঞা, সর্বশক্তিধরতা ও অনন্য অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশরূপে অতীব মহান, মহা মর্যাদাসম্পন্ন। তাঁর অনন্য রহমতের তো এটাই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি তাঁর দাসগণকে বঞ্চিত করেন না, তাঁর মহাসম্মানিত বাণীসম্ভারের মাধ্যমে সমৃদ্ধ, সম্পূর্ণ ও ধন্য করেন।

‘ইন্নাহু লা ক্বুরআনুন কারীম’ অর্থ নিশ্চয় এটা মহাসম্মানিত কোরআন। অর্থাৎ যে প্রত্যাদেশিত বাণী আমার রসুলের মুখে উচ্চারিত হয়, তা প্রভূত সম্মানের। আর এই বাণী যেহেতু আল্লাহ্‌র, তাই তা অন্য সকল বাণীর উপরে বিজয়ী ও মর্যাদার্হ। আল্লাহ্‌ যেমন তাঁর সৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তেমনি তাঁর বাণীও সৃষ্টির কথোপকথনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন তিরমিজি। অথবা পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর সকল কল্যাণের সূত্র ও মূল দিকনির্দেশনা যেহেতু এই কোরআনেই রয়েছে, সেহেতু এই কোরআন অবশ্যই মহাসম্মানিত, অফুরন্ত উপকার প্রদানকারী। অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন, ‘কারীম’ বলে ওই ব্যক্তিকে, যে প্রদান করে প্রভূত কল্যাণ। অথবা ‘কারীম’ অর্থ এখানে উত্তম ও অভিপ্রেত।

‘ফী কিতাবিম্‌ মাক্‌নূন’ অর্থ যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। অর্থাৎ লওহে মাহফূজে। ‘লা ইয়ামাস্‌সুহূ ইল্‌লাল মুতাহ্‌হারূন’ অর্থ যারা পুতঃপবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। এখানকার ‘ইয়ামাস্‌সুহূ’ এর ‘হু’ সর্বনামটি আগের আয়াতের ‘কিতাব’ এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কেননা ওই শব্দটিই এর সর্বাপেক্ষা নিকটে। অর্থাৎ লওহে মাহফুজকে স্পর্শ করতে পারে কেবল ফেরেশতা, যারা সতত পুতঃপবিত্র। ব্যাখ্যাটি কিন্তু যথাযথ নয়। কেননা সতত শারীরিক পবিত্রতা কোনো মর্যাদা লাভের কারণ নয়। প্রকৃত অর্থে তা যেমন মর্যাদা নয়, তেমনি নয় পবিত্রতাও। যদি তাই হয়, তবে ‘ফেরেশতারা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ’ এরকম বলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অথচ এরকম ধারণা বিদ্বজ্জনের ঐকমত্যবিরোধী। বরং দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা আল্লাহ্‌র তাজ্বাল্লি প্রস্ফুটিত হওয়ার প্রেক্ষাপট। মানুষের মধ্য থেকে নবী-রসুল নির্বাচন করা হয় সে কারণেই। তাই কথাটিকে ব্যাখ্যা করতে হবে এভাবে— ‘লা ইয়ামাস্‌সুহু’ (স্পর্শ করে না) এর ‘হু’ সর্বনামটি লওহে মাহফুজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। বরং এর সম্পর্ক ঘটেছে কোরআনের সঙ্গে। এমতাবস্থায় ‘করে না’ অর্থ হবে করতে পারবে না। অর্থাৎ ‘লা’ (লা) এখানে নিষিদ্ধতাপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ওজু অথবা গোসল যার নেই, তার জন্য কোরআন মজীদ স্পর্শ করা বৈধ নয়। আর আল্লাহ্‌র বাণী তো আল্লাহ্‌র মতোই আনুরূপ্যবিহীন। সুতরাং তা স্পর্শের অতীত। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে বিধান প্রদান করা হয়েছে আমাদের কাছে লিখিত অথবা মুদ্রিত যে কোরআন রয়েছে, তা স্পর্শ করা না করা সম্পর্কে। এক হাদিসে এসেছে, শত্রুদের দেশে কোরআন নিয়ে যেতে রসুল স. নিষেধ করে দিয়েছেন। বোখারী, মুসলিম। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক।

বিদ্বজ্জন এ বিষয়ে একমত যে, যার উপরে গোসল ফরজ, এরকম নর-নারী, ঋতুবতী ও প্রসবপরবর্তী অপবিত্রিনী এবং ওজুবিহীনদের জন্য কোরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়। দাউদ জাহেরীর উক্তি এর বিপরীত। তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সুফিয়ান বলেছেন, রসুল স. হেরাক্লিয়াসের কাছে যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন, তাতে কোরআনের এই আয়াতখানি লিপিবদ্ধ ছিলো ‘হে গ্রন্থধারীবৃন্দ! এসো’। হেরাক্লিয়াস ছিলো কাফের। আর শরিয়তের বিধান হচ্ছে কাফেরেরা অপবিত্র। এর জবাবে আমরা বলি, রসুল স. তাঁর ওই পত্রে আয়াতখানি কোরআনের আয়াতরূপে লিপিবদ্ধ করেননি। তিনি স. জানিয়েছিলেন কেবল ওই আয়াতের বিধান। তাই তিনি স. আয়াতের শুরুর ‘ক্বুল’ সেখানে উল্লেখ করেননি। বরং তিনি স. তার নিজের পক্ষ থেকে আহলে কিতাবদেরকে সম্বোধন করে লিখিয়েছিলেন ‘ইয়া আহলাল কিতাবি তায়ালাও’ (হে গ্রন্থধারী দল! এসো)। আয়াত হিসেবে যদি তিনি স. কথাটি লিখতেন, তবে অবশ্যই আয়াতের শুরুর শব্দটি (ক্বুল) উল্লেখ করতেন।

www.eelm.weebly.com

‘কুল’ শব্দটি উল্লেখ না করা এমতাবস্থায় তাঁর জন্য বৈধ হতো না। নামাজের মধ্যে অথবা বাইরে তেলাওয়াতের সময় নিশ্চয় আয়াতখানি ‘কুল’ সহযোগেই পাঠ করা হয়। রসুল স. নিজেও নিশ্চয় এরকমই আমল করতেন।

আমাদের মাযহাবের দিকপালগণ প্রমাণ উপস্থাপন করেন হজরত আমর ইবনে হাজাম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসের মাধ্যমে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. ইয়েমেনবাসীদের নিকট এই মর্মে পত্র প্রেরণ করেছিলেন যে, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেনো কোরআন স্পর্শ না করে। দারা কুতনী, হাকেম, বায়হাকী। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে হজরত হাকীম ইবনে হাজাম বলেছেন, ইয়েমেনে প্রেরণকালে রসুল স. আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোরআন স্পর্শ কোরো পবিত্র অবস্থায়। বর্ণনাটি এসেছে কেবল সুওয়াইদ ইবনে হাতেম সূত্রে। তিনি বর্ণনাকারী হিসেবে অবলিষ্ঠ। তবে এ বিষয়ে হজরত ইবনে ওমর থেকে সুপরিণত সূত্রে তিবরানী ও দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এরকম সূত্রপরম্পরাগত ত্রুটি নেই।

মাসআলা ঃ গিলাফ ও রেহেল যদি কোরআন মজীদ থেকে আলাদা থাকে (মলাটের মতো মিলিতভাবে বাঁধাই করা না থাকে) তবে কোরআন স্পর্শ করা বা উত্তোলন করা ইমাম আবু হানিফার মতে জায়েয। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, এমতাবস্থায় কোরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ‘যারা পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ কোরআন স্পর্শ করতে পারবে না’। অন্যত্র বলেছেন ‘ফী সুহুফিম্ মুকাররামাহ’ (মহামর্যাদামণ্ডিত লিপিকাতে)। আমরা বলি, কোরআনের ‘তাকরীম’ (মর্যাদা) এটাই চায় যে, বেওজু অবস্থায় যেনো কোরআন স্পর্শ করা না হয়। আর স্পর্শ করার অর্থ গিলাফ ও রেহেল ছাড়া স্পর্শ করা। শরিয়তে যতটুকু বলা হয়েছে, ‘তাকরীম’ হওয়া উচিত ততটুকুই। এর অতিরিক্ত করলে তা হবে বাড়াবাড়ি।

মাসআলা ঃ জামার আস্তিন অথবা পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল দিয়ে কোরআন স্পর্শ করা মাকরূহ। কেননা ওদু’টো হাতের সঙ্গে সম্মিলিত। যে মুদ্রায় কোরআনের আয়াত লিখিত থাকে ওই মুদ্রা থলে ব্যতীত স্পর্শ করা সিদ্ধ নয়। কেননা যাতে কোরআন লেখা থাকে, তা হয়ে যায় ‘মাসহাফ’ (লিপিবদ্ধ)।

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, যার উপরে গোসল ফরজ হয়েছে, তার জন্য কোরআন পাঠ করা অসিদ্ধ। বিষয়টি বিদ্বজ্জনের ঐকমত্যসঞ্জাত। কেননা কোনো কিছুর উপরে কোরআন লিখিত, খোদিত বা মুদ্রিত হলেই যখন তা কোরআনের মাসহাফ হয়ে যায় এবং তা স্পর্শ করা অসিদ্ধ হয়, তখন তা মুখে আনাও অসিদ্ধ। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মোহাম্মদের মতে ঋতুবতী ও প্রসবপরবর্তী অপবিত্রিণী গোসল ফরজ হয়ে যাওয়া (জুনুবী) ব্যক্তির মতো। এ বিষয়ে ইমাম মালেকের অভিমত সম্পর্কে এসেছে দু’টি বিবরণ। একটি হচ্ছে— তারা এমতাবস্থায় অল্প কিছু আয়াত পাঠ করতে পারে। আর একটি হচ্ছে— তারা কোরআনের যেখান থেকে যতোটুকু ইচ্ছা পাঠ করতে পারে। তাঁদের অধিকাংশ শেষোক্তই প্রচার করে থাকেন। দাউদ জাহেরীর অভিমতও এরকম। কিন্তু আমাদের উপরে বর্ণিত প্রমাণের ভিত্তিতে বলতে হয়, তাঁদের অভিমতটি ভুল। তাছাড়া হজরত ইবনে ওমরের এক বিবৃতিতে একথা স্পষ্ট করে বলেও দেওয়া হয়েছে। যেমন— রসুল স. বলেছেন, ঋতুবতী রমণী কোরআনের কোনো অংশ পাঠ করতে পারবে না, জুনুবীরাও নয়। দারাকুতনী, তিরমিজি, ইবনে মাজা। এই হাদিসের সূত্রভূত এক বর্ণনাকারী ইসমাইল ইবনে আয়াশ আবার অবলিষ্ঠ। কেউ কেউ অবশ্য তাঁকে বলিষ্ঠ বলে চিহ্নিত করেছেন এবং তাঁর অনুসরণ করেছেন মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান ও আবু মা’শার ইবনে মুসা ইবনে উকবা। ইবনে জাওজী আবার মুগীরাকে বলেছেন অবলিষ্ঠ। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, জাওজী ভুল বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে মুগীরা অবলিষ্ঠ নন। তিনি বলিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য। তবে তাঁর সূত্রপ্রবাহভূত আর এক বর্ণনাকারী আবদুল মালেক ইবনে মুসলিম অবলিষ্ঠ। আবু মা’শারও অবলিষ্ঠ। আর তার সূত্রপ্রবাহভূত এক বর্ণনাকারী তো অপবাদগ্রস্ত। তবে আবু মা’শারের বর্ণনার পক্ষে একটি সাক্ষ্য মিলে হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে। দারাকুতনী হাদিসটিকে সুপরিণত সূত্রবিশিষ্ট বলে সনাক্তও করেছেন। কিন্তু ওই হাদিসের বর্ণনাপরম্পরাভূত এক বর্ণনাকারী মোহাম্মদ ইবনে ফজল আবার ‘পরিত্যাজ’রূপে চিহ্নিত।

মাসআলা ঃ কিয়াস (তুল্যমূল্যতা) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বেওজু ব্যক্তির জন্যও কোরআন তেলাওয়াত করা না জায়েয। তবে প্রকৃত কথা এই যে, এমতাবস্থায় কোরআন পাঠ করা অসিদ্ধ নয়। কেননা ওজুবিহীন অবস্থার অপবিত্রতা মুখ পর্যন্ত পৌঁছে না। সেকারণেই ওজুর সময় কুলি করা ফরজ নয়। কিন্তু জুনুবী হওয়ার অপবিত্রতা মুখেও পৌঁছে যায়। সেকারণেই ফরজ গোসলের সময় গড়গড়াসহ কুলি করা ফরজ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি এক রাতে আমার খালা উম্মত জননী হজরত মায়মুনার ঘরে ছিলাম। রসুল স. তাঁর সঙ্গে লম্বালম্বিভাবে শুয়েছিলেন। আর আমি শুয়েছিলাম চওড়াভাবে। আনুমানিক অর্দ্ধরাত্রি যখন অতিক্রান্ত হলো তখন তিনি স. উঠে বসলেন। মুখ মুছে দূর করলেন ঘুমের প্রভাব। তারপর তেলাওয়াত করলেন সুরা আলে ইমরানের শেষ দশটি আয়াত। তারপর ঝুলন্ত একটি মশক থেকে পানি নিয়ে সম্পন্ন করলেন ওজু। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিসের

www.eelm.weebly.com

মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, বেওজু অবস্থায় কোরআন পাঠ করা সিদ্ধ। তাছাড়া হজরত আলী ইবনে আবী তালেব কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, জুনুবী অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো অবস্থা রসুল স. এর কোরআন পাঠের অন্তরায় ছিলো না। আহমদ ইবনে খুজাইমা, সুনান প্রণেতাবৃন্দ, হাকেম, ইবনে জারুদ, ইবনে সাকান, আবদুল হক, বাগবী। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

মাসআলা ঃ বাগবী লিখেছেন, মোহাম্মদ ইবনে ফজলের বিবৃতিতে এসেছে, কালাবী বলেছেন, এই আয়াতের 'মুতাহ্হারূন' (পুতঃপবিত্র) অর্থ 'মুওয়াহিদুন' (এক আল্লাহ্য় বিশ্বাসী)। আমি বলি, সুফীগণ 'মুওয়াহিদ' বলেন ওই ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো অভিমুখী নয়। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি বলেছেন, যা তোমার উদ্দেশ্য, তা-ই তোমার উপাস্য। উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই মানুষ নিয়োজিত করে তার সকল চেষ্টা, সাধনা, আরাধনা। দাসত্বের অর্থ এরকমই। রসুল স. তাই বলেছেন, যতক্ষণ না কারো কামনা বাসনা আমা কর্তৃক আনীত ধর্মমতের অনুগামী না হবে, ততক্ষণ সে পূর্ণ বিশ্বাসী হতে পারবে না। ইমাম নববী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আরবাঈন' গ্রন্থে। ইকরামা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে কোরআন পাঠ করার অনুমতি দিতেন না।

ফাররা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কোরআনের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবে কেবল তারা, যারা পুতঃপবিত্র। এমতো ব্যাখ্যার সমর্থনে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি বলেছেন, নফসকে ফানা করা এবং তার মন্দ স্বভাবগুলো থেকে পরিত্রাণ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ কোরআনের বরকত আশা করতে পারে না। নফসের ফানা হওয়ার আগে কোরআন পাঠ হতে পারে হয়তো কেবল সওয়াবের কাজ। কিন্তু ফানার পর কোরআন পাঠ নৈকট্যের স্তরসমূহে উপনীত করায়। আর সেই নৈকট্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি তাদের (বেহেশতীদের) বক্ষাভ্যন্তরের হিংসাদ্বেষ টেনে বের করে দিয়েছি'। রসুল স. জানিয়েছেন,

পরকালে কোরআন পাঠকারী ব্যক্তিকে বলা হবে, পৃথিবীতে যেভাবে সুললিত স্বরে কোরআন পাঠ করতে, সেভাবে কোরআন পাঠ করো। উন্নতমান হও এবং তোমার গন্তব্য সেই স্থানে, যে স্থানে তুমি পাঠবন্ধ করবে। হজরত ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ।

'তানযীলুম মির রব্বিল আ'লামীন' অর্থ এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ। এখানে 'তানযীল' এর অর্থ হবে 'মুনায্যাল'। ক্রিয়ামূলটি এখানে কর্তৃকারক বিশেষ্যের অর্থ প্রদায়ক।

'আফাবিহাজাল হাদীছি আনতুম মুদ্হিনূন' অর্থ তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে? এখানে 'আল হাদীছ' অর্থ কোরআন। 'তোমরা' বলে এখানে বোঝানো হয়েছে মক্কার অংশীবাদীদেরকে। আর 'মুদহিনূন' অর্থ এখানে তুচ্ছ গণ্য করবে। শব্দটি এসেছে 'ইদহান' থেকে, যার আভিধানিক অর্থ কোনো কিছুকে নরম করার উদ্দেশ্যে তাতে তৈল ব্যবহার করা। রূপক অর্থ আচার-আচরণকে বিনম্র করা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়াদ্দু লাও তুদ্হিনু ফাইয়ুদ্হিনুন' (সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা চায়, আপনি তাদের প্রতি সদয় হোন, তাহলে তারাও আপনার প্রতি সদয় হবে)। পরবর্তীতে শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে 'ঘৃণ্য' 'অপবিত্র' তুচ্ছ' এ সকল অর্থে। এখানেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থেই। অভিধান গ্রন্থে রয়েছে, 'দাহানা' অর্থ সে কাপট্য করেছে। 'মুদাহানাত' 'ইদহান' ইত্যাদির অর্থ যা অন্তরে আছে, তার বিপরীত প্রকাশ করা। এর পর থেকে 'মিথ্যা প্রতিপন্নকারী' হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে শব্দটি, কপটতার ভাব তার মধ্যে থাকুক, অথবা না থাকুক। বাগবী এরকম বলেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন 'মুদহিনূন' অর্থ মিথ্যা প্রতিপন্নকারীগণ। আর মুকাতিল ইবনে হাব্বান শব্দটির অর্থ করেছেন— অস্বীকারকারীগণ।

'ওয়া তাজ্আ'লুনা রিযক্বাকুম আন্না কুম তুকাজ্জিবূন' অর্থ এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছো। এখানে 'রিয্ক্বাকুম' ব্যবহৃত হয়েছে 'অংশ' বা 'উপজীব্য' অর্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে মক্কাবাসী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! কোরআনের ব্যাপারে তোমরা তো দেখা যাচ্ছে মিথ্যারোপ কর্মকেই তোমাদের অংশ করে নিলে। হাসান বলেছেন, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, কোরআনের ব্যাপারে যার অংশ কেবল মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা।

কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ এক স্থানে 'রিযক্ব' অর্থ করেছেন 'কৃতজ্ঞতা'। ইমাম আহমদ ও তিরমিজি হজরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স.ও এরকম বলেছেন। হায়ছাম ইবনে আদী বলেছেন, 'লা রাযাক্বা' অর্থ 'লা শাকারা' (সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি)। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, এখানে 'রিযক্বা' এর

www.eelm.weebly.com

পূর্বে অনুক্ত রয়েছে 'শুকুরা' শব্দটি এবং এখানে 'রিযক্ব' অর্থ বৃষ্টি। বৃষ্টিপাত শুরু হলে তখনকার আরববাসীরা বলতো, তারকারাজির প্রভাবে আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। আল্লাহ্ বৃষ্টিদান করেন, এরকম বিশ্বাস তাদের ছিলো না। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বৃষ্টিপাতের কারণে তোমরা তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে মিথ্যাকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছো। হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়ায় সকাল হলো। রসুল স. আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ সমাপন করলেন। রাতে বৃষ্টি হয়েছিলো। তার নিদর্শন দেখে তিনি স. আমাদের মুখোমুখি বসে বললেন, তোমরা কি জানো, তোমাদের পরম প্রভুপালক কি বলেছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর বার্তাবাহকই ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন, আমার দাসগণের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে বিশ্বাস করে, কেউ কেউ করে না। যে বলে আল্লাহ্র দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং তারকাকে অস্বীকারকারী। আর যে বলে, বৃষ্টিপাত হয়েছে অমুক তারকার প্রভাবে, সে তারকার প্রতি বিশ্বাসী এবং আমাকে অস্বীকারকারী।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক রাতে বৃষ্টি হলো। রসুল স. বললেন, আজ সকালে কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং কিছুসংখ্যক লোক হয়ে গিয়েছে আল্লাহ্র নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ। কেউ কেউ বলেছে, এ হচ্ছে আল্লাহ্র অনুকম্পা, যা তিনি দয়া করে আমাদেরকে দান করেছেন এবং কেউ কেউ বলেছে, এ হচ্ছে নক্ষত্রের প্রভাবজাত। তখন অবতীর্ণ হয় 'ফালা উক্বসিমু বি মাওয়াকিই'ন্ নুজুম' (কাজেই আমি তারকারাজির উদয়াস্তাচলের শপথ করছি)। ইবনে আবী হাতেম হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো তাবুক যুদ্ধের সময় এক আনসারী রমণী সম্পর্কে। ঘটনাটি ছিলো এরকম— রসুল স. এর অনুগামী মুসলিম বাহিনী হাজার নামক স্থানে পৌঁছলো। তিনি স. নির্দেশ দিলেন, এখানকার পানি কেউ ব্যবহার কোরো না। মুসলিম বাহিনী আরো অগ্রসর হয়ে এক স্থানে থামলো। সেখানে পানির কোনো ব্যবস্থা দেখা গেলো না। সাহাবীগণ সমস্যার কথা জানালেন। রসুল স. দুই রাকাত নামাজ পাঠ করে বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। পান ও অন্যান্য প্রয়োজন শেষ করে সকলে হলেন পরিতৃপ্ত। এক লোককে কপট বলে সন্দেহ করা হতো। জনৈক আনসারী সাহাবী তাকে লক্ষ্য করে বললেন, দেখলে, আল্লাহ্র রসুল স. নামাজ পাঠ করে দোয়া করলেন। অমনি শুরু হয়ে গেলো বৃষ্টি। লোকটি বললো, বৃষ্টি তো হলো অমুক অমুক

নক্ষত্রের প্রভাবে। তখন অবতীর্ণ হলো বর্ণিত আয়াত। ইবনে ইসহাকও বলেছেন, বর্ণিত আয়াত নাজিল হয়েছিলো হাজারের ঘটনার প্রেক্ষিতে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখনই আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তখনই একদল লোক অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। বৃষ্টি তো দান করেন আল্লাহ্, অথচ একদল লোক বলে, বৃষ্টি হয়েছে অমুক অমুক তারকার প্রভাবে।

সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭

❑ পরন্তু কেন নয়—প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়
❑ এবং তখন তোমরা তাকাইয়া থাক
❑ আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তাহার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না।
❑ তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও,
❑ তবে তোমরা উহা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মনুষ্য সমাজ! ভেবে দ্যাখো তো তোমাদের অন্তিম অবস্থা সম্পর্কে, যখন তোমাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। তখন তোমাদের সুহৃদ স্বজন তো তোমাদের পাশেই বসে থাকে। অথচ তারা তখন

www.eelm.weebly.com

তোমাদের কোনো কাজে আসে না। নিরুপায় হয়ে কেবল তাকিয়ে থাকে। তখনো আমি তোমাদের স্বজন-বান্ধব অপেক্ষা তোমাদের নিকটতর থাকি। কিন্তু তোমরা আল্লাহ্‌র সে অতি নৈকট্যকে অনুভব করতে পারো না। কারণ আমি আনুরূপ্যবিহীন। আমার নিকটতর হওয়ার বিষয়টিও তেমনি।

এখানে 'ইজা বালাগাতিল হুলকুম' অর্থ প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়। 'ওয়া আনতুম হীনাইজিন তানজুরূন' অর্থ এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাকো। আর 'আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর' কথাটির অন্য একটি অর্থও হয়। যেমন— জ্ঞানগত দিক থেকে আমি তোমাদের চেয়ে তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রী স্বজনের নিকটতর। অর্থাৎ তার অবস্থা আমি তোমাদের চেয়ে বেশী জানি। বাগবী কথাটির অর্থ করেছেন, তাকে জানা ও দেখার ব্যাপারে আমি তোমাদের

চেয়ে অধিক নিকটতর। কোনো কোনো প্রাজ্ঞজন বলেছেন, এখানে 'নিকটতর' হওয়ার অর্থ মৃত্যুদুত আজরাইলের নিকটতর হওয়া এবং ওই সকল ফেরেশতার নিকটতর হওয়া, যারা হজরত আজরাইলের সহকর্মী। তারা নিশ্চয় সে সময় অবস্থান করে স্বজন-বান্ধবদের চেয়েও নিকটে।

'কুরব' বা 'নৈকট্য' কথাটির বিভিন্ন ভাবার্থ করার প্রয়োজন এজন্য যে, নৈকট্য হয় সাধারণত স্থান ও কালসম্ভূত। কিন্তু আল্লাহ্ তো স্থান ও কালের অতীত। একারণেই ব্যাখ্যাকারগণ আল্লাহ্‌র নিকটতর হওয়ার অর্থ করতে গিয়ে বিভিন্ন জটিলতায় ভোগেন। অথচ তাঁদের অনেকেই এ বিষয়টিকে স্মরণে রাখেন না যে, নৈকট্য আকারপ্রকারবিহীনও হয় এবং এমতো আকার প্রকারবিহীন সামীপ্য শরিয়ত দ্বারাই প্রমাণিত। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি (ফেরাসাত) যাদের নেই, তাদের কাছে বিষয়টি জটিল। সাধারণ মানুষের ধারণাও তাই। বিষয়টি জটিল্য বিজড়িত। তাদের এমতো অবস্থাকে তাই প্রকাশ করা হয়েছে পরক্ষণেই। বলা হয়েছে, 'কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাও না'। অথবা এমতো নিকটতর হওয়ার বিষয়টি তোমাদের অবলোকনযোগ্যতা ও বোধশক্তির বাইরে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমরা যদি কর্তৃত্বহীন না হও (৮৬), তবে তোমরা তা ফেরাও না কেনো? যদি তোমরা সত্যবাদী হও'(৮৭)। একথার অর্থ— যদি তোমরা মনে করো, আল্লাহ্‌র বিধান তোমাদের উপরে খাটে না, সেকারণে তোমরা অপরাধী নও, মনে করো, যদি মহাপ্রলয়-পুনরুত্থান-বিচার এসকল কিছু হবে না, তবে তোমরা ওই মৃত্যুপথযাত্রীর কণ্ঠাগত প্রাণ তার দেহে অনুপ্রবেশ করিয়ে দাও না কেনো, রোধ করো না কেনো তার মৃত্যুকে, যদি তোমরা তোমাদের বিশ্বাসে ও কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকো।

এখানে 'গইরা মাদীনীন' যদি তোমরা কর্তৃত্বাধীন না হও, মনে যদি করো আল্লাহ্‌র বিধানে তোমরা অপরাধী নও। অথবা 'মাদীনীন' অর্থ দাসত্ব, অক্ষমতা, অপদস্থতা। যেমন আরববাসীরা বলেন 'দানাহু' (সে তাকে অপদস্থ করেছে, ক্রীতদাস বানিয়েছে)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যদি তোমরা হও আল্লাহ্‌র দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত, অক্ষমতা ও অপদস্থতা থেকে চিরস্বাধীন।

'তারজ্বিউ'না বিহা' অর্থ তা ফেরাও না কেনো? অর্থাৎ তার প্রাণ তার দেহে ফিরিয়ে দিতে পারো না কেনো, যদি তোমরা অক্ষমই না হবে। আর 'ইনকুনতুম সদিক্বীন' অর্থ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ আয়াত ৮৮—৯৬

- ❑ যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়,
- ❑ তবে তাহার জন্য রহিয়াছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখদ উদ্যান,
- ❑ আর যদি সে ডান দিকের একজন হয়,

www.eelm.weebly.com

❑ তবে তাহাকে বলা হইবে, ‘হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি শান্তি।’
❑ কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয়,
❑ তবে রহিয়াছে আপ্যায়ন অত্যুষ্ণ পানির দ্বারা,
❑ এবং দহন জাহান্নামের;
❑ ইহা তো ধ্রুব সত্য।
❑ অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

আলোচ্য আয়াতসম্ভারের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই মৃত্যুপথযাত্রী যদি আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজনগণের একজন হয়, তবে মহাবিচার দিবসে সে থাকবে অগ্রবর্তী দলের অন্তর্ভুক্ত। তার জন্য রয়েছে বেহেশতের অফুরন্ত সুখোপকরণ, নন্দিত জীবনোপকরণ ও মনোমুগ্ধকর কানন। আর যদি সে হয় এমন ব্যক্তি, যে হবে মহাবিচারের দিবসের ডান দিকের দলের অন্তর্ভূত, তবে সে তার আমলনামা পাবে ডান হাতে। সে-ও অতঃপর প্রবেশ করবে বেহেশতে। তাকে তখন আমার ফেরেশতারা এই বলে স্বাগতম জানাবে যে, হে দক্ষিণ প্রান্তবর্তী! তোমার প্রতি শান্তি, চিরশান্তি। কিন্তু সে যদি হয় অবিশ্বাসী ও পাপী, বিভ্রান্তদের একজন, তবে সে মহাবিচারের দিবসে অন্তর্ভূত হবে বাম দিকের দলে। আমলনামা পাবে বাম হাতে। অতঃপর তাকে প্রবেশ করানো হবে জাহান্নামে। সেখানে তাকে পান করানো হবে অতি উত্তপ্ত পানীয়। অনন্তকাল ধরে ভোগ করবে আরো অনেক ধরনের মর্মন্তুদ শাস্তি। এসকল কিছু ধ্রুব সত্য। এর ব্যতিক্রম কোনো কিছু ঘটবে না, ঘটতে পারে না। অতএব, হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে সত্যধর্ম ইসলামের পক্ষাবলম্বন করুন। এই মহাসত্যের ঘোষণা দিন উদাত্ত কণ্ঠে। আর যেহেতু আপনাকে নিযুক্ত করা হয়েছে এই মহাসত্যের পুরোধা, পরিকল্পক ও পথপ্রদর্শক, তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বর্ণনা করুন আপনার পরম প্রেমময় প্রভুপালয়িতার পবিত্রতা ও মহিমা।

এখানে ‘মুকার্‌রবীন’ অর্থ ওই নৈকট্যভাজনগণ, যাদেরকে এই সুরার প্রথম দিকে বলা হয়েছে ‘অগ্রবর্তী’। মহাবিচারের দিবসের তিন দলের মধ্যে এরাই হবেন সর্বাগ্রগণ্য ও সর্বোত্তম। ‘রওহুন’ অর্থ আরাম, সুখ, খুশি, আনন্দ। এরকম অর্থ করেছেন সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও মুজাহিদ। আর জুহাক অর্থ করেছেন— অনুকম্পা ও ক্ষমা। ‘রইহান’ অর্থ পবিত্র জীবনোপকরণ, রিজিক। এরকম অর্থ করেছেন সাঈদ ইবনে যোবায়ের, মুজাহিদ ও মুকাতিল। মুকাতিল আরো বলেছেন, ইয়েমেনী ভাষাতেও শব্দটির অর্থ এরকম। অন্যান্যরা বলেছেন, ‘রইহান’ বলে তাকে, যার ঘ্রাণ গ্রহণ করা হয়। ‘আবুল আলিয়া বলেছেন, যারা আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন, তাদেরকে পৃথিবীর পরিত্যাগের প্রাক্কালে বেহেশতের সুঘ্রাণ গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হয়। এর পর করা হয় তার প্রাণ হরণ। আবু বকর ওয়ার্‌রা বলেছেন, ‘রওহুন’ অর্থ দোজখ থেকে পরিত্রাণ প্রাপ্তি, আর ‘রইহান’ অর্থ বেহেশতে প্রবেশ।

‘ফা সালামুল্‌ লাকা মিন আসহাবিল ইয়ামীন’ অর্থ তবে তাকে বলা হবে, হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি শান্তি। বাগবী কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আপনি ডান দিকের দল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকুন। তারা আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে সুরক্ষিত। আপনি তাদের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করলে নিশ্চয় পরিতৃপ্ত ও তুষ্ট হবেন। মুকাতিল অর্থ করেছেন— আল্লাহ্‌ তাদের Î Wট-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন এবং গ্রহণ করবেন তাদের পুণ্যকর্মসমূহকে। ফাররা প্রমুখ ব্যাখ্যাতাগণ অর্থ করেছেন— হে আমার রসুল! দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী দলের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি সালাম। অথবা— দক্ষিণ পার্শ্ববর্তীদেরকে বলা হবে, তোমরাই দক্ষিণ পাশ্ববর্তীদের দলভূত। তোমাদের জন্য নিরাপত্তা।

‘ওয়া আম্‌মা ইন কানা মিনাল মুকাজ্‌জিবীনাদ্দ্বল্‌লীন’ অর্থ কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয়। এখানে ‘মুকাজ্‌জিবীন’ অর্থ সত্য অস্বীকারকারী, মিথ্যাবাদী। আর ‘দ্বল্‌লীন’ অর্থ বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট। উল্লেখ্য, মহাবিচারের দিবসে এ সকল মিথ্যাবাদী ও বিভ্রান্ত লোকেরাই হবে বাম দিকের দলের অন্তর্ভূত। তাদের তিনটি প্রধান অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। এভাবে একথাটিই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রধানতঃ কোরআন ও রসুলের প্রতি মিথ্যাচার এবং ভ্রান্ত পথানুসরণের কারণেই তাদেরকে পরকালে ভোগ করতে হবে অনন্তকালীন মর্মন্তুদ শাস্তি।

‘ফা নুযুলুম মিন হামীম’ অর্থ রয়েছে তাদের আপ্যায়ন অত্যুষ্ণ পানির দ্বারা। ‘ওয়া তাস্‌লিয়াতু জ্বাহীম’ অর্থ এবং দহন জাহান্নামের। আর ‘ফাসাব্‌বিহ্‌ বিস্‌মি রব্বিকাল আ’জীম’ অর্থ অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের

www.eelm.weebly.com

নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। অর্থাৎ আল্লাহ্র নাম স্মরণ করুন এবং নামাজ পাঠ করুন। অথবা— আল্লাহ্র নামের জিকিরের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করুন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা। কিংবা— পাঠ করুন আল্লাহ্ নামের তসবিহ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিরাতে সুরা ওয়াকিয়াহ পাঠ করবে, তাকে কখনো দারিদ্র স্পর্শ করতে পারবে না। বাগবী, আবু ইয়ালা। আর শিথিল সূত্রপরম্পরায় বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'শো'বুল ইমান' নামক গ্রন্থে। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

সূরা আল হাদীদ

পুণ্যধাম মদীনায় অবতীর্ণ এই সূরায় রয়েছে ৪টি রুকু ও ২৯টি আয়াত।
সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

তাফসীরে মাযহারী/২৯৮

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহারই; তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❑ তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

❑ তিনিই ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর 'আরশে সমাসীন হইয়াছেন। তিনি জানেন যাহা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যাহা কিছু উহা হইতে বাহির হয় এবং আকাশ হইতে যাহা কিছু নামে ও আকাশে যাহা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন— তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহারই এবং আল্লাহ্রই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হইবে।

❑ তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে, এবং তিনি অন্তর্যামী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সাব্বাহা লিল্লাহি মা ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব'। এর অর্থ— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। উল্লেখ্য, এখানে, সুরা হাশর ও সুরা সফে অতীতকালবোধক ক্রিয়ারূপে এসেছে 'সাব্বাহা'। আর সুরা জুমআ ও সুরা তাগাবুনে এসেছে বর্তমান ও

www.eelm.weebly.com

ভবিষ্যতকালবোধক শব্দরূপ 'ইউসাব্বিহু'। এভাবে বর্ণিত সকল স্থানে এই ইঙ্গিতটি দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত সৃষ্টি সর্বাবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত দিতে থাকবে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমার ঘোষণা। তাদের এমতো কর্ম হবে নিরবচ্ছিন্ন। আর সুরা বনী ইসরাইলের শুরুতে 'সুব্হানা' (আল্লাহ্ পবিত্র) বলে এই বিষয়টিকেই করে দেওয়া হয়েছে অধিকতর সুস্পষ্ট। কেননা 'সুব্হানা' হচ্ছে ক্রিয়ামূল। ক্রিয়ামূল কোনো কালের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। আর 'তাস্বীহ' শব্দটি স্বয়ং সকর্মক ক্রিয়া। এর আভিধানিক অর্থ মন্দ কোনো কিছুকে দূর করা, পবিত্র করা। 'সাব্বাহা' এর শাব্দিক অর্থ চলে গেলো, দূর হয়ে গেলো। কখনো কখনো কর্মকারকের মধ্যে ব্যবহৃত হয় লাম'। যেমন 'নাসাহ্তুহু' এবং 'নাসাহতু লাহু'। তাহবীহ্ শব্দটিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে দু'রকমভাবেই। কর্মপদের সঙ্গে 'লাম' ব্যবহৃত হওয়া এবিষয়টির দিকেই ইঙ্গিত করে যে, সৃষ্টির পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা হতে পারে কেবল আল্লাহ্র জন্য। 'মা ফিস্সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' অর্থ আকাশমণ্ডলী ও

পৃথিবীতে যা কিছু আছে। অর্থাৎ বিবেকবান ও বিবেকহীন সকল সৃষ্টি। কেউ কেউ বলেছেন, 'মা' (যা কিছু)দ্বারা এখানে বলা হয়েছে কেবল বিবেকবান সৃষ্টির কথা। অর্থাৎ আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে কেবল তারা। আবার কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, বিবেকহীন যারা তারাও আল্লাহ্র 'তাসবীহ' বর্ণনা করে। তবে তারা 'তাসবীহ' বর্ণনা করে তাদের নিজস্ব ভাবে ও ভাষায়। প্রকৃত কথা হচ্ছে, সচেতন-নিশ্চেতন সকল সৃষ্টিই জীবন ও জ্ঞান সম্পন্ন। সুরা বাকারার 'ওয়া ইন্না মিন্হা লামা ইয়াহ্বিতু মিন খশইয়াতিল্লাহ্' এই আয়াতের তাফসীরে এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং বুঝতে হবে, প্রতিটি সৃষ্টি তাদের স্ব স্ব বাক-ব্যবস্থানুপাতে 'তাসবীহ' পাঠ করে চলে, যদিও তা আমাদের জ্ঞানগোচর নয়। এক আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলাও হয়েছে। যেমন 'ওয়া ইম্মিন শাইইন্ ইউসাব্বিহু বিহামদিহি ওয়া লাকিল্ লা ইয়াফ্ক্বাহুনা তাস্বীহাহুম' (সবকিছুই তাদের প্রভুপালকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারো না)। আর এখানকার 'ওয়া হুয়াল আ'যীযিল হাকীম' অর্থ তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অসমকক্ষরূপে পরাক্রমধারী ও প্রজ্ঞামণ্ডিত।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তারই; তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'। একথার অর্থ— আকাশমণ্ডলী-পৃথিবী ও তৎমধ্যস্থিত সকল কিছুকে যেহেতু তিনিই এককভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই যেহেতু সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র জীবিকাদাতা, পরিচালক, নিয়ন্ত্রক ও পালয়িতা, সেহেতু এই মহা সৃষ্টি তাঁরই কর্তৃত্বগত। তিনিই তাঁর সতত স্বাধীন অভিপ্রায়ানুসারে সকলকে ও সকলকিছুকে জীবন দান করেন এবং তাদের মৃত্যুও ঘটান। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বকালে সর্বশক্তিমান।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত'।

এখানে 'হুয়াল আউয়ালু' অর্থ তিনিই আদি। অর্থাৎ এই মহাসৃষ্টির অস্তিত্বপ্রাপ্তির পূর্বেও তিনি ছিলেন। আর তিনিই সৃষ্টিকে অনস্তিত্বের অন্ধকার থেকে এনেছেন অস্তিত্বের আলোয়। 'ওয়াল আখিরু' অর্থ তিনিই অন্ত। অর্থাৎ সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তবুও তিনি থাকবেন। কেননা তাঁর সত্তা-গুণবত্তা ক্ষয়-লয়-ধ্বংস থেকে চিরসুরক্ষিত। আর প্রত্যেক বস্তুরই বিদ্যমানতা ঋণাত্মক। 'ওয়াজ্জহিরু' অর্থ তিনিই ব্যক্ত। অর্থাৎ তিনি স্বয়ং প্রকাশ। আর অন্য সকলে আত্মপ্রকাশ করে তাঁরই দয়ার্দ্র অনুমোদনে। আত্মপ্রকাশের নিজস্ব ভিত্তি সৃষ্টির নেই। বরং তাদের সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপ আল্লাহ্র সত্তা-গুণবত্তা-কার্যক্রমের প্রতিবিম্ব বা ছায়া। আল্লাহ্ সদাবিদ্যমান, আর অন্যেরা বিদ্যমান তাঁর অভিপ্রায় ও অনুকম্পানুসারে ওই বিদ্যমানতার প্রতিচ্ছবিরূপে। আল্লাহ্তায়ালার প্রকাশ স্বয়ংপূর্ণ, পক্ষান্তরে সৃষ্টি সকল বিষয়ে অপূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। তাদের দৃষ্টিশক্তিও

সেরকম। তাই তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্র সত্তা-গুণবত্তা প্রতিভাসিত হয় না। সৃষ্টির জন্য তার স্রষ্টাদর্শন অসম্ভব, যেমন অসম্ভব চামচিকার সূর্যদর্শন, দ্বিপ্রহরের সূর্যের দিকে সরাসরি তাকানো ইত্যাদি। সূর্যালোককে যেমন স্বীকার করে আবালবৃদ্ধবনিতা, বিবেকবান-বিবেকহীন, উন্মাদ-সুস্থ সকলেই, তেমনি ন্যূনতম শুভবোধ যার রয়েছে, সে আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য। কেননা তিনি যে সতত প্রকাশিত, সদাবিদ্যমান।

'ওয়াল বাত্বিনু' অর্থ এবং তিনিই গুপ্ত। অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত বলেই সৃষ্টির সংকীর্ণ ও অপূর্ণ দৃষ্টি থেকে তিনি গুপ্ত। তাছাড়া তাঁর সত্তার মূল তত্ত্ব তো চিররহস্যাচ্ছাদিত, চিরগোপন। দিব্যদৃষ্টিধারী নবী-রসুল ও আউলিয়াগণের দর্শন যোগ্যতাও তাঁর চির রহস্যাচ্ছাদিত সত্তা পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম।

www.eelm.weebly.com

জননী আয়েশা থেকে আবু ইয়ালা মুসেলী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. শয্যাগ্রহণকালে পাঠ করতেন— আল্লাহুম্মা রব্বাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব ওয়া রব্বাল আরশিল আ'জীম রব্বানা ওয়া রববা কুললি শাইইন ফালিকাল হাব্বি ওয়ান নাওয়া মুনায্যিলাত্ তাওরাতি ওয়াল ইঞ্জিল ওয়াল ফুরক্বান আউজু বিকা মিন শাররি কুললি শাইইন আন্তা আখিজুম বিনাসিয়াতিহ্ আল্লাহুম্মা আন্তাল্ আওয়ালু ফালাইসা ক্বব্লাকা শাই ওয়া আন্তাল্ আখিরু ফালাইসা বা'দাকা শাই ওয়া আন্তাজ্ জহির ফালাইসা ফাওক্বাকা শাই ওয়া আন্তাল বাতিনু ফালাইসা দুনাকা শাই ইক্বদ্বি আ'ন্নাদ দাইন ওয়া আগ্নিনা আনিল ফক্বর। (হে আল্লাহ্! আকাশসমূহ, পৃথিবী ও আরশের অধিকর্তা! হে শস্যবীজ ও আঁটি উদগমকারী! হে তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের অবতারক! আমি তোমার কাছে আশ্রয় যাচনা করি ওই সকল অমঙ্গল থেকে, যা তোমার আনুরূপ্যবিহীন হস্তের অধীন। হে আমার আল্লাহ্! তুমিই প্রথম, তোমার আগে আর কোনোকিছু নেই। তুমিই শেষ। তোমার পরেও কিছু নেই। তুমিই ব্যক্ত। তোমাপেক্ষা প্রকাশ্য কিছু নেই । তুমি গুপ্ত। তোমার চেয়ে অধিক গুপ্ত কিছু নেই। আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও। আমাদের উপর থেকে দারিদ্র দূর করে দিয়ে আমাদের স্বচ্ছল করে দাও।

বাগবী লিখেছেন, একবার হজরত ওমরকে আলোচ্য আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, এর অর্থ— সকলকিছুর অন্ত সম্পর্কে তিনি যেমন পরিজ্ঞাত, তেমনি জ্ঞাত সকলকিছুর আদি সম্পর্কে। অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান পরিবেষ্টন করে রয়েছে আদি-অন্তের সকল কিছুকে। তেমনি প্রকাশ্য-গোপন সকলকিছু সম্পর্কেও তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তিনিই ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন'। এখানকার 'অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন' কথাটি আয়াতে মুতাশাবিহাতের (রহস্যাচ্ছন্ন আয়াতের)

অন্তর্ভূত। তাই বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা না করাই সমীচীন। আল্লাহ্ আকার-প্রকারহীন, আনুরূপ্যবিহীন। তাঁর আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টিও সেরকম। বিষয়টি অবোধ্য। সুতরাং এ সম্পর্কে এতটুকু বলে ক্ষান্ত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ যা বলেছেন, তা সত্য বলেছেন। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে আমরা অপারগ।

এরপর বলা হয়েছে— তিনি জানেন, যা কিছু ভূমিতে অবতরণ করে ও যা কিছু তা থেকে বের হয়'। একথার অর্থ— ভূমিতে যা কিছু প্রবেশ করে, যেমন শস্যবীজ, বৃষ্টির ফোঁটা, মৃত দেহ, খনিজ উপকরণ এবং যা কিছু মাটি থেকে উদগত হয়, যেমন শস্য, বৃক্ষ, অংকুর, ধোঁয়া ইত্যাদি, এসকল কিছুই তাঁর জানা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আকাশ থেকে যা কিছু নামে এবং যা কিছু উত্থিত হয়'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ আরো জানেন ওই সকল কিছু সম্পর্কে, যা আকাশ থেকে নেমে আসে, যেমন বৃষ্টি, ফেরেশতা, বরকত ও আল্লাহ্র বিধানসমূহ এবং যা উত্থিত হয় আকাশে, যেমন ধোঁয়া, ফেরেশতা, বান্দার আমলসমূহ, মানুষের আত্মাসমূহ।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া হুয়া মাআ'কুম আইনা মা কুনতুম' (তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন)। একথার মর্মার্থ— তোমরা যখন যেখানে যেভাবেই থাকো না কেনো, আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গেই আছেন। কিন্তু তাঁর এমতো সঙ্গতা তাঁর সত্তা-গুণবত্তার মতোই আনুরূপ্যহীন, আকার-প্রকারবিহীন। তাই তোমরা তা বোধায়ত্ত করতে পারো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াল্লহু বিমা তা'মালূনা বাসীর' (তোমরা যা কিছু করো , আল্লাহ্ তা দেখেন)। একথার মর্মার্থ— তোমাদের ভালো-মন্দ সকল আমল আল্লাহ্ দেখেন। তাই মনে রেখো, যথাসময়ে যথোপযুক্ত প্রতিফল তোমাদেরকে ভোগ করতে হবেই— পুরস্কার, অথবা তিরস্কার।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই এবং আল্লাহ্রই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে'। একথার অর্থ— আকাশসমূহ, পৃথিবী ও এতদুভয়স্থিত সকল কিছুই তাঁর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বভূত। আর সবকিছু যেমন তাঁর দিক থেকে এসেছে, তেমনি অবশেষে ফিরে যাবে তাঁরই দিকে। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র সর্বময় কর্তৃত্বের কথা ঘোষিত হয়েছে এই সুরার প্রথমেই। এই আয়াতে হলো সেকথার পুনরাবৃত্তি। সেকারণেই বলা যেতে পারে যে, বাক্যটি যেনো আলোচ্য বক্তব্যের প্রারম্ভিকা ও উপসংহার।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে এবং তিনি অন্তর্যামী'। একথার অর্থ— তিনিই তাঁর ইচ্ছামতো দিবস ও রাত্রির সময় পরিসরের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটান। তাই দিবস-রজনী পালাক্রমে পরস্পরের দ্বারা কখনো হয় প্রসারিত, কখনো সংকুচিত। আর তোমরা হৃদয়ে যা লুক্কায়িত রাখো, সে সম্পর্কেও তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত।

www.eelm.weebly.com

ইমাম সুয়ূতী তাঁর 'জামেউল জাওয়াম' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, যে চায় তার মনোবাঞ্ছা পূরণ হোক, সে যেনো সুরা হাদীদের প্রথম কয়েক আয়াত এবং সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করে বলে, হে আল্লাহ্! তুমি যা বর্ণনা করলে, তুমি সেরকমই। দয়া করে তুমি আমার প্রয়োজন পূরণ করো।

সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯, ১০

❑ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা কিছুর উত্তরাধিকারী করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাহাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।

❑ তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহ্তে ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদিগকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিতে আহ্বান করিতেছে এবং আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হইতে অংগীকার গ্রহণ করিয়াছেন, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

❑ তিনিই তাঁহার বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্য। আল্লাহ্ তো তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

❑ তোমরা আল্লাহ্র পথে কেন ব্যয় করিবে না? আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহ্রই। তোমাদের মধ্যে যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করিয়াছে ও যুদ্ধ করিয়াছে, তাহারা এবং পরবর্তীরা সমান নহে। তাহারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ উহাদের অপেক্ষা, যাহারা পরবর্তী কালে ব্যয় করিয়াছে ও যুদ্ধ করিয়াছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবহিত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমিনূ বিল্লাহি ওয়া রসুলিহী'। একথার অর্থ— হে মনুষ্য সমাজ! তোমরা কেবল আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকেই যথেষ্ট মনে কোরো না। একই সঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করো তাঁর রসুলের উপরও। নতুবা তোমরা ইমানদার বলে গণ্য হতে পারবে না। কেননা রসুলগণের আনুগত্য ব্যতিরেকে তিনি কারো ইমান ও আমল গ্রহণ করেন না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় করো। তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার'। একথার অর্থ— তোমাদেরকে যে সম্পদ আল্লাহ্ দান করেছেন, তা থেকে তাঁর বিধানানুসারে দান করতে তোমরা কুণ্ঠিত হয়ো না। মনে রেখো সম্পদের প্রভুত মালিক আল্লাহ্, তোমরা নও। সুতরাং তার নির্দেশানুসারে তাঁরই দেওয়া সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে না কেনো? আরো শোনো তোমাদের এমতো ইমান ও দানের জন্য আমি তোমাদেরকে দান করবো মহাপুরস্কার— জান্নাত। অথবা কথাটির অর্থ হবে এরকম— ভেবে দ্যাখো, তোমরা আল্লাহ্র ইচ্ছায় সম্পদবিত্তের সাময়িক অধিকার সংরক্ষণ করো মাত্র। এভাবে চলতে থাকে প্রজন্মান্তরের উত্তরাধিকার। অতএব, সময় থাকতেই আল্লাহ্র বিধানানুসারে সম্পদ ব্যয় করো, সঞ্চয় করো এমন পুণ্য, যা তোমাদেরকে উপযোগী করবে পরকালের মহাপুরস্কারের। উল্লেখ্য, এখানে 'ব্যয় করো' বলে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে মহাপুরস্কার অর্জন করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছেন।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌তে ইমান আনো না? অথচ রসুল তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ইমান আনতে আহ্বান করছেন এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও'।

এখানে 'ওয়ামা লাকুম লা তু'মিনূনা বিল্লাহ্‌' অর্থ তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌তে ইমান আনো না? অর্থাৎ ইমান আনতে তোমাদের আপত্তি কোথায়? 'অথচ রসুল তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ইমান আনতে আহ্বান করছে' অর্থ রসুল স. তোমাদেরকে কতোরকম দলিল-প্রমাণ ও সমুজ্জ্বল নিদর্শনের মাধ্যমে বার বার এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তাঁর দরদী আহ্বান জানিয়ে চলেছেন, অথচ তোমরা যুক্তিহীনভাবে নিশ্চুপ রয়েছো কেনো?

'আল্লাহ্‌ তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন' অর্থ স্মরণ করো ওই সময়ের কথা যখন আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে তোমাদের প্রথম পিতা আদমের পৃষ্ঠ থেকে বের করে আত্মার জগতে তোমাদেরকে সমবেত করে প্রশ্ন করেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভুপালক নই? তোমরা বলেছিলে, অবশ্যই। এভাবে আমার সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছো, প্রত্যাখ্যান করছো আমার প্রত্যাদেশবাহককে। কেনো? অথবা 'অঙ্গীকার' অর্থ এখানে উম্মতের পক্ষে তাদের পয়গম্বরগণের অঙ্গীকারনামা, যা আল্লাহ্‌ গ্রহণ করেছিলেন পৃথকভাবে। অর্থাৎ যে অঙ্গীকারনামার কথা বলা হয়েছে আয়াতে মীছাক্বে। যেমন— 'এরপর তোমাদের নিকট এসেছিলো একজন রসুল, তিনি প্রত্যয়ন করেছিলেন তোমাদের নিকট যা আছে। অবশ্যই তোমরা আস্থা জ্ঞাপন করবে তাতে। আর অবশ্যই তোমরা সহায়তা করবে তার। তিনি বলেছিলেন, তোমরা কি স্বীকৃতি দিচ্ছো। আর তোমাদের উপর আরোপিত প্রতিশ্রুতির উপর কি তোমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছো? তারা বলেছিলো, আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি'। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, এখানে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, অর্থ আল্লাহ্‌ তার প্রভুপালকত্বের দলিল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন এবং তা দেখা ও অনুধাবন করার যোগ্যতাও মানুষকে দান করেছেন।

'ইন কুনতুম মু'মিনীন' অর্থ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপরে ইমান এনেছো বলে দাবি করে থাকো, তবে তাঁর রসুলের উপরেও ইমান আনো। নতুবা তোমরা ইমানদার বলে গণ্য হতে পারবে না। উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌কে সৃষ্টিকর্তা বলতো মক্কার মুশরিকেরাও। তৎসত্ত্বেও আল্লাহ্‌র দরবারের সুপারিশকারীজ্ঞানে তারা পূজা করতো প্রতিমার। তাই তাদেরকে লক্ষ্য করে এখানে জানানো হয়েছে প্রকৃত ইমান আনয়নের আহ্বান।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আব্‌দে কায়েসের প্রতিনিধি দল যখন রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হলো, তখন তিনি স. তাদেরকে চারটি উপদেশ দিলেন। প্রথমে নির্দেশ দিলেন এক আল্লাহ্‌র উপর ইমান আনতে। বললেন, তোমরা কি জানো, আল্লাহ্‌র উপরে ইমান আনার অর্থ কী? তারা বললো, আল্লাহ্‌ এবং রসুলই এ ব্যাপারে উত্তমরূপে অবহিত। তিনি স. বললেন, ইমান হচ্ছে— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্‌' এই কলেমায় বিশ্বাস স্থাপন করা, নামাজ পাঠ করা, জাকাত দেওয়া এবং রমজান মাসে রোজা রাখা। অপর বর্ণনায় এসেছে, যুদ্ধলভ্য সম্পদের এক পঞ্চমাংশ প্রদান করা। আরো বললেন, মাটির সবুজপাত্র, কাঠের পাত্র, কদুর পাত্র ও পিচজড়িত পাত্র ব্যবহার নিষেধ (এ সকল পাত্র তখন ব্যবহৃত হতো মদ্যপ্রস্তুতপাত্র হিসেবে)। শেষে তিনি স. বললেন, এ সকল কথা স্মরণে রেখো এবং স্ব জনপদে প্রত্যাবর্তন করে অনুপস্থিতজনদেরকে জানিয়ে দিয়ো।

আমি বলি, প্রকাশ্যত দেখা যায়, রসুল স. তখন উপদেশ দিয়েছিলেন পাঁচটি বিষয়ে— ১. তওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য ২. নামাজ ৩. জাকাত ৪. রমজানের

রোজা এবং ৫. গণিমতের মালের এক পঞ্চমাংশ প্রদান। অথচ হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তিনি স. হুকুম দিয়েছিলেন চারটি বিষয়ে। তাই বুঝতে হবে ইমান আনার বিষয়টিকে তিনি 'উপদেশে'র মধ্যে ধরেননি। না ধরে ঠিকই করেছেন। কেননা উপদেশ বা ধর্মসংক্রান্ত নির্দেশ তো দেওয়া যেতে পারে তাকেই, যে ইমানদার। এই হিসেবেই হজরত ইবনে আব্বাস উপদেশ হিসেবে গণনা করেছেন ইমানের পরের বিষয় চতুষ্টয়কে। অথবা প্রথমে শরিয়তের মূল হুকুম বিবৃত করার পর ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইমানানুকুল প্রধান চারটি বিষয়ের। আর এই হাদিসখানি একথাও প্রমাণ করে যে, রসুলের প্রতি ইমান আনা ছাড়া আল্লাহ্‌র প্রতি ইমান আনার কথা কল্পনাও করা যায় না। বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কোনো কারণের প্রেক্ষিতে যদি ইমান আনতে হয়, তবে সে কারণ তো এখন বিদ্যমান। আল্লাহ্‌র রসুল এখন স্বয়ং তোমাদের সামনে উপস্থিত। অতএব বিশ্বাসই যদি তোমাদের মূল লক্ষ্য হয়, তবে এখনই বিশ্বাস স্থাপন করো। বাগবী লিখেছেন, কথাটির অর্থ হবে— যদি তোমরা বিশ্বাসী হতে চাও, তবে এই সময়ই বিশ্বাস স্থাপন করার উৎকৃষ্ট সময়। কেননা সত্যের সপক্ষের প্রমাণপঞ্জি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। সর্বশেষ রসুলের মহাআবির্ভাব তোমরা প্রত্যক্ষ করছো। প্রত্যক্ষ করছো সর্বশেষ প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ আল কোরআন। বলো, বিশ্বাস আনয়নের এর চেয়ে উৎকৃষ্ট সময় আর কখনো আসবে কী?

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— ' তিনিই তাঁর বান্দাদের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনবার জন্য'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ই তাঁর প্রিয়তম রসুলের প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছেন এজন্য যে, তিনি অথবা তাঁর রসুল যাতে করে তোমাদেরকে অবিশ্বাস ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারেন বিশ্বাস ও জ্ঞানের আলোয় ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তো তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— হে মানুষ! আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি বড়ই কৃপাপরবশ ও পরম দয়াবান। দ্যাখো তাঁর কৃপার প্রকাশ। তিনি তোমাদেরকে শুধু জ্ঞানের উপরে ছেড়ে দেননি, তৎসঙ্গে স্মরণিকা ও পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছেন তাঁর বার্তাবাহক, আবার তার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন প্রত্যাদেশিত বিধি-বিধান, যাতে করে তোমরা তোমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞানকে সহজে করে নিতে পারো সত্যের পরিপূর্ণ অনুকূল। এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্র পথে কেনো ব্যয় করবে না'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। আর এখানে 'ফী সাবীলিল্লাহ্' (আল্লাহ্র পথে) বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল দানকে, যা আল্লাহ্র নৈকট্য আহরক।

এরপর বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহ্রই'। একথার অর্থ— সকলকিছুর মালিক তো কেবলই আল্লাহ্। তোমরা কেউই চিরদিন

এ পৃথিবীতে থাকবে না। একদিন অর্থ-বিত্ত সবকিছুই ছেড়ে তোমাদেরকে পরপারে প্রস্থান করতেই হবে। তাহলে অস্থায়ী সম্পদ ব্যয় করে পরপারের অক্ষয় কল্যাণ লাভের এটাই কি প্রকৃষ্ট সময় নয়। কার্পণ্য করলে তোমার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিকানা পাবে অন্যে, তুমি কী পাবে?

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক একটি ছাগল জবাই করে তার সমস্ত গোশত বণ্টন করে দিলো। নিজের কাছে রাখলো সামান্যকিছু। রসুল স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, বাকী রইলো কোন অংশ? সে বললো, একটি রান। তিনি স. বললেন, বরং বলো, এই রানটুকু ছাড়া আর সবগুলোই রইলো বাকী। অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে যা তুমি বণ্টন করে দিয়েছো, তার সওয়াবই কেবল অবশিষ্ট রইলো তোমার। আর যে টুকু তুমি রেখে দিয়েছো, তার জন্য কোনো সওয়াব অবশিষ্ট নেই। তিরমিজি।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছো, যার কাছে তার নিজস্ব সম্পদ ছাড়া তার উত্তরাধিকারীদের সম্পদ অধিক প্রিয়? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো প্রত্যেকেই উত্তরাধিকারীদের সম্পদ অপেক্ষা নিজেদের সম্পদকে অধিক প্রিয় মনে করি। তিনি স. বললেন, নিজের সম্পদ সেটাই, যা সে মৃত্যুর পূর্বে (পুণ্যরূপে) প্রেরণ করে। আর যা রেখে যায়, তা তো উত্তরাধিকারীদের।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত'।

অধিকাংশ ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে 'আলফাতাহ' বলে বুঝানো হয়েছে মক্কাবিজয়কে। শা'বীর মতে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— মক্কাবিজয়ের অথবা হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে তারা প্রভুত কল্যাণের অধিকারী। এরপরে যারা ইমান এনেছে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা পুণ্য, নৈকট্য ও মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের সমান নয়। তবে একথা ঠিক যে, উভয় দলই আল্লাহ্র কল্যাণভাজন। আর আল্লাহ্ সকলের সকলকিছু সম্পর্কে উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত। অর্থাৎ কার আমল অত্যুত্তম ও কার আমল কেবল উত্তম সকল কিছুই তাঁর জানা।

বাগবী লিখেছেন, মোহাম্মদ ইবনে ফজল বলেছেন, আলোচ্য বাক্য অবতীর্ণ হয়েছিলো হজরত আবু বকর সিদ্দীক সম্পর্কে। তিনিই সর্বপ্রথম আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং প্রথম সম্পদ ব্যয় করেছিলেন আল্লাহ্র রাস্তায়। তিনি আরো লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর মহিমময় সংসর্গে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, শ্রদ্ধেয় আবু বকরও সেখানে উপস্থিত। তাঁর পরনে ছিলো একটি লম্বা জামা, যার বুকের কাছটা তিনি আটকিয়ে রেখেছিলেন কাঁটা দিয়ে। এমন সময় আবির্ভূত হলেন

জিবরাইল। জিজ্ঞেস করলেন, এ কেমন কথা যে, আবু বকরকে তাঁর জামা আটকিয়ে রাখতে হবে কাঁটা দিয়ে? রসুল স. বললেন, বিজয়ের পূর্বেই তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্র পথে খরচ করেছেন। জিবরাইল বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন, তাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম দিয়ো এবং বোলো সে তার এই ঘোর দারিদ্রাবস্থায় আমার প্রতি প্রসন্ন কিনা। রসুল স. শ্রদ্ধেয় আবু বকরকে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে সালাম জানিয়েছেন এবং জিজ্ঞেস করেছেন, তুমি তোমার এমতো নিঃসম্বল অবস্থায় তাঁর প্রতি প্রসন্ন

www.eelm.weebly.com

কিনা। তিনি বললেন, আমি কি আমার প্রিয়তম প্রভুপালকের প্রতি অপ্রসন্ন হতে পারি? আমি অবশ্যই সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি প্রসন্ন। ওয়াহেদীও তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ঘটনাটি এভাবে বিবৃত করেছেন।

আমি বলি, আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মুহাজির ও আনসারগণ মক্কাবিজয়ের পরের সকল ইমানদার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার একথাও অপ্রমাণিত থাকে না যে, হজরত আবু বকর অন্যান্য সাহাবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর সাহাবীগণ শ্রেষ্ঠ অন্য সকল মানুষ থেকে। কেননা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অগ্রগামিতা এবং আল্লাহ্‌র পথে জান-মাল ব্যয়। রসুল স. বলেছেন, কেউ যদি কোনো ভালো কাজের প্রবর্তন করে, তবে এ জন্য সে সওয়াব তো পাবেই, তদুপরি পাবে তাদের সমান সওয়াব, যারা তার অনুসরণে উক্ত ভালো কাজ করবে। অথচ তাদের সওয়াবও বিন্দুমাত্র কমবে না। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবীগণও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁর আমন্ত্রণক্রমে। প্রভূত অর্থ ব্যয়ও তিনি করেছিলেন ইসলামের জন্য। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের হাতে প্রথম নির্যাতন ভোগকারীও ছিলেন তিনিই। সেজন্যই রসুল স. বলেছেন, যে আমার উপকার করেছে, আমি তার প্রত্যুপকার করেছি। কিন্তু আবু বকরের উপকারের প্রতিদান আমি দিতে পারিনি। মহাবিচারের দিবসে তাকে এর প্রতিদান দিবেন স্বয়ং আল্লাহ্‌। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকর যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর কাছে ছিলো চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। তিনি ওই অর্থের সম্পূর্ণটাই রসুল স. এর সেবায় ব্যয় করে ফেলেছিলেন। বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসের এক স্থানে বলা হয়েছে, অতঃপর হজরত আবু বকর এক কল্যাণময় পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তাঁর বসতবাড়ির প্রাঙ্গণে নির্মাণ করলেন একটি মসজিদ। সেখানে নিয়মিত পাঠ করতে লাগলেন নামাজ এবং তেলাওয়াত করতে লাগলেন কোরআন।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, একবার উকবা ইবনে আবী মুঈত রসুল স.কে কাবা গৃহের প্রাঙ্গণে নামাজ পড়তে দেখলো। সে এগিয়ে এসে রসুল স. এর পরনের চাদর দিয়ে এমনভাবে তাঁর গলায় পেঁচিয়ে ধরলো যে, রসুল স. এর শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হলো। দূর থেকে হজরত আবুবকর এদৃশ্য দেখতে পেয়ে

দৌড়ে এসে উকবাকে সরিয়ে দিলেন। বললেন, তুমি কি এমন একজন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, আল্লাহ্‌ আমার প্রভুপালক। আবু আমরও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে এসেছে এই কথাটুকু— মুশরিকেরা তখন হজরত আবু বকরের উপরে চড়াও হয়ে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করলো তাকে। ঘরে ফিরলেন যখন, তখন তাঁর অবস্থা হয়ে উঠলো অত্যন্ত সঙ্গীন। মাথার চুলে হাত বুলালে চুল উঠে আসতো হাতে। তিনি তখন পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন 'তাবারাক্‌তা ইয়া জালজ্বালালি'। আবু আমর তাঁর 'ইস্তিয়াব' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু বকর এমন সাতটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, আল্লাহ্‌র পথে আসার কারণে যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হতো নিয়মিত। হজরত বেলাল ও হজরত আমের ইবনে ফুহায়রাও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকর তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেননি। বরং প্রকাশ্যে মানুষকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের পথে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিলো অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাঁর সংগঠন ক্ষমতাও ছিলো অনবদ্য। ছিলেন কোমল স্বভাবের। সেকারণে সকলের প্রিয়পাত্রও তিনি ছিলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা নিশ্চিন্তে তাঁর প্রতি নির্ভর করতে পারতো। তাঁর কাছে যারা যাওয়া আসা করতো, তিনি তাদের সকলকে জানাতেন ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ। তাঁর আমন্ত্রণ সূত্রে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বনী আবদে শামসের গোত্রপতি হজরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান, বনী আসাদের গোত্রপতি হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ। শেষোক্ত দু'জন ছিলেন বনী জোহরার গোত্রপতি। আরো ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বনী তালহা গোত্রের হজরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ্‌। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে কুরায়েশদের বিভিন্ন শাখাগোত্রের প্রতাপ গিয়েছিলো কমে।

ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী বলেছেন, নিঃসন্দেহে হজরত আবু বকর সকল সাহাবীর চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। আমি বলি, সলফে সালেহীন এব্যাপারে একমত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেবল ইবনে আবদুল বার বলেছেন, সলফে সালেহীন এ বিষয়ে একমত হতে পারেননি যে, কে শ্রেষ্ঠ— হজরত আবু বকর, না হজরত আলী। তিনি ব্যতীত অন্যান্য বিদ্বজ্জন, যারা তাঁর চেয়ে অধিক প্রজ্ঞাবান ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিন্তু এব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। যেমন ইমাম শাফেয়ী। তিনি হজরত আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য করেননি। আমি বিভিন্ন অনুবৃত্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক (নকলী ও আকলী) দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে অন্যান্য সাহাবীর তুলনায় হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছি আমার 'সাইফে মাসলুল্‌' নামক গ্রন্থে।

ইসলামে হজরত আবু বকরের স্থান ছিলো অত্যন্ত উচ্চে। মেরাজের ঘটনাকে তিনিই সর্বাগ্রে বিশ্বাস করেছিলেন এবং অবিশ্বাসীদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ়তার সঙ্গে। হয়েছিলেন পরিবার-পরিজন-সুহৃদ-স্বজন ছেড়ে রসুল স. এর সঙ্গোপন

www.eelm.weebly.com

হিজরতের একান্ত সখা। রসুল স. এর সঙ্গে বিপজ্জনক সময় অতিবাহিত করেছিলেন সওর পর্বতের গুহায়। হুদায়বিয়ার প্রান্তরে যখন সকলে রসুল স. এর সিদ্ধান্তকে স্বাগতম জানাতে পারছিলেন না, তখনো তিনি ছিলেন রসুল স. এর প্রসন্ন অনুগামী। তখন হজরত ওমরের প্রশ্নাবলীর মোক্ষম জবাবও তিনি দিয়েছিলেন। তদ্রূপ বদরপ্রান্তরেও তিনি প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন। শান্ত করেছিলেন বিচলিত রসুলকে। এতো কিছু করা সত্ত্বেও তিনি অসহায় হয়ে পড়েছিলেন রসুল স. এর মহাতিরোধানের পর। তবুও তিনি অন্যান্যদের মতো সম্বিত হারাননি। বুকের বেদনা বুকে চেপে রেখে অনন্যসাধারণ ভাষণ দান করে জনতাকে করে তুলেছিলেন দায়িত্বসচেতন। শোকাচ্ছন্ন সাহাবীগণকে একথা বোঝাতে সামর্থ্য হয়েছিলেন যে, শোকের চেয়ে দায়িত্ব বড়। যে মহান ধর্ম ইসলামের প্রচার-প্রসার-প্রতিষ্ঠার জন্য রসুল স. তাঁর সারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছিলেন, সে ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে অঙ্গীকার গ্রহণের (বায়াতের) মাধ্যমে নেতা নির্বাচন যে তখন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিলো সেকথা তিনি সকলকে সেদিন বোঝাতেও সমর্থ হয়েছিলেন। সাহাবীগণ তখন তাঁকে ছাড়া আর কাউকে নেতা বলে মেনে নিতে পারেননি। সকলেই তাঁর কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে তাঁকেই মেনে নিয়েছিলেন বিশ্বাসীগণের প্রথম অধিনায়করূপে। অধিনায়কত্ব (খেলাফত) লাভ করার পর সর্বপ্রথম তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন রসুল স. এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার প্রতি। হজরত উসামা ইবনে জায়েদের নেতৃত্বভূত অপেক্ষমান বাহিনীকে প্রেরণ করেছিলেন সিরিয়ায়। মদীনার পার্শ্ববর্তী কিছু কিছু গোত্র সুযোগ বুঝে ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছিলো। তৎসত্ত্বেও তিনি রসুল স. এর অন্তিম সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করে কার্যকর করেছিলেন সিরিয়া অভিযান। পরে ধর্মত্যাগীদেরকেও তিনি কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন। বিদ্রোহীদেরকে করেছিলেন সম্পূর্ণরূপে পরাভূত। তাঁর আর একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি এই ছিলো যে, তিনি তাঁর প্রায় একক সিদ্ধান্তে পরবর্তী খলিফারূপে নিযুক্ত করেছিলেন হজরত ওমরের মতো অতুলনীয়রূপে সফল ব্যক্তিত্বকে।

'তবে আল্লাহ্ উভয়ের কল্যাণের অঙ্গীকার করেছেন' অর্থ সাহাবীগণের প্রথম দিকের দল ও শেষ দিকের দল উভয় দলকে আল্লাহ্ কল্যাণ দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। তাঁদের সকলকেই তিনি দান করবেন সওয়াব, জান্নাত ও আল্লাহ্র সন্তোষ। সুতরাং পরবর্তী সময়ে সংঘটিত সাহাবীগণের মতদ্বৈধতা ও দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ দৃষ্টে তাঁদের কাউকেও মন্দ বলা অসমীচীন। বরং তাঁরা সকলেই যে উত্তম উদ্দেশ্য বিশিষ্ট ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিলো কেবল বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে। ইমান ও ইসলামের ক্ষেত্রে তাঁরা সকলেই ছিলেন ন্যায়বান, বিশুদ্ধচিত্ত এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রকৃত প্রেমিক। তাঁরা জ্ঞানে, গুণে, চরিত্রে পরবর্তী সময়ের সকল মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা তাঁরাই সর্বপ্রথম সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন ইসলামের জন্য জীবন ও সম্পদ উৎসর্গের।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার সাহাবীগণকে মন্দ বোলো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করো, তবুও তা আমার কোনো সাহাবীর একসের অথবা অর্দ্ধসের যব দান করার সওয়াবের তুল্য হবে না।

'ওয়াল্লহু বিমা তা'মালূনা খবীর' অর্থ তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত। অর্থাৎ তোমাদের প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই আল্লাহ্ জানেন। তাই তিনি যথাসময়ে যথাপ্রতিফল তোমদেরকে দান করবেনই। করবেন পুরস্কৃত অথবা তিরস্কৃত।

সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

www.eelm.weebly.com

❑ কে আছে যে আল্লাহ্‌কে দিবে উত্তম ঋণ? তাহা হইলে তিনি বহু গুণে ইহাকে বৃদ্ধি করিবেন তাহার জন্য এবং তাহার জন্য রহিয়াছে সম্মানজনক পুরস্কার।

❑ সেদিন তুমি দেখিবে মু'মিন নর-নারীগণকে তাহাদের সম্মুখভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাহাদের জ্যোতি ছুটিতে থাকিবে। বলা হইবে, 'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তোমরা স্থায়ী হইবে, ইহাই মহাসাফল্য।'

তাফসীরে মাযহারী/৩১১

❑ সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মু'মিনদিগকে বলিবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাহাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করিতে পারি। বলা হইবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরিয়া যাও ও আলোর সন্ধান কর।' অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হইবে একটি প্রাচীর যাহাতে একটি দরজা থাকিবে, উহার অভ্যন্তরে থাকিবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকিবে শাস্তি।

❑ মুনাফিকরা মু'মিনদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, 'আমরা কি তোমাদের সংগে ছিলাম না?' তাহারা বলিবে, 'হাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজদিগকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছ। তোমরা প্রতীক্ষা করিয়াছিলে, সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, অবশেষে আল্লাহ্‌র হুকুম আসিল। আর মহাপ্রতারক তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল আল্লাহ্ সম্পর্কে।'

❑ 'আজ তোমাদের নিকট হইতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না এবং যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহাদের নিকট হইতেও নহে। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, ইহাই তোমাদের যোগ্য; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কে আছে যে, আল্লাহ্‌কে দিবে উত্তম ঋণ'? এখানে সম্বন্ধপদ রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছো, যে আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে উত্তম ঋণ (করজে হাসানা) দান করবে? অথবা এখানে আল্লাহ্‌কে ঋণ দান করার অর্থ আল্লাহ্‌র পথে এই আশায় অর্থ ব্যয় করা যে, আল্লাহ্ এর জন্য উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন। আর 'উত্তম ঋণ' অর্থ— কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষ কামনায় হালাল সম্পদ বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে দান করা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাহলে তিনি বহুগুণে একে বৃদ্ধি করবেন তার জন্য এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার'। এখানে 'ফাইউদ্বয়িফাহু' অর্থ বহুগুণে একে (এই উত্তম ঋণকে) বৃদ্ধি করবেন, যথাপ্রাপ্য অপেক্ষা বাড়িয়ে দিবেন কয়েকগুণ। আর 'ওয়া লাহু আজ্‌রুন্ কারীম' অর্থ এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'সেদিন তুমি দেখবে মুমিন নর-নারীগণকে তাদের সম্মুখভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের জ্যোতি ছুটতে থাকবে। বলা হবে, আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই মহা সাফল্য'। এখানকার 'সেদিন তুমি দেখবে' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে আগের আয়াতের 'বহুগুণে একে বৃদ্ধি করবেন' এর সঙ্গে। অথবা আয়াতের শুরুতে এখানে উহ্য রয়েছে একটি ক্রিয়াপদ 'উজকুর' (স্মরণ করো)। অর্থাৎ হে আমার রসুল! স্মরণ করুন মহাবিচার দিবসের কথা, যখন বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের সঙ্গে থাকবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি আনীত ইমানের নূর, তাদের সামনে ও ডানে। পুলসিরাতে ওই নূরই তাদেরকে পথপ্রদর্শন করবে জান্নাতের।

এখানে 'বাইনা আইদীহিম ওয়া বি আইমানিহিম' অর্থ সম্মুখভাগে ও দক্ষিণপার্শ্বে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে একথা বলে বোঝানো হয়েছে সব দিককে। অর্থাৎ তখন তাদের চতুষ্পার্শ্বে ছুটাছুটি করতে থাকবে জ্যোতি। এমতো তাফসীরের সমর্থনে রয়েছে বোখারী ও মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. যখন নামাজের উদ্দেশ্যে বের হতেন, তখন পাঠ করতেন— আল্লাহুম্মাজ্আ'ল ফী ক্বলবী নূরাওঁ ওয়া ফী বাসরী ওয়া ফী সাময়ী ওয়া ফী ইয়ামীনী নূরাওঁ ওয়া আন শিমালি নূরাওঁ ওয়া খলফী নূরাওঁ ওয়াজ্আ'ল্নী নূরাওঁ' (আয় আল্লাহ্! তুমি জ্যোতি দাও আমার হৃদয়ে, আমার দৃষ্টি শক্তিতে, আমার কর্ণে, আমার ডাইনে, বামে ও পশ্চাতে। আয় আল্লাহ্! আমাকে কোরো জ্যোতির্ময়)। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজা, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এই কথাগুলো— ওয়াজ্আ'ল মিন খলফী নূরাওঁ ওয়া মিন ইয়ামিনি নূরাওঁ ওয়াজ্আ'ল মিন ফাউক্বী নূরাওঁ ওয়া মিন তাহ্তি নূরা আল্লাহুম্মা ই'ত্বিনী নূরা' (আয় আল্লাহ্! তুমি জ্যোতির্ময় কোরো আমার পশ্চাৎ, সম্মুখ ঊর্ধ্ব ও অধোদেশকে। আয় আল্লাহ্!! তুমি আমাকে দান কোরো দীপ্তি)। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীরা তখন সকল দিক থেকে থাকবে নূর দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু সৌভাগ্যবানেরা তখন দুই শ্রেণীর হবে, অগ্রবর্তী ও ডান দিকের দল। তাই সম্ভবত এখানে দুই দিকের নূরের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

জুহাক এবং মুকাতিল কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— তখন তাদের সামনে নূর ছুটাছুটি করতে থাকবে এবং তাদের ডান হাতে থাকবে আমল নামা। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, এখানে সামনে ও ডানে জ্যোতি ছুটতে থাকার অর্থ হচ্ছে— তারা নিজেদের পুণ্য দেখে আনন্দিত হবে এবং তারা কৃতকার্য হবে তাদের জ্যোতির্ময় আমলনামার কারণে। ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, তাদেরকে তখন নূর দেয়া হবে তাদের আমল অনুসারে। যখন তারা পুলসিরাত পার হতে থাকবে, তখন তাদের কারো কারো নূর হবে পাহাড় সমান, কারো কারো নূর হবে খেজুর গাছের মতো। সবচেয়ে কম নূর হবে আঙটির নগিণার মতো। আর তা কখনো হবে প্রোজ্জ্বল, কখনো নিষ্প্রভ। কাতাদা বলেছেন, আমাদের কাছে এরকম আলোচনা পৌঁছেছে যে, রসুল স. বলেছেন, কারো কারো নূর হবে অতি প্রসারিত, মদীনা থেকে এডেনের দূরত্বের মতো। কারো কারো নূর হবে মদীনা থেকে সানআর দূরত্বের সমান। কারো কারো হবে এর চেয়ে কম। আবার কারো কারো নূর আলোকিত করবে তার দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানটুকু।

নূর ও জুলমতের কারণ ঃ হজরত বুরাইদা থেকে আবু দাউদ, তিরমিজি এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহা বিচার দিবসে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি লাভের শুভসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য, যে অন্ধকারে

পায়ে হেঁটে মসজিদে গমন করে। এরকম বর্ণিত হয়েছে সর্ব হজরত সহল ইবনে সা'দ, আবু দারদা, জায়েদ ইবনে হারেছা, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হারেছা ইবনে ওয়াহাব, আবু উমামা বাহেলী, আবু দারদা, আবু সাঈদ খুদরী, আবু মুসা আশয়ারী, আবু হোরায়রা এবং জননী আয়েশা সিদ্দীকা থেকেও। হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাজে যত্নশীল হবে, মহাবিচারের দিবসে তার নামাজ তার জন্য হবে জ্যোতি, প্রমাণ ও পরিত্রাণের নিমিত্ত। আর যে নামাজে যত্নশীল হবে না, তার নামাজ তখন তার জন্য হবে না নূর, দলিল ও নাজাতের কারণ। তার বিচার হবে ফেরাউন, হামান ও কারুনের সঙ্গে। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু সাঈদ থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি সুরা কাহাফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন ওই সুরা হবে তার জন্য মক্কা পর্যন্ত প্রসারিত নূর। অর্থাৎ ওই নূর হবে মক্কা মদীনার দূরত্বের মতো সুবিস্তৃত।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন সুরা কাহাফ তেলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিবসে নূর চমকাতে থাকবে তার পদতল থেকে মেঘমালা পর্যন্ত। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি এর একটি আয়াতও আবৃত্তি করবে, মহাবিচারের দিবসে ওই একটি আয়াতই তার জন্য হবে জ্যোতি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে দায়লামী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উপর দরূদ পাঠ করলে তা তার জন্য নূর হবে পুলসিরাতে। তিবরানী তাঁর 'আলআওসাত' গ্রন্থে লিখেছেন, পৃথিবীতে যে দৃষ্টিহীন, সে যদি পুণ্যবান হয়,

তবে মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ আলো দান করবেন তার চোখে। তিবরানীর বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত উবাদা ইবনে সামেত বলেছেন, হজের সময় মস্তক মুণ্ডনকালে মাটিতে পতিত কেশও মহাবিচারের দিবসে হবে মস্তকমুণ্ডনকারীদের জন্য জ্যোতি। সুপরিণতসূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বায্যার বর্ণনা করেছেন, হজের সময় কংকর নিক্ষেপকারীর কংকরও হবে তার জন্য জ্যোতি। উত্তমসূত্রপরম্পরায় সুপরিণতরূপে হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, ইসলামে অধিষ্ঠিত থাকতে থাকতে যার চুল শাদা হয়ে যাবে, তার জন্য ওই শাদা চুল পরকালে হবে আলো।

বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে অসংলগ্ন সূত্রপরম্পরায় সুপরিণত বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, বাজারে যে জিকির করবে, পরকালে তার শরীরের সকল লোমকূপ হবে নূরানী। উৎকৃষ্ট সূত্রপরম্পরায়— সুপরিণতরূপে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যুদ্ধগমন করে কেউ একটি তীর নিক্ষেপ করলেও ওই তীর তখন তার জন্য হবে জ্যোতি। সুপরিণত সূত্রে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের কোনো সমস্যার সুরাহা করে দিবে, পুলসিরাতে তার জন্য হবে এমন দু'টি নূরের ডালা, যার দ্বারা আলোকিত

হতে পারে একটি গোটা পৃথিবী। আর তার আলোর পরিমাণ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নির্ধারণ করতে পারবে না। হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী, মুসলিম, হজরত জাবের থেকে কেবল মুসলিম এবং হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত ইবনে ওমর থেকে হাকেম এবং হজরত ইবনে জিয়াদ থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জুলমবাজি থেকে বিরত থেকো। কেননা আখেরাতে 'জুলম' (অত্যাচার) পরিণত হবে 'জুলমাতে' (অন্ধকারে)।

'বুশরা কুমুল ইয়াওমা' অর্থ আজ তোমাদের জন্য শুভসংবাদ। অর্থাৎ তখন ফেরেশতারা তাদেরকে বলবে, আজ শুভদিন। সুতরাং তোমাদেরকে জানাই শুভ সংবাদ। বাক্যটি ছিলো ক্রিয়াবাচক। কিন্তু শুভসংবাদের বহমানতা বোঝাতে এখানে কথাটিকে প্রকাশ করা হয়েছে বিশেষ্যবাচকরূপে। আর 'জালিকা হুয়াল ফাওযুল আ'জীম' অর্থ এটাই মহাসাফল্য। 'জালিকা' মানে এটাই। অর্থাৎ এই নূর বা এই সুসংবাদ।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু থামো, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি'।

এখানে 'উনজুরূনা' অর্থ 'নজর' বা 'ইনতেজার'। এর অর্থ— অপেক্ষা করো, একটু দাঁড়াও। 'নাক্বতাবিস্ মিন্নূরিকুম' অর্থ যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। অর্থাৎ তোমাদের আলোতে আমরা পথ চলতে চাই। উল্লেখ্য, কপটাচারীরা তখন থাকবে ঘোর অন্ধকারে। পৃথিবীতে তারা ইমানদার ছিলো না, তাই তখন তারা হবে ইমানের আলোকবিচ্যুত। অন্য এক আয়াতে বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে 'ওয়া মাল্লাম ইয়াজ্‌আ'লিল্লাহু লাহু নূরান ফামা লাহু মিন নূর' (আল্লাহ্ যাকে দীপ্তিময় করবেন না, তার জন্য থাকবে না কোনো দীপ্তি)।

কালাবী ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু উমামা বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ প্রথমে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের উপরে চাপিয়ে দিবেন ঘনঘোর অন্ধকার। কেউ তখন নিজেদের হাতও দেখতে পাবে না। পরে তিনি বিশ্বাসীদের জন্য তাদের নিজ নিজ পুণ্যকর্মের তারতম্যানুসারে নূর সৃষ্টি করবেন। কপটাচারীরা তখন বিশ্বাসীগণের পশ্চাতে চলতে ইচ্ছা করবে। বলবে, একটু দাঁড়াও, যাতে আমরা তোমাদের আলোয় পথ চলতে পারি। হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত আর একটি দীর্ঘ হাদিসের একাংশে উল্লেখ করা হয়েছে, অতঃপর মানুষের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে ঘনঘোর অন্ধকার। এরপর বন্টিত হবে আলোক, দেওয়া হবে কেবল বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদেরকে। অবিশ্বাসী ও কপটাচারীদেরকে কিছুই দেওয়া হবে না। এক আয়াতে বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে—'তমসাবৃত অগাধ জলধির মতো। আস্ফালিত ঢেউয়ের উপর ঢেউ, তার উপর মেঘমালা। অন্ধকারময়। অন্ধকারের উপর অন্ধকার। যখন প্রসারিত করে দিবে তার হাত, তখন দেখতে পাবে না কিছুই। আল্লাহ্ যার জন্য জ্যোতির

প্রতিফলন ঘটাবেন না, তার জন্য হবে না কোনো জ্যোতি। সুতরাং বিশ্বাসীদের আলো দ্বারা অবিশ্বাসী কপটাচারী কেউই উপকৃত হতে পারবে না, যেনো দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নদের চোখের আলো দ্বারা আলো লাভ করতে পারে না দৃষ্টিশক্তিহীনেরা। সে সময় কপটাচারীরা বিশ্বাসীদেরকে বলবে, দাঁড়াও তোমাদের জ্যোতি থেকে কিছু অংশ গ্রহণ করি আমরাও।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলা হবে, তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান করো'। কপটাচারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তখন বলা হবে, তোমরা আমাদের অনুগামী হবার ব্যর্থ চেষ্টা কোরো না। তোমরা যে স্থানে আলো বন্টন করা হচ্ছে সে স্থানে ফিরে যাও। আলো যদি পাও, তবে সেখানেই পাবে। তখন তাদেরকে এরকম বলা হবে তাদের কপটতার উপযুক্ত জবাবরূপে, প্রতারিত করণার্থে। তারা তখন নূর বন্টনের স্থানে ফিরে যাবে, কিন্তু সেখানেও কিছু পাবে না।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাহির্ভাগে থাকবে শাস্তি'। একথার অর্থ— নূর বণ্টনের স্থানে কিছু না পেয়ে কপটাচারীরা পুনরায় ফিরে আসবে বিশ্বাসীদের দিকে। কিন্তু তারা দেখবে, উভয়ের মধ্যে খাড়া করে দেওয়া হয়েছে প্রকাণ্ড প্রাচীর। প্রাচীর গাত্রে একটি দরজাও থাকবে। কিন্তু তা থাকবে অর্গলাবদ্ধ অবস্থায়। ওই দরজার বাইরে চলতে থাকবে শাস্তি এবং অভ্যন্তরভাগে বইতে থাকবে শান্তির সুবাতাস।

ইবনে জারীর ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, লোকেরা যখন ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে, তখন হঠাৎ আল্লাহ্ ঘটাবেন এক ঝলক আলোর সম্পাত। বিশ্বাসীরা সেই আলোর দিকে যেতে শুরু করবে। ওই আলোই তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বেহেশতে। মুনাফিকেরা তখন তাদের পিছনে পিছনে অগ্রসর হতে চাইবে, কিন্তু সামনে দেখবে কেবল অন্ধকার। তাই তারা চীৎকার করে ডাকতে থাকবে বিশ্বাসীদেরকে। বলবে, একটু দাঁড়াও। আমাদেরকে সঙ্গে নাও। পৃথিবীতে তো আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম। বিশ্বাসীরা তখন জবাব দিবে, যে অন্ধকারে তোমরা ছিলে, সেই অন্ধকারেই ফিরে যাও। সেখানে গিয়েই আলোর সন্ধান করতে থাকো। মুজাহিদ সূত্রে ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, হজরত ইয়াজিদ ইবনে শাজারাহ বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালার কাছে লিপিবদ্ধ রয়েছে প্রত্যেকের নাম ধাম দেহাকৃতি, গোপন আলাপন, প্রকাশ্য আলাপচারিতা সবকিছু। মহাবিচারপর্ব শুরু হলে ঘোষণা করা হবে— হে অমুকের পুত্র অমুক! আজ তোমার জন্য কোনো নূর নেই। বাগবী লিখেছেন, তখন মুমিনদেরকে নূর দেওয়া হবে তাদের কৃতকর্ম অনুসারে। ওই নূরের আলোতেই তারা অতিক্রম করবে পুলসিরাত। মুনাফিকদেরকেও নূর প্রদান করা হবে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, যেহেতু তারা পৃথিবীতে ছিলো ধোকাবাজ। হাশর প্রান্তরের দিকে যখন লোকেরা চলতে শুরু করবে, তখন শুরু হবে দমকা হাওয়া ও অন্ধকার, ফলে মুনাফিকদের নূর যাবে নিভে। এ প্রসঙ্গে এক আয়াতে বলা হয়েছে

'ওয়া হুয়া খদিউ'হুম' (আর তিনি প্রতারণা করবেন তাদেরকে)। বিশ্বাসীগণ সেদিন বলবে 'হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের নূর পূর্ণ করে দাও। তাদের এরকম বলার উদ্দেশ্য হবে— মুনাফিকদের মতো যেনো আমাদের নূর নিভিয়ে না দেওয়া হয়। হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রত্যেক তওহীদবাদীকে দেওয়া হবে নূর। আর মুনাফিকদের নূর দেওয়া হবে নিভিয়ে। তাই তারা বলবে 'রব্বানা আত্মিম লানা নূরানা' (আয় আল্লাহ্! পূর্ণ করে দাও আমাদের জ্যোতি)। তিবরানীও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে মুসলিম, আহমদ, ও দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসের এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেদিন মুমিন মুনাফিক সকলকেই নূর দেওয়া হবে। ওই নূরের পিছনেই ছুটবে সবাই। দোজখের পুলের উপরে থাকবে শলাকা ও কাঁটা। ওই শলাকা ও কাঁটা বিদ্ধ করবে তাকে, যাকে আল্লাহ্ আটকাতে চাইবেন। তারপর তিনি নূর নির্বাপিত করে দিবেন মুনাফিকদের।

আমি বলি, প্রকৃত কথা এই যে, মুনাফিকদেরকে সেদিন কোনো নূরই দেওয়া হবে না। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে সেকথাই প্রতীয়মান হয়। তবে যে সকল হাদিসে তাদেরকে নূর দেওয়া হবে বলা হয়েছে, সেগুলোতে আবার একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, পরে তাদের নূর দেওয়া হবে নিভিয়ে। এরকমও হওয়া সম্ভব যে, এখানে 'মুনাফিক' দ্বারা প্রবৃত্তিপূজক বিকৃতবিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে। যেমন শীয়া, খারেজী ইত্যাদি। একথার প্রমাণ পাওয়া যায় ওই হাদিসে, যেখানে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তওহীদবাদীকেই নূর প্রদান করা হবে। আর তওহীদবাদী পদবাচ্য তারাই, যারা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে তওহীদ ও রেসালতকে। যেমন আবদুল কায়েসের প্রতিনিধিদল সম্পর্কে এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্র এককত্বে বিশ্বাস করার অর্থ— তোমরা ওই আল্লাহ্কে উপাস্য বলে মানো, যার কোনো অংশীদার নেই এবং স্বীকার করো, মোহাম্মদ মোস্তফা স. আল্লাহর রসুল।

'ইরজ্বিউ' ওয়ারাআকুম ফাল্তামিসূ নূরান' অর্থ তোমরা পিছনে ফিরে যাও, ও আলোর সন্ধান করো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন বিশ্বাসীরা কপটাচারীদেরকে লক্ষ্য করে এরকম বলবে। কাতাদা বলেছেন, কথাটি বলবে ফেরেশতারা। আর এখানে 'পিছনে ফিরে যাও' অর্থ ওই স্থানে ফিরে যাও, যেখানে নূর বণ্টন করা হয়েছিলো। হজরত আবু উমামা ও হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয়। অথবা 'পিছনে ফিরে যাও' অর্থ এখানে— ফিরে যাও পৃথিবীতে। সেখান থেকে পুনরায় সজ্জিত হয়ে এসো ইমান ও মারেফতের নূরে। সুসম্পন্ন করে এসো পরিশুদ্ধ ইবাদত। কেননা এখানকার নূর প্রকৃত প্রস্তাবে ওই ইমান ও ইবাদতেরই বহিঃপ্রকাশ।

'উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে' অর্থ স্থাপিত হবে বিশ্বাসী ও কপটদের মধ্যে। 'বি সূরিল্ লাহু বাব' অর্থ একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে। 'তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত' অর্থ ওই প্রাচীরের ভিতরে থাকবে চিরসুখময় বেহেশত। কেননা প্রাচীরাভ্যন্তরভাগ বেহেশতসংলগ্ন। 'এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি' অর্থ প্রাচীরের

বহির্ভাগ যেহেতু বেহেশতের বাইরে সেহেতু তা শাস্তির স্থানে বলেই গণ্য। কেননা তা দোজখেরই এলাকা। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, এই আয়াতে যে প্রাচীরের কথা এসেছে, তা হচ্ছে বায়তুল মাকদিসের পূর্ব দিকের দেয়াল। ওই

দেয়ালের ভিতরের দিকে থাকবে বায়তুল মাকদিস এবং বাইরের দিকে থাকবে জাহান্নামের উপত্যকা। ইবনে শোরাইহ্ বর্ণনা করেছেন, হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, এই আয়াতে উল্লেখিত দরজা হচ্ছে বায়তুল মাকদিসের ওই দরজা, যাকে বলা হয় 'বাবুর রহমত'।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'মুনাফিকেরা মুমিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? তারা বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছো'। একথার অর্থ— মুনাফিকেরা যখন প্রাচীরের বহির্ভাগের ঘোর অন্ধকারে আটকা পড়ে যাবে, তখন ইমানদারদেরকে লক্ষ্য করে চীৎকার করে বলতে থাকবে, আমরা কি পৃথিবীতে তোমাদের সঙ্গে নামাজ রোজা করিনি? ইমানদারেরা বলবে, তাতো করেছিলেই। কিন্তু প্রবৃত্তির দাসত্ব করে ও কপটাচরণ করে তোমরা নিজেদের সকল পুণ্য ধ্বংস করে দিয়েছো। বাহ্যত তোমরা নামাজী ও রোজাদার হলেও ভিতরে ভিতরে ভাবতে, রসুল স. পরলোকগমন করলে তোমাদের হাড় জুড়ায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাঙ্খা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিলো'। একথার অর্থ— তোমরা তখন অপেক্ষা করতে রসুল স. এর পরলোকগমনের। তিনি স. যে তোমাদেরকে পরকালের পুরস্কার ও তিরস্কারের কথা বলতেন, সে বিষয়ে তোমাদের ছিলো ঘোর সন্দেহ। মুসলমানদের উপরে বিপদ নেমে আসবেই, তাদের রসুলের মহাপ্রস্থানের পর ইসলামের নাম-নিশানা মুছে যাবেই, এরকম অলীক ধারণাও তোমরা লালন করতে তোমাদের হৃদয়ে। এরকম কপটাচ্ছন্ন অবস্থাতেই একদিন তোমাদের উপরে নেমে এসেছিলো আল্লাহ্র অমোঘ বিধান— মৃত্যু।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর মহাপ্রতারক তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিলো আল্লাহ্ সম্পর্কে'। একথার অর্থ— তখন মহাপ্রতারক শয়তান অথবা দুনিয়া তোমাদেরকে এই মর্মে প্রবঞ্চনা দিয়েছিলো যে, আল্লাহ্ মহাদয়াময়, সুতরাং পাপ করলেও কোনো ক্ষতি নেই, তিনি মাফ করে দিবেন। অথবা ধোকা দিয়েছিলো এমতো প্ররোচনা দিয়ে যে, পুনরুত্থান বলে কোনো কিছু নেই, হিসাব-নিকাশও কখনো হবে না। কাতাদা বলেছেন, কপটাচারীদেরকে শয়তান সবসময় প্রভাবিত করে রাখে। শেষে সে তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে ক্ষান্ত হবে।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'আজ তোমাদের নিকট থেকে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছিলো, তাদের নিকট থেকেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল। এটাই তোমাদের যোগ্য, কতো

নিকৃষ্ট এই পরিণাম'। একথার অর্থ— তখন কপটাচারী ও সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে লক্ষ্য করে এই মর্মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে যে, তোমরা অপরাধী। সুতরাং তোমাদেরকে আজ শাস্তি ভোগ করতেই হবে। কোনোকিছুর বিনিময়েই আজ এ সিদ্ধান্তকে রদ করা হবে না। এখন থেকে তোমরা হবে জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী। এটাই তোমাদের যোগ্য স্থান। হায়, কাপট্য ও সত্যপ্রত্যাখানের শাস্তি কতোই না নিকৃষ্ট।

এখানে 'ফিদইয়াতুন'অর্থ বিনিময়। 'ওয়া লা মিনাল্ লাজীনা কাফারূ' অর্থ এবং যারা প্রকাশ্যে সত্যপ্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দিয়েছিলো, তাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না কোনো বিনিময়। 'মা'ওয়াকুমুন্ নার' অর্থ জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল। 'হিয়া মাওলাকুম' অর্থ এটাই তোমাদের যোগ্য। অথবা— এই স্থানই তোমাদেরকে সহায়তাকারী। কিংবা 'মাওলা' অর্থ এখানে দায়িত্ব গ্রহণকারী। অর্থাৎ পৃথিবীতে থাকতে তোমরা যে জাহান্নামকে অনিবার্য করে নিয়েছিলে, আজ সে-ই হয়েছে তোমাদের দায়িত্ব গ্রহণকারী, বসবাস প্রদাতা।

সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

---

www.eelm.weebly.com

❑ যাহারা ঈমান আনে তাহাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হইবার সময় কি আসে নাই, আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে? এবং পূর্বে

যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মত যেন উহারা না হয়—বহু কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেলে যাহাদের অন্তঃকরণ কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। উহাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

❑ জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌ই ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

❑ দানশীল পুরুষগণ ও দানশীল নারীগণ এবং যাহারা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান করে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে বহু গুণ বেশী এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে সম্মানজনক পুরস্কার।

❑ যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলে ঈমান আনে, তাহারাই তাহাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক ও শহীদ। তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে ও আমার নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছে, উহারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

ইবনে আবী শায়বা তাঁর 'আল মুসান্নাফ' গ্রন্থে আবদুল আজিজ ইবনে রওয়াদ সূত্রে এবং ইবনে আবী হাতেম মুকাতিলের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, কোনো কোনো সাহাবী কিছুটা অতিরিক্ত হাস্য-কৌতুক করতেন। তাঁদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতখানি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আলাম ইয়া'নি'। এর অর্থ সময় কি আসেনি? কোনো কাজের সময় এসে গেলে আরববাসীগণ বলেন 'আনাল আমরু' (অমুক কাজের সময় সমাসন্ন)। 'লিল্ লাজীনা আমানূ' অর্থ যারা ইমান আনে। 'আন তাখ্‌শাআ' কুলূবুহুম লিজিকরিল্লাহ্' অর্থ তাদের হৃদয় আল্লাহত্ব জিকিরে ভক্তি-বিগলিত হবার।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমাদের মুসলমান হওয়া এবং এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে ব্যবধান ছিলো চার বৎসর। অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার পর চার বৎসর অতিক্রান্ত হতে না হতেই আল্লাহ্ এই আয়াত অবতীর্ণ করে আমাদেরকে তিরস্কার করলেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুসলমানদেরকে অলসতায় পেয়ে বসেছিলো। তাই কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হওয়ার ত্রয়োদশ বৎসরের শেষ প্রান্তে আল্লাহ্ আমাদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ করলেন এই তিরস্কারবাণী। ইবনে মোবারক তাঁর 'আজ্‌জুহুদ' গ্রন্থে সুফিয়ান সওরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত আ'মাশ বলেছেন, মুসলমানেরা হিজরতের পূর্বে কোনঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। প্রকারান্তরে তাঁরা স্বগৃহে ছিলেন অন্তরীণ। মুক্ত জীবনের ছোঁয়া পেলেন তাঁরা মদীনায় হিজরতের পর। ফলে প্রায়শ তাঁরা হয়ে পড়তেন আলস্যাক্রান্ত। তাঁদের এমতো আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

www.eelm.weebly.com

ইবনে আবী হাতেম সুদ্দী থেকে এবং তিনি কাসেম থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর কোনো কোনো সহচর কিছুটা অলস হয়ে পড়েছিলেন। তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন 'আল্লাহু নায্যালা আহসানাল হাদীছ' (আল্লাহ্ই অবতীর্ণ করেছেন

চরোমৎকৃষ্ট বাণী)। ফলে সচকিত হলেন তাঁরা। কিছুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় তাঁদের উপরে ভর করলো স্থবিরতা। তাঁরা তখন রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, তাঁদেরকে যেনো এমন কোনো বাণী শোনানো হয়, যাতে করে তাঁরা হতে পারেন স্থবিরতামুক্ত। তখন অবতীর্ণ হয় 'যারা ইমান আনে, আল্লাহ্র স্মরণে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবার সময় কি এখনো আসেনি'? বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, হিজরতের এক বৎসর পর এই আয়াত নাজিল হয়েছিলো মুনাফিকদের সম্পর্কে। ঘটনাটি ছিলো এরকম— একবার কিছুসংখ্যক মুনাফিক হজরত সালমান ফারসীকে বললো, তওরাতে তো অনেক চমকপ্রদ কাহিনী আছে। ওগুলো থেকে আমাদেরকে কিছু শোনান। তখন অবতীর্ণ হলো, 'নাহনু নাক্কুস্‌সু আ'লাইকা আহ্‌সানাল কাসাস' (আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি হৃদয়গ্রাহী ইতিবৃত্ত)। কিছুকাল তারা চুপচাপ থাকলো। তারপর একদিন আবার তারা কাহিনী শোনার আবদার নিয়ে উপস্থিত হলো হজরত সালমানের সামনে। তখন অবতীর্ণ হলো 'আল্লাহু নায্যালা আহ্‌সানাল হাদীছ'। এবারেও কিছুদিন তারা কাটালো চুপচাপভাবে। তারপর আবার একই আবদার নিয়ে হাজির হলো তাঁর কাছে। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। এই প্রেক্ষিতটিকে মেনে নিলে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যারা মুখে মুখে ইমানদার বলে দাবি করে, আল্লাহ্র জিকিরে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হয়ে যাওয়ার সময় কি এখনো অত্যাসন্ন হয়নি?

'ওয়া মা নাযালা মিনাল হাক্ব' অর্থ এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে? অর্থাৎ কোরআন মজীদে? বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত আগের বাক্যের 'আল্লাহ্র স্মরণে' এর সঙ্গে। আর 'আল্লাহ্র স্মরণ' অর্থও কোরআন মজীদ। 'জিকরুল্লাহ্' এবং 'হাক্ব' (আল্লাহ্র স্মরণ এবং সত্য) এদু'টো শব্দই কোরআনের বিশেষণ। আবার এরকমও হয়ে থাকতে পারে যে, 'জিকরিল্লাহ' অর্থ এখানে আল্লাহ্র জিকির।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিলো তাদের মতো যেনো এরা না হয়— বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিলো'। একথার অর্থ— আমার শেষ রসুলের এসকল সহচর যেনো আবার ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো না হয়ে যায়। তাদের উপরেও কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো। কিন্তু সুদীর্ঘ জীবনের আশা-কুহকিনী পেয়ে বসেছিলো তাদেরকে। তাদের সে বাসনা পূরণও করা হয়েছিলো। কিন্তু তা তাদের জন্য বয়ে এনেছিলো কুফল। তাদের অন্তঃকরণ শেষে হয়ে গিয়েছিলো অনম্র।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী'। একথার অর্থ— এভাবে তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিলো বলেই, তারা অবশেষে বেরিয়ে গিয়েছিলো সত্য ধর্মের গণ্ডি থেকে। হয়ে গিয়েছিলো পথভ্রষ্ট, সত্যপরিত্যাগকারী।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'জেনে রেখো, আল্লাহ্ই ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যেভাবে বিশুষ্ক মৃত্তিকাকে

সঞ্জীবিত করেন বারি সিঞ্চনে, সেভাবেই তিনি জীবন্ত করে দেন মানুষের অন্তঃকরণসমূহকে আল্লাহ্র স্মরণ ও কোরআন তেলাওয়াতের দ্বারা। অথবা— আল্লাহ্ মৃত বা শুকনো মাটিকে যেমন প্রাণবন্ত করেন, তেমনি করে তিনি পুনরুত্থান দিবসে জীবন দান করবেন সকলকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি নিদর্শনগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো'। এখানে 'লাআ'ল্লাকুম তা'ক্বিলূন' অর্থ যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো। উল্লেখ্য, হৃদয়ের কাঠিন্য দূর করা ও বিনয়নম্র পরিপক্ক জ্ঞানী হওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'দানশীল পুরুষগণ এবং দানশীল নারীগণ এবং যারা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান করে, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার'।

এখানে জমহুরের ক্বেরাত অনুসারে 'ইন্নাল মুস্‌সাদ্‌দিক্বীনা ওয়াল মুস্‌সাদ্‌দিক্বাতি' (নিশ্চয় দানশীল পুরুষগণ ও দানশীল নারীগণ) কথাটির ক্রিয়ামূল হচ্ছে 'তাসাদ্দুক', বাবে তাফয়ীলের রীতি অনুসারে এখানে 'তা' কে সন্ধি করা হয়েছে আদ্যক্ষরের সঙ্গে। তবে ক্বারী আসেমের ক্বেরাত অনুসারে শব্দটিকে উচ্চারণ করতে হয় 'মুসাদ্দিক্ব'। এমতাবস্থায় কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— স্বীকৃতিদানকারী নর-নারী।

'ক্বরদ্বান হাসানা' অর্থ উত্তম ঋণ। এখানে 'ঋণ'কে 'উত্তম' দ্বারা বিশেষায়িত করার উদ্দেশ্য হয়েছে, একথাটিকেই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য যে, দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে সংকল্পের পরিশুদ্ধিই (বিশুদ্ধ নিয়তই) মূল বিবেচ্য। নতুবা অর্থ ব্যয়ের কোনো সার্থকতাই নেই।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে ইমান আনে, তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক ও শহীদ'।

এখানে 'আস্‌সিদ্‌দীক্বুনা' অর্থ সর্বাধিক স্বীকৃতিদানকারী, বড়ই সত্যবাদী। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত সকল সংবাদকে যে মনেপ্রাণে সত্য বলে বিশ্বাস করে ও মেনে নেয়। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে প্রত্যেক মুমিনকেই সিদ্দীক বা সত্যবাদী বলা যেতে পারে। এই আয়াতের প্রেক্ষিতেই মুজাহিদ মন্তব্য করেছেন, যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের উপরে ইমান আনে, সে সিদ্দীক ও শহীদ।

আমর ইবনে মাইমুন বলেছেন, আর একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে সিদ্দীকের। সেটি হচ্ছে— তিনিই সিদ্দীক, যিনি কামালাতে নবুয়তের উত্তরাধিকারী এবং যার মধ্যে প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে নবীসুলভ গুণাবলী। 'সিদ্দীক' এর এই অর্থটিকেই প্রকট করা হয়েছে এক আয়াতে এভাবে 'ফা উলায়িকা মাআ'ল্ লাজীনা আনআ'মাল্লহু আ'লাইহিম মিনান্ নাবিয়্যিনা ওয়াস্ সিদ্দিক্বীনা ওয়াশ্ শুহাদায়ি ওয়াস্ সলিহীন' (আর তারাই তাদের সাথে হবে যাদেরকে করুণামণ্ডিত করেছেন আল্লাহ্, নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও পুণ্যবানগণের মধ্য থেকে)।

আমি বলি, হতে পারে আলোচ্য আয়াতের তাফসীরের আলোকে 'সিদ্দীক' (সত্যবাদী) ও 'আল্লাজী' (যারা) দ্বারা বুঝানো হয়েছে কেবল সাহাবীগণকে। কেননা আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় ইমানদার ছিলেন কেবল তাঁরাই। 'উলায়িকা' (তারাই) এবং 'সিদ্দীক্বুন' এর মধ্যে পার্থক্যসূচক সর্বনাম (জমীরে ফসল) ব্যবহার করা হয়েছে বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ করণার্থেই। অর্থাৎ একথা বুঝানোর জন্য যে, সাহাবীগণই কেবল সিদ্দীক। আর অধিকাংশ হিসেবেও তাঁরাই সিদ্দীক। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেছেন, সাহাবীগণ সকলেই ছিলেন নবুয়তের নূর-সমুদ্রে আসত্তা নিমজ্জিত। যিনি জীবনে মাত্র একবার রসুল স.কে ইমানের সঙ্গে চাক্ষুষ করেছেন, তিনিও আজীবন নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন নবুয়তের নূরের দরিয়ায়।

আরও একটি বিশেষ অর্থ হতে পারে 'সিদ্দীক' এর। ওই বিশেষ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতেই হজরত আলী বলেছেন, আমিই এখন সবচেয়ে বড় সিদ্দীক। আমার পরে কেবল মিথ্যাবাদীরাই এরকম দাবি করতে পারে। তাঁর এমতো শুভবচনের পরিপ্রেক্ষিতেই জুহাক মন্তব্য করেছেন, এই উম্মতের মধ্যে এ ধরনের সিদ্দীক ছিলেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আটজন— হজরত আবু বকর, হজরত আলী, হজরত জায়েদ, হজরত ওসমান, হজরত তালহা, হজরত যোবায়ের, হজরত সা'দ এবং হজরত হামযা রেদওয়ানুল্লহী আলাইহিম আজ্মায়ীন। এছাড়া নবম সিদ্দীক ছিলেন আর একজন। তিনি হলেন হজরত ওমর। পরে তাঁকেও ওই আটজনের দলভূক্ত করা হয়। কিন্তু একথার অর্থ এটা নয় যে, তিনি প্রথমে নিম্নমর্যাদাধারী ছিলেন, পরে তাঁকে উন্নত মর্যাদা দান করা হয়। বরং একথা বলার কারণ এই যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ওই আটজন সিদ্দীকের ছয় বৎসর পরে। নতুবা তাঁর মর্যাদা তো হজরত আবু বকর ছাড়া অন্য সকল সাহাবীর ঊর্ধ্বে।

'ওয়াশ্ শুহাদা' অর্থ শহীদগণ। হজরত ইবনে আব্বাস, মাসরুক ও একদল তাফসীরকার বলেন, এখানে শব্দটির অর্থ সাক্ষ্যদানকারী। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রসুলের সত্যতার সাক্ষ্যদাতা। বিচার দিবসে সকল উম্মতের জন্য সাক্ষ্যদাতা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'শুহাদা' অর্থ নবী-রসুলগণ। কেননা এক আয়াতে তাঁদেরকে 'শুহাদা' বলা হয়েছে। যেমন 'তখন কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য উপস্থিত করবো সাক্ষ্য। আর আপনাকে উপস্থিত করবো তাদের সকলের উপর সাক্ষ্যদাতা হিসেবে'। হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুকাতিল ইবনে হাব্বানের অভিমতও এরকম। কিন্তু মুকাতিল ইবনে সুলায়মান বলেছেন, এখানে 'শুহাদা' অর্থ শহীদ, আল্লাহ্র পথে প্রাণপাতকারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কুফরী করেছে ও আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী'। একথার অর্থ— যারা সিদ্দীক ও শহীদ, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, তারা

চিরকাল ভোগ করবে দোজখের শাস্তি। অর্থাৎ বিশ্বাসী পাপীরা দোজখে প্রবেশ করলেও চিরকাল সেখানে থাকবে না। পাপক্ষয়ের পর চলে যাবে বেহেশতে। এখানে বাক্যটি সীমিত অর্থপ্রকাশক। অর্থাৎ চিরকাল দোজখের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। আর 'জাহান্নামের অধিবাসী' (আসহাবুল জাহীম) বলেও এখানে একথা বুঝানো হয়েছে যে, তারাই হবে দোজখের অনন্তকালীন বাসিন্দা।

সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

www.eelm.weebly.com

❑ তোমরা জানিয়া রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। উহার উপমা বৃষ্টি, যদ্দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদিগকে চমৎকৃত করে, অতঃপর উহা শুকাইয়া যায়, ফলে তুমি উহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও, অবশেষে উহা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নয়।

❑ তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যাহা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত, যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাদের জন্য যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণে ঈমান আনে। ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন; আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

❑ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংঘটিত করিবার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহ্‌র পক্ষে ইহা খুবই সহজ।

❑ ইহা এইজন্য যে, তোমরা যাহা হারাইয়াছ তাহাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ্ পসন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদিগকে—

❑ যাহারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। যে মুখ ফিরাইয়া লয় সে জানিয়া রাখুক আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

www.eelm.weebly.com

❑ নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদের সংগে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়াছি যাহাতে রহিয়াছে প্রচণ্ড শক্তি ও রহিয়াছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রকাশ করিয়া দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করিয়াও তাঁহাকে ও তাঁহার রাসূলকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

পার্থিব জীবন যে অবক্ষয়প্রবণ, অস্থায়ী ও প্রতারণাপরায়ণ, আর পরকালের শাস্তি ও স্বস্তি যে অনন্ত, সেকথাই উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতখানিতে। পার্থিবতা যে আসলে কী, তা এখানে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি প্রকৃষ্ট উপমার মাধ্যমে। যেমন— বৃষ্টিপাতের ফলে যখন শুষ্ক মৃত্তিকা সঞ্জীবিত হয়, তখন কৃষক তাতে বপন করে শস্যের বীজ। ধীরে ধীরে জেগে ওঠে শস্যসম্ভার। তারপর এক সময় সবুজ শস্য হয়ে যায় পিঙ্গলাভ। তারপর তা শুকিয়ে হয়ে যায় খড়কুটার মতো তুচ্ছ ও মূল্যহীন বস্তু। প্রাণবন্ত পার্থিব জীবনও তেমনি এক সময় মৃত্যুর আঘাতে হয়ে যায় নিঃসাড়, মূল্যবিবর্জিত। শুরু হয় অনন্ত জীবন— স্বস্তির অথবা শাস্তির । সুতরাং চিরস্বস্তি লাভের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এখন থেকেই। হতে হবে বিশ্বাসী ও পুণ্যবান।

এখানে আয়াতের শুরুতেই পার্থিব জীবনকে বলা হয়েছে ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পরস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা। এসকলকিছুই হচ্ছে দুনিয়া, যা মানুষকে মজিয়ে রাখে এবং উদাসীন করে দেয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে।

এখানে 'কামাছালি গইছিন আয়্জাবাল কুফ্ফার' কথাটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, এ নশ্বর জগত ধ্বংসশীল। দ্রুতধাবমান ধ্বংসের প্রতি। কাফেরদের লোভাতুর দৃষ্টি পতিত হয় কেবল বাহ্যিক চাকচিক্যের দিকে। অভ্যন্তরীণ তত্ত্বের দিকে তাদের দৃষ্টি পতিত হয় না। তাই এই আয়াতে বলা হয়েছে 'আয়্জাবাল কুফ্ফার'। বিশ্বাসীদের দৃষ্টি কিন্তু এরকম স্থূল নয়। তারা পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যেই দ্যাখে আল্লাহ্র অভিপ্রায়, প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার বিস্ময়কর নিদর্শন। তাই তাদের মনোভাব ও চিন্তা- চেতনা থাকে সতত পরকালসম্পৃক্ত। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, এখানে 'কাফের' অর্থ কৃষক। কেননা অভিধানে 'কাফের' অর্থ কৃষকও লেখা হয়েছে। 'কুফুর' অর্থ গোপন করা। কাফেরেরা যেমন সত্যকে গোপন করে, তেমনি কৃষকও শস্যবীজকে লুকিয়ে রাখে মাটির নিচে।

এখানে 'ছুম্মা ইয়াহীজু' অর্থ অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। অর্থাৎ দৈব-দুর্বিপাকে হয়ে যায় বিনষ্ট। 'হুত্বামা' অর্থ খড়কুটা, শস্য আহরণের পর যা হয়ে যায় পরিত্যক্ত। অভিধানে এরকমই বলা হয়েছে। 'ওয়া ফীল আখিরাতি আ'জাবুন শাদীদ' অর্থ পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি। 'ওয়া মাগফিরাতুম মিনাল্লহি ওয়া রিদ্বওয়ান্' অর্থ এবং আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। 'হায়াতাদ্ দুন্ইয়া' অর্থ পার্থিব জীবন। আর 'মাতাআ'ল গুরূর' অর্থ প্রতারণার সামগ্রী।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে, যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মতো, যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলগণে ইমান আনে'।

এখানে 'সাবিক্বূ' অর্থ ইমান, ভয়, আশা ও পুণ্যকর্মের সঙ্গে অগ্রণী হও। 'ইলা মাগফিরাতিম মির্রব্বিকুম' অর্থ প্রভুপালকের ক্ষমার দিকে। 'ওয়া জ্বান্নাতিন আ'রদ্বুহা কাআর্দ্বিস্ সামায়ি ওয়াল আরদ্ব' অর্থ সেই জান্নাতের দিকে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মতো। সুদ্দী বলেছেন, 'আরদ্বুহা' অর্থ প্রস্থ। সপ্তআকাশ ও পৃথিবীকে একত্র করা হলে তা হবে জান্নাতের প্রস্থ। তাহলে দৈর্ঘ্য কতো হবে সেকথা কি চিন্তা করা যায়? দৈর্ঘ্য তো সব সময় প্রস্থ অপেক্ষা বড়ই হয়। এখানকার 'উই'দ্দাত লিল্লাজীনা' (যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য) কথাটির মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বেহেশত এখনো বর্তমান। সাথে সাথে একথাও আর অপ্রমাণিত থাকে না যে, জান্নাতে প্রবেশের জন্য ইমান-ই যথেষ্ট। আর 'ইমান' অর্থ একই সঙ্গে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ', যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল'। একথার অর্থ— জান্নাতপ্রাপ্তির বিষয়টি সম্পূর্ণতই

আল্লাহ্র অনুগ্রহনির্ভর। তিনি যাকে ইচ্ছা করবেন, তাকেই জান্নাত দান করবেন। তিনি যে বড়ই অনুগ্রহপরবশ। তাই ইমান যারা আনবে তাদেরকে তিনি দয়া করে জান্নাত প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। অঙ্গীকারও তাঁর অনুগ্রহ। নতুবা তিনি তো কারো ইচ্ছামতো পরিচালিত হতে কখনোই বাধ্য নন। বাধ্যতা, অত্যাবশ্যকতা ও ঔচিত্য থেকে তিনি সততমুক্ত, চিরপবিত্র। পথভ্রষ্ট মুতাজিলারা বলে, ইমানদারদেরকে বেহেশত প্রদান করা আল্লাহ্র জন্য অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ তাদেরকে জান্নাত দিতে তিনি বাধ্য (আল্লাহ্ রক্ষা করুন)।

হজরত আলী থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ বনী ইসরাইলের জনৈক নবীকে এই মর্মে একবার প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলেন যে, তুমি তোমার পুণ্যবান উম্মতকে বলে দাও, তারা যেনো তাদের পুণ্যকর্মের প্রতি নির্ভরশীল না হয়। কেননা মহাবিচারের দিবসে আমি যাকে আযাব দিতে চাইবো, তাকে (হিসাব কঠোর ভাবে গ্রহণ করে) অবশ্যই আযাব দিবো। আর তোমার পাপী উম্মতকে বলে দাও, তারা যেনো নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দেয় (নিরাশ না হয় আমার অনুগ্রহ সম্পর্কে) কেননা সেদিন আমি অনেক বড় বড় পাপীকে ক্ষমা করে দিবো। আমি তো তখন কাউকে গ্রাহ্যই করবো না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমাদের নেক আমল তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনাকেও কী? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, আমাকেও, যদি না আল্লাহ্র অনুগ্রহ আমাকে আবৃত করে। জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, সোজা পথে চলো, নৈকট্য লাভ করো, সুসংবাদ গ্রহণ করো। মনে রেখো, আমল কাউকে বেহেশতে নিয়ে যেতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আপনাকেও কী? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, আমাকেও, যদি না আল্লাহ্র রহমত ও মাগফিরাত আমাকে আচ্ছাদিত করে। হজরত জাবের থেকে মুসলিমও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, হজরত আবু মুসা আশয়ারী ও হজরত শুরাইক ইবনে তারেক থেকে বায্যার এবং হজরত শুরাইক ইবনে জরিফ, হজরত উসামা ইবনে শুরাইক ও হজরত আসাদ ইবনে কদর থেকে তিবরানী।

একটি প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন 'উদখুলূল জ্বান্নাতা বিমা কুনতুম তা'মালূন' (তোমাদের আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করো)। সুতরাং আমল মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না কেনো?

উত্তর ঃ জান্নাতে রয়েছে বহুবিধ মর্যাদা ও স্তর। ওই মর্যাদা ও স্তরসমূহ নির্ধারণ করা হবে আমলের তারতম্যানুসারে। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ ও সেখানে চিরকাল বসবাস নির্ধারিত হবে কেবল আল্লাহ্র অনুগ্রহের কারণে। একথার সমর্থন রয়েছে হান্নাদের 'আজ্জুহুদ' গ্রন্থে হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে, যেখানে তিনি বলেছেন, তোমরা পুলসিরাত অতিক্রম করবে আল্লাহ্র ক্ষমায়, জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ্র অনুগ্রহে এবং জান্নাতে মর্যাদালাভ করবে কৃতকর্ম অনুসারে। আউন ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে আবু নাঈমও এরকম বর্ণনা করেছেন।

'ওয়াল্লহু জুল ফাদ্বলিল আ'জীম' অর্থ আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাদেরকে তিনি এই কারণে জান্নাত দান করবেন যে, তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অসমকক্ষরূপে মহাঅনুগ্রহশীল।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপরে যে বিপর্যয় আসে, আমি তা সংঘটিত করবার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহ্র পক্ষে এটা খুবই সহজ'। একথার অর্থ— সামগ্রিকভাবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপরে রোগ-ব্যাধি, স্বজন-বিচ্ছেদ, দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য যে সকল বিপর্যয় নেমে আসে, সেগুলো সবই আমি লওহে মাহফুজে লিখে রেখেছি। আর আল্লাহ্র পক্ষে এরকম পূর্বনির্ধারণ অতি সহজ একটি বিষয়।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছো, তাতে যেনো তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও'। একথার অর্থ— পৃথিবীর বিপদ-বিপর্যয়ের কারণে তোমরা দুশ্চিন্তিত যেনো না হও, ধৈর্য ধারণ করো এই ভেবে যে, যা অদৃষ্টে ছিলো, তা-ই হয়েছে। আবার কোনো নেয়ামত পেলেও যেনো না হও অতিউৎফুল্ল, যার পরিণতি অহংকার। সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞচিত্ত থেকো এই ভেবে যে, সকল দান আল্লাহ্র। এখানে 'বিমর্ষ না হও' অর্থ এমনভাবে ভেঙে পোড়ো না, যা আল্লাহ্র সিদ্ধান্তে তুষ্ট থাকা এবং ধৈর্যধারণ করার পরিপন্থী। আর 'হর্ষোৎফুল্ল না হও' অর্থ এমনভাবে উৎকট আনন্দ প্রকাশ কোরো না, যাতে করে তা পরিণত হয় অহমিকায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীকে'। একথার অর্থ— যারা উদ্ধত ও গর্বিত, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন না। ইকরামা বলেছেন, প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল হওয়া এবং ক্ষতিতে বিমর্ষ হওয়া মানুষের স্বভাব। তাই আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে তোমরা বেদনাকে ধৈর্য এবং আনন্দকে কৃতজ্ঞতা বানিয়ে নাও। ইমাম জাফর সাদেক উপদেশরূপে বলেছেন, হে মানুষ! তুমি এমন বস্তু সম্পর্কে আক্ষেপ করো কেনো, যা ফিরে আসে না, আর অহংকারই বা করো কেনো এমন জিনিস নিয়ে, যা রয়েছে অন্যের অধিকারে? অর্থাৎ তোমার সার্বক্ষণিক সহচর তো মৃত্যু। যে কোনো সময় তো সে তোমাকে পরাভূত করে ফেলবে। সুতরাং অহমিকা প্রদর্শনের অবকাশ তোমার আর কোথায়?

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'যারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ ভালোবাসেন না তাদেরকেও, যারা কৃপণ এবং অন্যদেরকেও কৃপণতা করতে বলে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। একথার অর্থ— যে কৃপণতাবশত আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার মতো মহাসৌভাগ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে যেনো একথা মনে রাখে যে, কারো বদান্যতা ও কার্পণ্যে আল্লাহ্র কিছু যায় আসে না। কেননা তিনি কোনো বিষয়েই কখনো কারো মুখাপেক্ষী নন। বরং সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী।

www.eelm.weebly.com

'গণি' অর্থ অভাবমুক্ত, ধনী। আর 'হামীদ' অর্থ প্রশংসার্হ। অর্থাৎ সত্তাগতভাবেই তিনি ধনী ও প্রশংসার্হ। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক, অথবা না করুক।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয়ই আমি রসুলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে'। একথার অর্থ— ফেরেশতাদেরকে নবী-রসুলগণের কাছে এবং নবী-রসুলগণকে মানুষের পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরণ করেছি আমিই, স্পষ্ট প্রমাণ ও মোজেজা সহকারে। তাদের সঙ্গে আরো দিয়েছি প্রত্যাদেশিত বাণী ও ন্যায়বিচারবোধ যাতে করে পার্থক্য সূচিত হয় সত্য-মিথ্যার, ভালো-মন্দের, হালাল-হারামের, প্রতিষ্ঠিত হয় সুবিচার, শুভবিবেচনা।

এখানে 'মীযান' অর্থ ন্যায়বিচার, ইনসাফ। মুকাতিল ইবনে সুলায়মান বলেছেন, এখানে 'মীযান' দ্বারা বুঝানো হয়েছে ওই নিক্তিকে, যার দ্বারা ওজন করা হয়। সুতরাং এখানে 'সঙ্গে দিয়েছি ন্যায়নীতি' অর্থ অবতীর্ণ করেছি নিক্তি ব্যবহারের বিধান। যাতে করে মানুষ তার ন্যায্য প্রাপ্য পায়, সীমালংঘন না করে ক্রয়-বিক্রয়ে। কেউ কেউ বলেছেন, নিক্তি ব্যবহারের বিধান নিয়ে হজরত জিবরাইল সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন হজরত নুহের কাছে। আর 'লিইয়াক্বুমান্ নাসু বিলক্বিস্‌ত্ব' অর্থ যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে, খর্ব যেনো না করে কেউ কারো অধিকার।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি লৌহও দিয়েছি, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ'।

এখানে 'ওয়া আন্‌যাল্‌নাল হাদীদ' অর্থ আমি লোহাও দিয়েছি। হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত একটি সুপরিণতসূত্রবিশিষ্ট হাদিসে এসেছে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেছেন চারটি বরকত— লোহা, আগুন, পানি ও লবন। অর্থ বিশারদগণ লিখেছেন, এখানে নাজিল করা অর্থ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ খনিতে লোহা সৃষ্টি করেছেন, তারপর তার ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। কুতরব বলেছেন, এখানকার 'আনযালনা' শব্দটি এসেছে 'নুযুল' থেকে, যার অর্থ বদান্যতা। যেমন বলা হয়ে থাকে 'আন্‌যালাল আমীরু আ'লা ফুলানিন্ নুযুলান হাসানা' (প্রশাসক অমুক ব্যক্তির প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করেছে)। এমতো অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি মানুষকে লোহাও দান করেছি। অন্য এক আয়াতেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থে। যেমন 'আনযালা লাকুম মিনাল আনআ'মি ছামানিয়াতা আয্‌ওয়াজ্ব' (আর আমি তোমাদেরকে দান করেছি আট জোড় চতুষ্পদ জন্তু)।

'ফীহি বা'সুন শাদীদ' অর্থ যাতে রয়েছে প্রচণ্ড রণশক্তি। অর্থাৎ যা দিয়ে তৈরী করা হয় যুদ্ধাস্ত্র এবং যে যুদ্ধাস্ত্র বৃদ্ধি করে সমরশক্তিকে। 'ওয়া মানাফিউ' লিন্‌নাস্' অর্থ এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। অর্থাৎ মানুষ আরো অনেক ধরনের উপকার লাভ করতে পারে লোহা দ্বারা। বরং মানব সভ্যতার পরিকাঠামো যেনো লৌহনির্মিতই।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রকাশ করে দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে এবং তাঁর রসুলকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী'। একথার অর্থ— যাতে তোমরা আল্লাহ্‌কে না দেখেও তাঁর পক্ষে এবং তাঁর রসুলের পক্ষে তাঁদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং জেনে নিতে পারো যে, কে তাঁর রসুলের সাহায্যকারী এবং কে নয়।

'ইন্‌নাল্লহা ক্বভিউন' অর্থ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিমান। অর্থাৎ যাকে খুশী তাকে পরাভূত করতে পারেন। আর 'আ'যীযুন' অর্থ পরাক্রমশালী। অর্থাৎ তিনি কোনো বিষয়েই কখনো কারো মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং তাঁকে সাহায্যের প্রয়োজন, এমন ধারণা রেখে কেউ যেনো তাঁর শত্রু না হয়ে যায়। যেনো জেনে রাখে, জেহাদের বিধান তিনি দিয়েছেন মানুষের উপকারার্থে। যাতে তারা আল্লাহ্‌র দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁর সন্তোষভাজন হওয়ার ও পুণ্যার্জনের সুযোগ লাভ করে। গাজী অথবা শহীদ হয়ে যেনো প্রতিষ্ঠা করতে পারে মহাসত্য ইসলাম। পায় গণিমত, সওয়াব ও জান্নাত।

সূরা হাদীদ আয়াত ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

www.eelm.weebly.com

❑ আমি নূহ এবং ইব্রাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদের বংশধরগণের জন্য স্থির করিয়াছিলাম নুবূওয়াত ও কিতাব, কিন্তু উহাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করিয়াছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।

❑ অতঃপর আমি তাহাদের পশ্চাতে অনুগামী করিয়াছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করিয়াছিলাম মার্ইয়াম-তনয় 'ঈসাকে, আর তাহাকে দিয়াছিলাম ইঞ্জিল এবং তাহার অনুসারীদের অন্তরে দিয়াছিলাম করুণা ও দয়া। আর সন্ন্যাসবাদ— ইহা তো উহারা নিজেরাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করিয়াছিল। আমি উহাদেরকে ইহার বিধান দেই নাই; অথচ ইহাও উহারা যথাযথভাবে পালন করে নাই। উহাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, উহাদিগকে আমি দিয়াছিলাম পুরস্কার এবং উহাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

❑ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তাঁহার অনুগ্রহে তোমাদিগকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদিগকে দিবেন আলো, যাহার সাহায্যে তোমরা চলিবে এবং তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❑ ইহা এইজন্য যে, কিতাবীগণ যেন জানিতে পারে, আল্লাহ্র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও উহাদের কোন অধিকার নাই। অনুগ্রহ আল্লাহ্রই ইখ্তিয়ারে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি তাহা দান করেন। আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি নুহ ও ইব্রাহিমকে প্রেরণ করেছিলাম স্বতন্ত্র মর্যাদাবিশিষ্ট রসুলরূপে। তাদের বংশধরদের মধ্যে আমি অনেককে দিয়েছিলাম নবুয়ত এবং তওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের বংশধরদের অধিকাংশই বেছে নিয়েছিলো পথভ্রষ্টতাকে। অল্পসংখ্যকই গ্রহণ করেছিলো আমা কর্তৃক প্রদত্ত পথনির্দেশনা।

উল্লেখ্য, আগের আয়াতে সাধারণভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রসুল প্রেরণের কথা। বলা হয়েছে 'নিশ্চয় আমি আমার রসুলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ.....'। আর এখানে তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো নবী নূহ ও নবী ইব্রাহিমের কথা। এতে করে বুঝা যায়, এই দু'জন নবীর মর্যাদা অন্যাপেক্ষা স্বতন্ত্র। তাঁদের বংশবিস্তার ঘটেছে বিপুলভাবে। আর তাঁদের মধ্যে নবী-রসুলও আগমন করেছেন অনেক। তাঁদের উপরেই অবতীর্ণ হয়েছিলো প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থসমূহ। তওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিলো হজরত ইব্রাহিমের বংশভূত নবী-রসুলগণের উপর। আবার হজরত ইব্রাহিম ছিলেন হজরত নূহের বংশধর। তাফসীরে মাদারেকে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'কিতাব' অর্থ কলমের লেখা। আরববাসীগণ বলেন। 'কাতাবতু কিতাবান' (আমি কলম দ্বারা লিখেছি)।

‘ফা মিনহুম মুহ্তাদিন’ অর্থ কিন্তু তাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করেছিলো। অথবা ‘হুম’ (তাদের) সর্বনামটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে তাদেরকে, যাদের পথপ্রদর্শনের জন্য নবী-রসুল প্রেরণ করা হয়েছিলো। আর ‘ওয়া কাছীরুম মিনহুম ফাসিকুন’ অর্থ এবং অধিকাংশই ছিলো সত্যত্যাগী।

তাফসীরে মাযহারী/৩৩১

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে অনুগামী করেছিলাম আমার রসুলগণকে’। একথার অর্থ— নবী নুহ, নবী ইব্রাহিম ও তাঁদের উম্মতের পরে আমি প্রেরণ করেছিলাম আরো অনেক নবী রসুল। উল্লেখ্য, এখানে ‘আছারিহিম’ (তাদের পশ্চাতে) এর ‘হিম’ (তাদের) সর্বনামটি ‘জুররিয়াত’ (সন্তান-সন্ততি) এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত হবে না। কেননা পরবর্তী যুগের সকল নবী-রসুলই ছিলেন বর্ণিত নবীদ্বয়ের বংশদ্ভূত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং অনুগামী করেছিলাম মরিয়ম-তনয় ঈসাকে, আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া’। উল্লেখ্য, নবী ঈসা ছিলেন ইসরাইল বংশীয় সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে এবং শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর পূর্বে আর কোনো নবী আবির্ভূত হননি। হজরত ঈসার উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো ইঞ্জিল। আর তাঁর অনুসারীরা ছিলেন কোমলপ্রাণ। তাই এখানে বলা হয়েছে ‘আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া’। এখানে ‘র’ফাতাঁও ও রহমাহ’ অর্থ করুণা ও দয়া। এরকম বলা হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন ‘আর অবশ্যই তুমি পাবে তাদেরকে তাদের স্বজনদের প্রতি সৌহার্দপূর্ণ, যারা বলে আমরা নাসারা’। রসুলেপাক স. এর সাহাবীগণের পারস্পরিক প্রীতির কথাও বলা হয়েছে এক আয়াতে এভাবে— ‘রুহামাউ বাইনাহুম (পরস্পরের প্রতি তাঁরা সমমর্মী)।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আর সন্ন্যাসবাদ, এটা তো তারা নিজেরাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিলো। আমি তাদের এর বিধান দেই নি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি’। একথার অর্থ— আমি তাদেরকে সন্ন্যাসী হতে বলিনি। অতিরিক্ত ইবাদত-বন্দেগী করবে বলে তারা নিজেরাই সন্ন্যাসবাদের প্রবর্তন করেছিলো। কিন্তু সন্ন্যাসবাদকেও শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি। হয়ে গিয়েছিলো বিকৃতির শিকার।

‘রাহ্বানিয়্যাতান’ অর্থ সন্নাসবাদ, অতিরিক্ত উপাসনাপ্রবণতা, জনবিচ্ছিন্নতা, লোভনীয় এমনকি সিদ্ধ সামগ্রীও পরিত্যাগ, দিন-রাত নিরবচ্ছিন্ন রোজা পালন ও নামাজ পাঠ, জীবনভর অকৃতদার থাকা এবং নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করা। ‘রুহবান’ শব্দটি ‘ফু’লান’ এর ওজনে পরিগঠিত হয়েছে ‘রহবুন’ থেকে। যেমন ‘খশ্ইয়ান’ পরিগঠিত হয়েছে ‘খশইয়ুন’ থেকে।

‘মা কাতাব্নাহা আ’লাইহিম ইল্লাব্তিগাআ’ রিদ্বওয়ানিল্লাহ’ অর্থ এটা তো তারা নিজেরাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিলো। এখানে সম্বন্ধপদটি সংযুক্তক অথবা বিযুক্তক। সংযুক্তক হলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বৈরাগ্যবাদের কোনো অংশ আমি তাদের উপরে অপরিহার্য করিনি, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত। আর বিযুক্তক হলে অর্থ দাঁড়াবে— আমি সন্ন্যাসবাদ তাদের উপরে ফরজ করিনি, বরং ফরজ করেছি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাকে।

তাফসীরে মাযহারী/৩৩২

‘ফামা রআ’ওহা হাক্কা রিআ’ইয়াতিহা’ অর্থ আমি তাদেরকে এর বিধান দেইনি, অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি’। অর্থাৎ সন্ন্যাসব্রতও তারা যথাযথভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিলো। অথবা বৈরাগ্যকে তারা বেছে নিয়েছিলো খ্যাতি অর্জনের পন্থা হিসেবে, লৌকিকতা প্রদর্শনার্থে। কিংবা বৈরাগ্য ছিলো তাদের প্রতারণা, পৃথিবীর সাফল্য অর্জনের নিমিত্ত, বা তারা অবশেষে চলে গিয়েছিলো ত্রিত্ববাদের দিকে। অথবা তারা তাদের ওলামা-মাশায়েখদেরকে করে নিয়েছিলো তাদের প্রভুপালক। সেকারণেই প্রত্যাখ্যান করেছিলো হজরত ঈসা এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার নবুয়তকে। কিংবা রসুল স. এর আবির্ভাবের পূর্বে তারা তাঁকে মান্য করলেও আবির্ভাবের পরে তাঁকে করেছিলো অস্বীকার। এ সকল কিছুই ছিলো আল্লাহ্র সন্তোষানুকূল সন্ন্যাসব্রতের পরিপন্থী।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছিলো, তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার এবং তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী’। এখানে ‘যারা ইমান এনেছিলো’ বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল সৌভাগ্যবানকে, যারা সন্ন্যাসবাদকে গ্রহণ করেছিলো বিশুদ্ধচিত্তে কেবল আল্লাহ্র পরিতোষ অর্জনার্থে। তারা অবশেষে হজরত ঈসার অসিয়ত অনুসারে ইমান এনেছিলো শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর উপরে।

‘ফাআতাইনাল্ লাজীনা আমানু মিনহুম আজ্বরহুম’ অর্থ তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার। এখানে ‘পুরস্কার’ অর্থ ওই সওয়াব, যা পুণ্যকর্মের বিনিময়ে দান করবেন বলে আল্লাহ্ অঙ্গীকার করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেছিলেন তাদেরকে, যারা সন্ন্যাসব্রতকে গ্রহণ করেছিলো বিশুদ্ধচিত্তে, কেবল আল্লাহ্র পরিতোষ কামনায়। আর ‘ওয়া কাছীরুম মিনহুম ফাসিকুন’ অর্থ তাদের অধিকাংশই ছিলো সত্যত্যাগী। অর্থাৎ তাদের মধ্যে অধিকাংশই হজরত ঈসাকে মান্য করেনি। কেউ আবিষ্কার

www.eelm.weebly.com

করেছিলো ত্রিত্ববাদ, আবার কেউ ধর্মীয় পণ্ডিত ও পুরোহিতদেরকে বানিয়ে নিয়েছিলো তাদের প্রভুপালক। কেউ কেউ ছিলো তাদের পথভ্রষ্ট সম্রাটদের অনুসারী, আবার কেউ হজরত ঈসার ধর্মাদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সর্বশেষ রসুলকে করেছে অস্বীকার।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আমি একবার রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলাম। তিনি স. বললেন, হে ইবনে মাসউদ! শোনো, তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত আহলে কিতাবীরা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো বায়াত্তরটি দলে। তার মধ্যে পরিত্রাণ পেয়েছে মাত্র তিনটি দল। ওই তিনদলের এক দল ছিলো তারা, যারা যুদ্ধ করেছিলো তাদের ধর্মভ্রষ্ট রাজাদের বিরুদ্ধে। রাজারা তাদেরকে হত্যা করেছে। ফলে তারা হয়ে গিয়েছে শহীদ। আর এক দল ছিলো তারা, যারা রাজাদের বিরুদ্ধতা করার ক্ষমতা রাখতো না। এরকম সামর্থ্যও তাদের ছিলো না যে, তারা রাজাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নির্বিকচিত্তে হজরত ঈসার ধর্মাদর্শের দিকে আহ্বান জানাবে। তারা নির্বিঘ্ন ইবাদতের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলো দেশ থেকে দেশান্তরে। তাদের সম্পর্কেই এ আয়াতে বলা হয়েছে 'আর

সন্ন্যাসবাদ ....'। তিনি স. আরো বললেন, যারা আমার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং আমার অনুগামী হয়েছে, তারাই প্রকৃতপক্ষে সংরক্ষণ করেছে সন্নাসবাদকে (এই দলটিই তৃতীয় দল)। আর যে আমার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে না, সে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।

বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি একবার একটি গাধার পিঠে রসুল স. এর পশ্চাতে আরোহণ করেছিলাম। তিনি স. বললেন, হে উম্মে আবাদ তনয়! তুমি কি জানো, বনী ইসরাইলেরা বৈরাগ্য প্রথাকে গ্রহণ করেছিলো কীভাবে? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, নবী ঈসার আকাশারোহণের পর তাদের এক রাজা হয়ে গেলো খুবই শক্তিশালী। সে সবসময় পাপকাজে লিপ্ত থাকতো। বিশ্বাসীরা তার আচরণে ক্ষিপ্ত হলো। অস্ত্রধারণ করলো তার বিরুদ্ধে। কিন্তু পরাজয় বরণ করলো পরপর তিনবার। তাদের সংখ্যাও গেলো কমে। তখন তারা ভাবলো, এভাবে লোক ক্ষয় হতে থাকলে আমরা তো ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো। সত্যাদর্শের দিকে আহ্বান জানানোর জন্য কেউই আর অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং এখন আমাদের উচিত বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়া এবং ওই নবীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় থাকা, যার অসিয়ত করে গিয়েছেন নবী ঈসা। এ প্রস্তাবে সম্মত হলো সকলে। তারা লোকালয় ছেড়ে চলে গেলো। আশ্রয় গ্রহণ করলো পর্বতের গুহায়। এভাবে হয়ে গেলো পৃথিবীবিরাগী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দৃঢ়তার সঙ্গে সত্য ধর্ম আঁকড়ে ধরে রইলো এবং কেউ কেউ হয়ে গেলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এর পর তিনি স. আবৃত্তি করলেন 'আর সন্ন্যাসবাদ এটাতো তারা নিজেরাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভের জন্য প্রবর্তন করেছিলো'। এরপর তিনি স. 'তাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছিলো, তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার' এই বাক্যটির মর্মার্থ করে বললেন— যারা বিশুদ্ধ সন্ন্যাসবাদে প্রতিষ্ঠিত ছিলো, আমি তাদের পুরস্কৃত করেছি। শেষে বললেন, হে উম্মে আবাদ তনয়! তুমি কি জানো, আমার উম্মতের জন্য সন্ন্যাস্য কী? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর বার্তাবাহকই ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, আমার উম্মতের সন্ন্যাস্য হচ্ছে হিজরত, জেহাদ, নামাজ, রোজা, হজ, ওমরা এবং উচ্চস্থানে আরোহণকালে 'আল্লাহু আকবার' বলা।

বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতেরই এক ধরনের বৈরাগ্য আছে। আর আমার উম্মতের বৈরাগ্য হচ্ছে আল্লাহ্র পথে জেহাদ। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ঈসার আকাশারোহণের পর বনী ইসরাইলের বাদশাহরা তওরাত ও ইঞ্জিলের কোনো কোনো অংশ পরিবর্তন করে ফেলেছিলো। কিন্তু তাদের মধ্যে একদল সত্যাশ্রয়ী মানুষকে সত্যধর্মের দিকে আহ্বান জানাতে থাকলো। কিছুসংখ্যক কুটচক্রী তাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলো বাদশাহর কানে। বললো, তাদেরকে শাহী দরবারে ডাকা হোক। বলা হোক পরিবর্তিত ইঞ্জিল

পাঠ করতে। যদি তারা এ নির্দেশ মানে তো ভালোই, যদি না মানে, তবে অবাধ্যতার অপরাধে তাদেরকে হত্যা করাই হবে সমীচীন। বাদশাহ তাদের প্রস্তাব পছন্দ করলো। তলব করলো সত্যধর্মপ্রচারকদেরকে। বললো, তোমাদের সামনে এখন দু'টি পথ খোলা। পরিবর্তিত ইঞ্জিল পাঠ, অথবা মৃত্যু। ধর্মপ্রচারকদের কেউ কেউ বললো, আমাদেরকে যখন আপনি সহ্য করতে পারছেন না, তখন এক কাজ করুন। একটি উঁচু স্থান নির্মাণ করে আমাদেরকে সেখানে উঠিয়ে দিন। সেখানেই আমাদের পানাহারের সামগ্রী পাঠিয়ে দিবেন। আমরা নিচে নেমে আর কখনো আপনাদেরকে বিরক্ত করবো না। কেউ কেউ বললো, আমরা আর কখনো লোকালয়ে বাস করবো না। বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবো। তোমরা যদি আমাদেরকে কোনো জনবসতিতে দ্যাখো, তবে আমাদেরকে হত্যা করে ফেলো। আবার কেউ কেউ বললো, আমরা জনমানবহীন জায়গায় কূপ খনন করে চাষাবাদ করবো। তোমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবো না। বাদশাহ তাদের প্রস্তাবে সম্মত হলো। তারা যা বলেছিলো সেভাবে নবী ঈসার ধর্মে থেকেই শুরু করলো নতুন ধরনের জীবন যাপন। তাদের মৃত্যুর পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো অন্যেরা। তারা

আর পূর্বসূরীদের আদর্শে অটল থাকতে পারলো না। পরিবর্তন সাধন করলো আল্লাহ্‌র কিতাবের। বলতে লাগলো অমুক অমুক পুণ্যবান ব্যক্তি যেখানে যেখানে ইবাদত করতেন আমরাও সেখানে সেখানে গিয়ে ইবাদত করবো। অমুক সাধুপুরুষ দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। আমরাও ঘুরে বেড়াবো তাদের মতো করে। অমুক সাধক জঙ্গলে ঘর তৈরী করেছিলেন, আমরাও ঘর বানাবো জঙ্গলে। এধরনের কথা যারা বলতে শুরু করলো, তারা সকলেই ছিলো অংশীবাদী। তারা মনে করতো, তারা পুণ্যাত্মাগণের যথা অনুসরণ করছে, কিন্তু বিশুদ্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কই ছিলো না। ওই সকল পথভ্রষ্ট পুরোহিতদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে 'আর সন্ন্যাসবাদ— এটা তো তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিলো। অর্থাৎ পূর্ববর্তী পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কেবল আমার তুষ্টি লাভের আশায় প্রবর্তন করেছিলো সন্ন্যাসবাদদের। পরবর্তী প্রজন্মের ব্যর্থ অনুকারকেরা সে সন্ন্যাসবাদকে করে ফেলে বিকৃত। উভয় দলের কথা বলা হয়েছে এখানে এভাবে, 'তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার এবং তাদের অধিকাংশই ছিলো সত্যত্যাগী'। রসুল স. এর মহাআবির্ভাব যখন ঘটলো, তখন খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের সংখ্যা ছিলো অতি নগণ্য। তাদের মধ্যে খানকাবাসীরা, দেশদেশান্তর পর্যটনকারীরা এবং গীর্জায় বসবাসকারীরা আপন আপন জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এলো। ইমান আনলো রসুল স. এর উপর।

তিবরানী তাঁর 'আল আওসাত' গ্রন্থে জনৈক অপ্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আবিসিনিয়ায় সম্রাটের চল্লিশজন বিশিষ্ট সঙ্গী পুণ্যভূমি মদীনায় এসেছিলেন। উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা। সে যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্তও হয়েছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু শহীদ কেউই হননি। তাঁরা ছিলেন খুবই কোমলপ্রাণ। সাহাবীগণের অনেকের আর্থিক দুরবস্থা দেখে

তাঁরা মনো কষ্ট পেতেন। তাই একদিন তাঁরা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আমরা নিজ নিজ এলাকায় বিত্তপতি বলে পরিচিত। সদয় অনুমতি পেলে আমরা দেশ থেকে কিছু সহায়-সম্পদ এনে আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দকে দিতে পারি। তাদের এমতো প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো 'আল্‌লাজীনা আতাইনাহুমুল কিতাবা মিন্ ক্বাবলিহি হুম বিহী ইউ'মিনূন.......' (এর পূর্বে যাদেরকে আমি যে গ্রন্থ দিয়েছিলাম তা বিশ্বাস করতো তারা ....)। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁরা সাহাবীগণকে বলতে শুরু করলেন, হে ভ্রাতৃবৃন্দ! দ্যাখো, আল্লাহ্ কী বললেন। আমরা যদি তোমাদের কিতাবের প্রতি ইমান আনি, তবে লাভ করবো দ্বিগুণ পুরস্কার। যদি না আনি, তবে পাবো একগুণ, যেমন তোমরা পাও। তাঁদের এমতো মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত (২৮)।

বলা হয়— 'হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

ইবনে আবু দাউদ ও হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, মুকাতিল বলেছেন, 'উলায়িকা ইউ'তাওনা আজ্বরাহুম মার্‌রাতাইন' (তাদেরকে তাদের বিনিময় দেওয়া হবে দু'বার) এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন আহলে কিতাবগণের মধ্যে যাঁরা ইমান এনেছিলেন, তাঁরা সাহাবীগণের সম্মুখে এই নিয়ে গর্ব করতে শুরু করলেন। বলতে লাগলেন, আমরা পাবো দ্বিগুণ সওয়াব, আর তোমরা পাবে একগুণ। সাহাবীগণ বিব্রত হলেন। এমতো পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদেরকে এবং অন্যান্য মুসলমানকে, সাধারণভাবে তাঁদের সকলকেই আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে দেওয়া হলো দ্বিগুণ পুরস্কারের সুসংবাদ। বলা হলো— 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার'। এখানে 'তাঁর ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো' কথাটি বলা হয়েছে অধিকতর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের তাগিদ প্রদানার্থে। এমতো নির্দেশ দিতে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর রসুল যে সকল বিধিবিধান নিয়ে এসেছেন, তোমরা তার সকল কিছুই সর্বান্তঃকরণে জেনে নাও ও তার বাস্তবায়ন ঘটাও।

বাগবী এবং অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'হে মুমিনগণ' বলে বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে কেবল তাঁদেরকে, যারা ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মমত ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে ওই সকল লোক; যারা নবী মুসা ও নবী ঈসার অনুসরণ করতে, তারা শেষ রসুলের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করো। যদি তোমরা এরকম করো, তবে আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবেন। একগুণ তোমাদের পূর্ববর্তী

নবী ও তাঁদের উপরে অবতারিত কিতাবকে বিশ্বাস করার কারণে এবং আর একগুণ শেষ রসুল ও তাঁর উপরে অবতীর্ণ কোরআনে বিশ্বাস রাখার কারণে। বায়যাবী লিখেছেন, শেষ রসুলের আবির্ভাবের কারণে যদিও পূর্ববর্তী ধর্মমতসমূহ রহিত হয়েছে, তবুও পূর্বের সত্য ধর্মমতে বিশ্বাস রাখার কারণে একগুণ পুণ্য তো তাঁরা পেতেই পারেন। কেননা পূর্বের নবী ও কিতাবসমূহও ছিলো সত্য।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, রসুল স. এর জামানার শুধু খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, আলোচ্য আয়াতে 'হে বিশ্বাসীগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে তাঁদেরকেই। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু মুসা আশয়ারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তিন প্রকারের মানুষ দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হবে— ১. যারা তাদের নিজেদের নবীগণকে বিশ্বাস করতো, তারপর বিশ্বাস করলো শেষ রসুল মোস্তফা স.কে। ২. যে গোলাম আল্লাহ্র হক আদায় করার সাথে সাথে আদায় করে তার মনিবের হক। ৩. যে তার ক্রীতদাসীকে শয্যাসঙ্গিনী করে, দ্বীনধর্ম শিক্ষা দেয়, তারপর তাকে মুক্ত করে দিয়ে গ্রহণ করে স্ত্রীরূপে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে'। একথার অর্থ— আর তিনি তোমাদেরকে দিবেন এমন আলো, যার মাধ্যমে তোমরা অতিক্রম করতে পারবে পুলসিরাত। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুকাতিল। আলোচ্য আয়াত এবং 'ইয়াস্আ' নূরুহুম বাইনা আইদিহিম ওয়াবি আইমানিহিম (তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণে প্রদীপ্ত হবে দীপ্তি) আয়াত সমঅর্থসম্পন্ন। অর্থাৎ আয়াতদ্বয় পরস্পরের পরিপূরক। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'নূর' (আলো) অর্থ কোরআন মজীদ। মুজাহিদ বলেছেন, এর অর্থ— সুস্পষ্ট হেদায়েত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আর তিনি তোমাদেরকে এমন পথ প্রদর্শন করবেন, যাতে করে তোমরা পৌঁছে যেতে পারবে জান্নাতে এবং আল্লাহ্র নৈকট্যভাজনতার মঞ্জিলে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— এবং দ্বিগুণ পুরস্কার ও আলো তো তিনি দিবেনই, তদুপরি তোমাদেরকে করবেন মার্জনা। কেননা তিনি মহাক্ষমাপরবশ, পরম অনুকম্পাশীল।

ইবনে জারীর লিখেছেন, কাতাদা বলেছেন, আমার কাছে এইমর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন আহলে কিতাবীরা কিছুটা ঈর্ষান্বিত হলো। তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (২৯)।

বলা হলো— 'এটা এ জন্য যে, কিতাবীগণ যেনো জানতে পারে, আল্লাহ্র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোনো অধিকার নেই। অনুগ্রহ আল্লাহ্রই এখতিয়ারে। যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল'।

এখানে 'লিআল্লা ইয়া'লামা আহলুল কিতাব' (এটা এ জন্য যে, কিতাবীগণ যেনো জানতে পারে) বাক্যে ব্যবহৃত না-সূচক 'লা' অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। 'আল্লা ইয়াক্বদিরূনা আ'লা শাইইন্ মিন ফাদ্বলিল্লাহ' অর্থ আল্লাহ্র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোনো অধিকার নেই। অর্থাৎ স্বযোগ্যতা বলে আল্লাহ্র আনুগত্য করার ক্ষমতা কারো নেই। কাতাদা থেকে বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যা ওই বর্ণনাটির অনুকূল, যা বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস, ইবনে আবী হাতেম ও মুকাতিল কর্তৃক। তাঁরা বলেছেন, আগের আয়াতে 'হে মুমিনগণ' বলে কেবল আহলে কিতাবী সাহাবীগণকে বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে। বাগবী লিখেছেন, কাতাদা বলেছেন, যে সকল আহলে কিতাব রসুল স. এর প্রতি ইমান আনেনি, তারা তাদের মধ্য থেকে যারা ইমান এনেছিলেন, তাদেরকে হিংসা করতো। বলতো, আমরা আল্লাহ্র সন্তান। সুতরাং তাঁর বাঞ্ছিত ও মনোনীত। তাদের এমতো অপধারণা ও অপবচনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। 'আল্লাহ্র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরে তাদের কোনো অধিকার নেই' বলে তাদেরকে স্পষ্ট করে একথা জানিয়ে দেওয়া হয় যে, যেহেতু তারা শেষ রসুলকে মান্য করেনি, তাই তারা কোনো প্রকার সওয়াবই পাবে না। কেননা সকল প্রকার সওয়াবই ইমান সম্পৃক্ত। সুতরাং যার ইমান নেই, তার সওয়াবও নেই।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানকার 'লিআল্লা ইয়া'লামু (যেনো জানতে পারে) কথাটির 'লা' অতিরিক্ত নয়। তাদের এমতো অভিমতানুসারে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কিতাবীরা যেনো এরকম না ভাবে যে, রসুল ও তার অনুসারীরা সওয়াব পেতে পারেন না। মুজাহিদের উক্তিরূপে ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এবং বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, কিতাবীরা মনে করতো, তারা আল্লাহ্র সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এর বিপরীত। তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। কেননা তারা আল্লাহ্র রসুলকে প্রত্যাখ্যানকারী। হজরত আলীর উক্তি বলে পরিচিত এক বর্ণনায় এসেছে, ইহুদীরা বলতো, অচিরেই আমাদের মধ্যে এমন এক নবীর আবির্ভাব ঘটবে, যিনি মুসলমানদের হাত-পা কর্তন করবেন। আল্লাহ্ তাদের বক্তব্য খণ্ডনার্থে তাই বলেছেন, নবী প্রেরণ হচ্ছে আল্লাহ্র অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহ সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকেই নবী নির্বাচন করেন। তিনি মহা অনুগ্রহশীল। আর তাঁর এই মহান অনুগ্রহে তাদের কোনো প্রকার অধিকারই নেই।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর উল্লেখ করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমাদের আয়ুষ্কাল অতীত যুগের উম্মতের আয়ুষ্কালের তুলনায় এতোই নগণ্য, যেমন আসর থেকে মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়। তাদের সঙ্গে তোমাদের তুলনাটি এরকম— এক মালিক একদল শ্রমিককে বললো, তোমরা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এক কিরাতের বিনিময়ে কে আমার কাজ করতে চাও? ইহুদীরা বললো, আমরা। দুপুর হলে মালিক বললো, জোহর থেকে আসর পর্যন্ত এক

www.eelm.weebly.com

কিরাতের বিনিময়ে আমার কাজ করবে কে? খৃষ্টানেরা বললো, আমরা। এরপর আসরের সময় মালিক বললো, আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত যারা কাজ করবে, তাদের জন্য নির্ধারণ করা হলো দুই কিরাত। এ সময়ের মধ্যে কাজ করবে তোমরা। এভাবে কাজ সম্পন্নকারী শ্রমিকদের প্রথম দল হলো ইহুদী, দ্বিতীয় দল খৃষ্টান এবং তৃতীয় দল হলে তোমরা। প্রথম দল ও দ্বিতীয় দল অসন্তুষ্ট হলো। বললো, আমরা কাজ করলাম বেশী, অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম। লোকটি বললো, আমি কি তোমাদের প্রতি জুলুম করেছি? তারা বললো, না। মালিক বললো, এ হচ্ছে আমার অনুগ্রহ। আমি যাকে খুশী তাকে আমার অনুগ্রহ দান করি।

হজরত আবু মুসা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইহুদী, নাসারা ও মুসলমানের উদাহরণ এরকম— কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি কতিপয় শ্রমিককে নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সারা দিনের জন্য কাজে নিযুক্ত করলো। তারা দুপুর পর্যন্ত কাজ করার পর বললো, পারিশ্রমিক আমাদের মনঃপুত হয়নি। সুতরাং আমরা আর কাজ করবো না। এই বলে তারা কাজ করা বন্ধ করলো। ওই ব্যক্তি তখন নিযুক্ত করলো আর এক দল শ্রমিককে। বললো, দিবসের অবশিষ্টাংশের কাজ করে দাও, পুরো পারিশ্রমিক পাবে। তারা কাজে লেগে গেলো। আসর পর্যন্ত কাজ করার পর বললো, নাহ, আমরা আর কাজ করবো না। পারিশ্রমিকের প্রয়োজনও আর নেই আমাদের। মালিক বললো, দিন শেষ হতে তো আর বেশী দেরী নেই। কাজটা শেষ করো। কিন্তু তারা তার কথা মানলো না। তখন মালিক তার কাজ সম্পন্ন করলো আর এক দল শ্রমিককে দিয়ে এবং আগের দু'দলের পারিশ্রমিক দিয়ে দিলো তাদেরকেই। এটাই শেষ উম্মতকে আলো দান করার উপমা। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

আমি বলি, হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে ওই ইহুদী ও খৃষ্টানদের কথা বলা হয়েছে, যারা তাদের শরিয়ত রহিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্র বিধানের উপরে আমল করেছিলো। আল্লাহ্পাক তাঁর সদয় অঙ্গীকার অনুসারে তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। আর হজরত আবু মুসা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে ওই সকল ইহুদীর প্রসঙ্গ, যারা হজরত মুসার উপরে ইমান আনতে অস্বীকার করেছিলো। আর 'নাসারা' অর্থ ওই সকল লোক, যারা রসুল স.কে স্বীকার না করে হয়ে গিয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। অথচ তারা এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলো যে, শেষ রসুলের মহাআবির্ভাব যখন ঘটবে এবং তিনি স. যখন পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে সত্য বলে ঘোষণা করবেন, তখন তারা তাঁর উপরে ইমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। এধরনের আহলে কিতাবের জন্য কোনোই প্রতিদান নেই এবং তাদের সকল পুণ্যকর্মও হয়ে যাবে নিষ্ফল। আর উভয় হাদিসে শেষ উম্মতের জন্য রয়েছে শুভ সমাচার। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতগণকে যে পুরস্কার দেওয়া হবে, তার দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়া হবে মুসলমানদেরকে। আবার একথাটিও আর একটি শুভসমাচার যে, এই উম্মতের পুণ্যবানেরা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে সত্যাধিষ্ঠিত। হজরত মুয়াবিয়া বলেছেন, আমি

স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের একদল লোক সব সময় আল্লাহ্র হুকুমের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কেউ তাদেরকে সাহায্য করুক, অথবা কেউ তাদের বিরুদ্ধাচরণ করুক, তারা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এভাবে একসময় এসে পড়বে মহাপ্রলয়। বোখারী, মুসলিম।

আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইরবাস ইবনে সারীয়া বলেন, রসুল স. শয্যাগ্রহণকালে পাঠ করতেন 'মুসাব্বিহাত' (যে সকল সুরার প্রথমে রয়েছে 'সাব্বাহা' 'ইউসাব্বিহু' ও 'সাব্বিহ') এবং 'বলতেন, এ সকল সুরার মধ্যে এমন আয়াত রয়েছে, যা হাজার আয়াতের চেয়ে উত্তম। আমি বলি, সে সকল আয়াত হচ্ছে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা সংক্রান্ত আয়াত। পরিণতসূত্রে হজরত মুয়াবিয়া থেকে নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, 'মুসাববিহাত' হচ্ছে সুরা হাদীদ, সুরা হাশর, সুরা সফ, সুরা তাগাবুন, সুরা জুমআ এবং সুরা আ'লা। আমি বলি, সুরা বনী ইসরাইলও মুসাব্বিহাতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া তা উল্লেখ করেননি। তবে নাসাঈ, তিরমিজি ও হাকেমের বর্ণনায় এরকমও বলা হয়েছে যে, রসুল স. সুরা বনী ইসরাইল ও সুরা যুমার পাঠ না করে নিদ্রা যেতেন না।

অষ্টাবিংশতিতম পারা

সূরা মুজ্বাদালাহ্

এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে জ্যোতির্ময় ভূমি মদীনায়। এর মধ্যে রয়েছে ৩টি রুকু এবং ২২টি আয়াত।

হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং যথাসূত্রসম্বলিত বলে আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, সকল পবিত্রতা ওই আল্লাহ্র, যাঁর শ্রবণক্ষমতা সর্বত্রগামী, একদিন খাওলা বিনতে ছা'লাবা এসে রসুল স. এর কাছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলো। আমি তার সব কথা শুনতে পাইনি। শুনতে পেলাম শুধু এতটুকু, সে বললো, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! সে আমার মালমাত্তা সব খেয়ে ফেলেছে। আর আমি তার জন্য এতোদিন ধরে আমার পেটকে খাটালাম (সন্তান-সন্ততি ধারণ করলাম)। এখন আমি প্রজনন ক্ষমতারহিত। আর এমতাবস্থায় সে আমার সঙ্গে জেহার করলো। সে আমার সঙ্গে মেলামেশা করা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি আল্লাহ্র কাছে এর বিচার চাই। খাওলা এরকম বলার পর স্থান ত্যাগ করার আগেই অবতীর্ণ হলো নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ। বলা হলো—

সূরা মুজ্বাদালাহ্ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

---

www.eelm.weebly.com

❑ আল্লাহ্ অবশ্যই শুনিয়াছেন সেই নারীর কথা, যে তাহার স্বামীর বিষয়ে তোমার সহিত বাদানুবাদ করিতেছে এবং আল্লাহ্‌র নিকটও ফরিয়াদ করিতেছে। আল্লাহ্ তোমাদের কথোপকথন শোনেন, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

❑ তোমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে, তাহারা জানিয়া রাখুক— তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাদের মাতা নহে, যাহারা তাহাদিগকে জন্মদান করে কেবল তাহারাই তাহাদের মাতা; উহারা তো অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল।

❑ যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে এবং পরে উহাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে একে অপরকে স্পর্শ করিবার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করিতে হইবে, ইহা দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার খবর রাখেন।

❑ কিন্তু যাহার এ সামর্থ্য থাকিবে না, একে অপরকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তাহাকে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করিতে হইবে; যে তাহাতেও অসমর্থ, সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াইবে; ইহা এই জন্য যে, তোমরা যেনো আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন কর। এইগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান; কাফিরদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

❑ যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাদিগকে অপদস্থ করা হইবে যেমন অপদস্থ করা হইয়াছে তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে; আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছি; কাফিরদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি—

❑ সেই দিন, যেদিন উহাদের সকলকে একত্রে উত্থিত করা হইবে এবং উহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা উহারা করিত; আল্লাহ্ উহার হিসাব রাখিয়াছেন, আর উহারা তাহা বিস্মৃত হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ক্বদ্ সামিআ'ল্লহ্'। এর অর্থ আল্লাহ্ নিশ্চয় শুনেছেন। এখানে 'ক্বদ' (নিশ্চয়) শব্দটি 'সামিআ' (শুনেছেন) ক্রিয়াটিকে রূপায়িত করেছে নিকটবর্তী অতীতে। কথাটির মাধ্যমে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, রসুল স. অথবা তাঁর নিকট অভিযোগ উত্থাপনকারিনীর এমতো আশা ছিলো যে, আল্লাহ্ যেনো অভিযোগটি শুনেছেন এবং এ বিষয়ে একটি সুন্দর সমাধান দান করবেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সঙ্গে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহ্‌র নিকটও ফরিয়াদ করছে'। এখানে 'তুজ্বাদিলুকা' অর্থ বাদানুবাদ করছে। 'যাওজ্বিহা' অর্থ নারী। অর্থাৎ হজরত খাওলা। তাঁর স্বামী ছিলেন হজরত আউস ইবনে সামেত। 'তাহাভুরাকুমা' অর্থ কথোপকথন। আর 'ইন্নাল্লহা সামীউ'ন বাসীর' অর্থ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! যে নারী তার স্বামীর সম্পর্কে আপনার কাছে নালিশ করেছে এবং আমার কাছে সমাধানের আশা পোষণ করেছে, তার ও আপনার কথোপকথন আমি অবশ্যই শুনেছি। আর বিষয়টি আমার অগোচর নয়। কেননা আমি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আউস ইবনে সামেতের স্ত্রী হজরত খাওলাকে লক্ষ্য করে। হজরত খাওলা ছিলেন সুন্দরী। আর হজরত আউস ছিলেন তেজস্বী। একবার তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে গোপন মিলনের তীব্র আকাংখা পোষণ করলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী প্রকাশ করলেন বিরূপ মনোভাব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রেগে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে জেহার করলেন (বললেন, তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশ সদৃশ)। কিছুক্ষণ পর তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হলো। তখন তাঁর অপবচনের জন্য তিনি অনুতপ্ত হলেন খুব। কেননা 'জেহার' ও 'ইলাকে' তখনো পর্যন্ত গণ্য করা হতো তালাক বলে। তাই তিনি তাকে বললেন, আমার তো মনে হচ্ছে, এখন থেকে তুমি আর আমার জন্য আর বৈধ নও। হজরত খাওলা বললেন, অসম্ভব। এরকম কিছুতেই হতে পারে না। তিনি তখন রসুল স. এর সুমহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে সবকথা খুলে বললেন। সে সময় জননী

www.eelm.weebly.com

আয়েশা রসুল স. এর মস্তকের এক পার্শ্ব ধৌত করে দিচ্ছিলেন। হজরত খাওলা বললেন, আ'উস যখন আমাকে বিয়ে করেছিলো, তখন আমি ছিলাম যুবতী ও বিত্তবতী। তাছাড়াও আমি ছিলাম সম্ভ্রান্তবংশীয়া। এখন আমি বিগতযৌবনা, বিত্তহীনা ও বংশীয় প্রতাপচ্যুতা। এমতাবস্থায় সে আমাকে জেহার করেছে। অবশ্য সে এখন অনুতপ্তও। এখন আমাদের সম্পর্ক রক্ষার কী কোনো উপায় আছে? রসুল স. বললেন, তুমি তো এখন তার জন্য অবৈধ। হজরত খাওলা বললেন, আমি আমার অসহায় অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছি। তার সঙ্গে আমি এতোদিন কাটালাম। তার সন্তান-সন্ততি উদরে ধারণ করলাম। রসুল স. বললেন, কিন্তু কোনো উপায় তো দেখছি না। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে আমাকে কোনো বিধানও জানানো হয়নি। হজরত খাওলা এ সকল কথা শুনেও শুনলেন না। বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁর নিজের কথাই বলতে লাগলেন। রসুল স. তাঁর

শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন, তুমি যা কিছু বলো না কেনো, এখন তুমি তার জন্য হারাম। তিনি তখন বললেন, ঠিক আছে, আমি আল্লাহ্র কাছেই ফরিয়াদ জানালাম। আমার সন্তান-সন্ততিরা আমার কাছে থাকলে অভুক্ত থাকবে। আর তাদেরকে ফেলে চলে এলে তাদের যত্ন করার কেউ থাকবে না। শেষে তিনি আকাশের দিকে মস্তক উত্তোলন করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! আমার অভিযোগ কেবল তোমার কাছে। তুমি, তোমার নবীর উপরে নতুন বিধান অবতীর্ণ করো। উল্লেখ্য, এটাই ছিলো ইসলামের প্রথম জেহার। জননী আয়েশা উভয়ের কথাবার্তা শুনেছিলেন। হজরত খাওলা রসুল স.কে পুনরায় বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার উদ্দেশ্যে আমি উৎসর্গীকৃতা। আপনি আমার ব্যাপারে বিবেচনা করুন। জননী মহোদয়া বললেন, খাওলা! চুপ করো। আর কথা বাড়িয়ো না। তাকাও রসুল স. এর মুখমণ্ডলের দিকে। উভয়ে দেখলেন, রসুল স. এর মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হচ্ছে প্রত্যাদেশের প্রভাব। রসুল স. কিছুক্ষণ প্রত্যাদেশাচ্ছন্ন অবস্থায় কাটালেন। স্বাভাবিক অবস্থায় যখন ফিরে এলেন, তখন বললেন, যাও, তোমার স্বামীকে ডেকে আনো। হজরত খাওলা দ্রুত প্রস্থান করলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন তাঁর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে। রসুল স. তখন তাদেরকে পাঠ করে শোনালেন সদ্য অবতীর্ণ বিধান। জননী মহোদয়াও উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন সদ্য অবতীর্ণ আকাশাগত বাণীসম্ভার। বললেন, ওই আল্লাহ্ প্রভূত কল্যাণময়, যাঁর শ্রবণ ক্ষমতা বেষ্টন করে রাখে সমস্ত আওয়াজকে। তিনি আরো বলেছেন, আমি ইত্যবসরে ঘরের ভিতরে চলে গিয়েছিলাম। তাই খাওলার সব কথা শুনতে পাইনি। কিন্তু আল্লাহ্ তার সকল কথা শুনেছেন এবং সেই প্রেক্ষিতে বিধানও অবতীর্ণ করেছেন।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীগণের সঙ্গে জেহার করে তারা জেনে রাখুক— তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়, যারা তাদেরকে জন্মদান করে, কেবল তারাই তাদের মাতা। তারা তো অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল'।

'জেহার' অর্থ স্ত্রীকে এরকম বলা যে, তুমি আমার কাছে আমার মাতার পৃষ্ঠদেশ সদৃশ অবৈধ। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে জেহার করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটতো। কিন্তু ইসলামী শরিয়ত তা মনে করেনি। বরং বলেছে, এর ফলে ঘটে সাময়িক সম্পর্কচ্ছেদ। নির্ধারিত কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) পরিশোধ করার পর পুনরায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য হয়ে যায় আগের মতো হালাল।

'জেহার' শব্দটি এসেছে 'জাহার' থেকে। তবে ফকিহ্গণ জেহারকে কেবল মায়ের পৃষ্ঠদেশের তুলনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বলেছেন, রমণীদের যে সকল অঙ্গ অনাবৃত রাখা নিষিদ্ধ, সে সকল অঙ্গের তুলনা আনলেই তা হবে 'জিহার' পদবাচ্য। যেমন উরুদেশ, লজ্জাস্থান। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, স্ত্রীকে মায়ের যে কোনো অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করলে জেহার হবে। যে সকল অঙ্গ ঢেকে

রাখা নিষিদ্ধ নয়, সে সকল অঙ্গের তুলনাও । যেমন হাত, চোখ, মুখ। এভাবে দাদী, নানী, কন্যা, ফুফু, খালা— যে সকল নারীর সঙ্গে চিরদিনের জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ, সে সকল নারীর কোনো অঙ্গের সঙ্গেও স্ত্রীকে তুলনা করলে তা জেহার বলে সাব্যস্ত হবে। তিনি এমন শর্তও আরোপ করেছেন, তুলনীয়াগণের মর্যাদা আনুসাঙ্গিক নয়। সুতরাং তাঁর মতে দুধ মাতা ও পিতার অপর স্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করলে জেহার হবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে, এদের সঙ্গে তুলনা করলেও জেহার হবে। কেননা তাদের সঙ্গে চিরদিনের জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ। স্ত্রীর কোনো অনির্দিষ্ট অঙ্গ অথবা পূর্ণ অঙ্গের স্থলাভিষিক্ত কোনো অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হলেও জেহার সাব্যস্ত হবে। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বললো, তোমার মাথা, লজ্জাস্থান, চেহারা, ঘাড়, শরীর, জীবন, সত্তা, নিম্নাঙ্গ,অথবা একতৃতীয়াংশ শরীর আমার মায়ের পিঠের মতো। কেননা এ সকল অঙ্গ উল্লেখ করলে সম্পূর্ণ মানুষটিকেই বুঝায়। তবে কেউ যদি বলে, তোমার হাত, অথবা পা আমার মায়ের পিঠের মতো, তবে জেহার হবে না। ইমাম শাফেয়ীর প্রকাশ্য উক্তি এর পরিপন্থী। যদি কেউ তার পত্নীকে বলে, তুমি আমার কাছে এমন, যেমন আমার মা, অথবা বলে, তুমি আমার কাছে আমার মায়ের মতো, তবে এমতাবস্থায় বিধান নির্ভর করবে তার নিয়তের (উদ্দেশ্যের) উপর। এ জাতীয় কথার মাধ্যমে যদি পত্নীকে সম্মান প্রদর্শন বুঝানো হয়, তবে তাকে মিথ্যাবাদী বলা যাবে না। কেননা স্ত্রী জাতিকে সম্মানিতা করার জন্য

www.eelm.weebly.com

এরকম উপমা প্রদান বহুল প্রচলিত। আর এর দ্বারা যদি জেহার বুঝানো হয়, তবে তা যুক্তিযুক্ত হবে। কারণ এরকম কথা শারীরিক উপমা হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। ব্যাষ্টি বলে সমষ্টি বুঝানোর রীতিটিও সুপ্রচলিত। কিন্তু এরকম বক্তব্যে ভাব সুস্পষ্ট না হওয়ার কারণে নিয়তের বিষয়টি বিবেচ্য বলে গণ্য হবে। আর এরকম কথা বলে যদি তালাকের নিয়ত করে, তবে তালাকে বায়েন হবে। সেক্ষেত্রে বক্তব্যটির অর্থ হবে— তুমি আমার নিকটে আমার মায়ের মতো হারাম। আর যদি কোনো নিয়তই না করে, তবে কথাটি হয়ে যাবে বাতিল। ইমাম মোহাম্মদ বলেন, কোনো নিয়ত না করলেও এমতাবস্থায় জেহার হবে।

মাসআলা ঃ কেউ যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ করে স্ত্রীকে মায়ের পিঠের সঙ্গে তুলনা করে, বলে, তুমি এক মাসের জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো, তবে এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ী বলেন, এমতাবস্থায় জেহার হবে না। বরং তার এমতো উক্তি হয়ে যাবে বাতিল। অপর বর্ণনানুসারে, তিনি বলেন, এমতাবস্থায় জেহার সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মোহাম্মদের অভিমতও এরকম। এমতাবস্থায় ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি সে তার স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করে, তবে তাকে কাফ্‌ফারা দিতেই হবে। আর নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এরকম করলে কাফ্‌ফারা লাগবে না। ইমাম আহমদ বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঙ্গমে লিপ্ত হতে চাইলে পূর্বাহ্নে কাফ্‌ফারা পরিশোধ করা জরুরী। অর্থাৎ প্রথমে কাফ্‌ফারা আদায় করবে, তারপর সঙ্গমে লিপ্ত হবে। অন্যথায়

গোনাহগার হবে এবং পুনরায় কাফ্‌ফারা দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফার মতে এমতাবস্থায় সে গোনাহগার হবে, কিন্তু পুনরায় কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। তবে দ্বিতীয়বার এরকম করলে তার উপরে পুনঃকাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। আর নির্ধারিত সময়ের পরে এরকম করলে কাফ্‌ফারা আর লাগবে না। ইমাম মালেক বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জেহারের উল্লেখ করলেও তা স্থায়ী জেহার বলে গণ্য হবে।। এক বর্ণনামতে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এরকম।

জেহার সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে সুলায়মান ইবনে ইয়াসার সূত্রে হজরত সালমা ইবনে সাখার থেকে। তিনি বলেছেন, আমার সঙ্গমস্পৃহা ছিলো অত্যধিক। একবার রমজান মাসের জন্য আমি আমার স্ত্রীকে জেহার করলাম। ফলে তার সঙ্গে ঘটে গেলো সঙ্গমবিচ্ছেদ। এক রাতে সে আমার সেবা যত্ন করছিলো। হঠাৎ তার শরীরের আবরণযোগ্য এক অঙ্গের প্রতি আমার দৃষ্টি পতিত হলো। আমি আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না। সম্পন্ন করলাম আমার উদগ্র অভিলাষ। সকালে বাড়ির লোকজনের কাছে ব্যাপারটি প্রকাশ করলাম। বললাম, তোমরা আমাকে রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে নিয়ে চলো। আমার বিষয়টি তাঁর কাছে নিবেদন করো। তারা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তা করতে পারবো না। আমাদের ভয় হয়, শেষে আমাদের বিরুদ্ধে না জানি কোনো বিধান অবতীর্ণ হয়। অথবা রসুল স. এমন কোনো কথা বলেন, যাতে করে আমরা লজ্জিত হয়ে পড়ি। শেষে আমি স্বয়ং রসুল স. এর মহান সংসর্গে হাজির হয়ে সব কথা খুলে বললাম। তিনি স. বললেন, সত্যিই কি তুমি এমন করেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরকম প্রশ্ন তিনি স. করলেন আরো তিনবার। আমিও তিনবার একই উত্তর দিলাম। তখন তিনি স. বললেন, একটি গর্দান আজাদ করে দাও। আমি আমার গর্দানের এক পাশে হাত রেখে বললাম, শপথ ওই সত্তার যিনি আপনাকে তাঁর বার্তাবাহকরূপে প্রেরণ করেছেন, আমি তো এই গর্দান ছাড়া আর কোনো গর্দানের (ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর) মালিক নই। তিনি স. বললেন, তাহলে দু'মাস রোজা রাখো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! রোজার জন্যই তো এরকম অঘটন ঘটলো। তিনি স. বললেন, তাহলে সদকা করো (ষাটজন মিসকিনকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করাও)। আমি নিবেদন করলাম, শপথ ওই পবিত্র সত্তার। যিনি আপনাকে তাঁর প্রত্যাদেশবাহকরূপে পাঠিয়েছেন, আমি তো গতরাতও উপোস করে কাটিয়েছি। তিনি স. বললেন, তুমি যুরাইক গোত্রের জাকাত সংগ্রাহকের কাছে গিয়ে তোমার দুরবস্থার কথা জানাও। তোমার কথা শুনলে সে তোমাকে কিছু দিবে। তুমি তার কাছ থেকে নিয়ো এক ওসাক খেজুর (ষাট সা'য় হয় এক ওসাক। আর এক সা প্রায় চার সেরের সমান)। ওই খেজুর দিয়ে ষাট জন দরিদ্রকে আহার করিয়ো। যদি তা থেকে কিছু বাঁচে, তবে তা ব্যবহার কোরো তোমার পরিজনবর্গের জন্য। একথা শুনে আমি প্রথমে বাড়ি এলাম। বাড়ির লোকজনদেরকে বললাম, আমি তো তোমাদের কাছে পেয়েছি সংকীর্ণতা ও দুর্ব্যবহার। আর রসুল স. এর কাছে গিয়ে পেলাম প্রশস্ততা ও বরকত। রসুল স.

আমাকে জাকাতের মাল গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম আহমদ, হাকেম ও নাসাঈ ব্যতীত অন্যান্য সুনান রচয়িতা এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। শায়েখ আবদুল হক বর্ণনাটিকে চিহ্নিত করেছেন বিচ্ছিন্নরূপে। কেননা সুলায়মান ইবনে ইয়াসার হজরত সালমা ইবনে সাখারের সাক্ষাত কখনো পাননি। বোখারীর বরাত দিয়ে তিরমিজিও এরকম বর্ণনা করেছেন। হাকেম ও বায়হাকী ঘটনাটি মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ছওবান এবং সালমা ইবনে আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন এভাবে— হজরত সালমা ইবনে সাখার তাঁর স্ত্রীকে তাঁর মায়ের পিঠের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন কেবল রমজান মাসকে নির্দিষ্ট করে। কিন্তু তিনি রমজান মাসেই তা ভঙ্গ করেছিলেন। রসুল স.কে জানালে তিনি স. নির্দেশ দিয়েছিলেন, একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দাও।

www.eelm.weebly.com

ইবনে জাওজী এই হাদিস থেকে দু'টি বিধান বের করেছেন— ১. নির্দিষ্ট সময়ের জেহার কথিত সময়ের সঙ্গেই সম্পৃক্ত, চিরকালের জন্য নয়। ২. জেহারকারী কাফ্ফারা পরিশোধের পূর্বে সহবাস করলে পাপী হবে এবং কাফ্ফারা পরিশোধও তার উপরে হবে ওয়াজিব। তবে বর্ণিত হাদিসে এমন কোনো শব্দ নেই, যার মাধ্যমে বুঝা যায়, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জেহার কেবল ওই নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। তবে হ্যাঁ, একথা অবশ্যই প্রতীয়মান হয় যে, কথিত জেহারের বাক্য বাতিল বলে গণ্য হবে না, শরিয়তের দৃষ্টিতে তা সুনির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হোক, অথবা হোক স্থায়ী। সুতরাং ইবনে জাওজীর বক্তব্য বৈপরীত্যকণ্টকিত। কেননা সাময়িক জেহারকে যদি আমরা স্থায়ী জেহার হিসেবে মেনেও নিই, তবুও একথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে সহবাস করলে পুনরায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে পড়বে। এরকমও হতে পারে যে, রমজান মাসের সম্মানহানি করার কারণে রসুল স. হজরত সালমাকে কাফ্ফারা দিতে বলেছিলেন। আর কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে সহবাস করলে গোনাহগার হবে, কিন্তু সম্মানহানির বিধানটিও বিদ্যমান থাকবে। তাছাড়া কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) অপরিহার্য ওই ব্যক্তির জন্য, যে পুনরায় সহবাস করার ইচ্ছা করে এবং সম্মাননার বিষয়টি দূর করে দিতে চায়। আর কেউ ক্ষতিপূরণ প্রদানের আগে সহবাস করার পর যদি 'বাইন' তালাক দিতে চায়, তবে তার উপরে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু হানিফার অভিমত এরকম। অতএব বর্ণিত হাদিসের ভিত্তিতে সারকথা এটাই দাঁড়ায়— সাময়িক জেহার স্থায়ী জেহারের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। কেননা হজরত সালমা জেহার করেছিলেন কেবল রমজান মাসের জন্য, যা রমজান অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। তাই তার জন্য তো ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু রসুল স. তাঁকে দুই মাস রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর রমজান শেষ হওয়ার আগে দু'মাসের রোজা তো কল্পনাই করা যায় না।

মাসআলা ঃ জেহারকে শর্তযুক্ত করা ইমাম শাফেয়ীর মতে সিদ্ধ। হজরত সালমা ইবনে সাখার তাঁর জেহারকে শর্তযুক্ত করেছিলেন রমজানের সঙ্গে। ইবনে

রাফেয়ী বলেছেন, সুনান গ্রন্থাবলীতে উল্লেখিত বর্ণিত হাদিস দ্বারা অনুমিত হয়, হজরত সালমা দিয়েছিলেন জেহারের নির্দিষ্ট সময়সম্পৃক্ত ঘোষণা। তিনি বিষয়টিকে শর্তসম্পৃক্ত করেননি। বায়হাকীর বর্ণনামতেও ইবনে রাফেয়ীর উক্তির সমর্থন মিলে।

মাসআলা ঃ কেউ জেহারকে শর্তযুক্ত করার পর যদি বাইন তালাক দেয় এবং সেই তালাকের পর যদি শর্তের উপস্থিতি ঘটে, তবে তা তালাকই হবে। জেহার হবে না। ইবনে হুম্মাম এরকম বলেছেন।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, বিবাহের শর্তে জেহার করা সিদ্ধ। যেমন কেউ কোনো রমণীকে বললো, আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি, তবে তুমি হবে আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মতো। এরপর যদি সে ওই রমণীকে বিবাহ করে, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি রজব অথবা রমজান মাসে আমার কাছে আমার মাতৃপৃষ্ঠসদৃশ, এরপর যদি সে রজব মাসে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দেয়, তবে তা যথেষ্ট হবে। রমজান মাসে তাকে আর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

মাসআলাঃ কেউ যদি জেহার করার পর পাগল হয়ে যায়, আবার যদি ভালোও হয়ে যায়, তবে তার জেহার অটুট থাকবে। এমতাবস্থায় বিধান তার মূলের দিকে ধাবিত হবে না, যতক্ষণ না সে সহবাস করবে। ইমাম শাফেয়ীর একটি বক্তব্য এর বিপরীত।

মাসআলা ঃ একাধিক স্ত্রীধারী ব্যক্তি যদি তার সকল স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে, তোমরা আমার কাছে ওই রকম, যে রকম আমার জননীর পৃষ্ঠদেশ, তবে তাদের সকলের উপর এক সঙ্গে জেহার কার্যকর হবে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, ক্ষতিপূরণ কি তাকে স্ত্রীদের সংখ্যানুপাতে আদায় করতে হবে, না একটি ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট হবে সকলের জন্য, এ নিয়ে মতপ্রভেদ রয়েছে। হাসান বসরী, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, তিবরানী ও সুফিয়ান সওরী বলেন, এমতাবস্থায় ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে স্ত্রীদের সংখ্যানুসারে। আর ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেন, তাদের সকলের পক্ষ থেকে একটি ক্ষতিপূরণই হবে যথেষ্ট। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, বায়হাকী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর এবং মুজাহিদ বলেন, হজরত ইবনে আব্বাস এরকমই বলেছেন। ওরওয়া , তাউস এবং হজরত আলীর অভিমতও এরকম। তাঁরা সকলে ইলার বিষয়টিকে কিয়াস করেছেন কসমের সঙ্গে। (অর্থাৎ যদি কেউ শপথ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার স্ত্রীদের নিকট থেকে, তাহলে শপথ ভঙ্গ করে পুনর্মিলনের বিধান হচ্ছে, সকল স্ত্রীর পক্ষ থেকে একটি মাত্র প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য পৃথক পৃথক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না)।

আমরা বলি, এমতাবস্থায় জেহারের কারণে সকল স্ত্রীই হারাম হয়ে যায়, আর ক্ষতিপূরণ তাদের সকলকে করে দেয় হালাল। স্বামীর জন্য সকল স্ত্রী যেমন ভিন্ন ভিন্নভাবে হারাম হয়ে যায়, তেমনি তাদেরকে হালাল করতে হলেও দিতে হবে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষতিপূরণ। আর শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ তো অত্যাবশ্যক হয় আল্লাহ্ কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞাকে ভঙ্গ করার জন্য। এদিকে আল্লাহ্ কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তো একটি, একাধিক নয়।

মাসআলা ঃ একজন স্ত্রীর সঙ্গে এক বৈঠকে, অথবা বিভিন্ন বৈঠকে যদি কয়েকবার কেউ জেহার করে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে প্রত্যেকবারের জন্য আলাদা আলাদা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা জেহার করাতে বিবাহের উপরে কোনো

প্রতিক্রিয়া পতিত হয় না। প্রতিবারই বিবাহ বলবৎ থাকে পূর্বের মতো। সে কারণেই একাধিকবার জেহার সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ হারামের বিভিন্ন কারণ একত্র হওয়া সম্ভব। যেমন রোজা অবস্থায় মদ্যপান হারাম। মদ্যপান এমনিতেও হারাম, আবার তা রোজা ভঙ্গ করে বলেও হারাম। এভাবে কেউ যদি মদ্যপান না করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করে, তবে এমতাবস্থায় মদ্যপান হারাম, আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার কারণেও তা হারাম। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রে দু'টি হারাম একত্র হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার জেহারের শব্দাবলী উচ্চারণ করার পূর্বে যদি জেহারকে সুদৃঢ় করার নিয়ত করে এবং জেহারকারী যদি বলে, আমার তো একবার জেহার করারই নিয়ত ছিলো, তবে বিচার ও ধর্মপরায়ণতা উভয় দিক দিয়েই তাকে সত্যবাদী বলে সাব্যস্ত করা যাবে। তালাকের বিধান আবার এর বিপরীত। দুই বা তিনবার তালাক দেওয়ার পর যদি কেউ বলে, আমিতো একাধিকবার 'তালাক' বলেছি প্রথম তালাককে সুদৃঢ় করণার্থে, তবে তার কথা ধর্তব্য হবে না। কেননা জেহারের সম্পর্ক আল্লাহ্র অধিকার সম্পৃক্ত এবং তালাকের সম্পর্ক সম্পৃক্ত মানুষের অধিকারের সঙ্গে।

মাসআলা ঃ প্রথম জেহারেই হারামের বিধান বলবৎ হয়। তাই দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বারে নতুন করে হারামের বিধান বলবৎ হয় না। পূর্বের হারামটিই বলবৎ থাকে। একই ধরনের বিভিন্ন কারণ দ্বারা হারামের পুনঃপৌনিকতা সাব্যস্ত হয় না। তাই একাধিক জেহারের হারাম এক ক্ষতিপূরণ দ্বারাই দূর হয়ে যায়, যেমন বিভিন্ন কারণে ওজু ভঙ্গ হলে এক ওজুতেই তা দূর হয়ে যায়।

আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে 'তোমাদের মধ্যে' (মিনকুম)। কথাটি আরবের গোত্রীয় প্রাচীন কুসংস্কারের উপর একটি তিরস্কার। অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে। এতে করে বুঝা যায়, জিম্মিদের (জিযিয়া কর প্রদান করে মুসলিম রাজ্যের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বিধর্মী) জেহার বৈধ নয়। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক এরকম বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের অভিমত এর বিপরীত। প্রথম মতটির প্রমাণ এই যে, কাফেরেরা আমাদের ধর্মবিধানভূত নয়। সুতরাং কিয়াস করে তাদেরকে আমাদের ধর্মবিধানভূত করার বিষয়টি বেশ জটিল। কেননা জেহার এক ধরনের অপরাধ। এ অপরাধের বিধান হচ্ছে হারাম হওয়া। এই হারাম অপসারিত হয়ে যায় কাফ্ফারা প্রদান করলে। কিন্তু বিধর্মীরা অংশীবাদী। আর অংশীবাদিতার অপরাধ কাফ্ফারার মাধ্যমে দূর হয় না।। কেননা সে কাফ্ফারার অন্তর্ভূতই নয়। কাফ্ফারা তো এক প্রকারের ইবাদত, যার মধ্যে নিয়ত অপরিহার্য। কাজেই তাদের জেহার বিশুদ্ধ নয়। তাই কাফ্ফারার বিধান প্রয়োগের সুযোগ না থাকার কারণে তাদের জেহার চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। অথবা এরকম বলা যেতে পারে যে, এ সম্পর্কে কাফেরদের বিধান ভিন্নতর কিছু।

উল্লেখ্য, জেহার আরবীয়দের একটি প্রাচীন অপরীতি। মূর্খতার যুগে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের প্রতিজ্ঞার মধ্যে জেহারও একটি। আর ইসলাম জেহারের সংশোধনের বিধান প্রচলন করেছে। তাই এ বিধান প্রযোজ্য কেবল মুসলমানদের উপর, বিধর্মীর উপরে নয়।

একটি অনুযোগ ঃ আলোচ্য আয়াতে জেহারের কারণে স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হওয়া জেহারের ক্ষতিপূরণ আদায় করা এসব কিছু বলা হয়নি। বলা হয়েছে কেবল একথা যে, 'তারা অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে'। তারা পাপিষ্ঠ। জেহার যে স্ত্রীকে স্বামীর জন্য হারাম করে দেয় এবং ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে যে ওই হারামকে দূর করা যায়, সেকথা বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে। বলা হয়েছে দাসমুক্ত করার কথা। কিন্তু সেখানে 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্যে) কথাটি নেই। সেকারণেই বলা যেতে পারে, জেহারের বিধান কেবল মুসলমানদের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, জিম্মিরাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ব্যাখ্যাটি এরকম হওয়াই সমীচীন যে, জেহারের মাধ্যমে স্ত্রী হারাম হওয়া শরিয়তের বিধান। আর শরিয়তের বিধান কোনো বিধর্মীর উপরে বলবৎ হতে পারে না। কাজেই বুঝতে হবে এ বিধানটি প্রযোজ্য কেবল মুসলমানদের ক্ষেত্রে। বিধর্মীরা এ বিধানের আওতাভূত নয়। যেমন তারা শরিয়তসম্মত বিবাহের বিধানভূত নয়। তাদের বিবাহ হতে পারে সাক্ষী ছাড়া। আবার ইদ্দত পালনকালেও তারা তাদের নারীদেরকে বিবাহ করতে পারে। সুতরাং বুঝতে হবে, তাদের জন্য জেহার প্রযোজ্য না হওয়া কুফুরীর কারণে। জেহারের পরে কোনো বিধর্মী মুসলমান হয়ে গেলেও তার উপর আর জেহারের বিধান প্রযোজ্য হবে না। কেননা তখন তার জেহারের কারণ বিদ্যমান ছিলো না। অর্থাৎ তখন সে মুসলমানই ছিলো না।

'মিন নিসায়িহিম' অর্থ নিজেদের স্ত্রীগণের সঙ্গে। একথায় বুঝা যায় যে, জেহার প্রযোজ্য হতে পারে কেবল স্ত্রীর সঙ্গে, ক্রীতদাসীর সঙ্গে নয়, সে ক্রীতদাসীকে সম্ভোগ করা হয়ে থাকুক, অথবা না হয়ে থাকুক। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ এরকম বলেন। বহুসংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। কিন্তু ইমাম মালেক ও সওরী বলেছেন, ক্রীতদাসীর সঙ্গে জেহার সিদ্ধ। সাঈদ ইবনে যোবায়ের, ইকরামা, তাউস, কাতাদা ও জুহুরী বলেছেন, ওই ক্রীতদাসীকে যদি সম্ভোগ করা হয়ে থাকে, তবে তার সঙ্গে জেহার সিদ্ধ, অন্যথায় নয়। আমি বলি, আভিধানিক অর্থে 'ক্রীতদাসীও' 'নিসা' (নারী)। কিন্তু এখানে শব্দটি সে অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কেননা তোমাদের স্ত্রীগণ অর্থ বিবাহিত স্ত্রীগণ। যেমন 'জায়েদের ক্রীতদাসীগণ' বুঝাতে বলা হয় 'জাওয়ারি জায়েদ' 'নিসাউ জায়েদ' এরকম কখনো বলা হয় না। যেমন পর্দা সংক্রান্ত আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন 'ইয়া আইয়ুহান্ নাবীয়্যু কুল লি আজ্ওয়াযিকা (হে নবী! আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন)। এই আয়াতে 'নিসাউল মুমিনীন' বলে বুঝানো হয়েছে মুমিনগণের বিবাহিত স্ত্রীগণকে । আর ক্রীতদাসীদের উপরে পর্দা ফরজও

নয়। এক ক্রীতদাসীকে একবার ওড়না পরিধান করতে দেখে হজরত ওমর তাকে বলেছিলেন, ওড়না সরিয়ে ফ্যালো। তুমি কি স্বাধীনা?

তাফসীরে মাযহারী/৩৫০

ক্রীতদাসীদের সঙ্গে জেহার না হওয়ার আর একটি কারণ এ-ও হতে পারে যে, মূর্খতার যুগে জেহারকে তালাক মনে করা হতো। ইসলাম এমতো মনোভাবকে নিষিদ্ধ করেছে। এমতো নিষিদ্ধতা রহিত করণার্থে প্রয়োগ করেছে ক্ষতিপূরণের বিধান। আর একথা তো সকলেই জানে যে, ক্রীতদাসীকে তালাক দেওয়ার কোনো অর্থই হয় না।

'মা হুন্না উম্মাহাতিহিম' অর্থ তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। অর্থাৎ স্ত্রী তো কখনোই মাতা নয়, যে মাতার মতো সে তার স্বামীর জন্য নিষিদ্ধা হবে। 'ইন উম্মাহাতুহুম ইল্লাল্ লায়ী ওয়ালাদ্নাহুম' অর্থ যারা তাদেরকে জন্মদান করে, তারাই তাদের মাতা। আর 'ওয়া ইন্নাহুম লাইয়াকুলূনা মুনকারাম মিনাল ক্বওলি ওয়া যুরা' অর্থ তারা তো অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে। অর্থাৎ তাদের কথা অসংলগ্ন, অসংহত ও অসঙ্গত। তাই তা শরিয়তসিদ্ধ নয়। সুতরাং তা অসত্য, অযথার্থ, ভুল। 'যুর' অর্থ এখানে — অসত্য।

একটি সন্দেহ ঃ মিথ্যা হচ্ছে বিজ্ঞপ্তির একটি বৈশিষ্ট্য। আর বিজ্ঞপ্তি বলা হয় ওই বাক্যকে, যার মধ্যে সত্য বা মিথ্যা উভয়টির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু জেহার তো বিজ্ঞপ্তি নয়। জেহার হচ্ছে স্বেচ্ছারচিত বাক্য, যার দ্বারা স্ত্রী হারাম হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। এর মধ্যে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণের অবকাশ নেই।

সন্দেহের নিরসন ঃ জেহার স্বেচ্ছারচিত বাক্য হলেও প্রকৃত পক্ষে তা বিজ্ঞপ্তিই। কেননা সে তো এর মাধ্যমে নিষিদ্ধ হওয়ার সংবাদই জানাতে চায়।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'যারা নিজেদের স্ত্রীগণের সঙ্গে জেহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে একে অপরকে স্পর্শ করবার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এটা দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া যাচ্ছে। তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তার খবর রাখেন'।

এখানে 'ছুম্মা ইয়াউ'দূনা লিমা ক্বালূ' অর্থ পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে। কথাটির মর্মার্থ নিয়ে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। জাহেরী আলেমগণ কথাটির অর্থ করেছেন— জেহারের বাক্য যদি পুনরায় উচ্চারণ করে। এরকম অর্থ করেন বলেই তাঁরা বলেন, জেহারের বাক্যের পুনরাবৃত্তি না ঘটালে ক্ষতিপূরণ অত্যাবশ্যক হবে না। আবুল আলিয়াও এরকম বলেছেন। কিন্তু এমতো অভিমত ইমামগণের ঐকমত্য বিরোধী। আর কোনো হাদিসেই জেহারের বাক্যের পুনরাবৃত্তির সঙ্গে ক্ষতিপূরণকে শর্তায়িত করা হয়নি। মুজাহিদ কথাটির অর্থ করেছেন, মূর্খতার যুগে যারা জেহার করতো, তারা যদি ইসলামী যুগেও জেহার করে, তবে তাদের কথা ধাবিত হবে মূর্খতার দিকেই— প্রকৃতভাবে হোক, অথবা বিধানগতভাবে। বিধানগতভাবে মূর্খতার দিকে ধাবিত হওয়ার অর্থ মূর্খতার যুগের বাক্যাবলীকে বিশ্বাস করা। আর যে যা বিশ্বাস করে, তা-ই তো বলে। কিন্তু ব্যাখ্যাটি অযথার্থ। কেননা এখানকার 'ইয়াউ'দূনা' (প্রত্যাহার করে) কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'ইউজাহিরূনা' (জেহার করে) এর সঙ্গে। আর সম্পর্কযুক্ততার নিয়ম হচ্ছে সংযুক্তক ও সংযোজ্যের বিধান হবে পৃথক। 'ছুম্মা' (পরে) অব্যয়টি অনুক্রম প্রকাশক। অর্থাৎ প্রত্যাহার হতে হবে জেহারের কিছুকাল পরে। তাহলে একথা কীভাবে বলা যেতে পারবে যে, জেহার থেকে প্রত্যাবৃত হওয়া হুবহু জেহার।

তাফসীরে মাযহারী/৩৫১

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আ'ওদ' হচ্ছে অনুতপ্ত হওয়া, অনুশোচনা করা। অর্থাৎ সানুতপ্ত হৃদয়ে হারামের বিধানটিকে অপসারণ করতে চাওয়া, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলো, সেখানে পুনরায় ফিরে আসা। 'সিহাহ্' গ্রন্থসমূহে এরকমই বলা হয়েছে। জেহারকারীর অবস্থাও তদ্রূপ। স্ত্রী তো তার জন্য হালালই ছিলো। কিন্তু সে জেহার করার কারণে তার স্ত্রী তার জন্য হয়ে গেলো হারাম। তারপর সে অনুতপ্ত হলো এবং পুনরায় ফিরে যেতে চাইলো হালালের দিকে।

অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণীয় নয়। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'লিমা কালু' বাক্যের 'লাম' অব্যয়টি এসেছে 'আন' (হতে, থেকে) অর্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সে যা বলেছিলো, তা থেকে যদি সে ফিরে আসতে চায়। অর্থাৎ যদি স্ত্রীকে করে নিতে চায় হালাল। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সম্বন্ধপদটি রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সে যা বলেছিলো, তার সংশোধনার্থে যদি সে ফিরে আসতে চায়। বায়যাবী বলেছেন, এখানে 'লাম' অর্থ হবে 'ইলা' (দিকে)। অর্থাৎ অর্থ হবে— সে যদি প্রত্যাবর্তন করতে চায় কথিত বক্তব্যের সংশোধনের দিকে। যে ভাবেই কথাটিকে ব্যাখ্যা করা হোক না কেনো 'আ'ওদ' অর্থ হবে প্রত্যাবর্তন করা, স্থানান্তরিত হওয়া, রূপান্তরিত হওয়া। অর্থাৎ সে যখন ক্রোধ থেকে ফিরতে চায় প্রশান্তির দিকে, স্ত্রীকে করে নিতে চায় হালাল। ফাররা বলেছেন, 'পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে' অর্থ হতে পারে দু'রকমের—১. পরে সে ফিরে আসে পূর্বের কথায় ২. পরে সে ভঙ্গ করে তার ঘোষিত বক্তব্য। ছা'লাবী অর্থ করেছেন— যাকে সে হারাম করে নিয়েছিলো, তাকে যদি সে পুনরায় করে নিতে চায় হালাল। এরকম অর্থ করলেও ধরে নিতে হয়, এখানে সম্বন্ধপদ রয়েছে অনুক্ত। আর এখানে 'উক্তি' অর্থ ওই উক্তি, যার মাধ্যমে সে জেহারের

www.eelm.weebly.com

ঘোষণা দিয়েছিলো। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া নারিছুহু মা ইয়াকুলু'। এখানে 'কুলু' অর্থ উক্তি নয়, বরং ওই সামগ্রী, যার সম্পর্কে বলা হয়েছিলো। আবু মুসলিম বলেছেন, বক্তব্যটি হবে এরকম— স্ত্রীকে হালাল করার জন্য এবং তাকে ধরে রাখার জন্য ফিরে আসা।

হাসান, কাতাদা, জুহুরী ও তাউস বলেছেন, জেহার থেকে প্রত্যাবর্তন সাব্যস্ত হয় সহবাসের মাধ্যমে। তাই সহবাস না করা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ অপরিহার্য হবে না, যেমন প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ক্ষতিপূরণ দিতে হয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পর। কিন্তু এমতো বক্তব্যকে খণ্ডন করে আলোচ্য আয়াতের এই বাক্যটি 'তবে একে অপরকে স্পর্শ করবার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে'। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে সহবাসের পূর্বে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, জেহার করার পর যদি এতটুকু সময় অতিবাহিত হয়, যার মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারতো, কিন্তু তা দেয়নি, তবে এমতাবস্থায় এটাই প্রমাণিত হবে যে, স্বামী তার

কৃত জেহার থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং এমতোক্ষেত্রে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কিন্তু জেহার করার পরক্ষণে যদি তাকে শর্তযুক্ত করে ফেলে, অথবা স্বামী-স্ত্রীর যে কোনো একজন জেহারের পরক্ষণে মৃত্যুবরণ করে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা প্রথম কথা থেকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ তার বিরুদ্ধাচরণ করা। এমতাবস্থায় স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ধরে রাখে, তবে বুঝতে হবে জেহারের পর হারাম থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে সে কারণেই। ইমাম শাফেয়ী তো এমনও বলেছেন যে, রেজয়ী তালাক দেওয়া স্ত্রীকে জেহার করলেও জেহার হয়ে যাবে। আর কাফ্ফারা ওই সময় পর্যন্ত ওয়াজিব হবে না, যতক্ষণ না সে জেহার থেকে প্রত্যাবর্তন করে। অর্থাৎ প্রথম কথা থেকে (জেহারের কথা থেকে) যদি প্রত্যাবর্তন করে, তবে কাফ্ফারা অত্যাবশ্যক হবে।

আমরা বলি, জেহার যা হারাম করতে চায়, তা ওই তালাকের কারণে নয়, যা দেওয়া হয় জেহারের পরে। তালাক থেকে যদি প্রত্যাবর্তন করে এবং বিবাহবন্ধন বিদ্যমান থাকে, তবে জেহারের বিপক্ষ হয়। এতে জেহারের যা চাহিদা, তা পূরণ হয় না। প্রকৃত কথা হচ্ছে ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে জেহারকেও স্ত্রী হালাল হওয়ার পরিপন্থী মনে করা হতো, যেমন মনে করা হতো তালাককে। উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হতো না। কিন্তু ইসলামী বিধান উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছে। এভাবে জেহারকে হারাম হওয়ার কারণ বলে মান্য করা হলো, কিন্তু বিবাহকেও অবশিষ্ট রাখা হলো। আবার সহবাসের নিষিদ্ধতা দূর করার জন্য প্রবর্তন করা হলো কাফ্ফারা প্রদানের বিধান। সুতরাং জেহার করার পর নিশ্চুপ থাকার অর্থ এটাই প্রমাণ করে যে, জেহারকারী তার স্ত্রীর সান্নিধ্য কামনা করে এবং সহবাসকে করতে চায় হালাল।

এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'উক্তি প্রত্যাহার করে' কথাটির অর্থ সহবাস করতে চায়। অর্থাৎ 'আ'ওদ' শব্দটির অর্থ এখানে সহবাস। হাসান এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ এরকমই বলেন। কিন্তু 'একে অপরকে স্পর্শ করবার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে' কথাটিকে এখানে বানানো হয়েছে সহবাস হালাল হওয়ার শর্ত। এতে করেও প্রমাণিত হয় যে 'ইয়াউ'দুনা' অর্থ সহবাস। অর্থাৎ 'প্রত্যাহার করে' কথাটির অর্থ হবে এখানে— সহবাসের ইচ্ছা করে। যেমন ওজু সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে 'ইজা কুমতুম ইলাস্ সলাতি ফাগ্সিলু' (তোমরা যখন নামাজে দাঁড়াবে, তখন ওজু করে নিবে)। এখানে 'নামাজে দাঁড়াবে' অর্থ নামাজে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করবে। সুতরাং এরকম বলা ঠিক নয় যে, সহবাসের পূর্বে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

'ফা তাহ্রীরু রক্বাতিম্ মিন ক্বাবলি' অর্থ একটি দাস মুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ মুক্ত করে দিতে হবে একজন ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসীকে, যা সহবাস হালাল হওয়ার একটি জরুরী শর্ত। আর এখানকার 'ফা তাহ্রীরু' এর 'ফা' পরবর্তীতা প্রকাশক, কারণপ্রকাশক নয়। অথচ অধিকাংশ আলেম একে কারণপ্রকাশকই বলে থাকেন। অর্থাৎ ক্রীতদাস-দাসী মুক্ত করে দেয়ার কারণ হচ্ছে পূর্বতন উক্তি।

সেক্ষেত্রে পূর্বোক্ত 'ফা' পরোক্ত 'ফা'র নিমিত্ত। আলেমগণ তাই এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হচ্ছে জেহার। এরপর স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া যায়, এরকম সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে ছেড়ে না দেওয়াই সহবাসেচ্ছার নামান্তর। এখানে বিধানটি এতদুভয়ের মধ্যেই বর্তানো হয়েছে— জেহার এবং প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ সহবাসের দিকে ধাবিত হওয়া। আর বার বার জেহার করলেও বার বারই কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। এজন্য দু'টো কাজেরই সমন্বিত ওয়াজিব হচ্ছে কাফ্ফারার কারণ। হানাফী মতাবলম্বীগণ বলেন, জেহার কাফ্ফারার কারণ হতে পারে না। কেননা কাফ্ফারা প্রদান হচ্ছে এক প্রকারের ইবাদত। পক্ষান্তরে জেহার হচ্ছে একটি অনর্থক অপরাধ ও মন্দ কাজ, যা নিষিদ্ধ। আর যা নিষিদ্ধ, তা কখনো ইবাদতের কারণ হতে পারে না। আল্লাহ্তায়ালা কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়াকে দু'টি বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন— জেহার ও প্রত্যাবর্তন। সে জন্য কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হচ্ছে উভয়টির সমন্বিত অবস্থা। শুধুমাত্র জেহার তো পাপ এবং সে পাপের জন্য শাস্তি নির্ধারিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। অপরপক্ষে প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ স্ত্রীকে

শরিয়তসম্মতভাবে ধরে রাখা একটি ইবাদত। তাই বলতে হয়, কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া শাস্তি ও ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেকারণেই এ দু'টোর সমন্বিত অবস্থাই কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ। 'মুহীত' গ্রন্থে রয়েছে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ কেবল প্রত্যাবর্তন। কেননা কাফ্ফারার পূর্বে রয়েছে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ— জেহার ও প্রত্যাবর্তন। আর প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ আসে জেহারের পরে। তাই জেহারের বিধানও সেদিকেই গড়াবে। এমতোক্ষেত্রে জেহারকে বলা যেতে পারবে শর্ত। অর্থাৎ কারণের মূলটিকে এখানে ধরা হবে আসল কারণ। সেজন্যই কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হবে প্রত্যাবর্তন। আর একথাও মনে রাখতে হবে যে, শর্তের পুনঃপুনঃ উপস্থিতি বিধানকেও পুনঃপুনঃ আমন্ত্রণ জানায়, যেমন সদকায়ে ফিতির এসে থাকে বার বার শর্ত উপস্থিত হওয়ার কারণে। কিন্তু তার ওয়াজিব হওয়ার কারণ একটিই।

একটি দ্বন্দ্ব ঃ শুধু সহবাসের ইচ্ছা, অথবা জেহার ও সহবাসের ইচ্ছার সমন্বিত অবস্থাকে যদি কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণরূপে নির্ধারণ করা হয়, এমতাবস্থায় জেহারের পরে যদি সহবাসের ইচ্ছা করে, অতঃপর বাইন তালাক দেয় এবং সহবাসের ইচ্ছার পর যদি স্ত্রীকে ধরে রাখা হয়, তা হলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। কেননা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ এখানে বর্তমান। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এরকম অবস্থায় তো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। 'মাবসুত' গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, জেহারকারী যদি তার স্ত্রীকে বাইন তালাক দেয়, অথবা সহবাসের ইচ্ছার পর যদি তার স্ত্রী মারা যায়, তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

দ্বন্দ্ব নিরসন ঃ প্রকৃত কথা হচ্ছে, এমতোক্ষেত্রে ওয়াজিব বলা হয়েছে রূপকার্থে। ফেকাহ্ শাস্ত্রের মূলনীতিতে বলা হয়েছে, আদিষ্টদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার

সম্বোধন হতে পারে তিন ধরনের— ১. ইকতিজা (চাহিদার প্রেক্ষিতে) ২. তাখাইয়্যুর (ইচ্ছাধীন এর প্রেক্ষিতে) ৩. ওয়াদ্বা (ব্যুৎপত্তিমূলক প্রেক্ষিতে)। আবার ইকতিজা হতে পারে ইজাব (ওয়াজিব করা) এবং ইস্তিহবাব (মোস্তাহাব বানানো)। তাখাইয়্যুর এর সম্বোধন হচ্ছে মোবাহ (বৈধ) অর্থে। 'ফা' জায়েয (সিদ্ধ) অর্থে। আর 'ওয়াদ্ব' (ব্যুৎপত্তিমূলক) সম্বোধনটির অর্থ হচ্ছে কোনোকিছুকে কোনো বিধানের শর্ত, ভিত্তি বা প্রতিবন্ধক বানিয়ে নেওয়া। আর 'ওয়াদ্ব' এর সম্বোধনের স্তরটি 'ইকতিজা' এর নিম্নস্তরের। জেহারের কারণে যা হারাম হয়, তাকে দূর করার জন্যই আল্লাহ্ ক্ষতিপূরণকে কারণ সাব্যস্ত করেছেন এবং শর্ত নির্ধারণ করেছেন সহবাস সিদ্ধ হওয়ার। যেমন ওজু সম্পর্কিত আয়াতে ওজুকে করা হয়েছে নামাজ সিদ্ধ হওয়ার শর্ত এবং পবিত্রতার কারণ। অথবা যেমন 'যদি তোমরা রসুলের সাথে পরামর্শ করে নাও, তাহলে পরামর্শের পূর্বে কিছু হাদিয়া প্রদান কোরো' এই আয়াতে সদকা বা হাদিয়া প্রদানকে নির্ধারণ করা হয়েছে কথা বলার শর্ত। সুতরাং জেহার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ নয়। বরং নিষিদ্ধ হওয়ার বিধানকে বিলোপ করে দেওয়ার ইচ্ছাই কারণ। তদ্রূপ সহবাস করার ইচ্ছা কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ নয়, বরং বিবাহই হচ্ছে কারণ, যা স্ত্রীর অধিকারকে ওয়াজিব করে। আর স্ত্রীর অধিকারের মধ্যে সহবাসও অন্যতম। সেজন্য জেহারের কারণে সৃষ্ট নিষিদ্ধতা স্ত্রীর অধিকার পরিপুরিত হওয়ার প্রতিবন্ধক। সুতরাং বিবাহ যেমন স্ত্রীর অধিকার ওয়াজিব হওয়ার কারণ, তদ্রুপ স্ত্রীর অধিকারের প্রতিবন্ধকতা দূর করাও ওয়াজিব। আর ক্ষতিপূরণ হচ্ছে ওই নিষিদ্ধতা দূর করার মাধ্যম। সারকথা হচ্ছে, সাবেক বিবাহ জেহারের পর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হয়ে যায়, যেমন প্রতিজ্ঞা সেই কথা থেকে দূরে থাকার কারণ হয়ে যায়, যে বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিলো। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পর তাই সেই প্রতিজ্ঞাই আবার কারণ হয়ে যায় ক্ষতিপূরণের। দ্বিতীয়বার বিবাহবদ্ধ হবার নিয়মও এটাই। যেমন কেউ জেহারের পর তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলো, তারপর হিলা শেষে পুনরায় তাকে বিবাহ করলো, এমতাবস্থায় ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে সহবাস বৈধ হবে না। অথবা যেমন কোনো রমণী ছিলো একজনের ক্রীতদাসী। জায়েদ নামক এক ব্যক্তি তাকে বিবাহ করলো। তারপর তার সঙ্গে করলো জেহার। জেহারের পর আবার দান সূত্রে, উত্তরাধিকার সূত্রে, অথবা অন্য কোনো সূত্রে ওই ক্রীতদাসী এসে গেলো জায়েদের মালিকানায়, এমতাবস্থায় সহবাস হালাল করার জন্য কাফ্ফারা প্রদান করা হবে জরুরী।

মাসআলা ঃ জেহারকারীর জন্য ক্ষতিপূরণ না দিয়ে স্ত্রী সহবাস হারাম। সহবাসকে উদ্বুদ্ধ করে, এমন কাজ করাও তার জন্য হারাম। যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন, হস্তস্পর্শ ইত্যাদি। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক এরকম বলেছেন। এই বিধানটির বিষয়ে ইমাম শাফেয়ীর রয়েছে পুরাতন ও নতুন দু'টি অভিমত। নতুন মতটি সিদ্ধ হওয়ার অনুকূল। ইমাম আহমদেরও রয়েছে দু'টি অভিমত। শেষোক্তটি নিষিদ্ধ হওয়ার সমর্থক। আমাদের প্রমাণ হচ্ছে— জেহার

অবস্থায় যখন সহবাস হারাম, তখন সহবাস উদ্বুদ্ধকারী সকল কিছুও হারাম। অতএব সহবাসে জড়িত হওয়ার বিপদ থেকে বেঁচে থাকা চাই, যেমন গর্ভপাতের সময়সীমায় এবং ইহরামের দিবসসমূহে সহবাসেচ্ছা উদ্রেকক কাজ হারাম। ঋতুবতী নারী এবং রোজাদার নারীর সঙ্গে অবশ্য সহবাসেচ্ছা উদ্রেকক কাজ হারাম নয়। কেননা এরকম সাধারণত হয়েই থাকে। অর্থাৎ প্রতিমাসে ঋতুবতী হওয়া এবং বৎসরে একমাস রোজা রাখা অবধারিত। গর্ভমুক্ত হওয়া এবং ইহরামবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি সেরকম নয়। অর্থাৎ এ দুটো কাজ নিয়মিত হয় না। তাই ঋতুবতী অবস্থায় এবং রোজাদার অবস্থায় স্ত্রী স্পর্শ করাকে হারাম করে দেওয়া খুবই কঠিন। এমতোক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় প্রণিধাননীয়। তা হচ্ছে, জেহারজাত হারাম ইহরামবদ্ধা রমণী

www.eelm.weebly.com

হারাম হওয়ার মতোই। তাই যেহেতু ইহরামবদ্ধাদের সঙ্গে সহবাসেচ্ছা উদ্রেকক কাজ হারাম, তাই জেহারকৃতাদের সঙ্গে এমতো কর্ম হারামই।

মাসআলা ঃ জেহারকারী ক্ষতিপূরণ আদায় না করে যদি সহবাস করতে চায়, তবে স্ত্রীর উচিত তাকে প্রতিহত করা। আর কাযীর কর্তব্য হচ্ছে ক্ষতিপূরণ আদায় করার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করা। সে যদি ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে তবে কাযী তাকে প্রহার করবে। তবে সে যদি বলে, সে ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে, তবে তার কথাকে সত্য বলে বিবেচনা করতে হবে, যদি সে মিথ্যাবাদী বলে প্রসিদ্ধ না হয়ে থাকে। এরকম বলা হয়েছে 'ফাতহুল ক্বাদীর' নামক গ্রন্থে।

মাসআলা ঃ যেহেতু আলোচ্য আয়াতে কেবল দাস মুক্ত করতে বলা হয়েছে, দাসের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি, তাই কাফের বা মুসলমান ক্রীতদাস ক্রীতদাসী যে কোনো ধরনের দাস-দাসী মুক্ত করা যাবে, সে প্রাপ্তবয়স্ক অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক যেই হোক না কেনো । কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক বলেন, এমতোক্ষেত্রে কাফের গোলাম বা বাঁদী মুক্ত করলে তা যথেষ্ট হবে না। ইমাম আহমদের একটি উক্তিও এরকম। কেননা হত্যার ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে মুসলমান দাস-দাসী মুক্ত করার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ওই নিয়মটি প্রযোজ্য হবে। আমরা বলি, সুনির্দিষ্ট কোনো কিছুকে অনির্দিষ্টের সঙ্গে তুলনা করার কোনো কারণ নেই। উভয়টিকে রেখে দেওয়া উচিত তাদের স্ব স্ব স্থানে। বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে উসুলে ফেকাহ'র পুস্তকাদিতে।

মাসআলা ঃ জেহারের ক্ষতিপূরণরূপে যে সকল দাস-দাসী মুক্ত করা যাবে না, অন্ধ, দু'হাত, দু'পা অথবা এক হাত, এক পা কাটা, দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি, অথবা উভয় হাতের তিন আঙ্গুল কাটা, কিংবা বিপরীত দিকে এক হাত এক পা করে কাটা, অথবা এমন বধির যে চীৎকার করলেও শুনতে পায় না এরকম ক্রীতদাস ক্রীতদাসীকে। জোরে ডাকলে বা চীৎকার করলে যদি সে তা শুনতে পায়, তবে তাকে ক্ষতিপূরণরূপে মুক্ত করা যাবে। অর্থাৎ যার দ্বারা সাধারণ কাজকর্ম সম্পন্ন করা যায় না, এমন ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে ক্ষতিপূরণরূপে মুক্তি দেওয়া যাবে না। আর তার দ্বারা যদি কাজ চলে যায়, তবে তাকে ক্ষতিপূরণরূপে মুক্ত করা যাবে।

মাসআলা ঃ মুদাব্বার (যাকে তার মনিব বলেছে আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত) এবং উম্মে ওয়ালাদ (ওই ক্রীতদাসী, যে তার মনিবের ঔরসজাত সন্তান প্রসব করলে মুক্তি পাবে) কে জেহারের কাফ্ফারারূপে মুক্ত করা যাবে না। কেননা তাদের দাসত্ব অপরিণত। মুকাতাব (যাকে তার মনিব বলেছে 'এত টাকা উপার্জন করে, অথবা কারো কাছ থেকে এনে দিলে তুমি মুক্ত') যদি তার পরিশোধ্য অর্থের কিছু অংশও সে পরিশোধ করে থাকে, তবে তাকে জেহারের কাফ্ফারারূপে মুক্তি দেওয়া যাবে না। আর সে যদি তার পরিশোধ্য অর্থের কিছুমাত্র পরিশোধ না করে থাকে, তবে তাকে জেহারের ক্ষতিপূরণরূপে মুক্তি দেওয়া যাবে। ইমাম শাফেয়ী অবশ্য এ ব্যাপারে একমত নন।

মাসআলা ঃ কেউ যদি তার পিতা অথবা পুত্রকে জেহারের কাফ্ফারারূপে ক্রয় করে, তবে তার কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। যদিও স্বীয় পিতা অথবা পুত্রকে ক্রয় করলে এমনিতেই সে মুক্ত হয়ে যায়। এভাবে কারো পিতা বা পুত্র যদি অন্যের গোলাম হয়, আর তার মনিব যদি তার কাছে দান হিসেবে তাদেরকে দিয়ে দেয়, তবে তাদেরকে গ্রহণ করার সময় কাফ্ফারার নিয়ত করলে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী আবার এ সম্পর্কে একমত নন। কিন্তু পিতা বা পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে যদি কারো হস্তগত হয়, আর উত্তরাধিকার প্রদাতার মৃত্যুকালে উত্তরাধিকারী যদি কাফ্ফারা আদায়ের নিয়ত করে, তবে তার কাফ্ফারা আদায় হবে না।

মাসআলা ঃ কেউ যদি তার গোলামকে বলে, ঘরে প্রবেশ করলে তুমি আজাদ, আর ওই সময় যদি সে ক্ষতিপূরণ আদায়ের নিয়ত করে, তবে তার ক্ষতিপূরণ বিশুদ্ধ হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, এরকম বলার সময় তার ক্ষতিপূরণ আদায় করার নিয়ত অবশ্যই থাকতে হবে। বলার সময় নিয়ত না করে যদি গোলামের ঘরে প্রবেশ করার সময় নিয়ত করে তবে তার ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

'মিনক্বলি আইঁ ইয়াতামাস্সা' অর্থ তবে একে অপরকে স্পর্শ করবার পূর্বে। এখানে স্পর্শ করার অর্থ সহবাস করা। কথাটির মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সহবাস হালাল হওয়ার জন্য কাফ্ফারা আদায় করা একটি শর্ত, আর জেহার হচ্ছে সহবাস হারাম হওয়ার কারণ।

'জালিকুম তূআ'জুনা বিহী' অর্থ এ দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ সহবাসের পূর্বে তোমাদেরকে কাফ্ফারা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে, যেনো তোমাদের উপর থেকে হারামের বিধান রহিত হয়ে যায়। অথবা এই মর্মে তোমাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে, যেনো পুনর্বার তোমরা জেহারের অবতারণা না করো, কেননা এটা পাপ। আর এতে করে অনর্থক একটি হারামকে নিজের উপরে চাপিয়ে নেওয়া হয়। কিংবা— একথাটি তোমরা অবশ্যই মনে রেখো যে, তোমরা পাপ করেছো বলেই তোমাদের উপরে কাফ্ফারা ওয়াজিব করা হয়েছে। একথা স্মরণে রেখে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হয়ে যাও।

www.eelm.weebly.com

'ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালূনা খবীর' অর্থ তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তার খবর রাখেন'। একথার অর্থ— মনে রেখো, তোমাদের ভালো-মন্দ প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই আল্লাহ্র জ্ঞানায়ত্ত। সুতরাং যথাসময়ে তোমাদের কৃতকর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল তিনি দিবেনই।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে না, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাদিক্রমে দুইমাস সিয়াম পালন করতে হবে; যে তাতেও অসমর্থ, সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে; এটা এ জন্য যে, তোমরা যেনো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করো। এগুলি আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান; কাফেরদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি'।

এখানে 'যার এ সামর্থ্য থাকবে না' অর্থ যার কাছে গোলাম বা বাঁদী নেই এবং গোলাম বাঁদী যোগাড় করতেও যে অসমর্থ, হয়তো গোলাম-বাঁদী ক্রয় করার মতো অর্থ তার কাছে নেই, অথবা অর্থ থাকলেও গোলাম বাঁদী পাওয়া যাচ্ছে না। কিংবা অর্থ আছে, কিন্তু সেই পরিমাণ ঋণও আছে। কিংবা সে অর্থ প্রয়োজন সংসারের অত্যাবশ্যক ব্যয় নির্বাহের জন্য। এ সকল পরিস্থিতিতে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে গোলাম-বাঁদী আজাদ করার পরিবর্তে রোজা রাখা জায়েয। ইমাম মালেক ও ইমাম আওজায়ীর মতে আর্থিক সঙ্গতি যদি থাকে, তবে তার জন্য গোলাম বা বাঁদী ক্রয় করে আজাদ করে দেওয়া হবে ওয়াজিব, ঋণ থাকলেও অথবা সাংসারিক প্রয়োজন বিপর্যস্ত হলেও। এমতাবস্থায় রোজা চলবে না। আমরা বলি, যে অর্থ পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য অত্যাবশ্যক, সে অর্থ না থাকারই নামান্তর।

মাসআলা ঃ কারো দাস-দাসী আছে ঠিকই, কিন্তু সে দাস-দাসীর সেবা তার নিজের জন্যই অত্যাবশ্যক (যেমন সে প্রায় পঙ্গু ও অত্যন্ত দুর্বল)। এমতাবস্থায় দাস-দাসী মুক্ত না করে রোজা পালন করা সিদ্ধ। বিষয়টি পিপাসা নিবারণের পরিমাণ পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম সিদ্ধ হওয়ার মতো। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ এরকম অভিমতের প্রবক্তা। আর একটি উপমা এরকম হতে পারে যে, ঋণ থাকলে যেমন জাকাত ওয়াজিব হয় না। আমরা বলি, দাস-দাসী জরুরী প্রয়োজনে নিয়োজিত থাকলেও এমতোক্ষেত্রে দাসমুক্ত করা হবে ওয়াজিব। পানির স্বল্পতা ও ঋণের কারণে তায়াম্মুম সিদ্ধ হওয়া এবং জাকাত ওয়াজিব না হওয়াকে এই বিষয়টির সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নয়। কেননা বিষয়টি পৃথক প্রকৃতির। আর এ সম্পর্কে তায়াম্মুম জায়েয হওয়া এবং জাকাত ওয়াজিব না হওয়ার মতো শরিয়তসম্মত কোনো দলিলও নেই।

মাসআলা ঃ আর্থিক স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতার বিষয়টি ধর্তব্য হবে কাফ্ফারা আদায়ের সময়ে। ইমাম মালেক এরকম বলেছেন। ইমাম আহমদ ও আহলে জাহেরগণের নিকট স্বচ্ছলতা অস্বচ্ছলতা ধর্তব্য হবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার সময়ে। ইমাম শাফেয়ীর একটি মত ইমাম মালেকের অভিমতের মতো। আর তার অপর মতটি ইমাম আহমদের অভিমতের অনুকূল। তৃতীয় আর একটি মতও রয়েছে তাঁর। তা হচ্ছে— ওয়াজিব হওয়ার সময় এবং আদায় করার সময়ের মধ্যে যে সময়টি অধিক কঠিন হবে, সেটাই হবে ধর্তব্য।

'একাদিক্রমে দুই মাস রোজা রাখতে হবে' অর্থ রোজা রাখতে হবে রমজান মাস, ঈদুল ফিতর, কোরবানীর দিনসমূহ এবং তাশরীকের দিনসমূহ বাদে অন্যসময়ে একটানা ষাটদিন। এই একটানা রোজার মধ্যে যদি কোনো কারণবশতঃ অথবা বিনা কারণে ছেদ পড়ে, তবে তাকে রোজা শুরু করতে হবে নতুন করে। এভাবে রোজা পালন করতে হবে নিরবচ্ছিন্নতার সঙ্গে। এব্যাপারে বিদ্বানগণ একমত। এরকম বিরতিহীন রোজা রাখতে গিয়ে যদি কেউ রাত্রিবেলা ইচ্ছা করে, অথবা দিনের বেলা ভুলক্রমে জেহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ীর মতে তাকে আবার প্রথম থেকে রোজা শুরু করতে হবে না। কেননা এতে করে তার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় না। তবে এমতাবস্থায় কিছু রোজা পালিত হবে সহবাসের পূর্বে এবং কিছু রোজা সহবাসের পরে। ইমাম আহমদের একটি মত এরকম। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেন, এরকম অবস্থাতেও রোজা রাখতে শুরু করতে হবে নতুন করে। কেননা সহবাসের পূর্বে রোজা সম্পন্ন করা ছিলো জরুরী, আবার রোজা পালনকালেও সহবাস না করা ছিলো জরুরী। সেকারণেই এমতাবস্থায় নতুন করে একটানা ষাটদিন রোজা রাখা হবে ওয়াজিব। ইমাম আহমদের বহুল প্রচারিত বক্তব্যও এরকম।

'ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে' অর্থ অসুস্থতা, অতি বার্ধ্যক্য অথবা অধিক যৌনত্তেজনার কারণে কেউ যদি একাধারে ষাট দিন রোজা রাখতে অসমর্থ হয় তবে ক্ষতিপূরণ হিসাবে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করাবে ষাটজন মিসকিনকে। তাদের প্রত্যেককে দিতে হবে ইরাকী দুই সের, অর্থাৎ অর্ধ 'সা' পরিমাণের যে কোনো উৎকৃষ্ট খাদ্য। বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর এবং হজরত আলী এরকম বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেন, প্রত্যেক অভাবগ্রস্তকে দিতে হবে অর্ধ 'সা' গম। অথবা এক 'সা' যব, কিংবা খেজুর। শা'বী, নাখয়ী, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, হাকেম, মুজাহিদ এবং কারখীর অভিমতও এরকম। স্বসূত্রে কারখী মুজাহিদের সঙ্গে এই মূলনীতিকে সম্পর্কিত করেছেন যে, কোরআন মজীদে উল্লেখিত সকল কাফ্ফারার পরিমাণ অর্ধ 'সা' গম। ইমাম মালেক বলেছেন, কাফ্ফারা দিতে হবে এক মুদ, অর্থাৎ বাগদাদী দুই রতল। ইমাম আহমদের মতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে গম বা আটা বাগদাদী মুদে এক মুদ। অথবা দুই মুদ যব অথবা খেজুর, কিংবা দুই রতল রুটি (এক মুদ প্রায় আশি তোলার সমান, আর দুই রতল প্রায় এক মুদের অর্থাৎ পূর্ণমাণের এক সেরের সমান)। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, রসুল স. এর সময়ের

এক মুদের সমান ওই খাবার দিতে হবে, যা শহরাঞ্চলে প্রচলিত (রসুল স. এর সময়ের মুদ হচ্ছে ১.৭৫ রতলের সমান)। ইবনে জাওজী তাঁর 'আত্তাহক্বীক্ব' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার বলেছেন, আমি এমন লোকজনের সাক্ষাত পেয়েছি, যারা কাফ্ফারা আদায় করতেন এক মুদ হিসেবে এবং এরকম করাকেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করতেন। ইমাম আবু হানিফা দলিল গ্রহণ করেছেন হজরত সালমা ইবনে সাখার কর্তৃক বর্ণিত হাদিস থেকে, যাতে বলা হয়েছে, এক ওসাক (ষাট সা) খেজুর ষাটজন মিসকিনকে প্রদান

তাফসীরে মাযহারী/৩৫৯

করো। তবে আমরা একথা বলেছি যে, হাদিসটি বিচ্ছিন্ন সূত্রবিশিষ্ট। আবু সালমা সূত্রে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, হজরত সালমা ইবনে সাখার তাঁর স্ত্রীকে জেহার করেছিলেন রমজান মাসে। আর রসুল স. তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ষাটজন মিসকিনকে খাবার দাও। তিনি জবাবে বলেছিলেন, আমি তো অসমর্থ। তখন রসুল স. হজরত ওরওয়া ইবনে ওমরকে বলেছিলেন, একে এক 'ফারাক' (ষাটজন দরিদ্রকে খাওয়ানোর মতো খাদ্য) দিয়ে দাও। 'ফারাক' হচ্ছে এমন পাত্রের মাপ, যা হয়ে থাকে ঠিক ঠিক পনেরো সা। আবার এক 'ফারাক' পনেরো ষোলো সা এর সমানও হয়। শেষোক্ত বাক্যটি বর্ণনাকারীর। অর্থাৎ কথাটি হাদিসের অংশ নয়। হাদিসে কেবল বলা হয়েছে, এক 'ফারাক' দিয়ে দাও। অভিধান গ্রন্থে 'ফারাক' বলা হয়েছে টুকরীকে। আবার টুকরী ছোট বড় বিভিন্ন মাপের হয়।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আউস ইবনে সামেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বললেন, ষাটজন দরিদ্রকে আহার করানোর জন্য তিরিশ সা দিয়ে দাও। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার সহযোগিতা ছাড়া তো আমি অপারগ। তিনি স. তখন পনেরো সা দান করে আমাকে সহযোগিতা করলেন। বাকী পনেরো সা দিলো অন্যেরা। এভাবে আমার কাছে জমা হলো তিরিশ সা। আবু দাউদ লিখেছেন, হজরত খাওলা বিনতে ছা'লাবা বর্ণনা করেছেন, আমার স্বামী আউস যখন আমাকে জেহার করলো, তখন আমি অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলাম রসুল স. সকাশে। তিনি স. বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে বাদানুবাদ শুরু করলেন। বললেন, তুমি আল্লাহ্কে ভয় করো। সে তো তোমার চাচাতো ভাই। আমি সেখান থেকে চলে আসার আগেই অবতীর্ণ হলো 'আল্লাহ্ অবশ্যই শুনেছেন সেই নারীর কথা........'। রসুল স. তখন একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, তার তো কোনো ক্রীতদাস নেই। তিনি স. বললেন, তাহলে তাকে দু'মাস লাগাতার রোজা রাখতে হবে। আমি বললাম, সে তো বয়স্ক, রোজা রাখতে অসমর্থ। তিনি স. বললেন, তাহলে তাকে ষাটজন দরিদ্রকে আহার করাতে হবে। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! এতোগুলো লোককে আহার করানোর মতো খাদ্যও তো তার নেই। তিনি স. বললেন, আমি তাকে এক ফারাক খেজুর দিয়ে সাহায্য করবো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমিও তাকে এক ফারাক খেজুর দিয়ে সাহায্য করবো। তিনি স. বললেন, তাহলে তো তুমি খুবই ভালো কাজ করবে। এখন তুমি তোমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে চলে যাও এবং দুই ফারাক খাদ্য ষাটজন দরিদ্রকে আহার্যরূপে দিয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, এক ফারাক সমান ষাট সা। কেউ কেউ বলেছেন, ফারাক এমন পরিমাপের পাত্র যাতে সংকুলান হয় সাঁইত্রিশ সা। আবু দাউদ এই ব্যাখ্যাটিকে অধিকতর বিশুদ্ধ বলে মান্য করেছেন। ইবনে হুম্মাম আবু দাউদের এমতো কারণ নির্ণয়ার্থে বলেছেন, এক ফারাক যদি ষাট সা ই হতো, তবে হজরত খাওলার পক্ষ থেকে আর এক ফারাক দেওয়ার প্রয়োজনই পড়তো না।

তাফসীরে মাযহারী/৩৬০

ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর সহচরবর্গ রোজার কাফ্ফারার ব্যাপারে প্রমাণরূপে পেশ করেছেন হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিস, সেখানে তিনি বলেছেন, এক লোক রমজান মাসে রোজা ভেঙে ফেললো। তারপর রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে তার সমস্যার কথা জানালো। তিনি স. খেজুর ভর্তি একটি ফারাক আনালেন। তাতে খেজুর ছিলো পনেরো সা এর মতো। তিনি স. বললেন, এই খেজুর তুমি নিজে খেয়ো এবং তোমার পরিবার পরিজনকেও খাইয়ে দিয়ো। একদিন রোজা রেখো এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কোরো। আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হিশাম ইবনে সা'দ সূত্রে। কিন্তু নাসাঈ প্রমুখ বলেছেন, হিশাম বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

ইসমাইল সূত্রে আবু দাউদ যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাতেও পনেরো সা এর কথা এসেছে। ইবনে আবী হাফসার বিবরণও তদ্রূপ। বোখারী বলেছেন, ইসমাইলের হাদিস প্রত্যাখ্যাত। নাসাঈও তার বিবরণকে চিহ্নিত করেছেন অচল (জয়ীফ) বলে। কিন্তু অন্যান্যরা তাঁকে বলেছেন সুদৃঢ় (ক্বাবী)। দারাকুতনী জাহেরী থেকে হাজ্জাজ ইবনে আরতাতের বর্ণনাক্রমে ফারাক এর পরিমাণ পনেরো সা-ই বলেছেন। তিনি আবার একথাও বলেছেন যে, রসুল স. তা বণ্টন করে দিতে বলেছিলেন ষাটজন অভাবগ্রস্তদের মধ্যে। হাদিস বর্ণনাকারীগণের মধ্যে হাজ্জাজ ইবনে আরতাত ছিলেন অচল ও বর্ণনাকারীর নাম গোপনকারী (মুদাল্লাস)। আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ তাঁর পিতার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, হাজ্জাজ জুহ্রীর সাক্ষাত পাননি। এই হাদিসের সহযোগীরূপে হজরত আলীর যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী। ওই বর্ণনায়

www.eelm.weebly.com

এসেছে, খাওয়ানো হয়েছিলো ষাটজন মিসকিনকে। তারা প্রত্যেকে পেয়েছিলো এক মুদ করে। ওই হাদিসে রয়েছে পনেরো সা এর উল্লেখ (এক সা সমান চার মুদ, এভাবে পনেরো সা সমান ষাট মুদ)।

বোখারী বলেছেন, হাদিসটিতে রয়েছে গোলযোগ। কোনো কোনো বিবৃতিতে এসেছে পনেরো সা এর উল্লেখ। মেহরান সূত্রে ইবনে খুজাইমার বর্ণনায় এসেছে পনেরো সা বা বিশ সা এর উল্লেখ। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে 'সা' শব্দটির উল্লেখই নেই। আর ফারাক বলা হয় এক ধরনের বড় টুকরীকে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের বিবরণে এসেছে, ফারাক বিশ সা এর পরিমাপেরও হতে পারে। এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহভূত এক বর্ণনাকারীর নাম আতা খোরাসানী। উকাইলি তাকে অন্তর্ভূত করেছেন দুর্বল বর্ণনাকারীদের দলে। বোখারী বলেছেন, তাঁর বর্ণনাকৃত হাদিসসমূহে অকাট্যভাবে এসেছে বিশ সা এর কথা। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে প্রাপ্ত অপরিণত সূত্রের হাদিসে দারেমীও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে খুজাইমা জননী আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ফারাকই আনা হলো। তার মধ্যে ছিলো বিশ সা। হাদিসগুলি রোজার কাফ্ফারা সম্পর্কিত। আর ইমাম আবু হানিফা এগুলোকে গ্রহণ করেছেন জেহারের কাফ্ফারার দলিল হিসেবে। ইমাম শাফেয়ীও হাদিসগুলোকে

দলিলরূপে গণ্য করেছেন অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে, যার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে ন্যূনতর খাদ্যের পরিমাপ। এ সম্পর্কে সবচেয়ে বলিষ্ঠ হাদিস হচ্ছে হজরত কা'ব ইবনে আজরা কর্তৃক বর্ণিত হাদিস, যা বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। সুরা বাক্বারার 'ফামান কানা মিনকুম...............' এই আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে যথাস্থানে আমি হাদিসটির উল্লেখ করেছি। ওই বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন হুকুম দিলেন, এক ফারাক আহার্য দু'জন দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করে দাও, অথবা কোরবানী করো একটি ছাগল। কিংবা রোজা রাখো তিন দিন। আর সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, এক ফারাক অর্থ তিন সা। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. বললেন, প্রত্যেক অভাবগ্রস্তকে অর্ধ সা করে খেজুর দান করো। ইমাম আহমদের বর্ণনায় আছে অর্ধ সা আহার্যের উল্লেখ। হাসান ও ইবনে আবী লায়লার বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে অর্ধ সা কিসমিসের কথা। বলা হয়েছে, এক ফারাক কিসমিস দু'জন দরিদ্রকে বণ্টন করে দাও।

ইবনে হাজাম লিখেছেন, ঘটনাটি যেহেতু সংঘটিত হয়েছিলো এক জায়গায় একই সময়ে, সেহেতু এ সম্পর্কে সকল বর্ণনা বিশুদ্ধ হওয়ার কথা নয়। যেহেতু এগুলোতে রয়েছে বর্ণনাগত বৈষম্য। সুতরাং বর্ণনাগুলির মধ্যে অধিকতর প্রাধান্য নির্ণয় করা জরুরী। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, অর্ধ সা খাদ্য সম্পর্কিত শো'বার বর্ণনাটি 'মাহফুয' (সংরক্ষিত)। তবে সে খাদ্য গম না খেজুর তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। সম্ভবত এখানে বর্ণনাকারীগণের রূপান্তরপ্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। কিসমিসের বর্ণনা কেবল মাত্র হাজামের বর্ণনায় এসেছে। আবু দাউদও সেরকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনাপরম্পরায় রয়েছেন আবু ইসহাক নামক এক বর্ণনাকারী। তিনি অবশ্য মুদ সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য। তবে বিধান সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে কারো সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য দেখা দিলে তাঁর বর্ণনা আর গ্রাহ্য হয় না।

কোনো কোনো জ্ঞানী বলেছেন, খেজুরের বর্ণনা সংক্রান্ত হাদিস মাহফূয, যা বর্ণিত হয়েছে আবু কেলাবার সুত্রে। ইমাম মুসলিম তার প্রতি দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে আবু কেলাবার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলেনওনি। তিবরানীও এরকম বর্ণনা করেছেন শা'বী সূত্রে কা'ব থেকে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, মুসলিম শরীফের কোনো কোনো অনুলিপিতে বর্ণনা এসেছে অর্ধ সা সম্পর্কে, যা আবার পরে পরিবর্তনও করা হয়েছে। বিশুদ্ধ অনুলিপিতে তো অর্ধ সা এর কথা পরিষ্কারভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটাই বিশুদ্ধ কথা। আয়াতের মধ্যে আবার আহার করানোর প্রসঙ্গটি অস্পষ্ট। ওয়াজিবের পরিমাণ কী, সে সম্পর্কেও রয়েছে অস্পষ্টতা। আবার রোজা ও জেহারের অধ্যায়ে পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, তা-ও গোলযোগপূর্ণ। কাজেই হাদিসগুলোকে সদকায়ে ফিতিরের উপরে প্রয়োগ করার চেয়ে বোখারী ও মুসলিমের হাদিস প্রয়োগ করাই হবে অধিকতর উত্তম। সদকায়ে ফিতিরের হাদিসে সদকা আদায়ের হুকুম এসেছে। আহার করানোর হুকুম সেখানে নেই। আর এখানে রয়েছে আহার করানোর নির্দেশ। একারণেই এমতো ক্ষেত্রে ইরাকবাসীদের অভিমতই অধিকতর সুদৃঢ়। আর ইমাম আবু হানিফার অভিমত সাবধানতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

মাসআলা ঃ সকাল-সন্ধ্যায় যদি গমের রুটি খাওয়ানো হয় এবং তা যদি পরিবেশন করা হয় তরকারী ব্যতিরেকে, তবুও তা যথেষ্ট হবে। তবে যবের রুটির সঙ্গে অবশ্যই তরকারী দিতে হবে। সকাল-সন্ধ্যায় দু'বেলা যদি একজন দরিদ্রকে আহার করানো হয়, অথবা একজন দরিদ্রকে যদি দু'দিন দিনের বেলায় খাওয়ানো হয়, আর একজনকে খাওয়ানো হয় দু'দিন রাতে, তবু তা জায়েয হবে। তবে ষাটজনকে যদি সকালের খানা খাওয়ানো হয়, আর অপর ষাটজনকে খাওয়ানো হয় সন্ধ্যায়, তবে তা জায়েয হবে না। এমন ছোট মেয়ে, যার বক্ষদেশ অপুষ্ট অথবা এমন ব্যক্তি, যার পেট ভরা— এরকম কাউকে আহার করালে যথেষ্ট হবে না। আহার করাতে হবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে পেটপুরে, চাই সে স্বল্পাহারী হোক, অথবা হোক অধিকাহারী। মিসকিনকে আহার্যের মালিক বানিয়ে দেওয়া এক্ষেত্রে জরুরী শর্ত নয়। তবে ইমাম শাফেয়ী মালিক বানিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। একজন মিসকিনকেও যদি ষাটদিন আহার করানো হয়, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে তা জায়েয হবে। জমহুরের মত এর বিপরীত।

www.eelm.weebly.com

সুরা মায়েদার তাফসীরের যথাস্থানে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে ইমামগণের মতানৈক্যসমূহ বিভিন্ন দলিল প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

একটি উপযোগ ঃ দাস-দাসী মুক্ত করা এবং দু'মাস একাদিক্রমে রোজা রাখার ব্যাপারে 'একে অপরকে স্পর্শ করবার পূর্বে' এরকম শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু মিসকিনকে খানা খাওয়ানোর ব্যাপারে এরকম কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। সেকারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জেহারকারী যদি খানা খাওয়ানোর মধ্যবর্তী সময়ে তার জেহারকৃত স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে, তবে পুনরায় তাকে প্রথম থেকে খানা খাওয়াতে হবে না। ইমাম মালেক বলেছেন, এমতাবস্থায় যেহেতু আহারের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পরিশোধের অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে, তাই তার জন্য স্ত্রী সহবাস জায়েয। তবে জমহুরের মতে ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণ আদায়ের আগে সহবাস জায়েয নয়। সাধারণভাবে তাদের নিকট এটা হারাম, ক্ষতিপূরণে সে নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করুক, অথবা না করুক। কেননা জেহার হচ্ছে হারামের কারণ এবং ক্ষতিপূরণ হচ্ছে সে কারণ দূর করার মাধ্যম। তাই যতক্ষণ ক্ষতিপূরণ আদায় সম্পূর্ণ হবে না, ততক্ষণ হারামের বিধানও দূর হবে না।

'সুনান' প্রণেতাগণ লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে জেহার করলো, আবার জেহারের মধ্যে স্ত্রীর উপরে উপগত হলো। রসুল স.কে সে একথা জানালে তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, কেনো তুমি এরকম করলে? সে বললো, চাঁদনীরাতে আমি তার পায়ের গোছা দেখে ফেলেছিলাম (তাই আত্মসংবরণ করতে পারিনি)। তিনি স. বললেন, ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা পর্যন্ত স্ত্রী থেকে দূরে থাকো। এই হাদিসে সাধারণভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে স্ত্রী সহবাসকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তিরমিজির নিকটে হাদিসটি উত্তম, বিশুদ্ধ ও দুষ্প্রাপ্য। মুনজির বলেছেন, এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তারা সকলেই হাদিসটি একে অপরের নিকট থেকে শুনেছেন। বর্ণনাটি সুপ্রসিদ্ধও, তাই

গ্রহণযোগ্য। বাগবী লিখেছেন, এখানে প্রথমে দাসমুক্তি ও রোজা পালনকে সহবাসের পূর্বশর্ত করা হয়েছে, কিন্তু আহার করানোর বিষয়টিকে রাখা হয়েছে শর্তমুক্ত। সুতরাং প্রথমোক্ত শর্ত দ্বারা পরেরটিকেও শর্তযুক্ত করা যায়। বাগবীর এমতো বক্তব্য দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মূলনীতির ভিত্তিতে। সেটি হচ্ছে— অসীমাবদ্ধ বিধান সীমাবদ্ধ বিধানের আওতাভূত হওয়া অনিবার্য।

আমি বলি, দাসমুক্তি ও রোজা পালনের পূর্বে সহবাস করতে পারবে না, এরকম কথা ক্ষতিপূরণ জায়েয হওয়ার শর্ত নয়। যদি তাই হতো, তবে একথাও বলা যেতে পারতো যে, জেহারকারী ক্ষতিপূরণ আদায়ের পূর্বে সহবাস করার পর ক্ষতিপূরণ দিলে তার ক্ষতিপূরণ বৈধ হবে না। এবং তার স্ত্রীও তার জন্য হালাল হবে না। বরং 'একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে' শর্তটি একথাই জানিয়ে দিচ্ছে যে, ক্ষতিপূরণের আগে সহবাস হারাম। ক্ষতিপূরণের শেষোক্ত ধারাটিকে কিন্তু এরকম শর্তযুক্ত করা হয়নি। অর্থাৎ মিসকিনকে খানা খাওয়ানোর ব্যাপারে কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। সম্ভবত এরকম করা হয়নি একারণে— প্রথম ও দ্বিতীয় ধারায় তা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে এই ধারণায় যে, তৃতীয় ধারাটি অবশ্যই হবে শর্তটির অন্তর্ভুক্ত। আর পুনরাবৃত্তি রোধই বোধ হয় এর উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, দ্বিতীয় ধারাতেও তো শর্ত উল্লেখ না করলে চলতো। এর জবাবে বলা যায়, তাহলে বিষয়টি হয়ে পড়তো অতি সীমাবদ্ধ। মনে হতো শর্ত রক্ষা করতে হবে বুঝি কেবল দাসমুক্তির বেলায়। এমতো উদ্দেশ্যেই প্রথম দু'টো ধারাকে শর্তটিতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, আর শেষোক্তটিকে করে রাখা হয়েছে অনির্দিষ্ট, যাতে তা অনুগামী হিসেবে অবশেষে সুনির্দিষ্টভূত হতে বাধ্য হয়।

মাসআলা ঃ জেহেরকারী ক্ষতিপূরণ আদায়ের আগে সহবাস করলে 'ইস্তেগফার' (ক্ষমাপ্রার্থনা) করবে। কেননা কাজটি নাজায়েয। এরকম নাজায়েয কাজ করার পর তওবা ইস্তেগফার করা অবশ্য কর্তব্য। এরপর তাকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিতে হবে, যাতে করে হারামের বিধানটি চিরতরে অপসারিত হয়ে যায়। জেহারের ক্ষতিপূরণ ছাড়া আর একটি ক্ষতিপূরণ আছে, যাকে বলে সহবাসের ক্ষতিপূরণ, আর তা ওয়াজিবও নয়। অবশ্য কোনো কোনো বিদ্বানের নিকট দু'টি ক্ষতিপূরণই আবশ্যিক। একটি ক্ষতিপূরণ জেহারের এবং অপরটি ক্ষতিপূরণ আদায়ের আগের সহবাসের। কিন্তু কথাটি অসঠিক। হজরত সালমা ইবনে সাখারের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তাঁকে কেবল একটি কাফ্ফারা দিতে বলেছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসেও একটি কাফ্ফারার কথা এসেছে। তিরমিজি ও ইবনে মাজা হজরত সালমা ইবনে সাখারের ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। রসুল স.কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, জেহারকারী ব্যক্তি যদি কাফ্ফারা প্রদানের আগেই তার স্ত্রীর উপরে উপগত হয়, তবে তার বিধান কী, তখন তিনি স. বললেন, একটি কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। তিরমিজি হাদিসটিকে সনাক্ত করেছেন যথাসূত্রসম্বলিত ও দুষ্প্রাপ্যরূপে। ইমাম মালেক তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে এমন এক ব্যক্তির আলোচনা করেছেন, যে কাফ্ফারা প্রদানের পূর্বেই তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলো।

এরকম ব্যক্তি কাফ্ফারা প্রদানের পূর্বে তার স্ত্রীর সঙ্গে পুনঃ মিলিত হতে পারবে না এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাকে ক্ষমাপ্রার্থনাও করতে হবে। তিনি আরো বলেছেন, এ সম্পর্কে আমি যতো আলোচনা শুনেছি, তন্মধ্যে এই সমাধানটিই সর্বোত্তম।

'জালিকা লিতু'মিনু বিল্লাহি ওয়া রসুলিহী' অর্থ তোমরা যেনো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করো। এখানে 'লিতু'মিনু' (বিশ্বাস স্থাপন করো) অর্থ শরিয়তের বিধানের উপরে আমল করো। যেমন 'ওয়া মা কানাল্লহু লি ইউদ্বিয়া

ঈমানাকুম' এই আয়াতে 'বিশ্বাস স্থাপন করো' (ঈমানাকুম) অর্থ নামাজ প্রতিষ্ঠা করো। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ তোমাদেরকে এমতো বিধান দিয়েছেন এজন্য, যেনো তোমরা এর উপরে আমল করো এবং পরিত্যাগ করো মূর্খতার যুগের রীতিকে।

'তিলকা হুদুদুল্লহ' অর্থ এগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান। অর্থাৎ যারা এই বিধানাবলীর আওতায় পড়ে, তারা যেনো বিরত থাকে জেহারের মতো নিষিদ্ধ আচরণ থেকে। অথবা— এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বিধি-বিধান। এগুলো লংঘন করা বৈধ নয়। আর 'ওয়ালিল কাফিরীনা আ'জাবুন আলীম' অর্থ আর কাফেরদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত এ সকল বিধিবিধানকে মান্য করে না, তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাদের জন্যই পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দুর্ভোগ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে, যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে; আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি; কাফেরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি— (৫) সেই দিন, যেদিন তাদের সকলকে উত্থিত করা হবে এবং তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে, যা তারা করতো; আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা বিস্মৃত হয়েছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা' (৬)।

এখানে 'ইন্নাল্ লাজীনা ইউহাদ্দুনাল্লহা ওয়া রসুলাহু' অর্থ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে। অর্থাৎ যারা বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুশাসনের। অথবা— যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল কর্তৃক প্রবর্তিত বিধানাবলী পরিত্যাগ করে তদস্থলে প্রতিষ্ঠা করে অন্য কোনো রীতিনীতির। 'কুবিতূ কামা কুবিতাল্ লাজীনা মিন ক্ববলিহিম' অর্থ তাদেরকে অপদস্থ করা হবে, যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন, 'কাবাতাহু' অর্থ অপদস্থ করেছে, করেছে ধরাশায়ী। আর 'মুকবাত' অর্থ দুশ্চিন্তিত, চিন্তাচ্ছন্ন। 'পূর্ববর্তীদেরকে' অর্থ অতীতের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। 'আয়াতিম বায়্যিনাত' অর্থ সুস্পষ্ট আয়াত। আর 'আ'জাবুম মুহীন' অর্থ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

'ইয়াওমা' অর্থ সেই দিন। 'জামীয়ান' অর্থ সকলকে। 'ফাইউনাব্বিউহুম বিমা আ'মিলূ' অর্থ তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে, যা তারা করতো। 'আহ্সাহুল্লহু ওয়া নাসুহু' অর্থ আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা বিস্মৃত হয়েছে।

অর্থাৎ তাদের কোনো কৃতকর্মই আল্লাহ্‌র অজানা নয়, বরং তারাই তাদের আসক্তা পাপমগ্ন থাকার কারণে তাদের পশ্চাতের অপরাধসমূহের কথা ভুলে যায়। অথবা— পাপ তাদের মজ্জাগত স্বভাব, তাই তারা পাপকে গর্হিত কোনোকিছু বলে মনেই করে না। আর 'ওয়াল্লহু আ'লা কুল্লি শাইইন শাহীদ' অর্থ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা। অর্থাৎ কোনোকিছুই তাঁর কাছে অদৃশ্য বা গোপন নয়।

সূরা মুজাদালাহ্ ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩

www.eelm.weebly.com

❑ তুমি কি লক্ষ্য কর না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থ জন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাহাতে ষষ্ঠ জন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। উহারা এতদপেক্ষা কম হউক বা বেশী হউক তিনি তো তাহাদের সংগেই আছেন উহারা

www.eelm.weebly.com

যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর উহারা যাহা করে; তিনি উহাদিগকে কিয়ামতের দিন তাহা জানাইয়া দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

❑ তুমি কি তাহাদিগকে লক্ষ্য কর না, যাহাদিগকে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল? অতঃপর উহারা যাহা নিষিদ্ধ তাহারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কানাকানি করে। উহারা যখন তোমার নিকট আসে তখন উহারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্দ্বারা আল্লাহ্ তোমাকে অভিবাদন করেন নাই। উহারা মনে মনে বলে, 'আমরা যাহা বলি তাহার জন্য আল্লাহ্ আমাদিগকে শাস্তি দেন না কেন?' জাহান্নামই উহাদের জন্য যথেষ্ট, যেথায় উহারা প্রবেশ করিবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস!

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সে পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। তোমরা কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করিও, এবং ভয় কর আল্লাহ্কে যাঁহার নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।

❑ শয়তানের প্ররোচনায় হয় এই গোপন পরামর্শ মু'মিনদিগকে দুঃখ দেওয়ার জন্য। তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাহাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নহে। মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা।

❑ হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদিগকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও, তখন তোমরা স্থান করিয়া দিও, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করিয়া দিবেন এবং যখন বলা হয়, 'উঠিয়া যাও', তোমরা উঠিয়া যাইও। তোমাদের মধ্যে

যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে আল্লাহ্ তাহাদিগকে মর্যাদায় উন্নত করিবেন; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা রাসূলের সহিত চুপি চুপি কথা বলিতে চাহিলে তাহার পূর্বে সাদাকা প্রদান করিবে, ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক; যদি তাহাতে অক্ষম হও, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❑ তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলিবার পূর্বে সাদাকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর! যখন তোমরা সাদাকা দিতে পারিলে না, আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন, তখন তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবগত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি কি লক্ষ্য করো না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি নিশ্চয় জানেন ও বিশ্বাস করেন যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই আল্লাহ্র অবহিতিভূত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না, যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না, যাতে, ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না'।

এখানে 'মা ইয়াকূনু' অর্থ সংঘটিত হয়। এখানকার 'ইয়াকূনু' (হয়) ক্রিয়াটি অপূর্ণ কোনো ক্রিয়া নয়। তাই এর বিধেয় এর প্রয়োজন হয় না। 'মিন নাজ্বওয়া ছালাছাতিন' অর্থ তিন ব্যক্তির গোপন পরামর্শ। 'মিন' এখানে অতিরিক্ত এবং 'নাজ্বওয়া' হচ্ছে ক্রিয়ামূল। অভিধানগ্রন্থে এরকমই উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'নাজ্বওয়াতুন' থেকে। 'নাজ্বওয়াতুন' অর্থ ভূপৃষ্ঠের উঁচু টিলা, গোপন কথা, অথবা ওই গোপন চিন্তা, যা মস্তিষ্কে বাসা বাঁধে, অথচ মানুষ তা অবহিত হতে পারে না। এখানে গোপন পরামর্শকে 'নাজ্বওয়া' বলা হয়েছে এ কারণেই। এখানে এর ভাবার্থ— তিন ব্যক্তির গোপন শলাপরামর্শ। 'ইল্লা হুয়া রবিউ'হুম' অর্থ যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। অর্থাৎ কারো কোনো প্রকার গোপনীয়তাই আল্লাহ্র অবহিতির বাইরে নয়। তাই মনে রাখতে হবে তিন জনের গোপন পরামর্শেও চতুর্থজন হিসেবে রয়েছে তাঁর সতত উপস্থিতি। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র এমতো উপস্থিতি রকমপ্রকারহীন, আনুরূপ্যবিহীন। তাই তা যেমন অনির্বচনীয়, তেমনি অবোধ্য।

'ওয়ালা খাম্সাতিন ইল্লা হুয়া সাদিসুহুম' অর্থ পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন। এখানে তিনজন ও পাঁচজনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার কারণ এরকমও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। একস্থানে কয়েকজন কপটাচারী গোপনে শলা-পরামর্শ করছিলো। তাদের দিকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্র

সর্বজ্ঞতা ও সর্ববিদ্যমানতাপ্রকাশক এই আয়াত। অথবা এখানে পরামর্শকারীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন বেজোড়। আর তিনি বেজোড় সংখ্যাকেই পছন্দ করে। আর তাক হচ্ছে অখণ্ড এককত্ব, যার মধ্যে একাধিকত্ব, কিংবা আংশিকত্ব একেবারেই নেই। আর কোনো প্রসঙ্গে পরামর্শ করতে গেলে কমপক্ষে তিনজনের সমাবেশ জরুরী। কেননা দু'জনের মতানৈক্যের সমাধান করতে হয় তৃতীয় জনকে। সে যে কোনো একজনের মতামতকে প্রাধান্য দিবে, অথবা দিবে ভিন্নতর

www.eelm.weebly.com

সিদ্ধান্ত। তিনজনের অধিক ব্যক্তির মধ্যেও পরামর্শ বিনিময় হওয়া সম্ভব। পরামর্শ সম্ভব দলবদ্ধভাবেও। আর দলের নিম্নতম সংখ্যা হচ্ছে দুই। এভাবে চারজনের মধ্যে মতভেদ দেখা দিতে পারে। পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিতে পারে জোড়ায় জোড়ায়। তখন সিদ্ধান্ত দানের জন্য উপস্থিত থাকা প্রয়োজন পঞ্চমজনের। সে তখন প্রাধান্য দিতে পারে যে কোনো এক পক্ষকে। এভাবে পরামর্শ সভা হয়ে যেতে পারে পাঁচ সদস্যবিশিষ্টও। আর সর্বাবস্থাই হয়ে যায় আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন উপস্থিতিবিশিষ্ট। তাই এখানে দেওয়া হয়েছে চতুর্থজন ও পশ্চমজনের দৃষ্টান্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন। তারা যেখানেই থাকুক না কেনো। অতঃপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দিবেন। 'নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত'। একথার অর্থ— গোপনে ষড়যন্ত্রকারী কপটদের সংখ্যা যতো কম অথবা যতো বেশী হোক না কেনো, সর্বাবস্থায় আনুরূপ্যবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্ তাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাই তাদের কোনো কিছুই তাঁর অবহিতি বহির্ভূত নয়। মহাবিচারের দিবসে তিনি তাদেরকে শাস্তিযোগ্য বলে সাব্যস্ত করার জন্য তাদের প্রকাশ্য গোপন সকল অপকর্মের কথাই সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের সতত দ্রষ্টা।

ইবনে আবী হাতেম মুকাতিল ইবনে হাব্বান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এবং মদীনার ইহুদীদের মধ্যে সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিলো। কিন্তু ইহুদীদের উদ্দেশ্য মন্দ ছিলো বলে প্রায়শঃই তারা নিজেদের মধ্যে চুপেচুপে কথাবার্তা বলতো। সাহাবীগণের মনে হতো, তারা নিশ্চয়ই মুসলমানদেরকে বিপদে ফেলার জন্য গোপনে গোপনে শলাপরামর্শ করছে। বাগবীর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— মুসলমানেরা যখন দেখতেন তারা গোপনে গোপনে আলাপচারিতা চালিয়ে যাচ্ছে, তখন তাঁদের মনে হতো, তারা মনে অভিযানরত কোনো

সর্বজ্ঞতা ও সর্ববিদ্যমানতাপ্রকাশক এই আয়াত। অথবা এখানে পরামর্শকারীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন বেজোড়। আর তিনি বেজোড় সংখ্যাকেই পছন্দ করেন। আর 'তাক' হচ্ছে অখণ্ড এককত্ব, যার মধ্যে একাধিকত্ব, কিংবা আংশিকত্ব একেবারেই নেই। আর কোনো প্রসঙ্গে পরামর্শ করতে গেলে কমপক্ষে তিনজনের সমাবেশ জরুরী। কেননা দু'জনের মতানৈক্যের সমাধান করতে হয় তৃতীয় জনকে। সে যে কোনো একজনের মতামতকে প্রাধান্য দিবে, অথবা দিবে ভিন্নতর সিদ্ধান্ত। তিনজনের অধিক ব্যক্তির মধ্যেও পরামর্শ বিনিময় হওয়া সম্ভব। পরামর্শ সম্ভব দলবদ্ধভাবেও। আর দলের নিম্নতম সংখ্যা হচ্ছে দুই। এভাবে চারজনের মধ্যে মতভেদ দেখা দিতে পারে। পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিতে পারে জোড়ায় জোড়ায়। তখন সিদ্ধান্ত দানের জন্য উপস্থিত থাকা প্রয়োজন পঞ্চমজনের। সে তখন প্রাধান্য দিতে পারে যে কোনো এক পক্ষকে। এভাবে পরামর্শ সভা হয়ে যেতে পারে পাঁচ সদস্যবিশিষ্টও। আর সর্বাবস্থাই হয়ে যায় আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন উপস্থিতিবিশিষ্ট। তাই এখানে দেওয়া হয়েছে চতুর্থজন ও পঞ্চমজনের দৃষ্টান্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন। তারা যেখানেই থাকুক না কেনো। অতঃপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত'। একথার অর্থ— গোপনে ষড়যন্ত্রকারী কপটদের সংখ্যা যতো কম অথবা যতো বেশী হোক না কেনো, সর্বাবস্থায় আনুরূপ্যবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্ তাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাই তাদের কোনো কিছুই তাঁর অবহিতি বহির্ভূত নয়। মহাবিচারের দিবসে তিনি তাদেরকে শাস্তিযোগ্য বলে সাব্যস্ত করার জন্য তাদের প্রকাশ্য-গোপন সকল অপকর্মের কথাই সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের সতত দ্রষ্টা।

ইবনে আবী হাতেম, মুকাতিল ইবনে হাব্বান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এবং মদীনার ইহুদীদের মধ্যে সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিলো। কিন্তু ইহুদীদের উদ্দেশ্য মন্দ ছিলো বলে প্রায়শই তারা নিজেদের মধ্যে চুপেচুপে কথাবার্তা বলতো। সাহাবীগণের মনে হতো, তারা নিশ্চয়ই মুসলমানদেরকে বিপদে ফেলার জন্য গোপনে গোপনে শলা-পরামর্শ করছে। বাগবীর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— মুসলমানেরা যখন দেখতেন তারা গোপনে গোপনে আলাপচারিতা চালিয়ে যাচ্ছে, তখন তাঁদের মনে হতো, তারা মনে হয় অভিযানরত কোনো মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পেয়েছে। এরকম কথা ভেবে তাঁরা মনঃকষ্ট পেতেন এবং চিন্তিত হয়ে পড়তেন। এরকম ঘটনা যখন পুনঃপুনঃ ঘটতে লাগলো, তখন রসুল স. এর কানেও কথাটা পৌঁছতে দেরী হলো না। তিনি স. ইহুদীদেরকে এভাবে কানাঘুষা করতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু তারা বিরত হলো না। এমতো প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (৮)।

তাফসীরে মাযহারী/৩৬৯

বলা হলো— 'তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করো না, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিলো? অতঃপর তারা যা নিষিদ্ধ, তারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রসুলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কানাকানি করে। তারা যখন তোমার নিকট আসে, তখন তারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে, যদ্দারা আল্লাহ্ তোমাকে অভিবাদন করেননি।

www.eelm.weebly.com

তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি, তার জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেনো? জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট, যেখানে তারা প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট সেই আবাস'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! লক্ষ্য করুন, ইহুদীরা আপনার কথার কোনো মূল্য দিচ্ছে না। আপনি তাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করেছিলেন। তবু তারা এমতো অপকর্মটি চালিয়ে যাচ্ছে। অতএব, অনুধাবন করুন, তাদের এমতো কানাকানি স্পষ্টতই পাপাচরণ, সীমালংঘন ও আপনার খোলাখুলি বিরুদ্ধাচরণ। আবার তারা আপনাকে সম্বোধন করে অপঅভিবাদনে। 'আস্সালামু আ'লাইকুম' এর পরিবর্তে বলে 'সামুন আ'লাইকা' (তোমার মৃত্যু হোক)। অথচ আল্লাহ্ স্বয়ং আপনাকে সম্বোধন করেন অত্যুত্তম অভিবাদনে। তারা এরকম অপঅভিবাদন জানানোর পর আবার একথাও মনে মনে বলে যে, কই আল্লাহ্ তো আমাদেরকে এজন্য শাস্তি দিচ্ছেন না। অথচ তারা জানে না, তাদের জন্য আমি নির্ধারণ করে রেখেছি জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি, যা আবাস হিসেবে নিকৃষ্টতম। আর তাদের জাহান্নামবাস সুনিশ্চিত।

এখানে 'ছুম্মা ইয়াউদুনা' অর্থ অতঃপর পুনরাবৃত্তি করে। শব্দরূপটি বর্তমানকালের হলেও এর অর্থ হবে অতীতকালের। বর্তমানকালবোধক শব্দরূপ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে একারণে, যাতে তাদের অতীত অপকর্মগুলোও তাদের দৃষ্টির সামনে চলে আসে। 'বিল ইছমি' অর্থ পাপাচরণ। 'উ'দ্ওয়ান' অর্থ সীমালংঘন। 'মা'সিয়াতির রসুল' অর্থ রসুলের বিরুদ্ধাচরণ। অর্থাৎ রসুলের প্রতি অবাধ্য হওয়ার পরামর্শ। অবশ্য শুধু শুধু গোপন শলা-পরামর্শও রসুলের বিরুদ্ধাচরণের নামান্তর। এরপর যখন তিনি স. তা করতে নিষেধ করলেন, তখন তারা হয়ে গেলো অধিকতর বিরুদ্ধাচারী।

উত্তম সূত্রপরম্পরায় হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ ও বায্যার বর্ণনা করেছেন, ইহুদীরা রসুল স.কে সালাম প্রদানের পরিবর্তে বলতো 'সামুন আ'লাইকা' (তোমার মৃত্যু হোক)। আবার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো, কই আল্লাহ্ তো আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছেন না। তখন অবতীর্ণ হয় 'তারা যখন তোমার নিকট আসে.......'।

'ওয়া ইয়াক্বুলূনা ফী আনফুসিহিম' অর্থ তারা মনে মনে বলে। অথবা— যখন তারা রসুল স. এর কাছ থেকে চলে যায়, তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে 'লাও লা ইউআ'জ্জিবুনাল্লহু বিমা নাক্বুলু' (আমরা যা বলি, তার জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেনো)? 'হাসবুহুম জাহান্নাম' অর্থ জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর 'ফা বি'সাল মাসীর' অর্থ কতো নিকৃষ্ট সেই আবাস।

তাফসীরে মাযহারী/৩৭০

জননী আয়েশা বলেছেন, একবার একদল ইহুদী রসুল স.এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো 'আস্সামু আলাইকুম (তোমাদের মৃত্যু হোক)। জবাবে আমি বললাম 'বাল আস্সামু আলাইকুম ওয়াল লা'নাতু' (বরং তোমাদের মৃত্যু হোক, আর তোমাদের উপর অভিসম্পাত)। রসুল স. বললেন, আয়েশা! আল্লাহ্ স্বয়ং নম্রভাষী, তাই তিনি পছন্দ করেন নম্রভাষীকেই। আমি বললাম, আপনি কি তাদের কথা শোনেননি? তিনি স. বললেন,আমি তো বলেইছি 'ওয়া আ'লাইকুম' (তোমাদের উপরেও)। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আমি বলে দিয়েছি 'আ'লাইকুম'। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, এক ইহুদী একবার রসুল স. এর সুমহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আস্সামু আ'লাইকুম। তিনি স. বললেন, ওয়া আ'লাইকুম। আর মাতা আয়েশা বললেন 'আস্সামু আ'লাইকুম ওয়া লাআ'নাকুমুল্লহু ওয়া গদ্বিবা আ'লাইকুম' (তোমাদের মৃত্যু হোক, এবং তোমাদের উপরে পতিত হোক আল্লাহ্র অভিসম্পাত ও গজব)। রসুল স. বললেন, আয়েশা! নম্রবচনী হও। পরিহার করো কঠোর ও অমার্জিত উক্তি। মাতা মহোদয়া বললেন, হে আল্লাহ্র প্রেমাস্পদ! আপনি কি তার কথা শুনতে পাননি? তিনি স. বললেন, আমি যা বললাম, তুমিও তো তা শুনতে পাওনি। আমি তো 'ওয়া আ'লাইকুম' (তোমাদের উপরও) বলে তার কথা তার দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছি। আমার প্রার্থনা গৃহীত হবে। তাদের বাসনা চরিতার্থ হবে না। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বললেন, তুমি অশিষ্টবচনা হয়ো না। অশিষ্টভাষীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইহুদীরা যদি তোমাদেরকে সালাম প্রদানের বদলে বলে 'আস্সামু আ'লাইকা' তবে তোমরা বোলো 'ওয়া আ'লাইকুম' (তোমাদের প্রতিও)। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কিতাবীরা তোমাদেরকে সালাম দিলে তোমরা বোলো 'ওয়া আলাইকুম'। বোখারী, মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! তোমরা যখন গোপন কোনো পরামর্শ করো, সে পরামর্শ যেনো পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রসুলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। তোমরা কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ কোরো এবং ভয় কোরো আল্লাহকে, যাঁর নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে'।

মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'হে মুমিনগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে কপট বিশ্বাসীদেরকে যারা মুখে মুখে ইমানের ঘোষণা দিতো, কিন্তু অন্তরে তা বিশ্বাস করতো না। আতা বলেছেন, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে এমন বিশ্বাসীকে, যাদের বিশ্বাস ছিলো স্বধারণাজাত।

'ফালা তানাজ্বাও' অর্থ যখন গোপন পরামর্শ করো, তখন ইহুদীদের মতো কোরো না। 'ওয়া তানাজ্বাও বিল বির্‌রি ওয়াত্ তাক্বওয়া' অর্থ তোমরা কল্যাণকর কাজ ও তাক্‌ওয়া অবলম্বনের পরামর্শ কোরো। 'বির' অর্থ ফরজ আদায় করা, ইবাদত করা, এমন কিছু করা যা মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর। আর 'ওয়াত্‌তাকুল্লহ্' অর্থ এবং ভয় করো আল্লাহ্‌কে। অর্থাৎ প্রতিটি কর্ম গ্রহণ অথবা বর্জন করো আল্লাহ্‌ভীতির ভিত্তিতে। কেননা আল্লাহ্‌ই ভালো-মন্দ সকল কর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল দিবেন।

তাফসীরে মাযহারী/৩৭১

ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, কাতাদা বলেছেন, কপটাচারীদের কানাঘুষা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতো। এমতো পরিস্থিতিতেই অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত (১০)। বলা হয়—'শয়তানের প্ররোচনায় হয় এই গোপন পরামর্শ, মুমিনদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য। তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতিসাধনেও সক্ষম নয়। মুমিনদের কর্তব্য আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা'। একথার অর্থ— শয়তানই তাদেরকে গোপন শলা-পরামর্শ করতে প্ররোচিত করে এবং এরকম জঘন্য কাজটিকে তাদের সম্মুখে সুন্দর করে দেখায়। আর এরকম করে সে কেবল বিশ্বাসীদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য। তবে আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক ও নিরাপত্তাপ্রদাতা। তাই আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা বিশ্বাসীদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। আর বিশ্বাসীদের জন্য এটাই সমীচীন যে, তারা সর্বাবস্থায় কেবল আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করবে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা যদি তিনজন একত্রে থাকো, তবে একজনকে ছেড়ে দিয়ে অন্য দু'জন গোপনে শলা-পরামর্শ কোরো না। তাতে সে মনোকষ্ট পাবে। অবশ্য সে অনুমতি দিলে অন্য দু'জন আড়ালে কথা বলতে পারবে।

সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আহমদ, বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল তিরমিজি কর্তৃক 'বিশুদ্ধ' আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা যদি এক দলে তিনজন থাকো, তবে দু'জনে মিলে আড়ালে কথা বোলো না। যদি বলো, তবে তোমাদের সাথীটি মনোকষ্ট পাবে। তবে সকলের উপস্থিতিতে যে কোনো দু'জন কথাবার্তা বলতে পারবে।

বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাজির ও আনসারগণকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন। একবার তাঁদের কয়েকজন রসুল স. এর এক মজলিশে উপস্থিত হলেন। প্রথমে তাঁরা সালাম বিনিময় করলেন রসুল স. এর সঙ্গে। তারপর উপবিষ্ট জনতার সঙ্গে। কিন্তু বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেউ তাঁদেরকে বসার জায়গা করে দিলেন না। রসুল স. এর কাছে এটা ভালো বোধ হলো না। তিনি স. তাঁর সামনে বসা কয়েকজনকে নাম ধরে ধরে ডেকে বললেন, এখান থেকে উঠে যাও। এভাবে তিনি দণ্ডায়মান সাহাবীগণকে তাঁর সামনে বসার জায়গা করে দিলেন। যারা উঠে গেলেন, তাদের কাছে ব্যাপারটা মনঃপুত হলো না। রসুল স. তাদের মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির আভাস লক্ষ্য করলেন। এমতো প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (১১)।

বলা হলো— 'হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিয়ো, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন এবং যখন বলা হয়, উঠে যাও, তোমরা উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন, তোমরা যা করো, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত'।

তাফসীরে মাযহারী/৩৭২

ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো জুমআ'র দিন। বদরী সাহাবীগণ মসজিদে গিয়ে জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় আয়াতখানি। বাগবী লিখেছেন, কালাবী বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছিলো হজরত সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস সম্পর্কে। সুরা হুজুরাতে হজরত সাবেতের এই ঘটনা উল্লেখ

www.eelm.weebly.com

করা হয়েছে। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, সাহাবীগণ রসুল স. এর ঘনিষ্ট হবার মানসে সামনের দিকে ঘন হয়ে বসতেন। ফলে পরে যারা আসতেন তাঁরা বসার জায়গা পেতেন না। এমতো পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

এখানে 'ইজা ক্বীলা লাকুম' অর্থ যখন তোমাদেরকে বলা হয়। 'তাফাস্সাহু' অর্থ স্থান প্রশস্ত করে দাও। অর্থাৎ নড়ে চড়ে বসে অন্যের বসার স্থান করে দাও। আরববাসীরা বলেন 'ইফসাহ্ আ'ন্নী' (আমার কাছ থেকে সরে যাও, পৃথক হও)। 'ফী মাজ্বালিস' অর্থ মজলিশে। অর্থাৎ যে কোনো সমাবেশে। অথবা— যে সমাবেশে রসুল স. উপবিষ্ট থাকেন, সেই সমাবেশে। কেননা রসুল স. এর সমাবেশেই শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর পবিত্র বাণী শ্রবণের জন্য ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে বসতেন। 'ফাফসাহু ইয়াফ্সাহিল্লাহু লাকুম' অর্থ তখন তোমরা স্থান করে দিয়ো, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন। অর্থাৎ তোমরা যদি স্থান করে দাও, তবে তোমরা যে বিষয়ের প্রশস্ততা কামনা করো, আল্লাহ্ সে বিষয়ে তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন। যেমন জীবনোপকরণ, বেহেশত, অথবা অন্য কোনো প্রয়োজন। স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা কাউকে তার জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়ো না। বরং তার পাশেই নিজের জন্য জায়গা করে নিয়ো। ইমাম শাফেয়ী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেনো জুমআ'র দিন তার ভ্রাতাকে তার জায়গা থেকে সরিয়ে না দেয়। যেনো বলে, আমাকে একটু জায়গা দাও। আবুল আলিয়া, কুরতুবী ও হাসান বলেছেন, বিধানটি প্রযোজ্য কেবল যুদ্ধের ময়দানে, সেনা অবস্থানের ক্ষেত্রে। তখন কেউ কেউ পরে এসে সারিবদ্ধ সৈন্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে বলতেন, আমাদের জন্য স্থান করে দাও। কিন্তু প্রথমে অবস্থান গ্রহণকারীরা শহীদ হওয়ার জন্য লালায়িত থাকতেন। তাই পরে আগমনকারীদেরকে স্থান ছেড়ে দিতে চাইতেন না। এমতো পরিস্থিতি সম্পকেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

'ওয়া ইজা ক্বীলান শুযূ ফানশুযূ' অর্থ এবং যখন বলা হয়, উঠে যাও, তোমরা উঠে যেয়ো। বাগবী লিখেছেন, ইকরামা ও জুহাক বলেছেন, আজান হওয়ার পরেও কেউ কেউ নামাজে আসতে অলসতা করতো। তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। এমতো বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— যখন নামাজের জন্য আজান দেওয়া হয়, তখন উঠে পড়ো। মুজাহিদ এবং অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা কথাটির অর্থ করেছেন— যখন তোমাদেরকে নামাজ, জেহাদ অথবা অন্য কোনো কল্যাণকর কাজে ডাকা হয়, তখন তোমরা তাৎক্ষণিকভাবে

উঠে পোড়ো, কালক্ষেপণ কোরো না, প্রশ্রয় দিয়ো না আলস্যকে। 'যারা ইমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন' অর্থ— যারা ইমানদার ও পুণ্যকর্মপরায়ণ আলেম, তাদেরকে আল্লাহ্ দান করবেন উন্নত মর্যাদা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য দান করবেন, ফলে তারা বিশুদ্ধতার সঙ্গে নিয়মিত নেক আমল করতে পারবে। সম্মানিত হতে পারবে জনদৃষ্টিতে। এসব হবে পৃথিবীতে। আর পরকালে তাদেরকে দান করা হবে বেহেশত ও আল্লাহ্র নৈকট্য। উল্লেখ্য, বিশেষভাবে আলেমগণকে এখানে মর্যাদা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। আর আলেম অর্থ এখানে সৎকর্মশীল আলেম। তাদেরকে আল্লাহ্ দান করেন প্রভূত প্রতিদান, যা সৎকর্মশীল মূর্খদেরকে দেন না। কেননা সর্বসাধারণ সৎকর্মশীল আলেমদেরই এলেম ও আমলের অনুসরণ করে। সুতরাং তাদেরকে তাদের নিজের আমলের সওয়াব তো দেওয়া হবেই, তদুপরি দেওয়া হবে তাদের অনুসারীদের আমলের সওয়াব। কিন্তু এতে করে এরকম ধারণা করা যেতে পারবে না যে, অনুসারীদের সওয়াব এর ফলে কিছুমাত্র কমবে। অনুসারীরা তাদের প্রাপ্য পাবেই।

হজরত জারীর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো ভালো প্রথার প্রচলন ঘটাবে, তাকে তার প্রাপ্য বিনিময় তো দেওয়া হবেই, তৎসঙ্গে দেওয়া হবে ওই লোকদের সমতুল বিনিময়, যারা ছিলো তার সুপ্রথার অনুসারী। অনুসারীদের বিনিময়ও এতে করে কিছুমাত্র কমবে না। তিনি স. আরো বলেছেন, ইবাদতকারীর উপরে জ্ঞানীর মর্যাদা তারকারাজির উপরে পূর্ণিমার চাঁদের ঔজ্জ্বল্যের মতো। জ্ঞানীগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ উত্তরাধিকাররূপে কোনো দীনার ও দিরহাম রেখে যান না, রেখে যান জ্ঞান। যে এই উত্তরাধিকার পায়, সে বড়ই সৌভাগ্যবান। ইমাম আহমদ ও সুনান প্রণেতাগণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কাছীর ইবনে কায়েস সূত্রে। তাঁর মাধ্যমে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইবাদতকারীর উপরে বিদ্বানের মর্যাদা এমন, যেমন তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তির মর্যাদা উত্তম ব্যক্তিদের উপর। তিরমিজি কর্তৃক হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, মসজিদের দুই স্থানে দু'টি সমাবেশ বসেছিলো। রসুল স. সেদিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, দু'টো সমাবেশই কল্যাণের উপরে রয়েছে। তবে ওদু'টোর একটি অপরটির তুলনায় উত্তম। একটি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনারত। আল্লাহ্ চাইলে প্রার্থনা পূরণ করবেন, অথবা করবেন না। আর অপরটি চর্চা করছে ধর্মীয় জ্ঞানের। শিক্ষা দিচ্ছে তাদেরকে, যারা জানে না। সেকারণেই এই সমাবেশটি অগ্রগামী। আর আমাকেও তো প্রেরণ করা হয়েছে শিক্ষাদাতা হিসেবে। এরপর তিনি স. যোগ দিলেন জ্ঞানচর্চার সমাবেশটিতে।

হাসান বসরী বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ একবার আলোচ্য আয়াত পাঠ করে বলেছিলেন, হে শ্রোতৃমণ্ডলী! তোমরা এই আয়াতের মর্ম বুঝতে চেষ্টা করো। এখানে জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে— জ্ঞানী বিশ্বাসী জ্ঞানহীন বিশ্বাসীর চেয়ে অধিকতর মর্যাদাধারী।

www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়েছে যে, বদরী সাহাবীগণ ছিলেন প্রভূত মর্যাদার অধিকারী। আর সে কারণে রসুল স. ও তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করতেন। আর রসুল স. এর নির্দেশে যাঁরা জায়গা ছেড়ে দিয়েদিলেন, তাঁদেরকেও দেওয়া হবে প্রতুল পুণ্য।

'ওয়াল্লহু বিমা তা'মালূনা খবীর' অর্থ তোমরা যা করো, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। অর্থাৎ তোমাদের ভালো-মন্দ প্রকাশ্য-গোপন সকলকিছুই আল্লাহ্ জানেন। সুতরাং সাবধান! কথাটির মাধ্যমে শাসানো হয়েছে তাদেরকে, যারা বদরী সাহাবীগণকে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে সাময়িকভাবে হলেও অপ্রসন্ন হয়েছিলেন।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! তোমরা রসুলের সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সাদাকা প্রদান করবে, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক, যদি তাতে অক্ষম হও, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

'ইজা নাজ্বাইতুমুর রসুলা' অর্থ তোমরা রসুলের সঙ্গে যদি চুপি চুপি কথা বলতে চাও। বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে। তারা রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে এতো বেশী কথা বলতো যে, দরিদ্ররা তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগই পেতো না। রসুল স.ও ধনাঢ্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা বলতে অপছন্দ করতেন। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন অনেকেই রসুল স. এর সঙ্গে অতিরিক্ত কথা বলা বন্ধ করে দিলো। বন্ধ হয়ে গেলো অতিপ্রশ্নপ্রবণতা। বাগবী লিখেছেন, তখন লোকেরা রসুল স. এর সঙ্গে বাক্যালাপ করা থেকে বিরত হয়ে গেলো। বিত্তহীনেরাও কথাবার্তা বলতে অক্ষম হয়ে গেলো। বিত্তশালীরা কথাবার্তা বন্ধ করলো অর্থদণ্ডের ভয়ে। বিশুদ্ধচিত্ত সাহাবীগণও অর্থাভাবে মৌন হয়ে গেলেন। বিষয়টি তাদের জন্য হয়ে গেলো পীড়াদায়ক। পরে অবশ্য তাঁরা অর্থ প্রদান ছাড়াই বাক্যালাপের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

মুজাহিদ বলেছেন, কথা বলতে গেলে হাদিয়া দিতে হবে, এই বিধানটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত আলীই সর্বপ্রথম এক দীনার সম্প্রদান করে রসুল স. এর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এরপর অবতীর্ণ হয় হাদিয়া ছাড়াই কথা বলার অনুমতি। একারণেই হজরত আলী বলতেন, কোরআন মজীদে এমন একটি আয়াত আছে, যে আয়াতের উপর আমার আগে কেউ আমল করতে পারেনি, আর কেউ পারবেও না। আর সে আয়াত হচ্ছে এই আয়াত। ইবনে আবী শায়বা তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে এবং হাকেম তাঁর 'মুস্তাদরাক' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, আল্লাহ্র কিতাবে এমন একটি আয়াত আছে, যার উপরে আমল করতে পেরেছি কেবল আমি। আমার কাছে একটি দীনার ছিলো। আমি সেটিকে ভাঙিয়ে নিয়েছিলাম। যখনই আমি রসুল স. এর সঙ্গে কথা বলতাম, তখনই

হাদিয়া হিসেবে নিবেদন করতাম একটি করে দিরহাম। 'তাফসীরে মাদারেকে' রয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, আমি রসুল স.কে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য এক দিরহাম করে হাদিয়া নিবেদন করতাম। এভাবে আমি প্রশ্ন করেছিলাম দশটি। তিনি স.ও সেগুলোর জবাব দিয়েছিলেন যথারীতি। প্রশ্নোত্তরগুলো এরকম—

১. প্রশ্নঃ অঙ্গীকারপূরণ কাকে বলে? জবাবঃ একত্ববাদের সাক্ষ্য অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' কলেমার সাক্ষ্য প্রদানকে।
২. প্রশ্নঃ ফাসাদের অর্থ কী? জবাবঃ কুফুরী ও শিরিক করা।
৩. প্রশ্নঃ সত্য কী ? জবাবঃ ইসলাম, কোরআন ও বেলায়েত।
৪. প্রশ্নঃ হিলা কী? জবাবঃ পৃথিবীর বৈভব বর্জন।
৫. প্রশ্নঃ আমার উপরে কোন কাজ অপরিহার্য ? জবাবঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করা।
৬. প্রশ্নঃ আল্লাহ্র কাছে কীভাবে প্রার্থনা করবো? জবাবঃ বিশুদ্ধতা (ইখলাস) ও প্রত্যয়ের (একিনের) সঙ্গে।
৭. প্রশ্নঃ আল্লাহ্র কাছে আমি কী কামনা করবো ? জবাবঃ নরক ও পৃথিবীর দুর্ভোগ থেকে নিরাপত্তা।
৮. প্রশ্নঃ আমার পরিত্রাণের জন্য আমি কী করবো? জবাবঃ হালাল খাবে ও সত্য কথা বলবে।
৯. প্রশ্নঃ আনন্দ কী? জবাবঃ জান্নাত।
১০. প্রশ্নঃ শান্তি কী? জবাবঃ আল্লাহ্র দীদার।

আমার এ সকল প্রশ্নের উত্তর যখন আমি পেলাম, তখন রহিত হয়ে গেলো হাদিয়া নিবেদন করে প্রশ্ন করার বিধান।

'জালিকা খইরুল্ লাকুম' অর্থ এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়। 'ওয়া আত্বহারু' অর্থ এবং পরিশোধক। 'ফাইল্ লাম তাজ্বিদূ' অর্থ যদি তাতে অক্ষম হও। আর 'ফাইন্নাল্লহা গফুরুর রহীম' অর্থ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমার রসুলের সঙ্গে কথা বলতে গেলে হাদিয়া নিবেদনের এই বিধানটি তোমাদের জন্য উপকারী। এর মাধ্যমে তোমরা নিজেদেরকে করে নিতে পারবে পরিশুদ্ধ। কিন্তু বিত্তবিবর্জিত হওয়ার কারণে যদি তোমরা বিধানটির উপরে আমল করতে সক্ষম না হও, তবে তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করা হবে না। কেননা আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাপরবশ এবং পরম দয়াময়। বলা বাহুল্য, হাদিয়া ব্যতিরেকে কথা বলার অনুমতিটি সাধারণ নয়। বরং সাধারণ বিধান থেকে এই বিধানটিকে আলাদাভাবে বিশেষায়িত করা হয়েছে।

হজরত আলী থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত ও উত্তম আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, যখন অবতীর্ণ হলো 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রসুলের সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সাদাকা প্রদান করবে' তখন রসুল স. বললেন, আলী! তোমার

অভিমত কী? হাদিয়ার পরিমাণ কি এক দীনার (দশ দিরহাম) হওয়া উচিত? আমি বললাম, লোকেরা এর উপরে আমল করতে সক্ষম হবে না। তিনি স.

বললেন, তাহলে কি অর্ধ দীনার? আমি বললাম, তাতেও সক্ষম হবে না। তিনি স. বললেন, তাহলে? আমি বললাম, একটি যব (এক পয়সার সমতুল)। তিনি স. বললেন, তুমি তো দেখছি সাধক প্রকৃতির। তখন অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত(১৩)।

বলা হয়— 'তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলবার পূর্বে সাদাকা প্রদানকে কষ্টকর মনে করো! যখন তোমরা সাদাকা দিতে পারলে না, আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা সালাত কায়েম করো, জাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা সম্যক অবগত'।

এখানে 'তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলবার পূর্বে সাদাকা প্রদান করাকে কষ্টকর মনে করো' কথাটির অর্থ তোমরা কি দারিদ্রের ভয়ে হাদিয়া দিতে চাও না? না, শয়তান তোমাদেরকে অর্থদণ্ডের ভয় দেখাচ্ছে বলে তোমরা আমার রসুলের সঙ্গে একান্তে কথা বলার মতো দুর্লভ সৌভাগ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো? 'যখন তোমরা হাদিয়া দিতে পারলে না' অর্থ যখন দারিদ্রের ভয়ে অথবা কৃপণতাবশতঃ তোমরা হাদিয়া দিতে পারলেই না। 'আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন' অর্থ আর আল্লাহ্ তোমাদের এমতো অনীহার কারণে যখন তোমাদেরকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দিলেন, রহিত করে দিলেন হাদিয়া প্রদানের অত্যাবশ্যকতা। উল্লেখ্য, আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকাটি পাপ ছিলো। কিন্তু আল্লাহ্ সে পাপ মার্জনা করে দিয়েছেন। মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, বিধানটি বলবৎ ছিলো দশ রাত পর্যন্ত। কালাবী বলেছেন, দিনের এক ঘন্টার বেশী সময় এ বিধান কার্যকর ছিলো না।

'তখন তোমরা সালাত কায়েম করো, জাকাত প্রদান করো' অর্থ তখন তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত প্রদানের ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী হও, আলস্য কোরো না, যেমন আলস্য করেছিলে হাদিয়া নিবেদনের বেলায়। 'এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো' অর্থ নামাজ ও জাকাতসহ অন্যান্য ফরজ হুকুম পালনের ক্ষেত্রে অলসতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। সর্বান্তঃকরণে ও সর্বআচরণে মেনে চলো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নির্দেশনা। আর 'তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা সম্যক অবগত' অর্থ তোমাদের ভালো-মন্দ, ছোট-বড়, প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ত। সুতরাং একথা ভুলে যেয়ো না যে, তাঁর ও তাঁর রসুলের আনুগত্য না করে তোমরা পার পেয়ে যাবে। সকলকে যথাসময়ে যথোপযুক্ত প্রতিফল তিনি দিবেনই।

ইমাম আহমদ, বায্যার, ইবনে জারীর, তিবরানী ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. তখন বসেছিলেন তাঁর প্রকোষ্ঠে, অথবা প্রকোষ্ঠের ছায়ায়। বললেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক এখানে উপস্থিত হবে। অথবা বললেন, জালেমের অন্তরের মতো অন্তরবিশিষ্ট, অর্থাৎ শয়তানী স্বভাবের এক লোক এক্ষুণি এখানে আসবে। তোমরা তার সঙ্গে

কথা বোলো না। একটু পরই উপস্থিত হলো সে। তার চোখ নীল রঙের এবং সে কানা। রসুল স. তাকে দেখা মাত্র বললেন, তুমি ও তোমার সাঙ্গ-পাঙ্গরা আমাকে গালি দাও কেনো? সে বললো, আমাকে একটু সময় দিন। আমি একটু পরে আবার আসছি। সে চলে গেলো। একটু পরে আবার হাজির হলো তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে। সকলে শপথ করে সমস্বরে বললো, না আমরা আপনাকে গালি দেইনি। এরকম কাজ আমরা করতেই পারি না। এমতো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত। বলা হলো—

সূরা মুজ্বাদালাহ্ ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

❑ তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহারা, আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করে? উহারা তোমাদের দলভুক্ত নহে, তাহাদের দলভুক্তও নহে এবং উহারা জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা শপথ করে।

❑ আল্লাহ্ উহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন কঠিন শাস্তি। উহারা যাহা করে তাহা কত মন্দ!

❑ উহারা উহাদের শপথগুলিকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে, আর উহারা আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে; অতএব উহাদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

❑ আল্লাহ্‌র শাস্তির মুকাবিলায় উহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি উহাদের কোন কাজে আসিবে না; উহারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে।

❑ যে দিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করিবেন উহাদের সকলকে, তখন উহারা আল্লাহ্‌র নিকট সেইরূপ শপথ করিবে যেইরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে এবং উহারা মনে করে যে, ইহাতে উহারা ভাল কিছুর উপর রহিয়াছে। সাবধান! উহারাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী।

www.eelm.weebly.com

❑ শয়তান উহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; ফলে উহাদিগকে ভুলাইয়া দিয়াছে আল্লাহ্‌র স্মরণ। উহারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

❑ যাহারা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা হইবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

❑ আল্লাহ্‌ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমি অবশ্যই বিজয়ী হইব এবং আমার রাসূলগণও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

❑ তুমি পাইবে না আল্লাহ্‌ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যাহারা ভালবাসে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচারিগণকে— হউক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাহাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা ইহাদের জ্ঞাতি-গোত্র। ইহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌ সুদৃঢ় করিয়াছেন ঈমান এবং তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছেন তাঁহার পক্ষ হইতে রুহ দ্বারা। তিনি ইহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে; আল্লাহ্‌ ইহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ইহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট, ইহারাই আল্লাহ্‌র দল। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, কপটবিশ্বাসীরা ইহুদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে। তারা বিশ্বাসী যেমন নয়, তেমনি ইহুদীও নয় এবং তারা জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করে বলে, আমরা ইমানদার। অথচ একথাও তারা ভালোভাবে জানে যে, তারা তা নয়। আল্লাহ্‌ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন কঠোরতম শাস্তি। কেননা তাদের আচরণ জঘন্যতম।

'যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে' অর্থ কপটাচারীরা বন্ধুত্ব করে ইহুদীদের সঙ্গে। এখানে একথা বলে বুঝানো হয়েছে মুনাফিক আবদুল্লাহ্‌ ইবনে নাবতাল ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে। আর 'আল্লাহ্‌ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ইহুদীদেরকে। কেননা তারা আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতগ্রস্ত। 'তারা তোমাদের দলভুক্ত নয়, তাদের দলভুক্তও নয়' অর্থ ওই মুনাফিকেরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী যেমন নয়, তেমনি নয় ইহুদীদের ধর্মমতানুসারী। আর 'তারা জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করে' অর্থ মনেপ্রাণে বিশ্বাসী না হওয়া সত্ত্বেও তারা শপথ করে বলে, আমরা ইমানদার।

সুদ্দী ও মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে মুনাফিক আবদুল্লাহ্‌ সম্পর্কে। সে রসুল স. এর সঙ্গে ওঠাবসা করতো। পরে কী কথাবার্তা হয়েছে তা জানিয়ে দিতো ইহুদীদেরকে। বর্ণনাকারীদ্বয় হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম একটি বিবরণ এনেছেন, যার শেষাংশে বলা হয়েছে, আবদুল্লাহ্‌ তখন কসম করে বললো, আমি তো এরকম কিছু করিনি। অতঃপর সে তার সাঙ্গ-পাঙ্গদেরকে ডেকে নিয়ে এলো। তারাও কসম করে বললো, আমরা আপনাকে কখনো গালি দেইনি।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'তারা তাদের শপথগুলিকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে, আর তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে; অতএব তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি'। একথার অর্থ— মিথ্যা কসমগুলিকে তারা ব্যবহার করে রক্ষাকবচরূপে এবং কুটকৌশলের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের প্রতি করে তোলে বীতশ্রদ্ধ। সেকারণেই তো তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে চরম অবমাননাকর শাস্তি।

এখানে 'আইমানাহুম' অর্থ মিথ্যা শপথগুলিকে। 'জুন্নাতান' অর্থ ঢালস্বরূপ, রক্ষাকবচরূপে। আর 'ফাসদ্দূ আ'ন সাবীলিল্লাহ্‌' অর্থ আর তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে আসতে বাধা দেয়। অথবা— মুসলমানকে হত্যা ও তাদের মালামাল লুণ্ঠনের জন্য তাদেরকে ফিরিয়ে রাখে জেহাদের অত্যাবশ্যকতা থেকে। উল্লেখ্য, আগের আয়াতে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে তাদের কুফুরীর কারণে। আর এই আয়াতে 'লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি'র কথা বলা হলো আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করবার মতো নিন্দনীয় অপরাধের কারণে। অন্য এক আয়াতেও তাদেরকে শাসানো হয়েছে এভাবে 'যারা কুফরী করেছে এবং

আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করেছে, আমি তাদের উপরে চাপিয়ে দিবো শাস্তির উপর শাস্তি'। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, ১৫ সংখ্যক আয়াতে 'কঠিন শাস্তি' বলে বুঝানো হয়েছে কবরের আযাবকে এবং এই আয়াতে 'লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি' বলে উদ্দেশ্য করা হয়েছে পরকালের শাস্তিকে।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র শাস্তির মোকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনো কাজে আসবে না; তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে'। এখানে 'লান তুগনিয়া আনহুম আমওয়ালুহুম ওয়ালা আওলাদুহুম' অর্থ তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারবে না। 'উলায়িকা আসহাবুন্‌ নার' অর্থ তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। আর 'হুম ফীহা খলিদূন' অর্থ সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'যেদিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা আল্লাহ্র নিকট সেরূপ শপথ করবে, যেরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা ভালো কিছুর উপর রয়েছে। সাবধান! তারাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী।

এখানে 'তখন তারা আল্লাহ্র নিকট সেরূপ শপথ করবে, যেরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে' অর্থ মহাবিচার দিবসেও তারা আল্লাহ্র সকাশে মিথ্যা শপথ করে আত্মরক্ষার অপচেষ্টা করবে। অন্তরে অবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও মুখে 'আমরা ইমানদার' বলে যেমন তোমাদেরকে এখন ধোকা দিচ্ছে, তেমনি ধোকা দিতে চেষ্টা করবে আমাকেও। আর 'এবং মনে করে যে, এতে তারা ভালো কিছুর উপর রয়েছে' অর্থ তারা মনে করে এরকম করলেই তারা পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। সুতরাং মিথ্যা হলেও এটাই ভালো। আর 'সাবধান! এরাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী' অর্থ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অবশ্যই ওই সকল মুনাফিকদের সম্পর্কে সতর্ক থেকো। মনে রেখো, প্রকৃত মিথ্যাবাদী তারাই।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'শয়তান তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্র স্মরণ। তারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত'।

এখানে 'ইসতাহ্ওয়াজা আ'লাইহিমুশ শাইত্বন' অর্থ শয়তান তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে। 'ফাআনসাহুম জিকরাল্লহ্' অর্থ ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্র স্মরণ। এমনভাবেই ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আল্লাহ্র শাস্তিকেও তারা আর ভয় করছে না। একথা ভাববার অবকাশও তাদের হচ্ছে না যে, আল্লাহ্ সকলের সকলকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। 'আলা ইন্না হিযবাশ্ শাইত্বন' অর্থ সাবধান! তারা শয়তানেরই দল। আর 'হুমুল খসীরূন' অর্থ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা বেহেশতের পরিবর্তে তারা খরিদ করে নিয়েছে দোজখ।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, কবরবাসী কাফেরদের জন্য বেহেশতের দিকের একটি সুড়ঙ্গ খুলে দেওয়া হবে। ফলে তারা দেখতে পাবে বেহেশতের প্রাণবন্ততা ও মনোহারিত্ব। বলা হবে, দ্যাখো, ওই

আনন্দ থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন। তারপর ওই সুড়ঙ্গ বন্ধ করে দিয়ে আর একটি সুড়ঙ্গ খুলে দেওয়া হবে দোজখের দিকের। তারা দেখতে পাবে ভয়ংকর লেলিহান অগ্নিশিখাগুলো ক্রমাগত পরস্পরকে গ্রাস করে চলেছে। বলা হবে, ওই দ্যাখো তোমাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা। ইবনে মাজা। রসুল স. বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য বেহেশতে ও দোজখে রয়েছে একটি করে গৃহ। যারা দোজখে যায়, তাদের বেহেশতের মালিক হয় বেহেশতবাসীরা। এদিকে ইঙ্গিত করেই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'উলায়িকা হুমুল ওয়ারিছুন' (তারাই এর উত্তরাধিকারী)।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হবে লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত (২০)। আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করেছেন, আমি অবশ্যই বিজয়ী হবো এবং আমার রসুলগণও। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী' (২১)।

এখানে 'ফীল আজাল্লীন' অর্থ চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত, নিকৃষ্টতম। 'কাতাবাল্লহ' অর্থ আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছেন, সে সিদ্ধান্ত পূর্বাহ্নে লিখে রেখেছেন লাওহে মাহফুজে। 'লা আগলিবান্না আনা ওয়া রুসুলী' অর্থ আমি অবশ্যই বিজয়ী হবো এবং আমার রসুলগণও। অর্থাৎ আমি তো বিজয়ী হবোই, সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ী হবে আমা কর্তৃক প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণ; তাদের মধ্যে যাদের উপরে জেহাদ ফরজ করা হয়েছে, তারা হবে যুদ্ধবিজয়ী, আর যাদের উপরে যুদ্ধ আবশ্যিক করা হয়নি, তারা প্রতিপক্ষের উপর জয় লাভ করবে যুক্তি ও মোজেজার মাধ্যমে। 'ক্বওয়িয়্যিউন' অর্থ শক্তিমান, এমন শক্তিমান, যার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার সাধ্য কারো নেই। আর 'আ'যীয' অর্থ পরাক্রমশালী, এমন পরাক্রমাধিকারী, যার কাছে পরাভূত হওয়া ছাড়া কারো কোনো উপায় ও সহায় নেই।

শেষোক্ত আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'তুমি পাবে না আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায়কে, যারা ভালোবাসে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরূদ্ধচারীদেরকে— হোক না ওই বিরুদ্ধাচারী তাদের পিতা, পুত্র-ভ্রাতা অথবা এদের জ্ঞাতি-গোত্র'।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসীদেরকে ভালোবাসলে ইমানের ক্ষতি হয়। তাই কোনো বিশ্বাসী অবিশ্বাসীদেরকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে পারে না, সে অবিশ্বাসী যতো নিকটাত্মীয় হোক না কেনো। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত হাতেম ইবনে আবী বালতাকে লক্ষ্য করে। তিনি মক্কাবাসী মুশরিকদের কাছে রসুল স. এর গোপন সিদ্ধান্ত জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। সুরা মুমতাহিনার তাফসীরে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

আবু জুরাইজের মাধ্যমে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীকের পিতা হজরত আবু কোহাফা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন রসুল স. সম্পর্কে একটি মন্দ উক্তি করলেন। হজরত আবু বকর তা সহ্য করতে না পেরে

www.eelm.weebly.com

পিতাকে মারলেন একটি ঘুষি। ফলে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। রসুল স. একথা জানতে পেরে বললেন, কেনো এমন করলে? হজরত আবু বকর বললেন, তখন আমার হাতে তরবারী থাকলে তো আমি তাকে হত্যাই করে ফেলতাম। এ ঘটনাটিকে উপলক্ষ করেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

ইবনে সাওদা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ্ সম্পর্কে, যিনি বদর যুদ্ধে তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন। হাকেম এবং তিবরানীও ঘটনাটির সবিস্তার বিবরণ দিয়েছেন। ওই যুদ্ধে তাঁর পিতাই তাঁকে হত্যা করতে বারবার এগিয়ে আসছিলো। শেষে তিনি তাকে হত্যা করেন। মুর্‌রা হামাদানী সূত্রে মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, উহুদ যুদ্ধে আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন। সে সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় 'হোক না কেনো বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা'।

'আও আবনাআহুম' অর্থ অথবা পুত্র। বদর যুদ্ধে হজরত আবু বকর তাঁর পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে মনস্থ করলেন। বললেন, হে প্রত্যাদেশবাহী পুরুষ! আমাকে সম্মুখবর্তী হবার অনুমতি দিন। রসুল স. বললেন, আবু বকর! এই মুহূর্তে আমাকে তোমার সত্তা দ্বারা উপকৃত হতে দাও (স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে পরামর্শদাতা হিসেবে আমার সঙ্গে থাকো)।

'আও ইখওয়ানাহুম' অর্থ অথবা ভ্রাতা। অর্থাৎ বিশ্বাসীরা তাদের অবিশ্বাসী ভাইকেও ভালোবাসে না। হজরত মাসআব ইবনে উমায়ের উহুদ যুদ্ধে তাঁর ভাই উবায়েদ ইবনে উমায়েরকে একারণেই হত্যা করতে পিছপা হননি।

'আও আ'শীরাতাহুম' অর্থ অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র। এ বিষয়েও সাহাবীগণ আমল করেছিলেন। যেমন বদর যুদ্ধে হজরত ওমর হত্যা করেছিলেন তাঁর আপন মামা আসেম ইবনে হিশামকে। হজরত আলী, হজরত হামযা এবং হজরত উবায়দা বদর যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন তাঁদের নিকটাত্মীয় উতবা ইবনে রবীয়া, শায়বা ইবনে রবীয়া এবং ওলীদ ইবনে উতবাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এদের অন্তরে আল্লাহ্ সুদৃঢ় করেছেন ইমান'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহ্‌র জন্যই শত্রুতা পোষণকারী এ সকল মহাজনের হৃদয়ে আল্লাহ্ ইমানকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরস্থায়ী করেছেন। তাই তাঁদের হৃদয়ে কখনোই অবিশ্বাস ও দ্বিধা-সন্দেহ প্রবেশ করতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা'। এখানে 'রূহ' অর্থ নূর, অথবা আল্লাহ্‌র সাহায্য। সুদ্দী বলেছেন,এখানে 'রূহ অর্থ ইমান। রবী বলেছেন, কোরআন ও কোরআনস্থিত প্রমাণপঞ্জী। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ— আল্লাহ্‌র রহমত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'রূহ' অর্থ হজরত জিবরাইল।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি এদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে এরা স্থায়ী হবে; আল্লাহ্ এদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং

এরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, এরাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রাখো আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী'। একথার অর্থ— 'আল্লাহ্ এ সকল মহাজনকেই প্রবেশ করাবেন চিরস্থায়ী সুখের উদ্যানে, যেখানে সতত প্রবহমান রয়েছে সলিলিত স্রোতস্বিনীসমূহ। সেখানেই তারা চিরকাল বসবাস করবে। তাদের একনিষ্ঠ আনুগত্যে আল্লাহ্ প্রীত, তারাও আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত মহাপুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকারে তুষ্ট। অথবা পৃথিবীতে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালা যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তাতে তারা প্রসন্ন। এরাই আল্লাহ্‌র বাহিনী। হে মনুষ্যসমাজ! জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র বাহিনীই সর্বক্ষেত্রে সফলকাম হয়। লাভ করে উভয় জগতের কল্যাণ। সকল প্রকার ভয়-ভীতি থেকে থাকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত।

সূরা হাশর

সূরা হাশর অবতীর্ণ হয়েছে জ্যোতিস্নাত মদীনায়। এতে রয়েছে ৩ রুকু এবং ২৪ আয়াত।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, আমি একবার হজরত ইবনে আব্বাসের কাছে এই সুরার আবৃত্তি শুনে বলেছিলাম, এটা কি সুরা হাশর? তিনি বললেন, না। সুরা নাজীর। বোখারী ও মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন। বোখারী এরকমও উল্লেখ করেছেন যে, সুরা আনফাল অবতীর্ণ হয়েছিলো বদর যুদ্ধ সম্পর্কে এবং সুরা হাশর অবতীর্ণ হয়েছে বনী নাজীর সম্পর্কে।

সূরা হাশর ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

www.eelm.weebly.com

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

❑ তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কাফির তাহাদিগকে প্রথমবার সমবেতভাবে তাহাদের আবাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তোমরা কল্পনাও কর নাই যে, উহারা নির্বাসিত হইবে এবং উহারা মনে করিয়াছিল উহাদের দুর্গগুলি উহাদিগকে রক্ষা করিবে আল্লাহ্ হইতে; কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তি এমন এক দিক হইতে আসিল যাহা ছিল উহাদের ধারণাতীত এবং উহাদের অন্তরে তাহা ত্রাসের সঞ্চার করিল। উহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিল নিজেদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও; অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

❑ আল্লাহ্ উহাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না করিলে উহাদিগকে পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন; পরকালে উহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি।

❑ ইহা এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, এবং কেহ আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করিলে আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা, অধিকর্তা, নিয়ন্ত্রয়িতা ও পালয়িতা। তাই সমগ্র সৃষ্টিই বিরতিহীনভাবে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি যে মহা প্রতাপশালী ও মহান প্রজ্ঞাধিকারী।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে প্রথমবার সমবেতভাবে তাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন'। এখানে 'কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফের' অর্থ মদীনার বনী নাজীর সম্প্রদায়। তারা ছিলো নবী হারুনের বংশধর। 'আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন' অর্থ তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন। আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন, বনী নাজীরকে দেশান্তরিত করা হয়েছিলো উহুদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রসুল স. এর প্রত্যাবর্তনের পর। আর বনী কুরায়জার নিধনপর্ব সংঘটিত হয়েছিলো আহযাব যুদ্ধের শেষে। ঘটনা দু'টোর ব্যবধান ছিলো দুই বৎসর। বনী নাজীরকে দেশান্তরিত করা হয়েছিলো সন্ধিচুক্তি লংঘনের কারণে। রসুল স. মদীনায় এসেই তাদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন যে, প্রত্যেকেই শান্তিতে আপন আপন ধর্ম পালন করবে, কেউ কারো বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। কেউ কারো শত্রুকে সাহায্য করতে পারবে না। এরপর সংঘটিত হলো বদর যুদ্ধ। রসুল স. বিজয়ীর বেশে ফিরে এলেন মদীনায়। বনী নাজীরেরা তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করলো, ইনিই সেই নবী, যার কথা আমরা পাঠ করে

www.eelm.weebly.com

থাকি তওরাতে। তাঁর পতাকা কখনো অবনমিত হবে না। কিন্তু উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়ের পর তাদের মনোভাব গেলো বদলে। দ্বিধাসন্দেহে নিপতিত হলো তারা। এক পর্যায়ে প্রকাশ্যে শুরু করলো শত্রুতা। ভঙ্গ করলো সন্ধিচুক্তি। কা'ব ইবনে আশরাফ নামের তাদের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি চল্লিশ জন ইহুদীকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলো মক্কায়। মিলিত হলো কুরায়েশ গোত্রপতি আবু সুফিয়ানের সঙ্গে। দুই নেতা তাদের পক্ষের চল্লিশ জন করে লোক নিয়ে প্রবেশ করলো কাবা প্রাঙ্গণে। কাবাগৃহের পর্দা ধরে তারা সকলে রসুল স. এর বিরুদ্ধাচরণ করবে বলে শপথ করলো। এরপর কা'ব তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে ফিরে এলো মদীনায়। হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে তাদের সম্পর্কে সব কথা রসুল স.কে জানালেন। রসুল স. কা'বকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ প্রতিপালন করলেন হজরত মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমা। এ ঘটনাটি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সুরা আলে ইমরানের তাফসীরের যথাস্থানে। রসুল স. বনী নাজীরের অঙ্গীকারভঙ্গের বিভিন্ন রকম সংবাদ অবগত হলেন। যেমন—

১. তারা রসুল স. এর কাছে প্রস্তাব পাঠালো, আপনি আপনার তিরিশ জন সঙ্গী-সাথী নিয়ে আপনাদের ও আমাদের বসতির মধ্যবর্তী স্থানে আসুন। আমরাও উপস্থিত হবো আমাদের ত্রিশ জন লোক নিয়ে। আমাদের আলেমেরা আপনার কথা শুনবে। যদি তারা আপনাকে সত্য রসুল বলে মেনে নেয়, তবে আমরাও আপনার উপরে ইমান আনবো। রসুল স. তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। নির্ধারিত দিনে তিরিশজন সাহাবীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন যথাস্থানে। তারা এলো তাদের তিরিশজনকে নিয়ে। কাছাকাছি হওয়ার আগে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, মোহাম্মদের কাছে তোমরা পৌঁছবে কীভাবে। তাঁর সঙ্গে তো রয়েছে তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গকারী তিরিশজন সহচর। এরপর তারা কাছে এসে বললো, এখানে তো আমরা ষাটজন উপস্থিত। এতো লোকের সামনে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সম্ভব? আপনি বরং আর একদিন তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। আমরাও আসবো তিনজন আলেমকে নিয়ে। আপনার কথা শুনে যদি আমাদের আলেমেরা আপনাকে সত্য বলে গ্রহণ করে তবে আমরা সকলেই মুসলমান হয়ে যাবো। রসুল স. সাহাবীগণকে নিয়ে ফিরে এলেন। পরদিন গেলেন তিনজনকে নিয়ে। ইহুদীদের তিনজনও উপস্থিত হলো। তারা ছিলো সশস্ত্র। অতর্কিতে আক্রমণ করে রসুল স.কে হত্যা করার পরিকল্পনা ছিলো তাদের। রসুল স. এই সংবাদটি জানতে পারলেন নির্ধারিত স্থানে পৌঁছার আগেই। তাই আর অগ্রসর না হয়ে ফিরে এলেন মদীনায়। বনী নাজীর গোত্রের একজন ইতোপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বোন তাঁকে ইহুদীদের গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানিয়েছিলো। আর তিনি দেরী না করে সংবাদটি জানিয়ে দিয়েছিলেন রসুল স.কে। আবু দাউদ, বায়হাকী। আবদ ইবনে হুমাইদ এবং আবদুর রাজ্জাকও যথাসূত্রে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তাঁদের সুদীর্ঘ বিবরণে একথাও উল্লেখ করেছেন যে, বদর যুদ্ধের পরাজয়ের পর কুরায়েশরা তাদের কাছে এই মর্মে পত্র

লিখেছিলো যে তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বর্মপরিহিত অবস্থায় অযথা দুর্গমধ্যে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। তোমাদের তো উচিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া। শত্রুকে পরাভূত করা। যথাশীঘ্র তোমরা অমুক অমুক কাজে তৎপর হও। কুরায়েশদের পত্র পেয়ে তারা উজ্জীবিত হলো। গোপনে ষড়যন্ত্র করলো রসুল স.কে হত্যা করার। বাগবী এ ঘটনা বর্ণনা করার পর লিখেছেন, রসুল স. পরদিনই তাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন। একুশ দিন পর্যন্ত তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখলেন।

২. রসুল স. এর সঙ্গে আর একটি অঙ্গীকারভঙ্গ করেছিলো বনী নাজীরেরা। বীরে মাউনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তাদের আমর ইবনে উমাইয়া নামক এক লোক দু'জন মুসলমানকে হত্যা করে ফেললো। সন্ধির শর্তানুসারে রসুল স. তাদের কাছে হাজির হলেন রক্তপণের দাবি নিয়ে। তখন তারা দুর্গের প্রাকার থেকে ভারী পাথর গড়িয়ে দিয়ে রসুল স.কে হত্যার পরিকল্পনা করলো। আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে তাদের দুরভিসন্ধির কথা জানিয়ে দিলেন। ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণিত হয়েছে সুরা মায়েদার 'ইয়া আইয়্যুহাল্ লাজীনা আমানু উজকুরু নি'মাতিল্লাহি আ'লাইকুম' এই আয়াতের তাফসীরে। ইকরামা সূত্রে আবদ ইবনে হুমাইদ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা যখন রসুল স.কে তাদের দুরভিসন্ধির কথা জানিয়ে দিলেন, তখন তিনি স. ফিরে এলেন মদীনায়। তখন কেনানা ইবনে সুরিয়া নামের এক ইহুদী অন্যান্য ইহুদীদেরকে বললো, তোমরা কি জানো, মোহাম্মদ হঠাৎ চলে গেলেন কেনো? তারা বললো, আল্লাহ্র শপথ! এর কারণ আমরা যেমন জানি না, তেমনি তুমিও জানো না। কেনানা বললো, তওরাতের শপথ! আমি এর কারণ জানি। মোহাম্মদ তোমাদের দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরেই ফিরে গিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তার বিরুদ্ধে আর ষড়যন্ত্র কোরো না। আল্লাহ্র শপথ! তিনি আল্লাহ্র রসুল। আল্লাহ্ই তাঁকে তোমাদের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশেষ রসুল। তোমরা চেয়েছিলে শেষ রসুল যেনো নবী হারুনের বংশভূত হন। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান, তাকেই রসুল নির্বাচন করেন। তওরাত তো আমাদের সামনেই রয়েছে। তাতে তো একথা স্পষ্ট করে বলাই হয়েছে যে, শেষ রসুলের জন্মভূমি হবে মক্কা এবং হিজরতের স্থান হবে ইয়াসরেব। মোহাম্মদের আচার আচরণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী তো অবিকল ওইরকম যেরকম লেখা রয়েছে আমাদের তওরাতে। বরং আমি তো দেখতে পাচ্ছি, এ স্থান ছেড়ে তোমরা চলে যেতে বাধ্য হচ্ছো। নষ্ট হচ্ছে তোমাদের সন্তান-সন্ততি, বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদ। তোমাদের পরিণতি তো দেখছি বড়ই মন্দ। সুতরাং আমার কথা শোনো। মেনে নাও দু'টো বিষয়ের যে কোনো একটিকে। তৃতীয় কোনো বিষয় তোমাদের জন্য কল্যাণপ্রদ নয়। তারা জিজ্ঞেস করলো, সে দু'টো বিষয় কী? কেনানা বললো, ইসলাম গ্রহণ করে মোহাম্মদের একনিষ্ঠ

www.eelm.weebly.com

অনুগামী হয়ে যাও। তাহলে তোমাদের সন্তান-সন্ততি সহায়-সম্পদ সবকিছু রক্ষা পাবে। তোমরাও মর্যাদায়িত হবে তাঁর অন্যান্য সহচরবৃন্দের মতো। ইহুদীরা বললো,

কিন্তু আমরা তো তওরাত ও নবী মুসার উপদেশ ত্যাগ করতে পারি না। কেনানা বললো, তাহলে গ্রহণ করো দ্বিতীয়টি। অবিলম্বে তিনি এ স্থান ছেড়ে অন্যত্র গমনের নির্দেশ ঘোষণা করবেন। তাঁর এমতো নির্দেশও তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। যদি তা তোমরা নির্বিবাদে পালন করো, তাহলে তিনি তোমাদের জীবন ও সম্পদকে তাঁর জন্য হালাল সাব্যস্ত করবেন না। তোমরাও সুযোগ বুঝে তোমাদের মাল-মাত্তা বিক্রয় করে দিতে পারবে। অথবা নিয়ে যেতে পারবে সঙ্গে করে। তারা বললো, হ্যাঁ, একথা অবশ্য ঠিক। সালাম ইবনে মুশকাম বললো, তোমার আচরণ প্রথম থেকেই আমাদের পছন্দ হয়নি। এখন আবার বলছো, তিনি আমাদেরকে এই শহর ছেড়ে যেতে বলবেন।

এদিকে রসুল স. মদীনায় ফিরে এসেই মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমাকে ডেকে বললেন, তুমি এখনই বনী নাজীরদের বসতিতে যাও। গিয়ে বলো, আল্লাহ্‌র রসুল আমাকে এই ঘোষণাটি দিতে বলেছেন যে, তোমরা আমার শহর ছেড়ে চলে যাও। মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমা তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হলেন। তাদের বসতিতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র রসুল তাঁর একটি ঘোষণা করবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। তবে তার আগে আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে অবহিত করতে চাই, তোমরা হয়তো তা জানো। তারা বললো, বলো, কী বলতে চাও। মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমা বললেন, তোমাদেরকে আমি ওই তওরাতের শপথ দিয়ে বলছি, যা অবতীর্ণ হয়েছিলো নবী মুসার উপরে, তোমাদের কি মনে আছে শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর আবির্ভাবের আগে একদিন তোমরা আমাকে এক সমাবেশে বলেছিলে, হে ইবনে মুসলিমা! তুমি যদি ইহুদী হতে চাও, তবে আমরা তোমাকে ইহুদী বানিয়ে নিবো। আর যদি তা না চাও, তবে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। আমি বলেছিলাম, ইহুদী হবার অভিলাষ আমার নেই। তোমরা শাস্তি দিতে চাইলে দিতে পারো। তোমরা আমাকে শাস্তিই দিয়েছিলে। বলেছিলে, আমরা ইহুদী বলেই তুমি আমাদের ধর্মমতকে গ্রহণ করতে পারছো না। তুমি সম্ভবত হানিফী শরিয়তের অন্বেষণকারী, যার আলোচনা হয়তো তোমার কাছে পৌঁছেছে। তবে মনে রেখো হানিফী শরিয়ত আবু আমের সন্ন্যাসীর কাছে নেই। সে হানিফী পন্থীও নয়। হানিফী পন্থী তো হবে এক যুদ্ধবাজ (মুসায়লামা কাযযাব)। তার চোখ হবে রক্তিম বর্ণের। সে আগমন করবে ইয়েমেনের দিক থেকে। তার কাঁধে তরবারী ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। তার বচন হবে জ্ঞানগর্ভ। তোমাদের বসতি তার বাহিনীর দ্বারা লুণ্ঠিত হবে এবং তোমাদের নাক-কান কাটা পড়বে। ইহুদীরা বললো, হ্যাঁ, আমরা এরকম বলেছিলাম। সেকথা এখনো আমরা ভুলে যাইনি। মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমা বললেন, রসুল স. আমাকে জানাতে বলেছেন, তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছো। ভঙ্গ করেছো সন্ধিচুক্তি। আমর ইবনে হাজ্জাশের বাড়ীর ছাদ থেকে তোমরা পাথর নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলে। সুতরাং তোমাদেরকে এ শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। দশদিন সময় দেওয়া হলো তোমাদেরকে। এর পর যাকে এখানে পাওয়া যাবে, তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। ঘোষণাটি শোনার

পর ইহুদীরা অন্যত্র যাত্রার জন্য তোড়জোড় শুরু করলো। খুঁজতে শুরু করলো যানবাহন। এমতাবস্থায় মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের দু'জন দূত সুওয়ায়েদ ও আয়মাশ দেখা করলো তাদের সঙ্গে। বললো, আবদুল্লাহ্ তোমাদেরকে মদীনা ছেড়ে চলে যেতে নিষেধ করেছে। বলেছে, তোমরা তোমাদের দুর্গে অবস্থান করো। আরো বলেছে, আমার সঙ্গে আমার গোত্রের ও অন্যান্য আরব গোত্রের দু'হাজার লোক রয়েছে। আমরা সকলেই তোমাদেরকে সাহায্য করতে তোমাদের দুর্গে এসে উপস্থিত হবো। মুসলমানেরা আসার আগেই আমরা ঠিক ঠিক চলে আসবো। আমরা সকলে তোমাদের আগে মৃত্যুবরণ করতে রাজী। বনী কুরায়জার লোকেরাও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে সহায়হীন ভেবো না। তাছাড়া বনী গাতফানও তো তোমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তারাও তোমাদেরকে সাহায্য করবে। এরপর আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই কা'ব ইবনে আসাদ কারাজীর নিকটেও লোক প্রেরণ করলো। বলে পাঠালো, তুমি ও তোমাদের সঙ্গী-সাথীদেরকেও আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। কা'ব বললো, আমরা তো সন্ধিভঙ্গ করতে পারবো না। এরকম উত্তর পেয়ে সে নিরাশ হয়ে গেলো। সে চাইলো রসুল স. ও বনী নাজীরের মধ্যে উত্তেজনা জিইয়ে রাখতে। এরপর সে সাহায্য কামনা করলো হুয়াই ইবনে আখতাব কারাজীর নিকটে। হুয়াই প্রথমে তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলো। কিন্তু আবদুল্লাহ্‌র পুনঃপুনঃ অনুরোধে নরম হয়ে বললো, ঠিক আছে, আমি মোহাম্মদকে জানিয়ে দিবো, আমরা কেউ স্থান ত্যাগ করবো না। আপনি যা করবার তা-ই করুন। এদিকে সালাম ইবনে মুশকাম বললো, তোমার মতামতের প্রতি যদি আমার কোনো প্রকার সন্দেহ থাকতো, তবে আমি ইহুদীদেরকে নিয়ে আলাদা হয়ে যেতাম। হুয়াই হুঁশিয়ার হও। বললো, তুমি জানো, আমি যেমন জানি, তেমনি আমাদের সকলেই জানে, মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল। তাঁর গুণাবলীর বিবরণ তো আমাদের তওরাতেই রয়েছে। তৎসত্ত্বেও আমরা তাঁকে মেনে নিতে পারছি না তো একটি মাত্র কারণে যে, নবী হারুনের বংশ থেকে নবুয়ত বের হয়ে গেলো। ঠিক আছে, তাঁকে নবী হিসেবে আমরা যদি না-ই মানি, তবে তার কথামতো অন্তত এ শহর ছেড়ে চলে যেতে তো পারি। আমি জানি, সন্ধিভঙ্গের

ব্যাপারে তুমি আমার অভিমতের বিরোধী। খেজুরের মওসুম তাহলে আসুক। তখন আমরা না হয় ফিরে আসবো। অথবা তিনি খেজুরের জন্য আমাদের কাছে আসবেন। হুয়াই তার প্রস্তাব গ্রহণ করলো না। বরং তার ভাই জুদী ইবনে আখতাবকে রসুল স. এর কাছে পাঠিয়ে জানিয়ে দিলো, আমরা আমাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবো না। আপনার যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। হুয়াই তার ভাই জুদী দ্বারা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকেও জানিয়ে দিলো যে, আমরা মোহাম্মদের কাছে সন্ধিভঙ্গের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছি। এখন তোমরা বনী নাজীরের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছো, সেই মোতাবেক কাজ করো। রসুল স. যখন জুদীর মুখে হুয়াইয়ের বক্তব্য শুনলেন, তখন উচ্চকণ্ঠে তকবীর ধ্বনি দিলেন। সাহাবীগণও সমস্বরে বলে উঠলেন 'আল্লাহু আকবার'।

তিনি স. তখন বললেন, এখন আমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবো। জুদী যখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কাছে পৌঁছলো তখন সে ছিলো তার ঘরের মধ্যে। তার কাছে বসেছিলো আরো কিছুসংখ্যক লোক। এদিকে রসুল স. নির্দেশ দিলেন, তোমরা এবার বনী নাজীরদের লোকালয়ের দিকে যাত্রা করো। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের পুত্র হজরত আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতার কাছে পৌঁছলেন। দেখলেন, তার সঙ্গে বসে রয়েছে বেশ কিছু লোক। জুদীও রয়েছে তার মধ্যে। হজরত আবুদল্লাহ্ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হলেন এবং যাত্রা করলেন বনী নাজীরদের লোকালয়ের দিকে। জুদী উঠে চলে গেলো তার ভাই হুয়াইয়ের কাছে। হুয়াই জিজ্ঞেস করলো, সংবাদ কী? জুদী বললো, খারাপ। আমি মোহাম্মদের কাছে যখন তোমার কথা জানালাম, তখন তিনি ও তার সঙ্গী-সাথীরা তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। তারপর তিনি বললেন, এখন আমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবো। এরপর আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কাছে গেলাম। দেখলাম , তারা তেমন কোনো খবরই রাখে না। আমাকে সে কেবল বললো, আমি আমাদের মিত্র গাতফান গোত্রের কাছে সংবাদ পাঠাবো। তারা এসে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবে।

রসুল স. মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্তরূপে হজরত ইবনে উম্মে মাকতুমকে রেখে রওয়ানা হয়ে গেলেন বনী নাজীরদের জনপদের দিকে। সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি আসরের নামাজ পাঠ করলেন। এরপর মুসলিম বাহিনী যখন আক্রমণোদ্যত হলো, তখন বনী নাজীরেরা উঠে গেলো দুর্গের উপরে। সেখান থেকে তারা নিক্ষেপ করতে লাগলো তীর ও পাথর। বনী কুরায়জারা রইলো পৃথক অবস্থানে। তারা বনী নাজীরদেরকে কোনো প্রকার সাহায্য করলো না। রসুল স. সেখানে ইশার নামাজ পাঠ করার পর দশজন সাথী নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। সেনাপতি হিসেবে রেখে এলেন হজরত আলীকে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলেন হজরত আবু বকরকে। মুসলিম বাহিনী সারারাত তাদেরকে ঘেরাও করে রাখলেন। ভোরে আজান দিলেন হজরত বেলাল। রসুল স. তাঁর দেহরক্ষীগণসহ ফিরে এসেছিলেন। তিনি স. ফজরের নামাজ সম্পন্ন করলেন বনী খতমের প্রান্তরে। এমতাবস্থায় হুয়াই ইবনে আখতাব প্রস্তাব পাঠালো, আপনি যা করতে চান, আমরা তাতেই রাজী। আমরা আপনার শহর ছেড়ে চলে যাবো। রসুল স. বলে দিলেন, এখন আমি এরকম প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি না। এখন তোমাদেরকে রেখে যেতে হবে সমরসরঞ্জামসমূহ। অন্যান্য সামগ্রী কেবল তোমরা নিয়ে যেতে পারবে। সালাম ইবনে মুশকাম বললো, হতভাগ্যের দল! এ প্রস্তাব গ্রহণ করো। নইলে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে তোমাদেরকে। হুয়াই বললো, এর চেয়ে ভয়াবহ আর কী হবে? সালাম বললো, তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে বানানো হবে দাস-দাসী। সহায়-সম্পত্তি তো যাবেই, তার সাথে চলে যাবে জীবন। জীবন চলে যাওয়ার চেয়ে শুধুমাত্র সহায়-সম্পত্তি চলে যাওয়া কি উত্তম নয়? হুয়াই এক বা দুই পর্যন্ত এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানাতে থাকলো। ইয়াসিন ইবনে উমায়ের ও আবু সাঈদ ইবনে

রাহাব এমতো সঙ্গীণ অবস্থা দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, আল্লাহ্র শপথ! তোমরা যখন জানোই যে, তিনি আল্লাহ্র রসুল, তখন মুসলমান হতে আর বাধা কিসের? আমরা মুসলমান হয়ে যাবো। এতে করে আমাদের জীবন ও সম্পদ দু'টোই রক্ষা পাবে। তারা দু'জন রাতে নিচে নেমে এসে মুসলমান হয়ে গেলো। লাভ করলো জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা।

মোহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে সা'দ, বালাজুরী, আবু মা'শার এবং ইবনে হাব্বান বলেছেন, রসুল স. তাঁর অবরোধ অভিযান চালিয়ে যান। ইবনে ইসহাক ও আবু আমেরের মতানুসারে অবরোধ অভিযান চলেছিলো ছয় দিন। সুলায়মান তাঈমী বলছেন, বিশ দিন। আর আবু কেলা' বলেছেন, তেইশ দিন। জননী আয়েশা বলেছেন, ওই অবরোধ চলেছিলো পঁচিশ দিন পর্যন্ত। এর আগে তারা নিজেরাই তাদের জনপদের কাছাকাছি ঘরবাড়িগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। আর তাদের যে সকল বাড়িঘর মুসলমানদের জনপদের কাছাকাছি ছিলো, সেগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলো মুসলমানেরা।

অবশেষে সন্ধি হলো। ইহুদীরা দুর্গের বাইরে এসে আত্মসমর্পণ করলো। উটের পিঠে বোঝাই করলো তাদের মালপত্র। হঠাৎ কে একজন হত্যা করে ফেললো আমর ইবনে হাজ্জাশকে। একথা জানতে পেরে রসুল স. খুশী হলেন। তাদের কেউ কেউ বললো, কারো কারো কাছে আমাদের কিছু পাওনা আছে। আমাদেরকে কিছু সময় দেওয়া হোক, আমরা যেনো পাওনাগুলো উদ্ধার করে নিতে পারি। রসুল স. বললেন, তাড়াতাড়ি করো। হজরত উসায়েদ ইবনে হুজায়েরের কাছে আবু রাফেয়ের পাওনা ছিলো একশত কুড়ি দীনার। কথা ছিলো, তিনি ঋণ শোধ করবেন এক বৎসরে। কিন্তু তখনো এক বৎসর পূর্ণ হয়নি। তাই সাব্যস্ত হলো, তাঁকে পরিশোধ করতে হবে আশি দীনার। এবার তারা তাদের স্ত্রীলোক ও শিশুদেরকে উটের পিঠে আরোহণ

করালো। তার সঙ্গে যতটুকু মালপত্র নেওয়া সম্ভব হলো, তা-ও উটের পিঠে উঠিয়ে নিলো তারা। কেউ কেউ উঠিয়ে নিলো দরজার চৌকাঠ। অস্ত্র-শস্ত্র ও অবশিষ্ট মালপত্র অধিকারে এলো রসুল স. এর। এভাবে গণিমত হিসেবে পাওয়া গেলো পঞ্চাশটি বর্ম, পঞ্চাশটি শিরোস্ত্রাণ এবং তিনশ চল্লিশটি তরবারী। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রতি তিন পরিবার একটি উটের পিঠে যে মালপত্র নিতে পারবে, তা-ই নিতে দেওয়া হবে তাদেরকে। অবশিষ্ট মালপত্রের মালিক হবেন রসুল স.। জুহাক বর্ণনা করেছেন, তখন প্রতি তিন জনকে একটি করে উট দেওয়া হয়েছিলো। বনী নাজীর দেশান্তরিত হয়ে চলে যায় সিরিয়ার ইজরাআত ও আরীহার দিকে। হুয়াই ইবনে আখতাবের গোত্র এবং হাকীক গোত্র চলে যায় খায়বরে। তাদের মধ্যে একটি শাখাগোত্র আবার চলে যায় হীরার দিকে।

এখানে 'লিআউওয়ালিল হাশরি' অর্থ প্রথমবার সমবেতভাবে। অর্থাৎ প্রথম হাশরের সময়। যেমন 'ক্বদ্দামতু লিহাইওয়াতি' এই আয়াতে 'লাম' অব্যয়টি সময়জ্ঞাপক।

প্রথম হাশর কী ঃ জুহুরী বর্ণনা করেছেন, বনী নাজীরেরা ভেবেছিলো তাদেরকে কখনোই দেশান্তরিত হতে হবে না। আল্লাহ্তায়ালা তাদের অদৃষ্টে দেশান্তরিত হওয়া লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। দেশান্তরিত না হলে তাদের উপরে পৃথিবীতেই আযাব নেমে আসতো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হাশরের ময়দান হবে শাম বা সিরিয়ায়। একথায় যদি কেউ সন্দেহ পোষণ করে, তবে সে যেনো পাঠ করে 'হুয়াল্লাজী আখরাজ্বাল্ লাজীনা কাফারু মিন আহলিল কিতাবি মিন দিয়ারিহিম লি আউওয়ালিল হাশরি'। আর ইহুদী কাফেরদের প্রথম হাশর (আউওয়ালিল হাশরি) হয়েছে সিরিয়ায়। রসুল স. বনী নাজীরদেরকে বলেছিলেন, বেরিয়ে যাও। তারা বলেছিলো, কোথায় যাবো? তিনি স. বলেছিলেন, হাশরের জমিনে। কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টিকে সিরিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। কালাবী বলেছেন, এটি ছিলো ইহুদী বিতাড়নের প্রথম ঘটনা। তাই একে বলা হয়েছে প্রথম হাশর। পরবর্তী খলিফা হজরত ওমর তাঁর খেলাফতের সময় সকল ইহুদীকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দেন। মুররা হামাদানী বলেছেন, প্রথম হাশর মদীনা থেকে হয়েছিলো। আর দ্বিতীয় হাশর সংঘটিত হয়েছিলো হজরত ওমরের শাসনামলে খায়বর ও সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে সিরিয়ার ইজরাআত ও আরীহা আঞ্চলের দিকে। কাতাদা বলেছেন, প্রথম হাশরে তাদেরকে একত্র করে সিরিয়ার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। আর দ্বিতীয় হাশর হবে তখন, যখন একটি অগ্নিকুণ্ডলী পূর্ব দিকের কোনো এক গর্ত থেকে বের হয়ে সকলকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে পশ্চিমে। মানুষ যেখানে রাত্রিযাপন করবে, অগ্নিকুণ্ডলীটিও সেখানে থেমে থাকবে। দুপুরের যাত্রাবিরতির সময়েও থেমে থাকবে অগ্নিকুণ্ডলীটি। হজরত আনাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, একটি অগ্নিশিখা মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। এই বর্ণনাটিতে আয়াতের উদ্ধৃতি নেই। 'হাশর' অর্থ একটি দলকে এক স্থান থেকে অপর স্থানে স্থানান্তরিত করা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা কল্পনাও করোনি যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা মনে করেছিলো তাদের দুর্গগুলি তাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহ্ থেকে; কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তি এমন এক দিক থেকে এলো যা ছিলো তাদের ধারণাতীত এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করলো। তারা ধ্বংস করে ফেললো নিজেদের বাড়িঘর নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতে'।

এখানে 'মা জনানতুম' অর্থ তোমরা কল্পনাও করোনি। অর্থাৎ হে বিশ্বাসবানেরা! তোমরা একথা চিন্তাও করতে পারোনি যে, বনী নাজীরেরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হবে। কেননা তারা ছিলো আত্মবিশ্বাসী। তাদের দুর্গও ছিলো সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত। 'ফাআতাহুমুল্লহ' অর্থ আল্লাহ্র শাস্তি এমন এক দিক থেকে এলো। 'ফী কুলূবিহিমুর রু'বা' অর্থ তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সৃষ্টি করলো। 'রু'বা অর্থ ত্রাস, ভয়-ভীতি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তখন তাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করলেন। অভিধানবেত্তাগণ লিখেছেন 'রূআ'বাহু' অর্থ তাকে ভরে দেওয়া হয়েছে। 'ইউখরিবূনা বুয়ূতাহুম বিআইদিহিম ওয়া আইদিল মু'মিনীন' অর্থ তারা ধ্বংস করে

ফেললো নিজেদের বাড়িঘর নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতেও। উল্লেখ্য, বনী নাজীরদের অনপনেয় হিংসা ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মুসলমানেরা তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিতে বাধ্য হয়েছিলো। এটা যেনো তাদের স্বসৃষ্ট কাজ। তাই এখানে বলা হয়েছে 'তারা ধ্বংস করে ফেললো নিজেদের বাড়িঘর নিজেদের হাতে, মুমিনদের হাতেও।

'ইখরাব' অর্থ অকার্যকর করা, কোনো কিছুকে বরবাদ করে দেওয়া, ধ্বংস করা। তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করার ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে— রসুল স. ঘোষণা করলেন, তারা কেবল উটের পিঠে যতটুকু সংকুলান হয়, ততটুকু মালপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে। এ ঘোষণা শুনে তারা নিজেরাই নিজেদের বাড়ি-ঘর ভেঙে ফেললো এবং দরজা জানালার কাঠ খুলে নিয়ে উট বোঝাই করলো। তখন অর্ধভঙ্গ বাড়িঘরগুলো ধ্বংস করে দিলো মুসলমানেরা। ইবনে জায়েদ বর্ণনা করেছেন, তারা ছাদ ভেঙে দেওয়ালগুলো ছিদ্র করে দিয়েছিলো। খুলে নিয়ে গিয়েছিলো কাঠ, পেরেক ইত্যাদি। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমানেরা যেনো তাদের পরিত্যক্ত বাড়িঘর আর ব্যবহার না করতে পারে। কাতাদা বলেছেন, ইহুদীরা তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করে দিয়েছিলো ভিতরের দিক থেকে। আর মুসলমানেরা

www.eelm.weebly.com

বাইরের দিক থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুসলমানেরা তাদের কোনো বাড়িতে ঢুকলে তা ধূলিসাৎ করে দিতো, যাতে যুদ্ধক্ষেত্র প্রশস্ত হয়ে যায়। ইহুদীরা তখন বাড়ি বা ঘরের দেওয়াল ভেঙে চলে যেতে থাকতো অন্য বাড়িতে। আর বাড়িগুলোর পিছন দিকে একত্র হয়ে মুসলমানদের দিকে পাথর নিক্ষেপ করতো।

'ফা'তাবিরূ ইয়া উলিল আবসর' অর্থ অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। অর্থাৎ হে জ্ঞানী ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! তোমরা বনী নাজীরের এই ঘটনাটি থেকে উপদেশ গ্রহণ করো। সাবধান হয়ে যাও, যেনো তোমাদের দ্বারা না আবার কখনো অবিশ্বাস ও পাপ সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য, যে সকল আলেম তুল্যমূল্যতাকে (কিয়াসকে) শরিয়তের দলিলরূপে গণ্য করেন, তারা এই আয়াত থেকে প্রমাণ করেন যে, 'আসল' (মূল) ও 'ফরা' (শাখা) এর মধ্যে একটি বিষয়ে যদি অভিন্নগুণ থাকে, যা বিধান হওয়ার যোগ্য, তবে অভিন্ন বিষয়টির কারণে 'আসলে'র বিধান 'ফরা'র দিকে ধাবিত হয়। উপদেশ গ্রহণ করার ব্যাখ্যা এটাই। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে উপদেশ গ্রহণ করার অর্থ হবে হুকুম দেওয়া।

'ইয়া উলিল আবসর' অর্থ হে জ্ঞানী ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ। 'বসর' এর অর্থ জ্ঞানগত দৃষ্টি। মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী তাঁর 'সাবিলুর রাশাদ' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইব্রাহিম ইবনে জাফরের মাধ্যমে মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, হজরত জাফর বলেছেন, বনী নাজীরেরা চলে যাওয়ার পর ইহুদী আমর ইবনে সা'দ মদীনায় এলো। ঘুরে ঘুরে দেখলো তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ। তারপর বিমর্ষ বদনে উপস্থিত হলো বনী কুরায়জার জনপদে। তাদেরকে ডেকে বললো, আজ আমি উপদেশমূলক দৃশ্য দেখে এলাম। দেখলাম আমাদের ভ্রাতৃকুলের জনপদ জনশূন্য। এই তো কদিন আগেই সেখানে আমার ভ্রাতা

অবস্থান করতো প্রভুত সম্মান ও বীরত্বব্যঞ্জকতা নিয়ে। বিচার মীমাংসা করতো প্রজ্ঞার সঙ্গে। আক্ষেপ, আজ সে অবমাননার সঙ্গে বিতাড়িত, সহায়-সম্পদ চ্যুত। তাদের সম্পদ এখন অধিকার করেছে অন্যেরা। এর পূর্বে কা'ব ইবনে আশরাফের ঘটনা ঘটলো। রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে হত্যা করা হলো তাকে। ইবনে সানিয়ার ঘটনা তো আরো আগের। সে ছিলো ইহুদীদের অধিনায়ক। এরপর দেশান্তরিত করা হলো বনী কায়নুকাকে। তারা ছিলো ইহুদীদের মধ্যে সম্মানার্হ ও শক্তিমান পুরুষ। তাদেরকে ঘেরাও করা হলো। একজন লোকও বেষ্টনী থেকে মাথা বের করতে পারলো না। অবশেষে দেশান্তরিত হওয়ার শর্তে ছেড়ে দেওয়া হলো তাদেরকে। হে আমার স্বজাতি! তোমরা তো এ সকল কথা জানোই। এবার আমার কথা শোনো। এসো, আমরা সকলেই মোহাম্মদের অনুসারী হয়ে যাই। আল্লাহ্র শপথ! তোমরাও জানো যে, তিনি আল্লাহ্র নবী। আমাদের আলেম সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে তাঁরই সুসংবাদ দিয়ে এসেছেন। মনে কি পড়ে তোমাদের, একদিন আমাদের প্রথিতযশা দুই আলেম ইবনুস্সাইয়ান আবু উমায়ের এবং ইবনে হাওয়াস বায়তুল মাকদিস থেকে এসেছিলেন। তাঁরা দু'জনই আমাদেরকে শেষ রসুলের অনুসারী হওয়ার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। আরো বলেছিলেন, তোমরা তাঁর সাক্ষাত পেলে তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ সালাম পৌঁছে দিয়ো। তাদের মৃত্যু তো সত্যের উপরেই হয়েছিলো এবং তাদের দাফন করা হয়েছিলো ইসলামী বিধানানুসারে। আমর ইবনে সা'দের কথা শুনে সকলে চুপ করে রইলো। কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভাঙলো আমরই। সে তার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলো। বনী কুরায়জা জনতাকে ভয় দেখালো যুদ্ধের, বন্দীত্বের ও দেশান্তরের। তার বক্তব্য শেষে মুখ খুললো যোবায়ের ইবনে বাতা। বললো, তওরাতের শপথ! আমি ওই নবীর বিবরণ আমার তওরাতের অনুলিপিতে পেয়েছি, যা অবতীর্ণ হয়েছিলো নবী মুসার উপর। অন্যান্য অনুলিপি তো প্রকৃত অনুলিপি নয়। কা'ব ইবনে সা'দ বললো, হে আবু আবদুর রহমান! তাহলে তোমাকে মোহাম্মদের অনুসারী হতে বাধা দিচ্ছে কে? যোবায়ের বললো, তুমি। কা'ব বললো, কীভাবে? আল্লাহ্র শপথ! আমি তো তোমার আর মোহাম্মদের মধ্যে প্রতিবন্ধক হইনি। যোবায়ের বললো, তুমিই আমাদের জাতীয় নেতা। তুমি যার অনুসরণ করবে, আমরাও তার অনুসরণ করবো। আর তুমি যাকে অস্বীকার করবে, আমরাও তাকে করবো অস্বীকার। আমর ইবনে সা'দ কা'বের দিকে লক্ষ্য করে বললো, শোনো, ওই তওরাতের শপথ, যা মুসা নবীর উপরে সিনাই পর্বতে অবতীর্ণ হয়েছিলো, নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁর মর্যাদা ও বিজয়। নিঃসন্দেহে তিনি মুসা নবীর পথেই আছেন। আগামীতে তিনি ও তাঁর উম্মত মুসা নবীর সঙ্গে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। কা'ব বললো, আমরা প্রতিষ্ঠিত থাকবো আমাদের অঙ্গীকারের উপর। মোহাম্মদও তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। তবে আমরা দেখতে চাই, হুয়াই কী করে। তাকে তো তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে চরম অসম্মানের সঙ্গে। আমার ধারণা, সে অবশ্যই মোহাম্মদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করবে।

ওই যুদ্ধে যদি সে বিজয়ী হয় আমরা অবশ্য তাই-ই চাই, তবে আমরা আমাদের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবো। আর যদি মোহাম্মদ বিজয়ী হয়, তাহলে আমাদের জীবন হবে কল্যাণবিবর্জিত। আমরা তখন মোহাম্মদের সঙ্গ বর্জন করবো। চলে যাবো অন্য কোনো দেশে। আমর ইবনে সা'দ বললো, তাহলে এ ব্যাপারে আর বিলম্ব করছো কেনো? দেশত্যাগ করার এইতো প্রকৃষ্ট সময়। কা'ব বললো, না, এখনো সময় আছে। আমি যখনই মদীনা ছেড়ে চলে যেতে চাইবো, তখনই মোহাম্মদ তা অনুমোদন করবেন। আমর বললো, না, তা নয়। তখন সময় ও সুযোগ আমাদেরকে পরিত্যাগ করবে। তওরাতের শপথ! মোহাম্মদ যখন

www.eelm.weebly.com

আমাদের দিকে অগ্রসর হবেন, তখন অবশ্যই আমাদেরকে দুর্গমধ্যে আবদ্ধ হতে হবে। আবার এক সময় তার নির্দেশে বের হয়েও আসতে হবে। তখন তিনি আমাদেরকে নিপাত করবেন। কা'ব বললো, আমি যা বুঝি, তাই বললাম। আমার প্রবৃত্তি তাঁকে স্বীকার করতে পারছে না। তিনি তো আমাদের নবীবংশকে মর্যাদা দিবেন না। সমীহও করবেন না আমাদের কর্মকাণ্ডের। সাধারণভাবে আমাদেরকে অভিহিত করবেন কেবল ইসরাইলি বলে। আমর বললো, কেনো তা বলবেন না। আমার জীবনের শপথ করে বলছি, তিনি তো আমাদের মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাদের মধ্যে এভাবে যখন কথাবার্তা চলছিলো, তখন সংবাদ পাওয়া গেলো, রসুল স. বনী কুরায়জার জনপদে প্রবেশ করেছেন। আমর বললো, এটা তো সেই সংবাদ, যা আমি তোমাদেরকে আগেই জানিয়েছিলাম। উল্লেখ্য, বনী কুরায়জাও সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছিলো। খন্দকের যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে যোগসাজশ করে বিরুদ্ধাচারী হয়েছিলো রসুল স. এর।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না করলে তাদেরকে পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন, পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি'। একথার অর্থ— বনী নাজীরকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে লওহে মাহফুজের সিদ্ধান্ত অনুসারে। তাদেরকে এভাবে দেশান্তরিত করা না হলেও তারা আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচতে পারতো না। তাদেরকে হতে হতো বন্দী, অথবা নিহত, যেমন প্রথমে বন্দী ও পরে নিহত হতে হয়েছে বনী কুরায়জাকে। আর পরকালে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি তো রয়েছেই।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলো এবং কেউ আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর'। একথার অর্থ— বনী নাজীরকে এরকম দুর্বিপাকে পড়তে হয়েছিলো এজন্য যে, তারা অবস্থান গ্রহণ করেছিলো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতিপক্ষে। এরকম প্রতিপক্ষ যারা হয়, আল্লাহ্ তাদেরকে শায়েস্তা করেন। কেননা তিনি কঠোর শাস্তিদানকারী।

ইয়াজিদ ইবনে রুম্মান সূত্রে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন বনী নাজীরের জনপদে উপস্থিত হলেন, তখন তারা কেল্লার ভিতরে ঢুকে পড়লো। বন্ধ করে দিলো কেল্লার দরোজা। রসুল স. তাদের বাগানের খেজুর গাছগুলো

কেটে ফেলতে এবং সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন খেজুর গাছগুলো কর্তনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন হজরত আবী লায়লা মাসানী এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামকে। নির্দেশ অনুসারে হজরত আবী লায়লা আজওয়া ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম লাওন খেজুরের গাছগুলো কাটতে শুরু করলেন। এমতো নির্বাচন ছিলো তাঁদের নিজস্ব। পরে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে হজরত আবী লায়লা বলেছিলেন, আজওয়া খেজুর উন্নত মানের। তাই আমি ভেবেছিলাম, সেগুলো যেনো চিরদিনের জন্য তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। আর হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেছিলেন, আমি ভেবেছিলাম, অবিশ্বাসীদের এসকল সম্পদ পরে গণিমত হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হবে। তাই আমি আজওয়া গাছ না কেটে কেটেছিলাম লাওনগুলোকে। আজওয়া বৃক্ষগুলো যখন কাটা হলো, তখন ইহুদী নারীরা ক্ষোভে দুঃখে নিজেদের মুখে আঘাত করতে করতে বিলাপ শুরু করে দিয়েছিলো এবং ছিঁড়ে ফেলেছিলো তাদের গায়ের জামা। সালাম ইবনে মুশকাম তখন হুয়াইকে বললো, আজওয়া গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। আগামী তিরিশ বছরে একটি ঘোড়ার বিনিময়েও আজওয়ার একটি খোসা পাওয়া যাবে না। হুয়াই কেল্লার ভিতর থেকে রসুল স.কে বলে পাঠালো, আপনার লোকজনকে বলে দিন, তারা যেনো আজওয়া নিধন বন্ধ করে। মুসলমানদের মধ্যেও কেউ কেউ মনে করলেন, আজওয়া নিধন মনে হয় ঠিক হচ্ছে না। কেননা আজওয়া খেজুর খুবই মূল্যবান। কেউ কেউ প্রকাশ্যে তাঁদের এমতো মনোভাব প্রকাশও করতে লাগলেন। কেউ কেউ বললেন, আজওয়া তো আল্লাহ্র বিশেষ দান। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা আজওয়া ধ্বংস করবোই। ইহুদীদেরকেও নিপাত করবো চিরতরে। এমতো পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা হাশর ঃ আয়াত ৫

❑ তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলি কর্তন করিয়াছ এবং যেগুলি কাণ্ডের উপর স্থির রাখিয়া দিয়াছ, তাহা তো আল্লাহ্রই অনুমতিক্রমে; এবং এইজন্য যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মা কৃতা'তুম মিল লীনাতিন'। এর অর্থ— তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কর্তন করেছো। অর্থাৎ যে গাছগুলো কেটে ফেলেছেন হজরত আবী লায়লা। এরপর বলা হয়েছে 'এবং যেগুলি কাণ্ডের উপরে স্থির রেখে দিয়েছো'। একথার অর্থ— হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম যে বৃক্ষগুলোর সবকয়টি এখনো কর্তন করেননি।

www.eelm.weebly.com

এখানকার 'লীনাতুন' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'লাওনুন' থেকে। এর বহুবচন 'আলওয়ানূন' যার অর্থ রঙ। কারো কারো মতে শব্দটির ব্যুৎপত্তি ঘটেছে 'লাইয়্যিনূন' থেকে, যার অর্থ কোমল। নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীতে এরকমই বলা হয়েছে। বাগবী লিখেছেন, বিদ্বজ্জন 'লীনাতুন' এর বিভিন্ন রকম অর্থ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সকল প্রকার খর্জুরবৃক্ষকেই 'লীনাতুন' বলা হয়, তবে 'আজওয়া' এর অন্তর্ভূত নয়। ইকরামা এবং কাতাদাও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। যজান বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতও এরকম। তিনি বলেছেন, রসুল স. তখন আজওয়া বাদে অন্যান্য খেজুর গাছগুলো কর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আজওয়া বাদে অন্যান্য খেজুরকে মদীনাবাসীরা বলতেন 'আলওয়ান'। এর একবচন 'লাওনূন' এবং 'লাইয়্যিনূন'। জুহরী বলেছেন, আজওয়া ও বারীনাহ্ ছাড়া অন্যান্য সকল শ্রেণীর খেজুরকে বলা হয় আলওয়ান। মুজাহিদ ও আতিয়া বলেছেন, সঠিক শ্রেণী নির্ধারণ ব্যতীত সকল জাতের খেজুরকেই বলে 'লীনাতুন'। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, লীনাতুন বলা হয় উঁচু খেজুরের গাছকে। মুকাতিল বলেছেন, 'লীনাতুন' হচ্ছে 'লাওন' জাতীয় খেজুর বৃক্ষের নাম। এর রঙ এমন হলুদ ও স্বচ্ছ হয় যে, বাইরে থেকে তার বিচি দেখা যায়। আর ফল এতো নরম হয় যে, চিবুলে অনায়াসে তা দাঁতের ভিতরে ঢুকে পড়ে। আর এক একটি বৃক্ষের মূল্য একটি রসীফের মূল্যমানের মতো। আরববাসীগণের নিকটে 'রসীফ' অত্যন্ত প্রিয়। এর অর্থ মোজাইক করা পাকা রাস্তা।

'তাতো আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে' অর্থ খেজুর গাছগুলো কর্তন করা বা না করার বিষয়টি সম্পন্ন হয়েছে সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অনুমোদন সাপেক্ষে। সুতরাং এতে কোনো পাপ নেই। বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. বনী নাজীরদের খেজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। কেটে ফেলা এবং তারপর তা জ্বালিয়ে দেওয়া বৃক্ষকে বলা হয় 'বুওয়ায়রা'।

শিথিল সূত্রে হজরত জাবের থেকে ইবনে আবী লায়লা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই রসুল স. তাদের খেজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করিয়েছিলেন। তাদের প্রতি প্রদর্শন করেছিলেন কঠোর মনোভাব। সাহাবীগণ বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহক! আমরা তো কিছু গাছ কেটে ফেলেছি এবং কিছু কাটিনি। এতে কি আমাদের পাপ হবে? তখন অবতীর্ণ হয় 'তাতো আল্লাহ্রই অনুমতিক্রমে'। অর্থাৎ বৃক্ষকর্তনের মাধ্যমে ইহুদীদেরকে অপদস্থ করাই ছিলো আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়।

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াতের নিরীখে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোনো মুসলমান শাসক বিধর্মীদের দুর্গ অবরোধের পর তাদের বাগান, শস্যক্ষেত ও বাড়িঘর ধ্বংস করে জ্বালিয়ে দিতে পারবে। এরকম করা তার জন্য সিদ্ধ। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, এরকম করা জায়েয হবে ওই সময়, যখন এছাড়া তাদেরকে পরাভূত করা এবং বন্দী করার আর কোনো উপায় থাকবে না। যদি এছাড়াও উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে এরকম ধ্বংসসাধন জায়েয হবে না।

তখন এ জাতীয় কঠোরতা হবে নিস্প্রয়োজন। আর অনুমতি তো দেওয়া হয় জরুরী প্রয়োজন পূরণার্থেই। ইমাম আহমদ বলেছেন, এমতো ব্যবস্থা গ্রহণ জায়েয হতে পারে দু'টি শর্তের যে কোনো একটির ভিত্তিতে—১. বিধর্মীরা যদি মুসলমানদের সঙ্গে এরকম আচরণ করে ২. যদি এরকম না করলে তাদের উপর বিজয়ী হওয়া হয়ে যায় দুঃসাধ্য। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যুদ্ধজয়ের প্রয়োজনে যদি বৃক্ষনিধন ও ঘরবাড়ি ধ্বংস করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে তা জায়েয। আর যদি অপরিহার্য না হয়, তবে এরকম করা মোস্তাহাব। আর আয়াতটির ব্যাখ্যা দৃষ্টে এবং বর্ণিত হাদিস দু'টির আলোকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ওরকম পরিস্থিতিতে বৃক্ষনিধন বৈধ। ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত উসামা ইবনে জায়েদ বলেছেন, রসুল স. আমাকে একবার এক জনপদের দিকে প্রেরণ করে বললেন, ওই স্থানে সকাল বেলায় পৌঁছে তুমি আগুন জ্বালিয়ে দিয়ো। ইবনে জাওজী ইমাম আহমদের পক্ষে দলিল স্বরূপ বলেছেন, আমাদের সমমতাবলম্বীরা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কোথাও কোনো বাহিনী প্রেরণকালে তাদেরকে বলতেন, পানির নহর নষ্ট কোরো না। যুদ্ধকালে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কোনো বৃক্ষ ছাড়া অন্য কোনো বৃক্ষ কর্তন কোরো না। ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত ইবনে ওমর এবং হজরত উসামার হাদিসের মর্মার্থও তাই। আমি বলি, ইবনে জাওজী বৈধতার যে বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তার কোনো প্রমাণ নেই। বনী নাজীরেরা মদীনার কোনো বৃক্ষ কর্তন করেনি। আর এ বিষয়টিও প্রমাণিত নয় যে, কেবল যুদ্ধের কারণে বৃক্ষনিধন সিদ্ধ। বরং আলোচ্য আয়াতে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্তায়ালা শত্রুদেরকে অপদস্থ করবার জন্য এবং তাদের শক্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে বৃক্ষকর্তনের হুকুম দিয়েছেন। এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যের কথা এখানে বলা হয়নি। তবে এ বিষয়টি অবশ্যই সত্য যে, তিনি স. যখন বৃক্ষকর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তাঁর যুদ্ধ জয়ের প্রবল ধারণা ছিলো না। ২ সংখ্যক আয়াতের 'তোমরা কল্পনাও করতে পারোনি যে, তারা নির্বাসিত হবে' কথাটি এই বিষয়টিরই প্রমাণ। আর ইমাম আহমদ বৃক্ষকর্তনের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাকে যদি বিশুদ্ধ বলে ধরেও নেওয়া হয়, তথাপিও কোরআনের আয়াতের প্রেক্ষিতে উক্ত হাদিস গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। আলোচ্য আয়াত তো বৃক্ষকর্তন জায়েয হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করছে।

বাগবী লিখেছেন, বনী নাজীর যখন তাদের বসতবাটি ছেড়ে চলে গেলো, তখন মুসলমানেরা খায়বরের গণিমতের মালের মতো তাদের পরিত্যক্ত মালমাত্তা বণ্টন করার ইচ্ছা করলো। এমতো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

তাফসীরে মাযহারী/৩৯৮

❑ আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলকে যে ফায় দিয়াছেন, তাহার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ কর নাই; আল্লাহ্ তো যাহার উপর ইচ্ছা তাহার রাসূলদিগকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❑ আল্লাহ্ জনপদবাসীদের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলকে যাহা কিছু দিয়াছেন তাহা আল্লাহ্‌র, তাঁহার রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাহাতে তোমাদের মধ্যে যাহারা বিত্তবান কেবল তাহাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদিগকে যাহা দেয় তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করে তাহা হইতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।

❑ এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য যাহারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হইতে উৎখাত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সাহায্য করে। উহারাই তো সত্যাশ্রয়ী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ইহুদীদের নিকট থেকে তাঁর রসুলকে যে 'ফায়' দিয়েছেন'। 'ফায়উন' অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। 'আফাআ' অর্থ সে প্রত্যাবর্তন করলো। জাওহারী লিখেছেন, 'ফায়উন' অর্থ ভালো অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করা। কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন ১. 'হাত্তা তাফিউইলা আমরিল্লাহ্' (এমনকি তারা ফিরে এলো আল্লাহ্‌র হুকুমের প্রতি) ২. 'ফাইন্ ফাআত ফাআস্‌লিহু। (যদি তারা ফিরে আসে তাহলে সন্ধি কোরো)। ৩. 'ফাইন্ ফাউ ফাইন্‌নাল্লহা গফুরুর রহীম' (যদি তারা ফিরে আসে তাহলে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়ালু)।

তাফসীরে মাযহারী/৩৯৯

একটি সন্দেহ ও তার নিরসন ঃ 'আল্লাহ্ ইহুদীদের নিকট থেকে তাঁর রসুলকে যে 'ফায়' দিয়েছেন' কথাটির মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ প্রথমে মালের মালিক হয়েছেন, তারপর তার মালিক বানিয়ে দিয়েছেন রসুল স.কে। কিন্তু এরূপ ধারণা বাস্তব অবস্থার পরিপন্থী। বায়যাবী এমতো সন্দেহ দূর করণার্থে লিখেছেন, এখানে 'আফাআ' কথাটি রূপকার্থে হবে 'সাইয়্যারা'। অর্থাৎ আল্লাহ্ উক্ত সম্পদের মালিক করে দিয়েছেন তাঁর রসুলকে। অথবা অর্থ হবে— আল্লাহ্ ওই সম্পত্তির মালিকানা ফিরিয়ে দিয়েছেন রসুল স. এর দিকে। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। আর অন্য সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য, যাতে ওগুলোর সাহায্যে মানুষ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের দিকে ধাবিত হতে পারে। সুতরাং সম্পত্তির মালিক হওয়ার যোগ্য তারাই, যারা তাঁর আনুগত্য করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করোনি'। এখানকার 'আওজ্বাফতুম' ক্রিয়াটি এসেছে 'ওয়াজীফুন' থেকে। এর অর্থ দ্রুতগামী। আর এখানকার 'রিকাব' অর্থ বাহন। আভিধানিক অর্থে প্রত্যেক বাহনকেই বলা হয় 'রিকাব'। তবে শব্দটির মাধ্যমে সাধারণত বুঝানো হয় উটকে, যেমন 'রকিব' বলা হয় প্রত্যেক উষ্ট্রারোহীকে। এভাবে বক্তব্যটি

দাঁড়ায়— আল্লাহ্ বনী নাজীরের যে সকল সম্পত্তি তাঁর রসুলকে দিয়েছেন, তার জন্য তোমাদেরকে কোনো কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি। যুদ্ধ করতে হয়নি ঘোড়া অথবা উটের পিঠে চড়ে, যে কারণে সাধারণ মুসলমানেরা এর মালিকানা দাবি করতে পারবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তো যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসুলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তো তাঁর রসুলগণের শত্রুদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেন। ফলে তারা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এভাবে তিনি যার বা যাদের উপরে ইচ্ছা তাঁর রসুলগণের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেন। যেমন এখন করলেন। এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'। একথার অর্থ সর্ববিষয়ে আল্লাহ্ অজেয়, প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন। তাই তিনি তার পয়গম্বরগণকে যার উপরে ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন, বাহ্যিক কোনো উপায় বা প্রচেষ্টা এর সঙ্গে যুক্ত হোক, অথবা না হোক।

আলোচ্য আয়াত এবং যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বনী নাজীরের ফেলে যাওয়া সম্পত্তির একক মালিক ছিলেন রসুল স.। তিনি স. ওই সম্পত্তি যেভাবে খুশী খরচ করার পূর্ণ অধিকার রাখতেন। মালেক ইবনে আউস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব একবার বললেন, আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে ওই সম্পত্তির মালিক করে দিয়েছিলেন বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে, উপায়-প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই। এরকম অনায়াস মালিকানা তিনি আর কাউকেই দেননি। এরপর তিনি পাঠ করলেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। সুতরাং ওই সম্পত্তি তিনি স. নিজের কাছেই রেখেছিলেন। ওই সম্পত্তি থেকে তিনি স. তাঁর সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করতেন। ব্যয় করতেন যুদ্ধের

প্রয়োজনেও। খলিফা হজরত ওমরের প্রহরী ইয়ারফা একবার নিবেদন করলো, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! শ্রদ্ধেয় ওসমান, আবদুর রহমান, যোবায়ের ও আবু সাঈদ আপনার সাক্ষাতপ্রার্থী। তাঁরা কী ভিতরে আসতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাদেরকে ভিতরে নিয়ে এসো। কিছুক্ষণ পর ইয়ারফা আবার এসে বললো, মান্যবর আলী ও আব্বাস আপনার কাছে আসতে চান। তিনি বললেন, তাঁদেরকেও নিয়ে এসো। একটু পরে তাঁরাও উপস্থিত হলেন। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! আমার ও তার (হজরত আলীর) মধ্যে মীমাংসা করে দিন। বনী নাজীরদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তির ব্যাপারে হজরত আলী ও হজরত আব্বাসের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস ওই মতানৈক্য দূর করার জন্যই হজরত ওমরের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর কথা শুনে উপস্থিত জনতাও বললেন, হ্যাঁ, আমিরুল মুমিনীন! আপনি এই মতবিরোধটি মিটিয়ে ফেলুন। আর তাঁদেরকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অবকাশও দিন। হজরত ওমর বললেন, সকলে শান্ত হোন। তারপর বলছি। কিছুক্ষণ পর বললেন, আমি আপনাদেরকে সেই আল্লাহ্র শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর নির্দেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে, আপনাদের কি মনে আছে, রসুল স. বলেছিলেন, আমি কাউকে আমার কোনো সম্পদের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করি না। আমার উত্তরাধিকারের সবটুকুই দান। উপস্থিত জনতা বললেন, হ্যাঁ, রসুল স. এরকমই বলেছিলেন। হজরত ওমর এবার হজরত আলী ও হজরত ইবনে আব্বাসকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্র কসম করে বলছি, বলুন, রসুল স. এরকম বলেছিলেন কিনা? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। হজরত ওমর বললেন, এবার শুনুন আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে এই 'ফায়' এর সম্পত্তি বিশেষভাবে দান করেছিলেন। আর এ ব্যাপারে তাঁকে যে বিশষত্ব দান করেছিলেন, তা আর কাউকেই দান করেননি। এরপর হজরত ওমর পাঠ করলেন 'আল্লাহ্ ইহুদীদের নিকট থেকে তাঁর রসুলকে যে 'ফায়' দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করোনি, আল্লাহ্ তো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রসুলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'। এরপর বললেন, সুতরাং এই সম্পত্তি বিশেষভাবে রসুল স. এর জন্যই। আল্লাহ্র শপথ! এরপরেও তো রসুল স. এ সম্পত্তির পুরোটা নিজের জন্য ব্যয় করেননি। আপনাদেরকেও দিয়েছেন। আপনাদেরকে দেওয়ার পর যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকতো তা দিয়ে তিনি তাঁর সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করতেন। তারপর যা উদ্বৃত্ত থাকতো, তা ব্যয় করতেন আল্লাহ্র পথে। তিনি স. সারা জীবন এরকমই করে গিয়েছেন। এভাবে এক সময় তিনি স. পৃথিবী পরিত্যাগ করলেন। খলিফা হলেন মহামান্য আবু বকর। বললেন, আমি আল্লাহ্র রসুলের প্রতিনিধি। একারণেই তিনিও অধিকার করলেন ওই সম্পত্তি এবং তা ব্যয় করতে লাগলেন সেভাবে, যেভাবে রসুল স. ব্যয় করতেন। আপনারা এমন কথা জানেন। আল্লাহ্ও জানেন যে, খায়বরের সম্পত্তির মালিকানার ব্যাপারেও মহামান্য আবু বকর ছিলেন সত্যাশ্রয়ী, কল্যাণকামী এবং নির্ভুল পথের অনুসারী। তিনিও চলে গেলেন

একসময়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলাম আমি। বললাম, আমি প্রতিনিধি আল্লাহ্র রসুল ও তাঁর প্রিয়তম সহচর খলিফা আবু বকর সিদ্দীকের। সুতরাং আমিও ওই সম্পত্তি ব্যয় করতে থাকি তাঁদের অনুকরণে। আল্লাহ্ জানেন, এব্যাপারে আমি ছিলাম সত্যাশ্রয়ী। এরপর একসময় আপনারা দু'জনে একমত হয়ে সে সম্পত্তির উত্তরাধিকার দাবি করেছেন। আমি বলেছি, রসুল স. বলেছেন, আমার কোনো উত্তরাধিকারী নেই। আমার সমস্ত সম্পদ দান। তৎসত্ত্বেও আমি ওই সম্পত্তির দায়িত্ব আপনাদের উপরে ন্যস্ত করতে চেয়েছিলাম। তবে শর্ত আরোপ করেছিলাম, আপনাদেরকে ওই সম্পত্তি ব্যয় করতে হবে সেভাবে, যেভাবে ব্যয় করেছিলেন রসুল স. এবং তাঁর প্রিয়তম সহচর আবু বকর। আমি তো এতোদিন সেভাবেই ব্যয় করেছি। আপনারা যদি সেভাবে ব্যয় না করতে পারেন,

www.eelm.weebly.com

তবে আমার সঙ্গে এবিষয়ে আর কথা বলবেন না। আপনারা আমার শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। আমি ওই সম্পত্তি হস্তান্তর করেছিলাম নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে। এখন আপনারা কি এ ব্যাপারে আমাকে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত দিতে বলেন? শপথ সেই মহাপ্রভুপালনকর্তার! কিয়ামত পর্যন্ত আমি এর চেয়ে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারবো না। আর আপনারা যদি ওই সম্পত্তি সংরক্ষণ করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তবে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। আমি অবশ্যই দায়িত্ব পালন করবো যথাযথভাবে। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর তখন বললেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুলকে বনী নাজীরদের সম্পত্তি বিনা পরিশ্রমে দান করেছিলেন। মুসলমানদেরকে এজন্য ঘোড়া ও উটের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতে হয়নি। তাই ওই সম্পত্তির একক অধিকারী ছিলেন রসুল স. স্বয়ং। তিনি স. ওই সম্পত্তি থেকে তাঁর সারা বৎসরের সংসার খরচ চালাতেন। আর উদ্বৃত্ত যা কিছু থাকতো, তা দিয়ে গ্রহণ করতেন যুদ্ধপ্রস্তুতি।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রসুলকে যা কিছু দিয়েছেন, তা আল্লাহ্র, তাঁর রসুলের, রসুলের স্বজনগণের, এতিমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান, কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রসুল তোমাদেরকে যা দেয়, তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে, তা থেকে বিরত থাকো এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো; আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর'।

আলোচ্য আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের ধারাবাহিকতা। সেজন্যই এই আয়াতের শুরুতে কোনো সংযোজক অব্যয় নেই। আর এখানে 'জনপদবাসী' বলে সাধারণভাবে বনী নাজীর সহ অন্যান্য জনপদবাসীকেও বুঝানো হয়েছে, যাদের সম্পত্তি অধিকার করেছিলেন রসুল স.।

একটি সংশয় ঃ আলোচ্য আয়াত যদি পূর্ববর্তী আয়াতের ধারাবাহিকতা হতো, তবে তো বনী নাজীরদের সম্পত্তিতে আনসার সাহাবীগণের অধিকারও স্বীকৃত হতো। কিন্তু রসুল স. তো মাত্র তিনজন আনসার ছাড়া অন্য কাউকে বনী নাজীরদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তির অংশ দেননি।

সংশয়ভঞ্জন ঃ ওই সম্পত্তি আনসারগণের অধিকার ছিলো। কিন্তু তাঁরা তাঁদের মুহাজির ভ্রাতাদের জন্য তাঁদের অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আহ্লিল কুরা' (জনপদবাসী) বলে বুঝানো হয়েছে বনী নাজীর, বনী কুরায়জা, ফিদাকবাসী, খায়বরবাসী ও উরাইনার এলাকায় অবস্থিত বসতিবাসীদেরকে। জালালউদ্দিন মাহাল্লী বলেছেন, এর অর্থ সাফরা, ওয়াদী কুরা ও ইয়ালআ অধিবাসী। আমি বলি, প্রকৃত কথা হচ্ছে খায়বর বিজিত হয়েছিলো যুদ্ধের মাধ্যমে। রসুল স. সেখানকার সম্পত্তি আঠারো ভাগ করে বন্টন করে দিয়েছিলেন হুদায়বিয়া অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে।

'ফালিল্লাহি' অর্থ তা আল্লাহ্র। এরকম বলা হয়েছে কেবল বরকত প্রকাশ করণার্থে। অর্থাৎ সম্পত্তির কিছু অংশ আল্লাহ্র, এরকম বলা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কেননা তিনি তো আকাশ পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির একক মালিক। এরকম বলেছেন হাসান, কাতাদা, আতা, ইব্রাহিম নাখয়ী, আমের, শা'বী ও অন্যান্য ফকীহ্ ও তাফসীরকারকগণ। কারো কারো মতে 'আল্লাহ্র' বা আল্লাহ্র অংশ বলে বুঝানো হয়েছে ওই সম্পদকে, যা কাবা শরীফ ও অন্যান্য মসজিদ নির্মাণের জন্য ব্যয় করা হয়।

'ওয়ালি জিল কুরবা' অর্থ রসুলের স্বজনগণের। অর্থাৎ বনী হাশেম ও বনী আবদুল মুত্তালিবের। ইমাম শাফেয়ী বর্ণনা করেছেন, হজরত যোবায়ের ইবনে মুতঈম বলেছেন, রসুল স. যখন বনী হাশেম ও বনী আবদুল মুত্তালিব বংশভূতদের মধ্যে সম্পদ বন্টন করে দিচ্ছিলেন তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম আমি এবং মান্যবর ওসমান। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহক! আপনি হাশেমী কুলোদ্ভব। তাই হাশেমী গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাদের এই ভ্রাতা মুত্তালিব গোত্রের, এর সঙ্গে আপনার আত্মীয়তা ও আমাদের আত্মীয়তা সমান সমান। একে আপনি দান করেছেন, অথচ আমাদেরকে কিছুই দিচ্ছেন না। রসুল স. তাঁর এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের সঙ্গে মিলিয়ে জালের মতো করে বললেন, হাশেমী ও মুত্তালিবেরা এরকম। নাসাঈ ও আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন বললেন, মুত্তালিবের বংশের সঙ্গে আমি মূর্খতার যুগেও যেমন পৃথক ছিলাম না, তেমনি এখনও নই। আমি ও তারা এক। তিনি স. একথা বললেন তাঁর হাতের আঙ্গুলসমূহকে জালের মতো করে।

'ওয়াল্ ইয়াতামা' অর্থ এতিমদের, পিতৃহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের। 'ওয়াল মিসকীনা' অর্থ অভাবগ্রস্তদের 'ওয়াবনিস্ সাবীল' অর্থ পথচারীদের।

পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, ফায় এর একক মালিক রসুল স. আর এই আয়াতে বলা হয়েছে তাঁর স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের অংশও রয়েছে ওই সম্পদে। এরকম বলা হয়েছে রসুল স. তাঁর ওই সম্পদ কোন কোন খাতে ব্যয় করবেন, তার নির্দেশনা প্রদানার্থে। গণিমতের সম্পদ তো কেবল বন্টন করে দিতে হয় মুজাহিদগণের মধ্যে। কিন্তু ফায় এর বন্টনরীতি ভিন্নতর। সেই বন্টনরীতির কথাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। মহামান্য খলিফা চতুষ্টয়ও ফায় এর সম্পদ এভাবে বন্টন করতেন।

www.eelm.weebly.com

‘কাই লা ইয়াকূনা দূলাতাম বাইনাল আগনিইয়াই মিনকুম’ (যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে)। একথার মর্মার্থ— এরকম বণ্টনরীতির প্রবর্তন করা হলো এজন্য যেনো, ঐশ্বর্যের অংশীদার হয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীও। কেবল ধনীদের মধ্যে যেনো তা সীমাবদ্ধ না থাকে, যেমন থাকতো মূর্খতার যুগে। উল্লেখ্য, রসুল স. তাঁর বিবেচনানুসারে বর্ণিত খাতগুলোতে পরিমাণ মতো ফায় এর সম্পদ বিতরণ করতেন।

এরপর বলা হয়েছে— ‘রসুল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো; আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর’। একথার অর্থ— ফায় এর সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র রসুল তোমাদেরকে যা দেন, তোমরা তা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করো, অধিক প্রাপ্তির লোভ কোরো না এবং তিনি যা কিছু তোমাদেরকে করতে নিষেধ করেন, তা করা থেকে বিরত থাকো। আর তাঁর অবাধ্য হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তাঁর অবাধ্য যারা, আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্যই শায়েস্তা করবেন। কেননা তিনি কঠোর শাস্তিদাতা। উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যের নির্দেশনা বিশেষভাবে ফায় এর সঙ্গে সম্পর্কিত হলে এর বিধান হবে সাধারণ। অর্থাৎ বিশ্বাসীদের জন্য সর্বক্ষেত্রে রসুলের আনুগত্য অপরিহার্য। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ একবার বললেন, আল্লাহ্‌র লানত ওই নারীর উপর, যে গোদ গ্রহণ করে এবং অপরকে গোদ লাগিয়ে দেয়, যে মাথার শাদা চুল উপড়িয়ে ফেলে, রূপপ্রদর্শনের জন্য দাঁত বাঁধাই করে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট শরীরের গঠন পরিবর্তন করে। তাঁর এমতো উক্তি বনী আসাদ গোত্রের এক রমণীর কানে গেলো। সে এসে বললো, আমি শুনতে পেলাম, আপনি নাকি এরকম রমণীদেরকে অভিসম্পাত করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র রসুল যার উপরে অভিসম্পাত করেছেন, আমি তাকে অভিসম্পাত দিবো না কেনো। রমণীটি বললো, আল্লাহ্‌র কিতাব তো আমিও পাঠ করেছি, কিন্তু এমন কথা তো কোথাও দেখিনি যে, তাঁর রসুলের নির্দেশ পালন করতে হবে। হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, তুমি তো আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠই করোনি। করলে দেখতে, আল্লাহ্ বলেছেন ‘রসুল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো’।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— ‘এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী’।

এখানকার ‘অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণ’ কথাটি আগের আয়াতের ‘রসুলের স্বজনগণের, এতিমের ও অভাবগ্রস্তের’ কথাটির অনুবর্তী; সেখানকার ‘তাঁর রসুলের’

এর অনুগামী নয়। কেননা রসুল স.কে ‘অভাবগ্রস্ত মুহাজির’ বলা যায় না। তাছাড়া এখানে একথাও বলা হয়েছে যে ‘এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সাহায্য করে’। তাই এখানকার ‘অভাবগ্রস্ত মুহাজির’গণের মধ্যে রসুল স.কে শামিল করলে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— রসুল স. ও অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণ আল্লাহ্‌র দ্বীন ও তাঁর রসুলকে সাহায্য করেন। অর্থাৎ রসুল স. নিজেই নিজেকে সাহায্য করেন। সুতরাং বুঝতে হবে রসুল স. এখানে কথিত অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত নন, যদিও তিনি হিজরত করেছিলেন। আর এখানকার ‘লিল ফুক্বারা’ এর ‘আলিফ লাম’ হচ্ছে জাতিবাচক এবং ‘যারা’ অর্থ ওই সকল লোক যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আগের আয়াতে। অর্থাৎ রসুলের স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত ও পরিব্রাজক। সুতরাং এই অনুবর্তীটি সমগ্রের অনুবর্তন সমগ্র থেকে (বাদলুল কুল মিনাল কুল)।

আমি বলি, অভাবগ্রস্ত মুহাজির ও আগের আয়াতে উল্লেখিতজনেরা সকলেই কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে এই আয়াতের বিধানভূত, চাই তারা ধনী হোক, অথবা নির্ধন। ‘রসুলের স্বজনগণ’ও এর অন্তর্ভূত। এমতাবস্থায় ‘অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণ’ কথাটি হবে সাধারণার্থক। আর আগের উল্লেখিত জনেরা হবে বিশেষার্থক। এরূপ হলে এখানকার স্থলাভিষিক্তিটি হবে ‘বাদলুল কুল মিনাল বাজ’ (ব্যষ্টি থেকে সমষ্টির অনুবর্তন)।

‘আল্লাজীনা উখরিজু মিন দিয়ারিহিম ওয়া আমওয়ালিহিম’ অর্থ যারা নিজেদের ঘর বাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। কথাটির দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুহাজিরগণ তাঁদের যে সকল বাড়িঘর সহায়-সম্পদ মক্কায় ছেড়ে এসেছিলেন, তার মালিক হয়ে গিয়েছিলো সেখানকার অংশীবাদীরা। সেকারণেই আল্লাহ্ তাঁদেরকে বলেছেন নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত (ফকির)। ফকির তো বলে তাকেই, যার কিছুই নেই। সামান্য কিছু সম্পদ থাকলেও তাকে নিঃস্ব বলা যায় না। আবার ওই মুসাফিরকে নিঃস্ব বলা যায় না, যারা তাদের বসতবাটি থেকে দূর কোথাও অবস্থান করে। তারা দূর দেশে থাকলেও তাদের ঘরবাড়ি ও সহায়সম্পদের মালিকানা হারায় না। সেকারণেই আয়াতে প্রবাসী পথচারী বলে তাঁদেরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, ফকিরদের দলভূত করা হয়নি। একথার উপরে ভিত্তি করে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, কাফেরেরা মুসলমানের সম্পদ হস্তগত করলে শরিয়ত অনুযায়ী তাদেরকেই মালিক সাব্যস্ত করা হয়। ইমাম আবু হানিফা অবশ্য এই সিদ্ধান্তটির সঙ্গে একটি শর্তও আরোপ করেছেন। তা হচ্ছে— কাফেরদের দেশে যদি কাফেরেরা এককভাবে হস্তগত করে মুসলমানদের সম্পদ। ইমাম মালেক বলেছেন, মালিকানা পরিবর্তনের জন্য মুসলমানদের উপরে কাফেরদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়াই যথেষ্ট। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হস্তগত করার পরেও কাফেরেরা মুসলমানদের মালের মালিক হতে পারে না। ইবনে হুম্মাম এই মর্মে ইমাম আহমদের পরস্পরবিরোধী দু'টি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

www.eelm.weebly.com

একটি ইমাম আবু হানিফার অভিমতের অনুকূল, অপরটি ইমাম শাফেয়ীর। ইবনে জাওজী বলেন, ইমাম আহমদের উক্তি ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্যের অনুকূল।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতের সমর্থনে রয়েছে বেশ কয়েকটি হাদিস। যেমন— আবু দাউদ তার 'মারাসীল' পুস্তকে লিখেছেন, তামীম ইবনে তুরফা বর্ণনা করেছেন, এক লোক একবার অন্য এক লোকের উটনী অধিকারে পেয়ে দাবি করলো, এ উটনী আমার। শেষে বিবাদভঞ্জনের উদ্দেশ্যে তারা উপস্থিত হলো রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে। দাবিদার তার স্বপক্ষে সাক্ষী পেশ করলো। আর বিবাদী বললো, আমি উটনীটি কিনেছি শত্রুর কাছ থেকে। রসুল স. দাবিদারকে বললেন, তুমি যদি উটনীটি নিতে চাও, তবে উপযুক্ত দাম দিয়ে তার কাছ থেকে কিনে নিতে পারো। অন্যথায় উটনীটি পাবে সে-ই। হাদিসটি অপরিণত শ্রেণীর হলেও গ্রহণীয়। কেননা অধিকাংশ বিদ্বান এরকম হাদিসকে প্রামাণ্য বলে মন্তব্য করেছেন। তিবরানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তামীম ইবনে তুরফার মাধ্যমে হজরত জাবের ইবনে সামুরা থেকে। তবে তাঁর সূত্রপরম্পরাভূত ইয়াসীন যাইয়্যাত বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। দারাকুতনী ও বায়হাকী তাঁদের স্ব স্ব 'সুনান' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুসলমানদের যে সম্পদ দুশমনেরা হস্তগত করে নেয়, মুসলমানেরা তা পুনরায় স্বীয় অধিকারে নিয়ে আসবে। সম্পদ যদি ভাগাভাগি করা হয়ে যায়, তবে মূল মালিক তা মূল্য দিয়ে কিনে নিতে পারবে। এই হাদিসের সূত্রপরম্পরার একজন বর্ণনাকারীর নাম হাসান ইবনে আম্মারা। দারাকুতনী তাকে বলেছেন পরিত্যাজ্য। দারাকুতনীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর উল্লেখ করেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, ফায় এর মাল বণ্টনের পূর্বে যদি কেউ তার মাল সেখানে পায়, তবে সে মাল তারই। তা বণ্টনের পরে যদি কেউ তার মাল এর মধ্যে পায়, তবে সে মাল আর তার নয়। এই হাদিসের সূত্র প্রবাহভূত ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ফারওয়া বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। আর অন্য সূত্রপ্রবাহভূত রুশদীনও অ-বলিষ্ঠ।

সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে ওমর থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, ফায় এর সম্পদের মধ্যে বণ্টনের পূর্বে কেউ যদি তার সম্পদ পেয়ে যায়, তাহলে সে সম্পদের মালিক হবে সে-ই। আর বণ্টনের পরে পেলে সে ওই সম্পদ মূল্য পরিশোধ করে কেনার অধিকার রাখে। এই বর্ণনাটির সূত্রশৃঙ্খলাভূত ইয়াসীনও অ-বলিষ্ঠ। ইমাম শাফেয়ী বর্ণিত হাদিসসমূহের সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন হজরত ওমরের একটি বক্তব্য, যেখানে তিনি বলেছেন, শত্রুদের দখলে চলে যাওয়া মুসলমানের সম্পদ যদি পুনরায় তাদের অধিকারে চলে আসে এবং কোনো মুসলমানের সম্পদ যদি ফায় এর সম্পদের মধ্যে বণ্টনের পূর্বে পাওয়া যায়, তবে তাকে ওই সম্পদের মালিক বলে স্বীকার করা যাবে। আর যদি সে সম্পদ সনাক্ত করতে পারে ফায় বণ্টন করার পর, তবে মূল্য পরিশোধ করা ছাড়া সে ওই মাল অধিকার করতে পারবে না। হজরত ইবনে ওমরের এই বক্তব্যটি আরো উল্লেখ করেছেন শা'বী এবং রেজা ইবনে হায়াত। তাঁরা দু'জনেই হজরত ওমরের জামানা পেয়েছিলেন এবং উভয়ের বর্ণনাই অপরিণত শ্রেণীর। স্বসূত্রে তাহাবী কাবীসা

ইবনে যুওয়ায়েবের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, অংশীবাদীদের দ্বারা অধিকৃত মুসলমানদের সম্পত্তি যদি পুনরায় মুসলমানদের কাছে ফিরে আসে এবং ওই সম্পত্তি বণ্টন করার আগে যদি কোনো মুসলমান তার মধ্যে নিজের সম্পত্তি সনাক্ত করতে পারে, তবে ওই সনাক্তকৃত সম্পত্তি তারই হবে। আর যদি বিভিন্ন অংশে ভাগ করে ফেলার পর তার সম্পত্তি সনাক্ত করে, তবে সে আর তা পাবে না। হজরত আবু উবায়দার মাধ্যমেও হজরত ওমরের এই বক্তব্যটি বর্ণিত হয়েছে। হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত থেকে সুলায়মান ইবনে ইয়াফারও এরকম বর্ণনা করেছেন। কাতাদা সূত্রে জাল্লাসের মাধ্যমে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, কোনো সম্পত্তি দুশমনেরা দখল করে নিলে মুসলমানেরা তা খরিদ করে নিতে পারবে।

উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহের কিছু কিছু শিথিল সূত্রবিশিষ্ট এবং কিছু কিছু অপরিণত শ্রেণীর। তবে হাদিসগুলি একে অপরের পৃষ্ঠপোষক। এসকল হাদিসের প্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কাফেরদের রাজ্যে কাফেরদের দ্বারা মুসলমানদের সম্পত্তি অধিকৃত হওয়া স্বাভাবিক। তারপর মুসলমানেরা যদি তাদের উপরে বিজয়ী হয় এবং ফায় এর সম্পত্তির মধ্যে নিজের সম্পত্তি দেখতে পায় এবং সনাক্ত করতে পারে বণ্টনের পূর্বে, তবে সম্পত্তি হয়ে যাবে তারই। কিন্তু বণ্টনের পরে সনাক্ত করলে সে সম্পত্তি আর তার হবে না। তখন সে ওই সম্পদ গ্রহণ করতে চাইলে তাকে তা কিনে নিতে হবে। এভাবে কোনো ব্যবসায়ী যদি কাফেরদের দেশে গিয়ে মুসলমানদের লুণ্ঠিত সম্পদ কিনে নিয়ে আসে, তবে আসল মালিক ওই সম্পদ কিনে নিতে পারবে। তেমনি কোনো কাফের যদি কোনো মুসলমানের লুণ্ঠিত মালপত্র কোনো মুসলমানকে দান করে দেয়, তবে সে-ই হয়ে যাবে ওই মালপত্রের মালিক। মূল মালিক যদি তা নিতে চায়, তবে তা নিতে হবে উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করে।

কোনো কোনো হানাফী মতাবলম্বী তাঁদের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন এই হাদিস দ্বারা— মক্কাবিজয়ের দিবসে রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহী! আগামী কাল আপনি মক্কার কোন্ স্থানে অবস্থান গ্রহণ করবেন? তিনি স.

বললেন, আকীল কি আমার জন্য কোনো জায়গা ছেড়ে রেখেছে? এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, আকীল যখন কাফের ছিলো, তখন রসুল স. এর বাড়ি দখল করে নিয়েছিলো। অর্থাৎ তার এরকম জবর দখলকে রসুল স. মেনে নিয়েছিলেন। কোনো কোনো বিদ্বান আবার বলেছেন, এই হাদিস দ্বারা কাফেরদের মালিকানা স্বীকার করা বুঝায় না। বরং এতে করে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কোনো মুসলমান কোনো কাফেরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। কাফেরেরাও হতে পারে না মুসলমানদের উত্তরাধিকারী। আর আকীল উত্তরাধিকার পেয়েছিলো আবু তালেব সূত্রে। তাঁর পুত্র ছিলো চারজন। তার মধ্যে হজরত আলী ও হজরত জাফর মুসলমান হয়েছিলেন। আর আকীল ও তালেব উভয়ে কাফের হওয়ার কারণে উত্তরাধিকারী হয়েছিলো তাদের পিতার সম্পত্তির।

ইমাম শাফেয়ী তাঁর মতের সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন ইমাম আহমদের একটি বিবৃতি। ইমাম মুসলিমও তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে তার উল্লেখ করেছেন। বিবৃতিটি এই— হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বর্ণনা করেছেন, বনী আকীল গোত্রের এক লোকের একটি উষ্ট্রী ছিলো, তার নাম ছিলো আদ্ববা। উষ্ট্রীটি হাজীদের কাফেলার সর্বাগ্রে চলতো। হঠাৎ করে একদিন আদ্ববাকে গ্রেফতার করা হলো তার মালিক সহকারে। রসুল স. আদ্ববাকে আটক করে রাখলেন। কিছুদিন পর কাফেরেরা মদীনার বাইরে বিচরণরত উটের পালের উপরে হামলা করে সেগুলিকে লুঠ করে নিয়ে গেলো। তার মধ্যে আদ্ববাও ছিলো। তারা একজন মুসলিম রমণীকেও ধরে নিয়ে গেলো। পথিমধ্যে তারা যখন রাত্রি যাপন করতো, তখন উটগুলোকে বেঁধে রাখতো সম্মুখের প্রান্তরে। এক রাতে রমণী ঘুম ভাঙতেই দেখলো সকলেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সে ধীরে ধীরে উটগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো। যে উটের গায়ে সে হাত রাখলো সেটিই আওয়াজ করে উঠলো। একটি উট আর আওয়াজ করলো না। সেটি ছিলো আদ্ববা। সে ওই উটের পিঠে চড়ে যাত্রা করলো মদীনার দিকে। মনে মনে মানত করলো, এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে আদ্ববাকেই কোরবানী করবে। সে যখন মদীনায় পৌঁছলো, তখন সকলেই চিনে ফেললো আদ্ববাকে। লোকেরা তাঁকে ও আদ্ববাকে রসুল স. এর কাছে নিয়ে গেলো। রমণীটি প্রকাশ করলো তার পলায়ন ও মানতের বিবরণ। রসুল স. মৃদু হেসে বললেন, আল্লাহ্ যার উপরে আরোহণ করায়ে তোমাকে উদ্ধার করলেন, তুমি কি তাকেই কোরবানী করবে? পাপ কাজের মানত পূরণ করতে হয় না এবং ওই জিনিসের মানত করাও জায়েয নয়, যা নিজের মালিকানায় নেই। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কাফেরেরা লুণ্ঠিত বস্তুর মালিক হয় না। যদি হতো তবে রসুল স. আদ্ববাকে গ্রহণ করতেন না। ওই রমণীর মানতও পরিত্যক্ত হতো না।

আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমার একটি ঘোড়া হারিয়ে গিয়েছিলো এবং তা অধিকার করে নিয়েছিলো অবিশ্বাসীরা। কিছু দিন পর বিশ্বাসীরা বিজয়ী হলো। তখন ঘোড়াটি আমাকে ফেরত দেওয়া হলো। ঘটনাটি ঘটেছিলো রসুল স. এর পৃথিবীবাসের সময়ে। তিনি আরো বলেছেন, আমার এক ক্রীতদাস পালিয়ে গিয়েছিলো সিরিয়া দেশে। মুসলমানেরা যখন সিরিয়া অধিকার করলো, তখন ওই ক্রীতদাসকেও করা হলো বন্দী। সেনাপতি খালেদ ইবনে ওলীদ ওই ক্রীতদাসকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিলো রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর।

প্রথমোক্ত হাদিস সম্পর্কে বলা যেতে পারে, অবিশ্বাসীরা উটটি নিয়ে তাদের নিজেদের দেশাভ্যন্তরে পৌঁছতে পারেনি। হাদিসে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, পথিমধ্যে রাত্রিযাপনের সময় তারা তাদের উটগুলোকে সামনের প্রান্তরে বেঁধে রাখতো। পরের হাদিসটি আমাদের অভিমতেরই অনুকূলে। আমাদের মাযহাব হচ্ছে, বিধর্মীরা যখন আমাদের সম্পত্তি দখল করে নিবে, তখন তারা ওই সম্পত্তির মালিক হবে। তারপর আবার আমরা যদি বিজয়ী হই এবং ফায় এর

সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে যদি মূল মালিক তার সম্পত্তি চিনে নিতে পারে, তবে মূল্য পরিশোধ ব্যতিরেকেই সে ওই সম্পত্তি অধিকার করতে পারবে। আর বন্টনের পর যদি চিনতে পারে, তবে মালিক হতে পারবে মূল্য পরিশোধ করে। অবশিষ্ট রইলো ক্রীতদাস প্রসঙ্গ। সেতো নিজেই পালিয়ে গিয়ে বিধর্মীর রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলো। ইমাম আবু হানিফা তাই বলেন, বিধর্মীরা তার মালিক হতেই পারে না। মুসলমানেরা বিজয়ী হওয়ার পর তাকে বন্দী করে তার আসল মালিকের কাছে সোপর্দ করেছে। আর বিধর্মীদের কাছ থেকে কোনোকিছু কিনে নিলে, অথবা মূল্য ছাড়াই পেলে তার বিধানও অনুরূপ। অর্থাৎ মূল্য পরিশোধ করে মূল মালিক তা কিনে নিতে পারবে।

'ইয়াবতাগুনা ফাদ্বলাম মিনাল্লহি ওয়া রিদ্বওয়ানা' অর্থ তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র কাছে কামনা করে তাদের কৃতকর্মের অধিক বিনিময়। 'ওয়া ইয়ানসরূনাল্লহা ওয়া রসূলাহু' অর্থ এবং আল্লাহ্ ও তার রসুলের সাহায্য করে। আর 'উলায়িকা হুমুস্ সদিকুন' অর্থ তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। অর্থাৎ বিশ্বাসবান হওয়ার দাবিতে তারা সত্যবাদী। কোনো কোনো শীয়া বলে থাকে, ঘরবাড়ি ছেড়ে বের হওয়া মুহাজিরেরা মুমিন ছিলো না, ছিলো মুনাফিক। অর্থাৎ মুমিন হওয়ার দাবিতে তারা মিথ্যাবাদী ছিলো। আলোচ্য আয়াত তাদের অভিমতের বিপরীত। কাজেই তাদের বক্তব্য ও বিশ্বাস স্পষ্টতই কুফরী।

কাতাদা বলেছেন, তাঁরা ছিলেন মুহাজির, যাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের মহব্বতে ঘর বাড়ি আত্মীয় পরিজন ছেড়ে দেশত্যাগী হয়েছিলেন। ইসলামের পথে তাঁদেরকে সহ্য করতে হয়েছিলো অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট। ক্ষুধায় কাতর হয়ে তাঁদেরকে কখনো কখনো পেটে পাথরও বাঁধতে হয়েছিলো। কারো কারো অবস্থা ছিলো আরো করুণ। শীত থেকে আত্মরক্ষার মতো বস্ত্রও তাঁদের ছিলো না। তাই আশ্রয় নিতে হতো মাটির ভিতরে গর্ত করে। আমি বলি, তাঁরা আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হওয়ার জন্য পাগলপারা ছিলেন। বাগবী তাঁর 'মাআলিম' ও 'শরহে সুন্নাহ' পুস্তকে লিখেছেন, খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উসায়েদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের অসিলা দিয়ে দোয়া করতেন। হজরত ইবনে ওমর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহা বিচারের দিবসে বিত্তপতিদের চল্লিশ বৎসর আগে বেহেশত প্রবেশ করবে মুহাজিরেরা। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলতেন, হে মুহাজিরের দল! তোমরা মহাবিচারের দিবসের পূর্ণ নূর প্রাপ্তির শুভসমাচার শ্রবণ করো। তোমরা ধনী ব্যক্তিদের অর্দ্ধ দিবস পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর তখনকার অর্দ্ধদিবস হবে এখনকার পাঁচশ' বৎসরের সমান। আমি বলি, দরিদ্র মুহাজিরগণ ধনী মুহাজিরগণের চল্লিশ বৎসর পূর্বে এবং অন্যান্য ধনী মুসলমানের পাঁচশ বৎসর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবেন।

হজরত ইয়াজিদ ইবনে আনাস থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, একবার আনসারগণ রসুল স. এর নিকটে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ!

আমাদের ও আমাদের মুহাজির ভ্রাতাদের মধ্যে আমাদের জমিগুলো আধাআধি করে ভাগ করে দিন। তিনি স. বললেন, না, জমি তো তোমাদের। তোমরা তাদের কষ্টের বোঝা লাঘব করে দাও। জমির ফসল তাদেরকে দাও আধাআধি ভাগ করে। তাঁরা বললেন, আমরা এতে রাজী। এমতো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা হাশর ঃ আয়াত ৯

❑ আর তাহাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যাহারা এই নগরীতে বসবাস করিয়াছে ও ঈমান আনিয়াছে, তাহারা মুহাজিরদিগকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য তাহারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তাহারা তাহাদিগকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হইলেও। যাহাদিগকে অন্তরের কার্পণ্য হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছে, তাহারাই সফলকাম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, আনসারগণ আবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের মধ্যে এবং আমাদের ভাইদের (মুহাজিরদের) মধ্যে আমাদের খেজুর গাছগুলো ভাগ করে দিন। রসুল স. বললেন, তোমরা পরিশ্রম করতে থাকো। আমি ফলের মওসুমে ফলগুলো তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দিবো। আনসারগণ বললেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। এমতো আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি যথাযথ নয়।

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ইমান এনেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে'। এখানে 'তাবাওওয়াউদ্ দারা ওয়াল ঈমান মিন ক্বাবলিহিম' অর্থ মুহাজিরদের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ইমান এনেছে। অর্থাৎ আনসারগণ। এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'আলঈমান' (ইমান এনেছে) কথাটি একটি অনুক্ত ক্রিয়ার কর্ম। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— 'তাবাওওয়াউদ্ দারা ওয়া ইখলাসাল ঈমান' (যারা তাদের ইমানকে বিশুদ্ধ করে নিয়েছে)। আর 'দারাল ঈমান' অর্থ এখানে পুণ্যভূমি মদীনা। মদীনাকে পুণ্যভূমি

বলার কারণ এই যে, মদীনা হচ্ছে ইমান প্রকাশ হওয়ার স্থান। হজরত জাবের ইবনে সামুরা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ মদীনার নাম রেখেছেন তাবা। মুসলিম। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মদীনা রেতভুল্য, যা আবিলতাকে দূর করে দেয়। বোখারী, মুসলিম। মুসলিম হজরত আবু হোরায়রা থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

'মিন ক্বাবলিহিম' অর্থ তাদের আগমনের পূর্বে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, কথাটি 'তাবাওওয়াউদ্ দারা' (বসবাস করেছে) এর সঙ্গে সংযুক্ত (বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে সেভাবেই)। 'হাজ্বাতান' অর্থ যা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুহাজিরগণকে যা দেওয়া হয়েছে। কোনোকিছুর প্রয়োজন দেখা দিলে তাকে বলা হয় হাজ্বাত। এখানে সম্বন্ধপদ রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ মুহাজিরগণকে যা দেওয়া হয়েছে, আনসারগণ তার প্রয়োজন বোধ করেননি। কেউ কেউ বলেছেন, যার কারণে প্রয়োজন অনুভূত হয় তাকেই বলে হাজ্বাত। যেমন বিত্তস্পৃহা, হিংসা, ক্রোধ। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মুহাজিরগণকে যা দেওয়া হয়েছে, আনসারগণ তার আকাংখা করে না। করে না হিংসা, অথবা প্রকাশ করে না ক্রোধ। 'মিম্মা ঊতূ' অর্থ তার জন্য। অর্থাৎ মুহাজিরগণকে যা দেওয়া হয়েছে এবং আনসারগণকে যা দেওয়া হয়নি তার জন্য। উল্লেখ্য, রসুল বনী নাজীরদের ফেলে যাওয়া ফায় এর সম্পত্তি মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। আনসারগণের মধ্যে দিয়েছিলেন কেবল তিন জনকে। কিন্তু এরকম করাতে আনসারগণ এতটুকুও বেজার হননি। বরং খুশীই হয়েছিলেন।

মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী তাঁর 'সাবিলুর রাশাদ' গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. বনী আউফ ইবনে আমরের জনপদ থেকে মদীনায় ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে চলে এলেন মুহাজিরগণও। তখন মুহাজিরগণকে মেহমান হিসেবে পাওয়ার জন্য আনসারগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিলো। শেষে দ্বন্দ্ব নিরসন করা হলো লটারীর মাধ্যমে। লটারীতে যাদের নাম উঠলো, তাঁরা তাঁদের মেহমানকে নিয়ে নিজ নিজ গৃহে চলে গেলেন। গৃহ ও সম্পদের অংশীদার করে নিলেন তাদেরকে। বনী নাজীরদের পক্ষ থেকে সমস্ত ফায় যখন রসুল স. এর হস্তগত হলো, তখন তিনি সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসকে ডেকে বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ডেকে নিয়ে এসো। সাবেত বললেন, খাজরাজদেরকেও কি ডেকে নিয়ে আসবো? তিনি স. বললেন, না। বরং ডেকে নিয়ে এসো সকল আনসারকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমবেত হলেন মুহাজির ও আনসারগণের সকলেই। রসুল স. আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। এরপর উল্লেখ করলেন মুহাজিরগণের জন্য আনসারগণের ভালোবাসা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রসঙ্গ। উল্লেখ করলেন গৃহ ও সম্পদে তাঁদের মুহাজির ভ্রাতাগণদের অংশ প্রদানের কথা। শেষে বললেন, এখন তোমরা চাইলে আমি বনী নাজীরদের সম্পত্তি মুহাজির ও আনসারদের সবাইকে সমানভাবে ভাগ করে দেই। এভাবে ভাগ করে দিলে তোমাদের মুহাজির ভ্রাতা এখন যেমন তোমাদের বাড়ি ও সম্পদ অধিকার করে আছে তেমনই থাকবে।

আর যদি তোমরা পছন্দ করো, তবে আমি সকল সম্পত্তি তাদেরকেই দিয়ে দিবো এবং বলবো, তারা যেনো তোমাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গৃহ নির্মাণ করে। ছেড়ে দেয় তোমাদের অধিকৃত সম্পত্তি। ভাষণ শেষ হওয়ার পর হজরত সা'দ ইবনে উবাদা এবং হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ বিনিময়ের পর বললেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহক। আপনি সকল সম্পত্তি মুহাজিরদের মধ্যেই বণ্টন করে দিন এবং তাঁরা এখন যেমন আমাদের বাড়িতে আছেন তেমনি ভবিষ্যতেও থাকবেন। দুই নেতার এমতো বক্তব্য শোনার পর আনসার জনতা বললেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আমরা এতে রাজী। আমরা এ প্রস্তাব অনুমোদন করলাম। রসুল স. দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আনসারদের উপর রহমত বর্ষণ করো। এরপর তিনি ফায় এর সম্পত্তির পুরোটাই বিতরণ করে দিলেন মুহাজিরগণের মধ্যে। আনসারগণের মধ্যে দিলেন কেবল হজরত সহল ইবনে হানিফ এবং হজরত আবু দুজানাকে। আর হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজকে দিলেন কেবল ইবনে আবুল হাকীকের তরবারীটি। তরবারীটির সুখ্যাতি ছিলো খুব।

ঐতিহাসিক বালাজুরী তাঁর 'ফতহুল বুলদান' গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. তখন আনসারগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মুহাজির ভ্রাতাগণ নিঃস্ব। তোমরা যদি চাও, তবে আমি বনী নাজীরদের সম্পত্তি তোমাদের ও তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারি। আর এখন যে সকল সম্পদ তোমাদের আছে, তা-ও ভাগ করে দিতে পারি তাদের ও তোমাদের মধ্যে। আর যদি চাও, তোমাদের সম্পদ পুরোপুরি তোমাদেরই থাকবে, আর ফায় সম্পূর্ণ পাবে তারা। আনসারগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি ফায় এর সম্পদ তাদেরকেই দিয়ে দিন। আর আমাদের সম্পত্তিও আপনি যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে দান করুন। এমতো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় 'আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপরে অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও'। উল্লেখ্য, আনসারগণ নিজেদের প্রয়োজন অপেক্ষা তাঁদের মুহাজির ভ্রাতাগণের প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। এমনকি দু'জন স্ত্রীধারী কোনো কোনো আনসার একজন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিবাহ দিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের মুহাজির ভ্রাতাদের সঙ্গে।

'ওয়া লাও কানা বিহিম খাসাসাহ' অর্থ নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। বাগবী লিখেছেন, এসম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাসের বিবরণও ঐতিহাসিক বালাজুরির বিবরণের অনুরূপ। বোখারী হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, এক লোক একবার রসুল স. এর সুমহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি ক্ষুধায় কাতর। রসুল স. একজনকে তাঁর সহধর্মিণীগণের কাছে খাদ্য অনুসন্ধানের জন্য পাঠালেন। সে এসে জানালো, কারো ঘরে কিছু নেই। তিনি স. বললেন, এমন কেউ কি আছো যে আজ রাতের জন্য এই অতিথিকে আপ্যায়ন করাবে? এরকম যে করবে, আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হবে তার উপর। সঙ্গে সঙ্গে একজন আনসার দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি করবো। তিনি লোকটিকে নিয়ে বাড়ি গেলেন। স্ত্রীকে বললেন, আল্লাহ্‌র রসুলের এক অতিথিকে নিয়ে এসেছি। ঘরে যা

আছে সব তাঁর সামনে উপস্থিত করো। তাঁর স্ত্রী বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! বাচ্চাদের খাবার ছাড়া ঘরে আর কিছুই নেই। তিনি বললেন, রাতে বাচ্চারা খাবার চাইলে যা হোক কিছু একটা বলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ো। তাঁর স্ত্রী তাই করলেন। বাচ্চাদের খাবার দিয়েই পরিতৃপ্ত করলেন অতিথিকে। অপর বর্ণনায় এসেছে, তাঁর স্ত্রী তখন আহার্য প্রস্তুত করে শিশুদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। আর প্রদীপ ঠিক করার বাহানা করে তা নিভিয়ে ফেললেন। অন্ধকারে চলতে লাগলো আহারপর্ব। আনসারী আহারের ভান করলেন কেবল। এভাবে সকল খাবার খাওয়ালেন অতিথিকে। গৃহকর্তা, গৃহকর্ত্রী ও শিশুরা সকলেই রইলেন অভুক্ত। সকালে যখন সেই আনসারী সাহাবী রসুল স. এর দরবারে হাজির হলেন, তখন তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ অমুক পুরুষ ও অমুক রমণীর অতিথি সৎকারে প্রীত হয়েছেন। তখনই অবতীর্ণ হয় 'আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপরে অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও'।

মুসাদ্দাদ তাঁর 'মসনদ' গ্রন্থে এবং ইবনে মুনজির আবুল মুতাওয়াক্কিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ওই আনসারী সাহাবীর নাম ছিলো মান্যবর সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস। তাঁর সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় উদ্ধৃত আয়াত। মুহারিব ইবনে দিছার সূত্রে ওয়াহেদী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, জনৈক সাহাবীর কাছে একবার একটি ছাগলের মাথা উপঢৌকন হিসেবে পাঠানো হলো। তিনি বললেন, আমার অমুক ধর্মভ্রাতা ও তাঁর সন্তান-সন্ততিরা এর অধিক হকদার। একথা বলে তিনি তাঁর ওই ধর্মভ্রাতার কাছে মাথাটি পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আবার সেটিকে পাঠিয়ে দিলেন অন্য এক বাড়িতে। এভাবে মাথাটি সাত বাড়ি ঘুরে চলে গেলো প্রথম জনের বাড়িতে। তখন অবতীর্ণ হলো 'আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপরে অগ্রাধিকার দেয়'।

হজরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আনসারগণকে বাহরাইনের জায়গীর দান করবেন বলে কাছে ডেকে আনলেন। তাঁরা বললেন, আমাদের ধর্মভ্রাতা মুহাজিরগণের জন্যও জায়গীর প্রদান করা হোক। অন্যথায় আমরা জায়গীর চাই না। রসুল স. বললেন, তোমরা যখন এতোটাই ত্যাগ স্বীকার করতে চাও, তখন তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনেও ধৈর্যধারণ করতে হবে। সে দিনও আমার পরে তাদের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম'। উল্লেখ্য, প্রবৃত্তি বিত্ত-বৈভব খুবই ভালোবাসে। তাই বিত্ত ব্যয় তার জন্য খুবই অপ্রীতিকর। আর যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে, সে-ই হয় সফলকাম। কেননা আল্লাহ্‌র ভালোবাসা আনে হৃদয়ের প্রশস্ততা ও বদান্যতা। এখানে 'শুহ্' অর্থ কৃপণতা, লোভ। জাওহারী তাঁর 'সিহাহ্' পুস্তকে লিখেছেন, শব্দটির অর্থ লালসায়িত কার্পণ্য। বাগবী লিখেছেন, বিদ্বানগণ 'শুহ্' এবং 'বুখল' শব্দ দু'টোকে সমঅর্থসম্পন্ন মনে করেন না। এক লোক একবার হজরত ইবনে মাসউদকে বললো, আমার তো ভয় হয়, মহাবিচারের দিবসে হয়তো আমি স্থায়ীভাবে

www.eelm.weebly.com

ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। তিনি বললেন, কারণ? সে বললো, আল্লাহ্ বলেছেন, 'যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে তারাই সফলকাম'। আর আমি তো চরম বখিল (কৃপণ)। আমার হাত থেকে কোনো কিছুই বের হতে চায় না। তিনি বললেন, এটা ওই কার্পণ্য নয়। শুহ্ বা বখিলি হচ্ছে আপন ভ্রাতার সম্পত্তি অসিদ্ধ উপায়ে হস্তগত করা। আর তা অবশ্যই মন্দ।

হজরত ওমর বলেছেন, সম্পদ জমা রাখার নাম 'শুহ্' বা বখিলি নয়। বরং 'শুহ্' হচ্ছে অপরের সম্পত্তি অসিদ্ধ পদ্ধতিতে হস্তগত করার আকাংখা করা। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন 'শুহ্' হচ্ছে অবৈধ সম্পদ অর্জন করা এবং জাকাত না দেওয়া। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, 'শুহ্' হচ্ছে এমন একটি লোভ, যা নিষিদ্ধ কাজ করতে বাধ্য করে। ইবনে জায়েদ বলেছেন, আল্লাহ্ যে বস্তু গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকলে, যা দান করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা দান না করলেও বখিলি হবে না। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা জুলুম করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা মহাবিচারের দিবসে জুলুমই পরিণত হবে অন্ধকারে। আর বেঁচে থেকো কৃপণতা থেকে। কেননা কৃপণতাই ছিলো পূর্ববর্তী লোকদের বিনাশপ্রাপ্তির কারণ। কৃপণতার কারণেই তারা রক্তারক্তি করেছে এবং হারামকে হালাল বানিয়েছে। মুসলিম, আহমদ। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথে (জেহাদের কারণে) উড়ন্ত ধূলিকণা এবং দোজখের ধোঁয়া কোনো বান্দার উদরে একত্রিত হবে না। আর কোনো বান্দার অন্তরে একত্রিত হবে না কার্পণ্য ও ইমান। বাগবী। নাসাঈও এরকম বর্ণনা করেছেন।

সূরা হাশর ঃ আয়াত ১০

❑ যাহারা উহাদের পরে আসিয়াছে, তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা তাদের পরে এসেছে। অর্থাৎ যে সকল ইমানদার এসেছে মক্কা বিজয়ের পর এবং আসতে থাকবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ইমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করো'। একথার অর্থ— তারা বলে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! যারা আমাদের স্বনামধন্য পূর্বসূরী মুহাজির ও

আনসার তাঁরা কতোই না সৌভাগ্যবান। তাঁরা ইমান পেয়েছিলেন সরাসরি রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্য থেকে। তাই তারাই আমাদের অগ্রণী এবং আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ধর্মভ্রাতা। আমরা তোমার সকাশে যাচনা করি মার্জনা— আমাদের জন্য, তৎসহ আমাদের ওই অগ্রণীগণের জন্যও। নিশ্চয়ই আমাদের উপরে রয়েছে তাদের কৃতজ্ঞতা ও ক্ষমাপ্রার্থনার অধিকার।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না'। এখানে 'মুমিনদের বিরুদ্ধে' অর্থ মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের বিরুদ্ধে, যারা বিশ্বাসী হিসেবে সর্বাগ্রগণ্য। তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ সম্পূর্ণতই নিষিদ্ধ। ইবনে আবী লায়লা বলেছেন, বিশ্বাসীগণ তিন স্তরের—১. অভাবগ্রস্ত মুহাজির ২. যাঁরা ইমান ও ইসলামকে বানিয়েছেন আশ্রয়স্থল (আনসার) এবং ৩. পরবর্তীতে যাঁরা এদের অনুসারীরূপে আগমন করেছেন। শেষোক্তরা তাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য প্রার্থনা জানাবে 'হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদেরকে এবং ইমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা করো.......'। সুতরাং এই তিন প্রকারের বাইরে আর কোনো প্রকারের মুসলমান নেই।

স্বসূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, মাতা মহোদয়া আয়েশা বলেছেন, আমি তোমাদেরকে আদেশ করছি, রসুল স. এর সহচরবর্গের জন্য তোমরা ক্ষমাপ্রার্থনা কোরো। কেননা আমি তোমাদের রসুলকে বলতে শুনেছি, এই উম্মতের শেষ যুগের লোকেরা তাদের পূর্ববর্তীগণকে অভিসম্পাত দিবে। ইমামিয়া ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের এক লেখক তার 'আল ফসুল' পুস্তকে লিখেছেন, একবার একদল লোক হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং হজরত ওসমানের ব্যাপারে সমালোচনা শুরু করলো। তখন ইমাম জাফর সাদেক ইবনে আলী বাকের বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমরা কখনোই ওই দলের অন্তর্ভুক্ত নও, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন 'ওয়াল্ লাজীনা.........'। 'সহীফা কামেলা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইমাম জয়নুল আবেদীন প্রার্থনা করতেন, মোহাম্মদ মোস্তফা স. ও

www.eelm.weebly.com

তাঁর অনুচরবর্গকে তোমার বিশেষ রহমত দান করো, যাঁরা ছিলেন রসুল স. এর অত্যুত্তম সঙ্গী, তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে যাঁরা পরীক্ষিত, দৃঢ়তার সঙ্গে যারা নিয়োজিত ছিলেন রসুল স. এর সেবায় এবং যাঁরা ছিলেন সত্যধর্ম প্রচারে সকলের অগ্রণী। রসুল স. যখন তাঁদের সামনে তাঁর রেসালতের প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, তখনই তাঁরা সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিয়েছেন। তাওহীদ ও রেসালতকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে তাঁরা উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের জীবন, স্বজন-পরিবার-পরিজন ও সম্পদ। সত্যধর্মকে দৃঢ়ভিত্তি দানের মানসে তাঁরা পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও পিছপা হননি। আর তাঁরা তাঁদের নবীর অসিলায় লাভ করেছিলেন বিজয়, সাফল্য। হে আল্লাহ্! তোমার রসুলের প্রেমসাগরে যাঁরা নিমজ্জিত, তুমি তাদের প্রতি বর্ষণ করো সবিশেষ অনুকম্পা, যারা তোমার রসুলপ্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে তোমার কাছে ওই বেসাতির আকাংখী, যে বেসাতিতে ক্ষতির কোনো আশংকাই নেই। যাঁরা ইসলামকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ত্যাগ করেছিলেন দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-পরিজন, আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন রসুল স. এর ঘনিষ্ঠ, ঘনিষ্ঠতর নৈকট্যভাজনতার ছায়ায়।

হে আল্লাহ্! তাঁরা যে সকল সামগ্রী তোমার রাস্তায় উৎসর্গ করেছেন, তুমি তা দয়া করে বিস্মৃত হয়ো না। তুমি তোমার প্রীতি দান করে তাঁদেরকে প্রীত করো তাঁদের ওই কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ, যা তাঁরা সম্পন্ন করেছিলেন তোমার পথে অটল থেকে। তাঁরা যে তোমার প্রিয়তম প্রত্যাদেশবাহীর আদরের সাথী। তাঁরা তো তোমার রসুলের নির্দেশে আজীবন মানুষকে আহ্বান জানিয়ে গিয়েছেন তোমার দিকেই। তুমি তাঁদেরকে উচ্চতর বিনিময় প্রদান করে ধন্য করো। তারা তো তোমার জন্যই বিত্ত-বৈভব পরিত্যাগ করে হয়ে গিয়েছিলেন নিঃস্ব, নিঃস্বতর। হে আমার আল্লাহ্! তুমি তাঁদেরকেও দান করো তোমার সবিশেষ কৃপা, যারা ওই সকল মহাজনের যথাযথ অনুসারী এবং যারা দোয়া করে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদেরকে এবং ইমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করো এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না।

মালেক ইবনে মে'ওয়াল বর্ণনা করেছেন, আমার কাছে আমের ইবনে শুরাহবীল শা'বী বলেছেন, মালেক! একটি বিষয়ে ইহুদী-নাসারারা রাফেজীদের চেয়ে উত্তম। আমি যখন ইহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের ধর্মে সর্বোত্তম কে? তারা বললো, নবী মুসা ও তাঁর সাহাবীগণ। নাসারাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের ধর্মে শ্রেষ্ঠ কে? তখন তারা বললো, নবী ঈসা ও তাঁর হাওয়ারীগণ। কিন্তু রাফেজীদেরকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের ধর্মে সবচেয়ে মন্দ লোক কে, তারা বললো, মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর সাহাবীগণ। তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁদের জন্য দোয়া করার, অথচ তারা তার বদলে দোষচর্চা করছে সাহাবীগণের। আর তাঁদের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের তরবারীও শানিত থাকবে। কিন্তু তবুও তাদের ঝাণ্ডা কখনো সমুন্নত হবে না। তারা সুস্থির হতেও পারবে না। হতে পারবে না একমত। যদি তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে, তবে আল্লাহ্ তাদেরকে বিক্ষিপ্ত ও রক্তাক্ত করে যুদ্ধাগ্নি নির্বাপিত করবেন। তাদের ধ্বংসাত্মক অপবিশ্বাস থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমিন। হজরত আনাস একবার বললেন, যে ব্যক্তি কোনো সাহাবীকে ঘৃণা করবে, অথবা কারো প্রতি লালন করবে গোপন হিংসা, মুসলমানদের ফায় এর সম্পদ পাওয়ার তাদের কোনোই অধিকার নেই। এরপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য সুরার ৬ সংখ্যক আয়াত থেকে ১০ সংখ্যক আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন, ইতোপূর্বে বর্ণিত তিন ধরনের ইমানদারদের মধ্যে ফায় এর সম্পদ পাওয়ার যোগ্য তারাই, যারা অভাবগ্রস্ত। আমার মতে ৯ সংখ্যক আয়াতের 'মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে' বাক্যটি ৮ সংখ্যক আয়াতের 'এই সম্পদ মুহাজিরগণ' বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই মুসলমানের ফায় এর সম্পদপ্রাপ্তির জন্য অভাবগ্রস্ত হওয়া কোনো শর্ত নয়। একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পথচারী বা মুসাফিরেরাও ফায় পেতে পারে। এব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু সকল পথচারীকে তো আর অভাবগ্রস্ত বলা যায় না। দেশে তো তাদের অনেক সম্পত্তি

থাকা সম্ভব। তেমনি মুহাজিরগণও অভাবগ্রস্ত অথবা বিত্তবান উভয়টিই হতে পারেন। তবে অধিকাংশ মুহাজির তখন অভাবগ্রস্ত ছিলেন বলেই বিশেষভাবে তাঁদের উল্লেখের আগে বসানো হয়েছে 'ফুকারা' (অভাবগ্রস্ত)। সুতরাং ফায় পাওয়ার জন্য অভাবগ্রস্ত হওয়া কোনো শর্ত নয়। বরং এটি বাস্তব অবস্থার একটি যথাউল্লেখ মাত্র। যেমন 'ওয়া রবাবিউকুমুল লাতী ফী হুজুরিকুম' বাক্যের 'হুজুরিকুম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শুধুমাত্র বাস্তব পরিস্থিতি উল্লেখার্থে। তৎকালীন সময়ে কোনো রমণীর পূর্ব স্বামীর কন্যা সন্তান থাকলে সাধারণত প্রতিপালিতা হতো তার সৎপিতার গৃহে। 'ফী হুজুরিকুম' দ্বারা এখানে সে কথাটিকেই বুঝানো হয়েছে। আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আলেমগণের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতেই ফায় এর সম্পত্তিতে রয়েছে সবধরনের মুসলমানের অধিকার— চাই সে, বিত্তহীন হোক, অথবা বিত্তবান। অর্থাৎ প্রশাসক, শ্রমিক-কর্মচারী, আলেম-ওলামা সব ধরনের মুসলমানই ফায় সম্পত্তি দ্বারা উপকৃত হতে পারে। তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীও পরিচালিত হতে পারে ফায় দ্বারা। এমতোক্ষেত্রেও সৈন্যদের দরিদ্র হওয়া কোনো শর্ত নয়। খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দীক ফায় এর সম্পত্তি সকল মুসলমানকে সমানভাবে ভাগ করে দিতেন। খলিফা হজরত ওমর ধর্মীয় মর্যাদা ও ইসলামের সেবায় অবদান রাখার তারতম্যের ভিত্তিতে ফায় বণ্টনে তারতম্য ঘটাতেন।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর 'কিতাবুল খেরাজে' লিখেছেন, আমার কাছে ইবনে আবুন্‌নাজীহ্ বর্ণনা করেছেন, একবার খলিফা হজরত আবু বকরের কাছে কিছু ফায় আনা হলো। তিনি বললেন, রসুল স. যাদেরকে কিছু প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন, তারা চলে এসো। একথা শুনে এগিয়ে গেলেন হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্। বললেন, রসুল স. আমাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বাহরাইনের সম্পদ এলে তোমাকে আমি এতো এতো দিবো। হজরত আবু বকর বললেন, ঠিক আছে, দুহাত ভরে নিয়ে নাও। হজরত জাবের তাই করলেন। তারপর গুণে দেখলেন, হাতে উঠেছে পাঁচশ'। হজরত আবু বকর বললেন, এক হাজার নিয়ে নাও। হজরত জাবের তাই করলেন। এরপর হজরত আবু বকর তাঁদেরকেও দান করলেন, যাঁরা বলতে লাগলেন, রসুল স. আমাকেও সম্পদ প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন। এরপরেও দেখা গেলো, কিছু সম্পদ উদ্বৃত্ত রয়েছে। তিনি তা সমানভাবে বণ্টন করে দিলেন অন্যান্য নারী-পুরুষ, স্বাধীন-দাস, বালক-বৃদ্ধ সকলের মধ্যে। এভাবে প্রত্যেকে পেলো ৯.৭৫ দিরহাম। পরের বৎসর এর চেয়েও বেশী সম্পদ এলো। তিনি তা-ও ভাগ বণ্টন করে দিলেন সকলের মধ্যে। সেবার সকলে পেলো কুড়ি দিরহাম করে। এরপর কতিপয় মুসলমান নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুলের প্রতিনিধি! আপনি তো সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দিলেন। কিন্তু এদের মধ্যে তো এমন লোকও রয়েছে, ধর্মপরায়ণতা ও ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে যাদের দৃঢ়তা, অগ্রগামিতা ও অবদান অধিক। আপনি যদি তাদের দিকে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করতেন, তবে ভালো হতো।

হজরত আবু বকর বললেন, আমি বিষয়টি ভালোভাবেই জানি। তাদের পুণ্যকর্মের প্রতিদান তো আল্লাহ্‌ই দিবেন। আর এই বণ্টনের ব্যাপারটা হচ্ছে জাগতিক। তাই এমতোক্ষেত্রে কমবেশী করার চেয়ে সমান সমান করাই উত্তম। হজরত ওমর যখন খলিফা হলেন, তখনও ফাই এর সম্পদ আসতে লাগলো। তিনি বণ্টনরীতিতে ঘটালেন কিছুটা পরিবর্তন। লক্ষ্য করলেন ধর্মীয় মর্যাদার দিকে। বললেন, রসুল স. এর সহচর হয়ে যারা যুদ্ধ করেছে, তাদেরকে আমি ওই ব্যক্তিদের সমতুল মনে করতে পারি না, যারা একসময় ছিলো রসুল স. এর প্রতিপক্ষ। একথা বলে তিনি মুহাজির ও আনসারগণের জন্য অংশ নির্ধারণ করলেন অন্যদের চেয়ে বেশী। আর বদর যুদ্ধে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে দিলেন পাঁচ হাজার দিরহাম করে। অন্যদেরকেও দিলেন মর্যাদার তারতম্যানুসারে। ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন, আযারার মুক্ত ক্রীতদাস ওমর এবং আরো কয়েকজন আমাকে বলেছেন, হজরত ওমরের কাছে যখন যুদ্ধজয়ের সম্পদ এলো, তখন তিনি তা বণ্টন করে দিলেন নতুন নিয়মে, প্রত্যেকের ধর্মীয় মর্যাদার তারতম্য অনুসারে। হজরত আবু বকরের রীতি আর অনুসরণ করলেন না। বললেন, একসময় যারা রসুল স. বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো, তাদেরকে কি আমি ওই সকল লোকের সমান জ্ঞান করতে পারি, যারা প্রথম থেকে সকল অবস্থায় ছিলেন রসুল স. এর সঙ্গী। এভাবে তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে দিলেন সর্বোচ্চ পরিমাণ, চার হাজার দিরহাম। উম্মতজননীগণের মধ্যে হজরত সাফিয়্যা ও হজরত জুওয়াইরিয়াকে দিলেন ছয় হাজার দিরহাম করে এবং বারো হাজার দিরহাম করে দিলেন অন্যান্যদেরকে। জননী সাফিয়্যা ও জননী জুওয়াইরিয়া যখন ছয় হাজার দিরহাম নিতে অস্বীকার করলেন, তখন হজরত ওমর তাঁদেরকে বললেন, ওনাদেরকে দ্বিগুণ দিয়েছি আমি হিজরতের কারণে। তাঁরা বললেন, না, এটা কোনো কারণ নয়। বরং আপনার ধারণা, তাঁরা আমাদের চেয়ে রসুল স. এর দৃষ্টিতে ছিলেন অধিক মর্যাদাধারিণী। কিন্তু ভালো করে শুনে নিন, রসুল স. এর দৃষ্টিতে আমাদের সকলের মর্যাদা ছিলো সমান। একথা শুনে হজরত ওমর তাঁদেরকেও দিলেন বারো হাজার দিরহাম করে। রসুল স.এর পিতৃব্য হজরত আব্বাসকেও তিনি দিলেন বারো হাজার দিরহাম। হজরত উসামা ইবনে জায়েদকে চার হাজার এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরকে তিন হাজার । তিনি বললেন, হে আমার পিতা! আপনি উসামাকে আমার চেয়ে এক হাজার বেশী দিলেন কেনো? উসামার পিতা তো আমার পিতার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান নন। উসামারও তো সেরকম কোনো প্রাধান্য নেই যে, তিনি আমাকে অতিক্রম করতে পারেন। হজরত ওমর বললেন, উসামার পিতা তোমার পিতার চেয়ে রসুল স. এর অধিক প্রিয় ছিলেন। আর উসামাও রসুল স. এর কাছে ছিলো তোমাপেক্ষা অধিক আদরের। হজরত হাসান ও হজরত হোসাইনকে দিলেন পাঁচ হাজার করে। কেননা তাঁরা ছিলেন রসুল স. এর পরম আদরের দৌহিত্র। অন্যান্য মুহাজির ও আনসারকে দিলেন দু'হাজার করে। কিন্তু যখন হজরত আমর ইবনে আবী সালমা

সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন, তাঁকে দুই হাজার বৃদ্ধি করে দাও। তখন হজরত মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে জাহাশ বললেন, তাঁর পিতা আবু সালমা তো আমার পিতার চেয়ে অধিক মর্যাদাশালী ছিলেন না। আর সে-ও আমার চেয়ে মর্যাদার দিক দিয়ে অগ্রগামী নয়। হজরত ওমর বললেন, আবু সালমার পুত্র বারার কারণে তাকে দুই হাজার দিয়েছি। আর অধিক এক হাজার দিয়েছি তার মা উম্মে সালমার কারণে। তোমার মা যদি তাঁর মায়ের মতো মর্যাদাশালিনী হতেন, তবে তোমাকেও এক হাজার বেশী দিতাম। অবশিষ্ট সবাইকে তিনি দিলেন আটশ' করে। হজরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ্‌র ভাই যখন এলেন তখন তাঁকেও দিলেন আটশ'। কিন্তু হজরত নজর ইবনে আনাস যখন সামনে এলেন, তখন বললেন, একে দাও দুই হাজার। কেননা উহুদ যুদ্ধে তাঁর পিতা যেরূপ তৎপরতা প্রদর্শন করেছিলেন, অন্যেরা তেমন পারেননি। যুদ্ধ শেষে তিনি বলেছিলেন, রসুল স. এর কী অবস্থা? আমি বলেছিলাম, মনে হয় তাঁকে শহীদ করা হয়েছে। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি

তরবারী উত্তোলন করে বলেছিলেন, রসুল স. শহীদ হয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ্ তো জীবিত। তিনিতো চিরঞ্জীব। একথা বলেই তিনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে একসময় পান করলেন শাহাদাতের পানপাত্র। আর নজর তখন ছোট, সে বকরী চরাচ্ছিলো অমুক অমুক স্থানে। হজরত ওমর তাঁর শাসনামলে এভাবেই বণ্টন করতেন যুদ্ধজয়ের সম্পদ।

ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন, আমার কাছে আবু জাফরের মাধ্যমে আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর যখন যুদ্ধজয়ের সম্পদ বন্টন করতে শুরু করলেন, তখন সিদ্ধান্ত চলে গেলো অনেকের বিরুদ্ধে। কেউ কেউ বলতে শুরু করলেন, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! আপনি প্রথমে আপনার নিজের অংশ নির্ধারণ করুন। তিনি বললেন, না, তা হয় না। এই বলে তিনি সম্পদ বণ্টন শুরু করলেন রসুল স. এর সর্বাপেক্ষা নিকট-স্বজন থেকে। প্রথমে হজরত ইবনে আব্বাস, তারপর হজরত আলী এভাবে পাঁচ মূল গোত্র পর্যন্ত ক্রমানুসারে পৌঁছে গেলেন আদী ইবনে কা'ব পর্যন্ত। ইমাম আবু ইউসুফ আরো লিখেছেন, আমাদের কাছে মুখলিদ ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেছেন শা'বীর একটি বিবরণ। আর শা'বী তা এমন এক লোক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যিনি পেয়েছিলেন হজরত ওমরের শাসনামল। বিবরণটি এই— যখন পারস্য ও রোম বিজিত হলো এবং অনবরত আসতে লাগলো প্রচুর বিত্তবৈভব, তখন হজরত ওমর কতিপয় সাহাবীকে একত্র করে বললেন, এ সকল বিত্ত-অর্থ বণ্টনের ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কী? আমার তো ইচ্ছা বাৎসরিক ভিত্তিতে সকলের ভাতা নির্ধারণ করে দেই। সারা বৎসর ধরে ভাণ্ডারে বিত্ত অর্থ জমা হতে থাকুক। এতে মনে হয় খুব বরকত হবে। সাহাবীগণ বললেন, আপনি যা ভালো মনে করেন, তা-ই করুন। ইনশাআল্লাহ্ আপনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সামর্থ্য প্রাপ্ত হবেন। এরপর থেকে তিনি প্রচলন করলেন বাৎসরিক ভাতা। বললেন, শুরুটা তাহলে কীভাবে করি? তাঁরা বললেন,

আপনার নিজের থেকেই শুরু করুন। তিনি বললেন, না, তা হয় না। বরং আমি শুরু করবো বনী হাশেম থেকে, যাঁরা রসুল স. এর নিকটজন। এভাবে হাশেমীবংশের যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করলেন পাঁচ হাজার । এমনকি বনী হাশেমের মুক্তকৃত ক্রীতদাসদের জন্যও নির্ধারণ করলেন পাঁচ হাজার, তারা আরব হোক, অথবা হোক অনারব। হজরত ইবনে আব্বাসের জন্য নির্ধারণ করলেন বারো হাজার। বনী উমাইয়াদের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদেরকে দিলেন অগ্রাধিকার। বনী হাশেমের সঙ্গে যাঁরা আত্মীয়তা সূত্রে গ্রথিত ছিলেন তাঁদের জন্য নির্ধারণ করলেন পাঁচ হাজার। আনসারদের জন্য চার হাজার। তাঁদের মধ্যে মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমার ভাতা নির্ধারণ করা হলো সর্বাগ্রে। উম্মত-মাতাগণের প্রত্যেককে দেওয়া হলো দশ হাজার করে। কেবল মাতা আয়েশাকে দেওয়া হলো বারো হাজার। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের জন্য চার হাজার করে এবং আমর ইবনে আবু সালমাকে দেওয়া হলো চার হাজার। তাঁকে এরকম প্রাধান্য দেওয়া হলো হজরত উম্মে সালমার পুত্র হওয়ার কারণে। তখন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ বললেন, আপনি তাঁকে আমার উপরে প্রাধান্য দিলেন কী কারণে। এর উত্তর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত হাসান ও হজরত হোসাইন যেহেতু রসুল স. এর প্রিয়তম দৌহিত্র ছিলেন, তাই তাঁদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করলেন পাঁচ হাজার করে। এর পর আরবী ও আজমী মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করলেন তিনশ এবং চারশ করে। মুহাজির ও আনসারগণের স্ত্রীদের প্রত্যেককে দিলেন ছয়শ', চারশ', তিনশ' ও দুশ' করে। কিছুসংখ্যক মুহাজিরের জন্য ভাতা নির্ণয় করা হলো জনপ্রতি দু'হাজার করে। তখন বরকীল বললেন, আমার জমি আমার কাছে রেখে দেওয়া হোক। আমি তার খাজনা সেভাবেই পরিশোধ করবো, যেভাবে পরিশোধ করতাম আগে। হজরত ওমর তাঁর আবেদন গ্রহণ করলেন।

ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন, আমার কাছে আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফের উদ্ধৃতি দিয়ে মোহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আলকামা বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, হজরত ওমর মুহাজিরগণের জন্য জনপ্রতি পাঁচ হাজার, আনসারগণের জন্য তিন হাজার এবং উম্মত-মাতৃগণের প্রত্যেকের জন্য বারো হাজার নির্ধারণ করলেন। মাতা মহোদয়া জয়নাব বিনতে জাহাশের ভাতা যখন তাঁর কাছে পৌঁছানো হলো, তখন তিনি বললেন, আমিরুল মুমিনীনকে আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, এরকম বণ্টন তো আমার সঙ্গিনীগণই (অন্যান্য উম্মত-মাতাগণই) ভালো করে করতে পারতেন (তিনি মনে করেছিলেন এ বারো হাজার তাঁকে দেওয়া হয়েছে তাঁর সপত্মীগণের মধ্যে বণ্টনের জন্য)। যিনি ওই অর্থ নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি তখন বললেন, না, এগুলো আপনাকে বণ্টন করতে বলা হয়নি। এগুলো সবই আপনার। মাতা জয়নাব তখন মুদ্রাগুলো একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর তাঁর সামনে উপবিষ্টা একজনকে বললেন, তুমি

কাপড়ের ভিতরে হাত দিয়ে যা আসে, তা অন্যান্য মহিলাগণের মধ্যে বণ্টন করে দিতে থাকো। উপবিষ্টা রমণী তাই করে যেতে লাগলেন। একসময় বললেন, সম্ভবত আপনি আমার কথা ভুলেই গিয়েছেন। অথচ আপনার উপর আমার অধিকার বেশী। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তাহলে কাপড়ের ভিতরে যা আছে, তার সবটুকু তুমিই নিয়ে নাও। রমণীটি কাপড় উঠিয়ে দেখলেন, অবশিষ্ট রয়েছে পঁচাশিটি মুদ্রা। এরপর মাতা জয়নাব হাত তুলে দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্! এরপর থেকে আমাকে

যেনো আর কখনো ওমরের দান গ্রহণ করতে না হয়। তা-ই হলো। উম্মত-মাতৃকুলের মধ্যে তিনিই প্রথম পরলোকগমন করলেন এবং মিলিত হলেন তাঁর প্রিয়তম রসুলের সঙ্গে। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক দানশীলা।

হজরত ওমর আনসারগণের মধ্যে অর্থবণ্টনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন হজরত জায়েদ ইবনে সাবেতকে। তিনি বণ্টন শুরু করতেন মদীনার আওয়ালীর বাসিন্দাদের দিক থেকে। সর্বপ্রথম দিতেন আবু হাশবাল গোত্রকে। তারপর আউস গোত্রকে। কেননা তাদের বসতবাটি অবস্থিত ছিলো দূরে। এরপর দিতেন খাজরাজ গোত্রকে। সর্বশেষে গ্রহণ করতেন নিজে। তাঁর গোত্রের নাম ছিলো নাজ্জার গোত্র। তাঁরা বসবাস করতেন মসজিদে নববীর কাছাকাছি।

ইমাম আবু ইউসুফ আরো লিখেছেন, ইসমাঈল ইবনে সায়েব ইবনে ইয়াজিদের বরাত দিয়ে আমার কাছে মদীনার জনৈক জ্ঞানবৃদ্ধ বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল তাঁর পিতা থেকে বলেন, হজরত ওমর তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, সেই আল্লাহ্র শপথ! এ সম্পদের উপরে সকলের অধিকার স্বীকৃত। তৎসত্ত্বেও আমি কাউকে দান করি, আবার কাউকে দান করিও না। মামলুক গোলাম ছাড়া অন্য কারো অধিকার এক্ষেত্রে অধিক নেই। আমিও তোমাদের মধ্যে একজন। তবে কিতাবুল্লাহ্র দৃষ্টিতে বিভিন্ন জনের মর্যাদা বিভিন্ন রকম। কেউ ইসলামসম্মত উত্তরাধিকারী। কেউ ধর্মপরায়ণতায় অগ্রগামী। কেউ ধনী, কেউ নির্ধন। আল্লাহ্র শপথ! আমি যতোদিন জীবিত থাকবো, ততোদিন এ সম্পদের অংশ আমি পৌঁছাতে থাকবো সাফা পর্বতের পশুচারকের কাছেও। এই অংশ লাভ করার জন্য কাউকে তার চেহারা লোহিতাভ করতে হবে না।

হুমাইর গোত্রের বণ্টনতালিকা ছিলো ভিন্নতর। হজরত ওমর তাদের প্রধান সেনাপতির ভাতা নির্ধারণ করতেন নয়, আট, অথবা সাত হাজারের মধ্যে, যাতে করে তাদের খাওয়া পরার অসুবিধা না হয়। নবজাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তাদের জন্যও ভাতা নির্ধারণ করা হতো । বয়স বাড়ার পর তাদের প্রত্যেকের ভাতা দুই হাজার পর্যন্ত পৌঁছতো। অধিক বয়স হলে আরও বৃদ্ধি করা হতো। এভাবে হজরত ওমর যখন দেখলেন সম্পদ আরো অধিক হারে জমা হচ্ছে, তখন তিনি বললেন, আগামী বৎসর এ সময় পর্যন্ত যদি আমি জীবিত থাকি, তবে পশ্চাৎবর্তী দলকে তাদের সন্তান-সন্ততির সঙ্গে মিলিয়ে দিবো, যাতে করে বাৎসরিক ভাতার ব্যাপারে সকলের মধ্যে সমতা এসে যায়। কিন্তু পরবর্তী বৎসর পর্যন্ত তিনি আর বেঁচে থাকেননি। তার আগেই পরিত্যাগ করেন এ নশ্বর ধরাধাম।

তাফসীরে মাযহারী/৪২১

মাসআলা ঃ লড়াই ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রায়ত্তে যে সম্পদ এসে যায়, তা আট প্রকারের—১. জিযিয়া ২. ব্যবসায়িক করের এক দশমাংশ ৩. বিধর্মীরা ভয় পেয়ে যে সম্পদ ত্যাগ করে চলে যায় ৪. বিধর্মীদের কল্যাণার্থে যে সম্পদ তারা মুসলমানদেরকে দান করে ৫. জমির খাজনা ৬. ধর্মত্যাগীর মাল, যাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, অথবা যে মারা গিয়েছে ৭. উত্তরাধিকারীহীন মৃত জিম্মির সম্পদ এবং ৮. বনী তাগলীবের জাকাতের মাল। এখন কথা হচ্ছে, বর্ণিত আট প্রকারের সম্পদের এক পঞ্চমাংশ (খুমুস) আদায় করতে হবে কিনা। এই বিধানটির বিষয়ে ইমামগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক বলেন, এগুলোর এক পঞ্চমাংশ আদায় করতে হবে না। বরং তা ব্যয় করতে হবে মুসলমানদের সামাজিক কল্যাণে। যেমন রাষ্ট্রের সীমানা সংরক্ষণ, সীমানা_প্রতিষ্ঠা, সেতু নির্মাণ, বিচারক, অর্থ-সচিব, কর্মচারী, প্রশাসক ও প্রশাসনিক কর্মচারীদের বেতন প্রদান, সাধ্যানুপাতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য ভাতা নির্ধারণ, সেনাবাহিনী ও তাদের সাংসারিক প্রয়োজন নির্বাহ করা ইত্যাদি কাজে। ইমাম আহমদের সুদৃঢ় অভিমতও এরকম। 'তাজনীস' গ্রন্থে রয়েছে, শিক্ষক ও ছাত্রদের ভাতাও এ সম্পদ থেকে নির্ধারণ করতে হবে। সমস্ত ছাত্রই এ বিধানের আওতাভূত। ইমাম শাফেয়ী প্রথম দিকে বলতেন, এক পঞ্চমাংশ বের করতে হবে কেবল ভয়ে পালিয়ে যাওয়া বিধর্মীদের সম্পদ থেকে। অন্যান্য খাত থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করা যাবে না। পরে তিনি বলতেন, সকল খাত থেকেই এক পঞ্চমাংশ বের করতে হবে। এরপর ওই এক পঞ্চমাংশ ভাগ করতে হবে পাঁচভাগে। ওই পাঁচভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ সমস্ত সম্পদের পঁচিশভাগের এক ভাগ দিতে হবে বনী হাশেম ও বনী আবদুল মুত্তালিবকে। এক্ষেত্রে ধনী-নির্ধনের কোনো ভেদাভেদ নেই। তবে হ্যাঁ, পুরুষেরা পাবে নারীদের দ্বিগুণ। দ্বিতীয় ভাগ দিতে হবে পিতৃহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাকে। ইমাম শাফেয়ীর প্রসিদ্ধ মতানুসারে ওই এতিম কেবল অংশ পাবে যারা অভাবগ্রস্ত। তৃতীয় অংশ পাবে অভাবগ্রস্ত বা মিসকিনেরা। চতুর্থ ভাগ পাবে পথচারীরা। ইমাম শাফেয়ী বলেন, এই চার শ্রেণীর লোককে অবশ্যই তাদের প্রাপ্য দিতে হবে। এক বর্ণনায় এরকমও এসেছে যে, সকলকেই সম্পদ দেওয়া জরুরী নয়। বরং এদের মধ্যে যারা বর্ণিত অবস্থাধারী, দিতে হবে কেবল তাদেরকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পঞ্চম অংশটি দিতে হবে কাকে? এর উত্তরে বলতে হয়, শেষ পঞ্চমাংশ ব্যয় করতে হবে বৃহৎ প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের ব্যাপক কল্যাণ সাধনার্থে। যেমন রাষ্ট্রের সীমানা সংরক্ষণ ও সুদৃঢ়করণ, বিচারকর্তাদের বেতন, আলেম সম্প্রদায়ের ভাতা ইত্যাদি। এর মধ্যেও প্রয়োজন ও অবস্থাভেদে যে সকল ক্ষেত্র অধিক গুরুত্বপূর্ণ, ব্যয় করতে সে সকল ক্ষেত্রে।

অবশিষ্ট রইলো চার ভাগ, বা সমস্ত সম্পদের পঁচিশ ভাগের বিশভাগ। এ সম্পর্কে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, ওই বিশ ভাগ ব্যয় করতে হবে তাদের জন্য, যাদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান অত্যাবশ্যক। যেমন যোদ্ধৃবৃন্দ, যাদেরকে প্রস্তুত রাখা হয় প্রধানতঃ যুদ্ধের জন্য। তাদের নামের তালিকা প্রণয়ন ও তা

www.eelm.weebly.com

সংরক্ষণ জরুরী। ওই তালিকা অনুসারে প্রয়োজন মতো অর্থ সরবরাহ করতে হবে তাদেরকে। ওই তালিকায় সর্বপ্রথমে লিপিবদ্ধ করতে হবে কুরায়েশ যোদ্ধাদের নাম। আর কুরায়েশদের মধ্যে অগ্রাধিকার দিতে হবে হাশেমী গোত্র ও আবদুল মুত্তালিব গোত্রোদ্ভূতদেরকে। এরপর নাম আসবে আবদে শামস, নওফেল ও আবদুল উজ্জা গোত্রোদ্ভূতদের। তারপর আসবে কুরায়েশদের অন্যান্য শাখা গোত্রোদ্ভূতরা। আর এমতোক্ষেত্রেও অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হবে রসুল স. এর অধিক নৈকট্যভাজনেরা। এরপর আনসার সম্প্রদায়। তারপর অন্যান্য আরব ও অনারব। ওই তালিকার বাইরে রাখতে হবে অন্ধ, অক্ষম ও বিকলাঙ্গদেরকে, যারা যুদ্ধ করতে অসমর্থ। এভাবে চার অংশের প্রত্যেক অংশ পাঁচভাগে ভাগ করে দেওয়ার পরেও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তা বণ্টন করতে হবে পরিশ্রম ও দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে। তবে এরকম উদ্বৃত্ত অর্থ সমরাস্ত্র ক্রয় এবং সীমানা সুদৃঢ়করণের কাজে ব্যয় করাই সমীচীন ।

উপরে বর্ণিত বণ্টনপদ্ধতি প্রযোজ্য হবে কেবল অস্থাবর সম্পত্তির বেলায়। জমি ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির বণ্টনপদ্ধতি ভিন্নতর। এব্যাপারে সঠিক নিয়ম হচ্ছে, স্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করে দিতে হবে এবং তা থেকে উপার্জিত অর্থ বণ্টন করতে হবে অস্থাবর সম্পত্তি বণ্টনের নিয়মে। এরকম বলা হয়েছে 'মিনহাজ' গ্রন্থে। আর এ ব্যাপারে জমহুর ইমামগণের অভিমতের সমর্থন মিলে মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহীর 'সাবিলুর রাশাদ' গ্রন্থে। তিনি বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর সুমহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে হজরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত পুরুষ! আপনি কি এই সম্পদ পাঁচ ভাগে ভাগ করবেন না? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ যে সম্পদকে বিশ্বাসবানদের মধ্যে বণ্টন করা থেকে পৃথক রেখেছেন, আমি তো তাকে বণ্টন করতে পারি না। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ী জিযিয়ার যে সম্পদকে পাঁচভাগে ভাগ করতে বলেছেন, তার বিরুদ্ধে রয়েছে জ্ঞানীগণের ঐকমত্য। ইমাম কারখী লিখেছেন, এরকম কথা কেউই বলেননি। ইমাম শাফেয়ীর পূর্বেও কেউ এমতো অভিমতের প্রবক্তা ছিলেন না। তেমনি তাঁর সময়ে এবং তাঁর জামানার পরেও কারো কণ্ঠে এরকম কথা উচ্চারিত হয়নি। অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ীই কেবল এরকম সম্পত্তিকে গণিমতের মালের সঙ্গে তুল্যমূল্য বলে ভেবেছেন। ইবনে হুম্মাম আরো লিখেছেন, এমন কোনো বিবরণই নেই যে, রসুল স. হাজার নামক স্থানের অগ্নি উপাসক, নাজরানের খৃষ্টান ও ইয়েমেনবাসীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত জিযিয়া এক পঞ্চমাংশের নিয়মে ভাগ করেছিলেন। তিনি স. এরকম করলে অবশ্যই তার সংবাদ পরবর্তীদের কাছে পৌঁছতো। একটি শিথিল সূত্রপরম্পরায় আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাঁর আঞ্চলিক প্রশাসকদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে খলিফা হজরত ওমরের নির্দেশনাকেই গ্রহণ করতে হবে ন্যায় বিচারের ভিত্তিরূপে এবং সকল ক্ষেত্রে চলতে হবে রসুলেপাক স. এর আদর্শানুসারে। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

সূরা হাশর ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

www.eelm.weebly.com

❑ তুমি কি মুনাফিকদিগকে দেখ নাই? উহারা কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে উহাদের সেই সব সংগীকে বলে, 'তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সংগে দেশত্যাগী হইব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনও কাহারও কথা মানিব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদিগকে সাহায্য করিব।' কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

❑ বস্তুত উহারা বহিষ্কৃত হইলে মুনাফিকগণ তাহাদের সহিত দেশত্যাগ করিবে না এবং উহারা আক্রান্ত হইলে ইহারা উহাদিগকে সাহায্য করিবে না এবং ইহারা সাহায্য করিতে আসিলেও অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে; অতঃপর তাহারা কোন সাহায্যই পাইবে না।

❑ প্রকৃতপক্ষে ইহাদের অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা তোমাদের ভয়ই অধিকতর। ইহা এইজন্য যে, ইহারা এক অবুঝ সম্প্রদায়।

❑ ইহারা সকলে সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না, কিন্তু কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া; পরস্পরের মধ্যে উহাদের যুদ্ধ প্রচণ্ড। তুমি মনে কর উহারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু উহাদের মনের মিল নাই; ইহা এইজন্য যে, ইহারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

❑ ইহারা সেই লোকদের মত, যাহারা ইহাদের অব্যবহিত পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করিয়াছে, ইহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

❑ ইহারা শয়তানের মত, সে মানুষকে বলে, 'কুফরী কর'; অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন সে বলে, 'তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই, আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি।'

❑ ফলে উভয়ের পরিণাম হইবে জাহান্নাম। সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহাই যালিমদের কর্মফল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, মুনাফিকেরা কতো জঘন্য চরিত্রের। তাদের অগ্রণী আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল ও তার বশংবদেরা ইহুদীদেরকে অপসান্ত্বনা দিয়ে বলে, তোমরা চিন্তিত হয়ো না। আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করবো। তোমাদের

www.eelm.weebly.com

বিরুদ্ধে মোহাম্মদ ও তাঁর সাথীরা কিছু বললে, আমরা সেকথা কানেই তুলবো না। আর তারা যদি তোমাদেরকে আক্রমণ করে, তবে আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পক্ষ হয়ে লড়াই করবো। কিন্তু হে আমার বার্তাবাহক! আপনি ওই সকল অপকথনের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না। কারণ, আমি বলছি, তারা মিথ্যাবাদী।

এখানে 'মুনাফিকদেরকে' অর্থ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গ। 'তাদের সেই সব সঙ্গীকে' অর্থ কুফরী সূত্রে যারা তাদের ঘনিষ্ঠজনে পরিণত হয়েছে, তাদেরকে। 'কিতাবীদের মধ্যে' অর্থ নাজীর ও কুরায়জা গোত্রের ইহুদীদের মধ্যে। আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল দূত মারফত নাজীর গোত্রের ইহুদীদেরকে বলে পাঠিয়েছিলো, তোমরা মদীনা ছেড়ে চলে যেয়ো না। তোমাদের জন্য আমার দু'হাজার লোক প্রস্তুত। তারা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্গে অবস্থান করবে। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, সুদ্দী বলেছেন, কুরায়জা গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়েছিলো। তারা ছিলো মুনাফিক । এখানে মুনাফিক বলা হয়েছে তাদেরকেই। এমতাবস্থায় এখানকার 'সঙ্গীকে' অর্থ হবে বংশীয় ভ্রাতাদেরকে। এরাই নাজীর গোত্রের লোকদেরকে মদীনা ছেড়ে চলে যেতে নিষেধ করেছিলো। মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলো, তোমাদের হয়ে আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো, প্রয়োজনবোধে তোমাদের সঙ্গেই করবো দেশত্যাগ।

'আমরা তোমাদের ব্যাপারে কারো কথা মানবো না' অর্থ মুসলমানদের নেতা-জনতা কারো কথাই মানবো না আমরা। তারা যদি আমাদেরকে তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করে, তবুও সেকথা আমরা কিছুতেই কানে তুলবো না।

'যদি তোমরা আক্রান্ত হও' অর্থ যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায়। আর 'আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো' অর্থ আমরা তখন তোমাদের পক্ষ হয়ে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'বস্তুত তারা বহিষ্কৃত হলে মুনাফিকেরা তাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করবে না এবং তারা আক্রান্ত হলে এরা তাদেরকে সাহায্য করবে না এবং এরা সাহায্য করতে এলেও অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে; অতঃপর তারা কোনো সাহায্যই পাবে না'। একথার অর্থ— মুনাফিকেরা ইহুদীদেরকে যে আশ্বাসের বাণী শোনাচ্ছে, তার সবকিছুই মিথ্যা। ইহুদীরা আক্রান্ত হলে মুনাফিকেরা সাহায্য করতে আসবে না। এলেও অবস্থা বেগতিক দেখে পালিয়ে যাবে। শেষে ইহুদীরা হয়ে যাবে নিরুপায়। বলাবাহুল্য, সেরকমই হয়েছিলো। নাজীর গোত্রকে যখন মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো, তখন মুনাফিক শ্রেষ্ঠ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুলের দল ও কুরায়জা গোত্রের মুনাফিকেরা তাদের পক্ষে টু শব্দটিও করেনি। এরপর যখন কুরায়জা গোত্রের ইহুদীদেরকে নিধন করা হলো, তখনও মুনাফিকেরা রয়ে গেলো সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। এখানে 'সাহায্য করতে এলেও' অর্থ সাহায্য করার আকাংখা করলেও। আর এখানকার 'ছুমমা লা ইয়ানসুরূন' অর্থ অতঃপর তারা কোনো সাহায্যই পাবে না। অর্থাৎ ইহুদীরা শেষ পর্যন্ত রয়ে যাবে সহায়হীন। ফলে তারা কৃতকার্য হতে পারবে না। অথবা মুনাফিকেরা তাদের পরিকল্পনা সফল করতে পারবে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'প্রকৃতপক্ষে এদের অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা তোমাদের ভয়ই অধিকতর। এটা এজন্য যে, এরা এক অবুঝ সম্প্রদায় (১৩)। এরা সকলে সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না। কিন্তু কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গ প্রাচীরের অন্তরালে থেকে; পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ প্রচণ্ড। তুমি মনে করো তারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু তাদের মনের মিল নেই; এটা এজন্য যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়' (১৪)।

এখানে 'লা আনতুম আশাদ্দু রহবাতান ফী সুদূরিহিম মিনাল্লহ' অর্থ প্রকৃতপক্ষে এদের অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা তোমাদের (মুসলমানদের) ভয়ই অধিকতর। তাই তারা তোমাদের ভয়ে বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে ইমানদার বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে রয়ে যায় অবিশ্বাসী। অথচ যে আল্লাহ্ প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই জানেন, সে আল্লাহ্কে তারা মোটেও ভয় করে না। এভাবে বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে আশ্রয় করে থাকে কপটাচরণকে। 'এটা এজন্য যে, এরা এক অবুঝ সম্প্রদায়' অর্থ এই সকল লোক কপটাচরণকে আশ্রয় করে এজন্য যে, আল্লাহ্র সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিধরতার পরিচয় তারা জানে না। একথা বুঝতে পারে না যে, আল্লাহ্ই সকল মঙ্গলামঙ্গলের একক সংঘটক, তাই ভয় করা উচিত কেবল তাঁকে।

'লা ইউক্বাতিলূনাকুম জ্বামীআ' অর্থ এরা সকলে সংঘবদ্ধ হলেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করতে সমর্থ হবে না। অর্থাৎ হে বিশ্বাসবানেরা! ভালো করে জেনে নাও, অবিশ্বাসী ও কপটাচারীরা তোমাদেরকে খুবই ভয় করে, তাই তারা সকলে সংঘবদ্ধ হলেও তোমাদের সঙ্গে সম্মুখ-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে পারবে না। 'কিন্তু কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গপ্রাচীরের অন্তরালে থেকে পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ প্রচণ্ড' অর্থ তারা কিন্তু জন্মগতভাবে ভীরু নয়। তার প্রমাণ হচ্ছে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রদর্শন করে থাকে সাহসিকতা ও রণনৈপুণ্য, যখন তারা অবস্থান করে স্বআবাসে সুরক্ষিত স্থানে, অথবা আশ্রয় নেয় দুর্গপ্রাকারের আড়ালে। আর 'তুমি মনে করো তারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু তাদের মনের মিল নেই' অর্থ হে আমার

www.eelm.weebly.com

রসুল! আপনি হয়তো ভাবছেন, কাফের ও মুনাফিকেরা সকলে একতাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। তাদের নিজেদের মধ্যে রয়েছে অনেক সন্দেহ ও অবিশ্বাস। সেকারণে তারা মনের দিক দিয়ে এক নয়। আল্লাহ্ই তাদের মানসিক অবস্থাকে করেছেন বিপর্যস্ত এবং তাদের অন্তরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ভয়। তাই তাদের বড় বড় বীরও আপনার এবং আপনার সহচরবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ভয় পায়। 'ওয়া কুলূবুহুম শাত্তা' অর্থ তাদের মনের মিল নেই। আল্লাহ্ই তাদের অন্তরকে করে দিয়েছেন দ্বিধাদ্বন্দ্বকণ্টকিত। তাই কোনো সিদ্ধান্তের উপরেই তারা সুস্থির থাকতে পারে না। পার্থিব লাভের কারণে কখনো যুদ্ধ করতে চায়, আবার মুসলমানদের প্রতাপ দেখে যায় পিছিয়ে। আর 'এটা এজন্য যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়' অর্থ এদের এমতো দোদুল্যমানতার কারণ হচ্ছে, তারা অজ্ঞ, সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে অক্ষম, বিশ্বাসবিহীনতাই যে তাদের এমতো ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণ, তা তারা চিন্তাও করতে পারে না।

'এরা সেই লোকের মতো, যারা এদের অব্যবহিত পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে, এদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি'। এখানে 'এরা সেই লোকদের মতো' বলে বুঝানো হয়েছে বনী কায়নুকা জাতীয় ইহুদীদেরকে, যাদেরকে বদর যুদ্ধের পর পর মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই সকল অংশীবাদীকে, যারা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে পর্যুদস্ত হয়েছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কায়নুকা গোত্রের ইহুদীদের শাস্তিপ্রাপ্তির ঘটনাকেই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। কায়নুকা গোত্র ছিলো মান্যবর সাহাবী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামের গোত্র। তারা সন্ধিবদ্ধ ছিলো মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুলের দলের সাথে, অথবা উবায়দা ইবনে সামেত প্রমুখের সঙ্গে। কায়নুকারা ছিলো স্বর্ণকার এবং ইহুদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর। আর এখানে 'শাস্তি আস্বাদন করেছে' অর্থ রসুল স. এর সঙ্গে শত্রুতা করার কারণে তাদেরকে এই পৃথিবীতেই ভোগ করতে হয়েছে শাস্তি।

রসুল স. যখন মক্কা থেকে মদীনায় এলেন, তখন মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে এই মর্মে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হলো যে, একদল অন্য দলের শত্রুদেরকে সাহায্য

করবে না। কিন্তু বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে বনী কায়নুকা সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে ফেললো। প্রকাশ্যে হয়ে গেলো বিদ্রোহী। একদিন এক বেদুইন মুসলিম মহিলা বনী কায়নুকাদের বাজারে এক স্বর্ণকারের দোকানে অলংকার ক্রয় করতে গেলেন। বাজারের লোকেরা তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে শুরু করলো। দোকানে উপবিষ্টা ওই মহিলার পরিধেয় বসনের একপ্রান্ত স্বর্ণকারটি তার অগোচরে কাঁটা দিয়ে আটকে দিলো। চলে আসার সময় সে উঠে দাঁড়াতেই তার পরিধেয় বসন খসে পড়লো শরীর থেকে। তার অপ্রস্তুত অবস্থা দেখে সবাই শুরু করলো হাসাহাসি। এ দৃশ্য দেখে জনৈক মুসলমান উত্তেজিত হয়ে পড়লো। সে স্বর্ণকারের উপরে চড়াও হলো ও তাকে শেষ পর্যন্ত হত্যাই করে ফেললো। ইহুদীরা তখন তাকে ঘিরে ফেললো। তাদের সম্মিলিত আঘাতে সে হয়ে গেলো শহীদ। চারিদিকে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই মুসলমানেরা একজোট হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এগিয়ে এলো। শুরু হলো সংঘর্ষ। এদিকে রসুল স. দূরে থেকেও জানতে পারলেন সব। বললেন, আমি বনী কায়নুকার সন্ধিভঙ্গের আশংকা করছি। ইত্যবসরে অবতীর্ণ হলো 'যদি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে আপনি তাদের শান্তিচুক্তি ভণ্ডুল করে দিতে পারেন'। রসুল স. অভিযানের জন্য প্রস্তুত হলেন। যুদ্ধের নিশান অর্পণ করলেন হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের হাতে। মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করলেন হজরত আবু লুবাবাকে। বনী কায়নুকারা আশ্রয় নিলো তাদের দুর্গে। তিনি স. তাদের দুর্গ অবরোধ করলেন। অবরোধ চললো পনেরো দিন পর্যন্ত। অবশেষে আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করলেন। ফলে রসুল স. এর নির্দেশে দুর্গ থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো তারা। রসুল স. তাদেরকে শর্ত দিলেন, তোমাদের সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হলো। পরিবার পরিজনকে রাখা হলো তোমাদেরই অধিকারে। তিনি স. তাদের মশক বাঁধার হুকুম দিলেন। দায়িত্ব দিলেন মুনজির ইবনে কারামা সালামীকে। হজরত উবাদা ইবনে সামেত বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পরিতুষ্টিই আমার উদ্দেশ্য। আমি অবিশ্বাসীদের এরকম অঙ্গীকার থেকে দায়মুক্ত। এদৃশ্য দেখে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল বললো, মোহাম্মদ, আমার সাথীদের ব্যাপারে আমাকে অনুগ্রহ করুন। তিনি স. তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সে রসুল স. এর পরিধেয় বস্ত্রের একপ্রান্ত চেপে ধরলো পিছন থেকে। তিনি স. বললেন, ছেড়ে দাও, তোমার অমঙ্গল হবে। তাঁর পবিত্র মুখাবয়বে স্পষ্টত দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো ক্রোধ। পুনরায় বললেন, ছেড়ে দাও, তোমার অকল্যাণ হবে। সে বললো, আল্লাহ্র শপথ! আমার সহযোগীদেরকে ক্ষমা না করা পর্যন্ত আমি ছাড়বো না। তাদের লোকসংখ্যা সাতশত— তিনশত সশস্ত্র এবং নিরস্ত্র অবশিষ্ট চার শত। কাল সকালেই তো আপনি তাদেরকে কেটে ফেলবেন। আল্লাহ্র শপথ! আমি তো বিপদের আশংকা করছি। রসুল স. শেষে বললেন, ঠিক আছে, ওদেরকে ছেড়ে দাও। তাদের উপরে রয়েছে আল্লাহ্র অভিসম্পাত। রসুল স. তাদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা পরিত্যাগ

করলেন। নির্দেশ দিলেন দেশান্তরের। তিন দিন পর তারা মদীনা ছেড়ে চলে গেলো। তাদেরকে বের করার দায়িত্ব দেওয়া হলো হজরত উবাদা ইবনে সামেতের উপর। মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমা বলেছেন, মদীনা থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো ইযরাআর দিকে।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. তাদের রেখে যাওয়া অস্ত্র থেকে গ্রহণ করলেন দু'টি বর্ম, তিনটি তীর এবং তিনটি তরবারী। তাদের বাড়িঘরে পাওয়া গেলো স্বর্ণালংকার প্রস্তুত করার অনেক যন্ত্রপাতি। সেগুলোর এক পঞ্চমাংশ ও অবশিষ্ট সকল সামগ্রী তিনি বণ্টন করে দিলেন সাহাবীগণের মধ্যে। বদর যুদ্ধের সময় এভাবে তিনি স. প্রথম বণ্টন করলেন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। ঘটনাটি ঘটেছিলো হিজরতের কুড়ি মাস পর দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের পনের তারিখ শনিবারে। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল ও হজরত উবাদা ইবনে সামেত সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো সুরা মায়েদার আয়াত 'হে ইমানদারগণ! তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না ইহুদী এবং খৃষ্টানদেরকে' থেকে 'হুমুল গলিবুন' পর্যন্ত। যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

'ওয়ালাহুম আ'জাবুন আলীম' অর্থ এদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। অর্থাৎ পৃথিবীতে তো তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হলোই, আরো অধিক শাস্তি দেওয়া হবে পরকালে। আর পৃথিবীর এই শাস্তির কারণে তাদের পরকালের শাস্তি কিছুমাত্রও কমানো হবে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এরা শয়তানের মতো। সে মানুষকে বলে, কুফরী করো; অতঃপর যখন সে কুফরী করে, তখন সে বলে, তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি (১৬)। ফলে উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই জালেমদের কর্মফল' (১৭)।

এখানে 'ওরা শয়তানের মতো' অর্থ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল ও তার মতো অন্যান্য মুনাফিক, যারা ইহুদীদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলো, তারা শয়তানের মতো স্বভাববিশিষ্ট। 'সে মানুষকে বলে, কুফরী করো' অর্থ শয়তান মানুষকে এই মর্মে প্ররোচিত করে যে, আল্লাহ্‌র অবাধ্য হও। এ সম্পর্কে বাগবী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আতা'র মাধ্যমে লিখেছেন একটি চমকপ্রদ ঘটনা। ঘটনাটি এই— হজরত ঈসার আকাশারোহণ এবং রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে ছিলো এক সংসারত্যাগী সাধুপুরুষ। তার নাম ছিলো বরসীসা। সত্তর বৎসর ধরে সে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলো আল্লাহ্‌র নিরবচ্ছিন্ন উপাসনায়। কোনো মুহূর্ত ইবাদত ছাড়া কাটাতো না। ইবলিস অনেক চেষ্টা করেও তাকে এতটুকুও টলাতে পারেনি। শেষে সে তার সকল অনুগত শয়তানকে সমবেত করে বললো, এখন পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউই বরসীসাকে পথচ্যুত করতে পারলো না। শাদা বর্ণের এক শয়তান বললো, আমি তোমার উদ্দেশ্য সফল করতে পারবো। শাদা শয়তানটি সব সময় নবীগণের পিছনে লেগে থাকতো। সে একবার হজরত জিবরাইলের আকৃতি ধরে রসুল স.কেও ধোকা দিতে এসেছিলো। হজরত জিবরাইল তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন হিন্দুস্তানের দিকে।

শাদা শয়তানটি পরিধান করলো সাধুপুরুষদের পোশাক। তারপর মস্তক মুণ্ডন করে উপস্থিত হলো বরসীসার ইবাদতখানায়। কোমল কণ্ঠে ডাক দিলো বরসীসাকে। বরসীসা কোনো জবাব দিলো না। সে নামাজ ও রোজা থেকে বিরত থাকতো প্রতি দশ দিনে একদিন। শাদা শয়তান জবাব না পেয়ে বরসীসার খানকার নিম্নভূমিতে এসে মশগুল হয়ে গেলো ইবাদতে। ইবাদতবিরতিকালে বরসীসা নিচে তাকাতেই দেখলো, একজন সাধুপুরুষ ইবাদতে বিভোর। এ দৃশ্য দেখে বরসীসা সাধুপুরুষটির কথার জবাব না দেওয়ার কারণে অনুতপ্ত হলো। বললো, তুমি আমাকে ডেকেছিলে, কিন্তু আমি সাড়া দেইনি। এজন্য আমি অনুতপ্ত। এখন দয়া করে বলো, কী হেতু আগমন তোমার? শাদা শয়তান বললো, আমি আপনার সঙ্গ প্রত্যাশী। এখানে থেকে আমি আপনার সঙ্গে নিয়মিত ইবাদত করতে চাই। উপকৃত হতে চাই আপনার অগাধ জ্ঞান ও সাধনা থেকে। আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন, আমিও দোয়া করবো আপনার জন্য। বরসীসা বললো, আমি তোমার দিকে মনোযোগ দিতে পারবো না। তুমি যদি বিশ্বাসবান হও, তবে সাধারণভাবে সকল বিশ্বাসবানদের জন্য যে প্রার্থনা আমি করি, তুমি তার অংশ পাবে। একথা বলেই বরসীসা মগ্ন হয়ে গেলো তার ইবাদতে। শাদা শয়তানও শুরু করে দিলো তার ইবাদত। চল্লিশ দিন পর্যন্ত বরসীসা তার দিকে তাকালোই না। চল্লিশ দিন পর বিশ্রামগ্রহণ কালে বরসীসা দেখলো, সে তখনো ইবাদত বন্দেগীতেই বিভোর। বরসীসা বিস্মিত ও মুগ্ধ হলো। একটু পরে তাকে লক্ষ্য করে বললো, তোমার উদ্দেশ্য কী? শাদা শয়তান বললো, আমি আপনার সংসর্গপ্রার্থী। আপনার ইবাদতখানায় আমি নিয়মিত আপনার সঙ্গে ইবাদত করতে চাই। বরসীসা এবার তাকে অনুমতি দিলো। শাদা শয়তান উঠে এলো বরসীসার খানকায়। বিরতিহীনভাবে এক বৎসর ধরে ইবাদত করলো বরসীসার সঙ্গে। দু'জনেই শুরু করলো চিল্লাকাশি। চল্লিশ দিন পুরা না হলে তারা তাদের সাধনা উপাসনা থামাতো না। কখনো এদের কাটতে লাগলো দুইচল্লিশ বা দুইচিল্লা করে। বরসীসা দেখলো, শাদা শয়তানের ইবাদত-বন্দেগীর সঙ্গে তার নিজের ইবাদত-বন্দেগীর কোনো তুলনাই হয় না। শাদা শয়তানের অবস্থা দেখে সে নিজেকে ভাবতে লাগলো তুচ্ছাতিতুচ্ছ। শাদা শয়তান বললো, এবার আমাকে বিদায় দিন। কেননা আপনার মতো আর একজন সাথী আছে আমার। ভেবেছিলাম আপনি হয়তো তার চেয়ে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাধক। কিন্তু বাস্তবে তার কোনো আলামত পেলাম না। একথা শুনে বরসীসা মনঃক্ষুণ্ন হলো। শাদা শয়তান বললো, আমি কিছু দোয়া কালাম জানি। দোয়াগুলো আপনাকে শিখিয়ে দিয়ে যেতে চাই। আপনার সাধনার চেয়ে এই দোয়াগুলো উত্তম। আপনি এসকল দোয়া পাঠ করলে আল্লাহ্ দূর করে দিবেন মানুষের রোগ-ব্যাধি, বালামুসিবত এবং জ্বিন-ভূতের আসর। বরসীসা বললো, আমি এসকল বিষয় পছন্দ করি না। ইবাদত করতেই আমি বেশী ভালোবাসি। আমার

www.eelm.weebly.com

আশংকা হয়, ওগুলো করলে প্রচুর জনসমাগম ঘটবে। তখন আমার ইবাদত-বন্দেগী বিঘ্নিত হবে। শাদা শয়তান জনকল্যাণ ইত্যাদির

প্রসঙ্গ তুলে তার উপরে চাপাচাপি করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত দোয়াগুলো শিখিয়েই ছাড়লো তাকে। এর পর সে চলে গেলো ইবলিসের কাছে। বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি ওই লোককে বরবাদ করে দিয়েছি। এরপর সে এক পথচারীর সঙ্গে সাক্ষাত করে তার গলা চেপে ধরলো। ফলে লোকটি হয়ে পড়লো অসুস্থ। ফিরে এলো বাড়িতে। এরপর চিকিৎসকের রূপ ধরে তার পরিবার পরিজনের সঙ্গে দেখা করে বললো, তোমাদের গৃহকর্তার উপরে জ্বিনের আসর হয়েছে। তোমরা সম্মত হলে আমি তার চিকিৎসা করতে পারি। তারা বললো, ঠিক আছে, আপনি তার চিকিৎসা করুন। চিকিৎসকরূপী শাদা শয়তান বললো, এর উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে নারী জ্বিন। কিন্তু আমি তাকে বন্দী করার সামর্থ্য রাখি না। তবে আমি এক লোকের সন্ধান জানি, যিনি দোয়া করলে এ লোক ভালো হয়ে যাবে। তিনি ইসমে আজম জানেন। তোমরা বরং তার কাছে যাও। তারা শাদা শয়তানের পরামর্শানুযায়ী লোকটিকে নিয়ে উপস্থিত হলো বরসীসার খানকায়। সব শুনে বরসীসা দোয়া করলো। লোকটি ভালো হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। আরো অনেক লোকের কাছে সে সংবাদ পৌঁছাতে লাগলো বরসীসার। তারাও বরসীসার দোয়ায় লাভ করতে লাগলো নিরাময়।

একবার শাদা শয়তান ভর করলো বনী ইসরাইলের এক রাজকন্যার উপর। তার ছিলো তিন ভাই। পিতার মৃত্যু হলে এক ভাই হলো রাজা। শাদা শয়তান এরপর চিকিৎসকের রূপ ধরে নতুন রাজার কাছে গিয়ে বললো, আপনারা যদি চান, তবে আমি রাজকন্যার চিকিৎসা করতে পারি। রাজা ও তার সভাসদেরা বললো, করুন। সে রাজকন্যাকে দেখে বললো, এক খবিস জ্বিন ভর করেছে এর উপর। আমি তাকে তাড়াতে পারবো না। তবে এক সাধুপুরুষের কথা আমি জানি। তার কাছে গেলে আপনাদের উদ্দেশ্য পূরণ হবে। তিনি সকলের কাছে শ্রদ্ধাভাজন। সুতরাং তার প্রতি আপনাদেরও শ্রদ্ধা থাকা উচিত। রাজা বললো, কী নাম তার? শাদা শয়তান বললো, বরসীসা। রাজা বললো, তিনি তো অত্যন্ত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাধক। তিনি কি আমাদের কথা শুনবেন? শয়তান বললো, তার খানকা বরাবর আপনারা একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করুন, যেনো দৃষ্টি ফেরালেই তিনি তা দেখতে পান। তখন আপনারা আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন। তিনি যদি আপনাদের প্রস্তাবে সম্মত হন তো ভালোই, যদি না হন, তবে আপনারা রাজকন্যাকে রেখে চলে আসবেন। আসার সময় বলবেন, আমরা এ আমানত রাখলাম আপনার পুণ্যদৃষ্টি আকর্ষণের আশায়। এরপর তারা শয়তানের কথামতো যথাস্থানে নির্মাণ করলো ইবাদতখানা। তারপর সেখানে অবস্থান গ্রহণ করলো। বরসীসা তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই তারা তাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলো। বললো, এর জন্য চাই আপনার নেক দৃষ্টি। আমানত হিসেবে একে আমরা এখানেই রেখে গেলাম। এই বলে তারা অপ্রকৃতিস্থা রাজকুমারীকে সেখানে রেখে চলে এলো। বরসীসা পড়লো বিপদে। ইবাদত থেকে একটু অবসর হলেই তার দৃষ্টি পড়ে রাজকুমারীর উপর। হৃদয় চঞ্চল হয়। শাদা শয়তান বার বার রাজকুমারীর উপরে

ভর করে। কষ্ট পায় সে। তার কষ্ট দেখে বরসীসাও কষ্ট পায়। অগত্যা তাকে পড়তে হয় শাদা শয়তানের শেখানো দোয়া। শয়তানও রাজকুমারীকে মুক্ত করে দেয়। সুস্থ রাজকুমারীকে দেখে বরসীসা খুশী হলো খুব। নিশ্চিন্ত মনে সে শুরু করলো তার ইবাদত। ইত্যবসরে শাদা শয়তান আবার ভর করলো রাজকুমারীর উপর। এবার রাজকুমারী হয়ে গেলো প্রায় বেহুঁশ। নিজের অজান্তে খুলে ফেললো শরীরের বসন। ইবাদত থেকে বরসীসা যখন কিছুটা অবসর পেলো, তখন শাদা শয়তান আবির্ভূত হয়ে বললো, রাজকুমারীর চিকিৎসা করুন। তার কাছে গিয়ে বসুন। তাকে সম্ভোগ না করলে সে ভালো হবে না। আপনি তার কল্যাণ চান। আপনার উদ্দেশ্য তো ভালো। সুতরাং এরকম করলে পাপ হবে না। যদি পাপ হয়ও, তবে তওবা করে নিবেন। আল্লাহ্ নিশ্চয় আপনাকে ক্ষমা করবেন। কেননা তিনি গফুরুর রহীম। বরসীসা তখন রাজকুমারীর রূপে মুগ্ধ। নিজেকে আর সামলাতে পারলো না সে। মিলিত হলো প্রায় বেহুঁশ রাজকুমারীর সঙ্গে। এরপর থেকে চলতে লাগলো একই পাপের পুনরাবৃত্তি। এক সময় রাজকুমারী হয়ে গেলো সন্তানসম্ভবা। শাদা শয়তান আবির্ভূত হয়ে বললো, আরে বরসীসা! এবার তো আপনার অপদস্থ হওয়ার পালা। বাঁচতে যদি চান, তবে শীগগির রাজকুমারীকে হত্যা করে ফেলুন। তারপর মাটিতে তাকে চাপা দিয়ে রেখে সাধু সেজে বসে থাকুন। নিমগ্ন হয়ে যান ইবাদতে। তার ভাইয়েরা এলে বলবেন, জ্বিনেরা তাকে নিয়ে গিয়েছে। আমি তখন ইবাদতে মশগুল ছিলাম। বরসীসা দেখলো, উপায় নেই। বাধ্য হয়ে রাজকুমারীকে খুন করলো সে। এরপর পাহাড়ের পাদদেশে তাকে মাটি চাপা দিয়ে রাখলো ভালো করে। শয়তান তার পরিধেয় বসনের একপ্রান্ত টেনে নিয়ে এলো কবরের বাইরে। ফলে মাটি চাপা দেওয়ার পরেও তা দেখা যেতে লাগলো বাইরে থেকে।

বরসীসা তার খানকায় ফিরে এসে আবার আগের মতো শুরু করে দিলো নিরবচ্ছিন্ন উপাসনা। কিছু দিন পর বোনের খোঁজ নিতে এলো তার ভাইয়েরা। বরসীসাকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার! বোনকে দেখছি না কেনো? বরসীসা বললো, শক্তিশালী শয়তানেরা তাকে এখান থেকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। আমি তাদেরকে বাধা দিতে পারিনি। ভাইয়েরা তার কথা বিশ্বাস

করলো। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো সেখান থেকে। রাতে এক স্থানে ঘুমন্ত অবস্থায় তার বড় ভাইকে শয়তান জানিয়ে দিলো প্রকৃত ঘটনা। ঘুম ভাঙতেই রাজকুমারীর ভাই ভাবতে লাগলো, না এরকম স্বপ্ন কখনো সত্য হতে পারে না। বরসীসার মতো সাধুপুরুষ এরকম কাজ করতেই পারেন না। বরসীসার উপরে ছিলো তার অগাধ বিশ্বাস। তাই পর পর তিন রাত স্বপ্ন দেখিয়েও শয়তান তার বিশ্বাসে চিড় ধরাতে পারলো না। শয়তান এবার স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলো মেঝো ভাইকে। সে-ও স্বপ্ন টপ্পকে পাত্তা দিলো না। এরপর শয়তান স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলো ছোট ভাইকে। সে তখন তার বড় ভাইদেরকে খুলে বললো তার স্বপ্নের বৃত্তান্ত। এবার তারা চিন্তিত হয়ে পড়লো। ফিরে গিয়ে বরসীসাকে বললো, সত্যি করে বলুন তো, কী

হয়েছে আমাদের বোনের। বরসীসা বললো, সে কথা তো আমি আগেই বলে দিয়েছি। মনে হচ্ছে তোমরা আমাকে অপবাদ দিতে চাও। ভ্রাতৃদ্বয় লজ্জিত হলো। চলে এলো সেখান থেকে। শয়তান আবার স্বপ্ন দেখালো তাদেরকে। স্বপ্নেই বললো, গিয়ে দ্যাখো, তোমাদের আদরের বোনকে দাফন করা হয়েছে অমুক পাহাড়ের পাদদেশে। এখনও বাইরে রয়ে গিয়েছে তার বসনের প্রান্তদেশ। স্বপ্নে পাওয়া ঠিকানায় তারা উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলো পাহাড়ী উপত্যকা'র এক স্থানে মাটির উপরে বেরিয়ে রয়েছে রাজকন্যার পরিধেয় বসনের একপ্রান্ত। ক্ষুব্ধ হলো তারা। রাজকর্মচারীদেরকে তলব করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো বরসীসার তথাকথিত খানকা। বরসীসাকে ধরে নিয়ে এলো রাজদরবারে। শয়তান বরসীসাকে বললো, যা ঘটবার তাতো ঘটেছেই। এখন সত্যকথা বলা ছাড়া উপায় নেই। সত্য কথা বললে অভিযুক্ত হতে হবে কেবল খুনের জন্য। আর সত্য না বললে একই সঙ্গে হতে হবে মিথ্যাবাদী ও খুনী। বরসীসা তাই করলো। রাজ দরবারে স্বীকার করলো তার অপরাধ। রাজ-নির্দেশ ঘোষিত হলো, একে শূলদণ্ড দেওয়া হোক। যথারীতি যখন তাকে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন শাদা শয়তান উপস্থিত হয়ে বললো, আমাকে কি চিনতে পারছো? বরসীসা বললো, না। শাদা শয়তান বললো, আমি তো ওই ব্যক্তি, যে তোমাকে দোয়া কালাম শিখিয়েছে। আমানতের খেয়ানত ও খুন করতে কি তোমার অন্তর একটুও কাঁপেনি। এতটুকুও জাগেনি আল্লাহ্র ভয়। তুমি তো মনে করতে, বনী ইসরাইলদের মধ্যে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী। এভাবে শয়তান তাকে লজ্জা দিতে লাগলো। আরো বললো, শেষে সত্য কথা বলে সৃষ্টি করলে আর এক বিড়ম্বনার। মিথ্যা বললে নিশ্চয় বেঁচে যেতে। কেননা সাক্ষী প্রমাণ তারা খুঁজে পেতো না। এখন যে অপরাধী সাব্যস্ত হলে, এতে করে তুমি তো অপমান করলে সকল সাধুপুরুষকে। এখন দরবেশদেরকে দেখলেই তোমার কথা মনে করে সকলে তাদেরকে বলবে ধোকাবাজ, ভণ্ড। বরসীসা বললো, তাই তো। কিন্তু এখন আমি কী করবো? শয়তান বললো, এখন তুমি শুধু একবার আমাকে সেজদা করো। আমি এখানকার সকল লোককে সম্মোহিত করবো। তারা তখন তোমাকে ও আমাকে দেখতে পাবে না। আমি ঠিকই তোমাকে নিয়ে চলে যেতে পারবো এখান থেকে। বরসীসা বললো, ঠিক আছে, তাই করছি আমি। তার সেজদা শেষ হলে শাদা শয়তান বললো, এবার আমার উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হলো। আমি তো তোমাকে কাফের বানাতেই চেয়েছিলাম। আজ সে আকাংখা পূর্ণ হলো আমার।

'ইননী আখাফুল্লহা রব্বাল আ'লামীন' অর্থ আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি। উল্লেখ্য, শয়তান এরকম বলে কেবল লোক দেখানোর জন্য। কেননা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্র ভয় তার নেই-ই। কোরআন ব্যাখ্যাতাগণের কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'মানুষকে বলে' কথটির অর্থ মনুষ্য জাতিকে বলে। আর 'বলে' অর্থ প্ররোচিত করে। অথবা বলে, তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এরকম কথা সে বলবে মহাবিচারের দিবসে। যেমন এক আয়াতে বলা

হয়েছে 'যখন সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবে, শয়তান বলবে— আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আর আমিও দিয়েছিলাম সত্য প্রতিশ্রুতি। আমি বিভ্রান্ত করেছি তোমাদেরকে। আর তোমাদের জন্য আমার কোন দলিল ছিলো না। শুধুমাত্র আমি তোমাদেরকে আহ্বান করেছিরাম। আর তোমরা সাড়া দিয়েছিলে আমার ডাকে। তোমরা আমাকে গালি দিয়ো না। গালি দাও তোমাদের নিজেদেরকে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা আবার বলেছেন, এখানে 'মানুষকে বলে' অর্থ আবু জেহেলকে বলে। শয়তান বদর যুদ্ধের দিবসে নজদবাসী বৃদ্ধের রূপ ধরে আবু জেহেলকে বলেছিলো 'তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি'। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'কোনো মানুষই আজ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর সুনিশ্চিত আমি তোমাদের প্রতিবেশী। এরপর সে যখন দেখলো দু'টি দলকে, তখন পিছু হটলো এবং বললো— অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট থেকে পৃথক। আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না। নিশ্চয় আমি আল্লাহ্কে ভয় করি'। এই আয়াতে 'আল্লাহ্কে ভয় করি' অর্থ এই পৃথিবীতে ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে আমি আল্লাহ্কে ভয় করি।

'ফাকানা আ'ক্বিবাতাহুমা আন্নাহুমা ফিন্নার' অর্থ ফলে উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। 'খলিদীনা ফীহা' অর্থ সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর 'ওয়া জালিকা জ্বাযাউজ্ জলিমীন' অর্থ এবং এটাই জালেমদের কর্মফল।

সূরা হাশর ঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪

---

www.eelm.weebly.com

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর; প্রত্যেকেই ভাবিয়া দেখুক আগামীকল্যের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠাইয়াছে। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।

❑ আর তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা আল্লাহ্কে ভুলিয়া গিয়াছে; ফলে আল্লাহ্ উহাদিগকে আত্মবিস্মৃত করিয়াছেন। উহারাই তো পাপাচারী।

❑ জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নহে। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।

❑ যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম তবে তুমি উহাকে আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ দেখিতে। আমি এই সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।

❑ তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

❑ তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র, মহান।

❑ তিনিই আল্লাহ্, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, তাঁহারই সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো; প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে?' এখানে 'ওয়াত্তাকুল্লহ্' অর্থ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো। 'নাফসুন' অর্থ সে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি। 'মা ক্বদ্দামাত' অর্থ কী অগ্রিম— পুণ্য, না পাপ? আর 'লিগদ' অর্থ আগামীকালের জন্য। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের জন্য। কিয়ামত দিবসকে এখানে আগামীকল্য বলার কারণ এই যে, কিয়ামত খুবই নিকটে। অথবা— পৃথিবী এক দিন এবং পরবর্তী পৃথিবী আর এক দিন। যেমন রসুল স. বলেছেন, দুনিয়া হচ্ছে একদিন, আর এ দুনিয়ায় আমরা রোজাদার।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো; তোমরা যা করো, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত'। এখানে 'তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো' কথাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে বিষয়টির অধিকতর গুরুত্ব প্রদানার্থে। অথবা প্রথমোক্ত 'ভয় করো' দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ফরজ দায়িত্বসমূহ প্রতিপালনের এবং

www.eelm.weebly.com

শেষোক্ত 'ভয় করো' অর্থ বিরত থাকো আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে। ইতোপূর্বের আয়াতসমূহে অবশ্য 'আল্লাহ্‌কে ভয় করার দ্বিতীয় অর্থটিই ফুটে উঠেছে। কেননা সেখানে শাসানো হয়েছে আল্লাহ্‌র অবাধ্যদেরকে।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছে; ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাই তো পাপাচারী'।

এখানে 'নাসুল্লহা' অর্থ আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছে। অর্থাৎ বেপরোয়াভাবে নিষিদ্ধ কর্মসমূহ করছে এবং পরিত্যাগ করে যাচ্ছে অত্যাবশ্যক দায়িত্বসমূহ। 'ফাআনসাহুম আনফুসাহুম' অর্থ তিনি তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। অর্থাৎ যারা নিশ্চিন্তে আল্লাহ্‌র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে চলেছে, আত্মকল্যাণের জন্য চেষ্টা মাত্রই করছে না, তোমরা যেনো তাদের অনুসরণ কোরো না। অথবা— কিয়ামতের ভয়াবহতা যাদেরকে অকল্যাণায়িত করবে, তোমরা তাদের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখো না। কেননা আল্লাহ্‌ই তাদেরকে আত্মকল্যাণবোধ-বিচ্যুত করেছেন। আর 'উলায়িকা হুমুল ফাসিকুন' অর্থ তারাই তো পাপাচারী। অর্থাৎ তারা পুরোপুরি অবাধ্য।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম'। একথার অর্থ— যারা আত্মকল্যাণবোধবিচ্যুত হয়ে নিজেদেরকে দোজখের উপযুক্ত করেছে এবং যারা আত্মকল্যাণবোধকে জাগ্রত রেখে আল্লাহ্‌র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞানুগত হয়ে হয়েছে বেহেশতের উপযোগী, তারা কখনো সমান্তরাল নয়। উল্লেখ্য, এই আয়াতকে দলিলরূপে গ্রহণ করে শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, কিসাসরূপে কোনো বিশ্বাসীকে অবিশ্বাসীর বদলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় না। কিন্তু তাদের এমতো সিদ্ধান্ত যথার্থ নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পরজগতের মর্যাদাগত তারতম্য। অর্থাৎ পরকালে মুমিন ও কাফের সমান মর্যাদাধারী হবে না। তখন তারা হবে বেহেশতী এবং দোজখী। সেকারণেই শেষে বলা হয়েছে 'জান্নাতবাসীরাই সফলকাম'। অতএব বুঝতে হবে, জাহান্নামের অধিবাসীরা হবে অসফল। কেননা তারা তখন জান্নাতবাসীদের সমান হতে পারবে না।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'যদি আমি এই কোরআন পর্বতের উপরে অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি তাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত, অথবা বিদীর্ণ দেখতে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! কোরআন যে মহাসত্য এবং আল্লাহ্‌র মহামর্যাদাসম্পন্ন বাণী, সে কথা অবিশ্বাসীরা বুঝেও না বোঝার ভান করছে। অথচ বোধবিশিষ্ট কঠিন পাথুরে পর্বতের উপরেও যদি কোরআনের দায়িত্ব অর্পণ করা হতো, তবে সে পর্বতও হয়ে যেতো বিনয়াবনত, অথবা বিদীর্ণ, এইভয়ে যে, সে কোরআনের যথামর্যাদা রক্ষা করতে পারবে কিনা। অথবা— বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনুভূতিহীন মনে হলেও পাহাড়-পর্বত

ও অন্যান্য সৃষ্টিও বোধশক্তি রাখে। তাই তাদের উপরে কোরআন অবতীর্ণ করা হলে তারা আল্লাহ্‌র ভয়ে নিশ্চয়ই সমর্পণপ্রবণ হতো এবং চৌচির হয়ে ফেটে ভেঙে যেতো। অথচ কাফেরদের অন্তর কতো কঠিন! আল্লাহ্‌র কালাম শুনে তাদের অন্তরে এতটুকুও ভয় জাগে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি এই সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করে'। কথাটি ইঙ্গিতার্থক ও শাসনমূলক। এর অর্থ— আমি এমতো উপমা পরিবেশন করি মানুষকে সচকিত ও দায়িত্বমনস্ক করতে। উপমাটির মাধ্যমে আমি তাদেরকে একথাটিই বুঝিয়ে দিতে চাই যে, তারা যেনো কোরআন পাঠের সময় বিনম্রচিত্ত হয় এবং অন্তরে সতত জাগ্রত রাখে আল্লাহ্‌র ভয়।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু (২২)। তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র। তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তাবিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। তারা যাকে শরীক স্থির করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র, মহান (২৩)। তিনিই আল্লাহ্, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' (২৪)।

এখানে 'আলিমুল গইবি ওয়াশ শাহাদাতি' অর্থ তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। 'অদৃশ্য' ও 'দৃশ্যে'র সবিস্তার ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে সুরা জ্বিনের ২৬ সংখ্যক আয়াতের তাফসীরে। 'আলকুদ্দুস' অর্থ তিনিই পবিত্র। অর্থাৎ তিনি পবিত্র সকল প্রকার দোষত্রুটি-ক্ষয়-ক্ষতি-বিনষ্টি এবং বিবিধ অপূর্ণতা ও অসুন্দরতা থেকে। 'আস্‌সালাম' অর্থ তিনিই শান্তি। অর্থাৎ তিনি সকল প্রকার নিরাপত্তাহীনতা ও অপকৃষ্টতা থেকে চিরনিরাপদ। শব্দটি একটি মূল শব্দ। আর এখানে শব্দটি বিশেষণবাচক ও আধিক্যপ্রকাশক। 'আলমু'মিন' অর্থ তিনিই নিরাপত্তাবিধায়ক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'মু'মিন' অর্থ নিরাপত্তাপ্রদাতা কাফেরদেরকে জুলুম করা থেকে এবং ইমানদারদেরকে শাস্তি প্রদান থেকে। এমতো ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে বুঝতে হবে শব্দটি নির্গত হয়েছে 'আমান' (নিরাপত্তা) থেকে। 'আমান' হচ্ছে 'তাখ্‌ভীফ' (ভীতিপ্রদর্শন) এর বিপরীত। কোনো কোনো

www.eelm.weebly.com

বিদ্বান শব্দটির অর্থ করেছেন— প্রত্যয়নকারী। অর্থাৎ তিনি মোজেজা প্রদর্শনের মাধ্যমে তার বাণীবাহকগণকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করেন।

'আল মুহাইমিন' অর্থ তিনিই রক্ষক। আপন বান্দাদের রক্ষাকর্তা। 'হামানা' অর্থ সে রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। এরকম অর্থ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা, মুকাতিল ও সুদ্দী। অভিধানগ্রন্থে এরূপ লিপিবদ্ধ রয়েছে। 'হামানা আলা কাযা' অর্থ সে এরূপ বিষয়কে রক্ষা করেছে, হেফাজত করেছে, লক্ষ্য রেখেছে। খলিলও এরকম বলেছেন। কোনো কোনো ভাষাবিদ বলেছেন, 'মুহাইমিন' শব্দটির মূলরূপ

ছিল 'মুআইমিন'। পরে সাকিন আলিফকে রূপান্তরিত করে শব্দটিকে করা হয়েছে 'মুআইমিন'। এর পর হরকত বিশিষ্ট হামযাকে 'হা' অক্ষরে রূপান্তরিত করা হয়। এভাবে শব্দটি হয়ে যায় 'মুহাইমিন'। এই প্রক্রিয়ায় এর অর্থ দাঁড়ায় 'মু'মিন' (নিরাপত্তা দানকারী, প্রত্যয়নকারী)। ইবনে জায়েদও এরকম বলেছেন। সাইদ ইবনে মুসাইয়্যেব, জুহাক এবং ইবনে কীসান বলেছেন, 'মুহাইমিন' হচ্ছে আল্লাহ্‌র নামসমূহের মধ্যে একটি রহস্যময় নাম। এর প্রকৃত অর্থ জানেন কেবল তিনিই। পূর্ববর্তী আকাশজ গ্রন্থাবলীতেও রয়েছে এই মহান নামের উল্লেখ।

'আল জ্বাব্বার' অর্থ তিনিই প্রবল, প্রতাপান্বিত। হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। 'জ্বাবার্‌তুল্লাহ' অর্থ আমি আল্লাহ্‌র মহিমা, মহত্ব ঘোষণা করছি। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে 'আলজ্বাব্বার' হয় আল্লাহ্‌র এক বিশেষ গুণ। কোনো কোনো আরবী ভাষাবিশারদের মতে শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'আলজ্বাবার' থেকে। 'জ্বাবার' অর্থ ঠিক করা। যেমন বলা হয় 'জ্বাবারতুল আমরা' (আমি কাজটি ঠিক করে দিয়েছি) 'জ্বাবারতুল আজ্‌মা' (আমি হাড় জোড়া লাগিয়ে দিয়েছি)। আল্লাহ্‌তায়ালাও বিত্তহীনকে বিত্তশালী করে দেন এবং ভাঙ্গা বস্তুকে জোড়া লাগিয়ে দেন। তাই তাঁর নাম 'জ্বাব্বার'। হাদিস শরীফে এসেছে, তিনি ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগিয়ে দেন। মুকাতিল ও সুদ্দী বলেছেন, 'জ্বাব্বার' বলা হয় ওই সত্তাকে, যিনি স্বশক্তিতে সকলের এবং সকল কিছুর উপরে প্রবল এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন তা পূর্ণ করেন পরিপূর্ণ শক্তিমত্তার সঙ্গে। জনৈক পণ্ডিতকে একবার 'জ্বাব্বার' শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি জবাব দিলেন, 'জ্বাব্বার' তিনি, যিনি ইচ্ছে করা মাত্র স্বীয় ক্ষমতায় কার্য সুসম্পন্ন করতে সমর্থ। কেউই তাঁকে এ ব্যাপারে প্রতিহত করার যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখে না।

'আল মুতাকাব্‌বির' অর্থ তিনিই অতীব মহিমান্বিত। শব্দটি আধিক্যপ্রকাশক এবং এখানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে বাবে তাফায়্‌উ'ল নিয়মে দৃঢ়তা জ্ঞাপনার্থে, 'কিবর' বা 'কিবরিয়া' (সমূচ্চ) অর্থে। অর্থাৎ তিনি চিরসুরক্ষিত, অভাব, অক্ষমতা ও ত্রুটিময়তা থেকে। মুতাকাব্‌বির' অর্থ 'অতীব মহিমান্বিত'ও হতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, একারণেই রাজ্যশাসককে বলা হয় 'জুল কিবরিয়া'।

'সুবহানাল্লহি আ'ম্‌মা ইউশরিকূন' অর্থ তারা যাকে শরীক স্থির করে, আল্লাহ্‌ তা থেকে পবিত্র, মহান। অর্থাৎ অংশীবাদীরা আল্লাহ্‌র উপরোল্লিখিত গুণাবলীর সঙ্গে যাকে অংশীদার নির্ধারণ করে, তা থেকে তিনি চিরপবিত্র, সতত মহান।

'আল খলিক্ব' অর্থ তিনিই সৃজনকর্তা, সকল সৃষ্টবস্তুর পরিমাপপ্রদাতা। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ইয়াখলুকুকুম ফী বুত্বনি উমমাহাতিকুম খলাক্বাম মিমবা'দি খলক্ব' (তিনি তোমাদের মাতৃজঠরে তোমাদেরকে পরিগঠিত করেন এক সৃষ্টির পর আরেক সৃষ্টিরূপে)। অভিধান গ্রন্থে এসেছে, 'খলিক্ব' অর্থ পূর্বনমুনা ছাড়া কোনো কিছুকে অস্তিত্বদানকারী।

'আলবারিউ' অর্থ উদ্ভাবনকর্তা, সৃষ্টিকে পার্থক্যবিশিষ্ট পরিমিতিপ্রদাতা। আর 'আলমুসাউয়্যিরু' অর্থ রূপদাতা। বাগবী অর্থ করেছেন, সৃষ্টিকে এমন আকার

প্রদাতা, যাতে করে প্রত্যেকেই পায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যেমন, কথায় কথায় বলা হয় 'হাজিহি সূরাতুল আমরি' (এটা ওই কাজের উপমা)। আল্লাহ্‌ সৃষ্টিকে প্রথমে পরিমাপ করেছেন, তারপর অস্তিত্বের পোশাক পরিয়েছেন, এরপর দান করেছেন আকৃতি। 'সিহাহ্‌' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'তসভীর' বলা হয় কোনোকিছুর এমন চিত্রকে, যার কারণে পার্থক্যসূচিত হয় একটির সঙ্গে অপরটির। 'তসভীর' দু'রকমের— অনুভূতিজাত ও জ্ঞানগত। অর্থাৎ বাস্তবিক ও কাল্পনিক। অনুভূত বা বাস্তব আকৃতি সর্বসাধারণের দৃষ্টিগ্রাহ্য। তাই মানুষ, অশ্ব ইত্যাদিকে সকলেই চিনে নিতে পারে। আমি বলি, এমতো বাস্তব অনুভবের কারণেই জায়েদ, আমর ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যায়। আর জ্ঞানগত আকৃতিসমূহকে চিহ্নিত করতে পারে কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরা। সর্বসাধারণের জ্ঞান অতদূর পৌঁছতে সক্ষম নয়। অথচ মানুষের প্রকৃত স্বাতন্ত্র নির্ণীত হয় অভ্যন্তরীণ বিশেষত্বের কারণেই এবং বিবিধ আকৃতির কথা বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে ১. খলাক্বনাকুম ছুম্‌মা সওওয়ারনাকুম ২. সওওয়ারাকুম ফা আহ্‌সানা সুওয়ারাকুম্‌ ৩. ফী আইয়্যী সুরাতিম্‌ মা শাআ রক্‌কাবাক্‌ ৪. হুয়াল্‌ লাজী ইউসওভীরুকুম ফীল আরহামি কাইফা ইয়াশা— যথাক্রমে এগুলোর অর্থ ১. আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এরপর পরিগঠিত করেছি ২. তিনি

www.eelm.weebly.com

তোমাদেরকে রূপায়িত করেছেন উত্তমরূপে ৩. তিনি যেমন আকৃতিতে চেয়েছেন সংযোজন করেছেন ৪. তিনিই, যিনি তাঁর ইচ্ছামতো তোমাদের আকৃতিদান করেছেন মাতৃজঠরে।

রসুল স. বলেছেন, খলাক্বা আদামা আ'লা সূরাতিহী' (আল্লাহ্ আদমকে তার আকৃতিতে সৃজন করেছেন)। এ হাদিসে 'সূরাত' অর্থ ওই আকৃতি, যা বাহ্যিক চোখে দেখা যায়। আবার অন্তর্দৃষ্টি দ্বারাও মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব অনুভব করা সম্ভব। আর এই অভ্যন্তরীণ বিশেষত্বের কারণেই সমষ্টির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ব্যক্তি। আর 'সূরাতিহী' এর 'সূরত' (আকৃতি) শব্দটির অর্থ আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে না। কেননা তিনি আকারাতীত, সব রকমের সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। কিন্তু এখানে শব্দটিকে আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে মানুষের মর্যাদা প্রকাশার্থে, সম্মান বৃদ্ধির মানসে। যেমন, কোরআন মজীদে বলা হয়েছে 'নাক্বাতাল্লাহ্' (আল্লাহ্র উষ্ট্রী), 'বায়তুল্লাহ্' (আল্লাহ্র গৃহ)। এভাবে হজরত সালেহের উষ্ট্রী এবং হজরত ইব্রাহিম কর্তৃক নির্মিত ঘরকে করা হয়েছে সম্মানিত।

আমি বলি, 'আল্লাহ্ আদমকে স্বীয় আকৃতি প্রদান করেছেন' অর্থ তাকে দান করেছেন স্বীয় প্রতিবিম্ব। একারণেই মানুষ হতে পেরেছে আল্লাহ্র খলিফা, দায়িত্ব লাভ করেছে তাঁর আমানত বহনের। এরকম ব্যাখ্যা সঠিক হবে তখনই, যখন 'সূরতিহী' কথাটির 'হী' (তাঁর, স্বীয়) সর্বনামটি প্রযুক্ত হবে আল্লাহ্র সঙ্গে। আবার সর্বনামটি হজরত আদমের সঙ্গেও প্রযুক্ত হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করেছেন আদমেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকৃতিতে, যে আকৃতি অন্য কোনো সৃষ্টির নেই।

'আলআসমাউল হুসনা' অর্থ সকল উত্তম নাম ও বিশেষণ তাঁরই। আর 'আলহাকীম' অর্থ তিনি প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি সকল পূর্ণতার সমাহার। তাঁর জ্ঞান সর্বত্রমুখী এবং ক্ষমতা সর্বময়। সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিধরতা হচ্ছে তাঁর সকল পূর্ণতার উৎস বা ঝর্ণা।

হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে 'আউজু বিল্লাহিস্ সামিয়িল আ'লীম মিনাশ্ শাইত্বনির রজীম' উচ্চারণসহ তিনবার পাঠ করে সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত, আল্লাহ্ তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নির্ধারণ করে দেন। ওই ফেরেশতারা সারাদিনমান তার জন্য রহমত ও মাগফিরাত কামনা করতে থাকে। আর তার মৃত্যু হয় শহীদী মৃত্যু। এরকম আমল সন্ধ্যায় করলেও সে একই রকম ফযীলত পায়। হাদিসটি তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, বর্ণনাটি দুস্প্রাপ্য শ্রেণীর। হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে বা দিনে সুরা হাশরের শেষ আয়াতসমূহ পাঠ করে, সেইদিনে অথবা রাতে যখনই তার প্রাণহরণ করা হোক না কেনো, তার জন্য বেহেশত হয়ে যায় ওয়াজিব।

সূরা মুমতাহিনা

২ রুকু এবং ১৩ আয়াতবিশিষ্ট এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যময় মক্কায়। বাগবী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, আবু আমর ইবনে সফী ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মান্নাফের সারা নাম্নী এক ক্রীতদাসী মক্কা থেকে মদীনায় এলো। রসুল স. তখন মক্কাবিজয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি স. সারাকে বললেন, তুমি কি মুসলমান হয়ে এসেছো? সে বললো, না। তিনি স. বললেন, তাহলে কেনো এসেছো? সে বললো, আপনারাই তো ছিলেন আমার পরিবার, বংশ ও মনিব। আপনারা চলে আসার পর আমি অভাবগ্রস্তা হয়ে পড়ি। তাই এসেছি এই আশায় যে, আপনারা আমার ভরণ পোষণ ও বাহনের ব্যবস্থা করে দিবেন। রসুল স. বললেন, মক্কার যুবকদের কী হয়েছে? তারা তোমার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করলো না কেনো? সারা ছিলো গায়িকা ও বিলাপপটিয়সী। সে বললো, বদর যুদ্ধের পর আমার আর ডাক পড়ে না। রসুল স. তখন বনী আবদুল মুত্তালিবকে সারার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতে উৎসাহ দিলেন। তারা সারার খরচপত্র, কাপড়-চোপড় ও বাহনের ব্যবস্থা করে দিলো।

হজরত হাতেব ইবনে আবী বালতা ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। ছিলেন বনী আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা গোত্রের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ। তিনি মক্কাবাসীদের নিকট একটি পত্র লিখলেন। সারাকে দায়িত্ব দিলেন, পত্রটি মক্কাবাসীদের কারো কাছে পৌঁছে দিতে। একটি চাদর ও দশ দীনারের বিনিময়ে সারা পত্রটি যথাস্থানে পৌঁছে দিতে রাজী হলো। পত্রটিতে লেখা ছিলো— হাতেব ইবনে আবী বালতার পক্ষ থেকে মক্কাবাসীদের নামে। আল্লাহ্র রসুল তোমাদের উপর

হামলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তোমরা সাবধানতা অবলম্বন করো। সারা পত্রটি নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলো। হজরত জিবরাইল রসুল স. কে একথা জানিয়ে দিলেন। তিনি স. তখন হজরত আলী, হজরত আম্মার, হজরত যোবায়ের, হজরত তালহা, হজরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ এবং হজরত আবু মারছাদকে ডেকে সারার পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিলেন। বললেন, যাও, খাখ নামক এলাকায় খেজুর বাগান যেখানে আছে, সেখানে তোমরা উষ্ট্রারোহিণী সারা'র নাগাল পাবে। তার

কাছে রয়েছে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা একটি পত্র। পত্রটি ছিনিয়ে নিয়ো। আর সারাকে ছেড়ে দিয়ো। যদি সে পত্রটি বের করে দিতে না চায়, তবে তার গর্দান উড়িয়ে দিয়ো। সাহাবীগণ অশ্বারোহী হয়ে সারার অনুসন্ধানে বের হলেন। রসুল স. যে স্থানের কথা বলেছিলেন, সেই স্থানে গিয়েই তাঁরা সারার সাক্ষাত পেলেন। বললেন, চিঠিটি বের করে দাও। সে শপথ করে বললো, আমার কাছে কোনো চিঠি নেই। তাঁরা তার মালপত্রের মধ্যে চিঠির অনুসন্ধান করলেন। কিন্তু পেলেন না। সবাই ফিরে আসবেন বলে মনস্থ করলেন। সহসা হজরত আলী বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমাদের রসুল অসত্যভাষী নন। আমরাও নই মিথ্যাবাদী। একথা বলেই তিনি তাঁর তরবারী উত্তোলন করলেন। বললেন, এক্ষুণি চিঠিটি বের করে দাও। নয়তো তোমাকে নগ্ন করে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবো। সারা ভয় পেয়ে গেলো। চিঠিটি বের করে দিলো তার খোপার ভিতর থেকে। তাঁরা তাকে ছেড়ে দিলেন। চিঠিটি নিয়ে ফিরে এলেন মদীনায়। রসুল স. হজরত হাতেবকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কেনো তুমি এমন কাজ করলে। তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনোই বিশ্বাসভঙ্গ করিনি। যখন থেকে আপনার কল্যাণকামী হয়েছি, তখন থেকে আপনার কোনো ক্ষতির চিন্তা করিনি। অবিশ্বাসীদেরকে পরিত্যাগ করার পর কখনো তাদেরকে ভালোও বাসিনি। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, প্রত্যেক মুহাজিরের প্রিয়জন রয়েছে মক্কায়। তারা তাদের পরিবার পরিজনের দেখা শোনাও করে। আমার পরিবার পরিজন এখনো মক্কায়। তাদের কথা ভেবেই আমি মনে করেছিলাম, মক্কাবাসীদের কোনো উপকার যদি আমি করি, তবে তারা আমার পরিবার-পরিজনকে নিরাপত্তা দিবে। আর আমি এমতো বিশ্বাস রাখি যে, মক্কাবাসীদের উপরে আল্লাহ্র আযাব অনিবার্য। ওই আযাবের উপস্থিতিতে আমার এ চিঠি তাদের কোনো উপকারেই আসবে না। রসুল স. হজরত হাতেবের কথা বিশ্বাস করলেন। হজরত ওমর হলেন রাগান্বিত। বললেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহী! নির্দেশ করুন, এ মুনাফিকের কণ্ঠ ছেদন করি। তিনি স. বললেন, ওমর! তুমি কি জানো না, আল্লাহ্ বদরযোদ্ধাদের সম্পর্কে বলেছেন 'তোমরা যা খুশী তা করতে পারো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি'।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, রসুল স. তখন প্রেরণ করলেন যোবায়ের, মেকদাদ ও আমাকে। বললেন, খেজুর বাগান পরিশোভিত খাখ নামক যখন স্থানে পৌঁছবে তখন দেখা পাবে ওই উষ্ট্রারোহিণী

ক্রীতদাসীটির। তার কাছ থেকে পত্রোদ্ধার করে নিয়ে এসো। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। যথাস্থানে পেয়ে গেলাম তাকে। বললাম, চিঠিটা দাও। সে বললো, আমার কাছে কোনো চিঠি-টিঠি নেই। বললাম, শীগ্গীর চিঠি বের করো। নইলে তোমাকে উলঙ্গ করে তল্লাশী চালানো হবে। সে ভয় পেয়ে গেলো। চিঠিটি বের করে দিলো তার খোপার ভিতর থেকে। চিঠিটি মক্কাবাসী কতিপয় মুশরিকদের নামে লিখেছিলো হাতেব ইবনে আবী বালতা। রসুল স. এর কিছু গোপন পরিকল্পনার কথা লিখিত ছিলো চিঠিতে। রসুল স. হাতেবের কাছে কৈফিয়ত চাইলেন। হাতেব বললো। হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশিত পুরুষ! দয়া করে আমার বিষয়ে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আমি তো কুরায়েশ বংশের কেউ নই। অন্যান্য মুহাজিরেরা সকলেই কুরায়েশ বংশদ্ভূত। তাই তাদের মুশরিক আত্মীয়রা তাদের ফেলে আসা পরিবার পরিজনকে দেখা শোনা করে। আমি ভাবলাম, মক্কাবাসীদের কোনো উপকার যদি আমি করে দেই, তবে অ-কুরায়েশ হলেও আমার পরিবার-পরিজনকে তারা নিরাপদে রাখবে। তাই নিবেদন, আমার উদ্দেশ্যের বিচার করুন। অবিশ্বাসী, অথবা ধর্মত্যাগী হওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। সত্যপ্রত্যাখ্যানকে আমি ভালোবাসি না। রসুল স. বললেন তুমি ঠিক বলেছো। এই ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়—

সূরা মুমতাহিনা ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

www.eelm.weebly.com

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তোমরা কি উহাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করিতেছ, অথচ উহারা, তোমাদের নিকট যে সত্য আসিয়াছে, তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, রাসূলকে এবং তোমাদিগকে বহিষ্কার করিয়াছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বহির্গত হইয়া থাক, তবে কেন তোমরা উহাদের সহিত গোপনে বন্ধুত্ব করিতেছ? তোমরা যাহা গোপন কর এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর তাহা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইহা করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ ইহতে।

❑ তোমাদিগকে কাবু করিতে পারিলে উহারা হইবে তোমাদের শত্রু এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করিবে এবং কামনা করিবে যে, তোমরাও কুফরী কর।

❑ তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্তুতি কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসিবে না। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন; তোমরা যাহা কর তিনি তাহা দেখেন।

www.eelm.weebly.com

❑ তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাহার অনুসারীদের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ। যখন তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহার ইবাদত কর তাহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তোমাদিগকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হইল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যদি না তোমরা এক আল্লাহ্তে ঈমান

আন।' তবে ব্যতিক্রম তাহার পিতার প্রতি ইব্রাহীমের উক্তিঃ 'আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব; এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট আমি কোন অধিকার রাখি না।' ইব্রাহীম ও তাহার অনুসারিগণ বলিয়াছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করিয়াছি, তোমারই অভিমুখী হইয়াছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।

❑ 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে কাফিরদের পীড়নের পাত্র করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর; তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

❑ তোমরা যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর নিশ্চয় তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আদর্শ তাহাদের মধ্যে। কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে সে জানিয়া রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

'লা তাত্তাখিজূ আ'দুউয়্যি ওয়া আদুউওয়াকুম আউলিয়াআ' অর্থ তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। 'তুলক্বূনা ইলাইহিম বিল মাওয়াদ্দাহ' অর্থ তোমরা কি তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছো? কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'বিল মাওয়াদ্দাতি' কথাটির 'বা' অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত, যেমন 'ওয়ালা তুলক্বু বিআইদীকুম ইলাত্ তাহ্লুকাত' আয়াতের 'বা'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা কি অংশীবাদীদের সঙ্গে পত্রমিতালী করতে চাও? জুজায বলেছেন, এখানকার 'বা' অতিরিক্ত নয়, বরং কারণপ্রকাশক। এমতাবস্থায় কথাটি দাঁড়াবে— তোমরা কি পৌত্তলিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখার কারণে পত্রপ্রেরণের মাধ্যমে রসুলের গোপন পরিকল্পনা প্রকাশ করে দিতে চাও?

'অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে' অর্থ অথচ ওই পৌত্তলিকেরা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ মহাবাণী কোরআনকে অস্বীকার করেছে। 'রসুলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্তে বিশ্বাস করো' অর্থ অথচ তারা তোমাদের রসুল ও তোমাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা বলো ও বিশ্বাস করো, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহক। উল্লেখ্য, আল্লাহ্ উপস্থিত অনুপস্থিত সকলেরই একমাত্র প্রভুপালনকর্তা। তৎসত্ত্বেও এখানে কেবল বিশ্বাসীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে 'তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্'। এরকম করা হয়েছে উপস্থিতজনদেরকে অনুপস্থিতজনদের উপরে প্রাধান্য প্রদানার্থে। আল্লাহ্ যে কেবল সম্বোধিতজনদের প্রভুপালক সেকথা বোঝাতে নয়। এভাবে এখানে বাক্যের বাঁক পরিবর্তন করা হয়েছে সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়োজনে। শুরুতে বলা হয়েছে 'হে মুমিনগণ' তারপর পরোক্ষভাবে এখানে বলা হয়েছে 'তোমাদের প্রতিপালক'।

'ইনকুনতুম খারাজ্তুম' অর্থ যদি তোমরা বহির্গত হয়ে থাকো। 'জ্বিহাদান ফী সাবীলী' অর্থ আমার পথে জেহাদের উদ্দেশ্যে'। 'ওয়াব্তিগাআ মারদ্বাতী' অর্থ

এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য। 'তুসির্রূনা ইলাইহিম বিল মাওয়াদ্দাতি' অর্থ তবে কেনো তোমরা তাদের সঙ্গে গোপনে বন্ধুত্ব করছো? মুকাতিল বলেছেন, এখানকার 'আল মাওয়াদ্দাহ্' অর্থ কল্যাণকামিতা, যা প্রদর্শন করা হয় বন্ধু-সুহৃদদের প্রতি। 'বা' অক্ষরটি এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত, অথবা কারণপ্রকাশক। 'ওয়া আনা আ'লামু বিমা আখফাইতুম ওয়ামা আ'লানতুম' অর্থ তোমরা যা গোপন করো এবং তোমরা যা প্রকাশ করো, তা আমি সম্যক অবগত। 'ওয়া মাঁই ইয়াফ্আ'লহু মিনকুম' অর্থ তোমাদের মধ্যে যে কেউ এটা করে। আর 'ফাক্বদ দ্বল্লা সাওয়াআস্ সাবীল' অর্থ সে তো বিচ্যুত হয়েছে সরল পথ থেকে।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তারা হবে তোমাদের শত্রু এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং কামনা করবে যে, তোমরাও কুফুরী করো (২)। তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন' (৩)।

এখানে 'কাবু করতে পারলে' অর্থ বিজয়ী হলে। অভিধানে এসেছে 'ছাক্বাফাহু' আসে 'মানাআহু' এর ওজনে। এর অর্থ সে তাকে পেয়ে বসেছে, কাবু করতে পেরেছে, কৃতকার্য হয়ে গিয়েছে ইত্যাদি। 'তারা হবে তোমাদের শত্রু' অর্থ একবার তোমাদেরকে বাগে আনতে পারলেই দেখবে যে, বন্ধুত্বের কথা আর তাদের মনে থাকবে না। তারা হয়ে যাবে তখন ঘোর শত্রু। 'হস্ত ও রসনা দ্বারা তখন তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে' অর্থ তখন তারা তোমাদেরকে ভর্ৎসনা করবে, গালি দিবে, মারপিট করবে এবং সুযোগ পেলে হত্যাও করবে। 'ওয়া ওয়াদ্দূ লাও তাক্ফুরূন' অর্থ এবং কামনা করবে যে, তোমরাও কুফরী করো। এখানে 'লাও' অর্থ কামনা। আর 'ওয়াদ্দূ' হচ্ছে আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'ইন' (যদি) শর্তের প্রতিফল। এভাবে 'ইন' এর কারণে এখানে অতীতকাল হয়েছে ভবিষ্যতকালার্থক। অর্থ দাঁড়িয়েছে— কামনা করবে। এখানে অতীকালবোধক শব্দরূপ

www.eelm.weebly.com

ব্যবহারের মধ্যে এটাই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যেনো বিশ্বাসীদেরকে কাবু করেই ফেলেছে এবং তারা যেনো এটাও কামনা করছে যে, বিশ্বাসীরাও তাদের মতো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হয়ে যায়।

'তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোনো কাজে আসবে না' অর্থ হে বিশ্বাসীগণ! মনে রেখো, যাদের সঙ্গে তোমরা বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চাচ্ছো, তোমাদের সেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী আত্মীয়-স্বজন ও তাদের সন্তান-সন্ততিরা মহাবিচারের দিবসে কোনো কাজেই আসবে না। কথাটির মাধ্যমে হজরত হাতেব ও তাঁর মতো অন্যান্য বিশ্বাসীর ভুলচিন্তাকে প্রতিহত করা হয়েছে। 'আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন' অর্থ মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ বিষয়টির চূড়ান্ত নিস্পত্তি ঘটাবেন। সিদ্ধান্ত দান করবেন সত্য ও অসত্যের ভিত্তিতে, বন্ধুত্ব ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ভিত্তিতে নয়। যারা বিশ্বাসী, তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে এবং যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী,

তাদেরকে নিক্ষেপ করবেন জাহান্নামে। সুতরাং হে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অধিকার ক্ষুণ্ন করে তাঁদের শত্রুদের কল্যাণ কামনা করতে চাইবে কেনো? আর 'তোমরা যা করো, তিনি তা দেখেন' অর্থ হে মানুষ! তোমাদের ভালো-মন্দ সকল উদ্দেশ্য ও কর্ম তাঁর প্রত্যক্ষগোচর। সুতরাং কোনো কিছুই গোপন করতে তোমরা পারবে না। যথাসময়ে তিনি তোমাদেরকে যথোপযুক্ত প্রতিফল দিবেনই।

এর পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে 'তোমাদের জন্য ইব্রাহিম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

এখানে 'তোমাদের জন্য' অর্থ হে শেষ নবীর উম্মত, তোমাদের জন্য। 'ইব্রাহিম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' অর্থ নবী ইব্রাহিম ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামীরাই তোমারের পথিকৃৎ। তোমাদের নবীও প্রধানতঃ তাঁর আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী। এই আদর্শ শুভ, শাশ্বত ও সুন্দর। সুতরাং তোমরা এর একনিষ্ঠ অনুসারী হও।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইবাদত করো তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই'। একথার অর্থ— নবী ইব্রাহিম ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীরা তাদের অংশীবাদী স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হে আমাদের স্বজাতি! তোমরা অংশীবাদী। আর আমরা মুসলমান। সুতরাং তোমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজন হলেও তোমাদের সঙ্গে আমাদের আন্তরিক কোনো সম্পর্ক নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইন্না বুরাআউ মিনকুম' (আমরা তোমাদেরকে মানি না)। অর্থাৎ আমরা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। এখানকার 'বুরাআউ' শব্দটি 'বারিউন' এর বহুবচন, যেমন 'জুরাফা' বহুবচন 'জরীফুন' এর।

এরপর বলা হয়েছে— 'কাফারনা বিকুম ওবাদাআ বাইনানা ওয়া বাইনাকুমুল আ'দাওয়াতু ওয়াল বাগদ্বাউ আবাদা' (তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য)। এখানকার 'কুফর' শব্দটি 'ইমান' এর বিপরীত। এর অর্থ গোপন করা। কাফেরেরা সত্য ও আল্লাহ্‌র দেয়া অনুগ্রহসম্ভারকে গোপন করে, সত্যকে মানে না এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। এভাবে হয়ে যায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয়ভাজনগণের শত্রু। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আর মহাবিচার দিবসে একে অন্যের থেকে গোপন করবে'।

'হাত্তা তু'মিনূ বিল্লাহি ওয়াহদাহূ' অর্থ যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে ইমান আনো। অর্থাৎ যদি আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাস স্থাপন করো, তবে আমাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষের হবে চিরঅবসান। তখন আমাদের সকলের জীবন হবে সুখ, শান্তি ও সম্প্রীতিবদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইব্রাহিমের উক্তি, আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবো এবং তোমার ব্যাপারে আমি

আল্লাহ্‌র নিকট কোনো অধিকার রাখি না'। উল্লেখ্য, অবাধ্য স্বজাতির সঙ্গে চিরদিনের জন্য সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে হজরত ইব্রাহিম যখন হিজরত করেছিলেন তখন তাঁর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী পিতাকে শুধু বলেছিলেন, আমি আপনার জন্য কেবল আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকবো। কিন্তু আল্লাহ্ আমার প্রার্থনা গ্রহণ করবেন কি করবেন না, সেটা সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায়াধীন। কেননা পথপ্রাপ্তি ও পথভ্রষ্টতা সম্পূর্ণতই তাঁর ইচ্ছানির্ভর। সেখানে আমি অথবা অন্য কেউ কোনো অধিকারই রাখে না। এমতো অঙ্গীকারানুসারে তিনি তাঁর পিতার জন্য দূর দেশে থেকেও ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকেন। কিন্তু পরে আল্লাহ্‌পাক এব্যাপারে তাঁকে নিষেধ করে দিলে তিনিও ক্ষমাপ্রার্থনা বন্ধ করে দেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইব্রাহিম ও তাঁর অনুসারীগণ বলেছিলো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট'। এখানে 'রব্বানা আ'লাইকা তাওয়াক্কালনা' অর্থ হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করেছি। 'ওয়া ইলাইকা আনাব্‌না' অর্থ তোমারই অভিমুখী হয়েছি। আর 'ওয়া ইলাইকাল মাসীর' অর্থ এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের পীড়নের পাত্র কোরো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো, তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৫)। তোমরা যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রত্যাশা করো, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের মধ্যে। কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ' (৬)।

বায়যাবী প্রমুখ লিখেছেন, ৪ সংখ্যক আয়াতের 'ইব্রাহিম ও তার অনুসারীগণ বললো' থেকে বক্তব্য প্রবাহিত হয়েছে ৬ সংখ্যক আয়াতের 'নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের মধ্যে' পর্যন্ত। কিন্তু তাঁর এমতো অভিমত জটিলতামুক্ত নয়। কেননা এখানকার 'উসওয়াতুন' (আদর্শ) শব্দটি 'নাকেরা' (অনির্দিষ্ট)। সুতরাং শেষোক্ত বক্তব্য এখানে পূর্ববর্তী বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার বিষয়টি অকাট্য নয়। অতএব বুঝতে হবে ব্যতিক্রমটি এখানে বিকর্তিত। আবার একই সঙ্গে এটাও নিঃসন্দিগ্ধ নয় যে, বক্তব্যটি আলাদা। সুতরাং বুঝতে হবে, বক্তব্যটি সম্মিলিত। এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন 'ওয়া লাও কানা ফিহিমা আলিহাতুন ইল্লাল্লহ্' (নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর একজন উপাস্যের অস্তিত্ব যদি থাকতো— তাহলে অবশ্যই সৃষ্টি হতো বিপর্যয়)। এখানেও 'আলিহাতুন' শব্দটি অনির্দিষ্টবাচক। 'আল্লাহ্' শব্দটি এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া, অথবা না হওয়া কোনোটাই নিঃসন্দিগ্ধ নয়। একারণেই কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ এখানে 'ইল্লা'কে গ্রহণ করেছেন 'গইরা' (ব্যতীত) অর্থে। সেকারণে আলোচ্য বিষয়ে 'মুস্তাস্না মিনহু' (ব্যতিক্রম্য)কে উহ্য মনে করাই

হবে সমীচীন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— 'ইত্তাবিউ' আক্বওয়ালা ইব্রাহীমা ইল্লা ক্বওলা ইব্রাহীমা লিআবীহী' (তোমরা ইব্রাহিমের সব কথা অনুসরণ করো, তবে ওই কথাটি ব্যতীত, যা তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন)। 'আল বাহরুল মাওয়াজ' রচয়িতা লিখেছেন, ৪ সংখ্যক আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'ফী ইবরাহীম' (ইব্রাহিমের মধ্যে) হচ্ছে ব্যতিক্রম্য এবং তা থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে এর পরে উল্লেখিত 'ইল্লা ক্বওলা ইবরাহীম' (তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইব্রাহিমের উক্তি) এবং এখানে সম্বন্ধপদটি রয়েছে উহ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইব্রাহিমের বক্তব্যে, তবে ওই বক্তব্য ব্যতীত যে কথা তিনি বলেছিলেন তাঁর পিতাকে 'অবশ্যই আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো'। বায়যাবীর উদ্দেশ্যও সম্ভবত এরকমই। কেননা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী পিতার জন্য হজরত ইব্রাহিম যে দোয়া করেছিলেন, তা শরিয়তসম্মত নয়। তিনি অবশ্য এরকম করেছিলেন কাফেরদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বে। ৪ সংখ্যক আয়াতের 'এবং আমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট কোনো অধিকার রাখি না' কথাটিও ব্যতিক্রমের পরিপূরক, অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার অঙ্গীকার করার সঙ্গে একথাটিও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ব্যস, এতটুকুই করবো আমি, এর বেশী কিছু করার অধিকার ও ক্ষমতা আমার নেই। কেননা ক্ষমা করা অথবা না করার বিষয় সম্পূর্ণই আমার ক্ষমতার বাইরে। 'মিন শাইইন' এর 'মিন' এখানে অতিরিক্ত। আর 'শাইইন' কর্মপদ— যবর যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্র।

৫ সংখ্যক আয়াতের শুরুতে আবার উল্লেখ করা হয়েছে 'রব্বানা' (হে আমাদের প্রভুপালক)। এরকম পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে কেবল প্রার্থনাকে অধিকতর সুদৃঢ় করবার জন্য। 'তুমি আমাদেরকে কাফেরদের পীড়নের পাত্র বানিয়ো না' অর্থ হে আমাদের প্রভুপালক! কাফেরদেরকে তুমি আমাদের উপরে এমন প্রবল করে দিয়ো না যে, তারা আমাদেরকে বন্দী অথবা হত্যা করতে সমর্থ হয় এবং সে কারণে তাদের উপরে নেমে আসে তোমার তাৎক্ষণিক আযাব। জুজায বলেছেন, কথাটির অর্থ— তুমি তাদেরকে আমাদের উপরে বিজয়ী করে দিয়ো না। তারা যেনো আমাদেরকে কাবু না করতে পারে। যদি এরকম তারা করতে পারে তবে ধারণা করবে, তারাই সত্যাধিষ্ঠিত। মুজাহিদ কথাটির অর্থ করেছেন— তাদের হাতে আমাদেরকে শাস্তি দিয়ো না, শাস্তি দিয়ো না তোমার পক্ষ থেকেও। দিলে তারা বলবে, বিশ্বাসীরা যদি সত্যাধিষ্ঠিতই হতো, তবে তারা এভাবে শাস্তিপ্রাপ্ত হতো না।

'ওয়াগ্ফির লানা' অর্থ তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো। উল্লেখ্য, কখনো কখনো পাপের কারণে বিশ্বাসীদের উপরেও বিপদ মুসিবত নেমে আসে। তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের উপরে প্রাধান্য লাভ করে। তাই এখানে এভাবে জানানো হয়েছে ক্ষমার আবেদন।

'ইন্নাকা আনতাল আ'যীযুল হাকীম' অর্থ তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, অর্থাৎ তুমি যাকে আশ্রয় দান করো, কেউ তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না, কেননা তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রতাপশালী। আর কারো প্রার্থনা গ্রহণ করা না করার বিষয়টিও সম্পূর্ণতই তোমার বিবেচনানির্ভর। কেননা তুমি তো প্রজ্ঞাময়ও।

'তোমরা যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রত্যাশা করো' অর্থ তোমরা যারা মুসলমান, তারা তো আল্লাহ্ ও আখেরাত প্রত্যাশী। 'নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের মধ্যে' অর্থ নিশ্চয় মুসলমানদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ

www.eelm.weebly.com

হজরত ইব্রাহিম ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদের জীবনাচরণের মধ্যে। কথাটির মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত ইব্রাহিমের মতাদর্শের অনুসরণ করা হচ্ছে বিশ্বাসের দাবি, আর তাঁর অনুসরণ না করাই অবিশ্বাস, অথবা অপবিশ্বাস। 'কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে' অর্থ হজরত ইব্রাহিম ও অন্যান্য নবী রসুলের মতাদর্শ থেকে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে। আর 'সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ' অর্থ সে যেনো ভালোভাবে একথা জেনে রাখে যে, তার রসুলানুসরণ, ইবাদত বন্দেগী অথবা বিরোধিতা সম্পূর্ণতই তার কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে জড়িত। এতে আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কেননা তিনি চির অমুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসনীয়। সৃষ্টির ইবাদত ও প্রশংসার মুখাপেক্ষী তিনি মোটেও নন।

সূরা মুমতাহিনা ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯

❑ যাহাদের সহিত তোমাদের শত্রুতা রহিয়াছে সম্ভবত আল্লাহ্ তাহাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করিয়া দিবেন; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীরে মাযহারী/৪৪৯

❑ দীনের ব্যাপারে যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করে নাই তাহাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করিতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায় পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

❑ আল্লাহ্ কেবল তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে নিষেধ করেন যাহারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করিয়াছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করিয়াছে। উহাদের সহিত যাহারা বন্ধুত্ব করে তাহারা তো যালিম।

বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ যখন সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে শত্রু জ্ঞান করতে নির্দেশ দিলেন; তখন মুসলমানেরা তাদের অমুসলমান আত্মীয়স্বজনের প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কিন্তু কারো কারো হৃদয়ে রয়ে গেলো স্বজনবন্ধনের দূরবর্তী আকর্ষণ। আল্লাহ্‌পাক সর্বজ্ঞ। তাই তিনি তখন তাঁদেরকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে অবতীর্ণ করলেন 'যাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে, সম্ভবত আল্লাহ্ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। এখানে 'যাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে' অর্থ মক্কার মুশরিকেরা, যারা আত্মীয় হলেও এখন তোমাদের শত্রু। 'সম্ভবত আল্লাহ্ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন' অর্থ খুব শীঘ্রই এমন অবস্থা হবে যে, তারা মুসলমান হবে এবং হয়ে যাবে তোমাদের বিশ্বাসী বন্ধু। বলা বহুল্য, কিয়ৎকাল পরে এরকমই ঘটেছিলো। মক্কাবিজয়ের পর তারা হয়ে গিয়েছিলো মুসলমান। ব্যতিক্রম ছিলো কেবল কয়েকজন। যারা শত্রুতায় লিপ্ত থাকা অবস্থায় হয়েছিলো নিহত। সুরা নসরের তাফসীরে আমি তাদের সকলের নাম উল্লেখ করেছি।

একটি সন্দেহ ঃ আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য ব্যাপকার্থক। এখানে একথাটিই প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় যারা অমুসলমান ছিলো, তারা সকলেই পরে মুসলমান হয়ে যাবে। কিন্তু সেরকম তো হয়নি। তখনকার অমুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান হয়নি। মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে অমুসলমান অবস্থাতেই।

সন্দেহভঞ্জন ঃ কখনো কখনো রূপক অর্থে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার পর তাকে গ্রহণ করা হয় বিশেষ অর্থে। বরং প্রচলিত রীতি তো এটাই যে, সকল সাধারণত্বের কিছু অংশ বিশেষ। তৎসত্ত্বেও ক্রিয়ার সম্বন্ধ সাধারণের সঙ্গেই থাকে। কেননা ক্রিয়াকে কখনো কখনো সম্পৃক্ত করা হয় রূপক হিসেবে, বিধেয় এর উপস্থিতির কারণে। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে।

www.eelm.weebly.com

যেমন 'ফাকাজ্জাবুহু ফাআ'ক্বারূহা' (তারা তাকে অসত্যারোপ করলো এরপর তাকে কেটে ফেললো)। হজরত সালেহের সম্প্রদায়ের সকল লোক উষ্ট্রীবধের সঙ্গে জড়িত ছিলো না। অপকর্মটি করেছিলো তাঁর সম্প্রদায়ের কিছুসংখ্যক লোক। তৎসত্ত্বেও সাধারণভাবে রূপক অর্থে অপকর্মটিকে জড়িত করা হয়েছে সকলের সঙ্গে।

'ওয়াল্লহু ক্বদীরুন' অর্থ আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। আর 'ওয়াল্লহু গফুরুর রহীম' অর্থ এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের সকলকেই ক্ষমা করে দিয়েছেন, যারা নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতো এবং যারা নিষেধ করার পরেও অন্তরে পোষণ করতো আত্মীয়তার টান।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন (৮)। আল্লাহ্ কেবল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে। তাদের সঙ্গে যারা বন্ধুত্ব করে, তারা তো জালেম, (৯)।

বোখারী লিখেছেন, সিদ্দীকপুত্রী হজরত আসমা বলেছেন, আমার মা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। আমি রসুল স. এর নিকটে জানতে চাইলাম, আমি তাকে ঘরে তুলতে পারবো কিনা। তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতদ্বয়।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের থেকে আহমদ, বায্যার ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল হাকেম কর্তৃক 'বিশুদ্ধ' আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, মূর্খতার যুগে কাতীলাহ বিনতে আবদুল উজ্জা ছিলো হজরত আবু বকরের স্ত্রী। তিনি তাকে তালাক দিয়েছিলেন। সে একদিন তার কন্যা হজরত আসমার সঙ্গে কিছু উপঢৌকন নিয়ে দেখা করতে এলো। তিনি উপঢৌকন গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলেন। তাকে ঘরে প্রবেশের অনুমতিও দিলেন না। মাতা মহোদয়া আয়েশাকে বলে পাঠালেন, রসুল স. এর কাছ থেকে এ সম্পর্কিত বিধান জেনে নিয়ে আমাকে জানাও। এভাবে তাঁকে জানানো হলো যে, উপঢৌকন গ্রহণ করো এবং তোমার মাকে ঘরে বসতে দাও। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতদ্বয়।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে খাজাআ গোত্র সম্পর্কে। তারা রসুল স. এর সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলো যে, তারা কখনোই রসুল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং তাঁর শত্রুপক্ষকেও কখনো সাহায্য করবে না। আল্লাহ্ এই আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এই আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, জিম্মি কাফেরদেরকে নফল সদকা প্রদান জায়েয। এই মাসআলাটি আলোচিত হয়েছে সুরা বাকারার 'লাইসা আ'লাইকা হুদাহুম.......' এই আয়াতের তাফসীরে। একারণেই রসুল স. আবু আমরের মুক্তিপ্রাপ্ত দাসী সারাকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এখানে 'আল্লাহ্ কেবল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে' বলে বুঝানো হয়েছে মক্কার মুশরিকদেরকে। কেননা তারাই বার বার

রসুল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তাঁকে তাঁর জন্মভূমি পুণ্যময় মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য করেছে। আর 'এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে' বলে বুঝানো হয়েছে ওই কুরায়েশ বংশভূতদেরকে যারা তাদের গোত্রপতিদেরকে রসুল স. এর বহিষ্কার করার কাজে সাহায্য করেছে। 'তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তারা তো জালেম' একথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধংদেহী কাফের রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ। তবে তাদের সাথে জাগতিক বিষয়ে সদাচরণ প্রদর্শন নিষিদ্ধ নয়। তবে দেখতে হবে, এতে করে আবার যেনো মুসলমানদের কোনো ক্ষতি না হয়। আল্লাহ্পাক কাফের রাজ্যের বন্দীদের সম্পর্কে বলেছেন 'হয় বদান্যতা নয়তো রক্তপণের বিনিময়ে'। এখানে যে 'মান' এর কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ সদাচরণ, মহানুভবতা প্রদর্শন, সে সদাচরণ ও মহানুভবতা দান-ধ্যান করা ছাড়াও কেবল মৌখিক ও আচরণগত শিষ্টাচার প্রদর্শনের মাধ্যমেও সম্পন্ন হতে পারে। রসুল স. বলেছেন, তৃষিত হৃদয়ের মধ্যে পুণ্য রয়েছে। অর্থাৎ পিপাসিত ব্যক্তিকে পানি পান করালেও সওয়াব হয়, সে ব্যক্তি যে কেউ হোক না কেনো। বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত সুরাকা ইবনে মালেক থেকে। আহমদ এবং ইবনে মাজাও এরকম বর্ণনা করেছেন। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ।

বিধর্মীকে জাকাত প্রদান নাজায়েয। বিধানটি ঐকমত্যসম্মত। আর এমতো ঐকমত্যের সমর্থনে রয়েছে হজরত মুয়াজ কর্তক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ মুসলমানদের উপরে জাকাত ফরজ করেছেন। সুতরাং তা ধনী মুসলমানদের কাছ থেকে নিয়ে দিতে হবে দরিদ্র মুসলমানদেরকে। আর এখানে 'তাদের সঙ্গে যারা বন্ধুত্ব করে, তারা তো জালেম' বলে যদি কেবল কাফের রাজ্যের কাফেরদেরকে বুঝানো না হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে, কর প্রদান করে মুসলমান রাজ্যে

www.eelm.weebly.com

বসবাসকারী কাফেরের (জিম্মির) সঙ্গেও বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ। কেননা এখানে বিশেষভাবে কিছু বলা হয়নি। এই সুরার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। আবার হাদিস শরীফে এসেছে, যে যাকে ভালোবাসে , সে তার সঙ্গী।

হজরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান ইবনে হাকাম বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের সময় কুরায়েশ পক্ষের সহল ইবনে আমর এই শর্তটিও সন্ধিপত্রে যুক্ত করে দিয়েছিলো যে, আমাদের পক্ষের কেউ যদি আপনার কাছে গিয়ে মুসলমানও হয়ে যায়, তবে তাকে আমাদের কাছে সোপর্দ করতে হবে। সাহাবীগণ এই শর্তটি খুবই অপছন্দ করলেন। কিন্তু সহল তার দাবিতে অটল রইলো। শেষে রসুল স. এই শর্তটিকেও সন্ধিপত্রে লিপিবদ্ধ করালেন। ফলে বন্দী আবু জন্দল যখন পালিয়ে এসে রসুল স. এর আশ্রয় চাইলেন, তখন তিনি স. তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। ওই সন্ধিচুক্তি যতোদিন বলবৎ ছিলো, ততোদিন পর্যন্ত রসুল স.কে এরকমই করতে হয়েছিলো। আবু জন্দলের মতো

আরো কয়েকজনকে এভাবেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি স.। ওই সময় কতিপয় রমণীও হিজরত করে মদীনায় এলো। উম্মে কুলসুম বিনতে আকাবা ইবনে আবী মুঈতও ছিলেন তাদের মধ্যে। রসুল স. তাদেরকে ফিরিয়ে দেননি। কেননা ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তটি প্রযোজ্য ছিলো কেবল পুরুষদের বেলায়। এমতো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

সূরা মুমতাহিনা ঃ আয়াত ১০

❑ হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা হিজরত করিয়া আসিলে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিও; আল্লাহ্ তাহাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানিতে পার যে, তাহারা মু'মিন তবে তাহাদিগকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাইও না। মু'মিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নহে এবং কাফিরগণ মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নহে। কাফিররা যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহা উহাদিগকে ফিরাইয়া দিও। অতঃপর তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিলে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না যদি তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের মাহর দাও। তোমরা কাফির নারীদের সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখিও না। তোমরা যাহা ব্যয় করিয়াছ তাহা ফেরত চাহিবে এবং কাফিররা ফেরত চাহিবে যাহা তাহারা ব্যয় করিয়াছে। ইহাই আল্লাহ্র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! তোমাদের নিকটে মুমিন নারীরা হিজরত করে এলে, তাদেরকে পরীক্ষা কোরো'। একথার অর্থ— হে বিশ্বাসবানগণ! মক্কা থেকে হিজরত করে মুসলিম পরিচয় দিয়ে কোনো রমণী যদি মদীনায় আসে, তবে তোমরা তৎক্ষণাৎ তাকে বিশুদ্ধ বিশ্বাসবতী বলে গ্রহণ কোরো না। তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে তাদেরকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখো।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদের ইমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন'। একথার অর্থ— পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যদি তোমাদের দৃঢ় ধারণা হয় যে, তারা বিশ্বাসবতী তবে তাদেরকে বিশ্বাসবতী হিসেবেই গ্রহণ কোরো। কিন্তু অন্তরের অন্তর্নিহিত বিষয় তো তোমরা জানো না। আর তোমরা সর্বজ্ঞও নও। তাই দৃঢ় ধারণার উপরে আমল করাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। প্রকৃত অবস্থা তো জানেন কেবল আল্লাহ্। আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অন্তরের দৃঢ় ধারণার উপরে আমল করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ্পাক এখানে এরকমই নির্দেশ প্রদান করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা জানতে পারো যে, তারা মুমিন, তবে তাদেরকে কাফেরদের নিকটে ফেরত পাঠিয়ো না'। একথার অর্থ— সম্ভাব্য পরীক্ষার পর যদি তোমরা বুঝতে পারো যে, তারা প্রকৃতই বিশ্বাসবতী, তবে তাদেরকে তোমরা তাদের কাফের স্বামীদের কাছে আর ফিরে যেতে বোলো না। কেননা তারা কাফের পুরুষের জন্য হালাল নয়। উল্লেখ্য, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। সুরা নিসার ২৪ সংখ্যক আয়াতের তাফসীরে এই মাসআলা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে মাসআলাটি এরকম— স্বামী কাফের এবং স্ত্রী মুহাজির ও বিশ্বাসবতী হলে ইমাম আবু হানিফার মতে স্ত্রী কাফের রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করা মাত্র উভয়ের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। কারণ তখন তাদের দেশ দু'টি— একটি দারুল হরব এবং অপরটি দারুল ইসলাম। কিন্তু অপর ইমামত্রয় বলেন, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে গেলে স্বামীর মুসলমান হওয়ার সময় থেকে স্ত্রীকে তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, স্বামী যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে থাকে। যদি তা না হয়ে থাকে, তবে অপেক্ষা করতে হবে স্ত্রীর মুসলমান হওয়ার সময় থেকে তিন ঋতু পর্যন্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'মুমিন নারীগণ কাফেরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফেরেরা মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়'। একথার অর্থ— বিবাহ নবায়নের পরেও মুমিন রমণীর জন্য কাফের হালাল হবে না। কেননা কাফের পুরুষ মুসলমান রমণীর জন্য কখনোই বৈধ নয়। এরকমও হতে পারে যে, এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের তাকিদ। ওরওয়ার বর্ণনায় এসেছে, মাতা মহোদয়া আয়েশা বলেছেন, রসুল স. মুহাজির রমণীদেরকে পরীক্ষা করার জন্য এই আয়াত 'ইয়া আইয়্যুহান নাবিয়্যু ইজা থেকে 'আ'যীযুর রহীম' পর্যন্ত পাঠ করতেন। যে রমণী এ সকল শর্ত স্বীকার করে নিতো, তিনি স. তাকে বলতেন, আমি তোমার বায়াত গ্রহণ করলাম। রসুল স. তাদের হস্ত স্পর্শ করতেন না। মেয়েদের বায়াত অনুষ্ঠিত হতো মৌখিকভাবে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. ওমরা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যখন হুদায়বিয়ায় পৌঁছলেন, তখন মুশরিকেরা

কতিপয় শর্তসহ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এলো। শর্তগুলোর একটি হচ্ছে— রসুল স. এর সহচরদের মধ্যে কেউ ধর্ম ত্যাগ করে মক্কায় এলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না, কিন্তু মক্কা থেকে কেউ মুসলমান হয়ে মদীনায় গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবার কিছুক্ষণ পরেই সাবীআ আসলামিয়া বিনতে হারেছ মুসলমান হয়ে রসুল স. এর কাছে হাজির হলেন। একটু পরে হাজির হলো তাঁর কাফের স্বামী মুসাফির মাখজুমী, মতান্তরে সাইফী ইবনে রাহেব। সে তার স্ত্রীকে দাবি করে বসলো। বললো, মোহাম্মদ! আপনারা তো এ ব্যাপারে শর্তবদ্ধ। সুতরাং আমার স্ত্রীকে ফেরত দিন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য নির্দেশ। ঘোষিত হলো 'কাফেরেরা মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়'। আর এখানে 'হিজরত করে এলে' কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে ওই সকল রমণীকে, যারা কাফের রাজ্য ছেড়ে মুসলমান রাজ্যে হিজরত করে আসে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুমিন মুহাজির রমণীকে পরীক্ষা করা হতো এভাবে— তাকে বলতে হতো, আমি স্বামীর প্রতি ঘৃণার কারণে, অথবা অন্য কোনো পুরুষের প্রতি আসক্তা হয়ে এখানে আসিনি। আমার আগমনের কারণ এটাও নয় যে, একস্থানের প্রতি আমি অনাসক্তা এবং অপর স্থানের প্রতি আসক্তা। কোনো অপরাধ সম্পন্ন করেও আমি আসিনি এবং আসিনি বিত্ত-বৈভবের লোভে। আমি এসেছি কেবল ইসলামের প্রতি আমার ভালোবাসা, আগ্রহ ও আল্লাহ্‌র রসুলের আকর্ষণে। রসুল স. এভাবেই তাদেরকে অঙ্গীকার করাতেন। আর তারা যখন এভাবে অঙ্গীকারবদ্ধা হতো, তখন তিনি স. আর তাদেরকে ফেরত পাঠাতেন না। তাদের স্বামীর দাবি অনুসারে ফিরিয়ে দিতেন মোহর ও অন্যান্য খরচপত্র। সাবিআ আসলামিয়ার ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছিলো এবং তাঁকে বিবাহ দেওয়া হয়েছিলো মান্যবর ওমর ইবনে খাত্তাবের সঙ্গে। কিন্তু এভাবে কোনো পুরুষ পালিয়ে এলে রসুল স. তাকে ফেরত পাঠাতেন।

শিথিল সূত্রে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আবী আহমদ থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, সন্ধি সম্পাদনের সময় উম্মে কুলসুম মুসলমান হয়ে রসুল স. এর কাছে এলেন। তার পিছনে পিছনে এলো তার দুই ভাই, আমারা এবং ওলীদ ইবনে উক্‌বা। রসুল স. এর কাছে তারা তাদের বোনকে ফেরত দানের আবেদন জানালেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, ইয়াজিদ ইবনে আবী হাবীব বর্ণনা করেছেন, আমার কাছে এই সংবাদটি পৌঁছেছে যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উমাইমা বিনতে বাশার, অথবা আবু হাস্‌সান ইবনে দাহদাহা সম্পর্কে। মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, সাঈদা ছিলেন সাইফ ইবনে রাহেবের স্ত্রী। সন্ধি সম্পাদনের সময় তিনি তাঁর মুশরিক স্বামীকে ছেড়ে রসুল স. এর কাছে হিজরত করে এলেন। মুশরিকেরা দাবি করলো, সাঈদাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। জুহুরী সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন হুদায়বিয়া প্রান্তরের নিম্নভূমিতে মক্কাবাসীদের সঙ্গে এই মর্মে সন্ধি করছিলেন যে, কোনো মুসলামান হিজরত করে তাঁর কাছে চলে এলে তিনি তাকে তাদের হাতে সমর্পণ করবেন, তখন সেখানে পালিয়ে এসে উপস্থিত হলো কয়েকজন মুসলিম নারী। তাঁদেরকে উপলক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'কাফেরেরা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ো'। একথার অর্থ— হে বিশ্বাসবানগণ! হিজরতকারিণী এবং তাদের কাফের স্বামীদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তোমরা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ো তাদের দেওয়া মোহরানার অর্থ ও তাদের দেওয়া অন্যান্য খরচপত্র। এটা অপরিহার্য। বাগবী লিখেছেন, কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হওয়ার আগেও রসুল স. হিজরতকারিণীদেরকে রেখে দিতেন। তাদের কাফের স্বামীদের নিকট আর ফেরত পাঠাতেন না। মোহরানাও ফেরত দিতেন না। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে তিনি তাদের মোহরানা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিবাহ করলে তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না, যদি তোমরা তাদেরকে মোহর দাও'। কথাটির দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, এমতোক্ষেত্রে ইদ্দত পালন জরুরী নয়। অর্থাৎ কাফের স্বামীদের সাথে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটার পরক্ষণেই হিজরতকারিণীদেরকে বিবাহ করা যেতে পারে। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফের (সাহেবাইনের) মত এর বিপরীত। আর এখানে 'যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দাও' কথাটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, তাদেরকে বিবাহ করতে চাইলে নতুন করে মোহর ধার্য করতে হবে। তাদের পূর্বতন স্বামীদেরকে যে মোহরানা ফেরত দেওয়া হয়, ওই মোহরানাকে নতুন মোহরানা বলে গণ্য করা যাবে না।

আবু সালেহ থেকে কালাবী সূত্রে ইবনে মুনী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওমর ইবনে খাত্তাব যখন মুসলমান হলেন, তখন তাঁর স্ত্রী মুশরিকদের সঙ্গে রয়ে গেলো। ওই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেই অবতীর্ণ হয় পরের বাক্যটি।

বলা হয়— 'তোমরা কাফের নারীদের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না' (ওয়ালা তুমসিকু বিই'সামিল কাওয়াফির)। এখানকার 'ইসাম' বহুবচন 'ইস্‌মাতুন' এর। এর অর্থ সুদৃঢ় বন্ধন। যেমন বিবাহ, চুক্তি ইত্যাদি। আলোচ্য বাক্যের দ্বারা মুশরিক রমণীকে বিবাহবদ্ধা রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, জুহ্‌রী বর্ণনা করেছেন, যখন আলোচ্য বাক্য অবতীর্ণ হলো, তখন হজরত ওমর তাঁর মক্কাবাসিনী দুই পৌত্তলিক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন। তাদের একজনের নাম ছিলো করীনা বিনতে আবী উমাইয়া ইবনে মুগীরা। ইসলাম গ্রহণের আগে হজরত মুয়াবিয়া তাকে বিবাহ করেছিলেন। অপর জনের নাম ছিলো উম্মে কুলসুম খাজাইয়া বিনতে আমর ইবনে জারদাল। তিনি ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের মা। তাঁকে বিয়ে করেছিলেন পৌত্তলিক আবু জুহাইম ইবনে হুজাফা ইবনে গানেম। হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহর স্ত্রী আরওয়া বিনতে রবীআ ইবনে হারেছ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটেছিলো। তিনি হিজরত করে মদীনায় আসেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী রয়ে যায় মক্কায়।

ইসলাম ধর্ম উভয়ের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটায় এবং আরওয়াকে বিয়ে করে পৌত্তলিক খালেদ ইবনে সা'দ ইবনে আস ইবনে উমাইয়া। শা'বী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর কন্যা হজরত জয়নাবের বিবাহ হয় আবুল আ'স ইবনে রবীর সঙ্গে। তিনি মুসলমান হওয়ার পর মদীনায় রসুল স. এর কাছে চলে আসেন। কিন্তু তার স্বামী পৌত্তলিক অবস্থায় রয়ে যায় মক্কাতেই। কিছুদিন পর তিনিও মদীনায় উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা যা ব্যয় করেছো তা ফেরত চাইবে এবং কাফেরেরা ফেরত চাইবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহ্‌র বিধান। 'তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন' অর্থ— কোনো মুসলিম রমণী যদি ধর্ম ত্যাগ করে অমুসলিমের কাছে চলে যায়, আর সে তাকে রেখে দেয়, তবে তার মুসলিম স্বামী তার প্রদত্ত মোহরানার অর্থ দাবি করতে পারবে ওই অমুসলিমের কাছে, যে তার পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করেছে।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ সবসময় সঠিক বিধানই দিয়ে থাকেন। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ এবং অতুলনীয়রূপে প্রজ্ঞাময়।

বাগবী লিখেছেন, জুহ্‌রী বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানেরা প্রদত্ত বিধানানুসারে আমল করতে শুরু করলেন। মুহাজির রমণীকে বিবাহ করতে চাইলে তাদের কাফের স্বামীকে ফেরত দিতে লাগলেন মোহরানার অর্থ, যা তারা পরিশোধ করেছিলো। কিন্তু অমুসলিমেরা এ বিধান মানলো না। যে সকল রমণী ধর্মত্যাগ করে তাদের সঙ্গে বিবাহবদ্ধা হলো, তাদের মোহরানা ফিরিয়ে দিলো না তাদের মুসলিম স্বামীদেরকে। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা মুমতাহিনা ঃ আয়াত ১১

www.eelm.weebly.com

❑ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেহ হাতছাড়া হইয়া কাফিরদের নিকট রহিয়া যায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে তখন যাহাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে, তাহারা যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে, ভয় কর আল্লাহ্কে, যাঁহাতে তোমরা বিশ্বাসী।

'ওয়া ইন ফাতাকুম শাইউম মিন আয্ওয়াজ্বিকুম ইলাল কুফ্ফার' অর্থ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের নিকট রয়ে যায়। এখানে 'শাইউন' (বস্তু) বলে বুঝানো হয়েছে স্ত্রীকে। এরকম করা হয়েছে কেবল ধর্মত্যাগীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনার্থে এবং ব্যাপকতার ক্ষেত্রে আধিক্য জ্ঞাপনার্থে।

অথবা 'শাইউন' দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে মোহর। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কারো মোহরানা তোমাদের আওতার বাইরে চলে যায় এবং কাফেররা যদি তা প্রত্যর্পণ না করে।

হাসান বসরী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উম্মুল হাকাম বিনতে আবু সুফিয়ান সম্পর্কে। সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো। তারপর তাকে বিয়ে করেছিলো সাকাফী গোত্রের এক লোক। সে ছাড়া কুরায়েশ গোত্রের আর কোনো মহিলা মুসলমান হওয়ার পর ইসলাম ত্যাগ করেনি।

'ফাআ'কাব্তুম' অর্থ এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে। বাগবী লিখেছেন, তাফসীরকারগণ কথাটির অর্থ করেছেন— যদি গণিমতের মাল তোমাদের হস্তগত হয়। কেউ কেউ অর্থ করেছেন— তোমরা যদি বিজয়ী হও এবং যদি পাও সুযোগ।

'ফাআতুল্ লাজীনা জাহাবাত আযওয়াজুহুম মিছলা মা আনফাক্ব' অর্থ তখন যাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তাদেরকে, তারা যা ব্যয় করেছে, তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। অর্থাৎ তখন তোমরা গণিমতের মাল থেকে তাদের কাফের স্বামীদেরকে ওই পরিমাণ অর্থ প্রদান কোরো, যা তারা ধর্মত্যাগিনীদের জন্য খরচ করে ছিলো।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ছয়জন হিজরতকারিণী ধর্মত্যাগ করে পৌত্তলিকদের কাছে চলে গিয়েছিলো। পরে তারা পুনরায় ফিরে এসেছিলো ইসলাম ধর্মে। রসুল স. তাদের ধর্মত্যাগিনী অবস্থার স্বামীদেরকে গণিমতের মাল থেকে মোহরানার অর্থ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। ওই সকল রমণীর নাম ১. উম্মুল হাকাম বিনতে আবু সুফিয়ান, আয়ায ইবনে শাদ্দাদ ইবনে ফাহরীর স্ত্রী। ২. মাতা মহোদয়া উম্মে সালমার বোন ফাতেমা বিনতে আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরা, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের স্ত্রী। ৩. বরু বিনতে আকাবা, শাম্মাস ইবনে ওসমানের স্ত্রী। ৪. ইয্যা বিনতে আবদুল উয্যা ইবনে ফুযালা, ওমর ইবনে আবদুদের স্ত্রী। ৫. হিন্দা বিনতে আবু জেহেল ইবনে হিশাম, হিশাম ইবনে আ'স ইবনে ওয়ায়েলের স্ত্রী। ৬. উম্মে কুলছুম বিনতে খারদাল, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের স্ত্রী।

বায়যাবী 'ফাআ'ক্বাব্তুম' কথাটির অর্থ করেছেন— এভাবে তোমাদের পালা (উক্ববা) যদি এসে যায়। যেমন— মুমিনেরা কাফেরদেরকে মোহরানার অর্থ দিয়েছিলো, তেমনি কাফেরদের কাছে থাকা ইসলাম পরিত্যাগকারিণীদের মোহরানার অর্থ আদায় করার সুযোগ। বিষয়টি এরকম, যেনো এক বাহনে দুই আরোহী পালাক্রমে আরোহণ করে চলেছে। আর 'ফাআতুল্ লাজীনা জাহাবাত আয্ওয়াজুহুম মিছলা মা আনফাক্ব' কথাটির ব্যাখ্যা বায়যাবী করেছেন এভাবে— হিজরতকারিণীদেরকে ওই পরিমাণ অর্থ দাও, যা কাফেরেরা তাদেরকে দিয়েছিলো।

তাদের প্রাক্তন কাফের স্বামীদেরকে কিছুই দিয়ো না। কিন্তু কথাটির যথার্থ ব্যাখ্যাই সেটাই, যা আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। বাগবী লিখেছেন, হিজরতকারিণীদের পূর্বের কাফের স্বামীদেরকে মোহরানার অর্থ পরিশোধ করা ওয়াজিব, না মোস্তাহাব সে সম্পর্কে রয়েছে মতপ্রভেদ। এ সম্পর্কে আলেমদের রয়েছে দু'টি অভিমত। আর অভিমত দু'টোর ভিত্তি হচ্ছে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির ওই শর্ত— হিজরতকারী পুরুষ ও মহিলাদেরকে কাফেরদের হাতে সমর্পণ করা ওয়াজিব, অথবা ওয়াজিব নয়। প্রথমোক্ত অভিমতটির দলিল এই যে, চুক্তিনামায় লিখিত ছিলো 'আহাদুম্ মিন্না'। অর্থাৎ আমাদের মধ্য থেকে কোনো পুরুষ অথবা রমণী যদি মুসলমান হয়ে আপনার (রসুল স. এর) কাছে চলে আসে তবে আপনি তাকে অবশ্যই ফেরত দিবেন। শর্তটি ছিলো সাধারণ। অর্থাৎ পুরুষ ও রমণী উভয়েই ছিলো শর্তটির অন্তর্ভুক্ত। তবে পরবর্তীতে রমণীদের বিষয়টি রহিত করে দেওয়া হয় 'তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ো না' এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে। এভাবে যখন হিজরতকারিণীদেরকে ফেরত দেওয়ার বিষয়টি রহিত হয়ে যায়, তখন তাদের পূর্বতন কাফের স্বামীদেরকে তাদের প্রদত্ত মোহরানার অর্থ পরিশোধ করা হয়ে যায় ওয়াজিব। আর দ্বিতীয় অভিমতের সপক্ষে যুক্তি এই যে, প্রথম থেকেই শর্ত করা হয়েছিলো কেবল পুরুষদের জন্য। মেয়েদের ফেরত দেওয়ার কথা প্রথম থেকেই অনুল্লেখিত ছিলো। আর এমতোক্ষেত্রে পুরুষ ও রমণীর পার্থক্য করার কারণ ছিলো, পুরুষদেরকে ফিরিয়ে দিলে তাদের ধর্মত্যাগ করার সম্ভাবনা ছিলো কম। কাফেরেরা ভয় দেখিয়ে তাদের মুখ থেকে ইমানবিরোধী বাক্য উচ্চারণ করিয়ে নিতে পারলেও, তাদের অন্তরের ইমান ছিনিয়ে নেওয়ার সাধ্য

www.eelm.weebly.com

তাদের ছিলো না। কেননা পুরুষেরা হয় সাধারণত কুশলী ও দৃঢ়চেতা। কিন্তু রমণীমন স্বভাবতই দুর্বল। কাজেই তাদেরকে পুরোপুরি ধর্মত্যাগিনী বানানো অপেক্ষাকৃত সহজ। আত্মরক্ষামূলক কৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রেও তারা পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্না নয়। তাই তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি প্রথম থেকেই অনুল্লেখিত ছিলো। এমতো বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মোহরের অর্থ পরিশোধ করে দেওয়ার বিষয়টি তো মোস্তাহাবই হবে।

আমি বলি, প্রথম থেকেই চুক্তিপত্রে পুরুষ ও নারী উভয়ের কথা লিপিবদ্ধ ছিলো। কিন্তু পরে নারীদের ফেরত দানের প্রসঙ্গটি রহিত করে দেওয়া হয়। কেননা চুক্তির দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে নারীদের ফেরত দেওয়ার বিষয়টি জরুরী ছিলো না। সুতরাং তাদেরকে ফেরত দেওয়ার যেমন কোনো হেতু নেই, তেমনি তাদের জন্য নতুন কোনো বিধান অবতীর্ণ হওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিকভাবেই এটা বুঝা যায় যে, তাদেরকে ফেরত দেওয়া যেহেতু নিষিদ্ধ তাই তাদের মোহরানা ফিরিয়ে দেওয়াও ওয়াজিব। 'কাফেরেরা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ো' এরকম নির্দেশসূচক বক্তব্য এ বিষয়টিকেই প্রমাণ করে। আর 'এটাই আল্লাহ্‌র বিধান' কথাটির উদ্দেশ্যও এরকম।

'আললাজী আনতুম বিহী মু'মিনূন' অর্থ যাতে তোমরা বিশ্বাসী। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে যখন তোমরা প্রভুপালক ও নির্দেশদাতা বলে মেনে নিয়েছো, তখন সকলক্ষেত্রে তাঁরই আনুগত্যকে আশ্রয় করো। বিরত থাকো তাঁর অনানুগত্য থেকে।

একটি সংশয় ঃ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা তো নিষিদ্ধ। তাহলে হিজরতকারিণীদের ফেরত প্রদানের যে অঙ্গীকার করা হয়েছিলো, সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হলো কেনো?

সংশয়ভঞ্জন ঃ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অবশ্যই নিষিদ্ধ। কিন্তু এমতোক্ষেত্রে শর্তটির আংশিকভাবে রহিত করা হয়েছিলো এক বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, নারীদেরকে ফেরত না দেওয়ার বিষয়টি অঙ্গীকার ভঙ্গের আওতায় পড়ে না। কেননা তা রহিত করা হয়েছে অপর পক্ষের অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রেক্ষাপটে। অর্থাৎ কাফেরেরাই প্রথমে এ ব্যাপারে শর্তভঙ্গ করেছিলো। তারই অত্যাবশ্যক পরিণতিতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে শর্তটি উঠিয়ে নেওয়া হয়।

বাগবী লিখেছেন, বর্তমান সময়েও কোনো নারী মুসলমান হয়ে গেলে, তার প্রাক্তন কাফের স্বামীকে মোহ্‌রানা পরিশোধ করে দিতে হবে কিনা, সে সম্পর্কে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। মুজাহিদ, কাতাদা ও আতা বলেছেন, এখন আর তা ওয়াজিব নয়। আর আলোচ্য আয়াতের বিধানটিও এখন রহিত। আমি বলি, কোনো আয়াতকে রহিত বলে গণ্য করতে পারা যাবে তখন, যখন পাওয়া যাবে তার রহিতকারী আয়াত। কিন্তু এমতোক্ষেত্রে সেরকম কোনো আয়াত তো নেই। তাই কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, বিধানটি অ-রহিত। অতএব তা পূর্বের মতো এখনও সমান কার্যকর।

সূরা মুমতাহিনা ঃ আয়াত ১২

❑ হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার নিকট আসিয়া বায়'আত করে এই মর্মে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কোন শরীক স্থির করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করিবে না, তাহারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করিয়া রটাইবে না এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করিবে না তখন তাহাদের বায়'আত গ্রহণ করিও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিও। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এখানে 'ইয়া আইয়্যুহান নাবীয়্যু' অর্থ হে আমার বার্তাবাহক! 'ইজা জ্বাআকাল মু'মিনাতু ইউবায়ীনাকা আলা আঁল্লা ইউশরিকনা বিল্লাহি শাইয়া' অর্থ মুমিন নারীগণ যখন আপনার কাছে এসে বায়াত করে। 'ওয়ালা ইয়াসরিক্বনা' অর্থ চুরি করবে না। 'ওয়ালা ইয়াযনীনা' অর্থ ব্যভিচার করবে না। 'ওয়ালা ইয়াক্বতুলনা আওলাদাহুন্‌না' অর্থ নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না। উল্লেখ্য, মূর্খতার যুগের রীতি অনুসারে আরববাসীরা তাদের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলতো।

www.eelm.weebly.com

'ওয়ালা ইয়া'তীনা বিবুহতানিইঁ ইয়াফ্তারীনাহু বাইনা আইদীহিন্না ওয়াআরজুলিহিন্না' অর্থ তারা সজ্ঞানে কোনো অপবাদ রচনা করে তা রটনা করবে না। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে 'আইদী' (হাত) ও 'আরজুল' (পা) শব্দদু'টো স্পষ্ট করে উল্লেখ করার কারণ এই যে, মহাবিচারের দিবসে মানুষের হাত ও পা কৃত পাপের সাক্ষ্য প্রদান করবে। সুতরাং এখানে এই মর্মে সকলকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেনো সাক্ষীর (হাত ও পায়ের) সামনে পাপ করা থেকে হুঁশিয়ার হয়ে যায়। আর এখানে 'হাত ও পায়ের সামনে' এর মর্মার্থ— সজ্ঞানে, জেনে শুনে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে হাত ও পায়ের সামনে অপবাদ রচনা ও রটনা করে অর্থ কোনো নারী অন্যের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তান বলে পরিচয় দেয়। স্বামীকে বলে, এ সন্তান তোমার। এরকম নারীর ব্যভিচার, ব্যভিচারের সন্তান গর্ভেধারণ ও জন্মদান সবকিছুই সংঘটিত হয় তার হাত পায়ের সামনে। আর 'বুহতান' বলে সব ধরনের মিথ্যাচারকে। তবে এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রজনন সংক্রান্ত অপবাদ প্রকাশার্থে।

'ওয়ালা ইয়া'সীনাকা ফী মা'রূফিন' অর্থ এবং সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে না। অর্থাৎ তারা আপনার নির্দেশানুসারে শুভকর্ম সম্পাদন করবে এবং বিরত থাকবে অশুভ কর্ম থেকে। উল্লেখ্য, রসুল স. সব সময় সৎকর্মেরই আদেশ দিতেন। সুতরাং এখানে 'সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে না' এরকম বলার প্রয়োজন হয়তো ছিলো না। তৎসত্ত্বেও এখানে এরকম বলে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্র অবাধ্য হওয়ার ব্যাপারে কেউ কোনো নির্দেশ দিলে তা পালন করা জায়েয নয়।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে না' বলে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, কোনো রমণী যেনো কোনো পরপুরুষের সঙ্গে নির্জন স্থানে অবস্থান না করে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, কালাবী ও আবদুর রহমান ইবনে জায়েদ বলেছেন, কথাটির অর্থ— বিপদগ্রস্তা হলে কোনো নারী যেনো বিলাপ শুরু না করে, মস্তক মুণ্ডন না করে ফেলে ক্ষোভে দুঃখে, ছিঁড়ে ফেঁড়ে না ফেলে পরনের কাপড়, চপেটাঘাত যেনো না করে চোখে-মুখে, মাহরাম পুরুষের অনুপস্থিতিতে কথাবার্তা যেনো না বলে বেগানা পুরুষের সামনাসামনি হয়ে পর্দারহিত অবস্থায়, নির্জন স্থানে যেনো অবস্থান না করে পরপুরুষের সঙ্গে (ভ্রমণে যেনো বের না হয় গায়ের মাহরাম পুরুষের সঙ্গে)। ইবনে জারীর, তিরমিজি ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, মাতা মহোদয়া উম্মে সালমা উল্লেখ করেছেন, রসুল স.

এখানকার 'লা ইয়া'সীনাকা' কথাটির অর্থ করেছেন— যেনো বিলাপ না করে। বোখারী লিখেছেন, হজরত উম্মে আতিয়া বলেছেন, আমরা যখন রসুল স. এর কাছে বায়াত গ্রহণ করলাম, তখন তিনি স. এই আয়াত পাঠ করে বললেন, আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক কোরো না, বিলাপ কোরো না। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে একজন তার হাত গুটিয়ে নিলো। বললো, অমুক মহিলা আমাকে বিলাপ করার কাজে সহযোগিতা করেছিলো। সুতরাং আমাকে তো তার ঋণ শোধ করতে হবে। আমি প্রথমে তার ঋণ শোধ করবো। তারপর বায়াত গ্রহণ করবো। একথা বলেই সে চলে গেলো এবং কিছুক্ষণ পর এসে বায়াত গ্রহণ করলো।

হজরত আবু মালেক আশয়ারী থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে মূর্খতার যুগের চারটি অপপ্রথা রয়েছে, তারা তা বর্জনও করবে না। সেগুলো হচ্ছে— বংশমর্যাদার গর্ব করা, অন্যের বংশকে হেয় প্রতিপন্ন করা, তারকারাজির কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা এবং বিলাপ করা। রসুল স. আরো বলেছেন বিলাপকারিণী তওবা না করে মারা গেলে তাকে পুনরুত্থান দিবসে ওঠানো হবে আলকাতরার জামা ও ওড়না পরিহিতা অবস্থায়। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দুঃখে পড়ে মুখে আঘাত করে, জামা ছিঁড়ে ফেলে এবং মূর্খতার যুগের মতো বিলাপ করে কাঁদে, সে আমার উত্তম নয়। হজরত আবু সাইদ খুদরী থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বিলাপকারিণী ও বিলাপ শ্রবণকারিণীকে অভিসম্পাত দিয়েছেন।

'ফাবায়ী'হুন্না' অর্থ তখন তাদের বায়াত গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ তখন বলবেন, বর্ণিত শর্তের উপরে যদি তোমরা বায়াত গ্রহণ করো, তবে আমিও তোমাদের পুণ্যময় বায়াতে অংশগ্রহণ করলাম। 'ওয়াস্তাগ্ফির লাহুন্নাল্লহ্' অর্থ এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। অর্থাৎ তখন আপনি এই মর্মে আমার কাছে আবেদন করবেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি দয়া করে এই বায়াত গ্রহণকারিণীদের সকল পাপ মার্জনা করো। আর 'ইন্নাল্লহা গফুরুর রহীম' অর্থ আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। রহীমুন অর্থ পরম দয়ালু, ভবিষ্যত হেদায়েতের সামর্থ্য দানকারী। বোখারী লিখেছেন, মাননীয়া মাতা আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিধানানুসারে রসুল স. মেয়েদেরকে স্বকর্তৃত্বাধীনে মৌখিকভাবে বায়াত করাতেন। তাঁর স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের হাত স্পর্শ করে বায়াত করাতেন না।

বাগবী লিখেছেন, মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বর্ণনা করেছেন, উমাইমা বিনতে রুকাইবা বলেছেন, আমি কতিপয় মহিলার সঙ্গে রসুল স. এর কাছে বায়াত গ্রহণ করলাম। তিনি স. তখন একথাও বললেন যে, যেমন তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ্র রসুল আমার কাছে আমার জীবনের চেয়ে অধিক প্রিয়। মুখে বললাম, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহক! আমাদের সঙ্গে করমর্দন করুন। তিনি স. বললেন, আমি মেয়েদের সঙ্গে করমর্দন করি না। আমার যে কথা একজন মেয়ের প্রতি প্রযোজ্য, সে কথা প্রযোজ্য শত মেয়ের জন্য।

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো জ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় মক্কা বিজয়ের দিবসে। কিন্তু তাঁদের এমতো অভিমত যথার্থ নয়। আমি আয়াতে ইমতেহানের তাফসীরে মহা মাননীয়া মাতা আয়েশা সিদ্দীকা থেকে উল্লেখ করেছি, রসুল স. এই আয়াত পাঠ করে হিজরতকারিণীদেরকে পরীক্ষা করতেন। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কিছুকাল পরে।

রসুল স. মক্কা বিজয়ের দিন সাফা পাহাড়ের উপরে উঠে পুরুষদের বায়াত সম্পন্ন করলেন। হজরত ওমর তখন ছিলেন রসুল স. এর চেয়ে কিছুটা নিম্নস্থানে। তিনি রসুল স. এর নির্দেশে মেয়েদের বায়াত সম্পন্ন করলেন। রসুল স. এর পক্ষ থেকে তিনি তাদেরকে ধর্মের বাণী পৌঁছে দিলেন। গোত্রপতি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিনদা বিনতে উতবাও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তিনি ছিলেন নেকাব পরিহিতা অবস্থায়। তাঁর আশংকা ছিলো, রসুল স. হয়তো তাঁকে চিনে ফেলবেন। মেয়েরা যখন সকলে সমবেত হলো, তখন রসুল স. তাঁদেরকে বললেন, আমি তোমাদের কাছ থেকে এই মর্মে বায়াত গ্রহণ করছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে অথবা কোনোকিছুকে শরীক করবে না। হিন্দা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি যেভাবে পুরুষদের কাছ থেকে বায়াত গ্রহণ করলেন, সেরকমভাবে আমাদের কাছ থেকে বায়াত গ্রহণ করছেন না। আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের ও আমাদের বায়াতের বাণী ভিন্নতর। উল্লেখ্য, তিনি স. সেদিন পুরুষদের কাছে থেকে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন কেবল ইসলাম ও জেহাদের বিষয়ে। তিনি স. হিনদার কথায় জবাব না দিয়ে বলে যেতে লাগলেন, বলো, তোমরা চুরি করবে না। হিনদা বললো, আবু সুফিয়ান বড়ই কৃপণ। তাই আমি তার অগোচরে তার অর্থ সম্পদ থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করতাম। এভাবে নেওয়া অর্থ সম্পদ কি আমার জন্য বৈধ ছিলো, না অবৈধ? আবু সুফিয়ান বললেন, তুমি যে ভাবে আগে গ্রহণ করতে, সেভাবে ভবিষ্যতেও গ্রহণ করতে পারবে। তাঁদের দু'জনের কথা শুনে রসুল স. হেসে ফেললেন। বললেন, নিশ্চয় তুমি হিনদা বিনতে উতবা। তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতীতে যা কিছু ঘটেছে, তা আপনি মাফ করে দিন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে মার্জনা করুন। এরপর বললেন, বলো, ব্যভিচার করবে না। হিনদা বললো, কোনো স্বাধীনা রমণী কি ব্যভিচার করতে পারে? তিনি স. বললেন, বলো, তোমরা আপন সন্তানকে হত্যা করবে না। হিনদা বললো, আমার শিশু সন্তানকে আমি লালন-পালন করে বড় করেছিলাম। আপনি তাকে হত্যা করিয়েছেন। উল্লেখ্য, হিনদার পুত্র হানযালা ইবনে আবু সুফিয়ান বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো। হজরত ওমর হিনদার কথা শুনে উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করলেন। তিনি এতো বেশী হাসলেন যে, হাসির দমকে পিছনের দিকে পড়ে যাবার উপক্রম হলেন। রসুল স.ও মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, এবার বলো, তোমরা অপবাদ রটাবে না। হিনদা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! অপবাদ রটনা করা তো অতীব মন্দ বিষয়। আর আপনি তো আমাদেরকে উপদেশ দেন সরলপথে চলার এবং উত্তম

চরিত্র অর্জনের। এরপর রসুল স. বললেন, এবার বলো, সৎকাজে আমাকে অমান্য করবে না। হিনদা বললো, আমরা উপস্থিত হয়েছি পবিত্র এক অনুষ্ঠানে। সুতরাং আপনাকে অমান্য করার ধারণা আমাদের মনে আসতেই পারে না। এভাবে রসুল স. সমাপ্ত করলেন মেয়েদের অঙ্গীকারানুষ্ঠান। উপস্থিত সকল মহিলা তা সর্বান্তঃকরণে স্বীকারও করে নিলেন।

পুরুষদের কাছ থেকে ইসলামের বায়াত গ্রহণ করা হয়েছিলো সংক্ষেপে, আর মেয়েদের নিকট থেকে কিছুটা বিস্তৃতভাবে। এর কারণ, কতকগুলো অপরাধ বিশেষভাবে করে থাকে কেবল মেয়েরাই। যেমন অজ্ঞতাবশতঃ অনেক মেয়ে শিরিকমিশ্রিত বিশ্বাসকে লালন করে, গোপনে স্বামীর টাকা পয়সা সরিয়ে ফেলে, কেউ কেউ ব্যভিচারজাত সন্তানকে হত্যা করে। এভাবে তারা একই সঙ্গে খর্ব করে আল্লাহ্ ও তাদের স্বামীদের অধিকার। অন্যের সন্তানকে স্বামীর সন্তান বলে চালিয়ে দেওয়া, স্বামীর সম্পত্তিতে তাকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা, অপবাদ রচনা ও রটনা করা, বানিয়ে বানিয়ে কথা বলা, বিলাপ করা, হায়হুতাশ করা, চিৎকার করে কাঁদা, শরীরে আঘাত করা, জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলা— এ সকল কাজ করতে পারে কেবল তারাই। স্বামীর অনুগ্রহ-অনুকম্পার কথাও তারা ভুলে যেতে পারে সহজে। তাই রসুল স. এসকল বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাঁদেরকে অঙ্গীকারাবদ্ধা করেছিলেন। আর জেহাদ যেহেতু পুরুষদের বৈশিষ্ট্য, তাই বিশেষভাবে জেহাদের অঙ্গীকার তিনি গ্রহণ করেছিলেন পুরুষদের নিকট থেকে।

ইবনে মুনজির মোহাম্মদ ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে মোহাম্মদ থেকে, তিনি ইকরামা, অথবা সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং জায়েদ ইবনে হারেছ কতিপয় ইহুদীর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতেন। তাঁদের এ বিষয়টির দিকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয় নিম্নোক্ত আয়াত। বলা হয়—

সূরা মুমতাহিনা ঃ আয়াত ১৩

www.eelm.weebly.com

❑ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না, উহারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে যেমন হতাশ হইয়াছে কাফিররা কবরস্থদের বিষয়ে।

এখানে 'কুওমান গদ্বিবাল্লহু আলাইহিম' অর্থ আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট। অর্থাৎ ইহুদী সম্প্রদায়। এরকম বলেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। বাগবী লিখেছেন, কিছুসংখ্যক দরিদ্র মুসলমান ইহুদীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতো। তারা মুসলমানদের কিছু কিছু সংবাদ তাদেরকে জানাতো। বিনিময়ে পেতো কিছু

আর্থিক সহায়তা। আল্লাহ্ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট' বলে সাধারণভাবে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকেই বুঝানো হয়েছে।

'ক্বদ্ ইয়াইসূ মিনাল আখিরাতি' অর্থ তারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন, কথাটির উদ্দেশ্য যদি ইহুদীদেরকেই ধরা হয়, তবে তাদের নিরাশ হওয়ার বিষয়টি হতে পারে এরকম— তারা রসুল স. এর নবুয়ত ও মোজেজাকে অস্বীকারকারী। অথচ তওরাতে রয়েছে রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর স্পষ্ট বিবরণ। তাই তারা তাঁকে ভালোভাবেই চিনে ও জানে। কিন্তু তাঁকে অস্বীকার করে কেবল হিংসা ও বিদ্বেষবশতঃ। জেনে শুনে বুঝেও তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে এবং নিরাশ হয়ে যায় পরকালের কৃতকার্যতা থেকে। আর যদি 'আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট' বলে বুঝানো হয় সকল অবিশ্বাসীকে তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কাফেরেরা পরকাল, সওয়াব, আযাব এসকল কিছু যেহেতু বিশ্বাসই করে না, তাই পরকাল সম্পর্কে কোনো আশাও তাদের নেই। নৈরাশ্যই তাদের একমাত্র আশ্রয়।

'কামা ইয়াইসাল কুফ্ফারু মিন আসহাবিল কুবূর' অর্থ যেমন হতাশ হয়েছে কাফেরেরা কবরস্থদের বিষয়ে। অর্থাৎ কবরে জীবনপ্রাপ্ত হওয়া, শাস্তি ভোগ করা এ সকল বিষয়েও কাফেরেরা অবিশ্বাসী, নিরাশ। যদি 'আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট' বলে বুঝানো হয় সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে, তবে এখানকার 'কুফ্ফারু' কথাটির পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে এ বিষয়টিই প্রমাণিত হবে যে, কুফরী-ই তাদেরকে আখেরাতের সাফল্য সম্পর্কে নিরাশ করে ফেলেছে। এভাবে ব্যাখ্যা করলে এখানকার 'কবরস্থদের বিষয়ে' কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে 'ইয়াইসা' (হতাশ হয়েছে) ক্রিয়ার সঙ্গে এবং এমতাবস্থায় এখানকার ক্রিয়ার আধার হয়ে যাবে বাতিল। কারো কারো মতে এখানে 'জরফ'(ক্রিয়ার আধার) হবে 'মুসতাক্বর'(আবাসস্থল) আর 'কবরস্থ বিষয়ে' হবে 'কাফেরেরা' এর বিবরণ। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— কবরে সমাহিত কাফেরেরা যেমন আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ, তেমনই ইহুদীরা নিরাশ পরকালের সাফল্য সম্পর্কে। সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং মুজাহিদ এরকমই বলেছেন।

সূরা আস্সফ্ফ

পুণ্যভূমি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরা খানি। এর মধ্যে রুকু রয়েছে ২টি এবং আয়াত ১৪টি।

তিরমিজি ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক 'বিশুদ্ধ' আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেছেন, আমরা কয়েকজন বসে একদিন বলাবলি করছিলাম আমরা যদি জানতে পারতাম কোন আমল করলে আল্লাহ্র অধিক প্রিয়ভাজন হওয়া যায়, তবে আমরা সেই আমলই করতাম। তখন অবতীর্ণ হয়—

সূরা সফ্ফ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

www.eelm.weebly.com

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা যাহা কর না তাহা তোমরা কেন বল?
❑ তোমরা যাহা কর না তোমাদের তাহা বলা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।
❑ যাহারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে ভালবাসেন।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আকাশসমূহ, পৃথিবী ও এতদুভয়স্থিত সকল কিছুই নিরন্তর ঘোষণা করে চলেছে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বলো, যে আমল আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয়, আমরা তা-ই করবো। আমি বললাম, আমার কাছে প্রিয় আমল হচ্ছে জেহাদ। কিন্তু একথা যখন তোমরা জানলে, তখন আর তোমরা এ বিষয়ে আগ্রহ দেখালে না। তাহলে বলো, কেনো তোমরা এমন কথা বলো, যা কার্যকর করতে চাও না? এরকম আচরণ আমার মোটেও পছন্দ নয়। যারা আমার পথে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, আমি তাদেরকে ভালোবাসি।

হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম বলেছেন, রসুল স. আমাদেরকে এই সুরা শেষ পর্যন্ত পাঠ করে শুনিয়েছেন। ইবনে জারীরও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন। বাগবী লিখেছেন, ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, কিছু সংখ্যক মুসলমান বলেছিলেন, আমরা যদি জানতাম আল্লাহ্‌র কাছে সব চেয়ে প্রিয় আমল কোনটি, তাহলে সেই আমলের জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করতাম। তাঁদের এমতো কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় 'যারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো, আল্লাহ্‌ তাদেরকে ভালোবাসেন'। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই উহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণকে পরীক্ষা করা হয়েছিলো। আর ওই যুদ্ধে কিছুসংখ্যক মুসলমান পৃষ্ঠপ্রদর্শনও করেছিলো। তখন অবতীর্ণ হয়েছিলো

'তোমরা যা করো না, তা তোমরা কেনো বলো'? আবু সালেহ্‌ সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, মুসলমানগণ বলেছিলেন, আমরা যদি জানতে পারতাম, কোন আমল আল্লাহ্‌র নিকটে সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় ও উত্তম, তাহলে আমরা সেই আমলই করতাম। তখন অবতীর্ণ হয় 'ইয়া আইয়্যুহাল্‌ লাজীনা আমানু হাল আদুললুকুম আ'লা তিজ্বারাহ' ('হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদেরকে একটা ব্যবসা সম্পর্কে বলবো')। কিন্তু কারো কারো কাছে জেহাদকে মনে হলো অত্যন্ত কঠিন। তখন অবতীর্ণ হলো 'তোমরা যা করো না, তা তোমরা বলো কেনো? হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আলী সূত্রে ইবনে আবী হাতেমও অনুরূপ বলেছেন। হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে ইকরামার মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম এবং জুহাক সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, 'তোমরা যা করো না, তা তোমরা কেনো বলো' এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো ওই সকল লোক সম্পর্কে, যারা যুদ্ধের সময় তরবারী বা বর্শা কোনোটাই উত্তোলন করতো না। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, মুকাতিল বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের সময় যারা রণপ্রান্তর থেকে পালিয়ে এসেছিলো, তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা সম্পর্কে যখন আল্লাহ্‌ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করলেন, তখন সাহাবীগণ বলতে শুরু করলেন, ভবিষ্যতে এরকম সুযোগ পেলে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবো। কিন্তু উহুদ যুদ্ধের সময় দেখা গেলো, কেউ কেউ পশ্চাদপসরণ করলেন। আল্লাহ্‌ তাদেরকে লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তখন অবতীর্ণ করলেন এসকল আয়াত। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এ সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো কপটাচারীদের সম্পর্কে, যারা মুসলমানদেরকে সাহায্য করবে বলে অঙ্গীকার করতো, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করতো না।

'কাবুরা মাক্বতান ই'নদাল্লহ' অর্থ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক। 'মাক্বতান' বলে কঠিন ক্রোধকে। এরকম বলে এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, কথানুরূপ কাজ না করাকে আল্লাহ্‌ খুবই অপছন্দ করেন। কারণ এরকম স্বভাব স্পষ্টতই কপটাচরণ। সুতরাং বিশ্বাসবানেরা যেনো কখনোই এরকম না করে।

'সফ্‌ফান' অর্থ সারিবদ্ধভাবে। 'মারসূস' অর্থ সৃদৃঢ় প্রাচীরের মতো। 'রস' বলে ওই অট্টালিকাকে, যার এক অংশ অপরাংশের সঙ্গে সুদৃঢ়রূপে সম্পৃক্ত, মধ্যখানে যার এতটুকুও ফাঁক-ফোকর বা ফাটল থাকে না।

সূরা সফ্‌ফঃ আয়াত ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

---

www.eelm.weebly.com

❑ স্মরণ কর, মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিতেছ যখন তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল। অতঃপর উহারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করিল তখন আল্লাহ্ উহাদের হৃদয়কে বক্র করিয়া দিলেন। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

❑ স্মরণ কর, মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা বলিয়াছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমার পূর্ব হইতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রহিয়াছে আমি তাহার সমর্থক এবং আমার পরে আহ্‌মদ নামে যে রাসূল আসিবে আমি তাহার সুসংবাদদাতা। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের নিকট আসিল তখন উহারা বলিতে লাগিল, 'ইহা তো এক স্পষ্ট জাদু।'

❑ যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হইয়াও আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

❑ উহারা আল্লাহ্‌র নূর ফুৎকারে নিভাইতে চাহে কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিবেন, যদিও কাফিররা উহা অপসন্দ করে।

❑ তিনিই তাঁহার রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর উহাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকগণ উহা অপসন্দ করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! স্মরণ করুন আমার প্রিয় নবী মুসার কথা। তিনি বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীকে বলেছিলেন, হে আমার স্বজাতি! তোমরা আমাকে কেনো অমান্য করছো? একথা বলে কেনো

আমাকে কষ্ট দিচ্ছো যে, আমি স্ফীত অণ্ডকোষবিশিষ্ট। এটা কি তোমাদের জন্য শোভন, না সমীচীন? অথচ আমি যে তোমাদের পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরিত নবী, তা তোমরা ভালো করেই জানো। তোমরা আমার মোজেজাসমূহ দেখেছো, এখনও দেখে চলেছো। অত্যাচারী মিসরাধিপতির অত্যাচার থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার তো করেছি আমিই। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তোমাদেরকে নিয়ে এসেছি এই নিরাপদ স্থানে, তীহ প্রান্তরে। তবু তোমরা জেনে শুনে আমাকে কষ্ট দিচ্ছো কেনো? নবীকে কি কষ্ট দিতে হয়, না তার প্রতি প্রদর্শন করতে হয় সম্মান? নবী মুসার এমতো উপদেশের প্রতি তারা কর্ণপাত করলো না। সহজ হেদায়েতের সরল পথ পরিত্যাগ করে চলতে শুরু করলো গোমরাহীর বক্র পথে। তখন আমি তাদের হৃদয়বৃত্তিকেও বক্র করে দিলাম। হে আমার প্রিয়তম রসুল! শুনে রাখুন, পাপাচারিতার উপরেই যারা অনড় অবস্থান গ্রহণ করে, আমি তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করি না।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— স্মরণ করো, মরিয়ম তনয় ঈসা বলেছিলো, হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রসুল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের নিকট যে তওরাত রয়েছে, আমি তার সমর্থক'। লক্ষণীয়, হজরত মুসা বনী ইসরাইলদেরকে সম্বোধন করেছিলেন 'হে আমার সম্প্রদায়' বলে। কিন্তু হজরত ঈসা সম্বোধন করেছেন 'হে বনী ইসরাইল' বলে। এর কারণ এই যে, আল্লাহ্ তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন পিতা ব্যতিরেকে। আর বংশপরিচিতি সাব্যস্ত হয় পিতার পরিচয়ে। তাই তিনি নিজেকে বনী ইসরাইল বংশভূত মনে করেননি। হজরত মুসার মতো 'হে আমার সম্প্রদায়' না বলে বলেছেন' 'হে বনী ইসরাইল'!

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমার পরে আহমদ নামে যে রসুল আসবে, আমি তার সুসংবাদদাতা'।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'ইসমুহু আহমদ' অর্থ আহমদ নামে। উল্লেখ্য, শেষ রসুলের এক নাম আহমদ। এটা হচ্ছে 'আহমাদু' 'আফজালু' এর ওজনে ইসমে তাফজীলের শব্দরূপ। রসুল স. হচ্ছেন হামিদ (প্রশংসাকারী) এবং মাহমুদ (প্রশংসিত)। নবী-রসুলগণ সকলেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনাকারী। আর রসুল স. হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রশংসা বর্ণনাকারী। তাঁরা সকলে প্রশংসিতও ছিলেন। আর রসুল স. এক্ষেত্রেও তাঁদের সকলের অগ্রণী। বরং তিনি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী। তাই তাঁর নাম মোহাম্মদ। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেছেন, রসুল স. ছিলেন দু'রকমের বেলায়েতধারী। একটি হচ্ছে বেলায়েতে মোহাম্মদিয়া, যা বিজড়িত মহব্বতের সঙ্গে। আর অপরটি হচ্ছে বেলায়েতে আহমদিয়া। এই বেলায়েতই হচ্ছে মাহবুবিয়াতের মাকাম। এমতো ব্যাখ্যার আলোকে এখানকার 'আহমদ' মাহবুবিয়াত থেকে এসেছে বলে ধরে নেওয়াই উত্তম।

হজরত ঈসা এখানে নিজেকে মহাগ্রন্থ তওরাতের সমর্থক বলে ঘোষণা করেছেন। তার সঙ্গে সুসংবাদ দিয়েছেন শ্রেষ্ঠতম রসুলের মহাআবির্ভাবের। তওরাত শরীফে শেষতম রসুলের বৈশিষ্ট্যাবলীর সুস্পষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আর তাঁর মহাআবির্ভাবের সংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন পূর্ববর্তী যুগের সকল নবী-রসুল। তাছাড়া সকল আকাশজ গ্রন্থেই তাঁর মহাআগমনের শুভসংবাদ সুমুদ্রিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট এলো, তখন তারা বলতে লাগলো, এতো এক স্পষ্ট 'যাদু'। একথার অর্থ— অতঃপর নবী ঈসা তাঁর নবুয়তের সত্যতার সমর্থনে যখন মৃতকে জীবিত, জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান এবং কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দেখালেন, তখন তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। বললো, এগুলো তো স্পষ্টতই যাদু। অথবা— রসুল স. যখন চন্দ্রদ্বিখণ্ডন ইত্যাদি অলৌকিকত্ব কুরায়েশদের সম্মুখে প্রদর্শন করলেন, তৎসহ চিরজীবন্ত অলৌকিকত্ব কোরআন মজীদের বাণীসম্ভার তাদেরকে আবৃত্তি করে শোনালেন, তখন তারা বলতে শুরু করলো, এগুলো তো যাদু ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, তার অপেক্ষা অধিক জালেম আর কে'? এখানে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে' অর্থ আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক স্থাপন করে। বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেন' 'ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা'। অথবা বলে 'আল্লাহ্ কোনো মানুষের উপরে কোনো কিছু অবতীর্ণ করেননি'। কিংবা বলে 'আল্লাহ্ আমাদেরকে এমতো নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেনো কাউকে কখনো নবী বলে না মানি, যতক্ষণ না তার কোরবানী আকাশ থেকে আগুন এসে ভস্ম করে দিয়ে যায়'। অথবা বলে 'নবী মুসার শরিয়তই কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে'।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না'। একথার অর্থ আল্লাহ্‌র চিরন্তন নির্ধারণানুসারে যারা চিরভ্রষ্ট, সেই সকল জালেমকে আল্লাহ্ কস্মিনকালেও সৎপথ দেখান না।

এর পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্‌র নূর ফুৎকারে নেভাতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফেরেরা তা অপছন্দ করে'। একথার অর্থ— কেউ মুখের ফুৎকারে আকাশের সূর্য-চন্দ্রের আলো যেমন নেভাতে পারে না, তেমনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও মিথ্যা কথা ও শতসহস্র অপবাদ রচনা করে নির্বাপিত করতে পারবে না আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত সত্য ধর্ম ইসলামের আলো। আল্লাহ্ এধর্মের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা ঘটাবেনই। কেউ তার অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে পারবে না, এ বিষয়টি তাদের পছন্দ হোক, অথবা না হোক।

'ওয়া লাও কারিহাল মুশরিকূন' অর্থ যদিও অংশীবাদীরা তা অপছন্দ করে। এখানে 'লাও' অর্থ যদি বা যদিও। আর 'লাও' শব্দটি এখানে সংযুক্তক। অর্থাৎ এব্যাপারে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পরিতুষ্ট হোক, অথবা হোক অপরিতুষ্ট, উভয়টিই সমান।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তিনিই তাঁর রসুলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপরে তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকেরা তা অপছন্দ করে'।

এখানে 'রসুলকে' অর্থ শেষতম রসুল মোহাম্মদ মুসতফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। 'হেদায়েত' অর্থ মহাগ্রন্থ কোরআন, মোজেজা এমন উপকরণ, যার মাধ্যমে মানুষ খুঁজে পেতে পারে সত্য পথের দিশা। 'সত্য দ্বীন' অর্থ আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলাম। 'সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য' অর্থ সকল বাতিল ধর্মমতসমূহকে পরাভূত করে মহামর্যাদার সঙ্গে ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য— শক্তি ও যুক্তির মাধ্যমে।

সূরা সফ্‌ফ ঃ আয়াত ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

❑ হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে রক্ষা করিবে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে?

❑ উহা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবে। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে!

❑ আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। ইহাই মহাসাফল্য।

❑ এবং তিনি দান করিবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরও একটি অনুগ্রহঃ আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও।

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা হাওয়ারীগণকে বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে'? হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, 'আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী।' অতঃপর বনী ইস্‌রাঈলের একদল ঈমান আনিল এবং একদল কুফরী করিল। তখন আমি যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তাহাদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাহাদিগকে শক্তিশালী করিলাম, ফলে তাহারা বিজয়ী হইল।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসবানগণ! পরকালের মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে, এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান কি আমি তোমাদেরকে দিবো না? শোনো, বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের উপর এবং জেহাদ করো তোমাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে। এটাই হচ্ছে প্রকৃত বাণিজ্য। পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্য করা হয় দারিদ্র্য ও অনাহার থেকে বাঁচবার জন্য। আর এ বাণিজ্য রক্ষা করে আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ও পরকারের অন্তহীন শাস্তি থেকে। অতএব বুঝে নাও, এ বাণিজ্য পরিত্যাগ করার মতো কোনো বাণিজ্য নয়, বরং এ বাণিজ্য অপরিহার্য।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'হে বিশ্বাসবানগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিবো, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে' তখন সাহাবীগণ বলাবলি করতে লাগলেন, আমরা যদি জানতে পারতাম বাণিজ্যটি কী, তবে আমরা তার জন্য উৎসর্গ করে দিতাম জীবন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি সবকিছু; এমতাবস্থায় অবতীর্ণ হলো 'তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করবে'।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'তু'মিনূনা বিল্লাহী ও রসূলিহী' অর্থ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করবে। বাক্যটি বিজ্ঞপ্তিমূলক। কিন্তু এ বিজ্ঞপ্তিটিকে প্রকাশ করা হয়েছে আদেশ প্রদানার্থে। এভাবে এখানে এই ইঙ্গিতটিই দেওয়া হয়েছে যে, এ বাণিজ্য পরিত্যাগ করার মতো কোনো বাণিজ্য নয়। আর এর দ্বারা প্রকারান্তরে সাহাবীগণের প্রশংসাও করা হয়েছে প্রচ্ছন্নভাবে। যেনো বলা হয়েছে— হে আমার রসুলের সহচরবর্গ! তোমরা তো আমাকে এবং আমার রসুলকে বিশ্বাস করো এবং আমার পথে জেহাদও করে থাকো। 'খইরুল্ লাকুম' অর্থ তোমাদের জন্য শ্রেয়। অর্থাৎ তোমাদের জন্য এই বাণিজ্য তোমাদের প্রবৃত্তিজাত কামনাবাসনার চেয়ে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। আর 'ইন কুনতুম তা'লামূন' অর্থ যদি তোমরা জানতে। অর্থাৎ সামান্য বোধশক্তিও যদি তোমাদের থাকে, তবে তার দ্বারা একথা ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করো যে, এই বাণিজ্য গ্রহণ করা ছাড়া পরিত্রাণের আর কোনো উপায় নেই। সুতরাং এ বাণিজ্য কখনোই বর্জন কোরো না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য (১২)। এবং তিনি দান করবেন আরো একটি অনুগ্রহঃ আল্লাহ্র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও'।

এখানকার 'আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন' কথাটি পূর্ববর্তী আদেশের জবাব। অর্থাৎ যদি তোমরা ইমান আনো ও জেহাদ করো, তবে আল্লাহ্ তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন। আবার এরকম হয়ে থাকতে পারে যে, বাক্যটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যে ব্যবসার কথা আমি তোমাদেরকে জানালাম, তা কি তোমরা গ্রহণ করবে? যদি করো, তবে আমি ক্ষমা করে দিবো তোমাদের সকল পাপ।

'জান্নাতি আ'দনিন' অর্থ স্থায়ী জান্নাত। আ'দন অর্থ অবস্থান করা, থেমে যাওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া ইত্যাদি। যেমন বলা হয়ে থাকে 'আ'দানা বি মাকানিন কাজা' (সে অমুক স্থানে থেমে গিয়েছে)। 'আ'দিন' বলা হয় খনির অবস্থানকে। কুরতুবী লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে জান্নাত সাতটি— ১. দারুস্সালাম ২. দারুল খুলদ ৩. দারুল হালাল ৪. জান্নাতি আদন ৫. জান্নাতুল মাওয়া ৬. জান্নাতুন নাঈম ৭. জান্নাতুল ফেরদাউস। আবার কোনো কোনো বিবরণে এসেছে চারটি, যার বর্ণনা কোরআন মজীদে এসেছে এভাবে—'আর যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান।' 'এদু'টি ছাড়া আছে আরো দু'টি উদ্যান।'

হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দু'টি জান্নাত রৌপ্যনির্মিত। ওই জান্নাতদ্বয়ের আসবাবপত্র সমূহও রৌপ্যের। আর অপর দু'টো স্বর্ণের। ওদু'টোর প্রাসাদরাজি ও সাজসরঞ্জাম সমূহও সোনার। আর আদন জান্নাতে আল্লাহ্ ও জান্নাতবাসীদের মাঝখানে পর্দারূপে বিরাজ করবে কেবল আল্লাহ্র মহিমা-মহত্বের চাদর। এই চারটি জান্নাত হচ্ছে— আদন, খুলদ, মাওয়া ও দারুস্ সালাম। হাকেম ও তিরমিজি এই বিবরণটিকেই পছন্দ করেছেন। আবু শায়েখ তাঁর 'কিতাবুল আজমতে' হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, চারটি জিনিস আল্লাহ্ নিজ হাতে বানিয়েছেন— আরশ, আদন, কলম ও আদম। তারপর আল্লাহ্ সকলকিছু সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলেছেন 'হও'। সঙ্গে সঙ্গে সকলকিছু সৃজিত হয়েছে। ইবনে মোবারক, তিবরানী, আবু শায়েখ ও বায়হাকী হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর কাছে 'এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে' এই আয়াতের অর্থ জানতে চাওয়া হলো। তিনি স. বললেন, মোতির একটি প্রাসাদ, যার মধ্যে রয়েছে ইয়াকুত নির্মিত সত্তরটি ঘর, প্রত্যেক ঘরে বিছানো রয়েছে একটি করে ফলক। আর প্রত্যেক ফলকের উপরে প্রস্তুত রয়েছে

সত্তর রকমের আহার্য। প্রতিটি ঘরে রয়েছে অনেক সেবক ও সেবিকা। একজন জান্নাতবাসীকে প্রতিদিন সকালে এভাবে আপ্যায়ন করা হবে। 'জালিকাল ফাওযুল আ'জীম' অর্থ এটাই মহাসাফল্য। অর্থাৎ ক্ষমাপ্রাপ্তি এবং জান্নাত লাভই হচ্ছে মানুষের জন্য মহাসফলতা।

'ওয়া উখরা তুহিব্বূনাহা' অর্থ তোমাদের বাঞ্ছিত আরো একটি। কথাটির দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ত্বরিৎপ্রাপ্তিই মানুষ চায়। 'আল্লাহ্র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়' অর্থ এখানে মক্কাবিজয়, অথবা খায়বর বিজয়। আতা বলেছেন, একথার দ্বারা বুঝানো হয়েছে রোম ও পারস্য বিজয়কে। আমি বলি, সাধারণভাবে সকল বিজয়কেই বুঝানো হয়েছে এখানে। কেননা সকল সাহায্য ও বিজয়ই আল্লাহ্র দান। এ আয়াতে তাই বলা হয়েছে, আল্লাহ্ অবশ্যই সাহায্য করবেন তাদেরকে যারা সাহায্য করে তাঁকে। আর 'ওয়া বাশ্শিরিল মু'মিনীন' অর্থ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আমি আপনাকে আসন্ন বিজয় প্রদানের যে অঙ্গীকার করলাম, তা আপনি বিশ্বাসবানগণকে জানিয়ে দিন।

www.eelm.weebly.com

শেষোক্ত আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মরিয়ম তনয় ঈসা হাওয়ারীগণকে বলেছিলো, আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলেছিলো, আমরাই আল্লাহ্‌র পথের সাহায্যকারী'।

এই আয়াতের শুরুতে উহ্য রয়েছে আদেশসূচক শব্দ 'বলো'। আর এই 'বলো' সংযুক্ত রয়েছে আগের আয়াতের 'মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও' কথাটির সঙ্গে। অথবা 'সুসংবাদ দাও' কথাটি সম্পর্কযুক্ত ১১ সংখ্যক আয়াতের 'তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করবে' এর সঙ্গে। কেননা ১১ সংখ্যক আয়াতের এই বাক্যটি প্রকাশ্যতঃ বিজ্ঞপ্তিমূলক হলেও প্রকৃত অর্থে আদেশজ্ঞাপক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে বিশ্বাসবানগণ! তোমরা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করো এবং জীবন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হও। আর হে আমার রসুল! আপনি বিশ্বাসবানগণকে সুসংবাদ দান করুন।

'মান আনসারী ইলাল্লহ্‌' অর্থ আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? 'ক্বলাল হাওয়ারিয়্যূনা নাহনু আনসারুল্লহ' অর্থ হাওয়ারীগণ বললো, আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। উল্লেখ্য, হজরত ঈসার হাওয়ারী বা সহচর ছিলেন বারোজন। তাঁরাই সর্বপ্রথম তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে সুরা আলে ইমরানের তাফসীরের যথাস্থানে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর বনী ইসরাইলের একদল ইমান আনলো এবং একদল কুফরী করলো। তখন আমি যারা ইমান এনেছিলো তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাদেরকে শক্তিশালী করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো'। একথার

অর্থ— নবী ঈসার ডাকে সাড়া দিয়ে বনী ইসরাইলদের একটি দল তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং আর একদল হয়ে গেলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। অতঃপর আমি আমার প্রিয় নবী ঈসাকে আকাশে উঠিয়ে দিলাম। তারপর যুক্তিতে ও শক্তিতে সমৃদ্ধ করে দিলাম তাঁর বিশ্বাসী অনুচরবর্গকে। ফলে তারা বিজয়ী হয়ে গেলো তাদের প্রতিপক্ষীয়দের উপর।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ঈসার আকাশারোহণের পর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। একদল বললো, ঈসা ছিলেন আল্লাহ্‌। তাই তিনি আকাশে উঠে গিয়েছেন। আর একদল বললো, তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র পুত্র। আল্লাহ্‌ই তাঁর পুত্রকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। অন্য আর এক দল বললো, তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসুল। এভাবে প্রথমোক্ত দল দু'টো হয়ে গেলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী এবং শেষোক্ত দল রইলো সত্যধর্মাধিষ্ঠিত। এর পর প্রচণ্ড লড়াই শুরু হলো বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে। বিজয়ী হলো অবিশ্বাসীরা। রসুল স. এর মহা আবির্ভাব পর্যন্ত এভাবেই বিজয়ী রয়ে গেলো তারা। তারপর তারা পরাভূত হলো বিশ্বাসীদের কাছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'অতঃপর বনী ইসরাইলদের একদল ইমান আনলো এবং একদল কুফরী করলো। তখন আমি যারা ইমান এনেছিলো তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাদেরকে শক্তিশালী করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো'।

বাগবী আরো লিখেছেন, ইব্রাহিমের মাধ্যমে মুগীরা বর্ণনা করেছেন, যারা হজরত ঈসার প্রতি ইমান এনেছিলেন, তাদের বিশ্বাস ও যুক্তি-প্রমাণই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছিলো। কেননা রসুল স. হজরত ঈসাকে 'কালিমাতুল্লহ্‌' (আল্লাহ্‌র বাণী) এবং 'রুহুল্লহ্‌' (আল্লাহ্‌র রূহ) বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমি বলি, এখানে 'হাওয়ারীগণ বলেছিলো' এর সঙ্গে 'একদল ইমান আনলো' এবং 'শক্তিশালী করলাম' এর সঙ্গে 'বিজয়ী হলো' এর সম্পর্ক ঘটেছে। আর এমতো সম্পর্ক ঘটেছে 'ফা' (অতঃপর) এর মাধ্যমে। আর এখানে 'অতঃপর' বিলম্ব ছাড়াই অনুক্রম প্রকাশক। তাই প্রতীয়মান হয়, হজরত ঈসার আকাশারোহণের পর কিছুসংখ্যক লোক কালবিলম্ব না করে তাঁর উপরে ইমান এনেছিলেন এবং কিছুসংখ্যক লোক করেছিলো অস্বীকার। আবার ইমান আনার পর আল্লাহ্‌ তাদেরকে সাহায্য করলেন, ফলে তারা বিজয়ী হলো অবিশ্বাসীদের উপর। আল্লাহ্‌ই অধিক পরিজ্ঞাত।

সূরা জুমআ'

মহাপুণ্যময় শহর মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরা। এর রুকু সংখ্যা ২ এবং আয়াত সংখ্যা ১১।

সূরা জুমআ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

www.eelm.weebly.com

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্‌র, যিনি অধিপতি, মহাপবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

❑ তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন তাহাদের মধ্য হইতে, যে তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁহার আয়াতসমূহ; তাহাদিগকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো ইহারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে;

❑ এবং তাহাদের অন্যান্যের জন্যও যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

❑ ইহা আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন। আল্লাহ্ তো মহা অনুগ্রহশীল।

❑ যাহাদিগকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা উহা বহন করে নাই, তাহাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ! কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে! আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

❑ বল, 'হে ইয়াহূদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য কোন মানবগোষ্ঠী নহে; তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

❑ কিন্তু উহারা উহাদের হস্ত যাহা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে উহার কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করিবে না। আল্লাহ্ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।

❑ বল, 'তোমরা যে মৃত্যু হইতে পলায়ন কর সেই মৃত্যু তোমাদের সহিত অবশ্যই সাক্ষাত করিবে। অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র নিকট এবং তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।'

এখানে 'মালিক' অর্থ অধিপতি। 'কুদ্দুস' অর্থ মহাপবিত্র। অর্থাৎ যে সকল বৈশিষ্ট্য তাঁর অতুলনীয় মর্যাদার অনুকূল নয়, তা থেকে তিনি অতীব পবিত্র। 'আল আ'যীয' অর্থ পরাক্রমশালী, অদম্য, অজেয়। আর 'আল হাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়, বিজ্ঞানময়, তাঁর অতুল প্রজ্ঞার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে প্রতিটি সৃষ্টির অস্তিত্বে, স্থায়িত্বে ও ক্রমবিকাশে। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— সর্বাধিপতি,

www.eelm.weebly.com

মহাপবিত্র, মহাপ্রতাপশালী ও মহাবিজ্ঞানময় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে আকাশসমূহ, পৃথিবী ও এতদুভয়স্থিত সকল জড়-অজড় সৃষ্টি স্ব স্ব ভাবে ও ভাষায়। কিন্তু হে মানুষ! তোমরা অধিকাংশই অন্তর্দৃষ্টিবিবর্জিত বলে তা বুঝতে পারো না।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রসুল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ'। একথার অর্থ— সেই সর্বাধিপতি, মহাপবিত্র, মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ই আরববাসীদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন এমন এক রসুল, যিনি অক্ষরের অমুখাপেক্ষী এবং যিনি তাদের কাছে পাঠ করে শোনান আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশাবলী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত, ইতোপূর্বে এরা ছিলো ঘোর বিভ্রান্তিতে'। একথার অর্থ— সেই মহান

বার্তাবাহক মানুষকে পবিত্র করেন অংশীবাদিতা, অবিশ্বাস ও অশুভ চিন্তাভাবনা ও কর্ম থেকে। শিক্ষা দেন এমন এক মহাগ্রন্থ, যা অপ্রতিদ্বন্দ্বী, যে মহাগ্রন্থের একটি বাক্যের মতো বাক্য রচনা করার সাধ ও সাধ্য কোনো জ্বিন, অথবা কোনো মানুষের নেই, অন্য কোনো সৃষ্টির তো নেই-ই। আর তিনি তাদের প্রতি উন্মুক্ত করে দেন প্রজ্ঞার দুয়ার। এভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এক অনবদ্য জীবন-বিধান, অনুপম শরিয়ত যা সমর্থন করে পূর্ববর্তী যুগের নবীগণের শরিয়তকে। আরববাসী ও পৃথিবীবাসীরা তো তাঁর এমতো পবিত্র আবির্ভাবের আগে নিপতিত ছিলো ঘোর পথভ্রষ্টতায়। তারা বিগ্রহবন্দনা করতো, মৃত প্রাণী ভক্ষণ করতো। করতো আরো অনেক অসুন্দর ও অশুভ কর্ম। অথচ তাদের বিশ্বাস, রীতিনীতি সকলকিছুই ছিলো যুক্তি-বুদ্ধি-প্রমাণ ও শুভবোধবিবর্জিত।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখনো তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। এখানকার 'তাদের অন্যান্যের জন্যও' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ' এর সঙ্গে। অর্থাৎ এখানে 'অন্যান্য'রাও তাদের পূর্বসূরীদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ রসুল স. যেমন সাহাবীগণের সম্মুখে কোরআন আবৃত্তি করে শোনান, তেমনি তাঁরাও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের (তাবেয়ীদের) সম্মুখে কোরআন আবৃত্তি করবেন। এভাবে পবিত্রকরণ, কিতাব ও হিকমত শিক্ষাদানের পরম্পরা প্রলম্বিত হতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

ইকরামা ও মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'আখিরীনা' (অন্যান্যরা) বলে বুঝানো হয়েছে তাবেয়ীগণকে। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের দলভূত হয়েছে ও হতে থাকবে। ইবনে নাজীহ্ এর বর্ণনানুসারে মুজাহিদও এরকম বলেছেন। তবে আমর ইবনে সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও লাইছের বর্ণনাসূত্রে মুজাহিদ বলেছেন, 'আখিরীনা' দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে অনারবগণকে। কেননা হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একদিন আমরা কয়েকজন রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। সালমান ফারসীও উপবিষ্ট ছিলেন সেখানে।এমন সময় অবতীর্ণ হলো সুরা জুমআ'। রসুল স. তা আমাদেরকে পাঠ করে শোনালেন। যখন পাঠ করলেন 'এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখনো তার সঙ্গে মিলিত হয়নি' তখন প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহী! তারা কারা? তিনি স. নিরুত্তর রইলেন। প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করা হলো দুই তিন বার। তখন রসুল স. সালমান ফারসীর উপরে হাত রেখে বললেন, ইমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রের মতো দূরত্বেও অবস্থান করে, তবু তাকে সেখান থেকে ছিনিয়ে আনবে এর সম্প্রদায়ের কিছুসংখ্যক লোক। বোখারী, মুসলিম। অপর বর্ণনায় এসেছে, দ্বীন যদি সুরাইয়া নক্ষত্রের কাছেও চলে গিয়ে থাকে, তবুও সেখানে পৌঁছে যাবে পারস্যবাসী এবং কোনো এক ব্যক্তি তা অধিকারও করবে। আমি বলি, এই হাদিসে কেবল পারস্যবাসীদের কিছুসংখ্যক লোকের কথাই বলা হয়নি। বলা হয়েছে অনারব সকল জাতিগোষ্ঠীর

কিছুসংখ্যক বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান বীরপুরুষদের কথা। আর আমি একথাও বলি যে, ওই বীরপুরুষগণ হচ্ছেন নকশবন্দিয়া সিল্‌সিলার আউলিয়া দরবেশগণ। তাঁরা ছিলেন বোখারা ও সমরখন্দের অধিবাসী। তাঁদের তরিকার সম্বন্ধ ছিলো ইমাম জাফর সাদেকের সঙ্গে এবং তাঁর আত্মিক সম্পর্ক ছিলো হজরত কাসেম ইবনে মোহাম্মদের সঙ্গে, তিনি আত্মিকভাবে সম্বন্ধিত ছিলেন হজরত সালমান ফারসীর সঙ্গে, তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দীকের সঙ্গে এবং তিনি রসুলে পাক স. এর সঙ্গে।

'লাম্মা ইয়ালহাক্বু বিহিম' অর্থ যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি। অর্থাৎ যারা তখনও জন্মলাভ করেননি, কিন্তু পরে যারা হবেন সাহাবায়ে কেরামের একনিষ্ঠ অনুগামী। অথবা পরে যারা পৃথিবীতে আগমন করেন, তাঁরা সাহাবীগণের একনিষ্ঠ অনুসারী হলেও তাঁদের মতো মর্যাদা লাভ করতে পারবেন না। রসুল স. বলেছেন, আমার সাহাবীগণকে মন্দ বোলো না। তোমরা যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করো, তবুও আমার কোনো এক সাহাবীর আধা সের যব আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার সওয়াব পাবে না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

এমতো ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে সূত্রপাত হয় একটি দ্বন্দ্বের। তা হচ্ছে, 'লাম্মা' শব্দটি হচ্ছে নেতিবাচক অতীতকাল। আর শব্দটি ব্যবহৃত হয় ভবিষ্যতকালের কোনো ক্রিয়া প্রকাশার্থে। মর্যাদার সমতা রহিত করাই যদি এখানে উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তো এখানে সরাসরি ব্যবহার করা যেতো নেতিবাচক অতীতকালের শব্দরূপ। কেননা এমতাবস্থায় ব্যাখ্যাটি হতে পারে এরকমও— মর্যাদার দিক দিয়ে যারা তখন পর্যন্ত সাহাবীগণের সমকক্ষ হতে পারেননি। তবে ভবিষ্যতে এরকম আশা করা যেতে পারে। আর যদি এরকম করা হতোই, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াতো— ভবিষ্যতে যারা আগমন করবে, তারা সাহাবীগণের মর্যাদায় পৌঁছতে পারবেই না। এর উত্তরে বলা যেতে পারে— নেতিবাচক অতীতকালের অর্থ নির্ণীত হয় অধিকাংশের ভিত্তিতে। আর সম্ভাবনার অর্থ মিলিত হয় ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে। এমতাবস্থায় কথাটি দাঁড়ায়— পরবর্তীকালে আগমনকারী কোনো ব্যক্তি হাজার বৎসর পরে হলেও পরিপূর্ণ রসুলানুসরণের বদৌলতে সাহাবীগণের মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছে যেতেও পারেন।

উল্লেখ্য, এখানে যেনো এই ইঙ্গিত করা হয়েছে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির ও তাঁর অন্তরঙ্গ খলিফাগণের প্রতি যারা রসুল স. এর পরিপূর্ণ অনুসরণের বরকতে লাভ করেছিলেন প্রথম যুগের মুসলমানগণ, অর্থাৎ সাহাবীগণের মর্যাদা। লাভ করেছিলেন রেসালতের উৎকর্ষতার পরিপূর্ণতা। উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীগণের মতোই তাঁরা ছিলেন মাহবুবিয়াতের স্তরাধিকারি। সাহাবীগণের জামানার পরে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি ও তাঁর খলিফাবর্গের মতো অন্য কেউ এমতো দুর্লভ মর্যাদায় ভূষিত হতে পারেননি। সুতরাং তাঁরা যেনো ওই বৃষ্টিধারাতুল্য, যার প্রথমাংশ উত্তম, না শেষাংশ, তা নির্ণয় করা দুরূহ। রসুল স.

বলেছেন, আমার উম্মত বৃষ্টিধারার ন্যায়, বুঝা যায় না তার প্রথমাংশ উত্তম, না শেষাংশ। অথবা ওই বাগানের মতো, যার একাংশ ফলবান হয় এক বৎসর এবং অন্য বৎসর ফলবান হয় অপর অংশ। রজীন বলেছেন, সম্ভবত পরবর্তী বৎসর ফল উৎপাদনকারী অংশ সুপ্রশস্ত ও সুন্দর।

'ওয়া হুয়াল আ'যীযুল হাকীম' অর্থ আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ আল্লাহ্ এমন পরাক্রমশালী যে, একজন অক্ষরের অমুখাপেক্ষী বার্তাবাহককে বানিয়েছেন অক্ষরের অধীন সকল পণ্ডিতসহ সমগ্র মানবতার শিক্ষক, পরিচালক ও পবিত্রকারী। ফলে সকলের বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতাপ তাঁর কাছে নতিস্বীকারের পরই কেবল খুঁজে পায় সুপথ, শুভ-নির্দেশনা ও পরিত্রাণ। আর তিনি পরিপূর্ণরূপে প্রজ্ঞাময় বলেই তাঁর অক্ষরের অমুখাপেক্ষী নবীর এমতো মনোনোয়ন ও নির্বাচন নির্ভুল নিষ্কলুষ ও সঠিক গন্তব্যাভিসারী এবং এ ব্যাপারে তিনি পরিপূর্ণ ক্ষমতাবানও।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন। আল্লাহ্ তো মহাঅনুগ্রহশীল'। একথার অর্থ— শেষতম রসুলের এই যে ব্যতিক্রমী মনোনয়ন এবং তাঁর মাধ্যমে বিশ্বমানবতাকে পথপ্রদর্শন ও তাঁর মাধ্যমে তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামীগণের পবিত্রকরণ, কিতাব ও হেকমত শিক্ষাদীক্ষার সুব্যবস্থা, এসকল কিছু হচ্ছে মহাপ্রভুপালয়িতা আল্লাহ্র সবিশেষ অনুকম্পা। তিনি এ অনন্য অনুকম্পা দানে ধন্য করেন যাকে খুশী তাকে। তিনি যে মহামহিম অনুকম্পাপরবশ।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'যাদেরকে তওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিলো, কিন্তু তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কতো নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না'। একথার অর্থ— বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীকে তওরাত শরীফের নির্দেশানুসারে জীবন যাপন করতে বলা হয়েছিলো। কিন্তু তারা তওরাতের বিদ্যা অর্জন করেছে ঠিকই, কিন্তু তার নির্দেশানুসারে আমল করেনি। কোনো গাধার পিঠে পুস্তকের বোঝা উঠিয়ে দিলে তারা যেমন তা কষ্টে সৃষ্টে বহন করে চলে, কিতাবের নির্দেশনা দ্বারা উপকৃত হতে পারে না, তাদের দৃষ্টান্ত সেরকমই। এভাবে তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। প্রত্যাখ্যান করে তওরাতের ওই আয়াতসমূহও, যেগুলোতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে শেষতম রসুলের আনুগত্য করার কথা। তাঁর অনুসরণ যারা করে না, নিঃসন্দেহে তারা জালেম। এরকম জেদী, হঠকারী, হিংসুক ও জালেম যারা, তাদেরকে আল্লাহ্ কখনোই পথপ্রদর্শন করেন না।

এখানে 'কা মাছালিল হিমারি ইয়াহ্মিলু আসফারা' অর্থ তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। অর্থাৎ পুস্তকের বোঝাবাহী গর্দভ যেমন পুস্তক দ্বারা উপকৃত হতে পারে না, তেমনি তারাও তওরাত পাঠ করে বটে, কিন্তু তার দ্বারা উপকৃত হয় না। অর্থাৎ তারা এলেম অনুযায়ী আমল করে না। রসুল স. প্রার্থনা করতেন, হে আমার

আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পরিত্রাণ চাই এমন কিছু থেকে, যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না। আর 'লা ইয়াহ্দিল ক্বওমাজ্ জলিমীন' অর্থ আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। অর্থাৎ জুলুমই যাদের পছন্দ, তাদেরকে আল্লাহ্ সঠিকপথ দেখান না। অথবা— আল্লাহ্র সর্বজ্ঞতার নিরীখে যারা প্রকৃত অর্থে জালেম, আল্লাহ্ তাদেরকে কোনোক্রমেই হেদায়েত করেন না।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'বলো, হে ইহুদীগণ! যদি তোমরা মনে করো যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য কোনো মানবগোষ্ঠী নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৬)। কিন্তু তারা তাদের হস্ত যা করে, তার কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্‌ জালেমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত (৭)। একথার অর্থ— হে আমার বাণীবাহক! আপনি ইহুদীদেরকে বলুন, তোমরা দাবি করো, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য কেউ নয়। তোমরা যদি তোমাদের এমতো দাবিতে সত্যই হয়ে থাকো, তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে মৃত্যু কামনা করো না কেনো? মৃত্যু বরণ করলেই তোমরা যেতে পারো তোমাদের কাংখিত জান্নাতে। কিন্তু তোমরা তো দেখছি মৃত্যুকেই সবচেয়ে বেশী ভয় পাও। হতে চাও সহস্রায়ু। এর কারণ তো এই-ই যে, তোমরা ভালোভাবেই জানো তোমরা মহাঅপরাধী। তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব পরিবর্তন করেছো। অমান্য করে চলেছো তোমাদের কিতাবে উল্লেখিত শেষতম রসুলকে। মৃত্যুবরণ করতে ভয় পাও তো তোমরা একারণেই। কিন্তু জেনে রেখো, এতে করে তোমাদের শেষ রক্ষা হবে না। মহাশাস্তি তোমাদেরকে ভোগ করতে হবেই। কেননা তোমরা যে জালেম, তা আল্লাহ্‌ ভালো করেই জানেন। এখানে 'ফাতামান্নাউল মাউতা' অর্থ তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করো, কেননা মৃত্যু সেতু তুল্য, যা বন্ধুকে বন্ধুর কাছে পৌঁছে দেয়। উল্লেখ্য, মৃত্যুকামনা করা জায়েয কি নাজায়েয সে সম্পর্কে সবিস্তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরে যথাস্থানে। আর 'ইন্‌ কুনতুম সদিক্বীন' অর্থ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন করো, সেই মৃত্যু তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই সাক্ষাত করবে। অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে, যা তোমরা করতে'।

এখানে 'কুল ইন্নাল মাওতাল্‌ লাজী তাফিররুনা মিনহু ফাইন্নাহু মুলাক্বীকুম' অর্থ বলো, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন করো, সেই মৃত্যু তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই সাক্ষাত করবে। মৃত্যু যে অবধারিত, সেকথা বুঝানোর জন্যই এখানে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে নিশ্চিতার্থক শব্দ 'ইন্না' (অবশ্যই)। ইহুদীরা অবিশ্বাস এবং অন্যান্য অপরাধ করে চলতো নিঃশঙ্কচিত্তে। এতে করে মনে হতো যেনো মৃত্যুকে তারা স্বীকারই করে না। তাই মৃত্যুর বিজ্ঞপ্তিটিও এখানে প্রচার করা হয়েছে কঠোর ভাষায় গুরুত্বসহকারে। একই বাক্যে দু'বার 'ইন্না' উল্লেখ করা হয়েছে এখানে একারণেই। আর এখানে 'ইন্না'র মধ্যে রয়েছে শর্তের অর্থ। তাই

এখানে এর বিধেয়ের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে 'ফা'। এভাবে বুঝানো হয়েছে, মৃত্যু থেকে পলায়ন করার অর্থ মৃত্যুকেই অতি দ্রুত আমন্ত্রণ জানানো। কেননা মৃত্যু চিন্তাহীনতা মানুষকে মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন করে দেয়। ফলে তার কাছে মনে হয় জীবন অনেক দীর্ঘ। মৃত্যুর জন্য যথাপ্রস্তুতির কথা পরে ভাবলেও চলবে। এরকম চিন্তা যে করে, তার কাছে মৃত্যুকে মনে হয় অতি দ্রুত আগমনকারী। পক্ষান্তরে মৃত্যুর জন্য যে সতত প্রস্তুত থাকে, তার কাছে সংক্ষিপ্ত জীবনকেও মনে হয় অতিদীর্ঘ। এরকম ব্যক্তির কাছেই মৃত্যু এমন এক সেতু, যা বন্ধু-মিলনের সহায়ক। এরকমও হতে পারে যেম এখানকার 'ফা' শব্দটি এসেছে নৈমিত্তিক অব্যয় হিসেবে। আর 'ইন্না' এর বিধেয় এখানে রয়েছে উহ্য। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়ন করতে চাও, কিন্তু তোমাদের এই পলায়ন-মনোবৃত্তি তোমাদের জন্য কোনো উপকার বয়ে আনবে না। কেননা মৃত্যু তার নির্ধারিত সময়ে আগমন করবেই।

'ছুম্মা তুরাদ্দূনা ইলা আ'লিমিল গইবি ওয়াশ্‌ শাহাদাতি' অর্থ অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র নিকট। আর 'ফা ইউনাব্বিউকুম বিমা কুনতুম তা'মালূন' অর্থ এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে যা তোমরা করতে। অর্থাৎ তোমাদেরকে তখন দেওয়া হবে তোমাদের কৃতকর্মসমূহের যথাপ্রতিফল— স্বস্তি, অথবা শাস্তি।

সূরা জুমআ ঃ আয়াত ৯

❑ হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

এখানে 'ইজা নূদিয়া লিস্‌ সলাতি মিঁন ইয়াওমিল জুমুআ'তি' অর্থ জুমআর দিবসে যখন নামাজের জন্য আহবান করা হয়। এখানকার 'মিন' বর্ণনামূলক। অর্থাৎ 'মিন' এখানে 'নূদিয়া' (আহ্বান করা হয়) এর বিবরণ। কোনো কোনো বিদ্বান আবার এখানকার 'মিন'কে গ্রহণ করেছেন 'ফী' অর্থে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— জুমআর দিনে যখন জুমআর নামাজের আজান দেওয়া হয়। 'মিন'কে এভাবে 'ফী' অর্থ গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন 'আরূনী মাজা খলাক্বু মিনাল আরদ্ব'। এখানেও 'মিন' অর্থ 'ফী'।

www.eelm.weebly.com

জুমআ'র নামকরণ ঃ জুমআ'কে জুমআ' বলা হয় কেনো, সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য করেছেন। তবে একটি বিষয়ে তাঁরা একমত যে, মূর্খতার যুগে জুমআ'র দিবসকে বলা হতো আল আরুবা। এর অর্থ— মহিমান্বিত দিন। 'আয়্‌রবা' অর্থ সে প্রকাশ করেছে। এই 'আয়্‌রবা' থেকেই এসেছে 'আরুবা'।

কা'ব ইবলে লুয়াই সর্বপ্রথম 'আরুবা'কে অভিহিত করেন 'জুমআ' নামে। আরবী খুতবায় 'আম্মা বাদ' কথাটিকেও সর্বপ্রথমে প্রচলন করেছিলেন তিনিই। কা'ব ওই দিবসে মানুষকে সমবেত করে রসুলের মহাআবির্ভাবের সংবাদ বলতেন এভাবে, হে জনতা! তোমরা যদি তাঁর দেখা পাও, তবে অবশ্যই তাঁর উপরে ইমান এনো। এ সম্পর্কে কা'ব তাদেরকে কিছু কিছু কবিতা পাঠ করেও শোনাতেন। বনী ইসমাইলেরা কাবা ঘর নির্মাণের দিন থেকে দিন, তারিখ, মাস গণনা করতো। কা'ব ইবনে লুয়াইয়ের যখন মৃত্যু হলো, তখন তারা বৎসর গণনা শুরু করলো তাঁর মৃত্যু দিবস থেকে। তারপর বৎসর গণনা শুরু হয় হস্তীবৎসর থেকে, ওই বৎসরই ছিলো রসুলে পাক স. এর জন্মের বৎসর। এই নিয়ম চলতে থাকে তাঁর হিজরত পর্যন্ত। এরপর থেকে শুরু হিজরী সন তারিখ। কা'বের মৃত্যু এবং রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের মধ্যে ব্যবধান ছিলো ৫৬০ বৎসর।

আবু হুজায়ফা বোখারী তাঁর 'আল মুবতাদা' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সপ্তাহের এই দিনে বিরাট জনসমাগম ঘটে বলেই, এই দিবসের নাম জুমআ। তবে এই সাহাবীবচনটির সূত্রশৃঙ্খল শিথিল। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, এই দিন হজরত আদমের দেহ কাঠামোকে একত্র করা হয়েছিলো। তাই এই দিনের নাম জুমআর দিন। আহমদ, নাসাঈ, ইবনে খুজায়মা ও ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সালমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমরা কি জানো, জুমআ কী? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তিনি স. এরকম করে বললেন তিনবার। তৃতীয়বারে বললেন, এই দিনে তোমাদের প্রথম পিতা আদমের দেহকাঠামোকে একত্র করা হয়েছিলো। এরকম হাদিস আরো বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক যথাসূত্রে পরিণতরূপে এবং ইমাম আহমদ কর্তৃক শিথিল সূত্রে সুপরিণতরূপে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, ওই বর্ণনাটিই বিশুদ্ধ, যা ইবনে সিরীনের মাধ্যমে যথাসূত্রে বর্ণনা করেছেন আবদুর রাজ্জাক। বর্ণনাটি এই— মদীনার আনসারগণ এই দিন মিলিত হতেন আসাদ ইবনে জারারাহ্'র কাছে। তাঁরা আরুবাকে বলতেন জুমআ। এই দিনে আসাদ তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে নামাজ পড়তেন এবং তাঁদেরকে শোনাতেন শুভ উপদেশ। এভাবে 'জুমআ' কথাটির প্রথম প্রচলন ঘটে তাঁদের দ্বারাই। এরকম ঘটতো রসুল স. মদীনাতে শুভাগমনের পূর্ব পর্যন্ত। কোনো কোনো বর্ণনাকারী আবার বলেছেন, রসুল স. এর নির্দেশানুসারেই আসাদ ওরকম করতেন। দারাকুতনীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. তাঁদেরকে জুমআর নামাজ পড়ার হুকুম দিয়েছিলেন। তিনি স. মাসআব ইবনে উমায়েরকে লিখেছিলেন, আম্মা বা'দ (অতঃপর) তোমাদেরকে দেখতে হবে ইহুদীরা কোন বারে উচ্চস্বরে তওরাত পাঠ করে। তোমরাও তোমাদের নারী ও শিশুদেরকে নিয়ে ওই দিন সমবেত হয়ো। আর সূর্য ঢলে পড়ার পর দু'রাকাত নামাজ পাঠ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন

হওয়ার সুযোগ গ্রহণ কোরো। বর্ণনাকারী বলেছেন, সর্বপ্রথম জুমআর নামাজ পাঠ করেছিলেন হজরত মাসআব। রসুল স. এর মদীনায় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়মই চালু ছিলো। অবশ্য এই বর্ণনার সূত্রপ্রবাহভূত এক বর্ণনাকারী আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে গালিব বাহেলীকে বলা হয় হাদিস প্রস্তুতকারক। ইবনে শিহাব জুহুরী বলেছেন, বর্ণনাটি অপরিণত শ্রেণীর বলে পরিচিত।

কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, বিষয়টি স্থিরীকৃত হয়েছিলো সাহাবীগণের গবেষণাভিত্তিক সিদ্ধান্তে (ইজতিহাদে)। যথাসূত্রে মোহাম্মদ ইবনে সিরীন থেকে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর মদীনায় আগমনের পূর্বেই এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার আগেই মদীনাবাসী মুসলমানেরা জুমআ'র নামাজ পাঠ করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা সকলে একদিন সমবেত হয়ে আলোচনা করলেন, ইহুদীরা সপ্তাহে একদিন জমায়েত হয়, খৃষ্টানেরাও এরকম করে, তাই আমরাও একটি সাপ্তাহিক দিন ঠিক করে বিশেষভাবে ইবাদত করবো। সকলে এই আলোচনায় একমত হয় এবং আশুরার দিনে পাঠ করতে শুরু করে জুমআর নামাজ। আর আসাদ ইবনে জারারাহ্ করতে থাকেন জুমআর নামাজের ইমামতি। এরপর রসুল স. যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন অবতীর্ণ হয় 'হে বিশ্বাসীগণ! জুমআর দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয়....'। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, হাদিসটি যদিও অপরিণত শ্রেণীর, তবুও উত্তম শ্রেণীর একটি হাদিস রয়েছে এর সপক্ষে, যা বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে খুজায়মা এবং আরো কতিপয় বর্ণনাকারী। তাঁরা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত কা'ব ইবনে মালেক থেকে। ইবনে খুজায়মা একে 'বিশুদ্ধ' বলেছেন। হাদিসটি এরকম— হজরত কা'ব ইবনে মালেক বলেছেন, রসুল স. এর মদীনায় আগমনের পূর্বে আমাদের জুমআর নামাজ পড়াতেন আসাদ ইবনে জারারাহ্। যখন আজান হতো, তখন আমি আসাদের জন্য দোয়া করতাম। আবদুর রহমান ইবনে কা'ব বর্ণনা করেছেন, আমি একবার হজরত কা'বকে জিজ্ঞেস করলাম, তখন আপনারা কতোজন সমবেত হতেন? তিনি বললেন, চল্লিশ

www.eelm.weebly.com

জন। অপরিণত সূত্রে ইবনে সিরীন বর্ণনা করেছেন, ওই সময় মদীনার সাহাবীগণ জুমআর নামাজ পাঠের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে। আবার এরকমও হতে পারে যে, মক্কায় থাকতেই রসুল স. এর কাছে জুমআর নামাজ পাঠের জন্য প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছিলো। কিন্তু মক্কার পরিস্থিতি তখন প্রতিকূল ছিলো বলে তিনি স. সেখানে জুমআর নামাজের প্রচলন ঘটাতে পারেননি। এরকম বলা হয়েছে ইবনে খুজায়মার বর্ণনায় এবং তাঁর পরবর্তী মুরসাল হাদিসসমূহে। আর একারণেই মদীনায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই রসুল স. পাঠ করতে শুরু করেছিলেন জুমআ'।

রসুল স. এর প্রথম জুমআ'র নামাজ ঃ জননী আয়েশা থেকে বোখারী এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী থেকে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, মদীনার মুসলমানেরা শুনতে পেলেন, রসুল স. মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছেন। সংবাদটি শুনে সকলে হয়ে উঠলেন আনন্দচঞ্চল। প্রতিদিন ভোরে তাঁরা সকলে সমবেত হতে লাগলেন হার্‌রাতে। সূর্যের আলো যখন অতি প্রখর হতো, তখন তাঁরা ফিরে

আসতেন স্বগৃহে। তখন ছিলো গরমের মওসুম। সেদিনও তাঁরা দ্বিপ্রহর হওয়ার পর আপন আপন বাড়িতে ফিরে আসছিলেন। জনৈক ইহুদী তখন কার্যোপলক্ষে উঠেছিলো একটি ছোট দুর্গের ছাদে। সর্বপ্রথম তারই দৃষ্টি পতিত হলো রসুল স. এর উপর। সে চীৎকার করে বলতে শুরু করলো, হে মুসলমানেরা! তোমরা ফিরে যাচ্ছো কেনো? ওই দ্যাখো, তিনি আসছেন। মুসলমানেরা সচকিত হলো। ছুটতে শুরু করলো রসুল স. এর দিকে। উল্লাসে ফেটে পড়ে তারা স্বাগতম জানালো রসুল স.কে। সেদিন ছিলো পহেলা রবিউল আউয়াল সোমবার। আবু ইসহাক সূত্রে জারীর ইবনে হাযেম বর্ণনা করেছেন, তাঁর শুভাগমনের তারিখ ছিলো ২রা রবিউল আউয়াল। ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে ইব্রাহিম ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, তারিখটি ছিলো ১২ই রবিউল আউয়াল। আর আবু সাঈদ বলেছেন, ১৩ই রবিউল আউয়াল। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, অধিকাংশ আলেম মন্তব্য করেছেন, তিনি স. মদীনায় উপস্থিত হয়েছিলেন দিনের বেলায়। ইমাম মুসলিম বলেছেন রাতের বেলার কথা। এই দুই মতের সমন্বয়নার্থে বলা যেতে পারে যে, রাতের শেষভাগে সুবহে সাদেকের সময় মদীনায় শুভাগমন ঘটেছিলো তাঁর। রসুল স. প্রথমে কোবায় পৌঁছলেন। অবস্থান গ্রহণ করলেন বনী আমর ইবনে আউফের মহল্লায়, কুলসুম ইবনে হাদাম এবং আবু বকর হাবীব ইবনে আসাফের গৃহে। কুলসুম চীৎকার করে তাঁর ক্রীতদাসকে ডাকতে লাগলেন, নাজীহ্! নাজীহ্! রসুল স. বললেন, আবু বকর! আমি নাজীহ্। অর্থাৎ আমি কৃতকার্য। কোবায় কুলসুমের একখণ্ড জমি ছিলো। ওই জমিতে খেজুর শুকানো হতো। রসুল স. সেখানেই মসজিদ নির্মাণ করালেন। বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বনী আমর ইবনে আউফের মহল্লায় উঠেছিলেন এবং সেখানেই মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। ওই মসজিদ সম্পর্কেই বলা হয়েছে 'লামাসজিদুন উসসিসা আলাত্তাকৃওয়া' (এটা এমনই এক মসজিদ যা নির্মাণ করা হয়েছে সংযমশীলতার উপর)। বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে আরো এসেছে, রসুল স. সেখানে অবস্থান করেছিলেন দশ দিনেরও অধিক। হজরত আনাস বলেছেন, চৌদ্দ দিন। ইবনে ইসহাক বলেছেন, পাঁচদিন। ইবনে হাব্বান বলেছেন, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি এই তিনদিন তিনি স. অবস্থান করেছিলেন সেখানে এবং সেখান থেকে চলে এসেছিলেন জুমআর দিনে। মনে হয় বর্ণনাকারী তাঁর আগমন ও প্রস্থানের দিন তাঁর গণনা থেকে বাদ দিয়েছিলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে আহমদ, বোখারী, মুসলিম, হজরত ইবনে যোবায়ের থেকে সাঈদ ইবনে মনসুর এবং হজরত উয়াইমীর ইবনে সাঈদ থেকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বনী নাজ্জারের লোকদেরকে ডাকলেন। তাঁরা ছিলেন তাঁর মামার বংশ সম্পৃক্ত। তাঁর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের মাতাও ছিলেন তাঁদের বংশের। তাঁরা এলেন তলোয়ার ঝুলিয়ে। রসুল স. ও তাঁর সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা উপবেশন করুন। আপনাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের। আর আমরা আপনাদের নির্দেশ পালনের জন্যও প্রস্তুত। সেদিন ছিলো জুমআর দিন। রসুল স. তাঁর

কাসওয়া নাম্নী উষ্ট্রীর উপরে আরোহণ করলেন। লোকজন চলতে লাগলো তাঁর দক্ষিণে, বামে ও পশ্চাতে। কেউ কেউ চলতে লাগলো তাদের বাহনে আরোহণ করে এবং কেউ কেউ পদব্রজে। বনী আমর ইবনে আউফের লোকেরা সমবেত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! আপনি কি উত্তমতর কোনো স্থানের সন্ধান করছেন? আপনি কি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন? তিনি স. বললেন, আমাকে এমন এক লোকালয়ে গমনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে লোকালয় অন্য সকল লোকালয়কে অভিভূত করবে। সুতরাং আমার উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দাও। সে-ও আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট। যেখানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, সেখানেই সে থেমে যাবে। সে থামলো গিয়ে মদীনায়। লোকেরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে রসুল স.কে স্বাগত জানালো। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলো, আল্লাহ্‌র রসুল শুভাগমন করেছেন। জননী আয়েশা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, তখন মদীনার নারী ও শিশুরা সমস্বরে গেয়ে উঠলো —

ত্বলায়াল বাদরু আ'লাইনা
মিন সানিআ'তিল বিদায়ী
ওয়াজ্বাবাত শুকরু আ'লাইনা

www.eelm.weebly.com

মাদাআ' লিল্লাহি দায়ী'।

অর্থঃ সানিয়াতুল বিদা ঘাটি থেকে উদিত হয়েছে পূর্ণিমার পরিপূর্ণ শশী। প্রার্থনাকারী যতক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থনা করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ। আপনি যে প্রত্যাদেশ লাভ করেছেন, অবশ্যই তা যথাযথরূপে মান্য করা হবে।

হজরত আনাস থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন মদীনায় পদধূলি দিলেন, তখন আনন্দে অধীর হয়ে ছোট বর্শা নিয়ে খেলা দেখাতে লাগলেন হজরত ওয়াহশী। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, রসুল স. এর আগমনে মদীনাবাসীরা যেরকম আনন্দে মেতে উঠেছিলো, আমি তাদেরকে সে রকম আনন্দ করতে আর কখনো দেখিনি। আনসারগণের বাড়ির সামনে দিয়ে পথ অতিক্রমকালে তাঁরা সকলেই বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদ! স্বাগতম! আপনার জন্য রয়েছে নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য। রসুল স. তাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, এ উষ্ট্রী আদিষ্ট। সুতরাং তোমরা এর পথ ছেড়ে দাও। বনী মালেক গোত্রের কাছ দিয়ে গমনকালে এগিয়ে এলেন উতবা ইবনে মালেক ও নওফেল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মালেক। নওফেল তাঁর উষ্ট্রীর রশি ধরে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তমজন! দয়া করে আমাদের এখানে অবস্থান করুন। আমরা গরিষ্ঠসংখ্যক। সব দিক থেকে স্বচ্ছল। আমাদের রয়েছে প্রতুল সমরসম্ভার ও খেজুরের বাগান। শত্রুর ভয়ে যারা বাঁচতে চায়, তারা আমাদেরই শরণাপন্ন হয়। রসুল স. মৃদু হাসলেন। বললেন, উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দাও। সে আদিষ্ট। এগিয়ে এলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে সামেত ও আব্বাস ইবনে ফুজালা। নিবেদন জানালেন, প্রিয়তম রসুল! কৃপা

করে আমাদের বসতবাটিতে অবতরণ করুন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে কল্যাণ দান করুন। এ উষ্ট্রী যে আদিষ্ট। উষ্ট্রী থামলো ওয়ানুনা উপত্যকার বনী সালেমদের মসজিদে। বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বনী সালেম ইবনে আমর ইবনে আউফের মহল্লায় উপনীত হলেন। প্রথম জুমআর নামাজ আদায় করলেন সেখানকার মসজিদে। সেখানেই প্রদান করলেন মদীনার প্রথম ভাষণ। এরকমও বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথম জুমআ তিনি স. পড়েছিলেন মসজিদে কোবায়। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, প্রথম জুমআয় তাঁর সঙ্গে নামাজ পাঠ করেছিলেন একশত জন। এরপর যখন রসুল স. রাস্তার ডান দিক দিয়ে হেঁটে বনী সায়েদা গোত্রের এলাকা অতিক্রম করতে লাগলেন, তখন সা'দ ইবনে উবাদা, মুনজির ইবনে আমর ও আবু হাজানা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তমজন! দয়া করে এখানে অবস্থান গ্রহণ করুন। এখানে আপনার সেবায় রয়েছে সম্মান, সম্পদ, বীরত্ব, জনবল সবকিছু। রয়েছে খর্জুর কানন, পানির কূপ। স্বাচ্ছন্দ্যের এতো প্রতুল উপকরণ এখানকার আর কোনো মহল্লায় নেই। তিনি স. তাঁর উষ্ট্রীতে পুনঃ আরোহণ করে বললেন, আবু সাবেত! পথ ছেড়ে দাও। আমার উষ্ট্রী তো অদৃশ্য থেকে পরিচালিত। উষ্ট্রী চলতে শুরু করলো। কিছুদূর যেতে না যেতেই সামনে দাঁড়ালেন সা'দ ইবনে রবী; আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা এবং শিবর ইবনে সা'দ। নিবেদন জানালেন, হে আল্লাহ্‌র প্রেমস্পদ! আরো কি অগ্রসর হবেন? জিয়াদ ইবনে লবীদ ও ফারওয়া ইবনে ওমরও এরকম নিবেদন করলেন। তিনি স. সকলকে সংযত হওয়ার ইঙ্গিত দিলেন একই কথা বলে। বললেন, আদিষ্ট এ উষ্ট্রীর গতিরোধ অসমীচীন। উষ্ট্রী অগ্রসর হলো বনী নাজ্জার গোত্রের দিকে। তাঁরা ছিলেন রসুল স. এর মাতুল কুলের লোক। আবু সালীতা ও সারাফা ইবনে আবী উনায়েস আবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অনুগ্রহ করে আমাদেরকে ছেড়ে আর সামনে অগ্রসর হবেন না। আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, শক্তিমান। তাছাড়া আমরা তো আপনার নিকটাত্মীয়। সুতরাং আমাদের অধিকার তো অন্যাপেক্ষা অধিক। তিনি স. বললেন, এর গতি ব্যাহত কোরো না। এতো নির্দেশিত। উষ্ট্রী আরো কিছুদূর অগ্রসর হলো। বনী আদী ইবনে নাজ্জার গোত্রের এলাকায় গিয়ে থামলো। কিছুক্ষণ সেখানকার লোকজনের দিকে তাকিয়ে থাকার পর আর একটু এগিয়ে সেখানকার মসজিদের দরজার সামনে উপস্থিত হয়ে বসে পড়লো। জাব্বার ইবনে সাখার তাকে দাঁড় করাবার উদ্দেশ্যে আঘাত করলেন। কিন্তু সে আর দাঁড়ালো না। রসুল স. অবতরণ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এখান থেকে কার গৃহ সর্বাধিক নিকটে। হজরত আবু আইয়ুব আনসারী বললেন, আমার। রসুল স. তাঁর গৃহে গমন করলেন এবং চার বার পাঠ করলেন এই দোয়া 'আল্লাহুম্মা আনযিলনা মানযিলা মুবারাকাঁও ওয়া আন্‌তা খইরুল মুনযিলীন'। হজরত ইবনে যোবায়ের থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়িতে উঠলেন। হজরত জায়েদ ইবনে হারেছাও ছিলেন তাঁর সঙ্গে।

ইবনে ইসহাক তাঁর 'আলমুবতাদা' গ্রন্থে এবং ইবনে হিশাম তাঁর 'আত্‌তিজান' গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. হজরত আবু আইয়ুবের যে গৃহে অবস্থান গ্রহণ করেন, তা ছিলো মদীনা শহরের অগ্রভাগে। বহু বছর আগে ওই গৃহ নির্মাণ করিয়েছিলো প্রথম তুব্বা। তখন তার সঙ্গে ছিলো চারশত ইহুদী আলেম। তারা তুব্বাকে বলেছিলো, আমরা এ স্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যাবো না। তুব্বা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেছিলো, আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি, শেষতম নবী মোহাম্মদ স. হিজরত করে এই স্থানেই বসবাস করবেন। তাই আমরা এ স্থান আর ত্যাগ করতে চাই না। এমনও তো হতে পারে যে, আমরা

www.eelm.weebly.com

তাঁর সাক্ষাত পাবো। তাদের কথা শুনে তুব্বাও মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। ইহুদী আলেমদের প্রত্যেককে বাড়ি তৈরী করিয়ে দিলেন। চারশ' ক্রীতদাসী খরিদ করে বিয়ে দিলেন তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে। তাদেরকে দিলেন অনেক ধন সম্পদ। তারপর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনার্থে নিরুপায় হয়ে স্থান ত্যাগ করার সময় একটি ঘোষণাপত্রে লিপিবদ্ধ করালেন— আমি মুসলমান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল। আমার জীবনকাল যদি তাঁর মহাআবির্ভাব পর্যন্ত প্রলম্বিত হতো, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করতাম। তুব্বা ওই ঘোষণাপত্রে সোনার সীলমোহর লাগিয়ে ওই ইহুদী আলেমদের নেতার হাতে সমর্পণ করলো। তাকে এই মর্মে অসিয়তও করলো যে, সে যেনো এই ঘোষণাপত্রটি পুত্র-প্রপৌত্র পরম্পরায় শেষতম রসুলের কাছে পৌঁছে দেয়। তুব্বা রসুল স. এর জন্যও একটি গৃহ নির্মাণ করে। ওই গৃহের মালিকানা পরিবর্তিত হতে হতে পৌঁছে যায় হজরত আবু আইয়ুব আনসারীর অধিকারে। তিনি ছিলেন ওই ইহুদী আলেমদের নেতার অধস্তন পুরুষ। আর মদীনায় যারা রসুল স.কে সাহায্য করেছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন ওই ইহুদী আলেমগণের উত্তরপুরুষ। কথিত আছে, তুব্বার ঘোষণাপত্রে একটি কবিতাও লিপিবদ্ধ ছিলো। ইহুদী আলেমদের বংশদ্ভূত আবু ইউসুফ নামের একজন সেই কবিতাটি রসুল স. এর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বর্ণনাটি অবশ্য দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর।

মাসআলা ঃ এখানে 'নেদা (আহ্বান) দ্বারা ওই আজানকে বুঝানো হয়েছে, যা দেওয়া হয় ইমামের খুতবার আগে মিম্বরে আরোহণ করার পরক্ষণে। উল্লেখ্য, রসুল স., হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের শাসনামলে জুমআর আজান ওই সময়েই দেওয়া হতো। হজরত ওসমানের শাসনামলে মুসল্লিদের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। তাই তিনি আরেকটি আজানের প্রচলন করেন। তখন থেকে এই দ্বিতীয় আজানটি দেওয়া হতে থাকে মসজিদের মিনার থেকে। বলা হয়ে থাকে জুমআর আজান তিনটি। অর্থাৎ প্রথম আজান হচ্ছে নামাজের ইকামত, দ্বিতীয় আজান ইমামের মিম্বারোহণের পর এবং তৃতীয় আজান মিনারে ধ্বনিত আজান। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে দ্বিতীয় আজানের কথা। এই দ্বিতীয় আজান ধ্বনিত হওয়ার পর খুতবা শুরু হয়। তাই এই আজান শোনার সাথে সাথে দ্রুতগতিতে মসজিদে উপস্থিত হওয়া এবং খুতবা শোনা ওয়াজিব। কিন্তু বিশুদ্ধ

মত এই যে, মিনার থেকে যে আজান দেওয়া হয়, সেই আজান শোনার সঙ্গে সঙ্গে সকল কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে মসজিদের দিকে ধাবিত হওয়া ওয়াজিব। কেননা এখানকার 'যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়' কথাটি সাধারণার্থক। আর এই সাধারণ অর্থ হচ্ছে মিনার থেকে ধ্বনিত আজান।

'ফাসআ'ও' অর্থ ধাবিত হও। দ্রুতগতিতে চলে এসো। হজরত ইবনে মাসউদের ক্বেরাতে কথাটিকে উচ্চারণ করা হয়েছে 'ফামশূ' (চলো)। হাসান বলেছেন, আল্লাহ্র শপথ, এখানে 'ফাসআ'ও' অর্থ পা দ্বারা দৌড়ানো নয়। কেননা এভাবে দৌড়ে মসজিদে আসা নিষেধ। বরং শরিয়তে ধীর স্থির ও শান্তভাবে মসজিদে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে 'ফাসআ'ও' অর্থ মসজিদের দিকে ধাবিত হওয়া বিশুদ্ধচিত্তে ও বিনয়াবনত হয়ে নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে। কাতাদা বলেছেন, এখানে 'সাঈ' অর্থ হৃদয় ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উভয়ের দ্বারা ধাবিত হওয়া। অবশ্য সাধারণভাবে 'সাঈ' অর্থ পদব্রজে চলা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফালাম্মা বালাগা মাআ'হুস্ সা'ইয়া (যখন তাঁর সঙ্গে চলতে শুরু করলেন)। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া ইজা তাওয়াল্লা সাআ' ফীল আরদ্বি'। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ইন্না সা'ঈয়াকুম লাশাত্তা'। রসুল স. 'সাঈ' করতে যে নিষেধ করেছেন, তার অর্থ দৌড়ে নামাজের দিকে আসা নিষেধ। 'সিহাহ্' গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নামাজের জামাত শুরু হয়ে গেলেও তোমরা দৌড়ে নামাজের দিকে এসো না। বরং স্বাভাবিক গতিতে এসে নামাজে অংশগ্রহণ কোরো। এভাবে যতটুকু ইমামের সঙ্গে পড়বার সুযোগ পাও, পড়ে নিয়ো। যতটুকু না পাও, ততটুকু একা একা পূর্ণ করে নিয়ো ইমামের সালাম ফিরানোর পর। ইমাম আহমদের বর্ণনায় 'পূর্ণ করে নিয়ো' এর পরিবর্তে উল্লেখ করা হয়েছে 'কাযা করে নিয়ো'।

'ইলা জিকরিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র স্মরণে। এখানে এর অর্থ নামাজের জন্য বা নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব কথাটির অর্থ করেছেন— খুতবা শ্রবণের উদ্দেশ্যে।

'ওয়া জারুল বাইআ' অর্থ এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো। অর্থাৎ ত্যাগ করো কেনা- বেচাসহ এমন সকল কর্ম, যা ফিরিয়ে রাখে নামাজ থেকে। এমতো অর্থের প্রেক্ষিতে জুমআ'র নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে কেনা-বেচা করা জায়েয হবে না। তবে এখানে বিশেষভাবে ক্রয়বিক্রয়ের কথা বলা হয়েছে একারণে যে, অধিকাংশ মানুষ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরও কেনাবেচা স্থগিত করতে চায় না।

'জালিকুম্ খইরুল্লাকুম ইনকুনতুম তা'লামূন' অর্থ এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি করো। অর্থাৎ জুমআর আজান ধ্বনিত হওয়ার পর ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা নামাজের জন্য তৎপর হওয়া উত্তম। যদি তোমরা একথা বুঝতে পারো, তবে নিশ্চয় জুমআ'র আজান শুনেই নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে ধাবিত হবে।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, জুমআ'র আজানের সময় ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ও পাপ। কিন্তু কেউ যদি সে সময় ক্রয়-বিক্রয় করেই ফেলে, তবে তা কার্যকর হবে, না, বাতিল বলে গণ্য হবে, সে সম্পর্কে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কার্যকর হবে এবং বাতিল হবে বলেছেন ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ। এই বিধানটিতে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য সংঘটিত হয়েছে একটি মৌলিক সূত্রের ভিত্তিতে। সেই মাসআলাটি এরকম— কতকগুলো কাজ সত্তাগতভাবেই মন্দ, তাই নিষিদ্ধ, যেমন ব্যভিচার, চুরি। আবার কতকগুলো কাজ সত্তাগতভাবে পাপ যেমন নয়, তেমনি নয় নিষিদ্ধও। যেমন ক্রয়-বিক্রয়। অন্য কোনো কারণে এধরনের কাজ সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। জুমআর নামাজের সময় ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারটিও সেরকম। সত্তাগতভাবে ক্রয়বিক্রয় বৈধ। কিন্তু জুমআর নামাজের কারণে তা অবৈধ। সুতরাং এমতো অবৈধতা যেহেতু অন্য কারণের উপরে নির্ভরশীল, তাই তা পাপ হলেও তার কার্যকারিতা বিনষ্ট হতে পারে না। যেমন যে স্থানে নামাজ পাঠ করা নিষিদ্ধ, সে স্থানে কেউ যদি নামাজ পড়েই ফেলে, তবে তা অকার্যকর বলে গণ্য হবে না। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী তাই জুমআর নামাজের সময়ে সংঘটিত ক্রয়-বিক্রয়কে অকার্যকর বলেন না। অর্থাৎ এমতাবস্থায় সংঘটিত ক্রয়-বিক্রয় পাপ বটে, কিন্তু তা অকার্যকর নয়। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেন, জুমআর নামাজের সময় সংঘটিত ক্রয়-বিক্রয় মূলতঃই মন্দ। তাই এরকম যারা করবে, তাদের ক্রয়-বিক্রয় ও নামাজ দু'টোই অশুদ্ধ হবে।

উপযোগঃ কোরআন, হাদিস ও ঐকমত্যানুসারে জুমআর নামাজ অপরিবর্তনীয় ফরজ। সুতরাং এ নামাজকে যারা অস্বীকার করবে, তারা কাফের। আর জুমআর নামাজ অপরিবর্তনীয় ফরজ সাব্যস্ত হয়েছে আলোচ্য আয়াতের ভিত্তিতে। কেননা এখানে এইমর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, 'তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও'। 'আল্লাহ্‌র স্মরণ' অর্থ এখানে নামাজ অথবা খুতবা। কিংবা দু'টোই। শেষোক্ত অভিমতটিই অধিকতর যথার্থ। কেননা 'আল্লাহ্‌র স্মরণ' অর্থ নামাজ ও খুতবা দু'টোই।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীতে আমরা সকলের পরে এসেছি, কিন্তু পরবর্তী পৃথিবীতে থাকবো সর্বাগ্রে। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, অন্যেরা কিতাব পেয়েছে আগে আর আমরা পরে। আল্লাহ্ এই জুমআ তাদের উপরেই প্রথমে ফরজ করেছিলেন। কিন্তু তারা এব্যাপারে মতভেদ করেছে। তাই পিছনে পড়ে গিয়েছে। ইহুদীরা গ্রহণ করেছে শনিবারকে এবং খৃষ্টানেরা রবিবারকে। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু আমর এবং হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর মিম্বরে আরোহণ করে বলেছিলেন, জুমআ যেনো কেউ পরিত্যাগ না করে। যে এরকম করবে, সে হয়ে যাবে উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, কোনো কোনো লোক জুমআ'র নামাজে উপস্থিত হতো না। রসুল স. তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, আমার ইচ্ছা হয়, কাউকে ইমাম নিযুক্ত করে দিয়ে আমি নিজে গিয়ে তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিই। মুসলিম। হজরত তারেক ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, চার ধরনের লোক ছাড়া অন্য সকলের উপরে জুমআ ফরজ। ওই চার ধরনের লোক হচ্ছে— ক্রীতদাস, নারী, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পীড়িত। আবু দাউদ। তিনি বলেছেন, হজরত তারেক রসুল স.কে অবশ্য দেখেছেন, কিন্তু তাঁর কাছে কিছু শোনেননি। আমি বলি, আবু দাউদের এমতো মন্তব্যানুসারে হাদিসটি হয়ে যাবে অপরিণত পদবাচ্য। তবে সর্বসম্মতিক্রমে এরকম অপরিণত শ্রেণীর হাদিস প্রামাণ্য বলে গণনীয়। ইমাম নববী বলেছেন, শায়খাইনের (বোখারী ও মুসলিমের) শর্তানুসারে হাসিদটি 'বিশুদ্ধ'। বোখারীর সূত্রে তামীমদারীর মাধ্যমে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, শিশু, ক্রীতদাস ও পথচারী ছাড়া অন্য সকলের উপরে জুমআ ফরজ। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন হাকেম থেকে তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়া। তাঁদের বর্ণনায় নারী ও পীড়িতদের কথাও বলা হয়েছে। হজরত আবু জা'দ জুমায়রী বর্ণনা করেছেন রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি হেলাভরে পরপর তিন জুমআ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তাঁর হৃদয়কে অবরুদ্ধ করে দিবেন। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে খুজায়মা, ইবনে হাব্বান। ইবনে হাব্বান বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি শরিয়তসম্মত অজুহাত ছাড়া জুমআ ত্যাগ করে, তার নাম মুনাফিকদের তালিকায় এমনভাবে লেখা হয়, যা অনপনেয়। কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে তিন জুমআ ত্যাগ করার কথা। ইমাম শাফেয়ী। আবু ইয়াসার বর্ণনায় এসেছে, যে লোক পরপর তিন জুমআ ছেড়ে দিলো, সে যেনো ইসলামকে নিক্ষেপ করলো তার পশ্চাতে। এই হাদিসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে লোক আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে, তার উপর জুমআ'র নামাজ ওয়াজিব। ব্যতিক্রম কেবল এই কয়জন— মুসাফির, রমণী, বালক ও দাস। যে ব্যক্তি ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে বড় মনে করে জুমআর নামাজকে গুরুত্ব না দেয়, আল্লাহ্‌র কাছে তার কোনো গুরুত্ব নেই। আল্লাহ্ চির অমুখাপেক্ষী ও চিরপ্রশংসিত। দারাকুতনী। আলেমগণ এব্যাপারে একমত যে, জুমআর নামাজ ফরজে আইন। যে জুমআর নামাজকে ফরজে কেফায়া বলে, সে রয়েছে ভুলের মধ্যে।

মাসআলা ঃ আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে মুসাফিরের জন্য জুমআর নামাজ ফরজ নয়। এক বর্ণনায় এসেছে, জুহুরী ও ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, মুসাফির জুমআর আজান শুনতে পেলে তার উপরে জুমআর নামাজ পড়া ফরজ হয়ে যায়। ক্রীতদাস

www.eelm.weebly.com

ও মহিলাদের উপর জুমআর নামাজ ফরজ নয়। কিন্তু দাউদ জাহেরী বলেন, তাদের উপরেও জুমআ ফরজ। ইমাম আহমদ বলেছেন, ক্রীতদাসের

উপরে জুমআ ফরজ। চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস ও ব্যবসা করার অনুমতিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের উপরে জুমআ ফরজ কিনা, সে ব্যাপারে মতপ্রভেদ রয়েছে। আবার ওই ক্রীতদাসের ব্যাপারেও মতপ্রভেদ রয়েছে, যে তার মনিবের সঙ্গে মসজিদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে মনিবের বাহনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে এবং যে ওই সময় জুমআর নামাজ পড়লে বাহনের রক্ষণাবেক্ষণ বিঘ্নিত হয় না। কোনো প্রকার ক্রীতদাসের জন্যই জুমআ ফরজ নয়, এরকম যাঁরা বলেন, তাঁরা তাঁদের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেন উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের দ্বারা।

মাসআলা ঃ অন্ধ ব্যক্তিকে জুমআ'র নামাজে পৌঁছিয়ে দেওয়ার যদি কেউ না থাকে, তবে তার উপরে জুমআ ফরজ নয়। বিধানটি ঐকমত্যসম্মত। এরকম বলেছেন ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এমতাবস্থাতেও অন্ধের উপরে জুমআ ফরজ নয়। জমহুর ইমামগণ বলেন, হাদিস শরীফে অন্ধ ব্যক্তিদের উল্লেখ নেই। আমি বলি, হাদিস শরীফে পীড়িত ব্যক্তিদের উল্লেখ তো আছে। আর অন্ধ ব্যক্তি তো পীড়িতদেরই অন্তর্ভূত। নিরাপত্তাহীনতা অথবা অন্য কোনো শরিয়তসম্মত কারণ দেখা দিলেও জুমআ ফরজ হয় না। এ বিধানটিও ঐকমত্যসম্মত। অতি বৃদ্ধদের জন্যও জুমআ ফরজ নয়। জমহুর ইমামগণ বলেন, অন্ধ ব্যক্তি পথপ্রদর্শক পেলে হয়ে যায় চক্ষুস্মান ব্যক্তির মতো। আমি বলি, এমতাবস্থাতেও তো সে স্বচালিত নয়। অন্যের শক্তিতে শক্তিমান হওয়াকে শরিয়তের দৃষ্টিতে শক্তিমান হওয়া বলে না। যেমন পঙ্গু ব্যক্তিকে যদি কেউ পিঠে করে বয়ে নিয়ে যায়, তবে তাকে নিশ্চয় সুস্থ ব্যক্তি বলা যায় না।

মাসআলা ঃ অতিবৃষ্টি ও কাদার কারণে জুমআর নামাজ পরিত্যাগ করা সিদ্ধ। বোখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে মোহাম্মদ ইবনে সিরীন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বৃষ্টির দিনে তাঁর মুয়াজ্জিনকে বলতেন, তুমি আজানের সময় 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসুলুল্লহ' বলার পর 'হাইয়্যালাস্সলাহ' না বলে বোলো 'সল্লু ফী বুয়ুতিকুম' (তোমরা আপন আপন ঘরে নামাজ পড়ো)। তাঁর এমতো আমলকে কেউ কেউ অপছন্দ করলে তিনি বলেছিলেন, যিনি আমার চেয়ে অতিশ্রেষ্ঠ, তিনিও (রসুল স.ও) এমন করতেন। নিশ্চয় জুমআ ফরজ, কিন্তু আমি এটাও চাই না যে, তোমরা কাদা-পানি ভেঙে অযথা কষ্ট করো।

মাসআলা ঃ ক্রীতদাস, মুসাফির ও পীড়িত ব্যক্তি যদি জুমআর নামাজ পাঠ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে। তাদেরকে জোহরের নামাজ আর আদায় করতে হবে না।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, কোনো শহরে যদি কেবল ক্রীতদাস ও মুসাফিরদেরকে নিয়ে জুমআর নামাজ পাঠ করা হয়, তবুও তা শুদ্ধ হবে, সেখানে একজন গৃহবাসী (মুকিম) না থাকলেও। অন্য ইমামত্রয় বলেন, শুদ্ধ হবে না, স্বাধীন ও গৃহবাসীদের সংখ্যা কম হলেও নয়। কেবল অপ্রাপ্তবয়স্ক ও মেয়েদেরকে নিয়ে জুমআ পড়া হলে তা শুদ্ধ হবে না। বিধানটি ঐকমত্যসম্মত। জুমআর নামাজ বিশুদ্ধ হতে হলে চল্লিশ/পঞ্চাশ, অথবা কমপক্ষে তিনজন স্বাধীন

ও গৃহবাসী নামাজীর উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। ঠিক কতজন নামাজী উপস্থিত হলে জুমআর নামাজ বিশুদ্ধ হয়, সে সম্পর্কে আলেমগণের মতদ্বৈধতা রয়েছে। কেউ বলেছেন, পঞ্চাশ জন, কেউ বলেছেন চল্লিশ জন, আবার কেউ বলেছেন তিন জনের কথা। তবে বৃষ্টির কারণে যে উপস্থিত হতে পারেনি, অথবা অন্ধ, খঞ্জ হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি মসজিদে উপস্থিত হয়ে যায়, তাদেরকেও নামাজীর মধ্যে গণ্য করা যাবে। বিধানটি ঐকমত্যসম্মত।

আমাদের মতের স্বপক্ষে দলিল এই যে, জুমআ ফরজ সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উপর। আলেমগণের ঐকমত্যও এরকম যে, মেয়েদের উপরে জুমআ ফরজ নয়। অপ্রাপ্তবয়স্করা তো জুমআর ব্যাপারে আদিষ্টই নয়। আর সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উপরে জুমআ যে ফরজ তার দলিল রয়েছে এই আয়াতেই। এখানে 'তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে ধাবিত হও' বলে সম্বোধন করা হয়েছে সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে। কিন্তু ক্রীতদাস, পথচারী ও প্রতিবন্ধীদেরকে জুমআর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তৎসত্ত্বেও তাদের মধ্যে কেউ যদি জুমআর নামাজে শামিল হয়ে যায়, তবে তার জুমআ আদায় হয়ে যাবে এবং তা বিশুদ্ধও হবে, যেমন সফরকালে কোনো মুসাফির রমজানের রোজা রাখলে তার রোজা আদায় হয়ে যায়।

মাসআলা ঃ প্রতিবন্ধী ও বন্দীরা যদি শহরের মধ্যে জুমআ ফরজ এমন স্থানে জামাতবদ্ধ হয়ে জোহরের নামাজ আদায় করে, তবে তা হবে মাকরূহ। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেন। কিন্তু মাকরুহ হবে না বলেন ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ। এই বিধানটি প্রযোজ্য হবে ওই সকল লোকের ক্ষেত্রেও, যাদের জুমআ পরিত্যক্ত হয়েছে শরিয়তসম্মত অজুহাত ব্যতিরেকে।

মাসআলা ঃ আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, জুমআর নামাজের জন্য খুতবা অত্যাবশ্যক। কেননা এখানকার 'আল্লাহ্র স্মরণে' অর্থ খুতবাও। এমতো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানিফা বলেন, কমপক্ষে একবার 'সুবহানাল্লহ্' অথবা 'আলহামদুলিল্লাহ্'

উচ্চারণ করলেও খুতবা আদায় হয়ে যাবে। কেননা 'সংক্ষিপ্ত' ও 'বিস্তারিত' উভয় প্রকার স্মরণই (জিকিরই) আল্লাহ্র স্মরণ। ইমাম আবু হানিফার এমতো দলিল অবশ্য দুর্বল। কেননা 'আল্লাহ্র স্মরণ' অর্থ নামাজও হয়।

উম্মতের ঐকমত্য এই যে, জুমআর নামাজের জন্য খুতবা অপরিহার্য। কেননা রসুল স. সব সময় এরকম করতেন। বর্ণনাটি সুবিদিতও। সুতরাং খুতবা হতে হবে কমপক্ষে এমন দীর্ঘ, যাকে আরববাসীগণ খুতবা বলতে পারেন। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ এরকমই বলেছেন। এরপরেও এখানকার 'আল্লাহ্র স্মরণ'কে যদি কেবল 'খুতবা'ও ধরা হয়, তবু তা অন্তত এতটুকু দীর্ঘ তো হতেই হবে, যতটুকু দীর্ঘ করতেন রসুল স.। এমতাবস্থায় 'আল্লাহ্র স্মরণে ধাবিত হও' কথাটির অর্থ হবে— ধাবিত হও রসুল স. এর খুতবার দিকে। সুতরাং খুতবা সুন্নতসম্মত দীর্ঘ হওয়া অপরিহার্য।

খলিফা হজরত ওসমানের খুতবা ঃ খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর হজরত ওসমান মিম্বরে আরোহণ করে উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন কেবল 'আলহামদুলিল্লাহ্'। তারপরই তিনি কাঁপতে শুরু করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয় আগে থেকেই তাঁদের ভাষণ প্রস্তুত করে রাখতেন। কিন্তু আমি আজ অপ্রস্তুত। ভবিষ্যতে তোমরা পূর্ণ ভাষণ শুনতে পাবে। আস্তাগ্ফিরুল্লহা লী ওয়ালাকুম। এতটুকু বলেই তিনি মিম্বর থেকে নেমে এসে নামাজ পড়াতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর এমতো কার্যের বিরুদ্ধে কেউই আপত্তি তোলেননি। তাঁর এই আমলটি অবশ্য ইমাম আবু হানিফার অভিমতের পক্ষে। কিন্তু হাদিসবেত্তাগণ বলেন, হাদিসটি অপ্রসিদ্ধ। কাজেই তা পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়।

মাসআলা ঃ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক বলেছেন, দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ীর মতে দুই খুতবার মাঝখানে উপবেশন করাও ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, দাঁড়িয়ে খুতবা দান করা যেমন ওয়াজিব নয়, তেমনি ওয়াজিব নয় দুই খুতবার মধ্যে উপবেশন করাও। কিন্তু সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, খুতবা দাঁড়িয়ে বলতে হবে এবং দুই খুতবার মাঝখানে বসতেও হবে। এদু'টো আমল ওয়াজিব হওয়ার দলিল হচ্ছে প্রবহমান যুগরীতি। হজরত জাবের ইবনে সামুরা বর্ণনা করেছেন, আমি দেখেছি, রসুল স. দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়েছেন। তারপর উপবেশন করেছেন। পুনরায় ভাষণ দিয়েছেন দাঁড়িয়ে। তিনি একথাও বলেছেন যে, যে বলবে রসুল স. বসে ভাষণ দিয়েছেন, সে অসত্যভাষী। আল্লাহ্র শপথ! আমি রসুল স. এর পশ্চাতে দু'হাজার ওয়াক্তেরও বেশী নামাজ পাঠ করেছি। মুসলিম। ইমাম শাফেয়ীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, রসুল স. দু'টি ভাষণ দিতেন। আর দুই ভাষণের মাঝখানে বসতেন। ভাষণে তিনি স. কোরআন থেকে উদ্ধৃতি দিতেন এবং দান করতেন বিভিন্ন উপদেশ। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ভাষণ দিতেন দুই বার এবং তার মাঝখানে বসতেন। বোখারী, মুসলিম। মুসলিম বর্ণনা করেছেন, জুমআর দিন হজরত কা'ব ইবনে আজরা মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন বসে বসে ভাষণ দিচ্ছিলেন ইবনে উম্মে হাকাম। তিনি বলে উঠলেন, দ্যাখো, দ্যাখো, এই দুষ্টুটা বসে বসে ভাষণ দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন 'তারা যখন দেখে কোনো ব্যবসায়ের সুযোগ, অথবা ক্রীড়া-কৌতুক, তখন তারা সেদিকে ছুটে যায় আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে।' ইবনে হুম্মাম অবশ্য এই বর্ণনাটিকে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেওয়া ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণরূপে গণ্য করেননি। কেননা হজরত কা'ব তখন তাঁর নামাজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা বলেননি। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়াকে অপরিহার্য বলে মনে করতেন না।

মাসআলা ঃ খুতবার মধ্যে পাঁচটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকা সুন্নত— ১. আল্লাহ্র প্রশংসা ২. রসুল স. এর উপরে দরূদ ৩. তাকওয়া গ্রহণের বিষয়ে উপদেশ

৪. কোরআন থেকে উদ্ধৃতি ৫. বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের জন্য দোয়া। ইমাম শাফেয়ীর মতে, এই কাজগুলো ওয়াজিব। আর দুই খুতবা দানের সময় পবিত্র (ওজু অথবা গোসলবিশিষ্ট) থাকাও ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এরকম। অবশ্য জমহুরের নিকটে খুতবা দান কালে পবিত্র থাকা জরুরী নয়। অর্থাৎ ওজু ছাড়াও খুতবা দেওয়া যায়।

ইমাম আবু হানিফার মতে খুতবাদাতার সম্মুখে কমপক্ষে একজনের উপস্থিতি অপরিহার্য, যাতে তাকে সম্বোধন করে খুতবা দেওয়া যায়। ইমাম শাফেয়ী বলেন, নির্দিষ্ট সংখ্যক মুসল্লীর উপস্থিতির পূর্বে খুতবা শুরু করা ইমামের জন্য জায়েয নয়। আর তাঁর মতে নির্দিষ্ট সংখ্যক মুসল্লী অর্থ চল্লিশ জন। কেউ কেউ বলেছেন, জুমআর মুসল্লির সংখ্যা হতে হবে পঞ্চাশ জন। কমপক্ষে তিন জন। নামাজ আরম্ভ করার আগে যদি তাদের মধ্যে এক জনও উঠে চলে যায়, তবে ইমাম জুমআ'র নামাজ পড়াবেন না। পড়াবেন জোহরের নামাজ। সেই লোক যদি আবার ফিরে আসে এবং তার অনুপস্থিতি দীর্ঘ হতে থাকে, তবে ইমাম তাঁর খুতবাও দীর্ঘ করতে থাকবেন। আর যদি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সে ফিরে আসে, তবে ইমাম খুতবা শুরু করবেন নতুন করে।

মাসআলা ঃ খুতবা চলাকালে মুসল্লিদের কথাবার্তা বলা হারাম, খুতবা শোনা যাক অথবা না যাক। ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেছেন। ইমাম আহমদ বলেছেন, যদি খুতবা শোনা যায়, তবে কথা বার্তা বলা নাজায়েয। আর যদি না

www.eelm.weebly.com

শোনা যায়, তবে কথাবার্তা বলা হারাম নয়। তবে নিশ্চুপ থাকা এবং শোনার চেষ্টা করা মোস্তাহাব। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, খুতবা শোনা গেলেও কথাবার্তা বলা হারাম নয়, বরং মাকরুহ।

খুতবা দানকালে খুতবাদাতার কথাবার্তা বলাও হারাম। তবে পুণ্য- উপদেশমূলক শিক্ষাদান হারাম নয়। যেমন এ সম্পর্কে হজরত ওমর এবং হজরত ওসমানের ঘটনা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এরকম বলেছেন ইবনে হুম্মাম। ইমাম শাফেয়ীর প্রাথমিক বক্তব্যও এরকম। ইমাম মালেক বলেছেন, যে সকল কথা নামাজের কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সে সকল কথা বলা জায়েয। যেমন পিছন থেকে সামনের দিকে অগ্রসরোদ্যত ব্যক্তির ডিঙ্গিয়ে যাওয়া কাউকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে কথা বলা। খতিব (খুতবাদাতা) যদি কোনো ব্যক্তি বিশেষকে সম্বোধন করে কথা বলে, তবে তার জন্য কথা বলা জায়েয, যেমন বর্ণনা করা হয়েছে হজরত ওমর ও হজরত ওসমানের ঘটনায়। জুমআর গোসলের আলোচনায় এ বিষয়ে আমি সবিস্তার বিবরণ প্রদান করবো ইনশাআল্লাহ্। ইমাম আহমদ বলেছেন, খুতবা দানকালে খতিবের জন্য সব ধরনের কথা বলা জায়েয। অবশ্য এ প্রসঙ্গের হাদিসগুলোর বক্তব্য পরস্পরবিরোধী। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, খুতবা চলার সময় যে কথা বলে, সে পুস্তক বহনকারী গর্দভের মতো। তাছাড়া এই আয়াতের মাধ্যমেও খুতবা চলাকালে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হয়েছে 'ওয়া ইজা

ক্বুরিআল ক্বুরআনা ফাস্তামিউ'লাহু ওয়া আনসিতু' লাআ'ল্লাকুম তুরহামুন' (যখন কোরআন আবৃত্তি করা হয়, তখন মনোযোগ দিয়ে শুনো এবং চুপ থেকো, তাহলে তোমরা অনুগ্রহসিক্ত হবে)।

কোনো কোনো হাদিসে খুতবার সময় কথাবার্তা বলার বৈধতাও প্রমাণিত হয়েছে। যেমন হজরত আবদুর রহমান ইবনে কা'ব থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কয়েকজনকে খায়বরে প্রেরণ করেছিলেন ইবনে আবুল হাকিককে হত্যা করার জন্য। তাঁরা যখন ফিরে এলেন, তখন রসুল স. দণ্ডায়মান ছিলেন তাঁর মিম্বরে। আর সেদিন ছিলো জুমআর দিন। রসুল স. তাদেরকে দেখামাত্র বলে উঠলেন, তোমাদের বদন কৃতকার্য হোক। তাঁরাও বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কৃতকার্য হোক আপনার পবিত্র অবয়বও। তিনি স. বললেন, তোমরা কি তাকে বধ করতে পেরেছো? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. তলোয়ারটি চাইলেন। তাঁরাও তলোয়ার সমর্পণ করলেন। তিনি স. মিম্বরে দাঁড়িয়ে তলোয়ারটি খাপমুক্ত করে বললেন, হ্যাঁ এই তলোয়ারের ধারই ছিলো তার খাদ্য।

বায়হাকী বলেছেন, হাদিসটি আদর্শ অপরিণত শ্রেণীর। ওরওয়া সূত্রেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে আনাস সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. ওই ব্যক্তিকে (ইবনে আবুল হাকীককে) বধ করতে পাঠিয়েছিলেন। মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত রেফায়া বলেছেন, রসুল স. ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! একজন বিদেশী ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চান। তিনি স. ভাষণ বন্ধ করলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। এরপর শুরু করলেন তাঁর ভাষণ। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়ও।

ইবনে খুজায়মা ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত বুরায়দা বলেছেন, রসুল স. ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় লাল ডোরাকাটা জামা পরে ছোট ছোট পা ফেলে মসজিদে প্রবেশ করলেন তাঁর শিশুদৌহিত্রদ্বয়। রসুল স. তাঁদেরকে দেখতে পেয়েই মিম্বর থেকে নেমে এলেন এবং উভয়কে কোলে নিয়ে মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, আল্লাহ্ সত্যই বলেছেন 'তোমাদের মাল ও আওলাদ এক পরীক্ষা'। দ্যাখো, আমি এদেরকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আসতে দেখে স্থির থাকতে পারলাম না। ভাষণ বন্ধ করে তাদেরকে কোলে তুলে নিলাম।

হজরত জাবের থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, এক জুমআ'র দিনে রসুল স. তাঁর মিম্বরে আরোহণ করে নির্দেশ দিলেন, বসে পড়ো। সকলে বসে পড়লো। ইবনে মাসউদ ছিলেন দরজার কাছে। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লেন সেখানে। রসুল স. বললেন, সামনে এসে বসো। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, এক জুমআর দিবসে রসুল স. ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো, কিয়ামত কবে হবে? লোকেরা ইঙ্গিতে তাকে চুপ থাকতে বললো। কিন্তু সে মানলো না। পুনরায় একই প্রশ্ন করে বসলো। রসুল স. বললেন, তুমি তার

জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? সে বললো, কেবল আল্লাহ্র ও তাঁর রসুলের ভালোবাসা। তিনি স. বললেন, তাঁদের সাথেই তুমি থাকবে, যাঁদেরকে তুমি ভালোবাসো। আহমদ, নাসাঈ, ইবনে খুজায়মা, বায়হাকী। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জুমআর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার সমস্ত সম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এরপর বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন পুরো হাদিসটি। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হাদিসসমূহের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, খুতবার সময় খুতবা শ্রবণকারীর বাক্যালাপ করা মাকরুহ। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, একক বর্ণনাকে (খবরে ওয়াহিদকে) কোরআনের আয়াতের সমান্তরাল সাব্যস্ত করা যায়

না। তাছাড়া সাবধানতার বিষয়টিও এখানে প্রণিধাননীয়। তাই এমতোক্ষেত্রে কোরআনের আয়াতের উপরে আমল করাই সমীচীন। সুতরাং মেনে নিতে হবে, খুতবার সময় কথাবার্তা বলা নাজায়েয। ইমাম আহমদ বলেছেন, বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় না যে, খুতবা চলাকালে কথাবার্তা বলা হারাম। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

মাসআলা ঃ খুতবা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এবং শেষ হওয়ার পর কথা বলা দোষের নয়। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, একবার জুমআর দিনে রসুল স. তাঁর মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং কারো কারো সঙ্গে দরকারী কিছু কথা সেরে নিলেন। এরপর খুতবা শেষ করে গেলেন জায়নামাজের দিকে। আহমদ। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ওই সময় সাধারণভাবে কথা বলা হারাম। সাহাবীগণের মাধ্যমেও বিষয়টি সুপ্রমাণিত। ইবনে আবী শায়বা বলেছেন, হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে ওমর খুতবা চলাকালে কথাবার্তা বলার বিষয়টিকে মাকরুহ্ সাব্যস্ত করেছেন।

মাসআলা ঃ খুতবা চলাকালে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সংক্ষেপে তাহিয়্যাতুল মসজিদের দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিতে পারে। জমহুর ইমামগণ এরকমই বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, খুতবা চলাকালে নামাজ পড়া যায় না। হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে ওমর এই ত্রয়ী মনীষী থেকে ওরওয়া ও জুহরীর মাধ্যমে যে সাহাবীবচন বর্ণিত হয়েছে, তার দ্বারা একথাই সাব্যস্ত হয়। রসুল স. বলেছেন, তোমরা যদি তোমাদের সাথীকে বলো 'চুপ করো' তবে তোমরাও একটি অশুভ কাজ করলে। এই হাদিস খুতবা চলাকালে নামাজ পাঠ করার বিরুদ্ধ প্রমাণ। কেননা এখানে সৎকাজের আদেশ দেওয়াকেও নিষেধ করা হয়েছে। আর সৎকাজের আদেশ দান জুমআর সুন্নত ও তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামাজ পাঠ অপেক্ষা উত্তম। সুতরাং খুতবা চলাকালে জুমআর সুন্নত ও তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামাজ কোনোটাই পড়া যাবে না।

একটি দ্বন্দ্ব ঃ সৎকাজের আদেশ দেওয়া যদি আদতেই ওয়াজিব হয়, তবে খুতবাহ চলাকালে নামাজ পাঠ নাজায়েয হওয়ার বিষয়টিকে মেনে নেওয়া যাবে।

কিন্তু তা যদি ওয়াজিব না হয়ে মোস্তাহাব হয়, তবে তো তাকে জুমআর সুন্নতের উপরে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। আর ইমাম শাফেয়ীর মতে খুতবা চলাকালে চুপ থাকা ওয়াজিব নয়, মোস্তাহাব। কাজেই মোস্তাহাবকে জুমআর সুন্নত ও তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামাজের উপরে মর্যাদা দেওয়া যায় কীভাবে?

খুতবা চলাকালে জমহুরগণ তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামাজ পাঠের যে বিধান দিয়েছেন, তার পক্ষে তাঁরা প্রমাণ গ্রহণ করেছেন হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণিত একটি হাদিস থেকে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, খুতবা চলাকালে মসজিদে প্রবেশ করলে সংক্ষেপে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিয়ো। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, এক জুমআর দিনে রসুল স. খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় সালীক গাতফানি মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়লেন। তিনি স. তাকে দেখে বললেন, সালীক! ওঠো। সংক্ষেপে দু'রাকাত নামাজ পড়ে নাও। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইবনে হাব্বানও এরকম বর্ণনা করেছেন। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, খুতবা চলাকালে একবার মসজিদে ঢুকে বসে পড়লেন হজরত আবু জর। রসুল স. বললেন, তুমি কি দুই রাকাত নামাজ পাঠ করেছো? তিনি বললেন, না। রসুল স. বললেন, ওঠো। নামাজ পড়ে নাও। ইবনে হুম্মাম এ সম্পর্কে বলেছেন, দারাকুতনী তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, খুতবা চলাকালে এক লোক মসজিদে প্রবেশ করলো। রসুল স. বললেন, ওঠো। দু'রাকাত নামাজ পড়ে নাও। সে নামাজ শুরু করলো। তার নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রসুল স.ও তাঁর ভাষণ স্থগিত রাখলেন।

মু'তামিরের পিতা থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, একলোক খুতবা চলাকালে মসজিদে প্রবেশ করলো। রসুল স. তাকে নামাজ পাঠের নির্দেশ দিলেন। তার নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সকলেই খুতবার অপেক্ষায় বসে রইলেন। হাদিসটি অপরিণত শ্রেণীর। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, অপরিণত শ্রেণীর হাদিসও দলিলরূপে গণনীয়। আমি বলি, হাদিসটি অপরিণত শ্রেণীর হলেও উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহের সাথে এর বক্তব্যগত কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আগের হাদিসগুলো সাধারণার্থক, আর এটি একটি বিশেষ ঘটনার বিবরণ। তাছাড়া ইমাম আবু হানিফার মতে ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য বের হওয়ার পর কোনোপ্রকার নামাজ পাঠ জায়েয নয়। খুতবা চলাকালে তো নয়ই। জায়েয নয় খুতবা শেষেও। একথা যদি গ্রহণ করাও হয় যে, ওই আগন্তুকের নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রসুল স. খুতবা পাঠ বন্ধ রেখেছিলেন, তবু তা হবে ইমাম আবু হানিফার মাযহাবের পরিপন্থী। কেননা তাঁর মতে রসুল স. এর আগমনের পরেই নামাজ পাঠ করা নাজায়েয হয়ে যায়, চাই তিনি খুতবা দান করুন, অথবা চুপ থাকুন।

মাসআলা ঃ আলেমগণ এ বিষয়েও একমত যে, মাঠে-ময়দানে জুমআ'র নামাজ পড়া জায়েয নয়। ইমাম আবু হানিফা অবশ্য বলেছেন, যে মাঠ শহরের বিধানের আওতায় পড়ে, সে মাঠে জুমআর নামাজ পাঠ করা জায়েয। জুমআর নামাজের জন্য জামাত হওয়ার সর্বসম্মতিক্রমে অপরিহার্য। জুমআ'র অর্থও

www.eelm.weebly.com

জামাত। তবে এ বিষয়টিও লক্ষ্য করতে হবে যে, লোকালয়টি কী ধরনের এবং সেখানে নির্দিষ্টসংখ্যক মুসল্লির উপস্থিতি ঘটেছে কিনা। এ সম্পর্কে ইমামগণ বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য করেছেন। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইবনে ইসহাক বলেছেন, উপযুক্ত লোকালয় অর্থ ওই লোকালয়, যেখানে অন্ততপক্ষে বসবাস করে চল্লিশ জন স্বাধীন, জ্ঞানবান ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। অতিথি অথবা মুসাফির এর মধ্যে গণনীয় নয়। আর লোকালয়বাসীরা বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া বিদেশে গমন করে না, এরকম লোকালয়ের সকলের উপরে জুমআ ফরজ। এর কমসংখ্যক লোকের বসতিতে জুমআ বিশুদ্ধ নয়। ইমাম মালেক বলেছেন, যে লোকালয়ের ঘরবাড়িসমূহ পরস্পরলগ্ন এবং যেখানে রয়েছে মসজিদ ও বাজার, কেবল সেখানেই জুমআর নামাজ পাঠ করা ফরজ। এরকম লোকালয় গ্রাম হলেও তা শহররূপে গণ্য। আর জুমআ ফরজ হয় শহরে, গ্রামে নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জুমআর নামাজ পাঠ করা যেতে পারবে কেবল জামে শহরে। জামে শহর বলে ওই শহরকে, যেখানে রয়েছে অনেক অলিগলি, বাজার এবং এমন শাসক, যে অত্যাচারীদের উপরে প্রতিষ্ঠা করতে পারে অত্যাচারিতের অধিকার, সে ন্যায়বান অথবা অসৎ যে প্রকৃতিরই হোক না কেনো। আর সে শহরে কমপক্ষে এমন একজন আলেমও থাকতে হবে, ধর্মসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য যার কাছে যাতায়াত করা যায়। কারো কারো মতে শহর অর্থ ওই লোকালয়, যেখানকার জামে মসজিদে সকল লোকের স্থান সংকুলান হয় না।

জুমআর নামাজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য জামে শহরের শর্ত আরোপ করার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে কতিপয় সাহাবীবচনকে। যেমন— পরিণত সূত্রে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, জামে শহর বা বড় শহর ছাড়া অন্য কোথাও জুমআর নামাজ নেই, তাকবীরে তাশরীক নেই এবং ঈদুল ফিতর- ঈদুল আজহার নামাজও নেই। ইবনে হাযাম বলেছেন, সাহাবীবচনটি বিশুদ্ধ। ইমাম আহমদ বলেছেন, শিথিল। উল্লেখ্য, মদীনার পার্শ্ববর্তী লোকালয়গুলো থেকে লোকেরা মসজিদে নববীতে এসে রসুল স. এর সঙ্গে জুমআর নামাজ পড়তেন। 'সহীহ' গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। কোবা পল্লীর লোকেরা মসজিদে নববীতে এসে জুমআ পড়তেন। ইবনে মাজা ও ইবনে খুজায়মাও এরকম বর্ণনা করেছেন। কোবার বাসিন্দাদের মধ্যে একজন তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমরা যেনো নিয়মিত কোবা থেকে এসে তাঁর সাথে জুমআর নামাজ আদায় করি। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, জুল হুলায়ফার অধিবাসীরাও মদীনায় এসে জুমআর নামাজ আদায় করতেন। সাহাবীগণের যুগে বিভিন্ন দেশ বিজিত হয়েছিলো। সে সকল স্থানে নির্মাণ করা হয়েছিলো নতুন নতুন মসজিদ। মসজিদগুলোতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো মিম্বর এবং সেগুলোতে নিয়মিত জুমআর নামাজও আদায় করা হতো। কিন্তু জুমআ পড়া হতো কেবল শহরে, গ্রামে নয়।

যে সকল আলেম গ্রামে জুমআ'র নামাজ আদায় করার পক্ষে, তাঁরা বলেন, রসুল স. সর্বপ্রথম জুমআ'র নামাজ আদায় করেছিলেন গ্রাম এলাকায়, বনী আমর

ইবনে সুলাইমের মহল্লায়। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, শহরসন্নিহিত জনপদগুলোতেও জুমআ তেমনই জায়েয, যেমন জায়েয শহরাভ্যন্তরে। শুধু তাই নয় শহরের আশেপাশের মাঠে ময়দানেও জুমআর নামাজ আদায় করা যায়।

আলোচনার সারসংক্ষেপ ঃ এখানাকার 'আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও' কথাটি মুতলাক(অসীমাবদ্ধ বা সাধারণ ঘোষণা) মাঠে ময়দানে জুমআ জায়েয নয়। সকল গ্রামেও নয়। বরং ইমাম শাফেয়ী এরকম জনপদের জনসংখ্যাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর শহর গ্রাম অপেক্ষা অবশ্যই অধিক জনবহুল। তবে শহরে জুমআ পড়লে জোহর পড়তে হয় না। বিধানটি ঐকমত্যসম্মত। কিন্তু শহরের চেয়ে কম জনসংখ্যাবিশিষ্ট জনপদে জুমআর নামাজ বিশুদ্ধ হওয়া, ফরজ হওয়া ও জোহর পরিত্যক্ত হওয়ার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত। সুতরাং সন্দেহযুক্ত অবস্থায় জুমআ ফরজ হতে পারে না।

তিবরানী ও ইবনে আদী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এমন জনপদেও জুমআ ফরজ যেখানে প্রশাসক নিযুক্ত রয়েছে, যদিও সেখানে চার জনের বেশী লোক না থাকে। অপর বর্ণনায় এসেছে, 'চার' স্থলে 'তিন' জনের কথা। অবশ্য এই হাদিসকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। কেননা এই বর্ণনার সূত্রপরম্পরাভূত দু'জন বর্ণনাকারী হাকাম ইবনে আবদুল্লাহ্‌ ও ওলীদ ইবনে মোহাম্মদ উভয়েই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন জুহুরীর বরাত দিয়ে। দারাকুতনী বলেছেন, জুহুরী সূত্রে বর্ণনাকারীরা পরিত্যাজ্য। ইমাম আহমদ বলেছেন, হাকামের সকল বর্ণনাই স্বসৃষ্ট। হাকামের সূত্রে আরো রয়েছে মুসলিমা ইবনে আলী। ইয়াহ্‌ইয়া বলেছেন, সে অপদার্থ। নাসাঈও তাকে সাব্যস্ত করেছেন 'পরিত্যাজ্য' বলে। বলা হয়, হজরত জাবের বলেছেন, প্রচলিত রীতি এটাই যে, চল্লিশ অথবা চল্লিশের অধিক ব্যক্তির বসতিতে জুমআ ফরজ, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহাও ওয়াজিব। এই বর্ণনাসূত্রসংযুক্ত আবদুল আজিজ ইবনে আবদুর রহমান সম্পর্কে ইমাম আহমদ বলেছেন, তার সকল বর্ণনা মিথ্যা, তাই পরিত্যাজ্য। এক বর্ণনায় 'মিথ্যা'র বদলে উল্লেখ করা হয়েছে 'মওজু' (স্বসৃষ্ট)। এভাবে আরো বলা হয়, হজরত আবু উমামা বলেছেন, পঞ্চাশ জনের অধিক হলে জুমআ ফরজ হবে, এর কম হলে হবে না। তিবরানী এরকম বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাসূত্রভূত জাফর ইবনে যোবায়েরকেও সনাক্ত করা হয়েছে পরিত্যাজ্য বলে। আরেকজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে পরিত্যাজ্য বলে। বায়হাকীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর সুত্রসংযুক্ত নুহাশকে চিহ্নিত করা হয়েছে দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর মসজিদের পর সর্বপ্রথম জুমআ পড়া হয় জুওয়াছা নামক স্থানে। জুওয়াছা বাহরাইনের একটি ক্বরিয়া বা গ্রাম। বোখারী। এই হাদিস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, সকল গ্রামে জুমআ ফরজ। কেননা 'ক্বরিয়া' শব্দটি কখনো কখনো শহর বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'লাওলা নুয্যিলা হাজাল ক্বুরআনা আ'লা রজুলিম্ মিন ক্বরিয়াতাইনি আ'জীম'। এখানে 'ক্বরিয়াতাইন' দ্বারা বুঝানো হয়েছে মক্কা

ও তায়েফকে। আর সকলেই জানে যে, এদু'টো স্থান গ্রাম নয়, শহর। জাওহারী তাঁর 'সিহাহ্' গ্রন্থে লিখেছেন, 'জুওয়াছা' বাহরাইনের একটি কেল্লার নাম। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে স্থানটি শহরই ছিলো, গ্রাম নয়। আর যেখানে কেল্লা থাকে, সেখানে প্রশাসকও নিশ্চয় থাকে। আর আলেম তো সেখানে থাকবেনই। 'মাবসুত' গ্রন্থে রয়েছে, জুওয়াছা বাহরাইনের একটি বড় শহর।

জুমআ অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক লোকের কথা কোনো প্রামাণ্য হাদিসেই নেই। সেকারণেই হাসান বসরী ও আবু ছওরের মতে দু'জন লোকের উপস্থিতিতেও জুমআ অনুষ্ঠিত হতে পারে। কেননা দু'জনকে এক সাথে বলা হয় জামাত। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আওজায়ীর মতে তিনজনকে নিয়েও জুমআ আদায় করা যায়। তবে শর্ত হচ্ছে, ওই তিনজনের মধ্যে একজনকে হতে হবে ওই লোকালয়ের প্রশাসক। ইমাম আবু হানিফা বলেন, জুমআ অনুষ্ঠিত হতে হবে কমপক্ষে চারজনকে নিয়ে। কেননা এই আয়াতে বলা হয়েছে 'ফাসআ'ও ইলা জিকরিল্লাহ্'।

এখানকার 'ফাসআ'ও' ক্রিয়াটির দ্বারা সম্বোধিত হয়েছে তিনজন। কেননা আরবী ভাষায় বহুবচন শুরু হয় তিন সংখ্যা থেকে। আর একজনকে তো হতেই হবে 'জাকের' বা খতিব। এভাবে সংখ্যা দাঁড়ায় চার। আমি বলি, এমতো অভিমত যথার্থ নয়। কেননা এখানকার সম্বোধনটি সাধারণার্থক ও ব্যাপক। বহুবচনার্থক ক্রিয়া দ্বারা এখানে বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়নি। যদি হতো, তবে 'আক্বিমুস্সলাহ' 'আক্বিমুয্যাকাহ্' এ সকল নির্দেশ পালনের জন্য জামাত হওয়া অনিবার্য হতো।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামাত অপেক্ষা জুমআ'র জামাত বড় হওয়া উচিত। কেননা জুমআ ফরজ হয় সপ্তাহে একবার। একারণেই জুমআকে বলা হয় 'জ্বামেউল জ্বামায়াত'। আবার দু'জনের উপরও জামাত শব্দটি প্রয়োগ করা যায়। এ কারণেই ইমাম আবু ইউসুফ ইমামসহ তিন জনকে জামাত হওয়ার শর্ত বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ইমাম ছাড়া কেবল মুক্তাদীই হতে হবে তিনজন।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জুমআর নামাজের ইমামকে হতে হবে শহর প্রশাসক, অথবা তার অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি। কিন্তু ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে এটা কোনো জরুরী শর্ত নয়। আর এই শর্তটিকে জরুরী প্রমাণ করার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণও নেই। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, বনী নাজীরের মুক্তকৃত গোলাম আবু উবায়দা বলেছেন, হজরত ওসমানকে যখন অবরোধ করে রাখা হয়েছিলো, তখন আমরা নামাজ পড়তাম হজরত আলীর ইমামতিতে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ওই অবরোধ প্রলম্বিত হয়েছিলো চল্লিশ দিন পর্যন্ত। তখন ইমামতি করতেন কখনো হজরত তালহা, কখনো হজরত আবদুর রহমান, কখনো অন্য কেউ। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, তারা হয়তো ইমামতি করেছিলেন হজরত

ওসমানের অনুমতিক্রমে, অথবা অনুমতি ছাড়াই। কোনটা ঠিক, তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায় না। তবে এক্ষেত্রে রসুল স. এর নির্দেশনা অবশ্যমান্য। তিনি স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমাম (অত্যাচারী অথবা ন্যায়বান) বিদ্যমান থাকা অবস্থায় জুমআ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তার অশান্তি কখনো দূর করবেন না। তার কাজে বরকত দান করবেন না। আরো শোনো, তার নামাজও হবে না। ইবনে মাজা প্রমুখ। এই হাদিসে 'ইমাম' বা প্রশাসককে অপরিহার্য করা হয়েছে। আর এখানকার 'ওয়া লাহু জলিমুন আও আ'দিলুন' (অত্যাচারী অথবা ন্যায়বান) কথাটি জুমলায়ে হালিয়া' (অবস্থাজ্ঞাপক বাক্য)। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, শাসক অবশ্যই ইমামতি করবে, নিজে অথবা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে। আমি বলি, হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সুপরিণত সূত্রে। কিন্তু এর সূত্রপরম্পরাভূত আবদুল্লাহ্ আদুবী বর্ণনাকারী হিসেবে অচল। বারা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ভিন্ন এক সূত্রে। সে বর্ণনাসূত্রভূত আলী ইবনে জায়েদ ইবনে জাদআনও নির্ভরযোগ্য নয়। দারাকুতনী বলেছেন দু'টো সূত্রের কোনোটিই সুসাব্যস্ত নয়। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, হাদিসটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট।

মাসআলা ঃ জমহুরের মতে জুমআ পাঠের জন্য জোহরের ওয়াক্ত হওয়া শর্ত। কেননা জুমআ জোহরের স্থলাভিষিক্ত। তাই যতক্ষণ জোহর ফরজ না হবে ততক্ষণ জুমআ ফরজ হবে না এবং তা জোহরের স্থলাভিষিক্তও হবে না। ইমাম আহমদের মতে সূর্য ঢলে পড়ার আগেও জুমআ পড়া জায়েয। হজরত সহল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, আমরা দ্বিপ্রহরের আহার ও 'কায়লুলা' (দ্বিপ্রহরিক বিশ্রাম) করতাম জুমআ পাঠের পরে। হজরত সালমা ইবনে আকওয়া বর্ণনা করেছেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে জুমআ পাঠ শেষে যখন ঘরে ফিরতাম, তখন দেয়ালের ছায়া এতটুকু দীর্ঘ হতো, যাতে বসা বা চলা যায়। দু'টো হাদিসই বর্ণিত

www.eelm.weebly.com

হয়েছে ‘সহীহ’ গ্রন্থে। হজরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে জুমআ পড়ার পর কায়লুলা করার জন্য গৃহে ফিরে আসতাম। বোখারী।

ইমাম আহমদের অভিমত সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, জুমআর পূর্বে দুপুরের আহার না করা সূর্য ঢলে পড়ার আগে জুমআ নামাজ পাঠের দলিল হতে পারে না। আর পরের হাদিসও তাঁর অভিমতের পক্ষে নয়। কেননা সেখানে যা বলা হয়েছে, তার ভাবার্থ হচ্ছে, জুমআ শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে ছায়া এতোখানি দীর্ঘ হতো যে, তাতে বসা যায় অথবা বাহনারোহী হয়ে চলা যায়। আর একথা সুস্পষ্ট যে, সূর্য ঢলে পড়ার পর পরই ছায়া এতোখানি দীর্ঘ হয় না।

আমাদের মাজহাবের প্রমাণ রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত হাদিসসমূহে। এছাড়াও রয়েছে আরো প্রমাণ। যেমন— ১. রসুল স. হজরত মাসআব ইবনে উমায়েরকে এক পত্রে লিখেছিলেন, অতঃপর দেখো, যেদিন ইহুদীরা উচ্চস্বরে যবুর কিতাব পাঠ করে, সেদিন তোমরা তোমাদের নারী ও সন্তানদেরকে একত্রিত কোরো এবং যখন সূর্য ঢলে পড়ে, তখন দু'রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে সচেষ্ট হয়ো। ২. হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, সূর্য যখন

ঢলে পড়তো, তখন রসুল স. জুমআর নামাজ পাঠ করতেন। বোখারী, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। ৩. হজরত সালমা ইবনে আকওয়া বর্ণনা করেছেন, সূর্য যখন ঢলে পড়তো, তখন আমরা রসুল স. এর সঙ্গে জুমআ'র নামাজ আদায় করতাম। মুসলিম। ইউসুফ ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল যখন মক্কা শরীফে এলেন, তখন লোকেরা জুমআর নামাজ পাঠ করছিলো। আর ছায়া তখন ছিলো গৃহের ভিতরে। তিনি এ অবস্থা দেখে বলেছিলেন, তোমরা ওই সময় পর্যন্ত নামাজ পাঠ কোরো না, যতক্ষণ না কাবাগৃহের ছায়া পূর্ব দিকে চলে আসে। ইমাম শাফেয়ী।

মাসআলা ঃ জুমআর নামাজ যথাসময়ে শুরু করা হলেও শেষ করার আগেই যদি ওয়াক্ত চলে যায়, তবে ইমাম শাফেয়ীর মতে যতটুকু ইতোমধ্যে আদায় করা হয়েছে তার উপরে ভিত্তি করে বাকীটুকু আদায় করতে হবে জোহর হিসেবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এমতাবস্থায় জুমআর নামাজ হয়ে যাবে বাতিল। জোহর পড়তে হবে প্রথম থেকে। কেননা জুমআ ও জোহর এক নয়, একটি অপরটির ভিত্তি নয়। জুমআর আংশিক নামাজকে জোহরের অন্তর্ভূত করা তুলমূল্যতাবিরুদ্ধ। জুমআর নামাজের জন্য ওই সকল বিষয় জরুরী, যা জরুরী জোহরের নামাজের জন্য। এর একটি হচ্ছে, জোহরের ওয়াক্ত হওয়া। তাই জোহরের ওয়াক্ত চলে গেলে জুমআও বিশুদ্ধ হবে না। ইমাম মালেকের মতে জুমআ যদি আসরের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত আদায় না করা হয়ে থাকে, তবে জুমআ আদায় করা যাবে আসরের নামাজের সময় সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এমনকি সূর্যাস্তের পূর্বে জুমআ শুরু করে সূর্যাস্তের পর তা সমাপ্ত করলেও জুমআ আদায় হয়ে যাবে। ইমাম আহমদও এরকম বলেছেন। তাঁর মতে প্রয়োজন সাপেক্ষে জুমআর নামাজ জোহরের ওয়াক্ত থেকে শুরু করে আসর পর্যন্ত পড়া যায়।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, জুমআর স্থানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকা জরুরী। প্রশাসক যদি শহরের প্রবেশতোরণ বন্ধ করে দেয় এবং সাধারণ জনতাকে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দেয়, তবে জুমআ'র নামাজ বৈধ হবে না। জমহুরের অভিমত এর বিপরীত। ইবনে হুম্মাম ইমাম আবু হানিফার অভিমতকে সমর্থন করে বলেছেন, এই আয়াতে ‘যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়’ বলে সর্বসাধারণকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর এ ধরনের আহ্বান সাধারণার্থক। আমি বলি প্রমাণ উপস্থাপনের এমতো প্রক্রিয়া অ-দৃঢ়। কেননা আহ্বান বা আজানকে এখানে জুমআ'র দিকে ধাবিত হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে, শর্ত সাব্যস্ত করা হয়নি। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘ইজা কুরিআল কুরআনু ফাসতামিউ’ লাহু ওয়া আনসিতু’। এখানে কোরআন পাঠ মনযোগ দিয়ে শোনা ও চুপ থাকাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা এমন বুঝানো হয়নি যে, কেউ মনোযোগ দিয়ে কোরআন না শুনলে এবং চুপ না থাকলে কোরআন পাঠ করা যাবে না। এমনটি তো নয় যে, নামাজে মুক্তাদী কোরআন পাঠ করতে শুরু করলো, আর তার পাঠ শুনে ইমাম তার নিজের ক্বেরাত বন্ধ করে দিয়ে তা শুনবে অথবা খতিব বন্ধ করে দিবে তার খুতবা।

আমি বলি, জুমআর নামাজের জন্য সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকা যে প্রয়োজন, সে কথা প্রমাণিত হয়েছে এই হাদিসের মাধ্যমে— রসুল স. হজরত মাসআব ইবনে উমায়েরকে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেনো মদীনায় জুমআর নামাজের ইমামতি করেন, অথচ মক্কাবাসী রসুল স. তখনো জুমআর নামাজ শুরু করেননি, যদিও সাহাবীগণকে কোনো ঘরে একত্রিত করে তখন জুমআর নামাজ আদায় করা সম্ভব ছিলো। কিন্তু এ জন্য সর্বসাধারণকে আহ্বানের সুযোগ তখন ছিলো না। সে কারণেই রসুল স. তখন জুমআর নামাজ পাঠ করেননি।

মাসআলা ঃ গ্রামে বা মরুভূমিতে, যেখানে জুমআ ফরজ নয়, সেখানকার লোকদেরকে জুমআ পড়ার জন্য শহরে আসতে হবে কিনা, সে সম্পর্কে ইমামগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গ্রাম ও মরুভূমির অধিবাসীদের জন্য শহরে এসে জুমআ পাঠ করা ফরজ নয়। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইবনে ইসহাক বলেছেন, গ্রাম ও মরুবাসীরা যদি শহরের মসজিদের মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পায়, তবে তাদের জন্য শহরে গিয়ে জুমআ পাঠ করা ফরজ।

www.eelm.weebly.com

ইমাম মালেকও এরকম বলেছেন। তবে তিনি এর দূরত্ব নির্ধারণ করেছেন এক ফারসাখ। শরিয়ত মতে চার মাইল। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, কোনো কোনো আলেমের মতে এক মাইল। আবার কেউ কেউ বলেছেন, দু'মাইলের দূরত্ব হওয়া জরুরী। ইমাম শাফেয়ী দূরত্বের কোনো সীমা নির্ধারণ করেননি। ইমাম আহমদের মত ইমাম আবু হানিফার অভিমতের অনুরূপ। জুহুরী বলেছেন, ছয় মাইলের দূরত্ব তো অবশ্যই হতে হবে। এর চেয়ে অধিক দূরে বসবাসকারীদের উপরে জুমআ ফরজ নয়। এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকের মতও এরকম। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, দূরত্ব হতে হবে তিন ফারসাখ। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, যে জুমআর নামাজ পড়ার পর নিজের বসতিতে রাতের মধ্যে ফিরে যেতে পারে, তার উপরেও জুমআ'র নামাজ ফরজ। হেদায়া রচয়িতা ইমাম আবু ইউসুফের অভিমতকে উৎকৃষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। দূরত্বের সীমা নির্ধারণ না করার পক্ষপাতি যারা, তারা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের আহ্বানটি সাধারণার্থক। এখানে দূরত্বের কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। তাছাড়া আবু দাউদ প্রমুখ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জুমআ ওই সকল লোকের উপরে ফরজ, যারা আজান শুনতে পায়। এই হাদিসেও দূরত্বের নির্ধারণ নেই।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের বর্ণনাতেই কেবল সীমা নির্ধারণের উল্লেখ দেখা যায়। আর এই বর্ণনাটিকেই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন জুহুরী, ইমাম মালেক ও ইমাম আবু ইউসুফ। আবার তাঁদের কারো কারো মতে বারো মাইলে এক মঞ্জিল, আবার কারো কারো মতে আঠারো মাইলে। অর্থাৎ মঞ্জিলের দূরত্ব কমপক্ষে বারো মাইল এবং ঊর্ধ্বপক্ষে আঠারো মাইল। এ মতের সমর্থন রয়েছে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স.

বলেছেন, জুমআ ওই ব্যক্তির উপরেও ফরজ, যে জুমআ পাঠ করে রাতের মধ্যে হলেও তার ঘরে ফিরে যেতে পারে। তিরমিজি। কিন্তু এই বর্ণনাটি প্রামাণ্য নয়। ইমাম আহমদ বর্ণনাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, আপন প্রভুপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। (অর্থাৎ বর্ণনাটি ভুল)। হাদিসবেত্তাগণ বর্ণনাটির সূত্রসংযুক্ত হাজ্জাজ ইবনে নাসিরকে 'পরিত্যাজ্য' বলেছেন। একথা জানিয়েছেন আবু হাতেম রাজী। এর আর এক বর্ণনাকারীর নাম মাআরেক ইবনে উব্বাদ। আবু হাতেম বলেছেন, তার বর্ণনা অখ্যাত। আবু জরআ বলেছেন, সে এক অচল বর্ণনাকারী। সে আবদুল্লাহ্র কাছে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ মাকবুরীর বর্ণনা উপস্থাপন করে থাকে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ শায়বানী তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, সে অপদার্থ। তার বর্ণনা লেখার যোগ্য নয়। যে সকল আলেম বলেন, আজান শুনতে পেলে অথবা এমন দূরত্বে অবস্থান করলে যেখানে জুমআ শেষে রাতে হলেও ফিরে যাওয়া যায়— এরকম লোকদের উপরে জুমআ ফরজ, তারা দলিল উপস্থাপন করেন মদীনার পার্শ্ববর্তী বসতি সমূহের ও কোবা পল্লীর। সেখানকার লোকেরা মসজিদে নববীতে এসে জুমআ আদায় করতেন। তাছাড়া বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, জুলহুলায়ফার অধিবাসীরাও মসজিদে নববীতে এসে জুমআর নামাজ পাঠ করতেন। কিন্তু তাঁদের এমতো দলিল শুদ্ধ নয়। কেননা এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, মদীনায় এসে জুমআ পাঠ করা তাদের উপরে ফরজ ছিলো। বরং এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা এরকম করতেন রসুল স. এর সঙ্গে নামাজ পাঠ করার মর্যাদা লাভার্থে। তিরমিজির বিবরণে এসেছে, জনৈক কোবাবাসী বর্ণনা করেছেন, আমার সাহাবী পিতা আমাকে বলেছেন, রসুল স. আমাদেরকে বলেছিলেন, আমরা যেনো জুমআর নামাজ তাঁর সঙ্গে আদায় করি। এখানে বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। তাই বর্ণনাটি দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

মাসআলা ঃ ইমাম আহমদ বলেছেন, জুমআ'র দিনের ঈদ জুমআর নামাজকে সরিয়ে দেয়। তাই ওই দিন আমরা জুমআ'র বদলে জোহর পড়ে থাকি। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, ঈদের নামাজ পড়লে ওই দিনের জুমআ আর থাকে না। তাই ওই দিন নামাজ পড়তে শুরু করতে হবে আসর থেকে। এরকম বলেছেন আতা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, পার্শ্ববর্তী লোকালয়ের লোকেরা ঈদের নামাজ পড়ার পর জুমআ পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তাদের আপনাপন গৃহে ফিরে যেতে পারবে। এরকম করা তাদের জন্য জায়েয। কিন্তু মরুবাসীরা এরকম করতে পারবে না। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক বলেছেন, যার উপরে জুমআ ফরজ, ঈদের নামাজ পাঠ করলেও তাকে ওই দিনের জুমআ পাঠ করতে হবে। কেননা জুমআর নামাজ প্রমাণিত হয়েছে কোরআন, হাদিস ও ঐকমত্য দ্বারা। সুতরাং একক বর্ণনা দ্বারা তা রহিত হতে পারে না। আর এ নামাজ ফরজও, নফল নয়।

হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. এর পৃথিবীবাসের সময় একবার দুই ঈদ একত্রিত হয়েছিলো (ঈদ হয়েছিলো জুমআ'র দিনে)। রসুল স. তখন ঈদের নামাজ সমাপনান্তে বলেছিলেন, কেউ চাইলে জুমআর নামাজে অংশগ্রহণ করতে

পারবে, আর না চাইলে শরীক হতে হবে না। এই বর্ণনাসূত্রসংযুক্ত মুবাদ্দাল ইবনে আলী একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। এর আর এক বর্ণনাকারী কুবারা ইবনে মুফলিসকে মিথ্যাবাদী বলেছেন ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন। এ প্রসঙ্গে আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে, যার সূত্রভূত বাকিয়া হচ্ছে প্রতারক। হাদিস দু'টো বর্ণনা করেছেন জাওজী।

মাসআলা ঃ যার উপরে জুমআ ফরজ, তার জন্য সূর্য ঢলে পড়ার পর জুমআ না পড়ে সফরে বের হওয়া জায়েয নয়। তবে রাস্তায় যদি তার জুমআ আদায় করার সুযোগ থাকে, অথবা সফরসঙ্গীদের থেকে পিছনে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যদি তার থাকে,

www.eelm.weebly.com

তবে সে এমতাবস্থায় জুমআ পাঠ না করেও যাত্রা শুরু করতে পারবে। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের মতে সূর্য ঢলে পড়লে এমনিতেও জুমআ না পড়ে সফরে বের হওয়া যায়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এরকম করা নাজায়েয, সূর্য ঢলে পড়ার পরে হোক, অথবা আগে। ইমাম আহমদ বলেছেন, জুমআর দিনে সকল প্রকার সফর নাজায়েয। জায়েয কেবল জেহাদের সফর। জুমআর দিনে জুমআ পাঠ না করেও জেহাদের জন্য বের হয়ে যাওয়া যায়।

যাঁরা সর্বাবস্থায় জুমআর দিনে সফর নাজায়েয বলেন, তাঁরা তাদের পক্ষের প্রমাণরূপে উপস্থাপন করেন সুপরিণতসূত্রে বর্ণিত হজরত ইবনে ওমরের একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, যারা জুমআর দিনে সফর করে, ফেরেশতারা তাদের জন্য বদ দোয়া করে। এই বর্ণনাসূত্রভূত লেহিয়া একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। আর যাঁরা জেহাদ ছাড়া অন্য সময়ে জুমআর দিনের সফরকে নাজায়েয বলেন, তাঁরা দলিল দেন হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস থেকে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. একবার হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহার সৈনাপত্যে এক বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করলেন শুক্রবারে। নির্দেশানুসারে ওই বাহিনী রওয়ানা হয়ে গেল দুপুরের আগেই। হজরত আবদুল্লাহ্ গেলেন না। মনে করলেন, জুমআ পড়ে তিনি দ্রুত গিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন। নামাজ শেষে রসুল স. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি পিছনে রয়ে গেলে কেনো? তিনি জবাব দিলেন, আমি ভাবলাম, নামাজ পড়ে তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারবো। রসুল স. বললেন, এখন তুমি যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদও আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করো, তবুও জুমআর আগে যাত্রা করার সমান সওয়াব পাবে না। আহমদ, তিরমিজি। বর্ণনাটির সূত্রশৃঙ্খল বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে তিরমিজি একে বলেছেন, পরিত্যাজ্য। বায়হাকী বলেছেন, এই বর্ণনাসূত্রভূত হাজ্জাজ ইবনে আরতাত একজন দুর্বল বর্ণনাকারী।

জুমআর দিনে সফর জায়েয হওয়ার প্রবক্তাগণ বলেছেন, আবু দাউদ তাঁর 'মারাসীল' পুস্তকে লিখেছেন, একবার জুহ্রী জুমআর দিন দুপুরের পূর্বে সফরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। লোকেরা অনুযোগ উত্থাপন করলো। তিনি বললেন, রসুল স. স্বয়ং জুমআর দিনে সফর করেছেন। ইমাম শাফেয়ী বর্ণনা

করেছেন, হজরত ওমর একবার এক মুসাফিরকে বলতে শুনলেন, জুমআর দিন না হলে আমি আজ যাত্রা শুরু করতে পারতাম। তিনি বললেন, যাও, চলে যাও। জুমআ সফরের প্রতিবন্ধক নয়। সাঈদ ইবনে মনসুর বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ একবার জুমআর আগেই এক স্থানে যাত্রা করলেন। নামাজের জন্য অপেক্ষা করলেন না।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জুমআ ফরজ হয় সূর্য ঢলে পড়ার পর। তাই সূর্য ঢলে পড়ার পর ফরজ আদায় করার পূর্বে কোথাও যাত্রা করা জায়েয নয়। কিন্তু দ্বিপ্রহরের পূর্বে যাত্রা করা নাজায়েয নয়। কেননা তখন জুমআর নামাজ ফরজই হয় না। জুহ্রী এবং হজরত ইবনে আব্বাসের বিবৃতি একথাকেই প্রমাণ করে।

মাসআলা ঃ শহর যতো বড়ই হোকনা কেনো, সেখানে একবার জুমআর নামাজ পাঠ করাই ফরজ। একাধিকবার জুমআর নামাজ পাঠ জায়েয নয়। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেছেন। তাহাবী লিখেছেন, ইমাম মালেকও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। ইমাম শাফেয়ীর প্রাচীন মতও এরকম। মলফুজাত রচয়িতাগণ লিখেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, এক শহরে দুই জায়গায় জুমআ পড়া জায়েয নয়। তবে কোনো বড় নদী যদি সে শহরের মাঝখানে থাকে, তাহলে দুই জায়গায় নামাজ পাঠ করা যাবে। কারণ নদী শহরটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দুই শহর তুল্য করেছে। তিনি আরো বলেছেন, ওই নদীতে কোনো সেতু থাকলে তা ভেঙে দেওয়া উচিত। নতুবা শহরের যেখানে প্রথমে জুমআ পাঠ করা হবে, সেটাই বিশুদ্ধ হবে। পরের গুলো বিশুদ্ধ হবে না। আর এমতাবস্থায় যদি দুই স্থানে একই সঙ্গে নামাজ পড়া হয়, তবে উভয় নামাজই হয়ে যাবে ফাসেদ (অকার্যকর)। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, বড় শহরের দুই স্থানে জুমআর নামাজ পড়া যেতে পারে। দুই এর অধিক স্থানে পড়া যাবে না।

ইমাম আহমদ বলেছেন, শহর যদি অনেক বড় হয়, যেমন বাগদাদ শহর, আর তার লোক সংখ্যাও হয় অনেক বেশী, তবে প্রয়োজনবশতঃ দুই স্থানে জুমআ পড়া যাবে। আর প্রয়োজন না পড়লে নামাজ পাঠ করতে হবে এক স্থানে। দুই এর অধিক স্থানে নামাজ পাঠ সর্বাবস্থায় নাজায়েয। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, বাগদাদ মূলতঃ বড় শহর ছিলো না। ছিলো পৃথক পৃথক লোকালয় ও গ্রাম। জন সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় পরে সেগুলো সম্মিলিত হয়ে পরিণত হয়ে যায় বড় শহরে। কিন্তু জুমআ আগের মতোই অনুষ্ঠিত হতে থাকে প্রত্যেক লোকালয়ে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত ইমাম শাফেয়ীর মতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে, জন সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে যদি এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, সকল লোক সমবেত হলে স্থান সংকুলান হয় না, তবে দুই মসজিদে এমনকি অনেক মসজিদে জুমআর নামাজ পড়া জায়েয হবে। ইমাম মোহাম্মদ ইবনে হাসান বলেছেন, ছোট বড় সকল শহরে সর্বাবস্থায় বিভিন্ন মসজিদে জুমআর নামাজ আদায় করা সিদ্ধ। তিনি তাঁর এই বক্তব্যটিকে ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। ইমাম

www.eelm.weebly.com

সারাখসি বলেছেন, ইমাম আবু হানিফার বিশুদ্ধ বক্তব্য এই যে, দুই মসজিদে, এমনকি অনেক মসজিদে জুমআ প্রতিষ্ঠা করা সিদ্ধ। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, আমাদের কাছে এই অভিমতটিই অধিক পছন্দনীয়। কেননা জুমআ প্রতিষ্ঠা করার শর্ত শহর হওয়া। আর শহরের সকল প্রান্তই শহর।

এক শহরের বিভিন্ন স্থানে জুমআ পাঠ অসিদ্ধ, এরকম বলা হয় একারণে যে, জুমআ অর্থ সমাবেশ। সুতরাং এরকম সমাবেশ এক শহরে একটি হওয়াই সমীচীন। এই বিশেষ বিধানটিকে জুমআ বলা হয়েছে একারণেই। আছরম একবার ইমাম আহমদকে প্রশ্ন করেছিলেন, এক শহরের দু'জায়গায় জুমআ হতে পারে কীভাবে? তিনি জবাবে বলেছিলেন, আমি জানি না এরকম বলেছে কে? ইবনে মুনজির বলেছেন, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, রসুল স. ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে জুমআর নামাজ কেবল মসজিদে নববীতেই অনুষ্ঠিত হতো। জুমআর দিনে সকল মসজিদ ছেড়ে এক মসজিদে সমবেত হওয়া থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, জুমআর বিধান অন্যান্য জামাতের বিধান থেকে ভিন্নতর। তাই জুমআর নামাজ শহরের এক মসজিদে আদায় করাই দস্তুর। বিভিন্ন মসজিদে জুমআ পাঠ করার কথা বলেছেন কেবল আতা।

খতিব তাঁর 'তারিখে বাগদাদ' গ্রন্থে লিখেছেন, এক শহরের প্রাচীনতম মসজিদে জুমআ'র নামাজ আদায় করা সত্ত্বেও শহরের অন্যান্য মসজিদে জুমআ আদায় করার নিয়মটির প্রচলন ঘটেছিলো মুতাসিম বিল্লাহর শাসনামলে ২৮০ হিজরী সনে। তিনি তাঁর দরবারের মসজিদে জুমআ পড়তেন। সর্বসাধারণের ভিড়ের মধ্যে জুমআ পড়তে তিনি ভয় পেতেন। ওই সময় দরবার ছাড়া অন্য কোথাও জুমআর স্থানও নির্ধারণ করা হয়নি। এরপর মুকতাফী বিল্লাহ্‌র শাসনামলে জুমআ পাঠের জন্য আর একটি মসজিদ বানানো হয়। ইবনে আসাকের তাঁর 'তারীখে দামেশক' গ্রন্থে লিখেছেন, খলিফা হজরত ওমর তাঁর আঞ্চলিক প্রশাসকবৃন্দ হজরত আবু মুসা আশয়ারী, হজরত আমর ইবনে আস ও হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে লিখেছিলেন, শহরে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। ওই মসজিদেই জুমআ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর জনগণের মধ্যে এই ঘোষণাটি প্রচার করতে হবে যে, তারা যেনো তাদের আপন আপন পাড়ায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাঠের জন্য পৃথক পৃথক মসজিদ বানিয়ে নেয়।

উপযোগ ঃ ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, জুমআ'র শর্তসমূহের মধ্যে কোনো একটি শর্ত সন্দেহযুক্ত মনে হলে জুমআ পাঠ শেষে জোহরের নামাজের নিয়তে চার রাকাত নামাজ পড়ে নেওয়া উচিত। তাহলে জুমআ বিশুদ্ধ না হলেও জোহরের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। আর যদি জুমআই বিশুদ্ধ হয়, তবে পরের চার রাকাত হয়ে যাবে নফল।

জুমআর সুন্নতসমূহ ঃ জুমআর দিন গোসল করা সুন্নত। ইমাম মালেক ও দাউদ জাহেরী বলেছেন, ওয়াজিব।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জুমআর দিবসে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য গোসল করা ওয়াজিব। বোখারী, মুসলিম। হজরত ইবনে

ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে জুমআর নামাজ পড়তে যাবে, তার গোসল করে নেওয়া উচিত। বোখারী, মুসলিম। হাদিসটি প্রসিদ্ধ, বরং সুবিদিত। আবুল কাসেম ইবনে মান্দাহ ও নাফে থেকে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন তিন শতের অধিক বর্ণনাকারী। নাফে ছাড়া হজরত ইবনে ওমর থেকেই এই হাদিস বর্ণনাকারী রয়েছেন চৌদ্দজন সাহাবী। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, হাদিসটির নির্দেশনা ওয়াজিব অর্থে আসেনি। যদি 'ওয়াজিব' ধরাও হয়, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে— সুন্নত পদ্ধতি অনুসারে ওয়াজিব। কেননা জুমআর দিনে গোসলের সঙ্গে অন্য যে সকল আমলের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর কোনোটাই ওয়াজিব নয়। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জুমআর দিবসে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য গোসল করা, মেসওয়াক করা এবং সম্ভব হলে খুশবু ব্যবহার করা অপরিহার্য। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, লোকেরা নিজেদের কাজ কর্মে ব্যাপৃত থাকতো। কাজ শেষে সে অবস্থাতেই চলে আসতো মসজিদে (ঘাম ইত্যাদির কারণে মুসল্লিদের কষ্ট হতো, তাই তাদেরকে বলা হলো, গোসল করে আসলে ভালো হয়)।

জুমআর গোসল ওয়াজিব না হওয়ার দলিল হচ্ছে হাসান বসরী থেকে বর্ণিত কাতাদার একটি অপরিণত হাদিস, যা আবার সুপরিণতসূত্রে বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক। সেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ভালোভাবে ওজু করে মসজিদে এসে মনোযোগ সহকারে খুতবা শ্রবণ করে, মাফ করে দেওয়া হয় তার এক জুমআ থেকে অপর জুমআ পর্যন্ত সংঘটিত পাপসমূহ। এর সঙ্গে আরো তিন দিনের অধিক গোনাহ। মুসলিম।

একথা ঠিক যে, গোসল ওয়াজিব না হওয়ার হাদিসসমূহ ওয়াজিব হওয়ার হাদিসসমূহ অপেক্ষা দুর্বল। কিন্তু সাহাবীগণের আমল গোসল ওয়াজিব না হওয়াকেই প্রমাণ করে। তাই এমতো ক্ষেত্রে ওয়াজিব হওয়ার হাদিসসমূহকে হয় রহিত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে, অথবা গ্রহণ করতে হবে সেগুলোর ভাবার্থ।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, এক দিন খলিফা হজরত ওমর খুতবা দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হলেন। এমন সময় মসজিদে প্রবেশ করলেন প্রথম হিজরতকারীদের দলভূত একজন সাহাবী। হজরত তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, এখন কোন সময়? তিনি জবাব দিলেন, আমি কাজকর্মে ব্যস্ত ছিলাম। আজানের আওয়াজ শুনে বাড়িতে যাবার সময় পেলাম না। ওজু করে আসতে আসতেই একটু দেরী হয়ে গেলো। হজরত ওমর বললেন, এটাও তো ঠিক হলো না। আপনি নিশ্চয় জানেন, রসুল স. জুমআর দিনে গোসল করতে বলতেন। ইবনে জাওজী বলেছেন, ওই সাহাবী ছিলেন হজরত ওসমান। তিনি তখন গোসল করে মসজিদে আসেননি। আর সে কারণে হজরত ওমর তাঁর আগমনকে একেবারে নাকচও করেননি। অন্য কেউও তাঁর আমলের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, জুমআর দিন গোসল করা সুন্নত,

ওয়াজিব নয়। সুতরাং যে সকল হাদিসে গোসল ওয়াজিব বলা হয়েছে, সেগুলোর ভাবার্থ গ্রহণ করাই সমীচীন এবং সেগুলোকে রহিত হয়েছে, এমনও বলা যাবে না। যদি তাই হতো, তবে হজরত ওমর নিশ্চয় এমন করে বলতেন না যে, রসুল স. জুমআর দিনে গোসল করতে বলতেন। অতএব বুঝতে হবে জুমআর গোসল অভিপ্রেত (মোস্তাহাব) এবং শোভন (মাসনুন)।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জুমআর আগের চার রাকাত ও পরের চার রাকাত নামাজ সুন্নত। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, পরে সুন্নত ছয় রাকাত। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, ইমাম মোহাম্মদের অভিমত তাঁর অভিমতের অনুরূপ। জুমআর আগের চার রাকাত পড়ার কোনো দলিল নেই। দলিল কেবল এতটুকুই যে, রসুল স. সাধারণত জোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়তেন এবং বলতেন, এ সময় আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তাই আমি চাই, এ সময় আমার এই আমলটিও যেনো আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়। উত্তম সূত্রে আবু ইউসুফ থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা। এই আমলটির সঙ্গে তুলনীয় করেই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জুমআর আগের চার রাকাত সুন্নত। কেননা রসুল স. ফজরের আগের দুই রাকাত এবং জোহরের আগের চার রাকাত নামাজ কখনো বাদ দেননি। এরকম বর্ণনা করেছেন জননী আয়েশা থেকে বোখারী, আবু দাউদ ও নাসাঈ।

এখন অবশিষ্ট রইলো জুমআর পরের সুন্নত নামাজ প্রসঙ্গ। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জুমআর ফরজের পর আর কোনো নামাজ পড়তেন না। পড়তেন কেবল দুই রাকাত, যখন তিনি স. তাঁর ঘরে ফিরে যেতেন। ইমাম মালেক, বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ। 'সুনানে আবু দাউদ' গ্রন্থে এসেছে, হজরত ইবনে ওমর মক্কায় অবস্থান কালে জুমআর ফরজের পরে প্রথমে পড়তেন দুই রাকাত, তারপর চার রাকাত। কিন্তু মদীনায় অবস্থানকালে তিনি ফরজের পর পড়তেন কেবল দুই রাকাত। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, রসুল স. এরকমই করতেন। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, প্রকাশ থাকে যে, ওই সময়ের সুন্নত ছয় রাকাতই। হজরত ইবনে ওমর সে কথা জানতেন না। রসুল স. সফরের সময় সুন্নত মসজিদেই আদায় করতেন এবং গৃহবাসী অবস্থায় সুন্নত পড়তেন ঘরে।

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ জুমআর ফরজের আগে ও পরে চার রাকাত করে সুন্নত পড়ার পক্ষপাতি। কেননা হজরত ইবনে মাসউদ এরকমই করতেন। তিরমিজি তাঁর 'জামে' গ্রন্থে এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে মোবারক ও সুফিয়ান সওরীর অভিমতও এরকম। 'সহীহ্ মুসলিম' গ্রন্থে এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা জুমআর নামাজ পড়লে পরের চার রাকাত নামাজও পড়ে নিয়ো। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

মাসআলা ঃ হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জুমআর দিন গোসল করা, মেসওয়াক করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, উত্তম পোশাক

পরে মসজিদে যাওয়া, মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে না যাওয়া, আল্লাহ্ যেভাবে অনুমোদন করেন সেভাবে নামাজ পড়া, মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনা— এ সকল আমল পূর্বের জুমআ পর্যন্ত সকল পাপের ক্ষতিপূরণ। আবু দাউদ, বাগবী। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা একথাও বলেছেন, ক্ষতিপূরণ আরো তিনদিনের পাপের। কেননা আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একটি পুণ্যকর্ম করবে, তাকে প্রতিদান দেওয়া হবে দশটি। বোখারী প্রমূখ হজরত সালমান থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় 'আরো তিন দিনের' কথাটি নেই। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, জুমআর দিন ফেরেশতারা দণ্ডায়মান হয় মসজিদের সকল দরজায়। পর্যায়ক্রমে লিখতে থাকে মসজিদে আগমনকারীদের নাম। ইমাম যখন আগমন করেন, তখন তারা গুটিয়ে নেয় তাদের দপ্তর। শুনতে থাকে ইমামের ভাষণ। মসজিদে সর্বপ্রথম আগমনকারী পায় একটি উট কোরবানী করার সওয়াব। এর পরের জন সওয়াব পায় দুম্বা কোরবানীর। এর পরের জনেরা পায় মুরগী ও মুরগীর ডিম দান করার সওয়াব। বোখারী এবং মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সকল দিবস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দিবস হচ্ছে জুমআ'র দিবস। পিতা আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই দিবসে। তাঁকে বেহেশতে প্রবেশও করানো হয়েছে এই দিবসে। আবার বেহেশত থেকে

www.eelm.weebly.com

তাঁকে বহিষ্কারও করা হয়েছে এই দিনে। আর এই দিবসেই সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা এরকমও বর্ণনা করেছেন যে, রসুল স. বলেছেন, জুমআর দিবসে এমন এক সময় রয়েছে, যখন আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা কবুল করা হয়। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে, ওই সময়ের পরিসর স্বল্প। বোখারী ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে, ওই সময় যদি কেউ নামাজ পড়ে প্রার্থনা জানায়, তবে আল্লাহ্‌ তা নিশ্চয়ই গ্রহণ করেন। হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, ওই সময় হচ্ছে ইমামের দুই খুতবার মধ্যবর্তীতে উপবেশনের সময় থেকে নামাজ শেষ করা পর্যন্ত। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একবার সাহাবী কা'ব আহবারের সঙ্গে আমার সাক্ষাত ঘটলো। আমি তাঁর কাছে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে তওরাতের কিছু আয়াত পাঠ করে শোনালেন। আমি শোনালাম রসুল স. এর কয়েকটি বাণী। তার মধ্যে ছিলো এই বাণীটিও— রসুল স. বলেছেন, সকল দিবসের মধ্যে জুমআর দিবস সর্বশ্রেষ্ঠ। এই দিবসে নবী আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, আবার এই দিবসেই তাঁকে আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিলো পৃথিবীতে। তাঁর তওবা কবুল ও তাঁর মহাপ্রস্থানের ঘটনাও ঘটেছিলো এই দিবসেই। আর এই দিবসে সংঘটিত হবে কিয়ামত। জুমআর দিন ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষ ও জ্বিন ছাড়া অন্য সকল প্রাণী কিয়ামতের ভয়ে কাঁদতে থাকে। এই দিন এমন এক মুহূর্ত রয়েছে, যখন কেউ নামাজ পড়ে

আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলে তার দোয়া কবুল করে নেওয়া হয়। একথা শুনে কা'ব জিজ্ঞেস করলেন, ওই মুহূর্তটি কি বৎসরে একবার আসে? আমি বললাম, না। আসে প্রত্যেক জুমআর দিনেই। আমার কথা শুনে তিনি কিছুক্ষণ তওরাত পাঠ করলেন। তারপর বললেন, রসুল স. যথার্থ বলেছেন। হজরত আবু হোরায়রা আরো বলেছেন, এরপর আমি দেখা করলাম সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সঙ্গে। কা'বের সঙ্গে আমার যে সকল কথাবার্তা হয়েছে, সেগুলোর সবকিছুই তাঁকে খুলে বললাম। সব শুনে তিনি বললেন, কা'ব ভুল বলেছেন। আমি বললাম, তিনি তওরাত পাঠ করার পর এরকম মন্তব্য করেছেন। তিনি বললেন, তাহলে তিনি ঠিকই বলেছেন। আপনি কি জানেন, সেই দুর্লভ মুহূর্ত কোনটি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, জুমআর শেষ মুহূর্ত। আমি বললাম, তা কি করে হয়। রসুল স. যে বলেছেন, ওই সময় যে নামাজ পাঠ করে প্রার্থনা জানায়। শেষ মুহূর্তে তো নামাজ পড়া যায় না। তিনি বললেন, রসুল স. কি একথা বলেননি, নামাজের অপেক্ষায় যে বসে থাকে, সে নামাজ পাঠরতদের মতো? আমি বললাম, তাতো বলেছেন। তিনি বললেন, তাহলে বুঝুন, নামাজ পড়ার অর্থ এটাই। ইমাম মালেক, আবু দাউদ, তিরমিজি।

হজরত আউস ইবনে আউস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, সম্মানিত দিনগুলোর মধ্যে জুমআর দিনও অন্যতম। এদিনে নবী আদমকে সৃষ্টি করা হয়। এদিনেই ঘটে তাঁর মহাতিরোধান। এদিনেই শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং এদিনেই সকলে বেহুঁশ হয়ে যাবে। তাই এদিন আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ কোরো। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, আপনি যখন পৃথিবীতে থাকবেন না, তখন আমাদের দরূদ আপনার কাছে কেমন করে পৌঁছানো হবে? আপনি তো তখন মাটিতে মিশে যাবেন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌ নবীগণের দেহকে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন (মাটি তাদের শরীরকে গ্রাস করতে পারে না)। আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী, বায়হাকী। হজরত আবু লুবাবা থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, জুমআর দিন অন্য দিনগুলোর নেতা ও অন্যদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিনের চেয়েও সম্মানিত। পাঁচটি বিশেষত্ব রয়েছে এই দিনের— ১. এদিন নবী আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে ২. এদিনেই তাঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয় ৩. এদিনে ঘটে তাঁর মহাতিরোভাব ৪. এদিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যখন বান্দা কিছু চাইলে, তা তাকে দেওয়া হয়, যদি তা হারাম না হয় ৫. এই দিনেই সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। নৈকট্যভাজন ফেরেশতাবৃন্দ, আকাশ-পৃথিবী, বায়ুপ্রবাহ, পাহাড়, সমুদ্র সকলেই তাই জুমআর দিনকে ভয় করে। ইবনে মাজা। হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, জনৈক আনসারী একদিন রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! দয়া করে জানাবেন কী, জুমআর দিবসে কী কী কল্যাণ রয়েছে? তিনি স. বললেন, জুমআর দিনের বিশেষত্ব পাঁচটি। এর পর তিনি স. বর্ণিত বিশেষত্বসমূহের কথা উল্লেখ

করলেন। ইমাম আহমদ। হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, জুমআর দিন আমার উপরে অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পাঠ কোরো। এদিন ফেরেশতাদেরকে উপস্থিত করা হয়। ওই ফেরেশতারা পঠিত দরূদ আমার কাছে এনে দেয়। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র বাণীবহনকারী! আপনার পরলোক গমনের পরেও কি এরকম ঘটতে থাকবে? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌ নবীগণের শরীর মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের সমাধিতে জীবিত থাকেন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রিজিকপ্রাপ্ত হন। ইবনে মাজা।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জুমআর দিনে অথবা রাতে যে মুসলমান মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তাকে কবরের পরীক্ষা থেকে নিরাপদ রাখেন। আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর এবং এর সূত্রশৃঙ্খল অটুট নয়। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জুমআর দিবস অত্যুজ্জল ললাটবিশিষ্ট এবং জুমআর রাত্রি অতি শুভ্র ও সমুজ্জ্বল। বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'দাওয়াতুল কবীর' গ্রন্থে।

উপযোগ ঃ হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে জুমআর দিনের বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে চল্লিশটিরও অধিক উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন। তন্মধ্যে তিনি অধিক পছন্দ করেছেন 'হিসনে হাসীন' গ্রন্থের লেখক আল্লামা জামারী কর্তৃক সংকলিত মুসলিমের একটি বিবৃতিকে, যেখানে বলা হয়েছে, ওই বিশেষ মুহূর্তটি রয়েছে ইমামের খুতবা দানের উদ্যোগ গ্রহণের সময় থেকে নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু মুসা আশয়ারী। এ সম্পর্কে অধিকাংশ আলেম অবশ্য পছন্দ করেছেন হজরত আবু হোরায়রার বিবৃতিকে, যা তিনি বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামের উদ্ধৃতি সহকারে। নাসাঈ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের বর্ণনা করেন, আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ওই বিশেষ মুহূর্তটির অনুসন্ধান কোরো। বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. যেমন শবে কদরের নির্দিষ্ট সময় জানতেন, তেমনি জানতেন জুমআর দিনের বিশেষ মুহূর্তটির কথা। পরে যেমন শবে কদরের নির্দিষ্ট লগ্নের কথা তাঁকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনি ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে জুমআর দিনের বিশেষ মুহূর্তটির কথাও। ইবনে খুজায়মা তাঁর 'সহীহ্' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, আমরা একবার জুমআর দিনের বিশেষ মুহূর্ত সম্পর্কে রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি স. বললেন, আমি একথা জানতাম। কিন্তু পরে তা আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ। আসলাম বলেছেন, দু'টো অবস্থার যে কোনো একটিকে তো মানতেই হবে। হয় এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে কিছুসংখ্যক হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে অন্য কিছুসংখ্যক হাদিসের উপর, না হয় বলতে হবে, ওই বিশেষ মুহূর্তটি পরিবর্তিত হতে থাকে। অর্থাৎ এক এক জুমআয় এক এক সময়ে হয়, যেমন প্রতি বৎসর পরিবর্তিত হয় শবে কদরের তারিখ। কখনো হয় রমজানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত গুলোর যে কোনো এক রাতে, অথবা অন্য যে কোনো রাতে।

আমি বলি, শুক্রবারের দোয়া কবুলের সময় সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং হজরত আবু মুসা আশায়ারীর বিবরণ দু'টোকে সমন্বয় করা যেতে পারে এভাবে— তিনি জুমআর দিনের শেষ মুহূর্তকে দোয়া কবুল হওয়ার সময় বলেছেন তওরাতের উদ্ধৃতি থেকে। কিন্তু হজরত মুসার শরিয়তে জুমআ'র নামাজই ছিলো না। বনী ইসরাইলেরা সম্মান করতো শনিবারকে। ওই দিনই ছিলো তাদের সাপ্তাহিক বিশেষ ইবাদতের দিন। সুতরাং বলা যেতে পারে, যে লোকালয়ে বা প্রান্তরে জুমআর নামাজ নেই, সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য জুমআ'র দিনের শেষ মুহূর্তই দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্ত। আর যে স্থানে জুমআ পাঠ করা হয়, সে স্থানে দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্ত রয়েছে নামাজের সময়েই, যেমন বর্ণনা করেছেন হজরত আবু মুসা আশয়ারী। জুমআর দিনের দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্ত সম্পর্কে এই দু'টো বিবরণ ছাড়া অন্যান্য মতামতসমূহ নির্ভরযোগ্য নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জুমআর নামাজের প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে পাঠ করতেন সুরা জুমআ এবং সুরা মুনাফিকুন। মুসলিম। হজরত নোমান ইবনে বশীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. দুই ঈদে ও জুমআর নামাজে পাঠ করতেন যথাক্রমে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা' এবং 'হাল আতাকা হাদীছুল গশিয়াহ্'। আর জুমআ ও ঈদ একই দিনে হলে উভয় নামাজেই তিনি স. পাঠ করতেন বর্ণিত সুরাদ্বয়। মুসলিম। হজরত সামুরা থেকে আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জুমআর নামাজে পাঠ করতেন 'সাব্বিহিসমা' ও 'হাল আতাকা হাদীছুল গশিয়াহ'। বাগবী লিখেছেন, হজরত নোমান ইবনে বশীরকে একবার প্রশ্ন করা হলো, রসুল স. তো জুমআর নামাজে সুরা জুমআ পাঠ করতেন, তারপর আর কী পাঠ করতেন? তিনি বললেন, 'হাল আতাকা হাদীছুল গশিয়াহ'।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর একটি সুপরিণত বিবরণে এসেছে, জুমআর দিন যে সুরা কাহাফ পাঠ করবে, তার দুই জুমআর মধ্যবর্তী সময় হবে জ্যোতির্ময়। এই হাদিসের সমর্থনে রয়েছে হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত আরো একটি হাদিস, যা উদ্ধৃত হয়েছে ইবনে মারদুবিয়ার তাফসীর গ্রন্থে।

অনুচ্ছেদ ঃ হজরত জাবেরের এক সুপরিণতসূত্রবিশিষ্ট বিবৃতিতে এসেছে, তোমরা তোমাদের কোনো ভ্রাতাকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বোসোনা। জায়গা না পেলে বোলো, আমাকে একটু জায়গা দিন। মুসলিম। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি অযথা কথাবার্তা বলে এবং মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে ডিঙিয়ে যায়, সে জুমআর প্রতিদান পায় না। তার নামাজ হয়ে যায় জোহরের নামাজ। আবু দাউদ।

সূরা জুমআ ঃ আয়াত ১০, ১১

❑ সালাত সমাপ্ত হইলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করিবে ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করিবে যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

❑ যখন তাহারা দেখিল ব্যবসায় ও কৌতুক, তখন তাহারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রাখিয়া উহার দিকে ছুটিয়া গেল। বল, 'আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে তাহা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।' আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিয্‌কদাতা।

'ফা ইজা কুদ্বিয়াতিস্ সলাতু ফানতাশিরূ ফীল আরদ্বি ওয়াবতাগূ মিন ফাদ্বলিল্লাহ্' অর্থ সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করবে। নির্দেশটি ওয়াজিব নয়। জায়েয। অর্থাৎ নামাজের কারণে তোমরা যে কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছিলে, সেগুলো সম্পন্ন করার জন্য এবার তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হলো। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— যদি তোমরা জুমআর নামাজ শেষে আসর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাও, তবে তা করতে পারো, অথবা চাইলে এখনও চলে যেতে পারো। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, ছড়িয়ে পড়ার এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করার অর্থ এখানে দুনিয়া অর্জনের জন্য ছড়িয়ে পড়া নয়, বরং এর অর্থ রোগীর সেবা করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা এবং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে পাতানো বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাত করা। সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে ইবনে জারীর এবং পরিণত সূত্রে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বর্ণনা করেছেন। হাসান, সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও মাকহুলের উক্তি উল্লেখ করে বাগবী লিখেছেন, এখানে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করার অর্থ রিজিক অন্বেষণ করা নয়, এলেম অন্বেষণ করা। এ সকল ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায়, এখানকার আদেশটি মোস্তাহাব, কেবল জায়েয নয়।

'ওয়াজকুরুল্লহা কাছীরা' অর্থ এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র স্মরণকে কেবল নামাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখো না। আল্লাহ্‌কে স্মরণ কোরো নামাজের বাইরেও। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে পাঠ করে 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহ্য়ি ওয়া ইউমীতু ওয়াহুয়া হাইয়্যুন লা ইয়ামুতু বিইয়াদিহীল খইর ওয়া হুয়া আলা কুললি শাইইন ক্বদীর' আল্লাহ্ তাকে দান করেন এক হাজার সওয়াব এবং মাফ করে দেন তার

এক হাজার পাপ এবং মর্যাদাও বৃদ্ধি করে দেন এক হাজার। তিরমিজি। তিনি বলেছেন, হাদিসটি দুস্প্রাপ্য শ্রেণীর। এই বর্ণনাটির সূত্রশৃঙ্খলভূত আজহার ইবনে সেনান ছাড়া অন্য সকলেই নির্ভরযোগ্য। আজহারই কেবল বিতর্কিত।

হজরত আসামাহ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে 'সুবহানাল্লহ' বলা এবং সবচেয়ে অপ্রিয় হচ্ছে তাহরীফ করা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহী! 'সুবহানাল্লাহ্' বলার অর্থ কী? তিনি স. বললেন, অন্য লোকেরা যখন গল্প গুজবে মত্ত থাকে, তখন 'সুবহানাল্লহ্' বলা। আমরা নিবেদন করলাম; তাহলে তাহরীফ কী? তিনি স. বললেন, মানুষ স্বচ্ছল থাকা সত্ত্বেও তার প্রতিবেশী অথবা সাথী তার কাছে কিছু চাইলে বলে, আমিই তো রয়েছি দুরবস্থায়। তিবরানী।

'লাআ'ল্লাকুম তুফলিহূন' অর্থ যাতে তোমরা সফলকাম হও। অর্থাৎ নামাজের ভিতরে বাইরে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে অধিক স্মরণ করার মধ্যেই রয়েছে পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর পরিপূর্ণ সফলতা।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় সিরিয়া থেকে একটি বাণিজ্যবহর সেখানে উপস্থিত হলো। লোকজন খুতবা শোনা বাদ দিয়ে ছুটে গেলো সেদিকে। এই ঘটনাকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত। বারো জন ছাড়া অন্য সকলেই তখন মসজিদ থেকে বেরিয়ে

www.eelm.weebly.com

গিয়েছিলেন। কালাবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন মসজিদে উপস্থিত ছিলেন মাত্র আটজন। আবু আওয়ানার 'সহীহ্' গ্রন্থে এসেছে, হজরত জাবের বলেছেন, আমিও তখন ছিলাম মসজিদের অভ্যন্তরে। দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, তখন মসজিদে ছিলেন চল্লিশ জন। তবে তাঁর বর্ণনাটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। আর বর্ণনাটি বিবৃত হয়েছে মাত্র একজন বর্ণনাকারী কর্তৃক। তাঁর নাম আলী ইবনে আসেম। উকাইলিও হজরত জাবের থেকে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— তাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সর্বহজরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, যোবায়ের, সা'দ, সাঈদ, আবু উবায়দাহ, আম্মার, বেলাল, ইবনে মাসউদ এবং জাবের রেদ্বওয়ানাল্লহু তায়ালা আনহুম।

শেষোক্ত আয়াতের (১১) প্রথমে উল্লেখিত 'ওয়া ইজা রআও তিজ্বারাতান আও লাহ্ওয়ানিন ফাদ্বদ্বূ ইলাইহা ওয়া তারাকূকা ক্বয়িমান' অর্থ যখন তারা দেখলো ব্যবসায় ও কৌতুক, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তার দিকে ছুটে গেলো। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! দেখুন, লোকেরা কতোইনা অজ্ঞ, আপনি দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে এতো মূল্যবান উপদেশ দিচ্ছেন, অথচ এমন বিরল সৌভাগ্য ছেড়ে তারা ছুটে গেলো পার্থিবতার দিকে, কেনাকাটা করতে ও ক্রীড়া কৌতুক অবলোকনার্থে।

এখানে 'তিজ্বারাহ' (ব্যবসায়) ও 'লাহ্ওয়া' (কৌতুক) শব্দ দু'টো প্রথমে উল্লেখ করার পর 'ইলাইহা' এর 'হা' (তার) সর্বনামটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যকেই। কেননা 'লাহ্ওয়া' দ্বারা সব সময় খেলাধুলা বা ক্রীড়া কৌতুককে বুঝানো হয় না। বরং এখানে শব্দটির দ্বারা দফ বাজানোকে বুঝানো হয়েছে, যা করা হয় সাধারণত কোনো বাঞ্ছিত বহরকে স্বাগতম জ্ঞাপনার্থে। শব্দ দু'টোর মধ্যে আবার বসানো হয়েছে 'আও' অব্যয়টি। এতে করে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কিছুসংখ্যক লোক বাণিজ্যবহর দেখতে ও দফ বাজানো শুনতে বেরিয়ে গিয়েছিলো মসজিদ থেকে, অথচ রসুল স. তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। হজরত জাবের থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, বিবাহের অনুষ্ঠানে মেয়েরা যখন বাদ্য বাজাতো, তখন কিছুসংখ্যক লোক রসুল স.কে খুতবা দানরত অবস্থায় রেখে মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতো। 'লুবাবুবুন নুকুল' রচয়িতা লিখেছেন, উভয় ঘটনার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তিনি একথাও লিখেছেন যে, ইবনে মুনজির হজরত জাবের থেকে উভয় ঘটনার কথাই উল্লেখ করেছেন। ঘটনাদু'টোর বর্ণনাসূত্রও অভিন্ন। দু'টো ঘটনাকেই যদি আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করা হয় এবং এখানকার 'হা' সর্বনামটি যদি হয় 'ব্যবসায়ে'র স্থলাভিষিক্ত, তবে বুঝতে হবে খুতবা ছেড়ে ব্যবসার দিকে ছুটে যাওয়া তো নিন্দনীয়ই, তদপেক্ষা অধিক নিন্দনীয় 'কৌতুকে'র দিকে ছুটে যাওয়া। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে 'ছুটে গেলো তার প্রতি' বাক্যটি রয়েছে উহ্য। আসল কথাটি ছিলো যেনো এরকম— যখন তারা দেখলো ব্যবসা তখন ছুটে গেলো তার প্রতি, আর যখন দেখলো ক্রীড়া-কৌতুক তখন ছুটে গেলো তার প্রতিও'।

হাসান ও আবু মালেক বলেছেন, সে বছর মদীনায় দেখা দিয়েছিলো খাদ্য সংকট। দাহিয়া ইবনে খলিফা সিরিয়া থেকে কিছু জয়তুনের তেল নিয়ে মসজিদে নববীর পাশে জান্নাতুল বাকীতে এলেন। লোকেরা তখন মসজিদে সমবেত হয়ে খুতবা শুনছিলেন। হঠাৎ দাহিয়ার বাণিজ্যবহর আগমনের সংবাদ জানতে পেরে তাঁরা মনে করলেন, আগেভাগে পণ্য সংগ্রহ না করলে পরে আর তা পাওয়া যাবে না। সেজন্য তারা ছুটে গেলো জান্নাতুল বাকীর দিকে। মসজিদে বসে রইলেন মাত্র কয়েকজন। হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। এঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। রসুল স. তখন বললেন, শপথ সেই সত্তার, যিনি মোহাম্মদের জীবনাধিকারী, তোমরা সকলেই যদি এখান থেকে চলে যেতে, তবে এই উপত্যকা হয়ে যেতো আগুন, আর সে আগুনে জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যেতে তোমরা। মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন জুমআর খুতবা দিচ্ছেলেন। এমন সময় সিরিয়া থেকে কিছু পণ্য-সামগ্রী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন দাহিয়া ইবনে খলিফা কালাবী। তখনকার প্রচলনানুসারে মহিলারাও পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য কাফেলার কাছে সমবেত হতো। আর দাহিয়া নিয়ে আসতেন আটা, গম ও অন্যান্য

প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তিনি এসে থামতেন মদীনার আহজারুয্যাইত নামক স্থানে। সেখানে পৌঁছেই তিনি ঢোল শহরত করে তাঁর আগমনসংবাদ প্রচার করতেন। লোকেরা অতি দ্রুত সেখানে উপস্থিত হতো। দাহিয়া এরকম করতেন তাঁর ইসলাম গ্রহণের আগে। একদিন তিনি এসে পৌঁছলেন রসুল স. এর খুতবা দানের সময়। মসজিদের সমবেত লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলো সেদিকে। বসে রইলেন কেবল বারো জন পুরুষ ও একজন মহিলা। রসুল স. বললেন, তোমরা এখানে এখন কতোজন? বলা হলো, বারো জন পুরুষ এবং একজন রমণী। তিনি স. বললেন, এখানে এখন যদি কেউই উপস্থিত না থাকতো, তবে আকাশ থেকে বর্ষিত হতো প্রত্যেকের নামাঙ্কিত পাথর। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, ওই সময় বাণিজ্য কাফেলাকে স্বাগতম জানানো হতো ঢোল ও তালি বাজিয়ে।

www.eelm.weebly.com

‘ওয়া তারাকূকা ক্বয়ীমান’ অর্থ তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে। অর্থাৎ আপনাকে খুতবা দান অবস্থায় রেখে। মুসলিম এ কথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, লোকজন তখন রসুল স.কে খুতবা দানরত অবস্থায় রেখে চলে গিয়েছিলেন। বায়হাকীও এই বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু আর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন ছিলেন নামাজ পাঠরত অবস্থায়। কোনো কোনো হাদিসবেত্তা বর্ণনাদু’টোর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলেছেন, তিনি স. তখন নামাজ পাঠরত অবস্থায় ছিলেন কথাটির ভাবার্থ হবে— তখন তিনি স. ছিলেন খুতবা দানরত অবস্থায়। কেননা খুতবা নামাজেরই অংশ। এ সম্পর্কে কা’ব ইবনে আজরার বর্ণনা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বায়হাকী কিন্তু নামাজ সংক্রান্ত হাদিসগুলোকে প্রাধান্য দেননি। আলকামা বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত আবদুল্লাহ্কে প্রশ্ন করা হলো, সে সময় রসুল স. দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন, না বসা অবস্থায়। তিনি জবাব দিলেন, কেনো তুমি কি পাঠ করোনি ‘ওয়া তারাকূকা ক্বয়ীমা’?

চল্লিশ জনের কমসংখ্যক মুসল্লির উপস্থিতিতেও জুমআ আদায় করা যায়— এরকম যারা বলেন, তাঁরা তাঁদের পক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করেন এই হাদিস দ্বারা। বলেন, তখন তো রসুল স. সেখানে উপস্থিত বারো জনকে নিয়েই জুমআর নামাজ পড়েছেন। কিন্তু তাঁদের এমতো প্রমাণ বিনা বাক্যে গ্রহণ করা যায় না। কেননা কয়েকটি সন্দেহ ও সম্ভাবনা এর মধ্যে থেকেই যায়। যেমন— রসুল স. তখন জুমআর নামাজ পড়িয়েছিলেন, না পড়িয়েছিলেন জোহরের নামাজ, অথবা নামাজের মধ্যেই চলে যাওয়া মুসল্লিরা আবার ফিরে এসে নামাজে শামিল হয়েছিলেন, কিংবা তাঁরা ছাড়া অন্যান্য লোক এসে যোগ দিয়েছিলেন নামাজের জামাতে ইত্যাদি। কিন্তু এমতো সন্দেহ ও সম্ভাবনা অমূলক। কেননা এরকম অবস্থার কোনো একটি ঘটলেও, সে সম্পর্কে কোনো না কোনো বিবরণ পাওয়া যেতো। তাছাড়া বারো জনকে নিয়ে জুমআর নামাজ আদায় করার ঘটনা দ্বারা একথা প্রমাণ করা যায় না যে, জুমআর জামাতে কম পক্ষে বারো জনের উপস্থিতি জরুরী। যেমন হজরত আসাদ ইবনে জারারার হাদিসে এসেছে, তাঁরা প্রথম জুমআ পাঠ করেছিলেন চল্লিশ জন। তেমনি এরকমও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসুল স. বনী সালেম ইবনে

আমরের মহল্লায় জুমআ পাঠ করেছিলেন একশ’ জনকে নিয়ে। কিন্তু এ সকল বর্ণনা দ্বারা একথা সাব্যস্ত করা যায় না যে, জুমআর নামাজে চল্লিশ অথবা একশ’ জন মুসল্লির উপস্থিতি অপরিহার্য।

মাসআলা ঃ জুমআর সর্বনিম্ন মুসল্লির সংখ্যা নিরূপণার্থে ইমামগণ বিভিন্নরকম মন্তব্য করেছেন। আবার তাঁদের দ্বারা নিরূপিত সংখ্যা থেকে যদি একজন বাদ পড়ে, তাহলে কী হবে, সে সম্পর্কেও তাঁদের পৃথক পৃথক মত রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, প্রথম রাকাতে ইমামের সেজদার আগে যদি কোনো মুসল্লি চলে যায়, তবে নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে। নতুন করে আদায় করতে হবে জোহর। আর ইমামের সেজদার পরে কেউ চলে গেলে তিনি তাঁর জুমআর নামাজ পূর্ণ করতে পারবেন। ইমাম মালেক বলেছেন, প্রথম রাকাতের উভয় সেজদা সম্পন্ন হওয়ার পর যদি মুক্তাদীদের কেউ চলে যায়, তবে ইমাম অন্যান্য মুক্তাদীকে নিয়ে জুমআর নামাজ পুরা করবেন। ইমাম আহমদ বলেছেন, প্রথম তকবীর ধ্বনিত হওয়ার পরেও যদি কোনো মুক্তাদী চলে যায়, তবুও ইমাম জুমআর নামাজ পুরা করতে পারবেন। ইমাম শাফেয়ীর বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, নামাজের শেষ পর্যন্ত চল্লিশ জন মুসল্লির উপস্থিতি অপরিহার্য, যেমন ওয়াক্ত বাকী থাকা অপরিহার্য নামাজের শেষ পর্যন্ত। তাই ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্বেও যদি কেউ চলে যায়, তবে ইমামের জন্য ওয়াজিব হবে নতুন করে জোহরের নামাজ আদায় করে নেওয়া। তাঁর আরো একটি মত রয়েছে, জানা যায়। সেটি হচ্ছে— শেষ পর্যন্ত ইমামের সঙ্গে যদি দু’জন মুসল্লিও থাকে, তবু ইমাম জুমআর নামাজ পূর্ণ করবেন। মাযানী বলেছেন, ইমাম এক রাকাত পড়ানোর পর যদি সকল মুসল্লিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, তবুও ইমাম একা জুমআর নামাজ সম্পন্ন করবেন। আর এরকম অবস্থা যদি ঘটে প্রথম রাকাত শেষ হওয়ার আগে এবং তাঁর অনুসরণে দণ্ডায়মান থাকে চল্লিশ জনের কম, তবে ইমামকে পড়াতে হবে জোহরের চার রাকাত। ইমাম জোফার বলেছেন, শেষ বৈঠকের পূর্বে যদি মুসল্লিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং নির্দিষ্টসংখ্যক মুসল্লি আর না থাকে, তবে জুমআ বাতিল হয়ে যাবে। নতুন করে আদায় করতে হবে জোহর।

মাসআলা ঃ মাসবুক ব্যক্তি যদি ইমামের সঙ্গে জুমআর নামাজের কোনো অংশ পায়, এমনকি শেষ বৈঠকে সোহ সেজদার পরে হলেও, তবু সে জুমআ আদায় করবে। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেছেন। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন, এক রাকাত পেলে সে বাকী এক রাকাত আদায় করে নিবে। যদি এক রাকাতও না পায়, তবে তার জুমআ হবে না। তাকে পড়ে নিতে হবে জোহরের চার রাকাত। তাউস বলেছেন, তাকে পেতে হবে দু’টো খুতবা। নতুবা তার জুমআ হবে না।

সর্বশেষে বলা হয়েছে— ‘বলো, আল্লাহ্র নিকট যা আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা’। একথার অর্থ— হে আমার বার্তাবাহক! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নামাজ এবং রসুলের সাহচর্যের যে সওয়াব সংরক্ষিত রেখেছেন, তা নিশ্চয় ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনোপকরণদাতা।

www.eelm.weebly.com

মাসআলা ঃ সম্পদপ্রেম ও সম্পদের লোভ নিষিদ্ধ। জীবিকা অন্বেষণের জন্য গ্রহণ করতে হবে ভারসাম্যমূলক অবলম্বন ও শোভন উপায়। এরকম করা মোস্তাহাব। হজরত আবু হামেদ সাঈদী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, দুনিয়া অন্বেষণকে সংক্ষিপ্ত ও ভারসাম্যময় কোরো। কেননা অদৃষ্টে যা আছে, তা সে পাবেই। হাকেম, আবু শায়েখ, ইবনে মাজা। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. উপদেশ দিয়েছেন, হে জনতা! সম্পদাধিক্য দ্বারা ধনী হওয়া যায় না। মনের দিক থেকে ধনী হওয়াই হচ্ছে আসল ধনী হওয়া। আল্লাহ্ তাঁর দাসদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তা সে পাবেই। অতএব তার জন্য উত্তম পন্থা অবলম্বন কোরো। হালাল গ্রহণ কোরো এবং বর্জন কোরো হারামকে। আবু ইয়ালা। বর্ণনাটি উত্তমসূত্রবিশিষ্ট। এর প্রথম অংশ বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রিজিক তালাশ করে মানুষকে, যেমন তাকে তালাশ করে মৃত্যু। ইবনে হাব্বান, বাযযার তিবরানী। তিবরানীর ভাষ্য এরকম— মানুষ যতখানি রিজিক অন্বেষণ করে, রিজিক তার চেয়ে অধিক অন্বেষণ করে মানুষকে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রিজিক থেকে পলায়ন করতে চাইলেও সে তোমাদেরকে ধরে ফেলবে, যেমন তোমরা ধরে ফেলো রিজিককে। উত্তমসূত্র সহযোগে তিবরানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আস্সগীর' গ্রন্থে। হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, সর্বোত্তম জিকির হচ্ছে খফি জিকির এবং সর্বোত্তম জীবিকা হচ্ছে ওই জীবিকা, যাতে হৃদয় থাকে প্রসন্ন। আবু আওয়ানা, ইবনে হাব্বান। হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যুষ যাপন করে, সে আল্লাহ্র সংরক্ষণভূত নয়। যে ব্যক্তি মুসলমানদেরকে কটাক্ষ করে, সে তাদের দলভূত নয়। আর যে বাধ্যগতভাবে নয়, স্বেচ্ছায় ও প্রফুল্লচিত্তে অপরকে অপদস্থ করে, সে আমাদের দলভূত নয়। তিবরানী। হজরত কা'ব ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বকরীর পালে ঝাঁপিয়ে পড়া ক্ষুধিত নেকড়ে যেমন ভয়ংকর, তার চেয়ে অধিক ভয়ংকর হচ্ছে সম্পদলোভী ও সম্পদের অপচয়ক। তিরমিজি, ইবনে হাব্বান। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. প্রার্থনা করতেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পরিত্রাণ চাই ওই জ্ঞান থেকে, যা উপকারী নয়, ওই মনোবৃত্তি থেকে, যা বিনয়ী নয় এবং ওই প্রার্থনা থেকে, যা গৃহীত হয় না। নাসাঈ। মুসলিম ও তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম থেকে। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষ এমন যে, তার কাছে যদি বিত্ত-বৈভবপূর্ণ দুটি উপত্যকাও থাকে, তবুও সে আকাংখা করবে তৃতীয় আর একটির। লোভীদের উদর মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা পূর্ণ হয় না। যে ব্যক্তি লোভ পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্ তাকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে অবলোকন করেন।

সূরা মুনাফিক্বুন

২ রুকু এবং ১১ আয়াত বিশিষ্ট এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মদীনায়।

বোখারী প্রমুখ লিখেছেন, হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম বলেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, মুনাফিকদের অগ্রণী আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার সাথীদেরকে বলেছে, রসুল স. এর সঙ্গীরা তার সঙ্গ ত্যাগ না করা পর্যন্ত তোমরা তাদের জন্য কিছু ব্যয় কোরো না। আমরা যদি মদীনায় ফিরে যেতে পারি, তবে আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ওই সকল হীন লোকদেরকে বের করে দিবে। আমি একথা আমার চাচাকে বললাম। তিনি তা জানিয়ে দিলেন রসুল স.কে। তিনি স. আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর সুমহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে সবকিছু খুলে বললাম। তিনি স. আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে ডেকে এনে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা কসম খেয়ে বললো, এরকম কথা তারা বলেইনি। রসুল স. তখন আমাকেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেন। তাদেরকে মনে করলেন সত্যবাদী। আমি এতো দুঃখিত হলাম যে, এর আগে এমন দুঃখ আমি আর কখনোই পাইনি। আমার চাচা বললেন, আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে চাইনি। অথচ রসুল স. তোমাকে তাই মনে করলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো 'যখন মুনাফিকেরা তোমার নিকট আসে........' সঙ্গে সঙ্গে রসুল স. আমাকে ডেকে আনলেন। তারপর সদ্য অবতীর্ণ আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনিয়ে বললেন, দ্যাখো, আল্লাহ্ তোমাকেই সত্য বলে সাব্যস্ত করেছেন।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক এবং অন্যান্য সীরাত বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, রসুল স. জানতে পেলেন বনী মুস্তালিকের লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হচ্ছে। আর সে যুদ্ধের সেনাপতিরূপে তারা নির্বাচন করেছে উম্মতজননী হজরত জুওয়াইরিয়ার পিতা হারেছ ইবনে জেরারকে। মোহাম্মদ ইবনে আমর এবং ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, এ সংবাদ পেয়ে রসুল স. মদীনার ভার হজরত আবু জর গিফারীর উপরে অর্পণ করে কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে নিজে যুদ্ধযাত্রা করলেন। তিরিশটি অশ্ব ছিলো তাঁর বাহিনীতে, তার মধ্যে দশটি অশ্ব ছিলো মুহাজিরগণের। দু'টি ছিলো তাঁর নিজের, আর বাকীগুলো আনসারদের। গণিমতের লোভে কতিপয় মুনাফিকও তাঁর সহযাত্রী হলো। রসুল স. কাদীদ এর দিক থেকে নেমে আসা একটি ঢালু উপত্যকায় পৌঁছলেন। সেখানকার মুরাইসী নামক স্থানের একটি কূপের কাছে পৌঁছে তিনি স. মুখোমুখি হলেন বনী মুস্তালিক বাহিনীর। হারেছের বাহিনী প্রস্তুত হয়েই ছিলো। রসুল স. ও তাঁর বাহিনীকে সারিবদ্ধ করে ব্যূহ রচনা করলেন। তাঁর নির্দেশানুসারে

www.eelm.weebly.com

হজরত ওমর ঘোষণা করলেন, হে মুস্তালিক গোত্র! তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' বলো। তাহলে তোমাদেরকে দেওয়া হবে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা। তারা জবাব দিলো না। নিক্ষেপ করতে শুরু করলো তীর। মুসলিম বাহিনীও জবাব দিলো তীর নিক্ষেপ করে। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। পর্যুদস্ত হলো শত্রুপক্ষ। অনেকে হতাহত হলো। পরাজয় নিশ্চিত জেনে বাকীরা গেলো

পালিয়ে। রসুল স. অনেক গণিমত লাভ করলেন। অধিকার করে নিলেন তাদের নারী ও শিশুদেরকে। এমন সময় ঘটে গেলো একটি অপ্রীতিকর ঘটনা। হজরত ওমরের কাছে ছিলো গিফার গোত্রের একজন শ্রমিক। তার নাম ছিলো জাহ্দাহ্ ইবনে সাঈদ। সে হজরত ওমরের ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটছিলো। সেনান ইবনে ওয়াররাহ জুহানীর সঙ্গে শুরু হলো তার বচসা। জুহাইনা গোত্র ছিলো আউফ ইবনে খাজরাজ গোত্রের মিত্রপক্ষ। জাহ্দাহ্ ও সেনানের বচসা রূপ নিলো সংঘর্ষের। সেনান হলো রক্তাক্ত। সে সাহায্যের জন্য আনসারদেরকে ডাকতে শুরু করলো। জাহ্দাহ্ ডাকতে শুরু করলো গিফারী ও মুহাজিরদেরকে। মুখোমুখি হলো যুদ্ধংদেহী দু'টো দল। রসুল স. তাঁর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, কী ব্যাপার! মূর্খতার যুগের মতো শোরগোল শোনা যাচ্ছে কেনো? পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হলো তাঁকে। তিনি স. বললেন, ক্ষান্ত হও। এটাতো অতীব নিন্দনীয় বিষয়। স্বধর্মীয় ভ্রাতাদেরকে সাহায্য করা উচিত— অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়কে। সুতরাং যে অত্যাচারী তাকে প্রতিহত করো। এটাই তাকে সাহায্য করা। আর অত্যাচারিতদের পাশে দাঁড়াও। একথা শুনে কতিপয় মুহাজির হজরত উবাদা ইবনে সামেত ও অন্যান্য আনসারগণের সঙ্গে আপোষ-রফামূলক কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। তাঁরা সেনানকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। অবশেষে সেনান তার দাবি পরিত্যাগ করলো। প্রতিষ্ঠিত হলো শান্তি।

মুনাফিকশ্রেষ্ঠ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল বসেছিলো তার নিজের জায়গায়। তার সঙ্গে বসেছিলো আরো কয়েকজন মুনাফিক— মালেক, জুওয়াইদ, কায়েস, আউস ইবনে কিবতী, জায়েদ ইবনে সালত, আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবীল এবং মু'তার ইবনে কুশাইর। হজরত জায়েদ ইবনে আরকামও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন তখন বালক। তাই তাঁকে ততোটা গুরুত্ব না দিয়ে ইবনে উবাই তার সাথীদেরকে বলতে লাগলো, দেখলে তো, কেমন বাড় বেড়েছে তাদের। প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেছে তারা আমাদেরই সঙ্গে। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে 'কুকুরকে খাইয়ে খাইয়ে মোটা তাজা করো, যেনো সে তোমাকে কামড়াতে পারে' এই প্রবাদটির মতো। আল্লাহ্র কসম! আমরা মদীনায় আগে ফিরে যাই। তারপর দেখো, আমাদের অভিজাত ব্যক্তিরা নিশ্চয় বের করে দিবে অনাভিজাতদেরকে। অভিজাত বলে সে বুঝাচ্ছিলো নিজের দলকে, আর অনাভিজাত বলে বুঝাচ্ছিলো রসুল স. এর অনুসারীদেরকে। এরপর সে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে একত্র করে বললো, তোমরা তো তাদের জন্য অনেক কিছুই করেছো। দিয়েছো জমি ও সম্পদের ভাগ। এরকম না করলে মুহাজিরেরা কিছুতেই এতো বাড়তে পারতো না। নিরুপায় হয়ে অন্য কোথাও চলে যেতো। সুতরাং তোমরা মোহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদেরকে ত্যাগ করো। তাদেরকে কিছুই দিয়ো না। হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তুমিই অনভিজাত ও ঘৃণ্য। আর মোহাম্মদ মোস্তফা আল্লাহ্ কর্তৃক সম্মানিত, বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে প্রিয়তমজন। ইবনে উবাই

বললো, বৎস! উত্তেজিত হচ্ছো কেনো? আমি তো ঠাট্টাচ্ছলে এরকম বললাম। হজরত জায়েদ রসুল স. এর কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন। তিনি স. তাঁর কথা শুনে রোষান্বিত হলেন। পরিবর্তিত হলো তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলের রঙ। বললেন, সম্ভবত তুমি যা বলছো, তা ঠিক নয়। হজরত জায়েদ বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি নিজ কানে এরকম শুনেছি। তিনি স. বললেন, তুমি হয়তো ভুল শুনেছো। হজরত জায়েদ বললেন, না, ভুল আমি শুনিনি। তিনি স. বললেন, মনে হয় তুমি সন্দেহে পতিত। হজরত জায়েদ বললেন, না। ইতোমধ্যে ইবনে উবাইয়ের কথা সেনাবাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। এই নিয়ে যত্রতত্র শুরু হলো আলোচনা-সমালোচনা। কিছুসংখ্যক আনসারী সাহাবী হজরত জায়েদকে তিরস্কার করলেন। বললেন, তুমিই নষ্টের গোড়া। তুমি একজন সম্মানিত গোত্রপতির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছো। ছিন্ন করে দিয়েছো আত্মীয়তার বন্ধন। কেনো এমন করলে? হজরত জায়েদ বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি আপন কানে তাকে এরকম বলতে শুনেছি। খাজরাজ গোত্রের মধ্যে আমার পিতাই তাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে। আর আমিও আমার পিতাকে ভালোবাসি অত্যধিক। তিনি এরকম বললেও তো আমি তা রসুল স. এর গোচরীভূত করতাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্ নিশ্চয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে বিষয়টির প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করে দিবেন। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! নির্দেশ দিন, মুনাফিকের মস্তক ছেদন করি। অপর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর তখন বললেন, উব্বাদ ইবনে বশরকে আজ্ঞা করুন। সে ইবনে উবাইয়ের কর্তিত মস্তক আপনার কাছে এনে জমা দিবে। এক বর্ণনায় উব্বাদ ইবনে বশরের স্থলে এসেছে মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমার নাম। রসুল স. তখন বললেন, না। আমি এরকম নির্দেশ দিতে পারি না। এরকম করলে জনসমক্ষে শুরু হবে অপপ্রচার। লোকেরা বলবে, মোহাম্মদ তার সাথীদেরকে হত্যা করে। বরং বাহিনীকে গাত্রোত্থান করতে বলো। তখন ছিলো গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড দাবদাহে ঝলসে যাচ্ছিলো প্রকৃতি। এরকম গরমে তিনি স. সাধারণত সফর শুরু করতেন না। রসুল স. তাঁর কাসওয়া নাম্নী উষ্ট্রীর উপরে আরোহন করলেন। যাত্রা শুরু

করলেন মদীনার দিকে। বাধ্য হয়ে সকলকে হতে হলো তাঁর অনুগামী। মদীনায় পৌঁছেই তিনি স. ইবনে উবাইকে ডেকে এনে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে বললো, ওই আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি আপনার উপরে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এরকম কথা তো আমি বলতেই পারি না। জায়েদ মিথ্যা বলেছে। ইবনে উবাইকে তার সম্প্রদায়ের অনেকে বড় সরদার মনে করতো। তার সাথীরা ছিলো আনসার গোত্রের। তারা বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সম্ভবত এই ছেলেটি ভুল শুনেছে। ইবনে উবাই সেরকম কিছু বলেন নি। রসুল স. তাদের অজুহাত গ্রহণ করলেন। আনসারগণের সকলেই হজরত জায়েদ ইবনে আরকামকে তিরস্কার করতে লাগলো। তিনি থাকতেন তাঁর চাচার সঙ্গে। তাঁর চাচা তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে চাইনি। কিন্তু রসুল স. তো তোমাকে সত্যবাদী হিসেবে গ্রহণ করলেন না। হজরত জায়েদ সফরের সময়

রসুল স. এর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। কিন্তু এই ঘটনার পর তিনি এ ব্যাপারে ইতস্তত করতে লাগলেন। রসুল স. যখন মদীনায় ফিরতে শুরু করলেন তখন তাঁর সঙ্গে প্রথমে মিলিত হলেন হজরত সা'দ ইবনে উবায়দা। ইবনে ইসহাক হজরত সা'দ ইবনে উবায়দার স্থলে উল্লেখ করেছেন হজরত উসায়েদ ইবনে হুদায়েরের নাম। তিনি বললেন, আস্‌সালামু আ'লাইকা ইয়া আইয়্যুহান নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। রসুল স. জবাব দিলেন 'ওয়া আ'লাইকুমুস্‌ সালামু ওয়া রহমাতুল্লহি ওয়া বারাকাতুহু'। হজরত সা'দ অথবা হজরত উসায়েদ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহী! আপনি তো এমন উত্তপ্ত আবহাওয়ায় যাত্রা শুরু করেন না। রসুল স. বললেন, তোমাদের সাথী যা বলেছে, সে কথাটি তোমাদের মনে নেই? হজরত সা'দ বললেন, কে? তিনি স. বললেন, ইবনে উবাই। সে তো বলেই দিয়েছে, মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর সেখানকার সম্মানিত জনেরা অপদস্থদেরকে বের করে দিবে। হজরত সা'দ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি যদি চান, তবে আমরা তাকেই মদীনা থেকে বের করে দিবো। সেই-ই তো অপদস্থ। আর সম্মানিত হলেন আপনি। আল্লাহ্‌ তো তাঁর রসুল এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকেই সম্মানিত করেছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, অনুগ্রহ করে আপনি তার প্রতি বিনম্র হন। আপনি যখন মদীনায় শুভাগমন করলেন, তখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তার জন্য অভিষেকের আয়োজন করেছিলো। তাকে তারা বানাতে চেয়েছিলো তাদের রাজা। প্রস্তুত করে রেখেছিলো কণ্ঠহার ও মস্তকের মুকুট। মুকুট তৈরীর জন্য যখন মুক্তার দরকার হলো, তখন উইশা নামক এক ইহুদী ছাড়া কারো কাছেই মুক্তা পাওয়া গেলো না। সুযোগ বুঝে সে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করলো মুক্তাটি। এভাবে তার রাজ্যাভিষেকের প্রস্তুতি যখন চূড়ান্ত, তখন এলেন আপনি। ফলে তার সকল আয়োজন হয়ে গেলো ভণ্ডুল। তখন থেকেসে মনে করে বসে আছে আপনার কারণেই সে তার রাজত্ব হারিয়েছে।

ইবনে উবাইয়ের পুত্র হজরত আবদুল্লাহ্‌ ছিলেন বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী। তিনি যখন শুনলেন, হজরত ওমর তাঁর পিতাকে হত্যা করতে চেয়েছেন, তখন দ্রুতগতিতে রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদ! আপনি যদি আমার পিতাকে হত্যা করতে মনস্থ করেন, তবে আমাকে হুকুম দিন। আমি এক্ষুণি গিয়ে তাকে হত্যা করবো এবং এত দ্রুত তার ছিন্ন মস্তক নিয়ে আপনার কাছে চলে আসবো যে, আপনি স্থানান্তরে গমন করবার অবকাশও পাবেন না। আল্লাহ্‌র শপথ! খাজরাজ গোত্রের লোকেরা একথা ভালো করেই জানে যে, আমিই তাদের মধ্যে পিতা-মাতার অধিক অনুগত। তাই আমি আশংকা করি আমার পিতাকে কেউ হত্যা করলে আমি আমার মনকে সামলে রাখতে পারবো না। আমি নিশ্চয় তাকে কতল করে ফেলবো। তখন আমি এক মুমিনকে কতল করে হয়ে যাবো জাহান্নামী। অবশ্য আপনার পক্ষ থেকে উদারতা ও ক্ষমাই শোভন। রসুল স. বললেন, শোনো আবদুল্লাহ্‌! আমি তো হত্যা করার নির্দেশ

দেইনি। তাকে হত্যা করা আমার অভিপ্রায়ও নয়। আমি তো আমার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে সদাচরনই করি। হজরত আবদুল্লাহ্‌ বললেন, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! ওই এলাকার লোকেরা ইবনে উবাইকে রাজমুকুট পরানোর জন্য একতাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আপনার শুভাগমনের কারণে তারা নিবৃত্ত হতে বাধ্য হয়েছে। আল্লাহ্‌ আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। এখনো তার কাছে তার ভক্তরা ঘোরাফিরা করে এবং রোমন্থন করে অতীতের স্মৃতি। আল্লাহ্‌ তাদেরকে পরাভূত করেছেন। এরপর রসুল স. যাত্রা শুরু করলেন। যাত্রা অব্যাহত রাখলেন সারাদিন মান। এমনকি রাতেও তাঁর পথ চলা থামলো না। সকাল হলো। বেলা বাড়তে লাগলো। প্রখর সূর্যকিরণে যখন সকলে পরিশ্রান্ত, তখন তিনি স. যাত্রা স্থগিত করলেন। লোকেরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো। দিবসের শেষ ভাগে আবার শুরু করলেন সফর। ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে কেউ যেনো কথাবার্তা বলার সুযোগ না পায়, তাই তিনি স. পথ চলতে লাগলেন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। পরদিন থামলেন হেজাজের অন্তর্গত বাকী নামক এলাকার মালভূমিতে অবস্থিত বাকআ নামক কূপের কাছে। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন তাঁর সহযাত্রীদেরকে নিয়ে মদীনার উপকণ্ঠে উপনীত হলেন, তখন শুরু হলো প্রচণ্ড বালুকাঝড়। উট ও ঘোড়াগুলো ডুবে যাবার উপক্রম হলো বালির স্তূপের নিচে। রসুল স. বললেন, এক মুনাফিকের মৃত্যু নিশ্চিত করতে আল্লাহ্‌ই প্রবাহিত করে দিয়েছেন এই ঝড়। তোমরা মদীনায় পৌঁছেই জানতে পারবে, সেখানকার এক বড় মুনাফিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। মোহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, যখন তুফান শুরু হলো, তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো,

www.eelm.weebly.com

নিশ্চয় মদীনাতে সাংঘাতিক কোনো ঘটনা ঘটেছে। সেখানে রয়েছে আমাদের পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্ততি। রসুল স. এবং উয়াইনা ইবনে হিসান ফাজারীর সঙ্গে ছিলো একটি অনাক্রমণ চুক্তি। ওই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছিলো প্রায়। তাই কেউ কেউ ধারণা করলো, উয়াইনা মনে হয় মদীনা আক্রমণ করেছে। রসুল স. বলেছেন, এরকম আশংকা করার কোনো কারণ নেই। কেননা মদীনা সুরক্ষিত। সেখানকার প্রতিটি প্রবেশপথে নিয়োজিত রয়েছে প্রহরী ফেরেশতা। সুতরাং তোমরা ছাড়া অন্য কোনো বাহিনী সেখানে প্রবেশই করতে পারবে না। তবে ঘটনা হচ্ছে, সেখানে এক বড় কপটাচারীর মৃত্যু ঘটেছে। ঝড়ো বাতাস শুরু হয়েছে সেকারণেই। তার মৃত্যুতে অন্যান্য কপটাচারীরা খুবই চিন্তাযুক্ত। কেননা সে ছিলো তাদের খাঁটি পৃষ্ঠপোষক। শোনো, তার নাম জায়েদ ইবনে রেফায়া ইবনে তাবুত।

হজরত জাবের থেকে মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, সূর্য ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত আকাশে ছিলো অনেক মেঘ। এরপর আকাশ মেঘমুক্ত হলো। হজরত উবাদা ইবনে সামেত ইবনে উবাইকে বললেন, তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু জায়েদ ইবনে রেফায়া তো মারা গেলো। বিজয় হলো ইসলাম ও মুসলমানদের। ইবনে উবাই বললো, হ্যাঁ সে আমার বন্ধুই। কিন্তু হে আবু ওলীদ! তুমি তার মৃত্যুসংবাদ

কীভাবে জানলে? হজরত উবাদা বললেন, আল্লাহ্‌র রসুল এই মাত্র আমাদেরকে একথা জানালেন। ইবনে উবাই হয়ে পড়লো বিমর্ষ ও চিন্তিত। মোহাম্মদ ইবনে আমর হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, সে সময় রসুল স. এর উষ্ট্রী কাসওয়া হঠাৎ হারিয়ে গেলো। লোকেরা তাকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো। জায়েদ ইবনে সালত নামক এক মুনাফিক ছিলো আনসারদের দলের মধ্যে। ওই দলে ছিলো হজরত উবাদা ইবনে বাশার এবং হজরত উসায়েদ ইবনে হুদায়েরও। জায়েদ জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার! লোকেরা ছুটাছুটি করছে কেনো? তাঁরা বললেন, রসুল স. এর উটনীটি হারিয়ে গিয়েছে। লোকেরা তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে বললো, উটনীটি কোথায় রয়েছে তা আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছেন না কেনো? সাহাবীগণ তার কথায় রাগান্বিত হলেন। বললেন, হে আল্লাহ্‌র শত্রু! তোমার উপর আপতিত হোক আল্লাহ্‌র গজব। তুমি তো মুনাফিক। হজরত উসায়েদ ইবনে হুদায়ের বলেছেন, আল্লাহ্‌র রসুল পছন্দ করবেন, এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলে এক্ষুণি আমার খঞ্জর তোমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতো। তোমার অন্তর যখন এতোই কলুষ, তখন তুমি আমাদের সঙ্গে কেনো এসেছো? সে বললো, আমি তো এসেছিলাম গণিমতের মাল পাবার আশায়। আল্লাহ্‌র কসম! মোহাম্মদ তো উটনীর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আমাদেরকে জানান (উটনীর সংবাদ জানাবেন না কেনো)। সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ তোমার সঙ্গে আমরা পথ চলবো না। কোনো টিলার ছায়ার নিচে তোমার সঙ্গে বসবোও না। আমরা যদি অন্তর্যামী হতাম, তবে তোমাকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করতাম। একথা শুনেই জায়েদ ইবনে সালত ভয়ে সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলো। ভাবলো, কাছাকাছি থাকলে মুসলমানেরা নিশ্চয় তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সে চলে যাবার পর সাহাবীগণ তার মালপত্র দূরে দূরে নিক্ষেপ করলেন। সে তার সঙ্গীসাথীদের কাছেও বসলো না। সোজা গিয়ে আশ্রয় নিলো রসুল স. এর কাছে। এরপর হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হলেন (হারানো উটের সংবাদ দিলেন)। রসুল স. তখন হারানো উটের অবস্থানের সংবাদ প্রকাশ করলেন। তাঁর কাছে সমবেত মুনাফিকেরা তা শুনে যেতে লাগলো। তাদের একজন বললো, আল্লাহ্ তো আপনাকে অনেক বড় বড় সংবাদ জানান। কিন্তু উটনীর সংবাদ কেনো আগে জানালেন না? তিনি স. বললেন, অদৃশ্যের সংবাদ জানেন কেবল আল্লাহ্। কোনো কোনো বিষয়ে অবশ্য আমাকেও জানান। যেমন এখন আমার হারানো উটনী কোথায় আছে তা জানালেন। উটনীটি রয়েছে তোমাদের সামনের ঘাঁটিতে। একটি বাবলা গাছের সঙ্গে তার রশিটি আটকে গেছে। তোমরা অগ্রসর হয়ে দ্যাখো। লোকেরা অগ্রসর হলো। একটু পরেই আবার ফিরে এলো উটনীটিকে নিয়ে। মুনাফিকেরা লজ্জিত হলো। জায়েদ ইবনে সালত চলে গেলো আগের জায়গায়। গিয়ে দেখলো তার মালপত্র দূরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। লোকেরা বসে আছে তাদের আগের জায়গায়। তাকে দেখে তারা বললো, খবরদার! আমাদের কাছে এসো না। সে বললো, তোমাদের সঙ্গে

আমার কিছু কথা আছে। এ কথা বলেই সে সাহাবীগণের কাছে এসে বললো, তোমাদেরকে আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমার কথা মোহাম্মদের কাছে গিয়ে বলে দিয়েছো? তাঁরা বললেন, না। সে বললো, অথচ দ্যাখো, আমি কী বলেছি, তা তিনি ঠিক ঠিক বলে দিয়েছেন। এবার আসল কথা শোনো, আমি সত্য সত্যই প্রথমে তাঁকে সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু এখন আমার সে সন্দেহ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র রসুল। আগেও আমি মুসলমান ছিলাম। এখন হলাম পুরোপুরি মুসলমান। সাহাবীগণ বললেন, তুমি রসুল স. এর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও। তাহলে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। সে সঙ্গে সঙ্গে রসুল স. এর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলো। রসুল স.ও তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন।

রসুল স. যখন আকীক প্রান্তরে পৌঁছলেন, তখন ইবনে উবাইয়ের পুত্র হন্যে হয়ে কাফেলার উটগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। যখন তাঁর পিতার উটের দেখা পেলেন, তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে তার পাগুলো বেঁধে ফেললেন। ইবনে উবাই

বললো, আরে মূর্খ! একি করছো তুমি? হজরত আবদুল্লাহ্ বললেন, রসুল স. এর অনুমতি ছাড়া আপনি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেন না। আর এবার আপনি ভালো করেই একথা বুঝতে পারবেন যে, কে সম্মানিত এবং অপদস্থই বা কে? আপনি, না আল্লাহ্র রসুল। বাহিনীর লোকেরা যথারীতি অগ্রসর হতে লাগলো। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতাকে আটকেই রাখলেন। আর ইবনে উবাই বার বার বলতে লাগলো, আবদুল্লাহ্! কী করছো তুমি। নিজের পিতার সঙ্গে একি আচরণ তোমার! রসুল স. দূর থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন। সঙ্গীদেরকে বললেন, কী হচ্ছে ওখানে। তাঁরা বললেন, আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতাকে আটক করে রেখেছে। বলছে, আপনি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত সে তার পিতাকে মদীনায় প্রবেশ করতে দিবে না। রসুল স. অগ্রসর হয়ে দেখলেন, সত্যি সত্যিই হজরত আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতাকে আটক করে রেখেছেন। আর ইবনে উবাই বার বার বলছে, আমিই অপদস্থ। আমি শিশুদের চেয়েও অক্ষম। আমি নারীদের চেয়েও দুর্বল। রসুল স. নির্দেশ দিলেন, তোমার পিতাকে ছেড়ে দাও। হজরত আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতাকে ছেড়ে দিলেন।

হজরত রাফে ইবনে খাদীজ থেকে মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, ইবনে উবাই সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে হজরত উবাদা ইবনে সামেত তাকে বললেন, তুমি রসুলুল্লাহ্র কাছে উপস্থিত হও। তিনি তোমার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। কিন্তু সে ঘাড় নেড়ে অসম্মতি প্রকাশ করলো। হজরত উবাদা বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তোমার এই ঘাড় নাড়ানো সম্পর্কে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোনো আয়াত অবতীর্ণ করবেন; যা তোমার জন্য হবে অগ্নিসদৃশ। আর ওই আগুনেই তুমি জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, দিবসের শুরু থেকেই রসুল স. আমাদের বেষ্টনীর মধ্য থেকে পথ চলছিলেন। মাঝে মাঝে দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে হজরত জায়েদ ইবনে

আরকাম তাঁর উটনীর সামনে চলে আসছিলেন। এমতাবস্থায় প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো। হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম বলেন, আমি দেখলাম, রসুল স. এর খুব কষ্ট হচ্ছে। ঘাম নির্গত হচ্ছে তাঁর ললাটদেশ থেকে। ভারী হয়ে এসেছে তাঁর উষ্ট্রীর পা। বুঝতে পারলাম, তাঁর উপরে এবার ওহী নাজিল হতে শুরু করেছে। আমি মনে মনে কামনা করলাম, ওর মধ্যে আমার সত্যতার সাক্ষ্যও যদি থাকতো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর উপর থেকে ওহীর প্রভাব দূর হলো। তিনি স. আমার দু'কান ধরে তাঁর বাহনে উঠিয়ে নিলেন। বললেন, বৎস! তোমার কান তো দেখছি খুবই শক্ত। আল্লাহ্ তো তোমাকেই সত্যবাদী বলে সাব্যস্ত করেছেন। একথা বলেই তিনি পাঠ করে শোনালেন সদ্য অবতীর্ণ আয়াতসমূহ। এর নাম সুরা মুনাফিকুন। এর সকল আয়াতই অবতীর্ণ হয়েছে মুনাফিকদের সম্পর্কে। এরপর থেকে ইবনে উবাইয়ের কথার গুরুত্ব আর কেউ দিতো না। সে কিছু বললেই তার সম্প্রদায়ের লোকেরা হয়ে যেতো রাগান্বিত।

উপরে উল্লেখিত বিবরণ সমূহের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সুরা মুনাফিকুন অবতীর্ণ হয়েছে সফর অবস্থায় মদীনায় প্রবেশের প্রাক্কালে। কিন্তু বাগবী লিখেছেন, হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম বলেছেন, আমরা মদীনায় পৌঁছে গেলাম। আমি লজ্জায় ও অনুশোচনায় জর্জরিত হতে লাগলাম। বেশীরভাগ সময় বসে থাকতাম গৃহকোণে। কিছুদিনের মধ্যেই অবতীর্ণ হয় সুরা মুনাফিকুন। এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি স. আমাকে কান ধরে বলেছিলেন, হে জায়েদ! আল্লাহ্ তোমার কথাকেই সত্য বলেছেন এবং পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তোমার শ্রুতি। এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন ইবনে উবাই মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলো, তখন কেউ কেউ তাকে বললেন, কী হে, তোমার ব্যাপারে তো দেখছি খুব কঠিন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। বাঁচতে যদি চাও, তবে রসুল স. এর কাছে যেয়ে ক্ষমা চেয়ে নাও। তিনি স. আল্লাহ্ সকাশে তোমার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাইবেন। ইবনে উবাই মাথা নাড়িয়ে বললো, উঁহু। তোমরা আমাকে ইমান আনতে বলেছিলে, আমি ইমান এনেছি। জাকাত দিতে বলেছিলে, তা-ও তো দিয়েছি। এখন তো মোহাম্মদকে সেজদা করা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ বাকী নেই। তখন অবতীর্ণ হয় 'যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা এসো, আল্লাহ্র রসুল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও, তারা দম্ভভরে ফিরে যায়' (৫)। এ ঘটনার পর ইবনে উবাই আর বেশী দিন বাঁচেনি। অচিরেই মারা যায় রোগাক্রান্ত হয়ে।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, ঘটনাটি ঘটেছিলো ষষ্ঠ হিজরীতে শাবান মাসে। খলিফা ইবনে খইয়্যাত ও তিবরানী বলেছেন, বর্ণনাটি যথাসূত্রসম্বলিত। কিন্তু কাতাদা ও ওরওয়া বলেছেন, পঞ্চম হিজরীর শাবানে সংঘটিত হয়েছিলো এই ঘটনা। এই ঘটনা ঘটার সময়েই রসুল স. বিবাহ করেছিলেন হজরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেছকে। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও মোহাম্মদ ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা

বলেছেন, জুওয়াইরিয়া ছিলেন মিষ্টভাষিণী ও লাবন্যময়ী। তাঁর প্রতি যে দৃষ্টিপাত করতো, সে-ই অভিভূত হতো। একদিন রসুল স. একটি পানির কূপের কাছে বসেছিলেন। এমন সময় জুওয়াইরিয়া সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর মুক্তির জন্য আর্থিক সহায়তা কামনা করলেন। তাঁর এরকম আগমন আমার মোটেও পছন্দ হয়নি। আমি বুঝতে পারলাম, রসুল স. তাঁর প্রতি কোমল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন, যে দৃষ্টিতে তিনি তাকান আমার দিকে। জুওয়াইরিয়া বললেন, আমি বিশ্বাসবতী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য

www.eelm.weebly.com

নেই এবং আপনি আল্লাহ্‌র রসুল। আমি হারেছ ইবনে আবী জারারের কন্যা। হারেছ ছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের নেতা। এখন আমি বিপদগ্রস্তা। এখন আমি ক্রীতদাসী হিসেবে রয়েছি ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস এবং তার চাচাতো ভাইয়ের যৌথ মালিকানায়। ছাবেত আমার মুক্তিপণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু তার মূল্য এতো বেশী যে, তা পরিশোধ করার সামর্থ্য আমার নেই। তাই আমি আপনার শরণপ্রার্থিনী। দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন। রসুল স. বললেন, এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা যদি কিছু হয়, তবে তুমি কি তা গ্রহণ করবে? জুওয়াইরিয়া বললেন, বলুন। তিনি স. বললেন, আমি তোমার মুক্তিপণের সমুদয় অর্থ পরিশোধ করবো। তারপর তোমাকে বিবাহ করবো। তিনি বললেন, আমি রাজী। রসুল স. ছাবেত ইবনে কায়েসকে ডাকলেন এবং তাকে জুওয়াইরিয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ছাবেত বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! আপনার উদ্দেশ্যে আমার জনক-জননী উৎসর্গীকৃত হোক। জুওয়াইরিয়া আপনারই। রসুল স. চুক্তির অর্থ পরিশোধ করলেন। তারপর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলেন জুওয়াইরিয়াকে। বনী মুস্‌তালিক গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক দাসরূপে মুসলমানদের ভাগে পড়েছিলো। রমণীরাও দাসীরূপে এসে গিয়েছিলো তাঁদের মালিকানায়। রসুল স. যখন জুওয়াইরিয়াকে বিবাহ করলেন, তখন সাহাবীগণ বলতে শুরু করলেন, বনী মুসতালিক গোত্র তো এখন রসুল স. এর শ্বশুরকুল। সুতরাং তাঁদের কেউ তো আমাদের দাস-দাসী হতে পারেন না। একথা বলেই তাঁরা একে একে সবাইকে মুক্ত করে দিলেন। জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. জুওয়াইরিয়াকে বিবাহ করার ফলে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলো মুসতালিক গোত্রের একশত পরিবার। আপন সম্প্রদায়ের জন্য জুওয়াইরিয়ার চেয়ে আর কেউ অধিক কল্যাণময়ী হতে পারেননি।

ওরওয়া থেকে হিশাম ও হারামের মাধ্যমে মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, উম্মতজননী হজরত জুওয়াইরিয়া বলেছেন, রসুল স. এর অন্তঃপুরে আসার আগে এক রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম, একটি জ্যোতির্ময় চন্দ্র ইয়াসরেবের দিক থেকে এসে আমার কোলে পড়লো। আমি এ স্বপ্নের কথা কাউকে জানাইনি। যখন রসুল স. আমাকে মুক্ত করে দিয়ে বিবাহ করলেন, তখন আমি আমার স্বপ্নের মর্ম বুঝতে পারলাম। আমার সম্প্রদায়ের লোকদের মুক্তির কথাও আমি আগে জানতে পারিনি। মুসলমানেরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। রসুল স. যখন আমাকে এই শুভসংবাদ জানালেন, তখন আমি প্রাণভরে কৃতজ্ঞতা জানালাম মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে।

তাফসীরে মাযহারী/৫২৯

হাফেজ ইবনে আয়েদ বর্ণনা করেছেন, হজরত জুওয়াইরিয়ার পিতা হারেছ ইবনে আবী জারার কয়েকটি উট মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করার জন্য রওয়ানা হলেন। আকীক নামক উপত্যকায় পৌঁছে সবচেয়ে ভালো উট দু'টি তিনি এক স্থানে লুকিয়ে রাখলেন। অবশিষ্টগুলো নিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। বললেন, হে মোহাম্মদ! আমার কন্যা আপনার বন্দিনী। আমি তাকে মুক্ত করতে এসেছি। এই উটগুলো মুক্তিপণরূপে গ্রহণ করে তাকে মুক্তি দিন। রসুল স. বললেন, ওই উট দু'টো কোথায় যেগুলো তুমি পথিমধ্যে অমুক স্থানে লুকিয়ে রেখেছো? হারেছ বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি সত্যিই আল্লাহ্‌র রসুল। আমার প্রিয় উট দু'টোর লুকিয়ে রাখার কথা তো আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ জানে না। এভাবে হারেছ মনে-প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করলেন। মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, মুসতালিক গোত্রের প্রতিনিধিরা এসে মুক্তিপণ দিয়ে তাদের নারী ও শিশুদেরকে মুক্ত করে নিয়ে গিয়েছিলো। উপরোক্ত ঘটনার মধ্যে এরকমও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসুল স. মুসতালিক গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, ইবনে আউন বলেছেন, আমি একবার হজরত নাফেয়ের কাছে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আগে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো জরুরী কিনা তা জানতে চাইলাম। তিনি জবাবে জানালেন, এরকম বিধান ছিলো ইসলামের প্রাথমিক যুগে। রসুল স. মুসতালিক গোত্রের বিরুদ্ধে অতর্কিতে হামলা চালিয়েছিলেন। তখন তারা ছিলো সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। তারা তাদের উটগুলোকে পানি পান করাচ্ছিলো। যারা সশস্ত্রভাবে হামলা প্রতিহত করতে এগিয়ে এসেছিলো, তিনি স. তাদেরকে হত্যা করেছিলেন এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে করেছিলেন বন্দী। বর্ণনাকারী বলেন, আমার কাছে এরকম তথ্য পৌঁছেছে হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর থেকে, যিনি নিজেও ছিলেন ওই আক্রমণকারী বাহিনীর অন্তর্ভূত।

সূরা মুনাফিক্বুন ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

তাফসীরে মাযহারী/৫৩০

❑ যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে তাহারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল।' আল্লাহ্ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

❑ উহারা উহাদের শপথগুলিকে ঢালরূপে ব্যবহার করে আর উহারা আল্লাহ্‌র পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। উহারা যাহা করিতেছে তাহা কত মন্দ!

❑ ইহা এইজন্য যে, উহারা ঈমান আনিবার পর কুফরী করিয়াছে। ফলে উহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছে; পরিণামে উহারা বুঝে না।

❑ তুমি যখন উহাদের দিকে তাকাও উহাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং উহারা যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে উহাদের কথা শ্রবণ কর যদিও উহারা দেওয়ালে ঠেকান কাঠের স্তম্ভ সদৃশ; উহারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে উহাদেরই বিরুদ্ধে। উহারাই শত্রু, অতএব উহাদের সম্পর্কে সতর্ক হও; আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হইয়া উহারা কোথায় চলিয়াছে!

www.eelm.weebly.com

❑ যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা আইস, আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন' তখন উহারা মাথা ফিরাইয়া লয় এবং তুমি উহাদিগকে দেখিতে পাও, উহারা দম্ভভরে ফিরিয়া যায়।

❑ তুমি উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই উহাদের জন্য সমান। আল্লাহ্ উহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

❑ উহারাই বলে, 'তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করিও না, যাহাতে উহারা সরিয়া পড়ে।' আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহ্রই; কিন্তু মুনাফিকগণ তাহা বুঝে না।

❑ উহারা বলে, 'আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলে তথা হইতে প্রবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কার করিবে।' কিন্তু শক্তি তো আল্লাহ্রই, আর তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদের। তবে মুনাফিকগণ ইহা জানে না।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ইজা জ্বাআকাল মুনাফিক্বুন' (যখন মুনাফিকেরা তোমার নিকট আসে)। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! যখন মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার দলবল নিয়ে আপনাকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে আসে। এরপর বলা হয়েছে 'ক্বলূ নাশহাদু ইন্নাকা লা রসুলুল্লহ'। এর অর্থ— তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রসুল। এখানকার 'নাশহাদু' (সাক্ষ্য দিচ্ছি) কথাটি এসেছে 'শাহাদাতুন' ও 'শুহুদূন' থেকে। শুহুদ' অর্থ সাক্ষ্য, উপস্থিত হওয়া, অবহিত করা। আর ভাবার্থ— জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সংবাদ জ্ঞাপন। বলাবাহুল্য মুনাফিকদের এমতো সাক্ষ্য ছিলো অযথার্থ। কেননা তা জ্ঞান ও বিশ্বাস সম্মত ছিলো না।

এরপর বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রসুল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকেরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী'।

এখানে 'ইন্নাল মুনাফিক্বীনা লা কাজিবূন' অর্থ মুনাফিকেরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। অর্থাৎ তাদের বাহ্যিক স্বীকারোক্তিকে প্রকৃত সাক্ষ্য বলা ঠিক নয়। এরকম ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাবে তখন, যখন 'সাক্ষ্য দিচ্ছি' বাক্যটিকে ধরা হবে নিছক সংবাদ। আর যদি বাক্যটিকে এখানে ধরা হয় অভিপ্রায়মূলক, তবে তাকে সত্য বা মিথ্যা কোনোটাই নিশ্চিত করে বলা যাবে না এবং তখন সাক্ষ্যকৃত বাক্যটি হবে 'ইন্নাকা লা রসুলুল্লহ্'। এরকম ব্যাখ্যা করলে 'লা কাজিবূন' কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তারা তাদের স্বধারণা অনুসারে বাহ্যিকভাবে মোহাম্মদ মোস্তফা স. কে রসুল বলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে, অথচ তিনি সত্যিই আল্লাহ্র রসুল।

নিজাম মুতাজিলী (ইব্রাহিম ইবনে সাইয়্যার) বলেছেন, 'সিদক্ব' অর্থ বিশ্বাসানুসারে কথা বলা। আর 'কিজব' অর্থ বিশ্বাসবিরোধী বাক্য। তিনি তাঁর অভিমতের সমর্থনে এই আয়াতকেই দলিলরূপে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু তাঁর অভিমত ঠিক নয়। বরং আলোচ্য আয়াতের অর্থ সেটাই, যা আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে, আর তারা আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে'। এখানে 'আইমানাহুম' অর্থ শপথগুলিকে। অর্থাৎ সাক্ষ্যগুলিকে। কেননা সাক্ষ্যের শব্দসমূহ শপথেরই অন্তর্ভুক্ত। 'জুন্নাতান' অর্থ ঢালরূপে। অর্থাৎ নিহত হওয়া অথবা বন্দী হওয়া থেকে বাঁচবার উপায়রূপে। 'ফাসদ্দু আ'ন সাবীলিল্লাহ্' অর্থ আর তারা আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে। 'সদ্দু' অর্থ নিজে নিবৃত্ত হওয়া অথবা অন্যকে নিবৃত্ত করা। শব্দটির ক্রিয়ামূল যদি 'সদুদুন' হয়, হবে এর অর্থ হবে নিজে নিবৃত্ত হওয়া, বিরত থাকা, বিমুখ হওয়া। আর যদি এর ক্রিয়ামূল হয় 'সদ্দূন' তবে অর্থ হবে— অপরকে নিবৃত্ত করা, প্রতিহত করা, ফিরিয়ে রাখা। 'আল্লাহ্র পথ থেকে' অর্থ আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম থেকে। আর 'ইন্নাহু সাআ মা কানূ ইয়া'লামুন' অর্থ তারা যা করছে, তা কতো মন্দ। অর্থাৎ তাদের কপটাচরণ এবং আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্তকরণ কতোই না নিকৃষ্ট।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, তারা ইমান আনবার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেওয়া হয়েছে; পরিণামে তারা বুঝে না'। একথার অর্থ— তারা মুসলমানদের কাছে মুসলমান সেজে থাকতে চায়। তাই মুখে মুখে আল্লাহ্র রসুলের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা ঘোর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। সেকারণেই আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে অবরুদ্ধ করে দিয়েছেন। তাই সত্যের আলো সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু এর পরিণাম যে কতো মন্দ, তা তারা বুঝতেই পারে না। কেননা তারা শুভবোধ ও বুদ্ধিবিবেচনাহীন। অথবা— সত্য কোনো নিদর্শন দেখে তারা প্রথমে ইমান এনে ফেলে ঠিকই। কিন্তু পরে শয়তান ও অসৎ সহচরদের প্ররোচনায় পড়ে পতিত হয় সন্দেহে। এভাবে হয়ে যায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আল্লাহ্ তখন তাদের হৃদয়কে মোহর করে দেন। ফলে তারা হয়ে যায় চিরদিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত। অথচ তারা তাদের এমতো মন্দ পরিণতির কথা বুঝতেও পারে না।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও, তাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং তারা যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবণ করো, যদিও তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভ সদৃশ্য'।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইবনে উবাই ছিলো সুঠামদেহী ও শিল্পমণ্ডিত ভাষার অধিকারী। তাই রসুল স. তার কথা আগ্রহভরে শুনতেন ও তার দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতেন। সেকথাই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আর 'তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভ সদৃশ' অর্থ ইবনে উবাইয়েরা দেখতে সুন্দর ও সুকণ্ঠের অধিকারী হলেও বিশ্বাস, বুদ্ধি ও শুভবোধ বিবর্জিত। যেনো তা দেয়ালে ঠেকিয়ে রাখা কারুকার্যমণ্ডিত কোনো কাষ্ঠনির্মিত গৃহোপকরণ— সুন্দর, কিন্তু নিস্প্রাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যে কোনো শোরগোলকেই মনে করে তাদের বিরুদ্ধে'। একথার অর্থ— তাদের হৃদয় যেহেতু অপরাধী, তাই তারা থাকে সদা সন্ত্রস্ত। হাঁক ডাক কিছু শুনলেই তারা মনে করে, তাদের বিরুদ্ধেই বুঝি কিছু ঘটেছে। অথবা— তারা সব সময় এই আতংকে সময় কাটায় যে, এই বুঝি তাদের কপটতার কথা প্রকাশ হয়ে গেলো। এখন নিশ্চয় তাদেরকে দেওয়া হবে হত্যার হুকুম। সেকারণেই তারা চমকে উঠতো সেনাবাহিনীতে শোরগোল শোনা গেলে, চীৎকার করে কেউ কাউকে ডাকলে, পশু হারানো বা প্রাপ্তির ঘোষণা শুনলে।

এরপর বলা হয়েছে, 'তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! একথা ভালোভাবে জেনে রাখুন যে, মুনাফিকেরাই আপনার এবং আপনার বিশ্বাসী অনুচরবর্গের প্রধান শত্রু। সুতরাং তাদের সম্পর্কে সব সময় সতর্ক থাকবেন। কোনো ব্যাপারেই তাদের উপরে আস্থা স্থাপন করবেন না। অভিভূত হবেন না তাদের বাহ্যিক বাগাড়ম্বর দেখে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন'। কথাটি বদদোয়া। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এর দ্বারা মুসলমানদেরকে দেওয়া হয়েছে মুনাফিকদেরকে অভিসম্পাত করার শিক্ষা। অর্থাৎ মুসলমানেরা যেনো কখনোই মুনাফিকদেরকে আপন না ভাবে, শত্রু মনে করে অন্তর থেকে তাদেরকে দেয় অভিশাপ। আর 'আন্না ইউফাকূন' অর্থ বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে? অর্থাৎ হায় কপটাচারী! তোমরা তো বুঝতেই পারছো না, তোমরা পথহারা। তোমরা তো চলেছো সেই অনন্তকালীন মহাশাস্তির দিকেই।

ইকরামা থেকে কাতাদা, ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, মুসলমানগণ যখন ইবনে উবাইকে রসুল স. এর কাছে উপস্থিত হয়ে ক্ষমাভিক্ষার জন্য উপদেশ দিলো, তখন সে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রকাশ করলো তার অসম্মতি। তখন অবতীর্ণ হলো—

'যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা এসো, আল্লাহ্র রসুল তোমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও, তারা দম্ভভরে ফিরে যায় (৫)। তুমি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো, অথবা না করো, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না' (৬)।

এখানে 'লাওওয়াও রূউসাকুম' অর্থ মাথা ফিরিয়ে নেয়। অর্থাৎ বিমুখ হয়। আর 'যখন তাদেরকে বলা হয়' বলে এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে ওই সকল মুনাফিককে, যাদেরকে মুসলমানগণ রসুল স. এর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হবার উপদেশ দিয়েছিলেন। 'ওয়া রআইতাহুম ইয়াসুদ্দূনা ওয়াহুম মুসতাকবিরূন' অর্থ এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও, তারা দম্ভভরে ফিরে যায়। এখানকার 'ইয়াসুদ্দূনা' (ফিরে যায়) কথাটি এসেছে 'সুদূদুন' ক্রিয়ামূল থেকে।

'সাওয়াউন আ'লাইহিম' আস্তাগ্ফারতা লাহুম' অর্থ তুমি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো, অথবা না করো। ওরওয়া, কাতাদা ও মুজাহিদ থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন' তখন রসুল স. বললেন, আমি তাহলে তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবো সত্তরবারেরও অধিক, সে সময় অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। আউফির মাধ্যমে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন সুরা বারাআতের আয়াতে মুনাফিকদের জন্য সত্তরবার দোয়া করলেও তা কবুল করা হবে না বলা হলো, তখন রসুল স. বললেন, আমি তো তাদের জন্য প্রার্থনা করবো সত্তরের অধিক বার। তখন অবতীর্ণ হলো 'তুমি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো অথবা না করো, উভয়ই তাদের জন্য সমান'। আর 'ইন্নাল্লহা লা ইয়াহ্দিল ক্বওমাল ফাসিক্বীন' অর্থ আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। অর্থাৎ পাপাচরণে নিমজ্জিত থেকেও যারা স্বস্তিবোধ করে, তারা হেদায়েতের অযোগ্য। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে কখনোই সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা বলে, তোমরা আল্লাহ্র রসুলের সহচরদের জন্য ব্যয় কোরো না, যাতে তারা সরে পড়ে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার তো আল্লাহ্রই; কিন্তু মুনাফিকেরা তা বুঝে না (৭)। তারা বলে, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে সেখান থেকে প্রবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কার করবে, কিন্তু শক্তি তো আল্লাহ্রই, আর তাঁর রসুল ও মুমিনদের। তবে মুনাফিকেরা তা জানে না'(৮)।

এখানে 'আল্লাহ্‌র রসুলের সহচরদের জন্য ব্যয় কোরো না' অর্থ সাহায্য কোরো না হজরত জাহজাহ্‌ প্রমুখ বিত্তহীন মুহাজিরগণকে। 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার তো আল্লাহ্‌রই' অর্থ জান্নাতের অফুরন্ত সুখদ কাননসমূহ, সৃষ্টি এবং অদৃষ্টলিপি অনুসারে প্রদত্ত ও প্রদত্তব্য সকল কিছুই মহাপ্রভুপালক আল্লাহ্‌র একক অধিকারভূত। সেকারণেই তো আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ও অনুমোদন ব্যতিরেকে কেউ কাউকে কিছু দিতে পারে না, আবার প্রতিহতও করতে পারে না আল্লাহ্‌র কোনো দানকে। 'কিন্তু মুনাফিকেরা তা বুঝেনা' অর্থ কপটাচারীরা আল্লাহ্‌র সততস্বাধীন অভিপ্রায়, অনুমোদন, প্রজ্ঞা, প্রতিপালন প্রক্রিয়া ও অপার শক্তিমত্তা সম্পর্কে মোটেও অবহিত নয়। তাই তারা উচ্চারণ করে এমতো অজ্ঞজনোচিত বক্তব্য। বুঝলে নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরকে সম্পদের প্রকৃত মালিক ভাবতে পারতো না। মনে করতো না যে, তারা স্বেচ্ছায় কাউকে কিছু দিতে পারে, অথবা প্রতিহত করতে পারে আল্লাহ্‌র দানকে। 'শক্তি তো আল্লাহ্‌রই, তাঁর রসুলের ও মুমিনদের' অর্থ আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিধর। আর তিনিই কৃপাপরবশ হয়ে তাঁর রসুল ও রসুলের অনুসারী বিশ্বাসবানদেরকে করেছেন শক্তিমান। এভাবেই তিনি পৃথিবীতে বিজয়ী করে দিয়েছেন তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে। আর 'তবে মুনাফিকেরা এটা জানে না' অর্থ কপটাচারীরা মূর্খ, অজ্ঞ, অপরিণামদর্শী। তাই তারা সত্য পথের পথিকগণের এমতো জয়যাত্রার রহস্য বুঝতে অক্ষম।

সূরা মুনাফিকুন ঃ আয়াত ৯, ১০, ১১

❑ 'হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র স্মরণে উদাসীন না করে, যাহারা উদাসীন হইবে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

❑ আমি তোমাদিগকে যে রিয্‌ক দিয়াছি তোমরা তাহা হইতে ব্যয় করিবে তোমাদের কাহারও মৃত্যু আসিবার পূর্বে। অন্যথায় মৃত্যু আসিলে সে বলিবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকা দিতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম!'

❑ কিন্তু যখন কাহারও নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইবে, তখন আল্লাহ্‌ তাহাকে কিছুতেই অবকাশ দিবেন না। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্‌ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা কখনোই মুনাফিকদের মতো আচরণ কোরো না। তারা মনে প্রাণে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না বলেই মেতে থাকে দুনিয়া নিয়ে। ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততির ভালোবাসায় নিমগ্ন থাকে সারাক্ষণ। ফলে তারা ভুলে যায় আল্লাহ্‌কে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহকে। নিশ্চিত জেনো, তারা আল্লাহ্‌ ও আখেরাত সম্পর্কে উদাসীন। আর যারা এরকম উদাসী, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

এখানে 'আ'ন জিকরিল্লাহ্‌' অর্থ আল্লাহ্‌র স্মরণে। 'আল্লাহ্‌র স্মরণ' কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। তবে তাফসীরকারগণ বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্‌র স্মরণ' বলে বুঝানো হয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে। অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেনো তোমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সম্পর্কে গাফেল না করে দেয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে নিন্দা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতত্রয়ে বিশ্বাসীগণকে এই মর্মে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেনো কখনোই মুনাফিকদের মতো না হয়। নামাজ, জাকাত ইত্যাদি ফরজ দায়িত্ব সম্পর্কে থাকে সতত সচেতন। কেননা যথাসময়ে মৃত্যু আসবেই। তখন আর ঔদাসীন্যজনিত ক্ষতি পূরণ করার সুযোগ পাওয়া যাবে না।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসবার পূর্বে। অন্যথায় মৃত্যু এলে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদকা দিতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'।

এখানে 'আনফিকু' (ব্যয় করবে) অর্থ জাকাত দিবে। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। মৃত্যু আসবার পূর্বে, অর্থ মৃত্যুর আলামত দেখা দেওয়া, অথবা মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হওয়ার পূর্বে। অর্থাৎ জাকাত ও অন্যান্য দান খয়রাত করতে হবে যথাসময়ে, স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপনের সময়, মৃত্যুর মুহূর্তে নয়।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একবার এক লোক জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কোন সময়ের দান উত্তম? তিনি স. বললেন, যখন তুমি সুস্থ থাকো, প্রয়োজন বোধ করো সম্পদের, এরকম আশংকার অবকাশ যখন থাকে যে, দান করলে সম্পদ কমে যাবে এবং যখন আকাংখা করো আরো অধিক সম্পদের। যখন জীবন কণ্ঠাগত হয়, তখন তোমরা বলে থাকো, আমার সম্পদ অমুককে দিয়ে দাও। কী লাভ এরকম বলে, একটু পরেই তো তোমার সম্পদের মালিক হয়ে যাবে অন্যেরা।

'ফা ইয়াকুলা' অর্থ সে বলবে। অর্থাৎ যথাসময়ে দান করতে না পারলে মৃত্যুর পর সে আক্ষেপ করে বলবে। 'রব্বি লাও লা আখ্‌খর্‌তানী ইলা আজ্বালিন ক্বরীব ফাআস্‌সাদ্‌দাক্বা' অর্থ হে আমার প্রভুপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সদকা দিতাম। 'লাও লা' অর্থ অন্যথায়। কেউ কেউ বলেছেন, 'লাও' শব্দটি এখানে আকাংখাজ্ঞাপক। অর্থাৎ সে তখন এই আকাংখা করবে যে, আবার যদি তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হতো, তাহলে সে আর ভুল করতো না। দান-ধ্যান করতো যথাসময়ে ও যথানিয়মে। 'আজ্বালিন ক্বরীব' অর্থ কিছুকালের জন্য। আর এখানকার 'ওয়া আকুম্ মিনাস্ সলিহীন' (এবং সৎকর্মপরায়ণদের) বলে বুঝানো হয়েছে 'মুমিনগণকে'। মুকাতিল ও কোরআন ব্যাখ্যাতাগণের একটি দল এরকম বলেছেন। তাঁদের মতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মুনাফিকদের সম্পর্কে। আবার কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, মুসলমানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। এখানে 'সৎকর্ম' অর্থ শরিয়তের অত্যাবশ্যক নির্দেশাদি পালন এবং শরিয়তনিষিদ্ধ কর্মসমূহ বর্জন। জুহাক ও আতিয়া সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস একবার বললেন, যে ব্যক্তি সম্পদাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও জাকাত দেয় না এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ পালন করে না; সে মৃত্যুর প্রাক্কালে আক্ষেপে জর্জরিত হতে থাকবে। বলবে, আর একবার যদি কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে বসবাস করার সুযোগ পেতাম, তবে কিছুতেই আর এরকম ভুল করতাম না। জাকাত দিতাম, হজ করতাম, অন্যান্য পুণ্যকর্মসমূহও কখনো পরিত্যাগ করতাম না। এরপর তিনি পাঠ করে শোনালেন এই আয়াত।

শেষোক্ত আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'কিন্তু যখন কারো নির্ধারিত কাল উপস্থিত হবে, তখন, আল্লাহ্ তাকে কিছুতেই অবকাশ দিবেন না'। একথার অর্থ— নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসবেই। তখন কারো কোনো প্রকার প্রার্থনাই মৃত্যুকে বিলম্বিত করতে পারবে না। এরপর বলা হয়েছে 'তোমরা যা করো, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তোমাদের ভালো মন্দ প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই জানেন। সুতরাং যথাসময়ে তিনি তোমাদেরকে যথোপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করবেনই।

সূরা তাগাবুন

এই সূরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মদীনায়। এর মধ্যে রয়েছে ২টি রুকু এবং ১৮টি আয়াত।

সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

www.eelm.weebly.com

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আধিপত্য তাঁহারই এবং প্রশংসা তাঁহারই; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❑ তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেহ হয় কাফির এবং তোমাদের মধ্যে কেহ হয় মু'মিন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

❑ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে এবং তোমাদিগকে আকৃতি দান করিয়াছেন— তোমাদের আকৃতি করিয়াছেন সুশোভন, এবং প্রত্যাবর্তন তো তাঁহারই নিকট।

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যাহা গোপন কর ও তোমরা যাহা প্রকাশ কর এবং তিনি অন্তর্যামী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল সচেতন ও নিশ্চেতন সৃষ্টিই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে। তিনিই সর্বাধিপতি। সেকারণেই সকল প্রশংসা-প্রশস্তি স্তব-স্তুতি কেবল তাঁর। তিনি সকল বিষয়েই সর্বশক্তিধর। এখানে 'লাহু' সর্বনামটি উল্লেখ করা হয়েছে দু'বার। আর উভয় স্থানে 'লাহু'কে বসানো হয়েছে বাক্যের পূর্বে। এভাবে এখানে পবিত্রতা, মহিমা, আধিপত্য, সর্বশক্তিধরতা ইত্যাদি গুণসমূহকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে কেবলই আল্লাহ্‌র সঙ্গে।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফের এবং তোমাদের মধ্যে কেউ হয় মু'মিন। তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা'।

এখানে 'ফা মিনকুম' অর্থ তোমাদের মধ্যে। 'ফা' অব্যয়টি এখানে 'অতঃপর' অর্থপ্রকাশক। অর্থাৎ সৃষ্ট হবার পর তোমরা কেউ হয়েছো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী এবং কেউ বিশ্বাসী। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ সকল প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। অতঃপর কতিপয় প্রাণী তাদের পেটের উপরে ভর দিয়ে চলে, আবার কতিপয় চলে দুই পায়ের উপরে ভর করে'।

'ওয়াল্লহু বিমা তা'মালূনা বাসীর' অর্থ তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। অর্থাৎ তোমরা অবাধ্যতা-আনুগত্য যাই কিছু করো না কেনো, আল্লাহ্ তা নিশ্চয় দেখেন। এর জন্য তিনি তোমাদেরকে যথাসময়ে যথোপযুক্ত প্রতিফল দিবেনই।

মুতাজিলারা এই আয়াতকে তাদের অভিমতের প্রমাণরূপে উপস্থাপন করে। বলে, ইমান ও কুফর বান্দার সৃষ্টি। তকদীর অনুসারে কেউ ইমানদার অথবা কাফের হয় না। কিন্তু তাদের এমতো অভিমত ভ্রান্ত। কেননা সকল কিছুই তকদীর অনুসারে হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সব কিছুই আমি সৃষ্টি করেছি তকদীর অনুসারে'। সুতরাং বুঝতে হবে, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পুণ্য-পাপ, ভালো-মন্দ সকল কিছুই আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক সৃষ্ট। একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্ব অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, মানুষকে দেওয়া হয়েছে ভালো অথবা মন্দ গ্রহণের অভিপ্রায় ও অধিকার। তাই তাদেরকে বলা যেতে পারে নির্মাতা বা অর্জনকারী, স্রষ্টা কদাচ নয়। সৃজন সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র। আর স্বেচ্ছায় অর্জনকারী বলেই মানুষের কৃতকর্মের জন্য নির্ধারণ করা হয় সওয়াব অথবা আযাব। এটাই বিশুদ্ধ বিশ্বাস। আর এ ব্যাপারে রয়েছে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ঐকমত্য। এমতো বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হওয়া নাজায়েয। আল্লাহ্ এরশাদ করেন, বিশ্বাসীগণের পথ থেকে যে বিচ্যুত হয়েছে, আল্লাহ্ তাকে প্রবেশ করাবেন জাহান্নামে।

হজরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ মাতৃগর্ভে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন। সে আল্লাহ্‌পাকের সমীপে নিবেদন জানায়, এতো এখন শুক্রবিন্দু, এখন রক্তপিণ্ড, এখন গোশত পিণ্ড। এ পর্যায় অতিক্রান্ত হলে, গর্ভস্থিত শিশু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, হে আমার প্রভুপালক! একে কী করা হবে, পুরুষ না নারী, সৌভাগ্যশালী, না দুর্ভাগা? তার আয়ুষ্কাল কতো? রিজিক কী পরিমাণ? এ সকল কিছুই আল্লাহ্‌র হুকুমে ওই ফেরেশতা নির্ধারণ করে দেয় ওই শিশুর মাতৃগর্ভের জীবনেই। বোখারী। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও একটি সুপরিণত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যার শেষাংশে অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— শপথ ওই সত্তার! তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা সারাজীবন ধরে জান্নাতীদের মতো আমল করে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, জান্নাতের ও তাদের মধ্যে ব্যবধান থাকে মাত্র এক হাত, সহসা তকদীর তার উপরে প্রবল হয় এবং সে জাহান্নামবাসীদের মতো আমল শুরু করে চলে যায় জাহান্নামে। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, সৃষ্টিকে অস্তিত্বদানের পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই আল্লাহ্ তাদের তকদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তখন তাঁর আরশ ছিলো পানির উপরে। এ প্রসঙ্গের হাদিস রয়েছে আরো অনেক।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ই মানুষকে বিশ্বাসী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরূপে সৃষ্টি করেছেন। তাই পৃথিবীতে তারা বিশ্বাসী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়।

www.eelm.weebly.com

অর্থাৎ কোনো কোনো মানুষের জন্য তিনি নির্ধারণ করেছেন ইমান এবং কারো কারো জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন কুফর। তাই যারা কাফের, তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই কুফরীর দিকে ধাবিত হয়। আর যারা ইমানদার, তাদেরকে দেওয়া হয় পুণ্যকর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য। হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত উবাই ইবনে কা'ব উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হজরত খিজির যে শিশুটিকে হত্যা করেছিলেন, তকদীর অনুসারে সে কাফেরই ছিলো। হজরত নূহ ও তাঁর অপপ্রার্থনায় বলেছিলেন, 'এই কাফেরেরা এমন সন্তানের জন্মদান করবে, যারা হবে কাফের ও অসৎকর্মপরায়ণ'।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন— তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন এবং প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই নিকট'।

এখানে 'বিল হাক্কি' অর্থ যথাযথভাবে। 'ওয়া সাওওয়ারাকুম' অর্থ এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন। 'ফা আহসানা সুওয়ারাকুম' অর্থ তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন। অর্থাৎ হে মানুষ! আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে

তোমাদেরকেই দান করেছেন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার সৌন্দর্য। চেহারা- নাক-নকশাকে যেমন করেছেন সুশোভন, তেমনি তোমাদেরকে দিয়েছেন জ্ঞান-বুদ্ধি ও আল্লাহ্র পরিচয়প্রাপ্তির যোগ্যতা। আর 'ওয়া ইলাইহিল মাসীর' অর্থ এবং প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই নিকট। সুতরাং তোমরা মন্দ স্বভাব ও অশুভ কর্মের দিকে ধাবিত হয়ে তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যকে বিনষ্ট করে দিয়ো না।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন করো ও তোমরা যা প্রকাশ করো এবং তিনি অন্তর্যামী'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। তাই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলকিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত। আর তিনি তো তোমাদের ভালোমন্দ প্রকাশ্য-গোপন সকলকিছুই জানেন। অন্তরের অন্তস্থলে তোমাদের কী ভাবের উদয় হয়েছিলো, হয়, হবে— কোনোকিছুই তাঁর অজানা নয়। তিনি যে অন্তর্যামী। উল্লেখ্য, এখানে 'জানেন' (ইয়া'লামু) কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে দু'বার। এভাবে আল্লাহ্র সর্বজ্ঞতার প্রসঙ্গটি উচ্চকিত করে শাসানো হয়েছে তাদেরকে, যারা আল্লাহ্র অবাধ্য ও তাঁর সন্তোষবহির্ভূত কর্মে লিপ্ত।

সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

www.eelm.weebly.com

❑ তোমাদের নিকট কি পৌঁছে নাই পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত? উহারা উহাদের কর্মের মন্দ ফল আস্বাদন করিয়াছিল এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

❑ উহা এইজন্য যে, উহাদের নিকট উহাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিত তখন উহারা বলিত, 'মানুষই কি আমাদিগকে পথের সন্ধান দিবে?' অতঃপর উহারা কুফরী করিল ও মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু ইহাতে আল্লাহ্‌র কিছু আসে যায় না; আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

❑ কাফিররা ধারণা করে যে, উহারা কখনও পুনরুত্থিত হইবে না। বল, 'নিশ্চয়ই হইবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হইবে। অতঃপর তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হইবে। ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।'

❑ অতএব তোমরা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

❑ স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদিগকে সমবেত করিবেন সমাবেশ দিবসে সেদিন হইবে লাভ-লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাহার পাপ মোচন করিবেন এবং তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা হইবে চিরস্থায়ী। ইহাই মহাসাফল্য।

❑ কিন্তু যাহারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তাহারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে। কত মন্দ সে প্রত্যাবর্তনস্থল!

'আলাম ইয়া'তিকুম নাবাউল্ লাজীনা কাফারূ মিন ক্বলু' অর্থ তোমাদের কাছে কি পৌঁছেনি পূর্ববর্তী কাফেরদের বৃত্তান্ত। অর্থাৎ হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর দল! তোমাদের কাছে কি নবী নূহের সম্প্রদায়, আ'দ, ছামুদ, আসহাবুল আইকা এ সকল জনগোষ্ঠীর ইতিবৃত্ত পৌঁছেনি? 'ফাজাক্বূ ওয়াবালা আমরিহিম' অর্থ তারা তাদের কর্মের মন্দ ফল আস্বাদন করেছিলো। অর্থাৎ এই পৃথিবীতেই তারা পেয়ে গিয়েছিলো তাদের সত্যদ্রোহিতার উপযুক্ত শাস্তি। আল্লাহ্‌র আযাবে তারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলো সমূলে। এখানকার 'ওয়াবালা' এর শাব্দিক অর্থ ভার। যেমন আরবীতে বলা হয় 'ত্বআ'মুন ওয়াবীলুন' (ভারী আহার্য) 'মাতারুন ওয়াবীলূন' (ভারী বৃষ্টি)। আর 'ওয়া লাহুম আ'জাবুন আ'লীম' অর্থ এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। অর্থাৎ পরকালেও তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে দোজখের অনন্ত শাস্তি।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, তাদের নিকট তাদের রসুলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ যখন আসতো, তখন তারা বলতো, মানুষই কি আমাদেরকে পথের সন্ধান দিবে'? এখানে 'আল বায়্যিনাতি' অর্থ স্পষ্ট নিদর্শন। আর 'ফাক্বালূ আ বাশারুঁই ইয়াহ্দূনানা' অর্থ তখন তারা বলতো, মানুষই কি আমাদেরকে পথের সন্ধান দিবে? অর্থাৎ মানুষ কি কখনো আল্লাহ্র রসুল হতে

পারে নাকি? আল্লাহ্র রসুল তো হতে পারে ফেরেশতারা। এখানকার 'বাশার' হচ্ছে শ্রেণীবাচক বিশেষ্য। তাই শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে একবচন বহুবচন উভয়রূপে। কিন্তু এখানে শব্দটির দ্বারা বহুবচনই বুঝানো হয়েছে। তাই পরবর্তী ক্রিয়াটিও হয়েছে বহুবচনরূপী। আর এখানকার 'বাশার' এর পূর্বের 'হামযা'টি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্নবোধক। অর্থাৎ তারা প্রত্যেকে তাদের প্রতি প্রেরিত রসুলগণকে অস্বীকার করেছিলো এবং বিস্মিত হয়ে বলেছিলো, মানুষ আবার কখনো মানুষের পথপ্রদর্শক হতে পারে নাকি? আল্লাহ্র পয়গম্বর হওয়ার যোগ্যতা কি মানুষের আছে?

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা কুফরী করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিলো। কিন্তু এতে আল্লাহ্র কিছু আসে যায় না, আল্লাহ্ অভাব মুক্ত, প্রশংসার্হ'। এখানে 'ফা কাফারূ' অর্থ অতঃপর তারা কুফরী করলো। 'ওয়া তাওয়াল্লাও' অর্থ এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো। 'ওয়াস্তাগ্নাল্লহু' অর্থ কিন্তু এতে আল্লাহ্র কিছু এসে যায় না। অর্থাৎ তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করুক, অথবা না করুক, এতে আল্লাহ্র তো কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। রসুল প্রেরণ করে তাদেরকে সতর্ক করতে তো তিনি চেয়েছিলেন তাদের প্রতি নিছক মমতাপরবশ হয়ে। রসুলগণকে মান্য করলে উপকৃত তো হতো তারাই। কিন্তু তারা তা করেনি। ফলে হয়েছে চিরদিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত। এতে আল্লাহ্র তো কোনো লাভ-ক্ষতি নেই। আর 'ওয়াল্লহু গনিয়্যুন হামীদ' অর্থ আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তো চির অমুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসিত, সৃষ্টি একথা মান্য করলেও, না করলেও।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'কাফেরেরা ধারণা করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। বলো নিশ্চয়ই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়ই তোমরা পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে, তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ'। এখানে 'কাফেরেরা ধারণা করে' অর্থ মক্কার পৌত্তলিকেরা মনে করে। উল্লেখ্য, তারাই পুনরুত্থান দিবসকে প্রবলভাবে অস্বীকার করতো। 'তোমরা যা করতে, তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে 'অর্থ হে মানুষ! পুনরুত্থান দিবসে তোমাদের সকলকেই সমবেত করে তোমাদের ভালো-মন্দ সকল কর্মের হিসাব বুঝে নেওয়া হবে। আর 'এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ' অর্থ তোমরা অগণিতসংখ্যক হলেও তোমাদের এই হিসাব গ্রহণ আল্লাহ্র জন্য অতি সহজ। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিধর।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'অতএব তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করো। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত'। একথার অর্থ— অতএব হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও কোরআনকে বিশ্বাস করো। বিশ্বাস করো পুনরুত্থান দিবসকে। মনে রেখো, বিশ্বাসের পথ পরিহার করে তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি থেকে কখনোই অব্যাহতি পাবে না। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি তোমাদের ভালো-মন্দ প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই জানেন। যথাসময়ে যথোপযুক্ত প্রতিফল তিনি তোমাদেরকে দিবেনই।

এখানে 'ওয়ান্ নূরিল্ লাজী আনযালনা' অর্থ এবং যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করেছি। অর্থাৎ আমি অবতীর্ণ করেছি যে কোরআন। কোরআনকে এখানে 'নূর' বা জ্যোতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেননা জ্যোতি যেমন স্বয়ং প্রকাশিত, তেমনি কোরআন সুস্পষ্ট মোজেজা হওয়ার কারণে এর অলৌকিকত্বও স্বয়ং প্রকাশিত ও সতত উদ্ভাসিত। এর মধ্যে সুস্পষ্ট অক্ষরে বর্ণিত হয়েছে বিধিবিধান ও সদুপদেশাবলীও। আলো যেমন অন্যকে আলোকিত করে, তেমনি কোরআনও মানুষের অজ্ঞতার অন্ধকারে জ্বালায় জ্ঞানের অনির্বাণ আলোক।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিবসে সেদিন হবে লাভ লোকসানের দিন'। একথার অর্থ— হে মনুষ্যমণ্ডলী! স্মরণ করো মহাবিচারের দিবসের সেই মহাসমাবেশের কথা। সেদিন তিনি তোমাদেরকে দিবেন তোমাদের কৃতকর্মসমূহের যথোপযুক্ত প্রতিফল। এখানে 'লি ইয়াওমিল জ্বাময়ি' অর্থ সমাবেশ দিবসে। অর্থাৎ ওই দিন সমাবেশ ঘটানো হবে সকল মানুষ, জ্বিন ও ফেরেশতাদের । কথাটির 'লাম' হরফ এখানে এসেছে নিমিত্তের জন্য। অর্থাৎ ওই সমাবেশ হবে হিসাব গ্রহণ এবং প্রতিফল প্রদানের নিমিত্ত।

'জালিকা ইয়াওমুত্ তাগাবুন' অর্থ সেদিন হবে লাভ-লোকসানের দিন। এখানকার 'আত্তাগাবুন' কথাটি বাবে তাফাউ'লের ক্রিয়ামূল। এর শাব্দিক অর্থ— একে অপরের ক্ষতিসাধন করা। অর্থাৎ সেদিন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি বেহেশতের ওই স্থান অধিকার করবে, যা নির্ধারিত ছিলো 'দুর্ভাগা দোজখীর' যদি সে ইমান আনতো। আবার সেদিন অত্যাচারিতকেও দেওয়া হবে অত্যাচারীর ওই পরিমাণ

www.eelm.weebly.com

পুণ্য, যতোটুকু সে তার অধিকার ক্ষুণ্ন করেছিলো। 'তাগাবুন' শব্দটির রূপকার্থ 'তুজ্জার' (ব্যবসায়ী)। অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা যেমন লাভ-লোকসানের ভাগীদার হয়, তেমনি সেদিন ভাগ্যবান ও হতভাগ্যেরাও হবে লাভবান, অথবা ক্ষতিগ্রস্ত। আর 'আত্তাগাবুন' এর 'আলিফ লাম' হচ্ছে 'আহদী' (সীমিতার্থক)। অর্থাৎ ওই লাভ লোকসান হবে চিরস্থায়ী লাভ-লোকসান, পৃথিবীর লাভ-লোকসানের মতো সাময়িক লাভ-লোকসান নয়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল হাকেম কর্তৃক 'বিশুদ্ধ' আখ্যায়িত এক বিবরণে এসেছে, বিশ্বাসী ব্যক্তি বেহেশতে তার নিজের জন্য সংরক্ষিত জায়গার মালিক তো হবেই, তদুপরি মালিক হবে ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর জন্য সংরক্ষিত জায়গার, যে ইমান আনলে ওই জায়গার মালিক হতো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে সাঈদ ইবনে মনসুর, ইবনে মাজা, ইবনে জারির, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আখেরাতে রয়েছে দু'টি গৃহ, একটি বেহেশতে, অন্যটি দোজখে। যে বেহেশতে যাবে সে মালিক হবে দোজখীর গৃহেরও। 'উলায়িকা হুমুল ওয়ারিছুন' (তারাই হবে উত্তরাধীকারী) আয়াতের অর্থ এরকমই।

হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, কবরিত ব্যক্তিকে দু'জন ফেরেশতা এসে জিজ্ঞেস করে, মোহাম্মদ মোস্তফা সম্পর্কে তুমি কী জানো? সে যদি বিশ্বাসী হয়, তবে বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসুল। তখন তাকে বলা হবে, দোজখে গেলে তুমি যে জায়গায় থাকতে, সেই জায়গাটি দেখে নাও। আল্লাহ্ ওই জায়গার বদলে তোমাকে বেহেশতে জায়গা ঠিক করে দিয়েছেন। হজরত আনাস থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো উত্তরাধিকারীকে তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে, আল্লাহ্ তাকে বঞ্চিত করবেন বেহেশতের উত্তরাধিকার থেকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা কি জানো, দরিদ্র কে? সাহাবীগণ বললেন, ওই ব্যক্তি, যার কোনো সহায়-সম্পদ নেই। তিনি স. বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত দরিদ্র সে-ই, যে মহাবিচারের দিবসে নামাজ-রোজা-জাকাত ইত্যাদি পুণ্য কর্ম নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে পৃথিবীতে হয়তো কাউকে গালি দিয়েছে, কারো উপরে চাপিয়েছে ব্যভিচারের অপবাদ, আত্মসাৎ করেছে কারো সম্পদ, অথবা হত্যা করেছে কোনো লোককে। সুতরাং ওই সকল লোককে দিয়ে দেওয়া হবে তার পুণ্যসমূহ। এতেও যদি তাদের অধিকার পরিশোধ না হয় তবে তাদের পাপসমূহ চাপানো হবে তার স্কন্ধে। শেষে তাকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, কারো উপরে যদি তার মুসলমান ভ্রাতার কোনো হক থাকে, তবে সে যেনো দুনিয়াতেই তার হক পরিশোধ করে দেয়। কেননা আখেরাতে দীনার দিরহাম থাকবে না। তখন হকদারের হক পরিশোধ করতে হবে পুণ্য দিয়ে। এতেও যদি না কুলায়, তবে গ্রহণ করতে হবে তাদের পাপ। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, সেদিন কোনো মুদ্রা যেমন থাকবে না, তেমনি থাকবে না পুঞ্জীভূত সম্পদও। তাই তখন অত্যাচারীর পুণ্যসমূহ দিয়ে দেয়া হবে অত্যাচারিতকে, তদুপরি অত্যাচারীর উপরে চাপানো হবে অত্যাচারিতের পাপ।

এরপর বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহাসাফল্য'। এখানে 'জালিকাল ফাওযুল আ'জীম' অর্থ এটাই মহাসাফল্য। অর্থাৎ বিশ্বাস, সৎকর্মসমূহ এবং এর প্রতিফলস্বরূপ প্রাপ্ত আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও জান্নাতপ্রাপ্তিই হচ্ছে মানুষের জন্য মহাসফলতা। কেননা তা অক্ষয়, চিরন্তন।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'কিন্তু যারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কতো মন্দ সে প্রত্যাবর্তনস্থল'। এখানে 'ওয়া বি'সাল মাসীর' অর্থ কতো মন্দ সে প্রত্যাবর্তনস্থল। উল্লেখ্য, এখানকার ৯ ও ১০ সংখ্যক আয়াতদ্বয়েই

বিবৃত হয়েছে মহাবিচার দিবসের মহাসমাবেশের বিবরণ। স্পষ্ট করে এ দু'টো আয়াতে এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, ইমানদার-নেককার এবং কাফের বদকারদের পরিণতি হবে ভিন্ন ভিন্ন। একদল গমন করবে বেহেশতে এবং অন্য দল দোজখে। আর তাদের ওই বসবাস হবে চিরস্থায়ী।

সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩

❑ আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং যে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে তিনি তাহার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

❑ তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর; যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

❑ আল্লাহ্ , তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; সুতরাং মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুক।

'মা আসাবা মিম্ মুসীবাতিন ইল্লা বিইজ্‌নিল্লাহ' অর্থ আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো বিপদই আপতিত হয় না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ানুসারে এবং তকদীরের নির্ধারণানুযায়ীই আপতিত হয় সকল প্রকার বিপদ-আপদ। 'ওয়ামাঁই ইউমিনু বিল্লাহি' অর্থ এবং যে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ এমতো প্রত্যয় রাখে যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া কোনো বিপদ মুসিবত আসতেই পারে না, আর এরকম বিপদ প্রতিহত করার সাধ্যও কারো নেই। তেমনি যে বিপদ আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়সম্মত নয়, তা আনয়ন করবার ক্ষমতাও কেউ রাখে না। আর 'ইয়াহ্‌দি ক্বলবাহু' অর্থ তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ এরকম বিশ্বাসীর অন্তরে আল্লাহ্ দান করেন প্রশান্তি, ফলে সে তাঁর সিদ্ধান্তে থাকতে পারে তুষ্ট এবং অবলম্বন করতে পারে ধৈর্য।

ইবনে দায়লামী বর্ণনা করেছেন, আমি একবার হজরত উবাই ইবনে কা'বের মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে রসুল সহচর! আমার হৃদয় তকদীর সম্পর্কে কিছুটা সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এখন আপনি অনুগ্রহ করে এমন কোনো হাদিস বর্ণনা করুন, যাতে করে আমার এ সংশয়াচ্ছান্নতা কেটে যায়। তিনি বললেন, আল্লাহ্ সকল আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীকে ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে

পারেন। এরকম করলেও তিনি অত্যাচারী বলে পরিগণিত হবেন না। আর তিনি সকলকে অনুগ্রহ করে মার্জনাও করে দিতে পারেন। এরকম করলে সৃষ্টির পুণ্যকর্ম অপেক্ষা তাঁর অনুগ্রহই হবে অধিক অগ্রগামী। শোনো, তকদীরে বিশ্বাস যার নেই, তার উহুদ পর্বত পরিমাণ দানও আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না। জেনে রেখো, যা পাওয়ার, তা তুমি পাবেই, আর যা পাওয়ার নয়, তা তুমি কখনোই পাবে না। একথা না মেনে যদি তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হও, তবে তুমি হবে দোজখী। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি গেলাম হজরত ইবনে মাসউদের নিকট। তাঁর কাছেও আমার সমস্যার কথা জানালাম। তিনিও আমাকে একই কথা বললেন। এর পর হাজির হলাম হজরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামন এবং সর্বশেষে হজরত জায়েদ ইবনে সাবেতের কাছে। তাঁরাও আমাকে একই বাণী শুনিয়ে দিলেন। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

'ওয়াল্লহু বিকুল্লি শাইইন আ'লীম' অর্থ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। অর্থাৎ সৃষ্টির সকল কিছুই তিনি জানেন, প্রকাশ্য-গোপন, ভালো-মন্দ— সব।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো এবং রসুলের আনুগত্য করো; যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে রসুলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা'। এখানে 'ফা ইন তাওয়াল্লাইতুম' অর্থ যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। এখানকার 'ফাইন' এর 'ফা' (যদি) অব্যয়টি কারণপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের আনুগত্য করার কথা বলার কারণে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। আর 'ফা ইন্‌নামা আ'লা রসূলিনাল বালাগুল মুবীন' অর্থ তবে আমার রসুলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা। অর্থাৎ সত্যধর্ম প্রচারের যে দায়িত্ব আমার রসুলের উপরে ছিলো, সে দায়িত্ব যখন তিনি যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন, তখন তোমরা তা ফিরিয়ে দিলেও তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না, বরং এতে করে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তোমরাই।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; সুতরাং মুমিনগণ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুক'। এখানকার 'আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই' এই বাক্যটিই ইমান ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বানের কারণ। অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর আনুগত্যে সমর্পিত হও। কেননা তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত উপাস্য আর কেউ নয়। আর এখানকার 'ওয়া আ'লাল্লহি' (আল্লাহ্‌র উপর) কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'ফাল ইয়াতাওয়াক্কালিল মু'মিনূন' এর সঙ্গে।

www.eelm.weebly.com

এভাবে এখানে 'আ'লাল্লহি' কথাটিকে আগে এনে বক্তব্যটিকে করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যেহেতু ভাল-মন্দ সকলকিছুই আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীর অনুসারে হয়ে থাকে, সেহেতু বিশ্বাসীগণের উচিত কেবল তাঁরই প্রতি নির্ভরশীল হওয়া।

তিরমিজি ও হাকেম লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কায় বসবাসকারী কিছুসংখ্যক লোক মুসলমান হলো এবং মদীনায় হিজরত করতে

মনস্থ করলো। কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজন তাদেরকে হিজরতের অনুমতি দিলো না। বাগবী লিখেছেন, তাদের পরিবার পরিজনেরা বললো, তোমাদের মুসলমান হওয়াকে তো আমরা মেনেই নিয়েছি। কিন্তু তোমরা দেশত্যাগী হবে, একথা আমরা মেনে নিতে পারছি না। তাদের এমতো আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে ওই মুসলমানেরা হিজরতের ইচ্ছা পরিত্যাগ করলো। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

❑ 'হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের শত্রু; অতএব তাহাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকিও। তোমরা যদি উহাদিগকে মার্জনা কর, উহাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা কর এবং উহাদিগকে ক্ষমা কর, তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❑ তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ; আর আল্লাহ্, তাঁহারই নিকট রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

❑ তোমরা আল্লাহ্কে যথাসাধ্য ভয় কর, এবং শোন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য; যাহারা অন্তরের কার্পণ্য হইতে মুক্ত, তাহারাই সফলকাম।

❑ যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান কর তিনি তোমাদের জন্য উহা বহু গুণ বৃদ্ধি করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল।

❑ তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসবানগণ! তোমাদের মধ্যে যাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি হিজরতের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং অন্যান্য অপরিহার্য ধর্মীয় বিধান পালনের অন্তরায় হয়ে যায়, নিঃসন্দেহে তারা তোমাদের শত্রু

বিশেষ। সুতরাং তোমরা তাদের সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন কোরো। সতত মুক্ত থাকতে চেষ্টা কোরো অতিরিক্ত স্নেহমমতার অপপ্রভাব থেকে। তবে তাদের প্রতি তোমরা নিষ্ঠুর আচরণ কোরো না। অবুঝ মনে করে তাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ো। মনে রেখো, আল্লাহ্ তোমাদেরও অনেক দোষত্রুটি মার্জনা করে দেন। কেননা তিনি মার্জনাপরবশ ও পরম দয়ালূ।

তিরমিজি ও হাকেম লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই সকল নবমুসলিম যখন মদীনায় পৌঁছলো তখন দেখলো, তাদের পূর্বের হিজরতকারীগণ অনেক ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছে, তখন তারা তাদের পরিবারবর্গের উপরে রাগান্বিত হলো। পণ করলো, আমরা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবো। কেননা তাদের কারণেই আমাদের এই পশ্চাৎপদতা। তখন অবতীর্ণ

হলো— 'তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা করো, তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করো এবং তাদেরকে ক্ষমা করো, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, আতা ইবনে ইয়াজিদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এছাড়া এই সুরার অন্য সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। আর একথা নিঃসন্দিগ্ধ যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী সম্পর্কে। তাঁর পরিবার পরিজনের সদস্যসংখ্যা ছিলো অনেক। যখনই তিনি কোনো জেহাদে অংশগ্রহণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করতেন, তখনই তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি শুরু করে দিতো। বলতো, আপনি আমাদেরকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন? তাদের এরকম কান্নাকাটি ও বিলাপ শুনে তিনি মায়ায় পড়ে যেতেন এবং ত্যাগ করতে বাধ্য হতেন জেহাদে অংশগ্রহণের অভিপ্রায়। তাঁর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত এবং এই সুরার অবশিষ্ট আয়াতসমূহ।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ; আর আল্লাহ্, তাঁরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার'। একথার অর্থ— হে বিশ্বাসবানগণ! দেখো, তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেনো তোমাদেরকে আল্লাহ্র ইবাদতের অধিকার এবং বান্দার যথাঅধিকার পরিপূরণের ক্ষেত্রে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। কেননা তা তোমাদের জন্য পরীক্ষা বিশেষ। তোমরা যদি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারো, তবেই তোমরা হতে পারবে আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন এবং আল্লাহ্র নৈকট্যভাজনদের জন্যই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মহাপুরস্কার— আল্লাহ্র দর্শন, সন্তোষ ও জান্নাত। আলোচ্য আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইমামগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, নবী-রসুলগণ সর্বোচ্চ মর্যাদাধারী ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্র ওলী ও সালেহ (প্রিয়ভাজন ও সৎকর্মপরায়ণ)গণ শ্রেষ্ঠ সাধারণ মর্যাদার ফেরেশতাদের চেয়ে। কেননা ফেরেশতাদের মধ্যে নিখুঁত আনুগত্য আছে বটে, কিন্তু আনুগত্যের পথে কোনো অন্তরায় তাদের নেই। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে কথিত পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতে পারে না, তারা হয়ে যায় আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তোষবিচ্যুত। তখনই সৃষ্টির মধ্যে তারাই হয়ে যায় সর্বনিকৃষ্ট।

উপযোগ ঃ সকল পরিবার পরিজন শত্রু বিশেষ নয়। তাই পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 'ইন্না মিন আয্ওয়াজিকুম ওয়া আওলাদিকুম' (তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু)। এখানকার 'মিন' সীমিতার্থক। কিন্তু তারা শত্রু কিনা, তা যাচাই করাও নিতান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ তারা সাধারণভাবে আল্লাহ্র পথের এক ধরনের অন্তরায়ই বটে। তাই এই আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে 'তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ'। হজরত বুরাইদা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর প্রিয়তম দৌহিত্রদ্বয় হাসান ও হোসাইন গুটি গুটি পায়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। তিনি স. খুতবা বন্ধ করে এগিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, আল্লাহ্ সত্যই বলেছেন 'তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ'।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন সাহাবীগণ ভীত হলেন। তাঁদের কাছে এর উপর আমল করা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হলো। তাঁরা রাত জেগে জেগে দীর্ঘক্ষণ ধরে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। ফলে তাঁদের পা ফুলে যেতো এবং অধিক সেজদা করার কারণে ললাটদেশে দেখা দিতে শুরু করলো আঘাতের চিহ্ন। তখন পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে তাদের গুরুভার হালকা করে দেওয়া হয়। বলা হয়—

'তোমরা আল্লাহ্কে যথাসাধ্য ভয় করো, এবং শোনো, আনুগত্য করো এবং ব্যয় করো নিজেদেরই কল্যাণের জন্য; যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম' (১৬)। এখানে 'ফাত্তাকু' (ভয় করো) কথাটির 'ফা' অব্যয়টি হেতু জ্ঞাপক। কেননা ইমান হচ্ছে তাক্বওয়া' বা ভয়ের হেতু। অর্থাৎ তোমরা 'তাক্বওয়া' রক্ষা হেতু যথাসাধ্য চেষ্টা করো। 'ওয়াস্মাঊ' অর্থ শোনো, উপদেশসমূহ শ্রবণ করো। 'ওয়া আত্বীঊ' অর্থ আনুগত্য করো। 'ওয়া আনফিক্ব' অর্থ এবং ব্যয় করো, খরচ করো কেবল আল্লাহ্র পরিতোষ কামনায়। 'খইরাল্লি আনফুসিকুম' অর্থ তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য। অর্থাৎ ওই সকল পুণ্যকর্ম সম্পাদনে ব্রতী হও, যা সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা উত্তম, যাতে সাধিত হয় নিজেদেরই কল্যাণ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল আসন্ন হলে, সে যদি পরিত্যাগ করে যায় কোনো সম্পদ, তাহলে অসিয়ত করার বিধান দেয়া হলো তোমাদেরকে।' আর 'ওয়া মাঁইয়্যুক্বা শুহ্হা নাফসিহী ফা উলায়িকা হুমুল মুফ্লিহূন' অর্থ যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। উল্লেখ্য, অন্তরের কার্পণ্য যে কী, সে সম্পর্কে সবিশদ আলোচনা করা হয়েছে সুরা হাশরের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান করো, তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল (১৭)। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' (১৮)।

www.eelm.weebly.com

এখানে ‘তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান করো’ অর্থ তোমরা আল্লাহ্‌র তুষ্টি ও পূর্ণ প্রাপ্তির আশায় ঋণ দান করো আর্থিকভাবে পর্যুদস্ত মানুষকে। ‘উত্তম ঋণ’ অর্থ ওই ঋণ যা দেওয়া হয় হৃষ্টচিত্তে কেবল আল্লাহ্‌র তুষ্টি কামনায়, নাম ডাকের আশায় নয়, কিংবা নয় ঋণগ্রহিতার কাছ থেকে কোনো উপকারপ্রাপ্তির আশায়, যা পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহিতাকে দেওয়া হয় তার সুবিধামতো সময় এবং যার জন্য তাকে কখনো খোঁটা দেওয়া বা অন্য কোনোভাবে কষ্ট দেওয়া হয় না। ‘তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন’ অর্থ আল্লাহ্ তোমার ওই উত্তম ঋণের বিনিময় দান করবেন দশগুণ, অথবা তদপেক্ষা অধিক, যতো অধিক তাঁর অভিপ্রায়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘যারা আল্লাহ্‌র পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত হলো— যেমন একটি শস্যবীজ উৎপন্ন করে সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে থাকে একশতটি বীজ। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা দ্বিগুণ করে দেন। আর আল্লাহ্ সুপ্রসারিত, সর্বজ্ঞাতা’। ‘এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন’ অর্থ— আর ওই উত্তম ঋণের কারণে তিনি মার্জনা করে দিবেন তোমাদের পাপসমূহকে। ‘আল্লাহ্ গুণগ্রাহী’ অর্থ তিনি তোমাদের দানসমূহের প্রতি যথামর্যাদাপ্রদানকারী, অল্প দানের অত্যধিক বিনিময়দানকারী। ধৈর্যশীল’ অর্থ আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তি দানের ব্যাপারে ত্বরা করেন না। বরং তোমরা তোমাদের পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো কিনা, সেজন্য প্রদান করেন দীর্ঘ অবকাশ। ‘তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা’ অর্থ তিনি সর্বজ্ঞ। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানগোচর। অর্থাৎ সকলের ও সকলকিছুর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত। ‘আল আ’যীয’ অর্থ অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পরাক্রমশালী। আর ‘আল হাকীম’ অর্থ অতুলনীয়রূপে প্রজ্ঞাময়।

সূরা ত্বলাক

এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মদীনায়। এরমধ্যে রয়েছে ২টি রুকু এবং ১২টি আয়াত।

হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াজিদ, অর্থাৎ আবু রুকানা তার স্ত্রী উম্মে রুকানাকে তালাক দিয়ে বিবাহ করলেন মুজাইনা গোত্রের এক রমণীকে। ওই রমণী রসুল স. এর জ্যোতির্ময় সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! সে তো আমার চুল পরিমাণ কাজেও লাগে না। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নোক্ত আয়াত। জাহাবী বলেছেন, সূত্রটি অত্যন্ত শিথিল। ঘটনাটিও অসত্য। তদুপরি আবু রুকানাও তখন মুসলমান হননি। কাতাদা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. তাঁর পত্নী হজরত সাফিয়্যাকে তালাক দিলেন। তিনি চলে গেলেন তাঁর পিতৃ গৃহে। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত। একজন গিয়ে হজরত সাফিয়্যাকে জানালেন, রসুল স. তাঁর প্রদত্ত তালাক প্রত্যাহার করেছেন।

হজরত সাফিয়্যা ছিলেন অতিশয় পুণ্যবতী। তিনি সারা রাত নামাজ পড়তেন এবং সারা বৎসর রোজা পালন করতেন। তাঁর এমতো পুণ্যময়তার কারণেই রসুল স. ফিরিয়ে নিয়েছিলেন তাঁকে। এ সম্পর্কে অপরিণত সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন কাতাদা থেকে ইবনে জারীর এবং ইবনে সিরীন থেকে ইবনে মুনজিরও। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস এবং হজরত তোফায়েল ইবনে আমর ইবনে সাঈদ ইবনে আস সম্পর্কে। আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞাত।

সূরা ত্বলাক ঃ আয়াত ১

❑ হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর উহাদিগকে তালাক দিও 'ইদ্দাতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং তোমরা 'ইদ্দাতের হিসাব রাখিও এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করিও। তোমরা উহাদিগকে উহাদের বাসগৃহ হইতে বহিষ্কার করিও না এবং উহারাও যেন বাহির না হয়, যদি না উহারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়। এইগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা; যে আল্লাহ্‌র সীমা লংঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ্ ইহার পর কোন উপায় করিয়া দিবেন।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ইয়া আইয়্যুহান্নাবিয়্যু'। এর অর্থ— হে নবী! মর্মার্থ— হে আমার নবী! আপনি আপনার উম্মতকে বলুন। নবীই তাঁর উম্মতের মুখপাত্র। তাই এখানে তাঁকে সম্বোধন করেই তাঁর উম্মতকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে আলোচ্য নির্দেশনাটি নবী ও তাঁর উম্মত সকলের জন্যই প্রযোজ্য। অর্থাৎ শরিয়তের এই বিধানটি সকলের জন্য এক। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে যেহেতু নবীর সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে, সেহেতু সম্বোধ্যজন তো তিনিই হবেন। সুতরাং বুঝতে হবে বিশেষভাবে তাঁকে সম্বোধন করা হলেও বিধানটি এখানে সার্বজনীন। অর্থাৎ নবী ও তাঁর উম্মত সকলেই আলোচ্য

বিধানের অন্তর্ভূত। কিংবা বলা যায়, সম্বোধনটি এখানে রূপকার্থক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রত্যাদেশবাহী! আপনি আপনার উম্মতকে এই মর্মে নির্দেশনা দিন।

'ইজা ত্বল্লাক্বতুমুন্ নিসাআ' অর্থ তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দাও। অর্থাৎ তালাক দিতে ইচ্ছা করো। উল্লেখ্য, ক্রিয়ার অভিপ্রায়কে সাধারণত ক্রিয়া হিসেবেই প্রকাশ করা হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমরা যখন নামাজে দাঁড়াও'। অর্থাৎ যখন তোমরা নামাজে দাঁড়াতে ইচ্ছা করো। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'যখন তোমরা কোরআন পাঠ করো, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র শরণ যাচনা কোরো', এখানেও 'কোরআন পাঠ করো' অর্থ কোরআন পাঠ করতে চাও।

'ফাত্বল্লিকু হুন্না লি ই'দ্দাতিহিন্না' অর্থ তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে। হানাফী মতাবলম্বীগণের মতে এখানকার 'লি ইদ্দাতিহিন্না' অর্থ 'ফী ইদ্দাতিহিন্না'। অর্থাৎ তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের সময়ে। বাগবী এমতের সমর্থনে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে ওমর ঋতুগ্রস্তা অবস্থায় তালাক দেওয়াকে হারাম মনে করতেন। হজরত ইবনে ওমর তাঁর এক স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিলেন। হজরত ওমর একথা রসুল স.কে জানালে তিনি স. রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, তাকে বলো, সে যেনো তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং রেখে দেয় ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া পর্যন্ত। এমনকি পবিত্র হওয়া পর্যন্ত। এরপর আবার যখন সে ঋতুবতী হবে এবং ঋতু শেষে পুনরায় পবিত্র হবে, তখন ইচ্ছে করলে ওই পবিত্রতার সময় তাকে তালাক দিবে, যে পবিত্রতার সময়ে তার সঙ্গে সহবাস করা হয়নি, এটাই হচ্ছে ওই ইদ্দত, যার কথা আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন। বোখারী, মুসলিম। বাগবী আরো লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত ইবনে ওমরের এই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই। এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, 'ছালাছাতা কুরুইন' এর 'কুরু' অর্থ তুহুর' (পবিত্রতা) ঋতুকাল (হায়েজ) নয়। তাই ইদ্দত গণনা করতে হবে পবিত্রতা থেকে, ঋতুকাল থেকে নয়।

হানাফীগণ বলেন, আরববাসীগণ 'লাম' হরফকে 'ফী' অর্থে ব্যবহার করেন না। সুতরাং এখানকার 'লি ই'দ্দাতিহিন্না' কথাটিকে 'ফী ই'দ্দাতিহিন্না' অর্থে গ্রহণ করা সিদ্ধ নয়। কাজেই ঋতুকাল থেকে ইদ্দত গণনা না করে পবিত্র অবস্থা থেকে তা গণনা করতে হবে— কথাটি ভুল। তাছাড়া এখানকার 'লাম'কে 'ফী' অর্থে ব্যবহার করলে তালাকের চেয়ে ইদ্দতকে অগ্রগামী করা হয়, কমপক্ষে উভয়টির সময় হয়ে যায় এক। আয়াতের বক্তব্য একথাই দাবি করে। সুতরাং 'লাম' এখানে সময়জ্ঞাপক নয়, বরং পরিণতিসূচক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমরা যদি তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তাহলে তার পরিণতিতে ইদ্দত পালন করা অনিবার্য হবে। অর্থাৎ তোমরা তালাকের পর থেকে রাখতে শুরু কোরো ইদ্দতের হিসাব। এরকম অর্থায়নের দৃষ্টান্ত রয়েছে এই প্রবচনটিতে 'লিদুলিল মাউতি ওয়াবনু লিল খরাবি' (জন্মের অনিবার্য পরিণাম মৃত্যু)। যেমন নির্মিত

প্রাসাদের অনিবার্য পরিণতি ধ্বংস। এই প্রবচনটিতেও 'লাম' ব্যবহৃত হয়েছে আকিবৎ বা পরিণতিজ্ঞাপক হিসেবে। অথবা এখানকার 'লি ই'দ্দাতি' কথাটির 'লাম' অব্যয়টি সম্পর্কযুক্ত একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে এমনভাবে তালাক দাও, যাতে তারা তালাককে স্বাগতম জানাতে পারে (শুরু করতে পারে ইদ্দত)। দিন, তারিখ নির্ধারণের ব্যাপারে আরববাসীগণ কথাবার্তা বলেন এভাবে 'আমি বের হয়েছিলাম রমজানের তিন দিন বাকী থাকতে'। অর্থাৎ ওই তিন দিনের আগেই আমি বের হয়ে পড়েছিলাম।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. আমাদেরকে এই আয়াত পাঠ করে শুনিয়েছেন। হজরত ইবনে ওমর ও হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'লি ই'দ্দাতিহিন্না' অর্থ 'ফী কুবলি ইদ্দাতিহিন্না'। এতে করে এটাই

www.eelm.weebly.com

প্রতীয়মান হয় যে, ইদ্দত গণনা করা উচিত ঋতুকাল থেকে, ঋতুমুক্ত বা পবিত্র অবস্থা থেকে নয়। আর 'কুরু' অর্থ হায়েজ (ঋতু) এবং 'তুহুর' (পবিত্রতা) দু'টোই হয়। হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। এ সম্পর্কে সবিশদ আলোচনা করা হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে।

মাসআলা ঃ যে তুহুরে সহবাস করা হয়েছে, সে তুহুরে তালাক দেওয়া হারাম। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। রসুল স. বলেছেন, (যদি ইচ্ছা করো তবে) যে তুহুরে সহবাস করা হয়নি, ওই তুহুরে তালাক দিয়ো। এ প্রসঙ্গের আরো কয়েকটি মাসআলা সম্পর্কে আলেমগণের ঐকমত্য রয়েছে। যেমন— ১. যে স্ত্রীর সঙ্গে এখনো সহবাস করা হয়নি, তাকে ঋতুগ্রস্তা অবস্থায় তালাক দেওয়া যায়। ২. বালিকাবধু, যে এখনো ঋতুবতী হয়নি, তাকে সহবাসের পূর্বে অথবা পরে তালাক দেওয়া সিদ্ধ। ৩. বার্ধক্যজনিত কারণে ঋতুরুদ্ধা, যার আর কখনো ঋতুবতী হবার সম্ভাবনাই নেই, তাকেও সহবাসের পূর্বে বা পরে তালাক দেওয়া জায়েয।

ইদ্দতের সময়সীমা যাতে দীর্ঘ না হয়, সে কারণেই যে তুহুরে সহবাস করা হয়েছে, সে তুহুরে তালাক দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এরকম সম্ভাবনা যে ক্ষেত্রে নেই, সে ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞাটিও নেই। তাই যার সঙ্গে সহবাসই করা হয়নি, তার ইদ্দতের প্রয়োজনও নেই। কিন্তু ২ এবং ৩ ক্রমিকে বর্ণিত অবস্থায় (সাবধানতার পরিপ্রেক্ষিতে) ইদ্দত অবশ্যই পালন করতে হবে। তবে সে ইদ্দতসম্পন্ন করতে হবে মাস গণনার মাধ্যমে। আর মাস গণনার ক্ষেত্রে ইদ্দত প্রলম্বিত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

'ওয়া আহ্‌সূল ই'দ্দাতি' অর্থ ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখো। অর্থাৎ ইদ্দতের হিসাবও তোমরা স্মরণে রেখো, যেনো এমন না হয় যে, ইদ্দতের পর তালাক প্রত্যাহার করো, অথবা ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে বসে।

'ওয়াত্তাকুল্লহা রব্বাকুম' অর্থ এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় কোরো। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়ে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করা থেকে বিরত থেকো। 'লা তুখরিজু হুন্‌না মিন বুয়ূতিহিন্‌না' অর্থ তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার কোরো না। অর্থাৎ 'বাইন' অথবা রেজয়ী যে

ধরনের তালাকই তোমরা তাদেরকে দাওনা কেনো, ইদ্দতকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বাসগৃহ থেকে বের করে দিয়ো না। আর এখানে 'বাসগৃহ' অর্থ ওই ঘর, যে ঘরে স্ত্রী বসবাস করতো তালাকের আগে। 'ওয়ালা ইয়াখ্‌রুজ্‌না' অর্থ এবং তারাও যেনো বের না হয়। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দত পালনকালে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া দিনে অথবা রাতে ঘরের বাইরে যেতে পারবে না। ইবাদতের প্রয়োজনের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। তাছাড়া প্রয়োজন দেখা দিতে পারে আরো অনেক রকমের। যেমন ঘর ভেঙে পড়ার আশংকা, মালপত্র চুরি হওয়ার সম্ভাবনা, ঘর ভাড়া দেওয়ার অক্ষমতা, ঘর এতো সংকীর্ণ হওয়া, যাতে পুরুষ ও রমণী পৃথকভাবে বসবাস করতে পারে না। তাছাড়া স্বামীর নিষ্ঠুরতা, পর্দার শিথিলতা ইত্যাদিও প্রয়োজনের অন্তর্ভূত হতে পারে। তাই এমতো অবস্থাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে তালাকপ্রাপ্তা নারী তার ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে, অথবা অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে গিয়ে বসবাস করতে পারবে। ইমাম আহমদ বলেছেন, 'বাইন' তালাক প্রাপ্তা রমণী দিনের বেলায় প্রয়োজনবোধে বাড়ির বাইরে যেতে পারবে। ইমাম শাফেয়ী থেকে এ সম্পর্কে জায়েয ও নাজায়েয দু'রকমই বিবরণ পাওয়া যায়। বাগবী লিখেছেন, সুতা বা তুলা, অথবা এ জাতীয় কোনোকিছু ক্রয় করার জন্য তালাকপ্রাপ্তা নারী দিনের বেলায় বাড়ির বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু রাতের বেলায় তাদের বাড়ির বাইরে বের হওয়া নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের বিপরীতে এককভাবে বর্ণনাকৃত হাদিসকে দলিলরূপে গ্রহণ করা যায় না। তবে হ্যাঁ, অনিবার্য কোনো কারণ দেখা দিলে তারা যে বাড়ির বাইরে যেতে পারবে, সে বিষয়ে সকল ইমামই একমত।

মাসআলা ঃ সফর অবস্থায় যদি কোনো রমণীকে তালাক দেওয়া হয় এবং এমতাবস্থায় যদি ইদ্দত পালন করা অপরিহার্য হয়, আবার সেখানে অবস্থান করার যদি কোনো সুযোগও না থাকে, আর যে স্থান থেকে সফর শুরু করেছিলো, সেখান থেকে উক্ত স্থানের দূরত্ব যদি সফরের দূরত্বের চেয়ে কম দূরত্বে হয়, তাহলে ওই রমণী গৃহে ফিরে এসে ইদ্দত পালন করবে। আর যদি গন্তব্যস্থল ও তালাকপ্রাপ্তির স্থান সমদূরত্বে হয়, তবে সে স্বস্থলে যেমন ফিরে আসতে পারবে, তেমনি ইচ্ছা করলে সফর অব্যাহতও রাখতে পারবে, সঙ্গে তার কোনো অভিভাবক না থাকলেও। তবে এমতাবস্থায় তার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনই উত্তম। এতে করে সে তার স্বামীর গৃহের দেখাশুনাও করতে পারে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সে যাবে সেদিকে, যেদিক দূরত্বে কম। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, তালাকপ্রাপ্তির স্থানে অবস্থান করা সম্ভব হলে তাকে সেখানেই অবস্থান করে ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে। সাহেবাইন বলেছেন, সঙ্গে যদি তার কোনো অভিভাবক থাকে, তবে সে তার ইচ্ছা মতো গন্তব্য স্থলে গমন করা, অথবা বাসস্থানে ফিরে আসা, যে কোনো একটি করতে পারে।

মাসআলা ঃ যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, সে তার স্বামীর ঘর থেকে দিনের বেলা বাইরে যেতে পারবে, রাতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সে দিনে-রাতে যে কোনো সময়ে প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যেতে পারবে। মাসআলাটির সবিস্তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সুরা বাকারার যথাস্থানে।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, উহুদ যুদ্ধে কিছুসংখ্যক সাহাবী শহীদ হলেন। তাঁদের বিধবা পত্নীরা রসুল স.এর জ্যোতির্ময় সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! একাকীত্ব আমাদের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছে। রসুল স. তখন তাঁদেরকে এই মর্মে অনুমতি প্রদান করলেন যে, তোমরা দিনের বেলা এক জায়গায় জড়ো হয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বোলো। রাতে শয্যাগ্রহণকালে ফিরে যেয়ো আপন আপন ঘরে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জনৈকা বিধবাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত নিজ গৃহেই পালন কোরো; স্থানান্তরে গমন কোরো না।

'ইল্‌লা আঁই ইয়া'তীনা বিফাহিশাতিম মুবাইয়্যিনাহ্‌' অর্থ যদি না তারা লিপ্ত হয় প্রকাশ্য অশ্লীলতায়। অর্থাৎ যদি ইদ্দত পালনরতা কোনো রমণী অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে তাদেরকে তোমরা তোমাদের বাসগৃহ থেকে বের করে দিতে পারবে। ইবনে ওমর, সুদ্দী ও ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, অশ্লীলতায় লিপ্ত ইদ্দত পালনকারিণীকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া জায়েয। ইমাম আবু হানিফাও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, এধরনের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। যেমন আরববাসীগণ বলেন 'তুমি ব্যভিচার করতে পারো না, যদি না তুমি অশ্লীল হও' 'তুমি আমাকে গালি দিতে পারো না, যদি না তুমি হও রক্তসম্পর্ক ছিন্নকারী'। এমতাবস্থায় এখানকার সম্বন্ধ পদটি শুরু হবে দ্বিতীয় ক্রিয়া 'ইয়াখরুজ্না' (তারা যেনো বের না হয়) থেকে, উহ্য কোনো ক্রিয়া থেকে নয়। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'ফাহেশা' (অশ্লীলতা) অর্থ ব্যভিচার। ব্যভিচারিণীকে একশ' বেত্রাঘাত, অথবা সঙ্গেসার করার জন্য ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে। বেত্রাঘাত যদি করা হয়, তবে বেত্রাঘাতের পর আবার তাকে ঘরে ফিরিয়ে দিতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ এই বিধানটি সমর্থন করেছেন। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, অভিধানানুসারে এটাই সর্বাধিক সমীচীন। 'ইল্‌লা' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে শেষপ্রান্ত বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ এর অর্থ এখানে হবে 'ইলা' (দিকে)। আর কোনোকিছু অপর কোনো কিছুর সাহায্য ব্যতীত নিজে নিজে প্রান্তসীমা হতে পারে না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'লিপ্ত হয় অশ্লীলতায়' অর্থ ইদ্দত পালনকারিণী তার স্বামীর পরিবারের লোকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়। এরকম করলে তাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া যাবে। কাতাদা বলেছেন, স্ত্রী যদি তার স্বামীর অবাধ্য হয়, তবে তাকে তালাক দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া যাবে। শেষোক্ত দুই অবস্থাতেই কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে 'বহিষ্কার কোরো না' ক্রিয়াটির সঙ্গে।

'ওয়া তিলকা হুদূদুল্লহ' অর্থ এইগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত শরিয়তের এই সীমাসমূহ তোমরা লংঘন কোরো না। যদি করো, তবে তোমরা হবে শাস্তির উপযুক্ত। 'ওয়া মাইঁ ইয়াতায়াদ্দা হুদূদাল্লহি ফাক্বদ জলামা নাফসাহু' অর্থ যে আল্লাহ্‌র সীমা লংঘন করে, সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা যারা অতিক্রম করে, তারা অবশ্যই হয় শাস্তির উপযুক্ত। আর 'লা তাদরী লাআ'লাল্লহা ইউহ্‌দিছু বা'দা জালিকা আম্‌রা'

অর্থ তুমি জানো না, হয়তো আল্লাহ্ এর পর কোনো উপায় করে দিবেন। এই বাক্যটি এখানকার 'ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে' এবং 'বহিষ্কার কোরো না' কথা দু'টোর কারণ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ স্ত্রীর প্রতি বীতস্পৃহ স্বামীর অন্তরে তো পুনঃঅনুরাগও সৃষ্টি করে দিতে পারেন, এ সম্পর্কে তো সে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারে না, তাই পুনঃঅনুরাগই যদি প্রবল হয়, তবে স্বামী তাকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে অনুশোচনাও তো করতে পারে, এমতাবস্থায় ইদ্দত পালনকালেই সে একটা সুন্দর সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, তালাক প্রত্যাহার করে আবার তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে স্ত্রীরূপে।

সূরা ত্বলাক ঃ আয়াত ২, ৩

❑ উহাদের 'ইদ্দাত পূরণের কাল আসন্ন হইলে তোমরা হয় যথাবিধি উহাদিগকে রাখিয়া দিবে, না হয় উহাদিগকে যথাবিধি পরিত্যাগ করিবে এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে; আর তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সঠিক

www.eelm.weebly.com

সাক্ষ্য দিবে। ইহা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। যে কেহ আল্লাহ্কে ভয় করে আল্লাহ্ তাহার পথ করিয়া দিবেন,

❑ এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত উৎস হইতে দান করিবেন রিয্ক। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে তাহার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিবেনই; আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করিয়াছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।

'ফাইজা বালাগনা আজ্বালাহুন্না' অর্থ তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে। অর্থাৎ রেজয়ী তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ইদ্দত পালনের মেয়াদ শেষ হয়ে এলে। এখানে 'বালাগনা' এবং 'আজ্বালাহুন্না' এর মধ্যে যে সর্বনাম রয়েছে, তার দ্বারা বুঝানো হয়েছে রেজয়ী তালাকপ্রাপ্তাদেরকে। এখানকার বক্তব্যটি পূর্বের আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা। সাধারণভাবে পূর্বের আয়াতে তালাকপ্রাপ্তাগণের

বিবরণ দানের পর এই আয়াতে বিশেষভাবে বিধান দেওয়া হয়েছে রেজয়ী তালাকপ্রাপ্তাদের। এভাবে সাধারণ বিষয়ের অধীনে বিশেষ বিষয়ের বিবরণ দান বিধিসম্মত। অন্যান্য আয়াতেও এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন 'আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী নিজেকে প্রতীক্ষায় রাখবে তিন রজঃস্রাব।' এখানেও 'মুতাকাল্লাত' শব্দটি সাধারণ, কিন্তু এর বিধান বিশিষ্ট।

'ফা আমসিকু হুন্না বি মা'রূফিন আও ফাররিকু হুন্না বি মা'রুফিন' অর্থ তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে, না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে। অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হবার পূর্বেই তোমাদেরকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি তাকে রাখতে চাও, তবে সুন্দরভাবে রাখো, আর যদি রাখতে না চাও, তবে বিদায় করে দিয়ো সৌজন্যের সঙ্গে। কোনো অবস্থায় রূঢ় কিছু করো না। আর উদ্দেশ্যকেও করে নিয়ো শুদ্ধ। অর্থাৎ তার জন্য ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক কিছু হয়, এমন কাজ কোরো না। যেমন এই নিয়তে গ্রহণ কোরো না যে, আবার তাকে 'রেজয়ী' তালাক দিবে এবং আবারও ফিরিয়ে নিবে। এভাবে পুনঃপুনঃ গ্রহণ ও বর্জন করে তাকে কষ্টই দিতে থাকবে।

'ওয়া আশহিদূ জাওয়াই আ'দলিম্ মিনকুম' অর্থ এবং তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। উল্লেখ্য, সাক্ষী রাখার বিধানটি মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সাক্ষী রাখার দরকার নাই। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমতও এরকম। কিন্তু অপর বর্ণনানুসারে তাঁর মতে সাক্ষী রাখা ওয়াজিব এবং ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও সাক্ষী রাখা অপরিহার্য। ইমাম শাফেয়ীরও দু'রকম অভিমত পাওয়া যায়। আর তাঁর নির্ভরযোগ্য মতটি ইমাম আবু হানিফার মতের অনুরূপ।

আমি বলি, তালাক দিতে গেলে সাক্ষী রাখা ওয়াজিব নয়। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। সুতরাং ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও সাক্ষী রাখা ওয়াজিব নয়। বরং উভয় ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখার বিধানটি মোস্তাহাব পর্যায়ের, যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখার বিধান রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে 'আর সাক্ষী রাখো যখন তোমরা পরস্পরে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করবে।' এই বিধানটিও মোস্তাহাব। আর তালাক দানের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা ওয়াজিব না হলে ফিরিয়ে নেওয়ার সাক্ষী রাখা ওয়াজিব তো হতেই পারে না। যদি হয়, তাহলে তো প্রকৃত ও অপ্রকৃত বিষয় একাকার হয়ে যাবে, যা অসম্ভব।

'ওয়া আক্বীমুশ শাহাদাতা লিল্লাহ' অর্থ আর তোমরা আল্লাহ্র জন্য সঠিক সাক্ষী দিবে। অর্থাৎ তালাকের ব্যাপারে যদি তোমাদেরকে সাক্ষী দানের জন্য ডাকা হয়, তবে কেবল আল্লাহ্র ওয়াস্তে বস্তুনিষ্ঠ সাক্ষ্যপ্রদান কোরো। ব্যক্তিগত বিবেচনায় কারো দিকে ঝুঁকে পোড়ো না।

'জালিকুম ইউয়া'জু বিহী মান কানা ইউ'মিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি' অর্থ এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ উপদেশ তাদের জন্যই, যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্ ও আখেরাতকে। আল্লাহ্র বিধান মেনে উপকৃত হতে পারে তারাই।

কালাবী ও আবু সালেহের মাধ্যমে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার মান্যবর আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী রসুল স. এর জ্যোতির্ময় সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! শত্রুরা আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। ওর মা হয়ে পড়েছে শোক বিহবলা। তিনি স. বললেন, তুমি ও তোমার স্ত্রী বেশী বেশী করে 'লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্' পাঠ করতে থাকো। তাঁরা দু'জনে তাই করতে শুরু করলেন। ওদিকে শত্রুরা তাঁদের ছেলের ব্যাপারে

উদাসীন হয়ে গেলো। সেই সুযোগে ছেলেটি একপাল ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে উপস্থিত হলো নিজের বাড়িতে। তখন অবতীর্ণ হলো 'যে কেউ আল্লাহ্কে ভয় করে আল্লাহ্ তার পথ করে দিবেন..........'। বাগবী লিখেছেন, ওই পালে ছাগল ছিলো চার হাজার।

বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত আউফ ইবনে মালেক একবার রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহী! আমার পুত্রকে দুশমনেরা ধরে নিয়ে গিয়েছে। আর আমি তো অভাবগ্রস্ত। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে আত্মরক্ষা করো, সহিষ্ণু হও এবং বেশী করে পড়তে থাকো 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্'। তিনি তাই করলেন। কিছুকাল পরে তাঁর পুত্র বাড়িতে এলো দুশমনদের কিছুসংখ্যক উট হাঁকিয়ে নিয়ে। দুশমনেরা তার ব্যাপারে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলো। সালেম ইবনে আবীল জা'দ এবং সুদ্দী সূত্রে ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত জাবের থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, 'যে কেউ আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পথ করে দিবেন' এই আয়াত নাজিল হয় আশজাআ গোত্রের এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। তিনি ছিলেন অভাবী ও অধিক সন্তান-সন্ততিধারী। খতিব তাঁর 'তারিখ' গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন জুহাকের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। ছা'লাবী বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছে শিথিল সূত্রে এবং ইবনে আবী হাতেম ভিন্ন একটি অপরিণত সূত্রপরম্পরায়। জাহাবী হজরত জাবের থেকে বর্ণিত বিবরণটিকে সাব্যস্ত করেছেন 'পরিত্যাজ্য' বলে। কিন্তু বহুসংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় হাদিসটিকে প্রামান্য বলেই মেনে নেওয়া হয়েছে। তাই জাহাবীর মন্তব্য এ ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি।

পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিজিক'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ ও পরকালে যে ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয়ী, আল্লাহ্ই তাকে বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় বের করে দেন এবং এমন উৎস থেকে জীবনোপকরণ দান করেন, যা সে কখনো কল্পনাও করতে পারে না, যেমন ঘটেছিলো হজরত আউফ ইবনে মালেকের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্ তাঁর বিপদ তো দূর করে দিয়েছিলেনই, তদুপরি দিয়েছিলেন এমন উৎসজাত জীবনোপকরণ, যা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

উপযোগ ঃ বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, হজরত আউফ ইবনে মালেকের পুত্র যখন শত্রুদের কিছুসংখ্যক উট ও মালপত্র নিয়ে হাজির হলো, তখন তিনি রসুল স. এর জ্যোতির্ময় সকাশে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে

আল্লাহ্র রসুল! এগুলো কি আমার জন্য হালাল? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, হালাল। তখন অবতীর্ণ হলো 'এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিজিক'।

উপযোগ ঃ দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য এবং বিপদাপদ দূর করার জন্য হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহ. অধিকসংখ্যক 'লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' পাঠ করতে পছন্দ করতেন। এর পরিমাণ তিনি নির্ধারণ করেছেন এভাবে— 'লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ পাঁচশত বার এবং এর পূর্বে ও পরে এক শত বার করে দরূদ শরীফ। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কোনো বিশেষ নেয়ামতকে কেউ যদি স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে চায়, তবে সে যেনো অধিক সংখ্যায় পাঠ করে 'লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্'। হজরত উবাদা ইবনে আমের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু মাওলা থেকে বোখারী এবং মুসলিমও বর্ণনা করেছেন, 'লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' বেহেশতের গুপ্ত ধনভাণ্ডারের অন্যতম। নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, 'লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' নিরানব্বইটি রোগের নিরাময়, তার মধ্যে ন্যূনতম রোগ হচ্ছে দুঃশ্চিন্তা।

মাসআলা ঃ কোনো মুসলমান বন্দী অবস্থায় কাফের রাজ্যে ঢুকে পড়ার পর সেখান থেকে যদি অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করে স্বদেশে নিয়ে আসে, তবে ওই অর্থ সম্পদ তার জন্য হবে হালাল। এমতো অর্থ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ (খুমুস) প্রদান করা তার উপরে ওয়াজিব নয়। কিন্তু কাফের রাজ্যের কোনো লোক যদি ব্যবসা অথবা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে অনুমতিপত্র নিয়ে মুসলমান রাজ্যে প্রবেশ করে, তবে তার অর্থ সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। এমতো কর্ম হারাম। কেননা তা প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা। এ জাতীয় অর্থ সম্পদের খুমুস প্রদানও ওয়াজিব নয়, কেননা তা হালালই নয়। আর কেউ যদি বলপূর্বক কাফের রাজ্যে ঢুকে সেখান থেকে অর্থ-সম্পদ লুঠ করে আনে, তবে তা হবে গণিমতের মাল। তার খুমুস পরিশোধ করাও ওয়াজিব।

ইকরামা, জুহাক ও শা'বী সূত্রে বাগবী আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে এবং রসুলের আদর্শানুসারে স্ত্রীকে তালাক দেয়, আল্লাহ্ তার জন্য তালাক প্রত্যাহারের কোনো উপায় বের করে দেন, দূর করে দেন বিরাগ, তদস্থলে সৃষ্টি করে দেন অনুরাগ, ফলে সে তালাক প্রত্যাহার করে নেয় সুখের আকর্ষণে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এখানে 'পথ করে দিবেন' অর্থ বের করে দিবেন এমন এক উপায়, যা অবলম্বন করা অন্যের জন্য কঠিন। আবুল আলিয়া বলেছেন, এর অর্থ— কঠিন আবদ্ধতা থেকে বের হয়ে আসার রাস্তা। হাসান অর্থ করেছেন— নিষিদ্ধ কর্মাবলী থেকে মুক্তির উপায়। আমি বলি, আলোচ্য বাক্যের ভাবার্থ হজরত আউফ ইবনে মালিকের ঘটনার অনুকূলে। কিন্তু এর বিধানটি সাধারণ। আর এই বাক্যটি পূর্ববর্তী আয়াতের শেষ বাক্যটির ধারাবাহিকতা। এমতাবস্থায় এর মর্মার্থ দাঁড়াবে— যে

www.eelm.weebly.com

ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, অযথা স্ত্রীকে শাসায় না, অন্যবিধ অত্যাচারও করে না, সে যদি অবাধ্যতা, উগ্র স্বভাব অথবা অন্য কোনো সঙ্গত কারণে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, আর সে তালাক তার ঋতুগ্রস্তা অবস্থায় না হয়ে হয় 'তুহুর' অবস্থায় এবং ইদ্দতকালকে প্রলম্বিত করে স্ত্রীকে দুর্ভোগ প্রদান যদি তার উদ্দেশ্য না হয়, ইদ্দত পালনকালে তাকে ঘর থেকে বের করে না দেয়, আল্লাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত সীমানাও যদি সে লংঘন না করে, তবে আল্লাহ্ তাকে পাপ থেকে মুক্ত থাকার ব্যবস্থা করে দিবেন, মন্দ সহধর্মিণীর বদলে দান করবেন এমন কল্যাণময়ী ও পুণ্যবতী সহধর্মিণী, যার কথা সে ধারণাও করতে পারে না। পক্ষান্তরে যে স্ত্রী আল্লাহ্‌কে ভয় করে, স্বামীর অধিকার ক্ষুণ্ন করে না, তার প্রতি রূঢ় আচরণ করে না, অকারণে তালাক চায় না, দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে এবং নির্ভর করে সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র উপরে, আল্লাহ্‌ই তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন। তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে সরবরাহ করেন জীবনোপকরণ। মন্দ স্বামীর বদলে দান করেন পুণ্যবান ও ন্যায়পরায়ণ স্বামী।

আলোচ্য বিধানখানিকে উপরে সাধারণভাবে সকল মুত্তাক্বীগণই মান্য করে থাকেন। এটাকেই তাঁরা দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতিসমূহ থেকে আত্মরক্ষার উপায় বলে জানেন। রসুল স. একবার বললেন, আমি এমন একটি আয়াত জানি, যা মানুষের কল্যাণের জন্য যথেষ্ট। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'যে কেউ আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিজিক'। আহমদ, ইবনে মাজা, দারেমী, ইবনে হাব্বান। হাকেমের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— তিনি স. এই আয়াত বারংবার পাঠ করতে লাগলেন।

'ওয়া মাইঁ ইয়াতাওয়াক্‌কাল আ'লাল্লহি ফাহুয়া হাসবুহু' অর্থ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে, তার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র উপরে যেভাবে নির্ভর করা উচিত, সেভাবে যদি তোমরা নির্ভর করতে পারো, তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এমনভাবে রিজিকের ব্যবস্থা করবেন, যেভাবে তিনি রিজিক দেন পাখিদেরকে। তারা সকালে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিয়ে তাদের নীড় থেকে উড়াল দেয়, আবার সন্ধ্যায় নীড়ে ফিরে আসে পানাহারে পরিতৃপ্ত হয়ে। তিরমিজি, ইবনে মাজা। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তারা ওই সকল লোক, যারা তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস করে না, শরীরে উল্কি আঁকে না, বরং সকল অবস্থায় নির্ভর করে কেবল আল্লাহ্‌র উপর। বোখারী, মুসলিম।

'ইন্নাল্লহা বালিগু আমরিহী' অর্থ আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় অপ্রতিরোধ্য, অবশ্য বাস্তবায়নব্য। মাসরুক বলেছেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অবশ্যই পরিপূরিত হয়, কেউ তাতে ভরসা রাখুক, অথবা না রাখুক। তবে যে তাঁর উপরে ভরসা রাখে, তিনি তাকে মার্জনা করেন এবং দান করেন উত্তম প্রতিফল।

আর 'ক্বদ জ্বাআলাল্লহু লি কুল্লি শাইইন ক্বদরান' অর্থ আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর জন্য নির্ধারণ করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। অর্থাৎ সকল কিছুই হয়ে থাকে তকদীর অনুসারে। ওই তকদীর অনুসারেই নির্ধারিত হলো তালাকের সময় 'তুহুর' এবং ইদ্দতের সময় তিন ঋতু বা চার মাস দশ দিন। অথবা 'সমস্ত কিছু' অর্থ এখানে কঠোর-কোমল, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি। এগুলোর জন্যও আল্লাহ্ চূড়ান্ত মাত্রা নির্ধারণ করেছেন। ওই চূড়ান্ত মাত্রায় গিয়ে সেগুলোর মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। আর আল্লাহ্‌র এমতো বিধানের কোনো রদবদল নেই। সুতরাং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভীতসন্ত্রস্ত হলে, অথবা অধৈর্য হলেও কোনো লাভ নেই। সুখ-দুঃখের অথবা কর্কশতা-কোমলতার নির্ধারিত মাত্রা পরিপূরিত হবেই। এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে আলোচ্য বাক্যটি হবে 'তাওয়াক্কুল' অত্যাবশ্যক হওয়ার প্রমাণ। আর তা হবে মাসরুকের ব্যাখ্যার অনুকূলেও।

যথাসূত্রে হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে ইবনে জারীর, ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, সুরা বাকারায় যখন মেয়েদের ইদ্দত পালনের নিয়ম জানিয়ে দেওয়া হলো, তখন সাহাবীগণ বলাবলি করতে লাগলেন, অপ্রাপ্তবয়স্কা ও বৃদ্ধাদের বিধান তো জানা গেলো না। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা ত্বলাক ঃ আয়াত ৪, ৫

www.eelm.weebly.com

❑ তোমাদের যে সকল স্ত্রী আর ঋতুবতী হইবার আশা নাই তাহাদের 'ইদ্দাত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করিলে তাহাদের 'ইদ্দাতকাল হইবে তিন মাস এবং যাহারা এখনও রজঃস্বলা হয় নাই তাহাদেরও; আর গর্ভবতী নারীদের 'ইদ্দাতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে আল্লাহ্ তাহার সমস্যা সমাধান সহজ করিয়া দিবেন।

❑ ইহা আল্লাহ্‌র বিধান যাহা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে তিনি তাহার পাপ মোচন করিবেন এবং তাহাকে দিবেন মহাপুরস্কার।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমাদের যে সকল স্ত্রীর আর ঋতুবতী হবার আশা নেই'। একথার অর্থ— বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার কারণে তোমাদের যে সকল স্ত্রীর ঋতুস্রাব স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মেয়েদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ষাট বৎসর বয়সে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো রজঃস্বলা হয়নি, তাদেরও; আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত'। একথার অর্থ— সাধারণভাবে সকল তালাকপ্রাপ্তাদের ইদ্দতের সময়সীমা তো ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছেই, এখন যদি দ্যাখো তোমাদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা বৃদ্ধা হওয়ার কারণে ঋতুস্রাব রহিতা, অথবা ঋতুস্রাবমুক্তা অপ্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার কারণে, তবে তাদের জন্য ইদ্দতের সময়সীমা নির্ধারণ করা হলো তিন মাস। উল্লেখ্য, তিন ঋতু হয়ে থাকে সাধারণত তিন মাসেই, যেমন প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার বয়স ধরা হয় সাধারণত পনেরো অথবা সতের বৎসর। এর মধ্যে কোনো মেয়ে ঋতুগ্রস্তা না হলেও তাকে ধরে নিতে হয় প্রাপ্তবয়স্কা। যেমন সম্পদের জাকাত ফরজ হয় এক বৎসর পূর্ণ হলে। এর মধ্যে সম্পদ সাধারণত কিছু না কিছু বর্ধিত হয়েই থাকে। অথবা ঋতুস্রাব হওয়া থেকে নিরাশ হওয়ার বয়স ধরা হয় পঞ্চান্ন বা ষাট বৎসর, তেমনি বৃদ্ধা ও অপ্রাপ্তবয়স্কাদের ইদ্দতের সময়সীমা এখানে নির্ধারণ করা হয়েছে তিন মাস। শরিয়তে এরকম সময় বেঁধে দেওয়ার দৃষ্টান্ত আরো রয়েছে।

মুকাতিল তাঁর তাফসীরগ্রন্থে লিখেছেন, হজরত খাল্লাদ ইবনে আমর ইবনে জমুহ ঋতুবিবর্জিতা রমণীদের ইদ্দত সম্পর্কে রসুল স.কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তাঁর ওই জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। এভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একথা জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তাদের ইদ্দতের সময়সীমা হচ্ছে তিন মাস। এখানকার 'তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে প্রথম আয়াতের 'তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে' কথাটির সঙ্গে। আর এখানকার 'আল ই'দ্দাতি' (ইদ্দত) এর আলিফ লাম জাতিবাচক। অর্থাৎ বৃদ্ধা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কাদের ইদ্দতের সময়সীমাও তিন ঋতুর পরিমাণ, অর্থাৎ তিন মাস।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিধান প্রযোজ্য হবে কেবল স্বাধীনা স্ত্রীদের বেলায়। আর বিধানটি হচ্ছে সাধারণ। অর্থাৎ 'বাইন' ও 'রেজয়ী' উভয় প্রকৃতির তালাক প্রাপ্তাদের ইদ্দতের বিধান একই। আর মুসলমান পুরুষের মুসলমান স্ত্রী, কিতাবী স্ত্রী উভয়ের বিধানও এক। আর পূর্ণ ক্রীতদাসী, অথবা মুকাতাবা, কিংবা মুদারাবা ক্রীতদাসী যদি হয় বৃদ্ধা, অথবা অপ্রাপ্তবয়স্কা, বয়স বেশী হওয়ার কারণে যাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কিংবা প্রাপ্তবয়স্কা না হওয়ার কারণে এখানে যারা রজঃস্বলা হয়নি, তাদের ইদ্দত আলেমগণের ঐকমত্যক্রমে দেড়মাস। আমি সুরা বাকারার যথাস্থানে লিখেছি যে, ক্রীতদাসীর জন্য পূর্ণ তালাক দেড় তালাক (তিন তালাকের অর্ধেক) হওয়াই রীতিসম্মত। কিন্তু তালাক ও ঋতু যেহেতু

বিভাজন যোগ্য নয়, তাই ক্রীতদাসীর পূর্ণ তালাক হবে দুই তালাক এবং তার পূর্ণ ইদ্দত হবে দুই ঋতু। কিন্তু যারা ঋতুবিবর্জিতা, তাদের তালাক ও ইদ্দত গণনা করতে হবে দিন গণনার মাধ্যমে। আর এই দিন গণনা ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে হবে স্বাধীনাগণের অর্ধেক, অর্থাৎ দেড় মাস।

www.eelm.weebly.com

আবদুল্লাহ্ ইবনে উত্‌বা—সালমান ইবনে ইয়াসার—মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান—সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা— এই সূত্রে ইমাম শাফেয়ী বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, একজন ক্রীতদাস এক সঙ্গে দু'জন নারীকে বিবাহ করতে পারবে (স্বাধীন পুরুষদের মতো এক সঙ্গে চারজন নারীকে বিবাহ করতে পারবে না)। আর সে দুই তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে। আর ক্রীতদাসী ইদ্দত পালন করবে দুই ঋতু পর্যন্ত। আর ঋতুবিবর্জিতা হলে দুই মাস, অথবা দেড় মাস।

মাসআলা ঃ যুবতী নারী, যাদের নিয়মিত ঋতুস্রাব হওয়ার কথা, কোনো কারণে যদি তাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে অধিকাংশ আলেমগণের মতে তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে পুনরায় ঋতুস্রাব না হওয়া পর্যন্ত। এভাবে তার ইদ্দত পালিত হওয়ার জন্য তিন ঋতু অতিবাহিত হওয়া অপরিহার্য। আর যদি সে ঋতুগ্রস্তা হওয়া থেকে একেবারে নিরাশ হয়ে যায়, তবে তিন মাস অতিক্রান্ত হলে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত এবং হজরত ইবনে মাসউদ এরকমই বলেন। আতা বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। হজরত ওমর বলেছেন, এরকম রমণীকে অপেক্ষা করতে হবে নয় মাস। এর পরেও যদি সে ঋতুগ্রস্তা না হয়, তবে তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে আরো তিন মাস। ইমাম মালেকও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। হাসান বসরী বলেছেন, তাকে অপেক্ষা করতে হবে ছয় মাস। তারপর পালন করতে হবে তিন মাসের ইদ্দত।

মাসআলা ঃ দু'বার ঋতুগ্রস্তা হওয়ার পর বয়স বাড়ার কারণে কোনো নারীর যদি তৃতীয় ঋতু আর না আসে, তবে তাকে নতুন করে পালন করতে হবে তিন মাসের ইদ্দত। কিন্তু ঋতু হওয়া সম্পর্কে নিরাশ কোনো নারী যদি মাস গণনার মাধ্যমে তার ইদ্দত পালন শুরু করে, আর তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পর, অথবা ইদ্দত পালনকালে আবার তার রজস্রাব শুরু হয়, তবে তার অতীতের ইদ্দত আর ধর্তব্য হবে না। এমতাবস্থায় সে বিবাহবদ্ধা হলেও তার বিবাহ পণ্ড হয়ে যাবে। আর এ বিধানটি তার উপরে প্রযোজ্য হবে তখন, যখন তার আগের নিয়ম মতো বের হবে লাল অথবা কালো বর্ণের রক্ত। যদি তা না হয়ে বের হয় হলুদ, সবুজ, কিংবা মেটে রঙের স্রাব, তবে তা ঋতুস্রাব বলে গণ্য হবে না। কিন্তু ঋতু বন্ধ হওয়ার পূর্বে যদি তার এরকম রঙের স্রাব নির্গত হওয়ার নিয়ম থেকে থাকে, তবে তা গণ্য হবে ঋতুস্রাব হিসেবেই।

তালাক যদি মাসের শুরুতে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে ইদ্দতের হিসাব করতে হবে চন্দ্রমাস অনুসারে। আর মাসের মাঝামাঝি তালাক দেওয়া হলে ইদ্দত পালন করতে হবে দিন গণনার মাধ্যমে।

এভাবে নব্বই দিন পূর্ণ হলে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। এর কমে ইদ্দত পূর্ণ হবে না। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, এমতাবস্থায় প্রথম মাস পূর্ণ করতে হবে দিন গণনার মাধ্যমে এবং পরের দুই মাস পূর্ণ করতে হবে চন্দ্র মাস হিসেবে (সে মাস ঊনতিরিশ দিনের অথবা তিরিশ দিনের যাই হোক না কেনো)।

মাসআলা ঃ ইদ্দতের এসকল হিসাব প্রযোজ্য হবে কেবল তালাকপ্রাপ্তাদের উপর। বিধবাদের উপরে এ সকল হিসাব প্রযোজ্য হবে না। বিধবা যদি গর্ভবতী না হয়, তবে তার ইদ্দত হবে চারমাস দশদিন, সে অপ্রাপ্তবয়স্কা, যুবতী, বৃদ্ধা, যে-ই হোক না কেনো। একথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সলফে সালেহীনের ঐকমত্য। আর এমতো ঐকমত্যের ভিত্তি হচ্ছে ওই হাদিস, যা হজরত উবাই ইবনে কা'ব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে অবতরণের পরিপ্রেক্ষিতরূপে।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণ যখন বলাবলি করলেন, অপ্রাপ্তবয়স্কা, যারা ঋতুবতী নয় এবং বিধবাদের সম্পর্কে তো কিছু বলা হলো না, তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। সাহাবীগণ ঠিকই বলেছিলেন। সেকারণেই আলোচ্য আয়াতে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে 'তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে'। এখন কথা হচ্ছে 'আর তোমাদের মধ্যে যারা পরলোক গমন করো' এই আয়াত নিয়ে। এই আয়াত সাধারণার্থক। সকল প্রকার রমণীই এর অন্তর্ভূতা। কাজেই এর মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। অস্পষ্টতা তো ওই বিধানে থাকে, যা পাওয়া যায় সন্দিগ্ধ প্রমাণের মাধ্যমে। কিন্তু এই আয়াতটি অকাট্য।

একটি সন্দেহ ঃ এখানে আলোচিত তিনটি আয়াতের বক্তব্য একই রকম। অথচ বলা হলো, আলোচ্য আয়াত প্রযোজ্য কেবল তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের বেলায়। আবার এ দলিলটি এরকমও দাবি করে যে 'ওয়া উলাতুল আহ্‌মাল' এই আয়াতও বিশেষভাবে নির্ধারিত হোক কেবল তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের বেলায়। কিন্তু এরকম কথা তো আর কেউ বলেননি।

সন্দেহভঞ্জন ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ যে তালাকপ্রাপ্তাগণের জন্যই বিশিষ্ট, তা সাব্যস্ত হয়েছে আলেমগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে। কেবল একক বর্ণিত হাদিস কোনো অকাট্য বিধানকে বিশিষ্ট করতে পারে না। আর আমরা সেকথা বলিও না। বরং ঐকমত্য তো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথার উপরে যে 'আর গর্ভবতী নারীদের' আয়াতখানি সাধারণার্থক, গর্ভবতী, বিধবা সকলেই এর অন্তর্ভূতা।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং ইবনে আলিয়া বলেন, বিধবা যদি গর্ভবতী হয়, তবে তার ইদ্দত পূর্ণ হবে তার সন্তান প্রসবের পর। আবার এর পরে চার মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়াও অপরিহার্য। তাঁরা সাবধানতা বজায়ার্থে দুই আয়াতের উপরেই আমল করেছেন। তবে এক্ষেত্রে জমহুরের অভিমত হচ্ছে, কেবল প্রসবের পরেই ইদ্দত শেষ হয়ে যায়। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে হজরত ওমর এবং হজরত ইবনে ওমর থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন গর্ভবতীদের ইদ্দত প্রসঙ্গে কেউই এমন বলেননি যে, এ ধরনের রমণীর গর্ভমুক্ত হওয়া অপরিহার্য নয়।

www.eelm.weebly.com

ইমাম মালেক তাঁর 'মুয়াত্তা'য় সুলায়মান ইবনে ইয়াসার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফের সঙ্গে ওই মহিলার ইদ্দতের ব্যাপারে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিলো, যার সন্তান প্রসব হয়েছিলো তার স্বামীর মৃত্যুর অল্পকাল পরে। হজরত আবু সালমা তখন বললেন, মহিলাটি যখন গর্ভমুক্ত হলো, তখন তার ইদ্দতও শেষ হয়ে গেলো। আর হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, দু'টি মেয়াদের মধ্যে যে মেয়াদটি দীর্ঘ, সেই মেয়াদটি পালন করলেই কেবল ওই মহিলা ইদ্দতের দায়িত্বমুক্ত হতে পারবে। অর্থাৎ গর্ভমুক্তি যদি ঘটে চার মাস দশ দিন পরে, তবে তার সাধ্য নেই সে অবসান ঘটাবে তার ইদ্দতের। আর চারমাস দশ দিনের আগেই যদি তার গর্ভমুক্তি ঘটে, তবে তাকে অপেক্ষা করতে হবে আরো চার মাস দশ দিন। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আমার অভিমত আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আবু সালমার সঙ্গে।

একবার লোকেরা হজরত ইবনে আব্বাসের মুক্তকৃত ক্রীতদাস কুরাইবকে এই বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য প্রেরণ করলো উম্মতজননী হজরত উম্মে সালমার কাছে। কুরাইব ফিরে এসে বললেন, জননী বলেছেন, স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পর সাবিয়ার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলো। সে রসুল স.কে যখন একথা জানালো, তখন তিনি স. বললেন, তুমি এখন ইদ্দতমুক্ত। এবার তুমি যাকে ইচ্ছা করো, তার সঙ্গে বিবাহবদ্ধা হতে পারো। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, ওমর ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আরকাম বলেছেন, আমি একবার হজরত সাবীয়া আসলামীয়া বিনতে হারেছের কাছে গিয়ে তাঁর ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, আমি ছিলাম সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী। তিনি ছিলেন ইবনে লুওয়াই গোত্রের লোক (বদর যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন তিনি এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন বিদায় হজের সময়)। ছিলাম সন্তান সম্ভবা। সা'দের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। আমি নেফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর সাজগোজ করতে শুরু করলাম, যাতে বিবাহের প্রস্তাব আসে। আবদুদ্দার গোত্রের আবুস্সানাবিল আমাকে বললো, তুমি এখনই সাজ সজ্জা করতে শুরু করলে কেনো? তুমি কি পরিণয়প্রত্যাশিনী? কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ! চার মাস দশ দিন গত না হওয়া পর্যন্ত তো তুমি তা করতে পারো না। আমি সন্ধ্যাবেলায় হাজির হলাম রসুল স. এর জ্যোতির্ময় সাহচর্যে। তিনি স. সব শুনে বললেন, সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই তুমি ইদ্দতমুক্ত হয়েছো। এখন তুমি যাকে মন চায় তাকে বিয়ে করতে পারো।

এখন এ বিষয়টি সাব্যস্ত হলো যে, 'আর অন্তঃসত্ত্বা নারীদের' এই আয়াতের বিধান বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা উভয়কে সম্পৃক্ত করেছে। কেননা হজরত উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর কাছে নিবেদন করলাম 'অন্তঃসত্ত্বা নারীদের' এই আয়াত কি বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা উভয়কে একত্র করেছে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, এই আয়াতের বিধান উভয়ের জন্য। তবে এই বর্ণনাসূত্রসংযুক্ত মুসান্না ইবনে সাবাহ পরিত্যক্ত। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এই আয়াতের বিধান কেবল ওই বিধবার উপরে প্রযোজ্য, যার ইদ্দত নির্ধারিত হয়েছে চার মাস দশ

দিন। তাঁর মতে পরবর্তী বিধান দ্বারা পূর্ববর্তী বিধানকে সুনির্দিষ্টকরণ সিদ্ধ। বায়যাবী লিখেছেন, এই আয়াতের বিধানকে সাধারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখা 'ওয়াল্ লাজীনা ইয়াতাওয়াফ্ফুনা মিনকুম ওয়া ইয়াজীরুনা আযওয়াজ্বা' আয়াতকে সাধারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখা অপেক্ষা উত্তম। কেননা 'গর্ভবতী নারীদের' এর বিধান কোনো কারণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। হজরত সাবীয়ার হাদিস একথাটিকেই প্রমাণ করে। ইমাম আবু হানিফা তাই বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিধান সুরা বাকারায় উল্লেখিত এসম্পর্কিত বিধানটিকে রহিত করেছে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও এরকম বর্ণিত হয়েছে।

বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমরা কি কঠিন বিধানের উপরেই আমল করতে চাও? সহজ বিধান চাও না। ছোট সুরা তো অবতীর্ণ হয়েছে বড় সুরার পরে (সুরা ত্বলাক অবতীর্ণ হয়েছে সুরা নিসার পরে)। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, হ্রস্ব সুরাটি নাজিল হয়েছে দীর্ঘ সুরাটির পরে। এ ব্যাপারে কেউ যদি আমার সঙ্গে বিতর্ক করতে চায়, তবে আমি বিতর্ক করতেও প্রস্তুত। আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, কেউ চাইলে আমি তার সাথে অভিসম্পাতের শপথের প্রতিদ্বন্দ্বিতা (লানতের লেয়ান) করতে প্রস্তুত, সুরা নিসার চার মাস দশ দিনের ইদ্দতের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়েছে সুরা ত্বলাকের তিন ঋতু, বা তিন মাসের ইদ্দতের বিধান (পরের বিধানটি আগের বিধানকে রহিত করেছে)।

মাসআলা ঃ গর্ভবতী স্বাধীনা ও ক্রীতদাসীদের ইদ্দতের বিধান এক। কেননা তিন মাসের অর্ধেক করা যায়, কিন্তু সন্তান প্রসবের সময়কে তো ভাগ করা যায় না।

মাসআলা ঃ জমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ইদ্দত সমাপ্ত হবে শেষ জন ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর। কেননা পূর্ণগর্ভমুক্তিকেই ধরা হয়েছে ইদ্দত শেষ হওয়ার চিহ্ন।

'ওয়া মাইঁ ইয়াত্তাক্বিল্লাহা ইয়াজ্‌আল্ লাহু মিন আমরিহী ইউস্‌রা' অর্থ আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে, আল্লাহ্ তার সমস্যা সমাধান সহজ করে দেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে, আল্লাহ্ তার ইহকাল ও পরকালের সকল বিপদাপদ দূর করে দেন। সামর্থ্য দেন পুণ্যকর্ম সম্পাদনের।

পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্‌র বিধান, যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দিবেন মহাপুরস্কার'। একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! মনে রেখো

এই বিধান আল্লাহ্ই প্রবর্তন করেছেন। সুতরাং তোমরা এ বিধান মান্য যদি করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলো, তবে আল্লাহ্ তোমাদের পাপসমূহ মুছে দিবেন। কেননা পূণ্যের মাধ্যমে পাপ মুছে ফেলাই তাঁর রীতি। আর তিনি এর জন্য তোমাদের পুরস্কৃতও করবেন। প্রতিদান দিবেন দশগুণ, অথবা অনেক অনেক গুণ।

সূরা ত্বলাক ঃ আয়াত ৬, ৭

❑ তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেইরূপ গৃহে বাস কর তাহাদিগকেও সেইরূপ গৃহে বাস করিতে দিবে; তাহাদিগকে উত্ত্যক্ত করিবে না সঙ্কটে ফেলিবার জন্য; তাহারা গর্ভবতী হইয়া থাকিলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহাদের জন্য ব্যয় করিবে। যদি তাহারা তোমাদের সন্তানদিগকে স্তন্য দান করে তবে তাহাদিগকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিবে। তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও তাহা হইলে অন্য নারী তাহার পক্ষে স্তন্য দান করিবে।

❑ বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করিবে এবং যাহার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ্ যাহাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তাহার উপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেইরূপ গৃহে বাস করো, তাদেরকেও সেইরূপ গৃহে বাস করতে দিবে'। এখানে 'তাদেরকে' অর্থ তালাক প্রাপ্তা নারীদেরকে। তারা বাইন তালাকপ্রাপ্তা হোক অথবা 'রেজয়ী' তালাকপ্রাপ্তা। স্বাধীন হোক অথবা ক্রীতদাসী, অপ্রাপ্তবয়স্কা হোক অথবা বৃদ্ধা। তাদের সকলের জন্য একই বিধান। অর্থাৎ তাদের ইদ্দত পালনের জন্য তাদেরকে এমন ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, যেমন ঘরে বসবাস করে তালাকদাতারা।

'মিনম হাইছু সাকানতুম' কথাটির 'মিন' এখানে অতিরিক্ত। তাই বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমরা যেরূপ গৃহে বসবাস করো। অথবা এখানকার 'মিন'টি আংশিকার্থক। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমরা যে গৃহে বসবাস

করো, তার কিছু অংশের মধ্যে। অর্থাৎ ব্যাখ্যাতাগণের মতে 'মিন' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ফী' অর্থে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'মিন ক্বব্‌লু আনযালাত তওরাত' (তাওরাত অবতীর্ণের পূর্বে)। আর 'মিঁউ উজ্‌দিকুম' অর্থ এখানে— তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে উত্যক্ত করবে না সংকটে ফেলবার জন্য'। এখানে 'সংকট' হতে পারে কয়েক ধরনের। যেমন ঘরটি বসবাসের একেবারেই অনুপযোগী, অথবা সেখানে হতে থাকে অনেক লোকের আনাগোনা, কিংবা সেখানে এমন কোনো জিনিসপত্র থাকে, যাতে করে সেখানে তিষ্ঠানো হয়ে যায় অসম্ভব ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তোমরা তাদের জন্য ব্যয় করবে'। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, রেজয়ী তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দত পালনকালে তার স্বামীর কাছ থেকে খরচপাতি তো পাবেই, তদুপরি পাবে বসবাসের জন্য একটি নিরুপদ্রব ঘর। ঘর যদি স্বামীর অধিকারে থাকে এবং তালাক প্রত্যাহার করার ইচ্ছা যদি তার না-ও

www.eelm.weebly.com

থাকে, তবুও ইদ্দত পালনকালে তাকে তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, খালি করে দিতে হবে ওই ইদ্দত পালনকারিণীর জন্য। আর যদি ওই ঘর ভাড়া করা ঘর হয়, তবে ঘর ভাড়া পরিশোধ করাও তালাকদাতার উপরে অপরিহার্য। আর যদি স্ত্রী 'বাইন' তালাক প্রাপ্তা হয়, 'খোলা' তালাকের কারণে হোক, অথবা হোক তিন তালাকের কারণে, কিংবা 'লেয়ানের' কারণে বা 'কেনায়া' শব্দ উচ্চারণের কারণে, সর্বাবস্থায় ইদ্দত পালনকারিণীকে বসবাসের জায়গা ঠিক করে দেওয়া ইমাম আবু হানিফা এবং অধিকাংশ আলেমগণের মতে অপরিহার্য, সে গর্ভবতী হোক, অথবা না হোক। কেননা আলোচ্য আয়াতের বিধান সাধারণার্থক। তবে হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান ও শা'বী বলেছেন, 'বাইন' তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দতপালনকারিণীর জন্য বাসগৃহের বন্দোবস্ত করে দেওয়া তালাকদাতার জন্য অপরিহার্য নয়। তাঁরা একথাও বলেছেন যে, 'বাইন' তালাকপ্রাপ্তাদের ইদ্দত পালনকালীন খরচপাতি বহন করা তালাকদাতার জন্য অপরিহার্য নয়। তবে গর্ভবতীদেরকে খরচপত্র দেওয়া ওয়াজিব। আতা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ এরকমই বলেছেন। আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য দৃষ্টেও একথা প্রমাণিত হয়। তাছাড়া হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েসের ঘটনাও এরকম। তাঁর স্বামী হজরত আবু আমর ইবনে হাফস সিরিয়া গমনকালে তাঁকে চূড়ান্ত তালাক দিলেন এবং একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে খোরাকী হিসেবে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন কিছু যব। তিনি রাগান্বিতা হলেন। প্রতিনিধি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমাদের উপর তোমার কোনো অধিকার নেই। তিনি তৎক্ষণাৎ রসুল স.কে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি স. বললেন, তোমার ইদ্দত পালনের খরচপাতি দেওয়া তার উপরে অপরিহার্য নয়। তুমি বরং উম্মে শূরাইকের ঘরে থেকে তোমার ইদ্দত পূর্ণ করো। পরক্ষণে বললেন, তার ঘরে তো আবার আবু আমরও গমনাগমন করে। তুমি তাহলে ইদ্দত পালন করো ইবনে

উম্মে মকতুমের ঘরে থেকে। সে দৃষ্টিহীন। তুমি সেখানে নিশ্চিন্তে তোমার বস্ত্র বদলাতে পারবে। ইদ্দত শেষ হলে আমাকে জানিয়ো। হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন, ইদ্দত শেষ হওয়ার পর আমি রসুল স. এর জ্যোতির্ময় সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললাম, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং আবু জাহাশের পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব এসেছে। তিনি স. বললেন, আবু জাহাশের স্কন্ধে তো সব সময় থাকে ভারী দণ্ড। সে তা কাঁধ থেকে কখনো নামাতেও পারে না। আর মুয়াবিয়া তো দরিদ্র। তুমি বরং উসামা ইবনে জায়েদকে বিয়ে করো। প্রস্তাবটি আমার তেমন মনঃপুত হলো না। তিনি স. পুনরায় একই কথা বললেন। আমি সম্মত হলাম। আল্লাহ্ আমার এ সম্মতিতে দান করলেন প্রচুর বরকত। ফলে মানুষ আমাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হলো। মুসলিম। মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন ফাতেমা বিনতে কায়েসকে বললেন, ইদ্দত পালনকালে তুমি খরচপত্র পাবে না, পাবে না বাসস্থানও। তাঁর অন্য আর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মুগীরা হজরত আলী ইবনে আবু তালেবের সঙ্গে সফরে বের হলেন। সেখান থেকেই তিনি তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বিনতে কায়েসকে এক তালাক বলে পাঠালেন। ওই তালাক ছিলো আগের দেওয়া দুই তালাকের পরিপূরক (অর্থাৎ আগে দুই তালাক দেওয়া হয়েছিলো, তাই শেষেরটি হলো তৃতীয় তালাক)। যে বর্ণনায় তিন তালাকের কথা এসেছে, সেখানে এর মর্মার্থ এরকমই। অর্থাৎ আগের দেওয়া দুই তালাকের সঙ্গে যুক্ত করা হলো তৃতীয় তালাক। হারেছ ইবনে হিশাম এবং আব্বাস ইবনে রবীয়া কিছু খোরাকী ফাতেমার কাছে পাঠালেন। ফাতেমা তার পরিমাণের স্বল্পতা দেখে রাগান্বিতা হলেন। তাঁরা বললেন, তুমি তো কোনো খোরাকীই পাওনা। গর্ভবতী যদি হতে, তবে পেতে। তিনি রসুল স. সকাশে এ সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করলেন। তিনি স. বললেন, তুমি কোনো খোরাকী পাওয়ার অধিকারিণী নও। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, আবু হাফস ইবনে মুগীরা তাঁকে তিন তালাক দিয়ে চলে গেলেন ইয়েমেনে। তাঁর পরিবারের লোকেরা ফাতেমাকে বললেন, তোমাকে কোনো খোরাকী দেওয়া আমাদের উপরে আবশ্যিক নয়। খালেদ ইবনে ওলীদ তখন কয়েকজনকে নিয়ে উম্মতজননী হজরত মায়মুনার প্রকোষ্ঠে অবস্থানরত রসুল স. এর কাছে গিয়ে ঘটনাটি জানালেন।

ইমাম আবু হানিফা বললেন, তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী হোক অথবা না হোক, উভয় অবস্থায় ইদ্দত পালনকালে তার খরচপত্র দেওয়া স্বামীর উপরে অত্যাবশ্যক। আলোচ্য আয়াতেই রয়েছে এর প্রমাণ। এখানকার 'মিউ উজুদি কুম' কথাটির সম্পর্ক উহ্য একটি বাক্যের সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তোমরা তোমাদের সামর্থ্যানুসারে তাদের ইদ্দতের খরচপত্র দিয়ো। কেননা তাদের বাসগৃহ প্রদান সম্পর্কে বলা হয়েছে 'যেখানে তোমরা বাস করতে' এর পরেও যদি 'তোমাদের সামর্থ্যানুসারে' এর সম্পর্ক 'তাদের বাস করতে দাও' এর সঙ্গে করা হয়, তাহলে তা হবে নিরর্থক।

হজরত ইবনে মাসউদের কেরাতে এসেছে 'আনফিকু আলাইহিন্না'। ইমাম আবু হানিফা দলিল গ্রহণ করেছে এই কেরাত অনুসারে। কোনো বিষয়ের 'বিপরীত অর্থ' অন্য কোনোকিছুর দলিল হতে পারে না। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে 'গর্ভবতী নারীদের' কথাটির দ্বারা খরচপত্র দেওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া এর দ্বারা ওই ধারণাটিকেও অপসারিত করা হয়েছে যে, ইদ্দত পালনকারীনী গর্ভবতী না হলে তাকে খরচপত্র দেওয়া অত্যাবশ্যক নয়। কেননা গর্ভের কারণে তার ইদ্দতপালন তো দীর্ঘতরও হতে পারে, তিন ঋতু বা তিন মাসের চেয়েও বেশী।

হজরত ফাতেমা বিনতে হারেছের হাদিস যদিও যথাসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তবুও তা বিরল শ্রেণীর বর্ণনা হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। সলফে সালেহীন তা গ্রহণও করেননি। তাছাড়া তাঁর হাদিস অন্য অনেক হাদিসের বক্তব্যবিরোধী। এর কারণ হচ্ছে, কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে, তাঁর স্বামী তাঁকে তালাক দিয়েছিলেন সফর অবস্থায় দূরে থেকে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি তাঁকে তালাক দিয়ে সফরে বহির্গত হয়েছিলেন। আবার কখনো বলা হয়েছে, হজরত ফাতেমা রসুল স. এর কাছে গিয়ে বিষয়টি জানালেন। আবার একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. এর কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন খালেদ ইবনে ওলীদ। এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁর স্বামীর নাম ছিলো আবু আমর ইবনে হাফস। আবার আরেক বিবরণে এসেছে, তাঁর নাম ছিলো আবু হাফস ইবনে মুগীরা। তাছাড়া এক এক বার এক এক কথা বলা তো সাহাবীগণের স্বভাবও ছিলো না। সুতরাং তাঁর বর্ণনাটিকে তো গ্রহণীয় বলে মানা যেতে পারেই না। সাহাবীগণ যে হাদিসকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনেছেন, সেই হাদিসখানি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু সাঈদের বোন হজরত ক্বরীআ বিনতে মালেক থেকে। অথচ হজরত কুরীয়া স্বনামধন্যা কেউ নন। বরং তাঁর ওই হাদিসটিই তাঁকে প্রসিদ্ধা করেছে। আবার হজরত ওমর এ সম্পর্কে জুহাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবীর একক বর্ণনাকেও গ্রহণ করেছেন। অথচ তিনি ছিলেন একজন মরুচারী। উল্লেখ্য, হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েসের বর্ণনাকে সর্বপ্রথম অগ্রাহ্য করেছেন হজরত ওমরই।

ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন, আবু ইসহাক বলেছেন, আমি একবার আসওয়াদ ইবনে জায়েদের সঙ্গে বড় মসজিদে বসে ছিলাম। শা'বীও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তিনি বললেন, হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেছেন, রসুল স. আমার জন্য ইদ্দত কালে বাসগৃহ ও খরচপত্রের আবেদন মঞ্জুর করেননি। সঙ্গে সঙ্গে আসওয়াদ শা'বীর মুখে নিক্ষেপ করলেন এক মুঠো কাঁকর। বললেন, তুমি কি জানো না, খলিফা হজরত ওমর এ সম্পর্কে বলেছেন, আমি আল্লাহ্র কিতাব ও রসুল স. এর সুন্নতকে এক রমণীর কথায় পরিত্যাগ করতে পারি না। জানি না, সে এ সম্পর্কে রসুল স. এর সিদ্ধান্তের কথা ভুলেই গিয়েছে কিনা। শরিয়তে নিশ্চয় তার জন্য বাসগৃহ ও খরচপত্রের ব্যবস্থা ছিলো। আল্লাহ্ একথা সুস্পষ্ট করেই বলেছেন। বলেছেন 'তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী

যেরূপ গৃহে বাস করো, তাদেরকেও সেরূপ গৃহে বাস করতে দিবে, তাদেরকে উত্যক্ত করবে না সংকটে ফেলবার জন্য'। মোট কথা হজরত ওমর হজরত ফাতেমার বিবৃতিটিকে অগ্রাহ্য করেছেন। আর তিনি তো ছিলেন শরিয়তজ্ঞ ও সুন্নতানুগ। তাহাবী তাঁর গ্রন্থের এক স্থানে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিন তালাকপ্রাপ্তাদের বাসগৃহের ব্যবস্থা যেমন আছে, তেমনি আছে খরচপত্রের ব্যবস্থাও। হাদিসটি সুপরিণত শ্রেণীর এবং এর বক্তব্য হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েসের বিবৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। মুয়াবিয়া, আ'মাশ ও ইব্রাহিমের মাধ্যমে সাঈদ ইবনে মনসুর বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমরের কাছে যখন হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েসের ঘটনা বলা হলো, তখন তিনি বললেন, একজন নারীর কথায় আমরা আমাদের ধর্মের বিধানে পরিবর্তন আনতে পারি না। তাঁর এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, তিন তালাকপ্রাপ্তাদের জন্য বাসগৃহ ও খরচপাতির বিধানটি ছিলো প্রসিদ্ধ। জননী আয়েশা ছিলেন বিদুষী। তাঁর মাধ্যমে অনেক মহিলা রসুল স. থেকে বিভিন্ন বিধান জেনে নিতেন। তিনিও ফাতেমার বিবৃতিকে অগ্রাহ্য করেছেন। বোখারী ও মুসলিমও তাঁর বিবৃতিকে খণ্ডন করেছেন এই বর্ণনাটির মাধ্যমে— একবার ওরওয়া জননী আয়েশাকে বললেন, হে মাতঃ! দেখুন, হাকামের অমুক কন্যাকে তার স্বামী চূড়ান্ত তালাক দিলো, আর সঙ্গে সঙ্গে সে তার বাড়ি থেকে চলে গেলো। তিনি বললেন, সে মন্দ কাজ করেছে। ওরওয়া বললেন, আপনি কি এ ব্যাপারে ফাতেমার বক্তব্য শোনেননি? তিনি বললেন, তার কথার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। বোখারী লিখেছেন, জননী আয়েশা ফাতেমাকে বলেছিলেন, 'বাসগৃহও পাবে না, খোরাকীও নয়' এরকম কথা বলার ব্যাপারে তোমার কি আল্লাহ্র ভয় হয় না? রসুল স. এর একান্ত প্রিয়পাত্র হজরত উসামা ইবনে জায়েদও ফাতেমার কথাকে গ্রহণ করেননি। আবদুল্লাহ্ ইবনে সালেহ বলেছেন, লাইছ ইবনে শা'দ—জাফর—হজরত আবু হোরায়রা—আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান—মোহাম্মদ ইবনে উসামা— এই সুত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত উসামা রসুল স. এর নির্দেশক্রমে ফাতেমাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনিও ফাতেমার কথার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। একবার ফাতেমার এরকম কথা শুনে তিনি তার হাতের কাছে যা ছিলো, তাই ছুঁড়ে মেরেছিলেন তাঁর দিকে। এরকম হওয়ার কারণ কেবল এই-ই হতে পারে যে, হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েস নিশ্চয় এ সম্পর্কে রসুল স. কর্তৃক প্রদত্ত বিধানের কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। নয়তো তাঁর প্রসঙ্গটির নেপথ্যে ছিলো বিশেষ কোনো কারণ। যেমন নিরাপত্তাহীনতা, অথবা এরকম কোনো এক কারণে তাঁকে এ সম্পর্কে দেওয়া হয়েছিলো ব্যতিক্রমী কোনো সিদ্ধান্ত। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, উকাইলি—ইবনে শিহাব—আবু সালমা এই সূত্রে লাইছ বর্ণনা করেছেন, আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান বলেছেন, ফাতেমা তালাকপ্রাপ্তির পরে তাঁর স্বামীর গৃহে না থাকার ব্যাপারে বলতেন, কিন্তু তাঁর কথা গ্রহণ করতো না। মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে

www.eelm.weebly.com

লিখেছেন, একবার প্রশাসক মারওয়ানের কাছে কাবীসা ইবনে আবু যুওয়াইব হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েসের ঘটনাটি জানালেন। মারওয়ান বললেন, আপনি তো একথা শুনেছেন একজন নারীর কাছ থেকে। একজন নারীর কথায় তো আমরা আমাদের সুদৃঢ় রীতি বর্জন করতে পারি না, যে রীতির উপর আমরা মানুষকে আমল করতে দেখেছি। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, ওই যুগটি ছিলো সাহাবীগণের যুগ। সুতরাং বুঝতে হবে মারওয়ান 'মানুষকে' বলে বুঝিয়েছিলেন সাহাবীগণকেই। অর্থাৎ ওই সুদৃঢ় রীতি ছিলো সাহাবীগণের ঐকমত্য। তিনি আরো বলেছেন, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেতও ফাতেমার বক্তব্যকে সমর্থন করেননি। আরো সমর্থন করেননি তাবেয়ীগণের মধ্যে ইবনে মুসাইয়্যেব, শোরাইহ, শা'বী, হাসান ও আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ এবং তাবে তাবেয়ীগণের মধ্যে সুফিয়ান সওরী, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং আরো অনেক আলেম। একারণেই প্রতীয়মান হয়, হাদিসটি বিরল প্রকৃতির। তাছাড়া তা হজরত ওমর কর্তক বর্ণিত একটি সুপরিণত প্রকৃতির হাদিসের পরিপন্থী। তিবরানীর 'মুআ'জ্জাম' গ্রন্থের একটি হাদিসের সঙ্গেও রয়েছে এর প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব। যেখানে বলা হয়েছে, হজরত ওমর ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তিন তালাকপ্রাপ্তাদের জন্য বসবাসের জায়গাও আছে, খোরাকীও আছে। হজরত জাবের থেকে দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিন তালাকপ্রাপ্তাদের রয়েছে বাসগৃহ ও খোরাকী প্রাপ্তির অধিকার। ইবনে মুঈন অবশ্য এই হাদিসকে সুপরিণতরূপে গ্রহণ করার পক্ষে নন। কেননা তাঁর মতে বর্ণনাটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। তাই তিনি বলেন, হাদিসটিকে পরিণত বলাই শ্রেয়।

উপযোগ ঃ হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েসের বিবৃতিটিকে বিশুদ্ধ বলে জেনে নিলেও তার সমাধান করা যেতে পারে এভাবে— তিনি ছিলেন মুখরা। স্বামীর ভাইদেরকেও তিনি ছেড়ে কথা বলতেন না। সেকারণেই রসুল স. তাকে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও ইদ্দত পালন করতে বলেছিলেন। স্বসূত্রে কাযী ইসমাইল বর্ণনা করেছেন, মুখরা স্বভাবই তাঁকে গৃহচ্যুতা করেছিলো। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, তিনি মানুষকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন শানিত রসনাধারিণী। আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার বলেছেন, তাঁর গৃহবিচ্যুতা হওয়ার কারণ ছিলো তাঁর উগ্র স্বভাব। আর তাঁর খোরাকী নির্দিষ্ট না করার কারণ ছিলো, তাঁর স্বামী তখন ছিলেন সফরে। আর যেটুকু যব তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, তার চেয়ে বেশী কিছু দেওয়ার সামর্থ্য তখন তাঁর স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের ছিলো না। কিন্তু তিনি তাঁদের কাছেই দাবি করেছিলেন তাঁর যথাপ্রাপ্য। কেননা তাঁর স্বামী তখন ছিলেন অনেক দূরে— ইয়েমেনে। সেখান থেকেই তিনি তালাকনামা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর স্বামীর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর দাবি মেটাতে পারেননি বলেই বলেছিলেন, তোমার খরচপত্র দেওয়ার দায় আমাদের নয়। রসুল স. তাই বলেছিলেন, তোমার জন্য কোনো খোরাকী নেই, বসবাসের জায়গাও নেই। কেননা সে তোমার জন্য কিছু রেখে

যায়নি। আর আত্মীয়স্বজনের জন্যও খরচপত্র দেওয়া ওয়াজিব নয়। ফাতেমা হয়তো রসুল স. এর এমতো বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারেননি। তাই মনে করেছিলেন, কোনো তালাকপ্রাপ্তাই বাসগৃহ ও খোরাকী পায় না। আর সাহাবীগণ তাঁর এমতো ভুল ধারণারই প্রতিবাদ করেছিলেন।

মাসআলা ঃ বিধবা রমণী গর্ভবতী হোক, অথবা না হোক, আলেমগণের সর্বসম্মতিক্রমে ইদ্দত পালনের জন্য তাকে খরচপাতি দেওয়া ওয়াজিব নয়। তবে ইদ্দতপালনকালে তাকে থাকবার ঘর দেওয়া ওয়াজিব কিনা, সে সম্পর্কে আলেমগণ একমত নন। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর দু'টি মন্তব্য পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, ইদ্দত পালনকালে তাকে থাকবার ঘর দেওয়া জরুরী নয়। সে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই ইদ্দত পালন করতে পারে। জননী আয়েশা, হজরত আলী এবং হজরত ইবনে আব্বাস এরকমই বলেছেন। হাসান বসরীও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। জমহুরের মতে, সে বাসস্থান পাওয়ার অধিকার রাখে। হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আসের অভিমতও এরকম। ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী, ইমাম আহমদ এবং ইসহাকও এই অভিমতটিকে পছন্দ করেছেন। আমি বলি, ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এরকম। কিন্তু তিনি বিধানটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মৃত ব্যক্তির বাড়িতে ওই বিধবার যদি এতটুকু অংশও পাওনা না থাকে, যেখানে অবস্থান করে সে ইদ্দত পালন করতে পারে, আর ওই লোকের উত্তরাধিকারীরা যদি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাদের অংশে বিধবাকে থাকতে দিতে সম্মত না হয়, তবে তাকে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। আর এরকম সে করতে পারবে অজুহাতের কারণে। উল্লেখ্য, ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত অজুহাত গ্রাহ্য। আর এমতাবস্থায় তার অবস্থা ছাদ ধসে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার মতো। আবার ভাড়া করা বাড়ি হলে এবং ভাড়া পরিশোধ করার সামর্থ্য না থাকলেও তা হবে শরিয়তসম্মত অজুহাত। তবে স্থানান্তরিত হওয়ার পর সে যেখানে যাবে, সেখানেই পূর্ণ করতে হবে তার ইদ্দতকাল। ওই সময় সে আর কোথাও যেতে পারবে না। জমহুরের পক্ষে রয়েছে হজরত আবু সাঈদ খুদরীর ভগ্নি ফুরীয়া বিনতে মালেক ইবনে সেনানের হাদিস, যা ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যথাব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে'। আমি সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে একথা বলেছি

www.eelm.weebly.com

যে, নিজের শিশুসন্তানকে দুগ্ধ পান করানো মায়ের উপরে ওয়াজিব। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে 'মাতাগণ তাদের সন্তানদেরকে দুধপান করাবে'। সুতরাং কারো গৃহিণী, অথবা তালাকপ্রাপ্তা ও ইদ্দত পালনরতা স্ত্রী যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার সন্তানকে দুধ পান করায়, তবে তা জায়েয

হবে না। কেননা ওয়াজিব দায়িত্ব পালনের বিনিময় গ্রহণ নাজায়েয। এভাবে ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও যদি কেউ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার সন্তানকে দুধ পান করায়, তবুও তা নাজায়েযই হবে। কেননা 'মাতাগণ তাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করাবে' বিধানটি সাধারণার্থক। তবে আলোচ্য বাক্যে পারিশ্রমিকের বিধানটি সুসাব্যস্ত। কিন্তু বিধানটি শর্তযুক্ত। আর শর্তটি হচ্ছে— সন্তানের পিতা যখন সন্তানের মাতার খোরপোষের দায়িত্ব পালন করবে, তখনই কেবল মাতার জন্য তার সন্তানকে দুধ পান করানো হবে ওয়াজিব। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'পিতার কর্তব্য সন্তানের মাতাকে আহার্য ও পরিচ্ছদ প্রদান করা'। ইদ্দত পালনের সময় খোরপোষ দেওয়া তো সকল স্বামীর উপরেই ওয়াজিব। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তাদের উপর এই দায়িত্বটি আর থাকে না। এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি তার সন্তানকে দুধ পান করায় তবে সে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবে।

এখানে 'ওয়া'তামিরূ বাইনাকুম' অর্থ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে। একথা বলে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে স্বামী স্ত্রী উভয়কে। অর্থাৎ তারা দু'জনেই তখন সুসঙ্গত পরামর্শের মাধ্যমে পারিশ্রমিকের পরিমাণ ঠিক করে নিবে। ইমাম শাফেয়ী কথাটির অনুবাদ করেছেন— তোমরা পরস্পরে পরামর্শ করে নিয়ো। মুকাতিল বলেছেন, এমতোক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিকের উপর উভয় পক্ষেরই সন্তোষজনক সম্মতি থাকা বাঞ্ছনীয়। বায়যাবী কথাটির অর্থ করেছেন— তোমরা পারিশ্রমিক নির্ধারণ ও তা পরিশোধ করার বিষয়ে পরস্পরকে সদাচরণের পরামর্শ দিবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও, তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে'। এখানেও 'তোমরা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে সন্তানের পিতা-মাতা উভয়কে। অর্থাৎ মায়ের উপরে যদি তার সন্তানকে দুগ্ধ দান করা কঠিন হয়ে যায়, অথবা সে যদি তার সন্তানকে দুধ পান করাতে অস্বীকার করে, তবে সন্তানের পিতা তার উপরে বলপ্রয়োগ করতে পারবে না। তাকে মনে করতে হবে অক্ষম। কেননা সন্তানের প্রতি থাকে মায়ের সীমাহীন ভালোবাসা। তৎসত্ত্বেও যদি সে দুগ্ধদানে অনীহ হয়, তবে তাকে অক্ষম মনে করাই হবে সঙ্গত। আর মা যদি সত্যি সত্যি অক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও দুধ না পান করায়, তবে সে হবে গোনাহগার।

অক্ষমতা পিতার দিক থেকেও হতে পারে। সে অভাবগ্রস্ত হওয়ার কারণে যদি কম পারিশ্রমিক দিয়ে দুগ্ধদাত্রী হিসেবে অন্য কোনো নারীকে ঠিক করে, তবে তা তার জন্য বৈধ হবে। এমতোক্ষেত্রে পিতার উপরও এই মর্মে বলপ্রয়োগ করা যাবে না যে, অধিক পারিশ্রমিক দিয়ে তার মাতাকেই দুগ্ধদাত্রী নিযুক্ত করতে হবে। ইমাম আবু হানিফার সিদ্ধান্ত এরকমই। এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকের অভিমতও এরকম। ইমাম শাফেয়ীরও একটি অভিমত এরূপ। তবে ইমাম আহমদ বলেছেন, এমতাবস্থায় মাতাকে দিয়েই দুধ পান করানোর ব্যাপারে পিতার উপরে বলপ্রয়োগ করা যাবে এবং মাকেও দিতে হবে উপযুক্ত পারিশ্রমিক, অন্য কোনো মহিলা কম পারিশ্রমিকে, অথবা বিনা পারিশ্রমিকে দুধ পান করাতে সম্মত

থাকলেও। এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকের অভিমতও এরকম। আরেক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর সিদ্ধান্তও তাই। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আলোচ্য বাক্যে স্পষ্ট করেই একথা বলা হয়েছে যে, 'তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও, তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে'।

মাসআলা ঃ উপরে বর্ণিত অবস্থায় অন্য নারী দ্বারা দুধ পান করানোর শর্ত হচ্ছে, তাকে দুধ পান করাতে হবে সন্তানের মায়ের নিকট থেকে, যদি তার মা এমন কোথাও বিবাহবদ্ধা না হয়, যে তার জন্য গায়ের মাহরাম (বিবাহসিদ্ধ)। কেননা শিশুকে দুধ পান করানো এবং তার লালন পালনের অধিকার তার মায়ের। হজরত আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহ বর্ণনা করেছেন, একবার এক রমণী রসুল স. এর দ্যুতিময় সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তমজন! এ শিশুটি আমার। আমার উদর ছিলো তার শয্যা। এখন আমার বক্ষদেশ তার জন্য মশক, আর আমার কোল তার জন্য মমতাধার। এর পিতা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে এবং সে আমার এই বুকের মানিককে ছিনিয়ে নিতে চায়। রসুল স. বললেন, যতদিন তুমি অন্যত্র পরিণয়াবদ্ধা না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ শিশুর উপরে সর্বাধিক অধিকার তোমার। আবু দাউদ, হাকেম। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি যথাসূত্রসম্বলিত। ইমাম মালেকের 'মুয়াত্তা'য় বলা হয়েছে, কাসেম ইবনে মোহাম্মদ উল্লেখ করেছেন, হজরত ওমরের স্ত্রী ছিলেন জনৈকা আনসার রমণী। তাঁর পুত্র আসেম ইবনে ওমর জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরই গর্ভে। হজরত ওমর তাঁকে তালাক দিয়েছিলেন। একদিন তিনি অশ্বারোহী হয়ে কোবার দিকে গমনকালে দেখলেন, শিশু আসেম মসজিদ প্রাঙ্গণে খেলা করছে। তিনি তাকে দেখা মাত্র অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন এবং তাকে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হলেন। এমন সময় তার মাতামহী দৌড়ে এসে শিশুকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। শেষে দু'জনেই শিশুকে নিয়ে উপস্থিত হলেন হজরত আবু বকর সকাশে। হজরত আবু বকর বললেন, ওমর, শিশুকে তার মায়ের কাছে দিয়ে দাও। বচসা কোরো না। হজরত ওমর নির্বিবাদে এ সিদ্ধান্তকে মেনে নিলেন। আবদুর রাজ্জাকও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে শায়বার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর

www.eelm.weebly.com

সব শুনে বললেন, মায়ের আদর, মায়ের ক্রোড় এবং মায়ের শরীরের সুরভি তার সন্তানের জন্য তোমার চেয়ে উত্তম। সন্তান যখন বড় হয়ে যাবে, তখন তার ইচ্ছা, সে পিতার কাছে থাকবে, না মাতার কাছে।

মাসআলা ঃ মা যদি অন্য দুগ্ধদাত্রীর সমপরিমাণ পারিশ্রমিক দাবি করে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, দুগ্ধদাত্রী নিযুক্ত করতে হবে তাকেই। এমতাবস্থায় অন্য দুগ্ধদাত্রীকে নিযুক্ত করা ঠিক হবে না।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ্ যা দান করেছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দান করেছেন, তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তাদের উপরে চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি'। এখানে 'মিন সাআ'তিহী' অর্থ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী।

মাসআলা ঃ গৃহিনী ও বিচ্ছেদকৃতাদের খোরাকী কী পরিমাণ হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ এবং এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু হানিফার একটি অভিমত, যে অভিমতকে হেদায়া রচয়িতাও পছন্দ করেছেন, তা হচ্ছে— শরিয়তে এর কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। এটা নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর আর্থিক অবস্থার উপর। যদি তারা উভয়েই ধনী হয় তবে খোরাকীর পরিমাণ অধিক হওয়াই সমীচীন। আর স্বচ্ছল না হলে খোরাকী নির্ধারিত হবে ন্যূনতম প্রয়োজন অনুসারে। বিচারক যদি দরিদ্র স্বামীর উপরে মধ্যম ধরনের খোরাকী নির্ধারণ করে দেয়, অথবা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি মধ্যম ধরনের খোরাকীর ব্যাপারে একমত হয়ে যায়, তবে ন্যূনতম খোরাকী প্রদানের পর অতিরিক্ত অংশ পরিশোধ করাও হবে স্বামীর কর্তব্য। আর আয়াতে 'সামর্থ্য' কথাটির প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং গুরুত্ব দিতে হবে কেবল স্বামীর আর্থিক অবস্থাকে। স্ত্রীর অস্বচ্ছলতা হওয়া সত্ত্বেও স্বামী বিত্তশালী হলে খোরাকীর পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। আর সে দরিদ্র হলে তার উপরে অধিক খোরাকীর ভার চাপানো যাবে না, সে খোরাকী দিবে তার সামর্থ্যানুসারে, স্ত্রী ধনী বা দরিদ্র, যা-ই হোক না কেনো। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ কারো উপরে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না'। প্রকাশ্য সূত্রে ইমাম আবু হানিফার মতও এরকম। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, প্রকাশ্য বর্ণনানুসারে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্বামী দরিদ্র এবং স্ত্রী বিত্তশালিনী হলে স্ত্রী খোরাকী পাবে স্বামীর দারিদ্র অনুসারে। কেননা সে স্বেচ্ছায় দরিদ্র ব্যক্তিকে স্বামীত্বে বরণ করেছে। আর স্বামী বিত্তশালী এবং স্ত্রী বিত্তহীনা হলে স্বামী খোরাকী দিবে তার বিত্তশালিতা অনুসারে। একথাটিই আলোচ্য বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আর স্ত্রীর অবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে হাদিস দ্বারা। যেমন জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, হিনদা ইবনে উতবা নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান বড়ই কৃপণ। আমার ও আমার সন্তানদের যা খরচ দরকার, তা সে পুরাপুরি দেয় না। তাই তার অজ্ঞাতসারে আমি তার সম্পদ থেকে কিছু কিছু হাতিয়ে নেই। রসুল স. বললেন, তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যা প্রয়োজন, তা তুমি নিতে পারো। বোখারী, মুসলিম।

একটি সন্দেহ ঃ কোরআনের বিধান এবং হাদিসের হুকুম তো অবশ্য পালনীয়ই। তাহলে একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা কোরআনের স্পষ্ট বিধানকে পরিবর্তন করার বিষয়টি জায়েয হতে পারে কীভাবে?

সন্দেহের নিরসনঃ 'হেদায়া' রচয়িতা লিখেছেন, এখানে একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা কোরআনের বিধানকে পরিবর্তন করা হয়নি। বরং বিধান সাব্যস্ত হয়েছে তো কোরআনের বক্তব্য অনুসারেই। কোরআনে খোরাকী প্রদানের জন্য সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষকে। সুতরাং বুঝতে হবে খোরাকীর পরিমাণ নির্ণীত হবে তার সামর্থ্যানুসারেই। তবে বিত্তশালিনী স্ত্রীর দাবি তো থাকবেই। আর তা পূরণ করাও তো স্বামীর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলি, তাঁর কথা যথাস্থানে যথার্থই, কিন্তু এমনও তো বলা যেতে পারে না যে, স্ত্রীর

অবস্থাকে নগণ্য ভাবা যাবেই না। সামর্থ্যের অতিরিক্ত খোরাকী প্রদান স্বামীর দায়িত্বভূত নয়, আর কম হোক বেশী হোক খোরাকী প্রদানের দায়িত্বও স্বামীরই। আর হাদিসে বলা হয়েছে, স্ত্রীর অবস্থা অনুসারে খোরাকী প্রদান করা ওয়াজিব। তবে স্বামী দরিদ্র হলে এবং স্ত্রী বিত্তবতী হলে যতোটুকু পারবে দিবে, বাকীটুকু ওয়াজিব থাকবে স্বামীরই দায়িত্বে। এতে স্ত্রী যেমন তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না, তেমনি স্বামীও বাধ্য হবে না তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দিতে।

এই ব্যাখ্যাটিও বিতর্কের উর্ধ্বে নয়— রসুল স. জানতেন, আবু সুফিয়ান কৃপণ। তাই তিনি স. সে সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলে তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যা প্রয়োজন, তা তুমি নিতে পারো। স্ত্রীর অধিকারকে সেখানে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ার কারণেই তো রসুল স. এরকম বলেছিলেন। আর তিনি প্রয়োজনের কোনো পরিমাণও নির্দিষ্ট করে দেননি। কেননা শরিয়তে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু নেই। তিনি স. এরকম বলেছিলেন আবু সুফিয়ানের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে। আর আবু সুফিয়ান ছিলেন বিত্তশালী। সুতরাং তার সম্পদ থেকে প্রয়োজন পূরণ সম্ভব ছিলো। অর্থাৎ তিনি উপযুক্ত খোরাকী দেওয়ার সামর্থ্য রাখলেও তা দিতেন না কেবল কৃপণতার কারণে।

www.eelm.weebly.com

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, খোরাকীর পরিমাণ নির্ধারণ শরিয়তেরই বিষয়। বিচারকের সিদ্ধান্তভূত কোনো কিছু নয়। এ বিষয়ে স্বামীর আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বামী ধনী হলে তাকে দৈনিক দুই মুদ (দুই সের), দরিদ্র হলে এক মুদ এবং মধ্যবিত্ত হলে দেড় মুদ খোরাকী দিতে হবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর এমতো নির্ধারণের কথা কোরআনের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

মাসআলা ঃ স্ত্রীর যদি পরিচারকের প্রয়োজন হয়, তবে স্বামীর উচিত তার ব্যবস্থা করে দেওয়া। ইমাম আহমদের মতে এরকম করা দরিদ্র স্বামীর উপরেও ওয়াজিব। কিন্তু একাধিক পরিচারকের প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করা স্বামীর উপরে ওয়াজিব নয়। ওয়াজিব কেবল একজনকে ঠিক করে দেওয়া। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা; ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ। ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, দুই বা তিন জন পরিচারকের যদি প্রয়োজন হয়, তবে তাদের খোরাকীর ব্যবস্থা করে দেওয়াও স্বামীর উপরে ওয়াজিব। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, সর্বাধিক দুজন সেবকের খোরাকী দেওয়া স্বামীর উপরে ওয়াজিব— একজন ঘরের কাজের জন্য এবং অপরজন বাইরের।

'সা ইয়াজ্বআ'লুল্লহু বা'দা উ'সরি ইউস্রান' অর্থ আল্লাহ্ কষ্টের পরে দিবেন স্বস্তি। অর্থাৎ দ্রুত, অথবা বিলম্বে আল্লাহ্ অভাব দূর করে দিবেন। দান করবেন আর্থিক স্বচ্ছলতা, সুতরাং অভাবগ্রস্ত স্বামীরা যেনো ধৈর্য ধারণ করে।

সূরা ত্বলাক ঃ আয়াত ৮, ৯, ১০, ১১, ১২

❑ কত জনপদ উহাদের প্রতিপালক ও তাঁহার রাসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। ফলে আমি উহাদের নিকট হইতে কঠোর হিসাব লইয়াছিলাম এবং উহাদিগকে দিয়াছিলাম কঠিন শাস্তি।

❑ অতঃপর উহারা উহাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করিল; ক্ষতিই হইল উহাদের কর্মের পরিণাম।

❑ আল্লাহ্ উহাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যাহারা ঈমান আনিয়াছ। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন উপদেশ—

❑ এক রাসূল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনিবার জন্য। যে কেহ আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ্ তাহাকে উত্তম রিয্ক দিবেন।

www.eelm.weebly.com

❑ আল্লাহ্ই সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্ত আকাশ এবং উহাদের অনুরূপ পৃথিবীও, উহাদের মধ্যে নামিয়া আসে তাঁহার নির্দেশ; যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

এখানে 'ওয়া কা আইয়্যিম্ মিন ক্বরইয়াতিন আ'তাত্ আ'ন আমরি রব্বিহা ওয়া রুসুলিহী' অর্থ কতো জনপদ তাদের প্রতিপালক ও তাঁর রসুলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলো। 'জনপদ' অর্থ এখানে জনপদবাসী। 'ফাহাসাব্নাহা হিসাবান শাদীদা' অর্থ ফলে আমি তাদের নিকট থেকে কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম। আর 'ওয়া আ'জ্জাব্নাহা আ'জাবান নুকরান' অর্থ এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি। অর্থাৎ তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম বিভিন্ন প্রকারের আযাবের মাধ্যমে— যেমন প্লাবন, প্রস্তরবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি।

পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করলো; ক্ষতিই ছিলো তাদের কর্মের পরিণাম'। এখানে 'ওয়া বালা আম্‌রিহা' অর্থ কৃতকর্মের শাস্তি। অর্থাৎ মন্দ কর্মসমূহের জাগতিক শাস্তি। আর 'ক্ষতিই ছিলো তাদের কর্মের পরিণাম' অর্থ কবরে ও পরকালেও তারা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। দোজখই হবে তাদের স্থায়ী ঠিকানা।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে মুকাতিল বলেছেন, কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শব্দাবলীর অগ্র-পশ্চাৎ ঘটেছে। শব্দগুলোকে সুবিন্যস্ত করলে বক্তব্যটি দাঁড়ায় এরকম— আমি তাদেরকে প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, প্রস্তরবৃষ্টি ও অন্যান্য আযাব দ্বারা পৃথিবীতে শাস্তি দিয়েছি। পরবর্তী পৃথিবীতে তাদেরকে শাস্তি দিবো আরো কঠোরভাবে। তাই তাদের পরিণাম হবে কেবল ক্ষতি আর ক্ষতি। আবার কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে কেবল পরবর্তী পৃথিবীর শাস্তির কথাই বলা হয়েছে। আর তাদের শাস্তিগ্রস্ত হওয়া যেহেতু সুনিশ্চিত, তাই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে অতীতকালবাচক ক্রিয়া। অর্থাৎ পৃথিবীতে তাদের শাস্তি পাওয়ার বিষয়টি যেমন নিঃসন্দিগ্ধ, তেমনি আখেরাতেও তাদেরকে শাস্তিভোগ করতে হবে সন্দেহাতীতভাবে। যেনো সে শাস্তি তারা ভোগ করতে শুরু করেছে ইতোমধ্যেই।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যারা ইমান এনেছো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন উপদেশ— (১০) এক রসুল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনবার জন্য। যে কেউ আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, আল্লাহ্ তাকে উত্তম রিজিক দিবেন' (১১)।

এখানে 'ফাত্তাকুল্লহা' অর্থ আল্লাহ্‌কে ভয় করো। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ও শাস্তির ভয়ে তাঁর বিধান মানো ও তাঁর রসুলের অনুগামী হও, অবাধ্য হয়ো না। 'ইয়া উলিল্ আল্‌বাবিল্ লাজীনা আমানু' অর্থ হে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, যারা ইমান এনেছো। এখানে এরকম বলে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে,

বিশ্বাসীগণকে হতে হবে বোধশক্তিসম্পন্ন। অথবা প্রকৃত অর্থে বোধশক্তিসম্পন্ন ইমানদারেরাই। আর এখানে 'জিকরা' (উপদেশ) অর্থ কোরআন, যা অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।

'রসূলান' অর্থ এক রসুল, যাকে আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন তোমাদেরই পথপ্রদর্শনার্থে। বুঝতে হবে 'রসূলান' এর পূর্বে উহ্য রয়েছে একটি ক্রিয়া। তাই শব্দটি এখানে হয়েছে কর্মকারক। অর্থাৎ বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— 'আরসালা রসূলান' (তিনি রসুল প্রেরণ করেছেন)। অথবা 'রসূলান' এখানে 'মাফউলে মুতলাক' (সাধারণ কর্মপদ)।এমতাবস্থায় এখানকার 'রসূলান' (রসুল) অর্থ হবে রেসালাত, অর্থাৎ ধাত্যর্থ। কোনো কোনো বিদ্বান আবার বলেছেন, এখানে 'জিকরা' অর্থ আল্লাহ্‌র জিকির।। আর আল্লাহ্‌র জিকির বলে এখানে বুঝানো হয়েছে হজরত জিবরাইলকে। তাঁকে 'জিকির' বলার কারণ হতে পারে কয়েকটি। যেমন— ১. তিনি আল্লাহ্‌র জিকির করেন অত্যধিক ২. 'জিকির' (কোরআন) নিয়ে তিনিই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন ৩. আকাশজগতে তাঁর সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয় ৪. 'জিকির' অর্থ মর্যাদা, আর হজরত জিবরাইল মহামর্যাদাধারী। উল্লেখ্য, 'জিকির' অর্থ যদি এখানে 'জিবরাইল' বুঝানো হয় তবে বুঝতে হবে শব্দটির পূর্বে এখানে উহ্য রয়েছে 'জা'। এভাবে কথাটি দাঁড়ায় 'আনযালাল্লহু ইলাইকুম জা-জিকরা'। এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'জিকির' দ্বারা বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর মহান ব্যক্তিত্বকে। কেননা তিনি স. নিরবচ্ছিন্নরূপে বিভোর থাকেন জিকির ও কোরআন পাঠে। আর এখানকার 'যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্ত করে' কথাটি রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যপ্রকাশক। অর্থাৎ তিনিই বিশেষভাবে মানুষকে আবৃত্তি করে শোনান আল্লাহ্‌র কালাম। অন্য সকলে আবৃত্তি করে তো তাঁরই অনুসরণকারীরূপে।

'মিনাজ্ জুলুমাতি ইলান্ নূর' অর্থ অন্ধকার থেকে আলোকে আনবার জন্য। এখানে 'জুলুমাত' (অন্ধকার) অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যান, অজ্ঞতা ও মূর্খতা, আর 'নূর' অর্থ বিশ্বাস, পরিশুদ্ধ প্রজ্ঞা, পুণ্যকর্ম, যেগুলোর সাহায্যে অর্জিত হয় পরকালের জ্যোতি। আর 'আল্লাহ্

তাকে উত্তম রিজিক দিবেন' অর্থ আল্লাহ্ তাকে দান করবেন বেহেশত এবং তার অফুরন্ত সুখোপকরণসমূহ, যা হবে নিরবচ্ছিন্ন ও চিরস্থায়ী।

শেষোক্ত আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং তাদের অনুরূপ পৃথিবীও, তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ। যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন'।

এখানে 'ওয়া মিনাল আরদ্বি মিছলাহুন্না' অর্থ সপ্ত আকাশের মতো সপ্তস্তরবিশিষ্ট পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ই। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একদিন তাঁর সহচরবর্গকে নিয়ে একস্থানে বসেছিলেন। এমন সময় আকাশে ভেসে এলো এক খণ্ড মেঘ। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো, ওটা কী? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ এবং রসুলই এ সম্পর্কে অধিক

পরিজ্ঞাত। বললেন— ওটা মেঘ, যেনো পৃথিবীর উপরে পানিবহনকারী উষ্ট্র। ওই জলবাহী মেঘকে আল্লাহ্ সরিয়ে নিয়ে যান ওই সকল লোকের উপর থেকে, যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এবং প্রার্থীও হয় না আল্লাহ্ সকাশে। তিনি স. পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো, তোমাদের মাথার উপরে কী রয়েছে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, তোমাদের উপরে রয়েছে সুউচ্চ ও সুরক্ষিত ছাদ এবং তরঙ্গময় সলিল। তিনি স. পুনঃ প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি বলতে পারবে, ওই ছাদ ও তোমাদের মধ্যে ব্যবধান কতটুকু? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই সে কথা আমাদের চেয়ে বেশী জানেন। তিনি স. বললেন, পাঁচ শত বৎসরের পথের ব্যবধানের সমান। তিনি স. পুনরায় বললেন, বলতে কি পারো, কী রয়েছে তার উপরে? তাঁরা বললেন, এ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত আল্লাহ্ এবং তাঁর বার্তাবাহক। তিনি স. বললেন, তার উপরে রয়েছে আর একটি আকাশ। আর উভয়ের দূরত্ব পাঁচ শত বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। এভাবে রসুল স. একে একে বিবরণ প্রদান করলেন সাতটি আকাশের। শেষে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো, সাত আকাশের উপরে কী রয়েছে। সাহাবীগণ পূর্বের মতোই নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। তিনি স. বললেন, তার উপরে রয়েছে আরশ। আর আরশ ও তার নিম্নবর্তী আকাশের দূরত্বও পাঁচশত বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। এরপর তিনি স.বললেন, তোমরা কি জানো, তোমাদের নিচে কী আছে? তাঁরা আগের মতোই জবাব দিলেন। তিনি স. বললেন, মাটি। তার নিচে? তাঁরা জবাব দিলেন আগের মতো করেই। তিনি স. বললেন, আর একটি পৃথিবী, আর উভয় পৃথিবীর ব্যবধান পাঁচশত বছরের। এভাবে তিনি স. প্রদান করলেন সপ্তস্তর পৃথিবীর বিবরণ। এরপর বললেন শপথ ওই সত্তার, যাঁর অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, তোমরা যদি পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্তরের দিকে একটি রশি ঝুলিয়ে দাও, তবে সে রশি পতিত হবে অবশেষে আল্লাহ্র অলৌকিক শক্তির উপরে। সবশেষে বললেন 'হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখিরু ওয়াজ্ জুহিরু ওয়াল বাত্বিনু ওয়া হুয়া বিকুল্লি শাইইন আ'লীম'। আহমদ, তিরমিজি। আমি এই হাদিসটি সবিস্তারে উপস্থাপন করেছি সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে। কোনো কোনো হাদিসে এরকমও বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক পৃথিবীতে রয়েছে তোমাদের আদমের মতো আদম, তোমাদের নুহের মতো নুহ, তোমাদের ইব্রাহিমের মতো ইব্রাহিম, তোমাদের মুসার মতো মুসা এবং তোমাদের মোহাম্মদের মতো মোহাম্মদ। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

'ইয়াতানায্যালুল আমরু বাইনাহুন্না' অর্থ তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ। অর্থাৎ প্রতিটি আকাশে এবং পৃথিবীর প্রতিটি স্তরে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নেমে আসে সিদ্ধান্তসমূহ। আর সে সিদ্ধান্তসমূহ যথারীতি কার্যকরও হয়। উপরে বর্ণিত হাদিসটিকে যদি গ্রহণযোগ্য বলে ভাবা হয়, তবে এখানকার 'আমর' (নির্দেশ) কথাটির অর্থ হবে 'ওহী' (প্রত্যাদেশ)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্র প্রত্যাদেশাবলী অবতীর্ণ হয় সাত আকাশে, সপ্তস্তরবিশিষ্ট পৃথিবীতে, সবখানে। আর সে সকল প্রত্যাদেশের মধ্যেই রয়েছে তাঁর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহ।

'লি তা'লামমূ' অর্থ যাতে তোমরা বুঝতে পারো। অর্থাৎ যাতে তোমরা বুঝতে পারো প্রত্যাদেশাবলী অবতীর্ণ হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে কী কারণ। অথবা এখানকার ক্রিয়া, কর্ম ও নির্দেশ সব কিছুই সাধারণার্থক। 'ইন্নাল্লহা আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বদীর' অর্থ নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর 'ওয়া আন্নাল্লহা ক্বদ আহাত্বা বি কুল্লি শাইইন ই'লমা' অর্থ এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সমস্তকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এই বিশাল মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করা এবং এতে নির্দেশসমূহ কার্যকর করার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিধরতার নিদর্শন। হে মানুষ! যদি তোমরা একথা উত্তমরূপে বুঝতে, তবে কস্মিনকালেও তাঁর অবাধ্য হতে না। হতে ভীত, চিন্তিত, বোধশক্তিসম্পন্ন ও বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী।

সূরা তাহরীম

এই সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মদীনায়। এর রুকু-সংখ্যা ২ এবং আয়াত-সংখ্যা ১২।

www.eelm.weebly.com

আতা সূত্রে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের বর্ণনা করেছেন; আমি স্বয়ং শুনেছি, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. একবার আমার সপত্নী জয়নাব বিনতে জাহাশের ঘরে বসে মধুর শরবত পান করলেন। আমি ও হাফসা ঠিক করলাম, রসুল স. আমাদের ঘরে এলে বলবো, আপনার কাছ থেকে যে মাগফীরের (এক প্রকার ফুলের) গন্ধ আসছে। কিছুক্ষণ পর তিনি আমার, অথবা হাফসার ঘরে এলেন। তাঁকে বলা হলো সেকথাই যা আমরা পরামর্শ করে রেখেছিলাম। তিনি স. বললেন, আমি তো জয়নাবের ঘর থেকে মধুর শরবত পান করে এলাম। ঠিক আছে, আর কখনো এরকম করবো না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো——

সূরা তাহরীম ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

তাফসীরে মাযহারী/৫৮৩

❑ হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন তুমি তাহা নিষিদ্ধ করিতেছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাহিতেছ; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❑ আল্লাহ্ তোমাদের কসম হইতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আল্লাহ্ তোমাদের কর্মবিধায়ক, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

❑ স্মরণ কর—— নবী তাহার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা বলিয়াছিল। অতঃপর যখন সে উহা অন্যকে বলিয়া দিয়াছিল এবং আল্লাহ্ নবীকে উহা জানাইয়া দিয়াছিলেন, তখন নবী এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করিল এবং কিছু অব্যক্ত রাখিল। যখন নবী উহা তাহার সেই স্ত্রীকে জানাইল তখন সে বলিল, 'কে আপনাকে ইহা অবহিত করিল?' নবী বলিল, 'আমাকে অবহিত করিয়াছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।'

www.eelm.weebly.com

❑ যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর তবে ভাল, কারণ তোমাদের হৃদয় তো ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌ই তাহার বন্ধু এবং জিব্‌রাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও, তাহা ছাড়া অন্যান্য ফিরিশ্‌তাও তাহার সাহায্যকারী।

❑ যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তবে তাহার প্রতিপালক সম্ভবত তোমাদের স্থলে তাহাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী— যাহারা হইবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুগত, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হইতে, যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও প্রস্তর, যাহাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফিরিশ্‌তাগণ, যাহারা অমান্য করে না তাহা, যাহা আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে আদেশ করেন। আর তাহারা যাহা করিতে আদিষ্ট হয় তাহাই করে।

❑ হে কাফিরগণ! আজ তোমরা দোষ স্খালনের চেষ্টা করিও না। তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আল্লাহ্‌ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন, তাকে আপনি অবৈধ করতে চাচ্ছেন কেনো? মধুর শরবত তো হালাল। তবে পত্নীকে তুষ্ট করতে গিয়ে কেনো আপনি হালালকে স্বেচ্ছায় নিজের জন্য হারাম করে নিবেন। সুতরাং আর কখনো মধুর শরবত পান করবেন না বলে যে পণ আপনি করেছেন, তা ভঙ্গ করুন। তাহলে আল্লাহ্‌ আপনাকে মার্জনা করবেন। পণভঙ্গের জন্য আপনাকে দায়ী করবেন না। তিনি যে মহা ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন বলেছিলেন, আমি তো জয়নাবের ঘরে মাঝে মাঝে মধুর শরবত পান করে থাকি। ঠিক আছে, প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কখনো এরকম করবো না। তোমরা এ ব্যাপারে কাউকে আর কিছু বোলো না। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী মুলায়িকার মাধ্যমে তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জননী সাওদার ঘরে মাঝে মাঝে মধু পান করতেন। একদিন তাঁর ঘরে মধুর শরবত পান করার পর তিনি উপস্থিত হলেন জননী আয়শার ঘরে। তিনি বললেন, আপনার কাছ থেকে মাগফীরের গন্ধ বের হচ্ছে যে। এরপর রসুল স. যখন জননী হাফসার ঘরে গেলেন, তখন তিনিও একই কথা বললেন। তিনি স. বললেন, সাওদার ঘরে আমি মধুর শরবত পান করেছিলাম। সম্ভবত এটা তারই গন্ধ। ঠিক আছে, পণ করলাম, আর কখনো মধুপান করবো না। তাঁর একথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। হাফেজ ইবনে হাজার বোখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. মধুর শরবত পান করেছিলেন জননী জয়নাবের ঘরেই, জননী সাওদার ঘরে নয়। কেননা বর্ণনাটি উবায়েদ ইবনে উমায়েরের মাধ্যমে এসেছে, যা ওই বর্ণনাটির চেয়ে অধিক দৃঢ়, যা এসেছে ইবনে মুলায়িকার মাধ্যমে। এমতো সিদ্ধান্তের পক্ষে ওই বর্ণনাটিও উপস্থাপন করা যেতে পারে, যা বোখারী বর্ণনা করেছেন জননী আয়েশা থেকে। বলেছেন, উম্মত জননীগণের মধ্যে দু'টো দল ছিলো। এক দলে ছিলেন হজরত আয়েশা, হজরত হাফসা এবং হজরত সাওদা। আর অপর দলে ছিলেন

হজরত উম্মে সালমা ও অন্যান্য উম্মতজননীগণ। উল্লেখ্য, জননী সাওদা যখন জননী আয়েশার দলে ছিলেন, তখন তাঁর প্রতি তাঁর ঈর্ষা হওয়ার কথা নয়। ঈর্ষা তো হওয়া উচিত অন্য দলের জননী জয়নাবের প্রতিই। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, রসুল স. মধুর শরবত পান করেছিলেন জননী জয়নাবের ঘরেই, জননী সাওদার ঘরে নয়।

উপযোগ ঃ ওরওয়ার মাধ্যমে বোখারী বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স.কে মাঝে মাঝে মধুর শরবত পান করতে দিতেন হাফসা। রসুল স. মিষ্টি ও মধু খুব পছন্দ করতেন। তাঁর পবিত্র অভ্যাস ছিলো সাধারণত আসরের নামাজের পরে তিনি স. তাঁর সহধর্মিণীগণের প্রকোষ্ঠে যেতেন। একদিন তিনি স. আসরের পর প্রবেশ করলেন হাফসার প্রকোষ্ঠে। সেখানে অবস্থান করলেন বেশ কিছুক্ষণ। তাঁকে সেখানে দেরী করতে দেখে আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম, হাফসার কোনো এক আত্মীয়া তাকে মধু উপহার দিয়েছে। সেই মধুর শরবত বানিয়ে সে রসুলুল্লাহ্‌কে পান করাচ্ছে। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! এর একটা কিছু বিহিত আমি করবোই। (যাতে রসুল স. আর তার প্রকোষ্ঠে গিয়ে মধুর শরবত পান না করেন)। আমি তখন সাওদাকে গিয়ে বললাম, রসুল স. যখন তোমার কাছে আসবে, তখন তুমি তাকে বোলো, আপনি মাগফীর পান করেছেন। তিনি বলবেন, না তো। তুমি বোলো, তাহলে আমি গন্ধ পাচ্ছি কিসের? তুমি তো জানোই মাগফীরের গন্ধ তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। তাই তিনি তোমার কথা শুনে বলবেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। তুমি বোলো, মৌমাছিরা তাহলে মাগফীরের ফুলের রেনু থেকে মধু সংগ্রহ করেছে। আর শোনো, আমার কাছে যখন তিনি আসবেন, তখন আমিও তাঁকে এরকম করে বলবো। সাফিয়্যাকেও বলে দিবে, সে-ও যেনো এরকম করে বলে। এরপর রসুল স. যখন সাওদা, সাফিয়্যা ও আমার কাছে এলেন তখন আমরা সাজানো কথাগুলো বললাম। তিনি বেশ বিব্রত হলেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় হাফসার কাছে যখন গেলেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! মধুর শরবত

www.eelm.weebly.com

কি আরো পান করবেন? তিনি বললেন, না, না। মধুর শরবতের প্রয়োজন আর নেই। সাওদা আমাকে একান্তে ডেকে বললো, কাজটা কি ঠিক হলো? আমরা তো আল্লাহ্‌র রসুলকে মধুপান থেকে বঞ্চিত করলাম। আমি বললাম, চুপ।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এই বর্ণনাটির মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স.কে মধুর শরবত পান করাতেন জননী হাফসা। তবে বর্ণনাগত বৈষম্যের সুরাহা করা যেতে পারে এভাবে— দু'টো বর্ণনাই সঠিক। কেননা এরকম ঘটনা ঘটেছিলো দু'বার দু'জনের ঘরে। তবে বর্ণনাদুটোর মধ্যে একটি অধিকতর প্রাধান্য প্রদানের কথা যদি ওঠে, তবে বলা যেতে পারে উবায়েদ ইবনে উমায়ের সূত্রে প্রাপ্ত বর্ণনাটিই অধিক শক্তিশালী। আর হজরত ইবনে আব্বাস একথা বলেছেন। তাছাড়া এই মন্তব্যটি তাঁর বক্তব্যের পক্ষে যে, উম্মত জননীগণের দু'টি দলের একটিতে জননী আয়েশার সঙ্গে জননী হাফসাও ছিলেন। সুতরাং তাঁদের দু'জনের মধ্যে ঈর্ষা না হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই এরকম বলাই উত্তম যে, মধুর শরবত পান করার ঘটনা ঘটেছিলো দু'বার— একবার জননী

জয়নাবের ঘরে, আর একবার জননী হাফসার ঘরে। আর জননী জয়নাবের ঘরে যখন রসুল স. মধুর শরবত পান করেন, তখন জননী আয়েশা ও জননী হাফসা ছিলেন একই দলে। আর হাফসার ঘরে যখন তিনি স. মধুর শরবত পান করেন, তখন জননী আয়েশা, জননী সাওদা ও জননী সাফিয়্যাকে নিয়ে তা বন্ধ করার চেষ্টা করেন। তাঁদের এমতো পরিকল্পনায় বিব্রত হয়েই রসুল স. পণ করেন, তিনি আর কখনো মধু পান করবেন না। আর তখনই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। উল্লেখ্য, আয়াতে নির্দিষ্ট করে একথা বলা হয়নি যে, তিনি স. কার ঘরে মধুর শরবত পান করেছিলেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণরূপে ইমাম কুরতুবীও সেরকম কিছু বলেননি। আবার ওই বিবরণটিও যথাযথ নয়, যেখানে বলা হয়েছে, জননী আয়েশা, জননী সাওদা ও জননী সাফিয়্যার জোটবদ্ধতার কথা। কেননা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিবচন বোধক শব্দরূপ, বহুবচনবোধক শব্দরূপ এখানে ব্যবহৃত হয়নি। সুতরাং বুঝতে হবে এরকম জোট পাকিয়েছিলেন উম্মত জননীগণের মধ্যে যে কোনো দু'জন, এর অধিক নন। আর এমতো সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যসম্মতও।

আরো একটি উপায়ে এ সম্পর্কিত বর্ণনাবৈষম্য দূর করা যেতে পারে। যেমন— রসুল স. জননী হাফসার ঘরে মধুর শরবত পান করার পর যখন মাগফীরের গন্ধের কথা শুনালেন, তখন তাঁর ঘরে মধুর শরবত পান করা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো শপথ করলেন না। পরে যখন জননী জয়নাবের ঘরে মধু পান করার পর একই অভিযোগ শুনলেন, তখন তিনি শপথ করলেন, আর কখনো মধুর শরবত পান করবেন না। আর তখনই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাফে বলেছেন, আমি একবার এই আয়াত সম্পর্কে জননী উম্মে সালমার কাছে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, আমার কাছে একটি শাদা মধুর পাত্র ছিলো। রসুল স. ওই পাত্রের মধু পান করতেন। মধু তাঁর পছন্দও ছিলো খুব। একদিন তিনি মধু পান করে আয়েশার কাছে যেতেই সে বলে উঠলো, এই মধুর মৌমাছিরা তো দুর্গন্ধযুক্ত ফুলের রেনু পান করে। একথা শুনেই রসুল স. প্রতিজ্ঞা করলেন, আর তিনি মধু পান করবেন না। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। তিবরানী। সুদ্দী তাঁর তাফসীরে এই বর্ণনাটিকে চিহ্নিত করেছেন সুপরিণত শ্রেণীর রূপে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, বর্ণনাটি অপরিণত ও বিরল।

অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতার মতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উম্মত জননী হজরত মারিয়া সম্পর্কে। বাগবী লিখেছেন, রসুল স. তাঁর পত্নীগণের জন্য পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। একবার জননী হাফসার পালা যখন পড়লো তখন তিনি রসুল স. এর কাছে পিতৃদর্শনের জন্য পিতৃগৃহে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি স. অনুমতি দিলেন। জননী হাফসা চলে গেলেন। রসুল স. তখন ওই ঘরেই ডেকে আনলেন জননী মারিয়াকে। সেখানেই তাঁর সঙ্গে একান্তে মিলিত হলেন তিনি। ইত্যবসরে জননী হাফসা ফিরে এসে দেখলেন ঘর বন্ধ। সেখানেই বসে পড়লেন তিনি এবং কাঁদতে লাগলেন মনের কষ্টে। রসুল স. যখন

বের হলেন তখন জননী হাফসাকে দেখতে পেয়ে বললেন, কী ব্যাপার! তুমি এখানে বসে কাঁদছো কেনো? জননী হাফসা বললেন, আপনি তাহলে এ উদ্দেশ্যেই আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন? আপনি আমার শয্যায় ক্রীতদাসীকে স্থান দিলেন। আমার পালার দিনে নৈকট্য দান করলেন তাঁকে। আপনার কাছে দেখছি আমার কোনো মূল্যই নেই। রসুল স. বললেন, তাকে কি আল্লাহ্ আমার জন্য হালাল করেননি? ঠিক আছে, আর কেঁদো না। তোমাকে খুশী করার জন্য আমি তাকে আমার জন্য হারাম করে নিলাম। তবে এ কথা তুমি কিন্তু তোমার সপত্নীদের কাউকে বোলো না। কিন্তু রসুল স. স্থান ত্যাগ করার পরেই জননী হাফসা জননী আয়েশার প্রকোষ্ঠে গেলেন। বললেন, শোনো একটি সুসংবাদ। রসুলুল্লাহ্ মারিয়াকে হারাম ঘোষণা করেছেন। এখন আমরা আল্লাহ্‌র রসুলের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয়া হবো। উল্লেখ্য জননী হাফসা ও জননী আয়েশার মধ্যে ছিলো গভীর অন্তরঙ্গতা। তাই তিনি জননী আয়েশাকে একথা না বলে পারলেন না।

যথাসূত্রে বায্যার বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো রসুল স. এর জনৈকা ক্রীতদাসী সম্পর্কে। ইবনে জাওজী তাঁর 'আত্তাহকীক' গ্রন্থে স্বসূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন,

জননী আয়েশা এবং জননী হাফসার মধ্যে ছিলো গভীর সখ্য। একবার জননী হাফসা কোনো কর্মোপলক্ষে গেলেন বাপের বাড়িতে। ফিরে এসে দেখলেন তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ। তিনি সেখানেই বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে ঘর থেকে জনৈকা ক্রীতদাসীকে চলে যেতে দেখে তিনি খুব দুঃখ পেলেন। প্রচণ্ড অভিমানের সঙ্গে রসুল স.কে বললেন, আমি তো দেখছি আপনি আমাকে জ্ঞান করেন ক্রীতদাসীতুল্য। তিনি স. বললেন, তুমি যদি প্রীতা হও, তবে আমি তোমাকে একটি গোপন কথা বলতে পারি। কথাটা কিন্তু তুমি আর কাউকে বোলো না। তিনি বললেন, কী? রসুল স. বললেন, আমি ওই ক্রীতদাসীটিকে আমার জন্য হারাম করে নিলাম। তুমি সাক্ষী থেকো। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

যথাসূত্রে হাকেম ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. এর এক বাঁদী ছিলো, যার সঙ্গে তিনি স. মাঝে মাঝে একান্তে মিলিত হতেন। জননী হাফসা তাঁর পিছনে লেগেই ছিলেন, যতক্ষণ না রসুল স. তাঁকে নিজের জন্য হারাম করে না নেন। 'আল মুখতার' গ্রন্থে এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আমার সহোদরা হাফসাকে বললেন, তুমি কাউকে যেনো বোলো না, আমি ইব্রাহিমের মাকে আমার জন্য হারাম করে নিয়েছি। হাফসা কিন্তু পেটে কথা রাখতে পারেননি। বলে দিয়েছিলেন তাঁর সপত্নী আয়েশাকে। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। এ সকল হাদিসের দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো জননী মারিয়া কিবতীয়াকে লক্ষ্য করে, যখন রসুল স. তাঁকে নিজের জন্য নিষিদ্ধা করে দিয়েছিলেন। অথচ আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতরূপে ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে মধুর শরবত পান সম্পর্কিত হাদিসসমূহ। হাফেজ ইবনে হাজার

এগুলোর সমন্বয় সাধনার্থে বলেছেন, সম্ভবত দু'টো ঘটনাই ছিলো আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। তাঁর এমতো অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায় ইয়াজিদ ইবনে রুম্মানের বিবরণে, যা বিবৃত হয়েছে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক। বর্ণনাটি এই— একবার জননী হাফসার কাছে মধুভর্তি একটি ভাণ্ড হাদিয়া হিসেবে এলো। রসুল স. মধু খুব পছন্দ করতেন। তাই তাঁর কাছে ঘন ঘন মধু পান করতে যেতে শুরু করলেন। স্বাভাবিক নিয়মের চেয়ে তাঁর ঘরে অধিক সময়ও ক্ষেপণ করতে লাগলেন তিনি স.। একবার তাঁকে এরকম দেরী করতে দেখে জননী আয়েশা তাঁর এক দাসীকে বললেন, তুমি গিয়ে দেখে এসো তো উনি এতক্ষণ ধরে সেখানে কী করছেন। দাসী দেখে এসে বললো, তিনি সেখানে বসে মধুর শরবত পান করছেন। জননী আয়েশা সকল উম্মতজননীকে জড়ো করে বললেন, রসুল স. তোমাদের কাছে এলে তোমরা সকলেই বোলো, আপনার কাছ থেকে মাগফীরের গন্ধ ভেসে আসছে কেনো? সকলে তা-ই করলেন, রসুল স. যখন প্রত্যেকের কাছে একই কথা শুনতে পেলেন, তখন বললেন, আমি তো মধুর শরবত পান করেছি। ঠিক আছে, শপথ করলাম, আর কখনো এরকম করবো না। এর পরে ঘটলো আর একটি ঘটনা। জননী হাফসার পালা যেদিন এলো, সেদিন তিনি রসুল স. এর অনুমতি নিয়ে বাপের বাড়ি গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন রসুল স. তাঁর ঘর অর্গলাবদ্ধ করেছেন জনৈকা দাসীকে নিয়ে। তিনি সেখানে বসেই ক্ষোভে অভিমানে কাঁদতে শুরু করলেন। রসুল স. যখন বের হয়ে এলেন, তখন তিনি কাঁদতে শুরু করলেন আরো বেশী করে। তিনি স. বললেন, ভবিষ্যতের জন্য ওই রমণী আমার জন্য নিষিদ্ধ। একথাটা তুমি কিন্তু আবার আর কাউকে বোলো না। রসুল স. চলে গেলেন। জননী হাফসা খুশী চেপে রাখতে না পেরে জননী আয়েশাকে ডেকে বললেন, শুনেছো, রসুলুল্লাহ্ ওই বাঁদীকে হারাম করে দিয়েছেন।

আমি বলি, এই বর্ণনাটিতে দু'টো ঘটনাকে এক করে ফেলা হয়েছে। সম্ভবত এরকম করেছেন বর্ণনাকারী নিজে। কিন্তু এখানে জননী জয়নাবের ঘরে মধুর শরবত পান করার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতগুলোর মধ্যে জননী মারিয়ার ঘটনাটিই অধিক শক্তিশালী। কেননা এতে করে কেবল জননী আয়েশা ও জননী হাফসার সঙ্গে বিষয়টি সুসম্পৃক্ত হয়। কিন্তু বাদ পড়ে যায় মধুর শরবত পান করার বিষয়টি। পক্ষান্তরে মধুর শরবত পানের ঘটনাটিকে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত হিসেবে গ্রহণ করলে ঘটনাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যান তিন জন— জননী সাওদা, জননী আয়েশা ও জননী সাফিয়্যা। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিবচনবোধক ক্রিয়া। অতএব একথা মেনে নিতে আর কোনো বাধা নেই যে, জননী মারিয়ার ঘটনাটিই ছিলো আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রকৃত প্রেক্ষাপট।

'তাব্তাগী মারদ্বাতা আয্ওয়াজ্বিকা' অর্থ তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাইছো। কথাটিতে বিবৃত হয়েছে বৈধ বস্তু অবৈধ করার ব্যাখ্যা। অথবা বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য, যার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে হালালকে হারাম করার কারণ।

'ওয়াল্লহু গফুরুন' অর্থ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল। অর্থাৎ বৈধকে অবৈধ ঘোষণার জন্য যে অনর্থক শপথ আপনি করেই ফেলেছেন, আল্লাহ্ তা মার্জনা করে দিয়েছেন। কেননা তিনি ক্ষমাপরবশ। আর 'রহীম' অর্থ পরম দয়ালু। অর্থাৎ হালালকে হারাম ঘোষণা করে যে জটিলতার আবর্তে আপনি পতিত হয়েছিলেন, সেখান থেকে বের হয়ে আসার পথও আল্লাহ্ আপনাকে জানিয়ে দিলেন। কেননা তিনি পরমতম মমতাপরবশও।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের কর্মবিধায়ক, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আল্লাহ্ তো আপনার এবং আপনার অনুসারীদের

www.eelm.weebly.com

শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণের বিধান দিয়ে আপনাকে ও তাদেরকে শপথের বন্ধন থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কেননা তিনিই সকল কিছুর কর্মবিধায়ক, সকলের জন্য একমাত্র বিধানদাতা। তিনি তো সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাধিকারী। উল্লেখ্য, ক্ষতিপূরণ বা কাফফারা বলে তাকে, যার দ্বারা শপথের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ দূর হয়ে যায় শপথভঙ্গের পাপ।

একটি সন্দেহ ঃ এখানকার 'ফারাদ্বা' শব্দটির আগে 'আলা' শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিলো। কেননা 'আলা'র উল্লেখ ব্যতীত বিধানটি যে ওয়াজিব তা প্রমাণ হয় না। কিন্তু এখানে তা করা হয়নি। সুতরাং এখানে কীভাবে বুঝা যাবে যে, 'কসম থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা' অর্থাৎ কাফ্ফারা প্রদান করা ওয়াজিব? আবার এখানকার 'ফারাদ্বল্লহু লাকুম' এর স্থলে বলা উচিত ছিলো 'ফারাদ্বল্লহু আ'লাইকুম'। এরকম করারই বা কারণ কী?

সন্দেহের নিরসন ঃ 'লাম' ব্যবহৃত হয় উপকার অর্জনার্থে। আর 'আলা' ব্যবহার করা হয় ক্ষতি বোঝাতে। আর এখানে উপকার প্রাপ্তিটাই কাম্য। এভাবে কাফ্ফারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হলো বলেই তো হারাম পরিবর্তিত হলো হালালে এবং এভাবে দূর হয়ে গেলো শপথভঙ্গের গোনাহ। উল্লেখ্য, শপথভঙ্গের কাফ্ফারা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান আলোচনা করা হয়েছে সুরা মায়েদার তাফসীরে।

'মাওলাকুম' অর্থ এখানে কর্মবিধায়ক, কার্যপ্রণেতা, সহায়তাদাতা। 'ওয়া হুয়াল আ'লীমু' অর্থ তিনি সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ হে আমার নবী! আপনার কল্যাণ কীভাবে হবে, সে সম্পর্কে তিনি ভালো করেই জানেন। আর 'আলহাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি তার কর্ম ও বিধান সম্পর্কে অতুলনীয়রূপে প্রজ্ঞাধিকারী।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. কোনো কাফফারা আদায় করেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে রয়েছে বিস্তর মতপ্রভেদ। মুকাতিল বলেছেন, জননী মারিয়াকে হারাম করার শপথভঙ্গের কাফফারা হিসেবে রসুল স. মুক্ত করে দিয়েছিলেন একটি ষাঁড়। হাসান বলেছেন, এর জন্য তিনি স. কোনো কাফফারা আদায় করেননি। আল্লাহ্ তাঁর এমতো অনবধান এমনিতেই মার্জনা করে দিয়েছিলেন। আমার মতে এ সম্পর্কে মুকাতিলের মন্তব্যটিই সঠিক। কেননা আগের আয়াতে 'আল্লাহ্ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তা নিষিদ্ধ করছো

কেনো' বলার পর এখানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন'। অর্থাৎ বিধান দিয়েছেন কাফফারা প্রদানের। এতে করে বুঝা যায়, এ ঘটনায় রসুল স. এর উপরে কাফফারা প্রদান করা ছিলো ওয়াজিব। এখন অবশিষ্ট রইলো, মার্জনা করে দেওয়ার বিষয়টি। মার্জনা করা তো কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী নয়। আর একটি বিষয় অবশ্যস্মর্তব্য যে, রসুল স. ছিলেন চিরক্ষমাপ্রাপ্ত। তৎসত্ত্বেও নামাজে ভুল হওয়ার কারণে তাঁর উপরে সোহ্ সেজদা করা ছিলো ওয়াজিব। তদুপরি মুকাতিলের কথাটি সাব্যস্তকারী এবং হাসানের বক্তব্যটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। আর এমতোক্ষেত্রে সাব্যস্তকারীর বক্তব্যই অধিক প্রাধান্য প্রাপ্তির যোগ্য। তাছাড়া মুকাতিলের কথার সমর্থন পাওয়া যায় হজরত ইবনে আব্বাসের এক বর্ণনাতেও, যেখানে তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত 'ওয়া লাকুম ফী রসুলিল্লাহি উস্ওয়াতুন হাসানাহ্'। আবার স্বসূত্রে হারেছ ইবনে আবী উসামা বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, যখন আমার পিতা মান্যবর আবু বকর এই মর্মে শপথ করলেন যে, মিসতাহ্কে তিনি কিছুই দিবেন না, তখন অবতীর্ণ হয় 'আল্লাহ্ তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন'। বোখারী, মুসলিম। অবশ্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পটভূমিরূপে এই বর্ণনাটি সর্বাধিক দুর্বল।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ ও ইমাম আওজায়ী বলেছেন, 'আমি আমার ক্রীতদাসীকে আমার জন্য হারাম করে নিলাম' 'এই খাদ্য আমার জন্য হারাম' 'এজাতীয় আহার্য্য আমার জন্য নিষিদ্ধ'— এ ধরনের কথা শপথ পদবাচ্য, যদিও 'শপথ' কথার উল্লেখ এগুলোতে নেই। জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এরকমই বলা হয়েছে। আর এখানেও দেখা যাচ্ছে, বৈধকে অবৈধ ঘোষণা করার শপথ। যেমন 'হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তা নিষিদ্ধ করছো কেনো'। তারপর বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন'। অর্থাৎ 'কসম' বা 'শপথে'র উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও বৈধকে অবৈধ ঘোষণা শপথ পদবাচ্য। শপথভঙ্গের বিধান তো দেওয়া হয়েছে সেকারণেই। সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. হালালকে হারাম বানানোর কাফ্ফারা প্রদান করতেন। 'লাক্বদ কানা লাকুম ফী রসুলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ্' কথাটির মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয়।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হালালকে হারাম বানালো তা কসম হয় না। তাই রসুল স. তাঁর ক্রীতদাসীকে হারাম বানানোর কারণে যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছিলেন, তা শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ নয়। আর আহার্য্যদ্রব্য হারাম করে নেওয়ার বিষয়টি তো কোনো কসমই নয়।

কেউ যদি তার নিজের স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য হারাম, অথবা যদি বলে তোমাকে আমি আমার জন্য হারাম করে নিয়েছি, তবে এমতোক্ষেত্রে যদি তার তালাকের নিয়ত থাকে, তবে তার স্ত্রী হয়ে যাবে তালাক। আর যদি জেহারের

www.eelm.weebly.com

নিয়ত থাকে, তবে তা হবে জেহার। আর কোনো নিয়ত না থাকলে ইমাম শাফেয়ীর মতে আদায় করতে হবে কসমের কাফফারা। আর ইমাম আবু হানিফার মতে, এটা হবে ইলা এবং কাফ্ফারা দিতে হবে ইলা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর।

বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণ করা দুষ্কর যে, সাধারণভাবে ওই বস্তু হারাম, অথবা এরকম হারাম করাটা কসম হয়ে যায়, কাফফারা ওয়াজিব হলেও। তাছাড়া এরকমও তো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, রসুল স. তখন কসমের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বায়যাবীর এ মন্তব্যটি দুর্বলতাদুষ্ট। কেননা সেরকম হলে আয়াতে কসম কথাটির উল্লেখ থাকতো। কিন্তু শব্দটির উল্লেখ ছাড়াই এখানে সাধারণভাবে বলা হয়েছে আল্লাহ্ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তা নিষিদ্ধ করছো কেনো? পরে আবার বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ তোমাদের কসম থেকে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেছেন'। এতে করে এটাই প্রমাণিত হয় যে, নিজে থেকে হালালকে হারাম ঘোষণা করলে তা হয়ে যায় কসম।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো— নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিলো'। এখানে 'স্ত্রীদের একজন' অর্থ জননী হাফসা। আর 'গোপন কথা' অর্থ মধুপান নিজের জন্য হারাম করে নেওয়া, যেমন বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন উবায়েদ ইবসে উমায়ের সূত্রে জননী আয়েশা থেকে। অথবা 'গোপন কথা' অর্থ জননী মারিয়াকে হারাম করে নেওয়ার কথা। তাফসীরকারগণের মতে শেষোক্ত অভিমতটিই অধিকতর শুদ্ধ। তবে আল্লাহ্পাকই জানেন, কথাটা গোপন করার মধ্যে কী যৌক্তিকতা ছিলো। শো'বা সূত্রে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জননী আয়েশার পালার দিন জননী হাফসা তাঁর ঘর থেকে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর শূন্য ঘরে রসুল স. গোপনে মিলিত হলেন তাঁর কিবতী ক্রীতদাসী মারিয়ার সঙ্গে। কিছুক্ষণ পর জননী হাফসা এসে তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ দেখে সেখানেই বসে পড়লেন। রসুল স. যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁকে বললেন, আপনার কাণ্ড তো আমি দেখলাম। রসুল স. বললেন, দেখলেই যখন, তখন কথাটা আর প্রকাশ কোরো না। মারিয়াকে আমি ভবিষ্যতের জন্য হারাম করে নিলাম। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত কথাটা গোপন রাখতে পারলেন না। বলে দিলেন জননী আয়েশাকে। জননী আয়েশা তখন অভিমান করলেন। রসুল স.কে বললেন, আমার পালার দিন আপনি কিবতী রমণীকে সঙ্গ দান করেন। অথচ অন্যদের পালার দিন এরকম করেন না। তাঁর এমতো কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। এই বর্ণনাটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, জননী আয়েশা যাতে অতুষ্ট না হন, সেকারণেই রসুল স. কথাটি গোপন রাখতে বলেছিলেন।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'গোপন কথা' অর্থ খেলাফত সম্পর্কিত গোপন কথা। কালাবী বলেছেন, রসুল স. জননী হাফসাকে বলেছিলেন, আমার পরে আয়েশার পিতা ও তোমার পিতা পালাক্রমে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে। ওয়াহেদীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত

ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের খলিফা হওয়ার কথা কোরআনে বলে দেওয়া হয়েছে এভাবে 'স্মরণ করো— নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপন একটি কথা বলেছিলেন'। একথার অর্থ— রসুল স. জননী হাফসাকে বলেছিলেন, আমার পরে তোমার পিতা ও আয়েশার পিতা জনশাসক হবে। কথাটা তুমি কারো কাছে প্রকাশ কোরো না। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে অন্যান্য সূত্রেও। হজরত আলী, মায়মুন ইবনে মেহরান, হাবীব ইবনে সাবেত, জুহাক ও মুজাহিদের বিবরণও এরকম। মায়মুন ইবনে মেহরানের বিবৃতিটি এরকম— রসুল স. তাঁকে চুপি চুপি বলেছিলেন, আমার স্থলাভিষিক্ত হবে আবু বকর। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিলো'। একথার অর্থ— জননী হাফসা যখন গোপন কথাটা জননী আয়েশাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন'।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তখন নবী এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলো এবং কিছু অব্যক্ত রাখলো'। একথার অর্থ— জননী হাফসা যে জননী আয়েশাকে গোপন কথা জানিয়ে দিয়েছেন, সে কথা আল্লাহ্ তাঁর নবীকে জানালেন। নবী তখন তার কিছু অংশ জননী হাফসাকে ডেকে বললেন এবং কিছু অংশ বললেন না। এরকম ব্যাখ্যা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জননী আয়েশা যদিও মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন, তবুও তিনি রসুল স.কে মুখ ফুটে কিছু বলেননি। আল্লাহ্ই রসুল স.কে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কথাটা আর গোপন নেই, ইতোমধ্যে তা আয়েশার কাছে বলে দেওয়া হয়েছে।

ক্বারী কাসাইয়ের ক্বেরাতে এখানকার 'আ'র্‌রাফা' কথাটি উচ্চারিত হয়েছে 'আ'রাফা' 'র' অক্ষরে তাশদীদ ব্যতিরেকে। এরকম উচ্চারণ করলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়ার কারণে রসুল স. কিছু শাস্তি দিলেন জননী হাফসাকে এবং কিছু জননী আয়েশাকে। কেননা 'আ'রাফা' শব্দটি এসেছে 'ইরফান' থেকে। আর এর অর্থ জানা যেমন হয়, তেমনি হয় শাস্তি দেওয়াও। যেমন কারো আচরণে অতুষ্ট হলে লোকে বলে, আমি তোমার সম্পর্কে জানি। অর্থাৎ আমি তোমাকে শাস্তি দিবো। আর রসুল স. গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য শাস্তিস্বরূপ জননী হাফসাকে তালাক দিয়েছিলেন। হজরত ওমর একথা জানতে পেরে বলেছিলেন, খাত্তাবের বংশে যদি কোনো মঙ্গল থাকতো, তাহলে রসুল স. তোমাকে তালাক দিতেন না। এরপর হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে আল্লাহ্র নির্দেশে, অথবা নিজের পক্ষ থেকে বললেন, হাফসা অত্যধিক রোজা পালন করে এবং রাত জেগে নামাজ

www.eelm.weebly.com

পড়ে। সুতরাং আপনি তালাক প্রত্যাহার করুন। উল্লেখ্য, রসুল স. ওই সময় তাঁর সহধর্মিণীগণ থেকে এক মাস পৃথক থাকেন এবং অবস্থান গ্রহণ করেন ইব্রাহিম জননী মারিয়া কিবতিয়ার বসবাসস্থলে। তাঁর এমতো অবস্থা প্রলম্বিত হয়েছিলো 'আয়াতে তাখাইয়্যুর' অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত।

বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, রসুল স. জননী হাফসাকে তালাক দেননি, তালাক দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। তখন হজরত জিবরাইল এসে বলেছিলেন, হাফসা অত্যধিক রোজা পালনকারিণী, ইবাদতপ্রবণা। বেহেশতে তিনিও হবেন আপনার সঙ্গিনীগণের অন্যতমা। সুতরাং আপনার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করুন।

'এবং কিছু অব্যক্ত রাখলো' অর্থ রসুল স. জননী হাফসাকে পরে বিষয়টি খুলে বললেন না। কিছু অংশ ব্যক্ত করলেন এবং কিছু করলেন না। উল্লেখ্য, যারা মহানুভব, তাঁরা এরকমই করেন। অর্থাৎ তাঁরা অপরাধীর সামনে তার পুরো অপরাধের কথা প্রকাশ করে তাকে লজ্জিত করেন না। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন 'আল্লাহ্‌ পাপীদের সকল পাপ প্রকাশ করেন না'। রসুল স.ও এমনই করেছিলেন। জননী হাফসাকে তিনি দু'টি কথা জানিয়ে দিয়ে তা গোপন রাখতে বলেছিলেন। একটি হচ্ছে মারিয়াকে নিজের জন্য হারাম করে নেওয়া এবং অপরটি হজরত আবু বকরের জনশাসক হওয়ার সংবাদ। জননী হাফসা যখন গোপনে একথা জননী আয়েশাকে জানালেন, তখন আল্লাহ্‌ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে একথা জানিয়ে দিলেন তাঁর প্রিয়তম নবীকে। তিনি স. তখন হাফসাকে ডেকে শুধু বললেন, মারিয়াকে যে আমি আমার জন্য হারাম করে নিয়েছি, সে কথা তুমি আয়েশাকে জানালে কেনো? অপর বিষয়টি, অর্থাৎ হজরত আবু বকরের খলিফা হওয়ার সংবাদ সম্পর্কে তিনি স. আর উল্লেখ করলেন না। এদিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে 'এবং কিছু অব্যক্ত রাখলো'।

জুহাক সূত্রে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জননী হাফসা তাঁর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে রসুল স. ও মারিয়াকে দেখতে পেলেন। তিনি স. বললেন, তুমি একথা আয়েশাকে জানিয়ো না। আর একটি সুসংবাদ শোনো, আবু বকরের পরে খলিফা হবেন তোমার পিতা। জননী হাফসা উঠে গিয়ে জননী আয়েশাকে সব কথা জানালেন। জননী আয়েশা এসে বললেন, মারিয়াকে আপনার জন্য নিষিদ্ধ করে নিন। রসুল স. তাই করলেন। পরে জননী হাফসাকে শুধু বললেন, কেনো তুমি আয়েশাকে মারিয়ার কথা জানালে? খেলাফতের বিষয়ে তিনি স. আর জননী হাফসাকে কিছু বললেন না। একথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে 'নবী এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলো এবং কিছু অব্যক্ত রাখলো'। তিবরানী তাঁর 'আল আওসাত' ও 'আশারাতুন নিসা' গ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন। তবে উভয় বর্ণনাই অ-দৃঢ়।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখন নবী তা তার সেই স্ত্রীকে জানালো, তখন সে বললো, কে আপনাকে এটা অবহিত করলো? নবী বললো, আমাকে অবহিত করেছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত'। একথার অর্থ— যখন রসুল স. গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য জননী হাফসাকে ডেকে তিরস্কার করলেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি গোপন কথা প্রকাশ করে দিয়েছি, তা কে আপনাকে জানালো? তিনি স. বললেন, সেই মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ্‌। যিনি সর্বজ্ঞ, সকলকিছুই যাঁর জ্ঞানগোচর।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করো, তবে ভালো, কারণ তোমাদের হৃদয় তো ঝুঁকে পড়েছে'। এখানে 'তোমরা' বলে বুঝানো হয়েছে জননী হাফসা ও জননী আয়েশাকে। তবে জননী আয়েশা থেকে উবায়েদ ইবনে উমায়ের সূত্রে বোখারী ও মুসলিমের যে বিবরণ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে করে বুঝা যায়, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে কেবল জননী হাফসাকে।

'ফাক্বদ সগত ক্বুলূবুকুমা' অর্থ তোমাদের হৃদয় তো ঝুঁকে পড়েছে। কেননা তোমরা দু'জনে পছন্দ করেছো ওই বিষয়টিকে, যা আল্লাহ্‌র রসুলের পছন্দ নয়। তিনি মারিয়াকে তাঁর জন্য নিষিদ্ধা করা যেমন পছন্দ করেননি, তেমনি পছন্দ করেননি গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়াকেও। অথচ প্রত্যেক বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীর উচিত তিনি যা পছন্দ করেন, তা-ই পছন্দ করে নেওয়া এবং যা অপছন্দ করেন, তাকে অপছন্দ করা। তোমরা সেরকম করোনি। সুতরাং এখন ভালোয় ভালোয় তওবা করে নাও, প্রত্যাবর্তন করো অশোভন ও অসমীচীন মানসিকতা থেকে।

এখানকার 'ফাক্বদ' শব্দটির 'ফা' (অতঃপর) অব্যয়টি কারণপ্রকাশক। আর প্রণিধাননীয় যে, অন্যায়ের দিকে আকৃষ্ট হওয়া পাপকে অত্যাবশ্যক করে। আর পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনও অত্যাবশ্যক। বোখারী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, অনেকদিন ধরে আমি ভেবে রেখেছিলাম, খলিফা হজরত ওমরের কাছে আমি এই মর্মে জানতে চাইবো যে, 'তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে' এই আয়াতে রসুল স. এর কোন্‌ সহধর্মিণীদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেরকম কোনো সুযোগ পাচ্ছিলাম না। একবার তিনি হজে গমন করলেন। আমিও তাঁর সঙ্গ নিলাম। পথিমধ্যে একস্থানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন দেখা দিলো। তিনি একদিকে সরে গেলেন। আমিও পানি সংগ্রহ করে আনলাম। প্রয়োজন শেষে তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন আমি তাঁর হাতে

www.eelm.weebly.com

পানি ঢেলে দিতে দিতে বললাম, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! 'যদি তোমরা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করো, তবে ভালো' এই আয়াতে কোন দু'জন উম্মতজননীর কথা বলা হয়েছে? তিনি বললেন, জানো না! আয়েশা ও হাফসা। এরপর তিনি বলতে শুরু করলেন, আমি এবং মদীনার উপকণ্ঠের আওয়ালী এলাকার অধিবাসী উমাইয়া ইবনে জায়েদ গোত্রের এক আনসারী মিলে ঠিক করেছিলাম, আমরা দু'জন পালাক্রমে রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকবো— একদিন আমি, আর একদিন সে। এভাবে উপস্থিত থেকে আমরা দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে জেনে নিবো প্রতিদিনের প্রত্যাদেশ এবং অন্যান্য ঘটনা।

আমরা, কুরায়েশ কুলোদ্ভূতরা পত্নীদেরকে সব সময় শাসনে রাখি। কিন্তু মদীনায় এসে আমরা প্রথম দেখলাম, এখানকার নারীরা পুরুষদের উপর প্রভাব বিস্তার করে রাখে। এ অবস্থা দেখে আমাদের স্ত্রীরাও আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলো। একদিন আমি আমার স্ত্রীকে ধমক দিলাম।

সে-ও আমাকে কড়া কথা শুনিয়ে দিলো। আমি অতুষ্ট হলাম। স্ত্রী বললো, তুমি নারাজ হচ্ছো কেনো? রসুল স. এর স্ত্রীগণও তো এরকম করেন। আজ তো সারাদিন ধরে তাঁর কোনো কোনো স্ত্রী তাঁর সঙ্গে আড়ি দিয়ে বসে আছেন। একথা শুনে আমি শংকিত হলাম। বললাম, এরকম যে করবে, সে ব্যর্থ হবে। আমি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে গেলাম হাফসার কাছে। বললাম, তোমরা নাকি কেউ কেউ আজ সারাদিন রসুলের সঙ্গে আড়ি দিয়ে বসে আছো? হাফসা বললো, হ্যাঁ। আমি বললাম, যে এরকম করবে, সে অসফল হবে। তোমাদের কি একটুও ভয় হয় না যে, রসুল অতুষ্ট হলে আল্লাহ্‌ও অপরিতুষ্ট হবেন। এরকম ব্যক্তির ধ্বংস তো অনিবার্য। সাবধান! অধিক খরচপত্রের দাবি তুলে আল্লাহ্‌র রসুলকে কষ্ট দিয়ো না। তাঁকে কখনো পরিত্যাগ কোরো না। তোমার কিছু দরকার হলে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ো। আর সপত্নীদের (বিশেষ করে আয়েশার) প্রতি কখনো ঈর্ষান্বিতাও হয়ো না।

হজরত ওমর আরো বললেন, ওই সময় গাস্‌সান গোত্রের লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো। এমনি সময় আমার সেই আনসারী বন্ধু এসে আমার গৃহের দরজায় সজোরে আঘাত করতে লাগলো। তখন ছিলো এশার সময়। আমি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই সে বললো, শুনেছেন, আজ এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। আমি বললাম, গাস্‌সানীরা কি আক্রমণ করেছে? সে বললো, না। এর চেয়ে সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে আজ। রসুল স. তাঁর সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন। আমি বললাম, হাফসাকেও? আমার তো আগেই মনে হয়েছিলো, এরকম কিছু না ঘটে পারে না। আমি ফজরের নামাজ রসুল স. এর সঙ্গে পড়লাম। নামাজ শেষে তিনি তাঁর কোনো স্ত্রীর কাছে গেলেন না। অবস্থান গ্রহণ করলেন স্বীয় প্রকোষ্ঠে। আমি হাফসার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলাম, দেখলাম, সে কাঁদছে। আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমি কি আগেই তোমাকে সাবধান করে দেইনি? মসজিদে ফিরে এলাম আমি। দেখলাম, মিম্বরের কাছে কিছুসংখ্যক লোক জড়ো হয়ে কাঁদছে। আমিও তাদের কাছে বসে পড়লাম। কিন্তু মনকে শান্ত করতে পারলাম না। গেলাম রসুল স. এর বসবাস স্থলে। দেখলাম সেখানে তিনি একা। বাইরের দরজায় আছে কেবল তাঁর জনৈক পরিচারক। আমি তাকে বললাম, রসুল স. এর কাছ থেকে আমার সাক্ষাতের অনুমতি এনে দাও। সে ভিতরে গেলো। একটু পরে ফিরে এসে বললো, আমি আপনার কথা বললাম। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম। বসলাম ওই লোকদের সঙ্গে। কিন্তু অস্থিরতাকে দমন করতে পারলাম না। পুনরায় হাজির হলাম। রসুল স. এর পরিচারককে গিয়ে বললাম, আমার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করো। সে এবারেও ভিতরে গেলো। ফিরে এসেই বললো, আমি তো বললাম। কিন্তু তিনি যে কিছুই বললেন না। আমি ফিরে আসতে উদ্যত হতেই পরিচারক বললো, রসুল স. আপনাকে ডাকছেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, তিনি বিশ্রাম করছেন একটি চাটাইয়ের উপর। চাটাইয়ের দাগ পড়েছে তাঁর পবিত্র শরীরে। মাথার নিচে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি একটি বালিশ।

আমি ঢুকতেই তিনি উঠে বসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম জন! আপনি কি আপনার সহধর্মিণীগণকে পরিত্যাগ করেছেন? তিনি বললেন, না। আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি বললাম, কুরায়েশ স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের শাসন মেনে নেয়। কিন্তু মদীনায় আগমনের পর তারা দেখছি এখানকার মেয়েদের মতো স্বামীদেরকে বশীভূত করে রাখতে চায়। তিনি মৃদু হাসলেন। বললাম, আমি হাফসার কাছে গিয়েছিলাম। তাকে বলেছি, সে যেনো তার সপত্নীদেরকে হিংসা না করে। তিনি আবারো মৃদু হাসলেন। তাঁর প্রসন্ন রূপ দেখে আমি বসতে সাহস পেলাম। দেখলাম ঘরে তিনটি শুকনো কাঁচা চামড়া ছাড়া আর কোনো আসবাবপত্র নেই। নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! প্রার্থনা করুন, যেনো আপনার উম্মতকে আল্লাহ্‌ স্বচ্ছলতা দান করেন, যেমন তিনি স্বচ্ছলতা দিয়েছেন রোম ও পারস্যবাসীকে। তারা তো আল্লাহ্‌র ইবাদতও করে না। তিনি এতোক্ষণ বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমার কথা শুনে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর বললেন, হে খাত্তাবতনয়! তুমি এভাবে ভাবছো কেনো? আল্লাহ্‌ তো তাদেরকে দুনিয়াই দিয়েছেন (আখেরাতের নেয়ামতে তাদের কোনো অংশ নেই)। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আল্লাহ্‌ সকাশে আমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। তাঁর সঙ্গে এতটুকুই কথা হয়েছিলো আমার। তিনি তো গোস্‌সা করে তাঁর সকল সহধর্মিণীকে ছেড়ে তখন কয়েকদিনের জন্য হয়ে গিয়েছিলেন পৃথক। আর হাফসা আয়েশাকে গোপন কথা বলে দিয়েছিলেন বলেই তিনি এরকম করেছিলেন।

আল্লাহ্ যেহেতু তাঁর প্রিয়তম নবীকে স্নেহসিক্ত ভর্ৎসনা করেছিলেন, তাই রসুল স. রাগ করেছিলেন তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণীগণের উপর। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এক মাস তিনি কারো সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। জননী আয়েশা বলেন, অন্য অনেকের মতো আমিও দিন গণনা করে যাচ্ছিলাম। গত হলো ঊনতিরিশ দিন। রসুল স. সর্ব প্রথম শুভপদার্পণ করলেন আমারই গৃহে। বললাম— হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল— আপনি তো একমাসের জন্য পৃথকবাসের শপথ করেছিলেন? আর আজ অতিক্রান্ত হলো ঊনত্রিশ দিন। তিনি স. বললেন, মাস তো কখনো উনতিরিশ দিনেও হয়ে থাকে। বাস্তবিকই সে মাস হয়েছিলো উনতিরিশ দিনেই। জননী আয়েশা বলেন, তখন অবতীর্ণ হলো আয়াতে 'তাখাইয়্যুর'। তিনি স. প্রথমে আমার কাছে এলেন। পাঠ করে শোনালেন নতুন আয়াত। আমি সর্বান্তঃকরণে চিরকালের জন্য তাঁকেই গ্রহণ করে নিলাম। আমার অন্যান্য সপত্নীগণও তাই করলেন। তিনি স. তখন আমাকে বলেছিলেন, আয়েশা! তুমি তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে জবাব দিয়ো। তিনি স. ভালো করেই জানতেন, আমার পিতা-মাতা কখনোই আমাকে রসুলের বিবাহবন্ধন ছিন্ন করার পরামর্শ দিবেন না। তিনি স. পাঠ করলেন 'হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিনীগণকে বলুন; যদি তোমরা কামনা করো পার্থিব জীবন'..... আয়াত দুটি' শেষ পর্যন্ত। আমি বললাম, পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ করে কী হবে? আমি তো চাই আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল ও পরজগতের কল্যাণ। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, জননী হাফসা জননী আয়েশাকে গোপন কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন বলেই রসুল স. এক মাস পৃথক ছিলেন তাঁর সহধর্মিণীগণ থেকে।

তাফসীরে মাযহারী/৫৯৭

কিন্তু মুসলিমের বর্ণনায় ঘটনাটি এসেছে এভাবে— হজরত জাবের বলেছেন, মান্যবর আবু বকর রসুল স. এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলেন। দেখলেন বহির্দ্বারে অনেকে বসে আছে। কাউকেই ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। অনুমতি পেলেন কেবল তিনিই। তিনি ভিতরে প্রবেশ করার কিছুক্ষণ পর এলেন মান্যবর ওমর। তাঁকেও অনুমতি দেওয়া হলো। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন পরিস্থিতি থমথমে। আল্লাহ্র রসুল চিন্তিত ও চুপচাপ। তিনি মনে মনে বললেন, আমি এমন কথা বলবো, যাতে আল্লাহ্র রসুল প্রসন্ন হন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! খারেজার বেটি (আমার স্ত্রী) যদি ব্যয়বাহুল্যের জন্য আমার উপরে দাপট খাটায়, তবে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিবো। রসুল স. একথা শুনে হেসে ফেললেন। বললেন, ওমর! দেখছো তো, আমার সহধর্মিণীরা আমার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করছে। তারা সকলে মিলে দাবি তুলেছে, তাদের খরচপত্র বাড়িয়ে দিতে হবে। একথা শুনেই আবু বকর, ওমর দু'জনে বেরিয়ে গেলেন তাঁদের আপন আপন কন্যার প্রকোষ্ঠে। তাঁদেরকে তাঁরা এই মর্মে শাসিয়ে দিলেন যে, খবরদার! আল্লাহ্র রসুলের কাছে এমন কিছু চেয়ো না, যা তাঁর কাছে নেই। ওই সময় রসুল স. তাঁর সহধর্মিণীগণ থেকে উনতিরিশ দিন বা একমাস পৃথক হয়েছিলেন। তারপর অবতীর্ণ হয় আয়াতে 'তাখাইয়্যুর' (রসুল স. এর সাথে ঘর করা অথবা ঘর না করা সম্পর্কে ইচ্ছাস্বাধীনতার) এর আয়াত। তিনি স. সর্বপ্রথম তা পাঠ করে শোনান তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা সিদ্দীকাকে।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, হতে পারে সকল ঘটনাই ছিলো রসুল স. এর এক মাস পৃথক বাসের কারণ। যেমন মধুর শরবত পান করার ঘটনা, মারিয়ার ঘটনা, জননী হাফসা কর্তৃক জননী আয়েশার কাছে গোপন কথা ফাঁস করার ঘটনা, স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্য সকল উম্মতজননীর দাবি, জননী জয়নাব থেকে তিনবার হাদিয়া ফেরত আসা, প্রতিবারই তা বৃদ্ধি করে দেওয়া ইত্যাদি। যেমন ওমর সূত্রে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, ঘটনাগুলো একে একে ঘটে যাচ্ছিলো, আর রসুল স.ও সেগুলোকে উপেক্ষা করে চলেছিলেন। এভাবে ক্রমে ক্রমে যখন তাঁর ক্ষোভ-অভিমান পুঞ্জীভূত হলো, তখন তিনি স. তা প্রকাশ করার জন্য তাঁদের কাছ থেকে এক মাসের জন্য পৃথক হয়ে গেলেন। পরে আবার এক পর্যায়ে তাঁদের সকলের প্রতি হলেন প্রসন্ন।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা করো, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্ তাঁর বন্ধু এবং জিবরাইল ও সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও, তা ছাড়া অন্যান্য ফেরেশতাও তার সাহায্যকারী'।

এখানে 'ওয়া ইন তাজাহারা আ'লাইহি' অর্থ নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা যদি করো, যা তাঁর মনঃপুত নয়, যেমন অতিরিক্ত খরচপাতির দাবি, গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া ইত্যাদি, তবে তোমরা কৃতকার্য হতে পারবে না। 'ফা ইন্নাল্লহা হুয়া মাওলাহু' অর্থ তবে জেনে রাখো, আল্লাহ্ই তাঁর বন্ধু। এখানকার 'ফা' (তবে) অব্যয়টি কারণপ্রকাশক। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে আল্লাহ্র

তাফসীরে মাযহারী/৫৯৮

বন্ধুত্বই হচ্ছে তোমাদের কৃতকার্য না হওয়ার কারণ। 'ওয়া জিব্‌রীলু' অর্থ এবং জিবরাইল। 'ওয়া সলিহুল মু'মিনীন' অর্থ এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও। আর 'ওয়াল মালায়িকাতু বা'দা জালিকা জহীরুন' অর্থ তাছাড়া অন্যান্য ফেরেশতাও তাঁর সাহায্যকারী।

কালাবী বলেছেন, এখানে 'সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল বিশ্বাসবানগণকে, যাঁরা বিশুদ্ধচিত্ত, সম্পূর্ণরূপে কাপট্যমুক্ত। হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত আবু উমামা কথাটিকে সম্পৃক্ত করেছেন রসুল স. এর সঙ্গে।

www.eelm.weebly.com

অর্থাৎ যাঁরা রসুল অন্তঃপ্রাণ। হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, কথাটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে মহামাননীয় আবু বকর এবং মহামান্য ওমরকে।

উল্লেখ্য, 'আল্লাহ্ তাঁর বন্ধু' একথা বলার পর এখানে মর্যাদা অনুসারে ব্যক্ত করা হয়েছে তিনটি শ্রেণীকে— বিশেষ ফেরেশতা সাধারণ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাই প্রথমে বলা হয়েছে হজরত জিবরাইলের কথা। তারপর বলা হয়েছে সাধারণ সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদের কথা এবং শেষে বলে দেওয়া হয়েছে সাধারণ ফেরেশতাদের কথা এভাবে— তাছাড়া অন্যান্য ফেরেশতাও তার সাহায্যকারী। এভাবে এখানে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশেষ মানুষ (রসুল স.) বিশেষ ফেরেশতা (জিবরাইলের) চেয়ে শ্রেষ্ঠ, হজরত জিবরাইল শ্রেষ্ঠ সাধারণ সৎকর্মপরায়ণ মানুষের চেয়ে এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীরা শ্রেষ্ঠ সাধারণ মর্যাদার ফেরেশতাদের চেয়ে।

বোখারী লিখেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, আমি রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি যদি আপনার সহধর্মিণীগণকে পরিত্যাগ করেন, তবে অসুবিধার তো কিছু নেই। আপনার প্রকৃত বন্ধু তো আল্লাহ্। আর আপনার সাথী জিবরাইল, মিকাইল, আবু বকর ও বিশ্বাসবানগণ। হজরত ওমর বলেন, আমি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, আমি যখনই আশা করেছি কোনো ব্যাপারে আল্লাহ্র বিধান অবতীর্ণ হোক, তখনই আল্লাহ্ আমার আশা পূরণ করেছেন। এ ব্যাপারেও তিনি অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যাদেশ। পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে সে কথাই।

বলা হয়েছে— 'যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে, তবে তার প্রতিপালক সম্ভবত তোমাদের স্থলে তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী— যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুগত, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী'। এখানে বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে জননী আয়েশা ও জননী হাফসাকে। আর সাধারণভাবে সকল উম্মতজননীই এর অন্তর্ভূতা।

সন্দেহ করা যেতে পারে, এখানকার 'ইন ত্বল্লাক্বাকুন্না' কথাটির 'ইন' শর্তপ্রকাশক। তাই মনে হয় জননী হাফসাকে রসুল স. তালাক দেননি। আবার একথাও মনে হতে পারে যে, উম্মতজননীগণের চেয়ে উত্তম রমণী কেউ আছেন।

কিন্তু দু'টো চিন্তাই ভুল। কেননা— ১. হতে পারে তাঁদের কোনো একজনকে তিনি স. তালাক দিয়েছিলেন, সকলকে নয়। ২. যা বাস্তবায়িত হয়ইনি, তাকে সুসাব্যস্ত কোনো কিছু তো বলা যায়ই না। আলোচ্য আয়াতে উম্মতজননীগণের স্থলে তাঁদের চেয়েও উত্তম রমণীর কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু শর্তও দেওয়া হয়েছে যে, এরকম ঘটবে তখন, যখন রসুল স. উম্মতজননীগণকে পরিত্যাগ করবেন। আর যেহেতু রসুল স. তাঁদেরকে পরিত্যাগ করেননি, সেহেতু একথা বলা যাবে না যে, তাঁদের চেয়ে উত্তমা কেউ আছেন। বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ প্রকাশ করেছেন তাঁর অপার ক্ষমতার কথা। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে তিনি এরকম করতে নিশ্চয়ই সক্ষম। কিন্তু তিনি তো সেরকম ইচ্ছা করেননি।

এখানে 'মুসলিমাতিন' অর্থ আত্মসমর্পণকারিণী। 'মু'মিনাতি' অর্থ বিশ্বাসবতী। 'ক্বনিতাতি' অর্থ অনুগতা। 'তা-ইবাতি' অর্থ তওবাকারিণী, 'আ'বিদাতি' অর্থ ইবাদতপরায়ণা। 'সায়িহাতি' অর্থ রোজা পালনকারিণী। 'ছাইবাতি' অর্থ অকুমারী। আর 'আবকারা' অর্থ কুমারী। উল্লেখ্য, মুসাফিরের সঙ্গে যেমন পানাহারের ব্যবস্থা থাকে না, তাকে নির্ভরশীল হতে হয় অপরের আহারায়োজনের উপরে, তেমনি রোজাদারদেরকেও পানাহারবিচ্যুত হয়ে কাটাতে হয় ইফতারের সময় পর্যন্ত। সেজন্যই রোজাদারকে বলা হয 'সায়িহাত'।

কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, রোজা দু'প্রকার— প্রকৃত, অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ সংযম এবং পানাহার-কামাচারবিচ্যুত বাহ্যিক বিরতি। আর এক প্রকার হচ্ছে হুকমি— চোখ, কান, মুখ, হাত-পা ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পাপকর্ম থেকে বিরত রাখা। 'সিয়াহ' বলে দ্বিতীয় প্রকারের রোজাকে। অথবা 'সাইহাত' অর্থ হতে পারে এখানে— হিজরতকারিণী। অথবা ওই সকল সৌভাগ্যশালিনী, যাঁরা রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যধন্যা। কেউ কেউ আবার বলেছেন 'সায়ীহ্' তারা, যাদের সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা কি ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করেনি? যাতে তাদের এমন হৃদয় তৈরী হয়, যদ্দ্বারা তারা বুঝতে পারে, অথবা তৈরী হয় তাদের এমন শ্রবণেন্দ্রিয়, যার দ্বারা তারা শোনে'।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা করো অগ্নি থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ্ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তা-ই করে'।

এখানে 'তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো অগ্নি থেকে' অর্থ তোমরা নিজেরা ও তোমাদের পরিবার-পরিজন ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করো, ইসলামী অনুশাসনানুসারে জীবনযাপন করো এবং আত্মরক্ষা করো দোজখের অগ্নিশাস্তি থেকে। 'যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর' অর্থ মনে রেখো, দোজখের খোরাক হবে মানুষ এবং পাথর। 'যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়,

www.eelm.weebly.com

কঠোর স্বভাব ফেরেশতা' অর্থ দোজখীদের শাস্তি দানের জন্য সেখানে যে সকল ফেরেশতা নিযুক্ত করা আছে, তাদের হৃদয় দয়া-মায়াশূন্য এবং তারা অত্যন্ত কর্কশ স্বভাবের। তারা এতোই শক্তিশালী যে, তাদের যে কোনো একজন একসঙ্গে সত্তর হাজার দোজখীকে ধরে দোজখে নিক্ষেপ করতে পারে। তাদের নাম যাবানিয়া। জিয়া মুকাদ্দেসি বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, শপথ ওই সত্তার, যাঁর আনুরূপ্যহীন অধিকারে আমার জীবন, দোজখ সৃষ্টির হাজার বৎসর পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে দোজখের ফেরেশতাদেরকে। তখন থেকে নিয়ে ক্রমাগত তাদের শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তারা দোজখীদের চুল ও পা ধরে তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করার অভিপ্রায়, অধিকার ও সাহস তাদের নেই। আর 'তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তা-ই করে' অর্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যখন যে হুকুম তাদেরকে দেওয়া হয়, তখনই তারা সে হুকুম পালন করে যথাযথভাবে।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'হে কাফেরগণ! আজ তোমরা দোষ স্খালনের চেষ্টা কোরো না। তোমরা যা করতে, তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে'। এখানে 'লা তা'তাজিরুল ইয়াওমা' অর্থ আজ তোমরা দোষ স্খালনের চেষ্টা কোরো না। এরকম কথা তাদেরকে বলা হবে তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করার সময়। কেননা তারা তখন কসম কেটে বলবে 'আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না'। আরো বলবে 'হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, আমাদের কথা শুনুন। আমাদেরকে আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে দিন। আমরা সেখানে গিয়ে পুণ্যময় জীবন গঠন করবো'। বলা বাহুল্য তাদের এসকল কথায় সেদিন কোনো ভ্রূক্ষেপও করা হবে না।

সূরা তাহরীম ঃ আয়াত ৮, ৯, ১০, ১১, ১২

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা কর— বিশুদ্ধ তাওবা; সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলি মোচন করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেই দিন আল্লাহ্

www.eelm.weebly.com

লজ্জা দিবেন না নবীকে এবং তাহার মু'মিন সংগীদিগকে, তাহাদের জ্যোতি তাহাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হইবে। তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

❑ হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং উহাদের প্রতি কঠোর হও। উহাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

❑ আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিতেছেন, উহারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু উহারা তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। ফলে নূহ ও লূত উহাদিগকে আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিল না এবং উহাদিগকে বলা হইল, 'তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সহিত জাহান্নামে প্রবেশ কর।'

❑ আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য দিতেছেন ফির'আওন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করিয়াছিল ঃ 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিও এবং আমাকে উদ্ধার কর ফির'আওন ও তাহার দুষ্কৃতি হইতে এবং আমাকে উদ্ধার কর যালিম সম্প্রদায় হইতে।'

❑ আরও দৃষ্টান্ত দিতেছেন ইমরান-তনয়া মার্‌ইয়ামের— যে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল, ফলে আমি তাহার মধ্যে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং সে তাহার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁহার কিতাবসমূহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, সে ছিল অনুগতদের অন্যতম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা করো— বিশুদ্ধ তওবা'। এখানে 'তওবাতান নাসূহা' অর্থ বিশুদ্ধ তওবা। 'নাসূহ' শব্দটি আধিক্যপ্রকাশক। শব্দটি এসেছে 'নুসহুন' থেকে। এর অর্থ— কথা ও কাজের মাধ্যমে সঙ্গী-সাথীদের কল্যাণ কামনা করা। প্রকৃত কথা হচ্ছে 'নাসিহ' (বিশুদ্ধতা) হচ্ছে তওবাকারীদের একটি বৈশিষ্ট্য। শব্দটি এখানে 'তওবা'র সঙ্গে 'নাসূহ'রূপে ব্যবহৃত হয়েছে রূপকার্থে ও আধিক্যজ্ঞাপকরূপে। অথবা এখানকার 'নাসূহ' শব্দটি এসেছে 'নাসাহাত' থেকে। এর অর্থ টুকরা কাপড় সেলাই করা। পাপের কারণে ধর্মপরায়ণতা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। সেই ছিন্নভিন্নতাকে জোড়া লাগিয়ে দেয় তওবা। এর আর এক অর্থ— বিশুদ্ধতা। যেমন বলা হয় 'আসালুন নাসিহ' (নির্ভেজাল মধু)। সুতরাং 'তওবাতান নাসূহা' অর্থ প্রদর্শনপ্রবণতা ও খ্যাতির কামনামুক্ত তওবা।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, আমর বলেছেন, 'তওবাতান নাসূহা' অর্থ পাপ থেকে এমন প্রত্যাবর্তন, যার পরে আর কখনো পাপাভিমুখী না হতে হয়, যেমন দুগ্ধ দোহনের পর সে দুধ আর কখনো স্তনে মধ্যে প্রবেশ করানো সম্ভব হয় না। হাসান বলেছেন 'বিশুদ্ধ তওবা' হচ্ছে অতীতে পাপের জন্য আন্তরিক অনুশোচনা এবং ভবিষ্যতে পাপ না করার দৃঢ় সংকল্প। কালাবী বলেছেন, এর অর্থ— মুখে ক্ষমাপ্রার্থনা করা, অন্তরে অনুতপ্ত হওয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপবিমুক্ত রাখা। কুরতুবী বলেছেন, বিশুদ্ধ তওবা চারটি বিষয়ের সমন্বয়নের নাম— ১. মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা ২. অন্তরে অনুতপ্ত হওয়া ৩. পুনরায় পাপ না করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হওয়া এবং ৪. অসৎ বন্ধু পরিহার।

ইমাম বায়যাবী লিখেছেন, হজরত আলীকে একবার বিশুদ্ধ তওবার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন, বিশুদ্ধ তওবা হচ্ছে ছয়টি বিষয়ের সমন্বিত অবস্থা— ১. কৃত পাপের ব্যাপারে অনুশোচনা ২. বাদ পড়ে যাওয়া ফরজ দায়িত্বসমূহ আদায় করা ৩. অপরের অধিকার প্রত্যর্পণ ৪. দাবিদারকে প্রসন্ন করা ৫. পুনরায় পাপ না করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া এবং ৬. আল্লাহ্র আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে আত্মশুদ্ধি অর্জন।

'আ'সা রব্বুকুম 'আঁইয়ুকাফ্‌ফিরা আ'নকুম সায়্যিআতিকুম' অর্থ সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দকর্মগুলি মোচন করে দিবেন। এখানে 'আ'সা' (সম্ভবত) ব্যবহার করা হয়েছে আল্লাহ্ যে কোনোকিছু করতে বাধ্য নন, সেকথা বুঝাতে। একথাটিও জানিয়ে দিতে যে, বান্দারা যেনো আল্লাহ্র ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য আশান্বিত থাকে, হতাশও যেনো না হয়।

আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বনী ইসরাইলের জনৈক নবীকে এইমর্মে প্রত্যাদেশ করেছিলেন যে, তুমি তোমার উম্মতের পুণ্যবানদেরকে বলে দিয়ো, তারা যেনো তাদের আপন আমলের উপরে নির্ভরশীল না হয়। কেননা মহাবিচারের দিবসে আমি যাকে খুশী

তাকে শাস্তি দিবো। আর তোমার উম্মতের পাপীদেরকে জানিয়ে দিয়ো, তারা যেনো নিরাশ না হয়। আমি সেদিন মাফ করে দিবো বড় বড় পাপিষ্ঠকে। আমি তো বেপরোয়া।

হজরত আনাস থেকে বায্যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে মানুষের দফতর হবে তিনটি। একটিতে থাকবে পুণ্য কর্ম। দ্বিতীয়টিতে থাকবে পাপ এবং তৃতীয়টিতে থাকবে আল্লাহ্র অনুগ্রহসম্ভার। ওই অসংখ্য অনুগ্রহ থেকে যে কোনো একটি অনুগ্রহকে লক্ষ্য করে তখন বলা হবে, এই বান্দার পুণ্যকর্মসমূহ থেকে তোমার সমতুল্য যে কোনো

একটিকে নিয়ে নাও। সে একটি একটি করে তার সকল পুণ্য নিয়ে নিবে। তারপর বলবে, হে আমার প্রভুপালক! আমি এখন পর্যন্ত তো আমার সম্পূর্ণ বিনিময় নিতে পারিনি। এদিকে দেখছি এ লোকের পুণ্যের ভাণ্ডার শূন্য। তদুপরি রয়ে গিয়েছে পাপরাশি। এর পর আল্লাহ্ যখন তার ওই বান্দাকে দয়া করতে চাইবেন, তখন বলবেন, হে আমার দাস! আমি তোমার পুণ্যসমূহ বৃদ্ধি করে দিলাম, পাপসমূহ মার্জনা করলাম এবং তোমাকে করলাম অনুগ্রহায়িত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের আমল তোমাদেরকে পরিত্রাণ দিতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনাকেও কী? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, আমাকেও। কিন্তু আমি যে তাঁর অনুগ্রহে সতত আচ্ছন্ন। এ সম্পর্কে হাদিস রয়েছে আরো অনেক।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে। যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ্ লজ্জা দিবেন না নবীকে এবং তাঁর মুমিন সঙ্গীদেরকে, তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পাশে ধাবিত হবে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করো এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো, নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

এখানে 'নূরুহুম ইয়াসআ' বাইনা আইদীহিম ওয়া বিআইমানিহিম' অর্থ তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পাশে ধাবিত হবে। অর্থাৎ লজ্জা ও অপদস্থতা থেকে মুক্ত রাখার জন্যই সেদিন নবী ও তাঁর বিশ্বাসী অনুসারীদেরকে দেওয়া হবে নূর। পুলসিরাত অতিক্রমকালে ওই নূর চলতে থাকবে তাদের সামনে ও দক্ষিণে। ওই নূরের উজ্জ্বলতার তারতম্য ঘটবে ইমান ও পুণ্যকর্মের তারতম্যের কারণে। আর যারা কপটাচারী, তারা তখন নূর পাবেই না। তাই প্রার্থনা করতে থাকবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দাও। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে সূরা হাদীদের তাফসীরে।

পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, তা কতো নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল'। একথার অর্থ— হে আমার প্রত্যাদেশবাহক! আপনি

অবিশ্বাসী ও কপটাচারীদের বিরুদ্ধে আপনার অবস্থানকে করুন সংহত ও শক্তিশালী। এ ব্যাপারে তাদের কোনো আবদার ও কুটকৌশলকে প্রশ্রয় দিবেন না। জাহান্নাম তাদের জন্য অবধারিত। হায়! জাহান্নাম প্রত্যাবর্তনস্থল রূপে কতোইনা বীভৎস, নিকৃষ্ট ও ভয়ংকর।

এর পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ কাফেরদের জন্য নুহের স্ত্রী ও লুতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, তারা ছিলো আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন'।

হজরত নুহের স্ত্রীর নাম ছিলো ওয়ায়েলা এবং হজরত লুতের স্ত্রীর নাম ছিলো ওয়াহেলা। তারা দু'জন নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী। আল্লাহ্পাক এখানে তাদের উল্লেখ করেছেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে একথা বুঝিয়ে দিতে যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণীরা নবীর নিকটাত্মীয়, এমনকি আপন স্ত্রী হলেও পরকালের শাস্তি থেকে নিস্তার পাবে না। শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর আত্মীয়দেরকে সাবধান করে দেওয়াই এই আয়াতের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারাও সেদিন তাঁর আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।

'সলিহীন' অর্থ সৎকর্মপরায়ণ। হজরত নুহ এবং হজরত সালেহকে এখানে অভিহিত করা হয়েছে সৎকর্মপরায়ণ বলে। কেননা পরিপূর্ণ সৎকর্মপরায়ণতার নামই নিষ্পাপত্ব। আর যাঁরা নবী, তাঁরা নিষ্পাপই হয়ে থাকেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো'। একথার অর্থ জীবনসঙ্গিনী হওয়া সত্ত্বেও ওই দুই নারী তাদের স্বামীর ধর্মমতকে মেনে নেয়নি। এখানে 'বিশ্বাসঘাতকতা' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যান ও কপটাচরণ, ব্যভিচার বা এধরনের কোনো পাপ নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোনো নবীর স্ত্রীই ব্যভিচারিণী ছিলো না। তবে তাদের কেউ কেউ ছিলো কাফের ও মুনাফিক। হজরত নুহের স্ত্রী লোকদেরকে বলতো 'নুহ পাগল'। কেউ ইমান আনলে সে এই সংবাদ জানিয়ে দিতো, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সমাজপতিদের কাছে। হজরত লুতের স্ত্রীও ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অনুরাগিনী ও চর। রাতে ঘরে অতিথি এলে সে ঘরের আলো উসকে দিতো, যাতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপাচারীরা জানতে পারে যে, তাঁর গৃহে নতুন অতিথির আগমন ঘটেছে। আর দিনে মেহমান এলে সে ছড়িয়ে দিতো ধোঁয়া। কালাবী বলেছেন, এখানে 'বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো' অর্থ তারা ছিলো মুনাফিক স্বভাবের। বাইরে নিজেদেরকে প্রকাশ করতো ইমানদার বলে, আর ভিতরে লুকিয়ে রাখতো মুনাফিকী।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফলে নুহ ও লুত তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারলো না'। একথার অর্থ— যখন মহাপ্লাবন শুরু হলো, তখন

www.eelm.weebly.com

নবী নুহ যেমন তার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী পত্নীকে তার সলিলসমাধিপ্রাপ্তা হওয়া থেকে মুক্ত করতে পারেননি, তেমনি নবী লুতও তাঁর বিশ্বাসঘাতকিনী স্ত্রীকেও রক্ষা করতে পারেননি, যখন শুরু হয়েছিলো প্রস্তরবৃষ্টির আযাব। অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্ক তাদের কোনো কাজে আসেনি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে বলা হলো, তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ করো'। একথার অর্থ— ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদ্বয়কে মৃত্যুর সময় বলা হয়েছিলো, অথবা প্রতিফল দিবসে বলা হবে, যারা নবীগণের নিকট অথবা দূরের কোনো আত্মীয়-আত্মীয়া নয়, নয় তাঁদের বিশ্বাসী কোনো অনুসারী, তাদের সঙ্গে এখন তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করো।

এর পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ মুমিনদের জন্য দিচ্ছেন ফেরাউন পত্নীর দৃষ্টান্ত'। ফেরাউনের স্ত্রীর নাম ছিলো আসিয়া বিনতে মাযাহিম। আল্লাহ্র শত্রু ফেরাউন ছিলো তাঁর স্বামী। কিন্তু তিনি ছিলেন বিশ্বাসবতী ও আল্লাহ্র প্রিয়ভাজনা। ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন, হজরত মুসা যখন যাদুকরদেরকে পরাভূত করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর প্রতি ইমান আনেন। ফেরাউন একথা জানতে পেরে তাঁর উপরে চালায় অকথ্য নির্যাতন। প্রখর রোদে শায়িত করে পেরেক বিঁধিয়ে দেওয়া হতো তাঁর পবিত্র দেহাবয়বে। সুলায়মান বর্ণনা করেছেন, ফেরাউন তার স্ত্রীকে প্রখর রোদে ফেলে নানাভাবে কষ্ট দিতো। কিন্তু তার কর্মচারীরা চলে গেলে ফেরশতারা এসে তাঁকে ছায়া দান করতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে প্রার্থনা করতো, হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কোরো'। এখানে 'সন্নিধান' অর্থ ওই সন্নিধান, যা দর্শন, শ্রবণ ও অনুভবের অতীত। স্থান ও সময়ের সঙ্গেও যার সম্পর্ক মাত্রই নেই। আল্লাহ্ যেমন আনুরূপ্যবিহীন, তেমনি তাঁর সন্নিধানও। আর জান্নাতের প্রার্থিত গৃহটি তাঁকে দেখানো হয়েছিলো তাঁর পৃথিবী পরিত্যাগের আগেই, দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমাকে উদ্ধার করো ফেরাউন ও তার দুষ্কৃতি থেকে এবং আমাকে উদ্ধার করো জালেম সম্প্রদায় থেকে'। এখানে 'দুষ্কৃতি ' অর্থ কঠোর নির্যাতন। কালাবী বলেছেন, এখানে 'দুষ্কৃতি' দ্বারা বুঝানো হয়েছে ফেরাউনের অংশীবাদিতাকে। আবু সালেহ বর্ণনা করছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আ'মালিহি' (দুষ্কৃতি) দ্বারা বুঝানো হয়েছে ফেরাউনের নির্মমহৃদয় কর্মচারীদেরকে।

'মিনাল ক্বওমিজ্ জলিমীন' অর্থ জালেম সম্প্রদায় থেকে। অর্থাৎ ওই সকল লোক থেকে, যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে নিজেদের উপরে অত্যাচার তো করেছেই, অধিকন্তু অত্যাচার করে চলেছে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদেরকে। এক বর্ণনায় এসেছে, ফেরাউন নির্দেশ দিলো, একটি প্রকাণ্ড পাথর দিয়ে তাকে চাপা দাও। কর্মচারীরা হুকুম তামিলের জন্য প্রস্তুত হলো। তখন হজরত আসিয়া দোয়া করলেন 'হে আমার

প্রভুপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করো'। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দোয়া কবুল করা হলো। তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন সেই ঘর। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে চলে গেলো। আর পাথর চাপা দেয়া হলো তাঁর নিস্প্রাণ দেহের উপরে। হাসান বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁকে বেহেশতের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। আপ্যায়ন করেছেন তাঁকে বেহেশতের পানাহার দ্বারা।

শেষোক্ত আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান-তনয়া মরিয়মের— যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিলো, ফলে আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তার কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিলো, সে ছিলো অনুগতদের একজন'।

এখানে 'আল্লাতী আহসানাত ফারজ্বাহা' অর্থ যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিলো। 'ফা নাফাখ্না ফীহি মিররূহিনা' অর্থ ফলে আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম। অর্থাৎ আমার নির্দেশে জিবরাইল তার জামার গলার কাছের ফাঁড়া স্থানে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলো। ওই ফুৎকারের প্রভাবেই মরিয়ম হয়ে পড়েছিলেন গর্ভবতী। উল্লেখ্য, আল্লাহ্পাকই সকল কিছুর স্রষ্টা। তাই জিবরাইলের মাধ্যমে ফুৎকার দেওয়া হলেও এখানে তিনি কাজটিকে প্রকাশ করেছেন নিজের কাজ বলে। আর 'মিররূহিনা' কথাটির 'মিন' এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। সুতরাং বুঝতে হবে রূহ সৃষ্টির মূল সম্পর্ক আল্লাহ্পাকের সঙ্গেই। আখফাশ বলেছেন, বাক্যটি হাঁ-সূচক এবং 'মিন' এখানে অতিরিক্ত। কিন্তু সিবওয়াইহ্ এর মতে এখানকার 'মিন' আংশিক অর্থপ্রকাশক। যেমন 'ইয়াগফির লাকুম মিন জুনুবিকুম' আয়াতের 'মিন' আংশিক অর্থপ্রকাশক।

'বিকালিমাতি রব্বিহা' অর্থ তার প্রতিপালকের বাণী। এখানে 'বাণী' দ্বারা বুঝানো হয়েছে পূর্ববর্তী নবীগণের উপরে অবতারিত আকাশী পুস্তিকাসমূহকে। অথবা তাদের উপরে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশাবলীকে। অর্থাৎ জীবনবিধান, বা শরিয়ত। 'কুতুবিহী' অর্থ তাঁর কিতাব, যা লিখিত রয়েছে লওহে মাহফুজে। অথবা ওই সকল আকাশজ গ্রন্থ, যা অবতীর্ণ করা হয়েছে পূর্ববর্তী নবী-রসুলগণের উপর। আর 'মিনাল ক্বনিতীন' অর্থ সে ছিলো অনুগতদের অন্যতম। অর্থাৎ মরিয়ম ছিলেন আল্লাহ্র একান্ত অনুগত বান্দা-বান্দীগণের অন্যতম। 'ক্বনিতীন' শব্দটি বহুবচন ও পুংলিঙ্গবাচক। তৎসত্ত্বেও হজরত মরিয়মের ক্ষেত্রে এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর বিশেষ মর্যাদা

www.eelm.weebly.com

প্রকাশার্থে। অথবা শব্দটি এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে একথা প্রকাশ করতে যে, হজরত মরিয়ম নারী হলেও অন্যান্য স্বনামধন্য সাধুপুরষগণের চেয়ে কোনো দিক দিয়ে কম নন। অর্থাৎ তিনিও কামেল পুরুষগণের সমমর্যাদাসম্পন্না।

হজরত আবু মুসা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কামেল পুরুষ রয়েছেন অনেক। কিন্তু কামেল নারী কেবল আসিয়া ও মরিয়ম। আর আয়েশার মর্যাদা অন্য সকল নারীর উপরে ওইরূপ, যেরূপ ছরীদের (সর্বোৎকৃষ্ট আহার্য বিশেষ) মর্যাদা অন্যান্য আহার্যদ্রব্যের উপর। আহমদ, বোখারী, মুসলিম।

তিরমিজি, ইবনে মাজা, ছা'লাবী ও আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কামেল পুরুষ তো বহুসংখ্যক। তবে কামেল রমণী কেবল চারজন— আসিয়া বিনতে মাযাহিম, মরিয়ম বিনেত ইমরান, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ এবং ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ। আর আহার্য সামগ্রীর মধ্যে ছরীদ যেরূপ, সকল রমণীর তুলনায় আয়েশার মর্যাদা সেরকম।

আমি বলি, কামেল হওয়ার অর্থ মূলতঃ কামালতে নবুয়তের রঙে রঞ্জিত হওয়া। বোখারী ও মুসলিমের বিবরণে অতীত যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রকৃত কামেল পুরুষ হিসেবে ছিলেন অনেক নবী। কিন্তু তাঁদের নারীকুলের মধ্যে নবুয়তের উৎকর্ষ অর্জনকারিণী ছিলেন কেবল হজরত আসিয়া ও হজরত মরিয়ম।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সারা পৃথিবীর রমণীগণের মধ্যে উত্তম হচ্ছে মরিয়ম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ এবং ফেরাউন পত্নী আসিয়া। হজরত আলী বলেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, নারীদের মধ্যে মরিয়ম বিনতে ইমরান সর্বোত্তমা। আর আমাদের এ যুগের নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হচ্ছেন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ। বোখারী, মুসলিম।

জননী উম্মে সালমা বলেছেন, মক্কাবিজয়ের বছরে রসুল স. তাঁর প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমাকে ডেকে 'কানে কানে কী যেনো বললেন। ফাতেমা কাঁদতে শুরু করলো। পুনরায় তিনি স. তাকে কানে কানে কিছু বললেন। এবার সে হেসে ফেললো। রসুল স. এর মহাতিরোভাবের পর আমি ফাতেমাকে এ সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করলাম, তখন সে বললো, প্রথমে তিনি স. বলেছিলেন, অচিরেই তিনি পরলোকগমন করবেন। পরে বলেছিলেন, মরিয়ম বিনতে ইমরান ছাড়া অন্য সকল বেহেশতিনীগণের নেত্রী তুমিই।

একাদশ খণ্ড সমাপ্ত

www.eelm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

ঊনত্রিংশতিতম পারা

হে আমাদের পরম প্রেমময় প্রভুপালনকর্তা আল্লাহ্! তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই। তাই আমরা স্তব-স্তুতি ও মহিমা প্রকাশ করি কেবল তোমার, করি ইবাদত। কামনা করি কেবল তোমার শরণ। আর মার্জনা প্রার্থী হই তোমারই সকাশে। মানুষ প্রতিপ্রত্তিশালী হতে পারে কেবল তোমারই অভিপ্রায়ানুসারে। আবার তোমার ইচ্ছাতেই হয়ে যায় প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন। তুমিই তোমার পবিত্র অনুমোদনানুসারে কাউকে করো রাজ্যাধিপতি, আবার কাউকে করো রাজ্যহারা। কেননা সকল ক্ষমতা তোমার। সমগ্র কল্যাণসম্ভারও তোমার। তুমিই আমাদের এক, একক, অবিভাজ্য, চিরঅসমকক্ষ, আনুরূপ্যবিহীন অধিকর্তা। আমরা তোমারই সকাশে যাচনা করি তোমার কৃপা, শান্তি ও সান্নিধ্য। আর সকল প্রকার শান্তিবারতা ও করুণা বর্ষিত হোক তোমারই প্রেমাস্পদ, সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সালাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি তোমা কর্তৃক অবতারিত শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম নভজ বাণীসম্ভারের ধারক ও বাহক। শান্তিবারতা ও করুণা বর্ষিত হোক তাঁদের প্রতিও যাঁরা তোমার প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ— নবী-রসুল, সাহাবীবৃন্দ এবং আউলিয়াবর্গ। আমিন।

এবার শুরু হচ্ছে সুরা মুল্‌ক সম্পর্কে আলোচনা। ২ রুকু এবং ৩০ আয়াতবিশিষ্ট এই সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যধাম মক্কায়।

সূরা মুল্‌ক ঃ আয়াত ১, ২

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۡ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ﴿۱﴾ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ﴿۲﴾

www.eelm.weebly.com

r মহামহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁহার করায়ত্ত; তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

r যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য— কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল,

---

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তাবারাকাল্লাজী বিইয়াদিহিল মুল্ক'। এর অর্থ— মহামহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ত। এখানকার 'তাবারাক' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'বরকত' থেকে। এর অর্থ— সুপ্রচুর, চূড়ান্ত পর্যায়ের পূর্ণতা, যাতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ন্যূনতার অবকাশ মাত্র নেই। আর এটি আল্লাহ্‌র গুণাবলীর মধ্যে এমন এক গুণ, যা তাঁর সত্তার মতোই অচিন্তনীয় ও আনুরূপ্যবিহীন। সুতরাং তা অননুমানীয়।

উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌র অন্যান্য গুণবত্তাও এরকম। অর্থাৎ তাঁর সকল গুণই আদি-অন্তহীন, প্রকারবিহীন, অবিভাজ্য ও আনুরূপ্যবিহীন হিসেবে পূর্ণ ও পরিণত। যেমন— 'রহমান' (দয়ার্দ্র)। মানুষের অন্তরে দয়া-মায়ার সূত্রপাত যেভাবে হয়, আল্লাহ্‌র দয়া-মায়া সেরকম নয়। মানুষ কারো প্রতি আকৃষ্ট হলে তার হৃদয়ে সৃষ্টি হয় আবেগ, অনুরাগ, করুণা, ভালোবাসা। এই আবেগ-অনুরাগেরই পরিণতি হচ্ছে দয়া-মমতা-ভালোবাসা। কিন্তু আল্লাহ্‌পাকের দয়া এরকম নয়। কেননা তিনি মানুষের মতো হৃদয়বিশিষ্ট ও আবেগতাড়িত নন। বরং তাঁর দয়া তাঁর সত্তাসম্পৃক্ত। তাই তা তাঁর সত্তার মতোই আকার-প্রকারবিহীন এবং সূচনা-সমাপ্তিবিবর্জিত। তাই তিনি সূত্রপাত ও পরিণতির মুখাপেক্ষী হওয়া ব্যতিরেকেই দয়ার্দ্র, কল্যাণময়, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ইত্যাদি। তাঁর সকল গুণের মতো তাই 'মহামহিমান্বিত' হওয়ার বিষয়টিও অতুলনীয়রূপে সুপ্রচুর, অগণনীয় এবং অননুমানীয়। তাঁর এমতো রকম-প্রকারহীন পরিপূর্ণত্ব প্রকাশার্থেই অন্যত্র ব্যবহৃত হয়েছে 'বাসীর' 'আজীম' 'মুতাআ'ল' ইত্যাদি।

'সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ত' কথাটি আয়াতে মুতাশাবিহাতের (রহস্যাচ্ছন্ন আয়াতসমূহের) অন্তর্ভুক্ত। এখানকার 'ইয়াদ' এর শাব্দিক অর্থ হাত। হাত হচ্ছে শক্তি ও কর্তৃত্বের প্রতীক। কিন্তু এখানে শব্দটির মাধ্যমে যে শক্তি ও কর্তৃত্বের কথা বুঝানো হয়েছে, তা চিররহস্যময়, তাই অবোধ্য। কেননা তা আল্লাহ্‌র গুণ। পরবর্তী যুগের বিদ্বানগণ শব্দটির অর্থ করেছেন— ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, অধিকার, আধিপত্য ইত্যাদি। অর্থাৎ সর্বময় ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, অধিকার, আধিপত্য কেবল তাঁর। আর 'মুল্ক' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে সমগ্র সৃষ্টিকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সমগ্র সৃষ্টির একক ও অবিভাজ্য অধিকর্তা কেবল আল্লাহ্। এর মধ্যে অন্য কারো বা কোনোকিছুর অংশীদারিত্ব নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বদীর' (তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান)। এখানে 'শাই' অর্থ সচেতন-নিশ্চেতন সকল সৃষ্টি, যার উপরে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় কার্যকর হয়। অর্থাৎ সম্ভাব্যের বৃত্তের (দায়রায়ে

www.eelm.weebly.com

ইমকানের) সকলকিছুই তাঁর অভিপ্রায়, অধিকার ও ক্ষমতাভূত। তাঁর এমতো অভিপ্রায়, অধিকার ও ক্ষমতা আবার অবশ্যম্ভাবিতার বিলুপ্তির ক্ষেত্রে (দায়রায়ে উজুবে) কার্যকর নয়। কেননা সত্তা-গুণবত্তা ও কার্যের সে বৃত্ত কেবল তাঁর, যা আদি-অন্তহীন, রকম-প্রকারবিহীন, অব্যয়, অক্ষয়, চিরন্তন। সম্ভাব্যেরা লুপ্ত হতে পারে, হতে পারে বিবর্তিত, পরিবর্তিত, কিন্তু তাঁর অবশ্যম্ভাবিতার লুপ্তি, বিবর্তিতি ও পরিবর্তিতি অসম্ভব। সুতরাং তিনিই সম্ভাব্যের বৃত্তবাসীদের ভয় ও ভরসার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপাস্য।

যেনো আলোচ্য আয়াতের দাবি চারটি— তিনি সদা বিদ্যমান। তিনি চরম পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর রাজত্ব আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত। তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আর পরবর্তী আয়াতসমূহে এ দাবির উপরই উপস্থাপন করা হয়েছে যুক্তি প্রমাণ। প্রথমতঃ মানুষের অস্তিত্বে আল্লাহ্পাকের শক্তিমত্তার যে নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে শীর্ষতম নির্দশন হচ্ছে 'খলাক্বাল মাওতা ওয়াল হায়াত' (জীবন আর মরণের সৃষ্টি)। এরপর আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে অগণন নিদর্শনাবলী। যেমন আকাশে নেই কোনো খুঁত। না আছে ফাটল। এরপর এসেছে পৃথিবী সৃষ্টির কথা। সেখানে ভূমিকে করা হয়েছে বাসোপযোগী। করা হয়েছে উপজীবিকা উৎপাদনের ক্ষেত্র। প্রাণীকুলের বিচরণ ও আহার্য আহরণের শস্যভাণ্ডার। এরপর 'তোমরা কি দ্যাখো না পক্ষীকুলের প্রতি' বলে শূন্যমণ্ডলে অবস্থানকারী সৃষ্ট জীব সারি সারি পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর নেপথ্যে ঘোষিত হয়েছে অবাধ্য অবিশ্বাসীদের শাস্তির কথা। আর ভীতশংকিত কল্যাণ আহরণকারী বিশ্বাসীদের পুণ্য প্রতিদানের কথা।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন'। উল্লেখ্য, আল্লাহ্পাকের এক নাম 'হাই'। এর অর্থ— চিরঞ্জীব, চিরদিনের জন্য জীবিত। এ ধরনের জীবিত সত্তার আবার কয়েকটি গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। যেমন— তাঁকে হতে হবে প্রাজ্ঞ, দক্ষ ও জীবনপ্রদাতা। লক্ষণীয়, এ সকল গুণ রয়েছে কেবল আল্লাহ্র। তিনিই তাঁর সতত স্বাধীন অভিপ্রায়ানুসারে তাঁর সৃষ্টিনিচয়কে দিয়েছেন বিভিন্ন প্রকৃতির ভারসাম্যময় জীবন। যেমন—

মানব জীবন ঃ আল্লাহ্পাক মানুষকে এমন জীবন দান করেছেন যে, সে এমতো জীবনের অধিকারী হওয়ার কারণে লাভ করতে পারে আল্লাহ্র সত্তা-গুণবত্তা ও কার্যকলাপের পরিচয়। এই 'আমানত' (গচ্ছিত ধন) মানুষ বরণ করে নিয়েছে স্বেচ্ছায়, সে গুরুভার বহন করবার আহ্বান শুনে শংকিত হয়েছিলো আকাশ-পৃথিবী-গিরি-কান্তার। আল্লাহ্র পরিচয়ধন্য এই শুভজীবন অর্জিত হতে পারে কেবল তাঁরই দয়ায়, তাঁরই একান্ত সন্নিধানের জ্যোতি-সম্পাতে। এমতো জীবনের বিপরীত মৃত্যু সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সে ছিলো প্রাণহীন, পরে আমিই তাকে দান করলাম জীবন'। একথার অর্থ তত্ত্বজ্ঞানহীন মৃতবৎ মানুষকে আমিই দান করেছি জীবনরূপী ইমান ও তত্ত্বজ্ঞান। এভাবেই বিশ্বাসীরা

www.eelm.weebly.com

হতে পেরেছে এমন সফল জীবনের অধিকারী, যা মৃত্যুহীন। এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে বিঘোষিত হয়েছে, আল্লাহ্ এই মহাসৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন অন্ধকারে। তারপর তার উপর ঘটিয়েছেন জ্যোতির সম্পাত। যে সেই জ্যোতি পেয়েছে, সে হয়েছে পথপ্রাপ্ত এবং যে পায়নি, সে হয়েছে পথভ্রষ্ট। তাই আমি বলি, শুকিয়ে গিয়েছে অদৃষ্ট লিপিবদ্ধকারী লেখনী।

পশু-জীবন। পশুকুলের জীবন আবার অন্য রকমের। এ ধরনের জীবনপ্রাপ্তদের সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা ছিলো মৃত, তাদেরকে জীবন্ত করেছি, আমিই। অবশেষে তাদেরকে করবো মৃত'। একথার অর্থ— তারা ছিলো মৃত, অতঃপর আমি তাদেরকে দান করলাম পশুর জীবন। পুনরায় আমি তাদেরকে করবো অনুভূতিশূন্য, অচল।

উদ্ভিদ-জীবন ঃ উদ্ভিদরাজিকে জীবন দেওয়া হয়েছে কেবল বংশবিস্তারের জন্য। তাই উদ্ভিদ-জীবন কেবল দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও আয়তনবিশিষ্ট। এ সম্পর্কে এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে 'আমিই বিশুষ্ক ভূমিকে করি সঞ্জীবিত'। অর্থাৎ— মৃতবৎমৃত্তিকায় বৃষ্টি বর্ষণ করে আমিই করি তাকে তৃণলতা ও উদ্ভিদ উৎপাদনের উপযোগী।

উল্লেখ্য, এই তিন ধরনের জীবনের সৃজয়িতা আল্লাহ্। তাঁর অমোঘ নির্দেশ 'হও' এর মাধ্যমেই বিকশিত হয় এই ত্রিবিধ জীবন। যা নিরেট জড়, তার মধ্যে আল্লাহ্র এমতো নির্দেশের প্রতিফলন নেই। তাই পৌত্তলিকদের জড়প্রতিমাসমূহকে বলা হয়েছে 'অপ্রাণ'। কিন্তু কোনো কোনো জড়প্রস্তরও 'হও' নির্দেশের অন্তর্গত। তাই সেগুলো নিশ্চেতন হলেও জীবিত। সেগুলো সম্পর্কে তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওই প্রস্তরসমূহের মধ্যে এমন প্রস্তরও রয়েছে, যেগুলো পতিত হয় আল্লাহ্র ভয়ে'। এ প্রসঙ্গে সবিস্তার আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে। এভাবে দেখা যায়, যা কিছু মানবনির্মিত, তার সকলকিছুই অপ্রাণ, আর আল্লাহ্ কর্তৃক সৃজিত জড়-অজড় সকল সৃষ্টিই প্রাণবান। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সকল সৃষ্টি বর্ণনা করে আল্লাহ্র প্রশংসা ও মহিমা'।

'মাউত' অর্থ মৃত্যু। এই মৃত্যু হতে পারে দু'ধরনের— ১. অপ্রাণ ২. প্রাণহীন। প্রাণহীন প্রাণবান হবার যোগ্য। যেমন 'দৃষ্টিহীন' শব্দটি প্রয়োগ করা যেতে পারে মানুষ ও অন্যান্য চক্ষুবিশিষ্ট প্রাণীকুলের ক্ষেত্রে, যেহেতু তারা সকলে দৃষ্টিশক্তি ধারণের যোগ্যতাসম্পন্ন। কিন্তু দেয়াল, কিংবা বৃক্ষকে অন্ধ বা দৃষ্টিহীন বলা যায় না। কেননা দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হওয়ার যোগ্যতাই তাদের নেই। তেমনি 'অপ্রাণ' হচ্ছে প্রাণধারণের যোগ্যতারহিত এবং 'মৃত' অর্থ ওই মৃত্যুপ্রাপ্ত যে জীবিত অথবা পুনরুজ্জীবিত হবার যোগ্যতাধারী।

জীবন ও মৃত্যুর বিবরণসংক্রান্ত আয়াতগুলো পাঠ করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, জীবনের মতো মৃত্যুও একটি সৃষ্টি। আর আল্লাহ্পাক মৃত্যুকেই সৃষ্টি করেছেন প্রথমে, তারপর জীবনকে। যেমন বলা হয়েছে 'সে ছিলো মৃত, তারপর আমি

www.eelm.weebly.com

তাকে করেছি জীবিত' 'তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ, এরপর আমি তোমাদেরকে দান করেছি জীবন' 'তিনি ভূমিকে জীবন্ত করেছেন তার মৃত্যুর পর'। এতে করে বুঝা যায় মৃত্যু শূন্যতানির্ভর নয়, কেননা শূন্যতার উপরে কোনোকিছুই নির্ভরশীল হতে পারে না এবং জীবন অস্তিত্বনির্ভর।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'মৃত্যু'ও অস্তিত্বনির্ভর, তবে সে অস্তিত্ব জীবিত অস্তিত্বের বিপরীতধর্মী। অর্থাৎ জীবনের বিপরীত মরণ (যেনো কোনো মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠ)। জীবনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রজ্ঞা, সামর্থ্য, সচলতা ও অনুভূতি। প্রতিটি জীব সত্তায় এ লক্ষণগুলো পরিদৃষ্ট হয়। মৃত্যু এগুলোকেই বিলোপ করে। এমতো অভিমতের প্রমাণরূপে উল্লেখ করা হয় এই আয়াতকেই 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন'। অতএব বুঝতে হবে মৃত্যু যখন সৃষ্ট, তখন তা অবশ্যই অস্তিত্বশীল। কেননা অস্তিত্বহীন কোনো কিছু 'সৃষ্ট' পদবাচ্য হতে পারে না। আমরা কিন্তু এই অভিমতটির পরিপন্থী। তাই আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, মৃত্যু এমন কোনো অনস্তিত্ব নয়, যা অন্য কোনো স্থান থেকে এনে শরীরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। বরং মৃত্যু হচ্ছে দেহের বিলোপন সংক্রান্ত একটি বিশেষণ, যা কার্যকর হয় দেহাভ্যন্তরেই। আর তার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় শবদেহে। তখন সচল দেহ হয়ে যায় অচল, স্থবির, অনুভূতিশূন্য ও অকর্মণ্য। যেমন চক্ষুষ্মানেরা হয়ে যায় দৃষ্টিহীন, যখন বিলোপিত হয় তাদের দৃষ্টিশক্তি। তাই তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, প্রতিটি পদার্থ তাদের নেপথ্যকে নিয়ে আল্লাহ্র জ্ঞানভাণ্ডারে সতত বিদ্যমান। যেমন জীবন বিদ্যমান তার মৃত্যুসহ, জ্ঞান, ক্ষমতা ও দৃষ্টি বিদ্যমান যথাক্রমে তাদের অজ্ঞতা, অক্ষমতা ও অন্ধত্বসহ। একেই বলে প্রকৃতির তত্ত্ব। একেই বলে 'হাকায়েকে কাওনিয়া' বা 'কুন' (হও) নির্ভর আদেশে প্রতিষ্ঠিত জগতের মৌলিক তত্ত্ব এবং একেই বলে 'আয়ানে ছাবেতাহ্' অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত মৌল। ওই নৈপথ্যিকতার ভিত্তি অবশ্য অবিকল আল্লাহ্র গুণবত্তা নয়, বরং গুণবত্তার প্রতিবিম্ব। কিন্তু প্রকাশ্য যা কিছু তার ভিত্তি এটাই। এই হিসেবে বলতে হয় প্রকাশ্য জগত ওই প্রতিবিম্বেরই প্রতিবিম্ব। সেকারণেই প্রতিটি মূল অবস্থিতিকে বলে 'কওনে আউয়াল' (প্রথম প্রতিষ্ঠা)। ওই অবস্থিতিই অনুপ্রেরণার উৎস। ওখান থেকেই অস্তিত্বে আনা হয় সম্ভাব্য জগতের প্রকাশ্য দিকটিকে। আর তা সুসম্পন্ন হয় সততস্বাধীন অভিপ্রায়ধারী, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্ কর্তৃক। যেনো কাঁচের দেয়াল ঘেরা কোনো প্রদীপ থেকে ঠিকরে পড়া আলো, যা বিচ্ছুরিত হয় ওই কাঁচের দেয়ালের বাইরে। এ বিষয়টিকেই এক আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে 'তাঁর জ্যোতির দৃষ্টান্ত যেমন তাকে রক্ষিত একটি প্রদীপ, প্রদীপটি রক্ষিত কাঁচের চিমনীর মধ্যে'।

একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্পাকের 'সিফাত' (গুণবত্তা) এর প্রতিবিম্ব এবং সম্ভাব্য জগতের প্রকাশের মাধ্যম কার্যকর কেবল ইহজগতে। পরজগতে নয়। কেননা ইহজগত নশ্বর এবং পরজগত অনশ্বর। আর 'কুনতুম আমওয়াতান ফা আহ্ইয়াকুম' (তোমরা ছিলে মৃত, তারপর আমি তোমাদেরকে জীবিত করেছি) এবং 'মান কানা মাইতান ফা আহ্ইয়াকুম' (সে ছিলো মৃত, এরপর আমি তোমাদেরকে করেছি জীবিত) আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যু হচ্ছে একটি সম্ভাব্য বিশেষণ এবং তা জীবন অপেক্ষা অগ্রগামী।

www.eelm.weebly.com

এবার আসা যাক 'খলাক্বাল মাওতা' (সৃজন করেছেন মৃত্যু) কথাটির মর্মার্থ কী, সে সম্পর্কিত আলোচনায়। কথাটির মর্মার্থ হবে এরকম— আল্লাহ্পাক জীবনকে প্রকাশ অথবা বিলোপ করে প্রকাশ করেছেন মৃত্যুকে। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক দেহকে এমন করে দেন, যাতে করে তা প্রাণচ্যুত হয়। 'খল্ক্ব' অর্থ আবার 'নির্ধারণ'ও হয়। সেক্ষেত্রে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন জীবন ও মৃত্যুকে।

আতা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ এই পৃথিবীর জন্য নির্ধারণ করেছেন মৃত্যুকে এবং জীবনকে নির্ধারণ করেছেন পরবর্তী পৃথিবীর জন্য। আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাস সম্ভবত এই জীবনকে মৃত্যু এবং ওই জীবনকে জীবন বলে ঠাহর করেছেন। আর আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সম্ভাব্য জগতের ভিত্তি হচ্ছে 'আয়ানে ছাবেতা' বা নৈপথ্যিক মৌল। আর সকল সম্ভাব্য অস্তিত্বই অনস্তিত্ববিজড়িত। সেকারণেই জীবন জড়িত মৃত্যুর সাথে। এর প্রমাণ রয়েছে এই সকল আয়াতে 'নিশ্চয় তুমি মৃত, মৃত তারাও' 'এ ধরাপৃষ্ঠের সকলেই বিনাশশীল' 'প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংসশীল'। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে কর্তৃবাচক শব্দরূপ থেকে বর্তমান কালের অর্থ করাই অধিকতর সঙ্গত।

আবার অনেকে মনে করেন, মৃত্যু বায়বীয় বা অদৃশ্য কিছু নয়। বরং মৃত্যু অবয়বধারী। তার আকৃতি মেষের মতো। আর জীবনের আকৃতি অশ্বীর মতো। আল্লামা সুয়ূতী তাঁর 'বাহরে সাফিরা' গ্রন্থে এরকমই লিখেছেন। এ অভিমতের ভিত্তি হচ্ছে বাগবী কর্তৃক লিখিত হজরত ইবনে আব্বাসের একটি উক্তি, যেখানে তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ মৃত্যুকে দিয়েছেন ডোরাকাটা ভেড়ার আকার এবং জীবনকে আকার দিয়েছেন ডোরাকাটা অশ্বিনীর। মরণ-মেষের পদচারণাকালে যার গায়ে তার হাওয়া লাগে, সে-ই পতিত হয় মৃত্যুমুখে। আর জীবনাশ্বী হচ্ছে ওই মাদী অশ্ব, যার উপরে আরোহণ করতেন হজরত জিবরাইল এবং নবী-রসুলগণ। ওই অশ্বীর পদচারণাকালে যার গায়ে তার বাতাস লাগে, সে হয়ে ওঠে জীবন্ত। ওই অশ্বীর পদস্পর্শিত এক মুঠো মাটি নিক্ষেপ করাতেই সামেরীর গো-বৎসমূর্তিতে জেগে উঠেছিলো জীবনের উদ্ভাস।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, মরণ-মেষের নাম মৃত্যু এবং ডোরাকাটা ওই অশ্বীর নাম জীবন। বরং হাদিসটির মর্মার্থ— মৃত্যু ও জীবন হচ্ছে, ওই মেষ ও অশ্বীর প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া, যা বাতাসরূপে এসে লাগে মৃত্যুপথযাত্রীদের গায়ে। যেমন— বিষের নাম মৃত্যু নয়, বরং মৃত্যু বলা যেতে পারে তার প্রতিক্রিয়াকে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন নরকবাসী ও স্বর্গবাসীরা তাদের স্ব স্ব স্থানে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে স্বর্গ ও নরকের মাঝখানে। তারপর তাকে জবাই করার পর জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, হে স্বর্গ ও নরকবাসীরা! শুনে নাও, তোমরা আর কখনো মৃত্যুমুখে পতিত হবে না। ওই ঘোষণা শুনে

www.eelm.weebly.com

স্বর্গবাসীরা হবে মহাআনন্দিত এবং মর্মাহত হবে নরকবাসীরা। হজরত ইবনে সাঈদ থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে মৃত্যুকে মেষের আকারে দাঁড় করানো হবে বেহেশত ও দোজখের মাঝখানে। তারপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে চিরতরে মৃত্যু ঘটানো হবে তার। হাকেম ও ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল হাকেম কর্তৃক 'বিশুদ্ধ' আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মৃত্যুকে তখন হাজির করা হবে ডোরাকাটা মেষের আকারে। তারপর তার ঘটানো হবে চিরমৃত্যু।

পরবর্তী যুগের আলেমগণের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, বর্ণিত হাদিসসমূহ মুতাশাবিহাত (রহস্যাচ্ছন্ন) শ্রেণীর। সুতরাং আমাদের উচিত কেবল ওগুলোর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ওগুলোর মর্মার্থ আল্লাহ্‌র প্রতি ন্যস্ত করা। অর্থাৎ এরকম বলা যে, এ সকল বিবরণের প্রকৃত তত্ত্ব কেবল আল্লাহ্‌ই উত্তমরূপে অবগত। আল্লামা সুয়ূতী হাকেম ও তিরমিজি থেকে এরকম সিদ্ধান্তের কথাই উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে সুফী-দরবেশগণের অভিমত আবার স্বতন্ত্র। কেননা তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় উপমা-জগতের (আলমে মেছালের) দৃশ্য, যেখানে সতত বিদ্যমান রয়েছে প্রকাশ্য জগতের সকলকিছুর সূক্ষ্ম আকার। আল্লাহ্‌পাকের একটি প্রতিবিম্ববিশিষ্ট অবস্থিতিও রয়েছে সেখানে, যা আনুরূপ্যবিহীন, সৌসাদৃশ্যহীন। সুফী-দরবেশগণ সে সকল দৃশ্য অবলোকন করতে পারেন বলেই তাঁরা বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন অন্যভাবে, উদাহরণ জগতের দর্শনের প্রেক্ষিতে। এক হাদিসে ওই জগতের দর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— রসুল স. বলেছেন, আমি আমার সম্মানিত প্রথম পিতাকে দেখেছি শ্মশ্রু-গুম্ফবিহীন সৌম্যকান্তি যুবকের আকৃতিতে। তাঁর চরণযুগলে শোভা পাচ্ছিলো স্বর্ণের পাদুকা। এই হাদিসও মুতাশাবিহাত শ্রেণীর। আর অসংখ্য সুফি-আউলিয়া দ্বারা ওই উদাহরণ জগতের দর্শনাভিজ্ঞতার কথা সুবিদিত। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌পাক তখন ওই উদাহরণ জগতস্থিত মৃত্যুর আকারকে বেহেশত ও দোজখের মাঝখানে উপস্থিত করে তাকেই জবাই করার নির্দেশ দিবেন এবং বেহেশত ও দোজখবাসীকে জানিয়ে দিবেন যে, তাদের বাসস্থান চিরকালীন। ফলে বেহেশতবাসীরা হবে চিরনিশ্চিন্ত। আর দোজখবাসীরা হবে চিরনিরাশ। উদাহরণ জগতের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে আরো অনেক হাদিসে।

আল্লামা সুয়ূতী তাঁর 'বদরুস সাফিরা' গ্রন্থে লিখেছেন, মানুষের প্রতিটি কর্ম এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টবস্তু। তাই সেগুলোর প্রতিটির রয়েছে এক একটি নির্দিষ্ট আকার, যদিও তা খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু সেগুলোর কোনোটাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টির অগোচর নয়। তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, কর্মসমূহের আকার ও সেগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আকৃতি দর্শন আউলিয়াগণের একটি বহুল আলোচিত বৈশিষ্ট্য। কেননা তাঁরা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। এর প্রমাণ রয়েছে অনেক হাদিসে। বলা বাহুল্য, তাদের এমতো দর্শন উদাহরণ জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য— কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম'। একথার অর্থ— হে মানুষ! আল্লাহ্ জন্ম-মৃত্যুসম্বলিত এই পৃথিবীর জীবন দিয়ে এবং তৎসঙ্গে শরিয়তের বিধি-নিষেধ আরোপ করে তোমাদের বিষয়ে এই পরীক্ষাটি সম্পন্ন করতে চান যে, তোমরা এখানে উত্তম কর্মসমূহ সম্পাদন করো কিনা। উল্লেখ্য, কথাটির উদ্দেশ্য আবার এরকম নয় যে, মানুষের এই পরীক্ষার ফলাফল কী হবে, তা আল্লাহ্ পূর্বাহ্নে জানেন না। এমতো ধারণা অসম্ভব। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ। বরং এরকম পরীক্ষা তিনি সম্পন্ন করতে চান তাঁর বান্দাদের সম্মুখে তাদের উত্তীর্ণতা ও অনুত্তীর্ণতা প্রকাশের জন্য। যেনো তারা সুস্পষ্টভাবে একথা বুঝতে পারে যে, তাদেরকে পুরস্কৃত অথবা তিরস্কৃত করা হচ্ছে তাদেরই কৃতকর্মানুসারে। আর এখানকার 'কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম' কথাটি বাক্যের দ্বিতীয় কর্মপদ।

হজরত ইবনে ওমর থেকে সর্বোন্নত সূত্রে বাগবী লিখেছেন, এখানকার 'কে কর্মে উত্তম' অর্থ কে অধিক জ্ঞানী, কে-ই বা নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে মুক্ত এবং কে আল্লাহ্র আনুগত্যে একনিষ্ঠ। সুতরাং একথা বলতে আর কোনো বাধা থাকে না যে, এখানে 'কর্ম' অর্থ শুভবোধ, সংযম ও আনুগত্য। আর এখানকার 'পরীক্ষা করবার জন্য' কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে 'যিনি সৃষ্টি করেছেন' বাক্যাংশটির সঙ্গে। এমতাবস্থায় জীবন ও মৃত্যু-সৃষ্টির তাৎপর্য হবে একথা প্রকাশ করা যে— কে অনুগত এবং কে অনুগত নয়। আর আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ প্রতিপালনের স্থান হচ্ছে এই পৃথিবী। আর 'মৃত্যু' এমতোক্ষেত্রে সতর্ককারী, কর্তব্যবোধের স্মারক, সংকেত, অথবা সদুপদেশ। আর এমতো সদুপদেশকে মান্য করে চলে কেবল তারা, যারা বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। তাদের কাছে এমতো দায়িত্বপালন হচ্ছে মহাসুযোগ। কেননা সামান্য এ জীবনের যৎসামান্য সৎকর্মসমূহের বিনিময়েই লাভ হতে পারে কাংখিত জান্নাত এবং আল্লাহ্র দীদার। হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার থেকে সর্বোন্নত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, মৃত্যু একটি চূড়ান্ত হিতোপদেশ। আর ইমান হচ্ছে অমূল্য বৈভব। তিবরানী।

রবী ইবনে আনাস থেকে প্রায়োন্নত সূত্রে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, পৃথিবী-প্রীতির প্রতি বিরাগ এবং পরবর্তী পৃথিবীর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির জন্য উপদেশস্বরূপ মৃত্যুভীতিই যথেষ্ট। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, সাতটি বিষয় আগমনের পূর্বেই তোমরা তোমাদের পুণ্য কর্মসমূহ সম্পন্ন করো— ১. এমন দারিদ্র, যা আল্লাহ্র বিধানকে বিস্মৃত করে দেয় ২. এমন ঐশ্বর্য, যা করে তোলে আল্লাহদ্রোহী ৩. এমন ব্যাধি, যার নিরাময় নেই ৪. এমন বার্ধক্য, যা লুপ্ত করে দেয় জ্ঞান ৫. মৃত্যু ৬. দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ৭. মহাপ্রলয়। তিরমিজি ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, সৎকর্মসমূহ সমাধা করো ছয়টি বিষয় প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে— ১. পশ্চিম দিগন্তের সূর্যোদয় ২. ধূম্রপুঞ্জ ৩. দাব্বাতুল আরদ্ব ৪. দাজ্জাল ৫. মৃত্যু ৬. মহাপ্রলয়।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল'। একথার অর্থ— অননুগতদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি মহাপ্রতাপশালী এবং অনুগতদের প্রতি পরম ক্ষমাপরবশ।

সূরা মুল্‌ক ঃ আয়াত ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ
مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿۳﴾ ثُمَّ
ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ
حَسِيْرٌ ﴿۴﴾ وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَ جَعَلْنٰهَا
رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ﴿۵﴾ وَ لِلَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۶﴾ اِذَآ اُلْقُوْا
فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّ هِىَ تَفُوْرُ ﴿۷﴾ ۙ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ
الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ
نَذِيْرٌ ﴿۸﴾ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ۬ فَكَذَّبْنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ
مِنْ شَىْءٍ ۚۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ﴿۹﴾ وَ قَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ
اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْۤ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿۱۰﴾ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ
فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿۱۱﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿۱۲﴾ وَ اَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ
اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۳﴾ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَ هُوَ
اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿۱۴﴾ ع

www.eelm.weebly.com

q যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখিতে পাইবে না; তুমি আবার তাকাইয়া দেখ, কোন ত্রুটি দেখিতে পাও কি?

q অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হইয়া তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে।

q আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিয়াছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং উহাদিগকে করিয়াছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং উহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।

q যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি; উহা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

q যখন উহারা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে তখন উহারা জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনিবে, আর উহা হইবে উদ্বেলিত।

q রোষে জাহান্নাম যেন ফাটিয়া পড়িবে, যখনই উহাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হইবে, উহাদিগকে রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসে নাই?'

q উহারা বলিবে,'অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল, আমরা উহাদিগকে মিথ্যাবাদী গণ্য করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, 'আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রহিয়াছ।'

q এবং উহারা আরও বলিবে, 'যদি আমরা শুনিতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতাম, তাহা হইলে আমরা জাহান্নামবাসী হইতাম না।'

q উহারা উহাদের অপরাধ স্বীকার করিবে। ধ্বংস জাহান্নামীদের জন্য।

q যাহারা দৃষ্টির অগোচরে তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

q তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অর্ন্তযামী।

q যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।

'আল্লাজী খলাক্বা সাবআ' সামাওয়াতি ত্বিবাক্বা' অর্থ যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে-স্তরে সপ্তাকাশ। এখানকার 'যিনি সৃষ্টি করেছেন' কথাটি আগের আয়াতের 'যিনি' (হুয়া) উদ্দেশ্য পদের বিধেয়। অথবা 'ক্ষমাশীল' বিশেষ্যের বিশেষণ। কিংবা প্রথম আয়াতের 'সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ত' বাক্যের অনুবর্তী। আর এখানকার 'ত্বিবাক্ব' (স্তরে স্তরে) শব্দটি বহুবচন 'ত্বক্ব' এর 'যেমন 'হবল' এর বহুবচন 'হিবাল'। অথবা 'ত্বিবাক্ব' বহুবচন 'ত্বাক্বাতুন' এর। যেমন 'রিহাব' বহুবচন 'রহাবাতুন' এর। কিংবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'ত্বিবাক্বা' একটি অনুক্ত ক্রিয়ার কর্মপদ। চর্মশিল্পী যদি স্তরে স্তরে জুতা সেলাই করে, তবে তাকে বলা হয় 'ত্বিবাক্বান নাআল' (স্তরে স্তরে জুতা সেলাই করেছে)। 'ত্বিবাক্ব' শব্দটি

www.eelm.weebly.com

সর্বক্ষেত্রেই বহুবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অথবা বলা যায়, শব্দটি একটি অনুক্ত ক্রিয়ার কর্মপদের বিশেষণ। কিংবা অবস্থাপ্রকাশক। উল্লেখ্য, সপ্তাকাশের সবিস্তার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে। প্রয়োজনবোধে সেখানে বিষয়টি দেখে নেওয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে 'মা তারা ফী খল্‌ক্বির রহমানি মিন তাফাউত' (দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না)। এখানে 'মা তারা' (তুমি দেখতে পাবে না) বলে সম্বোধন করা হয়েছে কেবল রসুল স.কে। অথবা সম্বোধনটি এখানে সার্বজনীন। 'মা' অব্যয়টি এখানে হতে পারে না-সূচক। অথবা কথাটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। আবার প্রশ্নবোধকতার ক্ষেত্রে 'তারা' এখানে হতে পারে ক্রিয়াবোধক কর্মপদও। এখানকার 'দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টি' অর্থ কেবল আকাশ, অন্যান্য সৃষ্টি নয়। কেননা কথাটি এখানে সীমিতার্থক। আর এখানে সৃজনের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সঙ্গে করা হয়েছে সম্মানার্থে। অর্থাৎ সপ্ত আকাশের সৃজয়িতা কেবলই আল্লাহ্‌, যিনি দয়াময়। আর 'তাফাউত' অর্থ যদি হয় নিখুঁত অথবা অ-মিলিত, তবে এখানকার সম্বন্ধপদটি হবে জাতিবাচক এবং এমতাবস্থায় এখানকার 'সৃষ্টি করেছেন' কথাটি প্রযুক্ত হবে সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তাঁর কোনো সৃষ্টিই ত্রুটিযুক্ত নয়। অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির প্রকাশ ঘটানো হয়েছে যথাযথ পরিমাপ ও পরিমাণানুসারে এবং যে ব্যবস্থাপনানুসারে সেগুলো পরিচালিত হয়, তার চেয়ে উত্তম ব্যবস্থাপনা আর কিছু হতেই পারে না।

এখানকার 'মিন তাফাউত' এর 'মিন' (হতে) অব্যয়টি অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। অথবা 'মিন' এখানে আংশিক অর্থপ্রকাশক। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিতে সামান্যতম ত্রুটিও নেই। তবে এমতাবস্থায় 'মা' অব্যয়টির অর্থ হবে না-বাচক। আর এখানকার 'মা' অব্যয়টি প্রশ্নবোধক হলে 'মিন' হবে বর্ণনামূলক। এমতাবস্থায় পুরো বাক্যটি হবে সপ্তাকাশের অবস্থাপ্রকাশক অথবা 'সৃষ্টি করেছেন' ক্রিয়ার কর্তা, কিংবা কর্মপদের অবস্থাপ্রকাশক।

লক্ষণীয়, এখানে 'তাঁর সৃষ্টিতে' না বলে বলা হয়েছে 'দয়াময়ের সৃষ্টিতে'। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সপ্তস্তরবিশিষ্ট আকাশের নির্মাণনৈপুণ্য দোষত্রুটিশূন্য, কেননা এমন সৃজনকর্ম এমন এক সত্তার, যিনি স্বয়ং যাবতীয় দোষত্রুটিবিমুক্ত। উপরন্তু তিনি দয়াময়ও। অথবা কথাটির পূর্বে উহ্য রয়েছে এই প্রশ্নটি 'তাঁর সৃজনকর্ম কীরূপ'? এমতাবস্থায় বাক্যটি হবে পূর্বোক্ত বাক্য থেকে পৃথক এবং হবে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানুষ যেমন নিখুঁত, তেমনি নিখুঁত সপ্তস্তরবিশিষ্ট আকাশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি আবার তাকিয়ে দ্যাখো, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি'? এখানে 'তুমি আবার তাকিয়ে দ্যাখো' বাক্যটি একটি প্রচ্ছন্ন শর্তের পরিণতি। অর্থাৎ যদি তোমরা মনে করো আকাশে কোনো খুঁত খুঁজে পাবে, তবে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করো বার বার, যতোবার খুশী।

www.eelm.weebly.com

‘হাল তারা মিন ফুতুর’ অর্থ কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি? প্রশ্নটি ইতিবাচক। আর এখানকার ‘ফুতুর’ (ত্রুটি) শব্দটি এসেছে, ‘ফাতুরাহু’ (ছিঁড়ে ফেঁড়ে দিয়েছে) থেকে। আর ‘মিন’ অব্যয়টি এখানে অতিরিক্ত, অথবা আংশিক অর্থপ্রকাশক।

পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর তুমি বার বার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে’। এখানে ‘বাসারা কার্‌রাতাইন’ অর্থ বার বার দৃষ্টি ফিরাও। ‘কার্‌রাতাইন’ শব্দটি দ্বিবচন এবং আধিক্যজ্ঞাপক। অর্থাৎ শব্দটি দ্বিবচন হলেও এখানে এটি বহুবচনবোধক। যেমন ‘লাব্বাইকা’ কথাটি দ্বিবচনবোধক হওয়া সত্ত্বেও এর মাধ্যমে কেবল দু’বার উপস্থিতির উদ্দেশ্যে বলা হয় না, বলা হয় বহুবার উপস্থিতির উদ্দেশ্যে।

‘ইয়ানক্বালিবু ইলাইকাল বাসারু খশিয়াওঁ ওয়াহুয়া হাসীর’ অর্থ সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে। এখানকার ‘ইয়ানক্বালিব’ (ফিরে আসবে) কথাটি ‘ইরজ্বিউ’ (ফিরাও) অনুজ্ঞার জবাব। ‘খশিয়ান’ অর্থ ব্যর্থ হয়ে। ‘খশিউন’ অর্থ ক্লান্ত, নিষ্ফল, লাঞ্ছিত। আর ‘ওয়া হুয়া হাসীর’ বাক্যটি এখানে ‘ফিরে আসবে’ ক্রিয়ার কর্তা। অর্থাৎ ‘বাসারু’ (দৃষ্টিপাত) যাদের প্রথম অবস্থার প্রকাশ ‘ব্যর্থ হয়ে’ এবং দ্বিতীয় অবস্থার প্রকাশ ‘ক্লান্ত হয়ে’।

বাগবী লিখেছেন, কা’ব বলেছেন, পৃথিবীর নিকটতম আকাশ ছিলো উর্মি-বিক্ষুব্ধ, যাকে করা হয়েছে শান্ত। দ্বিতীয় আকাশ শুভ্র জমরুদ প্রস্তরনির্মিত, তৃতীয় আকাশ উষর। চতুর্থ আকাশ হচ্ছে পিতলের, পঞ্চম আকাশ রুপার, ষষ্ঠ আকাশ সোনার, আর সপ্ত আকাশ আল্লাহ্‌পাকের পরম সত্তার অন্তরাল বা সপ্তপ্রান্তরবিশিষ্ট সীমানা।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— ‘আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা’। এখানে ‘প্রদীপমালা দ্বারা’ অর্থ নক্ষত্ররাজি দ্বারা। অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জ যেনো অগণিত অসংখ্য প্রদীপ, যেগুলোর দ্বারা আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে। এ সম্পর্কে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা যে কথাই বলুন না কেনো, তাদের কথা যদি কোরআনানুকূল না হয়, তবে তা হবে পরিত্যাজ্য।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং তাদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি’। একথার অর্থ শয়তান যখন আকাশের কাছাকাছি গিয়ে চুপিসারে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করে, তখন আমি নক্ষত্র থেকে প্রস্তুত করি অগ্নিপ্রস্তর এবং তা সেই শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করে তাকে ধ্বংস করে দেই। অর্থাৎ সম্পূর্ণ নক্ষত্র উৎপাটন করে নয়, অগ্নিপ্রস্তররূপে নিক্ষেপ করা হয় নক্ষত্রের কিছু অংশকে। আর এখানকার ‘তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি’ অর্থ আমি তাদের জন্য পরকালেও প্রস্তুত করে রেখেছি দোজখের অগ্নিশাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— ‘যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, তা কতো মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল’। আগের আয়াতে বলা হয়েছে, শয়তানের জন্য জাহান্নামের শাস্তি প্রস্তুত রাখা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে। আর এই আয়াতে বলা হলো, জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকেও। এতে করে বুঝা যায়, শয়তানও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও শয়তানের সমতুল। অর্থাৎ তারা যেনো একে অপরের জ্ঞাতি ভ্রাতা।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'যখন তারা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনবে, আর তা হবে উদ্বেলিত'। এখানকার 'শাহীক্ব' এর শাব্দিক অর্থ— গর্দভের চীৎকার। মর্মার্থ— বিকট-বীভৎস শব্দ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা জাহান্নামে প্রবিষ্ট হওয়ার সময় শুনতে পাবে সেখানকার লেলিহান অগ্নিকুণ্ডলীর বিকট-বীভৎস শব্দ। অথবা চীৎকার শুনতে পাবে পূর্বে প্রবিষ্ট জাহান্নামীদের। কিংবা নিজেরাই তখন তারা ভয়ে আতংকে বীভৎস আওয়াজ করতে থাকবে গাধার বিকট আওয়াজের মতো।

'ওয়া হিয়া তাফূর' অর্থ আর তা হবে উদ্বেলিত। অর্থাৎ জাহান্নাম তখন ফুটতে থাকবে অতিউত্তপ্ত ডেকচির ফুটন্ত পানির মতো। অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ডলী থেকে তখন উত্থিত হবে সুতীব্র দহনের গর্জন। মুজাহিদ সূত্রে হান্নাদ বলেছেন, স্বল্প পানির জলাধারে জোয়ার এলে পানি যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ফুলে-ফেঁপে কেবল উপরের দিকে উত্থিত হতে থাকে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপকালে জাহান্নামের অবস্থাও হবে তেমনি। ফুলে ফেঁপে তখন টগবগ করতে থাকবে জাহান্নাম। কথাটি রূপকার্থক।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'রোষে জাহান্নাম যেনো ফেটে পড়বে'। এখানকার 'রোষ' কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'ফেটে পড়বে' এর সঙ্গে। এভাবে পুরো বাক্যটি হবে আগের আয়াতের 'উদ্বেলিত হবে' ক্রিয়ার কর্তা। অর্থাৎ জাহান্নামের অবস্থাপ্রকাশক। আগের আয়াতের 'আর তা হবে উদ্বেলিত' বাক্যটি 'লাহা' (তা) অর্থাৎ জাহান্নামের অবস্থাপ্রকাশক। আর এখানকার 'গইজ' অর্থ আল্লাহ্‌র রোষ, ক্রোধ, কোপ। অথবা রোষ শাস্তি প্রদানকারী ফেরেশতাদের। কিংবা ক্রোধ জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখার। শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি রূপকার্থক। কেননা অগ্নি জড় পদার্থ, ক্রোধ-আনন্দ ইত্যাদি অনুভূতিশূন্য। তবে জড়পদার্থকে যদি অনুভূতিসম্পন্ন বলে গণ্য করা হয়, তবে শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি প্রকৃতার্থকই হবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখনই তাতে কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের নিকটে কি কোনো সতর্ককারী আসেনি'? এখানে 'রক্ষী' অর্থ জাহান্নামের প্রহরী। তারাই জাহান্নামগমনের সময় জাহান্নামীদেরকে ভর্ৎসনা করে বলবে, কীহে! তোমাদের প্রতি কি কোনো রসুল প্রেরণ করা হয়নি? বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। আর একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হচ্ছে— কী অবস্থা হবে তখন, যখন জাহান্নামীদেরকে প্রবেশ করানো হবে জাহান্নামে? আর এখানকার 'কুল্‌লামা' (যখন) কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'সাআ'লাহুম' (জিজ্ঞেস করবে) এর সঙ্গে। আর আলোচ্য প্রশ্নটি (তোমাদের নিকট কি কোনো সতর্ককারী আসেনি) স্বীকৃতিমূলক।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিলো'। এখানে 'ক্বলু' অর্থ তারা বললো। কথাটি অতীতকালবোধক হলেও এখানে তা হবে ভবিষ্যতকালজ্ঞাপক। অর্থাৎ তারা তখন বলবে 'বালা'। আর 'বালা' অর্থ হ্যাঁ। কথাটি আবেগআরোপক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অবশ্যই আমাদের প্রতি যথাসময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন আল্লাহ্র বার্তাবাহকগণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছো'। একথার অর্থ— কিন্তু আমরা তাঁদের কথার কোনো মূল্যই দেইনি। উল্টো বরং তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা অসত্যভাষী। তোমরা কস্মিনকালেও প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নও। আল্লাহ্ তোমাদের মতো মানুষের উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করতে পারেই না। সুতরাং তোমরা মহাবিভ্রান্ত ব্যক্তি বৈ অন্য কিছুই নও। এরকমও হতে পারে যে, এরকম কথা তাদেরকে তখন বলবে জাহান্নামের প্রহরীরা। অর্থাৎ তারা বলবে, তোমরা তো তখন ওই সকল মহাপুরুষকে অমান্য করেছিলে। তাদেরকে সাব্যস্ত করেছিলে 'মহাবিভ্রান্ত' বলে। আর এখানকার 'নাজীর' অর্থ সতর্ককারী, নবী। শব্দটি একবচন হলেও এখানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনার্থে। অর্থাৎ এখানে 'নাজীর' অর্থ নবী-রসুলগণ। কেননা শেষে বলা হয়েছে 'তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছো'। অথবা বলা যেতে পারে, সম্বোধনের বেলায় এখানে উত্তম পুরুষের স্থলে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে মধ্যম পুরুষকে। কিংবা বলা যায়, একজন নবীকে অমান্য করার অর্থ সকল নবীকে অস্বীকার করা। অর্থাৎ তারা তখন বলবে, আমরা আমাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে লক্ষ্য করে বলেছিলাম, তুমি এবং তোমার মতো নবুয়তের দাবিদারেরা মহাবিভ্রান্তির শিকার।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'এবং তারা আরো বলবে, যদি আমরা শুনতাম, অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না'। একথার অর্থ— তারা তখন আরো বলবে, হায়! যদি আমরা তখন ওই সকল প্রেরিত পুরুষগণের উপদেশ হৃদয়ের কান দিয়ে শুনতাম, অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে তাঁদের আহ্বান ও প্রমাণপঞ্জীর মর্মোদ্ধার করতে চেষ্টা করতাম, তাহলে নিশ্চয় আমরা হতে পারতাম বিশ্বাসী। আর বিশ্বাসী হতে পারলে এখানকার এই মহাদুর্ভোগ থেকে পেতে পারতাম পরিত্রাণ। এখানে 'না'ক্বিলু' শব্দটির পূর্বে 'নাসমাউ' (শুনতাম) উল্লেখ করার তাৎপর্য হচ্ছে— বুদ্ধিগত প্রমাণ অপেক্ষা শ্রুত প্রমাণ অধিক পালনীয়। অর্থাৎ শুধু যুক্তি-বুদ্ধি ইমানের ভিত্তি নয়। আর 'বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম' বলে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, পরিশুদ্ধ বুদ্ধি-বিবেক স্বকপোলকল্পনা থেকে মুক্ত এবং তা প্রত্যাদেশের সম্পূর্ণ অনুকূল। আর এখানকার 'আও' (অথবা) যে 'ওয়াও' (এবং) অর্থে ব্যবহৃত

www.eelm.weebly.com

হয়েছে, এরকম বলারও অবকাশ রয়েছে এখানে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হায়! আমরা যদি তখন তাঁদের কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝতে চেষ্টা করতাম, তবে নিশ্চয় আজ আমরা হতাম না এই মহাদুর্গতির শিকার।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে, ধ্বংস জাহান্নামীদের জন্য'। একথার অর্থ— এভাবে তারা তখন তাদের কৃত অপরাধের স্বীকৃতি প্রদান করবে। কিন্তু সে স্বীকৃতি তাদের কোনোই কাজে আসবে না। কেননা তাদের ওই জাহান্নামবাস হবে চিরকালীন। এখানে 'জামবুন' (অপরাধ) অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যান। শব্দটি ধাতুমূল বলেই এখানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে একবচনরূপে। আর এখানকার 'সুহ্‌ক্বান' (ধ্বংস) শব্দটিও ধাতুমূল এবং কর্মপদ। এখানে এর ক্রিয়াপদ রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ কথাটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ তাদেরকে করেছেন তাঁর অনুকম্পাচ্যুত, তাই তারা হয়ে গিয়েছে চিরক্ষতিগ্রস্ত। বক্তব্যকে সংকুচিত করে বিশেষ একটি অর্থকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই এখানে কথাটি বলা হয়েছে এরকম করে। এভাবে এখানকার 'ধ্বংস জাহান্নামীদের জন্য' কথাটি হয়েছে একটি অভিসম্পাত, অসংলগ্নোচ্চারণ।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'যারা দৃষ্টির অগোচরে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও পুরস্কার'। এখানে 'গইব' অর্থ অদৃশ্য, অনাগত, দৃষ্টির অগোচর। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যারা অনাগত শাস্তির ভয় করে, তাদের জন্যই অপেক্ষা করছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। অথবা পরকালের নিশ্চিত শাস্তির সম্মুখীন না হওয়া সত্ত্বেও যারা তার ভয় হৃদয়ে লালন করে, মার্জনা ও মহাপ্রতিদান রয়েছে তাদের জন্যই। কিংবা— যারা নীরবে-নিভৃতেও আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে, তাদের জন্যই অপেক্ষমান মার্জনা ও মহাপুরস্কার। আবার 'গইব' বলে এখানে বুঝানো হয়ে থাকতে পারে দেহের কোনো গোপন অংশকেও। যেমন— অন্তঃকরণ। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— হৃদয়ে যারা পোষণ করে আল্লাহ্‌ভীতি— ক্ষমা, মহাপুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে তাদেরই জন্য। উল্লেখ্য, এতোক্ষণ ধরে অবিশ্বাসীদের শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা চলছিলো, তারপর এই আয়াতে ঘটলো প্রসঙ্গান্তর। অবিশ্বাসীদের পরিবর্তে এখানে বলা হলো বিশ্বাসী ও আল্লাহ্‌ভীরুদের কথা। এভাবে বিশ্বাসীগণকে এই শুভসমাচারটি দিয়ে দেওয়া হলো যে, আল্লাহ্-ভীতিই সকল সফলতার ভিত্তি। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌ভীতি হচ্ছে জ্ঞানের শিখর। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. সম্পর্কে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অশোভন আলাপ-আলোচনা করতো। আবার একে অপরকে সাবধান করতো এরকম বলে যে, উচ্চস্বরে কিছু বোলো না। না হলে আল্লাহ্ আবার আমাদের কথা শুনে ফেলবে এবং সে কথা জানিয়ে দিবে মোহাম্মদকে। হজরত জিবরাইল তাদের এমতো শলাপরামর্শ সম্পর্কে রসুল স.কে অবহিত করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াতদ্বয়।

www.eelm.weebly.com

বলা হলো— 'তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বলো, অথবা বলো প্রকাশ্যে, তিনি তো অন্তর্যামী (১৩) যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত' (১৪)। এখানকার 'তিনি কি জানেন না' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— তিনি তো সকল কিছুই জানেন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ই প্রকাশ্য গোপন সকল কিছুর স্রষ্টা। সুতরাং এটা কি অসম্ভব ব্যাপার নয় যে, তিনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে অনবহিত থাকবেন? একি কখনো সম্ভব? তোমরাই বলো, এরকম কি কখনো হতে পারে? তিনি যে অন্তর্যামী, সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ। অথবা— আরে, সৃজয়িতা কি কখনো তাঁর সৃজন সম্পর্কে অনবগত থাকতে পারেন? নিশ্চয় নয়।

'ওয়া হুয়াল লাত্বীফুল খবীর' অর্থ তিনি সুক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান সর্বত্রগামী, তা দৃশ্যমান হোক, অথবা হোক অদৃশ্য।

সূরা মুল্ক ঃ আয়াত ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَ
كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿۱۵﴾ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ
يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ ﴿۱۶﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى
السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ
نَذِيْرِ ﴿۱۷﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿۱۸﴾

r তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করিয়া দিয়াছেন; অতএব তোমরা উহার দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁহার প্রদত্ত জীবনোপকরণ হইতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থান তো তাঁহারই নিকট।

r তোমরা কি ইহা হইতে নির্ভয় হইয়াছ যে, যিনি আকাশে রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগকে সহ ভূমিকে ধসাইয়া দিবেন, অনন্তর উহা আকস্মিকভাবে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে?

r অথবা তোমরা কি ইহা হইতে নির্ভয় হইয়াছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদের উপর কঙ্করবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিবেন? তখন তোমরা জানিতে পারিবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী!

r ইহাদের পূর্ববর্তিগণও অস্বীকার করিয়াছিল; ফলে কিরূপ হইয়াছিল আমার শাস্তি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তার দিগ-দিগন্তে বিচরণ করো'। এখানে ভূমি অর্থ

www.eelm.weebly.com

পৃথিবীপৃষ্ঠ। আর 'সুগম করে দিয়েছেন' অর্থ পৃথিবীপৃষ্ঠকে করে দিয়েছেন চলাচলের উপযোগী। 'মানাকিবিহা' অর্থ পৃষ্ঠদেশ। 'মানাকিব' বলা হয় মানুষের গ্রীবাদেশকেও। আবার কেউ কেউ বলেছেন 'মানাকিব' অর্থ শৈলশ্রেণী।

'জালূল' অর্থ সুগম, সহজ। অর্থাৎ আল্লাহ্ পথচারীদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন সহজগম্য, এমন করেননি, যাতে যাতায়াত হতে পারে রুদ্ধ। অনুগত উষ্ট্রীকে তাই বলা হয় 'আন নাক্বাতুজ জালূলু'। এভাবে এখানে এ কথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, একান্ত অনুগত উষ্ট্রী অপেক্ষাও এই ধরিত্রীপৃষ্ঠ অধিক সহনশীল। তাইতো পৃথিবীবাসীরা এখানে পদচারণা করতে পারে নির্বিঘ্নে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে আহার্য গ্রহণ করো'। একথার অর্থ— এই ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করেই তোমরা আল্লাহ্র দেওয়া রিজিক অনুসন্ধান করো এবং জীবনধারণ করো সেই রিজিকের দ্বারা।

এরপর বলা হয়েছে— 'পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট'। একথার অর্থ— পুনরুত্থান দিবসে তো তোমাদেরকে তাঁর নিকটেই জবাবদিহি করতে হবে। তখন অবশ্যই তোমাদেরকে এমতো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে যে, তোমরা তাঁর অনুগ্রহসম্ভার পেয়ে ও ভোগ করে অনুগ্রহদাতার প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলে কিনা।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'তোমরা কি এটা থেকে নির্ভয় হয়েছো যে, যিনি আকাশে রয়েছেন, তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধসিয়ে দিবেন, অনন্তর তা আকস্মিকভাবে থর থর করে কাঁপতে থাকবে'।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে স্বেচ্ছাচারীরা! তোমাদের মনে কি আকাশবাসী আল্লাহ্ সম্পর্কে এতটুকুও ভয় নেই, যিনি ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে তোমাদেরকে ভূমিধস, অথবা ভূমিকম্পের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিতে পারেন। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতি রজনীর তৃতীয় যামে আল্লাহ্পাক অবতরণ করেন পৃথিবীর নিকটতম আকাশে। আহ্বান জানান— কে আছো যাচনাকারী যাচনা কর। তোমাদের আবেদন পূর্ণ করা হবে। কে আছো ক্ষমাপ্রার্থী! ক্ষমাপ্রার্থনা করো। তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ তখন প্রসারিত করে দেন তাঁর বাহুদ্বয়। বলেন, হে প্রার্থনাকারীরা! প্রার্থী হও ওই সত্তার সমীপে, যিনি বিত্তহীন নন, নন কারো অধিকার ক্ষুণ্নকারী। যাচনা করো। আমি তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করবো। এভাবে তিনি তাঁর এমতো দয়ার্দ্র আহ্বান ঘোষণা করতে থাকেন প্রত্যুষ পর্যন্ত। এই হাদিসের আলোকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াত 'দুর্জ্ঞেয়' (মুতাশাবিহাত) শ্রেণীর। কারণ আল্লাহ্ আকার-নিরাকার সম্ভূত সত্তা নন, নন স্থান, অথবা কালসম্পৃক্ত। কেননা তিনি আনুরূপ্যবিহীন (বেমেছাল)। সুতরাং আকাশস্থিত হওয়া তাঁর জন্য শোভন ও সমীচীন যেমন নয়, তেমনি নয় সম্ভবপর।

www.eelm.weebly.com

একারণেই পরবর্তী যুগের বিদ্বানগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মৌন থেকেছেন। আর সুফী-আউলিয়াগণ এ সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সেরকম, যেরকম মন্তব্য করেছেন 'আল্লাহ্ তাদের নিকট আগমন করবেন মেঘের ছত্রছায়ায়' আয়াত সম্পর্কে। শেষ যুগের বিদ্বানগণ এ সম্পর্কে উপস্থাপন করেছেন বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যা। যেমন— 'তিনি আকাশে রয়েছেন' অর্থ আকাশে রয়েছে তাঁর নির্বাহী পরিমণ্ডল। অথবা তাঁদের মতে এখানকার বক্তব্যটিকে পরিবেশন করা হয়েছে আরবের তখনকার জনসাধারণের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁরা মনে করতেন, আল্লাহ্ আকাশে অবস্থান করেন। অথবা 'সামা' অর্থ এখানে আকাশ নয়, বরং অজ্ঞেয় উর্ধ্বদেশ। এবং তা স্থান বা কাল সম্পৃক্ত নয়, বরং মর্যাদাসম্পৃক্ত। অর্থাৎ তাঁর মহিমা এমন গগনচুম্বী, যা ধারণা ও কল্পনার অতীত। আর আলোচ্য আয়াতের প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এরকমও বলা হয়েছে যে, এখানকার 'মান ফিস্ সামায়ী' অর্থ আকাশচারী ফেরেশতাবৃন্দ, যারা আল্লাহ্র বিধানসমূহ নির্বাহকারী। তারাই আল্লাহ্র নির্দেশে নাজিল করেন ভূমিধস, প্রস্তরবৃষ্টি, প্লাবন ইত্যাদি নৈসর্গিক বিপদ-আপদ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা এ সম্পর্কে কীভাবে নিশ্চিন্ত হতে পারলো যে, আকাশচারী ফেরেশতারা আল্লাহ্র হুকুমে ভূমিধসের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে না, যেমন ভূপ্রোথিত করে দিয়েছিলো দুরাচার 'কারুনকে' তখন তো অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠ কেঁপে উঠেছিলো থরথর করে।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— অথবা তোমরা কি এটা থেকে নির্ভয় হয়েছো যে, আকাশে যিনি রয়েছেন, তিনি তোমাদের উপর কঙ্করবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন? তখন তোমরা জানতে পারবে কীরূপ আমার সতর্কবাণী'। এখানকার প্রশ্নটিও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। 'আম' অর্থ এখানে 'হাল' (কি)। আর 'হাসিব' অর্থ কঙ্করবর্ষী ঝঞ্ঝা, প্রস্তরবর্ষণকারী ঝড়, যেমনটি হয়েছিলো নবী লুতের সম্প্রদায়ের উপর। 'জানতে পারবে কীরূপ ছিলো আমার সতর্কবাণী' অর্থ নবী লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপরে যেরকম সর্বনাশা প্রস্তর-ঝড় বয়ে গিয়েছিলো, সেরকম আযাব শুরু হলে তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারবে, আমার শাস্তি কতো কঠিন! কিন্তু তখন তোমাদের এমতো বোধোদয় কোনো কাজেই আসবে না।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'এদের পূর্ববর্তীগণও অস্বীকার করেছিলো; ফলে কীরূপ হয়েছিলো আমার শাস্তি'। বাক্যটি একটি প্রচ্ছন্ন শপথের জবাব। 'নাকীর' অর্থ অস্বীকার করা, কোনোকিছুকে নিকৃষ্ট ধারণা করা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এ সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পূর্বসূরীরাও ছিলো এদের মতোই দুর্বৃত্ত, ফলে তারা শাস্তিগ্রস্ত হয়েছিলো। এদের পরিণতিও হতে পারে সেরকম। তখন তারা বুঝতে পারবে আমার শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে। বক্তব্যটিতে যুগপৎ বিধৃত হয়েছে রসুল স. এর জন্য সান্ত্বনার বাণী এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি হুমকি। আর এখানকার 'কীরূপ হয়েছিলো আমার শাস্তি' কথাটি হতে পারে

www.eelm.weebly.com

বিস্ময়সূচক, অথবা অশুভ বার্তাপ্রকাশক। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়াতে পারে— অতীতের অবাধ্য জাতিগোষ্ঠীগুলো আমা কর্তৃক অবতারিত ধর্মাদর্শকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো, ফলে তাদের প্রতি আপতিত হয়েছিলো আমার তীব্র রোষ।

সূরা মুল্‌ক ঃ আয়াত ১৯, ২০, ২১, ২২

اَوَلَمۡ یَرَوۡا اِلَی الطَّیۡرِ فَوۡقَهُمۡ صٰٓفّٰتٍ وَّ یَقۡبِضۡنَ ؕۘ مَا یُمۡسِکُهُنَّ
اِلَّا الرَّحۡمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِکُلِّ شَیۡءٍۭ بَصِیۡرٌ ﴿۱۹﴾ اَمَّنۡ هٰذَا الَّذِیۡ هُوَ جُنۡدٌ
لَّکُمۡ یَنۡصُرُکُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ الرَّحۡمٰنِ ؕ اِنِ الۡکٰفِرُوۡنَ اِلَّا فِیۡ غُرُوۡرٍ ﴿۲۰﴾
اَمَّنۡ هٰذَا الَّذِیۡ یَرۡزُقُکُمۡ اِنۡ اَمۡسَکَ رِزۡقَهٗ ۚ بَلۡ لَّجُّوۡا فِیۡ عُتُوٍّ وَّ
نُفُوۡرٍ ﴿۲۱﴾ اَفَمَنۡ یَّمۡشِیۡ مُکِبًّا عَلٰی وَجۡهِهٖۤ اَهۡدٰۤی اَمَّنۡ یَّمۡشِیۡ
سَوِیًّا عَلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ ﴿۲۲﴾

r উহারা কি লক্ষ্য করে না উহাদের ঊর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকুলের প্রতি, যাহারা পক্ষ বিস্তার করে ও সঙ্কুচিত করে? দয়াময় আল্লাহ্‌ই উহাদিগকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

r দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি, যাহারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? কাফিররা তো রহিয়াছে প্রবঞ্চনার মধ্যে।

r এমন কে আছে, যে তোমাদিগকে জীবনোপকরণ দান করিবে, তিনি যদি তাঁহার জীবনোপকরণ বন্ধ করিয়া দেন? বস্তুত উহারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রহিয়াছে।

r যে ব্যক্তি ঝুঁকিয়া মুখে ভর দিয়া চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে ঋজু হইয়া সরল পথে চলে?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আ ওয়া লাম ইয়ারাও' (তারা কি লক্ষ্য করে না)। এখানে 'আ' অক্ষরটি প্রশ্নবোধক। 'ওয়াও' অব্যয়টি যোজক। আর সংযোজ্য বাক্যটি এখানে রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা কি আকাশ-পৃথিবীর নির্মাণশৈলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। দ্যাখে না কি তাদের মাথার উপরে উড়ন্ত পক্ষীকুলকে? এখানকার 'তাদের ঊর্ধ্বদেশে' কথাটির যোগ রয়েছে 'সফ্‌ফাত' এর সঙ্গে। 'সফ্‌ফাত' অর্থ শূন্যমার্গে পক্ষ বিস্তার করে উড়তে

www.eelm.weebly.com

থাকা। এভাবে শব্দটির মাধ্যমে অবস্থা প্রকাশ করা হয়েছে ঝাঁক বেঁধে ওড়া পাখিদের। আর 'লক্ষ্য করা' অর্থ এখানে দৃষ্টিপাত করা। কেননা এখানে 'লাম ইয়ারাও' (লক্ষ্য করে না) এর পরে বসানো হয়েছে 'ইলা' (দিকে)।

'ইয়াক্ববিদ্বনা' অর্থ সংকুচিত করে। এভাবে এখানে 'সফ্ফাত' ও 'ইয়াক্ববিদ্বনা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে উড়ন্ত বিহঙ্গবাহিনীর পক্ষসঞ্চারণ ও পক্ষসংকোচনকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'দয়াময় আল্লাহ্ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা'। কথাটির মর্মার্থ— শূন্যস্থিত কোনো কিছুর পতন স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহ্ পরম দয়ালু, সর্বশক্তিধর বলেই পাখিদের উড্ডয়নকে নির্বিঘ্ন করেছেন। আর তিনি সর্বদ্রষ্টাও। তাঁর এমতো নিরন্তর পর্যবেক্ষণের কারণেই পাখিরা নিরাপদ করতে পেরেছে তাদের আকাশী উড়াল। সুতরাং এটা আল্লাহ্র মহিমা ও সর্বশক্তিধরতার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয় কি?

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের এমন কোনো সৈন্যবাহিনী আছে কি, যারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফেরেরা তো রয়েছে প্রবঞ্চনার মধ্যে'। বক্তব্যসূত্রে আলোচ্য আয়াত পূর্বোক্ত আয়াতের সঙ্গে গ্রথিত। তাই এই আয়াতের শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে যোজক অব্যয় 'আম'। কেউ কেউ বলেছেন, পুনঃপুনঃ প্রশ্ন থেকে রক্ষাকল্পেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'আম'। তবে অব্যয়টি এখানে যোজকও যেমন নয় তেমনি নয় বিয়োজকও। 'মান' (যে, যিনি) এখানে প্রশ্নবোধক উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় হচ্ছে 'হাজা' (এই)। 'আললাজী' বিশেষণ, অথবা বিশেষ্যের অনুবর্তী। আর 'জুনদুন' পদের বিশেষণ 'ইয়ানসুরুকুম' (তোমাদেরকে সাহায্য করবে)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যিনি দয়াময় আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত তোমাদের এমন কোনো সেনাদল কি আছে, যারা তোমাদেরকে আল্লাহ্র রোষ থেকে রক্ষা করতে পারবে? সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো পতিত হয়েছে ঘোর প্রবঞ্চনায়।

একটি জিজ্ঞাসা ঃ ইঙ্গিতসূচক নামপদ 'হাজা' এবং সমন্বয়কারী নামপদ 'আল্লাজী' এখানে ব্যবহার না করলেও বক্তব্যটি অপরিস্ফুট থাকতো না। তাহলে এগুলো এখানে এভাবে ব্যবহার করার সার্থকতা কী?

জিজ্ঞাসার জবাব ঃ সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহারের পর বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যামূলক শব্দ ব্যবহার করলে বক্তব্য হয় অধিকতর হৃদয়গ্রাহী। যেমন, এখানকার 'হাজাল্ লাজী' কথাটি অস্পষ্ট এবং এই অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে 'ওয়া জুনুদুন' (কোনো সেনাদল) কথাটির মাধ্যমে। এভাবে প্রথমে উল্লেখিত অস্পষ্ট বিশেষ্যকে পরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিশেষণমূলক কথায়। আবার এরকম হওয়াও সম্ভব যে, 'হাজা' এখানে 'উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় হচ্ছে 'আল্লাজী'। আর 'ইয়ুক্বালু' (বলা হয়) কথাটিকে যদি এখানে উহ্য পদ হিসেবে ধরা হয় এবং পুরো বাক্যটিকে যদি ধরে নেওয়া হয় ওই উহ্য ক্রিয়ার কর্মপদ, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— 'আম্ মাইঁ ইয়ুক্বালু হাজাল লাজী হুয়াহু জুন্দুল্ লাকুম (অথবা যাকে বলা

www.eelm.weebly.com

হবে, এটাই তোমাদের সেনাদল)। এভাবে ব্যাখ্যা করলে এখানে 'জুনদুন' অর্থ হবে ওই সকল প্রতিমা, পৌত্তলিকেরা যেগুলোকে নির্ধারণ করেছে উপাস্যরূপে। অর্থাৎ এটাতো চিন্তাই করা যায় না যে, তাদের উপাস্যসমূহ তাদেরকে আল্লাহ্‌র রোষ থেকে বাঁচাতে পারবে, অথবা তাদেরকে দিতে পারবে উপজীবিকা। অথবা 'জুনদুন' অর্থ এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সহায়-সম্পদ।

'গুরূর' অর্থ শয়তানী প্রবঞ্চনা। এভাবে 'কাফেরেরা তো রয়েছে প্রবঞ্চনার মধ্যে' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— শয়তানই তাদেরকে এমতো প্রবঞ্চনায় নিমজ্জিত করে রেখেছে যে, তারাই সত্যপথে রয়েছে। সুতরাং তারা শাস্তিগ্রস্ত হতে পারে না।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করবে, তিনি যদি তাঁর জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন? বস্তুত তারা অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় অবিচল রয়েছে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যদি বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, স্তব্ধ করে দেন মৌসুমী বায়ু, তবে মৃত্তিকায় তো ফল ও ফসল উৎপাদিত হতে পারবেই না। তখন কী হবে? কে পারবে জীবিকার নিশ্চয়তা দিতে? হে আমার রসুল! দেখুন, এর পরেও তারা কীরূপ অবাধ্য ও সত্যবিমুখ। আসক্তা নিমজ্জিত মূর্খতা ও উন্নাসিকতায়।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি ঝুঁকে পড়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি, যে সরল পথে চলে ঋজু হয়ে' প্রশ্নটি স্বীকৃতি জ্ঞাপক। এর উদ্দেশ্য সত্যকে স্বীকার করার মানসিকতাকে উসকে দেওয়া।

'মুকিব্‌বান' অর্থ ভর দিয়ে চলে। শব্দটি কর্তৃপদরূপে সাধিত হয়েছে 'ইকবাব্' থেকে। এর প্রকৃতি 'কাব্‌বুন'। তবে আরবী ভাষায় শব্দসাধনের এই রীতি বিরল। অথবা বলা যেতে পারে, 'মুকিব্‌বান' এখানে কর্তৃপদ এবং এর কর্মপদ এখানে রয়েছে উহ্য। ওই উহ্য কর্মপদসহ কথাটি দাঁড়ায়— 'মুকিব্‌বান নাফসাহু' (নিজের উপরে নির্ভরশীল)।

কেউ কেউ আবার বলেন, এখানে 'মুখে ভর দিয়ে চলে' অর্থ চলে বন্ধুর পথে। ফলে পড়ে যায় মুখ থুবড়ে। বলা বাহুল্য, এরকম পথে চলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। পক্ষান্তরে বিশ্বাসীরা চলে সরল সহজ পথে, যা বিভ্রান্তিমুক্ত, সুগম ও অবশ্যই নির্ভুল গন্তব্যে উপনীতকারী। 'সিরাত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম' অর্থ সরল পথ। আর এখানকার 'মান' যোজকটি উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় হচ্ছে 'আহ্‌দা'। অথবা বিধেয় এখানে রয়েছে উহ্য। এভাবে এখানে একথাটিই বলে দেওয়া হয়েছে যে, সরল পথের পথিকেরাই হতে পারে সফল। কেননা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বাধিকারীরাই অনুসারী বিশুদ্ধচিত্ত-বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের। পক্ষান্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

www.eelm.weebly.com

একটি সন্দেহ ঃ এখানকার 'আহ্দা' শব্দটি তুলনামূলক বিশেষণ। আর তুলনামূলক বিশেষণের কাজ হচ্ছে দু'জন বিশেষ ব্যক্তির মধ্যের বিশেষণের তারতম্য নিরূপণ। সুতরাং এরকম মন্তব্য প্রকাশ করার অবকাশ তো রয়েই যায় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও কিছুটা পথপ্রাপ্ত, যদিও তারা বিশ্বাসীদের মতো অতোটা পথপ্রাপ্ত নয়।

সন্দেহভঞ্জন ঃ বিষয়টি সেরকম নয়। এখানে বিশেষণটি প্রয়োগ করা হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা বুঝাতে। কাতাদা বলেছেন, পৃথিবীর পাপাচারীরা পরজগতে পথ চলবে অধোমুখী হয়ে। আর পুণ্যবানেরা পথ চলবে স্বাভাবিক অবস্থায়। হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, মানুষ তখন অধোমুখী হয়ে চলবে কীভাবে? তিনি স. জবাব দিলেন, যে আল্লাহ্ মানুষকে দু'পায়ের উপরে ভর করিয়ে চালাতে পারেন, তিনি নিশ্চয় তাকে অধোমুখী করেও চালাতে সক্ষম। আবু দাউদও এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

সূরা মুল্ক ঃ আয়াত ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ
ط قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ
تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلْ
اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً
سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ
تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ
فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ
وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ
ع اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

r বল, 'তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে দিয়াছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'

www.eelm.weebly.com

r বল, 'তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।'

r আর উহারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হইবে?'

r বল, 'ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট আছে, আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

r উহারা যখন তাহা আসন্ন দেখিবে তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া পড়িবে এবং বলা হইবে, 'ইহাই তো তোমরা চাহিতেছিলে'।

r বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি— যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সঙ্গীদিগকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, তবে কাফিরদিগকে কে রক্ষা করিবে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে?

r বল, 'তিনিই দয়াময়, আমরা তাঁহাতে বিশ্বাস করি ও তাঁহারই উপর নির্ভর করি, শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।'

r বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়, তখন কে তোমাদিগকে আনিয়া দিবে প্রবহমান পানি?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন আল্লাহ্ই সকলের এবং সকলকিছুর স্রষ্টা ও পালয়িতা। তিনিই তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রুতি, দৃষ্টি ও বোধ। সুতরাং তোমরা শ্রবণ করো তাঁর উপদেশ, অবলোকন করো তাঁর নিদর্শনরাজি এবং অনুভব করতে চেষ্টা করো তাঁর মহিমা-মহত্ব। এভাবে শুনে, দেখে, বুঝে উপাসনা করো কেবল তাঁর।

এখানকার 'আস্‌সাম্‌আ' (শ্রবণশক্তি) শব্দটি ধাতুমূল। তাই একবচন, বহুবচন উভয়ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয় একইরূপে। লক্ষণীয় 'আবসর' (দৃষ্টিশক্তি) এবং 'আফ্‌ইদাহ্' (অন্তঃকরণ) কথা দু'টো এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনের আকারে। এমতো তারতম্যের কারণ সম্ভবত এই যে, শ্রুতির সাহায্যে জ্ঞান অর্জিত হয় একই প্রক্রিয়ায়। কিন্তু দৃষ্টি জ্ঞান আহরণ করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। যেমন রঙ-আকার-পরিমাণ-পরিমাপ এবং সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য দেখে। আবার অন্তঃকরণ তা গ্রহণ করে বিভিন্নভাবে— মেনে, না মেনে, চিন্তা-ভাবনা করে অথবা বিনা বিচারে।

'ক্বলীলাম্ মা তাশকুরূন' অর্থ তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। 'মা' অব্যয়টি এখানে অতিরিক্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা আল্লাহ্‌র দয়া ও দানের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না। অথবা যে পরিমাণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, সে পরিমাণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তোমরা করো না। কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্ব পালনে তোমরা অনিয়মিত ও উদাসীন। তাই কখনো এ দায়িত্বটি পালন করো, আবার কখনো করোই না।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'বলো, তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর নিকটই তোমাদেরকে সমবেত করা

www.eelm.weebly.com

হবে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক! আপনি তাদেরকে একথাও স্মরণ করিয়ে দিন যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্ই তোমাদেরকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন। কিন্তু মহাবিচারের দিবসে এভাবে রাখবেন না। তখন তোমাদের সমবেত করে গ্রহণ করবেন তোমাদের কৃতকর্মের হিসাব। কথাটি এখানকার 'জারাআ কুম' (তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন) পদের কর্তার অভিপ্রায়প্রকাশক।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আর তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে (২৫)' বলো এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্রই নিকটে আছে, আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র' (২৬)। একথার অর্থ— হে আমার বাণীবাহক! দেখেছেন, তারা কতোখানি মূর্খ ও উন্নাসিক! মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচার এ সকল সুনিশ্চিত বিষয়াবলীর প্রতি তারা এতটুকুও প্রত্যয় রাখে না। তাই আপনাকে বলতে সাহস পায়, বলো, তুমি যা বলে চলেছো, তা ঘটবে কখন? আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্ই কেবল এ সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। কারণ ওই সকল ঘটনা তিনিই ঘটাবেন তাঁর পবিত্র অভিপ্রায়ানুসারে এবং তাঁর অপার ক্ষমতাবলে। আমি তো কেবল তাঁর বার্তাবাহক, তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রেরিত দয়ার্দ্র সতর্ককারী।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তারা যখন তা আসন্ন দেখবে, তখন কাফেরদের মুখমণ্ডল ম্লান হয়ে পড়বে এবং বলা হবে, এটাই তো তোমরা চেয়েছিলে'। একথার অর্থ— যখন মহাপ্রলয় অত্যাসন্ন হবে, তখন তা অবলোকন করা মাত্র তাদের মুখমণ্ডল ধারণ করবে কৃষ্ণবর্ণ। তখন তাদেরকে বলা হবে, শংকিত হচ্ছো কেনো, এটাইতো তোমরা চেয়েছিলে। চাওনি? এখানে 'তাদ্দাঊ'ন। অর্থ চেয়েছিলে, কামনা করেছিলে, ত্বরান্বিত করার জন্য চোটপাট করেছিলে। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'দাওয়া' (প্রার্থনা) থেকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা তো এটাই প্রার্থনা করেছিলে, জানিয়েছিলে আবেদন ও দাবি।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, যদি আল্লাহ্ আমাকে এবং আমার সঙ্গীগণকে ধ্বংস করেন, অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, তবে কাফেরদেরকে কে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে'? প্রশ্নটি সূচনামূলক ও স্বীকৃতিজ্ঞাপক। আর এখানে 'ভেবে দেখেছো কি' অর্থ 'জানতে পেরেছো কি'। কথাটি এখানে অতীতকালবোধক হলেও অনুজ্ঞা অর্থপ্রকাশক। অর্থাৎ আমাকে তাহলে জানাও। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার বচনবাহক! আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করুন এভাবে— হে মক্কাবাসী! আমাকে তাহলে জানাও, তোমাদের অভিলাষানুসারে আল্লাহ্ যদি আমাকে ও আমার সহচরগণকে ধ্বংসই করে দেন, অথবা তোমাদের অভিলাষবিরুদ্ধ ভাবে আমাদেরকে দান করেন তাঁর দয়ার্দ্র আশ্রয়, তবে তোমাদের এতে করে উৎফুল্ল হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। আমাদের প্রতি যা-ই করুন না কেনো, তোমরা

www.eelm.weebly.com

তো তার শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। যথাসময়ে তিনি তোমাদেরকে শায়েস্তা করবেনই। কেননা তোমরা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। বলো, তখন তোমাদেরকে রক্ষা করবে কে?

এখানকার 'ফামান' কথাটির 'মান' প্রশ্নবোধকটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি থেকে কেউই বাঁচাতে পারবে না। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার নবী! আপনি তাদেরকে বলুন, আমার মৃত্যুকামনার মধ্যে তোমাদের কোনো কল্যাণ তো নেই। বরং তোমাদের জন্য কল্যাণকর দায়িত্ব হচ্ছে এখন থেকে এমন কারো আশ্রয়ার্থী হওয়া, যিনি তোমাদেরকে ওই সুনিশ্চিত শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেন। তোমাদের জড়-উপাস্যসমূহের সে ক্ষমতা তো নেই। কোনো কোনো কোরআনব্যাখ্যাতা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার প্রত্যাদেশবাহী! আপনি তাদেরকে বলুন, হে মক্কাবাসী! আল্লাহ্ যদি আমাকে এবং আমার সঙ্গীদেরকে মৃত্যুদান করেন এবং আমরা যদি শাস্তির উপযোগী হই, তবে তাতে করে তোমাদের কী লাভ? আমরা বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তিনি তো আমাদেরকে দয়া করে মার্জনাও করে দিতে পারেন। আর যেহেতু আমরা বিশ্বাসী, তা-ই আমাদের দৃঢ় আশা যে, তিনি আমাদেরকে মার্জনা করবেন। কিন্তু তোমাদের পরিণতি তখন কী হবে, তা ভেবে দেখেছো কি? তোমরা তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তোমাদের শাস্তিপ্রাপ্তি তো সুনিশ্চিত। ওই সুনিশ্চিত শাস্তি থেকে তোমাদেরকে তখন নিষ্কৃতি দিবে কে?

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'বলো, তিনিই দয়াময়, আমরা তাঁতে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! অতএব আপনি প্রার্থনা করুন এভাবে— বলুন, আমাদের প্রভুপালনকর্তা পরম কৃপাপরবশ। আমরা তাঁকেই বিশ্বাস করি এবং নির্ভর করি কেবল তাঁর উপরেই। আর হে বিরুদ্ধবাদী জনতা! জেনে রেখো, তোমাদের ও আমাদের মধ্যকার এই দ্বন্দ্ব চিরকাল অসমাধ্য অবস্থায় থাকবে না। একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হবেই। তখন তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে, সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত ছিলো কে।

এখানে 'তাওয়াক্কালনা' (আমরা নির্ভর করি) কথাটির পূর্বে 'আ'লাইহি' (তাঁর উপর) বসানো হয়েছে বক্তব্যটিকে সুনির্দিষ্ট করণার্থে। অর্থাৎ আমরা নির্ভর করি শুধুমাত্র তাঁর উপরেই। বাক্যটি পূর্বোক্ত 'তিনিই দয়াময়' এবং 'আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি' বাক্যদ্বয়ের পরিপোষক। বরং আলোচ্য আয়াতের পুরো বাক্যটি ইতোপূর্বের আয়াতসমূহে উল্লেখিত প্রমাণসমূহের ফলাফল। অর্থাৎ এই আয়াতের মাধ্যমেই নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পরিণতি। শেষে তাই বলা হয়েছে— শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ হে আমার নবী! তাদেরকে জানিয়ে দিন, তোমরা যে বিভ্রান্ত, সে কথা তোমরা জানতে পারবে অচিরেই।

www.eelm.weebly.com

শেষোক্ত আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দিবে প্রবহমান পানি'?

২৮ সংখ্যক আয়াতের বক্তব্য শুরু করা হয়েছে 'তোমরা ভেবে দেখেছো কি' বলে। আলোচ্য আয়াতেও করা হয়েছে সেরকম। এখানে ভাবতে বলা হয়েছে একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে। সেটি হচ্ছে প্রবহমান পানি যদি তোমাদের নাগাল থেকে অনেক নিচে নেমে যায়, তখন সে পানি তোমাদের নাগালের মধ্যে এনে দিতে সক্ষম কে? তোমাদের পূজিত উপাস্যরা? নিশ্চয় নয়। সে ক্ষমতা তো রয়েছে কেবল আল্লাহ্র। তবুও কি তোমরা তাঁর প্রতি পূর্ণসমর্পিত হবে না?

এখানে 'গওরা' অর্থ নাগালের বাইরে, অনেক গভীরে। আর 'মাঈন' অর্থ প্রবহমান পানি। শব্দটি সাধিত হয়েছে 'আলআ'ইনুন জ্বারিয়াতুন' (প্রবাহিত ঝর্ণা) থেকে। শব্দরূপটি কর্তৃপদের। কিন্তু এর অর্থ কর্মপদীয়। অর্থাৎ শব্দটি ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে 'আলআ'ইনুন বাসিরাতুন' থেকে। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— দৃশ্যমান পানিপ্রবাহ, যা আহরিত হয় সহজে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— পানি যদি পৌঁছে যায় মৃত্তিকাভ্যন্তরের সংগ্রহের অযোগ্য কোনো স্তরে, তবে সেখান থেকে ওই পানি বের করে আনতে পারবে কে? তোমাদের দেব-দেবী-প্রতিমারা? না, আল্লাহ্? ভেবে দ্যাখো, তোমাদের বুদ্ধি-বিবেক কী বলে।

শায়েখ জালালউদ্দিন মাহাল্লী বলেছেন, এই সুরা পাঠ করার পর 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন' পাঠ করা মোস্তাহাব।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল হাকেম কর্তৃক 'বিশুদ্ধ' আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তিরিশ আয়াতসম্বলিত একটি সুরা এমন, যার পাঠকারী অবশ্যই হবে ক্ষমাপ্রাপ্ত। সুরাটি হচ্ছে— 'তাবারাকাল্ লাজী বিইয়াদিহিল্ মুল্ক'। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, তিরিশ আয়াতবিশিষ্ট সুরা মুল্ক তার পাঠকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে। এভাবে তাকে দোজখ থেকে পৌঁছে দিবে বেহেশতে।

হজরত জাবের বলেছেন, রসুল স. 'আলিফ লাম তানযীল' এবং 'তাবারাকাল্ লাজী বিইয়াদিহিল মুল্ক' না পড়ে ঘুমাতেন না। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সুরাটি সংরক্ষক। অর্থাৎ আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষাকারী।

মালেক ইবনে মা'দান বলেছেন, এক লোক 'আলিফ লাম তানযীল' ও 'তাবারাকাল্ লাজী বিইয়াদিহিল মুল্ক' ছাড়া অন্য কোনো সুরা পাঠ করতো না। লোকটি ছিলো পাপী। তার মৃত্যুর পর সুরা দু'টো পাখির আকার নিয়ে তার উপর পক্ষ বিস্তার করেছিলো এবং বলেছিলো, হে আমাদের আল্লাহ্! একে ক্ষমা করো। এ আমাদেরকে বার বার পাঠ করতো। আল্লাহ্পাক তাদের প্রার্থনা গ্রহণ করেন। বলবেন, এর প্রতিটি পাপ মুছে দাও একটি করে পুণ্য দিয়ে এবং বাড়িয়ে দাও এর মর্যাদা। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, সুরা মুল্ক কবরে তার পাঠকারীর পক্ষে

www.eelm.weebly.com

বাদানুবাদ করবে। বলবে, হে আমাদের আল্লাহ্! আমি যদি তোমার গ্রন্থভূত হই, তবে তুমি আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। আর যদি তা না হই, তবে আমাকে তোমার গ্রন্থ থেকে বিলোপ করে দাও। সুরাটি তখন ধারণ করবে পাখির আকৃতি। ডানা প্রসারিত করে কবরের শাস্তি থেকে বাঁচাবে তার পাঠকারীকে। তাউস বলেছেন, 'আলিফ লাম তানযীল' ও এই সুরা কোরআনের অন্যান্য সুরা অপেক্ষা ষাটগুণ অধিক পুণ্যবিশিষ্ট। দারেমী।

সূরা ক্বলাম

এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে মহা পুণ্যধাম মক্কায়। এর মধ্যে রয়েছে ২টি রুকু এবং ৫২টি আয়াত।

সূরা ক্বলাম ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ○

نٓ وَالۡقَلَمِ وَمَا يَسۡطُرُوۡنَۙ ﴿١﴾ مَاۤ اَنۡتَ بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ بِمَجۡنُوۡنٍۚ ﴿٢﴾ وَ اِنَّ لَكَ لَاَجۡرًا غَيۡرَ مَمۡنُوۡنٍۚ ﴿٣﴾

r নূন— শপথ কলমের এবং উহারা যাহা লিপিবদ্ধ করে তাহার,

r তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নহ।

r তোমার জন্য অবশ্যই রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার,

প্রথমে বলা হয়েছে— 'নূন' বর্ণটি বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজির অন্তর্ভূত এবং দুর্জ্ঞেয়। এর মর্ম জানেন কেবল আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং অতি অল্পসংখ্যক সৌভাগ্যশালী, যারা জ্ঞানে সুগভীর (ওলামায়ে রসিখীন)।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, 'নূন' অর্থ মৎস্য, সে মৎস্য সাধারণ মাছ হতে পারে, অথবা হতে পারে 'বাহমূত' নামক ওই রহস্যময় মাছ, যার উপরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে মহাপৃথিবীকে। অথবা এর অর্থ দোয়াত বা কালির পাত্র। কেননা কোনো কোনো মাছ থেকে প্রস্তুত করা হয় কালো কালি, যা কাজে লাগে লেখা-লেখিতে। উল্লেখ্য, অক্ষরটির লেখ্যরূপ অর্ধচন্দ্রাকৃতির এবং এর অভ্যন্তরে রয়েছে বিন্দু চিহ্ন। এ অক্ষরটি উচ্চারিত হয় অন্তঃবর্ণ ও হ্রস্ব করে আনুনাসিক স্বরে।

এরপর বলা হয়েছে— 'শপথ কলমের' (ওয়াল ক্বলাম)। 'ওয়াও' অক্ষরটি এখানে প্রযুক্ত হয়েছে শপথার্থে। আর এখানে 'ক্বলাম' অর্থ ওই কলম, যে কলম দ্বারা লেখা হয়েছে অদৃষ্টলিপি। হজরত উবাদা ইবনে সামেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন কলম। তারপর তাকে আজ্ঞা করেন, লেখো। কলম বলে, কী লিখবো? আল্লাহ্ বলেন, নিয়তি। তখন কলম লিখে ফেলে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য সকল বিষয়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি এবং বলেছেন বর্ণনাটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ সৃষ্টির নিয়তি লিপিবদ্ধ করিয়েছেন আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে, যখন তাদের প্রভুপালকের আরশ ছিলো পানির উপর। বাগবী লিখেছেন, ভাগ্যলিপি লেখার কলমটি ছিলো জ্যোতির। আর তা লম্বায় ছিলো আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবধানের সমান। ওই কলমের দ্বারাই লেখা হয় মহাকল্যাণকর অসংখ্য বিষয়। কলমের শপথ করা হয়েছে এখানে সেকারণেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা যা লিপিবদ্ধ করে তার'। এখানে 'কলম' অর্থ যদি ভাগ্যলিপি লেখার কলমকে বুঝানো হয়, তবে সে কলম তো ছিলো একটি। কিন্তু এখানে তো বলা হয়েছে 'তারা যা লিপিবদ্ধ করে (ইয়াস্‌তুরূন)। অর্থাৎ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে বহুবচন। এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, এখানে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে ওই কলমের মর্যাদা প্রকাশার্থে। আর যদি আলোচ্য বাক্যের 'কলম' হয় সাধারণ কলম, তাহলে বহুবচন তো ব্যবহার করতে হবেই। লিপিক্রিয়ার সম্পর্ক এখানে ঘটানো হয়েছে লেখনীর সঙ্গে। আর লেখনীর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে লেখকদেরকে। আর লেখক যেহেতু অসংখ্য, তাই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে বহুবচন 'ইয়াস্‌তুরূন'। অথবা বলা যেতে পারে 'তারা যা লিপিবদ্ধ করে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে কৃতকর্ম লেখক ফেরেশতামণ্ডলীকে, কিংবা ওই সকল বিদ্বজ্জনকে, যাঁরা লিপিবদ্ধ করেন ধর্মীয় বিষয়াদি।

এরপরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নও'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম প্রত্যাদেশবাহী! আপনি তো আসত্তা আপনার মহান প্রভুপালনকর্তার অনুগ্রহসিক্ত। সুতরাং নিন্দুকেরা আপনাকে 'উন্মাদ' বললেও আপনি কিছুতেই উন্মাদ নন। এখানে 'অনুগ্রহ' অর্থ নবুয়ত, কল্যাণ, করুণা, আভিজাত্য, জ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিচক্ষণতা, মর্যাদা ইত্যাদি।

বাগবী লিখেছেন, মক্কার মুশরিকেরা রসুল স.কে বলতো, তুমি তো উন্মাদ। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। ইবনে জুরাইজ সূত্রে ইবনে মুনজিরও এরকম বর্ণনা করেছেন।

রসুল স. যখন মহাসত্য ইসলাম প্রচার শুরু করলেন, তখন সম্মুখীন হলেন প্রচণ্ড বিরোধিতার। তাঁর তখন ছিলো আর্থিক সংকট। আর তাঁর শত্রুরা ছিলো স্বচ্ছল, ধনাঢ্য। তাই তারা বিস্মিত হলো। বলতে লাগলো, এতো দেখছি বদ্ধ পাগল। পাগল ছাড়া কি এরকম সংকটাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও কেউ নতুন ধর্মমত প্রচার করতে পারে? তারা ছিলো অবিশ্বাসে অনড়। তাই দৃঢ়তার সঙ্গে তারা প্রকাশ করেছিলো তাদের অপঅভিমতকে। বলেছিলো 'ইন্‌নাকা লামাজ্বনূন' (অবশ্যই তুমি উন্মাদ)। তাদের এমতো দৃঢ়তার বিপরীতে আল্লাহ্‌পাকও তাই তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন শপথ সহকারে। আবার এর মধ্যেই ব্যক্ত করেছেন তাদের অপমন্তব্যের অসারতার প্রমাণ। বলেছেন তাঁর অনুগ্রহের কথা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যে পায়, সে তো হয় সর্ববিষয়ে সচেতন ও সফল। উন্মাদ তো সে কখনো

www.eelm.weebly.com

হতেই পারে না। এরপরেও যদি কেউ তাঁকে উন্মাদ বলে, তবে তাকে নিশ্চয় কেউ প্রজ্ঞাবান বলে ভাবতে পারবে না। উল্লেখ্য, রসুল স. এর দুগ্ধমাতা মাননীয়া হালিমা যখন তাঁকে কোলে নিয়ে তাঁর মাদী গর্দভের পিঠে চড়ে তাঁর লোকালয়ের দিকে যাত্রা করলেন, তখন গর্দভটি তিনবার কাবামুখী হয়ে সেজদা করলো এবং বলে উঠলো, আমার পৃষ্ঠোপরি রয়েছে নবীকুল শিরোমনি, রসুলগণের মস্তকের মুকুট, মহাবিশ্বের মহাপ্রভুপালয়িতার পরম প্রেমাস্পদ। ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, রসুল স.কে অমান্যকারীরা গর্দভ অপেক্ষাও অধিক মূর্খ ও হতভাগ্য।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক! আপনি আপনার উপরে আরোপিত রেসালাতের যে গুরুত্ব পালন করতে গিয়ে ক্রমাগত দুঃখ-যাতনা ভোগ করে চলেছেন, তার জন্য আপনাকে দেওয়া হবে মহান প্রতিদান, যা বর্ধিত হতে থাকবে নিরবচ্ছিন্নরূপে। এখানে 'আজ্‌রান' অর্থ মহাপুরস্কার। আর পুরস্কারের মহিমা বোঝাতেই এখানে প্রযুক্ত হয়েছে আভিজাত্যপ্রকাশক 'তানভীন' (দুই যবর)।

সূরা ক্বলাম ঃ আয়াত ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿٤﴾ فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُوْنَ ﴿٥﴾ بِاَيِّكُمُ
الْمَفْتُوْنُ ﴿٦﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَ هُوَ
اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٧﴾ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٨﴾ وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ
فَيُدْهِنُوْنَ ﴿٩﴾ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ
بِنَمِيْمٍ ﴿١١﴾ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿١٢﴾ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ﴿١٣﴾

q তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

q শীঘ্রই তুমি দেখিবে এবং উহারাও দেখিবে—

q তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।

q তোমার প্রতিপালক তো সম্যক অবগত আছেন কে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাহাদিগকে, যাহারা সৎপথপ্রাপ্ত।

q সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করিও না।

q উহারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহা হইলে উহারাও নমনীয় হইবে,

q এবং অনুসরণ করিও না তাহার— যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত,

www.eelm.weebly.com

q পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগাইয়া বেড়ায়,
q যে কল্যাণের কার্যে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ,
q রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত;

'ইন্নাকা লাআ'লা খুলুক্বিন্ আ'জীম' অর্থ তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। অর্থাৎ হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি মহান। আপনার স্বভাব-চরিত্র অতীব মহিমময়। সেকারণেই তো আপনি মহাসত্য প্রচারের পথে নীরবে সহ্য করে চলেছেন এতো প্রতিকুলতা, অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট। এরকম সহিষ্ণুতা, মহত্ত্ব ও দৃঢ়তা তো আর কারো মধ্যে নেই।

রসুল স. স্বয়ং বলেছেন, আল্লাহ্র পথে আমার মতো কষ্ট আর কেউ সহ্য করেনি। হজরত আনাস থেকে আবু নাঈম হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর 'হুলিয়া' নামক পুস্তকে। হজরত জাবের থেকে ইবনে আসাকেরও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! অবিশ্বাসীদের জন্য অপপ্রার্থনা করুন। তিনি স. বললেন, আমাকে অভিসম্পাত প্রদানকারীরূপে প্রেরণ করা হয়নি। প্রেরণ করা হয়েছে করুণার প্রতিভূরূপে। মুসলিম।

হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'মহান চরিত্র' অর্থ মহান ধর্ম। অর্থাৎ ইসলাম। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি তো মহান ইসলাম ধর্মের উপরে চিরপ্রতিষ্ঠিত।

হাসান বসরী বলেছেন, এখানে 'মহান চরিত্র' অর্থ কোরআনানুগ শিষ্টাচার। উম্মতজননী হজরত আয়েশার কাছে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, রসুলেপাক স. এর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন, তোমরা কি কোরআন পাঠ করো না? তাঁর পবিত্র স্বভাবই তো ছিলো কোরআনের বাস্তবরূপ। এরপর তিনি পাঠ করে শোনালেন 'ক্বদ আফ্লাহাল্ মু'মিনূন' আয়াতের শেষ পর্যন্ত। বোখারী, মুসলিম।

কাতাদা বলেছেন, এখানে মহান চরিত্র অর্থ আল্লাহ্র আদেশসমূহকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া এবং তাঁর নিষেধসমূহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। তিনি আরো বলেছেন, যাঁর সম্মুখে আল্লাহ্র পরিতোষ সাধন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, তিনিই মহান চরিত্রের অধিকারী।

রসুল স. এর মহিমান্বিত চরিত্রের বিবরণ ঃ হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, রসুল স. ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট সুষমার অধিকারী। ছিলেন সুঠাম, সৌম্য— না দীর্ঘ, না হ্রস্ব।

হজরত আনাস বলেছেন, আমি রসুল স. এর বিশেষ পরিচারক হিসেবে তাঁর সেবা-যত্ন করেছি দশ বৎসর ধরে। এর মধ্যে তিনি স. কখনো আমাকে এরকম বলেননি যে, তুমি এটা করেছো কেনো, অথবা কেনো এটা করোনি। কৈফিয়তও চাননি আমার কোনো অনবধানতার। তিনি ছিলেন সুমধুর স্বভাববিশিষ্ট। তাঁর

www.eelm.weebly.com

পবিত্র করপল্লব দু'টি ছিলো রেশমী বস্ত্রের চেয়েও কোমল। আর তাঁর শরীর নিঃসৃত স্বেদ ছিলো মেশক আম্বর ও কস্তুরীর চেয়েও অধিক সুরভিময়। তিনি আরো বলেছেন, একবার এক মহিলা এসে বললো, আপনার সঙ্গে আমার কিছু প্রয়োজনীয় কথা আছে। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে, বলো। এজন্য তুমি আমাকে যেখানে যেতে বলবে, আমি সেখানেই যাবো। একথা বলেই তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। মহিলাটিও তার প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিলো। হজরত আনাস আরো বলেছেন, মদীনার ক্রীতদাসীরাও তাঁকে হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারতো। তিনি অম্লান বদনে তাদের প্রয়োজনাদি পূরণ করতেন। কেউ তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলে, তিনি তার আগে হাত গুটিয়ে নিতেন না। কেউ তাঁর দিক থেকে মুখ না ফেরানো পর্যন্ত তিনিও তার দিক থেকে মুখ ফেরাতেন না। কখনো তিনি কারো সামনে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতেন না। তিরমিজি।

জননী আয়েশা বলেছেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র কখনোই কারো প্রাণসংহার করেননি। প্রহার করেননি কখনো কোনো পরিচারক অথবা পরিচারিকাকে। কেউ তাঁর অধিকার খর্ব করলেও তিনি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে তিনি শাস্তি দিয়েছেন তাকে, যে আল্লাহ্র অধিকার খর্ব করেছে। আর তা করেছেন কেবল আল্লাহ্র সন্তোষ সাধনার্থে। মুসলিম।

হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. একবার মোটা একটি নাজরানী উত্তরীয় কাঁধে জড়িয়ে এক স্থানে যাত্রা করলেন। আমিও সহগামী হলাম তাঁর। হঠাৎ এক বেদুইন এসে তাঁর উত্তরীয়ের এক প্রান্ত ধরে সজোরে টান মারলো। উত্তরীয়খানি খসে পড়লো তাঁর পবিত্র শরীর থেকে। বেদুইন বললো, মোহাম্মদ! তোমার কাছে আল্লাহ্র দেওয়া সম্পদ যদি থাকে, তবে তা থেকে আমাকে কিছু দাও। রসুল স.একটুও বিরক্ত হলেন না। বরং তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। নির্দেশ দিলেন তাকে কিছু দেওয়ার জন্য। বোখারী, মুসলিম। তিনি আরো বলেছেন, রসুল স. ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর, সর্বাধিক দাতা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ। বোখারী, মুসলিম। হজরত জাবের বলেছেন, কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি না বলতেন না। বোখারী, মুসলিম।

হজরত যোবায়ের ইবনে মুতঈম বলেছেন, হুনায়েন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রসুল স. এর সঙ্গে ছিলাম আমি। পথিমধ্যে কিছুসংখ্যক বেদুইন প্রার্থী তাঁকে ঘিরে ধরলো। তিনি বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিলেন একটি বাবলা বৃক্ষের নিচে। তারা এক সময় টানাটানি করতে গিয়ে তাঁর উত্তরীয়টি হস্তগত করলো। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, আমার উত্তরীয়টি দাও। আমার কাছে ওই নুড়ি পাথরগুলোর মতো অজস্র উট থাকলেও তো আমি সেগুলোকে বিলিয়ে দিতাম। আমি তো ব্যয়কুণ্ঠ নই, নই কাপুরুষ, অথবা মিথ্যাশ্রয়ী। বোখারী।

জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. এর পবিত্র মুখ থেকে কখনো অশ্রাব্য শব্দ উচ্চারিত হতো না। তিনি বাজারে চীৎকার করে কথা বলতেন না। মন্দের দ্বারা নিতেন না মন্দের প্রতিশোধ। বরং মার্জনা করে দিতেন। হজরত আবু হোরায়রা

www.eelm.weebly.com

বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সুকুমার স্বভাবাবলীর উৎকর্ষ সাধনের লক্ষেই আবির্ভূত হয়েছি আমি। আহমদ। 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে রয়েছে, তিনি স. বলেছেন, শুভ স্বভাবের সৌন্দর্যসাধন এবং তার প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করা হয়েছে আমাকে।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে বিশ্বাসীগণের হিসাবের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে তাদের সুন্দর স্বভাব। আল্লাহ্পাক ঘৃণা করেন কর্কশভাষী ও অশ্লীলভাষীকে। তিরমিজি, আবু দাউদ। তিরমিজি মনে করেন হাদিসটি শুদ্ধসূত্রবিশিষ্ট। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমরা কি জানো, কোন আমল অধিকসংখ্যক লোককে জান্নাতবাসী করবে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ভীতি ও সচ্চরিত্র। জননী আয়েশা বলেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, শিষ্টাচারের কল্যাণেই মানুষ রাত জেগে নামাজ পাঠকারী এবং দিনভর রোজা পালনকারী অপেক্ষা উত্তম পদবাচ্য হয়। আবু দাউদ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার সহচরবৃন্দের মধ্যে সে-ই আমার অধিকতর প্রিয়, যার স্বভাবচরিত্র অধিকতর উত্তম। বোখারী। বোখারী ও মুসলিমের ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, আমার নিকট মহানুভব তারা, যাদের স্বভাব চরিত্র সুন্দর।

বায়হাকীর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে এক মাযানী ব্যক্তি সূত্রে এবং 'শরহে সুন্নাহ্' গ্রন্থে হজরত উসামা ইবনে শুরাইক থেকে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবীগণ একবার নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! মানুষের প্রতি আল্লাহ্র সর্বোৎকৃষ্ট দান কোনটি? তিনি স. বললেন, আদর্শ চরিত্র। হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বলেছেন, যাত্রাকালে আমি যখন আমার অশ্বের রেকাবে পা রাখলাম তখন রসুল স. আমাকে শেষ উপদেশস্বরূপ বললেন, মানুষের প্রতি শিষ্টাচারী হয়ো। মালেক।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে—(৫) তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত'(৬)।

এখানে 'ফা সাতুবসিরু' অর্থ শীঘ্রই তুমি দেখবে। কথাটির 'সীন' অক্ষরটি এখানে আবশ্যিক অর্থে ব্যবহৃত। এভাবে কথাটির মাধ্যমে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। 'ওয়া ইয়ুব্সিরুন' অর্থ এবং তারাও দেখবে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! মহাবিচারের দিবসে আপনি যেমন দেখবেন, তেমনি দেখবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও।

'বিআয়্যিকুম' অর্থ তোমাদের মধ্যে। 'বা' অব্যয়টি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতিরিক্ত রূপে। আর 'মাফতূন' অর্থ বিকারগ্রস্ত, উন্মাদ। এভাবে এখানে 'বিআয়্যিকুম' হয়েছে উদ্দেশ্য এবং 'মাফতূন' বিধেয়। অথবা 'আল মাকুল' এবং 'আল মাজ্বলুদ' এর

www.eelm.weebly.com

মতো এখানকার 'আল মাফতূন'ও শব্দমূল। অর্থাৎ এর অর্থ হবে— উন্মাদনা। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়াবে— তোমাদের মধ্যে কে উন্মাদনায় প্রকটতর, তা পরিদৃশ্যমান হবে অচিরেই, মহাবিচার পর্বের প্রান্তরে।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই বিকারগ্রস্ত। তারা তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে যথাস্থানে ব্যবহার করে না। অন্যথায় বুদ্ধি-বিবেকের দাবি তো এই যে, কাউকে স্বেচ্ছায় কোনো কিছু বেছে নিতে বলা হলে সে নিশ্চয়ই বেছে নেয় উত্তমতর বিষয়টিকেই। আবার বিপদসমূহের মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নিতে বলা হলে সে অবশ্যই বেছে নিবে সর্বাপেক্ষা লঘু বিপদটিকে। বিশ্বাসীগণ তো এরকমই করে। যেহেতু তারা বুদ্ধিমান তাই বেছে নেয় এমন সত্তাকে যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর, পরিপূর্ণ ও সকল অক্ষমতা ও দোষত্রুটিমুক্ত। সকল লাভ ও ক্ষতি তাঁরই অভিপ্রায়াধীন। পক্ষান্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বেছে নেয় নশ্বর পৃথিবীর ভোগোপকরণকে এবং উপাস্য হিসেবে নির্ধারণ করে এমন জড়প্রতিমাকে, কারো কল্যাণ, অথবা অকল্যাণ করার সাধ্য যাদের আদৌ নেই। তারা এতটুকুও বুঝতে পারে না যে, পৃথিবীর ভোগোপকরণপ্রাপ্তিও নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের উপর। সুতরাং তারা চাইলেও তো সবকিছু পায় না। পায় ততোটুকু, যতোটুকু আল্লাহ্ তাদেরকে দিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং তারা বিকারগ্রস্ত নয়তো কী?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক তো সম্যক অবগত আছেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাদেরকে, যারা সৎপথপ্রাপ্ত (৭)। সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ কোরো না'(৮)।

এখানে 'হুয়া' (তিনি) সর্বনামটি বিয়োজক। আর 'কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে' কথাটি এখানে সম্বন্ধযুক্ত হবে 'সম্যক জানেন' কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন, কে বিভ্রান্ত এবং কে পথপ্রাপ্ত। প্রকৃতপক্ষে বিভ্রান্ত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই। কেননা তারা বিকারগ্রস্ত। বলাবাহুল্য, বিভ্রান্ত হওয়া বিকারগ্রস্তদেরই কাজ। 'ফালা তুত্বিই'ল মুকাজ্জিবীনা' অর্থ সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ কোরো না। এখানকার 'ফা' অব্যয়টি হেতুবাচক। অর্থাৎ হে আমার নবী! আপনি যেহেতু জানলেন যে, আপনি সত্যাধিষ্ঠিত, সেহেতু আপনি ওই বিভ্রান্তদের কথামতো চলবেন না। গুরুত্ব দিবেন না তাদেরকে একেবারেই।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে'। এখানকার 'তারা চায়' ক্রিয়ার কর্তা হচ্ছে আগের আয়াতে উল্লেখিত মিথ্যাচারীরা। 'লাও' (যদি) অব্যয়টি এখানে সীমিতার্থক। 'ইয়ুদ্হিনূন' অর্থ নমনীয় হও। 'ইদদিহান' শব্দটি সাধিত হয়েছে 'দিহান' থেকে। এর অর্থ নমনীয়তা, কোমলতা। আর 'ফা ইয়ুদ্হিনূন' এর 'ফা' যদি এখানে যোজক হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ধর্মীয় ব্যাপারে তারা নমনীয় হতে চায়,

www.eelm.weebly.com

কিন্তু সেই সঙ্গে তারা এ-ও কামনা করে যে, প্রথমে নমনীয় হোক মুসলমানেরা। অথবা— তারা চায়, তোমরা কোনো কোনো বিষয়ে তাদের সঙ্গে একাত্ম হও, তাহলে তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ত্যাগ করবে তোমাদের বিরোধিতা।

সমাধান ঃ ধর্মীয় বিধানের ব্যাপারে নমনীয় হওয়া নিষিদ্ধ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এবং অনুসরণ কোরো না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত (১০), পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়'(১১)।

আগের আয়াতে সাধারণভাবে মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছিলো। আর আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করা হলো কথায় কথায় শপথকারী, লাঞ্ছিত ও পশ্চাতে নিন্দাকারীদের অনুসরণ করতে।

কাতাদা বলেছেন, আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে ওলীদ ইবনে মুগীরাকে লক্ষ্য করে। কালাবী সূত্রে মুনজির এবং সুদ্দী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ ছিলো আখফাশ ইবনে শুরাইক। আতা এবং বাগবীও এরকম বলেছেন। তবে মুজাহিদ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আসওয়াদ ইবনে ইয়াগুছকে উদ্দেশ্য করে।

'হাল্লাফ' অর্থ অধিক পরিমাণে মিথ্যা শপথকারী। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সুরা বাকারার 'ওয়ালা তাজ্‌য়ালুল্লহা উ'রদ্বাতাল্ লি আইমানিকুম' আয়াতের তাফসীরে। 'মুহীন' অর্থ লাঞ্ছিত, অপমানিত, তুচ্ছ। অর্থাৎ যে অসৎসিদ্ধান্তকামী ও বিচক্ষণতাবিচ্যুত। আর 'হাম্‌মায' অর্থ পশ্চাতে নিন্দাকারী, ছিদ্রান্বেষী, চোখ অথবা চোখের ভ্রূ দ্বারা ইঙ্গিতে অন্যের দোষত্রুটি বর্ণনাকারী। আর 'মাশ্‌শাইম বি নামীম' অর্থ একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়। তারাও পশ্চাতে নিন্দাকারীদের মতোই।

সমাধান ঃ অত্যধিক শপথোচ্চারণ অশোভন ও অনভিপ্রেত (মাকরূহ)।

একটি সংশয় ঃ এখানে বলা হয়েছে 'কুল্লা হাল্লাফ'। এর অর্থ যে কোনো ধরনের শপথকারী। এতে করে কি একথা বুঝা যায় না যে, সকল মিথ্যা শপথকারীর অনুসরণ করা না গেলেও তাদের মধ্যেই কিছুসংখ্যকদের অনুসরণ করা যাবে?

সংশয়ভঞ্জন ঃ 'কুল' শব্দটি সমষ্টির একটি একক। সাধারণ-বিশেষ উভয় প্রকার নিষেধাজ্ঞাই শব্দটির অর্ন্তভূত হতে পারে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সকল প্রকার মিথ্যা শপথকারীর অনুসরণ নিষিদ্ধ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যে কল্যাণের কাজে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ (১২), রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত' (১৩)। এখানে 'মান্নাই'ল্লিল্ খইর' অর্থ কল্যাণকর কাজে বাধাদানকারী, বিশ্বাস ও পুণ্যকর্মময় পথের প্রতিবন্ধক।

'মুয়তাদ' অর্থ সীমালংঘনকারী, অতি মাত্রায় অত্যাচারী। 'আছীম' অর্থ পাপাসক্ত, পাপিষ্ঠ। 'উতুল্লিম' অর্থ রূঢ় স্বভাব। আর 'বা'দা জালিকা যানীম' অর্থ তদুপরি কুখ্যাত। অর্থাৎ এতোক্ষণ ধরে বর্ণিত দোষগুলো থাকার কারণে যে ব্যক্তি কুখ্যাত।

www.eelm.weebly.com

‘যানীম’ এর শাব্দিক অর্থ— গোত্রপরিচয়হীন হওয়া সত্ত্বেও গোত্রগৌরব প্রকাশকারী। প্রকৃতপক্ষে ‘যানীম’ বলে দু’য়ীয়াকে। ‘দু’য়ীয়া’ বলে পাতানো সন্তানকে, অর্থাৎ যে ঔরসজাত সন্তান নয়। অথবা ‘দু’য়ীয়া’ বলে অবৈধ জাতককে। কামুস। বায়যাবী লিখেছেন, ‘যানীম’ কথাটি এসেছে ‘যানামাতাশ শাত’ থেকে। এর অর্থ— অতি ঝুলন্ত কান ও স্তনবিশিষ্ট ছাগল। উল্লেখ্য আঠারো বছর বয়সে ওলীদ ইবনে মুগীরাকে পুত্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলো তার পিতা। আখনাস ইবনে শুরাইক বলেছেন, সে ছিলো সাকাফী গোত্রের। পরে তাকে জোহরা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে অত্যন্ত রূঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মন্দ গুণাবলী। কিন্তু বিশেষভাবে কে এগুলোর লক্ষ্যস্থল তা ছিলো অজানা। পরে যখন অবতীর্ণ হলো ‘তদুপরি কুখ্যাত’ তখন আমরা বুঝতে পারলাম কুখ্যাত লোকটি হচ্ছে ওলীদ। একটি মাদুলী ঝুলানো থাকতো তার গলায়। তাই তাকে চেনা যেতো সহজেই।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই সুরার ১০ ও ১১ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও আমরা বুঝতে পারিনি যে, এ সকল কথার লক্ষ্যস্থল কে। এরপর যখন ‘তদুপরি কুখ্যাত’ পর্যন্ত অবতীর্ণ হলো, তখন বুঝতে পারলাম, কথাগুলো বলা রয়েছে ওলীদ সম্পর্কে। ছাগলের কান, অথবা স্তনের মতো ঝুলন্ত ছিলো তার কান।

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, লোকটি প্রসিদ্ধ ছিলো তার দুষ্কর্মের কারণে, যেমন কোনো ছাগল প্রসিদ্ধ হয় তার লম্বা কান ও ঝুলন্ত স্তনের জন্য।

আমার ধারণা, উপরোক্ত নিকৃষ্ট বিশেষণগুলির চেয়ে ‘যানীম’ বিশেষণটি অধিক নিকৃষ্ট। সেজন্য তা উল্লেখ হয়েছে অপকৃষ্ট কয়েকটি বিশেষণের পরে।

হজরত হারেস ইবনে ওয়াহাব খাজায়ী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, জান্নাতী ও জাহান্নামী কে সেকথা কি আমি তোমাদেরকে জানাবো না? সাহাবীগণ বললেন, নিশ্চয়ই। তিনি স. বললেন, ওই প্রতিপত্তিহীন বিশ্বাসী, যে শপথ করে কিছু বললে আল্লাহ্ তার বাসনাকে সত্যে পরিণত করে দেন। আর জাহান্নামী সে, যে খল ও মদগর্বিত।

সূরা ক্বলাম ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬

اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّ بَنِيْنَ ﴿١٤﴾ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٥﴾ سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ﴿١٦﴾

r এইজন্য যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধিশালী।

www.eelm.weebly.com

r উহার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইলে সে বলে, 'ইহা তো সেকালের উপকথা মাত্র।'

r আমি উহার শুঁড় দাগাইয়া দিব।

সম্মানিত ক্বারীগণ প্রথমোক্ত আয়াতটি পাঠ করেছেন তিন রকম নিয়মে। যেমন— ১. 'আন কানা জা মালিঁউ ওয়া বানীন' ২. 'আআনকানা জা মালিউ ওয়া বানীন' ৩. 'লি আন কানা জা মালিউ ওয়া বানীন'। এখানে উদ্ধৃত হয়েছে প্রথম নিয়মটি। সাধারণ ক্বারীগণ আয়াতখানি এভাবেই পাঠ করে থাকেন। ক্বারী ইবনে আমের, ক্বারী হামযা, ক্বারী আবুবকর এবং ক্বারী ইয়াকুব পাঠ করতেন দ্বিতীয় নিয়মে 'হামযা' সহযোগে। আবার কোনো কোনো ক্বারী অবলম্বন করেছেন তৃতীয় উচ্চারণ রীতিটি। কিন্তু যে ভাবেই পাঠ করা হোক না কেনো, বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় প্রায় একই রকমের— 'এই জন্য যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধিশালী'। অর্থাৎ ওই মিথ্যাচারী চায়, রসুল স. তার আনুগত্য করুন এ কারণে যে, সে ধনবল ও জনবলে শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় উচ্চারণরীতির ক্ষেত্রে বাক্যটি হবে প্রশ্নবোধক ও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনি তার অনুসারী কি হবেন এ জন্য যে, সে বিত্তশালী ও অধিক সন্তান-সন্ততির অধিকারী? অথবা বলা যেতে পারে, প্রশ্নটি প্রযুক্ত হবে পরবর্তী আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে এবং মর্মার্থ দাঁড়াবে— সে কোরআনকে 'সেকালের উপকথা' বলার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে কি এ জন্য যে, সে সম্পদশালী ও অধিক সন্তান-সন্ততিধারী? কিংবা সম্পদশালী হওয়ার কারণে তার উচিত ছিলো সম্পদদাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাঁর বাণী ও তাঁর বাণীবাহককে মান্য করা। কিন্তু সে তো কৃতঘ্ন ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আর তৃতীয় উচ্চারণরীতিতে যুক্ত করা হয়েছে একটি উহ্য অব্যয় 'লি'। কিন্তু এতে করে আয়াতখানির কোনো ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায় না।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে, এটাতো সেকালের উপকথা মাত্র'। একথার অর্থ— দুরাচার ওলীদের সম্মুখে যখন কোরআনের আয়াত আবৃত্তি করা হয়, তখন সে তা মান্য করার বদলে করে অস্বীকার। চরম দৌরাত্ম্য প্রকাশ করে এমতো অপমন্তব্য করে যে, এগুলো তো অতীত যুগের কিংবদন্তী মাত্র। আল্লাহ্‌র বাণী কদাচ নয়। এখানে 'আসাত্বীর' অর্থ উপকথা, কল্পকাহিনী, জনশ্রুতি, কিংবদন্তী।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'আমি তার শুঁড় দাগিয়ে দিবো'। এই বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। উক্তিটি শাসনমূলক ও হুমকিপ্রকাশক। 'খুরতুম' এর শাব্দিক অর্থ মাতঙ্গ-শুণ্ড ও বরাহের চিবুক। মর্মার্থ— নাসিকা, নাক। মাতঙ্গ ও বরাহের সঙ্গে তুলনা করে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোরআনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী ওই লোকটির নাক ছিলো হাতীর শুঁড়, অথবা শূকরের থুতনির মতো। ফাররা বলেছেন, এখানে 'শুঁড়' বা নাক বলে বুঝানো হয়েছে তার সারা শরীরকে। অর্থাৎ আংশিক বলে মর্মার্থ নেওয়া হয়েছে

www.eelm.weebly.com

সমষ্টির। আবুল আলিয়া এবং মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ— মহাবিচারের দিবসে তার মুখমণ্ডল হবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের। ফলে আল্লাহ্‌র শত্রু বলে সহজেই শনাক্ত করা যাবে তাকে। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— আমি তার নাকের উপরে হানবো তরবারীর আঘাত। উল্লেখ্য, বদর যুদ্ধে সেরকমই ঘটেছিলো।

সূরা ক্বলাম ঃ আয়াত ১৭—৩৩

إِنَّا بَلَوْنَٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا
مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ
وَهُمْ نَآئِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا۟ مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾
أَنِ ٱغْدُوا۟ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰرِمِينَ ﴿٢٢﴾ فَٱنطَلَقُوا۟ وَهُمْ
يَتَخَٰفَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَ
غَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍ قَٰدِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ
نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾
قَالُوا۟ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
يَتَلَٰوَمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَٰغِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن
يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَ
لَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

r আমি উহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি, যেভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম উদ্যান-অধিপতিগণকে, যখন উহারা শপথ করিয়াছিল যে, উহারা প্রত্যূষে আহরণ করিবে বাগানের ফল,

r এবং তাহারা 'ইন্‌শাআল্লাহ্' বলে নাই।

q অতঃপর তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে, যখন উহারা ছিল নিদ্রিত।

www.eelm.weebly.com

q ফলে উহা দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল।

q প্রত্যূষে উহারা একে অপরকে ডাকিয়া বলিল,

q 'তোমরা যদি ফল আহরণ করিতে চাও তবে সকাল সকাল বাগানে চল।'

q অতঃপর উহারা চলিল নিম্নস্বরে কথা বলিতে বলিতে,

q 'অদ্য যেন তোমাদের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করিতে না পারে।'

q অতঃপর উহারা নিবৃত্ত করিতে সক্ষম— এই বিশ্বাস লইয়া প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করিল।

q অতঃপর উহারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিল, তখন বলিল, 'আমরা তো দিশা হারাইয়া ফেলিয়াছি।'

q 'বরং আমরা তো বঞ্চিত।'

q উহাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই? এখনও তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছ না কেন?'

q তখন উহারা বলিল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছি, আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম।'

q অতঃপর উহারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল।

q উহারা বলিল, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী।

q সম্ভবতঃ আমাদের প্রতিপালক ইহা হইতে আমাদিগকে উৎকৃষ্টতর বিনিময় দিবেন; আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হইলাম।'

q শাস্তি এইরূপই হইয়া থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর। যদি উহারা জানিত!

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান অধিপতিগণকে'। একথার অর্থ— ইয়েমেন অঞ্চলের ওই বিশেষ বাগানের মালিকদেরকে অন্নসংকটে ফেলে আমি যেমন করে তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম, তেমনি করে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত করে পরীক্ষা করেছি মক্কাবাসীদেরকে। ঘটনাটি ছিলো এরকম— মক্কার মুশরিকেরা বার বার মহাসত্য ইসলামের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে লাগলো। তদুপরি ক্রমাগত অত্যাচার করে যেতে লাগলো রসুল স. ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরবর্গের উপর। এভাবে অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেলো, তখন রসুল স. প্রার্থনা জানালেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! মক্কাবাসীদের উপরে আপতিত করো নবী ইউসুফের যুগের দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষ। বলা বাহুল্য, তাঁর প্রার্থনা গৃহীত হলো। এক টানা সাত বৎসর ধরে তাদেরকে ভোগ করতে হলো অবর্ণনীয় কষ্ট। মৃতদেহ ও মৃতের চামড়া-হাড় ভক্ষণ করতে বাধ্য হলো তারা। শেষে মুক্তি পেলো রসুল স. এর দোয়ার বরকতে।

www.eelm.weebly.com

‘আসহাবাল জান্নাহ্’ অর্থ উদ্যান অধিপতিগণ। এখানকার ‘আল’ সীমিতার্থক। অর্থাৎ ‘আল’ ব্যবহার করে এখানে বুঝানো হয়েছে একটি বিশেষ উদ্যানের কথা।

ইবনে জুরাইজ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীর সেনাস্বল্পতা লক্ষ্য করে আবু জেহেল দর্পভরে বলেছিলো, ওদেরকে ধরে ধরে রশি দিয়ে বেঁধে ফ্যালো, অযথা হত্যা কোরো না। ওই ঘটনাটির দিকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে— আমি মক্কার মুশরিকদেরকে শক্তিশালী করে পরীক্ষা করেছিলাম, যেমন বিত্তশালী করে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান-অধিপতিদেরকে।

ইবনে সালেহ সূত্রে কালাবীর মাধ্যমে মোহাম্মদ ইবনে মারওয়ান বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইয়েমেন রাজ্যের সানআ নগরীর ছয় মাইল দূরে বাস করতেন এক পুণ্যবান ব্যক্তি। তিনি রচনা করেছিলেন একটি মনোরম ফলের বাগান। ওই বাগানের নাম ছিলো মারওয়া। তিনি আকর্ষি দিয়ে ফল পাড়ার পর যে ফলগুলো পাড়তে পারতেন না, সেগুলো রেখে দিতেন অভাবগ্রস্তদের জন্য। ফল শুকানোর চাটাই থেকে যে ফলগুলো চাটাইয়ের বাইরে ছিটকে পড়তো, সেগুলোকেও তিনি রেখে দিতেন তাদের জন্য। বাগানের পাশে ছিলো তাঁর শস্যক্ষেত্র। ফসল কাটার সময়েও ঝরে যাওয়া শস্যশীষগুলোকে তিনি আর গ্রহণ করতেন না। রেখে দিতেন দরিদ্র জনসাধারণের জন্য। এক সময় তিনি ইন্তেকাল করলেন। তখন সে বাগানের মালিক হলো তাঁর সন্তানেরা। তারা শপথ করলো, পিতার আদর্শ তারা অনুসরণ করবে না। এখন থেকে কোনো পরিত্যক্ত ফল ও ফসল রাখবে না অভাবীদের জন্য। তাই-ই করতে লাগলো তারা। ফল ও ফসল নিঃশেষে তুলতে লাগলো নিজেদের ঘরে। তাদের সে শপথের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে এভাবে—

‘যখন তারা শপথ করেছিলো যে, তারা প্রত্যুষে আহরণ করবে বাগানের ফল’।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— ‘এবং তারা ইনশাআল্লাহ্ বলেনি’। এখানে ‘ইসতিছনা’ অর্থ ব্যতিক্রমী বাক্য। আর এখানে ব্যতিক্রমী বাক্য হচ্ছে ‘ইনশাআল্লাহ্’। ব্যতিক্রমী বাক্য দ্বারা পূর্বাপর বাক্যের পার্থক্য নির্ণীত হয়। আবার ‘ইনশাআল্লাহ্ (আল্লাহ্ যদি চান) বললে ব্যতিক্রমীটিই হয় মুখ্য উদ্দেশ্য। অথবা বলা যেতে পারে, তারা বলেনি ‘আফআ’লু ইনশাআল্লাহ্’ (যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তাহলে আমি করবো)। কিংবা ‘লা আফআ’লু ইল্লা আনশাআল্লাহ্’ (আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না হলে করবো না)। কথা দু’টোর মর্মার্থ একই। এমতাবস্থায় আগের আয়াতের ‘যখন তারা শপথ করেছিলো’ কথাটির ক্রিয়ার অবস্থাপ্রকাশক হবে ‘তারা ইনশাআল্লাহ্ বলেনি’। অর্থাৎ তারা ব্যতিক্রমী বাক্যটি তাদের শপথের সময় উচ্চারণ করেনি। আর একটি মর্মার্থ হতে পারে আলোচ্য আয়াতের। সেটি হচ্ছে— তারা শপথ করেছিলো, অতি প্রত্যুষে আহরণ করবে বাগানের ফল। কিন্তু তাদের পিতার মতো তারা অভাবগ্রস্তদের জন্য কোনো অংশই রাখবে না।

www.eelm.weebly.com

এমতাবস্থায় এখানকার ব্যতিক্রমী বাক্যটি সংযুক্ত হবে আগের আয়াতের ‘ফল আহরণ করবে’ কথাটির সঙ্গে। অথবা আলোচ্য আয়াতের বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে এক বিপর্যয় হানা দিলো সেই উদ্যানে, যখন তারা ছিলো নিদ্রিত’। একথার অর্থ— ‘ইনশাআল্লাহ্’ বচনবিহীন শপথ উচ্চারণ করার পর তারা ঘুমিয়ে পড়লো। তখন আল্লাহ্র নির্দেশে তাদের বাগানের উপর দিয়ে বয়ে গেলো অগ্নিঝড়। তারা সে ঝড়ের কথা জানতেও পারলো না।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— ‘ফলে তা দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলো’। ‘সরীম’ অর্থ বিরাণ বাগান, যে বাগানে কোনোই ফল নেই। অথবা অর্থ— নিশীথ। অর্থাৎ বাগানটি তখন অগ্নিঝড়ে দগ্ধ হয়ে উৎসন্ন হয়ে গেলো অন্ধকার নিশীথের মতো। অথবা ‘সরীম’ অর্থ দিবস। অর্থাৎ দগ্ধীভূত বাগান হয়ে গেলো ঝকঝকে দিবসের মতো পরিষ্কার, ফলহীন। ‘সরমূন’ অর্থ কর্তন। দিবস-রজনী পরস্পরের দিক থেকে কর্তিত হয়। তাই দিবস-রজনীকেও বলে ‘সরীম’।

হাসান বসরী বলেছেন, উদ্যানটি থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলো চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য। অর্থাৎ তখন বাগানের কোনোকিছুই আর অবশিষ্ট ছিলো না। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বনী খুজাইমারা তাদের প্রবাদে কালো ছাইকে বলে ‘সরীম’। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আগুনে ঝলসে গিয়ে বাগানটি হয়ে গেলো কালো ছাই।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘প্রত্যুষে তারা একে অপরকে ডেকে বললো(২১), তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল বাগানে চলো’ (২২)।

এখানে ‘উগদু’ অর্থ সকাল সকাল চলো। আরবী ভাষায় ‘উগদু’ এর পরে বসে ‘ইলা’ (দিকে) অব্যয়। অথচ এখানে শব্দটির পরে বসেছে আলা’ (উপর)। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ‘গদবুন’ এর সম্পর্ক ঊষাকালের যাত্রার সঙ্গে। আর মনোনিবেশনের অর্থও নিহিত হয়েছে এর মধ্যে। অথবা বলা যায়, এর মধ্যে রয়েছে প্রাধান্য ও সক্ষমতার অর্থ। আবার এরকমও বলা যেতে পারে, ‘উগদু’ শব্দটি এখানে অনুজ্ঞাসূচক অসমাপিকা ক্রিয়া। আর এর বিধেয় ‘আ’লা হারছিকুম’ (তোমাদের ক্ষেতে)।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘অতঃপর তারা চললো নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে (২৩), অদ্য যেনো তোমাদের নিকট কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করতে না পারে’ (২৪)। একথার অর্থ— তারা মৃদু আওয়াজে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে অতি সন্তর্পণে বাগানের দিকে চললো। বললো, একদম শোরগোল করো না। নয়তো আগের অভ্যাস অনুসারে অভাবগ্রস্তরা এসে ভিড় জমাবে। তবুও কোনোক্রমে টের পেয়ে তারা যদি এসেই পড়ে, তবে সাবধান!

www.eelm.weebly.com

কিছুতেই তাদেরকে যেনো ভিতরে ঢুকতে দিয়ো না। এখানকার 'লা ইয়াদখুলান্নাহা' (প্রবেশ করতেই না পারে) কথাটিতে প্রকাশ পেয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ের না-সূচকতা। অর্থাৎ তারা যেনো বাগানে প্রবেশ না করতে পারে কোনোক্রমেই। যেমন বলা হয় 'লা আতিআন্নাকা হাহুনা' (আমি তোমাদের কাছে কখনোই আসবো না)।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম— এই বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করলো'। বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত ২৩ সংখ্যক আয়াতের 'অতঃপর তারা বললো' এর সঙ্গে। আর এখানকার 'আ'লা হারদিন' কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে 'নিবৃত্ত করতে সক্ষম ' এর সঙ্গে। 'হারদুন' এর আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা, বাধা দেওয়া, রোষান্বিত হওয়া। একারণেই হাসান বসরী, কাতাদা এবং আবুল আলিয়া বলেছেন, এখানে 'হারদুন' এর অর্থ হবে চেষ্টাচরিত্র। কুরতুবী, মুজাহিদ ও ইকরামা বলেছেন, এখানে শব্দটির অর্থ একমত। আবু উবায়দা বলেছেন, তারা ওই অভাবীদেরকে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে ছিলো একমত। শা'বী ও সুফিয়ান সওরী বলেছেন, তারা একমত ছিলো ওই অভাবগ্রস্তদের প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়ার ব্যাপারে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তারা ছিলো বাগানের মালিক। তাই তাদের ধারণা ছিলো, তারা অবশ্যই ওই দরিদ্র জনতাকে প্রতিহত করতে পারবে। এমতো বিশ্বাস নিয়েই তারা যাত্রা করেছিলো তাদের বাগানের দিকে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করলো, তখন বললো, আমরা তো দিশা হারিয়ে ফেলেছি (২৬)। বরং আমরা তো বঞ্চিত (২৭)। তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বললো, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছো না কেনো'(২৮)? একথার অর্থ— সেখানে পৌঁছে অগ্নিঝড়ে ভস্মীভূত বাগান দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো তারা। সম্বিত হারিয়ে ফেললো প্রায়। ভাবলো, এ কোথায় এলাম। প্রকৃত ঘটনা বুঝতে পারলো সম্বিত ফিরে পাবার পর। আশাহত কণ্ঠে বলে উঠলো, আমরা তো বঞ্চিত হলাম। তাদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ, বোধশক্তিসম্পন্ন মাঝবয়সী ভ্রাতা বললো, ইনশাআল্লাহ্ না বলে যে তোমরা শপথ করেছিলে, সেটা যে ঠিক ছিলো না, তা কি আমি তোমাদেরকে আগে বলিনি? আশ্চর্য! এখনো তোমরা অনুতপ্ত হচ্ছো না কেনো? ঘোষণা করছো না কেনো আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা? এখনো কি তোমরা বুঝতে পারছো না যে, আল্লাহ্র অভিপ্রায় ব্যতীত কোনোকিছুই সংঘটিত হতে পারে না?

আবু সালেহ বলেছেন, শপথ করার সময় তারা ইনশাআল্লাহ্ না বলে বলেছিলো 'সুবহানাল্লাহ্'। অথবা বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ওই মধ্যম বয়সী লোকটি তখন বললো, আমি কি তোমাদেরকে আগেই স্মরণ করিয়ে দেইনি যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্ত হলে তাঁর প্রতি অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়? তিনি তোমাদেরকে

www.eelm.weebly.com

দিয়েছেন এতো সুন্দর ফলবান বাগান। অথচ তোমরা পণ করেছিলে আল্লাহ্র দরিদ্র বান্দাদেরকে কিছুই দিবে না। এটা কি তাঁর অনুপম অনুকম্পার প্রতি অকৃতজ্ঞতা নয়? এখনো সময় আছে। তাঁর সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হও। ঘোষণা করো তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'তখন তারা বললো, আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম'। বক্তব্যটিতে নিহিত রয়েছে তাদের দু'টি স্বীকৃতি— ১. আল্লাহ্ জুলুম করা থেকে পবিত্র এবং ২. আমরাই নিজেদের উপরে জুলুমকারী। অভাবগ্রস্ত জনতাকে বঞ্চিত করতে চেয়ে সীমালংঘন করেছি আমরাই।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগলো (৩০)। তারা বললো, হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী (৩১)। সম্ভবত আমাদের প্রতিপালক এ থেকে আমাদেরকে উৎকৃষ্টতম বিনিময় দিবেন; আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম' (৩২)।

এখানে 'আক্ববাল' অর্থ একে অপরের প্রতি। কথাটি এখানে বাক্যের কর্তা এবং এখানে কর্মপদের অবস্থাপ্রকাশক হচ্ছে 'ইয়াতালাওয়ামূন' (দোষারোপ করতে লাগলো)। যেমন বলা হয় 'লাক্বীয়াহু রাকেবাইন' (উভয়ে মিলিত হলো তাদের বাহনারোহী অবস্থায়)। 'হায় দুর্ভোগ! আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী' অর্থ হায়! সীমালংঘন তো করেছি আমরাই। আমাদের পুণ্যবান পিতা যেমন দরিদ্র দরদী ছিলেন, আমরা তো তেমন ছিলাম না। তিনি ছিলেন কৃতজ্ঞচিত্ত। আর আমরা তার বিপরীত।

'সম্ভবত আমাদের প্রতিপালক এ থেকে আমাদেরকে উৎকৃষ্ট বিনিময় দিবেন' অর্থ তারা বললো আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য সর্বান্তঃকরণে তওবা করলাম। সাবধান হলাম ভবিষ্যতের জন্য। আর আমরা এরকম করবো না। যথাপ্রাপ্য প্রদান করবো দরিদ্রদের। সুতরাং হে আমাদের আল্লাহ্! আমরা আশা রাখি তুমি আমাদের তওবা কবুল করবে এবং আমাদেরকে দান করবে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান। কেননা তুমিই একমাত্র ত্রাতা ও দাতা। এখানে 'ইলা' (প্রতি) অব্যয়টির মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে আল্লাহ্র প্রতি অনুরাগের চূড়ান্ত পর্যায়কে। অথবা এখানকার শেষ শব্দটির (রগবত) মধ্যে নিহিত রয়েছে আল্লাহ্ অভিমুখী হওয়ার চরমতর আর্তি। তাই এরপর বলা হয়েছে 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম'। এই বাক্যটিতেই নিহিত রয়েছে তাদের দৃঢ় আশাবাদী হওয়ার কারণ। অর্থাৎ তারা বললো, যেহেতু আমরা এখন অনুতাপানলে জর্জরিত মনে সম্পূর্ণতই আল্লাহ্ অভিমুখী, সেহেতু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তিনি আমাদেরকে দান করবেন উৎকৃষ্টতর বিনিময়।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি, তারা বিশুদ্ধচিত্তে তওবা করেছিলো। আর আল্লাহ্ তাদের আশা পূরণও করেছিলেন। তাদেরকে দান করেছিলেন আর একটি ফলবান বাগান। বাগানটি ছিলো আগের বাগানের চেয়ে অধিক সুন্দর ও বরকতময়। বাগানটির নাম ছিলো 'জুনুন'। ওই বাগানের একটি আঙ্গুরগুচ্ছ বহন করতে প্রয়োজন পড়তো একটি খচ্চরের। বাগবী।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'শাস্তি এরকমই হয়ে থাকে এবং আখেরাতের শাস্তি কঠিনতর। যদি তারা জানতো'। একথার অর্থ— ওই বাগানাধিকারীদেরকে যেমন আমি অকৃতজ্ঞতার কারণে শাস্তি দিয়েছিলাম। তেমনি দুর্ভিক্ষকবলিত করে শাস্তি দিয়েছি মক্কাবাসীদেরকে। এভাবেই আমি পৃথিবীতে অকৃতজ্ঞদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। এরপরেও যদি তারা তওবা না করে, বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল না হয়, তবে তাদেরকে আমি শাস্তি দিবো পরবর্তী পৃথিবীতে। সে শাস্তি হবে মর্মন্তুদ ও অনিঃশেষ। এ তত্ত্বটি যদি তারা জানতো, তবে এমতো অপকর্ম আর করতো না। পরিত্যাগ করতো অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা।

সূরা ক্বলাম ঃ আয়াত ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ
كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾ اَمْ لَكُمْ
كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ﴿٣٧﴾ اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ﴿٣٨﴾ اَمْ لَكُمْ
اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٩﴾
سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ﴿٤٠﴾ اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ ۚ فَلْيَاْتُوْا
بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٤١﴾

r মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই রহিয়াছে ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত তাহাদের প্রতিপালকের নিকট।

r আমি কি আত্মসমর্পণকারীদিগকে অপরাধীদের সদৃশ গণ্য করিব?

r তোমাদের কী হইয়াছে, তোমরা এ কেমন সিদ্ধান্ত দিতেছ?

r তোমাদের নিকট কী কোন কিতাব আছে যাহাতে তোমরা অধ্যয়ন কর—

r যে, তোমাদের জন্য উহাতে রহিয়াছে যাহা তোমরা পসন্দ কর?

r তোমাদের কি আমার সহিত কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন অঙ্গীকার রহিয়াছে যে, তোমরা নিজেদের জন্য যাহা স্থির করিবে তাহাই পাইবে?

r তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর উহাদের মধ্যে এই দাবির যিম্মাদার কে?

www.eelm.weebly.com

r উহাদের কি কোন দেব-দেবী আছে? থাকিলে উহারা উহাদের দেব-দেবীগুলিকে উপস্থিত করুক— যদি উহারা সত্যবাদী হয়।

মক্কার অংশীবাদীরা বলতো, আমরা পরকাল বিশ্বাস করি না। আর পরকাল বলে যদি কিছু থেকেই থাকে, তবে এখানে আমরা যেমন সম্মান ও সম্পদ-বিত্ত নিয়ে সুখে আছি, সেখানেও সেরকমই থাকবো। তাদের এমতো অপকথনের প্রতিবাদ করা হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ে, যার মর্মার্থ— আমার প্রতি যারা সমর্পিত ও মুত্তাকী তারা কখনোই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতো নয়। পরকালে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আমি অবশ্যই শাস্তি দিবো এবং মুত্তাকীদেরকে করবো পুরস্কৃত। তাদেরকে দান করবো অসংখ্য সুখোপকরণবিশিষ্ট জান্নাত।

এখানে 'আমি কি আত্মসমর্পণকারীদেরকে অপরাধীদের সদৃশ গণ্য করবো' বাক্যটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক এবং এর সম্পর্ক রয়েছে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আত্মসমর্পণকারী ও অপরাধী কি সমমর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে ? কখনোই নয়। তাই আমি যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক, সেহেতু আমিও তো তাদেরকে সমান্তরাল জ্ঞান করতে পারি না।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা এ কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছো'? একথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! তোমরা কি এতোই মূঢ় ও মূর্খ যে, ভালো ও মন্দের পার্থক্যও বুঝতে পারো না? এ কেমনতর সিদ্ধান্ত তোমাদের?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমাদের নিকট কি কোনো কিতাব আছে, যা তোমরা অধ্যয়ন করো— (৩৭) যে, তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে যা তোমরা পছন্দ করো' (৩৮)?

এখানকার 'আম' অব্যয়টি পার্থক্যসূচক 'বাল' (বরং) অর্থে ব্যবহৃত। আর 'ইন্না' অব্যয়টি ব্যবহার করা হয়েছে কর্মপদের স্থলে, যদিও শব্দটি হওয়া উচিত ছিলো 'আন্না'। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে এখানকার 'ইন্না' এর পূর্বে উহ্য রয়েছে একটি শব্দ 'ক্বওল' বা 'কথা'। অর্থাৎ তোমরা কি সেই কিতাবে এরকম কথা পাঠ করেছো? অথবা বলা যেতে পারে, এখানে 'লাকুম' এর সঙ্গে 'লাম' ব্যবহৃত হওয়ার কারণেই 'আন্না' অব্যয়টি হয়েছে 'ইন্না'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! যে অদ্ভুত দাবি তোমরা করছো, তার সপক্ষে কি তোমাদের কাছে এমন কোনো আসমানী কিতাব আছে, যা তোমরা নিয়মিত পাঠ করো এবং যে কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে এমন কথা, যা তোমাদের আকাংখার অনুকূল? এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে পরের আয়াতে উল্লেখিত বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'তোমাদের কি আমার সঙ্গে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোনো অঙ্গীকার রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা স্থির করবে, তা-ই পাবে'? একথার অর্থ— হে মক্কার পৌত্তলিকেরা! আমি কি মহাপ্রলয়

www.eelm.weebly.com

পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, তোমরা যা কামনা করবে, তা-ই আমাকে দিতে হবে? বাক্যটির সম্বন্ধ রয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমাদের সঙ্গে আমার এমন প্রতিশ্রুতি কি আছে, যা আমি পরিপূরণ করতে বাধ্য? মহাবিচারের দিবসে তোমরা যে রকম চাও, সেরকম সিদ্ধান্ত দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে অঙ্গীকারাবদ্ধতা থেকে আমি মুক্ত হতে পারবোই না? অথবা কথাটি বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত হবে এখানকার 'বালিগা' (সুদৃঢ়) এর সঙ্গে। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়াবে— যে অঙ্গীকার বলবৎ থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত? আর এখানকার 'আইমান' শব্দটি শপথজ্ঞাপক। আর পুরো বাক্যটি এই শপথের প্রত্যুত্তর। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— আমি তোমাদের সঙ্গে কি এই মর্মে শপথ করেছি যে, তোমরা যেমন চাও, আমি তেমনই করবো?

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তাদের মধ্যে এই দাবির জিম্মাদার কে'? একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ— এরকম কথার দায়-দায়িত্ব বহন করার সাধ্য, সাহস ও অধিকার আছে কার?

এরপরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'তাদের কি কোনো দেব-দেবী আছে? থাকলে তারা তাদের দেব-দেবীগুলোকে উপস্থিত করুক— যদি তারা সত্যবাদী হয়'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! তারা নিজেরা যদি তাদের অসম্ভব দাবির দায় বহন করতে না চায়, তবে তাদের মিথ্যা উপাস্যগুলোকে ডেকে আনুক। তারাই বলুক যে, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা সমমর্যাদাসম্পন্ন? যদি তাদের দাবি সত্যই হয়, তবে তারা এরকম করে দেখায় না কেনো? এখানে 'উপস্থিত করুক' বলে প্রকাশ করা হয়েছে পৌত্তলিকদের অক্ষমতাকে। 'ফালইয়া'তূ' (উপস্থিত করুক) কথাটির 'ফা' অব্যয়টি এখানে কারণপ্রকাশক। আর 'যদি তারা সত্যবাদী হয়' কথাটি পরিণতিপ্রমাণক। কাজেই এখানে শর্তযুক্ত বাক্য হওয়া সত্ত্বেও পরিণতি নিষ্প্রয়োজন।

সূরা ক্বলাম ঃ আয়াত ৪২, ৪৩

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٤٢﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾

r স্মরণ কর, সেই দিনের কথা যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হইবে, সেই দিন উহাদিগকে আহ্বান করা হইবে সিজ্‌দা করিবার জন্য, কিন্তু উহারা সক্ষম হইবে না;

www.eelm.weebly.com

r উহাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে অথচ যখন উহারা নিরাপদ ছিল তখন তো উহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল সিজ্দা করিতে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, সেই দিনের কথা, যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে'। এখানে 'ইয়াওমা' (সেই দিনে) পদটি কালাধিকরণকারক। এর পূর্বে উহ্য রয়েছে 'উজ্কুর' (স্মরণ করো) কথাটি। এখানে অনুবাদ করা হয়েছে ওই উহ্যতা সহকারেই। আর 'পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে' অর্থ তখন কঠিন সংকটে ফেলা হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সেদিন তাদেরকে আহ্বান করা হবে সেজদা করার জন্য, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না'। একথার অর্থ— পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্পাক যখন প্রকাশ ঘটাবেন তাঁর আনুরূপ্যবিহীন জ্যোতির, তখন সবাইকে হুকুম দেওয়া হবে, সেজদা করো। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন সেজদা করতে পারবে না।

বোখারী, মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, একবার কয়েকজন সাহাবী রসুল স. এর নিকটে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহী! আমরা কি পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্কে দেখতে পাবো? তিনি স. জবাব দিলেন, নির্মেঘ আকাশের দ্বিপ্রাহরিক সূর্যদর্শন কি অস্পষ্ট? সাহাবীগণ বললেন না। তিনি স. বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে উদিত চতুর্দশীর চন্দ্র কি দুর্ণিরীক্ষ্য? তাঁরা বললেন, নাহ্। তিনি স. বললেন, তাহলে বোঝো, পুনরুত্থান দিবসের আল্লাহ্ দর্শনও তেমনি— স্পষ্ট ও অন্তরালহীন। তখন জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, তোমরা যার যার উপাসনা করতে, তার তার পিছনে চলে যাও। ওই ঘোষণার সাথে সাথে পৌত্তলিকদেরকে নিক্ষেপ করা হবে নরকে। ইহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কার উপাসনা করতে? তারা বলবে, আল্লাহ্র পুত্র উযায়েরের। বলা হবে, তোমরা মিথ্যার পূজারী। আল্লাহ্ তো ভার্যা ও সন্তান-সন্ততি গ্রহণ করা থেকে চিরপবিত্র। এরপর বলা হবে, কী চাও এখন? তারা বলবে, পানি। আমরা পিপাসার্ত। বলা হবে, তোমরা কি দৃষ্টিহীন! সামনে তাকাও। তারা সামনে তাকাতেই জাহান্নামকে দেখতে পাবে মরীচিকার মতো। তাদের সকলকে তখন তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। এরপর খৃষ্টানদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা উপাসক ছিলে কার? তারা বলবে, আল্লাহ্র পুত্র মসী'র। বলা হবে, তোমরা উপাসক অসত্যের। এরপর তাদেরকে ইহুদীদের মতো জিজ্ঞাসাবাদ করে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে।

হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, সেদিন সূর্য-চন্দ্র ও মূর্তিপূজারীদের সামনে তাদের উপাস্যসমূহকে সুনির্দিষ্ট অবয়বে উপস্থিত করানো হবে। আর ইহুদী-খৃষ্টানদের সামনে শয়তানকে উপস্থিত করানো হবে নবী উযায়ের ও নবী ঈসা মসীহরূপে। এরপর ওই বাতিল উপাস্যসমূহ ও তাদের উপাসকদেরকে নিক্ষেপ করা হবে নরকে। হাদিসটি প্রত্যয়ন করেছেন তিবরানী।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিবরানী আবু ইয়ালী, বায়হাকী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, মহাবিচারের দিবসে দু'জন ফেরেশতাকে উযায়ের ও ঈসা'র আকারে উপস্থিত করা হবে ইহুদী ও নাসারাদের সামনে। তাদের নেতৃত্বেই দোজখে প্রবেশ করবে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা। 'তারা যদি উপাস্যই হতো, তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো' আয়াতে সেকথাই বলে দেওয়া হয়েছে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তারপর অবশিষ্ট থাকবে কেবল বিশ্বাসী ও কপটাচারীরা। আল্লাহ্ নির্দেশ দিবেন। তোমরা দাঁড়িয়ে রয়েছো কেনো? অগ্রসর হও। তারা বলবে, আমরা ওই জাহান্নামীদের অনুসরণ করবো কেনো? পৃথিবীর জীবনে আমরা তো তাদের অনুসারী ছিলাম না। এরপর আল্লাহ্ প্রকাশ করবেন তাঁর আনুরূপ্যবিহীন জানুদেশ। সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় পতিত হবে পুণ্যবানেরা। যারা পৃথিবীর জীবনে ছিলো বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী ও একনিষ্ঠ ইবাদতকারী। কিন্তু লোক দেখানো ইবাদত যারা করেছিলো, তারা তখন সেজদা করতে পারবে না। তাদের পিঠ হয়ে যাবে তক্তার মতো শক্ত। তারা তা বাঁকাতে পারবে না। সেজদা করতে চাইলেও হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। এরপর জাহান্নামের উপরে স্থাপন করা হবে একটি সেতু। ওই সেতুর নাম পুলসিরাত। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! পুলসিরাত কী? তিনি স. বললেন, কম্পমান পিচ্ছিল পথ, বক্রলৌহকণ্টকিত, নজদে উৎপাদিত কাঁটা-গুল্ম সদৃশ কণ্টক দ্বারা আবৃত। ওই সময় আমাকে ও অন্যান্য নবীকে দেওয়া হবে শাফায়াত করার অনুমতি। তাঁরা নিবেদন করবেন, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! সেতু অতিক্রমকারীদেরকে রক্ষা করুন। বিশ্বাসীরা তখন তাদের আপন আপন সৌভাগ্য অনুসারে পুলসিরাত অতিক্রম করবে বায়ু, পাখি, দ্রুতগামী অশ্ব, অথবা উষ্ট্রের গতিতে। কেউ কেউ আবার কণ্টকাহত হয়ে পড়ে যাবে জাহান্নামে। যাঁর অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, তাঁর শপথ! বিশ্বাসীগণ জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণপ্রাপ্তির পর তাদের জাহান্নামবাসী ভ্রাতাদের জন্য এমনভাবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে শুরু করে দিবে বাদানুবাদ, যেমন তোমরা বাদানুবাদ করো যথাপ্রাপ্য বুঝিয়ে নেওয়ার জন্য। বলা হবে, কলহ কোরো না। তারা নিবেদন করবে, ওরা তো আমাদের সঙ্গে নামাজ-রোজা পালন করতো। হজও করতো। আল্লাহ্ বলবেন, তাদেরকে সনাক্ত করো। জাহান্নামে প্রবেশ করা সত্ত্বেও যাদের চেহারা অবিকৃত থাকবে, তাদেরকে তখন তারা সনাক্ত করতে পারবে। আল্লাহ্ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। জান্নাতবাসীরা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা যাদের সম্পর্কে বলেছিলাম, তাদের কেউ আর জাহান্নামে নেই। আল্লাহ্ বলবেন, ভালো করে দেখে নাও। এক দীনার পরিমাণ ইমানের চিহ্ন কারো মধ্যে যদি দেখতে পাও, তবে তাকেও বের করে নিয়ে এসো। নির্দেশ পেয়ে তারা ভালো করে দেখতে শুরু করবে। এভাবে সনাক্ত করতে পারবে আরো অনেককে। আল্লাহ্ তাদেরকেও বের করে আনবেন। পুনঃ নির্দেশ দিবেন, অর্ধ দীনার পরিমাণ ইমান বিশিষ্টদেরকেও

www.eelm.weebly.com

চিহ্নিত করো। এভাবে তারা চিহ্নিত করবে আরো অনেককে। তাদেরকে বের করে আনার পর পুনরায় নির্দেশ দেওয়া হবে, এবার চিহ্নিত করো পিপীলিকা পরিমাণ ইমানবিশিষ্টদেরকে। তারা তাই করবে। এভাবে বের করে আনা হবে আরো অনেককে। তারপর জান্নাতবাসীরা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা। জাহান্নামের মধ্যে আর তো কল্যাণকর কিছু দেখি না। আল্লাহ্ বলবেন, ফেরেশতা ও বিশ্বাসীদের শাফায়াতপর্ব তো শেষ। এবার রইলেন কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ালু আল্লাহ্। একথা বলে আল্লাহ্ জাহান্নাম থেকে এমন অনেক লোককে বের করে আনবেন, যাদের পুণ্যকর্ম বলে কিছু নেই, আছে শুধু অতি সূক্ষ্ম এক বিন্দু ইমান এবং যাদের সর্বাঙ্গ জ্বলে পুড়ে হয়ে গিয়েছিলো অঙ্গার। জান্নাতের এক তোরণের কাছে অবস্থিত জীবন-সাগরে গোসল করতে বলা হবে তাদেরকে। সেখানে অবগাহনের পর তারা হয়ে যাবে সিক্ত মৃত্তিকায় অঙ্কুরিত নতুন তরুশিশুর মতো কান্তিময়। কিন্তু তাদের গ্রীবাদেশে তখনো থাকবে একটি সীলমোহর। সেদিকে তাকিয়ে জান্নাতবাসীরা বলবে, এরা হচ্ছে দয়াময় আল্লাহ্ কর্তৃক মুক্তকৃত দাস। এদেরকে আল্লাহ্ জান্নাত দান করলেন পুণ্যকর্ম ব্যতিরেকেই। আল্লাহ্ ওই ক্ষমাপ্রাপ্তদেরকে বলবেন, যা কিছু দেখছো, সবই তোমাদের। উল্লেখ্য, হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাকেমও এরকম বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম। তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— তাদের কাছে তখন আল্লাহ্ এমনভাবে তাঁর আবির্ভাব ঘটাবেন, যা তারা কল্পনাও করতে পারবে না।

লালকায়ী তাঁর 'কিতাবুস্ সুন্নাহ্'য় এবং আজরী তাঁর 'কিতাবুর রুইয়াত' গ্রন্থে হজরত আবু মুসা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মহা বিচারের দিবসে প্রত্যেক জাতির সামনে আকৃতিবিশিষ্ট করে উপস্থিত করা হবে তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক উপাস্যদেরকে। সকলেই পক্ষাবলম্বন করবে তাদের আপন আপন উপাস্যদের। অবশিষ্ট থাকবে কেবল আল্লাহ্র এককত্বে আস্থা স্থাপনকারীরা। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, তোমরাও অগ্রসর হও। দাঁড়িয়ে রয়েছো কেনো? তারা বলবে, কার কাছে যাবো? আমরা যাঁর আরাধনা করতাম, তাঁকে তো দেখছিনা। বলা হবে, তাঁকে দেখলে কি তোমরা চিনতে পারবে? তারা বলবে, আমরা তো জানি, তিনি আকারাতীত। আল্লাহ্ তখন অপসারণ করবেন তাঁর অন্তরাল। তাঁকে প্রত্যক্ষ করে তারা লুটিয়ে পড়বে সেজদায়। কিন্তু কিছুসংখ্যক লোক সেজদা করতে পারবে না। জোর করে সেজদা করতে গিয়ে তারা মাটিতে পড়ে যাবে উল্টো হয়ে। আল্লাহ্ বলবেন, শির উত্তোলন করো। তোমাদের প্রত্যেকের পরিবর্তে দোজখে পাঠিয়ে দিয়েছি একজন করে ইহুদী, অথবা খৃষ্টানকে। এ সকল হাদিসের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্র জ্যোতি তখন প্রতিভাসিত হবে বিভিন্নরূপে। এক ধরনের প্রতিভাস হবে আলমে মেছালের প্রতিভাসের অনুরূপ, যা প্রকৃতপক্ষে প্রতিবিম্ব দর্শন, মূল দর্শন নয়। যেমন রসুল স. তাঁকে দেখেছিলেন সৌম্যকান্তি যুবাপুরুষরূপে, যিনি ছিলেন কুঞ্চিতকুন্তলবিশিষ্ট এবং স্বর্ণপাদুকা পরিহিত।

www.eelm.weebly.com

এধরনের উদ্ভাস দৃষ্টিগোচর হতেই বিশ্বাসীরা বলে উঠবে, আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রার্থী। আমরা তো আমাদের প্রভুপালয়িতাকে আকারবিশিষ্ট বলে মানি না। তখন প্রতিভাসিত হবে আনুরূপ্যবিহীন জ্যোতির সম্পাত। তার মধ্যে থাকবে অবোধ্য এক মানবাকৃতির প্রতিচ্ছবি। সম্ভবত ওই উদ্ভাসনই হবে জানুদেশের উদ্ভাসন, যা বিশ্বাসীরা প্রত্যক্ষ করবে নির্মেঘ আকাশের দ্বিপ্রাহরিক সূর্য, অথবা মেঘমুক্ত আকাশের পূর্ণশশীর মতো সুস্পষ্ট। অবিশ্বাসীরা এমতো দর্শন থেকে হবে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এ কথাই এক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে 'কক্ষণোই নয়, সেদিন আল্লাহ্ থাকবেন তাদের দৃষ্টির অন্তরালে'। রসুল স. বলেছেন, সেদিন পুণ্যবান ও পাপী বিশ্বাসীরা ছাড়া অন্য কেউ যখন সেখানে উপস্থিত থাকবে না, তখন আল্লাহ্ উন্মোচন করবেন তাঁর আনুরূপ্যবিহীন জানুদেশ। উল্লেখ্য, কোরআন মজীদে উল্লেখিত 'আল্লাহ্‌র হাত' 'আল্লাহ্‌র চেহারা' এই কথাগুলো যেমন দুর্জ্ঞেয়, তেমনি দুর্জ্ঞেয় 'আল্লাহ্‌র জানুদেশ' কথাটিও। মুতাশাবিহাত (দুর্জ্ঞেয়) পর্যায়ের এ সকল কথার প্রকৃত মর্ম জানেন কেবল আল্লাহ্‌পাক। তত্ত্বজ্ঞগণ তাই বলেন, আমরা এসকল কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, যদিও এগুলোর মর্ম আমাদের বোধায়ত্ত নয়। আরো উল্লেখ্য, তৃতীয় জ্যোতিসম্পাত ঘটবে জান্নাতাভ্যন্তরে। সেখানে মনুষ্যাকৃতির প্রতিচ্ছবিও হবে অপসৃত। ওই অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে এক আয়াতে এভাবে 'লিল্লাজীনা আহসানুল হুসনা ওয়া যিয়াদাতুন'।

উল্লেখ্য, পরকাল ইবাদত করার স্থান নয়, প্রতিফল প্রাপ্তির স্থান। তৎসত্ত্বেও তখন পুণ্যবান ও পাপী বিশ্বাসীদেরকে সেজদা করতে হুকুম দেওয়া হবে কেবল তাদের দাসত্বের স্বভাব-প্রকৃতি প্রদর্শনার্থে। আর মহামহিমময় আল্লাহ্ যখন তাঁর অন্তরাল উঠিয়ে দিবেন, তখন সে অনন্য অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আল্লাহ্‌কে সেজদা জানানোই তো হবে তাঁর দাসগণের জন্য স্বাভাবিক। পুণ্যবান ও পাপী বিশ্বাসীরা সকলেই তখন আদিষ্ট হবে সেজদা করতে। পুণ্যবানেরা সে আদেশ পালন করতে পারবে। কিন্তু পাপীরা পারবে না তাদের অহমিকা ও অন্যবিধ পাপের কারণে। যেমন যথানিয়মে ও যথাসময়ে নামাজ না পাঠ করা, বেদাতীদের সঙ্গে হৃদ্যতা, ইবাদতে প্রদর্শনপ্রবণতা ইত্যাদি।

একটি প্রশ্ন ঃ হজরত আবু হোরায়রা প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, অবিশ্বাসীদের দোজখগমনের পর অবশিষ্ট থাকবে কেবল বিশ্বাসী ও কপটাচারীরা। আল্লাহ্ তখন তাঁর জ্যোতির উদ্ভাস ঘটাবেন। এবং হুকুম দিবেন সেজদা করতে। সে হুকুম পালন করতে পারবে বিশ্বাসীরা, কপটাচারীরা পারবে না। কথাটি বিসদৃশ নয় কি? কপটাচারীরা তখন বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকতে পারবে কীভাবে?

জবাব ঃ ওই হাদিসগুলোকে উল্লেখিত কপটাচারী অর্থ ধর্মের শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ের কপটাচারী। মূল কপটাচারী বা মুনাফিক নয়। তারা তো অবশ্যই অবিশ্বাসীদের দলভূত। কেননা তাদের স্খলন বিশ্বাসগত। তাই তারা প্রাথমিক বিবেচনাতেই জাহান্নামী। তাদের স্থায়ী আবাস হবে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে। তারা আল্লাহ্-দর্শন থেকে হবে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। রসুল স. বলেছেন, চারটি

www.eelm.weebly.com

অপস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিরা মুনাফিক। যেমন— ১. আমানত আত্মসাৎ ২. নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যাবচন ৩. প্রতিশ্রুতিভঙ্গ এবং ৪. অশ্লীল ভাষণ। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। আবার হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে প্রথমোক্ত তিনটি অপস্বভাবের কথা। আর সেখানে শেষে বলা হয়েছে এই কথাটুকু— যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং দাবি করে মুসলমান হওয়ার।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে, অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিলো, তখন তো তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিলো সেজদা করতে'। একথার অর্থ— পৃথিবীতে যেহেতু সেজদা করার কথা শুনেও তারা আল্লাহ্কে সেজদা করেনি, তাই সেখানেও তারা আল্লাহ্কে সেজদা করতে পারবে না। সেকারণেই লজ্জায় ও আক্ষেপে মুহ্যমান হয়ে সেজদার নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও তখন দাঁড়িয়ে থাকবে অধোবদনে। এভাবেই তারা তখন হবে চরম লাঞ্ছনার শিকার।

সূরা ক্বলাম ঃ আয়াত ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ؕ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ
لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَاُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿٤٥﴾ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا
فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٦﴾ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤٧﴾
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَ
هُوَ مَكْظُوْمٌ ﴿٤٨﴾ لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَ
هُوَ مَذْمُوْمٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٥٠﴾

r ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং যাহারা এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে, আমি উহাদিগকে ক্রমে ক্রমে ধরিব এমনভাবে যে, উহারা জানিতে পারিবে না।

r আর আমি উহাদিগকে সময় দিয়া থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

r তুমি কি উহাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, তাহা উহাদের কাছে দুর্বহ দণ্ড মনে হয়?

r উহাদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, উহারা তাহা লিখিয়া রাখে!

www.eelm.weebly.com

r অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য-সহচরের ন্যায় অধৈর্য হইও না, সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করিয়াছিল।

r তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তাহার নিকট না পৌঁছিলে সে লাঞ্ছিত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইত উন্মুক্ত প্রান্তরে।

r পুনরায় তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন এবং তাহাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! সীমালংঘনকারী মক্কাবাসীদের ব্যাপারে বিচলিত হবেন না। তাদের শায়েস্তা করার বিষয়টি আমার উপরে ছেড়ে দিন। আমি জানি, যারা আমার প্রত্যাদেশিত বাণীকে অমান্য করে, তাদেরকে শাস্তি দিতে হয় কীভাবে। তারা পৃথিবীর ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকুক। আমি ক্রমে ক্রমে তাদেরকে শাস্তিকবলিত করবো। জানতেও দিবো না, কখন কীভাবে কোথায় আমি তাদেরকে পাকড়াও করবো।

বাক্যটি অনন্বয়ী এবং রসুল স. এর প্রতি একটি সান্ত্বনামূলক নির্দেশ। 'বাণী' অর্থ এখানে কোরআনের বাণী। 'হুম' (তারা) সর্বনামটি এসেছে এখানে 'মান' (যে) পদের অর্থের দিক থেকে। কেননা 'মান' একবচন হলেও বহুবচনার্থক। 'দারজুন' অর্থ কাপড় অথবা কাগজ মোচড়ানো। অর্থগত দিক থেকে শব্দটি কর্মপদরূপে ব্যবহৃত। অর্থাৎ জড়িত। 'ত্বই' শব্দের অর্থ যেমন মৃত্যু, তেমনি ঋণাত্মক অর্থে 'দারুজু' ও মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত। এরকম বলেছেন জাওহারী। তাঁর মতে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি তাদেরকে কাগজ ভাঁজ করার মতো করে ভাঁজ করবো, মোচড়াবো, তাদেরকে রাখবো অমনোযোগী। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধরবো' অর্থ আমি তাদেরকে শাস্তিদানের জন্য পাকড়াও করবো ধীরে ধীরে। অর্থাৎ ধীরে ধীরে আমি তাদেরকে এমনভাবে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসবো যে, তারা টেরও পাবে না।

এরপরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ'। একথার অর্থ— আর আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে এরকম আচরণই করি। শাস্তি দেওয়ার পূর্বে দান করি দীর্ঘ অবকাশ। এটা হচ্ছে আমার দুর্ভেদ্য কৌশল। এ কৌশল ভেদ করার সাধ্য তাদের হয়ই না। কেননা আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ, অপ্রতিরোধ্য। এখানে 'কাইদী' অর্থ আমার কৌশল, ব্যবস্থাপনা, অবকাশরূপী এমন প্রতিশোধ, যথাসময়ে যার প্রকাশ অনিবার্য। জাওহারী বলেছেন, কেউ কেউ বলেন, এখানে 'কাইদী' অর্থ শাস্তি। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, এখানে শব্দটির অর্থ— অবকাশ দেওয়া, শিথিলতা করা। অর্থাৎ পৃথিবীতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যে ধন-জনবলের প্রাচুর্য আমি দেই, তা বিশ্বাসীদের চেয়ে তাদেরকে অধিক পছন্দ করি বলে নয়, বরং তাদেরকে প্রদত্ত এমতো প্রকাশ্য অনুগ্রহ মধুররূপী বিষ, আনন্দরূপী চিরবিষাদ।

www.eelm.weebly.com

একটি উপযোগ ঃ পাপে লিপ্ত হওয়ার পর বিপদকবলিত হলে বুঝতে হবে, এই বিপদ হচ্ছে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সুতরাং এর মধ্যে রয়েছে কল্যাণ। আর পাপমগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নিরুপদ্রব জীবন যাপিত হওয়া ভয়ের কারণ। তাই এমতাবস্থায় ভাবতে হবে, তাহলে কি চূড়ান্ত শাস্তি দানের জন্য আমাকে অবকাশ দেওয়া হচ্ছে?

এরপরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'তুমি কি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছো যে, তা তাদের কাছে দুর্বহ দণ্ড মনে হয়'? একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! আপনি তো স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন মহাকল্যাণের দিকে। এর জন্য তাদের কাছে তো আপনি কোনো পারিশ্রমিকও দাবি করছেন না। তাহলে আপনার আহ্বান তাদের কাছে এতো দুর্বহ মনে হবে কেনো? 'আম' (কি) অব্যয়টি এখানে অসংবদ্ধ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তাদের উপরে কি তাহলে জরিমানার বোঝা চেপেছে? নিশ্চয় নয়। তবে তারা আপনার মহা আহ্বানে সাড়া দিবে না কেনো? আর এখানকার 'ফাহুম' কথাটির 'ফা' অব্যয়টি হেতুজ্ঞাপক ও যোজক।

এরপরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে—'তাদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে'? একথার অর্থ— তাদের কাছে কি আছে লওহে মাহফুজের তত্ত্বজ্ঞান? অথবা অদৃশ্যাগত কোনো জ্ঞানসংযোগ? নিশ্চয়ই নেই। তাহলে তারা আপনাকে অস্বীকার করে কিসের জোরে? লক্ষণীয়, ৩৭ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমাদের নিকট কি কোনো কিতাব আছে, যা তোমরা অধ্যয়ন করো— যে, তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে যা তোমরা পছন্দ করো'? আর এখানে বলা হলো 'তাদের কি অদৃশ্য জ্ঞান আছে যে তারা তা লিখে রাখে'? এভাবে প্রথমে তাদের জ্ঞানগত ও অনুকৃত (আকলী ও নকলী) জ্ঞানকে যেমন অস্বীকার করা হয়েছে, তেমনি পরে অস্বীকার করা হলো তাদের অদৃশ্যদর্শনজাত (কাশফী) এবং অদৃশ্যাগত বিজ্ঞপ্তি (ইলহামী)কে। অর্থাৎ সত্যজ্ঞানের কোনোপ্রকার ভিত্তি ও সূত্রই তাদের নেই। সুতরাং বুঝতে হবে তারা অনুসরণ করে কেবল স্বকপোলকল্পনার, স্বেচ্ছাচারিতার ও মিথ্যাচারের। উল্লেখ্য, কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয় করেন নবী-রসুল এবং ফেরেশতাগণ। আউলিয়াগণের মধ্যেও অনেকে জ্ঞানাহরণ করেন এদু'টো বিশেষ সূত্রের মাধ্যমে।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ করো তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য সহচরের ন্যায় অধৈর্য হয়ো না, সে বিপদে আচ্ছন্ন অবস্থায় প্রার্থনা করেছিলো'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বচনবাহক! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তিকামনায় ত্বরাপ্রবণ হবেন না। নবী ইউনুস যেমন তার অবাধ্য সম্প্রদায়ের শাস্তির ব্যাপারে ধৈর্যহারা হয়ে আমার প্রত্যাদেশের অপেক্ষা না করে স্থানান্তরে গমন করেছিলেন, শেষে মৎস্য-উদরবাসী হয়ে বুঝতে পেরেছিলেন ধৈর্যের মর্ম এবং কালাতিপাত করতে বাধ্য

www.eelm.weebly.com

হয়েছিলেন আমা সকাশে কাতর প্রার্থনা করে, সেরকম দুরবস্থার দিকে আপনি কিছুতেই গমন করবেন না। বরং আপনি অপেক্ষা করুন আমার প্রত্যাদেশের। দেখুন কী হয়? তাদেরকে সাময়িক যে অবকাশ আমি দিয়েছি, তারপরে আমি অবশ্যই তাদেরকে শায়েস্তা করবো।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ বলেছেন, নবী ইউনুস ছিলেন অত্যন্ত সজ্জন ও পুণ্যবান। কিন্তু ত্বরাপ্রবণতাও ছিলো তাঁর স্বভাবজাত। তাই তাঁর কাছে নবুয়তের দায়িত্বপালনকে মনে হয়েছিলো অত্যন্ত গুরুভার। উষ্ট্রশাবকপৃষ্ঠে বোঝা চাপালে যেমন সে মনেপ্রাণে বোঝা মুক্ত হতে চেষ্টা করে, তাঁর অবস্থাও ছিলো কিছুটা সেরকম। উল্লেখ্য, উলুল আজম পয়গম্বরগণের অন্তর্ভুক্ত তিনি ছিলেন না। তাই এক সময় তাঁর মধ্যে একবার ঘটেছিলো ত্বরাপ্রবণতার বহিঃপ্রকাশ। হজরত ইবনে মাসউদ, সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং ওয়াহাবের বর্ণনানুসারে ঘটনাটি ছিলো এরকম— নীনুয়া নামক স্থানের মোসেল অঞ্চলের অধিবাসীদের পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি। ওই অঞ্চলের লোকসংখ্যা ছিলো প্রায় এক লক্ষ। তারা ছিলো অবাধ্যাচারী। নবী ইউনুস বার বার তাদেরকে সত্যধর্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাতে লাগলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না। আগের মতোই আঁকড়ে রইলো অবাধ্যতাকে। শেষে একসময় তিনি প্রত্যাদেশানুসারে ঘোষণা করলেন, তোমরা যদি তওবা না করো, তবে তিন দিন পরেই তোমাদের উপরে নেমে আসবে সর্বনাশা শাস্তি। ঘোষণা শুনে তারা চিন্তিত হলো। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, দ্যাখো, ইউনুস কিন্তু যে সে লোক নয়। মিথ্যা কথা সে কোনোদিনই বলেনি। সুতরাং তোমরা তার প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখো। বিশেষ করে রাতে যদি দ্যাখো সে স্থান ত্যাগ করেছে, তবে নিশ্চয় জেনো পরদিন সকালে তার কথিত শাস্তি আপতিত হবেই। তখন আমাদেরকে কিন্তু সর্বান্তঃকরণে তওবা করতেই হবে। একে একে অতিবাহিত হলো তিন দিন তিন রাত। নবী ইউনুস মধ্যরাতে তাঁর গৃহ থেকে বেরিয়ে গেলেন। সকাল হতে না হতেই আকাশে জমতে লাগলো ঘন কালো ধোঁয়া। কালো হয়ে গেলো চতুর্দিক। তারা তাড়াতাড়ি খোঁজ নিয়ে দেখলো নবী ইউনুস নেই। ভীত হয়ে পড়লো তারা। সিদ্ধান্ত নিলো, আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থনা করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই এখন নেই। সকলে পরিধান করলো কম্বল। তারপর নারী-পুরুষ-শিশু-পশু সবকিছু নিয়ে সকাতর ক্ষমাপ্রার্থনার উদ্দেশ্যে একত্রিত হলো উন্মুক্ত প্রান্তরে। শিশুদেরকে পৃথক করে দিলো তাদের মাতাদের নিকট থেকে। পশুশাবকদেরকেও রাখলো তাদের পশুমাতাদের থেকে দূরে। এরপর আল্লাহ্র ক্ষমা কামনায় ডুকরে ডুকরে কাঁদতে শুরু করলো তারা। তাদের অনুশোচনাজর্জরিত রোদনধ্বনিতে ভারী হয়ে গেলো আকাশ বাতাস। রোষ প্রশমিত হলো আল্লাহ্র। তিনি প্রত্যাহার করে নিলেন তাঁর প্রায়-অবতীর্ণ আযাবকে। ঘটনাটি ঘটেছিলো দশই মহররমে।

নবী ইউনুস দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু প্রত্যক্ষ করলেন। আযাব অপসারিত হওয়ার পর তিনি চিন্তিত হলেন। ভাবলেন, এখন তো আমি হয়ে গেলাম মিথ্যাবাদী।

www.eelm.weebly.com

নীনুয়ায় ফিরে গেলে লোকেরা তো আমাকে এখন থেকে মিথ্যাবাদী বলে উপহাস করতে শুরু করবে। সুতরাং সেখানে ফিরে গিয়ে আর কী হবে? একথা ভেবে তিনি যাত্রা করলেন নিরুদ্দেশের পথে। চলতে চলতে উপস্থিত হলেন এক সাগরের পাড়ে। দেখলেন ঘাটে বাঁধা একটি যাত্রী বোঝাই নৌকা ছাড়বো ছাড়বো করছে। তিনিও উঠে পড়লেন ওই নৌকায়। নৌকা চলতে শুরু করলো। মাঝ দরিয়ায় গিয়ে থেমে গেলো নৌকাটি। যাত্রীরা পড়ে গেলো মহাসংকটে। মাঝিমাল্লারা অনেক চেষ্টা করেও নৌকাটিকে আর গতিশীল করতে পারলো না। নবী ইউনুস বললেন, নিশ্চয় এ নৌকায় আরোহণ করেছে আল্লাহ্‌র অবাধ্য কোনো লোক। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কে সে? তিনি বললেন, সম্ভবত আমিই। হে অভিযাত্রীবৃন্দ! তোমরা আমাকে সাগরে ফেলে দাও। তাহলেই মনে হয় তোমরা এ মহাসংকট থেকে পরিত্রাণ পাবে। যাত্রীরা বললো, না। দেখে তো মনে হয় আপনি সাধুপুরুষ। সুতরাং এমতো অপকর্ম আমরা করতে পারবো না। তার চেয়ে আমরা লটারী করে এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেই। এ প্রস্তাবে সম্মত হলো সকলে। লটারী করা হলো তিন বার। আর তিন বারই নাম উঠলো নবী ইউনুসের। তিনি বললেন, এবার তোমরা আর দ্বিধাদ্বন্দ্বকে প্রশ্রয় দিয়ো না। সাগরবক্ষে আমাকে নিক্ষেপ করো। লোকেরা তাই করলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট মৎস্য গ্রাস করলো তাঁকে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নৌকা যখন আর চললো না, তখন মাঝি-মাল্লারা বললো, এরকম তো হওয়ার কথা নয়। নিশ্চয় নৌকায় রয়েছে কোনো মহাঘাতক, অথবা পালিয়ে আসা কোনো ক্রীতদাস। আমরা তাকে লটারীর মাধ্যমে চিহ্নিত করবোই। লটারী করা হলো, তিনবার। প্রতিবারই নাম উঠে এলো নবী ইউনুসের। তিনি তখন স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিলেন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বিশাল সাগরে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গিলে ফেললো এক বিশালাকৃতির মাছ। আল্লাহ্ মাছকে নির্দেশ দিলেন, সাবধান! ইউনুস তোমার আহার্য নয়। তোমার উদরকে আমি বানিয়েছি তার আশ্রয়স্থল ও মসজিদ। অপর বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ তখন বললেন, তোমার পেট তার জন্য বন্দীশালা। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত ইউনুস তখন দণ্ডায়মান হয়ে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমিই মহাঘাতক। আমিই পলাতক দাস। লোকেরা বললো, আমরা শুনেছি আপনি আল্লাহ্‌র নবী। সুতরাং আমরা আপনাকে পানিতে ফেলে দিতে পারি না। আমরা বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে চাই লটারীর মাধ্যমে। তাই করা হলো। সকলে বিস্মিত হয়ে দেখলো, প্রতিবারেই উঠে আসছে হজরত ইউনুসের নাম। তিনি তখন নিজেই ঝাঁপ দিলেন সমুদ্রে। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত ইউনুস সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী ও দুই শিশুসন্তানকে সাথে নিয়ে। যখন জাহাজে উঠতে যাবেন, তখন ঘটলো সাংঘাতিক ঘটনা। স্ত্রী ও এক সন্তানকে হঠাৎ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো সামুদ্রিক ঢেউ। আর অপর সন্তানকে অকস্মাৎ এসে ধরে নিয়ে গেলো একটি নেকড়ে। তিনি দুঃখভারাক্রান্ত অন্তরে একাই উঠে পড়লেন জাহাজে। সে জাহাজও থেমে গেলো মাঝ দরিয়ায়।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, মাছটি নবী ইউনুসকে গলাধঃকরণ করে নেমে গেলো সাগরের গভীর তলদেশে। ওই ঘোর অন্ধকারেও মৎস্যোদরবাসী নবী শুনতে পেলেন চতুর্দিক থেকে মুহুর্মুহু আল্লাহ্র তসবী পাঠের আওয়াজ। তিনিও তখন পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করতে শুরু করলেন 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ্ জলিমীন'।

'ইজ্ নাদা ওয়া হুয়া মাকজূম' অর্থ সে বিপদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিলো। অর্থাৎ তিনি মৎস্য উদরে বন্দী হওয়ার কারণে তখন দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে অনবরত আল্লাহ্র মহিমা ও প্রশংসা বর্ণনা করছিলেন। এখানকার 'ইজ' অব্যয়টি সম্পর্কযুক্ত একটি উহ্য ক্রিয়া 'উজকুর' (স্মরণ করো) এর সঙ্গে 'লাতাকুন' (হয়ো না) এর সঙ্গে নয়। কেননা হজরত ইউনুস এর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনার কাজটি গর্হিত ছিলো না, ছিলো অত্যুত্তম। অনুত্তম ছিলো কেবল তাঁর ত্বরাপ্রবণতা। যে প্রসঙ্গের উল্লেখ করেই আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুলকে এই মর্মে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, হে আমার শেষতম রসুল! আপনি যেহেতু রসুলগণের মধ্যে সর্বোত্তম, তাই আপনার জন্য কিছুতেই শোভন নয় মীনোদরবাসী নবী ইউনুসের মতো চাঞ্চল্য প্রকাশ করা, যদিও তিনি চরম বিপদকালেও আল্লাহ্কে বিস্মৃত হননি। বরং বিষাদাক্রান্ত হয়েও মুহুর্মুহু আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশের মাধ্যমে হয়েছিলেন ক্ষমাপ্রার্থী।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার নিকট না পৌঁছলে সে লাঞ্ছিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হতো উন্মুক্ত প্রান্তরে'। এখানে 'লাও লা আন্ তাদারাকাহু নি'মাতুম্ মির রব্বিহী' অর্থ তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ তাঁর নিকটে না পৌঁছলে। এখানকার 'লাও লা' শব্দটি অব্যাহতিসূচক। 'তাদারাকা' 'আদরাকা' শব্দদ্বয় সমার্থক। 'তাদারাকাহু' অর্থ তাকে না সামলাতো, তার নিকটে পৌঁছে তাকে রক্ষা না করতো। কথাটির কর্তা 'নি'মাত' (অনুগ্রহ)। শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক। আর এর ক্রিয়া 'তাদারাকা' পুংলিঙ্গবাচক। উল্লেখ্য, এরকম শব্দসমন্বয় রীতিসিদ্ধ নয়। তবে এর সমর্থনে বলা যেতে পারে যে, এখানকার কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যকার 'হু' সর্বনামটির উপস্থিতিই এমতো শব্দসমন্বয়কে রীতিসিদ্ধ করেছে। 'নি'মাতুন' অর্থ অনুগ্রহ, দয়া, অনুকম্পা, কৃপা। আর 'মির্ রব্বিহী' (তার প্রতিপালকের) কথাটি এর বিশেষণ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— ওই মহাদুর্বিপাকের সময় আল্লাহ্র কৃপা যদি তাঁকে রক্ষা না করতো, তবে উন্মুক্ত প্রান্তরে লাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে থাকা ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় থাকতো না।

'লানুবিজা বিল আ'রায়ি ওয়া হুয়া মাজমূম' অর্থ সে লাঞ্ছিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হতো উন্মুক্ত প্রান্তরে। উল্লেখ্য, চল্লিশ দিন পর ওই মৎস্যটি তাঁকে উগলে ফেলে দিয়েছিলো জনমানবশূন্য প্রান্তরে, কিন্তু লাঞ্ছিত তিনি হননি। বরং তখনো করুণাসিক্ত ছিলেন আল্লাহ্র। কেননা তিনি ছিলেন অনুতপ্ত এবং আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনাকারী নবী। আর নবী বলেই আল্লাহ্পাক তাঁকে দিয়েছিলেন এমতো দুর্ভোগ,

www.eelm.weebly.com

যার পরিণতি ছিলো অতীব মঙ্গলময়। কেননা উত্তমতা পরিত্যাগও নবীগণের মহান মর্যাদার অননুকূল। অর্থাৎ সাধারণ বিশ্বাসীগণের জন্য যা কিছুই নয়, তা-ও সম্মানিত নবীগণের জন্য অপরাধ। এ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে সুরা সফ্ফার তাফসীরে।

আউফী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী ইউনুস বসবাস করতেন তাঁর স্বজাতির সঙ্গে ফিলিস্তিনে। একবার এক দুর্ধর্ষ ও অত্যাচারী রাজা তাদের উপরে আক্রমণ করে বসলো। ধরে নিয়ে গেলো ফিলিস্তিনবাসীদের বারোটি গোত্রের সাড়ে নয়টি গোত্রের লোকজনকে। অবশিষ্ট রইলো আড়াই গোত্রের লোক। আল্লাহ্ নবী শাইয়াকে প্রত্যাদেশ করলেন, তুমি বনী ইসরাইলদের রাজা হেরাক্লিয়াসকে বলো, সে যেনো ওই অত্যাচারী রাজার কাছে পাঠিয়ে দেয় কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তিকে। সে যেয়ে ওই রাজাকে সংযত হতে বলবে। আমি তখন তার মনোভাব পরিবর্তিত করে দিবো। ফলে মুক্তি পাবে বন্দীরা। রাজা হেরাক্লিয়াসের শাসনামলে মানুষের পথপ্রদর্শনার্থে নিয়োজিত ছিলেন পাঁচজন নবী। তাঁদের মধ্য থেকে নবী ইউনুসকে সে ডেকে পাঠালো। তাঁকে অনুরোধ করলো অত্যাচারী রাজার কাছে দূত ও সুপারিশকারীরূপে গমন করতে। নবী ইউনুস বললেন,আল্লাহ্ কি আমাকেই সেখানে যেতে বলেছেন? হেরাক্লিয়াস বললো, না। নবী ইউনুস বললেন, তাহলে বিচক্ষণ নবীগণের কাউকে সেখানে পাঠালেই তো হয়। হেরাক্লিয়াস আর কিছু বললো না। কিন্তু জনসাধারণ শুরু করলো পীড়াপীড়ি। তিনি তাদের প্রতি অতুষ্ট হলেন। যাত্রা করলেন নিরুদ্দেশের পথে। চলতে চলতে পারস্য সাগরের পাড়ে গিয়ে দেখলেন যাত্রী বোঝাই একটি জাহাজ ছাড়বো ছাড়বো করছে। এর পরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ইতোপূর্বেই।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'পুনরায় তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মপরায়ণগণের অন্তর্ভুক্ত করলেন'। একথার অর্থ— মৎস্যোদরবাসের অনুগ্রহসিক্ত বিপদ ভোগের পর আল্লাহ্ নবী ইউনুসকে পরিণত করলেন পূর্বাপেক্ষা অধিকতর পরিশুদ্ধ ব্যক্তিত্বে। ফলে সৎকর্মপরায়ণগণের তালিকায় তাঁর নাম সুমুদ্রিত হলো আগের চেয়ে অধিকতর মহিমায়। জনৈক সূফী সাধক বলেছেন, সৃষ্টিকুলের কারো কাছ থেকে দুঃখ-যাতনা এলে ধৈর্য ধারণ করাই কর্তব্য। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অমঙ্গল কামনাও সিদ্ধ নয়। বরং সহিষ্ণুতার সঙ্গে কামনা করতে হবে তাদের হেদায়েত। সুতরাং বুঝতে হবে, নবীগণের দায়িত্ব যখন এরকম, তখন আউলিয়াগণের দায়িত্ব তো সেরকমই হবে।

সূরা ক্বলাম ঃ আয়াত ৫১, ৫২

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۝ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

www.eelm.weebly.com

r কাফিররা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন উহারা যেন উহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়াইয়া ফেলিবে এবং বলে, 'এ তো এক পাগল।'

r কুরআন তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।

বাগবী লিখেছেন, মক্কার মুশরিকদের প্রবল বিশ্বাস ছিলো, তারা রসুল স. এর প্রতি তীক্ষ্ণ অশুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁকে প্রতিহত করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে যখন তারা যা চাইলো, তা কার্যকর করতে পারলো না, তখন বললো, মোহাম্মদ তো অদ্ভুত লোক দেখছি। তার দলিল-প্রমাণের কাছে আমরাই তো বার বার কূপোকাত হচ্ছি। এক বর্ণনায় এসেছে, বনী আসাদ গোত্রের লোকদের কুদৃষ্টির প্রভাব ছিলো ভয়ংকর। কোনো মোটা তাজা উট অথবা গরুকে দেখলে যদি তারা বলতো, 'আরে বেটি! কয়েকটা টাকা আর টুকরী নিয়ে যা না, গোশত নিয়ে আয়' তবে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে মরে যেতো ওই উট অথবা গরুটি।

কালাবী বলেছেন, আরব দেশের এক লোক ছিলো এরকম— দু' তিন দিন উপবাসে থেকে যত্রতত্র ঘোরাঘুরি করে সে ফিরে আসতো তার তাঁবুতে। তখন যদি সে উট অথবা ছাগপালকে দেখে বলতো, বাহ্! এতো সুন্দর পশু তো আর দেখিনি, তবে সঙ্গে সঙ্গে মরে যেতো পশুগুলো। ওই লোকটিকে একবার পৌত্তলিকেরা বললো, তুমি একবার তোমার দৃষ্টিবান মোহাম্মদের দিকে নিক্ষেপ করো তো দেখি। তাদের এমতো কুপ্রস্তাবের প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়— 'কাফেরেরা যখন কোরআন শ্রবণ করে, তখন তারা যেনো তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়ে ফেলবে এবং বলে, এতো এক পাগল'।

'ইযলাক্ব' শব্দটির বর্তমান ও ভবিষ্যতকালের শব্দরূপ 'ইয়ুযলিক্বুনা' আর নাফেয়ের মতে 'ইয়াযলিক্বুন'। দু'টো শব্দই সমার্থক। তাই এখানে 'যালক্বুন' অথবা ইয়ুযলাক্বুন' অর্থ হবে সফল করা, রসুল স.কে দৃষ্টিবানে বিদ্ধ করে ধরাশায়ী করা বা আছড়ে ফেলা। যেমন বলা হয় 'যালাক্বা আলসিনাতুহুম' (তাদের উক্তিগুলি প্রভাবান্বিত হয়েছে)।

সুদ্দী বলেছেন, শব্দটির অর্থ নজর লাগানো, অশুভ দৃষ্টিনিক্ষেপ। আর কালাবী শব্দটির অর্থ করেছেন— আছড়ে ফেলা, ধরাশায়ী করা। আর এখানে 'আছড়ে ফেলা' কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'শ্রবণ করে' এর সঙ্গে। হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অশুভ মানুষের কুলক্ষুণে দৃষ্টি মানুষকে নিয়ে যায় কবরে, আর উটকে নিয়ে যায় রন্ধনপাত্রে। আবু নাঈম। হজরত আবু জর সূত্রে ইবনে আদীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, অশুভ দৃষ্টির অপপ্রভাব সত্য। আহমদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কুদৃষ্টির কুপ্রভাব সত্য। নিয়তিকে অতিক্রম করতে পারলে কুদৃষ্টিই তা পারতো। সুতরাং কেউ যদি তোমাদেরকে গোসল করতে বলে, তবে তোমরা গোসল কোরো। গোসলের পানি কুদৃষ্টি প্রভাবিতদের উপরে ঢেলে দিলে

www.eelm.weebly.com

উপকৃত হওয়া যায়। হজরত আবু হোরায়রার অপর এক বর্ণনায় এসেছে, কুদৃষ্টির অশুভ প্রভাব যথার্থ। কেননা কুদৃষ্টির উপরে ভর করে শয়তান। সে হিংসা করে আদম সন্তানদেরকে।

হজরত উবায়েদ ইবনে রেফায়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আসমা বিনতে উমাইস একবার রসুল স. এর সুমহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! জাফরের সন্তানদের উপর মানুষ বদ নজর করে। আপনি দয়া করে তা দূর করে দিন। তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। অদৃষ্টলিপিকে অতিক্রম যদি কেউ করতে পারতো, তবে তা করতো বদনজরই। বাগবী। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— কোরআনের বাণী শুনলে পৌত্তলিকেরা হিংসায় জ্বলে যায়। ইচ্ছে করে কোরআন পাঠকারীদের উপর কুদৃষ্টি হেনে ভূতলশায়ী করে দেয়। তা যখন পারে না, তখন বলে, এতো এক উন্মাদ। যেমন প্রবাদে বলা হয়— সে এমনভাবে তাকালো যে, মনে হলো, তোমাকে ভূতলশায়ী করে দিবে। এমতো মনোভাব হচ্ছে শত্রুতার চরম বহিঃপ্রকাশ। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বলতে হয়, তারা হিংসাত্মক মনোভাব প্রকাশ করতো কেবল কোরআন শুনলে। কেননা তারা কোরআনের প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার না করে পারতো না।

শেষোক্ত আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'কোরআন তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ'। বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে তাদের 'এতো এক পাগল' এই অপউক্তির পরিপ্রেক্ষিতে। অর্থাৎ কোরআন যেহেতু বিশ্ববাসীদের জন্য মহান উপদেশ, সেহেতু বিরুদ্ধাচারীরা তো পরাজিত হবেই। অন্ধকার তো আলোর কাছে পরাভূত হয়েই থাকে।

আমার শায়েখ মাযহারে জানে জানাঁ এবং মাওলানা ইয়াকুব কারখী বলেছেন, এখানকার 'হুয়া' সর্বনামটি রসুল স. এর স্থলাভিষিক্তও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমার প্রিয়তম রসুল তো বিশ্বজগতের জন্য জীবন্ত উপদেশ। এখানে 'জিকরুন' অর্থ উপদেশ। শব্দটি একটি শব্দমূল হলেও এখানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে কর্তৃপদের শব্দরূপ 'জাকির' (উপদেশদাতা) অর্থে। যেমন 'জায়িদুন আদলুন' অর্থ 'জায়িদুন আদিলুন' (জায়েদ ন্যায়পরায়ণ)।

হজরত হানজালা বলেছেন, একবার পথিমধ্যে সাক্ষাত পেলাম মান্যবর আবু বকরের। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হানজালা! ভালো আছো? আমি বললাম, হানজালা মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লহ্! এ কেমন কথা! আমি বললাম, যখন রসুলুল্লাহ্‌র সুমহান সাহচর্যে থাকি, শুনি স্বর্গ-নরকের বিবরণ, তখন মনে হয়, আমরা যেনো তা প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু গৃহে ফিরে এলে হয়ে যাই ঘোর সংসারাসক্ত। তিনি বললেন, আরে, আমার অবস্থাও তো সেরকম। আমরা তখন দু'জনে মিলে রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে আমাদের সমস্যার কথা খুলে বললাম। সব শুনে তিনি স. বললেন, যার অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, সেই আনুরূপ্যবিহীন সত্তার শপথ করে বলছি, আমার

www.eelm.weebly.com

সংসর্গে থাকার অবস্থা যদি নিরবচ্ছিন্ন হতো, তবে পথে-ঘাটে-শয়নকক্ষে তোমাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে করমর্দন করতো ফেরেশতারা। শোনো হানজালা! সময় হচ্ছে সময়েরই মতো। তিনি স. একথা উচ্চারণ করলেন পরপর তিনবার।

উপসংহার ঃ আল্লাহ্র ওলীগণের সাহচর্যেও প্রকাশ পায় এরকম বরকত। তাদেরকে দেখলে জাগ্রত হয় আল্লাহ্র স্মরণ। কতিপয় সুপরিণত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর নিকট জানতে চাওয়া হলো, আল্লাহ্র ওলী কারা? তিনি স. বললেন, যাদের দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়। এরকম বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমার প্রিয়ভাজন দাস তারাই, যাদের স্মরণ আমারই স্মরণ এবং আমার স্মরণও তাদের স্মরণ। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত।

হাসান বসরী বলেছেন, কুদৃষ্টি প্রতিকার করতে চাইলে পাঠ করতে হবে এই আয়াত। অর্থাৎ কেউ যদি এই আয়াত পড়ে কুদৃষ্টিপ্রভাবিতকে ফুঁক দেয়, তবে সে লাভ করবে নিরাময়। আল্লাহ্ই সর্ব বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত।

সূরা আল হাক্বক্বহ্

৫২ আয়াত ও ২ রুকুসম্বলিত এই সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কায়।
সূরা হাক্বক্বহ্ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

اَلۡحَآقَّةُ ۝١ مَا الۡحَآقَّةُ ۝٢ وَمَآ اَدۡرٰىكَ مَا الۡحَآقَّةُ ۝٣ كَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ وَ
عَادٌۢ بِالۡقَارِعَةِ ۝٤ فَاَمَّا ثَمُوۡدُ فَاُهۡلِكُوۡا بِالطَّاغِيَةِ ۝٥ وَاَمَّا عَادٌ
فَاُهۡلِكُوۡا بِرِيۡحٍ صَرۡصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝٦ سَخَّرَهَا عَلَيۡهِمۡ سَبۡعَ لَيَالٍ
وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوۡمًا ۙ فَتَرَى الۡقَوۡمَ فِيۡهَا صَرۡعٰى ۙ كَاَنَّهُمۡ
اَعۡجَازُ نَخۡلٍ خَاوِيَةٍ ۝٧ فَهَلۡ تَرٰى لَهُمۡ مِّنۡۢ بَاقِيَةٍ ۝٨

r সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা,

r কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা?

r আর তুমি কি জান সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী?

r 'আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় অস্বীকার করিয়াছিল মহাপ্রলয়।

r আর ছামূদ সম্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা।

r আর 'আদ সম্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ূ দ্বারা,

www.eelm.weebly.com

r যাহা তিনি উহাদের উপর প্রবাহিত করিয়াছিলেন সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে; তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখিতে— উহারা সেথায় লুটাইয়া পড়িয়া আছে সারশূন্য খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়।

r অতঃপর উহাদের কাহাকেও তুমি বিদ্যমান দেখিতে পাও কি?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল হাক্কুক্কুহ্'। এর অর্থ সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। অর্থাৎ সেই কিয়ামত বা মহাপ্রলয় সুনিশ্চিত। তা যে সংঘটিত হবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। অথবা কিয়ামতকে 'হাক্কুক্কুহ্' বলা হয়েছে একারণে যে, সেদিনই উদঘাটিত হবে সকল বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব। যেমন বলা হয় 'হাক্কুক্কুত আ'লাইহিম শাই' (তার উপর বিষয়টি অপরিহার্য হয়েছে)। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'হাক্কুক্কুত কালিমুত আ'জাব' (অপরিহার্য হয়েছে শাস্তির বিষয়টি)। সুতরাং বুঝতে হবে মহাপ্রলয়কে 'আল হাক্কুক্কুহ্' বলা হয়েছে এখানে রূপকার্থে।

এরপরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'মাল হাক্কুক্কুহ্'। এর অর্থ— কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা? এরকম না বলে এখানে 'সেটা কী' এরকম বললেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু কিয়ামতের বিষয়টিতো আর দশটা সাধারণ বিষয়ের মতো নয়। তাই এর যথাগুরুত্ব প্রকাশার্থে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে প্রশ্নবিশিষ্ট নামপদ। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তুমি কি জানো, সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী'? একথার অর্থ— হে আমার নবী! আপনি এবং অন্যান্য পৃথিবীবাসী কি জানে মহাপ্রলয়ের স্বরূপ হবে কী ভয়ংকর? সে ঘটনা তো অতীব ভয়াবহ? ভুক্তভোগী ছাড়া তার গুরুত্ব কি কেউ পরিমাপ করতে পারবে? প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— মহাপ্রলয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করার সাধ্য কারো নেই।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আ'দ ও ছামুদ সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিলো মহাপ্রলয়'। একথার অর্থ— নবী সালেহের স্বজাতি ছামুদ এবং নবী হুদের সম্প্রদায় আ'দ মহাপ্রলয়কে অস্বীকার করে হয়ে গিয়েছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাই পৃথিবীর জীবনেই তাদের উপরে নেমে এসেছিলো সর্বনাশা আযাব। সে আযাবে চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো তারা। এখানে 'মহাপ্রলয়'কে বুঝানো হয়েছে আর একটি সমার্থক শব্দ 'আলকুারিআ'হ' এর মাধ্যমে। এর শাব্দিক অর্থ এমন বিকট বীভৎস আওয়াজসম্বলিত মহাত্রাস, যা কর্ণবিবরকে করে অকার্যকর, সংহার করে সকল জীবনকে। এভাবে এখানকার আলোচিত আয়াতচতুষ্টয়ের মাধ্যমে একথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মহাপ্রলয়কে যে অস্বীকার করে, তার বিনাশ অনিবার্য। ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে সে লাঞ্ছিত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হবেই। কেননা সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'আর ছামুদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা'। বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত আগের

www.eelm.weebly.com

আয়াতের ‘অস্বীকার করেছিলো’ কথাটির সঙ্গে। এখানে ‘ফাউহলিকূ’ (ধ্বংস করা হয়েছিলো) কথাটির ‘ফা’ অব্যয়টি কারণপ্রকাশক। ‘আম্মা’ (আর) বিশ্লেষক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কিয়ামতকে অবিশ্বাস করার কারণে আদ ও ছামুদ জাতিকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিলো। আর আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিলো ‘ত্বগীয়াহ্’ (প্রলয়ংকর বিপর্যয়) দ্বারা। ‘ত্বগীয়াহ্’ অর্থ বিকট-বীভৎস আওয়াজ, মহানাদ। এরকম বলেছেন কাতাদা। অর্থাৎ হজরত জিবরাইল তখন তুলে ছিলেন এক মহানাদ। আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে গিয়েছিলো ছামুদ জাতির সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এরকমও বলা হয়েছে যে, তখন আকাশ থেকে উত্থিত হয়েছিলো প্রলয়ংকারী মহানাদ, ফলে তারা কলিজা ফেটে মরে গিয়েছিলো তৎক্ষণাৎ।

কেউ কেউ বলেছেন ‘ত্বগীয়াহ’ শব্দটি ‘আফিয়াহ’র মতো ধাতুমূল, যা ‘তুগইয়ান’ (উচ্ছৃঙ্খলতা) এর অর্থপ্রকাশক। অর্থাৎ ছামুদ জাতি বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলো চরম উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে। তারা তাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে অমান্য করেছিলো। বধ করেছিলো আল্লাহ্র অপার ক্ষমতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন অলৌকিক উষ্ট্রীকে। এরকমও বলা হয়ে থাকে যে, ‘ত্বগীয়াহ’ শব্দটির ‘তা’ আধিক্যপ্রকাশক। এর মর্মার্থ— চরম বিদ্রোহী। উল্লেখ্য, নবী সালেহের অলৌকিক উষ্ট্রীটির হন্তারকদের প্রধান হোতা ছিলো কাজার ইবনে সালিফ। এক বর্ণনায় এরকমও বলা হয়েছে যে, হন্তারকদের যে দলটি কাজারকে উষ্ট্রীবধের ইন্ধন যুগিয়েছিলো, ওই দলটিই ছিলো সমগ্র ছামুদ জাতি গোষ্ঠীর সমূলে উৎপাটিত হওয়ার উপলক্ষ।

ঘটনাটি ছিলো এরকম— দুরাচার ছামুদ জাতির পথপ্রদর্শনার্থে আল্লাহ্পাক প্রেরণ করলেন নবী সালেহকে। তিনি তাদেরকে সত্য ধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করলো। বললো, তুমি যে নবী, তার প্রমাণ দেখাও। পাথরের ভিতর থেকে বের করে আনো দশমাসের গর্ভবতী একটি উটনী। যদি এরকম করতে পারো, তবেই কেবল আমরা তোমার কথা মানবো। গ্রহণ করবো তোমার ধর্মমত। নবী সালেহ আল্লাহ্ সকাশে প্রার্থনা জানালেন। তাঁর প্রার্থনা গৃহীত হলো। সকলে সবিস্ময়ে দেখলো একটি প্রকাণ্ড পাথরের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো একটি বিরাটাকায় উষ্ট্রী’। তার প্রস্থই ছিলো একশত কুড়ি হাত। একটু পরেই উষ্ট্রীটি প্রসব করলো তার শাবক। নবী সালেহ বললেন, তোমরা আল্লাহ্র এই অলৌকিক নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো। তোমাদের কূপের পানি একদিন পর একদিন পান করতে দিয়ো একে। তোমরাও তোমাদের পশুগুলোকে পান করিয়ো একদিন পর একদিন। কিছুদিন পর্যন্ত তারা এই নিয়মটিকে মান্য করলো। তারপর হয়ে উঠলো অসহিষ্ণু। উষ্ট্রীটি একদিন পর একদিন তাদের কূপের পানি নিঃশেষে পান করে। সেদিন তারা কূপের পাশেও যেতে পারে না। নিয়মটি তারা সহ্যই করতে পারলো না। কয়েকজন মিলে ষড়যন্ত্র করলো উষ্ট্রীটিকে বধ করতে হবে। তাদের এমতো অপকর্মের নেতৃত্ব

www.eelm.weebly.com

দিলো চিরহতভাগা কাজার ইবনে সালিফ। একদিন তারা তাদের ষড়যন্ত্রকে কার্যকর করেই ফেললো। যারপর নাই ব্যথিত হলেন আল্লাহ্‌র নবী সালেহ। বললেন, এবার তাহলে শাস্তিগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও। তিন দিন পরেই তোমাদের উপরে আপতিত হবে সর্বগ্রাসী শাস্তি। প্রথম দিন তোমাদের চেহারা ধারণ করবে হলুদ বর্ণ। দ্বিতীয় দিন হবে লাল এবং তৃতীয় দিন কালো। তা-ই হলো। তিন দিন পর হঠাৎ ধ্বনিত হলো মহানাদ। প্রকম্পিত হলো সমগ্র মেদিনী। সঙ্গে সঙ্গে আপন আপন গৃহে মুখ থুবড়ে পড়ে মরে রইলো তারা। চোখের পলকে জনমানবশূন্য হয়ে গেলো তাদের জনপদ।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'আর আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা'। এখানে 'ফা উহ্‌লিকূ বিরীহিন সরসরিন আ'তীয়াহ' অর্থ তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা। উল্লেখ্য ওই ঝঞ্ঝাবাত্যা ছিলো অত্যুপ্ত, অথবা অতিশীতল— জীবনসংহারক। 'কামুস' অভিধানে বলা হয়েছে 'আতীয়াতুন' শব্দরূপটি কর্তৃকারক। এর অর্থ— প্রচণ্ড, সীমাহীন। আতা শব্দটির অর্থ করেছেন— সদম্ভ, সীমাতীত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌পাক আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন বীভৎস প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাঝড় দ্বারা। এটি একটি পৃথক বাক্য। অথবা 'ঝঞ্ঝা' এখানে বায়ুর বিশেষণ। ওই ঝঞ্ঝাঝড়ের আঘাতেই যে আল্লাহ্‌পাক আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, সে কথা এখানে স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই অপধারণাটিকে নির্মূল করতে যে, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো সাধারণ এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে।

তাদের জনপদের উপরে ওই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাঝড় প্রবাহিত হয়েছিলো সাত রাত আটদিন ধরে, এক বুধবার সকাল থেকে আর এক বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত। আর তা ছিলো শীতকালের ঝড়, যে শীতকালকে আরববাসীগণ বলেন, স্থবির ঋতু, বা বৃদ্ধার সময়। বৃদ্ধার সময় বলার কারণ হচ্ছে, তাদের সম্প্রদায়ের এক বৃদ্ধা তখন ওই ঝড় থেকে আত্মরক্ষার্থে আশ্রয় নিয়েছিলো একটি গুদাম ঘরে। কিন্তু তবুও সে আত্মরক্ষা করতে পারেনি। মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো তার স্বজাতির মতো। পরবর্তী আয়াতে (৭) ওই ঝঞ্ঝাঝড়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এভাবে—

'যা তাদের উপরে প্রবাহিত হয়েছিলো সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে; তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে, তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূন্য খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়'।

এখানে 'হুসূমান' অর্থ বিরামহীন, নিরবচ্ছিন্ন। শব্দটি বহুবচন 'হাসিমুন' এর। যেমন বলা হয় 'হাসামাল ফাইয়া' (ক্ষতস্থানে যুৎ মতো দাগ দাও, যাতে আরোগ্য নিশ্চিত হয়)। অথবা 'হুসূমান' অর্থ অশুভ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফী আইয়্যামিন নাহিসাতিন' (অশুভ দিবসে)। 'হাসামুন' অর্থ মূলোৎপাটন করা। অর্থাৎ ওই দিবসগুলোতে অকুস্থলে কল্যাণকর সকলকিছুর মূলোৎপাটন করা হয়েছিলো। সাত রাত আট দিন ধরে সেখানে আবর্তিত হয়েছিলো কেবল অকল্যাণ

www.eelm.weebly.com

আর অকল্যাণ। কিংবা ‘হুসূমান’ অর্থ এখানে কর্তনকারী। অর্থাৎ ওই অশুভ সময় চিরতরে কর্তন করে দিয়েছিলো তাদের বংশপ্রবাহকে। এরকম বলেছেন জুজায এবং নজর ইবনে শামুয়েল। এরকমও বলা যেতে পারে যে, ‘হুসূমান’ হচ্ছে শব্দমূল এবং এখানে শব্দটি একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্মপদ। এবাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্পাক তখন ঝড়কে প্রচণ্ড ও সর্বনাশা করে দিয়েছিলেন তাদেরকে নির্মূল করণার্থে।

‘তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে’ অর্থ হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি যদি ওই সময় সেখানে উপস্থিত থাকতেন, তবে দেখতেন। ‘ফীহা সরআ’ অর্থ সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে। ‘সরআ’ অর্থ লুটিয়ে পড়া। এর বহুবচন ‘সরীউ’ন’। ‘সরআ’ এখানে কর্মপদের অর্থপ্রদায়ক। এখানে ‘দেখা’ অর্থ যদি আত্মিক দর্শন হয়, তবে ‘তারা’ (দেখতে) ক্রিয়ার দ্বিতীয় কর্মপদ হবে ‘সরআ’। আর যদি তা না হয়, তবে ‘সরআ’ হবে এখানে ‘আল কওম’ (উক্ত সম্প্রদায়কে) কথাটির অবস্থাপ্রকাশক। ‘আ’জ্বায’ অর্থ মূল, কাণ্ড। আর ‘খভিয়াতুন’ অর্থ শূন্য, অন্তসারশূন্য, শূন্যগর্ভ।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর তাদের কাউকে তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি’? প্রশ্নটি স্বীকৃতিসূচক। অর্থাৎ এর মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়েছে একথা স্বীকার করতে যে, ওই দুর্বৃত্তদের কেউ নিশ্চয় তোমার, তোমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

সূরা হাক্কহ্ ঃ আয়াত ৯, ১০, ১১, ১২

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۚ ﴿٩﴾ فَعَصَوْا
رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾ اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ
فِى الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ﴿١٢﴾

r ফির‘আওন, তাহার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টাইয়া দেওয়া জনপদ পাপাচারে লিপ্ত ছিল।

r উহারা উহাদের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করিয়াছিল, ফলে তিনি উহাদিগকে শাস্তি দিলেন— কঠোর শাস্তি।

r যখন জলোচ্ছ্বাস হইয়াছিল তখন আমি তোমাদিগকে আরোহণ করাইয়াছিলাম নৌযানে,

r আমি ইহা করিয়াছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এইজন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরাউন ও তার অনুসারী এবং তাদের পূর্বের নবী লুতের সম্প্রদায়কেও আমি দিয়েছিলাম ভয়ানক শাস্তি। প্রথমোক্তদেরকে

www.eelm.weebly.com

দিয়েছিলাম সলিল সমাধি এবং শেষোক্তদের জনপদ উল্টে দিয়ে করেছিলাম ভূপ্রোথিত। এভাবেই তাদেরকে করেছি নির্মূল। কেননা তারা ছিলো সীমালংঘনকারী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এখানকার 'মুতাফিকাত' শব্দটি সাধিত হয়েছে 'ইফ্কুন' থেকে। এর অর্থ— উলটিয়ে দেওয়া। আর 'পাপাচারে লিপ্ত ছিলো' অর্থ তারা ছিলো ঘোর অংশীবাদী, চরম দুষ্কৃতিকারী, পাপিষ্ঠ, আল্লাহ্দ্রোহী।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'তারা তাদের প্রতিপালকের রসুলকে অমান্য করেছিলো, ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিলেন, কঠোর শাস্তি'। একথার অর্থ— ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় যেমন অস্বীকার করেছিলো নবী মুসাকে, তেমনি তাদের পূর্ববর্তী অবাধ্য সম্প্রদায়গুলোও অমান্য করেছিলো তাদের নিজ নিজ নবীগণকে। ফলে তারা সকলেই হয়েছিলো আমার কঠোর শাস্তির শিকার। বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলো সমূলে। বাক্যটি বিশ্লেষণাত্মক এবং এর সম্পর্ক রয়েছে আগের আয়াতের 'তার পূর্ববর্তীরা' কথাটির সঙ্গে।

এখানকার 'ফাআখাজাহুম' (ফলে তাদেরকে শাস্তি দিলেন) কথাটির 'ফা' (ফলে, অতঃপর) অব্যয়টি হেতুবাচক। আর 'আখজাতান' হচ্ছে সাধারণ কর্মপদ এবং অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ উল্লেখিত পাপাচারের কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে এমন কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন, যার চেয়ে কঠোর শাস্তি আর হয় না।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিলো, তখন আমি তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে'। একথার অর্থ— ওই কঠোর শাস্তিসমূহের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে নবী নুহের অবাধ্য সম্প্রদায়ের প্লাবন সমাধি। সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত হয়েছিলো ওই ভয়ংকর মহাপ্লাবনে। হে সমসময়ের মানুষ! তখন কিন্তু তোমাদের মহান পিতৃপুরুষ নবী নুহকে আমি ঠিকই রক্ষা করেছিলাম। তাঁকে ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরবর্গকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌকায়।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য'। একথার অর্থ— ওই মহাপ্লাবনে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে বিনাশ করে এবং আমার সত্যাধিষ্ঠিত নবী ও তাঁর বিশ্বাসী সহচরবর্গকে উদ্ধার করে আমি তোমাদের জন্য এই শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তটি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি যে, তোমরা যেনো বুঝতে পারো আমি যেমন সংহারকারী, তেমনি দয়াময়ও। অর্থাৎ অবাধ্যদের বিনাশ সাধনের মাধ্যমে যেমন প্রকাশ পায় আমার অতুলনীয় পরাক্রম, তেমনি পরিত্রাণদানের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় সীমাহীন দয়া।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং এজন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ তা সংরক্ষণ করে'। একথার অর্থ— তোমরা ওই ইতিবৃত্ত শুনবে, ইতিহাস রচনা করে সমৃদ্ধ করবে স্মৃতির ভাণ্ডার, করবে স্মৃতিচারণ, এভাবে ওই ঘটনার আলোকে সংশোধন করবে তোমাদের জীবনযাপন, এটাও ছিলো আমার এমতো ঘটনা ঘটানোর আর একটি উদ্দেশ্য। আর এখানকার 'ওয়াই'ইয়াতুন' (সংরক্ষণ করে) কথাটিতে ব্যবহৃত 'তানভীন'

www.eelm.weebly.com

নির্দিষ্টবাচক ও ন্যূনতাপ্রকাশক। কেননা যারা শিক্ষণীয় ঘটনা স্মৃতিস্থ রাখে, তারা প্রজ্ঞাবান। আর প্রজ্ঞাবানগণের সংখ্যা স্বল্পই হয়। তাঁরাই উপলক্ষ হন সাধারণ জনতার পরিত্রাণের ও জ্ঞানপরম্পরার। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হৃদয় হচ্ছে স্মৃতির ভাণ্ডার। আর সর্বোত্তম হৃদয় সেটাই, যা সংরক্ষণ করে সর্বাধিক স্মৃতি।

সূরা হাক্কাহ্ ঃ আয়াত ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَانْشَقَّتِ
السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَ
يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا
تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ
هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي
عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا
وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

q যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে— একটি মাত্র ফুৎকার,

q পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হইবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় উহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

q সেদিন সংঘটিত হইবে মহাপ্রলয়,

q এবং আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে আর সেই দিন উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে।

q ফিরিশ্‌তাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকিবে এবং সেই দিন আটজন ফিরিশ্‌তা তোমার প্রতিপালকের 'আর্‌শকে ধারণ করিবে তাহাদের ঊর্ধ্বে।

q সেই দিন উপস্থিত করা হইবে তোমাদিগকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকিবে না।

www.eelm.weebly.com

q তখন যাহাকে তাহার 'আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, 'লও, আমার 'আমলনামা, পড়িয়া দেখ;

q 'আমি জানিতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে।'

q সুতরাং সে যাপন করিবে সন্তোষজনক জীবন;

q সুউচ্চ জান্নাতে

q যাহার ফলরাশি অবনমিত থাকিবে নাগালের মধ্যে।

q তাহাদিগকে বলা হইবে,'পানাহার কর তৃপ্তির সহিত, তোমরা অতীত দিনে যাহা করিয়াছিলে তাহার বিনিময়ে।'

মহাপ্রলয় যে অতীব ভয়াবহ এবং তা অস্বীকারকারীদের পরিণতি যে অতীব মন্দ, সে সম্পর্কে এতক্ষণ ধরে ধারণা দেওয়ার পর এখান থেকে শুরু করা হয়েছে তার সবিস্তার বিবরণ। প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফা ইজা নুফিখা ফিস্ সূর'। এর অর্থ— যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, 'সূর' হচ্ছে একটি শিঙ। ওই শিঙের মধ্যেই ফুৎকার দেওয়া হবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'একটি মাত্র ফুৎকার'। কথাটির মাধ্যমে এখানে বলা হয়েছে ওই ফুৎকারধ্বনির কথা, যা শুনলে মানুষসহ সকল প্রাণী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। ফুৎকার ধ্বনিত হবে আরো একবার, অথবা দুইবার— এ সম্পর্কে বিদ্বজ্জনের মধ্যে রয়েছে মতানৈক্য। কেউ কেউ বলেছেন, শিঙ্গায় ফুৎকার ধ্বনিত হবে মোট তিনবার— ১. ত্রাসের ফুৎকার, যা শুনলে সন্ত্রস্ত হবে সকলে ২. সংজ্ঞাবিলোপক ফুৎকার, যা শুনলে সকলে হয়ে যাবে বেহুঁশ। ৩. পুনরুত্থানের ফুৎকার। এই ফুৎকার শুনেই পুনরুজ্জীবিত হবে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী।

ত্রাসসঞ্চারক ফুৎকার সম্পর্কে বলা হয়েছে 'আর সেদিন ফুৎকার দেওয়া হবে শিঙ্গায়, তখন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে নভোবাসী ও পৃথিবীবাসীরা'। সংজ্ঞাবিলোপক ফুৎকার সম্পর্কে বলা হয়েছে 'আর ফুৎকার দেওয়া হবে শিঙ্গাতে, ফলে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসী'। আর পুনরুত্থানের শিঙ্গাধ্বনি সম্পর্কে বলা হয়েছে 'অতঃপর তাতে ফুৎকার দেওয়া হবে পুনর্বার, অকস্মাৎ তারা পুনরুত্থিত হয়ে দেখতে থাকবে পরস্পরকে'। শায়েখ ইবনে আরাবী এরকম ব্যাখ্যার প্রবক্তা। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে বলা হয়েছে, শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তিনবার। প্রথম ফুৎকার হবে বিভীষিকাসঞ্চারক, দ্বিতীয় ফুৎকারের ফলে সকলে হারিয়ে ফেলবে সংজ্ঞা এবং তৃতীয় ফুৎকার শুনে ঘটবে সকলের পুনরুত্থান। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে, তিবরানী তাঁর 'মুতাওয়ালে', আবু ইয়ালী তাঁর 'মসনদে' এবং বায়হাকী তাঁর 'আল বা'ছ' নামক পুস্তকে।

কেউ কেউ বলেছেন, শিঙ্গার ফুৎকার ধ্বনিত হবে দু'বার— মহামরণের এবং মহাপুনরুত্থানের। অর্থাৎ ত্রাসোদ্দীপক ফুৎকারধ্বনির ফলেই সংজ্ঞাহীন হবে সকলে। হারিয়ে ফেলবে জীবন। পরবর্তীতে জীবন ফিরে পাবে আর একবার

www.eelm.weebly.com

শিঙ্গাধ্বনি উত্থিত হলে। এমতো অভিমতের প্রবক্তা ইমাম কুরতুবী। তিনি তাঁর অভিমত প্রমাণার্থে বলেন, ত্রাসসঞ্চারক ফুৎকার সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে— তখন সকলে হয়ে পড়বে সংজ্ঞাহীন, কিছুসংখ্যককে আল্লাহ্ রক্ষা করবেন সংজ্ঞাহীন হওয়া থেকে, যাদেরকে তিনি ইচ্ছা করবেন। সুতরাং বুঝতে হবে ত্রাস-সঞ্চারক ও সংজ্ঞাহারক ফুৎকার হচ্ছে একটিই ফুৎকার। আবার অধিকাংশ হাদিসে দু'টি ফুৎকারের কথাই এসেছে। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, দুই ফুৎকারের মধ্যকার ব্যবধান হবে চল্লিশ বৎসর। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত তিন ফুৎকারের বিবরণবিশিষ্ট হাদিসটির সূত্রগত বিশুদ্ধতা সর্ববাদীসম্মত নয়। শায়েখ ইবনে আরাবী এবং কুরতুবীর নিকটে ওই হাদিসটি যথাসূত্র-সম্বলিতরূপে গৃহীত হলেও বায়হাকী এবং শায়েখ আবদুল হকের নিকটে অ-দৃঢ়। কেননা হাদিসটি বিবৃত হয়েছে মদীনার এক বিচারক ইসমাইল ইবনে রাফেয়ের মাধ্যমে। আর ইসমাইল বর্ণনাকারী হিসেবে বিতর্কিত। আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, হাদিসটির বর্ণনাভঙ্গি সুসঙ্গত নয়। কেউ কেউ বলেছেন, হাদিসটি এসেছে বিভিন্ন সূত্রপরম্পরা থেকে বিভিন্ন জনের মাধ্যমে।

'যখন শিঙ্গার ফুৎকার দেওয়া হবে' বলে এখানে কোনো সংকীর্ণ কালকে নির্দেশ করা হয়নি। বরং এর কাল পরিসর সুবিস্তৃত। অবশ্য কিয়ামত শুরু হবে প্রথম ফুৎকার থেকে এবং সমাপ্ত হবে তখন, যখন মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারপর্বের শেষে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীরা চলে যাবে তাদের নিজ নিজ ঠিকানায়। অর্থাৎ কিয়ামতের পরিসর সুবিস্তীর্ণ। তাই কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে বলা হয়েছে কিয়ামতের কথা। যেমন 'আল হাক্কা' (অবশ্যম্ভাবী ঘটনা) 'আল ক্বারিআ'হ্' (মহাবিনাশপর্ব) 'আলক্বিয়ামাহ' (মহাপ্রলয়)।

জিয়াদ ইবনে মিখরাক বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক মুক্তকৃত দাস ইকরামাকে একবার শাসক হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলো, পরকালের দিবস কি পৃথিবীর দিবসের মতো, না তার চেয়ে দীর্ঘ? তিনি বললেন, তখনকার দিবস শুরু হবে পৃথিবীর দিবসের মতোই। কিন্তু শেষ হবে পারলৌকিক দিবসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে কিয়ামতের সূচনাপর্বের কথা। আর এর শেষ পর্বের বিবরণ দেওয়া হয়েছে 'ফাহুয়া ফী ই'শাতির রদ্বিয়্যা' আয়াতে। এর মধ্যেই একে একে ঘটতে থাকবে মহাবিনাশকাণ্ড, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচার, আমলনামা প্রদান, পাপ-পুণ্যের ওজন, পুলসিরাত অতিক্রমণসহ এ সম্পর্কিত সকল ঘটনা।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে'।

এখানে 'দাক্কান' অর্থ চূর্ণন, নিষ্পেষণ। জাওহারী বলেছেন, এর আসল মানে— ভেঙে চুরে চুরমার করা। জাওহারীর বরাত দিয়ে বাগবী লিখেছেন, 'দাককুন' অর্থ কর্দমাক্ত ভূমি। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন 'ওয়া দাককাতিল জ্বিবাল' (আর শৈলশ্রেণী হবে কর্দমাক্ত ভূমির মতো)। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ তখন হয়ে যাবে

www.eelm.weebly.com

কর্দমাক্ত ভূমির মতো একাকার, সমান, উঁচু-নিচু বলে কিছু থাকবেই না। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত উবাই ইবনে কাব বর্ণনা করেছেন, তখন গিরিশ্রেণী ও ভূপৃষ্ঠ হবে গোধুলি সদৃশ। অবিশ্বাসীদের সর্বাঙ্গ হবে ধূলি-মলিন। কিন্তু বিশ্বাসীদের অবয়ব থাকবে পরিচ্ছন্ন। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা রয়েছে কেবল শর্তের। কিন্তু এর পরিণতি এখানে রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকা এবং মৃত্তিকাস্থিত পাহাড় পর্বতসমূহকে উঠিয়ে নিয়ে করা হবে চৌচির, চুরমার। মহাবিনাশ কাণ্ড শুরু হবে এভাবেই।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়'। একথার অর্থ— যে মহাবিনাশপর্বের কথা যুগ যুগ ধরে মহামানবতার শ্রুতিকে সচকিত করেছে, বিশুদ্ধচিত্তদেরকে করেছে উদ্বেল, সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা সংঘটিত হবে তখনই।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, আর সেদিন তা বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে'। এখানে 'ওয়াহ্ইয়ুন' অর্থ বিশ্লিষ্ট, বিপন্ন, শিথিল। ফাররা বলেছেন, আকাশ তখন ফেটে যাবে বলেই হারিয়ে ফেলবে তার অটুটতার দৃঢ়তা।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন ফেরেশতা তোমার প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের ঊর্ধ্বে। এখানে 'তোমার প্রতিপালকের আরশ' বলে আরশকে করা হয়েছে সম্মানিত। তার এই সম্মানপ্রাপ্তির কারণ হচ্ছে, সারাক্ষণ তার উপরে পতিত হতে থাকে আল্লাহ্‌র অবর্ণনীয় জ্যোতির সম্পাত।

আরশবাহী ফেরেশতাগণের সংখ্যা আট। তাঁরা মহাসম্মানিত। আবু দাউদ ও তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব বলেছেন, একবার আমরা কয়েকজন রসুল স. এর সঙ্গে বুতহা নামক স্থানে উপবিষ্ট ছিলাম। আকাশে ভেসে যাচ্ছিলো একটি মেঘখণ্ড। তিনি স. সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, বলো দেখি, ওটা কী? আমরা বললাম 'সাহাব'। তিনি স. বললেন, বলো 'মুযন'ও। আমরা বললাম, হ্যাঁ, 'মুযন'ও। তিনি স. পুনরায় বললেন, বলো, 'ইনান'ও। রসুল স. এরপর বললেন, তোমরা কি জানো, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যেকার ব্যবধান কতো? আমরা বললাম, না। তিনি স. বললেন, ওদু'টোর মধ্যকার ব্যবধান একাত্তর, বায়াত্তর অথবা তিয়াত্তর বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। এরপর তিনি স. একে একে বললেন সাত আকাশের কথা। বললেন, ওগুলোর প্রত্যেকের একটি থেকে অপরটির দূরত্ব একই রকম। শেষে বললেন, সপ্তম আকাশের উপরে রয়েছে একটি মহাসাগর। ওই মহাসাগরের গভীরতাও দুই আকাশের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তার উপরে রয়েছে একটি প্রকাণ্ডকায় পার্বত্য ছাগল। তার পায়ের ক্ষুর থেকে কটিদেশের দূরত্বও দুই আকাশের মধ্যবর্তী

www.eelm.weebly.com

দূরত্বের সমান। তার উপরেই রয়েছে আল্লাহ্‌র আরশ। আরশের উচ্চতাও দুই আকাশের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। আর মহামহিম আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন অবস্থিতি সর্বোপরি। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় পৃথিবী থেকে প্রথম আকাশ, এক আকাশ থেকে আর এক আকাশ, মহাসাগর ও আরশের উচ্চতা ইত্যাদির ব্যবধান উল্লেখিত হয়েছে— পাঁচ শত বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। গতির ন্যূনতা ও আধিক্যই সম্ভবত এমতো বর্ণনাবৈষম্যের কারণ। সুতরাং বলা যায়, দু'টো বর্ণনাই স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সঠিক।

বাগবী লিখেছেন, হাদিস শরীফে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে আল্লাহ্‌র আরশ ধরে আছেন চার জন ফেরেশতা। তাদের এক জনের আকৃতি মানুষের মতো এবং অপর তিন জনের আকৃতি নেকড়ে, বলদ ও গর্দভের মতো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহাপ্রলয় দিবসে আরশ বহনকারী ফেরেশতার সংখ্যা হবে আট। অর্থাৎ ফেরেশতাদের আটটি বৃহৎ দল তখন আরশ বহনকারী হবে। আল্লাহ্‌ই জানেন, তাদের সংখ্যা কতো।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না। একথার অর্থ— হে মনুষ্যমণ্ডলী! মহাপুনরুত্থানের পর কৃতকর্মের বিচারার্থে হাশর প্রান্তরে উপস্থিত করা হবে তোমাদের সকলকে। তখন তোমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পুণ্য ও পাপ কোনোকিছুই তোমরা চাইলেও গোপন থাকবে না।

রসুল স. বলেছেন, প্রতিফল দিবসে মানুষকে হতে হবে তিনটি সাক্ষাতকারের সম্মুখীন। দু'টি সাক্ষাতকার হবে বাদানুবাদ ও অজুহাতের এবং তৃতীয়টি হবে আমলনামা প্রাপ্তির। কেউ আমলনামা পাবে ডান হাতে এবং কেউ বাম হাতে। হাকেম ও তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, সাক্ষাতকার তিনটি হবে তিনটি পৃথক পরিবেশে। প্রথম সাক্ষাতকার হবে আল্লাহ্‌র শত্রুদের সঙ্গে। তারা আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে না। তাই তারা মনে করবে, বাদানুবাদ করলে বোধ হয় পরিত্রাণের কোনো উপায় পাওয়া যাবে। বাদানুবাদে তারা লিপ্ত হবে একারণেই। দ্বিতীয় সাক্ষাতকার হবে অবাধ্যদের উপস্থিতিতে। তারা উপস্থাপন করবে বিভিন্ন রকমের অজুহাত। আল্লাহ্‌ তখন হজরত আদম ও অন্যান্য নবী-রসুলগণের দ্বারা তাদের অজুহাত খণ্ডন করাবেন। শেষে তাদের সকলকে প্রেরণ করবেন জাহান্নামে। তৃতীয় সাক্ষাতকার অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বাসীগণের সমাবেশে। আল্লাহ্‌ তাদেরকে এমনভাবে শাসাবেন যে, তারা হয়ে যাবে লজ্জাবনত ও অনুতপ্ত। শেষে তিনি তাদেরকে দান করবেন মার্জনা ও তুষ্টি।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তখন যাকে তার আমলনামা তার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হবে, সে বলবে, নাও, এই হচ্ছে আমার আমলনামা, পড়ে দ্যাখো'। এখানে বলা হয়েছে তৃতীয় সাক্ষাতকারের সম্মুখীন যারা হবে তাদের

www.eelm.weebly.com

কথা। এখানকার 'হাউম্' অর্থ লও, নিয়ে নাও, ধরো। শব্দটি ক্রিয়ার অর্থ বিশিষ্ট নামপদ। একবচন বহুবচন পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ সকলক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয় একইরূপে। এর কর্মপদ বর্তমানে লুপ্ত।

'কিতাবিয়াহ্' অর্থ আমলনামা। 'কিতাবিয়াহ্' 'মালিয়াহ' 'সুলতানিয়াহ্' শব্দগুলোর অন্তক্ষরে রয়েছে অপরিণত ছন্দপতনসূচক স্বরভঙ্গি 'হা'। স্বরভঙ্গিটি উচ্চারিত হয় যতিপাত ঘটলে। আর মিলিত পাঠে স্বরভঙ্গিটি হয় অপসৃত। আলোচ্য আয়াতে বাক্যের শেষে ঘটেছে যতিপাত। তাই এখানে শেষ শব্দটি উচ্চারিত হবে 'কিতাবিয়াহ্'রূপে। এখানে 'কিতাবিয়াহ্' হচ্ছে 'ইক্বরাউ' (পড়ে দ্যাখো) কথাটির কর্মপদ। আর 'হাউমু' এর কর্মপদ এখানে রয়েছে উহ্য। যেহেতু 'কিতাবিয়াহ্' এর অব্যবহিত পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে 'ইক্বরাউ'।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে'। একথার অর্থ— এ বিষয়ে আমার সুদৃঢ় প্রতীতি ছিলো যে, পরকালে আমাকে আমার কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবেই। মর্মার্থ— আমি জানতাম, পরকালে কৃতকর্মের জবাবদিহি অনিবার্য। আর তখন পরিত্রাণের উপযোগী হওয়া যাবে কেবল পুণ্যকর্মশীল হলে। তাই আমি আমার জীবনকে করেছিলাম পুণ্যকর্মশোভিত। সেকারণেই আজ আমার ডান হাতে আমলনামা পেয়ে হলাম চিরসৌভাগ্যাধিকারী। উল্লেখ্য, যিনি মহাপ্রভুপালয়িতা, তাঁর সম্মুখে নিজের শুভ কৃতকর্মের উল্লেখ করার অর্থ স্বকৃতিত্ব প্রকাশ করা, যা বিনয়নম্রতা ও বিশ্বাসী হওয়ার বৈশিষ্ট্য-বিরোধী। তাই এখানে কর্মের উল্লেখ প্রচ্ছন্ন রেখে বলা হয়েছে কেবল বিশ্বাসের কথা। যেনো বলা হয়েছে— হে আমার প্রভুপালক! এরকম যে ঘটবে তা আমি জানতাম, বিশ্বাস করতাম। পুণ্যকর্মসমূহ সম্পাদন করতাম সেকারণেই। বায়যাবী লিখেছেন, গবেষণালব্ধ জ্ঞান নিঃসন্দিগ্ধ নয়। প্রকৃত অবস্থাকে ধারণার প্রলেপ দিয়ে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে সেকারণেই। এতে করে একথাটিও প্রমাণিত হয়েছে যে, এভাবে বিশ্বাসকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করা দূষণীয় কিছু নয়, যদিও বিশ্বাসও গবেষণালব্ধ।

আবু ওসমান নাহদীর বরাতে ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্পাক বিশ্বাসীদের হাতে তাদের আমলনামা দিবেন সবার অলক্ষ্যে। তারা তাদের আমলনামার পাপগুলো দেখে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যাবে। স্বস্তি ফিরে পাবে তখন, যখন দেখবে পুণ্যকর্মাবলীর বিবরণ। পুনরায় পাপগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখবে, সেগুলো রূপান্তরিত হয়েছে পুণ্যে। তখনই তারা সোৎসাহে বলে উঠবে, এই ধরো আমলনামা। দ্যাখো, পড়ে দ্যাখো।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন (২১); সুউচ্চ জান্নাতে (২২) যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে' (২৩)।

www.eelm.weebly.com

‘ফাহুয়া ফী ঈ’শাতির রদ্বীয়াহ’ অর্থ সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন। ‘রদ্বীয়াহ’ অর্থ সন্তোষজনক, আনন্দময়। শব্দটি কর্তৃবাচক হলেও এখানে শব্দটি হবে কর্মবাচক অর্থপ্রকাশক। অর্থাৎ প্রথমোক্ত আয়াত এর অর্থ ‘আনন্দদানকারী জীবন’ না হয়ে হবে ‘আনন্দময় জীবন’ বা ‘সন্তোষজনক জীবন’। বায়যাবী অবশ্য অর্থ করেছেন কর্তৃবাচক হিসেবেই। জীবনের সঙ্গে আনন্দের বিশেষণটি এখানে সম্পৃক্ত হয়েছে রূপকার্থে।

‘ফী জ্বান্নাতিন আ’লীয়াহ্’ অর্থ সুউচ্চ জান্নাতে। অর্থাৎ চির আনন্দময় ওই জীবন যাপিত হবে চিরউন্নত কাননে, আল্লাহ্র সান্নিধ্যস্নাত মহামর্যাদাসম্পন্ন উদ্যানে। অথবা বলা যেতে পারে স্থানগত দিক থেকেও জান্নাত সর্বোন্নত। কেননা জান্নাত রয়েছে সপ্ত আকাশেরও উপরে। কিংবা সুদীর্ঘ তরুরাজি পরিশোভিত বলেই এখানে জান্নাতকে বলা হয়েছে সুউচ্চ।

‘কুতুফুহা দানিয়াহ্’ অর্থ যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। অর্থাৎ জান্নাতের বৃক্ষরাজি অতি দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর ফলগুচ্ছ থাকবে জান্নাতবাসীদের নাগালের মধ্যে। তাই তারা সেখানে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে যেকোনো অবস্থায় যখন ইচ্ছা তখন আহরণ করতে পারবে ফল।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— ‘তাদেরকে বলা হবে, পানাহার করো তৃপ্তির সঙ্গে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে, তার বিনিময়ে’। বাক্যটির পূর্বে উহ্য রয়েছে আর একটি বাক্য। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের পৃথিবীর জীবনের সুকীর্তির বদৌলতে এখানে করা হয়েছে পানাহারের এই প্রতুল আয়োজন। সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্তে ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে এখানে সম্পন্ন করতে থাকো পানাহার। লক্ষণীয়, এখানে বলা হয়েছে ‘কুলূ ওয়াশ্‌রাবূ’ (তোমরা পানাহার করো)। অথচ ২১ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে ‘সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন’। একবচন ও বহুবচনের এই অসঙ্গতি দূর করণার্থে বলা যেতে পারে, ‘হুয়া’ (সে) সর্বনামটি কখনো কখনো ‘তারা’ অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে কোনো অসঙ্গতি আসলে নেই। এমতাবস্থায় আলোচ্য বাক্যটি হবে ২১ সংখ্যক আয়াতের ‘হুয়া’ উদ্দেশ্যের দ্বিতীয় বিধেয়। অথবা বলা যেতে পারে আলোচ্য বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য।

‘অতীত দিনে যা করে ছিলে তার বিনিময়ে’ অর্থ তোমরা পৃথিবীতে যেসকল সুকর্ম করেছিলে, তার পারিতোষিক হিসেবে। ‘আইয়ামিল খলিয়াহ্’ অর্থ অতীত দিনে। পৃথিবীর জীবন একসময় অতীত হয়েই থাকে। পৃথিবীর সময়কে এখানে অতীত দিন বলা হয়েছে সে কারণেই। ‘খলী’ বলে ওই স্থান ও কালকে, যা শূন্য হলে আর পূর্ণ হয় না। পৃথিবীবাসীরাও তেমনি, একবার মৃত্যুবরণ করলে আর কখনো পৃথিবীতে ফিরে আসে না। তাই তাদের পৃথিবীর সবকিছুই হয়ে যায় অতীত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘ক্বদ্ খলাত মিন ক্ববলিহির রসুল (তাঁর পূর্বে অতীত হয়েছেন অনেক রসুল)।

www.eelm.weebly.com

وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَیَقُوْلُ یٰلَیْتَنِیْ لَمْ اُوْتَ
كِتٰبِیَهْ ۚ﴿۲۵﴾ وَ لَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ ۚ﴿۲۶﴾ یٰلَیْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِیَةَ ۚ﴿۲۷﴾
مَاۤ اَغْنٰی عَنِّیْ مَالِیَهْ ۚ﴿۲۸﴾ هَلَكَ عَنِّیْ سُلْطٰنِیَهْ ۚ﴿۲۹﴾ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۙ﴿۳۰﴾ ثُمَّ
الْجَحِیْمَ صَلُّوْهُ ۙ﴿۳۱﴾ ثُمَّ فِیْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا
فَاسْلُكُوْهُ ۚ﴿۳۲﴾ اِنَّهٗ كَانَ لَا یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِیْمِ ۙ﴿۳۳﴾ وَ لَا یَحُضُّ
عَلٰی طَعَامِ الْمِسْكِیْنِ ۚ﴿۳۴﴾ فَلَیْسَ لَهُ الْیَوْمَ هٰهُنَا حَمِیْمٌ ۙ﴿۳۵﴾ وَّ
لَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِیْنٍ ۙ﴿۳۶﴾ لَّا یَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِـُٔوْنَ ﴿۳۷﴾

q কিন্তু যাহার 'আমলনামা তাহার বাম হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, 'হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হইত আমার 'আমলনামা,

q 'এবং আমি যদি না জানিতাম আমার হিসাব!

q 'হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হইত!

q 'আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসিল না।

q 'আমার ক্ষমতাও বিনষ্ট হইয়াছে।'

q ফিরিশ্‌তাদিগকে বলা হইবে, 'ধর উহাকে, উহার গলদেশে বেড়ি পরাইয়া দাও।

q 'অতঃপর উহাকে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে।

q 'পুনরায় তাহাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর হস্ত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে',

q সে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী ছিল না,

q এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করিত না,

q অতএব এই দিন সেথায় তাহার কোন সুহৃদ থাকিবে না,

q এবং কোন খাদ্য থাকিবে না ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত,

q যাহা অপরাধী ব্যতীত কেহ খাইবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যাদেরকে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তারা মনের দুঃখে বলতে থাকবে, হায়! আমাদেরকে আমলনামা যদি দেওয়াই না হতো। বায়হাকী বলেছেন, তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বাম হাত পিঠের পশ্চাতে নিয়ে তাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে তাদের আমলনামা। ইবনে সায়েব বলেছেন, তাদের বাম হাত মুচড়ে পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর ওই

www.eelm.weebly.com

হাতে গুঁজে দেওয়া হবে তাদের অপকর্মসমূহের বিবরণলিপি। এরকমও বলা হয়েছে যে, তখন তাদের বাম হাত তাদের বক্ষ ভেদ করে পিঠের পশ্চাতে বের করে তাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে তাদেরই কৃতকর্মের বিবরণী।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব'। একথার অর্থ— শাস্তি সুনিশ্চিত, একথা বুঝতে পেরে সে তখন তার সতীর্থদেরকে লক্ষ্য করে আরো বলবে, হে আমার স্বজাতি! একি হলো! কতোই না ভালো হতো, যদি আমি আমার এই হিসাব সম্পর্কে জানতে না পারতাম। এখানে 'মা হিসাবিয়াহ্' প্রশ্নবোধক এবং 'লাম আদরি' (না জানতাম) এর কর্মপদ।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো'। একথার অর্থ— সে আরো বলবে, হায়! হায়! শিঙ্গার ফুৎকার শুনে মৃত্যুকবলিত হওয়ার পর আমি যদি আর জীবন্ত না হতাম। ওই মৃত্যুই যদি হতো আমার শেষ পরিণতি! কাতাদা বলেছেন, পৃথিবীতে মৃত্যুই ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সর্বাধিক অস্বস্তিকর বিষয়। আর পরজগতে মৃত্যুই হবে তাদের কাম্য। আরো কাম্য হবে, আমলনামা না পাওয়া, হিসাবের সম্মুখীন না হওয়া, পুনর্জীবনপ্রাপ্ত না হওয়া।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমার ধন সম্পদ আমার কোনো কাজে এলো না (২৮)। আমার ক্ষমতাও বিনষ্ট হয়েছে' (২৯)। এখানে 'মা আগনা আ'ন্নী' (আমার কোনো কাজে এলো না) কথাটির 'মা' না-সূচক। অথবা অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কই, আমার ধন-সম্পদ এখন কি আমার কোনো কাজে লাগলো? আমার কর্তৃত্ব-প্রতাপ জনবল— সবকিছুই তো এখন অবলুপ্ত। আমি তো এখন সম্পূর্ণরূপে অসহায়।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, ধরো তাকে, তার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও (৩০) অতঃপর তাকে নিক্ষেপ করো জাহান্নামে (৩১) পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত করো সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে' (৩২)।

'ফেরেশতাদেরকে বলা হবে' কথাটি এখানে অনুক্ত। অর্থাৎ তখন এমতো নির্দেশ দেওয়া হবে জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে। 'আল জাহীম' এখানে কর্মপদ, বসেছে 'সল্লূহু' (নিক্ষেপ করো) ক্রিয়াপদের পূর্বে। এভাবে তাদের গন্তব্যকে করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট। আর সে গন্তব্যস্থল হচ্ছে জাহান্নাম। 'আলজাহীম' অর্থ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড, জাহান্নাম। আর 'ছুম্মা (অতঃপর) শব্দটি পুনঃপুনঃ উল্লেখিত হওয়ার কারণে এখানে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকবে তাদের দুর্ভোগ। যেমন প্রথমে তাদের গলদেশে বেড়ি পরানো হবে, তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তারপর বেঁধে ফেলা হবে সত্তর হাত দীর্ঘ এক 'শিকলে' আর 'ফাস্লুকূহু' কথাটির 'ফা' এখানে অলংকারিক, তাই অতিরিক্ত। অব্যয়টি এখানে যোজক নয়। অন্যথায় 'ছুম্মা' ও 'ফা' অব্যয় দু'টো হয়ে যাবে একাকার।

www.eelm.weebly.com

আউফী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পশ্চাদ্দেশের ভিতর দিয়ে লৌহশিকল প্রবেশ করিয়ে তা বের করা হবে তাদের নাকের ছিদ্র দিয়ে। আবার ইবনে জারীর সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শিকল প্রবেশ করানো হবে তাদের নিতম্বের ভিতর দিয়ে এবং তা বের করা হবে মুখ-গহ্বর দিয়ে, যেভাবে কাঠিতে গেঁথে ফেলা হয় কোনো টিড্ডিকে। তারপর ওই টিড্ডিকে যেমন আগুনে ভুনা করা হয়, তেমনি তাদেরকেও ঝলসানো হবে জাহান্নামের আগুনে।

নাওফ বুকায়ী শামী বলেছেন, ওই শিকলের দৈর্ঘ্য হবে সত্তর জেরা। প্রতিটি জেরা সত্তর হাতবিশিষ্ট এবং প্রতি হাত হবে কুফা থেকে মক্কা শরীফের দূরত্বের সমান। হান্নাদ ও ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, সুফিয়ান বলেছেন, একটি জেরা গঠিত হবে সত্তরটি জেরার সমন্বয়ে। হাসান বসরী বলেছেন, আল্লাহ্ই জানেন, ওই জেরা কোন জেরা। আমি বলি, ওই জেরা হবে নরকের দ্বাররক্ষীদের জেরা বা বিঘত। অথবা নারকীদের হাতের বিঘত। আর হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, তাদের দেহাকৃতি হবে উহুদ পাহাড় সদৃশ বিশাল। আর তাদের গাত্রত্বকের ঘনত্ব হবে তিন দিনের পথের দূরত্বের সমান। সুপরিণতসূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে। হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ তিরমিজি ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক 'উত্তম' আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার তার মাথার তালুর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, নরকের ওই শিকলের এতটুকু একটি বালা পৃথিবীর দিকে নিক্ষেপ করা হলে পৃথিবীতে তা পৌঁছবে রাত শেষ হওয়ার আগে, যদিও আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবধান পাঁচশত বৎসরের রাস্তা। কিন্তু ওই বালা যদি নরকের শিকলের এক প্রান্তে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা অনবরত পতিত হতে হতে নরকের তলদেশে পৌঁছবে চল্লিশ বৎসরে। ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, কা'ব বলেছেন, ওই শিকলের একটি বালাতে রয়েছে এই জগতের সকল লোহা। মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদিরের বরাত দিয়ে আবু নাঈম লিখেছেন, পৃথিবীর সমূদয় লোহা একত্রিত করলেও নরকের লৌহশৃঙ্খলের একটি কড়ার সমান হবে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সে মহান আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ছিলো না (৩৩), এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করতো না'(৩৪)। এখানে 'বিল্লাহিল আ'জীম' অর্থ মহান আল্লাহ্। কথাটির মাধ্যমে এখানে এটাই প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত মহিমা মহত্ব কেবলই তাঁর। সুতরাং কেউ যদি অন্য কাউকে অথবা কোনোকিছুকে এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ অথবা অংশী মনে করে, তবে অবশ্যই সে হবে অংশীবাদী ও মহাশাস্তির উপযোগী। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, মহত্ত্ব আমার উত্তরীয় এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার পরিচ্ছদ। যে এ দু'টোকে আকর্ষণ করতে উদ্যত হবে, আমি অবশ্যই তাকে প্রবেশ করাবো নরকাগ্নিতে।

www.eelm.weebly.com

‘অভাবীদেরকে অন্নদানে উৎসাহিত করতো না’ অর্থ সে নিজে তো অভাবীদের অভাব মোচন করতোই না, উপরন্তু এমতো মহান কর্মে অন্যদেরকে করতো নিরুৎসাহিত। কথাটিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, অন্নদানে নিরুৎসাহিত করার শাস্তিই যদি এতো ভয়াবহ হবে, তবে যে এমতো অপকর্ম অহরহ করে, তার শাস্তি হবে আরো কতো ভয়ংকর। অতএব সময় থাকতে সাবধান। এখানে আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের বিশ্বাসগত স্খলনের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত তো হবেই, উপরন্তু শাস্তিভোগ করবে কর্মগত স্খলনের জন্যও। আর নিকৃষ্টতম বিশ্বাস হচ্ছে ‘কুফরী’(অবিশ্বাস) এবং নিকৃষ্টতম কর্ম— অন্নদানে অনীহা।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— ‘অতএব এই দিন সেখানে তার কোনো সুহৃদ থাকবে না (৩৫), এবং কোনো খাদ্য থাকবে না ক্ষতনিঃসৃত স্রাব ব্যতীত (৩৬), যা অপরাধী ব্যতীত কেউ খাবে না’ (৩৭)।

এখানে ‘ফা লাইসা লাহু ইয়াওমা’ (এই দিনে তার থাকবে না) কথাটির ‘ফা’ কারণপ্রকাশক। অর্থাৎ একারণেই সেদিন সেখানে তার পক্ষে থাকবে না কোনো সুহৃদ-স্বজন। ‘লা ত্বআ’মুন’ অর্থ কোনো খাদ্য থাকবে না। ‘লা’ এখানে অতিরিক্ত। ব্যতিক্রমীটি এখানে পার্থক্যসূচক। ‘গিসলীন’ অর্থ নরকবাসীদের ক্ষতস্থাননিঃসৃত তাজা রক্ত। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে ‘গোসল’ থেকে। ইকরামার পদ্ধতিতে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন ‘গিসলীন’ হচ্ছে নারকীদের ক্ষতনিঃসৃত সতেজ শোণিত। রবী ইবনে আনাস এবং জুহাক বলেছেন ‘গিসলীন’ হচ্ছে বিশেষ ধরনের বৃক্ষ, যা আহার্য হবে নারকীদের। মুজাহিদ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি জানিনা ‘গিসলীন’ কাকে বলে। তবে মনে হয় ‘গিসলীন’ হচ্ছে সীজ গাছ।

‘লা ইয়া’কুলুহু ইল্লাল খত্বিউন’ অর্থ যা অপরাধী ব্যতীত কেউ খাবে না। এখানকার ব্যতিক্রমীটিও পার্থক্যসূচক। অর্থাৎ তা ভক্ষণ করবে কেবল নারকীরা। ‘খত্বিউন’ অর্থ অপরাধীরা। অর্থাৎ তারা, যারা ভুলে নয়, অপরাধ করে স্বেচ্ছায়, নিঃশংক ও নির্দ্বিধচিত্তে।

সূরা হাক্বক্বহ্ ঃ আয়াত ৩৮— ৫২

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ۙ﴿٣٨﴾ وَ مَا لَا تُبْصِرُوْنَ ۙ﴿٣٩﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلُ
رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۚ﴿٤٠﴾ وَّ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۙ﴿٤١﴾
وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ؕ﴿٤٢﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ﴿٤٤﴾ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ﴿٤٥﴾

www.eelm.weebly.com

ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ الۡوَتِيۡنَ ﴿۴۶﴾ فَمَا مِنۡكُمۡ مِّنۡ اَحَدٍ عَنۡهُ حٰجِزِيۡنَ ﴿۴۷﴾
وَاِنَّهٗ لَتَذۡكِرَةٌ لِّلۡمُتَّقِيۡنَ ﴿۴۸﴾ وَاِنَّا لَنَعۡلَمُ اَنَّ مِنۡكُمۡ مُّكَذِّبِيۡنَ ﴿۴۹﴾
وَاِنَّهٗ لَحَسۡرَةٌ عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ ﴿۵۰﴾ وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الۡيَقِيۡنِ ﴿۵۱﴾ فَسَبِّحۡ
بِاسۡمِ رَبِّكَ الۡعَظِيۡمِ ﴿۵۲﴾

q আমি কসম করিতেছি উহার, যাহা তোমরা দেখিতে পাও,
q এবং যাহা তোমরা দেখিতে পাও না;
q নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা।
q ইহা কোন কবির রচনা নহে; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর,
q ইহা কোন গণকের কথাও নহে, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।
q ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।
q সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিত,
q আমি অবশ্যই তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম,
q এবং কাটিয়া দিতাম তাহার জীবন-ধমনী,
q অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।
q এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।
q আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রহিয়াছে।
q এবং এই কুরআন নিশ্চয়ই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হইবে,
q অবশ্যই ইহা নিশ্চিত সত্য।
q অতএব তুমি মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি আমার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহসম্ভারের শপথ করে বলছি, নিশ্চয় এই কোরআন আমি অবতীর্ণ করেছি আমার মহাসম্মানিত দূত জিবরাইল ফেরেশতার মাধ্যমে।

এখানে 'ফালা উক্বসিমু' এর শাব্দিক অর্থ আমি শপথ করি না। মর্মার্থ— কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী হওয়ার ব্যাপারটি এতোই সুনিশ্চিত যে, এর জন্য শপথ করার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না। 'লা' অব্যয়টি এখানে না-বাচক। আর 'লা' কে যদি এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত বলে ধরা হয়, তবে বক্তব্যার্থটি দাঁড়াবে— আমি সুদৃঢ় শপথ করছি। অথবা বলা যেতে পারে, 'লা' অব্যয়টির সম্পর্ক রয়েছে এখানে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অবিশ্বাসীরা কোরআনকে আল্লাহ্‌র বাণী বলে স্বীকার করতে চায় না। বলে, মোহাম্মদ কবি ও গণক। সে-ই কোরআন রচনা করে। আমি শপথ উচ্চারণ করে বলছি, তাদের এ সকল মন্তব্য মিথ্যা। নিশ্চয় কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী।

www.eelm.weebly.com

'যা তোমরা দেখতে পাও এবং যা তোমরা দেখতে পাও না' অর্থ যা কিছু পরিদৃশ্যমান এবং যা কিছু অপরিদৃশ্য। এরকমও বলা হয়েছে যে, এখানে প্রথমটির অর্থ আকারসম্ভূত এবং দ্বিতীয়টির অর্থ আত্মাবিশিষ্ট। অথবা এখানে 'যা তোমরা দেখতে পাও' অর্থ মনুষ্যজাতি এবং 'যা তোমরা দেখতে পাও না ' অর্থ ফেরেশতা ও জ্বিন। অথবা কথাটির অর্থ— প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহসম্ভার। কিংবা ওই জ্ঞান, যা দেওয়া হয়েছে মানুষ-ফেরেশতা-জ্বিনকে এবং ওই জ্ঞান, যা দেওয়া হয়নি তাদের কাউকেই। আর 'এই কোরআন এক সম্মানিত রসুলের বাহিত বার্তা' অর্থ এই কোরআনের ধারক-বাহক ও প্রচারক জিবরাইল আমিন, অথবা মোহাম্মদ মোস্তফা স.।

এরপরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'এটা কোনো কবির রচনা নয়'। একথার অর্থ— হে মক্কার পৌত্তলিকেরা! 'মোহাম্মদ কবি এবং কোরআন তাঁরই রচনা' তোমাদের এই মন্তব্যটি সর্বৈবরূপে মিথ্যা, ভিত্তিহীন। এরকম বিস্ময়কর, নিখুঁত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাণী আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো হতেই পারে না। কিন্তু তোমাদের তো এর প্রতি বিশ্বাস মাত্রই নেই।

এখানে 'অল্পই বিশ্বাস করো' অর্থ কিছুই বিশ্বাস করো না। 'ক্বলীলান' (অল্পই) শব্দটি এখানে কর্মপদ, কিংবা ক্রিয়ার আধার হওয়ার কারণে যবরযুক্ত হয়েছে। আর স্বল্পতাকে সুনির্দিষ্ট করণার্থে এরপর ব্যবহৃত হয়েছে 'মা' অব্যয়টি। এভাবে শব্দার্থটি দাঁড়িয়েছে— অত্যল্প। অর্থাৎ অত্যল্প সময়ের জন্য তোমরা বিশ্বাস করো। অর্থাৎ কোরআনের বাণীর মহিমা যখন তোমাদের মনোযোগের সম্মুখে সুপ্রকট হয়, তখন তোমরা অভিভূত হয়ে তা স্বীকার করতে বাধ্য হও অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য। পরক্ষণে আত্মসমর্পণ করো তোমাদের জেদ, গোঁয়ার্তুমি ও পূর্বসংস্কারের কাছে। এধরনের স্বীকৃতি অস্বীকৃতিরই নামান্তর। কেননা তা স্থায়ী ও কার্যকর কোনোটাই নয়। যেমন বলা হয় 'আরে, তুমি তো এদিকে খুব কমই আসো'। অর্থাৎ তুমি তো এদিকে আসোই না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এটা কোনো গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন করো (৪২)। এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ' (৪৩)।

এখানে 'অল্পই অনুধাবন করো' অর্থ অনুধাবনই করো না। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কোরআনকে যেমন তোমরা বিশ্বাস করো না, তেমনি এর মর্মবাণীও অনুধাবন করতে চেষ্টা করো না। একে কবির কাব্য এবং গণকের কথা বলে উড়িয়ে দাও। অথচ পরিচ্ছন্ন বিশ্বাস ও সুস্থ বিবেকের দাবি হচ্ছে একথা স্বীকার করা যে, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র নিকট থেকে। এখানকার 'তানযীল' (অবতীর্ণ) শব্দটি ধাতুমূল ও কর্মপদার্থে ব্যবহৃত।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতচতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'সে যদি আমার নামে কোনো কথা চালাতে চেষ্টা করতো (৪৪), আমি অবশ্যই তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম (৪৫) এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী (৪৬), অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে' (৪৭)। একথার অর্থ— কেউ তার নিজের মনগড়া কথাকে আমার কথা বলে চালাতে চেষ্টা করলে আমি কি তা সহ্য করতাম? এরকম অপচেষ্টা করলে আমি তো তাকে মেরেই ফেলতাম। আর তখন তাকে কেউ সাহায্যও করতে পারতো না। সুতরাং হে মক্কাবাসী! মিথ্যাচার পরিত্যাগ করো। মেনে নাও আমার বাণী ও বাণীবাহককে।

এখানে 'লাআখাজনা মিনহু বিল ইয়ামীন' অর্থ আমি অবশ্যই তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম। অথবা— আমার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আমি পাকড়াও করতাম তাকে। শেষোক্ত অর্থের ক্ষেত্রে এখানকার 'মিন' অব্যয়টি হবে অতিরিক্ত। আর 'আল্লাহ্র দক্ষিণ হস্ত' কথাটি দুর্জ্ঞেয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ্ আকার ও দিকের অতীত, আনুরূপ্যবিহীন (বেমেছাল)। সুতরাং স্বীকার করতে হবে, কথাটির মর্ম জানেন কেবল আল্লাহ্। তবে হজরত ইবনে আব্বাস প্রমুখ বলেছেন, এখানে 'দক্ষিণ হস্ত' বলে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্র অপার শক্তিমত্তাকে। কেননা হাত হচ্ছে শক্তির প্রতীক। অবশ্য একথাটিও স্বীকার্য যে, আল্লাহ্র শক্তিও আল্লাহ্র মতো আনুরূপ্যবিহীন। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বিষয়টি থেকে যায় দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যাচ্ছন্নই।

'ওয়াতীন' অর্থ জীবন-ধমনী, হৃৎপিণ্ডের একটি শিরা, যা কেটে দিলে মৃত্যু অনিবার্য হয়। 'ফামা মিনকুম মিন আহাদিন' অর্থ অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই। আর 'আ'নহু হাজ্বিযীন' অর্থ যে তাকে রক্ষা করতে পারে। এখানকার 'আহাদিন' শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনার্থক। সেকারণেই শেষে উল্লেখিত হয়েছে বহুবচনরূপী 'হাজ্বিযীন'। অর্থাৎ যারা তাকে রক্ষা করতে পারে।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'এই কোরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ'। একথার অর্থ— যারা সাবধানী (মুত্তাকী), কেবল তারাই কোরআনের উপদেশ দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহঃ বলেছেন, এখানকার 'লিল মুত্তাক্বীন' কথাটিতে 'আলিফ লাম' ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষ অর্থে। অর্থাৎ কোরআন দ্বারা প্রকৃত অর্থে উপকৃত হতে পারেন কেবল সাবধানীরা। আর সাবধানী তারাই, যারা বিশুদ্ধচিত্ত ও পরিশুদ্ধ প্রবৃত্তিবিশিষ্ট। অর্থাৎ যাদের অর্জিত হয়েছে কলব ও নফসের ফানা। এ ধরনের ব্যক্তিগণই কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উপকৃত হন। অর্থাৎ কোরআন পাঠ তাদের ক্ষেত্রেই হয় আত্মিক স্তরোন্নতির উপলক্ষ। যারা এরকম নন, তাদের কোরআন পাঠ কেবল একটি সাধারণ পুণ্যকর্ম, অথবা পুণ্যময় অনুশীলন, প্রকৃত উপকারপ্রদায়ক নয়।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে (৪৯) এবং এই কোরআন নিশ্চয়ই কাফেরদের অনুশোচনার কারণ হবে (৫০), অবশ্যই এটা নিশ্চিত সত্য' (৫১)। একথার অর্থ— তোমরা যারা কোরআনকে অস্বীকার করো, তাদের সম্পর্কে আমি ভালো করেই জানি। যথাসময়ে আমি তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তিদান করবোই। তখন তারা কোরআনের সতর্কবাণীর কথা স্মরণ করে অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হতে থাকবে। সুতরাং হে মক্কাবাসী! এখনো সময় আছে, সাবধান হও। এই মুহূর্তে মেনে নাও যে, এই কোরআন অবশ্যই-নিশ্চয় মহাসত্য।

এখানে 'ইয়াক্বীন' অর্থ নিঃসন্দিগ্ধ, সত্য। কামুস। 'ইয়াক্বীন' হচ্ছে প্রজ্ঞার এক উচ্চতর মার্গের বিশেষণ। এভাবে এখানে কথাটির মাধ্যমে এই তত্ত্বটিই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোরআন স্বমহিমায় সতত সমুজ্জ্বল। প্রকৃত অর্থে যারা প্রজ্ঞাবান, তাদের কাছে এ তত্ত্বটি অবিদিত নয়। এভাবে এখানে 'হাক্বক্কুল ইয়াক্বীন' কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— নিশ্চিত সত্য। কথাটির আসল রূপ ছিলো 'ইয়াক্বীনুল হাক্ব' (সত্য বিশ্বাস)। এরকম লিখেছেন 'বাহার' অভিধান প্রণেতা। অর্থাৎ কোরআন যে নিশ্চিত সত্য, তা অবশ্য বিশ্বাস্য।

একটি প্রশ্ন ঃ 'ইয়াক্বীন' অর্থই নিশ্চিত বিশ্বাস বা সুনিশ্চিত সত্য। তাহলে এখানে 'ইয়াক্বীন' এর সঙ্গে আবার 'হাক্ব' (সত্য) সংযুক্ত হলো কেনো? এরকম পুনরাবৃত্তির স্বার্থকতা কী?

উত্তর ঃ এরকম করা হয়েছে 'ইয়াক্বীন' কে অধিকতর সুনিশ্চিতি প্রদানার্থে, অধিক প্রবলভাবে প্রকাশার্থে। বাগবী লিখেছেন, 'ইয়াক্বীন' ও 'হাক্ব' সমার্থক। ফলে বলা যেতে পারে, শব্দ দু'টো যেনো সম্বন্ধিত হয়েছে নিজেদেরই সঙ্গে, পরিস্ফুটক, পরিপূরক বা পরিপোষকরূপে।

শেষোক্ত আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'অতএব তুমি মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্, রসুল ও কোরআন সম্পর্কে যে সকল অযথার্থ উক্তি করে, তার প্রতিবাদে আপনি বর্ণনা করুন আপনার মহান প্রভুপালয়িতার নামের পবিত্রতা ও মহিমা।

এখানে 'তাসবীহ' অর্থ পবিত্রতা। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'তাসবীহ্' অর্থ নামাজ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আপনি আল্লাহ্র স্মরণে তাঁর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাদি বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করুন নামাজ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'বিসমি' (নামের) কথাটির 'বা' অব্যয়টি এবং 'ইসিম' উভয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে অতিরিক্তরূপে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বর্ণনা করুন আপন প্রভুপালকের পবিত্রতা।

হজরত উকবা ইবনে আমের জুহুনী বর্ণনা করেছেন, যখন 'সাব্বিহিস্মা রব্বিকাল আ'জীম' অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. বললেন, তোমরা এ বাণীকে

www.eelm.weebly.com

মিলিয়ে নাও তোমাদের রুকুর সঙ্গে। আর যখন অবতীর্ণ হলো 'সাব্বিহিস্মা রব্বিকাল আ'লা' তখন তিনি স. বললেন, এ কথাটিকে তোমরা মিলিয়ে নাও তোমাদের সেজদার সঙ্গে।

হজরত হুজায়ফা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. রুকুতে পাঠ করতেন 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'জীম' এবং সেজদায় পাঠ করতেন 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা'। আর কোরআন পাঠকালে যখন তিনি পৌঁছে যেতেন রহমত-বর্ষণ বিষয়ক কোনো আয়াতে, তখন সেখানে থেমে গিয়ে দোয়া করতেন বরকতের জন্য। তেমনি যদি পৌঁছে যেতেন শাস্তির বিবরণবিশিষ্ট আয়াতে, তখন আশ্রয় চাইতেন আল্লাহ্র সমীপে। তিরমিজি, আবু দাউদ, দারেমী।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আওন ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন তোমরা রুকুর সঙ্গে তিনবার মিলিয়ে নিয়ো 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'জীম' এবং তিনবার 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' মিলিয়ে নিয়ো সেজদার সঙ্গে। কমপক্ষে এতটুকু করলেই পূর্ণ হবে তোমাদের রুকু ও সেজদা। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটির সূত্রপরম্পরা অযথার্থ। কেননা হজরত ইবনে মাসউদের সঙ্গে আওন ইবনে আবদুল্লাহ্র কখনো সাক্ষাত ঘটেনি।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লহিল আ'জীম' পাঠ করে, আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতে রোপণ করেন একটি খেজুর গাছ। তিরমিজি।

মাসআলা ঃ আলেমগণের সর্ববাদী সম্মত মত এই যে, রুকু ও সেজদায় তসবীহ্ পাঠ করা সুন্নত। ইমাম আহমদ বলেছেন, ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক)। কেননা রসুল স. আজ্ঞা করেছেন 'মিলিয়ে নিয়ো'। তাঁর আজ্ঞা পালন করা ওয়াজিব। আবার তিনি স. একথাও বলেছেন যে 'এতটুকু করলে পূর্ণ হবে তোমাদের রুকু ও সেজদা'। কিন্তু আলেমগণ বলেন, এখানকার আজ্ঞাটি মোস্তাহাব (অভিপ্রেত) পর্যায়ের।

রুকুতে ও সেজদায় গমনকালে এবং সেজদা থেকে মাথা ওঠানোর সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নত, সকল বিদ্বান এ ব্যাপারে একমত। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবল ইমাম আহমদ। তাঁর মতে নামাজের তকবীরসমূহ ওয়াজিব। 'সামিআ'ল্লহু লিমান হামিদাহ্' এবং 'রব্বানা লাকাল হামদ' সম্পর্কেও রয়েছে এরকম মতপ্রভেদ। অর্থাৎ সকল বিদ্বান কাজ দু'টোকে বলেছেন সুন্নত। কিন্তু ইমাম আহমদ বলেছেন ওয়াজিব। তবে দুই সেজদার মাঝখানের 'রব্বিগ্ফিরলি' পাঠের ব্যাপারে কারো কোনো মতপৃথকতা নেই। অর্থাৎ এই আমলটির ওয়াজিব হওয়ার কথা কেউই বলেননি। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত।

www.eelm.weebly.com

সূরা আল মাআ'রিজ্ব

মহাপুণ্যভূমি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এর মধ্যে রয়েছে ২টি রুকু এবং ৪৪ টি আয়াত।

সূরা মাআ'রিজ্ব ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ﴿۱﴾ لِّلۡكٰفِرِیۡنَ لَیۡسَ لَهٗ دَافِعٌ ﴿۲﴾ مِّنَ
اللّٰهِ ذِی الۡمَعَارِجِ ﴿۳﴾ تَعۡرُجُ الۡمَلٰٓئِكَةُ وَ الرُّوۡحُ اِلَیۡهِ فِیۡ یَوۡمٍ
كَانَ مِقۡدَارُهٗ خَمۡسِیۡنَ اَلۡفَ سَنَةٍ ﴿۴﴾ فَاصۡبِرۡ صَبۡرًا جَمِیۡلًا ﴿۵﴾

r এক ব্যক্তি চাহিল সংঘটিত হউক শাস্তি যাহা অবধারিত—

r কাফিরদের জন্য, ইহা প্রতিরোধ করিবার কেহ নাই।

r ইহা আসিবে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে, যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

r ফিরিশ্‌তা এবং রূহ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিনে, যাহার পরিমাণ পার্থিব পঞ্চাশ হাযার বৎসর।

r সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর পরম ধৈর্য।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এক ব্যক্তি চাইলো সংঘটিত হোক শাস্তি, যা অবধারিত'। এখানে 'এক ব্যক্তি' অর্থ নজর ইবনে হারেছ। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে নাসাঈ ও ইবনে হাতেম বর্ণনা করেছেন, নজর ইবনে হারেছ বলেছিলো, হে আল্লাহ্! এ সকল বাণী যদি সত্যি সত্যিই তোমার নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে এ সবকিছু অস্বীকার করার কারণে তুমি আমাদেরকে এখনই শাস্তি দাও, প্রস্তর বর্ষণ করো।

সুদ্দী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, নজর ও তার সঙ্গী-সাথীদের কাংখিত শাস্তি আপতিত হয়েছিলো বদর যুদ্ধের দিবসে। প্রথম বর্ণনানুসারে বলতে হয়, তারা চেয়েছিলো প্রস্তরবর্ষণের শাস্তি, অথবা অন্য কোনো মর্মন্তুদ শাস্তি। কেননা এখানে 'সাআলা' ক্রিয়ার কর্মপদ 'আ'জাব' সংবদ্ধ হয়েছে 'বা' অব্যয় দ্বারা (সায়িলুম বি আ'জাবি)। অন্য রকম অর্থও হওয়া সম্ভব কথাটির। যেমন— ক্বারী নাফেয়ের পাঠরীতিতে 'সাআলা' এসেছে 'আলিফ'সহ। ফলে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে— বহমান। আর বদরের রণক্ষেত্রে এরকমই ঘটেছিলো। প্রবাহিত হয়েছিলো তাদের রক্ত। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যে শাস্তি বহমান হয়

www.eelm.weebly.com

উপত্যকাভূমি থেকে, সে শাস্তিই কামনা করেছিলো নজর ইবনে হারেছ। সুতরাং বলা যেতে পারে— ওই অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিলো বদর প্রান্তরে, তদুপরি পরকালের শাস্তিও তাদের জন্য অনিবার্য। বাগবী লিখেছেন, দোজখের একটি উপত্যকার নাম 'সায়িল'। আবদুর রহমান ইবনে জায়েদ ইবনে আসলামও এরকম বলেছেন।

ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, মক্কার এক পৌত্তলিক একবার আবেদন করলো, যে শাস্তি অবধারিত, সে শাস্তি এখনই নেমে আসুক। তখন অবতীর্ণ হলো 'এক ব্যক্তি চাইলো সংঘটিত হোক শাস্তি, যা অবধারিত'। পৌত্তলিক জনতা প্রশ্ন করলো, তাহলে কবে আপতিত হবে সেই শাস্তি? তখন অবতীর্ণ হলো 'কাফেরদের জন্য, এটা প্রতিরোধ করবার কেউ নেই'। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, এখানকার 'সায়িলুন' অর্থ হবে 'প্রশ্ন'। বি আ'জাবি' এর 'বা' অব্যয়টির অর্থ হবে 'আ'ন' (হতে)। অর্থাৎ প্রশ্নটি যেহেতু অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তাই তা পরিবেশিত হয়েছে 'বা' সহযোগে। আর 'ওয়াক্বিয়্' শব্দটি এখানে 'শাস্তি'র বিশেষণ। অর্থাৎ অবধারিত শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'কাফেরদের জন্য, এটা প্রতিরোধ করবার কেউ নেই'। এ কথার অর্থ— প্রার্থিত ওই শাস্তি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে আপতিত হবেই। সে শাস্তি প্রতিহত করার সাধ্য কারো নেই। এই কথাটিও পূর্বোক্ত প্রশ্নের জবাব।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এটা আসবে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে, যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী'। একথার অর্থ— মহামর্যাদাধারী আল্লাহ্ স্বয়ং যেহেতু ওই শাস্তি অবতীর্ণ করবেন, সেহেতু তা হবে অপ্রতিরোধ্য।

এখানে 'জিল মাআ'রিজ্ব' অর্থ— মহাপারদর্শী আল্লাহ্। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এর অর্থ— মহিমান্বিত। আমি বলি, কথাটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের ওই সকল স্তরকে, যে স্তরসমূহে স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে উপনীত হন নবী-রসুল, ফেরেশতাকুল এবং আউলিয়াগণ। অর্থাৎ পাত্রভেদে যে সকল স্তরে উন্নিত হয় পুণ্যকর্মসমূহ। অথবা এর অর্থ— বেহেশতের স্তরান্তর। হজরত উবাদা ইবনে সামেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতের ভিতরে আছে একশতটি স্তর। এক স্তর থেকে আর এক স্তরের ব্যবধান আকাশ-পৃথিবীর ব্যবধানের মতো। আর ফেরদাউস হচ্ছে বেহেশতের সর্বোন্নত স্তর। সেখান থেকেই উৎসারিত হয়েছে বেহেশতের স্রোতস্বিনীচতুষ্টয়। এর উপরে রয়েছে আল্লাহ্‌র আরশ। তোমরা বেহেশত কামনা করলে কামনা কোরো ফেরদাউস। হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। তবে তাঁর বর্ণনায় 'আকাশ-পৃথিবীর ব্যবধানের' স্থলে বলা হয়েছে 'একশত বৎসরের পথের দূরত্বের সমান'।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা তাদের আপন আপন প্রাসাদে বসে একে অপরকে দেখতে পাবে দিগন্ত-দূরবর্তী সমুজ্জ্বল তারকার মতো। কারণ তাদের মধ্যে থাকবে স্তরগত পার্থক্য। মান্যবর সহচরবৃন্দ বললেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহক! নবী-রসুলগণ ছাড়া উন্নততর স্তরে অন্য কেউ কি পৌঁছতে পারবে? তিনি স. বললেন, যাঁর আনুরূপ্যবিহীন অধিকারে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, উন্নততর স্তরের অধিবাসী হতে পারবে তারাও। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'মাআ'রিজ্ব' অর্থ নভোমণ্ডল। কেননা ফেরেশতামণ্ডলী আরোহণ করে আকাশে। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ— অনুগ্রহভাণ্ডার। অর্থাৎ যিনি আকাশাধিকারী, অথবা ভাণ্ডারাধিশ্বর।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহ্র দিকে ঊর্ধ্বগামী এমন একদিনে, যার পরিমাণ পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসর'। বাক্যটির যোগসূত্র রয়েছে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে, যার সঙ্গে সম্পৃক্ত 'শাস্তি যা অবধারিত' কথাটি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়, যেদিন তাদের উপরে মহাশাস্তি আপতিত হবে, সেদিনের পরিমাণ হবে পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসর। সেদিনের নামই মহাবিচার দিবস। ইকরামা সূত্রে বায়হাকী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। ইয়ামান বলেছেন, মহাবিচার দিবসের বিরতিস্থল হবে পঞ্চাশটি। প্রতিটি বিরতিস্থলে অবস্থান করতে হবে এক হাজার বৎসর ধরে।

হজরত আবু হোরয়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে বিত্তপতি তার জমানো সোনা-রূপার জাকাত আদায় করবে না, মহাবিচারের দিবসে তার সোনা-রূপাগুলোকে দোজখের আগুনে পুড়িয়ে বানানো হবে পিণ্ড, আর ওই জ্বলন্ত পিণ্ড দিয়ে দাগ দেয়া হবে তার বাহু ও ললাটে। বিচারপর্ব সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এভাবেই শাস্তি দেওয়া হবে তাকে। আর বিচারপর্ব সমাপ্ত হতে লাগবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। এরপর তাকে দেখানো হবে স্বর্গ অথবা নরকের পথ। আর যে উষ্ট্রপতি জাকাত আদায় করবে না তার উটের, তাকে শোয়ানো হবে উন্মুক্ত প্রান্তরে। তারপর পদদলিত করা হবে উটের সাহায্যে। উটের শাবকগুলোও তাকে পদপিষ্ট করবে একইভাবে। তারা একবার তার উপর দিয়ে যাবে, একবার আসবে। সেদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। এরপর আল্লাহ্ তার জন্য সিদ্ধান্ত দান করবেন জান্নাতের, অথবা জাহান্নামের। ছাগলের মালিকেরা জাকাত না দিলেও এরকমই ঘটবে। তখন তার ছাগলগুলি তাকে শিঙ দিয়ে গুঁতো দিতে থাকবে এবং তাকে জর্জরিত করতে থাকবে তাদের খুরের আঘাতে। সেদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ সহস্র বৎসর। পরিশেষে তাদের সম্পর্কেও ফয়সালা দেওয়া হবে বেহেশত, অথবা দোজখের। সুপরিণত সূত্রে আহমদ, আবু ইয়ালা, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, একবার নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! সেই

www.eelm.weebly.com

দিনটি কতোইনা দীর্ঘ হবে, যেদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ সহস্র বৎসর! তিনি স. বললেন, আমার জীবনপ্রদীপ যার করতলগত, তাঁর শপথ! ওই দিনটি বিশ্বাসীদের কাছে মনে হবে অতি সংক্ষিপ্ত, ফরজ নামাজ পাঠের সময় অপেক্ষাও কম। আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে মহাবিচার দিবসের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। আর সুরা 'তানযীলুল সেজদা'য় বলা হয়েছে— হজরত জিবরাইল আল্লাহ্‌র বিধান পৃথিবীতে এনে পুনরায় ফিরে যান একদিনে। পৃথিবীর হিসেবে এই এক দিনের পরিমাণ এক হাজার বৎসর। বাহ্যত এ দু'টো তথ্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হলেও প্রকৃত পক্ষে এর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কেননা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্ব পাঁচ শত বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। তাই হজরত জিবরাইলের পৃথিবীতে আগমন ও প্রত্যাগমনে সময় লাগে পাঁচশ' যোগ পাঁচশ' সমান সমান এক হাজার বৎসর। বরং এর কম সময়ের মধ্যেও ফেরেশতারা দুনিয়ায় এসে আসমানে ফিরে যেতে পারেন।

আবু তালহা সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইহজগতে ফেরেশতারা একদিনে এক হাজার বৎসরের পথ অতিক্রম করতে পারে। আর পরজগতের বিচারের দিন হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান। তবে এমতো প্রলম্বিতি অনুভব করবে কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা, বিশ্বাসীরা নয়। আবার কেউ কেউ বলেন 'এক হাজার বৎসর' 'পঞ্চাশ হাজার বৎসর' দু'টো সময়ই আখেরাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ মহাবিচারের দিবসের প্রলম্বিতিকে কারো কারো কাছে মনে হবে এক হাজার বৎসর, আবার কারো কারো বোধ হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। আর ইমানদারদের কাছে মনে হবে ফরজ নামাজ পাঠ করার সময়ের মতো সংক্ষিপ্ত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে সর্বোন্নত ও উন্নত সূত্রে হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, বিশ্বাসীদের জন্য প্রতিফল দিবস হবে জোহর ও আসরের মধ্যকার সময়ের মতো সংক্ষিপ্ত। এমতো বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়, আল্লাহ্‌পাক তাঁর আকাশগত নির্দেশাদি পৃথিবীতে কার্যকর করেন পৃথিবীর সময়ানুসারে। এরপর যখন পৃথিবীর আয়ু শেষ হবে, ইতি ঘটবে সকল বিচারকর্তার বিচারকর্মের, সমাপ্ত হবে সকল শাসনকর্তার শাসনের, তখন সকল নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও ব্যবস্থাপনাকে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হবে কেবল মহাবিচার দিবসের সঙ্গে। আর তার পরিমাণ হবে এক হাজার বৎসর।

কেউ কেউ বলেছেন, 'এক হাজার বৎসর' এবং 'পঞ্চাশ হাজার বৎসর' সম্বলিত দু'টো আয়াতেই উল্লেখিত হয়েছে 'ফী ইয়াওমিন' কথাটি, যার সম্বন্ধ রয়েছে 'ইয়া'রুজু' এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় দ্বন্দ্ব নিরসনার্থে বলা যেতে পারে, আকাশ-পৃথিবীর দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের সমান। এই হিসেবে যাতায়াতে সময় লাগে এক হাজার বৎসর। আর এই হিসেবে হয়তো সপ্ত আকাশ ও সপ্ত-স্তরবিশিষ্ট পৃথিবীর মধ্যে যাতায়াতে মোট সময় লাগে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। লাইছ বর্ণনা করেছেন, এরকম বলেছেন মুজাহিদ। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, কোনো

www.eelm.weebly.com

মানুষ যদি স্বাভাবিক গতিতে পৃথিবী থেকে আরশে পৌঁছতে চায়, তবে তার সময় লাগবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। একারণেই সুফী সাধকগণ বলেন, আধ্যাত্মিক পথের পথিকগণের আত্মিক বিনাশন (ফানা) অর্জিত হয় আল্লাহ্‌পাকের প্রেমাকর্ষণে (জজবায়) নবী-রসুলগণ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরু বা পীর-মোর্শেদের মাধ্যমে। সুতরাং কেউ যদি পীর-মোর্শেদ ব্যতিরেকে স্বচেষ্টায় কেবল ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে ওই স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে চায়, তবে তার সময় লাগবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার বৎসর আয়ুবিশিষ্ট কেউই নয়। তাছাড়া পৃথিবী যে আরো পঞ্চাশ হাজার বৎসর টিকে থাকবে, তারও তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে জজবা ও পীর-মোর্শেদের তাওয়াজ্জোহ্‌ (অভিনিবেশ) ব্যতিরেকে ফানা প্রাপ্তি অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি পীর-মোর্শেদ ব্যতিরেকেও ফানার স্তরে উন্নীত হতে পারেন। তাদের নিয়মটি হচ্ছে ওয়াইসী নিয়ম। অর্থাৎ ওয়ায়েস ক্বরনী যেভাবে ফানা লাভ করেছিলেন, সেই নিয়ম। কিন্তু এমতোক্ষেত্রে রসুলে পাক স. এর রূহানী তাওয়াজ্জোহ অপরিহার্য। আর এটি একটি ব্যতিক্রমী নিয়মও বটে, সাধারণ নিয়ম নয়।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ করো, পরম ধৈর্য'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের শাস্তির ব্যাপারে অবলম্বন করুন অনুপম সহিষ্ণুতা। অসহিষ্ণু হবেন না মোটেও। এখানে 'ফাস্‌বির' (ধৈর্যধারণ করো) কথাটির 'ফা' অব্যয়টি যোজক। এর যোগসূত্র রয়েছে প্রথম আয়াতের 'এক ব্যক্তি চাইলো' কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের একজন চাইলো, শাস্তি ত্বরান্বিত হোক। এটা ছিলো তাদের উপহাস। রসুল স. মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তাই আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিলেন, হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কারণে চাঞ্চল্য প্রকাশ করবেন না। নিশ্চয় যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি তাদেরকে দেওয়া হবেই।

নাফে বলেছেন, প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দ 'সাআ'লা' (সে চাইলো, সে প্রশ্ন করলো) পরিগঠিত হয়েছে 'সাইলান' থেকে। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার প্রিয়তম নবী! ধৈর্য ধরুন। অপেক্ষা করুন। তাদের অপকর্মপ্রবাহ তাদেরকে ক্রমাগত নিয়ে চলেছে শাস্তির দিকেই। আর সে শাস্তি অত্যাসন্নও।

সূরা মাআ'রিজ্ব ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ
كَالْمُهْلِ ﴿٨﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾
يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ

www.eelm.weebly.com

بِبَنِيهِ ﴿١١﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾

- উহারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর,
- কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা আসন্ন।
- সেদিন আকাশ হইবে গলিত ধাতুর মত
- এবং পর্বতসমূহ হইবে রঙ্গীন পশমের মত,
- এবং সুহৃদ সুহৃদের তত্ত্ব লইবে না,
- উহাদিগকে করা হইবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেই দিনের শাস্তির বদলে দিতে চাহিবে তাহার সন্তান-সন্ততিকে,
- তাহার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে,
- তাহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যাহারা তাহাকে আশ্রয় দিত
- এবং পৃথিবীর সকলকে, যাহাতে এই মুক্তিপণ তাহাকে মুক্তি দেয়।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ধারণা করে, কিয়ামত অনেক দূরে, আর তা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যায় না, কিন্তু আমি তো প্রত্যক্ষ করছি, কিয়ামত অত্যাসন্ন। উল্লেখ্য, যা অবশ্যম্ভাবী, তাকে আসন্ন বলাই সঙ্গত।

এরপরের আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— সেদিন কঠিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মতো তরল এবং শৈলশ্রেণী হবে রঙীন পশমের মতো অসংলগ্ন, আর তখন আপনজনেরা তাদের প্রিয়জনদের তত্ত্ব-তালাশ নিতে পারবে না। সকলেই হবে পর্যুদস্ত, ভীত-সন্ত্রস্ত।

এখানে 'মুহলি' অর্থ গলিত তামা। অথবা অন্য কোনো বিগলিত ধাতু। কিংবা তেলের গাদ। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তখন আকাশ হয়ে যাবে বিবর্ণ। কখনো হবে বিগলিত তাম্র, অথবা অন্য কোনো ধাতুর মতো তরল, আবার কখনো হবে তেলের গাদের মতো লোহিতাভ। হবে বিদীর্ণ, শিথিল। 'পর্বতসমূহ হবে রঙীন পশমের মতো' অর্থ রঙ-বেরঙের তুলির পশমের মতো হয়ে যাবে তখন পাহাড়-পর্বতগুলো। এমনিতে পাহাড়গুলো হয় বিভিন্ন বর্ণের। তাই তখন উড়তে থাকা চূর্ণ-বিচূর্ণ পাহাড়গুলোকে দেখে মনে হবে, যেনো আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে রঙ-বেরঙের তুলি। আর 'সুহৃদ সুহৃদের তত্ত্ব নিবে না' অর্থ মানুষ তখন এতো অধিক বিপদাপন্ন হবে যে, বন্ধু-বান্ধবদের কথা জিজ্ঞেস মাত্র করবে না।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে (১১), তার স্ত্রীকে ও ভ্রাতাকে (১২), তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিতো (১৩) এবং পৃথিবীর সকলকে যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়' (১৪)।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'ইউবাস্‌সরূনাহুম' (তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর) কথাটি আগের আয়াতের 'হামীমা' (সুহৃদ) এর বিশেষণ। অথবা এখান থেকে শুরু হয়েছে পৃথক বাক্য। কথাটির মাধ্যমে এখানে এটাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যে তখন বন্ধু-বান্ধবের খোঁজ নিবে না, তা তাদের অনুপস্থিতির কারণে নয়। তারা তখন পরস্পরকে দেখবে ঠিকই। কিন্তু ভয়ে-আতংকে এমনভাবে জড়সড় হয়ে থাকবে যে কারো ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করার প্রবৃত্তিও তাদের থাকবে না। আর সেরকম অবকাশও তারা পাবে না। বাগবী লিখেছেন, মহাপ্রলয় দিবসে পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততি বন্ধু-বান্ধব সকলেই সকলকে দেখতে পাবে। কিন্তু তখন তারা এমনভাবে সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে যে, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার ফুসরত মাত্রই পাবে না। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন, তারা একে অপরের চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও কেউ কাউকে চিনতে পারবে না, তাদের অবস্থা তখন হবে এতোই সঙ্গিন। বিশ্বাসীদের মুখমণ্ডল হবে শুভ্র ও গৌরবর্ণের এবং কৃষ্ণ মুখাবয়ববিশিষ্ট হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা।

এখানে 'মুজ্বরিম' অর্থ অপরাধী, পৌত্তলিক। তারাই মহাবিচারের দিবসে তাদের সন্তান-সন্ততি, ভার্যা-ভ্রাতা, অধীনস্থ-স্বজন, এমনকি সারা পৃথিবীর সবকিছুকে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইবে। 'ইয়াওয়াদ্‌দু' অর্থ চাইবে, কামনা করবে। অর্থাৎ আপনজনদের কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করা তো দূরের কথা তাদেরকে পরিত্যাগ করে হলেও তারা তখন মুক্তি পেতে চাইবে। তাদের অবস্থা হবে তখন এতোই শোচনীয়। কিন্তু বিশ্বাসীদের আচরণ হবে তখন ভিন্নতর। তারা তাদের স্বজন-বান্ধবদের খোঁজ-খবর নিবে। এমনকি যারা জাহান্নামে চলে যাবে, তাদের পক্ষেও সুপারিশ করবে। যেমন এক হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! তোমরা কেউই এখন তোমাদের প্রাপ্য সম্পর্কে এতো বাদানুবাদ করো না, যতো বাদানুবাদ করবে মহাবিচারের দিবসে তোমাদের বিপদগ্রস্ত স্বজনদের জন্য। জাহান্নামী স্বজনদের সম্পর্কে তোমরা তখন বলবে, হে আমাদের দয়াময় প্রভুপালনকর্তা! তারা তো আমাদের সাথে নামাজ পড়তো, রোজা পালন করতো। বোখারী, মুসলিম। এ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও।

'সাহিবাতিহী' অর্থ তার ভার্যা, পত্নী। 'আখীহি' অর্থ তার ভ্রাতা। 'ফাসীলাতিহি' অর্থ তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, ওই গোত্র— যার একটি অংশ পৃথক। 'আললাতী তু'য়িহী' অর্থ যারা তাকে আশ্রয় দিতো। আর 'মান ফীল আরদ্বি জ্বামীআ' অর্থ পৃথিবীর সকলকে।

সূরা মাআ'রিজ্ব ঃ আয়াত ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰى ۙ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۚ﴿١٦﴾ تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَ
تَوَلّٰى ۙ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ﴿١٨﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۙ﴿١٩﴾ اِذَا مَسَّهُ

www.eelm.weebly.com

الشَّرُّ جَزُوۡعًا ۙ﴿۲۰﴾ وَّ اِذَا مَسَّهُ الۡخَیۡرُ مَنُوۡعًا ۙ﴿۲۱﴾

q না, কখনই নয়, ইহা তো লেলিহান অগ্নি,

q যাহা গাত্র হইতে চামড়া খসাইয়া দিবে।

q জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকিবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল।

q যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল।

q মানুষ তো সৃজিত হইয়াছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে।

q যখন বিপদ তাহাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী।

q আর যখন কল্যাণ তাহাকে স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ;

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— না, কোনোকিছুই তখন মুক্তিপণ হিসেবে গৃহীত হবে না। দোজখে প্রবেশ করতে তাদেরকে হবেই। আর দোজখে রয়েছে কেবল লেলিহান আগুন। সে আগুন অহরহ তাদেরকে দগ্ধীভূত করবে। ফলে চামড়া খসে খসে পড়তে থাকবে তাদের শরীরের। সেই দোজখ তখন তাদেরকে আহ্বান জানাবে, যারা সত্যবিমুখ ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, যারা সম্পদপতি হওয়া সত্ত্বেও জাকাত দেয় না, বরং ক্রমাগত স্ফীত করে তুলতে থাকে সম্পদের পাহাড়।

'ইননাহা লাজা' অর্থ এটা তো লেলিহান অগ্নি। এখানকার 'হা' (এটা) সর্বনামটি বিবৃতিমূলক। অথবা সর্বনামটি ওই আগুনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যা নিহিত রয়েছে 'শাস্তি' কথাটির মধ্যে। অথবা সর্বনামটি এখানে অনির্ণেয়, দুর্বোধ্য যার বিশ্লেষণাত্মক শব্দ 'লাজা'। বাগবী লিখেছেন, 'লাজা' দোজখের দ্বিতীয় দরোজার নাম। সেখানে রয়েছে বিশেষ ধরনের অতি তেজস্বী লেলিহান অগ্নি।

'নায্‌যাআ'তাল লিশ্‌শাওয়া' অর্থ যা গা থেকে চামড়া খসিয়ে নিবে। 'শাওয়া' অর্থ দুই হাত এবং দুই পা। অর্থাৎ লেলিহান অগ্নি তখন তাদের হাত-পাগুলো উপড়ে তুলে পৃথক করে দিবে। অথবা 'শাওয়া' হচ্ছে 'শূয়াতুন' এর বহুবচন, অর্থ— মস্তিষ্কের চামড়া। অর্থাৎ মস্তিষ্কের চামড়া স্খলক। অথবা হাতের মাংস স্খলনকারী। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই লেলিহান শিখা টেনে নিবে তাদের নিতম্ব। কালাবী বলেছেন, ওই জ্বলন্ত হুতাশন ভক্ষণ করবে গোটা মস্তিষ্কের ঘিলু। পুনরায় ঘিলু তৈরী করে দেওয়া হবে। পুনরায় তা গ্রাসিত হবে অগ্নি কর্তৃক। এভাবে ক্রমাগত শাস্তি দেওয়া হতে থাকবে তাদেরকে।

'তাদ্‌উ' মান আদবারা ওয়া তাওয়াল্লা' অর্থ জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলো ও হয়েছিলো বিমুখ। বলবে— ওরে পামর! প্রবঞ্চক! পৌত্তলিক! আয়, আমার কাছে আয়। হজরত ইবনে আব্বাস

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, সেদিন জাহান্নাম অবিশ্বাসী ও কপটদেরকে আহ্বান জানাবে সালংকৃত ভাষায় এবং ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে নিজের ভিতরে, যেমন করে পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যায় তার আহার। আর 'ওয়া জ্বামাআ' ফা আওআ' অর্থ যে সম্পদ পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষিত করে রেখেছিলো।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে—'মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে (১৯)। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে, সে হয় হা-হুতাশকারী (২০)। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে হয় অতি কৃপণ'(২১)।

এখানে 'হালূআ'ন' অর্থ অতিশয় অস্থিরচিত্ত। হজরত ইবনে আব্বাস এর অর্থ করেছেন— অসিদ্ধ বস্তুর প্রতি লোভাতুর। সাঈদ ইবনে যোবায়ের অর্থ করেছেন— ঘোর কৃপণ। ইকরামা বলেছেন, সংকীর্ণচেতা। কাতাদা বলেছেন, অস্থিরচিত্ত। মুকাতিল বলেছেন, সংকীর্ণমনা। 'হুলউন' অর্থ অত্যধিক লোভী, অসহিষ্ণু। আতিয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'অতিশয় অস্থিরচিত্ত' কথাটিকেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে পরের দুই আয়াতে 'হা-হুতাশকারী' ও 'কৃপণ' বলে।

'বিপদ তাকে স্পর্শ করলে সে হয় হা-হুতাশকারী' অর্থ বিপদে সে ধৈর্য ধারণ করে না। হয়ে যায় অসহিষ্ণু ও অকৃতজ্ঞ। 'আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে হয় অতিকৃপণ' অর্থ সে ব্যয় করে না আল্লাহ্র পথে, যখন তার অবস্থা থাকে স্বচ্ছল। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দু'টি উপত্যকা ভর্তি সম্পদও যদি কারো হস্তগত হয়, তবুও সে কামনা করবে আর একটি। মানুষের লোভের উদর পরিপূরিত হতে পারে কেবল মৃত্তিকা দ্বারা। আর যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্মুখী হয়ে যায়, আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মানুষ বৃদ্ধ হতে থাকে, কিন্তু দু'টি বিষয় হতে থাকে উত্তরোত্তর যুবক— বিত্তপ্রীতি ও দীর্ঘ আয়ুর আশা। বোখারী, মুসলিম।

সূরা মাআ'রিজ্ব ঃ আয়াত ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ
فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ
يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم
مُّشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

www.eelm.weebly.com

اَيۡمَانُهُمۡ فَاِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُوۡمِيۡنَ ﴿۳۰﴾ فَمَنِ ابۡتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡعٰدُوۡنَ ﴿۳۱﴾

q তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত,
q যাহারা তাহাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত,
q আর যাহাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রহিয়াছে
q যাচঞাকারী ও বঞ্চিতের,
q এবং যাহারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলিয়া জানে।
q আর যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত—
q নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি হইতে নিঃশংক থাকা যায় না—
q এবং যাহারা নিজেদের যৌন অংগকে সংযত রাখে,
q তাহাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত, ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না—
q তবে কেহ ইহাদিগকে ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা হইবে সীমালংঘনকারী—

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত'। একথার অর্থ— অস্থিরচিত্ততা, হতাশা ও কার্পণ্য থেকে মুক্ত থাকতে পারে কেবল তারা, যারা কেবল আল্লাহ্র সন্তোষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে যথানিয়মে সুসম্পন্ন করে তাদের নামাজ। এখানে 'মুসল্লী' (নামাজী) অর্থ পূর্ণ ইমানদার। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'মা কানাল্লহু লিইয়ুদ্বিআ' ইমানাকুম'। সেখানে আবার 'ইমান' অর্থ নামাজ। কেননা বিশ্বাসীগণকে মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে পারে নামাজ। সে কারণেই হাদিস শরীফে নামাজকে বলা হয়েছে 'মেরাজ' ও 'ধর্মের স্তম্ভ'। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহঃ বলেছেন, মানুষের সম্ভাব্য মর্যাদাগুলোর মধ্যে নামাজই সর্বশ্রেষ্ঠ।

মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির বিবরণ দেওয়া শুরু হয়েছে এখানে ১৯ সংখ্যক আয়াত থেকে। বর্ণনা শুরু করা হয়েছে 'ইন্নাল ইনসান' বলে। এখানে 'আল ইনসান' এর 'আলিফ লাম' জাতিবাচক। শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনার্থক। সেকারণেই আলোচ্য আয়াতে বহুবচনের উল্লেখ— 'মুসল্লী' না বলে বলা হয়েছে 'মুসাল্লীন'। আর 'ইল্লা' (ব্যতীত) ব্যতিক্রমীটি এখানে মিলনান্তক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— প্রকৃতিগতভাবে মানুষ অস্থিরচিত্ত, হা-হুতাশকারী ও কৃপণ। তবে বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদের মনোভাব ও আচার-আচরণ নির্মল ও পরিশোধিত। কেননা তারা নামাজ ও অন্যান্য সৎকর্মের দ্বারা প্রধানতঃ আল্লাহ্র সন্তোষকামনাতেই থাকেন বিভোর। তাদের কাছে পরকাল ইহকালের চেয়ে মূল্যবান। তাই চঞ্চল্য, কার্পণ্য ও লালসা তাদেরকে স্পর্শ করতে পারেই না। তারা নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী, দুঃখের সময় ধৈর্যধারণকারী এবং সুখের সময় কৃতজ্ঞচিত্ততার সঙ্গে আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয়কারী। এই ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতাই অবশেষে তাদেরকে নিয়ে যাবে জান্নাতে।

www.eelm.weebly.com

হাবীব সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীদের কর্মকাণ্ড বিস্ময়কর। তাদের প্রতিটি কর্মই কল্যাণার্জক। তারা দুঃখে ধৈর্যধারণকারী এবং সুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। তাই তাদের জীবনের সম্পূর্ণ পরিসর কল্যাণমণ্ডিত। এমতো বক্তব্যের অনুকূল ওই আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে 'সকল মানুষ রয়েছে ধ্বংসের মধ্যে, তারা ব্যতীত, যারা বিশ্বাস করে, সত্যাধিষ্ঠিত থাকে এবং অবলম্বন করে ধৈর্য'।

অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'ইল্লা' (ব্যতীত) ব্যতিক্রমীটি পার্থক্য নির্ণায়ক। আর ১৯ সংখ্যক আয়াতের 'আল ইন্‌সান' সীমিতার্থক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যে ব্যক্তি সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, সে-ই জন্মগতভাবে থাকে অস্থিরচিত্ত, সংকীর্ণচেতা, লোভী। বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা কখনো এরকম নয়। তারা নামাজ আদায় করে, এখতিয়ার করে সবর এবং শোকর। উল্লেখ্য, এরকম হয় আসলে প্রত্যেকের উৎসস্থলের (মাব্‌দায়ে তাইয়ুনের) প্রভাবে। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহঃ বলেছেন, আল্লাহ্‌র নামসমূহই হচ্ছে তাদের উৎসস্থল এবং তাদের প্রতিপালনকারী হচ্ছে আল্লাহ্‌র গুণসমূহ। যেমন 'হাদী' (হেদায়েত দানকারী) হচ্ছে বিশ্বাসীদের উৎসস্থল। আর অবিশ্বাসীদের উৎসস্থল হচ্ছে 'আল মুদ্বিল্‌লু' (পথভ্রষ্টকারী)। প্রত্যেকের পার্থিব জীবনে প্রতিভাসিত হয় তাদের আপন আপন উৎসস্থলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। তাই এখানে কেউ হয় ইমানদার, কেউ কাফের।

রসুল স. বলেছেন, মানবজাতি যেনো বিভিন্ন খনি। খনি হয় সোনা, চাঁদি ও অন্যান্য অনেককিছুর। তাই মূর্খতার যুগে যে শ্রেষ্ঠ, ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামী যুগেও সে উত্তম।

মাতা মহোদয়া আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ কিছুসংখ্যক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জান্নাতের জন্য। তারা জান্নাতপ্রাপ্তির যোগ্যতাসম্পন্ন থাকে তাদের পিতৃপৃষ্ঠের অবস্থানের সময়েই। আবার কিছুসংখ্যক মানুষকে তিনি বানিয়েছেন জাহান্নামের জন্য। তারাও তাদের পিতৃপৃষ্ঠে থাকতেই যোগ্যতাধারী হয় জাহান্নামের। মুসলিম। এধরনের কথা বলা হয়েছে আরো অনেক হাদিসে। যেমন— ১. যদি তোমাকে বলা হয়, অমুক পাহাড় স্থানচ্যুত হয়েছে, তবুও তা হয়তো হবে বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু যদি শোনো, অমুক ব্যক্তি তার স্বভাব বদলিয়েছে, তবে তা বিশ্বাস কোরো না। ২. কেউ কেউ সারাজীবন ধরে সম্পাদন করে চলে জান্নাতানুকূল কর্ম। এভাবে এমন অবস্থায় সে পৌঁছে যে, জান্নাত ও তার মধ্যে ব্যবধান থাকে মাত্র এক বিঘত। এমতাবস্থায় তকদীর তার উপরে প্রবল হয়। ফলে সে এমন অপকর্ম করে, যার ফলে পণ্ড হয়ে যায় তার সকল পুণ্যকর্ম। শেষে সে পৃথিবী পরিত্যাগ করে জাহান্নামের উপযোগী হয়ে। আবার কিছুসংখ্যক লোক সারা জীবন ধরে অপকর্ম করে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, তার এবং জাহান্নামের মধ্যে পার্থক্য থাকে মাত্র এক বিঘত। হঠাৎ

www.eelm.weebly.com

তকদীর তাকে প্রভাবান্বিত করে। ফলে সে শুরু করে শুভজীবন এবং সে পৃথিবী থেকে চলে যায় জান্নাতে গমনের যোগ্য হয়ে। উল্লেখ্য, তকদীরের ভালো-মন্দের উপরে বিশ্বাস রাখার নাম ইমান।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত'। একথার অর্থ— যারা নামাজে তাদের দৃষ্টিকে নিয়ত নিবদ্ধ রাখে সেজদার স্থলে, আর হৃদয়কে একাগ্র রাখে কেবল আল্লাহ্‌র দিকে। সুরা মু'মিনুনের এক আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন, 'যারা তাদের নামাজে থাকে বিনয়াবনত'। ৩৪ সংখ্যক আয়াতেও বলা হয়েছে 'এবং নিজেদের সালাতে যত্নবান'। কিন্তু সেখানকার বক্তব্য ভিন্ন। এখানে বলা হয়েছে নামাজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা সাধন করার কথা। 'সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত' থাকার মর্মার্থ— এটাই।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, আবুল খায়ের একবার হজরত উকবা ইবনে আমেরকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মান্যবর রসুল সহচর! 'সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত' আয়াতখানির মর্মার্থ কী? তিনি বললেন, যে নামাজ পাঠকালে সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে তাকায় না। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ। হজরত আবু জর সূত্রে দারেমী সংকলন করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নামাজী যতক্ষণ নামাজে মনোনিবদ্ধ রাখে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ও সরাসরি তার দিকে লক্ষ্য রাখেন। যখন সে তার মনোযোগ ছিন্ন করে, তখন আল্লাহ্‌ও ফিরিয়ে নেন তার বিশেষ দৃষ্টি। 'সুনানে কবীর' গ্রন্থে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. আমাকে এই মর্মে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, আনাস! নামাজে তোমার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখো সেজদার স্থানে। হজরত আনাস থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নামাজ পাঠকালে এদিক সেদিক লক্ষ্য করার অর্থ নামাজকে বিনষ্ট করা। উল্লেখ্য, একাগ্রচিত্ততাসহ নামাজ পাঠের অনুষঙ্গ হিসেবে সেজদার স্থলে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার বিষয়টি অত্যন্ত মূল্যবান।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে (২৪) যাচনাকারী ও বঞ্চিতের'(২৫)। একথার অর্থ— তারা সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত তো থাকেই, তদুপরি পরিপূরণ করে যাচনাকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার। অর্থাৎ জাকাত গ্রহিতাদের যে প্রাপ্য তার সম্পদের মধ্যে রয়েছে, সে প্রাপ্য যে পরিশোধ করে যথারীতি।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'এবং যারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে (২৬)। আর যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত—(২৭) নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের শাস্তি থেকে নিঃশংক থাকা যায় না' (২৮)। একথার অর্থ— আর তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, মহাবিচারের দিবসে প্রত্যেককে তাদের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবেই। সেকারণেই তো তারা পার্থিব দুখ-সুখে চঞ্চল ও কৃপণ হয় না। ধারণ করে ধৈর্য, পালন করে কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ্‌র

www.eelm.weebly.com

অসন্তোষ ও শাস্তির ভয়ে এখন থেকেই সুসম্পন্ন করতে থাকে নামাজ-জাকাত ও অন্যবিধ নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাদি। কেননা তারা একথাও ভালোভাবে জানে ও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সতত স্বাধীন অভিপ্রায়ধারী। সকল প্রকার মুখাপেক্ষিতা থেকেও তিনি চিরপবিত্র। সুতরাং যারা বিশ্বাসী ও জ্ঞানী, তারা কিছুতেই তার কৃত পুণ্যকর্মের উপরে নির্ভরশীল হতে পারে না। হতে পারে না তাঁর অসন্তোষ ও শাস্তির ব্যাপারে নিঃশঙ্কচিত্ত।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'এবং যারা নিজেদের যৌনঅঙ্গকে সংযত রাখে (২৯), তাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না—(৩০) তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী' (৩১)।

এখানকার 'ফুরূজ' শব্দটি 'ফরজ' এর বহুবচন। এর অর্থ পুরুষ ও নারীদের যৌন অঙ্গ। যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে অর্থ নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে রতিকর্ম সম্পাদন করে না, করে বৈধভাবে। আপন স্ত্রী অথবা নিজস্ব ক্রীতদাসীর সঙ্গে।

'ইল্লা আ'লা আয্ওয়াজ্বিহিম আও মা মালাকাত আইমানুহুম' অর্থ তাদের পত্নী অথবা অধিকারভূত দাসী ব্যতীত। ব্যতিক্রমীটি এখানে পার্থক্যসূচক। আর 'আ'লা' (উপর) অব্যয়টি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'মিন' (হতে) অর্থে। এভাবে বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত হবে আগের 'সংযত রাখে' কথাটির সঙ্গে। যেমন বলা হয়— 'আহ্ফিজ আ'লা ইনানি ফারাসী' (আমার ঘোড়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকো)। এখানে 'আ'লা' ব্যবহৃত হয়েছে 'মিন' অর্থে। অথবা 'আ'লা আয্ওয়াজ্বিহিম' বাক্যটি এখানে অবস্থা প্রকাশক। আর 'আ'লা' এখানে স্বঅর্থেই ব্যবহৃত। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা সর্বাবস্থায় তাদের লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে। ব্যতিক্রম কেবল স্বামী ও স্ত্রী। কেননা স্বামী-স্ত্রীর রতিবিহার বৈধ।

মানুষ বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টি, সে মুক্ত হোক, অথবা হোক ক্রীতদাস। সেকারণে আরবী ভাষায় মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় 'মান' সর্বনামটি। কিন্তু দেখা যায় ক্রীতদাসীর ক্ষেত্রে এখানে সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়েছে 'মা'। অথচ 'মা' সর্বনাম ব্যবহার করা হয় বিবেকহীন সৃষ্টির ক্ষেত্রে। এরকম করার কারণ হচ্ছে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীরা বিবেকসম্পন্ন হলেও স্বাধীন নয়। সেদিক থেকে তারা বিবেকহীন সৃষ্টির মতোই। তাদেরকে জীবনযাপনও করতে হয় তাদের মালিকের ইচ্ছায়। 'তারা হবে সীমালংঘনকারী' অর্থ স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে রতিকর্ম করলে তা হবে অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কেননা তা স্পষ্টতই শরিয়ত লংঘন। আর এখানে 'মালাকাত' কথাটির অর্থ করা হয়েছে কেবল ক্রীতদাসী, ক্রীতদাস নয়। কেননা ক্রীতদাসকে সম্ভোগ করা যায় না। এ সম্পর্কে যথাব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে সুরা বাকারায় 'ইয়াসআলূনাকা আনিল মাহিদ্ব' আয়াতের তাফসীরে।

www.eelm.weebly.com

একটি জিজ্ঞাসা ঃ 'মা মালাকাত আইমানুহুম' কথাটির অন্তর্ভুক্ত ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী উভয়েই। সুতরাং বুঝতে হবে উভয়কে কাজকর্মে ব্যবহার করা বৈধ। তাহলে হাদিস কিংবা কিয়াসের মাধ্যমে কথাটির অন্যরকম ব্যাখ্যা করা হবে কেনো? কেনো বলা হবে, ক্রীতদাসী সম্ভোগ্যা, অথচ ক্রীতদাস সম্ভোগ্য নয়?

জবাব ঃ আলেমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, আলোচ্য আয়াত সাধারণার্থক নয়, বিশেষার্থক। তাছাড়া স্ত্রী ও ক্রীতদাসীকেও তো সব সময় সম্ভোগ করা যায় না। যেমন ঋতুবতী অবস্থায়, জেহার অবস্থায়। দুধ সম্পর্কীয় ক্রীতদাসীর সঙ্গেও সহবাস অসিদ্ধ। এ সকলক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে একক বর্ণিত হাদিস ও কিয়াস (তুল্যমূল্যতা) দ্বারা। কোরআনের সাধারণ বিধানকে এভাবে সুনির্দিষ্ট করা সিদ্ধ। আবার মহিলা মালিকও তার ক্রীতদাসের সম্ভোগ্যা হতে পারবে না। কেননা তা হবে এখানকার 'আ'লা' (উপরে) কথাটির বিপরীত। অর্থাৎ মনিবের মর্যাদা সব সময় গোলামের উপরেই থাকবে, নিচে কখনোই নয়।

'ফাইন্নাহুম গইরু মালূমীন' অর্থ এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। অর্থাৎ স্ত্রী ও ক্রীতদাসীকে সম্ভোগ করা নিন্দনীয় তো নয়ই, বরং প্রশংসনীয়। তবে এমতাবস্থাতেও তাদেরকে হতে হবে ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসবপরবর্তী অপবিত্রতা (নেফাস) থেকে পবিত্র।

'তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী' অর্থ স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য কোনো নারীকে কামসহচরীরূপে কামনা যদি কেউ করে, সে অবশ্যই শরিয়তের দৃষ্টিতে হবে অপরাধী। রসুল স. বলেছেন, পর নারী দেখে যদি কেউ চঞ্চল হয়ে পড়ে, তবে তার উচিত তৎক্ষণাৎ আপন পত্নীর সঙ্গে মিলিত হওয়া। কেননা তার কাছে যা আছে, তা আছে এর কাছেও। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারেমী।

একটি পর্যালোচনা ঃ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আরো প্রমাণিত হয়, মুতআ (সাময়িক বিবাহ) অবৈধ। কেননা এধরনের রমণী স্ত্রী ও ক্রীতদাসী কোনোটাই নয়। স্ত্রী হলে তার সন্তানেরা তাদের পিতার সম্পত্তির অংশীদার হতো। কিন্তু তাতো তারা হয় না। যারা মুতআকে সিদ্ধ বলে, তাদের মতেও হয় না। সুতরাং মুতআকৃত রমণী স্ত্রী নয়, ক্রীতদাসীও নয়। অতএব মুতআ নাজায়েয।

আলোচ্য আয়াত থেকে বাগবী এই প্রমাণটিও উদ্ধার করেছেন যে, হস্তমৈথুনও অবৈধ। অন্যান্য আলেমও এরকম বলেন। আতার উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে জুরাইজ বলেছেন, হস্তমৈথুন মাকরূহ্। আতা এরকমও বলেছেন যে, আমি শুনেছি, কিছুসংখ্যক লোক মহাবিচারের দিবসের মহাসমাবেশে উপস্থিত হবে গর্ভবতী হস্ত নিয়ে। আমার মনে হয়, তারাই হস্তমৈথুনকারী। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আল্লাহ্পাক ওই লোকদেরকে শাস্তি দিবেন, যারা তাদের লজ্জা স্থান নিয়ে খেলা করে। আমি বলি, এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আনাস থেকে। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, যে স্বীয় হস্তের সঙ্গে বিবাহকর্ম করে, সে

www.eelm.weebly.com

অভিসম্পাতগ্রস্ত। ইজদী হাদিসটি সংকলন করেছেন তাঁর ‘জুয়াফা’ গ্রন্থে। ইবনে জাওজী তাঁর ‘জুযীয়াত’ গ্রন্থে হাসান ইবনে আরাফা সূত্রে উল্লেখ করেছেন, সাত ধরনের ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ সদয় দৃষ্টি দিবেন না। তন্মধ্যে এক ধরনের হচ্ছে হস্তমৈথুনকারী। অবশ্য বর্ণনাটির সূত্রপ্রবাহ শিথিল।

সূরা মাআ’রিজ্ব ঃ আয়াত ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝٣٢ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ۝٣٣ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝٣٤ اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۝٣٥

r এবং যাহারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে,
r আর যাহারা তাহাদের সাক্ষ্যদানে অটল,
r এবং নিজেদের সালাতে যত্নবান—
r তাহারাই সম্মানিত হইবে জান্নাতে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে’। আমানত রক্ষা করার অর্থ গচ্ছিত বস্তু যথাযথভাবে তার মালিককে ফেরত দেওয়া। আল্লাহ্‌র দেওয়া আমানতও রক্ষা করতে হয় মানুষকে। তাঁর বিধানও আমানত। সুতরাং তাদেরকে নামাজ-রোজা, হজ-জাকাত যেমন পালন করতে হবে, তেমনি বিরত থাকতে হবে আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে। আমাদের অস্তিত্ব অঙ্গ-প্রতঙ্গ-শরীর-আত্মা এ সকলকিছুও আল্লাহ্‌র দেওয়া আমানত। সুতরাং এসকলকিছুকেও সতত রাখতে হবে তাঁর সন্তোষ ও স্মরণানুকূল। পরিতুষ্ট থাকতে হবে তিনি যেভাবে রাখেন, সেভাবেই। বিপদে অবলম্বন করতে হবে ধৈর্য এবং সচ্ছলতায় কৃতজ্ঞতা। মানুষের পারস্পরিক লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদির বেলাতেও আমানত রক্ষা করা অত্যাবশ্যক।

‘প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে’ অর্থ তারা যেমন পূরণ করে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার, তেমনি পরিপূরণ করে মানুষের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিও। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকার অর্থ ওই অঙ্গীকার যা সম্পাদিত হয়েছিলো রূহের জগতে, পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে। আল্লাহ্ তখন বলেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভুপালনকর্তা নই? সকলে বলেছিলো, অবশ্যই। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পর্যায়েও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলা অত্যাবশ্যক। উল্লেখ্য, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করা কপটাচারীদের বৈশিষ্ট্য। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুনাফিকদের স্বভাববৈশিষ্ট্য তিনটি— মিথ্যা বচন, প্রতিশ্রুতি চূর্ণন, গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাত। মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— যদিও সে নামাজ-রোজা করে এবং দাবি করে, সে মুসলমান।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, চারটি অপবৈশিষ্ট্য যার মধ্যে রয়েছে, সে অবশ্যই মুনাফিক। একটি পাওয়া গেলে সে মুনাফিক এক চতুর্থাংশের, যতোক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করবে। ওই চারটি অপবৈশিষ্ট্য হচ্ছে— মিথ্যাবাদিতা, আমানতের খেয়ানত, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, অশ্লীল কথন।

আবু দাউদ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবীল হুমাম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন রেসালতের দায়িত্ব পাননি, তখন তাঁর সঙ্গে আমার ক্রয়-বিক্রয় হতো। একবার একস্থানে তাঁকে আমি বললাম, অপেক্ষা করুন, আমি একটু পরেই ফিরে এসে আপনার পাওনা পরিশোধ করে দিবো। আমি বাড়িতে এসে কথাটা ভুলেই গেলাম। মনে পড়লো তিন দিন পর। আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম রসুল স.কে। তিনি স. শুধু বললেন, তুমি আমাকে কষ্ট দিলে। তিনদিন ধরে আটকে রাখলে।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'আর যারা তাদের সাক্ষ্যদানে অটল'। এখানে 'সাক্ষ্যদানে অটল' অর্থ যারা সাক্ষ্যের মধ্যে কোনো রদবদল ঘটায় না, সাক্ষ্য গোপন করে না আংশিক কিংবা সামগ্রিকভাবে। সাক্ষ্যেরও রয়েছে দু'টি দিক— একটি সম্পৃক্ত আল্লাহ্র আধিকারের সঙ্গে এবং অপরটি অধিকারের সঙ্গে বান্দার। যেমন আল্লাহ্র এককত্বজ্ঞাপক সাক্ষ্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্', রেসালতের সাক্ষ্য 'মুহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্'; চাঁদ দেখার সাক্ষ্য, আল্লাহ্র কোনো বিধান কার্যকর করা সম্পর্কিত সাক্ষ্য ইত্যাদি। আর বান্দার অধিকার সম্পৃক্ত সাক্ষ্য হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়, দেনা-পাওনা, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি বিষয়ক সাক্ষ্য। অর্থাৎ উভয়বিধ সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে যারা এমতো অটল থাকে যে, লোকনিন্দা বা লোকরঞ্জন কোনো কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না, সে সাক্ষ্য পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন এমনকি নিজেদের বিরুদ্ধে গেলেও।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'এবং নিজেদের সালাতে যত্নবান'। একথার অর্থ— আর যারা নামাজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ সৌন্দর্যের প্রতি থাকে সতত সতর্ক। নামাজ পাঠ করে একাগ্রচিত্তে, সঠিক সময়ে, ফরজ, সুন্নত, মোস্তাহাব সকল নিয়মকানুনের যথাবাস্তবায়নসহযোগে। উল্লেখ্য, এখানে নামাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে দু'বার। একবার ২২ সংখ্যক আয়াতে এবং আর একবার আলোচ্য আয়াতে। দুই স্থানে আলোচনার ধরন পৃথক। আর বারংবার বিষয়টি উল্লেখ করাতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের অন্যান্য স্তম্ভ অপেক্ষা নামাজই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে'। একথার অর্থ— এতোক্ষণ ধরে যে সকল শুভ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হলো, সে সকল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যারা, তারাই চিরসুখময় জান্নাতে হবে সম্মানিত।

www.eelm.weebly.com

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ
الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿٣٧﴾ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ
نَعِيْمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا ۖ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ
الْمَشٰرِقِ وَ الْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿٤٠﴾ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٤١﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَ يَلْعَبُوْا حَتّٰى
يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ
سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ
تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٤﴾

q কাফিরদের হইল কি যে, উহারা তোমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে

q দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে, দলে দলে।

q উহাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, তাহাকে দাখিল করা হইবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে?

q কখনো না, আমি উহাদিগকে যাহা হইতে সৃষ্টি করিয়াছি তাহা উহারা জানে।

q আমি শপথ করিতেছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির— নিশ্চয়ই আমি সক্ষম

q উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানবগোষ্ঠীকে উহাদের স্থলবর্তী করিতে এবং ইহাতে আমি অক্ষম নহি।

q অতএব উহাদিগকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকিতে দাও, যে দিবস সম্পর্কে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল, তাহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

q সেদিন উহারা কবর হইতে বাহির হইবে দ্রুতবেগে, মনে হইবে উহারা কোন কোন উপাসনালয়ের দিকে ধাবিত হইতেছে

q অবনত নেত্রে; হীনতা উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে; ইহাই সেই দিন, যাহার বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছিল উহাদিগকে।

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফা মা লিল্ লাজীনা কাফারূ'। এর অর্থ কাফেরদের কী হলো? তারা এমন করছে কেনো? এখানকার 'ফামা' কথাটির 'ফা' অব্যয়টি কারণপ্রকাশক। আর 'মা' প্রশ্নবোধক। এভাবে কথাটির মাধ্যমে এখানে শাসানো হয়েছে মক্কার পৌত্তলিকদেরকে। বাগবী লিখেছেন, তাদের একটি দল ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে রসুল স. এর কোরআন পাঠ শুনতে আসতো। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিলো অশুভ। তাই মনোযোগী তারা হতো না। বরং কোরআন নিয়ে করতো নানাপ্রকার ব্যঙ্গ-কৌতুক। তাদেরকে ধমক দেওয়ার জন্যই এখানে বলা হয়েছে কী হলো তাদের? আল্লাহ্‌র বাণী ও তাঁর রসুলের সঙ্গে তারা এমন আচরণ করছে কোন সাহসে?

এরপর বলা হয়েছে— 'ক্বিবালাকা মুহ্‌ত্বিয়ীন' (তারা বুক টান টান তোমার দিকে ছুটে আসছে)। 'মুহ্‌ত্বিয়ীন' অর্থ উন্নত মস্তকে বুক টান টান করে ছুটে আসা। এরকম বলেছেন বাগবী। আর 'কামুস' রচয়িতা লিখেছেন, 'হাত্বুআ' 'হাত্বাআ' এবং 'হাত্বআ'ন' অর্থ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কোনো নিদিষ্ট দিকে লক্ষ্য করে অতিদ্রুততার সঙ্গে ছুটে আসা। আর 'আহত্বাআ' অর্থ ছুটে আসা বুক টান টান করে উন্নাসিকতার সঙ্গে।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'দক্ষিণ ও বাম দিক থেকে, দলে দলে'। এখানকার 'ই'যীন' বহুবচন 'ই'যাতুন' এর। এর অর্থ পৃথক পৃথক বসতি, ডান ও বাম দিকের সকল জনপদ। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, 'ই'যাতুন' অর্থ দলবদ্ধ মানুষ।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'তাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, তাকে দাখিল হতে হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে'?

মক্কার মুশরিকেরা পরকাল— বেহেশত-দোজখ এসকল কিছু বিশ্বাসই করতো না। আবার কখনো কখনো বলতো, পরকাল যদি থাকেও, তবে সেখানেও আমরা হবো এখানকার মতো ধনাঢ্য, কুলীন ও প্রতাপশালী। সুতরাং জান্নাত থাকলে সে জান্নাতও থাকবে আমাদেরই অধিকারে। তাদের এমতো অপবচনের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এখানে স্পষ্ট করে এই প্রশ্নটি করা হয়েছে যে, জান্নাতপ্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন ইমান ও সৎকর্ম। সুতরাং এপথের বিরোধিতা করে জান্নাত লাভের আশা করা কি ঠিক? এখানে 'হামযা' অক্ষরটি প্রশ্নটিকে করেছে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'কখনো না, আমি তাদেরকে যা থেকে সৃষ্টি করেছি, তা তারা জানে'। একথার অর্থ— তারা যা কামনা করে, তা দুরাশামাত্র। কখনোই তা বাস্তবায়িত হবে না। তারা তো জানেই যে, এক ফোঁটা অপবিত্র পানি থেকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদেরকে। ওই অনুল্লেখ্য সলিলবিন্দুটুকুর কী মর্যাদা রয়েছে যে, সে দাবি করতে পারে জান্নাতের। হ্যাঁ দাবি করতে পারতো, যদি ইমান আনতো এবং যাপন করতো সৎকর্মশোভিত জীবন। কিন্তু তা তো তারা করেনি। সুতরাং জান্নাত তাদের জন্য চিরনিষিদ্ধ। এখানে 'কাল্‌লা' অর্থ কখনো নয়। অর্থাৎ অংশীবাদীদের জান্নাতগমনের ঘটনা কস্মিনকালেও ঘটবে না।

www.eelm.weebly.com

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত বিশার ইবনে জাহাশ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার তাঁর হাতের তালুতে তাঁর মুখের সামান্য পরিমাণ থুথু নিয়ে বললেন, আল্লাহ্ বলেন, হে আদম সন্তান! তোমরা আমার পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দিতে পারবে কীভাবে? তোমাদেরকে তো আমি গঠন করেছি এমনি এক তুচ্ছ বস্তু থেকে। তারপর দিয়েছি আকৃতি, প্রকৃতি, শরীর, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য। এরপর তুমি বড় হলে। হলে বস্ত্রাবৃত। শুরু করলে উপার্জন। কুক্ষিগত করলে সম্পদ। এরপর প্রাণপাখি যখন তোমার দেহপিঞ্জর ছেড়ে চলে যাবে, তখন তো আসতেই হবে আমার সকাশে। তখন মহাসত্যের স্বীকৃতি প্রদান করা ছাড়া তোমাদের কোনো গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু কী লাভ হবে তখন আমাকে স্বীকার করে। তখন ইমান গ্রহণ ও সৎকর্ম সম্পাদনের সময় নয়। তখন তো দেওয়া হবে সকলের কৃতকর্মসমূহের যথাপ্রতিফল।

অথবা আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে এরকম— ইমান ও সৎকর্ম ব্যতিরেকে কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে, এরকম তো কখনো হতে পারেই না। একথা তো তোমরা ভালো করেই জানো? জানো না? আমি তো বলেই দিয়েছি— আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল এই উদ্দেশ্যে যে, তারা কেবল আমার ইবাদত করবে। হবে আমার পরিচয়ধন্য। সুতরাং এ পৃথিবীতে ইমান ও শুভ আমলসহ জীবন যাপন করা তো তোমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এ কর্তব্য পালন ব্যতিরেকে তোমরা জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে কি? নিশ্চয় না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির— নিশ্চয়ই আমি সক্ষম (৪০) তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানবগোষ্ঠীকে উহাদের স্থলবর্তী করিতে এবং ইহাতে আমি অক্ষম নই' (৪১)। এখানে 'উদয়াচল ও অস্তাচল' অর্থ নক্ষত্রপুঞ্জের, অথবা সূর্য-চন্দ্রের উদয়স্থল ও অস্তস্থল। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে মানুষ! আমিই উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতি। একক অধীশ্বর সমগ্র সৃষ্টির। সুতরাং আমি শপথ করে বলছি— কোরআন আমার বাণী এবং মোহাম্মদ মোস্তফা আমারই রসুল। তোমরা একথা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করো। তাহলেই হতে পারবে জান্নাতবাসী। কেনো গর্ব করো? কেনো প্রদর্শন করো উন্নাসিকতা। তোমাদের জীবন-মৃত্যু-জীবনোপকরণ সবকিছুই তো আমার অভিপ্রায় ও ক্ষমতার অধীন। আমি তো ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি। তদস্থলে সৃষ্টি করতে পারি এমন মানবগোষ্ঠীকে, যারা হবে তোমাদের চেয়ে উত্তম। যারা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিবে আমার বাণী ও আমার বার্তাবাহককে। তোমরা কি জানো না, অক্ষমতার স্পর্শ থেকে আমি চিরমুক্ত, চিরপবিত্র।

এরপরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'অতএব তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া- কৌতুকে মত্ত থাকতে দাও, যে দিবস সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিলো, তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম

www.eelm.weebly.com

রসুল! আপনি যখন জানেনই যে, আমি সতত-স্বাধীন অভিপ্রায়ধারী, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, তখন অংশীবাদীদের শাস্তিদানের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আমার উপরে ছেড়ে দিন। আমি তো তাদেরকে যথাসময়ে যথোপযুক্ত দণ্ডদান করবোই। আপনি ব্যাপৃত থাকুন আপনার প্রচারকর্মে। আর তাদেরকে উপেক্ষা করুন। সাময়িক যে অবকাশ আমি তাদেরকে দিয়েছি, সেই অবকাশে তারা বচসা-বিবাদ ক্রীড়া-কৌতুক এই নিয়ে মেতে থাকুক। উত্তরোত্তর বাড়তে থাকুক তাদের পাপের বোঝা। হোক তারা আরো অধিক শাস্তির উপযুক্ত।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'সেদিন তারা কবর থেকে বের হবে দ্রুতবেগে, মনে হবে তারা কোনো উপসনালয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে'। একথার অর্থ— পুনরুত্থান দিবসে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কবর থেকে উঠেই দৌড়াতে থাকবে মহাবিচারের সমাবেশ স্থলে, যেমন করে তারা পৃথিবীতে তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর দিকে ধাবিত হয়, কে কার আগে ভক্তি জানাবে, সেই উদ্দেশ্যে। তবে এমতো কর্ম তারা করে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে, কিন্তু তখন তারা এরকম করবে ভয়ে, বাধ্য হয়ে। এভাবেই তখন মহাশাস্তিকে অভ্যর্থনা জানাতে বাধ্য হবে তারা। কালাবী এখানকার 'নুসুব' শব্দটির অর্থ করেছেন— পতাকা, কেতন। অর্থাৎ সেনাবাহিনী যেমন তাদের পতাকাতলে একত্রিত হয়, তেমনি তারা তখন সমবেত হবে মহাসমাবেশস্থলে।

শেষোক্ত আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'অবনত নেত্রে; হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে; এটাই সেই দিন, যার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিলো তাদেরকে'। এখানে 'খশিয়াতান আব্সরুহুম' অর্থ অবনত নেত্রে, যেরকম নত দৃষ্টিতে অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকে লাঞ্ছিত অপরাধীরা। তাই পরক্ষণেই বলা হয়েছে 'হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে'। আর 'এটাই সেই দিন, যার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিলো তাদেরকে' বাক্যটি পূর্বোক্ত বাক্যকে দৃঢ়তা প্রদানকারী, অথবা বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

সূরা নূহ

এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যধাম মক্কায়। সুরাখানি ২ রুকু এবং ২৮ আয়াতবিশিষ্ট।

সূরা নূহ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ○

اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنَا نُوۡحًا اِلٰى قَوۡمِهٖۤ اَنۡ اَنۡذِرۡ قَوۡمَكَ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ يَّاۡتِيَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ﴿۱﴾ قَالَ يٰقَوۡمِ اِنِّىۡ لَـكُمۡ نَذِيۡرٌ مُّبِيۡنٌ ﴿۲﴾

www.eelm.weebly.com

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اتَّقُوْهُ وَ اَطِيْعُوْنِ ۙ﴿۳﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۴﴾

r নূহ্‌কে আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি এই নির্দেশসহ ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাহাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসিবার পূর্বে।

r সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী—

r 'এই বিষয়ে যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর ও তাঁহাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর;

r 'তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে উহা বিলম্বিত হয় না; যদি তোমরা ইহা জানিতে!'

প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে নিশ্চিতার্থক শব্দ 'ইন্‌না'। এভাবে এখানে গুরুত্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে নবী নুহ ও তাঁর সম্প্রদায়ের বৃত্তান্তের। তারপর বলা হয়েছে— 'নুহকে আমি প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি'। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, নবী নুহকে প্রেরণ করা হয়েছিলো কেবল তাঁর সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শনার্থে। অর্থাৎ তাঁর নবুয়ত সার্বজনীন ছিলো না। একথার সমর্থনে রয়েছে হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমাকে দান করা হয়েছে এমন পাঁচটি বিশেষত্ব, যা আমার পূর্বের কোনো নবী পাননি। যেমন— ১. আমার শত্রুরা এক মাসের পথের সমান দূরে থেকেও আমার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে ২. পৃথিবীর সকল স্থানের মৃত্তিকাকে আমার জন্য করা হয়েছে মসজিদ, তাই আমার উম্মত পৃথিবীর যে কোনো স্থানে নামাজ পাঠ করতে পারে ৩. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে কেবল আমার ও আমার উম্মতের জন্য ৪. আমাকে দেওয়া হয়েছে মহাশাফায়াতের অধিকার ৫. পূর্ববর্তী নবীগণকে পাঠানো হয়েছিলো তাঁদের আপন আপন সম্প্রদায়ের লোকদের পথপ্রদর্শনার্থে। আর আমি প্রেরিত হয়েছি বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শনের জন্য। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে ছয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা। সেখানে আবার শাফাআতের উল্লেখ নেই। তৎপরিবর্তে বলা হয়েছে— আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র সৃষ্টির জন্য। আর আমাতেই সমাপ্ত করা হয়েছে নবুয়তের প্রবাহ।

এখানকার 'আরসালনা' (আমি প্রেরণ করেছিলাম) কথাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে 'এই নির্দেশসহ' বা 'একথা জানাতে' বক্তব্যটি। সেই নির্দেশনাটি বা কথাটি পরক্ষণে ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে— 'তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক করো তাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসবার পূর্বে'। অর্থাৎ আমি নবী নুহকে এই মর্মে

www.eelm.weebly.com

নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে অংশীবাদিতা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলো। তৎসহ একথা বলে সতর্ক করে দাও যে, ইমান না আনলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ইহ-জাগতিক ও পারলৌকিক শাস্তি— মহাপ্লাবন ও নরক। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'আন্' অব্যয়টি এখানে ধাতুমূল। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে একটি উহ্য বাক্য 'আমি বলেছিলাম'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি নুহকে বলেছিলাম, তুমি তোমার স্বজাতিকে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করো।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী— (২) এই বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো ও তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো' (৩)। একথার অর্থ— নবী নুহ আমার নির্দেশ যথারীতি পালন করেছিলেন। বলেছিলেন, হে আমার স্বজাতি! আমি তোমাদের সুহৃদ, সতর্ককারী, পথপ্রদর্শক। সুতরাং তোমরা আমার কথা শোনো। বিগ্রহ-বন্দনা ছেড়ে দিয়ে উপাসনা করো কেবল আল্লাহ্র। ভয় করো কেবল তাঁকেই। কেননা তিনি মহাসৃজয়িতা, মহাপ্রভুপালয়িতা এবং সকলের কৃতকর্মের হিসাবগ্রহীতা।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র প্রতি ইমান আনলে এবং কেবল তাঁর উপাসনা করলে তিনি তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন। আর আমার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেও তিনি তোমাদেরকে শাস্তিদান করবেন না যথাসময় সমাগত না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু অবকাশ তোমাদেরকে যতোই দেওয়া হয়, অবশেষে তোমরা শাস্তিকবলিত হবেই। সুতরাং সতর্ক হও। এই ক্ষণে মান্য করো আমার উপদেশ।

হজরত আমর ইবনে আস বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললাম; হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! হস্ত প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করতে চাই। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তিনি স. বললেন, কী ব্যাপার আমর! হাত গুটিয়ে নিলে কেনো? বললাম, আমি একটি শর্ত আরোপ করতে চাই। তিনি স. বললেন, কী শর্ত? আমি বললাম, আমার পাপসমূহ যেনো মার্জনা করা হয়। তিনি স. বললেন, আমর! তুমি কি জানো না, ইসলাম পূর্বের পাপসমূহকে ঢেকে ফেলে। হিজরত ও হজ্ব বিলোপ করে দেয় অতীতের পাপরাশি। মুসলিম।

হজরত মুয়াজ বলেছেন, আমি রসুল স. এর বাহনে সহআরোহী ছিলাম তাঁর এক প্রবাসযাত্রায়। তিনি সামনে। আমি তাঁর পশ্চাতে। দু'জনের মধ্যে ব্যবধান ছিলো কেবল গদির কাষ্ঠখণ্ডটুকু। তিনি স. বললেন, মুয়াজ! তুমি কি জানো, আল্লাহ্র উপর বান্দার এবং বান্দার উপর আল্লাহ্র অধিকার কী? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর বার্তাবাহকই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তিনি স. বললেন,

www.eelm.weebly.com

বান্দার উপরে আল্লাহ্‌র অধিকার হচ্ছে, সে ইবাদত করবে কেবল তাঁর। অন্য কাউকে বা কোনোকিছুকে তাঁর সমকক্ষ বা অংশীদার নির্ধারণ করবে না। আর আল্লাহ্‌র উপরে বান্দার অধিকার হচ্ছে, তাঁকে যারা বিশ্বাস করে, তাদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন না। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তমজন! আমি কি জনগণকে এই শুভসমাচারটি জানাবো? তিনি স. বললেন, না। একথা জানলে তারা এটাকেই যথেষ্ট মনে করবে (আমল করবে না)। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাস থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। জ্ঞান গোপন করার অপরাধে অপরাধী হন কিনা, এই ভয়ে তাঁরা এই হাদিস প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের অন্তিম যাত্রার কিছুকাল পূর্বে।

এখানকার 'মিন জুনূবিকুম' বাক্যের 'মিন' অব্যয়টি বিবৃতিমূলক। তাই কথাটির অর্থ হবে— তিনি ক্ষমা করে দিবেন তোমাদের সকল অপরাধ। অথবা 'মিন' এখানে আংশিকার্থক। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তিনি মাফ করে দিবেন তোমাদের ওই সকল গোনাহ্, যা সম্পৃক্ত তাঁর অধিকারের সঙ্গে, কিন্তু বান্দার অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত গোনাহ্ তিনি মাফ করবেন না।

এরপর বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিতকাল উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয় না, যদি তোমরা এটা জানতে'।

প্রকাশ থাকে যে, তকদীর দুই রকমের— আল মুবরাম (অটল) এবং আল মুআ'ল্লাক (পরিবর্তনশীল)। পরিবর্তনশীল নিয়তি এরকম, যেমন— অদৃষ্ট-লিপিতে লেখা রয়েছে, বকর যদি আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত থাকে, তবে এতোদিন পর্যন্ত সে সুরক্ষিত থাকবে, আর অবাধ্য হলে বিনাশপ্রাপ্ত হবে জীবনসংহারক ঝড়ে।

শর্ত বিলুপ্ত হলেই কেবল পরিবর্তনশীল নিয়তি কার্যকর হয়। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তা বিলোপ করে দেন এবং যা ইচ্ছা করেন, তা রাখেন প্রতিষ্ঠিত'। হজরত সালমান ফারসী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দোয়া ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই নিয়তির বিধানকে টলাতে পারে না। আর আয়ু বৃদ্ধি পায় পুণ্যকর্মের দ্বারা। তিরমিজি। অটল নিয়তি সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌র বাণী কখনো পরিবর্তিত হয় না'। অবশ্য অটল নিয়তি অনুসারে যখন নির্ধারিত কাল উপস্থিত হয়, তখন তা টলটলায়মান হওয়া অসম্ভব। এরকম সিদ্ধান্তের কখনো অগ্র-পশ্চাৎ ঘটে না। আবার পরিবর্তনশীল নিয়তিও অটল হয়ে যায়, যখন বিলুপ্ত হয় তার শর্ত। তাই আল্লাহ্‌র আনুগত্যকেই আশ্রয় করা উচিত। পরিহার করা উচিত অনানুগত্য। নতুবা পরিবর্তনশীল নিয়তিও রূপান্তরিত হবে অটল নিয়তিতে। তখন আত্মরক্ষার আর কোনো উপায়ই থাকবে না।

একটি জিজ্ঞাসা ঃ আয়ু সুনির্ধারিত। তার কখনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এমনকি একজন নিহত ব্যক্তিও পূর্ণ করে তার আয়ুষ্কাল। অথচ হাদিসে বলা হয়েছে,

www.eelm.weebly.com

পুণ্যকর্ম আয়ুবৃদ্ধির উপলক্ষ। এর অর্থ কী? এখানে আয়ু বৃদ্ধি অর্থ কি আয়ুর বরকত বৃদ্ধি, না বৃদ্ধি সময়? আয়ুর হ্রাস-বৃদ্ধির এরকম ধারণাটি কি মুতাজিলাদের অভিমত সদৃশ নয়?

জবাব ঃ পথভ্রষ্ট মুতাজিলারা তো তকদীরকেই বিশ্বাস করে না। তারা তো মনে করে মানুষই তার ভালো ও মন্দ উভয় কর্মের স্রষ্টা। এ হিসেবে হন্তারক নিজেই হয়ে যায় নিহত ব্যক্তির আয়ুর নিয়ন্তা। তকদীর বলে তো তাহলে আর কোনোকিছুই থাকেই না। আমরা তো মান্য করি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমতকে— যা নির্ভুল। আমরা বিশ্বাস করি— আয়ুষ্কাল অনড়, এর মধ্যে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এটাই অটল নিয়তি। এর পরিবর্তন অসম্ভব। নিহত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে ওই অটল নিয়তি অনুসারেই। তবে হতে পারে, পরিবর্তনশীল নিয়তিতে হয়তো একথা লেখা ছিলো যে, অমুক ব্যক্তি যদি তাকে হত্যা করে, তবেই কেবল তার মৃত্যু হবে, অন্যথায় নয়। অথবা লেখা ছিলো, অমুক সময় অমুক ব্যক্তি তাকে হত্যা করবেই। বেঁচে থাকার কোনো উপায়ই সে তখন পাবে না। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে ওই হাদিসটিও আর অবোধগম্য থাকে না, যা বর্ণিত হয়েছে আবু খুজামা কর্তৃক তার পিতার মাধ্যমে এভাবে— একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি কিছু দোয়া কালাম পড়ে মানুষের রোগ নিরাময় করি। উপকৃত হই আমি নিজেও। আমার এ কাজ কি নিয়তিবিরোধী। তিনি স. বললেন, আরে ভাগ্যলিপি তো এটাই। এটাই তকদীর। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— তকদীরে লেখা রয়েছে, অমুক ব্যক্তি যদি এই নিয়মে অমুকের চিকিৎসা করে, তবে সে আরোগ্য লাভ করবে।

'লাও কুনতুম তা'লামূন' অর্থ যদি তোমরা এটা জানতে। অর্থাৎ যদি তোমরা একথা বুঝতে পারতে যে, আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে ইহ-পারত্রিক নিরাপত্তা, রয়েছে পাপ মুক্তির নিশ্চয়তা, তাহলে তোমরা কিছুতেই হতে পারতে না স্বেচ্ছাচারী। বিশ্বাস স্থাপন করতে আল্লাহ্ ও তাঁর বার্তাবাহকের প্রতি।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত নুহ নবুয়তের গুরুদায়িত্ব লাভ করেছিলেন তাঁর চল্লিশ বৎসর বয়ক্রমকালে। আর মহাপ্লাবনের পরেও তিনি বেঁচে ছিলেন আরো ষাট বৎসর। মুকাতিল বলেছেন, তিনি নবুয়ত পেয়েছিলেন এক শত বৎসর বয়সে। পঞ্চাশ বৎসর এবং দুই শত বৎসরের কথাও বলেছেন কেউ কেউ। তাঁর আয়ুষ্কাল ছিলো এক হাজার চারশত পঞ্চাশ বৎসর। আর তিনি সত্যধর্ম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সুদীর্ঘ নয় শত পঞ্চাশ বৎসর ধরে।

জুহাক বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সম্প্রদায়ের লোকেরা হজরত নূহকে যখন তখন প্রহার করতো। তিনি সজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন। ফলে কখনো কখনো মৃত ভেবে লোকেরা তাঁকে কম্বলে পেঁচিয়ে রেখে আসতো তাঁর গৃহে। তবুও তিনি জ্ঞান ফিরে পেলে দোয়া করতেন তাদের পথপ্রাপ্তির জন্য। নিরলসভাবে চালিয়ে যেতেন তাঁর প্রচারকর্ম।

www.eelm.weebly.com

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, উবায়েদ ইবনে ওমর লাইছি বলেছেন, দুরাচারেরা তাঁকে গলা চেপে ধরতো। ফলে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন। তারা তখন তাঁকে ফেলে অন্যত্র গমন করতো। সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর তিনি আবার তাদের জন্যই প্রার্থনা করতেন। বলতেন, হে আমার পরম প্রেমময় প্রভুপালক! তুমি আমার সম্প্রদায়কে মার্জনা করো। এরা অবুঝ। এভাবে দীর্ঘদিন গত হলো। তবুও তাদের চৈতন্যোদয় ঘটলো না। এলো তাদের পরবর্তী বংশধরেরা। তারাও অনুসরণ করলো তাদের পিতৃপুরুষদের পঙ্কিল পথ। বরং তারা হজরত নুহের বিরোধিতা করলো আরো নিকৃষ্টভাবে। তাদের পরের প্রজন্ম হলো আরো অধিক দুরাচার। হজরত ক্লান্ত হলেন। সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম শেষে অবসন্ন হয়ে পড়লেন আল্লাহ্‌র নবী। ধীরে ধীরে হারিয়ে গেলো তাঁর সকল উদ্যম। কতোভাবে কতো দরদ দিয়ে যে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত হয়েছে তাঁর সেই শুভ প্রচেষ্টার কিছু নমুনা।

সূরা নূহ ঃ আয়াত ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَّ نَهَارًا ۙ﴿۵﴾ فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعَآءِیْۤ
اِلَّا فِرَارًا ﴿۶﴾ وَ اِنِّیْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْۤا اَصَابِعَهُمْ فِیْۤ
اٰذَانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَ اَصَرُّوْا وَ اسْتَكْبَرُوا
اسْتِكْبَارًا ۚ﴿۷﴾ ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۙ﴿۸﴾ ثُمَّ اِنِّیْۤ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ
اَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۙ﴿۹﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ
غَفَّارًا ۙ﴿۱۰﴾ یُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَیْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ﴿۱۱﴾ وَّ یُمْدِدْكُمْ
بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِیْنَ وَ یَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ یَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ؕ﴿۱۲﴾

r সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমিতো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহ্‌বান করিয়াছি,

r 'কিন্তু আমার আহ্‌বান উহাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করিয়াছে।

r 'আমি যখনই উহাদিগকে আহ্‌বান করি যাহাতে তুমি উহাদিগকে ক্ষমা কর, উহারা কানে অংগুলী দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজদিগকে ও জিদ করিতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

r 'অতঃপর আমি উহাদিগকে আহ্‌বান করিয়াছি প্রকাশ্যে

www.eelm.weebly.com

r ‘পরে আমি উচ্চৈস্বরে প্রচার করিয়াছি ও উপদেশ দিয়াছি গোপনে।’

r বলিয়াছি, ‘তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহাক্ষমাশীল,

r ‘তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করিবেন,

r ‘তিনি তোমাদিগকে সমৃদ্ধ করিবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করিবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করিবেন নদী-নালা।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শ’ বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা শেষে নবী নূহ যখন উদ্যমহারা হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর আকুতি উপস্থাপন করলেন এভাবে— হে আমার পরম প্রভুপালনকর্তা! আমি তো তাদের চৈতন্যোদয়ার্থে বিরতিহীনভাবে চেষ্টা চালিয়ে এলাম। কিন্তু তারা আমার নিকট থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগলো। এখন তো তারা আমার দিকে এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ করে না। এখন আমি কী করবো?

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করি, যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো, তারা কানে আঙ্গুল দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজেদেরকে ও জেদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে’। একথার অর্থ— আমি তো উদাত্ত কণ্ঠে পরম আপনজন জ্ঞানে তাদেরকে তোমার পথে আহ্বান জানিয়েছি। তোমা সকাশে তাদের জন্য মার্জনার সুপারিশ করেছি বার বার। কিন্তু তারা তবুও এক চুল নড়েনি তাদের অশুভ অংশীবাদিতা থেকে। আমার কথা শুনে তারা কানে আঙ্গুল দিয়েছে, কাপড়ে মুখ ঢেকেছে, প্রকাশ করেছে চরম একগুঁয়েমি ও অতিশয় ঔদ্ধত্য।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— ‘আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি প্রকাশ্যে’। এখানে ‘জ্বিহারান’ অর্থ প্রকাশ্যে। শব্দটি ‘যবর’ যুক্ত করা হয়েছে এজন্য যে, প্রকাশ্য আমন্ত্রণ হচ্ছে এক প্রকারের বিশেষ আহ্বান। অথবা শব্দটি একটি অনুক্ত ধাতুমূলের বিশেষণ। আর ‘জ্বিহার’ হচ্ছে কর্মপদী শব্দরূপের অর্থ প্রদায়ক। অর্থাৎ তাদের প্রতি আমার আমন্ত্রণ ছিলো প্রকাশ্য আমন্ত্রণ। অথবা শব্দটি কর্তৃপদীয় শব্দরূপের অর্থসম্পন্ন ধাতুমূলের অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ আমি তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছি প্রকাশ্যে।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— ‘পরে আমি উচ্চস্বরে প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে’। বাক্যের শুরুতে এখানে ‘ছুম্মা’ (পরে, অতঃপর) ব্যবহৃত হয়েছে প্রচারকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রকাশার্থে। অপ্রকাশ্য আমন্ত্রণ অপেক্ষা প্রকাশ্য আমন্ত্রণ অধিক গুরুত্ববহ। তাই প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে প্রকাশ্য আমন্ত্রণের কথা এভাবে ‘পরে আমি উচ্চস্বরে প্রচার করেছি’। পরে বলা হয়েছে ‘উপদেশ দিয়েছি গোপনে’। উল্লেখ্য, উভয় প্রকার আমন্ত্রণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ হজরত নুহ এখানে বলতে চেয়েছেন যে, তাঁর সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে তিনি কোনো প্রকার প্রচেষ্টাই বাকী রাখেননি।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'বলেছি, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো মহাক্ষমাশীল'। বাগবী লিখেছেন, হজরত নুহের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর আহবানকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান করতেই লাগলো। বার বার ব্যর্থতার আঘাত খেয়ে মুষড়ে পড়লেন হজরত নুহ। তখন আল্লাহ্ বন্ধ করে দিলেন বৃষ্টিপাত। রহিত করে দিলেন ললনাকুলের জন্মদান যোগ্যতা। এভাবে ধ্বংস হয়ে গেলো তাদের সম্পদ, পশুপাল। রুদ্ধ হলো প্রজন্মায়ণ প্রক্রিয়া। হজরত নুহ বললেন, হে জনতা! অবাধ্যতা পরিত্যাগ করো। কৃত পাপরাশি থেকে করো সানুতপ্ত ও সলজ্জিত প্রত্যাবর্তন। ক্ষমাপ্রার্থী হও পরম প্রভুপালক সকাশে। তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। তিনি যে মহাক্ষমাপরবশ।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন'। এখানে 'মিদরারা' অর্থ প্রচুর জলবাহী মেঘপুঞ্জ। শব্দটি 'সামাআ'র (আকাশের) অবস্থাপ্রকাশক। আর এটি হতে পারে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয় প্রকার বিশেষ্যের বিশেষণ। আলোচ্য প্রসঙ্গের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, অবাধ্যতা পরিত্যাগ ও ক্ষমাপ্রার্থনা বিপদ দূরীভূত হওয়ার উপলক্ষ। পার্থিব বিপদ-আপদ আপতিত হয় অবশ্য উগ্র পাপাচরণের কারণেই। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমাদের উপরে আপতিত হয়েছে বিপদ, সে-তো তোমাদেরই স্বহস্তার্জিত'। তবে যে সকল বিপদ আপতিত হয় অধিকতর মর্যাদা প্রদানার্থে, তা কখনো ক্ষমাপ্রার্থনা বা অন্য কোনো কারণে রহিত হয় না। এধরনের বিপদ আপতিত হয় কেবল নবী-রসুলগণ এবং তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারী পুণ্যবানগণের উপর। যেমন ঘটেছিলো হজরত আইয়ুব ও অন্যান্য নবীগণের উপর।

হজরত আবু সাঈদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিপদের বোঝা সবচেয়ে বেশী বহন করতে হয় নবী-রসুলগণকে। তৎপর তাদের চেয়ে নিম্ন মর্যাদাধারীগণকে। এরপর তদপেক্ষা নিম্ন মর্যাদাবিশিষ্টদেরকে। আর পাপীদের বিপদ-আপদ তওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা ছাড়া অপসারিত হয় না। আহমদ, বোখারী, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

বোখারী তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে জনৈকা উম্মতজননী সূত্রে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এ জগতে সবচেয়ে বেশী সংকটাপন্ন হন নবী ও ওলীগণ। হাকেম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে এবং হজরত আবু সাঈদ থেকে ইবনে মাজা ও আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, উপহার পেলে তোমরা যেমন উৎফুল্ল হও, তেমনি উৎফুল্ল হন নবীগণ বিপদাপন্ন হলে।

উল্লেখ্য, অনাবৃষ্টি একটি সাধারণ বিপদ। জনসাধারণের পাপের কারণেই আপতিত হয় এই সাধারণ মুসিবতটি। সেকারণেই শরিয়তে বিধান রয়েছে বৃষ্টি প্রার্থনার (ইসতেসকার) নামাজের। শা'বীর উক্তি উল্লেখ করে মাতরাফ বর্ণনা করেছেন, খলিফা হজরত ওমর একবার জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে শহরের বাইরে সমবেত হলেন। সেখানে সকলকে নিয়ে আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন শুধু।

www.eelm.weebly.com

তারপর ফিরে এলেন স্ব আবাসে। জনতা প্রশ্ন করলেন, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা হলো না যে? তিনি বললেন, আমি তো বৃষ্টির মালিকের কাছেই প্রার্থনা করেছি। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'তোমরা তোমাদের প্রভুপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো মহাক্ষমাশীল'।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা'। আতা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— যদি তোমরা কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হও, অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ সকাশে হও ক্ষমার্থী, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করবেন আগের মতো স্বাচ্ছন্দ্য। দিবেন বিত্ত-বৈভব, সন্তান-সন্ততি। আবার তোমরা পাবে ফলের বাগান, নদী-নালা বিধৌত ফসলের ক্ষেত।

সূরা নূহ ঃ আয়াত ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿۱۳﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ﴿۱۴﴾ اَلَمْ
تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ﴿۱۵﴾ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ
فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿۱۶﴾ وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ
الْاَرْضِ نَبَاتًا ﴿۱۷﴾ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ﴿۱۸﴾ وَاللّٰهُ
جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ﴿۱۹﴾ لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿۲۰﴾

r 'তোমাদের কী হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহিতেছ না!

r 'অথচ তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন পর্যায়ক্রমে,

r 'তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই? আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী?

r 'এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপরূপে;

r 'তিনি তোমাদিগকে উদ্ভূত করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে

r 'অতঃপর উহাতে তিনি তোমাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিবেন ও পরে পুনরুত্থিত করিবেন,

r 'এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে করিয়াছেন বিস্তৃত—

r 'যাহাতে তোমরা চলাফেরা করিতে পার প্রশস্ত পথে।'

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— নবী নুহ তাঁর সম্প্রদায়ের জনগণকে আরো বলেছিলেন, হে জনতা! কী হলো তোমাদের? মহাকল্যাণের আহ্বানের প্রতি তোমরা কর্ণপাত করছো না কেনো? কেনো একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হচ্ছো যে, আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই একমাত্র সৃজয়িতা ও পালয়িতা। তিনিই তো তোমাদেরকে সৃজন করেছেন পর্যায়ক্রমে— পিতৃপৃষ্ঠ থেকে মাতৃউদরে, শুক্রবিন্দু থেকে মানবাকৃতিতে।

এখানে 'মা লাকুম লা তারজুনা' কথাটির 'মা' প্রশ্নবোধক। আর 'ওয়াক্বারা' অর্থ— শ্রেষ্ঠত্ব, আভিজাত্য, মর্যাদা। হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন 'রিজ্বা' অর্থ হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ই যে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, সে কথা তোমরা মানতে চাচ্ছো না কেনো? প্রকৃত প্রস্তাবে 'রিজ্বা' অর্থ আশা, যা একটি গৌণ ধারণার বশবর্তী। অর্থাৎ ধারণার প্রাবল্যই আশা। এখানে সুদৃঢ় বিশ্বাসকে 'আশা' অর্থে প্রকাশ করাতে এটাই অনুমিত হয় যে, বক্তব্যকে অধিক বেগবান করাই এখানে উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ্পাকের মাহাত্ম্য তাদের ধারণায় তেমন সুপ্রকট নয়, যেমন সুপ্রকট থাকে প্রকৃত বিশ্বাসীদের বিশ্বাসে। কালাবীর নিকট এখানকার 'রিজ্বা' অর্থ ভীতি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমাদের অন্তরে কি আল্লাহ্ভীতি একেবারেই নেই? হাসান বসরী কথাটির অর্থ করেছেন— কী হয়েছে তোমাদের? তোমরা কি আল্লাহ্র অধিকার সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ? তাঁর অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি এতটাই অকৃতজ্ঞ? ইবনে কীসান অর্থ করেছেন— তোমরা তোমাদের উপাসনাকালে আল্লাহ্কে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য বলে মানতে চাও না কেনো? তোমরা কি এতটাই মূর্খ! কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— তোমরা কি এমতো আশা একেবারেই পোষণ করো না যে, আল্লাহ্র ইবাদত করলে তিনি তোমাদেরকে এর যথোপযুক্ত প্রতিফল দিবেন? তোমাদেরকে করবেন সম্মানিত?

'ওয়া ক্বদ্ খলাক্বাকুম আত্বওয়ারা' অর্থ অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে। অর্থাৎ জরায়ন— জন্ম-প্রবৃদ্ধি-পরিণতি-আয়ুষ্কাল-অন্তিমযাত্রা-পুনরুত্থান-প্রতিফলদিবস-বেহেশত-দোজখ— এসকল পর্যায়ে তোমাদেরকে পরিচালিত করে কে? তিনিই তো। তোমরা তো তাঁর এসকল বিধান মানতে বাধ্য। তাহলে তোমরা তাঁকে স্বীকার করতে কেনো এতো কুণ্ঠিত? তোমাদের অস্তিত্ব-স্থায়িত্ব-পরিণাম যার প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, তিনিই কি তোমাদের একমাত্র উপাস্য ও বিশ্বাসভাজন নন?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমরা কি লক্ষ্য করোনি, আল্লাহ্ কীভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী (১৫)? এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে' (১৬)?

www.eelm.weebly.com

এখানে ‘ত্বিবাক্বান’ অর্থ স্তরে স্তরে, একটির উপরে আর একটি। ইতোপূর্বে সপ্ত আকাশের বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরকমও বলা হয়েছে যে, এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের ব্যবধান পাঁচশত বৎসরের পথের দূরত্বের সমান।

‘ফী হিন্না’ অর্থ সেখানে, আকাশসমূহের মধ্যে একটি আকাশে। অর্থাৎ পৃথিবীর নিকটতম আকাশে। কেননা চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রপুঞ্জ রয়েছে পৃথিবীর নিকটতম আকাশেই। যেমন বলা হয়, মদীনায় রসুল স. এর শুভাগমন ঘটেছিলো বনী নাজ্জারের গৃহসমূহে। অর্থাৎ ওই গোত্রের গৃহসমূহের মধ্যে একটি গৃহে। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, চন্দ্র-সূর্যকে করা হয়েছে আকাশমুখী। তাই এদু'টোর কিরণ বিচ্ছুরিত হয় সেদিকেই। আর পৃথিবীতে পতিত হয় তার প্রতিফলন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে।

সন্দেহ ঃ সূর্যকিরণ হয় অত্যন্ত প্রখর। আর প্রদীপের আলো অতি কোমল। তাছাড়া আকারের দিক দিয়েও সূর্যাপেক্ষা প্রদীপ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। তাহলে এখানে প্রদীপকে সূর্যসদৃশ বলা হলো কেনো?

নিরসন ঃ শ্রোতার নিকটে প্রদীপ ব্যতীত এমন আলোকবর্তিকা তো নেই, যার সঙ্গে সূর্যকে তুলনীয় করা যায়। এরকম উপমা এখানে দেওয়া হয়েছে সেকারণেই। লক্ষণীয়, এখানে চাঁদকে বলা হয়েছে আলো, জ্যোতি, আর সূর্যকে বলা হয়েছে প্রদীপ। এতে করে একথাটিই প্রতীয়মান হয় যে, চাঁদ আলো গ্রহণ করে সূর্য থেকে। কারণ আলো পাওয়া যায় প্রদীপ থেকেই।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— তিনি তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মৃত্তিকা থেকে (১৭)। অতঃপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন' (১৮)।

সর্বনাম উল্লেখ না করে এখানে স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে ‘ওয়াল্লহু আম্বাতাকুম’। অর্থাৎ ‘তিনি’ না বলে সরাসরি বলা হয়েছে ‘আল্লাহ্’। এর কারণ হচ্ছে প্রিয়তমজনের নামের উল্লেখ তাঁর সর্বনাম অপেক্ষা অধিক আস্বাদ্য। আর এখানে তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন না বলে বলা হয়েছে ‘তিনি তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন’। এরকম করা হয়েছে এখানে একথা বুঝাতে যে, সৃষ্টবস্তু থেকে উদ্ভূত বস্তু হয়ে থাকে অধিক অনিত্য।

‘মিনাল আরদ্ব’ অর্থ মৃত্তিকা থেকে। অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মৃত্তিকা থেকে। অথবা তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুক্রকণা থেকে, শুক্রকণা সৃষ্ট হয় আহার্যবস্তু থেকে, আর আহার্য বস্তু মৃত্তিকাজাত। আর ‘নাবাতান’ বলার উদ্দেশ্য এখানে একথা বলা যে, তোমরা সৃজিত হয়েছো আল্লাহ্তায়ালার সৃজনাভিপ্রায়ের কারণেই।

‘অতঃপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত করবেন’ অর্থ মৃত্যুর পরে তিনি তোমাদেরকে ওই মৃত্তিকার সঙ্গেই মিশিয়ে দিবেন, যে মৃত্তিকা থেকে তোমরা সৃজিত হয়েছো। অর্থাৎ মৃত্যুর পর তোমরা একাকার হয়ে যাবে কবরের মাটির

www.eelm.weebly.com

সঙ্গে। আর ‘পরে পুনরুত্থিত করবেন’ অর্থ মহাপ্রলয়ের পর ঘটানো হবে তোমাদের পুনরুত্থান। তারপর বিচারার্থে সকলকে সমবেত করানো হবে হাশর প্রান্তরে। অর্থাৎ মনে রেখো, মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচার অবশ্যম্ভাবী। এখানে ‘ইখরাজ্বান’ হচ্ছে বেগপ্রদায়ক সাধারণ কর্মপদ। আগের আয়াতে যেমন বেগপ্রদায়করূপে ব্যবহৃত হয়েছে ‘নাবাতান’ সেখানকার ‘আমবাতাকুম’ (উদ্ভূত করেছেন) কথাটিকে বেগপ্রদানার্থে, তেমনি এখানে ‘ইখরাজ্বান’ বেগ প্রদান করেছে ‘ইউখরিজুকুম’ (পুনরুত্থিত করবেন) কথাটিকে। এভাবে এখানে এই ইঙ্গিতটি দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের জন্ম-মৃত্যু যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনি অবশ্যম্ভাবী তোমাদের পুনরুত্থান ও মহাবিচারপর্বও। সুতরাং যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকো এখন থেকে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত— (১৯) যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পারো প্রশস্তপথে’ (২০)। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই ধরাপৃষ্ঠকে এমন ভাবে বিস্তৃত করেছেন, যেনো এখানে তোমাদের বসবাস ও বিচরণ হয় স্বচ্ছন্দ ও সুগম। এখানে ‘ফিজ্বাজ্বা’ অর্থ প্রশস্ত পথে। ‘ফাজ্বজ্বুন’ এর বহুবচন ‘ফিজ্বাজ্বুন’। এর অর্থ প্রশস্ত পথ। আর এখানে ‘মিনহা’ (যা থেকে) কথাটির ‘মিন’ (তে, হতে) অব্যয়টির মধ্যে নিহিত রয়েছে ‘গ্রহণ করা’র অর্থ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা যেনো পৃথিবীপৃষ্ঠে তোমাদের জন্য প্রশস্ত পথ তৈরী করে নিতে পারো।

সূরা নূহ ঃ আয়াত ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ
إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ
آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَ
نَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾
مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن
دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ
الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا
إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن

www.eelm.weebly.com

دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ لَا تَزِدِ
الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿۲۸﴾

q নূহ্‌ বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করিয়াছে এবং অনুসরণ করিয়াছে এমন লোকের যাহার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাহার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করে নাই।'

q আর উহারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল;

q এবং বলিয়াছিল, 'তোমরা কখনও পরিত্যাগ করিও না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করিও না ওয়াদ্, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়া'ঊক ও নাস্‌রকে।

q 'উহারা অনেককে বিভ্রান্ত করিয়াছে; সুতরাং যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করিও না।'

q উহাদের অপরাধের জন্য উহাদিগকে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল এবং পরে উহাদিগকে দাখিল করা হইয়াছিল অগ্নিতে, অতঃপর উহারা কাহাকেও আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় পায় নাই সাহায্যকারী।

q নূহ্‌ আরও বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরগণের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।

q 'তুমি উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে উহারা তোমার বান্দাদিগকে বিভ্রান্ত করিবে এবং জন্ম দিতে থাকিবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির।

q 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যাহারা মু'মিন হইয়া আমার গৃহে প্রবেশ করে তাহাদিগকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে; আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমার প্রিয় নবী আরো বলেছিলো, হে আমার প্রভুপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে সর্বোতভাবে অস্বীকার করেছে। আমি তাদেরকে সত্যধর্মের প্রতি দিন-রাত উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছি। কিন্তু তারা আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করেনি। আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরেছে পলায়নপ্রবণতাকে। আমার কথা শুনে কখনো কানে আঙ্গুল দিয়েছে। কখনো নিজেদেরকে করেছে বস্ত্রাবৃত। প্রদর্শন করেছে একদেশদর্শিতা, ঔদ্ধত্য। নিরবচ্ছিন্নরূপে অনুসরণ করেছে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যে গর্বিত তাদের সমাজপতিদের, যারা পথভ্রষ্ট ও চিরকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যগত যোগাযোগ রয়েছে ৫, ৬,ও ৭ সংখ্যক আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে। তাই এর মর্মার্থ উপস্থাপন করা হলো সেভাবেই। আর 'ক্বলা' (সে বলেছিলো) কথাটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে দু'বার। একবার বর্ণিত আয়াতদ্বয়ের শুরুতে সত্যধর্ম প্রচারের অত্যাবশ্যক দায়িত্ব পালনের বিবরণ প্রদানার্থে এবং আলোচ্য আয়াতের শুরুতে অবাধ্যদের জন্য অপপ্রার্থনা উপস্থাপনের পটভূমিকারূপে।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিলো'। এখানকার 'মাকারূ' (তারা ষড়যন্ত্র করেছিলো) কথাটির যোগসূত্র রয়েছে আগের আয়াতের 'মাল্‌লাম ইয়াযিদ্‌হু' (যে তা বৃদ্ধি করেনি) এর সঙ্গে। আর 'মাল্‌লাম' এর 'মান' একবচন হলেও অর্থগত দিক দিয়ে বহুবচন। অথবা এখানকার ষড়যন্ত্র করেছিলো' কথাটি সংযুক্ত হবে আগের আয়াতের 'অনুসরণ করেছে' এর সঙ্গে।

'কুব্‌বারান' শব্দটি সাধিত হয়েছে 'কাবীর' থেকে। এর অর্থ— ভয়ানক, ভীষণ। অর্থাৎ ভয়ানক ষড়যন্ত্র, ভীষণ চক্রান্ত, বৃহৎ কুট কৌশল। তাদের নেতাদের কুটচক্রান্ত ছিলো, তারা নবী নুহকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করতো। অনুপ্রাণিত করতো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হতে। আর জনতা তাঁর উপরে অত্যাচার চালাতো বিভিন্নভাবে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তাদের নেতা-জনতা সকলেই নবী নুহের প্রতি অত্যাচার চালাতো। করতো ভয়ানক ষড়যন্ত্র।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এবং বলেছিলো, তোমরা কখনো পরিত্যাগ কোরো না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ কোরো না, ওয়াদ, সুওয়াআ, ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নসরকে' উল্লেখ্য, 'পরিত্যাগ কোরো না তোমাদের দেব-দেবীকে' বললেই তাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ হতো। তৎসত্ত্বেও তারা তাদের দেব-দেবীদের নাম উল্লেখ করতো তাদের গুরুত্ব প্রকাশার্থে।

মোহাম্মদ ইবনে কা'বের উক্তি উল্লেখ করে বাগবী লিখেছেন, তাদের উপাস্যগুলো ছিলো তাদের সজ্জন পিতৃপুরুষদের কাল্পনিক মূর্তি, যাঁরা অতীত হয়েছিলেন হজরত আদম ও হজরত নুহের মধ্যবর্তী সময়ে। শয়তান তাদেরকে এই মর্মে প্ররোচনা দিয়েছিলো যে, ওই সকল সাধুপুরুষদের বিগ্রহ সম্মুখে রেখে যদি তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তবে তোমাদের ইবাদত হবে অত্যধিক আস্বাদ্য। এভাবে সে সক্ষম হলো পরের প্রজন্মকে আগের প্রজন্মের সাধুপুরুষদের বিগ্রহমূর্তির অনুরাগী হতে। এভাবে বংশানুক্রমিকভাবে চলতে লাগলো পিতৃপুরুষদের বিগ্রহমূর্তির উপাসনা। ওই মূর্তিগুলোকেই তারা বলতো দেব-দেবী।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এসব নামের কিছুসংখ্যক পুণ্যবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন হজরত নুহের সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ। তাদের তিরোধানের পর শয়তান তাদেরকে বোঝালো, তোমাদের উচিত তাঁরা যেখানে উপবেশন করতেন সেখানে তাঁদের প্রতিমা বানিয়ে তাঁদের পুণ্যময় স্মৃতি রক্ষা করা। তা-ই করলো তারা। কিন্তু মূর্তিগুলোর আরাধনা তারা করতো না। আরাধনা করতো তাদের পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা। তারা ধরেই নিলো যে, সেই মূর্তিগুলোই তাদের দেবতা। তিনি আরো বলেছেন, মহাপ্লাবনে ওই মূর্তিগুলো জলমগ্ন হয়েছিলো। চাপা পড়ে গিয়েছিলো মাটির তলায়। পরে শয়তান সেগুলোকে মক্কাবাসীদের জন্য পুনরুদ্ধার করায়। এভাবে দাওমাতুল জানদালের কেলাব গোত্রের লোকেরা পূজা করতে শুরু

www.eelm.weebly.com

করে, 'ওয়াদা' প্রতিমাটির। 'সুওয়াআ' হয়ে যায় হুজাইল গোত্রের দেবতা। 'ইয়াগূছ' প্রথমে পূজিত হয় বনী মুররা গোত্রের লোকদের দ্বারা। পরে তার পূজারী হয় বনী আতীফেরা। তারা প্রতিমাটিকে নিয়ে চলে যায় সাবা অঞ্চলে, 'ইয়াউকের' উপাসনা করতো হামাদান গোত্র এবং বনী হুমাইর ভক্ত ছিলো 'নসর' প্রতিমার।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং জালেমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি কোরো না'। এখানে 'তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে' অর্থ তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে তাদের দেব-দেবীগুলো, অথবা তাদের সমাজপতিরা। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে— তারা বিভ্রান্ত হওয়ার উপলক্ষ মাত্র। মূল বিভ্রান্তকারী হচ্ছে শয়তান। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'হে আমাদের প্রভুপালক! ওরা আমাদের অধিকসংখ্যককে পথভ্রষ্ট করেছে'। এখানেও পথভ্রষ্টতার সম্পৃক্তি ঘটেছে রূপকার্থে, প্রকৃতার্থে নয়। অর্থাৎ শয়তানের সঙ্গে নয়। আর 'জালিম' (অত্যাচারী) অর্থ এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। 'ইল্লা দ্বলাল' (বিভ্রান্তি ব্যতীত) কথাটির অর্থ হবে এখানে— ধ্বংস বা বিনাশ ব্যতীত। অর্থাৎ 'বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি কোরো না' অর্থ হবে এখানে— ধ্বংস ছাড়া তাদের জন্য অন্য কিছু নির্ধারণ কোরো না। কিংবা— তারা যতো ষড়যন্ত্রই করুক না কেনো, তাদের ষড়যন্ত্র কখনো সফল কোরো না।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিলো অগ্নিতে, অতঃপর তারা কাউকেও আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় পায়নি সাহায্যকারী'।

এখানকার 'মিম্‌মা' (মিন্ মা) কথাটির 'মিন' হেতুবাচক এবং 'মা' অতিরিক্ত। কথাটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানার্থে। অর্থাৎ তারা প্লাবনে নিমজ্জিত হয়েছিলো অত্যধিক পাপাচরণের কারণে। 'নার' অর্থ অগ্নি, আলমে বরজখ বা কবরের জগতের শাস্তিদায়ক আগুন। উল্লেখ্য, কবর হবে জান্নাতের একটি উদ্যান, অথবা জাহান্নামের একটি অংশ। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, হজরত নুহের অবাধ্য সম্প্রদায়কে এখনো অগ্নিশাস্তি দেওয়া হচ্ছে আলমে বরজখে। কেননা এখানকার 'ফা উদখিলু' কথাটির 'ফা' (অতঃপর) অব্যয়টি ত্বরিৎ অনুক্রমজ্ঞাপক। আর 'উদখুলু' (দাখিল করা হয়েছে) শব্দরূপটি অতীতকালবোধক। এতে করে বোঝা যায় মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত করার পর পরই তাদেরকে প্রবেশ করানো হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন অগ্নিশাস্তিতে, যে শাস্তি থেকে বাঁচাবে এমন কোনো সাহায্যকারী তাদের নেই। থাকতে পারেও না।

পথভ্রষ্ট মুতাজিলা ও অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায় আলোচ্য আয়াতকে ব্যাখ্যা করেছে এভাবে— পানিতে নিমজ্জিত করা এবং অগ্নিতে প্রবিষ্ট করার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য এখানে নেই। অতএব মনে করা যেতে পারে নিমজ্জনই এখানে অগ্নিপ্রবেশন। অর্থাৎ নিমজ্জনই এখানে অগ্নিপ্রবেশনকে করেছে

www.eelm.weebly.com

অবশ্যম্ভাবী। অতীতকালবোধক শব্দরূপ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সে কারণেই। অথবা বলা যেতে পারে— কারণের পর কারণিকের আগমন স্বতঃসিদ্ধ। অর্থাৎ কারণ যখন বিদ্যমান, তখন কারণিক অনিবার্য। এজন্যই কারণের উল্লেখের পরক্ষণেই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে কারণিকের।

আমরা বলি, রূপক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিরর্থক। কেননা এখানে মূল বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মূল তত্ত্ব। আর সে মূল তত্ত্বটি হচ্ছে, মৃত্যুর পর সকলকে দেওয়া হয় জান্নাতের আনন্দ অথবা জাহান্নামের শাস্তি। অসংখ্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে আলমে বরজখের স্বস্তি ও শাস্তির কথা। অতএব বুঝতে হবে, মৃত্যুর পর হজরত নুহের অবাধ্য সম্প্রদায়কে প্রবেশ করানো হয়েছিলো আলমে বরজখের অগ্নিশাস্তিতে এবং তাদের সে শাস্তি চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। এরপর সংঘটিত হবে মহাবিচার পর্ব। তারপর তাদেরকে পুনরায় প্রবেশ করানো হবে মূল দোজখের লেলিহান অনলে। আর তাদের ওই শাস্তি হবে অনন্তকালীন।

এবার উল্লেখ করা যাক কবরের শাস্তি সম্পর্কিত কতিপয় হাদিস।

রসুল স. বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করার পর যখন লোকেরা ফিরে আসতে থাকে, তখন ওই কবরবাসী শুনতে পায় তাদের পাদুকার আওয়াজ। তার কাছে তখন দু'জন ফেরেশতা উপস্থিত হয়। একজন জিজ্ঞেস করে রসুল স. সম্পর্কে। বলে, তাঁর সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? সে বিশ্বাসী হলে বলে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসুল। তখন তাকে দেখানো হয় দোজখ ও বেহেশত, দু'টোই। বলা হয়, ওই দ্যাখো প্রজ্জ্বলন্ত দোজখ। ওই দোজখের বদলে আল্লাহ্ তোমাকে দান করেছেন ওই বেহেশত। সে তখন বেহেশত ও দোজখ দু'টোকেই প্রত্যক্ষ করে। আর সে যদি হয় অবিশ্বাসী, তবে রসুল স. এর দিকে তাকিয়ে বলে, একে আমি চিনি না। সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে তাকে বেদম প্রহার করতে শুরু করে। তখন যন্ত্রনায় চীৎকার করতে থাকে সে। সে চীৎকারের আওয়াজ শুনতে পায় মানুষ এবং জ্বিন ব্যতীত অন্য সকল সৃষ্টি। বোখারী ও মুসলিম।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে এমন কোনো নামাজ পাঠ করতে দেখিনি, যে নামাজে তিনি পরিত্রাণকামনা করেননি কবরের আযাব থেকে। বোখারী, মুসলিম।

খলিফা হজরত ওসমান গনি কোনো কবরের পাশে দাঁড়ালে অঝোর ধারায় কাঁদতেন। চোখের জলে ভিজে যেতো তাঁর পবিত্র শ্মশ্রু। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, রসুল স. বলেছেন, কবর হচ্ছে পরকালের প্রথম পর্যায়। কবরের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ যে পায়, তার পরের পর্যায়গুলোর পরিত্রাণ তার জন্য হয় সহজতর। অন্যথায় হয় এর বিপরীত। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অবিশ্বাসীদের প্রত্যেককে শাস্তিদানের জন্য কবরে নিয়োজিত করা হবে নিরানব্বইটি করে ভয়ংকর দর্শন বিষধর সাপ। তারা তাকে দংশন করতে থাকবে মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত। ওই সাপগুলোর কোনো একটি যদি পৃথিবীতে একটি প্রশ্বাস

www.eelm.weebly.com

ছাড়ে, তবে ভূপৃষ্ঠে আর কোনোদিনও সবুজ তৃণগুল্ম জন্মাবে না। দারেমী, তিরমিজি। তিরমিজি নিরানব্বইয়ের স্থলে উল্লেখ করেছেন সত্তরটি সাপের কথা।

'নারান' অর্থ অগ্নিতে। এখানে শব্দটিতে 'তানভীন' যুক্ত করা হয়েছে ওই অগ্নিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানার্থে। অথবা বলা যেতে পারে, এরকম করা হয়েছে অনির্দিষ্টবাচকতা বুঝাতে। অর্থাৎ হজরত নুহের অবাধ্য সম্প্রদায়কে যে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করানো হয়েছে, তা পৃথক প্রকৃতির, সে আগুন দোজখের আগুন নয়।

'ফালাম ইয়াজিদূ লাহুম্ মিন দুনিল্লাহি আনসারা' অর্থ অতঃপর তারা কাউকেও আল্লাহ্র মোকাবিলায় পায়নি সাহায্যকারী। সমষ্টিকে যখন সমষ্টির বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়, তখন অনিবার্য হয় মোকাবিলা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাই বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তাদের কেউই তাদের কাউকেও সাহায্যকারীরূপে পায়নি। এভাবে এখানে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে তাদের পূজিত প্রতিমাগুলোর প্রতি। অর্থাৎ তাদের দেব-দেবীগুলোও তখন তাদেরকে সাহায্য করতে পারেনি।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'নুহ আরো বলেছিলো, হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফেরগণের মধ্য থেকে কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিয়ো না'। এখানকার 'আলআরদ্ব' কথাটির 'আলিফ লাম' সীমিতার্থক। অর্থাৎ 'পৃথিবী' অর্থ এখানে একটি বিশেষ ভূখণ্ড। অর্থাৎ হজরত নূহের সম্প্রদায় যে অঞ্চলে বসবাস করতো, সেই অঞ্চল। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়ের অবাধ্যরা যে অঞ্চলে বাস করে, সেই অঞ্চলের কোনো একটি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকেও তুমি রেহাই দিয়ো না।

'দাইয়্যারান' অর্থ অব্যাহতি দিয়ো না। কথাটি অনির্দিষ্টবাচক, সাধারণ অর্থজ্ঞাপক। অর্থাৎ আমাদের জনপদের কোনো গৃহবাসীকে তুমি বাদ দিয়ো না। বিনাশ সাধন করো সকলের। 'দাইয়্যার' শব্দটি মূলতঃ ছিলো 'দাইওয়ার' যেমন 'সাইয়্যাদ' এর মূলরূপ ছিলো 'সাইওয়াদ'।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফের'।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী, মুকাতিল ও রবী ইবনে আনাস বলেছেন, হজরত নুহ এরকম অপপ্রার্থনা করেছিলেন তখন, যখন জানতে পেরেছিলেন, যে কয়জন ইমান আনার ছিলো, তারা ইতোমধ্যেই ইমান এনেছে। অবাধ্যদের বংশে আর কোনো ইমানদার আসবে না। তাই হলো। চল্লিশ অথবা নব্বই বৎসর ধরে তাদের নারীরা রইলো বন্ধ্যা এবং পুরুষেরা প্রজনন ক্ষমতাহীন। সেকারণে মহাপ্লাবনের প্রাক্কালে তাদের মধ্যে একটি শিশুও ছিলো না। শিশুরা আমলনামাবিহীন। তাদের উপরে আযাব আসতে পারে না। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আর নুহের স্বজাতি যখন রসুলগণের উপর অসত্যারোপ করলো,

www.eelm.weebly.com

তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম'। আর আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাটিও প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ ওই মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়ে মরেনি। মরেছিলো কেবল নবী নুহের সম্প্রদায়-অধ্যুষিত অঞ্চল। কেননা অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা তাঁকে অমান্য করেনি। আর তিনি তাঁর নিজ সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের প্রতি প্রেরিতও হননি।

শেষোক্ত আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা করো আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে, তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণকে; আর জালেমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করো'।

হজরত নুহের পিতার নাম ছিলো লামাক ইবনে মনুশালাখ এবং মাতার নাম ছিলো সামুজার বিনতে আতওয়াশ। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন বিশ্বাসী। 'বাইত' অর্থ এখানে গৃহ। জুহাক বলেছেন, মসজিদ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে শব্দটির অর্থ হবে তরণী। 'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী বলে' এখানে বুঝানো হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত যে সকল বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী আসবে তাদের সকলকে। 'জালিম' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, অবাধ্য। আর 'তাবারা' অর্থ ধ্বংস। উল্লেখ্য, শয়তানও তখন আরোহণ করেছিলো নুহ নবীর কিশতিতে। কেননা সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হওয়া সত্ত্বেও আয়ুষ্কাল পেয়েছে মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— নবী নুহ অবশেষে এই মর্মে প্রার্থনা জানালেন যে, হে আমার পরম প্রভুপালয়িতা। আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং আমার তরণীর আরোহী বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদেরকে তুমি মার্জনা করো। দাও পরিত্রাণ। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে করো সমূলে উৎপাটিত। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় নবীর এমতো আবেদন গ্রহণ করেছিলেন। ভয়ংকর মহাপ্লাবনে ডুবিয়ে মেরেছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে।

সূরা জ্বিন

এই সুরা খানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কা নগরীতে। সুরা খানি ২ রুকু এবং ২৮ আয়াত সম্বলিত।

সূরা জ্বিন ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○

قُلۡ اُوۡحِیَ اِلَیَّ اَنَّہُ اسۡتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الۡجِنِّ فَقَالُوۡۤا اِنَّا سَمِعۡنَا
قُرۡاٰنًا عَجَبًا ۙ﴿۱﴾ یَّہۡدِیۡۤ اِلَی الرُّشۡدِ فَاٰمَنَّا بِہٖ ؕ وَ لَنۡ نُّشۡرِکَ

www.eelm.weebly.com

بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝٢ وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ۝٣

r বল, 'আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হইয়াছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছে এবং বলিয়াছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি,

r 'যাহা সঠিক পথনির্দেশ করে; ফলে আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করিব না,

r 'এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেন নাই কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি বলুন, আমার কাছে এই মর্মে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগের সঙ্গে আমার কোরআন পাঠ শুনেছে এবং বলেছে, আমরা তো শুনেছি বিস্ময়কর বাণী।

এখানে 'নাফারুম্ মিনাল জ্বিন্ন' অর্থ জ্বিনদের একটি দল। তিন থেকে দশ সদস্যবিশিষ্ট দলকে বলা হয় 'নাফার'। নাসীবীন নামক স্থানে ছিলো সাতটি অথবা নয়টি জ্বিন। তাদেরকেই এখানে বলা হয়েছে 'জ্বিনদের একটি দল'। উল্লেখ্য, অন্যান্য প্রাণীর মতো জ্বিনেরাও একটি জাতি। তারা যেমন প্রাণধারী, তেমনি অবয়বধারীও। মানুষের মতো তারাও বিবেকসম্পন্ন। কিন্তু মানুষের মতো সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি তারা নয়। 'জ্বিন' এর শাব্দিক অর্থ গোপনীয়, গুপ্ত। তারা পরিদৃশ্যমান নয়। তাই তাদেরকে বলা হয় 'জ্বিন'। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে, আর জ্বিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আর জ্বিনদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি উত্তপ্ত অগ্নি থেকে'। ফেরেশতারা যেমন না নারী, না পুরুষ, জ্বিনেরা তেমন নয়। তাদের মধ্যেও প্রবহমান রয়েছে বিবাহ-বসত-বংশধারা। আর শয়তানও জ্বিন বংশদ্ভুত।

বলাবাহুল্য, জ্বিন, শয়তান ও ফেরেশতার অস্তিত্ব শরিয়ত-স্বীকৃত। গ্রীক দার্শনিকেরা অবশ্য একথা স্বীকার করে না। তারা প্রবক্তা দশ শ্রেণীর বিবেকবানের। কিন্তু বাস্তবে তারা ইসলাম সমর্থিত ফেরেশতা নয়। তাদের তথাকথিত বিবেকবানেরা অশরীরি, কিন্তু ফেরেশতারা অশরীরি নয়, যদিও তারা নয় দৃষ্টিগোচর। ফেরেশতারা আত্মা ও শরীরবিশিষ্ট।

আলোচ্য আয়াত পাঠে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স. জ্বিনদের ওই দলটিকে দেখেননি। তারা যে তাঁর কোরআন পাঠ শুনেছিলো, তিনি তা-ও জানতে পারেননি। আর জ্বিনেরাও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলো অতর্কিতে। আর তিনি স. এসকলকিছুই জেনেছিলেন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে

www.eelm.weebly.com

বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জ্বিনদের সম্মুখে কোরআন পাঠ করেননি। আর তিনি তাদেরকে দেখেনওনি। বরং ঘটনাটি ছিলো এরকম— রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের পর আকাশের কাছাকাছি শয়তানদের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হলো। কেউ আড়ি পেতে আকাশের ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করলে তার দিকে ছুঁড়ে মারা হতে লাগলো জ্বলন্ত উল্কাখণ্ড। জ্বিনেরা হলো বিস্মিত, হতচকিত ও চিন্তিত। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, তোমরা পূর্ব-পশ্চিম সবদিকে খবর লাগাও। দ্যাখোতো, কী হলো? তারা দলে দলে ছড়িয়ে পড়লো বিভিন্ন দিকে। তেহামার দিকে যে দলটি গেলো সেই দলটিই ফিরতি পথে সাক্ষাত পেলো রসুল স. এর। দেখলো, তিনি স. তাঁর এক প্রিয় সহচর সহ ফজরের নামাজ আদায় করছেন। সুললিত স্বরে আবৃত্তি করছেন কোরআন। তারা তন্ময় হয়ে শুনলো। তারপর বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! একারণেই আমাদেরকে আর আকাশের দিকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। তারা ফিরে গেলো তাদের সম্প্রদায়ের কাছে। সকলকে জানালো, আমরা শুনেছি এক বিস্ময়কর আকাশাগত বাণী, যা দান করে সঠিক পথনির্দেশনা। উল্লেখ্য, ঘটনাটি ঘটেছিলো রসুল স. এর ওকাজ মেলা থেকে প্রত্যাবর্তন কালে নাখলা নামক স্থানে।

প্রিয় পিতৃব্য আবু তালেবের মৃত্যুর পর রসুলেপাক স. অসহায় বোধ করতে লাগলেন। অংশীবাদীদের অত্যাচারও বেড়ে চললো ক্রমাগত। তিনি তাই বিষণ্ণচিত্তে একদিন পথে নামলেন। যাত্রা শুরু করলেন তায়েফের দিকে। উদ্দেশ্য ছিলো, তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানো। আশা ছিলো, হয়তো তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। আল্লাহ্‌পাক এভাবে তাঁর হাতকে করে দিবেন শক্তিশালী। আর তাতে করে তিনি প্রতিহত করতে পারবেন অংশীবাদীদের অত্যাচার। সাক্বীফ গোত্রের লোকদের সম্পর্কেই এরকম আশাধারী হয়েছিলেন তিনি। তাই তাদের কাছেই গমন করলেন প্রথমে।

ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদ ও মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী সূত্রে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তায়েফে পৌঁছে সাক্ষাত করলেন সাক্বীফ গোত্রের কয়েকজনের সঙ্গে। তাদের মধ্যে ছিলো উমাইয়ের তিন পুত্র ও গোত্রনেতা ইয়ালীল, মাসউদ ও হাবীব। কুরায়েশদের শাখাগোত্রের বনী জামুহীর এক রমণীও ছিলো তাদের মধ্যে। রসুল স. তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানালেন। বললেন, ইসলাম গ্রহণ করো এবং আমার প্রচারসহযোগী হও। একজন বললো, আল্লাহ্ যদি সত্যিসত্যি তোমাকে নবী বানিয়ে থাকেন, তবে আমি কাবা গৃহের আবরণী কেটে আমার গায়ের জামা বানাবো। দ্বিতীয়জন বললো, আল্লাহ্ কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে নবী হিসেবে পেলেন না? তৃতীয়জন বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমার সঙ্গে কথাই বলতে চাই না। তুমি যা বলছো তা যদি সত্যিই হয়, তবে তোমার মর্যাদা তো আমার কথা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর যদি তুমি প্রতারক হও, তবে তোমার সঙ্গে কথা বলাই তো ঠিক নয়। রসুল স. তাদের কথা শুনে হতাশ হলেন। তাই আর কথা বাড়ালেন না। শুধু বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যা

www.eelm.weebly.com

বলার বলেছো। এখন তোমাদের কাছে শুধু এতটুকুই চাই যে, আমাদের এই কথোপকথনের বিষয়টি তোমরা আর কারো কাছে প্রকাশ কোরো না। কিন্তু তারা রসুল স. এর একথারও কোনো মূল্য দিলো না। তাঁর আগমনের কারণ ও উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে দিলো সাধারণ জনতা ও ক্রীতদাসদেরকে। তারা তখন তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলো। শুরু করে দিলো হই-চই, কটুবাক্যবর্ষণ। উপায়ন্তর না দেখে রসুল স. আশ্রয় গ্রহণ করলেন উতবা ও শায়বার বাগানে। তারা দু'জন তখন বাগানে উপস্থিত ছিলো। তাই পশ্চাদ্ধাবনকারীরা আর অগ্রসর হলো না। রসুল স. বসলেন একটি আঙ্গুরবীথির ছায়ায়। প্রার্থনা জানালেন, হে আমার পরম প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তা! আমি দুর্বল। অসহায়। তাই মানুষ আমাকে অপমান করতে উদ্যত হয়েছে। তুমি তো দুর্বলকে রক্ষাকারী। অসহায়ের পালয়িতা। সকল কৃপাকারীর চেয়ে অধিক কৃপানিধান। আমার অক্ষমতাকে তুমি ক্ষমা করো। আমি এখন দুঃখ-ক্লেশে পতিত। এতে কোনো প্রকার আক্ষেপ আমার নেই। আমি চাই কেবল তোমার পরিতুষ্টি। আমি জানি এবং সর্বান্তঃকরণে একথা মানি যে, তোমার দিক ছাড়া অন্য কোনো দিক থেকে কোনো শক্তি নেই, সাহায্যও নেই।

বাগানের মালিক রবীয়ার দুই পুত্র উতবা ও শায়বা একটু দূরে থেকে রসুল স. এর কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগলো। বিপর্যস্ত নবীকে দেখে তাদের অন্তর হলো বিগলিত। ক্রীতদাস আদ্দাসকে বললো, যাও, তাঁকে একগুচ্ছ আঙ্গুর খেতে দাও। আদ্দাস নির্দেশ পালন করলো। রসুল স. প্রীত হলেন। 'বিসমিল্লাহ্' বলে আঙ্গুর খেতে শুরু করলেন। আদ্দাস বললো, আপনি যা বলে আহার শুরু করলেন, তাতো এখানকার কাউকে উচ্চারণ করতে দেখি না। রসুল স. বললেন, তুমি কোথাকার লোক? আদ্দাস বললো, আমি খৃষ্টান। আমার নিবাস নীনুয়ায়। রসুল স. বললেন, ও, তুমি নবী ইউনুস ইবনে মাতা'র জনপদের লোক? সে বললো, আপনি তাঁর নাম জানলেন কীভাবে? তিনি স. বললেন, তিনি তো আমার ভ্রাতা। তিনি নবী ছিলেন, আমিও নবী। আদ্দাস অভিভূত হলো। চুম্বন দিতে লাগলো রসুল স. এর পবিত্র মস্তকে, হাতে ও চরণে। একটু দূরে থেকে উতবা ও শায়বা ঘটনা কোন দিকে গড়াচ্ছে তা আঁচ করতে পারলো। আদ্দাস ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলো, আদ্দাস! কী ব্যাপার? আমরা দেখলাম, তুমি আগন্তুক ব্যক্তিটির মাথায়-হাতে-পায়ে চুমু দিচ্ছো। আদ্দাস বললো, পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে উত্তম মানুষ আর নেই। তিনি আমাকে এমন কিছু কথা শুনিয়েছেন, যা নবী ছাড়া অন্য কারো জানা থাকতে পারে না। তারা বললো, দেখো, সে তোমাকে যেনো আবার ধর্মচ্যুত না করে দেয়। তোমার ধর্মই তো সর্বোত্তম।

রসুল স. এবার ফিরে চললেন মক্কা অভিমুখে। সন্ধ্যা হলো। তিনি স. যাত্রা স্থগিত করলেন নাখলায়। রাতে নামাজে দণ্ডায়মান হয়ে পরম অনুরাগে পাঠ করতে লাগলেন আল্লাহ্র বাণী। নসীবীনের কিছুসংখ্যক জ্বিন তখন সে পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলো। কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনে তন্ময় হয়ে গেলো তারা। রসুল স. যখন নামাজ শেষ করলেন, তখন তারা স্বজাতির কাছে গমন করে সব

www.eelm.weebly.com

ঘটনা খুলে বললো। নিজেরা ইমান তো আনলোই; অন্যদেরকেও আহ্বান জানালো ইসলামের প্রতি। এই ঘটনাটির কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

ইবনে জাওজী তাঁর 'কিতাবুস্ সফওয়া'য় স্বসূত্রে উল্লেখ করেছেন, হজরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, আমি একবার অবস্থান গ্রহণ করলাম ওয়াযআর পার্শ্ববর্তী এক এলাকায়। আমি সেখানে দেখতে পেলাম একটি প্রস্তরনগরী। ওই নগরীর অধিবাসীরা ছিলো জ্বিন। এক বাড়িতে দেখলাম, এক বৃদ্ধ লোক কাবামুখী হয়ে নামাজ পাঠ করছে। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র ছিলো একেবারে নতুন। আমি ঝকঝকে পরিচ্ছদ দেখেই বিস্মিত হলাম বেশী। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি প্রত্যুত্তর দিয়ে বললেন, সহল, বস্ত্র পরিধান করলেই তা পুরাতন হয় না। পুরাতন হয় পাপের দুর্গন্ধে এবং নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করার কারণে। আমি এ জামাটি পরিধান করে আছি সাতশত বৎসর ধরে। এটা পরে আমি সাক্ষাত করেছি নবী ঈসার সঙ্গে এবং পরে নবী মোহাম্মদ মোস্তফার সঙ্গেও। আমি তাঁদের দু'জনের উপরেই ইমান এনেছিলাম। আমি বললাম, আপনার পরিচয়? তিনি বললেন, আমি তাদের একজন যাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে সূরা জ্বিন।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেন, রসুল স. জ্বিনদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে নির্দেশিত হয়েছিলেন। তাই নীনুয়া থেকে যখন একদল জ্বিন তাঁর কাছে হাজির হলো, তখন তিনি স. তাদেরকে কোরআন পাঠ করে শোনালেন। সেদিন তিনি স. বলেছিলেন, আজ কে আমার সাথী হতে চাও? আজ আমি একদল জ্বিনকে কোরআন পাঠ করে শোনাবো। উপস্থিত সাহাবীগণ নিশ্চুপ রইলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ কেবল বললেন, আমি। তিনি বলেছেন, আমি ছাড়া আর কেউ তখন রসুল স. এর সাথী হওয়ার সাহস করেনি। রসুল স. যথাসময়ে যাত্রা শুরু করলেন। আমিও অনুগামী হলাম তাঁর। উপনীত হলাম মক্কার উপকণ্ঠে এক উচ্চ ভূমিতে। এরপর শু'বুল হাজ্জুন নামক এক গিরিপথ ধরে এগিয়ে গেলেন তিনি স.। যাবার আগে তিনি বললেন, তুমি এখানেই বসে থাকো। এরপর আমার চারপাশে একটি রেখা এঁকে দিয়ে বললেন, আমি না ডাকা পর্যন্ত এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ো না। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তিনি স. থেমে গেলেন। উপবেশন করলেন এবং শুরু করলেন কোরআনের মনোমুগ্ধকর আবৃত্তি। আমি দেখতে পেলাম শকুনের মতো এক ধরনের পাখি দ্রুত ছুটে আসছে। পাখিগুলো রসুল স.কে ঘিরে ফেললো। আমি তখন তাঁকে আর দেখতে পেলাম না। শুনতেও পেলাম না তাঁর কণ্ঠস্বর। বেশ কিছুক্ষণ পর পাখিগুলো খণ্ড খণ্ড মেঘের মতো উড়ে উড়ে সরে যেতে লাগলো। রাত শেষ হলো। রসুল স. আমার কাছে এসে বললেন, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে? আমি বললাম, না। আমার একবার মনে হচ্ছিলো, আপনার সাহায্যের জন্য চীৎকার করে লোক জড়ো করি। কিন্তু যতোবার এরকম মনে হলো, ততোবারই দেখলাম, আপনি লাঠি উঁচিয়ে উঁচিয়ে আমাকে চুপ থাকার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। তিনি স. বললেন, আর কি দেখেছো? আমি যা দেখেছিলাম, তা

www.eelm.weebly.com

বললাম। আরো বললাম, শাদা পোশাক পরিহিত কালো বর্ণের কিছু লোককেও দেখেছি আমি। তিনি স. বললেন, ওরা ছিলো নাসীবীন অঞ্চলের জ্বিন। তারা তাদের আহার্যদ্রব্য কী হবে তা জানতে চাইলো। আমি আহার্য হিসেবে তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিলাম পুরুষ্ট অস্থি, শুকনো গোবর ও ভেড়া-ছাগলের লেদ। তারা বললো, এগুলোকে মানুষ অপবিত্রতা দূর করার কাজেও লাগায়। আমি বললাম, অস্থি ও শুকনো গোবর দ্বারা অপবিত্রতা দূর করা আমি মানুষের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম জন! এগুলো থেকে তারা কী পাবে? তিনি স. বললেন, অস্থিগুলো পাবে গোশতপূর্ণ এবং গোবর-লেদে পাবে ওই সকল বস্তু, যা ভক্ষিত হয়েছিলো আহার্যরূপে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আমি যে একসময় তুমুল কোলাহল শুনতে পেলাম। তিনি স. বললেন, হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত একটি মামলা আমার কাছে উপস্থিত করেছিলো তারা। বচসা শুরু করেছিলো বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষই। আমি সবকিছু শুনে সিদ্ধান্ত দিয়েছি। তারা তা মেনেও নিয়েছে। এ পর্যন্ত বলে রসুল স. প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে কিছু দূরের এক স্থানে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে বললেন, পানি আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু সে পানিতে ভেজানো রয়েছে খেজুর। তিনি স. বললেন, তাই আনো। আমি তাঁর হাতে পানি ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি ওজু সমাপন করলেন এবং বললেন, খেজুর পবিত্র, খেজুরের পানিও পবিত্র।

দাউদের মাধ্যমে ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম সূত্রে আলী ইবনে মোহাম্মদের বর্ণনা উল্লেখ করে মুসলিম বলেছেন, আমর উল্লেখ করেছেন, আমি একবার আলকামাকে জিজ্ঞেস করলাম, রসুল স. এর সুমহান সংসর্গে যে রাতে জ্বিনেরা উপস্থিত হয়েছিলো, সে রাতে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ কি রসুল স. এর সঙ্গে ছিলেন? আলকামা বললেন, আমি এ ব্যাপারে একবার যখন হজরত ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন, ঘটনাটি ছিলো এরকম— এক রাতে রসুল স.কে খুঁজে পাওয়া গেলো না। আমরা আশেপাশের পাহাড়ে সমতলভূমিতে গিরিপথে তাঁকে খুঁজে বেড়ালাম। ভাবলাম, কেউ কি তাঁকে ধরে নিয়ে গেলো, না কি কেউ তাকে শহীদ করে ফেলে রাখলো কোনো গোপন স্থানে। রাতটিকে আমাদের কাছে মনে হয়েছিলো অত্যন্ত অশুভ। শেষে এক সময় তিনি স. আমাদেরকে দর্শন দিয়ে বললেন, শংকামুক্ত ও কৃতার্থ হও। আরো বললেন, আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলো জ্বিনেরা। তাদের সঙ্গেই আমি গিয়েছিলাম। আমি তাদেরকে কোরআন পাঠ করে শুনিয়েছি। এরপর রসুল স. কেবল আমাকে সঙ্গে নিয়ে এক স্থানে গেলেন। দেখালেন তাঁর যাত্রাপথের নিশানা এবং স্থানে স্থানে অগ্নিচিহ্ন।

শা’বী বর্ণনা করেছেন, জ্বিনগুলো ছিলো উপদ্বীপবাসী। তারা রসুল স.কে জিজ্ঞেস করেছিলো তাদের আহার্যবস্তু সম্পর্কে। রসুল স. বলেছিলেন, তোমরা আহার কোরো ওই অস্থি, যার উপরে পাঠ করা হয়েছে বিসমিল্লাহ্। ওই অস্থি যদি

www.eelm.weebly.com

তোমাদের অধিকারে আসে এবং তাতে যদি কিছু গোশত লেগে থাকে, তবে তোমরা তা আহার করতে পারো। আর আহার করতে পারো চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্যের উচ্ছিষ্ট ও ভক্ষিত অংশ। মানুষকে এগুলো দ্বারা অপবিত্রতা দূর করতে (কুলুখ হিসেবে ব্যবহার করতে) নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এগুলো তোমাদের ভ্রাতা জ্বিনদের খাদ্য। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ জাঠ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে দেখে বলেছিলেন, এরা দেখতে সেই জ্বিনের রাত্রির আগন্তক জ্বিনগুলোর মতো।

আমি বলি, রসুল স. এর সঙ্গে জ্বিনদের সাক্ষাত ঘটেছিলো দু'বার। একবার রসুল স. এর তায়েফ থেকে ফেরার পথে। আর একবার ওকাজ মেলার দিকে গমনের প্রাক্কালে। ওই সময়েই তিনি স. জ্বিনদেরকে প্রথম কোরআন পাঠ করিয়ে শুনিয়েছিলেন। সেই ঘটনার কথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে 'বলো, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি....'। আর হজরত ইবনে মাসউদের বিবরণটি ছিলো অন্য এক সময়ের।

বাগবী লিখেছেন, সুরা আহকাফের 'ফাসতাজাবা লাহুম' আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, নাখলায় রসুল স. এর কোরআন পাঠ শুনে জ্বিনেরা চলে গেলো তাদের স্বজাতির কাছে। তাদেরকে খুলে বললো সবকিছু। তখন সত্তর জন জ্বিন আগ্রহান্বিত হয়ে উপস্থিত হলো বুতহা নামক স্থানে অবস্থানরত রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। রসুল স. তাদেরকেও কোরআন পাঠ করে শোনালেন। জানালেন আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে।

খাফাজী বলেছেন, রসুল স. এর কাছে জ্বিনেরা আগমন করেছিলো মোট ছয় বার। এতে করে একথাটিও প্রমাণিত হয় যে, তিনি স. প্রেরিত হয়েছেন মানুষ ও জ্বিন উভয় সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে। তাঁর পূর্বে উভয় সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শকরূপে আর কোনো নবী আর্বিভূত হননি।

'ফাক্বালূ ইন্‌না সামি'না ক্বুরআনান্ আ'জ্বাবা' অর্থ এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরআন শুনেছি। অর্থাৎ আমরা শুনেছি এমন বিস্ময়কর বাণী, যা কোনো মানুষের দ্বারা রচিত হওয়া সম্ভবই নয়। নিশ্চয় এ বাণী আকাশাগত। এখানে 'আজ্বাব' অর্থ বিস্ময়কর, অনন্য। শব্দটি ধাতুমূল।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'যা সঠিক পথনির্দেশ করে, ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোনো শরীক স্থির করবো না'। এখানে 'পথনির্দেশ করে' কথাটি কোরআনের বিশেষণ এবং 'ইলার রুশ্‌দি' অর্থ সঠিকতার দিকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— এই অনন্য কোরআন দান করে সঠিক গন্তব্যের পথনির্দেশনা। সে গন্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র পরিতোষ ও জান্নাত। 'ফা আমান্‌না বিহী' অর্থ আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অর্থ কোরআন যে আল্লাহ্‌র বাণী এবং নির্ভুল পথের দিশারী, তা আমরা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছি। 'ওয়া লান্ নুশরিকা বিরব্বিনা আহাদা' অর্থ

www.eelm.weebly.com

আমরা কখনো আমাদের প্রভুপালকের কোনো শরীক স্থাপন করবো না। অর্থাৎ অংশীবাদিতাকে আমরা আর কখনো প্রশ্রয় দিবোই না। কেননা অংশীবাদিতা নিষিদ্ধ, অপবিত্র ও আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনের অন্তরায়।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা, তিনি গ্রহণ করেননি কোনো পত্নী এবং না কোনো সন্তান'।

এখানে 'ইন্নাহু' (নিশ্চয় তিনি) কথাটির 'হু' (তিনি) সর্বনামটি অভিজাত শ্রেণীর। সর্বনামটির সম্পৃক্তি ঘটেছে এখানে 'রব' (প্রতিপালক) এর সঙ্গে। 'জ্বাদ্দু' এর শাব্দিক অর্থ পিতামহ। এখানে এর মর্মার্থ হবে— সমুচ্চ, মহিমময়। এরকম বলেছেন মুজাহিদ, কাতাদা এবং ইকরামা। হজরত আনাসের একটি অভিবচন এরকম 'ইজা ক্বরিয়া বাক্বারাতিন ওয়া আ'লা ইমরানা জ্বাদ্দা ফীনা' (সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান যখন আবৃত্ত হয়, তখন আমাদের নিকটে বৃদ্ধি পায় তাঁর মহিমা)। এই অভিবচনটির মধ্যে মুজাহিদ প্রমুখের ব্যাখ্যার পোষকতা সুপরিস্ফুট। কিন্তু সুদ্দী শব্দটির অর্থ করেছেন— আদেশদাতা, মহাশাসক। আবুল হাসান অর্থ করেছেন— অমুখাপেক্ষী। হজরত ইবনে আব্বাসের মতে— শক্তি। জুহাকের নিকট— ক্রিয়াশীল। কুরতুবীর নিকট— অনুগ্রহদাতা। আর আখফাশের মতে— সর্বাধিপতি, সর্বময় কর্তৃত্বাধিকারী। আর কেবল 'জ্বাদ্দুন' না বলে এখানে 'জ্বাদদু রব্বিনা' বলা হয়েছে সৃষ্টির লালন-পালন করার বিষয়টিকে সুপ্রকটিত করতে। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগতকে প্রতিপালন করেন বলেই তো তিনি সমুচ্চ ও মহামহিম।

'মাত্তাখাজা সহিবাতাঁও ওয়া লা ওয়ালাদা' অর্থ তিনি গ্রহণ করেননি কোনো পত্নী এবং না কোনো সন্তান। এখানকার 'মাত্তাখাজা' কথাটি হচ্ছে এ বাক্যের দ্বিতীয় বিধেয়। বক্তব্যকে অধিকতর সুদৃঢ়করণার্থেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এই অতিরিক্ত বিধেয়টি। 'সমুচ্চ আমাদের প্রভুপালকের মর্যাদা' বলে এখানে প্রথমে প্রকাশ করা হয়েছে তাঁর আনুরূপ্যবিহীন মহিমময়তাকে, তারপর তাঁর চিরঅমুখাপেক্ষিতাকে প্রকাশ করা হয়েছে একথা বলে যে 'তিনি গ্রহণ করেননি কোনো পত্নী এবং না কোনো সন্তান'। অর্থাৎ তিনিই এক, অবিভাজ্য ও আনুরূপবিহীন সৃজয়িতা। আর সকলেই এবং সকলকিছুই তাঁর সৃষ্টি। সুতরাং তাঁর সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপে সৃষ্টির কোনো প্রকার অংশ থাকা সম্ভবই নয়— ভার্যারূপে যেমন নয়, তেমনি নয় সন্তান-সন্ততিরূপেও।

সূরা জ্বিন ঃ আয়াত ৪, ৫, ৬, ৭

وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۝٤ وَّ اَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ
تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝٥ وَّ اَنَّهٗ كَانَ

www.eelm.weebly.com

رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۝٦ وَّ اَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۝٧

r 'এবং আরও এই যে, আমাদের মধ্যকার নির্বোধেরা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করিত।

r 'অথচ আমরা মনে করিতাম মানুষ এবং জ্বিন আল্লাহ্ সম্বন্ধে কখনও মিথ্যা আরোপ করিবে না।

r 'আরও এই যে, কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনের শরণ লইত, ফলে উহারা জ্বিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়াইয়া দিত।'

r আরও এই যে, জিন্নেরা বলিয়াছিল, 'তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কাহাকেও পুনরুত্থিত করিবেন না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাসত্যের পরিচয়প্রাপ্ত ওই সকল জ্বিন আরো বলেছিলো, আমাদের জ্বিন সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য ধর্মের পরিচয়প্রাপ্ত কেউ তো এতোদিন ছিলোই না। আর মহাসৃষ্টির মহাসৃজয়িতা সম্পর্কে তারা নানা প্রকার আজেবাজে ধারণার কথা প্রচার করতো। এখন আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, তারা কতোটা নির্বোধ ও হতভাগ্য। এখানে 'সাফীহুনা' অর্থ আমাদের নির্বোধেরা। এরকম বলেছেন কাতাদা। মুজাহিদ শব্দটির অর্থ করেছেন— ইবলিস ও তার অনুসারীরা। কেউ কেউ অর্থ করেছেন— অবাধ্য জ্বিনেরা। 'শাত্বাত্বা' অর্থ সত্যের অতি অপলাপ, সীমাতিক্রম। অর্থাৎ ওই নির্বোধেরা আল্লাহ্ সম্পর্কে অনেক অযথার্থ উক্তি করতো। যেমন স্বকপোলকল্পনায় নির্ণয় করতো তাঁর পত্নী, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি।

পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ্ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা আরোপ করবে না'। এখানে 'কাজিবুন' অর্থ মিথ্যা বলা, কথা বলার একটি ধরন। শব্দটি ধাতুমূল এবং 'ক্বওল' (কথা) ক্রিয়ার কর্মপদ। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমরা বিশ্বাস করি কোরআনকে। আর কোরআনের বাণী-বৈভবের মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারলাম সত্যের স্বরূপ। বুঝলাম, আমাদের নির্বোধ নেতারা সত্যাশ্রয়ী নয়। আল্লাহ্ সম্পর্কে তারা এতোদিন ধরে আমাদের যেসকল কথা শুনিয়েছে, সেগুলো অযথার্থ ও অংশীবাদিতাদুষ্ট।

সন্দেহ ঃ বলা হয়েছে, রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের পূর্বে জ্বিনেরা আকাশের কাছে গিয়ে আড়ি পেতে ফেরেশতাদের আলাপচারিতা শুনতো। ফেরেশতারা তো আল্লাহ্‌র এককত্ব ঘোষণা করতো। মুহুর্মুহু বর্ণনা করতো আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা। তৎসত্ত্বেও জ্বিনেরা ইমান আনতো না কেনো? অথচ একবার মাত্র কোরআন শুনে তারা ইমানদার হয়ে গেলো। বলতে শুরু করলো, তাদের নির্বোধ নেতারা এতোদিন আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদেরকে মিথ্যা ধারণা দিয়েছে। বিষয়টি সঙ্গতিহীন নয় কি?

www.eelm.weebly.com

নিরসন ঃ ইমান সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র দয়া ও দান, স্বেচ্ছার্জিত কোনো বিষয় নয়। পথপ্রদর্শকগণের পথপ্রদর্শন প্রচেষ্টা পথান্বেষীগণের হৃদয়ে সৃষ্টি করে ইমান গ্রহণের এক ধরনের যোগ্যতা। আবার এমতো যোগ্যতা সকলের ক্ষেত্রে একরকম নয়। আর এই গ্রহণযোগ্যতার রয়েছে দুটি দিক— একটি গোপন এবং অন্যটি প্রকাশ্য। গোপন দিকটি সম্পৃক্ত আল্লাহ্‌র সঙ্গে এবং প্রকাশ্য দিকটি যুক্ত সৃষ্টির সঙ্গে। এভাবে পথান্বেষীরা তাদের স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে আল্লাহ্‌পাকের নিকট থেকে গ্রহণ করে তাঁর অনুকম্পা, বদান্যতা। কেননা আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ কোনো গুণই তার অভিভাবক, প্রতিপালক ও সূচনাস্থল। আবার পথপ্রদর্শন-কর্মেরও রয়েছে দু'টি দিক। একটি দিক সম্পৃক্ত আল্লাহ্‌র সঙ্গে, অপরটি সংযুক্ত সৃষ্টির সঙ্গে। তাই পথপ্রদর্শকগণের অভ্যন্তরীণ দিকটি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জ্যোতিপ্রাপ্ত হয় এবং প্রকাশ্য দিক তা বিতরণ করে সৃষ্টিকুলের মধ্যে। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে থাকে উরুজ (ঊর্ধ্বারোহণ) ও নুযুলের (নিম্নাবতরণের) মাধ্যমে। নবী-রসুলগণের গ্রহণ-বিতরণের প্রক্রিয়া উপলক্ষ, মাধ্যম বা যোগসূত্র। আর ফেরেশতাগণের মধ্যে রয়েছে কেবল গোপন দিকটি। অর্থাৎ তাদের মধ্যে রয়েছে কেবল উরুজ, নুযুলের দিকটি একেবারেই নেই। তাই উপকার আহরণের মাধ্যম হিসেবে তারা একেবারেই অচল। সেকারণেই অসংখ্যবার তাদের কথাবার্তা ও আল্লাহ্‌র স্তব-স্তুতি শুনেও জ্বিনেরা উপকৃত হয়নি। আর নির্বোধ জ্বিনেরা যেহেতু তাদের স্বগোত্রীয়, তাই তাদের মিথ্যা কথাই স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলো তাদের উপর। পরে তাদের সে সকল অপধারণা এক মুহূর্তে কেটে গেলো একারণে যে, রসুল স. হচ্ছেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, শেষতম, শ্রেষ্ঠতম নবী, যাঁর উরুজ-নুযুল দু'টোই সর্বাধিক পরিপূর্ণ। জ্বিনেরা তাদের অন্তরের অভাবিতপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করে তাই বলেছিলো 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি' (যার পাঠক আরো অধিক বিস্ময়কর)।

জিজ্ঞাসা ঃ নবী-রসুলগণ যখন উরুজ ও নুযুল উভয় দিকে সম্পর্ক রাখেন, তখন হজরত নুহ, হজরত মুসা, হজরত ঈসা ও অন্যান্য নবীগণের দ্বারা জ্বিন জাতি প্রভাবান্বিত হতে পারেনি কেনো? কেনোই বা তাঁদেরকে প্রেরণ করা হয়নি জ্বিন জাতির পথপ্রদর্শনার্থে?

জবাব ঃ এর কারণ হচ্ছে, অন্যান্য নবী-রসুলের উরুজ পূর্ণ হলেও নুযুল ছিলো অপূর্ণ। আর শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. ছিলেন উরুজ-নুযুল উভয়ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিপূর্ণ, পূর্ণত্বের চরম পরাকাষ্ঠা। ফেরেশতাদের চেয়ে অধিক উন্নত ছিলো তাঁর উরুজ। আবার নুযুল ছিলো মহাসৃষ্টির সকল সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই তিনিই কেবল হতে পেরেছিলেন মানুষ ও জ্বিন উভয় সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত পথপ্রদর্শক। তাঁর হেদায়েতের সূর্য পরিপ্লাবিত করেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল অঞ্চলকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দেখা যায়, আবু জেহেল এবং তার মতো লোকেরা তাঁর দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি। এর কারণ ছিলো এই যে, তারা ছিলো স্বভাবগতভাবে চিরভ্রষ্ট। হৃদয় ছিলো তাদের চির অবরুদ্ধ। তাই

www.eelm.weebly.com

প্রকৃত শ্রুতি, দৃষ্টি ও বিবেকবোধ তাদের ছিলোই না। মধ্যাহ্ন গগনের প্রখর সূর্য যেমন জন্মান্ধের অন্ধত্ব দূর করতে পারে না, তাদের অবস্থাও ছিলো তদ্রূপ। সেকারণেই হেদায়েতের মহাকাশের মহাসূর্য রসুলেপাক স. এর সুমহান সংসর্গে উপস্থিত থেকেও তারা হেদায়েত পায়নি।

শায়েখে আকবর বলেছেন, হজরত নুহের আমন্ত্রণকে তাঁর স্বজাতির অধিকাংশ লোক গ্রহণ করেনি একারণে যে, তাঁর নুজুল ছিলো অসম্পূর্ণ। ফলে সর্বসাধারণের মন-মানসিকতার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব ছিলো অনেক। আর মোহাম্মদ মোস্তফা স. ছিলেন পরিপূর্ণ নুজুলসম্পন্ন। তাই পথভ্রষ্টরা তাঁকে হৃদয়ের কাছে পেয়েছে। অতি সহজে তাদের অন্তর্দেশকে আলোকিত করতে পেরেছে তাঁর তীব্র তীক্ষ্ণ জ্যোতিচ্ছটায়। এমতো সফলতার মূলে ছিলো তাঁর উরুজ-নুজুলের সমতা, পরিপূর্ণতা। তার সাথে ছিলো কোরআনের হৃদয়-স্পর্শী ও জ্যোতির্ময় বাণী। তাঁর পূর্বের কোনো নবীই এমতো পরিপূর্ণতার প্রতিভূ ছিলেন না। তিনিই ছিলেন কেবল মহাসৃজয়িতা ও মহামানবতার মহামিলনোৎসবের মহান আয়োজক। মহাসাফল্যের মহামহিম অগ্রনায়ক।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— ‘আরও এই যে, কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনের শরণ নিতো, ফলে তারা জ্বিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিতো’।

ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে শায়েখ বর্ণনা করেছেন, হজরত করুম ইবনে সায়েব আনসারী বলেছেন, একবার আমি আমার পিতার সঙ্গে এক কার্যোপলক্ষে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলাম। পথিমধ্যে দিবাবসান হলো। আমরা যাত্রাবিরতি করলাম। আশ্রয় নিলাম এক রাখালের আস্তানায়। গভীর রাতে এক নেকড়ে আক্রমণ করলো তার ছাগলের পালের উপর। একটু পরেই উধাও হলো এক ছাগ-শাবককে নিয়ে। রাখাল তার পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে বলতে লাগলো, হে উপত্যকার মালিক! ছাগলছানাটি ছিলো তোমারই আশ্রয়ে। হঠাৎ নেপথ্য থেকে আওয়াজ ধ্বনিত হলো, ওহে নেকড়ে। ছাগশিশুটিকে ছেড়ে দাও। একটু পরেই ছাগলছানাটি দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে এলো। মিশে গেলো অন্যান্য ছাগলের সাথে। আমরা বিস্মিত হয়ে দেখলাম, তার গায়ে কোনো আঁচড়েরও চিহ্ন নেই। ঘটনাটি ছিলো তখনকার, যখন যত্রতত্র শোনা যাচ্ছিলো ইমান ও ইসলামের আলোচনা। সম্ভবত তখনই অবতীর্ণ হয় ‘আরো এই যে, কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনের শরণ নিতো ......’।

ইবনে সা’দ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু রিজা আতরিদী বলেছেন, আমি সাংসারিক কাজকর্ম করতাম। ছাগল চরাতাম। রসুল স. এর মহাআবির্ভাব যখন ঘটলো, তখন আমরা পৃথক হয়ে পড়লাম অন্যান্য গোত্র থেকে। একদিনের ঘটনা— আমরা যাত্রা করলাম এক স্থানের উদ্দেশ্যে। একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত নেমে এলো। আমাদের গোত্রপতির রীতি ছিলো ভ্রমণকালে অরণ্যসংকুল অথবা বিরাণ কোনো প্রান্তরে রাত কাটাতে হলে তিনি উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করতেন, আমরা আজ রাতের জন্য এ অরণ্যের, অথবা এ প্রান্তরের জ্বিন

www.eelm.weebly.com

অধিপতির আশ্রিত। সেদিনও তিনি তেমনই ঘোষণা দিলেন। নেপথ্য থেকে সহসা ধ্বনিত হলো, এরূপ আশ্রয়ের নিরাপত্তামূলক স্বীকৃতি হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্!' আমরা চমৎকৃত হলাম। ওই সফর থেকে ফিরে এসেই আশ্রয় গ্রহণ করলাম ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। আমার ধারণা,আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আমি এবং আমার সঙ্গী-সাথীদেরকে লক্ষ্য করে।

জাযাউসাফী তাঁর 'হাওয়াতিফুল জ্বিন' গ্রন্থে স্বসূত্রে উল্লেখ করেছে, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, আমার কাছে ইসলামের প্রাথমিক যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন তামীম গোত্রের রাফে ইবনে উমাইর। তিনি বলেছেন, এক রাতে আমি অতিক্রম করছিলাম আলেজ মরুপ্রান্তর। হঠাৎ ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। আমি আমার উটনী থেকে নেমে একস্থানে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমোবার সময়শরণ গ্রহণ করলাম জ্বিনের। স্বপ্নে দেখলাম, বর্শা হাতে এক লোক এলো। সে আমার উটনীটির গলদেশে আঘাত করতে উদ্যত হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। কিন্তু জেগে উঠে কিছুই দেখতে পেলাম না। পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার একই স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেলো। এবার দেখলাম উটনীটি আতঙ্কগ্রস্ত। এদিকে ওদিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম স্বপ্নে দেখা লোকটিকে। তার হাতে ছোট একটি বর্শা। সে উটনীটির দিকে অগ্রসর হতে চাচ্ছে। আর তাকে প্রতিহত করছে আর একজন প্রবীণ লোক। হঠাৎ উপস্থিত হলো তিনটি নীল গাভী। প্রবীণ ব্যক্তি লোকটিকে বললো, এ লোকের উটনীর বদলে তোমার ইচ্ছামতো গাভী তিনটির যে কোনো একটিকে শিকার করে নিয়ে যাও। লোকটি একটি নীল গাভী শিকার করে নিয়ে গেলো। আমি প্রবীণ ব্যক্তির দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, এখন থেকে কোনো নির্জনপ্রান্তরে রাত্রিযাপন করলে বোলো, আমি শরণ প্রার্থনা করছি মোহাম্মদের প্রভুপালয়িতার। জ্বিনদের সাহায্য আর চেয়ো না। কেননা তাদের প্রতিপত্তি এখন অবলুপ্ত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মোহাম্মদ কে? তিনি বললেন, আরব উপদ্বীপবাসী একজন নবী। তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্য কোনো স্থানের নন। তাঁর মহাআবির্ভাব ঘটেছে সোমবারে। আমি বললাম, তিনি এখন কোথায়? প্রবীণ ব্যক্তি বললেন, খর্জুর কানন শোভিত ইয়াসরিবে।

ভোর হলো। আমি আমার উটনীর পিঠে আরোহণ করে যাত্রা করলাম মদীনার দিকে। রসুল স. আমাকে দেখেই বলে দিলেন, গত রাতে কী ঘটেছিলো। আমাকে আহ্বান জানালেন ইসলামের প্রতি। আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলাম। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেন, তাঁর কথা শুনে আমার মনে হলো, এই সেই লোক, যার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে 'কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনের শরণ গ্রহণ করতো....'।

'ফাযাদুহুম রহাক্বা' অর্থ ফলে তারা জ্বিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিতো। এখানে 'রহাক্বা' অর্থ আত্মম্ভরিতা। এরকম অর্থ করেছেন ইব্রাহিম নাখয়ী। হজরত ইবনে আব্বাস এর অর্থ করেছেন— পাপ। হাসান বসরী অর্থ করেছেন— দুষ্কর্ম। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— জ্বিনদের কাছে সাহায্য চাইলে তারা গর্বিত হতো। বলতো, আমরাই মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়ের নেতা। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে—

www.eelm.weebly.com

জ্বিনেরা মানুষকে পথভ্রষ্ট করতো। তাই মানুষ পথ হারাবার ভয়ে তাদের শরণ যাচনা করতো। এতে করে তারা বোধ করতো আত্মপ্রসাদ। 'রহাক্ব' এর আভিধানিক অর্থ কোনো কিছুতে লিপ্ত হওয়া। মর্মার্থ— নিষিদ্ধ কোনো কিছুতে জড়িত হওয়া, পাপপ্রলিপ্ত হওয়া।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'আর এই যে, জ্বিনেরা বলেছিলো, তোমাদের মতো মানুষ মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কাউকেও পুনরুত্থিত করবেন না'। এখানকার 'আন্নাহুম' কথাটিকে যদি 'ইন্নাহুম' (হামযা বর্ণটিকে যের সহযোগে) পাঠ করা হয়, তবে উক্তিটি হবে জ্বিনদের এবং বক্তব্যটি দাঁড়াবে— জ্বিনেরা বলেছিলো, ইতোপূর্বে মানুষ ছিলো বিভ্রান্তির শিকার। কিয়ামত হাশর-নশর এসকলকিছু তারা মানতোই না। এরপর অবতীর্ণ হলো কোরআন। মানুষ তখন বুঝতে পারলো, প্রকৃত সত্য কী। তারা বিশ্বাস করলো অদৃশ্য সত্তাকে। প্রত্যয়ী হলো মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচার-এর উপর। আর কথাটিকে যদি 'আন্নাহুম'ই পাঠ করা হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে মক্কার পৌত্তলিকেরা! আগে জ্বিনেরাও ছিলো তোমাদের মতো অবিশ্বাসী। পরকালের প্রতি তাদেরও আস্থা ছিলো না। পরে যখন কোরআন অবতীর্ণ হলো, তখন তারা পরিত্যাগ করলো অবিশ্বাসকে। তোমরাও কোরআন শোনো এবং আগমন করো অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে বিশ্বাসের অমল আলোয়।

সূরা জ্বিন ঃ আয়াত ৮, ৯, ১০

وَّ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ شُهُبًا ۙ﴿۸﴾ وَّ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ﴿۹﴾ وَّ اَنَّا لَا نَدْرِيْۤ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۙ﴿۱۰﴾

r 'এবং আমরা চাহিয়াছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করিতে কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ;

r 'আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনিবার জন্য বসিতাম কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনিতে চাহিলে সে তাহার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।

r 'আমরা জানি না জগদ্বাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের মংগল চাহেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে'। এখানে 'সামাআ' (আকাশ) অর্থ মেঘমালা। কেননা ঊর্ধ্বমার্গের সকল

www.eelm.weebly.com

কিছুকেই বলা হয় 'সামাআ'। এরকম বলেছেন জননী আয়েশা। তিনি বলেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, ফেরেশতামণ্ডলী অবতরণ করে মেঘের উপরে। তারা সেখানে আলাপ-আলোচনা করে আকাশাগত বিধান সম্পর্কে। আর শয়তানেরা তা আড়ি পেতে শোনার চেষ্টা করে। যা শুনতে পায় তা এসে আবার বলে দেয় তাদের ভক্ত গণৎকারদেরকে। তারা আবার সে তথ্যগুলোকে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে প্রচার করে জনসমক্ষে। বোখারী।

সন্দেহ ঃ কোনো কোনো হাদিসের বিবরণানুসারে 'সামাআ' অর্থ প্রকৃত আকাশই, মেঘমালা নয়। যেমন হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ ঊর্ধ্বাকাশে যখন কোনো সিদ্ধান্ত অবতীর্ণ করেন, তখন ফেরেশতারা বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশার্থে ঝাপটাতে থাকে তাদের ডানা। ফলে আওয়াজ উত্থিত হতে থাকে সেরকম, যেরকম হয় পাথরে শিকল আছড়ালে। সিদ্ধান্ত প্রদান যখন শেষ হয়, তখন ফেরেশতারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করে, বলো তো, তোমাদের প্রভুপালক কী ঘোষণা দিলেন। তারাই আবার জবাব দেয়, তিনি যা বলেছেন, তা সত্য বলেছেন। তিনি মহামহিমময়। সুমহান। এরপর তারা উল্লেখ করে সদ্য অবতীর্ণ সিদ্ধান্তের কথা। শয়তানেরা চুপিসারে তা শুনে ফ্যালে এবং তা জানিয়ে দেয় তাদের নিম্নবর্তীদেরকে। তারা আবার জানায় তন্নিম্নবর্তীদেরকে। এভাবে এক সময় তা পৌঁছে যায় পৃথিবীবাসী গণকদের কাছে। তারা আবার প্রাপ্ত সংবাদ প্রচার করে তার সঙ্গে শত শত মিথ্যা মিলিয়ে। আবার কখনো আড়ি পেতে থাকা শয়তানদের দিকে ছুঁড়ে মারা হয় আগুনের গোলা। ফলে তাদের প্রচেষ্টা হয়ে যায় ভণ্ডুল। বোখারী।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্পাক যখন নবতর বিধান প্রবর্তণ করেন, তখন আরশবাহী ফেরেশতারা ঘোষণা করতে থাকে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা। তন্নিম্নবর্তী ফেরেশতারাও তখন বারংবার উচ্চারণ করতে থাকে 'সুবহানাল্লহ্' 'সুবহানাল্লহ্'। এভাবে ক্রমান্বয়ে 'সুবহানাল্লহ্' ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে নিম্নবর্তী আকাশসমূহের ফেরেশতাদের কণ্ঠে। এরপর সকল ফেরেশতার মধ্যে আলোচনা চলতে থাকে সদ্য অবতীর্ণ বিধান সম্পর্কে। তারা তখন একথাও বলতে থাকে যে, আমাদের প্রভুপালক যা বলেছেন, তা সত্য বলেছেন। শয়তানেরা আড়ি পেতে শুনতে চেষ্টা করে সবকিছু। তারপর যতোটুকু জানতে পায়, তা বলে দেয় তাদের একান্ত অনুগত গণৎকারদেরকে। তারা আবার তা অতিরঞ্জিত করে প্রচার করে জনতার কাছে। মুসলিম।

নিরসন ঃ বর্ণিত হাদিস দু'টোতে এমন কোনো বর্ণনা নেই, যাতে করে বুঝা যায় শয়তান আকাশের কাছে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে। তাই এরকম ভাবাই সমীচীন যে, মেঘমালার উপরে অবতরণ করে ফেরেশতারা যে বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে, শয়তানেরা সারিবদ্ধ হয়ে তা আড়ি পেতে শুনে নেয়। এভাবে তারা পরস্পরের মাধ্যমে শ্রুত সংবাদ পৌঁছে দেয় পৃথিবীস্থ শয়তানের কাছে। সে

www.eelm.weebly.com

আবার তা জানিয়ে দেয় গণৎকারদেরকে। আর তাদের এমতো চেষ্টা সব সময় সফলও হয় না। ফেরেশতারা তাদের অবস্থান টের পেলে তাদের প্রতি উল্কা ছুঁড়ে মারে। তখন তারা পুড়ে ছাই হয়ে ঝরে পড়ে নিম্নে। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ'। এখানে 'হারাস' অর্থ প্রহরী, রক্ষী। শব্দটি 'খাদাম' শব্দের মতো বহুবচনবোধক নামপদ। 'শিহাব' এর বহুবচন 'শুহুব'। এর অর্থ নক্ষত্রাগত পতনশীল অগ্নিপিণ্ড। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— জ্বিনেরা বলেছিলো, আমরা আকাশের সংবাদ সংগ্রহ করতে যেয়ে দেখলাম সেখানে রয়েছে প্রহরারত অসংখ্য ফেরেশতা। আর নিরাপত্তা নিশ্চিতার্থে অগণিত উল্কাপিণ্ডও সেখানে রয়েছে প্রস্তুত।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনবার জন্য বসতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়'। একথার অর্থ— রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের আগে আমরা আকাশের কাছাকাছি গিয়ে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার জন্য ওঁত পেতে বসে থাকতে পারতাম, কিন্তু এখন আর তা পারি না। কেননা সেখানে এখন প্রহরা বসানো হয়েছে অগ্নিপিণ্ডধারী ফেরেশতাদের। এখানকার 'রসাদা' শব্দটি 'রসিদ' এর বহুবচন। এর অর্থ অগ্নিদণ্ডধারী ফেরেশতা। উল্লেখ্য, অগ্নিদণ্ডধারী ফেরেশতাদের দ্বারা আকাশের এলাকা সুরক্ষিত করার এই ব্যবস্থাটি রসুল স. এরই একটি মোজেজা। আর এমতো মোজেজা দেখেই ইমান এনেছিলো নাসীবীনের জ্বিনেরা।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'আমরা জানি না, জগতবাসীর অমঙ্গলই অভিপ্রেত, না তাদের প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চান'। একথার অর্থ— ওই জ্বিনেরা আরো বলেছিলো, আকাশকে এভাবে সুরক্ষিত করার মধ্যে আল্লাহ্র কী অভিপ্রায় নিহিত? তিনি কি আমাদের অমঙ্গল চান, না মঙ্গল? তবে আল্লাহ্তায়ালার দয়ায় আমরা তো একথা বুঝতে পারলাম যে, তিনি এমতো অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করে আমাদেরকে পথপ্রদর্শনই করতে চান। তাইতো আমরা তাঁর বাণীর প্রতি এবং তাঁর রসুলের প্রতি ইমান আনতে পারলাম। আর এতে করেও যারা ইমান আনতে সমর্থ হলো না, তাদের অমঙ্গল তো অতিনিশ্চিত। আল্লাহ্র অভিপ্রায়ও সেরকমই। তাঁর অভিপ্রায়বিরোধী কোনো কিছু সংঘটিত তো হতে পারেই না। আরো উল্লেখ্য, আল্লাহ্ই সকলকিছুর একক সৃজয়িতা। আর ভালো-মন্দ সকলকিছুই সৃজিত হয় কেবল তাঁর সতত স্বাধীন অভিপ্রায়ানুসারে। কিন্তু শালীনতা বজায়ার্থে এখানে অভিব্যক্তি দু'টো প্রকাশ করা হয়েছে দু'রকমভাবে— অমঙ্গলের সঙ্গে তাঁর অভিপ্রায়কে প্রকাশ করা হয়েছে কর্মবাচ্যে এভাবে 'অমঙ্গলই অভিপ্রেত' এবং মঙ্গলের সঙ্গে অভিপ্রায়কে ব্যক্ত করা হয়েছে কর্তৃবাচ্যে। 'মঙ্গল চান' বলে। আর এভাবে এখানে একথাটিও উত্তমরূপে পরিস্ফুটিত হয়েছে যে, এখানকার ৮, ৯ ও ১০ সংখ্যক আয়াতের বক্তব্যগুচ্ছ

www.eelm.weebly.com

রসুল স. এর রেসালতের সত্যতার একটি অনন্য প্রমাণপঞ্জী। এ প্রমাণপঞ্জীকে অস্বীকার যারা করে, বুঝতে হবে তাদের অমঙ্গলই আল্লাহ্র অভিপ্রেত এবং যারা প্রমাণকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ তাদেরই মঙ্গল চান।

সূরা জ্বিন ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

وَّ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۙ﴿۱۱﴾ وَّ اَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَ لَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۙ﴿۱۲﴾ وَّ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّ لَا رَهَقًا ۙ﴿۱۳﴾ وَّ اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَ مِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿۱۴﴾ وَ اَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۙ﴿۱۵﴾

r ‘এবং আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক ইহার ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী;

r ‘এখন আমরা বুঝিয়াছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে পরাভূত করিতে পারিব না এবং পলায়ন করিয়াও তাঁহাকে ব্যর্থ করিতে পারিব না।

r ‘আমরা যখন পথনির্দেশক বাণী শুনিলাম তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে তাহার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকিবে না।

r ‘আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালংঘনকারী; যাহারা আত্মসমর্পণ করে তাহারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বাছিয়া লয়।

r ‘অপরপক্ষে সীমালংঘনকারী তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।’

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই সকল জ্বিন আরো বলেছিলো, আমাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে পুণ্যবান ও পাপী ছিলো। পাপীরা আবার ছিলো বিভিন্ন মতের অনুসারী। কিন্তু এখন আমরা কোরআন শুনে বুঝতে পারলাম শেষতম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর অনুসারী হওয়া ছাড়া কল্যাণের আর কোনো পথ খোলা নেই। আল্লাহ্র এই মহানির্দেশনাকে অকার্যকর করতে আমরা কখনোই পারবো না। অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে যে আমরা আত্মরক্ষা করবো, সে সুযোগও আমাদের নেই। কেননা সকল জগত আল্লাহ্র। তাই আমরা যখন বিস্ময়কর বাণী শুনে পথের দিশা পেলাম, তখনই তা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে নিলাম। একথাটিও ভালোভাবে বুঝতে পারলাম যে, যে ব্যক্তি বিশ্বজগতের প্রভুপালককে বিশ্বাস করে, সে সকল অমঙ্গল ও ক্ষতি থেকে থাকে চিরসুরক্ষিত।

www.eelm.weebly.com

এখানে ‘সলিহুনা’ (সৎকর্মপরায়ণ) বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল জ্বিনকে, যারা ইমান এনেছিলো পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের প্রতি অবতারিত আসমানী কিতাবসমূহের উপর, বিশেষ করে তওরাত শরীফের উপর। ‘আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী’ অর্থ বিভিন্ন প্রকার অপথ, কুপথ ও বিপথের অনুসারী ছিলো আমাদের পূর্বসূরীরা। এখানে ‘ক্বিদাদা’ অর্থ বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন, খণ্ড-বিখণ্ড। শব্দটি বহুবচন ‘ক্বিদ্দাতুন’ এর। শব্দটি এখানে বেগবান করেছে আগের বাক্যের ‘কতক সৎকর্মপরায়ণ’ কথাটিকে। হাসান বসরী ও মাহদী বলেছেন, জ্বিনদের মধ্যেও তোমাদের মতো বিভ্রান্ত কাদরিয়া, জাবরিয়া, মারজিয়া, রাফেজী ইত্যাদি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় রয়েছে। আর এখানকার ‘আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ’ কথাটিও ১৩ সংখ্যক আয়াতের ‘আমরা যখন পথনির্দেশক বাণী শুনলাম’ বাক্যটির পটভূমিকা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমরা এখন যেমন আল্লাহ্‌র এককত্বে বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তেমনি বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিলো আমাদের কিছুসংখ্যক পিতৃপুরুষও। অর্থাৎ সকলেই যে তারা অবিশ্বাসী ও পাপী ছিলো, তা নয়। বরং তাদের অনেকে পথভ্রষ্টতায় শতধাবিচ্ছিন্ন হলেও কিছুসংখ্যক তো বিশ্বাসী ও সজ্জন ছিলোই।

‘যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি ইমান আনে, তার কোনো ক্ষতি ও অন্যায়ের আশংকা থাকবে না’ অর্থ বিশ্বাসীরা চিরনিরাপদ। ইহকাল ও পরকালে ক্ষতি ও আশংকা থেকে চিরমুক্ত। অথবা অর্থ— যারা বিশ্বাসী, তারা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ও শাস্তি থেকে নিঃশংক থাকতে পারে না। কেননা কোরআনের দাবি হচ্ছে সকল প্রকার অন্যায়াচরণ থেকে সততসতর্ক জীবনযাপন।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— ‘আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালংঘনকারী, যারা আত্মসমর্পণ করে, তারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বেছে নেয়’। এখানে ‘মুসলিমূন’ অর্থ আত্মসমর্পণকারী। আর ‘ক্বসিতুন’ অর্থ সীমালংঘনকারী, দুরাচার, সত্যবিমুখ। যে সুবিচার করে, তাকে বলা হয় ‘আক্বসাতার রজুলু’ আর যে পীড়ন করে, তাকে বলে ‘ক্বসাত্বা’। এই ‘ক্বসাত্বা’ শব্দেরই কর্তৃকারকের বহুবচনীয় শব্দরূপ হচ্ছে ‘ক্বসিতুন’। উল্লেখ্য, ১১ সংখ্যক আয়াতের ‘আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ’ এবং আলোচ্য আয়াতের ‘আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী’ কথা দু’টো সমার্থক। কিন্তু কথা দু’টির উদ্দেশ্য ভিন্ন। প্রথমোক্তটির উদ্দেশ্য ছিলো একথা বলা যে, আমরাই প্রথম বিশ্বাসী নই, বিশ্বাসী ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষদের কিছুসংখ্যক সৌভাগ্যবানও। আর শেষোক্তটির বক্তব্যটি হচ্ছে— কোরআন শোনার পর আমাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং কিছুসংখ্যক এখনও রয়ে গেলো অবিশ্বাসী। বলা বাহুল্য, একথাগুলো তাদের, যারা রসুল স. এর কণ্ঠে কোরআন আবৃত্তি শুনে ইমান এনেছিলো, তারপর তাদের স্বজাতির কাছে গিয়ে আহ্বান জানিয়েছিলো ইসলামের প্রতি। তখন তাদের আহ্বানে কেউ কেউ সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়েছিলো এবং কেউ কেউ হয়নি। সে পরিস্থিতির কথাই তাদের কণ্ঠে এখানে উচ্চারিত হয়েছে

www.eelm.weebly.com

এভাবে ‘আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালংঘনকারী’। আর এখানে ‘ফামান আসলামা ফা উলায়িকা তাহার্‌রাও রশাদা’ অর্থ যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিন্তিত সত্য পথ বেছে নেয়।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— ‘অপরপক্ষে সীমালংঘনকারীরা তো জাহান্নামেরই জন্য’। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো জাহান্নামের ইন্ধন হবেই। উল্লেখ্য, ৮ সংখ্যক আয়াত থেকে ১৪ সংখ্যক আয়াতের প্রতিটির শুরুতেই উল্লেখিত হয়েছে ‘আন্‌না’। এমতো উল্লেখের কারণে বক্তব্যগুলো যে জ্বিনদের, সে কথা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কিন্তু কথাটিকে ‘আন্‌না’ না পড়ে যদি ‘ইন্‌না’ পড়া হয়, তবে কথাগুলি যে জ্বিনদের, এ বিষয়টি আর ব্যাখ্যা করে না বুঝিয়ে দিলেও চলে।

সমাধান ঃ ঐকমত্যসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, অবিশ্বাসী জ্বিনদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে অগ্নিশাস্তি। অন্যান্য আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন ‘আর বক্র পথের পথিক! সে তো হবে জাহান্নামের জ্বালানী’। এবার আসা যাক বিশ্বাসী জ্বিনদের পরিণতি কী হবে, সে সম্পর্কে। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও তুমুল মতপ্রভেদপূর্ণ। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, বিশ্বাসী জ্বিনেরা দোজখের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবে, কেবল এটাই হবে তাদের পুরস্কার। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে ‘ওহে স্বজাতি! আল্লাহ্‌র পথের আহ্বানকারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করো, তাঁর প্রতি যদি ইমান আনো, তবে মার্জনা করা হবে তোমাদের পাপরাশি এবং মুক্ত রাখা হবে তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে’।

বাগবী লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফাও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। লাইছের অভিমতের অনুসরণে সুফিয়ান সওরী বলেছেন, বিশ্বাসী জ্বিনদের প্রতিদান কেবল এই হবে যে, তারা নিষ্কৃতি লাভ করবে নরকানল থেকে। এরপর চতুষ্পদ জন্তুদেরকে যেমন মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হবে, তাদেরকেও করা হবে তেমনই। নিয়াজ বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক যখন মানব জাতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত দান করবেন, তখন বিশ্বাসী জ্বিনদেরকে বলবেন, মাটি হয়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে তারা রূপান্তরিত হবে মৃত্তিকায়। অবিশ্বাসী মানুষেরা তখন এ দৃশ্য দেখে বলতে থাকবে, আহা! আমরাও যদি এভাবে মাটি হয়ে যেতে পারতাম।

এরকমও বলা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা মৌনতা অবলম্বন করেছেন। কেননা রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, আল্লাহ্ যে বিষয়কে রহস্যাচ্ছন্ন করে রেখেছেন, তোমরাও সে বিষয়কে রহস্যাচ্ছন্ন রাখো। আল্লাহ্ অবিশ্বাসী জ্বিনদের জাহান্নামের জ্বালানী হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু বিশ্বাসী জ্বিনদের প্রতিফল প্রদান সম্পর্কে থেকেছেন নীরব। তাদের সম্পর্কে কেবল এতটুকু বলেছেন যে— তারা নিরাপদ থাকবে নরকবাসী হওয়া থেকে।

কিছুসংখ্যক বিদ্বজ্জন বলেছেন, জ্বিনেরাও তাদের পুণ্য ও পাপের প্রতিফল পাবে। ইমাম মালেক এবং ইবনে আবী লাইলা এমতো অভিমতের প্রবক্তা।

www.eelm.weebly.com

জুহাকের বক্তব্যের অনুকরণে ইবনে জারীর বলেছেন, জ্বিনেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে তারা পানাহারও করবে। নাককাশা তাঁর তাফসীরে এই মর্মে এক হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, বিশ্বাসী জ্বিনেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবু শায়েখকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, জ্বিনেরা পরকালে কী কী নেয়ামত পাবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্পাক তাদের অন্তরে ইলহামের মাধ্যমে সৃষ্টি করে দিবেন জিকির ও তসবীহ্'র সতত অনুরণন। তারা ওই জিকির ও তসবীহ্'র মাধ্যমে সেরকমই আস্বাদ প্রাপ্ত হবে, যেভাবে আস্বাদ লাভ করবে বিশ্বাসী মানুষেরা জান্নাতের বিভিন্ন প্রকারের আপ্যায়ন দ্বারা। এমতো বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, আবু শায়েখ বিশ্বাসী জ্বিনদেরকে করেছেন ফেরেশতাদের পর্যায়ভূত। কেননা ফেরেশতাদের অবস্থাও তখন হবে এরকম। ইবনে মুনজির বলেছেন, আমি একবার হজরত হামযা ইবনে হাবীবকে জিজ্ঞেস করলাম, জ্বিন জাতি কি কোনো প্রতিদান পাবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'লাম ইয়াত্বমিছ্হুন্না ইনসুন ক্ববলাহুম ওয়া লা জ্বান' (ইতোপূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি কোনো মানব অথবা জ্বিন)। কাজেই জান্নাতে মানব হুর পাবে মানুষ এবং জ্বিন হুর পাবে জ্বিনেরা।

জুহাক সূত্রে আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন সমগ্র সৃষ্টি বিভক্ত হবে তিনটি শ্রেণীতে। একশ্রেণী হবে বিনা বিচারে জান্নাতী, আর একদল বিনা বিচারে জাহান্নামী। প্রথম দল হবে ফেরেশতাদের এবং দ্বিতীয় দল জ্বিনদের। তৃতীয় দলটির মধ্যে কেউ কেউ প্রবেশ করবে জান্নাতে এবং কেউ কেউ নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে। আর তারা হবে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়ভূত।

ইবনে ওয়াহাবের নিকট একবার জিজ্ঞেস করা হলো, জ্বিনদেরকে কি কোনো প্রতিদান দেওয়া হবে? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর পাঠ করলেন 'মানুষ, জ্বিন— প্রত্যেকের জন্য রয়েছে যোগ্যতা অনুযায়ী মর্যাদা'। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বলেছেন, জ্বিনেরা থাকবে জান্নাতের সন্নিকটবর্তী প্রান্তরে, জান্নাতাভ্যন্তরে নয়।

জ্বিনদের পুরস্কারপ্রাপ্তির প্রবক্তারা বলেন, বিশেষভাবে নয়, সাধারণভাবেই আল্লাহ্পাক উল্লেখ করেছেন 'যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা আপ্যায়িত হবে জান্নাতুল ফেরদাউসে'। এরকম আয়াত রয়েছে আরো অনেক। তাছাড়া সুরা ক্বসাসে জ্বিন ও মানব উভয় সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে 'ওলিমান খাফা...লাম ইয়াত্বমিস্ হুন্না ইনসুন'। হানাফী বিদ্বানগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, এখানে সাধারণভাবে বলা হয়েছে কেবল মানবজাতির কথা। জ্বিনেরা এ আয়াতের বক্তব্যভূত নয়। সুফীসাধকগণের অভিমতও এরকম। অবশিষ্ট রইলো সুরা আর রহমানের পুনঃপুনঃ বিধৃত 'তোমরা তোমাদের প্রভুপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে' আয়াত প্রসঙ্গ। এ আয়াতে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে জ্বিন ও মানুষ উভয়কে। এই আয়াতখানি

www.eelm.weebly.com

আবার পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে শাস্তি সম্পর্কিত আয়াতসমূহের পরেও। যেমন ‘নিক্ষেপ করা হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধুম্রপুঞ্জ। অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে’। আবার ‘অপরাধীদেরকে চেনা যাবে তাদের চেহারা দেখে। অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অমান্য করবে’। আবার ওই সুরায় বর্ণিত সাধারণ অনুগ্রহসম্ভারের কোনো কোনোটি প্রযোজ্য কেবল মানুষের বেলায়। জ্বিনদের সেখানে কোনো দখলই নেই। সেগুলোর পরেও আবার জ্বিন-মানব উভয়কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ‘অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুপালকের কোন্ কোন্ অনুকম্পাকে অস্বীকার করবে’। যেমন সাগরে বিচরণশীল জাহাজের কথা। এগুলো তো মানুষেরই কাজে লাগে। জ্বিনদের জাহাজের কোনো প্রয়োজনই নেই। অথচ সেখানেও উভয়কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে। সুতরাং এমতো সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত যে, জান্নাতের অনুগ্রহসম্ভারের অধিকারী হবে কেবল মানুষ, জ্বিনেরা নয়।

আমার মতে বিদ্বানগণের ঐকমত্যটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ বলেন, জ্বিনেরাও পুণ্যাধিকারী হয়। একথা সুপ্রমাণিত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা কেবল দলিল প্রমাণের অভাবেই এর অধিক মন্তব্য করতে পারেননি। আর এ ব্যাপারে হজরত ইবনে আব্বাস, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ও অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীগণ যা কিছু বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর সূত্রপরম্পরা সর্বোন্নত পর্যায়ের না হলেও বক্তব্যার্থ সর্বোন্নত পর্যায়েরই। তবে সর্বোন্নত সূত্রে হজরত আনাস থেকে বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার বললেন, বিশ্বাসী জ্বিনদের জন্য রয়েছে পুণ্য এবং অবিশ্বাসী জ্বিনদের জন্য রয়েছে শাস্তি। আমরা প্রতিদান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি স. জানালেন, তারা বসবাস করবে আ'রাফে, জান্নাতে নয়। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আ'রাফ কী? তিনি স. বললেন, সাগর, বৃক্ষ ও ফলে পরিপূর্ণ জান্নাতের বাইরের একটি স্থান।

সূরা জ্বিন ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

وَّ اَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَ مَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَّ اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿١٨﴾ وَّ اَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

r উহারা যদি সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকিত উহাদিগকে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করিতাম,

www.eelm.weebly.com

r যদ্দ্বারা আমি উহাদিগকে পরীক্ষা করিতাম। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হয় তিনি তাহাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাইবেন।

r এবং এই যে মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। সুতরাং আল্লাহ্‌র সহিত তোমরা অন্য কাহাকেও ডাকিও না।

r আর এই যে, যখন আল্লাহ্‌র বান্দা তাঁহাকে ডাকিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল তখন তাহারা তাহার নিকট ভিড় জমাইল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— জ্বিন ও মানুষ যদি ইমান আনতো এবং ইসলামের বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতো, তবে আমি তাদেরকে কখনো অন্ন সংকটে ফেলতাম না, দান করতাম প্রচুর উপজীবিকা।

এখানে 'সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকতো' অর্থ যদি তারা মেনে নিতো আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলাম। 'আর প্রচুর বারিবর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম' অর্থ তাহলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে আমি তাদের ভূমিকে করতাম সুজলা, সুফলা। মুকাতিল বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক মক্কাবাসীদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছিলেন একটানা সাত বৎসরের অনাবৃষ্টি। অন্নকষ্টে যখন তারা ঘোর বিপন্ন, তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'প্রচুর বারিবর্ষণ' অর্থ প্রতুল জীবনোপকরণ। কেননা পানিই জীবনোপকরণ প্রাপ্তির প্রধান উৎস। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তিনি যে জীবনোপকরণ আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেন....'। এখানে 'জীবনোপকরণ' (রিজিক) অর্থ পানি। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌কে মান্য করা ও সত্যাধিষ্ঠিত হওয়ার শর্তে দেওয়া হয়েছে প্রতুল রিজিক প্রদানের অঙ্গীকার। এরকম নিশ্চয়তার কথা ঘোষিত হয়েছে অন্যান্য আয়াতেও। যেমন ১. যদি তারা প্রতিষ্ঠা করে তওরাত, ইঞ্জিল, আরো যা অবতীর্ণ হয়েছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে, তবে অবশ্যই তারা আহার করবে তাদের মাথার উপর থেকে এবং পায়ের তলদেশ থেকে ২. জনপদবাসী যদি ইমান গ্রহণ করে, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য উন্মোচন করে দিবো আকাশের বরকতসম্ভার।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'যদ্দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম'। একথার অর্থ— আর সুপ্রচুর জীবনোপকরণ দিয়ে আমি তাদেরকে এই মর্মে পরীক্ষাও করতাম যে, তারা আমার দানের যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কিনা। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আতা ইবনে রেবাহ, জুহাক, কাতাদা, মুকাতিল ও হাসান বসরী। আর রবী ইবনে আনাস, জায়েদ ইবনে আনাস, কালাবী এবং ইবনে কীসান ব্যাখ্যা করেছেন— যদি তারা সত্যাধিষ্ঠিত না হয়ে সত্যপ্রত্যাখ্যানের উপরেই অনড় থাকে, তবুও আমি তাদেরকে দান করবো ধনবল, জনবল ও অন্যান্য পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য। এরকম করবো আমি তাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য, যেনো সত্যোপলব্ধির অবকাশ আর না পায় এবং ঘোর পার্থিবতায় মগ্ন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় চিরদিনের জন্য। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তাদেরকে যা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা থেকে যখন তারা মুখ

www.eelm.weebly.com

ফিরিয়ে নিয়েছে, তখন তাদের জন্য আমি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম সকলকিছুর দুয়ার'। কিন্তু ব্যাখ্যাটি যথার্থ নয়। কেননা এতে করে এই ধারণাটিই বদ্ধমূল হয়ে পড়বে যে, জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ্য ও বৈভবিত জীবন মাত্রেরই উৎসস্থল কুফরী বা সত্যপ্রত্যাখ্যান। অথচ উক্ত আয়াতে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে 'যদি তারা প্রতিষ্ঠা করে তওরাতের বিধিবিধান.... আর জনপদবাসী যদি ইমান গ্রহণ করে'। সুতরাং বুঝতে হবে বক্তব্যদু'টো সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এখানে বলা হয়েছে 'সমগ্র মানবজাতি যদি এক দলভূত না হতো, তাহলে যারা তাদের দয়াময় প্রভুপালকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের গৃহের ছাদগুলি আমি করে দিতাম রৌপ্যের'। কিন্তু বাস্তবে সেরকম হয়নি। সুতরাং বুঝতে হবে, এরকম না করার কারণ এই যে, এতে করে সবাই এরকম ধারণাকেই বদ্ধমূল বলে মনে করতো যে, বিত্তশালী হওয়ার একমাত্র চাবিকাঠি হচ্ছে কুফরী। আর এরকম ধারণা তাহলে এমন সর্বোজনীন হয়ে পড়তো যে, সকলেই তখন হয়ে যেতো সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারী। তারা ছাড়া অন্য কোনো দল আর থাকতোই না। এখন আসা যাক 'তারা যখন বিস্মৃত হয়ে পড়েছিলো উপদেশ....' এই আয়াতের আলোচনায়— এ আয়াতে যা বলা হয়েছে, তাতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে উপদেশবিস্মৃতির উপর। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বক্তব্যটি একটি অতীত ইতিবৃত্তের বিবৃতি। সাধারণ বিধান এটা নয়। আর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপটও শেষোক্ত ব্যাখ্যার পরিপন্থী। ঘটনাটি ছিলো এরকম— আবু জেহেল ও তার সঙ্গী-সাথীরা যখন সীমালংঘন করলো, তখন আল্লাহ্পাক তাদের উপরে চাপিয়ে দিলেন সাত বৎসরের একটানা দুর্ভিক্ষ। পরিস্থিতি এতো ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ালো যে, ক্ষুধার তাড়নায় তারা চতুষ্পদ জন্তুর বর্জ্য ভক্ষণ করেও জীবন বাঁচাতে বাধ্য হলো। পরে তাদেরকে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হলো বদর যুদ্ধে। পক্ষান্তরে মুসলমানেরা অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করেও মহান ইসলামে অনড় অবস্থান করার বদৌলতে পরবর্তীতে লাভ করেছিলেন স্বাচ্ছন্দ্য, সম্মান ও সাম্রাজ্য। রোম ও পারস্যের মতো দুর্ধর্ষ জাতিগোষ্ঠীগুলোও হয়েছিলো তাদের অধীন। এছাড়া পরবর্তী বাক্যটিও প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটির পরিপোষক। যেমন এরপর বলা হয়েছে—

'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন'। একথার অর্থ— যে ব্যক্তি আল্লাহ্র স্মরণে মগ্ন থাকে তাকে তিনি দান করবেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ইহকাল-পরকাল উভয় জগতে, আর ইহকালে লাঞ্ছিত করবেন এবং পরকালে দুঃসহ শাস্তিতে নিপতিত করবেন তাকে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র স্মরণবিচ্যুত।

এখানে 'আ'জাবান সআ'দা' অর্থ দুঃসহ শাস্তি, অসহনীয় দুঃখ যাতনা। আর সে শাস্তি হতে পারে পৃথিবীতে, কবরে, অথবা পরকালে। অথবা সকল স্থানে। তবে জাগতিক শাস্তিই আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যভঙ্গির সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ।

www.eelm.weebly.com

কেননা একথা বলা হয়েছে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যের বিপরীতে। এরকম কথা বলা হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে 'যে আমার জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তার পার্থিব জীবন হবে অনটনক্লিষ্ট এবং পুনরুত্থান দিবসে আমি তাকে অন্ধ করে ওঠাবো'। এ আয়াতে 'অনটনক্লিষ্ট' অর্থ পার্থিব জীবনের অভাব-অনটন। আর অন্ধ করে ওঠানোর শাস্তিটি হবে তার পরকালে। এখানে বক্তব্যগত কোনো অস্পষ্টতা একেবারেই নেই। এর বিপরীত বক্তব্য এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে এভাবে 'যে বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী পুণ্যকর্ম করে, তাকে আমি অবশ্যই দান করি পুতঃপবিত্র জীবন, আর আমি তাকে দান করবো উত্তম পারিতোষিক'। এ আয়াতে 'হায়াতান ত্বইয়্যিবান' (পুতঃপবিত্র জীবন) অর্থ পৃথিবীর আনন্দঘন জীবন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'তাকওয়া' বা সংযমের অভাব ঘটলে স্বচ্ছল জীবনকেও মনে হবে অনটনক্লিষ্ট। উল্লেখ্য, যাদের সংযম নেই তারা বিত্তশালী হলেও পরিতৃপ্ত হতে পারে না। কারণ তারা সব সময় এক আতংকে ভুগতে থাকে যে, এই বুঝি অর্থবিত্ত সব হাতছাড়া হয়ে গেলো। যে অর্থ ব্যয় হলো তা বুঝি আর পূরণ হবে না। এ সকল দুঃশ্চিন্তার কারণেই তারা জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় অপরিতৃপ্তি ও অস্বস্তির সঙ্গে। অথচ এক সময় সকলকিছু তো তাদের অধিকারচ্যুত হয়েই যায়। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'অল্পেতুষ্টি' বৈশিষ্ট্যটি সাধারণত বিত্তপতিদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সে কারণেই স্বস্তির মুখ দেখার সৌভাগ্য তাদের কোনোদিনই হয় না।

আমি বলি, পৃথিবীপ্রসক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে যে 'অল্পেতুষ্টি' গুণটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়, একথা ধ্রুব সত্য। সেকারণেই তারা প্রতিটি মুহূর্ত লিপ্ত থাকে উপার্জনের চিন্তায় এবং সার্বক্ষণিক প্রহরী হয়ে যায় সঞ্চিত সম্পদের। সম্পদচ্যুতির আশংকায় মনোকষ্ট পেতে থাকে প্রায় সারাক্ষণ। হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি। তারা কখনো অনুমানও করতে পারে না, বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীর সংযমশোভিত জীবন কতো আস্বাদ্য, স্বস্তি-সুখ পূর্ণ। তাঁরা অল্পে তুষ্ট। তাই সম্পদচ্যুতির আতংক তাঁদের নেই। নেই কারো সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুশ্চিন্তা ও অশান্তি। তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্য পেলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, আর প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলে অবলম্বন করেন ধৈর্য। এভাবে আল্লাহ্রই স্মরণে থাকেন সতত মগ্ন। বরং তাঁদের মধ্যে যাঁরা আল্লাহ্র অধিকতর নৈকট্যভাজন, তাঁদের কাছে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক আস্বাদ্য। কারণ তাঁরা প্রকৃত অর্থেই আল্লাহ্প্রেমিক। তাঁরা প্রত্যক্ষ করেন সুখের আস্বাদে প্রবৃত্তিও অংশগ্রহণ করে, যদিও সে হয় কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুঃখের মধ্যে তার অংশগ্রহণের কোনো সুযোগই নেই। দুঃখকালে জেগে থাকে কেবল পরম প্রেমময় প্রভুপালকের একক অভিপ্রায়, সে অভিপ্রায়ের মধ্যে স্বঅভিপ্রায়কে বিলীন করার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত আনন্দ, চূড়ান্ত সফলতা।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'এবং এই যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ্রই জন্য। সুতরাং আল্লাহ্র সঙ্গে তোমরা অন্য কাউকেও ডেকো না'।

www.eelm.weebly.com

বাক্যটির সংযোগ রয়েছে ১৬ সংখ্যক আয়াতের 'তারা যদি সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকতো' কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অপরাপর প্রত্যাদেশের সঙ্গে এই প্রত্যাদেশটিও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ নির্মাণ করা হয় কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য। মসজিদের মধ্যে অংশীবাদিতামূলক কার্যকলাপ করার অধিকার কারো নেই। সুতরাং তোমরা মসজিদসমূহে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত কোরো না।

কাতাদা বলেছেন, ইহুদী-খৃষ্টানেরা তাদের উপাসনালয়সমূহে আল্লাহ্‌কে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও ডাকতো। যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানেরা সেখানে আল্লাহ্‌র পুত্র জ্ঞানে ডাকতো যথাক্রমে হজরত উযায়ের এবং হজরত ঈসাকে। সেজন্য আল্লাহ্‌পাক এখানে মুসলমানদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেনো সেরকম না করে। মসজিদে আরাধনা করে কেবল আল্লাহ্‌র। এখানে 'মসজিদ' অর্থ পৃথিবীর সকল মসজিদ। এক আয়াতে কাবা মসজিদ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'তোমরা এই গৃহকে রুকুকারী, সেজদাকারী, অবস্থানকারী ও প্রদক্ষিণকারীদের জন্য সতত পবিত্র রাখো'। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা মসজিদ থেকে পৃথক রাখো শিশু, উন্মাদ, ক্রয়-বিক্রয়, বিবাদ-বিসম্বাদ, চীৎকার, দণ্ডবিধান ও উন্মুক্ত অসি থেকে। মসজিদের প্রবেশ দ্বারে রেখে দিয়ো পবিত্রতা অর্জনের আয়োজন। আর জুমআর দিবসে মসজিদকে কোরো সুশোভিত। ওয়াসেলা থেকে সর্বোন্নত সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা। তিরমিজি ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, আমর ইবনে শোয়াইব উল্লেখ করেছেন, আমার পিতামহ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. মসজিদে উচ্চস্বরে কবিতা পাঠ, ক্রয়-বিক্রয় এবং জুমআর দিন গল্পের আসর বসাতে নিষেধ করেছেন। তিনি স. আরো বলেছেন, মসজিদের ভিতরে থুথু ফেলা পাপ। যদি কেউ এরকম করেই ফ্যালে, তবে সে যেনো তা মাটির মধ্যে দাবিয়ে দেয়। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস থেকে আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল পুণ্যকর্ম আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। তিনি স. আরো আজ্ঞা করেছেন, তোমরা যদি মসজিদের ভিতরে কাউকে তার হারানো উটের খোঁজ-খবর নিতে শোনো, তবে বোলো, আল্লাহ্ যেনো তোমার উটকে ফিরিয়ে না দেন। কেননা হৃত উটের খোঁজ-খবর নেওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করছেন তিরমিজি ও দারেমী। হাদিসটি উল্লেখ করার পর এর বর্ণনাকারী তিরমিজি ও দারেমী বলেছেন, মসজিদে কাউকে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখলেও তোমরা বোলো, আল্লাহ্‌পাক যেনো তোমার ব্যবসায় উন্নতি না দেয়।

হাসান বসরী বলেছেন, এখানে 'মসজিদ' বলে বুঝানো হয়েছে সারা পৃথিবীর জমিনকে। কেননা উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য গোটা পৃথিবীকেই মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই যে কোনো স্থানে তারা নামাজ পাঠ করতে পারে। সুতরাং এখানকার 'তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে ডেকো না' কথাটির মর্মার্থ হবে— কোনো স্থানেই তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে অথবা কোনোকিছুকে শরীক কোরো না।

www.eelm.weebly.com

আবু সালেহ্ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার জ্বিনেরা রসুল স. এর সুমহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা কি আপনার সঙ্গে মসজিদে নামাজের জামাতে অংশ নিতে পারি? তাদের এমতো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত যোবায়ের বলেছেন, একবার জ্বিনেরা রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহক! আমরা কেমন করে আপনার সঙ্গে নামাজের জামাতে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতে পারবো? আমরা তো থাকি অনেক দূরে। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। কোনো কোনো জ্ঞানী বলেন, এখানে 'মসজিদ' অর্থ সেজদার স্থান। অর্থাৎ সেজদায় ব্যবহৃত কপাল, হাত-পা স্থাপন করার স্থান। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র সৃষ্টি। সুতরাং এসকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে সেজদা কোরো না। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে সাতটি অঙ্গের সাহায্যে সেজদা করতে বলা হয়েছে— ললাট, দু'হাঁটু, দুই হাত, দুই পা। এরকমও আদেশ করা হয়েছে যে, নামাজের মধ্যে কাপড় গুটিয়ে নিতে পারো, ধূলাবালি নয়।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'আর এই যে, যখন আল্লাহ্র বান্দা তাকে ডাকবার জন্য দণ্ডায়মান হলো, তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো'।

এখানে 'আল্লাহ্র বান্দা' (আবদুল্লাহি) বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে। এখানে এরকম বলে প্রকাশ করা হয়েছে রসুল স. এর অতুলনীয় বিনয়াবনতাকে, যা দাসত্বের মর্যাদার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। 'তাঁকে ডাকবার জন্য দণ্ডায়মান হলো' অর্থ রসুল স. যখন নামাজে দণ্ডায়মান হলেন। নামাজের দণ্ডায়মানতাই একজন আল্লাহ্র বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। এরকম বলেছেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহঃ। 'তাঁকে ডাকবার জন্য' অর্থ আল্লাহ্র ইবাদত করবার জন্য।

কাদূ ইয়াকূনূনা আ'লাইহি লিবাদা' অর্থ তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো। ক্বারী হিশাম এখানকার 'লিবাদা' শব্দটিকে পাঠ করতেন 'লুবাদা'। আর 'লিবাদা' পাঠ করতেন অন্য ক্বারীগণ। 'লুবদাতুন' এর বহুবচন 'লুবাদুন' বা 'লিবাদুন'। শব্দটির ধাত্যার্থ— মানুষের প্রচণ্ড ভীড়, যেনো একজন চড়েছে আরেকজনের ঘাড়ে। কাতাদা এবং ইবনে জায়েদ কথাটির অর্থ করেছেন— রসুল স. যখন জনসমাবেশে দাঁড়িয়ে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন, তখন প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো মক্কার অংশীবাদী ও দুষ্ট জ্বিনেরা। এভাবে আল্লাহ্র মনোনীত ইসলামের নূরকে তারা ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের সকল বুদ্ধি ও শক্তি নিয়োজিত করলো। কিন্তু আল্লাহ্র অভিপ্রায় অন্যরূপ। তিনি তাঁর রসুলের মাধ্যমে ইসলামকে বিজয়ী করতে চেয়েছেন। তাই শতসহস্র বাধা বিপত্তি ডিঙিয়ে ইসলামের অগ্রযাত্রা হয়েছে দুর্বার। পূর্ণরূপে সজ্জিত হয়েছে বিজয়ীর বেশে।

www.eelm.weebly.com

বক্তব্যটি এখানে এরকমও হতে পারে যে, রসুল স. যখন বতনে নাখলায় নামাজে দণ্ডায়মান হয়ে কোরআন পাঠ করতে শুরু করলেন, তখন জ্বিনদের একটি দল কোরআন শোনার জন্য অত্যন্ত আগ্রহভরে সেখানে ভীড় জমালো।

সূরা জ্বিন ঃ আয়াত ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ
لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ
اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ۭ وَمَنْ
يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ﴿٢٣﴾
حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّ
اَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾ قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ
رَبِّيْٓ اَمَدًا ﴿٢٥﴾

r বল, 'আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁহার সংগে কাহাকেও শরীক করি না।'

r বল, 'আমি তোমাদের ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নহি।'

r বল, 'আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়ও পাইব না,

r 'কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে পৌঁছান এবং তাঁহার বাণী প্রচারই আমার দায়িত্ব। যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অমান্য করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের অগ্নি, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে।

r যখন উহারা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে, বুঝিতে পারিবে, কে সাহায্যকারীর দিক দিয়া দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প।

r বল, 'আমি জানি না তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক ইহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করিবেন।'

প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে 'ক্বুল'। এরকম পাঠ করতেন ক্বারী আসেম, ক্বারী হামযা ও ক্বারী আবু জাফর। অন্যান্য ক্বারী পাঠ করতেন 'ক্বলা'। 'ক্বুল' অর্থ বলো। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি জ্বিনদেরকে বলুন। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! যারা অতি আগ্রহভরে আপনার কাছে ভিড় জমিয়েছে, ওই সকল জ্বিনকে আপনি বলুন, আমি আমার সকল আবেগ-

www.eelm.weebly.com

আবেদন উপস্থাপন করি আমার পরম প্রভুপালকের নিকটে। তোমরাও এরূপ করো। আর কখনোই কাউকে অথবা কোনোকিছুকে তাঁর সমকক্ষ অথবা অংশীদার নির্ধারণ কোরো না। আর এখানকার 'কুল'কে যদি পড়া হয় 'কৃলা' তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে—আল্লাহ্র বান্দা তখন ওই জ্বিনদেরকে বললেন, তোমরা অযথা ভীড় জমিয়ে আমার ইবাদতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছো কেনো? আমি তো তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি কেবল আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে। আর এ বিষয়েও তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, তোমরা কখনোই কাউকে অথবা কোনো কিছুকে তাঁর সমকক্ষ অথবা অংশীদার বানিও না।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'বলো, আমি তোমাদের ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নই'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক! আপনি তাদেরকে আরো বলুন, তোমাদের লাভ-ক্ষতি অথবা তোমাদের পথভ্রষ্টতা-পথপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার অধিকারীও আমি নই। আমি কেবল সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভীতিপ্রদর্শক। সুতরাং সত্য পথের দিকে আহবান জানানোই আমার কাজ। এখানে 'রুশদ্' অর্থ ইষ্ট এবং 'দ্বর্‌রা' অর্থ অনিষ্ট। মর্মার্থ— পথপ্রাপ্তি ও পথভ্রষ্টতা। যেভাবেই অর্থ করা হোক না কেনো, একটি বিশেষ্য হবে ধাত্যর্থক এবং অপরটি রূপকার্থক।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'বলো, আল্লাহ্র শাস্তি থেকে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আমি কোনো আশ্রয়ও পাবো না'।

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য গঠিত হয়েছে দু'টো বাক্যের সমন্বয়ে। আর 'মুলতাহাদা' অর্থ এখানে আশ্রয়স্থল। শব্দটিকে যেদিকেই সম্পর্কযুক্ত করা হোক না কেনো, এখানকার বাক্য দু'টো হবে একটি অনুক্ত প্রশ্নের উত্তর। ওই অনুক্ত প্রশ্নটি হচ্ছে— রসুলেপাক স. যেনো আল্লাহ্কে বলছেন, হে আমার আল্লাহ্! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো আমার প্রচারকর্মের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। কেউ কেউ বলছে, তুমি যদি সত্যি সত্যিই নবী হও, তবে আমি যে তোমাকে অমান্য করলাম, এর জন্য তুমি তোমার কথিত শাস্তি আনয়ন করো। আবার কেউ কেউ বলছে, তুমি আমাদের ধর্মের বিরোধিতা যদি পরিত্যাগ করো, তবে আমরাই তোমাকে আশ্রয় দান করবো। আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করবো। এখন আমি তাদেরকে কী বলবো? এমতো সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাবেই যেনো এখানে বলা হয়েছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্র শাস্তি থেকে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না, যদি তিনি আমাকে শাস্তি দিতে চান। কেননা তাঁর অভিপ্রায় অপ্রতিরোধ্য। আর এরকম যদি ঘটেই, তবে নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো আশ্রয় আমি পাবো না। বস্তুত তিনি ছাড়া কারোই কোনো আশ্রয়স্থল নেই। এরকমও হওয়া সম্ভব যে, এখানকার প্রথম বাক্যটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি যেনো এরকমের— যখন রসুল স. এর

www.eelm.weebly.com

সঙ্গে তারা সাক্ষাতের জন্য আগ্রহান্বিত হলো, তখন তিনি স. নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলেন, আমি তাদেরকে কী বলবো এখন? তাদের অপধারণাটি অপসারিত করাই সম্ভবত সমীচীন। অপধারণাটি হচ্ছে— রসুল স. ই সকল কল্যাণ-অকল্যাণের নিয়ন্তা। তখন আল্লাহ্পাক নির্দেশ দিলেন, হে আমার রসুল! আপনি বলুন, আল্লাহ্ যদি আমাকে শাস্তি দিতে চান, তবে সে শাস্তি থেকে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আবার এরকমও হতে পারে যে, এখানকার প্রথম বাক্যটি রসুল স.কে বলতে বলা হয়েছে সীমাতীত বিনয় প্রকাশার্থে। আর দ্বিতীয় বাক্যটি এসেছে প্রথম বাক্যটিকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলতে। হাজরামী সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, জ্বিনদের কোনো এক গোত্রনেতা তার গোত্রের লোকদেরকে বলেছিলো, মোহাম্মদ মনে হয় চান, আমরা তাঁকে আশ্রয় দেই। কাজেই আমিই তাঁকে আশ্রয় দান করলাম। তার এমতো বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'কেবল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পৌঁছানো এবং তাঁর বাণী প্রচারই আমার দায়িত্ব'। এখানকার 'ইল্লা' (কেবল, ব্যতীত) শব্দটি ব্যতিক্রমী অব্যয়। অর্থাৎ এখানে এই অব্যয়টির মাধ্যমে আগের আয়াত দু'টোর ব্যতিক্রমী বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। বরং ব্যতিক্রমী অব্যয়টির মাধ্যমে যেনো আগের অক্ষমতাপ্রকাশক বক্তব্য দু'টোকে (ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নই, আল্লাহ্র শাস্তি থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না) আরো অধিক গুরুত্ববহ করা হয়েছে। আর এই বিষয়টিও প্রমাণ করা হয়েছে যে, নবীগণের কাজ কল্যাণ নির্ধারণ নয়, কল্যাণের সংবাদ প্রচার। অথবা ব্যতিক্রমী অব্যয়টি এখানে সম্পর্কযুক্ত হবে আগের আয়াতের 'আহাদুন' (কেউ) কিংবা 'মুলতাহাদ' (আশ্রয়স্থল) এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্র শাস্তি থেকে যেমন কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না, তেমনি আল্লাহ্ ছাড়া কোনো আশ্রয়ও আমার নেই। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্র বাণী প্রচারের যে দায়িত্ব আমার উপরে ন্যস্ত, সেই দায়িত্বের যথাপ্রতিপালনই কেবল আমাকে রক্ষা করতে পারে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে এবং সেটুকুর বদৌলতেই আমি পেতে পারি আল্লাহ্র আশ্রয়লাভের নিশ্চয়তা। অন্যথায় নিষ্কৃতিপ্রাপ্তির অন্য কোনো অবলম্বন আমার নেই। হাসান ও মুকাতিল কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমার না আছে ইষ্ট-অনিষ্টের উপরে কোনো অধিকার, না আছে কাউকে হেদায়েত করার ক্ষমতা। আমাকে তো কেবল দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্র বচনবৈভব পৌঁছানোর গুরুদায়িত্ব। এরকমও বলা হয়েছে যে, এখানকার 'ইল্লা' শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'ইন্ লা'। শর্তযুক্ত 'ইন' অর্থ যদি এবং 'লা' অর্থ না। আর শর্তের পরিণতি এখানে রয়েছে উহ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি তাঁর মহাবাণী যদি মানুষের কাছে না প্রচার করি, তবে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না তাঁর শাস্তি থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে'।

www.eelm.weebly.com

এখানকার 'মান' (যে) শব্দটি একবচন হওয়ার কারণে 'ইয়া'সি' (যে সীমালংঘন করে) এবং 'লাহু' (তার জন্য) কথাটিও এসেছে একবচনে। 'খলিদীনা' কথাটি আবার বহুবচন হয়েছে ভাবগতভাবে। আর এখানকার 'অমান্য করে' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বার্তা পৌঁছানোই কেবল আমার দায়িত্ব। তাই আমি এমতো দায়িত্ব পালনে সতত তৎপর। এখন যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে মান্য করবে, সে সুপথ পাবে এবং যে এর বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে অবশ্য অবশ্যই প্রবেশ করবে জাহান্নামে। আর জাহান্নামই হবে তার চিরস্থায়ী আবাস।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, বুঝতে পারবে, কে সাহায্যকারীর দিক দিয়ে দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প'।

১৯ সংখ্যক আয়াতের 'তারা তাঁর নিকট ভীড় জমালো' কথাটির অর্থ যদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের যুথবদ্ধ বিরোধিতা হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে— তাদের বিরোধিতা চলতে থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না তারা প্রতিশ্রুত শাস্তির সম্মুখীন হবে। তারা তো রসুলকে দুর্বল মনে করেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতো এবং ভাবতো, তারা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ সেহেতু তারা সহজেই ইসলামের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে পারবে। কিন্তু তাদের এমতো অপধারণা কর্পুরের মতো উবে যাবে তখন, যখন এসে পড়বে প্রতিশ্রুত শাস্তি। তখন তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, দুর্বল ও সংখ্যালঘু কে। আর যদি 'ভীড় জমানো'র অর্থ হয় কোরআন শুনতে আগ্রহী জ্বিন সম্প্রদায়ের স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ, তবে এখানকার 'হাত্তা' (যতোক্ষণ না) অব্যয়টির সম্বন্ধ হবে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে এবং সে বাক্যটি হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অবস্থাবিষয়ক। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা রসুল স.কে দুর্বল মনে করেই প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলো। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মক্কার অংশীবাদীরা রসুল স.কে দুর্বল মনে করে তাঁর অবাধ্যতা করতেই থাকবে, যতোক্ষণ না প্রত্যক্ষ করবে আল্লাহ্র শাস্তি।

এখানে 'প্রতিশ্রুত শাস্তি' অর্থ বদর যুদ্ধের শাস্তি। ওই যুদ্ধে তাদের অনেকেই নিহত ও আহত হয়েছিলো, কেউ কেউ হয়েছিলো বন্দী এবং অবশিষ্টরা প্রাণ বাঁচিয়েছিলো পালিয়ে। আর 'প্রতিশ্রুত শাস্তি' অর্থ যদি পরকালের শাস্তি হয়, তবে সে শাস্তি হবে, মৃত্যু, কবরের আযাব, মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও দোজখ। আর 'বুঝতে পারবে, কে সাহায্যকারীর দিক দিয়ে দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প' অর্থ প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে তাদের কাছে এই তত্ত্বটি উন্মোচিত হয়ে পড়বে যে, দুর্বল ও সংখ্যায় স্বল্প কার দল— রসুল স. এর, না তাদের। এই প্রশ্নবোধক বাক্যটির পুরোটাই এখানে 'ফাসাইয়া'লামূন' (বুঝতে পারবে) কথাটির দুটি কর্মপদের স্থলাভিষিক্ত।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'বলো, আমি জানি না, তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক এর জন্য

www.eelm.weebly.com

কোনো দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন'। মক্কার মুশরিকদের মধ্যে কেউ কেউ যখন বলতে শুরু করলো, কই, কোথায় তোমার তথাকথিত শাস্তি। সত্যবাদী যদি তুমি হও, তবে এখনই শাস্তি নিয়ে এসো। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

এখানে 'ক্বরীব' অর্থ আসন্ন। বিধেয়টি এখানে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে 'মা তূআ'দূন' (তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে) উদ্দেশ্যের। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পরিপূরিত হবে। কিন্তু তা এখনই হবে, না পরে, তা আমি জানি না। বিষয়টি সম্পূর্ণতই আমার প্রভুপালকের অভিপ্রায়াধীন। তিনি যা ইচ্ছা, তা-ই করেন।

সূরা জ্বিন ঃ আয়াত ২৬, ২৭, ২৮

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

r তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁহার অদৃশ্যের জ্ঞান কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না,

r তাঁহার মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন,

r রাসূলগণ তাহাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন কি না জানিবার জন্য। রাসূলগণের নিকট যাহা আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

'আ'লিমুল গইব' অর্থ অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। কথাটি আগের আয়াতের 'রব্বী' (আমার প্রতিপালক) এর বিশেষণ। অথবা একটি উহ্য উদ্দেশ্যের বিধেয়। অর্থাৎ 'হুয়াল আ'লিমূল গইব'। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়ায়— তিনিই অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তিনি ব্যতীত অন্য কেউই অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা নয়।

'গইব' অর্থ অদৃশ্য, অনুপস্থিত, অপ্রত্যক্ষ। যেমন পরলোকের ঘটিতব্য বিষয়। অথবা অতীতের অবলুপ্ত ঘটনা, ইতিহাস যা ধরে রাখেনি। অথবা আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পৃক্ত নাম-গুণাবলী, যে গুণগুলো সম্পর্কে তাঁর বান্দাগণ অনবগত, যা দলিল-প্রমাণের ঊর্ধ্বে। অবশ্য আল্লাহ্‌পাকের কোনো কোনো নাম ও গুণ সম্পর্কে আমরা

www.eelm.weebly.com

পরিচিত— যেমন, তিনি চিরঞ্জীব, গফুর, রহমান। পৃথিবীর পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কেও আমরা অনবগত নই। সুতরাং শ্রুতি, দৃষ্টি ও চিন্তার আয়ত্ত যা কিছু, তার কোনোটাই 'অদৃশ্য' পদবাচ্য নয়।

কোনো কোনো জিনিস আবার এমনও রয়েছে যে, তা কখনো দৃশ্যমান, আবার কখনো অদৃশ্য। যেমন ফেরেশতা ও জ্বিন। তারা আকৃতি ধারণ করলে দৃশ্যমান হয়, নচেৎ থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে। আবার দূরের জিনিস অগোচর হলেও, ফেরেশতা-জ্বিনদের কাছে তা দৃশ্যমান। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা বলা যাবে না যে, ফেরেশতা ও জ্বিনেরা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে। এক আয়াতে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে এভাবে 'যখন (নবী সুলায়মানের) পবিত্র মরদেহ ভূতলশায়ী হলো, তখন জ্বিনেরা জানতে পারলো তাঁর পরলোকগমনের সংবাদ। তারা যদি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখতো, তবে কখনোই অবস্থান করতো না লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির মধ্যে'।

অথবা 'অদৃশ্য' অর্থ এখানে পৃথিবীবাসীদের কাছে অদৃশ্য, যেমন আকাশজগত। যেমন প্রাচ্যবাসীদের কাছে অদৃশ্য প্রতীচ্য এবং প্রতীচ্যবাসীদের কাছে অদৃশ্য প্রাচ্য। তবে এধরনের অদৃশ্য অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় কখনো কখনো প্রত্যাদেশ, অথবা ইলহামের (অন্তর্জ্ঞানের) মাধ্যমে। আবার কখনো মধ্যবর্তী অন্তরাল অপসারিত করে কাশফের (অন্তর্চক্ষুর) মাধ্যমে। যেমন হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি বসেছিলাম হাজরে আসওয়াদের সম্মুখে। কুরায়েশরা আমাকে মেরাজ রজনীর ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলো। জিজ্ঞেস করতে লাগলো, বায়তুল মাকদিস মসজিদের কয়টি সিঁড়ি, কয়টি দরজা ইত্যাদি। আমি অস্বস্তিতে পড়লাম। কেননা অতো কিছু তো আমি মনে রাখিনি। তখন বিলুপ্ত করে দেওয়া হলো আমার ও বায়তুল মাকদিসের দূরত্বের অন্তরাল। আমি তখন দেখে দেখে জবাব দিতে লাগলাম তাদের প্রশ্নের।

আবু ওমর সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, খলিফা হজরত ওমর একবার সারিয়াকে সেনাপতি বানিয়ে তাঁর নেতৃত্বে একদল সৈন্যকে পাঠালেন এক যুদ্ধক্ষেত্রে। এরপর একদিন মসজিদে খুতবা দান কালে হঠাৎ বলে উঠলেন, হে সারিয়া! জাবাল! জাবাল! (পাহাড়ের দিকে, পাহাড়ের দিকে)। অর্থাৎ খুতবা দান কালেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মদীনা থেকে বহু দূরের সারিয়া-বাহিনীকে। দেখেছিলেন, একদল শত্রুসেনা পেছনের পাহাড় থেকে তাদের উপরে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই তিনি 'পাহাড়ের দিকে' এরকম বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন সারিয়া-বাহিনীকে। আর ওই বাহিনীও আমিরুল মুমিনীনের কণ্ঠস্বর শুনে সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন।

আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর পরলোকগমনের পর তাঁর সমাধি থেকে যে আলোর উদ্ভাস আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিলো, সে সম্পর্কে আমরা মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে আলাপ করতাম। উল্লেখ্য, অন্তরাল উন্মোচিত হওয়ার পর অন্তরালবর্তী বিষয় আর

www.eelm.weebly.com

অদৃশ্য থাকে না, যদিও তা পরিদৃষ্ট হয় অলৌকিক নিয়মে। আবার এমতো দৃশ্য সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর নয়। একারণেই পরবর্তী আয়াতের প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে 'তাঁর মনোনীত রসুল ব্যতীত'। আর আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে এধরনের অদৃশ্যজ্ঞান দান করেন এ কারণে যে, তাঁদের সুসংবাদপ্রদানকর্ম ও ভীতিপ্রদর্শন কার্য যেনো প্রতিষ্ঠিত থাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তাঁর মনোনীত রসুল ব্যতীত'। অর্থাৎ তাঁর মনোনীত প্রত্যাদেশবাহক যাঁরা, তাঁদের কাছে তিনি অদৃশ্যের কোনো কোনো বিষয় প্রকাশ করেন।

এখানে 'মির রসুলি' অর্থ রসুল, প্রত্যাদেশ বাহক, দূত, প্রেরিত পুরুষ। উল্লেখ্য, ফেরেশতা ও মানুষ উভয়েই রসুল হতে পারে। নবীগণ প্রেরিত পুরুষ হিসেবেই পৃথিবীতে প্রচার করেন আল্লাহ্র বিধি-বিধান। তাঁদের মধ্যে আবার যাঁদের উপরে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাঁদেরকেই ব্যবহারিক অর্থে বলা হয় রসুল। প্রকৃত অর্থে সকল নবীই রসুল, অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত পুরুষ। কোনো কোনো বিদ্বান বলেন, রূপকার্থে ওলীগণও রসুল পদবাচ্য। কেননা রসুল স. বলেছেন, ধর্মীয় বিষয়ের বিদ্বানগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। এরকম বর্ণনা করেছেন কাছীর ইবনে কায়েস সূত্রে আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারেমী, হজরত আনাস সূত্রে বোখারী এবং হজরত আলী সূত্রে ইবনে আদী। শেষোক্ত সূত্রপরম্পরা কর্তৃক প্রাপ্ত বিবরণটি এরকম— রসুল স. বলেছেন, আলেমগণ পৃথিবীর প্রদীপ্ত প্রদীপ এবং তাঁরা নবীগণের স্থলাভিষিক্ত। অথবা বলেছেন, আলেমগণ আমার উত্তরাধিকারী। হজরত আনাস সূত্রে ইবনে আকীল বর্ণনা করেছেন, আলেমগণ নবীগণের পক্ষ থেকে ততোক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসভাজন, যতোক্ষণ তারা দ্বারস্থ হবে না কোনো শাসকের, অথবা যতোক্ষণ তারা থাকবে পার্থিব মোহমুক্ত।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত এই যে, ওলীগণের কারামতও নবীগণের মোজেজার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ কারামত হচ্ছে মোজেজার প্রতিবিম্ব। আর প্রতিবিম্ব যেহেতু মূল বস্তুর অনুরূপ, সেহেতু কারামতও মোজেজার অনুরূপ। আল্লাহ্পাক স্বয়ং বলেছেন, 'আমি প্রত্যেক রসুলকে তাঁদের মাতৃভাষায় দৌত্যকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রেরণ করেছি'। রসুল স. যেহেতু শেষ নবী, সেহেতু তাঁর কাছে সমগ্র মানবমণ্ডলী একই জাতি। আর সেকারণে সকল দেশের সকল গোত্রের আলেম-ওলী তাঁরই মুখপাত্র, তাঁরই বচন। তাঁদের অলৌকিকত্বও তাঁরই অলৌকিকত্ব, তাঁরই মোজেজার প্রতিবিম্ব, বিস্তৃতি বা বিকাশ। সুতরাং ওলীগণের যদি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান অর্জিত হয়, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। আল্লাহ্পাক যেহেতু অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেন, সেহেতু তাঁর প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্তরা তো সে জ্ঞানের অংশ পেতেই পারেন। বরং একথা বলতে কোনো বাধা নেই যে, তাঁদের অদৃশ্যবিষয়ক জ্ঞান রসুল স. এর অদৃশ্য জ্ঞানেরই প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। আবার যদি রসুল স. এর অদৃশ্য জ্ঞান থেকে তাঁদেরকে পৃথককও করা হয়, তবুও তাঁরা অদৃশ্য জ্ঞান প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবেন না। কেননা তাঁদেরকে সাহায্য করা হয়

www.eelm.weebly.com

ইলহাম দ্বারা, যা ওহী বা প্রত্যাদেশের প্রতিবিম্ব। এরকম ধারণাও এই আয়াতের বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। আর এমতাবস্থায় তাঁদের ইলহামগত জ্ঞান হবে ধারণাপ্রসূত, প্রত্যাদেশের মতো অকাট্য নয়। অর্থাৎ ইলহাম সত্য হবে তখন, যখন তা হবে প্রত্যাদেশের পরিপূর্ণ অনুকূল। আর তখনই তা হতে পারবে কেবল প্রত্যাদেশের প্রতিবিম্ব, যা প্রত্যাদেশেরই অধীন বা অন্তর্ভুক্ত। সে কারণেই সুফী-আউলিয়াগণ বলেন, ইলহামকে পরখ করতে হবে প্রত্যাদেশের নিরীখে। অর্থাৎ কোরআন ও হাদিসের মাপকাঠিতে। এভাবে পরীক্ষা করার পর কোরআন-হাদিসের অনুকূল যদি হয়, তবে তা হবে গ্রাহ্য। আর প্রতিকূল হলে হবে অবশ্য পরিত্যাজ্য। তাঁরা আরো বলেন, যা শরিয়তবিরোধী, তা অবশ্যই পথভ্রষ্টতা। উল্লেখ্য, এখানে যে অদৃশ্য জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, তা অকাট্য, সন্দিগ্ধ নয়। নবীগণকে কখনোই অস্পষ্টতার মধ্যে রাখা হয় না। কেননা তাঁরা অবশ্যঅনুসরণীয়। আর সন্দিগ্ধতা বা অস্পষ্টতা কখনোই অবশ্য অনুসরণীয় হতে পারে না।

এতোক্ষণের আলোচনার মাধ্যমে 'কাশশাফ' রচয়িতা জমখশরীর ওই অভিমতটি রহিত হয়ে যায়, যা মুতাজিলাদের মতবাদভিত্তিক। তা হচ্ছে— আলোচ্য আয়াতে কেবল নবীগণকে অদৃশ্যজ্ঞানদানের কথা বলা হয়েছে, ওলীদের বিষয়ে এখানে কিছু বলা হয়নি। অর্থাৎ তাঁর মতে নবীগণের মোজেজা সত্য হলেও ওলীগণের কারামত সত্য নয়। বলা বাহুল্য, মুতাজিলারা পথভ্রষ্ট। তাই তাদের অন্যান্য ভুল অভিমতসহ তাদের এই অভিমতটিও পরিত্যাজ্য।

ওলীগণের কারামত ও ইলহামের প্রমাণ রয়েছে কোরআন মজীদের অন্যান্য আয়াতেও। যেমন—

'আর আমি মুসা-জননীকে ইলহাম করলাম, তুমি তাকে স্তন্য দান করো। আর যদি তার ব্যাপারে শংকাগ্রস্ত হও, তবে তাকে নিক্ষেপ করো নদীগর্ভে। দুঃখ কোরো না। আমি তাকে পুনরায় তোমার কোলে ফিরিয়ে দিবো। তাকে আমি করবো আমার নবীগণের একজন'।

'অতঃপর ফেরেশতা তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়াজ দিলো, দুঃখ কোরো না। তোমার প্রভুপালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিবেন। আর তুমি খেজুর কাণ্ড ধরে নাড়া দাও, তা থেকে পতিত হবে সুপক্ক খেজুর। তুমি তা পান করো ও আহার করো এবং শীতল করো দু'চোখ। কোনো মানুষ যদি তোমার বিষয়ে প্রশ্ন করে, তবে তুমি ইঙ্গিতে বোলো, আমি রোজা মানত করেছি, তাই কথা বলবো না'।

'আমি হাওয়ারীগণের নিকট ইলহাম করলাম, আমার উপর এবং আমার রসুলের উপর ইমান আনো'।

পর্যালোচনা ঃ ওলীগণের যে ইলহামকে আমরা ধারণা প্রসূত (জন্নী) বলেছি, তা হচ্ছে অর্জিত জ্ঞান। কখনো তা অর্জিত হয় সরাসরি অনুপ্রেরণা (ইলহাম) যোগে, কখনো ফেরেশতাদের মাধ্যমে, আবার কখনো মধ্যবর্তী অন্তরাল বিলুপ্ত

www.eelm.weebly.com

করে, যেমন হয়েছিলো খলিফা হজরত ওমরের বেলায়। তাঁর সামনে থেকে অন্তরাল অপসৃত হয়েছিলো বলেই তিনি বহুদূরে অবস্থিত সেনাবাহিনীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন এবং তাদেরকে সতর্কও করে দিতে পেরেছিলেন তাঁর মিম্বরে দণ্ডায়মান থেকেই। তাঁর ওই আত্মিক প্রতিভাস (ইনকেশাফ) ওই শ্রেণীর প্রতিভাস, যা কখনো কখনো কোনো কোনো ওলীর অন্তরে প্রতিবিম্বিত হয় লওহে মাহফুজ থেকে। ওই সকল ওলী তা প্রাধ্যয়ন করে থাকেন অনড় (মুবরাম) অথবা পরিবর্তনশীল (মুয়াল্লাক) অদৃষ্টলিপি হিসেবে। আবার এমতো প্রতিভাস কখনো কখনো পরিদৃষ্ট হয় স্বপ্নে অথবা আধ্যাত্ম্যানুশীলনাবস্থায় (মোরাকাবায়) উপমা জগতের প্রতিচ্ছায়ারূপে। তাই হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সঠিক স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, মুবাশ্শিরাত ব্যতীত নবুয়তের আর কোনো নিদর্শন অবশিষ্ট নেই। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! মুবাশ্শিরাত কী? তিনি স. বললেন, পরিশুদ্ধ স্বপ্ন। বোখারী। নবী-রসুলগণ ব্যতীত প্রজ্ঞার্জনের বর্ণিত মাধ্যমগুলোতে অন্যান্যদের ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। তাই তাঁদের ইলহামের মধ্যে কখনো শয়তানের অপচেষ্টার প্রভাব পড়তেও পারে। কেননা মানুষের হৃদয়ে রয়েছে দুটি প্রকোষ্ঠ— একটি অধিকার করে রাখে ফেরেশতা এবং অপরটিকে প্ররোচনাপিষ্ট করে শয়তান। তাই কখনো কখনো শয়তানী প্ররোচনাও ফেরেশতাদের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে প্রকাশ পায়। আবার এর মধ্যে থাকতে পারে কল্পনার দখলও। অথবা শয়তান প্রতারণা করে কাশফ এবং উদাহরণ জগতের (আলমে মেছালের) পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায়। হজরত আবু কাতাদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শুভ স্বপ্ন আসে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং অশুভ স্বপ্ন আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। বোখারী, মুসলিম।

মোহাম্মদ ইবনে সিরীন বলেছেন, স্বপ্ন তিন ধরনের— ১. মনের খেয়াল ২. শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতি সঞ্চার ৩. আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে শুভসমাচার। বোখারী ও মুসলিম এরকমই বর্ণনা করেছেন। আবার কখনো স্বপ্নের তাৎপর্য বিশ্লেষণেও হয়ে যায় ভুল, যদিও ওলীগণের কাশফ ও ইলহামে ভুল হয় কদাচিৎ। কেননা তাঁরা নবী না হলেও তাঁদেরই একনিষ্ঠ অনুসারী। তাই উভয়ের মধ্যে রয়েছে সৌসাদৃশ্য। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, নবীগণ মাসুম (নিষ্পাপ), আর ওলীগণ সুরক্ষিত (মাহফুজ)।

এবার আসা যাক ওলীগণের সত্তাসঞ্জাত জ্ঞানের (এলমে হুজুরীর) আলোচনায়। বলা বাহুল্য, ওলীগণের সত্তাসঞ্জাত জ্ঞান দিবালোকের চেয়েও অধিক সুস্পষ্ট। এই জ্ঞানকে এলমে লাদুন্নিও বলা হয়। এ জ্ঞান সম্পর্কযুক্ত আল্লাহ্তায়ালার পরম সত্তা ও গুণবত্তার (সিফাতের) সঙ্গে। এই জ্ঞানের মধ্যে ভুলের কোনো সম্ভাবনাই নেই। কেননা এ জ্ঞান সত্তা কর্তৃক উপলব্ধ। তাই নির্ভুল। বরং এ জ্ঞানের স্তর সাধারণ অকাট্য জ্ঞানের স্তর অপেক্ষাও উন্নত পর্যায়ের।

www.eelm.weebly.com

যেহেতু স্বীয় সত্তা অপেক্ষা অধিক নির্ভুল ও নিশ্চিতা কোনোকিছুই নয়, সেহেতু সত্তা কর্তৃক উপলব্ধ জ্ঞানও সুনিশ্চিত ও সর্বাংশে নির্ভুল। সত্তা এমতোক্ষেত্রে একাধারে জ্ঞানী (আলেম), জ্ঞান (এলেম) ও উপলব্ধি (মা'লুম)। আপন সত্তাকে অনুভব করার জন্য যেমন চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয় না, তেমনি এমতো জ্ঞান অনুভব করার জন্যও মুখাপেক্ষী হতে হয় না চিন্তা-গবেষণার। এই জ্ঞান যে পায়, সে-ই পায় আল্লাহ্র পরিচয়। কেননা আল্লাহ্র পরম সত্তা নিজের সত্তা অপেক্ষাও অধিক নিকটে। তাই তাঁর পরিচয় পাওয়া সম্ভব কেবল এই সত্তাসঞ্জাত জ্ঞানের পথেই। আল্লাহ্পাক স্বয়ং বলেছেন 'আমি তোমাদের প্রাণ-ধমনী অপেক্ষাও অধিক নিকটে'। একথার অর্থ— হে আমার বান্দা! তুমি তোমার যতোখানি নিকটে, তার চেয়েও অধিক নিকটে আমি তোমার। এই অবস্থাটি চিন্তা-গবেষণা-অবলোকনের অতীত। এটাই এলমে লাদুন্নি। আবার ওলীগণ এই জ্ঞান পেয়ে ধন্য হন নবীগণের মাধ্যমে। সে মাধ্যম যতো বেশী প্রলম্বিত হোক না কেনো (আধ্যাত্মিক সংশ্লিষ্টতার শিকল বা সিলসিলা হোক না কেনো যতো অধিক দীর্ঘ)।

সংশয় ঃ 'আমি তোমার প্রাণ-ধমনী অপেক্ষা অধিক নিকটে' ঘোষণাটি একটি সাধারণ ঘোষণা। তাহলে কি একথাই বলতে হবে যে, সকলেই আল্লাহ্র এমতো নৈকট্যধারী?

নিরসন ঃ না। আল্লাহ্র প্রিয়ভাজনতার নৈকট্য বিশেষ ধরনের, যা নির্ভর করে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের উপর। আমি সুরা মুলকের তাফসীরে আলোচনা করেছি জীবন চার ধরনের, তন্মধ্যে এক ধরনের জীবন এরকম, যা আনয়ন করে আল্লাহ্ পরিচিতি। ওই জীবনের অধিকারী হতে গেলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। আর এমতোক্ষেত্রে কেবল আলাপ-আলোচনা নিরর্থক।

জিজ্ঞাসা ঃ আধ্যাত্মবিদগণ যে এলমে হুজুরী (সত্তাসঞ্জাত জ্ঞান) লাভ করেন তা নির্ভুল। এ জ্ঞানে ভুলের সম্ভাবনা নেই। তৎসত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয় কেনো? দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তওহীদে ওজুদী মতাবলম্বী এবং কেউ তওহীদে শুহুদীর প্রবক্তা। এরূপ হওয়ার কী কারণ?

জবাব ঃ এলমে হুজুরীর ভাবপ্রকাশের ভাষা এখনো অনাবিষ্কৃত। তাই এ জ্ঞানকে যখনই ভাষা দিতে চাওয়া হয়, তখনই ঘটে বিপত্তি। অথচ মূল অনুভব একটিই। সেখানে কোনো দ্বিত্ব নেই। বৈষম্য ঘটে কেবল প্রকাশের ক্ষেত্রে।

উল্লেখ্য, স্রষ্টা ও সৃষ্টির যে সম্পর্ক, সে সম্পর্ক সৃষ্টির কারো সঙ্গে কারোই নেই। কেননা তাদের কেউ কারো স্রষ্টা নয়। শিল্পীর সঙ্গে তার শিল্পকর্মের সম্পর্কও সেরকম নয়। কেননা শিল্পী তার শিল্পকর্মের স্রষ্টা নয়, নির্মাতা। সৃজন সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র, অর্থাৎ আল্লাহ্ শিল্পী ও তার শিল্পকর্মসহ সকল কিছুর স্রষ্টা। মুতাজিলারা অজ্ঞ ও পথভ্রষ্ট বলেই এ বিষয়টি বুঝতে পারে না। বলে, মানুষ তার ভালো ও মন্দ উভয় কর্মের স্রষ্টা। বিবেকবান সৃষ্টির সঙ্গে বিবেকহীন সৃষ্টিরও এক প্রকার সাদৃশ্যপূর্ণ অথবা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন মানুষের সঙ্গে

www.eelm.weebly.com

অন্যান্য প্রাণীকুলের অথবা পাথরের। কিন্তু এরকম সম্পর্কও আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির দৃষ্টান্ত হওয়ার অনুপযোগী। কেননা স্রষ্টা সম্পূর্ণতই স্রষ্টা এবং সৃষ্টি সর্বোতভাবেই সৃষ্টি। স্রষ্টা চিরঅমুখাপেক্ষী, আর সৃষ্টি চিরমুখাপেক্ষী। তাদের অস্তিত্ব-স্থায়িত্ব-প্রবৃদ্ধি-পরিণতি-সাফল্য-বৈফল্য সবকিছুই আল্লাহ্‌র চিরঅমুখাপেক্ষী অভিপ্রায়নির্ভর। সুতরাং এমতো সম্পর্ককে ভাষা দিতে পারা যাবে কীভাবে। তওহীদে ওজুদী এবং তওহীদে শুহুদীর ধারণাবৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তো এই অনির্বচনীয় সম্পর্কটিকে প্রকাশ করতে গিয়েই।

তত্ত্বজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সত্তা ও মানব সত্তা মৌলিকভাবে এক নয়। তাহলে সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে একাকার ভাবা তো যাবেই না। আবার যদি বলা হয় সৃষ্টি সত্তাগতভাবে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহলে তো তাকে স্বয়ম্ভু বলতে হয়। কিন্তু তা-ও তো হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই বা কোনোকিছুই স্বয়ম্ভু, স্বাধিষ্ঠ, বা স্বতিষ্ঠ নয়। সৃষ্টি তার অস্তিত্ব পেয়েছে তাঁর অভিপ্রায়ে, দয়ায় ও দানে। কিন্তু সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক নির্ণয়ের ভাষা আবিষ্কার সত্যিই দুরূহ। অর্জিত জ্ঞানের (এলমে হুসুলীর) সকল অহমিকা এমতোক্ষেত্রে স্থবির, বিমূঢ়, দ্বিধা-দ্বন্দ্বপূর্ণ। সুতরাং এমতো সম্পর্কের স্বরূপ উপলব্ধ হতে পারে কেবল এলমে হুজুরীর দ্বারা। কেননা তা পরম সত্তা সন্নিহিত। তাই বলা যেতে পারে কেবল, তিনি আনুরূপ্যবিহীন। বোধ, চিন্তা, কল্পনা ও ধারণার অতীত হিসেবে সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিধর। মার্জনাপরবশ, দয়ালু, শাস্তিদাতা, উদ্ধারকর্তা, সর্বাধিপতি, সৃজয়িতা, পালয়িতা। অর্থাৎ তিনি অদৃশ্যের অদৃশ্য, রকম, প্রকার ও আকার নিরাকারহীন। অর্জিত জ্ঞান কেবল এভাবে প্রকাশ করতে পারে তার আল্লাহ্‌পরিচিতি প্রসঙ্গের অক্ষমতা। আর এলমে হুজুরী পায় সেই অক্ষমতার পরিচয়, যা কেবল সত্তা দ্বারা অনুভব্য। ভাষা দ্বারা প্রকাশযোগ্য নয়। আল্লাহ্‌র মারেফত জ্ঞান লাভ হয় এই এলমে হুজুরীর পথেই।

সংশয় ঃ এতো গেলো নবী ও ওলীগণের এলেম ও মারেফতের বিবরণ। কিন্তু দেখা যায়, গণৎকার ও চিকিৎসকেরাও এক ধরনের অদৃশ্য জ্ঞান রাখে। নাহলে তাদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় কীভাবে? যেমন ইলীয়ার প্রশাসক ইবনে নাতুর সূত্রে বোখারী বর্ণনা করেছেন, সম্রাট হেরাক্লিয়াস যখন ইলীয়ায় এলেন, তখন একদিন সকালে তাকে দেখা গেলো অত্যন্ত বিমর্ষ। নেতৃপর্যায়ের এক লোক জিজ্ঞেস করলো, সম্রাটপ্রবরকে বিষণ্নচিত্ত মনে হচ্ছে কেনো? হেরাক্লিয়াস বলেছিলো, রাতে নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করে বুঝতে পারলাম, পুরুষাঙ্গের ত্বক ছেদনকারীদের রাজার জন্ম হয়েছে। সে তার এক জ্যোতির্বিদ সুহৃদকেও একথা লিখে জানালো। প্রত্যুত্তরে সে-ও জানালো, হ্যাঁ, খতনাকারীদের সম্রাট নবীর শুভাগমন ঘটেছে।

ফেরাউনের দরবারের জ্যোতিষীদের বিষয়টিও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। তারা বলেছিলো, বনী ইসরাইলদের মধ্যে এমন এক শিশু জন্মগ্রহণ করবে, যার হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ফেরাউনের সাধের সাম্রাজ্য। ফেরাউন একথা

www.eelm.weebly.com

শুনে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেও সফল হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তা-ই ঘটেছিলো, যার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো জ্যোতিষীরা। আবার রোগী দেখে ও পরীক্ষা করে চিকিৎসকেরা যে ব্যবস্থাপত্র দেন, তার অনুসরণ করে অধিকাংশ রোগীই ভালো হয়ে যায়। তারা ঔষধের গুণাগুণ সম্পর্কেও জ্ঞাত, যে গুণাগুণ পরিদৃশ্যমান নয়। তাহলে কি বুঝতে হবে তারাও এক ধরনের অদৃশ্য জ্ঞান রাখে?

নিরসন ঃ রসুলেপাক স. এর মহাআর্বিভাবের আগে জ্যোতিষ-গণকদের কথা সাধারণত সত্য হতো একারণে যে, তারা আকাশে আড়ি পেতে শোনা শয়তানদের কাছ থেকে আকাশবাসী ফেরেশতাদের কথাবার্তার মাধ্যমে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয়ে জানতে পারতো। আবার সে সংবাদ অবিকল আহরণ না করতে পারলে তাদের কথা সঠিক হতো না। কিন্তু রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের পর তাদের অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণী হয় প্রমাদপূর্ণ। কেননা শয়তানকে আর আকাশের কাছে যেতে দেওয়া হয় না। অগ্নিদণ্ডধারী ফেরেশতারা সেখানে সতত প্রহরারত। এখন তারা যা বলে, তা নিছক অনুমান ও শয়তানী খেয়াল, কাকতালীয়ভাবে তা কখনো কখনো ফলেও যায়। তাই বিষয়টি এখন একেবারেই গুরুত্বহীন। জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর কাছে জানতে চাওয়া হলো, গণৎকারদের সম্পর্কে আমাদের করণীয় কী? তিনি স. বললেন, কখনো কখনো তাদের কথা ফলে যায়। শয়তান ফেরশতাদের কথাবার্তা চুরি করে শুনে তা মুরগীর মতো কোঁ কোঁ করে তাদেরকে শোনায়। তারা আবার সেগুলোকে প্রচার করে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে। বোখারী, মুসলিম।

এবার আসা যাক জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসকদের আলোচনায়। নিঃসন্দেহে জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার ভিত্তি হচ্ছে অভিজ্ঞতা। আর অভিজ্ঞতা লব্ধ হয় দৃশ্যমান বস্তু থেকে। নক্ষত্রের গতিবিধির হিসাব যার অভিজ্ঞতায়ত্ত, সে তো শুভ-অশুভ ক্ষণের একটা নির্ঘন্ট প্রস্তুত করতে পারবেই। তেমনি ঔষধের গুণাগুণ সম্পর্কে যে চিকিৎসক ওয়াকিফহাল, তার ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ করে নিরাময় লাভ অন্যান্য সচরাচর ঘটনার মতোই। কিন্তু তাদের জ্ঞান ও ব্যবস্থাপত্রও সর্বাংশে ফলপ্রসূ হয় না। হতে পারেও না। আর তাদের এই বিদ্যাটি নবীগণের শিক্ষা থেকেই জ্যোতিপ্রাপ্ত। মানুষ তাদের আগ্রহে ও প্রয়োজনে এই বিদ্যা দু'টোকে তাদের অভিজ্ঞতাপরম্পরাভুক্ত করে নিয়েছে। কেননা এর মধ্যে রয়েছে ইহজাগতিক কল্যাণ। নবী ইব্রাহিমের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতে গিয়ে এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে 'ইব্রাহিম নক্ষত্রমালার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো এবং বললো, আমি পীড়িত'। অর্থাৎ অচিরেই আমি পীড়িত হবো।

চিকিৎসা বিজ্ঞান তো সম্পূর্ণতই নবুয়তের আলোক থেকে আলোকপ্রাপ্ত। একথার প্রমাণস্বরূপ ইমাম বাগবী সুরা সাবা'র তাফসীরের একস্থানে উল্লেখ করেছেন, বায়তুল মাকদিসে ইবাদত করতেন নবী সুলায়মান। সেখানে কোনো বৃক্ষ চারা উদ্‌গত হতে দেখলে তিনি তাকে বলতেন, কী নাম তোমার? উদ্ভিদ শিশুটি তার নাম বলতো। তিনি পুনঃ জিজ্ঞেস করতেন, কী কাজ তোমার? সে এ প্রশ্নেরও

www.eelm.weebly.com

জবাব দিতো। তিনি তার জবাব লিখে রাখতেন এবং চারাটি তুলে রোপণ করিয়ে দিতেন অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে। একবার এক নতুন বৃক্ষচারা দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী নাম তোমার? সে বললো খারুবা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী কাজ তোমার? সে বললো, আপনার মসজিদ বিনষ্ট করা। ইমাম গাজ্জালীও ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন তাঁর 'আল মুনকিজ আনিদ দ্বলাল' নামক পুস্তকে।

একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, নক্ষত্র ও ঔষধের নিজস্ব কোনো গুণাগুণ নেই। যেমন আগুনের নেই নিজস্ব দাহিকা শক্তি। এদের অস্তিত্ব যেমন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তেমনি— তাদের মধ্যকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও। তাই দেখা যায় অনেক সময় ঔষধেও কাজ হয় না— এবং নক্ষত্রের গতিবিধির হিসাবও মেলে না। তাই স্বীকার করতে হবে সকল শুভ ও অশুভের প্রকৃত স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রয়িতা কেবলই আল্লাহ্। সকল কিছু তাঁর অভিপ্রায়াধীন। তিনি যা যেমন ভাবে করতে ইচ্ছা করেন, তা তেমনভাবেই হয়। তাঁর পবিত্র অভিপ্রায় সতত স্বাধীন। অপ্রতিরোধ্য। এমতো ব্যাখ্যার আলোকে বলা যেতে পারে, যদি কোনো জ্যোতির্বিদ এরকম বিশ্বাস রাখে যে, নক্ষত্রগুলোর মাধ্যমে শুভাশুভ নির্ণয় করা গেলেও আল্লাহ্‌পাকই তাদের ও তাদের অবস্থানগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্রষ্টা এবং তাদের নিয়ন্ত্রয়িতা, তাহলে সে কাফের হবে না। তেমনি চিকিৎসক ও পীড়িত ব্যক্তিও কাফের হবে না, যদি তারা বিশ্বাস করে, ঔষধ ও ঔষধের গুণাগুণ আল্লাহ্ কর্তৃক সৃজিত এবং আল্লাহ্ এই রোগ থেকে মুক্ত করবেন ওই ঔষধটি সেবন করলে। যেমন হলাহল পান মৃত্যুর নিমিত্ত হলেও মৃত্যু সম্পূর্ণই আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তনির্ভর। এরকম বিশ্বাস অন্যায় নয়। এভাবে আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্ট বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ধারণা করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই সকল কল্যাণ-অকল্যাণের স্রষ্টা ও অধিকর্তা। অন্য কেউ বা কোনোকিছু নয়। এভাবে সৃষ্টিকে উপলক্ষ হিসেবে এবং আল্লাহ্‌কে চূড়ান্ত মীমাংসাকারীরূপে জানাই প্রকৃত জ্ঞান।

হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ জুহাইনি বর্ণনা করেছেন— আমরা তখন হুদায়বিয়ায়। রাতে বৃষ্টি হলো। ভোরে রসুল স. আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ পাঠ করলেন। তারপর আমাদের দিকে ঘুরে বসে বললেন, তোমরা কি জানো, তোমাদের প্রভুপালনকর্তা কী বলেছেন? আমরা অপারগতা প্রকাশ করলাম। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন— আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাসী এবং কেউ কেউ অবিশ্বাসী। যারা বলেছে, বৃষ্টি হয়েছে অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে, তারা অবিশ্বাসী। আর যারা বলেছে, বৃষ্টিপাত হয়েছে আমার অভিপ্রায়ে ও কৃপায়, তারা বিশ্বাসী। বোখারী, মুসলিম।

একথাটি প্রণিধাননীয় যে, জ্যোতির্বিদ্যায় কোনো কল্যাণ নেই। তাই এই বিদ্যাচর্চা করা মাকরুহ। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে লোক জ্যোতির্বিদ্যা থেকে জ্ঞান আহরণ করলো, সে যেনো জ্ঞান আহরণ করলো যাদুবিদ্যার একটি শাখা থেকে। বাহ্যত সে বিদ্যার্থী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়।

www.eelm.weebly.com

এবার আলোচনা করা যেতে পারে হস্তরেখা গণনা, তাবিজ তুমার ইত্যাদি সম্পর্কে। বলাবাহুল্য, এ সকলকিছু নবীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত তুচ্ছ বস্তু। তাই এগুলো মূল্যহীন। হজরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম বর্ণনা করেছেন, একবার আমি রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আমরা তো অজ্ঞতার যুগে গণকদের কাছে যাতায়াত করতাম। তিনি স. বললেন, আর যেয়ো না। আমি বললাম, আমরা তাদের কাছ থেকে তাবিজ-কবজ গ্রহণ করতাম। তিনি স. বললেন, আর নিয়ো না। আমি বললাম, কিছুসংখ্যক লোক তো রেখা গণনা করে। এর ফলে ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতে পায়। তিনি স. বললেন, একজন নবীও এরকম করতেন। কিন্তু এখন তা পরিত্যক্ত। মুসলিম।

জিজ্ঞাসা ঃ কোনো কোনো সন্যাসী-সন্তুর ভবিষ্যদ্বাণীও ফলে যায়। অথচ তারা কাফের, কৃচ্ছসাধনায় নিমগ্ন। তাদের সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কী?

জবাব ঃ অদৃশ্যের জ্ঞান আহরণের মূল ভিত্তি হচ্ছে, অন্তরালের বিলুপ্তি এবং উপমার জগতের প্রতিভাস ধারণ। তবে দেখতে হবে, এদু'টো অবস্থা সাধিত হচ্ছে কীভাবে? বিষয়টি সম্ভব হতে পারে দু'রকমভাবে। যেমন— ১. যাঁরা শরিয়তের পুরাপুরি পাবন্দ, তাঁরা হন সুন্নতের একনিষ্ঠ অনুসারী। আর সে কারণে তাঁদের অভ্যন্তরভাগ ও বহির্বিভাগ হয়ে যায় জ্যোতির্ময়। আর ওই জ্যোতিই তখন হয় তাদের অদৃশ্য জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম। এই মাধ্যমকেই বলে ফেরাসাত বা অন্তর্দৃষ্টি। ২. কৃচ্ছসাধনাও মধ্যবর্তী অন্তরালকে ভেদ করতে পারে, এবং কাফের হলেও এরকম সাধকদের দৃষ্টিপথে ভেসে আসতে পারে উপমাজগতের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু তবু এমতো প্রতিচ্ছবিকে অদৃশ্যজ্ঞান বলা যাবে না। বরং তাদের জ্ঞান পরিদৃশ্যমান জ্ঞানের মতোই। কেননা তারা মিথ্যানুসারী, শয়তানের চেলা। আর আলোচ্য আয়াতে যে অদৃশ্য জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, তা প্রযোজ্য হবে কেবল নবী-রসুলগণের বেলায়। শয়তানের চেলারা এমত উচ্চমার্গীয় বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পর্কই রাখে না। পরবর্তী বাক্য থেকে শেষোক্ত আয়াতের শেষ পর্যন্ত একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আরো স্পষ্টভাবে। বলা হয়েছে—

'সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ রসুলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন (২৭), রসুলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন কিনা জানবার জন্য। রসুলগণের নিকট যা আছে, তা তাঁর জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন' (২৮)। একথার অর্থ— রসুল স. ফেরেশতাদের সতত সুরক্ষার মাধ্যমে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ্র আশ্রয়-প্রশ্রয় ও পর্যবেক্ষণভূত। সুতরাং তাঁর প্রত্যাদেশে, প্রজ্ঞায় ও সিদ্ধান্তে শয়তানের প্রভাব বিস্তারণের অবকাশ মাত্রই নেই। তাঁর পরিপূর্ণ ও একনিষ্ঠ প্রেমিক অনুগামীরাও তাঁর কারণে এরকম নিরাপত্তাপ্রাপ্ত।

www.eelm.weebly.com

মুকাতিল প্রমুখ বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁর কোনো মনোনীত বান্দাকে যখন নবুয়তের দায়িত্ব দেন, তখন ইবলিস ফেরেশতার আকৃতি ধরে তার কাছে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেখান থেকে মেরে পিটে তাড়িয়ে দেয় প্রহরী ফেরেশতারা। প্রত্যাদেশবহনকারী ফেরেশতার কাছেও ইবলিসকে যেতে দেওয়া হয় না। অর্থাৎ নবীগণ সতত সুরক্ষিত, তাই নিষ্পাপ। তাঁদের এমতো নিরাপত্তার কথা এক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে 'তাঁর নিকট আসতে পারে না কোনো অবাঞ্ছিত, না তাঁর সম্মুখ থেকে, না পশ্চাৎ থেকে'।

'লি ইয়া'লামা আন ক্বদ আব্‌লাগূ রিসালাতি রব্বিহিম' অর্থ রসুলগণ তাঁদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন কিনা, তা জানার জন্য। আল্লাহ্‌পাক সর্বজ্ঞ তবুও এখানে এরকম করে বলা হয়েছে তাঁর জ্ঞানের সম্পর্ক কখনো কখনো নিমিত্তের সঙ্গেও যে সম্পৃক্ত হয় সেকথা বোঝাতে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তিনি যেনো জেনে নিতে পারেন, কে তাকে না দেখে ভয় করে'। বাক্যটি প্রহরী ফেরেশতা নিযুক্তির কারণপ্রকাশক। অর্থাৎ এ কারণেই আল্লাহ্‌ নিযুক্ত করেন প্রহরী ফেরেশতাদেরকে, যদিও সকলের ও সকল কিছুর প্রকাশ্য-গোপন সবকিছু তাঁর জানা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এ বিষয়টি তিনি ভালোভাবেই জানেন যে, প্রহরী ফেরেশতা কর্তৃক পরিবেষ্টিত তাঁর সুরক্ষিত নবী তাঁর প্রত্যাদেশাবলী যথাযথভাবে জনসমক্ষে প্রচার করেন।

কোনো কোনো বিদ্বান এখানকার 'জানবার জন্য' কথাটির কর্তা নির্ধারণ করেন রসুল স.কে। যদি এরকমই করা হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— রসুল স. যেনো একথা জানতে পারেন যে, তিনি এবং তাঁর অন্যান্য নবী ভ্রাতাগণ সঠিকভাবে জনসমক্ষে প্রচার করেন আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ। আর এ প্রত্যাদেশ শয়তানের প্ররোচনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অথবা বলা যেতে পারে 'পৌঁছে দিয়েছেন' ক্রিয়ার কর্তা এখানে ফেরেশতা। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ফেরেশতা কর্তৃক আনীত প্রত্যাদেশ যে সম্পূর্ণরূপে শয়তানের প্রভাবমুক্ত, রসুল স. যেনো বিষয়টি ভালোভাবে জেনে নিতে পারেন।

'ওয়া আহাত্বা বিমা লাদাইহিম' অর্থ রসুলগণের নিকট যা আছে, তা আল্লাহ্‌র জ্ঞানগোচর। অর্থাৎ রসুল, প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ, প্রহরী ফেরেশতা— সকলকিছুই আল্লাহ্‌র জ্ঞানায়ত্ত। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ। আর 'ওয়া আহ্‌সা কুল্‌লা শাইইন আ'দাদা' অর্থ এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন। অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির ক্ষুদ্র-বৃহৎ দৃশ্য-অদৃশ্য সকলকিছুর হিসাব তাঁর জানা। কোথায় কীভাবে কতোটুকু কখন বিদ্যমান, অথবা অবিদ্যমান— তার কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। আল্লাহ্‌ই প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত।

www.eelm.weebly.com

সূরা মুয্যাম্মিল

মহাতীর্থভূমি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এর রুকু সংখ্যা ২ এবং আয়াত সংখ্যা ২০।

সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ﴿۱﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ﴿۲﴾ نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ
قَلِيْلًا ۙ﴿۳﴾ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ﴿۴﴾

r হে বস্ত্রাবৃত!

r রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত,

r অর্ধ রাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প

r অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে;

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'ইয়া আইয়্যুহাল মুয্যাম্মিল'। কথাটির অর্থ— হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি! 'তাযামমুল' ধাতুমূল থেকে ' মুয্যাম্মিল' সাধিত হয়েছে কর্তৃপদীয় শব্দরূপে। শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'মুতাযাম্মিল'। সন্ধিরীতি অনুসারে 'তা' অক্ষরটি হয়েছে 'যা'। আর এভাবেই শব্দরূপটি দাঁড়িয়েছে—'মুয্যাম্মিল'। বস্ত্রাবৃত ব্যক্তিকেই সম্বোধন করা হয় 'ইয়া আইয়্যুহাল মুয্যাম্মিল' বলে। যেমন বলা হয় 'তাযাম্মালা ছিয়াবাহ' (সে তার দেহে বস্ত্র জড়িয়েছে)। 'মুয্যাম্মিল' ও 'মুদ্দাস্সির' সমার্থক। রেসালাতের গুরুভার অর্পণের প্রাক্কালে সুরাগুলোর শুরুতে আল্লাহ্পাক এভাবে তাঁর প্রিয়তম জনকে স্নেহসিক্ত স্বরে সম্বোধন করতেন। আর ওই সময় রসুল স.ও অধিকাংশ সময় থাকতেন বস্ত্রাবৃত। পরবর্তী সময়ে তিনি স. সম্বোধিত হতে থাকেন 'হে আমার নবী', 'হে আমার রসুল'— এভাবে।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, প্রথম বার ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর দীর্ঘকাল যাবত ওহী আগমন বন্ধ ছিলো। ওই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে রসুল স. একদিন আমাকে বললেন, আমি পদব্রজে কোথাও যাচ্ছিলাম। অকস্মাৎ একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। দৃষ্টি উত্তোলন করতেই দেখতে পেলাম সেই ফেরেশতাকে, যিনি আমার কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন হেরা পর্বতের গুহায়। দেখলাম, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্য স্থানে তিনি একটি আসনে বসে রয়েছেন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বাড়িতে ফিরে এসে বললাম, খাদিজা! আমাকে বস্ত্রাবৃত করো। আমাকে

www.eelm.weebly.com

বস্ত্রাবৃত করো। তখন অবতীর্ণ হলো 'ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাস্সিরু' থেকে 'ফাহজুর' পর্যন্ত। এরপর থেকে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হতে শুরু করলো কিছুকাল পরপর ক্রমাগতভাবে। বোখারী, মুসলিম।

এ সম্পর্কে বোখারী ও মুসলিম জননী আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন এক দীর্ঘ হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. তখন গৃহে ফিরে এসে মাননীয়া খাদিজাকে বললেন, আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। তিনি তাঁকে কাপড়ে জড়িয়ে দিলেন। এভাবে ক্রমশঃ প্রশমিত হলো তাঁর আতংক। ইনশাআল্লাহ্ হাদিসটি আমি সবিস্তারে বর্ণনা করবো সুরা ইক্বরা'র তাফসীরে।

শিথিল সূত্রপরম্পরা যোগে বায্যার ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের বলেছেন, কুরায়েশদের পরামর্শকক্ষ লোকে লোকারণ্য। সকলে মিলে একটি ব্যাপারে একমত হলো যে, মোহাম্মদকে একটি অপঅভিধায় অভিহিত করতে হবে। আর ওই নামটি প্রচার করতে হবে ব্যাপকভাবে। তাহলে ওই খারাপ নামেই সকলের কাছে পরিচিত হবে সে। প্রশ্ন উত্থাপিত হলো, তাহলে তার কী নাম দেওয়া যায়? একজন বলে উঠলো, তার নাম দেওয়া হোক কাহিনীকার। আর একজন বললো, না, তাকে বলা হোক উন্মাদ। অন্য আর একজন বললো, তাকে যাদুকর বললেই ভালো হয়। রসুল স. এর কানে গেলো এ সমস্ত কথা। তিনি স. মনঃক্ষুণ্ন হলেন। মনের দুঃখে শুয়ে পড়লেন গায়ে কাপড় জড়িয়ে। তখন প্রত্যাদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন হজরত জিবরাইল। পাঠ করলেন 'ইয়া আইয়্যুহাল মুয্যাম্মিল' ও 'ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাস্সির'।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'ক্বুমিললাইল' (রাত্রি জাগরণ করো)। অর্থাৎ রাতে জাগ্রত হয়ে নামাজ পাঠ করো। এখানকার 'ক্বুম' শব্দটি এসেছে 'ক্বিয়াম' (নামাজের দণ্ডায়মানতা) থেকে। ব্যষ্টির উল্লেখ করে মর্মার্থ নেওয়া হয়েছে সমষ্টির। অর্থাৎ কেবল ক্বিয়ামের কথা উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে রুকু, সেজদা, তেলাওয়াতসহ পুরো নামাজকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার বস্ত্রাবৃত রসুল! রাতে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে নামাজ পাঠ করুন। বাক্যটির মাধ্যমে একথাটিও প্রমাণিত হয় যে, দণ্ডায়মানতা (ক্বিয়াম) হচ্ছে নামাজের প্রধান স্তম্ভ। অবশ্য এটাই ঐকমত্যসম্মত অভিমত।

'আল্লাইল' অর্থ সারা রাত। এর পূর্বে অনুক্ত রয়েছে একটি যের প্রদানকারী অব্যয় 'ফী'। আর এভাবেই কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— সারা রাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইল্লা ক্বলীলা' (কিছু অংশ ব্যতীত)। এখানে আবার ব্যতিক্রমী অব্যয় 'ইল্লা' (ব্যতীত) অব্যয় ব্যবহার করে সমস্ত রাত থেকে কিছু অংশ বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা কতোখানি, তা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (৩) এভাবে—

'নিস্ফাহু' (অর্ধরাত্রি)। কথাটি প্রলম্বিত হয়েছে 'আললাইল' থেকে। আরেক আয়াতে বলা হয়েছে 'কিছু অংশ ব্যতীত'। অর্থাৎ রাতের কিছু অংশ বাদে সারা

www.eelm.weebly.com

রাত ধরে নামাজ পাঠ করো। কেননা ব্যতিক্রমটুকু বাদ দিলে বাকী অংশটুকু হয়ে যায় বিধানের আওতাভূত। এরপর আবার এই আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে, অর্ধরাত্রি বাদ দিয়ে রাতের অবশিষ্ট অর্ধাংশ নামাজ পাঠে অতিবাহিত করুন।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'নিস্‌ফাহু' (অর্ধরাত্রি) শব্দটি 'ক্বলীলা' (কিয়দংশ) কথাটির অনুবর্তী এবং 'নিস্‌ফাহু' এখানে 'ক্বলীলা' এর বিশ্লেষক। এভাবে এখানে অনিশ্চিত ব্যতিক্রমকে করা হয়েছে সীমায়িত। ব্যতিক্রমীর উল্লেখ করে লোপ করা হয়েছে অনিশ্চয়তাকে। স্থিরীকৃত হয়েছে— নামাজ পাঠ করতে হবে অর্ধরাত্রি ব্যাপী। আর 'অর্ধরাত্রি'কে এখানে 'কিছু অংশ' বলা হয়েছে একথা বোঝাতে যে, সারা রাতের তুলনায় অর্ধেক রাত তো অল্পই, কিছু অংশই। 'কিছু অংশ' বলার আরো একটি কারণ থাকতে পারে এখানে। সেটি হচ্ছে— রাতের অংশেই পাঠ করতে হয় মাগরিব, এশা, সম্পন্ন করতে হয় রাতের পানাহার। তাই নিদ্রার জন্য থাকে অর্ধরাত্রির কম সময়, যদি নিদ্রা থেকে উঠে ঠিক ঠিক অর্ধরাত্রি নামাজে কাটাতে হয়।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানকার 'নিস্‌ফাহু' অনুবর্তী 'আললাইল' এর। তাঁরা 'নিস্‌ফ' (অর্ধ)কে কেউ কেউ ধরে নিয়েছেন ব্যতিক্রম। এভাবে প্রতিপাদ্য বক্তব্যটি দাঁড়ায় 'ক্বুম নিস্‌ফাল লাইলা ইল্‌লা ক্বলীলা'। অর্থাৎ মাঝরাতে জেগে উঠে নামাজ পাঠ করো। তার মধ্যে আবার কিছু অংশ বাদ দাও।

এরপর বলা হয়েছে— 'আউইন ক্বুস্‌ মিনহু ক্বলীলা' (কিংবা তদপেক্ষাও অল্প)। কথাটির যোগসূত্র রয়েছে 'ক্বুম' এর সঙ্গে। অর্থাৎ ব্যতিক্রমের পর অবশিষ্ট রইলো যে অর্ধেক, সেই অর্ধেকেরও কম, এক চতুর্থাংশের চেয়ে কিছু বেশী।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আওযিদ আ'লাইহি' (অথবা তদপেক্ষা বেশী)। অর্থাৎ অর্ধেক রাত্রির বেশী, যতো বেশী বাড়াতে ইচ্ছা করো। এভাবে এখানে শেষ সিদ্ধান্ত দাঁড়ালো— রাতে শয্যাসুখ থেকে গাত্রোত্থান করে নামাজ পাঠ করো রাতের এক চতুর্থাংশ সময়ের জন্য। অথবা এর চেয়ে কিছু বেশী সময়ের জন্য, যতোটুকু বেশী তুমি ইচ্ছা করো। উল্লেখ্য, বিধানটি আবশ্যিক, কেননা এর প্রকৃতি আদেশসূচক। জননী আয়েশা থেকে বাগবী এরকমই বর্ণনা করছেন, যার সারমর্ম হচ্ছে— ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে রসুল স. এবং তাঁর উম্মতগণের উপরে রাত জেগে নামাজ পাঠ করা ছিলো ফরজ। অবশ্য পরে এই বিধানটির অত্যাবশ্যকতা রহিত হয়ে যায়। বাগবী লিখেছেন, তখন রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দ রাত জেগে নামাজ পাঠ করতেন। নামাজে এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে যেতেন যে, কারো খেয়ালই থাকতো না, কতোক্ষণ ধরে তাঁরা নামাজ পাঠ করেছেন, রাতের এক তৃতীয়াংশ, অর্ধেক, না দুই তৃতীয়াংশ। বিনিদ্র রজনী তাঁরা এভাবে অতিবাহিত করতেন এই ভেবে যে, সময়ের আবশ্যিকতা যেনো লংঘিত না হয়। নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ফুলে যেতো

www.eelm.weebly.com

তাঁদের চরণযুগল। দায়িত্বটি তাঁদের কাছে যখন হয়ে পড়লো নিতান্তই কষ্টকর, তখন আল্লাহ্পাক সদয় হলেন তাঁদের প্রতি। অবতীর্ণ করলেন 'ততোটুকু পাঠ করো, যতোটুকু হয় তোমাদের জন্য স্বস্তিকর'। এভাবে বিধানটিকে পরিণত করা হয় সুন্নতে।

সাঈদ ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, আমি একবার মাতা মহোদয়া আয়েশা সিদ্দীকার পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে মাননীয়া জননী! রসুল স. এর অনন্য চরিত্রামৃত সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। তিনি বললেন, তুমি কি কোরআন পাঠ করোনি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কোরআনই তাঁর অনুপম চরিত্রের আলেখ্য। আমি নিবেদন করলাম, তাঁর নিশীথের নামাজ সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন, তুমি কি সুরা মুয্যাম্মিল পড়োনি? আমি বললাম, নিশ্চয়। তিনি বললেন, সুরাখানির প্রথমাংশের কতিপয় আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর উপরে নিশীথের নামাজ ফরজ করে দিয়েছিলেন। তাই তিনি স. ও তাঁর সাহাবীগণ সারা বছর ধরে প্রতিরাতে জেগে জেগে নামাজ পাঠ করতেন। এতে তাঁদের খুব কষ্ট হতো। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ফুলে যেতো পা। শেষের আয়াতখানি তখনো আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেননি। অবশেষে শেষ আয়াতখানি অবতীর্ণ করে বিধানখানিকে লঘু করা হয়। তখন নিশিথের নামাজ হয়ে যায় নফল। আবু দাউদ, নাসাঈ, বাগবী। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাকেম এবং ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন।

মুকাতিল ও ইবনে কীসান বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিশীথের নামাজ (তাহাজ্জুদ) ফরজ ছিলো। পরে যখন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের বিধান অবতীর্ণ হয়, তখন তাহাজ্জুদের ফরজ হয়ে যায় রহিত এবং তা হয়ে যায় নফল।

আমি বলি, নিশীথের নামাজ ফরজ ছিলো কেবল রসুল স. এর উপর। কেননা শেষ আয়াতে (২০) বলা হয়েছে 'তোমার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ করো কখনো রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সঙ্গে যারা আছে, তাদের একটি দলও। এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে 'জাগে তোমার সঙ্গে যারা আছে, তাদের একটি দলও'। অর্থাৎ সাহাবীগণের কেউ কেউ তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং কেউ কেউ পড়তেন না। তাহাজ্জুদ যদি রসুল স. ছাড়া অন্যদের উপরে ফরজ হতো, তবে নিশ্চয় সাহাবীগণ সকলেই তাহাজ্জুদ পড়তেন। অবশ্যই ফরজ দায়িত্ব কেউই লংঘন করতেন না।

জিজ্ঞাসা ঃ তাহাজ্জুদ যদি কেবল রসুল স. এর উপরেই ফরজ হতো, তবে সাহাবীগণের কেউ কেউ কেনো তা পাঠ করতেন। আর শেষ আয়াতে একথা কেনো বলা হয়েছে 'তিনি জানেন যে, তোমরা এটা পুরাপুরি পালন করতে পারবে না, অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছেন'। আরো বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে'। এতে করে কি এটাই প্রতীয়মান হয় না যে, তাঁদের উপরে রাতের নামাজ ফরজ ছিলো এবং তা পালন করা কষ্টকর ছিলো বলেই আল্লাহ্‌পাক তা লঘু করে দিয়েছেন। অর্থাৎ উম্মতের দৈহিক দৌর্বল্যই কি তাদের উপর থেকে তাহাজ্জুদের ফরজ দায়িত্ব রহিত হওয়ার কারণ নয়? তাহলে কেনো এরকম বলা হবে যে, তাহাজ্জুদ ফরজ ছিলো কেবল রসুল স. এর উপরে।

জবাব ঃ উম্মতের দৈহিক দৌর্বল্যই ছিলো তাহাজ্জুদের অত্যাবশ্যকতা রহিত হওয়ার কারণ, একথা যেমন ঠিক, তেমনি এই অভিমতটিও সঠিক যে, তাহাজ্জুদ ফরজ ছিলো কেবল রসুল স. এর উপর। উল্লেখ্য, যে নফল রসুল স. নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করেন, তা-ও তাঁর উম্মতের জন্য হয়ে যায় সুন্নত, তবে আবশ্যিক হিসেবে নয়। সেজন্য এরকম সুন্নত পরিত্যাগ তিরস্কারযোগ্য হলেও শাস্তিযোগ্য নয়। আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং বলেছেন 'তোমাদের রসুলের চরিত্রে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ, যারা আশা রাখে আল্লাহ্‌র ও পরকালের'। কিন্তু রসুল স. এর কিছু কিছু কর্ম আবার এরকম নয়। যেমন 'সওমে বেসাল' (ইফতার ও সেহেরী ব্যতিরেকে কয়েকদিন ধরে একটানা রোজা রাখা)। এই আমলটি উম্মতের জন্য সুন্নত নয়। বরং তাদের জন্য এই আমলটি নিষিদ্ধ।

বিদ্বানগণের কেউ কেউ বলেন, রসুল স. এর সকল আমলই উম্মতের জন্য সুন্নত, তা ওয়াজিব-নফল, যা-ই হোক না কেনো। কিন্তু অভিমতটি যথার্থ নয়। তবে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, উম্মতের জন্য রসুল স. এর সকল আমল মাকরুহ বা হারাম নয়। তবে তাঁর কোনো কোনো আমলের অনুসরণ অবশ্যই হারাম। যেমন— সওমে বেসাল, চার জনের অধিক রমণীর পানিগ্রহণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া রত্তিলিল কুরআনা তারতীলা' (আর কোরআন আবৃত্তি করো ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে)। কথাটির যোগসূত্র রয়েছে ২ সংখ্যক আয়াতের 'কুমিল্ লাইল' (রাত্রি জাগরণ করো) এর সঙ্গে। কেউ কেউ বলেছেন, যথাযথ উচ্চারণে কোরআন পাঠ করার দায়িত্বটি চিত্তবিনোদনমূলক, তাই মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। কিন্তু অভিমতটি অযথার্থ। কেননা কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'রাত্রি জাগরণ করো' এর সঙ্গে। আর 'রাত্রি জাগরণ করো' কথাটি আদেশসূচক, যা পালন করা ওয়াজিব। সুতরাং যথাযথ উচ্চারণে কোরআন পাঠ করাও ওয়াজিব। কেননা যোজ্য ও যোজিত সমগুরুত্বসম্পন্ন। এর একটি ওয়াজিব হলে অন্যটি তো ওয়াজিব হবেই।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোরআন পাঠকারীকে বলা হবে, পাঠ করো, উন্নতমান হও এবং তারতীল করো। তোমার অবস্থিতি হবে তোমা কর্তৃক পঠিত শেষ আয়াতে। এখানে তারতীল অর্থ সরল ও সহজ উচ্চারণ, ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে আবৃত্তি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'তারতীল' অর্থ খোলাখুলিভাবে কোরআন বর্ণনা। হাসান বসরীও এরকম

www.eelm.weebly.com

বলেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, এর অর্থ— পাঠ করো স্বচ্ছগতিতে। কাতাদা বলেছেন, হজরত আনাসকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, রসুল স. কীভাবে কোরআন পাঠ করতেন? তিনি জবাব দিলেন, তিনি স. কোরআন পাঠ করতেন দীর্ঘ লয়ে। এরপর তিনি স. এর নমুনা হিসেবে পাঠ করে শোনালেন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'। 'আল্লাহ্' 'রহমান' ও 'রহীম' শব্দত্রয় পাঠ করলেন প্রলম্বিত মাত্রায়।

আমি বলি, 'আল্লাহ্' শব্দের 'লাম' বর্ণ এবং 'রহমান' শব্দের 'মীম' বর্ণ এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে। আর 'রহীম' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু যতিপাত করতে হবে, তাই তা দুই আলিফ সমান টেনে পড়া সিদ্ধ। আর যতিপাত না ঘটিয়ে পরের বাক্যের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করলে টানতে হবে এক আলিফ সমান। একবার জননী উম্মে সালমার কাছে রসুল স. এর কোরআনের পাঠের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো। তিনি বললেন, তিনি স. প্রতিটি অক্ষর উচ্চারণ করতেন সুস্পষ্ট উচ্চারণে। তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ। জননী উম্মে সালমা থেকে এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন' পাঠ করে থেমে যেতেন। আবার 'আর্‌রহ্‌মানির রহীম' বলেও পাঠবিরতি দিতেন। পাঠ করতেন এভাবে বাক্য শেষের বিরতি দিয়ে। তিরমিজি। আমি বলি, সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করাও 'তারতীল' এর অন্তর্ভূত।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর ভূবনমোহিনী কণ্ঠের কোরআন পাঠের প্রতি আল্লাহ্ যেরূপ মনোনিবেশ করেন, সেরকম মনোনিবেশ আর কোনো কিছুর প্রতি করেন না। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন মধুর স্বরে সশব্দে কোরআন পাঠে রত থাকেন, তখন আল্লাহ্ যেভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন, সেভাবে আর কোনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হন না। বোখারী, মুসলিম। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা চিত্তাকর্ষক কণ্ঠে কোরআন আবৃত্তি করবে না, তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। বোখারী। হাদিসটিতে উল্লেখিত 'তুগান্‌নী' শব্দটি কিন্তু সঙ্গীতের সুর নয়। কেননা গান হারাম। বরং এর অর্থ সুমধুর স্বর। এই সুমধুর স্বরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আরো কয়েকটি বর্ণনায়।

হজরত হুজায়ফা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা কোরআন আবৃত্তি কোরো, আরবী উচ্চারণভঙ্গি ও ধ্বনি সহযোগে। বিরত থেকো ইহুদী-খৃষ্টানদের সুরলহরী ও প্রেমসঙ্গীতের সুরমুর্চ্ছনা থেকে। আমার মহাতিরোধানের পর এমন কিছুসংখ্যক লোকের আগমন ঘটবে, যারা কোরআন পাঠ করবে সঙ্গীতের সুরলহরী সহকারে। কোরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিম্মে পৌঁছবেই না। তাদের ও তাদের অনুরক্তদের হৃদয় হবে বিশৃঙ্খল (ফেত্‌নাযুক্ত)। বায়হাকী।

উপযোগ ঃ তারতীলের উদ্দেশ্য হচ্ছে, উপদেশমূলক বাণীসম্ভারের প্রতি অভিনিবেশী হওয়া। শাস্তির আয়াত পাঠকালে ভীত হওয়া, পুণ্য দানের সংবাদসম্বলিত আয়াত পাঠকালে হওয়া আশাবাদী ইত্যাদি।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, চীৎকার করে কোরআন পাঠ কোরো না। সঙ্গীতবিদদের মতো সুরসংযোজনা কোরো না। গুরুত্ব দিয়ো বাণীসম্ভারের অসাধারণত্বের উপর। একটি সুরা শেষ পর্যন্ত পাঠ করাই যেনো তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য না হয়। বরং এর সঙ্গে মিলন ঘটিয়ো তোমার হৃদয়ের।

হজরত হুজায়ফা বলেছেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে নিশীথের নামাজ পাঠ করেছি। তিনি স. জান্নাতের বিবরণবিষয়ক আয়াত পাঠ করার পর থামতেন। অভিলাষ প্রকাশ করতেন জান্নাতের। জাহান্নামের বিবরণবিশিষ্ট আয়াত পাঠ করার পরও থেমে যেতেন তিনি। নিবেদন জানাতেন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের।

হজরত উবায়েদ মুলকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওহে কোরআনের বাহক! কোরআনকে তোমরা উপলক্ষ মনে কোরো না। দিবস-নিশীথে যথানিয়মে পাঠ কোরো। এর বাণী প্রচার কোরো। পাঠ কোরো সুমধুর স্বরে। আর এ নিয়ে চিন্তা-গবেষণাও কোরো, যাতে তুমি লাভ করতে পারো সাফল্য। তাড়াহুড়া করে কখনো কোরআন আবৃত্তি কোরো না। জেনো যথাআবৃত্তিতেও রয়েছে পুণ্য। বায়হাকী।

হজরত সহল ইবনে সা'দ সায়েদী বলেছেন, আমরা কোরআন পাঠ করছিলাম। এমন সময় শুভাগমন ঘটলো রসুল স. এর। তিনি স. বললেন, তোমাদের কোরআন কিন্তু একটিই। অথচ তোমাদের মধ্যে আছে বিজ্ঞজন। কালো শাদা রঙের মানুষ। তোমরা পাঠ করতে থাকো ওই যুগ আসার পূর্বে, যে যুগে এমন কিছুসংখ্যক কোরআন পাঠকারীর আবির্ভাব ঘটবে, যারা এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণে কোরআন পাঠ করবে, যেমন বাঁকা তীর সোজা করা হয় অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কোরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিম্নে নামবে না। তারা অভিলাষী হবে তাৎক্ষণিক প্রাপ্তির। তর সইবে না তাদের এতোটুকুও (ধৈর্য থাকবে না পরকালের পুণ্যপ্রাপ্তির)।

সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত ৫

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝٥

r আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিতেছি গুরুভার বাণী।

'ইন্না সানুল্ক্বী আ'লাইকা ক্বওলান ছাক্বীলা' অর্থ আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুভার বাণী। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'গুরুভার বাণী' (ক্বওলান ছাক্বীলা) অর্থ রাতের নামাজ। তাহাজ্জুদ বা রাতের নামাজ সত্যিই প্রবৃত্তির (নফসের) উপরে এক গুরুভার। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, আলোচ্য আয়াতখানি ইতোপূর্বের আয়াতসমূহের গুরুত্ববর্ধক ও পরিপূরক। আর 'সানুল্ক্বী' (অবতীর্ণ করেছি) কথাটির 'সীন' এখানে ভবিষ্যতকালবোধক নয়, বরং গুরুত্বপ্রদায়ক।

www.eelm.weebly.com

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'সানুল্‌ক্বী' অর্থ কোরআন মজীদ। অর্থাৎ গুরুভার রূপে আমি অবতীর্ণ করেছি কোরআন মজীদ। মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেছেন, কপটাচারীদের জন্য কোরআন একটি ভারী বোঝা। আমি বলি, এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে ওই আয়াতের মতো, যেখানে বলা হয়েছে 'অংশীবাদীদের জন্য এটা একটা গুরুতর বোঝা, (যদিও আপনি তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন)। হাসান ইবনে ফজল বলেছেন, কোরআন মজীদ অত্যন্ত ভারী হবে মীযানে। আমি বলি, এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, দুটি মাত্র কথা, যার উচ্চারণ সহজ, কিন্তু মীযানে তা হবে অত্যন্ত ভারী। কথা দুটি হচ্ছে 'সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী' এবং 'সুবহানাল্লহিল আ'জীম'। বোখারী, মুসলিম।

মুকাতিল বলেছেন, কোরআন অত্যন্ত গুরুভার বাণী। কারণ এতে রয়েছে নির্দেশ, নিষেধাজ্ঞা ও দণ্ডবিধান। কাতাদাও এরকম বলেছেন। আবুল আলীয়া বলেছেন, কোরআন গুরুভার অঙ্গীকার ও হুমকির কারণে। বর্ণিত অভিমতসমূহের সারমর্ম হচ্ছে— কোরআনে যেহেতু আছে সুকঠিন আদেশ-নিষেধ, পুরস্কারের অঙ্গীকার-শাস্তির হুমকি, আছে পরকালের ভীতিপ্রদ আলোচনা, তাই যাদেরকে কোরআন মান্য করতে বলা হয়েছে, তাদের জন্য কোরআন গুরুভারই। বিশেষ করে রসুল স. এর উপরে এটা সবদিক থেকেই গুরুভার। কেননা এ ভারোত্তলনের প্রধান দায়িত্ব তাঁর। তাঁর উম্মতও এ ভারোত্তলনের জন্য আদিষ্ট। এ কারণেই রসুল স. বলেছেন, সুরা হুদ এবং এর সন্নিহিত সুরাগুলি আমাকে বয়োপ্রবীণ বানিয়েছে। হাদিসটি হজরত হুজায়ফা এবং উতবা ইবনে আমের থেকে বর্ণনা করেছেন তিবরানী। রসুল স. এর এরকম বলার কারণ হচ্ছে, সেখানে তাঁকে এই মর্মে আজ্ঞা করা হয়েছে 'সুতরাং তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছো, তাতে স্থির থাকো এবং তোমার সঙ্গে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাও স্থির থাকুক; এবং সীমালংঘন কোরো না'। উল্লেখ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল হিসেবে স্বভাবগতভাবেই তিনি স. ছিলেন সর্বাধিক আল্লাহ্‌ভীরু। তার উপর এরকম নির্দেশ তাঁকে করে তুলেছিলো আরো বেশী আতংকগ্রস্ত। তাই তিনি স. বলেছেন, এই সুরা আমার বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে। অথবা বলা যেতে পারে, সুরা হুদে উল্লেখ করা হয়েছে পরকালের ভয়াবহতা এবং অতীতযুগের অবাধ্যদের মর্মন্তুদ ইতিবৃত্ত। তাই তিনি স. বলেছেন, সুরা হুদ আমাকে করেছে বৃদ্ধ। এরকম ভীতিসঞ্চারক বিবরণ রয়েছে অন্যান্য সুরাতেও। তাই রসুল স. বলেছেন, সুরা হজ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাআ'লুন এবং ইজাশ্‌ শামসু কুয়্যিরাত আমাকে বৃদ্ধ বানিয়েছে। হজরত আবু বকর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাকেম। এরকম হাদিস আরো বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি এবং হজরত সা'দ থেকে ইবনে মারদুবিয়া। হজরত আনাস থেকে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে সুরা হুদ এবং তার দোসর সুরাগুলি বয়োবৃদ্ধ করে দিয়েছে।

www.eelm.weebly.com

কেউ কেউ বলেছেন, কোরআন গুরুভার এর গবেষকদের জন্য। কারণ এমতো দায়িত্ব পালন করতে গেলে প্রয়োজন হয় নিবিষ্টচিত্ততা, পরিশুদ্ধতা এবং সর্বাধিক সতর্কতা। তৎসহ প্রয়োজন অখণ্ড উদ্দীপনা ও অটুট দৃঢ়তা। এই ব্যাখ্যাটি পূর্বাপর বক্তব্যের সঙ্গে একারণে সঙ্গতিপূর্ণ যে, গবেষণা ও উপলব্ধিও চায় তারতীল (ধীর ও সুস্পষ্ট আবৃত্তি)। এর সঙ্গে রয়েছে রাত্রি জাগরণ। মুখ ও মনের সমন্বয়ন।

এরকমও বলা যায় যে, আধ্যাত্মিক সাধকদের জন্য কোরআনের সঙ্গোপন পাঠও অত্যন্ত গুরুভার। কেননা সঙ্গোপন পাঠের ফলে আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য ও ভালোবাসার জ্যোতিসম্পাত ঘটে অন্তরের অন্তস্থলে, যা সর্বাধিক গুরুভার। ফাররার বক্তব্যও এরকম। তিনি বলেছেন, আমাদের মহান প্রভুপালকের বাণী কোনো লঘু বিষয় নয়, বরং তা সকল ভার-অপেক্ষা অধিক ভারী।

আমাদের মহামান্য শায়েখ মাযহারে শহীদ জানে জানাঁ রহ. বলেছেন, কোরআনের নিগুঢ় নির্যাস (হকিকতে কোরআন) আধ্যাত্মিক পথযাত্রীদের (সালেকদের) অন্তর্জগতের (বাতেনের) জন্য বিশাল গুরুভার। আমি বলি, এমতো উপলব্ধির পোষকতায় এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে 'যদি আমি এই কোরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি তাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ দেখতে পেতে'।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত বলেছেন, রসুল স. এর উপরে যখন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হতো, তখন তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল তখন হয়ে যেতো বিবর্ণ। বর্ণনান্তরে এসেছে, প্রত্যাদেশ গ্রহণকালে তিনি স. মস্তক অবনত করতেন। উপস্থিত সাহাবীগণও তখন বসে থাকতেন মাথা নিচু করে। প্রত্যাদেশ শেষ হলে তাঁরা উত্তোলন করতেন তাঁদের মস্তক।

বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, মাতা মহোদয়া আয়েশা বলেছেন,একবার হারেছ ইবনে হিশাম নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আপনার উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় কীভাবে? তিনি স. জবাব দিলেন, কখনো ঘণ্টাধ্বনির মতো। তখন আমার কষ্ট হয় খুব। আবার কখনো মনুষ্য আকৃতিতে আবির্ভূত হয় ফেরেশতা। তখন সে যা বলে, তা আমি স্মরণ রাখি। মাতা মহোদয়া আরো বলেছেন, ঘোর শীতকালেও আমি দেখেছি, প্রত্যাদেশ গ্রহণের সময় রসুল স. ঘামছেন। টপটপ করে স্বেদবিন্দু ঝরে পড়ছে তাঁর ললাটদেশ থেকে। বোখারী, মুসলিম।

প্রত্যাদেশ গুরুভার হওয়ার আর একটি সম্ভাব্য কারণ এরকম— প্রথমে রসুল স. ছিলেন সম্পূর্ণতই আল্লাহ্ অভিমুখী। হেরা পর্বতের গুহায় দিনের পর দিন কেবল আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকতেন তিনি। যখন নির্দেশ দেওয়া হলো 'গাত্রোত্থান করুন। ভীতিপ্রদর্শন করুন নিকটাত্মীয়দেরকে' তখন তাঁকে হতে হলো সৃষ্টির প্রতি মনোযোগী। নিঃসন্দেহে এমতো নির্দেশ তাঁর জন্য ছিলো বেদনাদায়ক গুরুভার। কেননা এটা ছিলো এক ধরনের বিচ্ছেদ, যা যাতনাদায়ক।

www.eelm.weebly.com

'গুরুভার' এর মর্মার্থ সম্পর্কে এরকমও বলা হয়েছে যে, হেরা গুহার নিভৃত ধ্যানমগ্নতা থেকে গৃহবাসীদের অধিকার পূরণার্থে গৃহে আগমন, মাতা মহোদয়া খাদিজাকে সঙ্গদান, আহার্য গ্রহণ ইত্যাদিও ছিলো রসুল স. এর জন্য গুরুভার। সৃষ্টির প্রতি এমতো মনোনিবেশন বৈধ হলেও তা পীড়াদায়ক বইকি। কেননা এরকম অবস্থা অখণ্ড মগ্নতার অননুকূল। মাতা মহোদয়া আয়েশা থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। একারণেই আধ্যাত্মিক পথযাত্রীরা নির্জনবাস ও ধ্যানমগ্নতাকেই অধিক পছন্দ করেন। কেউ কেউ তাই বলেন, বেলায়েত (নৈকট্য) নবুয়ত (বার্তাবহন, পথপ্রদর্শন) অপেক্ষা উত্তম, যদিও নবুয়ত সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ। অর্থাৎ নবুয়ত অত্যুত্তম হলেও বেলায়েত আস্বাদ্য। কেননা এমতাবস্থায় ধ্যান-জ্ঞান-মন জুড়ে থাকেন কেবল আল্লাহ্, অন্য কেউ নয়। তাই কেউ কেউ বলেন, একজন নবীর নবুয়ত অপেক্ষা তাঁর বেলায়েত উত্তম। কেননা তিনি তাঁর বেলায়েত অবস্থায় পুরোপুরি অভিনিবেশী হতে পারেন আল্লাহ্র প্রতি। আর নবুয়তের অবস্থায় পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব পালনার্থে তাঁকে অভিনিবেশী হতে হয় সৃষ্টির প্রতি।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহ. বলেন, সিদ্ধান্তটি ঠিক নয়। নিঃসন্দেহে নবুয়ত সর্বাবস্থায় বেলায়েত অপেক্ষা উত্তম, সে বেলায়েত নবীর হলেও। কেননা নবীগণ পরিভ্রমণ করেন আল্লাহ্র সত্তাগত জ্যোতিচ্ছটার (তাজাল্লিয়ে জাতির) মধ্যে, আর ওলীগণকে পরিভ্রমণ করতে হয় গুণবত্তাগত জ্যোতিবিচ্ছুরণের (তাজাল্লিয়ে সিফাতের) মধ্যে। সুতরাং নবুয়ত ও বেলায়েতের মধ্যকার ব্যবধান বিরাট। সুফী-আউলিয়াগণ আল্লাহ্মুখী আরোহণকে বলেন উরুজ এবং সৃষ্টিমুখী অবতরণকে বলেন নুযুল। ওলীগণের উরুজ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের লক্ষ্য থাকে সাধারণত ঊর্ধ্বপানে। আর নবীগণ উরুজে পূর্ণ বলে নুযুলেও সম্পূর্ণ। তাই তাঁরা অন্যকেও প্রদর্শন করতে পারেন পূর্ণত্বের পথ। যদিও তাঁদের অভীষ্ঠ সৃষ্টি নয়, স্রষ্টা। তবুও তাঁরা সৃষ্টিকে পথ দেখান আল্লাহ্র নির্দেশ পালনার্থে। আর এমতো নির্দেশ পালনের মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম মর্যাদা। এভাবে তাদের সংগ্রামমুখর জীবনে যখন যবনিকা নেমে আসে, তখন তাঁরা চিরদিনের জন্য মিলিত হতে পারেন তাঁদের পরম সখার (রফিকে আ'লার) সঙ্গে। এভাবে অবশেষে তাঁরা পরিপূরিত, পরিশোভিত ও পরিকৃতার্থ হন যুগপৎ নবুয়ত ও বেলায়েতের মহাসফলতায়।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের বাক্যটি আগের আয়াতের বক্তব্যের প্রতি গুরুত্বারোপক এবং পরিপূরক। অথবা বাক্যটি নিশিজাগরণের তাৎপর্য বহণকারী একটি পৃথক বাক্য। এভাবে এখানে বিষয়টির পুনঃপুনঃ উল্লেখ করে নিশিজাগরণকে অধিক গুরুত্ববহ করে তোলা হয়েছে। কেননা গভীর নিশীথের উপাসনা নিঃসন্দেহে শ্রম-সাধ্য ও সাধনাসংকুল। তাই তা প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধতা অর্জনের সহায়ক। অথবা বলা যেতে পারে গভীর রাতের নামাজ রসুল স. এর কাছে ছিলো আনন্দদায়ক, যদিও তা অন্যদের জন্য ছিলো কষ্টকর। আহমদ,

www.eelm.weebly.com

নাসাঈ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নামাজকে আমার জন্য করে দেওয়া হয়েছে নয়ন শীতলকারী। খাজায়ী গোত্রের জনৈক সাহাবী থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত বেলালকে বলতেন, বেলাল! নামাজের ইকামত বলে আমাকে প্রশান্ত করো। এ সকল হাদিসের মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সৃষ্টির পথপ্রদর্শনের যে গুরুদায়িত্ব তাঁর উপরে ন্যস্ত ছিলো, সেই গুরুদায়িত্ব বহনের ক্লান্তি তিনি স. অপনোদন করতেন তাহাজ্জুদ নামাজের মাধ্যমে। কিংবা বলা যেতে পারে, তাহাজ্জুদ নামাজ প্রভূত প্রভাব বিস্তারকারী। তিনি স. তাহাজ্জুদ পড়তেন বলে তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ তাঁর নির্দেশ অবনত মস্তকে গ্রহণ না করে পারতেন না। জ্বিনেরাও তাই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করে পারেনি। আবার এরকমও বলা যেতে পারে যে, রাতের নামাজ সম্পর্কযুক্ত প্রতিফল দিবসের সুপারিশস্থলের (শাফায়াতের মাকামের) সঙ্গে। কেননা আল্লাহ্পাক স্বয়ং বলেছেন 'আর কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পাঠ করুন। আপনার জন্য এটা অতিরিক্ত। অনতিবিলম্বে আপনার প্রভুপালনকর্তা আপনাকে স্থিত করবেন প্রশংসিত স্থানে'।

সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত ৬, ৭

إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ هِيَ أَشَدُّ وَطۡـًٔا وَأَقۡوَمُ قِيلًا ۝٦ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبۡحًا طَوِيلًا ۝٧

r অবশ্য দলনে রাত্রিকালের উত্থান প্রবলতর এবং বাকস্ফুরণে সঠিক।
r দিবাভাগে তোমার জন্য রহিয়াছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।

'ইন্না নাশিয়াতাল্ লাইলি হিয়া আশাদ্দু' অর্থ নিশ্চয় দলনে রাত্রিকালের উত্থান প্রবলতর। অর্থাৎ রাতে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পাঠ করা প্রবৃত্তির জন্য অত্যন্ত কঠিন। কেননা সাধনা-শ্রম প্রবৃত্তির পছন্দ নয়। নিদ্রাসুখই তার অভিপ্রেত। তাই গভীর রাতের সাধনা প্রবৃত্তিকে দলিত-মথিত তো করবেই।

এখানে 'নাশিয়াতাল্ লাইল' অর্থ রাত্রিকালের উত্থান। অর্থাৎ শয্যাসুখ থেকে গাত্রোত্থান করে নামাজে দণ্ডায়মান হওয়া, তাহাজ্জুদ পাঠ করা। ইবনে কীসান বলেছেন, নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে শেষ রাতে জাগ্রত হওয়াকে বলে 'নাশিয়াতাল্ লাইল'। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'নাশা' শব্দটি আবিসিনীয়। এর অর্থ দাঁড়ানো। তাই রাতের যে কোনো অংশে নামাজের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হওয়াকে বলে 'নাশিয়া'। ইবনে জায়েদও এরকম বলেছেন। ইকরামা বলেছেন 'নাশিয়া' বলে রাতের প্রথমাংশে জাগ্রত হওয়াকে।

ইমাম জয়নুল আবেদীন সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইমাম হোসাইন ইবনে আলী মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তীতে নামাজ পাঠ করতেন এবং বলতেন, এটাই 'নাশিয়াতাল্ লাইল'। লক্ষণীয়, ইকরামা এবং হজরত ইমাম হোসাইনের বক্তব্য

www.eelm.weebly.com

রসুল স. এর কর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা রসুল স. আদিষ্ট হয়েছিলেন রাতের শেষাংশে নামাজ পাঠ করতে। হাসান বলেছেন, ইশার নামাজ পাঠের পর যে কোনো নামাজই 'নাশিয়াতাল্ লাইল'।

কেউ কেউ বলেছেন, 'নাশিয়াতান' হচ্ছে কর্তৃপদীয় শব্দরূপ। এর অর্থ— দণ্ডায়মান হওয়া। এখানেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থেই। মর্মার্থ— নিদ্রা থেকে জেগে উঠে নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। 'নাশা' অর্থ সে দাঁড়িয়েছে। এই 'নাশা'রই কর্তৃপদীয় শব্দরূপ 'নাশিয়াতিল'। রাতের যে কোনো অংশে জাগ্রত হওয়াকেই বলে 'নাশিয়া'। যেমন বলা হয় 'নাশাতিম্ মাহাবাতু ওয়াবাদাত' (মেঘ উঠেছে ও প্রকাশ পেয়েছে)। তাই রাতে কোনো বিষয়ের উৎপত্তি বা প্রকাশ না হওয়াকে বলে 'নাশি'। আর 'নাশি' বহুবচন 'নাশিয়াতুন' এর। ইবনে মুলায়িকা বলেছেন, আমি একবার মান্যবর ইবনে আব্বাস এবং মাননীয় যোবায়েরের কাছে 'নাশিয়া' শব্দটির অর্থ জানতে চাইলাম। তাঁরা জবাব দিলেন, সারারাতের যে কোনো অংশের কর্মকাণ্ডকে বলে 'নাশিয়া'।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াত্বআঁও ওয়া আক্বওয়ামু ক্বীলা'। এর অর্থ— এবং বাকস্ফুরণে সঠিক। ক্বারী ইবনে আমের ও ক্বারী আবু আমর এখানকার 'ওয়াত্বআন' শব্দটিকে পাঠ করতেন 'উইত্বউন'। এভাবে উচ্চারণ করলে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়— সমন্বয়ন। অর্থাৎ রাতের এই নামাজে মন ও মুখ যেনো থাকে সমভাবসম্পন্ন। মুখের আবৃত্তি যেনো পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করে হৃদয়। আর 'ওয়াত্বআন' পড়লে শব্দার্থটি দাঁড়ায়— ভার, বোঝা, কষ্ট। অর্থাৎ দিনের নামাজ অপেক্ষা রাতের নামাজ অধিক গুরুভার, কষ্টকর। রসুল স. বলেছেন, হে আল্লাহ্! তোমার পক্ষ থেকে মুজাব গোত্রকে কাঠিন্য কবলিত (ওয়াত্বআন) করো। উল্লেখ্য, কষ্ট সহ্য করতে শিখলে তখন সে কষ্ট আর কষ্ট থাকে না। আর সুন্নত স্বীকৃত কষ্ট তো প্রভূত কল্যাণকর ও আস্বাদ্য। কেননা এতে করে প্রবৃত্তি থাকে অবদমিত, বশীভূত। এ ধরনের প্রবৃত্তিপীড়ক আমল মীযানের পাল্লায় হবে অত্যন্ত গুরুভার।

মান্যবর ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'রাত্রিকালের উত্থান প্রবলতর' অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফরজ করে দেওয়া রাতের নামাজ প্রচণ্ড কষ্টকর। তাই এ নামাজ পাঠ করা উচিত রাতের প্রথমাংশে। কারণ নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির পক্ষে এমতো নিশ্চয়তা নেই যে, সে জাগতে পারবে। কাতাদা বলেছেন, 'প্রবলতর' অর্থ এখানে— পুণ্যসঞ্চয়কারী ও আবৃত্তি সংরক্ষণকারী। ফাররা বলেছেন, রাতি জাগ্রত হওয়া রাতের নামাজের প্রস্তুতিকে সুদৃঢ় করে। কেননা তখন প্রকৃতি থাকে নীরব, নিস্তব্ধ। আর দিনে যেহেতু সকলেই জেগে থাকে ও কর্মমুখর হয়, তাই দিনের পরিবেশে নামাজ পাঠ সহজ। কথাটির মর্মার্থ এরকমও করা হয়েছে যে— রাতে জেগে ওঠা কঠিন। কারণ তা প্রবৃত্তির জন্য কষ্টদায়ক।

রাতের নামাজ অধিক আস্বাদন করেন সুফী-আউলিয়াগণ। ইবনে জায়েদ বলেছেন, রাতের বেলা সাংসারিক ঝক্কি-ঝামেলা থাকে না, তাই দিনের তুলনায়

www.eelm.weebly.com

রাতই ইবাদতের অধিক অনুকূল। হাসান বলেছেন, রাতের নামাজ পুণ্যসঞ্চারক ও শয়তান থেকে সুরক্ষক। আর 'বাকস্ফুরণে সঠিক' অর্থ রাতের নামাজে কোরআন আবৃত্তি করা যায় অতীব আন্তরিকতাসহ ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'ইন্‌না লাকা ফিন্‌নাহারি সাব্‌হান ত্বউইলা'। এর অর্থ দিবাভাগে তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। এখানকার 'সাব্‌হান' শব্দটির ধাতুমূল 'আস্‌সাব্‌হু'। এর অর্থ— দীর্ঘ, দ্রুতগামিতা। পানিতে দ্রুত সন্তরণকারী মৎস্যকে এ কারণেই বলা হয় 'সাবাহাত'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! দিনের বেলায় আপনাকে ব্যস্ত থাকতে হয় ধর্মপ্রচারে ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কাজে। রাতে পান আপনি অবকাশ। সুতরাং আমার দিকে পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করুন গভীর রাতের নামাজের মাধ্যমে। এভাবে এখানে কারণ বিবৃত হয়েছে ইতোপূর্বে প্রদত্ত আদেশের।

রাতের নামাজের মাহাত্ম্য ঃ হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ্‌পাকের আনুরূপ্যবিহীন অবতরণ ঘটে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে। তখন তিনি আহ্বান করতে থাকেন, কে আছো আবেদনকারী! আবেদন করো। তোমার আবেদন গ্রহণ করা হবে। কে আছো ক্ষমাপ্রার্থী! ক্ষমা প্রার্থনা করো। তোমার অপরাধ ক্ষমা করা হবে। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— আল্লাহ্ তাঁর আনুরূপ্যবিহীন হস্তযুগল প্রসারিত করে দিয়ে বলেন, তোমরা কেউ কি ঋণ দিতে পারো এমন এক সত্তাকে, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, কারো অধিকার হরণকারীও নন।

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রাতে রয়েছে এক বিশেষ সময়। ওই সময় কেউ আল্লাহ্ সকাশে তার ইহ-পারত্রিক কল্যাণকামনায় প্রার্থী হলে আল্লাহ্ তার অভিলাষ পূর্ণ করেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় নামাজ হচ্ছে নবী দাউদের নামাজ। আর সর্বাপেক্ষা প্রিয় রোজা হচ্ছে নবী দাউদের রোজা। তিনি অর্ধরাত্রি অতিবাহিত করতেন নিদ্রায়। তারপর নামাজ পাঠ করতেন রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকার পূর্ব পর্যন্ত। তারপর, আবার রাতের এক ষষ্ঠাংশ কাটাতেন ঘুমে। আর রোজা রাখতেন একদিন পর একদিন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু উমামা বাহেলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রাতের নামাজকে তোমরা অপরিহার্য করে নিয়ো। এটাই ছিলো পূর্ববর্তী যুগের পুণ্যবানগণের রীতি। আর এটাই পরম প্রভুপালনকর্তার নৈকট্যভাজন হওয়ার মাধ্যম। পাপস্খলনের উপলক্ষ। আর পাপপ্রবণতা থেকে আত্মরক্ষার ঢাল। তিরমিজি।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিন ধরনের মানুষের কর্মকাণ্ড দেখে আল্লাহ্ প্রীত হন— ওই ব্যক্তি, যে রাতে জেগে উঠে

www.eelm.weebly.com

নামাজ পড়ে, যে নামাজ পাঠ করে একাগ্রচিত্ততার (হুজুরী কলবের) সঙ্গে এবং ওই ব্যক্তি, যে জেহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে। বাগবী হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর 'শরহে সুন্নাহ' নামক গ্রন্থে। হজরত আমর ইবনে উয়াইমিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রাতের শেষ পর্বে আল্লাহ্ তাঁর বান্দার সর্বাধিক সন্নিকটবর্তী হন। তোমরা সমর্থ হলে ওই সময় আল্লাহ্‌র স্মরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ ও উত্তম। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোরআনের ধারক, বাহক (হাফেজ, আলেম) এবং নিশাচারী (গভীররাতে নামাজ পাঠকারী) আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম। বায়হাকী এরকম বর্ণনা করেছেন তাঁর শো'বুল ইমান নামক পুস্তকে।

সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত ৮, ৯

وَاذۡكُرِ اسۡمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلۡ اِلَيۡهِ تَبۡتِيۡلًا ﴿٨﴾ رَبُّ الۡمَشۡرِقِ وَ الۡمَغۡرِبِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذۡهُ وَكِيۡلًا ﴿٩﴾

r সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁহাতে মগ্ন হও।

r তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; অতএব তাঁহাকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়করূপে।

'ওয়াজ্ কুরিস্মা রব্বিকা ওয়া তাবাত্তাল ইলাইহি তাবতীলা' অর্থ সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁতে মগ্ন হও'। এখানে 'প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো' অর্থ সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র জিকির করো, কোনো মুহূর্তের জন্য জিকির থেকে অমনোযোগী থেকো না। বাক্যটির বক্তব্যগত যোগাযোগ রয়েছে ২ সংখ্যক আয়াতের 'রাত্রি জাগরণ করো' কথাটির সঙ্গে। উল্লেখ্য, সার্বক্ষণিক জিকির মুখের দ্বারা সম্ভব নয়। মুখ ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দ্বারা সম্পাদন করা যেতে পারে কেবল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা, কোরআন পাঠ, নামাজ ইত্যাদি। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে কলব দ্বারা মনে মনে জিকির করার কথাই বলা হয়েছে। আর মনের জিকিরই প্রকৃত জিকির। মনই স্মরণের স্থান। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে, অমনোযোগীদের মধ্যে অবস্থানরত একজন জিকিরকারী বিত্তশালীদের মধ্যে ধৈর্যশীলের মতো। এই হাদিস দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, জিকির দ্বারা অমনোযোগিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বলা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এরই নাম জিকির বা আল্লাহ্‌র স্মরণ। অমনোযোগিতা দুষ্টে নামাজ মূল্যহীন। আল্লাহ্‌র স্মরণবিহীন তসবীহ্, ক্বেরাত ধর্তব্যের বাইরে। অন্যমনস্ক হয়ে যে নামাজ আদায় করে, তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য।

আমরা আলোচ্য আয়াত দ্বারা সার্বক্ষণিক স্মরণ মর্মার্থ নিয়েছি একারণে যে, এর যোগাযোগ রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'রাত্রি জাগরণ করো' কথাটির সঙ্গে।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য, যোজ্য ও যোজিতের মধ্যে অর্থের বৈপরীত্য আসে বৈয়াকরণগতভাবে। সাধারণ জিকির তো রাতের নামাজ ও কোরআন পাঠের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে। এ কারণেই এখানে 'ওয়াজ্‌কুর' (স্মরণ করো) কথাটির অর্থ যদি আমরা 'সার্বক্ষণিক জিকির' নেই, তাহলে অধিকতর কল্যাণ থেকে আমরা আর বঞ্চিত হই না। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে অর্থগত গুরুত্বাপেক্ষা অন্বয়ার্থক ভাব গ্রহণ করাই উত্তম। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, এখানকার 'নাম স্মরণ করো' অর্থ পাঠ করো 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' (শুরু করছি পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ্‌র নামে)। অর্থাৎ কোরআন পাঠ করো আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে।

মাসআলা ঃ নামাজের বাইরে কেউ যদি সুরা ফাতিহা অথবা অন্য কোনো সুরা পাঠ করতে চায়, তবে তাকে সর্বাগ্রে পাঠ করতে হবে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' এরকম করা সুন্নত। কিন্তু এভাবে তেলাওয়াত করতে করতে নতুন সুরা এসে পড়লে তার পূর্বে পুনরায় 'বিসমিল্লাহ্‌' পড়তে হবে কিনা সে ব্যাপারে রয়েছে বিভিন্ন অভিমত। সুরা আনফাল ও সুরা তওবা এক টানা পাঠ করার সময়ে সুরা তওবার আগে 'বিসমিল্লাহ্‌' পড়া যাবে না, কিন্তু এক টানা পাঠের সময়েও সকল সুরার পূর্বে বিসমিল্লাহ্‌ পাঠ করতে হবে, এরকম অভিমতের প্রবক্তা ইবনে কাছীর, ক্বারী কালুন ও ক্বারী আসেম। তাঁদের মতে পৃথক পৃথক সময়ে তেলাওয়াত করলেও প্রতি সুরার শুরুতে পাঠ করতে হবে 'বিসমিল্লাহ্‌'। অন্য ক্বারীগণ বলেন, একটানা পাঠ করার সময় প্রথমে একবার 'বিসমিল্লাহ্‌' পাঠ করলেই হবে। অর্থাৎ এর মধ্যে নতুন সুরা এসে পড়লেও পুনঃপুনঃ 'বিসমিল্লাহ্‌' পড়তে হবে না। তাঁদের মধ্যে আবার ক্বারী হামযা ও তাঁর সতীর্থগণ এমতাবস্থায় প্রথম সুরার শেষ শব্দটিকে মিলিয়ে পড়তেন পরের সুরার প্রথম শব্দের সঙ্গে। ক্বারী ওয়ারশ, ক্বারী আবু আমর ও ক্বারী ইবনে আমর উভয় সুরার মাঝে নিঃশ্বাস না ছেড়ে একটুখানি বিরতি দিয়ে (সেকতা করে) পাঠ শুরু করতেন। তাঁদের মতে কোনো সুরার মাঝামাঝি কোনো স্থান থেকে তেলাওয়াত শুরু করলে তেলাওয়াতের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ্‌' পড়ে নেওয়া না নেওয়া নির্ভর করে পাঠকের অভিরুচির উপর। অর্থাৎ এমতাবস্থায় পাঠক 'বিসমিল্লাহ্‌' পড়ে নিতে পারেন, অথবা না-ও পারেন। তবে সুরা আনফাল ও সুরা তওবার মিলিত পাঠের সময় সুরা তওবার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ্‌' না পড়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

এবার আসা যাক নামাজের ভিতরে কোরআন পাঠের নিয়ম কানুনের আলোচনায়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' প্রতিটি সুরার প্রথম আয়াত। তাই সুরা ফাতিহার আগে 'বিসমিল্লাহ্‌' পড়া ওয়াজিব এবং অন্যান্য সুরার পূর্বে সুন্নত এবং নামাজে 'বিসমিল্লাহ্‌' পাঠ করতে হবে সরবে। অন্য ইমামত্রয় বলেন, 'বিসমিল্লাহ্‌' কোনো সুরারই অংশ নয়। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, 'বিসমিল্লাহ্‌' কোরআনের আয়াত ঠিকই, কিন্তু তা অবতীর্ণ হয়েছে সুরাসমূহকে পৃথককরণের উদ্দেশ্যে। ইমাম মালেক বলেছেন, নামাজের মধ্যে 'বিসমিল্লাহ্‌' পাঠ করা যাবেই না, সুরা ফাতিহা, অথবা অন্য কোনো সুরার সঙ্গেও

www.eelm.weebly.com

নয়। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, 'বিসমিল্লাহ্' নীরবে পাঠ করতে হবে কেবল সুরা ফাতিহার শুরুতে। অন্যান্য সুরার শুরুতে কিছুতেই নয়। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, প্রতি সুরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' পাঠ করা মোস্তাহাব। আমি সুরা ফাতিহার তাফসীরে সপ্রমাণ উল্লেখ করেছি যে 'বিসমিল্লাহ্' সুরা ফাতিহা এবং অন্য কোনো সুরারই অংশ নয়। আর নামাজের মধ্যে বিসমিল্লাহ্র সরব উচ্চারণ রসুল স.এর আমল দ্বারা যেমন প্রমাণিত হয়নি, তেমনি প্রমাণিত হয়নি খলিফা চতুষ্টয়ের আমল দ্বারা।

নামাজের ভিতরে সরবে 'বিসমিল্লাহ্' পাঠের সমর্থনে শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ উপস্থাপন করেছেন নয়টি হাদিস। হাদিসগুলি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী ও খতিব বাগদাদী। কিন্তু ইবনে জাওজী হাদিসগুলি উল্লেখ করার পর মন্তব্য করেছেন, দারাকুতনী বলেছেন, হাদিসগুলির সূত্রপরম্পরা সঠিক নয়। তবে কেবল সাহাবীগণ থেকে যে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর কোনো কোনোটি বিশুদ্ধ, কোনো কোনোটি শিথিল।

আবু দাউদের এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. ওই সময় বিসমিল্লাহ্ সশব্দে পাঠ করতেন, যখন ইয়ামামার মিথ্যাবাদী মুসায়লামা প্রসিদ্ধ ছিলো 'ইয়ামামার রহমান' নামে। মক্কার মুশরিকেরা তা শুনে বলেছিলো, শোনো, শোনো, এবার মোহাম্মদ ডাকতে শুরু করেছে ইয়ামামাবাসীদের পরম পূজনীয় রহমান মুসায়লামাকে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলকে 'বিসমিল্লাহ্' নীরবে পাঠ করার নির্দেশ দেন। রসুল স. এই আমলটি অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন তাঁর মহাতিরোভাব পর্যন্ত। এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. তাঁর মক্কাবাসের প্রথমদিকে নামাজে 'বিসমিল্লাহ্' পাঠ করতেন সশব্দে। তারপর আর এরকম করেননি। সেকারণেই মহামান্য খলিফা চতুষ্টয় এবং মান্যবর সাহাবী ইবনে মাসউদ, আম্মার ইবনে ইয়াসার, আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল, আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের, আবদুল্লাহ্ ইবনে আরকাম এবং শ্রদ্ধেয় তাবেয়ী হাসান বসরী, শা'বী, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, ইব্রাহিম নাখয়ী, কাতাদা, ওমর ইবনে আবদুল আযীয, আ'মাশ, সুফিয়ান সওরী প্রমুখের আমলে 'বিসমিল্লাহ্'র সশব্দ পাঠের কোনো প্রমাণ নেই। অবশ্য মান্যবর সাহাবী মুয়াবিয়া এবং শ্রদ্ধেয় তাবেয়ী আতা, তাউস ও মুজাহিদ থেকে সশব্দে 'বিসমিল্লাহ্' পাঠের পক্ষে বিবৃতি পাওয়া গিয়েছে। এরকম বলেছেন ইবনে জাওজী।

'ওয়া তাবাত্তাল ইলাইহি তাব্তীলা' অর্থ এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁতে মগ্ন হও। এখানকার 'তাবাত্তাল' শব্দটির ধাতুমূল 'তাবতীল' তাফয়ীলের শব্দরূপে পরিগঠিত। এর অর্থ— সম্পর্কচ্ছিন্ন করে, একনিষ্ঠভাবে। হাসান বসরী বলেছেন, 'তাবাত্তাল' অর্থ চেষ্টা করো। ইবনে জায়েদ অর্থ করেছেন, জাগতিক বিষয়ে চিত্তাকর্ষণবিচ্যুত হয়ে আল্লাহ্ অভিমুখী হও। অর্থাৎ 'তাবাত্তাল' হচ্ছে আল্লাহ্ অভিমুখিতার পারিপার্শ্বিকতার নাম। কিন্তু কথাটির অর্থ আবার এরকম নয় যে, পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীদের সঙ্গে বাহ্যিক আকর্ষণও ছিন্ন করতে হবে, খর্ব করতে হবে

www.eelm.weebly.com

বান্দার অধিকার, গ্রহণ করতে হবে সন্ন্যাস। বলা বাহুল্য, সন্ন্যাস অবলম্বনের অবকাশ ইসলামে নেই। ইসলাম হচ্ছে কর্মবাদ, নিষ্ক্রিয়তাবাদ নয়। জীবনাবাদ, পলায়নবাদ নয়। তাই পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, পথচারী, বিধবা এতিমদের অধিকার পূরণ করতে গিয়ে সংসারী যেমন হতে হবে, তেমনি অন্তর্দেশকে সদা মুক্ত রাখতে হবে এ সকল কিছুর মোহ থেকে, অতি-আকৃষ্টি থেকে। তাই আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হচ্ছে—আল্লাহ্‌র স্মরণে একাগ্র হও, কিন্তু একেবারে আত্মবিস্মৃত হয়ো না। কেননা আত্মভোলা যারা, তারা যেমন বান্দার অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়, তেমনি নয় আল্লাহ্‌র অধিকার সম্পর্কে সচেতন। আধ্যাত্ম-মনীষীগণ তাই বলেন, যে পথ আমরা রুদ্ধ করতে চাই, সে পথের মোহনা দ্বিধাবিভক্ত। একটি হচ্ছে সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি এবং অপরটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ অভিমুখীনতা। এদু'টো আবার একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য। একারণেই আল্লাহ্ বান্দার উভয় কর্তব্য নির্দেশ করতে গিয়ে মাঝে যুক্ত করেছেন যোজক অব্যয় 'ওয়াও' (এবং), যা সমষ্টির অর্থবহ। প্রথমে নির্দেশ করেছেন 'তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো'। তারপর বলেছেন 'এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও'। দায়িত্ব দু'টিকে তিনি একাকার করে দেননি। তবে মুখ্য উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন প্রথমে। তারপর দিয়েছেন পার্থিব মোহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নির্দেশ, যা মূলতঃ মুখ্য উদ্দেশ্যটিরই পরিপূরক।

আমি 'জিক্‌রুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র জিকির)কে বলি মহাসত্যের মানদণ্ড। কেননা জিকিরই কেবল দূর করে দিতে পারে আলস্য, ঔদাসীন্য ও বিস্মৃতি। আর এমতো জিকিরই এলমে হুজুরী। অর্থাৎ যে এলমে হুজুরীসম্পন্ন সে-ই কেবল হতে পারে সার্বক্ষণিক জিকিরকারী। এধরনের ব্যক্তিবর্গই এমন অবস্থানে স্থিত হন, যাকে বলে অভেদ (ইত্তেহাদ) ও সুস্থিতি (বাক্বা)। শব্দ ব্যবহারে ভিন্নতা থাকলেও এখানে অর্থগত দিক থেকে প্রকৃত বিষয় অভিন্ন। আর এই অভিন্ন কর্তব্যটিকেই প্রথম যুগের পুণ্যবান মনীষীগণ বলেছেন চিত্তশুদ্ধি (এখলাস)। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাস তাই উপদেশ দিয়েছেন, তোমরা বিশুদ্ধচিত্ত হও কেবল আল্লাহ্‌র জন্য।

এখানে 'ওয়াজ্‌কুর রব্বাকা' না বলে বলা হয়েছে 'ওয়াজ্‌কুরিস্‌মা রব্বিকা'। অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র জিকির করো' না বলে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌র নামের জিকির করো'। কেনো? এমতো প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌র সত্তার জ্ঞান ও পরিচিতি লাভ অতীব দুরূহ। কেননা এর মধ্যে রয়েছে অগণন অন্তরাল, এমনই দুর্বোধ্যতা, সৃষ্টির পক্ষে যা ভেদ করা অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে সৃষ্টি তাঁর পরিচয় যৎকিঞ্চিত হলেও লাভ করতে সক্ষম। সেকারণেই এখানে বলা হয়েছে 'একনিষ্ঠভাবে তাঁতে মগ্ন হও'। অর্থাৎ একাগ্রতার সঙ্গে কেবল তাঁর প্রতি অভিনিবেশী হয়ে করতে থাকো তাঁর নামের জিকির। তাহলে তাঁর নাম-গুণাবলী থেকে বিচ্ছুরিত দ্যুতিচ্ছটা দ্বারা তোমরা রঞ্জিত হতে পারবে এবং পাবে তাঁর আনুরূপ্যবিহীন পরিচয়। উল্লেখ্য, এখানে 'তাবাত্‌তাল' (একনিষ্ঠভাবে)

www.eelm.weebly.com

কথাটির অর্থ 'ফানা' হওয়া। এমনভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলা যাতে অন্তর্জগতে প্রতিভাসিত হতে থাকে আল্লাহ্‌র নাম-গুণবত্তার তাজাল্লি। আরো উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌র সত্তাসম্পর্কিত জ্ঞানের নাম 'তাবাত্‌তাল' নয়। 'তাবাত্‌তাল' হচ্ছে আল্লাহ্‌র নাম-গুণাবলীসম্পৃক্ত জ্ঞান, যা লাভ হতে পারে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌তে মগ্ন হলে। অর্থাৎ ফানা (আত্মবিলোপন) লাভ করে।

এরকম হওয়াও সম্ভব যে, এখানে 'জিকির' অর্থ মৌখিক জিকির, যা অবশ্যই সম্পৃক্ত সার্বক্ষণিক জিকিরের সঙ্গে। আর 'সার্বক্ষণিক জিকির' অর্থ সুযোগ ও সামর্থ্যানুসারে জিকির করা। এরকম জিকিরও পৌঁছে দিতে পারে 'তাবাত্‌তাল' (একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌মগ্ন) এর পর্যায়ে। এরকম জিকিরও নিরবচ্ছিন্ন জিকির পদবাচ্য। তবে শর্ত হচ্ছে পরিবেশ পরিস্থিতি হতে হবে অনুকূল এবং সাথে সাথে পেতে হবে সামর্থ্যের (তাওফীকের) আনুকূল্য, যেমন দেখা যায় কোনো কোনো নবী ও কিছুসংখ্যক ওলীর ক্ষেত্রে। কিংবা বলা যেতে পারে, স্বীয় পীর- মোর্শেদের তাওয়াজ্জোহ এর ফলে সামর্থ্য প্রাপ্তি হয় সহজে। এরকম ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, এখানে 'একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌মগ্ন হওয়ার পূর্বে প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো' কথাটির উল্লেখ করা হয়েছে সঠিক ও স্বাভাবিক। কেননা সাফল্যের উল্লেখের পূর্বে সাফল্যলাভের মাধ্যমের উল্লেখ করাই রীতিসম্মত। এখানেও তেমনি মূল সাফল্য হচ্ছে আল্লাহ্‌মগ্ন হওয়া এবং তার মাধ্যম হচ্ছে জিকির।

বর্ণিত ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বলা যায়, এখানে 'প্রতিপালকের নামের স্মরণ করো' বলে নির্দেশ করা হয়েছে 'আল্লাহ্‌' নামের পুনঃপুনঃ আবৃত্তির। আর পরবর্তী আয়াতে 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা' কথাটিতে প্রকাশ পেয়েছে এই তত্ত্বটি যে, তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বত্রগামী। অর্থাৎ তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। এরপরের কথাটিতে (লা ইলাহা ইল্লা হুয়া) রয়েছে দু'টি বিষয়— ঋণাত্মক ও ধ্বনাত্মক। অর্থাৎ 'নফী' (লা ইলাহা) এবং 'ইছবাত' (ইল্লা হুয়া)। এই বাক্যটির পুনরাবৃত্তিও জিকির এবং এমতো জিকির জিকিরকারীকে পৌঁছে দেয় পরিপূর্ণ নৈকট্যে (কামেল বেলায়েতে)। নফি হচ্ছে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য সকল কিছুকে অভীষ্ট পথ থেকে বিলীন করে দেওয়া এবং 'ইছবাত' হচ্ছে প্রমাণ করা কেবল আনুরূপ্যবিহীন আল্লাহ্‌কে। উল্লেখ্য, নিশিথের নামাজ, কোরআন তেলাওয়াত এবং প্রভুপালনকর্তার মহিমময় নামের জিকির পৃথক পৃথক তিনটি বিধান।

এমতো বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, নামাজ, কোরআন পাঠ, 'আল্লাহ্‌' 'আল্লাহ্‌' জিকির এবং 'নফী ইছবাত' (লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্‌) জিকির— এই চারটি আমল আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন হওয়া ও প্রিয়ভাজন হওয়ার মূল মাধ্যম। প্রথমোক্ত দু'টি উপনীত করায় মর্যাদার চূড়ান্ত স্তরে। আর শেষোক্ত দু'টি সাহায্য করে প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী স্তরসমূহ অতিক্রম করতে। যেহেতু এখানে সম্বোধিতজন রসুল স. স্বয়ং এবং যেহেতু তিনি স. সকল নবী ওলীগণের পুরোধা, তাই প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে নামাজ পাঠ ও কোরআন আবৃত্তির। তারপর সাধারণ সালেকদের (আধ্যাত্মিক পথের পথিকদের) উপযোগী মাধ্যম 'জিকির' ও 'তাবাত্‌তাল' এর।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, অতএব তাঁকেই গ্রহণ করো কর্মবিধায়করূপে'।

এখানকার 'রব্বুল মাশরিক্ব' কথাটির 'রব্বুল' শব্দটিকে পেশ সহযোগে পাঠ করেছেন আল্লামা ইবনে কাছীর, ক্বারী নাফে, ক্বারী আবু আমর ও ক্বারী হাফস। এমতাবস্থায় শব্দটি হবে একটি উহ্য উদ্দেশ্যের বিধেয়। অথবা শব্দটিই হবে উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় হবে অবলুপ্ত। আর যদি শব্দটিকে যের সহযোগে 'রব্বিল' পাঠ করা হয়, তবে বলতে হবে, শব্দটি আগের আয়াতে উল্লেখিত 'রব্বিকা' এর অনুবর্ত্তিকা। কিংবা বলা যেতে পারে, এর পূর্বে অনুক্ত রয়েছে একটি শপথসূচক বাক্য, যার জবাব 'লা ইলাহা ইল্লা হুয়া' (তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই)।

'ফাত্তাখিজ্‌হু ওয়াকীলা' অর্থ অতএব তাঁকেই গ্রহণ করো কর্মবিধায়করূপে। এখানকার 'ফাত্তাখিজ্‌হু' এর 'ফা' (অতএব) হচ্ছে নিমিত্ত অব্যয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌পাক তাঁর অতুলনীয় প্রজ্ঞা ও কর্মকুশলতার কারণেই সমগ্র সৃষ্টির একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকর্তা। আর তিনি ছাড়া যেহেতু অধিকর্তা কেউ নেই এবং উপাস্য হওয়ার দিক থেকে তিনি যখন এক, একক ও অদ্বিতীয়, সেহেতু সকল কর্মকাণ্ড তাঁর প্রতি ন্যস্ত করাই সমীচীন। অতএব হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি এমনই করুন।

প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে, আল্লাহ্‌র উপরে সবকিছু সোপর্দ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার কথাই কি এখানে বলা হলো? যদি তাই হয়, তবে তো প্রশ্রয় দেওয়া হলো সন্ন্যাসবাদকেই। সমাজ জীবন তাহলে চলবে কীভাবে? উত্তরে বলা যেতে পারে, না, বিষয়টি সেরকম নয়। অপরিহার্য বৈধ কর্মকাণ্ডে মানুষকে তো নিয়োজিত থাকতেই হবে। তবে তাঁকে সর্বাবস্থায় নির্ভর করতে হবে আল্লাহ্‌র উপরে এবং সকল প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যা দূরীকরণের প্রার্থনা জানাতে হবে কেবল তাঁরই সকাশে। কেননা তিনিই সমগ্র সৃষ্টির একক সৃজয়িতা, পালয়িতা, অধিকর্তা। সকল কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ধারিত হয় তাঁরই অভিপ্রায়ে। তিনিই একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তাঁর নিকটে সকলকিছু ন্যস্ত করাই তো সমীচীন। বরং তা অত্যাবশ্যক। বিশ্বাসের দাবি তো এটাই।

'রব্বুল মাশ্‌রিক্বি ওয়াল মাগ্‌রিবি লা ইলাহা ইল্লা হুয়া' বচনটি স্তুতিপ্রকাশক। বচনটিতে প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহ্‌র বিশেষ গুণাবলী। বচনটি এখানে একথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌পাকের কর্ম ও আধিপত্যের বিস্তৃতি তাঁর প্রজ্ঞা ও অজেয় শক্তিমত্তাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর 'লা ইলাহা ইল্লা হুয়া' (তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই) কথাটির দ্বারা চিরতরে বিলুপ্ত করা হয়েছে অন্য কারো, অথবা অন্য কোনোকিছুর উপাস্য হওয়ার সম্ভাবনাকে। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এমতো শাশ্বত বিশ্বাসের— আল্লাহ্‌ই একমাত্র উপাস্য। আধ্যাত্ম পথের পথিকগণ যখন এই অবস্থানটি অতিক্রম করে, তখনই তার জিকির হয় প্রকৃত জিকির। এর আগে আগে যা হয়, তা জিকিরের অনুশীলন মাত্র, প্রকৃত জিকির নয়। এভাবে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে সে সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয় মহান আল্লাহ্‌র। তখন তার অন্তর থেকে মুছে যায় পৃথিবীপ্রসক্তি। ফলে সে একনিষ্ঠভাবে হতে পারে আল্লাহ্‌মগ্ন।

www.eelm.weebly.com

হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যেরকম নির্ভরযোগ্য, তোমরা যদি তাঁর প্রতি সেরকম নির্ভরশীল হতে পারো, তবে তিনি তোমাদেরকে রিজিক দিবেন সেভাবে, যেভাবে তিনি রিজিক দেন বিহঙ্গকুলকে। তারা প্রত্যুষে নীড় ত্যাগ করে ক্ষুধার্ত উদরে, আর সন্ধ্যায় নীড়ে ফিরে আসে পানাহার-পরিতৃপ্ত হয়ে। তিরমিজি, ইবনে মাজা। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জিবরাইল ফেরেশতা আমার বক্ষ্যাভ্যন্তরে এই কথাটি প্রক্ষেপণ করেছে যে, নির্ধারিত উপজীবিকা নিঃশেষ হওয়ার পূর্বে কেউই পরলোকগমন করে না। সুতরাং তোমরা সাবধান হও। উপজীবিকা অন্বেষণ করো শরিয়তসিদ্ধ পথে। হাদিসটি বায়হাকী উল্লেখ করেছেন তাঁর 'শো'বুল ইমানে' এবং বাগবী তাঁর 'শরহে সুন্নাহ্'য়।

হজরত আবু জর থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সংসার বিরাগ এরকম নয় যে, তুমি হালালকে মনে করবে হারাম। বিনষ্ট করবে বৈধ ধনসম্পদ। বরং সংযম হচ্ছে এই, তোমার নিকট যা আছে, তার চেয়ে তুমি অধিক নির্ভরশীল হও, যা আছে আল্লাহ্র অধিকারে তার উপর। বিপদে পতিত হলে কামনা কোরো না বিপদের প্রলম্বায়নকে।

আমাদের পরম শ্রদ্ধার্হ শায়েখ মাওলানা ইয়াকুব চরখী রহঃ বলেছেন, এ সুরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অধ্যাসনের (মাকামের), পথপরিক্রমার (সুলুকের)। নিশীথের নিভৃত নামাজ, কোরআন তেলাওয়াত, জিকির-আজকার, আল্লাহ্মগ্নতা, আল্লাহ্নির্ভরতা এ সকল কিছুর রয়েছে বিভিন্ন স্তর। তবে এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাসন হচ্ছে অরাতিকুলের অবদমন, দলন, যার দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿١٠﴾ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿١١﴾ اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ﴿١٢﴾ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿١٤﴾

r লোকে যাহা বলে, তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে উহাদিগকে পরিহার করিয়া চল।

r ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য অস্বীকারকারীদিগকে; আর কিছু কালের জন্য উহাদিগকে অবকাশ দাও,

www.eelm.weebly.com

r আমার নিকট আছে শৃংখল ও প্রজ্বলিত অগ্নি,

r আর আছে এমন খাদ্য, যাহা গলায় আটকাইয়া যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি।

r সেই দিবসে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হইবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মুখে 'উন্মাদ' 'কবি' 'যাদুকর' ইত্যাদি অপবচন শুনে আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। অবলম্বন করুন ধৈর্য। কৌশলে এড়িয়ে চলুন তাদেরকে। তাদের অশুভ আচরণের বিপরীতে প্রদর্শন করুন সৌজন্য। উল্লেখ্য, জেহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর এই আয়াতখানির কার্যকারিতা রহিত হয়েছে।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য অস্বীকারকারীদেরকে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আবু জেহেল ও তার মতো অন্যান্য বিত্তপতি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিষয়টি আপনি আমার প্রতি ন্যস্ত করুন। তাদেরকে শায়েস্তা করতে আমিই যথেষ্ট। যথাকালে যথাশাস্তি আমি তাদেরকে দিবোই। সুতরাং এ নিয়ে আপনি যেনো আর বিচলিত না হন। এখানে 'উলিন্ নি'মাতি' (বিলাস সামগ্রীর অধিকারী) বলে বুঝানো হয়েছে অংশীবাদীদের দলপতিকে। আর 'ওয়াল মুকাজ্জিবীন' (সত্য অস্বীকারকারীদেরকে) কথাটির 'ওয়াও' (এবং) এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'সাথে' অর্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর কিছুকালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও'। একথার অর্থ— আপনি স্বাভাবিক নিয়মে তাদেরকে মরতে দিন। তারপর চিরস্থায়ী শাস্তির ব্যবস্থা তো তাদের জন্য রয়েছেই। অথবা অচিরেই আমি পৃথিবীতেও তাদেরকে শাস্তি দিবো। মুসলমানদের হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ভবলীলা সাঙ্গ করার ব্যবস্থা করবো তাদের। এভাবে স্বস্তিদান করবো আপনাকে এবং আপনার অত্যাচারিত সঙ্গীসাথীকে।

মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার ইঙ্গিত। ওই যুদ্ধেই নিহত হয়েছিলো সত্যঅস্বীকারকারীদের প্রধান প্রধান দলপতিরা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমার নিকট আছে শৃঙ্খল ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি (১২) আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি' (১৩)।

এখানকার 'আনকালা' শব্দটি 'নাকালা' এর বহুবচন। এর অর্থ শৃঙ্খল, বেড়ি। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, এখানে 'আনকালাঁও ওয়া জ্বাহীমা' অর্থ অগ্নিশৃঙ্খল। 'ওয়া ত্বয়ামান জা গুছ্‌ছাতিন' অর্থ এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায়, যা গলাধঃকরণ করা যেমন যায় না, তেমনি যায় না উগলানো। এভাবে বক্তব্যটি

www.eelm.weebly.com

দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! শুনুন, তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি ভয়ংকর সব শাস্তির উপকরণ— শৃঙ্খল, লেলিহান অগ্নি, এমন বিস্বাদযুক্ত খাদ্য, যা আটকে থাকবে গলায়। এছাড়াও রয়েছে আরো অনেক মর্মন্তুদ শাস্তি।

ইবনে জারীর ও ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বলেছেন, গলায় খাদ্য আটকে যাবে আগুনের কারণে। অর্থাৎ খাদ্য হিসেবে তাদেরকে খেতে দেওয়া হবে আগুন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাদেরকে খাওয়ানো হবে যাক্কুমবৃক্ষ। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দোযখে রয়েছে 'দ্বরী' নামক একটি বৃক্ষ, যা হবে কণ্টকাকীর্ণ, তিক্ত, মরদেহবৎ দুর্গন্ধযুক্ত ও উত্তপ্ত। ওই বৃক্ষ দোজখীদেরকে যখন খাওয়ানো হবে, তখন তা আটকে থাকবে তাদের কণ্ঠনালীতে। তারা তা না গিলতে পারবে, না পারবে উগলে দিতে।

'আ'জাবান আ'লীমা' অর্থ মর্মন্তুদ শাস্তি। এসম্পর্কে সুপরিণত সূত্রে হজরত হুজায়ফা থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, নরকবাসীদের উপরে আপতিত হবে অগ্নি, সর্প ও বৃশ্চিক। ওই সর্প যদি পৃথিবীতে একবার নিঃশ্বাস ছাড়ে, তবে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সবকিছু জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। আর যদি সে একজন মানুষকে দংশন করে, তবে সকল মানুষই হয়ে যাবে লাশ। ওই সর্প ও বৃশ্চিকগুলো প্রবেশ করবে নরকবাসীদের চামড়ার মধ্যে। হজরত আবু সাঈদ বলেছেন, নারকীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা লঘু শাস্তি হবে আবু তালেবের। তাকে পরানো হবে অগ্নিপাদুকা। ফলে গলে যাবে তার মস্তকের মগজ।

হজরত নোমান ইবনে বশীর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, নরকবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে কম শাস্তি হবে ওই সকল লোকের, যাদেরকে পরানো হবে আগুনের জুতা। ফলে জ্বলন্ত উনুনে চাপানো ডেকচির ফুটন্ত পানির মতো টগবগ করে ফুটতে থাকবে তাদের মাথার মগজ। সে তখন ভাববে, সবচেয়ে বেশী শাস্তি ভোগ করছে সে। এরকম আরো হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাকেম।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'সেই দিবসে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে'। একথার অর্থ— 'কিয়ামতের দিন শুরু হবে প্রচণ্ড ভূকম্পন। পৃথিবী ও পৃথিবীর পাহাড়-পর্বতগুলো কাঁপতে থাকবে থর থর করে। এভাবে সেগুলো হবে ধূলিসাৎ। পরিণত হবে বালুকারাশিতে।

এখানে 'ইয়াওম' (দিবস) কথাটি ক্রিয়ার কালাধার। আর ক্রিয়ার বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে আগের আয়াত দুটোতে। বলা হয়েছে, শৃঙ্খল, অগ্নি ও তিক্ত খাদ্যের কথা।

সংশয়ঃ পৃথিবীতে ভূকম্পন শুরু হবে শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের পূর্বে। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে মহাবিচারপর্ব শেষে নরকে। অথচ এখানে আগে দোজখের শাস্তির বিবরণ দেওয়ার পর উল্লেখ করা হলো কিয়ামতের। এতে করে বর্ণনার ক্রম-বৈপরিত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হলো না কি?

www.eelm.weebly.com

সংশয়ভঞ্জনঃ কিয়ামতের পরিসর সুবিশাল। শিঙ্গাধ্বনির পূর্বের ভূকম্পন থেকে শুরু করে স্বর্গবাসী ও নরকবাসীদের স্ব স্ব ঠিকানায় গমন করার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। সুতরাং এই সুবিশাল পরিসরের কোনো কোনো ঘটনা আগে পরে উল্লেখ করলে দোষের তো কিছু নেই।

এখানকার 'ওয়া কানাতিল জ্বিবালু' এর 'ওয়াও' (এবং) হচ্ছে যোজক অব্যয়। এর যোজ্য হবে 'তারজুফ়্' (প্রকম্পিত হবে)। ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'কাছীবাম মাহীলা' বাক্যটির মর্মার্থ করেছেন উড়ন্ত বালুকা সদৃশ। কালাবী বলেছেন, এমন বালির স্তূপ, যা থেকে একমুঠো উঠিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ শূন্যস্থান হয়ে যায় পূর্ণ।

সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ
فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَ
بِيلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
﴿١٧﴾ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِ
تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾

r আমি তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ যেমন রাসূল পাঠাইয়াছিলাম ফির'আওনের নিকট,

r কিন্তু ফির'আওন সেই রাসূলকে অমান্য করিয়াছিল, ফলে আমি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিয়াছিলাম।

r অতএব যদি তোমরা কুফরী কর তবে কি করিয়া আত্মরক্ষা করিবে সেই দিন যেই দিনটি কিশোরকে পরিণত করিবে বৃদ্ধে,

r যেই দিন আকাশ হইবে বিদীর্ণ। তাঁহার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হইবে।

r নিশ্চয় ইহা এক উপদেশ, অতএব যে চাহে সে তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক!

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মক্কাবাসী! শোনো, আমার নিয়ম এই যে, যুগে যুগে আমি পথভ্রষ্ট মানুষকে সুপথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করে থাকি বার্তাবাহক। যেমন ইতোপূর্বে নবী মুসাকে প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউন ও তার অনুসারীদের পথপ্রদর্শনার্থে। এখন আবার তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি আমার প্রিয়তম নবী মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌কে। তোমাদের মধ্যে কারা তাঁকে মান্য করো এবং কারা মান্য করো না, তিনি হবেন তার সাক্ষ্যদাতা।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'ইন্না আরসালনা ইলাইকুম রসুলা' অর্থ নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি রসুল। লক্ষণীয়, ইতোপূর্বে রসুল স.কে যেমন নিশ্চিতার্থক শব্দ 'ইন্না' (নিশ্চয়) দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছিলো (ইন্না সানুল্‌ক্বী), এখানেও তেমনই বক্তব্য শুরু করা হয়েছে 'ইন্না' দিয়ে। এভাবে দু'টো সম্বোধনকেই করা হয়েছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ সম্বোধিতজন এক্ষেত্রে ভিন্ন হলেও বক্তব্যপ্রবাহকে করা হয়েছে প্রাসঙ্গিক ও বেগবান।

'শাহীদান আ'লাইকুম' অর্থ তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কে তাঁকে স্বীকার করো এবং কে করো না, তার সাক্ষ্য তিনি উপস্থাপন করবেন আমার কাছে। আর এখানকার 'কামা আরসালনা' কথাটি এখানে বিশেষণ এবং এর বিশেষ্য এখানে রয়েছে অনুক্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ফেরাউনের নিকট রসুল প্রেরণের বিষয়টি যেমন ছিলো, তোমাদের নিকট রসুল প্রেরণের বিষয়টি তেমনই।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'কিন্তু ফেরাউন সেই রসুলকে অমান্য করেছিলো, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম'। এ কথার অর্থ— ফেরাউন আমা কর্তৃক প্রেরিত সেই বার্তাবাহককে অমান্য করেছিলো। ফলে আমি সে ও তার বশংবদদেরকে ডুবিয়ে মেরেছিলাম সমুদ্রগর্ভে। অতএব হে মক্কাবাসী! এখনো সময় আছে, সাবধান হও। সর্বান্তঃকরণে মেনে নাও আমা কর্তৃক প্রেরিত বার্তাবাহককে। অন্যথায় তোমাদেরকেও দেওয়া হবে ফেরাউন ও তার অনুসারীদের মতো, অথবা তদপেক্ষা অধিক শাস্তি।

এখানে 'আখজাঁও ওয়াবীলা' অর্থ কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম। মুষলধারার বৃষ্টিকে বলে 'ওয়াবীল'। আবার 'ত্বআ'মুন ওয়াবীলুন' অর্থ দুষ্প্রাপ্য আহার্য। এভাবে 'কঠিন শাস্তি' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায় ব্যতিক্রম ধারার সুকঠিন শাস্তি। বলা বাহুল্য, ব্যতিক্রম ধারার শাস্তিই দেওয়া হয়েছে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'অতএব যদি তোমরা কুফরী করো, তবে কী করে আত্মরক্ষা করবে সেই দিন, যেদিন কিশোরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে'। একথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! বিষয়টি তাহলে ভালোভাবে চিন্তা করে দ্যাখো। যদি তোমরা অবাধ্যতার সঙ্গেই জীবন যাপন করতে চাও এবং এভাবেই সাঙ্গ করো পৃথিবীর জীবন, তবে যেদিন ভয়ে-আতংকে দুশ্চিন্তায় বালকেরাও হয়ে যাবে বৃদ্ধের মতো পক্ককেশবিশিষ্ট ও নিস্তেজ, সেই ভয়ংকর কিয়ামত দিবসে কী করে তোমরা পাবে পরিত্রাণ? আত্মরক্ষাই বা করতে পারবে কী করে জাহান্নামের মর্মন্তুদ ও চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে? বক্তব্যটি একটি উপমা। অর্থাৎ বালকের বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপমা উপস্থাপন করে এখানে ধারণা দেওয়া হয়েছে মহাপ্রলয়কালের ভয়াবহতার।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে সুপরিণতসূত্রবিশিষ্ট একটি হাদিসে এসেছে, একবার রসুল স. বললেন, প্রতিফল দিবসে আল্লাহ্‌পাক নবী আদমকে ডেকে

www.eelm.weebly.com

বলবেন, ওহে আদম! তিনি বলবেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা। এই যে আমি। আল্লাহ্পাক বলবেন, জাহান্নামের অংশ পৃথক করো। নবী আদম বলবেন, কতো? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি হাজারে একজন বাদ দিয়ে অন্য সবাই। তখন কোনো নারীই গর্ভবতী অবস্থায় থাকবে না। আর আপামর জনসাধারণকে মনে হবে নেশাগ্রস্ত, উন্মত্ত। কিন্তু আসলে তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। ওরকম হয়ে যাবে তারা ভয়ে ও দুঃশ্চিন্তায়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! হাজারে একজন করে যারা জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্তার পাবে, তারা কারা? তিনি স. বললেন, 'ইয়াজুজ-মাজুজদের মধ্য থেকে জাহান্নামী হবে এক হাজার এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন (এ-ই হবে তখন জাহান্নামী ও জান্নাতীদের অনুপাত)। কিছুক্ষণ পর তিনি স. বললেন, তোমরা কি এ সংবাদে খুশী নও? যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, তোমরা হবে জান্নাতবাসীগণের এক চতুর্থাংশ। সাহাবীগণ আনন্দিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন আল্লাহু আকবার। তিনি স. পুনরায় বললেন তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ। সাহাবীগণ পুনরায় তকবীর ধ্বনি দিলেন। তিনি স. আবারো বললেন, জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে তোমরাই। সাহাবীগণ তকবীরধ্বনি দিলেন আরো অধিক উচ্চ কণ্ঠে। শেষে তিনি স. বললেন, জাহান্নামে (সাময়িকভাবে) তোমাদের সংখ্যা হবে অতি নগণ্য, যেনো শাদা ষাঁড়ের গায়ে একটি কালো পশম, অথবা কালো ষাড়ের শরীরে একটি শাদা লোম। বোখারী, মুসলিম।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'সেই দিন আকাশ হবে বিদীর্ণ'। একথার অর্থ— আকাশ সুবিশাল, দুর্ভেদ্য ও সুদৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও কিয়ামতের দিন তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে না। ভেঙে চুরে হয়ে যাবে চুরমার।

এখানকার 'সামা' (আকাশ) শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। আর 'মুনফাত্বিরুন' (বিদীর্ণ) শব্দটি পুংলিঙ্গ। আর আরবী ভাষার রীতি অনুসারে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় হতে হয় সমলিঙ্গবাচক। অথচ এখানে তা করা হয়নি। এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, এখানে 'সামা' অর্থ নেওয়া হয়েছে 'সাকারা' (ছাদ), যা পুংলিঙ্গবাচক। এভাবেই শব্দদু'টোকে করা হয় সমলিঙ্গসম্পন্ন। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'মুনফাত্বিরুন' এর পূর্বে প্রচ্ছন্ন রয়েছে 'শাই' (বস্তু) শব্দটি। অর্থাৎ আকাশ ভেঙে ফেটে যাওয়ার বস্তু। এই ব্যাখ্যাটিকে মেনে নিলে লিঙ্গরীতি সমস্যা আর থাকেই না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে'। একথার অর্থ— মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচার এ সকল কিছু সম্পর্কে আল্লাহ্ যে অঙ্গীকার করেছেন, তার অন্যথা হওয়া অসম্ভব। তাঁর এমতো অঙ্গীকার পরিপূরিত হবেই হবে।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় এটা এক উপদেশ, অতএব যে চায় সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক'। এখানে 'ইন্না হাজিহী' অর্থ

www.eelm.weebly.com

নিশ্চয় এটা। অর্থাৎ এই সকল নিদর্শন, যা আমি আমার রসুলের উপরে অবতীর্ণ করেছি। 'তাজকিরাতুন' অর্থ উপদেশ, স্মারক। অর্থাৎ স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহ্র অনুগ্রহসম্ভার, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির কথা। 'ফা মান শাআত্ তাখাজা' অর্থ অতএব যে চায় সে অবলম্বন করুক। আর 'ইলা রব্বিহী সাবীলা' অর্থ তার প্রতিপালকের পথ।

এখানকার 'ফা মান শাআ' কথাটির 'ফা' অব্যয়টি নৈমিত্তিক। অর্থাৎ এই উপদেশাবলীই আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্ত। এর বিকল্প আর কিছু নেই। উল্লেখ্য, আল্লাহ্ আমাদের প্রাণ-ধমনী অপেক্ষা অধিক নিকটে। কিন্তু তাঁর ও আমাদের মধ্যে রয়েছে ঔদাসীন্যের ও অমনোযোগিতার অন্তরায়। বিশ্বাসী মনোনিবেশন ছাড়া এই অন্তরায় ভেদ করা অসম্ভব। উদাসীন ও অবিশ্বাসী মানুষ তাই তাঁর মহিমান্বিত ও অবোধ্য নৈকট্যের পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয় না। রসুলেপাক স. বলেছেন, আল্লাহ্পাককে আনুরূপ্যবিহীনরূপে ঘিরে রয়েছে আলো ও অন্ধকারের সত্তর হাজার পর্দা। মহত্ত্ব ও পরাক্রমের পর্দাগুলো জ্যোতির্ময়। আল্লাহ্পাক বলেন, মহত্ত্ব আমার উত্তরীয় এবং পরাক্রম আমার পরিধেয়। আর তমসাময় পর্দাগুলো হচ্ছে বান্দার উদাসীনতার। যদি আল্লাহ্ তাঁর সকল পর্দা অপসারণ করেন, তবে তাঁর জ্যোতিসম্পাতে ভস্মীভূত হয়ে যাবে সমগ্র সৃষ্টি। অন্ধকার পর্দাগুলোকে অপসারণ করতে পারে কেবল আল্লাহ্র জিকির। যারা জিকিররত, তাঁরাই লাভ করেন আল্লাহ্র আনুরূপ্যহীন নৈকট্য, হতে পারেন আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন (ওলী)। রসুল স. বলেছেন, যে যাকে ভালোবাসে, সে তার সঙ্গে। এপথেই অর্জিত হয় 'ফানা' (সমাহিতি) ও 'বাক্বা' (স্থিতি)। অর্থাৎ আল্লাহ্মগ্নতা ও আল্লাহতে স্থায়িত্ব লাভ।

সূরা মুয্যাম্মিল ঃ আয়াত ২০

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ
أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا

www.eelm.weebly.com

تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا ۭ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

r তোমার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনও রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সংগে যাহারা আছে তাহাদের একটি দলও এবং আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন দিবস ও রাত্রির পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা ইহা পুরাপুরি পালন করিতে পারিবে না, অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হইয়াছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর, আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, কেহ কেহ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করিবে এবং কেহ কেহ আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হইবে। কাজেই তোমরা কুরআন হইতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর। অতএব সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্কে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য ভাল যাহা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করিবে তাহা তোমরা পাইবে আল্লাহ্র নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্র নিকট; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইন্না রব্বাকা ইয়া'লামু আন্নাকা তাকূমু আদ্না'। এখানে 'আদ্না' অর্থ প্রায়, কাছাকাছি। 'মিন ছুলুছাইল লাইলি' অর্থ রাতের দুই তৃতীয়াংশ। 'ওয়া নিস্ফাহু' অর্থ অর্ধেক। 'ওয়া ছুলুছাহু' অর্থ এবং এক তৃতীয়াংশ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আপনার প্রভুপালক আপনার এবং আপনার কিছুসংখ্যক সহচরের রাত জেগে ইবাদত করার সংবাদ নিশ্চয় জানেন। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ। তাই কখনো আপনি ও আপনার ওই সঙ্গীরা রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সময়, কখনো অর্ধেক, আবার কখনো এক তৃতীয়াংশ সময় ধরে নামাজ ও কোরআন পাঠ করেন, সে সম্পর্কে তিনি এতোটুকুও অনবগত নন। উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে কাছীর ও কুফানিবাসী ক্বারীগণ পাঠ করতেন 'নিস্ফাহু ওয়া ছুলুছাহু'। এভাবে পাঠ করলে পদ দুটি সম্পর্কযুক্ত হবে 'আদ্না' (প্রায়) শব্দটির সঙ্গে এবং অর্থ দাঁড়াবে— আপনি রাত্রি জাগরণ করেন কখনো প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কখনো অর্ধেক এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ। অন্যান্য ক্বারী পাঠ করতেন 'নিস্ফিহী ওয়া ছুলুছিহী'। এই পাঠরীতিকে মান্য করলে পদদু'টি সম্পর্কিত হবে 'ছুলাছাই' এর সঙ্গে এবং এমতাবাস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আপনি নামাজ পড়েন কখনো প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো প্রায় অর্ধেক এবং কখনো প্রায় এক তৃতীয়াংশ রাত্রি ব্যাপী।

আলোচ্য বাক্য থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স. রাত জাগতেন কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি ব্যাপী, অথবা এক চতুর্থাংশের অধিক। 'এক চতুর্থাংশের অধিক' বলা হলো ইতোপূর্বের 'কিংবা তদপেক্ষা অল্প' (মিনহু ক্বলীল) কথাটির ভিত্তিতে। কথাটির উদ্দেশ্য এক চতুর্থাংশের অধিকই।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া ত্বয়িফাতুম মিনাল্ লাজীনা মাআ'ক্'। এর অর্থ— এবং জাগে তোমার সঙ্গে যারা আছে, তাদের একটি দলও। এখানে 'মিনাল্ লাজীনা মাআ'ক' এর 'মিন' আংশিকার্থক। অর্থাৎ নিশি জাগরণকারী ছিলেন কিছুসংখ্যক সাহাবী, সকলেই নন। বাগবী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, সকল সাহাবীই ছিলেন নিশি জাগরণকারী। কিন্তু তাঁর একথাটি ঠিক নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াল্লহু ইউক্বদ্দিরুল লাইলা ওয়ান নাহার'। এর অর্থ— এবং আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন দিবস ও রাত্রির পরিমাণ। বাক্যটির যোগসূত্র রয়েছে 'রব্বাকা' (প্রতিপালক) এর সঙ্গে। উল্লেখ্য, এখানে সর্বনাম ব্যবহার না করে সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে নামপদ 'আল্লাহ্'। এর তাৎপর্য হচ্ছে দিবস-রজনীর পরিমাপের রহস্য জানেন কেবল আল্লাহ্। তাই তিনিই কেবল নির্ধারণ করতে পারেন দিবস-যামিনীর পরিমাপের হ্রাস-বৃদ্ধি, প্রবহমানতা।

আল্লামা বায়যাবী লিখেছেন, এখানে বাক্যের প্রারম্ভে আল্লাহ্ উল্লেখ করে ক্রিয়াপদীয় বাক্যে নামপদীয় বাক্যের বিধেয়কে স্থির করাতে প্রতীয়মান হয় যে, সময়ের প্রকৃত রহস্য কেবল আল্লাহ্ই জানেন। অন্য কেউ নয়। এরকম বলেছেন আবদুল কাহের এবং জমখশারীও। সাক্কাকী অবশ্য এ প্রসঙ্গে পোষণ করেন ভিন্নমত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি জানেন যে, তোমরা এটা পুরোপুরি পালন করতে পারবে না। অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ উত্তমরূপে এ বিষয়টি অবগত যে, তোমরা পূর্ণরূপে সময়ের রহস্য ভেদ করতে পারবে না। সময়ের যথাসংরক্ষণ ও যথা মূল্যায়নও তোমাদের দ্বারা সম্ভবপর নয়। সেকারণেই তিনি পাঁচওয়াক্ত নামাজের সময় নির্ধারণ করেছেন সূর্যের গতিবিধির ভিত্তিতে। সূর্যের উদয়-অস্ত, দ্বিপ্রাহরিক অবস্থান, ছায়ার হ্রাস-বৃদ্ধি-প্রলম্বায়ন, এগুলোই তো সময়প্রবাহের বাহ্যিক চিহ্ন। এ সকল চিহ্ন নির্ণয় করা সহজ। সেকারণেই আল্লাহ্ এখন থেকে রাতের অংশ নির্ধারণের জটিলতা রহিত করে দিলেন। এখন থেকে তোমাদের জন্য ফরজ হিসেবে নির্ধারণ করলেন সহজসাধ্য আমল— পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফাক্বরাউ মা তাইস্সারা মিনাল কুরআন'। এখানকার 'ফা' অব্যয়টি নিমিত্ত প্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— গভীর রাতে উঠে যতোটুকু নামাজ পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ হয়, ততোটুকু নামাজ পড়ো। এখানে 'আবৃত্তি করো' (ফাক্বরাউ) অর্থ নামাজ পাঠ করো। কোরআন আবৃত্তি করা নামাজের একটি অঙ্গ। আর এখানে এই অঙ্গটির উল্লেখ দ্বারাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে পুরো অবয়বকে, অর্থাৎ নামাজকে। যেমন অন্য আয়াতে 'ক্বিয়াম' উল্লেখ করে উদ্দেশ্য করা হয়েছে পুরো নামাজকে। আর এটা ঐকমত্যসম্মত অভিমত যে, 'ক্বিয়াম' (দণ্ডায়মানতা) ও 'ক্বিরাত' (কোরআন পাঠ) দু'টোই নামাজের স্তম্ভ। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াত দ্বারা রাত্রি জাগরণের সময়সীমায় (দুই-তৃতীয়াংশ,

www.eelm.weebly.com

অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ) অত্যাবশ্যকতাকে রহিত করা হয়েছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত তাহাজ্জুদের অত্যাবশ্যকতাকে রহিত করা হয়নি। পরে যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়, তখন রহিত হয়ে যায় তাহাজ্জুদ পাঠের অত্যাবশ্যকতা। তাহাজ্জুদ তখন হয়ে যায় নফল। এরকম বলেছেন মাতা মহোদয়া আয়েশা, হজরত ইবনে আব্বাস, মুকাতিল ও ইবনে কীসান।

আমি বলি, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে রসুল স. সহ তাঁর সকল উম্মতের উপরে তাহাজ্জুদ নামাজ ফরজ ছিলো। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, পরে যখন উম্মতের জন্য তাহাজ্জুদ রহিত করা হলো, তখন কি-তা রসুল স. এর জন্যও রহিত করা হয়েছিলো? যদি তা না হয়, তবে কি বলা যাবে, তখনও রসুল স. এর উপরে তাহাজ্জুদ ফরজ ছিলো? তারপর যখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য বাক্য, তখন কি তাঁর উপর থেকে অপসারিত করা হলো ফরজের বিধান? অথবা এরকম কি বলা যেতে পারে যে, পূর্বের ফরজ বিধান আলোচ্য বাক্য (ফাক্বরাউ) অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. এবং তাঁর উম্মত উভয়ের উপর থেকে এক সাথে এ সম্পর্কিত ফরজ রহিত হয়ে যায়? বিদ্বজ্জনের নিকট বিষয়টি মতদ্বৈধতাধীনই রয়ে গিয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত রসুল স. এর উপরে তাহাজ্জুদ ফরজ ছিলো, না নফল। কেউ কেউ বলেছেন, পরলোক গমন পর্যন্ত তাঁর স. উপর তাহাজ্জুদ পাঠ ছিলো ফরজ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, পরে তাহাজ্জুদকে তাঁর জন্য করা হয় নফল। আমি বলি, শেষোক্ত অভিমতটি অধিকতর যথার্থ এবং গ্রহণযোগ্য। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফা তাহাজ্জাদ বিহী নাফিলাতাল্লাক' (আর রাতের কিয়দংশে তাহাজ্জুদ পাঠ করো, এটা তোমার জন্য নফল)। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, এখানে 'নাফিলা' অর্থ 'অতিরিক্ত'। সুতরাং বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ। আর তোমার উপরে ফরজ এই অতিরিক্ত এক ওয়াক্ত (তাহাজ্জুদ) সহ মোট ছয় ওয়াক্ত। আমি বলি, অভিমতটি ঠিক নয়। কেননা তাহলে এখানে 'লাকা' না বলে বলা হতো 'আ'লাইকা' (তোমার উপর)। অর্থাৎ হে আমার নবী! এ বিধান অপরিহার্য শুধু আপনার উপর। অনিবার্যতা বুঝাতে উল্লেখ করা হয় 'আ'লাইকা' 'লাকা' নয়। কিন্তু এখানে তো তা করা হয়নি। সুতরাং ছয় ওয়াক্ত ফরজের কথা ধোপে টিকে না। কেউ কেউ আবার বলেছেন, উদ্ধৃত আয়াতের 'লাকা' অর্থ আপনার জন্য। যদি তাই হয়, তবে বলতে হয় তাহাজ্জুদ নফল কেবল রসুল স. এর জন্য। অন্যের জন্য নয়। অথচ একথাটি সুবিদিত যে, তাহাজ্জুদ নামাজ নফল গোটা উম্মতের জন্য। উদ্ভূত জটিলতা নিরসনার্থে মুজাহিদ, হাসান বসরী ও হজরত আবু উমামার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমি বলতে চাই, 'এটা আপনার জন্য নফল' কথাটির অর্থ— তাহাজ্জুদ নফল আপনার মর্যাদার অনুকূলে আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির মাধ্যমরূপে এবং আপনার উম্মতের জন্য তাদের কৃত ক্ষুদ্র-বৃহৎ যাবতীয় ভুল-ত্রুটির ক্ষতিপূরণরূপে।

হজরত মুগীরা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসেও একথার প্রমাণ রয়েছে যে, তাহাজ্জুদ নামাজ ছিলো রসুল স. এর জন্য নফল। তিনি বলেছেন, রসুল স. গভীর

www.eelm.weebly.com

নিশীথে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন। ফলে তাঁর পা ফুলে যেতো। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার অতীত-ভবিষ্যতের সকল অনবধানতাই তো আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও আপনি এতো কষ্ট করেন কেনো? তিনি স. জবাব দিলেন, আমি কি হবো না তাঁর কৃতজ্ঞচিত্ত দাস? উল্লেখ্য, তিনি স. তখন এমন কথা বলেন নি যে, তাহাজ্জুদ আমার উপরে ফরজ।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, সফরের সময় রসুল স. তাহাজ্জুদ পড়তেন তাঁর বাহনে আরূঢ় আবস্থায়। তখন তাঁর উট যেদিকে মুখ করে চলতো, তিনিও সেদিকে মুখ করে তাহাজ্জুদ পড়তেন। আর রুকু-সেজদা আদায় করতেন ইশারায়। তবে এভাবে তিনি স. কখনো ফরজ নামাজ পাঠ করেননি। কিন্তু বিতির নামাজ আদায় করেছেন। বোখারী, মুসলিম।

প্রবিধান ঃ তাহাজ্জুদ নামাজ সুন্নতে মোয়াক্কাদা, না মোস্তাহাব, সে সম্পর্কে আলেমগণের মতানৈক্য রয়েছে। একদল আলেম বলেন, সাধারণ মুসলমানের জন্য তাহাজ্জুদ মোস্তাহাব, আর রসুল স. এর জন্য ছিলো সারা জীবন ফরজ। কেননা তিনি স. সারাজীবনই তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেছেন। আমি বলি, তাহাজ্জুদ নামাজ 'সুনানে হুদা' (পথপ্রদর্শক সুন্নত)। কেননা রসুল স. তাহাজ্জুদ পালন করেছেন নিরবচ্ছিন্নরূপে। তিনি স. যদি এই আমল ওয়াজিব হিসেবে পালন করেন, তাতেও কোনো অসঙ্গতি দেখা দেয় না। কেননা তাঁর বিরতিহীন আমল তার জন্য ওয়াজিব বা নফল যা-ই হোক না কেনো আমাদের জন্য তা সুন্নত। তবে শর্ত এতটুকুই যে, তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে কাউকে বাধা দেওয়া হয়নি, যেমন বাধা দেওয়া হয়েছিলো সওমে বেছালের ক্ষেত্রে।

প্রবিধান ঃ নামাজে কী পরিমাণ ক্বেরাত (কোরআন পাঠ) করতে হবে, সে সম্পর্কেও আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। এক বর্ণনানুসারে ইমামশ্রেষ্ঠ আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে, যতোটুকু ক্বেরাতকে কোরআন বলে চিহ্নিত করা যায় এবং যতোটুকু নামাজের অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়, ততোটুকু ক্বেরাত আবৃত্তি করতে হবে। অর্থাৎ যতোটুকু পাঠ করলে মানুষের উক্তি সদৃশ না হয়, ততোটুকু পাঠ অত্যাবশ্যক। এরূপ অভিমতের প্রেক্ষিতে বলতে হয়, এক আয়াতের কম পাঠ করলেও নামাজ সিদ্ধ হবে। কুদুরী প্রণেতাও এই অভিমতটির পরিপোষক। আর এক বর্ণনানুসারে, ইমাম শ্রেষ্ঠের অভিমত হচ্ছে, এক আয়াতের কম পাঠ করলে নামাজ সিদ্ধ হবে না। ইমাম আহমদও এরকম বলেছেন। হেদায়া প্রণেতাও এটা মেনে নিয়েছেন। অপর আর এক বর্ণনানুসারে ইমামশ্রেষ্ঠ বলেন, হ্রস্ব তিন আয়াত, অথবা তত্তুল্য দীর্ঘ এক আয়াত পাঠ করা নামাজ সিদ্ধ হওয়ার জন্য অনিবার্য। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের অভিমতও এরকম। তাঁরা দু'জন আরো বলেন, সুরা ফাতিহার সঙ্গে ছোট তিন আয়াত, অথবা বড় এক আয়াত মিলানো ওয়াজিব। যদি এ ওয়াজিব ভুলক্রমে পরিত্যক্ত হয়, তবে আদায় করে নিতে হবে সংশোধনের সেজদা (সোহ সেজদা)। আর ইচ্ছাকৃতভাবে যে এরকম করবে, সে গোনাহ্গার হবে এবং ওই নামাজ আবার আদায় করতে হবে। এরকম করা হবে তার জন্য ওয়াজিব, ফরজ নয়।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজই হবে না। আর সুরা ফাতিহার সঙ্গে আর একটি সুরা মিলানো সুন্নত, ওয়াজিব নয়। তাঁরা তাঁদের অভিমতের সমর্থনে বর্ণনা করেছেন হজরত উবাদা ইবনে সামেত কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে তার নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করলো না, তার নামাজই হলো না। দারাকুতনীর বর্ণনায় এসেছে, যে সুরা ফাতিহা পড়লো না, তার নামাজ সিদ্ধ হলো না। দারাকুতনী আরো বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। ইবনে খুজাইমা ও ইবনে হাব্বান হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। তবে এই বর্ণনাটিতে অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— বর্ণনাকারী তখন বললেন, আমি যদি কোনো ইমামের পিছনে নামাজ পাঠ করি? তিনি বললেন, তখন মনে মনে পড়ে নিয়ো। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাজ পাঠ করলো, অথচ কোরআন-জননী (সুরা ফাতিহা) আবৃত্তি করলো না, তার নামাজ হলো অসম্পূর্ণ। আমি বললাম, হে রসুল সহচর! আমি যে কখনো কখনো ইমামের পিছেনে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করি? তিনি বললেন, ওহে পারস্যবাসী! তখন সুরা ফাতিহা পাঠ কোরো মনে মনে। আশহালের পদ্ধতিতে আবু উতবা সূত্রে হাকেমের মাধ্যমে হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং মোহাম্মদ ইবনে রবী কর্তৃক হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে সুপরিণতসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, অন্যান্য সুরা কোরআন জননীর অনুবর্তী। কিন্তু কোরআন-জননী অন্যান্য সুরার অনুবর্তী নহে।

আমি বলি, একদল আলেম 'সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় না' কথাটির অর্থ করেছেন, সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ পরিপূর্ণ হয় না। অর্থাৎ এমতাবস্থায় নামাজ হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু তা থেকে যায় অসম্পূর্ণ। যেমন এক হাদিসে বলা হয়েছে, মসজিদের প্রতিবেশীদের পক্ষে অন্য মসজিদে নামাজ হয় না। অর্থাৎ এরকম করলে তার নামাজ পরিপূর্ণ হয় না। উল্লেখ্য, এরকম ব্যাখ্যা ভুলের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। তাছাড়া 'সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় না' হাদিসটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। অর্থাৎ 'নামাজ হয় না' অর্থ শরিয়তসমর্থিত নামাজ হয় না। অর্থাৎ নামাজ বিশুদ্ধ হয় না। আর মসজিদের প্রতিবেশীর অন্য মসজিদে নামাজ না হওয়ার অর্থ তার নামাজ পরিপূর্ণ হয় না। হাদিস দু'টোর বর্ণনারীতি এক নয়। সুরা ফাতিহা সংক্রান্ত হাদিসে যের প্রদানকারী ও যের মিলিতভাবে 'ফাতিহা'কে বিধেয় করেছে বাক্যটির উদ্দেশ্যের। কিন্তু মসজিদে নামাজ পাঠসংক্রান্ত হাদিসে যের প্রদানকারী অব্যয় ও যের প্রদত্ত পদ 'মসজিদ' উভয়ে মিলিতভাবে বাক্যটির উদ্দেশ্য হয়নি। বরং সেখানে বিধেয় হয়েছে লুপ্ত। সুতরাং ব্যাকরণগত ভিন্নতার কারণে অর্থগত ভিন্নতাকে মান্য করতেই হবে। অর্থাৎ এক হাদিসের বক্তব্য— নামাজ বিশুদ্ধ হবে না এবং আর এক হাদিসের উদ্দেশ্য নামাজ পূর্ণ হবে না। বিধানটি ঐকমত্যসম্মত। হাদিসে কুদসীতে এসেছে আল্লাহ্ বলেন, আমি নামাজকে দ্বিধা-বিভক্ত করেছি আমার এবং আমার বান্দাগণের মধ্যে। অর্থাৎ সুরা ফাতিহাকে করেছি দুই ভাগে বিভক্ত। সুতরাং বুঝতে হবে, সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হবেই না।

www.eelm.weebly.com

ইমাম আবু হানিফা এই হাদিসটিকে তো মান্য করেছেনই, তদুপরি মান্য করেছেন মুসলিম, আবু দাউদ ও ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত আর একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি সুরা ফাতিহা এবং এর চেয়েও অধিক ক্বেরাত পাঠ করলো না, তার নামাজই হলো না। একারণেই তিনি বলেছেন, সুরা ফাতিহা এবং তার সঙ্গে আর একটি সুরা মিলিয়ে পাঠ করা ওয়াজিব।

ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, যে ব্যক্তি তার নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার সঙ্গে আর একটি সুরা মিলিতভাবে পাঠ করে না, তার নামাজ নামাজই নয়, সে নামাজ ফরজ হোক, অথবা হোক নফল। ইবনে হুম্মাম—কাতাদা—আবু বকরা— এই সূত্রে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ বলেছেন, রসুল স. আমাদেরকে সুরা ফাতিহা এবং তার সঙ্গে সাধ্যমতো কিছু পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেন না যে, সুরা ফাতিহা নামাজের অঙ্গ এবং সুরা ফাতিহা পাঠ না করলে নামাজই হবে না; বরং তিনি বলেন, 'কোরআন যতোটুকু তোমাদের জন্য পাঠ করা সহজ ততোটুকু আবৃত্তি করো' এই আয়াত অনুসারে সাধ্যমতো কোরআনের যে কোনো স্থান থেকে কিছু আয়াত পাঠ করা ফরজ। আর তাঁর মতে হাদিসটি দ্বারা কোরআনের কোনো সাধারণ বিধানকে বিশেষায়িত করা যায় না। অর্থাৎ নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ নয়, ওয়াজিব। একারণেই আমরা বলি নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করা এবং তার সঙ্গে আর একটি সুরা মিলানো ওয়াজিব।

আমি বলি, প্রকৃত কথা এই যে, সুরা ফাতিহা পাঠ ও তার সঙ্গে আর একটি সুরা সংযুক্ত করণ দু'টোই নামাজের অঙ্গ— এ দুটো ছাড়া নামাজ সিদ্ধ হবে না। আর এখানকার 'কাজেই কোরআনের যতোটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততোটুকু আবৃত্তি করো' এই আয়াত দ্বারা সুরা ফাতিহা নামাজের অঙ্গ নয়, একথার প্রমাণ গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। কেননা এখানে 'পাঠ করো' অর্থ রাতের নামাজে পাঠ করো। আর 'ফাতাবা আলাইকুম মা তাইয়াস্সারা' অর্থ নিশি জাগরণের গুরুভারকে করে দেওয়া হচ্ছে সহজ, যা ছিলো অ-সহজ ও সুনির্দিষ্ট নিয়মবিশিষ্ট। অর্থাৎ এখন থেকে রাতের নামাজ ও অন্যান্য নামাজে কোরআন পাঠ কোরো ইচ্ছামতো, যতোটুকু করা তোমার জন্য হয় সহজ। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা নামাজের ক্বেরাতের পরিমাণ নির্ধারণ করা সমীচীন নয়। কেননা এরকম দুর্বল ব্যাখ্যা দ্বারা ওই হাদিসকে পরিত্যাগ করা কী করে সম্ভব, যা সুবিদিত এবং যার উপর আমল করেছেন গোটা উম্মত। রসুল স. কিংবা তাঁর পরের কেহ কি সুরা ফাতিহা ছাড়া কখনো নামাজ পড়েছেন? নিশ্চয় নয়। তাহলে হাদিসটি একক বর্ণিত হলেও গোটা উম্মতের ঐকমত্যসঞ্জাত। তাছাড়া কোরআন মজীদে

www.eelm.weebly.com

নামাজের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে সংক্ষেপে, যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে হলে হাদিসের শরণাপন্ন হতেই হয়। একথাটিও তো মনে রাখতে হবে যে, এরকম একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা হানাফী মতাবলম্বীগণও দলিল-প্রমাণ গ্রহণ করে থাকেন। যেমন হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিস দ্বারা তাঁরা নামাজের শেষ বৈঠক যে ফরজ তা প্রমাণ করে থাকেন, যেখানে বলা হয়েছে, তোমরা যখন এটা বলেছো, বা করেছো, তখন তোমাদের নামাজ পূর্ণ হয়েছে। এখন ইচ্ছা করলে তোমরা উঠে যেতে পারো, অথবা বসেও থাকতে পারো। হানাফীগণ বলেন, এই হাদিসের বর্ণনানুযায়ী নামাজের পূর্ণতা সংশ্লিষ্ট দু'টো বিষয়ের যে কোনো একটির সঙ্গে। কাজেই এদু'টোর যে কোনো একটি ফরজ— বলা, না হয় করা। হাদিসটি একক বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও তো হানাফীগণ এর দ্বারাই শেষ বৈঠক ফরজ হওয়ার প্রমাণ গ্রহণ করেছেন।

তাঁরা সুরা ফাতিহা যে নামাজের অঙ্গ নয়, তা প্রমাণার্থে উপস্থাপন করেন হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার পর 'আল্লাহু আকবার' বলবে, তারপর কোরআন থেকে ততোটুকু পাঠ করবে, যতোটুকু তোমাদের সাধ্যে কুলায়.... শেষ পর্যন্ত। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় কোরআনের যে কোনো স্থান থেকে কিছু আয়াত পাঠ করার অপরিহার্যতা। আর 'সুরা ফাতিহা বিহনে নামাজ হয় না' এই হাদিস দ্বারা অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয় সুরা ফাতিহা পাঠের। তাহলে সুনির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্টকে যদি একীভূত করা হয়, অর্থাৎ যদি বলা হয় সুরা ফাতিহা নামাজের অঙ্গ, সুতরাং তা পাঠ করা ফরজ এবং তৎসহ আরো কিছু আয়াতও এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া ফরজ এবং তা-ও নামাজের অঙ্গ— তাহলে আর সমস্যা থাকে কোথায়? এছাড়াও হজরত আবু হোরায়রা থেকে রেফা ইবনে রাফেয়ের মাধ্যমে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যখন তোমরা নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হও, তখন প্রথমে উচ্চারণ কোরো 'আল্লাহু আকবার'। তারপর পাঠ কোরো কোরআন জননী এবং তারপর পাঠ কোরো যে কোনো স্থান থেকে যতোটুকু ইচ্ছা। দারাকুতনীর বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— এরপর তাকবীর বোলো, তারপর পাঠ কোরো সুরা ফাতিহা এবং তারপর পাঠ কোরো যতোটুকু পাঠ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং যতোটুকু তোমাদের জন্য সহজ।

একটি বিধানের জটিলতা নিরসন ঃ মুকতাদীকে (ইমামের অনুসারীকে) সুরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে কিনা, সে সম্পর্কে রয়েছে আলেমগণের মতপৃথকতা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মুকতাদী ও একা নামাজ পাঠকারীর জন্য সুরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে এরকমই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মতে মুক্তাদীর জন্য সুরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানিফা বলেন, মুকতাদীর জন্য সুরা

www.eelm.weebly.com

ফাতিহা পাঠ মাকরুহ। ইমাম মালেক বলেন, সশব্দ ক্বেরাতবিশিষ্ট নামাজে মাকরুহ। আর ইমাম আহমদ বলেন, ওয়াজিব-মাকরুহ কোনোটাই নয়, বরং সর্বাবস্থায় তা মোস্তাহাব। তবে তিনি এর সঙ্গে একটি শর্তও জুড়ে দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে— ইমাম যখন সশব্দে ক্বেরাত পাঠ করে, তখন মাকরুহ। আর যখন পাঠবিরতি দেয় (শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে কিছুক্ষণের জন্য থামে) তখন মাকরুহ নয়, মোস্তাহাব। ইমাম মালেক, জুহুরী ও ইবনে মোবারকও এরকম বলেছেন। এরকম আরো বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর, হজরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের এবং আবুল কাসেম ইবনে মোহাম্মদ থেকেও।

ইমামের ক্বেরাত পাঠ করার সময় মুক্তাদীর ক্বেরাত পাঠ নিষিদ্ধ, এই অভিমতটির প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে হজরত জাবের থেকে জাবের জু'ফী সূত্রে ইমাম আহমদ ও দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিস থেকে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ইমামের ক্বেরাত মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট। দারাকুতনী বলেছেন, হাদিসটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। ইবনে জাওজী বলেছেন, হাদিসটি সুদৃঢ়সূত্রবিশিষ্ট। এরকম আরো বলেছেন সুফিয়ান সওরী ও শো'বা। দারাকুতনী হাদিসটি ভিন্নতর সূত্রে বর্ণনা করেছেন লাইছের মাধ্যমেও। কিন্তু ইবনে আলীয়া বলেছেন, লাইছ বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সালামের পদ্ধতিতে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, যে নামাজে গ্রন্থজননীকে পাঠ করা হয় না, ওই নামাজ হয় অসম্পূর্ণ, তবে ইমামের পশ্চাতে এরকম করা হলে অসম্পূর্ণ হয় না। ইয়াহ্ইয়াকে দুর্বল বর্ণনাকারী আখ্যা দিয়েছেন দারাকুতনী। আবার ইবনে জাওজী মন্তব্য করেছেন, তাকে অদৃঢ় বর্ণনাকারী বলেছেন, এরকম কাউকেই আমি পাইনি। দারাকুতনী, বায়হাকী এবং ইবনে আদী বলেছেন, বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, হাদিসটি প্রায়োন্নত পর্যায়ের। কেননা অধিকসংখ্যক বর্ণনাকারীই একে প্রায়োন্নত সূত্রপরম্পরায় মুসা ইবনে আয়েশা সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদের পদ্ধতিতে রসুল স. থেকে বর্ণনা করেছেন। ওই বর্ণনাকারীগণ হচ্ছেন— সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, সুফিয়ান সওরী, আবুল আহ্ওয়াস, শো'বা, ইসরাইল, শরীক ইবনে খলদালানী, জরীর, আবদুল হামীদ, জায়েদাহ্ এবং জুহাইর।

আমরা বলি, প্রায়োন্নতসূত্রবিশিষ্ট হাদিসও আমাদের নিকট দলিলরূপে গণ্য। ইবনে জাওজী তো বলেছেন, হাদিসটি সর্বোন্নত পর্যায়ের। অধিকন্তু ইমাম আবু হানিফা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে বিশুদ্ধ সূত্রে। লক্ষণীয় ইমাম মোহাম্মদ তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে লিখেছেন, আমার নিকট হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু হানিফা। তিনি বলেছেন, আমার নিকট হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ থেকে আবুল হাসান মুসা ইবনে আবী আয়েশা। তিনি হজরত জাবের থেকে এবং তিনি রসুল স. থেকে। আবার আহমদ ইবনে মুনী' তাঁর 'মসনদ' নামক পুস্তকে এরকম সূত্রসহযোগে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, যা মুসলিমের শর্তবহ। তিনি বলেছেন, আমি হাদিসটি পেয়েছি ইসহাকুল আযরক

www.eelm.weebly.com

থেকে। তিনি বলেছেন, আমাকে হাদিস শিক্ষা দিয়েছেন সুফিয়ান ও শুরাইক। তাঁরা হাদিসটি পেয়েছেন মুসা ইবনে আবী আয়েশা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ থেকে এবং তিনি হজরত জাবের থেকে। আলোচনা যাতে দীর্ঘ না হয়, সেজন্য এ সম্পর্কে আরো অনেক শিথিল সূত্রবিশিষ্ট হাদিস পরিহার করা হলো।

সংশয় ঃ এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে 'কাজেই কোরআনের যতোটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততোটুকু আবৃত্তি করো' ঘোষণাটি সার্বজনীন। তাহলে ইমাম আবু হানিফার রীতি অনুসারে একক বর্ণিত একটি হাদিস দ্বারা বিধানটিকে সীমায়িত করা যেতে পারে কীভাবে?

সমাধান ঃ আয়াতখানি আংশিক সীমায়নসহ সার্বজনীন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুকু অবস্থায় এসে ইমামের সঙ্গে নামাজে অংশগ্রহণ করে, সে বিধানটির সার্বজনীনতা থেকে মুক্ত। সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যসম্মত। এ ধরনের মুক্তাদী বাদে অন্যান্যদের জন্য বিধানটি সার্বজনীনই।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, সকল নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করা মোস্তাহাব। যেমন রসুল স. বলেছেন, আবৃত্তি যদি সশব্দে করা হয়, তবে তোমরা মুক্তাদীরা কোরআন থেকে কোনো আয়াত পাঠ কোরো না, কেবল গ্রন্থজননী ব্যতীত। দারাকুতনী হাদিসটি বর্ণনা করার পর মন্তব্য করেছেন, এর সকল বর্ণনাকারীই বলিষ্ঠ। এই হাদিসের দ্বারা সশব্দ ক্বেরাত বিশিষ্ট নামাজে মুকতাদীদের ক্বেরাত পাঠ নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। বিশেষভাবে এখানে সশব্দ ক্বেরাতের কথা উল্লেখ থাকাতে প্রতীয়মান হয় যে, সকল নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করা মোস্তাহাব। তবে ব্যতিক্রমের যে ইঙ্গিত এখানে রয়েছে, তার দাবি হচ্ছে, তা পাঠ করতে হবে ইমামের পাঠ-যতির সময়। এরকম করলে এ সম্পর্কিত সকল হাদিসের উপরেই আমল করা হয়ে যায়। আবার এতে করে 'যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন শোনো এবং চুপ থাকো' এ আয়াতের উপরেও আমল করা হয়। মান্যবর সাহাবীগণের অনেকেও মুকতাদীর ক্বেরাত পাঠ না করার প্রবক্তা। নাফে সূত্রে ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে ওমর ইমামের পশ্চাতে নামাজে দাঁড়ালে ক্বেরাত পাঠ করতেন না।

হজরত জায়েদ ইবনে ছাবেত এবং হজরত জাবেরের উক্তি উল্লেখ করে তাহাবী বলেছেন, ইমামের পশ্চাতে কোনো অবস্থায় ক্বেরাত পাঠ করা যাবে না। ইমাম আহমদ তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদকে একবার মুকতাদীর ক্বেরাত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি জবাব দিলেন, ওই সময় নিশ্চুপ ও মনোযোগী থেকো। কেননা তোমার ক্বেরাতে নামাজের নিবিষ্টচিত্ততা বিঘ্নিত হতে পারে। তোমার জন্য ইমামের ক্বেরাতই যথেষ্ঠ। মোহাম্মদ ইবনে সা'দ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামাজ আদায়কালে ক্বেরাত পড়ে, আমার তো মনে হয়, তার মুখ অগ্নিপূর্ণ। আবদুর রাজ্জাকও এরকম বলেছেন। তবে তাঁর বক্তব্যে অগ্নির বদলে এসেছে পাথরের কথা।

www.eelm.weebly.com

উজলান থেকে দাউদ ইবনে কায়েস সূত্রে মোহাম্মদ বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পশ্চাতে নামাজ আদায় করে, সে যেনো মনে করে তার মুখে রয়েছে পাথর।

ইবনে আবী শায়বা তাঁর 'মুসান্নিফ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত জাবের বলেছেন, ইমাম সশব্দে ক্বেরাত পাঠ করুক, অথবা পাঠ করুক নিঃশব্দে, সর্বাবস্থায় মুকতাদীদের উচিত ক্বেরাত পাঠ না করা। এ সকল বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সরব-নীরব উভয় ক্বেরাতবিশিষ্ট নামাজে মুকতাদীদের ক্বেরাত পাঠ মাকরূহ। আবার এমতো অভিমতের পক্ষে রয়েছে এই আয়াতও 'যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন মনোযোগ দিয়ে তা শোনো এবং চুপ থাকো'। রসুল স.ও বলেছেন, যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন চুপ থাকো ও মনোযোগের সঙ্গে শোনো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা।

প্রবিধান ঃ ফরজ-নফল সব রকমের নামাজের প্রতি রাকাতে ক্বেরাত পাঠ করতে হবে কিনা, সে সম্পর্কে রয়েছে বিভিন্ন অভিমত। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেন, সাধারণভাবে প্রত্যেক রাকাতেই ক্বেরাত পাঠ করা ওয়াজিব। রুকু-সেজদার মতো ক্বেরাতের বিধানও এক। তবে এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকের অভিমত হচ্ছে, তিন বা চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজের এক রাকাতে যদি ক্বেরাত বাদ পড়ে যায়, তবে সোহ সেজদা ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবু হানিফার মতে বিতির ও নফল নামাজের প্রত্যেক রাকাতে ক্বেরাত ওয়াজিব। তবে তা পরিত্যক্ত হলে সংশোধনের সেজদা ওয়াজিব হবে না, যেহেতু তাঁর অভিমত হচ্ছে, নফল নামাজের প্রতি দু'রাকাত হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ নামাজ। আর ফরজ নামাজ কেবল দুই রাকাতে ক্বেরাত ওয়াজিব, অথচ নীতিগতভাবে ক্বেরাত ওয়াজিব শুধু এক রাকাতে। সূত্রানুসারে অনুজ্ঞাসূচক বিধান পুনঃ পৌনিকতার দাবি রাখে না। আর অনুজ্ঞা হয়েছে 'যতোটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততোটুকু পাঠ করো'। বার বার পাঠের কথা এখানে বলা হয়নি। তবুও আমরা ক্বেরাতকে দু'রাকাতের জন্য বিধিবদ্ধ করার প্রবক্তা। তবে তিন অথবা চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজের শেষ এক অথবা দুই রাকাত এমতো বিধান থেকে মুক্ত। অর্থাৎ শেষ এক অথবা দুই রাকাতে ক্বেরাত ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানিফার অভিমতের ভিত্তি হচ্ছে আলোচ্য আয়াত। তিনি বলেন এই আয়াত দ্বারাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে ক্বেরাত পাঠের উপযোগিতা নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর এই অভিমতটি মেনে নেওয়া দুষ্কর।

জমহুর আলেমগণের অভিমতের সপক্ষে রয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, একবার মসজিদে ঢুকেই এক লোক নামাজ পাঠ করতে শুরু করলো। নামাজ শেষ হলে সে রসুল স.কে সালাম বললো। তিনি স. সালামের প্রত্যুত্তর দিয়ে বললেন, তোমার নামাজ হয়নি। পুনরায় নামাজ পড়ে নাও। সে একটু দূরে গিয়ে পুনরায় নামাজ পাঠ

www.eelm.weebly.com

করলো। নামাজ শেষে রসুল স. এর সঙ্গে সাক্ষাত করতেই তিনি স. বললেন, নামাজ হয়নি। পুনরায় পড়ো। সে পুনরায় নামাজ পড়লো। এরকম ঘটলো তিনবার। শেষে লোকটি বললো, আপনাকে যিনি সত্য বার্তাবাহক করে পাঠিয়েছেন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! আমি তো এর চেয়ে উৎকৃষ্ট নামাজ জানি না। তিনি স. বললেন, দণ্ডায়মান হয়ে প্রথমে তাকবীর বলো। তারপর কোরআন থেকে পাঠ করো ততোটুকু, যতোটুকু পাঠ করা হয় তোমার জন্য সহজ। এরপর রুকুতে যাও। শান্তভাবে রুকু সম্পন্ন করার পর মস্তক উত্তোলন করে কিছুক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়াও। তারপর সেজদা করো। প্রশান্তির সঙ্গে সেজদা সম্পন্ন করে মস্তক উত্তোলন করে স্থির হয়ে বসো। এভাবে ধীরে সুস্থে সম্পন্ন করো তোমার নামাজ। রেফা যরকীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসাঈ।

হজরত আবু কাতাদা বলেছেন, রসুল স. জোহর ও আসর নামাজের প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহাসহ আর একটি করে সুরা পাঠ করতেন। আর শেষ দুই রাকাতে পাঠ করতেন কেবল সুরা ফাতিহা। আর তিনি স. ফজরের দুই রাকাতে এবং জোহরের প্রথম দুই রাকাতে পাঠ করতেন দীর্ঘ ক্বেরাত। বর্ণিত হাদিসগুলোকে 'তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দ্যাখো, সেভাবে নামাজ আদায় কোরো' হাদিসটির সঙ্গে পাঠ করলে এগুলোকে মনে হবে কোরআনের সংক্ষিপ্ত বিধানেরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা। হজরত আবু দারদা বর্ণনা করছেন, এক লোক একবার রসুল স. এর সুমহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! প্রত্যেক নামাজেই কি কোরআন পাঠ করতে হবে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। একথা শুনেই সেখানে উপস্থিত জনৈক আনসারী বলে উঠলো, তাহলে তো বিধানটি ওয়াজিব? যদি বলা হয়, বর্ণিত হাদিসগুলো তো একক বর্ণিত। আর একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা তো কোরআনের আয়াতের উপর অতিরিক্ততা করা যায় না, তাহলে ফেকাহ্‌ শাস্ত্রের মূল সূত্রাবলী মেনেও বলা যেতে পারে বিধানটি ওই সময়ের, যখন বিশেষ কোনো বিধানের উপর কোরআনের অবস্থান ছিলো অকাট্য, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমুক্ত। আর এখানকার 'ফাক্বরাঊ' (আবৃত্তি করো) বাক্যটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। আর নামাজের জন্য যেরূপ আবৃত্তি করার কথা বলা হয়েছে, তা সংক্ষিপ্ত হলেও বিস্তারিত অর্থবহ। তাই এমতাবস্থায় ধরে নিতে হবে, হাদিসগুলো তার বিশ্লেষক।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে'। এখানে 'আ'লিমা' (জানেন) ক্রিয়ার কর্তা হচ্ছেন আল্লাহ্‌। আর এখানকার 'আন' হচ্ছে হ্রস্ব অব্যয়। আর 'ফাক্বরাঊ' (আবৃত্তি করো) কথাটির পুনঃপৌনিকতা বক্তব্যটিকে করেছে অধিকতর গুরুত্ববহ। এমনও বলা যেতে পারে যে, গুরুত্ববহ ঠিক নয়, বরং প্রথম বিধানের সুসংস্কৃত দ্বিতীয় বিধান, যা সহজলভ্যতার দাবিদার। দ্বিতীয় 'পাঠ করো' বাক্যটি প্রথম 'পাঠ করো' বাক্যটির বিবরণ। একারণেই তার উপরে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে বিধানের শাখা-প্রশাখা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যারা অসুস্থ, তারা তো নিশিজাগরণের মতো কষ্টসাধ্য আমল করতে সমর্থ হবে না।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'কেউ কেউ আমার অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে'। একথার অর্থ— কেউ কেউ তো আবার ব্যবসা-বাণিজ্য, বিদ্যার্জন, হজ এসকল উদ্দেশ্যে অনুগৃহীত হওয়ার আশায় সফর করবে। তখন তো তাদের জন্য রাত জেগে নামাজ পড়া ও কোরআন পাঠ করা হবে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এখানে 'ফাদ্বলিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র অনুগ্রহ, বাণিজ্য, বিদ্যার্জন, হজ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র পথে যারা জেহাদ করবে তাদের জন্যও তো তাহাজ্জুদ পাঠ করা প্রায় অসম্ভব।

ইব্রাহিম সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, যে ব্যক্তি পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে অন্য দেশ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী মুসলিম অধ্যুষিত কোনো শহরে আমদানী করে এবং মওজুদ করার আগেই তা বিক্রি করে দেয়, সে ব্যক্তি হয়ে যায় শহীদের পর্যায়ভূত। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে'।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব তোমরা কোরআন থেকে যতোটুকু সহজসাধ্য, তা আবৃত্তি করো'। একথার অর্থ— সুতরাং রাত জেগে জেগে কোরআন পাঠ করার এই কঠিন আমলটির অত্যাবশ্যকতা তোমাদের উপর থেকে উঠিয়ে নেওয়া হলো। বিষয়টিকে এখন করে দেওয়া হলো তোমাদের ইচ্ছাধীন। তোমরা এখন থেকে আমলটি করতে পারো ততোটুকু, যতোটুকু হয় তোমাদের জন্য সহজসাধ্য।

সংশয় ঃ এখানে 'মা' (যা, যতোটুকু) অব্যয়টি সাধারণার্থক। তাহলে কি বুঝতে হবে, এখানে যতোটুকু বলে বুঝানো হয়েছে সমুদয় কোরআনকে?

নিরসন ঃ না, বিষয়টি সেরকম নয়। কেননা বক্তব্যের গতিধারা এখানে একথাই বলে দিচ্ছে যে, পাঠ করতে হবে কোরআনের কিয়দংশ, যা পাঠ করা সহজ।

প্রবিধানঃ ক্বেরাতের পরিমাণ কতোখানি হবে তা বিবেচনা করতে হবে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেই। মনে রাখতে হবে, শরিয়তে মধ্যাবস্থাই প্রশংসনীয়। সুতরাং মধ্যম পরিমাণ ক্বেরাত পাঠ মোস্তাহাব। মধ্যম ধরনের ক্বেরাত হচ্ছে একশত পঞ্চাশ আয়াত। আর সর্বোতিরিক্ত এক হাজার আয়াত। এভাবে পড়লে কোরআন খতম হয়ে যায় এক সপ্তাহের মধ্যে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোরআন থেকে তোমরা যথাসাধ্য আবৃত্তি কোরো। প্রতিদিন পাঠ কোরো এক শত আয়াত। ইবনে কাছীর বলেছেন, হাদিসটি একেবারে দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করবে, সে কখনো উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত

www.eelm.weebly.com

হবে না। যে একশত আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাকে গণ্য করবেন ইবাদতকারী বলে। যে পাঠ করবে দুই শত আয়াত, মহাবিচারের দিবসের বাদানুবাদে কোরআন তার উপরে জয়ী হতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচশত আয়াত পাঠ করবে, তাকে দেওয়া হবে পুণ্যের এক বিশাল স্তূপ।

প্রায়োন্নত সূত্রে হাসান বসরী থেকে দারেমী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. তাঁর নিকটে উপস্থিত সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, রাতে যে একশত আয়াত তেলাওয়াত করে, তার সাথে কোরআন বিতণ্ডা বাধায় না। যে পাঠ করে দু'শ আয়াত, সারা রাত ধরে তার আমলনামায় পুণ্য লেখা হতে থাকে। আর যে পাঠ করে পাঁচশত থেকে এক হাজার আয়াত, তার জন্য প্রস্তুত করা হয় পুণ্যের একটি বিরাট স্তূপ। মান্যবর সহচরগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! স্তূপ কী? তিনি স. বললেন, বারো হাজার উন্নত স্তর।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, একবার রসুল স. বললেন, কোরআন আদ্যোপান্ত পাঠ করে শেষ কোরো এক মাসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি তো এর কম সময়ের মধ্যে কোরআন খতম করতে সক্ষম। তিনি স. বললেন, তাহলে পাঠ সমাপ্ত কোরো কুড়ি রাতে। আমি বললাম, এর কমেও তো আমি পারি। তিনি স. বললেন, তাহলে খতম কোরো সাত দিনে, এর কমে নয়। মাতা মহোদয়া আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র কাছে ওই ইবাদত প্রিয়, যা করা হয় নিয়মিত, অত্যল্প হলেও। মাতা মহোদয়া আরো বলেছেন, রসুল স. একথাও উল্লেখ করেছেন যে, সামর্থ্যে যতোটুকু কুলায়, ততোটুকু ইবাদত কোরো। কেননা বেশী করতে গেলে তোমরা নিজেরাই হবে বিব্রত, কিন্তু আল্লাহ্ বিব্রত হবেন না (তোমাদেরকে পুণ্যদান করতে)। হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, উদ্দীপনা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত নামাজ দীর্ঘায়িত কোরো, আর পরিত্যাগ কোরো আলস্য আসার সাথে সাথে।

মাতা মহোদয়া আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নামাজে নিদ্রা বা তন্দ্রা এলে নামাজ পাঠে বিরতি দেওয়া উচিত। ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার আগে। কেননা নিদ্রাপ্রভাবিত নামাজে নামাজী কী বলে, তার খবর সে নিজেই জানে না। সে হয় তো ক্ষমাপ্রার্থনা শুরু করলো, অথচ গালি দিলো নিজেকেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব নামাজ কায়েম করো, জাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ্কে দাও উত্তম ঋণ'।

এখানে 'নামাজ' অর্থ ফরজ নামাজ। বাক্যটির যোগসূত্র রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'ফাক্বরাউ' (আবৃত্তি করো) কথাটির সঙ্গে। 'ওয়াও' (এবং) অব্যয়টি এখানে সমষ্টিবাচক। আর এমতো যোগসূত্রের দাবি হচ্ছে, পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ

www.eelm.weebly.com

দ্বারা যেনো তাহাজ্জুদকে রহিত না করা হয়। যেমন অনেকে বলেছেন, তাহাজ্জুদ ওয়াজিব নয়, মোস্তাহাব। 'জাকাত' অর্থ এখানে ফরজ জাকাত। আর 'করদ্বান হাসানা' অর্থ উত্তম ঋণ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ— জাকাত ছাড়া অন্যান্য দান-খয়রাত এবং অন্যান্য কল্যাণকর আমল। যেমন অতিথি সেবা, আত্মীয়দের সঙ্গে শিষ্ট আচরণ। আমি বলি, কথাটির অর্থ আল্লাহ্র আনুগত্যপ্রকাশক কর্মাবলী। আবার এমনও হয়ে থাকতে পারে যে, 'ক্বরদ্বান হাসানা' অর্থ এখানে উত্তম পন্থায় যাকাত আদায় করা। অবশ্য বর্ণিত সকল বিষয়ই কথাটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। 'হাসান' (উত্তম) শব্দটির দ্বারা উত্তম কর্মসমূহ সম্পাদনকারীদেরকে অনুপ্রাণিত করাই এখানে উদ্দেশ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা তোমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য ভালো যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে, তোমরা তা পাবে আল্লাহ্র নিকটে। তা উৎকৃষ্টতর ও পুরস্কার হিসেবে মহত্তর'। এখানে 'খইর' (ভালো যা কিছু) অর্থ শারীরিক ইবাদত, অথবা এমন সৎকর্ম, যা হতে পারে 'অগ্রিম' হিসেবে গণ্য।

'খইরান' (উৎকৃষ্টতর) কথাটি এখানে দ্বিতীয় কর্মপদ হয়েছে 'তাজ্বিদুহু' (তা তোমরা পাবে) এর। আর 'হুয়া' (তা) সর্বনামটি এখানে কৃতিত্বপ্রকাশক ও নির্দিষ্টবাচক। হজরত আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছো, যার কাছে অংশীবাদীদের বিত্তসম্পদ অপেক্ষা নিজের বিত্তসম্পদ উত্তম? সাহাবীগণ জবাব দিলেন, না, এমন কেউই তো আমাদের মধ্যে নেই, যার কাছে অংশীবাদীদের সম্পদ অপেক্ষা নিজের সম্পদ অধিক পছন্দনীয় নয়। তিনি স. বললেন, বুঝে সুঝে জবাব দাও। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো এতটুকুই বুঝলাম। তিনি স. বললেন, তোমরা সাধারণত অংশীদারদের সম্পদই অধিক পছন্দ করো। সাহাবীগণ বললেন, কীভাবে? তিনি স. বললেন, নিজের সম্পদ সেটাই, যা তোমরা পুণ্যের আশায় অগ্রিম ব্যয় করো। আর অংশীদারদের সম্পদ সেটাই, যা তার মালিক মৃত্যুর পরক্ষণে ত্যাগ করে যায়, বাগবী।

শেষে বলা হয়েছে— 'আর তোমরা ক্ষমাপ্রার্থনা করো আল্লাহ্র নিকট; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— পুণ্যকর্মসমূহ যথানিয়মে সম্পাদন করা সত্ত্বেও কখনো সেগুলোর উপরে নির্ভরশীল হয়ে পোড়ো না। এতে করে তোমরা হয়ে যাবে গর্বিত, ফলে পুণ্যকর্মসমূহের প্রতিফল আর তোমরা পাবেই না। তাই দাসত্বের মূল বৈশিষ্ট্য বিনয় ও মুখাপেক্ষিতা অক্ষুণ্ন রাখতে এবং পুণ্যসমূহের যথাসংরক্ষণ নিশ্চিত করণে তোমরা আল্লাহ্ সকাশে মার্জনাপ্রার্থী হও। একথাটিও মনে রেখো যে, পুণ্যকর্মসমূহ সম্পাদনের মনোবৃত্তি, প্রচেষ্টা ও বাস্তবায়ন সকল কিছুই সম্পন্ন হয়েছে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত সামর্থ্যানুসারে। তাঁর-ই দয়ার্দ্র অভিপ্রায়ের আনুকূল্যে। সুতরাং কৃতিত্ববোধের আবিলতা দূর করণার্থে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি বিনয়াবনত ক্ষমাপ্রার্থীদের জন্য ক্ষমাপরবশ ও অতীব দয়ালু, তোমাদের যৎকিঞ্চিত পুণ্যকর্মের বিশাল বিনিময় দাতা।

www.eelm.weebly.com

সূরা মুদ্দাছ্ছির

এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থধাম মক্কায়। সুরাখানি ২ রুকু এবং ৫৬ আয়াতবিশিষ্ট।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীর বলেছেন, একবার আমি আবু সালমা ইবনে হজরত আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলাম, বলুন তো, কোরআনের কোন অংশ প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলো? তিনি বললেন, 'আল মুদ্দাছ্ছির'। আমি বললাম, লোকে যে বলে, সবার আগে অবতীর্ণ হয়েছে 'ইক্বরা বিসমি'? আবু সালমা বললেন, তুমি যেভাবে প্রশ্ন করছো, সেভাবে আমিও প্রশ্ন করেছিলাম মান্যবর সাহাবী জাবেরকে। তিনি বলেছিলেন, আমি রসুল স.কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি স. বলেছিলেন, আমি সেবার হেরা পর্বতের গুহায় অতিবাহিত করলাম একটানা একমাস। তারপর সেখান থেকে নেমে বাড়ির পথ ধরলাম। সহসা শুনতে পেলাম অদৃশ্য আওয়াজ। আকাশের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ভয় পেলাম। বাড়িতে এসেই খাদিজাকে বললাম, শিগগির আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করো। বস্ত্রাচ্ছাদিত করো। গায়ে ঢেলে দাও ঠাণ্ডা পানি। এর কিছুক্ষণ পরেই অবতীর্ণ হলো 'ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাছ্ছির......ফাহজুর' (আয়াত ১—৫)। ঘটনাটি ঘটেছিলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বে। বোখারী, মুসলিম।

কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিলো 'ইক্বরা বিস্মি রব্বিকাল্লাজী খলাক্ব'। এ ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করবো 'ইক্বরা বিস্মি' সুরার তাফসীরে ইনশাআল্লাহু তায়ালা। এখানে কেবল উল্লেখ করছি এ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস। তাঁরা বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে ফিতরাতুল ওহীর সময়ের কথা বলতে শুনেছি (ফিতরাতুল ওহী হচ্ছে প্রত্যাদেশরুদ্ধ কাল, প্রথম প্রত্যাদেশের পর বেশ কিছুকাল ধরে যে প্রত্যাদেশ বন্ধ ছিলো— সেই সময়)। তিনি বলেছেন, পথ চলতে চলতে আমি আকাশের দিক থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম। দেখলাম সেই ফেরেশতাকে, যিনি ইতোপূর্বে আমার কাছে আগমন করেছিলেন হেরা পর্বতের গুহায়। দেখলাম, তিনি বসে আছেন আকাশ পৃথিবীর মাঝখানে শূন্যে স্থিত একটি আসনে। আমি ভীত হলাম। ফিরে এলাম গৃহে। খাদিজাকে বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত করো। আমাকে বস্ত্রাবৃত করো। এর কিছুক্ষণ পরেই অবতীর্ণ হলো 'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! ওঠো, আর সতর্ক করো, এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো, আর অপবিত্রতা পরিহার করে চলো'। এরপর থেকে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হতে লাগলো ধারাবাহিকভাবে। এই হাদিস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সুরা মুদ্দাছ্ছির অবতীর্ণ হয়েছে ফিতরাতুল ওহীর পরে। এর আগে হজরত জিবরাইল প্রত্যাদেশ নিয়ে রসুল স. এর কাছে আগমন করেছিলেন হেরা পর্বতের গুহায়।

www.eelm.weebly.com

শিথিল সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার ওলীদ ইবনে মুগীরা কুরায়েশ গোত্রপতিদেরকে নিমন্ত্রণ করলো। পানাহারপর্ব শেষ হলো। শুরু হলো আলাপচারিতা। একজন বললো, এ লোক (রসুল স.) সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? এক ব্যক্তি জবাব দিলো, আমার তো মনে হয় সে যাদুকর। আর এক ব্যক্তি বলে উঠলো, না না, যাদুকর নয়, গণৎকার। অন্য আর এক ব্যক্তি বললো, না, গণৎকার নয়, কবি। তবে তার কথায় যাদুর প্রভাব রয়েছে। তাদের এসকল কথা পৌঁছে গেলো রসুল স. এর কানে। তিনি স. মর্মাহত হলেন। মনের দুঃখে বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা মুদ্দাছ্ছির ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○
يٰۤاَيُّهَا الۡمُدَّثِّرُ ۙ﴿۱﴾ قُمۡ فَاَنۡذِرۡ ۪ۙ﴿۲﴾ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرۡ ۪ۙ﴿۳﴾

r হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!

r উঠ, আর সতর্ক কর,

r এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বস্ত্রাচ্ছাদিত পুরুষ! যে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন, সে বস্ত্র পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়ান। নৈরাশ্য পরিহার করে কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে তৎপর হন। আপনি তো আমার রসুল। সুতরাং রেসালাতের অত্যাবশ্যক দায়িত্ব পালনার্থে মানুষকে ওই অবধারিত শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করুন, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য। উল্লেখ্য, এখানে কর্মপদের উল্লেখ নেই। অর্থাৎ কাকে সতর্ক করতে হবে তার কথা এখানে বলা হয়নি। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, এখানে কোনো বিশেষ ব্যক্তি, অথবা বিশেষ দলকে সতর্ক করার কথা বলা হয়নি। বরং 'সতর্ক করো' কথাটির দ্বারা এখানে ভীতি প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে সাধারণভাবে সকল মানুষকে।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি সর্বাবস্থায় ঘোষণা করতে থাকুন আপনার মহিমময় প্রভুপালকের প্রশংসা ও পবিত্রতা। এখানকার 'ফাকাব্বির' (শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো) কথাটির 'ফা' অব্যয়টি পরিণতিপ্রকাশক। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'রব্বাকা' (তোমার প্রভুপালকের) কথাটি একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্মপদ। আর এরপরের 'ফাকাব্বির' কথাটি এর গুরুত্ববোধক। এভাবে বিধানটিকে করা হয়েছে নিত্যবৃত্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন অহরহ, অবিরাম।

www.eelm.weebly.com

‘তাকবীর’ অর্থ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা। তিনি যে অনশ্বর, অক্ষয়, চিরন্তন, সেকথা উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করা। তাঁর একক উপাস্য হওয়ার ধারণার সঙ্গে কাউকে অথবা কোনোকিছুকে সমকক্ষ বা অংশী স্থির না করার প্রতিজ্ঞা করা। তিনিই যে কেবল পরিপূর্ণ, মহান, সকল গুণবত্তাধিকারী, সে কথা প্রকাশ্যে বলা। এমতো ব্যাখ্যার আলোকে বলতে হয়, ‘তাকবীর’ এর উপরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা অত্যাবশ্যক। বরং সকল কাজের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর অন্যথা ক্ষমার অযোগ্য। আর শরিয়ত যদি একে অপরিহার্য না-ও করতো, তবুও সৃষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক ছিলো জ্ঞান-চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে এমতো বিশ্বাসের কাছে উপনীত হওয়া। কিন্তু এভাবে প্রকৃত বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছানো অসম্ভব বলেই শরিয়ত এ সম্পর্কে সকলকে পথপ্রদর্শন করেছে।

বিধান ঃ ফেকাহ্‌ শাস্ত্রবিদগণ এই আয়াতের উপরে ভিত্তি করেই বলেছেন, নামাজের তাকবীরে তাহরীমা (প্রথম তাকবীর ‘আল্লাহু আকবার’) ফরজ। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, ‘আল্লাহু আকবার’ এর বদলে অনুরূপ যে কোনো আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য প্রকাশক শব্দ দ্বারা তাকবীরে তাহরীমা সম্পন্ন করলেও তা যথেষ্ট হবে। যেমন ‘আল্লাহ্‌ আজ্বাল’ ‘আল্লাহ্‌ আ’জামু’ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্‌’ ‘আর রহমানু আকবার’। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, যে ব্যক্তি ‘আল্লাহু আকবার’ উচ্চারণ করতে অক্ষম, কেবল তার জন্যই জায়েয হবে অন্য কোনো সমার্থক বাক্যের মাধ্যমে তাকবীরে তাহরীমা সম্পন্ন করা। অবশ্য তিন জন ইমাম বলেছেন, তাকবীরে তাহরীমা সিদ্ধ হবে ‘আল্লাহু আকবার’ ও ‘আল্লাহুল কাবীর’ দু’টো কথার যে কোনো একটি দ্বারা। আর প্রশংসার ক্ষেত্রে নির্দিষ্টবাচক ‘আলিফ লাম’ সংযোজন করা আলংকারিক রীতিতে শুদ্ধ। আর তাঁর প্রশংসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় ‘আকবারু’ ‘আফ্‌দ্বলু’ ও ‘কারীমু’ শব্দরূপে, যেমন ‘কাবীর’ ‘রহীম’ সমপর্যায়ভূত। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ‘আল্লাহু আকবার’ ছাড়া অন্য কোনো বাক্যের মাধ্যমে তাকবীরে তাহরীমা সম্পাদন করা হলে, তা হবে অশুদ্ধ, মাকরুহে তাহরীমি। আর ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেছেন, কেবল ‘আল্লাহু আকবার’ বলাই সিদ্ধ। অন্য কোনো কিছু তাকবীরে তাহরীমারূপে গণ্য নয়।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, আলোচ্য আয়াত তাকবীরে তাহরীমা সম্পর্কিত নয়। উল্লেখ্য, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে নামাজ ফরজ হওয়ার অনেক আগে। সুতরাং এখানে নামাজের তাকবীরে তাহরীমার কথা আসবে কীভাবে? এর বিপরীতে যদি কেউ যুক্তি দেখায়, নামাজের বাইরে তো তাকবীর পাঠ ওয়াজিব নয়। অথচ কথাটি (রব্বাকা ফা কাব্বির) অনুজ্ঞাজ্ঞাপক, তাহলে আমরা বলবো, নামাজের বাইরেও তাকবীর ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ্‌র অখণ্ড এককত্বের স্বীকৃতিদানের নামই তো তাকবীর। সুতরাং এর আবশ্যিকতা তো রয়েছে নামাজের বাইরে ভিতরে সকল সময়। এতো হচ্ছে ইমান, যা ফরজ স্থায়ীভাবে। সুতরাং স্বীকার করতে হবে নামাজ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ও সাময়িক বিষয়, সার্বক্ষণিক কোনো দায়িত্ব

www.eelm.weebly.com

নয়। আর তাকবীর হচ্ছে সুবিস্তৃত, সামগ্রিক ও নিরবচ্ছিন্ন। তবে কীরূপ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তাকবীর উচ্চারণ করতে হবে, সে কথা কোরআন মজীদের কোথাও স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে এর রূপায়ণ রয়েছে রসুল স. এর মহিমময় জীবনে। সুবিদিত সূত্রে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি স. তাকবীরে তাহরীমার জন্য উচ্চারণ করতেন আল্লাহু আকবার। অন্য কোনো বাক্যদ্বারা তিনি তাকবীরে তাহরীমা সম্পন্ন করেছেন, এরকম কোনো প্রমাণ তাঁর পবিত্র জীবনে নেই। তাই তাঁর সাহাবীগণের জীবনেও এর বিকল্প কোনোকিছু পরিদৃষ্ট হয়নি। বরং বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রেফায়ার হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ওই লোকের নামাজ গ্রহণযোগ্য নয়, যে ওজু করে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ না করে 'আল্লাহু আকবার'।

সূরা মুদ্দাছ্ছির ঃ আয়াত ৪, ৫, ৬, ৭

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝٦
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝٧

- তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ,
- পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়া চল,
- অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না।
- এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! প্রবৃত্তিকে পরিমল রাখুন যাবতীয় পাপাচারণের প্রভাব থেকে। কাতাদা, মুজাহিদ, ইব্রাহিম, জুহাক, শা'বী, জুহুরী ও ইকরামা বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি জবাব দিলেন, এই আয়াতের অর্থ— পাপার্জিত পরিচ্ছদ পরিধান কোরো না। তারপর বললেন, তোমরা কি গইলান ইবনে সালমা সাকাফীর কবিতাটি শোনোনি—

ওয়া ইননী বিহামদিল্লাহি লা ছওবু ফাজ্বিরিন
লাবিসতু ওয়ালা মিন উজরাতিন আত্তাক্বানিউ

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ জন্যে যে, আমি দুষ্কৃতকারীদের মতো পোশাক পরিনি। শরীরেও জড়াইনি কোনো কলুষিত উত্তরীয়।

হজরত উবাই ইবনে কা'বও এরকম বলেছেন। জুহাক বলেছেন, এর অর্থ স্বীয় কর্মাবলী যথাযথভাবে সম্পন্ন করো। সুদ্দী বলেছেন, কথাটির অর্থ পুণ্যকর্ম করো। কেননা পুণ্যশীলগণকে বলা হয় পুতঃপবিত্র পরিচ্ছদধারী, আর দুর্বৃত্তদেরকে বলা হয় অপবিত্র পোশাকধারী। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে 'পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো' অর্থ পবিত্র রাখো নিজের হৃদয় ও আবাসকে।

www.eelm.weebly.com

হাসান বসরী বলেছেন, এর অর্থ চরিত্রবান হও। ইবনে সিরীন ও ইবনে জায়েদ কথাটির অর্থ করেছেন— পরিধেয় বস্ত্রকে পবিত্র রাখো, কেননা অংশীবাদীরা তাদের পরিধেয়কে পবিত্র রাখে না। তাউস অর্থ করেছেন— ভূলুণ্ঠিত হয়, এতো দীর্ঘ পরিধেয় পরিধান কোরো না। পরিধেয় বস্ত্রের এমতো দীর্ঘতা পরিহার করাই পরিচ্ছদ পবিত্র রাখা।

আমি বলি, এখানে যেহেতু স্পষ্ট করে পরিচ্ছদ পবিত্র করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাই বুঝতে হবে, পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখা ফরজ। এর সঙ্গে একথাটিও মান্য করতে হয় যে, শরীরও পবিত্র রাখা ফরজ। কেননা পরিধেয় বসন অপেক্ষা শরীর অধিক মূল্যবান। অর্থাৎ পরিধেয় বসনের অপবিত্রতা যেহেতু আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়, সেহেতু শরীরের অপবিত্রতা তাঁর কাছে আরো বেশী অপছন্দের। এভাবে একথাটিও আর অস্পষ্ট থাকে না যে, হৃদয় পবিত্র রাখা আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। কেননা হৃদয় তো দেহ অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা, আল্লাহ্‌র স্মরণ— এসকলকিছুর সম্পর্ক তো মূলতঃ হৃদয়ের (কলবের) সঙ্গেই। তওবাও প্রধানতঃ কলবের ব্যাপার। আর আল্লাহ্ ভালোবাসেন তওবাকারী ও পবিত্রতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গকেই।

প্রবিধান ঃ ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ এই আয়াতের অধ্যাদেশ থেকে প্রমাণ করেন, নামাজীদের বস্ত্র, দেহ ও তাদের নামাজ পাঠের জায়গা পবিত্র হওয়া ফরজ। আমি বলি, এই আয়াতে কেবল এই তিনটি বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা ঠিক নয়। কেননা বিশ্বাসীগণকে পবিত্রতা রক্ষা করে চলতে হয় সার্বক্ষণিকভাবে। তবে নামাজের সময় এই তিনটি বিষয় বিধানগতভাবেও ফরজ। আর সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যসম্মতও। কিন্তু এ কথাটিও ভুলে গেলে চলবে না যে, বিধানগতভাবে শারীরিক ও পরিচ্ছদিক পবিত্রতা যখন প্রমাণিত, তখন স্বভাবগত পবিত্রতা তো আরো অধিক উত্তম রূপে প্রমাণিত। যেমন ওজুর বিধান সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় এরকম নয় যে, তিনি তোমাদের প্রতি সৃষ্টি করবেন কোনো অসংগতি, বরং তাঁর অভিপ্রায় হচ্ছে তোমাদেরকে পবিত্র করা'। হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসমাইলকে সম্বোধন করে আর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমরা আমার গৃহটিকে পবিত্র রাখো তাওয়াফকারীদের জন্য, ইতেকাফকারীদের জন্য এবং রুকু-সেজদাকারীদের জন্য'।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন একবার আমি এক কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম দু'জন কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। একজনকে প্রস্রাবজনিত অপবিত্রতা থেকে মুক্ত না থাকার কারণে এবং অপরজনকে পরচর্চার জন্য। বোখারী, মুসলিম।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'পৌত্তলিকতা পরিহার করে চলো'। মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা, জুহুরী, ইবনে যায়েদ ও আবু সালমা এখানকার 'রুজ্‌যা' শব্দটির অর্থ করেছেন প্রতিমা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার

www.eelm.weebly.com

রসুল! আপনি আপনার উম্মতসহ প্রতিমা পরিহার করে চলুন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'রুজ্‌যা' অর্থ পাপ। অর্থাৎ পরিহার করে চলুন পাপ। আপনি তো এরকম করেনই, সুতরাং এমতো নির্দেশ দিন আপনার উম্মতকে।

আবুল আলীয়া ও রবী ইবনে আনাস বলেছেন, শব্দটির অর্থ অপবিত্রতা ও পাপ। জুহাক বলেছেন, এর মর্মার্থ— শিরিক। কালাবী অর্থ করেছেন— শাস্তি। অর্থাৎ আপনি মানুষকে এমন বিশ্বাস ও কর্ম পরিহার করতে বলুন, যা অনিবার্য করে শাস্তিকে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান কোরো না'। অধিকাংশ ব্যাখ্যাতা আয়াতখানির অনুবাদ এভাবেই করেছেন। কাতাদা অর্থ করেছেন— পার্থিব বিনিময় প্রত্যাশী হয়ে কাউকে কিছু দিয়ো না। দিয়ো কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষ অর্জনের আশায়।

বলা হয়, এই নিষিদ্ধতাটি মাকরুহে তানযিহী, বাধ্যতামূলক নয়। জুহাক ও মুজাহিদ মন্তব্য করেছেন, প্রবিধানটি বাধ্যতামূলক ছিলো কেবল রসুল স. এর বেলায়। জুহাক এমনও বলেছেন, সুদ দুই প্রকার। তার মধ্যে একটি হালাল— যেমন, হাদিয়া, উপঢৌকন, উপহার। হারাম প্রকারটি হচ্ছে প্রচলিত সুদ। হাসান বসরী কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— স্বীয় পুণ্যকর্মকে অধিক মনে করে আল্লাহ্‌র কাছে বিনিময় প্রত্যাশী হয়ো না। তিনি আরো বলেছেন, নিজের সুকর্মকে অধিক মনে কোরো না। আল্লাহ্ কর্তৃক যে অনুগ্রহরাশি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তার বিপরীতে সেগুলো তো সামান্যই। খসীফ বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, 'মাযীন' অর্থ দুর্বল। মর্মার্থ— অধিক কল্যাণ অন্বেষায় দুর্বল হয়ো না। ইবনে জায়েদ অর্থ করেছেন— নবী-রসুলগণের নিকটে পার্থিব প্রত্যুপকার প্রত্যাশী হয়ো না। কথাটির অর্থ এভাবেও করা হয়েছে যে— অভাবীকে কিছু সম্প্রদান করে তার কাছে প্রত্যুপকার প্রত্যাশা কোরো না।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করো'। একথার অর্থ— ধৈর্য ধারণ করো আল্লাহ্‌পাকের পরিতোষ ও পুণ্যের অন্বেষায় তাঁর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা পালনে ও বিপদাপদে। বাক্যটির মূলরূপ ছিলো এরকম 'ওয়াস্‌বির লিরব্বিকা ফাস্‌বির' (পালনকর্তার উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর্তব্য)। এভাবে 'সবর' (ধৈর্য) কথাটির পুনরাবৃত্তি ধৈর্য ধারণের দায়িত্বটিকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। অথবা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণের মহিমা প্রকাশার্থে করা হয়েছে 'ধৈর্য' কথাটির এমতো পুনরাবৃত্তি। মুজাহিদ কথাটির অর্থ করেছেন— সব ধরনের দুঃখ-ক্লেশে ধৈর্য ধারণ করো। ইবনে জায়েদ অর্থ করেছেন— দায়িত্ব এসেছে আরব-অনারব সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার। এই জেহাদে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করো। অথবা কথাটির অর্থ হতে পারে— নিয়তির বিধানকে সহিষ্ণুতার সঙ্গে মেনে নাও।

www.eelm.weebly.com

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾

- যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে
- সেই দিন হইবে এক সংকটের দিন—
- যাহা কাফিরদের জন্য সহজ নহে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে'। এখানকার 'নাক্বুর' শব্দটির অর্থ শিঙ্গা। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'নাক্বার' থেকে। আর 'নুক্বিরা' অর্থ ফুৎকারধ্বনি। শাব্দিক অর্থ— কোনো বস্তুকে এমনভাবে আঘাত করা, যাতে তাতে তৈরী হয় ছিদ্র। একারণেই পাখির চঞ্চুকে বলে 'মিনক্বার' যেহেতু পাখি তার চঞ্চু দ্বারা ঠুকরে ঠুকরে ছিদ্র করে বৃক্ষশাখা, অথবা বৃক্ষের পত্রপল্লব। সিহাহ্, জাওহারী। আবু শায়েখ ইবনে হাব্বান তার 'আল উজমা' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, আল্লাহ্পাক মুক্তা অপেক্ষা অধিক শুভ্র পাথর থেকে সৃষ্টি করেছেন শুভ্রোজ্জ্বল শিঙ্গা। তারপর আরশকে বললেন, গ্রহণ করো। আরশ গ্রহণ করলো। শিঙ্গা লটকিয়ে রাখা হলো আরশে। এরপর আল্লাহ্পাক আজ্ঞা করলেন, হও। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হলো ফেরেশতা ইসরাফিল। তাকে বললেন, গ্রহণ করো। ইসরাফিল শিঙ্গাটি গ্রহণ করলেন। সে শিঙ্গাগাত্রে ছিদ্র করা হলো ততোগুলো, যতোগুলো সৃষ্টি আছে তাঁর। আর শিঙ্গাটির মাঝখানে করা হলো আকাশ-পৃথিবীর পরিধিতুল্য একটি সুবিশাল ছিদ্র। ওই ছিদ্রমুখে মুখ দিয়ে ইসরাফিল দণ্ডায়মান হলো। আল্লাহ্পাক বললেন, আমি তোমাকে দায়িত্ব দিলাম যথাসময়ে ত্রাসসঞ্চারক ও জীবন সংহারক ফুৎকার ধ্বনি দানের। এমতো নির্দেশ পেয়ে ইসরাফিল উপস্থিত হলো আরশের পুরোভাগে। এক পা আরশের এলাকায় রেখে অপর পা বাড়িয়ে দিলো আরশের সীমানার বাইরে। এভাবে সে এখনো ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আল্লাহ্পাকের আদেশের প্রতীক্ষায়।

সুদৃঢ় সূত্রসহযোগে হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম থেকে আহমদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, কী করে আমি স্বস্তিলাভ করতে পারি? শিঙ্গাধারী যে নির্দেশের অপেক্ষায় সতত উৎকর্ণ। কখন আসে আদেশ। সাহাবীগণ একথা শুনে খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, আল্লাহ্র রসুলই যদি স্বস্তি না পান, তবে আমরা স্বস্তি পাবো কীভাবে? তিনি স. বললেন, তোমরা পাঠ কোরো 'হাসবুনাল্লহা ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' (আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর তিনি উত্তম মুখপাত্র)। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম আহমদ ও হাকেমও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় দোয়াটির সঙ্গে অতিরিক্ত রয়েছে এই কথাটুকু 'আলাল্লহি তাওয়াক্কালনা'।

www.eelm.weebly.com

এখানকার 'ফা ইজা নুক্বিরা' বাক্যের 'ফা' অব্যয়টি নৈমিত্তিক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! অবিশ্বাসীদের অপমন্তব্য শুনে ধৈর্য ধারণ করুন। তারা তো শাস্তিগ্রস্ত হবেই। আর আপনার ধৈর্য ধারণ আপনার জন্য বয়ে আনবে সুফল।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেদিন হবে এক সংকটের দিন— (৯) যা কাফেরদের জন্য সহজ নয়' (১০)। একথার অর্থ— সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা কিয়ামতের ভয়াবহ দিবসে, পুনরুত্থানের সময় ও বিচারানুষ্ঠানকালে পড়বে মহাসংকটে। পরিত্রাণের কোনো উপায়ই তখন তাদের থাকবে না। এখানে 'জালিকা' (সেই) কথাটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে শিঙ্গার ফুৎকার ধ্বনির প্রতি। এখানে 'জালিকা' উদ্দেশ্য এবং 'ইয়াওমুন আ'সীর' (সংকটের দিন) বিধেয় এবং এর অনুবর্তী হচ্ছে 'ইয়াওমাইজিন'। আর 'গইরু ইয়াসীর' অর্থ সহজ নয়। কথাটি পূর্বের 'আ'সীর' শব্দের গুরুত্ববর্ধক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তি সেদিন এতটুকুও লাঘব করা হবে না। অথচ বিশ্বাসীগণের জন্য সেইদিন হবে শুভ ও সহজ।

বাগবী লিখেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'হা মীম তানযীলুন কিতাবি মিনাল্লহি.......ইলাইহিল মাসীর' তখন রসুল স. তা কুরায়েশ জনতার সামনে পাঠ করে শোনালেন। ওলীদ ইবনে মুগীরাও উপস্থিত ছিলো সেখানে। সে আল্লাহ্‌র কালাম শুনে মুগ্ধ হলো। তার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে গিয়ে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আজ আমি মোহাম্মদের মুখে এমন বাণী শুনলাম, যা কোনো মানুষ অথবা জ্বিনের বাণী নয়। সে বাণী এতো হৃদয়স্পর্শী, যেনো তা ফুল-ফল ভারাবনত কোনো অবাক বৃক্ষ। তার বিজয় সুনিশ্চিত। সে কখনো পরাভব মানতেই পারে না। একথা বলেই সে স্থানত্যাগ করলো। চলে গেলো তার বাড়িতে। লোকেরা বলাবলি করতে শুরু করলো, ওলীদ ধর্মান্তরিত হয়েছে। এখন কুরায়েশরাও সকলে ধর্মান্তরিত হবে। উল্লেখ্য, লোকেরা তাকে উপাধি দিয়েছিলো কুরায়েশ-সৌরভ। আবু জেহেল চিন্তিত হয়ে পড়লো। সে তার বাড়িতে গিয়ে বললো, হে পিতৃব্য! আমি তোমার দুঃখে দুখী। একথা বলেই সে ওলীদের পাশে বসে পড়লো। ওলীদ বললো, ভ্রাতুষ্পুত্র! কী বলতে চাও তুমি? মনে হচ্ছে তুমি খুব মুষড়ে পড়েছো। আবু জেহেল বললো, মুষড়ে পড়বো না কেনো? আপনি একাধারে বয়োপ্রবীণ ও জ্ঞানপ্রবীণ। অথচ লোকেরা আপনার নামে বদনাম ছড়াচ্ছে। আপনি নাকি মোহাম্মদের বাণীকে পরীক্ষা করে সত্য বলে রায় দিয়েছেন। আর উচ্ছিষ্ট ভোজনের জন্য আপনি নাকি ইবনে কাছীর ও ইবনে আবু কোহাফার কাছে যাতায়াত করেন। একথা শুনে ওলীদ রেগে গেলো খুব। বললো, কী! তাদের এতো বড় সাহস! কী বলতে চায় তারা। আমি সকলের চেয়ে অধিক বিত্তশালী ও অধিক সন্তানের জনক। আর মোহাম্মদ ও তার সঙ্গী-সাথীরা তো আধপেটা খেয়ে জীবন কাটায়। তাদের আবার উচ্ছিষ্ট থাকবে কোত্থেকে? এরপর সে আবু

www.eelm.weebly.com

জেহেলকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলো কুরায়েশদের এক সমাবেশে। বললো, তোমরা কী মনে করো? মোহাম্মদ কি উন্মাদ? তোমরা কি তাকে কখনো কোনো অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে শুনেছো? লোকেরা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তো তাকে অবান্তর কথাবার্তা বলতে কখনোই শুনিনি। ওলীদ বললো, তাহলে তোমরা কি ধারণা করো, সে গণৎকার? বলো, তাকে কি তোমরা কোনোদিন গণৎকারের মতো ভবিষ্যদ্বাণী করতে দেখেছো? লোকেরা বললো, আল্লাহ্‌ সাক্ষী, আমরা কখনোই তাকে এরকম করতে দেখিনি। ওলীদ বললো, তোমরা তো তাকে কবিও বলো। বলো দেখি, তোমরা কি তাকে কখনো কবিতার আসরে বসতে দেখেছো? লোকেরা বললো, না। ওলীদ বললো, কেউ কেউ তো আবার বলো, সে মিথ্যাবাদী। সে কখনো মিথ্যা কথা বলেছে, এরকম কোনো প্রমাণ কি তোমাদের হাতে আছে? তারা বললো, আল্লাহ্‌র দিব্যি! মিথ্যার সঙ্গে কোনো সংস্রবই তো তার নেই। আমরা তো তাকে 'আলআমীন' বলে ডাকি। এরকম বলার পর লোকেরা প্রশ্ন করে বসলো, তাহলে আপনিই বলুন, সে আসলে কী? ওলীদ চিন্তায় পড়ে গেলো। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থাকার পর বিদ্রূপের স্বরে বললো, কী আবার? যাদুকর। দেখতে পাও না, তার কথা কেমন যাদুর মতো প্রভাব বিস্তার করে। সে-ই তো আমাদের লোকালয়ে শুরু করেছে অনাসৃষ্টি। বিরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নির মধ্যে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বিবরণটি উপস্থাপন করেছেন হাকেম এবং তিনি বিবরণটিকে প্রত্যয়নও করেছেন। বাগবী লিখেছেন, পরবর্তী আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এই ঘটনাটিকে লক্ষ্য করে। বিবরণটি অপর এক সূত্র সহযোগে বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম।

সূরা মুদ্‌দাছ্‌ছির ঃ আয়াত ১১—২৫

ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ﴿١١﴾ وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ﴿١٢﴾
وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ﴿١٣﴾ وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ
اَزِيْدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ﴿١٦﴾ سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ﴿١٧﴾
اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾
ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ
اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾

www.eelm.weebly.com

q ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং যাহাকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি একাকী।
q আমি তাহাকে দিয়াছি বিপুল ধন-সম্পদ
q এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ,
q এবং তাহাকে দিয়াছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ—
q ইহার পরও সে কামনা করে যে, আমি তাহাকে আরও অধিক দেই।
q না, তাহা হইবে না, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী।
q আমি অচিরেই তাহাকে চড়াইব শাস্তির পাহাড়ে।
q সে তো চিন্তা করিল এবং সিদ্ধান্ত করিল।
q অভিশপ্ত হউক সে! কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্ত করিল!
q আরও অভিশপ্ত হউক সে! কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল!
q সে আবার চাহিয়া দেখিল।
q অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল ও মুখ বিকৃত করিল।
q অতঃপর সে পিছন ফিরিল এবং দম্ভ প্রকাশ করিল।
q এবং ঘোষণা করিল, 'ইহা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নহে,
q 'ইহা তো মানুষেরই কথা।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! দুরাচারশ্রেষ্ঠ ওলীদের বিষয়টি আপনি আমার উপরে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। আমিই তাকে শায়েস্তা করবো। তার স্রষ্টা তো আমিই। সুতরাং তাকে শাস্তিদান আমারই অধিকার ও দায়িত্বভূত।

এখানকার 'ওয়াও' অব্যয়টি সঙ্গতার্থক। অর্থাৎ তাকে ছেড়ে দিন আমার হাতে। যা করবার আমিই করবো। আর 'আমি সৃষ্টি করেছি একাকী' অর্থ অন্য সকলের এবং সকলকিছুর মতো তার সৃষ্টি কর্মেও আমার সঙ্গে কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই। অথবা— আমি তাকে সৃষ্টি করেছিলাম বিত্তহীন-সন্তানহীনভাবে, তখন তো কেউ ছিলো না তার সঙ্গে। কিংবা আমিই তাকে সৃষ্টি করেছি দুষ্টমতি সহকারে। 'ওয়াহীদা' অর্থ এখানে— পিতৃপরিচয় শূন্য। অর্থাৎ ওলীদ ছিলো অবৈধ সন্তান। বাগবী লিখেছেন, ওলীদ তার সমাজে পরিচিত ছিলো 'ওয়াহীদা' হিসেবে। আল্লাহ্পাকও উপহাসচ্ছলে এখানে তাকে বলেছেন 'ওয়াহীদা'।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ'। এখানে 'মামদুদ' অর্থ বিপুল, প্রচুর। ওলীদ ছিলো বিপুল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী। কৃষিক্ষেত, পশুচারণ ভূমি, বাণিজ্য— সবকিছুই ছিলো তার। মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, তার সঙ্গে সব সময় থাকতো এক হাজার দীনার। কাতাদা বলেছেন, চার হাজার দীনার। সুফিয়ান বলেছেন, হাজার হাজার দীনার। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নয় হাজার মিছক্বাল রৌপ্য। মুকাতিল

www.eelm.weebly.com

বলেছেন, তায়েফে ছিলো তার এমন একটি বাগান, যার ফল কখনো নিঃশেষ হতো না। শীত-গ্রীষ্ম কোনো মওসুমেই নয়। হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্য উল্লেখ করে আতা বলেছেন, মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী এলাকায় চরে বেড়াতো তার বহুসংখ্যক উট, ঘোড়া ও ছাগল। পানির উৎস ও দাস-দাসীও ছিলো তার অনেক।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ'। ওলীদ ছিলো দশজন সন্তানের গর্বিত পিতা। মুকাতিল বলেছেন, তার সন্তান ছিলো সাতজন— ওলীদ ইবনে ওলীদ, খালেদ, আম্মারা, হিশাম, আস, কায়েস ও আবদে শামস্। মক্কাতেই বসবাস করতো তারা। তাই এখানে বলা হয়েছে 'নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ'। অর্থাৎ পুত্ররা তার কাছেই থাকতো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। ফলে ওলীদকে কখনো বাণিজ্যব্যপদেশে বিদেশ ভ্রমণ করতে হতো না। তার সন্তানদের মধ্যে মুসলমান হয়েছিলেন তিনজন— মান্যবর হিশাম, আম্মারা ও খালেদ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ— (১৪) এর পরেও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরো অধিক দেই' (১৫)। একথার অর্থ— আমি তাকে দিয়েছি কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব-খ্যাতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি। সুদীর্ঘ আয়ুষ্কালও দিয়েছি তাকে। 'কুরায়েশ-সৌরভ' বলে লোকেরা তাকে সমীহও করে। তৎসত্ত্বেও সে পরিতৃপ্ত নয়। দিন দিন বেড়েই চলেছে তার লালসার আগুন।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'না, তা হবে না, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী'। এখানকার 'কাল্লা' হচ্ছে রোধক অব্যয়। অর্থ— না, তা হবে না। অর্থাৎ সে চূড়ান্ত পর্যায়ের অকৃতজ্ঞ। তাই আমি তার লালসার আগুনে আর ইন্ধন যোগাবো না। এখন থেকে শুরু হলো তার পতনের পালা। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকেই তার অর্থ-খ্যাতি-প্রতিপত্তি ক্রমশ ক্ষয় হতে থাকে। এমতো ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা দেখেই শেষপর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয় তাকে। 'সে তো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী' অর্থ সে আমা কর্তৃক অবতারিত প্রত্যাদেশ ও আমার প্রত্যাদেশবাহককে অবজ্ঞা করেছে। তার এমতো ঔদ্ধত্য ক্ষমার অযোগ্য। তার ক্ষয়-ক্ষতি-অপপরিণতি অনিবার্য। সে যা চায়, তা আর কখনোই হবে না।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'আমি অচিরেই তাকে চড়াবো শাস্তির পাহাড়ে'। এখানে 'সঊ'দা' অর্থ শাস্তির পাহাড়, সর্বোচ্চ শাস্তি।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন 'সঊ'দা' হচ্ছে জাহান্নামের একটি উপত্যকা। ওলীদকে ওই পাহাড়ে চড়তে বলা হবে। কিন্তু সে যখনই পাহাড়ের গায়ে হাত রাখবে, তখনই অত্যুত্তাপের প্রতিক্রিয়ায় গলে যাবে তার হাত। পা রাখতে গেলেও ঘটবে একই বিপত্তি। বাগবী। হজরত ওমর সূত্রেও

www.eelm.weebly.com

হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে বাগবী কর্তৃক। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান ও হাকেম। হাকেম বর্ণনাটিকে প্রত্যয়নও করেছেন। হজরত আবু সাঈদ খুদরীর আর এক বর্ণনায় এসেছে রসুল স. বলেছেন 'সঊ'দ' হচ্ছে নরকাভ্যন্তরের একটি পাহাড়। সত্তর বছর ধরে চেষ্টার পর তার চূড়ায় অতি কষ্টে আরোহণ করতে সমর্থ হবে ওলীদ। এভাবে অনুবর্তন হতেই থাকবে তার ওঠা-নামার। কালাবী বলেছেন 'সঊ'দ' হচ্ছে দোজখের তেলতেলে পিচ্ছিল শৈলশৃঙ্গ। ওলীদকে আরোহণ করতে বলা হবে তার উপর। লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাকে উঠতে বাধ্য করা হবে তার চূড়ায়। তারপর সেখান থেকে ফেলে দেওয়া হবে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে পেটাতে পেটাতে। তার প্রতি আরোহণে সময় লাগবে চল্লিশ বৎসর। আর তার এমতো ওঠানামা চলতেই থাকবে অনন্তকাল ধরে।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'সে তো চিন্তা করলো এবং সিদ্ধান্ত করলো'। একথার অর্থ— সে কোরআন ও কোরআনের বাহকের বিরুদ্ধে যুৎসই কথা বলার জন্য অনেক চিন্তা-ভাবনা করে, গবেষণা করে, বুদ্ধি খাটায় এবং এ ব্যাপারে তার অনুচরদেরকে অশুভ সিদ্ধান্ত দেওয়ার অপচেষ্টা থেকেও ক্ষান্ত হয় না। আলোচ্য বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে ওলীদের বিরুদ্ধাচরণ ও তার সুকঠিন শাস্তিভোগ অবধারিত হওয়ার কারণ। অর্থাৎ মাথা খাটিয়ে বিরোধিতার কৌশল আবিষ্কার করা এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে অপপরামর্শ দেওয়ার কারণেই তাকে সেদিন উঠতে বাধ্য করা হবে ওই অতিভয়ংকর শাস্তির পাহাড়ে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্ত করলো (১৯)! আরো অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো' (২০)। এখানকার 'কাইফা' (কেমন করে) কথাটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও বিস্ময়সূচক অব্যয়। ওলীদের অপকর্মের প্রতি এভাবেই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে ভর্ৎসনা ও বিস্ময়। আর এখানকার শেষোক্ত বাক্যটি প্রথমোক্তটির গুরুত্ববর্ধক। আর 'ছুম্‌মা' (অতঃপর) এখানে ক্রিয়ার ক্রম।

এরপরের আয়াত পঞ্চকের (২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫) মর্মার্থ হচ্ছে— ওলীদ বহু চিন্তা-গবেষণা করেও যখন রসুল স.কে প্রতিহত করার যুৎসই কোনো যুক্তি খুঁজে পেলো না, তখন সে রসুল স. এর প্রতি কিছুক্ষণ কেবল রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো, ঘৃণায় ভ্রূকুঞ্চিত করলো, ক্ষোভে বিকৃত করলো মুখের আদল, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলো দম্ভভরে এবং বললো, শোনো হে জনতা! এ লোক কিন্তু যাদুকর। তার কথায় রয়েছে যাদুর প্রভাব, যা সে অবশ্যই শিখেছে কারো না কারো কাছ থেকে। আর সে আল্লাহ্‌র কথা বলে যা কিছু তোমাদেরকে পাঠ করে শোনায়, তা আল্লাহ্‌র কথা নয়, তা তার নিজের, অথবা অন্য কোনো মানুষের রচনা।

এখানকার 'নাজারা' (চেয়ে দেখলো) কথাটির যোগ রয়েছে আগের আয়াতের (১৮) 'চিন্তা করলো' ও 'সিদ্ধান্ত করলো' কথাদু'টোর সঙ্গে। অর্থাৎ সে যখন চিন্তা-গবেষণা করেও কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলো না, তখন রসুল স.

www.eelm.weebly.com

এর দিকে চেয়ে রইলো নিষ্ফল আক্রোশে। তারপর ব্যর্থতার গ্লানি ঢাকতে ভ্রূ বাঁকিয়ে, মুখ ভেঙচিয়ে দম্ভভরে ফিরিয়ে নিলো মুখ। আর এখানকার 'এটা তো মানুষের কথা' বাক্যটি বেগবান করেছে আগের বাক্যের 'এটা তো লোকপরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়' কথাটিকে। সেকারণেই এ বাক্যটির আগে কোনো সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয়নি।

সূরা মুদ্দাছ্ছির ঃ আয়াত ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾
لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

r আমি তাহাকে নিক্ষেপ করিব সাকার-এ,

r তুমি কি জান সাকার কী?

r উহা উহাদিগকে জীবিতাবস্থায় রাখিবে না এবং মৃত অবস্থায়ও ছাড়িয়া দিবে না।

r ইহা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করিবে,

r সাকার-এর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে উনিশজন প্রহরী।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! অবাধ্যশ্রেষ্ঠ ওলীদের কী পরিণতি হবে তা শুনুন। আমি তাকে নিক্ষেপ করবো সাকারের অভ্যন্তরে। আপনি কি জানেন সাকার কী? সাকার হচ্ছে এমন এক দোজখ, যা কাউকে পেলে তাকে জীবিত যেমন রাখবে না, তেমনি মরতেও দিবে না চিরতরে। তার অধিবাসীরা জ্বলে পুড়ে ভস্ম হওয়ার পর পুনরায় জীবিত হবে, তারপর পুনরায় হবে ভস্মীভূত। এভাবে অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে তার জীবন-মরণ শাস্তি। উল্লেখ্য, সকলকিছুর পরাক্রম-প্রতাপ এক সময় স্তিমিত হয়ে আসবে, কিন্তু 'সাকার' এর দাপট কখনো কমবে না। উল্লেখ্য 'তুমি কি জানো সাকার কী' এই প্রশ্নটি এখানে 'সাকার' এর ভয়াবহতার অবস্থাপ্রকাশক।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'এটা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে'। একথার অর্থ— সাকারের ভয়াবহ আগুন পুড়িয়ে ফেলবে গায়ের চামড়া। ফলে তার অধিবাসীদের শুভ্র গাত্রত্বক হয়ে যাবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত জায়েদ ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'সাকার' হবে গাত্রচর্ম দগ্ধকারী। আবার 'লাওওয়াহা' কথাটির অর্থ করা হয়েছে— উদয় হওয়া, প্রকাশ পাওয়া। অর্থাৎ সাকার উদয় হবে মানুষের দৃষ্টিপথে। হাসান ও ইবনে কীসান বলেছেন, যার দৃষ্টিপথে 'সাকার' এর অভ্যুদয় ঘটবে, সে-ই সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার অভ্যন্তরে। যেমন বলা হয়েছে পথভ্রষ্টদের সম্মুখে দোজখ প্রকাশিত হবে'।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'সাকার এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে ঊনিশ জন প্রহরী'। একথার অর্থ— সাকার নামক নরক পাহারা দিয়ে রাখবে ঊনিশ জন ফেরেশতা। অর্থাৎ প্রধান প্রহরী মালেক ফেরেশতার অধীনে আরো আঠারো জনের তত্ত্বাবধানে থাকবে সাকার নরক। আবুল আওয়ামের বক্তব্য উদ্ধৃত করে ইবনে মোবারক এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই প্রহরীদের স্কন্ধদেশ দৈর্ঘ্য-প্রস্থে হবে এতো এতো। জায়েদ ইবনে আসলাম সূত্রে ইবনে ওয়াহাব বলেছেন, রসুল স. বলেছেন, তাদের প্রত্যেকের দুই কাঁধের ব্যবধান হবে এক মাসের পথের দূরত্বের সমান। তারা হবে দয়ামায়াশূন্য। তারা ইচ্ছে করলে প্রত্যেকে একাই সত্তর হাজার দোজখীকে উত্তোলন করে নিক্ষেপ করতে পারবে দোজখের যে কোনো স্থানে।

হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও জুহাক সূত্রে বাগবী এবং ইবনে ইসহাক সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আবু জেহেল অংশীবাদীদেরকে একত্র করে বললো, কী হে, তোমাদের জন্য তোমাদের মা কেঁদে মরুক। তোমরা কি এতোই কাপুরুষ যে, দশ জনে মিলেও একজন প্রহরী ফেরেশতাকে ধরাশায়ী করতে পারবে না? ইবনে কাবশা যে বলছে, দোজখের দৌবারিক মাত্র ঊনিশ জন। আর তোমরা তো শুনি, এক এক জন জবরদস্ত পালোয়ান। আবুল আসওয়াদ ইবনে কেলাদা জামুহী বলে উঠলো, ঊনিশ জনের মধ্যে সতের জনকে তোমরা আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমি একাই তাদের জন্য যথেষ্ট। দশ জনকে বেঁধে নিবো পিঠে এবং বাকী সাতজনকে পেটে। ব্যস! জঙ্গখতম। তোমাদের ভাগে তো রইলো মাত্র দু'জন। তার এমতো গর্হিত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। সুদ্দীর বরাত দিয়ে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, যখন 'সাকার তত্ত্বাবধানে রয়েছে ঊনিশজন প্রহরী' এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন জোড়া বাঘের জনক বুক টান টান করে বললো, মাত্র ঊনিশ জন প্রহরীর ভয়ে ভীত হওয়ার কোনো কারণই তো দেখি না আমি। আরে আমি তো একাই ডান কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে পারবো তাদের দশ জনকে। বাকী নয় জনকে ফেলে দিবো বাম ঘাড় দিয়ে ধাক্কা মেরে। তার এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত—

সূরা মুদ্দাছ্ছির ঃ আয়াত ৩১

وَ مَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّ مَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ يَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّ لَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَ لِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ

www.eelm.weebly.com

وَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ مَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ؕ وَ مَا هِىَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ﴿۳۱﴾

r আমি ফিরিশ্তাদিগকে করিয়াছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি উহাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছি যাহাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। ইহার ফলে, যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা ও কাফিররা বলিবে, 'আল্লাহ্ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন'? এইভাবে আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্নামের এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধান বাণী।

সাকার এর তত্ত্বাবধানকারী ফেরেশতাদের সংখ্যা উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এর কারণ হচ্ছে চারটি— ১. অবিশ্বাসীরা যেনো পরীক্ষায় নিপতিত হয়। এই আয়াতকে অস্বীকার করে হয়ে যায় আরো অধিক শাস্তির উপযোগী। ২. কিতাবীরা (ইহুদী-খৃষ্টানেরা) যাতে বুঝতে পারে কোরআন সত্য, কেননা তাদের কিতাব তওরাত ও ইঞ্জিলেও প্রহরী ফেরেশতাদের এমতো বিবরণ বিদ্যমান। ৩. যারা বিশ্বাসী, তাদের বিশ্বাস যেনো হয় অধিকতর বর্ধিত— ইতোপূর্বে অবতারিত আয়াতগুলোর সঙ্গে সদ্য অবতীর্ণ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণে। ৪. বিশ্বাসী ও কিতাবীরা যেনো সন্দেহবিমুক্ত থাকতে পারে এই ভেবে যে, এ ব্যাপারে তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের সাক্ষ্য এক। এই কারণগুলিই আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— 'আমি ফেরেশতাদেরকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফেরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি, যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয়, এবং বিশ্বাসী ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে'। উল্লেখ্য, এখানকার 'যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে' বাক্যটির যোগসূত্র রয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সাথে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আমি দোজখের প্রহরীদের সংখ্যা উল্লেখ করলাম একারণে, আপনার রেসালত ও আপনার উপরে অবতীর্ণ কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে যেনো কিতাবীরা জানতে পারে এবং হতে পারে আপনার ধর্মমতের উপরে একনিষ্ঠ বিশ্বাসী, কেননা প্রহরী ফেরেশতাদের এমতো সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তওরাত এবং ইঞ্জিলেও।

'ওয়া লা ইয়ারতাবাল্ লাজীনা উতুল কিতাবা ওয়াল মু'মিনূন' অর্থ এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। এখানে যোজক অব্যয় 'ওয়াও' (এবং) ব্যবহৃত হয়েছে বিশ্লেষণাত্মক যোজক হিসেবে। আর এখানে সন্দেহ পোষণ না করার অর্থ হচ্ছে, প্রহরী ফেরেশতাদের সংখ্যার উপর সন্দেহ পোষণ না করা।

www.eelm.weebly.com

অর্থাৎ সংখ্যাস্বল্পতার কারণে এরকম মনে না করা যে, মাত্র এই কয়েকজন ফেরেশতা আর কী করতে পারবে। আমরা তো তাদের চেয়ে শক্তিমান। অথবা— মাত্র কয়েকজন ফেরেশতার মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক মানুষকে শাস্তি দেওয়া আবার সম্ভব নাকি?

ইবনে আবী হাতেম এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, ইহুদীদের একটি দল একবার সাহাবীগণের নিকটে জানতে চাইলো, নরকের তত্ত্বাবধানকারী ফেরেশতাদের সংখ্যা কতো। সাহাবীগণ তখন রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে। তখন অবতীর্ণ হলো 'সাকার এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে ঊনিশজন প্রহরী'। এই আয়াত শুনে যুগপৎ বৃদ্ধি পেয়েছিলো কিতাবী ও বিশ্বাসীগণের ইমান।

এরপর বলা হয়েছে— 'এর ফলে, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা ও কাফেরেরা বলবে, আল্লাহ্ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কী বুঝাতে চেয়েছেন'? এখানে 'মারাদ্ব' অর্থ অন্তরের ব্যাধি, কপটতা। 'যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে' অর্থ যারা কপট, মুনাফিক। উল্লেখ্য, আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কায়। সেখানে কোনো মুনাফিক ছিলো না। রসুল স.কে মুনাফিকদের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো তাঁর হিজরতের পরে, মদীনায়। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য বাক্যটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা মনে করেছিলো মাত্র ঊনিশজন প্রহরী দ্বারা দোজখের তত্ত্বাবধান করার সংবাদটি অদ্ভুত কোনো উপমা নয়। এই উপমাটির দ্বারা আল্লাহ্ হয়তো বুঝাতে চেয়েছেন ভিন্নতর কোনো বিষয়। 'আল্লাহ্ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কী বুঝাতে চেয়েছেন' বলেছিলো তারা সেকারণেই। বলা বাহুল্য, তাদের এমতো প্রশ্ন কৌতূহলনিবারক ছিলো না, ছিলো সন্দেহমূলক, যা আল্লাহ্র বাণীর প্রতি ঘোরতর অস্বীকৃতিই, অন্য কিছু নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ ভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন'। এখানকার 'কাজালিকা' (এভাবে) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের সাথে। অর্থাৎ নরকের তত্ত্বাবধানকারী ফেরেশতাদের সংখ্যা নির্দেশ করে তিনি কাউকে করেন পথভ্রষ্ট এবং কাউকে পথপ্রাপ্ত। এভাবেই তিনি বাস্তবায়ন করেন তাঁর অভিপ্রায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন'। একথার অর্থ— ফেরেশতা কেবল ঊনিশজন নয়। ফেরেশতা তো আরো অনেক, অজস্র, অসংখ্য— যার পরিসংখ্যান সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই অবগত নয়। আর তাদের শক্তিমত্তা পরিমাপ করবার সামর্থ্যও কারো নেই। উল্লেখ্য, ঊনিশ জন ফেরেশতা সম্পর্কে যখন আবু জেহেল তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শুরু করেছিলো, তখনই অবতীর্ণ হয়েছিলো আলোচ্য বাক্য। আতা বাক্যটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্পাক যে কতো ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, তার সঠিক পরিসংখ্যান তিনি ব্যতীত অন্য কেউই অবহিত নয়। অর্থাৎ

www.eelm.weebly.com

নরকের তত্ত্বাবধানকারী ফেরেশতা তো কেবল উনিশ জন। কিন্তু তাদের সহকারী ফেরেশতাদের সংখ্যা যে কতো, তা কি কেউ জানে? নিশ্চয় জানে না। কা'বের উদ্ধৃতি দিয়ে হান্নাদ বলেছেন, যাকে দোজখে নিয়ে যেতে বলা হবে, তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হবে এক লক্ষ ফেরেশতা। একারণেই কুরতুবী বলেছেন, ওই উনিশজন ফেরেশতা হচ্ছে ফেরেশতাদের দলপতি। তাদের অধীনস্থ ফেরেশতারা ছাড়া দোজখে আরো যে কতো ফেরেশতা দায়িত্ব পালন করবে, তার সংখ্যা আল্লাহ্পাক ছাড়া আর কেউ জানে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'জাহান্নামের এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধান বাণী'। একথার অর্থ— নরক, নরকের ফেরেশতা, অথবা নরকের বিবরণসম্বলিত এই সুরা, এই আয়াত, কিংবা এধরনের অন্যান্য আয়াত ও সুরাগুলি মানুষের জন্য সতর্কবাণী। যারা সতর্ক হবার, তারা এ সকল বিবরণ শুনে সতর্ক হয়ে যায়। যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করে নরক থেকে আত্মরক্ষা করতে।

সূরা মুদ্দাছ্ছির ঃ আয়াত ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾
إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن
يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

r কখনই না, চন্দ্রের শপথ,

r শপথ রাত্রির, যখন উহার অবসান ঘটে,

r শপথ প্রভাতকালের, যখন উহা হয় আলোকোজ্জ্বল—

r এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম,

r মানুষের জন্য সতর্ককারী—

r তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হইতে চাহে কিংবা যে পিছাইয়া পড়িতে চাহে তাহার জন্য।

r প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ,

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কাল্লা' (কখনোই না)। কথাটির দ্বারা ব্যতিক্রম করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। অর্থাৎ নরকের এমতো বিবরণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সাবধানবাণী নয়। এ সকল কথা তাদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না, কেননা এ গুলোকে তারা বিশ্বাসই করে না, অথচ এগুলো হচ্ছে সার্বজনীন উপদেশমালা।

এরপর বলা হয়েছে— 'চন্দ্রের শপথ (৩২), শপথ রাত্রির, যখন তার অবসান ঘটে (৩৩), এখানে 'ওয়াল ক্বমার' অর্থ চন্দ্রের শপথ। 'ওয়াল্ লাইলি' অর্থ শপথ

www.eelm.weebly.com

রাত্রিকালের। আর 'ইজ্ আদবারা' অর্থ যখন তার অবসান ঘটে। ক্বারী নাফে, ক্বারী হাসান, ক্বারী হামযা ও ক্বারী ইয়াকুব কথাটিকে পড়তেন 'ইজ আদবারা'। আর অন্য ক্বারীগণ পড়তেন 'ইজ দাবারা'। দু'টো পাঠই সমার্থক। যেমন সমার্থক 'ক্বীলা' ও 'উক্বীলা' শব্দদ্বয় 'দারাবাল লাইল' ও 'আদবারাল লাইল' বাক্য দু'টো সমার্থক। ক্বারী আবু আমর বলেছেন, এগুলো হচ্ছে কুরায়েশদের পাঠরীতি। কুতরব বলেছেন, 'দাবারা' অর্থ 'আক্ববালা' (অগ্রবর্তী হলো)। যেমন আরববাসীগণ বলে থাকেন 'দাবারানী ফূলানুন' (অমুক ব্যক্তি আমার পশ্চাতে এসেছে), তেমনই রাত আসে দিনের পশ্চাতে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'শপথ প্রভাতকালের, যখন তা হয় আলোকোজ্জ্বল— (৩৪) এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম' (৩৫)। একথার অর্থ— আদিগন্ত আলোকিত করে আগমন ঘটে যে উষাকালের, তার শপথ করে ঘোষণা করছি, সম্মুখে রয়েছে বৃহত্তর বিপদ সাকার। ওই বিপদে অবশ্যই পতিত হবে অনেক মানুষ। সাকার ছাড়া আরো তো অনেক মুসিবত রয়েছে তাদের জন্য— জাহান্নাম, লাজা, হুতামাহ্, সায়ীর, জাহীম, হাভীয়া। এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমুহের অন্যতম। বাক্যটি এখানে চন্দ্র, রাত্রি এবং প্রভাত কালের শপথের জবাব। অথবা আগের আয়াতের (৩২) 'কাল্লা' ব্যতিক্রমীটি হচ্ছে নিমিত্ত। আর মাঝখানের শপথগুলো উদ্ধৃত বক্তব্যটির গুরুত্ববর্ধনকারী।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'মানুষের জন্য সর্তককারী'। এখানকার 'নাজীর' শব্দটি ধাতুমূল। এর অর্থ সর্তককারী, ভীতিপ্রদর্শনকারী। অথবা পূর্ববর্তী বাক্যের অবস্থাপ্রকাশক। অথবা পরিস্থিতিগত দিক থেকে 'সাকার' অতীব ভয়াবহ। হাসান বলেছেন 'সাকার'এর চেয়ে অধিক ভয়াবহ কোনোকিছুর বর্ণনা কোরআনে নেই। খলিল বলেছেন, 'নাজীর' 'নাক্বীর' এর মতো ধাতুমূল, সাকার এর অবস্থাপ্রকাশক। কেউ কেউ বলেছেন 'নাজীর' অর্থ ভীতিজনক, ভীতিসংকুল। কেউ কেউ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার বস্ত্রাচ্ছাদিত প্রিয়তম বার্তাবাহক! গাত্রোত্থান করুন, মানুষকে পরকালের বিষয়ে ভীতি প্রদশর্ন করুন।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়তে চায়, তার জন্য'। একথার অর্থ হে আমার রসুল ! বিশ্বাসী অবিশ্বাসী উভয় দলের জন্য আপনি ভীতি প্রর্দশনকারী। অথবা কথাটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবে— 'তোমাদের মধ্যে যে চায়' (লিমান শাআ মিনকুম) কথাটি এখানে অগ্রবর্তী বিধেয়। আর 'অগ্রসর হতে কিংবা পিছিয়ে পড়তে' (আইঁইয়াতা ক্বদ্দামা আও ইয়াতাআখ্খারা) হচ্ছে পশ্চাদবর্তী উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় আয়াতখানি হবে ভর্ৎসনামূলক ও হুমকিপ্রকাশক।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য আবদ্ধ'। এখানকার 'রহীনাতুন' শব্দটি 'শাতীমাতুন' এর মতোই ধাতুমূল।

www.eelm.weebly.com

শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষ্যের বিশেষণার্থে, কর্মপদ অর্থে নয়। কেননা 'ফায়ীল' শব্দরূপে যদি 'রহীন' হতো, তবে তা ব্যবহৃত হতো কর্মপদার্থে। শব্দটি পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রে একইরূপে ব্যবহার্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— প্রত্যেকে তার আপন কৃতকর্মের দায়ে চিরদিনের জন্য আটকা পড়ে যাবে জাহান্নামের জিন্দানখানায়। এখানে 'কৃতকর্ম' অর্থ এমন অপকর্ম, যা দোজখকে অবধারিত করে। অর্থাৎ 'কৃতকর্ম' অর্থ এখানে অবিশ্বাস, সত্যপ্রত্যাখ্যান।

সূরা মুদ্দাছ্ছির ঃ আয়াত ৩৯, ৪০, ৪১. ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭

إِلَّآ أَصۡحَٰبَ ٱلۡيَمِينِ ٣٩ فِي جَنَّٰتٖ يَتَسَآءَلُونَ ٤٠ عَنِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ٤١
مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ٤٣ وَلَمۡ نَكُ
نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِينَ ٤٤ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلۡخَآئِضِينَ ٤٥ وَكُنَّا
نُكَذِّبُ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤٦ حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلۡيَقِينُ ٤٧

q তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ নহে,

q তাহারা থাকিবে উদ্যানে এবং তাহারা জিজ্ঞাসাবাদ করিবে—

q অপরাধীদের সম্পর্কে,

q 'তোমাদিগকে কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করিয়াছে?'

q উহারা বলিবে, 'আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না,

q 'আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করিতাম না,

q 'এবং আমরা বিভ্রান্ত আলোচনাকারীদের সহিত বিভ্রান্তিমূলক আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতাম।

q 'আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করিতাম,

q 'আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ নয়'। একথার অর্থ— ডানের দিকের দলটি তখন থাকবে দোজখ থেকে মুক্ত। কেননা তারা বিশ্বাসী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তারাই ডানদিকের দল। আসাদ গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, খলিফা হজরত ওমর একবার হজরত কা'বকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি পরলোকবিষয়ক কোনো বাণী আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! মহাবিচারের দিবসে আমলনামাসমূহ উপস্থিত করা হবে সকলের সম্মুখে। প্রত্যেকে তা প্রত্যক্ষ করবে। এরপর আমলনামাগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হবে আরশের চতুষ্পার্শ্বে। তারপর বিশ্বাসীদের আমলনামা দেওয়া হবে তাদের ডান হাতে। তারা তা পড়বে, আর ভাববে।

www.eelm.weebly.com

মুকাতিল বলেছেন, দক্ষিণ পাশের দল হবে জান্নাতের অধিকারী। অঙ্গীকার দিবসে এরা ছিলো হজরত আদমের ডান পাশে। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ বলেছেন, এরা হবে জান্নাতী। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দলে থাকবে তারাই, যাদের হৃদয় পুতঃপবিত্র। এসকল অভিমতের সারকথা হচ্ছে, বিশ্বাসীগণের দলই হবে দক্ষিণ পাশের দল। তারাই থাকবে চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে মুক্ত। পাপের কারণে তারা সাময়িক শাস্তি ভোগ করলেও অবশেষে প্রবেশ করবে জান্নাতে। অথবা তারা মাফ পাবে শাফায়াতের মাধ্যমে, কিংবা আল্লাহ্পাক এমনিতেই তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এভাবে কেবল আল্লাহ্পাকের অনুকম্পাস্নাত হয়ে তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে। হাসান বসরী বলেছেন, বিশুদ্ধ-চিত্ত বিশ্বাসীরাই হবে 'আসহাবে ইয়ামিন' (দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দল)।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে কাসেম বলেছেন, সেদিন প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে তাদের ভালো-মন্দ কৃতকর্মের জন্য। যারা তাদের পুণ্যকর্মের উপরে নির্ভরশীল তাদেরকে আবদ্ধ রাখা হবে তাদের পুণ্যকর্মের সঙ্গে এবং তাদের হিসাব নেওয়া হবে কঠোরতার সঙ্গে। আর যারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র দয়া-অনুকম্পার উপরে নির্ভর করবে, তাদেরকে কোনো জবাবদিহিই করতে হবে না। বিনা হিসাবেই তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে। এরাই আসহাবে ইয়ামিন। বক্তব্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে সকলকেই। তবে কারো কারো হিসাব হবে সহজ। আর আসহাবে ইয়ামিন অর্থ যে কামেল ইমানদার (পরিপূর্ণ বিশ্বাসী) সেকথার কোনো প্রমাণ নেই।

হজরত আলী থেকে সাঈদ ইবনে মনসুর, ইবনে আবী হাতেম ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, 'আসহাবে ইয়ামিন' হচ্ছে মুসলমানদের ওই সকল শিশু যারা মৃত্যুবরণ করে দুগ্ধপোষ্য অবস্থায়। হাকেম বর্ণনা করেছেন অতিরিক্ত এই কথাটুকু— যারা কোনো পুণ্যকর্ম করতে সক্ষম হয়নি, অথবা যারা বাঁধা পড়েনি পুণ্যে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু জুবিয়ান বর্ণনা করেছেন, 'আসহাবে ইয়ামিন' বলা হয় ফেরেশতামণ্ডলীকে।

পরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'তারা থাকবে উদ্যানে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে— (৪০) অপরাধীদের সম্পর্কে (৪১), তোমাদেরকে কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করেছে' (৪২)? একথার অর্থ— জান্নাতবাসীরা জান্নাতের মনোরম উদ্যানে বসবাস করবে মহা আনন্দে। আর পরিচিতজনদের মধ্যে যাদেরকে জান্নাতে দেখতে পাবে না, তাদের সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে শুরু করবে আলাপচারিতা। তাদের মধ্যে আবার কেউ জাহান্নামীদেরকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেই বসবে, কী কারণে আজ তোমরা পতিত হয়েছো এরকম ভয়ানক শাস্তিতে? 'আন' (হতে, থেকে, সম্পর্কে) অব্যয়টি এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। তাই মর্মার্থ হবে— জান্নাতবাসীরা সরাসরি জাহান্নামবাসীদেরকেই জিজ্ঞেস করবে যে, এমতো করুণ পরিণতি তোমাদের কেনো হলো?

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, আমরা মুসল্লিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না (৪৩)। আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম না' (৪৪)। একথার অর্থ— তারা বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না, অনাহারক্লিষ্টদেরকে অন্নদান করতাম না।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসীদেরকে সেদিন শরিয়তের ফরজ দায়িত্বাবলী সম্পর্কেও জবাবদিহি করতে হবে, যদিও পৃথিবীতে তাদের উপরে শরিয়তের নির্দেশাদি বর্তায় না। বর্তায় না একারণে যে, তারা ইমানদার নয়। কিন্তু তারা যে শরিয়তের দায়িত্বমুক্ত, সে কথাও বলা যায় না। কেননা, ইমান আনা ছিলো তাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। সে দায়িত্ব তারা পালন না করাতেই তো শাস্তিগ্রস্ত হবে। তখন শরিয়তের দায়িত্ব লংঘনের কারণেও শাস্তি দেওয়া হবে তাদেরকে। আবার একথাও ঠিক যে, ইমান আনলে ইমানপূর্ব জীবনের ইবাদতের দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়। তৎসহ মুছে যায় অন্য সকল পাপও। রসুল স. তাই বলেছেন, ইসলাম বিগত জীবনের পাপরাশি নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'এবং আমরা বিভ্রান্ত আলোচনাকারীদের সঙ্গে বিভ্রান্তিমূলক আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম (৪৫)। আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করতাম (৪৬), আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত' (৪৭)। একথার অর্থ— যারা পথভ্রষ্ট, তাদের অনুগমন ছিলো আমাদের জন্য নিষিদ্ধ, অথচ পৃথিবীতে তাদের সঙ্গেই ছিলো আমাদের দহরম মহরম। তারা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতো। আমরাও তাই করতাম। এভাবে একসময় এসে পড়লো মৃত্যু। তওবা করার সময় আমাদের হয়নি। লক্ষণীয়, সর্বশেষে বলা হলো সত্যপ্রত্যাখ্যানের কথা। এভাবে এখানে একথাই বোঝানো হলো যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানই (কুফরী) সর্ববৃহৎ পাপ। আর এখানকার 'ইয়াক্বীন' শব্দটির মর্মার্থ— মৃত্যু। শাব্দিক অর্থ 'বিশ্বাস' এখানে গ্রহণীয় নয়। অর্থাৎ 'হাত্তা আতানাল ইয়াক্বীন' অর্থ আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত।

সূরা মুদ্দাছ্‌ছির ঃ ৪৮

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤٨﴾

r ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ উহাদের কোন কাজে আসিবে না।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পক্ষে যদি সকল সুপারিশকারী একযোগে সুপারিশ করে, তবুও তা গৃহীত হবে না। বক্তব্যটির যোগসূত্র রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ' (৩৮) এবং 'আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত' (৪৩) কথা দু'টোর সঙ্গে। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের বিপরীতে এই কথাটিও পরিস্ফুট হয় যে, ইমানদারগণ পাপী হলেও তার পক্ষের সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে।

www.eelm.weebly.com

ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্ তাঁর ‘মসনদ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, উম্মতজননী উম্মে হাবীবা, অথবা উম্মে সালমা বলেছেন, একবার আমরা উপস্থিত হলাম আমাদের সপত্নী আয়েশার ঘরে। একটু পরে সেখানে রসুল স. উপস্থিত হলেন এবং বললেন, কারো যদি তিন সন্তান শিশুকালে মৃত্যুবরণ করে, তবে মহাবিচারের দিবসে তাদেরকে উপনীত করানো হবে জান্নাতের দ্বারপ্রান্তে। বলা হবে, প্রবেশ করো। তারা বলবে, আগে আমাদের পিতা-মাতাকে প্রবেশ করানো হোক। দু'তিন বার এরকম বলার পর শেষে নির্দেশ দেওয়া হবে, ঠিক আছে, তোমরাও প্রবেশ করো, তোমাদের পিতা-মাতাও প্রবেশ করুক। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এরকম সুপারিশ পাবে না।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, প্রতিফল দিবসে সুপারিশ করবেন নবী-রসুলগণ, ফেরেশতামণ্ডলী, পুণ্যবান, শহীদ ও ইমানদারগণ। শেষে চার প্রকারের লোক ছাড়া আর কেউই থাকবে না দোজখের মধ্যে। ওই চার প্রকার লোকের কথা বলা হয়েছে এই আয়াতে এবং এই সুরার ৪৩-৪৬ আয়াতে। হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বলেছেন, নিঃসন্দেহে শাফায়াত মঙ্গল সাধন করবে মানবজাতির। তবে তাদের জন্য শাফায়াত একেবারেই কার্যকর হবে না, যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত ইবনে হোসাইনের বক্তব্যে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নামাজ ও জাকাত পরিত্যাগকারী এবং বিভ্রান্তিমূলক আলোচনাকারী যদি বিশ্বাসীও হয়, তবুও তাদের জন্য সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। আর তাঁরা এমতো মন্তব্য করেছেন এই আয়াতের ভিত্তিতেই। তাঁরা বলেন, এখানকার ‘ফামা’ কথাটির ‘ফা’ নৈমিত্তিক। তাই বুঝতে হবে, নামাজ-জাকাত পরিত্যাগ ও বিভ্রান্তিমূলক আলোচনায় লিপ্ত থাকা এবং প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করা— এই চারটি দোষের যে কোনো একটিও হতে পারে সুপারিশ ফলপ্রসূ না হওয়ার নিমিত্ত। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, সমষ্টিগতভাবে যে এই দোষগুলোর অধিকারী, সুপারিশ কার্যকর হবে না কেবল তার বেলায়। আর এর মধ্যে প্রতিফল দিবস অস্বীকার দোষটি থাকতেই হবে। সুতরাং এই দোষটি বাদে অন্যগুলোর যে কোনো একটি, দু'টি বা তিনটি শাফায়াত কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় নয়।

প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য শাফায়াত বা সুপারিশ সিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি ঐকমত্যসম্মত। তাই তখন দেখা যাবে, যে পাপী বিশ্বাসীর জন্য দোজখ নির্ধারিত হয়েছে, সে-ও সুপারিশের বদৌলতে দোজখ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। আবার অনেককে সুপারিশের কারণে মুক্ত করে আনা হবে দোজখাভ্যন্তর থেকেও। কিন্তু পথভ্রষ্ট মুতাজিলা, খারেজী ইত্যাদি সম্প্রদায় সুপারিশ করার বিষয়টিকে মানে না। অথচ সুপারিশের বিষয়টি সুবিদিত হাদিসসমূহের দ্বারা সুপ্রমাণিত।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিফল দিবসে আমি আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করবো। অবশেষে আমার দয়াময় প্রভুপালনকর্তা

www.eelm.weebly.com

আমাকে বলবেন, ‘তুমি খুশী হয়েছো তো? আমি বলবো, হ্যাঁ। হজরত আনাস থেকে বায্যার, তিবরানী ও আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি সুপারিশ করবো পাপিষ্ঠ উম্মতের জন্যই। হজরত জাবের থেকে তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, হাকেম, আহমদ ও আবু দাউদ এরকম বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, হাকেম, ইবনে মাজা, তিবরানী; হজরত ইবনে ওমর থেকে খতিব বাগদাদী এবং হজরত কা’ব ইবনে উজারাহ থেকেও খতিব বাগদাদী।

হজরত ওসমান থেকে সর্বোন্নত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, প্রতিফল দিবসে এক জায়গায় জড়ো করা হবে আলেম ও আবেদকে। আবেদকে বলা হবে, তুমি জান্নাতে চলে যাও। আর আলেমকে বলা হবে, তুমি থামো। তোমাকে তো সুপারিশ করতে হবে। সর্বোন্নত সূত্রে হজরত ওসমান গণি থেকে ইসপাহানী, তিরমিজি ও আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, আমার উম্মতের দুষ্কৃতিকারীরাও পুণ্যবান। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কীভাবে? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌পাক আমার সুপারিশে তাদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর পুণ্যবানেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ্‌র অনুকম্পায়। হজরত ইবনে ওমর থেকে সর্বোন্নত সূত্রে দায়লামী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তখন বিদ্বানকে বলা হবে, তোমার ছাত্রদের জন্য সুপারিশ করো, যদিও তাদের সংখ্যা হয় আকাশের নক্ষত্রতুল্য অসংখ্য। সর্বোন্নত সূত্রে হজরত আবু দারদা থেকে আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, একজন শহীদ তার পরিবারের সত্তরজন সদস্যের জন্য সুপারিশ করতে পারবে।

সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহাবিচারের দিবসে জনগণ সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান থাকবে। এমন সময় একজন জান্নাতী গমন করবে একজন দোজখীর সামনে দিয়ে। দোজখী তাকে দেখে বলবে, তোমার কি মনে নেই, একদিন তুমি আমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিলে। আমি তোমাকে শরবত পান করিয়েছিলাম। একথা শুনে জান্নাতী ব্যক্তি ওই দোজখীর জন্য সুপারিশ করবে। তার সুপারিশে তখন দোজখী ব্যক্তিটি পরিত্রাণ পাবে। পরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকটি আবার গমন করবে আর একজন দোজখীর সামনে দিয়ে। সে বলবে, তোমার কি স্মরণ আছে, একদিন আমি তোমাকে পরিতৃপ্ত করিয়েছিলাম সুপেয় পানীয় দ্বারা। সে তখন ওই লোকটির জন্য সুপারিশ করবে। সে-ও পাবে পরিত্রাণ। তারপর সে যখন আর এক দোজখীর সামনে দিয়ে যাবে তখন ওই দোজখী বলবে, খেয়াল করতে চেষ্টা করো দেখি ওই দিনের কথা, যেদিন তুমি এক কাজের জন্য কোথাও যাচ্ছিলে। আমি উপযাজক হয়ে তোমার ওই কাজটি করে দিয়েছিলাম। একথা শুনে ওই পরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকটি তার জন্যও সুপারিশ করবে। ফলে সে-ও নিষ্কৃতি পাবে দোজখ থেকে।

মাসআলা ঃ হজরত আনাস থেকে সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই লোকের ভাগ্যে শাফায়াত জুটবে না, যে শাফায়াতকে

www.eelm.weebly.com

অস্বীকার করে এবং ওই লোক হাউজে কাওছারের পানি পান করতে পারবে না, যে অবিশ্বাস করে হাউজে কাওছারকে। হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম এবং আরো দশজন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আমার শাফায়াত সত্য, যে একথা বিশ্বাস করবে না, সে আমার শাফায়াত পাবে না। ইবনে মুনী'।

আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য আমার শাফায়াত অবারিত। কেবল তাদের জন্য নয়, যারা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করে। সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে দু'টি সম্প্রদায় হবে আমার শাফায়াতবঞ্চিত— মরজিয়া ও ক্বদরিয়া (পথভ্রষ্ট মরজিয়ারা বলে, ইমান ঠিক থাকলে গোনাহ্তে কোনো ক্ষতি হয় না, ফরজ পরিত্যক্ত হলেও এবং হারামে লিপ্ত হলেও। আর ক্বদরিয়া বা মুতাজিলারা বলে, বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা। উভয় সম্প্রদায়ই শাফায়াতে অবিশ্বাসী)।

মাসআলা ঃ বিভিন্ন হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, কতিপয় পাপ শাফায়াত থেকে বঞ্চিত করে। সুপরিণত সূত্রে হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আরববাসীগণের সঙ্গে প্রতারণা করবে, সে আমার শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হবে। উত্তম সূত্রপরম্পরায় হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে বায়হাকী ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে দু'ধরনের লোক হবে আমার শাফায়াতবঞ্চিত— অত্যাচারী, জনগণের অধিকার খর্বকারী এবং অধিক দুনিয়াদার, ধর্মবিচ্যুত।

হজরত আবু দারদা থেকে তিবরানী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করে চলো। প্রতিফল দিবসে আমি কলহপ্রিয়দের পক্ষে সুপারিশ করবো না।

সূরা মুদ্দাছ্ছির ঃ আয়াত ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا ۖ بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

www.eelm.weebly.com

q উহাদের কী হইয়াছে যে, উহারা মুখ ফিরাইয়া লয় উপদেশ হইতে?
q উহারা যেন ভীত-ত্রস্ত গর্দভ—
q যাহা সিংহের সম্মুখ হইতে পলায়নপর।
q বস্তুত উহাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাহাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হউক।
q না, ইহা হইবার নহে; বরং উহারা তো আখিরাতের ভয় পোষণ করে না।
q না, ইহা হইবার নহে, কুরআনই সকলের জন্য উপদেশবাণী।
q অতএব যাহার ইচ্ছা সে ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করুক।
q আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিবে না, একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করিবার অধিকারী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখানকারীরা এরকম কেনো, কোরআনের হৃদয়স্পর্শী বাণী তাদেরকে শোনানো হয়, অথচ তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এ অনন্য মহাকল্যাণ থেকে? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা এমন করছে কেনো? আর এখানকার 'তাজকিরাহ' (উপদেশ) অর্থ কোরআন।

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'কা আন্না হুম হুমুরুম মুসতানফিরাহ্' (তারা যেনো ভীত-পলায়নপর গর্দভ)। এখানকার 'মুসতানফিরাহ্' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'নাফারা' 'ইসতানফারাহ্' থেকে। শব্দরূপটি কর্তৃপদীয়। এর অর্থ ভীত-পলায়নপর।

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'ফাররাত মিন ক্বাসওয়ারাত' (যা সিংহের সম্মুখ থেকে পলায়নপর)। এখানকার 'ক্বাসওয়ারাহ্' শব্দটি সাধিত হয়েছে 'ক্বাসওয়ারাতুন' শব্দমূল থেকে এবং গঠিত হয়েছে ক্বাসারা থেকে। এর অর্থ দুর্যোগ, দুর্বিপাক। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, এখানে 'ক্বাসওয়ারাহ্' অর্থ সিংহ। আতা এবং কালাবীও এরকম বলেছেন। মুজাহিদ, কাতাদা ও জুহাক বলেছেন, এর অর্থ ধনুর্ধর, শিকারী। শব্দটির একবচন হয় না। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আতা এরকম বলেছেন। জায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, স্থূলকায় বলশালী ব্যক্তিকে আরববাসীগণ বলেন 'ক্বাসওয়ারাহ্'। আবুল মুতাওয়াককিল বলেছেন, 'ক্বাসওয়ারাহ' বলে হৈ হল্লোড়কে।

ইকরামা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শিকারীর জালকে বলে 'ক্বাসওয়ারাহ্'। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এর অর্থ শিকারী।

সুদ্দী সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, মক্কার মুশরিকেরা একবার বললো, মোহাম্মদ যদি সত্যি সত্যিই নবী হয়ে থাকে, তবে তার লিখিত একটি পত্রিকা যেনো আমরা কাল ভোরে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে বালিশের নিচে পাই, যাতে লেখা থাকবে নরক থেকে সুরক্ষিত থাকার নিয়মাবলী। তাদের এমতো অপমন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াতসমূহ।

www.eelm.weebly.com

প্রথমে (৫২) বলা হয়— 'বস্তুত তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হোক'। এখানে 'বাল' অর্থ বস্তুত। শব্দটি এখানে বসানো হয়েছে প্রারম্ভিকাস্বরূপ। কিন্তু এর দ্বারা প্রসঙ্গান্তর ঘটানো এখানে উদ্দেশ্য নয়। ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, মক্কার অবিশ্বাসীরা বলেছিলো, মোহাম্মদ! সত্যিই যদি তুমি রসুল হয়ে থাকো, তাহলে এমন একটা ব্যবস্থা করো, যাতে সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমরা যেনো প্রত্যেকে আমাদের নিজ নিজ বালিশের নিচে দেখতে পাই একটি পরিপত্র, যাতে একথা লেখা থাকবে যে, সত্যি সত্যিই তুমি একজন প্রত্যাদেশবাহী।

এরপরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'না, এটা হতে পারে না'। বরং তারা আখেরাতের ভয় পোষণ করে না। এখানে 'কাল্লা' অর্থ না, কক্ষণো নয়। কস্মিনকালেও এটা হতে পারে না। কেননা কোরআন হচ্ছে সুস্পষ্ট আলোকবর্তিকা। এমতো আলোর প্রকাশের পর অন্য অলৌকিকত্ব নিষ্প্রয়োজন। আর এখানেও 'বাল' (বরং) অব্যয়টি সূচনার্থক। কিন্তু এর দ্বারা এখানেও প্রসঙ্গান্তর ঘটানো হয়নি। অর্থাৎ এখানেও মূল বক্তব্য হচ্ছে, কর্মফল দিবসের প্রতি তাদের বিশ্বাস মাত্রই নেই। তাই অবতারণা করে এরকম অবান্তর কথাবার্তার। পলায়ন করে 'উপদেশ' (কোরআন) থেকে, যেনো সিংহের সম্মুখ থেকে পলায়নপর কোনো আতংকিত গর্দভ। অথবা 'বাল' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তাদের অযথার্থ দাবি যদি পূরণ করা হয়ও, তবুও তারা ইমান আনবে না। কেননা তারা বিষয়টিকে অস্বীকার করছে জেনে, শুনে, বুঝে। আসল কথা হচ্ছে, পরকালের ভীতি তাদের একেবারেই নেই। উল্লেখ্য, পরকালভীতি হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত অনন্য উপহার, যা পায় কেবল বিশ্বাসীরা। অবিশ্বাসীরা এমতো উপহার থেকে বঞ্চিত বলেই শতসহস্র সুস্পষ্ট নিদর্শনও তাদের কোনো উপকারে আসে না।

এরপরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'কাল্লা ইন্নাহু তাজকিরাহ্' (না, তা হয় না, কোরআন সকলের জন্যই উপদেশবাণী)'। এখানেও 'কাল্লা' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে ধাত্যর্থে। অথবা সতর্ককরণার্থে, নির্বাক করে দেওয়ার জন্য, ধমক প্রদানের উদ্দেশ্যে। এখানকার এই 'কাল্লা' পূর্বোক্ত 'কাল্লা'র গুরুত্ব বর্ধনকারী। আর 'কোরআন সকলের জন্য উপদেশবাণী' অর্থ কোরআন হচ্ছে সকলের জন্য সতত-উন্মুক্ত উপদেশ। এতে রয়েছে আল্লাহ্র সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপ, কোমলতা-কঠোরতা, দয়া-নির্মমতা, স্বস্তি-শাস্তির বিশদ বিবরণ।

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'অতএব যার ইচ্ছা সে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক'। একথার অর্থ— যে ইচ্ছা সে, খোলা মনে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এই কোরআন থেকে। আর যে এরকম করবে না, তার শাস্তিভোগ অনিবার্য।

www.eelm.weebly.com

শেষোক্ত আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ উপদেশ গ্রহণ করবে না, একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করবার অধিকারী'। একথার অর্থ— কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, আল্লাহ পাকের অভিপ্রায়ের আনুকূল্য না পেলে কোরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করে উপকৃত হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং ভয় যদি করতে হয়, তবে ভয় করতে হবে তাঁকেই। ক্ষমাপ্রার্থীও হতে হবে কেবল তাঁরই সকাশে। কেননা ক্ষমা করার অধিকার ও যোগ্যতাও সংরক্ষণ করেন কেবল তিনিই। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাটিও সুপ্রমাণিত হয় যে, মানুষের সকল প্রকার কর্মকাণ্ডই আল্লাহ্‌র সতত স্বাধীন অভিপ্রায়ের সঙ্গে বিজড়িত।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন 'একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী' কথাটির অর্থ তোমাদের প্রভুপালক বলেন আমি এক, অংশীহীন, সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো, বিরত থাকো অংশীবাদিতা থেকে। যে এরকম করবে তাকে আমি মার্জনা করবো। কেননা মার্জনা করার অধিকার সংরক্ষণ করি কেবল আমিই। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, হাকেম।

সূরা ক্বিয়ামাহ্‌

মহাতীর্থ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এতে রয়েছে ২ রুকু এবং ৪০ আয়াত।

সূরা ক্বিয়ামাহ্‌ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝١ وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝٢ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۝٣ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ۝٤ بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ۝٥

- r আমি শপথ করিতেছি কিয়ামত দিবসের,
- r আরও শপথ করিতেছি তিরস্কারকারী আত্মার।
- r মানুষ কি মনে করে যে, আমি তাহার অস্থিসমূহ একত্র করিতে পারিব না?
- r বস্তুত আমি উহার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করিতে সক্ষম।
- r তবুও মানুষ তাহার ভবিষ্যতেও পাপাচার করিতে চাহে।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে— 'লা উক্বসিমু বিইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ' (আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের)। ক্বারী কানাবেল ও ক্বারী বযী'র নিকটে বাক্যটি হবে 'লা উক্বসিমু' (অবশ্যই আমি শপথ করি)। 'লা' অব্যয়টি এখানে বেগসঞ্চারক। আর 'উক্বসিমু' হচ্ছে শপথসূচক ক্রিয়া। তবে সর্বজনীন পাঠ হচ্ছে 'লাম-আলিফ' সহযোগে 'লা উক্বসিমু'। অর্থ হবে পূর্ববৎ এবং বুঝতে হবে 'লা' (না) সংযোজিত হয়েছে এখানে অতিরিক্তরূপে।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'ওয়া লা উক্বসিমু বিন্নাফসিল লাওওয়ামা' (আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার)। এখানে 'লা' অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত, অর্থ গ্রহণ করতে হবে কেবল শপথের। আর শপথের জবাব, অর্থাৎ শপথ করে যা বলা হবে, তা এখানে উহ্য। তার ইঙ্গিত হচ্ছে— মহাপ্রলয় ও মহাপুনরুত্থান সুনিশ্চিত। সুনিশ্চিত হিসাব, পুণ্য-পাপের ওজন, পুরস্কার-তিরস্কার।

আবু বকর ইবনে আয়াশ বলেছেন, শপথকে গুরুত্ববহ্ করবার জন্যই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'লা'। বায়যাবী লিখেছেন, শপথকে গুরুত্ববহ করবার জন্য 'লা' তাকিদ আরবী ভাষায় অহরহ ব্যবহৃত হয়। আমি বলি, শপথ ক্রিয়ার না-সূচক 'লাম' ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যানের অযোগ্য, সুস্পষ্ট ও ধ্রুব করে তোলা। শপথ করার পর বাক্যমধ্যে গুরুত্ববহ পৃথক অব্যয় ব্যবহারের আর প্রয়োজন থাকে না। বিবেকসম্পন্ন লোকেরা ভালো করেই জানে যে, পৃথিবীতে বাস করে এমন কিছুসংখ্যক লোক, যারা অকৃতজ্ঞ, অত্যাচারী, স্বজন-বন্ধন ছিন্নকারী এবং বিবিধ অপকর্মমগ্ন। অথচ তারা জীবন যাপন করে নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে। আবার কিছুসংখ্যক লোক ঠিক এর বিপরীত। তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি কৃতজ্ঞ, বিধি-বিধানের প্রতি অনুগত ও পরিতুষ্ট, ন্যায়বিচারপ্রেমিক। অথচ তাদেরকে ভোগ করতে হয় দুঃখ-ক্লেশ, বিপদাপদ। বিষয়টি অবশ্যই বিসদৃশ ও অন্যায়। সুতরাং বুঝতে হবে, এর প্রতিকারের ব্যবস্থা অবশ্যই আছে। কৃতকর্মসমূহের চূড়ান্ত প্রতিফল প্রদানের বিষয়টি সুনিশ্চিত হওয়াই সমীচীন এবং তা হবেও। হবে পরবর্তী পৃথিবীতে, মহাবিচারের দিবসে। অন্যথায় জয় হবে অন্যায়ের, আর ন্যায়-বিচার হবে মূল্যহীন।

'বি নাফসিল লাওওয়ামাহ্' অর্থ তিরস্কারকারী আত্মার। এখানকার 'আলিফ লাম' অব্যয়টি জাতিবাচক। অর্থাৎ সকল নফস (প্রবৃত্তি)ই এর অর্ন্তভূত। ফাররা বলেছেন, পুণ্যবান, পাপী সকলেই মহাবিচারের দিবসে ধিক্কার দিতে থাকবে নিজেদেরকে। পুণ্যবানেরা এই ভেবে আক্ষেপ করবে যে, আরো বেশী পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলাম না কেনো! আর পাপীরা ভাববে, হায় পুণ্যকর্ম সম্পাদনের সুযোগ আমরা হেলায় হারালাম কেনো! এভাবে সকলেই তখন নিজেদেরকে তিরস্কার করতে থাকবে। তাই এখানে শপথ করা হয়েছে সকল প্রবৃত্তির। বলা হয়েছে— আরো শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।

www.eelm.weebly.com

হাসান বসরী বলেছেন, 'নাফসিল লাওয়ামা' (তিরস্কারকারী আত্মা) বলে এখানে বুঝানো হয়েছে বিশ্বাসীগণের নফসকে। কেননা তারা অহরহ ভর্ৎসনা করে তাদের প্রবৃত্তিকে। কিন্তু পাপিষ্ঠরা এমতো আত্মসমালোচনায় লিপ্ত হয়ই না। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'তিরস্কারকারী আত্মা' বলে বুঝানো হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। কেননা প্রতিফল দিবসে তারাই তাদের নফসকে তিরস্কার করবে। অথবা কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে ওই সকল লোকের কথা, যারা ছিলো আল্লাহ্‌র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞার প্রতি অননুগত, অপরিতুষ্ট ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রকাশকারী।

সুফী-আউলিয়াগণ বলেন, প্রবৃত্তি সাধারণত অসৎকর্মের প্রতি প্ররোচিত করতেই অভ্যস্ত। যারা আল্লাহ্‌র জিকির করে, তারাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভ করে প্রবৃত্তিকে পরাভূত করবার সামর্থ্য। আর তখন প্রবৃত্তির অসৎস্বভাবের পরিচয় পেয়ে সে হয়ে পড়ে চমকিত ও চিন্তিত। তিরস্কার করতে থাকে নিজেকে। যে নফস এই স্তরে উপনীত হয়, সেই নফসকেই বলে 'নফসে লাওওয়ামা'। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এরপর যখন সে আল্লাহ্‌র প্রেমে পূর্ণমগ্ন (ফানা) হয়, তারপর হয় আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে অস্তিত্বশীল (বাকা) তখন তার নফস হয় 'নফসে মুত্বমাইন্না' (প্রশান্ত প্রবৃত্তি, পূর্ণানুগত আত্মা)।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবো না'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও শাসনমূলক। আর এখানে 'আল-ইনসান' (মানুষ) বলে বুঝানো হয়েছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সমগ্র মানব জাতিকে। অথবা বলা যেতে পারে 'আল' এখানে সীমিতার্থক। অর্থাৎ 'মানুষ' অর্থ এখানে বিশেষ কোনো ব্যক্তি। বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আদী ইবনে রবীয়া সম্পর্কে। সে ছিলো জোহরা গোত্রের মিত্র। আর জামাতা ছিলো আখনাস ইবনে শুরাইক ছাক্বাফীর। রসুল স. তাদের সম্পর্কেই দোয়া করেছিলেন, হে আমার প্রভুপালক! আমাকে অসৎপ্রতিবেশী থেকে হেফাজত করো।

একদিন আদী রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললো, মোহাম্মদ! বলো, পুনরুত্থান কবে হবে? আর তখন পরিস্থিতিই বা হবে কীরকম? রসুল স. সবিস্তারে বিবরণ দিলেন পুনরুত্থান দিবসের। সে বললো, আমি পুনরুত্থান দিবস স্বচক্ষে দেখলেও তা বিশ্বাস করবো না। তোমাকেও স্বীকার করবো না সত্যবাদী বলে। কী বিস্ময়! মাটিতে মিশে যাওয়া হাড়গুলোকে আবার আল্লাহ্‌ জোড়া লাগাবেন কীভাবে? তার এরকম গর্হিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। এর মর্মার্থ হচ্ছে— পুনরুত্থান অস্বীকারকারীরা কী ভেবেছে? আমিই সকলের ও সকল কিছুর একমাত্র সৃজয়িতা ও পালয়িতা। আমিই তো প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, তা হলে দ্বিতীয়বার কী তা পারবো না? প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা তো দ্বিতীয় সৃষ্টি সহজতর।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে—'বস্তুত আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম'। এখানে 'বালা' অর্থ বস্তুত, কেনো নয়, অবশ্যই। অর্থাৎ অবশ্যই আমি মৃতের অস্থিগুলি একত্রিত করে তাকে পুনর্জীবিত করবো। আর এখানকার 'ক্বাদিরীন' হচ্ছে একটি উহ্য কর্তার অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ কথাটির মাধ্যমে প্রকাশ ঘটেছে অত্যধিক শক্তিমত্তার। অর্থাৎ আমি তার অস্থিগুলোকে সংযোজিত তো করবোই, তদুপরি তার সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গকে করবো যথাযথরূপে বিন্যস্ত। যেমন বলা হয় 'আমি তোমাকে জব্দ তো করবোই, জব্দ করবো তোমার গোষ্ঠীকেও'। আর 'বানান' অর্থ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অঙ্গুলীর অগ্রভাগ তো নিতান্তই হালকা ও সূক্ষ্ম, তৎসত্ত্বেও সেগুলোকে আমি সৃষ্টি করবো অবিকল আগের মতো করে। আর এরকম করা আমার জন্য সহজ।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'তবুও মানুষ তার ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়'। এখানে 'বাল' (তবুও) অব্যয়টি যোজক, যোজিত হয়েছে ৩ সংখ্যক আয়াতের 'মানুষ কি মনে করে' কথাটির সঙ্গে। বাক্যটি এখানে প্রশ্নবোধকও হতে পারে, আবার হতে পারে তাকিদপ্রকাশকও। কারণ ৩ সংখ্যক আয়াতের প্রশ্ন ও প্রশ্নকারী থেকে প্রসঙ্গান্তর ঘটানোই এখানে উদ্দেশ্য। এভাবে এখানে বোঝানো হয়েছে ৩ সংখ্যক আয়াতের 'মানুষ' এবং এখানকার 'মানুষ' পৃথক ব্যক্তি।

মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইকরামা ও সুদ্দী আয়াতখানিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— প্রত্যেকে জানে যে, আল্লাহ্‌পাক তার অস্থিসমূহ পুনঃ সংযোজন করতে সক্ষম। কিন্তু পুনরুত্থান দিবসকে তারা অস্বীকার করে কেবল অহমিকাবশত। এভাবে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে সত্যপ্রত্যাখ্যানের উপর। ফলে তওবাও করতে সক্ষম হয় না শেষাবধি। সাঈদ ইবনে যোবায়ের ব্যাখ্যা করেছেন— পাপকর্মে মানুষ ত্বরা করে। দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করে তওবা করতে। বলে, সময় হলে সৎকর্ম তো করবোই। সহসাই আগমন ঘটে মৃত্যুর। ফলে পরপারে পাড়ি দিতে হয় তওবা ব্যতিরেকেই। জুহাক অর্থ করেছেন— মানুষ দীর্ঘ আশাধারী হয়ে থাকে। মনে করে সে দীর্ঘজীবি হবেই। সুতরাং এই বেলা সম্পদ-সম্মান অর্জনের প্রতি মনোযোগী হওয়াই উত্তম। এভাবে সহসা তাকে বরণ করতে হয় মৃত্যুকে। চিরতরে হারিয়ে যায় তওবা করার সুযোগ।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানকার 'ইয়াফজুরা' অর্থ সে মিথ্যা কথা বলতে চায়। আর 'আমামাহু' অর্থ ভবিষ্যতকে, পুনরুত্থান দিবসকে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য পুনরুত্থান দিবসকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চায়। 'ফজুর' এর আভিধানিক অর্থ বিকর্ষিত হওয়া। 'ফাজের' অর্থ মহাসত্য থেকে বিকর্ষিত জন, পাপাচারী।

www.eelm.weebly.com

يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ﴿٦﴾ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾ وَ خَسَفَ
الْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ﴿٩﴾ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ
اَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ۨالْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾
يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَ اَخَّرَ ﴿١٣﴾ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى
نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ﴿١٣﴾ وَّ لَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ﴿١٥﴾

q সে প্রশ্ন করে, ‘কখন কিয়ামত দিবস আসিবে?

q যখন চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে,

q এবং চন্দ্র হইয়া পড়িবে জ্যোতিহীন,

q যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হইবে—

q সেদিন— মানুষ বলিবে,‘আজ পালাইবার স্থান কোথায়?’

q না, কোন আশ্রয়স্থল নাই।

q সেদিন ঠাঁই হইবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।

q সেদিন মানুষকে অবহিত করা হইবে সে কী অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে।

q বস্তুত মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত,

q যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সে আবার উপহাসচ্ছলে এরকম প্রশ্নেরও অবতারণা করে যে, কই, কোথায় কিয়ামত? কিয়ামত দিবস আবার কখনো আসবে নাকি? অর্থাৎ কিয়ামত তো কখনো আসতে পারেই না।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে—‘যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে’। এখানে ‘বারিক্বাল বাসার’ অর্থ চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। ক্বারী নাফে পাঠ করতেন ‘বারাক্বা’। আর জমহুর পাঠ করেন ‘বারিক্বা’। দু’টো শব্দই রয়েছে ‘কামুস’ অভিধান গ্রন্থে। শব্দদু’টোর ধাতুমূল ‘বারক্বুন’ ও ‘বারুক্বুন’। এর অর্থ আতংকে চক্ষু স্থির হয়ে যাওয়া, চোখে কিছু না দেখা। ফাররা ও খলিল বলেছেন, ‘বারিক্বা’ অর্থ সন্ত্রস্ত হবে, হবে ভীত। অর্থাৎ যা সে অস্বীকার করতো, তা স্বচক্ষে দেখে হয়ে যাবে ভীত, সন্ত্রস্ত।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে’ অর্থ মৃত্যুর ভয়াবহতা যখন সে প্রত্যক্ষ করবে, তখন ভয়ে-আতঙ্কে তার চক্ষু হয়ে যাবে স্থির। কিন্তু কথাটির অর্থ এরকম না হওয়াই সমীচীন। কেননা পূর্বাপর আয়াতসমূহে বিবৃত

www.eelm.weebly.com

হয়েছে কিয়ামতের সময়ের অবস্থা। তাই কথাটির অর্থ হবে— যখন সে মহাপ্রলয়কালের বিভীষিকা স্বচক্ষে দেখতে পাবে, তখন আতংকে ত্রাসে স্থবির হয়ে যাবে তার চক্ষুগোলক।

পরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'যখন চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন (৮), যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে— (৯) সেদিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায় (১০)? না, কোনো আশ্রয় স্থল নেই' (১১)। এখানে 'যখন চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন' অর্থ যখন উধাও হয়ে যাবে চন্দ্রের কিরণ প্রকাশের ক্ষমতা। 'যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে' কথাটির অর্থ কেউ কেউ করেছেন এভাবে— যখন সূর্য-চন্দ্র উভয়টি নিষ্প্রভ হয়ে একযোগে উদিত হবে পশ্চিম আকাশে। এখানে 'খসাফা' এর রূপকার্থ দ্যুতিহীন। আতা ইবনে ইয়াসার বলেছেন, তখন চাঁদ-সুরুজকে একত্র করে নিক্ষেপ করা হবে মহাসমুদ্রে। ফলে মহাসাগরের নীলাম্বুরাশি হয়ে যাবে অগ্নিময়। এরকমও বলা হয়েছে যে, এখানে 'সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে' অর্থ উভয়টিকে জ্যোতিহীন করা হবে একযোগে। 'জুমাল' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ কেউ যেহেতু ৭ সংখ্যক আয়াতের 'চক্ষুস্থির হয়ে যাবে' কথাটির অর্থ করেন 'মৃত্যু-বিভীষিকা দেখে স্থির হয়ে যাবে চোখের দৃষ্টি' তাই তারা 'চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন' বাক্যটির অর্থ করেন— তার চোখের জ্যোতি যেহেতু তখন বিলীন হয়ে যাবে, তাই সে চাঁদকেও দেখতে পাবে জ্যোতিবিবর্জিতরূপে। মৃত্যুর আতংকে চন্দ্র-সূর্যকে জ্যোতিহীন পরিদৃষ্ট হওয়াই তখন তার জন্য হবে স্বাভাবিক। অথবা মর্মার্থ হবে— মানবাত্মা তখন এমন স্তরে উন্নীত হবে যে, সূর্য-চন্দ্রের অস্তিত্ব সেখানে থাকবেই না। সেখানে বিকিরীত হবে কেবল জ্ঞানের দ্যুতি।

'শামস্' (সূর্য) শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। 'জুমিয়া' ক্রিয়াপদটি পুংলিঙ্গ। যেহেতু কর্তৃপদ এখানে প্রকাশ্য, তাই ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হয়েছে পুংলিঙ্গ। অথবা বলা যেতে পারে, 'ক্বমার' (চন্দ্র) শব্দটি পুংলিঙ্গ, যা যোজিত হয়েছে 'শামস্' এর সঙ্গে। পুংলিঙ্গবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে এখানে সেকারণেই। এভাবে এখানে যোজ্যকে রাখা হয়েছে আড়ালে। ৭ সংখ্যক আয়াতের 'ইজা' (যখন) শব্দটি ক্রিয়ার আধার। 'স্থির হয়ে যাবে', 'হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন' এবং 'একত্র করা হবে' ক্রিয়াত্রয়ের ঘটিতব্য নির্ধারিত কালাধার হচ্ছে 'সেদিন মানুষ বলবে'। এখানে 'সেদিন মানুষ বলবে' অর্থ সেদিন অবিশ্বাসীরা বলবে। 'পালাবার স্থান কোথায়' বাক্যটি এখানে 'বলবে' এর কর্মপদ। অর্থাৎ 'আজ পালাবার স্থান কোথায়' বক্তব্যটি হবে অবিশ্বাসীদের। আর 'কোনো আশ্রয়স্থল নেই' অর্থ এখানে— প্রাণ বাঁচাবার কোনো ব্যবস্থাই যে এখন নেই। এখানে 'আশ্রয়স্থল' অর্থ পাহাড়। কেননা সে যুগের মানুষ প্রাণভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতো গিরিগহ্বরে।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'সেদিন ঠাঁই হবে তোমার প্রতিপালকের নিকট'। একথার অর্থ— সেদিন আশ্রয় নিতে গেলে গ্রহণ করতে হবে কেবল আল্লাহ্র আশ্রয়। তখন এককভাবে কার্যকর থাকবে কেবল তাঁর অভিপ্রায় ও আদেশ। এখানে 'মুস্তাক্বার' অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে—'সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে, সে কী অগ্রে প্রেরণ করেছে ও কী পশ্চাতে রেখে গিয়েছে'। হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এখানে 'কী অগ্রে প্রেরণ করেছে' অর্থ কোন কোন পুণ্যকর্ম সে প্রেরণ করেছে পূর্বাহ্নে। আর 'কী পশ্চাতে রেখে এসেছে' অর্থ পৃথিবীতে পরিত্যাগ করে এসেছে কোন কুকর্ম, অপপ্রথা। কাতাদা বলেছেন, কথাদু'টোর অর্থ আনুগত্য ও অনানুগত্য। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— প্রথম কর্ম ও শেষ কর্ম। জায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, এখানে অগ্রে প্রেরিত কর্ম হচ্ছে আল্লাহ্র পথে অর্থব্যয়, আর পশ্চাতে রেখে যাওয়ার অর্থ পরিত্যক্ত সম্পদ রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারীদের জন্য। আবার কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— কে পারলৌকিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছে ইহলৌকিকতার উপর। অথবা এর বিপরীত। অর্থাৎ দু'টো ব্যাপারেই অবহিত করা হবে তাকে প্রতিফল দিবসে।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'বস্তুত মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত'। একথার অর্থ— পার্থিব বিষয়াদিতে মানুষ খুবই সচেতন। অসচেতন কেবল পারলৌকিক বিষয়ে। এখানকার 'বাসীরাহ্' শব্দটিতে 'তা' প্রযুক্ত হয়েছে আধিক্য প্রকাশার্থে। অর্থাৎ নিজের বিষয়ে সে খুবই সচেতন। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট'। এরকম বলেছেন আবুল আলীয়া ও আতা। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবীও এরকম ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। এমনও বলা যেতে পারে যে, 'বাসীরাহ্' এর বিশেষ্য এখানে রয়েছে উহ্য। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বস্তুত মানুষ নিজেই তার নিজের অবস্থার সম্যক দ্রষ্টা।

অথবা 'বাসীরাহ্' অর্থ এখানে প্রমাণ। অর্থাৎ মানুষ নিজেই তার নিজের বিরুদ্ধের প্রমাণ। কেননা প্রত্যক্ষ-দর্শীরা স্বয়ং সাক্ষ্যপ্রমাণ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমাদের প্রভুপালকের পক্ষ থেকে অবশ্যই এসেছে প্রমাণ'। কিংবা 'বাসীরাহ্' অর্থ এখানে নিয়োজিত ফেরেশতা, যারা মানুষের কৃতকর্ম লিপিবদ্ধকারী, যারা উপস্থাপন করবে সাক্ষ্য প্রমাণ। মুকাতিল ও কালাবী কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মানুষের জন্য নিযুক্ত রয়েছে কতিপয় সাক্ষ্যদাতা। তারা মহাবিচারের দিবসে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। তারা হচ্ছে— চোখ, কান ও হাত-পা। অর্থাৎ 'বাসীরাহ্ অর্থ এখানে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অথবা বলা যায়, এখানে উহ্য রয়েছে একটি যের প্রদানকারী অব্যয়। অর্থাৎ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাই তার বিরুদ্ধ-সাক্ষ্য। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ইন আরাত্তুম আন্

www.eelm.weebly.com

তাসতারদ্বাউ’ আওলাদুকুম’। এখানেও যের প্রদানকারী ‘আওলাদুকুম’ এর পূর্বে উহ্য রয়েছে ‘লি’। তেমনি এখানেও ‘আল ইনসান’ (মানুষ) এর পূর্বে ‘লি’ অব্যয়টি উহ্য থাকা অসম্ভব নয়।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— ‘যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে’। এখানকার ‘মাআ’জীরাহ্’ বহুবচন ‘মিজার’ এর ‘মাআ’জীরাহ্’ অর্থ অজুহাতের অবতারণা করে। পর্দাকে বলা হয় ‘মিজার’। একারণেই জুহাক ও সুদ্দী আয়াতখানিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মানুষ তার ঘরের জানালা-দরজার পর্দা লাগিয়ে, এমনকি জানালা-দরজা অর্গলাবদ্ধ করেও যদি কোনো অপকর্ম করে, তবুও তা গোপন থাকবে না। কেননা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই হবে তার প্রতিপক্ষীয় সাক্ষী। তদুপরি সাক্ষী রয়েছে ফেরেশতারা। আর আল্লাহ্ তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ।

মুজাহিদ, কাতাদা ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মানুষ সেদিন শত অজুহাত খাড়া করলেও, সহস্র বচসা-বাদানুবাদ করলেও কোনো লাভ হবে না। কেননা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘তখন জালেমদের অজুহাত কোনো কাজে আসবে না’।

ফাররা বলেছেন, মানুষ যদিও সেদিন নানা অজুহাতের অবতারণা করবে, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকেই সেগুলোকে আবার করবে নাকচ। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে ‘তোমাদের কথা তোমাদের বিরুদ্ধেই নিক্ষেপ করো, নিশ্চয়, তোমরা মিথ্যাবাদী’। এসকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, এখানকার ‘মাআ’জীর’ শব্দটি বহুবচন ‘মাআ’জুরাত’ এর। অবশ্য এরূপ শব্দোৎসারণ রীতি নিপাতনে সিদ্ধ। যেমন নিপাতনে সিদ্ধ ‘মুনকার’ এর বহুবচন ‘মানাকীর’। ‘মাআ’জীর’ এবং ‘মানাকীর’ দুটো শব্দই আবার বহুবচনীয় নামপদ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত জিবরাইল প্রত্যাদেশিত বাণী যখন পাঠ করে শোনাতেন, তখন রসুল স.ও সাথে সাথে তা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পাঠ করতেন এই ভেবে যে, তিনি স. যেনো তা আবার ভুলে না যান। বিষয়টি ছিলো তাঁর জন্য বিব্রতকর। তাঁর এমতো বিব্রতকর অবস্থা ফুটে উঠতো তাঁর চোখে-মুখেও। এমতো অবস্থার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াতসমূহ ’ বলা হয়—

সূরা ক্বিয়ামাহ্ ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ﴿١٦﴾ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٧﴾

فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٨﴾ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ﴿١٩﴾

r তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করিবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা উহার সহিত সঞ্চালন করিও না।

r ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাইবার দায়িত্ব আমারই।

www.eelm.weebly.com

r সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর,

r অতঃপর ইহার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! প্রত্যাদেশিত বাণী আয়ত্ত করবার মানসে আপনি তা তড়ি-ঘড়ি করে আওড়াবেন না। ব্যতিব্যস্ত হয়ে অতি দ্রুত করবেন না রসনা-সঞ্চালন। বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. আশংকা করতেন, তিনি স. প্রত্যাদেশিত বাণী আবার যেনো ভুলে না যান। তাই তিনি স. প্রত্যাদেশকালেও তা ঘন ঘন আওড়াতে থাকতেন।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমার'। একথার অর্থ— হে প্রত্যাদিষ্টপুরুষ! আপনি তো আমার প্রত্যাদেশের ধারক, বাহক ও প্রচারক। সুতরাং প্রত্যাদেশিত বাণী যাতে যথাযথভাবে আপনার স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকে এবং আপনি যেনো তা যখনই প্রয়োজন হবে তখনই সুষ্ঠুভাবে পাঠ করতে পারেন, তার দায়িত্ব তো ন্যস্ত আমার উপরেই। সুতরাং আপনি দুঃশ্চিন্তিত হবেন কেনো?

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি, তুমি সেই পাঠের অনুসরণ করো'। এখানে 'আমি তা পাঠ করি' অর্থ যখন আমার দূত জিবরাইল তা পাঠ করে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! এখন থেকে আপনি এই নিয়মটি মেনে চলুন— প্রথমে জিবরাইল তার পাঠ শেষ করবে, তারপর আপনি শুরু করবেন আপনার আবৃত্তি। এভাবেই দেখবেন, সকলকিছুই আপনি অবিকল স্মৃতিবদ্ধ করে ফেলেছেন। উল্লেখ্য, এই নিয়মটিই অনুসৃত হয় শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে। প্রথমে শিক্ষক বলেন, পরে বলে ছাত্ররা।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে—'অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমার'। একথার অর্থ— স্মৃতিস্থ ও পঠিত হওয়ার পর যে বিষয়টি বাকী থাকে, তা হচ্ছে প্রত্যাদেশাবলীর যথাব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। এ দায়িত্বটিও আপনি ছেড়ে দিন আমার উপরে। আপনার হৃদয়ে আমি যেমন সৃষ্টি করে দিবো প্রত্যাদেশাবলীর যথার্থ বোধ, তেমনি প্রচারকালে আপনার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত করবো এর নির্ভুল ব্যাখ্যা।

আমি বলি, কোরআনের কোনো কোনো আয়াত 'মুহকামাত' (সুস্পষ্ট) এবং কোনো কোনো আয়াত 'মুতাশাবিহাত' (রহস্যাচ্ছন্ন, দুর্জ্ঞেয়)। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. উভয় প্রকার আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে ছিলেন সম্যক অবগত। অর্থাৎ তাঁর কাছে সকল আয়াতের মর্মার্থ ছিলো সুস্পষ্ট। এরকম হওয়াই শোভন ও সমীচীন। অন্যথায় প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য হয়ে যায় ব্যর্থ। তদুপরি, তা হয়ে যায় আলোচ্য আয়াতের প্রতি সরাসরি অস্বীকৃতি। আমরা বিষয়টিকে সবিস্তারে উল্লেখ করেছি 'আল্লাহ্ ব্যতীত তার তাৎপর্য কেউ জানে না' এই আয়াতের ব্যাখ্যায়।

www.eelm.weebly.com

এখানকার 'ছুম্‌মা' (অতঃপর) শব্দটির মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সম্বোধনকালে যদি বক্তব্য পরিষ্কার করে দেওয়া না হয়, তাতে অসুবিধার কিছু নেই। কিছুকাল পরেও তার ব্যাখ্যা প্রদান সিদ্ধ। তবে তা সিদ্ধ হবে অনিবার্যতা ব্যতীত। আগের আয়াতের (১৬) 'রসনা সঞ্চালন কোরো না' বাক্যটি বিপত্তিমূলক। কেননা বক্তা যাকে লক্ষ্য করে কথা বলতে চায়, সে যদি নিজেই তার কথার মধ্যে কথা বলতে থাকে, তখন বক্তা তাকে এরকম করতে নিষেধ করে দেয়। যেমন তখন বক্তা বলে, কথার মধ্যে কথা বলছো কেনো? প্রথমে শোনো আমি কী বলি। এই কথাগুলি বিজ্ঞপ্তিমূলক। আর এধরনের কথা বক্তার মূল বক্তব্য বিষয় নয়। এরকম বলার পরই বক্তা ফিরে যায় তার মূল বক্তব্যে। এখানেও ঘটেছে তেমনই। সাময়িক বিরতির পর পরবর্তী আয়াত থেকে শুরু হয়েছে মূল বক্তব্য এভাবে—

সূরা ক্বিয়ামাহ্ আয়াত ঃ ২০, ২১, ২২, ২৩

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَ تَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٢١﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

- না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস;
- এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর।
- সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইবে,
- তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে।

প্রথোমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আসলে পৃথিবীপ্রসক্ত। আখেরাতকে উপেক্ষা করাই তোমাদের স্বভাব। এখানে 'ইউহিব্বুনা' অর্থ ভালবাসে এবং 'তাজারূনা' অর্থ উপেক্ষা করে।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে — সেদিন কোনো কোনো মুখ উজ্জ্বল হবে (২২), তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে' (২৩),। এখানকার 'উজুহুন' (মুখমণ্ডল) হচ্ছে উদ্দেশ্য। এর পূর্বে উহ্য রয়েছে একটি সম্বন্ধপদ। অর্থাৎ যারা আল্লাহর নৈকট্যভাজন, প্রতিফল দিবসে তাদের মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল। এখানে বিশেষণও রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ কোনো কোনো মুখমণ্ডল। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে 'উজুহুন' এর সঙ্গে যুক্ত হবে 'মিনহুম' (তাদের মধ্যে)। 'ইয়াওমাইজিন' অর্থ সেদিন, প্রতিফল প্রদানের দিন। 'নাদ্বিরাহ্' অর্থ উজ্জ্বল, সতেজ, সৌন্দর্যমণ্ডিত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— প্রতিফল দিবসে মানুষের মধ্যে ওই সকল মানুষের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, যারা আল্লাহর নৈকট্যভাজন।

'ইলা রব্বিহা' অর্থ প্রতিপালকের দিকে। 'নাজিরাহ্' অর্থ তাকিয়ে থাকবে। অর্থাৎ ওই সকল উজ্জ্বল মুখাবয়ববিশিষ্ট সৌভাগ্যবানেরা সেদিন আল্লাহ্‌র দিকে তাকিয়ে থাকবে পরম পরিতৃপ্তি ও মুগ্ধতার সঙ্গে। বলাবাহুল্য, তাদের এমতো দর্শন হবে স্থান-কাল-পাত্রের অতীত, আনুরূপ্যবিহীন। কেননা আল্লাহ্ আনুরূপ্যবিহীন।

www.eelm.weebly.com

‘কিতাবুর রুইয়াত’ গ্রন্থে উল্লেখিত আজরী ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার ‘নাদ্বিরাহ্’ অর্থ অনিন্দ্য সুন্দর। আর ‘ইলা রব্বিহা নাজিরাহ্’ অর্থ দৃষ্টিপাত করবে প্রভুপালকের দিকে। হাসান বসরী এবং আরো অনেকে এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের একজন জান্নাতবাসী তার উদ্যান, সঙ্গিনী, সুখোপকরণসমূহ, পরিচারক-অনুচর ও মশারীগুলো ঘুরে ফিরে পরিদর্শন করবে একমাসের পথের সমান দূরত্ব অতিক্রম করে। আর সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদাধারী জান্নাতবাসী প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় লাভ করবে আল্লাহ্র মহিমময় দীদার। এরপর রসুল স. আবৃত্তি করলেন আলোচ্য আয়াত। আহমদ, তিরমিজি, দারাকুতনী, লালকায়ী, আজারী। আজারীর বর্ণনায় এসেছে, সবচেয়ে নিম্নমর্যাদাধারী জান্নাতির রাজত্বের পরিধি হবে দুই হাজার বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। সে তার পুরো এলাকাই দেখতে পাবে একসঙ্গে। দূর ও নিকট তার চোখে প্রতিভাসিত হবে একই লহমায়।

আল্লাহ্দর্শন প্রসঙ্গে হজরত আনাস থেকে বাযযার, তিবরানী, বায়হাকী, আবু ইয়ালা ও ইসপাহানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, শুক্রবারে জান্নাতে আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন আবির্ভাব ঘটবে সর্বাধিক বরকতের সঙ্গে। এজন্যই শুক্রবারকে বলা হয় ‘ইয়াওমুম্ মাজ্বীদ’ (আধিক্যের দিন)।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আজারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতবাসীরা প্রতি শুক্রবার তাদের প্রিয়তম আল্লাহ্র দর্শন লাভ করবে। হাসান বসরী থেকে প্রায়োন্নত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, প্রতি শুক্রবারে স্বর্গের অধিবাসীরা তাদের প্রভুপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে নির্ণিমেষ নেত্রে। হাদিসটি উদ্ধার করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে সালাম। সর্বোন্নত সূত্রে হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমি তার প্রিয় দু'চোখের অধিকারী হবো। প্রতিদানে সে বাস করবে আমারই গৃহে (জান্নাতে)। নির্ণিমেষ নেত্রে অবলোকন করবে কেবল আমাকে।

হজরত জারীর বাজালী বলেছেন, একরাতে আমরা কয়েকজন উপবিষ্ট ছিলাম রসুল স. এর সুমহান সংসর্গে। আকাশে শোভা পাচ্ছিলো পূর্ণিমার পূর্ণশশী। সে দিকে ইঙ্গিত করে তিনি স. বললেন, নিশ্চয় তোমরা দেখতে পাবে তোমাদের প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তাকে, যেমন এখন দেখতে পাচ্ছো চতুর্দশীর চাঁদ। ওই দর্শন হবে অনন্তরাল। সুতরাং উদয়াস্তের পূর্বের নামাজের রক্ষণাবেক্ষণ কোরো। বোখারী, মুসলিম। হজরত হুজায়ফা থেকে লালকায়ীও এরকম বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম।

হজরত জায়েদ ইবনে ছাবেত বলেছেন, রসুল স. দোয়া করতেন, হে আমার পরম সখা! তোমা সকাশে আমি প্রার্থনা করি, পরবর্তী পৃথিবীতে তুমি আমাকে দান কোরো সৌভাগ্যময় জীবন। দিয়ো তোমার দীদার। হজরত উবাদা ইবনে সামেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, মৃত্যুর পূর্বে তোমরা তোমাদের

www.eelm.weebly.com

প্রভুপালনকর্তাকে দেখতে পাবে না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে লালকায়ীও এরকম বর্ণনা করেছেন। আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. প্রার্থনা জানালেন, 'হে আমার প্রভুপালয়িতা! দ্যাখা দাও। তারপর 'তারা তাদের প্রভুপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে' এই আয়াত পাঠ করে বললেন, আল্লাহ্ নবী মুসাকে জানিয়ে দিয়েছেন, পৃথিবীতে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। দেখবে শুধু জান্নাতবাসীরা। তাদের দৃষ্টি সেখানে বিপর্যস্ত হবে না। আর তারাও হবে না কখনো বৃদ্ধ। 'যারা তাদের প্রভুপালনকর্তার সাক্ষাত লাভে আগ্রহী, তারা যেনো পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে' এই আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত আলী বলেছেন, যারা আল্লাহ্র দীদারের অনুরাগী, তাদের জন্য পুণ্যপরায়ণ হওয়া অপরিহার্য। তারা যেনো কখনোই তাদের প্রভুপালকের সমকক্ষ অথবা অংশীদার নির্ধারণ না করে। সারকথা কোরআন মজীদের অনেক আয়াত দ্বারা আল্লাহ্র দীদার সন্দেহাতীতরূপে সুপ্রমাণিত। যেমন 'ফামান কানা ইয়ারজু লিক্বাআ রব্বিহী ফাল ইয়া'মাল আ'মালান সলিহা' 'লিল্লাজীনা আহসানুল হুসনা ওয়া যিয়াদাহ', 'লাদাইনা মাযীদ' ইত্যাদি। এছাড়া রসুল স. তাঁর প্রিয় সহচরবৃন্দ, তাঁদের অনুসারী এবং তাঁদের অনুসারীগণ কর্তৃক দীদারের সত্যতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ব্যাপকভাবে। হাদিসবেত্তাগণ তাই মন্তব্য করেন, বিষয়টি উপনীত হয়েছে সুবিদিত পর্যায়ে। আল্লামা সুয়ূতী এবং প্রথিতযশা কোরআনব্যাখ্যাতা ও হাদিসবেত্তা তাই বিষয়টিকে গ্রহণ করেছেন অত্যাবশ্যকীয় বিশ্বাসরূপে। অর্থাৎ বিশ্বাসটি ঐকমত্যসম্মত, যার অস্বীকারকারীরা অবশ্যই কাফের।

পথভ্রষ্ট মুতাজিলা ও খারেজী সম্প্রদায় বলে, দীদার অসম্ভব। তাদের যুক্তি হচ্ছে, যা দৃষ্টির আয়ত্ত, তা অবশ্যই আকারসম্ভূত ও স্থানবিশিষ্ট। অথচ আল্লাহ্ স্থান, আকার ও নিরাকারের অতীত। এমতো যুক্তির কারণেই তারা আলোচ্য আয়াতের 'নাজিরাহ্' (তাকিয়ে থাকবে) কথাটির অর্থ করে, অপেক্ষমান থাকবে। কিন্তু তাদের এমতো অর্থোদ্ধার প্রচেষ্টা আরবী ভাষার ব্যাকরণরীতিসিদ্ধ নয়। কেননা 'ইনতেজার' (অপেক্ষা) ক্রিয়ার কর্মপদের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় 'লাম' অব্যয়। 'ইলা' (দিকে) অব্যয় নয়। আর চোখে দেখা ক্রিয়ার পর কর্মপদে ব্যবহৃত হয় 'ইলা' অব্যয়। এখানে সেরকমই হয়েছে। অর্থাৎ 'লি রব্বিহা' (তার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে) না বলে বলা হচ্ছে 'ইলা রব্বিহা' (তার পালনকর্তার প্রতি)।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিদ্বানগণ বলেন, দ্রষ্টব্যের জন্য কেবল মাত্র উপস্থিতিই যথেষ্ট। দর্শক তা দর্শন করবে জীবিতাবস্থায়, সজ্ঞানে, তার দৃষ্টি শক্তির সাহায্যে। যদি দ্রষ্টব্য উপস্থিত থাকে এবং দর্শক তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবে তার দর্শন তো ঘটবেই। এসকল শর্ত প্রযুক্ত হয় বস্তুগত দর্শনের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্পাককে এভাবে দর্শন করা অসম্ভব। কেননা তিনি বস্তুর অতীত, অদৃশ্যের অদৃশ্য। লক্ষণীয়, আল্লাহ্পাক সৃষ্টিজগতের প্রকাশ্য-গোপন, সংক্ষিপ্তি-বিস্তৃতি সকলকিছুই এক সঙ্গে দেখেন। তাঁর এমতো দর্শনের না আছে কোনো সীমা, না

www.eelm.weebly.com

আছে পার্থক্যরেখা। নিকট দূর বলেও কোনো কিছুর অস্তিত্ব এতে নেই। তার এমতো দর্শন তাঁর দৃষ্টিকে ক্লান্তও করে না কখনো। কেননা তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। সৃষ্টি এমতো বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত। এতদসত্ত্বেও বেহেশতে বেহেশতবাসীরা যে তাঁকে দেখবে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কেননা বিষয়টি সুপ্রমাণিত। তবুও কথা থেকে যায় যে, তাহলে সে দীদারের প্রকৃতি হবে কী রকম? অথবা তা কি সত্যিসত্যিই দীদার, না দীদার নামের অন্য কোনোকিছু? কেননা আল্লাহ্পাক বলেছেন 'লা তুদ্রিকুহুল আবসার' (তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন)। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইদরাক' শব্দটি। স্মর্তব্য, শুধু দেখার নাম 'ইদরাক' নয়। 'ইদরাক' হচ্ছে কোনোকিছুকে পুরোপুরি পরিবেষ্টন করা, কোনো কিছুর তথ্য ও তত্ত্বসমূহ পুরোপুরি আয়ত্ত করা। বলাবহুল্য, এরকম যোগ্যতা সৃষ্টির নেই, থাকা সম্ভবও নয়। তবে যাকে সে জানতে, বুঝতে, অবলোকন করতে পারে না, তাঁর সকাশে তার বিদ্যমানতা তো অসম্ভব নয়। আর এ বিষয়টিও অসম্ভব নয় যে, যদি তাঁর দর্শনকে বলা হয় তাঁরই মতো অবোধ্য ও আনুরূপ্যবিহীন। আর তা সংঘটিত হতে পারবে এখানে নয়, ওখানে, যে জগত, জগতবাসীরা অনশ্বর ও যারা আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

উপযোগ ঃ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতবাসীরা তাদের প্রভুপালকের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে এবং তারা তখন হবে উজ্জ্বল মুখাবয়ববিশিষ্ট। কেননা নামপদীয় বাক্যের (জুমলায়ে ইসমিয়ার) বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা কর্মকে করে নিরবচ্ছিন্ন ও প্রবহমান। হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ কেউ আল্লাহ্র দীদার পাবে সপ্তাহে একদিন এবং কেউ কেউ পাবে সপ্তাহে দুদিন। হজরত আবু উমামা থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া এরকমই বর্ণনা করেছেন। কারো কারো আবার দীদার ভাগ্যে জুটবে দুই ঈদের মতো বৎসরে দু'বার। আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ্ মাজানী থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে সালাম। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে এভাবেই। অবশ্যই নামপদীয় বাক্য হয় নিরবচ্ছিন্ন। সুতরাং বুঝতে হবে এখানেও বলা হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন দীদারের কথা। কিন্তু প্রত্যেক বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে যে এরকম ঘটবে, সেরকম কথা এখানে নেই। তবে একথা অবশ্যই বলা হয়েছে যে, এরকম সৌভাগ্যের অধিকারী হবে বিশ্বাসীগণের একটি বিশেষ দল। আর ওই দলটি যে আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। অর্থাৎ সেদিন যারা আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র, তাদেরই মুখাবয়ব হবে বিশেষভাবে সমুজ্জ্বল এবং বিশেষভাবে তারাই আল্লাহ্র দীদার লাভ করবে নিরবচ্ছিন্ন পরিবেশে।

আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, আবু ইয়াযিদ বোস্তামী বলেছেন, আল্লাহ্পাকের কিছু বান্দা এরকমও হবেন, যারা দীদার বিরতির সময় এমন করুণভাবে ফরিয়াদ জানাতে থাকবেন, যেমনভাবে জাহান্নামীরা ফরিয়াদ জানাতে থাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য। এতে করে বুঝা যায়, আল্লাহ্পাকের নৈকট্যভাজনতার স্তর হবে অসংখ্য। সে সকল স্তর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর

www.eelm.weebly.com

তা আমাদের দায়িত্বভূতও নয়। তাই আমরা এই হাদিস পর্যন্ত এসেই থেমে যেতে চাই যে, বেহেশতের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত জন যারা হবেন, তাঁরা আল্লাহ্র দীদার লাভ করবেন সকাল-সন্ধ্যায়। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে সকলের অগ্রণী হচ্ছেন নবী-রসুলগণ। তারপর তাঁরা যাঁরা আল্লাহ্র নৈকট্যধন্য। আনুরূপ্যবিহীনরূপে সতত আল্লাহ্র সত্তাসন্নিহিত। তাঁর অস্তিত্বে সতত স্নাত, মাঝে মাঝে বা বিরতি সহকারে নয়। এ পার্থিব জগত আল্লাহ্র দীদারের অন্তরায়। তাই পৃথিবীতে তাঁরা আল্লাহ্র দীদার পান না। কিন্তু আখেরাতে যেহেতু এ অন্তরায়টি আর থাকবে না, তাই সেখানে তাঁরা অবশ্যই পাবেন তাঁদের কাংখিত দীদার, সার্বক্ষণিকভাবে, এবং যাঁরা মাঝে মাঝে তাজাল্লি লাভ করেন, তাঁরা মাঝে মাঝে।

উপযোগ ঃ আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন যাঁরা, তাঁদের হৃদয়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ভালোবাসা থাকতেই পারে না। অথচ দেখা যায় হজরত ইয়াকুব তাঁর পুত্র হজরত ইউসুফের মহব্বতে ছিলেন পাগলপারা। পুত্রবিরহে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বিষয়টি বেশ রহস্যময়। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বিষয়টির রহস্য উদঘাটনে সমর্থ হয়েছেন। তিনি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— প্রত্যেক মানুষের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন উৎপত্তিস্থল (মাবদায়ে তাইয়ুন)। সে উৎপত্তিস্থলের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার কোনো না কোনো নাম অথবা গুণ। ওই নাম গুণই তাদের রব বা প্রতিপালক। পৃথিবীর জীবনে তাই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয় ওই বিশেষ বিশেষ নাম অথবা গুণের বিকাশ— তরুলতা, সাগর-নদী, সেবক-পরিচারক, বিভিন্নরূপে। এরকম বিকাশ ঘটবে জান্নাতেও। রসুল স. সেজন্যই বলেছেন, জান্নাতের মৃত্তিকা পবিত্র এবং সেখানকার পানি সুমিষ্ট। আর সেখানকার স্রোতস্বিনী এবং প্রাসাদ-বৃক্ষরাজি হবে 'সুবহানাল্লহ্' 'আলহামদুলিল্লাহ্' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' ও 'আল্লাহু আকবার'। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির কথাতেও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্তায়ালার নাম-গুণাবলীর জ্যোতি বিকিরীত হবে জান্নাতের প্রাসাদ-বৃক্ষরাজি- স্রোতস্বিনীর মধ্যে। জান্নাতবাসীরা তা দেখে হবে ধন্য, উল্লসিত, পরিতৃপ্ত। এরপর তাঁরা অধিকতর আনন্দিত ও মোহিত হবে তখন, যখন ঘটবে আল্লাহ্র সরাসরি দীদার। তখন জান্নাতের সুখোপকরণসমূহের জ্যোতি হয়ে যাবে নিষ্প্রভ। সেগুলো আবার সমুজ্জ্বল হবে দীদারে ছেদ পড়লে। এভাবে জান্নাতবাসীগণ অনন্তকাল ধরে শান্তি ও পরিতৃপ্তি পেতে থাকবেন কখনো আল্লাহ্র নাম-গুণাবলীর জ্যোতিচ্ছটা দর্শনে, আবার কখনো আল্লাহ্র আনুরূপ্যহীন দর্শনধন্য হয়ে।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি আরো বলেছেন, সুফী-আউলিয়াগণ পৃথিবীতে আল্লাহ্পাকের সত্তাসঞ্জাত জ্যোতিচ্ছটা (তাজাল্লিয়ে জাতি) লাভ করেন তাঁর নাম গুণাবলীর (আসমা-সিফাতের) জ্যোতিচ্ছটার আড়ালে থেকে। কখনো কখনো আবার এই আড়াল অপসারিতও হয়। তখন তাঁরা অবলোকন করেন বিদ্যুৎবৎ জ্যোতিচ্ছটা (তাজাল্লিয়ে বরকী)। পরকালের দর্শনও হবে এরকম—

www.eelm.weebly.com

কখনো নাম গুণাবলীর জ্যোতিচ্ছটার আড়াল থেকে, আবার কখনো আড়ালবিবর্জিত অবস্থায়, সরাসরি। তখন প্রত্যেক জান্নাতবাসীর মাবদায়ে তাইয়্যুন যে নাম ও গুণ, সেই নাম-গুণই প্রকাশিত হবে তার জান্নাতরূপে। কখনো কখনো জান্নাতের সুখপোকরণই হবে তাঁর প্রিয়তম দর্শনের দর্পন। আবার কখনো কখনো দর্শন হবে দর্পন ছাড়াই, সরাসরি। আমি বলি, এরকম অবস্থা হবে সাধারণ জান্নাতবাসীর। আর দর্পনবিবর্জিত সার্বক্ষণিক দর্শনধন্য হবেন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ। অথবা পৃথিবীতে যাঁরা সার্বক্ষণিকভাবে তাজাল্লিয়ে জাতির জ্যোতিচ্ছটাস্নাত, তাঁরাই তখন বিরতিহীনভাবে লাভ করবেন আল্লাহ্‌র দীদার।

সংশয় ঃ তাফসীরকারগণ বলেছেন, এখানকার 'ইলা রব্বিহা নাজিরাহ্' বাক্যের শুরুতে 'ইলা' ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের বিষয়বস্তুকে করেছে সীমিতার্থক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যখন আল্লাহ্‌পাক ইচ্ছা করবেন, জান্নাতবাসীরা তাঁর দিকে তাকাতে পারবেন তখনই। ওই সময় তাঁরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো দিকেই দৃষ্টিপাত করবেন না। একথার সমর্থন রয়েছে হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা আরাম আয়াশে মগ্ন থাকবে। অকস্মাৎ আলোকসম্পাত ঘটবে উর্ধ্বদেশ থেকে। তারা দৃষ্টি উত্তোলন করেই দেখতে পাবে তাদের প্রিয়তম প্রভুপালককে। আল্লাহ্ বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তিবারতা (সালামুন ক্বওলাম মির রব্বির রহীম)। এরপর আল্লাহ্ এবং তাঁর-বান্দাগণ তাকিয়ে থাকবে পরস্পরের দিকে। জান্নাতবাসীদের দৃষ্টি তখন অন্য কোনো দিকে যাবেই না। এক সময় নেমে আসবে যবনিকা। অন্তর্হিত হবে আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন সৌন্দর্যচ্ছটা। কিন্তু জান্নাতের সকল পরিসরে তখনো জেগে থাকবে তার রেশ। ইবনে মাজা, ইবনে আবিদ্দুনইয়া, দারাকুতনী।

এখন প্রশ্ন ঃ কিছুসংখ্যক লোকের জন্য যদি দীদার নিরবচ্ছিন্ন হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটিকে সীমিতার্থক বলার হেতু কী?

উত্তর ঃ বাক্যের শুরুতে যের প্রদানকারী অব্যয় ও যের প্রদত্ত পদ 'ইলা রব্বিহা' ব্যবহৃত হওয়ায় বক্তব্যটি সীমিতার্থক হয়েছে, এমনটি মেনে নেওয়া যায় না। বরং বলা যেতে পারে— এরকম করা হয়েছে যতিপাত ঘটাতে, ও ছন্দবদ্ধতার লক্ষ্যে। আর প্রিয়তম দর্শনের ক্ষেত্রে জান্নাতের অনুগ্রহসম্ভারসমূহ তো বিপত্তিকর কিছু নয়। বরং ওগুলো তো তাঁদের প্রিয়তমদর্শনের দর্পন। এভাবেই তো তাদের দর্শন হবে নিরবচ্ছিন্ন, কখনো দর্পনের মাধ্যমে, কখনো মাধ্যম ছাড়া। ফলে জান্নাতের সুখোপকরণসমূহ সম্ভোগের ক্ষেত্রেও কোনো বাধা সৃষ্টি হবে না। অর্থাৎ এক অবস্থা তাদেরকে অন্য অবস্থা থেকে করতে পারবে না উদাসীন। তবে সাধারণ জান্নাতবাসীদের ক্ষেত্রে তাদের সুখোপকরণসমূহ সৃষ্টি করবে অন্তরায়। তারা যখন জান্নাতমুখী হবে তখন আল্লাহ্‌মুখী হতে পারবে না। আবার যখন আল্লাহ্‌মুখী হবে, তখন আর খেয়াল রাখতে পারবে না জান্নাতের দিকে। আর এরকম ঘটবে তাদের যোগ্যতার অভাবের কারণেই।

www.eelm.weebly.com

অথবা প্রশ্নটির জবাব দেওয়া যেতে পারে এভাবে— আলোচ্য আয়াতকে সীমিতার্থক বলার অর্থ, ওই সকল লোককে সুনির্দিষ্ট করা, যাদের ভাগ্যে জুটবে নিরবচ্ছিন্ন দীদারের সৌভাগ্য। আর হজরত জাবেরের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সাধারণ মর্যাদাবিশিষ্ট জান্নাতবাসীদের অবস্থা।

সংশয় ঃ একথা মেনে নিতে আর আপত্তি নেই যে, বেহেশতের অনুগ্রহ সম্ভারের প্রতি মনোনিবেশন প্রিয়তম দর্শনের ক্ষেত্রে বিপত্তি সৃষ্টি করবে না। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, তবে এমতাবস্থায় অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি মনোনিবেশনের প্রয়োজনই বা কী?

নিরসন ঃ আল্লাহ্পাকের নাম-গুণাবলীর বিকাশই হচ্ছে জান্নাত এবং তা প্রিয়তম দর্শনের দর্পনও বটে। তাহলে দর্পনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা অনাবশ্যকই বা হবে কেনো?

উপযোগ ঃ কোনো কোনো বিদ্বান বলেন, প্রিয়তমদর্শনের এই মহামূল্যবান সম্পদটি নির্ধারিত রয়েছে কেবল বিশ্বাসী মানুষের জন্য। এমন কি ফেরেশতামণ্ডলীও এমতো সম্পদ লাভ করতে পারবে না। কিন্তু বায়হাকী এ সম্পর্কে পোষণ করেন ভিন্ন মত এবং তাঁর অভিমতের সমর্থনে তিনি উপস্থাপন করেন এই হাদিস— হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্পাক তাঁর ইবাদত করার দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন আকার বিশিষ্ট ফেরেশতাকে। তাঁরা তাদের সৃষ্টিলগ্ন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সারিবদ্ধ হয়ে সম্পন্ন করে চলেছেন ইবাদত। মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবেন তাঁরা। মহাপ্রলয়ের পর আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে দান করবেন তাঁর দীদার। তাঁরা তখন আল্লাহ্পাকের আনুরূপ্যবিহীন সৌন্দর্যচ্ছটা অবলোকন করে বলবে, হে আমাদের পরম প্রভুপালয়িতা! আমরা তোমার যথাযথ ইবাদত করতে পারিনি। দ্বিতীয় সূত্রপরম্পরায় আদী ইবনে আরতাতের পদ্ধতিতে অনুরূপ একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে অন্য একজন সাহাবী কর্তৃক। আর আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি, প্রত্যেকে তার মাবদায়ে তাইয়্যুন (উৎসস্থল) অনুযায়ী লাভ করবে আল্লাহ্র দীদার। এতে করে বুঝা যায়, সাধারণ বিশ্বাসী অপেক্ষা সাধারণ ফেরেশতা শ্রেষ্ঠ। মানুষের ব্যক্তি-সত্তার চেয়ে ফেরেশতাদের ব্যক্তিসত্তাও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। মহামান্য মোজাদ্দেদে আলফে সানির তত্ত্বগত ব্যাখ্যাও সেরকমই বলে। তবে আমরা এ কথাও উল্লেখ করেছি যে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রিয়তম দর্শন হবে নিরবচ্ছিন্ন। এতে করে একথাও প্রমাণিত হয়ে যায় যে, বিশেষ মানুষ বিশেষ ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আকায়েদ সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীতে বিষয়টির আলোচনা করা হয়েছে সবিস্তারে।

সূরা ক্বিয়ামাহ্ ঃ আয়াত ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾

www.eelm.weebly.com

كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَ ﴿٢٦﴾ وَقِیْلَ مَنْ ٜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾
وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ اِلٰی رَبِّكَ یَوْمَئِذِ ﮐ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

q কোন কোন মুখমণ্ডল হইয়া পড়িবে বিবর্ণ,

q আশংকা করিবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাহাদের উপর আপতিত হইবে।

q কখনো নয়, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে,

q এবং বলা হইবে, 'কে তাহাকে রক্ষা করিবে?'

q তখন তাহার প্রত্যয় হইবে যে, ইহা বিদায়ক্ষণ।

q এবং পায়ের সংগে পা জড়াইয়া যাইবে।

q সেই দিন তোমার প্রভুর নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— সেদিন কোনো কোনো লোকের মুখমণ্ডল হবে বিবর্ণ, বিকৃত। আর তারা এই ভেবে আতংকিত হয়ে পড়বে যে, চরম বিপদকবলিত হওয়া ব্যতিরেকে তাদের নিস্তার নেই। অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় তাদেরকে আঘাত করবেই। 'ফাক্বিরাহ' অর্থ এমন বিপদ, যা আঘাত করে মেরুদণ্ডে। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে 'ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়' অর্থ অবধারিত নরকগমন। আর কালাবী বলেছেন, প্রিয়তমজন দর্শন থেকে বঞ্চিতি।

পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'কখনো নয়, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে'। 'কাল্লা' অর্থ কখনোই নয়। অর্থাৎ পরকাল অপেক্ষা ইহকালকে অধিক মূল্যবান মনে করার বিষয়টি কখনোই অনুমোদনযোগ্য নয়। 'ইজা বালাগাতিত্ তারাক্বিয়া' অর্থ যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। এখানে 'ইজা' (যখন) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শর্ত হিসেবে। এর জবাব হচ্ছে 'সেদিন তোমার প্রভুর নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে' (৩০)। আর 'ইজা' কে যদি এখানে ক্রিয়ার আধার হিসেবে ধরা হয়, তবে বুঝতে হবে ক্রিয়াটি রয়েছে এখানে অনুক্ত। অর্থাৎ তখনই তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুপালনকর্তার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে, যখন কণ্ঠাগত হবে তোমাদের প্রাণ। 'তারাক্বী' বলে কণ্ঠনালীর দু'পাশে অবস্থিত বঙ্কিম অস্থিদু'টোকে। এখানে 'যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে' অর্থ যখন সমুপস্থিত হবে মৃত্যু।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'এবং বলা হবে, কে তাকে রক্ষা করবে'? কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন— মৃত্যুপথযাত্রী, অথবা তার পাশে উপস্থিত লোকেরা তখন বলে, বাঁচাও। মন্ত্রটন্ত্র কিছু পাঠ করে ফুঁ দাও। সুলায়মান তাইমী এবং মুকাতিল ইবনে সুলায়মান অর্থ করেছেন— মৃত্যুদূতের সহযোগী ফেরেশতারা তখন বলে, এ লোকের আত্মাকে হস্তগত করবে কে? স্বস্তি না শাস্তির ফেরেশতা? এখানকার 'রক্ব' (রক্ষা) শব্দটির ধাতুমূল হচ্ছে 'রক্বইয়ুন'।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'তখন তার প্রত্যয় হবে যে, এটা বিদায়ক্ষণ'। একথার অর্থ— প্রাণ কণ্ঠাগত হলে মৃত্যুপথযাত্রী ভালোভাবেই একথা বুঝতে পারবে যে, এটাই পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের সময়।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'এবং পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে'। শা'বী, হাসান বসরী প্রমুখ কথাটির অর্থ করেছেন— তখন এক পাঁজরের সঙ্গে মিশে যাবে আর এক পাঁজর। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'সাক্ব' অর্থ ইহকাল ও পরকাল। মৃত্যুই হচ্ছে ইহকাল ও পরকালের মিলনমুহূর্ত, মানুষের জন্য এক অনপনেয় সংকট, পৃথিবী থেকে চিরবিদায় এবং অনন্তকালের দিকে অনিশ্চিত যাত্রা। জুহাক বলেছেন, পৃথিবীবাসীরা তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ে তার মরদেহ সৎকারের বিষয়ে, আর ফেরেশতারা ব্যস্ত হয় তার আত্মা নিয়ে।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'সেদিন তোমার প্রভুর নিকট সকলে প্রত্যানীত হবে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! মৃত্যুর পর, অথবা পুনরুত্থান দিবসে আপন আপন কৃতকর্মের হিসাব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য সকলকে তাদের প্রভুপালনকর্তার সমীপে উপস্থিত হতেই হবে। এর অন্যথা হওয়া সম্ভবই নয়।

সূরা ক্বিয়ামাহ্ ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ۙ﴿٣١﴾ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۙ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى
اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ؕ﴿٣٣﴾ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۙ﴿٣٤﴾ ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ؕ﴿٣٥﴾

r সে বিশ্বাস করে নাই এবং সালাত আদায় করে নাই।
r বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল।
r অতঃপর সে তাহার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরিয়া গিয়াছিল দম্ভভরে,
r দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!
r আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— তারা আল্লাহ্র রসুল ও আল্লাহ্র বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি। নামাজ পাঠ করেনি। জাকাতও দেয়নি।

এই আয়াতের যোগসূত্র রয়েছে 'মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারবো না' (৩) আয়াতের সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তারা মনে করে মৃত্যুর পর আমি তাদের অস্থিসমূহকে পুনঃসংযোজিত করতে পারবো না। তাদের পুনরুত্থান কখনো হবেই না। সেকারণেই তো তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের উপর ইমান আনে না। নামাজ পড়ে না। জাকাত দেয় না। এখানকার 'সদ্দাক্বা' এবং 'সল্লা' পদ দু'টির সর্বনাম পদ প্রত্যাবৃত হবে

www.eelm.weebly.com

৩ সংখ্যক আয়াতের 'মানুষ' কথাটির প্রতি। এভাবে বক্তব্যভঙ্গিটির প্রতি লক্ষ্য করলে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এর লক্ষ্য আদী ইবনে রবীয়া। কিন্তু বাগবী লিখেছেন, রবীয়া নয়, আবু জেহেল। উল্লেখ্য, 'আল্‌ইনসান' এর 'আল' অব্যয়টিকে যদি সীমিতার্থক ধরা হয়, তবেই কেবল ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিষ্ট করা যায়— সে রবীয়া, বা আবু জেহেল, যে-ই হোক না কেনো। আর 'আল' যদি হয় জাতিবাচক, তবে এখানে 'মানুষ' দ্বারা উদ্দেশ্য হবে রবীয়া, আবু জেহেল সহ সকল অবিশ্বাসী ও বেনামাজী।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'বরং সে সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিলো ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো'। একথার অর্থ— নামাজ-জাকাত ও বিশ্বাস পরিত্যাগ করেই সে ক্ষান্ত হয়নি, সত্যের প্রতি প্রদর্শন করেছে চরম অবজ্ঞা, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে চিরতরে। অনুতপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাকে করেছে চিররুদ্ধ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে তার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিলো দম্ভভরে (৩৩), দুর্ভোগ তোমার জন্য দুর্ভোগ (৩৪)। আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য দুর্ভোগ' (৩৫)। এখানে 'ইয়াতামাত্‌ত্ব' অর্থ দম্ভভরে ফিরে গিয়েছিলো, প্রত্যাবর্তন করেছিলো দ্রুতগতিতে। 'কামুস' অভিধানগ্রন্থে রয়েছে 'মাত্বা ফী সাইরিহী' (সে চলেছে দ্রুতগতিতে)। 'সিহাহ্‌' রচয়িতা জাওহারী লিখেছেন, কথাটির অর্থ গর্বিত পদক্ষেপে চলা। কেউ কেউ বলেছেন, বুক উঁচু করে চলা। আর এখানকার 'দুর্ভোগ, তোমার জন্য দুর্ভোগ' কথাটি একটি ভীতি-ভর্ৎসনা প্রদর্শক অপপ্রার্থনা। ইতোপূর্বে 'ইনসান' (মানুষ) এর সর্বনাম 'সে' সহযোগে বাক্য উপস্থাপন করা হয়েছিলো, আর এখানে বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো ভিন্নতররূপে, মধ্যম পুরুষে। আর কথাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে বক্তব্যটিকে গুরুত্ব প্রদানার্থে। আবার এরকমও হতে পারে যে, প্রথমে বলা হয়েছে ইহজগতের দুর্ভোগের কথা এবং পরে দুর্ভোগ কামনা করা হয়েছে পরকালের। অর্থাৎ ইহকালে যুদ্ধে হতাহত হওয়া এবং পরকালে ভোগ করা দোজখের আযাব। কিংবা প্রথম বাক্যে দু'বার 'আওলা' (দুর্ভোগ) বলা হয়েছে জীবন-যাপনে ও মৃত্যুকালে বিপর্যয় কামনার্থে এবং পরের দুই 'দুর্ভোগ' অর্থ মহাবিচারের দিবসের আতংক এবং দোজখের শাস্তি। এর বিপরীতে যেমন নবী ইয়াহ্‌ইয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে 'আর শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি তার জন্মগ্রহণকালে, অন্তিম যাত্রার সময় এবং পুনরুত্থান দিবসে।

এখানে বার বার 'দুর্ভোগ' কামনা করে অভিসম্পাত করা হয়েছে আদী, আবু জেহেল প্রমুখ দাম্ভিক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি এবং উদ্ধৃত আয়াতে অভিবাদন জ্ঞাপন করা হয়েছে নবী ইয়াহ্‌ইয়ার প্রতি। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, এখানে পার্থক্যসূচক বিশেষণীয় শব্দরূপে 'আওইয়ালু' শব্দটি সাধিত হয়েছে ধাতুমূল 'ওয়াইলু' থেকে, যার লিখিতরূপ 'আওলা'। এর অর্থ ধ্বংসাত্মক দুর্ভোগ।

www.eelm.weebly.com

যেমন ধাতুমূল ‘দুনা’ থেকে সাধিত বিশেষণীয় শব্দরূপ ‘আওদানুন’ যার লিখিত রূপ ‘আদ্‌না’। অথবা বলা যায় ‘আওলা’ শব্দরূপটি এখানে অতীতকালবোধক। আর এখানকার ‘লাকা’ পদের ‘লাম’ অব্যয়টি অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমার ধ্বংস সাধিত হোক। যেমন বলা হয় ‘আওলাকাল্লহু মা তুকরাহুহু’ (আল্লাহ্ তোমাকে সেটাই দান করবেন, যাতে তোমার অরুচি)। কেউ কেউ বলেছেন, বক্তব্যটি হবে এরকম— ‘আওলা লাকাল হালাক্ব’ (তোমার ধ্বংসই তোমার জন্য মঙ্গল)। ‘কামুস’ গ্রন্থে বলা হয়েছে ‘আওলা লাকা’ বাক্যটি তিরস্কারসূচক। এর উদ্দেশ্য একথা বলা যে, ধ্বংস তোমার সন্নিকটবর্তী। এমতাবস্থায় বলতে হয়, ‘আওলা’ শব্দটি সাধিত হয়েছে ‘ওয়ালীউন’ ধাতুমূল থেকে, যার অর্থ সন্নিকটবর্তী।

কাতাদা বলেছেন, আমাদের নিকট এই তথ্যটি পৌঁছেছে যে, আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. বুতহা নামক স্থানে আবু জেহেলকে পেয়ে তার পরিধেয় বস্ত্র আকর্ষণ করে পাঠ করলেন ‘দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য দুর্ভোগ’। আবু জেহেল বললো, মোহাম্মদ! তুমি কি আমাকে ধমক দিচ্ছো? আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না, তোমার পালনকর্তাও নয়। তুমি তো ভালো করেই একথা জানো যে, আমি এই পার্বত্য শহরের একজন অত্যন্ত বলশালী ব্যক্তি। বলাবাহুল্য, তার এমতো দর্প পূর্ণরূপে চূর্ণ করা হয়েছিলো বদর যুদ্ধে তার জীবনলীলা সাঙ্গ করে দেওয়ার মাধ্যমে। রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক নবীর উম্মতের মধ্যে থাকে একজন করে ফেরাউন। আর আমার উম্মতের ফেরাউন হচ্ছে আবু জেহেল।

আউফির মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন সুরা মুদ্‌দাস্‌সিরের ৩০ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হলো, বলা হলো ‘সাকার এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে ঊনিশ জন প্রহরী’ তখন আবু জেহেল তার সঙ্গী-সাথীদেরকে বললো, তোমাদের মায়েরা তোমাদের জন্য কেঁদে মরুক! শুনেছো কাবশার ব্যাটা কী বলে? জাহান্নামে নাকি নিযুক্ত আছে মাত্র ঊনিশজন প্রহরী। তোমরা তো এক একজন মস্ত বড় পালোয়ান। কী? দশজনে মিলেও কি তোমরা একজন পাহারাদারকে কাবু করতে পারবে না? কী? জবাব দিচ্ছো না কেনো? তার এমতো আস্ফালনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌পাক প্রত্যাদেশ করলেন, হে আমার রসুল! আপনি আবু জেহেলের কাছে যান এবং তাকে পাঠ করে শোনান ‘আওলা লাকা ফা আওলা। ছুম্মা আওলা লাকা ফা আওলা’।

নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, একবার সাঈদ ইবনে যোবায়ের হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মান্যবর! রসুল স. কি নিজে থেকে আবু জেহেলকে ‘দুর্ভোগ তোমার জন্য’ কথাগুলো বলেছিলেন, না এটা ছিলো তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ। তিনি জবাব দিলেন, প্রথমে তিনি নিজে থেকেই আবু জেহেলকে কথাগুলো শুনিয়ে দিয়েছিলেন। পরে আল্লাহ্‌পাক ওই কথাগুলোকেই অবতীর্ণ করেন প্রত্যাদেশরূপে।

www.eelm.weebly.com

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ
يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ
الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

r মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে?

r সেকি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না?

r অতঃপর সে 'আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাহাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন'।

r অতঃপর তিনি তাহা হইতে সৃষ্টি করেন যুগল— নর ও নারী।

r তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম নহে?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মানুষ ভেবেছে কী? তাকে কি এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ্র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা বহনের দায়িত্ব তাকে বহন করতে হবে না? ঘটানো হবে না পুনরুত্থান? প্রতিফল দিবসে দেওয়া হবে না তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল? উল্লেখ্য, পৃথিবীতে মানুষকে প্রেরণ করা হয়েছে এই পরীক্ষাটি সম্পন্ন করবার জন্য যে, কে আল্লাহ্র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞানুগত এবং কে নয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি জ্বিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ক্বুল মা ইয়াবাউবিকুম রব্বী লাও লা দুআ'উকুম'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিলো না (৩৭)? অতঃপর সে 'আলাকা'য় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাকে আকৃতিদান করেন ও সুঠাম করেন' (৩৮)। একথার অর্থ— আবু জেহেল এবং তার মতো লোকেরা এতো দম্ভ দ্যাখায় কিসের ভিত্তিতে? তারা কি জানে না, আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মাতৃগর্ভান্তরে অত্যন্ত অনুল্লেখ্য এক শুক্রকণা থেকে। তারপর সে শুক্রবিন্দুটিকে করেছি মাংসপিণ্ড, তারপর চর্মবেষ্টিত, অস্থিময়, তারপর তাতে ফুৎকার করেছি রূহ। অবশেষে তাদেরকে ভূমিষ্ঠ করেছি সুন্দর সুঠাম দেহবল্লরী সহকারে। যে আমি এরূপ অপূর্ব সৃজন ক্ষমতাসম্পন্ন, সেই আমি কেনো তাদেরকে পুনর্জীবিত করে ওঠাতে পারবো না পুনরুত্থান দিবসে? দ্বিতীয় সৃজন তো প্রথম সৃজন অপেক্ষা অবশ্যই সহজতর।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৩৯, ৪০) মর্মার্থ হচ্ছে— মানুষের জন্মায়নের এই পরিণতিকে আমি আবার করি দ্বিধাবিভক্ত। কাউকে করি নারী, কাউকে নর। তবুও কি তারা বলবে, আমি পুনরুত্থান ঘটাতে সক্ষম নই? কেনো বলবে? তারা কি এতোই নির্বোধ?

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরা তীনের শেষ আয়াত 'আ- লাইসাল্লহু বি আহকামিল হাকিমীন' পাঠ করে, তার বলা উচিত 'বালা ওয়া আনা আ'লা জালিকা মিনাশ শাহিদীন' (হে আল্লাহ্! হ্যাঁ, আমি একথার সত্যতার সাক্ষ্যদাতা)। আর যে ব্যক্তি পাঠ করে সুরা ক্বিয়ামাহ্'র শেষ আয়াত 'তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নয়' তারও বলা উচিত 'বালা ওয়া আনা আ'লা জালিকা মিনাশ শাহিদীন'। আর যে ব্যক্তি পাঠ করে সুরা মুরসালাতের আয়াত 'ফাবিআইয়্যি হাদিছিম্ বা'দাহু ইউমিনূন' তাকে বলতে হবে 'আমান্না বিল্লাহ'। আবু দাউদ।

মুসা ইবনে আয়েশা বর্ণনা করেছেন, একবার জনৈক সাহাবীকে দেখা গেলো, তিনি তাঁর গৃহের ছাদে নামাজ পাঠ করছিলেন। নামাজে আবৃত্তি করলেন 'আ-লাইসা জালিকা বিক্বাদিরিন আ'লা আঁইউহ্য়িইয়াল মাওতা'। তখন তিনি বললেন 'সুবহানা বালা'। লোকেরা পরে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এমন করলেন কেনো? তিনি বললেন, আমি রসুল স.কে এরকম করতে দেখেছি। আবু দাউদ।

সূরা দাহর

এই সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যধাম মদীনায়। এর মধ্যে রয়েছে ২রুকু এবং ৩১ আয়াত।

সূরা দাহ্র ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ○
هَلۡ اَتٰى عَلَى الۡاِنۡسَانِ حِيۡنٌ مِّنَ الدَّهۡرِ لَمۡ يَكُنۡ شَيۡـئًا مَّذۡكُوۡرًا ﴿١﴾
اِنَّا خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ نُّطۡفَةٍ اَمۡشَاجٍ ۖ نَّبۡتَلِيۡهِ فَجَعَلۡنٰهُ سَمِيۡعًۢا
بَصِيۡرًا ﴿٢﴾ اِنَّا هَدَيۡنٰهُ السَّبِيۡلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوۡرًا ﴿٣﴾ اِنَّاۤ
اَعۡتَدۡنَا لِلۡكٰفِرِيۡنَ سَلٰسِلَاۡ وَ اَغۡلٰلًا وَّ سَعِيۡرًا ﴿٤﴾ اِنَّ الۡاَبۡرَارَ
يَشۡرَبُوۡنَ مِنۡ كَاۡسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوۡرًا ﴿٥﴾ عَيۡنًا يَّشۡرَبُ بِهَا
عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوۡنَهَا تَفۡجِيۡرًا ﴿٦﴾

www.eelm.weebly.com

r কালপ্রবাহে মানুষের উপর তো এমন এক সময় আসিয়াছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

r আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মিলিত শুক্রবিন্দু হইতে, তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য; এইজন্য আমি তাহাকে করিয়াছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।

r আমি তাহাকে পথের নির্দেশ দিয়াছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হইবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হইবে।

r আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি শৃংখল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।

r সৎকর্মশীলেরা পান করিবে এমন পানীয় যাহার মিশ্রণ কাফূর—

r এমন একটি প্রস্রবণ যাহা হইতে আল্লাহ্র বান্দাগণ পান করিবে, তাহারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হাল আতা আ'লাল ইনসানি হীনুম মিনাদ্দাহরি'। এর অর্থ— কালপ্রবাহে কি মানুষের উপর এমন এক সময় এসেছিলো? এখানকার 'হাল' (কি) অব্যয়টি প্রশ্নবোধক হলেও নিশ্চিতার্থক। স্বীকৃতিসূচক। অর্থাৎ কালপ্রবাহে মানুষের উপর তো এমন এক সময় এসেছিলোই। আর এখানে 'মানুষ' অর্থ মানবমণ্ডলী। অথবা সীমিতার্থে কেবল হজরত আদম।

'হীন' অর্থ এমন একসময়, নির্ধারিত এক কাল। এরকম অর্থ করেছেন বায়যাবী। আর কামুস গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'হীন' হচ্ছে অনির্ধারিত কাল, যা প্রযোজ্য হয় সর্বসময়ে, হ্রস্ব সময়সীমা অথবা দীর্ঘ সময়পরিসর উভয়টি বোঝাতে। কেউ কেউ বলেছেন, চল্লিশ অথবা ষাট বৎসর, এক অথবা দুই মাস সময় পরিসরকে বলে 'হীন'।

আর 'দাহর' হচ্ছে নিঃসীম মহাকাল। 'কামুস' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, সুদীর্ঘ কাল, অথবা কমপক্ষে এক হাজার বৎসরের সময় সীমাকে বলে 'দাহর'। আমি বলি, হজরত আদমের আয়ুষ্কাল ছিলো এক হাজার বৎসর। 'সিহাহ' অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, মহাপৃথিবীর আয়ুষ্কালের নাম দাহর। অর্থাৎ 'দাহর' অর্থ সৃষ্টির সূচনা-সমাপ্তি। আলোচ্য আয়াতেও 'দাহর' অর্থ সৃষ্টির সূচনা-সমাপ্তি। এখানে 'দাহর' ব্যবহৃত হয়েছে ব্যক্তিবিশেষের পূর্ণ আয়ুষ্কাল অর্থে। যেমন বলা হয় 'দাহরু ফুলানিন' (অমুক ব্যক্তির সারা জীবন)।

এরপর বলা হয়েছে— 'লাম ইয়াকুন শাইয়াম্ মাজকূরা'। এর অর্থ— যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলো না। অর্থাৎ যখন সে অস্তিত্বের অতীত ছিলো, তখন তার সম্পর্কে কেউ কোনোকিছু জানতোই না। বাক্যটি পূর্বোক্ত 'হীন' পদের বিশেষণ। আর নামপদের সঙ্গে যোজক অব্যয়টি এখানে রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ সে সময়টি ছিলো এমন, যখন সে আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভূত ছিলোই না। লক্ষণীয়, বাক্যের গতিধারা কিন্তু একথা প্রমাণ করে যে, মানুষ অস্তিত্বপূর্ব অবস্থাতেও কিছু না কিছু ছিলো। নতুবা তার উপরে কাল অতিবাহিত হল কীভাবে। সুতরাং একথা স্বীকার করতেই হয় যে, সে তখন স্মরণভূত কিছু না থাকলেও ছিলো

www.eelm.weebly.com

স্মরণবহির্ভূত। কিন্তু সে ছিলো। একারণেই ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, এখানে ‘মানুষ’ বলে বোঝানো হয়েছে পিতা আদমকে। আর ‘এমন এক সময়’ অর্থ ওই সময়, যখন কর্দম থেকে তাঁর দেহ নির্মাণ করে চল্লিশ বৎসর ধরে প্রাণহীন অবস্থায় তাঁকে ফেলে রাখা হয়েছিলো মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পিতা আদমকে প্রাণবন্ত করা হয়েছিলো তাঁর মূর্তি নির্মাণের একশত বিশ বৎসর পর। আর যদি এখানে ‘মানুষ’ অর্থ ধরা হয় সকল মানুষ, তবে ‘এমন এক সময়’ কথাটির অর্থ হবে ওই সময়, যখন তারা অবস্থান করে স্ব স্ব মাতৃ-উদরে, যার সময়সীমা কমপক্ষে ছয় মাস এবং ঊর্ধ্বপক্ষে দুই বৎসর। কেউ কেউ বলেছেন, সাত বৎসর। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, যে সময় মানুষ উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলো না, সেই সময়ের পরিসর হয় পিতা আদমের মূর্তির প্রাণবিবর্জিত অবস্থা, না হয় মনুষ্যজাতির মাতৃজঠরে অবস্থানের সময়। আলোচ্য আয়াতের দাবিও সেরকম। কেননা মানুষের আত্মপ্রকাশের পূর্বেও মানুষ ছিলো, যদিও তা প্রকাশ্য অবস্থায় নয়। সে জন্যই সর্বোৎকৃষ্ট ভাষ্য হচ্ছে, মানুষ এক সময় ছিলো আরো সূক্ষ্ম অবস্থায় ‘আইয়ানে ছাবেতা’র (মৌল অস্তিত্বের) স্তরে, যে স্তর সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন সুফী-তাত্ত্বিকগণ। ‘হীন’ শব্দটির ‘তানভীন’ এর প্রমাণ, যেহেতু তা আধিক্যের অর্থবহ। ওই অবস্থায় মানুষকে থাকতে হয় বহু বহু বৎসর। আর ওই অবস্থাটির যথাভাষ্য প্রদানও অসম্ভব। তাই ওই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত প্রদানার্থে এখানে বলা হয়েছে— যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলো না।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর একবার এক লোককে পাঠ করতে শুনলেন ‘যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলো না’। তিনি তখন বললেন, হায়! মানুষের সম্পূর্ণ জীবন যদি এরকম হতো। তাঁর এই মন্তব্যটি সুফী-দরবেশগণের ব্যাখ্যার সন্নিকটবর্তী। তাঁরা বলেন, মানুষ আত্মিক উন্নতির এমন স্তরে পৌঁছে যায়, যখন সে হয়ে যায় অনস্তিত্বসদৃশ, আলোচনার অতীত। ওই স্তরের নামই ফানা বা আত্মবিনাশন, মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যু। আর ওই স্তরটি উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব লাভ হয় ওই স্তরেই। আর যখন সে উল্লেখযোগ্য থাকে তখন, যখন সে তার মানবিক দোষ-গুণ নিয়ে জীবিত থাকে পৃথিবীতে।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহ. বলেছেন, হে আমার প্রভুপালক! মানুষের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয় এমন এক সময়, যখন সে থাকে না উল্লেখ করার মতো কোনো অস্তিত্ব। সে তো থাকে তখন দর্শনের অতীত এক অনস্তিত্বের বলয়ে। এরপর তুমিই তাকে দান করো তোমার জীবন থেকে জীবন, তোমার স্থিতি থেকে স্থায়িত্ব, তোমারই স্বভাব থেকে সুপ্রবৃত্তি। তোমারই করুণাস্নাত হয়ে সে তখন আত্মবিনাশিত হয়েও স্থিত হয় তোমার স্থিতিতে। তার ফানা ও বাকা দুই অবস্থাই তখন থাকে অন্তরালবিহীনরূপে সমভাবে সক্রিয়। তাঁর ‘যদি তোমার অভিপ্রায় হয়’ কথাটিই এখানকার ‘হীনুম মিনাদ্ দাহরি’ বাক্যের ব্যাখ্যা। এখানে ‘মিন’ অব্যয়টি সূচনামূলক। আল্লাহ্পাকের নামসমূহেই তো গণনা করা হয়

www.eelm.weebly.com

যুগের। এরকমই বলেছেন 'কামুস' রচয়িতা। বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আদমসন্তানেরা আমাকে ক্লেশ দেয়। তারা গালি দেয় কাল-কালান্তরকে। অথচ আমিই কাল। আমিই যুগের গতিনিয়ন্ত্রক। আমিই দিবস-বিভাবরীর বিবর্তক।

এরপরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করবার জন্য'। 'মাশজুন' অথবা 'মাশীজুন' এর বহুবচন 'আমশাজ্ব'। শব্দটি 'মাশাজ্বাশ শাই' থেকে সাধিত। এর অর্থ— মিলিত, মিশ্র। 'নুতুফাতিন আমশাজ্ব' অর্থ মিলিত শুক্রবিন্দু। 'নুতুফা'র (শুক্রবিন্দুর) বিশেষণরূপে এখানে 'আমশাজ্ব' এজন্যই ব্যবহৃত হয়েছে যে, নর-নারীর শুক্রবিন্দুর মিলিতরূপের নাম 'নুতুফা'। আর প্রত্যেক 'নুতফা'ই বৈশিষ্ট্য, লঘুত্ব ও বলিষ্ঠতার দিক দিয়ে ভিন্ন।

কেউ কেউ বলেছেন, 'আমশাজ্ব' শব্দটি একবচন। এর অর্থ সম্মিলিত, বিমিশ্র। অর্থাৎ নর-নারীর শুক্রবিন্দুর মিলিত অস্তিত্ব। কাতাদা বলেছেন, 'আমশাজ্ব' অর্থ পদ্ধতি। অর্থাৎ বিভিন্ন পদ্ধতিতে মিলিত শুক্রকণা, যে শুক্রকণা পরিণত হয় রক্তপিণ্ডে, তারপর মাংসপিণ্ডে। এরপর থেকে সৃজন সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যা অতিক্রম করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে।

'নাবতালীহ্' অর্থ পরীক্ষা করবার জন্য। অর্থাৎ পরীক্ষা করবার জন্য মানুষের বিভিন্ন অবস্থা। 'ইব্তিলাহ্' এর রূপকার্থ পরীক্ষা, রূপান্তরণ। অথবা কথাটির মর্মার্থ— আমি পরীক্ষা অনুপাতে মানুষকে সৃজন করেছি মিলিত শুক্রকণা থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন'। একথার অর্থ— আমার অস্তিত্ব ও নাম-গুণাবলীর প্রমাণরূপে শ্রবণ ও দর্শনের যোগ্যতা আমি তাদেরকে দিয়েছি। দিয়েছি এই পরীক্ষাটি সম্পন্ন করবার জন্য যে, তারা তাদের এমতো যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বাসীদের দলভূত হয় কিনা। অর্থাৎ শ্রুতি ও দৃষ্টিদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরীক্ষা করা। সেজন্যই এখানে বাক্যের শুরুতেই যোজক অব্যয় 'ফা' ব্যবহার করা হয়েছে। আর এর যোজ্য হচ্ছে আগের বাক্যের 'খলাক্বনা' (আমি সৃষ্টি করেছি)।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— ' আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে'। একথার অর্থ— আমি তাকে সৎপথের নির্দেশনা দিয়েছি কিতাব ও নবী-রসুলগণের মাধ্যমে। এতদসত্ত্বেও প্রকাশ্য জগতে উন্মোচন করে রেখেছি আমার সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপের অসংখ্য নিদর্শন। এখন বিষয়টি তার অভিপ্রায়ভূত। সে এখন যথাযথ নির্দেশনা মেনে আমার পথপ্রাপ্ত কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভূত হতে পারে, অথবা তা অমান্য করে হয়ে যেতে পারে অকৃতজ্ঞ, পথভ্রষ্ট। এখানে 'হেদায়েত' অর্থ পথের নির্দেশ, পথ অতিক্রম শেষে গন্তব্যে উপনীত করানো নয়। অর্থাৎ সুরা ফাতিহার 'ইহ্দিনাস সিরাত্বল মুসতাক্বীম' আয়াতে সত্য পথের পথিক হওয়ার যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে রকম পথপ্রাপ্ত হওয়া নয়।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'শাকির' অর্থ কৃতজ্ঞ এবং 'কাফুর' অর্থ অকৃতজ্ঞ। শব্দ দু'টো এখানকার 'হাদাইনাহু' (আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি) কথাটির 'হু' (তাকে) সর্বনামের অবস্থা প্রকাশক। অর্থাৎ হয় মানুষ আমার এই পথের নির্দেশনাকে মান্য করে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অমান্য করে হবে কৃতঘ্ন। অনেকে আবার বলেছেন, শব্দদু'টো এখানকার 'সাবীল' (পথ) পদটির অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ আমি মানুষকে দু'টি পথই দেখিয়েছি— একটি কৃতজ্ঞতার, অপরটি অকৃতজ্ঞতার। এখন সে যেটা পছন্দ করে সেটারই অনুসারী হোক। এর যথাপ্রতিফল পাবে সে-ই। এতে করে আমার কিছু এসে যায় না। অথবা কৃতঘ্নতার পথ প্রদর্শনের বিষয়টি হবে এখানে রূপকার্থক।

উল্লেখ্য, এখানকার 'ইম্মা' পদটি বিয়োজক অব্যয়। সুতরাং এর সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক হেদায়েতের সঙ্গে যেমন নয়, তেমনি নয় গোমরাহীর সাথে। বরং এর সম্পর্ক কেবল পথের সঙ্গে, সে পথ হতে পারে দু'রকমের— কৃতজ্ঞতার অথবা অকৃতজ্ঞতার। অনেকে এই মূল তত্ত্বটি না বুঝে এখানকার 'পথের নির্দেশ' কথাটিকে সম্মিলিত করেন কেবল হেদায়েতের পথের সঙ্গে। যদি তা-ই হয়, তবে বিয়োজক অব্যয়টি ব্যবহারের আর যৌক্তিকতা থাকে কোথায়। এই বিয়োজকটির কারণেই বক্তব্যার্থটি দাঁড়ায়— সত্য-অসত্য দু'টো পথই আমি খুলে রেখেছি মানুষের জন্য। এখন তারা ভেবে দেখুক, কোন পথ অবলম্বন করবে তারা, ন্যায়ের, না অন্যায়ের। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে একথাটিও প্রমাণিত হয় যে, অদৃষ্টের বিধান অনুসারেই মানুষ চলবে— হয় শুভপথে, না হয় অশুভ পথে। এবং দু'টো পথেরই সন্ধান দিয়েছেন আল্লাহ্।

কেউ কেউ মনে করেন বাক্যটি শর্তযুক্ত। অর্থাৎ এখানকার 'ইম্মা' এর 'ইন' (যদি) শর্তজ্ঞাপক এবং 'মা' (যা) অতিরিক্ত, দু'টো পদের সন্ধি। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানুষ কৃতজ্ঞ হোক, অথবা হোক অকৃতজ্ঞ, তাতে আমার তো কিছু এসে যায় না। আমি তো চিরঅমুখাপেক্ষী। আর তাদেরকে পথের সন্ধানও তো আমিই দিয়েছি। কোনো সুযোগ রাখিনি অজুহাত প্রদর্শনের।

প্রশ্ন জাগে, এখানে 'শাকির' বলার পর 'কাফির' বলাই ছিলো অধিকতর সঙ্গত। কিন্তু তা না করে 'কাফুর' বলা হলো কেনো? এর জবাবে বলা যেতে পারে, 'শাকির' এমন 'কৃতজ্ঞ' যার মধ্যে অল্পবিস্তর অকৃতজ্ঞতা থাকলেও থাকতে পারে। তাই এর বিপরীতে ব্যবহার করা হয়েছে 'কাফুর', যার অর্থ ঘোর অকৃতজ্ঞ। অথবা বলা যেতে পারে, ছন্দগত পার্থক্য নিরূপণার্থে এখানে বলা হয়েছে 'আলকাফুরা'।

উল্লেখ্য, এখানে 'ইন্না হাদায়না' থেকে শুরু হয়েছে নতুন বাক্য। এমতাবস্থায় উত্থিত হয় এই প্রশ্নটি— আল্লাহ্পাক যখন মানুষ সৃষ্টি করলেন, তাকে দিলেন শ্রবণ ও দর্শনশক্তি। এরপর মানুষ কী করলো? আল্লাহ্পাকই বা কী করলেন? এরকম একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরেই এখানে বলা হয়েছে 'ইন্না হাদায়না' (আমি তাকে পথের নির্দেশনা দিয়েছি)।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শৃঙ্খল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি'। বাক্যটিতে বিবৃত হয়েছে অকৃতজ্ঞদের মর্মান্তিক পরিণতির কথা। লক্ষণীয়, আগের আয়াতে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে কৃতজ্ঞদের এবং পরে অকৃতজ্ঞদের। কিন্তু প্রতিফল দানের বেলায় প্রথমে উল্লেখ করা হলো অকৃতজ্ঞদের। আবার পরের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে কৃতজ্ঞদের। কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ তাহলে কী পাবে— এরকম একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে এখানে। আর অকৃতজ্ঞদের প্রতিদানের উল্লেখ এসেছে আগে। এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সুসংবাদ প্রদান অপেক্ষা ভীতিপ্রদর্শন মানুষের জন্য অধিক কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ। আর এরকম বক্তব্যবিন্যাসটিও অনবদ্য। আল্লাহ্র বক্তব্যশৈলী এরকম অনবদ্য ও অতুলনীয় হওয়াই তো সমীচীন।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সৎকর্মশীলেরা পান করবে এমন পানীয়, যার মিশ্রণ কাফুর— (৫) এমন একটি প্রস্রবণ, যা থেকে আল্লাহ্র বান্দাগণ পান করবে, তারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে' (৬)।

এখানকার 'আবরার' শব্দটি 'বাররুন' এর বহুবচন। 'আবরার' অর্থ ওই সকল সৎকর্মশীল, যাদের বিশ্বাস বিশুদ্ধ ও অটুট। 'বাররুন' শব্দটি ধাতুমূল। 'ইয়াশরাবূনা মিন কা'স্' অর্থ পান করবে এমন পানীয়। 'সিহাহ্' প্রণেতা জাওহারী বলেছেন, 'কা'স' বলে শরবতপূর্ণ অথবা শরবতশূন্য পাত্রকে। যেমন বলা হয় 'কা'সুন খলিস' (শরবতশূন্য পাত্র) 'শারিব্তু কা'সান ত্বয়্যিবাতান' (আমি পবিত্র শরবতপূর্ণ পেয়ালা পান করেছি)।

'কামুস্' অভিধানে উল্লেখিত হয়েছে, 'কা'স' বলে পানপাত্রকে। অথবা পানীয়পূর্ণ পানপাত্রের নাম 'কা'স'— তার মধ্যে যে পানীয়ই থাকুক না কেনো — মদ, মধু, দুধ, অথবা পানি। সম্ভবত এখানে শব্দটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে সেরকম কোনো পানপাত্রকেই। 'মিন' অব্যয়টি এখানে সূচনাজ্ঞাপক। অথবা পুণ্যবানেরা তখন দুধ-মধু-সুরা বা পানি যা কিছুই পান করুক না কেনো, তা পান করবে পানপাত্র দ্বারাই। অথবা এর মর্মার্থ হবে কেবল পানীয়— ভাবার্থক হোক, অথবা রূপকার্থক। আধারের উল্লেখ করে এখানে বুঝানো হয়েছে আধারস্থিত বস্তুকে। যেমন বলা হয় 'জ্বারান্ নাহার' (নদী প্রবহমান)। কিন্তু নদী তো প্রবাহিত হয় না, প্রবাহিত হয়, নদীর পানি। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে 'মিন কা'স' বাক্যাংশের 'মিন' অব্যয়টি এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত এবং তা আংশিকার্থকও। যেমন— কিছু পরিমাণ শরবত। আবার বিবৃতিতার্থকও, যেমন— কী পান করবে? হতে পারে শরবত।

'কানা মিযাজুহা কাফুরা' অর্থ যার মিশ্রণ কাফুর। এখানে 'মিযাজ্ব' অর্থ মিশ্রিত বস্তু। আর 'হা' (যার) সর্বনামটি যুক্ত হবে পাত্রের সাথে। এখন 'কা'স' অর্থ যদি হয় পানীয়, তবে মিশ্রিত বস্তু হবে প্রকৃতই। আর এর অর্থ যদি হয় পাত্র, তবে

www.eelm.weebly.com

এখানকার ‘মিশ্রণ’ হবে রূপকার্থক। অর্থাৎ পাত্রস্থিত পানীয়ের সঙ্গে মিশ্রিত কোনো বস্তু। যেমন বলা হয় ‘কোনো অঞ্চলে যদি বৃষ্টিপাত হয়, তবে আমি তাকে গোপন করি’। অর্থাৎ উৎপন্নোন্মুখ তৃণরাজিকে করি গোপন।

কাতাদা বলেছেন, জান্নাতবাসীদের শরবতের সাথে মিশ্রিত করা হবে ‘কাফুর’ (কর্পুর) এবং তা সীল করা থাকবে মেশক দিয়ে। ইকরামা বলেছেন, ওই পানীয় পান করার সময় সুবাস পাওয়া যাবে কর্পুরের। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘যখন সেটাকে করা হলো আগুন’। অর্থাৎ আগুনের মতো। কালাবী বলেছেন, জান্নাতের একটি নির্ঝরের নাম কাফুর, যেমন আর একটি নির্ঝরের নাম তাসনীম।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— ‘এমন একটি প্রস্রবণ, যা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করবে’। এখানকার ‘আইনান’ (এমন এক প্রস্রবণ) পদটি আগের আয়াতের ‘কাফুর’ এর অনুবর্তী, অথবা অনুগামী ‘কা’স’ এর কর্মপদের। এর সম্বন্ধপদ এখানে রয়েছে উহ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— জান্নাতবাসীগণ পান করবে ঝর্ণার পানি। এখানকার ‘বিহা’ পদের ‘বা’ অব্যয়টি অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। ‘হা’ (যা) সর্বনামটি কর্মপদীয়। অর্থাৎ যা থেকে তারা পান করবে। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার ‘ইয়াশরাবু’ (সে পান করবে) কথাটির অর্থ হবে— আস্বাদ গ্রহণ করবে। আস্বাদ গ্রহণ করার কর্মপদের সাথে ‘বা’ অব্যয় যুক্ত হয়। তাই ‘ইয়াশরাবু’ কর্মপদের সঙ্গেও এখানে যুক্ত হয়েছে ‘বা’। আর ‘ইবাদুল্লাহ’ অর্থ আল্লাহ্‌র দাসগণ, যারা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী এবং একনিষ্ঠ অনুগত।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে’। একথার অর্থ— জান্নাতবাসীরা ঝর্ণাগুলোকে তাদের ইচ্ছামতো যেখানে সেখানে প্রবাহিত করতে পারবে, প্রাসাদে, অলিন্দে, উদ্যানে অথবা প্রান্তরে। আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ তাঁর ‘আজজুহুদ’ পুস্তকে লিখেছেন, ইবনে শাজুর বলেছেন, জান্নাতবাসীদের হাতে থাকবে বৃক্ষশাখার মতো স্বর্ণের একটি শাখা। তারা ওই সোনার ডালগুলো দিয়ে বেহেশতের ঝর্ণাগুলোকে যেদিকে খুশী সেদিকে খেদিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। জান্নাতের পানি হবে তাদের নির্দেশানুগত।

সূরা দাহ্‌র ঃ আয়াত ৭

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

r তাহারা কর্তব্য পালন করে এবং সেই দিনের ভয় করে, যেই দিনের বিপত্তি হইবে ব্যাপক।

প্রথমোক্ত আয়াতখানি একটি প্রারম্ভিক বাক্য। অর্থাৎ এখান থেকে শুরু হয়েছে নতুন প্রসঙ্গ। বাক্যটি যেনো একটি ধারণাপ্রসূত প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হচ্ছে, আল্লাহ্‌র পুণ্যবান বান্দাগণকে এরকম প্রতিদান দেওয়া হবে কী কারণে? অথবা তাদের পরিচয় কী? এমতো প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে এখানে এভাবে— তারা

www.eelm.weebly.com

কর্তব্য পালন করে এবং সেই দিনের ভয় করে, যে দিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক। অর্থাৎ তারা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষ কামনায় যথানিয়মে ও যথাসময়ে পালন করে তাঁর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাবলী এবং ভয় করে কেবল তাঁকেই, যিনি অনিবার্য করেছেন মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও প্রতিফল দিবস। উল্লেখ্য, এ সকল গুণ অর্জিত হয় ফানা ও বাকার স্তরে উপনীত হলে। তখন কলব (হৃদয়) হয় 'সালিম' (প্রশান্ত) এবং নফস (প্রবৃত্তি) হয় 'মুত্বমাইন্না' (প্রশান্ত)। এমতাবস্থায় তাঁরা হন 'মুক্বাররাবীন' (নৈকট্যভাজন), 'আবরার' (পুণ্যবান) অপেক্ষা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।

আবার এরকমও হতে পারে যে, পূর্ববর্তী বাক্যের নিমিত্ত হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইউফূনা' (পালন করে) কথাটি। অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের বর্ণিত সুখোপকরণসমূহ প্রাপ্তির প্রধানতম কারণ এই যে, পৃথিবীতে তারা পালন করতো 'নজর' (কর্তব্য)। 'নজর' শব্দটির আভিধানিক অর্থ যা অত্যাবশ্যক নয়, তাকেও অত্যাবশ্যক কর্ম হিসেবে গ্রহণ করা। 'সিহাহ্' অর্থাৎ পুণ্যপ্রেমিকগণ মোস্তাহাব (শোভন) বিষয়াবলীকেও নিজের উপর ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক) করে নেয়। কাতাদা বলেছেন, এখানে 'কর্তব্য পালন করে' অর্থ সম্পাদন করে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি ফরজ দায়িত্বসমূহ।

ওয়াজিবের বিবরণ ঃ 'নজর' বা 'মানত' অর্থ যা আবশ্যিক নয়, তাকেও আবশ্যিক হিসেবে গ্রহণ করা। এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নজর বা মানত বিধিবদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে দুটি—১. যে বিষয়ে মানত করা হয়, তা হতে হবে শরিয়তসিদ্ধ। সুতরাং বুঝতে হবে শরিয়তগর্হিত কোনো বিষয় মানত হিসেবে প্রতিপালন করা যায় না। রসুল স. বলেছেন, মানত ওই বিষয়, যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুকূল। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ। ২. প্রথম থেকে যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অপরিহার্য হবে না। হবে কেবল সিদ্ধ (জায়েয)।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এর সঙ্গে শর্ত রয়েছে আরো দুটি—১. ইবাদতটি হতে হবে মৌলিক, আনুসাঙ্গিক নয়। ২. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে থাকতে হবে ওই রকম আরো একটি অপরিহার্য ইবাদত। জমহুর বিদ্বানগণের মতে এই শেষোক্ত শর্ত দু'টো আবশ্যিক নয়। যেমন ইতেকাফের মানত সর্বসম্মতিক্রমে সঠিক, ইতেকাফ একটি মৌলিক ইবাদত না হওয়া সত্ত্বেও। উল্লেখ্য, ইতেকাফ নিজে কোনো ইবাদত নয়, বরং ইতেকাফ হচ্ছে অবস্থান করা, নামাজের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকা। আবার ইতেকাফ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবধারিতও করা হয়নি। এই ব্যাখ্যাটিকে মেনে নিলে ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক কথিত শর্তদু'টোর অস্তিত্ব আর থাকে না। একারণেই ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মানতের কারণেই সূচিত হয় ইবাদতের কর্তব্য। অর্থাৎ প্রথমে যা ওয়াজিব ছিলো না, মানতের পর তা হয়ে যায় ওয়াজিব। যেমন— পীড়িতের সেবা, জানাযায় সহগমন, সালাম প্রদান ইত্যাদি। উম্মতজননী হজরত আয়েশা থেকেও সাধারণভাবে মানত ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ

www.eelm.weebly.com

পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেছেন, যারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মানত করে, তার উচিত তা পরিপূরণ করা। আর যারা মানত করে আল্লাহ্‌র অনানুগত্যের উপর তাদের কর্তব্য হচ্ছে তা অপরিপূরিত রাখা। বোখারী।

মাসআলা ঃ যদি কেউ শরিয়ত সম্মত মানত করা সত্ত্বেও তার সঙ্গে যুক্ত করে কিছু নিরর্থক শর্ত, তার কর্তব্য হবে ওই নিরর্থক শর্তসমূহ ছাড়া ওই মানত পরিপূরণ করা। যেমন কেউ মানত করলো, অথবা বললো, আমি রোজা পালন করবো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এমতাবস্থায় তাকে রোজা পালন করতে হবে ওই অতিরিক্ত শর্ত দু'টোকে বাদ দিয়ে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ বলেন, কেউ যদি মসজিদে হারামে নামাজ পড়ার মানত করে, তবে তাকে ওই মসজিদেই নামাজ পড়তে হবে। অন্য মসজিদে নামাজ পড়লে তার মানত পুরা হবে না। তবে মসজিদে নববী, অথবা মসজিদে আকসায় নামাজ আদায়ের মানত করার পর কেউ যদি মসজিদে হারামে তার মানতকৃত নামাজ পাঠ করে, তবে তার মানত পরিপূরিত হবে। অর্থাৎ কম মর্যাদাবিশিষ্ট যে কোনো স্থানে নামাজ পাঠের মানত অধিক মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদে আদায় করলে তা যথাযথ হবে। এর বিপরীত করলে হবে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানে নামাজ পাঠের মানতকারী পৃথিবীর যে কোনো স্থানে নামাজ পাঠ করলেও তার মানত পুরা হয়ে যাবে। হজরত জাবের বলেছেন, মক্কা বিজয়ের দিবসে এক ব্যক্তি রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহী! আমি মানত করেছিলাম, আল্লাহ্ আপনাকে মক্কাবিজয়ী করলে আমি বায়তুল মাকদিসে নামাজ পাঠ করবো। তিনি স. বললেন, এখানেই আদায় করো। লোকটি দু'তিনবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। শেষে রসুল স. বললেন, যা ভালো বোঝো, করো। অর্থাৎ এখানে আদায় করো, অথবা ওখানে। আল্লাহ্‌ই অধিক পরিজ্ঞাত। আবু দাউদ, দারেমী। এই হাদিসের উপরে ভিত্তি করেই ইমাম আবু হানিফা সুনির্দিষ্ট স্থানের শর্তটিকে অনাবশ্যক মনে করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হচ্ছে, ত্রয়ী মসজিদের যে কোনো একটিকে মানতের সঙ্গে শর্তযুক্ত করলেই অধিকতর পুণ্যের বিষয়টি গণনায় আনতে হবে। আর মানতকারীর উদ্দেশ্যেও তো আনুগত্য প্রতিপালনই। কাজেই শর্ত এমতোক্ষেত্রে নিরর্থক বিবেচিত হবে না।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মসজিদে হারাম ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য যে কোনো মসজিদ অপেক্ষা আমার মসজিদে পঠিত নামাজের মর্যাদা হাজারগুণ বেশী। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, স্বগৃহে পঠিত নামাজের পুণ্য একগুণ। গ্রামের মসজিদে পঁচিশ গুণ। জামে মসজিদে পাঁচশত গুণ। মসজিদে আকসায় হাজার গুণ। আমার মসজিদে পঞ্চাশ হাজার গুণ। আর মসজিদে হারামে একলক্ষ গুণ। ইবনে মাজা। উল্লেখ্য, বর্ণিত পুণ্যের তারতম্য ঘটে কেবল ফরজ নামাজের বেলায়। নফল

www.eelm.weebly.com

নামাজের বেলায় নয়। হজরত জায়েদ ইবনে ছাবেত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ফরজ ব্যতীত অন্যান্য নামাজ আমার মসজিদে পাঠ করা অপেক্ষা নিজগৃহে পাঠ করা উত্তম। আবু দাউদ, তিরমিজি।

আনুগত্যের শর্ত ব্যতীত অন্যান্য শর্ত মূল্যহীন— একথার সমর্থনে উপস্থাপন করা যেতে পারে হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে তিনি বলেছেন, রসুল স. একবার বক্তৃতাকালে দেখলেন, এক লোক রোদে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি স. তার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আবু ইসরাইল তখন বললো, সে মানত করেছে, সে রোজা পালনকালে কখনো ছায়ায় বসবে না এবং কারো সাথে বাক্যালাপও করবে না। তিনি স. বললেন, লোকটিকে বলে দাও, সে যেনো ছায়ায় বসে, কথা বলে এবং তার রোজাও পালন করে। আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান। বোখারী। বোখারীর বর্ণনায় রোদের উল্লেখ নেই। প্রায়োন্নত সূত্রে ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এভাবে— রসুল স. তখন বললেন, তাকে শুনিয়ে দাও, সে আল্লাহ্র আনুগত্য পূরণ করুক এবং বিরত থাকুক তাঁর অবাধ্যাচরণ থেকে। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, আমাদের নিকট এই তথ্যটিও পৌঁছেছে যে, তিনি স. তাকে এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত (কাফফারা) করারও নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইমাম শাফেয়ীও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনার শেষাংশে বলা হয়েছে, রসুল স. তাকে প্রায়শ্চিত্ত করার নির্দেশ দেননি। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মোহাম্মদ ইবনে কুরাইবের মাধ্যমে বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে প্রায়শ্চিত্তের কথা। অবশ্য মোহাম্মদ ইবনে কুরাইব বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

মাসআলা ঃ ওয়াজিব মানত যথাসময়ে আদায় না করতে পারলে তার কাজা আদায় করতে হবে। ওই কাজা প্রকৃত (হাকীকী) হোক, অথবা হোক হুকুমী (প্রবিধানগত)। যেমন নামাজের মানতের কাজা নামাজ। রোজার মানতের কাজা রোজা। এরকম কাজা হচ্ছে প্রকৃত কাজা। আর বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল, যে রোজা রাখতে অসমর্থ, সে আহার করাবে একজন অভাবীকে। এরকম কাজার নাম প্রবিধানগত কাজা।

কেউ যদি পদব্রজে হজযাত্রায় মানত করার পর যাত্রাকালে বাহনে আরোহণ করতে বাধ্য হয়, তবে জমহুরের মতে কাফ্ফারাস্বরূপ তাকে দিতে হবে একটি কোরবানী। বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ইমামশ্রেষ্ঠও এরকম অভিমত পোষণ করেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত অভিমত হচ্ছে— কেউ পদব্রজে হজযাত্রার নিয়ত করলেও তার উপরে পদব্রজে হজ গমন ওয়াজিব হয় না। তাই এমতাবস্থায় যানবাহনে আরোহণ করলেও তার উপরে কোরবানী ওয়াজিব হয় না। কেননা হজরত উকবা ইবনে আমের জুহুনী বলেছেন, আমার বোন মানত করলো, সে হজ করবে খোলা মাথায়, খালি পায়ে ও পায়ে হেঁটে। হজযাত্রার সময় রসুল স. তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? তার সহযাত্রীদের একজন জবাব দিলো, সে এভাবেই হজযাত্রা করবে বলে মানত করেছে। রসুল স. আজ্ঞা করলেন, তাকে বলে দাও, সে যেনো বাহনে আরোহণ করে এবং ঢেকে নেয় তার মস্তক। বোখারী, মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. দেখলেন, এক লোক তার দুই ছেলের কাঁধে ভর করে হজপালনের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে চলেছে। রসুল স. জিজ্ঞেস করলেন, সে এভাবে চলেছে কেনো? জনৈক সাহাবী জবাব দিলেন, সে এভাবেই হজে যাবে বলে মানত করেছে। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র কী প্রয়োজন পড়েছে লোকটিকে এভাবে শাস্তি দেওয়ার? এরপর তিনি স. লোকটিকে তার বাহনোপরি আরোহণ করতে নির্দেশ দিলেন। বোখারী, মুসলিম। জমহুর (নিখিল আলেম সমাজ) বলেন হজরত উকবা ইবনে আমেরের হাদিসটি সর্বোন্নত সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, যার শেষাংশে উল্লেখ করা হয়েছে— রসুল স. তখন তাকে যানবাহনে আরোহণ করে যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন এবং একটি কোরবানী দিতে বললেন।

'সুনানে আবু দাউদ' গ্রন্থে হজরত জায়েদ ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত উকবা ইবনে আমেরের ভগ্নি পায়ে হেঁটে হজগমনের মানত করলো। কিন্তু এরকম সামর্থ্য তার ছিলো না। রসুল স. তা জানতে পেরে হজরত উকবাকে বললেন, তোমার ভগ্নির এরকম আমলের পরওয়া আল্লাহ্ করেন না। সুতরাং তাকে তার বাহনে চড়ে হজে যেতে বলো। আর এর জন্য তাকে কোরবানী দিতে বোলো একটি উট। হাদিসটি সর্বোন্নত সূত্রে হজরত উকবা ইবনে আমের থেকে বর্ণনা করেছেন তাহাবীও। এ সকল উদ্ধৃতি দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসগুলো ছিলো সংক্ষিপ্ত। তাই সেগুলোতে উট কোরবানীর কথা আসেনি। আর অন্যদের দ্বারা বর্ণিত হাদিসগুলো বিস্তারিত বলেই সেগুলোতে উল্লেখ এসেছে কোরবানীর এবং কোরবানী করতে হবে উট। বিশুদ্ধসূত্রপরম্পরায় আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কাবার পথে গমন করার মানত করে, তার পায়ে হেঁটে কাবাভিমুখে যাত্রা করা উচিত। তবে সে ক্লান্ত হয়ে পড়লে যানবাহনে চড়তে পারবে এবং এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাকে কোরবানী দিতে হবে একটি উট। এরকম মন্তব্য এসেছে হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা এবং হাসান বসরী থেকেও।

মাসআলা ঃ আনুগত্যের পর্যায়ভূত নয়, এরকম সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ কর্মের মানত যদি কেউ করে, তবে তার মানত পূরণ করা ওয়াজিব নয়। ঐকমত্যসম্মত অভিমত এই যে, তার এরকম মানত সঠিক হবে না। ইমামশ্রেষ্ঠ বলেন, এমতাবস্থায় মানত হয়ে যাবে পণ্ড। নিখিল আলেম সমাজ বলেন, এমতাবস্থায় মানত সাব্যস্ত হবে না বটে, কিন্তু তার কথা বৃথাও যাবে না। তাই এমতোক্ষেত্রে সুস্থ জ্ঞানসম্পন্নদের কথাকে পণ্ড হওয়া থেকে সংরক্ষণ করতে হবে, কেননা মানতের নেপথ্যে থাকে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এর সঙ্গে উচ্চারিত হয় আল্লাহ্‌র নামও। তাই বক্তব্যটি শব্দগতভাবে শপথের পর্যায়ে পড়ে। অর্থগতভাবেও। কারণ যে বস্তু মানতকে অবধারিত করেছে, তার বিপরীত বস্তুকে নির্ধারণ করা হয়েছে হারাম। একারণেই ওলামা সমাজ বলেন, এধরনের শপথ ভঙ্গ করা এবং

www.eelm.weebly.com

পাপযুক্ত মানতের ক্ষেত্রের শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণের মতো ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব। তবে সিদ্ধ কর্মের মানতের ক্ষেত্রে বিষয়টি তার ইচ্ছাধীন, এমতাবস্থায় হয় সে তার মানত পূরা করবে, না হয় প্রায়শ্চিত্ত করবে শপথভঙ্গের মতো। তাঁদের এমতো অভিমতের পরিপোষকতায় রয়েছে বহুসংখ্যক হাদিস। তন্মধ্যে একটি এরকম— হজরত উকবা ইবনে আমের বলেছেন, মানতের প্রায়শ্চিত্ত শপথভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তের মতোই।

সর্বোন্নত সূত্রে হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতামূলক কোনো মানত সিদ্ধ নয়। এরকম মানতের কাফ্ফারা শপথের কাফ্ফারার অনুরূপ। নাসাঈ, হাকেম, বায়হাকী। হাদিসটির মূল বর্ণনাকারী মোহাম্মদ ইবনে যোবায়ের হানযালী। তিনি আবার বলিষ্ঠ বর্ণনাকারী নন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, অন্য পদ্ধতিতেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, যার সূত্রপরম্পরা বিশুদ্ধ, তবে তা রুগ্নদশাসম্পন্ন (মা'লুল)। ইমাম আহমদ, সুনান রচয়িতাবর্গ, বায়হাকী, জুহ্‌রীর মাধ্যমে আবু সালমা সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার সূত্রপরম্পরাটি বিকর্তিত। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু সালমার হাদিস শোনার বিষয়টি প্রামাণ্য নয়। সুনান রচয়িতাগণ জননী আয়েশা থেকেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই সূত্রসংযুক্ত বর্ণনাকারী সুলায়মান ইবনে আরকাম পরিত্যক্ত। জননী আয়েশা থেকে সর্বোন্নত সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনীও, যেখানে বলা হয়েছে, যে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতাপূর্ণ মানত নিজের উপরে অবধারিত করে নেয়, তার প্রায়শ্চিত্ত শপথের প্রায়শ্চিত্ত। হাদিসটির সূত্র প্রবাহভূত গালিব ইবনে আবদুল্লাহ্ পরিত্যাজ্য। তবে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে কুরাইবের মাধ্যমে আবু দাউদ যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তার সূত্রপরম্পরা আবার উত্তম পর্যায়ের। কিন্তু ইমাম নববী লিখেছেন, আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধভাবাপন্ন মানত পালনীয় নয়। তার প্রায়শ্চিত্ত শপথের প্রায়শ্চিত্তের মতো। হাদিসবেত্তাগণের ঐকমত্য এই যে, বর্ণনাটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, তাহাবী হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। এরকম বলেছেন আলী ইবনে সাকানও। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নির্দিষ্ট মানতের কাফ্ফারা শপথের কাফ্ফারার মতো। পাপযুক্ত মানতের বিধানও একই। আর কেউ যদি এমন মানত করে, যা পূরণ করার সাধ্য তার নেই। তার কাফ্ফারাও শপথের কাফ্ফারার মতো। কেউ সাধ্যায়ত্ত মানত করলে, তা যেনো পূরণ করে। আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

হজরত ছাবেত ইবনে জুহাক বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে উট জবাই করার মানত করলো। রসুল স. একথা জানতে পেরে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, অজ্ঞতার যুগে কি সেখানে কোনো পূজাপার্বন হতো? লোকেরা বললো, না। রসুল স. জিজ্ঞেস করলেন, তখন সেখানে কি কোনো প্রমোদসর্বস্ব মেলা বসতো? লোকেরা বললো, না। তিনি স. বললেন, ঠিক

www.eelm.weebly.com

আছে, তুমি তোমার মানত পুরা করো। আবু দাউদ। হাদিসটির সূত্রপ্রবাহ বিশুদ্ধ। আমর ইবনে হজরত শোয়াইব তাঁর পিতা ও পিতামহ থেকেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজা। এতে করে বুঝা যায়, আনুগত্য অথবা অনানুগত্য কোনো প্রকৃতিরই নয়, এরকম মানত করা হলে তা পূরণ করা সিদ্ধ। আমর ইবনে শোয়াইব তাঁর পিতা ও পিতামহের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, একবার এক রমণী রসুল স.কে বললো, আমি মানত করেছিলাম, এখানে আপনার শুভাগমন ঘটলে আমি আপনার সামনে দফ বাজাবো। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে, বাজাও। সম্ভবত ঘটনাটি ছিলো দফ বাজানো নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের।

শর্তযুক্ত মানতের ক্ষেত্রে শর্ত পাওয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানতটি হয়ে যায় অনিবার্য মানত। তখন তার বিধানও হয় অবশ্যপূরণীয় মানতের মতো। ইমাম শ্রেষ্ঠ কর্তৃক সংকলিত 'জাহিরুর রওয়ায়েত' গ্রন্থেও এরকম বলা হয়েছে। এরকম বলেছেন ইমাম আবু ইউসুফ। ইমাম শাফেয়ীর একটি অভিমতও এরকম। এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। অপর বর্ণনানুসারে আবার এর বিপরীত। যেমন তিনি বলেছেন, যদি কেউ তার মানতে এই শর্তটি যুক্ত করে যে, সে তার সমুদয় সম্পদ দান করবে, তবে তাকে দান করতে হবে তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ। এছাড়া অন্যান্য সকলক্ষেত্রে যা মানত করা হয়েছে, তা পূরণ করতে হবে হুবহু।

এক বর্ণনায় এসেছে, ইমামশ্রেষ্ঠ তাঁর বর্ণিত অভিমতটি পরে নিজেই পরিত্যাগ করেছেন। উপরন্তু বলেছেন, শর্তযুক্ত মানত পূরণ করতে পারলে তো ভালোই, অন্যথায় প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে শপথের প্রায়শ্চিত্তের মতো। ইমাম মোহাম্মদও এরকম বলেন। হেদায়া রচয়িতা ও অন্যান্য হানাফী তাত্ত্বিকগণ বলেন, ইমামশ্রেষ্ঠের অভিমতে শপথের প্রায়শ্চিত্ত ওইরূপ শর্তযুক্ত মানতের জন্য যথেষ্ট হবে, যখন কাম্য থাকবে না শর্তের উপস্থিতি। যেমন কেউ বললো, আমি যদি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করি, অথবা অমুক ব্যক্তির সাথে কথা বলি, কিংবা অমুক কাজ করি, তাহলে আমার উপরে একটি হজ, অথবা এক বৎসরের রোজা অবধারিত। এমতাবস্থায় মানতকারীর নিকট শর্তগুলো কাম্য নয়। আর যদি শর্তসমূহ মানতকারীর কাম্য হয় এবং সেগুলো উপস্থিতও হয়ে যায়, তাহলে মানত পূরণ করা তার জন্য হবে আবশ্যিক। যেমন কেউ বললো, অমুক নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি এসে পড়ে, কিংবা আমার অমুক শত্রু যদি বিনাশ হয়, অথবা আমার অমুক কর্ম যদি সিদ্ধ হয়, বা আমার স্ত্রী যদি একটি পুত্র সন্তানের জননী হয়, তবে আমার উপরে অমুক বিষয় অবধারিত। এমতোক্ষেত্রে যেমন মানত করা হয়েছে, তেমনই পূরণ করতে হবে। এ ধরনের মানতকে বলে, মানতে তাবাররু। এমতো বিস্তৃত অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ী। অবশ্য ইমাম শাফেয়ীর তৃতীয় অভিমতটি ইমাম মোহাম্মদের অভিমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। অভিমতটি হচ্ছে, হজের মানতে শপথের প্রায়শ্চিত্ত অবধারিত, এমতাবস্থায় মানত পূরণ করা সিদ্ধ নয়।

www.eelm.weebly.com

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেছেন, দুজন আনসারী ভ্রাতা ঘটনাক্রমে কিছু অংশীদারিত্বের সম্পদের মালিক হলো। তারা একে অপরকে বললো, তুমিই বণ্টন করো। একজন হঠাৎ বললো, তুমি যদি আর একবার আমাকে বণ্টনের কথা বলো, তবে আমি বলবো, আমার সকল অংশ ব্যয়িত হবে কাবাগৃহের উন্নয়নমূলক কার্যে। এরপর থেকে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেলো তাদের। বিষয়টি হজরত ওমরের কর্ণগোচর হলো। তিনি বললেন, তোমার সম্পদের কোনো প্রয়োজন কাবাগৃহের নেই। তোমরা বরং তোমাদের কৃত শপথের প্রায়শ্চিত্ত করো। পরস্পরের মধ্যে বাক্য বিনিময় করো। আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের উপরে শপথের কোনো দায়িত্ব বর্তাবে না, আবার মানতেরও কোনো দায় আসবে না, যদি তোমরা মানত করো আল্লাহ্র অবাধ্যতার, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার, এমন বিষয়ের, যা তোমার আওতাবহির্ভূত।

মাসআলা ঃ যদি কেউ সাধ্যাতীত মানত করে তবে তার জন্য তার প্রায়শ্চিত্ত করা সিদ্ধ। ইমামশ্রেষ্ঠ বলেন, এমতাবস্থায় শুধু ক্ষমাপ্রার্থনা করলেই চলবে। আমাদের জন্য দলিল ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি তার সাধ্যবহির্ভূত মানত করে, তার কাফ্ফারা শপথের কাফ্ফারার মতো। রসুল স. হজরত উকবা ইবনে আমেরকে বলেছিলেন, তোমার বোনের পায়ে হেঁটে চলার পরিশ্রান্তির কোনো প্রয়োজন আল্লাহ্র নেই। তাকে যানবাহনে চড়ে হজে যেতে বলো এবং আদায় করতে বলো কসমের কাফ্ফারার মতো কাফ্ফারা। আবু দাউদ। আবদুল্লাহ্ ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, হজরত উকবা ইবনে আমের বলেছেন, আমার সহোদরা খালি মাথায়, খালি পায়ে পদব্রজে হজ করার মানত করেছিলো। রসুল স. একথা জানতে পেরে বলেছিলেন, তোমার বোনকে বলে দাও, সে যেনো তার মস্তকে ওড়না জড়িয়ে নেয় এবং যাত্রা করে বাহনে আরোহণ করে এবং তিন দিন রোজা পালন করে। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী ও তাহাবী। হাদিসগুলোর বর্ণনাবৈষম্যের সমাধান করা যেতে পারে এই বলে যে, সম্ভবত রসুল স. তাঁকে কাফ্ফারা দিতে বলেছিলেন তখন, যখন তিনি স. জানতে পেরেছিলেন যে, তিনি মানত পূরণ করতে অক্ষম। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

'ওয়া ইয়াখাফূনা ইয়াওমান' অর্থ এবং সেই দিনের ভয় করে। অর্থাৎ ওই পুণ্যবানগণের আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, তারা ভয় করে মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবসকে।

'কানা শার্রুহূ মুসতাত্বীরা' অর্থ— সেই দিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক। এখানে 'শার' অর্থ বিপত্তি, অনভিপ্রেত বিষয়, যাকে এড়িয়ে চলা হয়। আর 'মুসতাত্বীর' অর্থ ব্যাপক, সুদূর প্রসারিত। যেমন বলা হয় 'ইস্তাত্বরল হাকীক্ব' (বিস্তৃত হয়েছে আগুন) 'ইসতাত্বরল ফাজ্বরু' (প্রসারিত হয়েছে উষালোক)। মুকাতিল বলেছেন, মহাপ্রলয়ের প্রভাব আকাশে ছড়িয়ে পড়লে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে আকাশসমূহ, খসে পড়বে নক্ষত্রপুঞ্জ, চন্দ্র-সূর্য হয়ে পড়বে নিষ্প্রভ। সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে ফেরেশতামণ্ডলী।

www.eelm.weebly.com

আর যখন তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীতে, তখন পাহাড়-পর্বত শূন্যে ভেসে বেড়াতে থাকবে ধূলিকণার মতো হয়ে, মহাসমুদ্রের পানি হয়ে যাবে অগ্নিময়। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে পুণ্যবান বিশ্বাসীগণের দু'টি বিশেষ গুণের কথা— কর্তব্যপালন ও পরকালভীতি।

সূরা দাহ্‌র ঃ আয়াত ৮, ৯, ১০

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا
نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا
نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾

r আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তাহারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে,

r এবং বলে, 'কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদিগকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হইতে প্রতিদান চাহি না, কৃতজ্ঞতাও নহে।

r 'আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আর ওই সকল পুণ্যবানেরা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রাণীদের প্রতিও অত্যন্ত মমতাপরবশ। তাই তারা পানাহারের প্রয়োজন ও আসক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্নদান করে অন্নহীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে। এরকম করে তারা কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষ কামনায়।

এখানে 'আসীরা' অর্থ বন্দী। ইবনে জুরাইজের উক্তি উল্লেখ করে ইবনে মুনজির বলেছেন, রসুল স. কোনো মুসলমানকে বন্দী করতেন না। তাই এখানকার 'বন্দীদেরকে আহার্য দান করে' কথাটির অর্থ হবে— আহার করায় পৌত্তলিক বন্দীদেরকে, যারা মাঝে মাঝে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসতো। রসুল স. তাঁর সাহাবীগণকে ওই সকল বন্দীর সঙ্গে শিষ্ট আচরণ করার নির্দেশ দিতেন। এরকম কথা এসেছে কাতাদার বিবরণ থেকেও। তবে মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে যোবায়েরের ব্যাখ্যায় এসেছে 'আসীরান' অর্থ মুসলিম বন্দী। কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাটিই অধিক স্পষ্ট। কারো কারো মতে এখানে 'আসীর' বলে বুঝানো হয়েছে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নারী জাতিকে। যেহেতু রসুল স. বলেছেন, দু'টি দুর্বল জাতির ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কোরো— অধীনস্থ দাস-দাসী এবং নিরীহ নারী।

আবু আমর বর্ণনা করেছেন, জননী উম্মে সালমা আজ্ঞা করেছেন, নামাজ পাঠকালে এবং অধিকৃত দাস-দাসীদের আচরণের ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহ্‌কে

www.eelm.weebly.com

বিশেষভাবে ভয় কোরো। খতীব। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী আজ্ঞা করেছেন, অধিকৃত গোলাম-বাঁদীর বিষয়ে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, রমণীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করে চলো, কেননা তারা তোমাদের হাতে বন্দী।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত সম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে জনৈক আনসার সাহাবীকে লক্ষ্য করে। তিনি একই দিনে পানাহার করিয়েছিলেন একজন অভাবগ্রস্ত, একজন পিতৃ-মাতৃহীন ও একজন বন্দীকে।

মুজাহিদ ও আতা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আলী ইবনে আবু তালেব সম্পর্কে। তিনি একদিন এক ইহুদীর বাড়িতে শ্রম দিয়ে যে পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন, তার এক তৃতীয়াংশ ব্যয় করে তাঁর পরিবার পরিজনের জন্য আহার্য প্রস্তুত করালেন। এমন সময় জনৈক অভাবগ্রস্ত এসে অন্নপ্রার্থনা করলো। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে প্রস্তুতকৃত আহার্য দিয়ে দিলেন। তারপর আহার্যের ব্যবস্থা করালেন আর এক তৃতীয়াংশ খরচ করে। তখন এলো একজন পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক। তিনি প্রস্তুতকৃত আহার্য তাকেই দিয়ে দিলেন। অবশেষে শেষ তৃতীয়াংশ দিয়ে আহার্য বানানোর পর দেখলেন, একজন পৌত্তলিক বন্দী ক্ষুধায় কাতর। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ওই আহার্য দিয়ে দিলেন তাকে। এরপর তিনি সেদিন উপোস করলেন পরিবারবর্গসহ।

ছা'লাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার হাসান-হোসাইন ভ্রাতৃদ্বয় অসুস্থ হয়ে পড়লো। রসুল স. তাঁর প্রিয় দৌহিত্রদ্বয়কে দেখতে গেলেন। আলীকে বললেন, আবু হাসান! তোমরা যদি এদের রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে মানত করো, তবে উত্তম হয়। একথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে রোজার মানত করলেন, আলী, ফাতেমা এবং তাদের দাসী কুজ্জা। তাঁরা উল্লেখ করলেন, পর পর তিনদিন রোজা রাখবেন তাঁরা। সে সময় আলীর গৃহে খাবার ছিলো না। তাই তিনি খায়বরবাসী এক ইহুদীর কাছ থেকে কর্জ হিসেবে গ্রহণ করলেন প্রায় বারো সের পরিমাণ আটা। রোজা শুরু করলেন পরদিন থেকে। প্রথম দিনের রোজা শেষে তাঁরা গৃহে প্রস্তুতকৃত কয়েকটি রুটি দিয়ে ইফতারের আয়োজন করলেন। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো এক অভাবী লোক। খাদ্যপ্রার্থনা করলো সে। তাঁরা রুটিগুলো তাঁকেই দিয়ে দিলেন। রোজা ভঙ্গ করলেন কেবল পানি পান করে। অভুক্ত অবস্থাতেই শুরু হলো তাদের দ্বিতীয় দিনের রোজা। সেদিনও ইফতারের সময় একই ধরনের ঘটনা ঘটলো। হঠাৎ এসে খেতে চাইলো এক অনাথ বালক। প্রস্তুতকৃত রুটি দেওয়া হলো তাকেই। তৃতীয় দিনের রোজাও শুরু হলো খালি পেটে। কিন্তু সেদিনও রোজা শেষে তাঁরা প্রস্তুতকৃত রুটি খেয়ে রোজা ভঙ্গ করতে পারলেন না। সহসা হাজির হলো একজন অন্নপ্রার্থী। তাকে দিয়ে দিতে হলো রুটিগুলো। তৃতীয় রাতও কেটে গেলো নিরাহারে। তখন

www.eelm.weebly.com

হজরত জিবরাইল রসুল স. সকাশে আবির্ভূত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র প্রেমাস্পদ! আল্লাহ্ আপনার কন্যা-জামাতার পরিবারের প্রতি পরিতুষ্ট হয়েছেন। প্রেরণ করেছেন শুভবারতা। এরপর তিনি পাঠ করে শোনালেন সদ্য অবতীর্ণ এই আয়াত। হাকেম ও তিরমিজি বলেছেন, নিতান্ত নির্বোধ না হলে কেউ এরকম ঘটনা বিশ্বাস করবে না। ইবনে জাওজী ঘটনাটি বিবৃত করেছেন তাঁর 'মাওজুয়াত' গ্রন্থে এবং বলেছেন, ঘটনাটি নিঃসন্দেহে স্বকপোলকল্পিত। কেননা আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায় এবং হজরত আলী ও হজরত ফাতেমার বিয়ে হয়েছিলো রসুল স. এর হিজরতের দু'বছর পর মদীনায়।

আমি বলি, মুকাতিল ও মুজাহিদের বর্ণনাকেও এরকম আপত্তি-বানে বিদ্ধ করা যেতে পারে। আয়াতখানি যদি মক্কী হয়, তবে কোনো আনসারীকে লক্ষ্য করে এই আয়াত অবতীর্ণ হতে পারে কীভাবে? আবার হজরত আলী ইহুদীর বাড়িতে কাজ করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার কথাটি যদি সত্যি হয়, তাহলে তো বলতে হয় আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। কেননা মক্কায় কোনো ইহুদী বসতি ছিলো না। কিন্তু আয়াতখানির বিষয়বস্তুর দাবি অনুসারে একথা বলতে হয় যে, আয়াতখানি মদীনায় অবতীর্ণ। কেননা মক্কায় কোনো বন্দীর অস্তিত্ব ছিলো না। জেহাদের সূত্রপাত হয় পরে, মদীনায়। আর তারপর থেকেই বিধর্মীরা মুসলমানদের হাতে বন্দী হতে থাকে। সুতরাং এরকম বলাই সঙ্গত যে, আয়াতখানির কিছু অংশ অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায় এবং কিছু অংশ মদীনায়। আর যদি সম্পূর্ণ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে মনে করা হয়, তবে বলতে হয়, এখানে বিঘোষিত হয়েছে ভবিতব্য। অর্থাৎ হিজরতের পর মদীনায় গিয়ে মুসলমানেরা যে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, তার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'এবং বলে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি'। এখানকার 'নুত্বয়িমুকুম' (আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি) কথাটি আয়াতের 'আহার্যদান করে' কথাটির অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ তারা এরকম বলতো, কিংবা এটা ছিলো তাদের ভাবগত অভিব্যক্তি। মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, তাঁরা একথা মুখে উচ্চারণ করতেন না। এটা ছিলো তাঁদের মনের কথা, যা আল্লাহ্ জানতেন এবং তাঁর জানা কথাটিই তিনি প্রকাশ করেছেন এভাবে। আর 'ওয়াজহুন' কথাটি এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে অতিরিক্ত হিসেবে। এভাবে এর মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আমাদের এমতো কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র পরিতোষ অর্জন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা তোমাদের নিকট থেকে প্রতিদান চাই না'। একথার অর্থ— আমাদের এমতো দানের কোনো প্রকার প্রতিদান আমরা তোমাদের নিকট থেকে চাই না— না দৈহিক, না আর্থিক। আর 'ওয়ালা শুকূরা' অর্থ এবং কৃতজ্ঞতাও নয়। অর্থাৎ এজন্য আমরা তোমাদের কৃতজ্ঞতাপ্রত্যাশীও নই। 'শাকুর' 'দাখুল' 'জারুহ' 'ক্বুবুল' এসকল শব্দ ধাতুমূল। এক বর্ণনায় এসেছে, জননী

www.eelm.weebly.com

আয়েশা কোনো বাহককে দিয়ে কারো গৃহে সদকা প্রেরণের পর তার অপেক্ষায় থাকতেন। সে ফিরে এলে বলতেন, গৃহকর্ত্রী কী বললো? বাহক যদি বলতো, তিনি আপনার জন্য দোয়া করেছেন। একথাও শোনার সাথে সাথে তিনিও ওই গৃহকর্ত্রীর জন্য দোয়া করতেন, যাতে করে তার দান কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে অবশেষ থাকে।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিবসের'। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে অভাবী, এতিম ও বন্দীকে আহার্য দানের আর একটি কারণ। সেটি হচ্ছে— আল্লাহ্‌র ভয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমরা অন্নদান করি কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষ লাভের অভিলাষে এবং সেই প্রভুপালকের ভয়ে, যিনি নিশ্চিত অবতারণা ঘটাবেন মহাভীতিপ্রদ মহাপ্রলয় দিবসের। এছাড়া অন্য কিছু আমরা চাই-ই না— না কৃতিত্ব, না কৃতজ্ঞতা, না অন্য কোনো প্রকারের প্রতিদান।

'ইয়াওমান আ'বূসান কৃমৃত্বরীরা' অর্থ এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের। 'আ'বূস' অর্থ ভীতিপ্রদ, ভয়ার্ত, সন্ত্রস্ত। পদটি এখানে দিবসের বিশেষণ এবং রূপকার্থক। যেমন বলা হয় 'নাহারুহু সাওমুন' (তার দিবস রোজাদার)। দিবস তো কখনো রোজাদার হয় না। তাই কথাটির অর্থ হবে— সে দিবসে রোজা রেখেছে। অনুরূপ এখানে দিনের ভীতিপ্রদ হওয়ার অর্থ সেদিন মানুষ ভয়ার্ত হয়ে পড়বে। 'কৃমৃত্বরীর' অর্থ ভয়ংকর। কালাবী এর অর্থ করেছেন— ভীষণ ভয়াবহ। আখফাশ বলেছেন, 'কৃমৃত্বরীর' অর্থ সুদীর্ঘ ভয়াবহ দিবস। 'কামুস' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, 'কৃমৃত্বরীর' অর্থ ভয়াবহ, ভয়ংকর। 'ইক্বমাত্বর্‌রা' অর্থ কঠিনতম হয়ে যাওয়া। 'ইক্বমাত্বররা নাফসুহু' অর্থ সে ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তের দিকে উন্নীত হচ্ছে।

সূরা দাহ্‌র ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّ سُرُوْرًا ﴿١١﴾ وَ
جَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّ حَرِيْرًا ﴿١٢﴾ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى
الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّ لَا زَمْهَرِيْرًا ﴿١٣﴾ وَ دَانِيَةً
عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَ ذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ﴿١٤﴾ وَ يُطَافُ
عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّ اَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَاۡ ﴿١٥﴾
قَوَارِيْرَاۡ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿١٦﴾ وَ يُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا
كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ﴿١٨﴾ وَ

www.eelm.weebly.com

يُطُوفُ عَلَيۡهِمۡ وِلۡدَانٌ مُّخَلَّدُوۡنَ ۚ اِذَا رَاَيۡتَهُمۡ حَسِبۡتَهُمۡ لُؤۡلُؤًا مَّنۡثُوۡرًا ﴿۱۹﴾

q পরিণামে আল্লাহ্ তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন সেই দিবসের অনিষ্ট হইতে এবং তাহাদিগকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ,

q আর তাহাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কারস্বরূপ তাহাদিগকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র।

q সেথায় তাহারা সমাসীন হইবে সুসজ্জিত আসনে, তাহারা সেখানে অতিশয় গরম অথবা অতিশয় শীত বোধ করিবে না।

q সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাহাদের উপর থাকিবে এবং উহার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাহাদের আয়ত্তাধীন করা হইবে।

q তাহাদিগকে পরিবেশন করা হইবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানপাত্রে—

q রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে উহা পূর্ণ করিবে।

q সেথায় তাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া ইহবে যান্‌জাবীল মিশ্রিত পানীয়,

q জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের যাহার নাম সালসাবীল।

q তাহাদিগকে পরিবেশন করিবে চিরকিশোরগণ, যখন তুমি উহাদিগকে দেখিবে তখন মনে করিবে উহারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা,

---

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পুণ্যবান বিশ্বাসীরা যেহেতু আল্লাহ্ ও মহাপ্রলয় দিবসকে ভয় করে, সেহেতু তিনি তাদেরকে তখন সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে তখন দান করবেন সজীবতা ও শান্তি। এখানকার 'ফা ওয়াক্বাহুমুল্লহ' (আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করবেন) কথাটির 'ফা' হেতুপ্রকাশক। অর্থাৎ যেহেতু অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় ও পরকালের শাস্তির আতংক থাকার কারণে তারা সতত পুণ্যকর্ম সম্পাদনে সচেষ্ট থাকে, সেহেতু আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেদিনের অকল্যাণ থেকে। 'শার' অর্থ এখানে অনিষ্ট, চক্রান্ত। আর 'ওয়া লাক্বক্বাহুম নাদ্বরাতাওঁ ওয়া সুরূরা' অর্থ এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র'। একথার অর্থ— পৃথিবীতে দুঃখ-ক্লেশে পতিত হয়ে অদৃষ্টের বিধানকে মেনে নিয়ে তারা যে ধৈর্য অবলম্বন করে, তার বিনিময় হিসেবেই আমি তাদেরকে দান করবো জান্নাত। সেখানে তাদেরকে পরাবো রেশমী বসন।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, তারা সেখানে অতিশয় গরম, অথবা অতিশয় শীত বোধ করবে না'। এখানকার 'মুত্তাকিঈনা' পদটি অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ পুণ্যবানেরা জান্নাতে

www.eelm.weebly.com

সমাসীন হবে সুসজ্জিত পালংকে। 'আরাইক' অর্থ সুসজ্জিত, ঝালরযুক্ত মশারী বা পালংক। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— পর্দাবিবর্জিত উন্মুক্ত খাট। আর বায়হাকী বলেছেন, 'আরাইক' বলে ছাউনি ও পর্দাঘেরা খাটকে, উন্মুক্ত খাটকে নয়।

'কামুস' অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, হিম-ঠাণ্ডা চাঁদকে বলে 'যামহারীর'। 'ইযমাহার্‌রাতিল কাওয়াকিব' অর্থ নক্ষত্রপুঞ্জ চমকাচ্ছে। 'যামহারী'র প্রকৃত অর্থ প্রচণ্ড শৈত্য। আর 'শামস্‌' অর্থ প্রখর দাবদাহ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বেহেশতের আবহাওয়া কখনোই চরমভাবাপন্ন হবে না। বরং সেখানে বিরাজ করবে চিরবসন্ত— না গ্রীষ্ম, না শীত।

ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আহমদ তাঁর 'জাওয়ায়েদ' গ্রন্থে সংকলন করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, জান্নাত অত্যন্ত আরামদায়ক স্থান। সেখানে অত্যধিক উষ্ণতা যেমন নেই, তেমনি নেই অতিরিক্ত শীতলতা। অথবা 'যামহারীর' অর্থ এখানে— চন্দ্র, কিংবা জ্যোতির্ময় নক্ষত্র। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে জান্নাত স্বয়ং আলোকজ্জ্বল, তার প্রভুপালকের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান। তাকে আলোকিত করার জন্য চন্দ্র-সূর্যের কোনো প্রয়োজনই নেই। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, শুয়াইব ইবনে জাইহান বলেছেন, একদিন আমি অতি প্রত্যুষে আবুল আলিয়ার সঙ্গে বাইরে বের হলাম। তিনি বললেন, জান্নাত এরকম শুভ্র ও পরিমল আলোয় সতত উদ্ভাসিত। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'আর দীর্ঘায়িত ছায়া'।

আমি বলি, আবুল আলিয়ার বক্তব্যটি এমন নয় যে, ভোরের আলো অবিকল জান্নাতের আলোর মতো। এরকম হওয়া সম্ভবই নয়; কেননা ভোরের আলোর শুভ্রতা ও পরিমল ক্ষণস্থায়ী। তাছাড়া তার মধ্যে রাতের আবছা অন্ধকারও তো রয়েছে। বরং তাঁর এমতো তুলনার অর্থ হচ্ছে— ভোরের শুভ্রতা যেমন অনিঃশেষে এগিয়ে চলে নতুন নতুন দিগন্তে, তেমনি জান্নাতের জ্যোতিচ্ছটাও অন্তহীন, অনিঃশেষ, চিরভাস্বর।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'ওয়া দানিয়াতান আ'লাইহিম জিলালুহা' (সন্নিহিত বৃক্ষচ্ছায়া তাদের উপরে থাকবে)। এখানে 'দানিয়াতুন' অর্থ সন্নিহিত, নিকটবর্তী, সমীপবর্তী। এর যোগসূত্র রয়েছে আগের আয়াতের 'মুত্‌তাকিঈনা' কথাটির সঙ্গে; অথবা 'লা ইয়ারাওনা' এর সঙ্গে। অর্থাৎ তারা সন্নিকটেই দেখবে। কিংবা কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে ১২ সংখ্যক আয়াতের জান্নাত এর সঙ্গে এবং ধরে নিতে হবে নামপদ এখানে রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক দান করবেন আর একটি জান্নাত, যার ছায়া হবে সন্নিকটবর্তী, যেনো তাদেরকে দান করা হবে দু'টি করে জান্নাত, যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সম্মুখীন হওয়াকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত'। তবে এ ব্যাখ্যাটি অ-সবল। কেননা এতে করে এই ধারণাটি প্রশ্রয় পেতে পারে যে, আগের জান্নাতের ছায়া নিকটবর্তী হবে না, সেখানে সন্নিহিত বৃক্ষচ্ছায়া তাদের উপরে থাকবে না।

www.eelm.weebly.com

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া জুল্লিলাত কুতুফুহা তাজ্লীলা' (এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে)। এখানকার 'জুললিলাত' আগের বাক্যের 'জিলালুহা' এর অবস্থাপ্রকাশক। অথবা শব্দটি সম্পর্কযুক্ত হবে আগের বাক্যের 'দানিয়াতুন' এর সঙ্গে। 'কুতুফ' অর্থ ফল। অর্থাৎ জান্নাতের ফলমূল হবে সহজলভ্য। জান্নাতবাসীগণ যখন যেভাবে যতোটুকু ইচ্ছা সেগুলো চয়ন করতে পারবে। ভোগও করতে পারবে যথেচ্ছভাবে। হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, জান্নাতবাসীরা তাদের ইচ্ছা মতো সেখানকার বৃক্ষের ফল আহরণ ও আস্বাদন করতে পারবে— দাঁড়িয়ে, বসে অথবা শুয়ে। বায়হাকী, সাঈদ ইবনে মনসুর।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পানপাত্রে— (১৫) রজতশুভ্র স্ফটিকপাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে' (১৬)।

এখানকার 'আকওয়াব' অর্থ রৌপ্যপাত্র। 'কানাত' ক্রিয়াটিকে যদি এখানে অসমাপিকা ক্রিয়া ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এখানকার 'ক্বওয়ারীর' হবে অবস্থা প্রকাশক। অর্থাৎ পানপাত্র হবে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। আর যদি ক্রিয়াটিকে ধরা হয় সমাপিকা তাহলে 'ক্বওয়ারীর' হবে তার বিধেয়, অর্থাৎ ওই পানপাত্র হবে স্বচ্ছতায় ও ঔজ্জ্বল্যে স্ফটিকনির্মিত পেয়ালার মতো। আউফি সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই পানপাত্রগুলি হবে রৌপ্যনির্মিতই, কিন্তু তার স্বচ্ছতা হবে স্ফটিক সদৃশ। সাঈদ ইবনে মাসউদ ইবনে আবদুর রাজ্জাক ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৃথিবীর রূপা পিটিয়ে মাছির পাখার মতো হালকা পাত তৈরী করে তা দিয়ে যদি তোমরা পানপাত্র নির্মাণ করো, তবুও সে পাত্রের গাত্র ভেদ করে পানি দৃষ্টিগোচর হবে না। কিন্তু জান্নাতের পানপাত্রের শুভ্রতা হবে চাঁদির মতো এবং স্বচ্ছতা কাঁচের মতো।

'ক্বওয়ারীরা মিন ফিদ্দ্বাতিন' অর্থ রজত শুভ্র স্ফটিক পাত্রে। এই কথাটি আগের বাক্যের 'ক্বওয়ারীরা' এর অনুবর্তী। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বেহেশতে এমন কিছু নেই, যার নমুনা পৃথিবীতে নেই। যেমন সেখানকার রৌপ্যপাত্র এখানকার রূপার পেয়ালার মতো। কালাবী বলেছেন, প্রত্যেক জাতির পানপাত্র সে দেশের মৃত্তিকানির্মিত। কিন্তু জান্নাতের মৃত্তিকা রৌপ্যের। তাই জান্নাতের পানপাত্রও রৌপ্যের।

'পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে' অর্থ জান্নাতের সেবকগণ ওই পানপাত্রগুলো এমনভাবে পানীয়পূর্ণ করবে যে, তা হবে সুপরিমিত, যা পান করলে জান্নাতবাসীরা হবে পুরোপুরি পরিতৃপ্ত। পানীয়ের পরিমাণে থাকবে না বিন্দুবৎ ন্যূনতা, অথবা অতিরিক্ততা। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ফারইয়াবি এরকমই বর্ণনা করেছেন। শায়েখ ইয়াকুব চরখী বলেছেন, সম্ভবত কথাটিতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ পরিচিতি যে যতোটুকু লাভ করবে, সে অনুপাতে

www.eelm.weebly.com

জান্নাতবাসীরা পান করবে তাদের পানীয়। হান্নাদ বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে' অর্থ সেবকেরা পানপাত্রগুলো পূর্ণ করবে কানায় কানায়, কিন্তু তা উপচে পড়বে না। আর সেগুলোতে তারা এমনভাবেও পরিবেশন করবে না যে, দেখে মনে হবে পানীয় পড়ে রয়েছে প্রায় তলায়। প্রকৃত কথা হচ্ছে— জান্নাতবাসীরা মনে মনে একটা পরিমাণ স্থির করবে। ঠিক সেই পরিমাণেই পানীয় পরিবেশিত হবে তাদের পানপাত্রে। অথবা মর্মার্থ হবে— পুণ্যকর্মের তারতম্যানুসারে তখন ঘটবে তাদের প্রাপ্তি।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'সেখানে তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে যানজাবীল মিশ্রিত পানীয়'। এখানকার 'পান করতে দেওয়া হবে' কথাটি সম্পর্কযুক্ত ১৯ সংখ্যক আয়াতের 'পরিবেশন করবে কিশোরগণ' বাক্যের সঙ্গে। আর 'কা'সান' অর্থ এখানে প্রকৃতই পানীয় বস্তু, রূপকার্থক নয়। আর এখানকার 'যানজাবীল মিশ্রিত পানি' বাক্যটি পান করতে দেওয়া হবে' বাক্যের বিশেষণ। আর 'যানজাবীল মিশ্রিত' অর্থ আদা মিশ্রিত। শুকনো আদা ভেজানো পানীয় আরববাসীগণের নিকট ছিলো খুবই প্রিয়। এখানে আল্লাহ্পাক তাদের ওই প্রিয় পানীয় প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোরআন মজীদে জান্নাতের যে সকল নেয়ামতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর নমুনা পৃথিবীতেও আছে। কেউ কেউ বলেছেন, 'যানজাবীল' হচ্ছে বেহেশতের একটি ঝর্ণা, যার পানি হবে শুকনো আদা মিশ্রিত। কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন জান্নাতীরা ঝরণার পানি পাবে মিশ্রিত হওয়ার আগে এবং সাধারণ জান্নাতীরা মিশ্রিত হওয়ার পরে।

আমি বলি, আল্লাহ্পাক কখনো বলেছেন, কর্পুর মিশ্রিত পানির কথা। আবার কখনো বলেছেন, শুকনো আদা মিশ্রিত পানির কথা। সুতরাং বুঝতে হবে, বেহেশতে পানীয় পরিবেশন করা হবে বেহেশতবাসীদের রুচি ও স্বভাব অনুসারে। উষ্ণ স্বভাবসম্পন্ন যারা, তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে শীতল পানীয়। কর্পুর মিশ্রিত পানীয়ও তাদের জন্য হবে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আর শিষ্টস্বভাবসম্পন্নদের জন্য অধিক আকর্ষণীয় মনে হবে তেজবর্ধক পানীয়। শুকনো আদামিশ্রিত পানীয়ই পছন্দ করবে তারা।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের, যার নাম সালসাবীল'। একথার অর্থ— ওই আদা মিশ্রিত পানি হবে সালসাবীল নামক প্রস্রবণের।

'সালসাবীল' যদি বেহেশতের কোনো প্রস্রবণের নাম হয়, তবে এখানকার 'আইনান' পদটি হবে তার অনুবর্তী। অন্যথায় শব্দটি অনুবর্তী হবে আগের আয়াতের 'কা'সান' (পান করতে দেওয়া হবে) কথাটির এবং মনে করতে হবে সম্বন্ধ পদ এখানে রয়েছে উহ্য।

www.eelm.weebly.com

‘সালসাবীল’ বলে ওই প্রস্রবণকে, যার পানি অনায়াসে পান করা যায়। অর্থাৎ যার পানি সুপেয়। ‘সালসালা’ ‘সালসালান’ ‘সালসাবীলান’ শব্দত্রয় সমঅর্থসম্পন্ন। কেউ কেউ বলেছেন, ‘সালসাবীল’ এর মূল রূপ ছিলো ‘সালসীল’। এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে একটি অতিরিক্ত অক্ষর ‘বা’। ‘সালসাবীল’ নামকরণের তাৎপর্য সম্পর্কে জুজায বলেছেন, জান্নাতবাসীরা তাদের ইচ্ছা মতো সেখানকার নদীগুলোকে প্রবাহিত করতে পারবে। নদীগুলোকে এরকম নাম দেওয়া হয়েছে সে কারণেই। মুকাতিল ও আবুল আলিয়া বলেছেন, সালসাবীল প্রবহমান থাকবে জান্নাতের পথে-ঘাটে, অলিন্দে-উদ্যানে, ঘর- দোরের আনাচে কানাচে। আরশের নিম্নদেশ থেকে প্রবাহিত হয়ে জান্নাতে আদন ভেদ করে সেগুলো বিস্তৃত হয়ে পড়বে অন্যান্য জান্নাতে। সেগুলো প্রবাহিত হবে জান্নাতবাসীদের অভিপ্রায়ানুসারে। আর সেগুলোর পানিতে থাকবে কর্পুরের শীতলতা, শুকনো আদার আস্বাদ ও মেশকের সুরভি।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— ‘তাদেরকে পরিবেশন করবে চিরকিশোরগণ, যখন তুমি তাদেরকে দেখবে, তখন মনে করবে, তারা যেনো বিক্ষিপ্ত মুক্তা’। ‘উইলদান’ অর্থ গিলমান, জান্নাতের সেবক, পরিচারক, অথবা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অকালপ্রয়াত শিশুগণ। তাদেরকেই সেখানে নিযুক্ত করা হবে বেহেশতবাসীদের পরিচারকরূপে। বার্ধক্য এবং মৃত্যু তাদেরকে কখনোই স্পর্শ করবে না। তাই এখানে বলা হয়েছে ‘মুখাল্লাদূন’। ওই গিলমানেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে জান্নাতের যত্রতত্র। তাদের ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য দেখে তাই তখন মনে হবে, তারা যেনো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা। হান্নাদ, ইবনে মোবারক ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর একবার বললেন, সর্বনিম্ন মর্যাদাধারী বেহেশতবাসী হবে এক হাজার গিলমানের মালিক। আর ওই গিলমানদের প্রত্যেকের কর্ম ও দায়িত্ব হবে পৃথক পৃথক। এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন আলোচ্য আয়াত।

হজরত আনাস থেকে ইবনে আবিদ্দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সর্বনিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন বেহেশতবাসীদের প্রত্যেকের নির্দেশ পালনের জন্য সদাপ্রস্তুত থাকবে দশ হাজার পরিচারক। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবিদ্দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সর্বনিম্ন স্তরের বেহেশতবাসী যে হবে, তার সেবার উদ্দেশ্যে সকাল-সন্ধ্যায় আগমন করবে পাঁচ হাজার সেবক। তাদের প্রত্যেকের হাতে এমন পান-ভোজনের আয়োজন থাকবে, যা থাকবে না অন্যের হাতে। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

ইকরামা সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ওমর রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, তিনি স. শুয়ে রয়েছেন একটি খেজুরপাতার পাটির উপর। তাঁর পবিত্র শরীরে অঙ্কিত রয়েছে খেজুর পাতার দাগ। তিনি এ দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেললেন। রসুল স. বললেন, ওমর! কাঁদছো কেনো? তিনি বললেন, রোম, পারস্য ও আবিসিনিয়ার রাজারা কতোইনা বিলাস

www.eelm.weebly.com

ব্যসনে দিন কাটায়। আর আপনি আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল হওয়া সত্ত্বেও শুয়ে রয়েছেন খেজুর পাতার পাটিতে। তিনি স. বললেন, ওমর! তুমি কি একথা জেনে প্রসন্ন হবে না যে, তাদেরকে দেওয়া হয়েছে ইহকাল, আর পরকাল কেবল আমাদের? এ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

সূরা দাহ্‌র ঃ আয়াত ২০, ২১, ২২

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَّمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَّإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَّحُلُّوٓا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾

r তুমি যখন সেথায় দেখিবে, দেখিতে পাইবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য।

r তাহাদের আবরণ হইবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, তাহারা অলংকৃত হইবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে পান করাইবেন বিশুদ্ধ পানীয়।

r অবশ্য, ইহাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনাকে এবং আপনার বিশ্বাসী উম্মতকে যখন বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে, তখন দেখতে পাবেন, সেখানে রয়েছে অজস্র-অসংখ্য সুখোপকরণ এবং সে রাজ্যের পরিধি কতো বিশাল!

এখানকার 'রআয়তা' (দেখবে) ক্রিয়াটি সকর্মক ক্রিয়া, কিন্তু এখানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে অকর্মক ক্রিয়া হিসেবে। এর কর্মপদ এখানে রয়েছে উহ্য। 'ছাম্‌মা' অর্থ সেখানে। অর্থাৎ বেহেশতে। পদটি 'রআয়তা' পদের ক্রিয়ার স্থানাধার। 'নাঈমান' অর্থ সীমাহীন শান্তি। ইতোপূর্বে সর্বোন্নত সূত্রবিশিষ্ট হজরত ইবনে ওমরের একটি হাদিসে বলা হয়েছে, সর্বনিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন বেহেশতবাসী এক হাজার, অথবা দু'হাজার বৎসরের পথের সমদূরত্বে থেকেও দেখতে পাবে বাগ-বাগিচা, প্রাসাদ, সঙ্গিনী, সেবক-পরিচারক ও খাট-পালঙ্ককে। নিকট-দূরের সকল কিছুই তার দৃষ্টিতে থাকবে সমভাবে প্রতিভাসিত। আর বেহেশতকে এখানে 'মুলকান কাবীরা' (বিশাল রাজ্য) বলা হয়েছে একারণে যে, তার সীমানা হবে যেমন সুবিশাল, তেমনি সে রাজ্য হবে চিরন্তন। সেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে শান্তি সম্ভাষণ জানাতে থাকবে ফেরেশতারা। আর সেখানে তারা যা চাবে, তা-ই পাবে। সর্বোপরি পাবে তাদের মহাপ্রতাপশালী প্রভুপালনকর্তার আনুরূপ্যবিহীন দর্শন।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম'। এখানে 'ছিয়াব' (আবরণ) হচ্ছে উদ্দেশ্য, অথবা বিধেয়, কিংবা 'আ'লীয়াহুম' বাক্যের কর্তা। 'সুনদুস' অর্থ সূক্ষ্ম, মিহিন রেশমী বস্ত্র এবং 'ইস্তাব্রাক্ব' অর্থ স্থূল রেশম, ঘন বুননবিশিষ্ট পুরুষ্ট রেশমী চাদর। অথবা টেকসই জলজ রেশমী উত্তরীয়। কামুস।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহক! জান্নাতবাসীদের বস্ত্র কীরূপ হবে? সেগুলো কী বৃক্ষোদ্ভূত তন্তু দ্বারা নির্মিত হবে? তিনি স. বললেন, সেগুলো হবে জান্নাতেরই ফল, জান্নাতের বৃক্ষোদ্ভূত। উত্তম সূত্রপরম্পরায় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নাসাঈ, বায্যার ও বায়হাকী। বিশুদ্ধ সূত্র সহযোগে বায্যার, তিবরানী ও আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, জান্নাতের একটি বৃক্ষে উৎপন্ন হবে রেশম। ওই রেশম দিয়েই পরিধেয় প্রস্তুত করা হবে জান্নাতবাসীদের। হজরত ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে পুরুষ পৃথিবীতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করে, সে জান্নাতে রেশমী পরিধেয় পাবে না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী, মুসলিম, হাকেম এবং নাসাঈও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এই কথাটুকু— যে ব্যক্তি এ জগতে মদ্যপান করেছে, সে আর সুরাপান করতে পারবে না ওই জগতে। যে ব্যক্তি স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত পাত্রে পানাহার করেছে, সেও সেখানে বঞ্চিত থাকবে সোনা-রূপার পাত্রে পরিবেশিত পানাহার থেকে। বোখারী ও মুসলিম হজরত আনাস ও হজরত যোবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত ওমরের অনুরূপ হাদিস। আবার এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও। তবে সেখানে অতিরিক্ত হিসেবে বলা হয়েছে— জান্নাতে প্রবেশ করলেও সে পরতে পারবে না রেশমী পোশাক। বিশুদ্ধ সূত্রসহযোগে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদও। হাদিসটির সংকলয়িতাদের মধ্যে আরো রয়েছেন নাসাঈ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা অলংকৃত হবে রৌপ্যনির্মিত কংকনে'। বাক্যটির যোগসূত্র রয়েছে ১৫ সংখ্যক আয়াতের 'তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে' কথাটির সঙ্গে। অথবা কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে ১৯ সংখ্যক আয়াতের 'তাদেরকে পরিবেশন করবে চিরকিশোরগণ' বাক্যটির সঙ্গে। অথবা কথাটি এই আয়াতেরই 'তাদের আবরণ হবে' বাক্যটির অবস্থাপ্রকাশক। এখানে উহ্য রয়েছে একটি নিশ্চিতার্থক শব্দ 'ক্বদ' (নিশ্চয়)। আরও উহ্য রয়েছে এখানকার 'আসাউইরা' শব্দের পূর্বে একটি যের প্রদানকারী অব্যয়ও। আর এখানকার 'মিন ফিদ্বদ্বাত' (রৌপ্যের) কথাটির 'মিন' এখানে সংযোজিত হয়েছে অতিরিক্ত হিসেবে। আবু শায়েখ তাঁর 'আলউজমা' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, একজন ফেরেশতা জান্নাতবাসীদের সৃষ্টির পূর্ব থেকে

www.eelm.weebly.com

এখন পর্যন্ত ক্রমাগত নির্মাণ করে যাচ্ছে তাদের অলংকার। মহা প্রলয়কাল পর্যন্ত চলতেই থাকবে তার এমতো নির্মাণকর্ম। ওই অলংকারগুলোর কোনো একটিকে যদি পৃথিবীতে আনা হয় তবে তার তেজে নিষ্প্রভ হয়ে যাবে সূর্যকরচ্ছটা।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীগণের হাতে অলংকার থাকবে তাদের ওজুর স্থান পর্যন্ত। নাসাঈ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত উকবা ইবনে আমের উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যদি তোমরা জান্নাতের রেশমী বসন ও কংকন পরতে চাও, তবে পৃথিবীতে ওগুলো ব্যবহার কোরো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়'। একথার অর্থ— যা পবিত্র ও অস্পর্শিত, ওইরূপ অভূতপূর্ব পানীয় আল্লাহ্ পান করাবেন জান্নাতের অধিবাসীদেরকে। ওই পানীয়ের নাম শারাবান ত্বহূরা। আবু কেলাবা ও ইব্রাহিম বলেছেন, জান্নাতের পানীয় জান্নাতবাসীদের শরীরাভ্যন্তরে কোনো বর্জ উৎপাদন করবে না। বরং তা কেবল প্রস্তুত করবে মেশক আম্বর সদৃশ সুরভিত স্বেদ। আর এমতো স্বেদনির্গমনের ফলেই সৃষ্টি হবে তাদের পানাহার-স্পৃহা।

মুকাতিল বলেছেন, জান্নাতের তোরণে বিদ্যমান থাকবে 'ত্বহুরা' নামক একটি পানির উৎস। ওই উৎসের পানি পান করবে যারা, আল্লাহ্পাক তাদের অন্তর থেকে চিরদিনের জন্য দূর করে দিবেন হিংসা- দ্বেষ। বায়যাবী লিখেছেন, এ সকল কথার চেয়ে উত্তম কথা হচ্ছে, সেখানকার শরাব হবে অমূল্য ও অতুলনীয় এক পানীয়, যা পরিবেশন করবেন স্বয়ং আল্লাহ্। ওই পানীয়ের নামই 'শারাবান ত্বহূরা'। ওই পানীয় পান করলে পানকারী চিরদিনের জন্য হয়ে যাবে অন্যের মোহ থেকে মুক্ত। কেবল আল্লাহ্ই হবেন তখন তার কামনা ও আরাধনা। তখনই সে লাভ করবে পরমতম সত্তার অতুল দর্শন। এই পর্যায়টি পুণ্যবানগণের বিনিময় প্রাপ্তির সর্বোচ্চ স্তর। আর প্রাথমিক স্তর সিদ্দীকগণের।

'মাদারেক' রচয়িতা লিখেছেন, কেউ কেউ বলেন, জান্নাতবাসীদেরকে পানীয় পরিবেশন করবে ফেরেশতারা। একসময় জান্নাতবাসীরা অভিমান করবে। বলবে, হে আল্লাহ্! এতোদিন ধরে আমরা অন্যের মাধ্যমে পানীয় লাভ করেছি। এখন কোনো মাধ্যম আমরা চাই না। আমরা এখন চাই সরাসরি। হঠাৎ দেখা যাবে নেপথ্য থেকে পানীয়পূর্ণ পানপাত্র এসে ঠেকেছে তাদের ওষ্ঠাধারে। এমতো বক্তব্যের সমর্থনে উল্লেখ করা যেতে পারে উত্তম সূত্রপরম্পরায় হজরত আবু উমামা থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, জান্নাতবাসীরা মনে মনে সুরা পানের আকাংখা করবে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতে এসে যাবে সুরার পেয়ালা। তারা তখন তা পান করে পরিতৃপ্ত হবে। মাওলানা ইয়াকুব চরখী বলেছেন, অগ্রগামী নৈকট্যভাজনগণের নিকটে কোনো মাধ্যম

www.eelm.weebly.com

ছাড়াই শরাবের জাম পৌঁছে যাবে আরশের নিম্নদেশ থেকে। সাধারণ পুণ্যবানগণের কাছে পৌঁছবে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে। আর জাহান্নামের শাস্তিভোগের পর আল্লাহ্‌র কৃপায় ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের কাছে সুরা পরিবেশন করবে গিলমানেরা।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে সাধারণ পুণ্যবান (আবরার)গণের কথা। তাদেরকে পানীয় পরিবেশন করবে কখনো গিলমানেরা, কখনো ফেরেশতারা। আবার কখনো তারা পানীয় পাবে কোন প্রকার মাধ্যম ব্যতিরেকেই। আর নৈকট্যভাজনগণ (মুকাররাবীন) অধিকাংশ সময় পানীয় লাভ করবে বিনা মাধ্যমে, সরাসরি।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'অবশ্য এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত'। একথার অর্থ— এতোক্ষণ ধরে যে সকল সুখোপকরণের বিবরণ দেওয়া হলো, সেগুলো তোমরা পাবে তোমাদের পুণ্যকর্মের বদৌলতে। কেননা তোমার শুভকর্মসমূহ আমার নিকটে হবে গ্রহণযোগ্য।

এখানে 'মাশকূরা' অর্থ স্বীকৃত, গ্রাহ্য, মনঃপুত, প্রশংসার্হ, প্রতিদান প্রাপ্তির উপযুক্ত। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি যেনো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ। ওই সকল পুণ্যবানেরা নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যেহেতু অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীর আহার যোগান এবং যেহেতু তারা এর গ্রহীতার নিকট কোনো প্রতিদান অথবা কৃতজ্ঞতার অভিলাষী হন না, সেহেতু আল্লাহ্‌পাক তাদের প্রতি প্রকাশ করেছেন কৃতজ্ঞতা। অর্থাৎ তিনি তাঁদের এমতো বিশুদ্ধ পুণ্য প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। আমি বলি, আল্লাহ্‌পাক তাঁদেরকে পুরস্কৃত করবেন নিজে দয়াপরবশ হয়ে। নতুবা এমন পুণ্যকর্ম কোথায়, যার বদলে পুণ্যবানেরা জান্নাতপ্রাপ্তির দাবি জানাতে পারে।

সূরা দাহ্‌র ঃ আয়াত ২৩— ৩১

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ
هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾
نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۚ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ

www.eelm.weebly.com

تَبۡدِيۡلًا ﴿۲۸﴾ اِنَّ هٰذِهٖ تَذۡكِرَةٌ ۚ فَمَنۡ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيۡلًا ﴿۲۹﴾ وَ
مَا تَشَآءُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا ﴿۳۰﴾ ۖ
يُّدۡخِلُ مَنۡ يَّشَآءُ فِىۡ رَحۡمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمِيۡنَ اَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابًا اَلِيۡمًا ﴿۳۱﴾

q আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি ক্রমে ক্রমে।

q সুতরাং ধৈর্যের সহিত তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর এবং উহাদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অথবা কাফির তাহার আনুগত্য করিও না।

q এবং তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর সকালে ও সন্ধ্যায়,

q এবং রাত্রির কিয়দংশে তাঁহার প্রতি সিজদাবনত হও আর রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

q উহারা ভালবাসে পার্থিব জীবনকে এবং উহারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করিয়া চলে।

q আমি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাদের গঠন সুদৃঢ় করিয়াছি। আমি যখন ইচ্ছা করিব উহাদের পরিবর্তে উহাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করিব।

q ইহা এক উপদেশ, অতএব যাহার ইচ্ছা সে তাহার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক।

q তোমরা ইচ্ছা করিবে না যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

q তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁহার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু যালিমরা— উহাদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রাখিয়াছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! সমগ্র কোরআন আমি একবারে অবতীর্ণ করি নাই। বরং অবতীর্ণ করেছি এর একটি একটি করে আয়াত, অথবা সুরা। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। বৈয়াকরণগণের মতে বাক্যটি অত্যন্ত বেগবান। এর মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে, ক্রমে ক্রমে কোরআন অবতীর্ণ করার মধ্যে রয়েছে সবিশেষ প্রজ্ঞা ও অতিসুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিদর্শন।

পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং ধৈর্যের সঙ্গে তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষা করো'। এখানে 'ফাসবির' (ধৈর্যের সঙ্গে) কথাটির 'ফা' অব্যয়টি নিমিত্ত প্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! পাপী ও পুণ্যবানদের শেষ পরিণতি কী হবে, সে কথা যখন আপনি জানতে পারলেন, সেই সঙ্গে বুঝলেন কী কারণে আমি তাদেরকে শায়েস্তা করতে বিলম্ব করছি, তখন আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দ্বারা সৃষ্ট অপমান-অত্যাচারের

www.eelm.weebly.com

ব্যাপারে কিছুকাল ধৈর্যধারণ করুন। তাদের ত্বরিৎ শাস্তি আর কামনা করবেন না। আর এর জন্য মনঃক্ষুণ্ণও হবেন না। বরং আপনি সর্বাবস্থায় প্রতীক্ষা করতে থাকুন নতুন নতুন নির্দেশের। দেখুন, আপনার প্রতি কখন কী অবতীর্ণ হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ, অথবা কাফের, তার আনুগত্য কোরো না'। একথার অর্থ— ইসলামের পূর্ণ বিজয় বিলম্বিত হতে দেখে পাপিষ্ঠ, অথবা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথামতো চলতেও চেষ্টা করবেন না। এখানে 'আছিমা' অর্থ ওই পাপিষ্ঠ, যে মানুষকে পাপকর্মের দিকে আহ্বান জানায়। আর 'কাফুর' অর্থ ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, যে আহ্বান জানায় সত্যপ্রত্যাখ্যানের (কুফরীর) দিকে।

সংশয় ঃ আলোচ্য বাক্য দৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে, যে কোনো এক দলের আনুগত্য পরিহার করতে হবে— গোনাহগারের, অথবা কাফেরের। তাহলে কি এরকম বলতে পারা যাবে যে, তাদের যে কোনো একজনের আনুগত্য সিদ্ধ?

সংশয় অপনোদন ঃ এখানকার 'আছিমান' ও 'কাফূরান' শব্দ দু'টো অনির্দিষ্টবাচক, একটি না-সূচক নিষেধাজ্ঞার অধীন। নিয়ম হচ্ছে অনির্দিষ্টবাচক বিষয়াদি নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হলে তা কার্যকর হয় সাধারণভাবে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়, পাপকর্মে আহ্বান করুক, অথবা আহ্বান করুক কুফরী কর্মের প্রতি— কোনোটারই আনুগত্য করা যাবে না। কিন্তু এখানে 'আও' (অথবা) এর পরিবর্তে যদি ব্যবহৃত হতো 'ওয়াও' (এবং) তবে বক্তব্যটি দাঁড়াতো— ওই ব্যক্তির আনুগত্য করা যাবে না, যে আহ্বান জানায় পাপ ও সত্যপ্রত্যাখ্যান উভয়ের প্রতি। এতে করে একথা পরিষ্কার বুঝা যেতো না যে, তার কোন কর্মের আনুগত্য করা যাবে না— পাপের, না সত্যপ্রত্যাখ্যানের।

আয়াতের দাবি ঃ আলোচ্য আয়াতের দাবিটি এরকম— যদি পাপ পথে আহ্বানকারী, অথবা অবিশ্বাসের দিকে আহ্বানকারী এমন কোনো কর্মের প্রতি আহ্বান জানায়, যা পাপ-অবিশ্বাস কোনোটাই নয়, তবে তার আনুগত্য করা সিদ্ধ হবে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'অথবা 'ব্যবহৃত হয়েছে 'এবং' অর্থে। আর এখানকার 'আছিম' ও 'কাফূর' উভয়টির যুগ্মোপলক্ষ— আবু জেহেল। ঘটনাটি ছিলো এরকম— সে একবার রসুল স. এর নামাজে বাধা সৃষ্টি করলো। বললো, এখন থেকে তোমাকে এবং তোমার অনুচরদেরকে নামাজ পড়তে দেখলে আমি তোমাদের গর্দান পদদলিত করবো। কাতাদা থেকে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন আবদুর রাজ্জাক, ইবনে মুনজির ও ইবনে জারীর।

মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'পাপিষ্ঠ' ও 'কাফের' বলে বুঝানো হয়েছে যথাক্রমে উতবা ইবনে রবীয়া এবং ওলীদ ইবনে মুগীরাকে। তাঁরা দু'জন একবার রসুল স.কে বললো, মোহাম্মদ! তুমি যা করছো, তা-কি নারী ও সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে? উতবা বললো, যদি বলো, তাহলে আমার কন্যার সঙ্গে বিনা মোহরে আমি

www.eelm.weebly.com

তোমার বিয়ে দিয়ে দেই। ওলীদ বললো, আমি তোমাকে দিবো তোমার মনোমতো সম্পদ। এই ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'এবং তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো সকালে ও সন্ধ্যায়'। এখানে 'জিকির' (স্মরণ) অর্থ নামাজ। ব্যষ্টি বলে এখানে রূপকার্থ নেওয়া হয়েছে সমষ্টির। শর্ত শুধু একটিই— অংশটিও যেনো হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন তাকবীরে তাহরীমা নামাজের অংশ, কিন্তু অপরিহার্য একটি অঙ্গ। অথবা বলা যেতে পারে, নামাজের প্রতিটি পালনীয় বিষয়ই জিকির। যেমন রসুল স. বলেছেন, নামাজে মানুষের কথার কোনো অংশ নেই। নামাজ কেবল তাকবীর, তাসবীহ্ ও কোরআন আবৃত্তি। মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

এখানে 'বুকরাতান' অর্থ সকালে দিবসের প্রথমভাগে। অর্থাৎ ফজরের নামাজ। আর 'আসীলা' অর্থ সন্ধ্যায়, দিবসের শেষভাগে। অর্থাৎ জোহর ও আসরের নামাজ।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'এবং রাত্রির কিয়দংশে তাঁর প্রতি সেজদাবনত হও, আর রাত্রির দীর্ঘসময় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো'। এখানে আবার 'সেজদা' অর্থ নামাজ। অর্থাৎ পূর্বের আয়াতে ফজর, জোহর ও আসরের কথা বলে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে মাগরিব ও এশার নামাজের কথা। এভাবে দেওয়া হয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাঠের নির্দেশ। আর রাতের নামাজ যেহেতু কষ্টসাধ্য, তাই 'মিনাল্ লাইল' (রাত্রির কিয়দংশে কথাটিকে এখানে বসানো হয়েছে 'ফাসজুদ্ লাহু' (সেজদাবনত হও) কথাটির পূর্বে। 'ফাসজুদ্' এর 'ফা' অব্যয়টি এখানে অতিরিক্ত হিসেবে সংযোজিত। আর শর্তমূলক একটি পদ 'আম্মা' এখানে রয়েছে উহ্য। প্রকৃত বাক্য ছিলো যেনো 'ওয়া আম্মা মিনাল লাইলি ফাসজুদ্'। আবার 'তসবীহ্' (পবিত্রতা ও মহিমা) অর্থও এখানে নামাজ। আর 'ত্বউইলান' (দীর্ঘতর) পদটি একটি উহ্য নামপদের বিশেষণ। অর্থাৎ 'তাসবীহান ত্বউইলান' (প্রলম্বিত, দীর্ঘ তসবীহ)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— রাতের নামাজ পাঠ করো অর্ধরাত্রি ব্যাপী, অথবা তার কিছু কম বেশী।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তারা ভালোবাসে পার্থিব জীবনকে এবং তারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে চলে'। একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকদের কাছে পার্থিবতাই পরমার্থ। পরবর্তী পৃথিবীতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য যে কঠিন বিপদ রয়েছে, সে কথার পরওয়া তারা করেই না। এখানে 'ইয়াওমান ছাক্বীলা' অর্থ কঠিন দিবস। 'ছাক্বীলা' বলে কঠোর, দুঃসাধ্য কর্মকাণ্ডকে। কিন্তু এখানে দিবসকেই রূপকার্থে বলা হয়েছে কঠিন দিবস। অর্থাৎ ওই দিবসের সিদ্ধান্ত-মীমাংসা হবে অত্যন্ত কঠিন, অতীব গুরুভার।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করবো তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবো'। এখানে 'বাদ্‌দাল্‌না' (আমি পরিবর্তন করবো) পদটি সাধারণ কর্মপদ, যা বক্তব্যকে করেছে বেগবান। আর 'ইজা শী'না' (আমি যখন ইচ্ছা করবো) শর্তযুক্ত বাক্য, যোজিত হয়েছে 'শাদাদ্‌না'র (আমি সুদৃঢ় করেছি) কথাটির সঙ্গে। এভাবে এখানকার পুরো বাক্যটি হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি এক কঠোর ভর্ৎসনা। কেননা তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাশির প্রতি প্রকাশ করেছে চরম অকৃতজ্ঞতা। আর সর্বোত্তম অনুগ্রহ হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের অস্তিত্ব সৃষ্টির। কারণ অস্তিত্ব প্রাপ্তিই সকল অনুগ্রহের মূল। এভাবে এখানে আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলকে এই মর্মে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন যে, সেদিন তো বেশী দূরে নয়, যেদিন তাদেরকে অবনমিত করা হবে শোচনীয়ভাবে। অতএব হে আমার রসুল! আপনি এ ব্যাপারে বিচলিত হবেন না মোটেও। বলা বাহুল্য, সেরকমই ঘটেছিলো। বদর যুদ্ধে তারা এমনভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিলো যে, আর কখনো উত্থানের মুখ দেখেনি। আর এখানকার 'ইজা' (যখন) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'ইন' (যদি) অর্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে তাদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি অন্য কোনো জাতিগোষ্ঠীকে। উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌পাক এরকম ইচ্ছা আর করেননি। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে কেবল প্রকাশ করা হয়েছে তাঁর চির অপ্রতিরোধ্য ও সততস্বাধীন 'অভিপ্রায়' গুণের কথা।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'এটা এক উপদেশ, অতএব, যার ইচ্ছা, সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক'। একথার অর্থ— এই সুরা, অথবা আলোচ্য আয়াতগুচ্ছ হচ্ছে অমূল্য উপদেশবাণী, যা প্রদর্শন করে আল্লাহ্‌র পরিতোষের পথ। কাজেই যে আল্লাহ্‌র পরিতোষ কামনা করে, হতে চায় তাঁর নৈকট্যভাজন, তার কর্তব্য হবে, এই উপদেশাবলীর যথা অনুসরণ করা, বিশুদ্ধচিত্তে যথা আনুগত্য করা আল্লাহ্‌র এবং তাঁর প্রিয়তম রসুলের।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন'। একথার অর্থ— হে মানবমণ্ডলী! অথবা হে মক্কার পৌত্তলিকেরা! জেনে রাখো, তোমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কখনোই বাস্তবরূপ লাভ করবে না, যতোক্ষণ না তা সমর্থনপুষ্ট হয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছার। সুতরাং আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়কে মান্য না করে শুভউপদেশাবলীর অনুসরণ অথবা অননুসরণ অসম্ভব।

হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সকল আদম সন্তানের হৃদয় একটি হৃদয়ের মতো আবদ্ধ রয়েছে আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন হাতে। তিনি হৃদয়কে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বিবর্তন করেন। সুতরাং তোমরা

www.eelm.weebly.com

প্রার্থনা কোরো এভাবে— হে অন্তরসমূহের আবর্তন-বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে কেবল তোমা-অভিমুখী করে দাও। মুসলিম। সুতরাং একথা আর না মেনে উপায় নেই যে, আল্লাহ্ যাদেরকে হেদায়েত করতে চান, তারাই সৎপথ পায়, আর যাদেরকে করতে চান গোমরাহ, তারা অবশ্যই হয় পথভ্রষ্ট।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— কে হেদায়েত পাবে, না পাবে তা তিনি আগে থেকেই জানেন। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ। আর তিনি প্রজ্ঞাময়ও। মানুষের পথপ্রাপ্তি ও পথবিচ্যুতির বিষয়টিও তাই সম্পন্ন হয় তাঁর আনুরূপ্যবিহীন ও অবোধ্য প্রজ্ঞার চাহিদা অনুসারে। পথপ্রাপ্তদের সূচনাস্থল তাঁর 'আলহাদী' (পথপ্রদর্শনকারী) গুণবাচক নাম এবং পথভ্রষ্টদের সূচনাস্থল তাঁরই গুণবাচক নাম 'আল মুদ্বিল্লু' (পথভ্রষ্টকারী)।

শেষোক্ত আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু জালেমেরা— তাদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি'। একথার অর্থ— তিনি যাকে চান, তাকে করেন জান্নাতবাসীদের দলভূত। ফলে সে পায় ইমান, হেদায়েত, পুণ্য কর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য তিনি তো মর্মন্তুদ দোজখাগ্নির ব্যবস্থা করে রেখেছেনই, অনন্তকাল ধরে তা তাদেরকে ভোগ করতে হবেই। এখানে 'রহমত' (অনুগ্রহ) অর্থ জান্নাত। কেননা জান্নাতই হচ্ছে অনন্তকালীন অনুগ্রহের আলয়।

সূরা মুরসালাত

২ রুকু এবং ৫০ আয়াতবিশিষ্ট এই পবিত্র সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কায়।

সূরা মুরসালাত ঃ আয়াত ১—১৫

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○

وَالۡمُرۡسَلٰتِ عُرۡفًا ۙ﴿۱﴾ فَالۡعٰصِفٰتِ عَصۡفًا ۙ﴿۲﴾ وَّ النّٰشِرٰتِ نَشۡرًا ۙ﴿۳﴾
فَالۡفٰرِقٰتِ فَرۡقًا ۙ﴿۴﴾ فَالۡمُلۡقِیٰتِ ذِکۡرًا ۙ﴿۵﴾ عُذۡرًا اَوۡ نُذۡرًا ۙ﴿۶﴾ اِنَّمَا تُوۡعَدُوۡنَ
لَوَاقِعٌ ؕ﴿۷﴾ فَاِذَا النُّجُوۡمُ طُمِسَتۡ ۙ﴿۸﴾ وَ اِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتۡ ۙ﴿۹﴾ وَ اِذَا
الۡجِبَالُ نُسِفَتۡ ۙ﴿۱۰﴾ وَ اِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتۡ ؕ﴿۱۱﴾ لِاَیِّ یَوۡمٍ اُجِّلَتۡ ؕ﴿۱۲﴾ لِیَوۡمِ

www.eelm.weebly.com

الْفَصْلِ ﴿١٣﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٥﴾

q শপথ কল্যাণস্বরূপ প্রেরিত বায়ুর,
q আর প্রলয়ংকরী ঝটিকার,
q শপথ সঞ্চালনকারী বায়ুর
q আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর,
q এবং শপথ তাহাদের যাহারা মানুষের অন্তরে পৌঁছাইয়া দেয় উপদেশ—
q ওযর-আপত্তি রহিতকরণ ও সতর্ক করার জন্য
q নিশ্চয়ই তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অবশ্যম্ভাবী।
q যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হইবে,
q যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে
q এবং যখন পর্বতমালা উন্মুলিত ও বিক্ষিপ্ত হইবে
q এবং রাসূলগণকে নিরূপিত সময়ে উপস্থিত করা হইবে,
q এই সমুদয় স্থগিত রাখা হইয়াছে কোন্ দিবসের জন্য?
q বিচার দিবসের জন্য।
q বিচার দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান?
q সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

মুকাতিল বলেছেন, এখানকার প্রথম পাঁচটি আয়াতে বর্ণিত বিষয়াবলী দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে ফেরেশতামণ্ডলীকে। যেমন প্রথমে বলা হয়েছে 'ওয়াল মুরসালাতি উ'রফান'। এখানে 'মুরসালাত' অর্থ ওই সকল ফেরেশতা, যারা বহন করে আনে শরিয়তের বিধি-নিষেধসমূহ। হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে 'উ'রফান' পদটি হবে নৈমিত্তিক কর্মপদ। আবার হতে পারে পদটি অবস্থা প্রকাশক। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে 'অবিরত'। শব্দটি উৎসারিত হয়েছে 'উ'রুফুল ফারাস' (অবিরত ঘোড়-দৌড়) থেকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— শপথ ওই সকল ফেরেশতার! যাদেরকে বিধি-নিষেধসহ প্রেরণ করা হয় অবিরত। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে 'ফাল আ'সিফাতি আ'সফান'। এর মর্মার্থ— তারা আদেশ পালনে বৈকাল (আসর) পর্যন্ত চলে। 'আসফুর রিয়াহ্' অর্থ ঝড়ের গতি। ৩ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়ান্ নাশিরাতি নাশরান'। মর্মার্থ— তারা এ পৃথিবীতে বিস্তার করে আল্লাহ্র বিধি বিধান। মানুষের মৃত হৃদয়গুলোকেও সঞ্জীবিত করে তারা। ৪ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফাল ফারিক্বাতু ফারক্বান'। মর্মার্থ— তারা বিভেদ সৃষ্টি করে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে। আর ৫ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফাল মুলক্বিয়াতি জিকরান' মর্মার্থ— তারা নবী-রসুলগণের হৃদয়ে প্রক্ষেপ করে প্রত্যাদেশাবলী। অথবা সকল বিশ্বাসীদের অন্তরে সম্পাত ঘটায় শুভ ও সুদৃঢ় প্রতীতীর, আল্লাহ্র স্মরণের।

www.eelm.weebly.com

মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, এই সুরার প্রথম পাঁচ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে বায়ু সম্পর্কে। তাই প্রথম আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়— ওই বায়ুর শপথ! যা প্রবাহিত হয় নিরবধি। কারো কারো মতে এখানকার 'উ'রফান' অর্থ অধিক। অর্থাৎ ওই বায়ু যা অধিক প্রবাহিত। দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ— ঝড়ের বেগে প্রবাহিত বায়ু। তৃতীয় আয়াতের অর্থ— মেঘমালা সঞ্চালনকারী বায়ু। চতুর্থ আয়াতের অর্থ— মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ু, অথবা বারিপাতের পর মেঘমালাকে বিক্ষিপ্তকারী বাতাস। আর পঞ্চম আয়াতের অর্থ— আল্লাহ্র স্মরণ উদ্রেককারী মলয়প্রবাহ। অর্থাৎ বাতাস-তাড়িত সঞ্চারমান মেঘমালার লীলারহস্য দেখে মনে হয় মহাসৃজয়িতা ও মহাপালয়িতা আল্লাহ্র মহিমময়তার কথা। বারিবর্ষণরূপ অনুগ্রহ দর্শনে মনে উদয় হয় অনাবিল কৃতজ্ঞতার। এভাবে বায়ুপ্রবাহ হয় মানবমনের জিকিরের নিমিত্ত।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য আয়াত পঞ্চকের মর্মার্থ হচ্ছে কোরআনের আয়াতসমূহ, যা সদুপদেশসম্ভাররূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে রসুল স. এর উপরে। আর এখানে 'আসিফাত' বলে বুঝানো হয়েছে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ ও ধর্মসমূহের রহিত হওয়ার কথা, যেনো সেগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঝটিকা সঞ্চালনে। 'আন্নাশিরাত' বলে বুঝানো হয়েছে, হেদায়েতের মর্মবাণী ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রাচ্যে প্রতীচ্যে। সবখানে। 'আলফারিক্বাত' বলে পার্থক্য করে দেওয়া হয়েছে সত্য ও অসত্যের মধ্যে। আর 'মুলক্বিয়াত' বলে আল্লাহ্র স্মরণকে উচ্চকিত করা হয়েছে মহাপৃথিবীতে।

আবার এরকমও হওয়া সম্ভব যে, আয়াত পঞ্চকের উদ্দেশ্য নবী-রসুলগণ, যাঁদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শনার্থে। 'আল্আ'সিফাত' (প্রলয়ংকারী ঝটিকা) অর্থ তাঁরা আল্লাহ্পাকের বিধানাবলী বাস্তবায়নের বিষয়ে ছিলেন অতিতৎপর। 'আন্নাশিরাত' (সঞ্চালনকারী) অর্থ তাঁরা ছিলেন পথপ্রদর্শন পরিকল্পনার ব্যাপক প্রসারণে সনিষ্ঠ। 'আল ফারিক্বাত' (বিচ্ছিন্নকারী) অর্থ হক ও বাতিলকে পৃথককারী। আর 'আল মুলক্বিয়াতি' দ্বারা বুঝানো হয়েছে— তাঁরা আল্লাহ্র জিকিরকে তাঁদের আপন আপন উম্মতের মনে ও মুখে প্রতিষ্ঠিত করে দেন সুদৃঢ়ভাবে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'ওজর আপত্তি রহিত করণ ও সতর্ক করার জন্য'। এখানকার 'উজরান আও নুজরান' শব্দদু'টো সাকিনযুক্ত জাল সহযোগে ধাতুমূল। 'উজর' অর্থ ওজর-আপত্তি-অজুহাত। আর 'নুজর' অর্থ ভীতি প্রদর্শন, সতর্কীকরণ। পেশযুক্ত জাল সহযোগে শব্দদু'টো বহুবচন। অর্থাৎ 'আজীর' এবং 'নাজীর' এর বহুবচন যথাক্রমে 'উজুর' ও 'নুজুর'। ধাতুমূল হিসেবে শব্দদু'টোর অর্থ হবে যথাক্রমে— অজুহাত-আপত্তি উপস্থাপন করা এবং সতর্ক করা। আর 'আজীর' ও 'নাজীর' এর কর্তৃপদীয় অর্থ হবে— অজুহাত উত্থাপনকারী ও সতর্ককারী। শব্দদু'টোকে যদি ধাতুমূল ধরে নেওয়া হয়, তবে শব্দদু'টো হবে

www.eelm.weebly.com

পূর্বের আয়াতপঞ্চকের বিবরণ। এমতোক্ষেত্রে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— বর্ণিত কর্মপঞ্চক সম্পন্ন হয় বিশ্বাসীগণের পাপস্খলনের অজুহাত হিসেবে এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে ভীতিসঞ্চারকরূপে। যদি সেখানকার 'মুরসালাত' অর্থ হয় বায়ু, তবে অবিশ্বাসীদের ভীতির উপলক্ষ হবে এরকম— তারা বিশ্বাস করে বারিপাত নির্ভর করে নক্ষত্রের গতিবিধির উপর। তাদের এমতো অপবিশ্বাসের কারণে বর্ষণশীল মৌসুমী বায়ুও শাস্তির বার্তাবাহক। আর যদি সেখানকার 'জিকির' (উপদেশ) এর অর্থ নেওয়া হয় প্রত্যাদেশ, তবে বুঝতে হবে এখানকার 'উজরান' ও 'নুজরান' পদদু'টো যবরযুক্ত হয়েছে অনুবর্তী বক্তব্য হিসেবে।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী'। বাক্যটি আগের আয়াতসমূহে বর্ণিত শপথের জবাব। এর মর্মার্থ— মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও প্রতিফল দিবসের আগমন অনিবার্য। এর মধ্যে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ মাত্রই নেই।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ের (৮— ১১) মর্মার্থ হচ্ছে— সেই অবশ্যম্ভাবী মহাপ্রলয় দিবস যখন সমাগত হবে, তখন নক্ষত্রপুঞ্জ হয়ে পড়বে দ্যুতিহীন, টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে আকাশ, পাহাড়-পর্বত সমূহ হয়ে পড়বে উৎক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত। এভাবে এক সময় সকলকিছুই হয়ে যাবে নিশ্চিহ্ন, নীরব, নিথর। এরপর শুরু হবে পুনরুত্থান পর্ব। সকলকে সমবেত করা হবে হাশরের প্রান্তরে। নবী-রসুলগণ তখন সাক্ষ্য প্রদান করবেন তাঁদের আপন আপন উম্মত সম্পর্কে। বাক্যগুলো এখানে শর্তযুক্ত। আর সে শর্তের জবাব এখানে রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ সেদিন পৃথক করা হবে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদেরকে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এই সমূদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন দিবসের জন্য (১২)? বিচার দিবসের জন্য' (১৩)। এখানকার 'লি ইয়াওমিন' (কোন দিবসের জন্য) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে 'উজ্জ্বিলাত' (স্থগিত রাখা হয়েছে) বাক্যাংশের সাথে। আর প্রশ্নটি এখানে রূপকার্থে মহাপ্রলয় দিবসের বিস্ময় ও ভয়াবহতাপ্রকাশক। অর্থাৎ উল্লেখিত ঘটনা এখনো ঘটছে না কেনো? দেরী কেনো? স্থগিত কেনো?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'বিচার দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জানো (১৪)? সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য' (১৫)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কি জানেন, সত্যঅস্বীকারকারীদেরকে আমি তখন কীভাবে শায়েস্তা করবো? তাদের সেদিনের দুর্ভোগ তো হবে সীমাহীন। উদ্ধৃত প্রশ্নটিতে প্রকাশ করা হয়েছে বিপুল বিস্ময়। আর এখানকার 'ওয়াইল' অর্থ দুর্ভোগ। শব্দটি ধাতুমূল। এর ধাত্যর্থ— ধ্বংস ও অনাসৃষ্টি। বক্তব্যভঙ্গি দৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে, সেদিনকার দুর্ভোগ হবে নিরবচ্ছিন্ন। কেননা বাক্যটি রূপান্তর করা হয়েছে ক্রিয়াবাচক থেকে নামবাচকে এবং বাক্যটি একটি অপপ্রার্থনাও বটে।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওয়াইল হচ্ছে জাহান্নামের গহীন গহ্বর। জাহান্নামীদেরকে সেই গহ্বরে ফেলে দিলে চল্লিশ বৎসরেও তারা পৌঁছতে পারবে না তার তলদেশে। হাকেম, আহমদ, তিরমিজি, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, বায়হাকী, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, হান্নাদ। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, জাহান্নামের একটি প্রবাহের নাম ওয়াইল। সেখানে প্রবাহিত হতে থাকবে জাহান্নামীদের বিগলিত রক্ত ও পুঁজ। ইবনে আবী হাতেম এরকম বর্ণনা করেছেন বায়হাকী, ইবনে মুনজির ও নোমান ইবনে বশীর সূত্রে। আতা ইবনে ইয়াসার বলেছেন, গলিত রক্ত-পুঁজ ভর্তি জাহান্নামের একটি আবর্তের নাম ওয়াইল। ওই আবর্তে পাহাড় নিক্ষেপ করা হলেও তা উত্তাপে গলে যাবে। বায়হাকী, ইবনে জারীর, ইবনে মোবারক।

হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওয়াইল হচ্ছে দোজখের একটি পাহাড়। শিথিল সূত্রে হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে ইবনে জারীর ও বায্যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওয়াইল হচ্ছে দোজখের একটি বিশাল প্রান্তর। সেখানে অনবরত ওঠা নামা করতে থাকবে আরাফাত দাবিদারেরা (ভবিষ্যদ্বক্তারাই আরাফাত দাবিদার)।

সূরা মুরসালাত ঃ আয়াত ১৬—২৮

أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ
بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ
مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا
فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ
كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَ
أَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾

q আমি কি পূর্ববর্তীদিগকে ধ্বংস করি নাই?

q অতঃপর আমি পরবর্তীদিগকে উহাদের অনুগামী করিব।

q অপরাধীদের প্রতি আমি এইরূপই করিয়া থাকি।

q সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

q আমি কি তোমাদিগকে তুচ্ছ পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই?

www.eelm.weebly.com

q অতঃপর আমি উহা রাখিয়াছি নিরাপদ আধারে,

q এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত,

q অতঃপর আমি ইহাকে গঠন করিয়াছি পরিমিতভাবে, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা!

q সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

q আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করি নাই ধারণকারীরূপে,

q জীবিত ও মৃতের জন্য?

q আমি উহাতে স্থাপন করিয়াছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদিগকে দিয়াছি সুপেয় পানি।

q সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের অর্থ— আমি কি পূর্ববর্তী যুগের আদ, ছামুদ, কওমে নূহ, সাদুমবাসী ইত্যাদি অবাধ্য সম্প্রদায়গুলোকে ধ্বংস করিনি? নিশ্চয় করেছি। সুতরাং মক্কার অবিশ্বাসীরা নিশ্চিন্তে বসে আছে কোন ভরসায়? আমি তো তাদেরকেও ধ্বংস করবো। অপরাধী যারা, তাদেরকে তো আমি এভাবেই শায়েস্তা করে থাকি। এতো গেলো ইহকালীন শাস্তি। আর পরকালে তাদের জন্য সীমাহীন দুর্ভোগ তো রয়েছেই। রয়েছে ওয়াইল গহ্বরের মর্মন্তুদ শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি'। একথার অর্থ— হে মানবমণ্ডলী! নিজেদের দিকে তাকাও। ভেবে দ্যাখো, তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি কীভাবে। এক ফোঁটা তুচ্ছ বারিবিন্দু থেকে আমি কি তোমাদেরকে সৃজন করিনি? তবুও কি তোমরা কেবল আমাকেই সৃজয়িতা ও পালয়িতা বলে মানবে না? প্রশ্নটি স্বীকৃতিমূলক। আর এখানকার 'মুহীন' অর্থ তুচ্ছ পানি, শুক্রবিন্দু।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তা রেখেছি নিরাপদ আধারে (২১), এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত' (২২)। এখানে 'নিরাপদ স্থানে' অর্থ মাতৃগর্ভে। বাক্যটির সম্পর্ক রয়েছে আগের আয়াতের 'আমি কি সৃষ্টি করিনি' কথাটির সঙ্গে। এখানকার 'ফা জ্বাআ'লনা' এর 'ফা' অব্যয়টি ব্যাখ্যামূলক, ধারাবাহিকতা বা ক্রমপ্রকাশক নয়। অর্থাৎ সৃষ্টি করার পর মাতৃগর্ভে রেখেছি এরকম নয়। আর 'এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত' অর্থ অন্যূন ছয় মাস, অনুর্ধ্ব দুই বৎসর। প্রকৃত সময় কতো, তা নির্ধারণ করেন আল্লাহ্ই।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমি কতো নিপুণ স্রষ্টা'। এখানকার 'ফা ক্বদার্না' (গঠন করেছি) কথাটিকে ক্বারী কাসায়ী পাঠ করতেন 'ফা ক্বদ্দারনা'। এভাবে পাঠ করলে অর্থ দাঁড়ায়— পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছি তার মাতৃউদরে অবস্থানের সময়সীমা, জন্মগ্রহণের সময়কাল, আয়ুষ্কাল, উপজীবিকা, সৌভাগ্য—দুর্ভাগ্য। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদেরকে তোমাদের

www.eelm.weebly.com

মাতৃজঠরে চল্লিশ দিন রাখা হয় শুক্রকণারূপে। এরপর তোমাদেরকে করা হয় জমাট রক্ত, তারপর গোশতপিণ্ড। এরপর তোমাদের কাছে পাঠানো হয় এক ফেরেশতাকে। সে আল্লাহ্‌র নির্দেশে লিখে দেয় তোমাদের চারটি বিষয়— কর্ম, আয়ু, জীবনোপকরণ ও সৌভাগ্য, অথবা দুর্ভাগ্য। তারপরে ফুৎকার করা হয় প্রাণ। যিনি আমার জীবনাধিকারী, সেই পরমপবিত্র প্রভুপালকের শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বেহেশতবাসীদের মতো কর্ম করতে থাকে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তার এবং বেহেশতের মধ্যে দূরত্ব থাকে মাত্র এক বিঘত। এমন সময় প্রবল হয় তার ভাগ্যলিপি। সে তখন শুরু করে দোজখবাসীদের মতো আমল। পরিশেষে প্রবেশ করে জাহান্নামে। বোখারী, মুসলিম। ক্বারী নাফে, ক্বারী কাসায়ী কথাটিকে পাঠ করেছে 'ফা ক্বদারনা' এখানে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— আমি তাদের অস্তিত্ব প্রদানে, বিনাশ সাধনে ও পুনরুত্থানে সম্পূর্ণ সক্ষম। অর্থাৎ আমি সকলকিছুতেই সুদক্ষ, নিপুণ। সম্ভবত এখানকার 'ক্বদির' অর্থ 'মুক্বতাদির' অর্থাৎ আমি পরিমিতি নির্ধারণকারী।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারীরদের জন্য'। একথার অর্থ— আমার এমতো পরিমিতি নির্ধারণকে যারা অবিশ্বাস করে, তাদের জন্যই আমি প্রস্তুত করে রেখেছি ওয়াইল। উল্লেখ্য, ভাগ্যলিপি বা তকদীরকে অস্বীকার করে ক্বদরিয়া দল। তারাই এই উম্মতের অগ্নি উপাসক।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারীরূপে'? এখানকার 'কিফাত' শব্দরূপটি বিশেষণীয়। এর অর্থ— ধারণকারী, সম্মিলনকারী। অথবা শব্দটি ধাতুমূল। আধিক্য অর্থে পৃথিবীকে এখানে বলা হয়েছে 'কিফাত'। অথবা শব্দটি কর্তৃপদীয়রূপে বহুবচন। যেমন 'সিয়াম' বহুবচন 'সায়েম' এর। অথবা 'কিফাত' বহুবচন 'কাফেতুন' এর। 'কাফতুন' অর্থ পূর্ণ করা। ভূমিকে যদি 'কিফাত' বলা হয়, তবে বুঝতে হবে, খণ্ডখণ্ড ভূমির সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে ভূপৃষ্ঠ।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'জীবিত ও মৃতের জন্য'। বাক্যটিতে কর্মপদ রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ জীবিত ও মৃত প্রাণীর জন্য। অবশ্য 'কিফাত'কে বিশেষণীয় শব্দরূপ ধরে নিলেই কেবল এরকম ব্যাখ্যাকে মনে করা যেতে পারে সঙ্গত। অন্যথায় ধরে নিতে হবে এখানে উহ্য রয়েছে একটি ক্রিয়া। অর্থাৎ ভূমি সীমাবদ্ধ করে, সামাল দেয়। এই ভূমি জীবিতদেরকে রাখে তার পিঠে এবং মৃতদেরকে রাখে তার অভ্যন্তরে। ফাররা বলেছেন, এখানে কর্মপদ (মানুষ) যেহেতু সুবিদিত, তাই বুঝতে হবে, এখানে উহ্য রয়েছে কর্মপদ। সম্ভাবনা এমনও রয়েছে যে, এখানকার 'আহ্‌ইয়াআন' (জীবিত) ও 'আমওয়াতান' (মৃত) দু'টোই কর্মপদ। আর দু'টোতেই তানভীন যুক্ত করা হয়েছে গুরুত্ব প্রকাশার্থে। কেননা জীবন ও মৃত্যু দু'টোই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুকাতিল বলেছেন, উপরোক্ত কর্মসমূহ মহাপ্রলয় ও মহাপুনরুত্থান অপেক্ষাও অধিক বিস্ময়কর।

www.eelm.weebly.com

انْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿۲۹﴾ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ
شُعَبٍ ﴿۳۰﴾ لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿۳۱﴾ اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ
كَالْقَصْرِ ﴿۳۲﴾ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿۳۳﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۳۴﴾
هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَيْلٌ
يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۳۷﴾ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿۳۸﴾
فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿۳۹﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۴۰﴾

q তোমরা যাহাকে অস্বীকার করিতে, চল তাহারই দিকে।
q চল তিন শাখাবিশিষ্ট ছায়ার দিকে,
q যে ছায়া শীতল নহে এবং যাহা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হইতে,
q ইহা উৎক্ষেপ করিবে বৃহৎ স্ফুলিংগ অট্টালিকাতুল্য,
q উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ,
q সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।
q ইহা এমন একদিন যেদিন কাহারও বাকস্ফূর্তি হইবে না,
q এবং তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে না ওযর পেশ করার।
q সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।
q 'ইহাই ফয়সালার দিন, আমি একত্র করিয়াছি তোমাদিগকে এবং পূর্ববর্তীদিগকে।'
q তোমাদের কোন কৌশল থাকিলে তাহা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে।
q সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, চলো তারই দিকে'। কথাটি একটি অনুমানসাপেক্ষ প্রশ্নের জবাব। ওই প্রশ্নটিসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সেদিন তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করা হবে? সেদিন তো তাদের প্রতি প্রদর্শন করা হবে নির্মম আচরণ। বলা হবে, পৃথিবীতে তোমরা যে জাহান্নামকে অস্বীকার করতে, এখন সেই জাহান্নামেরই যোগ্য হয়েছো তোমরা। চলো, এবার সেই জাহান্নামের দিকেই চলো।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'চলো তিন ছায়াবিশিষ্ট ছায়ার দিকে'। বাক্যটি পূর্বোক্ত বাক্যের প্রতি গুরুত্বআরোপক, অথবা তার অনুবর্তী। ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, এখানে 'তিন ছায়াবিশিষ্ট ছায়া' অর্থ জাহান্নামের তিন শাখাবিশিষ্ট ধুম্রপুঞ্জ। ওই তিন শাখাবিশিষ্ট ধুম্রের যে ব্যাখ্যা বায়যাবী দিয়েছেন, আমার তা মনঃপুত নয়। আমার মতে কথাটির ব্যাখ্যা হবে এরকম— জাহান্নামবাসীরা তাদের কর্মফলানুসারে হবে তিন ধরনের। তাই তারা তখন আবদ্ধ হবে তিন রকমের ধুম্রজালে— ১. ওই সকল কাফের, যারা প্রকাশ্যে রসুল স. এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাঁর সম্পর্কে বলেছে 'সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে'। ২. ওই সকল বেদাতী, যাদের অপবচন কোরআন ও হাদিসের প্রকাশ্য বক্তব্যের বিপরীত, যারা উম্মতের ঐকমত্যের বিরোধী। যাদের বক্তব্যে ফুটে ওঠে কোরআনের আয়াতের অস্বীকৃতি ও রসুল স. এর রেসালতের অবমাননা। তারা হচ্ছে মুজাস্সিমা, ক্বদরিয়া, রাফেজী, খারেজী, মরজিয়া (বর্তমান যুগের কাদিয়ানি, মওদুদী)। মুজাস্সিমারা জান্নাতে আল্লাহ্র দীদার হওয়াকে অস্বীকার করে। আরো অস্বীকার করে প্রতিফল দিবসের পাপপুণ্যের পরিমাপ, পুলসিরাত ইত্যাদিকে। অথচ এ সকল কিছু কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আর রাফেজী-খারেজীরা অস্বীকার করে ওই সকল সুবিদিত হাদিস, যেগুলোতে রয়েছে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুখ্যাতি। ৩. প্রবৃত্তির অনুসারী মুসলমান, যারা অসংখ্য লঘু-গুরু পাপে পরিপূর্ণ, ফরজ দায়িত্বসমূহ পরিত্যাগকারী। এই তিন দলই সেদিন আবদ্ধ হবে জাহান্নামের তিন ধরনের ধুম্রকুণ্ডলীতে।

বাগবী লিখেছেন, কতিপয় বিদ্বজ্জনের অভিমত হচ্ছে, নরকের অভ্যন্তরভাগ থেকে বেরিয়ে আসবে তিন শাখাবিশিষ্ট একটি চূড়া। একটি শাখা হবে জ্যোতির, যা এসে থেমে যাবে বিশ্বাসীগণের মস্তকের উপরে। আর একটি শাখা হবে ধোঁয়ার, যা উড়ে এসে স্থির হবে কপটাচারীদের মাথার উপরে এবং অন্য আর একটি শাখা হবে অগ্নির। আগুনের ওই শাখাটি এসে থামবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মাথার উপরে। আমি বলি, বক্তব্যটিকে অবশ্যই হতে হবে সুপরিণত সূত্রাগত। তবে বক্তব্যটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবে— নরকানলকে যে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তার প্রথম ভাগ হচ্ছে নূর, অর্থাৎ এমন আলো, যাতে অপর দুই অংশের চেয়ে আঁধারের পরিমাণ থাকবে স্বল্পমাত্রায়। নচেৎ নরকের আগুনে তো প্রকৃত নূরের কথা চিন্তাও করা যায় না। রসুল স. বলেছেন, নরকের আগুন এক হাজার বছর জ্বলে জ্বলে ধারণ করেছিলো লাল বর্ণ। আরো এক হাজার বছর জ্বলবার পর তা হয়ে গিয়েছে কৃষ্ণবর্ণের। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি ও বায়হাকী। ওই আগুনের ধোঁয়ার ফিকে রঙই ছেয়ে যাবে মুসলমান পাপীদের মাথার উপরে। দ্বিতীয় প্রকারের ধোঁয়া হবে অধিক অগ্নিময় ও মসীলিপ্ত। ওই ধোঁয়া আচ্ছাদিত করবে কপট বিশ্বাসীদের মাথার উপরিভাগ। কপটবিশ্বাসী বা মুনাফিক অর্থ এখানে ওই সকল বিশ্বাসী, যারা

www.eelm.weebly.com

ইমানের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও এমন সব মন্তব্য করে, যা হয়ে যায় কোরআন অস্বীকার এবং রসুল স. এর প্রতি অবমাননা। ওই সকল মুনাফিক নয়, যারা সচেতনভাবে অন্তরে কাফের এবং মুখে ইমানদার। তারা তো প্রকাশ্য কাফের অপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক। তাদের ঠিকানা হবে নরকের সর্বনিম্ন স্তরে। তৃতীয় ধোঁয়া হবে এমন আগুনের, যার দহন ক্রিয়া হবে চরমতম। ওই ধোঁয়া ছেয়ে যাবে কাট্টা কাফেরদের মস্তকের উপরিভাগে। উল্লেখ্য, বেদাতীদেরকে কপটাচারী বা মুনাফিক বলার কারণ বিবৃত হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানকার 'জিল্লান' (ছায়া) অর্থ নরকেরই আগুন। সে আগুনকে এখানে 'ছায়া' বলা হয়েছে তার অন্ধকারাচ্ছন্নতার কারণে। অর্থাৎ সে অগ্নি ঘোর কালো বলেই তাকে এখানে বলা হয়েছে ছায়া। আর এখানকার 'তিন ছায়াবিশিষ্ট শাখার দিকে চলো' অর্থ চলো ওই নরকানলের দিকে, যেখানে পৌঁছানোর পথ হচ্ছে— ১. আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা ২. নবীগণকে অস্বীকার করা এবং ৩. পাপভারাক্রান্ত হওয়া। আর আদেশটি এখানে উপহাসমূলক। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে 'নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রান্ত, তাই এবার শাস্তি আস্বাদন করো' 'তাকে সুসংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির'।

এরপরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা থেকে'। এখানকার 'জলীলিন' শব্দটি আগের আয়াতের 'জিললিন' এর বিশেষণ। অর্থাৎ যে ছায়া শীতল নয়, নয় আরশের ছায়ার মতো স্বস্তিকর। বাক্যটি সম্ভবত একটি নামপদীয় উহ্য বাক্যেরও বিশেষণ। অর্থাৎ সে ছায়া প্রতিহত করতে পারবে না জাহান্নামের অগ্নিশিখা। অথবা বাক্যটি যোজিত হবে 'জলীল' এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বাক্যটি তৃতীয় বিশেষণ হবে পূর্বোক্ত 'জিল' এর। বস্তুত 'জিল্ল' (ছায়া) শব্দটির উল্লেখ করাতে স্বাভাবিকভাবে এরকম ধারণার উদ্রেক হতে পারে যে, হয়তোবা এ ছায়া জাহান্নামের উত্তাপ থেকে কিছুটা রেহাই দিবে, অথবা রক্ষা করবে দোজখের হলকা থেকে। এমতো সম্ভাব্য ধারণার মূলোৎপাটনার্থেই এখানে বলা হয়েছে 'যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা থেকে'।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে—'তা উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকাতুল্য'। এখানকার 'ইন্নাহা' কথাটির 'হা' (তা) সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত হবে আগের আয়াতের 'জিল্ল' এর সঙ্গে, যদি 'জিল্ল' অর্থ করা হয় 'নরকানল'। অন্যথায় বুঝতে হবে সম্পৃক্তব্য পদ এখানে রয়েছে উহ্য। তবে বক্তব্যভঙ্গিতে শেষোক্ত সম্ভাবনার অবকাশ নেই।

'তা উৎক্ষেপ করবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অট্টালিকাতুল্য' অর্থ ওই ছায়া দোজখের আগুনের বিশাল ঝাপটা ঠেকাতে পারবেই না। 'শারার' অর্থ এখানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। শব্দটি 'শারারাহ্' এর বহুবচন। আর 'ক্বাসর' অর্থ অট্টালিকা, প্রস্তর নির্মিত ইমারত, গ্রাম, দুর্গ। এরকম উল্লেখ করা হয়েছে 'কামুস' অভিধানে। শব্দটির একবচন 'ক্বসর'। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'ক্বসর' বহুবচন 'ক্বসরাতুন' এর 'ক্বসরাতুন' অর্থ খেজুর বৃক্ষের মূল, অথবা স্থূলকায় বৃক্ষ।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'তা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ'। 'জিমাল' শব্দটি 'জুমাল' এর বহুবচন। আবার এর বহুবচনের বহুবচন হচ্ছে 'জিমালাতুন'। এর অর্থ— উষ্ট্রসমূহ। আর এখানকার 'সুফর' অর্থ পীতবর্ণ। শব্দটি বহুবচন 'আসফার' এর। অগ্নিস্ফুলিঙ্গটি যেহেতু হবে অগ্নিময়। তাই তা হবে পীত বর্ণের। এভাবে 'কাআন্নাহু জিমালাতুন সুফর' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— তা হবে পীতবর্ণ উষ্ট্রসদৃশ। কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'সুফর' অর্থ 'সুফ' (কৃষ্ণ বর্ণ)। যেমন হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে দোজখের আগুন হবে আলকাতরার মতো কালো। উটের কৃষ্ণবর্ণ হয় হলুদাভ। একারণে আরববাসীগণ উটের রঙকে বলে 'সুফর'। আগের আয়াতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে অট্টালিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তার বিশালত্ব বোঝাতে, আর এই আয়াতে উটের সঙ্গে তুলনা করা হলো তার দ্রুততর সম্প্রসারণত্ব বোঝাতে।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য'। সেদিন অবিশ্বাসীরা যে অবর্ণনীয় দুর্ভোগে নিমজ্জিত হবে, সে কথা বুঝাতেই বাক্যটির পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে বার বার।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'এটা এমন এক দিন, যেদিন কারো বাকস্ফূর্তি হবে না (৩৫) এবং তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে না ওজর পেশ করার (৩৬)। সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য' (৩৭)।

এখানে 'বাকস্ফূর্তি হবে না' অর্থ ভয়ে সেদিন তারা কথাই বলতে পারবে না। অথবা কথা বলতে পারলেও সে কথায় কোনো কাজ হবে না। প্রকৃত কথা হচ্ছে সেদিন কোনো কোনো স্থানে তারা কথা বলতে সক্ষম হবে বটে, কিন্তু তাতে করে তাদের শাস্তি এতটুকুও কমবে না। আবার কোনো কোনো স্থানে তারা হয়ে যাবে নির্বাক। 'অনুমতি দেওয়া হবেনা ওজর পেশ করার' অর্থ তাদেরকে তখন অজুহাত উপস্থাপনের কোনো সুযোগই দেওয়া হবে না। কথাটির যোগসূত্র রয়েছে আগের আয়াতের 'বাকস্ফূর্তি হবে না' বাক্যের সঙ্গে। আবার এখানকার 'ওজর পেশ করার' কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'অনুমতি দেওয়া হবে না' বাক্যাংশের সঙ্গে। অর্থাৎ তাদের যেহেতু উপযুক্ত অজুহাত থাকবেই না, সেহেতু অনুমতি প্রদানের প্রশ্ন উঠবেই বা কেনো? একারণেই হয়তো তারা তখন অজুহাত প্রদর্শনের কথা ভাববেই না। অর্থাৎ কথা বলার অনুমতি দিলেও তারা তখন কোনো অজুহাত-আপত্তি প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে না।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— এটাই ফয়সালার দিন, আমি একত্র করেছি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে (৩৮)। তোমাদের কোনো কৌশল থাকলে তা প্রয়োগ করো আমার বিরুদ্ধে (৩৯)। সেইদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য' (৪০)।

এখানে 'হাজা ইয়াওমুল ফাসলি' অর্থ এটাই ফয়সালার দিন। পুরো বাক্যটি 'হাজা' এই ইঙ্গিতসূচক উদ্দেশ্যের বিধেয়। অথবা বিধেয় হবে 'ফয়সালার দিনে'র।

www.eelm.weebly.com

এমতাবস্থায় এর সর্বনামকে ধরে নিতে হবে উহ্য। অর্থাৎ ওই দিন আমি সমবেত করবো তোমাদেরকে। অথবা বাক্যটি হবে 'ফয়সালার দিন' বা 'পার্থক্যের দিন' এর নিমিত্ত। অর্থাৎ সেই দিন পার্থক্যের দিন হওয়ার কারণেই আমি প্রথমে তোমাদেরকে করবো একত্রিত। অথবা ৩৮ সংখ্যক আয়াতের এই বাক্যটি হবে 'ফয়সালা' বা পার্থক্যের গুরুত্বনির্দেশক ও বিবৃতিমূলক।

'তোমাদের কোনো কৌশল থাকলে তা প্রয়োগ করো' অর্থ তখন তাদেরকে বলা হবে, পৃথিবীতে তোমরা তো সর্বশক্তি দিয়ে সত্য ধর্মের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে চাইতে। আবার বলতে, তোমাদের মধ্যকার দশ জন বলশালী ব্যক্তি মিলে জাহান্নামের এক জন প্রহরীকে কাবু করতে পারবে। এবার তাহলে সেরকম কিছু করো, যদি পারো। এখানকার 'কীদূনী' (আমার বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন কোরো) শব্দটির 'ইয়া' অক্ষরটি রয়েছে উহ্য। আর বাক্যটি একই সঙ্গে আদেশসূচক ও হুমকিপ্রকাশক।

'সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য' অর্থ কৌশল প্রয়োগের কথা তারা তখন চিন্তাই করতে পারবে না। নিশ্চিত বুঝতে পারবে, দুর্ভোগকবলিত তারা হবেই।

সূরা মুরসালাত ঃ আয়াত ৪১—৫০

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَٰلٍ وَّعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا
قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ
لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ
حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

r মুত্তাকীরা থাকিবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে,

r তাহাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে।

r 'তোমাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার কর।'

r এইভাবে আমি সৎকর্ম পরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

r সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

r তোমরা আহার কর এবং ভোগ করিয়া লও অল্প কিছু দিন, তোমরা তো অপরাধী।

r সেইদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

www.eelm.weebly.com

r যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্র প্রতি নত হও' উহারা নত হয় না।
r সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।
r সুতরাং উহারা কুরআনের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে?

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— সেদিন মুত্তাকীগণের জীবন হবে কতোই না মধুর। তারা থাকবে তখন মনোরম বেহেশতী উদ্যানের ঘনসন্নিবিষ্ট তরুরাজির অনন্ত সুখের ছায়ায়। থাকবে বাঞ্ছিত ফলমূলের অন্তহীন প্রাচুর্যের পরিবেশে।

এখানে মুত্তাকী অর্থ বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী, যারা পৃথিবীতে থাকে সতত অংশীবাদিতামুক্ত। অথবা সাধারণভাবে পাপাচরণমুক্ত, বিশ্বাসের বিভিন্ন স্তরে স্থিত। আর বেহেশতের ঘন সন্নিবিষ্ট তরুরাজিকেই এখানে উপমাস্বরূপ বলা হয়েছে ছায়া। নতুবা সেখানে তো ছায়া বলে কিছু থাকবে না। কেননা সূর্য থাকবে অনুপস্থিত। যেমন দীর্ঘাঙ্গী মানুষকে বলা হয় কোষধারী, তার কাছে তরবারী না থাকলেও। 'প্রস্রবণ' অর্থ এখানে দুধ, মধু, সুরা ও পানির বহুসংখ্যক স্রোতস্বিনী, যেগুলোর পানীয় কখনো বিস্বাদযুক্ত হবে না। আর 'বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্য' অর্থ সেখানে বেহেশতীরা যখন যে ফল যতো পরিমাণে খেতে চাইবে, তখন সে ফল ততো পরিমাণেই অনায়াসে পাবে। এখানকার 'বাঞ্ছিত' কথাটিতে এই ইঙ্গিতও রয়েছে যে, সেখানকার পানীয় ও ফলমূল বহুবিচিত্র স্বাদবিশিষ্ট, পৃথিবীর পানীয় ও ফলমূলের মতো এক রকমের স্বাদযুক্ত নয়।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে—'তোমাদের কর্মের পুরস্কাররূপে তোমরা তৃপ্তির সঙ্গে পানাহার করো'। কথাটি আগের আয়াতের 'ফী জিলাল' (ছায়ায়) এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি অনুক্ত বাক্য 'মুসতাক্বির্রুনা' (অবস্থানকারী) তে লুপ্ত (তারা) সর্বনামের অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ সেখানকার বৃক্ষরাজির ছায়াসদৃশ স্বস্তিমধ্যে অবস্থানকালে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে— তোমাদের পুণ্যকর্মের বিনিময়রূপে তোমরা এখন পরম শান্তিতে পানাহার করো। অথবা বলা যায়, আলোচ্য আয়াতের প্রসঙ্গ ভিন্নতর। অর্থাৎ তাদেরকে কেবল বলা হবে— এ হচ্ছে তোমাদের শুভকর্মফল। সুতরাং তোমরা পান করো ও আহার করো।

এখানে 'হানীআম' অর্থ পানাহার করো, কথাটি একটি অনুক্ত ধাতুমূলের বিশেষণ। অর্থাৎ পান করো ও খাও। অথবা বাক্যটি অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ পরম পরিতৃপ্তির সাথে। 'হানাউন' অর্থ অনায়াসলব্ধ, অনিষ্ট মুক্ত।

এরপরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি'। এখানে 'সৎকর্ম' অর্থ ইমান এবং যাবতীয় প্রকারের দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত। আলোচ্য আয়াতের বাক্যটি সম্পূর্ণ নতুন একটি বাক্য, যা সূচনামূলক।

এখানকার 'নাজ্যী' ক্রিয়ার কর্মপদ হচ্ছে 'কাজালিকা'। এখানে 'নাজ্যী' ক্রিয়াবাচক বাক্য 'ইন্না'র বিধেয়। 'ইন্না' দ্বারা যে কর্মপদবাচক বাক্য গঠিত হয়, তাতে নিহিত থাকে পূর্বোক্ত বাক্যের অধিকতর তাৎপর্য। কেননা 'সৎকর্মপরায়ণ'

www.eelm.weebly.com

(মুহসিনীন) যারা, তারাই মুত্তাকী। আবার সৎকর্মপরায়ণগণ কখনো কখনো মুত্তাকী (সংযমী, সাবধানী)গণের চেয়ে অধিক বৈশিষ্ট্যশীলও হয়। কারণ 'ইহ্সান' অর্থ এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা, যেনো আল্লাহ্ ইবাদতকারীর প্রত্যক্ষগোচর, অথবা এরকম বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, তিনি তো তাঁর ইবাদতকারীকে দেখছেন। প্রত্যাদেশবাহক জিবরাইল আমীনের এক প্রশ্নের জবাবে রসুল স. এমনই বলেছিলেন। বোখারী, মুসলিম। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে 'ইহ্সান' এর কথা সে অর্থে আসেনি। যদি আসতো, তবে গুরুত্বপূর্ণ ও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একাকার হয়ে যেতো, যা অসমীচীন। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে 'মুহসিনীন' বলে অধিকতর মর্যাদামণ্ডিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

এরপরের আয়াতে (৪৫) পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে— 'সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য'। একথার অর্থ— সেদিন অবশ্যই চরম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। তারা বেহেশত থেকে হবে চিরবঞ্চিত।

এরপরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'তোমরা আহার করো এবং ভোগ করে নাও অল্প কিছুদিন, তোমরা তো অপরাধী'। বাক্যটি সম্পূর্ণ পৃথক। এর মাধ্যমে ভীষণভাবে শাসানো হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। এখানকার 'ক্বলীলান' (অল্প কিছুদিন) কথাটি এই অনুক্ত ধাতুমূলের বিশেষণ। অথবা বিশেষণ একটি প্রচ্ছন্ন ক্রিয়ার আধারের, যথাক্রমে যৎকিঞ্চিত আহার্য, অথবা সাময়িক সম্ভোগ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! যতোদিন তোমরা পৃথিবীতে বাঁচো ততোদিন খাও-দাও, ফুর্তি করো। মৃত্যুর পর তো তোমাদের এসকলকিছু শেষ হয়ে যাবেই। তারপর? তখন তো অপরাধের শাস্তি তোমাদেরকে পেতেই হবে। উল্লেখ্য, আগের আয়াতের ধমকের প্রভাব প্রবাহিত হয়েছে এই আয়াতেও।

এরপরের আয়াতে (৪৭) পুনরায় বলা হয়েছে— 'সেই দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য'। এ কথার অর্থ— পৃথিবীর সাময়িক সম্ভোগোন্মত্ততার কারণেই পরবর্তী পৃথিবীতে তাদেরকে পোহাতে হবে অন্তহীন বিড়ম্বনা।

মুজাহিদ সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার সাক্বিফ গোত্রের নেতৃবর্গকে ডেকে আমন্ত্রণ জানালেন ইমান ও নামাজের প্রতি। তারা বললো, আমরা তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু তোমার মতো ষাষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাত করতে আমরা পারবো না। তখন অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত(৪৮)। বলা হয়—

'যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্র প্রতি নত হও, তারা নত হয় না'। এই আয়াতখানিও শাসনমূলক। অথবা বলা যেতে পারে, আয়াতখানি সম্পর্কযুক্ত ৪৬ সংখ্যক আয়াতের 'তোমরা তো অপরাধী' কথাটির সঙ্গে। বক্তব্যবিষয়ের প্রতি মগ্নতা ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যেই এখানে বাক্যটিকে সহসা রূপান্তরিত করা হয়েছে মধ্যম পুরুষ থেকে প্রথম পুরুষে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমরা তো অপরাধী।

www.eelm.weebly.com

শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজের প্রতি তোমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, অথচ তোমরা সেজদা করতে অস্বীকৃত হচ্ছো। এরকমও হতে পারে যে, আয়াতখানির যোগসূত্র রয়েছে আগের বা পরের আয়াতের 'মুকাজ্জিবীন' (অস্বীকারকারী) পদটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা নামাজ অস্বীকারকারী। নামাজ পড়তে বলা হলেও তারা নামাজ পড়ে না।

এরপরের আয়াতেও (৪৯) বলা হয়েছে— অস্বীকারকারীদের চিরদুর্ভোগ কবলিত হওয়ার কথা। অর্থাৎ 'ওয়াইল' দোজখ অবধারিত করা হয়েছে তাদেরই জন্য, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আদেশ-নিষেধের তোয়াক্কাই করে না।

শেষোক্ত আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তারা কোরআনের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে'? একথার অর্থ— কী চায় তারা? কোরআনের বদলে কি অন্য কারো কথা মান্য করতে চায়? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ প্রত্যাদেশিত বাণীর এই বিপুল সমাহার শব্দগত ও অর্থগত উভয় দিক দিয়েই চিরঅজেয়। এতে রয়েছে সুস্পষ্ট প্রমাণপঞ্জী। অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তসম্ভার, মহাকল্যাণের নির্ভুল পথনির্দেশনা। সুতরাং কোরআন অস্বীকারকারীরা যে আর কোনো দলিল-প্রমাণ মানবে, তা আশা করা বৃথা।

সুরা দাহ্র যেমন আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে ভরপুর, তেমনি এর মধ্যে রয়েছে অবিশ্বাসীদের প্রতি প্রচণ্ড ভীতিপ্রদর্শন। রসুল স. বলেছেন, হুদ, ওয়াক্বিয়া, মুরসালাত, আ'মমা ইয়াতাসাআলূন এবং ইজাশ্ শামসু কুয়্যিরাত সুরা সমূহ আমাকে বয়োপ্রবীণ করে দিয়েছে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাকেম এবং হজরত আবু সাঈদ থেকে ইবনে মারদুবিয়া, আর প্রত্যয়ন করেছেন হাকেম।

www.eelm.weebly.com

ত্রিংশতিতম পারা

সূরা নাবা

মহাপুণ্যময় মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরাখানি ২ রুকু এবং ৪০ আয়াতবিশিষ্ট।
সূরা নাবা ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُوۡنَ ۚ ﴿١﴾ عَنِ النَّبَاِ الۡعَظِيۡمِ ﴿٢﴾ الَّذِىۡ هُمۡ فِيۡهِ مُخۡتَلِفُوۡنَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعۡلَمُوۡنَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُوۡنَ ﴿٥﴾

r উহারা একে অপরের নিকট কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে?
r সেই মহাসংবাদ বিষয়ে,
r যেই বিষয়ে উহাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে।
r কখনও না, উহাদের ধারণা অবাস্তব, উহারা শীঘ্র জানিতে পারিবে;
r আবার বলি কখনও না, উহারা অচিরেই জানিবে।

'আ'ম্মা ইয়াতাসাআলূন' অর্থ তারা একে অপরের নিকট কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? অর্থাৎ হে আমার রসুল! মক্কাবাসীরা একে অপরের কাছ থেকে কোন্ ভয়াবহ সংবাদটি জানতে চায়, আপনি কি তা জানেন?

এখানকার 'আ'ম্মা' শব্দটির মূল রূপ ছিলো 'আ'ন' ও 'মা'। 'আন' (হতে, থেকে) হচ্ছে যের প্রদানকারী একটি অব্যয় এবং 'মা' অব্যয়টি প্রশ্নবোধক। শব্দদু'টোর সন্ধি হলে যের প্রদানকারী অব্যয়ের পর 'মা' অব্যয়ে 'আলিফ' অক্ষরটি লোপ পায় এবং 'নূন' অক্ষরটি পরিবর্তিত হয় 'মীম' এ। যেমন 'লিমা' 'ফীমা' 'আ'ম্মা' 'মিম্মা'। এরূপ হওয়ার কারণ দু'টি— ১. অধিক ব্যবহার এবং ২. যোজক ও প্রশ্নবোধক দু'টি 'মা' এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ। উল্লেখ্য, আল্লাহ্পাকের নিকটে কোনোকিছুই গোপন নয়। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ। তাই বুঝতে হবে, এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে কেবল আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব বর্ধনার্থে।

'ইয়াতাসাআলূন' অর্থ কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? অর্থাৎ মক্কার পৌত্তলিকেরা কতোইনা ভয়াবহ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা সমালোচনা করে। অর্থাৎ রসুল স. যখন তাদের কাছে মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, প্রতিফল দিবস ইত্যাদির অবশ্যম্ভাবিতার কথা শোনান, তখন তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, দেখেছো, মোহাম্মদ আমাদেরকে কী ভয়ংকর সব কথা শোনায়। এরকম

www.eelm.weebly.com

বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর এবং হাসান বসরীর উক্তিরূপে যথাক্রমে বাগবী ও ইবনে আবী হাতেম। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— পৌত্তলিকেরা ঠাট্টা-বিদ্রূপের স্বরে রসুল স. এবং সাহাবীগণের কাছে পরলোকের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতো। এমতাবস্থায় 'ইয়াতাসাআলূন' অর্থ হবে — তারা কী বিষয়ে প্রশ্ন করে?

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেই মহাসংবাদ বিষয়ে (২), যেই বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে' (৩)।

আগের আয়াতের 'আ'ম্মা' সম্পৃক্ত হবে 'ইয়াতাসাআলূন' এর সঙ্গে। অথবা সম্পৃক্ত অনুক্ত আরেকটি 'ইয়াতাসাআলূন' এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় প্রথম আয়াতখানির জবাব হবে দ্বিতীয় আয়াত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— কী বিষয়ে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে? জিজ্ঞাসাবাদ করে এক মহাসংবাদের বিষয়ে। এরকমও হতে পারে যে, দ্বিতীয় আয়াতের বাক্যটিও প্রশ্নবোধক। অর্থাৎ বাক্যটির পূর্বে অনুক্ত রয়েছে একটি প্রশ্নবোধক শব্দ। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বাক্যটি হবে প্রথম বাক্যের উল্লেখিত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও ভয়াবহতাপ্রকাশক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তারা কী বিষয়ে জানতে চায়? মহাপ্রলয় ও তৎপরবর্তী বিষয়ের মহাবার্তা সম্পর্কে নাকি? আবার এরকম হওয়াও সম্ভব যে, এখানকার দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রথম প্রশ্নের প্রতি অস্বীকৃতিমূলক। অর্থাৎ সেই ভয়ংকর বিষয় সম্পর্কে উপহাসমূলক প্রশ্ন উত্থাপন করা সঙ্গত নয়। কেননা তা সন্দেহ-কৌতুকের অতীত। তাই তা প্রত্যক্ষগোচরতা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস্য। সুতরাং প্রশ্ন কেনো? বিষয়টিকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিলেই তো হয়।

মুজাহিদ প্রমুখ বলেছেন, এখানে 'মহাসংবাদ' অর্থ কোরআন মজীদ, মহাপ্রলয় বা পরকাল নয়। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আপনি বলুন, কোরআন একটি মহাসংবাদ'। কাতাদা বলেন, প্রতিফল দিবস।

'আল্লাজী হুম ফীহি মুখতালিফূন' অর্থ যেই বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। এখানকার 'আল্লাজী' যোজক অব্যয় হিসাবে ব্যবহৃত, যা পরবর্তী যোজ্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশেষণ হয়েছে 'নাবা' (সংবাদ) পদের। আর এখানকার 'তাদের মধ্যে' অর্থ মক্কার পৌত্তলিকদের মধ্যে, যেমন প্রথম আয়াতের 'তারা' অর্থ মক্কার পৌত্তলিকেরা। এমতাবস্থায় বাক্যটি বিশেষণরূপে পরিগণিত হবে তখন, যখন প্রশ্নটিকে ধরে নেওয়া হবে উপহাসমূলক, অথবা অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মক্কার কিছুসংখ্যক লোক মহাসংবাদ অস্বীকারকারী এবং কিছুসংখ্যক সন্দিগ্ধ। এরকমও বলা যেতে পারে যে, প্রথম আয়াতের 'তাদের' এবং এই আয়াতের 'তারা' সর্বনাম দু'টো দ্বারা বুঝানো হয়েছে মক্কার বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী উভয়কে। তাদের মধ্যে একদল প্রশ্ন করে 'মহাসংবাদ' সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণের জন্য এবং আর এক দল প্রশ্ন করে ঠাট্টাবিদ্রূপ চরিতার্থে।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'কখনও না, তাদের ধারণা অবান্তর, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে'। এখানে 'কাল্লা' (কখনও না) কথাটির

www.eelm.weebly.com

দ্বারা প্রতিহত করা হয়েছে ওই সকল পৌত্তলিকদের মতদ্বৈধতাকে। কেননা ওই মতদ্বৈধতার ভিত্তি ছিলো অস্বীকৃতি। সে অস্বীকৃতি তাদেরকে অধিকার করেছিলো ব্যাপকতরভাবে, অথবা অস্বীকারকারী ছিলো তাদের মধ্যকার কিছুসংখ্যক লোক। আর 'তারা শীঘ্র জানতে পারবে' অর্থ অদূর ভবিষ্যতে তাদের সকলকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবেই। তখন তারা তো সকলকিছু প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'আবার বলি, কখনও না, তারা অচিরেই জানবে'। আগের বাক্যের এই পুনরাবৃত্তি এখানে ঘটানো হয়েছে বিষয়টিকে প্রাধান্য প্রদানার্থে। এভাবে এখানে হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছে দু'বার, একবার কবরের, আর একবার মহাপ্রলয় দিবসের। আর এখানকার 'ছুম্‌মা' (আবারও) শব্দটির দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সমাধির শাস্তি অপেক্ষা মহাপ্রলয় দিবসের ত্রাস-আতংক হবে আরো অধিক ভয়ংকর।

সূরা নাবা ঃ আয়াত ৬—১৬

اَلَمۡ نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ مِهٰدًا ۙ﴿۶﴾ وَّ الۡجِبَالَ اَوۡتَادًا ۪ۙ﴿۷﴾ وَّ خَلَقۡنٰکُمۡ
اَزۡوَاجًا ۙ﴿۸﴾ وَّ جَعَلۡنَا نَوۡمَکُمۡ سُبَاتًا ۙ﴿۹﴾ وَّ جَعَلۡنَا الَّیۡلَ لِبَاسًا ۙ﴿۱۰﴾
وَّ جَعَلۡنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۪﴿۱۱﴾ وَّ بَنَیۡنَا فَوۡقَکُمۡ سَبۡعًا شِدَادًا ۙ﴿۱۲﴾ وَّ
جَعَلۡنَا سِرَاجًا وَّ هَّاجًا ﴿۱۳﴾ وَّ اَنۡزَلۡنَا مِنَ الۡمُعۡصِرٰتِ مَآءً
ثَجَّاجًا ۙ﴿۱۴﴾ لِّنُخۡرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّ نَبَاتًا ۙ﴿۱۵﴾ وَّ جَنّٰتٍ اَلۡفَافًا ﴿۱۶﴾

q আমি কি করি নাই ভূমিকে শয্যা
q ও পর্বতসমূহকে কীলক?
q আমি সৃষ্টি করিয়াছি তোমাদিগকে জোড়ায় জোড়ায়,
q তোমাদের নিদ্রাকে করিয়াছি বিশ্রাম,
q করিয়াছি রাত্রিকে আবরণ,
q এবং করিয়াছি দিবসকে জীবিকা আহরণের সময়,
q আর আমি নির্মাণ করিয়াছি তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ
q এবং সৃষ্টি করিয়াছি প্রোজ্জ্বল দীপ।
q এবং বর্ষণ করিয়াছি মেঘমালা হইতে প্রচুর বারি,
r যাহাতে তদ্দ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ,
r ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ— তাকাও পৃথিবী ও পর্বতসমূহের দিকে। তারপর বলো, আমি কি ভূপৃষ্ঠকে শয্যাস্বরূপ বিছিয়ে দিয়ে তাকে সুস্থির রাখবার জন্য কীলকরূপে পর্বতসমূহকে তার উপরে স্থাপন করিনি? প্রশ্নটি স্বীকৃতিমূলক। অর্থাৎ তোমাদের প্রতি নিছক অনুকম্পাবশত এরকম তো করেছি আমিই। সুতরাং তোমরা আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে অথবা কোনো কিছুকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করবে কেনো? বলা বহুল্য, এখানে এমতো প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে মানুষকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি অনুপ্রাণিত করণার্থে।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় (৮), তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম (৯), করেছি রাত্রিকে আবরণ (১০), এবং করেছি দিবসকে জীবিকা আহরণের সময়' (১১)।

এখানে 'সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়' অর্থ তোমাদেরকে করেছি নারী, অথবা পুরুষ। 'নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম' অর্থ পরিপূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের নিমিত্ত বানিয়েছি নিদ্রাকে। এখানে 'সুবাতান' অর্থ বিশ্রাম। এর শাব্দিক অর্থ বিচ্ছিন্ন করা। পরিধেয় বসন যেমন বিচ্ছিন্ন করে জনদৃষ্টিকে, নিদ্রাও তেমনি মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় সকল জনসম্পৃক্ততা ও কর্মব্যস্ততা থেকে। 'রাত্রিকে করেছি আবরণ' অর্থ রাতকেই আমি নির্ধারণ করেছি বিশ্রাম গ্রহণের জন্য প্রকৃষ্ট সময়রূপে। তাই স্বাভাবিকভাবে তখন মানুষের কলকোলাহল থেকে রাতের আবরণে ঢেকে যায় দিবসের কর্মব্যস্ততা। আর 'দিবসকে করেছি জীবিকা আহরণের সময় অর্থ উপার্জন, জাগতিক কর্মসম্পাদন এবং পরকালের পাথেয় সংগ্রহের জন্য শরিয়তের বিধি-বিধানাদি পালনের সময়রূপে আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি দিনকে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ (১২) এবং সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল দীপ' (১৩)। এখানে 'সিরাজাঁও ওয়াহ্‌হাজা' অর্থ প্রোজ্জ্বল প্রদীপ, সূর্য। মুকাতিল বলেছেন, সূর্য অত্যুপ্ত বলেই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে 'ওয়াহ্‌হাজ' শব্দটি। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক সূর্যকে দান করেছেন আলোক ও উত্তাপ উভয়টিই।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'এবং বর্ষণ করেছি মেঘমালা থেকে প্রচুর বারি'। এখানে 'মু'সিরাত' অর্থ ওই মৌসুমী বায়ু, যা বৃষ্টিপাত ঘটায়। আউফির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। মুজাহিদ, মুকাতিল ও কালাবীর অভিমতও এরকম। আবুল আলিয়া ও জুহাক বলেছেন, 'আল মু'সিরাত' অর্থ মেঘপুঞ্জ। ওয়ালেব সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ফাররা বলেছেন, 'আল মু'সিরাত' বলে বর্ষণোদ্যত বৃষ্টিবাহী মেঘকে। যেমন বলা হয় 'আল মারআতু মু'সিরাহ্' (ঋতু-আসন্ন নারী)। ইবনে কীসান শব্দটির অর্থ করেছেন— বর্ষণমুখর মেঘমালা। হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, জায়েদ ইবনে আসলাম ও মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন,

www.eelm.weebly.com

'আল মু'সিরাত' অর্থ আকাশ। মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার 'মিনাল মু'সিরাত' কথাটির 'মিন' অব্যয়টি নৈমিত্তিক। অন্যান্যরা বলেন, সূচনাজ্ঞাপক। মুজাহিদ এখানকার 'ছাজ্জ্বাজ্বা' কথাটির অর্থ করেছেন— প্রচুর বর্ষণ। কাতাদা বলেছেন, নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাত। ইবনে জায়েদ বলেছেন, অতিবৃষ্টি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যাতে তদ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ (১৫), ও ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্যান' (১৬)। একথার অর্থ— বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে আমিই ভূমিতে উৎপন্ন করি মানুষের জন্য গম, যব, ধান, সবজী ইত্যাদি এবং পশুদের জন্য ঘাস। এভাবে ভূপৃষ্ঠকে সজ্জিত ও সমৃদ্ধ করি উদ্যানে ও অরণ্যে।

এখানে 'জান্নাতিন আলফাফা' অর্থ ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্যান। 'আলফাফ' বহুবচন 'লাফফুন' এর, যেমন 'আজজ্বাউন' বহুবচন 'জ্বাজাউন' এর। অথবা 'আলফাফ' বহুবচন 'লাফীফুন' এর, যেমন 'আশরাফ' বহুবচন 'শরীফুন' এর। অথবা শব্দটি এমন এক বহুবচন, যার একবচন হয় না। যেমন 'আওদ্ব'। শব্দটিকে যদি 'লাফ্ফুন' এর বহুবচন ধরা হয়, তবে একে বলতে হবে বহুবচনের বহুবচন। কেননা 'লাফ্ফুন' আবার বহুবচন 'লাফ্ফাফাতুন' এর। বৃক্ষরাজি ঘনসন্নিবিষ্ট হলে তাকে বলা হয় 'আলফাফ'। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'জান্নাতুন আলফাফা'। এভাবে এখানে একথাটিই বলতে চাওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ যেহেতু আকাশ, সূর্য, মেঘমালা, বৃষ্টি, অরণ্য-উদ্যান, শস্য-উদ্ভিদ ইত্যাদি সৃষ্টি করতে পেরেছেন, সেহেতু মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থানও তিনি ঘটাতে পারবেন। কেননা প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি সহজতর।

সূরা নাবা ঃ আয়াত ১৭, ১৮, ১৯, ২০

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿١٧﴾ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ
اَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَّ فُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَّ سُيِّرَتِ
الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

r নিশ্চয় নির্ধারিত আছে বিচার দিবস;

r সেই দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হইবে,

r আকাশ উন্মুক্ত করা হইবে, ফলে উহা হইবে বহু দ্বারবিশিষ্ট।

r এবং চলমান করা হইবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেইগুলি হইয়া যাইবে মরীচিকা,

---

প্রথমে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় নির্ধারিত আছে বিচার দিবস'। একথার অর্থ— মহাবিচার পর্ব অবশ্যম্ভাবী, যা অনুষ্ঠিত হবে মহাপ্রলয় ও মহাপুনরুত্থানের পর। সেদিনই প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করা হবে অনন্তকালীন পুরস্কার, অথবা তিরস্কার।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'সেই দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমবেত হবে'। বাক্যটি আগের আয়াতের 'ইয়াওমিল ফাসলি' (বিচার দিবস) এর অনুবর্তী, অথবা বর্ণনামূলক যোজ্য। কিংবা অনুবর্তী আগের আয়াতের 'মীক্বাত্বা' (নির্ধারিত রয়েছে) কথাটির। বা 'কানা' অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিতীয় বিধেয়।

বিশুদ্ধ সূত্র সহযোগে সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, শিঙ্গা হবে শিঙের আকৃতিবিশিষ্ট। মহাপ্রলয়ের প্রাক্কালে হজরত ইসরাফিলের হস্তধৃত ওই শিঙ্গাতেই ফুৎকার দেওয়া হবে। হজরত ইবনে ওমরও এরকম বলেছেন। বিষয়টির বিশদ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে সুরা হাক্বক্বা'র তাফসীরে। ওয়াহাব বলেছেন, শিঙ্গার গঠন প্রকৃতি হবে শুভ্র মুক্তা সদৃশ। শিঙ্গাটি হবে অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট এবং স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে সুরা আল মুদ্দাছ্ছিরে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যখন ওই শিঙ্গায় দ্বিতীয় বারের মতো ফুৎকার ধ্বনিত হবে, তখন সকলে তাদের আপন আপন সমাধি থেকে পুনরুত্থিত হয়ে দ্রুতগতিতে গমন করতে থাকবে বিচার-প্রান্তরের দিকে।

হজরত আবু জর গিফারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিফল দিবসে সমবেত জনতা বিভক্ত হবে তিন শ্রেণীতে। এক শ্রেণী হবে প্রতুল পানাহারে পরিতৃপ্ত, অভিজাত পরিচ্ছদে সজ্জিত এবং সুদৃশ্য বাহনে আরুঢ়। দ্বিতীয় শ্রেণী ধাবিত হবে পদব্রজে। আর তৃতীয় শ্রেণীটি হবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত। তারা হাজির হবে অধোমুখী হয়ে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে। নাসাঈ, হাকেম, বায়যাবী।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বর্ণনা করেছেন রসুল স. একবার আমাদেরকে 'সেই দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে' এই আয়াত পাঠ করে শোনালেন। তারপর বললেন, মহাবিচারের দিবসে আমার উম্মত বিভক্ত হবে দশটি শ্রেণীতে। তাদের মধ্যে একদল হবে বানরের মতো (ক্বদরিয়া সম্প্রদায়), এক দল হবে শূকরের আকৃতিবিশিষ্ট (মুরজিয়া সম্প্রদায়), এক দল হবে শূয়োর-কুকুরের মতো (হারুরিয়া সম্প্রদায়)। গাধার আকৃতিবিশিষ্ট হবে রাফেজীরা। অহংকারীরা হবে চতুষ্পদ জন্তুর মতো, সুদখোরেরা বন্য পশুর মতো। পরচর্চাকারী এবং মূর্তিনির্মাতারা চলতে থাকবে মুখে ভর দিয়ে। একদল চলতে থাকবে হেলে দুলে নির্ভয়ে। তারাই আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন। আর পান ভোজনে পরিতৃপ্ত অবস্থায় থাকবে দক্ষিণ দিকের দল। ইবনে আসাকের হাদিসটি লিপিবদ্ধ করবার পর মন্তব্য করেছেন, বর্ণনাটিকে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। কেননা এর সূত্রপরম্পরার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন কতিপয় অজ্ঞাতনামা বর্ণনাকারী।

হাদিসটি আবার খতিব বাগদাদীর 'আস্‌সিরাজুম্‌ মুনীর' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— সেদিন আমার উম্মতের হবে দশটি দল। তাদের মধ্যে পরচর্চাকারীদের চেহারা হবে বানরের মতো, হারাম ভক্ষণকারীদের চেহারা হবে শূকরের মতো। সুদখোরেরা তাদের নিজেদের পা কাঁধে নিয়ে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে

www.eelm.weebly.com

চলবে। যারা অন্যায় বিচার করে তারা উঠবে অন্ধ হয়ে এবং তারা তাদের মাথা দোলাতে থাকবে এদিকে ওদিকে। দাম্ভিকেরা হবে বধির। যে সকল আলেম বক্তার আমল তাদের কথার বিপরীত, তাদের জিহ্বা তখন ঝুলে পড়বে তাদের বুকের কাছে। আর তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে থাকবে দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত ও পুঁজ। প্রতিবেশীদেরকে ক্লেশ প্রদানকারীরা উঠবে হাত পা কর্তিত অবস্থায়। আগুনের তক্তার উপরে আসীন থাকবে পর নিন্দাকারীরা। গলিত মৃতদেহের চেয়ে অধিক দুর্গন্ধযুক্ত হবে প্রবৃত্তিতাড়িতরা, যারা খর্ব করে অপরের অধিকার। জাকাত ও উশর যারা যথাপাত্রে বিতরণ করে না, তাদের পরনে থাকবে সেদিন আলকাতরার চাদর। হজরত মুয়াজ থেকে হজরত বারা ইবনে আজীবও এরকম বর্ণনা করেছেন, যা সংকলন করেছেন ছা'লাবী।

ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়গুলোর বিবরণ এসেছে এভাবে— ১. ক্বদরিয়া ঃ তারা বলে, মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা। আল্লাহ্‌কে কর্মের স্রষ্টা হিসেবে তারা মানেই না। ২. মরজিয়া ঃ তারা বলে, যার ইমান ঠিক, তার পাপ তার জন্য ক্ষতিকারক নয়। তাদের কাছে আমলের কোনো গুরুত্বই নেই। ৩. হারুরিয়া ঃ তারা খারেজীদের একটি উপদল। হারুরী নামক স্থানে তারা সেনাসমাবেশ ঘটিয়েছিলো। হারুরিয়া নামে কুখ্যাত তারা সেকারণেই। তাদের অভিমত হচ্ছে আমল ইমানের অবিচ্ছেদ অঙ্গ। তাই লঘু পাপ করলেও ইমান চলে যায়। তারা হজরত ওসমান, হজরত আলী এবং হজরত মুয়াবিয়াকে কাফের বলে। ৪. রাফেজী ঃ এদের মতবাদ মরজিয়াদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের মত হচ্ছে, অল্প কয়েকজন সাহাবী ইমানদার ছিলেন, আর হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর সহ অন্যান্য সকলেই ছিলেন ইমানহারা। তারা আরো বলে, খেলাফতের অধিকারী ছিলেন কেবল হজরত আলী। তার কাছ থেকে খেলাফত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঐকমত্য (ইজমা) কোনো দলিল নয়। খেলাফত ও ইমামত আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত। নবুয়তের উপর যেমন ইমান আনা অত্যাবশ্যক, তেমনি ইমান আনা অত্যাবশ্যক ইমামতের প্রতি। পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়গুলোর এমতো অপবিশ্বাস থেকে আল্লাহ্‌পাক আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমিন।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, ফলে তা হবে বহুদ্বারবিশিষ্ট'। এখানে 'আবওয়াবান' (বহু দ্বারবিশিষ্ট) কথাটির সম্বন্ধপদ রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ বহুদ্বারবিশিষ্ট হবে আকাশ। অথবা গুরুত্ব সহকারে আকাশকেই এখানে বলা হয়েছে দরজা। অর্থাৎ আকাশে তখন এতো বেশী সংখ্যক দরজা দৃষ্ট হবে যে, মনে হবে সম্পূর্ণ আকাশই দরজাময়।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'এবং চলমান করা হবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেগুলি হয়ে যাবে মরীচিকা'। একথার অর্থ— তখন পাহাড়-পর্বতগুলোকে করা হবে চূর্ণ-বিচূর্ণ। ফলে সেগুলো অণুপরমাণুর মতো ভাসতে থাকবে শূন্যমার্গে। অর্থাৎ সেগুলোর কোনো চিহ্নই আর তখন খুঁজে পাওয়া যাবে

www.eelm.weebly.com

না, যেমন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না মরীচিকার। ‘সারাব’ এর আভিধানিক অর্থ— যাওয়া, প্রস্থান করা। মরীচিকাকেও বলে ‘সারাব’। এই উপমাটি এখানে আনা হয়েছে একথা বোঝাতে যে, চূর্ণ-বিচূর্ণ পাহাড় পবর্তগুলোর কোনো চিহ্নই আর তখন থাকবে না।

সূরা নাবা ঃ আয়াত ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾ لَّابِثِينَ فِيهَآ
أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَّ
غَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾
وَّكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾
فَذُوقُوا فَلَنْ نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

q নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে;
q সীমালংঘনকারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল।
q সেথায় উহারা যুগ যুগ ধরিয়া অবস্থান করিবে,
q সেথায় উহারা আস্বাদন করিবে না শৈত্য, না কোন পানীয়—
q ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত;
q ইহাই উপযুক্ত প্রতিফল।
q উহারা কখনও হিসাবের আশংকা করিত না,
q এবং উহারা দৃঢ়তার সহিত আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিয়াছিল।
q সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করিয়াছি লিখিতভাবে।
q অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, আমি তো তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করিব।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— নিশ্চয় অবাধ্যদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম তাদের জন্য ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করছে। এখানে ‘কানাত মিরসাদা’ অর্থ অপেক্ষা করছে, ওঁৎ পেতে আছে। ‘রসদ’ অর্থ অপেক্ষা, প্রস্তুতি। বক্তব্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— শাস্তি ও স্বস্তির ফেরেশতারা নিস্পলক চোখে চেয়ে থাকবে পুলসিরাত অতিক্রমকারীদের দিকে। শাস্তির ফেরেশতারা তখন অবাধ্যদেরকে ধরে ধরে নিক্ষেপ করবে নরকে। আর স্বস্তির ফেরেশতারা হবে বিশ্বাসীগণের সুহৃদ। তাঁরা তাঁদেরকে রক্ষা করবে পুলসিরাতের দু’পাশের নরকানলোত্তাপ থেকে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, সেদিন পুলসিরাত অতিক্রম করতে বলা হবে বিশ্বাসীদেরকেও। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘তোমরা প্রত্যেকে অতিক্রম

www.eelm.weebly.com

করতে থাকবে জাহান্নাম'। এমতাবাস্থায় 'মিরসাদ' এর অর্থ হবে পথ। এরকমও বলা হয়েছে যে, 'মিরসাদ' অর্থ অবিশ্বাসীদের জন্য নির্মিত। যেমন বলা হয় 'আরসত্‌তুশ্‌ শাই (আমি অমুক বস্তু নির্মাণ করছি)। হতে পারে, এখানকার 'মিরসাদ' শব্দরূপটি আধিক্যজ্ঞাপক। অর্থাৎ ওই ফেরেশতারা তখন তাদের দৃষ্টিকে রাখবে সতত সচকিত, যাতে করে একজন অবিশ্বাসীও হাত ফসকে না যায়।

হজরত আনাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, পুলসিরাত অসি অপেক্ষাও অধিক ধারালো। তখন বিশ্বাসী ও বিশ্বাসবতীগণকে নিরাপত্তা প্রদান করবে ফেরেশতারা। জিবরাইল ধরে রাখবে আমার কটিদেশ। আমি বলবো, হে আমার প্রভুপালয়িতা! রক্ষা করো! রক্ষা করো! তখন পুলসিরাত থেকে পতিত হবে অসংখ্য নর-নারী। হজরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের থেকে ইবনে মোবারক, বায়হাকী ও ইবনে আবিদ্‌ দুন্‌ইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নরকের উপরে অবস্থিত পুলসিরাত হবে তলোয়ারের চেয়েও অধিক শানিত। তার দুই পাশ হবে কণ্টকাকীর্ণ আকর্ষীযুক্ত। ওগুলো উত্তোলন করবে মানুষকে। আমার জীবনাধিকারী পবিত্রতম প্রভুপালকের শপথ! ওই আকর্ষীগুলো মুজার ও রবীয়া গোত্রের লোকদের চেয়েও অধিকসংখ্যক লোককে ধরে ফেলবে। পাশে দণ্ডায়মান ফেরেশতারা মুহুর্মুহু উচ্চারণ করতে থাকবে— ইলাহী ! রক্ষা করো! রক্ষা করো!

হজরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, তরবারীর ধারের চেয়েও অধিক তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট হবে পুলসিরাত। হবে পিচ্ছিল ও এবড়ো থেবড়ো। কিছুসংখ্যক ফেরেশতা তার পাশে দাঁড়িয়ে বলবে, বাঁচাও বাঁচাও। আবার কিছুসংখ্যক ফেরেশতা আকর্ষীতে গেঁথে গেঁথে তুলতে থাকবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

মুকসিম সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জনগণকে পুলসিরাতের উপরে সাতটি স্থানে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রথম স্থানে প্রশ্ন করা হবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্‌ কলেমায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে কিনা। দ্বিতীয় স্থানে প্রশ্ন করা হবে নামাজ সম্পর্কে। তৃতীয় স্থানে জাকাত সম্পর্কে, চতুর্থ স্থানে রোজা সম্পর্কে, পঞ্চম স্থানে হজ সম্পর্কে, ষষ্ঠ স্থানে ওমরা সম্পর্কে এবং সপ্তম স্থানে বান্দার হক সম্পর্কে। এ সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলে তো ভালোই, যদি এ সকল আমলে কিছু ত্রুটি থাকে, তবে তার ক্ষতিপূরণ করা হবে নফল ইবাদতের দ্বারা। এভাবে অবশেষে বিশ্বাসীগণকে নিয়ে যাওয়া হবে জান্নাতে। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যখন যে স্থানে আটকে যাবে, সে স্থান থেকেই তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।

এখানে 'ত্বগীন' অর্থ পাপের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রমকারী, সীমালংঘনকারী। মৌখিকভাবে অবিশ্বাস প্রকাশকারীকে বলে কাফের। আর মনে-মুখে অবিশ্বাসে বদ্ধমূল হয়ে যাওয়াকে বলে 'ত্বগী'। যেমন রাফেজী, খারেজী, ক্বদরিয়া, মরজিয়া, (বর্তমান যুগের কাদিয়ানি, মওদুদী) ইত্যাদি। আর এখানকার 'মাআব' অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। পদটি 'কানাত' এর দ্বিতীয় বিধেয়।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে'। এখানে 'আহক্বাবা' অর্থ যুগ যুগ ধরে। শব্দটি 'হাক্বব' এর বহুবচন। জাহান্নামের একদিন হবে পৃথিবীর একহাজার বৎসরের সমান। এভাবে পরকালের আশি বৎসরের সমান হবে এক 'হোক্ববা'। সুতরাং এখানকার 'যুগ যুগ ধরে' কথাটির অর্থ হবে হোক্ববা হোক্ববা ধরে। এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত আলী থেকে বাগবী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে হান্নাদ। মুজাহিদ পরিসংখ্যান দিয়েছেন এরকম— এক হাজার বছরে একদিন, এই হিসেবে তিন শত ষাট বছরে এক বছর। সাত শত বছরে এক খরীফ। সত্তর খরীফে এক হোক্ববা এবং তেতাল্লিশ হোক্ববায় এক আহক্বাব। মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, সত্তর হাজার বছরে হয় এক হোক্ববা।

একটি সংশয় ঃ আহক্বাব যতোই দীর্ঘ হোক না কেনো, তা তো এক সময় শেষ হয়ে যাবেই। অর্থাৎ আহক্বাব অন্তহীন নয়। অথচ কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে দোজখীদের অনন্ত দোজখবাসের কথা। যেমন 'ওয়াফীল আ'জাবিহুম খলিদূন' (তারা শাস্তি পেতে থাকবে অনন্তকাল ধরে)। বিষয়টি ঐকমত্যসম্মতও। মুররা ইবনে আবদুল্লাহ্‌র উক্তি উল্লেখ করে সুদ্দী বলেছেন, দোজখবাসীরা যদি জানতে পারে, তাদেরকে দোজখে থাকতে হবে ততোদিন পর্যন্ত, যতোগুলি প্রস্তরকণা আছে এই পৃথিবীতে, তবুও তারা উৎফুল্ল হবে এই ভেবে যে, একদিন না একদিন তারা নিষ্কৃতি পাবেই। আর বেহেশতবাসীরা যদি জানে পৃথিবীতে যতো প্রস্তরকণা রয়েছে, তাদের বেহেশতবাসও ততোদিনের, তবু তারা হবে বিমর্ষ এই ভেবে যে, এই সুখ তাহলে তো চিরন্তন নয়। তাই প্রশ্ন— তাহলে এখানে আহক্বাব বলা হলো কেনো?

সংশয়ভঞ্জন ঃ উদ্ভূত সংশয় নিরসনার্থে একদল কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতখানি রহিত (মনসুখ)। আর এর রহিতকারী আয়াত হচ্ছে 'ফালান নাযীদাকুম ইল্‌লা আ'জাবা' (আমি তাদের শাস্তি কেবল বাড়িয়েই দিবো)। অর্থাৎ অনন্তকাল ধরে শাস্তি কেবল বর্ধিতই করা হবে দোজখীদের।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াত বিজ্ঞপ্তিমূলক। আর বিজ্ঞপ্তি কখনো রহিত হয় না। রহিত হয় বিধান। হাসান বসরী বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক এখানে জাহান্নামবাসের কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করে দেননি। বলেছেন 'আহক্বাবা' (যুগ যুগ ধরে)। অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে তাদের শাস্তি, যা কখনো নিঃশেষ হবে না। আমি বলি, বিষয়বস্তু কখনো বক্তব্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। একারণেই আমরা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে চিরজাহান্নামী বলে জানি। তবে আলোচ্য আয়াতখানি নিশ্চয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। আর 'আহক্বাব'কে অনন্তকাল বলে ব্যাখ্যা করার বিষয়টি অ-সবল। কেননা শব্দটি এখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে মর্মার্থের বিপরীত ধারণা অপসারণার্থে। সুতরাং শব্দটির অর্থ অনন্তকাল নয়।

www.eelm.weebly.com

এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'হাক্বিব' এর বহুবচনরূপে আহক্বাব এখানে ব্যবহার করা হয়েছে অবস্থাপ্রকাশক হিসেবে। যেমন বলা হয় 'হাক্বাবার রজুলু' (লোকটির জীবিকা রুদ্ধ হয়েছে)। অর্থাৎ সে উপজীবিকা থেকে হয়েছে বঞ্চিত। আবার যেমন 'হাক্বাবাল আ'লাক্ব' (পৃথিবীতে বৃষ্টি রুদ্ধ হয়েছে)। অর্থাৎ পৃথিবী বঞ্চিত হয়েছে বৃষ্টি থেকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— জাহান্নামবাসীরা বসবাস করতে থাকবে রিজিকবঞ্চিত অবস্থায়। কোনো আহার্যই তাদের জুটবে না। পরবর্তী আয়াতে সেকথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এভাবে 'সেখানে তারা আস্বাদন করবে না শৈত্য, না কোনো পানীয়'। আমি বলি, এমতো ব্যাখ্যা হজরত আলী প্রমুখ সাহাবীগণের উক্তির বিপরীত। আর একথা তো মানতেই হবে যে, ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ এখানে একদম নেই। তাই সাহাবীবচনকে গ্রহণ করাই সমীচীন। কেননা তা সুপরিণত সূত্রবিশিষ্ট হাদিসের মতোই অবশ্য মাননীয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা আস্বাদন করবে না শৈত্য, না কোনো পানীয়— (২৪) ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত' (২৫)। বাক্যটি আগের আয়াতের 'লাবিছীনা' (অবস্থান করবে) কথাটির অবস্থাপ্রকাশক, অথবা 'আহক্বাবা' (যুগ যুগ ধরে) এর বিশেষণ, কিংবা সেখানকার 'আহক্বাবা' এখানকার 'লা ইয়াজূক্বূনা' এর কর্মপদ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে আগুনে জ্বলতে থাকবে এবং পান করতে থাকবে ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আস্বাদ্য পানভোজন তাদের ভাগ্যে কখনোই জুটবে না।

আমি বলি, ২২ সংখ্যক আয়াতের 'ত্বগীন' শব্দটির অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী মনে করার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে জটিলতার। 'ত্বগীন' (সীমালংঘনকারী) বলে যদি কেবল 'বেদাতী' (রাফেজী, খারেজী ইত্যাদি) অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে বিষয়টি আর জটিল থাকে না। কেননা বেদাতীরাও যেহেতু ইসলামের দাবিদার, তাই প্রকৃত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতো তারা অনন্তকাল ধরে জাহান্নামে অবস্থান করবে না। একসময় তারা নিষ্কৃতি পাবেই। তাই 'আহক্বাবা' কথাটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়াই সমীচীন। অর্থাৎ যুগের পর যুগ জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর তারা একসময় নিষ্কৃতি পাবে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আমার এমতো অভিমতের সমর্থনে রয়েছে হজরত ইবনে ওমর থেকে বায্যার কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আহক্বাব পূরণ না করা পর্যন্ত কেউ নরকাগ্নি থেকে নিস্তার পাবে না। আশি বৎসরের কিঞ্চিদধিক সময় কালকে বলে 'হাক্বব'। আর সেখানকার প্রত্যেক বৎসর হবে এখানকার তিন শত ষাট দিনের। এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা 'ত্বগীন' তারা নির্ধারিত 'হোক্ববা' পূর্ণ করার পর বেরিয়ে আসবে নরক থেকে।

'হামীমা' অর্থ ফুটন্ত পানি। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, লোহার চিমটা দিয়ে তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানির কাছে। ওই অতুষ্ণ পানির কাছে গেলেই ঝলসে যাবে তাদের মুখমণ্ডল। আর তা পান করলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে পেটের নাড়িভুঁড়ি। তিরমিজি ও বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু দারদা থেকে।

www.eelm.weebly.com

আর 'গাস্সাক্ব' অর্থ সীমাতিরিক্ত হিমশীতল। মুজাহিদ সূত্রে হান্নাদ এরকম বলেছেন। অর্থাৎ অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে ওই পানীয় জাহান্নামীরা গলাধঃকরণ করতে পারবে না। মুকাতিল বলেছেন, যে শীতলতা হিমাংকের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে, তাকেই বলে 'গাস্সাক্ব'। আবুল আলিয়ার বক্তব্যের অনুসরণে হান্নাদ বলেছেন, 'ইল্লা হামীমাঁও ওয়া গাস্সাক্বা' এই আয়াতে 'পানীয় সমূহের মধ্যে উষ্ণতর পানিকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে 'গাস্সাক্ব' থেকে। আর হান্নাদের বর্ণনানুসারে আতিয়ার অভিমতানুযায়ী 'গাস্সাক্ব' অর্থ জাহান্নামীদের প্রবাহিত রক্ত, পুঁজ। ইব্রাহিম নাখয়ী এবং আবু রযীনের অভিমতও এরকম। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে 'গাস্সাক্ব' এর ধাতুমূল হয় 'গাসাক্বাত' (প্রবহমান)। কা'বের উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বলেন, 'গাস্সাক্ব' নরকের একটি সরোবরের নাম। সেখানে জমা করা হবে সাপ, বিচ্ছু ও অন্যান্য বিষধর প্রাণীর বিষ। সেখানে কোনো নারকীকে একবার মাত্র ডুবিয়ে দিলেই প্রচণ্ড বিষের প্রকোপে গোশত ও চামড়া খসে পড়বে তার অস্থিকাঠামো থেকে। তখন ওই নারকী তার ঝুলে পড়া গোশত ও চামড়া এমনভাবে টেনে নিয়ে ফিরবে, যেমনভাবে টেনে নিয়ে বেড়ায় কোনো অতিপ্রশস্ত বস্ত্রধারী তার বস্ত্র। যাহোক, বিভিন্ন বক্তব্যের আলোকে এখানে 'গাস্সাক্ব' অর্থ যদি অতি শৈত্য নেওয়া হয়, তবে বলতে হয় শব্দটি ব্যতিক্রম হয়েছে 'বারদান' থেকে। নচেৎ 'হামীম' ও 'গাসসাক্ব' দু'টো শব্দই ব্যতিক্রম হবে 'শারাবান' থেকে। এমতাবস্থায় 'বারদান' এর মর্মার্থ হবে জাহান্নামের অত্যধিক শৈত্য। আর 'শারাব' অর্থ হবে ওই জাতীয় পানীয়, যদ্দারা পিপাসিতরা পরিতৃপ্ত হয়। মোট কথা, সেরকম পরিতৃপ্তিদায়ক পানীয় নারকীদের ভাগ্যে জুটবেই না। জুটবে কেবল ফুটন্ত পানি ও পুঁজ।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'এটাই উপযুক্ত প্রতিফল'। বাক্যটি একটি উহ্য ক্রিয়াপদের সাধারণ কর্মপদ। 'উইফাক্বা' অর্থ অনুরূপ, সদৃশ, উপযুক্ত। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— তাদেরকে প্রদত্ত ওই শাস্তি হবে তাদেরই অপকর্মসমূহের অনুরূপ। অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল, উপযুক্ত প্রতিফল। মুকাতিল বলেছেন, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে তাদের পাপ অনুপাতে। শিরিক যেহেতু সর্ববৃহৎ পাপ, তাই তার শাস্তিও হবে ভয়াবহতম। অবশ্য এরকম মর্মার্থ গ্রহণ করা যাবে তখন, যখন 'ত্বগীন' অর্থ গ্রহণ করা হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, যেমন অর্থ করেছেন কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা। লক্ষণীয়, ২১ সংখ্যক আয়াতের 'নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে' বাক্যটি 'জ্বাযা' (প্রতিফল) এর প্রতিই ইঙ্গিতবাহী। সুতরাং অন্য কোনো অর্থ গ্রহণের সুযোগ এখানে নেই। তাই বাক্যটি পূর্বোক্ত বাক্যের গুরুত্ব আরোপক।

তবে আমাদের ভাষ্যমতে যদি 'ত্বগীন' অর্থ বেদাতীদল করা হয়, তবে এখানকার 'জ্বাযাআন' শব্দটিকে পূর্বোক্ত বাক্যের গুরুত্বআরোপক বলা যাবে না। বরং এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে ভিন্নতর এবং বক্তব্যটি দাঁড়াবে— বেদাতীরা শাস্তি পাবে তাদের স্ব স্ব অপবিশ্বাসানুপাতে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন মেয়াদে। এভাবে পূর্ণ হবে তাদের 'আহক্বাব'। কমপক্ষে তাদেরকে এক হোক্ববা শাস্তি ভোগ করতে তো হবেই।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা কখনো হিসাবের আশংকা করতো না (২৭), এবং তারা দৃঢ়তার সঙ্গে আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করতো' (২৮)। একথার অর্থ— পরকালের হিসাব-নিকাশ হওয়ার কথা স্বীকার না করা এবং আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করার কারণেই সেদিন তাদেরকে দেওয়া হবে উপযুক্ত শাস্তি। উল্লেখ্য, বেদাতীদের কোনো কোনো দলও আখেরাতের হিসাব-নিকাশে আস্থাশীল নয়। যেমন মরজিয়ারা। আবার রাফেজীরা বলে, হজরত আলীর অনুসারী ও সুহৃদগণের লঘু-গুরু কোনো পাপেরই শাস্তি হবে না। তারা মান্যবর সাহাবীগণের মাহাত্ম্য অস্বীকারকারী। কেবল তিনজন সাহাবী ছাড়া অনান্য সকলকে তারা বলে মুরতাদ ও মুনাফিক। তাদের প্রবল ধারণা, হজরত আলীর পূর্ববর্তী ত্রয়ী খলিফার শাসনামল ছিলো বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। সাহাবীগণের যুগকেই তারা সর্বনিকৃষ্ট যুগ বলে অভিহিত করে থাকে। অথচ তাঁদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্পাক স্বয়ং ঘোষণা করেছেন 'যাদেরকে আমি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম, তারা নামাজ আদায় করতো' 'অবশ্যই আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রতি পরিতুষ্ট, যারা বৃক্ষতলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলো আপনার হাতে। আল্লাহ্ জানেন তাদের হৃদয়ে কী আছে', 'মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে প্রথম অগ্রবর্তী দল হবে'। তাঁদের প্রশংসা ঘোষিত হয়েছে আরো অনেক আয়াতেও।

'কিজ্জাবান' শব্দটি ধাতুমূল, অসত্যারোপের সমঅর্থবহ। অর্থাৎ অস্বীকার করতো। এটা হচ্ছে শব্দটির সাধারণ ব্যবহার রীতি। অথবা 'কিজ্জাবান' 'মুফায়িলাতের' পরিমাপে ধাতুমূল 'মুকাজিবাতুন' এর। অর্থাৎ বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা একে অপরের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী। কিংবা 'কিজ্জাবান' শব্দরূপটি আধিক্যজ্ঞাপক। মর্মার্থ— তারা অন্যান্য মিথ্যাবাদীর মতোই সাংঘাতিক মিথ্যাবাদী।

মাসআলা ঃ আমাদের ভাষ্যমতে আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়— বেদাতীরা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। জাহান্নামে প্রবেশ করবে কবীরা গোনাহ্কারীদেরও কেউ কেউ। আর তারা সেখানে অবস্থান করবে সাত হাজার বছর। তাদের জন্য ফুটন্ত পানি ও পুঁজ সরবরাহ করা হবে না। দেওয়া হবে না অন্যান্য ভয়াবহ শাস্তিও।

হজরত আলী থেকে ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে শাহীন বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের কবীরা গোনাহ্কারী যে সকল বিশ্বাসী তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করবে এবং অবশেষে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদের চোখ পীতবর্ণ হবে না, কৃষ্ণবর্ণধারণ করবে না তাদের মুখমণ্ডল, শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে না তাদেরকে শয়তানের সাথে এবং বেড়ি পরানো হবে না গলদেশেও। তাদেরকে পান করানো হবে না হামীম, পরিধান করানো হবে না আলকাতরার পোশাক। আল্লাহ্পাক তাদের শরীরের জন্য হারাম করে দিয়েছেন অনন্ত নরকবাস। সেজদা করার কারণে আল্লাহ্পাক তাদের মুখমণ্ডলকে নরকের আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আগুন স্পর্শ করবে তাদের কারো কারো পা, কারো কারো হাঁটু, কারো

www.eelm.weebly.com

কারো কটিদেশ এবং কারো কারো গলদেশ। তারা এভাবে শাস্তিগ্রস্ত হবে তাদের পাপ ও অপকর্মের অনুপাতে। কেউ সেখান থেকে নিষ্কৃতি পাবে এক বৎসর পর, কেউ আরো বেশী, আবার কেউ তারো বেশী। এভাবে তাদের পাপ যতো বেশী হোক না কেনো, তারা পৃথিবীর আয়ুষ্কালের পর, অর্থাৎ সর্বোচ্চ সাত হাজার বছর পর নরক থেকে নিষ্কৃতি পাবেই। হাকেম তাঁর নাওয়াদিরুল উসুল গ্রন্থেও এরূপ হাদিস সংকলন করেছেন। সেখানে অতিরিক্ত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এই কথাগুলোও— তাদের লৌহদণ্ড দিয়ে আঘাত করা হবে না, নিক্ষেপ করা হবে না নিম্নতর স্তরে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নরক থেকে বের হয়ে আসবে এক ঘণ্টা অবস্থানের পর, কেউ একদিন পর, কেউ এক বছর পর। তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ শাস্তি ভোগকারীরা সেখানে অবস্থান করবে পৃথিবীর আয়ুষ্কালের সমান সময়, অর্থাৎ সাত হাজার বছর।

আমি বলি, তাদের নরকবাসের দিন-মাস গণনা করা হতে পারে পৃথিবীর দিন-মাসের গণনা অনুসারে। নচেৎ শেষের 'সাত হাজার বছর' কথাটির সঙ্গে তা হবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কতিপয় সুপরিণতসূত্রবিশিষ্ট হাদিসে এসেছে, কোনো কোনো গুরুতর পাপী বিশ্বাসীকে আল্লাহ্পাক অগ্নিশাস্তিতে নিপতিত করার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদান করবেন। পরে যখন শাফায়াতের কারণে সাধারণভাবে তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করা হবে, তখন তিনি তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং ক্ষমা করে বের করে দিবেন নরক থেকে। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অবস্থা হবে এর বিপরীত। তারা সেখানে মরবেও না, স্বস্তিমতো বাঁচবেও না।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'সবকিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে' বাক্যটি একটি অনুক্ত ক্রিয়াপদের কর্মপদ, যার বিশ্লেষণ করা হয়েছে পরবর্তী ক্রিয়াপদ 'সংরক্ষণ করেছি' দ্বারা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী অথবা বেদাতীদের প্রত্যেক কর্মই আমি লিখিতভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি।

'আহ্সাইনাহু কিতাবা' অর্থ সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে। এখানে 'কিতাবা' শব্দটি পার্থক্যকারী অথবা অবস্থাপ্রকাশক। 'কিতাব' শব্দটি এখানে ধাতুমূল ব্যবহৃত হয়েছে কর্মপদার্থে। অথবা এটি একটি সাধারণ কর্মপদ। যেমন বলা হয় 'দ্বরাব্তু হুম সুউতান' (আমি তাকে চাবুকের মার মেরেছি)। অর্থাৎ আমি তার প্রতিটি কর্মই কুক্ষিগত করেছি, যেমন আয়ত্তভূত করা হয় লিপিবদ্ধ করে। অথবা বলা যায় এখানকার 'কিতাবান' একটি অনুক্ত ক্রিয়াপদের কর্মপদ। অর্থাৎ আমি তার কর্মকে বেষ্টন করে নিয়েছি সংরক্ষিত ফলকে (লওহে মাহফুজে) অথবা আমল লেখক ফেরেশতাদ্বয়ের কর্মবিবরণীতে (আমলনামায়)। এমনও বলা হয়েছে যে, বাক্যটি ভিন্ন প্রসঙ্গের। কিন্তু আমার মতে বাক্যটি ২৬ সংখ্যক আয়াতের 'উপযুক্ত' কথাটির নিমিত্ত, যেমন সেখানকার 'প্রতিফল' নিমিত্ত ২৭ সংখ্যক আয়াতের 'তারা কখনো হিসাবের আশংকা করতো না' কথাটির। এমতাবস্থায় মর্মার্থ দাঁড়ায়— আমি তাদেরকে

www.eelm.weebly.com

এই নিমিত্ত শাস্তি দিবো যে, তারা হিসাব নিকাশের ধারই ধারতো না। আর এই শর্তটি হবে তাদের কর্মফলানুপাতে। কেননা তাদের দুষ্কৃতিগুলো আমার কাছে লিখিতরূপে সুসংরক্ষিত।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ করো, আমি তো তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করবো'। এখানকার 'ফাজুকু' এর 'ফা' (অতঃপর) অব্যয়টি নৈমিত্তিক। দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এই অব্যয়টি। আর তোমরা বলে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) অথবা বেদাতীদেরকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি যেহেতু তাদের সবকিছুই লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছি, তাই তাদেরকে সেদিন বলবো, যে শাস্তির কথা আমি তোমাদেরকে পূর্বাহ্নে জানিয়েছিলাম সেই শাস্তি এখন ভোগ করতে থাকো। আর এই শাস্তি আমি ক্রমাগত বর্ধিত করতেই থাকবো।

হজরত আবু বুরাইদা থেকে সুপরিণত সূত্রে ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া এবং পরিণতসূত্রে বায়হাকী ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সমগ্র কোরআনপাকের মধ্যে নরকবাসীদের সম্পর্কে এই আয়াতখানি সর্বাধিক কঠোর। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

সূরা নাবা ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۙ﴿۳۱﴾ حَدَآئِقَ وَ اَعْنَابًا ۙ﴿۳۲﴾ وَّ كَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۙ﴿۳۳﴾
وَّ كَاْسًا دِهَاقًا ؕ﴿۳۴﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا كِذّٰبًا ۚ﴿۳۵﴾ جَزَآءً
مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۙ﴿۳۶﴾ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا
بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۚ﴿۳۷﴾ يَوْمَ يَقُوْمُ
الرُّوْحُ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۚۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ
الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا ﴿۳۸﴾ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ
اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿۳۹﴾ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ
الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَ يَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿۴۰﴾

r মুত্তাকীদের জন্য তো আছে সাফল্য,
r উদ্যান, দ্রাক্ষা,
r সমবয়স্কা উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী
r এবং পূর্ণ পানপাত্র।

www.eelm.weebly.com

r সেথায় তাহারা শুনিবে না অসার ও মিথ্যা বাক্য;

r ইহা পুরস্কার, যথোচিত দান তোমার প্রতিপালকের,

r যিনি প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছুর, যিনি দয়াময়; তাঁহার নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাহাদের থাকিবে না।

r সেই দিন রূহ ও ফিরিশ্‌তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে; দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলিবে না এবং সে যথার্থ বলিবে।

r এই দিবস সুনিশ্চিত; অতএব যাহার ইচ্ছা সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক।

r আমি তোমাদিগকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিলাম; সেই দিন মানুষ তাহার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করিবে এবং কাফির বলিবে, 'হায়, আমি যদি মাটি হইতাম'!

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আর তখন মুক্তাক্বীগণের অবস্থা হবে সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের জন্য সেখানে থাকবে প্রভূত সুখোপকরণ। থাকবে কুসম-পরিকীর্ণ মনোরম কানন, চিরসতেজ দ্রাক্ষাকুঞ্জ, সমবয়সিনী পূর্ণ যৌবনা ললনাকুল এবং অতি-আস্বাদ্য পানীয়পূর্ণ পানপাত্র। এখানে 'মাফাযান' অর্থ সাফল্য। পদটি ক্রিয়ার আধার। অর্থাৎ সাফল্যস্থল। 'কাওয়াইবা' অর্থ উদ্ভিন্ন যৌবনা নারী। শব্দটি বহুবচন 'কাঈব' এর। 'আতরাবান' অর্থ সমবয়সিনী। আর 'দিহাক্বান' অর্থ পরিপূর্ণ। এরকম অর্থ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও কাতাদা। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন 'দিহাক্বান' অর্থ ক্রমান্বয়ে। আর ইকরামা বলেছেন, স্বচ্ছ।

পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা শুনবে না অসার ও মিথ্যা বাক্য'। আলোচ্য আয়াতখানি মুক্তাক্বীগণের সর্বনামের অবস্থাপ্রকাশক। এখানকার 'ফীহা' এর 'হা' (সেখানে) সর্বনামটি সম্বন্ধযুক্ত হবে ৩১ সংখ্যক আয়াতের 'মাফাযান' এর সঙ্গে। এখানে মাফাযান অর্থ উদ্যান। অথবা বাক্যটি 'কা'সান' এর বিশেষণ। অর্থাৎ পার্থিব সোমরস পান করলে পানকারীরা যেমন অযথার্থ ও অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে, স্বর্গের অধিবাসীরা সেখানকার শরাব পান করলে সেরকম কিছু বলবে না। এখানে 'লাগ্‌ওয়ান' অর্থ অসার কথা। আর 'কিজ্‌জাবান' অর্থ অসত্যারোপ করা। অর্থাৎ সেখানে কেউ কারো প্রতি অসত্যারোপ করবে না। কেননা অসত্য বলে কিছু সেখানে থাকবেই না। শব্দটিকে ক্বারী কাসায়ী পাঠ করতেন 'কিজাবান'। এভাবে পাঠ করলে শব্দটি হয় ধাতুমূল। কেউ কেউ বলেছেন, 'কিজ্‌জাব' অর্থ মিথ্যা বলা। আবার কেউ কেউ বলেছেন 'কিজ্‌জাব' ও 'কাজাব' সমঅর্থসম্পন্ন।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'এটা পুরস্কার, যথোচিত দান তোমার প্রতিপালকের'। এখানকার 'জ্বাযাআন' (পুরস্কার) এবং 'আ'ত্বাআন' (দান) দু'টো শব্দই ধাতুমূল এবং একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্মপদ, পূর্বোক্ত বাক্যের গুরুত্ববর্ধক, যেমন উল্লেখিত হয়েছে ২৬ সংখ্যক আয়াতের 'এটাই উপযুক্ত প্রতিফল' বাক্যের বিশেষণে। অর্থাৎ তাদেরকে দেওয়া হবে পরিপূর্ণ পুরস্কার ও পূর্ণ

www.eelm.weebly.com

প্রতিদান। আর এখানকার ‘হিসাবান’ পদটি ‘দান’ এর বিশেষণ। অর্থাৎ পরিপূর্ণ দান। যেমন ‘আহ্সাবতু ফুলানান’ বলে বুঝানো হয়— আমি তাকে এই পরিমাণ দিয়েছি, যা তার জন্য যথেষ্ট। এমনকি সে নিজেও বলেছে, যথেষ্ট।

ইবনে উতবা বলেছেন, ‘আ’ত্বাআন হিসাবান’ অর্থ বিশাল দান। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন— কর্ম অনুপাতে দান। ‘কামুস’ অভিধানে বলা হয়েছে ‘হাজা হিসাবিহী’ বলে বুঝানো হয়, গণনায় এটা তার সমতুল। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য ২৬ সংখ্যক আয়াতের বক্তব্যের ঠিক বিপরীত। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— কাফের ও বেদাতীরা যেমন তাদের অপকর্মানুপাতে শাস্তি ভোগ করবে, তেমনি পুণ্যকর্মানুপাতে পুরস্কৃত হবে মুত্তাক্বীরা।

আমি বলি, যেমন কর্ম তেমন প্রাপ্তি— এই নিয়মানুসারে মুত্তাক্বীদেরকে পুরস্কৃত করা হবে না। বরং আল্লাহ্পাক তাদেরকে দান করবেন তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে দ্বিগুণ, দশগুণ, বহুগুণ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে দ্বিগুণ দিবেন। আর তিনি অপ্রতুল বৈভবাধিকারী, অতিশয় প্রাজ্ঞ’। নৈকট্যভাজন (মুকাররাবীন)ও পুণ্যবান (আবরার)গণের প্রাপ্তি যোগেও ঘটবে তারতম্য। নৈকট্যভাজনেরা তাদের অল্প আমলের বিনিময় এতো বেশী পাবে যে, পুণ্যবানেরা অধিক আমল করেও তা পাবে না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা আমার সহচরবৃন্দের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ কোরো না। তোমাদের উহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণদানও তাদের অর্ধ সা যব দানের সমতুল হবে না। মান্যবর মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেছেন, সকল সাহাবী, অধিকাংশ তাবেয়ী এবং কিছুসংখ্যক তাবে তাবেয়ী ছিলেন আল্লাহ্র বিশেষ নৈকট্যভাজন। তারা ছিলেন নবুয়তের উৎকর্ষ (কামালিয়াত) প্রাপ্ত। নবুয়ত-সূর্যের প্রখর কিরণে আসত্তা নিমজ্জিত থাকতেন তাঁরা। তাঁদের ওই তিন উত্তম যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর অন্তরালবর্তী হয় নবুয়তের সূর্যালোক। সুদীর্ঘ এক হাজার বৎসর পর পুনরায় অভ্যুদয় ঘটে সেই সুমহান সূর্যের। কিছুসংখ্যক ব্যক্তি আবারও আল্লাহ্পাকের বিশেষ দয়ায় আসত্তা স্নাত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন নবুয়তের সেই মহান সূর্যের কিরণে। তাঁরা পরবর্তী, কিন্তু অবিকল পূর্ববর্তীগণের মতো। যেমন রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মত বৃষ্টিপাতের মতো। দেখলে বুঝা যায় না, কোন অংশ উত্তম— প্রথম না শেষ। হজরত আনাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

জাফর ইবনে মোহাম্মদের মান্যবর পিতামহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, উল্লসিত হও, শুভ সমাচার শোনো। আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত বৃষ্টিপাতের মতো, বুঝা যায় না এর প্রথমাংশ উত্তম, না শেষাংশ। অথবা তারা যেনো ফলের বাগান, যা থেকে ফলাহরণ করে এক মওসুমে এক দল, অন্যদল পরের মওসুমে। হতে পারে শেষ দলই অধিক হৃষ্টপুষ্ট,

www.eelm.weebly.com

অধিক পুণ্যবান। বায়হাকী ও রজিন বর্ণনা করেছেন, জনৈক সাহাবী জানিয়েছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি রসুল স. বলেছেন, শেষ যুগে এই উম্মতের মধ্য থেকে উদ্ভব ঘটবে এমন এক সম্প্রদায়ের, যাদের বিনিময় প্রাপ্তি ঘটবে প্রথম যুগের উম্মতের মতো।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'যিনি প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্তকিছুর, যিনি দয়াময়; তাঁর নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাদের থাকবে না'।

কুফার ক্বারীগণ এখানকার শুরুর কথাটিকে পাঠ করতেন 'রব্‌বিস্ সামাওয়াতি'। অন্যান্য ক্বারীগণ পাঠ করতেন 'রব্‌বুস সামাওয়াতি'। আবার ক্বারী আসেম ও ক্বারী ইবনে আমের পাঠ করতেন 'আর রহমানি' যের সহযোগে এবং অন্যান্য ক্বারীগণ পেশ সহযোগে পাঠ করতেন 'আর রহমানু'। এভাবে যেরবিশিষ্ট পাঠ 'রব্‌বি' ও 'রহমানি' নামপদ দু'টো হবে আগের আয়াতের 'রব্বিকা' (প্রতিপালকের) এর বিশেষণ, অথবা অনুবর্তী। আর পেশবিশিষ্ট ক্বেরাতে 'রব্‌বুস্ সামাওয়াত' হবে উদ্দেশ্য এবং 'আর রহমানু' হবে বিধেয় এবং তার বিধেয় হবে 'লা ইয়ামলিকূনা'। আর 'লা ইয়ামলিকূনা মিনহু খিত্বাবা' অর্থ তাঁর নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাদের থাকবে না। অর্থাৎ পরকালে আল্লাহ্‌পাকের এমনই মহত্ত্ব-মহিমা প্রকাশিত হবে যে, আকাশ-পৃথিবীর কেউই তাঁর বিনা অনুমতিতে তাঁর নিকট কোনো প্রকার আবেদন-নিবেদন উত্থাপন করতে সাহসী হবে না। কালাবী বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ তখন শাফায়াত করতে পারবে না। অথবা মর্মার্থ হবে— কেউ তখন এমতো অনুযোগও উপস্থাপন করতে পারবে না যে, কাউকে কাউকে অত্যধিক বিনিময় দেওয়া হলো কেনো? কেননা সকলেই তাঁর দাস। সকলেরই এবং সবকিছুরই একক অধিকর্তা তিনিই। সুতরাং পুণ্যার্জন কারো অধিকার নয়, বরং তাঁর দয়া।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের সঙ্গে তোমাদের পূর্ববর্তীদের দীর্ঘ সময়ের তুলনা আসর-মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের মতো। দৃষ্টান্তটি এরকম— এক মহাপ্রতাপান্বিত ব্যক্তি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাজ করার জন্য নিযুক্ত করলো একদল শ্রমিককে। মজুরী নির্ধারিত হলো এক কিরাত। এভাবে দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত নির্ধারিত হলো এক কিরাত এবং আসর থেকে মাগরিবের সময়ের জন্য নির্ধারিত হলো দুই কিরাত। এই নির্ধারণানুসারেই কাজ করলো তিনদল শ্রমিক— ইহুদী, খৃষ্টান এবং তোমরা। প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করলেন নির্ধারিত মজুরী। ইহুদী-খৃষ্টানেরা বললো, আমাদের শ্রম বেশী, মজুরী কম, আর তাদের শ্রম কম, মজুরী বেশী। আল্লাহ্ বললেন, আমি কি তোমাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করেছি? তারা জবাব দিল, না। আল্লাহ্ বললেন, এটা আমার নিছক অনুগ্রহ, আমি এভাবে অনুগৃহীত করি যাকে খুশী তাকে। বোখারী।

www.eelm.weebly.com

আমি বলি, দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে রসুল স. জানিয়েছেন পূর্ববর্তী উম্মতের তুলনায় তাঁর উম্মতের আয়ুর স্বল্পতার কথা। আসর থেকে মাগরিবের দৃষ্টান্তটি তিনি স. দিয়েছেন একারণেই। এভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই উম্মতের আয়ুষ্কাল স্বল্প, কিন্তু পুণ্য সঞ্চয় করবে এরাই অধিক। দুই কিরাতের কথা তিনি স. বলেছেন পুণ্যার্জনের আধিক্য বুঝাতেই। যেমন বলা হয়েছে 'তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও দু'বার'। অর্থাৎ বার বার। আমাদের এই ব্যাখ্যাটি আগের আয়াতের বক্তব্যবিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'সেই দিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলবে না এবং সে যথার্থ বলবে'। এখানকার 'সেই দিন' কথাটির যোগসূত্র রয়েছে আগের আয়াতের 'আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাদের থাকবে না' বাক্যটির সঙ্গে। অর্থাৎ সেদিন কেউই আল্লাহ্পাক সকাশে কোনো কথা বলতে পারবে না, যেদিন সকলে সমবেত হবে হাশর প্রান্তরে, সমবেত হবে রূহ ও ফেরেশতাগণও। অথবা কথাটির সম্পর্ক রয়েছে এখানকার 'সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলবে না' এর সঙ্গে। কিন্তু প্রথম ব্যাখ্যাটিই অধিক সুস্পষ্ট।

'রূহ' সম্পর্কে বিদ্বজ্জন বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেছেন। যেমন ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, রূহ অবস্থান করে চতুর্থ আকাশে। আকাশ-পর্বতমালা-ফেরেশতা অপেক্ষাও তা বৃহৎ। প্রতিদিন সে বারো হাজার তসবীহ পাঠ করে। আর তার প্রতি তসবী থেকে আল্লাহ্পাক সৃষ্টি করেন একটি করে ফেরেশতা। প্রতিফল দিবসে তারা দাঁড়াবে পৃথকভাবে সারিবদ্ধ হয়ে।

আলোচ্য আয়াতের 'রূহ' সম্পর্কে জুহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে আবু শায়েখ বলেছেন, রূহ সব সময় আল্লাহ্পাকের বিশেষ সান্নিধ্যে দণ্ডায়মান। ফেরেশতাদের চেয়ে অনেক বড়। যদি সে মুখব্যাদান করে তবে সকল ফেরেশতা স্থান গ্রহণ করতে পারবে তার মুখগহ্বরে। তাই ফেরেশতারা ভয়ে তার দিকে তাকায় না। বরং তারা উপরের দিকে দৃষ্টিপাতই করে না। হজরত আলীর উক্তি উদ্ধৃত করে আবু শায়েখ বলেছেন, রূহ একজন ফেরেশতার নাম। তার মুখমণ্ডলের সংখ্যা সত্তর হাজার। প্রতিটি মুখে রয়েছে সত্তর হাজার করে রসনা। প্রতিটি রসনা থেকে কথা বের হয় সত্তর হাজার। আর তার প্রতিটি কথাই আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা জ্ঞাপক।

আতা সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, একজন ফেরেশতার নাম রূহ। তার ডানার সংখ্যা সত্তর হাজার। তালহা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আকৃতিগতভাবে সে সকল ফেরেশতার চেয়ে বড়। আতা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, মহাসমাবেশস্থলে রূহের জন্য নির্ধারিত থাকবে একক একটি সারি। অন্য ফেরেশতারা দাঁড়াবে পৃথক

www.eelm.weebly.com

একটি সারিতে। তবুও আকৃতিগতভাবে উভয় সারি হবে সমান। মুকাতিল ইবনে হাব্বানের বরাত দিয়ে আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, মর্যাদার দিক দিয়েও রূহ সকল ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাদের সকলের চেয়ে আল্লাহ্র অধিক নৈকট্যধন্য এবং সে প্রত্যাদেশধারকও।

জুহাক সূত্রে আবু শায়েখ বর্ণনা করেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে জিবরাইল ফেরেশতা আল্লাহ্পাকের সকাশে দাঁড়িয়ে থাকবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে। নিবেদন জানাবে, পুতঃপবিত্র তুমি! তুমি ছাড়া আর কোনোই উপাস্য নেই। আমি এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অন্য কেউই তোমার যথাযোগ্য ইবাদত করার উপযোগী নয়।

মুজাহিদের উক্তিরূপে আবু নাঈম এবং হজরত উম্মে হানির মুক্তকৃত দাস আবু সালেহের উক্তিরূপে ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, রূহ হচ্ছে মানবাকৃতিবিশিষ্ট আর এক ধরনের সৃষ্টি, যারা মানুষ নয়। কাতাদা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, তারা এবং ফেরেশতারা দাঁড়াবে পৃথক দু'টি সারিতে। সুপরিণতসূত্রে মুজাহিদ সূত্রে আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস একবার বললেন আল্লাহ্পাকের সেনাবাহিনীর মধ্যে রূহও একটি বাহিনী, যারা ফেরেশতা নয়। তাদের মাথা আছে। হাত-পা-ও আছে। এরপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত। শেষে বললেন, একটি দল হবে তাদের এবং একটি এদের।

বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ্পাক রূহকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের আকৃতিতে। আকাশ থেকে যখন ফেরেশতারা নেমে আসে, তখন অবশ্যই তাদের সঙ্গে থাকে এক জন করে রূহ। আবু শায়েখ এবং ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, বায়হাকী বলেন, সেদিন আল্লাহ্পাকের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকবে দু'টি সারি— একটি ফেরেশতার, আর একটি রূহের। বাগবী লিখেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত রূহ অর্থ আদম সন্তানগণ। কাতাদা এরূপ বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। তিনি আরো বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস প্রথম দিকে কথাটিকে গোপন রেখেছিলেন।

'সাফফান' পদটি এখানে কর্তার অবস্থাপ্রকাশক। অথবা একটি উহ্য ক্রিয়ার সাধারণ কর্মপদ হিসেবে ধাতুমূল। অর্থাৎ তারা তখন দাঁড়িয়ে থাকবে সারিবদ্ধ অবস্থায়।

'অন্যেরা কথা বলবে না' অর্থ— রূহ এবং ফেরেশতারা যেখানে আল্লাহ্র সর্বাধিক নৈকট্যধন্য হওয়া সত্ত্বেও সেদিন বিনা অনুমতিতে কথা বলতে পারবে না, সেখানে অন্যদের কথা বলা তো চিন্তাই করা যায় না। আর 'দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত' কথাটি 'অন্যেরা কথা বলবে না' বাক্যের কর্তৃবাচক সর্বনামের অবস্থা প্রকাশক। শাব্দিক সামুজ্যের দৃষ্টিতে 'অন্যেরা কথা বলবে না' বাক্যটি কর্তৃবাচক সর্বনামের অবস্থা প্রকাশক হওয়াই সমধিক সুস্পষ্ট। আর অর্থগত দিক দিয়ে দ্বিতীয়টির অবস্থাপ্রকাশ হওয়া সমধিক সঙ্গত। কেননা শাফায়াত করা এবং কথা বলার বিষয়টি শুধুমাত্র ফেরেশতাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

www.eelm.weebly.com

আর ‘ওয়া ক্বলা সওয়াবা’ অর্থ এবং সে যথার্থ বলবে। অর্থাৎ তখন অনুমতি প্রাপ্তদের বচন হবে অবশ্যই তাদের বিশ্বাসের অনুকূলে। বস্তুতঃ কথা সাধারণত বিশ্বাসের অনুবর্তীই হয়। এখানকার ‘বলবে’ কথাটির যোগসূত্রে রয়েছে আগের বাক্যের ‘অনুমতি দিবেন’ এর সঙ্গে। অর্থাৎ পৃথিবীর জীবনে যেহেতু তারা মহাসত্যের স্বীকৃতি দিয়েছে, অবিশ্বাস ও মিথ্যাচারের আশ্রয় কখনোই নেয়নি, তাই তারা সেদিনও সত্য কথাই বলবে। মিথ্যা তো চিরকালই মিথ্যা। আর সত্য চিরদিন সত্যই। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় বেদাতীদের কথা। কোরআন মজীদই সাক্ষ্য দেয় যে, তারা অসত্যভাষী। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার ‘ক্বলা সওয়াবা’ অর্থ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্’। আর বেদাতীদের ভাগ্যে তখন শাফায়াত (সুপারিশ) জুটবে না। কেননা তারা শাফায়াতকে স্বীকার করে না।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— ‘এই দিবস সুনিশ্চিত’। একথার অর্থ— মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচার দিবসের যে সকল বিবরণ এতোক্ষণ ধরে প্রকাশ করা হলো, সে সকল বিবরণ সর্বৈবরূপে সত্য। এতে দ্বিধা-সংশয়-সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই।

এরপর বলা হয়েছে— ‘অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক’। এখানে ‘মাআবা’ অর্থ আল্লাহ্র শরণাপন্ন হওয়া, আল্লাহ্পাকের আনুগত্য করা এবং অনুগমন করা রসুল স. এবং তাঁর প্রতিনিধি কামেলে মোকাম্মেল পীর-মোর্শেদের। এখানকার ‘ফামান’ পদটির ‘ফা’ নৈমিত্তিক। কেননা আল্লাহ্পাক পর্যন্ত উপনীত হওয়ার পথের পথিক হতে পারার কারণ হচ্ছে পরলোক, যা মহাসত্য। এখানে ‘ইলা রব্বিহী’ কথাটির সম্পৃক্তি ঘটেছে ‘মাআব’ এর সঙ্গে। অতএব কথাটি অবস্থাপ্রকাশক।

শেষোক্ত আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— ‘আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি থেকে সতর্ক করলাম; সেইদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফের বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম’। কথাগুলো বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী-দেরকে লক্ষ্য করে। ‘আসন্ন শাস্তি’ অর্থ এখানে পারলৌকিক শাস্তি, যার আগমন অবধারিত। আর অবধারিত বিষয় আসন্নই হয়। অথবা ‘আসন্ন শাস্তি’ অর্থ এখানে— কবরের আযাব। আর মৃত্যু তো জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটে।

এখানকার ‘ইয়াওমা’ (সেই দিন) পদটি ‘আ’জাবান’ (শাস্তি) এর তৎসন্নিহিত কর্মপদ। কেননা শাস্তি অর্থ এখানে— শাস্তি প্রদান। ‘মা’ অব্যয়টি এখানে প্রশ্নবোধক, অথবা যোজক এবং ‘ইয়ানজুরু’ (প্রত্যক্ষ করবে) এর কর্মপদ। আর এর যোজ্য ‘ক্বদ্দামাত’ (পূর্বাহ্নে প্রেরিত কৃতকর্ম) বাক্যে সর্বনাম রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ বাক্যরূপটি হবে ‘ক্বদ্দামাতহু’। উল্লেখ্য পূর্বাহ্নে প্রেরিত কৃতকর্ম বুঝাতে এখানে বলা হয়েছে ‘ইয়াদাহু’ (হাত)। অর্থাৎ স্বহস্তঅর্জিত। হাত দ্বারাই অধিকাংশ কর্ম সম্পাদিত হয় বলেই ‘হাত’ এখানে এসেছে কর্মের প্রতীক

www.eelm.weebly.com

হিসেবে। অথবা ‘হাত’ এখানে প্রতীক শক্তি-সামর্থ্যের, যার সাহায্যে কর্মসমূহ সম্পন্ন করা হয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— প্রতিফল দিবসে মানুষ প্রত্যক্ষ করবে তাদের ওই সকল কৃতকর্ম যা তারা সম্পন্ন করেছিলো পৃথিবীর জীবনে। অথবা তারা তখন প্রত্যক্ষ করবে ওই সকল কর্মের প্রতিফল। কিংবা অপকর্মসমূহের প্রতিক্রিয়া তারা দেখতে পাবে কবরে।

হজরত ওসমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কবর হচ্ছে পরলোকের প্রথম ঘাঁটি। এই ঘাঁটি সহজে অতিক্রম করতে পারলে অন্য সকল ঘাঁটি অতিক্রমণ হবে সহজতর। আর যদি কবরে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, তবে পরবর্তী পর্যায়গুলো হবে আরো বেশী ভয়াবহ। কবরের শাস্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে অনেক অনেক হাদিস। যেমন বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার রসুল স. দু’টি কবরের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করতে করতে বললেন, কবরবাসীদ্বয়কে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। বড় কোনো অপরাধের জন্য নয়। অপরাধ কেবল এতটুকু যে, তারা মুত্রত্যাগের প্রাক্কালে আড়াল করতো না। আর মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, এদের একজন প্রস্রাবের অপবিত্রতা থেকে সতর্ক থাকতো না। আর একজন করে বেড়াতো পরনিন্দা।

কবরের মধ্যে কবরবাসীকে যে বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, সে সম্পর্কে হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে বর্ণিত হয়েছে একটি দীর্ঘ হাদিস, সেখানে বিশ্বাসীগণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদের কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে ততোদূর পর্যন্ত, যতোদূর চোখ যায়। তার কাছে আসবে একজন সৌম্যকান্তি সুন্দর পোশাক পরিহিত যুবক। বলবে, সাধুবাদ গ্রহণ করো। উৎফুল্ল হও। আজ সেই শুভ দিন, যেদিনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো তোমাকে। কবরবাসী বলবে, তুমি তো দেখছি খুবই সুদর্শন। নিশ্চয় তোমার আগমন ঘটেছে কল্যাণ সহকারে। সে বলবে, আমি তোমার পুণ্যকর্ম। আর অবিশ্বাসীদের কবর হবে অতিসংকীর্ণ। মাটি তাকে এমনভাবে চাপ দিবে যে, ওই চাপের ফলে তার এক পাঁজরের অস্থিসমূহ ঢুকে যাবে অপর পাঁজরের মধ্যে। তার কাছে আসবে এক কুৎসিৎদর্শন ও বিশ্রি পোশাক পরা পুঁতিগন্ধময় ব্যক্তি। বলবে, শোনো এমন সংবাদ, যা তোমার মনঃপুত নয়। এই দিন সম্পর্কেই তোমাকে যথাসময়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিলো। কবরবাসী বলবে, তুমি কে? তুমি তো দেখছি অশুভবার্তাবাহী ও অতি কুশ্রী। সে বলবে, আমি তোমারই অশুভকর্ম। আহমদ।

‘ইয়া লাইতানী কুনতু তুরাবা’ অর্থ হায়! আমি যদি মাটি হতাম। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, চামড়া যেভাবে মোড়ানো হয়, প্রতিফল দিবসে সেভাবে মোড়ানো হবে মৃত্তিকাকে। আল্লাহ্‌পাক পুনরুত্থান ঘটাবেন মানুষ ও পশু-পাখিদের। চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে সম্পন্ন করবেন প্রতিশোধ গ্রহণ পর্ব। এমনকি শিঙবিহীন ছাগলও তখন প্রতিশোধ নিবে শিঙবিশিষ্ট ছাগলের উপর। এভাবে পারস্পরিক প্রতিশোধ গ্রহণের পালা যখন সাঙ্গ হবে, আল্লাহপাক তখন বলবেন, এবার তোমরা সকলে মাটি হয়ে যাও। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন

www.eelm.weebly.com

এমতো দৃশ্য অবলোকন করে বলবে, হায়! আমরাও যদি এভাবে মাটি হয়ে যেতে পারতাম। হাকেম। ইয়াহ্ইয়া ইবনে জা'দা সূত্রে দিনুয়ারী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। বাগবী কর্তৃক লিখিত মুকাতিলের উক্তিও এরকম। তিনি বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কেউ কেউ তখন বলবে, পৃথিবীতে যদি আমি শূকর হতাম, তাহলে আজ মিশে যেতে পারতাম মৃত্তিকায়।

বাগবী লিখেছেন, জিয়াহ এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে জাকোয়ান বলেছেন, আল্লাহ্পাকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তানুসারে যখন জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীরা তাদের নিজ নিজ আবাসে চলে যাবে, তখন তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন বিশ্বাসী জ্বিন ও চতুষ্পদ জন্তু সম্পর্কে। তারা মিশে যাবে মাটিতে। তা দেখে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলবে, হায়! আমরাও যদি এভাবে মাটি হয়ে যেতে পারতাম। ইবনে সুলাইম বলেছেন, বিশ্বাসী জ্বিনেরা মাটিতে পরিণত হবে।

এরকমও বলা হয়েছে যে, এখানে 'কাফের বলবে' অর্থ চির অভিশপ্ত ইবলিস বলবে। সে মৃত্তিকাজাত আদমকে ঘৃণা করেছিলো। নিজে অগ্নির জাতক বলে প্রদর্শন করে ছিলো দম্ভ। কিন্তু পরকালে যখন সে আদমসন্তানদের প্রভূত মর্যাদা এবং নিজের দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখবে, তখন সে আক্ষেপে জর্জরিত হয়ে বলবে, হায় আমিও যদি মৃত্তিকার জাতক হতাম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ তখন বলবেন, এরকম হওয়া সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি আমার সমকক্ষ, অথবা অংশীদার নির্ধারণ করে, আজ তার কোনো সম্ভ্রম নেই।

সূরা নাযিআ'ত ঃ

মহাপুণ্যভূমি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এর রুকু সংখ্যা ২ এবং আয়াত সংখ্যা ৪৬।

সূরা নাযিআ'ত ঃ আয়াত ১, ২. ৩. ৪. ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ ﴿١﴾ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ ﴿٢﴾ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ ﴿٣﴾
فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ ﴿٤﴾ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ ﴿٥﴾

- শপথ তাহাদের যাহারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে,
- এবং যাহারা মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করিয়া দেয়
- এবং যাহারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে,
- আর যাহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়,
- অতঃপর যাহারা সকল কর্ম নির্বাহ করে।

---

www.eelm.weebly.com

এখানকার প্রথম আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত ‘ওয়াও’ অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে শপথ অর্থে। শপথের জবাব এখানে রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ ‘নাযিআ’ত’ ও ‘নাশিত্বাত’ এর শপথ! মহাপুনরুত্থান অবশ্যই ঘটবে এবং সকলকে তাদের কর্মফলের হিসাব দিতেই হবে। আর শপথের জবাব প্রতিধ্বনিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতসমূহে।

‘আন্ নাযিআ’তি গরক্বান’ অর্থ ওই সকল ফেরেশতা যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের প্রাণ সংহার করে নির্মমভাবে, অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে। ‘গরক্বা’ শব্দটি মূলতঃ নামপদ, এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ধাতুমূলের স্থলে। আর ‘আন নাশিত্বাতি নাশত্বান’ অর্থ ওই সকল ফেরেশতা, যারা বিশ্বাসীগণের জীবন হস্তগত করে মৃদুভাবে, অত্যন্ত কোমলতার সঙ্গে। শব্দটি একটি প্রবাদবাক্য ‘নাশাত্বদ্ দালবু’ থেকে সাধিত হয়েছে, যার অর্থ সে অতি সহজেই পানির পাত্রটি কূপ থেকে বের করে আনলো। অথবা শব্দটি উৎসারিত হয়েছে অন্য একটি প্রবাদবচন ‘নাশাত্বাল হাবলু’ থেকে, যার অর্থ সে তার রশি এতোটাই শিথিল করে দিয়েছে যে, তা খুলেই পড়েছে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, বিশ্বাসীগণ পৃথিবীতে বন্দী জীবন যাপন করেন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো। মৃত্যুকালে ফেরেশতারা এসে সে বন্ধন আলগা করে দেয়, যেমন আলগা করে দেওয়া হয় উটের জানুর বন্ধন। সে কথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে— যারা মৃদুভাবে বন্ধন মুক্ত করে দেয়। হাদিস শরীফে বিষয়টি বিবৃত করা হয়েছে এভাবে— যেনো খুলে দেওয়া হয় তাদের পদযুগলের বন্ধন। করে দেওয়া হয় তাদেরকে চিরমুক্ত।

হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পরকালযাত্রার সময় সমাগত হলে বিশ্বাসীরা সম্পূর্ণরূপে অভিমুখী হয় পরলোকের প্রতি। তখন বেহেশতী কাফন ও সৌরভ নিয়ে তাদের কাছে আগমন করে দিবসের আলোর মতো শ্বেতশুভ্র ফেরেশতারা। মৃত্যুপথযাত্রীর শিয়রে বসে বলে, হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি! এসো আল্লাহ্র মার্জনা ও পরিতোষের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে তার আত্মা, উপুড় করা কলস থেকে পতিত পানির মতো দ্রুত। ফেরেশতারা তা হস্তগত করে এবং মুহূর্তমধ্যে তাকে জড়িয়ে নেয় বেহেশতী বস্ত্রে। সুরভিত করে বেহেশতী মেশকের সৌরভে। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যুকাল এসে গেলে আকাশ থেকে নেমে আসে কৃষ্ণকায় ভয়াল দর্শন ফেরেশতারা। সঙ্গে থাকে তাদের শনের খসখসে পট্টবস্ত্র। মৃত্যুপথযাত্রীর শিয়রে বসে তারা বলে, হে দুষ্প্রবৃত্তি! চলো, আল্লাহ্র রোষতপ্ততার দিকে। সে ভয় পায়। কিছুতেই সম্পর্কছিন্ন করতে চায় না তার দেহের সঙ্গে। তখন কণ্টকগুচ্ছ থেকে যেমন জোর করে কণ্টকতার বের করে আনা হয়, তেমনি জোর করে বের করে আনা হয় তার প্রাণ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে জড়িয়ে নেয় খসখসে শনের পট্টবস্ত্রে। তৎসত্ত্বেও ছড়িয়ে পড়ে তার বিশ্রী দুর্গন্ধ। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, মৃত্যুদূত তখন তার প্রাণ ছিনিয়ে নেয় তার শিরা-উপশিরাসহ। আহমদ।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে মাসউদের বিবরণ উল্লেখ করে বাগবী লিখেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতা অবিশ্বাসীদের প্রাণ সংহার করে তাদের প্রতিটি পশম, নখ এবং পায়ের তালুর নিচ থেকে খিঁচে খিঁচে। একবার টানে আর একবার ছেড়ে দেয়— এভাবে বার বার করবার পর তাদের মৃত্যু ঘটায়। মুকাতিল বলেছেন, মৃত্যুদূত ও তার সহকারী ফেরেশতারা অবিশ্বাসীদের প্রাণ জোর করে বের করে আনে সেভাবে, যেভাবে কাঁটাতারের গুচ্ছ থেকে বের করে আনা হয় কোনো একটি তার।

উপযোগ ঃ বর্ণিত আলোচনার মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নফস বা প্রবৃত্তি দেহের মতোই স্থূল। আর কলব, রূহ, সির, খফি, আখফা হচ্ছে সম্ভাব্য মৌল, যেগুলোর প্রকৃত সম্পর্ক আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে। আর যেহেতু ওই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মৌলগুলো অবস্তুক, তাই সেগুলো নফসের উপরে আদেশকর্তা। এবং সেগুলো অনিরীক্ষ্য না হলেও দুর্নিরীক্ষ। আরশের উপরের উপমার জগতে আত্মিক দৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে কেবল ওগুলোর অস্তিত্ব নেত্রগোচর হয়।

সুফী দার্শনিকগণ বলেন, আল্লাহ্পাক তাঁর পরিপূর্ণ ও রহস্যাচ্ছন্ন শক্তিমত্তার মাধ্যমে ওই নির্বস্তুক মৌলগুলোকে নফসের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেন এমনভাবে, যেমনভাবে দিবাকরের সম্মুখে কিরণোদ্ভাসিত হয় দর্পণ। অর্থাৎ নফস আলোকিত হয় রূহের মাধ্যমে। অথবা বলা যায়, রূহ সূর্য এবং নফস চন্দ্র। পূর্ণিমার পূর্ণ শশী যেমন সূর্যালোক বুকে ধারণ করে হয়ে ওঠে আলোকজ্জ্বল, আলোকিত প্রবৃত্তিও তেমনি আলোকজ্জ্বল হয় রূহের আলোকে। মৃত্যুকালে তাই বের করে আনা হয় প্রবৃত্তি বা নফসকে, আত্মা বা রূহকে নয়। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, বিশ্বাসীগণের প্রশান্ত প্রবৃত্তিকে অতিসহজে বের করে নিয়ে ফেরেশতারা তাকে জড়িয়ে নেয় পবিত্র বস্ত্রে ও বেহেশতি সুরভিতে। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ঊর্ধ্বাকাশে। বিশ্বাসীগণের প্রবৃত্তির জন্য খুলে দেওয়া হয় সকল আকাশের দরজা। আল্লাহ্ তখন বলেন, আমার এই বান্দার কর্মবিবরণী লিখে রাখো ইল্লিয়্যিনে এবং তাকে ফেরত পাঠাও পৃথিবীতে। কেননা আমি তাকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে। তাই এখন তাকে মিশিয়ে দিবো মাটিতে। তারপর যথাসময়ে সেখান থেকেই পুনরুত্থান ঘটাবো তার। অবিশ্বাসীদের প্রবৃত্তির জন্য আকাশের দরজা উন্মোচন করা হয় না। তাদেরকে সজোরে নিক্ষেপ করা হয় নিম্নদেশে, সিজ্জিনে।

বর্ণিত হাদিস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, যে নফসকে সাধারণত রূহ বলা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে ভূতচতুষ্টয় (আগুন, পানি, মাটি, বাতাস) জাত। আর বিষয়টির তাত্ত্বিক আলোচনা দৃষ্টে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, কবরের আযাবকে অস্বীকার করবার কোনো উপায়ই নেই। অথচ বেদাতীরা তাকে অজ্ঞতাবশতঃ অস্বীকার করে। বলে, শাস্তি হলে হবে আত্মিকভাবে, স্থূলভাবে কবরে নয়। কিন্তু আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্যসম্মত অভিমত এই যে, কবর আযাব সত্য। এ সম্পর্কে সবিস্তার বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে। ওয়াল্লহু আ'লাম।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং যারা তীব্রগতিতে সন্তরণ করে'। একথার অর্থ— যারা বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পাদনার্থে পরিভ্রমণরত, শপথ সেই সকল ফেরেশতাদেরও। মুজাহিদ কথাটির অর্থ করেছেন, যে সকল সুদর্শন ফেরেশতা ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট অশ্বের মতো অতিদ্রুত অবতরণ করে নভঃদেশ থেকে, তাদের শপথ!

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আর যারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়'। একথার অর্থ— ওই সকল ফেরেশতাদেরও শপথ! যারা পুণ্যকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানুষের চেয়ে অগ্রগামী। মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— শপথ ওই সকল ফেরেশতাবর্গেরও, যারা বিশ্বাসীগণের অন্তরাত্মাকে অনুপ্রাণিত করে শুভকর্মাবলীর দিকে। এর সঙ্গে আমি যুক্ত করি এই কথাটি— এবং অবিশ্বাসীদের প্রবৃত্তিগুলোকে ধাবিত করে শাস্তির দিকে। উল্লেখ্য, এ সকল ফেরেশতার কথা হজরত বারা ইবনে আজীব কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে বিবৃত হয়েছে এভাবে— মৃত্যু দূত মানুষের প্রাণ হরণ করার পরক্ষণেই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তা নিয়ে নেয় তার সহচর ফেরেশতারা। অর্থাৎ এখানে 'দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল ফেরেশতাকেই। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'যারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল পুণ্যাত্মাকে, যারা আল্লাহ্‌র অবাধ সান্নিধ্যধন্য হওয়ার সুতীব্র আনন্দে মৃত্যুকালে ছুটে যায় মৃত্যুর ফেরেশতাদের দিকে।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যারা সকল কর্মনির্বাহ করে'। একথার অর্থ— শপথ নির্বাহী ফেরেশতাদেরও।

ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আলমুদাব্বিরাত' (কর্মনির্বাহী) বলে শপথ করা হয়েছে ওই সকল ফেরেশতার, যারা কোনো ব্যক্তির জান কবজ করার সময় মৃত্যুদূতের সহযোগী হিসেবে আসে। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মৃত ব্যক্তির প্রাণ নিয়ে আকাশের দিকে উঠে যায় এবং কিছুসংখ্যক তার মরদেহের পাশে সমবেত আত্মীয়স্বজনদের দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকে 'আমিন' 'আমিন'। আর কিছুসংখ্যক তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকে তার কাফনদাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস অভিমত প্রকাশ করেছেন, এখানে ওই সকল ফেরেশতার শপথ করা হয়েছে, আল্লাহ্‌পাক যাদের উপরে ন্যস্ত করেছেন কিছু দায়িত্ব। আল্লাহ্ তাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞান। তারাই কার্যনির্বাহী ফেরেশতা।

আবদুর রহমান ইবনে সাবেত বলেছেন, পৃথিবীতে নির্বাহী ফেরেশতা আছেন চারজন— জিবরাইল, মিকাইল, আজরাইল ও ইস্রাফিল। জিবরাইলের দায়িত্ব হচ্ছে আকাশী বিপদ-মুসিবত ঠেকিয়ে দেওয়া, অথবা অবতীর্ণ করা এবং বিশেষ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধরত বিশ্বাসীগণের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা। মিকাইলের দায়িত্ব হচ্ছে বৃষ্টিপাত ঘটানো এবং উদ্ভিদরাজি উৎপন্নকরণ। আজরাইলের কাজ যথাসময়ে মানুষের প্রাণ সংহার করা। আর ইস্রাফিল সুবিশাল শিঙ্গা নিয়ে নিস্পলক দাঁড়িয়ে আছেন আল্লাহ্‌র শিঙ্গাধ্বনির আদেশের অপেক্ষায়।

www.eelm.weebly.com

কাতাদার অভিমত হচ্ছে, আলোচ্য আয়াত ব্যতীত আগের তিন আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে নভোমণ্ডলে স্বাভাবিকভাবে পরিক্রমণরত নক্ষত্রপুঞ্জের কথা। যেমন আল্লাহ্পাক বলেছেন 'শূন্যমার্গের সবকিছুই পরিক্রমণশীল'। এরকম পরিক্রমণে সেগুলোর কোনো কোনোটি অগ্রবর্তী এবং কোনো কোনোটি পশ্চাদবর্তী। কিন্তু তাঁর এমতো ব্যাখ্যা অযথার্থ। কেননা 'নাজ্বউন' 'নাশত্বন' 'সুবহুন' এই শব্দগুলোর মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট প্রভেদ। এগুলোকে কিছুতেই সমার্থকরূপে গণ্য করা যায় না। আর এগুলোর অর্থ যদি একই হয়, তবে পুনঃপুনঃ একই কথা বলার কোনো প্রয়োজনই তো নেই।

তবে বর্ণনাক্রমিক (রেওয়ায়েত)ও অনুবৃত্তিক (নকলি) ব্যতিরেকে আলোচ্য আয়াতগুলোর একটি বুদ্ধিবৃত্তিক (আকলি) ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা এখানে করা যেতে পারে। যেমন বায়যাবী লিখেছেন, এখানকার প্রথম চার আয়াতে বলা হয়েছে নফসসমূহের অবস্থা, যা সৃষ্টি হয় দেহ পরিত্যাগ করার সময়। তখন অপবিত্র নফসকে নির্মমভাবে টেনে হিঁচড়ে বের করে নেওয়া হয় দেহ থেকে, যেমন তীর ছোঁড়ার সময় ধনুকের ছিলা টেনে নিতে হয় সজোরে। প্রথম আয়াতের 'ওয়ান নাযিআ'তি গরক্বান' কথাটি উপস্থাপন করা হয়েছে ধনুকের ওই তীর ছোঁড়ার দৃষ্টান্ত থেকেই। আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে পবিত্র নফসের কথা। তারা তখন নিজে নিজেই দ্রুত ধাবমান হয় ফেরেশতাজগতের প্রতি। সেখানে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্র। এরপর অগ্রসর হয় 'খত্বিরাতুল কুদস্' এর দিকে। এমনকি স্বীয় শক্তিমত্তা ও মর্যাদার নিমিত্ত অন্তর্ভূত হয় 'মুদাব্বিরাতি' পর্যায়ে। অথবা বলা যায়, আল্লাহ্পাকের দিকে পথপরিক্রমণকারী মর্যাদাশালী নফসগুলির অবস্থা হয় এরকম— প্রথমতঃ এরা প্রবৃত্তিপরায়ণতা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র জগতের দিকে আগুয়ান হয় মৃদু চালে। শুরু হয় উন্নতির স্তরান্তরণ। এভাবে এগিয়ে যায় পরিপূর্ণতার দিকে। সর্বশেষে উপনীত হয় 'মুদাব্বিরাতি'র দিকে, নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে। তখন পথ নির্দেশনা দিতে থাকে অন্যদেরকেও। অথবা আয়াতপঞ্চকে বলা হয়েছে জেহাদের ময়দানের যোদ্ধৃবৃন্দের কথা। তারা প্রচণ্ড শক্তিতে টান দেয় ধনুকের ছিলায়। তীর নিক্ষেপ করে উল্লাসের সঙ্গে। বিচরণ করে জলে স্থলে অরণ্যে। অগ্রসর হতে থাকে শত্রুদের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার জন্য। পরিশেষে অধিনায়ক হিসেবে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে রণকৌশল প্রণয়নে ও শৃঙ্খলা বিধানে।

কিংবা বলা যেতে পারে, এখানে বলা হয়েছে মুজাহিদবৃন্দের সমরাশ্বদের কথা। অর্থাৎ তাদের অশ্বগুলো ক্রীড়ারত হয় নিজেদের লাগামের সঙ্গে। হয়ে ওঠে ঘর্মাক্ত। মুসলমানদের রাষ্ট্রে থেকে প্রবেশ করে অমুসলমানদের রাষ্ট্রে। দুলকি চালে যেনো সন্তরণ করতে করতে সম্মুখবর্তী হয় শত্রুদের। পরিশেষে নিশ্চিত করে বিজয়।

www.eelm.weebly.com

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۗ﴿٧﴾ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ
وَّاجِفَةٌ ۙ﴿٨﴾ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۘ﴿٩﴾ يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِي
الْحَافِرَةِ ۗ﴿١٠﴾ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۗ﴿١١﴾ قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ
خَاسِرَةٌ ۘ﴿١٢﴾ فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۙ﴿١٣﴾ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۗ﴿١٤﴾

r সেই দিন প্রথম শিংগাধ্বনি প্রকম্পিত করিবে,
r উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি,
r কত হৃদয় সেই দিন সন্ত্রস্ত হইবে,
r উহাদের দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বলতায় নত হইবে।
r তাহারা বলে, 'আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হইবই—
r গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?'
r তাহারা বলে, 'তাহাই যদি হয় তবে তো ইহা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন।'
r ইহা তো কেবল এক বিকট আওয়াজ,
r তখনই ময়দানে উহাদের আবির্ভাব হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ইয়াওমা তারজুফুর রজিফাহ্'। এখানকার 'ইয়াওমা' (সেই দিন) পদটি কালাধিকরণ কারক, শপথের উহ্য জবাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ হাশর প্রান্তরে তোমাদের মহাসমাবেশ ঘটবে সেই দিন, যেদিন বিকট শিঙ্গাধ্বনিতে প্রকম্পিত হবে সমগ্র সৃষ্টি। সেদিন থেকে জান্নাত-জাহান্নাম গমন পর্যন্ত সময়সীমা হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। সেদিনেরই একটি অংশে অনুষ্ঠিত হবে মহাসমাবেশ, হিসাব-নিকাশ। ওই সাময়িকতার দিকে লক্ষ্য করেই বলা হয় 'ইয়াওমুল হাশর' 'ইয়াওমুল হিসাব' ইত্যাদি। মুজাহিদের উক্তি উল্লেখ করে বায়হাকী বলেছেন, এখানকার 'তারজুফুর রজিফাহ্' অর্থ সেদিন কম্পন অনুভূত হবে ভূপৃষ্ঠে ও শৈলশ্রেণীতে। এরপর আসবে দ্বিতীয় ভূকম্পন।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিঙ্গাধ্বনি'। এখানে 'রদিফাহ্' অর্থ দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনি'। আর আগের আয়াতে 'রজিফাহ্' দ্বারা বুঝানো হয়েছে প্রথম শিঙ্গাধ্বনিকে। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। প্রথম ফুৎকারকে 'রজিফাহ্' বলা হয়েছে একারণে যে, ওই ফুৎকারে শুরু হবে ভূকম্পন। সকল প্রাণী ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। আর দ্বিতীয় ফুৎকারকে 'রদিফাহ্' (পরবর্তী ফুৎকার) বলা হয়েছে এজন্য যে, ওই ফুৎকার হবে প্রথমটির অনুবর্তী। অপরিণত সূত্রে হাসান বসরী থেকে

www.eelm.weebly.com

ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, দুই ফুৎকারের মধ্যকার ব্যবধান হবে চল্লিশ বৎসর। হালিমী বর্ণনা করেছেন, দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ বৎসর। এব্যাপারে অন্যান্য বর্ণনাকারীরাও একমত।

বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা একবার বললেন, দুই ফুৎকারের মধ্যে ব্যবধান হবে চল্লিশ। শ্রোতারা জিজ্ঞেস করলেন, হে রসুল সহচর! চল্লিশ কী— দিন, মাস, না বৎসর। তিনি বললেন, তা জানিনা। রসুল স. এরকমই বলেছেন। এরপর আল্লাহ্পাক আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করবেন। কবর থেকে মানুষেরা উত্থিত হতে থাকবে, যেমন ভূমি থেকে উদ্গত হতে থাকে বৃক্ষের চারা। মৃত্যুর পর নিতম্বের একটি অস্থি ছাড়া সবকিছুই মাটিতে মিশে যায়। ওই অস্থিকে ভিত্তি করেই আবার তাদেরকে দেওয়া হয় নতুন জীবন। এই হাদিসটি আবু দাউদ উল্লেখ করেছেন তাঁর 'আলবা'ছ' গ্রন্থে। তবে সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে চল্লিশ বৎসরের কথা। হাদিসটি সমধিক শুদ্ধও।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত থাকবে সমস্ত পৃথিবী। প্লাবন সরে যাওয়ার পর পুণর্জীবনপ্রাপ্ত হবে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী, যেমন প্লাবনের পরে জমিতে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন প্রকৃতির উদ্ভিদ। আর পুনর্জীবনপ্রাপ্ত সকলকেই দেখা যাবে অবিকল আগের মতো। এরপর ছেড়ে দেওয়া হবে রূহগুলোকে। তারা সংযোজিত হবে তাদের নিজ নিজ দেহের সঙ্গে। এই বিষয়টিই এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে 'ওয়া ইজান্ নুফূসু জুয়্যিজাত' (আর যখন মিলিত করে দেওয়া হবে আত্মাগুলোকে)।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'কতো হৃদয় সেদিন সন্ত্রস্ত হবে'। এখানে 'আল ওয়াজ্বিফাহ্' কথাটি ইঙ্গিতার্থে অধিক কম্পমান বা ভীতি-সন্ত্রাস হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে। কথাটির আভিধানিক অর্থ অবশ্য দ্রুতগমনশীল। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— সেদিন অনেকেই হয়ে পড়বে ভয়ে জড়সড়।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তাদের দৃষ্টি ভীতিবিহ্বলতায় নত হবে'। একথার অর্থ— ভয়ে তারা তখন চোখ তুলে তাকাতেও পারবে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা বলে, আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবোই—(১০) গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও'(১১)? একথার অর্থ— মহাপুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী হওয়া সত্ত্বেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বিষয়টিকে বিশ্বাস করে না। বলে, মরার পরে তো আমাদের গোশত-হাড়-গোড় সবকিছু মাটিতে মিশে যাবে। এর পরেও কি আমরা পুনর্জীবিত হতে পারবো? এটা কি একটি কথার মতো কথা হলো? এখানকার 'আমরা কি' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ তারা বলে, পুনরুত্থান অসম্ভব। কোনো কোনো ক্বেরাতে আবার প্রশ্নবোধক 'হামযা'টি অনুল্লেখিত রয়েছে। এমতোক্ষেত্রেও বক্তব্যটির অর্থ গ্রহণ করতে হবে অনুল্লেখিত প্রশ্নবোধক 'হামযা' সহকারে। যেমন বলা হয় 'রজ্বাআ ফুলানুন ফীল

www.eelm.weebly.com

হাফিরাহ' (লোকটি তার পূর্ব পথে ফিরে গিয়েছে, যে পথ ছিলো তার স্বরচিত)। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে বর্তমান জীবনের সাথে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যতের। তাই এখানে বর্তমানকালের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে ভবিষ্যতকাল। ইবনে জায়েদ বলেছেন, 'আল হাফিরাহ' অর্থ নরক।

'গলে অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও' প্রশ্নটিও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। পুনঃপুনঃ অস্বীকৃতি বর্ধিত করে বক্তব্যবিষয়ের গুরুত্বকে। আর এভাবেই পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমরা কি পচে গলে মাটিতে মিশে যাওয়ার পরেও পুনরুত্থিত হবো? ফিরে আসবো আগের জীবনে? অসম্ভব।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব সূত্রে সাঈদ ইবনে মনসুর বর্ণনা করেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'তারা বলে, আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবোই' (১০) তখন অবিশ্বাসী কুরায়েশরা বলতে শুরু করলো, পুনরুত্থিত হলে আমরা তো পড়বো মহাদুর্বিপাকে। তখনই অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (১২)। বলা হলো—

'তারা বলে, তাই, যদি হয় তবে তো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন'। ১০ সংখ্যক আয়াতের 'তারা বলে' কথাটির সঙ্গে রয়েছে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যগত সংযোগ। অথবা এখানে উহ্য রয়েছে একটি শব্দ 'কৃদ'। এভাবে কথাটি হয় 'তারা বলে' বাক্যের 'তারা' কর্তার অবস্থাপ্রকাশক। তবে মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কর্তৃক বর্ণিত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপটটি একথা সমর্থন করে না। কেননা অবস্থা প্রকাশকারী ও তার অবস্থানের বক্তব্য হতে হয় একই সময়ে। অথচ বক্তব্য দু'টোর মধ্যে রয়েছে বিস্তর প্রভেদ। এখানে 'তিলকা' (এই) কথাটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে প্রত্যাবর্তনের দিকে। আর 'আমরা কি প্রত্যাবর্তিত হবো' থেকেই অনুমিত হয় প্রত্যাবর্তনের ধারণা। অর্থাৎ তারা বলে, মোহাম্মদের কথা যদি সত্যিই হয়, তবে সে জীবন তো হবে অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত। বলা বাহুল্য, তারা এরকম বলতো ঠাট্টা করে।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'এটা তো কেবল এক বিকট আওয়াজ'। এখানে 'যাজ্বরাতুঁও ওয়াহিদাহ্' অর্থ এক বিকট আওয়াজ। 'সিহাহ্' অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে 'যাজ্বর' অর্থ হুংকার দেওয়া। যেমন বলা হয় 'যাজ্বারতুহু ফাআনযাজ্বাহু' (আমি তার প্রতি হুংকার ছেড়েছি, ফলে সে বের হয়ে গিয়েছে)। এই আয়াতের মর্মার্থও সেরকম। অর্থাৎ শিঙ্গার বিকট আওয়াজ শুনে তখন মানুষেরা বের হয়ে পড়বে তাদের আপন আপন সমাধি থেকে। আবার কখনো কখনো 'যাজ্বর' ব্যবহৃত হয় শুধু আওয়াজের ক্ষেত্রে। যেমন 'ওয়ায্ যাজ্বিরাতি যাজ্বরান' (ওই সকল ফেরেশতা, যারা ধমকের সুরে পরিচালনা করে বাতাস)। আবার কখনো শব্দটি ব্যবহৃত হয় কেবল বের করে দেওয়া অর্থেও। যেমন 'ইয্দাজ্বার' (সে বের করে দিলো)।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে—'তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে'। এখানকার প্রারম্ভিক শব্দ 'ফা' হচ্ছে যোজক অব্যয়। 'ইজা' অর্থ অকস্মাৎ,

www.eelm.weebly.com

ঠিক তখনই। এখানে 'ইজা' সন্নিবেশ করায় 'হুম বিস্ সাহিরাহ্' নামপদীয় বাক্যটি পরিণত হয়েছে ক্রিয়াপদীয় বাক্যে। এভাবে পূর্বোক্ত 'তারা বলে' ক্রিয়াপদীয় বাক্যের সঙ্গে যোগসূত্রটি হয়েছে যথার্থ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এখন তারা এরকম বলছে। কিন্তু যখন ভূপৃষ্ঠ হবে কেবল একটি সুবিশাল প্রান্তর, যেখানে শুরু হবে বিচারপর্ব, যা এসে পড়বে অকস্মাৎ। এমতো ব্যাখ্যাকে মান্য করলে বলতে হয় 'এটা তো কেবল এক বিকট আওয়াজ' কথাটি ভিন্ন প্রসঙ্গের, যা যোজক ও যোজ্যের মধ্যে একথাই প্রকাশ করে দেয় যে, যে ভূকম্পনের কথা তারা অস্বীকার করে, আল্লাহ্পাক তা ঘটাবেন অতি সহজে। কেননা তাঁর জন্য কোনোকিছুই কঠিন নয়।

'আস্সাহিরাহ্' অর্থ ময়দানে, ভূপৃষ্ঠে। মর্মার্থ— তারা তখন হঠাৎ করে সমবেত হবে বিচারের ময়দানে। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— প্রতিফল দিবসের ভূমি। কাতাদা বলেছেন, জাহান্নাম।

সূরা নাযিআ'ত ঃ আয়াত ১৫— ২৬

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿١٥﴾ اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ
طُوًى ﴿١٦﴾ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ
تَزَكّٰى ﴿١٨﴾ وَ اَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾ فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ
الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿٢١﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ
فَنَادٰى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ
وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾

r তোমার নিকট মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে কি?

r যখন তাহার প্রতিপালক পবিত্র উপত্যকা তুওয়া-য় তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,

r 'ফির'আওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে,'

r এবং বল,'তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও—

r 'আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথপ্রদর্শন করি যাহাতে তুমি তাঁহাকে ভয় কর'?

r অতঃপর সে উহাকে মহানিদর্শন দেখাইল।

r কিন্তু সে অস্বীকার করিল এবং অবাধ্য হইল।

www.eelm.weebly.com

r অতঃপর সে পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইল।

r সে সকলকে সমবেত করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল,

r আর বলিল, 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।'

r অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করিলেন।

r যে ভয় করে তাহার জন্য অবশ্যই ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! নবী মুসার বৃত্তান্ত সম্পর্কে আমি কি আপনাকে প্রত্যাদেশ করিনি? প্রশ্নটি স্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ আমি তো আপনাকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে নবী মুসা সম্পর্কে অবহিত করেছিই। কথাটি একই সঙ্গে রসুল স. এর প্রতি সান্ত্বনা এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুমকি। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি রসুল মুসার ইতিবৃত্তটি স্মরণ করুন। তিনিও সত্যধর্ম প্রচার করতে গিয়ে আপনারই মতো সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। আপনিও তেমনই করুন। আর হে মক্কার অবিশ্বাসীরা! তোমরাও জেনে রেখো, শেষরক্ষা তোমাদেরও হবে না। রসুল মুসার শত্রুরা যেমন শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিলো, তোমাদের কপালেও রয়েছে সেরকম দুর্ভোগ। সুতরাং এখনো সময় আছে, সতর্ক হও। ফিরে এসো শাশ্বত সত্যের পথে, ইসলামের চিরঅক্ষয় সুশীতল ছায়ায়।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'যখন তার প্রতিপালক পবিত্র উপত্যকা তুওয়ায় তাকে আহ্বান করেছিলেন'। এখানকার 'ইজ' (যখন) পদটি ক্রিয়ার আধার, সম্পর্কযুক্ত আগের আয়াতের 'মুসার বৃত্তান্ত' কথাটির সাথে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! মুসা নবীর ওই ঘটনাটি তো আপনাকে অবগত করানো হয়েছেই, যখন তাঁর প্রভুপালক তাঁকে ডেকে নিয়েছিলেন পবিত্র তুওয়া উপত্যকায়। এখানকার 'তুওয়া' পদটি 'আহ্বান করেছিলেন' অথবা 'পবিত্র উপত্যকা'র সাধারণ কর্মপদ, অর্থাৎ তিনি তাঁকে আহ্বান করেছিলেন দু'বার। অথবা ওই উপত্যকার পবিত্রতা ছিলো দ্বিগুণ।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'বলেছিলেন, ফেরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে (১৭), এবং বলো, তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও-(১৮) আর আমি তোমাকে তোমার প্রভুপালকের দিকে পথপ্রদর্শন করি, যাতে তুমি তাঁকে ভয় করো' (১৯)। একথার অর্থ— পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় ডেকে নিয়ে তিনি নবী মুসাকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করেছিলেন যে, হে আমার নবী! তুমি মিসরাধিপতির নিকটে গমন করো। কেননা সে পথভ্রষ্টতার সীমা ইতোমধ্যেই অতিক্রম করেছে। আসত্তা নিমজ্জিত হয়েছে অংশীবাদিতায় ও অহংকারে। তাই তাকে গিয়ে সোজাসুজি বলো, অংশীবাদিতা থেকে পবিত্র হবার কোনো আগ্রহ তোমার আছে কি? আছে কি এমন শুভ অভিপ্রায় যে, আমি তোমাকে তোমার প্রভুপালনকর্তার দিকে পথ দেখাই, যাতে তুমি তাঁকে ভয় করতে শেখো। মান্য করতে পারো তাঁর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহকে।

www.eelm.weebly.com

এখানে ‘তাযাক্কা’ অর্থ যাতে তুমি পবিত্র হতে পারো শিরিক থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস অর্থ করেছেন— ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্’ কালেমা পড়ে পবিত্র হবে, এমতো আগ্রহ তোমার আছে কি? ‘ফা তাখ্‌শা’ অর্থ যাতে তাঁকে ভয় করো। এখানকার ‘ফা’ অব্যয়টি নৈমিত্তিক। যেহেতু আল্লাহ্‌ভীরুতার পরিণতি আল্লাহ্‌পরিচিতি, আর আল্লাহ্‌পরিচিতির পরিণতি হেদায়েত, সেহেতু তুমি কি চাও আল্লাহ্ ভীরু হতে?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘অতঃপর সে তাকে মহানিদর্শন দেখালো (২০)। কিন্তু সে অস্বীকার করলো এবং অবাধ্য হলো’ (২১)। একথার অর্থ— অতঃপর তুওয়া উপত্যকা থেকে নেমে এসে নবী মুসা সপরিবারে যাত্রা করলেন মিসর অভিমুখে। সেখানে পৌঁছে তাঁর ভ্রাতা ও নবী হারুনকে নিয়ে উপস্থিত হলেন ফেরাউনের রাজসভায়। তাকে ও তার পারিষদবর্গকে আহ্বান জানালেন সত্য ধর্মের প্রতি। তাঁর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ তাদের সম্মুখে প্রদর্শন করলেন মোজেজা। তবুও তারা ইমান আনলো না। আগের মতোই অনড় রইলো ঘোর অবাধ্যতায়।

এখানে ‘আয়াতাল কুবরা’ (মহানির্দশন) বলে বোঝানো হয়েছে নবী মুসা কর্তৃক প্রদর্শিত সকল মোজেজাকে। তবে মোজেজাসমূহ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য যেহেতু একটাই, তাঁর নবুয়তের প্রত্যয়ন, তাই কথাটিকে ‘আয়াত’ (মোজেজা) বলে উল্লেখ করা হয়েছে এখানে একবচনে। অর্থাৎ সকল মোজেজা যেনো একটিই। অথবা কথাটির অর্থ হবে— মোজেজাসমূহের মধ্যে একটি মোজেজা, অলৌকিক যষ্টির সর্পরূপ পরিগ্রহণ।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর সে পশ্চাৎ ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হলো’। একথার অর্থ— হজরত মুসা তাঁর হাতের লাঠি মাটিতে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিটি হয়ে গেলো বিশালাকৃতির একটি সাপ। সাপটি ফেরাউনকে তাড়া করলো। ভয়ে সে পিছন ফিরে দিলো দৌড়। পরিস্থিতি সামাল দিতে সে তখন অবলম্বন করল এক কৌশল। এখানকার ‘ইয়াস্‌আ’ (সচেষ্ট হলো) কথাটি অবস্থাপ্রকাশক ‘সে পশ্চাৎ ফিরলো’ বাক্যের ‘সে’ সর্বনামের। অথবা কথাটির মর্মার্থ— সে সচেষ্ট হলো ইমান ও আনুগত্য থেকে পশ্চাদপসরণের জন্য। এভাবে ডেকে আনলো নিজের ও রাষ্ট্রের ধ্বংস।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘সে সকলকে সমবেত করলো এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করলো (২৩), আর বললো, আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক’(২৪)। একথার অর্থ— ফেরাউন তখন তার বশংবদদের, অথবা যাদুকরদের ডেকে চীৎকার করে বলতে লাগলো, সাবধান! মুসার কীর্তিকলাপ দেখে বিভ্রান্ত হয়ো না। তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুপ্রতিপালক কিন্তু আমিই। এখানকার পরবর্তী বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের ‘উচ্চস্বরে ঘোষণা করলো’ পদের বিবৃতিপ্রদায়ক। অর্থাৎ সে তখন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলো, আমিই তোমাদের সর্বাপেক্ষা বড় পালনকর্তা, আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো পালনকর্তা নেই।

www.eelm.weebly.com

অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— তোমাদের কর্মের উপরে যাদের কর্তৃত্ব রয়েছে, আমিই তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। কিংবা— আমি যেমন তোমাদের দেবতা, তেমনি দেবতা তোমাদের পূজনীয় দেব-দেবীসমূহেরও।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আল্লাহ্ তাকে আখেরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করলেন। একথার অর্থ— ফেরাউনের এমতো ধৃষ্টতার শাস্তি আল্লাহ্পাক যথাসময়ে ঠিকই দিয়েছেন। সমুদ্রের পানিতে তাকে ডুবিয়ে মেরেছেন সদলবলে। আর পরকালেও তাকে শাস্তিভোগ করতে হবে অনন্তকাল ধরে।

এখানে 'নাকালা' অর্থ পাকড়াও করলেন, দমন করলেন। শব্দটির আভিধানিক অর্থ দুর্বল করে দিলেন, দিলেন অক্ষম করে। চতুষ্পদ জন্তুর পায়ে বাঁধা রশি এবং উষ্ট্র-অশ্বের লাগামকে বলে 'নাকালি', যা ক্ষুণ্ণ করে তাদের স্বাধীনতাকে। আর 'নাকাল' হচ্ছে 'তানকীল' ক্রিয়ার নামপদ। এভাবে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় এমন শাস্তি, যা বাধাপ্রদান করে অপরাধমূলক কর্মকে। যেমন বলা হয় 'নাকালতু বিহী' (আমি তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছি) এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে একটি উহ্য ধাতুমূলের বিশেষণরূপে, যা বেগমান করেছে পূর্বের ক্রিয়াকে। অর্থাৎ আমি তাকে শায়েস্তা করেছি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে, তার অপকর্মপ্রবাহকে করে দিয়েছি চিররুদ্ধ।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, ক্রিয়াপদটি এখানে রয়েছে উহ্য। আর 'নাকাল' হচ্ছে তার গুরুত্ববর্ধক কর্মপদ। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক দমন করলেন তাকে। স্থাপন করলেন একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। আর এখানকার 'নাকাল'কে 'আল আখিরাতে'র সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করার ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে, মধ্যবর্তীতে উহ্য রয়েছে হয় 'ফী' (র) অথবা সম্বন্ধপদীয় 'লাম'। 'ফী' ধরলে 'নাকালা ফীল আখিরাতি' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— ফেরাউনকে শায়েস্তা করার বিষয়টি একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে পরকালের নরকযন্ত্রণা ও ইহকালের সলিল সমাধিরূপে। অর্থাৎ দু'টো শাস্তিই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হাসান বসরী ও কাতাদা। আর সম্বন্ধপদীয় 'লাম' সহযোগে মর্মার্থ দাঁড়াবে— তাকে কঠিন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়েছিলো একারণে যে, সে বলেছিলো মারাত্মক দু'টি কথা 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক' এবং 'আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো প্রতিপালক আছে বলে তো আমার জানা নেই'। উল্লেখ্য, তার উদ্ধৃত বক্তব্যদু'টোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিলো চল্লিশ বৎসর। তার এ দু'টো অপবচনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন মুজাহিদ ও বিদ্বজ্জনের একটি দল।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'যে ভয় করে, তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে'। একথার অর্থ— ফেরাউন ও তার অনুসারীদের এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মধ্যে অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে তাদের জন্য, যারা ভয় করে কেবল আল্লাহ্কে। এখানে 'ভয় করে' বলে বোঝানো হয়েছে ওই সকল লোককে,

www.eelm.weebly.com

যাদের হৃদয়ে রয়েছে আল্লাহ্কে ভয় করার যোগ্যতা। আর যারা আল্লাহ্কে ভয় করে চলে, তারা তো মুত্তাকী (সংযমী, সাবধানী, আল্লাহ্ভীরু)। সুতরাং তাদেরকে ভয় করে চলতে বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

সূরা নাযিআ'ত ঃ আয়াত ২৭—৩৯

ءَاَنۡتُمۡ اَشَدُّ خَلۡقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمۡكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿٢٨﴾
وَاَغۡطَشَ لَيۡلَهَا وَاَخۡرَجَ ضُحٰهَا ﴿٢٩﴾ وَالۡاَرۡضَ بَعۡدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿٣٠﴾
اَخۡرَجَ مِنۡهَا مَآءَهَا وَمَرۡعٰىهَا ﴿٣١﴾ وَالۡجِبَالَ اَرۡسٰىهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَّكُمۡ
وَلِاَنۡعَامِكُمۡ ﴿٣٣﴾ فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الۡكُبۡرٰى ﴿٣٤﴾ يَوۡمَ يَتَذَكَّرُ
الۡاِنۡسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ الۡجَحِيۡمُ لِمَنۡ يَّرٰى ﴿٣٦﴾ فَاَمَّا مَنۡ
طَغٰى ﴿٣٧﴾ وَاٰثَرَ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا ﴿٣٨﴾ فَاِنَّ الۡجَحِيۡمَ هِيَ الۡمَاۡوٰى ﴿٣٩﴾

r তোমাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন;

r তিনি ইহার ছাদকে সুউচ্চ করিয়াছেন ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন।

r আর তিনি ইহার রাত্রিকে করিয়াছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করিয়াছেন ইহার সূর্যালোক;

r এবং পৃথিবীকে ইহার পর বিস্তৃত করিয়াছেন।

r তিনি উহা হইতে বহির্গত করিয়াছেন উহার পানি ও তৃণ,

r এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিয়াছেন;

r এই সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের আন'আমের ভোগের জন্য।

r অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হইবে

r মানুষ যাহা করিয়াছে তাহা সে সেই দিন স্মরণ করিবে,

r এবং প্রকাশ করা হইবে জাহান্নাম দর্শকদের জন্য

r অনন্তর যে সীমালংঘন করে

r এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়।

r জাহান্নামই হইবে তাহার আবাস।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'হে মানুষ! বলো, তোমাদের মতো ক্ষুদ্র প্রাণী সৃষ্টি করা কঠিন, না সৃষ্টি করা কঠিন বিশালাকৃতির আকাশ? এই বিরাট আকাশকে তো নিখুঁত নৈপুণ্যে নির্মাণ করেছেন তিনিই।

www.eelm.weebly.com

এখানকার ‘সামাউ’ পদটির বিধেয় রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ আকাশ সৃষ্টি দুরূহতর। এখানকার প্রশ্নটি স্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ অবশ্যই আকাশ সৃষ্টি দুরূহতর। আর এখানে ‘আকাশ’ অর্থ আকাশসহ আকাশের সকলকিছু। কারণ এর পরে সবিস্তারে ভূমি, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এভাবে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, সামগ্রিক সৃষ্টির (আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়স্থিত সকল কিছুর) তুলনায় আংশিক সৃষ্টি মানুষের সৃজনায়ন নিশ্চয়ই সহজতর। তেমনি প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি (পুনরুত্থান) কি সহজতর নয়? যুক্তি তো এরকমই বলে।

‘বানাহা’ অর্থ তা নির্মাণ করেছেন। বাক্যটি ‘আস্‌সামাউ’ (আকাশ) বিশেষ্যের বিশেষণ। আর ‘আস্‌সামাউ’ এর আলিফ লাম এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত, যেমন ‘ওয়ালাক্বাদ আমরু আলাল লাইয়্যিমি ইয়াসুব্‌বুনী’ বাক্যে ‘ইয়াসুব্‌বুনী’ অনির্দিষ্টবাচক হওয়া সত্ত্বেও বিশেষণ হয়েছে ‘আল লাইয়্যিম’ একটি নির্দিষ্টবাচক পদের। অথবা বলতে হয়, এখানকার ‘বানাহা’ এর পূর্বে অনুক্ত রয়েছে একটি ‘আল লাতী’ যোজক অব্যয়। অর্থাৎ ওই আকাশ, যা নির্মাণ করেছেন আল্লাহ্‌। কিংবা বলা যায়, এখানকার দ্বিতীয় বাক্যটি সংযোজিত প্রথম বাক্যের সাথে। কিন্তু যোজক অব্যয় এখানে অনুক্ত। দু’টি বাক্যের মিলিতাবস্থায় এখানে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে এভাবে— আল্লাহ্‌ নির্মাণ করেছেন আকাশ, যা তোমাদের অস্তিত্ব নির্মাণ অপেক্ষা কঠিনতর। আর যিনি তা নির্মাণ করতে সক্ষম, তিনি তা থেকে দুর্বলতর বস্তু তো সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘তিনি এর ছাদকে সুউচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন (২৮)। আর তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন এর সূর্যালোক’ (২৯)।

এখানে ‘সামকাহা’ অর্থ সূউচ্চ করেছেন। অর্থাৎ ভূমি থেকে আকাশ পর্যন্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন উচ্চতার একটি পরিমাণ। অথবা ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশ মার্গের উচ্চতাও নির্মাণ করেছেন আল্লাহ্‌ই। ‘ফাসাওয়াহা’ অর্থ এবং বিন্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ আকাশকে করেছেন মসৃণ, সেখানে রাখেননি কোনো ফাঁক-ফোকর ও অমসৃণতা। ‘ওয়া আগ্‌ত্বশা লাইলাহা’ অর্থ আর তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন। অর্থাৎ তিনি আকাশাগত রাতকে করেছেন তমসাবৃত। যেমন বলা হয় ‘গত্বাশাল লাইল’ (রাত তমসাচ্ছন্ন হয়েছে)। এখানে রাতের সম্পর্ক আকাশের সঙ্গে করা হয়েছে একারণে যে, আকাশস্থিত দিবাকরের অবস্থান আকাশেই। তার উদয়াস্তের ফলেই তো পৃথিবীতে নেমে আসে দিবা-রাত্রি।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— ‘এবং পৃথিবীকে এর পর বিস্তৃত করেছেন’। একথার অর্থ— আকাশ সৃষ্টির পর আল্লাহ্‌পাক সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী এবং পরে পৃথিবীকে করেছেন প্রসারিত। এখানকার ‘ওয়াল আরদ্ব’ (এবং পৃথিবী) কথাটির পূর্বে লুপ্ত রয়েছে একটি শব্দ ‘দ্বহা’ পরবর্তী ‘দাহাহা’ তার বিশ্লেষক।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্পাক ভূমি ও ভূমিস্থিত সকলকিছু সৃষ্টি করছেন দুই দিনে, আকাশ সৃষ্টির পূর্বে। এরপর তাঁর শুভদৃষ্টি পতিত হলো আকাশ নির্মাণের দিকে। ফলে দুই দিনে সৃজিত হলো আকাশ। এভাবে তিনি সুবিন্যস্ত করলেন সপ্ত আকাশ। এরপর তিনি আবার মনোযোগী হলেন পৃথিবীর প্রতি। দুই দিনে পৃথিবীকে করলেন প্রসারিত, মানুষের বাসোপযোগী। এভাবে তিনি পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থিত সকল কিছু সৃষ্টি করলেন মোট চারদিনে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'বা'দা জালিকা' কথাটির অর্থ 'এরপর' না হয়ে হবে 'এর সাথে'। অর্থাৎ তিনি আকাশ সুবিন্যস্ত করার সাথে সাথে সুবিস্তৃত করেছেন পৃথিবীকে। যেমন আল্লাহ্পাক বলেন, 'উ'তুলিম বা'দা জালিকা যানীম'। এই আয়াতেও 'বা'দা' (পরে) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ধাত্যর্থে। আর 'ছুম্মাস্ তাওয়া ইলাস্ সামা' আয়াতের 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটি কালক্রম বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে আভিজাত্যের অনুক্রম বিকাশের মানসে। কেননা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে রয়েছে মর্যাদাগত বিশাল পার্থক্য। যেমন 'ছুম্মা কানা মিনাল্ লাজীনা আমানূ' আয়াতে 'ছুম্মা' ব্যবহৃত হয়েছে বিশ্বাসীদের আভিজাত্য প্রকাশার্থে। প্রথম ব্যাখ্যাটি যেহেতু পূর্বসূরীগণের অভিমত্যানুগামী, তাই বলতে হয়, সেটাই সর্বোত্তম।

এরপরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'তিনি তা থেকে বহির্গত করেছেন তার পানি ও তৃণ'। একথার অর্থ— তিনিই সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর পানি, তৃণলতা ও চারণভূমি। বাক্যটি আধারাধিকরণ রূপের স্থল বলে মর্মার্থ নেওয়া হয়েছে পরিস্থিতির। অর্থাৎ সবজির স্থল বলে অর্থ নেওয়া হয়েছে সবজির। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'মারআ' (তৃণ) শব্দটি ধাতুমূল, ব্যবহৃত হয়েছে কর্মপদার্থে। অর্থাৎ তৃণভূমি বা চারণভূমি বলে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে চরে বেড়ানো পশুকূলের।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন (৩২); এই সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের আনআ'মের ভোগের জন্য' (৩৩)। একথার অর্থ— হে মানবজাতি! সুবিস্তৃত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাহাড়পর্বতগুলোকে কীলকরূপে প্রোথিত করে দিয়েছি আমি তোমাদের এবং তোমাদের জন্তু জানোয়ারগুলোর সুবিধার্থে, যাতে তোমরা এবং তোমাদের পশুগুলো এখানে নির্বিঘ্নে বিচরণ করতে পারো। উল্লেখ্য, এখানকার 'মাতাআ'ন' (ভোগের) পদটি নিমিত্ত। পূর্বোক্ত 'দাহা' এবং 'আরসা' পদের ক্রিয়া দু'টো এখানে 'মাতাআন' পদকে কর্মপদে রূপায়িত করার লক্ষ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছে। আমি বলি, 'তোমাদের এবং তোমাদের আনআ'মের ভোগের জন্য' কথাটিকে 'আখরাযা মিনহা' (সেখান থেকে উদগত করেন) এর নিমিত্ত করা হলেই সম্ভবতঃ বিশ্লেষণটি হয় অধিক সঙ্গত। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক পানি ও তৃণকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ ও পশুদের ভোগের জন্য।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে (৩৪) মানুষ যা করেছে, তা সে সেই দিন স্মরণ করবে' (৩৫)। এখানকার 'ফা' (অতঃপর) অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে নৈমিত্তিক হিসেবে। অর্থাৎ এই বিশাল মহাসৃষ্টির পটভূমিতে যখন আল্লাহ্র সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিধরতার প্রভূত প্রমাণপঞ্জী সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত, তখন তাঁর অনড় অঙ্গীকার মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারের বিষয়টি আর অপ্রামাণ্য নয়। সুতরাং মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো এখানে সেই মহাসংকটের প্রতি, যা অবশ্যম্ভাবী। এভাবে এখানে বিষয়টির অবতারণা করা হলো 'যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে' বলে, যাতে অনুমিত হয় সেই ভয়ংকর দিবসের কিছুটা পূর্বাভাস।

এখানে 'ত্বাম্মাতুন' অর্থ মহাসংকট। 'ত্বম্মুন' এর আভিধানিক অর্থ প্রাবাল্য, প্রতাপ, প্রাধান্য, বিজয়। প্রবল প্রতাপান্বিত বলেই সমুদ্রকে বলা হয় 'ত্বম্মুন'। ভীষণ বিপদকেও বলা হয় 'ত্বম্মুন'। বলা বাহুল্য, সর্বাপেক্ষা ভীষণ হচ্ছে কিয়ামত, মহাপ্রলয়। তাই মহাপ্রলয়কে এখানে বলা হয়েছে 'ত্বম্মাতুন'। এখানে 'ইজা' (যখন) পদের অনুবর্তী হয়েছে 'ইয়াওমা' (সেই দিন)। আর 'মাসাআ' (স্মরণ করবে) পদটির 'মা' অব্যয়টি ধাতুমূল, অথবা যোজক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যখন বিচারানুষ্ঠান শুরু হবে, তখন মানুষ তাদের আপন আপন আমলনামা হাতে নিয়ে হয়ে পড়বে চিন্তাযুক্ত, রোমন্থন করতে চেষ্টা করবে পৃথিবীর জীবনের স্মৃতি।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'এবং প্রকাশ করা হবে জাহান্নাম দর্শকদের জন্য'। অর্থাৎ তখন জাহান্নামকে আনা হবে সকলের দৃষ্টির সম্মুখে। মুকাতিল বলেছেন, তখন উন্মোচিত হবে দোজখের আচ্ছাদন। তার উপরে অবস্থিত পুলসিরাত অতিক্রম করতে গিয়ে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা নিক্ষিপ্ত হবে দোজখে এবং বিশ্বাসীরা নির্বিঘ্নে তা অতিক্রম করে চলে যাবে বেহেশতে। অথবা মর্মার্থ হবে— তখন দোজখকে উন্মোচন করা হবে কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দৃষ্টির সম্মুখে। এখানে 'ইজা'র জবাব (সেদিন কী হবে) কথাটি রয়েছে উহ্য। আর তা প্রতীয়মান হয় এখানকার 'সেই দিন মানুষ স্মরণ করবে' কথাটি থেকে। তবে এখানে লুপ্ত কিছু রয়েছে ধরে না নিলেও বক্তব্যটি অস্পষ্ট থাকে না। কেননা পরবর্তীতে বিষয়টিকে ব্যক্ত করা হয়েছে বিস্তারিতভাবে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে—'অনন্তর যে সীমালংঘন করে (৩৭) এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় (৩৮) জাহান্নামই হবে তার আবাস' (৩৯)। একথার অর্থ— যে ব্যক্তি লংঘন করে অবাধ্যতার সর্বশেষ সীমা, পার্থিব অর্জনকে অগ্রাধিকার দেয় পারলৌকিক কল্যাণের উপর, নরকগমন তার জন্য অবধারিত। হজরত আবু মুসা আশয়ারী বলেছেন, যে ব্যক্তি পৃথিবীর মোহে অন্ধ, সে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে তার আখেরাতকে। আর যে ব্যক্তি ভালবাসে তার পরকালকে, সে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে তার দুনিয়াকে। সুতরাং তোমরা পরলোকপ্রেমিক হও। নশ্বরতার পরিবর্তে গ্রহণ করো অবিনশ্বরতাকে। আহমদ, বায়হাকী।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নরক আচ্ছাদিত রয়েছে কুপ্রবৃত্তির তাড়না দ্বারা। মুসলিমের বর্ণনানুযায়ী— নরক পরিবেষ্টিত রয়েছে প্রবৃত্তির অপবাসনা দ্বারা। আর জান্নাত আচ্ছাদিত বা পরিবেষ্টিত প্রবৃত্তির অপছন্দনীয় বিষয়াদি দ্বারা। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, জিকির, আলেম ও এলেম অন্বেষণকারী ব্যতীত এ জগতের সবকিছুই অভিশপ্ত। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

সূরা নাযিআ'ত ঃ আয়াত ৪০, ৪১

وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾

r পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হইতে নিজকে বিরত রাখে

r জান্নাতই হইবে তাহার আবাস।

উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আর যে ব্যক্তি মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ সকাশে তার কৃতকর্মাবলীর হিসাব দেওয়ার ব্যাপারে ভীত-চিন্তিত থাকে এবং বিরত থাকে প্রবৃত্তির অপবাসনা চরিতার্থ করা থেকে, সে অধিবাসী হবে অক্ষয় জান্নাতের।

'সিহাহ' অভিধানে বলা হয়েছে, 'হাওয়া' অর্থ চিত্তাকর্ষক বিষয়াদির প্রতি প্রবৃত্তির অনুরাগ। এই 'হাওয়া' বা প্রবৃত্তির অপবাসনাই প্রবৃত্তি পূজকদেরকে নিয়ে যায় চরম বিপদগ্রস্ততার দিকে। আর পরজগতে নিক্ষেপ করবে হাবিয়া নরকে। 'হাওয়া' এর শাব্দিক অর্থ— নিম্নাবতরণ, অধঃপতন।

স্মর্তব্য, সকল নিষিদ্ধ বিষয়াদির মূলে রয়েছে নফস বা প্রবৃত্তি। জ্ঞানগত ও ধর্মগত উভয় দিক দিয়েই প্রবৃত্তিতাড়না জঘন্য ও নিন্দার্হ। আর নফসে আম্মারাই আল্লাহ্র সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি। জ্ঞানগতভাবে জঘন্য এজন্য যে, প্রত্যেক বিষয়বস্তুর একটি মৌলিক অবস্থান রয়েছে, বিশেষ করে আদি-অন্তের মূল তত্ত্বের। যেমন স্বভাব ও কর্ম। এ দুটোর দাবি হচ্ছে, হয় এদু'টো শুভ হবে, অথবা অশুভ। তবে তা জ্ঞানের দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হয়ও, তবুও তা নির্ভরযোগ্য নয়, যতোক্ষণ না অদৃশ্যের অধিকারী আল্লাহ্পাক এ সম্পর্কে অবহিত না করেন। মানুষের দ্বারা শুভ-অশুভ, পুণ্য-পাপ নির্ণয়ন যদি সম্ভব হতো, তাহলে নবী-রসুল প্রেরণের প্রয়োজন আর পড়তো না। সুতরাং বুঝতে হবে, বিশুদ্ধ বিশ্বাস, শুভ-অশুভ নির্ণয়ন, নন্দিত ও ধিক্কৃত স্বভাবের পার্থক্য নিরূপণ অর্জিত হতে পারে কেবল প্রবৃত্তির অপবাসনা পরিহার এবং রসুলগণের অনুসরণের মাধ্যমে। প্রবৃত্তিপরায়ণতা (নফসানিয়াত) অবশ্যই রসুলানুসরণের পরিপন্থী।

www.eelm.weebly.com

আবার শরিয়তের দৃষ্টিতেও অপপ্রবৃত্তি একটি জঘন্য বস্তু। একারণেই আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'আমি মানব ও জ্বিন সম্প্রদায়কে আমার ইবাদত সম্পাদন ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি'। জাওহারী তাঁর 'সিহাহ' অভিধানে লিখেছেন, বিনয়, নম্রতা, আনুগত্য ও ইবাদতের তাৎপর্য হচ্ছে আত্মসমর্পণের শেষ প্রান্ত স্পর্শ করা।

ইবাদত দু'ধরনের— ১. বাধ্যতামূলক। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকলকিছুই আল্লাহ্র প্রতি সমর্পিত হয় স্বেচ্ছায়, অথবা বাধ্যগত ভাবে'। ২. ইচ্ছাধীন। এই ইচ্ছাধীন ইবাদতই চাওয়া হয়েছে মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। এখন কথা হচ্ছে, সকল কিছুই যেমন বাধ্যগতভাবে আল্লাহ্র অনুগত, তেমনি সম্পাদিত হওয়া উচিত ইচ্ছাধীন ইবাদতগুলোও। তাই দৈহিক, মানসিক ও প্রবৃত্তিক কোনো কর্মই আল্লাহ্র অভিপ্রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে না হওয়াই সমীচীন। প্রবৃত্তিপরায়ণতার অর্থই ইবাদতের বিরোধিতা করা। আর প্রতিটি জঘন্য ও নিকৃষ্ট কর্মই প্রবৃত্তিপরায়ণতার শাখা অথবা প্রশাখা, যা উৎপন্ন হয় বিসদৃশ ও বিকৃত চিন্তা-চেতনা থেকে। তাই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে 'আরে, এ কেমন রসুল! পানাহার করে, আবার বাজারে যায়'। এরকম বিকৃত চিন্তার একটি সম্প্রদায়ের নাম মুজাস্সামা। তারা বলে, আল্লাহ্ আকারসম্ভূত। বলে, প্রতিটি অস্তিত্বের অধিষ্ঠিতি কোনো না কোনো স্থানে। আর আল্লাহ্ যেহেতু অস্তিত্ববান, সেহেতু তিনি সাকার (আল্লাহ্পাক রক্ষা করুন)। মুতাজিলারাও বিকৃত বিশ্বাসী। তাই তাদের মুখে উচ্চারিত হয়— কবরের শাস্তি, পাপ-পুণ্যের পরিমাপ, পুলসিরাত ইত্যাদি ভিত্তিহীন। বৃহৎ পাপীরাও স্বীকার করে যে, কোরআনের বিধান ও রসুলের নির্দেশ অবশ্যপালনীয়। চরিত্রহীনেরাও জানে, পরকালের শাস্তি অনিবার্য। তবুও তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাদি মানে না। পরিত্যাগ করে অত্যাবশ্যক দায়িত্বসমূহ এবং লিপ্ত হয় নিষিদ্ধ বিষয়াদিতে।

হজরত আসমা বিনতে উমাইস থেকে তিরমিজি ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিনটি বিষয় ধ্বংসাত্মক। আর যে প্রবৃত্তির দাস, সে সর্বনিকৃষ্ট। প্রবৃত্তির দাসত্ব মানুষকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করে। তিনি স. আরো বলেছেন, তিনটি বিষয় মানুষের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে— ১. প্রবৃত্তির অপকামনা ২. সীমাতিরিক্ত কার্পণ্য ৩. আত্মশ্লাঘা। অবশ্য শেষোক্তটিই অধিক নিকৃষ্ট। হাদিসটি হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন বায়হাকী। আমি বলি, হাদিসে উল্লেখিত প্রবৃত্তি অর্থ যদিও বিশেষ ধরনের প্রবৃত্তি, কিন্তু তিনটি বিষয়ই প্রবৃত্তিপরায়ণতাসম্পৃক্ত।

উপযোগ ঃ প্রবৃত্তিপরায়ণতা পরিহার করা যেতে পারে বিভিন্ন উপায়ে। এর মধ্যে ন্যূনতম উপায় হচ্ছে, বিশ্বাসগত দিকটিকে হতে হবে অত্যন্ত সুদৃঢ়। অবশ্য বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ, কোরআন-হাদিসের সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং বিদ্বজ্জনের ঐকমত্যের বিরোধিতা করা যাবেই না। এরকম বিশ্বাসধারীরাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতভুক্ত। মধ্যম পন্থা হচ্ছে, পাপচিন্তা এলেই স্মরণ করতে হবে পরকালের

www.eelm.weebly.com

হিসাব নিকাশ ও পুরস্কার-তিরস্কারের কথা। এ স্তরের পূর্ণতা অর্জিত হয় সন্দিগ্ধ বিষয়াবলী পরিত্যাগের মাধ্যমে। আবার সন্দিগ্ধ বিষয়াবলী পরিহার করাও প্রয়োজন। রসুল স. বলেছেন, যারা সন্দিগ্ধ বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে, তারা তাদের ধর্ম ও মানসম্মানকে নিরাপদ রাখে। আর যারা সন্দিগ্ধ বিষয়সমূহে মগ্ন হয়, তারা শেষ পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয় নিষিদ্ধতার গহ্বরে। তারা যেনো ওই ধরনের রাখাল, যে তার পশুগুলোকে চরায় নিষিদ্ধ চারণভূমির আশে পাশে। এমতাবস্থায় তার পশুপালের নিষিদ্ধ চারণভূমিতে অনুপ্রবেশের রয়েছে সমূহ সম্ভাবনা। বোখারী, মুসলিম।

এ স্তরের আর একটি পূর্ণতা এরকম— তোমার প্রয়োজনকে সীমায়িত করো সিদ্ধ বস্তুসমূহের বৃত্তে। পরিত্যাগ করো সৌখিন আকাংখা। হজরত নোমান ইবনে বশীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যা মন চায়, তা-ই উদরস্থ করা অপব্যয়। ইবনে মাজা, বায়হাকী। এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আনাস থেকেও।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহ. বলেন, আমাদের মহাসম্মানিত শায়েখ বাহাউদ্দিন নক্শবন্দ উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ পর্যন্ত উপনীত হওয়ার সহজতম উপায় হচ্ছে, প্রবৃত্তিপরায়ণতার বিরুদ্ধাচরণ। অর্থাৎ শরিয়ত প্রতিপালনের সাথে সাথে প্রবৃত্তিপরায়ণতার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ। আল্লাহ্ই সমধিক পরিজ্ঞাত। আর একটি সূক্ষ্ম বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তা হচ্ছে, কিছু কিছু পাপ প্রকাশ্যত দৃষ্টিগোচর। কিন্তু কিছু কিছু পাপ আসে অন্ধকারে গোপন পথ ধরে, ধীরগতিসম্পন্ন পিপীলিকার মতো। এসব পাপ পরিধান করে পুণ্যের পোশাক। যেমন লোক দেখানো ইবাদত। কৃত ইবাদত ও সাধনার বিষয়ে আত্মগর্ব অনুভব। প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারে অতিরিক্ত ইবাদত-বন্দেগী করা। এই স্তর আসলেই পদস্খলনের স্তর, যদিও তা বাহ্যত পুণ্যময়। জনৈক পীর-মোর্শেদ তাঁর মুরিদকে বলেছিলেন, শোনো, পাপের পথ ধরে শয়তান তোমাকে পথভ্রষ্ট করবে, এরকম আশংকা আমি করি না। তবে আশংকা করি, সে হয়তো তোমার কাছে পৌঁছে যাবে পুণ্যের পথ ধরে। সুতরাং প্রবৃত্তিকে সব সময় সন্দেহের চোখে দেখো। অবলম্বন গ্রহণ কোরো রোদনের ও ক্ষমাপ্রার্থনার (ইস্তেগফারের)। জনৈক কবি বলেছেন— সর্বদা প্রবৃত্তি ও শয়তানের বিরোধিতা কোরো, যদিও তারা তোমার মঙ্গলাকাংখী হয়ে আসে। তুমি তো ভালো করেই জানো সুহৃদ-স্বজন ও সমাজপতিদের চক্রান্তের স্বরূপ। সুতরাং তাদের কথার কোনো মূল্য দিয়ো না। যা আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণীয় নয়, তা থেকে আশ্রয়প্রার্থী হয়ো কেবল তাঁরই সকাশে। অগ্রাহ্য কথা ও কর্ম বন্ধ্যা রমণীতুল্য। পুণ্যের পরম্পরা তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারেই না। এই স্তরে নিরাপদ থাকার উপায় হলো এমন এক পীর-মোর্শেদের সাহচর্য অবলম্বন, যিনি আল্লাহ্র প্রতি পরিপূর্ণরূপে নিবেদিত। তাঁর আদেশ ও অনুমতি ব্যতীত কিছু করা নিতান্তই অসমীচীন।

www.eelm.weebly.com

শায়েখ ইয়াকুব চরখী তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন এভাবে— একবার আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম। প্রবৃত্তি হয়ে পড়লো অলস। হৃদয়ে অনুভব করলাম অস্বচ্ছতা। ভাবলাম নফসের আলস্য ও কলবের অস্বচ্ছতা দূর করার জন্য কয়েকদিন রোজা রাখবো। রোজা রাখতে শুরু করলাম। এমতাবস্থায় একদিন উপস্থিত হলাম আমার প্রাণপ্রিয় পীর-মোর্শেদ ইমাম বাহাউদ্দিন নক্শবন্দের মহান সান্নিধ্যে। তিনি পানাহারের আয়োজন করলেন। বললেন, খাও। ওই ব্যক্তি অসুন্দর, যে দাসত্ব করে তার প্রবৃত্তির। তাকে বিপথে নিয়ে যায় প্রবৃত্তিই। শোনো, প্রবৃত্তির প্ররোচনায় রোজা রাখা অপেক্ষা আহার করা উত্তম। আমি বুঝতে পারলাম, নফল ইবাদতের জন্য এমন মহান মোর্শেদের অনুমতি গ্রহণ অপরিহার্য, যিনি প্রকৃতই আল্লাহ্মগ্ন এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত। নিবেদন করলাম, এমন মহান মোর্শেদ যদি কেউ না পায়, তবে সে কী করবে? তিনি বললেন, এরকম ব্যক্তির উচিত হবে অধিক পরিমাণে ক্ষমাপ্রার্থনা করা। প্রতি ওয়াক্তে নামাজ পাঠের পর ইস্তেগফার করতে হবে কমপক্ষে কুড়িবার। যেমন রসুল স. বলেছেন, একবার আমি হৃদয়ে অশান্তি অনুভব করলাম। তখন আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলাম প্রতিদিন এক শত বার করে।

প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে মুক্ত হতে গেলে তার সকল প্রভাব-প্রতিক্রিয়াকে হৃদয় থেকে টেনে বের করে নিক্ষেপ করতে হবে দূরে। হৃদয়ে ভরপুর রাখতে হবে আল্লাহ্র পরিতোষ কামনায়। একমাত্র তাঁকেই করতে হবে কামনা-বাসনা-অভীষ্ট-উদ্দেশ্য-লক্ষ্য। এমতো উদ্দেশ্য পরিপূরণার্থে আধ্যাত্মিক পথের পথিকগণ নিরবচ্ছিন্নরূপে মনে মনে পাঠ করেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহ. বলেছেন, যতোক্ষণ মানুষ তার প্রবৃত্তির সঙ্গে বিজড়িত থাকে, ততোক্ষণ সে প্রবৃত্তির দাস ও শয়তানের অনুগামী। এমতো বিপদ থেকে মুক্ত হতে গেলে বেলায়েত অর্জন অপরিহার্য। আর বেলায়েত নির্ভর করে ফানা ও বাকার উপর। কিন্তু এমতো সমুচ্চ নেয়ামত আবার সকলের ভাগ্যে জোটে না।

আমি বলি, যারা আল্লাহ্র প্রকৃত দাস, তারা বেলায়েতের স্তরে পৌঁছলেই পছন্দ করতে শুরু করেন নিয়তিকে। স্বভাবের বিপরীত হলেও প্রসন্নচিত্তে মেনে নেন তকদীরকে। দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে পরিত্রাণ প্রার্থনা করেন কেবল এই উদ্দেশ্যে যে, দোয়া করা আল্লাহ্র আদেশ। আর প্রভুপালকের দাসত্ব স্বীকার করাই দাসগণের মূল কর্তব্যকর্ম। নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছার অনুগামী তিনি তখন হন না। শয়তান এরকম ব্যক্তিবর্গের কাছে আসার পথই খুঁজে পায় না। কেননা তার মূল সূত্র অপপ্রবৃত্তি তখন নিশ্চিহ্ন। লক্ষণীয়, যে ব্যক্তি রাগী স্বভাবের, শয়তান হত্যাকাণ্ড ও জুলুমকে তার সামনে তুলে ধরে সুন্দর কর্ম হিসেবে। আর যে কোমল স্বভাবের, শয়তান তাকে প্ররোচিত করে জেহাদের ময়দান থেকে পালাতে। শয়তান তাকে আরো প্ররোচনা দেয় মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে অবশ্যপ্রযোজ্য প্রতাপকে পরিত্যাগ করতে, অধিকন্তু কপটতা করতে।

www.eelm.weebly.com

স্বনামধন্য শায়েখ ইয়াকুব চরখী বলেছেন, নফসের গোলামী থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত পৌরুষ অর্জন করা যায় না, যা একজন মানুষকে চিহ্নিত করে প্রকৃত মুমিন বলে। এদিকে ইঙ্গিত করেই এক হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমা কর্তৃক আনীত শরিয়তের পূর্ণ অনুসারী না হওয়া পর্যন্ত কেউ মুমিন হতে পারে না। ইমাম বাগবী হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'শরহে সুন্নাহ' গ্রন্থে। আর আল্লামা নববী তাঁর 'আর রাযীন' গ্রন্থে লিখেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত।

হজরত যোবায়ের থেকে ইবনে আবী হাতেম এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে জুহাক বর্ণনা করেছেন, অংশীবাদীরা একবার রসুল স.কে অতর্কিতে প্রশ্ন করে বসলো, বলো, কিয়ামত হবে কবে? তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াতগুচ্ছ। বলা হয়—

সূরা নাযিআ'ত ঃ আয়াত ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ﴿٤٣﴾
اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ﴿٤٤﴾ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ﴿٤٥﴾ كَاَنَّهُمْ
يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ﴿٤٦﴾

r উহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে 'কিয়ামত সম্পর্কে, 'উহা কখন ঘটিবে?'
r ইহার আলোচনার সহিত তোমার কী সম্পর্ক!
r ইহার পরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট;
r যে উহার ভয় রাখে তুমি কেবল তাহার সতর্ককারী।
r যেই দিন উহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিবে সেই দিন উহাদের মনে হইবে যেন উহারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করিয়াছে!

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল ! তারা আপনাকে বিব্রত করে একথা জিজ্ঞেস করে যে, মহাপ্রলয় কখন সংঘটিত হবে?

এখানে 'মুরসাহা' অর্থ কখন ঘটবে। 'মুরসা' শব্দটির ধাতুমূল 'রাস' অর্থ সংঘটিত হওয়া, বাস্তবায়িত হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া। হাকেম ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, অংশীবাদীদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রসুল স. জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, অথবা প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জানতে চেয়েছিলেন, মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে কখন? তখনই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। তিবরানী ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, তারেক ইবনে শিহাব বলেছেন, রসুল স. প্রায়শই কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করতেন। এমতো অবস্থার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত (৪৩)। বলা হয়—

www.eelm.weebly.com

‘এর আলোচনার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক’। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আরো একটি প্রেক্ষিত বর্ণনা করেছেন হজরত ওরওয়া থেকে ইবনে আবী হাতেম। বিবরণটি এরকম— যখন জনগণ কিয়ামত হওয়ার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানার জন্য রসুল স.কে বার বার জিজ্ঞেস করতে শুরু করলো, তখন তিনি স. এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাকের নিকটে দোয়া করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো ‘এর আলোচনার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক’? অর্থাৎ হে আমার রসুল! এ সম্পর্কে আপনি বিচলিত হচ্ছেন কেনো? কিয়ামত কখন হবে, তা জানা এবং প্রচার করার দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়নি। লক্ষণীয়, এমতো বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথাটিই প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ গোপন রাখার মধ্যে নিশ্চয় রয়েছে কোনো বিশেষ রহস্য, যা ভেদ করার যোগ্যতা ও অধিকার কারোই নেই।

এখানকার ‘ফীমা’ পদের ‘মা’ প্রশ্নবোধকটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক এবং তা ‘মিন জিক্‌রাহা’ বাক্যের বিবৃতি। অর্থাৎ রসুল স.কে সম্বোধন করে এখানে বলা হয়েছে, হে আমার রসুল স.! এ সম্পর্কে আপনি ব্যতিব্যস্ত হতে যাবেন কেনো? কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ জানাবার বিষয় যদি হতো, তবে তা তো আপনাকে জানিয়েই দেওয়া হতো। তা যখন করা হয়নি, তখন বুঝে নিন, বিষয়টি গোপন রাখাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। অথবা মর্মার্থ হবে— কিয়ামত সম্পর্কে আপনিই যখন কিছু জানেন না, তখন তা অন্যকে জানাবেন কী ভাবে? কিংবা এখানকার ‘ফীমা’ বাক্যটি বিধেয় এবং এর উদ্দেশ্য এখানে রয়েছে অনুক্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এমতো প্রসঙ্গের অবতারণা করার উদ্দেশ্য কী? কী লাভ হবে একথা জেনে? এরপর শুরু হয়েছে নতুন বাক্য ‘আনতা মিন জিকরাহা’ (আপনি যার আলোচনায় নিমগ্ন)। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়ায়— আপনিই তো কিয়ামতের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। কেননা আপনি শেষতম নবী। আপনার নবুয়তের জামানা যখন শেষ হবে, তখনই তো সংঘটিত হবে কিয়ামত। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি ও কিয়ামত এরকম পরস্পরলগ্ন (তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী একত্রিত করে দেখালেন)। হজরত মাসতুরাহ ইবনে শাদ্দাদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে আসন্ন কিয়ামতের আগে। যেমন এটা (শাহাদাত অঙ্গুলী) এটার (মধ্যমা অঙ্গুলীর) আগে। তিরমিজি।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে, হে আমার রসুল! এরকম আলোচনার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক? বাক্যটির যোগসূত্র রয়েছে আগের আয়াতের ‘তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে’ কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ জনগণ যা জানার জন্য ব্যাগ্র, তা আপনি প্রশ্রয়যোগ্য বিষয় বলে বিবেচনা করবেন কেনো, যে সম্পর্কে আপনাকে জানানোই হয়নি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘এর পরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের নিকট (৪৪); যে তার ভয় রাখে, তুমি কেবল তাদের সতর্ককারী’

www.eelm.weebly.com

(৪৫)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনুন, এ বিষয়ের জ্ঞানকে আল্লাহ্ গোপন রাখাই পছন্দ করেন। আর আপনাকে তো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেবল একথা বলতে যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, তা যখনই ঘটুক না কেনো। এররকম প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেবল এ বিষয়ে সতর্ক করণার্থে যে, কিয়ামতের কথা স্মরণ করে মানুষ যেনো নিজেকে সাবধান করে নেয়, বিরত থাকে ওই সকল কার্যাবলী থেকে, যা কিয়ামত দিবসে ডেকে আনবে সমূহ বিপদ। সুতরাং আপনি সতর্ক করতে থাকুন কেবল তাদেরকে, যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় আত্মসংশোধনের বিষয়টিকে। তারাই তো সফলকাম।

শেষোক্ত আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে, যেনো তারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা, অথবা এক প্রভাত অবস্থান করেছে'।

এখানে 'আ'শীয়াতান' অর্থ এক সন্ধ্যা এবং 'দ্বুহা' অর্থ এক প্রভাত। উল্লেখ্য, সন্ধ্যা ও প্রভাত একই দিনের দু'টি অংশ। অর্থাৎ অত্যল্প সময়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যখন মহাপ্রলয় অনুষ্ঠিত হবে, অনুষ্ঠিত হবে মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারপর্ব, তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হবে প্রকৃত সত্য। আখেরাতের অনন্ত জীবনের তুলনায় পৃথিবী এবং কবরের জীবন যে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, সে কথা বুঝতে পেরে তারা আক্ষেপে জর্জরিত হয়ে আপন মনে বলতে থাকবে, হায়! কী করলাম আমরা! পৃথিবীর সুখ-সম্ভোগে মত্ত হয়ে অস্বীকার করলাম আখেরাতকে। এখন তো দেখছি আখেরাতের অনন্ত জীবনের তুলনায় পৃথিবীর জীবন একটি সন্ধ্যা, অথবা একটি সকাল মাত্র। তাদের এমতো আক্ষেপের কথা অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে 'আমরা দুনিয়ায় অবস্থান করেছিলাম এক দিন, অথবা দিনের কিয়দাংশ সময়'। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াত যেনো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের 'মহাপ্রলয় কখন সংঘটিত হবে' প্রশ্নটির যথার্থ উত্তর।

সূরা আ'বাসা

মহাপুণ্যধাম মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরাখানির রুকুর সংখ্যা ১ এবং আয়াতের সংখ্যা ৪২।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শোরাইহ্ ইবনে মালেক ইবনে রবীয়া ফেহরী পরিচিত ছিলেন ইবনে উম্মে মাকতুম নামে। তিনি ছিলেন আমের ইবনে লুয়াইয়ের গোত্রভূত। একদিন তিনি রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন। রসুল স. তখন আলাপ করছিলেন উতবা, আবু জেহেল, ইবনে হিশাম, আব্বাস ইবনে মুত্তালিব, উবাই ইবনে খলফ, উমাইয়া ইবনে খলফ প্রমুখ কুরায়েশ গোত্রপতিদের সঙ্গে। হজরত ইবনে উম্মে মকতুম ছিলেন দৃষ্টিহীন। তাই তিনি রসুল স. এর আচরণের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি না করতে পেরে বার বার বলে

www.eelm.weebly.com

যাচ্ছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল। হে মহান শিক্ষাদাতা! আল্লাহ্ আপনাকে যা শিখিয়েছেন, তা থেকে আমাকেও কিছু শিক্ষা দিন। প্রত্যাদেশিত বাণীসমূহ থেকে আমাকেও কিছু পাঠ করে শোনান। আমি যে অন্ধ। রসুল স. গোত্রপতিদের সঙ্গে আলাপচারিতাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন এই ভেবে, তারা যদি ইমান আনে, তবে সাধারণ জনতাও ইসলাম গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে। তাই হজরত ইবনে উম্মে মাকতুমের কথায় বার বার তাঁর মনোযোগ ব্যহত হতে লাগলো। তিনি স. এই ভেবে আরো বিরক্ত বোধ করলেন যে, গোত্রপতিরা একটা ছুতা পেয়ে যেনো আবার এরকম মন্তব্য না করে বসে, ইসলামের অনুসারীরা আসলে এরকম অন্ধ-বিকলাঙ্গ ক্রীতদাসেরাই। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হয় নিম্মোক্ত আয়াতগুচ্ছ—

সূরা আ'বাসা ঃ আয়াত ১—১৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ﴿١﴾ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ﴿٣﴾ اَوْ
يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ﴿٤﴾ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ﴿٥﴾ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ﴿٦﴾ وَمَا
عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ﴿٧﴾ وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشٰى ﴿٩﴾ فَاَنْتَ
عَنْهُ تَلَهّٰى ﴿١٠﴾ كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿١٢﴾ فِيْ صُحُفٍ
مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾

q সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল,
q কারণ তাহার নিকট অন্ধ লোকটি আসিল।
q তুমি কেমন করিয়া জানিবে— সে হয়ত পরিশুদ্ধ হইত,
q অথবা উপদেশ গ্রহণ করিত, ফলে উপদেশ তাহার উপকারে আসিত।
q পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না,
q তুমি তাহার প্রতি মনোযোগ দিয়াছ।
q অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হইলে তোমার কোন দায়িত্ব নাই,
q অন্যপক্ষে যে তোমার নিকট ছুটিয়া আসিল,
q আর সে সশংকচিত্ত,
q তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিলে;
q না, ইহা ঠিক নহে, ইহা তো উপদেশবাণী,
q যে ইচ্ছা করিবে সে ইহা স্মরণ রাখিবে,

www.eelm.weebly.com

- উহা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে
- যাহা উন্নত, পবিত্র,
- মহান, পূত-চরিত্র লিপিকারের হস্তে লিপিবদ্ধ।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— রসুল স. বিরক্তিতে ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং ফিরেয়ে নিলেন তাঁর মুখ। কারণ তাঁর নিকটে তাঁর অন্ধ সহচর এসে বার বার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছিলো। এখানকার দ্বিতীয় আয়াতখানি প্রথম আয়াতের 'ভ্রুকুঞ্চন' ও 'বিমুখতা'র কারণ। অর্থাৎ 'আবাসা' ও 'তাওয়াল্লা' এখানে তৎসন্নিহিত কর্মপদ।

তিরমিজি ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, এই আয়াতে 'অন্ধ লোকটি' বলে বুঝানো হয়েছে সাহাবী ইবনে উম্মে মকতুমকে। তিনি আরো বলেছেন, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন ইবনে উম্মে মকতুম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম জন! আমার উপরে আপনি কি অপ্রসন্ন? তিনি স. বললেন, না। এরকম বর্ণনা এসেছে হজরত আনাস থেকেও। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেমও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথা টুকুও— এরপর থেকে রসুল স. ইবনে উম্মে মাকতুমকে স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে দেখতেন। দেখা হলেই তাঁকে সমাদর করতেন। বলতেন, অভিনন্দন ওই ব্যক্তির জন্য, যার কারণে আমার প্রিয়তম পালনকর্তা আমাকে ভর্ৎসনা করেছেন। তাঁকে দেখলেই বলতেন, বৎস! কিছু বলতে চাও?

তিরমিজি ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. দুই যুদ্ধের সময় তাঁর অনুপস্থিতিতে ইবনে উম্মে মকতুমকে মদীনার সাময়িক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে হজরত ইবনে উম্মে মকতুমকে অন্ধ বলায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি দেখতে পেতেন না বলেই তখন রসুল স.কে সম্বোধন করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই তাঁর এমতো আচরণ ক্ষমার্হ।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তুমি কেমন করে জানবে, সে হয় তো পরিশুদ্ধ হতো'। 'ওয়ামা ইয়াদরীকা' অর্থ তুমি কেমন করে জানবে। এখানকার 'মা' অব্যয়টি না-সূচক। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি তো জানেন না। মূলত প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক হিসেবেই না-সূচক। রসুল স. এর এমতো অনবহিতিই এখানে একটি অজুহাত হিসেবে গণ্য হয়েছে। অর্থাৎ তিনি স. যদি তাঁর মনের অবস্থা জানতেন, তবে তাঁকে ফেলে অন্যদিকে মনোযোগী হতেন না। কথাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে রসুল স. এর প্রভুত মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত। যেমন—

বক্তব্যের সূচনায় লক্ষ্য করা যায়, সরাসরি সম্বোধন না করে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে, প্রথম পুরুষে অনুপস্থিত জনকে লক্ষ্য করে। এতে করে এই ধারণাটি পাল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, উপেক্ষা করার বিষয়টি আপনার দ্বারা সম্পন্ন হয়নি, সম্পন্ন হয়েছে অন্য কারো দ্বারা। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, একজন

www.eelm.weebly.com

মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যেই এখানে সম্বোধন করা হয়েছে অনুপস্থিত জনকে। এভাবে ব্যাখ্যাটি দাঁড়ায়— কর্মের ফলাফল নির্ভর করে উদ্দেশ্যের উপর। আর হজরত ইবনে উম্মে মকতুমকে উপেক্ষা করা নিশ্চয় রসুল স. এর উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং তিনি ভেবেছিলেন, ইবনে উম্মে মকতুম তো ইসলাম গ্রহণ করেছেনই। সুতরাং তাঁর শিক্ষা দীক্ষা একটু দেরীতে হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু কুরায়েশ গোত্রপতিরা এখনও যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করেনি তাই তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তারা এখান থেকে এখন চলেও যেতে পারে। তখন তাদেরকে ইসলামের বিষয়ে বুঝানোর সুযোগটি যাবে হারিয়ে। আর কথাবার্তার মাধ্যমে এখনই যদি তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ইমান আনে, তবে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পরিসর হবে অধিকতর প্রশস্ত, শক্তি যাবে বেড়ে। একারণেই তিনি স. তখন অধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন ওই গোত্রপতিদেরকেই।

'তুমি কেমন করে জানবে' বলে এখানে রসুল স. এর অনবহিতিকেই বানানো হয়েছে একটি অজুহাত। এভাবে এই অজুহাতকেই বানানো হয়েছে তাঁর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার একটি নিমিত্ত।

মধ্যম পুরুষে সম্বোধন করে এখানে রসুল স. এর ব্যক্তিত্বকে করা হয়েছে সুমহান। এভাবে দূরীভূত করা হয়েছে ওই ধারণাটির, যার উদ্ভব ঘটতো প্রথম পুরুষে সম্বোধন করলে।

অজুহাত প্রদর্শনের সম্পর্ক এখানে করা হয়েছে সরাসরি রসুল স. এর সঙ্গে। এভাবে এখানে এই বিষয়টিকেই সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, হে আমার রসুল! এতে অবশ্য আপনার কোনো হাত ছিলো না। বরং আপনার অনবহিতি আপনার এমতো আচরণের পক্ষের একটি যথাযথ অজুহাতই বটে।

'লাআ'ল্লাহু ইয়ায্যাক্কা' অর্থ সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনার মনোযোগ পেলে ইবনে উম্মে মকতুম হয়তো পরিশুদ্ধ হতো পরিপূর্ণরূপে। মুক্ত হতে পারতো প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার প্রবৃত্তিপরায়ণতা থেকে, অংশীবাদিতার সর্বদূরবর্তী অপরিচ্ছন্নতা থেকে, বস্তুজগতের প্রতিটি মৌলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রভাব থেকে, কলব, রূহ, সির, খফি, আখফা লতিফাগুলোর অতি সূক্ষ্ম অমনোযোগিতা থেকেও। এ সকল কিছু তো অর্জিত হওয়া সম্ভব কেবল আপনার সুমহান নৈকট্য ও পরিপূর্ণ মনোনিবেশনের (তাওয়াজ্জোহের) মাধ্যমে, নবুয়তের উৎকর্ষতার আলোক সম্পাতে।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসতো'। এখানে 'উপদেশ গ্রহণ করতো' অর্থ আল্লাহ্র স্মরণে নিমগ্ন হতো। আর 'উপদেশ তার উপকারে আসতো' অর্থ আল্লাহ্র ওই স্মরণমগ্নতা দ্বারা সে লাভ করতো প্রভূত কল্যাণ। সূদৃঢ় হতো তার হুজুরে কলব। সে অর্জন করতে পারতো আল্লাহ্র রহমতের অধিকতর আশা এবং শাস্তির অধিকতর ভীতি। এখানকার 'ইয়াজ্জাক্কারু' কথাটি মূলতঃ ছিলো 'ইয়াতাজাক্কারু'।

www.eelm.weebly.com

'সিহাহ্' অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, 'জিক্‌রা' অর্থ অধিক জিকির। সাধারণ 'জিকির' অপেক্ষা 'জিক্‌রা' অধিকতর সুদৃঢ় ও আধিক্যজ্ঞাপক। আগের আয়াতের 'লাআ'ল্‌লাহু ইয়ায্‌যাক্‌কা' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে পুণ্যবান (আবরার) গণের চূড়ান্ত উৎকর্ষের প্রতি, আর পুণ্যাত্মা (আখইয়ার)গণের শেষ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতের 'ইয়াজ্‌জাক্‌কারু' দ্বারা। লক্ষণীয়, সিদ্দীক ও নৈকট্যভাজন (মুকার্‌রাবীন)গণের আলোচনা এখানে আসেনি। কেননা এই মাকামটি হচ্ছে আমিত্বের অধিষ্ঠান। অর্থাৎ ইচ্ছাস্বাধীনতা দ্বারা যা কিছু অর্জন করা যায়, তার অধিষ্ঠান। এর ঊর্ধ্বের স্তরসমূহের আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। বলাবহুল্য, এর ঊর্ধ্বের মর্যাদাসমূহ তো লাভ হতে পারে কেবল আল্লাহ্‌র নিছক দয়া-অনুকম্পায়। পুণ্যকর্মসমূহ এক্ষেত্রে কোনো উপকারে আসে না। এ বিষয়টি তো স্বতঃসিদ্ধ যে, নৈকট্যভাজনগণের মনোনয়ন আসে কেবল আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। তাঁর এমতো মনোনয়নের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে কেবল নবী-রসুলগণের সঙ্গে। আর তাঁদের সৌজন্যে এমতো মর্যাদা লাভ করতে পারেন ওলীআল্লাহ্‌গণ। আল্লাহ্‌পাক যাকে ইচ্ছা তাকেই এমতো নেয়ামত দানে ধন্য করেন। এতো হচ্ছে নিছক তাঁর ফজল। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

এখানে 'সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো, অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো' কথাটির উদ্দেশ্য এরকম নয় যে, হজরত ইবনে উম্মে মকতুম একই সঙ্গে পরিশুদ্ধ হওয়া ও উপদেশ গ্রহণ করার যোগ্য নন। বরং কথাটি উদ্দেশ্য হবে এরকম যে, যদি তাঁর প্রতি তিনি স. মনোযোগী হতেন, তবে তাঁর কমপক্ষে দু'টোর একটি তো অর্জিত হতোই। কথাটির মধ্যে আবার প্রচ্ছন্নভাবে এই কথাটিও নিহিত রয়েছে যে, হজরত ইবনে মকতুমের মধ্যে যে যোগ্যতা রয়েছে, সে যোগ্যতা ওই গোত্রপতিদেরও নেই। তারা ইসলাম গ্রহণও করবে না। সুতরাং রসুল স. যে উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি মনোযোগ দিতে চাচ্ছেন, তা কখনো সফল হবে না। আর আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ও সেরকম নয়। বরং তিনি চান তাঁর রসুল মনোযোগী হন আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র ইবনে উম্মে মাকতুমের প্রতি।

কোনো কোনো বিদ্বান আবার বলেছেন, আগের আয়াতের 'সে হয়তো' কথাটির 'সে' সর্বনাম দ্বারা বুঝানো হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনি হয়তো আশা করছেন, ওই গোত্রপতিরা পরিশুদ্ধ হবে এবং উপদেশ গ্রহণ করবে। কিন্তু আপনি তো জানেন না, আপনার এমতো আশা আদৌ পূরণ হবে কিনা। এমতাবস্থায় এখানকার 'কেমন করে জানবে' বাক্যের 'জানবে' এর প্রথম কর্মপদ হবে 'কেমন করে' এবং দ্বিতীয় কর্মপদ হবে 'সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো'। আল্লাহ্‌ই সমধিক জ্ঞাত।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'পক্ষান্তরে যে পরওয়া করে না (৫), তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছো (৬)। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোনো দায়িত্ব নেই' (৭)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! তারা তো তাদের

www.eelm.weebly.com

ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে গর্বিত, উদ্ধত। মহাসত্যের আহ্বানের কোনো মূল্যই নেই তাদের কাছে। অথচ আপনি তাদেরই পথপ্রাপ্তির আশায় ব্যাকুল। সুতরাং তারা পরিশুদ্ধ হতে না চাইলেও কি তাদেরকে জোর করে হেদায়েত করবেন? আপনার কাজ তো কেবল মহাসত্যের দিকে আহ্বান জানানো। তারা এ আহ্বানকে মান্য করবে কি করবে না, সেটা তাদের ব্যাপার। তারা ইমান না আনলে আপনাকে তো আর একারণে অভিযুক্ত করা হবে না।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'অন্যপক্ষে যে তোমার নিকট ছুটে এলো (৮), আর সে সশংকচিত্ত (৯) তুমি তাকে উপেক্ষা করলে' (১০)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! দেখুন, ইবনে উম্মে মকতুম জ্ঞানাহরণের জন্য কতো অনুরাগ নিয়ে আপনার কাছে ছুটে এলো, আর তার অন্তর আল্লাহ্র ভয়ে ভীতও। অথচ আপনি তার প্রতি মনোনিবেশই করলেন না। এটা কি ঠিক হলো।

এখানকার 'তোমার নিকট ছুটে এলো' এবং 'আর সে সশংকচিত্ত' বাক্য দু'টো অবস্থাজ্ঞাপক। উল্লেখ্য, শুরুর আয়াতে 'ভ্রূকুঞ্চিত করলো' ও 'মুখ ফিরিয়ে নিলো' কথাদু'টোর দ্বারা যে বক্তব্য শুরু করা হয়েছিলো, আলোচ্য আয়াতত্রয়ের শেষ বাক্যে তা লাভ করলো পরিণত রূপ। এভাবে পুরো বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! ইবনে উম্মে মকতুম সম্পর্কে আপনি যে আচরণ করেছেন, তা আমার মনঃপুত নয়। এর বিপরীত আচরণই আমার মনঃপুত। অবশ্য আপনার উদ্দেশ্য মহৎ। তাই আপনাকে এ সম্পর্কে আর ভর্ৎসনা করা হলো না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'না, এটা ঠিক নয়, এটা তো উপদেশবাণী (১১), যে ইচ্ছা করবে, সে এটা স্মরণে রাখবে' (১২)। প্রথম বাক্যটির অর্থ— এটা সন্দেহাতীতরূপে সত্য যে, সমগ্র কোরআন, অথবা কোরআনের আয়াতসমূহ অবধারিত করে আল্লাহ্র জিকিরকে। এখানে 'ইন্নাহা' বাক্যের 'হা' (এটা) সম্পর্কযুক্ত হবে কোরআনের সঙ্গে। আর এরকম হওয়া একারণেই শোভন হবে যে, এর বিধেয় স্ত্রীলিঙ্গবাচক। আর 'যে ইচ্ছা করবে সে এটা স্মরণ রাখবে' অর্থ সুতরাং যে চায় সে যেনো সমগ্র কোরআন, অথবা এর আয়াতসমূহ স্মৃতিস্থ করে। উল্লেখ্য, আয়াতের বক্তব্যভঙ্গিমা দৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে, কোরআন হেফজ করা না করা মানুষের ইচ্ছাধীন। তবে এর মর্মার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে ভর্ৎসনা করা হয়েছে কোরআন, অথবা এর আয়াতসমূহ স্মৃতিস্থ না করার প্রতি এবং একই সঙ্গে প্রশংসা করা হয়েছে তাদের, যারা আল্লাহ্র জিকির করে।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'এটা আছে মর্যাদাসম্পন্ন লিপিসমূহে (১৩) যা উন্নত, পবিত্র (১৪), মহান পুতঃপবিত্র লিপিকারের হস্তে লিপিবদ্ধ' (১৫, ১৬)।

এখানকার 'মর্যাদাসম্পন্ন লিপিসমূহে' বাক্যটি ১১ সংখ্যক আয়াতের 'উপদেশবাণী' এর বিশেষণ, অথবা ওই আয়াতেরই 'এটা তো' পদের দ্বিতীয়

www.eelm.weebly.com

বিধেয়, কিংবা বিধেয় একটি অনুক্ত উদ্দেশ্যের। অর্থাৎ ওই উপদেশবাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে সম্মানিত সুরক্ষিত ফলকে (লওহে মাহফুজে), অথবা ফেরেশতাগণ কর্তৃক সংরক্ষিত লিপিসমূহে, কিংবা বিভিন্ন নবীর উপরে অবতীর্ণ আকাশী পুস্তিকা সমূহে (সহিফায়)। সহিফা বা আকাশী পুস্তিকার কথা বলা হয়েছে অন্যান্য আয়াতেও। যেমন 'অবশ্যই তা বিধৃত হয়েছে পূর্ববর্তীগণের যবুরে' 'অবশ্যই একথা বিবৃত হয়েছে পূর্ববর্তী সহিফাসমূহে' 'ইব্রাহিম ও মুসার সহিফা সমূহে'। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'মর্যাদাসম্পন্ন লিপিসমূহ' অর্থ সাহাবীগণের ওই সকল নথিপত্র, যেগুলোতে তাঁরা প্রত্যাদেশাবলী লিপিবদ্ধ করতেন রসুল স. এর কাছে শুনে শুনে।

'যা উন্নত, পবিত্র' অর্থ আল্লাহ্পাকের সমীপে সমুন্নত ও মহিমময়। অথবা সপ্ত আকাশে উন্নীত। আর 'পবিত্র' অর্থ ঋতুবতীদের স্পর্শ থেকে পবিত্র।

'সাফারাতিন' অর্থ লিপিকার। শব্দটি বহুবচন 'সাফিরুন' এর। বই পুস্তককে একারণেই বলে 'সফর'। আর সফরের বহুবচন হচ্ছে 'আসফার'। এভাবে এখানকার 'মহান, পুতপবিত্র লিপিকার' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— মানুষের আমল লেখক ফেরেশতাবর্গ, অথবা নবী-রসুলগণ, কিংবা ওহীবাহক ফেরেশতাগণ। অন্যান্য বিদ্বজ্জন বলেন, 'সাফরাতুন' বহুবচন 'সাফীর' এর। আর 'সাফীর' অর্থ ওই মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি, যে আপোষ-মীমাংসা করে দেয় বিবদমান দু'টি দলের মধ্যে। এখানে ফেরেশতা ও মানব জাতির মাধ্যম হচ্ছেন নবী রসুলগণ। আমি বলি, মাধ্যম হচ্ছেন প্রত্যাদেশ লিপিবদ্ধকারীগণ। উপরন্তু এই উম্মতের আলেমগণও মাধ্যম। তাঁরা হচ্ছেন রসুল স. ও সাধারণ উম্মতের মধ্যস্থতাকারী।

রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন অধ্যয়ন করে এবং তা অপরকে শেখায়, সে মহান ও পুতঃপবিত্র লিপিকারগণের দলভূত। আর যে ব্যক্তি কোরআন অনুশীলনের সাথে সাথে এর দুরূহ বিধানগুলির মর্মোদ্ধারে ব্রতী হয়, সে পায় দ্বিগুণ বিনিময়। জননী আয়েশা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। হাদিসে উল্লেখিত দ্বিগুণ বিনিময় হচ্ছে কোরআন অধ্যয়ন ও কোরআনের বিধান উদ্ধার প্রচেষ্টার বিনিময়। আরেকটি বিষয় এখানে সুস্পষ্ট যে, কোরআনের তত্ত্বজ্ঞগণের বিনিময়ের কথা এখানে রয়েছে অনুল্লেখিত। এতে করে বুঝা যায়, তাদের বিনিময় অপরিমেয়।

'কিরাম' অর্থ পুত-চরিত্র, যশস্বী, বিশ্বাসীদের প্রতি কৃপাপরবশ, কল্যাণ প্রয়াসী, ক্ষমা প্রার্থনাকারী। 'বারারাহ্' অর্থ মহান, সংযমী, আল্লাহ্ভীরু। বলাবহুল্য, ধর্মপ্রাণ বিদ্বানগণ এমনই হন। আর এখানকার 'বারারাহ্' পদটি 'সাফারাহ্' পদের দ্বিতীয় বিশেষণ।

সূরা আ'বাসা ঃ আয়াত ১৭—৩২

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ﴿١٧﴾ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ﴿١٨﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ

www.eelm.weebly.com

خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿۱۹﴾ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ﴿۲۰﴾ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴿۲۱﴾ ثُمَّ اِذَا
شَآءَ اَنْشَرَهٗ ﴿۲۲﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ﴿۲۳﴾ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى
طَعَامِهٖٓ ﴿۲۴﴾ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿۲۵﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ﴿۲۶﴾
فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﴿۲۷﴾ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿۲۸﴾ وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ﴿۲۹﴾ وَّ
حَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿۳۰﴾ وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ﴿۳۱﴾ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿۳۲﴾

q মানুষ ধ্বংস হউক! সে কত অকৃতজ্ঞ!

q তিনি উহাকে কোন্ বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?

q শুক্রবিন্দু হইতে, তিনি উহাকে সৃষ্টি করেন, পরে উহার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন,

q অতঃপর উহার জন্য পথ সহজ করিয়া দেন;

q অতঃপর উহার মৃত্যু ঘটান এবং উহাকে কবরস্থ করেন।

q ইহার পর যখন ইচ্ছা তিনি উহাকে পুনর্জীবিত করিবেন।

q না, কখনও না, তিনি উহাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, সে এখনও উহা পুরাপুরি করে নাই।

q মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক!

q আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি,

q অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি;

q এবং উহাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য;

q দ্রাক্ষা, শাক-সব্জি,

q যায়তূন, খর্জুর,

q বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান,

q ফল এবং গবাদি খাদ্য,

q ইহা তোমাদের ও তোমাদের আন'আমের ভোগের জন্য।

প্রথমোক্ত আয়াতখানি একটি বিস্ময়প্রকাশক অভিসম্পাত। 'কুতিলা' পদটি মানবজাতির জন্য একটি বিস্ময়উদ্রেকক নিকৃষ্ট সম্বোধন। বিস্ময় একারণে যে, মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে রয়েছে ইমান গ্রহণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যোগ্যতা। কিন্তু সে যোগ্যতা তারা কাজে লাগায় না। ফলে হয়ে যায় বেইমান ও অকৃতজ্ঞ। উদ্ধৃত অভিসম্পাতটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু রোষ ও তিরস্কারে ভরপুর।

ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবু লাহাব নন্দন উতবাকে লক্ষ্য করে। সে প্রকাশ্যে বলেছিলো, আমি নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভুপালককে অস্বীকার করি। ঘটনাটি ছিলো এরকম— রসুল স.

www.eelm.weebly.com

তাঁর আদরের দুলালী হজরত উম্মে কুলসুম ও তাঁর সহোদরাকে বিবাহ দিয়েছিলেন আবু লাহাবের দুই পুত্র উতবা এবং উতাইবার সঙ্গে। যখন সুরা লাহাব অবতীর্ণ হলো, তখন আবু লাহাব তার ওই দুই ছেলেকে বললো, তোমরা যদি মোহাম্মদের দুই কন্যার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ না ঘটাও, তবে বুঝবো, তোমরা আমার অবাধ্য সন্তান। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উতবা বিবাহবিচ্ছেদ ঘটালো হজরত উম্মে কুলসুমের সঙ্গে। সে রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে দম্ভভরে বললো, আমি আপনার ধর্মমতকে প্রত্যাখ্যান করি। একথা বলেই সে রসুল স. এর পরিধেয় বস্ত্রের একাংশ টেনে ছিঁড়ে ফেললো। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ তাঁর সারমেয়গুলোর মধ্যে যে কোনো একটি সারমেয়কে যেনো তোমার উপরে লেলিয়ে দেন। এর কিছুদিন পর উতবা এক বাণিজ্যবহরের সঙ্গে যাত্রা করলো সিরিয়া অভিমুখে। পথিমধ্যে যাওরা নামক এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে যাত্রাবিরতি করলো বহরটি। স্থাপন করলো শিবির। রাত হলো। একটি নেকড়ে এসে নিঃশব্দে চক্কর দিতে শুরু করলো শিবিরের চারদিকে। উতবা বললো, মোহাম্মদের বদদোয়া এবার না জানি কার্যকর হয়। তাকে শংকিত দেখে তার সঙ্গী-সাথীরা তাদের সকল মালপত্র দিয়ে নির্মাণ করলো একটি উঁচু স্তূপ। তার উপরে উতবাকে উঠিয়ে তারা শুয়ে পড়লো স্তূপটিকে ঘিরে। গভীর রাতে নেকড়েটি তাদেরকে একলাফে ডিঙিয়ে আক্রমণ করলো উতবাকে। সঙ্গে সঙ্গে অক্কা পেলো আল্লাহ্র দুশমন উতবা।

আমি বলি, আবু লাহাবের অপর দুই পুত্র উতাইবা ও মুয়াইতীব ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হুনায়েন যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেছিলেন তাঁরা। আর তখন তাঁরা ওই সকল সৈন্যেরও অন্তর্ভূত ছিলেন, যাঁরা ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর পুনরায় একত্রিত হয়েছিলেন রসুল স. এর আহ্বানে।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'তিনি তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন'? প্রশ্নটি স্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা স্বীকার করো যে, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নিতান্ত অনুল্লেখ্য এক ফোঁটা পানি থেকে। আগের আয়াতের 'মা আকফারাহ্' এর 'মা' প্রশ্নবোধকটির বিবরণ হচ্ছে এখানকার 'মিন আইয়্যি শাইইন' (কোন্ বস্তু থেকে)। এরকম করা হয়েছে বক্তব্যটি আকর্ষণীয় করণার্থে। এভাবে মানুষকে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, অতি তুচ্ছ পদার্থ থেকে তোমার উৎপত্তি। সুতরাং অকৃতজ্ঞতা ও অহংকার তোমাকে মানায়ই না।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'শুক্র বিন্দু থেকে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেন, পরে তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন'। উল্লেখ্য, আগের আয়াতের 'কোন বস্তু থেকে' কথাটির নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে বিষয়টি, তার বিশেষণ প্রকাশিত হয়েছে এখানকার 'শুক্রবিন্দু থেকে' কথাটির মধ্যে। এরপর দেওয়া হয়েছে মানুষের সৃজন ও পরিণতির বিবরণ। বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক প্রথমে তাকে মাতৃউদরে দান করেন এক অবয়ব, এরপর তার জন্য নির্ধারণ করেন একটি সুনির্দিষ্ট পরিমিতি। অর্থাৎ তাঁর নির্দেশে একজন ফেরেশতা এসে মাতৃজঠরস্থিত

www.eelm.weebly.com

ওই মানবশিশুর জন্য লিখে দেন চারটি বিষয়— আয়ুষ্কাল, কর্ম, জীবনোপকরণ এবং সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য। হাদিসটির সবিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সুরা মুরসালাতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে উল্লেখিত হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী-মুসলিমের এক বর্ণনায়। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন' কথাটির অর্থ পরিমিত বিকাশসাধন করেন তার দেহের। তারা আরো বলেন, কথাটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে, সৃষ্টি শুরু হয় শুক্রকণা থেকে, তারপর পর্যায়ক্রমে ঘটানো হয় তার পরিমিত বিকাশ। তবে একথা বললে অতুক্তি হয় না যে, এ সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যাটিই উত্তমতর।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন'। এখানে 'আস্‌সাবীল' অর্থ পথ। 'পথ' শব্দটি এখানে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার কর্মপদ। অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে নির্গমনের পথ। আর 'ইয়াস্‌সারা' অর্থ সহজ, সরল, সুগম। কথাটি 'পথে'র ব্যাখ্যা। অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পথটি তার জন্য করে দেন সুগম। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন মুকাতিল ও সুদ্দী। অথবা বক্তব্যার্থটি হতে পারে এরকম— আল্লাহ্‌পাক নবী-রসুল প্রেরণ করে ও কিতাব অবতীর্ণ করে তোমাদের আল্লাহ্‌প্রাপ্তির পথকে করে দিয়েছেন সহজ, যেনো এতে করে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রকৃষ্ট প্রমাণপঞ্জী। এমতো ব্যাখ্যার পরিপোষকতায় উপস্থাপন করা যেতে পারে এই আয়াত 'অতএব যে দান করে, সংযমী হয়, প্রত্যয়ন করে সত্যের, অচিরেই আমি তার সুখের বিষয়ের জন্য দান করবো সহজ পথ। যে কৃপণতা করে, উদ্ধত হয় এবং প্রত্যাখ্যান করে উত্তম বিষয়কে, আমি তাকে দান করবো সহজ পথ কষ্টকর বিষয়ের প্রতি'। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'পথ সহজ করে দিয়েছেন' অর্থ সহজ করে দিয়েছেন পার্থিব জীবনের সূচনা ও পরিণতি। সুগম করে দিয়েছেন জান্নাতের পথ, নয়তো জাহান্নামের। সুতরাং জেনে রেখো, এই পৃথিবী তোমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়। যেমন হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা পৃথিবীতে প্রবাসী, অথবা পথচারী। ইবনে মাজাও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে, তিনি স. আরো বলেছেন, এ জগতে তোমরা নিজেদেরকে কবরবাসী বলে মনে কোরো।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তৎপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন'। লক্ষণীয়, এতোক্ষণ ধরে বর্ণিত নেয়ামতসমূহের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মৃত্যুকেও। কেননা চিরস্থায়ী বাসস্থানে গমন করতে হয় মৃত্যুর তোরণ পেরিয়েই। রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীগণের জন্য মৃত্যু এক 'অনন্য উপহার'। হাদিসটি হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন বায়হাকী, আবু নাঈম, তিবরানী ও হাকেম। এ জগতকে নরকের পথ বলা যেতে পারবে তখন, যখন মানুষ তার জীবনপথকে বেছে নিতে করবে ভুল। আর এমতো পথনির্বাচনের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের কিছু নেই। বিষয়টি মানুষের স্বেচ্ছাধীন।

www.eelm.weebly.com

রসুল স. বলেছেন, আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই উদাহরণটি— জনৈক প্রতাপশালী ব্যক্তি একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলো। তারপর এক ঘোষককে নির্দেশ দিলো, সবাইকে নিমন্ত্রণ জানাও। ঘোষকের আহ্বান শুনে কেউ কেউ উপস্থিত হলো ওই প্রাসাদে। পানাহার করলো পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে। নিমন্ত্রণকারীও হলো আনন্দিত। আর যারা এলো না, তারা হলো বঞ্চিত। নিমন্ত্রণকারীও রুষ্ট হলো তাদের প্রতি। এখানে প্রতাপশালী ব্যক্তি হলেন আল্লাহ্। ঘোষক আমি। প্রাসাদ জান্নাত। হাদিসটি হজরত রবীয়া জারাশী এবং হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে দারেমী ও বোখারী।

'ফা আক্ববারাহ্' অর্থ এবং তাঁকে কবরস্থ করেন। অর্থাৎ তাঁর বিধানানুসারেই মানুষ তাদের প্রয়াত স্বজনদের মরদেহ সংরক্ষণ করে মৃত্তিকাভ্যন্তরে, কবরে। বলা বাহুল্য, মরদেহকে সমাধিস্থ করার বিধানটিও একটি নেয়ামত। কেননা এই বিধানে মানুষের মরদেহকে সমাধিস্থ করা হয়। নতুবা মানুষের মরদেহগুলোকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রাখা হতো অন্যান্য পশু-পাখির মতো।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনর্জীবিত করবেন'। কথাটির মর্মার্থ— মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অনিবার্য। তারপর বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদেরকে দেওয়া হবে যথোপযুক্ত প্রতিফল। ন্যায়-বিচারের দাবিতো এটাই।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'না, কখনও নয়, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে এখনও তা পুরোপুরি করেনি'। একথার অর্থ— না, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা কখনো সমমর্যাদাসম্পন্ন হতে পারে না, সমান্তরাল হতে পারে না কৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্নেরা। বিশ্বাসীরা কৃতজ্ঞ ও দায়িত্বপরায়ণ, পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীরা উদাসীন। তারা এখনো তো আল্লাহ্র আদেশ অমান্যই করে চলেছে। আয়াতের শুরুতে 'কাল্লা' (কখনো নয়) কথাটি এভাবে এখানে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য রচনা করেছে।

এরপরের আয়াতগুলোতে বিবৃত হয়েছে আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহসম্ভারের কথা এভাবে— 'মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক (২৪)। আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি (২৫), অতঃপর আমি ভূমিকে প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি (২৬), এবং তাতে উৎপন্ন করি শস্য (২৭); দ্রাক্ষা, শাকসবজি (২৮), যয়তুন, খর্জুর (২৯), বহুবৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান (৩০), ফল ও গবাদি খাদ্য (৩১), এটা তোমাদের ও তোমাদের আনআ'মের ভোগের জন্য' (৩২)।

এখানে 'ভূমি বিদারণ' বা ভূমি কর্ষণের সম্পর্ক করেছেন আল্লাহ্পাক তাঁর নিজের সঙ্গে। কেননা মূল কর্মনির্বাহী তো তিনিই। শস্য উৎপাদনের সম্পর্কটিও এভাবে তিনি করেছেন তাঁর নিজের সঙ্গে। কেননা মূল সৃজয়িতাও তিনিই। 'ইনাবাঁও ওয়া ক্বদ্ববা' অর্থ দ্রাক্ষা, শাক সবজি। 'ক্বদ্ববুন' শব্দটি মূলত ধাতুমূল। এর অর্থ কর্তন। শাকসবজী যেহেতু ঘন ঘন কর্তন করতে হয়, তাই আরবী ভাষায়

www.eelm.weebly.com

শাকসবজিকে বলে ‘কৃদ্বব’। ‘কামুস’ অভিধানে বলা হয়েছে, সুদীর্ঘ শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট ও সুবিস্তৃত সকল বৃক্ষকেই বলে ‘কৃদ্বব’। ‘যাইতুনাঁও ওয়া নাখলা’ অর্থ যয়তুন, খেজুর। ‘হাদাইক্বা গুল্‌বা’ অর্থ বহু বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান। ‘হাদায়িক্ব’ বহুবচন ‘হাদীক্বাতুন’ এর। আর ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষের সমাহারকে বলে ‘গুলব’। এরকম উল্লেখ করা হয়েছে ‘কামুস’ গ্রন্থে। ‘ফাকিহাতুন’ অর্থ ফল, যা ভক্ষণ করা হয় সাগ্রহে। ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন, কেউ যদি ‘আমি ফলভক্ষণ করবো না’ বলে শপথ করার পর খেজুর, আঙ্গুর ও যয়তুন ভক্ষণ করে, তবুও তাকে শপথভঙ্গের দায়ে দায়ী হতে হবে না। কেননা এই ফলগুলি মূলত শরীরের শক্তিবর্ধক, কেবল আস্বাদ্য আহার্য নয়। অনেক ফল তো এমনও রয়েছে, যেগুলো ভক্ষণ করা হয় মূলত আস্বাদ গ্রহণের জন্য, অথবা ঔষধী হিসেবে, দৈনন্দিন খাদ্য হিসেবে নয়। ওই সকল ফল ভক্ষণ করলেও শপথ ভঙ্গ হবে না। যেমন ডালিম। এতদ্ব্যতীত ‘ফাকিহাতুন’ এর যোগসূত্র রয়েছে ‘শস্য’ ও ‘আঙ্গুর’ এর সঙ্গে। যোজ্য ও যোজিতের মধ্যে ঘটে বৈপরীত্য। যদ্দরুন এগুলি খাদ্য জাতীয় ফল নয়, বরং আস্বাদ্য জাতীয়। ‘আব্‌বা’ অর্থ গবাদিখাদ্য, চারণ ভূমির তৃণলতা। আর ‘এটা তোমাদের ও তোমাদের আনআমের ভোগের জন্য’ অর্থ হে মানুষ! বর্ণিত শস্য, ফল, শাকসবজি, তৃণলতা ইত্যাদি আমি তো নিতান্ত কৃপাপরবশ হয়ে সৃষ্টি করেছি কেবল তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুসমূহের জন্য।

সূরা আ’বাসা ঃ আয়াত ৩৩— ৪২

فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ
وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ
شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ
مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا
قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

r যখন কিয়ামত উপস্থিত হইবে,

r সেই দিন মানুষ পলায়ন করিবে তাহার ভ্রাতা হইতে,

r এবং তাহার মাতা, তাহার পিতা,

r তাহার পত্নী ও তাহার সন্তান হইতে,

r সেই দিন উহাদের প্রত্যেকের হইবে এমন গুরুতর অবস্থা যাহা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখিবে।

r অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হইবে উজ্জ্বল,

www.eelm.weebly.com

r সহাস্য ও প্রফুল্ল,
r এবং অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হইবে ধুলিধূসর
r সেইগুলিকে আচ্ছন্ন করিবে কালিমা।
r ইহারাই কাফির ও পাপাচারী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফা ইজা জাআতিস্ সখ্‌খাহ্' (যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে)। এখানে 'সখ্‌খাহ্' অর্থ মহানাদ। কামুস। মমার্থ শিঙ্গার ফুৎকার ধ্বনি। 'সিহাহ' অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, বাকশক্তি সম্পন্ন প্রাণীদের মহাকলরবকে বলে 'সখ্‌খাহ্'। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে রূপকার্থে শিঙ্গার ফুৎকারের আওয়াজকে বলা হয়েছে 'সখ্‌খাহ্'। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়াবে— যখন শিঙ্গা ফুৎকারিত হবে, তখন মানুষ ভয়ে শুরু করে দিবে বিকট চীৎকার। এরপর কী হবে, তা আর এখানে উল্লেখ করা হয়নি। আর পুরো শর্তসূচক বাক্যটির বক্তব্যগত যোগসূত্র রয়েছে ১১ সংখ্যক আয়াতের 'এটা তো আদেশবাণী' কথাটির সঙ্গে, অথবা ১৭ সংখ্যক আয়াতের 'মানুষ ধ্বংস হোক! সে কতো অকৃতজ্ঞ' কথাটির সঙ্গে। প্রথম যোগসূত্রানুসারে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— কোরআন হচ্ছে সদুপদেশবাণী। যখন শিঙ্গার ফুৎকারধ্বনি উচ্চারিত হবে, তখন এই সদুপদেশবাণী মান্যকারী ও অস্বীকারকারীদের অবস্থা হবে পৃথক। মান্যকারীদের মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল এবং অস্বীকারকারীদের মুখমণ্ডল হবে ধূলিধূসরিত। এরকমও হতে পারে যে, তখন কী হবে, তার ফলাফল এখানে রয়েছে অনুক্ত। বরং 'অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলিধূসর' (আয়াত ৪০) কথাটিই ফলাফল। আর দ্বিতীয় যোগসূত্রানুসারে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মানুষ ধ্বংস হোক। কতোইনা অকৃতজ্ঞ তারা। যখন ধ্বনিত হবে শিঙ্গার বিকট আওয়াজ, তখন তারা মর্মেমর্মে উপলব্ধি করতে পারবে, অকৃতজ্ঞতার পরিণতি কতো ভয়ংকর।

পরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা থেকে (৩৪), এবং তার মাতা, তার পিতা (৩৫), তার পত্নী ও তার সন্তান থেকে' (৩৬)। একথার অর্থ— মহাপুনরুত্থান দিবসে মানুষ একথা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারবে যে, মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগ্নী-পত্নী-সন্তান কেউ আজ কোনো উপকারে আসবে না। তাই তারা তাদের কাছ থেকে পলায়ন করবে। হয়ে পড়বে সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ। অথবা স্বজন-সুহৃদদের কৃতঘ্নতা ও দুরবস্থা দৃষ্টে তখন তাদের প্রতি তারা পোষণ করবে ঘৃণা ও রোষ। লুকাতে চাইবে নিরালা কোনো জায়গায়। হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, জননী খাদীজা একবার তাঁর ইসলামপূর্ব জীবনের দুই প্রয়াত পুত্র সম্পর্কে রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন। রসুল স. বলেছেন, তারা প্রবেশ করবে নরকে। জননী মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তিনি স. বললেন, তুমি যদি তাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করো, তবে তুমিও তাদেরকে ঘৃণা করবে। আহমদ।

লক্ষণীয়, এখানে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে অপেক্ষাকৃত কম আপনজনদের। অধিক আপনজনদের উল্লেখ করা হয়েছে পরে। এভাবে এখানে বক্তব্যের আবেদনকে করা হয়েছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যেনো বলা হয়েছে— সেদিন

www.eelm.weebly.com

মানুষ তার ভ্রাতা থেকে পলায়ন তো করবেই, অধিকন্তু পলায়ন করবে তাদের মাতা-পিতার নিকট থেকেও। শুধু তাই নয়, তারা পালিয়ে যাবে তখন তাদের প্রিয়তমা পত্নী এবং প্রাণপ্রিয় সন্তান-সন্ততিদের নিকট থেকেও।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'সেই দিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা, যা তাকে সম্পূর্ণ ব্যস্ত রাখবে'। একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে মানুষের অবস্থা এতোই শোচনীয় হয়ে পড়বে যে, কেউ কারো দিকে মনোযোগ দেওয়ার কোনো অবকাশই পাবে না।

তিবরানী, বায়হাকী ও বাগবী বর্ণনা করেছেন, জননী সাওদা বলেছেন, রসুল স. একবার বললেন, প্রতিফল দিবসে মানুষ পুনরুত্থিত হবে নগ্ন পা, নগ্ন দেহ এবং খতনাবিহীন অবস্থায়। তখন তারা নিমজ্জিত থাকবে স্বেদ-সাগরে। ফলে দেখে মনে হবে যেনো তাদের মুখে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘামের লাগাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহক! তাহলে তো একে অপরের লজ্জাস্থান দেখে ফেলবে। তিনি স. বললেন, সেরকম কিছু করার অবকাশই তারা তখন পাবে না। জননী আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম ও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে সংযোজিত হয়েছে এই কথাটুকু— সেদিন পরিস্থিতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। অর্থাৎ কেউ কারো দিকে তাকাবার ফুরসৎই পাবে না। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

এরপরের আয়াতপঞ্চকে বলা হয়েছে— 'অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হবে উজ্জ্বল (৩৮) সহাস্য ও প্রফুল্ল (৩৯) এবং অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হবে ধূলিধূসর (৪০) সেগুলিকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা (৪১)। এরাই কাফের ও পাপাচারী ' (৪২)।

'উজুহুঁই ইয়াওমাইজিম মুস্ফিরাহ্' অর্থ অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল। এখানকার 'মুস্ফিরাহ্' (উজ্জ্বল) শব্দটি সাধিত হয়েছে 'আসফারাস্ সুবহু' (উষালোক) থেকে। অর্থাৎ সেদিন বিশ্বাসীদের মুখমণ্ডল হবে প্রভাতের আলোর মতো সমুজ্জ্বল। 'দ্বহিকাতুম মুস্তাব্শিরাহ্' অর্থ সহাস্য, প্রফুল্ল। শব্দদুটি উজ্জ্বল মুখমণ্ডলের বিশেষণ। অর্থাৎ উজ্জ্বল মুখাবয়ববিশিষ্ট ব্যক্তিরা তখন হবে সহাস্য ও প্রফুল্ল।

'অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলিধূসর' অর্থ সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সকলের, অথবা অধিকাংশের মুখমণ্ডল হবে কদাকার, মলিন, ধূলিধূসরিত। 'তার হাকুহা কৃতারাহ্' অর্থ সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তারা তখন হবে লাঞ্ছিত। ইবনে জায়েদ বলেছেন 'গবারাতুন' অর্থ ঘামমিশ্রিত ধূলি এবং 'কৃতারাহ্' অর্থ বিশুষ্ক ও উড়ন্ত ধূলিকণা। আর 'উলাইকা হুমুল কাফারাতুল্ ফাজ্বারাহ্' অর্থ তারাই কাফের ও ফাজের। অর্থাৎ ওই ধূলিধূসরিত এবং কালিমালিপ্ত মুখাবয়ববিশিষ্ট ব্যক্তিরাই হচ্ছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপাচারী। এখানকার 'কাফারাহ্' ও 'ফাজ্বারাহ্' বহুবচন যথাক্রমে 'কাফির' ও 'ফাজ্বির' এর। 'ফাজ্বারাহ্' এর ধাতুমূল 'ফাজ্বর' অর্থ— বিদীর্ণ করা। অর্থাৎ ফাজের বা পাপাচারী তারাই, যারা মানুষের নিকট গচ্ছিতকৃত দীন-ধর্মকে করে বিদীর্ণ, বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই ফাজের।

www.eelm.weebly.com

সূরা তাকভীর

এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যভূমি মক্কায়। এর রুকু সংখ্যা ১ এবং আয়াত সংখ্যা ২৯।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাপ্রলয়ের দৃশ্যাবলী যে ব্যক্তি স্বচক্ষে অবলোকন করতে চায়, সে যেনো পাঠ করে সুরা ইনশিকাক, সুরা ইনফিতার ও সুরা তাকভীর। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম সূত্রবিশিষ্ট। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে কেবল সুরা তাকভীরের নাম।

সূরা তাকভীর ঃ আয়াত ১—১৪

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

اِذَا الشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ ۪ۙ﴿۱﴾ وَ اِذَا النُّجُوۡمُ انۡكَدَرَتۡ ۪ۙ﴿۲﴾ وَ اِذَا الۡجِبَالُ
سُيِّرَتۡ ۪ۙ﴿۳﴾ وَ اِذَا الۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ ۪ۙ﴿۴﴾ وَ اِذَا الۡوُحُوۡشُ حُشِرَتۡ ۪ۙ﴿۵﴾
وَ اِذَا الۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ ۪ۙ﴿۶﴾ وَ اِذَا النُّفُوۡسُ زُوِّجَتۡ ۪ۙ﴿۷﴾ وَ اِذَا الۡمَوۡءٗدَةُ
سُئِلَتۡ ۪ۙ﴿۸﴾ بِاَیِّ ذَنۡۢبٍ قُتِلَتۡ ۚ﴿۹﴾ وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتۡ ۪ۙ﴿۱۰﴾ وَ اِذَا
السَّمَآءُ كُشِطَتۡ ۪ۙ﴿۱۱﴾ وَ اِذَا الۡجَحِیۡمُ سُعِّرَتۡ ۪ۙ﴿۱۲﴾ وَ اِذَا الۡجَنَّةُ
اُزۡلِفَتۡ ۪ۙ﴿۱۳﴾ عَلِمَتۡ نَفۡسٌ مَّاۤ اَحۡضَرَتۡ ؕ﴿۱۴﴾

- সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হইবে,
- যখন নক্ষত্ররাজি খসিয়া পড়িবে,
- পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হইবে,
- যখন পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হইবে,
- যখন বন্য পশু একত্র করা হইবে,
- সমুদ্র যখন স্ফীত করা হইবে,
- দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হইবে,
- যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে,
- কী অপরাধে উহাকে হত্যা করা হইয়াছিল?
- যখন 'আমলনামা উন্মোচিত হইবে,
- যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হইবে,
- জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হইবে,

www.eelm.weebly.com

q এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী করা হইবে,
q তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানিবে সে কী লইয়া আসিয়াছে।

'ইজাশ্ শামসু কুয়্যিরাত' অর্থ সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হবে। এখানকার 'ইজা' (যখন) পদটি শর্তসূচক। আর 'আশ্শামসু' (সূর্য) পদটি একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্তা। আর 'কুয়্যিরাত' (নিষ্প্রভ করা হবে) ওই উহ্য ক্রিয়ার ব্যাখ্যা। কুয়্যিরাত' অর্থ সংকুচিত হওয়া, নিষ্প্রভ হওয়া, আলোকহীন হওয়া। এরকম বলেছেন ইবনে জারীর। আবু তালহার বক্তব্য উল্লেখ করে ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস 'কুয়্যিরাত' শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন— 'আজলামাত' (আঁধারে ছেয়ে যাবে)। 'ফীল বাহার ওয়াল আহ্ওয়াল' গ্রন্থে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া এবং 'আল উজমা' গ্রন্থে আবু শায়েখ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাসের যে উক্তি সংকলন করেছেন এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম যা বলেছেন, তা হচ্ছে— মহাপ্রলয়কালে আল্লাহ্তায়ালা চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারাকে কিরণহীন করে নিক্ষেপ করবেন মহাসমুদ্রে। আর প্রবাহিত করবেন পশ্চিমা লু হাওয়া। ওই হাওয়া সমুদ্রের পানি স্পর্শ করার সাথে সাথে সমুদ্র পরিণত হবে অগ্নিসাগরে।

কেউ কেউ বলেছেন, সূর্য সাগরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাগর হয়ে যাবে উত্তপ্ত ও অগ্নিময়। ইবনে মরিয়ম সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সূর্যকে যখন জ্যোতিহীন করে নরকে নিক্ষেপ করা হবে এবং নক্ষত্রপুঞ্জ যখন ঝরে পড়বে নরকাভ্যন্তরে, তখন নরকে নিক্ষেপ করা হবে অংশীবাদীদের মিথ্যা উপাস্যগুলোকেও। ব্যতিক্রম হবেন কেবল হজরত ঈসা এবং তাঁর পুতপবিত্রা জননী।

আমি বলি 'সূর্যকে নিক্ষেপ করা হবে সাগরে' এবং 'নিক্ষেপ করা হবে নরকে' কথাদু'টোর অর্থ আসলে একই। অর্থাৎ সাগর তখন নিজে নিজেই হয়ে যাবে অগ্নিময় নরক। আর ওই অগ্নিতরঙ্গময় নরকেই নিক্ষেপ করা হবে সূর্যকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাপ্রলয় দিবসে নিষ্প্রভ হয়ে যাবে চাঁদ-সুরুজ। বায্যার তাঁর 'মসনদ' গ্রন্থে লিখেছেন, ও দু'টোকে নিক্ষেপ করা হবে আগুনে।

এরপরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে'। একথার অর্থ— তখন নক্ষত্রগুলোও হয়ে যাবে কক্ষচ্যুত। বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে এদিকে ওদিকে। যেমন বলা হয় 'ইনকাদারাত্ ত্বইরু' (পাখি ছিন্নভিন্ন হয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে)। কালাবী বলেছেন, সেদিন আকাশের তারকাগুলো বৃষ্টির মতো ঝরে ঝরে পড়বে। আকাশে তখন একটি তারকাও আর থাকবে না।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে—'পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে'। একথার অর্থ— সেদিন পাহাড়-পর্বতগুলো বিচূর্ণিত ধূলিকণার মতো ভেসে বেড়াতে থাকবে বায়ুমণ্ডলে।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে'। এখানকার 'ইশারু' এর বহুবচন 'আশারা' অর্থ দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী। পুরো এক বৎসর পরে শাবক প্রসব করলেও আরববাসীগণ এরকম উষ্ট্রীকে বলেন 'আশারা'। উল্লেখ্য, আরব্য সমাজ ও সংসারের অন্যতম প্রিয় বস্তু হচ্ছে উট। তাই তখনকার যুগে তাঁদের বেশীর ভাগ সময়ই ব্যয়িত হতো উটের পরিচর্যায়। আর 'উত্ত্বিলাত' অর্থ উপেক্ষিত, রাখালের সংরক্ষণমুক্ত। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের বিভীষিকা দর্শনে রাখাল অথবা মনিব ভুলেই যাবে তাদের গর্ভবতী উটনীগুলোর কথা। অথবা 'ইশারু' অর্থ এখানে মেঘমালা। অর্থাৎ বৃষ্টিহীন মেঘ।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'যখন বন্য পশু একত্র করা হবে'। হজরত উবাই ইবনে কা'ব কথাটির অর্থ করেছেন— মহাপ্রলয়ের বীভৎস রূপ দেখে হিংস্র-অহিংস্র জন্তু জানোয়ারগুলোর মধ্যে সৃষ্টি হবে উত্তাল তরঙ্গ সদৃশ চাঞ্চল্য। হিংসা-ক্রোধ ভুলে তারা মিলিত হবে এক জায়গায়। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— কোনো পশু অন্য কোনো পশুর ক্ষতি করে থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত পশুকে দেওয়া হবে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ, যেমন উল্লেখ করা হয়েছে 'হায়! আমরাও যদি মাটিতে মিশে যেতে পারতাম' আয়াতের ব্যাখ্যায়। ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জন্তু-জানোয়ারদের হাশর হচ্ছে তাদের মৃত্যু। এমনও বলা হয়েছে যে, মানুষ ও জ্বিন ছাড়া অন্য সকল প্রাণীকে সেদিন চিরতরে মিশিয়ে দেওয়া হবে মাটির সঙ্গে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'যখন সমুদ্র স্ফীত করা হবে'। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, তখন সমুদ্রসমূহ হবে উত্তপ্ত, অগ্নিময়। অর্থাৎ ভূগর্ভ থেকে অগ্নিময় লাভা উদগত হয়ে সমুদ্রকে করে দিবে অগ্নিময় নরক। কালাবী কথাটির অর্থ করেছেন— সমুদ্রকে যখন করা হবে পরিপূর্ণ। কেননা 'মাসজুর' অর্থ ভর্তি করা, পরিপূর্ণ করা। মুজাহিদ ও কালাবী বলেছেন, সাগরগুলোকে তখন পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হবে। আর নোনা-মিঠা পানির ওই সম্মিলিত সমুদ্রই হবে নরকের অনল। হাসান ও কাতাদা বলেছেন, সাগরসমূহ তখন হয়ে যাবে বিশুষ্ক, জলহীন।

আমি বলি, ব্যাখ্যাগুলোর সম্মিলিত অর্থ হচ্ছে— তখন সকল সাগর-উপসাগর মিলে হয়ে যাবে একটি মাত্র সীমাহীন মহাসাগর। সূর্যকে নিক্ষেপ করা হবে ওই মহাসাগরেই। ফলে মহাসাগরের পানি হয়ে যাবে অগ্নিপূর্ণ উত্তপ্ত। শীতল পানির কোনো প্রকার চিহ্নও থাকবে না সেখানে। ওই উত্তপ্ত পানিই হবে নরকবাসীদের 'হামীম' (উত্তপ্ত সলিল)।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার পূর্বে দেখা যাবে ছয়টি নিদর্শন। মানুষ কোলাহলমুখর বাজারে থাকবে কর্মব্যস্ত। হঠাৎ সূর্য হতে থাকবে নিষ্প্রভ। ধূলিসাৎ হবে পাহাড়-পর্বতগুলো। শুরু হবে প্রচণ্ড ভূকম্পন। মানুষ ও জ্বিনেরা হবে ভীত

www.eelm.weebly.com

সন্ত্রস্ত। জ্বিনেরা মানুষদেরকে বলবে, অপেক্ষা করো, আমরা সংবাদ নিয়ে আসছি। এই বলে তারা যাবে সমুদ্রের পাড়ে। দেখবে, সমস্ত সমুদ্র জুড়ে তরঙ্গিত হচ্ছে কেবল আগুন, আর আগুন। এমন সময় বইতে শুরু করবে অত্তপ্ত লু হাওয়া। অল্পক্ষণের মধ্যে মৃত্যু ঘটবে সকল প্রাণীর। হজরত উবাই ইবনে কা'ব সূত্রে আবুল আলিয়ার মাধ্যমে বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন, সেখানে অতিরিক্ত হিসেবে বলা হয়েছে— ভূপৃষ্ঠ হবে বিদীর্ণ। ধ্বনিত হবে মহাপ্রলয়ংকরী বিকট আওয়াজ। ভেঙে চুরে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে একাকার হয়ে যাবে সপ্ত আকাশ ও সপ্তস্তরবিশিষ্ট মেদিনী। তখন আর নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকবে না কোনো প্রাণীর। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহাপ্রলয়ের নিদর্শন হবে বারোটি— ছয়টি ইহকালে এবং ছয়টি পরকালে। ওই ছয়টি নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে পরবর্তী ছয় আয়াতে।

৭ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে— 'দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হবে'। এখানকার 'যুয়্যিজ্বাত' অর্থ পুনঃসংযোজিত হবে। হজরত নোমান ইবনে বশীর থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ওই সকল লোকের কথা, যারা সাংসারিক জীবনে একে অপরের দোসর, কাজে-কর্মে পরস্পরের অনুসারী। দেহে আত্মা পুনঃসংযোজনের মাধ্যমে তাদেরকে মিলিয়ে দেওয়া হবে এক সাথে। বলাবাহুল্য, এরকম ঘটবে আল্লাহ্পাকের আদেশেই। এরূপ পরিস্থিতির সমর্থনে রসুল স. পাঠ করতেন 'এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে— ডান দিকের দল; কতো ভাগ্যবান ডান দিকের দল! আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী'।

হজরত নোমান ইবনে বশীর থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য ওই দুই ব্যক্তি, যারা একই আদেশে অনুপ্রাণিত। সেকারণেই তারা হয় জান্নাতে যাবে, না হয় যাবে জাহান্নামে। তিনি আরো বলেছেন, 'উহ্শুরুল্ লাজীনা জলামু ওয়া আযওয়াজ্বাহুম' (যারা জুলুম করেছে, তাদের এবং তাদের সতীর্থদের পুনরুত্থান হবে সম্মিলিতভাবে)। সাঈদ ইবনে মনসুর বলেছেন, পুণ্যবানদেরকে পুণ্যবানদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হবে জান্নাতে এবং অপরাধীদেরকে অপরাধীদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হবে জাহান্নামে।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'উহ্শুরুল্ লাজীনা জলামু ওয়া আযওয়াজ্বাহুম' আয়াতের মর্মার্থ— জালেম এবং তাদের দোসরদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাও দোজখে। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে 'মিলিত করে দেওয়া হবে' অর্থ— তাদেরকে তখন মিলিত করে দেওয়া হবে তাদের কর্মবিবরণীর (আমলনামার) সঙ্গে। মুকাতিল বলেছেন, পুন্যবানদেরকে তখন মিলিয়ে দেওয়া হবে তাদের আয়তলোচনা সঙ্গিনীগণের সঙ্গে এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে মিলিয়ে দেওয়া হবে শয়তানের সঙ্গে।

www.eelm.weebly.com

এভাবে এখানকার 'ওয়া ইজান্ নুফূসু যুয়্যিজ্বাত' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায় তাদের আত্মাগুলোকে তখন মিলিয়ে দেওয়া হবে তাদের শরীরের সঙ্গে। এরকম বলেছেন ইকরামা।

৮ এবং ৯ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো'?

এখানে 'আল মাওউদাতু' অর্থ জীবন্ত প্রোথিত শিশুকন্যা। শব্দটির ধাতুমূল 'ওয়াদুন' অর্থ বোঝা, ভার। জীবন্ত শিশুকন্যার উপরে মূর্খতার যুগের আরববাসীরা এমনভাবে মাটির বোঝা চাপিয়ে দিতো যে, তাদের বাঁচার আর কোনো উপায় থাকতো না। এটা ছিলো তাদের একটি জঘন্য প্রথা। নিম্নবংশে যদি মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, তবে আর মান-সম্মান বলে কিছু থাকবে না, তাদেরকে খাওয়া-পরা দিতে গেলে দরিদ্র হয়ে যেতে হবে— এরকম বিকৃত চিন্তার বশবর্তী হয়েই তারা এরকম করতো।

'কী অপরাধে তোমাদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো' এরকম প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের হত্যাকারীদেরকে নিরুত্তর করে দেওয়া, যেনো তারা তাদের অপকর্মের পক্ষে আর কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে না পারে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'হে মরিয়ম তনয়! তুমি কি জনগণকে এরকম বলেছিলে যে, আমাকে এবং আমার জননীকে তোমরা তোমাদের উপাস্য বানিয়ে নাও'। অথবা বলা যেতে পারে, জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে' কথাটি এখানে রূপকার্থক। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তখন হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে হন্তারকদেরকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ইননাল আ'হদা কানা মাসউলা' (জিজ্ঞাসিত হবে প্রতিশ্রুতি)। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করা হবে প্রতিশ্রুতিদাতাকে। কিংবা 'আলমাওউদাতু' এখানে কর্মপদের শব্দরূপ হলেও অর্থ প্রদান করবে কর্তৃপদীয় শব্দরূপ 'ওয়ায়িদাতু' এর। অর্থাৎ জিজ্ঞেস করা হবে সমাধিস্থকারীদেরকে। বা কথাটির অর্থ হবে 'আলমাওউদাতু লাহা'। অর্থাৎ যার পক্ষ থেকে প্রোথিত করা হয়েছে। ধাত্রী অথবা অন্য কেউ তো তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকেই এরকম করতো। অর্থাৎ প্রশ্ন করা হবে শিশুকন্যার পিতা-মাতাকে। যেমন রসুল স. বলেছেন, যে সমাধিস্থ করেছে এবং যার পক্ষ থেকে সমাধিস্থ করা হয়েছে, তারা উভয়েই জাহান্নামী। উত্তম সূত্রসহযোগে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ।

উপযোগ ঃ জীবন্ত শিশুকে সমাধিস্থ করা মহাপাপ। চার মাসের উপরের গর্ভপাতও মহাঅন্যায়। কেননা চার মাসে ভ্রূণের অবয়বে আসে পূর্ণতা। তাতে সঞ্চার ঘটে প্রাণের। চার মাসের নিম্নের ভ্রূণ হত্যাও অবৈধ। তবে পূর্বানুপাতে পাপটি লঘু। এরকম করলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক দাস অথবা দাসীকে মুক্ত করে দেওয়া ওয়াজিব। বিধানটি ঐকমত্যসম্মত। যদি কেউ কোনো গর্ভধারিণীর উপরে আঘাত হানে, সে আঘাতে তার গর্ভস্থিত শিশুর মৃত্যু ঘটে গর্ভপাতের আগে অথবা পরে, তবে আঘাতকারীর উপরে ওয়াজিব হবে একজন

www.eelm.weebly.com

পূর্ণ বয়স্ক লোকের রক্তপণ, ওই শিশুটির অবয়ব সম্পূর্ণ হোক, কিংবা হোক অসম্পূর্ণ। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, বনী লেহিয়ানের এক রমণীর গর্ভপাত ঘটেছিলো এক লোকের আঘাতে। রসুল স. বিধান দিয়ে দিলেন, আঘাতকারীকে মুক্ত করতে হবে একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক দাস অথবা দাসী। বোখারী, মুসলিম।

বিধান ঃ ক্রীতদাসীর সঙ্গে আযল করা (জরায়ুর বাইরে রেতঃপাত করা) সিদ্ধ। স্বাধীনাগণের সঙ্গে তাদের বিনা অনুমতিতে এরকম করা সিদ্ধ নয়। আবার সিদ্ধ হওয়ার বিষয়টিও মাকরূহ থেকে মুক্ত নয়। হজরত খুদ্দামা বিনতে ওয়াহাবের বর্ণনায় এসেছে, লোকেরা একবার রসুল স.কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি স. বললেন, এটা হচ্ছে গোপনে সমাধিস্থ করা, যেমন সমাধিস্থ করার কথা বলা হয়েছে 'যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে' আয়াতে। আবার হজরত জাবের বলেছেন, আমরা আযল করতাম ওই সময়েও, যখন কোরআন অবতীর্ণ হতো। রসুল স. এ সম্পর্কে জানতেন। কিন্তু আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধও করা হয়নি। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্ত বলা হয়েছে এই কথাটুকু— তিনি স. বিষয়টি জানতেন। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদেরকে নিষেধও করেননি।

এক বর্ণনায় এসেছে, তোমরা ইচ্ছা করলে ক্রীতদাসীদের সঙ্গে আযল করতে পারো। কিন্তু নিয়তিতে যা আছে, তা হবেই। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এরকম না করলে অসুবিধা কী? মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত যারা আসবার, তারা আসবেই। স্বাধীনাদের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয় হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের সঙ্গে আযল করতে নিষেধ করেছেন।

১০ এবং ১১ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে, যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে'।

'আস্সুহুফু নুশিরাত' অর্থ আমলনামা উন্মোচিত হবে। আর 'আস্সামাউ কুশিত্বাত' অর্থ আকাশের আবরণ অপসারিত হবে। অর্থাৎ জবাইকৃত পশুর চামড়া যেভাবে ছেলা হয়, সেভাবে উঠিয়ে নেওয়া হবে আকাশের আচ্ছাদন। এরকম হবে সংজ্ঞাহারক শিঙ্গা ফুৎকারের পূর্বে, যখন সূর্য হবে নিষ্প্রভ, নক্ষত্রপুঞ্জ পড়বে খসে। অথবা এরকম ঘটবে সংজ্ঞাহারক শিঙ্গার ফুৎকারের সময়ে। আবার এমনও বলা যেতে পারে যে, এরকম ঘটবে ওই সময়ে, যখন আকাশ-পৃথিবীকে করে দেওয়া হবে একাকার। ফলে তারা উভয়ে হয়ে পড়বে স্থানচ্যুত।

কা'ব কারাজী লিখেছেন, আকাশ-পৃথিবীর বিভিন্ন রূপান্তরণের বর্ণনাবৈষম্যের সমাধান 'আফসাহ্' প্রণেতা দিয়েছেন এভাবে— আকাশ ও পৃথিবী রূপান্তরিত হবে দু'বার। প্রথমে হবে আকৃতিগতভাবে, সংজ্ঞাহারক শিঙ্গাধ্বনির আগে। আকাশ তখন হবে তাম্রবর্ণের। চন্দ্র-সূর্য হবে আলোহীন, নক্ষত্ররাজি হবে বিক্ষিপ্ত

www.eelm.weebly.com

ও নিক্ষিপ্ত। সাগর হবে অগ্নিময়, উত্তপ্ত। ভূপৃষ্ঠ হবে বিদীর্ণ, ফাটল ও গর্তবিশিষ্ট, অসমতল। এর পরের রূপান্তর হবে অবস্থানগত। শিঙ্গার দু'টি ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে আকাশ-পৃথিবীকে মোচড়ানো হবে কাগজ মোচড়ানোর মতো করে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হবে (১২), এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী করা হবে (১৩), তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে, সে কী নিয়ে এসেছে' (১৪)। একথার অর্থ— শেষে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য উসকে দেওয়া হবে নরকানলকে এবং মুত্তাকীদের নিকটে আনা হবে সুখদ স্বর্গোদ্যানকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সন্নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে জান্নাতকে সংযমীদের জন্য'। আর এখানকার শেষোক্ত আয়াতটি ইতোপূর্বের চৌদ্দটি আয়াতের বক্তব্যের ফলাফল। অর্থাৎ সুরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত যে সকল বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হলো, তার জবাব হচ্ছে 'তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কী নিয়ে এসেছে'। উল্লেখ্য, বর্ণিত ঘটনাগুলো ঘটবে দীর্ঘ সময় ধরে, শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার থেকে স্বর্গ-নরকে প্রবেশ করা পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘ কালকেই বলা হয় কিয়ামত।

সূরা তাকভীর ঃ আয়াত ১৫— ২৯

فَلَآ اُقۡسِمُ بِالۡخُنَّسِ ﴿۱۵﴾ الۡجَوَارِ الۡكُنَّسِ ﴿۱۶﴾ وَالَّيۡلِ اِذَا عَسۡعَسَ ﴿۱۷﴾
وَالصُّبۡحِ اِذَا تَنَفَّسَ ﴿۱۸﴾ اِنَّهٗ لَقَوۡلُ رَسُوۡلٍ كَرِيۡمٍ ﴿۱۹﴾ ذِیۡ قُوَّةٍ
عِنۡدَ ذِی الۡعَرۡشِ مَكِيۡنٍ ﴿۲۰﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيۡنٍ ﴿۲۱﴾ وَمَا صَاحِبُكُمۡ
بِمَجۡنُوۡنٍ ﴿۲۲﴾ وَلَقَدۡ رَاٰهُ بِالۡاُفُقِ الۡمُبِيۡنِ ﴿۲۳﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الۡغَيۡبِ
بِضَنِيۡنٍ ﴿۲۴﴾ وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَيۡطٰنٍ رَّجِيۡمٍ ﴿۲۵﴾ فَاَيۡنَ تَذۡهَبُوۡنَ ﴿۲۶﴾
اِنۡ هُوَ اِلَّا ذِكۡرٌ لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۲۷﴾ لِمَنۡ شَآءَ مِنۡكُمۡ اَنۡ يَّسۡتَقِيۡمَ ﴿۲۸﴾
وَمَا تَشَآءُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۲۹﴾

q আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের,
q যাহা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়,
q শপথ নিশার যখন উহার অবসান হয়
q আর ঊষায় যখন উহার আবির্ভাব হয়,
q নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী
q যে সামর্থ্যশালী, 'আর্‌শের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন,

www.eelm.weebly.com

q যাহাকে সেথায় মান্য করা হয়, যে বিশ্বাসভাজন।
q আর তোমাদের সাথী উন্মাদ নহে,
q সে তো তাহাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখিয়াছে,
q সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নহে।
q এবং ইহা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নহে।
q সুতরাং তোমরা কোথায় চলিয়াছ?
q ইহা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ,
q তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলিতে চাহে, তাহার জন্য।
q তোমরা ইচ্ছা করিবে না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন।

'ফালা উক্বসিমু বিল খুন্নাস' অর্থ আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের। 'ফা' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে প্রসঙ্গান্তর ঘটানোর জন্য। আর 'উক্বসিমু' কথাটির বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সুরা ক্বিয়ামাহ'র তাফসীরে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি শপথ করে বলছি, কিয়ামত সম্পর্কে যে সকল বিবরণ আমি দিলাম, সে সকল কিছু অবশ্যই সত্য। এগুলোর মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্রও নেই।

'খুন্নাস' শব্দটির ধাতুমূল 'খুনুস'। এর অর্থ, ভ্রমণের শেষ প্রান্ত থেকে সূচনাস্থলের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা। এখানে 'খুন্নাস' এর মর্মার্থ নেওয়া হয়েছে— পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্র, গতিশীল তারকা। অর্থাৎ আতারদ, জোহরা, মুশতারী, মিররিখ ও জোহল। এই নক্ষত্রগুলো কখনো পরিক্রমণ করে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, আবার কখনো থাকে স্থির। প্রাচীন জ্যোতির্বিদেরা এই নক্ষত্রপঞ্চকের বৈচিত্রময় পরিক্রমণ সম্পর্কে যা বলেছেন, তা সংক্ষেপে এরকম— সৌরমণ্ডলের কতকগুলি বলয় অপেক্ষাকৃত ছোট। এরকম ছোট একটি বলয়ের অধিবাসী ওই নক্ষত্রপঞ্চক। এই সৌর বলয়টিও পরিক্রমণশীল। এর ঊর্ধ্বাংশ বৃহৎ সৌরবলয়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তার মতোই পরিক্রমণ করে পশ্চিম থেকে পূর্বে। কিন্তু পরিক্রমণশীল নক্ষত্রপঞ্চক যখন অবস্থান করে ছোট সৌরবলয়ের নিম্নাংশে তখন সেগুলোর গতি হয়ে যায় বিপরীত। অর্থাৎ তখন তারা পরিক্রমণ করে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। অথবা গতিবেগের তারতম্যানুসারে সেগুলো কখনো কখনো থাকে স্থির। এই বিপরীতমুখীনতাকেই বলে 'খুন্নাস'। আমরা অবশ্য প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের এমতো মহাশূন্যতত্ত্ব গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি না। বরং জানি, প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্রের রয়েছে পৃথক পৃথক কক্ষপথ এবং প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্রই গতিশীল। আর গতিশীল নক্ষত্রপঞ্চক সব সময় কক্ষ পরিক্রমণ করে কখনো পূর্ব দিকে, আবার কখনো পশ্চিম দিকে, কখনো ধীর লয়ে, কখনো দ্রুতগতিতে, অর্থাৎ আল্লাহ্পাক যখন যেভাবে চান, তখন সেভাবেই সেগুলোকে পরিচালিত করেন।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'আলজ্বাওয়ারিল কুন্নাস' (যা প্রত্যাগমন করে এবং অদৃশ্য হয়)। কাতাদা বলেছেন, দিবসে অন্তর্হিত এবং নিশীথে সমুদ্ভাসিত

www.eelm.weebly.com

নক্ষত্রকে বলে 'খুন্নাস'। বরং 'খুন্নাস' বলে অস্তাচলকেই। আমি বলি, 'খুন্নাস'ও 'কুন্নাস' শব্দদ্বয় সমার্থক। এরকম বললে পুনরাবৃত্তির সংশয় আর থাকে না। 'কুন্নাস' বলে খরগোশ ও হরিণের নিজ নিজ আড্ডায় আশ্রয় নেওয়াকে। এখানে 'কুন্নাস' বলা হয়েছে অস্তমিত নক্ষত্রের বিলুপ্তিকে। আমি বলি, নক্ষত্রের প্রত্যাগমনস্থল বলে এখানে বোঝানো হয়েছে সম্ভবত আরশের নিম্নস্থলকে। যেমন হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, একদিন সূর্যকে অস্তমিত হতে দেখে রসুল স. আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো অস্তমিত হওয়ার পর সূর্য কোথায় যায়? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই এ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত। তিনি স. বললেন, সে তখন আল্লাহ্কে সিজদা করার জন্য গমন করে আরশের নিচে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'শপথ নিশার, যখন তার অবসান হয় (১৭) আর ঊষার, যখন তার আবির্ভাব হয়' (১৮)। এখানে 'আ'সআ'সা' অর্থ নিশাবসান। আর 'তানাফ্ফাসা' অর্থ ঊষার অভ্যুদয়। হাসান বসরী বলেছেন 'আ'সআ'সা' অর্থ আঁধার সহকারে রাতের আগমন। অথবা রাতের পশ্চাদপসরণ। শব্দটি বিপরীতার্থক। 'সুবহি' অর্থ ঊষা এবং 'তানাফ্ফাসা' অর্থ আবির্ভাবও হয়।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে—'নিশ্চয়ই এই কোরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী (১৯) যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন (২০), যাকে সেখানে মান্য করা হয়, যে বিশ্বাসভাজন' (২১)।

'এই কোরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী' অর্থ এই কোরআন পৃথিবীতে এনেছেন হজরত জিবরাইল, অথবা রসুলেপাক স.। 'যে সামর্থ্যশালী' অর্থ হজরত জিবরাইল, অথবা রসুল স. প্রচণ্ড শক্তিমত্তার অধিকারী। হজরত জিবরাইলের শক্তিমত্তা এরকম— তিনি নবী লুতের অবাধ্য জনপদবাসীকে তাদের আবাসভূমিসহ এক হাতে শূন্যে উঠিয়ে নিয়ে উল্টো করে প্রোথিত করেছেন মৃত্তিকায়। একটি মাত্র বিকট আওয়াজে মেরে ফেলেছিলেন ছামুদ জাতিকে। মুহূর্ত মধ্যে তিনি যাতায়াত করতেন ঊর্ধ্বাকাশ থেকে পৃথিবীতে। আর রসুল স. যে সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। নবী নুহ সাড়ে নয়শত বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার পরেও হেদায়েত করতে পেরেছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের অল্প কয়েকজন লোককে। অথচ রসুল স. তাঁর উম্মতের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন মাত্র তেইশ বৎসর। এরই মধ্যে এক বিশাল জনগোষ্ঠী হয়েছিলো তাঁর অনুগামী। ইসলামের প্রসার ঘটেছিলো আরব জাহান ছাড়িয়ে অনারব অঞ্চলেও। বিদায় হজের সময় তিনি হজসমাপন করেছিলেন তাঁর অন্যূন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবীকে নিয়ে। সপ্তম আকাশের বদরী বৃক্ষের ওপারে যেখানে হজরত জিবরাইলও যেতে অক্ষম সেখানেও তিনি স. গমন করেছিলেন মেরাজ রজনীতে। লাভ করেছিলেন আল্লাহ্র দীদার। অন্যান্য নবীর ভাগ্যে এমতো সৌভাগ্য জোটেনি। নবী মুসা তো দীদার চেয়েও পাননি। তাঁর প্রার্থনার পরিণাম এই হয়েছিলো যে, আল্লাহ্র অতিদূরবর্তী জ্যোতিচ্ছটায় ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিলো তুর পর্বত। আর তিনি হয়ে পড়েছিলেন সংজ্ঞাহীন।

www.eelm.weebly.com

এখানকার 'ইনদা' (নিকট) শব্দটি সম্পর্কযুক্ত 'মাকীন' এর সঙ্গে। অর্থাৎ আরশের অধিপতির নিকট তিনি স. অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন প্রিয়তমজন। সুতরাং তিনি মানবমণ্ডলীর অবশ্যমাননীয়। 'মুত্বাইন' অর্থ যাকে মান্য করা হয়। অর্থাৎ ফেরেশতারাও তাঁকে মান্য করে চলে। আর ছাম্‌মা আমীন' অর্থ যে বিশ্বাসভাজন। বাগবী লিখেছেন, মেরাজ রজনীতে আকাশের দ্বাররক্ষীরা হজরত জিবরাইলের নির্দেশে আকাশের দ্বার খুলে দিয়েছিলো রসুল স. এর মহামর্যাদার কারণেই। স্বর্গ-নরকের প্রহরীরাও দ্বার খুলে দিয়ে সম্মান জানিয়েছিলো তাঁকে। আমি বলি, আকাশ ও স্বর্গ-নরকের দ্বারোন্মোচন ছিলো রসুল স. এর অতুলনীয় মর্যাদার এক অনন্য নিদর্শন। অথবা 'মান্য করা হয়' কথাটির অর্থ হবে এখানে— আল্লাহ্‌পাকের প্রত্যাদেশ প্রথমত অবতীর্ণ হয় হজরত জিবরাইলের উপর। তারপর তাঁর মাধ্যমে পৌঁছে যায় অন্যান্য ফেরেশতার কাছে।

হজরত নাওয়াস ইবনে সামআন বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহপাক যখন কোনো কিছু প্রত্যাদেশ করেন, তখন সমস্ত আকাশে শুরু হয় কম্পন। আকাশবাসীরা তখন সেজদাবনত হয়ে হারিয়ে ফেলে তাদের চেতনা। এরপর প্রথম চেতনা ফিরে পান হজরত জিবরাইল। প্রত্যাদেশাবলী নিয়ে অবতরণ করেন নিম্নবর্তী আকাশসমূহের দিকে। আকাশবাসী ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করে, আমাদের পরম প্রভুপালনকর্তা কী বললেন? হজরত জিবরাইল বলেন, তিনি যা বলেন, তা সত্যই বলেন। তিনি সুমহান, সুপবিত্র। সকল ফেরেশতা তখন তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করতে থাকে। সে ধ্বনি অনুরণিত হতে থাকে সমগ্র আকাশমার্গে।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতাদের আনুগত্যের লক্ষ্যস্থল হজরত জিবরাইল। আর তিনি সহ সমগ্র ফেরেশতার আনুগত্যের লক্ষ্যস্থল রসুলুল্লহ্ স.। সুফী দার্শনিকগণ বলেন, হকিকতে মোহাম্মদী হচ্ছে মহাসত্যের ভাবাবেগস্থল (ফাইজে ওয়াজুদ) এবং নৈকট্যভাজনতার দিক দিয়ে এই নিখিল সৃষ্টি ও সম্ভাব্য জগতের মধ্য থেকে শীর্ষস্থানীয় সৃষ্টির উৎসমূল। রসুল স. স্বয়ং বলেছেন, আকাশে আছে আমার দুই মন্ত্রী— জিবরাইল ও মিকাইল। আর আমার পৃথিবীর দুই মন্ত্রণাদাতা হচ্ছে আবু বকর ও ওমর। সুতরাং একথা আর না বললেও চলে যে, রসুল স. ছিলেন হজরত জিবরাইলেরও আনুগত্যের লক্ষ্যস্থল।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'আর তোমাদের সাথী উন্মাদ নয়'। বাক্যটি শপথের জবাব। এখানে 'তোমাদের সাথী' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে। মক্কার অংশীবাদীরা তাঁকে 'উন্মাদ' বলেছিলো। এক আয়াতে কথাটি বলা হয়েছে এভাবে 'সে কি আল্লাহ্ সম্পর্কে অসত্য রচনা করেছে, না সে একটা উন্মাদ'? ১৯ সংখ্যক আয়াতের 'বার্তাবহ' অর্থ যদি রসুল স. হন, তাহলে বুঝতে হবে এখানে 'তোমাদের সাথী' বলে বুঝানো হয়েছে তাঁকেই। এভাবে সর্বনামের

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ না করে মক্কার অংশীবাদীদেরকে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এখন রসুল বলে যিনি দাবি করেছেন, তাঁকে তো তোমরা চল্লিশ বছর ধরে দেখছো। কোনো দিনও তো তোমরা তাঁকে জ্ঞানবিবেকবর্জিত কিছু বলতে শোনোনি। তাহলে এখন তোমরা তাঁকে উন্মাদ বলছো কেনো? এটা কি তোমাদের গোঁয়ার্তুমি, না তোমরা নিজেরাই উন্মাদ? তোমাদের উদ্দেশ্য আসলে কী?

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'সে তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে'। বিদ্বজ্জনের ঐক্যমত্যাগত সিদ্ধান্ত এই যে, এখানে 'সে' অর্থ রসুল স.। অর্থাৎ ঊর্ধ্ব দিগন্তে সুস্পষ্টভাবে তাঁকে দেখেছিলেন রসুল স. স্বয়ং। আর তাঁকে অর্থ আরশের অধিকারীকে। এমতাবস্থায় 'স্পষ্ট দিগন্তে' কথাটি হবে 'সে দেখেছে' এর অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ রসুল স. যখন সপ্ত আকাশের ঊর্ধ্বে এমনকি মহাসৃষ্টির সর্বোচ্চ দিগন্তে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি স. প্রত্যক্ষ করেছিলেন আল্লাহ্পাককে।

বাগবী লিখেছেন, মেরাজের ঘটনায় আমরা শুরাইক ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত যে হাদিস উল্লেখ করেছি, তাতে বলা হয়েছে, তিনি স. নিকটবর্তী হলেন মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্তায়ালার। হলেন ধনুকের দুই জ্যা, অথবা তদপেক্ষা অধিক সমীপবর্তী। এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সালমা এবং হজরত ইবনে আব্বাসও। জুহাক তাই বলেছেন, রসুল স. তখন আল্লাহকে দেখেছিলেন কীভাবে, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণ ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন রকমের অভিমত। কেউ বলেছেন, তিনি স. তাঁকে দেখেছিলেন অন্তর্চক্ষু দিয়ে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তিনি যা দেখেছেন, তাঁর হৃদয় তা অস্বীকার করেনি'। হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। আবুল আলিয়া সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'তিনি যা দেখেছেন, তাঁর হৃদয় তা অস্বীকার করেনি' অর্থ রসুল স. আল্লাহ্ পাককে দেখেছিলেন দু'বার, হৃদয়ের চোখ দিয়ে।

হজরত আনাস, হাসান বসরী ও ইকরামা বলেছেন, রসুল স. আল্লাহকে দেখেছিলেন তাঁর চর্মচক্ষু দিয়ে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্পাক হজরত ইব্রাহিমকে মনোনীত করেছিলেন তাঁর সখা (খলিল)রূপে। হজরত মুসাকে নির্বাচন করেছিলেন কথক বা বক্তা (কলিম)রূপে, আর রসুলে পাক স.কে নির্ধারণ করেছিলেন তাঁর দীদার দানের জন্য। হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আপনি কি স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখেছেন? তিনি স. জবাব দিলেন, কেমন করে দেখবো? তিনি যে নূর।

আমি বলি, সম্ভবত 'আলউফুক্বিল্ মুবীন' এবং 'আল উফুক্বিল্ আ'লা' অর্থ আধ্যাত্ম পথের পথিকদের পথপরিক্রমার শেষ স্তর, দাসত্ব-তত্ত্বের সর্বোচ্চ পর্যায় হকিকতে মোহাম্মদী, যা প্রেমের বিশুদ্ধতম মহিমা। এটাই লা তাআ'য়্যুন (সীমাবিহীনতা)। এমতো স্তরে পথ পরিক্রমণের কথা চিন্তাও করা যায় না। এই পর্যায়ে পরিভ্রমণীয় হতে পারে কেবল চিন্তা-গবেষণা। মহামান্য মোজাদ্দেদ এরকমই বলেছেন।

www.eelm.weebly.com

কোরআন ব্যাখ্যাতাগণের একটি বড় দলের অভিমত এই যে, এখানকার 'তাঁকে' অর্থ হজরত জিবরাইলকে। অর্থাৎ রসুল স. স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন হজরত জিবরাইলকে। কাতাদা ও মুজাহিদ বলেছেন, তিনি ছিলেন তখন ঊর্ধ্বলোকের পূর্ব দিগন্তে। স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. একবার হজরত জিবরাইলকে বললেন, ভ্রাতঃ জিবরাইল! আপনি আমাকে আপনার প্রকৃত আকৃতি দেখান, যে আকৃতি নিয়ে আপনি বিহার করেন আকাশমার্গে। হজরত জিবরাইল বললেন, এটা তো সম্ভব নয়। তিনি স. বললেন, কেনো সম্ভব নয়? হজরত জিবরাইল বললেন, কোথায় দেখতে চান বলুন। রসুল স. বললেন, আবতাহা প্রান্তরে। তিনি বললেন, সেখানে তো স্থান সংকুলান হবে না। তিনি স. বললেন, তাহলে মীনায়। তিনি বললেন, সেখানেও তো একই সমস্যা। তিনি স. বললেন, তাহলে আরাফাতে। তিনি বললেন, আরাফাও অপ্রশস্ত। রসুল স. বললেন, তাহলে হেরা পর্বতে। তিনি বললেন, হেরা পর্বতমালা যদি আমার ভার বহন করতে পারতো, তবে তো ভালোই হতো। কথা মতো একদিন রসুল স. হেরা পর্বতে গেলেন। অকস্মাৎ শুরু হলো অস্ত্রের ঝনঝনানী এবং মেঘমালার গুরুগম্ভীর আওয়াজ। আরাফার শৈলমালার দিক থেকে ভেসে উঠলো হজরত জিবরাইলের সুবিশাল দেহাবয়ব। পা মাটিতে এবং মাথা ছুঁয়ে আছে আকাশ। আর পূর্ব-পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপী বিস্তৃত হয়ে আছে তাঁর শরীর। রসুল স. ওই সুবিশাল অবয়ব দেখে চেতনা হারিয়ে ফেললেন। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তাঁর সংজ্ঞাহীন শরীর। হজরত জিবরাইল ধারণ করলেন তাঁর পূর্বরূপ। রসুল স.কে তুলে জড়িয়ে নিলেন তাঁর বুকে। রসুল স. এর জ্ঞান ফিরে এলে বললেন, মহাসম্মানিত ভ্রাতঃ! ইসরাফিলকে দেখলে তো আপনি সহ্যই করতে পারবেন না। তার পা সর্বনিম্ন স্থানে, আর মাথা ঠেকে আছে সপ্তম আকাশ ভেদ করে আরশে। তাঁর কাঁধে রয়েছে আল্লাহ্‌র আরশ। এতো বিশাল বপুর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ্‌র ভয়ে হয়ে যান ক্ষুদ্র চড়ুই সদৃশ। আর তখন শ্রেষ্ঠত্ব বিকশিত হয় কেবল আরশাধিপতির। উল্লেখ্য, জননী আয়েশাও স্পষ্ট দিগন্তে হজরত জিবরাইলকে দেখার প্রবক্তা। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি বলে রসুল স. আল্লাহকে দেখেছেন, সে মিথ্যাবাদী। এরপর তিনি আবৃত্তি করতেন 'তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত'। আরো আবৃত্তি করতেন, 'প্রত্যাদেশ অথবা অন্তরালবর্তী হওয়া ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষেই আল্লাহ্‌র সঙ্গে বাক্যালাপ করা সম্ভব নয়'। বোখারী।

বিষয়টির সমাধান করা যেতে পারে এভাবে— মেরাজ রজনীতে রসুল স. আল্লাহকে দেখেছিলেন, একথা যাঁরা বলেন, তাঁদের অভিমত জননী আয়েশার অভিমত অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। কেননা তাঁর উদ্ধৃত আয়াত 'তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন' পরলোকে আল্লাহ্‌র দীদার লাভকে যে নাকচ করে না, সে কথা তো ঐকমত্যসম্ভূত। অনুরূপ মেরাজ রজনীতে রসুল স. এর আল্লাহ্‌দর্শনের বিরুদ্ধে কোনো কথা উদ্ধৃত আয়াতখানিতে নেই। এখন কথা হচ্ছে হজরত জিব্‌রাইলকে

www.eelm.weebly.com

দেখা নিয়ে, যা বর্ণনা করেছেন জননী আয়েশা ও হজরত ইবনে আব্বাস। তাঁদের অভিমত তো অবশ্যই সঠিক। কিন্তু এর সঙ্গে আলোচ্য আয়াতকে সম্পর্কযুক্ত করার তো কোনো কারণ নেই। আলোচ্য আয়াতের গতি-প্রকৃতি দৃষ্টে তো একথাই প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স. এর মাহাত্ম্য পূর্ণরূপে প্রকাশ করাই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ্কে যখন তিনি দেখেছেন, তখন তাঁর মর্যাদা অবশ্যই অন্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হজরত জিবরাইলকে দেখলে তো তাঁর মর্যাদা বাড়ে না। কারণ তিনি স. এমনিতেই তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। পূর্বের আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর এই বৈশিষ্ট্যগুলো 'যিনি সামর্থ্যশালী' 'আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন' 'যাকে সেখানে মান্য করা হয়' ও 'যিনি বিশ্বাসভাজন'। এরপর আল্লাহ্র দীদারের কথা উল্লেখিত হওয়াই তো স্বাভাবিক, হজরত জিবরাইলের দীদার তো পূর্বোল্লিখিত মর্যাদাগুলোর তুলনায় অধিকতর শ্রেষ্ঠ নয়। আর যদি পূর্বোল্লিখিত গুণগুলো ধরা হয় হজরত জিবরাইলের, তবে তো বক্তব্যটির উদ্দেশ্য হয়ে যাবে পণ্ড। কেননা তিনি আবার স্পষ্ট দিগন্তে কাকে দেখবেন? সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ— রসুল স. তখন স্পষ্ট দিগন্তে আনুরূপ্যহীন আল্লাহ্কেই দেখেছিলেন। হজরত জিবরাইল আল্লাহ্র দরবারে প্রভুত মর্যাদাশালী— এতে সন্দেহ মাত্র নেই। কিন্তু তাঁকে দেখলে রসুল স. এর মর্যাদা বেড়ে যাবে, এরকম ভাবার তো কোনো কারণ নেই। কেননা রসুল স. তাঁর তুলনায় আরো অধিক মর্যাদাশালী।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয় (২৪) এবং এটা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয় (২৫)। সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছো' (২৬)। একথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! হে বিশ্ববাসী! শোনো, আমার শেষতম রসুল এমন নন যে, তিনি আমা কর্তৃক অবতারিত প্রত্যাদেশাবলীর কোনো অংশ প্রকাশ করবেন এবং কোনো অংশ করবেন গোপন। এই আকাশাগত জ্ঞান তিনি কাউকে শেখাবেন, আবার কাউকে শেখাবেন না, এমন কৃপণ তিনি কিছুতেই নন। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের একথাও সর্বৈবরূপে মিথ্যা যে, এই বাণী অভিশপ্ত শয়তানের বাণী। কাজেই হে মক্কাবাসী! হে বিশ্ববাসী! ভেবে দ্যাখো, তাঁর প্রদর্শিত সত্য পথ ছেড়ে দিয়ে তোমরা কোথায় চলেছো?

'ফা আইনা তাজহাবূন' অর্থ সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছো? এখানকার 'ফা' অব্যয়টি নৈমিত্তিক। আর প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ এই পথ ছেড়ে তোমরা অন্য কোনো পথে গমন কোরো না। জুজায বলেছেন, এই আয়াতের মর্মার্থ হবে— আমি যে পথের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দান করলাম, সেই পথের চেয়ে উত্তম পথ আর কোথায় যে, তোমরা সে পথের পথিক হবে? বলো, সে পথ কোনটি?

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'এটা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ'। এখানে 'জিকরুন' অর্থ উপদেশ। 'কামুস' অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে 'তাজকুরুন' শব্দটির মতো 'জিকরুন' শব্দটিও ধাতুমূল। এর অর্থ কোনো

www.eelm.weebly.com

কিছু স্মরণে রাখা, যা উচ্চারণেও সাবলীল। অর্থাৎ কারো প্রসিদ্ধি, প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা, নামাজ, প্রার্থনা, আকাশজ গ্রন্থ, যাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে শরিয়তের বিধিবিধান, শিক্ষামূলক কাহিনী ইত্যাদিও জিকির নামে পরিচিত। এখানে মর্মার্থ গ্রহণ করা হয়েছে শেষোক্তটির। কেননা কোরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র স্মারক, যে আল্লাহ্‌র স্মরণ একান্ত জরুরী— সর্বদা, অথবা অধিকাংশ সময় আবৃত্তিযোগ্য বিষয়। এই কোরআনের আবৃত্তি অর্থ যেমন আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা, ইবাদত, তেমনি মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক ও তাদের প্রার্থনা-যাচনাও বটে।

'আ'লামীন' অর্থ বিশ্বজগত, মানবজগত। জ্বিনজগতও এর উদ্দেশ্যভূত। কেননা রসুল স. এর নবুয়ত ছিলো জ্বিন ও মানুষ উভয় সম্প্রদায়ের জন্য। এতদসত্ত্বেও তাঁর পবিত্র সত্তা গোটা বিশ্বজগতের জন্য 'রহমত' বা করুণাসিন্ধু। অর্থাৎ তিনি স. 'রহমতাল্লিল আ'লামীন'। কোরআন অনুপ্রাণিত করে ফেরেশতাদেরকেও। যেমন হাকেম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন সুরা আনআ'ম অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. বর্ণনা করলেন আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা। তারপর বললেন, এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানতে পেরে এতো অধিকসংখ্যক ফেরেশতা সমবেতভাবে এর সুচিতার বর্ণনা করেছিলেন যে আকাশমার্গে তিল ধারণের ঠাঁই ছিলো না।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য'। একথার অর্থ— যারা মহাসত্যাভিমুখী পথের পথিক, কোরআন শুভোপদেশ কেবল তাদের জন্য। এখানে এরকম বলার কারণ হচ্ছে, কোরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারে কেবল তারাই, যারা বিশ্বাসবান, মহাসত্যাভিমুখী। আর যাবতীয় বিধান-সংবিধানকে এখানে সীমাবদ্ধ করেছে 'ইয়াসতাক্বীম' শব্দটি। সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ সাক্বাফী বর্ণনা করেছেন, একবার আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! দয়া করে আমাকে এমন কিছু ধর্মের কথা শোনান, যাতে আপনার মহাপ্রস্থানের পরেও আমাকে অন্য কারো দ্বারস্থ হতে না হয়। রসুল স. বললেন, বলো 'আমি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করলাম এবং একথার উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত রইলাম'।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবী হাতেম, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার সূত্রে ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং সুলায়মান ইবনে কাসেম, ইবনে মুখাইমিয়া সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন আবু জেহেল বললো, বাহ্! এবার তো পরিষ্কার করে বলেই দেওয়া হলো যে, যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্যই কোরআন উপদেশ। অর্থাৎ যে এরকম চায় না, তার কাছে কোরআন কিছুই নয়। এভাবে তো বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে করে দেওয়া হলো আমাদের ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ হে মোহাম্মদ! আমরা ইচ্ছা করলে তোমার পথে চলতে পারি, আবার না-ও পারি। তার এমতো কুটকথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (২৯)। বলা হলো—

www.eelm.weebly.com

‘তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন’। একথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর দল! তোমরা ভেবেছো কী? ইচ্ছা করলেও তো তোমরা সরল পথের পথিক হতে পারবে না, যতোক্ষণ না তোমরা লাভ করবে আল্লাহ্র ইচ্ছার আনুকুল্য, অনুমোদন অথবা সমর্থন। কেননা তিনিই সর্বাধিপতি। এই সুবিশাল সৃষ্টির প্রতিটি অস্তিত্বকে তিনিই দান করেছেন গতি-প্রকৃতি-প্রবৃদ্ধি ও পরিণতি, সে অস্তিত্ব মৌল হোক, অথবা হোক যৌগ। তিনিই সকলের ও সকল কিছুর একক সৃজয়িতা, পালয়িতা ও নিয়ন্ত্রয়িতা। এমন কি তোমাদের অভিপ্রায় সৃজয়িতাও তিনিই। সুতরাং কাউকে যদি সরল পথাভিমুখী হতে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে তার ইচ্ছার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্পাকের দয়ার্দ্র অভিপ্রায়ের অনুমোদন।

সূরা ইনফিত্বর

১ রুকু এবং ১৯ আয়াতসম্বলিত এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কায়।

সূরা ইনফিত্বর ঃ আয়াত ১— ১২

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○
اِذَا السَّمَآءُ انۡفَطَرَتۡ (١) وَاِذَا الۡكَوَاكِبُ انۡتَثَرَتۡ (٢) وَاِذَا
الۡبِحَارُ فُجِّرَتۡ (٣) وَاِذَا الۡقُبُوۡرُ بُعۡثِرَتۡ (٤) عَلِمَتۡ نَفۡسٌ مَّا
قَدَّمَتۡ وَاَخَّرَتۡ (٥) يٰۤاَيُّهَا الۡاِنۡسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الۡكَرِيۡمِ (٦)
الَّذِيۡ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِيۡۤ اَيِّ صُوۡرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ (٨)
كَلَّا بَلۡ تُكَذِّبُوۡنَ بِالدِّيۡنِ (٩) وَاِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحٰفِظِيۡنَ (١٠) كِرَامًا
كَاتِبِيۡنَ (١١) يَعۡلَمُوۡنَ مَا تَفۡعَلُوۡنَ (١٢)

r আকাশ যখন বিদীর্ণ হইবে,

r যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরিয়া পড়িবে,

r সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হইবে,

r এবং যখন কবর উন্মোচিত হইবে,

r তখন প্রত্যেকে জানিবে, সে কী অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে।

www.eelm.weebly.com

r হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করিল?

r যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করিয়াছেন এবং সুসমঞ্জস করিয়াছেন,

r যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, তিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন।

r না, কখনও না, তোমরা তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করিয়া থাক;

r অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ;

r সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ;

r তাহারা জানে তোমরা যাহা কর।

প্রথমোক্ত আয়াতপঞ্চকের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাপ্রলয়কালে অবশ্যই মানুষ জানতে পারবে পূর্বাহ্নে তারা কী কী পুণ্যকর্ম প্রেরণ করেছে, আর পশ্চাতে রেখে এসেছে কোন কোন কুপ্রথা, যখন আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে ভেঙে পড়বে, নক্ষত্রগুলো কক্ষচ্যুত হয়ে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে বিক্ষিপ্তরূপে, সমুদ্রসমূহ হয়ে উঠবে অগ্নিময়-উত্তপ্ত এবং কবরগুলো উন্মোচিত হয়ে পুনরুত্থিত হবে সকল মানুষ। বলাবাহুল্য, আলোচ্য আয়াতপঞ্চকে বলা হয়েছে অনেক কথা। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, এখানে 'অগ্রে পাঠিয়েছে' অর্থ সুকীর্তি এবং 'পশ্চাতে রেখে গিয়েছে' অর্থ কুকীর্তি। অর্থাৎ সুপ্রথা ও কুপ্রথা, যার অনুসরণ তাদের পরবর্তী বংশধরেরা করে। সেদিন এ বিষয়টিই বার বার মনে পড়বে তাদের। কেউ কেউ বলেছেন, মানুষের মন তখন এই চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকবে যে, তারা কী কী করতে পেরেছে এবং কী কী করতে পারেনি। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তখন তাদের প্রথমে মনে পড়বে দান খয়রাতের কথা, তারপর জাকাতের কথা। আবার কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, ইহকাল ও পরকালের মধ্যে কোনটিকে তারা প্রাধান্য দিয়েছিলো, সে কথাই তখন তাদের মনে পড়বে বার বার। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সেদিন মানুষকে জানানো হবে, যা তারা অগ্রগণ্য করেছে এবং যা কিছু করেছে পশ্চাৎগণ্য'।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করলো'। একথার অর্থ— হে মানব জাতি! তোমাকে প্রতারক বানালো কে? কে তোমাকে তোমার দয়াময় প্রভুপালনকর্তার বিরুদ্ধে যেতে অনুপ্রাণিত করলো? আয়াতখানি ভিন্ন প্রসঙ্গের। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওলীদ ইবনে মুগীরা সম্পর্কে। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে উবাই ইবনে খলফকে লক্ষ্য করে। কালাবী বলেছেন, উসায়েদ ইবনে কেলাদাহ ছিলো আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ। সে একবার রসুল স.কে আঘাত করেছিলো। রসুল স. তার প্রতিশোধ নেননি। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

www.eelm.weebly.com

এখানে ‘আল কারীম’ অর্থ ক্ষমাশীল, মহান। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সেই ক্ষমাশীল প্রভুপালক সম্পর্কে কে তোমাকে করেছে প্রবঞ্চক, প্রতারক। কে তোমাকে শক্তি যোগালো তাঁর বিরুদ্ধবাদী হতে। তিনি তো তোমাকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দিতে পারতেন। অথচ তিনি তা দেননি। তাহলে ভেবে দ্যাখো, তাঁর ক্ষমা ও ঔদার্য কতো বিপুল। ‘কারীম’ (ক্ষমাশীল, অনুকম্পাপরবশ, মহান) বিশেষণটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে একথা বুঝাতে যে, হে মানুষ! তাঁর এমতো অনুকম্পার কারণেই তোমরা প্রতারণায় পতিত হয়েছো। তাঁর দয়ার সুযোগেই শয়তান তোমাদেরকে একথা বুঝাতে সমর্থ হয়েছে যে, তোমাদের প্রভুপালনকর্তা তো অসীম দয়াময়। সুতরাং তোমরা শত অপরাধ করলেও তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন না। মুকাতিল বলেছেন, আল্লাহ্পাক সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেননি বলেই ওই লোকটি ধোকা খেয়েছে। সুদ্দী বলেছেন, মহান আল্লাহ্র সহনশীলতার কারণেই লোকটি পতিত হয়েছে প্রবঞ্চনায়।

আয়াতের প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার সহিষ্ণুতা ও ঔদার্যের সুযোগ গ্রহণ করে প্রতারণায় পতিত হওয়া সিদ্ধ নয়। আর এরকম ভাবনাও প্রশ্রয়যোগ্য নয় যে, এভাবে শেষরক্ষা সম্ভব হবে। চিরদিনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে অপরাধীকে। শত্রু-মিত্র সব হয়ে যাবে একাকার। কেননা আল্লাহ্পাক কঠোর শাস্তিদাতাও। অপরাধীকে যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি তিনি অবশ্যই দিবেন। সুতরাং ঔদাসীন্য ও ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করে বিনম্র, অনুগত ও সংযত হওয়াই সমীচীন।

‘আলকারীম’ কথাটির দাবি হচ্ছে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রতিবাদ করা অকৃতজ্ঞতার। অনুগ্রহদাতার দানের প্রতি কৃতঘ্ন হওয়া নিশ্চয় নিষিদ্ধ ও অসিদ্ধ। বরং এমতো ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও অনুগত হওয়া অপরিহার্য। মার্জনা ও মহানুভবতার সুযোগ নিয়ে পাপমগ্ন হওয়া অবশ্যই ক্ষমাহীন অপরাধ।

কেউ কেউ বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে পাপীরা যেনো বলতে না পারে, হে আমাদের মহান প্রভুপালক! আমরা তো তোমার অপার অনুকম্পার কারণেই পৃথিবীতে প্রতারণায় পতিত হয়েছিলাম, সেকারণেই অবতীর্ণ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াত। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতের উল্লেখ করেই সেদিন তাদের এমতো অশুভ অজুহাত খণ্ডন করা হবে। বলা হবে, কেনো? ধোকায় যাতে না পড়ো, সেজন্য তো তোমাদেরকে আগেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছিলো।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুয়াজ বলেছেন, সেদিন আল্লাহ্পাক যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, বলো, আমার ব্যাপারে তোমাকে কে প্রতারণা করেছিলো? আমি জবাব দিবো, পরম প্রভুপালনকর্তা আমার! তোমার আগত-অনাগত করুণাই আমাকে তখন উদাসীন করে রেখেছিলো। আবু বকর ওয়ারাক বলেছেন, আমাকে যদি আল্লাহ্পাক প্রশ্ন করেন, কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রভুপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করেছে? আমি বলবো, তোমারই মহানুভবতা। হে আমার প্রাণপ্রিয় প্রভুপালক! তোমারই উদারতা।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউই মহাবিচারের দিবসে জিজ্ঞাসাবাদ থেকে রেহাই পাবে না। তিনি অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন, হে আদম সন্তান! তোমাকে আমার সম্পর্কে নির্ভিক হতে সাহস যোগালো কে? তুমি কি তোমার জ্ঞানানুপাতে কর্ম সম্পাদন করেছো? নবীগণের আহ্বানে কি তুমি সাড়া দিয়েছিলে? আতা আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন এভাবে— হে মানুষ কিসে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করেছে তোমার অনুকম্পাপরবশ আল্লাহ্ থেকে? কে তোমাকে করেছে প্রবৃত্তির পূজারী?

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি নামাজে দণ্ডায়মান হয়, তখন আল্লাহ্ হয়ে যান তার অভিমুখী। এরপর যখন সে আল্লাহ্র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (নামাজ পরিত্যাগ করে) তখন আল্লাহ্ বলেন, ওহে আদম সন্তান! তুমি কার দিকে মুখ ফেরালে? আমার চেয়ে অধিক আপন তোমার কে? সে যখন দ্বিতীয়বার মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখনো আল্লাহ্ একই কথা বলেন। কিন্তু তৃতীয়বার সে এরকম করলে আল্লাহ্ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। বায্যার।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসমঞ্জস করেছেন'। একথার অর্থ— হে মনুষ্য সম্প্রদায়! কী করে তোমরা ভুলে যেতে পারলে তোমাদের পরম অনুকম্পাপরবশ সেই আল্লাহকে, যিনি দয়া করে তোমাদের আদি পিতাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে, তারপর তোমাদের বংশানুক্রমকে বিস্তারিত করেছেন শুক্রবিন্দুর মাধ্যমে। তারপর তোমাদেরকে দিয়েছেন সুঠাম দেহবল্লরী এবং সুসমঞ্জস অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এভাবে তোমাদেরকে করেছেন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি!

এখানে 'আ'দালাক' অর্থ সুসমঞ্জস করেছেন তোমাকে। অথবা— সমন্বয় করেছেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে। অর্থাৎ রক্ত-শ্লেষ্মা-অম্ল-পিত্ত ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী উপাদানগুলোকে এক সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন তোমাদের অবয়বে এনেছেন কী নিখুঁত ভারসাম্য। এমতো সৃজনৈপুণ্যের প্রতি তোমরা দৃষ্টিপাত করো না কেনো? কোনো কোনো ক্বারী এখানকার 'ফা আ'দালাক' কথাটিকে পড়তেন 'ফা আ'দ্দালাক' যার অর্থ আল্লাহ্পাক তোমাদের দৈহিক কাঠামোকে করেছেন সুবিন্যস্ত, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে করেছেন সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন'। এখানকার 'সূরাত' শব্দটিকে অনির্দিষ্টকারক 'তানভীন যুক্ত করে করা হয়েছে 'সূরাতিন'। আর এই অনির্দিষ্টবাচকতাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ করার নিমিত্তে এর পরে ব্যবহার করা হয়েছে 'মা' অব্যয়টি। এভাবে বুঝানো হয়েছে, তোমরা অসংখ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি তোমাদের সকলকে দিয়েছেন পৃথক পৃথক আকৃতি, যেমনটি তিনি চেয়েছেন।

www.eelm.weebly.com

মুজাহিদ, কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ— তোমাদেরকে তিনি দিয়েছেন তোমাদের পিতা, মাতা, মামা, অথবা চাচার মতো অবয়ব, যেমন তিনি অভিপ্রায় করেছেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, পিতার শুক্ররেণু যখন অবস্থান করে মাতৃগর্ভে, তখন ওই রেণুর সম্মুখে উপস্থিত করা হয় হজরত আদম পর্যন্ত তার সকল পূর্বপুরুষের আকৃতি। এরপর রসুল স. আবৃত্তি করলেন 'যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন'। হাদিসটি শিথিলসূত্রে মুসা ইবনে আলী ইবনে রেবাহ থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর ও তিবরানী। উল্লেখ্য, এখানকার 'আ'দালাক' কথাটির বিশ্লেষণ হচ্ছে 'ফী আইয়্যি সূরাতিম মা শাআ রক্কাবাক'। একারণেই বাক্য দু'টোর মধ্যে কোনো সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করা হয়নি।

আগের আয়াতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বক্তব্যটি এখানে ৬ সংখ্যক আয়াতের বক্তব্যটির দ্বিতীয় বিশেষণ, যা থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে আল্লাহ্পাকের প্রতিপালকত্বের চূড়ান্ত মহিমা ও মাহাত্ম্য। সেই সঙ্গে বিঘোষিত হয়েছে এই সতর্কসংকেতটিও যে, যে মহান প্রভুপালক সৃষ্টির সূচনালগ্নে এমন অভূতপূর্ব প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন, পুনরুত্থান দিবসে তিনি তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে অবশ্যই পারঙ্গম। এভাবে এখানে এটাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সত্যপ্রত্যাখ্যান নিষিদ্ধ। সুতরাং সাধু সাবধান!

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'না, কখনও না, তোমরা তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করে থাকো'। এখানে 'কাল্লা' অর্থ না, কখনো না। একথা বলে এখানে শাসানো হয়েছে আল্লাহ্র অনুকম্পার সুযোগে বিভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে। আর 'বিদ্দীন' অর্থ এখানে— বিনিময়, বিচার, প্রতিফল, অথবা ইসলাম। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্র অনুকম্পার প্রতি কেবল অকৃতজ্ঞই নও, তোমরা তো প্রতিফল দিবসকেও অস্বীকার করে থাকো। অথবা বলা যেতে পারে, আলোচ্য আয়াত ৫ সংখ্যক আয়াতের 'সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কী পশ্চাতে রেখে এসেছে' কথাটির অনুবর্তী। অর্থাৎ যখন তোমরা জানবে, কী নিয়ে এসেছো এবং কী রেখে এসেছো, তখন একথাও তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, তোমরা পৃথিবীতে নিমজ্জিত ছিলে ঘোর অবাধ্যতায়। তৎসহ মহাবিচারের দিবস সম্পর্কেও তোমরা ছিলে ঘোর অবিশ্বাসী।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ (১০); সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ (১১); তারা জানে তোমরা যা করো' (১২)। একথার অর্থ— হে মানব সম্প্রদায়! এখনো সময় আছে, সাবধান! তোমাদের কৃতকর্মসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার অবশ্যই হবে। তোমরা তোমাদের কোনো অপরাধকে তখন লুকাতেও পারবে না। কেন না আমি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। তাছাড়া তোমাদের কৃতকর্মসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার জন্য আমি কিরামান ও কাতেবীন নামক দু'জন করে ফেরেশতা নিয়োগ করেছি। তারা

www.eelm.weebly.com

সম্মানিত। সারাক্ষণ তারা তোমাদের সঙ্গেই থাকে। তারা দেখে, জানে ও লিপিবদ্ধ করে সকল কিছুই, তোমরা যা করো। উল্লেখ্য, এখানে আমল লেখক ফেরেশতাদ্বয়কে বিভূষিত করা হয়েছে তিনটি ভূষণে— 'কিরামান' (সম্মানিত) 'কাতিবীন' (লিপিকার) এবং 'ইয়া'লামূন' (পরিজ্ঞাত)। এভাবে তাদের পরিচিতি প্রকাশ করে একথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মহাবিচারের দিবসে সকলের কৃতকর্মের বিচার করা হবেই। দেওয়া হবে সকলকে যথোপযুক্ত প্রতিফল— স্বস্তি অথবা শাস্তি।

সূরা ইনফিত্বর ঃ আয়াত ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾
يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا
أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ
لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ﴿١٩﴾

r পুণ্যবানগণ তো থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে;
r এবং পাপাচারীরা তো থাকিবে জাহান্নামে;
r উহারা কর্মফল দিবসে উহাতে প্রবেশ করিবে;
r এবং উহারা উহা হইতে অন্তর্হিত হইতে পারিবে না।
r কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান?
r আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান?
r সেই দিন একের অপরের জন্য কিছু করিবার সামর্থ্য থাকিবে না; এবং সেই দিন সমস্ত কর্তৃত্ব হইবে আল্লাহ্‌র।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা পুণ্যবান তারা জান্নাতে দিনাতিপাত করবে পরম আনন্দে, অনন্তকাল ধরে। আর পুণ্যবান তারাই, যারা প্রকৃত ইমানদার। যারা নিজেদেরকে বিরত রাখে ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাস থেকে। মুক্ত থাকে অসুন্দর স্বভাব ও নিন্দনীয় কর্ম থেকে। অর্থাৎ যারা থাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশানুগত ও নিষেধাজ্ঞাবিচ্যুত। ইবনে আসাকের তাঁর 'ইতিহাস' গ্রন্থে হজরত ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে পুন্যবান বলে আখ্যায়িত করেছেন এ কারণে যে, তারা তাদের পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'এবং পাপাচারীরা তো থাকবে জাহান্নামে'। এখানে 'ফুজ্জার' অর্থ পাপাচারী, হতভাগ্য, যারা অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার আড়ালে চিরতরে আচ্ছাদিত করে ফেলে ধর্মপরায়ণতা ও আমানতকে।

www.eelm.weebly.com

আয়াতখানির যোগসূত্র রয়েছে ৫ সংখ্যক আয়াতে 'তখন প্রত্যেকে জানবে সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে গিয়েছে' কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ প্রত্যেকে তাদের কৃতকর্মের পরিচয় যখন পাবে, তখন পাপাচারীদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।

সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেক একবার আবু হাশেম মাদানীকে বললেন, হায়! যদি জানতে পারতাম আল্লাহ্তায়ালার নিকটে আমার জন্য কী প্রতিফল জমা আছে। আবু হাশেম বললেন, কেনো, তোমার জন্য কী রয়েছে, তা তুমি কোরআনেই তো দেখতে পাবে। সুলায়মান বললেন, কোন আয়াতে? আবু হাশেম আবৃত্তি করলেন 'পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে; এবং পাপাচারীরা তো থাকবে জাহান্নামে'। সুলায়মান বললেন, তাহলে আল্লাহ্পাকের রহমত কোথায় থাকলো? আবু হাশেম বললেন, পুণ্যবানগণের কাছে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা কর্মফল দিবসে তাতে প্রবেশ করবে (১৫); এবং তারা তা থেকে অন্তর্হিত হতে পারবে না' (১৬) একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে প্রতিফলপ্রাপ্তির পর যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তারা সেখান থেকে আর কখনো বের হতে পারবে না। এখানকার 'তারা' সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতিকারীর সঙ্গে। তারা পাপাচারী। 'ফুজ্জার' অর্থ এখানে অবিশ্বাসী, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, কাফের। অর্থাৎ প্রকৃত পাপাচারী তারাই।

'ওয়ামা হুম আ'নহা বিগয়িবীন' অর্থ এবং তারা তা থেকে অন্তর্হিত হতে পারবে না। অর্থাৎ নরকে তাদের অবস্থান হবে সার্বক্ষণিক। অথবা মর্মার্থ হবে— আগেও তারা নরকের বাইরে ছিলো না। অর্থাৎ তারা নরকযন্ত্রণা ভোগ করতো তাদের সমাধিমধ্যেও। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় দেখানো হয় তাদের আসল নিবাস— জান্নাতীদেরকে জান্নাত এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নাম। হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কবরবাসী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় দ্বীন সম্পর্কে। তারা তখন বলে, হায়, হায়! দ্বীন কী, তা তো আমি জানি না। তখন নেপথ্য থেকে আওয়াজ ভেসে আসে, এ লোক মিথ্যাবাদী। তার জন্য অনলশয্যা বিছিয়ে দেওয়া হোক। পরিধান করানো হোক তাকে আগুনের পোশাক। তার দিকে খুলে দেওয়া হোক নরকের দরজা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জানো (১৭)? আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জানো' (১৮)? পুনঃ পুনঃ একই কথা বলে এখানে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কর্মফল দিবসের গুরুত্বকে। আর প্রশ্ন দু'টো এখানে বিস্ময়পূর্ণ ও শাসনমূলক। অর্থাৎ সাবধান! সাবধান! কর্মফল দিবস হবে অত্যন্ত কঠিন, ভয়াবহ।

শেষোক্ত আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'সেই দিন একের পক্ষে অপরের জন্য কিছু করবার সামর্থ্য থাকবে না, এবং সেই দিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্র'। একথার অর্থ— সেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না। কেননা সেদিন সর্বময় কর্তৃত্বের সরাসরি নিয়ন্ত্রয়িতা হবেন স্বয়ং আল্লাহ্।

www.eelm.weebly.com

ক্বারী ইবনে কাদের ও ক্বারী আমেরের ক্বেরাতে এখানকার 'ইয়াওমা' পদটি এসেছে আগের আয়াতের 'মা ইয়াওমুদ্ দীন' এর অনুবর্তী হয়ে। অথবা এর পূর্ব উদ্দেশ্য হিসেবে উহ্য রয়েছে একটি সর্বনাম 'হুয়া' (সে)। আর জমহুরের ক্বেরাতে আগের 'ইয়াওমাদ্ দীন' থেকে অনুবর্তী হয়েছে আলোচ্য আয়াতের 'ইয়াওমা' পদটি। অথবা এটি একটি উহ্য ক্রিয়ার আধার। অর্থাৎ দু'টি দলকেই সেদিন দেয়া হবে প্রতিফল, যেদিন কেউ কারো কোনো উপকারেই আসবে না। কিংবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'ইয়াওমা' (সেই দিন) কথাটির পূর্বে অনুক্ত রয়েছে 'উজকুর' (স্মরণ করো) কথাটি। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— স্মরণ কর সেই দিনের কথা, যে দিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না। কেননা সেই দিন প্রত্যক্ষত সর্বময় কর্তৃত্বাধিকারী হবে স্বয়ং আল্লাহ্।

'ওয়াল আমরু ইয়াওমায়িজিল্ লিল্লাহ্' অর্থ এবং সেই দিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্র। অর্থাৎ পৃথিবীর জীবনের মতো সেদিন কাউকে কোনো প্রকার সাময়িক মালিকানাও দেওয়া হবে না। অবশ্য মুমিনগণকে দেওয়া হবে শাফায়াতের অনুমতি। কিন্তু শাফায়াতের মালিক তাঁরা হবেন না। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে এরকম— পৃথিবীতেও বস্তুত কারো কোনো মালিকানা নেই, আছে শুধু সাময়িক ভোগের অধিকার। কিন্তু পরকালে অধিকারের এই আবরণটুকুও আর থাকবে না। ফলে দ্বিধাহীন দৃষ্টিতে তখন সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারবে যে, সকল কর্তৃত্ব ও অধিকার কেবলই আল্লাহ্র। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

সূরা মুত্বাফ্ফিফীন ঃ

১ রুকু এবং ৩৬ আয়াতবিশিষ্ট এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কায়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরায় হাকেম, নাসাঈ ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন মদীনায় এলেন, তখন দেখলেন মদীনাবাসীদের ওজন-মাপের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তাদের এমতো অপ-অভ্যাস সম্পর্কেই তখন অবতীর্ণ হলো সুরা মুত্বাফ্ফিফীন। এরপর থেকে তারা ক্রয়-বিক্রয় করতে লাগলো সঠিক পরিমাপে।

সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন মদীনায় শুভাগমন করলেন, তখন সেখানে বাস করতো আবু জুহাইনা নামের এক লোক। সে পণ্যবিনিময়ের সময় ব্যবহার করতো দু'টি টুকরী। একটি ব্যবহার করতো নেওয়ার সময় এবং দেওয়ার সময় ব্যবহার করতো অপরটি। তাকে উদ্দেশ্য করেই অবতীর্ণ হয় 'দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়.....'।

www.eelm.weebly.com

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○
وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِيۡنَ ۙ﴿۱﴾ الَّذِيۡنَ اِذَا اكۡتَالُوۡا عَلَى النَّاسِ يَسۡتَوۡفُوۡنَ ۖ﴿۲﴾
وَاِذَا كَالُوۡهُمۡ اَوۡ وَّزَنُوۡهُمۡ يُخۡسِرُوۡنَ ؕ﴿۳﴾ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمۡ
مَّبۡعُوۡثُوۡنَ ۙ﴿۴﴾ لِيَوۡمٍ عَظِيۡمٍ ۙ﴿۵﴾ يَّوۡمَ يَقُوۡمُ النَّاسُ لِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ؕ﴿۶﴾

r দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়,

r যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে,

r এবং যখন তাহাদের জন্য মাপিয়া অথবা ওজন করিয়া দেয়, তখন কম দেয়।

r উহারা কি চিন্তা করে না যে, উহারা পুনরুত্থিত হইবে

r মহাদিবসে?

r যেদিন দাঁড়াইবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে!

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা পণ্য-সামগ্রী মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে, অথচ মাপে ও ওজনে কম দেয়, তাদের জন্য রয়েছে চরম দুর্ভোগ, ওয়াইল দোজখ। এখানে 'আল মুত্বাফ্ফিফীন' অর্থ যারা মাপে কম দেয়। অর্থাৎ নেওয়ার সময় ঠিক ঠাক মাপ বুঝে নিলেও দেওয়ার সময় দেয় কম। উল্লেখ্য, তখনকার দিনের মাপ হতো দু'ধরনের— পাত্র বা টুকরি দিয়ে, যাকে বলা হতো মাপ এবং বাটখারা দিয়ে দাঁড়িপাল্লার মাধ্যমে, যাকে বলা হতো ওজন। এখানে বলা হয়েছে কেবল মাপের কথা। অবশ্য এর সঙ্গে ওজনের কথা আপনাআপনিই এসে যায়। আবার এমনও বলা যেতে পারে যে, সে যুগে পণ্য আদান প্রদান হতো অনেকটা অনুমান-আন্দাজে। লক্ষণীয়, এখানে 'মিনান্ নাসি' (জনগণের নিকট থেকে) না বলে বলা হয়েছে 'আলান্ নাসি' (জনগণের উপর)। এভাবে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, জনগণের উপরে বিক্রেতার যে অধিকার আছে, তা সে গ্রহণ করে পুরোপুরি। অথবা, জনগণের কাছ থেকে সে তার পাওনা উসুল করে নেয় চক্রান্তমূলকভাবে।

ফাররা বলেছেন, এরূপক্ষেত্রে 'মিন' ও 'আলা' (উপরে) দু'টো অব্যয়ই ব্যবহার করা যায়। যেমন বলা হয় 'আকতাল্তু মিনকা' (তোমার নিকট থেকে আমি আমার পাওনা বুঝে নিয়েছি) এবং 'আকতালতু আলাইকা' (তোমার উপর আমার যে অধিকার ছিলো, তা আমি মেপে নিয়েছি)।

এখানকার 'কালূ হুম' ও 'ওয়াযানূ হুম' বাক্যদ্বয়ের 'হুম' এর পূর্বে উহ্য রয়েছে যের প্রদানকারী একটি করে 'লাম'। এভাবে 'কালূ লাহুম' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়—

www.eelm.weebly.com

তারা তাদের জন্য, বা তাদেরকে মাপ করে দেয় এবং ‘ওয়াযানূ লাহুম’ অর্থ দাঁড়ায়— তারা তাদের জন্য বা তাদেরকে ওজন করে দেয়। এমনও বলা হয়েছে যে, বাক্যটির মূলরূপ ছিলো ‘কালূ মাকীলাহুম’ (তাদের মাপযোগ্য বস্তু মাপ করে)।

‘ইউখ্সিরূন’ অর্থ কম দেয়। ওজন কম করা, বা ওজন কম দেওয়াকে বলে ‘তাত্বফীফ’। কারণ, মাপে-ওজনে কমের বিষয়টি ঘটে তুচ্ছতা থেকে। আলোচ্য আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, অতি তুচ্ছ পরিমাণ কম দিলেও ওয়াইল দোজখের অধিবাসী হওয়া অনিবার্য হয়। সুতরাং অধিক পরিমাণে কম দিলে দোজখবাসী হওয়া তো হয়ে যায় আরো অধিক অনিবার্য। রসুল স. বলেছেন, পাঁচটি বিষয় থেকে উদ্ভব হয় পাঁচটি বিষয়ের— ১. যে জাতি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ্পাক তাদের উপরে প্রবল করে দেন তাদের শত্রুদেরকে ২. যে জাতি আল্লাহ্র বিধানের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, আল্লাহ্পাক সে জাতিকে করেন দারিদ্রকবলিত ৩. যাদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচলন ঘটে প্রকাশ্যভাবে, তাদের মধ্যে মৃত্যুহার হয় অধিক ৪. যারা ওজনে কম দেয়, তাদের দেশের শস্য উৎপাদন যায় কমে, ফলে তারা হয় দুর্ভিক্ষকবলিত ৫. যারা জাকাত দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তাদের দেশে বন্ধ হয়ে যায় বৃষ্টি। হজরত বুরাইদা এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাকেম।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, যে জাতির মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ চুরির প্রচলন ঘটে, আল্লাহ্পাক সে জাতির অন্তরে সৃষ্টি করে দেন আতংক। যে জাতির মধ্যে সুদের প্রচলন বেড়ে যায়, সে জাতির মধ্যে মৃত্যু হার যায় বেড়ে। মাপ ও ওজনে কম দেয় যে জাতি, তাদের উপরে চাপানো হয় অন্নকষ্ট। সত্য বিধানের বিপরীত সিদ্ধান্ত দেয় যে সম্প্রদায়, তারা হয় রক্তাপ্লুত। আর যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তাদের উপরে কর্তৃত্ব করে তাদের দুশমনেরা। পরিণত সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মালেক। এই হাদিসের ‘ফতর’ শব্দটির মর্মার্থ গ্রহণ করা হয়েছে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ। আর ওজনে মাপে কম দিলে যে অন্নকষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা হবে দু’ভাবে— হয় মানুষ হবে দরিদ্র, অথবা উপজীবিকা থাকা সত্বেও তা ভোগ করার সামর্থ্য তাদের থাকবে না।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর কোনো ব্যবসায়ীর পাশ দিয়ে গমনকালে তাকে লক্ষ্য করে বলতেন, আল্লাহকে ভয় কোরো। মাপে ও ওজনে কম দিয়ো না। মনে রেখো, মাপে-ওজনে যারা কম দেয়, তাদেরকে মহাবিচারের দিবসে এতো অধিক সময় দাঁড় করিয়ে রাখা হবে যে, তাদের শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকবে তেমনিভাবে, যেমনভাবে কলমের খোলা মুখ দিয়ে ঝরতে থাকে কালি। কানের অর্ধেক পর্যন্ত তাদের ডুবে যাবে ঘামের সাগরে।

পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে’? প্রশ্নটি একই সঙ্গে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক, বিস্ময়প্রকাশক ও শাসনমূলক। উল্লেখ্য, মহাপুনরুত্থান অবশ্যবিশ্বাস্য। অথচ এখানে ব্যবহার করা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে ‘ধারণা’ শব্দটি। এতে করে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, মহাপুনরুত্থান ও প্রতিফল দিবস সম্পর্কে যদি কারো ন্যূনতম ধারণাও থাকে, তবুও সে পাপ থেকে সংযত হতে পারবে। আর এ সম্পর্কে যে দৃঢ় বিশ্বাসী, সে তো হবে আরো অধিক সংযমী (মুত্তাক্বী)।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘মহা-দিবসে (৫)? যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে’ (৬)!

‘লিইয়াওমিন আ’জীম’ অর্থ মহাদিবসে। এখানকার ‘লাম’ অব্যয়টি নৈমিত্তিক। অর্থাৎ সেই মহাদিবসে হিসাব-কিতাবের জন্য। অথবা ‘লাম’ অব্যয়টি এখানে ক্রিয়ার আধার, ‘ফী’ (এতে) অর্থে। মর্মার্থ ওই মহান দিনে। মহাবিচারের দিবসকে এখানে মহাদিবস বলা হয়েছে একারণে যে, ওই দিন ঘটবে মহা মহা ঘটনা। ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, হাসান বসরী বলেছেন, তোমার আগে এমন অনেক জাতি অতীত হয়েছে, যারা অসংখ্য সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা সত্ত্বেও মহাবিচারের দিবসে তাদের ভাগ্যে নিষ্কৃতি জুটবে না।

আর এখানকার ‘সে দিন সমস্ত মানুষ দাঁড়াবে ‘কথাটির যোগসূত্র রয়েছে ৪ সংখ্যক আয়াতের ‘পুনরুত্থিত হবে’ কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ যে দিন তাদেরকে তাদের নিজ নিজ কবর থেকে ওঠানো হবে, সেদিন তারা দণ্ডায়মান হবে জগতসমূহের প্রভুপালনকর্তার সকাশে। ‘লিরব্বিল আ’লামীন’ অর্থ জগতসমূহের প্রভুপালক, মহাবিশ্বের নিয়ন্তা।

সুপরিণতসূত্রে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, সেদিন জনগণ আল্লাহ্ সকাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। আর ঘামের সাগরে কানের অর্ধেক পর্যন্ত ডুবন্ত অবস্থায় থাকবে কিছুসংখ্যক লোক। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন হাকেম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে মানুষের শরীর থেকে এতো ঘর্ম নির্গত হবে যে, তা ভূপৃষ্ঠের উপরে উঁচু হয়ে থাকবে সত্তর বানহা পর্যন্ত। আর স্বেদ-সলিল পৌঁছবে তাদের কর্ণ পর্যন্ত। তিবরানী, আবু ইয়ালী ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রতিফল দিবসে অবিশ্বাসীদের মুখে লাগানো হবে তাদেরই ঘামের লাগাম। তারা তখন বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! এ বিপদ থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও; যদিও আমাদেরকে পাঠিয়ে দাও নরকে। হজরত জাবের থেকে হাকেম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাসমাবেশস্থলে কিছুসংখ্যক লোকের মুখে লাগানো থাকবে ঘামের লাগাম। তারা মিনতি জানাবে, হে আমাদের প্রভুপালয়িতা! এরকম কষ্ট থেকে তো নরকে চলে যাওয়াই উত্তম।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে বায়হাকী লিখেছেন, কাতাদা বর্ণনা করেছেন, হজরত কা’ব বলেছেন, মানুষ প্রতিফল দিবসের মহাসমাবেশস্থলে দণ্ডায়মান থাকবে তিনশত বৎসর ধরে।

www.eelm.weebly.com

হজরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কর্মফল দিবসে সূর্য নেমে আসবে অতি নিকটে, এক মাইল ব্যবধানে। সুলাইম ইবনে আমের বলেছেন, শপথ আল্লাহ্র! রসুল স. এক মাইল বলে কী বুঝাতে চেয়েছেন, আমি তা জানি না। জানি না তা কি পৃথিবীর প্রচলিত দূরত্ব, না চোখে সুরমা লাগানো কাঠির। তিনি স. তো এরকমও বলেছেন যে, তখন মানুষ স্বেদ-সমুদ্রে ডুবে থাকবে তাদের কৃতকর্মের তারতম্যানুসারে। ঘামের অবস্থান থাকবে তাদের কারো কারো পায়ের গ্রন্থি পর্যন্ত, কারো কারো উরুদেশ পর্যন্ত। কারো কারো কটিদেশ বরাবর, আবার কারো কারো মুখে লাগানো থাকবে ঘামের লাগাম। অর্থাৎ ঘাম পৌঁছবে তাদের মুখমণ্ডল পর্যন্ত। একথা বলার পর রসুল স. তাঁর হাত দ্বারা ইঙ্গিত করেছিলেন মুখমণ্ডলের প্রতি। হজরত উকবা ইবনে আমের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী, আহমদ, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। হজরত আবু উমামা থেকে আহমদ ও তিবরানীও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। সে বর্ণনায় আবার অতিরিক্তরূপে বর্ণিত হয়েছে এই কথাটুকু— সূর্যের তাপে তখন স্বেদসাগরের কীটপতঙ্গগুলোও উদ্বেলিত হতে থাকবে এমনভাবে, যেমনভাবে উথলে ওঠে জলভরা ফুটন্ত ডেকচি। আহমদ ও তিবরানী অত্যুত্তম সূত্রে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, জীবন ধারণের পর মানুষ মৃত্যু অপেক্ষা অধিক বিপদের সম্মুখীন হয় না। কিন্তু পরবর্তী পৃথিবীর বিপদাপদ মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণাদায়ক। ভয়ে আতংকে তখন তাদের দেহ থেকে এতো অধিক স্বেদ নির্গত হতে থাকবে যে, তার লাগাম লেগে যাবে তাদের মুখে। ইচ্ছে করলে তখন স্বেদ-সরোবরে ভাসানো যাবে নৌকা।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বায়হাকী লিখেছেন, অবস্থা তখন এতোই ভয়াবহ হবে যে, হিসাব গ্রহণের পূর্বে লাগাম লাগিয়ে দেওয়া হবে তাদের মুখে। আর পুণ্যবান বিশ্বাসীরা তখন উপবিষ্ট থাকবে মেঘের ছায়ায়, স্বর্ণ-কেদারায়। হাদিসগুলো হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে হান্নাদ বর্ণনা করেছেন অতিরিক্ত এই কথাগুলো সহযোগে— বিশ্বাসীদের কাছে তখনকার পুরো সময়কে মনে হবে এক দিনের কিয়দংশ।

হজরত সালমান ফারসী থেকে হান্নাদ ও ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, প্রতিফল দিবসে সূর্য নেমে আসবে মানুষের মাথার কাছাকাছি, ধনুকের দুই জ্যা এর ব্যবধানে। সূর্য তখন তার দশ বৎসরের উত্তাপ ছড়াবে একদিনে। সে সময় মানুষের দেহে থাকবে না কোনো দেহাবরণ। বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের শরীরে লাগবে না তখন এতোটুকু উত্তাপ। তারা তখন দেহাবরণবর্জিতও হবে না। কিন্তু অবিশ্বাসী ও অবিশ্বাসিনীদের অবস্থা তখন হবে অতি করুণ। প্রচণ্ড উত্তাপে তাদের শরীর থেকে নির্গত হতে থাকবে ঘামের ঝরণা। আর তাদের ভিতর থেকে উত্থিত হতে থাকবে 'অক অক' আওয়াজ।

www.eelm.weebly.com

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾
كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ
بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿١١﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ إِذَا تُتْلَىٰ
عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم
مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا ٱلَّذِى
كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾

r কখনও না, পাপাচারীদের 'আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে।
r সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কী জান?
r উহা চিহ্নিত 'আমলনামা।
r সেই দিন দুর্ভোগ হইবে অস্বীকারকারীদের ,
r যাহারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে,
r কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী ইহা অস্বীকার করে;
r উহার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইলে সে বলে, 'ইহা পূর্ববর্তীদের উপকথা।'
r কখনও নয়; বরং উহাদের কৃতকর্মই উহাদের হৃদয়ে জঙ্ ধরাইয়াছে।
r না, অবশ্যই সেই দিন উহারা উহাদের প্রতিপালক হইতে অন্তরিত থাকিবে;
r অতঃপর উহারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করিবে;
r তৎপর বলা হইবে, 'ইহাই তাহা যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।'

প্রথমে বলা হয়েছে 'কাল্লা' এর অর্থ— না, কখনো নয়। অর্থাৎ না, না, তা হয় না, যা মহাসত্য, তাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। শব্দটি নিজেই যেনো পুরো একটি বাক্য। আর এর যোগসূত্রে রয়েছে ইতোপূর্বের বক্তব্যপ্রবাহের সঙ্গে। এরকম বলেছেন হাসান বসরী।

'ইন্না কিতাবাল ফূজ্জ্বারি লাফী সিজ্জ্বীন' অর্থ পাপাচারীদের আমলনামা তো রয়েছে সিজ্জীনে। 'ফুজ্জ্বার' অর্থ পাপাচারী, অবিশ্বাসী, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, কাফের। আর এখানকার 'সিজ্জ্বীন' শব্দটি সাধিত হয়েছে 'সিজ্জ্বুন' ধাতুমূল থেকে। 'সিজ্জ্বুন' অর্থ অবরুদ্ধ, বন্দী। কামুস অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে 'সিক্কীন'

www.eelm.weebly.com

শব্দরূপে ‘সিজ্জীন’ অর্থ চিরবন্দী। আখফাশ অর্থ করেছেন, সুকঠিন বন্ধনে বন্দী। ইকরামা অর্থ করেছেন— লাঞ্ছিত, বিভ্রান্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের কর্মবিবরণী অনুসারেই তারা হবে বিভ্রান্ত, লাঞ্ছিত, সুকঠিন বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ব্যাখ্যাটি রূপকার্থক। কেননা আমলনামাই তাদের বন্দীত্বের মূল কারণ নয়। মূল কারণ হচ্ছে তাদের অবিশ্বাস, সত্যপ্রত্যাখ্যান, বিভ্রান্তি।

নবীবচন ও সাহাবীবচন থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, সিজ্জীন ওই স্থানের নাম, যেখানে সংরক্ষিত থাকে অবিশ্বাসীদের আমলনামা। কামুস। তাদের নিবন্ধন তালিকার নামও সিজ্জীন হতে পারে। আবার তাদের কর্মবিবরণীর সংরক্ষিতাগারের নাম সিজ্জীন হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এরকম নামকরণের উদ্দেশ্য— তাদের আত্মাসমূহ সিজ্জীনে বন্দী অবস্থায় থাকে। কেননা ‘সিজ্জনুন’ অর্থ বন্দী করা। আবার সিজ্জীনের অবস্থান মৃত্তিকার সপ্তমতম স্তরে। ইবনে মানদাহ, তিবরানী ও আবু শায়েখ অপরিণত সূত্রে হামযা ইবনে হাবীব থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স.কে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের আত্মার অবস্থানস্থল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, বিশ্বাসীদের আত্মা সবুজ পাখির আকারে বেহেশতের যেখানে খুশী সেখানে উড়ে বেড়ায়। আর অবিশ্বাসীদের আত্মা বন্দী থাকে সিজ্জীনে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের মাধ্যমে ইবনে মোবারক, হাকেম, তিরমিজি, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া ও ইবনে মানদাহ বর্ণনা করেছেন, হজরত সালমান ফারসী বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আত্মা থাকে সিজ্জীনে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, কাতাদা, মুজাহিদ ও জুহাক বলেছেন, সিজ্জীন রয়েছে ভূপৃষ্ঠের সপ্তমতম স্তরে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আত্মাসমূহকে সেখানে বন্দী করে রাখা হয়। আমি বলি, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের এরকম উক্তি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া। হজরত বারা ইবনে আজীবের বর্ণনানুসারে স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, সিজ্জীন পৃথিবীর সপ্তম স্তরেরও নিচে এবং ইল্লিন সপ্তমাকাশেরও ঊর্ধ্বে আরশের নিম্নদেশে। সুপরিণত সূত্রে হজরত বারা ইবনে আজীব কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যুর সময় আকাশের দরোজা খোলা হয় না। আল্লাহ্ তখন মৃত্যুর ফেরেশতাদেরকে বলেন, তাদের আমলনামাগুলো সিজ্জীনে রেখে দাও। আর তাদের আত্মাগুলোকে ছুঁড়ে দাও দূরতম কোনো দিগন্তের দিকে।

ইমাম আহমদ ও ইমাম বাগবী উল্লেখ করেছেন, শুবরামা ইবনে আত্তার বলেছেন, একবার হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস হজরত কা’ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘পাপাচারীদের আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে’— এই আয়াতের ব্যাখ্যা আমাকে জানান। তিনি জবাব দিলেন, মৃত্যুর পর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের রূহ উঠতে থাকে উপরের দিকে। কিন্তু আকাশ তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি

www.eelm.weebly.com

জানায়। তখন ওই রূহকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় সপ্তমতম স্তরে সর্বনিম্ন স্থানে। সিজ্জীন থেকে বের হয়ে আসে তার নামাংকিত একটি কাগজ। ওই কাগজটি সীল মোহর করে সংরক্ষণ করা হয় ইবলিসবাহিনীর অবস্থানস্থলের নিম্নে, যাতে প্রতিফল দিবসে তার সত্যপ্রত্যাখ্যানের প্রমাণ হিসেবে কাগজটিকে উপস্থিত করা যায়।

কালাবী বলেছেন, মাটির সপ্তম স্তরের নিম্নের একটি সবুজ পাথরের নাম সিজ্জীন। তার উপর আকাশের নীলিমার ছায়াপাত ঘটে বলে পাথরটি নীলাভ, অথবা সবুজাভ। ওই পাথরটির নিচেই সংরক্ষিত রয়েছে কাফেরদের আমলনামা। বাগবী লিখেছেন, হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল ফালাক্ব হচ্ছে জাহান্নামের অভ্যন্তরে সিজ্জীনে অবস্থিত ঢাকনি দিয়ে ঢাকা একটি কূপ। আর একটি মুখ খোলা কূপও রয়েছে সেখানে। আমি বলি, 'সিজ্জীন জাহান্নামে' এবং 'সিজ্জীন মৃত্তিকার সপ্তম স্তরে' এরকম বর্ণনা বৈষম্যের সমাধানার্থে বলা যেতে পারে, জাহান্নামের অবস্থিতিও ভূপৃষ্ঠের সপ্তমতম স্তরে। আবু শায়েখের 'আল উজমা'য় বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, আবু যা'রা হজরত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, জান্নাত সপ্তমাকাশের উপরে এবং জাহান্নাম জমিনের সপ্তস্তরে। বায়হাকী তাঁর 'দালায়েল' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেছেন, জান্নাত আকাশে এবং জাহান্নাম মৃত্তিকাভ্যন্তরে।

ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! মহাবিচারের দিবসে জাহান্নামকে কোথা থেকে আনা হবে? তিনি স. বললেন, তখন তাকে টেনে আনা হবে মৃত্তিকাভ্যন্তরের সপ্তম স্তর থেকে। অনেকগুলো লাগাম থাকবে তার। আর প্রতিটি লাগাম ধরে টানবে সত্তর হাজার করে ফেরেশতা। এভাবে টানতে টানতে তাকে আনা হবে মহাসমাবেশস্থলের এক হাজার বৎসরের পথের দূরত্বে। তখন সে ছাড়বে একটি দীর্ঘশ্বাস। তাই দেখে আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন ফেরেশতা এবং নবী রসুলগণ হাঁটু গেড়ে বসে বলতে থাকবেন 'রব্বি নাফসি নাফসি' (হে আমার প্রভুপালক! আমার কী হবে? আমার কী হবে)?

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কী জানো (৮)? তা হচ্ছে চিহ্নিত আমলনামা' (৯)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! সিজ্জীন কতো বিশাল, ভয়াল, তা কি আপনি জানেন? সিজ্জীন হচ্ছে এমনভাবে মুদ্রিত আমলনামা, যার লিপি অনপনেয়। ওই আমলনামার প্রতিবেদনানুসারেই শাস্তি দেওয়া হবে কাফেরদেরকে। অথবা মর্মার্থ হবে— আমলনামাগুলো এমন সংকেতবিশিষ্ট হবে যে, দর্শক মাত্রই সেগুলো দেখে অতি সহজে বুঝতে পারবে যে, ওগুলোর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

'সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কী জানো' প্রশ্নটি এখানে 'জ্ঞানাহরণসূচক'। কথাটির মর্মার্থ— বলো দেখি সিজ্জীনের বিশালতা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে কী জানা আছে তোমার? জুজায কথাটির অর্থ করেছেন— সিজ্জীন তোমার কাছে অভূতপূর্ব। তোমার স্বজাতিরাও জানে না, সিজ্জীন কী?

www.eelm.weebly.com

‘মারকুম’ অর্থ চিহ্নিত। ইয়েমেনী হুমাইরি গোত্রের আঞ্চলিক ভাষায় ‘মারকুম’ অর্থ সীলমোহরযুক্ত। বাগবী লিখেছেন, ‘মারকুম’ এখানে সিজ্জীনের ব্যাখ্যা নয়, বরং আমলনামার বিবরণ। বায়যাবী লিখেছেন, শব্দটি সিজ্জীনের ব্যাখ্যা। আর সিজ্জীনকে এখানে আমলনামার সঙ্গে একারণেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে যে, আমলনামা হচ্ছে তাদের অবরোধ ও বন্দীত্বের নিমিত্ত। গ্রন্থিত বিষয় তেমনইভাবে গ্রন্থমধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে, যেভাবে কয়েদীরা বন্দী থাকে কারাগারে। সে কারণেই সিজ্জীন একটি গ্রন্থ বা আমলনামা সদৃশ। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সকল জ্বিন ও মানুষের কৃতকর্মসমূহের বিবরণ জমা থাকে ওই সিজ্জীনেই। প্রকাশ থাকে যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আত্মাগুলোর অবস্থানস্থলও সিজ্জীন। আবার তা তাদের আমলনামাগুলোরও সংরক্ষণাগার। আর সম্ভবত বাক্যটিতে একটি শব্দ রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ কথাটির মূল রূপ ছিলো ‘মা কিতাবু সিজ্জীন’ (সিজ্জীনের সংরক্ষিত আমলনামাগুলো সম্পর্কে তুমি কী জানো)। অথবা এখানকার কিতাবুম মারকুম’ এর আসল রূপ ছিলো ‘মাহাল্লু কিতাবিম্ মারকুম’ (আমল নামার ভাণ্ডার)।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— ‘সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের’। একথার অর্থ— যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদেরকে পরকালে ওয়াইল দোজখের শাস্তি ভোগ করতে হবেই।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— ‘যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে’। বাক্যটি আগের আয়াতে উল্লেখিত ‘অস্বীকারকারী’র বিশেষণাত্মক বিশেষণ। অথবা অসৎ বা বিশেষ বিশেষণ। কিংবা ‘অস্বীকারকারী’ কথাটির অনুবর্তী। এ বাক্যটির প্রসঙ্গ আগের আয়াতের প্রসঙ্গ থেকে ভিন্নতর। তবে এখানে ‘অস্বীকার করে’ বলে তিরস্কার করা হয়েছে অস্বীকারকারীদেরকেই। আমি বলি, আলোচ্য বাক্যটি ৯ সংখ্যক আয়াতের ‘চিহ্নিত আমলনামা’র স্থলাভিষিক্ত কর্তা (নায়েবে ফায়েল)। অর্থাৎ তাদের চিহ্নিত আমলনামাতেও একথা লেখা রয়েছে যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তিভোগ অবধারিত। অথবা বলা যেতে পারে, বাক্যটি বিশেষণ আমলনামার। অর্থাৎ তাদের আমলনামাই তাদের জন্য অনিবার্য করবে ওয়াইল দোজখ। প্রথম ব্যাখ্যাটি শাব্দিক বন্ধনের দিক দিয়ে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু অর্থগত দিক দিয়ে পরের ব্যাখ্যাটিই অধিকতর জোরালো। কেননা তখন কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরই আমলনামা থাকবে না, আমলনামা থাকবে বিশ্বাসীদেরও।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— ‘কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী তা অস্বীকার করে’। এখানে ‘মু’তাদিন আছীম’ অর্থ পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী। ‘মু’তাদ’ বলে তাকে, যে তার অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন পিতৃপুরুষদের নির্বিবাদ অনুকরণের ক্ষেত্রেও সীমালংঘন করে। অস্বীকার করে মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও কর্মফল দিবসকে। আর ‘আ’ছীম’ অর্থ প্রবৃত্তিপূজক, পাপিষ্ঠ, এমনই পাপমগ্ন যে, এর বিপরীত কিছু তার চিন্তাতেই আসে না।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে, এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা। একথার অর্থ— ওই পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারীদের সম্মুখে কোরআনের বাণী পাঠ করে শোনানো হলে তারা তাদের চিরাচরিত স্বভাব অনুসারে অথবা হিংসা-দ্বেষ, কিংবা অজ্ঞতার কারণে বলে, এগুলো প্রাচীনকালের কিংবদন্তি, কল্পকাহিনী। এখানকার 'আসাত্বীর' শব্দটি 'উসত্বুর' 'আসত্বার' ও 'ইসত্বর'এর বহুবচন। এর অর্থ অসংলগ্ন কথা। কামুস।

'সুরাহ' অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আসাত্বীরুল আউয়ালীন' অর্থ অতীত যুগের লোকদের বানানো কল্পিত কিস্সা। কথাটির উল্লেখ করে এখানে এটাই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, তাদের বিভ্রান্তি সীমাহীন। তাই বুদ্ধিবৃত্তিক ও অনুবৃত্তিক (আকলি ও নকলি) কোনো প্রমাণই তাদের জন্য কল্যাণকর নয়।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'কখনও নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জঙ ধরিয়েছে'। এখানে কাল্লা' (কখনো নয়) অর্থ তারা কখনোই এরকম অপবচন উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকবে না। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— না, না, কোরআনকে তারা বিশ্বাস করবেই না।

'বাল' অর্থ বরং। কথাটির দ্বারা পূর্ববর্তী বাক্য থেকে অপহৃতি করে এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তাদের হৃদয় সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের যোগ্যতারহিত, বিভ্রান্তির রঙে রঞ্জিত। 'রনা আ'লা কুলূবিহিম মা কানূ ইয়াক্সিবূন' অর্থ তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জঙ ধারিয়েছে। 'রনা'র ধাতুমূল 'রইনুন' অর্থ প্রাধান্য, প্রভাব। যেমন বলা হয় 'রনাল খমরু আ'লা কুলবিহী' (মদ তার মনে প্রভাব ফেলেছে)। এভাবে এখানকার 'হৃদয়ে জঙ ধরেছে' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— পাপের কলুষ তাদের অন্তরে ছায়াপাত করেছে। আর সে ছায়া হয়েছে এতোই প্রবল যে সেখানে সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের যোগ্যতাটুকু আর একেবারেই নেই।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসী ব্যক্তি একটি পাপ করলে সাথে সাথে তার কলবে পড়ে যায় একটি কালো দাগ। দাগটি মুছে যায় তখন, যখন সে তওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা করে। কিন্তু যদি সে পুনঃপুনঃ পাপ করতেই থাকে, তাহলে ধীরে ধীরে কালো দাগে ছেয়ে যায় তার সারা অন্তর। এরকম অবস্থার কথা বুঝাতেই এখানে বলা হয়েছে 'তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জঙ ধরিয়েছে'। বাগবী, আহমদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, হাকেম, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। কোনো কোনো বর্ণনায় 'বিশ্বাসী ব্যক্তি একটি পাপ করলে' কথাটির পরিবর্তে উল্লেখ করা হয়েছে 'নিশ্চয় বান্দা যখন পাপকর্ম করে'। এখন কথা হচ্ছে, বিশ্বাসীদের অবস্থাই যদি এরকম হয়, তবে অবিশ্বাসীদের অবস্থা যে কতো শোচনীয় হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। ইমান নেই বলে তারা তওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনাও করে না। তাই তাদের হৃদয় হয়ে যায় স্থায়ীভাবে জঙ ধরা।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'না, অবশ্যই সেই দিন তারা তাদের প্রতিপালক থেকে অন্তরিত থাকবে'। এখানে 'কাল্লা' (না, না) বলে পাপে পাপে জঙ পড়ে যাওয়া হৃদয়ের প্রতি প্রদর্শন করা হয়েছে বৈমুখ্য। অথবা 'কাল্লা' অর্থ এখানে ঠিক ঠিক। অর্থাৎ তারা যে জঙ ধরা হৃদয়ের অধিকারী, তা অতি নিশ্চিত। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'কাল্লা' অর্থ 'লা ইউ'সাদ্দিকুন'। অর্থাৎ না, না, সত্যের স্বীকৃতি তারা দিবেই না।

'অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রতিপালক থেকে অন্তরিত থাকবে' অর্থ মহাবিচারের দিবসে যখন বিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করবে, তখন অবিশ্বাসীরা সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। তাদের দৃষ্টির সামনে তখন থাকবে কেবল পাপের ঘন কালো পর্দা। ফলে আল্লাহ্ দর্শন থেকে তারা থাকবে বঞ্চিত, যেমন এখন বঞ্চিত আছে মহাসত্য দর্শন থেকে।

হাসান বসরী বলেছেন, আল্লাহ্‌প্রেমিকেরা যদি জানতে পারে যে, দীদারে ইলাহী তাদের ভাগ্যে জুটবে না, তবে তারা কলিজা ফেটে মারাই যাবে। ইমাম মালেকের নিকট একবার আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ জানতে চাওয়া হলো। তিনি বললেন, এখানে যেহেতু বলা হয়েছে পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারীদের ভাগ্যে দীদার জুটবে না, সেহেতু একথা আর না বললেও চলে যে, বিশ্বাসীগণ অবশ্যই লাভ করবে দীদার। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন বিপরীতার্থ গ্রহণ করতে হবে আলোচ্য আয়াতের। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী যেহেতু আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে না, সেহেতু তাঁকে দেখতে পাবে বিশ্বাসীরা।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে'। একথার অর্থ— তখন তারা দীদার থেকেই কেবল বঞ্চিত হবে না, অধিকন্তু নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামেও।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— তৎপর বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা অস্বীকার করতে'। একথার অর্থ— তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করার পর সেখানকার প্রহরী ফেরেশতারা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, এটাই সেই দোজখ, যার কথা তোমরা বিশ্বাস করতে না।

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন ঃ আয়াত ১৮— ২৮

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ﴿١٨﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ﴿١٩﴾
كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٢٠﴾ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢١﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ﴿٢٢﴾
عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ﴿٢٤﴾
يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿٢٥﴾ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ط وَفِيْ ذٰلِكَ

www.eelm.weebly.com

فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَ مِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا
يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٨﴾

r অবশ্যই পুণ্যবানদের ‘আমলনামা ইল্লিয়্যীনে,
r ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে তুমি কী জান?
r উহা চিহ্নিত ‘আমলনামা।
r যাহারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তাহারা উহা দেখে।
r পুণ্যবানগণ তো থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে,
r তাহারা সুসজ্জিত আসনে বসিয়া অবলোকন করিবে।
r তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখিতে পাইবে,
r তাহাদিগকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হইতে পান করান হইবে;
r উহার মোহর মিস্‌কের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।
r উহার মিশ্রণ হইবে তাস্‌নীমের,
r ইহা একটি প্রস্রবণ, যাহা হইতে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পক্ষান্তরে পুণ্যবানগণের আমলনামা থাকবে ‘ইল্লিয়্যীন’ নামক স্থানে, যা সিজ্জীনের সম্পূর্ণ বিপরীত। উল্লেখ্য, ‘কাল্‌লা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি বৈমুখ্য প্রদর্শনার্থে। আবার হতে পারে শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সঠিক অর্থে। অর্থাৎ অবশ্যই। মুকাতিল বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ সুনির্ঘাত, অবশ্যই। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যে বেহেশতের কথা বিশ্বাসই করতো না, সেই বেহেশতের ‘ইল্লিয়্যীন’ নামক স্থানেই সংরক্ষিত থাকবে ইমানদারগণের আমলনামা।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, এখানকার ‘ইল্লিয়্যীন’ অর্থ উচ্চ থেকে উচ্চতর, ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর। একারণেই— ‘ওয়াও’ ‘নূন’ সহযোগে শব্দটিকে করা হয়েছে বহুবচন। ফাররা বলেছেন, শব্দটি বহুবচনবোধক। কেননা শব্দটির একবচন হয় না, তবে ব্যবহৃত হয় স্থানের নামে। সতর্ক তত্ত্বজ্ঞগণ লিখেছেন, শব্দটির ধাতুমূল ‘উলয়্যুন’। ইতোপূর্বে হজরত বারা ইবনে আজীব কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, ‘ইল্লিয়্যীন’ সাত আকাশের উপরে, আরশের নিচে। হজরত বারা ইবনে আজীব কর্তৃক বর্ণিত আর এক হাদিসে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর মুমিনদের রূহ উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সপ্তম আকাশে। আল্লাহ্‌ তখন বলেন, আমার এই দাসের আমালনামা রেখে দাও ইল্লিয়্যীনে এবং তাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো পৃথিবীতে, তার নিজ সমাধিতে। আহমদ, আবু দাউদ, হাকেম। হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইল্লিন হচ্ছে সবুজ জমরুদ পাথরের একটি ফলক, যা লটকানো রয়েছে আরশের নিচে। ওই ফলকেই মুদ্রিত

www.eelm.weebly.com

রয়েছে বিশ্বাসীগণের পুণ্যকর্মসমূহের বিশদ বিবরণ। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন, ইল্লিন হচ্ছে মানুষ, জ্বিন ও ফেরেশতাকূলের পুণ্য কর্মসমূহের দপ্তর। কা'ব এবং কাতাদা বলেছেন, ইল্লিন আরশের দক্ষিণ পায়ার নাম। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, একটি জান্নাতের নাম ইল্লিন। আতা এবং জুহাক মন্তব্য করেছেন, ইল্লিন হচ্ছে সিদ্‌রাতুল মুনতাহা। অর্থাৎ সর্বোচ্চ সীমান্তবর্তী বদরীবৃক্ষ।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে তুমি কী জানো (১৯)? ওটা চিহ্নিত আমলনামা' (২০)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! ইল্লিন কী, সে সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন? ইল্লিন হচ্ছে বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের সীলমোহরযুক্ত আমলনামা।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত, তারা তা দ্যাখে'। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত' অর্থ আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন ফেরেশতাবৃন্দ। আমি বলি, নবী-রসুল-সিদ্দীক-শহীদ এবং পুণ্যবানগণের আত্মাগুলোও আল্লাহ্‌র সন্নিধানধন্য। তাঁদের আত্মাগুলোও ইল্লিনে থাকবে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শহীদগণের আত্মা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে সবুজ পাখিরূপে অবস্থান করে। তারা জান্নাতের যত্রতত্র ইচ্ছামতো ওড়াউড়ি করে। আবার ফিরে আসে সেই ঝাড়বাতির কাছে, যা লটকানো রয়েছে আরশের নিচে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে সাঈদ ইবনে মনসুর এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তকী ইবনে মাখলাদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হজরত আনাসের উক্তির অনুকরণে আবু শায়েখ বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক শাদা পাখির অভ্যন্তরস্থিত অবস্থায় শহীদগণকে ওঠাবেন। পাখিগুলো অবস্থান করবে আরশের নিম্নে ঝুলন্ত ঝাড় ফানুসে। তারা অতি প্রত্যুষে উড়াল দেয়। ইচ্ছা মতো উড়ে উড়ে বেড়ায় জান্নাতের যেখানে খুশী সেখানে। আল্লাহ্‌পাক প্রত্যহ তাদেরকে দান করেন তাঁর বিশেষ সন্নিধান। জানান সালাম।

হজরত আবু দারদার উক্তি উল্লেখ করে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, শহীদগণের রূহগুলো হরিৎবর্ণের বিহঙ্গের আকারে অবস্থান করে আরশের নিম্নদেশে ঝুলানো ঝাড় ফানুসে। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, যখন হারেছা শহীদ হলেন, তখন রসুল স. বললেন, নিশ্চয় হারেছা জান্নাতী, সমুন্নত ফেরদাউসের অধিকারী। হজরত হাবীব নাজ্জার সম্পর্কে সুরা ইয়াসীনে উল্লেখ করা হয়েছে 'তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলে উঠলো, হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারতো কীরূপে আমার প্রভুপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে করেছেন সম্মানিত'।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, শহীদগণের রূহ অবস্থান করবে জান্নাতে, আবার কোনো কোনোটিতে বলা হয়েছে— আরশের নিম্নের ঝাড় ফানুসে। এমতো বর্ণনাবৈষম্য নিরসনার্থে বলা যায়— জান্নাতের উপরে আরশ রয়েছে

www.eelm.weebly.com

আকাশের মতো ছাদ হিসেবে। আমি বলি, এরকম ব্যবস্থা কেবল শহীদগণের জন্যই নির্ধারিত নয়। নবী-রসুল ও সিদ্দীকগণও হবেন এমতো সৌভাগ্যের অধিকারী। কেননা তাঁরা শহীদগণের ঊর্ধ্বে। তাছাড়া হাদিস শরীফে এ সম্পর্কে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 'আল মু'মিনীন' (বিশ্বাসীগণ)। এতে করে একথাটিও প্রতীয়মান হয় যে, যারা প্রকৃত ইমানদার, তাদের অবস্থাও সেখানে হবে একই রকম।

হজরত কা'ব ইবনে মালেক থেকে বিশুদ্ধসূত্রে মালেক ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীগণের আত্মা সবুজ পাখির আকারে বসে থাকবে জান্নাতের বৃক্ষরাজির ডালে। তারা তাদের পূর্বের অবয়বে ফিরে যাবে মহা বিচারের দিবসে। হজরত উম্মে হানি থেকে আহমদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতের বৃক্ষশাখায় পাখির মতো ঘুরে বেড়াবে মুমিনদের রূহ। প্রতিফল দিবসে তারা ধারণ করবে আসল আকার। আবু মারূফের স্ত্রী পুণ্যবতী উম্মে বিশর থেকে ইবনে আসাকেরও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য, হাদিসগুলোতে উল্লেখিত 'মুমিন' অর্থ কামেল মুমিন (পূর্ণ বিশ্বাসী)। 'যারা আল্লাহ্র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত, তারা তা দ্যাখে' বাক্যটির সারমর্মও তা-ই। কোনো কোনো হাদিসে এসেছে, মুমিনগণের রূহ অবস্থান করে ইল্লিনে। সেখান থেকে তারা প্রত্যক্ষ করে তাদের স্বর্গের নিবাস।

হজরত আবু হোরায়রা এবং ওয়াহাব ইবনে মুন্নাব্বাহ থেকে শিথিল সূত্রে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, সপ্তম আকাশে আছে আল্লাহ্ কর্তৃক বিশেষভাবে সংরক্ষিত একটি গৃহ। ওই গৃহের নাম শ্বেত নিবাস। বিশ্বাসীগণের আত্মা সেখানে সমবেত হয়। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রূহগুলো যখন সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়, তখন সেগুলোকে রাখা হয় আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে। হজরত সালমান ফারসী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনে মনসুর।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব সূত্রে ইবনে মোবারক, হাকেম, তিরমিজি, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া এবং ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, হজরত সালমান ফারসী বলেছেন, বিশ্বাসীগণের রূহ অদৃশ্যভাবে পৃথিবীতেই বিচরণ করে। যাতায়াত করে যেখানে খুশী সেখানে। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের রূহগুলোকে বন্দী করে রাখা হয় সিজ্জীনে।

ইমাম শা'বী তাঁর 'বাহারুল কালাম' গ্রন্থে মর্যাদার তারতম্যানুসারে বিশ্বাসীগণের আত্মা সম্পর্কে যে সকল হাদিস সংকলন করেছেন, সেগুলো এরকম— ১. নবীগণের আত্মা তাঁদের পবিত্র দেহের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার পর ধারণ করে মেশক ও কর্পূরের রূপ। জান্নাতাভ্যন্তরে দিনভর পানাহার বিনোদনে কাটিয়ে রাতে অবস্থান গ্রহণ করে আরশের নিচে ঝুলন্ত ঝাড় ফানুসে। ২. শহীদগণের আত্মা দেহত্যাগ করার পর আশ্রয় নেয় সবুজ পাখির উদরে। তারাও সারাদিন জান্নাতে প্রমোদবিহার করে এবং পানাহারে পরিতৃপ্ত হয়ে রাতে ফিরে যায় আরশের নিচের সেই ঝুলন্ত ঝাড়বাতির আবাসে। ৩. সাধারণ পুণ্যবান বিশ্বাসীদের আত্মার গতিবিধি থাকে কেবল জান্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারা

www.eelm.weebly.com

বেহেশতের সৌন্দর্য দর্শন করে মুগ্ধ হয়। তাদেরকে পানাহার করানো হয় না। ৪. পাপী বিশ্বাসীদের আত্মা ঝুলন্ত থাকে আকাশ-পৃথিবীর মাঝামাঝি, শূন্যস্থানে। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আত্মাগুলোকে কালো পাখির জঠরাভ্যন্তরে ভরে অবরুদ্ধ করে রাখা হয় সিজ্জীনে।

আমি বলি 'নবীগণের আত্মা ধারণ করে মেশক ও কর্পুরের রূপ' কথাটির অর্থ তাঁদের পবিত্র দেহ মানব দেহ সদৃশ হলেও সেগুলোকে তখন করা হয় মেশক ও কর্পুরগঠিত, যাতে করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে তাঁদের মহিমার সৌরভ। মেশক আম্বর ও কর্পুরের দেহ বলতে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি মর্মার্থ গ্রহণ করেছেন— দত্তক দেহ। নবীগণ এবং তাঁদের একনিষ্ঠ অনুগামী সিদ্দীকগণ আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ অনুকম্পারূপে ওই বিশেষ দেহ লাভ করেন এই পৃথিবীতেই। অর্থাৎ পরলোকগমনের আগেই।

একটি সংশয় ঃ ইতোপূর্বে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, নবী-রসুল, সাধারণ বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী সকলের রূহই অবস্থান করে তাদের আপন আপন সমাধিতে। তাহলে তাদের ইল্লিন ও সিজ্জীনে থাকার কথা কীভাবে স্বীকার করা যায়? যেমন হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, বিশ্বাসীগণ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, এদের আমলনামা সংরক্ষণ করা হোক ইল্লিনে। আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক পৃথিবীতে। কেননা আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা থেকে। সেখান থেকেই আমি যথাসময়ে ঘটাবো তাদের পুনরুত্থান।

অবিশ্বাসীদের প্রসঙ্গেও এধরনের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের আত্মাগুলোকেও পৃথিবীতেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়। হজরত বারা ইবনে আজীব কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। মেরাজ রজনীতে রসুল স. নবী মুসাকে নামাজ পড়তে দেখেছিলেন তাঁর কবরেই। তিনি স. একথাও বলেছেন যে, আমার সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে কেউ দরূদ সালাম পাঠ করলে আমি তা শুনি। আর দূরবর্তী স্থানের কেউ দরূদ সালাম পাঠ করলে, তা আমার কাছে পৌঁছানো হয়।

নিরসন ঃ উদ্ভূত জটিলতা নিরসনার্থে আমরা বলি, মুমিনগণের রূহ থাকে ইল্লিনে, অথবা সপ্তম আকাশের উপরে এবং কাফেরদের রূহ থাকে পৃথিবী পৃষ্ঠের সপ্তমতম স্তরে সিজ্জীনে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, ওই রূহগুলোর এক ধরনের সম্পর্ক তাদের আপন আপন কবরের সঙ্গে থাকেই, যার রহস্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত কেবল আল্লাহ্পাক। সুতরাং বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বৈষম্য নেই। কোরআন ও হাদিসের বিবরণানুসারে বলতে হয়, দেহ ও আত্মার মিলিত নাম মানুষ। আর কবরস্থিত মানুষের সামনে উপস্থিত করা হয় স্বর্গের সুখানুভূতি, অথবা নরকের দুঃখযন্ত্রণা। তাই কবরবাসীরা সুখ ও দুঃখ ভোগ করে তাদের নিজ নিজ কবরে থেকেই। সেখানেই তারা জবাব দেয়, অথবা জবাব দিতে সক্ষম হয় মুনকির-নকির নামক ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য হজরত জিবরাইলের প্রসঙ্গও

www.eelm.weebly.com

টেনে আনা যেতে পারে। তিনি আকাশবাসী হওয়া সত্ত্বেও প্রায়শ নেমে আসতেন পৃথিবীতে। উপস্থিত হতেন রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে। আবার কখনো কখনো হাত রাখতেন তাঁর উরুদেশে।

শা'বী তাঁর 'বাহরুল কালামে' লিখেছেন, রূহ সম্পর্কযুক্ত দেহের সাথে। শাস্তি রূহের উপরে হলেও শরীর অনুভব করে তার ব্যথা। যেমন সূর্য আকাশে অবস্থান করলেও তার আলোকে আলোকিত হয় পৃথিবী।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে(২২), তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে' (২৩)।

তাফসীরবেত্তাগণ বলেছেন, এখানে 'অবলোকন করবে' অর্থ তারা তখন দেখতে থাকবে তাদের প্রাপ্ত মর্যাদা ও সম্ভোগসম্ভারের প্রতুলতা। আমি বলি, অবিশ্বাসীরা যখন আল্লাহ্ দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকবে, তখন বিশ্বাসীগণ দেখতে থাকবেন আল্লাহ্-তায়ালার আনুরূপ্যবিহীন রূপচ্ছটা। কাতাদা বলেছেন, তারা তখন জান্নাতের আরাম কেদারায় বসে দেখতে থাকবে জাহান্নামে শাস্তিপ্রাপ্ত আল্লাহ্র দুশমনদেরকে।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে'। একথার অর্থ— জান্নাতের অফুরন্ত সুখসম্ভার সম্ভোগের কারণে তাদের মুখমণ্ডলে ফুটে উঠবে পুলক ও পরিতৃপ্তির চিহ্ন— সজীবতা। এখানে 'দেখতে পাবে' বলে সম্বোধন করা হয়েছে সাধারণভাবে সকল মানুষকে। হাসান বসরী বলেছেন, স্বাচ্ছন্দ্য-সজীবতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় মুখমণ্ডলে এবং হৃদয়ে অনুভূত হয় প্রশান্তি।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় থেকে পান করানো হবে'। এখানে 'রহীক্ব' অর্থ বিশুদ্ধ, নির্মল, স্বচ্ছ-শুভ্র, পবিত্র। আর 'মাখতূম' অর্থ মোহর করা। অর্থাৎ পুণ্যবানেরাই ভেঙে ফেলবে ওই সীলমোহর, যা ইতোপূর্বে ছিলো অস্পর্শিত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— পুণ্যবানেরাই তখন স্বহস্তে সীলমোহর ভেঙে ফেলবে। তারপর পান করবে পবিত্র ও সুস্বাদু মদিরা।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'তার মোহর মেশকের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক'। এখানে 'খিতাম' অর্থ ওই মৃত্তিকা যার উপরে সীল করা হয়। অর্থাৎ জান্নাতের পানপাত্রগুলো সীলমোহর করা থাকবে মেশকের দ্বারা এবং তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে সেখানকার মোমসদৃশ মাটিতে। ইবনে জায়েদও এরকম অর্থ করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, এখানে 'মোহর মেশকের' অর্থ পানপাত্রের শেষ চুমুক হবে মেশকের ঘ্রাণযুক্ত, আস্বাদ্য। 'কামুস' অভিধানে বলা হয়েছে, প্রত্যেক বস্তুর শেষাংশকে বলে 'খিতাম'।

'তানাফুস' অর্থ উত্তম কোনোকিছু প্রাপ্তির জন্য প্রতিযোগিতা, যে প্রতিযোগিতায় থাকে কেবল ভোগের বাসনা, ত্যাগের নয়। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— পার্থিব সুখোপকরণসমূহ অপর্যাপ্ত, অস্থায়ী ও তুচ্ছ। তবুও মানুষ তা লাভ করার জন্য শুরু করে প্রাণপণ প্রতিযোগিতা। অথচ প্রতিযোগিতা করা উচিত পরকালের সুখোপকরণের জন্য, যা পর্যাপ্ত, পবিত্র ও চিরস্থায়ী।

www.eelm.weebly.com

সন্দেহ ঃ সুখোপকরণ প্রাপ্তির প্রতিযোগিতা তো আসে লোভ থেকে। তাহলে লোভকে কি শরিয়তসম্মত বলা যাবে?

সন্দেহভঞ্জন ঃ পার্থিব বস্তু প্রাপ্তির প্রতিযোগিতা আসে লোভ থেকে। এমতো প্রতিযোগিতায় যারা অবতীর্ণ হয়, তারা শেষ পর্যন্ত একে অপরের ক্ষতি করেই ছাড়ে। তাই এমতো প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ। কিন্তু পরবর্তী পৃথিবীর অবস্থা তো এরকম নয়। তাই পরকালের কল্যাণপ্রাপ্তির প্রতিযোগিতা সিদ্ধ, বরং অভিপ্রেত। আর এমতো প্রতিযোগিতায় কোনো প্রতিযোগীরই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। একজন পেলে অন্য জন পাবে না, অথবা কম পাবে, এরকম আশংকার কথা এমতোক্ষেত্রে অচিন্তনীয়।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের'। এখানে 'মিযাজ্' অর্থ ওই বস্তু, যা মিশ্রিত করা হয় সুরার সঙ্গে। অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা যে সুরা পান করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করবে, তা হবে 'তাসনীম' মিশ্রিত। 'তাসনীম' শব্দটি এসেছে 'সানাম' থেকে, যার অর্থ উটের কুঁজ। কাতাদা বলেছেন 'তাসনীম' শব্দটি ঊর্ধ্ব অর্থবহ। কাতাদার বক্তব্যানুসরণে বাগবী লিখেছেন, 'তাসনীম' হবে ওই পানীয়, যা বর্ষিত হবে জান্নাতবাসীদের ঘরে, ছাদের দিক থেকে। অর্থাৎ ঊর্ধ্ব দিক থেকে। আমি বলি 'তাসনীম' বর্ষিত হবে ঊর্ধ্ব দিক থেকেই। আর জান্নাতের ঊর্ধ্বে রয়েছে আল্লাহ্র আরশ। সুতরাং বুঝতে হবে, তখন আরশ থেকেই বর্ষিত হবে 'তাসনীম'।

এরকমও বলা হয়েছে যে, তখন সুরার প্রস্রবণ প্রবাহিত হবে ঊর্ধ্বদেশের আবহাওয়ামণ্ডল থেকে। আর সে প্রবাহ দ্বারা পূর্ণ হতে থাকবে কেবল জান্নাতবাসীদের পানপাত্রসমূহ। অর্থাৎ সুরার প্রবাহ পূর্ণ করবে কেবল শূন্য পানপাত্রগুলো। আর সেগুলো পূর্ণ যখন থাকবে, তখন বন্ধ থাকবে ওই প্রবাহ।

জুহাক বলেছেন 'তাসনীম' জান্নাতের সর্বোত্তম শরাবগুলোর অন্যতম। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, নৈকট্যভাজনগণের জন্য 'তাসনীম' একটি আদর্শ পানীয়। ওই পানীয়ের সঙ্গে কোনোকিছু মিশ্রিত না করেই তা পান করবেন তাঁরা। আর সাধারণ জান্নাতীগণের পানীয়ের সঙ্গে মিশ্রিত করে দেওয়া হবে 'তাসনীম'।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'এটা একটা প্রস্রবণ, যা থেকে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে'। এখানে দেওয়া হয়েছে 'তাসনীমে'র ব্যাখ্যা। অর্থাৎ 'তাসনীম' নামের অনন্য মদিরা পান করার সৌভাগ্য অর্জন করবেন কেবল আল্লাহ্র সান্নিধ্যধন্যগণ, যারা নবুয়তের উৎকর্ষতার পূর্ণ অধিকারী। অথবা বলা যায়, যাঁরা এমতো উৎকর্ষ অর্জন করেছেন নবীগণের আত্মিক সহায়তায়। অর্থাৎ সিদ্দীকগণ। বাগবী লিখেছেন, ইউসুফ ইবনে মেহরান বলেছেন, একবার হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের নিকটে জানতে চাওয়া হলো, 'তাসনীম' অর্থ কী? তিনি জবাব দিলেন, এটা একটা অজানা বস্তু। এ ধরনের বস্তু সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'কেউই জানে না তাদের চোখের আড়ালে কী গোপন রাখা হয়েছে'।

www.eelm.weebly.com

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا
مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ
حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى
الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

r যাহারা অপরাধী তাহারা তো মু'মিনদিগকে উপহাস করিত

r এবং উহারা যখন মু'মিনদের নিকট দিয়া যাইত তখন চক্ষু টিপিয়া ইশারা করিত।

r এবং যখন উহাদের আপনজনের নিকট ফিরিয়া আসিত তখন উহারা ফিরিত উৎফুল্ল হইয়া,

r এবং যখন উহাদিগকে দেখিত তখন বলিত, 'ইহারাই তো পথভ্রষ্ট।'

r উহাদিগকে তো তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক করিয়া পাঠান হয় নাই।

r আজ মু'মিনগণ উপহাস করিতেছে কাফিরদিগকে,

r সুসজ্জিত আসন হইতে উহাদিগকে অবলোকন করিয়া।

r কাফিররা উহাদের কৃতকর্মের ফল পাইল তো?

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আবু জেহেল, ওলীদ, আস— এ সকল দুর্বৃত্তরা তো আম্মার, খাব্বাব, সুহাইব, বেলাল প্রমুখ প্রতিপত্তিহীন বিশ্বাসীকে যখন তখন ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। এদের সঙ্গে দেখা হলেই ওই দুরাচারেরা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তাদের সতীর্থদের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। কটাক্ষপাত করে। আর তারা এমতো অপকর্ম করার পর তাদের সঙ্গী-সাথীদের কাছে ফিরে যায় অতি উৎফুল্ল হয়ে। যেনো সরল বিশ্বাসী ওই সকল মুসলমানকে অপমান করাই এক বিরাট বিজয়। আবার তাদের দেখলে প্রায়শ প্রচণ্ড হিংসাবশত তারা মন্তব্য করে, দ্যাখো, দ্যাখো, এরাই মোহাম্মদের অনুসারী। এরা তো পথভ্রষ্ট। না হলে কী এরা বাপ-দাদার ধর্মের বিরোধিতা করে। পরলোকের অসীম সুখের আশায় পরিত্যাগ করে পার্থিব ভোগ-সম্ভোগ।

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! দেখুন; আবু জেহেল ও তার অনুসারীরা কতো অজ্ঞ এবং কতো অধিক সীমালংঘনকারী। তাদেরকে তো আমি কারো পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করিনি। এরকম মন্তব্যও তো করতে বলিনি যে, কে পথভ্রষ্ট এবং কে তা নয়।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'আজ মুমিনগণ উপহাস করছে কাফেরদেরকে (৩৪) সুসজ্জিত আসন থেকে তাদেরকে অবলোকন করে (৩৫)। কাফেররা তাদের কৃতকর্মের ফল পেলো তো' (৩৬)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! শুনে রাখুন, তাদের ঔদ্ধত্যের যথাযোগ্য প্রতিফল তারা পাবেই। পরকালে বেহেশতের সুখাসনে বসে আজকের এই নিগৃহীত মুসলমানেরাই অবলোকন করবে তাদেরকে দোজখাভ্যন্তরে শাস্তিভোগরত অবস্থায়। এভাবেই তারা তখন দিবে তাদের এখানকার উপহাসের উত্তর। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে, অথবা দোজখীদেরকে লক্ষ্য করে তারা তখন বলবে, দেখলে তো, বুঝলে তো যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানের শাস্তি কীরূপ সুনিশ্চিত।

আবু সালেহ বলেছেন, তখনকার বাস্তবচিত্র হবে এরকম— হঠাৎ করে খুলে দেওয়া হবে দোজখের দরোজা। দোজখবাসীদেরকে বলা হবে, যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। একথা শোনার সাথে সাথে তারা পড়িমড়ি করে ছুটতে থাকবে দরোজার দিকে। কিন্তু দরোজার কাছাকাছি পৌঁছার আগেই বন্ধ করে দেওয়া হবে দরোজা। নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে দোজখীরা। পুনরায় যখন দরোজা খুলে দেওয়া হবে, তখন পুনরায় তারা চেষ্টা করবে বের হওয়ার জন্য। কিন্তু এবারও দরোজা হয়ে যাবে বন্ধ। এভাবে বার বার তাদের সঙ্গে করা হবে উপহাস। জান্নাতবাসীরা তাদের এরকম দুরবস্থা দেখে মৃদু মৃদু হাসবে। যেমন ওই দোজখীরা তাদেরকে দেখে হাসতো পৃথিবীতে।

হজরত কা'ব বলেছেন, স্বর্গ-নরকের মধ্যে থাকবে কতকগুলো জানালা। জান্নাতবাসীরা যখন তাদের পৃথিবীর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী শত্রুদেরকে দেখতে চাইবে তখন খুলে দেওয়া হবে জানালাগুলো। তারা তখন দেখতে পাবে, নরকবাসীদের সঙ্গে পরিহাস করার দৃশ্য। তখন তারা আর না হেসে পারবে না।

হাসান বসরী সূত্রে বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুসলমানদেরকে দেখে যারা পৃথিবীতে হাস্য-কৌতুক করে, তাদেরকে জান্নাতের দরোজা খুলে দিয়ে ডাকা হবে, এসো। তারা অগ্রসর হতে থাকবে। দরোজার কাছাকাছি পৌঁছতেই দরোজা বন্ধ করে দেওয়া হবে সশব্দে। এদৃশ্য দেখে নিরাশ হয়ে পড়বে তারা। আশাধারী হবে পুনরায় দরোজা উন্মুক্ত করা হলে। আবারও তারা পা বাড়াবে। কিন্তু শেষে আগের মতোই বন্ধ করে দেওয়া হবে প্রবেশপথ। পুনঃপুনঃ এভাবে আশাহত হতে হতে একসময় হয়ে যাবে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ। তখন দরোজা খোলা দেখলেও তারা আর সেদিকে পা বাড়াবে না।

www.eelm.weebly.com

সূরা ইনশিক্বাক্ব

এই সূরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কায়। এর রুকুর সংখ্যা ১ এবং আয়াতের সংখ্যা ২৫।

সূরা ইনশিক্বাক্ব ঃ আয়াত ১— ১৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ﴿٢﴾ وَ اِذَا الْاَرْضُ
مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ﴿٥﴾
يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ﴿٦﴾ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ
كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ﴿٨﴾ وَّ يَنْقَلِبُ اِلٰۤى
اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴿٩﴾ وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ
يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ﴿١١﴾ وَّ يَصْلٰى سَعِيْرًا ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ كَانَ فِىْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴿١٣﴾
اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ﴿١٤﴾ بَلٰۤى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ﴿١٥﴾

r যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,

r ও তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে এবং ইহাই তাহার করণীয়।

r এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হইবে।

r ও পৃথিবী তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে তাহা বাহিরে নিক্ষেপ করিবে ও শূন্যগর্ভ হইবে।

r এবং তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে ইহাই তাহার করণীয়; তখন তোমরা পুনরুত্থিত হইবেই।

r হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর সাধনা করিয়া থাক, পরে তুমি তাঁহার সাক্ষাত লাভ করিবে।

r যাহাকে তাহার 'আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে

r তাহার হিসাব-নিকাশ সহজেই লওয়া হইবে

r এবং সে তাহার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরিয়া যাইবে;

www.eelm.weebly.com

r এবং যাহাকে তাহার 'আমলনামা তাহার পৃষ্ঠের পশ্চাৎদিক হইতে দেওয়া হইবে

r সে অবশ্য তাহার ধ্বংস আহ্বান করিবে;

r এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে;

r সে তো তাহার স্বজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল,

r সে তো ভাবিত যে, সে কখনই ফিরিয়া যাইবে না;

r নিশ্চয়ই ফিরিয়া যাইবে; তাহার প্রতিপালক তাহার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যখন মহাপ্রলয় সমাগত হবে, তখন আল্লাহ্ যেভাবে চান, সেভাবে আকাশ ভেঙে পড়বে। আকাশের জন্য তাঁর আদেশ পালন করাই সঙ্গত, কেননা আল্লাহ্ই তার সৃজয়িতা। আর পৃথিবীকে তখন করা হবে অধিকতর বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত।

মুকাতিল বলেছেন, চামড়া যেমন টেনে সম্প্রসারিত করা হয়, তেমনি করে তখন টেনে প্রসারিত করা হবে পৃথিবীকে। করা হবে সম্পূর্ণ সমতল। পাহাড়-পর্বত, প্রাসাদ অট্টালিকা উঁচু-নিচু কোনো কিছুই থাকবে না। হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে পৃথিবীকে এমনভাবে টেনে সমতলিত ও সম্প্রসারিত করা হবে, যেমনভাবে টেনে টান টান করা হয় চামড়াকে। তারপর সেখানে সমবেত করা হবে সকল মানুষকে।

উত্তম সূত্রপরম্পরায় হজরত জাবের থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে ভূমিকে টেনে প্রসারিত করা হবে, যেমন সম্প্রসারিত করা হয় চামড়া। তবুও মানুষ সেখানে কোনোক্রমে পাবে কেবল পা রাখার মতো জায়গা। প্রথমে ডাকা হবে আমাকে। আমি সেজদাবনত হবো। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে আবেদন জানানোর। জিবরাইল দাঁড়িয়ে থাকবে আরশের দক্ষিণ প্রান্তে। আল্লাহ্র শপথ! জিবরাইল দর্শন করবে আল্লাহ্পাককে। ইতোপূর্বে আর কখনো সে দেখেনি। আমি নিবেদন করবো, হে আমার পরম প্রভুপালয়িতা! এই জিবরাইল আমাকে বলতো, তাকে আমার কাছে প্রেরণ করতে তুমিই। জিবরাইল কথা বলবে না। আমিও হয়ে যাবো নির্বাক। আদেশ ঘোষিত হবে, প্রার্থনা করো। আমি প্রার্থনা করবো, হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তা! তোমার দাসেরা সকলেই সমবেত হয়েছে। তিনি বলবেন, জিবরাইল ঠিকই বলেছে। এবার তুমি শাফায়াত করো। অনুমতি দেওয়া হলো। এখন তুমি অধিষ্ঠিত রয়েছ 'মাকামে মাহমুদে' (শাফায়াতের অধিষ্ঠানে)।

পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে যা আছে, তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে '। একথার অর্থ— পুনরুত্থান দিবসে পৃথিবী তার ভিতর থেকে বের করে দিবে সকল মৃত লাশ এবং সকল খনিজ সম্পদ। সবকিছুকে এভাবে উগলে দিয়ে ভার মুক্ত হবে সে।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'এবং তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে। এটাই তার করণীয়; তখন তোমরা পুনরুত্থিত হবেই'। একথার অর্থ— পৃথিবী তখন আল্লাহ্‌র এমতো নির্দেশ তো পালন করবেই। কেননা এটা তার কর্তব্য। আর তখন তোমরাও উঠে আসবে তোমাদের আপন আপন সমাধি থেকে।

আবুল কাসেম খাত্তালী তাঁর 'দীবাজ' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. 'যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে' এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রতিফল দিবসে সর্বপ্রথম ভূমি বিদীর্ণ করে পুনরুত্থিত হবো আমি। কিন্তু আমি বসে থাকবো আমার সমাধিতেই। আমার সম্মুখে খুলে দেওয়া হবে সাত আকাশের দরজা। দৃষ্টিগোচর হবে সাতটি আকাশ। এর পর খুলে দেওয়া হবে সাত তবক জমিনের দরজা। দেখতে পাবো নিম্নতম পাতাল। এরপর খুলে দেওয়া হবে দক্ষিণ প্রান্তের একটি তোরণ। সেদিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পাবো জান্নাত। দৃষ্টিগোচর হবে আমার সঙ্গী-সাথীদের আবাসস্থলগুলোও। অকস্মাৎ আলোড়িত হবে পৃথিবী। আমি জিজ্ঞেস করবো, কী হলো তোমার? পৃথিবী বলবে, আমার প্রভুপালক আমাকে আদেশ করেছেন, আমার অভ্যন্তরের সকলকিছু উগলে ফেলে দিয়ে এখন আমাকে ভারমুক্ত হতে হবে, হতে হবে আগের মতো, মানবজাতি পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে যেমন ছিলাম। তখনকার অবস্থার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে এখানকার ৪ ও ৫ সংখ্যক আয়াতে।

ইবনে মুনজির তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ৪ ও ৫ সংখ্যক আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, মাটি তখন উগলে দিবে তার ভিতরের স্বর্ণস্তম্ভগুলো। অর্থাৎ সকল গুপ্ত ধন তখন বেরিয়ে আসবে বাইরে। আতীয়া থেকে ইবনে আবী হাতেমও এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবী হাতেম ও মুজাহিদ সূত্রে ফারইয়াবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন পৃথিবী বাইরে নিক্ষেপ করবে তার অভ্যন্তরস্থিত মৃত দেহগুলোকে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর সাধনা করতে থাকো, পরে তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবে'। এখানে 'হে মানুষ' সম্বোধন করে বুঝানো হয়েছে সাধারণভাবে সকল মানুষকে। এখানকার 'কাদিহুন' অর্থ কঠোর সাধনা, ভালো-মন্দ সকল কাজে এমন অধ্যবসায়, যার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় কর্তার উপরেও। আর 'ইলা রব্বিকা কাদ্‌হান' অর্থ তোমার প্রভুপালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে মানব সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র নৈকট্যধন্য হবার সাধনায় তোমাকে নিয়োজিত থাকতে হবে আমৃত্যু। শেষে তুমি পাবে তোমার কাংখিত ফল— আল্লাহ্‌র দীদার। 'ফামুলাক্বীহ্' অর্থ এখানে— ফল লাভ করবে। অর্থাৎ পরিশেষে তুমি পাবে তোমার সাধনার যথোপযুক্ত প্রতিফল। অথবা এখানকার 'তাঁর' সর্বনামটি প্রযুক্ত হবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— সাধনার উপযুক্ত পুরস্কার হিসেবে তুমি তখন পাবে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত। কিংবা সম্বন্ধপদটি এখানে রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাক্ষাত ঘটবে তোমার হিসাব-কিতাবের সঙ্গে।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'যাকে তার আমলনামা তার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হবে (৭) তার হিসাব নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে (৮) এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে' (৯)। বলাবাহুল্য, এরকম ঘটবে পুণ্যবান বিশ্বাসীগণের ক্ষেত্রে, পাপী বিশ্বাসীগণের অবস্থা হবে ভিন্ন। তাদের কথা বলা হয়েছে পরে।

ইবনে আবী মুলাইকা সূত্রে বোখারী বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা কোনো বিষয় বুঝতে অসমর্থ হলে সে সম্পর্কে রসুল স.কে প্রশ্ন করতেন। একবার রসুল স. বললেন, মহাবিচারের দিবসে যার হিসাব বুঝে নেওয়া হবে, তাকে অবশ্যই দেওয়া হবে শাস্তি। জননী বললেন, তা কেনো? আল্লাহ্ কি বলেননি 'তার হিসাব নিকাশ নেওয়া হবে সহজে'। রসুল স. বললেন, এই আয়াতে যে হিসাবের কথা বলা হয়েছে, তা হবে নামমাত্র। কিন্তু প্রকৃতই যার হিসাব বুঝে নেওয়া হবে, সে তো ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, মাতা মহোদয়া আয়েশা বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! 'হিসাব-নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে' কথাটির অর্থ কী? তিনি স. বললেন, কেবল দেখা হবে আমলনামা। পরক্ষণেই দেওয়া হবে ক্ষমার ঘোষণা। কিন্তু যার হিসাব নিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝে নেওয়া হবে, সে নিষ্কৃতি পাবে না কিছুতেই।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'এবং যাকে তার আমলনামা তার পৃষ্ঠের পশ্চাৎ দিক থেকে দেওয়া হবে (১০) সে অবশ্য তার ধ্বংস আহ্বান করবে (১১); এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে' (১২)।

বায়হাকী লিখেছেন, পৃষ্ঠের পশ্চাৎ দিক থেকে আমলনামা দেওয়ার ব্যাপারটিকে মুজাহিদ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— পাপিষ্ঠদের বাম হাত নিয়ে যাওয়া হবে তাদের পিঠের পশ্চাতে। তারপর ওই হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে তাদের আমলনামা। ইবনে সা'দ বলেছেন, তাদের বাম হাত তাদেরই বক্ষভেদ করে নিয়ে যাওয়া হবে পিঠের দিকে। তারপর ওই হাতে দেওয়া হবে তাদের আমলনামা।

'ইয়াদঊ' ছুবূরা' অর্থ ধ্বংস আহবান করবে। অর্থাৎ বাম হাতে আমলনামা পেয়েই সে বুঝবে তার আর কোনো নিস্তার নেই। তখন সে নিজেই ডাকতে থাকবে মৃত্যুকে একথা ভেবে যে, এরকম দুর্গতির চেয়ে মৃত্যুও ভালো। আর 'ওয়া ইয়াস্‌লা সায়ীরা' অর্থ এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ তখন সে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে নরকের লেলিহান আগুনে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'সে তো তার স্বজনদের মধ্যে আনন্দে ছিলো (১৩) সে তো ভাবতো যে, সে কখনোই ফিরে যাবে না (১৪) নিশ্চয়ই ফিরে যাবে; তার প্রতিপালক তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন' (১৫)। প্রথম বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'ধ্বংস আহবান করবে' কথাটির কারণ। অর্থাৎ পৃথিবীতে সে পরিবার-পরিজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মহা আনন্দে দিন কাটাতো। পরকালের কথা তখন মনেও পড়তো না। এ সকল কথা মনে হওয়াতেই সে তখন আক্ষেপে জর্জরিত হয়ে আহ্বান জানাবে মৃত্যুকে। ভাববে, মৃত্যুই এর চেয়ে ভালো।

www.eelm.weebly.com

'ইন্‌নাহু জন্‌না আল্‌লাইঁ ইয়াহূরা' অর্থ সেতো ভাবতো, সে কখনো ফিরে যাবে না। অর্থাৎ একথাও সে তখন মনে মনে বিশ্বাস করতো যে, পরকাল-হিসাব-নিকাশ হয়তো হবেই না। সুতরাং আর চিন্তা-ভাবনা কিসের। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রবাহের মধ্যে তাহলে ছেদই বা টানতে হবে কেনো?

'বালা' অর্থ হ্যাঁ, নিশ্চয়। শব্দটির মাধ্যমে এখানে দেওয়া হয়েছে নেতিবাচক ধারণার ইতিবাচক উত্তর। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকটে সকলকে একদিন ফিরে যেতে হবেই। এর অন্যথা হওয়া সম্ভবই নয়। আর 'ইন্‌না রব্বাহু কানা বিহী বাসীরা' অর্থ তার প্রতিপালক তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। অর্থাৎ বান্দার কোনো কর্মই আল্লাহ্‌র দৃষ্টি বহির্ভূত নয়। সুতরাং তাদেরকে যথাসময়ে যথোপযুক্ত কর্মফল ভোগ করতে হবেই— চিরস্বস্তি, অথবা চিরশাস্তি।

সূরা ইনশিক্বাক্ব ঃ আয়াত ১৬— ২৫

فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۙ﴿۱۶﴾ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۙ﴿۱۷﴾ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۙ﴿۱۸﴾
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ؕ﴿۱۹﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ﴿۲۰﴾ وَاِذَا قُرِئَ
عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ؕ السجدة ﴿۲۱﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ۖ﴿۲۲﴾
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ۖ﴿۲۳﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ﴿۲۴﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿۲۵﴾

q আমি শপথ করি অস্তরাগের,
q এবং রাত্রির আর উহা যাহা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তাহার,
q এবং শপথ চন্দ্রের, যখন ইহা পূর্ণ হয়;
q নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করিবে।
q সুতরাং উহাদের কি হইল যে, উহারা ঈমান আনে না
q এবং উহাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হইলে উহারা সিজ্‌দা করে না?
q পরন্তু কাফিরগণ উহাকে অস্বীকার করে।
q এবং উহারা যাহা পোষণ করে আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবগত।
q সুতরাং উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও;
q কিন্তু যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

এখানকার প্রথমোক্ত তিন আয়াতে (১৬, ১৭, ১৮) আল্লাহ্‌পাক শপথ করেছেন অস্তরাগ, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি ও পূর্ণ চন্দ্রের। তার পরের আয়াতে (১৯) বলেছেন 'নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করবে'।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'শাফাক্ব' অর্থ অস্তরাগ, সূর্যাস্তশেষে পশ্চিমাকাশের লালিমা অপসারণ হওয়ার পরের শুভ্র আভা। আর 'মা ওয়াসাক্ব' অর্থ ওই সকল গৃহপালিত পশু, যেগুলো দিনভর চরে ফিরে সন্ধ্যাগমে ফিরে আসে স্বগৃহে। 'লাইল' অর্থ রাত।

'মা ওয়াসাক্ব' অর্থ রাত যেগুলোকে আবৃত করে। মুজাহিদের উক্তির প্রতিধ্বনি করে মনসুর বলেছেন, রাত্রির নিবিড় আঁধার যে সকল বস্তুকে দৃষ্টির আড়াল করে দেয়, সেগুলোকে বলে 'মা ওয়াসাক্ব'। সাঈদ ইবনে যোবায়ের শব্দটির অর্থ করেছেন— রাতে যা কিছু করা হয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— শপথ রাতের তমসাবৃত বস্তুনিচয়ের, অথবা নিশীথের কৃতকর্মসমূহের।

'ক্বমর' অর্থ চন্দ্র। 'ইজাত্ তাসাক্ব' অর্থ যখন তা পূর্ণ হয়। অর্থাৎ শপথ ওই চন্দ্রের, যখন পূর্ণ হয় ষোল কলায়। কিংবা— শপথ চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত রাত্রির।

'লাতার্‌কাবুন্‌না ত্ববাক্বান আ'ন ত্ববাক্ব' অর্থ নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে উন্নতি করবে। এখানকার 'তারকাবুন্‌না' শব্দটিকে যদি ধরে নেওয়া হয় মধ্যম পুরুষের পুংলিঙ্গের একবচন তাহলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তুমি ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বারোহণ করবে। সম্বোধনটি করা হয়েছে রসুল স.কে। অর্থাৎ হে আমার রসুল! শুভসংবাদ শ্রবণ করুন, আপনি উত্তরোত্তর ঊর্ধ্বারোহণ করতেই থাকবেন। শা'বী ও মুজাহিদের মন্তব্য অনুসারে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি উল্লঙ্ঘন করবেন আকাশের পর আকাশ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'যিনি আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে'। এমতো অর্থ গ্রহণ করলে বলতে হয়, বাক্যটিতে ঘোষিত হয়েছে রসুল স. এর মেরাজের শুভসংবাদ। উল্লেখ্য, মেরাজ সম্পর্কিত হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে সুরা ইস্‌রা ও সুরা নাজ্‌মের তাফসীরে।

এরকমও হতে পারে যে, এখানে ধাপে ধাপে আরোহণ করবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের পথের স্তরসমূহ অতিক্রম করার কথা। স্বসূত্রে বোখারী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'ধাপে ধাপে' অর্থ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায়। তিনি আরো বলেছেন, এখানে 'ধাপে ধাপে আরোহণ করবে' কথাটি বলা হয়েছে রসুল স.কে লক্ষ্য করে।

'তার্‌কাবুন্‌না' শব্দটিকে যদি এখানে স্ত্রীলিঙ্গবাচক একবচন ধরে নেওয়া হয়, তবে এর অর্থ হবে আকাশারোহণ। আর 'ত্ববাক্বান' এর মর্মার্থ দাঁড়াবে— স্তরান্তর, অবস্থান্তর। অর্থাৎ আকাশ এক অবস্থার পর ধারণ করবে অন্য অবস্থা। এই আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে সাঈদ ইবনে মনসুর, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তখন ফাটল সৃষ্টি হবে আকাশে। ফলে তা ভেঙে ভেঙে পড়বে। শেষে ধারণ করবে লোহিত বর্ণ। বায়হাকী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তখন আকাশ ধারণ করবে বিভিন্ন রঙ, কখনো লাল, কখনো গোলাপী। হয়ে পড়বে শিথিল। এক অবস্থার পর ধারণ করবে আর এক অবস্থা।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'তার্‌কাবুন্‌না' শব্দটিকে লেখা হয়েছে 'বা' অক্ষরে পেশযুক্ত করে বহুবচনীয় শব্দরূপে (একারণেই বঙ্গানুবাদে তুমি না লিখে লেখা হয়েছে তোমরা)। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে মানব জাতি! প্রতিফল দিবসের বিভিন্ন ঘাঁটিতে ঘটবে তোমাদের অবস্থান্তর। রূপান্তরিত হবে তোমাদের আকার-আকৃতি।

'ধাপে ধাপে' কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুকাতিল বলেছেন, মৃত্যুর পর ঘটবে পুনরুত্থান। আতা বলেছেন কথাটির অর্থ জাগতিক জীবনের বিভিন্ন অবস্থা— কখনো ধনী, কখনো নির্ধন। আমর ইবনে দীনার বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'ধাপে ধাপে' অর্থ পর্যায়ক্রমে— বিপদ, স্বাচ্ছন্দ্য, মৃত্যু, পুনরুত্থান, মহাসমাবেশস্থলে গমন। ইকরামা কথাটির অর্থ করেছেন— বয়োক্রম, শৈশব-কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব-বার্ধক্য। আবু উবায়দা অর্থ করেছেন— তোমরাও অতীতায়িত জাতিগুলোর মতো ক্রমশ নিমজ্জিত হবে প্রথাসর্বস্বতায়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাকেম কর্তৃক বর্ণিত ও বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরাও এক সময় বিগত যুগের সম্প্রদায়গুলোর অনুসরণ করবে পায়ে পায়ে। তারা যদি প্রবেশ করে কোনো জানোয়ারের গর্তে, তবে তোমরাও তাই করবে। তারা যদি পথের ধারে স্ত্রীসহবাস করে, তোমরাও তা করবে। বোখারীও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তাদের কী হলো যে, তারা ইমান আনে না'? প্রশ্নটি একই সঙ্গে বিস্ময়সূচক ও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। ইতোপূর্বে উল্লেখিত পুণ্যবান ও পাপীদের প্রতিফল প্রদানের বিবরণসম্বলিত আয়াতগুলোর সঙ্গে রয়েছে এর বক্তব্যগত যোগাযোগ। মাঝখানের শপথপ্রকাশক আয়াতগুলো ভিন্ন প্রসঙ্গের। আমি বলি, এরকমও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতের যোগসূত্র রয়েছে আগের আয়াতের 'ধাপে ধাপে আরোহণ করবে' কথাটির সাথে। কারণ অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় জানা যায় অবস্থা পরিবর্তনকারীর। প্রকাশিত হয় তাঁর সামর্থ্য ও শক্তিমত্তাও। এর পরেও তাঁকে মান্য না করার কি কোনো কারণ অবশিষ্ট থাকে?

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'এবং তাদের নিকট কোরআন পাঠ করা হলে তারা সেজদা করে না'? বাক্যটি পাঠ করলে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, কোরআন পাঠ শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সেজদা করতে হবে। কেননা কোরআন পাঠ শুনে সেজদা না করার জন্য এখানে ঘোষিত হয়েছে নিন্দাবাদ। অথচ ঐকমত্যসম্মত অভিমত এই যে সেজদা করা ওয়াজিব হয় কেবল সেজদার আয়াত পাঠ করলে বা শুনলে। সুতরাং বুঝতে হবে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'সেজদা' অর্থ বিনয়াবনত হওয়া। অর্থাৎ বিনয় প্রকাশ করাকেই এখানে রূপকার্থে বলা হয়েছে সেজদা। অর্থাৎ কোরআনের প্রতিটি আয়াত শুনতে হবে আন্তরিক বিনয় সহকারে। অথবা 'সেজদা' অর্থ এখানে তেলাওয়াতের

www.eelm.weebly.com

সেজদা। ‘আল কুরআন’ এর আলিফ লাম এখানে সীমিতার্থক। অর্থাৎ যখন পাঠ করা হয় সেজদার আয়াত তখন তারা সেজদা করে না কেনো? ইমাম আবু হানিফার মতে তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব। শেষোক্ত মর্মানুসারে এই আয়াতই তাঁর অভিমতের পক্ষের প্রমাণ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আলোচ্য আয়াতকে তিনি সেজদার আয়াত বলে স্বীকার করেননি। কেননা বিষয়টি বিতর্কিত।

ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর সহচরদ্বয় তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণরূপে উপস্থাপন করেন হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষ যখন সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায়, বলে, আক্ষেপ! মানুষকে সেজদার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা সে আদেশ মেনে অধিকারী হয়েছে জান্নাতের। আমাকেও তো এরকম আদেশই দেওয়া হয়েছিলো। আমি তা অমান্য করে হয়ে গিয়েছি জাহান্নামী।

প্রমাণ গ্রহণের উপাত্ত হলো— বক্তা ও শ্রোতা যদি জ্ঞানবান হয় এবং ওই বক্তার কথা শুনে ওই শ্রোতা কোনো প্রতিবাদ না করে, তবে বুঝতে হবে, বক্তার বিবরণ সঠিক। বর্ণিত হাদিসটিতে রসুল স. শয়তানের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর তার ওই উক্তিটির সমালোচনাও তিনি স. করেননি। এতে করেই প্রমাণিত হয় যে, তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব। ইবনে আবী শায়বা তাঁর ‘আলমুসান্নাফ’ গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, যে ব্যক্তি সেজদার আয়াত শুনবে, তার উপরে সেজদা ওয়াজিব হবে।

জমহুর ফেকাহশাস্ত্রজ্ঞ ও হাদিসবেত্তাগণ বলেন, তেলাওয়াতের সেজদা সুন্নত। তাঁরা তাঁদের অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেন এই হাদিসগুলো— হজরত জায়েদ ইবনে ছাবেত বলেছেন, আমি রসুল স. এর সম্মুখে সুরা নজ্‌ম পাঠ করেছি, কিন্তু তিনি স. সেজদা করেননি। বোখারী, মুসলিম, দারাকুতনী, সুনান রচয়িতাবৃন্দ। দারাকুতনীর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— আমাদের কেউই তখন সেজদা করেননি। হানাফীগণ বলেন, সেজদা ওয়াজিব নয়— এই হাদিস দ্বারা তা প্রমাণ করা যায় না। কেননা এটা একটি ঘটনা মাত্র। এরকমও তো হতে পারে যে, যখন সুরা নজ্‌ম তেলাওয়াত করা হয়েছিলো, তখন সেজদা করা ছিলো মাকরূহ্। কিংবা বলা যেতে পারে, যারা সেজদা করবে, তারা ছিলেন তখন ওজুবিহীন। বা এটাই হয়তো তখন প্রমাণ করা উদ্দেশ্য ছিলো যে, সাথে সাথেই সেজদা করা ওয়াজিব নয়।

আমি বলি, সেজদা না করার পক্ষে যদি উল্লেখিত কারণগুলোর মধ্যে কোনো একটি কারণও থাকতো, তবে তা উল্লেখও করা হতো। তাছাড়া হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব কৃর্তক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, জুমআর দিন তিনি মিম্বরে অধিষ্ঠিত অবস্থায় একটি সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করলেন। পরক্ষণে মিম্বার থেকে নেমে সেজদা করলেন। জনগণও সেজদা করলো। এরপর আর এক জুমআর দিন তিনি খুতবা দান কালে একটি সেজদার আয়াত তেলাওয়াত

www.eelm.weebly.com

করলেন। জনগণ সেজদা করার প্রস্তুতি নিলো। কিন্তু তিনি মিম্বর থেকে নামলেন না। বললেন, আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন। তেলাওয়াতের সেজদাকে ফরজ করে দেননি। কেউ ইচ্ছা করলে সেজদা করবে। ইচ্ছা না করলে করবে না।

শায়েখ ইবনে হাজার মক্কী বলেছেন, মাযানীর ধারণা, হাদিসটি ইমাম বোখারীর তালিকাত পর্যায়ের। কিন্তু মন্তব্যটি অনুমানপ্রসূত। বায়হাকী এবং আবু নাঈমও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আমি বলি, হাদিসটি ঐকমত্যের বর্ণনাগত। আর ওই সমাবেশের কেউ হজরত ওমরের কথার কোনো প্রতিবাদও করেননি। আর শয়তানের উক্তি ছিলো মানুষকে সেজদার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই সেজদা নিশ্চয় তেলাওয়াতের সেজদা নয়। হজরত আদমকে সেজদা করার যে নির্দেশ শয়তানকে দেওয়া হয়েছিলো, সে সেজদাও তেলাওয়াতের সেজদা ছিলো না।

একটি বিধান ঃ সুরা মুফাস্সালাতের তেলাওয়াতের সেজদা বিতর্কিত। জমহুরের অভিমতে তেলাওয়াতের সেজদা রয়েছে সুরা নাজ্‌ম, সুরা ইনশিক্বাক্ব ও সুরা আলাক্বে। এই অভিমতটিও অবিতর্কিত নয়। সুরা হজের দু'টি সেজদা এবং সুরা সফের সেজদাও এধরনের বিরুদ্ধমতপূর্ণ। জমহুরের মতে কোরআন মজীদে তেলাওয়াতের সেজদা রয়েছে ১৪টি অথবা ১৫টি। ইমাম মালেক বলেছেন, সুরা মুফাস্সালাতে সেজদার আয়াত নেই। একথার প্রমাণ হিসেবে তিনি উপস্থাপন করেন হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. হিজরতের পরে সুরা মুফাস্সালাতের কোথাও সেজদা করেননি। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আবু কুদামা হারেছ ইবনে উবায়েদ সূত্রে আবু দাউদ ও আবু আলী ইবনে সাকান, তিনি মাতার থেকে, তিনি ইকরামা থেকে। শায়েখ ইবনে হাজার বলেছেন, আবু কুদামা ও মাতার দু'জনই বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। ইবনে জাওজী বলেছেন, ইমাম আহমদের মতে আবু কুদামা বিতর্কিত। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, সে একজন হীন প্রকৃতির লোক। তার বর্ণনাগুলো লিপিবদ্ধ হওয়ার অযোগ্য।

তাহাবী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, মুফাস্সালাত সুরায় সেজদার আয়াত আছে কি নেই, সে সম্পর্কে একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন, নেই। আর আমাদের প্রমাণ হচ্ছে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে তিনি বলেছেন, রসুল স. সুরা ইনশিক্বাক্ব ও সুরা আলাক্ব পড়ে সেজদা করেননি। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কেবল মুসলিম। তবে ভিন্ন সূত্রে বোখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন, আবু নাফে বলেছেন, আমি একবার হজরত আবু হোরায়রার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ইশার নামাজ আদায় করলাম। তিনি সুরা ইনশিক্বাক্ব পাঠ করলেন। সেজদাও করলেন। আমি পরে বললাম, আপনি সেজদা করলেন যে। তিনি বললেন, আমি তো এরকম করেছি রসুল স. এর সঙ্গে নামাজ পাঠকালেও। তাই আমরণ এরকমই করতে থাকবো। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ষষ্ঠ হিজরীতে। এ সম্পর্কে আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী কর্তৃক, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. সুরা নাজ্‌ম পাঠ করে সেজদা করেছিলেন। তাঁর সাথে সেজদা করেছিলো পৌত্তলিকেরাও। তিরমিজিও এরকম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

www.eelm.weebly.com

হজরত আমর ইবনে আস বলেছেন, রসুল স. তেলাওয়াতের সেজদা করতেন কোরআন মজীদের পনরোটি স্থানে— সুরা মুফাস্সালাতের তিনটি এবং সুরা হজের দুইটি সেজদাও তার অন্তর্ভূত। আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারাকুতনী, হাকেম। আল্লামা মুনজিরী এবং ইমাম নববী বলেছেন, বর্ণনাটি উত্তমসূত্রবিশিষ্ট। কিন্তু শায়েখ আবদুল হক বলেছেন, শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। ইবনে জাওজী বলেছেন, বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য নয়। আরো বলেছেন, এই বর্ণনাসূত্রসংযুক্ত মোহাম্মদ ইবনে রাশেদকে আলেমগণ সাব্যস্ত করেছেন মিথ্যাবাদী বলে। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং লক্ষ্য করেছি, রসুল স. স্বয়ং 'ইজাস্ সামাউন শাক্বক্বাত' সুরাটি পড়ে সেজদা করেছেন অন্ততপক্ষে দশবার।

একটি বিধান ঃ তেলাওয়াতে সেজদার পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের জন্য সেজদা ওয়াজিব, শ্রবণ ইচ্ছাকৃত হোক, অথবা হোক অনিচ্ছাকৃত। কেননা এরকম আয়াতে নির্দেশ আসে সাধারণভাবে, কোনো প্রকার সীমারেখা ব্যতিরেকেই। আর সেজদা পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে প্রকাশ করা হয় নিন্দাবাদও। অবশ্য জমহুর বলেন, অনিচ্ছাকৃতভাবে সেজদার আয়াত শুনলে সেজদা করা ওয়াজিব হয় না। তাঁরা তাঁদের এমতো অভিমতের পক্ষে উপস্থাপন করেন একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, হজরত ওসমান একবার কোরআন পাঠরত হজরত আমর ইবনে আসের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। যখন সেজদার আয়াত এলো, তখন পাঠ করার পর হজরত আমর ভাবলেন, হজরত ওসমানও হয়তো এখন সেজদা করবেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। বরং বলতে বলতে গেলেন, সেজদা করতে হয় তাকে, যে ইচ্ছা করে তেলাওয়াত শোনে। আবদুর রাজ্জাক হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুয়াম্মার থেকে, তিনি জুহুরী থেকে এবং তিনি ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে। বোখারী হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর 'তালীকাত' নামক পুস্তকে।

ইবনে আবী শায়বা তাঁর 'আল মুসান্নাফ' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ওসমান বলেছেন, সেজদা তার জন্য, যে শোনার জন্য উপবিষ্ট। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সেজদা করতে হবে তাকেই, যে কোরআন শোনার জন্য বসে থাকে। বায়হাকী, ইবনে আবী শাইবা।

একটি বিধান ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, শ্রোতার জন্য সেজদা করা ওয়াজিব, পাঠক সেজদা না করলেও। যেহেতু নির্দেশটি একটি সাধারণ নির্দেশ। আর পাঠকের সেজদা করার শর্তও এখানে নেই। জমহুর বলেন, যতোক্ষণ পাঠক সেজদা করবে না, ততোক্ষণ শ্রোতার উপরে সেজদা ওয়াজিব হবে না। কেননা জায়েদ ইবনে আসলামের বর্ণনায় এসেছে, একবার জনৈক ব্যক্তি রসুল স. এর সম্মুখে সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করলেন। রসুল স.ও তাঁর সাথে সেজদা করলেন। এরপর আর একজন পাঠকও সেজদার আয়াত পড়লেন। কিন্তু তিনি স. সেজদা করলেন না। লোকটি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তার তেলাওয়াত শুনে সেজদা করলেন, অথচ আমার তেলাওয়াত শুনে সেজদা করলেন না যে। তিনি স. বললেন, এক্ষেত্রে তুমিই তো ইমাম। তুমি সেজদা

www.eelm.weebly.com

করলেই তো আমি সেজদা করতে পারতাম। জায়েদ ইবনে আসলামের এই হাদিসটি অপরিণত সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ। কিন্তু জায়েদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাবেয়ী আতা ইবনে ইয়াসারের মাধ্যমে। তাতে কোনো সাহাবীর নামোল্লেখ নেই। সাহাবীর নামোল্লেখ ব্যতিরেকে ইমাম শাফেয়ীও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে বায়হাকী লিখেছেন, হাদিসটি জুহুরী বর্ণনা করেছেন কোররা থেকে এবং কোররা হজরত আবু হোরায়রা থেকে। কিন্তু কোররা বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। বোখারী আবার প্রলম্বিত সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে।

একটি বিধান ঃ নীরব নামাজে সরবে সেজদার আয়াত পাঠ করা মকরূহ্। এই বিধানটি প্রযোজ্য একা একা নামাজ পাঠকারীর ক্ষেত্রেও। সরব নামাজের ক্ষেত্রে এমতো বিধান প্রয়োগযোগ্য নয়। ইমাম আহমদ বলেছেন, ইমাম যদি নীরবে সেজদার আয়াত পাঠ করে, তবে তাকে সেজদা করতে হবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কোনো অবস্থাতেই সেজদা মকরূহ্ নয়। কেননা হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. জোহরের নামাজের মধ্যে তেলাওয়াতের সেজদা আদায় করেছিলেন। সাহাবীগণ তাঁর এই আমলটির অনুসরণ করেছিলেন।

বিধান ঃ ইমাম সেজদা করলে মুক্তাদিদেরকেও সেজদা করা উচিত। ইমাম শাফেয়ীর অভিমতানুসারে যদিও তেলাওয়াতের সেজদা সুন্নত, তৎসত্ত্বেও এমতো ক্ষেত্রে তিনিও একমত।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'পরন্তু কাফেরগণ তাকে অস্বীকার করে'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সেজদার আয়াত শুনে সেজদা তো করেই না, উপরন্তু আল্লাহ্র বাণী বলে অস্বীকার করে সমগ্র কোরআনকে।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এবং তারা যা পোষণ করে, আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবগত'। একথার অর্থ— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী মনে মনে আল্লাহ্, রসুল এবং কোরআনের প্রতি যে কতো তীব্র বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ উত্তমরূপে অবহিত। কেননা তিনি অন্তর্যামী ও সর্বজ্ঞ।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'ফাবাশ্শিরহুম বিআ'জাবিন আ'লীম' (সুতরাং তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও)। এখানে 'ফা' অব্যয়টি নৈমিত্তিক। আর 'বাশারাত' অর্থ সুসংবাদ। অর্থাৎ সুসংবাদের নিমিত্ত হলো তাদের সত্যপ্রত্যাখ্যান। উল্লেখ্য, 'সুসংবাদ' বলা হয়েছে এখানে বিদ্রূপার্থে। অন্যথায় মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ তো কখনো সুসংবাদ হতে পারে না।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'কিন্তু যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার'। এখানকার 'ইল্লা' (ব্যতীত) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'লাকিন্না' (কিন্তু) অর্থে। আর এই ব্যতিক্রমীটি এখানে সংযুক্তক, অথবা বিযুক্তক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! শাস্তির

www.eelm.weebly.com

'সুসংবাদ' আপনি তাদেরকে দিবনে না— যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ। কেননা তাদের জন্য রয়েছে অনন্তকালীন সুখ। অথবা— তারা পুরস্কার পাবে আশাতিরিক্ত। এটাই ব্যতিক্রমীটির নিমিত্ত।

সূরা বুরূজ

এই সুরাখানিও মহাপুণ্যধাম মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১টি রুকু এবং ২২টি আয়াত।

সূরা বুরূজ ঃ আয়াত ১ ¾ ১০

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الۡبُرُوۡجِ ۙ﴿۱﴾ وَ الۡيَوۡمِ الۡمَوۡعُوۡدِ ۙ﴿۲﴾ وَ شَاهِدٍ وَّ
مَشۡهُوۡدٍ ؕ﴿۳﴾ قُتِلَ اَصۡحٰبُ الۡاُخۡدُوۡدِ ۙ﴿۴﴾ النَّارِ ذَاتِ الۡوَقُوۡدِ ۙ﴿۵﴾ اِذۡ
هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُوۡدٌ ۙ﴿۶﴾ وَّ هُمۡ عَلٰى مَا يَفۡعَلُوۡنَ بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ شُهُوۡدٌ ؕ﴿۷﴾
وَ مَا نَقَمُوۡا مِنۡهُمۡ اِلَّاۤ اَنۡ يُّؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَمِيۡدِ ۙ﴿۸﴾ الَّذِىۡ
لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ شَهِيۡدٌ ؕ﴿۹﴾ اِنَّ
الَّذِيۡنَ فَتَنُوا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَتُوۡبُوۡا فَلَهُمۡ
عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمۡ عَذَابُ الۡحَرِيۡقِ ؕ﴿۱۰﴾

q শপথ বুরূজ বিশিষ্ট আকাশের,

q এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,

q শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের—

q ধ্বংস হইয়াছিল কুণ্ডের অধিপতিরা—

q ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিল অগ্নি,

q যখন উহারা ইহার পাশে উপবিষ্ট ছিল;

q এবং উহারা মু'মিনদের সহিত যাহা করিতেছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল।

q উহারা তাহাদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল শুধু এই কারণে যে, তাহারা বিশ্বাস করিত পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহে—

r আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁহার; আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।

www.eelm.weebly.com

r যাহারা বিশ্বাসী নরনারীকে বিপদাপন্ন করিয়াছে এবং পরে তাওবা করে নাই তাহাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ওয়াস্‌সামাই জাতিল বুরূজ'। এর অর্থ শপথ বুরূজবিশিষ্ট আকাশের। এখানকার 'বুরূজ' শব্দটি বহুবচন 'বুর্‌জ' এর। এর অর্থ প্রকাশ পাওয়া, দুর্গ, প্রাসাদ। যেমন বলা হয় 'তাবাররাজার মারআতু' (রমণীটি প্রকাশ পেয়েছে)। অর্থাৎ সে বেপর্দা হয়েছে। লোকচক্ষুর সম্মুখে সমুদ্ভাসিত বলে দুর্গকেও বলা হয় 'বুরূজ'।

আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে, আকাশে এমন কিছু স্থান রয়েছে, যেগুলোকে বলা হয় 'বরজ'। আতিয়া বলেছেন, বরজ বলে প্রহরী পরিবেষ্টিত গৃহকে। মেরাজের ঘটনার এক স্থানে বলা হয়েছে—এর পর আমাকে উত্থিত করা হলো সপ্তমাকাশে অবস্থিত বায়তুল মামুর পর্যন্ত, যা কাবাগৃহের ঠিক উপরে। বোখারী, মুসলিম। সুরা তাত্বফীতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ বলেছেন, সপ্তম আকাশে রয়েছে একটি শাদা প্রাসাদ। ওই প্রাসাদে একত্র করা হয় বিশ্বাসীগণের আত্মাসমূহকে।

অথবা 'বুরূজ' অর্থ আকাশের দ্বার। কেননা আকাশের দ্বারগুলো দিয়েই আকাশবাসীরা নেমে আসে পৃথিবীতে। প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের ধারণা— আকাশ বারো ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগেই রয়েছে স্থির তারকাপুঞ্জ। আবার সচল নক্ষত্রগুলোও উপস্থিত হয় সেখানে। ওগুলোর নাম— বৃষ, মেষ, কর্কট ইত্যাদি। বিষয়টি সম্পূর্ণতই তাদের কল্পণাপ্রসূত এবং তা কোরআন হাদিসের বিপরীতও। প্রকৃত কথা হচ্ছে, আকাশ এবং আকাশের সকল গ্রহ-নক্ষত্র সতত পরিভ্রমণশীল। তবে একথা ঠিক যে আকাশের কোনো নির্দিষ্ট অংশের নামই বুরূজ। আলোচ্য আয়াতের ইঙ্গিত এরকমই। এমনও বলা হয়েছে যে, আকাশের বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রগুলোর নাম বুরূজ, যেহেতু সেগুলো সতত প্রোজ্জ্বল। হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদাও এরকম বলেছেন।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এবং প্রতিশ্রুত দিবসের (২), শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের—' (৩)। এখানে 'ইয়াওমিল মাওঊ'দ' (প্রতিশ্রুত দিবস) অর্থ কিয়ামত দিবস। 'শাহেদ' (দ্রষ্টা) অর্থ সাক্ষ্যদাতা এবং 'মাশহুদ' (দৃষ্ট) অর্থ আরাফার দিবস, যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় একজন সত্য সাক্ষ্যদাতা। অথবা ওই বস্তু, যার সাক্ষ্য দেয় একজন সাচ্চা সাক্ষ্যদাতা। আবার জুমআর দিবসকে (শুক্রবারকে)ও বলা হয় শাহেদ। বলা বাহুল্য, বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই আল্লাহ্ এ সকল বিষয়ের উল্লেখ করে শপথ করেছেন।

ইমাম আহমদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, এখানে 'প্রতিশ্রুত দিবস' অর্থ মহাপ্রলয় দিবস। দৃষ্ট বা প্রত্যয়িত দিবস হচ্ছে আরাফার দিন এবং দ্রষ্টা বা সাক্ষ্যদাতা অর্থ শুক্রবার। শুক্রবারে এমন এক মুহূর্ত রয়েছে, যখন প্রার্থনা করলে তা আল্লাহ্পাক কর্তৃক গৃহীত

www.eelm.weebly.com

হয়। কল্যাণ চাইলে দেওয়া হয় কল্যাণ। অর্থাৎ অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণ চাইলে দেওয়া হয় কাংখিত পরিত্রাণ। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর। আর এর বর্ণনাসূত্রভূত এক বর্ণনাকারী মুসা ইবনে উবায়দা বলিষ্ঠ। শিথিল সূত্রসহযোগে হজরত আবু মালেক আশয়ারী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন তিবরানী। সেখানে অতিরিক্ত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে— আল্লাহ্পাক আমাদের জন্য শুক্রবারকে ধার্য করেছেন একটি বিশেষ দিন হিসেবে।

হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করে ইউসুফ ইবনে মেহরান বর্ণনা করেছেন, এখানে সাক্ষ্যদাতা হলেন রসুলে পাক স.। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তাদের উপরে সাক্ষ্যদাতারূপে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি'। আর 'মাশহুদ' অর্থ এখানে— কিয়ামত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সেদিন হবে মানুষের সমবেত হওয়ার দিন, আর দিনটি প্রত্যয়িত'। এরকম অর্থ গ্রহণ করলে অবশ্য পুনরাবৃত্তি হয়ে যায় অনিবার্য। অর্থাৎ 'ইয়াওমিল মাওউ'দ'ও হয়ে যায় 'ইয়ামিল মাশহুদ'।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে 'দ্রষ্টা' বা সাক্ষ্যদাতা বলে বুঝানো হয়েছে আমল লেখক ফেরেশতাদেরকে এবং 'দৃষ্ট' বা প্রত্যয়িত বলে বুঝানো হয়েছে মানবজাতিকে। হোসাইন ইবনে ফজল বলেছেন, এখানে 'শাহেদ' অর্থ উম্মতে মোহাম্মদী এবং 'মাশহুদ' অর্থ অন্যান্য উম্মত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'যেনো তোমরা হও মানবমণ্ডলীর জন্য সাক্ষ্যদাতা'।

মালেক ইবনে আবদুল্লাহ একবার সাঈদ ইবনে যোবায়েরের কাছে এই আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তিনি জবাব দিলেন, এখানে 'শাহেদ' হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং 'মাশহুদ' হচ্ছে মানবজাতি। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট'। কেউ কেউ বলেছেন, 'শাহেদ' হচ্ছে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের রসনা ও হাত-পা'। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'শাহেদ' হচ্ছেন অন্যান্য নবী এবং 'মাশহুদ' হচ্ছেন রসুল স. স্বয়ং। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আর আল্লাহ্ যখন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন নবীগণ থেকে ... তখন তারা সাক্ষ্য প্রদান করলো। আর আমিও ছিলাম সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভূত'। আমি বলি, এখানকার 'শাহেদ' এবং 'মাশহুদে'র ব্যাখ্যা যদি কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণ করা যায়, তবে ওই প্রমাণই হবে যথেষ্ট। তাহলে অন্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজনই আর থাকবে না। অন্যথায় আমরা বলতে পারি এখানে 'শাহেদ' অর্থ সত্যসাক্ষ্যদাতা। আর 'মাশহুদ' অর্থ সত্য দ্বারা সাক্ষ্যয়িত, সে যে কেউ হোক না কেনো । যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; আরো সাক্ষ্য দেন ফেরেশতাবর্গ এবং জ্ঞানীগণ'। এভাবে বুঝা যায়, এখানে 'সাক্ষ্যদাতা' অর্থ আল্লাহ্, ফেরেশতামণ্ডলী, আমল লেখক ফেরেশতা, নবী-রসুল, বিশ্বাসীগণ, বিশেষ করে উম্মতে মোহাম্মদী, আবার উম্মতে মোহাম্মদীর আলেমগণ, তারাও, যারা দণ্ডবিধানের মামলায় আদালতে পৌঁছে

www.eelm.weebly.com

সত্যসাক্ষ্য দেয়। আর 'মাশহুদ' অর্থ আল্লাহ্‌র এককত্বের বাণী, নবীগণের স্বীকৃতি, ধর্মপ্রচারকর্ম, মানুষের কর্ম ও আচরণ এবং ওই সকল কথা, যা বলেন একজন সত্যসাক্ষ্যদাতা। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা সাক্ষ্যদাতার মর্যাদা বজায় রেখো। আল্লাহ্‌ তাদের মাধ্যমে সত্যের প্রকাশ ঘটান। আর রক্ষা করেন প্রপীড়িতদেরকে। শিথিল সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন খতীব ও ইবনে আসাকের।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'কুতিলা আসহাবুল উখদূদ্‌' (ধ্বংস হয়েছিলো কুণ্ডের অধিপতিরা)। কেউ কেউ এখানকার 'কুতিলা' (ধ্বংস হয়েছিলো) বাক্যটিকে বলেছেন শপথের জবাব। কিন্তু অভিমতটি নিতান্তই অশক্ত। কেননা শপথের জবাবে 'লাম' অব্যয়ের ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী। 'লাম' বিবর্জিত শপথের জবাব খুব কমই পরিদৃষ্ট হয়। তবে এখানে 'কুতিলা'কে শপথের জবাব না বলে বলা যেতে পারে, শপথের জবাব রয়েছে এখানে উহ্য। পরের আয়াতে শপথের সামঞ্জস্যশীল জবাব সুস্পষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক বলেছেন— আমি শপথ করেই বলছি, কুরায়েশ পৌত্তলিকেরা অভিশপ্ত, যেমন অভিশপ্ত অগ্নিকুণ্ডের অধিপতিরা।

হজরত সুহাইব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রাচীন যুগে ইয়েমেন প্রদেশ শাসন করতো এক রাজা। তার দরবারে থাকতো এক যাদুকর। যখন সে বৃদ্ধ হলো, তখন বললো, রাজন! আমি তো বুড়ো হয়ে গেলাম। মনে হয় বেশীদিন আর বাঁচবো না। আপনি বরং একটি ছেলে ঠিক করে দিন। আমি তাকে যাদু বিদ্যায় পণ্ডিত বানিয়ে দিয়ে যাবো। রাজা একটি যুবককে ঠিক করে দিলো। যুবকটি নিয়মিত যাতায়াত করতে লাগলো যাদুকরের বাড়িতে। তার যাতায়াতের পথে পড়তো এক দরবেশের আস্তানা। সে একই সঙ্গে ওই দরবেশের কাছেও দীক্ষা গ্রহণ করলো। তাঁর সঙ্গে কিছু সময় কাটাতো বলে কখনো কখনো যাদুকরের বাড়িতে যেতে তার বিলম্ব ঘটতো। তাই যাদুকর তাকে শাস্তি দিতে শুরু করলো। ফিরতি পথে দরবেশের সংসর্গে আবার কিছু সময় কাটাতো সে। ফলে বিলম্বে বাড়িতে ফেরার জন্য পিতা-মাতার কাছ থেকেও ভর্ৎসনা শুনতে হতো তাকে। একদিন তার পথে পড়লো এক বিরাট দর্শন বন্য প্রাণী। তার কারণে সে রাস্তায় লোক চলাচল হয়ে গিয়েছে একবারে বন্ধ। যুবকটি ভাবলো আজ হবে পরীক্ষা। দেখি কে উত্তম— দরবেশ, না যাদুকর। একথা ভেবেই সে হাতে তুলে নিলো একটি পাথরের টুকরা। বললো, হে আল্লাহ্‌! যাদুকর অপেক্ষা দরবেশ যদি তোমার অধিক প্রিয়পাত্র হয়, তাহলে আমার হাতের এই পাথর দ্বারা তুমি বন্য জন্তুটিকে ধ্বংস করে দাও। একথা বলেই সে পাথরটি ছুঁড়ে মারলো হিংস্র প্রাণীটিকে লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে মরে গেলো প্রাণীটি। পথিকদের পথ হয়ে গেলো নিরাপদ। যুবক দরবেশের কাছে উপস্থিত হয়ে খুলে বললো সব। দরবেশ বললেন, বৎস! তুমি

www.eelm.weebly.com

অনেক উন্নত হয়েছো। তোমার সাফল্য থেকে আমার ধারণা হচ্ছে, অচিরেই তুমি বিপদাপন্ন হবে। তবে বিপদাপন্ন হলেও তুমি আমার কথা কখনো প্রকাশ কোরো না।

এরপর থেকেই যুবকটির দ্বারা সম্পাদিত হতে শুরু করলো অনেক অলৌকিক ঘটনা। তার হাতের ছোঁয়ায় নিরাময় লাভ করতে শুরু করলো জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীরা। অন্যান্য রোগীরাও তার কাছে নিরাময় না হয়ে ফিরতো না। তার এমতো কীর্তির কথা প্রচার হয়ে গেলো সারা দেশে। রাজার এক বিশেষ সহচর ক্রমে ক্রমে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। সে-ও নিরাময়ের আশায় অনেক উপঢৌকন নিয়ে একদিন উপস্থিত হলো যুবকের দরবারে। বললো, আমার চোখ ভালো করে দাও, আর এই উপঢৌকনগুলো গ্রহণ করো। যুবক বললো, আমি আরোগ্যদাতা নই। আরোগ্য দান করেন আল্লাহ্। আপনি তাঁকে বিশ্বাস করুন এবং তাঁর নিকটেই আরোগ্য প্রার্থনা করুন। লোকটি তাই করলো। আল্লাহ্পাক তার চোখ ভালো করে দিলেন। সেখান থেকে সে সোজা গিয়ে উপস্থিত হলো রাজদরবারে। অন্ধ হওয়ার পর থেকে রাজদরবারে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিলো সে। রাজা তাকে দেখে অবাক হলো। তার অন্ধত্ব দূর হয়েছে বুঝতে পেরে বললো, কী ব্যাপার! তোমার চোখ ভালো হয়ে গেলো কী করে? লোকটি বললো, আমার মালিক সবকিছুই করতে পারেন। রাজা বললো, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মালিক আছে নাকি? সে বললো, নিশ্চয়ই। তিনি প্রভুপালনকর্তা তোমার, আমার, সকলের। রাজা একথা শুনে রোষান্বিত হলো। বন্দী করলো তাকে। শাস্তি দিতে শুরু করলো। বললো, ঠিক করে বলো, তোমাকে দৃষ্টিদান করলো কে? অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সে একসময় বললো যুবকের নাম। রাজা সঙ্গে সঙ্গে শান্ত্রী পাঠিয়ে রাজ দরবারে ধরে নিয়ে এলো যুবককে। বললো, তোমার যাদু তো ভালোই প্রভাব বিস্তার করেছে। ভালো হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিহীন, কুষ্ঠাক্রান্ত ও অন্যান্য রোগগ্রস্তরা। এটাতো বড়ই আনন্দের বিষয়। যুবক বললো, আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আরোগ্যদাতা তো আল্লাহ্। একথা শুনে রাজা ক্ষিপ্ত হলো। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলো যুবককে বন্দী করতে। বন্দী অবস্থায় তার উপর অত্যাচার করা হতে লাগলো নিয়মিত। রাজা মাঝে মাঝেই তাকে বলতে শুরু করলো, বলো, এই বিদ্যা তুমি রপ্ত করলে কীভাবে? একসময় শাস্তির প্রকোপ সহ্য করতে না পেরে যুবক বলে দিলো দরবেশের কথা। রাজা তলব করলো দরবেশকে। তিনি রাজ দরবারে উপস্থিত হলে রাজা বললো, দরবেশ! আমি নির্দেশ দিচ্ছি, তুমি তোমার ধর্ম পরিত্যাগ করো। দরবেশ বললেন, অসম্ভব। রাজা দিলো মৃত্যুর দণ্ডাদেশ। রাজনির্দেশে করাত দিয়ে দুই টুকরা করা হলো দরবেশকে। এরপর রাজা নির্দেশ দিলো, যুবকটিকে নিয়ে উঠে যাও অমুক পাহাড়ের চূড়ায়। সেখান থেকে ফেলে দিয়ে নিপাত করে দাও তাকে। সিপাই শান্ত্রীরা তাকে নিয়ে যাত্রা করলো অমুক স্থানের দিকে। যেতে যেতে সে দোয়া করলো, হে আমার

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্! তুমি এদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো। একটু পরেই শুরু হলো ভূমিকম্প। হঠাৎ নিকটের একটি পাহাড় ধসে চাপা দিলো সিপাই শান্ত্রীদেরকে। যুবক অক্ষত অবস্থায় ফিরে গেলো রাজ দরবারে।

তাকে দেখে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হলো রাজা। এক দল লোককে নির্দেশ দিলো, একে নৌকায় তুলে নিয়ে মাঝ দরিয়ায় যাও। তারপর ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলতে থাকো। যদি সে তোমাদের কথা শোনে তো ভালোই। অন্যথায় ফেলে দিয়ো দরিয়ার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে। লোকেরা নির্দেশ পালন করলো। তাকে নিয়ে যখন সকলে মাঝ দরিয়ায় উপস্থিত হলো, তখন যুবক শরণ গ্রহণ করলো আল্লাহ্র। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রমধ্যে শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়। নৌকাডুবিতে মারা গেলো লোকেরা। যুবক রক্ষা পেলো অলৌকিকভাবে। রাজ দরবারে ফিরে এসে সে বর্ণনা করলো আনুপূর্বিক ঘটনা। বললো, রাজা! এভাবে তুমি আমার প্রাণ সংহার করতে পারবে না। যদি তুমি প্রকৃতই আমাকে বধ করতে চাও, তবে আমার পরামর্শ গ্রহণ করো। রাজা বললো, বলো। যুবক বললো, উন্মুক্ত প্রান্তরে জনসমাবেশের ব্যবস্থা করো। সেখানে একটি গাছের গুড়ির সঙ্গে আমাকে বেঁধে দাও। তারপর আমারই তুন থেকে একটি তীর নিয়ে 'বিস্‌মিল্লাহি রব্বিল গুলাম' বলে নিক্ষেপ করো আমার দিকে। তাহলেই তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে। রাজা তাই করলো। বহু লোকের সামনে শহীদ হয়ে গেলো যুবক। কিন্তু ঘটনা মোড় নিলো অন্য দিকে। উপস্থিত জনতা সমস্বরে তিন বার ঘোষণা করলো, আমরা এই যুবকের পালনকর্তার উপরে ইমান আনলাম।

রাজা ক্ষেপে গেলো খুব। নির্দেশ দিলো, পথের ত্রিমোহনীতে খনন করো একটি বিশাল গর্ত। গর্তটি ভর্তি করো শুকনো কাঠ দিয়ে। জ্বালিয়ে দাও আগুন। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। একে একে আগুনে নিক্ষেপ করো তথাকথিত ইমানদারদেরকে। তাই করা হলো। নিষ্ঠুর রাজার নির্মমহৃদয় বশংবদেরা জ্বলন্ত আগুনে একে একে নিক্ষেপ করতে লাগলো বিশ্বাসীগণকে। এ সময় সামনে আনা হলো এক শিশু ও তার মাতাকে। মাতার কোল থেকে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার সময় শিউরে উঠলো মাতা। শিশুটি বললো, মা! ভয় পেয়ো না। তুমি সত্যাধিষ্ঠিতা। মুসলিম।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আতাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, ইয়েমেন রাজ্যের নাজরান অঞ্চলের হুমাইরি বংশের এক রাজার নাম ছিলো ইউসুফ জুনুয়াস ইবনে শারজীল। ঘটনাটি ঘটেছিলো তাঁর সময়েই, রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের সত্তর বৎসর আগে। তখন পৃথিবীতে কোনো নবী ছিলেন না। যুবকটির নাম ছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে তামীর। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ সূত্রে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রাজা জুনুয়াস তখন আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিলো বারো হাজার লোককে। এরপর ইয়েমেন জয় করে রাজা কাফী ইরবাত। জুনুয়াস পালিয়ে গিয়ে সাগরে ঝাঁপ দেয়। এভাবেই সলিল সমাধি ঘটে তার। কালাবী বলেছেন, জুনুয়াসই হত্যা করেছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে তামীরকে।

www.eelm.weebly.com

মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর বর্ণনা করেছেন, খলিফা ওমরের শাসনামলে সেখানে একটি খাল খনন করা হয়েছিলো। তখন বের হয়ে পড়েছিলো শহীদ আবদুল্লাহ্ ইবনে তামীরের মরদেহ। হাত রাখা ছিলো মস্তকের আহত স্থানে। হাত সরিয়ে নিতেই শুরু হতো রক্তপ্রবাহ। আবার হাত ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আপনা আপনি চলে যেতো পূর্বের স্থানে। লোহার সীলযুক্ত একটি অঙ্গুরীয় ছিলো তাঁর হাতে। তাতে লেখাছিলো 'রব্বী আল্লাহ্' (আল্লাহ্ই পরম প্রভুপালক)। খলিফার কাছে ঘটনাটি জানানো হলে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁকে যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, সে অবস্থাতেই সমাহিত করা হোক।

'আসহাবুল উখ্দূদ' বা অগ্নিকুণ্ডের অধিপতিদের সম্পর্কে আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে। তবে সেগুলোর মধ্যে ইমাম মুসলিমের বর্ণনাটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তাই অন্যান্য বর্ণনা আর উল্লেখ করা হলো না।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে—'ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিলো অগ্নি'। 'জাতিল ওয়াক্বুদ' বাক্যটি এখানে অগ্নির বিশেষণ। অর্থাৎ ইন্ধনপূর্ণ অগ্নি, লেলিহান শিখাযুক্ত অগ্নিকুণ্ড। আর এখানকার 'আলিফ লাম' হচ্ছে জাতিবাচক।

রবী ইবনে আনাস বর্ণনা করেছেন, যে সকল বিশ্বাসীকে তখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো, আল্লাহ্পাক তাঁদের প্রাণ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অগ্নিকুণ্ডে পতিত হওয়ার পূর্বেই। আর তাঁদের প্রাণহীন দেহগুলোকেও আল্লাহ্পাক সুরক্ষিত রেখেছিলেন অগ্নিপ্রতিক্রিয়া থেকে। উপরন্তু অগ্নিকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট অবিশ্বাসীরাই পুড়ে মরেছিলো ওই আগুনে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যখন তারা এর পাশে বসে ছিলো (৬); এবং তারা মুমিনদের সঙ্গে যা করেছিলো, তা প্রত্যক্ষ করছিলো' (৭)। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে বসে মজা দেখছিলো, কীভাবে বিশ্বাসীগণকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। একথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে। এরকম বলেছেন, মুজাহিদ। এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'প্রত্যক্ষ করছিলো' অর্থ তাদের কিছুসংখ্যক লোককে পর্যবেক্ষক হিসেবে সেখানে নিয়োগ করা হয়েছিলো। তারাই রাজার কাছে গিয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলো যে, শাস্তিদানের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাদের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করেনি। ঠিকঠাক মতোই সবকিছু সম্পন্ন করেছে। অথবা মর্মার্থ হবে— মহাবিচারের দিবসে যখন তাদেরকে নির্বাক করে দেওয়া হবে, তখন তাদের হাত-পা-ই সাক্ষ্য দিবে যে, তারা ওই বিশ্বাসীগণকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলো এবং এমতো সিদ্ধান্তে তারা ছিলো প্রীত।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিলো শুধু এই কারণে যে, তারা বিশ্বাস করতো পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহে— (৮) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর; আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা' (৯)।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'নাক্বামূ' অর্থ তারা নির্যাতন করেছিলো। ক্রিয়াটির কর্মপদ হচ্ছে 'আঁই ইউমিনূ' (তারা বিশ্বাস করতো)। 'নাক্বামূ' অতীতকালের ক্রিয়া বলেই এখানকার 'ইউমিনূ' অতীতকালার্থক, যদিও তা সন্নিবেশিত হয়েছে বর্তমান ও ভবিষ্যতকালরূপে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— ওই দুর্বৃত্তরা কোনো কৌলীন্য-প্রতিপত্তির কারণে, কিংবা প্রতিবাদী হওয়ার কারণে নয়, বিশ্বাসীগণকে তারা বধ করেছিলো কেবল এই কারণে যে, তারা ছিলো ইমানদার।

'আল আ'যীয' অর্থ পরাক্রমশালী, মহা পরাক্রান্ত, এমন মহাপ্রতাপান্বিত যে, যে কোনো সময় তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তির আশংকা বিদ্যমান। আর 'আল হামীদ' অর্থ প্রশংসার্হ, এমনই স্তব-স্তুতির অধিকারী যে, তাঁর কাছ থেকে পুণ্যকর্মের যথাবিনিময় আশা করা যায়।

'আল্ লাজী' লাহু মুলকুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' অর্থ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর। 'ওয়াল্লহু আলা কুল্লি শাইইন শাহীদ' অর্থ আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্ই যেহেতু সকল কিছুর একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বদ্রষ্টা, সেহেতু তিনিই সকলের একমাত্র উপাস্য এবং সকলের ভয় ও আশার লক্ষ্যস্থল। কথাটির মাধ্যমে বিশ্বাসীগণকে দেওয়া হয়েছে সান্ত্বনা এবং পুরস্কার প্রদানের পূর্ণ নিশ্চয়তা। একথাটির প্রতিও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, তারাই সত্যাধিষ্ঠিত। আর তাদের প্রতিপক্ষীয়রা মিথ্যাশ্রয়ী। সুতরাং বিশ্বাসীরা যেনো তাদের পরবর্তী পৃথিবীর সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে। এ বিষয়টিকেও তাদের বিশ্বাসের অঙ্গীভূত করে নেয় যে, যেহেতু তিনি সর্বদ্রষ্টা, সেহেতু তিনি যথাসময়ে সকলকে যথোপযুক্ত প্রতিফল দিবেনই— বিশ্বাসীগণকে পুরস্কার এবং তিরস্কার অবিশ্বাসীদেরকে।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তওবা করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি'।

এখানে 'ইন্নাল্ লাজীনা ফাতানুল মু'মিনীনা ওয়ালা মু'মিনাতি' অর্থ যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে। অর্থাৎ বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদেরকে বিপদাপন্ন করার অধিকার কারো নেই, অগ্নিকুণ্ডের অধিপতিদের যেমন নেই, তেমনি নেই অন্যান্যদেরও, না অবিশ্বাসীদের, না বিশ্বাসীদের।

'ছুম্মা লাম ইয়াতূবূ' অর্থ এবং পরে তওবা করেনি। 'ফা লাহুম আ'জাবু জ্বাহান্নাম' অর্থ তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। অর্থাৎ বিশ্বাসী-বিশ্বাসিনীদেরকে দুঃখ কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও যারা তওবা করে না এবং তওবা ছাড়াই ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে, তাদের নরকগমন সুনিশ্চিত, তারা যদি বিশ্বাসীও হয়, তবুও এমন হতে পারে যে, এখানে বলা হয়েছে কেবল অবিশ্বাসী অত্যাচারীদের

www.eelm.weebly.com

কথা। কেননা প্রসঙ্গটি সূত্রায়িত হয়েছে অগ্নিকুণ্ডের অধিপতি প্রসঙ্গে, যারা সকলেই ছিলো অবিশ্বাসী। আর বিশ্বাসীরাও তাদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলো কেবল ইমান আনার কারণে, আর ইমানদারেরা কখনো আরেক ইমানদারের উপরে ইমান আনার কারণে অত্যাচার করে না। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ওই অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলনকারীরা এবং তাদের মতো অন্যান্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অবশ্যই প্রবেশ করবে জাহান্নামে। শাস্তি ভোগ করবে বিরতিহীনভাবে।

'ওয়া লাহুম আ'জাবুল হারীক্ব' অর্থ এবং আছে দহন যন্ত্রণা। অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হয় এই পৃথিবী থেকেই। এখানেও দেখা যায়, যে অপরকে বিপদে ফেলতে চায়, সে-ই বিপদে পড়ে। অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারীদের ক্ষেত্রেও তেমনই ঘটেছিলো। তাদের জ্বালানো আগুনে তারা পুড়ে মরেছিলো নিজেরাই। সমুদ্রে ডুবে মরেছিলো জুনুয়াসও। সম্ভবত আলোচ্য আয়াতে দেওয়া হয়েছে একটি অনুক্ত প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হচ্ছে— আল্লাহ্পাক তাহলে কুণ্ডের অধিপতিদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছিলেন?

সূরা বুরূজ ঃ আয়াত ১১— ১৬

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾
إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ
الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

r যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; ইহাই মহাসাফল্য।

r তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন।

r তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান,

r এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়,

r 'আর্শের অধিকারী ও সম্মানিত।

r তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং মেনে চলে শরিয়তের নির্দেশ নিষেধাজ্ঞাসমূহ, তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে চিরসুখময় জান্নাত, যেখানে প্রবহমান রয়েছে মনোমুগ্ধকর স্রোতস্বিনী সমূহ। হে মানুষ! শুনে রাখো। এই জান্নাতপ্রাপ্তিই হচ্ছে মহা সফলতা। পৃথিবী ও পৃথিবীর সুখোপকরণসমূহ সে সফলতার কাছে কিছুই নয়।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন'। এখানে 'বাত্বশা' অর্থ মার, আক্রমণ, আঘাত। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে মানুষ! জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র মার বড় শক্ত মার। তাঁর পাকড়াও থেকে বেরিয়ে আসবার সাধ্য কারো নেই, কারো এমতো ক্ষমতাও নেই যে, তাঁর পক্ষ থেকে আগত আঘাতকে প্রতিহত করে। সুতরাং সাবধান হও। পরিত্যাগ করো তাঁর অবাধ্যতা।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'তিনিই অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরাবর্তন ঘটান (১৩), এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময় (১৪), আরশের অধিকারী ও সম্মানিত'(১৫)।

'ইন্‌নাহু হুয়া ইউব্‌দীউ ওয়া ইউয়ীদ' অর্থ তিনি অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরাবর্তন ঘটান। অর্থাৎ তিনি যেমন সকলকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টি করবেন পুনর্বার, পুনরুত্থান দিবসে। সুতরাং স্রষ্টা যেহেতু তিনি ছাড়া কেউ নয়, সেহেতু তিনি ছাড়া উপাস্যও আর কেউ নেই। সে কারণেই তার পাকড়াও তো অনতিক্রম্য হবেই। অথবা বক্তব্যার্থটি দাঁড়াবে— এই পৃথিবীতে যেমন তিনি অপরাধীকে শাস্তি দেন, তেমনি শাস্তি দিবেন পরলোকেও।

'ওয়া হুয়াল গফুরুল ওয়াদূদ' অর্থ এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়। অর্থাৎ তিনিই বিশ্বাসীগণের পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের প্রেমিক ও প্রেমাস্পদও তিনিই। কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিতটিও রয়েছে যে, অবিশ্বাসীদের প্রতি তিনি এর বিপরীত, নির্মম ও কঠোর শাস্তিদাতা। 'জুল আ'রশিল মাজ্বীদ' অর্থ আরশের অধিকারী ও সম্মানিত। অর্থাৎ সকল কিছুই যেহেতু তাঁর অধিকারায়ত্ত, তাই সকল সম্মান-কর্তৃত্ব কেবল তাঁর। 'মাজ্বীদ' অর্থ সম্মানিত, মহিমান্বিত। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র চির-অবশ্যম্ভাবিতাই তাঁর সত্তা ও মহিমার বহিঃপ্রকাশক। তাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তার পূর্ণত্বজ্ঞাপক। ক্বারী হামযা ও ক্বারী কাসায়ী 'আল মাজ্বীদ' কথাটিকে পড়তেন যেরযুক্ত 'দাল' সহযোগে। এমতাবস্থায় এখানকার 'সম্মানিত' পদটি বিশেষণ হবে আরশের। অর্থাৎ সম্মানিত আরশের অধিকর্তা তিনিই। আরশ যেহেতু আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন জ্যোতিসম্পাতে সতত সমুজ্জ্বল, সেহেতু আরশ যে মহাসম্মানিত, তা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ 'সম্মানিত' বলা না হলেও আরশ সম্মানিতই।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'ফায়্‌'আ'লুল্ লিমা ইউরীদ'। একথার অর্থ— তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন। অর্থাৎ তিনি চিরস্বাধীন অভিপ্রায়ধারী। তাঁর অভিপ্রায় অবশ্যবাস্তবায়নব্য, অপ্রতিহত।

সূরা বুরূজ ঃ আয়াত ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ﴿١٩﴾ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ

www.eelm.weebly.com

مَّجِيْدٌ ﴿٢١﴾ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿٢٢﴾

r তোমার নিকট কি পৌঁছিয়াছে সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত—
r ফির'আওন ও ছামূদের?
r তবু কাফিররা মিথ্যা আরোপ করায় রত;
r এবং আল্লাহ্ উহাদের অলক্ষ্যে উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।
r বস্তুত ইহা সম্মানিত কুরআন,
r সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার নিকট অবাধ্য ফেরাউনের সম্প্রদায় ও ছামুদ সম্প্রদায়ের সত্যদ্রোহীতা এবং তার করুণ পরিণতি সম্পর্কিত বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? প্রশ্নটি স্বীকৃতিসূচক। এর সোজাসুজি অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি তো জানেনই, কী নিদারুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও উদ্ধত ফেরাউন সম্প্রদায় এবং ছামুদ সম্প্রদায়কে। ফেরাউন সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মারা হয়েছিলো পানিতে, আর ছামুদেরা অক্কা পেয়েছিলো মহানাদের আঘাতে। তাছাড়া পরকালের অনন্তকালীন শাস্তি তাদের জন্য তো নির্ধারিত রয়েছেই। সুতরাং আপনি কুরায়েশ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপব্যবহার দৃষ্টে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। বরং ধৈর্যের সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করুন। তাদের পূর্বসূরীদের মতো তাদেরকে আমি যথাসময়ে শাস্তি বিধান তো করবোই।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তবু কাফেরেরা মিথ্যা আরোপ করায় রত'। একথার অর্থ— হে আমার প্রত্যাদেশবাহী! পূর্ববর্তী যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চেয়ে আপনার উম্মতের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অধিক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। কারণ এরা সত্যপ্রত্যাখ্যান করছে সজ্ঞানে, সব কিছু দেখে শুনে, বুঝে। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগোষ্ঠীগুলোর কাহিনী তারা শুনেছে। দেখেছে তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের চিহ্নসমূহ। আপনিও তাদেরকে বার বার সতর্ক করে চলেছেন। তদুপরি সর্বশ্রেষ্ঠ আকাশজ গ্রন্থ আল কোরআনের হৃদয়স্পর্শী বাণীসমূহ অবতীর্ণ হয়ে চলেছে তাদের সম্মুখেই। তাদের স্বজাতিভুক্ত ও সমভাষী রসুল সেগুলো তাদেরকে পাঠ করেও শোনাচ্ছেন। তবুও তো তারা দেখছি সত্যপ্রত্যাখ্যানেই অনড়। সংশোধিত হওয়ার এতো অধিক সুযোগ তো অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগোষ্ঠীগুলোর ছিলো না।

'তানভীন' যুক্ত 'তাকজীব' (মিথ্যারোপ) এখানে আতিশয্যপ্রকাশক। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানে কুরায়েশ কাফেরেরা অধিকতর দৃঢ়। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, 'বাল' (বরং) অব্যয়টি এখানে প্রসঙ্গান্তর ঘটানোর জন্য ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে সূচনা-সূচক 'কিন্তু' অথবা 'তবু' অর্থে। এর যোগসূত্র রয়েছে

www.eelm.weebly.com

ইতোপূর্বের শপথের জবাবমূলক বাক্যের সঙ্গে। মাঝখানের আলোচনাগুলো ভিন্ন প্রসঙ্গের। এমতাবস্থায় মর্মার্থ দাঁড়াবে— আগের যুগের কাফেরদের চেয়ে কুরায়েশ কাফেরেরা সত্যপ্রত্যাখ্যানে অধিকতর দৃঢ়।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ তাদের অলক্ষ্যে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টিকে ঘিরে রেখেছেন তার জ্ঞান ও কর্তৃত্ব দ্বারা। সুতরাং অপরাধীরা অপরাধ করেও পার পেয়ে যাবে, এরকম কখনো হতেই পারে না। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ কর্তৃক সমগ্র সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রাখার বিষয়টি তাঁর সত্তা-গুণবত্তার মতোই অবোধ্য, অতুল্য ও আনুরূপ্যবিহীন।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'বস্তুত এটা সম্মানিত কোরআন (২১), সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ' (২২)।

'বাল হুয়া কুরআনুম মাজ্বীদ' অর্থ বস্তুত এটা সম্মানিত কোরআন। অর্থাৎ এই কোরআন মাহাত্ম্যে ও আভিজাত্যে সকল গ্রন্থের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এর প্রতিটি পঙক্তিই অব্যর্থ। ভাব ও ভাষা অজেয়। কথাটির যোগসূত্র রয়েছে আগের আয়াতের 'তবু কাফেরেরা মিথ্যা আলাপ করায় রত' বাক্যটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কোরআন মহাসম্মানিত ও চির অজেয় হওয়া সত্ত্বেও কাফেরেরা একে অস্বীকার করে। এতে করে তো একথাই প্রমাণিত হয় যে, ন্যূনতম প্রজ্ঞা ও বিবেচনাবোধও তাদের নেই।

'ফী লাওহিম মাহ্ফূজ' অর্থ সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। অর্থাৎ কোরআনের মূল অনুলিপি লিপিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহফুজে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ লওহে মাহফুজকে সৃষ্টি করেছেন শ্বেতশুভ্র মুক্তা দ্বারা। এর পত্রগুলো লাল ইয়াকুতের। লেখাগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে জ্যোতির কলম দ্বারা। আল্লাহ্ প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে লওহে মাহফুজের বিধানানুসারে সৃষ্টি করেন, জীবনোপকরণ দান করেন, ঘটান জীবন-মৃত্যু, সম্মান-অসম্মান। করেন আরো অনেক কিছু, যেরকম অভিপ্রায় করেন।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, লওহে মাহফুজের শীর্ষে লেখা রয়েছে এই কথাগুলো— আল্লাহ্ এক, একক। তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। তাঁর নিকট পরম সত্য হচ্ছে ইসলাম। মোহাম্মদ তাঁর রসুল ও শ্রেষ্ঠ দাস। যে ব্যক্তি তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সত্য বলে জানবে তাঁর প্রতিশ্রুতিকে, মান্য করবে তাঁর নবীগণকে, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে।— লওহে মাহফুজ শ্বেতশুভ্রমুক্তানির্মিত। তার দৈর্ঘ্য আকাশ-পৃথিবীর ব্যবধানের সমান। প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বের সমপরিমাণ। এর দুই প্রান্ত মুক্তা ও ইয়াকুত নির্মিত। কলম নূরের। লেখাও নূরের। এর সংশ্লিষ্টি আরশের সঙ্গে। আর লওহে মাহফুজকে কোলে করে রেখেছে এক বিশালাকৃতির ফেরেশতা। মুকাতিল বলেছেন, লওহে মাহফুজ রয়েছে আরশের দক্ষিণ প্রান্তে।

www.eelm.weebly.com

‘মাহফূজ্বিন’ পদটি এখানে ‘লওহে’র বিশেষণ। এর অর্থ— হ্রাস-বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সুরক্ষিত, সংরক্ষিত। ওই লিপিগুলিকে লওহে মাহফুজ বলা হয়েছে একারণেই। এটাই মূল গ্রন্থ বা উম্মুল কিতাব। ‘আল কিতাব’ সংকলিত হয়েছে এখান থেকেই। নাফে শব্দটিকে পাঠ করতেন ‘মাহফূজুন’ শেষ অক্ষরে পেশ সহযোগে। এমতাবস্থায় পদটি হবে কিতাবের বিশেষণ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘ইন্‌না নাহ্‌নু নায্‌যালনাজ্‌ জিকরা ওয়া ইন্‌না লাহু লাহাফিজূন’ (এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি আমিই এবং আমিই এর সংরক্ষক)। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌পাকের এমতো দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার কারণেই কোরআন সকল প্রকার সংযোজন বিয়োজন পরিবর্তন পরিবর্ধন থেকে চিরমুক্ত। অথচ দুরাচার রাফেজীরা আল্লাহ্‌তায়ালার এমতো অঙ্গীকারকে মান্য করে না। বলে, কোরআনের সঙ্গে রয়েছে অন্য কথার মিশ্রণ। আরো বলে, কোরআন ছিলো চল্লিশ পারা। এর মধ্যে দশ পারা বিলোপ করা হয়েছে। তাদের কথার প্রতিবাদে পাঠ করা যেতে পারে ‘তবু কাফেরেরা মিথ্যা আরোপ করায় রত; এবং আল্লাহ্‌ তাদের অলক্ষ্যে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। বস্তুত এটা সম্মানিত কোরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ’।

সূরা ত্বারিক্ব

মহাতীর্থ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানিও। এর রুকুর সংখ্যা ১ এবং আয়াতের সংখ্যা ১৭।

কালাবী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর পরম শুভাকাঙ্খী পিতৃব্য আবু তালেব তাঁকে আহার করতে দিলেন দুধ ও রুটি। রসুল স. খেতে শুরু করলেন। হঠাৎ ঘটলো উলকাপাত। তার ঝলকানিতে সমুদ্ভাসিত হলো দর্শনযোগ্য সকলকিছু। আবু তালেব আতংকিত হয়ে বললেন, ওটা কী? তিনি স. বললেন, একটি নক্ষত্রাংশ, নিক্ষিপ্ত হলো শয়তানের প্রতি। এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন। আবু তালেব একথা শুনে বিস্মিত হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা ত্বারিক্ব ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ ۙ﴿۱﴾ وَ مَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۙ﴿۲﴾ النَّجۡمُ الثَّاقِبُ ۙ﴿۳﴾ اِنۡ کُلُّ نَفۡسٍ لَّمَّا عَلَیۡهَا حَافِظٌ ؕ﴿۴﴾

- শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় তাহার;
- তুমি কি জান রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় উহা কী?
- উহা উজ্জ্বল নক্ষত্র!

www.eelm.weebly.com

r প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রহিয়াছে।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আকাশের এবং রাতের আকাশে যা প্রকাশ পায়, তার শপথ! হে আমার রসুল! আপনি কি জানেন, রাতে যা প্রকাশ পায় তা কী? তা হচ্ছে উজ্জ্বল তারকা।

এখানকার 'আত্ব ত্বারিক্ব' শব্দটির অভিধানিক অর্থ পথের পথিক। ব্যবহারিক অর্থ রাতের আগন্তুক। উদীয়মান বস্তুকেও বলে তারিক্ব। এখানে শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে উলকাপাতকে। উলকাপাতের বিশেষত্ব কয়েকটি। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, উলকাপাত ঘটানো হয় আড়ি পাততে আসা শয়তানকে আকাশ থেকে তাড়ানোর জন্য। তাছাড়া এটি একটি অলৌকিক নিদর্শনও বটে, যার উদ্দেশ্য মানুষের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় জাগ্রত করা। বিষয়টিকে গুরুত্ববহ করে তুলবার উদ্দেশ্যেই এখানকার বক্তব্যটিকে দেওয়া হয় প্রশ্নের আকার।

'আন্ নাজ্মুছ ছাক্বিব' অর্থ উজ্জ্বল নক্ষত্র, যে কোনো তারকা। 'আলিফ লাম' এখানে জাতিবাচক। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— কক্ষচ্যুত কোনো নক্ষত্র, যা নিক্ষিপ্ত হয় শয়তানের প্রতি। অথবা 'আলিফ লাম' এখানে সীমিতার্থক। এরকম হলে অর্থ দাঁড়ায়— সপ্তর্ষিমণ্ডল। আরববাসীগণ সপ্তর্ষিমণ্ডলকে বলেন 'নাজ্মুছ্ ছাক্বিব'। এরকম বলেছেন ইবনে জায়েদ। অথবা এর অর্থ— শনি গ্রহ, যার অবস্থান আকাশের দূরতম স্থানে। তাই একে বলা হয় 'আন্ নাজ্ম'। আরববাসীগণ তো দূর আকাশের উড়ন্ত পাখিকেও বলেন 'ক্বদ ছাক্বাব' (পাখিটি উঁচুতে উঠেছে)। 'আছ্ ছাক্বিব' অর্থ দীপ্তিমান, উজ্জ্বল। কেননা 'ছাক্বব' অর্থ ছিদ্র করা। ছিদ্র যেমন কোনোকিছুকে ভেদ করে, তেমনি কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের জ্যোতিচ্ছটাও ভেদ করে রাতের অন্ধকারকে। মুজাহিদ এরকম বলেছেন।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক জীবের উপরেই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে'। এখানে 'হাফিজ' অর্থ তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষণাবেক্ষণকারী। আলোচ্য আয়াতের অর্থ হতে পারে দু'ধরনের— তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া কোনো মানুষই নেই, অথবা প্রত্যেকের জন্য নিয়োজিত রয়েছে একজন করে সহায়তাকারী। আয়ু যখন কারো শেষ হয়, শেষ হয়ে যায় রিজিক, তখন ঘটে তার মৃত্যু। আর এখানে 'তত্ত্বাবধায়ক' অর্থ কোনো একজন তত্ত্বাবধায়ক নয়, বরং তত্ত্বাবধায়কদের একটি দল। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আর অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে বহুসংখ্যক তত্ত্বাবধায়ক'। এরকম মর্মার্থ গ্রহণ করলে আয়াতদু'টোর মধ্যে আর কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না। অথবা মর্মার্থ হবে— মূল হেফাজতকারী তো আল্লাহ্। তাঁর নির্দেশেই ফেরেশতারা রক্ষণাবেক্ষণ করে মানুষের। একারণেই তাদের রক্ষণাবেক্ষণ বা তত্ত্বাবধানের বিষয়টি সম্পৃক্ত আল্লাহ্র সঙ্গে। আর দু'টো আয়াতই অর্থগত দিক থেকে বিবেচিত হবে শপথের জবাব হিসেবে।

www.eelm.weebly.com

ইকরামার উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, কুরায়েশ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে আবুল আসাদ ছিলো খুবই শক্তিমান। একবার সে কাঁচা চামড়ার উপরে দাঁড়িয়ে দম্ভভরে বললো, শোনো জনতা! যে মোহাম্মদকে বিপদে ফেলতে পারবে তার জন্য রইলো পুরস্কার। সে বলে, জাহান্নামে নাকি রয়েছে উনিশজন শাস্তিদাতা ফেরেশতা। আরে, দশজনকে ধরাশায়ী করতে পারবো তো আমি একাই। বাকী নয়জনকে কি তোমরা কাবু করতে পারবে না? তার এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

সূরা ত্বারিক্ব ঃ আয়াত ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآئِبِ ﴿٧﴾ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّ لَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾

r সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কী হইতে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে!
r তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সবেগে স্খলিত পানি হইতে,
r ইহা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে।
r নিশ্চয় তিনি তাহার প্রত্যানয়নে ক্ষমতাবান।
r যেই দিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হইবে
r সেই দিন তাহার কোন সামর্থ্য থাকিবে না, এবং সাহায্যকারীও নহে।

'ফাল্ইয়ান্জুরিল ইনসান' অর্থ সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক। 'ফাল্ইয়ান্জুর' এর 'ফা' অব্যয়টি এখানে নৈমিত্তিক। অর্থাৎ ফেরেশতাগণের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে উপস্থিতি, তাদের দ্বারা ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল শুভ-অশুভ কর্মের তালিকা প্রণয়ন ইত্যাদি নিমিত্ত এই বিষয়টির যে, মানুষ তার প্রকৃতির উপর চিন্তা-ভাবনা করবে। যেনো সে তার প্রথম অস্তিত্বপ্রাপ্তি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে পৌঁছে যেতে পারে পরবর্তী সৃষ্টির (পুনরুত্থানের) বাস্তবতা পর্যন্ত এবং এমতো উত্তরণ তাকে একথাটি শিখিয়ে নিতে পারে যে, কৃতজ্ঞতা অত্যাবশ্যক। আর সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে।

'মিম্মা খুলিক্ব' অর্থ কী থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 'মিম্মা' পদটিতে আছে দু'টি শব্দ— 'মিন (হতে) এবং 'মা' (কী)। প্রথমটি সূচনাজ্ঞাপক এবং পরেরটি প্রশ্নবোধক। আর 'মিম্মা খুলিক্ব' এখানে 'ইয়ান্জুরু' (প্রণিধান করুক) বাক্যের কর্মপদ। অর্থাৎ মানুষের উচিত, তার সূচনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা, চিন্তা-গবেষণা করা। এমতো অনুসন্ধিৎসার জবাব দেওয়া হয়েছে অবশ্য পরবর্তী আয়াতেই (৬)। বলা হয়েছে—

www.eelm.weebly.com

'তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে'। এখানে 'মাইন দাফিক্ব' অর্থ সবেগে স্খলিত পানি। 'দাফিক্ব' (সবেগে) শব্দটি এখানে বসানো হয়েছে রূপকার্থ প্রদানার্থে। অথবা বলা যেতে পারে, কর্তৃবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত কর্মবাচক অর্থে। যেমন 'ঈশাতুর রদ্বিয়াতুন' বাক্যের 'রদ্বিয়াতুন' অর্থ মনোনয়নদানকারী। কিন্তু শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'মারদ্বিয়াতুন' (মনোনীত) অর্থে। 'দাফ্‌ক্বুন' অর্থ প্রবাহিত হওয়া। এমতাবস্থায় পানির সঙ্গে শব্দটির সম্পৃক্তি ঘটবে ধাত্যর্থে। আর এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগ শুক্রপাত থেকে।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্যে থেকে'। এখানে 'সুল্‌ব' অর্থ পৃষ্ঠ, মেরুদণ্ড। 'সুরাহ' তাঁর অভিধানে লিখেছেন, 'সুল্‌ব' অর্থ সুদৃঢ়। পিঠ বা মেরুদণ্ডকে 'সুলব' বলা হয় এই দৃঢ়তার কারণেই।

'কামুস' অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, 'তারাইব' অর্থ বক্ষস্থিত অস্থি, অথবা ওই সকল অস্থি, যেগুলো মিলিত হয়েছে কণ্ঠদেশের অস্থির সঙ্গে। কিংবা ওই হাড়, যা অবস্থিত কণ্ঠের হাড় ও বুকের মাঝখানে, বা বুকের দু'পাশের চারটি করে পঞ্জরাস্থি। অথবা দুই হাত, দুই পা ও চক্ষুযুগল। কিংবা হাসুলি ব্যবহৃত হওয়ার স্থান। বায়যাবী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, চতুর্থ পর্যায়ের পরিপাকের পর সর্বোন্নত স্তরের অণু থেকে প্রস্তুত হয় 'নুত্‌ফা' বা শুক্ররেণু, নির্গত হয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি থেকে খিঁচে খিঁচে। সে কারণেই এর দ্বারা পরিগঠিত হয় অনুরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অণ্ডকোষ দু'টোর সূক্ষ্ম তন্ত্রীসমূহ শুক্ররেণুর অবস্থানস্থল। শুক্র সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করে মস্তিষ্ক। তাই অত্যধিক সহবাস ডেকে আনে মস্তিষ্ক-দৌর্বল্য। আর দ্বিতীয় দফায় মগজ শুক্রসৃষ্টিতে সময় নেয়। তখন তার অবস্থানস্থল হয় মেরুদণ্ড। তাই এখানে বলা হয়েছে— এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থি থেকে।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় তিনি তার প্রত্যানয়নে ক্ষমতাবান'। এখানে 'ইন্‌নাহু' অর্থ নিশ্চয় তিনি। 'ক্বদীর' অর্থ ক্ষমতাবান। অর্থাৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম, পুনঃসৃজনের ব্যাপারে পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান। উল্লেখ্য, ৬ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে মানুষের প্রথম সৃষ্টির কথা। আর এখানে বলা হলো তাদের পুনরুত্থান দিবসের পুনঃ সৃষ্টি হওয়ার কথা। অর্থাৎ দ্বিতীয়বারের মতোও তিনি মানুষকে সৃষ্টি করবেন। আর এরকম করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। কেননা প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি সহজতর। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কাতাদা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যেই দিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হবে (৯) সেই দিন তার কোনো সামর্থ্য থাকবে না এবং সাহায্যকারীও নয়'(১০)। একথার অর্থ— পুনরুত্থান দিবসে মানুষের গোপন বিশ্বাস, কথা ও কর্মগুলোকে প্রকাশ করা হবে। প্রকাশ করে দেওয়া হবে অন্তরের গোপন কথাগুলোও। আর সেদিন সকলেই হবে সামর্থ্যহীন ও সাহায্যবিহীন। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্‌পাক প্রকাশ করে দিবেন যাবতীয় গুপ্ত বিষয়। গোপন রহস্যাবলী প্রকাশিত হবে বদনমণ্ডলে।

www.eelm.weebly.com

‘ফামা লাহু মিন কুওওয়াত’ অর্থ সে দিন তার কোনো শক্তি-সামর্থ্য থাকবে না। ‘ওয়া লা নাসির’ অর্থ থাকবে না সাহায্যকারীও। অর্থাৎ সেদিন তাদের শক্তিসামর্থ্য ও সুহৃদ সাহায্যকারী থাকবে না বলেই শাস্তির উপযোগী যারা, তাদের ভাগ্যে জুটবে না পরিত্রাণ। শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবেই।

সূরা ত্বারিক্ব ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَ الْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾ وَّ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

r শপথ আসমানের, যাহা ধারণ করে বৃষ্টি,

r এবং শপথ যমীনের, যাহা বিদীর্ণ হয়,

r নিশ্চয় আল-কুরআন মীমাংসাকারী বাণী।

r এবং ইহা নিরর্থক নহে।

r উহারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে,

r এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি।

r অতএব কাফিরদিগকে অবকাশ দাও; উহাদিগকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য।

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের শপথ, শপথ ধরিত্রীর, যাকে বিদীর্ণ করা হয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে, নিশ্চয় মহাগ্রন্থ কোরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করেই ছাড়ে। সুতরাং এর জ্যোতির্ময় বাণীসম্ভার কখনো অর্থহীন, বা উদ্দেশ্যবিহীন হতেই পারে না।

এখানে ‘রজ্বউন’ অর্থ প্রত্যাগমন করা, ফিরে আসা। বর্ষা যেহেতু প্রতি বৎসর ফিরে ফিরে আসে, তাই বৃষ্টিকে বলা হয়েছে ‘রজ্বউন’। আর আকাশকে এখানে ধারণকারী বা প্রত্যাবর্তনস্থল বলা হয়েছে একারণে যে, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলো নির্ধারিত সময়ে কক্ষ পরিভ্রমণ শেষে ফিরে আসে তাদের আগের জায়গাতেই।

‘জাতিস্ সদয়ী’ অর্থ যা বিদীর্ণ হয়। চাষ-বাসের সময় ভূমিকে বিদীর্ণ করা হয়। আবার লাঙ্গলও প্রবাহিত হয় মাটির বুক চিরে। আরো অনেক কারণে বিদীর্ণ করা হয় ভূমি। সেকারণেই এখানে শপথ করা হয়েছে বিদীর্ণ ভূমির। আর ‘ওয়ামা হুয়া বিল হায্‌লি’ অর্থ এবং এটা নিরর্থক নয়।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— ‘তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে’। একথার অর্থ—মক্কার মুশরিকেরা আমার রসুলের প্রতি পোষণ করে ঘোর বিদ্বেষ ও শত্রুতা।

www.eelm.weebly.com

বাইরে তারা তা পুরোপুরি প্রকাশ করে না। ষড়যন্ত্র করে গোপনে। অথবা— তারা সত্যের অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করার জন্য আমার রসুলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে বিভিন্ন ধরনের কলা-কৌশল।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি'। এখানে আল্লাহ্‌র কৌশল অবলম্বনের অর্থ, তিনি তাদেরকে অবকাশ দিতে থাকেন, যাতে তারা হয় অধিকতর পাপিষ্ঠ অথবা— তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন একারণে, যেনো পরকালে তাদের শাস্তি হয় অধিকতর মর্মন্তুদ।

শেষোক্ত আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'অতএব কাফেরদেরকে অবকাশ দাও; তাদেরকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি যেহেতু তাদেরকে সাময়িক অবকাশ দিচ্ছি, সেহেতু আপনিও এরকম করুন। তাদের বিনাশ বাসনায় ব্যতিব্যস্ত হবেন না। আমার আওতাবর্হির্ভূত হওয়া তো তাদের পক্ষে সম্ভবই নয়। আর যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি আমি তো তাদেরকে দিবোই। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের বিধান রহিত হয়েছে জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে।

এখানে 'আম্‌হিল' ও 'মাহ্‌হিল' দু'টো শব্দের অর্থই— অবকাশ দাও। পরেরটি দ্বারা তাগিদ দেওয়া হয়েছে প্রথমটির। তাছাড়া দ্যোতনা সৃষ্টি করাও ছিলো এমতো দ্বিত্ব ব্যবহারের আর একটি উদ্দেশ্য।

'রুওয়াইদা' শব্দটি ব্যবহৃত হয় অল্প-বিস্তর, কিছু ইত্যাদি বুঝাতে। এখানে এর অর্থ— কিছুকাল। অর্থাৎ অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য, অনন্তকালের জন্য নয়। অথবা 'আরওয়াদ' শব্দটির ন্যূনতা প্রকাশক শব্দরূপ 'রুওয়াইদা' যার ধাতুমূল 'রওদুন' অর্থ— ধীরগতি সম্পন্ন। যেমন বলা হয় 'রদাতির রহি' (মন্দ মলয়)। ন্যূনতম শব্দরূপ ব্যতীত আরবী ভাষায় এর ব্যবহার নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য' কথাটিতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে শাস্তির হুমকি ও নিশ্চিত সংবাদ। অর্থাৎ কিছুকাল অবকাশ দেওয়ার পর তাদেরকে শায়েস্তা করা হবেই। তাই হয়েছিলো। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কিছুকাল পর বদর যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত করা হয়েছিলো তাদেরকে।

সূরা আ'লা

মহাপুণ্যভূমি মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরাখানিতে রয়েছে ১টি রুকু এবং ১৯ টি আয়াত।

সূরা আ'লা ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝١ الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝٢ وَالَّذِىْ

www.eelm.weebly.com

قَدَّرَ فَهَدٰى ﴿٣﴾ وَالَّذِىٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ﴿٤﴾ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ﴿٥﴾

r তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,
r যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন।
r এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথনির্দেশ করেন,
r এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন,
r পরে উহাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।

'সাব্বিহিস্‌মা' অর্থ তুমি নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। 'রব্বিকাল আ'লা' অর্থ তোমার সুমহান প্রতিপালকের। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতখানির মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি আপনার প্রভুপালকের ওই সকল নামের মাধ্যমে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, যে নামগুলো সুনির্ধারিত কেবল তাঁর সুমহান সত্তার জন্য। অনুপযুক্ত, অযথার্থ এবং অপবিত্র (অংশীবাদিতা মিশ্রিত) নামে কখনো তাঁকে ডাকবেন না। আবার তাঁর জন্য নির্ধারিত নামে ডাকবেন না অন্য কাউকে অথবা কোনো কিছুকে। তাঁর নামোচ্চারণ করবেন অতীব সম্মান ও গুরুত্বের সঙ্গে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে নাম' অর্থ নামধারী পরম সত্তা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা যার উপাসনা করছো, তা তো কেবল কতকগুলো নাম। আর সে নাম গুলো দিয়েছো তোমরাই'। অনেকে মনে করেন, এখানে 'নাম' (ইসিম) শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে অতিরিক্ত সংযোগরূপে। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— তোমরা মুখের ভাষায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। বিরুদ্ধতা করো ওই সকল বিধর্মীদের, যারা বিভিন্ন অপনামে তাঁকে ডেকে কলংকিত করে তাঁর মহিমাকে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, এখানে তসবীহ পাঠের (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার) যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়িত করতে হবে বাচনিকভাবে। এর সমর্থন রয়েছে স্বসূত্রে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের একটি বিবৃতিতে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. একবার 'সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা' পাঠ করার পর বললেন 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা'। মনে হলো, তিনি স. যেনো নির্দেশটি এভাবেই বাস্তবায়িত করার জন্য আদিষ্ট।

কোনো কোনো বিদ্বান আবার বলেছেন, সকল প্রকারের পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে— বচনগত, কর্মগত ও বিশ্বাসগত। সুতরাং নির্দেশটিকে কেবল বাচনিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে ভাবার কোনো কারণ নেই। হাদিসের দ্বারাও কেবল মৌখিকভাবে তসবীহ পাঠের কথা প্রমাণিত হয় না। বরং বুঝতে হবে একই সঙ্গে মনে ও মুখে তসবীহ পাঠ করাই আলোচ্য নির্দেশনাটির উদ্দেশ্য। কেবল মুখের তসবীহ পাঠের তো কোনো মূল্যই নেই, যদি না তা হয় অন্তরের অন্তঃস্থলের বিশ্বাসোৎসারিত।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নামাজ পাঠের। যেহেতু রসুল স.কে অন্যত্র নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 'সল্লি বি আমরি রব্বিকাল আ'লা' (আপনার মহান প্রভুপালকের নির্দেশে নামাজ পাঠ করুন)। এরকম মর্মার্থ গ্রহণ করাও সম্ভব যে, নামাজের অভ্যন্তরে মুখে তসবীহ পাঠ করতে বলাই আলোচ্য নির্দেশনাটির উদ্দেশ্য। যেমন সুরা 'আল হাক্বক্বা'র তাফসীরে আমরা উল্লেখ করেছি, রসুল স. বলেছেন, একে তোমরা তোমাদের সেজদার সঙ্গে যোগ করে নাও। হজরত হুজায়ফার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. সেজদা অবস্থায় পাঠ করতেন 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা'। এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও। উল্লেখ্য, এ প্রসঙ্গে সবিস্তার বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে সুরা আল হাক্বকার তাফসীরে।

এখানে 'রব' (প্রভুপালক) এর বিশেষণ 'আল আ'লা' (মহিমা, শ্রেষ্ঠত্ব)। পবিত্রতা (তসবীহ) এখানে কর্মের নিমিত্ত। আর আল্লাহ্পাকের মহাপ্রতাপের নিমিত্ত হচ্ছে তাঁর মাহাত্ম্য। তাঁর প্রতাপ-পরাক্রম মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উর্ধ্বে। সেকারণেই তাঁর মনোনীত নাম ব্যতিরেকে অন্য কোনো অযথার্থ নামে তাঁকে বিভূষিত করা যেতেই পারে না। বিধর্মীরা তাঁকে যে সকল অপনামে অভিহিত করে, তার চেয়ে তিনি অনেক অনেক পবিত্র ও মহান।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন'। 'আল্ লাজী খলাক্ব' অর্থ যিনি সৃষ্টি করেন। এখানে কর্মপদ রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ তিনি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন— মৌলিক পদার্থসমূহ, মহাকাশ, মহাপৃথিবী, প্রাণী-উদ্ভিদ, জড়-অজড়, আশ্রয়সাপেক্ষ, আশ্রয়নিরপেক্ষ— সব। যেমন কোনো কোনো সৃষ্টি আবার স্বনির্ভর নয়, একক অথবা যৌথভাবে অন্যের উপরে নির্ভরশীল। যেমন রঙ, পরিবর্তনশীল আকার— পানির, বাতাসের, শব্দ, অবস্থা, পরিস্থিতি, পরিমাপ ইত্যাদি। মানুষের কর্ম, অর্থাৎ কর্মজগতের স্রষ্টাও তিনিই।

'ফাসাও্ওয়া' অর্থ এবং সুঠাম করেন। অথবা পরিগঠন করেন স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে। কিংবা— তিনি সৃষ্টি করেন সুশৃঙ্খলতা ও সুবিন্যস্ততার চাহিদা অনুসারে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে— যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি অসম্ভব।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথনির্দেশ করেন'। এখানে 'ওয়াল্ লাজী ক্বদ্দারা' অর্থ এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন। ক্বারী কাসাই কথাটিকে পাঠ করতেন 'ওয়াল্ লাজী ক্বদারা'। অর্থাৎ তিনি সকল সম্ভাব্য সৃষ্টিতে সমর্থ। তবে প্রসিদ্ধ পাঠ হচ্ছে 'ক্বদ্দারা' তাশদীদযুক্ত 'দাল' সহযোগে।

বাগবী লিখেছেন, 'ক্বদ্দারা' ও 'ক্বদারা' সমঅর্থসম্পন্ন। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক তাঁর সতত স্বাধীন অভিপ্রায়ানুসারে সকল সৃষ্টির জাতি, শ্রেণী, বৈশিষ্ট্য, নিয়তি, নিয়ন্ত্রণ, আকৃতি-প্রকৃতি-অবস্থা, কর্ম, উপজীবিকা, প্রবৃদ্ধি-স্থিতি সবকিছু নির্ধারণ

www.eelm.weebly.com

করে দিয়েছেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন সকল সৃষ্টির তকদীর। সে সময় তাঁর আরশ ছিলো পানির উপরে। মুসলিম। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সকল কিছুকে করা হয়েছে ভারসাম্যময়। এমনকি বোধবুদ্ধি এবং সতর্কতা-অসতর্কতাকেও।

'ফাহাদা' অর্থ এবং পথনির্দেশ করেন। অর্থাৎ যে পথে যেতে চায়, আল্লাহ্পাক তাকে সেই পথেই পরিচালিত করেন। মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহ্পাক মানবজাতিকে দেখিয়েছেন কল্যাণ-অকল্যাণ, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট এবং সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের পথ। মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, আল্লাহ্পাক সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন, সেই সকল কল্যাণের পথই দেখিয়েছেন তাদেরকে। সুদ্দী বলেছেন, কথাটির অর্থ—আল্লাহ্পাক মানবশিশুকে তার মাতৃউদরে বসবাসের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তাকে জানিয়েও দিয়েছেন তার বহির্গমনের পথের কথা। এরকম অর্থও গ্রহণ করা যায় যে— আল্লাহ্পাক যাকে হেদায়েত করতে চান, তাকে হেদায়েত করেন এবং গোমরাহ করেন তাদেরকে, যাদেরকে গোমরাহ করা তাঁর ইচ্ছা। যেনো পুরো বাক্যটি ছিলো এরকম 'ফাহাদা ওয়া আদ্বল্লা' (তিনিই পথ দেখান এবং পথভ্রষ্ট করেন)। 'আদ্বল্লা' বাক্যটিকে এখানে অনুল্লেখিত রাখা হয়েছে একারণে যে, অন্য আয়াতে বলা হয়েছে 'ইউদ্বিল্লু মাঁই ইয়াশাউ ওয়া ইয়াহ্দী মাঁই ইয়াশাউ'। অর্থাৎ 'ইউদ্বিল্লু' বলে দেওয়া হয়েছে স্পষ্ট করেই। তাই এখানে কেবল 'ফাহাদা' বলাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন (৪), পরে তাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন'(৫)। এখানে 'ওয়াল্ লাজী আখ্রাজ্বাল্ মার্আ' অর্থ এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন। অর্থাৎ তিনিই ভূপৃষ্ঠে ঘটান সবুজের সমারোহ, তৃণভোজী পশুকুলের জন্য। 'ফাজ্বাআ'লাহু গুছাআন আহ্ওয়া' অর্থ পরে তাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন। 'আহ্ওয়া' অর্থ ধূসর, কৃষ্ণবর্ণ। পদটি এখানকার 'গুছাআন' (আবর্জনা) এর বিশেষণ। আবার অনেকে বলেন, অবস্থাপ্রকাশক আগের আয়াতের 'মার্আ' (তৃণাদি) এর। অর্থাৎ সবুজ তৃণরাজিকে তিনি এক সময় পরিণত করেন ধূসর আবর্জনায়।

সূরা আ'লা' ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ﴿٦﴾ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا
يَخْفٰى ﴿٧﴾ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ﴿٩﴾
سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ﴿١٠﴾ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ﴿١١﴾ الَّذِىْ يَصْلَى

www.eelm.weebly.com

النَّارَ الْكُبْرٰى ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿١٣﴾

r নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি বিস্মৃত হইবে না,

r আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহা ব্যতীত। তিনি জানেন যাহা প্রকাশ্য ও যাহা গোপনীয়।

r আমি তোমার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ।

r উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দাও;

r যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করিবে।

r আর উহা উপেক্ষা করিবে যে নিতান্ত হতভাগ্য,

r যে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করিবে,

r অতঃপর সেথায় সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।

হজরত জিবরাইল যখন সদ্য অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ পাঠ করে শোনাতেন, তখন রসুল স. তা স্মৃতিস্থ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। আশংকা করতেন বিস্মৃতির। তাঁর এমতো অবস্থা লক্ষ্য করে এখানে বলা হয়েছে 'নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাবো, ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না'। অর্থাৎ হে আমার রসুল! প্রত্যাদেশ স্মৃতিস্থ রাখার ব্যাপারে আপনি আর দুশ্চিন্তিত হবেন না। এখন থেকে এ ব্যাপারে আপনি আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করুন। প্রত্যাদেশবিস্মৃতি থেকে আমি আপনাকে চিরমুক্ত করে দিলাম। বিস্মৃতি আপনাকে আর স্পর্শ করবে না। আপনি যখন যে আয়াত পাঠ করতে চাইবেন, সেই আয়াতই আমি যথাযথরূপে আপনার কণ্ঠে উচ্চারিত করবো। বলা বাহুল্য, এর পর থেকে রসুল স. আর কোনো আয়াত ভুলে যেতেন না। এখানকার 'ফালা তান্সা' (ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না) বাক্যটিতে 'সীন' অক্ষরের পরে 'আলিফ' বৃদ্ধি করা হয়েছে দুটি আয়াতের মধ্যে যতিপাত ঘটানোর জন্য।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, কোরআন সংরক্ষণ করো। যিনি আমার জীবনাধিকারী, সেই পবিত্রতম সত্তার শপথ করে বলছি, এমন সময় আসবে, যখন ঔদাসীন্যের কারণে কোরআন অতিদ্রুত বেরিয়ে যাবে তোমাদের নাগালের বাইরে, যেমন হাঁটুর বেড়ি মুক্ত উট ছুটে পালিয়ে যায় দূরে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী এবং মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কোরআনসংরক্ষক যেনো পায়ে বেড়ি পরানো উট। তার বেড়ি আলগা হলেই সে ছুটে পালায়। হজরত সা'দ ইবনে মাসআদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করার পর তা ভুলে যায়, সে পুনরুত্থিত হবে কুষ্ঠ রোগী হয়ে। আবু দাউদ, দারেমী।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করবেন, তা ব্যতীত'। একথার অর্থ— কিন্তু আল্লাহ্ যদি না চান, তবে তা আপনি স্মৃতিবদ্ধ রাখতে পারবেন

www.eelm.weebly.com

না। ব্যাখ্যাটি জমহুরের ব্যাখ্যার অনুরূপ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে, যে বিধান আমি রহিত করে দিবো, তার কথা আপনি আর মনে করতে পারবেন না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'মা নান্সাখ মিন আয়াতিন আও নুন্সিহা'। অর্থাৎ ভুলিয়ে দেওয়াও এক ধরনের রহিতকরণ (মনসুখ)। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, আলোচ্য আয়াতে মোজেজা রয়েছে দু'টি— ১. কোনোক্রমে ভুল না হওয়া, অথচ ভুল হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। ২. ভবিতব্য সম্পর্কে পূর্বাহ্নে অবগত করা। ব্যাখ্যাটি সঙ্গত বলে বিবেচ্য হতে পারবে কেবল তখন, যখন এখানকার 'ফালা তান্সা' বাক্যটিকে ধরে নেওয়া হবে সাধারণ না-বাচক। কিন্তু একে নিষেধাজ্ঞা সূচক বাক্য ধরা হলে এখানকার 'ইল্লা' (ব্যতীত) ব্যতিক্রমীটির অর্থ গ্রহণ করতে হবে— সাধ্যানুযায়ী কোরআন স্মৃতিবদ্ধ রাখা ওয়াজিব। তবে আল্লাহ্ যদি কোনো বিষয় ভুলিয়ে দিতে চান, তবে মানুষ তো এ ব্যাপারে নিরুপায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি জানেন, যা প্রকাশ্য এবং যা গোপনীয়'। অর্থাৎ— হে আমার প্রিয়তম নবী! আমি তো আপনার এবং অন্য সকলের গোপন-প্রকাশ্য ভাবনা বক্তব্য কর্ম সকল কিছু সম্পর্কে সম্যক অবহিত। আপনি জিবরাইলের পাঠ শুনে প্রকাশ্যে তা স্মৃতিস্থ করার জন্য যে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন, তা যেমন আমি জানি, তেমনি জানি বিস্মৃতির যে আশংকা আপনি অন্তরে লালন করেন, তা-ও।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'আমি তোমার জন্য সুগম করে দিবো সহজ পথ'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম জন! আমি আপনাকে দান করবো অপার্থিব সামর্থ্য। ফলে জান্নাতগমনের জন্য যে সকল কৃতকর্মকে নিমিত্ত করা হয়, সে সকল কৃতকর্ম সম্পাদন করা আপনার জন্য হয়ে যাবে সহজ। অর্থাৎ জান্নাতগমনের জন্য কোরআন স্মৃতিস্থ রাখা এবং কোরআনানুসারে জীবনযাপন করার সামর্থ্য আপনাকে দান করবোই। সুতরাং এব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

আলোচ্য আয়াতের শব্দবিন্যাসে করা হয়েছে কিছু অগ্র-পশ্চাৎ। মূল বাক্যটি যদি হতো 'নুইয়াস্সিরুকা লিল্ইউস্রা লাকা' তবে তার অর্থ দাঁড়াতো— আমি আপনার জন্য সৃষ্টি করে দিবো সহজসাধ্যতা। কিন্তু এখানে 'ওয়া নুইয়াস্সিরুকা লিল ইউস্রা' বলাতে বক্তব্যবিষয়ে ঘটেছে আধিক্য। মূল বাক্যে আকাংখিত বস্তু ছিলো সহজসাধ্যতা, বস্তুত রসুল স. ছিলেন তার আকাংখাকারী। আর উদ্ধৃত বাক্যে শব্দবিন্যাসের অগ্র-পশ্চাৎ ঘটানোতে সহজসাধ্যতা বা সুগমতাই হয়েছে আকাংখাকারী এবং আকাংখিতজন হয়েছেন রসুল স. স্বয়ং। যেমন রিজিকের আকাংখাকারী হচ্ছে মানুষ, কিন্তু রিজিক যদি হয় অবশ্যম্ভাবী, তবে বলা হয়— আরে রিজিক তো তাকেই তালাশ করে বেড়াচ্ছে।

আমি বলি, বিশুদ্ধ প্রেমানুরাগের মহিমা তো এরকমই হয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'ইউস্রা' অর্থ পুণ্যকর্ম। কতক বিদ্বান বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— আমি আপনাকে দান করবো সহজতর ও বিশুদ্ধ শরিয়ত বহনের সামর্থ্য।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'ফা জাক্কির ইন্ নাফাআ'তিজ্ জিকরা' (উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয়, তবে উপদেশ দাও)। এখানকার 'ফাজাক্কির' বাক্যের 'ফা' অব্যয়টি নৈমিত্তিক। অর্থাৎ আমি যখন কোরআন ও শরিয়তের দায়িত্বহন আপনার জন্য সহজ করে দিয়েছি, তখন আপনি এর অনুকূলে মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করুন। দান করুন সদুপদেশ, যদি তা ফলপ্রসূ হয়। এখানকার 'তবে উপদেশ দাও' কথাটি আগের 'উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয়' বাক্যের শর্তের পরিণতিপ্রকাশক। সেকারণেই এখানে নতুন করে শর্তসূচক শব্দ 'ইন' উল্লেখের আর প্রয়োজন পড়েনি। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, বার বার উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও কিছুসংখ্যক লোকের সত্যবিমুখতা রসুল স.কে যাতে নিরাশ না করে, তাই এখানে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে বলা হয়েছে— উপদেশ দিন, দিতে থাকুন। হয়তো তা এক সময় ফলপ্রসূ হবে। নিরাশ হবেন না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আপনি ইমান গ্রহণে তাদেরকে তো বাধ্য করতে পারবেন না। আবার কতিপয় বিদ্বান বলেছেন, বাহ্যত বাক্যটি শর্তযুক্ত হলেও তিরস্কারার্থক। অর্থাৎ এর মাধ্যমে তিরস্কার করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকেই। একটু পরোক্ষভাবে একথাই বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা চিরদুর্ভাগা। তাই শুভউপদেশ তাদের উপরে ফলপ্রসূ হয় না।

এরকমও বলা হয়েছে যে, উপদেশ দিতে হবে তখন, যখন তা ফলপ্রসূ হবে। অর্থাৎ যখন অত্যাবশ্যক হবে সৎকাজে আদেশ-অসৎকাজে নিষেধের দায়িত্ব। একারণেই এখানে রসুল স. এর প্রতি এই নির্দেশনাটি দেওয়া হয়েছে যে, যারা সত্যবিমুখ তিনি যেনো তাদেরকে উপেক্ষা করেন। কেউ কেউ আবার বলেছেন, শর্তের একটি অংশ এখানে রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ততাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আপনার উপদেশ ফলপ্রসূ হোক আর না হোক, আপনি উপদেশ দিতেই থাকুন।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে'। একথার অর্থ— যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, উপদেশ ফলপ্রসূ হবে তার উপরেই। কেননা তারাই উপাদেশাবলীর মর্ম বোঝে, এই নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং কর্মসম্পাদন করে তদনুসারে।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'আর তা উপেক্ষা করবে, যে নিতান্ত হতভাগ্য'। এখানে 'আল্আশক্বা' অর্থ যে হতভাগ্য। অর্থাৎ প্রত্যেক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। 'আল' এখানে সীমিতার্থক। তাই বুঝতে হবে এখানে 'যে উপেক্ষা করবে' বলে বিশেষভাবে বুঝানো হয়েছে ওলীদ ইবনে রবীয়া এবং উতবা ইবনে রবীয়াকে। অর্থাৎ তারাই নিতান্ত হতভাগ্য। তৎসহ নিতান্ত হতভাগ্য তারা, যারা তাদের মতো উদ্ধত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। বলা বাহুল্য, পাপী বিশ্বাসীরা নিতান্ত হতভাগ্য নয়।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করবে (১২), অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না' (১৩)। একথার অর্থ— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা জাহান্নামের লেলিহান অগ্নির মধ্যে অনুপ্রবেশ করবেই। আর সেখানে তারা অগ্নিশাস্তি ভোগ করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। সেখানে তারা মৃত্যুমুখেও পতিত হবে না। কেননা মৃত্যু ঘটলে শাস্তিতো শেষ হয়ে যায়। আবার তারা সেখানে বেঁচে থাকার যে সুখ, তা-ও কখনো অনুভব করতে পারবে না। কারণ তাদেরকে সেখানে শাস্তি দেওয়া হবে বিরতিহীনভাবে। লক্ষণীয়, শুধু শুধু শাস্তির চেয়ে সার্বক্ষণিক শাস্তি অধিক যন্ত্রণাদায়ক। আর কালের দিক থেকে শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করার মধ্যেও রয়েছে অগ্রসরতা। একারণেই শাস্তির ভয়াবহতা ও অস্তিত্ব দুদিক থেকেই সার্বক্ষণিক শাস্তি শুধু শাস্তির চেয়ে পশ্চাদবর্তী। তাই এখানে 'সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না' কথাটির শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে 'ছুম্‌মা' (অতঃপর) অব্যয়টি।

সূরা আ'লা ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۙ﴿۱۴﴾ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ؕ﴿۱۵﴾ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۖ﴿۱۶﴾ وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ؕ﴿۱۷﴾ اِنَّ هٰذَا لَفِى
الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۙ﴿۱۸﴾ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى ﴿۱۹﴾

- নিশ্চয় সাফল্য লাভ করিবে যে পবিত্রতা অর্জন করে।
- এবং তাহার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে।
- কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও,
- অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী।
- ইহা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে—
- ইব্‌রাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে, যে পবিত্রতা অর্জন করে'। আলোচ্য আয়াত থেকে তিন ধরনের পবিত্রতা সাফল্য লাভের চাবিকাঠি বলে প্রতীয়মান হয়—

১. অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা— অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতার কদর্যতা থেকে হৃদয়কে পবিত্র রাখা। মুক্ত থাকা প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে এবং আল্লাহ্‌র জিকিরের ব্যাপারে গাফলিত বা ঔদাসীন্য থেকে।

২. বাহ্যিক পবিত্রতা— হালাল উপার্জন, জাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদের পরিশুদ্ধায়ন। ৩. দৈহিক পবিত্রতা— পরিধেয় ও দেহকে নাপাক বস্তুসমূহ থেকে মুক্ত করণ ইত্যাদি। এই ত্রয়ী পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে যে, সে-ই লাভ করবে সাফল্য।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে'।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নিশ্চয় সাফল্য লাভ করে সে, যে বিশুদ্ধ হয়, সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং আমাকে স্বীকার করে রসুল বলে। আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে এবং যত্নের সঙ্গে সম্পাদন করে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ।

হানাফী মতাবলম্বীগণ বলেন, এখানে 'প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে' অর্থ তকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করে। তাঁরা আরো বলেন 'তকবীরে তাহরীমা' বা প্রথম তকবীর নামাজের অঙ্গ নয়, বরং শর্ত। কেননা এখানকার 'ফা সল্লা' (ও সালাত কায়েম করে) বাক্যের 'ফা' অব্যয়টি যোজক, অনুক্রমার্থক। সুতরাং বুঝতে হবে, যোজ্য ও যোজিত যেহেতু পৃথক, সেহেতু তকবীরে তাহরীমা এবং সালাত পৃথক বিষয়। অর্থাৎ তকবীরে তাহরীমা নামাজের অংশ নয়।

একটি সংশয় ঃ নির্দিষ্ট বিষয় কিন্তু অনির্দিষ্টের অন্তর্ভূত নয়। তবু নির্দিষ্টকে অনির্দিষ্টের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। নিয়মটি ঐকমত্যসম্মতও। এই হিসেবে তাকবীরে তাহরীমা নামাজের অংশ হয়ে যায়। আর একে নামাজের অংশ বললে অসুবিধা কোথায়?

নিরসন ঃ নির্দিষ্টকে অনির্দিষ্টের সঙ্গে সংযোজন করা হয় বিশেষ এক পর্যায়ে। যেমন নির্দিষ্টকে অধিক গুরুত্ব প্রদানার্থে। যেমন করা হয়েছে অনির্দিষ্ট সকল নামাজের সঙ্গে আসরের নামাজের। সেখানে কেবল 'মধ্যবর্তী নামাজ' বলে আসরের নামাজকে করা হয়েছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ ফেরেশতাদের সঙ্গে হজরত জিবরাইলের উল্লেখও করা হয়েছে তাঁর অনন্যসাধারণ মর্যাদা প্রকাশার্থে। কিন্তু এখানে তো সেরকম কোনো বিশেষ পর্যায়ের কথা ভাববার অবকাশ নেই। আরবী সাহিত্যে এরকম সাধারণার্থক কোনো দৃষ্টান্তও নেই। একারণেই ফরজ নামাজ পাঠকারীর সঙ্গে নফল নামাজ পাঠকারীর সংযুক্তি (নিয়ত) সঠিক। সঠিক নফল নামাজ পাঠকারীর সঙ্গে নফল নামাজ পাঠকারীর সংযুক্তিও। বরং আবুল ইয়াসারের বর্ণনানুসারে নফল নামাজ পাঠকারীর সঙ্গে ফরজ নামাজ পাঠকারীর সংযুক্তিও অবিশুদ্ধ নয়। কিন্তু সাধারণ হানাফীগণ শেষোক্ত অভিমতটিকে স্বীকার করেন না।

আমি বলি, তকবীরে তাহরীমাকে যদি নামাজের শর্ত ধরে নেওয়া হয়, তবুও তা অবলম্বনের সিদ্ধতা জরুরী নয়। যেমন নিয়ত নামাজের শর্ত। কিন্তু এক নিয়তে দুই নামাজ সিদ্ধ নয়। আবার ওজু নামাজের শর্ত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রতি ওয়াক্তের নামাজের জন্য পৃথক পৃথক ওজু করা ওয়াজিবও ছিলো। তবে ফরজ নামাজ পাঠকারীর সঙ্গে অনুগামী হিসেবে নফল নামাজ পাঠকারীর নামাজ অবশ্যই সঠিক। কেউ যদি জোহরের নামাজ চার রাকাত পূর্ণ করার পর ভুলক্রমে পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তবে তাকে আরো এক রাকাতসহ মোট ছয় রাকাত নামাজ পড়তে হয় এবং এমতাবস্থায় তার শেষের দুই রাকাত হয়ে যায় নফল।

www.eelm.weebly.com

ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ গবেষকের মতে নামাজের অন্যান্য স্তম্ভের মতো তকবীরে তাহরীমাও একটি স্তম্ভ এবং অন্যান্য স্তম্ভের মতো এই স্তম্ভটিও অবশ্য সম্পাদ্য। বরং এটা তো অন্যান্য স্তম্ভের প্রারম্ভিক নিদর্শন। হানাফীগণের বক্তব্য হচ্ছে, নামাজের বাইরের শর্তগুলো তো নামাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পৃক্ত। নতুবা আলাদাভাবে এগুলোর নিজস্ব কোনো গুরুত্ব নেই। যার দেহ ও বস্ত্রে অপবিত্রতা আছে, অথবা লজ্জাস্থান উন্মুক্ত, কিংবা সূর্য এখনো ঢলে পড়েনি, বা কেবলামুখী হওয়া হয়নি— এমতাবস্থায় তকবীরে তাহরীমা উচ্চারিত হলো, পরক্ষণে বর্ণিত বিঘ্নগুলো অপসারিত হলো— লজ্জাস্থান আবৃত করা হলো, দূর হয়ে গেলো বস্ত্রের ও দেহের অপবিত্রতা, সূর্যও ঢলে পড়লো এবং কেবলামুখী হওয়ার কাজও সম্পন্ন হলো, এমতাবস্থায় নামাজ পাঠ করলে তা সঠিক হবে। 'কাফী' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের কিছুসংখ্যক হানাফী বিদ্বানের মতে তকবীরে তাহরীমা নামাজের রোকন। তাহাবীও এরকম বলেন। আর এরকম মন্তব্য গৃহীত হলে উপরোল্লেখিত সংজ্ঞাগুলোর গুরুত্ব তো আর থাকেই না।

আমি বলি, সম্ভবত এখানকার 'প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে' কথাটির অর্থ আজান ও ইকামত। এরকম অর্থ গ্রহণ করলে তকবীরে তাহরীমাকে নামাজের রোকন প্রমাণ করার অবকাশ আর এখানে থাকে না। 'পবিত্রতা অর্জন করে' এবং 'তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামাজ প্রতিষ্ঠা করে' কথাদু'টোর অর্থ কিছুসংখ্যক আলেম করেছেন— সদকায়ে ফিতর এবং ঈদের তকবীরসমূহ। আতাও এরকম বলেছেন। হজরত ইবনে মাসউদ 'তাযাক্কা' (যে পবিত্রতা অর্জন করে) কথাটির অর্থ করেছেন— যে দান খয়রাত করে। তিনি বলতেন— যে ব্যক্তি সদকা করে, অতঃপর নামাজ পাঠ করে। এরপর তিনি আবৃত্তি করতেন আলোচ্য আয়াত।

নাফে বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ঈদের দিন ফজরের নামাজ পাঠ করার পর বলতেন, নাফে! সদকায়ে ফিতর কি আদায় করা হয়েছে? আমি 'না' বললে তিনি বলতেন, এক্ষুণি দিয়ে দাও। জানো না, 'নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে, যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামাজ প্রতিষ্ঠা করে' অবতীর্ণ হয়েছে এই উদ্দেশ্যেই। আবুল আলিয়া ও ইবনে সিরীনও এরকম বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন, এরকম ব্যাখ্যা কীভাবে গ্রহণ করা যায়? কেননা এই সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। আর তখন সেখানে না ছিলো ঈদ, না ছিলো জাকাত-সদকা। এর জবাবে বাগবী লিখেছেন, হতে পারে আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছিলো পূর্বাহ্নে, মক্কায়, যার উপরে আমল করা হয় পরে, মদীনায়। লক্ষণীয়, সুরা বালাদও অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কায়। তখন বলা হয়েছিলো, 'আর আপনি এই নগরের বৈধ অধিকারী হবেন'। অথচ একথা বাস্তবায়িত হয়েছিলো অনেক পরে মক্কাবিজয় সম্পন্ন হওয়ার পর। তেমনি এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা অচিরেই পরাজিত হবে দলে বলে, করবে পশ্চাদপসরণ'। এই আয়াতও মক্কায় অবতীর্ণ।

www.eelm.weebly.com

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, আমি বুঝতে পারতাম না, পরাজিত হবে এবং পশ্চাদপসরণ করবে কারা। কিন্তু পরে যখন বদর যুদ্ধ শুরু হলো, তখন আমি দেখলাম, রসুল স. এই আয়াত আবৃত্তি করছেন।

আমি বলি 'পরাজিত হবে' 'পশ্চাদপসরণ করবে' কথাগুলো ভবিষ্যতকাল-জ্ঞাপক। সুতরাং এক্ষেত্রে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ার অবকাশ নেই। কিন্তু এখানকার 'স্মরণ করেছে' 'কায়েম করেছে' কথাদু'টো তো অতীতকালবোধক। সুতরাং এখানে আমলের পরবর্তিতার কথা মেনে নেওয়া যেতে পারে কীভাবে?

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'সল্লা' (সালাত) অর্থ দোয়া। দোয়ার সুন্দরতম পদ্ধতি হচ্ছে, আল্লাহ্র প্রশংসা করতে হবে প্রথমে ও শেষে। হজরত ফুজালা বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় সেখানে এক লোক এসে নামাজ পাঠ করলো। তারপর প্রার্থনা করতে শুরু করলো। বললো, হে আল্লাহ্! আমাকে মার্জনা করো। আমার প্রতি বর্ষণ করো তোমার কৃপা। রসুল স. তাকে ডেকে বললেন, হে প্রার্থনাকারী! তুমি তো তাড়াহুড়া করে ফেলেছো। তোমার উচিত ছিলো প্রথমে আল্লাহ্র স্তব-স্তুতি করা। তারপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করা এবং শেষে প্রার্থনা জানানো। বর্ণনাকারী বলেন, এর পর উপস্থিত হলো আর একজন। সে-ও নামাজ পাঠ করলো। তারপর দোয়া শুরু করলো প্রথমে আল্লাহ্পাকের প্রশংসা বর্ণনা ও দরূদ শরীফ পাঠের পর। প্রার্থনা শেষ হলে রসুল স. তাকে ডেকে বললেন, এভাবেই প্রার্থনা করতে থাকো। তোমার প্রার্থনা কবুল করা হবে।

তিরমিজি, নাসাঈ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি একবার মসজিদে নামাজ পাঠ করলাম। সেখানে রসুল স. এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মান্যবর আবু বকর ও মাননীয় ওমর। নামাজ শেষ করে আমি বসে বসে দোয়া করতে শুরু করলাম। প্রথমে বর্ণনা করলাম আল্লাহ্পাকের প্রশস্তি। তারপর পাঠ করলাম দরূদ। শেষে যাচনা করলাম নিজের জন্য। তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, এভাবে চাইতে থাকো, পেয়ে যাবে।

আমাদের মহান শায়েখ মওলানা ইয়াকুব চরখী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে রয়েছে আধাত্ম্য পথচারীর ক্রমময় বিভিন্ন স্তরের প্রতি ইঙ্গিত। যেমন— ১. 'ক্বদ আফ্লাহা মান তাযাক্কা' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে তওবা ও আত্মশুদ্ধির। ২. জবানী, কলবী, রূহানী ও খফি (গোপন) জিকিরে নিমগ্নতার কথা বলা হয়েছে 'ওয়াজাকারাস্মা রব্বিহী' দ্বারা। ৩. আর 'ফাসাল্লা' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে মুশাহিদার (দর্শনের) প্রতি। কেননা নামাজ হচ্ছে মুমিনগণের মেরাজ। রসুল স. এরকমও বলেছেন যে, নামাজ আমার চোখের শান্তি। আহমদ, নাসাঈ, হাকেম, বায়হাকী।

আমি বলি, হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি এ সম্পর্কে বলেছেন, এখানে 'তাযাক্কা' এবং 'জাকারা' শব্দদ্বয়ের 'ওয়াও' যোজক দ্বারা সংযুক্তি এবং 'ফাসল্লা' এর 'ফা' যোজকটির ব্যবহার জিকিরের বিশেষ পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিতার্থক।

www.eelm.weebly.com

অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির প্রাথমিক পথিকদের জন্য জিকির হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে 'ইসমে জাত' (আল্লাহ্) অথবা 'নফি এসবাত' (লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্)। তিনি আরো বলেছেন, আত্মশুদ্ধি ব্যতিরেকে নামাজের পুরোপুরি কল্যাণ অর্জন সম্ভব নয়। পরমতম সত্তার জ্যোতিচ্ছটা এবং তাঁর নৈকট্যের দিকে উন্নতির জন্য নামাজই মূল মাধ্যম। সুতরাং নামাজ যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি অত্যাবশ্যক আত্মশুদ্ধিও।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও (১৬), অথচ আখেরাতই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী' (১৭)। একথার অর্থ— হে হতভাগার দল! তোমরা তো অজ্ঞ, অন্ধ ও অপবিত্র। তাই তোমরা আত্মশুদ্ধির পথে আগমন করো না। করো না আল্লাহ্র জিকির। পাঠ করো না নামাজ। তাই তো তোমাদের অযথার্থ বিবেচনায় প্রাধান্য পায় পার্থিবতা, যা অবক্ষয়প্রবণ, নশ্বর ও অস্থায়ী। অথচ স্থায়ী, উৎকৃষ্ট ও অবিনশ্বর হচ্ছে আখেরাত। সেখানে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত সুখসম্ভার। রয়েছে পরম প্রেমময় প্রভুপালকের পরিতোষ, নৈকট্য ও দীদার।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এটা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে— (১৮) ইব্রাহিম ও মুসার গ্রন্থে' (১৯)। আলোচ্য আয়াতদ্বয় যাবতীয় ধর্মীয় অনুশীলনকে অন্তর্ভূতকারী। সকল আকাশীগ্রন্থের সারসংক্ষেপ; বিশেষ করে নবী ইব্রাহিম ও নবী মুসার গ্রন্থের। এখানকার 'সুহুফি ইব্রহীমা ওয়া মূসা' (ইব্রাহিম ও মুসার গ্রন্থে) কথাটি আগের আয়াতের 'সুহুফিল উ'লা' (পূর্ববর্তী গ্রন্থে) কথাটির আংশিক অনুবর্তী।

হজরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বাযযার বর্ণনা করেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'এটা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে' তখন রসুল স. বললেন, এ সকল বিষয় লিপিবদ্ধ ছিলো নবী ইব্রাহিম এবং নবী মুসার পুস্তিকায়। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে 'এটা তো আছে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে আলোচ্য সুরায় উল্লেখিত বিষয়াবলীর প্রতি।

কোনো কোনো হানাফী মতাবলম্বী এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন যে, নামাজে ফারসী ভাষায় কোরআন আবৃত্তি সিদ্ধ। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে সহজভাবে কোরআন পাঠ করার কথা। আবার এখানে বলা হয়েছে 'এটা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে'। অন্যত্র বলা হয়েছে 'নিশ্চয় এটা ছিলো পূর্ববর্তী যবুরে'। আর একথা তো ঠিকই যে, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের ভাষা আরবী ছিলো না। কিন্তু বক্তব্যবিষয় ছিলো এক। কাজেই কোরআনের বিষয়বস্তু প্রকাশ করা যায়, এরকম যে কোনো ভাষাতেই নামাজের মধ্যে কোরআন পাঠ করা যাবে।

আমি বলি, হানাফীগণের এই অভিমতটি ভুল। কারণ কোরআন হচ্ছে শব্দ ও অর্থের মিলিত নাম। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সরল আরবী ভাষায় কোরআন'। অন্যত্র বলা হয়েছে 'নিয়ে এসো অনুরূপ একটি সুরা'। বলা বাহুল্য,

www.eelm.weebly.com

প্রতিটি সুরার পাঠই এরকম অজেয়। একারণেই ‘মিছলিহি’ (অনুরূপ) কথাটির মর্মার্থ নেওয়া হয়েছে— পাঠরীতির সমতুল। অর্থাৎ কোরআনের ভাষাশৈলী যেমন, তেমনই। সুতরাং কোরআনের অক্ষরান্তর কখনো কোরআন নয়, সে যে ভাষায় অক্ষরান্তর ঘটানো হোক না কেনো। তাই কোরআনের অনুবাদ গ্রন্থ ওজু-গোসলহীন অবস্থায় স্পর্শ করা দোষের নয়। বরং অপবিত্র দেহে এবং ঋতুবতী অবস্থাতেও তা পাঠ করা যাবে। অর্থাৎ ‘ইন্নাহু লাফী যাবুর’ (নিশ্চয় এটা ছিলো পূর্ববর্তী যবুরে) আয়াতের ‘এটা’ সর্বনামটি বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও তা হবে রূপকার্থক। অতএব একথা স্বীকার করতেই হবে যে, কেবল ভাব ও বিষয়বস্তুর নাম কোরআন নয়। কোরআন হচ্ছে শব্দ ও অর্থের সম্মিলিত নাম।

হজরত আলী বলেছেন, রসুল স. এই সুরাটিকে খুব ভালোবাসতেন। জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. বিতির নামাজের প্রথম দুই রাকাতে পড়তেন যথাক্রমে সুরা আ'লা ও সুরা কাফিরূন। আর তৃতীয় রাকাতে পাঠ করতেন সুরা এখলাস, অথবা ফালাক্ব, অথবা নাস। আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে আবু দাউদ, তিরমিজি এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমদ ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বিতির নামাজের প্রথম রাকাতে পাঠ করতেন ‘সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা’, দ্বিতীয় রাকাতে ‘ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন’ এবং তৃতীয় রাকাতে ‘ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ’। হজরত নোমান ইবনে বশীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. দুই ঈদ ও জুমআর নামাজে পাঠ করতেন ‘সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা’ এবং ‘হাল আতাকা হাদীছুল গশিয়্যাহ’। মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, হজরত সামুরা বর্ণনা বলেছেন, রসুল স. জুমআর নামাজে পাঠ করতেন সুরা আ'লা ও সুরা গশিয়াহ।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেছেন, নুযুলের (আত্মিক অবরোহণের) ক্ষেত্রে যেমন সুরা আলাম নাশরাহ্ প্রভাবশীল, তেমনি উরুজের (আত্মিক উর্ধ্বারোহণের) ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী সুরা আ'লা।

সূরা গশিয়াহ্

এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। এর মধ্যে রুকু রয়েছে ১টি এবং আয়াত ২৬টি।

সূরা গশিয়াহ্ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾

www.eelm.weebly.com

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝٤ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝٥ لَيْسَ
لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝٦ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ۝٧

r তোমার নিকট কি কিয়ামতের সংবাদ আসিয়াছে?
r সেই দিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত,
r ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হইবে,
r উহারা প্রবেশ করিবে জ্বলন্ত অগ্নিতে;
r উহাদিগকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হইতে পান করান হইবে;
r উহাদের জন্য খাদ্য থাকিবে না কণ্টকময় গুল্ম ব্যতীত,
r যাহা উহাদিগকে পুষ্ট করিবে না এবং উহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে না।

প্রথমে বলা হয়েছে 'তোমার নিকট কি কিয়ামতের সংবাদ পৌঁছেছে'? প্রশ্নটি স্বীকৃতিসূচক। এর সোজাসুজি অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার নিকট নিশ্চয় পৌঁছেছে মহাপ্রলয়ের সংবাদ। 'গশিয়াহ্' অর্থ এখানে— মহাপ্রলয়, যেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে সমগ্র সৃষ্টি। কেউ কেউ শব্দটির অর্থ করেছেন— নরকাগ্নি। কেননা এর পরেই বলা হয়েছে নরকাগ্নির কথা। কিন্তু যেহেতু এরপর বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী উভয়ের পরিণতির কথা ধারাবাহিকভাবে এসেছে, তাই 'গশিয়াহ্' অর্থ এখানে মহাপ্রলয় ও মহাপুনরুত্থান গ্রহণ করাই উত্তম।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে 'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত (২), ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হবে' (৩)।

এখানে 'উজুহুন' অর্থ মুখমণ্ডলসমূহ। ব্যবহৃত 'তানভীন' এখানে আধিক্যপ্রকাশক। তাই শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়— অনেক মুখমণ্ডল। অথবা 'তানভীন' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সম্বন্ধ পদকে অনুক্ত রেখে। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মুখমণ্ডল, যাদের সংখ্যা হবে অনেক। 'খশিয়াহ্' অর্থ অবনত, নত, হেয়, লাঞ্ছিত— দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণে।

'আ'মিলাতুন' অর্থ ক্লিষ্ট এবং 'নাসিবাহ্' অর্থ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। অর্থাৎ তারা পরিশ্রান্ত হয়ে নিক্ষিপ্ত হবে নরকে। 'নাসবাতুন' এর ধাতুমূল 'নাসবুন'। হাসান বসরী বলেছেন, পৃথিবীতে তারা যেহেতু আল্লাহ্র সন্তোষ সাধনার্থে কোনো কর্মই করে না, সেকারণে তখন আল্লাহ্পাক তাদেরকে কর্মক্লান্ত করে ছাড়বেন। কণ্ঠদেশে হাঁসুলি ও শৃঙ্খলের গুরুভার চাপিয়ে দিয়ে মহাবিচারের দিবসে পরিশ্রান্ত করা হবে তাদেরকে। কাতাদাও এরকম বলেছেন। আউফি বর্ণনা করেছেন, এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাসও। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তারা নরকে এমনভাবে দেবে যাবে, যেমন চোরাবালিতে দেবে যায় উট।

www.eelm.weebly.com

কালাবী বলেছেন, তাদেরকে অধোমুখী করে টেনে হিচঁড়ে নিয়ে যাওয়া হবে নরকে। জুহাক বলেছেন, তাদেরকে আরোহণ করানো হবে দোজখের লৌহ-গিরিশৃঙ্গে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হবে' বলে বুঝানো হয়েছে পৌত্তলিকদের দুরবস্থার কথা। বুঝানো হয়েছে ওই সকল ইহুদী-খৃষ্টানকে ও যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করেছে সন্ন্যাসব্রত। আল্লাহ্পাক তাদের এমতো পণ্ডশ্রম গ্রহণ করেন না। তাদের দোজখবাস অবধারিত। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন সাঈদ ইবনে যোবায়ের, জায়েদ ইবনে আসলাম এবং আতা সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস। সুদ্দী এবং ইকরামা বলেছেন, এজগতে পাপের ভার বহনকারী এবং পরজগতে দোজখের দুঃখ-কষ্ট ভোগকারীদের সম্পর্কেই এখানে বলা হয়েছে 'ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হবে'।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে—'তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন দোজখের আগুনকে করা হবে অধিকতর উত্তপ্ত এবং চাপিয়ে দেওয়া হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপর।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— তাদেরকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ থেকে পান করানো হবে'। সুদ্দী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এখানকার 'আনিয়াহ্' শব্দটির অর্থ সর্বোচ্চ মাত্রার উষ্ণতা। হাসান বসরী সূত্রে বায়হাকী লিখেছেন, যে পদার্থের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তাকেই আরববাসীরা বলে 'ক্বদ আনিয়া হাররাহ'। এখানে 'মিন আইনিন আনিয়াহ্' বলা হয়েছে সে কথা বুঝাতেই। কেউ কেউ বলেছেন, সৃষ্টিলগ্ন থেকে দোজখ ওই অত্যুষ্ণ প্রস্রবণের উপরে জ্বলছে। তাফসীরবেত্তাগণ লিখেছেন, পিপাসার্ত নারকীদেরকে পান করানো হবে এমন উত্তপ্ত পানি, যা একটা পর্বতগাত্রে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে গলে যাবে পুরো পর্বত।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'তাদের জন্য খাদ্য থাকবে না, কণ্টকময় গুল্ম ব্যতীত'। নহশল সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে আহাদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের উক্তি উল্লেখ করে জুহাক বিবৃত করেছেন, রসুল স. বলেছেন 'দ্বরী' (কণ্টকময় গুল্ম) এমনই বস্তু, যা পিলু বৃক্ষের চেয়েও তিক্ত। বাসী মৃতদেহ অপেক্ষাও অধিক দুর্গন্ধযুক্ত এবং আগুনের চেয়েও অধিক উত্তপ্ত। বিষাক্ত ও কণ্টকাকীর্ণ। ওই কণ্টকময় উদ্ভিদ যদি কাউকে খাওয়ানো হয়, তবে সে তাকে না উদরস্থ করতে পারবে না, পারবে উগলে ফেলে দিতে। বরং তা আটকে থাকবে কণ্ঠদেশে। ওই উদ্ভিদ ভক্ষণ করলে স্বাস্থ্যের উন্নতি যেমন হবে না, তেমনি পরিতৃপ্ত হবে না ক্ষুন্নিবৃত্তিও। এমতো বিপদের মধ্যে আবার পান করানো হবে উত্তপ্ত পানি।

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন 'দ্বরী' (কণ্টকময় গুল্ম) অর্থ যাক্কুম বা কণ্টকময় উদ্ভিদ। হজরত আবু দারদা থেকে তিরমিজি ও বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, জাহান্নামীরা

www.eelm.weebly.com

তখন আক্রান্ত হবে এমন অনন্ত ক্ষুধায় যে, তা যেনো হয়ে যাবে সকল শাস্তির সমতুল। মুজাহিদ, ইকরামা ও কাতাদা বলেছেন, ‘দ্বরী’ এমন এক কাঁটাভরা গাছ, যার শিকড়গুচ্ছ মৃত্তিকা স্পর্শমুক্ত। কুরায়েশেরা একে বলে ‘শাবরক’। এর বিশুষ্ক অবস্থাকেই বলে ‘দ্বরী’। এটা একটা অতি নিকৃষ্ট খাদ্য। কালাবী বলেছেন, ‘শাবরক’ যখন শুকিয়ে যায়, তখন তার কাছে চতুষ্পদ জন্তুরাও ভিড়ে না। ইবনে আবী জায়েদ বলেছেন ‘দ্বরী’ বলে পৃথিবীর যাবতীয় শুষ্ক, কণ্টকময়, পত্রপুষ্পহীন ঝোপঝাড়গুলোকে। আর পরবর্তী পৃথিবীর ‘দ্বরী’ হবে ভীষণ উত্তপ্ত ও কণ্টকময়।

ভাষ্যকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর পৌত্তলিকেরা বলতে শুরু করলো, আমাদের উটগুলো তো ‘দ্বরী’ খেয়ে খেয়েই বেড়ে ওঠে, হৃষ্টপুষ্ট হয়। উট সাধারণত ভক্ষণ করে সতেজ লতাগুল্ম। শুকিয়ে গেলে তারা আবার এর ধারে কাছেও ঘেঁষে না। জাহান্নামে তো থাকবে এগুলোই। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত (৭)। বলা হয়—

‘যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে না’। একথার অর্থ— ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ ও পুষ্টি সাধন, খাদ্যগ্রহণের এই দু’টি উদ্দেশ্যের একটিও পূরণ হবে না জাহান্নামের কণ্টকময় যাক্কুম বৃক্ষ ভক্ষণ করলে। অর্থাৎ তা হবে উদ্দেশ্যবিবর্জিত আহার। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘তোমরা যেরকম ধারণা করো, আমার রসুল সেরকম আদৌ নন— নন গণৎকার, যাদুকর, অথবা কবি’। কেননা এর সবগুলোই রসুল হওয়ার প্রতিবন্ধক। লক্ষণীয় এখানে বলা হয়েছে দু’ধরনের দোজখীর কথা— এক ধরনের দোজখীকে পান করানো হবে কেবল ‘দ্বরী’ এবং আর এক ধরনের দোজখীকে ‘দ্বরী’ ও ‘যাক্কুম’।

সূরা গশিয়াহ্ ঃ আয়াত ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا
تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾
وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾

- অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হইবে আনন্দোজ্জ্বল,
- নিজেদের কর্ম-সাফল্যে পরিতৃপ্ত,
- সুমহান জান্নাতে—
- সেথায় তাহারা অসার বাক্য শুনিবে না,
- সেথায় থাকিবে বহমান প্রস্রবণ,
- উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন শয্যা,

www.eelm.weebly.com

r প্রস্তুত থাকিবে পানপাত্র,
r সারি সারি উপাধান,
r এবং বিছান গালিচা;

প্রথমে বলা হয়েছে 'অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে আনন্দোজ্জ্বল'। এখানে 'উুজ্জুহুন' অর্থ মুখমণ্ডল। আর এখানে 'তানভীন' প্রযুক্ত হয়েছে বিশেষার্থে। অর্থাৎ ইতোপূর্বে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ক্ষেত্রে আধিক্য প্রকাশার্থে এবং এখানে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে অবলুপ্ত সম্বন্ধপদের স্থলে। আর এখানেও 'মুখমণ্ডল' অর্থ মুখমণ্ডলধারী। এখানে 'নায়িমাহ্' অর্থ আনন্দোজ্জ্বল, সতেজ।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'নিজেদের কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত (৯), সুমহান জান্নাতে' (১০)। একথার অর্থ— কৃতকর্মের যথাবিনিময় পেয়ে তখন বিশ্বাসীরা হবে পরিতৃপ্ত, যার জাজ্জ্বল্যমান প্রতিভূ হবে উন্নতমানের জান্নাত।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা অসার বাক্য শুনবে না'। এখানে 'লা 'তাস্‌মাউ' অর্থ তারা শুনবে না। অর্থাৎ শুনবে না ওই মুখমণ্ডলধারীগণ। অথবা এখানে সম্বোধিতজন হতে পারেন রসুল স.। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার প্রিয়তম জন! জান্নাতাভ্যন্তরে আপনি কাউকে অর্থহীন, অশিষ্ট কথা বলতে শুনবেন না। 'লাগিয়াহ্' অর্থ অসার বাক্য, অর্থহীন কথা।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'সেখানে থাকবে বহমান প্রস্রবণ'। এখানকার 'আ'ইনুন' (প্রস্রবণ) শব্দটিতে তানভীন প্রযুক্ত হয়েছে মাহাত্ম্য প্রকাশার্থে। অর্থাৎ জান্নাতে প্রবাহিত হতে থাকবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্রোতস্বিনী, ওই স্রোতস্বিনীসমূহের প্রবাহে থাকবে নিরবচ্ছিন্ন মধু, কর্পুর, দুধ, অথবা সুরাবিশিষ্ট পৃথক পৃথক ধারা। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে হাব্বান, হাকেম, বায়হাকী ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতের স্রোতস্বিনীসমূহ উৎসারিত হতে থাকবে মেশকের গিরিমালা থেকে।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন শয্যা'। একথার অর্থ— জান্নাতবাসীদের আসনসমূহ হবে সমুন্নত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু তালহা। আর হজরত আবু সাঈদ থেকে আহমদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতীদের দু'টি শয্যার মধ্যে ব্যবধান হবে আকাশ-পৃথিবীর দূরত্বের মতো। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে পাঁচ শত বছরের পথের ব্যবধানের কথা। তিনি আরো লিখেছেন, শয্যাগুলির পারস্পরিক মর্যাদাগত ব্যবধান হবে আকাশ-পৃথিবীর ব্যবধানের মতো।

ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু উমামা বলেছেন, যদি উপরের শয্যার চাদর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তবে চল্লিশ বছরেও তার প্রান্ত পৌঁছতে পারবে না নিচের শয্যা পর্যন্ত। সর্বোন্নত সূত্রে হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, শয্যার চাদরের প্রান্ত উপর থেকে নিচে পৌঁছতে সময় লাগবে দুই শত বছর।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই সুখাসনগুলোর তক্তা হবে স্বর্ণের এবং তার প্রান্ত হবে জমরুদ, ইয়াকুত ও মোতির। আসনগুলো হবে অত্যুচ্চ। কিন্তু জান্নাতবাসীরা তাতে উপবেশন করার ইচ্ছা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো অবনমিত হবে। আবার তার উপরে উপবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো উঁচু হয়ে যাবে আগের মতো।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র'। এখানকার 'আক্‌ওয়াব' শব্দটি 'ক্বওব' এর বহুবচন। এর অর্থ—পানপাত্র, পেয়ালা, সুরাহী। মুজাহিদের ব্যাখ্যা উল্লেখ করে হান্নাদ বলেছেন 'আক্‌ওয়াব' হচ্ছে হাতলবিবর্জিত পানপাত্র। 'মাওদূয়াহ্‌' অর্থ প্রস্তুত থাকবে। অর্থাৎ ওই পানপাত্রগুলো সুরক্ষিত থাকবে স্রোতস্বিনীসমূহের তীরে তীরে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সারি সারি উপাধান (১৫) এবং বিছানো গালিচা' (১৬)। একথার অর্থ— সেখানে আরাম আয়েশে বসা ও ঠেস দেওয়ার জন্য থাকবে সারি সারি তাকিয়া, বালিশ। বিছানো থাকবে মসৃণ ও মনোহর গালিচাসমূহ। এখানকার 'নামারিক্ব' (উপাধান) শব্দটি 'নুমরিকাহ্‌' অথবা 'নামরিকাহ্‌'র বহুবচন। আর 'যারাবিয়্যু' বহুবচন 'যারবিয়াতুন' এর।

জান্নাতের এ সকল সুখোপকরণসমূহের কথা যখন মক্কার মুশরিকেরা শুনলো, তখন তারা বিশ্বাস করলো না। প্রকাশ করলো তাদের অস্বীকৃতিসূচক বিস্ময়। তখন অবতীর্ণ হলো—

সূরা গশিয়াহ্‌ ঃ আয়াত ১৭— ২৬

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ
رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ
سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ
بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ
الْاَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

r তবে কি উহারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে?

r এবং আকাশের দিকে, কিভাবে উহাকে ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে?

r এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে উহাকে স্থাপন করা হইয়াছে?

r এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে উহাকে বিস্তৃত করা হইয়াছে?

www.eelm.weebly.com

r অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশদাতা,
r তুমি উহাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নহ।
r তবে কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে ও কুফরী করিলে
r আল্লাহ্ উহাকে দিবেন মহাশাস্তি।
r উহাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট;
r অতঃপর উহাদের হিসাব-নিকাশ আমারই কাজ।

'মাদারেক' রচয়িতা লিখেছেন, যখন বেহেশতের সুখসম্ভারের বিবরণসম্বলিত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. সেগুলোর কথা ব্যাখ্যা করে সকলকে বুঝাতে লাগলেন। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাঁর এসকল কথা বিশ্বাস করলো না। উড়িয়ে দিলো অলীক বলে। বললো, অতো উঁচু আসনে মানুষ বসবে কী করে? অতো বেশী পানপাত্র প্রস্তুত করে রাখার দরকারই বা কী? বিছানার চাদর আবার এতো বেশী লম্বা হয় না কি? তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় 'তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে'? অর্থাৎ উট তাদের চেয়ে অনেক উঁচু হওয়া সত্ত্বেও তো তারা উটের পিঠে আরোহণ করে হর-হামেশা চলাফেরা করে। উট বসে পড়ে বলেই তো তারা তার পিঠে চড়তে পারে। বেহেশতের শয্যাগুলোও তেমনি অনেক উঁচু হওয়া সত্ত্বেও নিচে নেমে আসবে, যখন তার উপর উপবেশন করতে চাইবে বেহেশতবাসীরা। তাহলে তারা এ সম্পর্কে অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিচ্ছে কেনো?

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'এবং আকাশের দিকে, কীভাবে তাকে ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে'? একথার অর্থ— ঊর্ধ্বাকাশের দিকে তারা দৃষ্টিপাত করলে কি দ্যাখে না, সেখানে জ্বল জ্বল করছে অসংখ্য নক্ষত্র। তাহলে বেহেশবাসীদের জন্য সেখানে অসংখ্য পানপাত্র প্রস্তুত করে রাখা যাবে না কেনো?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে (১৯, ২০) বলা হয়েছে— 'এবং পর্বতমালার দিকে, কীভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে? এবং ভূতলের দিকে, কীভাবে তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে'। একথার অর্থ— সারি সারি পর্বতগুলোর দিকে তারা তাকায় না কেনো? দ্যাখে না কেনো, কীভাবে বিছিয়ে রাখা হয়েছে ভূপৃষ্ঠকে। বেহেশতে বালিশ, তাকিয়া ও গালিচা বিছানো থাকবে তো এভাবেই।

আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে, সৃষ্টি বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের। কোনো কোনোটি যৌগিক এবং কোনোটি মৌলিক। এসকল কিছুই তো মহাসৃজয়িতা আল্লাহ্‌র অপার প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তার পরিচায়ক। এগুলোর দিকে গভীরভাবে অভিনিবেশী হলে তো একথা অবশ্যমান্য হয়ে যায় যে, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। যিনি এ সকল কিছু একবার সৃষ্টি করেছেন, তিনি তো তা পুনঃ সৃষ্টিতেও সক্ষম। কেননা পূর্ববর্তী সৃষ্টি অপেক্ষা পরবর্তী সৃষ্টি সহজতর। সুতরাং মহাপুনরুত্থান, মহাবিচার পর্ব, বেহেশত-দোজখ— এ সকল কিছু মেনে নিতে আর আপত্তি কোথায়? পরকালের সাফল্যের জন্য যথাপ্রস্তুতি গ্রহণে অনীহাই বা কেনো?

www.eelm.weebly.com

লক্ষণীয়, আল্লাহ্‌পাকের অসংখ্য যৌগিক সৃষ্টির মধ্যে এখানে উপমা হিসেবে আনা হয়েছে কেবল উটকে। আর মৌলিক সৃষ্টি হিসেবে উপমা দেওয়া হয়েছে আকাশ, পর্বতশ্রেণী ও পৃথিবীপৃষ্ঠের। এরকম করার কারণ হচ্ছে, এই ত্রয়ী প্রয়োজন ও মহিমা নিয়ে যাপিত হয় আরববাসীগণের জীবন। যেহেতু এখানে সম্বোধন করা হয়েছে আরবজাতিকে, তাই এখানে ঘটানো হয়েছে এরকম উপমার সমাহার। তাদের দৃষ্টিপথে সতত প্রতিভাসিত হয় দিগন্ত প্রসারিত আকাশ, প্রলম্বিত পর্বতামালা এবং সুবিস্তৃত মরুপ্রান্তর। আর যুথবদ্ধ উটের বহর সতত তাদেরকে করে রাখে প্রাণবন্ত— সাংসারিক জীবনে, সামাজিকতায়, বাণিজ্যে। তাদের গোশত, দুধ ব্যবহৃত হয় আহার হিসেবে। ভ্রমণ ও পণ্য পরিবহনের জন্যও উট তাদের জন্য অপরিহার্য। তাই এখানে প্রথমে বিশেষভাবে উটের উল্লেখ করে তাদেরকে এটাই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, বিশাল বপুধারী উটও দ্যাখো, আল্লাহ্‌র নিয়মানুসারে তোমাদের কথায় ওঠে বসে। তাহলে বেহেশতের অত্যুচ্চ আসনগুলো তাঁর নিয়মানুসারে বেহেশতবাসীদের ইচ্ছানুসারে ওঠানামা করতে পারবে না কেনো? কেনো অযৌক্তিকভাবে অস্বীকার করতে হবে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশকে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ইবিলি' অর্থ মেঘমালা, উট নয়। 'কামুস' অভিধানে লেখা আছে, 'ইবিলি' বলে ওই মেঘকে, যা পানিতে ভরপুর। হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত এক হাদিসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্‌ বলেন, আমা কর্তৃক সৃষ্ট মেঘের মতো মেঘ, পাহাড়ের মতো পাহাড় এবং দিকচক্রবাল পর্যন্ত প্রসারিত ভূমি কি কেউ সৃষ্টি করতে সক্ষম?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশদাতা (২১), তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও' (২২)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক! আপনি এতোক্ষণ ধরে বর্ণিত দলিল প্রমাণের মাধ্যমে মানুষকে কেবল উপদেশ দিয়ে যেতে থাকুন। হয়তো তাদের মধ্যে কারো কারো বোধোদয় ঘটবে। কেউ কেউ গ্রহণ করবে আপনার পথনির্দেশনা। কেননা আপনি তো কেবল উপদেশদাতা। তাদের কর্মনিয়ন্ত্রণ তো আপনার দায়িত্বভূত নয়। এখানকার 'তুমি তাদের কর্ম-নিয়ন্ত্রক নও' কথাটি আগের বাক্যের বেগ সৃষ্টিকারক। অর্থাৎ এরকম দায়িত্ব তো আপনাকে দেওয়া হয়নি যে, আপনি তাদেরকে আপনার উপদেশ মানিয়েই ছাড়বেন। এরকম বলা হয়েছে অন্য একটি আয়াতেও। যেমন 'আপনি তাদের উপর বলপ্রয়োগকারী তো নন'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে (২৩) আল্লাহ্‌ তাকে দিবেন মহাশাস্তি' (২৪)।

'ইল্‌লা' ব্যতিক্রমীটি এখানে বিযুক্তক, ব্যবহৃত হয়েছে 'তবে' অর্থে। অর্থাৎ তবে যারা আপনার উপদেশ প্রত্যাখ্যান করবে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে দিবেন ভীষণ শাস্তি। অবশ্যই প্রবেশ করাবেন জাহান্নামে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার

www.eelm.weebly.com

ব্যতিক্রমীটি সংযুক্তক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তবে আপনার উপদেশ যারা মানবে না, তাদেরকে আল্লাহ্ পৃথিবীতে শাস্তি দিবেন তাদের উপরে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে, আর পরকালে জাহান্নামের শাস্তি তো তাদের হবেই। অথবা বক্তব্যার্থটি দাঁড়াবে— আপনি তাদেরকে উপদেশ দিয়ে যেতে থাকুন। এর পরে যদি কেউ আপনার উপদেশ গ্রহণে অনীহ হয়, আল্লাহ্ তো তাকে শাস্তি দিবেনই দিবেন। ছেড়ে দিবেন না। এমতো ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করলে বুঝতে হবে বক্তব্যটির যোগসূত্র রয়েছে ২১ সংখ্যক আয়াতের 'উপদেশ দাও' কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ আপনি নিরাশ হবেন না। আর নিরাশ না হওয়াই এমতাবস্থায় হবে ব্যতিক্রম্য।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট (২৫); অতঃপর তাদের হিসাব নিকাশ আমারই কাজ'। ভীতিপ্রদর্শনকে সুদৃঢ় করার জন্যই এখানে 'ইলাইনা' পদটিকে উল্লেখ করা হয়েছে আগে। অর্থাৎ তাদের প্রত্যাবর্তন এক মহাশক্তিধর সত্তার সমীপে হবে, যিনি তাদেরকে শাস্তি দিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। আর এখানকার 'তাদের হিসাব নিকাশ আমারই কাজ' কথাটির অর্থ— তাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের তারতম্যানুসারে উপযুক্ত শাস্তি নির্ধারণ করার দায়িত্বটি আমার। এখানে 'আ'লাইনা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অনিবার্যতা প্রকাশার্থে। অর্থাৎ হিসাব নিকাশ করে তাদেরকে অবশ্যই তিনি শাস্তিদান করবেন, যদিও এরকম করতে তিনি বাধ্য নন। তবে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা তাঁর মহামর্যাদার অননুকূল। তাই কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণার্থে শাস্তি তিনি তাদেরকে দিয়েই ছাড়বেন।

সূরা ফাজ্বর

মহাপুণ্যনিকেতন মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরাখানিতে রয়েছে ১টি রুকু এবং ৩০টি আয়াত।

সূরা ফাজ্বর ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالْفَجْرِ ۙ﴿۱﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۙ﴿۲﴾ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۙ﴿۳﴾ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۚ﴿۴﴾ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ؕ﴿۵﴾

r শপথ উষার,

r শপথ দশ রজনীর,

r শপথ জোড় ও বেজোড়ের

r এবং শপথ রজনীর যখন উহা গত হইতে থাকে—

www.eelm.weebly.com

r নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে শপথ রহিয়াছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ওয়াল ফাজ্‌রি'। এর অর্থ শপথ ঊষার। অর্থাৎ শপথ প্রভাতকালের। আবু সালেহের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। ইকরামাও এরকম বলেছেন । আতিয়া বলেছেন, এখানে 'ফাজ্‌রি' অর্থ ফজরের নামাজ। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ— মহররম মাসের প্রথম দশ দিনের প্রভাতকাল। কেননা এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে জিলহজ মাসের দশ রাত।

এরপরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'ওয়া লাইয়ালিন আ'শরিন'। এর অর্থ— শপথ দশ রজনীর। এখানকার 'তানভীন' শ্রেষ্ঠত্বপ্রকাশক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'দশ রজনী' অর্থ জিলহজ মাসের প্রথম দশ রাত্রি। কাতাদা, মুজাহিদ, জুহাক, সুদ্দী এবং কালাবীও এরকম বলেছেন। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জিলহজ্ব মাসের প্রথম দশদিনের ইবাদত অপেক্ষা অন্য কোনো দিনের ইবাদত আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয় নয়। এ সময়ের এক দিনের রোজা সারা বছরের রোজার সমান। এক রাতের ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমান। শিথিল সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি ও ইবনে মাজা।

আবু ওয়ারাক সূত্রে জুহাক বর্ণনা করেছেন, এখানকার 'দশ রজনী' অর্থ রমজান মাসের প্রথম দশ রাত্রি। আবু জুবিয়ানের বর্ণনায় এসেছে রমজান মাসের শেষ দশদিনের কথা। আমরা সুরা বাকারার তাফসীরে রমজান মাসের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। মহাসম্মানিত শবে কদরও শেষ দশ রাতের অন্তর্ভূত। ইনশাআল্লাহ্ সুরা কদরের তাফসীরে বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করা হবে। আইমান ইবনে রুবাব বলেছেন, এখানে শপথ করা হয়েছে মহররম মাসের প্রথম দশ রাত্রির, যার দশম দিন আশুরা। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রমজানের রোজার পর আল্লাহ্ পাকের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট রোজা হচ্ছে মহররমের রোজা। আর ফরজ নামাজের পরে সর্বোত্তম নামাজ তাহাজ্জুদ। মুসলিম।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'শপথ জোড় ও বেজোড়ের'। এখানে 'ওয়াশ্‌শাফ্‌য়ি' অর্থ সৃষ্টি, যা হয় যুগ্ম। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়'। আর বেজোড় হলেন আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং। এরকম অর্থ করেছেন হজরত আবু সাঈদ, আতিয়া এবং আউফি। মুজাহিদ ও মাসরুকও এরকম বলেছেন। তাঁরা আরো বলেছেন, সকল সৃষ্টি যুগল। তাদের একজনের বিপরীতে আছে আর একজন। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা এরূপ বৈপরিত্য-বিবর্জিত। তিনি বৈপরিত্যবিবর্জিত চির একক। তিনি ব্যতীত অন্য সকল কিছুই বিভিন্নভাবে বৈপরিত্যধারী, যৌগ। যেমন বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সুপথ-বিপথ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, রাত-দিন, আকাশ-পৃথিবী, জল-স্থল, চন্দ্র-সূর্য, জ্বিন-মানব, নর-নারী। আল্লাহ্‌পাক সকল প্রকার বিপরীতার্থকতা থেকে সতত পবিত্র।

www.eelm.weebly.com

একবার মহামান্য আবু বকর সিদ্দীককে জোড় ও বেজোড় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, যুগল সৃজন হওয়া সৃষ্টির অমোঘ নিয়তি। যেমন জীবন-মৃত্যু, সম্মান-অসম্মান, বিনয়-দুর্বিনয়, সাবল্য-দৌর্বল্য, জ্ঞান-অজ্ঞান, দৃষ্টি-দৃষ্টিহীনতা, শ্রুতি-বধিরতা, শব্দ-নৈশব্দ, বিত্ত-বিত্তহীনতা। কিন্তু আল্লাহ্ অযুগল। তিনি মৃত্যুহীন চিরঞ্জীব, অক্ষমতাহীন পরাক্রমশালী, অজ্ঞতাহীন প্রাজ্ঞ, বৈভবশালী।

হাসান বসরী ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, জোড় এবং বেজোড় উভয়ই আল্লাহ্পাকের সৃষ্টি। কোনো সৃষ্টি জোড়, কোনো সৃষ্টি বেজোড়। হাসান বসরী বলেছেন, জোড় ও বেজোড় দু'টি সংখ্যা। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে নামাজের জোড় ও বেজোড়কে। সর্বোন্নত সূত্রে হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে ইমাম মালেক এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের থেকে ইমাম আহমদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, 'শোফা' অর্থ হজ। অর্থাৎ হজের প্রথম প্রত্যাবর্তনের পরের প্রত্যাবর্তন। যেহেতু আল্লাহ্পাক বলেন 'যে ব্যক্তি ত্বরা করবে দু'দিনের মধ্যে, তার জন্য কোনো পাপ নেই'। মুকাতিল ও ইবনে হাব্বান বলেছেন, পৃথিবীর দিবারাত্রি জোড়, আর পরবর্তী পৃথিবীর দিবস বেজোড়, কেননা ওই দিবসের পরে কোনো রাত্রি নেই। হাসান বসরীর অপর এক উক্তিতে এসেছে, জান্নাতের আটটি স্তর জোড়সংখ্যক, আর জাহান্নামের স্তর সাতটি বেজোড়সংখ্যক। সম্ভবত এখানে জোড়-বেজোড় উল্লেখ করে জান্নাত জাহান্নামের শপথ করা হয়েছে।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এবং শপথ রজনীর, যখন তা গত হতে থাকে'। এরকম শপথ করা হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন 'অপসৃয়মান রাতের শপথ'। কাতাদা বলেছেন, এখানকার 'ইজা ইয়াস্‌রি' অর্থ আগমনশীল রাতের শপথ। দিনের পরে রাতের সুনিশ্চিত আগমনও আল্লাহ্পাকের প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার নিদর্শন। আর রাত তাঁর অনুগ্রহও। কেননা রাতের সঙ্গে জড়িত রয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত ও গোপন অনেক কিছু। সেজন্যই রূপকার্থে অভিসারের সম্পর্ক করা হয় রাতের সঙ্গে। যেমন বলা হয় 'সল্‌লাল মুকাম' (স্থান নামাজ পাঠ করেছে)। কিন্তু স্থান তো নামাজ পাঠ করে না। বরং নামাজ পাঠ করা হয় স্থানে। আর এখানকার 'রাতের শপথ' অর্থ যে কোনো রাতের শপথ, যা চলিষ্ণু, গমনশীল।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য'। প্রশ্নবোধকটি এখানে স্বীকৃতিসূচক। তাই বঙ্গানুবাদটিও করা হয়েছে সোজাসুজি। অর্থাৎ নিশ্চয় এই কোরআনের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য শপথ। এখানে 'ক্বসামুন' অর্থ শপথ, কসম। এখানকার 'তানভীন'টি শ্রেষ্ঠত্বার্থক। অর্থাৎ নিশ্চয় বর্ণিত বিষয়গুলোর শপথ বিরাট এক ব্যাপার। এমতো শপথই যথেষ্ট। আর কোনোকিছুর শপথের প্রয়োজন পড়ে না । কেননা যে বিষয়গুলোর উল্লেখ করে শপথ করা হয়েছে, সে বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়গুলো আল্লাহ্পাকের বিচিত্র শক্তিমত্তা ও অতুলনীয় গুণবত্তার পরিচায়ক।

www.eelm.weebly.com

জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক মানুষকে বিরত রাখে অশুভ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে। সেকারণেই জ্ঞানকে এখানে বলা হয়েছে 'হিজ্র'। আর এখানকার শপথের জবাব হবে 'নিশ্চয় আপনার প্রভুপালক রয়েছেন প্রতীক্ষাস্থলে'। অথবা বলা যেতে পারে, শপথের জবাব রয়েছে এখানে অনুক্ত। অথবা বিষয়টি আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়নির্ভর। কিংবা বলা যায়, আল্লাহ্পাক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করবেন, যেমন ধ্বংস করেছিলেন আদ-ছামুদ জাতিকে।

সূরা ফাজ্র ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۙ﴿۶﴾ اِرَمَ ذَاتِ الۡعِمَادِ ۙ﴿۷﴾ الَّتِیۡ لَمۡ
یُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِی الۡبِلَادِ ۙ﴿۸﴾ وَ ثَمُوۡدَ الَّذِیۡنَ جَابُوا الصَّخۡرَ بِالۡوَادِ ۙ﴿۹﴾
وَ فِرۡعَوۡنَ ذِی الۡاَوۡتَادِ ۙ﴿۱۰﴾ الَّذِیۡنَ طَغَوۡا فِی الۡبِلَادِ ۙ﴿۱۱﴾ فَاَكۡثَرُوۡا
فِیۡهَا الۡفَسَادَ ۙ﴿۱۲﴾ فَصَبَّ عَلَیۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ ۚ﴿۱۳﴾ اِنَّ
رَبَّكَ لَبِالۡمِرۡصَادِ ﴿۱۴﴾

---

r তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক কি করিয়াছিলেন 'আদ বংশের—

r ইরাম গোত্রের প্রতি— যাহারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?—

r যাহার সমতুল্য কোন দেশ নির্মিত হয় নাই;

r এবং ছামূদের প্রতি?- যাহারা উপত্যকায় পাথর কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল;

r এবং বহু সৈন্য-শিবিরের অধিপতি ফির'আওনের প্রতি?

r যাহারা দেশে সীমালংঘন করিয়াছিল,

r এবং সেথায় অশান্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল।

r অতঃপর তোমার প্রতিপালক উহাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানিলেন।

r তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আলাম তারা'। এর অর্থ তুমি কি দ্যাখোনি? প্রশ্নটিতে প্রকাশ পেয়েছে না-সূচকতার অস্বীকৃতি, যার পরিণতি দাঁড়ায় হাঁ-সূচক। অর্থাৎ তোমরা তো দেখেছো। কথাটিতে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ও।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক কী করেছিলেন আদ বংশের— (৬) ইরাম গোত্রের প্রতি—(৭)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! মক্কার অধিবাসীরা তো জানেই, কী নিদারুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিলো আদ জাতিকে, যাদের পিতৃপুরুষ ছিলো ইরাম। প্রচণ্ড দৈহিক শক্তিমত্তার অধিকারী

www.eelm.weebly.com

ছিলো তারা। ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও গর্বোন্মত্ত। মহা তুফানের আঘাতে আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন তাদেরকে। তাহলে মক্কার মুশরিকেরা কীভাবে নিশ্চিন্ত হতে পারে যে, সত্যদ্রোহিতা করা সত্ত্বেও তারা আত্মরক্ষা করতে পারবে?

ইরাম আদ জাতির পূর্বপুরুষদের একজন। অথবা ইরাম আদের একটি শাখাগোত্র। শব্দটি 'তাদের' পদের অনুবর্তী, অথবা বিবৃতিমূলক যোজক। আদ জাতির শাসন ক্ষমতা ছিলো ওই ইরাম গোত্রের হাতে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, ইরাম ছিলো আদ ইবনে শাম ইবনে নুহের পুত্র। তার নামানুসারেই তার গোত্রের নাম হয়েছে ইরাম। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, ইরাম ছিলো আদের পিতামহ। তাই বলা যায়, আদ ইরাম গোত্রের একটি শাখা। কালাবী বলেছেন, আদ, সুয়াদে ইরাকের অধিবাসী। আরব উপদ্বীপের জনসাধারণের ঊর্ধ্বতন বংশই ইরাম বংশ। এজন্যই বলা হয় আদে ইরাম, ছামুদে ইরাম। আল্লাহ্পাক আদ ও ছামুদ জাতিকে গজবে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। অবশিষ্ট ছিলো কেবল সুয়াদে ইরাক ও আরব উপদ্বীপের অধিবাসীবৃন্দ। এ সকল বর্ণনা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ইরাম ছিলো একটি বৃহৎ জাতিগোষ্ঠী।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা অধিকারী ছিলো সুউচ্চ প্রাসাদের (৭)? যার সমতুল্য কোনো দেশে নির্মিত হয়নি'(৮)।

আদ সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো দীর্ঘদেহী ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ। তারা নির্মাণ করতো বিরাট বিরাট অট্টালিকা। একারণে তারা গর্বও করতো খুব। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাদের দৈর্ঘ্য ছিলো খুঁটির মতো। মুকাতিল বলেছেন, তাদের দৈর্ঘ্য ছিলো রসুল স. এর হাতের মাপে বারো হাত। কেউ কেউ বলেছেন, তারা ছিলো আরো লম্বা। তাদেরকে স্তম্ভবিশিষ্ট বলা হতো একারণে যে, বসন্তকালে তারা তাদের তাঁবু, তাঁবুর খুঁটি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সামগ্রী বেঁধে নিয়ে পশুপালসহ বেরিয়ে পড়তো চারণভূমির দিকে। সেখানকার তৃণ-গুল্ম যখন শেষ হয়ে যেতো, তখন তারা ফিরে আসতো স্বগৃহে। তারা চাষাবাদ করতো, বাগান করতো। তাদের বসতবাটি ছিলো কুরা উপত্যকায়। কেউ কেউ বলেছেন, তারা নির্মাণ করতো সুউচ্চ প্রাসাদ। বড় বড় এবং মজবুত স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলো প্রাসাদগুলো। তাই তাদেরকে বলা হতো 'স্তম্ভবিশিষ্ট'। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, শাদ্দাদ ইবনে আদ নির্মাণ করিয়েছিলো এমন অট্টালিকামালা, যার স্থাপত্যশৈলী ছিলো অতুলনীয়। একবার সে সদলবলে পরিদর্শন করতে চললো ওই শিল্পসৌধগুলো। এক সপ্তাহ চলার পরে একখানে যাত্রাবিরতি করলো তারা। সেখানেই অকস্মাৎ আকাশ থেকে ধ্বনিত হলো মহানাদ। ওই মহানাদের আঘাতে চিরদিনের মতো নির্মূল হয়ে গেলো শাদ্দাদ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'ইরামা জাতিল ইমাদ' একটি নগরীর নাম; যা বর্তমানে পরিচিত দামেশক বলে। কুরতুবী বলেছেন, ওই স্থানের বর্তমান নাম ইসকান্দারিয়া। আর এখানকার 'যার সমতুল কোনো দেশে নির্মিত হয়নি' অর্থ তাদের ওই সুউচ্চ প্রাসাদগুলো ছিলো অতি মনোহর। ওরকম সুন্দর প্রাসাদ আর কোনো নগরীতে নির্মিত হয়নি।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'এবং ছামুদের প্রতি? যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিলো'। এখানে 'জ্বাবু' অর্থ কাটতো, কর্তন করতো, কেটে কেটে মসৃণ করতো। 'সখ্র' অর্থ পাথর। এর একবচন 'সখরাতুন'। আর 'আল ওয়াদ' অর্থ কুরা উপত্যকা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কুরা উপত্যকায় বসবাস করতো ছামুদ জাতি। তারাও ছিলো সত্যদ্রোহী। তারা পর্বতগাত্রে পাথর কেটে কেটে নির্মাণ করতো সুন্দর সুন্দর বাড়ি। আল্লাহ্র গজবে তারাও বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলো আদ জাতির মতো।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'এবং বহু সৈন্যশিবিরের অধিপতি ফেরাউনের প্রতি'? 'আওতাদ' অর্থ এখানে মজবুত বালাখানা। হজরত ইবনে আব্বাস এবং মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী এরকমই বলেছেন। আবার অনেকে বলেছেন, এর অর্থ দীর্ঘস্থায়ী রাজত্ব। যেমন আরববাসীগণ বলেন, 'হুম ফীল ইযনি ছাবিতুল আওতাদ' (তারা মর্যাদার কীলক প্রোথিত করেছে) অর্থাৎ অধিকারী হয়েছে যশের। আতিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'জিল আওতাদ' অর্থ সেনাবাহিনী। কেননা তারা কোথাও যাত্রা করলে সঙ্গে সঙ্গে বহন করে তাঁবু-খুঁটি-রসদপত্র। শিবির নির্মাণের সময় তাঁবু খাটায় কীলকের সাহায্যে। মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, 'ওয়াতাদ' এর বহুবচন 'আওতাদ'। এর অর্থ কীলক। নিষ্ঠুরহৃদয় ফেরাউন মানুষকে শাস্তি দিতো কাঠের খুঁটিতে দাঁড় করিয়ে। তারপর পেরেক মেরে দিতো তার হাতে, পায়ে ও মাথায়। কখনো কখনো পেরেক মেরে দিতো ঝুলিয়ে। মুজাহিদ এবং মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, ফেরাউন মানুষকে শাস্তি দিতো এভাবে— প্রথমে মাটিতে চিৎ করে শোয়াতো। তারপর তার হাত-পাগুলো সোজা করে দিয়ে তাতে ঠুকে দিতো কীলক। সুদ্দী বলেছেন, মাটিতে লম্বা করে শুইয়ে হাত-পা টান টান করে তার মধ্যে গেঁথে দেওয়া হতো কীলক। এরপর সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দেওয়া হতো তার উপর। কাতাদা এবং আতা বলেছেন, একবার ফেরাউন তার অর্থসচিবের স্ত্রীকে তার সামনেই এভাবে সাজা দিয়েছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফেরআউনের অর্থসচিব হিযকীলের স্ত্রী ছিলেন বিশ্বাসবতী। দীর্ঘ দশ বছর ধরে তিনি তাঁর ইমানকে গোপন করে রেখেছিলেন। ফেরাউনের কন্যার পরিচর্যাকারিণী ছিলেন তিনি। একদিন তিনি চিরুনী দিয়ে তার চুল আঁচড়িয়ে দেওয়ার সময় হঠাৎ করে হাত থেকে চিরুনীটি মাটিতে পড়ে গেলো। চিরুনীটি উঠিয়ে নেওয়ার সময় তিনি আপন মনে উচ্চারণ করলেন, আল্লাহ্কে যারা অস্বীকার করে, তারা নিপাত যাক। ফেরাউনদুহিতা বললো, আমার পিতা ব্যতীত আর কোনো উপাস্য আছে নাকি? অর্থসচিব-ভার্যা বললেন, নিশ্চয়। তোমার আমার, তোমার পিতার এবং আকাশ পৃথিবীর অধিপতি যিনি, সেই আল্লাহ্ই সকলের একমাত্র উপাস্য। ফেরাউনদুহিতা একথা সহ্য করতে পারলো না। সঙ্গে সঙ্গে তার পিতার কাছে গিয়ে বললো, শুনেছেন, অর্থ সচিবের স্ত্রী তো আপনাকে প্রভুপালক বলে মানে না। বলে আকাশ-পৃথিবীসহ

www.eelm.weebly.com

সকলের সৃষ্টিকর্তা নাকি একজন। আর তিনিই সকলের একমাত্র প্রভুপালক ও উপাস্য। ফেরাউন তৎক্ষণাৎ তলব করলো অর্থসচিবের পত্নীকে। বললো, তুমি কি তাহলে মুসার অনুগামিনী? ভালো চাও তো এক্ষুণি পরিত্যাগ করো তার ধর্মবিশ্বাসকে। অর্থসচিবের স্ত্রী বললেন, না, তা হয় না। আপনি যদি আমাকে সত্তর বছর ধরে শাস্তি দান করতে থাকেন, তবুও আমি সত্য ধর্মবিশ্বাস থেকে এতোটুকুও টলবো না। সে তখন দু'টি শিশুকন্যার বড়টিকে এনে তার মায়ের সামনেই জবাই করলো। তারপর বললো, দ্যাখো হতভাগিনী! এখনো সময় আছে, মুসার ধর্ম পরিত্যাগ করো। নয়তো তোমার অপর কন্যাকেও আমি হত্যা করবো। তিনি বললেন, সারা পৃথিবীর সকল মানুষকেও যদি তুমি আমার সামনে বধ করো, তবুও আমি আমার পরম আরাধ্যকে পরিত্যাগ করতে পারবো না। ফেরাউন তাঁর ছোট মেয়েকে হত্যা করার হুকুম দিলো। জল্লাদ তাকে ধরে এনে মাটিতে শুইয়ে দিলো। শিশুকন্যাটি ছিলো দুগ্ধপোষ্য। তবু তার কণ্ঠে কথা ফুটলো। মানুষের ইতিহাসে মাত্র চার জন দুগ্ধপোষ্য শিশু কথা বলেছিলো। তার মধ্যে ওই শিশুটিও একজন। সে বললো, মা! ধৈর্যধারণ করো। বিচলিত হয়ো না। আল্লাহ্ তোমার বাসস্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন জান্নাতে। সেখানে তোমার জন্য রয়েছে অভূতপূর্ব মর্যাদা। তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল্লাদ তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললো।

ফেরাউন এবার হিযকীলকে ধরে আনার জন্য লোক পাঠালো। লোকেরা ফিরে এসে জবাব দিলো, হিযকীল বাড়িতে নেই। সে নাকি এক পাহাড়ে গিয়ে উপাসনা শুরু করেছে। ফেরাউন দু'জন শান্ত্রীকে নির্দেশ দিলো, যেখানে পাও, তাকে ধরে আনো। শান্ত্রী দু'জন খুঁজতে খুঁজতে হিযকীলকে এক পাহাড়ের উপরে পেয়ে গেলো। সবিস্ময়ে দেখলো, তিনটি সারিতে সারিবদ্ধ হয়ে বনের হিংস্র পশুরা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। আর তিনি নিশ্চিন্ত মনে সেখানে নামাজ পাঠ করছেন। তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে হিযকীল বললেন, হে শান্ত্রীদ্বয়! ফিরে যাও। অগ্রসর হতে চেষ্টা করলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। তারা ফিরে গেলো। হিযকীল প্রার্থনা জানালেন, পরওয়ারদিগার আমার! বহু বছর ধরে আমি তো আমার ইমানকে গোপন করে রাখলাম। এখন কেউ যদি তা প্রকাশ করে দেয়, তবে তুমি তাকে এ পৃথিবীতেই শাস্তি দিয়ো। আর পরবর্তী পৃথিবীতে তাকে নিক্ষেপ কোরো নরকে। শান্ত্রী দু'জন ফেরাউনের দরবার অভিমুখে যাত্রা করলো। পথিমধ্যে তাদের একজনের ঘটলো অন্তর্বিপ্লব। সে আল্লাহ্ ও নবী মুসার উপরে ইমান আনলো। অপর জন রাজদরবারে গিয়ে বলে দিলো সব কথা। বললো, হিযকীল এখন আপনার নির্দেশবহির্ভূত। তিনি এখন এক আল্লাহ্‌র পূজারী। ফেরাউন তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলো, এ কি সত্য কথা বলেছে? ইমানদার শান্ত্রী বললো, সে যা বলছে, আমিতো সে সম্পর্কে কিছু জানি না। ফেরাউন ক্রোধান্বিত হলো। নির্দেশ দিলো, সংবাদদাতা শান্ত্রীকে প্রহার করে শূলে চড়ানো হোক।

www.eelm.weebly.com

ফেরাউনের স্ত্রী পরম রূপবতী মাননীয়া আসিয়াও ছিলেন বিশ্বাসবতী। অর্থ সচিবের স্ত্রীর দুর্গতি দেখে তিনি প্রমাদ গুণলেন। ভাবলেন, এই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীটির সঙ্গে আর কি ঘর করা সম্ভব! পথপ্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনাই তো এর নেই। তিনি চরম বুঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। ফেরাউন এলো। পাশে বসলো তার। অকস্মাৎ মহাপুণ্যবতী আসিয়া বলে উঠলেন, তুমি এতো জঘন্য! নিষ্ঠুর! নিষ্পাপ শিশুকন্যা দু'টিকে হত্যা করলে কোন আক্কেলে? ফেরাউন চমকে উঠলো। বললো, তোমারও শেষে মতিভ্রম ঘটলো নাকি? আসিয়া বললেন, মতিভ্রম আমার ঘটেনি, ঘটেছে তোমার। কেনো তুমি এখনো এই মহাসত্যটি স্বীকার করতে চাইছো না যে, তোমার আমার সকলের একমাত্র প্রভুপালয়িতা আল্লাহ্। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। ফেরাউন ক্রোধান্ধ হলো। ডেকে পাঠালো আসিয়ার পিতা-মাতাকে। বললো, দ্যাখো, তোমাদের মেয়ের দশা হয়েছে হিযকীলের স্ত্রীর মতো। আসিয়া তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিখিল বিশ্বের একমাত্র সৃজয়িতা ও পালয়িতা হচ্ছেন আল্লাহ্। তিনি সমকক্ষতা ও অংশীবাদিতা থেকে সতত পবিত্র। পিতা বললো, আসিয়া! তুমি কি আমালেকা সম্প্রদায়ের সবচেয়ে অভিজাত রমণী নও? তোমার স্বামী কি আমালেকাদের প্রভুপালক নয়? আসিয়া জবাব দিলেন, আমি এরকম অপবিশ্বাস থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় যাচনা করি। পিতা! তুমি যা বলছো, তা যদি সত্যি হয়, তবে ফেরাউনকে বলো, আমাকে যেনো সে এমন একটি মুকুট বানিয়ে দেয়, যার সামনে থাকবে সূর্য এবং পেছনে থাকবে চন্দ্র। আর পুরো মুকুটটি শোভিত থাকবে নক্ষত্রপুঞ্জ দিয়ে। ফেরাউন বিষয়টিকে আর দীর্ঘায়িত করতে দিলো না। বিদায় করে দিলো আসিয়ার পিতা-মাতাকে। তারপর তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে কীলক দিয়ে তাঁর হাত-পা টান করে পেরেক বিদ্ধ করে দিলো মাটিতে। আল্লাহ্পাক তাঁর দৃষ্টির সামনের অন্তরাল অপসারিত করলেন। আসিয়া তাকিয়ে রইলেন জান্নাতের অসংখ্য সুখপোকরণসমূহের দিকে। ফেরাউনের দেওয়া শাস্তির কষ্ট তাঁর অনুভূতিকে স্পর্শই করতে পারলো না। তিনি জান্নাতের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার পরম দয়াময় প্রেমময় প্রভুপালয়িতা। পৃথিবী আমি আর চাই না। চাই কেবল তোমার সকাশ। দয়া করে আমার অভিলাষ পূর্ণ করো। আল্লাহ্পাক তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করলেন। তাঁর পবিত্র প্রাণপাখিকে স্থান দিলেন তাঁর একান্ত সন্নিধানে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'যারা দেশে সীমালংঘন করেছিলো (১১), এবং সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিলো (১২)। অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন' (১৩)।

এখানে 'ত্বগাও' ফীল বিলাদ' অর্থ দেশে সীমালংঘন করেছিলো। 'আক্ছারূ ফীহাল ফাসাদ' অর্থ সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিলো। আর 'সাওত্বা আ'জাব' অর্থ শাস্তির কশাঘাত হানলেন। এখানে বিশেষণকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে বিশেষ্যের

www.eelm.weebly.com

সঙ্গে। মূল কথাটি ছিলো 'আ'জাবা সাওত্বিন'। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। যেমন বলা হয় 'আখলাকু ছিয়াবিন' (পুরাতন অনেক বস্ত্র) 'সাওত্ব' এর ধাতুগত অর্থ মিশিয়ে দেওয়া। অনেক সুতার মিশ্রণ বলেই সুতলিকে বলে 'সাওত্ব'। পরকালের শাস্তির প্রতিপক্ষে ইহকালের শাস্তি যেনো অসির প্রতিপক্ষে রশি। একারণেই এখানে পার্থিব শাস্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে রশির সাথে। কাতাদা বলেছেন, শাস্তির সাহায্যে পাকানো রশিই আল্লাহ্পাক ছুড়ে মেরেছিলেন তাদের দিকে। ভাষাবিদগণ বলেন, কথাটি রূপকার্থক। মূলতঃ শাস্তিটি ছিলো কঠিনতম। আর এখানকার 'সব্বা' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, ওই শাস্তি যেনো শাস্তির বৃষ্টিপাত। এমতাবস্থায় 'শাস্তির কশাঘাত হানলেন' কথাটির মর্মার্থ হবে— আল্লাহ্পাক তাদের উপরে সরাসরি অবতীর্ণ করেছিলেন সুকঠিন শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন'। বাক্যটি শপথের জবাব। অথবা জবাবটি অনুক্ত হলে, তার তাগিদ। 'মিরসাদ' অর্থ ঘাঁটি। এভাবে শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্ ঘাঁটিতে অবস্থান করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক চান তাঁর বান্দারা তাঁর প্রতি হোক সমর্পণপ্রবণ ও অনুগত। তাই তিনি তাদের কৃতকর্মের প্রতি রাখেন সদাসতর্ক দৃষ্টি। কোনো কিছুই তাঁর অবহিতিবহির্ভূত নয়। যেমন কোনো গোপন ঘাঁটির অতন্দ্র প্রহরীর দৃষ্টিবর্হিভূত নয় তার সম্মুখের ব্যক্তিদের গতিবিধি। কিন্তু মানুষ কতো উদাস। বিষয়টিকে গুরুত্বই দেয় না। মত্ত থাকে কেবল পার্থিবতার প্রেমে।

সূরা ফাজ্র ঃ আয়াত ১৫— ২৬

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَ نَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ
اَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَ اَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ
اَهَانَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿١٧﴾ وَ لَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى
طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٨﴾ وَ تَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَّ تُحِبُّوْنَ
الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾ كَلَّاۤ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَّ جَآءَ رَبُّكَ
وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَ جِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ
الْاِنْسَانُ وَ اَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٤﴾
فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗۤ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَّ لَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗۤ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾

www.eelm.weebly.com

q মানুষ তো এইরূপ যে, তাহার প্রতিপালক যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করিয়া, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।'

q এবং যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন তাহার রিয্ক সংকুচিত করিয়া, তখন সে বলে,'আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করিয়াছেন।'

q না, কখনও নহে। বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না,

q এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদিগকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না,

q এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করিয়া ফেল,

q এবং তোমরা ধন-সম্পদ অতিশয় ভালবাস;

q ইহা সংগত নহে। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে,

q এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হইবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফিরিশ্তাগণও,

q সেই দিন জাহান্নামকে আনা হইবে এবং সেই দিন মানুষ উপলব্ধি করিবে, তখন এই উপলব্ধি তাহার কী কাজে আসিবে?

q সে বলিবে, 'হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাইতাম?'

q সেই দিন তাঁহার শাস্তির মত শাস্তি কেহ দিতে পারিবে না,

q এবং তাঁহার বন্ধনের মত বন্ধন কেহ করিতে পারিবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— মানুষ সাধারণত অকৃতজ্ঞই হয়। যখন আল্লাহ্ তাদেরকে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিত্ত-বৈভব-খ্যাতি দান করে পরীক্ষায় নিপতিত করেন, তখন সে বলতে থাকে, দ্যাখো, আমার কতো সম্মান। সবাই কি এরকম সম্মান লাভের যোগ্য? এভাবে সে কৃতিত্ব জাহির করে নিজের। আবার যখন আল্লাহ্ তাদেরকে অভাব-অনটনে-পরীক্ষায় নিপতিত করেন, তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপন করে অভিযোগ। বলে, দ্যাখো, এতো লোক থাকতে আল্লাহ্ আমাকেই করলেন বিপদ কবলিত।

এখানে 'ফাইয়াক্বলু রব্বি আকরামান' অর্থ আমার প্রভুপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন। বাক্যটি আগের বাক্যের নিমিত্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ যেহেতু মানুষকে সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, সেকারণেই তারা এরকম বলে।

'ফা ক্বদারা আ'লাইহি রিয্ক্বাহু' অর্থ পরীক্ষা করেন তার রিজিক সংকুচিত করে। ক্বারী ইবনে আমের ও ক্বারী আবু জাফর এখানকার 'ফা ক্বদারা' শব্দটিকে পাঠ করতেন 'ফা ক্বদ্দারা' তাশদীদ সহযোগে। সাধারণভাবে অবশ্য 'ফা ক্বদারা'ই প্রচলিত। কেউ কেউ বলেছেন, তাশদীদ প্রযুক্ত হলে অর্থ হবে আল্লাহ্ যখন তাকে অভাবী করে দেন। আর তাশদীদবিহীনভাবে অর্থ দাঁড়াবে— যখন আল্লাহ্ দান করেন পরিমাণ মতো। কোনো কোনো বিদ্বান আবার বলেছেন, শব্দদু'টো সমঅর্থসম্পন্ন। অর্থাৎ যখন তিনি সংকুচিত করে দেন মানুষের জীবনোপকরণ।

www.eelm.weebly.com

আগের আয়াতে বলা হয়েছে সম্মান ও অনুগ্রহ দান করার কথা। পরে সম্মান ও অনুগ্রহের বিপরীতে বলা হয়েছে কেবল রিজিক সংকুচিত করার কথা। অথচ লাঞ্ছিত হওয়ার কথা বলাই ছিলো আপাত দৃষ্টিতে শোভন। কিন্তু সে রকম করা হয়নি একারণে যে, অভাব অনটন সব সময় অসম্মানের কারণ নয়। বরং তা কোনো কোনো সময় হয় পরকালের মহাসম্মান লাভের নিমিত্ত।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেবল দু'ধরনের লোকের প্রতি হিংসা সিদ্ধ। এক, ওই ব্যক্তি, আল্লাহ্ যাকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে সারাক্ষণ তা পাঠ করতে থাকে। দুই, ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ দান করছেন প্রতুল বিত্ত; আর সে তা অহরহ ব্যয় করতে থাকে আল্লাহ্র সন্তোষকামনায়। এই হাদিসের বক্তব্য দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, বিত্ত-সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ্র দান। এর মাধ্যমে পরজগতেও প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হওয়া যায়। এর জন্য যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ অপরিহার্য।

'ফা ইয়াক্বুলু রব্বী আহানান' অর্থ আমার প্রভুপালক আমাকে হীন করেছেন। বলা বাহুল্য, এরকম যারা বলে, তারা সংকীর্ণচিত্ত। তাদের চিন্তা সম্পৃক্ত কেবল এ জগতের সঙ্গে। অনটনাবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করা যে অপরিহার্য এবং এর মাধ্যমে যে দুনিয়া আখেরাতের প্রভূত কল্যাণ লাভ করা যায়, সে কথা তারা বুঝতেই পারে না। কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে উবাই ইবনে খলফ জুহুনীকে লক্ষ্য করে।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'না, কখনও নয়। বরং তোমরা ইয়াতিমকে সম্মান করো না'।

এখানে 'কাল্লা' অর্থ না, কখনো নয়। অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ ও ধৈর্যহীনেরা যেমন ভেবেছে, সেরকম কিছুতেই নয়। অকৃতজ্ঞতা ও অধৈর্য কখনো সফলতার পথ নয়। সফলতার অবলম্বন হচ্ছে কৃতজ্ঞতা ও সহিষ্ণুতা।

হজরত মাসআব ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা সা'দ নিজেকে অন্যদের চেয়ে অধিক সম্মানিত জন বলে মনে করতেন। একদিন রসুল স. তাঁকে ডেকে বললেন, মনে রেখো, তোমাদের রিজিক দেওয়া হয় দরিদ্র জনসাধারণের অসিলায়। বোখারী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিফল দিবসে নিঃস্ব মুহাজিরগণ বিত্তশালীদের চল্লিশ বৎসর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, বিত্তশালীদের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে বিত্তহীনেরা।

আর যদি অভাব-অনটনের সঙ্গে যুক্ত থাকে ধৈর্য ও আল্লাহ্র পরিতোষকামনা, তবে তো তা আল্লাহ্র নেয়ামত। অসম্মানজনক কিছু নয়। হজরত কাতাদা ইবনে নোমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যখন তাঁর কোনো বান্দাকে ভালোবাসতে শুরু করেন, তখন তাকে পৃথক রাখেন পার্থিবতা থেকে, যেমন তোমরা পানি থেকে পৃথক রাখো জলাতংক রোগীকে। আহমদ, তিরমিজি।

www.eelm.weebly.com

এরপরের 'বাল্‌লা' অর্থ বরং তা নয়। অর্থাৎ তোমরা এরূপ মনে করো না যে, অভাবীদের মধ্যে ফেলে রেখে আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে অসম্মান করছেন। 'তুক্‌রিমূনাল ইয়াতিম' অর্থ এতিমকে সম্মান করো না। অর্থাৎ তোমরা পিতৃহীনদের অভাবমোচন করো না। তাদের প্রতি প্রকাশ করো না সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি। এভাবে অসম্মান করছো তাদের অধিকারের।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানকার 'বরং' শব্দটির যোগসূত্র রয়েছে আগের আয়াতের 'তারা বলে' কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা যা বলে, তাতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, তারা পিতৃহীনদের দাবির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে না। পার্থিব ভোগসম্ভোগের মধ্যেই তারা আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখে নিজেদেরকে। মুকাতিল বলেছেন, উমাইয়া ইবনে খলফের পোষ্য ছিলো কুদামাহ্‌ ইবনে মাজউন। উমাইয়া তার অধিকার পূরণ করতো না। ক্বারী ইবনে আমের এখানকার 'লা তুক্‌রিমূনা' বাক্যটিকে পাঠ করতেন 'লা ইউক্‌রিমূনা'। অর্থাৎ তারা যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতো না। অনুরূপ পরবর্তী আয়াতের 'তাহাদ্বদ্বূনা' কে পাঠ করতেন 'ইয়াহাদ্বদ্বূনা', অর্থাৎ খাদ্যদানে তারা একে অপরকে উৎসাহিত করতো না। তেমনি এর পরের আয়াতদ্বয়েও বলা হয়েছে 'তারা উত্তরাধিকারীদের সম্পদ ভক্ষণ করতো' 'ধন-সম্পদ অতিশয় ভালোবাসতো'। এভাবে বুঝতে হবে, ১৭, ১৮, ১৯ সংখ্যক আয়াতের 'তারা' সর্বনাম সম্পর্কযুক্ত ১৫ সংখ্যক আয়াতের 'মানুষ' এর সঙ্গে, অথচ 'মানুষ' (ইনসান) শব্দটি একবচন। সেকারণে এখানকার 'মাব্‌তালাহু' (তাকে পরীক্ষা করেন) 'আকরামাহু' (তাকে সম্মানিত করেন) 'নাআ'মাহু' (তাকে অনুগৃহীত করেন) এবং ইয়াক্বুলু' (সে বলে) বাক্যাংশগুলোতে 'হু' (সে, তাকে) সর্বনামগুলো সম্পর্কযুক্ত হয়েছে 'ইনসান' (মানুষ) এর সঙ্গে।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না'। এখানকার 'ওয়া লা তাহাদ্বদ্বূনা' (পরস্পরকে উৎসাহিত করো না) ক্বেরাতটি কুফাবাসীদের। অন্যান্য ক্বারীর ক্বেরাত হচ্ছে 'ওয়ালা তাহুদ্বদ্বূনা'। দু'টো ক্বেরাতই অবশ্য সমঅর্থসম্পন্ন। অর্থাৎ অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্যদানে তোমরা একেবারেই উৎসাহবোধ করো না। এ ব্যাপারে পরস্পরকে কোনো তাগিদও দাও না।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে ফেলো'। একথার অর্থ— ন্যূনতম ন্যায়বিচারবোধও তোমাদের নেই। তা নাহলে তোমরা এভাবে বিধবা, এতিম ও অন্যান্য দুর্বল উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখতে পারতে না। ইবনে জায়েদ কথাটির অর্থ করেছেন— তোমরা হাতের কাছে যা পাও, তাই ভোগ করো, এরকম করা বৈধ কী অবৈধ, সে কথা একবারও ভেবে দ্যাখো না। কথাটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এরকমভাবেও— প্রাপ্ত সম্পদ হালাল, না হারাম, সে বিষয়ে তোমরা এতটুকু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দ্যাখো না। যা পাও, তাই লুটে পুটে খাও।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— ‘এবং তোমরা ধন-সম্পদকে অতিশয় ভালোবাস। এ কথার অর্থ— তোমাদের এমতো অপআচরণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তোমরা আসলে সম্পদলোভী, বিত্তপ্রেম তোমাদের মজ্জাগত।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— ‘এটা সঙ্গত নয়’। অর্থাৎ তোমাদের গর্হিত আচরণগুলোকে কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। শাস্তি থেকে যদি বাঁচতে চাও, চাও ইহ-পারত্রিক কল্যাণ, তবে তোমাদেরকে ওই কুঅভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করতেই হবে। মুকাতিল বলেছেন, এখানে ব্যবহৃত হয়েছে নেতিবাচক শব্দ ‘কাল্লা’ যার অর্থ কখনোই নয়। অর্থাৎ তারা তা কখনোই কার্যকর করবে না। অথবা যে সকল শাস্তির কথা এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে সে সকল শাস্তিতে তাদের নিপতিত হওয়ার সন্দেহটিকে অপসারিত করা হয়েছে এখানকার ‘কাললা’ কথাটির মাধ্যমে। অর্থাৎ ওই সকল শাস্তি থেকে তারা কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না।

এরপর বলা হয়েছে— ‘পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে’। অর্থাৎ যখন মহাপ্রলয় সমাগত হবে, তখন পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, করে ফেলা হবে কেবল সমতল ভূমি। উঁচু-নিচু কোনো কিছুই আর থাকবে না।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— ‘এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধ ফেরেশতাগণও’। এখানে ‘ওয়া জ্বাআ রব্বুকা’ অর্থ এবং যখন তোমার প্রভুপালক উপস্থিত হবেন। আল্লাহ্‌পাকের এমতো উপস্থিতি যে হবে আনুরূপ্যবিহীন তা বলাই বাহুল্য। কথাটি নিঃসন্দেহে মুতাশাবিহাত (দুর্জ্ঞেয়) আয়াতসমূহের অন্তর্গত। ‘আল্লাহ্ তাদের নিকট আগমন করবেন মেঘের ছায়ায়’ আয়াতের তাফসীরে এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনাও করা হয়েছে। ‘ওয়াল মালাকু’ অর্থ ফেরেশতাগণও যার ‘আলিফ লাম’ জাতিবাচক। অর্থাৎ ফেরশতা সম্পদায়। আর এখানকার ‘সফ্‌ফান্ সফ্‌ফা’ (সারিবদ্ধভাবে) পদটি ফেরেশতাদের অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ প্রতিফল দিবসে ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে থাকবে সারিবদ্ধভাবে।

ইবনে জারীর ও ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, জুহাক বলেছেন, মহাপ্রলয় দিবসে প্রথমে ভেঙে পড়বে পৃথিবীর নিকটতম আকাশ। ফেরেশতারা অবস্থান গ্রহণ করবে এক প্রান্তে। তারপর আল্লাহ্‌র আদেশে তারা নেমে আসবে পৃথিবীতে। যাবতীয় সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে দাঁড়িয়ে যাবে সারিবদ্ধ হয়ে। এরপর বিদীর্ণ হবে দ্বিতীয় আকাশ। তারপর একে একে ভেঙে যাবে তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশ। ওই আকাশসমূহের ফেরেশতারাও পৃথিবীতে নেমে এসে বৃত্তাকারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে পূর্বের সারিগুলোকে পরিবেষ্টন করে। সর্বোন্নত স্তরের ফেরেশতারা অবতরণ করবে সকলের শেষে। তাদের বাম পাশে আনা হবে জাহান্নামকে। জাহান্নাম দেখেই মানুষ প্রাণভয়ে পালাতে শুরু করবে। কিন্তু থেমে যাবে ফেরেশতাদের সাতটি দুর্ভেদ্য বেষ্টনী দেখে। এক সময় জনান্তিকে ঘোষিত হবে একটি আহ্বান। তারপর শুরু হবে হিসাব নিকাশ। ওই দিনের দুর্গতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে বেশ কিছুসংখ্যক আয়াতে। যেমন ‘নিশ্চয়

www.eelm.weebly.com

আমি তোমাদের জন্য ভয় করি মহাপ্রলয় দিবসের ......' 'যখন তোমার প্রভুপালনকর্তা আগমন করবেন' 'হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! যদি পারো, আকাশ-পৃথিবীর সীমানা ভেদ করে চলে যাও'।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'সেই দিন জাহান্নামকে আনা হবে এবং সেই দিন মানুষ উপলব্ধি করবে, তখন তার এই উপস্থিতি তার কী কাজে আসবে'?

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জাহান্নামের রয়েছে সত্তর হাজার লাগাম। প্রতিটি লাগাম ধরে টানবে সত্তর হাজার করে ফেরেশতা। এভাবে তাকে টেনে হিঁচড়ে সেদিন হাজির করানো হবে মহা সমাবেশস্থলে। মুসলিম, তিরমিজি এবং ইবনে ওয়াহাব উল্লেখ করেছেন, জায়েদ ইবনে আসলাম বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর কাছে আগমন করলেন জিবরাইল। হজরত আলী জানতে চাইলেন, তাঁর আগমনের হেতু কী? তিনি স. বললেন, তিনি নিয়ে এসেছিলেন প্রত্যাদেশ 'পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে .... সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে' পর্যন্ত। জাহান্নামের আছে সত্তর হাজার লাগাম। সত্তর হাজার করে ফেরেশতা প্রতিটি লাগাম ধরে টেনে টেনে তাকে নিয়ে আসবে হাশর প্রান্তরে। এর মধ্যে একবার ফেরেশতাদের হাত থেকে ফসকে যাবে লাগাম। ওই সুযোগে সে ছুটে যেতে চাইবে। কিন্তু পরক্ষণে সকল ফেরেশতা ধরে ফেলবে তার লাগাম। এভাবে টেনে ধরে রাখবে তাকে। নাহলে সে পুড়িয়ে দিবে মহাসমাবেশস্থলের সকল মানুষকে।

কুরতুবী বলেছেন, জাহান্নামকে বন্দী করে তার নিজস্ব স্থান থেকে টেনে ধরে আনা হবে বিচারস্থলের মহাসমাবেশে। জান্নাতবাসীদেরকেও তার উপরের পুলসিরাত অতিক্রম করে যেতে হবে জান্নাতে।

আবু লাইছের বর্ণনায় এসেছে, কা'ব বলেছেন, মহাপ্রলয়দিবসে ফেরেশতারা অবতরণ করে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ্ জিবরাইলকে আদেশ করবেন, জাহান্নামকে উপস্থিত করো। জিবরাইল সত্তর হাজার লাগাম দিয়ে জড়িয়ে জাহান্নামকে টানতে থাকবেন। হাশর প্রান্তরের একশত বৎসরের দূরত্বে থাকতেই জাহান্নাম ছাড়বে একটি নিঃশ্বাস। ওই নিঃশ্বাসের উত্তাপে মানুষের প্রাণপাখি বেড়িয়ে যেতে চাইবে। দ্বিতীয় নিঃশ্বাস ছাড়লে হৃৎকম্পন শুরু হবে সকলের। জীবন হবে কণ্ঠাগত। লোপ পেয়ে যাবে বিবেক-বুদ্ধি। এমন কি নবী ইব্রাহিমও নিরুপায় হয়ে আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর সখ্যের দোহাই দিয়ে পরিত্রাণ প্রার্থনা করবেন কেবল তাঁর নিজের জন্য। নবী মুসা নিবেদন করবেন, হে আমার প্রভুপালক! তুমি আমাকে দোয়ার ভাণ্ডার দান করে অনুগৃহীত করেছো। সেই দোয়ার ভাণ্ডারের দোহাই দিয়ে মিনতি জানাই, তুমি আমাকে পরিত্রাণ দাও। হজরত ঈসা বলবেন, ইয়া ইলাহী! তুমি আমাকে দান করেছো প্রভূত সম্মান। তোমার সেই মহাঅনুদানের অসিলা দিয়ে আমি ত্রাণ চাই কেবল আমার জন্য। আমার জন্মদাত্রী জননীর জন্যও আমি তোমার কাছে সুপারিশ করি না। শেষে, শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম

www.eelm.weebly.com

রসুল প্রার্থনা জানাবেন, হে মহাপ্রতাপশালী! সর্বজ্ঞ! সর্বশক্তিধর! আজ আধিপত্য কেবলই তোমার। দয়া করে তুমি আমার উম্মতকে রক্ষা করো। আমার পরিণতি নিয়ে আমি ভাবি না। আজ চাই কেবল আমার উম্মতের পরিত্রাণ। আল্লাহ্ বলবেন, প্রেমাস্পদ আমার! তোমার উম্মতের মধ্যে যারা আমার বন্ধু (আওলিয়া) তাদের কোনো ভয় নেই। আমি আমার মহামর্যাদার শপথ করে বলছি, তোমার উম্মতের ব্যাপারে আমি তোমার চক্ষুযুগলকে শীতল করে দিবো। হে আমার প্রিয়তমজন! মস্তক উত্তোলন করো। দাঁড়াও। ফেরেশতারা তখন সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আল্লাহ্‌র আদেশের অপেক্ষায়।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'সে বলবে, হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম'। একথার অর্থ— পৃথিবীর জীবনে যারা সুখে থাকলে গর্ব করতো এবং দুঃখ-কষ্টে পড়লে ধৈর্য ধারণের বদলে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতো, তারা তখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে। আক্ষেপ প্রকাশ করবে এই বলে যে, যথাসময়ে যদি আমরা সত্য উপলব্ধি করতে পারতাম, তবে আজকের এই কঠিন বিপদের দিনে পরিত্রাণের নিমিত্ত স্বরূপ করতে পারতাম কিছু পুণ্যসঞ্চয়।

প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ তাদের এমতো আক্ষেপ তখন তাদের কোনো উপকারে আসবে না। কেননা তারা ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আয়াতখানি আবার একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাবও বটে। প্রশ্নটি হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন কী করবে? এর উত্তর হচ্ছে— তারা তখন তাদের ভুলের জন্য আফসোস করতে থাকবে। বলবে, হায়! পৃথিবীর জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করে যথাসময়ে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে পারতাম, তবে আজ তার প্রতিফল পেতাম হাতে হাতে। বাঁচতে পারতাম এই মহাদুর্বিপাক থেকে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেদিন তাঁর শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিতে পারবে না (২৫), এবং তাঁর বন্ধনের মতো বন্ধন কেউ করতে পারবে না'(২৬)।

এখানে 'আ'জাবাহু' অর্থ তাঁর শাস্তি। 'তাঁর শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিতে পারবে না' অর্থ তাঁর দেওয়া শাস্তির তুলনাই হয় না। 'তাঁর বন্ধনের মতো বন্ধন কেউ করতে পারবে না' অর্থও তেমনি তাঁর শাস্তির বন্ধনও অতুলনীয়। এরকম আষ্টে-পৃষ্ঠে চিরদিনের জন্য শাস্তির বাঁধনে বাঁধার ক্ষমতা কারো নেই। এখানে 'তাঁর শাস্তি' এবং 'তাঁর বন্ধন' কথা দু'টোর 'তাঁর' সর্বনাম হয় কর্তৃবাচক, নয় তো কর্মবাচক। কর্তৃবাচক হলে কথাটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌র শাস্তি। অর্থাৎ মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ অপরাধীদেরকে যেভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে শাস্তি দিবেন, সেভাবে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। কেননা সার্বভৌমত্ব এবং আধিপত্য হবে এককভাবে শুধু তাঁর। দ্বিতীয় অবস্থায় সর্বনামটি হবে কর্মবাচক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— নরকের প্রহরীরা তাদেরকে

www.eelm.weebly.com

যেভাবে শক্ত করে বেঁধে শাস্তি দিতে থাকবে, সেরকম শাস্তি কেউ কাউকে দিতে পারবে না। এই ব্যাখ্যাটিকে সঙ্গতিপূর্ণ বলে ভাবা যেতে পারবে তখন, যখন 'শাস্তি কেউ দিতে পারবে না' এবং 'বন্ধন কেউ করতে পারবে না' ক্রিয়াদু'টোর কালাধাররূপে নির্ণয় করা হবে 'সেই দিন' কথাটিকে। আর যদি ধরে নেয়া হয়, ক্রিয়া দু'টো সম্পর্কযুক্ত রয়েছে 'সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে' কথাটির সঙ্গে, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে তখন এমন ভাবে বাঁধবেন ও শাস্তি দিবেন যে, সেরকম শাস্তি তিনি কাউকে দেননি, দিবেনও না। ব্যাখ্যাগুলো করা হলো প্রসিদ্ধ ক্বেরাত অনুসারে। কিন্তু ক্বারী কাসাই এবং ক্বারী ইয়াকুবের ক্বেরাত অনুসারে এখানকার 'ইউআ'জজিবু' হবে 'লা ইউআ'জজাবু' এবং 'ইউছিক্বু' হবে 'ইউছাক্বু'— কর্মপদবাচক পদের শব্দরূপ। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সেদিন এমন শাস্তি কাউকে দেওয়া হবে না, যেমন শাস্তি দেওয়া হয় সাধারণ দণ্ডবিধি অনুসারে। বাঁধাও হবে না তাদেরকে সাধারণ কয়েদীদের মতো করে। অথবা বক্তব্যটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ, কিংবা বিশেষরূপে। আর ওই বিশেষ ব্যক্তিটি ছিলো উমাইয়া ইবনে খালফ।

সূরা ফাজ্বর ঃ আয়াত ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾

r হে প্রশান্ত চিত্ত!

r তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া আইস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া,

r আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও,

r আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

'ইয়া আইয়্যাতুহান নাফসুল মুত্বমাইন্নাহ্' অর্থ হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি! বাক্যের পূর্বে অনুক্ত রয়েছে একটি ক্রিয়াপদ, একটি পৃথক বাক্য, যা একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব। আর ওই প্রশ্নটি হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কী দুর্গতি হবে তা তো জানা গেলো। বিশ্বাসীদের পরিণতি তা হলে হবে কী?

'নাফসুল মুত্বমাইন্নাহ্' অর্থ ওই প্রবৃত্তি, যা আল্লাহ্র স্মরণে ও আনুগত্যে শান্তিপ্রাপ্ত, যেমন পানির ভিতরে শান্তি পায় মাছ। প্রবৃত্তি প্রশান্ত হতে পারে তখন, যখন তার মধ্যে অসুন্দর ও অশ্লীলতার প্রতি আকর্ষণ আর থাকেই না। আল্লাহ্পাকের গুণাবলীর জ্যোতিচ্ছটা যখন তার উপরে পতিত হয়, তখনই সে কেবল হতে পারে যাবতীয় অপপ্ররোচনা মুক্ত। তখন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সেই জ্যোতিচ্ছটার মধ্যে হয়ে যায় বিলীন। এটাই ফানা। আর এই অবস্থা স্থায়ী যখন হয়, তখনই তাকে বলে বাকা। নফসের এই ফানা-বাকার আগে হয় কলবের

www.eelm.weebly.com

ফানা-বাকা। আর তা হয় আল্লাহ্র জিকিরের নিরবচ্ছিন্নতার মাধ্যমে। নফস মুতমাইন্নাহ্ বা প্রশান্ত যখন হয়, তখনই লাভ হয় প্রকৃত ইমান। যেমন কুকুর একটি অপবিত্র প্রাণী, যা ভক্ষণ করা হারাম। তবে লবনের মধ্যে একে নিমজ্জিত করা হলে তার অপবিত্রতা যায় উবে। সম্পূর্ণটাই তখন হয়ে যায় লবন। তখন তা ভক্ষণ করা আর নিষেধ থাকে না।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে'।

এখানে 'রদ্বীয়াহ্' অর্থ সন্তুষ্ট এবং 'মারদ্বিয়াহ্' অর্থ সন্তোষভাজন। বান্দা যখন আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তখন আল্লাহ্ও তার প্রতি পরিতুষ্ট হন এবং তখনই সে হয়ে যেতে পারে আল্লাহ্র সন্তোষভাজন। বরং আল্লাহ্র সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি সন্তুষ্ট থাকাই তাঁর সন্তোষভাজন হওয়ার নিদর্শন। হাসান বসরী বলেছেন, আল্লাহ্পাক যখন কোনো প্রশান্তহৃদয় প্রবৃত্তিকে গ্রহণ করতে চান, তখন তার হৃদয় ও প্রবৃত্তি হয় আরো অধিক প্রশান্ত। ফলে সে হয়ে যায় আল্লাহ্র পরিতোষভাজন।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, যারা আল্লাহ্র সাক্ষাত পছন্দ করে, আল্লাহ্ও তাদের সাক্ষাতে প্রীত হন। একথা শুনে জননী আয়েশা, অথবা অন্য কোনো উম্মতজননী জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু মৃত্যু তো কারো পছন্দ নয়। তিনি স. বললেন, না। ব্যাপারটা ওরকম নয়। মৃত্যু যখন কারো কাছে মহাসৌভাগ্যের শুভসংবাদ নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন পরকাল যাত্রা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতি তার আকর্ষণ আর থাকে না। আর মৃত্যু যখন কারো কাছে মহাশাস্তির পূর্বাভাষ হয়ে আসে, তখন চিরতরে হারিয়ে যায় তার সকল স্বস্তি। পরযাত্রা করতে হয় তাকে বাধ্য হয়ে। বোখারী, মুসলিম। জননী আয়েশার আর এক বর্ণনায় এসেছে, মৃত্যু আসে আল্লাহ্র পরম সাক্ষাতের পূর্বে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন রসুল স. বলেছেন, মুমিনের পরলোকগমনের প্রাক্কালে শুভ্র রেশমী বস্ত্র নিয়ে রহমতের ফেরেশতারা উপস্থিত হয়। বলে, হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি! তোমার প্রভুপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। এ ডাক শুনে বের হয়ে আসে মেশকের মতো সুরভিময় পবিত্র রূহ। ফেরেশতাদের মাধ্যমে হাত বদল হতে হতে সে পৌঁছে যায় আকাশের দরজায়। সেখানকার ফেরেশতারা বলে, এতো দেখছি পবিত্র ও প্রশান্ত রূহ। রূহবাহী ফেরেশতারা বলে, একে মিলিয়ে দাও পবিত্র রূহগুলোর সঙ্গে। তাই করা হয়। পবিত্র রূহবৃন্দ নতুন সাথী পেয়ে মেতে উঠে আনন্দে, যেমন আনন্দাপ্লুত হয় বন্ধুরা তাদের হারানো বন্ধুকে ফিরে পেলে। তাদের একজন নতুন সাথীকে জিজ্ঞেস করে, অমুকের কী খবর? অন্যরা বলে, তুমি থামোতো। অস্বস্তিকর স্থান ছেড়ে ও কেবল তো এলো। ওকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও। নতুন অতিথি তবুও তার সাথীর প্রশ্নের জবাবে হয়তো বলে, অমুকের কথা জিজ্ঞেস করছেন? সে তো চলে গিয়েছে তার আসল ঠিকানায় (হাবিয়া দোজখে)। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যুকাল যখন সমাগত হয়, তখন তার

www.eelm.weebly.com

কাছে উপস্থিত হয় শাস্তির ফেরেশতারা। বলে, হে অপবিত্র নফস! বের হয়ে এসো আল্লাহ্‌র রোষতপ্ততার দিকে। তোমার প্রতি আল্লাহ্‌ অপ্রসন্ন। একথা বলে তারা তাকে জোর করে বের করে আনে। নিয়ে যায় সিজ্জীনের দরজায়। সেখানকার ফেরেশতারা বলে, উহ! কী দুর্গন্ধ! এরপর তারা তাকে মিলিয়ে দেয় তার হতভাগ্য পূর্বসূরীদের সঙ্গে।

ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসেও এরকম বলা হয়েছে। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— বিশ্বাসীদের রূহ উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ঊর্ধ্বাকাশে। তার জন্য খুলে দেওয়া হয় আকাশের দ্বার। বলা হয়, পবিত্রাত্মার জন্য অভিনন্দন। আর অবিশ্বাসীদের আত্মাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলেও আকাশের দ্বার তার জন্য খোলা হয় না। বলা হয় এর আগমন অশুভ। অভিনন্দন এর প্রাপ্য নয়। সুতরাং একে নিক্ষেপ করো দূরে। তাই করা হয়। তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তার সমাধিক্ষেত্রে। এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে আরো অনেক। তবে এই বিষয়টি কোনোক্রমেই তেমন স্পষ্ট নয় যে, এরকম কথা বলা হবে আসলে কখন। কেউ বলেছেন, এরকম কথোপকথন হয় মৃত্যুর সময়। একথার সমর্থন রয়েছে অনেক হাদিসে। আবু সালেহ বলেছেন, অন্তিম যাত্রার সময় বলা হয় 'এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে'। আর প্রতিফল দিবসে বলা হবে, 'আমার বান্দাদের অন্তর্ভূত হও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো'। কিছুসংখ্যক বিদ্বান বলেছেন, কবর থেকে পুনরুত্থিত করার সময় বলা হবে 'ইরজ্বিঈ' ইলা রব্বিক, ওয়াদখুলী ফী আজ্বসাদি ই'বাদী'। (স্বীয় পালনকর্তার দিকে ফিরে এসো, আর আমার বান্দার নিজ দেহে প্রবেশ করো)। অর্থাৎ তাকে তখন হুকুম দেওয়া হবে তার নিজ দেহে প্রবেশের। এরকম বলেছেন ইকরামা, আতা, জুহাক এবং আউফি সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস।

হাসান বসরী বলেছেন, আলোচ্য বক্তব্যটির মর্মার্থ হবে এরকম— হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি! ফিরে এসো আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক প্রদত্ত মর্যাদা ও পুণ্যের দিকে। তিনি তোমার জন্য যা প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাতে সন্তুষ্ট হও; জেনে রাখো, তিনিও তোমার প্রতি তুষ্ট। আর আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন দাসদের দলভূত হয়ে প্রবেশ করো জান্নাতে।

আমি বলি, বক্তব্যের গতি-প্রকৃতি এমতো ব্যাখ্যারই সমর্থক। অর্থাৎ প্রবৃত্তিকে উদ্দেশ্য করে এরকম বলা হবে পুনরুত্থান দিবসে। যেমন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের তখনকার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে 'সেদিন তাঁর শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিতে পারবে না এবং তার বন্ধনের মতো বন্ধন কেউ করতে পারবে না' (২৫, ২৬)। তবে ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, এরকম বলা হবে তাদের মৃত্যুকালে। এমতো দ্বন্দ্ব নিরসনার্থে বলা যেতে পারে, এরকম বলা হবে মৃত্যু ও পুনরুত্থান উভয় সময়ে। তবে প্রশান্ত প্রবৃত্তি এরকম যোগ্যতা লাভ করে তার পৃথিবীর জীবনেই। অর্থাৎ পৃথিবীতেই সে হয় প্রশান্ত ও তুষ্ট। একারণেই তাকে সম্বোধন করে বলা হয়, 'ফিরে এসো তোমার প্রভুপালনকর্তার দিকে'।

www.eelm.weebly.com

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমার বান্দাদের অন্তর্ভূত হও (২৯); আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো' (৩০)।

এখানে 'ই'বাদী' অর্থ বান্দাগণ, যাঁরা পুণ্যবান। এই পুণ্যবানদের দলভূত হওয়ার আকাংখা নবী সুলায়মান প্রকাশ করেছিলেন এভাবে 'আর তুমি অনুকম্পা পরবশ হয়ে আমাকে দলভূত কোরো তোমার পুণ্যবান বান্দাদের'। নবী ইউসুফ বলেছিলেন 'তুমি আমার মৃত্যু দাও মুসলমান অবস্থায়। আর আমাকে দলভুক্ত করো পুণ্যবানদের'। আল্লাহ্পাক স্বয়ং ইবলিসকে এদের সম্পর্কেই বলেছিলেন যে, তুমি তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

'ফাদ্খুলী' অর্থ অন্তর্ভুক্ত হও। এখানকার 'ফা' অব্যয়টি নৈমিত্তিক। অর্থাৎ সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হওয়াই বিশুদ্ধ দাসত্ব অর্জনের নিমিত্ত। এমতো দাসত্ব অর্জন করা সম্ভব হবে কেবল তখন, যখন প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখা যাবে মিথ্যা উপাস্যসমূহের অপপ্রভাব থেকে এবং শয়তানী প্ররোচনার সকল সূত্র থেকে। উল্লেখ্য, অন্য এক আয়াতে প্রবৃত্তিপূজকদেরকে গঞ্জনা দিয়ে আল্লাহ্পাক বলেছেন 'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা উপাস্য নির্ধারণ করে নিয়েছে তাদের প্রবৃত্তিকে'। আর রসুল স. তাদেরকে তিরস্কার করে বলেছেন, যারা বিত্তের দাস, তারা অধম।

'ওয়াদ্খুলী জান্নাতী' অর্থ আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো। আল্লাহ্পাক এখানে এই জান্নাতকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন তাঁর নিজের সত্তার সঙ্গে। সুতরাং বুঝতে হবে, যে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য তিনি প্রশান্ত প্রবৃত্তিধারীদেরকে ডাকবেন, সেই জান্নাত নিশ্চয়ই হবে অন্যান্য জান্নাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস পরলোকগমন করেছিলেন তায়েফে। আমি তার জানাযায় উপস্থিত হলাম। অকস্মাৎ উড়ে এলো অদৃশ্যপূর্ব এক পাখি। পাখিটি ঢুকে পড়লো তাঁর নিঃসাড় দেহের ভিতরে। আর বের হলো না। যখন তাঁকে সমাধিস্থ করা হলো, তখন নেপথ্য থেকে কে যেনো আবৃত্তি করলো 'হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি! তুমি তোমার প্রভুপালকের নিকটে ফিরে এসো পরিতুষ্ট ও পরিতোষভাজন হয়ে, আমার বান্দাদের অন্তর্ভূত হয়ে। আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো'।

হজরত বুরাইদা থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিলো শহীদশ্রেষ্ঠ মহামান্যবর হামযাকে লক্ষ্য করে। জুহাক সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতগুচ্ছ অবতীর্ণ হয়েছে মহামাননীয় খলিফা ওসমান ইবনে আফ্ফানকে কেন্দ্র করে।

দ্রষ্টব্যঃ কোনো কোনো সুফী আউলিয়া আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ করেন এভাবে— ওহে পৃথিবীর মোহে মগ্ন প্রবৃত্তি! ছিন্ন করো পার্থিবতার সর্বশেষ আকর্ষণ সূত্র। সম্পূর্ণরূপে হও আল্লাহ্অভিমুখী। ধরো তাদের তরিকা (পথ) যারা সতত পরিভ্রমণরত আল্লাহ্র পথে।

www.eelm.weebly.com

সূরা বালাদ

সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে চিরজ্যোতির্ময় পুণ্যধাম মক্কায়। এতে রয়েছে ১ রুকু এবং ২০ আয়াত।

সূরা বালাদ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

لَاۤ اُقۡسِمُ بِهٰذَا الۡبَلَدِ ﴿۱﴾ وَ اَنۡتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الۡبَلَدِ ﴿۲﴾ وَ وَالِدٍ وَّ مَا وَلَدَ ﴿۳﴾ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِیۡ کَبَدٍ ﴿۴﴾ اَیَحۡسَبُ اَنۡ لَّنۡ یَّقۡدِرَ عَلَیۡهِ اَحَدٌ ﴿۵﴾ یَقُوۡلُ اَهۡلَکۡتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿۶﴾ اَیَحۡسَبُ اَنۡ لَّمۡ یَرَهٗۤ اَحَدٌ ﴿۷﴾ اَلَمۡ نَجۡعَلۡ لَّهٗ عَیۡنَیۡنِ ﴿۸﴾ وَ لِسَانًا وَّ شَفَتَیۡنِ ﴿۹﴾ وَ هَدَیۡنٰهُ النَّجۡدَیۡنِ ﴿۱۰﴾

- আমি শপথ করিতেছি এই নগরের
- আর তুমি এই নগরের অধিবাসী,
- শপথ জন্মদাতার ও যাহা সে জন্ম দিয়াছে।
- আমিতো মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে
- সে কি মনে করে যে, কখনও তাহার উপর কেহ ক্ষমতাবান হইবে না?
- সে বলে, 'আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করিয়াছি।'
- সে কি মনে করে যে, তাহাকে কেহ দেখে নাই?
- আমি কি তাহার জন্য সৃষ্টি করি নাই দুই চক্ষু?
- আর জিহ্বা ও দুই ওষ্ঠ?
- আর আমি তাহাকে দুইটি পথ দেখাইয়াছি।

প্রথমে বলা হয়েছে 'লা উক্বসিমু বিহাজাল বালাদ' (আমি শপথ করছি এই নগরের)। এখানকার 'লা' শব্দগতভাবে সংযোজিত হয়েছে অতিরিক্ত হিসেবে এবং অর্থগতভাবে বক্তব্যকে গুরুত্ববহ করার উদ্দেশ্যে। 'লা' এর অতিরিক্ততা এটাই ইঙ্গিত প্রদান করে যে, বিষয়টি অতিনিশ্চিত, তাই এ সম্পর্কে শপথ না করলেও চলে। আর 'হাজাল বালাদ' অর্থ এই নগরের। অর্থাৎ মক্কার।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আর তুমি এই নগরের অধিবাসী'। কথাটি পূর্বোক্ত বাক্যের অবস্থাপ্রকাশক। আল্লাহ্পাক পুণ্যভূমি মক্কার শপথ করেছেন— একথা ঠিক, কিন্তু একথাও ঠিক যে, শপথটি সীমিতার্থক। অর্থাৎ

www.eelm.weebly.com

শপথ মক্কার একারণে যে, এ নগর মহিমান্বিত। আর এর মহিমা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম রসুলের অবস্থানের কারণে। রসুল স. হিজরতের প্রাক্কালে মক্কাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, সকল নগরী অপেক্ষা তুমি অধিকতর সুন্দর, মহিমময়। মক্কাবাসীরা আমাকে বের করে না দিলে আমি কখনোই তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতাম না। হাদিসটি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন তিরমিজি এবং বলেছেন, বর্ণনাটি সূত্রগতভাবে উত্তম, বিশুদ্ধ ও দুর্লভ শ্রেণীর। অনুরূপ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আদী থেকে তিরমিজি ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন বলেছিলেন, প্রিয়তম মক্কা আমার ! শপথ আল্লাহ্‌র, তুমি আল্লাহ্‌র নিকট সকল নগরী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আমাকে বের করে না দেওয়া হলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।

এখানকার 'হিল্লুন' অর্থ মুস্তাহিল (বৈধ), হালাল মনে করা। অর্থাৎ হে আমার নবী! আপনাকে এ শহর থেকে বের করে দেওয়াকে আপনার শত্রুরা হালাল মনে করে, যেমন হালাল মনে করা হয় হেরেম শরীফের বাইরে শিকার করাকে। এভাবে এখানে যেনো মক্কার মুশরিকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে এই বলে যে, হে আমার নবী! আপনাকে বন্দী, হত্যা, অথবা দেশান্তর করা তাদের বিবেচনায় বৈধ। কথাটির মর্মার্থ এরকমও করা হয়েছে যে— হে আমার রসুল! অন্য সকলের জন্য নিষিদ্ধ হলেও আপনার জন্য এই নগরীতে কাউকে বন্দী অথবা হত্যা করা বৈধ। এরকম ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে বুঝতে হবে, বক্তব্যটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী ও একটি অঙ্গীকার। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রত্যাদেশবাহক! আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, বিজয়ী আমি আপনাকে করবোই। সেদিন বেশী দূরে নয়। যখন মক্কা ও মক্কাবাসীসহ সমগ্র আরব ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে কেবল আপনার। তখন কিছুকালের জন্য এই শহরে রক্তপাত ঘটানো হবে আপনার জন্য বৈধ। বলা বাহুল্য, এরকমই ঘটেছিলো। মক্কাবিজয়ের দিবসে তিনি বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। নির্দেশ দিয়েছিলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে হানযালাকে বধ করতে হবে, যেখানে তাকে পাওয়া যাবে সেখানেই। সে আঁকড়ে ধরেছিলো কাবা গৃহের গেলাফ। সেখান থেকে তাকে টেনে এনে হত্যা করেছিলেন হজরত মাকীস ইবনে খাবাবা ও তাঁর সঙ্গীগণ। তিনি স. তখন বলেছিলেন, আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির দিবস থেকেই আল্লাহ্ এই নগরীকে করেছেন মহাসম্মানিত। মহাপ্রলয় পর্যন্ত বজায় থাকবে এই নগরীর মহামর্যাদা। এখানে রক্তপাত নিষিদ্ধ। আমার পূর্বে এখানে রক্তপাত ঘটানো কারো জন্য বৈধ ছিলো না। বৈধ থাকবে না আমার পরেও। আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে কেবল দিবসের একাংশের জন্য। এখানে রক্তপাত তো নিষিদ্ধই, তদুপরি নিষিদ্ধ এখানকার বৃক্ষকর্তন ও তৃণগুল্ম উচ্ছেদ। কোনো শিকার এখানে আশ্রয় গ্রহণ করলে তাকেও সংহার করা যাবে না । এখানকার পরিত্যক্ত সম্পদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে না কারো অধিকার। তবে হ্যাঁ, পরিত্যক্ত সম্পদের ঘোষণা দিয়ে সে তা প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত আমানত হিসেবে নিজের কাছে রাখতে পারবে।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে'। এখানে 'ওয়ালিদিন' অর্থ জন্মদাতা। অর্থাৎ মানুষের প্রথম পিতা নবী আদম, অথবা মুসলিম মিল্লাতের পিতা নবী ইব্রাহিম, অথবা সকল পিতা, যারা তাদের আপন আপন সন্তান-সন্ততির জনক।

'ওয়ামা ওয়ালাদ' অর্থ যা সে জন্ম দেয়। কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে সকল আদম সন্তানকে, অথবা নবী ইব্রাহিমের বংশোদ্ভূত নবীগণকে। অথবা কেবল রসুল স.কে। এখানকার অনির্দিষ্টবাচক অব্যয় 'মা' মাহাত্ম্যপ্রকাশক। 'মান' (যে ব্যক্তি) এর স্থলে 'মা' (যা) এখানে বিস্ময়প্রকাশক। 'মা' এর এরকম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন 'আর আল্লাহ তা জানেন, যা সে প্রসব করেছে'। সেরূপ এখানেও 'মান' এর স্থলে ব্যবহার করা হয়েছে 'মা'।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে'। বাক্যটি পূর্বোক্ত শপথের জবাব। আর এখানকার 'আল ইনসান' এর আলিফ লাম জাতিবাচক। অর্থাৎ যে কোনো মানুষ। অথবা বিশেষ কোনো মানুষ। যেমন আবুল আসাদ। এক বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছিলো আবুল আসাদ সম্পর্কে। তার আসল নাম ছিলো উসায়েদ ইবনে কেলাদা ইবনে জমুহ। সে ছিলো খুবই বলশালী। উকাজী চামড়ার উপরে দাঁড়িয়ে সে বলতো, যে আমার পায়ের নিচের চামড়া সরিয়ে নিতে পারবে, তার জন্য রয়েছে এতো এতো পুরস্কার। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে কেউ পুরস্কার নিতে পারেনি। চামড়া ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়েছে। কিন্তু তাকে তার স্থান থেকে কেউ নড়াতে পারেনি এতটুকুও।

'কাবাদ' অর্থ কষ্ট-ক্লেশ। এখানকার 'আল ইনসান' এর 'আল' যদি জাতিবাচক হয়, তবে শব্দটির অর্থ হবে দুঃখ-কষ্ট। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে আমি দিয়েছি ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবন। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি মানুষের জন্ম, প্রবৃদ্ধি ও পরিণতি ঘটাই বিভিন্ন ক্লেশকর পর্যায়ের মাধ্যমে। যেমন ভ্রূণ, মাতৃজঠরের তমসা, ভূমিষ্ট হওয়ার অস্বস্তি, দুগ্ধপানের মুখাপেক্ষিতা, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থা। যৌবনের জীবিকার্জন চেষ্টা, বার্ধক্যের দৌর্বল্য, মৃত্যুর যন্ত্রণা— সবকিছুই তো ভোগ করতে হয় মানুষকে।

আমি বলি, অন্যান্য প্রাণীর জীবনও এরকম ঘাত-প্রতিঘাতময়। সুতরাং জৈবিক দুঃখ-কষ্ট এখানকার বক্তব্যবিষয় নয়। বরং এখানে বলা হয়েছে বুদ্ধিগত ঘাত-প্রতিঘাত দুঃখ-ক্লেশের কথা। অন্যান্য প্রাণীর বিবেক-বুদ্ধি নেই। তাই তাদের দুঃখ-ক্লেশের উপলব্ধিও অত্যন্ত সীমিত। মানুষ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন। তাই প্রকৃত দুঃখভোগ করতে হয় তাদেরকেই। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে বলা হয়েছে 'আমানত' বহনের দুঃখ-ক্লেশের কথা, যে আমানতের দায়িত্ববহনের আমন্ত্রণ পেয়ে সভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছে আকাশ-পৃথিবী-পাহাড়-পর্বত। অথচ মানুষ তা স্বস্কন্ধে তুলে নিয়েছে অবলীলায়। এখন এই দায়িত্ববহনের কষ্ট যারা স্বীকার করবে, তারাই আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন; আর যারা তা করবে না, তারা অবশ্যই হবে

www.eelm.weebly.com

শাস্তিগ্রস্ত। এরকম ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে আয়াতখানি হয়ে যায় অন্য আর একটি আয়াতের সমার্থক, যেখানে বলা হয়েছে 'আমি জ্বিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমারই ইবাদত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে'। উল্লেখ্য, মহান ধর্ম ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে রসুল স.কে ভোগ করতে হতো অনেক দুঃখ-যাতনা। তাই আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মাঝে মাঝে তাকে সান্ত্বনা দান করতেন। আলোচ্য আয়াতখানিও তেমনি একটি সান্ত্বনা প্রদানকারী আয়াত। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ ছিলো আবুল আসাদ, এরকম মন্তব্য করার পর মুকাতিল বলেছেন, এখানকার 'কাবাদ' অর্থ শক্তি, বল।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'সে কি মনে করে যে, কখনো তার উপরে কেউ ক্ষমতাবান হবে না'। এখানে 'আ ইয়াহ্সাবু' অর্থ সে কি মনে করে? কথাটির কর্তা আগের আয়াতের 'মানুষ'। আর 'মানুষ' যদি এখানে আবুল আসাদ হয়, তবে ধরে নিতে হবে, এটা তার প্রতি এবং তার মতো অন্যান্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর প্রতি হুমকি। অর্থাৎ ক্ষমতার দর্প তাদেরকে পরিত্যাগ করতেই হবে। নতুবা শিকার হতে হবে করুণ পরিণতির, আর যদি 'মানুষ' অর্থ হয় মানব জাতি, তবে বুঝতে হবে এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে আবুল আসাদ, ওলীদ ইবনে মুগীরা ও তার মতো কতিপয় দুরাচারকে, যারা রসুল স.কে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতো। সর্বাবস্থায় প্রশ্নটি হবে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক এবং প্রতাপপ্রকাশক।

'আল্ লাঁই ইয়াক্বদিরা আ'লাইহি আহাদ' অর্থ কখনো তার উপরে কেউ ক্ষমতাবান হবে না? অর্থাৎ এরকম অপধারণা তারা যদি করেই, তবে এই মুহূর্তে সাবধান হয়ে যাক। পরিত্যাগ করুক দম্ভ, অহমিকা। নতুবা পরিত্রাণ তাদের কপালে জুটবে না। এখানে না বাচক বক্তব্যের পর উল্লেখ করা হয়েছে অনির্দিষ্টবাচক 'আহাদ'। অর্থাৎ কেউ নয়। আবুল আসাদের ধারণা ছিলো, শাস্তিদানকারী ফেরেশতারা তার সাথে শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। অথবা 'আহাদ' অর্থ এখানে আল্লাহ্। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আবুল আসাদ ধারণা করে কী? সে কি এরকম ভেবে বসে আছে যে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, দান করেছেন তাকে প্রচুর শারীরিক সামর্থ্য, সেই সর্বশক্তিধর আল্লাহ্ও তাকে পরাভূত করতে পারবে না?

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'সে বলে, আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করেছি'। এই উক্তিটিও আবুল আসাদের। কথাটির অর্থ— সে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী তো বলেই, তদুপরি এরকম কথাও বলে যে, হে কুরায়েশ জনগোষ্ঠী! আমি তো মোহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রচুর অর্থও ব্যয় করে থাকি, যাতে করে তার অগ্রযাত্রা প্রতিহত হয়। অতএব এ ব্যাপারেও তো আমার শ্রেষ্ঠত্বের কথা তোমাদের স্বীকার করে নেওয়া উচিত। এখানে 'লুবাদান' অর্থ প্রচুর অর্থ-সম্পদ। এর একবচন 'লুবদাতুন'।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি'? একথার অর্থ— সে মনে করেছে কী? আল্লাহ্পাক কি তার মনোভাব ও কর্মকাণ্ডের খবর রাখেন না। সে তো নিতান্তই অজ্ঞ। তাই জানে না ও বিশ্বাস করতে চায় না যে, আল্লাহ্ অন্তর্যামী, সর্বদ্রষ্টা। তাই তিনি যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি তাকে দিবেনই। শারীরিক শক্তি ও সম্পদ সম্পর্কে অবশ্যই তাকে এমতো জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এই ব্যাখ্যাটি সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও কাতাদার ব্যাখ্যার অনুরূপ। কালাবী বলেছেন, আবুল আসাদ ছিলো মিথ্যুক ও দাম্ভিক। সে প্রচুর অর্থ ব্যয় করার কথা বলেছিলো বটে, কিন্তু আদতে তা করেনি। কেননা সে ছিলো ব্যয়কুণ্ঠও। তাই এখানে বলা হয়েছে— সে বলে আমি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছি। কিন্তু কথাটা যে মিথ্যা, তা কেউ না জানলেও আল্লাহ্ তো জানেন। সুতরাং সত্যপ্রত্যাখ্যানের সঙ্গে মিথ্যাবাদিতার শাস্তিও তার জন্য অবধারিত। বাক্যটির মাধ্যমে তার প্রবহমান বক্তব্যকে করা হয়েছে অধিকতর বেগবান।

আল্লাহ্পাক অবশ্যই তাঁর এবং তাঁর রসুলের শত্রুদেরকে শায়েস্তা করতে সক্ষম এবং বিষয়টি সম্পূর্ণতই তাঁর অধিকারভূত। কেননা তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন শত সহস্র নেয়ামত। সুতরাং অবাধ্যদেরকে শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণরূপে তাঁর অধিকার ও ক্ষমতাভূত। প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের মধ্যে পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে কিছুসংখ্যক নেয়ামতের কথা। বলা হয়েছে—

'আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দুই চক্ষু (৮)? আর জিহ্বা ও দুই ওষ্ঠ' (৯)। একথার অর্থ— তার সত্তা এবং সত্তাসম্পৃক্ত সকল কিছুই যে আমা কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহ, সে কথা সে ভেবে দ্যাখে না কেনো? আমি তাকে দিয়েছি দু'টি চোখ, যা দিয়ে সে দ্যাখে। দিয়েছি রসনা, যা দ্বারা সে কথা বলে, আস্বাদন করে খাদ্যের স্বাদ। দিয়েছি ওষ্ঠাধর, যা তাকে সাহায্য করে কথা বলতে, খেতে ও ফুৎকার দিতে।

বাগবী লিখেছেন, হাদিসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্পাক বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার রসনা যদি অশোভন কথা বলতে উদ্যত হয়, তবে তুমি ব্যবহার করো আমা কর্তৃক প্রদত্ত ঢাকনা— ওষ্ঠাধর। আর দৃষ্টি যদি উদগ্রীব হয় অসিদ্ধ কিছু দেখতে, তবে বন্ধ করে দিয়ো চোখের দুই পাতা, যা আমি তোমাকে দিয়েছি চোখের আবরণস্বরূপ। আর লজ্জাস্থানকে সংবৃত কোরো উপযুক্ত আচ্ছাদন দ্বারা, যে আচ্ছাদন আমারই দান।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে দু'টি পথ দেখিয়েছি'। একথার অর্থ— পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে আমি তাকে দেখিয়েছি তার খাদ্যাধার, মায়ের দুই দুগ্ধপূর্ণ স্তন। মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেছেন, এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব ও জুহাক। তবে অধিকাংশ ব্যাখ্যাতাগণ এখানকার 'দু'টি পথে'র অর্থ করেছেন উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট পথ, ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, হক-বাতিল, সুপথ-বিপথ। এভাবে কথাটির মর্মার্থ

www.eelm.weebly.com

দাঁড়ায়— আমি তাকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে, নবী-রসুল ও কিতাব পাঠিয়ে তার সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছি সত্য ও মিথ্যা, সুপথ ও বিপথ। এখন সে নিজে নিজে ঠিক করুক কোন পথে সে চলবে ।

সূরা বালাদ ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০

فَلَا اقۡتَحَمَ الۡعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الۡعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ اَوۡ
اِطۡعٰمٌ فِیۡ یَوۡمٍ ذِیۡ مَسۡغَبَةٍ ﴿١٤﴾ یَّتِیۡمًا ذَا مَقۡرَبَةٍ ﴿١٥﴾ اَوۡ مِسۡكِیۡنًا ذَا
مَتۡرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَتَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ وَتَوَاصَوۡا
بِالۡمَرۡحَمَةِ ﴿١٧﴾ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ الۡمَیۡمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا
بِاٰیٰتِنَا هُمۡ اَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَیۡهِمۡ نَارٌ مُّؤۡصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

r সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করে নাই।
r তুমি কী জান— বন্ধুর গিরিপথ কী?
r ইহা হইতেছে ঃ দাসমুক্তি
r অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্যদান
r ইয়াতীম আত্মীয়কে,
r অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে,
r তদুপরি সে অন্তর্ভুক্ত হয় মু'মিনদের এবং তাহাদের, যাহারা পরস্পরকে উপদেশ দেয়, ধৈর্য ধারণের ও দয়া-দাক্ষিণ্যের;
r ইহারাই সৌভাগ্যশালী।
r আর যাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, উহারাই হতভাগ্য।
r উহারা পরিবেষ্টিত হইবে অবরুদ্ধ অগ্নিতে।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ফা লাক্বতাহামাল আ'ক্বাবাহ্' (সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করেনি)। অনেকের মতে এখানকার 'ফালা' শব্দের 'লা' অব্যয়টি 'কেননা' অর্থে ব্যবহৃত। কারণ পুনরাবৃত্তি ব্যতীত 'লা' অব্যয়টি অতীতকালবোধক ক্রিয়াতে ব্যবহৃত হয় না। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সে তাহলে আমার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ বাদ দিয়ে আমার আনুগত্যকে মান্য করেনি কেনো, শয়তানের পথে সম্পদ ব্যয় না করে কেনো অর্থ ব্যয় করেনি আমার পথে। এরকম করলেই তো সে তার সম্পদের সাহায্যে অতিক্রম করতে পারতো আল্লাহ্‌র পরিতোষের পথের যাবতীয় প্রতিকূলতাকে।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে না-বাচক অব্যয় 'লা' ব্যবহৃত হয়েছে তার যথা অর্থেই। শব্দগতভাবে 'লা' এর ব্যবহারিক স্থল একটাই। কিন্তু অর্থগত দিক দিয়ে এর ব্যবহার রয়েছে কয়েকটি আক্বাবাতে। 'আ'ক্বাবা' অর্থ ঘাঁটি,

www.eelm.weebly.com

গিরিসংকট, বন্ধুর গিরিপথ। পরবর্তী আয়াতসমূহে 'লা' ব্যতীত উল্লেখ করা হয়েছে তিনটি ঘাঁটির কথা— দাসমুক্তি, অন্নহীনকে অন্নদান এবং বিশ্বাস গ্রহণ। এই তিনটি ক্ষেত্রে 'লা' ব্যবহারের সুযোগ ছিলো উন্মুক্ত। তবুও তা করা হয়নি। সুতরাং বুঝতে হবে, মূল বক্তব্যটি ছিলো যেনো এরকম— যে দাসকে মুক্ত করেনি, নিরন্নকে অন্ন দেয়নি, সে নিজেও বিশ্বাসী হয়নি।

প্রথমোক্ত ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতখানি সম্পর্কযুক্ত হবে ৬ সংখ্যক আয়াতের 'আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করেছি' কথাটির সঙ্গে। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির প্রেক্ষাপটে আয়াতখানির যোগসূত্র মিলিত হবে শপথের জবাবের সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি আদেশ-নিষেধের আওতাভূত করে। কিন্তু তারা আদেশ-নিষেধের ঘাঁটিতে অবতরণ করতেই চায় না। ফলে তাদের সাফল্য লাভের উদ্দেশ্য হয়ে যায় ব্যর্থ। অথবা বলা যেতে পারে, আলোচ্য আয়াতের যোগসূত্র রয়েছে 'আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দু'টি নয়ন' কথাটির সঙ্গে। এমতাবস্থায় ভাবার্থ দাঁড়ায়— আমি তাকে দিয়েছি অবলোকনপ্রবণ চক্ষু এবং বাকশক্তিসম্পন্ন রসনা ও ওষ্ঠাধর। দেখিয়েছি সুপথ ও বিপথ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে তার জ্ঞান-বিবেচনাকে ব্যবহার করেনি। পথিক হয়নি সরল সঠিক পথের (সিরাত্বল মুস্তাক্বীমের)। প্রদর্শন করেনি আমার অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা।

বস্তুতঃ 'আক্বাবাহ্' বলে গিরিপথকে, যা সাধারণত হয় বন্ধুর। 'ইক্বতিহাম' অর্থ ঘষা। এখানে অর্থ হবে— নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা, আনুগত্যের পথের পথযাত্রার ক্লেশ। কাতাদা এরকম বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন 'ইক্বতিহাম' অর্থ গিরিপথের চড়াই-উৎরাই অতিক্রমণ। এভাবে মুক্তি প্রাপ্তির অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব থেকে। কারণ পাপীর উপরে পাপের বোঝাকে এবং অপরিহার্য দায়িত্বকে তুলনা করা হয়েছে এখানে বন্ধুর গিরিপথের সঙ্গে। আর অর্পিত দায়িত্বসমূহ যথাপ্রতিপালনকে তুলনা করা হয়েছে বন্ধুর গিরিপথ অতিক্রমণের সঙ্গে।

হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, এই বন্ধুর গিরিপথটি হচ্ছে জাহান্নামের একটি পার্বত্য পথ। হাসান ও কাতাদা বলেছেন, 'আক্বাবাহ্' হচ্ছে জাহান্নামের সেতু পারাপারের একটি গিরিপথতুল্য পথ, যা অতিক্রম করা যায় কেবল আল্লাহ্পাকের আনুগত্যের দ্বারা।

মুজাহিদ, জুহাক ও কালাবী বলেছেন, জাহান্নামের উপরে স্থাপিত সেতুর নাম আক্বাবাহ্, যা তলোয়ারের ধার অপেক্ষা তীক্ষ্ণ এবং যার চড়াই-উৎরাই ও দৈর্ঘ্যের পরিমাণ তিন হাজার বছর পথের দূরত্বের সমান। তার দু'পাশে রয়েছে শাদা বৃক্ষের কণ্টকসদৃশ কন্টক ও বাঁধানো আংটি। কেউ সে পথ অতিক্রম করবে অনায়াসে, কেউ ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে। কেউ অশ্বারোহীর মতো দ্রুতগতিতে। আবার কেউ অধোমুখী হয়ে পড়ে যাবে জাহান্নামের আগুনে। কেউ চলবে ঝড়ের বেগে, কেউ পদব্রজে, কেউ নিতম্ব ঘষতে ঘষতে। কেউ কেউ আবার কাঁটার আঁচড়ে জখম হতে হতে এক সময় লুটিয়ে পড়বে জাহান্নামে। ইবনে জায়েদ বলেছেন, সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করেনি' অর্থ সে তো চলেনি পরিত্রাণের পথে।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— তুমি কি জানো, বন্ধুর গিরিপথ কী? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, তারা কি জানে পরিত্রাণের পথের স্বরূপ কী? সে পথের বন্ধুরতা কী? আর সে বন্ধুরতা অতিক্রমের পুরস্কারই বা কী? ইবনে উয়াইনিয়া বলেছেন, আল্লাহ্পাক যদি বলেন 'মা আদ্রাকা' (তুমি কি জানো) তাহলে পরক্ষণেই জানিয়ে দেন তার জবাব। কিন্তু যদি বলেন 'মা ই'দরীকা' তাহলে তার জবাবটি আর উল্লেখ করেন না। এখানে কিন্তু বলা হয়েছে 'মা আদরাকা' তাই এর পর দেওয়া হয়েছে উত্থাপিত প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর।

'আক্বাবাহ্' অর্থ যদি হয় আনুগত্য, তাহলে উহ্য কোনো কিছু আর ধরে নিতে হবে না। কিন্তু শব্দটির মর্মার্থ যদি করা হয় পাপের বোঝা, তবে বুঝতে হবে এখানে উহ্য রয়েছে একটি সম্বন্ধপদ। এমতাবস্থায় ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তুমি কি জানো, পাপের পথ অবলম্বন এবং তা থেকে মুক্তির উপায় কী?

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'এটা হচ্ছে দাসমুক্তি'। 'ফাক্কু রক্বাবাতিন' এর শাব্দিক অর্থ গ্রীবামুক্তি। মর্মার্থ দাসমুক্তি। বক্তব্যটি সাধারণার্থক। এর অর্থ একজন ক্রীতদাসকে পূর্ণরূপে মুক্ত করে দেওয়া, অথবা তাকে মুক্ত করে দেওয়া তার মূল্য পরিশোধ করে। অথবা লিখিত শর্তে মুক্তি প্রাপ্য দাসকে মুক্তির ব্যাপারে আর্থিক সহায়তা দান। কিংবা যে ক্রীতদাসের মুক্তিপণের কিছু অংশ অপরিশোধিত অবস্থায় আছে, তার সেই অপরিশোধিত অংশ পরিশোধ করে দেওয়া। অর্থাৎ সকল ধরনের ক্রীতদাস মুক্তিই আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যভূত।

হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, একবার এক বেদুইন রসুল স. এর মহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল ! আমাকে এমন কিছু করতে বলুন, যা আমাকে নিয়ে যাবে জান্নাতে। তিনি স. বললেন, তোমার কথা ছোট্ট, কিন্তু এর আবেদন বিশাল। ঠিক আছে, ক্রীতদাস মুক্ত করো। মুক্ত করে দাও গ্রীবা। বেদুইন বললো, কর্ম দু'টো কি এক নয়? তিনি স. বললেন, ক্রীতদাস মুক্ত করা অর্থ পুরোপুরি একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেওয়া। আর গ্রীবা মুক্ত করার অর্থ কোনো ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে মুক্তিপণ পরিশোধের ব্যাপারে আর্থিকভাবে অংশ গ্রহণ। আর শোনো, ক্রীতদাস মুক্ত করার সামর্থ্য যদি তোমার না থাকে, তবে অনাহারীকে আহার করিয়ো। পানি পান করিয়ো পিপাসার্তকে। সৎকর্মের আদেশ দিয়ো এবং বিরত থাকার উপদেশ দিয়ো অসৎকর্ম থেকে। তাও যদি না পারো তবে জিহ্বাকে সংযত রেখো। ভালো কথা ছাড়া মন্দ কথা বোলো না। বায়হাকী। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ক্রীতদাসকে মুক্ত করে, আল্লাহ্ তার প্রতিটি অঙ্গের পরিবর্তে নরকের আগুন থেকে রক্ষা করেন তার প্রতিটি অঙ্গকে। এমনকি গুপ্তাঙ্গের বিনিময়ে গুপ্তাঙ্গকে। বোখারী, মুসলিম। ইকরামা বলেছেন, পাপ থেকে তওবা করে স্বীয় প্রবৃত্তিকে পাপমুক্ত রাখার নামই 'ফাক্কু রক্বাবাতিন'।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্যদান (১৪) এতিম আত্মীয়কে (১৫), অথবা দারিদ্রনিষ্পেষিত নিঃস্বকে' (১৬)। এখানকার 'মাস্গাবাতুন' 'মাক্বরাবাতুন' এবং 'মাতরাবাতুন' শব্দত্রয়ের ধাতুমূল হচ্ছে যথাক্রমে 'সাগবুন' 'ক্বারুবুন' ও 'তারিবুন'। এর অর্থ ক্ষুধার্ত হওয়া, নিকটবর্তী হওয়া ও নিঃস্ব হওয়া। এখানে চরম নিঃস্বের কথাই বলা হয়েছে এভাবে— অথবা দারিদ্রনিষ্পেষিত নিঃস্বকে।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'তদুপরি সে অন্তর্ভুক্ত হয় মুমিনদের এবং তাদের, যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয়, ধৈর্য ধারণের ও দয়া-দাক্ষিণ্যের'। বাক্যটির যোগসূত্র রয়েছে 'বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করেনি' অথবা 'এটা হচ্ছে দাসমুক্তি' এর সাথে। এখানে 'ছুম্মা' (তদুপরি, অতঃপর) হচ্ছে অনুক্রমিক অব্যয়। এর পূর্বাপর বিষয় হয় পৃথক পৃথক। দাসমুক্তি, অন্নদান ইত্যাদি পুণ্যকর্ম ও ইমান পৃথক পৃথক বিষয়। তবে ইমান হচ্ছে যাবতীয় পুণ্যকর্মের ভিত্তি।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'এরাই সৌভাগ্যশালী'। 'আস্হাবুল মাইমানাহ্' এর শাব্দিক অর্থ দক্ষিণ দিকের দল। প্রতিফল দিবসে এরাই যে হবে সৌভাগ্যশালী, তা বলাই বাহুল্য। এরাই তাদের সঙ্গী-সাথীদেরকে সৎ উপদেশ দেয়। বলে, বিপদে ধৈর্যধারণ করতে এবং পরস্পরের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ করতে।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে 'আর যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই হতভাগ্য (১৯)। তারা পরিবেষ্টিত হবে অবরুদ্ধ অগ্নিতে' (২০)। একথার অর্থ— আর যারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করে, তারা প্রতিফল দিবসে অন্তর্ভুক্ত হবে বাম দিকের দলের। আমলনামা পাবে বাম হাতে। নিঃসন্দেহে তারাই চিরহতভাগ্য। দোজখের অবরুদ্ধ অগ্নিই হবে তাদের চিরকালীন আবাস। এখানে 'আসহাবুল্ মাশ্আমাহ্' অর্থ বাম দিকের দল। আর 'মু'সাদাহ্' অর্থ অবরুদ্ধ অগ্নি, আবদ্ধ গৃহ।

সূরা শাম্স

মহাপুণ্যময় নগরী মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এতে রয়েছে ১টি রুকু এবং ১৫টি আয়াত।

সূরা শাম্স ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

وَالشَّمۡسِ وَضُحٰهَا ۝١ وَالۡقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝٢ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝٣ وَ
الَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰهَا ۝٤ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝٥ وَالۡاَرۡضِ وَمَا طَحٰهَا ۝٦

www.eelm.weebly.com

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝٧ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝٨ قَدْ اَفْلَحَ
مَنْ زَكّٰىهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝١٠

q শপথ সূর্যের এবং উহার কিরণের,
q শপথ চন্দ্রের, যখন উহা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়,
q শপথ দিবসের, যখন সে উহাকে প্রকাশ করে,
q শপথ রজনীর, যখন সে উহাকে আচ্ছাদিত করে,
q শপথ আকাশের এবং যিনি উহা নির্মাণ করিয়াছেন তাঁহার,
q শপথ পৃথিবীর এবং যিনি উহাকে বিস্তৃত করিয়াছেন তাঁহার,
q শপথ মানুষের এবং তাঁহার, যিনি উহাকে সুঠাম করিয়াছেন,
q অতঃপর উহাকে উহার অসৎকর্ম ও উহার সৎকর্মের জ্ঞান দান করিয়াছেন।
q সে-ই সফলকাম হইবে, যে নিজেকে পবিত্র করিবে।
q এবং সে-ই ব্যর্থ হইবে, যে নিজকে কলুষাচ্ছন্ন করিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ওয়াশ্‌শাম্‌সি ওয়া দুহাহা' (শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের)। মুজাহিদ ও কালাবী কথাটির অর্থ করেছেন— উদীয়মান সূর্য-কিরণের শপথ কেননা ওই সময়ের সূর্যকিরণ থাকে অনাবিল। কাতাদা বলেছেন, 'দুহা' অর্থ দিনভর। মুজাহিদ বলেছেন, সূর্যের উত্তাপ। কামুস' অভিধানে লেখা রয়েছে 'দ্বাহিয়্যাতু' অর্থ ক্রমবর্দ্ধমান দিবস। 'দুহা' এবং 'দ্বিহা' উভয় শব্দের অর্থ দ্বিপ্রহরের পূর্বক্ষণ।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'শপথ চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়'। বলা বাহুল্য চন্দ্র উদ্ভাসিত হয় সূর্যাস্তের পরেই। আর তার এ অবস্থা থাকে চান্দ্রমাসের প্রথম অর্ধাংশে। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে— ওই সময়ের চন্দ্রের শপথ! যখন তা হয় ষোলো কলায় পরিপূর্ণ, প্রায় সূর্যের মতো উজ্জ্বল ও গোলাকার। জুজাযও এরকম বলেছেন। আর চন্দ্রের এরূপ সৌন্দর্য ফোটে চান্দ্রমাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের রাতে।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'শপথ দিবসের, যখন সে তাকে প্রকাশ করে'। একথার অর্থ— শপথ দিবসের, যা উজ্জ্বল করে দেয় সূর্যকে, অথবা অন্ধকারকে, কিংবা পৃথিবীকে। সমুজ্জ্বল করার সঙ্গে এখানে দিবসের সম্পৃক্তি ঘটেছে রূপকার্থে। যেমন বলা হয়— তার দিবস রোজা রেখেছে। এখানে একটি অনুক্ত সর্বনাম 'হা' (তা) সম্বন্ধযুক্ত হবে সূর্যের সঙ্গে। অর্থাৎ দিবস যখন নিজেকে বিস্তার করে দেয়, তখন নেত্রগোচর হয় সূর্য। অথবা সর্বনামটির সম্বন্ধপদ এখানে অনুক্ত' অর্থাৎ অন্ধকার ও পৃথিবী।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'শপথ রজনীর, যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে'। একথার অর্থ— শপথ রজনীর, যা সূর্যকে, অথবা আকাশকে, কিংবা পৃথিবীকে করে অন্ধকারাচ্ছাদিত। এই তিন অবস্থাতেই এখানকার 'ইজা'

www.eelm.weebly.com

(যখন) অব্যয়টি কালাধিকরণ কারক হিসেবে সম্বন্ধযুক্ত হবে শপথের ক্রিয়ার সঙ্গে। এরকম বলেছেন জমহুর। পক্ষান্তরে 'বাহরে মাওয়াজ' প্রণেতা বলেছেন, শপথবদ্ধতাকে ওই সময়গুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা ঠিক নয়। তাঁর মতে শপথবদ্ধতাকে চন্দ্র-সূর্য বা দিবসের বিশেষণ স্থির করাও ঠিক নয়। কেননা কালাধিকরণ কারক সর্বদা ক্রিয়াবিশেষণই হয়। কারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় কালের মধ্যেই। তাই অনুভূতিপ্রবণ কোনোকিছু ক্রিয়ার বিশেষণ হতে পারে না। অতএব এমতোক্ষেত্রে জমহুরের ব্যাখ্যা সমালোচনা সাপেক্ষ। তবে বলা যেতে পারে, এখানে একটি সম্বন্ধপদ রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ সূর্যকিরণের সময়ের শপথ, যা সূর্যের পশ্চাতে প্রতিগমনের সময় ধার করে নেয়। ওই দিবসের উদীয়মান সময়ের শপথ, যে উদীয়মান দিবস উদিত করে সূর্যকে। আর নিশিথাগমনের সময়ের শপথ, যে আগমনী ছড়িয়ে যায় শূণ্যতায়। এরূপ অর্থ করলে কালাধিকরণ কারক বিশেষণ হবে অনুক্ত সম্বন্ধপদের। অথবা বলা যেতে পারে 'ইজা' এখানে ক্রিয়ার আধার নয়, বরং 'ইজা' অর্থ এখানে— সময়। যেমন বলা হয় 'ইজা ইয়াকুমু যায়িদ ইয়াক্বউদু আমর' (জায়েদের দাঁড়ানোর সময় আমর বসবে)। 'এখানে 'ইজা' ব্যবহৃত হয়েছে 'সময়' অর্থে।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেন, তাঁর'। লক্ষণীয়, এখানে আকাশের উল্লেখ করা হয়েছে তার সৃষ্টিকর্তার আগে। তাই প্রশ্ন জাগে, এটা কি সৌজন্য বিরোধী নয়? স্রষ্টার পূর্বে সৃষ্টির উল্লেখ কি সমীচীন? এর উত্তরে বলা যায়— হ্যাঁ, এটাই তো নিয়ম। এ হচ্ছে ছোট থেকে বড়র দিকে, নিচু থেকে উচ্চতার দিকে যাত্রার প্রক্রিয়া। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে গমনই তো অধিক সৌজন্যসম্মত ও সমীচীন।

জুজায বলেছেন, এখানে 'মা' (তা) ব্যবহৃত হয়েছে ধাত্যর্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আকাশ ও তার সৃষ্টিশৈলীর শপথ।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন, তাঁর'। এখানেও 'মা' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে 'মান' অর্থে, অথবা ধাত্যর্থে। অর্থাৎ ভূমি ও তার সম্প্রসারণকারীর শপথ। অথবা শপথ ভূপৃষ্ঠের এবং ভূপৃষ্ঠস্থিত সকল কিছুর। এরূপে ব্যাখ্যারীতি প্রযোজ্য হবে পরবর্তী আয়াতেও।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন'। একথার অর্থ— শপথ মানবপ্রবৃত্তির এবং তাঁর, যিনি প্রবৃত্তির স্রষ্টা ও বিন্যাসক। তিনিই তো 'মানব প্রবৃত্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বৈপরীত্যের সমতা, সুসাম্য ও যথা-উপযোগিতা।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন'।

'কাশ্শাফ্' রচয়িতার অনুকরণে বায়যাবী লিখেছেন, এখানকার 'মা' অব্যয়টিকে ধাতুমূল ধরে নিলে বাক্যগুলোর মধ্যে দেখা দিবে অসঙ্গতি। আগের আয়াতের 'সাও্ওয়া' (সুঠাম করেছেন) শব্দটি ক্রিয়া। এর কর্তা তিনি, অর্থাৎ

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্। আবার আলোচ্য আয়াতের 'আলহামা' (তিনি জ্ঞান দান করেছেন) বাক্যটির যোগসূত্র যদি করা হয় পূর্বোক্ত 'সাও্ওয়া'র সাথে, তবে ক্রিয়ার যোগসূত্র ধাতুমূল 'মা' কে গ্রহণ করতে হবে 'মান' অর্থে। কিন্তু 'বাহরে মাওয়াজ' রচয়িতা লিখেছেন, একথা তো ভুলে গেলে চলবে না যে 'সাও্ওয়া' ক্রিয়ার সাথে 'মা' মিলিত হওয়ায় 'সাও্ওয়া' যেমন ধাত্যর্থ প্রকাশ করছে, তেমনি 'আলহামা'কেও ধাত্যর্থ ধরে নিয়ে যদি ধাতুমূলকে ধাতুমূলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়, তবে তা মোটেও অসঙ্গত হবে না। বিষয়টি সহজ, জটিল কিছু নয়।

আগের আয়াতের 'নাফসিন' এর 'তানভীন' আধিক্যপ্রকাশক ও সাধারণার্থক। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আ'লিমাত নাফ্সুম্ মা কৃদ্দামাত ওয়া আখ্খারাত'। অথবা বলা যায়, এরকম করা হয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশার্থে। এমতাবস্থায় 'নাফস' অর্থ হবে বিশেষ এক ব্যক্তি। অর্থাৎ নবী আদম। আতা বলেছেন, এখানে 'নাফসিন' বলে বুঝানো হয়েছে তাবৎ জ্বিন ও মানুষকে। আর এখানকার 'ইলহাম' (আল্হামাহা) 'ফুজুর' (ফুজুরাহা) এবং তাকৃওয়া (তাকৃওয়াহা) শব্দত্রয়ের অর্থ হবে— আল্লাহ্ মানুষের সম্মুখে তুলে ধরেছেন ভালো-মন্দ, আনুগত্য-অবাধ্যতার পরিচয়, যেনো তারা গ্রহণ করে ভালো ও আনুগত্যকে এবং পরিত্যাগ করে মন্দ ও অবাধ্যতাকে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং ইবনে জায়েদের ব্যাখ্যা এরকম— আল্লাহ্পাক মানুষের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন মিতাচার ও অমিতাচারকে। সে যা আকাংখা করে, তার অন্তরকে আল্লাহ্পাক সেদিকেই ধাবিত করে দেন। অথবা তিনি প্রবৃত্তিকে দান করেন সংযমী হওয়ার সামর্থ্য। হৃদয়ে সৃষ্টি করেন সংযম-স্পৃহা। অথবা অসহায় ভাবে প্রবৃত্তিকে ছেড়ে দেন দুষ্কর্মাবলীর দিকে এবং হৃদয়েও সৃষ্টি করে দেন দুর্বৃত্তি। জুজায এই ব্যাখ্যাটিকে পছন্দ করেছেন।

হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বলেছেন, একবার মুজাইনা গোত্রের দু'জন লোক নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! মানুষ যা করে, বা করার চেষ্টা করে, তা কি তার নিয়তির বিধানানুসারে? না তা আপনার আনীত শরিয়তের বিধানানুসারে ঘটিতব্য ভবিষ্যতের কর্মযোগ? অবাধ্যতার কারণে তো আমাদের বিরুদ্ধ দলিল-প্রমাণও প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি স. বললেন, না, মানুষের সকল কর্ম তার নিয়তির অনুসরণেই সম্পাদিত হয়। একথার প্রমাণ রয়েছে আল্লাহ্র কালামে। যেমন 'শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন'।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, মানুষের অন্তঃকরণ সর্বোতোভাবে আল্লাহ্র করতলগত। তিনি মানবহৃদয়কে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ঘুরিয়ে দেন। এরপর তিনি স. প্রার্থনা করলেন, হে হৃদয়সমূহের বিবর্তক! আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও। মুসলিম।

এখানে 'তাকৃওয়া'র পূর্বে 'ফুজুর' এর উল্লেখ করে 'ফুজুরাহা ওয়া তাকৃওয়াহা' রচনা করা হয়েছে ছন্দের দাবি পূরণার্থে। তাছাড়া এরকম করার আর একটি কারণ এই যে, নফস বা প্রবৃত্তি স্বভাবতই অপকর্মপ্রবণ। এরপরে সে সংযমী হতে

www.eelm.weebly.com

শেখে যথাঅনুশীলনের মাধ্যমে। আর এখানকার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'ওয়াও' শপথজ্ঞাপক। সমস্যা রয়েছে কেবল চতুর্থ 'ওয়াও' নিয়ে। তবে একথা বললেও তা সঠিক পদবাচ্য হবে যে, প্রথম 'ওয়াও' শপথজ্ঞাপক, আর পরেরগুলো তার যোজক। সুতরাং বুঝতে হবে প্রথম শপথের সমাধান হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় শপথের অনুপ্রবেশ সিদ্ধ নয়। আর যোজক অব্যয় শপথের জন্য প্রতিনিধিস্বরূপ।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'ক্বদ আফলাহা মান যাক্কাহা' (সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে)। 'যাক্কা' এর মর্মার্থ এখানে তিনি পবিত্র করবেন। প্রকৃত কর্তা এখানে আল্লাহ্পাক স্বয়ং। আর এখানকার 'হা' (একে, নিজেকে) সর্বনামটি সংযোজিত হবে 'মান' (যে) এর সঙ্গে। কিন্তু কথা হচ্ছে, 'হা' স্ত্রীলিঙ্গ এবং 'মান' পুংলিঙ্গ। এই বৈসাদৃশ্যটির সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলা যায়, 'মান' ব্যক্তিগতভাবে পুংলিঙ্গ হলেও 'মান' অর্থ এখানে নফস, যা স্ত্রীলিঙ্গবাচক। অর্থাৎ অর্থগতভাবে 'মান' এখানে স্ত্রীলিঙ্গবাচকই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে এই আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে বলতে শুনেছি, ওই নফস সফল, যাকে আল্লাহ্ পবিত্র করে দিয়েছেন। জুয়াইবিরের পদ্ধতিতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর। সুপরিণত সূত্রে হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম থেকে মুসলিম, তিরমিজি, নাসাঈ এবং ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলতেন, ইয়া ইলাহী! আমি তোমা সকাশে আশ্রয় যাচনা করি অস্বস্তি, আলস্য, অপৌরুষ, অতিবার্ধক্য ও কবরের শাস্তি থেকে। হে আমার আল্লাহ্! আমার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে দাও সংযম ও পবিত্রতা দিয়ে। তুমিই প্রবৃত্তি-পবিত্রতাকারী হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ। তুমিই প্রবৃত্তির সকল কর্মের অধিকর্তা ও অভিভাবক। হে আমার পরম প্রভুপালক! আমি পরিত্রাণ প্রার্থনা করি ওই জ্ঞান থেকে, যা শুভপ্রসূ নয়, ওই হৃদয় থেকে যা বিনয়াবনত নয়, ওই প্রবৃত্তি থেকে যা পরিতৃপ্ত নয় এবং ওই প্রার্থনা থেকে যা গ্রহণযোগ্য নয়।

বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে আয়াতখানির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্পাক তাঁর গুণবত্তার জ্যোতিসম্পাত দ্বারা যে নফসকে পবিত্র করেছেন, সেই নফস হয় আল্লাহ্ ও তাঁর বিধানে পরিতুষ্ট এবং তাঁর স্মরণ ও আনুগত্যে প্রশান্ত। সে বিরত থাকে আল্লাহ্ ও তাঁর পথের সকল প্রতিবন্ধকতা, সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে। এরকম প্রবৃত্তির অধিকারী যারা, তারাই সফল। হাসান বসরী বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করেছে, করেছে পুণ্য ও আনুগত্যমণ্ডিত, সে-ই সফলতার অধিকারী। সম্ভবত হাসান বসরী এখানকার 'যাক্কা' শব্দসংযুক্ত সর্বনামটি 'হা' কে সম্পৃক্ত করেছেন এখানকার 'মান' এর সঙ্গে। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, আলোচ্য আয়াতে ওই সকল লোকের অবস্থা বিবৃত হয়েছে, যারা হয়ে গিয়েছে আল্লাহ্র শুভদৃষ্টির লক্ষ্য। নিজস্ব অভিপ্রায় বলতে তাদের কিছুই নেই। তারা সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায়নির্ভর। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে ওই সকল লোকের কথা, যারা সর্বোতোরূপে আল্লাহ্র অভিপ্রায়প্রত্যাশী। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, তাকে মহিমময় করে দেন। আর যারা তাঁর অভিমুখী হয়, তিনি তাদেরকে পথ দেখান।

www.eelm.weebly.com

আর আলোচ্য আয়াত হচ্ছে শপথের জবাব। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি উপস্থাপনার্থেই এতোক্ষণ ধরে এতোগুলি শপথ উচ্চারণ করা হয়েছে। তবে শপথের জবাব হিসেবে এখানকার 'ক্বদ' শব্দটির সাথে একটি 'লাম' সংযুক্ত হওয়া উচিত ছিলো। এ সম্পর্কে জুজায বলেছেন, পূর্বোক্ত বাক্যগুলোর প্রলম্বিত উপস্থাপনাই স্থলাভিষিক্ত হয়েছে 'লাম' এর। আল্লাহ্ পাক যখন চাইলেন, মানুষ তাদের প্রবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ ও প্রশান্ত করার জন্য আজীবন চেষ্টা-সাধনা করুক, তখন তিনি এমন শপথ করলেন, যেনো এতে করে প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর চিরস্থায়ী সত্তা ও গুণবত্তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এভাবে তার অভিনিবেশকে তিনি এখানে অধিষ্ঠিত করেছেন সর্বোচ্চ স্তরে। ফলে মানব জাতির জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ হয়েছে অপরিহার্য। এই স্তরটির পূর্ণত্ব আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে অবতরণ করে প্রেমাকর্ষণ এবং বান্দার পক্ষ থেকে সুবিন্যস্ত হয় সাবলীল সংযম। আর এভাবেই সাধিত হয় আত্মশুদ্ধি বা প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধি।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, পরের আয়াতের 'এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে' কথাটি ভিন্ন প্রসঙ্গের । এভাবে এখানে পার্থক্য করা হয়েছে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে। আর শপথের জবাব এখানে রয়েছে অনুক্তই, যার দিকনির্দেশনা করছে তারও পরের আয়াতে উল্লেখিত ছামুদ সম্প্রদায়ের অবাধ্যতার প্রসঙ্গের প্রতি। তারা তাদের নবী সালেহকে অমান্য করেছিলো। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তদ্রূপ মক্কার অবাধ্যদেরকেও তিনি নিশ্চয় যথাসময়ে শাস্তি দিবেন।

এরপরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে'। একথার অর্থ—আল্লাহ্পাক যাকে পথ দেখাবেন না, সে অবশ্যই হবে অসফল। তারা অপরিশুদ্ধ, তাই ধ্বংসের উপযুক্ত । অথবা মর্মার্থ হবে— যারা হয়েছে ভ্রষ্টপথানুগামী, তারা ডেকে এনেছে নিজেদেরই ধ্বংস।

এখানকার 'দাস্সা' এর মূল রূপ ছিলো 'দাস্সাসা' । শেষের 'সীন' অক্ষরটি রূপান্তরিত হয়েছে 'আলিফ' দ্বারা। শব্দটির ধাতুমূল 'তাদাস্সাসুন'। এর অর্থ গোপন করা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আম ইয়াদুস্সুহু ফীত্ তুরাব' (তাকে গোপন করে দাও মৃত্তিকায়)। এখানে এর অর্থ ব্যর্থ হওয়া, অথবা ধ্বংস করা। যা ধ্বংস করা হয়, তা তো চিরতরেই হয়ে যায় গুপ্ত অথবা লুপ্ত।

সূরা শাম্স ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ﴿١١﴾ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمْ
رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَ سُقْيٰهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ
عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ﴿١٤﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ﴿١٥﴾

www.eelm.weebly.com

r ছামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করিয়াছিল।

r উহাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হইয়া উঠিল,

r তখন আল্লাহ্‌র রাসূল উহাদিগকে বলিল, 'আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও উহাকে পানি পান করাইবার বিষয়ে সাবধান হও।

r কিন্তু উহারা রাসূলকে অস্বীকার করিল এবং উহাকে কাটিয়া ফেলিল। উহাদের পাপের জন্য উহাদের প্রতিপালক উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া একাকার করিয়া দিলেন।

r এবং ইহার পরিণাম সম্পর্কে তিনি ভয় করেন না।

'কাজ্‌জাবাত ছামূদু বি ত্বগওয়াহা' অর্থ ছামুদ জাতি অবাধ্যতাবশতঃ অস্বীকার করেছিলো। উল্লেখ্য, পূর্বের আয়াতে ব্যর্থ হওয়া বা ধ্বংস হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তার দৃষ্টান্তরূপে এখান থেকে সুরার শেষ পর্যন্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত ছামুদ জাতির। ক্রমে ক্রমে বক্তব্যকে করা হয়েছে অধিকতর বেগবান। আর 'কাজ্‌জাবাত' (অস্বীকার করেছিলো) ক্রিয়াপদটির কর্মপদ এখানে রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ তারা অস্বীকার করেছিলো নবী সালেহের রেসালাতকে।

'বি ত্বগওয়াহা' অর্থ অবাধ্যতাবশত। কথাটির 'বা' অব্যয়টি হেতুবাচক। অর্থাৎ তাদের ধ্বংস হওয়ার হেতু বা কারণ ছিলো এই যে, তারা পৌঁছে গিয়েছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানের চরম সীমায়। নবী সালেহ কর্তৃক প্রচারিত এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা এবং তাঁর নবুয়তের সত্যতার কথা তারা স্বীকারই করতে চায়নি। তিনি বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত একজন বিশ্বস্ত রসুল। তারা বলেছিলো, তুমি তো আমাদের মতোই একজন মানুষ। তারা এরকমও দাবি করেছিলো যে, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে এসো। পাথরের ভিতর থেকে বের করো একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী। তিনি তাদের দাবি মেনে নিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশে একটি প্রকাণ্ড পাথরের বুক চিরে বের করে এনেছিলেন একটি দশ মাসের শাবকসম্ভবা উষ্ট্রী। বের হওয়ার পরক্ষণে উষ্ট্রীটি প্রসব করেছিলো তার শাবক। উষ্ট্রীটি পানি পান করতো অত্যধিক। তাই তিনি নিয়ম করে দিলেন তাদের জনপদের কূপের পানি পালাক্রমে একদিন পান করবে উষ্ট্রীটি, আর একদিন পান করবে তারা ও তাদের পশুরা। প্রথম প্রথম তারা নিয়ম মান্য করে চললো। কিন্তু পরের দিকে হয়ে পড়লো অসহিষ্ণু। ঠিক করলো উটটিকে তারা বধ করবে।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠলো'। একথার অর্থ— উষ্ট্রীবধের ব্যাপারে সর্বাধিক আগ্রহী ছিলো এক হতভাগ্য। সে নিজ হাতে উষ্ট্রীবধ করবে বলে পণ করলো এবং গ্রহণ করলো কার্যকর উদ্যোগ। এখানে 'ইজিম বাআ'ছা' অর্থ তৎপর হয়ে উঠলো। অর্থাৎ তাদের মধ্যে সর্বাধিক নিষ্ঠুর ও হতভাগ্য যে লোকটি, সে যখন আর স্থির থাকতে পারলো না। অস্ত্র হাতে এগিয়ে যেতে লাগলো উষ্ট্রী ও তার শাবকটির দিকে। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে সে সকলের অগ্রণী হলেও তার সম্প্রদায়ের সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীই এ ব্যাপারে ছিলো তার পরামর্শক ও সমর্থক।

www.eelm.weebly.com

হতভাগ্য লোকটির নাম ছিলো কাজার ইবনে সালিক। সে ছিলো বেঁটে, গৌরবর্ণ ও নীল চক্ষুবিশিষ্ট। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জামআ থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার সালেহ নবীর উষ্ট্রীসংহার পর্ব প্রসঙ্গে বললেন। একথাও বললেন যে, উষ্ট্রীটি বধ করতে উদ্যত হয়েছিলো তাদের সম্প্রদায়ের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। যেমন আবু জামআ।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সালেহ নবীর উষ্ট্রী বধকারী লোকটিই মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক হতভাগা। আর হতভাগা আদম নবীর ওই সন্তান, যে হত্যা করেছিলো তার আপন ভাইকে। হত্যাকাণ্ডের প্রথম প্রচলন ঘটায় সে। সেকারণে পরবর্তী সময়ের সকল হত্যাকাণ্ডের পাপের একটা অংশ বহন করতে হবে তাকে। তিবরানী, হাকেম এবং বিশুদ্ধ সূত্রে 'হুলিয়া' পুস্তকে আবু নাঈম।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তখন আল্লাহ্র রসুল তাদেরকে বললো, আল্লাহ্র উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করবার বিষয়ে সাবধান হও'। এখানে ওই অলৌকিক উষ্ট্রীটিকে 'আল্লাহ্র উষ্ট্রী' বলে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তার গুরুত্ব ও সম্মানকে। আর এখানকার 'তাকে পানি পান করাবার বিষয়ে সাবধান হও' অর্থ সাবধান! আল্লাহ্কে ভয় করো। উটনীটির প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ো না। তাকে বাধা দিয়ো না কূপের পাড়ে যেতে। তার দেহের কোথাও আঘাত করতেও চেষ্টা কোরো না। অন্যথায় তোমাদের উপরে নেমে আসবে আল্লাহ্র গজব।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা রসুলকে অস্বীকার করলো এবং তাকে কেটে ফেললো। তাদের পাপের জন্য তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন'।

উষ্ট্রীটি বধ করে ওই হতভাগ্য লোকটিই। তৎসত্ত্বেও এখানে বলা হয়েছে 'কিন্তু তারা রসুলকে অস্বীকার করলো এবং তাকে কেটে ফেললো'। এরকম বলার কারণ হচ্ছে ওই লোকটি উটনীটি হত্যা করেছিলো সর্বসম্মতিক্রমে। তাই 'সে কেটে ফেললো' না বলে এখানে বলা হয়েছে 'কেটে ফেললো তারা'। নবী সালেহের সাবধানবাণীকে তারা তোয়াক্কাই করলো না। মুকাতিল বলেছেন, হত্যাকারী ছিলো নয় জন। উপরন্তু 'সর্বাধিক হতভাগ্য' যদিও পার্থক্যসূচক বিশেষণের একবচন, তবু তা যদি সদৃশপদ হয়, তবে কথাটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে একবচন বহুবচন উভয় অর্থে।

উষ্ট্রীবধের পর নবী সালেহ মর্মাহত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, ঠিক আছে। মাত্র তিন দিন তোমাদেরকে অবকাশ দেওয়া হলো। প্রথম দিন তোমাদের চেহারা হয়ে যাবে হলুদ। পরদিন লাল এবং শেষের দিন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তারপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিবেন। তাই হয়েছিলো। সেই ঘটনাটিকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— তাদের পাপের জন্য তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন। 'বাহরে মাওয়াজ' প্রণেতা লিখেছেন 'দাম্দামাতুন' শব্দটির অর্থই হচ্ছে— সমূলে উৎপাটন করা, অথবা

www.eelm.weebly.com

ধ্বংস করে দেওয়া। আতা ও মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ তাদেরকে একেবারে বিনাশ করে দিয়েছিলেন। কামুস' অভিধানে লেখা রয়েছে 'দাম্দামাতুন' অর্থ ক্রোধান্বিত হওয়া। যেমন 'দাম্দামা আ'লাইহি' (তার সাথে সে ক্রোধের সাথে কথা বলেছে)। আর 'দাম্দামা আ'লাইহিম' অর্থ তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছে ধ্বংস, ঘিরে ধরেছে চারদিক থেকে।

'বি জাম্বিহিম' অর্থ তাদের পাপের জন্য। অর্থাৎ নবীর অবমাননা ও উষ্ট্রীবধের জন্য। আর 'ফাসাওয়াহা' অর্থ একাকার করে দিলেন। অর্থাৎ তাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে নিপাত করলেন একভাবে, এক সাথে।

শেষোক্ত আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'এবং এর পরিণাম সম্পর্কে তিনি ভয় করেন না'। একথার অর্থ— শাস্তি প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি নির্দ্বিধ, নিঃশঙ্ক। ছামুদ জাতিগোষ্ঠীকেও তাই তিনি নিপাত করেছিলেন অসংকোচে। রেহাই দেননি কাউকেই। এরকম ব্যাখ্যাকে যথাযথ মনে করা যেতে পারবে তখন, যখন এখানকার 'ইয়াখাফ্' (তিনি ভয় করেন না) কথাটির 'তিনি' সর্বনাম দ্বারা ধরে নেওয়া হবে আল্লাহ্কে। আবু জুহাক এবং কালাবী বলেছেন, এখানকার 'ইয়াখাফ্' কথাটির সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত হবে ১২ সংখ্যক আয়াতের 'সর্বাধিক হতভাগ্য' বাক্যের সাথে। আর বাক্যটিতে রয়েছে কিঞ্চিত অগ্র-পশ্চাৎ। যেনো মূল বাক্যটি ছিলো এরকম 'ই'জিম বাআ'ছা আশক্বাহা ওয়া লা ইয়াখাফ্ উক্ববাহা'। অর্থাৎ তাদের মধ্যকার সর্বাধিক হতভাগ্য লোকটি উষ্ট্রীটির প্রাণসংহার করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠলো এবং এ ব্যাপারে সে ছিলো নিঃশঙ্ক, নির্ভয়। এই বাক্যটি 'দাম্দামা' অথবা 'ইজিম বাআ'ছা' পদের কর্তা থেকে অবস্থাপ্রকাশক। আর অবস্থাজ্ঞাপক এখানকার 'ওয়াও' (এবং) অব্যয়টিও।

সূরা লাইল

১ রুকু এবং ২১ আয়াত সম্বলিত এই সূরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কায়।

সূরা লাইল ঃ আয়াত ১ — ১১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ○

وَ الَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰى ﴿۱﴾ وَ النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ﴿۲﴾ وَ مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ
الۡاُنۡثٰٓى ﴿۳﴾ اِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتّٰى ﴿۴﴾ فَاَمَّا مَنۡ اَعۡطٰى وَ اتَّقٰى ﴿۵﴾ وَ صَدَّقَ
بِالۡحُسۡنٰى ﴿۶﴾ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡيُسۡرٰى ﴿۷﴾ وَ اَمَّا مَنۡۢ بَخِلَ وَ اسۡتَغۡنٰى ﴿۸﴾

www.eelm.weebly.com

وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۙ﴿۹﴾ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ؕ﴿۱۰﴾ وَ مَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ؕ﴿۱۱﴾

q শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছন্ন করে,
q শপথ দিবসের, যখন উহা উদ্ভাসিত হয়
q এবং শপথ তাঁহার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন—
q অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির।
q সুতরাং কেহ দান করিলে, মুত্তাকী হইলে
q এবং যাহা উত্তম তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে,
q আমি তাহার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ।
q এবং কেহ কার্পণ্য করিলে ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিলে,
q আর যাহা উত্তম তাহা অস্বীকার করিলে,
q তাহার জন্য আমি সুগম করিয়া দিব কঠোর পথ।
q এবং তাহার সম্পদ তাহার কোন কাজে আসিবে না, যখন সে ধ্বংস হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়াল্ লাইলি ইজা ইয়াগ্শা'। এর অর্থ শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছন্ন করে। অর্থাৎ যখন সে আবৃত করে সূর্যকে, অথবা দিবসকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'রাত্রি আবৃত করেছে দিবসকে'। প্রকৃত কথা হচ্ছে, রাত্রি তার অন্ধকার দ্বারা ঢেকে ফেলে সবকিছুকেই। এখানকার 'যখন সে আচ্ছন্ন করে' কথাটির যোগসূত্র রয়েছে একটি অনুক্ত শপথসূচক ক্রিয়ার সঙ্গে, অথবা একটি উহ্য সম্বন্ধপদের সাথে। 'ইজা' এখানে কালের আধার। তবে 'আল্ লাইল' (রজনীর) বিশেষণটি এখানে কালাধিকরণ কারক নয়। বরং 'ইজা' অর্থ এখানে— সময়, কাল।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'শপথ দিবসের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়'। একথার অর্থ— শপথ ওই দিবসের, যা উদ্ভাসিত হয় রাত্রির আঁধার ভেদ করে।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'ওয়ামা খলাক্বাজ্ জাকারা ওয়াল উন্‌ছা' (এবং শপথ তাঁর যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন)। 'মা' অব্যয়টি এখানে 'মান' অর্থপ্রকাশক। অর্থাৎ শপথ ওই সত্তার, যিনি বংশবিস্তারক্ষম প্রাণীকে বিভক্ত করেছেন দু'রকম সত্তায়— নর ও নারী। অথবা 'নর ও নারী' অর্থ এখানে— পিতা আদম ও মা হাওয়া । আবার 'মা' এখানে ধাতুমূলও হতে পারে। অর্থাৎ শপথ নর ও নারীর এবং যিনি এদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির'। বাক্যটি শপথের জবাব। এর অর্থ হে মানুষ! কর্মপ্রচেষ্টা অনুসারে তোমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে দু'টি স্থান— জান্নাত ও জাহান্নাম। তাই তো দেখা যায়, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ জাহান্নামের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করতে ব্যস্ত। আর কেউ কেউ তৎপর জান্নাতের উন্নততর স্তর সন্ধানে।

www.eelm.weebly.com

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু মালেক আশরারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষ সকালে বাড়ি থেকে বের হয়। তারপর বিক্রয় করতে থাকে নিজেকে। এভাবে কেউ নিজেকে মুক্ত করে জাহান্নাম থেকে, আবার কেউ নিজেকে নিক্ষেপ করে জাহান্নামে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে (৫) এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করলে (৬) আমি তার জন্য সুগম করে দিবো সহজ পথ' (৭)।

এখানে 'দান করলে' অর্থ আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করলে। আর 'মুক্তাকী হলে' অর্থ যে সকল অপকর্মের জন্য শাস্তি অবধারিত, সে সকল অপকর্ম থেকে বিরত থাকলে। আদী ইবনে হাতেম সূত্রে বোখারী-মুসলিম, জননী আয়েশা থেকে আহমদ, হজরত আনাস থেকে বাযযার, 'আওসাত' পুস্তকে তিবরানী, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে 'তাফসীরে কবীর' রচয়িতা, হজরত নোমান ইবনে বশীর এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে হজরত আবু উমামা ও হজরত বারা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা একটি খেজুরের অর্ধেক দান করে হলেও নরকাগ্নি থেকে পরিত্রাণের প্রয়াস পেয়ো।

'আল হুসনা' অর্থ যা সুন্দর। আবদুর রহমান আসলামা ও জুহাক বলেছেন, এখানে 'আল হুসনা' অর্থ কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্‌'। আতিয়া বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যাও এরকম। মুজাহিদ বলেছেন 'আল হুসনা' অর্থ জান্নাত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'লিল্‌লাজীনা আহ্‌সানুল হুসনা' (তাদের জন্য, যারা পুণ্যকর্ম করেছে জান্নাতের জন্য)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়—যারা আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকারী, তিনি তাদেরকে দান করবেন জান্নাত। ইকরামা বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যাও এরকম। কাতাদা, মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ— যে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতিকে সত্য বলে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছে, সে অবশ্যই তাঁকে পাবে প্রতিশ্রুতি পূরণকারী হিসেবে।

'আমি তার জন্য সুগম করে দিবো সহজ পথ' অর্থ আমি এরকম বিশ্বাসীকে দান করবো পুণ্যকর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য। ফলে সে পুণ্যকর্ম সমাধা করে উপযোগী হয়ে যাবে জান্নাতের। হবে আল্লাহ্‌র পরিতোষভাজন। এখানকার 'ইয়ুস্‌রা' (সুগম করে দিবো) কথাটি গঠিত হয়েছে 'ইয়াস্‌সায়াল ফারাস' যার অর্থ— অশ্বকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে লাগাম এবং তার উপরে স্থাপন করা হয়েছে গদি।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'এবং কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে (৮) আর যা উত্তম, তা অস্বীকার করলে (৯) তার জন্য আমি সুগম করে দিবো কঠোর পথ (১০)।

এখানে 'কার্পণ্য করলে' অর্থ আল্লাহ্‌র আদেশ মান্য করার ব্যাপারে গড়িমসি করলে। হজরত আনাস থেকে আলিয়া, হাকেম এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তি কৃপণ, যার

www.eelm.weebly.com

সামনে আমার নামোচ্চারণ করা হয়, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না। 'নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে' অর্থ আল্লাহ্‌র প্রতি প্রদর্শন করলে বেপরোয়া মনোভাব, তোয়াক্কা না করলে আল্লাহ্‌পাকের পাপ-পুণ্যের সিদ্ধান্তের।'যা উত্তম তা অস্বীকার করলে' অর্থ অমান্য করলে আল্লাহ্‌র এককত্বপ্রকাশক ও নবুয়তের সত্যতাজ্ঞাপক বাণীর। আর 'তার জন্য আমি সুগম করে দিবো কঠোর পথ' অর্থ তার উপরে আমি চাপিয়ে দিবো এমন স্বভাব, যা তাকে নিয়ে যাবে নরকে।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার স্থান নির্ধারণ করা হয়নি স্বর্গ অথবা নরকে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তাহলে কি আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবো? তিনি স. বললেন, না। আমল করতে থাকো। প্রত্যেকে সেই আমল করতে সমর্থ হবে, যার জন্য সে সৃজিত। সৌভাগ্যবানেরা আমল করতে সক্ষম হবে সৌভাগ্যবানদের মতোই। আর দুর্ভাগারা আমল করতে সমর্থ হবে হতভাগ্যদের মতো। প্রত্যেকের জন্য নিজ নিজ আমল করা হবে সহজ। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন আলোচ্য সুরার ৫ থেকে ১০ সংখ্যক আয়াত। বোখারী, মুসলিম।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীক একজন ক্রীতদাস ও দশ আওকিয়া রূপার বিনিময়ে উমাইয়া ইবনে খলফের কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়েছিলেন হজরত বেলালকে, তারপর তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ওই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হয় 'অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির'। অর্থাৎ উমাইয়া ইবনে খলফ এবং হজরত আবু বকর সিদ্দীকের আমল ছিলো পৃথক প্রকৃতির। একজনের আমল ছিলো জাহান্নামের জন্য, অপর জনের জান্নাতের। এরকম বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও। ইকরামা সূত্রে হাকেম ইবনে আবানের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক লোকের একটি খেজুর গাছ ছিলো, যার কাছ ঘেঁসে বসবাস করতো এক অতি দরিদ্র ব্যক্তি। একদিন গাছের মালিক তার ওই গাছের খেজুর পাড়তে শুরু করলো। তখন কয়েকটি খেজুর গিয়ে পড়লো দরিদ্র ব্যক্তির বাড়ির ভিতরে। তার ছোট ছোট ছেলে- মেয়েরা সেগুলো টপাটপ মুখে পুরতে লাগলো। লোকটি তৎক্ষণাৎ তাদের কাছে গেলো। খেজুরগুলোও সে বের করে নিলো মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে। দরিদ্র ব্যক্তি ঘটনাটি জানালো রসুল স.কে। তিনি খেজুর গাছের মালিককে ডেকে বললেন, ওই খেজুরের গাছটি আমাকে দিয়ে দাও। তোমাকে অনুরূপ খর্জুরবৃক্ষ দেওয়া হবে জান্নাতে। লোকটি বললো, খেজুর গাছ তো আমার আরো অনেক আছে। কিন্তু ওই গাছটি আমার অত্যধিক প্রিয়। একথা বলেই সে প্রস্থান করলো। আর একজন আগন্তুক এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো। সে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ! ওই খেজুর গাছটি যদি আমি তার কাছ থেকে খরিদ করে নিয়ে আপনাকে দিতে পারি, তবে আমিও কি অনুরূপ বিনিময় পাবো? তিনি স. বললেন, নিশ্চয়ই। আগন্তুক লোকটি তখন গেলো খেজুরের গাছের মালিকের কাছে। বললো, গাছটি আমার কাছে বিক্রয়

www.eelm.weebly.com

করে দাও। সে বললো, গাছটি আমার খুবই প্রিয়। ঠিক আছে তুমি যদি গাছটি কিনে নিতে চাও, তবে ওই গাছের বদলে আমাকে চল্লিশটি গাছ দাও। আগন্তুক বললো, আমি রাজি। এভাবে সে গাছটি খরিদ করার পর উপস্থিত হলো রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। বললো, গাছটি এখন আমার। আমি ওটিকে আপনার অধিকারে অর্পণ করলাম। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র ব্যক্তিটির কাছে গিয়ে বললেন, গাছটি এখন থেকে তোমার। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হলো শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছন্ন করে....'। ইবনে কাছীর বলেছেন, বর্ণনাটি বিরল পর্যায়ের। বাগবী লিখেছেন, আতার মাধ্যমেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁর বিবরণটি এরকম— খেজুর গাছের মালিক রসুল স. এর সুমহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করলো, আমার ওই খেজুর গাছটির সংলগ্ন বাড়ির ছেলে-মেয়েরা গাছটির খেজুর খেয়ে ফেলে। এখন আমি কী করবো? তিনি স. বললেন, গাছটি আমাকে দিয়ে দাও। এর বদলে তোমাকে অন্য গাছ দেওয়া হবে, যে কয়টি চাও। লোকটি অসম্মত হলো। পথিমধ্যে তার সাক্ষাত ঘটলো আবুল দাহদাহের সঙ্গে। তখন অবতীর্ণ হলো 'এবং কেউ কার্পণ্য করলে ....'।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত হিসেবে হজরত আবু বকর ও উমাইয়া ইবনে খলফের ঘটনাটিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। কেননা এই সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। পরের ঘটনাটিকে যদি আলোচ্য আয়াতসমূহের অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত ধরে নেওয়া হয়, তবে বলতে হয়, আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায় এবং একথাও তাহলে স্বীকার করে নিতে হয় যে, এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে আবুল দাহদাহের সাধুতা সম্পর্কে। এমতাবস্থায় এখানকার 'যা উত্তম, তা সত্য বলে গ্রহণ করে' কথাটির অর্থ হবে— যে আল্লাহ্র রসুলের অঙ্গীকারকে সত্য বলে জানে ও মানে। অর্থাৎ আবুল দাহদাহের মতো যে আল্লাহ্র পরিতোষাকাংখায় তাঁর রসুলের কাছে তার সম্পদ সম্প্রদান করে, জান্নাত গমনের সহজ পথ সুগম করে দেই আমি তার জন্যই। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতসমূহ বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হলেও এর নির্দেশনাটি সার্বজনীন। তবে একথাটিকেও মেনে নিতে হবে যে, 'কার্পণ্য করলে' 'নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে' 'যা উত্তম তা অস্বীকার করলে' এ সকল কথা এখানে খেজুর গাছের মালিককে লক্ষ্য করে বলা হয়নি। কেননা তিনি ছিলেন একজন আনসারী সাহাবী। সুতরাং কৃপণতা, বেপরোয়া ভাব, উত্তমতার প্রতি অস্বীকৃতি এ সকল অপস্বভাব তাঁর মধ্যে ছিলোই না। তাই তিনি কঠোর পথের অনুসারী কিছুতেই নন। কঠোর পথ বা জাহান্নামের পথ তো নির্ধারণ করা হয় তাদের জন্য, যারা ফরজ জাকাত দিতে অস্বীকার করে। এখানে তো সেরকম কিছু ঘটেনি।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'ওয়া মা ইউগ্নী আ'নহু মালুহূ' (এবং তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না)। 'মা' অব্যয়টি এখানে না-সূচক, অথবা অস্বীকৃতিজ্ঞাপক, প্রশ্নবোধক। এরপর বলা হয়েছে 'ইজা তারাদ্দা' (যখন সে ধ্বংস হবে)। 'তারাদ্দা' এর ধাতুমূল 'রাদ্দুন' অর্থ ধ্বংস, অথবা

www.eelm.weebly.com

শাস্তির উপযুক্ত। অথবা ‘রাদ্‌দুন’ অর্থ নিক্ষিপ্ত হওয়া। অর্থাৎ যখন সে নিক্ষিপ্ত হবে কবরে, অথবা জাহান্নামে। কাতাদা এবং আবু সালেহ বলেছেন, নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কথাই বলা হয়েছে এখানে।

সূরা লাইল ঃ আয়াত ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴿١٣﴾ فَأَنذَرْتُكُمْ
نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا
لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾
وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

q আমার কাজ তো কেবল পথনির্দেশ করা,
q আমিতো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের।
q আমি তোমাদিগকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি।
q উহাতে প্রবেশ করিবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য,
q যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়।
q আর উহা হইতে দূরে রাখা হইবে পরম মুত্তাকীকে,
q যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য,
q এবং তাহার প্রতি কাহারও অনুগ্রহের প্রতিদানে নহে,
q কেবল তাহার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়;
q সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘ইন্‌না আ’লাইনা লাল্‌হুদা’ (আমার তো কাজ কেবল পথনির্দেশ করা)। এখানকার ‘আলা’ অব্যয়টি বেগ সৃষ্টিকারী। অর্থাৎ পথ নির্দেশনা দানের দায়িত্বটি আমি অবধারিত করে নিয়েছি আমার পূর্বসিদ্ধান্তের কারণে, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে।

‘লাল্‌হুদা’ অর্থ সত্যপথ প্রদর্শন। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ উপস্থাপন এবং প্রত্যাদেশ প্রেরণই হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাগণের প্রতি হেদায়েত বা পথ প্রদর্শন। এরকম বলেছেন জুজায ও কাতাদা। ফাররা বলেছেন, যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে চলে তার গন্তব্য হয় আল্লাহ্। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘সরল পথের গন্তব্যস্থল ’।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— ‘আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের’। একথার অর্থ— পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর স্রষ্টা ও অধিকর্তা আমিই। সুতরাং যে প্রকৃত অধিকর্তাকে ছেড়ে অন্যের কাছে যাচনা করে, সে

www.eelm.weebly.com

বিভ্রান্ত । অথবা অর্থ— যেহেতু আমিই একমাত্র স্রষ্টা ও অধিকর্তা, তাই যারা পথপ্রাপ্ত, তাদেরকে পুরস্কৃতও করবো আমিই। আর যারা হেদায়েতের পথে চলে না, তাদেরকে পুরস্কৃত করা আমার কাজ নয়।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি (১৪)। তাতে প্রবেশ করবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য (১৫) যে স্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়' (১৬)।

'ফা' অব্যয়টি এখানে হেতুবাচক। অর্থাৎ যেহেতু আমি পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর স্রষ্টা ও অধীশ্বর, সেহেতু ভীতিপ্রদর্শনের অধিকার রয়েছে কেবল আমার। আমি তাই তোমাদেরকে জাহান্নামের লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সাবধান করে দিলাম। আর এখানকার 'আশক্বা' (নিতান্ত হতভাগ্য) যদিও পার্থক্যসূচক বিশেষণ, তবুও তা গুণবত্তাসূচক বিশেষণের অর্থপ্রদায়ক। একারণেই যারা অবিশ্বাসী এবং পাপী বিশ্বাসী, তারাই এই বক্তব্যটির আওতাভূত। আর এখানকার 'যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়' কথাটির অর্থ— যে সত্যপ্রত্যাখ্যান করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ্‌র রসুলকে। কথাটির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে কিছুসংখ্যক হতভাগার পরিচয়। যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। পাপী বিশ্বাসীরা বক্তব্যটির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা বিশ্বাস ও হতভাগ্যতা কখনো একত্র হতে পারে না। নিরেট হতভাগ্য কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই। অথবা বলা যেতে পারে 'অস্বীকার করে' অর্থ এখানে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে, যেমন করে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। কার্যত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে অবিশ্বাসীরা আর পাপী বিশ্বাসীরা করে নিষিদ্ধ কর্ম। বিশ্বাস বা সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী তারা নয়। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে 'অস্বীকার করে' অর্থ অস্বীকার করে মুখ ও মন উভয়ের দ্বারা। এটাই প্রকৃত কুফরী বা সত্যপ্রত্যাখ্যান। কিংবা 'অস্বীকার করে' অর্থ এখানে অস্বীকার করে নফসে আম্মারা, মনে ও মুখে ইমান থাকলেও। অর্থাৎ সব ধরনের অস্বীকৃতিই এর অন্তর্ভুক্ত।

এমনও বলা যেতে পারে যে 'আশক্বা' এখানে পার্থক্যসূচক বিশেষণ অর্থেই ব্যবহৃত এবং এর মর্মার্থ— অবিশ্বাসী, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আর জাহান্নামে প্রবেশ করার অর্থ এখানে সাধারণভাবে প্রবেশ করা নয়, যেমন জাহান্নামে প্রবেশ করবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপী বিশ্বাসী উভয়েই। এখানে জাহান্নামে প্রবেশ করার অর্থ বিশেষভাবে চিরদিনের জন্য নরকবাসী হওয়া। একারণেই শায়েখ বায়যাবী আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে লিখেছেন, জাহান্নামে যারা চিরদিন অবস্থান করবে, তারা হবে হতভাগ্য। তারাই কাফের। পাপী বিশ্বাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করলেও তাদের জাহান্নামবাস হবে সাময়িক। কেউ কেউ বলেছেন, বিষয়টি জটিল করার তো কোনো প্রয়োজন নেই। 'তাতে প্রবেশ করবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য' কথাটিতে ব্যবহৃত 'তাতে' সর্বনামটিকে 'লেলিহান অগ্নি'র সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিলেই তো বিষয়টি সহজ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— লেলিহান অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করবে কেবল অবিশ্বাসীরা। পাপী বিশ্বাসীরা

www.eelm.weebly.com

সেখানে প্রবেশ করলেও তারা থাকবে লেলিহান নরকাগ্নি থেকে মুক্ত। অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের তুলনায় তাদের শাস্তি হবে অনেক কম। জাহান্নামের উপরের স্তরে, ঠাঁই পাবে পাপী বিশ্বাসীরা এবং সেখানকার সর্বনিম্নস্তরে থাকবে অবিশ্বাসীরা।

আমি বলি, এখানে 'হতভাগ্য' বলে বুঝানো হয়েছে কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকেই। আর 'নার' (অগ্নি) অর্থ এখানে সমতেজস্বী অগ্নি। জাহান্নামের আগুনও হবে সমান দহন ক্ষমতাসম্পন্ন। নিম্ন স্তরের হোক অথবা হোক উপরের স্তরের। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকেই বলা হয়েছে 'নিতান্ত হতভাগ্য'। আর জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখায় নিক্ষিপ্ত হবে তারাই।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর সহচরবৃন্দ কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবেন না। কেননা তাঁরা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) যেমন নন, তেমনি নন পাপী (ফাসেক)। হতভাগ্যতার সঙ্গে তাঁদের কোনোই সম্পর্ক নেই। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য এই যে, তাঁরা সকলেই ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্পাক জান্নাত নির্ধারণ করেছেন। বলেছেন 'তোমরা উত্তম দল, নির্বাচিত হয়েছো মানব জাতির কল্যাণের জন্য'। আরো বলেছেন 'মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল। তাঁর সহচরবর্গ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে তাঁরা একে অপরের প্রতি নম্র'।

হজরত জাবের থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ইমানসহ আমার সাহচর্য লাভ করেছে, তাকে দোজখের আগুন স্পর্শ করবে না। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে রযীন বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র সদৃশ। তাদের যে কোনো একজনের অনুসরণ যারা করবে, তারা হেদায়েত পাবে। কোনো সাহাবীর দ্বারা পাপকর্ম সংঘটিত হওয়ার ঘটনা অতি বিরল। ঘটনাক্রমে এরকম ঘটে থাকলেও তাঁরা মনে প্রাণে তওবা করেছেন। আল্লাহ্পাকও নিশ্চয় তাঁদের তওবা কবুল করেছেন। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, পাপ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির মতো। ইবনে মাজা। আর রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গ তাঁদেরকে করেছে চিরপরিশুদ্ধ। তাঁরা অবশ্যই পুণ্যবান। আর রসুল স. তাঁর পুণ্যবান উম্মত সম্পর্কে বলেছেন, যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসবে তারা কখনো হতভাগ্য হবে না। এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজি। সাধারণ পুন্যবানের মর্যাদা যদি এরকম হয়, তবে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রসুল স. এর সুমহান সংসর্গে জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের মর্যাদা কীরকম হবে তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

রসুল স. এর যুগে মানবগোষ্ঠী ছিলো স্পষ্ট দু'টি ভাগে বিভক্ত— নির্ভেজাল কাফের, অথবা পরিপূর্ণ ইমানদার। সেকারণেই কোরআন মজীদে আলোচনা এসেছে এই দুই দল সম্পর্কে। পাপী বিশ্বাসীদের আলোচনা তেমন নেই। কেননা আলোচনার অবতারণা করা হয় সাধারণত উপস্থিত জনতাকে কেন্দ্র করে।

www.eelm.weebly.com

মরজীয়া সম্প্রদায় আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে যে, দোজখে প্রবেশ করবে কেবল কাফেরেরা। মুসলমান কখনো দোজখে প্রবেশ করবে না, পাপী হলেও। লঘু-গুরু কোনো প্রকার পাপই তার ইমানের জন্য ক্ষতিকর নয়। অর্থাৎ তারা বলে, ইমান থাকলে পাপ করলেও কোনো ক্ষতি নেই। তাদের এমতো অভিমত সঠিক নয়। কেননা বেইমান অবস্থায় যেমন পুণ্য কোনো কাজে আসে না, সুতরাং ইমানদার অবস্থায় পাপ ক্ষতিকর হবে না কেনো? খারেজীরাও এ ব্যাপারে মরজীয়াদের অভিমতানুসারী। আর শিয়ারা তো এই আয়াত থেকেই প্রমাণ করে যে, গুরু পাপের পাপীরা চিরকাল দোজখে বসবাস করবে। অর্থাৎ তাদের মত হচ্ছে, গুরুতর (কবীরা) গোনাহ যারা করে, তারা ইমানদারই নয়। অন্যান্য পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়গুলোও এরকম বলে। আমরা এ সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছি ইতোপূর্বেই। সুতরাং এ সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্পাক ক্ষমা করবেন না কেবল শিরিকের গোনাহ্। অন্যান্য গোনাহ তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন। তার জন্য তওবা করা হোক, অথবা না হোক।

আল্লাহ্পাক স্বয়ং এরশাদ করেছেন 'হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে যারা তোমাদের নফসের উপরে জুলুম করেছো, তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। তিনি যে পরম ক্ষমাপরবশ, অতীব দয়ালু'। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তিনি যাকে ইচ্ছা মার্জনা করবেন, যাকে ইচ্ছা দিবেন শাস্তি'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ পুণ্যও করবে, সে তা দেখতে পাবে'। অতএব মুমিনদেরকে কখনো চিরজাহান্নামী বলা যাবে না, তারা পাপাচারী হলেও, তাদের পাপ মার্জনা করা না হলেও।

রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' বলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'অণুপরিমাণ পাপ যে করবে, সে তা দেখতে পাবে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক যদি তাকে শাস্তি দিতে চান তবে তাকে ভোগ করতে হবে জাহান্নামের শাস্তি। আর ওই শাস্তি হবে তার পাপক্ষয়ের কারণ। এভাবে পাপক্ষয়ের পর তাকে দেওয়া হবে নিষ্কৃতি।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'আর তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে'। এখানে 'সাইউজ্বান্নাবুহাল আত্ক্বা' কথাটির 'সীন' অক্ষরটি নিশ্চিতার্থক। অর্থাৎ প্রকাশ্য-গোপন, দৈহিক-আত্মিক-প্রবৃত্তিক পাপ করা থেকে যারা মুক্ত, তাদেরকে অবশ্যই দূরে রাখা হবে জাহান্নাম থেকে। আর 'আতক্বা'র (তাকওয়ার) স্তর অর্জিত হয় তখন, যখন হৃদয় হয় প্রশান্ত এবং প্রবৃত্তি হয় পবিত্র।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য'। একথার অর্থ— জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ওই সকল মুত্তাকীকেই, যারা আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্রীতদাস মুক্ত করে, দান করে অভাবগ্রস্তকে এবং ইত্যাকার জনহিতকর কার্যে।

www.eelm.weebly.com

এখানকার 'ইয়াতাযাক্কা' (আত্মশুদ্ধি করে) পদটি অনুবর্তী 'ইউতী' (দান করে) পদের, যা কর্তার অবস্থা বর্ণনাকারী। অর্থাৎ মুত্তাকীরা দান করে আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন, কিংবা খ্যাতির জন্য নয়। অথবা 'ইতাযাক্কা' অর্থ এখানে জাকাত দেয়, যেহেতু এর বিপরীত অনুভূতি আমাদের কাছে ধর্তব্য নয়। একারণে এই আয়াত থেকে একথা প্রমাণ করা যায় না যে, যারা সংযমী (মুত্তাকী) তারা আবার জাহান্নামে যাবে। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের অভিমতও এই যে, সংযমীরা কখনোই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যদিও তারা বিপরীত অনুভূতির প্রবক্তা। কারণ আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সম্ভবত বাক্যটি তারই বিবরণ। হজরত আবু বকর সিদ্দীক ছিলেন নবীগণের পরে সর্বাপেক্ষা অধিক মুত্তাকী। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে তাঁর কথা। অর্থাৎ তিনি দান করেন কেবল আত্মশুদ্ধির জন্য, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। আর আগের আয়াতের 'আল আত্ক্বা' (পরম মুত্তাকী) দ্বারা আমরা নবী-রসুলগণকে পৃথক করেছি কোরআন হাদিস এবং আলেমগণের ঐকমত্যের আলোকে। কথাটির 'আলিফ লাম' অন্তরালমূলক।

আগের আয়াতের 'আত্ক্বা' (পরম মুত্তাকী) কথাটিকে নিবৃত্তিমূলক ধরে নিয়ে 'তুক্বা'র (স্বল্প মুত্তাকীর) জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করার আদেশের বিপরীত অনুভূতি সাপেক্ষ মনে করলে এবং 'আত্ক্বা'র বিপরীত হিসেবে' 'তুক্বা' যদি মেনেও নেওয়া যায় এবং এর বিপরীত অনুভূতি সাপেক্ষে জাহান্নামে প্রবেশ যদি ধরেও নেওয়া যায়, তবুও 'তুক্বা'র মর্মার্থ গ্রহণ করতে হবে— ওই ব্যক্তি নিবৃত্ত ছিলো কেবল শিরিক বা অংশীবাদিতা থেকে। সে শিরিকসহ অন্যান্য পাপ থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারেনি। ফলে হতে পারেনি 'পরম মুত্তাকী'। আর এ ধরনের ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের শাস্তি সিদ্ধ।

ওরওয়া সূত্রে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীক এমন সাত জন ক্রীতদাসকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, যাদের উপরে অকথ্য অত্যাচার চালানো হতো কেবল ইসলাম গ্রহণ করার কারণে। তাঁর এমতো পুণ্যপ্রচেষ্টাকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে 'আর তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে......'।

আমি বলি, 'আল আত্ক্বা' এর 'আলিফ লাম' সীমিতার্থক। অর্থাৎ কথাটি প্রযোজ্য কেবল হজরত আবু বকর সিদ্দীকের ক্ষেত্রে। আমের ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে হাকেম লিখেছেন, একবার পিতা আবু কোহাফা পুত্র আবু বকরকে বললেন, তুমি তো দেখছি কেবল দুর্বল লোকগুলোকে কিনে কিনে মুক্ত করে দিচ্ছো। যদি শক্তিশালী লোকগুলোকে এভাবে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতে, তবে তারা তোমার হেফাজত করতো, করতো সেবা-যত্নও। পুত্র বললেন, পিতা! আমি তো ওই বস্তুর প্রত্যাশী, যা সংরক্ষিত রয়েছে আল্লাহ্র নিকটে। তাঁর এমতো শুভবচনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য সুরার ৫, ৬ ও ৭ সংখ্যক আয়াত।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, হজরত বেলালের পিতার নাম ছিলো রিবাহ এবং মাতার নাম ছিলো হামামাহ্। তিনি ছিলেন জমুহ গোত্রের ক্রীতদাস। ছিলেন পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী। মহাপাতক উমাইয়া ইবনে খালফ তাঁকে প্রখর রোদে

www.eelm.weebly.com

উত্তপ্ত বালির উপরে চিৎ করে শুইয়ে দিতো। বুকে চাপা দিতো একটি প্রকাণ্ড পাথর। বলতো, মোহাম্মদের ধর্ম ছেড়ে দাও, যদি মুক্তি পেতে চাও। হজরত বেলাল যতক্ষণ জ্ঞান থাকতো ততক্ষণ বলতেন 'আহাদ' 'আহাদ' (আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক)।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হিশাম ইবনে ওরওয়া বলেছেন, একবার হজরত আবু বকর সিদ্দীক কোথাও যাচ্ছিলেন। বনী জমুহের পল্লী অতিক্রমকালে দেখলেন, হজরত বেলালের উপর চালানো হচ্ছে চরম উৎপীড়ন। তিনি উমাইয়া ইবনে খালফকে বললেন, নিরীহ লোকটিকে তুমি কষ্ট দিচ্ছো। তোমার বিবেক বলে কি কিছু নেই? সে বললো, তুমিই একে নিয়ে নাও ও মুসিবত থেকে আমাকে মুক্তি দাও। হজরত আবু বকর বললেন, আমার কাছে আছে এক বলশালী কাফ্রী ক্রীতদাস। তার সঙ্গে এর বদলাবদলি করো। উমাইয়া রাজী হলো। হজরত আবু বকর এভাবে হজরত বেলালকে নিজের অধিকারে নিয়ে তাঁকে মুক্ত করে দিলেন। তাঁর পূর্বে তিনি এরকম আরো ছয়জন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁদের একজনের নাম ছিলো হজরত আমের ইবনে ফুহাইরা। তিনি বদর যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পরে শহীদ হয়েছিলেন বীরে মাউনার যুদ্ধে। মুক্ত ক্রীতদাসীদের মধ্যে এক জন ছিলেন উম্মে উমাইস। মুক্ত হওয়ার প্রাক্কালে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পাচ্ছিলো। তাই কুরায়েশ কাফেরেরা তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছিলো, দ্যাখো, মুক্তিই তোমার দৃষ্টি কেড়ে নিলো। তাঁর কন্যা হুসনাও ছিলেন মুক্ত ক্রীতদাসীদের একজন। তাঁরা মাতা-পুত্রী দু'জনেই ছিলেন আবদুদ্দার গোত্রের এক মহিলার ক্রীতদাসী। হজরত আবু বকর একদিন ওই মহিলাকে বললেন, এদেরকে মুক্ত করে দাও। মহিলা বললো, তুমি এদেরকে কিনে নিয়ে ছেড়ে দাওনা কেনো? হজরত আবু বকর তাই করেছিলেন। মহাপুণ্যবতী মাতা-পুত্রীকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

বনী মুসেল গোত্রের এক ক্রীতদাসীও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উপরেও চালানো হতো চরম নিপীড়ন। হজরত আবু বকর তাঁকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকর যখন হজরত বেলালকে ক্রয় করতে চাইলেন, তখন উমাইয়া বললো, বিনিময়রূপে দিতে হবে তোমার নাসতাশ নামের ক্রীতদাসটিকে। হজরত আবু বকর তখন ছিলেন ধনাঢ্য। তিনি নাসতাশকেও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু নাসতাশ তাতে রাজী হয়নি। শেষে নাসতাশের বিনিময়ে তিনি ক্রয় করলেন হজরত বেলালকে এবং যথারীতি তাঁকে মুক্তও করে দিলেন। তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (১৯)।

বলা হলো— 'এবং তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়'। একথার অর্থ— হজরত আবু বকর হজরত বেলাল ও তাঁর মতো অন্যান্য ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষ কামনায়। তাঁদের এমন কোনো অনুগ্রহ তাঁর উপরে ছিলো না যে, তিনি এরকম করেছিলেন

www.eelm.weebly.com

তার প্রতিদান পরিশোধার্থে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের থেকে বায্যার বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীককে লক্ষ্য করেই। পুরো বাক্যটিই আগের আয়াতের 'দান করে' কথাটির অবস্থাপ্রকাশক। অথবা বাক্যটি প্রারম্ভিক, একটি ধারণাপ্রসূত প্রশ্নের জবাব। সেই ধারণাটি হচ্ছে— ক্রীতদাসগণ কি পূর্বে কখনো হজরত আবু বকরের কোনো উপকার করেছিলেন, যার প্রত্যুপকারস্বরূপ তিনি তাঁদেরকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন? এমতো প্রশ্নের জবাবেই এখানে বলা হয়েছে 'এবং তাঁর প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়'।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়'। এখানকার 'ইল্লা' (কেবল) ব্যতিক্রমীটি বিযুক্তক। অর্থাৎ— না, তিনি প্রত্যুপকার সাধনার্থে তাঁদেরকে মুক্ত করে দেননি, মুক্ত করে দিয়েছিলেন কেবল আল্লাহ্র পরিতোষ লাভের আশায়। অথবা ব্যতিক্রমীটি এখানে যুক্তক এবং যা থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে, তা এখানে রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ তিনি তাঁর মহান প্রভুপালকের সন্তোষ লাভের আশা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে, বা প্রত্যুপকার করার জন্য এমনটি করেননি।

শেষোক্ত আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে'। একথার অর্থ— হজরত আবু বকর পরলোকে অবশ্যই লাভ করবেন আল্লাহ্র পরিতোষ, আর পরকাল তো আসন্নই, বরং অত্যাসন্ন। অথবা কথাটির অর্থ হবে—আল্লাহ্পাক পরবর্তী পৃথিবীতে তাঁর এমতো পুণ্যকর্মের এমন প্রতিদান দিবেন, যা লাভ করে তিনি হবেন অত্যুৎফুল্ল। উল্লেখ্য, রসুল স.কেও শুভ বারতা জানানো হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে 'অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন, আর তুমি তুষ্ট হবে'।

নবী-রসুলগণের পরে হজরত আবু বকর সিদ্দীকই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মুত্তাকী। সুতরাং তিনিই মানব জাতির মধ্যে সর্বোত্তম। সর্বোত্তম ব্যক্তির পরিচয় ঘোষণা করা হয়েছে এক আয়াতে এভাবে 'তোমাদের মধ্যে মর্যাদাশালী ওই ব্যক্তি, যে মুত্তাকী'। উম্মতের আলেমগণের ঐকমত্যও এরকম। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমরা রসুল স. এর সময়ে মহামান্য আবু বকরের সমতুল্য অন্য কাউকে মনে করতাম না। তাঁর পরে মান্যবর ওমর, তাঁর পর মাননীয় ওসমান এবং তাঁর পরে শ্রদ্ধেয় আলী। বোখারী।

মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া একবার হজরত আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, অনুগ্রহ করে বলুন, রসুল স. এর পরে সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব ছিলেন কে? তিনি জবাব দিলেন, আবু বকর। তারপর ওমর। আমি এ সম্পর্কে অনেক হাদিস, সাহাবীবচন উল্লেখ করে বিষয়টি যে ঐকমত্যসম্মত তা প্রমাণ করেছি আমার 'সাইফুল মাসলুল' গ্রন্থে।

সূরা দুহা

মহাপুণ্যময় মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এরমধ্যে রয়েছে ১টি রুকু এবং ১১টি আয়াত।

www.eelm.weebly.com

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁদের বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে গভীর রাতে উঠে তিনি স. দু'এক রাত নামাজ পড়তে পারলেন না। তাঁর প্রতিবেশিনী মহিলা বললো, মোহাম্মদ! এবার মনে হয় তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। তখন অবতীর্ণ হয় এই সুরা। বাগবী লিখেছেন, হজরত জুনদুব বলেছেন, মহিলাটি ছিলো হতভাগা আবু লাহাবের হতভাগিনী স্ত্রী।

হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম থেকে হাকেম বলেছেন, একবার বেশ কিছু দিন প্রত্যাদেশ অবতরণ বন্ধ রইলো। আবু লাহাবের স্ত্রী তখন বললো, মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গী তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। সে তোমার প্রতি অতুষ্ট। তার এমতো অপবচনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই সুরা।

হজরত জুনদুব থেকে সাঈদ ইবনে মনসুর বর্ণনা করেছেন, একবার বেশ কিছু দিন যাবত হজরত জিবরাইলের আগমন ঘটলো না। পৌত্তলিকেরা বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদের সঙ্গী মোহাম্মদকে পরিত্যাগ করেছে। তখন অবতীর্ণ হয় 'ওয়াদ্দুহা ওয়াল লাইলি ইজা সাজ্বা....'। শাদ্দাদ ইবনে আবদুল্লাহ্র মাধ্যমে ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, তখন জননী হজরত খাদীজা বললেন, মনে হয় আপনার অধৈর্যভাব দেখে আল্লাহ্ আপনার উপরে অপরিতুষ্ট হয়েছেন। তাঁর এমতো কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় সুরা দুহা। দু'টো বর্ণনাই অপরিণত শ্রেণীর। তবে বর্ণনাকারীগণ বলিষ্ঠ। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, প্রকাশ্যত ধারণা করা যেতে পারে, উম্মে জামিল এবং জননী খাদিজা হয়তো এরকমই বলেছিলেন। তবে তাঁদের একজনের মন্তব্য ছিলো উৎফুল্ল মনের এবং অন্য জনের ব্যথিত চিত্তের।

ইবনে আবী শায়বা এবং তিবরানী এমন এক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছেন একজন অপ্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী হাফস ইবনে মাইসারা কুরায়েশী। তিনি তাঁর মাতা এবং তিনি তাঁর মাতা থেকে, যিনি ছিলেন রসুল স. এর পরিচারিকা, তিনি বলেছেন, একবার রসুল স. এর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলো একটি কুকুর ছানা। আশ্রয় গ্রহণ করলো রসুল স. এর খাটিয়ার নিচে। এরপর সে সেখানে মারা গেলো। ফলে চারদিন যাবত প্রত্যাদেশ আগমন বন্ধ রইলো। তিনি স. আমাকে বললেন, খাওলা! দ্যাখোতো কী ঘটলো। ভ্রাতা জিবরাইল আসছেন না কেনো? আমি ভাবলাম, ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করি। ঝাড়ু দিতে গিয়েই দেখলাম খাটিয়ার নিচে মরে পড়ে রয়েছে কুকুর ছানাটি। আমি সেটিকে বাইরে ফেলে দিয়ে এলাম। এমন সময় রসুল স. ঘরে ঢুকলেন। দেখলাম, তাঁর পবিত্র শ্মশ্রু কাঁপছে। আমি জানতাম প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর সমস্ত শরীর এভাবে কাঁপে। জানলাম, অবতীর্ণ হয়েছে নতুন সুরা 'ওয়াদ্দুহা' ১ থেকে ৫ সংখ্যক আয়াত পর্যন্ত। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, কুকুর ছানার কারণে যে ওহী বন্ধ ছিলো, সে কথা ঠিকই। বর্ণনাটিও নিঃসন্দেহে সুপ্রসিদ্ধ। তবে এই ঘটনাটিকে সুরা ওয়াদ্দুহার অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত ভাবা অনুচিত।

বাগবী লিখেছেন, ওহী কতোদিন বন্ধ ছিলো, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণ মতানৈক্য করেছেন। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, বারো দিন। মুকাতিল বলেছেন, চল্লিশ দিন। তিনি আরো বলেছেন, প্রত্যাদেশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পৌত্তলিকেরা রসুল স.কে

www.eelm.weebly.com

উপহাস করতে শুরু করলো। বলতে লাগলো, তার পালনকর্তা তাকে পরিত্যাগ করেছে। তাদের এমতো অপমন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই সুরাখানি। ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দীর্ঘ বিরতির পর যখন হজরত জিবরাইল ওহী নিয়ে আগমন করলেন, তখন রসুল স. বললেন, প্রিয় ভ্রাতঃ! আপনি আসছেন না দেখে আমি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। জিবরাইল বললেন, আমি তো স্বচালিত নই, পরিচালিত। নির্দেশ পাইনি বলেই এতোদিন আসতে পারিনি।

সূরা দুহা ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

وَ الضُّحٰی ۙ﴿١﴾ وَ الَّیۡلِ اِذَا سَجٰی ۙ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ مَا قَلٰی ؕ﴿٣﴾ وَ
لَلۡاٰخِرَۃُ خَیۡرٌ لَّکَ مِنَ الۡاُوۡلٰی ؕ﴿٣﴾ وَ لَسَوۡفَ یُعۡطِیۡکَ رَبُّکَ فَتَرۡضٰی ؕ﴿٥﴾

r শপথ পূর্বাহ্নের,

r শপথ রজনীর যখন উহা হয় নিঝুম,

r তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নাই।

r তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়।

r অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করিবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ওয়াদ্দুহা'। একথার অর্থ— শপথ পূর্বাহ্নের, অথবা দিবসের। কেউ কেউ বলেছেন, 'দুহা' অর্থ দিবস, যেহেতু এর পরে দিবসের বিপরীতে এসেছে রজনীর কথা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আঁই ইয়া'তিয়া হুম বা'সুনা দুহান' (আমার শাস্তি তাদের উপরে আপতিত হয়েছিলো দিবাভাগেই)। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, এর অর্থ সকালের প্রথম ভাগ, যখন সূর্য একটু চড়া হয়ে ওঠে। এ সময়ের বিশেষত্ব সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, শীত-গ্রীস্ম-বর্ষা-বসন্ত সব ঋতুতেই এ সময়টা থাকে প্রায় একই রকম— আরামপ্রদ।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'ওয়াল্ লাইলি ইজা সাজ্বা' এর অর্থ— শপথ রজনীর, যখন তা হয় নিঝুম। এখানে 'ইজা' (যখন) হচ্ছে ক্রিয়ার আধার। আর শপথসূচক ক্রিয়াটি এখানে রয়েছে উহ্য। অথবা এখানকার 'লাইল' (রজনী) শব্দটির পূর্বে অনুক্ত রয়েছে একটি সম্বন্ধপদ। অর্থাৎ 'হুসুলু লাইল' (যখন রজনীর আগমন ঘটে)। 'যখন' সম্পৃক্ত এই আগমনের সাথে। অথবা 'ইজা' এখানে 'লাইল' এর বিশেষণ। কিংবা 'ইজা' এখানে ক্রিয়ার আধার না হয়ে হবে 'সময়ে'র অর্থবহ। আর 'সাজ্বা' অর্থ আঁধারসহ রাতের আগমন। এরকম বলেছেন হাসান বসরী। অর্থাৎ

www.eelm.weebly.com

আঁধারসহ আগমনকারী রাতের শপথ! আউফির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। আর ওয়ালেবী অর্থ করেছেন— অপসৃয়মান রাতের শপথ! আতা এবং জুহাক অর্থ করেছেন— রাতের শপথ, যখন সে তমসাবৃত করে সকল বস্তুকে। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— যখন সে ঠিক হয়ে যায়। কাতাদা ও ইবনে সাকান বলেছেন— রাতের অন্ধকার যখন স্থির হয়ে যায়, যখন অন্ধকার আর বাড়ে না। অথবা মর্মার্থ হতে পারে— নিস্তব্ধ নিঝুম রাতে মানুষ যখন সুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই সময়ের শপথ। 'লাইলুন সাজ্বা' অর্থ সেই রাত্রি, যাতে জন্ম নেয় প্রশান্তি। যেমন 'বাহরুন সাজ্ব' অর্থ প্রশান্ত সাগর। আগের সুরায় দিবসের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে রাত্রির। কেননা রাত আসে দিনের আগে। আর এখানে প্রথমে এসেছে পূর্বাহ্নের কথা। রাতের উল্লেখ এসেছে পরে। দিন যে রাতের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই এখানে রাতের আগে এসেছে দিনের পূর্বাহ্নের কথা।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক! আমি তো আপনাকে ভালোবাসি। সুতরাং আপনি একথা কখনো ভাববেন না যে, আমি আপনাকে পরিত্যাগ করবো, অথবা হবো অপ্রসন্ন। এখানকার 'মা ওয়াদ্দাআ'কা (পরিত্যাগ করেননি) কথাটির 'কা' (তোমাকে) হচ্ছে কর্মপদ। তাই 'মা ক্বলা' (বিরূপও হননি) এর পরে আর 'কা' (তোমাকে) কথাটির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়নি। অন্যথায় এখানকার 'মা ক্বলা' কে পড়তে হতো 'মা ক্বলাকা'।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তোমার জন্য তো পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়'। কথাটি সম্ভবত পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— আপনাকে আপনার প্রভুপালক তো পরিত্যাগ করেনইনি, অপ্রসন্নও হননি এতটুকু। তিনি ক্রমশ আপনাকে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রত্যাদেশ করতে থাকবেন। ক্রমাগত দান করতে থাকবেন অধিকতর মর্যাদা। ফলে আপনার মর্যাদা হতে থাকবে উন্নত থেকে উন্নততর।

এখানে 'পরবর্তী সময়' অর্থ পরকাল। অর্থাৎ আখেরাতে আপনি হবেন অধিকতর মহিমময় ও মহান। পাবেন নবীগণসহ সকল মানুষের একচ্ছত্র নেতৃত্ব। লাভ করবেন মাকামে মাহমুদ, হাউজে কাওছার, প্রশংসার পতাকা। আপনার উম্মত হবে অন্য সকল উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতা। উল্লেখ্য, রসুল স. এর আখেরাতের অনন্যসাধারণ মর্যাদা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি সুরা বাকারায় 'তিলকার রসুল' আয়াতের তাফসীর ব্যপদেশে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। ইবনে আবী শায়বার মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার আহলে বায়াতের জন্য আল্লাহ্ ইহজগত অপেক্ষা পরজগতকে প্রাধান্য দিয়েছেন বেশী।

অথবা আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হতে পারে এরকম— আপনার এ জীবনের পরবর্তী সময় হতে থাকবে পূর্ববর্তী জীবনের চেয়ে অধিক কল্যাণময়। অর্থাৎ রূহানী দিক থেকে আপনি পেতে থাকবেন আল্লাহ্‌র অধিকতর নৈকট্য ও পরিচয় (কোরবত ও

www.eelm.weebly.com

মারেফত)। একারণেই সুফীগণ বলেন, যে আধ্যাত্মিক পথিকের দুইদিন একরকম হাল থাকে, সে ক্ষতিগ্রস্ত। বুঝতে হবে, তার উন্নতি হয়ে গেছে রুদ্ধ।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন, আর তুমি সন্তুষ্ট হবে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! ভাবছেন কেনো, অচিরেই আমি আপনাকে দান করবো অনেক অনেক কল্যাণ। দান করবো বিজয়, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, প্রতাপ। অধিকসংখ্যক সহচর। ইসলামের ব্যাপকতর প্রসার। আর আখেরাতে শাফায়াতের অধিকার এবং নৈকট্যভাজনতা-প্রিয়ভাজনতার এমন মহিমা, যা কারো অনুমানসাধ্য নয়। প্রদর্শন করবো আমার আনুরূপ্যবিহীন সৌন্দর্য। ফলে উৎফুল্ল না হয়ে আপনি পারবেনই না।

বায়হাকী তাঁর 'দালায়েল' গ্রন্থে, তিবরানী তাঁর 'আওসাতে' এবং হাকেম তাঁর নিজস্ব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ভবিষ্যতে কী কী সাফল্যের অধিকারী করা হবে, তা একবার তাঁকে আত্মিক দর্শনের মাধ্যমে দেখানো হলো। তিনিও হলেন বিস্মিত ও হর্ষোৎফুল্ল। তখনই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

শাফায়াতের অধিকারপ্রাপ্তি হচ্ছে রসুল স. এর একটি সুবৃহৎ মর্যাদা। তিনি স. বলেছেন, আমার একজন উম্মতও যদি দোজখে যায়, তবুও আমি সন্তুষ্ট হবো না। হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করতেই থাকবো। পরিশেষে আমার প্রভুপালনকর্তা আমাকে বলবেন, মোহাম্মদ! খুশী হয়েছো তো? আমি বলবো, হ্যাঁ। হে আমার পরমতম উপাস্য! আমি পরিতুষ্ট।

আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন 'অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন' কথাটির অর্থ— অচিরেই আল্লাহ্ আপনাকে দিবেন শাফায়াতের অধিকার। আপনার সুপারিশে মার্জনা করা হবে অসংখ্য পাপীকে। আর আপনি তখন হবেন পূর্ণরূপে পরিতুষ্ট। এরকম ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে হজরত আলী এবং ইমাম হাসান থেকেও। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার প্রার্থনা করলেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! আমার উম্মতকে মার্জনা করো, আমার উম্মতকে মার্জনা করো। আল্লাহ্ তখন জিবরাইলকে বললেন, যাও, আমার প্রিয়তম রসুলকে সান্ত্বনা দাও। বলো, তার উম্মতের ব্যাপারে আমি তাকে প্রসন্ন করবো। দুঃখ দিবো না।

আইয়ুব ইবনে শোরাইহ বর্ণনা করেছেন, আমি মান্যবর আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে আলী জয়নুল আবেদীনকে বলতে শুনেছি, ওহে ইরাকবাসী! তোমরা বলে থাকো, কোরআন মজীদের সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক আয়াত 'হে আমার ওই সকল বান্দা, তোমরা যারা তোমাদের নফসের উপরে অত্যাচার করেছো, তারা আল্লাহ্র করুণা থেকে নিরাশ হয়ো না' কিন্তু আমরা আহলে বাইত বলি, সর্বাপেক্ষা অধিক আশাব্যঞ্জক আয়াত হচ্ছে 'অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন, আর তুমি সন্তুষ্ট হবে'।

www.eelm.weebly.com

এখানকার 'লাসাওফা' পদের 'লাম' অব্যয়টিকে অনেকে বলেছেন সূচনামূলক। অর্থাৎ উদ্দেশ্য এখানে অনুক্ত এবং বিধেয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'লাম'। মূলতঃ বাক্যটি ছিলো 'ওয়া লা আনতা সাওফা ইউত্বিকা' (আর অবশ্যই আপনাকে দেওয়া হবে অচিরেই)। 'লাম' টি এখানে তাগিদসূচক নয়। কেননা বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের শব্দরূপের সঙ্গে 'লাম' তাগিদ যুক্ত হয় না। আবার অধিকাংশ বিদ্বানের মতে এখানকার 'লাম' তাগিদসূচক। এজন্যেই 'লাম' যুক্ত হয়েছে 'সাওফা'র সাথে। বর্তমান-ভবিষ্যতকালের শব্দরূপ 'ইউত্বিকা'র সঙ্গে যুক্ত হয়নি। আর সূচনামূলক 'লাম'ও 'সাওফা'র সাথে যুক্ত হয় না। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে কতকগুলো অযাচিত অনুগ্রহের কথা। যেমন—

সূরা দুহা ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝٦ وَ وَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝٧ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۝٨

r তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই আর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই?

r তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।

r তিনি তোমাকে পাইলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করিলেন,

---

প্রথমে বলা হয়েছে 'আ লাম ইয়াজ্বিদ্কা ইয়াতীমান'। এর অর্থ— আল্লাহ্ কি আপনাকে পিতৃহীন, অনাথ হিসেবে পাননি? এখানকার 'ইয়াজ্বিদ' শব্দটির ধাতুমূল 'ওয়াজ্বদ'। এর অর্থ পাওয়া, জানা। প্রশ্নটি করা হয়েছে 'না' কে বিলুপ্ত করার জন্য। আর 'না'র বিলুপ্তিতে অনিবার্য হয় হাঁ। সম্বোধ্য ব্যক্তির নিকট থেকে স্বীকৃতি আদায় করাই হয় এরকম প্রশ্নের উদ্দেশ্য। এভাবে কথাটির সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! স্মরণ করুন, আপনি পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন পিতৃহীন হয়ে। আপনার পিতা তো আপনার জন্য কোনো সহায়-সম্পদও রেখে যাননি।

এরপর বলা হয়েছে 'ফাআওয়া'। এর অর্থ— আর তোমাকে আশ্রয় দান করেননি? অর্থাৎ তারপর আল্লাহ্ই তো আপনার ভরণপোষণের সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আপনার পিতৃব্য আবু তালেবের হৃদয়ে ঢেলে দিয়েছিলেন আপনার প্রতি সুগভীর বাৎসল্য। ফলে একান্ত মমতায় আপনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন তার গৃহে। এটা কি আপনার প্রতি আমার বিশাল অনুগ্রহ নয়?

তিরমিজি সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি একবার আল্লাহ্র কাছে এমন একটি নিবেদন করেছিলাম, যা না করাই ছিলো উত্তম। আমি বলেছিলাম, হে আমার প্রভুপালক! তুমি নবী দাউদ ও নবী

www.eelm.weebly.com

সুলায়মানকে বিশাল রাজত্ব দান করেছিলে। দান করেছিলে আরো অনেক কিছু। আল্লাহ্ বললেন আমি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাইনি? আর তোমাকে আশ্রয় দান করিনি? আমি বললাম, নিশ্চয়, হে আমার প্রভুপালনকর্তা, অবশ্যই। এটা তো আমার উপর তোমার বিশাল অনুকম্পা। তিনি আরো বললেন, আমি কি তোমাকে পাইনি পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর আমি পথের নির্দেশ দিলাম। আমি জবাব দিলাম, হে আমার পরম প্রভুপালয়িতা, একথাও তো সঠিক। আর এটাও তো তোমার অযাচিত দয়া। আল্লাহ্ পুনরায় বললেন, আমি তোমাকে পেলাম নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাব মুক্ত করলাম। আমি বললাম, হে আমার পরম প্রভুপালক। তুমি তো তা করেছোই। এভাবে আমাকে করেছো বিশেষভাবে অনুকম্পায়িত। তিনি বললেন, আমি কি তোমার বক্ষ সম্প্রসারিত করে দেইনি? আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়, নিশ্চয়। এটাও তো তোমার অতুলনীয় অনুগ্রহ।

কেউ কেউ ধারণা করেন, রসুল স. বিত্তহীন ছিলেন বলেই বিধর্মীরা বলতো, সম্পদ চাও তো বলো। আমরা তোমাকে বিত্তশালী করে দিবো। তবু তোমার উদ্ভট প্রচার থামাও। রসুল স.ও মনে করতে শুরু করলেন, তাঁর ধন সম্পদ থাকলে তারা তাঁকে এরকম কথা বলতে পারতো না এবং তাঁকে হয়তো সত্য নবী বলে বিশ্বাসও করতো। আর তিনিমনে প্রাণে চাইতেন, তারা ইসলাম গ্রহণ করুক। সেকারণেই তিনি আল্লাহ্র কাছে সম্পদপ্রার্থনা করেছিলেন। তখন আল্লাহ্পাক তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে উল্লেখ করেছিলেন অতীতের কয়েকটি অনুগ্রহের কথা। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অভাবমুক্ত করার। কিন্তু তাঁদের এরকম ব্যাখ্যা যথার্থ নয়। কেননা—১. আল্লাহ্পাক তাঁকে দান করেছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ নবুয়ত। সুতরাং পার্থিব সম্পদের প্রতি তাঁর আগ্রহ থাকা শোভনীয় নয়। ২. আল্লাহ্পাক বলেছেন, তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন, সুতরাং অভাবমুক্ত বা ধনী হওয়ার পর তাঁর পক্ষে পুনঃসম্পদ কামনা করাও সম্ভব নয়। ৩. তিনি স. যদি আল্লাহ্র কাছে সম্পদপ্রার্থী হতেন, তবে আল্লাহ্পাক নিশ্চয়ই তাঁর প্রার্থনা পূরণ করতেন, কেননা তিনি স. ছিলেন আল্লাহ্র প্রিয়তমজন। বাস্তবে দেখা যায়, তিনি স. ছিলেন পার্থিব সম্পদের প্রতি ঘোর নিস্পৃহ। কখনো কখনো অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটিয়েছেন, কিন্তু এর জন্য কখনো বিচলিত বোধ করেননি। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের প্রতি ছিলেন সতত পরিতুষ্ট। জননী আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম তো এরকমই বর্ণনা করেছেন।

সুফী-আউলিয়াগণের ব্যাখ্যা আবার অন্য রকম। তাঁরা বলেন, আধ্যাত্মিক পথের পথিকগণের সম্মুখে উপস্থিত হয় দুটি অবস্থা— ১. সৃষ্টির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত হয়ে তাঁরা হন পূর্ণরূপে আল্লাহ্ অভিমুখী। তাঁদের পরিভাষায় এর নাম আল্লাহ্র প্রতি পরিভ্রমণ, বা আল্লাহ্তে পরিভ্রমণ (সায়ের ইলাল্লহ্)। এ অবস্থার নাম অধিরোহণ (উরুজ)। ২. আল্লাহ্র আদেশে তাঁরা হন সৃষ্টির প্রতি পূর্ণ মনোযোগী। তাঁদের প্রতি অর্পিত হয় সৃষ্টিকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব। তাঁরা তখন আল্লাহ্র সঙ্গে হন বাহ্যত বিচ্ছিন্ন। এ অবস্থার নাম অবরোহণ (নুযুল)। পূর্বাবস্থা থেকে এ অবস্থা অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে বিরহ-বেদনা।

www.eelm.weebly.com

তাই তাঁরা এমতাবস্থায় হন বিষণ্ন, ব্যথিত। কিন্তু এ অবস্থা পূর্ণ ও পরিণত না হলে সৃষ্টি তাঁদের দ্বারা উপকৃত হয় না। তাই দেখা যায়, যাঁর উরুজ-নযুল দু'টোই পূর্ণ, তাঁর দ্বারা হেদায়েত পায় অধিকসংখ্যক মানুষ। সুফী-আউলিয়াগণ দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন, নূহ নবী উরুজে পূর্ণ ছিলেন তো অবশ্যই, কিন্তু নুযুলে ছিলেন অপূর্ণ। তাই তাঁর সাড়ে নয়শত বছরের চেষ্টার পরেও ইমান এনেছিলেন অল্প কিছুসংখ্যক ব্যক্তি। অথচ শেষ রসুল স. ধর্মপ্রচারে নিয়োজিত ছিলেন মাত্র তেইশ বছর। এর মধ্যেই ইসলামের প্রসার ঘটেছিলো সমগ্র আরবে, এমন কি আরবের বাইরেও। তাঁর মাধ্যমে সরাসরি হেদায়েত পেয়েছিলেন বিশাল এক জনগোষ্ঠী। আর পরোক্ষভাবে তো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি। এটা ছিলো তাঁর নুযুল পরিপূর্ণ হওয়ার প্রতিক্রিয়া। আবার উরুজের ক্ষেত্রেও তিনি স. অন্যান্য নবীর তুলনায় ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তিনি স. তো আল্লাহ্‌র এমন নৈকট্য লাভ করেছিলেন যে, পৌঁছেছিলেন এমন অবস্থায়, যার সম্পর্কে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে 'ক্বাবা কাওসাইনি আও আদনা' (নিকটে, আরো নিকটে, দুই ধনুকের জ্যা এর মতো অ-দূরত্বে)।

শায়েখে আকবর মুহিউদ্দিন আরাবী লিখেছেন, নবী নূহের আমন্ত্রণ পূর্ণফলপ্রসূ না হওয়ার কারণ ছিলো এটা যে, জনগণের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্পৃক্তি ছিলো অসম্পূর্ণ। অর্থাৎ তাঁর প্রচারযোগ্যতা ছিলো সীমিত। আর শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. আন্তরিকভাবেও সম্পৃক্ত ছিলেন জনগণের সঙ্গে। অর্থাৎ তাঁর প্রচারযোগ্যতা ছিলো পূর্ণ ও পরিণত। নবুয়তে কামালাতের ফয়েজের তিনি স. ছিলেন পরিপূর্ণ অধিকারী। আর একারণেই তিনি স. এর বিরহযন্ত্রণা ছিলো অন্যান্য নবীর তুলনায় অধিকতর তীক্ষ্ণ ও তীব্র। তিনি স. তাঁর এমতো অবস্থা প্রকাশ করতে যেয়ে বলেছেন, আমার চেয়ে অন্য কেউ অধিক ব্যথিত হননি। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে ইবনে আসাকের এবং আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' পুস্তকে।

হাদিসখানির মর্মার্থ যদি এরকমই ধরে নেওয়া হয়, তবে এর জন্য অন্য কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন আর পড়েই না। কেননা রসুল স. এর মনোব্যথাই ছিলো বেশী। নতুবা অন্যান্য অনেক নবী বাহ্যিকভাবে অনেক বেশী দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করেছিলেন। নবী নুহ অত্যাচারিত হয়েছিলেন সাড়ে নয়শত বছর ধরে। নবী ঈসার উপরে অত্যাচারের মাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো বলেই তাঁকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিলো আকাশে। নবী ইয়াহ্‌ইয়া সহ আরো অনেক নবীকে করা হয়েছিলো শহীদ। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে একথা বলতে আর কোনো বাধা থাকে না যে, সুরা দ্বুহা এবং সুরা 'আলাম নাশরাহ্' অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স.কে বিশেষভাবে সান্ত্বনা প্রদানার্থে। আর ওই সময়টি ছিলো ইসলামের একেবারে প্রাথমিক অবস্থা। সেই সঙ্গে সূচিত হতে শুরু করেছিলো তাঁর অবরোহ প্রক্রিয়া। তিনি স. বুঝতে পারছিলেন, তিনি ক্রমশঃ সৃষ্টিমুখী হচ্ছেন, দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাঁকে আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ সন্নিধান থেকে। চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে দায়িত্ব— সৃষ্টিকে পথপ্রদর্শনের। এমনকি তখন তিনি স. বিচ্ছেদ-যাতনায় এমনই কাতর

www.eelm.weebly.com

হয়ে পড়েছিলেন যে, মাঝে মাঝে ইচ্ছা করছিলেন, পর্বতশিখর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটাবেন তাঁর বিরহযন্ত্রণার। এমতাবস্থায় একদিন হজরত জিবরাইল তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন, ভ্রাতঃ মোহাম্মদ! নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্‌র রসুল। তাঁর তখনকার অস্বস্তিকর অবস্থা দেখে জননী খাদিজাও একবার তাঁকে বলেছিলেন, আপনি তো মানুষের হেদায়েত কামনায় অতি উদগ্রীব। একারণেই কি আপনার পরম সখা আপনার উপরে রুষ্ট হলেন? রসুল স. মনেপ্রাণে তখন চাইছিলেন, এরকম অস্বস্তির চির অবসান ঘটুক। চিরতরে নিভে যাক বিচ্ছেদযাতনার অসহনীয় আগুন।

উল্লেখিত ব্যাখ্যার আলোকে 'তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি, এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! সৃষ্টিকে পথপ্রদর্শনের মতো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই তো আপনাকে অতিবাহিত করতে হচ্ছে এই বিরহতাপিত সময়। কিন্তু মনে রাখবেন এটাই পরিপূর্ণতা, মহামিলনের পূর্ণ মাত্রা। এমতো অবরোহণ তিক্ত হলেও শত সহস্র মধুর ঊর্ধ্বারোহণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং বুঝে নিন আপনার পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়। পূর্বে তো আপনি ছিলেন কেবল উরুজের সম্পদে সম্পদবান, আর এখন উরুজসহ নুযুলের নেয়ামতপ্রাপ্তিতে ধন্য। আসন্ন আখেরাতে এর জন্য আপনি পাবেন সুবিশাল বিনিময়। তখন আপনার প্রভুপালক আপনাকে দান করবেন অতুলনীয় অনুগ্রহ। অধিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। দান করবেন শাফায়াতের অধিকার। তখন কি আপনি পরিতুষ্ট না হয়ে পারবেন ? পারবেন না।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন'। এখানকার 'তিনি তোমাকে পেলেন' কথাটি সম্পর্কযুক্ত আগের আয়াতের 'তিনি কি তোমাকে পাননি' বাক্যাংশের সঙ্গে। বাক্যাংশটিতে শব্দগতভাবে না-সূচক হয়েছে অর্থগতভাবে হ্যাঁ-সূচক এবং বিজ্ঞপ্তিমূলক, অর্থাৎ তিনি তোমাকে পেয়েছে বা জেনেছেন।

'দ্বল্লান' অর্থ এখানে অনবহিত। অর্থাৎ অনবহিত নবুয়তের দায়িত্ব ও শরিয়তের বিধি-বিধান এবং প্রত্যাদেশিত জ্ঞান সম্পর্কে। এভাবে এখানে এটাই বলতে চাওয়া হয়েছে যে, এ সকল কিছু সম্পর্কে আপনি তো ছিলেন উদাসীন, নির্লিপ্ত। জানতেন না— কিতাব কী, ইমান কী। হাসান বসরী জুহাক ও ইবনে কীসান এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। আবুদ্‌দ্বোহা বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আপনি তখন ছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক, নিরীহ। অন্যান্য কুরায়েশ যুবকদের মতো চপল-চঞ্চল ছিলেন না বলে ছিলেন অনুল্লেখ্যও। ভাগ্যবতী হালিমা আপনাকে তাঁর দুগ্ধ পান করিয়েছেন। দুগ্ধপানের বয়স অতিক্রান্ত হলে সমর্পণ করেছেন আপনার পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের কাছে।

www.eelm.weebly.com

'ফাহাদা' অর্থ পথের নির্দেশ দিলেন। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেছেন, হজরত খাদিজাতুল কোবরার ক্রীতদাস মাইসারার প্রবাসী যাত্রীদলে রসুল স.ও ছিলেন তাঁর প্রিয় পিতৃব্য আবু তালেবের সহযাত্রী হিসেবে। সেখানে এক অন্ধকার রাতে ইবলিস তাঁর বাহনের লাগাম ধরে তাঁকে বিপথগামী করলো। সঙ্গে সঙ্গে হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে এক ফুৎকার দিলেন। সেই ফুৎকারের চোটে ইবলিস ছিটকে গিয়ে পড়লো সুদূর আবিসিনিয়ায়। হজরত জিবরাইল তখন তাঁর বাহনের লাগাম ধরে বাহনটিকে নিয়ে এলেন সঠিক রাস্তায়। সেই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে 'অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন'।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত' কথাটির অর্থ— আপনি কে, তা তো আপনি নিজেও জানতেন না। কোনো কোনো সুফী তত্ত্বজ্ঞ কথাটির অর্থ করেছেন— আপনি তো ছিলেন আপনার প্রেমাস্পদের প্রেমে আসত্তা নিমজ্জিত। অর্থাৎ রূপকভাবে প্রেমাকর্ষণকেই এখানে বলা হয়েছে অনবহিতি বা বিভ্রান্তি। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেমাকর্ষিত (মজ্জুব) ব্যক্তি হয় দিশাহীন। এমতো দিশাহীনতাকেই এখানে বলা হয়েছে বিভ্রান্তি, অনবহিতি। যেমন এক হাদিসে বলা হয়েছে, প্রেম তাদেরকে করেছে অন্ধ, বধির। এভাবে এখানে কারুণিক (বিভ্রান্ত) বলে মর্মার্থ গ্রহণ করা হয়েছে কারণ (আকর্ষণ) এর। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ জীবিকা অবতরণ করেন আকাশ থেকে'। অর্থাৎ তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত ঘটান, যা হয় জীবিকার নিমিত্ত। নবী ইউসুফের ভ্রাতাগণ তাঁদের পিতা নবী ইয়াকুব সম্পর্কে বলেছিলেন 'নিশ্চয় আমাদের পিতা পড়েছেন প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে' 'আপনি তো ভুগছেন সেই পুরাতন ভ্রান্তিতে' মিসরের ললনাকুল আযীযভার্য্যা সম্পর্কে বলেছিলো 'আযীয-গৃহিনী তো তার অপঅভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য তার ভৃত্যকে ফুসলায়। সে তো তার প্রেমোন্মত্ত। আমরা তো তাকে দেখছি প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে'।

'পথের নির্দেশ দিলেন' অর্থ তিনি আপনাকে বলে দিলেন নিদর্শন ও নির্দেশাবলী। অথবা আপনার দুধমাতার গৃহ থেকে আপনাকে পৌঁছে দিলেন আপনার পিতামহের গৃহে। কিংবা— মিলিয়ে দিলেন আপনাকে প্রবাসী যাত্রীদলের সঙ্গে। বা তিনি শিখিয়ে দিলেন আপনাকে আপনার সত্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পন্থা। অর্থাৎ আত্মপরিচয় যে পায়, সে-ই পায় তার প্রভুপালকের পরিচয়। কিংবা— আপনার পরম প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তার নিবিড় সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার পথ তো প্রদর্শন করেছেন তিনিই। ফলে আপনি পৌঁছতে পেরেছিলেন 'ক্বাবা কাওসাইনি আও আদনা'র মতো অতুলনীয় অধিষ্ঠানে।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাব মুক্ত করলেন'। একথার অর্থ— আপনি তো ছিলেন, কপর্দকশূন্য। তিনিই তো আপনাকে বানিয়েছেন বিত্তশালী— মহাপুণ্যবতী খাদিজার আর্থিক সহায়তায়, অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের আনুকূল্যে, কিংবা যুদ্ধলভ্য

www.eelm.weebly.com

সামগ্রীর দ্বারা। এখানে 'অভাবমুক্ত করলেন' অর্থ এমন নয় যে, তিনি আপনাকে এমন বিত্তবান করলেন, যাতে করে আপনার উপরে জাকাত ফরজ হয়, বরং এখানে অভাবমুক্ত করার অর্থ ক্রমশ সম্পদ দান করা, যাতে করে প্রয়োজন পূরণ হয়, দূর হয়ে যায় নিঃস্বতা। মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— আল্লাহ্পাক আপনাকে প্রয়োজনীয় জীবিকা দান করে আপনাকে রক্ষা করেছেন অপরের মুখাপেক্ষিতা থেকে। এই ব্যাখ্যাটিকে অত্যধিক পছন্দ করেছেন ফাররা এবং বলেছেন, রসুল স. পার্থিব বৈভবে বৈভবিত ছিলেন না, ছিলেন হৃদয়ের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান। আর প্রকৃত বিত্তপতি তারাই, যাদের হৃদয় ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তিই সফল, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে। পেয়েছে প্রয়োজন মতো। আর আল্লাহ্ তাকে দান করেছেন অল্পে তুষ্টির মতো শুভ স্বভাব।

এরপরের আয়াত তিনটি ভিন্ন প্রসঙ্গের। অথবা রসুল স. এর এতিম হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে পরের আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে পিতৃহীনদের বিধান। বলা হয়েছে—

সূরা দুহা ঃ আয়াত ৯, ১০, ১১

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩ وَ اَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠ وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١

- সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হইও না;
- এবং প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করিও না।
- তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানাইয়া দাও।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফা আম্মাল ইয়াতীমা ফালা তাক্বহার'। কথাটির অর্থ— সুতরাং তুমি এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি পিতৃহীনদের সম্পদের উপর বলপ্রয়োগপূর্বক আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেন না। তাদের অসহায়তার সুযোগে গ্রাস করবেন না তাদের সম্পদ, যেমন করে থাকে মূর্খতার যুগের আরববাসীরা। এরকম অর্থ করেছেন ফাররা এবং জুজায। উল্লেখ্য, রসুল স. এর দ্বারা এরকম করা সম্ভবই নয়। তাই বুঝতে হবে তাঁকে লক্ষ্য করে এরকম উপদেশ দেওয়া হয়েছে অন্যদেরকে। অর্থাৎ বিধানটি সার্বজনীন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুসলমানদের ওই গৃহ সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে গৃহে বাস করে পিতৃমাতৃহীনেরা এবং তাদের প্রতি প্রদর্শন করা হয় শিষ্টাচার। আর তাদের মধ্যে ওই গৃহ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, যে গৃহে বাস করে পিতৃমাতৃহীনেরা, অথচ তাদের প্রতি প্রদর্শন করা হয় রূঢ়তা। রসুল স. তাঁর হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে বলেছেন, এভাবে, আমি ও এতিমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে অবস্থান করবো এভাবে। বাগবী, ইবনে মাজা, বোখারী, আবু নাঈম।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'এবং প্রার্থীকে ভর্ৎসনা কোরো না'। ব্যাখ্যাতাগণ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আপনার গৃহদ্বারে যদি কোনো প্রার্থী উপস্থিত হয়ে আপনার কাছে আহার্য প্রার্থনা করে, তবে আপনি তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন না। তাড়িয়ে দিবেন না। হয় তাকে আহার্য দান করবেন, অথবা সামর্থ্য না থাকলে সুন্দরভাবে কথা বলে তাকে বিদায় করবেন। কেননা এক সময় আপনিও ছিলেন অভাবগ্রস্ত। এই বিধানটিও সার্বজনীন। কেননা রসুল স. এর সুমহান স্বভাবে এরকম অপআচরণের কথা কল্পনাই করা যায় না। হাসান বসরী কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— কোনো বিদ্যান্বেষী যদি আপনার কাছে কিছু জানতে চায়, তবে আপনি তাকে বিমুখ করবেন না।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, জ্ঞানানুসন্ধিৎসুর কাছে জ্ঞান গোপনকারীর মুখে মহাবিচারের দিবসে লাগিয়ে দেওয়া হবে আগুনের লাগাম। হাসান বসরীর ব্যাখ্যানুসারে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কযুক্ত ৭ সংখ্যক আয়াতের 'তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত' কথাটির সঙ্গে। আর এরকম হলে আলোচনার ক্রমাগ্রসরতা হবে সঙ্গতিপূর্ণ।

শেষোক্ত আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দাও'। এই আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে ৮ সংখ্যক আয়াতের 'তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাব মুক্ত করলেন' কথাটির সাথে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম নবী! নিঃস্বতা দূর করে আপনাকে অভাবমুক্ত করেছি তো আমিই। সুতরাং আমা কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করুন। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে একথা সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করুন। সানাম ইবনে সামীয়াহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কৃতজ্ঞ পানাহারকারী ধৈর্যশীল রোজাদারের মতো পুণ্যপ্রাপ্তির যোগ্য। যথাসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, ইবনে মাজা ও দারেমী। আর তিরমিজি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরাইরা থেকে।

আশআছ ইবনে কায়েস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী সে-ই, যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মানুষের প্রতি। আবার এক বর্ণনায় এসেছে, যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না আল্লাহ্‌র প্রতিও। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। এর অন্যান্য বর্ণনাকারীও বলিষ্ঠ। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির উচিত উপকারীর প্রতিদান দেওয়া। না পারলে অন্যদের কাছে তার সুখ্যাতি করা। এরকম করলেও দানের প্রতিদান দেওয়া হয়। আর দানের কথা গোপন করলে হয় অকৃতজ্ঞতা। এভাবে কেউ যদি বস্ত্রদাতার কথা গোপন করে, তবে সে যেনো পরিধান করে মিথ্যার বস্ত্র। বাগবী।

হজরত নোমান ইবনে বশীর বলেছেন, আমি স্বকর্ণে রসুল স.কে তাঁর মিম্বরের উপরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি স্বল্পের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো না, সে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো না অধিকেরও। যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায়

www.eelm.weebly.com

করলো না, সে ব্যক্তি শুকরিয়া আদায় করলো না আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্‌র দান স্মরণ করাই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, আর দানের কথা বিস্মৃতি হওয়াই অকৃতজ্ঞতা, কুফরী। 'যুথবদ্ধ থাকাই আল্লাহ্‌র করুণা এবং যুথবিচ্ছিন্ন হওয়াই তাঁর রোষ'। সবগুলো হাদিসই সংকলন করেছেন বাগবী। এ সকল হাদিসের শিক্ষা হচ্ছে— মাশায়েখ ও শিক্ষকগণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। সুখ্যাতি করতে হবে তাঁদের উপকারের। তাঁদের জন্য কামনা করতে হবে আল্লাহ্‌র পরিতোষ।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার 'নি'মাত' (অনুগ্রহ) অর্থ নবুয়ত। এরকম বর্ণিত হয়েছে বশীর থেকেও। আর এই ব্যাখ্যাটি জুজাযেরও মনঃপুত। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনাকে যে বার্তাসহ প্রেরণ করা হয়েছে, আপনি তা মানুষের কাছে প্রচার করুন।

লাইছ সূত্রে মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'নি'মাত' অর্থ কোরআন মজীদ। কালাবীও এই অভিমতের প্রবক্তা। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যে কোরআন আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, আপনি তা পাঠ করুন। আর এভাবে আয়াতখানির বক্তব্যগত সম্পৃক্তি ঘটে 'তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত' আয়াতের সঙ্গে। মুকাতিল বলেছেন, আল্লাহ্‌পাকের নেয়ামতের স্মরণ করাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর সে কৃতজ্ঞতার মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্‌পাক আপনাকে যে আশ্রয় দান করেছেন, পথের নির্দেশ দিয়েছেন, অভাবমুক্ত করেছেন, সে জন্য আপনি শোকর গোজারী করুন। এই ব্যাখ্যাটিই সমধিক সুস্পষ্ট। কেননা আলোচ্য আয়াতগুচ্ছে যে সকল নেয়ামতের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো সাধারণ নেয়ামত। এ সকল নেয়ামতকে সুনির্দিষ্ট করার কোনো প্রয়োজনই নেই, সে নেয়ামত ইহলৌকিক হোক, অথবা হোক পারলৌকিক। অর্থাৎ সব রকমের নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্যকর্তব্য। এমতাবস্থায় আয়াতখানি সম্পৃক্ত হবে ইতোপূর্বের আয়াতগুলোর সঙ্গে।

একটি সমাধান ঃ সব ধরনের অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ওয়াজিব। আর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অর্থ হচ্ছে— অনুগ্রহদাতার অভিপ্রায়ানুসারে অনুগ্রহসম্ভার ব্যয় করা বা বিতরণ করা। আর্থিক অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিয়ম হচ্ছে— অর্থব্যয় করতে হবে প্রসন্নচিত্তে আল্লাহ্‌র পথে। আর শারীরিক সামর্থ্যরূপ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে শারীরিক ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন করে এবং যাবতীয় অবাধ্যতা থেকে বিরত থেকে। আর জ্ঞানরূপ অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করতে হবে যথাপাত্রে জ্ঞান বিতরণ করে, শুভপথ প্রদর্শন করে।

আর একটি সমাধান ঃ অনুগ্রহের প্রচার করে সম্পন্ন করতে হয় অনুগ্রহদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা। এ কারণেই রসুল স. বলেছেন, নিশ্চয় আমি আদম সন্তানগণের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাশালী। একথা গর্ব ও অহমিকামুক্ত। এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে। শায়েখ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী বলেছেন, প্রত্যেক ওলী চলেন তাঁর নিজের

www.eelm.weebly.com

চরণে ভর করে, আর আমার গমন রসুল স. এর পবিত্র চরণনির্ভর, যে চরণযুগল পূর্ণিমার শশী সদৃশ। তিনি আরো বলেছেন, প্রত্যেক ওলীর স্কন্ধে স্থাপিত আমার পা।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি ছিলেন বেলায়েতে ছোগরা, বেলায়েতে কোবরা এবং বেলায়েতে উলিয়া— এই তিন ধরনেরই পূর্ণত্বধন্য। তদুপরি তিনি পেয়েছিলেন নবুয়তের উৎকর্ষও। উলুল আজম রসুলগণের পূর্ণত্বের উৎকর্ষও তাঁকে দান করেছিলেন আল্লাহ্পাক। আর এ সকলকিছু তিনি অর্জন করেছিলেন রসুল স. এর একনিষ্ঠ অনুগমনের কারণে আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার সূত্রে। যেহেতু তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো ওই মৃত্তিকা থেকে, যে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজিত হয়েছিলেন রসুল স. স্বয়ং। সে কারণেই তিনি ছিলেন কাইয়্যুম। ছিলেন মহান মোজাদ্দেদ। এভাবে তাঁকে উপনীত করানো হয়েছিলো নৈকট্যের স্বর্ণশিখরে। এসকল কথা তিনি প্রকাশ করেছিলেন নিজ মুখে। আর বলা বাহুল্য, তাঁর সকল বচন অবশ্যই ছিলো গর্ব-অহমিকামুক্ত। অর্থাৎ এ সকল কথা তিনি বলেছিলেন কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। সুতরাং একথা বলতে আর কোনো দ্বিধা নেই যে, যে ব্যক্তি তাঁর এ সকল বাণীকে শরিয়তবিরোধী বলে মনে করে, সে এই আয়াতের অস্বীকারকারী। এভাবে অন্যান্যরাও আল্লাহ্পাক থেকে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা নিজ মুখে প্রকাশ করতে পারেন। এতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, তাকে হতে হবে প্রশান্ত হৃদয় ও পরিশুদ্ধ প্রবৃত্তির অধিকারী। অন্যথায় এ ধরনের কথা উচ্চারণ করা অবৈধ। কারণ এমতাবস্থায় তার কথা হবে অহমিকাপূর্ণ, শয়তানের কথার মতো, যে বলেছিলো, আমি আদমের চেয়ে উত্তম।

পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম বাগবী লিখেছেন, মক্কাবাসীগণের সুন্নতসম্মত কোরআন পাঠের নিয়ম ছিলো এরকম— তাঁরা সুরা ওয়াদ্দুহা থেকে সুরা নাস পর্যন্ত প্রত্যেক সুরা পাঠ শেষে উচ্চারণ করতেন 'আল্লাহু আকবর'। এভাবে তকবীর উচ্চারণ করার কারণ হচ্ছে— যখন কিছুদিন প্রত্যাদেশ আগমন বন্ধ ছিলো, তখন মক্কার পৌত্তলিকেরা বলতে শুরু করেছিলো, মোহাম্মদের শয়তান মোহাম্মদকে পরিত্যাগ করেছে। রসুল স. তাদের এরকম কথা শুনে মনঃকষ্ট পেতেন। এরপর যখন সুরা দুহা অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি স. তা পাঠ করে আনন্দাতিশয্যে বলে উঠেছিলেন 'আল্লাহু আকবর'। তাঁর এই শুভ আমলটিকে সাহাবীগণ মান্য করে চলেছিলেন সারা জীবন। এই সুন্নতখানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এভাবেই।

বাগবী আরো লিখেছেন, আমি ইমামুল কুররা আবু নশর মোহাম্মদের নিকট থেকে এরকম ক্বেরাত শিক্ষা করেছি। তিনি ছিলেন আল্লামা ইবনে কাছীরের পাঠপদ্ধতির পরম্পরাভূত। তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন মুজাহিদ থেকে এবং মুজাহিদ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এবং তিনি স্বনামধন্য ক্বারী সাহাবী হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে।

www.eelm.weebly.com

সূরা ইনশিরাহ্

৮ আয়াতবিশিষ্ট এই মহান সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কায়।
সূরা ইনশিরাহ্ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○
اَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ ۙ﴿۱﴾ وَ وَضَعۡنَا عَنۡكَ وِزۡرَكَ ۙ﴿۲﴾ الَّذِیۡۤ اَنۡقَضَ
ظَهۡرَكَ ۙ﴿۳﴾ وَ رَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ ؕ﴿۴﴾ فَاِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا ۙ﴿۵﴾ اِنَّ مَعَ
الۡعُسۡرِ يُسۡرًا ؕ﴿۶﴾ فَاِذَا فَرَغۡتَ فَانۡصَبۡ ۙ﴿۷﴾ وَ اِلٰى رَبِّكَ فَارۡغَبۡ ﴿۸﴾

r আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করিয়া দেই নাই?
r আমি অপসারণ করিয়াছি তোমার ভার,
r যাহা ছিল তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক
r এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি।
r কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে,
r অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।
r অতএব তুমি যখনই অবসর পাও একান্তে ইবাদত করিও
r এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করিও।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আলাম নাশরাহ্ লাকা সদ্‌রাক'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবহক! আমি কি আপনার বক্ষ আপনার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেইনি?

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতসহ এই সুরার সকল আয়াত সম্পৃক্ত হবে সুরা দুহার ৬, ৭ ও ৮ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে। যদি বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলে মান্য করা হয়, তবে বুঝতে হবে, রসুল স. সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মনোভাব পরিবর্তিত হবে ভেবে আল্লাহ্‌র কাছে যে সম্পদ প্রার্থনা করেছিলেন, সেই প্রার্থনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আয়াতগুলো। যা হোক, সর্বাবস্থায় আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আমি তো উন্মুক্ত করে দিয়েছি আপনার হৃদয়ের দুয়ার। ফলে ওই উন্মুক্ত দুয়ার দিয়ে আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে অপার্থিব জ্যোতি, প্রজ্ঞা ও পরিচয়, পঠন-পাঠন নতুবা বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন দ্বারা তা অর্জন করা কখনোই সম্ভব হতো না। মানুষ সাধারণত হয় একমুখী। পূর্ণরূপে মজে থাকে সৃষ্টির প্রেমে। কিন্তু দেখুন, আপনার অবস্থা সেরকম নয়। আপনি তো একই সঙ্গে আমার প্রতি এবং পথ

www.eelm.weebly.com

প্রদর্শনার্থে আমার সৃষ্টির প্রতি সমান অভিনিবেশী। আমি আপনার বক্ষাভ্যন্তর সম্প্রসারিত করে দিয়েছি বলেই তো আপনি এভাবে হতে পেরেছেন উরুজ ও নুযুল উভয় প্রকার পূর্ণত্বে পরিপূর্ণ। সুতরাং অংশীবাদীদের অপবচন শুনে আপনি বিচলিত ও ব্যথিত হবেন কেনো। আপনি সর্বাবস্থায় আমার প্রিয়তম জন।

রসুল স. এর প্রকাশ্য বক্ষবিদারণ হয়েছিলো দু'বার। একবার অতি শৈশবে। যেমন হজরত আনাস থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. অন্যান্য বালকের সঙ্গে আনমনে সময় কাটাচ্ছিলেন। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত জিবরাইল। তিনি তাঁকে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। চিরে ফেললেন তাঁর বুক। হৃৎপিণ্ড থেকে টেনে বের করলেন একটি জমাট রক্তপিণ্ড। তারপর সেটিকে নিক্ষেপ করলেন দূরে। বললেন, এটাই ছিলো শয়তানের অংশ। এরপর তিনি তাঁর হৃৎপিণ্ড বের করে এনে ধৌত করলেন একটি পাত্রে রক্ষিত জমজমের পানি দ্বারা। তারপর হৃৎপিণ্ড সংস্থাপিত করলেন যথাস্থানে। এরপর চেরা বুক জোড়া লাগিয়ে দিলেন আগের মতো করে। তাঁর বালকবন্ধুরা দূরে থেকে এ দৃশ্য দেখে দৌড়ে গিয়ে খবর দিলো তাঁর দুধমাতাকে। তিনি ও অন্যান্য লোক অতিদ্রুত অকুস্থলে ছুটে এসে দেখলেন, বালক মোহাম্মদ এগিয়ে আসছেন বিষণ্ন বদনে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে। হজরত আনাস বলেছেন, আমি স্বচক্ষে রসুল স. এর বক্ষবিদারণের দাগ দেখেছি।

দ্বিতীয় বার তাঁর বক্ষবিদারণ করা হয়েছিলো মেরাজ রজনীতে। ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন হজরত আবু জর থেকে বোখারী ও মুসলিম। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. স্বয়ং বলেছেন, মেরাজ যাত্রার পূর্বে জিবরাইল আমার কাছে এলেন। আমাকে চিৎ করে শুইয়ে ফেঁড়ে ফেললেন আমার বুক। তারপর সমস্ত বক্ষাভ্যন্তর ধুয়ে দিলেন জমজমের জল দিয়ে। তারপর বক্ষাভ্যন্তর পূর্ণ করে দিলেন ইমান ও হেকমত দিয়ে। আর ফেঁড়ে ফেলা বুক জোড়া লাগিয়ে দিলেন আগের মতো করে।

বোখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে মালেক ইবনে সা'সা' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আনাস বলেছেন, একবার রসুল স. আমাদের সম্মুখে মেরাজের ঘটনা বর্ণনা করলেন। বললেন, জিবরাইল এসে আমার এখান থেকে এখান পর্যন্ত (কণ্ঠনালী থেকে বক্ষদেশ পর্যন্ত) বিদীর্ণ করলেন। বের করে আনলেন হৃৎপিণ্ড এবং তা ধৌত করলেন স্বর্ণনির্মিত পাত্রে রক্ষিত জমজমের পানি দিয়ে। এরপর আর একটি স্বর্ণ নির্মিত পাত্রে রক্ষিত ইমান ও হেকমত ভরে দিলেন আমার হৃৎপিণ্ডে। তারপরে যথাস্থানে তা পুনঃসংযোজন করে জোড়া লাগিয়ে দিলেন বিদীর্ণ বক্ষদেশ। আমি বলি, যে বস্তুটি তখন তাঁর হৃৎপিণ্ড থেকে বের করে ফেলা হয়েছিলো, তা ছিলো ভূতচতুষ্টয়জাত প্রবৃত্তি ও হৃদয়ের নিকৃষ্ট অংশ, যা প্রবৃত্তিকে প্ররোচিত করে অশ্লীলতা ও পাপের দিকে।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আমি অপসারণ করেছি তোমার ভার'। বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত আগের আয়াতের 'তোমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেইনি' প্রশ্নটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি আপনার বক্ষকে সুপ্রশস্ত করে দিয়েছি।

www.eelm.weebly.com

তৎসহ নামিয়ে দিয়েছি আপনার গুরুভার। এখানে 'উইয্‌রাক' অর্থ নামিয়ে দিয়েছি ভার। 'উইয্‌রুন' এর আভিধানিক অর্থ পাহাড়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'কাল্‌লা লা ওয়াযারা' (না, না, কোনো পাহাড়ও থাকবে না আশ্রয় নেওয়ার জন্য)। এখানে শব্দটির রূপকার্থ হবে ভার, গুরুভার। অর্থাৎ বিচ্ছেদযাতনা, যা ভেঙে ফেলেছিলো তাঁর ধৈর্যের প্রাচীর। পরে যখন সুরা দ্বুহা ও সুরা ইনশিরাহ্ অবতীর্ণ হলো, তখন বিরহের গুরুভার হলো অপসারিত। চাঞ্চল্য পরিণত হলো স্থিরতায়। তিনি স. হলেন প্রশান্ত, একথা জেনে যে, সাময়িকভাবে প্রত্যাদেশ স্থগিত হওয়ার কারণ আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ছিলো না। বরং বিষয়টি ছিলো প্রজ্ঞাপূর্ণ, কল্যাণকর। আর ওই ব্যথার ভারকেই আল্লাহ্ অভিহিত করেছেন তাঁর অনুগ্রহ বলে। অথবা 'ভার' অর্থ হতে পারে এখানে— শরিয়তের বিধি-বিধানের গুরুভার, কেননা শরিয়তের ভার বহন, তার প্রচার ও বাস্তবায়ন নিশ্চয় ছিলো বিশাল এক গুরুদায়িত্ব, যে গুরুদায়িত্ব বহনের আহ্বান পেয়ে আকাশ-পৃথিবী সভয়ে তাদের অনীহা প্রকাশ করেছিলো। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'বিনয়ীগণ ব্যতীত অন্যের কাছে এটা একটা বিরাট বোঝা'।

রসুল স. এর বক্ষদেশ থেকে যখন শয়তানের অতিদূরবর্তী অংশ বের করে ফেলে দেওয়া হয়েছিলো, বক্ষাভ্যন্তরকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিলো ইমান ও হেকমত দিয়ে, তখনই তাঁর বোঝা হয়ে গিয়েছিলো হালকা। শরিয়তের বিধি-নিষেধগুলো তখন তাঁর কাছে মনে হয়েছিলো শান্তিদায়ক ও মনোমুগ্ধকর। তাই তিনি স. স্বয়ং স্বীকার করেছেন, নামাজ আমার চোখের শান্তি, নয়ন জুড়ানো নেয়ামত। 'অপসারণ করেছি তোমার ভার' কথাটির মর্মার্থ এরকমই। এটাই সুফী দার্শনিকদের বিবেচনায় প্রকৃত ইমান। তাঁরা বলেন, এরকম অবস্থা ঘটলেই শরিয়তের ভার হয় সহনীয়, মনঃপুত ও শান্তিপ্রদায়ক। ভারী বোঝা তখন আর ভারী থাকে না। হয়ে যায় সুবহ। এই প্রকাশ্য অবস্থা রসুল স. এর অর্জিত হয়েছিলো প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দু'ভাবেই। আর তাঁর উম্মতের আউলিয়াগণের এ অবস্থা লাভ হয় অপ্রকাশ্যভাবে, যার রেখাপাত তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিভাসিত হয় উপমার জগতে, প্রবৃত্তির যাবতীয় লালসার বিনাশ (ফানা) সাধনের পর। তখন তাঁদেরকে জানানো হয় বক্ষসম্প্রসারণের সাধুবাদ। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি এবং অন্যান্য স্বনামধন্য মাশায়েখ। আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াহইয়া এবং আবু উবায়দা কথাটিকে ব্যাখ্যা করছেন এভাবে— আমি আপনার উপর থেকে দূরীভূত করেছি নবুয়তের ভারী বোঝা। লঘু করে দিয়েছি নবুয়তের দায়িত্ববহনকে। ব্যাখ্যাটি পরের বিশ্লেষণটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— হে আমার প্রিয়তম নবী! নবুয়তের মহান দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে মূর্খতার যুগের অনবধানতাসমূহকে আমি মার্জনা করলাম। কিন্তু ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ ভুল। কেননা নবুয়তের দায়িত্ব গ্রহণের আগেও তিনি স. নবী ছিলেন। যেমন তিনি স. স্বয়ং বলেছেন, আমি তখনও নবী ছিলাম, যখন

www.eelm.weebly.com

আদম ছিলো পানি ও কাদায়। অর্থাৎ আদম সৃষ্টির পূর্ব থেকেই আমি নবী। সুতরাং নবুয়তের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার আগেও তাঁর দ্বারা এমন কিছু সংঘটিত হওয়া অসম্ভব, যা অনবধানতা বা অন্যায়ের মধ্যে পড়ে। আর যা অপরাধ নয়, তা মার্জনা করার চিন্তাও তো করা যায় না। তাঁর মহান মর্যাদার ক্ষেত্রে এমতো ধারণা নিতান্তই অশোভন।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'যা ছিলো তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক'। একথার অর্থ— ওই গুরুভার তো চেপে বসেছিলো আপনার কটিদেশে, যেমন ভারী বোঝা কাঁধে চাপালে মেরুদণ্ড ও কোমরে উত্থিত হয় কট কট আওয়াজ। সে গুরুভারকে তো আমি দূর করে দিয়েছি। এখানকার 'অতিশয় কষ্টদায়ক' কথাটি আগের আয়াতের 'ভার' পদটির বিশেষণ। 'ভার' অর্থ যদি বিরহের ভার হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বিরহব্যাথায় জ্বলে জ্বলে আপনি তো হয়ে গিয়েছিলেন পর্যুদস্তপ্রায়, আমি সে বিরহের অবসান ঘটিয়েছি। পুনরায় প্রবাহিত করেছি প্রত্যাদেশের ধারা। আর শরিয়তের বিধি-বিধানকেই যদি এখানে 'ভার' বলা হয়ে থাকে, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি যদি আপনার বক্ষসম্প্রসারণ না করতাম, বিধি-বিধানের ভার অপসারণ না করতাম, তাহলে তা আপনার মেরুদণ্ডকে করে দিতো লুব্ধ। তখন আর আপনি সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করতে পারতেন না। রসুল স. স্বয়ং বলেছেন, যদি আমার প্রভুপালক আমার প্রতি কৃপাপরবশ না হতেন, তাহলে আমি সরল পথের সন্ধান পেতাম না। জানতে পারতাম না দান, নামাজ এ সকল কিছুর সংবাদ।

যেহেতু শরিয়তের দায়িত্ববহন অতিশয় কষ্টদায়ক, যা পিঠ কুঁজো করে দেয়, প্রতিবন্ধকতা রচনা করে আবশ্যিক কর্তব্যাবলী প্রতিপালনের ক্ষেত্রে, সেহেতু এখানকার 'আ'নক্বাদ্বা' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে অতীত কালার্থক শব্দরূপে। কেননা রসুল স. সব সময়ই ছিলেন নিষ্পাপ। পক্ষান্তরে পাপকর্ম তো পরকালে ভেঙে চুরমার করে দিবে সহনশীলতাকে। তাই সাধারণভাবে পরকালের দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে ভবিষ্যতকালার্থক শব্দরূপ ব্যবহার করাই হতো সঙ্গত।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি'। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বলুন 'আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি' কথাটির অর্থ কী? হজরত জিবরাইল বলেছিলেন, এর অর্থ, আল্লাহ্পাক বলেন, যখন আমার নাম স্মরণ করা হবে, তখন স্মরণ করা হবে আপনার নামও।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াত ও উদ্ধৃত হাদিসের অর্থ হচ্ছে, ফেরেশতাজগতে ফেরেশতারা যখন আল্লাহ্র নামের জিকির করেন, তখন রসুল স. এর নামেরও জিকির করেন। ইতোপূর্বে এই হাদিসটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরশের মধ্যস্থলেও লেখা রয়েছে রসুল স. এর মহান নাম। সুরা বুরূজের তাফসীরেও

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, লওহে মাহফুজের মধ্যস্থলে লেখা রয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহ্দাহু দীনুহুল ইসলাম ওয়া মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু'।

আতা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতের 'জিকির' অর্থ আজান, ইকামত, তাশাহ্হুদ ও মিম্বরের খুতবা। যদি কেউ আল্লাহ্পাককে স্বীকার করে, তাঁর ইবাদতও করে, অথচ রসুল স.কে স্বীকার না করে, তবে তার সকল কর্মকাণ্ড হবে ব্যর্থ। এমতাবস্থায় সে হবে কাফের। হজরত ইয়াসার ইবনে সাবেত তাঁর কবিতায় বলেছেন, আল্লাহ্পাক তাঁর মহান নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন তাঁর প্রিয়তম নবীর নাম। মুয়াজ্জিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজানে 'আশহাদু আল্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' বলার সঙ্গে সঙ্গে বলে 'আশহাদু আন্‌না মুহাম্মাদার রসুলুল্লহ্'। আরশের অধিপতির নাম মাহমুদ, আর তাঁর প্রেমাস্পদের নাম মোহম্মাদ।

অনেকে বলেন, এখানে খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করার অর্থ আধ্যাত্মিক জগতের নবী-রসুলগণের ওই অঙ্গীকার, যাকে বলা হয়েছে 'মীছাক'। তাঁরা তখন এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তাঁরা সকলেই রসুল স.কে নবী বলে স্বীকার করবেন। অর্থাৎ রসুল স. এর উপরে ইমান আনা আল্লাহ্পাক তাঁদের উপরে অপরিহার্য করে দিয়েছিলেন।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'ফা ইন্‌না মাআ'ল উ'স্‌রি ইউস্‌রান' (কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে)। এখানকার, 'ইউস্‌রান' শব্দটিতে প্রযুক্ত তানভীন প্রাচুর্যপ্রকাশক। আর এই বাক্যটি আর একটি অনুক্ত বাক্যের নিমিত্ত। যেনো বাক্যটি ছিলো— আপনার উপরে যে কষ্ট আপতিত হয়েছে, তার জন্য আপনি মুষড়ে পড়বেন না। কেননা এই কষ্টের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সুখ, কঠোরতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোমলতা।

কেউ কেউ আবার এর পরের আয়াতের 'ইউস্‌রান' শব্দে প্রযুক্ত তানভীনকে স্থির করেছেন অঙ্গীকারের দৃঢ়তা ও আশার শালীনতারূপে। তবে সঠিক কথা হচ্ছে, এ অঙ্গীকার একটি নতুন ধরনের অঙ্গীকার, পূর্বকৃত কোনো অঙ্গীকার নয়। এর মর্মার্থ হচ্ছে আপনার জন্য কষ্টের দ্বিতীয় সত্তারূপে সুখ অবধারিত।

আবদুর রাজ্জাক তাঁর তাফসীরে, হাকেম তাঁর 'মুসতাদরাকে' এবং বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমানে' অপরিণত সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো তখন রসুল স. তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, শুভবারতা শোনো, এবার তোমাদের জন্যও সমাগত হয়েছে স্বস্তি। একটি কঠোরতা দু'টি কোমলতার উপরে কখনোই প্রবল হতে পারে না। হজরত জাবের থেকে শিথিল সূত্রে ইবনে মারদুবিয়াও হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালেক তাঁর 'মুয়াত্তা'য় এবং হাকেম তাঁর 'মুসতাদরাকে' হাদিসটির প্রত্যয়নানুকূলে আরো একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, দুঃখ-দুর্দশা যদি কোনো ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করে, তবে স্বস্তি-সুখও খুঁজে খুঁজে সেখানে প্রবেশ করবে ওই ছিদ্রপথ দিয়েই। দুর্বিপাক একগুণ, আর সাফল্য দ্বিগুণ। একগুণ কখনো দুই

www.eelm.weebly.com

গুণের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আরবী ভাষাবিদগণের রীতি এই যে, একটি শব্দ যদি দ্বিতীয়বার নির্দিষ্টবাচকরূপে উল্লেখ করা হয়, তবে উভয়স্থলে তার অর্থ হবে একই, শব্দটির প্রথম উল্লেখ নির্দিষ্টবাচক বা অনির্দিষ্টবাচক যাই হোক না কেনো। কেননা পরে উল্লেখিত শব্দটি নির্দিষ্টবাচক হওয়ার কারণে সীমিতার্থক হয়েছে। কিন্তু পরে উল্লেখিত শব্দটি যদি অনির্দিষ্টবাচক হয়, তবে তার অর্থ হবে ভিন্নতর, প্রথমে উক্ত শব্দটি নির্দিষ্টবাচক হোক, অথবা হোক অনির্দিষ্টবাচক। এমতাবস্থায় বাক্যে বেগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ভিন্নতর অর্থ গ্রহণ করাই হয় উত্তম। এখানেও তেমনি 'আলউ'স্‌র' শব্দটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তবে পরবর্তী 'আলউ'স্‌র' নির্দিষ্টবাচক হওয়ার জন্য উভয়ক্ষেত্রে শব্দটি হবে সমার্থক। তেমনি শব্দটির পরের উল্লেখ অনির্দিষ্টবাচক হওয়ার জন্য তার অর্থ হবে ভিন্নতর। অর্থাৎ তা হবে দু'বার স্বস্তির অর্থবহ।

'তানকীহুল উসুল' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ যদি শর্তযুক্ত স্বীকারোক্তিতে বলে, আমার নিকট তোমার এক হাজার টাকা পাওনা আছে, তাহলে এরকম কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলেও তাকে বলতে হবে ওই এক হাজার টাকাই। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। আর কেউ যদি শর্তহীনভাবে এক হাজার টাকার স্বীকারোক্তির পর কথাটির পুনরাবৃত্তি করে, তবে তাকে দিতে হবে দুই হাজার টাকা। কিন্তু বৈঠক যদি একটিই হয়, তবে শর্তযুক্ত বা শর্তহীন কথার কোনো গুরুত্ব থাকবে না। সর্বাবস্থায় দিতে হবে এক হাজার। আমি বলি, পরোক্ত উক্তি প্রথমোক্ত উক্তির তাগিদ হবে তখনই, যখন বিদ্যমান থাকবে কোনো ইঙ্গিত।

একটি সংশয় ঃ আরবী ভাষাবিদগণের যে রীতির কথা উপরে বর্ণিত হলো, তার বিপক্ষে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, এই বাক্যটির অবস্থা তাহলে কী হবে 'ইন্‌না মাআ'ল ফারিসি সাইফান ইন্‌না মাআ'ল ফারিসি সাইফান'। এখানে তো দু'টি স্থলেই নির্দিষ্টবাচক পদ 'আলফারিসে'র একই অর্থ। অর্থাৎ একই অশ্বারোহী। আর অনির্দিষ্টবাচক 'সাইফান' দুই স্থলে একই তরবারী। বরং দ্বিতীয় বাক্যটি এখানে প্রথম বাক্যের তাগিদ।

সংশয়-নিরসন ঃ একথা আমরা বলেই দিয়েছি যে, তাগিদ ধরে নেওয়ার কোনো ইঙ্গিত যদি বর্তমান থাকে, তবে দু'টি উল্লেখের একই অর্থ গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখিত উদাহরণটিতে বাক্যের গতিপ্রবাহ একটাই এবং একই বৈঠক একথাই প্রমাণ করে যে, পরোক্ত উক্তিটি প্রথমোক্ত উক্তির তাগিদ, সমঅর্থবহ। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের যে দু'টি ভাষাগত তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, তার দু'টিই সঠিক। তাগিদ হিসেবে এবং নতুন বাক্য হিসেবে— দু'ভাবেই ব্যাখ্যা গ্রহণ সিদ্ধ। তবে এমতোক্ষেত্রে রসুল স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে করে এর ভিন্নভাষ্য গ্রহণ করার উপায় আর নেই। এজন্যই এখানকার 'আল উ'সর' এর মর্মার্থ প্রথম 'আল উ'সর' এবং 'ইউস্‌রান'র অর্থ আর এক 'ইউস্‌রান'।

www.eelm.weebly.com

বাগবী কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে, যার মর্মার্থ হচ্ছে, এখানে একটি অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে দু'টি স্বস্তির ইঙ্গিত। এর কারণ এই নয় যে, এখানে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অনির্দিষ্টবাচক শব্দের, বরং এর কারণ— বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত আগের সুরার আয়াতগুলোর সঙ্গে, যেখানে রসুল স.কে সান্ত্বনাস্বরূপ দেওয়া হয়েছে অভাবমুক্ত হওয়ার শুভসংবাদ। তাই হয়েছিলো। আল্লাহ্পাক তাঁকে পরে দিয়েছিলেন প্রতুল সম্পদ, রাজ্যাধিকার। এরকম ঘটনাও তখন ঘটেছে যে, তিনি স. কখনো কখনো একজনকেই দিয়েছেন দুইশত উট, তৎসহ আরো অনেক মূল্যবান সামগ্রী।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে'। বাক্যটি একটি নতুন বাক্য। কেননা এর পূর্বে নেই 'ফা' অথবা 'ওয়াও' এর মতো কোনো যোজক অব্যয়। এখানে ঘোষিত হয়েছে বিশ্বাসবানকে পুণ্যপ্রদানের অঙ্গীকার, যার মধ্যে রসুল স.ও অন্তর্ভূত। আর অঙ্গীকারখানির মর্ম এই যে— পার্থিব অস্বস্তির পরে রয়েছে পারত্রিক অনাবিল শান্তি। আর রসুল স. এর জন্য রয়েছে একটি পার্থিব অস্বস্তির বদলে দু'টি স্বস্তি— একটি পৃথিবীর এবং আর একটি পরবর্তী পৃথিবীর। তাই তিনি স. বলেছেন, দু'টি সাফল্যের উপরে একটি বিপর্যয় বিজয়ী হতে পারে না। একথার অর্থ— ইহলৌকিক একটি দুর্বিপাক পার্থিব স্বস্তিকে পর্যুদস্ত করলেও তা অশুভ নয়। কেননা পারলৌকিক সাফল্য তো অক্ষুণ্ন রইলোই, যা চিরকালীন।

বাগবী লিখেছেন, এখানকার 'আল উ'সর' শব্দের 'আল' অব্যয়টি সীমিতার্থক এবং পরের 'আল উ'সর' এর 'আল' জাতিবাচক। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'আল উ'সর' অর্থ দারিদ্র ও নিগ্রহ, যা আগমন করতো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দিক থেকে। তিনি স. এ বিষয়ে আল্লাহ্পাকের নিকটে অভিযোগও উত্থাপন করেছিলেন। এভাবে এখানকার প্রথম 'ইউস্রান' এর অর্থ হবে— কষ্টকর অবস্থার বিলোপন এবং পরবর্তী 'ইউস্রান' অর্থ হবে বিত্তহীনতার স্থলে বিত্তশালিতা।

বায়যাবী লিখেছেন, 'আল উ'সর' অর্থ বক্ষের সংকীর্ণতা, পৃষ্ঠের গুরুভার। স্বজাতির পথভ্রষ্টতা এবং অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে আসা উৎপীড়ন। আর প্রথম 'ইউস্রান' অর্থ বক্ষাভ্যন্তরের সম্প্রসারণ, গুরুভার অপসারণ, স্বজাতির সুপথ প্রাপ্তির সুযোগ, আনুগত্য এবং সকলের জন্য পারত্রিক পূর্ণ প্রতিফল। কতিপয় ভাষ্যকার লিখেছেন, এখানকার 'ইন্না মাআ'ল উ'স্রি ইউস্রান' অর্থ 'নিশ্চয় কষ্টের সাথে সাথে স্বস্তি' না হয়ে হবে— নিশ্চয় কষ্টের পরে স্বস্তি। দুঃখের পরে সুখের আগমন সুনিশ্চিত। অর্থাৎ দুঃখ-সুখ পরস্পরলগ্ন, তবে এক সঙ্গে নয়— পর পর।

আমি বলি, 'আল উ'স্র' (কষ্ট) অর্থ— স্রষ্টার প্রতি অভিনিবেশী থাকা অবস্থায় সৃষ্টির প্রতি মনোযোগ প্রদান কষ্টদায়ক। অর্থাৎ উরুজ অবস্থায় নুযুলের প্রভাব অসহনীয়। রসুল স. এর উপরে এরকম টানাপোড়েনই ছিল তাঁর জন্য কষ্ট। আবার

www.eelm.weebly.com

এই টানাপোড়েন বা বৈপরীত্যের সংঘর্ষের কারণেই অর্জিত হয়েছিলো তাঁর বক্ষসম্প্রসারণ (শরহে সুদুর)। তারপর বিষয়টি তাঁর প্রতি হয়ে গিয়েছিলো সহজ। এর পর থেকেই তিনি স. আল্লাহ্‌র প্রতি নিরবচ্ছিন্ন নিবিষ্টতা সহ অভিনিবেশী হতে পেরেছিলেন তাঁর সৃষ্টির প্রতি। এই অবস্থাকেই সুফী-দার্শনিকগণ নাম দিয়েছেন 'সায়ের মিনাল্লহ্‌ বিল্লাহ্‌'। এভাবেই পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন ধর্মপ্রচারকেরা হন আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ও নির্দেশের বাস্তবায়নকারী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এখানকার প্রথম 'মাআ' হবে প্রকৃত অর্থে সঙ্গে, আর দ্বিতীয় 'মাআ' হবে রূপকার্থক। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার পরম প্রেমাষ্পদ! ব্যথিত হবেন না। এখন তো আপনার দায়িত্বপালনের সময়। সুতরাং আমার সৃষ্টির পথপ্রদর্শনার্থে তাদের প্রতি পূর্ণরূপে মনোযোগী হন। আমার সঙ্গে সার্বক্ষণিক সংযোগ তো আপনার রইলোই। প্রকাশ্যত এ অবস্থা যাতনাদায়ক হলেও এর সঙ্গে রয়েছে অনন্তকালীন নিরবচ্ছিন্ন সুখের নিশ্চয়তা। পরবর্তী পৃথিবীতে তো বাহ্যিক এই আবরণটুকু আর থাকবে না। তখন তো আপনি পাবেন অনন্তরাল দীদার।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'অতএব তুমি যখনই অবসর পাও, একান্তে ইবাদত কোরো'। এখানে 'ফা ইজা ফারাগ্‌তা' অর্থ অতএব তুমি যখনই অবসর পাও। 'ফানসব' অর্থ একান্তে ইবাদত কোরো। 'নসব' অর্থ শ্রান্তি, ক্লান্তি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আপনি যখন ধর্মপ্রচারের গুরুদায়িত্ব থেকে অবকাশ পাবেন, তখন নিমগ্ন হবেন ইবাদত-বন্দেগীতে, যেনো আপনাকে যে অনুগ্রহসম্ভার আমি দান করেছি এবং ভবিষ্যতে যে সকল অনুগ্রহ দান করবো বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সকল কিছুর জন্য সম্পন্ন করতে পারেন যথাকৃতজ্ঞতা। অথবা— যখন এক ইবাদত থেকে আপনি অবসর গ্রহণ করবেন, তখন নিমগ্ন হবেন অন্য ইবাদতে, ইবাদতশূন্য অবস্থায় থাকবেন না। রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা ওই সময়ের জন্য আক্ষেপ করতে থাকবে, পৃথিবীতে যে সময়টুকু তারা অতিবাহিত করেছিলো ইবাদতবিহীন অবস্থায়।

হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা, জুহাক, মুকাতিল ও কালাবী আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ করেছেন— যখন আপনি ফরজ, অথবা অন্য কোনো নামাজ শেষ করবেন, তখন আমার কাছে দোয়া করবেন। চাইবেন, যা চান। অর্থাৎ দোয়া করবেন তাশাহ্‌হুদ শেষ করে, অথবা সালাম ফিরানোর পর। শা'বী অর্থ করেছেন— যখন আপনি তাশাহ্‌হুদ পাঠ শেষ করবেন, তখন যাচনা করবেন ইহ-পারত্রিক কল্যাণ। হজরত ইবনে মাসউদ অর্থ করেছেন— ফরজ নামাজসমূহ সমাপন করার পর নিমগ্ন হবেন নিশীথের নামাজে। হাসান বসরী এবং জায়েদ ইবনে আসলাম অর্থ করেছেন— যখন শত্রুর সাথে যুদ্ধ শেষ হবে, তখন আপনি মনোযোগী হবেন একান্ত উপাসনায়। এরকম কথা বলা হয়েছে একটি হাদিসেও। যেমন তিনি স. এক যুদ্ধ শেষে সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ছোট যুদ্ধ শেষ হলো। এবার আমাদের শুরু হলো বড় যুদ্ধ (ইবাদত, যা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ)।

www.eelm.weebly.com

মনসুরের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ কথাটির অর্থ করেছেন— যখন পার্থিব ক্রিয়াকর্ম থেকে অবকাশ পাও, তখন তোমরা আরাধনা কোরো তোমাদের পরম প্রভুপালকের। ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় এসেছে, কালাবী অর্থ করেছেন— হে আমার নবী! আপনি যখন নবুয়তের দায়িত্ব সম্পাদন শেষে অবকাশ পাবেন, তখন আমা সকাশে মার্জনাপ্রার্থনা করবেন বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের জন্য। এমতো ব্যাখ্যানুসারে আলোচ্য আয়াতের যোগসূত্র সাধিত হবে আগের আয়াতসমূহের সাথে এভাবে— আমা কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহসম্ভারের যথাকৃতজ্ঞতা আপনি প্রতিপালন করুন ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে। আর আমার ব্যাখ্যানুসারে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— যখন আপনি সৃষ্টির প্রতি পথপ্রদর্শনের গুরু দায়িত্ব সমাপন করবেন, পূর্ণ করবেন অবরোহণের (নুযুলের) উদ্দেশ্য, তখন আপনি অধিরোহণের (উরুজের) দর্শন (শুহুদ) মুখী হওয়ার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াবেন। অগ্রসর হবেন আরো সম্মুখে।

শেষোক্ত আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ কোরো'। বাক্যটির বিশ্লেষণাত্মক যোগসূত্র রয়েছে আগের আয়াতের 'একান্তে ইবাদত করো' কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ আপনি একান্ত ইবাদত সুসম্পন্ন করার পর যাচনা করবেন কেবল আপনার প্রভুপালনকর্তা সকাশে। অন্য কারো কাছে প্রার্থী হবেনই না। আতা কথাটির অর্থ করেছেন— আপনি আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হবেন জাহান্নামের ভয়ে এবং জান্নাতের আশায়। কেউ কেউ অর্থ করেছেন— সর্বাবস্থায় আপনার কামনা-বাসনাকে একাগ্র করবেন কেবল আপনার প্রভুপালকের প্রতি।

এখানে 'ইলা রব্বিক' এর সন্নিহিত বাক্যটি রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ সম্ভাব্য বাক্যটি ছিলো যেনো 'ফারগাব ইলা রব্বিকা ফারগাব'। অর্থাৎ মনোনিবেশ করুন, হোন আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ অভিনিবেশী। আমি বলি, দু'বার মনোনিবেশী হওয়ার অনুজ্ঞা এখানে একথাটিই প্রমাণ করে যে, প্রথমে মনোনিবেশ করতে হবে আল্লাহ্র অনুগ্রহসম্ভার ও তাঁর গুণবত্তার (সিফাতের) প্রতি এবং পরবর্তীতে মনোনিবেশ করতে হবে তাঁর পবিত্রতম সত্তার (জাতের) প্রতি।

দ্রষ্টব্য ঃ নুযুল অবস্থায় সুরা ইনশিরাহ এবং উরুজ অবস্থায় সুরা আ'লা পাঠ সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। সুরা আ'লার তাফসীরেও আমি এ বিষয়ে আলোকপাত করেছি।

সূরা তীন

এই সুরাখানিও ৮ আয়াত বিশিষ্ট এবং এই সুরাও অবতীর্ণ হয়েছে পরম পুণ্যভূমি মক্কায়।

www.eelm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○
وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۙ﴿۱﴾ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۙ﴿۲﴾ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ﴿۳﴾
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ﴿۴﴾ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ
سٰفِلِيْنَ ۙ﴿۵﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ
غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ؕ﴿۶﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ؕ﴿۷﴾ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ
الْحٰكِمِيْنَ ﴿۸﴾

r শপথ 'তীন' ও 'যায়তুন' এর,

r শপথ 'সিনাই' পর্বতের

r এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর,

r আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে,

r অতঃপর আমি উহাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি—

r কিন্তু তাহাদিগকে নহে যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ; ইহাদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

r সুতরাং ইহার পর কিসে তোমাকে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে?

r আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নহেন?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়াত্ তীনি ওয়ায্ যাইতূন' (শপথ তীন ও যয়তুন এর)। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইব্রাহিম, আতা, মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, তীন হচ্ছে ডুমুর ফল, যা তোমরা ভক্ষণ করো। আর যয়তুন ওই ফল, যা থেকে নিঃসৃত হয় তেল। এখানে ডুমুরের শপথ করে বলে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, দ্যাখো, ডুমর ফলে বিচি নেই। জান্নাতের ফলসমূহও হবে এরকম বীজহীন। এদিক থেকে ডুমুর জান্নাতী ফল সদৃশ।

ছা'লাবী এবং আবু নাঈম তাঁর 'আত্বত্বিব' গ্রন্থে এক অপ্রসিদ্ধ সূত্রে উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু জর বলেছেন, ডুমুর অর্শরোগের মহৌষধ। পায়ের ঘায়েরও প্রতিষেধক।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'শপথ সিনাই পর্বতের'। জুহাক বলেছেন, 'সীনীন' (সিনাই) শব্দটি নাবতী ভাষার। এর অর্থ সৌন্দর্যময়, অথবা সৎ। মুকাতিল বলেছেন, ফলবান বৃক্ষে সুশোভিত পাহাড়কে নাবতী ভাষায় বলে 'সীনীন' বা 'সাইনা'। ইকরামা বলেছেন, ওই ভূখণ্ডকে 'সীনীন' বলে, যেখানে

www.eelm.weebly.com

অবস্থিত তুর পর্বত। কেউ কেউ বলেছেন, সুরিয়ানি ভাষায় ঘন সন্নিবিষ্ট তরুবীথি শোভিত শ্যামল শৈলশ্রেণীকে বলে 'সীনীন' বা 'সাইনা'। কেউ কেউ আবার বলেছেন, শব্দটি আবিসিনীয়। মুজাহিদ বলেছেন 'সীনীন' অর্থ বরকত। অর্থাৎ বরকতময় পাহাড়। কাতাদা বলেছেন, সৌন্দর্যময় গিরিমালা। কালাবী বলেছেন, সুসজ্জিত পর্বত শ্রেণী। কেউ কেউ বলেছেন, বিশেষ প্রস্তর। এধরনের প্রস্তর ছিলো তুর পর্বত সংলগ্ন। তাই এখানে 'তূর' কে সম্বন্ধিত করা হয়েছে 'সীনীন' এর সঙ্গে।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর'। এখানে 'আমীন' অর্থ নিরাপদ। শব্দটির ব্যুৎপত্তি ঘটেছে 'আমান' থেকে। 'আমান' অর্থ নিরাপত্তা। শব্দটি কর্তৃপদীয় হলে অর্থ হবে— যে এই শহরে প্রবেশ করে, তাকে এই শহর নিরাপত্তা দেয়। আর কর্মপদীয় হলে অর্থ হবে— যে এই শহরে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ। 'আমীন' এর আর এক অর্থ— গচ্ছিত সম্পদ রক্ষাকারী।

'নিরাপদ নগরী' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মহাশান্তিধাম মক্কাকে। মূর্খতা ও ইসলাম উভয় যুগে মক্কাভূমি ছিলো নিরাপদ আলয়। এখানে যে কয়টি বস্তুর শপথ করা হয়েছে, সেগুলোর সব কয়টিই বরকতপূর্ণ। ডুমুর ও যয়তুনের উৎপন্ন স্থল ছিলো নবী ইব্রাহিমের হিজরতের স্থান। সিনাই পর্বতসন্নিহিত অঞ্চল ছিলো নবীগণের আবাসভূমি এবং প্রত্যাদেশ অবতরণের স্থান। তুর পর্বতে নবী মুসার সঙ্গে আল্লাহ্পাক বাক্যালাপ করেছিলেন। আর মহাতীর্থ মক্কা তো ছিলো শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম নবীর জন্মস্থান এবং প্রত্যাদেশ অবতরণের কেন্দ্র।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দর গঠনে'। এখানে 'মানুষ' (আল ইনসান) বলে বুঝানো হয়েছে সমগ্র মানব জাতিকে। আর 'তাক্বভীম' শব্দটি সাধিত হয়েছে 'ক্বিয়াম' বা 'ক্বওয়াম' ধাতুমূল থেকে 'তাফয়ীল' প্রক্রিয়ায়। কোনোকিছুর অবয়ব বা ভিত্তি নির্ধারণ করার অবস্থাকে বলে 'ক্বিয়াম'। আমি বলি, 'ক্বওয়াম' ওই প্রেক্ষাপট, যা থেকে প্রস্তুত করা হয় কোনোকিছুর মৌলিক পরিকাঠামো। মানবসৃষ্টির মৌলিক উপাদানসমূহের মধ্যে প্রকাশ্য জগতের সকল বস্তু বিদ্যমান। এছাড়াও তার মধ্যে রয়েছে আত্মা জগতের সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বস্তু। রয়েছে বাকশক্তি। এই সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষ সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিভূ। তাই মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে পরিদৃষ্ট হয় শয়তান ও ফেরেশতার স্বভাবের সহাবস্থান। হিংস্র জন্তুর মতো পাশবিকতার মধ্যে সমাগত হয় জীবন, প্রজ্ঞা, শক্তিমত্তা, অভিপ্রায়, দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাকশক্তি ও প্রেম-ভালোবাসা— এককথায় আল্লাহ্তায়ালার সমষ্টিগত গুণবত্তার প্রতিবিম্ব। মানুষ তাই বিবেক-বুদ্ধির জ্যোতিতে স্নাত। পরম সত্তার অস্তিত্ব, গুণাবলী ও প্রতিবিম্বজাত পূর্ণত্বসমূহের ধারক ও বাহক মানুষই। একারণে মানুষই পেয়েছে আল্লাহ্পাকের প্রতিনিধিত্বের (খেলাফতের) উপঢৌকন। তিনি তাই বলেছেন 'আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চাই'।

www.eelm.weebly.com

'আহ্সানি তাক্বভীম' অর্থ সুন্দরতম গঠন। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন— কান্তিময় আকৃতি। কেননা 'তাক্বভীম' শব্দটি ধাতুমূল, যার অর্থ সুপরিমিত। 'কামুস' অভিধানে লেখা আছে 'ক্বওয়ামতুহু' (আমি তাকে সুপরিমিত করেছি, দিয়েছি সুষম সৌষ্ঠব)। 'ক্বভীম' ও 'মুস্তাক্বীম' অর্থ সরল, সমতল। আয়াতের ধাতুমূল শব্দটি কর্মপদীয় শব্দরূপীয়। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে সঠিক পরিমাপ সহকারে। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর পরিগঠনকৌশল এমন নয়। প্রাণীসমূহের মধ্যে কেবল মানুষই পরিমিত অবয়ব, পরিচ্ছন্ন ত্বক এবং ধারণ শক্তিসম্পন্ন হাতের অধিকারী।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি'। বাগবী লিখেছেন, বাক্যটি অনির্দিষ্টবাচক হওয়ার কারণে যথাযোগ্য সমষ্টিকে অন্তর্ভুক্তকারী। আর সাধারণার্থে সমষ্টিকে অন্তর্ভুক্তকারী বলে যদি ধরে না নেওয়া হয়, তবে তা হবে আংশিকার্থক। এমতাবস্থায় যথাক্রমে এর অর্থ দাঁড়ায়— সকলেই অধঃপতনের অতল তলের অধিবাসী এবং অধঃপতিতদের মধ্যে কেউ কেউ অধিবাসী অতল তলের। এখানকার ৪ ও ৫ সংখ্যক আয়াতের বক্তব্যের পরিপোষকতায় একটি হাদিস উল্লেখ করা যায়। সেটি হচ্ছে— হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে ইসলামের প্রকৃতির উপর। এরপর তার মাতাপিতা তাকে বানিয়ে দেয় ইহুদী, খৃষ্টান, অথবা অগ্নিউপাসক। আলোচ্য আয়াত এবং উদ্ধৃত হাদিসের মধ্যে পার্থক্য কেবল এতোটুকু যে, আয়াতে মানবজাতির অধঃপতিত হওয়ার সম্পর্ক করা হয়েছে আল্লাহ্র সঙ্গে। এ সম্পর্কটি সৃষ্টিগত। কেননা আল্লাহ্পাক মানুষের কর্মেরও স্রষ্টা। আর হাদিসে ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিউপাসক বানানোর সম্পর্ক করা হয়েছে তাদের মাতাপিতার সঙ্গে। এ সম্পর্ক অর্জন বা নির্মাণ গত। কারণ আল্লাহ্পাক একমাত্র সৃজয়িতা হওয়ার কারণে মানুষের কর্মাবলীর সৃজয়িতা হলেও কর্মাবলীর নির্মাতা হয়েছে মানুষ। তাই তারা কর্মফল অর্জকও।

'সাফিলীন' অর্থ হীনতাগ্রস্তদের। অর্থাৎ হিংস্র জীবজন্তু পশু-পাখি ও শয়তানদের, যারা চিরকালের জন্য মানবিক পূর্ণত্ব লাভের বৈশিষ্ট্যবিবর্জিত। আল্লাহ্র নৈকট্য এবং আল্লাহ্র প্রেম-ভালোবাসা-পরিচয়ের জ্যোতির্সম্পাত ধারণ করা কোনোদিনই তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 'সাফিলীন' 'সাফিল' এর বহুবচন। আর এখানে 'সাফিলীন' উল্লেখ করার কারণ এই যে, পশু-পাখি-জন্তু-জানোয়ার বিবেকসম্পন্ন প্রাণী নয়, কিন্তু জ্বিন ও শয়তান বুদ্ধি-বিবেকবিশিষ্ট। কিন্তু তারা যখন তাদের মানবিক পূর্ণত্ব অর্জনের সম্ভাবনাকে করে ব্যর্থ, বরণ করে কুফরী ও কৃতঘ্নতাকে, তখন তাদের পতন হয় অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ্পাক তখন তাদেরকে নামিয়ে দেন কুকুর-শূকর-শয়তান ইত্যাদি সৃষ্টিরও নিম্নতম পর্যায়ে। দুর্ভোগ, শাস্তি ও লাঞ্ছনা হয় তখন তাদের জন্য অবধারিত। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কবরবাসী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দেওয়া

www.eelm.weebly.com

হয় বেহেশতের দিকের একটি জানালা। তারা যখন ওই জানালা দিয়ে বেহেশত ও তার বিপুল সুখসম্ভারসমূহ দেখতে থাকে, তখন তাদেরকে বলা হয়, ওই দ্যাখো, ওই সকল সুখসম্ভার ভোগ করতে পারতে তোমরাও, যদি হতে বিশ্বাসী ও পুণ্যবান। এরপর আর একটি জানালা খুলে দেওয়া হয় দোজখের দিকের। হাদিসটি ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে। তাঁর নিকট থেকে আবার বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীকে তাদের জাহান্নামের আবাস না দেখানো পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে না। তেমনি জাহান্নামীদেরকেও জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে না তাদের জান্নাতের ঠিকানা না দেখিয়ে। এরকম করা হবে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদেরকে যথাক্রমে অধিকতর কৃতজ্ঞভাজন ও আক্ষেপজর্জরিত করার জন্য। অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা ইমানদার না হলে যেখানে যেতো এবং জাহান্নামীরা ইমানদার হলে যা পেতো, তা তাদেরকে দেখানো হবেই। তবে শয়তান ও জীব-জানোয়ারদের ক্ষেত্রে এরকম করা হবে না। কেননা তাদের মধ্যে জান্নাতগমনের যোগ্যতা একেবারেই নেই। হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, এখানে 'আসফালা সাফিলীন' অর্থ দোজখ। কেননা দোজখ বহুস্তরবিশিষ্ট— একটি আরেকটির নিচে। আবুল আলিয়া কথাটির অর্থ করেছেন— আমি তাদেরকে শূকর ইত্যাদি নিকৃষ্ট জীবের আকৃতিবিশিষ্ট করে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবো দোজখের দিকে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ; এদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার'। এখানকার 'ইল্লাল্ লাজীনা আমানূ' বাক্যের 'ইল্লা' ব্যতিক্রমীটি মিলিতার্থক। কেননা বিশ্বাসী ও পুণ্যবানদেরকে কখনো দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে না। রূপান্তরিতও করা হবে না তাদের আকার-আকৃতি।

'ফা লাহুম' (এদের জন্য) কথাটির 'ফা' অব্যয়টি নৈমিত্তিক। আর কথাটির অবস্থানও এখানে ব্যতিক্রমীর নিমিত্তস্থলে, যাতে করে বুঝা যায় ব্যতিক্রমের বাঁধনটি অত্যন্ত সুদৃঢ়। কেউ কেউ বক্তব্যটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে এবং সর্বোত্তম সম্ভাবনা সহকারে, যাতে তারা সামান্য পরিশুদ্ধ-প্রচেষ্টায় পেয়ে যেতে পারে মহাসফলতা। সকল প্রাণী ও অন্যান্য সৃষ্টিকে করেছি তাদের সেবাদাস। তাই অনুগত হয়ে যায় জ্বিন-শয়তানেরাও। আবার কিছুসংখ্যক মানুষকে আমি করেছি বয়োবৃদ্ধ, দুর্বল, শিশুদের চেয়েও অধিক অকেজো। এভাবে তাদেরকে করেছি অক্ষমতার অতলতাবাসী। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এখানকার ব্যতিক্রমীটি হবে পৃথকার্থক। অর্থাৎ 'ইল্লা' (ব্যতীত) অর্থ এখানে হবে 'লাকিন্না' (কিন্তু), বাক্যের গতিধারা থেকে উদ্বুদ্ধ একটি ধারণাকে বিলুপ্ত করবার জন্য। তবে এখানে এরকম একটি ধারণা জাগতে পারে যে, সাধারণ মানুষের অবস্থা এরকম হলে দুর্বল ইমানদারদের অবস্থাও তো হবে তথৈবচ। অচল-অক্ষম জীবন তো এক চরম বিড়ম্বনা। এরূপ ধারণা অপনোদনার্থে

www.eelm.weebly.com

তাই বলা হয়েছে— যারা যৌবনে নিয়মিত পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে, তারা বার্ধক্যে অক্ষম হয়ে গেলেও জারী থাকবে তাদের পুণ্যার্জনের খতিয়ান। জুহাক বলেছেন কথাটির অর্থ— পুণ্যকর্ম সম্পাদন ব্যতিরেকেই তারা তখন পেতে থাকবে পুণ্য।

আউফির মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর সময়ে কেউ কেউ উপনীত হয়েছিলেন অতি বার্ধক্যে। তাঁদের স্মৃতিশক্তি যখন লোপ পেতে থাকলো, তখন তাঁরা রসুল স. সকাশে অনুযোগ উপস্থাপন করলেন। তিনি স. তাঁদেরকে জানিয়ে দিলেন, আগে তোমরা যে সকল পুণ্যকর্ম নিয়মিত করতে, সে সকল পুণ্যকর্মের প্রতিদান তোমরা পেতেই থাকবে, যেহেতু তোমরা সেগুলো করতে এখন অসমর্থ।

ইকরামা সূত্রে আসেম আহওয়াল বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন 'ইল্লাল্ লাজীনা আমানূ ওয়া আ'মিলুস সলিহাত' আয়াতের মর্মার্থ— যারা কোরআন তেলাওয়াত করে, তারা অসহায়, অকর্মণ্য ও বিপর্যস্ত বয়সে উপনীত হয়ই না। জালালউদ্দিন মাহাল্লী লিখেছেন, বিশ্বাসীদের পুণ্যকর্ম করবার সামর্থ্য নেই— এরকম বয়সে পৌঁছলেও তাদের পূর্বাহ্নের পুণ্যকর্মগুলোর প্রতিদান লেখা হতেই থাকে। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন কোনো মুসলমান দৈহিকভাবে বিপদাপন্ন হয়, তখন আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেন, সে স্বাস্থ্যবান থাকার সময় যে সকল আমল করতো, সে সকল আমলের পুণ্য তার আমলনামায় লিখে যেতে থাকো। হজরত ওমর থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। দু'টো হাদিসই সংকলন করেছেন বাগবী। হজরত আবু মুসা থেকে বোখারীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

একটি দ্বন্দ্ব ঃ অলংকারশাস্ত্রের রীতি হচ্ছে— সম্বোধিত জন যখন কোনো বিষয়ে প্রত্যাখ্যানপ্রবণ হয়, তখন তার প্রত্যাখ্যানের স্বরূপ বুঝে বক্তব্যকে করা হয় গুরুত্ববহ অব্যয়বিশিষ্ট, যাতে তা প্রতিপন্ন হতে পারে সঠিক প্রমাণ হিসেবে। আর প্রত্যাখ্যানের কোনো ইঙ্গিত যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে ব্যবহার করা হয় সাদামাটা বাক্য। মানুষ জানে, সে একটি সুন্দর সৃষ্টি। আবার একথাও জানে যে, জরা-ব্যাধি-অসহায়ত্ব-বার্ধক্য এ সকলকিছুই তার ললাটলিখন। তৎসত্ত্বেও এখানে এমন কী ঘটলো, যার কারণে আল্লাহ্পাক উপস্থাপন করলেন শপথসূচক ও গুরুত্বজ্ঞাপক অব্যয় 'লাম'? আর 'ক্বদ' এর মতো নিশ্চিতার্থক শব্দ দ্বারা তাকে করলেন আরো অধিক তাৎপর্যপূর্ণ?

নিরসন ঃ প্রামাণ্য বিষয়কে অস্বীকার করার অর্থ প্রমাণকেই অস্বীকার করা। এদের একটি আর একটিকে অবধারিত করে। মানুষের পার্থিব জীবনের এই বিবর্তন তাদের পরবর্তী পৃথিবীর জীবন এবং তাদের প্রতিফল-প্রতিদান প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এমতাবস্থায় কেউ যদি তার পরবর্তী পৃথিবীর জীবনকে অস্বীকার করে তবে বুঝতে হবে, সে এই পৃথিবীর বাস্তব জীবনকেও অস্বীকারকারী। সে অবশ্যই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, তাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্যকে তো অতীব গুরুত্ববহ করতে হবেই।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'সুতরাং এর পর কিসে তোমাকে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে'? একথার অর্থ— হে অপরিণামদর্শী মানুষ! তোমার নিজের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বসম্পৃক্ত সকলকিছুই মহাসত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও বলো, কী এমন ঘটলো, যাতে করে তুমি অতি অবশ্যম্ভাবী মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবসকে অস্বীকার করে বসলে? অথবা মর্মার্থ হবে— বলো, কীসে তোমাকে মিথ্যাবাদী বানালো, যাতে করে তুমি অস্বীকার করে বসলে মহাপুনরুত্থান, মহাসমাবেশ, মহাপ্রতিদান এসকলকিছুকে? তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেককে এতোটুকু জাগ্রত করবার অবকাশও কি তুমি পেলে না? কেনো একথাটি ভেবে দেখলে না যে, যিনি তোমাকে সুন্দরতম পরিকাঠামো সহকারে সৃষ্টি করলেন, তারপর জরা-ব্যাধি-বার্ধক্য দিয়ে তোমাকে করে ফেললেন ক্রমশঃ অকর্মণ্য, তিনি কি সক্ষম নন, তোমার মৃত্যু ঘটানোর পর তোমার পুনরুত্থান ঘটাতে? যথাসময়ে তোমার কর্মকাণ্ডসমূহের যথাপ্রতিফল প্রদান করতে?

এখানকার প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও প্রতাপপ্রদর্শনমূলক। অর্থাৎ সাবধান! প্রতিফল দিবসকে মান্য করে এখান থেকেই মহা সাফল্যলাভের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। অন্যথায় বিপদগ্রস্ত হবে। অথবা এখানে সম্বোধন করা হয়েছে সরাসরি রসুল স.কে। আর 'মা' অব্যয়টি এখানে না-সূচক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! কোনোকিছুই আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারবে না। কিংবা 'মা' অব্যয়টি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এমতাবস্থায় মর্মার্থ হবে— আপনাকে যে তারা অমান্য করে, তার সপক্ষে তাদের কাছে কী কোনো প্রমাণ আছে? নিশ্চয়ই নেই। তাহলে তারা কিসের জোরে অস্বীকার করে প্রতিফল দিবসের মতো অবশ্যম্ভাবী বিষয়কে? এরকম কথা বিবৃত হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন 'হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ উপস্থাপন করো'।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'মা' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে 'মান' অর্থে। আর প্রশ্নটি এখানে বিস্ময়প্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম নবী! কী বিস্ময়! আপনার সত্যবাদিতার সপক্ষে প্রকৃষ্ট ও প্রতুল প্রমাণপঞ্জী বিদ্যমান থাকার পরেও তারা আপনাকে অসত্যভাষী বলে!

শেষোক্ত আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। তদুপরি না-সূচকও। এভাবে এখানে অস্বীকৃতি ও না-সূচকতার সমন্বয়ে সাধিত হয়েছে হ্যাঁ-সূচকতা। আর একারণেই বাক্যটি আগের আয়াতের বাক্যের পরিপোষক ও গুরুত্ব আরোপক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যে আল্লাহ্ মানুষকে সুন্দরতম অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যিনি অকৃতজ্ঞদের পরিণত করেন হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে, তিনি কি মানুষসহ তাঁর মহাসৃষ্টির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষার ব্যাপারে মহাপ্রাজ্ঞ নন? আর যিনি মহাপ্রাজ্ঞ ও

www.eelm.weebly.com

মহাশক্তিধর, তিনি কি সক্ষম নন পুনরুত্থান সংঘটনে ও যথোপযুক্ত প্রতিফল প্রদানে? নিশ্চয়-ই। অবশ্য-ই। অথবা মুকাতিলের ভাষ্যানুসারে মর্মার্থ হবে— আল্লাহ্ কি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাধিকারী নন? অবশ্যই, নিশ্চয়ই। তাহলে হে আমার নবী! আপনি নিশ্চিত থাকুন। আপনার এখনকার বিব্রতকর অবস্থা সাময়িক। নিশ্চয় আসন্ন প্রতিফল দিবসে আমি আপনার এবং আপনার বিরুদ্ধপক্ষীয়দের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান করবো। আপনাকে দান করবো সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতা এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবো অনন্তকালীন নরকাগ্নিতে।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে রসুল স.কে। যেনো বলা হয়েছে— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অশোভন ও অসমীচীন আচরণে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। কী করবেন। তারা যে চিরহতভাগ্য। নাহলে কি তারা তাদের সর্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলাকাংখীদের প্রতি এমন অযথার্থ আচরণ করে? অথবা বাক্যটি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন হুমকি। কিংবা বাক্যটি উপস্থাপিত হয়েছে পূর্বোক্ত বাক্যের নিমিত্তের স্থলে। অর্থাৎ হে মানব জাতি! আমার রসুলের প্রতি অসত্যারোপ করা নিতান্তই অসঙ্গত। মনে রেখো, আল্লাহ্পাক সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। সুতরাং অন্যায় করে তোমরা কিছুতেই পার পাবে না। সংশোধিত না হলে যথাসময়ে তিনি তোমাদেরকে শায়েস্তা করবেনই। এর অন্যথা হওয়া অসম্ভব।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি এই সুরার শেষ আয়াত 'আ লাইসাল্লহু বি আহ্কামিল হাকিমীন' পাঠ করবে, সে যেনো বলে 'বালা ওয়া আনা আলা জালিকা মিনাশ শাহিদীন' (আর হ্যাঁ, আমিও এর একজন সাক্ষ্য-দাতা)। হজরত বারা বলেছেন, রসুল স. এক সফরে ইশার নামাজ পাঠ করলেন। তখন নামাজের এক রাকাতে তিনি স. পাঠ করলেন সুরা তীন। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

সূরা আ'লাক

মহাপুণ্যধাম মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরাখানিতে রয়েছে ১৯টি আয়াত।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, মাতা মহোদয়া আয়েশা বলেছেন, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয় 'ইক্বরা বিসমি রব্বিকাল লাজী খলাক্ব' সুরা। অধিকাংশ ব্যাখ্যাতাও এ ব্যাপারে একমত। অর্থাৎ সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলো এই সুরার ১ থেকে ৫ সংখ্যক আয়াত।

মাতামহোদয়া আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, রসুল স. এর প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির সূচনা ঘটে সত্যস্বপ্ন দর্শনের মাধ্যমে। স্বপ্নে তিনি যা দেখতেন, তা প্রতিভাত হতো আদিগন্ত বিস্তারিত উষার আলোকরশ্মির মতো। অর্থাৎ তিনি যা দেখতেন, তা সত্যে পরিণত হতো। এর কিছুকাল পর থেকে তাঁর কাছে নির্জনবাস প্রীতিপ্রদ

www.eelm.weebly.com

হয়ে ওঠে। প্রায়শই তিনি হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। প্রতিবার কয়েকদিনের আহার্য ও পানীয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন তিনি। মহাপুণ্যবতী খাদিজা ছিলেন তাঁর এ কাজের একনিষ্ঠ সহযোগিনী। তিনি নিয়মিত তাঁর আহার্য-পানীয়ের যোগান দিতেন। একদিন গুহাভ্যন্তরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁর নিকটে প্রত্যাদেশ নিয়ে আগমন করলেন জিবরাইল আমিন। বললেন, পাঠ করুন। তিনি স. বললেন, আমি তো পাঠক নই। তিনি স. নিজ মুখে বলেছেন, তখন জিবরাইল আমাকে বুকে জাড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। আমি নিস্তেজ হয়ে গেলাম। তিনি ছেড়ে দিয়ে বললেন, এবার পাঠ করুন আমি পুনরায় অনীহা প্রকাশ করলাম। তিনি পুনরায় জাড়িয়ে ধরলেন আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে উবে গেলো আমার শক্তি। আবারো বললেন, 'পাঠ করুন। আপনার প্রভুপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন— সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পাঠ করুন, আর আপনার প্রভুপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন— শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না'।

এরপর আমি প্রত্যাবর্তন করলাম স্বগৃহে। আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছিলো। কাঁপছিলো বুক। খাদিজাকে ডেকে বললাম, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। সে আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলো। কিছুক্ষণ পর যখন আমি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলাম, তখন তাকে খুলে বললাম সবকিছু। বললাম, মনে হয় এবার আমার মৃত্যু ঘটবে। সে বললো, না, তা কখনোই হতে পারে না। আপনি বিপদগ্রস্তদের বিপদ দূর করে দেন, দান করেন এতিম, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদেরকে। একথা বলে খাদিজা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে। ওয়ারাকা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হিব্রু ভাষায় লিখতে জানতেন। আরবীতে ভাষান্তর করতে পারতেন ইঞ্জিল। তিনি ছিলেন তখন অতি বৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন। খাদিজা তাঁকে সবকিছু খুলে বললেন। ওয়ারাকা উৎফুল্ল হয়ে বললেন, এতো সেই নামুস, যাকে আল্লাহ্ পাঠাতেন নবী মুসার নিকট। আক্ষেপ! এখন যদি আমার যৌবনকাল থাকতো, তাহলে মোহাম্মদকে যখন তার স্বজাতি বহিষ্কার করবে, তখন আমি দাঁড়াতে পারতাম তার সহযোগী হিসেবে। আমি বললাম, কী বলছেন আপনি? আমার স্বজাতি কি আমাকে দেশান্তর করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তুমি যা এনেছো তার জন্যই তারা তোমার ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। সকল মহাবাণীর বাহককে এরকমই দুঃখ-যাতনা ভোগ করতে হয়। আমি যদি সে সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারি, তবে আমি অবশ্যই একান্ত পক্ষ অবলম্বন করবো তোমার। এর কিছুদিন পরেই তিনি পরলোক গমন করলেন। এদিকে প্রত্যাদেশপ্রবাহও গেলো বন্ধ হয়ে।

অনেকের মতে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয় সুরা মুদ্দাছ্ছির। সুরা মুদ্দাছ্ছিরের তাফসীরে আমরা এ সম্পর্কে আলোকপাতও করেছি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সর্বাগ্রে অবতীর্ণ হয় সুরা ফাতিহা। কেননা বায়হাকী তাঁর 'দালায়েল' গ্রন্থে উল্লেখ

www.eelm.weebly.com

করেছেন, তখন মাতা মহোদয়া খাদিজা হজরত আবু বকরকে ডেকে বললেন, আতীক! আপনার বন্ধুকে নিয়ে ওয়ারাকার কাছে যান। হজরত আবু বকর তাই করলেন। রসুল স. বলেছেন, আবু বকর আমাকে ওয়ারাকার কাছে নিয়ে গেলো। আমি তাঁকে বললাম, আমি নির্জনে থাকলেই ডাক শুনি, মোহাম্মদ! মোহাম্মদ! এরকম ডাক শুনলেই আমি পালিয়ে আসি। ওয়ারাকা বললেন, এরকম কোরো না। ডাক শুনতে পেলে থেমে যেয়ো। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চেষ্টা করো। যা শুনতে পাও, তা এসে আমাকে জানিয়ো। এরপর একদিন নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমি শুনতে পেলাম, মোহাম্মদ! আমি দাঁড়ালাম। শুনতে পেলাম 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম— আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন......'শেষ পর্যন্ত। এরপর আমাকে বলা হলো, বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্।

প্রথমোক্ত বর্ণনাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। বাগবী বলেছেন, ওইটাই সঠিক। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী জমহুর আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একমত। আর সুরা মুদ্দাছ্ছিরকে প্রথম অবতীর্ণ সুরা বলা হয়েছে একারণে যে, প্রত্যাদেশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সুরা মুদ্দাছ্ছির অবতীর্ণ হয়েছিলো সর্বপ্রথমে। আর সুরা ফাতিহাকে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সুরা বলার কারণ হচ্ছে, সর্বপ্রথম একবারে পুরো সুরা অবতীর্ণ হয়েছিলো এই সুরা ফাতেহা-ই। অথবা বলা যেতে পারে, সুরা মুয্যামমিল ও সুরা মুদ্দাছ্ছিরের পর সর্বপ্রথম সম্পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হয় সুরা ফাতিহা।

রসুল স. হেরা পর্বতের গুহায় কতোদিন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। বোখারী ও মুসলিম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি হেরা গুহায় এক মাস ইতেকাফ করেছিলাম। আর ওই মাসটি ছিলো রমজান মাস। বর্ণনাটি ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন তাঁর 'চরিতামৃত' গ্রন্থে। যুরকানী বলেছেন, এর অধিক দিনের নির্জনবাসের বিবরণগুলো সঠিক নয়। মুসাওয়ার ইবনে মাসআব বলেছেন চল্লিশ দিনের কথা। কিন্তু বর্ণনাটি পরিত্যাজ্য।

নবী মুসা যেহেতু তুর পর্বতে অবস্থান করেছিলেন চল্লিশ দিন, তাই কেউ কেউ বলেছেন রসুল স. এরও হেরা গুহায় চল্লিশ দিন অবস্থান করার কথা। দলিল হিসেবে তাঁরা উপস্থাপন করেন রসুল স. এর একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন আল্লাহ্পাকের সন্তোষ কামনায় সাধনা করবে, তার হৃদয় ও মুখ থেকে নিঃসৃত হবে হেকমতের স্রোতধারা। আবু নাঈম তাঁর হুলিয়া'য় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু আইয়ুব থেকে। কিন্তু হাদিসটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। আর নবী মুসার সঙ্গে এর যোগসূত্র স্থাপন করার ধারণাটিও দুর্বল। কেননা দুই নবীর নবুয়তের প্রেক্ষাপট ও সময়কাল ভিন্ন। তাছাড়া নবী মুসাকেও আল্লাহ্পাক এক মাস তুর পর্বতে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে বাড়িয়ে দেন আরো দশ দিন। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি মুসার অঙ্গীকার নিয়েছিলাম তিরিশ রাত্রির জন্য। এর সঙ্গে পরে যোগ করে দিয়েছিলাম আরো দশ। এভাবে সে পূর্ণ করে ছিলো চল্লিশ রাত্রি'।

www.eelm.weebly.com

'রসুল স. হেরা পর্বতাভ্যন্তরে কী ধরনের ইবাদত করতেন, তা নিয়ে বিদ্বানগণ মন্তব্য করেছেন অনেক রকমের। কেউ বলেছেন, তিনি স. সেখানে ইবাদত করছিলেন নূহ নবীর শরিয়তানুসারে। কেউ বলেছেন, তিনি স. তখন আরাধনা করতেন ইব্রাহিম নবীর শরিয়ত অনুযায়ী। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ঈসা নবীর শরিয়তই ছিলো তাঁর তখনকার উপাসনার ভিত্তি। কিন্তু অভিমতগুলো অসঠিক। কেননা রসুল স. ছিলেন অক্ষরের অমুখাপেক্ষী (উম্মি)। তাই পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব তিনি স. পাঠ করেছিলেন, একথা বলা যায় না। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তিনি স. তখন সৃষ্টিজগত থেকে আন্তরিক সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়েছিলেন মোরাকাবায়— ধ্যানে, চিন্তা-গবেষণায়।

কুসতুলানী বলেন, প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির সময় রসুল স. এর হৃৎকম্প শুরু হয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু তা জিবরাইলকে দেখে নয়। কেননা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মাহাত্ম্য ছিলো জিবরাইলের চেয়ে অনেক উচ্চে। আর তাঁর হৃদয়ও ছিলো অত্যন্ত সুদৃঢ়। বরং তখন তিনি ভয়ে কাঁপছিলেন একথা ভেবে যে, পরম আরাধ্য আল্লাহ্‌কে ছেড়ে আবার না ভিন্নতর ব্যস্ততার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি স. তখন কাঁপছিলেন নবুয়তের মহান গুরুভার বহনের কথা চিন্তা করে। আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, ফেরেশতা জিবরাইল ও মিকাইল উভয়ে মিলে তখন তাঁর বক্ষ বিদারণ করেছিলেন। হৃৎপিণ্ড ধৌত করে দিয়েছিলেন জমজমের পানি দিয়ে। তারপর বলেছিলেন, পড়ুন ....।

একটি বিধান ঃ এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিসমিল্লাহ্ প্রত্যেক সুরার অংশ— কথাটি ঠিক নয়। কিন্তু ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফেরেশতা জিবরাইল যখন প্রথম আবির্ভূত হলেন, তখন বললেন, মোহাম্মদ! আল্লাহ্ সকাশে আশ্রয় যাচনা করুন। তিনি স. বললেন, 'আসতাঈজু বিল্লাহিস্ সামীই'ল আ'লীম মিনাশ শাইত্বনির রজ্বীম'। তিনি পুনরায় বললেন, এবার বলুন 'বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম'। বলুন 'ইক্ব্‌রা বিস্মি রব্বিকাল্লাজী খলাক্ব.......'।

একটি উপযোগ ঃ সুহাইল বর্ণনা করেছেন, প্রত্যাদেশাগমন বন্ধ ছিলো আড়াই বৎসর। শা'বী থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, প্রত্যাদেশের ধারাবাহিকতা শুরু হয় রসুল স. এর চল্লিশ বৎসর বয়স থেকে। এরপর থেকে তিন বৎসর পর্যন্ত তাঁর একান্ত সঙ্গী ছিলেন ফেরেশতা ইস্রাফিল। তিনি তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। তবে প্রত্যাদেশের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তিন বৎসর এভাবে অতিবাহিত হওয়ায় রসুল স. এর নবুয়তের দায়িত্বের সঙ্গে জড়িত হলেন ফেরেশতা জিবরাইল। এরপর থেকে বিশ বছর ধরে প্রধানত তাঁর মাধ্যমেই নিরবচ্ছিন্ন থাকে প্রত্যাদেশপ্রবাহ।

www.eelm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اِقْرَاْ وَ
رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝٣ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

r পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—
r সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে 'আলাক' হইতে।
r পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত,
r যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন—
r শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে, যাহা সে জানিত না।

'ক্বিরআত' ধাতুমূলের অনুজ্ঞাসূচক শব্দরূপ ইক্বরা। এর অর্থ— পড়ুন। কর্মপদ এখানে অনুক্ত। ওই অনুক্ততাসহ কথাটি দাঁড়ায়— পাঠ করুন কোরআন।

এরপর বলা হয়েছে— 'বিস্‌মি রব্বিক'। এর অর্থ আপনার প্রভুপালনকর্তার নাম নিয়ে। অথবা তাঁর নামের বরকত সহকারে। অথবা বলা যায়, বাক্যটি উল্লেখিত হয়েছে 'ইক্বরা' (পড়ুন) ক্রিয়ার কর্মপদের স্থলে। আর 'বা' অব্যয়টি এখানে সংযোজিত হয়েছে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়ায়— আপনি আপনার প্রভুপালনকর্তার নাম পাঠ করুন।

লক্ষণীয়, এখানে 'আল্লাহ্‌র নামে পাঠ করুন' না বলে বলা হয়েছে 'আপনার প্রভুপালনকর্তার নাম পাঠ করুন'। এরকম করার কারণ এই যে, আল্লাহর সত্তাগত নাম— 'আল্লাহ্‌'। আর 'রব' (প্রভুপালনকর্তা) নামটি গুণবাচক। এখানে এই ইঙ্গিতটি দেওয়াই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্‌র সত্তার পরিচয় পেতে গেলে প্রথমে পরিচয় পেতে হবে তাঁর গুণাবলীর। আর তাঁর গুণাবলীর মধ্যে 'পালন' গুণটির প্রভাবই অধিকতর প্রকাশ্য এবং ঘনিষ্ঠ। তাই এই গুণটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এখানে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে। আমরা দেখি সৃষ্টি অবক্ষয় প্রবণ, নিত্য-নতুন। আর এই নিত্যনতুনতার সৃজয়িতা ও পালয়িতা তো একজন থাকবেনই, যিনি অনিত্য, অনাদি, অনন্ত, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিবর্তন-রূপান্তরণ থেকে চির পবিত্র। তাই তাঁর পরিচয় পেতে গেলে প্রথমে পরিচয় লাভ করতে হবে তাঁর প্রতিপালন গুণের। তাঁর সত্তার পরিচয় তো লাভ হবে পরে। তবে এ ব্যাপারে সুফী-দার্শনিকেরা পোষণ করেন ভিন্ন মত। তাঁরা তাঁদের আধ্যাত্মিক পথযাত্রা শুরু করেন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জাতের দিকে লক্ষ্য করে। পরমতম সত্তাই তাঁদের পরমতম লক্ষ্য। আর তাঁর সকল গুণের সমাহারও তো তিনিই। তাই এমতো মহান অভিযাত্রায় 'ইসমে জাত' (আল্লাহ্‌) জিকিরই হয় তাদের প্রারম্ভিক অবলম্বন এবং চূড়ান্ত অবলম্বনও হয় ওই আনুরূপ্যবিহীন সত্তা প্রমাণকারী কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্‌'।

www.eelm.weebly.com

তৈয়বী লিখেছেন, এখানকার 'পাঠ করো' কথাটি সাধারণার্থক। কী পাঠ করতে হবে, সেকথা এখানে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। সুতরাং এখানকার 'আলিফ লাম'কে জাতিবাচক বা পঠনজাতীয় কিছু বলতে হয়। আর 'বিস্‌মি' এর 'বা' অব্যয়টি এখানে সহায়ক হিসেবে বিবেচ্য, অতিরিক্ত হিসেবে নয়। বাক্যটি রসুল স. এর কণ্ঠনিঃসৃত বাণী 'আমি পাঠক নই' এর জবাব। অর্থাৎ কীভাবে পাঠ করবো? এমতাবস্থায় আয়াতখানির মর্মার্থ দাঁড়ায়— হ্যাঁ, পাঠ করুন। তবে আপনার নিজস্ব শক্তি ও জ্ঞান সহযোগে নয়, বরং আপনার প্রভুপালয়িতার প্রজ্ঞা ও শক্তি সহযোগে। তৈয়বীর ব্যাখ্যানুসারে 'বিসমি রব্বিকা' (আপনার প্রভুপালকের নামে) বাক্যের 'ইসিম' (নাম) হবে অতিরিক্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্‌ লাজী খলাক্ব' (যিনি সৃষ্টি করেছেন)। বাক্যটি 'রব' বা প্রভুপালনকর্তার বিশেষণ। আর 'রবে'র অর্থ এখানে বিকাশক। কেননা প্রভুপালকত্বের দাবিই হচ্ছে সৃষ্টিকে বিকশিত করা। সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব বা অপূর্ণতা থেকে ক্রমোন্নতির পথে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। 'খলাক্বা' ক্রিয়ার কর্মপদ এখানে অনুক্ত। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, প্রতিটি বস্তুই তাঁর সৃষ্টি। যদি কর্মপদ এখানে উক্ত হতো, তবে তাঁর সৃষ্টিকর্ম হয়ে পড়তো সীমিত। তখন এই ধারণাটির উদয় হতে পারতো যে, অবশিষ্ট সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা হয়তো বা অন্য কেউ। আর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এমন এক সৃষ্টি বিদ্যমান, যাদের রয়েছে পঠন শক্তি। এই পঠনশক্তিও তাঁরই সৃষ্টি। অথবা এখানে কর্মপদ অনুক্ত থাকার আর একটি কারণ এই হতে পারে যে— যদিও 'খলাক্বা' ক্রিয়াটি এখানে সকর্মক, তবুও এখানে তা ব্যবহৃত হয়েছে অকর্মক হিসেবে, এমতো অর্থ প্রদান করার জন্য যে, ওই আল্লাহ্‌ই প্রভুপালনকর্তা, যাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সৃজন ও উদ্ভাবন। এরকম বিশেষণ অন্য কোনো সত্তার প্রতি প্রযোজ্য হওয়া অসম্ভব।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে'। প্রকাশ্যত বাক্যটি যোগসূত্রহীন একটি নতুন বাক্য। আগের বাক্যের সূত্রে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌ কী সৃষ্টি করেছেন? এই সম্ভাব্য প্রশ্নটিরই যেনো জবাব দেওয়া হয়েছে একথা বলে যে, তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। আর বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মানুষ সৃষ্টি করার বিভিন্ন নিমিত্ত হিসেবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে—

১. মানুষ গোটা বিশ্বগজতের সংক্ষিপ্তসার। সমগ্র সৃষ্টিতে যা কিছু আছে, তার সকলকিছুই আছে মানুষের মধ্যে। সে কারণেই বিশ্বজগতকে বলা হয় বৃহৎ বিশ্ব এবং ক্ষুদ্র বিশ্ব বলা হয় মানুষকে।

২. মানুষ সৃষ্টির সেরা। পরমতম সত্তার সত্তা ও গুণবত্তাজাত জ্যোতিসম্পাত ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন। আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভের যোগ্যতাসম্পন্ন। আর এই মহাসৃষ্টি সৃজনের উদ্দেশ্যও এই যে, সৃষ্টির নেতা হিসেবে মানুষ লাভ করবে তাঁর পরিচয় (মারেফত)। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়কে

www.eelm.weebly.com

আমার ইবাদত করার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি'। একথার অর্থ— আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি তাদের কাছে আমার পরিচয় প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। হাদিসে কুদসীতে এসেছে, হে আমার নবী! আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি কোনোকিছুই সৃষ্টি করতাম না। বিকাশ ঘটাতাম না আমার প্রতিপালন কর্মের।

লক্ষণীয়, বর্ণিত হাদিসখানিতে সম্বোধন করা হয়েছে কেবল শেষতম নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে। কেননা তিনিই হচ্ছেন আদম সন্তানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। অপর এক হাদিসে এসেছে, আল্লাহ্পাক বলেন, আমি ছিলাম গুপ্ত ধনভাণ্ডার। চাইলাম পরিচয় প্রকাশ করতে। সেকারণেই আমি সৃষ্টি করলাম এই নিখিলবিশ্ব। উল্লেখ্য, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এখানে বলা হয়েছে কেবল মানুষ সৃষ্টির কথা। কেননা মানুষই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাই বিশেষভাবে তাদের আভিজাত্য প্রকাশ করাই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য। তদুপরি সমগ্র সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য যে একমাত্র মানব জাতি, সেকথা প্রকাশ করাও আলোচ্য আয়াতের আর একটি উদ্দেশ্য।

শরিয়তের গুরুভার বহনের প্রধান দায়িত্ব মানুষের। আল্লাহ্পাকের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কর্তব্য কেবল মানুষের উপরে ন্যস্ত। একমাত্র মানুষই পার্থক্য করতে সক্ষম নিজেদের ও অন্যান্যদের অবস্থার। নিজেদের এবং সমগ্র সৃষ্টির আবর্তন-বিবর্তন দৃষ্টে কেবল তারাই আল্লাহ্পাকের অস্তিত্বের প্রমাণ সাপেক্ষে নির্ধারণ করতে পারে তাঁর পরিচয় জ্ঞান অর্জনের উপায়।

এরূপ মর্মার্থের সম্ভাবনাও নাকচ করা যায় না যে, প্রথম 'খলাক্বা' ক্রিয়ার কর্মপদ এখানে উহ্য। অর্থাৎ 'খলাক্বা'কা (তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন)। এ ক্ষেত্রে আবার থেকে যায় একটি সম্ভাব্য প্রশ্নও। তা হচ্ছে, কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে? তার জবাবেই এখানে বলা হয়েছে 'মিন আ'লাক' (আলাক বা শুক্রকণা থেকে)। অধিকন্তু এরকমও বলা যায় যে, প্রথম 'খলাক্বা' ক্রিয়ার কর্মপদ 'মনুষ্যজাতি' এখানে অনুক্ত। আর দ্বিতীয় 'খলাক্বাল ইনসানা' পূর্বোক্ত বাক্যের প্রতি গুরুত্বআরোপক। একই সাথে রহস্যের জটিলতা উন্মোচক। অভিজাত জনের নিকটে বিষয়টিকে হৃদয়গ্রাহী করাই এখানে প্রধান উদ্দেশ্য। এমনও বলা যায় যে, 'আল ইনসান' (মানুষ) বলে এখানে বুঝানো হয়েছে কেবল রসুল স.কে। আর বিশেষভাবে তাঁর কথা বলার অর্থ, তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের মর্যাদা প্রকাশ করা। কেননা তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত সম্বোধিত জন।

'মিন আ'লাক্ব' অর্থ আলাক থেকে। অর্থাৎ জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। 'আ'লাক্ব' হচ্ছে 'আলাক্বাতুন' এর বহুবচন। আর 'আল ইনসান' অর্থ যেহেতু এখানে মানব জাতি, সেহেতু এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনার্থক 'আ'লাক্ব'। উল্লেখ্য, শুক্রবিন্দু অথবা মাটি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে না বলে এখানে বলা হয়েছে 'আ'লাক্ব' (জমাট রক্তপিণ্ড) থেকে। এরকম করা হয়েছে আয়াতের অন্তমিল রক্ষার্থে। অথবা বলা যেতে পারে, মানবসৃজনের বিভিন্ন পর্যায়গুলোর মধ্যে জমাট

www.eelm.weebly.com

রক্তপিণ্ডের পর্যায়টি এমন, যা থেকে অন্যান্য পর্যায়গুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে সহজে। তাই এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে জমাট রক্তপিণ্ডের। কেননা মানব সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি। এরপরে মানব দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের বিভিন্ন রূপান্তরণের পর সৃষ্টি হয় শুক্রবিন্দু। ওই শুক্রবিন্দু পরিণত হয় জমাট রক্তপিণ্ডে। রক্তপিণ্ড থেকে হয় গোশতপিণ্ড। গোশতপিণ্ড থেকে অস্থি। তার উপরে হয় ত্বকের আচ্ছাদন। পরিশেষে তন্মধ্যে ফুৎকার করা হয় আত্মাকে। অবশেষে পরিগঠিত হয় মানুষের জীবন্ত ও পূর্ণ অবয়ব। এ সকলকিছুর মধ্যে রক্তপিণ্ডের অবস্থান প্রায় মাঝামাঝি। এখান থেকে দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় উভয় দিকের।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'পাঠ করো, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত'। এখানে 'ইক্বরা' (পাঠ করো) কথাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্বপ্রদানার্থে, আধিক্য প্রকাশার্থে। প্রথম 'ইক্বরা' ছিলো সাধারণ পাঠের জন্য এবং দ্বিতীয় 'ইক্বরা' প্রচারের নিমিত্ত। অথবা দ্বিতীয় 'ইক্বরা' নামাজে কোরআন পাঠের ইঙ্গিতবহ। অথবা বলা যেতে পারে, প্রথম 'পাঠ করো' ব্যবহৃত হয়েছে অকর্মক ক্রিয়া হিসেবে, যার অর্থ হবে— পাঠক হও। আর এখানকার 'পাঠ করো' কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে প্রথম আয়াতের 'তোমার প্রতিপালকের নামে' কথাটির সঙ্গে। বাক্যটি যোগসূত্রবিহীন একটি নতুন বাক্য হিসেবেও পরিগঠিত। অর্থাৎ রসুল স. যখন বলেছিলেন, আমি তো পাঠক নই, পাঠ করবো কী প্রকারে? এমতো প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে— কোরআন পাঠ করুন 'বিসমিল্লাহ্' সহকারে। এরূপ মর্মার্থ গ্রহণ করা হলে হজরত জিবরাইলের 'পাঠ করো' কথাটির জবাবে রসুল স. এর বাণী 'মা আনা বি ক্বারী' হবে প্রশ্নবোধক। অর্থাৎ আমি কি পাঠক?

'ওয়া রব্বুকাল আকরাম' অর্থ আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। 'ওয়াও' এখানে অবস্থাপ্রকাশক। 'রব্বুকা' (তোমার প্রতিপালক) হচ্ছে উদ্দেশ্য। 'আকরাম' হচ্ছে উদ্দেশ্যের বিশেষণ। 'করীম' অর্থ দানশীল। আর 'আকরাম' অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। কেননা তিনি দান করেন কোনো বিনিময় প্রাপ্তির উদ্দেশ্য ছাড়া নিছক দয়া পরবশ হয়ে, তাঁর বান্দা বাধ্য না অবাধ্য, মুমিন না কাফের, কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ— এ সকলকিছুর পরওয়া না করে। তিনি দান করেন অকাতরে। অবলীলায়। অসংখ্য, অগণিত। অথবা তিনি মাফ করে দেন ক্ষমার যোগ্য অপরাধসমূহকে। কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণযোগ্য পাপের প্রতিশোধও তিনি তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করেন না— সর্বশক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও। বরং অবকাশ দেন পার্থিব সুখসম্ভোগের। বিদ্বানগণ বলেন, 'আফআ'লু' ও 'ফায়িল' শব্দরূপে গঠিত হয়েছে 'আকরাম' ও 'কারীম'। ক্রিয়াগুলো সমঅর্থসম্পন্ন। 'কারীম' মূলত আল্লাহ্পাকের একটি গুণ (সিফাত)। তাঁর সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপের কেউ সমকক্ষ নয়। তাই বুঝতে হবে সৃষ্টির মধ্যে পরিদৃষ্ট 'দয়া' 'মায়া' ইত্যাদি রুপকার্থক, প্রকৃতার্থক নয়। কেননা সৃষ্টি তাঁরই নাম-গুণাবলীর দর্পণ।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন'। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানকার 'তিনি শিক্ষা দিয়েছেন' ক্রিয়াটির কর্মপদ রয়েছে অনুক্ত। আর 'কলমের দ্বারা' কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে ওই অনুক্ত কর্মপদের সঙ্গে। অর্থাৎ বক্তব্যটি দাঁড়াবে 'আ'ল্লামাল খাত্ত্বা বিল ক্বলাম' (আল্লাহ্ কলমের দ্বারা লেখার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন)। কেননা এতে করে আকাশাগত গ্রন্থগুলো লিপিবদ্ধ আকারে সংরক্ষণ করা যাবে। ফলে তা টিকে থাকবে শতাব্দীর পর শতাব্দী। মানুষ জানবে যুগ-যুগান্তরের ইতিবৃত্ত, শরিয়তের বিধি-বিধান। শিক্ষাদানের প্রধান উপকরণ হিসেবে এখানে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে কলমের কথা। ফলে লেখনীর গুরুত্ব বেড়েছে অত্যধিক। কেউ কেউ বলেছেন, নবী ইদ্রিসই সর্বপ্রথম লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে তিনিই প্রথম লেখক।

আমি বলি, এখানকার 'বিল ক্বলাম' (কলমের সাহায্যে) বাক্যটি সম্পৃক্ত হবে 'আল্লামা' (শিক্ষা দিয়েছেন) এর সঙ্গে। অর্থাৎ তিনি কলমের সাহায্যেই জ্ঞান দান করেছেন। কলমের দ্বারা জ্ঞানদান পদ্ধতিই শিক্ষাদানের যাবতীয় পদ্ধতির মধ্যে অগ্রগণ্য। সেকারণে এই পদ্ধতিটিরই উল্লেখ করা হয়েছে আগে। আর এতো হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার অনুপম অনুকম্পা

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না'। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও কর্মশক্তি সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য প্রমাণাদি। নবী-রসুলগণের নিকটে প্রেরণ করেছেন 'ওহী' (প্রত্যাদেশ)। আউলিয়াগণের নিকটে 'ইলহাম' (অনুপ্রেরণা)। সাধারণ ও বিশেষ মেধাসম্পন্নদেরকে দিয়েছেন অভাবনীয় জ্ঞান। সুবিদিত বার্তা সহযোগে দান করেছেন পারস্পরিক অবহিতি। এ সকল সূত্র থেকে মানুষ আহরণ করতে পারে এমন জ্ঞান, যা সে পূর্বে জানতো না।

লক্ষণীয়, ইতোপূর্বের 'আল্লাজী' (যিনি) এবং 'আলআক্রাম' (মহামহিমান্বিত) পদদ্বয়কে যদি 'রব্বুকা' (তোমার প্রভুপালনকর্তা)র বিশেষণ ধরে নেওয়া হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি হবে বিজ্ঞপ্তিমূলক। আর যদি পূর্বোক্ত বাক্যটিকেই বিধেয় ধরে নেওয়া হয়, তাহলে বলতে হয়, এই বাক্যটি তার অনুবর্তী (বদল)। তবে আগের বাক্যে শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে কলমের ব্যবহারের মাধ্যমে, আর এ বাক্যে বলা হয়েছে এমন জ্ঞান দানের কথা, যা কলমের গণ্ডিবহির্ভূত। অর্থাৎ এই জ্ঞান হচ্ছে বিশেষ ধরনের জ্ঞান। এতে করে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে আর একটি জগত থেকে, যা লেখনীর আওতাবহির্ভূত। এরকম বলা হয়েছে একারণে যে, মানুষ জ্বিন ও ফেরেশতাকে জ্ঞান দান করা হয় ওই কলম দ্বারাও, যে কলম সকল কিছুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রেখেছে লওহে মাহফুজে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ নিরস-সরস এমন কিছু নেই যার কথা লওহে মাহফুজের লিপিতে নেই। কিন্তু একথাটিও স্মরণে রাখতে হবে যে, কেবল মানুষকে দেওয়া হয়েছে এরও অধিক কিছু জ্ঞান, যা লওহে মাহফুজের

www.eelm.weebly.com

লিপিতেও নেই। এ জন্যই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আর আল্লাহ্ আদমকে শিখিয়ে দিলেন সকল কিছুর নাম'। বলা বাহুল্য, এই নামগুলো লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ ছিলো না। যদি থাকতো, তবে ফেরেশতাদেরকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা একথা বলতেন না যে 'এ সকল কিছু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই'। অতএব বুঝতে হবে, আল্লাহ্পাকের তত্ত্বজ্ঞান অর্জিতব্য নয়। অর্থাৎ কেবল চেষ্টা করলে তা অর্জন করা যায় না। বরং এই জ্ঞান হচ্ছে সত্তাসঞ্জাত জ্ঞান, যা পরম দয়ালু দাতার অভাবনীয় করুণা। লওহে মাহফুজে এই জ্ঞানের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকতে পারেই না। কলমের সাধ্য নেই যে সে এই জ্ঞান তার লিপিরেখায় আটকে রাখে। বরং কলম তো এই জ্ঞানের একটি শাখা মাত্র। জনৈক কবির কবিতায় বিষয়টি বিধৃত হয়েছে এভাবে— 'এই পৃথিবী ও মহাপৃথিবীর সকল জ্ঞান, কলম আর সুরক্ষিত ফলক, সে তো তোমার মহাজ্ঞানের এক কণা'।

আবার এরকমও বলা যায় যে, 'ওয়া রব্বুকাল আকরাম' বাক্যটি 'ইক্বরা' বাক্যের কর্তৃপদীয় সর্বনামের অবস্থাপ্রকাশক। রসুল স. যখন 'পাঠ করো' কথাটির প্রেক্ষিতে বললেন 'আমি তো পাঠক নই' তখন তাঁকে বলা হলো— আপনি ওই মহামহিম সত্তার শরণ গ্রহণ করে পাঠ করুন, যিনি জ্ঞান দান করেছেন কলমের সাহায্যে। আদম ও অন্যান্য নবীকে এমন জ্ঞান দান করেছেন, যা তাঁরা জানতেন না। তিনিই তাঁর অপার মহিমার বলে আপনাকে পাঠক হতে দিবেন, যদিও আপনি পাঠক নন। মর্মার্থ এমনও হওয়া সম্ভব যে— 'মানুষ' অর্থ এখানে স্বয়ং রসুল স.। তিনি স. বার বার বলতে লাগলেন, আমি পাঠক নই। আর হজরত জিবরাইল বার বার তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন। তিনি স. ক্রমশ হয়ে পড়লেন স্বশক্তিচ্যুত। এভাবে তৃতীয়বার আল্লাহ্পাক আদি-অন্তের জ্ঞান দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিলেন তাঁর হৃদয়াভ্যন্তর। কেননা তিনি তো তাঁর বান্দাগণের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের স্রষ্টা। সেহেতু তিনি অবশ্যই করতে পারেন জ্ঞানবিহীনকে জ্ঞানী এবং অপাঠককে পাঠক। এর পরেই তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর বিশেষ অনুকম্পার কথা। বললেন, 'শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না'। অন্য এক আয়াতেও কথাটি বলা হয়েছে এভাবে 'আপনি যা জানতেন না, তিনি আপনাকে তা জানিয়েছেন'।

একটি সংশয় ঃ জ্ঞান দান করা হয় তো অজানা বিষয়েরই। যা জানা আছে, তার জ্ঞান দান করার বিষয়টি অযৌক্তিক নয় কি? তাহলে এখানকার 'যা সে জানতো না' কথাটির সার্থকতা কী?

সংশয়ভঞ্জন ঃ মানুষ তো মূলত অক্ষম, অসহায়, অজ্ঞ। সুতরাং আত্মগরিমা কি তার সাজে? নিজেকে জ্ঞানহীন ভাবা এবং প্রাপ্ত জ্ঞান যে আল্লাহ্তায়ালার নিছক দয়ার দান— একথা মনে করার মধ্যেই তো রয়েছে তার কৃতজ্ঞতার আভাস। সার্থকতা তো তার এখানেই।

'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে, হজরত জিবরাইল রসুল স. এর কাছে এলেন অনিন্দ্যসুন্দর আকৃতি ধরে। বললেন, মোহাম্মদ! আল্লাহ্ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। আপনাকে তিনি মনোনীত করেছেন জ্বিন ও মানব জাতির

www.eelm.weebly.com

রসুল হিসেবে। 'আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই' এই মহাবাণীর প্রতি আপনি তাদেরকে আমন্ত্রণ জানান। এরপর তিনি মৃত্তিকায় পদাঘাত করলেন। উচ্ছিত হলো ঝর্ণা। ঝর্ণার পানিতে ওজু করলেন তিনি। রসুল স.কেও বললেন তাঁর অনুকরণ করতে। রসুল স.ও তাই করলেন। ওজু শেষে হজরত জিবরাইল রসুল স.কে ডান পাশে নিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন। সম্পন্ন করলেন দুই রাকাত নামাজ। এভাবে তাঁকে নামাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে হজরত জিবরাইল উধাও হয়ে গেলেন দূর অম্বরের ওধারে। রসুল স. বাড়ির পথ ধরলেন। পথের দু'পাশের তরুলতা, পাহাড় তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো— আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লহ। ঘরে ফিরে তিনি স. তাঁর মহাপুণ্যবতী ভার্যাকে খুলে বললেন সব। আহবান জানালেন মহাবাণী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'র প্রতি। সঙ্গে সঙ্গে হৃষ্টচিত্তে তা গ্রহণ করলেন মহাপুণ্যবতী খাদিজা। তিনিও রসুল স. এর কাছ থেকে শিখে নিলেন ওজু ও নামাজ। ওই সময় ফরজ নামাজ ছিলো দুই রাকাতই। পরে যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়, তখন জোহর, আসর ও ইশার নামাজকে করা হয় চার রাকাত, মাগরিবকে তিন রাকাত এবং ফজর রয়ে যায় দুই রাকাতই। আর মুসাফির অবস্থায় চার রাকাত নামাজগুলিকে করা হয় দুই রাকাত।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার আগে অন্য কোনো নামাজ ফরজ ছিলো কিনা সে সম্পর্কে রয়েছে মতপ্রভেদ। কেউ কেউ বলেছেন, তখন ফরজ ছিলো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামাজ। অর্থাৎ ফজর ও আসর। ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. মেরাজের পূর্বেও নামাজ পাঠ করতেন এবং তাঁর অনুসরণে নামাজ পাঠ করতেন সাহাবীগণও। তিনি আরো লিখেছেন, রসুল স. এর প্রথম দায়িত্ব ছিলো আল্লাহ্র এককত্বে বিশ্বাস স্থাপন করবার জন্য আহ্বান। দ্বিতীয় দায়িত্ব ছিলো অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ্র শাস্তির ভীতি প্রদর্শন। এর পরের দায়িত্ব ছিলো নিশীথের নামাজ। সুরা মুয্যাম্মিলের প্রথম দিকে উল্লেখিত নিশিজাগরণ। পরের দিকের আয়াতগুলোতে আবার এই গুরুদায়িত্ব থেকে কিছুটা রেহাই দেওয়া হয়। এরপর যখন তাঁর মেরাজ সংঘটিত হয়, তখন ফরজ করা হয় পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ। সঙ্গে সঙ্গে রহিত হয়ে যায় রাত্রি জাগরণ ও নিশীথের নামাজের অপরিহার্যতা। আর উপরে বর্ণিত হাদিস অনুসারে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বে ফরজ করা হয়েছিলো ওজু।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, আবু জেহেল একবার জনগণকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি কখনো মোহাম্মদকে মাটিতে মাথা ঘষতে দেখেছো (সেজদা করতে দেখেছো)? তারা বললো, হ্যাঁ। সে বললো, আমি যদি তাকে এরকম করতে দেখি, তবে তার মস্তক পদদলিত করবো। ধূলিধূসরিত করবো তার মুখমণ্ডল। তার এমতো অপবচনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াতসমূহ। বলা হয়—

www.eelm.weebly.com

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰىٓ ۙ﴿۶﴾ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ؕ﴿۷﴾ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ
الرُّجْعٰى ؕ﴿۸﴾ اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ۙ﴿۹﴾ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ؕ﴿۱۰﴾ اَرَءَيْتَ
اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۙ﴿۱۱﴾ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ؕ﴿۱۲﴾ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ
وَتَوَلّٰى ؕ﴿۱۳﴾ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ؕ﴿۱۴﴾ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ۬ لَنَسْفَعًۢا
بِالنَّاصِيَةِ ۙ﴿۱۵﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۚ﴿۱۶﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۙ﴿۱۷﴾ سَنَدْعُ
الزَّبَانِيَةَ ۙ﴿۱۸﴾ كَلَّا ؕ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩﴿۱۹﴾

q বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করিয়াই থাকে,
q কারণ সে নিজকে অভাবমুক্ত মনে করে।
q তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত।
q তুমি কি উহাকে দেখিয়াছ, যে বাধা দেয়
q এক বান্দাকে— যখন সে সালাত আদায় করে?
q তুমি লক্ষ্য করিয়াছ কি, যদি সে সৎপথে থাকে
q অথবা তাক্ওয়ার নির্দেশ দেয়,
q তুমি লক্ষ্য করিয়াছ কি যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়,
q তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন?
q সাবধান, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তাহাকে অবশ্যই হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইব, মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরিয়া—
q মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠের কেশগুছ।
q অতএব সে তাহার পার্শ্চরদিগকে আহ্বান করুক!
q আমিও আহ্বান করিব জাহান্নামের প্রহরীদিগকে।
q সাবধান! তুমি উহার অনুসরণ করিও না এবং সিজ্দা কর ও আমার নিকটবর্তী হও।

প্রথমে বলা হয়েছে 'কাল্লা'। এর অর্থ কক্ষণো না। অর্থাৎ যারা মহাসত্যের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে চায়, তারা কখনো সফল হবে না। এভাবে এখানে গতিরোধ করতে চাওয়া হয়েছে আবু জেহেলের অপবচনের, যদিও তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। অথবা 'কাল্লা' অর্থ এখানে— বস্তুত, মূলত। আর 'ইন্নাল ইনসানা লা ইয়াত্বগা' অর্থ মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে। এখানে 'মানুষ'

www.eelm.weebly.com

অর্থ গোটা মানব জাতি হলেও এর প্রকৃত অর্থ হবে মানুষের মধ্যে কিছুসংখ্যক দুরাচার। অর্থাৎ আবু জেহেল ও তার মতো চিরহতভাগ্যরা। অর্থাৎ তাদের মতো হতভাগ্যরা স্বভাবতই সীমালংঘক।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে'। একথার অর্থ— সে নিজেকে বিত্ত-বৈভবের দিক থেকে বেপরোয়া মনে করে বলেই এমন দুর্বিনীত হতে সাহস পায়। বাক্যটির পূর্বে অনুক্ত রয়েছে একটি নিমিত্তপ্রকাশক 'লাম' অব্যয়। অথবা বাক্যটির আগে উহ্য রয়েছে 'ওয়াক্ত' (সময়, কাল) শব্দটি। তার বিত্তসম্পদগুলোই তার চোখে সব সময় ভাসে, এমতাবস্থায় অবাধ্যতা দর্শনের সময়টা বিবেচিত হবে ক্রিয়ার কালাধার হিসেবে। অর্থাৎ সে কারণেই সে উচ্চারণ করতে পারে এরকম অবাধ্যতাপ্রকাশক বাক্য। কিংবা এখানে 'দর্শন' অর্থ হৃদয়ের দর্শন, চোখের দর্শন নয়। অর্থাৎ সে যে সম্পদপতি, ভিতরে ভিতরে সে কথা সে এতোটুকুও বিস্মৃত হয় না। উল্লেখ্য, আবু জেহেল যে সম্পদশালী, সে কথা সে প্রকাশ করতে ভুলতো না। পানাহার, পোশাক পরিচ্ছদ, বাহন সবকিছুতেই সে পার্থক্য বজায় রাখতো সাধারণ জনতার নিকট থেকে।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত'। বাক্যটি শাসনমূলক, ভীতিপ্রদর্শক, যোগসূত্রবিহীন, প্রারম্ভিক এবং একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি ছিলো— এ ধরনের সীমালংঘনকারীদের পরিণাম তাহলে কী? এমতো প্রশ্নের জবাবেই যেনো এখানে বলা হয়েছে— আল্লাহ্র কাছে তো তাদেরকে ফিরে আসতে হবেই। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্যই দিবেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তুমি কি তাকে দেখেছো, যে বাধা দেয় (৯) এক বান্দাকে, যখন সে সালাত আদায় করে' (১০)।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একদিন রসুল স. নামাজ পাঠ শুরু করলেন। আবু জেহেল তাঁকে বাধা দিলো। তখন অবতীর্ণ হলো 'তুমি কি দেখেছো' থেকে 'মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ' পর্যন্ত (আলোচ্য সুরার ৯ থেকে ১৬ সংখ্যক আয়াত)।

এখানে 'তুমি কি দেখেছো' বলে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। প্রশ্নটি স্বীকৃতিসূচক, নিশ্চিতার্থক। উদ্দেশ্য এই যে, সম্বোধিত জন যেনো স্বীকার করেন, হ্যাঁ, তিনি দেখেছেন। অথবা প্রশ্নটি বিস্ময়সূচক, দেখা না দেখার কথা এখানে নেই। দর্শিত বিষয় সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করাই এখানে উদ্দেশ্য। এখানে দেখা অর্থ মনের দেখা, বা মনে রাখা। 'বাধা দেয়' অর্থ আবু জেহেল বাধা দেয়। আর 'এক বান্দা' ও 'সালাত আদায় করে' অর্থ রসুল স. নামাজ পাঠ করেন।

লক্ষণীয়, প্রথমে রসুল স.কে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে 'তুমি কি দেখেছো' বলে এবং পরে তাঁর কথা বলা হয়েছে পরোক্ষভাবে 'এক বান্দাকে, যখন সে সালাত পাঠ করে' বলে। এরকম করা হয়েছে রসুল স. এর দাসত্বের চরম পরাকাষ্ঠা

www.eelm.weebly.com

প্রকাশার্থে। আল্লাহ্‌র দাসত্বের মধ্যেই প্রকাশ পায় মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা। আর দাসত্বের পরম প্রকাশ ঘটতে পারে কেবল নবী-রসুলগণের মধ্যে। রসুল স. হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ দাসত্ব তো প্রকাশ পাবে তাঁর সুমহান স্বভাবেই। তাঁর এই সুমহান স্বভাবকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে এমতো বিশেষ বাকভঙ্গি। আর এভাবে এখানে এই বিষয়টিও প্রমাণ করা হয়েছে যে তাঁর কাজে যারা বাধা দেয়, তারা যে চিরহতভাগা, তা বলাই বাহুল্য।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তুমি লক্ষ্য করেছো কি, যদি সে সৎপথে থাকে (১১) অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়' (১২)। এখানেও 'তুমি কি লক্ষ্য করেছো' বলে পুনর্বার সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কেই। অর্থাৎ হে আমার নবী, আপনি তো জানেনই, যিনি নামাজ পাঠ করেন, তিনি যদি হন সৎপথের পথিক এবং মানুষকে আহ্বান জানান আল্লাহভীরু হতে, তবে তাঁর কাজে যারা বাধা সৃষ্টি করবে, তাদেরকে তো মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হবেই। এর অন্যথা হওয়া সম্ভবই নয়।

এখানে আরো প্রমাণিত হয় যে, আবু জেহেল বাধা দিয়েছিলো দু'টি কাজে— নামাজ পাঠে ও ধর্মপ্রচারে। কিন্তু এর আগের আয়াতে (৯, ১০) বলা হয়েছে কেবল নামাজে বাধা দেওয়ার কথা। পরে দু'টির উল্লেখ করা হবে বলেই আগে একটির উল্লেখকে মনে করা হয়েছে যথেষ্ট। অথবা কেবল নামাজে বাধা সৃষ্টি করার অর্থই নামাজ ও ধর্মপ্রচারের বাধা সৃষ্টি করা। কিংবা 'বান্দাকে বাধা দেয়' অর্থ আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন বান্দার সবকিছুকেই প্রতিহত করতে চায়। আর ওই সময় রসুল স. এর প্রতি দায়িত্ব ছিলো ওই দুইটিই— আল্লাহ্‌র একত্বার্থক বিশ্বাসের প্রচার ও নামাজ পাঠ।

এখানকার 'ইন কানা' (যদি সে) কথাটি শর্তযুক্ত। এর জবাব রয়েছে এখানে অনুক্ত। অর্থাৎ রসুল স. স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হেদায়েতের উপর। তাই তাঁর মহা আহ্বানও প্রতিষ্ঠিত সত্যের উপরে। সুতরাং তাঁর কাজে সে বাধা দেয় কেনো? সে কি জানে না, তাঁর প্রতিপক্ষ যে হবে, তার ধ্বংস অনিবার্য? আর 'আরাআইতা' ক্রিয়ার কর্মপদ থাকে দু'টি। এখানকার শর্তযুক্ত বাক্যটি ওই দু'টি কর্মপদের স্থলাভিষিক্ত। পরের 'আরাআইতা' ক্রিয়ার ব্যাপারটি একই রকম।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তুমি লক্ষ্য করেছো কি, যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় (১৩) তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন' (১৪)? একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনিই বলুন, যে সত্য পথের পথিককে বাধা দেয়, তার প্রতি অসত্যারোপ করে এবং সত্যের আহ্বানের প্রতি হয় বিমুখ, সে কি কখনো আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে? সে তো জানে না, আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা। সুতরাং সে কখনোই তার অপরাধ গোপন করতে পারে না। ফলে মর্মন্তুদ শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে।

প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর মাধ্যমে আবু জেহেল ও তার মতো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি প্রদর্শন করা হয়েছে হুমকি ও ভীতি। আর 'আন্নাল্লহা ইয়ারা' অর্থ নিশ্চয় আল্লাহ্ দেখেন, জানেনও। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক

www.eelm.weebly.com

ভালো করেই জানেন ও দেখেন, কে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী এবং কে সত্যপ্রচারের প্রতিবন্ধক, মিথ্যাআরোপক এবং সত্যবিমুখ। আর এ বিষয়টিও তাঁর অবহিতি ও অবলোকনের অন্তর্ভুক্ত যে, তাঁর এই বিশেষ বান্দা শেষতম, শ্রেষ্ঠতম নবী সতত সত্যাধিষ্ঠিত। আর তিনি মানুষকে নিরন্তর মহাসত্যের দিকে আমন্ত্রণও জানিয়ে চলেছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র অবহিতি ও দর্শনের অবশেষ পরিণতি এই যে, তাঁর প্রিয়তম দাস ও সর্বশেষ বাণীবাহক হবেন পুরস্কৃত এবং তাঁর শত্রু আবু জেহেল ও তার মতো হতভাগারা হবে তিরস্কৃত। যথাক্রমে জান্নাত ও জাহান্নামই হবে তাদের নিজ নিজ আবাসস্থল। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এখানকার 'তুমি লক্ষ্য করেছো কী' কথাটির অর্থ হবে— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি কি জানেন, কী ভয়ানক দুর্গতি হবে আবু জেহেল ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের?

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে পরপর চার বার উল্লেখ করা হয়েছে 'আরাআইতা' (তুমি কি লক্ষ্য করেছো) কথাটি। এর মধ্যে প্রথম তিনবার কথাটি বলা হয়েছে রসুল স.কে সম্বোধন করে। আর শেষ সম্বোধনের লক্ষ্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। এরকম করা হয়েছে এখানে ন্যায়বিচারের নিরীখ প্রতিপালনার্থে। বিচারক যেমন বাদী-বিবাদী দু'জনের দিকেই লক্ষ্য করে কথা বলেন, এখানকার বিষয়টি সেরকম।

শায়েখ জালালউদ্দিন মাহাল্লী বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সম্বোধিত জনকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেছেন, কী বিস্ময়ের কথা! একজন স্বয়ং সত্যাধিষ্ঠিত, অন্যকেও সত্যের দিকে আহ্বান করার কাজে রত, অথচ তার কাজে ও নামাজে আর একজন অনর্থক প্রতিবন্ধকতা রচনা করছে। ভাবছে, এতো বড় অপরাধ করেও সে পার পেয়ে যাবে। অথচ সে জানে না, আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা। সুতরাং তিনি যথাসময়ে তার অপকর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল অবশ্যই দিবেন। এর অন্যথা হওয়া অসম্ভব।

কেউ কেউ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! দেখুন, আমি আবু জেহেলকে সত্যদ্রোহী ও সত্যবিমুখ করে রেখেছি। সে যদি সত্য পথের পথিক হতে চাইতো, তবে তা তার জন্য হতো কতোইনা কল্যাণকর। কিন্তু সে এতো বড় সৌভাগ্যলাভের যোগ্যই নয়। তাই আমি তাকে সত্যাভিমুখী হবার সামর্থ্যই দেইনি। আমি যথাসময়ে তাকে শায়েস্তা করবোই। প্রবেশ করাবো জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। সে তো জানে না, আমি সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। এখানে 'তুমি কি লক্ষ্য করেছো' তিনবার বলে এবং দু'টি শর্তযুক্ত বাক্য 'যে বাধা দেয়' বলে প্রকাশ করা হয়েছে সীমাহীন বিস্ময়।

বায়যাবীর ব্যাখ্যা এরকম— হে আমার একান্ত মনোনীত বাণীবাহক! আপনিই বলুন, এই যে লোকটি অনর্থক আপনার নামাজে বাধা দিচ্ছে, সেটা কি কল্যাণকর কোনো কাজ? সে যে ঘোর প্রতিমাপ্রসক্ত এবং সেই অপবিত্রতার দিকেই সে সকলকে ফিরে যেতে বলে, তা কি যুক্তিযুক্ত, না শোভন? সে তো মিথ্যাকেই সত্য বলে

www.eelm.weebly.com

গ্রহণ করে এবং সত্যকে বলে মিথ্যা। তার কি জানা নেই, তার সৃজয়িতা ও পালয়িতা আল্লাহ্ সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেন? জানেন, কে পথপ্রাপ্ত এবং কে পথভ্রষ্ট? সে কী জানে, তার পরিণতি হবে কতো ভয়ংকর?

বাগবী লিখেছেন, বক্তব্যটি হবে এরকম— হে আমার পরম প্রিয়ভাজন রসুল! দেখুন, আমার বান্দা যখন আমার পরিতোষ কামনায় নামাজে দণ্ডায়মান হয়, তখন তাঁকে বাধা দেয় যে, সে কতোইনা মহাপাতক! আর আমার বান্দা কতোইনা সজ্জন, সুশীল, যিনি নিজে সুপথের পথিক, আবার অন্যকেও আহ্বান জানান সুপথের পথিক হতে। অথচ মহাপাতকটি জানেই না, আল্লাহ্ তার সকল কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করছেন। সুতরাং যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি সে পাবেই।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সাবধান, সে যদি বিরত না হয়, তবে আমি তাকে অবশ্যই হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাবো, মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরে (১৫) মিথ্যাচারী, পাপীদের কেশগুচ্ছ' (১৬)। একথার অর্থ— না, আর তাকে বাড়তে দেওয়া হবে না। সে সংযত না হলে, পুনঃপুনঃ তার মহাপাপের পুনরাবৃত্তি ঘটালে আমি তাকে অবশ্যই ধরে ফেলবো। আমার হুকুমে আমার ফেরেশতারা ওই মিথ্যাচারী ও পাপিষ্ঠের মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে তাকে নিয়ে গিয়ে ফেলবে জাহান্নামের আগুনে।

এখানকার 'কাল্লা লাইল্ লাম ইয়ান্তাহি' (সাবধান! সে যদি বিরত না হয়) কথাটি শাব্দিকভাবে শপথের জবাব এবং অর্থগতভাবে শর্তের পরিণতি। আর তাগিদযুক্ত 'নূন' 'তানভীন' রূপে লেখার রীতিটিও সুপ্রচল। 'সাফউন' অর্থ কোনো বস্তুকে ধরে সজোরে টান দেওয়া। এভাবে এখানকার 'লানাস্ফাআ'ম্' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আমি তাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করবো নরকে। 'আন নাসিয়্যাহ্' অর্থ মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ। আর এখানকার 'কাজিবাহ্ (মিথ্যাবাদী) ও 'খত্বিআহ্' (পাপিষ্ঠ) শব্দদ্বয় 'নাসিয়্যাহ্' (কেশগুচ্ছ) পদের রূপকার্থক বিশেষণ। আর এই 'নাসিয়্যাহ্' আগের বাক্যের 'নাসিয়্যাহ্' এর অনুবর্তী।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'অতএব সে তার পার্শ্বচরদেরকে আহ্বান করুক'।

তিরমিজি ও ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল তিরমিজি কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. একবার কাবাগৃহের প্রাঙ্গণে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। আবু জেহেল এসে বললো, মোহাম্মদ! আমি কি তোমাকে এখানে নামাজ পড়তে নিষেধ করে দেইনি? রসুল স. রাগান্বিত হলেন। বললেন, তুমি নিজেকে কী মনে করো। আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমার বিরুদ্ধে এই পাহাড়-প্রান্তর ভরে দিবো অশ্বারোহী সৈন্য-সামন্ত দিয়ে।

www.eelm.weebly.com

'নাদি ' অর্থ ওই উঁচু স্থান যেখানে গোত্রের লোকেরা সমবেত হয়ে পরামর্শ সভা বসায়। শব্দটির পূর্বে অনুক্ত রয়েছে একটি পদ 'আদল' (সভাসদবর্গ) এভাবে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— ওহে নরপশু! তোমার জাত্যাভিমানে যদি তুমি এতোই মদগর্বিত হও, তবে ডাকো তোমার সকল সহযোগীকে।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'আমিও আহ্বান করবো জাহান্নামের প্রহরীদেরকে'। একথার অর্থ— তোমার দলবলকে যদি তুমি ডেকে আনো, তবে আমিও ডেকে আনবো দোজখের প্রহরীদেরকে, যারা তোমাকে এবং তোমার সকল অনুচর-পার্শ্বচরদেরকে এক সঙ্গে এক মুহূর্তে দোজখে নিক্ষেপ করতে সক্ষম।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'যাবানিয়্যাহ্' অর্থ দোজখের প্রহরীরা অথবা দোজখের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতারা। জুজায বলেছেন, কঠিন চেহারার দুর্দান্ত প্রকৃতির ফেরশতাদেরকে বলা হয় 'যাবানিয়্যাহ্'। 'যাবানিয়্যাহ্' বহুবচন 'যাবান' এর, অর্থ— প্রতিরোধ করা। অর্থাৎ যে কোনো আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম ফেরেশতাবর্গ। বাক্যটিতে একটি শর্ত রয়েছে অনুক্ত।

হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, যদি আবু জেহেল তখন তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে ধরে নিয়ে আসতো, তাহলে ঠিকই দেখতে পেতো জাহান্নামের প্রহরীরা কীভাবে তাদের সকলকে পাকড়াও করে গায়েব করে দেয়। জালালুদ্দিন মাহাল্লী বলেছেন, উক্তিটি সুপরিণত পর্যায়ের।

শেষোক্ত আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— ' সাবধান! তুমি তার অনুসরণ কোরো না এবং সেজদা করো এবং আমার নিকটবর্তী হও'।

এখানে 'কাল্লা' অর্থ না, তা কখনোই না। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যাবানিয়্যা বাহিনীর ভয়ে আবু জেহেল আর তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে জড়ো করার চেষ্টা করবেই না। সুতরাং হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি তাকে এতোটুকুও মান্য করবেন না। একটুও মূল্য দিবেন না তার হুমকির। আপনি নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে আপনার কাজে মনোনিবেশ করুন। নিমগ্ন হোন আপনার প্রিয় নামাজে এবং অধিকতর নৈকট্যলাভ করতে থাকুন কেবল আমার। বাক্যটি যোগসূত্রহীন একটি নতুন বাক্য, রসুল স. এর দিক থেকে একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হচ্ছে হে আমার আল্লাহ্! এই মহাদুর্বৃত্তটির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির বিরুদ্ধে আমার করণীয় কী? এই সম্ভাব্য প্রশ্নটিরই জবাব দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

এখানকার 'সেজদা করো' কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'তুমি তার অনুসরণ কোরো না' বাক্যের সঙ্গে। অর্থাৎ 'সেজদা করো' কথাটিই এই কথাটিকে করেছে অধিকতর বলিষ্ঠ ও বেগবান। আর 'ইক্বতারিব' অর্থ আমার নিকটবর্তী হও। অর্থাৎ সেজদার মাধ্যমে অর্জন করুন আমার অধিকতর আনুরূপ্যবিহীন সামীপ্য। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষ সেজদা অবস্থায় আল্লাহ্‌র অধিক সমীপবর্তী হয়। কাজেই তোমরা সেজদায় পড়ে দোয়া কোরো।

www.eelm.weebly.com

এখানে 'সেজদা করো' কথাটি আদেশসূচক। তাই এই আয়াত পাঠ করলে সেজদা ওয়াজিব হবে। রসুল স.ও এই আয়াত পাঠ করলে সেজদা করতেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন। রসুল স. সুরা ইনশিক্বাক্ব ও সুরা আ'লাক পাঠ করলে সেজদা করতেন।

জমহুরের অভিমত হচ্ছে, এখানকার 'সেজদা করো' কথাটি সম্পর্কযুক্ত যেহেতু 'তুমি তার অনুসরণ কোরো না' কথাটির সঙ্গে, তাই বুঝতে হবে, এখানে 'সেজদা করো' বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নামাজ পাঠের। অর্থাৎ সেজদা অর্থ এখানে নামাজ। অর্থাৎ আংশিকতাই এখানে সামগ্রিকতার্থক। আর রসুল স. এই সুরা পড়ে যে সেজদা করতেন বলা হয়েছে, তাঁর এই আমলখানি হবে সুন্নত, ওয়াজিব নয়। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

সূরা ক্বদর

৫ আয়াতবিশিষ্ট এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহান ও মহিমময় ভূমি মক্কায়।

হজরত ইমাম হাসান থেকে তিরমিজি, হাকেম ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. স্বপ্নে দেখলেন, উমাইয়া গোত্রের লোক তাঁর মিম্বরে সমাসীন। স্বপ্নটি দেখে রসুল স. বিষণ্ন হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো 'নিশ্চয় আমি আপনাকে দান করেছি কাওছার' (সুরা কাওছার) এবং 'নিশ্চয় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে; আর মহিমান্বিত রজনী কী, তুমি কি জানো? মহিমান্বিত রজনী সহস্র রজনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'। অর্থাৎ বনী উমাইয়ার হাজার মাসের শাসন অপেক্ষা একটি কদরের রাত্রি উত্তম। কাসেম ইবনে ফজল হামাদানী বলেছেন, আমি বনী উমাইয়ার শাসনকাল গণনা করে দেখেছি, কম-বেশী ব্যতীত তা এক হাজার মাস। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর। মাযানী ও ইবনে কাছীর বলেছেন, হাদিসবেত্তাগণের নিকট বর্ণনাটি চরমভাবে অস্বীকৃত।

মুজাহিদের উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে আবী হাতেম ও ওয়াহেদী বলেছেন, একবার রসুল স. বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ওই ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন দীর্ঘ এক হাজার মাস ধরে। একথা শুনে সাহাবীগণ বিস্মিত হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো 'নিশ্চয় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি....সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'। অর্থাৎ কদরের একটি রাত্রি বনী ইসরাইলের ওই মুজাহিদের হাজার মাসের জেহাদ অপেক্ষা উত্তম।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, বনী ইসরাইলের এক সাধু পুরুষ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত নামাজ পাঠ করতেন এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যাপৃত থাকতেন জেহাদে। তাঁর এমতো কর্মসূচী নিরবচ্ছিন্ন ছিলো একাধারে এক হাজার মাস। তাঁর ওই সাধনার দিকে ইঙ্গিত করে অবতীর্ণ হয় 'ইন্না আনযাল্নাহু ফী লাইলাতিল ক্বদর.....'।

www.eelm.weebly.com

ইমাম মালেক তাঁর 'মুয়াত্তা'য় লিখেছেন, আমি একজন বিশ্বস্ত বিদ্বানকে বলতে শুনেছি, রসুল স. এর উম্মতের আয়ুষ্কাল হবে সামান্য। তাই পূর্ববর্তী উম্মতের তুলনায় তাদের পুণ্যকর্মের পরিমাণও হবে সামান্যই। যুক্তি অনুসারে এরকম ধারণাই যথার্থ। কিন্তু তা যে যথার্থ নয়, সে কথা জানিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে 'ইন্না আনযালনা....'। অর্থাৎ এই উম্মতের একটি কদরের রাত অন্যান্য উম্মতের হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আমি বলি, সুত্রপ্রবাহের দিক থেকে বর্ণনাটি অপরিণত। তবে এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার যতোগুলো প্রেক্ষিতের কথা জানা যায়, তন্মধ্যে এই বর্ণনাটিই সমধিক শুদ্ধ। আর এই বর্ণনাটির দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, অতি বৈশিষ্ট্যময় কদরের রাত বিশেষভাবে নির্ধারিত কেবল এই উম্মতের জন্য। ইবনে হাবীব মালেকীর ধারণাও এরকম। আর এটাকেই জমহুরের অভিমত বলে চিহ্নিত করেছেন ইমাম শাফেয়ী তাঁর 'আল ইদ্দত' গ্রন্থে। তবে অভিমতটির বিপক্ষে রয়েছে হজরত আবু জরের একটি উক্তি, যা বর্ণনা করেছেন নাসাঈ। উক্তিটি হচ্ছে— আমি একবার রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র প্রেমাষ্পদ! কদরের রাত্রি কি কেবল নবুয়ত ও রেসালাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নবী-রসুলগণের মহাপ্রস্থান ঘটার সাথে সাথে কি কদরের রাত্রির কল্যাণও অন্তর্হিত হয়ে যায়? তিনি স. বললেন, না। বরং তা প্রবহমান থাকে। হাদিসটির ভাষ্যানুসারে শায়েখ ইবনে হাজার মন্তব্য করেছেন, কদরের রাত্রি ছিলো পূর্ববর্তী উম্মতের জন্যও। তিনি আরো মন্তব্য করেছেন, ইমাম মালেকের বিবরণটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। আর ব্যাখ্যাসাপেক্ষ হাদিস কখনো সুস্পষ্ট হাদিসের প্রতিপক্ষে কার্যকর নয়।

আমি বলি, সুপরিণত সূত্রবিশিষ্ট হজরত আবু জরের হাদিসের প্রতিপক্ষে ইমাম মালেক কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটিই অধিক সুস্পষ্ট। হজরত আবু জরের বর্ণনার 'বরং তা প্রবহমান থাকবে' কথাটিই আসলে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কথাটির মর্মার্থ তো এরকমও হতে পারে যে, রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পরে প্রবহমান থাকবে কদর রজনীর কল্যাণ। এমনও তো বলা যায় যে, ওই কল্যাণ কেবল এক বৎসরের জন্য নয়, প্রতি বৎসরের জন্য। আবার এরকম ধারণাকেও নাকচ করা যায় না যে, কদর রজনীর আগমন অসংখ্যবার ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর। লক্ষণীয়, হজরত আবু হোরায়রাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, পৃথিবীর বুক থেকে কি কদরের রাতকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে? তিনি জবাবে বলেছিলেন, না। যে এরকম বলে, সে ভুল বলে। বর্ণনাকারী আরো বলেছেন, আমি স্বয়ং যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি প্রতি রমজান মাসেই কদরের রাত্রি দেখতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

সূরা ক্বদর ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِىۡ لَيۡلَةِ الۡقَدۡرِ ۚ﴿۱﴾ وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِ ؕ﴿۲﴾

www.eelm.weebly.com

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا
بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

r নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি মহিমান্বিত রজনীতে;

r আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জান?

r মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

r সেই রাত্রিতে ফিরিশ্তাগণ ও রূহ্ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাহাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।

r শান্তিই শান্তি, সেই রজনী ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ইন্না আন্যাল্নাহু'। এর অর্থ— নিশ্চয় আমি তা অবতীর্ণ করেছি। অর্থাৎ আমিই অবতীর্ণ করেছি এই কোরআন। কোরআন মজীদের সুবিশাল মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে প্রত্যক্ষভাবে কোরআনের উল্লেখ না করে উল্লেখ করা হয়েছে এর সর্বনাম। শ্রোতৃবৃন্দকে উৎকর্ণ ও অভিভূত করবার উদ্দেশ্যেই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এরকম বাকভঙ্গিমা। অর্থাৎ আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন, নিশ্চয় তা শ্রেষ্ঠ ও মহিমময়। আর তা তো কোরআনের মতোই মহিমান্বিত গ্রন্থ। আবার বক্তব্যটিকে অধিকতর বলিষ্ঠ ও বেগবান করার লক্ষ্যেই এখানে প্রথমে ক্রিয়াবাচক বিধেয় 'আন্যাল্না' (অবতীর্ণ করেছি) এর আগে ব্যবহার করা হয়েছে নিশ্চিতার্থক শব্দ 'ইন্না'। অথবা এরকম করা হয়েছে কর্তার মহানুভবতার দিকে লক্ষ্য রেখে।

এরপর কোরআনপাকের আরো অধিক মাহাত্ম্য প্রকাশার্থে যোগ করা হয়েছে 'ফী লাইলাতিল ক্বদর' (মহিমান্বিত রজনীতে) অর্থাৎ কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার লগ্নটিও মহাআড়ম্বরপূর্ণ, মহান। কেননা সমগ্র বিশ্বজগতের ও মানবসমাজের ঘটিতব্য যাবতীয় ক্রিয়াকর্মও স্থিরীকৃত হয় কদর রজনীতেই। হোসাইন ইবনে ফজলকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেই কি আল্লাহ্পাক সকল ঘটিতব্য বিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে কদরের রাতের অর্থ কী? তিনি বললেন, স্থিরীকৃত বিষয়কে তার নির্ধারিত সময়ের দিকে পরিচালনা এবং নির্ধারিত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন। অর্থাৎ প্রতি আগামী বৎসরের জন্য আল্লাহ্পাক কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়গুলি কদরের রাতেই জানিয়ে দেওয়া হয় নির্বাহী ফেরেশতাদেরকে, যারা ওই ঘটনাগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

ইকরামা বলেছেন, স্থিরকৃত বিষয়গুলোর নির্ধারণ ও যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপনা হয়ে থাকে মধ্য শাবানের রাতে (শবে বরাতে)। তালিকা প্রস্তুত করা হয় মৃত ও জীবিতদের। ওই তালিকার কোনো হেরফের হয় না। ইকরামার উক্তির সমর্থনে উল্লেখ করা যেতে পারে বাগবীর একটি বিবৃতি, যেখানে বলা হয়েছে,

www.eelm.weebly.com

রসুল স. বলেছেন, মধ্য শাবানে পরবর্তী বৎসরের মধ্য শাবান পর্যন্ত দেওয়া হয় মৃত্যুর সিদ্ধান্ত। আরো দেওয়া হয় বিবাহের, জন্মের। এর মধ্যে যে সন্তান অথবা সন্ততি জন্মলাভ করার পর মৃত্যুবরণ করবে, তার নামও থাকে মৃতদের তালিকায়। নাম থাকে তাদেরও, যারা এই সময়ের মধ্যে বিয়ে করার পর মৃত্যুবরণ করবে।

আমি বলি, সম্ভবত নির্ধারিত বিষয়ের ন্যূনতম পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা হয় মধ্য শাবানের রাতে। আর কদরের রাতে নিশ্চিত করা হয় সকল কর্মকাণ্ডের সাধারণ নিষ্পত্তি ও বিস্তারিত ব্যবস্থাপনা। কদরের রাত সম্পর্কে বলা হয়েছে 'প্রতিটি প্রশাসনিক কর্মই সে রাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কদর রজনীতে সারা বৎসরের শুভ-অশুভ, উপজীবিকা, জীবন-মৃত্যু এমনকি হাজীদের হজ সম্পর্কেও অনুলিপি করে দেওয়া হয় লওহে মাহফূজের লিপিবদ্ধ ফলক থেকে।

জুহুরী বলেছেন, 'লাইলাতুল ক্বদর' নামকরণ করা হয়েছে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা অনুসারে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আর আল্লাহ্ যা নির্ণয় করে দিয়েছেন, তা যথাযথ'। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব যে পর্যায়ের, তেমনই তাঁর নির্ণয়নও। আবুদ্ দোহার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মধ্য শাবানের রাতে আল্লাহ্পাক সকল বিধানের সিদ্ধান্ত দেন। আর কদরের রাতে তার তালিকা হস্তান্তর করেন কার্যনির্বাহী ফেরেশতাদের নিকটে। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

'লাইলাতুল ক্বদর' নামকরণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, এই রাতের পুণ্যকর্ম আল্লাহ্পাকের নিকটে হয় অতি আদৃত। এর বিনিময় জোটে সুপ্রতুল। আর কদরের রাতে কোরআন অবতরণের তাৎপর্য প্রসঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাসের সমর্থনপুষ্ট সমাধান হচ্ছে, এই রাতেই সমগ্র কোরআন সুরক্ষিত ফলক থেকে নিয়ে আসা হয় পৃথিবীর নিকটতম আকাশের বাইতুল ইজ্জতে। পরে হজরত জিবরাইল তা কুড়ি বৎসর ধরে অল্প অল্প করে রসুল স. এর কাছে পৌঁছাতে থাকেন।

হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নবী ইব্রাহিমের পুস্তিকাগুলি অবতীর্ণ হয়েছে ৩রা রমজানে। বর্ণনান্তরে ১লা রমজানে। নবী মুসার তওরাত ৬ রমজানে। নবী ঈসার ইঞ্জিল ১৩ রমজানে। নবী দাউদের যবুর ২৮ রমজানে এবং আমার কোরআন ২৪ রমজানে, যখন রমজানের রাত অবশিষ্ট ছিলো মাত্র ৬টি।

হজরত ওয়াইল ইবনে আসকা থেকে আহমদ ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিমের সহিফাগুলি তাঁর উপরে অবতীর্ণ হয়েছিলো পহেলা রমজানে। তওরাত ষষ্ঠ রমজানে। ইঞ্জিল ত্রয়োদশ রমজানে। আর কোরআন চব্বিশে রমজানে। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে মাসউদ, শা'বী, হাসান বসরী এবং কাতাদা। এর সমর্থন পাওয়া যায় হজরত বেলাল কর্তৃক বর্ণিত একটি সুপরিণত শ্রেণীর হাদিসেও, যা বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। হাদিসটি এই— তোমরা

www.eelm.weebly.com

কদরের রাত অনুসন্ধান কোরো রমজানের চব্বিশ তারিখে। হাদিসটির সূত্রপরম্পরাসম্পৃক্ত ইবনে লেহিয়া সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার মন্তব্য করেছেন, তিনি হাদিসটিকে সুপরিণত শ্রেণীর বলে ভুল করেছেন।

বর্ণিত হাদিসগুলো যদি বিশুদ্ধও হয়, তবু একথা প্রমাণিত হয় না যে, প্রতি বছর শবে কদর রমজানের চব্বিশ তারিখেই হয়। বরং এতে করে এটাই জানা যায় যে, যে বৎসর কোরআনপাকের অবতরণ ঘটে, সে বৎসরের শবে কদর ছিলো চব্বিশ তারিখে। হজরত বেলালের উক্তি অনুসারেও ওই বৎসরের শবে কদর ছিলো চব্বিশ তারিখে।

একটি উপযোগ ঃ শবে কদরের তারিখ নির্ণয়নের প্রসঙ্গটি মতপ্রভেদপূর্ণ। এ সম্পর্কে রয়েছে প্রায় চল্লিশটি অভিমত। তবে প্রকৃত কথা হচ্ছে, শবে কদরের আগমন ঘটে প্রতি রমজান মাসের শেষ দশ রাতের যে কোনো এক রাতে। এটাই বর্ণনাবৈষম্য অপনোদনের উত্তম পদ্ধতি। নিম্নে এ সম্পর্কে আরো কয়েকটি হাদিস বর্ণনা করা হলো। হজরত সালমান ফারসী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার শাবান মাসের শেষ তারিখে জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। বললেন, সমবেত জনমণ্ডলী! একটি আশির্বাদপুষ্ট মাস সমাগত। মাসটি অতীব মহিমান্বিত। এ মাসে এমন এক রাত রয়েছে, যে রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। রমজানের মাহাত্ম্য বর্ণনার উদ্দেশ্যে হাদিসটি আমরা ইতোপূর্বে উদ্ধৃত করেছি সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে। তবে রমজান মাস ছাড়াও অন্য মাসে শবে কদর আসে— এই অভিমতটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ইমামশ্রেষ্ঠ আবু হানিফার এরকম একটি মন্তব্য কাযীখান উল্লেখ করেছেন তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ কাযীখানে।

একটি সংশয় ঃ সম্ভবত হজরত সালমান ফারসীর বিবরণটি ওই বৎসরের জন্য প্রযোজ্য, যে বৎসর অবতীর্ণ হয়েছিলো কোরআন মজীদ। অথবা তা প্রযোজ্য হবে তিনি যে বৎসরের কথা বলেছেন, সেই বৎসরের জন্য। সুতরাং তাঁর বিবরণ দ্বারা ওই অভিমতটিকে কীভাবে ভুল প্রমাণ করা যায়, যেখানে বলা হয়েছে, রমজানে যেমন শবে কদরের আগমন ঘটে, তেমনি ঘটে অন্যান্য মাসেও?

সংশয়খণ্ডন ঃ হজরত সালমান ফারসী রমজান মাসের আরো অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এ মাসে রোজা রাখা আল্লাহ্ ফরজ করে দিয়েছেন। আর নফল করে দিয়েছেন রাতের নামাজ। এ মাসের নফল নামাজ অন্য মাসের ফরজ নামাজ তুল্য। আর এ মাসের ফরজ নামাজ অন্য মাসের ফরজ নামাজের চেয়ে সত্তর গুণ অধিক ফযীলতপূর্ণ। এ মাস ধৈর্যের মাস। সহানুভূতি প্রকাশের মাস ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল বৈশিষ্ট্য কোনো নির্দিষ্ট রমজানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সকল রমজানেরই রয়েছে এ সকল বৈশিষ্ট্য। অনুরূপ কদর রাত্রির বৈশিষ্ট্যও কেবল কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাসের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়।

মাতা মহোদয়া আয়েশা বলেছেন, রসুল স. রমজানের শেষ দশদিন এমন কঠোরভাবে ইবাদতে মগ্ন হতেন, যা অন্য সময় হতেন না। মুসলিম। তিনি আরো বলেছেন, যখন রমজানের শেষ দশ দিনের আগমন ঘটতো, তখন তিনি স. কষে

www.eelm.weebly.com

বাঁধতেন তার লুঙ্গি। রাতভর নামাজ আদায় করতেন। পরিবারবর্গকেও জাগাতেন। বোখারী, মুসলিম। তিনি আরো বলেছেন, রসুল স. তাঁর মহা-প্রস্থানের পূর্ব পর্যন্ত রমজানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ পালন করেছেন। আর তাঁর মহা প্রস্থানের পরে ইতেকাফ পালন করতেন তাঁর পত্নীগণ। বোখারী, মুসলিম। মাতা মহোদয়া আরো বলেছেন, রসুল স. রমজানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করতেন। বলতেন, তোমরা রমজানের শেষ দিন শবে কদর অনুসন্ধান কোরো। বোখারী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. প্রথমে রমজানের প্রথম দশ দিন ইতেকাফ পালন করেছিলেন। তারপর পালন করেছিলেন মাঝের দশ দিন। এরপর থেকে পালন করতেন শেষ দশ দিন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, প্রথম ও মাঝের দশ দিন ইতেকাফ করার পর আমার কাছে এক ফেরেশতা এসে বললো, শবে কদর হয় শেষ দশ দিনের মধ্যে। সুতরাং আমি বলি, কেউ যদি শবে কদর পেতে চায়, তবে যেনো সে ইতেকাফ করে রমজানের শেষ দশ দিনে। আমি এ রাত পেয়েছি শেষ দশ দিনের মধ্যে। স্বপ্নেও আমাকে এ রাতকে দেখানো হয়েছে। আমি দেখেছি, সে রাতের সকালে আমি সেজদা করছি কাদা-পানির মধ্যে। এরকম কথা শোনার পর সাহাবীগণ শবে কদর তালাশ করতেন শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে। বর্ণনাকারী বলেন, সে রাতে বৃষ্টি হয়েছিলো। মসজিদের ছাদ ছিলো খেজুর পাতার। তাই বৃষ্টির পানির ফোটা পড়ার পরে মসজিদের মেঝেতে কাদা হয়ে গিয়েছিলো। একুশ তারিখ ভোরে নামাজের শেষে আমি দেখলাম, রসুল স. এর কপালে লেগে রয়েছে কাদা-পানির দাগ। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, লাইলাতুল কদরের অন্বেষণে রসুল স. রমজানের মাঝের দশ দিন ইতেকাফ করেছিলেন। দশদিন শেষ হলে তিনি স. বললেন, তাঁবু গুটিয়ে নাও। তিনি স. লাইলাতুল কদরের সঠিক তারিখ বিস্মৃত হয়েছিলেন। এরপর থেকে তিনি স. শেষ দশ দিন ইতেকাফ করতে শুরু করেন এবং বলেন, আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিলো শবে কদরের সঠিক তারিখ। আমি তা তোমাদেরকে জানানোর জন্য যখন বাইরে এলাম, তখন হঠাৎ আমার কাছে আগমন করলো দু'জন লোক। শয়তানও ছিলো তাদের সঙ্গে। তাই আমি শবে কদরের সঠিক তারিখ ভুলে গেলাম। এখন থেকে তোমরা রমজানের শেষ দশ তারিখের মধ্যে শবে কদর তালাশ করতে থাকো। বিশেষভাবে তালাশ কোরো শেষ দশদিনের পঞ্চম, সপ্তম ও নবম রাতে। বর্ণনাকারী হজরত আবু সাঈদ খুদরীর নিকট জানতে চাইলেন, গণনাবিদ্যায় তো আপনি অগ্রণী। তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তা অবশ্য ঠিক। এ ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে অধিক পারঙ্গম। তারপর বললেন, শোনো, নবম, সপ্তম ও পঞ্চম মানে কী? একুশ তারিখের রাত্রি অতিবাহিত হলে আসবে বাইশ তারিখ। বাইশের পর তেইশ। এই তেইশ তারিখের রাতই রমজানের শেষ নবম রাত্রি। এর একদিন পর পর আসে সপ্তম ও পঞ্চম। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আবু দাউদ ও তায়ালাসী বর্ণনা করেছেন, শবে কদর অনুষ্ঠিত হয় রমজানের চব্বিশ তারিখ দিবাগত রাতে।

www.eelm.weebly.com

সুপরিণত সূত্রে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, শবে কদর আমাকে দেখানো হয়েছে স্বপ্নে। এর পর আমি তা ভুলে গিয়েছি। ওই রাতের ভোরে দেখলাম আমি সেজদা করছি কাদা-পানিতে। বর্ণনাকারী বলেন, বৃষ্টি হয়েছিলো ২৩ তারিখ দিবাগত রাতে। ভোরে রসুল স. আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পাঠ করলেন। নামাজ শেষে তিনি স. আমাদের দিকে মুখ ফেরালেন। আমরা দেখলাম তাঁর ললাটদেশে লেগে রয়েছে কাদা-পানির চিহ্ন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে একটি নির্দিষ্ট তারিখ জানিয়ে দিন, যেদিন আমি আপনার মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হবো। তিনি স. বললেন, তেইশ তারিখের পরে এসো। অন্য এক সূত্রে এসেছে, বর্ণনাকারী বলেন, আমি একুশ তারিখ ভোরে শবে কদর সম্পর্কে রসুল স. এর কাছে জানতে চাইলাম। বললাম, কদরের রাত কি বাইশ তারিখের রাত? তিনি স. বললেন, ওই রাত, অথবা তার পূর্বের রাত।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কদরের রাত চায়, সে যেনো তা অনুসন্ধান করে সাতাশ তারিখের রাতে। আহমদ, ইবনে মুনজির। হজরত জাবের ইবনে সামুরা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন তিবরানীও।

হজরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কদরের রাত্রি হয় সাতাশ তারিখে। যে সকল হাদিসে সাতাশ তারিখের কথা আছে, সেগুলোর সঙ্গে এই হাদিসটিও বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ এবং তা সমর্থন করেছেন ইমাম আহমদ। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এরকম। হজরত উবাই ইবনে কা'বও ছিলেন এই অভিমতটির প্রবক্তা এবং তিনি এ সম্পর্কে শপথও করেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আবুল মুনজির! কিসের উপর ভিত্তি করে আপনি এরকম বলছেন? তিনি বলেছিলেন, পূর্বাভাসের উপরে, যে পূর্বাভাস আমাকে দিয়েছিলেন রসুল স. স্বয়ং। পূর্বাভাসটি হচ্ছে, ওই দিন সূর্যোদয় ঘটবে প্রখর কিরণ ব্যতিরেকে। মুসলিম।

হজরত ওমর, হজরত হুজায়ফা ও অন্যান্য সাহাবী থেকে ইবনে আবী শায়বাও এরকম বর্ণনা করেছেন। আবার এমতো উক্তির পোষকতা রয়েছে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসেও, যেখানে তিনি বলেছেন, আমরা একবার নিজেদের মধ্যে কদরের রাত্রি সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় সেখানে রসুল স. উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি স্মরণ আছে ওই সময়ের কথা, যখন চাঁদ উদিত হয়েছিলো কাস্তের আকৃতিতে? আবুল হাসার ফারসী বলেছেন, একথার অর্থ— চাঁদের কৃষ্ণপক্ষের সাতাশ তারিখের রাত্রি। কেননা ওই রাতে চাঁদের আকৃতি এমনই হয়। এরপর পর চাঁদ হয়ে যায় অদৃশ্য। কিন্তু প্রমাণটি সবল নয়। কেননা ইতোপূর্বের হাদিসে বলা হয়েছে, সে রাতের ভোরে সূর্যকিরণ হয় অপ্রখর। তেমনি রাতের চাঁদ হয় নিষ্প্রভ। এর কারণ চাঁদের মাস পূরণ হওয়া নয়। বরং এর কারণ ভিন্নতর। তবে এ সকল হাদিসের দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, কখনো কখনো কদররাত্রির আগমন ঘটে সাতাশ তারিখেও। তার মানে আবার এটাও নয় যে, কেবল সাতাশ তারিখের রাত্রিই কদরের রাত্রি।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, এক লোক কদর রাত্রির সাক্ষাত পেলো সাতাশ তারিখে। রসুল স. বললেন, আমি চান্দ্রমাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে তোমাদের স্বপ্নের বাস্তবতা লক্ষ্য করেছি। সুতরাং তোমরা শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোতে তার অনুসন্ধান কোরো। মুসলিম। সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে ওমর থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সাতাশ তারিখের রাতে কদরের অন্বেষণ করা উচিত। আবদুর রাজ্জাক। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। অর্থাৎ বিশ তারিখের পরে সাতাশ তারিখের রাত। হজরত নোমান ইবনে বশীর থেকেও সুপরিণত সূত্রে এসেছে অতিক্রমণশীল সাতাশ তারিখের রাতের কথা। আহমদ। আবার হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও সুপরিণত সূত্রে এসেছে, কদর রজনীর আগমন ঘটে রমজান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে, সাতাশ তারিখে।

ভিন্নতর সূত্রে বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, কদর রজনী অন্বেষণ কোরো রমজান মাসের শেষ দশ দিনের পঁচিশ ও সাতাশের রাতে। হজরত উবাদা ইবনে সামেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আমাদেরকে কদর রাত্রির সঠিক তারিখ জানানোর জন্য আসছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো দু'জন লোকের। শয়তানও ছিলো তাদের সঙ্গী। সে কারণে রসুল স. সঠিক তারিখের কথা ভুলে গেলেন। পরে আমাদেরকে বললেন, মনে হয় আমার ভুলে যাওয়ার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। তোমরা কদর অন্বেষণ কোরো রমজানের তেইশ, পঁচিশ, অথবা সাতাশের রাতে।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা কদর রাতের অন্বেষণ কোরো একুশ, পঁচিশ ও সাতাশ তারিখের রাতে। অথবা শেষ তারিখের রাতে। হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকেও এরকম বর্ণনা করেছেন তিরমিজি ও আহমদ।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, জনৈক সাহাবী একবার স্বপ্নে দেখলেন, কদর রাত্রি হয় রমজানের শেষ সাত তারিখের যে কোনো এক রাতে। রসুল স. তাঁর কথা শুনে বললেন, আমার ধারণাও তাই। সুতরাং যে কদরের রাত চায়, সে যেনো তা তালাশ করে রমজানের শেষ বেজোড় রজনীগুলিতে। বোখারী, মুসলিম। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, কিছুসংখ্যক লোককে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিলো, কদর রাত্রি হয় রমজানের শেষ দশ রাতে। আবার কিছুলোক দেখেন, রমজানের শেষ সপ্তাহের মধ্যেই রয়েছে লাইলাতুল কদর। রসুল স. তাদের কথা শুনে সিদ্ধান্ত দেন, তোমরা কদর অনুসন্ধান কোরো রমজানের শেষ সপ্তাহের রাতগুলোতে।

সুপরিণত সূত্রে হজরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যদি তোমরা বিপর্যস্ত হও, রাত্রি জাগরণে হও অক্ষম, তবু রমজানের শেষ সপ্তাহের রাতগুলোতে বসে থেকো না। নামাজে দাঁড়িয়ে যেয়ো। আহমদ।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সুপরিণত সূত্রসহযোগে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা রমজানের শেষ দশ রাতের মধ্যে কদর অন্বেষণ কোরো, দেহ যদি তোমাদের অবাধ্য হয়, তবুও। বর্ণিত হাদিসসমূহ দৃষ্টে একথাই

www.eelm.weebly.com

প্রতীয়মান হয় যে, কদর রাত্রির উপস্থিতি ঘটে রমজানের শেষ দশদিনের মধ্যে। কখনো একুশের রাতে, যেমন বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক। কখনো তেইশের রাতে, যেমন সাব্যস্ত হয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের বিবরণ দ্বারা। কখনো চব্বিশের রাতে, যেমন প্রত্যয়িত হয়েছে কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হওয়ার রাত হিসেবে। কখনো সাতাশের রাতে, যেমন নিদর্শন অবলম্বন করে সনাক্ত করতে পেরেছিলেন হজরত উবাই ইবনে কা'ব। আবার এমন প্রমাণিত হয়েছে যে, কদরের উপস্থিতি ঘটে বাইশ, চব্বিশ, আটাশ, উনত্রিশ ও তিরিশের রাতে। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল ক্বদর' (আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জানো)। এখানে 'মা' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে দু'বার। অস্বীকৃতিজ্ঞাপক হিসেবে। আর দু'বারই এরকম করা হয়েছে কদর রজনীর বিস্ময়কর মাহাত্ম্য প্রকাশার্থে। অর্থাৎ কদর রাত্রির মাহাত্ম্য অতুলনীয়।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'। একথার অর্থ— এই এক রাতের ইবাদতের প্রতিফল অন্য সময়ের হাজার রাতের প্রতিফল অপেক্ষা অধিক। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, যে বিশ্বাসবান পুণ্যসঞ্চয়ের মানসে কদর রজনীতে নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয়, আল্লাহ্ মার্জনা করে দেন তার পূর্বকৃত সকল পাপ। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, সে যদি নামাজে দাঁড়িয়ে যায়, আর যদি প্রকৃতই সে রাতে উপস্থিতি ঘটে লাইলাতুল কদরের। হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি মাঝরাতে জেগে উঠে নামাজে দণ্ডায়মান হয়, আর ওই রাত যদি হয় কদরের রাত, তবে তার ভাগ্যে জোটে ক্ষমা।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'সেই রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে'। রূহ সম্পর্কে ইতোপূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আর এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে কদর রাত্রির আর একটি ফযীলত। অথবা উল্লেখ করা হয়েছে কদর রাত্রির মহিমান্বিত হওয়ার আর একটি কারণ। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের অনুমতিক্রমে এই রাতে ধূলির ধরণীতে আকাশ থেকে নেমে আসে রূহ সহ অগণিত ফেরেশতা। একারণেই এই রাতটি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কদরের রাতে জিবরাইল ফেরেশতা তার বিশাল বাহিনী নিয়ে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করেন। অবলোকন করেন ওই সকল ব্যক্তির কার্যকলাপ, যারা জিকির, তেলাওয়াত ও ইবাদতে মগ্ন এবং মানুষের জন্য আল্লাহ্র সমীপে করেন ক্ষমাপ্রার্থনা।

শেষোক্ত আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'শান্তিই শান্তি, সেই রজনী ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত'। এখানকার 'সালাম' (শান্তি) পদটি একটি অনুক্ত উদ্দেশ্যের বিধেয়। অর্থাৎ বিষয়টি শান্তিময়, প্রশান্তিপ্রদায়ক। অথবা যাবতীয় বিপদাপদের

www.eelm.weebly.com

রক্ষাকবচ। আর ‘আমরিন সালাম’ এর ‘আমর’ অর্থ— ওই অনাবিল আনন্দের ফল্গুধারা, যা আল্লাহ্ পাক সে রাতে প্রবাহিত করে দেন বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীগণের হৃদয়ে।

‘হিয়া হাত্তা মাত্বলাই’ল ফাজ্বরি’ অর্থ সেই রজনী ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত। অর্থাৎ কদর রজনী স্থায়িত্ব লাভ করে ঊষার উদয়কাল পর্যন্ত। এখানে ‘হিয়া’ (সেই) হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং ‘ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত’ হচ্ছে বিধেয়। বলা বাহুল্য, প্রতিটি রাতই স্থায়ী হয় ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত। তাই কদর রাত সম্পর্কে এরকম বলা অর্থহীন। তাই কথাটির মর্মার্থ হবে— কদর রাতে রূহ ও ফেরেশতাগণের আগমন ও তাদের শুভাশিস বর্ষণের বৈশিষ্ট্য প্রবহমান থাকে ফজরের নামাজের সময় হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। অথবা বলা যেতে পারে ‘হিয়া’ এখানে উদ্দেশ্য এবং এর অগ্রবর্তী বিধেয় হচ্ছে ‘সালাম’। এখানকার অগ্রবর্তী বিধেয়টি সীমিতার্থক। আর এর পরবর্তী পুরো বাক্যটি ‘লাইলাতুল ক্বদর’এর দ্বিতীয় বিধেয়। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কদরের নিশীথ শুধু শান্তি আর শান্তি, পরিপূর্ণরূপে শান্তিময়। মঙ্গল আর মঙ্গল; একেবারে মঙ্গলময়— অমঙ্গলের লেশমাত্র এ রাতে নেই।

জুহাক বলেছেন, আল্লাহ্পাক এ রাতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন অশান্তি ও অমঙ্গলের পরিকল্পনা। অজস্র ধারায় বর্ষণ করেন কেবল মঙ্গল-বারি। শয়তানও এ রাতে করতে পারে না কোনো প্রকার অনিষ্ট। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ‘শান্তিই শান্তি’ অর্থ এ রাতে ফেরেশতারা বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীগণকে অধিক হারে অভিবাদন প্রদান করতে থাকে। অর্থাৎ তারা শান্তিসম্ভাষণে মুখর ও পরিপূর্ণ করে রাখে সারা রাত।

একটি উপযোগ ঃ কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, কদর রজনীতে পৃথিবীর সকল কিছুই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়। নূরে নূরে ভরপুর হয়ে যায় বিশ্ব চরাচর। আর সারারাত ধরে ফেরেশতারা জানাতে থাকে শান্তিসম্ভাষণ। আমি বলি, এ সকল কিছু উদ্ভাসিত হয় কিছুসংখ্যক সাধকের আত্মিক দৃষ্টিতে। সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে এ সকলকিছু ধরা পড়ে না। আর পুণ্যপ্রাপ্তির জন্য এরকম আত্মিক উদ্ভাসন অত্যাবশ্যকও নয়। যদি অত্যাবশ্যক হতো, তবে সকল সাহাবী, তাবেয়ী ও আউলিয়াগণ এরকম দেখতেন। তবে কদরের রাত ইবাদতের সঙ্গে অতিবাহিত করা অত্যাবশ্যক। কেননা হাদিসে কদরের রাতে নামাজ পাঠকারীদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার শুভসংবাদ জানানো হয়েছে।

প্রবিধান ঃ যে ব্যক্তি কদরের রাতে ইশা ও ফজর জামাতের সাথে আদায় করে, সে পুণ্য লাভ করে কদর রজনীর। আর যে ব্যক্তি রাতে আরো অধিক ইবাদত করে, সে লাভ করে আরো অধিক পুণ্য। হজরত ওসমান গনি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করে, সে যেনো ইবাদত করে অর্ধরাত্রি ব্যাপী। এরপর যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে নামাজ পাঠ করে ফজরের, সে যেনো ইবাদত করে কাটায় সারা রাত। মুসলিম। কদরের

www.eelm.weebly.com

রাতে এই দোয়া অধিক পরিমাণে পাঠ করা মোস্তাহাব ‘আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ’ফউন তুহিব্বুল আ’ফওয়া ফা’ফু আন্নী’ (হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমা করতে ভালোবাসো। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও)। জননী আয়েশা বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কদর রজনীতে আমি কী করবো? তিনি স. বললেন, এই দোয়া পাঠ কোরো ‘আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ’ফউন তুহিববুল আ’ফওয়া ফা’ফু আন্নী’। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

সূরা বায়্যিনাহ

পরম পুণ্যময় ভূমি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এর মধ্যে রয়েছে ৮টি আয়াত।

সূরা বায়্যিনাহ ঃ আয়াত ১—৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ
حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿۱﴾ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿۲﴾
فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿۳﴾ وَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ
مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿۴﴾ وَ مَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ
الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ
الْقَيِّمَةِ ﴿۵﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ
جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿۶﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿۷﴾ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ﴿۸﴾

www.eelm.weebly.com

q কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা এবং মুশরিকরা আপন মতে অবিচলিত ছিল যে পর্যন্ত না তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসিল—

q আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এক রাসূল, যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ,

q যাহাতে আছে সঠিক বিধান।

q যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা তো বিভক্ত হইল তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর।

q তাহারা তো আদিষ্ট হইয়াছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদত করিতে এবং সালাত কায়েম করিতে ও যাকাত দিতে, ইহাই সঠিক দীন।

q কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরী করে তাহারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে; উহারাই সৃষ্টির অধম।

q যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

q তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাহাদের পুরস্কার— স্থায়ী জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহাতে সন্তুষ্ট। ইহা তাহার জন্য, যে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— শেষতম রসুলের মহাআবির্ভাবের আগে ইহুদী, খৃষ্টান ও অংশীবাদীরা নিমগ্ন ছিলো ঘোর অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতায়। ইহুদী-খৃষ্টানেরা আল্লাহ্‌র পুত্র বলতো নবী ওযায়ের ও নবী ঈসাকে। আর অংশীবাদীরা করতো প্রতিমা ও আগুনের উপসনা। এরপর মহাগ্রন্থ আল কোরআন নিয়ে আবির্ভূত হলেন সর্বশেষ রসুল। তিনি তাদেরকে কোরআন পাঠ করে শোনাতে লাগলেন, যার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে শরিয়তের নির্ভুল বিধান।

এখানে ভবিষ্যতকালের শব্দরূপ ব্যবহার করা হলেও অর্থ হবে অতীতকালবোধক। 'আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এক রসুল' বাক্যটি আগের বাক্যের 'সুস্পষ্ট প্রমাণ এলো' কথাটির অনুবর্তী। 'ইয়াতলু সুহুফান' অর্থ যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ। বাক্যটি 'রসুল' পদের বিশেষণ। অর্থাৎ তিনি অক্ষরের অমুখাপেক্ষী, তাই অক্ষরপরিচয়ের প্রচলিত বিদ্যা ব্যতিরেকেই আবৃত্তি করতে পারেন আকাশজ গ্রন্থ। 'মুত্বাহ্‌হারা' অর্থ পবিত্র। অর্থাৎ ওই গ্রন্থ, যা অনুপযুক্ততা ও শয়তানের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, পুতঃপবিত্র। অথবা পুতঃপবিত্র যাবতীয় ভ্রান্ত মতবাদের স্পর্শ থেকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'যার সম্মুখ ও পশ্চাৎ থেকে ভ্রান্ত কিছু আসতে পারেই না'। কিংবা পুতঃপবিত্র ওজুবিহীন, ঋতুবতী ইত্যাদির অপবিত্র স্পর্শ থেকে। যেমন আল্লাহ্‌পাক বলেছেন 'পবিত্রগণ ব্যতীত একে কেউ স্পর্শ করবে না'। আর 'ফী হা কুতুবুন ক্বয়্যিমাহ্' অর্থ যাতে আছে সঠিক বিধান। অর্থাৎ যারা পথান্বেষী, তাদের জন্য এই কোরআনে রয়েছে নির্ভুল পথের দিক নির্দেশনা, সঠিক শরিয়ত।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিলো, তারা তো বিভক্ত হলো তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর'। একথার অর্থ— ইহুদী-খৃষ্টানেরা ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট ছিলো বলেই তাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব-বিবাদ বাঁধতো না। দ্বন্দ্ব দেখা দিলো তখন, যখন আবির্ভূত হলেন মহানবী মোহাম্মদ স.। অথচ তার জন্য তারা অপেক্ষা করতো। যুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করতো তাঁর অসিলা দিয়ে। কিন্তু তিনি যখন কোরআনসহ আবির্ভূত হলেন, আহ্বান জানালেন বিশুদ্ধ বিশ্বাসের দিকে, তখনই তাদের মধ্যে শুরু হলো বিবাদ। শুভমনোবৃত্তিসম্পন্ন যারা, তারা গ্রহণ করলো তাঁর আহ্বানকে। আর অন্যান্যরা পোষণ করতে লাগলো চরম বিদ্বেষ, যেহেতু তিনি স. তাদের মতো বনী ইসরাইল বংশদ্ভূত ছিলেন না, ছিলেন বনী ইসমাইল সম্প্রদায়ের। এটাই ছিলো তাদের হিংসা-বিদ্বেষের কারণ। আল্লাহ্র সুস্পষ্ট কিতাবই এভাবে তাদেরকে ইমানদার ও কাফের এই দুই দলে ভাগ করে দিলো। প্রকৃত কথা হচ্ছে, আল্লাহ্পাকের গুণবত্তা (সিফাত) সম্পর্কে গ্রন্থধারীদের মধ্যে ছিলো চরম এক জটিলতা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্তায়ালার সত্তা ও গুণবত্তার (জাত ও সিফাতের) অবিভাজ্য এককত্ব ও আনুরূপ্যবিহীনতা সম্পর্কে সঠিক ধারণাই রাখতো। কিন্তু এ সম্পর্কে তাদের অধিকাংশের ধারণাই ছিলো বিকৃত ও অংশীবাদিতাদুষ্ট। তারা বলতো, আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টজগতের পিতা। কিন্তু রসুল স. এর আবির্ভাবের অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে তাদের মনেও কোনো দ্বিধা-সংশয় ছিলো না, যেহেতু তাদের গ্রন্থে ছিলো রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর সবিস্তার বিবরণ। কিন্তু অংশীবাদীদের এ সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিলো না। কেননা তাদের কাছে ছিলো না কোনো আকাশজ গ্রন্থ। সেকারণেই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে কেবল গ্রন্থধারীদের প্রসঙ্গ, যাতে করে রসুল স. এর প্রতি তাদের অস্বীকৃতির বিষয়টি প্রতিভাত হয় অধিকতর স্পষ্টরূপে।

বাগবী লিখেছেন, কিছুসংখ্যক আলেম বলেন, প্রথম আয়াতের 'মুনফাক্কিনা' শব্দটির অর্থ ধ্বংসশীল। অর্থাৎ 'আপন মতে অবিচলিত ছিলো' অর্থ হবে এখানে— তারা ছিলো ধ্বংসের মধ্যে। যেমন আরবী প্রবাদে বলা হয় 'ইনফাককা সদরুল মারআ'তি ইন দান উইললাদাত' (সন্তান প্রসব কালে ফেটে গ্যাছে রমনীর বক্ষদেশ, যা আর জোড়াও লাগেনি, ফলে, সে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে)। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের আগে গ্রন্থধারীরা ধ্বংসের মধ্যে থাকলেও শাস্তিযোগ্য ছিলো না। কেননা আল্লাহ্পাকের চিরাচরিত রীতি এই যে, নবী-রসুল প্রেরণ না করে তিনি কোনো জাতিকে শাস্তি দেন না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি কোনো সম্প্রদায়কে শাস্তি দেই না, যতোক্ষণ না প্রেরণ করি রসুল'।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিলো আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্টভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে, জাকাত দিতে, এটাই সঠিক দ্বীন'।

www.eelm.weebly.com

এখানকার 'লিইয়া'বুদু' (ইবাদত করতে) কথাটির 'লাম' অব্যয়টি অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। আর এর স্থলে ধরে নিতে হবে একটি অনুক্ত অব্যয় 'আন' (যেনো)। অর্থাৎ 'আইঁ ইয়া'বুদুল্লহ্' (যেনো তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে)। কথাটি এখানকার 'উমিরু' (আদিষ্ট হয়েছিলো) পদের আদেশ-ক্রিয়ার কর্মপদ। অথবা 'লাম' অব্যয়টি এখানে নিমিত্তপ্রকাশক। আর কর্মপদই এখানে রয়েছে অনুক্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আদিষ্ট হয়েছিলো তারা একারণেই যে, তাতে করে তারা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে। অর্থাৎ শেষতম রসুলের বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে যে সকল কথা তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিলো, সেগুলো ছিলো তাদের জন্য প্রভুত কল্যাণের আকর। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের বিশুদ্ধ বিশ্বাসকে ধরে রাখতে পারলো না। হয়ে গেলো মতোবিরোধাক্রান্ত। আশ্চর্য! আর এখানকার 'মুখলিসীনা লাহুদ্ দীন' (এটাই সঠিক দীন) বাক্যটি 'ইবাদত করতে' বাক্যের 'তাঁর' সর্বনামের অবস্থাপ্রকাশক।

'হুনাফা' অর্থ একনিষ্ঠভাবে, যাবতীয় অযথার্থ ধর্মমতসমূহের প্রতি বিমুখ হয়ে, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। এই পদটিও সমার্থবোধক অবস্থাপ্রকাশক। আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ প্রসঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তওরাত-ইঞ্জিল গ্রন্থে তাদেরকে এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছিলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র অংশীবিহীন এককত্বে অবিচল আস্থা রেখে বিশুদ্ধচিত্তে ইবাদত করো কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষ কামনায়। সময়মতো সম্পাদন করো ফরজ নামাজ। আদায় করো জাকাত। উল্লেখ্য, এখানকার 'সালাত' ও জাকাত' সম্পর্কযুক্ত হবে 'ইবাদত করতে' কথাটির সঙ্গে।

'আর এটাই সঠিক দীন' অর্থ শেষতম রসুলের ধর্মাদর্শে যে সকল বিধি-বিধানের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে, সে সকলকিছুই ছিলো পূর্ববর্তী যুগের নবী রসুল ও পুণ্যবানগণের ধর্ম। আর এমতো ধর্মমতকে মান্য করতেন বলেই তাঁরা সকলেই ছিলেন সরল সঠিক পথের অভিযাত্রী। নজর ইবনে শুমাইল বলেছেন, একবার 'দ্বীনুল ক্বয়্যিমা' (সঠিক ধর্ম) সম্পর্কে খলিল ইবনে আহমদকে প্রশ্ন করা হলো। তিনি উত্তরে বললেন, 'ক্বয়্যিমুন' 'ক্বয়্যিমাতুন' ও 'ক্বয়িমুন' সমঅর্থসম্পন্ন। অর্থাৎ এটাই ছিলো সেই সঠিক তওহীদভিত্তিক ধর্মাদর্শ, যার উপর তাঁরা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অথবা— সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাবলীনির্ভর ধর্মমত এটাই। অর্থাৎ ওই বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহে এই ধর্মের বাণীমালাই লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিবিবর্জিত। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— এটাই সত্য ধর্ম, সহজ সরল শরিয়তের পথ।

বাগবী লিখেছেন, এখানকার 'দ্বীন' ও 'আল ক্বয়্যিমাহ্' পৃথক দু'টি শব্দ। সেজন্যই শব্দ দু'টোকে এখানে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। আর 'আল ক্বয়্যিমাহ্' পদে স্ত্রীলিঙ্গবাচকতার সংযোজনের মূলে রয়েছে একটি অনুক্ত বিশেষ্য পদ 'আল মিল্লাত'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— 'জালিকা দীনুল মিল্লাতুন ক্বয়্যিমাহ্' (এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মাধিকারীদের ধর্ম)।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে, তারা এবং মুশরিকেরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, তারাই সৃষ্টির অধম'। একথার অর্থ— গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তারা (ইহুদী-খৃষ্টান) এবং অংশীবাদীরা (পৌত্তলিক-অগ্নিপূজকেরা) সকলেই চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে নরকাভ্যন্তরে। এখানকার 'কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে, তারা এবং মুশরিকেরা' বাক্যটি 'ইন্‌না' (নিশ্চয়) অব্যয়ের নামপদ, অথবা উদ্দেশ্য। আর 'অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে' বাক্যটি হচ্ছে এর বিধেয়। অর্থাৎ তারা হবে নরকের স্থায়ী বাসিন্দা। আর এখানকার 'উলায়িকা হুম শাররুল বারিয়্যাহ' অর্থ তারাই সৃষ্টির অধম। অর্থাৎ তারা শূকর-কুকুর ইত্যাদি নিকৃষ্ট জীব অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ'। অর্থাৎ ইমানদার ও সৎকর্মশীলেরা সমগ্র সৃষ্টি, এমনকি নিষ্পাপ ফেরেশতা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। এই আয়াতের মাধ্যমে অনেকে প্রমাণ করেন যে, বিশেষ মর্যাদার মানুষ বিশেষ মর্যাদার ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম। আর পাপী ইমানদারদের পাপসমূহকে যখন ক্ষমা করে দেওয়া হবে, অথবা শাস্তিদানের মাধ্যমে শুদ্ধ করে নেওয়া হবে, তখন তাদেরকেও মিলিয়ে দেওয়া হবে পুণ্যবান ইমানদারগণের সঙ্গে। এভাবে তারাও প্রবেশ করবে জান্নাতে।

শেষোক্ত আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'তাদের প্রতিপালকের নিকটে আছে তাদের পুরস্কার— স্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে'।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে দেওয়া হয়েছে কয়েকটি সুসংবাদ—১. ইমানদারেরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ২. তাদের পুণ্যকর্মের জন্য তাদেরকে করা হবে পুরস্কৃত ৩. ওই পুরস্কার রয়েছে আল্লাহ্র অধিকারে, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন ৪. তাদেরকে যে জান্নাত দান করবেন, তা হবে চিরস্থায়ী ৫. ওই জান্নাতের নিম্নদেশে প্রবহমান থাকবে স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী ৬. 'জান্নাতু আদনিন' বলে এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, ওই জান্নাত কোনো সাধারণ ও নশ্বর প্রমোদোদ্যান নয়। বরং তা অদৃষ্টপূর্ব ও চিরস্থায়ী ৭. আল্লাহ্ তাদের প্রতি থাকবেন সতত প্রসন্ন, তেমনি তারাও থাকবে আল্লাহ্র প্রতি সদাসন্তুষ্ট। শেষে বলা হয়েছে 'জালিকা লিমান খশিয়া রব্বাহ্'। একথার অর্থ— এ সকল অনুগ্রহসম্ভারের অধিকারী হতে পারবে তারাই, যারা আল্লাহ্কে ভয় করবে এবং তাঁর প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাস রেখে জীবন যাপন করবে তাঁর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞানুসারে।

'রদ্বিয়াল্লহু আ'নহুম' অর্থ আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্পাকের এই প্রসন্নতাই হবে তাঁর সকল অনুগ্রহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তখন বলবেন, হে

www.eelm.weebly.com

জান্নাতবাসীরা! তারা জবাবে বলবে, হে আমাদের প্রিয়তম প্রভুপালয়িতা! এইতো আমরা। সকল কল্যাণ তো তোমারই আনুরূপ্যবিহীন অধিকারে। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি প্রসন্ন? তারা বলবে, কেনো নয়? তুমি তো আমাদেরকে দিয়েছো শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহসম্ভার, যা আর কাউকেই দাওনি। আল্লাহ্ বলবেন, এর চেয়েও অধিক অনুগ্রহ কি আমি তোমাদেরকে দান করবো না? তারা বলবে, এর চেয়েও উচ্চতর অনুগ্রহ আছে কি? আল্লাহ্ বলবেন, হ্যাঁ। আর তা হচ্ছে আমার পরম প্রসন্নতা। সেই অনুগ্রহই আজ তোমাদেরকে দিলাম। আর কখনো আমি তোমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হবো না। বোখারী, মুসলিম।

আমি বলি, জান্নাতবাসীদের 'তুমি তো আমাদেরকে দিয়েছো শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ সম্ভার, যা আর কাউকে দাওনি' কথাটির অর্থ হবে— যা তুমি দাওনি ফেরেশতাদেরকেও। কেননা এমতোক্ষেত্রে জাহান্নামীদের সঙ্গে জান্নাতবাসীরা তো তুলনীয় হতে পারেনই না।

'ওয়া রাদ্বু আনহু' অর্থ তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট। অর্থাৎ জান্নাতবাসীরাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট।

বাগবী লিখেছেন, জান্নাতবাসীদের সন্তুষ্টি হতে পারে দু'রকমের— ১. 'রিদ্বা' (সন্তুষ্টি) শব্দটির পরে যদি উল্লেখ করা হয় 'বা' (সঙ্গ) অব্যয়, তবে অর্থ দাঁড়ায়— সম্মতি, স্বীকৃতি। যেমন 'রদ্বিয়াবিহী' অর্থাৎ তিনি যে বিশ্বজগতের একমাত্র প্রভুপালক, পরিচালক— সে বিষয়ে তারা জানায় সম্মতি, প্রদান করে স্বীকৃতি ২. আর শব্দটির পরে যদি উল্লেখ থাকে 'আন' (হতে, থেকে) অব্যয়ের, তবে তার অর্থ হয়— সন্তুষ্টি, পরিতুষ্টি। যেমন 'রদ্বিয়া আনহু' অর্থাৎ তারা তাঁর ব্যবস্থাপনায়, প্রতিপালনে ও প্রতিদানে সন্তুষ্ট।

বিষয়টি আমি আরো একটু পরিষ্কার করে দিতে চাই এভাবে— দ্বিতীয় প্রকারের পরিতুষ্টি হতে পারে কয়েক ধরনের— ১. আল্লাহ্‌পাকের সুষ্ঠু ও প্রাজ্ঞ ব্যবস্থাপনা তাঁরা মেনে নেয় নির্বিবাদে, বিনা বাক্য ব্যয়ে। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা জন্মে, আল্লাহ্ চিরমঙ্গলময়। তিনি যা কিছু করেন, তার সবকিছুই কল্যাণকর, তা তাঁদের মনঃপুত হোক, অথবা না হোক। তাঁরা এমতো বিশ্বাসও রাখে যে, আল্লাহ্‌পাকের অভিপ্রায় ছাড়া কোনো কিছু হওয়া সম্ভবও নয়। এমনকি কুফরী ও পাপকর্মও। তবুও অবিশ্বাস ও পাপের জন্য অভিযুক্ত হতে হয় বান্দাকেই। কেননা আল্লাহ্‌পাক সকলকিছুর স্রষ্টা হলেও বান্দা নির্মাতা ও অর্জনকারী। এভাবেই তারা অবিশ্বাস ও পাপের সঙ্গে যুক্ত এবং শাস্তির যোগ্য। এভাবে বিশ্বাসী পুণ্যবানেরাও তাদের কর্মের নির্মাতা ও অর্জনকারী, কদাচ স্রষ্টা নয়। তবে যারা কাফের ও গোনাহ্‌গার তারা কখনোই এরকম ভাবতে পারে না যে, যেহেতু তাঁর অভিপ্রায়েই আমরা অবিশ্বাসী ও পাপী তাই অবিশ্বাস ও পাপের প্রতি, বরং এদু'টোর স্রষ্টার প্রতি আমরা পরিতুষ্ট। কেননা আল্লাহ্ পুণ্য-পাপ দু'টোরই স্রষ্টা হলেও পাপের ও পাপীর প্রতি তিনি অপরিতুষ্ট এবং পরিতুষ্ট পুণ্যের ও পুণ্যবানের প্রতি। এমতো

www.eelm.weebly.com

পরিতুষ্টির অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয় জ্ঞান-বিবেক ও দলিল প্রমাণের দ্বারাও। জ্ঞানীগণ যখন লক্ষ্য করেন, আল্লাহ্পাকই সকলকিছুর একক অধিকর্তা, তখন সকলকিছুকেই তিনি পরিচালনা করবেন তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে। এ ব্যাপারে তিনি অবশ্যই হবেন সতত স্বাধীন। তাঁর অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি-অনুযোগ-অভিযোগ খাটবেই না। জ্ঞানীগণ এ-ও বোঝেন যে, আল্লাহ্পাক মহাপ্রজ্ঞাময়। তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তই প্রজ্ঞামণ্ডিত। কাজেই তাঁরা অনুকূল-প্রতিকূল সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি থাকেন পরিতুষ্ট। বিশ্বাস করেন, প্রবৃত্তির দ্রোহ এবং ধর্মীয় দুর্বলতার মধ্যেই লুকানো থাকে অবিশ্বাস ও পাপের বীজ। আর অবিশ্বাস ও পাপ অবশ্যই আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি উদ্রেককারী। প্রখ্যাত সুফী-সাধক সররি সাকতি এমতো পরিতুষ্টির প্রতি লক্ষ্য করেই বলেছেন, তুমি যদি তাঁর প্রতি তুষ্টই না থাকো, তবে তাঁর পরিতুষ্টির আশা করবে কীভাবে?

পরিতুষ্টির দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে— বান্দা অনুরাগী হবে তাঁর প্রভুপালনকর্তার যাবতীয় ইচ্ছার, যদিও তা হয় তার প্রবৃত্তির বিপরীত। আল্লাহ্প্রেম তো হওয়া উচিত স্বভাবজ। প্রেমাষ্পদের প্রতি সদামুগ্ধ থাকাই তো প্রেমিকদের স্বভাব। প্রেমাষ্পদের প্রতিটি কার্যকলাপই প্রেমিকগণের দৃষ্টিতে হয় চিত্তাকর্ষক, সুন্দর। তাই প্রেমিকেরা তাদের প্রেমাষ্পদের পক্ষ থেকে আঘাত সুখ-দুঃখ সকলকিছুর প্রতিই হয় অনুরাগী। প্রেমের নিয়মই এরকম। তাই জনৈক কবি বলেছেন, তুমি যদি আমার বিরহ-যাতনাতেই তুষ্ট হও, তবে আমি তাতেই তুষ্ট।

তৃতীয় প্রকারের পরিতুষ্টির ব্যাখ্যা এরকম— মানুষ যখন আশা-আকাংখার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে পরিতৃপ্ত হয়, তখন আল্লাহ্ই তার পরিতোষ কামনা করেন। যেমন সুরা দুহায় বলা হয়েছে 'অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে'। এই আয়াতখানি যখন অবতীর্ণ হয়, তখন রসুল স. বলেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত আমার একজন উম্মত জাহান্নামে থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হবো না।

'জালিকা লিমান খশিয়া রব্বাহ্' অর্থ এটা তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের পরম প্রসন্নতা পেয়ে পরিতুষ্ট হতে পারবে ওই ব্যক্তি, যে ভয় করবে আল্লাহ্কে। উল্লেখ্য, আল্লাহ্ভীতিই সকল সৎকর্মের উৎস এবং সকল অশুভ কর্মের প্রতিবন্ধক।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার উবাই ইবনে কা'বকে বললেন, আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেনো তোমার সম্মুখে কোরআন তেলাওয়াত করি। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে— আমি যেনো তোমাকে সুরা বায়্যিনাহ্ পাঠ করে শোনাই। উবাই বললেন, আল্লাহ্ কি আমার নামোচ্চারণ করেছেন? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। উবাই বললেন, মহাবিশ্বের মহাপ্রভুপালয়িতা কি আমারই নাম বলেছেন! রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। একথা শুনে উবাই অঝোর ধারায় কাঁদতে শুরু করলেন। বোখারী, মুসলিম।

আমি বলি, হজরত উবাই ইবনে কা'বের এমতো অবস্থা ছিলো প্রেমের সর্বোচ্চ স্তরের।

www.eelm.weebly.com

সূরা যিল্‌যাল

৮ আয়াতসম্বলিত এই সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যতীর্থ মদীনায়।
সূরা যিল্‌যাল ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○
اِذَا زُلۡزِلَتِ الۡاَرۡضُ زِلۡزَالَهَا ۙ﴿۱﴾ وَ اَخۡرَجَتِ الۡاَرۡضُ اَثۡقَالَهَا ۙ﴿۲﴾
وَ قَالَ الۡاِنۡسَانُ مَا لَهَا ۚ﴿۳﴾ یَوۡمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخۡبَارَهَا ۙ﴿۴﴾ بِاَنَّ رَبَّكَ
اَوۡحٰی لَهَا ؕ﴿۵﴾ یَوۡمَئِذٍ یَّصۡدُرُ النَّاسُ اَشۡتَاتًا ۬ۙ لِّیُرَوۡا اَعۡمَالَهُمۡ ؕ﴿۶﴾
فَمَنۡ یَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَیۡرًا یَّرَهٗ ؕ﴿۷﴾ وَ مَنۡ یَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا یَّرَهٗ ﴿۸﴾

---

r পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হইবে,
r এবং পৃথিবী যখন তাহার ভার বাহির করিয়া দিবে,
r এবং মানুষ বলিবে, 'ইহার কী হইল?'
r সেই দিন পৃথিবী তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবে,
r কারণ তোমার প্রতিপালক তাহাকে আদেশ করিবেন,
r সেই দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বাহির হইবে, যাহাতে উহাদিগকে উহাদের কৃতকর্ম দেখান যায়,
r কেহ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করিলে সে তাহা দেখিবে
r এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করিলে সে তাহাও দেখিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ইজা যুলযিলাতিল আরদ্বু যিল্‌যালাহা'। এর অর্থ পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের দিন পৃথিবী ভয়ংকরভাবে কাঁপতে শুরু করবে, যে রকম কম্পন তার উপযুক্ত। অথবা— পৃথিবী তখন প্রবলভাবে আলোড়িত হতে থাকবে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নৈসর্গিক নিয়মে। কিংবা— যতোখানি আলোড়িত হওয়া তার পক্ষে উপযুক্ত, ততোখানিই তখন আলোড়িত হবে এই ধরিত্রী। বা— এ ভূপৃষ্ঠের জন্য যতোখানি প্রবল আলোড়ন নির্ধারণ করা হয়েছে, ততোখানিই তখন আলোড়িত হবে সে।

ইবনে আবী হাতেমের বিবরণে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই আলোড়ন সৃষ্টি হবে পৃথিবীর নিম্নতম স্তর থেকে। তবে প্রকম্পনকালের সময়সীমা সম্পর্কে বিদ্বানগণ মতানৈক্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ওই প্রকম্পন শুরু

www.eelm.weebly.com

হবে শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের আগে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, প্রকম্পন শুরু হবে দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে, পুনরুত্থানের সময়। প্রথমোক্ত মতের প্রবক্তা শায়েখ ইবনে আরাবী ও তাঁর সমমতাবলম্বীগণ। তাঁদের দলিল হচ্ছে এই আয়াত 'যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন স্তন্যদায়িনী মাতা বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে। গর্ভপাত ঘটবে গর্ভবতীদের। আর তুমি দেখতে পাবে, মানুষেরা যেনো মাতাল......'। শেষোক্ত মতের প্রবক্তাদের প্রমাণ হচ্ছে এই আয়াত। এমতাবস্থায় এই আয়াতের প্রকৃতার্থ গ্রহণ না করে গ্রহণ করতে হবে রূপকার্থ। তাঁরা তাঁদের দাবির সমর্থনে আরো উপস্থাপন করেন হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত ও প্রত্যয়িত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, আমরা কয়েকজন রসুল স. এর পাশে ছিলাম যখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ভয় করো তোমাদের প্রভুপালনকর্তাকে। নিশ্চয় মহাপ্রলয়ের প্রকম্পন হবে অতি ভয়াবহ। সেদিন তোমরা দেখতে পাবে, স্তন্যদায়িনী মাতা ভুলে গিয়েছে তার দুগ্ধপানরত শিশুকে, গর্ভপাত ঘটেছে গর্ভিনীদের। আর তুমি মানুষকে দেখতে পাবে মাতাল সদৃশ.....'। রসুল স. বললেন, তোমরা কি জানো, ওই দিন হবে কোন দিন? যেদিন আল্লাহ্ পিতা আদমকে বলবেন, তোমার বংশধরদের মধ্য থেকে দোজখীদের অংশ পৃথক করে ফেলো।

হাদিসটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, প্রতিফল দিবসে আল্লাহ্ নবী আদমকে ডেকে বলবেন, ওঠো! তোমার বংশধরদের মধ্য থেকে দোজখের অংশ বের করে দাও। তিনি নিবেদন করবেন, হে আমার প্রভুপালক! দোজখের অংশ কতো? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি সহস্রে নয়শত নিরানব্বই জন। এরূপ নির্দেশ শুনে তখন ভয়ে-আতংকে বালকেরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। গর্ভপাত ঘটে যাবে গর্ভবতীদের। আর তোমাদেরকে দেখা যাবে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের মতো, অথচ তোমরা নেশাগ্রস্ত হবে না। এরকম হবে তোমরা শাস্তির ভয়াবহতা দেখে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তাহলে ওই প্রতি হাজারের একজন হবে কারা? তিনি স. বললেন, ইয়াজুজ-মাজুজদের মধ্য থেকে একহাজার এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন। অন্যান্য জাতির মধ্যে তোমরা হবে শাদা বলদের চামড়ার পশমের মধ্যে একটি কালো পশমের মতো। অথবা কালো ষাঁড়ের চামড়ার একটি শাদা পশম।

দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে পৃথিবী প্রকম্পিত হবে যারা বলেন, তাদের অভিমত অভ্রান্ত নয়। আর তাঁরা তাঁদের অভিমতের পক্ষে যে হাদিস উপস্থাপন করেন, তার দ্বারাও তা প্রমাণিত হয় না যে, প্রকম্পনের ঘটনা ঘটবে তখন, যখন হজরত আদমকে দেওয়া হবে দোজখীদের অংশ বের করার নির্দেশ। তবে এতোটুকু প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া যায় যে, তখনও পৃথিবী প্রকম্পিত হবে এবং ওই প্রকম্পনের পরেই হজরত আদমকে দেওয়া হবে কথিত নির্দেশ। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে, রসুল স. প্রথম কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় কম্পনের কথাও

www.eelm.weebly.com

আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমার মতে বোখারী-মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটির এরকম ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হবে না। কেননা সেখানে স্পষ্ট করেই একথা বলা হয়েছে যে, দোজখীদের অংশ বের করার নির্দেশ ঘোষিত হওয়ার সময়েই বালক বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং গর্ভবতীদের ঘটবে গর্ভপাত। বরং আমি মনে করি, প্রকম্পনের ঘটনা ঘটবে কয়েকবার। তার মধ্যে একবার মহাপ্রলয়ের নিদর্শন হিসেবে এবং আর একবার পুনরুত্থানের পর। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'এবং পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দিবে'। এখানে 'পৃথিবী তার ভার বের করে দিবে' কথাটি বলা হয়েছে রূপকভাবে। আসলে আল্লাহ্পাকই তখন পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত সকলকিছু বের করে দিবেন। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন পৃথিবী তার অভ্যন্তরে সমাহিত সকল লাশ বের করে দিবে। ফারিয়াবী বলেছেন, মুজাহিদের অভিমতও এরকম। এই ব্যাখ্যাটিকে মান্য করলে বলতে হয়, এরকম ঘটবে দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে।

আতিয়ার ব্যাখ্যাসূত্রে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, ভূমি তার অভ্যন্তরে রক্ষিত ধনভাণ্ডার বাইরে নিক্ষেপ করবে। সুতরাং এখানকার 'ভার' অর্থ ভূমধ্যস্থিত খনিজ সম্পদ। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ভূমি তখন তার কলিজার টুকরা সোনা-রূপা উগলে বের করে দিবে। একজন হত্যাকারী এসব দেখে বলবে, এগুলোর জন্যই তো আমি মানুষ খুন করতাম। একজন আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী বলবে, আমি তো আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতাম এসবের কারণেই। তস্কর বলবে, আমি তো অপহরণ করতাম এগুলোই। আর আমার হস্তও কর্তন করা হয়েছিলো এজন্য। কিন্তু ওগুলো গ্রহণ করার প্রবৃত্তি আর তখন কারো থাকবে না। মুসলিম।

সুপরিণত সূত্রসহযোগে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেই সময় আসন্ন, যখন সর্বোত্তম স্বর্ণ বহির্গত হবে ফোরাতের তীর থেকে। কিন্তু তখন পথচারীরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করবে না। মুসলিমের বর্ণনায় আরো এসেছে— সেদিন ততোক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতোক্ষণ না দৃষ্টিগোচর হবে ফোরাত নদী থেকে উত্থিত স্বর্ণের পাহাড়। তা হস্তগত করার জন্য জনতা লিপ্ত হবে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। নিহত হবে শতকরা নিরানব্বই জন। সবশেষে একজন বেঁচে থাকবে। বলবে, সম্ভবত আমিই একমাত্র জীবিত। আমি বলি, প্রথমেই শুরু হবে হত্যাকাণ্ড। শেষে ওই সম্পদ আর কারো ভাগ্যেই জুটবে না।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং মানুষ বলবে, এর কী হলো'? একথার অর্থ— ভূমির কম্পন ও উদগীরণ দেখে তখন মানুষ বলবে, কী সংঘাতিক কাণ্ড! কী ভয়ংকর ভূকম্পন!

www.eelm.weebly.com

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে 'মানুষ' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। কেননা তারা পুনরুত্থান দিবসকে বিশ্বাস করতো না। তাই তারা নিজেদেরকে পুনরুত্থিত হতে দেখে বলবে, কী অবাক কাণ্ড! এ কী হচ্ছে! আর বিশ্বাসীগণ তখন বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্পাক এই দিবসেরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর তাঁর মহান প্রেরিত পুরুষগণও একথা প্রচার করেছিলেন।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'সেইদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে'। বাগবী লিখেছেন, এখানকার ৩ ও ৪ সংখ্যক আয়াতের মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ লক্ষণীয়। মূলে যেনো বক্তব্যটি ছিলো এরকম— সেদিন পৃথিবী বর্ণনা করবে তার উপর সংঘটিত ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে। আর মানুষ বলবে, আরে পৃথিবীটার হলো কী! এতো দেখছি সবকিছু উন্মোচন করে দিচ্ছে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আলোচ্য আয়াত পাঠ করার পর বললেন, তোমরা কি জানো, তখন ভূমি কী বর্ণনা করবে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই অধিক অবগত। তিনি স. বললেন, ভূমি তখন পৃথিবীর সকল নর-নারীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করবে। বলবে, অমুক ব্যক্তি আমার উপরে এরূপ এরূপ কাজ করেছিলো। হাদিসটি বর্ণনা ও প্রত্যয়ন করেছেন তিরমিজিও। হজরত রবীয়া হারাছীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মৃত্তিকার সঙ্গে তোমরা সদাচরণ কোরো। কেননা মৃত্তিকা তোমাদের মাতা। তার উপরে তোমরা যা-ই কিছু করো না কেনো, সেই বৃত্তান্ত সে বর্ণনা করবেই। তিবরানী আরো বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদও এরকম বলেছেন।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন'। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এখানকার 'বি আন্না' পদের 'বা' অব্যয়টি নৈমিত্তিক। আর 'লাহা' শব্দের 'লা' (জন্য) অব্যয়টি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইলা' (প্রতি) অর্থে। অর্থাৎ পৃথিবী তখন একারণেই তার বৃত্তান্ত প্রকাশ করবে যে, সে আল্লাহ্র নিকট থেকে এ সম্পর্কে লাভ করবে ইঙ্গিত বা আদেশ। বাক্যটি পূর্বের আয়াতের বক্তব্যের অনুবর্তী, অথবা জবাব। অর্থাৎ মানুষ যখন বলবে 'এ কী হলো' তখন তার জবাবে পৃথিবী বলবে, আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে আমাকে এরকমই আদেশ করা হয়েছে যে, আমি আমার অস্তিত্ব জুড়ে সৃষ্টি করবো প্রকম্পন এবং আমার ভিতরের সকলকিছু নিক্ষেপ করবো বাইরে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'সেইদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়'। অর্থাৎ সেদিন হিসাব নিকাশ গ্রহণের পর মানুষ প্রত্যাবর্তন করবে পৃথক পৃথক দলে। কেউ যাবে ডানে জান্নাতের দিকে এবং কেউ বামে জাহান্নামের দিকে।

হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়' কথাটির অর্থ করেছেন— তাদেরকে তখন দেখানো হবে তাদের কৃতকর্মের ফলাফলরূপে স্বস্তি অথবা শাস্তি।

www.eelm.weebly.com

উল্লেখ্য, এখানে ‘তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়’ কথাটি বলা হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে। এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে এভাবে— ‘কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে (৭) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে, সে তা-ও দেখবে’ (৮)।

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের উদ্ধৃতি সহযোগে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, যখন ‘আল্লাহ্‌কে ভালোবেসে যারা আহার করায় পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত ও বন্দীকে’ এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন সাহাবীগণের কেউ কেউ ধারণা করলেন, যৎসামান্য কিছু আল্লাহ্‌র পথে দান করলে হয়তোবা সওয়াব পাওয়া যাবে না। আবার কারো কারো মনে এরকম ধারণারও উদয় হলো যে, ছোটখাট বিষয়ে মিথ্যা কথা বলায়, অথবা নর-নারীর প্রতি দুই চারবার দৃষ্টিপাত করায় হয়তোবা পাপ নেই। এগুলোর জন্য কোনো শাস্তিও হবে না। শাস্তি প্রয়োগ করা হবে তো কেবল বৃহৎ বৃহৎ পাপের জন্য। এরূপ অপধারণা অপনোদনার্থেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য সুরার শেষোক্ত আয়াতদ্বয়।

‘কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে’ অর্থ যদি কেউ ক্ষুদ্র পিপীলিকাবৎ অথবা ততোধিক ক্ষুদ্র সৎকর্মও করে, তবুও ওই সৎকর্মের প্রতিফল তাকে দেওয়া হবে আখেরাতে। অর্থাৎ তাকে তখন সম্মুখীন করা হবে ওই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৎকর্মের প্রতিদানের। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির দ্বারা বিশ্বাসীদেরকে সৎকর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে চরমভাবে। যেনো বলা হয়েছে, তোমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৎকর্মের সুযোগও হস্তচ্যুত কোরো না। কেননা তা পরকালে হতে পারে অনেক বড় বিনিময়প্রাপ্তির নিমিত্ত। রসুল স. বলেছেন, কেউ তার পবিত্র উপার্জন থেকে অর্ধেকটি খেজুর দান করলেও আল্লাহ্ তা গ্রহণ করেন এবং তাকে বৃদ্ধি করতে থাকেন। ফলে তা বৃদ্ধি হতে হতে হয়ে যায় পর্বত সদৃশ। যেমন তোমাদের দ্বারা প্রতিপালিত গোশাবক কালক্রমে ধারণ করে বিশাল আকৃতি। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু জর গিফারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কল্যাণকর সামান্য কর্মকেও তোমরা তুচ্ছ জ্ঞান কোরো না। যেমন প্রফুল্ল বদনে ভ্রাতাদের সঙ্গে সাক্ষাত। মুসলিম। আলোচ্য আয়াতের মর্মবাণী মুতাজিলাদের বিপক্ষে এবং আহলে সুন্নত জামাতের পক্ষে। কেননা সুন্নত জামাতের অভিমত হচ্ছে, বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা বড় বড় পাপে পাপী, তারা দোজখে গেলেও চিরকাল সেখানে থাকবে না। পাপমোচনের পর নিষ্কৃতি পাবে এবং অবশেষে প্রবেশ করবে বেহেশতে। পথভ্রষ্ট মুতাজিলারা বলে এর বিপরীত। আল্লাহ্‌পাকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যবাস্তবায়নব্য। আর তিনি তো এখানে স্পষ্ট করে বলেই দিয়েছেন যে— অণু পরিমাণ পুণ্যকর্মের প্রতিদানও তিনি দিবেন। তবে এমতো প্রতিদান পাবে কেবল ইমানদারেরা। কেননা ইমানই সকল প্রকার পুণ্যকর্মের ভিত্তি। সুতরাং ইমানদারেরা পাপের শাস্তি ভোগ করলেও পুণ্যের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে না। আর পুণ্যের প্রকৃত প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত। অভিমতটি ঐকমত্যসম্মত। তাছাড়া

www.eelm.weebly.com

রসুল স. এর সুমহান বাণীও এর সমার্থক। হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার হৃদয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি অণু পরিমাণ বিশ্বাসও লালন করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করলেও অবশেষে সেখান থেকে বের হয়ে আসবে।

হজরত ওসমান গনি থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই' এই বিশ্বাস বুকে নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে যাবে। হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে শিরিক নিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে, সে জাহান্নামে যাবে। আর শিরিকবিমুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীরা যাবে জান্নাতে।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তর থেকে সাক্ষ্য দিবে 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর প্রেরিত রসুল' তার জন্য দোজখ নিষিদ্ধ। হাদিসটি বোখারী-মুসলিম কর্তৃক সংকলিত হয়েছে হজরত আনাস ও হজরত উতবান ইবনে মালেক থেকে, হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর সূত্রে এবং মুসলিমের নিকট পৌঁছেছে হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যাদের অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ইমান বিদ্যমান, তারা দোজখে প্রবেশ করবে না। অর্থাৎ তার জন্য চিরস্থায়ী দোজখবাস হারাম। হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমায় বিশ্বাসী হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে প্রবেশ করবে জান্নাতে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! যদি সে চোর ও ব্যভিচারী হয়, তবুও কি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আমি পুনঃ পুনঃ আরো দু'বার একই প্রশ্ন করলাম। তিনিও একই জবাব দিলেন। শেষে বললেন, হ্যাঁ, তবুও, আবু জরের নাসিকা ধূলিধূসরিত হলেও (তুমি তা পছন্দ না করলেও)। আহমদ, বাযযার এবং তিবরানীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, এ প্রসঙ্গের হাদিসগুলো সুবিদিত পর্যায়ের চেয়েও অধিক সুবিদিত।

একটি সংশয় ঃ আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য সাধারণার্থক। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে কেবল অণু পরিমাণ পুণ্য ও পাপের প্রতিদানপ্রাপ্তির কথা। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর পার্থক্য তো এখানে করাই হয়নি। তাহলে কেনো একথা বলা হবে যে, অবিশ্বাসীরা চিরকাল দোজখে থাকবে?

সংশয়-নিরসন ঃ অবিশ্বাসীরা তাদের পুণ্যকর্মের বিনিময় পাবে না। কেননা পুণ্যকর্ম গৃহীত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো বিশ্বাস ও বিশুদ্ধ নিয়ত, যা ইমান ছাড়া সম্ভবই নয়। রসুল স. বলেছেন, আমলের প্রতিফলপ্রাপ্তি নিয়ত বা বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বুঝতে হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পুণ্যকর্ম ওজুবিহীন নামাজের মতো। আর কে না জানে, ওজু ছাড়া নামাজ হয় না। বরং এরকম কাজ নামাজের প্রতি উপহাস ছাড়া অন্য কিছু নয়। একারণেই বিদ্বানগণ বলেছেন, কেউ যদি কাফের অবস্থায় নামাজ-রোজা-ইতেকাফ পালনের মানত

www.eelm.weebly.com

করে, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেলেও তার ওই মানত পূরণ করা অত্যাবশ্যক হবে না। কেননা তার তখনকার নামাজ-রোজা-ইতেকাফ ধর্তব্যই নয়। তাই বুঝতে হবে, কাফেরদের পুণ্যকর্ম মরীচিকা সদৃশ, যা দৃশ্যত পানি বলে মনে হলেও মূলতঃ অস্তিত্বহীন।

শেষে বলা হয়েছে— 'কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলেও সে তা-ও দেখবে'। শিরিক ছাড়া অন্যান্য পাপ যে তওবার মাধ্যমে অথবা তওবা ছাড়াও মার্জনা করা হয়, সে কথা আমরা ইতোপূর্বে বলেছি। সুতরাং এখানকার 'অসৎকর্ম' অর্থ হবে— বিশ্বাসীগণের সাধারণ পাপ। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা দিবেন শাস্তি'— এই আয়াতও প্রযোজ্য হবে কেবল ইমানদারদের ক্ষেত্রে। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'পথভ্রষ্টরা ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহ্র করুণা থেকে নিরাশ হয় না'। অন্য আর এক আয়াতে নির্দেশ এসেছে 'তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না'।

হজরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যাঁর নিরূপম হাতে আমার জীবনপ্রদীপ, তাঁর শপথ করে বলি, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ ক্ষমার সাধারণ ঘোষণা দিবেন। এমনকি তখন ইবলিসও আশান্বিত হয়ে এগিয়ে আসবে। কিন্তু তার ভাগ্যে ক্ষমা জুটবে না। বায়হাকী। এ বিষয়ে এতো অধিকসংখ্যক হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, বিষয়টি অতিক্রম করেছে সুবিদিত পর্যায়।

পথভ্রষ্ট মরজিয়া সম্প্রদায় বলে, ইমানদার ব্যক্তি যদি ফাসেকও হয়, তবুও আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন না। আর ইমান যার আছে, তার জন্য পাপ ক্ষতিকর নয়। তাদের এমতো অপধারণার বিরুদ্ধে আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ। আর আয়াতখানি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ বিশ্বাসের পক্ষের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অর্থাৎ প্রকৃত কথা হচ্ছে— কোনো ইমানদারের পাপ যদি ক্ষমা না করা হয়, তবে তা অবশ্যই উপস্থাপন করা হবে তার সম্মুখে। আর এর জন্য তাকে শাস্তিও দেওয়া হতে পারে, আবার করে দেওয়া হতে পারে ক্ষমা। ইমানদারদের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, এরকম কথা কোরআন মজীদের কোথাও নেই। বরং কোরআন মজীদে শাস্তির কথা উল্লেখ করে বার বার তাদেরকে শাসানোই হয়েছে। আর বহুসংখ্যক হাদিসেও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করলে ক্ষুদ্র পাপের জন্যও শাস্তি দিবেন। কেননা তিনি ন্যায়বিচারক। আবার বৃহৎ পাপও তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন। কেননা তিনি পরম মার্জনাপরবশ। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস এরকমই। আর বলা বাহুল্য, এই জামাতের আকিদাই বিশুদ্ধ আকিদা।

মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, মহাবিচারের দিন পাপীর দৃষ্টিতে তার ক্ষুদ্র পাপও মনে হবে বিশাল পাহাড় সদৃশ। হজরত সাঈদ ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, হুনাইন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রসুল স. শিবির স্থাপন করলেন তরুলতাহীন এক বিজন প্রান্তরে। আজ্ঞা করলেন, তোমরা যা কিছু পেয়েছো, তা আমার সামনে হাজির করো। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। প্রস্তুত হলো বিভিন্ন

www.eelm.weebly.com

দ্রব্যসামগ্রীর এক বিশাল স্তূপ। সেদিকে ইঙ্গিত করে তিনি স. বললেন, দ্যাখো। এভাবেই একত্রিত করা হবে মানুষের পাপের বোঝা। সুতরাং মানুষের উচিত, তারা যেনো আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং বেঁচে থাকে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রকার পাপ থেকে। কেননা পাপরাশির প্রতিফল উপস্থিত করা হবে পাপীদেরই বিরুদ্ধে। তিবরানী।

নাসাঈ, ইবনে হাব্বান ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, একবার রসুল স. বললেন, আয়েশা! ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাপ থেকেও বিরত থেকো। কেননা সে সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে। ইবনে হাব্বান হাদিসটির প্রত্যয়নও করেছেন। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, তোমরা ছোট খাটো পাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করো। কিন্তু রসুল স. এর যুগে আমরা এগুলোকে ধ্বংসাত্মক পাপ বলে গণ্য করতাম। বিশুদ্ধসূত্রসহযোগে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন আহমদ।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, কোরআন মজীদের মধ্যে এই সুরার শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ই সর্বাধিক সুদৃঢ় এবং তাৎপর্যপূর্ণ। হজরত আনাস থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদিসের একাংশে বলা হয়েছে— এই সুরার শেষোক্ত আয়াতদ্বয় নজিরবিহীন সমাবদ্ধ আয়াত। রবী ইবনে খাইছুম বর্ণনা করেছেন, এক লোক হাসান বসরীর পাশ দিয়ে সুরা যিলযাল পাঠ করতে করতে যাচ্ছিলো। তার পাঠ যখন শেষ হলো, তখন হাসান বসরী বললেন, বৎস! শেষ আয়াত দু'খানির নসিহতই আমার জন্য যথেষ্ট। এখানেই তুমি তোমার সদুপদেশের সীমারেখা টেনে দিয়েছো।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আমাকে কিছু সদুপদেশ দিন। তিনি স. বললেন, কোরআন মজীদের আলিফ লাম র সংযুক্ত সুরা তিনখানি পাঠ কোরো। লোকটি বললো, আমি তো বয়োবৃদ্ধ। হৃদয় অ-কোমল। রসনাও ভারী। আমার পক্ষে এ নির্দেশ আয়ত্ত করা দু'ঃসাধ্য। রসুল স. বললেন, তাহলে পাঠ কোরো 'হা-মীম' সম্বলিত যে কোনো তিনটি সুরা। লোকটি পুনরায় তার অক্ষমতার কথা প্রকাশ করলো। তারপর বললো, আমাকে এমন একটি সুরা শিক্ষা করতে বলুন, যা সমাবদ্ধ, পুণ্যে ভরপুর। রসুল স. তখন তাকে শিক্ষা দিলেন সুরা যিলযাল। লোকটি সুরাখানি স্মৃতিস্থ করার পর বললো, সেই পরম সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যের বাহকরূপে প্রেরণ করেছেন, আমি এর কম অথবা বেশী আবৃত্তি করবোই না। একথা বলেই সে প্রস্থান করলো। তার দিকে তাকিয়ে তিনি স. বললেন, লোকটি সফলতা অর্জন করলো। আহমদ, আবু দাউদ।

হজরত আনাস এবং হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সুরা যিলযাল অর্ধ কোরআনের সমতুল। সুরা ইখলাস ও সুরা কাফিরূন সমতুল যথাক্রমে এক তৃতীয়াংশ ও এক চতুর্থাংশের। তিরমিজি, বাগবী। ইবনে আবী শায়বার মাধ্যমে তিরমিজির অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, সুরা যিলযাল এক চতুর্থাংশ কোরআন তুল্য।

www.eelm.weebly.com

জাফরী বলেছেন, সুরা যিলযাল এক চতুর্থাংশ কোরআনের তুল্য। অর্থাৎ কোরআন মজীদে প্রধানত বর্ণিত হয়েছে চারটি বিষয়— জীবন, মৃত্যু, বিচার দিবসের মহাসমাবেশ ও হিসাব-নিকাশ। আর এই সুরায় বর্ণিত হয়েছে কেবল হিসাব নিকাশের কথা। আবার একে অর্ধেক কোরআনের সমতুল বলা হয়েছে একারণে যে, কোরআনে মূলত আলোচনা করা হয়েছে ইহলোক ও পরলোকের কথা। এই সুরায় বলা হয়েছে কেবল পরলোকের কথা। একটি অতি শিথিল সূত্রপরম্পরায় হজরত আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি চারবার সুরা যিলযাল তেলাওয়াত করে, সে সওয়াব পায় সমগ্র কোরআন তেলাওয়াতের। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

সূরা আ'দিয়াত

১১ আয়াতসম্বলিত এই সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যময় নগরী মক্কায়।

হজরত ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে বায্যার, দারাকুতনী, হাকেম ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. একটি অশ্বারোহী সেনাবাহিনীকে এক অভিযানে প্রেরণ করলেন। এক মাস গত হলো। কিন্তু তাদের সম্পর্কে কোনো খবরাখবর পাওয়া গেলো না। রসুল স. বিচলিত হয়ে পড়লেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সূরা আ'দিয়াত ঃ আয়াত ১—১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ﴿١﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ﴿٢﴾ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ﴿٣﴾
فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ﴿٤﴾ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ﴿٥﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ﴿٦﴾
وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ﴿٧﴾ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۭ﴿٨﴾ اَفَلَا يَعْلَمُ
اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۙ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ﴿١٠﴾ اِنَّ رَبَّهُمْ
بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ﴿١١﴾

r শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির,
r যাহারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নি-স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে,
r যাহারা অভিযান করে প্রভাতকালে,
r এবং সেই সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে;

www.eelm.weebly.com

r অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে।

r মানুষ অবশ্যই তাহার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ

r এবং সে অবশ্যই এই বিষয়ে অবহিত,

r এবং অবশ্যই সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল।

r তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নহে যখন কবরে যাহা আছে তাহা উত্থিত হইবে

r এবং অন্তরে যাহা আছে তাহা প্রকাশ করা হইবে?

r সেই দিন উহাদের কী ঘটিবে, উহাদের প্রতিপালক অবশ্যই তাহা সবিশেষ অবহিত।

এখানে 'আলআ'দিয়াত' অর্থ আল্লাহ্‌র পথের যোদ্ধৃবৃন্দের ধাবমান সমরাশ্ব। এরকম অর্থ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান বসরী, কালাবী, কাতাদা, আবুল আলিয়া প্রমুখ ভাষ্যকারগণ। আর আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতরূপে যদি উপরোল্লিখিত বিবরণটিকে গ্রহণ করা হয়, তবে বলতে হয়, সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। কেননা রসুল স. এর মক্কাবাসের সময় জেহাদের প্রত্যাদেশ আসেনি। জেহাদ তো অপরিহার্য হয়েছে তাঁর মদীনায় হিজরতের পর। এতদসত্ত্বেও যদি মনে করা হয়, এই সুরা মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে ধরে নিতে হবে, এখানে ধাবমান সমরাশ্বের শপথ করা হয়েছে ভবিষ্যতের জেহাদের দিকে ইঙ্গিত করে।

'দ্ববহান' অর্থ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান। এখানে কর্মপদের ক্রিয়াপদ রয়েছে অনুক্ত। আর পুরো বাক্যটিই এখানে অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ উর্ধ্বশ্বাসে, হাঁপাতে হাঁপাতে। প্রকৃতপক্ষে 'দ্ববহান' বলে উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনিকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ঘোড়া, কুকুর ও শৃগাল ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণীর হাঁপানীর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না। আর তাদের দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শোনা যায় কেবল তখনই, যখন তারা পরিশ্রান্ত হয়ে থমকে দাঁড়ায়।

হজরত আলী বলেছেন, হজযাত্রীদের উষ্ট্রপালকে বলে 'আল আ'দিয়াত' যখন সেগুলো ধাবিত হয় আরাফা থেকে মুজদালিফায় এবং মুজদালিফা থেকে মিনায়। ইসলামের সর্বপ্রথম যুদ্ধ ছিলো বদর যুদ্ধ। ওই যুদ্ধে আমাদের ছিলো কেবল দু'টি ঘোড়া— একটি যোবায়েরের এবং অপরটি মেকদাদ ইবনে আসওয়াদের। এই বর্ণনাটিকে যদি মান্য করা হয়, তবে এখানকার 'আল আ'দিয়াত' অর্থ সমরাশ্ব হতে পারে কীভাবে? এরকম প্রশ্ন তুলেছেন হজরত ইবনে মাসউদ ও সুদ্দী। মোহাম্মদ ইবনে কা'বের উক্তিও এরকম। সুতরাং তাঁদের মতে এখানকার 'দ্ববহান' কথাটির অর্থ হবে— দীর্ঘ গ্রীবাবিশিষ্ট অগ্রসরমান উটের পাল।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে'। এখানে 'মূরিয়াত' অর্থ ওই সকল ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন ঘোড়া, যেগুলো প্রস্তরময় পথে রাতে চলার সময় ক্ষুরের আঘাতে উদগিরিত করে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

www.eelm.weebly.com

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'যারা অভিযান করে প্রভাতকালে'। এখানকার 'আল মুগীরাত' অর্থ দ্রুতগতিসম্পন্ন। আর 'মুগীরাত' অর্থ ওই সকল যুদ্ধাশ্ব, যেগুলো অতি প্রত্যুষে স্বীয় আরোহীসহ ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুসেনাদের উপর। অধিকাংশ ভাষ্যকারই এরকম মর্মার্থ গ্রহণ করেছেন। তবে কুরতুবী কথাটির অর্থ করেছেন— ওই উষ্ট্র, যে কোরবানীর দিন ঊষাকালে তার আরোহীকে বহন করে নিয়ে যায় মুজদালিফা থেকে মিনায়। অবশ্য প্রত্যুষের পূর্বে মুজদালিফা ত্যাগ না করা সুন্নত। বরং ওয়াজিব। তবে রসুল স. নারী ও শিশুদেরকে কোরবানীর দিন ফজরের সময় হলেই যাত্রা করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এবং সেই সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে'। এখানকার 'বিহী' কথাটির 'হী' (সেই) সর্বনামটি প্রত্যাবর্তিত হবে শত্রুকুলের প্রতিআক্রমণ মুহূর্তের দিকে। বাক্যের গতিপ্রবাহ এখানে একথাটিই প্রমাণ করে। অথবা সর্বনামটি প্রত্যাবৃত হবে শত্রুকুলের অবস্থানস্থলের প্রতি। এরকম ধরে নেওয়া যায় বাক্যটির ইঙ্গিত থেকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— শপথ ওই সকল অশ্বের, যেগুলো শত্রুকুলের উপরে হানা দেওয়ার সময়, অথবা তাদের অবস্থান স্থলে আক্রমণ করার সময় ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে'। অর্থাৎ অতঃপর ঢুকে পড়ে তাদের ব্যূহ ভেদ করে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'মানুষ অবশ্যই তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ'। বাক্যটি শপথের জবাব। আর এখানকার 'আল ইনসান' (মানুষ) এর নির্দিষ্টার্থক 'আল' অব্যয়টি জাতিবাচক হলেও মানবজাতির কিয়দংশের অর্থপ্রকাশক। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া ক্বলীলুম মিন ই'বাদীয়াশ্ শাকুর'। এই আয়াতেও অকৃতজ্ঞদের সংখ্যানিরূপণ করা হয়েছে কিয়দংশের ভিত্তিতে। আর এখানকার 'লি রব্বিহী' (প্রতিপালকের প্রতি) কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'লা কানূদ' (অকৃতজ্ঞ) এর সঙ্গে। এরকম রীতিবিরুদ্ধ সম্পৃক্তির কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, এখানে 'লা কানূদ' এর পূর্বে 'লি রব্বিহী' বসানো হয়েছে ছন্দের যতিপাত সম্পাদনার্থে।

'কানূদ' অর্থ এখানে— অকৃতজ্ঞ। মুজারগোত্রের আঞ্চলিক ভাষা অনুসারে শব্দটির অর্থ এরকমই দাঁড়ায় এবং এরকম অর্থ গ্রহণ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদা। আবার কুন্দা গোত্রের উপভাষা অনুযায়ী শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়— অবাধ্য। মালেকা গোত্রের উপভাষায়— কৃপণ। আবু উবায়দা বলেছেন, 'কানূদ' অর্থ 'ক্বলীলুল খইর' (অকিঞ্চিতকর কল্যাণ)। যেমন 'আরদ্বুন কানূদ' অর্থ অনুর্বর ভূমি।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'এবং সে অবশ্যই এই বিষয়ে অবহিত'। এখানকার 'ইন্নাহু' 'অবশ্যই সে' কথাটির 'সে' সর্বনামটি স্থলাভিষিক্ত আগের আয়াতের 'মানুষ' এর। আর 'এই' শব্দটির মাধ্যমে এখানে ইঙ্গিত করা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য অথবা কৃপণদের অপস্বভাবের প্রতি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্পাক কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। অথচ সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলেই মুক্ত হতে পারে এমতো অপমনোবৃত্তি থেকে। অথবা বিষয়টি তারা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে পরকালে। তখন বলবে, আমরা নিশ্চয় অপরাধী। আমরা নামাজ পাঠ করতাম না। অন্নাভাবীদেরকে অন্ন দান করতাম না। পক্ষান্তরে অধিকাংশ তাফসীরবেত্তাদের মতে এখানকার 'অবশ্যই সে' কথাটির 'সে' সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে আগের আয়াতের 'প্রতিপালক' এর সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— মানুষের অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা, অথবা কৃপণতা সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত। তাঁর কাছে কোনোকিছুই গোপন নয়। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, আলোচ্য আয়াতে অকৃতজ্ঞদের প্রতি ঘোষিত হয়েছে প্রচ্ছন্ন হুমকি।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'এবং অবশ্যই সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল'। এখানেও 'সে' শব্দটি সর্বনাম 'মানুষ' এর। আর 'আল খইর' অর্থ এখানে ধন-সম্পদ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ইন তারাকা খইরান' (যদি সে পরিত্যাগ করে সম্পদ)।

'লাশাদীদ' অর্থ সুকঠিন, প্রবল। যদি ৬ সংখ্যক আয়াতের 'কানূদ' শব্দটির অর্থ অকৃতজ্ঞ হয়, তবে বুঝতে হবে, এখানকার 'লিহুব্বিল খইর' (ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল) বাক্যের 'লাম' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে যোজক অব্যয় হিসেবে। অর্থাৎ মানুষ স্বভাবতই ধন-সম্পদের মোহে প্রবলভাবে জড়িত। তাই তারা তাদের অর্থ-বিত্ত কল্যাণকর পথে ব্যয় করে না। আর 'কানূদ' অর্থ যদি হয় কৃপণতা, তবে এখানকার 'লাম' অব্যয়টি হবে নৈমিত্তিক। অর্থাৎ মানুষ কার্পণ্য প্রকাশ করে অতিরিক্ত সম্পদাসক্তির দরুন।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নয়, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে (৯) এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে' (১০)? এখানকার 'আফালা ইয়া'লামু' (সে কি অবহিত নয়) কথাটির 'হামযা' বিস্ময়প্রকাশক। আর 'ফা' অব্যয়টি যোজক। আর এর যোজ্য ক্রিয়াটি এখানে রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ততাসহ কথাটি দাঁড়ায়— আলা ইয়ানজুরু ফালা ইয়া'লামু (একি বিস্ময়! মানুষ এখনো এ সম্পর্কে অবহিত নয় কেনো)। এভাবে পুরো বাক্যটি দাঁড়াবে— তবে কি সে এ সম্পর্কে জানে না যে, মৃত্যুর পর তার সমাধি থেকে তাকে পুনরুত্থিত করা হবেই। তারপর আল্লাহ্পাক তাকে দিবেন তার কৃতকর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল। এমনকি তার অন্তরে যা কিছু লুক্কায়িত আছে, বিশ্বাস, অথবা অবিশ্বাস সবকিছুকেই তখন প্রকাশ করা হবে সর্বসমক্ষে?

এখানকার 'মা ফীল কুবূর' (কবরে যা আছে) বাক্যটি হওয়া উচিত ছিলো 'মান ফীল কুবূর'। কিন্তু তা করা হয়নি। এর কারণ হচ্ছে, পরের আয়াতের 'মা ফীস্ সুদূর' (অন্তরে যা আছে) এর সঙ্গে ধ্বনিসামঞ্জস্য সাধন এবং এর আর একটি কারণ হচ্ছে একথা বুঝানো যে, মৃত ব্যক্তিরাও জড় পদার্থতুল্য নিঃসাড়, নিশ্চেতন।

www.eelm.weebly.com

‘ওয়া হুস্সিলা মা ফীস্ সুদূর’ অর্থ এবং অন্তরে যা আছে, তা প্রকাশ করা হবে। লক্ষণীয়, এখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করার কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে অন্তরস্থিত প্রতীতি প্রকাশ করার কথা। অর্থাৎ তখন প্রকাশ করা হবে মানুষের অন্তরের বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাসকে। কেননা বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাসই মানুষের যাবতীয় শুভ-অশুভ কর্মকাণ্ডের ভিত্তি।

শেষোক্ত আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— ‘সেদিন তাদের কী ঘটবে, তাদের প্রতিপালক অবশ্যই তা সবিশেষ অবহিত’। আল্লাহ্পাক সর্বজ্ঞ। তৎসত্ত্বেও এখানে বিশেষভাবে তাঁর সেদিনের ঘটনাবলীর অবহিতির কথা বলা হয়েছে প্রতিফল দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বৃদ্ধির জন্য। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে ‘খবীর’ অর্থ বিনিময়দাতা। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্পাক সেদিন সকলের কর্মকাণ্ডের যথোপযুক্ত বিনিময় দান করবেন। এরকম অর্থ করেছেন জুজায।

সূরা ক্বারিয়াহ্

এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যধাম মক্কায়। এতেও রয়েছে ১১টি আয়াত।

সূরা ক্বারিয়াহ্ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

اَلۡقَارِعَةُ ۙ﴿١﴾ مَا الۡقَارِعَةُ ۚ﴿٢﴾ وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الۡقَارِعَةُ ؕ﴿٣﴾ يَوۡمَ يَكُوۡنُ
النَّاسُ كَالۡفَرَاشِ الۡمَبۡثُوۡثِ ۙ﴿٤﴾ وَتَكُوۡنُ الۡجِبَالُ كَالۡعِهۡنِ
الۡمَنۡفُوۡشِ ؕ﴿٥﴾ فَاَمَّا مَنۡ ثَقُلَتۡ مَوَازِيۡنُهٗ ۙ﴿٦﴾ فَهُوَ فِيۡ عِيۡشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ﴿٧﴾

r মহাপ্রলয়,
r মহাপ্রলয় কী?
r মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জান?
r সেই দিন মানুষ হইবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত
r এবং পর্বতসমূহ হইবে ধূনিত রংগিন পশমের মত।
r তখন যাহার পাল্লা ভারী হইবে,
r সে তো লাভ করিবে সন্তোষজনক জীবন।

এখানে ‘আল ক্বারিয়াহ্’ অর্থ কিয়ামত, মহাপ্রলয়। কথাটির সবিস্তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সুরা ‘আল হাক্বক্বা’র তাফসীরে। শব্দটিতে স্ত্রীলিঙ্গবাচক ‘তা’ ব্যবহৃত হয়েছে এজন্য যে, এটি একটি বিশেষণ। আর এখানে এর বিশেষ্য

www.eelm.weebly.com

(সময়, মুহূর্ত, কাল) রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের সময় সবকিছু হয়ে যাবে ধ্বংস। অথবা শব্দটি এখানে আধিক্যজ্ঞাপক। এভাবে এখানকার প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! মহাপ্রলয়ের সম্বন্ধে আপনি কি জানেন, যখন মানুষসহ সকলকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে? অথবা— মহাপ্রলয়ের ধ্বংসপর্বমধ্যে মানুষও যে থাকবে, তা কি আপনার জানা নেই?

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'সে দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো'। অর্থাৎ তখন মনে হবে মানুষ যেনো উন্মত্ত কীটপতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিচ্ছে ধ্বংসের আগুনে। এখানে মানুষকে পতঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে শ্লেষ প্রকাশার্থে। অর্থাৎ অত্যধিক আতংক ও অস্থিরতার কারণে মানুষ তখন হয়ে পড়বে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য আগুনে আত্মাহুতিদানরত পতঙ্গের মতো বিক্ষিপ্ত, উৎক্ষিপ্ত ও উন্মাতাল।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙিন পশমের মতো'। 'ই'হ্‌ন' বলে রঙবেরঙের পশমকে। অর্থাৎ তখন পাহাড় পর্বতগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে এমনভাবে শূন্যে উড়তে থাকবে যে, দেখে মনে হবে যেনো আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে ধূনিত রঙ-বেরঙের পশম।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তখন যার পাল্লা ভারী হবে (৬) সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন' (৭)। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে 'সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো'। আর এখান থেকে সুরার শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে তাদের পরিণতির বিবরণ। এখানকার 'মাওয়াযীন' বহুবচন 'মাওযুন' এর। এর মর্মার্থ— ওই সকল কর্ম, যা তখন উপস্থিত করা হবে মানুষের সম্মুখে। আর 'কর্ম' অর্থ এখানে কেবল পুণ্যকর্ম। অর্থাৎ পুণ্যবানদেরকে তখন দেখিয়ে দেওয়া হবে তাদের পুণ্যকর্মের স্বরূপ। অথবা এখানকার 'মাওয়াযীন' বহুবচন' 'মীযান' এর। মর্মার্থ— পুণ্যকর্মের পাল্লা। বিশুদ্ধ হাদিসে বলা হয়েছে, ন্যায়ের ওই পাল্লার থাকবে বাকশক্তি এবং তার পক্ষ থাকবে দু'টি। হাদিসটি জননী আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে মারদুবিয়া, 'জুহুদ' গ্রন্থে সংকলন করেছেন ইবনে মোবারক এবং আবু শায়েখ উল্লেখ করেছেন তাঁর তাফসীরে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আজারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যেমন আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টি করেছেন ন্যায়ের তুলাদণ্ডও।

'যার পাল্লা হবে ভারী' কথাটি একবচনবোধক। আবার 'মাওয়াযীন' উল্লেখিত হয়েছে বহুবচনে। এরূপ রীতিবিরুদ্ধ বহুবচন ব্যবহারের কারণ হচ্ছে, এখানকার 'মান' (যে, যার) শব্দটি শব্দগতভাবে একবচন হলেও জনসমুদ্রের ইঙ্গিতবহ বলে অর্থগতভাবে বহুবচন। আর বহুবচনের বিপরীতে বহুবচন ব্যবহৃত হলে সে বহুবচন বিভক্ত হয়ে যায় এককের মধ্যে। ফল দাঁড়ায়— দাঁড়িপাল্লা থাকবে প্রত্যেকের জন্য একটি করে। যদিও দাঁড়িপাল্লা হবে একটি। কিন্তু যেহেতু যাদের কৃতকর্ম ওজন করা হবে, তারা হবে অসংখ্য, তাই বলা যেতে পারে, তাদের পাল্লাও যেনো অসংখ্য।

www.eelm.weebly.com

'ফাহুয়া ফী ঈ'শাতির রদ্বীয়াহ' অর্থ সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন। অর্থাৎ সে তখন হবে মনঃপুত জীবনের অধিকারী। কথাটি রূপকার্থক। প্রকৃতপক্ষে ওই জীবনাধিকারীরাই হবে মনঃপুত। অথবা বলা যেতে পারে, এখানকার 'রদ্বীয়াতুন' এর শব্দরূপ কর্তৃবাচক হলেও এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কর্মবাচক 'মারদ্বিয়াহ্' অর্থে। অর্থাৎ মনঃপুত। কিংবা বলা যায়, 'রদ্বীয়াতুন' অর্থ এখানে— সন্তোষজনক।

সূরা ক্বরিয়াহ্ ঃ আয়াত ৮, ৯, ১০, ১১

وَ اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ﴿٨﴾ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ
مَاهِيَهْ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾

r কিন্তু যাহার পাল্লা হাল্কা হইবে
r তাহার স্থান হইবে 'হাবিয়া'।
r তুমি কি জান উহা কী?
r উহা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।

'ওয়া আম্মা মান খফ্ফাত মাওয়াযীনুহু' অর্থ কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে। সাধারণভাবে একথার লক্ষ্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। তবে ইমান না থাকার কারণে তাদের পুণ্যকর্ম গণনাই করা হবে না। আবার পাপী বিশ্বাসীরাও কথাটির অন্তর্ভূত। তাদেরই পুণ্যাপেক্ষা পাপের পাল্লা হবে ভারী। লক্ষণীয়, ইতোপূর্বে 'যার পাল্লা ভারী হবে' বলে বুঝানো হয়েছে নিষ্পাপ মুমিনদেরকে। অথবা যাদেরকে মার্জনা করা হবে, তাদেরকে। কিংবা তাদেরকে, যাদের পাপ অপেক্ষা পুণ্যের পাল্লা হবে ভারী।

কুরতুবী বলেছেন, আমাদের জ্ঞানীগণের অভিমত হচ্ছে, মহাবিচারের দিবসে মানুষ বিভক্ত হবে তিনটি দলে। একটি দল হবে মুত্তাকীগণের। তাদের আমলনামায় কোনো কবীরা গোনাহ থাকবে না। সুউজ্জ্বল পাল্লায় স্থাপিত হবে তাদের পুণ্যকর্মসমূহ। তখন পুণ্যের ভারে সে পাল্লা আর উপরে উঠতে পারবেই না। অপর পাল্লা হালকা হয়ে ভাসতে থাকবে শূন্যে। দ্বিতীয় দল হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের। তাদের অবিশ্বাস ও পাপের বোঝা রাখা হবে অন্ধকার পাল্লায়। আর তাদের দুঃস্থ আত্মীয়স্বজনের প্রতিপালনজাত পুণ্য রাখা হবে অপর পাল্লায়। কিন্তু প্রথম পাল্লার তুলনায় দ্বিতীয় পাল্লা হবে ওজনহীন। আর শূন্য পাল্লার মতো তা ঝুলতে থাকবে উপরে। রসুল স. একবার বললেন, বিচার অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় কিছুসংখ্যক মোটাতাজা দীর্ঘকায় লোক তুলাদণ্ডের নিকটবর্তী হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তাদের ওজন একটি মাছির ওজনেরও সমান হবে না। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন 'প্রতিফল দিবসে তাদের কোনো ওজনই স্থির হবে না'। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

তৃতীয় দলটি হবে পাপী মুমিনদের। তাদের পুণ্য ও পাপ রাখা হবে যথাক্রমে উজ্জ্বল ও অন্ধকার পাল্লায়। পুণ্যের পাল্লা ভারী হলে তারা যাবে জান্নাতে। আর পাপের পাল্লা ভারী হলে বিষয়টি নির্ভর করবে আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর। ইচ্ছা করলে তিনি তখন তাদেরকে পাঠিয়ে দিবেন জাহান্নামে, আবার ইচ্ছা করলে কৃপাপরবশ হয়ে তাদের পাপরাশি মার্জনা করবেন এবং প্রেরণ করবেন জান্নাতে। আর তাদের দু'টি পাল্লায় যদি সমান সমান হয়, তবে তারা বাস করবে আরাফবাসীদের সঙ্গে। তবে এরূপ সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে তখনই, যখন তাদের বৃহৎ পাপগুলো সম্পৃক্ত থাকবে আল্লাহ্র অধিকারের (হক্কুল্লাহ'র) সঙ্গে। আর যদি তা হয় বান্দার অধিকার (হক্কুল ইবাদ) সম্পৃক্ত, তাহলে তাদের পুণ্যগুলো দিয়ে দেওয়া হবে অধিকারসংশ্লিষ্ট দাবিদার বান্দাদেরকে। এতে করে যদি তাদের দাবি মিটে যায়, তবে তো ভালোই। নচেৎ তাদের পাপগুলো চাপিয়ে দেওয়া হবে তার ঘাড়ে। ফলে সে পাপগুলোরও শাস্তি ভোগ করতে হবে তাকে।

আহমদ ইবনে হারেছ বলেছেন, প্রতিফল দিবসে মানুষের পুনরুত্থান ঘটানো হবে তাদেরকে তিন দলে ভাগ করে। একদল তাদের পুণ্যকর্মের সুবাদে হবে বিরাট বিত্তপতি। দ্বিতীয় দল চরম অভাবগ্রস্ত হবে পুণ্যকর্মের ঘাটতির জন্য। আর তৃতীয় দলকে প্রথমে দেখা যাবে বিশাল পুণ্যাধিকারী। পরে বান্দার অধিকার পরিশোধ করতে করতে হবে চরম নিঃসম্বল।

সুফিয়ান সওরী বলেছেন, তুমি যদি সত্তরটি গোনাহ্ নিয়েও আল্লাহ্পাক সকাশে উপস্থিত হও, তবুও তা বান্দার অধিকার খর্ব করার একটি পাপ নিয়ে হাজির হওয়া অপেক্ষা তোমার জন্য হবে উত্তম। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রতিফল দিবসে মানুষের পাপ-পুণ্যের ওজন করা হবে। যার পাপ অপেক্ষা একটি পুণ্যও অধিক হবে, সে প্রবেশ করবে বেহেশতে। আর যার পুণ্য অপেক্ষা অধিক হবে একটি পাপ, সে প্রবেশ করবে দোজখে। একটি শস্যবীজ পরিমাণ অপেক্ষাও সূক্ষ্মভাবে পাপ-পুণ্যের পাল্লায় পার্থক্য সূচিত হবে। আর যাদের পাপ-পুণ্য হবে সমান, তারা অবস্থান করবে আরাফে। তাদেরকে পুলসিরাত অতিক্রম করতে দেওয়া হবে না। এমতাবস্থায় তাকে কিছু পাপের শাস্তি দিয়ে পাপের চেয়ে পুণ্যের পাল্লা কিছু ভারী করে তাকে করা হবে বেহেশতগমনের উপযোগী।

আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, নিষ্পাপ মুত্তাকী ব্যক্তিরও পুণ্য ওজন করা হবে। এরকম করা হবে জনসমক্ষে তাঁর মর্যাদা প্রকাশার্থে। আর পুরোপুরি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরও পাপ ওজন করা হবে সর্বসমক্ষে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। আমি বলি, কোরআন মজীদে যেখানেই পুণ্যবান বিশ্বাসীগণকে বিনিময় দানের কথা উল্লেখিত হয়েছে, সেখানেই বিঘোষিত হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দেওয়ার কথা। তবে পাপ-পুণ্য বিমিশ্রিত বিশ্বাসীগণের ব্যাপারে শরিয়ত নীরব। আর এখানে 'কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে' বলে বলা হয়েছে কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথা। কেননা পরবর্তী আয়াতে (৯) স্পষ্ট করে বলা হয়েছে 'তার স্থান হবে হাবিয়া'। বলা বাহুল্য, কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই প্রবেশ করবে ভয়ংকর ও লেলিহান অগ্নিশিখাবিশিষ্ট হাবিয়া দোজখে।

www.eelm.weebly.com

'ফা উম্মুহু হাবিয়া' এর শাব্দিক অর্থ তার মাতা হবে হাবিয়া। অর্থাৎ হাবিয়া দোজখই হবে তার স্থায়ী বাসস্থান। 'উম্' অর্থ মাতা। সন্তানের অবস্থান যেমন মাতৃক্রোড়, তেমনি দোজখীদের অবস্থানও হাবিয়া। এরূপ বাগধারা আরবী ভাষায় সুপ্রচল। হাবিয়া একটি গভীর গহ্বরবিশিষ্ট দোজখের নাম। ওই গহ্বরের পরিমাপ আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জানা নেই।

কাতাদা বলেছেন 'উম্মুহু হাবিয়া' অর্থ তার মাতা পতনোন্মুখ। আরবী প্রবাদে বলা হয় 'হাওয়াত উম্মুহু' (তার মাতা পতিত হয়েছে)। এরকম বলা হয় তাকে লক্ষ্য করে, যে হয় কঠিন বিপদে বিপদগ্রস্ত। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'উম্' অর্থ মস্তক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সে অধোমুখে দোজখে পতিত হবে। বাগবী বলেছেন, ব্যাখ্যাটি কাতাদা ও আবু সালেহের সমর্থনপুষ্ট।

আমি বলি, হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে মুত্তাকীগণের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে কাফেরদের কথা। যেমন রসুল স. বলেন, তখন মানুষ পেয়ে যাবে তাদের পুরোপুরি প্রতিফল। দাঁড়িপাল্লার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন ফেরেশতা সকলের পাপ-পুণ্যের ওজন পরীক্ষা করবে। কারো পুণ্যের পাল্লা ভারী হলে সে সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার করে বলবে, এ লোক সৌভাগ্যশালী। আর কোনোদিন সে হতভাগ্য হবে না। সমগ্র সৃষ্টি তার ওই চীৎকার শুনবে। এরকম বিকট চীৎকার সে করবে কারো পাপের পাল্লা ভারী হওয়ার পরক্ষণেও। বলবে, এই লোকটি চিরহতভাগ্য। আর কখনো সে সৌভাগ্যের মুখ দেখবে না। এই হাদিসে পাপ-পুণ্য মিশ্রিত ইমানদারদের বিষয়ে মৌনতাবলম্বন করা হয়েছে। সুতরাং বুঝতে হবে ফেরেশতা তাদের ব্যাপারে কোনো ঘোষণা দিবে না।

একটি উপযোগ ঃ কুরতুবী বলেছেন, সকলের জন্য তুলাদণ্ডের প্রয়োজন হবে না। একদল বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। আর এক দল জাহান্নামে যাবে বিনা হিসাবে। এই দুই দলের জন্য তুলাদণ্ডের প্রয়োজন হবে না। আর বিনা হিসাবে জাহান্নামীদের উদ্দেশ্যেই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'অপরাধীরা পরিচিত হবে তাদের আকৃতি দ্বারা। ধরা হবে তাদের মাথার সম্মুখ ভাগের চুল ও পা'।

আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, সম্ভবত তারা হবে কপট বিশ্বাসী, যারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে নামাজ রোজা করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। যখন অংশীবাদী গোষ্ঠীগুলো পশ্চাতে দাঁড়াবে তাদের অলীক উপাস্যের, তখন কপটবিশ্বাসীরা মিশে থাকবে বিশুদ্ধ বিশ্বাসীদের সঙ্গে। তাদেরকেই তুলাদণ্ডের মাধ্যমে আল্লাহ্পাক পৃথক করে দিবেন।

ইমাম গায্যালী লিখেছেন, বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে সত্তর হাজার লোক। তাদের জন্য কোনো তুলাদণ্ড স্থাপন করা হবে না এবং তারা আমলনামাও গ্রহণ করবে না। তৎপরিবর্তে পাবে একটি মুক্তিপত্র। তাতে লেখা থাকবে— এই মুক্তিপত্র অমুকের পুত্র অমুকের। হজরত আনাস থেকে ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তখন উপস্থাপন করা হবে তুলাদণ্ড। সেখানে উপস্থিত করানো হবে নামাজীদেরকে। পুণ্য পরিমাপের পর তাদেরকে বিনিময়ও দেওয়া হবে

www.eelm.weebly.com

পুরোপুরি। এরপর হাজির করানো হবে হজ পালনকারীদেরকে। তাদেরকেও প্রতিদান দেওয়া হবে যথোপযুক্তরূপে। তারপর হাজির করানো হবে বিপদগ্রস্তদেরকে। কিন্তু তাদের আমল যেমন ওজন করা হবে না, তেমনি তাদের জন্য খোলা হবে না কোনো হিসাব-কিতাবের খতিয়ান। তাদের উপর অঝোরধারায় বর্ষিত হবে পুণ্যবিনিময়। তখন এ জগতের নিরুপদ্রব জীবনযাপনকারীরা কামনা করবে, আমাদেরকে যদি পৃথিবীতে কাটা হতো কাঁচি দিয়ে। বিপদগ্রস্তদের অশেষ বিনিময় প্রাপ্তি দেখেই তখন মনে মনে এভাবে আক্ষেপ করতে থাকবে তারা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'নিশ্চয় ধৈর্যশীলদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে পরোপুরি, বেহিসাবী'।

যথাসূত্র সহযোগে হজরত আনাস থেকে তিবরানী ও আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে হিসাব নিকাশের জন্য উপস্থিত করানো হবে শহীদগণকে। এরপর দান খয়রাতকারীদেরকে। তারপর দুঃখীদেরকে। কিন্তু তাদের জন্য না খোলা হবে হিসাবের খতিয়ান, না স্থাপন করা হবে ন্যায়ের তুলাদণ্ড। তাদের উপরে আল্লাহ্র করুণা বর্ষিত হতে থাকবে অজস্র ধারায়। সে দৃশ্য দেখে এখনকার সুখী লোকেরা মনে মনে আফসোস করতে থাকবে এই বলে যে, হায়! পৃথিবীতে যদি আমাদের দেহকে কাঁচি দিয়ে কেটে ছিন্ন ভিন্ন করা হতো। ইতোপূর্বে আমরা একস্থানে উল্লেখ করেছি, সুফীসাধকগণ বিনা হিসাবে জান্নাতে গমন করবেন। তাই মনে হয়, সম্ভবত হাদিসে উল্লেখিত 'বালা' শব্দটির অর্থ হবে— দুঃখ-যাতনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষাক্লিষ্ট আল্লাহ্প্রেমিকগণ। কেননা তাঁরা পরিতুষ্ট থাকেন সুখে-দুঃখে-সর্বাবস্থায়।

হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর পরিমাপ আছে। পরিমাপ নেই কেবল অশ্রুর। অশ্রুর দ্বারা আগুনের সাগরও নিভিয়ে দেওয়া যায়। এ অশ্রু হচ্ছে আল্লাহ্ প্রেমিকগণের রোদনাশ্রু। অন্যথায় বিপদগ্রস্তদের কৃতকর্মের পরিমাপের কথা জানা যায় বহুসংখ্যক বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত হাদিসের মাধ্যমে। যেমন হজরত ছাওবান ও হজরত আবু সালমা থেকে নাসাঈ, হাকেম, ইবনে হাব্বান, বায্যার, আহমদ ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পাঁচটি তুলাদণ্ডে পাঁচটি বিষয় হবে কতোইনা গুরুভার— লা ইলাহা ইল্লাল্লহু, সুবহানাল্লহু, আলহামদুলিল্লাহ্ এবং আল্লাহু আকবর। আর যে পুণ্যবান মুসলমানের শিশুসন্তান মৃত্যুবরণ করেছে........শেষ পর্যন্ত। এ বিষয়টিও সন্দেহাতীতরূপে সত্য যে, শিশুসন্তানের মৃত্যু তার পিতা-মাতার জন্য একটি অবর্ণনীয় বিপদ। আর হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে যে শস্যের কথা বলা হয়েছে, সেটাও এক ধরনের বিপদ। আল্লাহ্ই অধিক অবহিত।

একটি জিজ্ঞাসা ঃ যথাসূত্রসহযোগে হজরত ইবনে ওমর থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিফল দিবসে ন্যায়ের তুলাদণ্ড প্রতিস্থাপনের পর এক লোককে আনা হবে। আর পাপ-পুণ্য উঠিয়ে দেওয়া হবে তার দুই পাল্লায়।

www.eelm.weebly.com

দেখা যাবে তার পাপের পাল্লাই ভারী। সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে, সে নারকী। সে তখন নরকের দিকে পা বাড়াবে। তরঙ্গায়িত হবে আল্লাহ্‌র দয়ার সমুদ্র। তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করা হবে, তোমরা ওকে থামাও। তার একটি বিষয়ের ওজন তো এখনো নেওয়াই হয়নি। ফেরেশতারা তাকে থামাবে। বের করা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ' লিখিত একটি ছোট্ট চিরকুট। ওই চিরকুটটিসহ তাকে পুনরায় ওঠানো হবে এক পাল্লায়। দেখা যাবে তার পুণ্যের পাল্লাই হয়েছে ভারী। হজরত আবু সাঈদ খুদরী ও হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনা করেছেন ইবনে হাব্বান ও তিরমিজি। তবে এখানে একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। তা হচ্ছে মুমিনদের পাল্লা হাল্‌কা হবে কেনো? আর মুমিন তো কখনো লা ইলাহা ইল্লাল্লহ বিবর্জিত নয়, মাত্র একবার এ কলেমার স্বীকৃতি দিলেও। আর লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্‌'র ওজনই তো হবে সর্বাধিক।

জিজ্ঞাসার জবাব ঃ সাধারণ রীতিনীতি পরকালেও চলবে, এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। তখনকার রীতিনীতি হবে আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পাবিশিষ্ট। সেদিন ঘটবে তাঁর সকল গুণের প্রভূত বিকাশ। তবে তাঁর বিশেষ করুণাধারা প্রাপ্তির একমাত্র যোগ্যতা সেদিন হবে পরিশুদ্ধতা (ইখলাস)। তখন প্রত্যেকের প্রাপ্তি নির্ণীত হবে তার পরিশুদ্ধতার তারতম্যানুসারে।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তুমি কি জানো, ওটা কী (১০)? ওটা হচ্ছে উত্তপ্ত অগ্নি' (১১)। এখানে 'তুমি কি জানো' বলে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে হাবিয়া দোজখের ভয়াবহতা বোঝাতে। ক্বারী হামযা এখানকার 'মা হিয়াহ্‌' (ওটা কী) পাঠ করেছেন মিলিতভাবে। আর অন্যান্য ক্বারী পাঠ করেছেন সংক্ষিপ্ত যতিপাত সহকারে, প্রশ্বাস না ছেড়ে। 'হিয়া' (ওটা) সর্বনামটি এখানে 'হাবিয়া'র স্থলাভিষিক্ত। আর 'ওটা কী' প্রশ্নটি হাবিয়া দোজখের ভয়ংকরতা প্রকাশক।

'নারুন হামিয়াহ্‌' অর্থ ওটা তো উত্তপ্ত অগ্নি। কথাটি 'অগ্নি' অথবা 'হাবিয়া'র অনুবর্তী (বদল)। অথবা তার বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ।

সূরা তাকাছুর

৮ আয়াতসম্বলিত এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছ বিশ্বতীর্থ মক্কা নগরীতে।

সূরা তাকাছুর ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ﴿۱﴾ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ؕ﴿۲﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿۳﴾

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ؕ﴿۴﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ؕ﴿۵﴾ لَتَرَوُنَّ

www.eelm.weebly.com

الْجَحِيْمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ
عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

r প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন রাখে
r যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।
r ইহা সংগত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে;
r আবার বলি, ইহা সংগত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে।
r সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকিলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হইতে না।
r তোমরা তো জাহান্নাম দেখিবেই;
r আবার বলি তোমরা তো উহা দেখিবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে,
r ইহার পর অবশ্যই সেই দিন তোমাদিগকে নি'মাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে 'আলহাকুমুত্ তাকাছুর'। এর অর্থ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। অর্থাৎ পার্থিব বিত্ত-বৈভব লাভের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেয়। তোমরা তাই প্রলিপ্ত হয়ে পড়ো অকল্যাণকর কর্মকাণ্ডে। পরিত্যাগ করো আল্লাহ্র আনুগত্য এবং ওই সকল কাজ, যা আল্লাহ্র সন্তোষার্জনের সহায়। 'আলহা' অর্থ মোহাচ্ছন্ন রাখে, উদাসীন করে দেয়।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে 'হাত্তা যুরতুমুল মাক্বাবির' (যতোক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও) একথার অর্থ— তোমরা বিত্ত-বৈভব অর্জনে এমনই মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ো যে, কখন মৃত্যু এসে পড়ে তা তোমরা টেরই পাও না। ফলে তোমরা অপ্রস্তুত অবস্থায় সমাহিত হও ভূ-অভ্যন্তরে। হজরত জায়েদ ইবনে আসলাম থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য তোমাদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বিমুখ করে রাখে। সহসা এসে পড়ে মৃত্যু। কাতাদা বলেছেন, ইহুদীরা প্রাচুর্যের বড়াই করতো। বলতো, আমরা অমুক অমুক গোত্র অপেক্ষা অধিক বিত্তশালী। এমতো আত্মম্ভরিতাই তাদেরকে বিমুখ করে রাখে মহাসত্যের পরিচয় ও আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে। আর তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

হজরত ইবনে বুরাইদা থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ ছিলো সম্মানিত আনসারগণের দু'টি গোত্র— বনী হারেছা ও বনী হারেছ। তাঁরা তাঁদের ধন-সম্পদ নিয়ে একে অপরের সম্মুখে বড়াই করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা বলতেন, আমাদের অমুক অমুক ব্যক্তির মতো তোমাদের মধ্যে কেউ আছে নাকি। আবার কখনো সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে কোনো বিশেষ কবরের দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন, আমাদের— এঁর মতো তোমাদের তো একজনও নেই।

www.eelm.weebly.com

কালাবী বলেছেন, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছিলো কুরায়েশ গোত্রাবলী সম্পর্কে। তাদের বনী আবদে মান্নাফ এবং বনী সাহাম একে অপরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো, আমাদের মধ্যে রয়েছে অনেক মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব, যা তোমাদের মধ্যে নেই। তা ছাড়া তোমাদের চেয়ে আমাদের জনসংখ্যাও বেশী। যখন গণনা করে দেখা গেলো, বনী আবদে মান্নাফই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তখন বনী সাহাম বললো, এখন আমরা আমাদের প্রয়াত ব্যক্তিদেরকেও গণনার মধ্যে ধরবো। এই বলে তারা সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে তাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে গণনা করলো। দেখা গেলো জীবিত ও মৃত মিলিয়ে তাদের জনসংখ্যা বনী আবদে মান্নাফের চেয়ে তিন ঘর বেশী। তাদের এমতো স্থূল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। এমতো ঘটনার প্রেক্ষিতে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা জনসংখ্যার গর্ব করো। জীবিতদেরকে গণনা করেও ক্ষান্ত হও না। উপনীত হও কবরস্থানেও। তবুও দম্ভ থেকে পশ্চাদপসরণ করো না। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে 'কবরে উপনীত হও' কথাটি হবে রূপকার্থক। অর্থাৎ মৃতদের কবরে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে তোমরা সেখানে সমবেত হও না। সমবেত হও দম্ভ প্রকাশের নিমিত্ত গ্রহণার্থে। অথবা কথাটি হতে পারে প্রকৃতার্থক। কেননা প্রকৃতই তারা কবর গণনার উদ্দেশ্যেই তখন উপস্থিত হয়েছিলো সেখানে। আর এখানকার 'হাত্তা' (যতোক্ষণ) অব্যয়টি নিমিত্তজ্ঞাপক।

বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সাখীর বলেছেন, আমি একদিন রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তিনি আবৃত্তি করছেন 'আলহাকুমুত্ তাকাছুর.....'। আবৃত্তি শেষ হলে তিনি বললেন, মানুষ বলে, আমার সম্পদ আমার সম্পদ। আরে, তোমার সম্পদ তো ততোটুকু খাদ্য যতোটুকু তুমি ভক্ষণ করেছো এবং ওই পরিধেয়, যা ব্যবহার করে করে ফেলেছো পুরাতন। আর যা দান খয়রাত করে প্রেরণ করেছো সম্মুখে।

হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, মৃতের পশ্চাতে গমন করে তিনটি বস্তু, দু'টি ফিরে আসে, আর একটি থেকে যায়। যে দু'টি ফিরে আসে, সে দু'টি হচ্ছে তার আত্মীয়-স্বজন এবং বিত্ত, থেকে যায় তার আমল। বোখারী। হজরত আয়াজ ইবনে হিমার মাজশেয়ী থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, আল্লাহ্ আমাকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরা বিনয়াবনত হও। কখনো দম্ভ প্রকাশ কোরো না। কড়াকড়ি কোরো না কোনোকিছু নিয়ে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষের উচিত, তারা যেনো বাপ-দাদাদের নামে আত্মগরিমা করা থেকে বিরত থাকে। কেননা আত্মগরিমা হচ্ছে জাহান্নামের কয়লা। আত্মগরিমা প্রকাশকারীরা তো আল্লাহ্র নিকট ওই গুবরে পোকার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট, যে তার শুঁড় দিয়ে ঠেলাঠেলি করে ময়লাযুক্ত বস্তু। আল্লাহ্ দয়া করে তোমাদের নিকট থেকে দূর করে দিয়েছেন মূর্খতার যুগের আত্মম্ভরিতা। এরপর তোমরা হবে পুণ্যবান, অথবা পাপী। তোমরা সকলেই আদম সন্তান। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো মৃত্তিকা থেকে।

www.eelm.weebly.com

হজরত উকবা ইবনে আমের থেকে আহমদ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের বংশ-গৌরব করার কিছু নেই। তোমরা সকলেই আদম সন্তান, যেমন একটি সা' (কাষ্ঠনির্মিত পরিমাপ পাত্রবিশেষ) অপর একটি সা' এর সমান। ধর্মপরায়ণতা ও সংযমশীলতা ব্যতীত আত্মপ্রসাদ লাভ করার কিছু নেই। এ দুটো গুণ ছাড়া কেউ কারো চেয়ে অধিক মর্যাদাবান নয়। নিকৃষ্টতা প্রকাশ পায় কটুভাষিতা, অশ্লীলতা ও কৃপণতা থেকে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিফল দিবসে আল্লাহ্ তাঁর এক ফেরেশতাকে এই বলে ঘোষণা দিতে বলবেন যে, শোনো হে জনতা! আমি একটি সম্বন্ধ স্থির করেছি; আর তোমরা সম্বন্ধ স্থির করেছো আর একটি। আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী বলি তাকে, যে মুত্তাকী। কিন্তু তোমরা তা মানতে চাওনা। তোমরা বলো, মর্যাদাশালী অমুকের পুত্র অমুক। আজ আমি আমা কর্তৃক স্থিরীকৃত সম্বন্ধটিকেই প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত করবো। অবনমিত করবো তোমাদের বংশগৌরব। সুতরাং যারা মুত্তাকী, তারা অগ্রসর হও। তিবরানী হাদিসটি সংকলন করেছেন তাঁর 'আল আওসাত' গ্রন্থে।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'কাল্লা সাওফা তা'লামূন' (এটা সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে)। এখানে 'কাল্লা' অর্থ এটা কিছুতেই সঙ্গত নয়। অর্থাৎ প্রাচুর্যের মোহাচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার মধ্যে কোনো কল্যাণই নেই। 'তা'লামূন' (তোমরা জানতে পারবে) ক্রিয়ার কর্মপদ এখানে রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ আগামীতে যখন তোমরা শাস্তিকবলিত হবে, তখন বুঝতে পারবে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা ও আত্মঅহমিকার পরিণতি কতো ভয়াবহ।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'ছুম্মা' কাল্লা সাওফা তা'লামূন' (আবার বলি, এটা সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে)। বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানার্থে আগের আয়াতটিরই পুনরুক্তি করা হয়েছে এখানে। অথবা প্রথমে হুমকি দেওয়ার পর এখানে হুমকি দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় বারের মতো। আর এখানকার 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটি একথাটিকেই প্রমাণ করে যে, প্রথম হুমকির চেয়ে দ্বিতীয় হুমকি প্রবলতর। কেননা 'ছুম্মা' ব্যবহার করা হয় ক্রমোন্নতি বোঝাতেও। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে প্রথমে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে মৃত্যুর, অথবা কবরের। আর পরে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে পুনরুত্থানপর্বের পরের শাস্তির। ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, কবরের শাস্তি সম্পর্কে আমাদের প্রতীতি অস্বচ্ছ ছিলো। সে অস্বচ্ছতা দূর হলো তখন, যখন অবতীর্ণ হলো 'আলহাকুমুত্ তাকাছুর.......সাওফা তা'লামূন'।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'কাল্লা লাও তা'লামূনা ই'লমাল ইয়াক্বীন' (সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না)। কথাটি প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতার নিষিদ্ধতার তাগিদের উপর উপতাগিদ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হায়! পরকালের জ্ঞান যদি তোমাদের থাকতো,

www.eelm.weebly.com

যেমন তোমাদের অনেকের রয়েছে পার্থিব বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান। বলোতো, তাহলে কী হতো? এমতো সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর এখানে রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ তাহলে তো তোমরা পরকালকেই অগ্রাধিকার দিতে, অথবা তাহলে তো তোমরা ঐশ্বর্য অর্জনের মোহে এভাবে জঘন্য প্রতিযোগিতায় নামতে না। উল্লেখ্য, অধিক গুরুত্ব প্রদর্শনের মানসেই এখানে এভাবে প্রশ্নের আড়ালে 'লাও' শব্দের জবাবকে রাখা হয়েছে অনুক্ত। কাতাদা বলেছেন, আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম, মৃত্যুর পরের মহাপুনরুত্থান সম্পর্কে দৃঢ় প্রতীতি রাখার নামই 'ই'লমুল ইয়াক্বীন'। আমি বলি, অদৃশ্যের উপরে বিশ্বাস স্থাপনের নামই ই'লমুল ইয়াক্বীন, যা অর্জিত হয় দলিল-প্রমাণের সাহায্যে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'লাতারা উন্‌নাল জ্বাহীম' (তোমরা তো জাহান্নামকে দেখবেই)। স্মর্তব্য, কথাটি শর্তের দাবি নয়। কেননা জাহান্নামদর্শনের বিষয়টি অবশ্যম্ভাবী। বরং বলা যেতে পারে, কথাটি একটি অনুক্ত শপথের জবাব। এভাবে এখানে শাস্তির ভীতিকে করে তোলা হয়েছে অধিকতর প্রকট ও ভয়ংকর। আমি বলি, আগের আয়াতের 'লাও' (যদি) শর্তসূচক অব্যয়টি 'ইজা' (যখন) ক্রিয়ার আধার হিসেবে বিবেচ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মৃত্যুকালে যখন তোমাদের মনোযোগ সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ হবে পরকালের প্রতি, তখন তোমাদের চোখে ভেসে উঠবে জাহান্নামের ভয়ংকর রূপ। কিন্তু তখন তোমাদের এমতো দর্শন তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচবার জন্য যে পুণ্যকর্ম করতে হয়, সে সুযোগ তো তখন তোমরা হারিয়েই ফেলবে চিরতরে।

এখানে 'দেখবে' অর্থ জানবে। অর্থাৎ 'রুয়ত' (দেখা) অর্থ এখানে 'ইলম' (জানা)। আবার এর অর্থ চাক্ষুষ দর্শনও হতে পারে। কেননা কবরে কাফেরদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নাম দেখানো হবেই। আমরা এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি ইতোপূর্বে সুরা ইনফিত্বরের তাফসীরের যথাস্থানে।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'ছুম্মা লাতারা উন্‌নাহা আ'ইনাল ইয়াক্বীন' (আবার বলি, তোমরা তো দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে)। একথার অর্থ— যে জাহান্নামের বিদ্যমানতা সম্পর্কে মৃত্যুকালে তোমরা ভালোভাবে জানতে পারবে, সেই জাহান্নামকে তোমরা চাক্ষুষ করে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে মহাপুনরুত্থানের পর হাশর প্রান্তরে। উল্লেখ্য, 'রুয়ত' (সাধারণ দর্শন) এবং 'আইনুল ইয়াকিন' চাক্ষুষ দর্শন সমঅর্থসম্পন্ন। একারণেই 'ইলম' (জানা) অর্থ চাক্ষুষ দর্শনও হয়।

এখানকার 'লাতারা উন্‌নাহা (তোমরা তো তা দেখবেই) কথাটির কর্মপদ 'আ'ইনুল ইয়াক্বীন' (চাক্ষুষ প্রত্যয়ে)। ক্রিয়ামূল দু'টি ভিন্ন হলেও এদু'টোর অর্থ অভিন্ন। অবশ্য ইতোপূর্বে বলা হয়েছে 'রুয়ত' অর্থ 'ইলম' (জানা, চেনা, দর্শন) তাই এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আগের ব্যাখ্যাটিকে বলতে হবে অচল এবং এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমরা তখন এমনভাবে জাহান্নামকে অবলোকন

www.eelm.weebly.com

করবে যে, তার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে অপরিহার্য। এটাই কারণ যে, দর্শন ও পর্যবেক্ষণের পর যে জ্ঞান অর্জিত হয় তার নামই 'ইলমূল ইয়াক্বীন'। আর জ্ঞানার্জনের শক্তিশালী বাহনই হচ্ছে চোখের দেখা।

রসুল স. বলেছেন, শ্রবণ দর্শনের মতো নয়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে খতীব বাগদাদী এবং উত্তম সূত্র সহযোগে হজরত আনাস থেকে তিবরানী। তবে এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে যথার্থ সূত্রে হাকেম এবং তিবরানী যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাতে অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাগুলো— আল্লাহ্ যখন প্রত্যাদেশযোগে রসুল মুসাকে তাঁর উম্মতের গোবৎসপূজক হয়ে যাওয়ার কথা জানালেন, তখন তিনি তওরাতের ফলকগুলো নিক্ষেপ করেননি। নিক্ষেপ করেছিলেন তখন, যখন বিষয়টি চাক্ষুষ করেছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে। মাটিতে পড়ে তখন ফলকগুলো ভেঙেও গিয়েছিলো।

কেউ কেউ বলেছেন, 'আ'ইনাল ইয়াক্বীন' বিশেষণটির বিশেষ্য এখানে রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ এমনই দর্শন, যা স্বয়ং প্রত্যয়। চাক্ষুষ করাকেই এখানে 'ইয়াক্বীন' বলা হয়েছে আধিক্য প্রকাশার্থে।

শেষোক্ত আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'এরপর অবশ্যই সে দিন তোমাদেরকে নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে'। একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমরা আমা কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করোনি কেনো, কেনোই বা হয়েছিলে অকৃতজ্ঞ, সে সম্পর্কে পরকালে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেই।

বাগবী লিখেছেন, মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহ্র অনুগ্রহসমুদ্রে ডুবে থাকে। তাই এ সম্পর্কে তখন তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেই। মুকাতিল বলেছেন, আল্লাহ্ মক্কার পৌত্তলিকদেরকে দিয়েছিলেন প্রভূত সম্মান ও ধনসম্পদ। অথচ তারা এক আল্লাহ্কে ছেড়ে উপাসক হয়েছিলো প্রতিমার। তাই তাদেরকে তাদের এমতো অকৃতজ্ঞতা সম্পর্কে পরকালে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবেই। হাসান বসরীও এরকম বলেছেন। হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত হয়েছে। তবে আলোচ্য আয়াতের সম্বোধনটি সার্বজনীন। এর দ্বারা যেনো সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে এই বলে সাবধান করা হয়েছে যে, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে যারা আল্লাহ্র আনুগত্য পরিত্যাগ করে অন্যের উপাসনায় জীবন কাটিয়ে দেয়, তাদেরকে প্রতিফল দিবসে কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। ফলে পরিত্রাণ তারা পাবেই না। আবার এরকমও হতে পারে যে, এমতো সার্বজনীন সাবধানবাণী ঘোষিত হয়েছে এই সুরার ৬ থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমরা সকলেই এর আওতাভূত'। এক হাদিসে বলা হয়েছে, মুমিনদেরকে তাদের কবরের মধ্যে দেখানো হবে তার জন্য নির্ধারিত জাহান্নামের ওই স্থানটি, যার বিনিময়ে তাকে দেওয়া হয়েছে জান্নাত, যাতে করে সে হতে পারে অধিকতর কৃতজ্ঞচিত্ত।

www.eelm.weebly.com

একটি উপযোগ ঃ কোরআনের বাকভঙ্গি অনুসারে প্রমাণিত হয় যে, কেবল প্রচুর বিত্তবৈভবের অধিকারীদেরকেই কেবল প্রতিফল দিবসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর এখানেও বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেভাবে। কিন্তু একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, সুবিদিত হাদিস দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয়েছে, তখন অনুগ্রহসম্ভারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলকেই।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে হজরত ইবনে মাসউদ উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তখন মানুষকে এ বিষয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, তাদেরকে প্রদত্ত নিরাপত্তা ও সুস্থতার কৃতজ্ঞতা তারা প্রকাশ করেছিলো কিনা। হজরত ইবনে আব্বাস এ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ্পাক তখন জিজ্ঞেস করবেন চোখ, কান ও শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কেও। অর্থাৎ তাকে তখন বলা হবে শরীর ও তার অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ সে ব্যবহার করেছিলো কোন কাজে? ইবনে আবী হাতেম। মুজাহিদ বলেছেন, তখন জিজ্ঞেস করা হবে সকল আস্বাদ্য সামগ্রী সম্পর্কেও। ফারইয়াবী, আবু নাঈম। কাতাদা সূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্পাক কর্তৃক প্রদত্ত সকল দান-অনুদান সম্পর্কেও সেদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ইমাম আহমদ তাঁর 'জুহুদ' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত আবু কেলাবা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক ময়দার রুটি ভক্ষণ করবে মধু ও ঘি সহযোগে। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন কিছুসংখ্যক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কীরূপ নেয়ামত সম্পর্কে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে? আমরা তো ভক্ষণ করি রুটি ও খেজুর। আর সতত সশস্ত্র থাকি শত্রুর আক্রমণাশংকায়। তিনি স. বললেন, ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করো। অচিরেই তোমাদের অধিকারায়ত্ত হবে অজস্র নেয়ামত।

ইকরামা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! কোন অনুগ্রহ আমাদের জন্য সুলভ? আমরা প্রায়শ দিনাতিপাত করি অর্ধাহারে। খাই কেবল যবের রুটি। তাদের এমতো নিবেদনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো 'হে আমার নবী! তাদেরকে বলুন, উত্তপ্ত বালুকা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমরা কি পাদুকা ব্যবহার করো না? পান করো না কি শীতল পানি'?

হজরত আলী বলেছেন, যে ব্যক্তি গমের রুটি আহার করে, সূর্যোত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উপভোগ করে ছায়া, পান করে সুপেয় পানি, তাকেও সেদিন এ সকলকিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, একবার রসুল স. মান্যবর আবু বকর ও ওমরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন আবুল হাইছুমের গৃহে। সেখানে তাঁরা আহার করলেন খেজুর ও গোশত এবং পান করলেন পানি। পানাহারপর্ব শেষ হলে তিনি স. বললেন, এগুলোই ওই নেয়ামত, যেগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তাঁর সহচরবৃন্দ উচ্চারণ করলেন 'আল্লাহু আকবর'। তিনি স. পুনরায়

www.eelm.weebly.com

বললেন, যখন তোমরা আহার্যসামগ্রীর সম্মুখে উপবেশন করবে, তখন শুরুতেই উচ্চারণ করবে 'বিসমিল্লাহি ওয়া আ'লা বারাকাতিল্লাহ্'। আর পানাহার শেষ হলে বলবে 'আলহামদু লিল্লাহিল্ লাজী হুয়া আস্বাগানা ওয়া আরওয়ানা ওয়া আনআ'মা আ'লাইনা ওয়া আফদ্বাল'। অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও। তাঁর মাধ্যমে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা জ্ঞানচর্চায় পরস্পরের শুভানুধ্যায়ী হয়ো। কারো কাছে কেউ জ্ঞান গোপন কোরো না। জ্ঞান আত্মসাৎ ধন আত্মসাৎ অপেক্ষা অধিক অপকৃষ্ট। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রশ্ন করবেন। তিবরানী, ইসপাহানী। হজরত আবু দারদা থেকে ইমাম আহমদ ও ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন, সর্বপ্রথম বান্দাকে প্রশ্ন করা হবে, তোমরা যে জ্ঞানার্জন করেছিলে, সে সম্পর্কে কী ব্যবস্থা নিয়েছিলে?

হজরত ইবনে ওমর থেকে তিবরানী সুপরিণত সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একজন বান্দা যেমন তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, তেমনি জিজ্ঞাসিত হবে তার যোগ্যতা সম্পর্কে। আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বান্দা তার একটি পদক্ষেপ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসিত হবে। বলা হবে, তোমার ওই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিলো কী?

আবু নাঈম ও ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, হজরত মুয়াজ কর্তৃক বর্ণিত একটি সুপরিণত সূত্রবিশিষ্ট হাদিসে এসেছে, প্রতিফল দিবসে বান্দাকে তার প্রতিটি উদ্যোগ সম্পর্কে কৈফিয়ত দিতে হবে। এমনকি তার চোখে সুরমা ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও। সুপরিণত সূত্রসহযোগে হাসান বসরী বলেছেন, যখন কোনো বান্দা ভাষণ দেয়, তখনই সে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহির দায়ে দায়ী হয়ে যায়। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তার ভাষণদানের উদ্দেশ্য ছিলো কী? হাদিসটি উত্তম পর্যায়ের এবং অপরিণত সূত্রবিশিষ্ট। বর্ণনা করেছেন বায়হাকী।

আলোচ্য আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'ছুম্মা' (এরপর) শব্দটির দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষকে নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে জাহীম, জাহান্নাম দেখার পর। আমি বলি, এরকম বলার কারণ হচ্ছে, নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে পুলসিরাতে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'থামাও ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে'। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ না করা পর্যন্ত বান্দা পুলসিরাত থেকে অগ্রসর হতে পারবে না। যেমন— ১. সে তার আয়ুষ্কালকে ব্যবহার করেছিলো কোন কাজে ২. শরীরকে শ্রান্ত করেছিলো কোন কাজের জন্য। ৩. কী কাজে লাগিয়েছিলো অর্জিত জ্ঞানকে এবং ৪. সম্পদ আয় ও ব্যয় করেছিলো কোথায়, কীভাবে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিরমিজি ও ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বর্ণনা করেছেন। কুরতুবী লিখেছেন, এই সাধারণ বিধান থেকে তাঁরা ওই মুসলমানদের সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস উল্লেখ করেছেন, যারা বিনা হিসাবে প্রবেশ করবেন জান্নাতে।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে ওমর থেকে হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার তাঁর সহচরবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বললেন, প্রতিদিন এক হাজার আয়াত পাঠ করার সাধ্য কি তোমাদের নেই? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম নবী! এরকম সাধ্য হবে কার? তিনি স. বললেন, কেনো? তোমরা প্রতিদিন সুরা তাকাছুরও কি পাঠ করতে পারবে না?

সূরা আ'সর

৩ আয়াত বিশিষ্ট এই সুরাখানির অবতরণ স্থল মহাপুণ্যময় নগরী মক্কা।

সূরা আ'সর ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

وَالۡعَصۡرِ ۙ﴿۱﴾ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِىۡ خُسۡرٍ ۙ﴿۲﴾ اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوۡا بِالۡحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ ﴿۳﴾

r মহাকালের শপথ,

r মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত,

r কিন্তু উহারা নহে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

'ওয়াল আ'সর' অর্থ মহাকালের শপথ। হজরত ইবনে আব্বাস এরকমই অর্থ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে মহাকালের শপথ করা হয়েছে এ জন্য যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের জন্য মহাকাল প্রসঙ্গটি ভীতি উদ্রেকক ও শুভ উপদেশ প্রদায়ক। ইবনে কীসান বলেছেন, এখানে 'কাল' অর্থ দিবারাত্রি। হাসান বসরী বলেছেন, দ্বিপ্রহরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে বলে আ'সর। কাতাদা বলেছেন, আ'সর বলে দিবসের শেষ প্রহরকে। মুকাতিল বলেছেন, শব্দটির অর্থ আসরের নামাজ। এটাই দিবারাত্রির মধ্যভাগের নামাজ। সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে আমরা এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে 'ইন্নাল ইনসানা লাফী খুসরিন' (মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত)। এখানকার 'খুসরিন' পদের তানভীন গুরুত্বপ্রকাশক। মূল পুঁজির বিনাশকে বলে 'খুস্র'। মানুষও সাধারণতঃ তেমনি তার জীবন, সময় ও সম্পদ এমন কাজে ব্যয় করে, যা আখেরাতে তার কোনো কাজেই আসে না। সেকারণেই এখানে বলা হয়েছে, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে— 'ইল্লাল্ লাজীনা আমানূ ওয়া আ'মিলুস্ সলিহাত' (কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে)। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও পরকালে বিশ্বাস রাখে এবং তাদের জীবন, সময়, সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তারা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত নয়। বরং তারা লাভবান। কেননা তারা নশ্বর উপকরণের দ্বারা ক্রয় করতে পারে অনশ্বর সফলতা।

www.eelm.weebly.com

'ওয়া তাওয়া সও বিল্ হাক্ব' অর্থ এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। কাতাদা এবং হাসান বলেছেন, এখানে 'হাক্ব' অর্থ কোরআনপাক। আর মুকাতিল বলেছেন, ইমান ও তওহীদ। আর 'ওয়া তাওয়াসাও বিস্ সবর' অর্থ এবং ধৈর্যের উপদেশ দেয়। অর্থাৎ যারা পরস্পরকে ওই সকল বিষয় থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়, যে সকল বিষয় আল্লাহ্ পাকের কোপ উদ্রেকক।

'সবর' এর সাধারণ অর্থ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সে ধৈর্য বা সহিষ্ণুতা আল্লাহ্র আনুগত্যের বিষয়ে হোক, অথবা হোক নিকৃষ্ট বিষয়াবলী পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে। আর এখানকার 'সৎকর্ম' অর্থ সাধারণ সৎকর্ম। অথবা ওই সকল ক্রিয়াকলাপ, যা একজন মানুষকে করে পরিশুদ্ধ মানুষ। সত্যাধিষ্ঠিত থাকা এবং ধৈর্য ধারণ করাও সৎকর্মের অর্ন্তভূত এবং এদু'টো বিশেষ সৎকর্মও পরিশুদ্ধতা অর্জনের সহায়ক। এগুলো বাদে অন্য সকল ক্রিয়াকলাপ ধ্বংসের উপলক্ষ। ইব্রাহিম বলেছেন, মানুষ বয়োবৃদ্ধ হলে ক্ষতির মধ্যে পড়ে যায়। সে তখন হয়ে যায় পুণ্যকর্ম সম্পাদনের ও পুণ্যের বিনিময় লাভের অনুপযুক্ত। হয়ে যায় পশ্চাদবর্তী। কিন্তু মুমিন ব্যক্তি বয়োবৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তখন তার আমলনামায় ওই সকল পুণ্যকর্মের বিনিময় লেখা হতে থাকে, যে সকল পুণ্যকর্ম সে সম্পাদন করতো যৌবনে, সুস্থাবস্থায়। অর্থগত দিক থেকে আয়াতখানি ওই আয়াতের সমতুল, যেখানে বলা হয়েছে 'আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে, অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদেরও হীনতমে পরিণত করি কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ; এদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার'।

মাসআলা ঃ সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করা এবং অসৎকর্মের প্রতিবন্ধক হওয়া একটি আবশ্যকীয় কর্তব্যকর্ম। এই দায়িত্বটি যারা পালন করে না, তারা ক্ষতিগ্রস্ত। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের সম্মুখে যদি শরিয়তবিরুদ্ধ কোনো কর্ম উপস্থিত হয়, তবে তোমরা প্রতিরোধ কোরো শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে, না পারলে কথার মাধ্যমে এবং তা-ও না পারলে ওই কর্মের প্রতি পোষণ কোরো আন্তরিক ঘৃণা। আর সেটা হবে দুর্বলতর ইমান। মুসলিম।

বাগবী তাঁর 'শরহে সুন্নাহ্'য় লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বিশেষ লোকের দুষ্কর্মের শাস্তি সাধারণ লোকের উপরে চাপিয়ে দেন না। তবে সর্বসাধারণ তাদের সম্মুখে অপকর্ম হতে দেখেও বাধা না দিলে আল্লাহ্ শাস্তি অবতীর্ণ করেন বিশেষ সাধারণ সকলের উপরে। হজরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে সুপরিণত সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও ইবনে মাজা।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, যে জাতির মধ্যে পাপকর্মের প্রসার ঘটে, সেই জাতি যদি তা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সংস্কার না করে তাহলে মনে রেখো, অচিরেই তাদের উপরে আপতিত হবে নৈসর্গিক বিপদাপদ। আল্লাহ্ই সমধিক পরিজ্ঞাত।

www.eelm.weebly.com

সূরা হুমাযাহ্

এই সুরাখানির অবতরণ স্থলও মহাপুন্যময় নগরী মক্কা। এর মধ্যে আয়াত রয়েছে ৯টি।

সূরা হুমাযাহ্ ঃ আয়াত ১— ৯

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۝

وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ﴿۱﴾ الَّذِىۡ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ ۙ﴿۲﴾
يَحۡسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخۡلَدَهٗ ۚ﴿۳﴾ كَلَّا لَيُنۡۢبَذَنَّ فِى الۡحُطَمَةِ ۖ﴿۴﴾ وَ مَاۤ
اَدۡرٰٮكَ مَا الۡحُطَمَةُ ؕ﴿۵﴾ نَارُ اللّٰهِ الۡمُوۡقَدَةُ ۙ﴿۶﴾ الَّتِىۡ تَطَّلِعُ عَلَى
الۡاَفۡـِٕدَةِ ؕ﴿۷﴾ اِنَّهَا عَلَيۡهِمۡ مُّؤۡصَدَةٌ ۙ﴿۸﴾ فِىۡ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿۹﴾

r দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে,
r যে অর্থ জমায় ও উহা বার বার গণনা করে;
r সে ধারণা করে যে, তাহার অর্থ তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে;
r কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হইবে হুত্বামায়;
r তুমি কি জান হুত্বামা কী?
r ইহা আল্লাহ্র প্রজ্বলিত হুতাশন,
r যাহা হৃদয়কে গ্রাস করিবে;
r নিশ্চয় ইহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে
r দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

'ওয়াইলুল্ লিকুল্লি হুমাযাতিল লুমাযাহ্' অর্থ দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন 'হুমাযাহ্' ও লুমাযাহ্' শব্দ দু'টো সমঅর্থসম্পন্ন। 'হুমাযাহ্' অর্থ নিন্দুক, যারা অপরের অসাক্ষাতে তার দোষবর্ণনা করে। আর 'লুমাযাহ্' অর্থ কলঙ্ক লেপনকারী, যারা নিষ্কলঙ্ক লোকের চরিত্রে আরোপ করে কলঙ্ক। মুকাতিল বলেছেন, সামনাসামনি দোষারোপ করাকে বলে 'হুমাযাহ্' এবং 'লুমাযাহ্' বলে আড়ালে, অনুপস্থিতিতে দোষচর্চা করাকে। আবুল আলিয়া ও হাসান বসরী বলেছেন এর বিপরীত। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন 'হুমাযাহ্' হচ্ছে পরনিন্দুক, মানুষের গোশত ভক্ষণকারী তুল্য। আর 'লুমাযাহ্' হচ্ছে অপবাদ আরোপকারী, দোষারোপকারী।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, ওই ব্যক্তিকে 'হুমাযাহ্' বলে, যে হাতের কুৎসিত ইঙ্গিতে মানুষকে মর্মাহত করে। আর কথার দ্বারা মানুষের দোষবর্ণনাকারীকে বলে 'লুমাযাহ্'। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, কথার দ্বারা নিন্দা করা 'হুমাযাহ্'। আর

www.eelm.weebly.com

চোখের ইশারায় দোষচর্চা করা 'লুমাযাহ্'। ইবনে কীসান বলেছেন, যে ব্যক্তি তার সঙ্গী-সাথীদেরকে শানিত কথায় জর্জরিত করে সে 'হুমাযাহ্'। আর 'লুমাযাহ্' ওই ব্যক্তি, যে মানুষের দোষ প্রকাশ করে চোখ, মাথা, অথবা ভ্রূ'র দ্বারা।

আমি বলি 'হুমাযাহ্' এর আভিধানিক অর্থ ভেঙে দেওয়া, প্রবঞ্চনা করা। এক হাদিসে প্রার্থনা করা হয়েছে 'আল্লাহুম্মা ইননী আউজুবিকা মিন হামাযাতিশ শায়াত্বীন' (হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যাবতীয় শয়তানের প্রতারণা থেকে রক্ষা করো)। আর 'লুমাযাহ্' অর্থ দোষারোপ। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শব্দদু'টোর অর্থ দাঁড়ায়— এরূপ সমালোচনা, যার দ্বারা মানুষের মানসম্ভ্রম আহত হয়। মানুষ হয় কলংকিত। এ সব অপকর্মে যারা অভ্যস্ত, তারাই 'হুমাযাহ্' ও 'লুমাযাহ্'।

হজরত ওসমান ও হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমরা সর্বক্ষণ একথাই শুনে এসেছি যে, এই আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে উবাই ইবনে খালফকে লক্ষ্য করে। এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী হাতেম। সুদ্দীর বর্ণনায় এসেছে, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আখনাস ইবনে শুরাইক ইবনে ওয়াহাব সাকাফীকে কেন্দ্র করে। রেকা অধিবাসীদের জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, জামীল ইবনে আমেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। ইবনে ইসহাক সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, উমাইয়া ইবনে খালফ সব সময় রসুল স. এর সমালোচনা করতো। তার সম্পর্কেই এই সুরা অবতীর্ণ হয়। ওলীদ ইবনে মুগীরাও সব সময় ছিলো রসুল স. এর সমালোচনামুখর। সে-ও এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যে অর্থ জমায় ও তা বার বার গণনা করে (২) সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে' (৩)। একথার অর্থ— উমাইয়া ইবনে খালফ এবং ওলীদ ইবনে মুগীরার মতো ধনবান সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা মনে করে দরিদ্র জনসাধারণই কেবল অনাহারে-অর্ধাহারে ধুঁকে ধুঁকে মরে, ধনবানেরা মরে না। কিন্তু এরকম আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ এখানে সমীচীন নয়। কেননা পৃথিবীতে অমর যে কেউ নয়, তা সকলেই জানে। তাই এখানে কথাটির অর্থ হবে— দীর্ঘ জীবনের আশা ও লালসাই তাদেরকে মৃত্যুর মতো মহাবিপদ থেকে উদাসীন করে রাখে। অথবা বাক্যটি উপেক্ষামূলক, শ্লেষাত্মক। প্রকৃত প্রস্তাবে অমরতা কখনো ধন-সম্পদনির্ভর নয়, ইমান ও পুণ্যকর্মনির্ভর।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, একবার রসুল স. মাটিতে আঁকলেন একটি বর্গক্ষেত্র। তার মাঝামাঝি অংকন করলেন একটি সরলরেখা। এরপর আরো কিছু রেখা আঁকলেন সরল রেখাটির দু'পাশে। তারপর বললেন, মাঝের সরল রেখাটি মানুষ। আর দু'পাশের রেখাগুলো তার পরিকল্পনাসমূহ। যদি এক পাশের রেখা থেকে সে মুক্তি পায়, তবে তাকে জড়িয়ে ধরে আর এক পাশের রেখাগুলো। এভাবে সে একবার জড়িয়ে যায় এদিকে, আরেকবার ওদিকে। হজরত আনাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. পাশাপাশি

www.eelm.weebly.com

কয়েকটি রেখা অংকন করলেন। তারপর মাঝের দু'টি রেখার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এটা মানুষের আশা এবং এটা তার মৃত্যু। সে সতত আশার ছলনেই মগ্ন হয়ে থাকে। সহসা এসে পড়ে মৃত্যু।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'কখনো না'। একথার অর্থ— পরনিন্দা, ধনলিপ্সা ও অনিয়ন্ত্রিত আশা অবশ্যপরিত্যাজ্য। এরপর বলা হয়েছে 'সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুত্বামায়'। বাক্যটি একটি অনুক্ত শপথের জবাব। আবার এরকমও বলা যেতে পারবে যে, 'কাল্লা' অর্থ এখানে সঠিক। এমতাবস্থায় শপথের জন্য অর্থটি হবে যথার্থ। আর আলোচ্য বাক্যের জবাব হবে 'হুত্বামাহ্'। 'হুত্বামাহ্' একটি জাহান্নামের নাম। 'হাত্বাম' অর্থ পিষ্ট করা, চূর্ণ করা। যেহেতু তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তাই তারা সেখানে আগুনের আঘাতে হতে থাকবে চূর্ণ-বিচূর্ণ। একারণেই জাহান্নামের আর এক নাম 'হুত্বামাহ্'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সে যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তা সুনিশ্চিত।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তুমি কি জানো হুত্বামা কী (৫)? এটা আল্লাহ্র প্রজ্জ্বলিত হুতাশন' (৬)। এভাবে এখানে প্রশ্ন আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জাহান্নামের বিশাল ভয়াবহতাকে। কিছু জানার জন্য এখানে প্রশ্ন করা হয়নি। যেনো বলতে চাওয়া হয়েছে— তোমরা জাহান্নামের ভয়ংকর রূপ সম্পর্কে অনবহিত। তোমাদের পক্ষে ভাবনা-চিন্তা করেও বিষয়টি অনুধাবন করা দুঃসাধ্য।

'নারুল্লহি মূক্বাদাহ্' অর্থ এটা আল্লাহ্র প্রজ্জ্বলিত হুত্বাশন। দোজখের আগুনকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে ধরার জন্যই এখানে আগুনকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে আল্লাহ্র সঙ্গে। বলা হয়েছে— আল্লাহ্র প্রজ্জ্বলিত আগুন। এতে করে একথাই প্রকাশ পায় যে, আল্লাহপাক কতোই না প্রতাপশালী (আল্লাহ্পাক রক্ষা করুন)। উল্লেখ্য, আল্লাহ্পাকের 'জালাল' (প্রাবাল্য) 'জামাল' (কোমলতা) সকল প্রকার গুণই চরম পূর্ণত্বসম্পন্ন, যা মানুষের ধারণা-অনুমানের ঊর্ধ্বে।

'আল মূক্বাদাহ্' (প্রজ্জ্বলিত) পদটি এখানে অগ্নির বিশেষণ। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে এমন ভয়ংকর অগ্নি প্রজ্জ্বলন করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি সম্ভব নয় একে নিভিয়ে দেওয়াও। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দোজখের আগুন এক হাজার বৎসর ধরে জ্বলতে জ্বলতে ধারণ করেছিলো লালরঙ। এরপর আরো এক হাজার বৎসর পর হয়েছিলো শাদা। এরপরে আরো এক হাজার বৎসর পর ঘোর কালো। তারপর থেকে তার কালো রঙ আর পরিবর্তিত হয়নি। তিরমিজি।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'যা হৃদয়কে গ্রাস করবে'। একথার অর্থ— ওই অগ্নি পৌঁছে যাবে অন্তরাত্মা পর্যন্ত। 'ইত্তিলা' ও 'বুলুগ' শব্দ দু'টো সমার্থক। যেমন আরবী প্রবচনে বলা হয় 'ইত্তালাইতা আরাদ্বনা' (তুমি আমাদের দেশে পৌঁছে গিয়েছো)। স্বসূত্রে ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, খালেদ ইবনে ইমরান উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নরকাগ্নি নারকীদেরকে গ্রাস করবে।

www.eelm.weebly.com

পৌঁছে যাবে তাদের কলিজা পর্যন্ত। এরপর লোকটি পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। আবার তাকে গ্রাস করবে আগুন এবং পুনরায় তা পৌঁছে যাবে তার হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত। এভাবে পুনঃপুনঃ তার শাস্তি চলতেই থাকবে অনন্তকাল ধরে। এরকম বলেছেন কুরতুবী ও কালাবী।

আমি বলি, এখানে 'যা হৃদয়কে গ্রাস করবে' কথাটি বলার উদ্দেশ্য এরকম হতে পারে যে, মানুষ যেনো হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে দোজখের আগুনের শাস্তির নিরবচ্ছিন্নতা কতো ভয়ংকর। জাগতিক আগুন তো সেরকম নয়। পৃথিবীর আগুন গায়ে লাগলে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই মানুষের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু দোজখের আগুন কলিজা পর্যন্ত পৌঁছলেও মৃত্যু আসবে না। অর্থাৎ বিরতিহীনভাবে শাস্তি চলতেই থাকবে। অথবা বলা যায়, মানবদেহের মধ্যে হৃদয়ই সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল ও সূক্ষ্ম অংশ। তাই এখানে বলা হয়েছে, হৃদয়কে গ্রাস করবে। কিংবা কথাটি এখানে এভাবে বলা হয়েছে এ কারণে যে, হৃদয়ই অপবিশ্বাস ও যাবতীয় দুষ্কর্মের মূল। অর্থাৎ অপবিত্র হৃদয়ই যেহেতু নরকাগ্নির প্রসূতি গৃহ, তাই নরকের আগুন তো হৃদয়কে গ্রাস করবেই।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় এটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে (৮) দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে' (৯)। এখানকার 'আ'লাইহিম' (তাদেরকে) কথাটি সম্পর্কযুক্ত 'মু'সাদাতুন' (পরিবেষ্টন করে রাখবে) বাক্যের সঙ্গে। আর এখানে বহুবচনবোধক সর্বনাম ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রথম আয়াতের 'কুল্‌লি' (প্রত্যেকের) কথাটি অর্থগত দিক দিয়ে বহুবচনার্থক। আর পুরো বাক্যটি অসম্পৃক্ত একটি নতুন বাক্য।

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, দোজখবাসীরা দোজখ থেকে বের হতে পারবে না কেনো? এমতো প্রশ্নের জবাবেই এখানে বলা হয়েছে 'নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে'। 'মু'সাদাহ্' শব্দটির অর্থই পরিবেষ্টন করে রাখা, বা আবদ্ধ রাখা। সুপরিণত সূত্রে অনুরূপ একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক। যেমন 'আওসাত্‌তুল বাব' অর্থ আমি দরজা বন্ধ করেছি।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, দু'জন করে দোজখবাসীকে আবদ্ধ করা হবে একটি লোহার সিন্দুকে। তার উপরে ঠুকে দেওয়া হবে লোহার পেরেক। এভাবে কয়েকটি সিন্দুককে আবদ্ধ করা হবে আর একটি সিন্দুকের ভিতরে। তারপর এরকম সিন্দুকগুলিকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখের অতল গহবরে। ফলে দোজখীরা পরস্পরকে দেখতেই পাবে না। এই হাদিসটি আবার হজরত সুয়াইদ ইবনে গাফলা থেকে বর্ণনা করেছেন আবু নাঈম ও বায়হাকী।

'ফী আ'মাদিম মুমাদ্দাদাহ্' অর্থ দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে। অর্থাৎ তাদেরকে জড়িত করা হবে সুদীর্ঘ স্তম্ভের সঙ্গে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে স্তম্ভ (ফী আ'মাদ) কথাটির সম্পর্ক হবে একটি অনুক্ত শব্দ 'জড়িত' (মু'সিদ্বীন) এর সঙ্গে।

www.eelm.weebly.com

এরকমও বলা যেতে পারে যে, শব্দটি সম্পর্কযুক্ত এখানকার ‘মুমাদ্দাদাহ্’ এর সঙ্গেই। এমতাবস্থায় অগ্নি হবে স্তম্ভের অভ্যন্তরে। ‘উ’মুদ’ এর বহুবচন ‘আ’মাদ’, যেমন ‘উদুম’ বহুবচন ‘আদাম’ এর। ফাররা এরকম বলেছেন। আবু উবায়দা বলেছেন, ‘আ’মাদ’ ‘ইমাদ’ এর বহুবচন, যেমন ‘ইহাব’ বহুবচন ‘আহাব’ এর।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই সকল স্তম্ভের মধ্যে নরকবাসীদেরকে প্রবেশ করানো হবে। তারপর সেগুলোর উপরে স্থাপন করানো হবে আরো অনেক স্তম্ভ। আর তাদের গলদেশে পরানো হবে কয়েদীদের মতো শিকল। তারপর বন্ধ করে দেওয়া হবে দোজখের দরোজা। কাতাদা বলেছেন, আমার নিকটে এই তথ্যটি পৌঁছেছে যে, ওই সকল স্তম্ভের দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে নরকাভ্যন্তরে। মুকাতিল বলেছেন, তাদেরকে ওই স্তম্ভগুলোর সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে বন্ধ করে দেওয়া হবে নরকের দরোজা। তারপর দরোজায় এঁটে দেওয়া হবে লৌহকীলক। অন্য কেউ তখন সেখানে উপস্থিত হতে পারবে না। ‘মামদুদা’ অর্থ সুদীর্ঘ, সুপ্রশস্ত। সুদীর্ঘ হওয়ার কারণেই তা আটকে থাকবে অধিক শক্তভাবে। আল্লাহ্ই সমধিক অবহিত।

সূরা ফীল

৫ আয়াত বিশিষ্ট এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে চিরশান্তিধাম ও মহাপুণ্যময় মক্কা নগরীতে।

সূরা ফীল ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥

r তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক হস্তী-অধিপতিদের প্রতি কী করিয়াছিলেন?

r তিনি কি উহাদের কৌশল ব্যর্থ করিয়া দেন নাই?

r উহাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন,

r যাহারা উহাদের উপর প্রস্তর-কংকর নিক্ষেপ করে।

r অতঃপর তিনি উহাদিগকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন।

প্রথমে বলা হয়েছে ‘আ লাম তারা (তুমি কি দ্যাখোনি)। অর্থাৎ হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! আপনি কি বিষয়টি লক্ষ্য করেননি? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক, যার পরিণতি স্বীকৃতিমূলক। কেননা না-সূচকেও নেতিবাচকতায় সৃষ্টি হয় হাঁ-সূচকতার।

www.eelm.weebly.com

এভাবে কথাটির সরাসরি অর্থ দাঁড়াবে— হে আমার বাণীবাহক! আপনি নিশ্চয় বিষয়টি লক্ষ্য করে থাকবেন। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে আবরাহার হস্তিবাহিনীর ধ্বংস হওয়া প্রসঙ্গ। উল্লেখ্য, ওই হস্তিবাহিনীর ধ্বংস হওয়ার ঘটনা ঘটেছিলো রসুল স. এর পৃথিবীতে আগমনের আগে। সুতরাং তিনি ওই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেননি। দেখেছিলেন ধ্বংসের চিহ্নসমূহ পরে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর। অর্থাৎ ঘটনাটি যেহেতু ছিলো নিকট অতীতে, সেহেতু তিনি স. তা জানতেনই। তাই এখানে নিশ্চিতার্থক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে যে, আপনি তো তা পর্যবেক্ষণ করেছেনই। অথবা 'দেখা' অর্থ এখানে হবে— জানা, অথবা শোনা। অর্থাৎ আপনি তো তা জানেনই। যেহেতু ওই সর্বজনবিদিত ঘটনা আপনি বাল্যবেলা থেকেই শুনে এসেছেন। এভাবে এখানকার এই কথাটিতে এমতো ইঙ্গিতও রয়েছে যে, ওই বাহিনীর আরোহীদেরকে সত্যদ্রোহিতা ও সীমালংঘনের কারণে যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছিলো, সেভাবে তাদের উত্তরসূরীদেরকেও অবশ্যই ধ্বংস করা হবে।

এরপর বলা হয়েছে 'কাইফা ফাআ'লা রব্বুকা বিআস্হাবিল ফীল' (তোমার প্রতিপালক হস্তি-অধিপতিদের প্রতি কী করেছিলেন)। প্রশ্নটি বিস্ময়জ্ঞাপক। এজন্যই এখানে 'মা ফাআ'লা' না বলে বলা হয়েছে 'কাইফা ফাআ'লা'। উল্লেখ্য, একটি লুপ্ত রহস্যের দ্বারোন্মোচনের উদ্দেশ্যেই অবতারণা করা হয়েছে ঘটনাটির। এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে আল্লাহ্পাকের অতুলনীয় প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তা এবং তাঁর প্রিয়তম রসুলের প্রভূত মর্যাদা। কেননা ঘটনাটি ছিলো তাঁর রেসালতের অবতরণিকা এবং তাঁর মহাআবির্ভাবের পূর্বাভাস। নতুবা হস্তিবাহিনীর অধিপতিরা ছিলো পথভ্রষ্ট খৃষ্টান, আর তখনকার মক্কাবাসীরা ছিলো পৌত্তলিক। সুতরাং তাদের কাউকে বিজয়ী করার মধ্যে কোনো মহিমা নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ঘটনাটি ঘটেছিলো ২২শে মহররম, রবিবার। তথ্যটি সর্বজনস্বীকৃত এবং বোখারী-মুসলিম কর্তৃক সুপ্রত্যয়িত। এ সম্পর্কে ভিন্নমতগুলি সন্দেহমুক্ত নয়। ওই ঘটনার দু'মাস পরেই এ ধরাপৃষ্ঠে মহা আবির্ভাব ঘটেছিলো রসুল স. এর। অধিকাংশ মুসলিম মনীষী এরকমই বলেছেন। তাই এই সিদ্ধান্তটিই বিশুদ্ধ। অবশ্য মুকাতিল বলেছেন, রসুল স. এর মহাআবির্ভাব ঘটেছিলো ওই ঘটনার চল্লিশ বছর পর। কেউ কেউ বলেছেন, সত্তর বছর পর। খুলাসাতুল ইয়াসার।

'বিআস্হাবিল ফীল' অর্থ হস্তি-অধিপতির সাথে। অর্থাৎ ইয়েমেনের অধিপতি আবরাহা ও তার সঙ্গী-সাথীরা। জুহাক বলেছেন, তারা এসেছিলো আটটি হাতি নিয়ে। কেউ কেউ বলেছেন, সর্ববৃহৎ হাতিটির নাম ছিলো মাহমুদ। তার সঙ্গে হাতি ছিলো আরো ১২টি। 'আল ফীল' শব্দটি একবচনবোধক। ওই বাহিনীতে একাধিক হাতি থাকা সত্ত্বেও এখানে এভাবে একবচনার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাদের মধ্যের প্রধানটিকে লক্ষ্য করে। কেউ কেউ বলেছেন, এরকম করা হয়েছে ছন্দের চাহিদা পূরণার্থে।

www.eelm.weebly.com

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সাঈদ ইবনে যোবায়ের, ইকরামা সূত্রে ইবনে ইসহাক এবং ওয়াকেদীর বর্ণনায় এসেছে, তৎকালীন আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী তাঁর সেনাপতি আরিয়াতের অধীনে এক দল সৈন্য প্রেরণ করলো ইয়েমেন রাজ্য অধিকারের উদ্দেশ্যে। ইয়েমেন বিজিত হলো সহজেই। আবরাহা ইবনে সাবাহ ছিলো ওই বাহিনীর এক উচ্চাভিলাষী সেনানায়ক। মনে মনে সে ঈর্ষা করতো প্রধান সেনাপতি আরিয়াতকে। সুযোগ বুঝে একদিন সে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। যুদ্ধ হলো। আরিয়াত নিহত হলো। আর বিজয়ী হলো আবরাহা। এভাবে সে লাভ করলো পুরো বাহিনীর অধিকার।

শুরু হলো হজের মওসুম। আবরাহা লক্ষ্য করলো ইয়েমেনের বহু লোক হজযাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। ব্যাপারটা তার মোটেও পছন্দ হলো না। ভাবলো, এরা অতো দূরে মক্কায় যাবে কেনো? তার চেয়ে বরং কাবাগৃহের অনুকরণে এখানেই একটি উপাসনালয় নির্মাণ করা হোক। তাহলে মানুষ এখানেই হজ করতে পারবে। সে আর দেরী করলো না। কাবার আকৃতিতে নির্মাণ করলো একটি গীর্জা। তারপর সম্রাটকে লিখে জানালো, আমি ইয়েমেনের সানআ নামক স্থানে একটি মনোমুগ্ধকর উপাসনালয় নির্মাণ করিয়েছি। এতো সুন্দর ধর্মালয় কোনো রাজা বাদশাহ নির্মাণ করতে পারেনি। আপনি শীঘ্রই শুভপদার্পন ঘটিয়ে ধর্মগৃহটি দেখে যান। আমি তো হজেরও ব্যবস্থা করেছি। মানুষকে আর মক্কায় হজ করতে যেতে হবে না। সিদ্ধান্তটি কানে গেলো বনী কেনানার জনৈক ব্যক্তির। সে সানআতে উপস্থিত হয়ে অবস্থান গ্রহণ করলো ওই গীর্জায়। রাতে গীর্জাভ্যন্তর অপবিত্র করে দিয়ে সরে পড়লো সে। পরদিন আবরাহার কানে যখন এ সংবাদ পৌঁছলো, তখন সে রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লো। শপথ করলো, কাবাগৃহকে আমি ধূলিসাৎ করবোই। সে সম্রাটকে লিখে জানালো, আমাকে কিছু সংখ্যক হাতি পাঠিয়ে দিন। আমি কাবাগৃহ মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে আসবো। তখন জনগণের সানআয় হজ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। সম্রাট তার আবেদন মতো কিছুসংখ্যক হাতি পাঠিয়ে দিলো। সেগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎটির নাম ছিলো মাহমুদ।

আবরাহার পরিকল্পনার কথা ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র ইয়েমেনে— আরবে। আরববাসীরা ঠিক করলো, যেভাবে হোক আবরাহা বাহিনীকে তারা প্রতিরোধ করবেই। ইয়েমেনের এক আঞ্চলিক প্রশাসক জুনফার প্রথম গতিরোধ করলো আবরাহার। যুদ্ধ হলো। জুনফার হলো পরাজিত ও বন্দী। আবরাহা তাকে হত্যা করলো না। কিন্তু হাত পা বেঁধে রাখলো শক্ত করে। যাত্রা শুরু করলো মক্কাভিমুখে। পথে রুখে দাঁড়ালো নুফাইলের নেতৃত্বে খাছআম গোত্রের লোকেরা। সংঘর্ষ বাধলো। পরাজিত ও বন্দী হলো নুফাইল। বললো, আমি মক্কার পথ চিনি। সুতরাং আমাকে আপনি কাজে লাগাতে পারেন। আবরাহা তাকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দিলো। এভাবে আবরাহা বাহিনী পৌঁছলো তায়েফে। সেখানে মাসউদ ইবনে মুগীছ সাকাফী তার গোত্রের লোকদেরকে নিয়ে আবরাহার

www.eelm.weebly.com

সঙ্গে সাক্ষাত করলো। বললো, আমরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করলাম। আপনিও আমাদেরকে নিরাপত্তা দিন। আমরা আপনাকে একজন পথপ্রদর্শক দিচ্ছি। একথা বলে তারা পথপ্রদর্শক হিসেবে দিলো ক্রীতদাস আবু রগালকে। সে পুরো বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো। কিন্তু মারা গেলো মাগমাস নামক স্থানে পৌঁছে। সে স্থান অতিক্রম কালে এখনো মানুষ তার কবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করে। আবরাহা সেখানে থামলো। আসওয়াদ নামক এক হাবশী সৈন্যকে হুকুম দিলো, হেরেম এলাকার সকল উট, দুম্বা, ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে এসো। সে কুরায়েশ গোত্রপতি আবদুল মুত্তালিবের দুইশত উট হাঁকিয়ে নিয়ে এলো। এবার আবরাহা জনৈক বাহনাত হুমাইরিকে নির্দেশ দিলো, তুমি গিয়ে মক্কাবাসীদের প্রধানকে খুঁজে বের করো এবং তাকে একথা জানাও যে, আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এখানে আসিনি। এসেছি কেবল কাবাগৃহ ধূলিসাৎ করতে। বাহনাত মক্কায় গিয়ে আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে দেখা করে আবরাহার অভিপ্রায়ের কথা জানালো। আবদুল মুত্তালিব বললেন, এ গৃহ আল্লাহ্র। তিনিই এর রক্ষাকর্তা। আবরাহাকে বলো, তাকে বাধা দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের নেই। একথা বলে তিনি নিজেই উপস্থিত হলেন আবরাহার কাছে। তিনি ছিলেন সুদর্শন ও সুঠামদেহী। প্রথম দর্শনেই আবরাহা মুগ্ধ হলো। তাঁর প্রতি সম্ভ্রমবোধ জন্মালো তার মনে। আলোচনা শুরু হলো দোভাষীর মাধ্যমে। আবরাহা বললো, আপনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করুন। আবদুল মুত্তালিব বললেন, আমার উটগুলো ফেরত দিন। আবরাহা বিস্মিত হলো। বললো, আপনি কুরায়েশপ্রধান। কাবাগৃহের তত্ত্বাবধায়ক। কাবাগৃহ রক্ষা করা তো আপনার ধর্মীয় কর্তব্য। কিন্তু সে সম্পর্কে তো আপনি কিছুই বললেন না। তিনি জবাব দিলেন। উটগুলো যেহেতু আমার, তাই আমি উটগুলোই চাই। কাবাগৃহের মালিক তো আল্লাহ্। তিনিই একে রক্ষা করবেন। আবরাহা বললো, আমার হাত থেকে কেউই একে রক্ষা করতে পারবে না।

মান্যবর আবদুল মুত্তালিব তাঁর উটগুলো নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন। জনতাকে বললেন, তোমরা আশে পাশের উপত্যকাগুলোর দিকে চলে যাও। আবরাহাকে বাধা দিতে যেয়ো না। আমি কাবাগৃহের হেফাজত সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করলাম আল্লাহ্র কাছে। প্রার্থনা করলেন, হে বিশ্বজগতাধিপতি! আমরা নিরুপায়। তোমার গৃহকে তুমিই রক্ষা করো। রক্ষা করো আমাদেরকেও। এরপর কবিতা আবৃত্তি করলেন— তোমার বান্দারা তাদের সম্পদের হেফাজত করুক। তুমি হেফাজত করো তোমার গৃহের। ক্রুশের ধারক-বাহকদেরকে পরাভূত করো। তোমার কৌশলের কাছে ওরা পরাভব মানতে বাধ্য। আশ্চর্য! তারা চায় তোমার গৃহ উৎসন্ন হোক। পরাজিত হোক তোমার গৃহের প্রতিবেশীরা। কতোইনা মূর্খ তারা। তুমি যে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর ও চিরবিজয়ী, তা তারা জানেই না। তোমার ঘর এখন তোমার হেফাজতে। এখন তুমি যা ভালো মনে করো, তা-ই করো। প্রার্থনা ও কবিতা সমাপনের পর তিনি সকলকে নিয়ে মক্কা ছেড়ে চলে গেলেন।

www.eelm.weebly.com

তখন সকাল। আবরাহা তার বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হলো। নুফাইল প্রধান হাতিটার কানে কানে বললো, মনে রেখো, এখন তুমি অবস্থান করছো আল্লাহ্র মহাসম্মানিত গৃহের এলাকায়। সুতরাং আল্লাহ্র গৃহের সম্মান রক্ষা করে এখানেই চুপচাপ বসে থাকো। নতুবা যেখান থেকে এসেছো, সেখানেই ফিরে যাও। হাতিটি চুপচাপ বসে রইলো। অনেক চেষ্টা করেও তাকে ওঠানো গেলো না। উপর্যুপরি প্রহারের আঘাতেও সে সেখান থেকে নড়লো না। শেষে যখন তার চোখের পাশে হানা হলো অঙ্কুষের আঘাত, তখন সে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু যাত্রা শুরু করলো ইয়েমেনের দিকে। কোনোক্রমেই তাকে আর কাবামুখী করা গেলো না। বরং ক্রমাগত অঙ্কুষের আঘাত খেয়ে পুনরায় বসে পড়লো। আল্লাহ্পাক সমুদ্রের দিক থেকে পাঠালেন আবাবিল নামের এক ঝাঁক ক্ষুদ্র পাখি। তারা তাদের দুই ডানায় দু'টি এবং চঞ্চুতে একটি করে মসুর দানার মতো ক্ষুদ্র প্রস্তরকণা বহন করে নিয়ে এলো। পুরো বাহিনীর উপর বর্ষণ করতে লাগলো প্রস্তরকণাগুলো। ফলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগলো বাহিনীর লোকেরা। এদিকে ওদিকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেও বাঁচতে পারলো না। আবরাহা হঠাৎ আক্রান্ত হলো এক অজানা রোগে। প্রথমে তার হাতের আঙ্গুলের গিটগুলো ফুলে গেলো। তারপর আঙ্গুল খসে পড়তে লাগলো একটি একটি করে। পালিয়ে গিয়ে সে কোনোমতে সানআ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলো ঠিকই, কিন্তু বেশীক্ষণ বাঁচতে পারলো না। তার বুক স্ফীত হতে শুরু করেছিলো আগে থেকেই। হঠাৎ স্ফীতবুক গেলো ফেটে। সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গ হলো তার ভবলীলা।

ওয়াকেদী লিখেছেন, হাতিগুলো অক্কা পেয়েছিলো প্রস্তরকণার আঘাতে। বেঁচে গিয়েছিলো কেবল মাহমুদ নামের সর্ববৃহৎ হাতিটি। কেননা সে আল্লাহ্র গৃহের প্রতি প্রদর্শন করেছিলো সম্মান।

কাবা শরীফে হস্তিযুথের আক্রমণের উপলক্ষ সম্পর্কে মুকাতিল ইবনে সুলায়মান বর্ণনা করেছেন, একবার কয়েকজন কুরায়েশ বণিক বাণিজ্য ব্যপদেশে নাজ্জাশীর দেশে গমন করলো। একস্থানে সাগর তীরে তারা যাত্রাবিরতি করলো। রান্নাবান্না করলো সেখানে। পানাহার করলো। তারপর যাত্রা করলো সম্মুখের দিকে। এক সময় তাদের চুলার আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ বাতাসের সঙ্গে উড়ে গিয়ে পড়লো নিকটবর্তী এক গীর্জার উপর। ফলে আগুন ধরে গেলো। আর ওই আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেলো গীর্জাটি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি কানে গেলো নাজ্জাশীর। সে তখন পণ করলো, এর প্রতিশোধ নিতে কাবাগৃহ সে ধ্বংস করবেই।

সে সময় আবু মাসউদ নামে ছিলেন এক সাধু পুরুষ। তিনি ছিলেন দৃষ্টিহীন। তিনি গ্রীষ্মকালে বাস করতেন তায়েফে এবং শীতকালে মক্কায়। মানুষ তাঁকে মান্য করতো। সংকটে-বিপদে পরামর্শ গ্রহণ করতো তাঁর। মান্যবর আবদুল মুত্তালিব ছিলেন তাঁর একান্ত সুহৃদ। আবরাহা বাহিনী যখন মক্কার কাছাকাছি এসে যাত্রা স্থগিত করলো, তখন আবদুল মুত্তালিব আবু মাসউদের কাছে ছুটে গেলেন। কামনা করলেন তাঁর পরামর্শ। আবু মাসউদ বললেন, আমাকে হেরা পর্বতের চূড়ায় উঠিয়ে দাও। ভেবে দেখি, কী করা যায়। তাই করা হলো। তিনি সেখানে

www.eelm.weebly.com

উঠে বললেন, শোনো, একশত উট জোগাড় করো। তাদের গলায় ঝুলিয়ে দাও মানতের কোরবানীর চিহ্নরূপে জুতার মালা। তারপর উটগুলোকে হেরেম এলাকায় যথেচ্ছ চরে ফিরে বেড়াতে দাও। সম্ভবত কোনো হাবশী লোক জোর করে ওগুলোকে ধরে নিয়ে যাবে। আবদুল মুত্তালিব তাঁর পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো। একসময় দেখা গেলো, সত্যি সত্যিই এক হাবশী লোক সেগুলোকে ধরে নিয়ে গেলো। তাদের কিছুসংখ্যককে বানালো তাদের বাহন। অবশিষ্টগুলোকে খেয়ে ফেললো জবাই করে।

ইয়েমেন প্রদেশের অধিপতিদের উপাধি ছিলো তুব্বা। আবু মাসউদ বললেন, তুব্বা কাবাগৃহ ধূলিসাৎ করার জন্য অগ্রসর হলো। কিন্তু হঠাৎ ঘোর অন্ধকার ঢেকে ফেললো তাকে। তিন দিন পর্যন্ত ঘোর অন্ধকারে আটকে রইলো সে। শেষ পর্যন্ত সে তার অসৎ সংকল্প পরিত্যাগ করলো। মিসরে নির্মিত শাদা চাদরে কাবাগৃহ আবৃত করে দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করলো আল্লাহ্‌র ঘরের প্রতি। মানত করলো উট কোরবানী করার এবং সে মানত পূরণও করলো সে।

ওদিকে আবু মাসউদ খেয়াল করলেন সাগরের দিকে। তারপর মান্যবর আবদুল মুত্তালিবকে লক্ষ্য করে বললেন, লক্ষ্য করুন, সমুদ্রের দিকে কিছু একটা ঘটছে। আবদুল মুত্তালিব বললেন, ওদিকে তো উড়ন্ত কিছু পাখি দেখা যাচ্ছে। আবু মাসউদ বললেন, চিনতে পারেন? আবদুল মুত্তালিব বললেন, শপথ আল্লাহ্‌র! ওরকম পাখি তো আমি কোনোদিনই দেখিনি। আবু মাসউদ বললেন, সংখ্যা কতো হবে? তিনি বললেন, মৌমাছিদের মতো অসংখ্য। প্রত্যেকের লাল চঞ্চুতে রয়েছে পাথরের কণা। মাথাগুলো কালো। গ্রীবাগুলো লম্বা। একটি পাখির নেতৃত্বে তারা উড়ে আসছে গগন অন্ধকার করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাখিগুলো উড়ে এসে স্থির হলো আবরাহা বাহিনীর উপরে। শুরু করলো প্রস্তরকণা বর্ষণ। প্রস্তরকণাগুলোর গায়ে যার যার নাম লেখা ছিলো সেগুলো আঘাত করলো তাদেরকেই। ফলে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলো সকলে। তারপর পাখিগুলো যেদিক থেকে উড়ে এসেছিলো, ফিরে গেলো সেদিকেই।

হজরত আবদুল মুত্তালিব ও আবু মাসউদ হেরা পর্বতের চূড়া থেকে নেমে এলেন পরদিন সকালে। একটি টিলার উপরে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করবার চেষ্টা করলেন আবরাহাবাহিনীর অবস্থা। নাহ্! কারো কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সেখান থেকে উঠলেন আর একটি টিলায়। কিন্তু সবকিছু নীরব। নিঝুম। কাছে গিয়ে দেখলেন রাশি রাশি শব। প্রস্তরকণাগুলো শিরস্ত্রাণ ভেদ করে ঢুকে পড়েছে তাদের মস্তিষ্কে। আর হাতি-ঘোড়াগুলোর দেহ ভেদ করে প্রস্তরকণা ঢুকে গেছে মাটির মধ্যে। তাঁরা দু'জনে আবরাহার লোকদের বেলচা দিয়ে মাটি খুঁড়লেন। প্রস্তুত করলেন দু'টি গর্ত। তাদের পরিত্যক্ত মূল্যবান বস্তুগুলো গর্ত দু'টোতে রেখে দিলেন। আবদুল মুত্তালিব বললেন, আবু মাসউদ! একটি তোমার এবং একটি আমার। ওই সম্পদ বহুদিন ধরে খরচ করেছিলেন তাঁরা। সম্পদের ভাগ পেয়েছিলো মক্কাবাসীরাও।

www.eelm.weebly.com

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— আল্লাহ্ তো তাদের অপপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেনই।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন'। কথাটি সম্পর্কযুক্ত আগের আয়াতে! 'ব্যর্থ করে দেননি' বাক্যের সঙ্গে। অর্থাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছোট পাখি প্রেরণ করে আমি তাদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছিলাম। এখানে 'তুইরান' (পাখি) এর বিশেষণ 'আবাবীল' (ঝাঁকে ঝাঁকে)। চতুর্দিক থেকে অশ্ববাহিনী আক্রমণ করলে আরববাসীগণ বলে 'জাআতিল খইল ওয়াল আবাবীল'। আবু উবায়দা বলেছেন, 'আবাবীল' বহুবচন 'ইব্বালাতুন' এর। পাখিগুলো ছিলো অসংখ্য। ছুটে আসছিলো একটির পিছনে একটি। তাই এখানে বলা হয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ফাররা বলেছেন 'আবাবীল এমন ধরনের একটি বহুবচন, যার ধাতুমূল থেকে বহুবচন হয়ই না। কাসায়ী বলেছেন, 'আবুলুন' এর বহুবচন 'আবাবীল' যেমন 'আজ্বলুন' এর বহুবচন 'আজ্বাজ্বীল'।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'যারা তাদের উপর প্রস্তরকংকর নিক্ষেপ করে। বাক্যটি আগের আয়াতের 'পাখি' এর বিশেষণ। অর্থাৎ ওই পাখিগুলো অসংখ্য প্রস্তরকণা নিক্ষেপ করেছিলো আবরাহার হস্তিযুথের উপর। 'সিজ্জীল' অর্থ প্রস্তরকণা, ওই মৃত্তিকাখণ্ড যা রূপান্তরিত হয় প্রস্তরে। কেউ কেউ বলেছেন 'সিজ্জীল' গঠিত হয়েছে 'সিজ্জুলুন' থেকে, যার অর্থ বৃহৎ ডোল বা বালতি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'আস্‌সিজ্জুলূ' অর্থ সীলমোহর করা। অর্থাৎ ওই পাথরকণাগুলোতে যাদের নাম সীলমোহর করা ছিলো, পাথরকণা আঘাত করেছিলো তাদেরকেই। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পাখিগুলোর উপরের ঠোঁট পাখির মতোই ছিলো, কিন্তু নিচের ঠোঁটগুলো ছিলো কুকুরের থাবার মতো। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, পাখিগুলোর রঙ ছিলো সবুজ, আর তাদের ঠোঁটগুলো ছিলো হলুদ। কাতাদা বলেছেন, পাখিগুলো ছিলো কৃষ্ণবর্ণের। তারা দলে দলে আক্রমণ করেছিলো সমুদ্রের দিক থেকে এসে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, প্রতিটি প্রস্তরকণায় লেখা ছিলো নিহত ব্যক্তিদের নাম। নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের দিকেই তারা তীব্রভাবে নিক্ষেপ করেছিলো পাথরকণাগুলো। সেগুলো তাদের মস্তক ফুঁড়ে বের হয়ে গিয়েছিলো তাদেরই পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে।

শেষোক্ত আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন'। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক ওই প্রস্তরকণাগুলোর আঘাতে তাদেরকে করেন পশুপাল কর্তৃক ভক্ষিত চূর্ণবিচূর্ণ তৃণের মতো। 'কা আ'সফিম্ মা'কূল' অর্থ ভক্ষিত তৃণসদৃশ। 'আ'সফ' অর্থ গাছের পাতা। কাতাদা বলেছেন, ভূষি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, গমের উপরের আবরণীকে বলে 'আ'সফ'। আর 'মা'কূল' এর অর্থ ভক্ষিত।

www.eelm.weebly.com

সূরা কুরাইশ

এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কানগরীতে। এতে রয়েছে ৪টি আয়াত।

সূরা কুরাইশ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○
لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ﴿١﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ ۚ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوْا
رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ﴿٣﴾ الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ۬ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

r যেহেতু কুরায়শের আসক্তি আছে,

r আসক্তি আছে তাহাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের

r অতএব, উহারা ‘ইবাদত করুক এই গৃহের মালিকের,

r যিনি উহাদিগকে ক্ষুধায় আহার দিয়াছেন এবং ভীতি হইতে উহাদিগকে নিরাপদ করিয়াছেন।

প্রথমে বলা হয়েছে ‘লিঈলাফি কুরাইশ’ (যেহেতু কুরায়েশদের আসক্তি আছে)। কাসায়ী এবং আখফাশ বলেছেন, এখানকার ‘লাম’ বিস্ময়প্রকাশক, সম্পৃক্ত একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই অনুক্ততাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কুরায়েশদের অনুরাগ দেখে অবাক লাগে। জুজায বলেছেন, এখানকার ‘লাম’ অব্যয়টি সংযুক্ত হবে ৩ সংখ্যক আয়াতের ‘তারা ইবাদত করুক’ বাক্যের সঙ্গে। অর্থাৎ কুরায়েশদের যেহেতু অনুরাগ আছে, তাই তাদের উচিত কাবা গৃহের মালিকের ইবাদত করা। কেননা তাদের উপরে রয়েছে আল্লাহ্‌র অগণন অনুগ্রহ। এমতো অনুগ্রহ। এমতো অনুগ্রহের কথা বাদ দিলেও তাদের উচিত এই ঘরের অধিপতির উপাসনা করা।

এরকমও হতে পারে যে, এখানকার ‘লিঈলাফি’ কথাটি সম্পর্কযুক্ত আগের সুরার শেষাংশের সঙ্গে। যেমন কোনো কবিতার দ্বিতীয় পঙক্তির সম্পর্ক থাকে প্রথম পঙক্তির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্‌পাক আবরাহার হস্তিযুথক করে দিয়েছেন ভক্ষিত তৃণসদৃশ, যেনো কুরায়েশেরা নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে বহির্বিশ্বের সঙ্গে। অন্য দেশের লোকের সঙ্গে স্থাপন করতে পারে সম্প্রীতি-সৌহার্দ। অর্থাৎ ঘটনাটির মাধ্যমে অন্যান্য অঞ্চলের জনগণের কাছে ফুটে উঠছে কুরায়েশদের মাহাত্ম্য। মানুষ বুঝতে পারবে, তাদের জন্যই আল্লাহ্‌পাক ধ্বংস করে দিয়েছেন তাদের কাবাগৃহের প্রতি আক্রমণ পরিচালনাকারীদেরকে। ফলে তারা তাদেরকে সমীহ করবে। কেউ আর তাদের প্রতি পোষণ করতে পারবে না আক্রমণাত্মক মনোভাব। অর্থগত এই সঙ্গতির কারণে কেউ কেউ বলেছেন, সুরা দু’টো মূলতঃ একই সুরা। হজরত উবাই ইবনে কা’বের পাণ্ডুলিপিতে সুরা দু’টো লিপিবদ্ধ ছিলো ছেদ ব্যতিরেকেই।

www.eelm.weebly.com

কুরায়েশ বলা হয় নজর ইবনে কানানার বংশধরদেরকে। শব্দটি সাধিত হয়েছে 'ক্বারশূন' থেকে। 'তাক্বাররুশূন' অর্থ উপার্জন করা, কুক্ষিগত করা। যেমন বলা হয় 'ফুলানুন ইয়াক্বরুশু লি আহ্লিহী' (অমুক ব্যক্তি তার পরিবারের পোষ্যদের জন্য উপার্জন করেছে)। উপার্জনশীল সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রতি তাদের ছিলো উদগ্র আগ্রহ। এজন্যই তাদের নাম হয়েছে 'কুরাইশ'।

একবার হজরত মুয়াবিয়া হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন, এই জনগোষ্ঠীর নাম কুরায়েশ হয়েছে কেনো? তিনি জবাব দিলেন, 'কুরাইশ' একটি সুবৃহৎ সামুদ্রিক প্রাণী। সে তার আশেপাশের ক্ষুদ্র জীব-জন্তুদেরকে ভক্ষণ করে। অথচ তাকে কেউ ভক্ষণ করতে পারে না। অর্থাৎ অন্যান্য প্রাণীরা তার উপর প্রভাব বিস্তার করতেই পারে না।

'কামুস' অভিধানে লেখা রয়েছে 'ক্বারাশাহু' অর্থ তাকে কর্তন করেছে এবং এদিক সেদিক থেকে এনে একত্রিত করেছে। একটিকে যুক্ত করেছে অন্যটির সঙ্গে। কুরায়েশরাও সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতো হেরেম এলাকায়। এমতো নামকরণের আর একটি কারণ এ-ও হতে পারে যে, তারা অন্য স্থান থেকে পণ্য সামগ্রী কিনে এনে গুদামজাত করে রাখতো। আর একটি কারণ— একদিন নজর ইবনে কানানা একটি মাত্র বস্ত্রে নিজেকে আবৃত করে এক স্থানে বসেছিলো। লোকেরা তাকে এভাবে বসে থাকতে দেখে বলে উঠলো 'তাক্বাররাশা' (স্তূপীকৃত হয়েছে সে)। সেদিন থেকে তার বংশধরদেরকে বলা হতে থাকে 'কুরাইশ'। অন্য আর একটি কারণ— একবার নজর ইবনে কানানা তার স্বজাতিদের সমাবেশে আগমন করলে তারা সমস্বরে বলে উঠলো, আরে এ যে দেখছি কুরায়েশি উট (শক্তিশালী উট)। কুরাইশ নামের প্রচলন ঘটে সেদিন থেকেই। অথবা বলা যায়, শব্দটি 'ক্বারশূন' এর ন্যূনতা প্রকাশক রূপ। 'ক্বারাশ' হচ্ছে বৃহদাকার সামুদ্রিক প্রাণী।

একটি উপযোগ ঃ হজরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বনী ইসমাইল থেকে আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন কানানাকে। কানানা গোত্র থেকে কুরায়েশকে। কুরায়েশ গোত্র থেকে হাশেমকে। হাশেম গোত্র থেকে আমাকে। বাগবী। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এদিক দিয়ে সকল মানুষ কুরায়েশদের অনুসারী। তাদের মধ্যেই রয়েছে মুসলমান এবং তাদের মধ্যেই রয়েছে কাফের। বোখারী, মুসলিম। হজরত জাবের থেকে সুপরিণত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, মানুষ উত্তম ও অধম এবং বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর ক্ষেত্রে কুরায়েশদের অনুগামী। মুসলিম।

আমি বলি, সম্ভবত প্রথমোক্ত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে কুরায়েশদের যোগ্যতার মাত্রা এই নিরিখে যে, তাদের মধ্য থেকেই এসেছেন বহুসংখ্যক সাহাবী এবং আউলিয়া। আর পরের হাদিস দু'টোর মর্মার্থ হচ্ছে— রসুল স. এর মহাআবির্ভাব ঘটেছিলো কুরায়েশ গোত্রেই। তাই ইসলাম গ্রহণ ও শরিয়তের বিধান কার্যকর করার প্রাথমিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিলো তাঁদের উপরেই। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'অবশ্যই আমি আমার রসুলকে প্রেরণ করেছি তাঁর স্বজাতির ভাষাসহ, যেনো তিনি তাদের নিকটে প্রকাশ করতে পারেন'। আর এক আয়াতে বলা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে 'আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজনদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন'। যে কুরায়েশ ইমান গ্রহণ করবে, রসুল স. এর অনুগামী হবে, তার জন্য থাকবে উত্তম বিনিময়। অধিকন্তু পরবর্তী যুগের পুণ্যবানদের উত্তম বিনিময়ও তাদের ভাগ্যে জুটবে। সে কারণেই নবীগণের পরেই নির্ধারিত রয়েছে ওই মহান ব্যক্তিগণের মর্যাদা। আবার যে কুরায়েশ সত্যপ্রত্যাখ্যান করবে, হবে রসুল স. এর প্রতিপক্ষ; এরপর মৃত্যুমুখে পতিত হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায়, তাকে ভোগ করতে হবে কঠিনতর শাস্তি। তদুপরি পরবর্তী যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তিও তার ভাগ্যে জুটবে। যেমন কাবিল ছিলো প্রথম নরঘাতক। তাই সে তার ওই অপকর্মের শাস্তি তো পাবেই, তদুপরি পাবে পরবর্তী সময়ের সকল নরঘাতকদের সমতুল শাস্তি। অবশ্য পরবর্তীদের শাস্তি এতে করে এতোটুকুও কমবে না। হজরত ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী। সুরা ওয়াশ্ শামসের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে, হন্তারকদের মধ্যে কাবিলই সর্বাধিক দুর্ভাগা। হজরত ইবনে ওমর থেকে সুপরিণত সূত্রে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, কুরায়েশদের মধ্যে দু'জন জীবিত থাকলেও চালু থাকবে এই পদ্ধতি। হজরত মুয়াবিয়া বলেছেন, আমি স্বকর্ণে রসুল স.কে বলতে শুনেছি, যতোক্ষণ পর্যন্ত কুরায়েশেরা তাদের মধ্যে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত রাখবে, এই পদ্ধতি চালু থাকবে ততোদিন পর্যন্ত। এমতাবস্থায় কেউ তাদের বিরুদ্ধাচরণ করলে, আল্লাহ তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন। বোখারী।

আমি বলি, হাদিসে বর্ণিত 'আমর' বা পদ্ধতি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে খেলাফতের দিকে। আর হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের উদ্দেশ্য ভবিতব্য বর্ণনা নয়, বরং কুরায়েশগণের খেলাফত। আর হজরত মুয়াবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের বক্তব্যটি একটি অপপ্রার্থনা ওই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের জন্য, যে বা যারা বিদ্রোহী হয় একজন কুরায়েশ খলিফার। হজরত সা'দ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরায়েশদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবে, আল্লাহ্ তাকে হেয় করবেন। বোখারী।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাকেম, তিবরানী ও বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ ৭টি বৈশিষ্ট্য দ্বারা কুরায়েশদেরকে মর্যাদায়িত করেছেন। যেমন— ১. আমার মহাআবির্ভাব ঘটেছে তাদের মধ্যে ২. তাদের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছে নবুয়ত ৩. তারাই কাবাগৃহের রক্ষী ৪. তারাই হজযাত্রীদেরকে পানি সরবরাহকারী ৫. তাদেরকে বিজয়দান করা হয়েছে হস্তিবাহিনীর উপরে ৬. নবুয়তের প্রথম দশ বছর কুরায়েশেরা ছাড়া আর কেউ ইবাদত করার সুযোগ পায়নি ৭. তাদের নামোল্লেখ করেই কোরআন পাকে অবতীর্ণ হয়েছে একটি সুরা। আর এ সুরার মধ্যে তারা ছাড়া আর কারো প্রসঙ্গ নেই। এ সুরার নাম 'লি ঈলাফি কুরাইশ'। হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে 'আমার মহাআবির্ভাব ঘটেছে তাদের মধ্যে' কথাটি নেই। তিবরানী।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের'। বাক্যটি 'ঈলাফি কুরাইশ' এর অনুবর্তী এবং 'রিহ্লাতাশ্ শিতাই ওয়াস্সইফ' বাক্যের সীমারেখা। এভাবে এখানে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে কুরায়েশদের আসক্তি বা অনুরাগকে। এটা তাঁদের প্রতি আল্লাহ্র এক

www.eelm.weebly.com

সুমহান অনুগ্রহ। কেননা হেরেম উপত্যকা তরুলতাশূন্য পর্বতময় ও পানিবিহীন, মানুষ বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সুতরাং শীত ও গ্রীষ্মকালে যদি বাণিজ্য যাত্রার সুযোগও তাদের না থাকতো, তবে তাদের জীবন যাপন করা হয়ে যেতো অসম্ভব। আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে কৃপা করলেন। মক্কাকে করলেন মহাসম্মানিত হেরেম। হেরেম এলাকার বাইরে যত্রতত্র যখন তখন চলতো লুটপাট-রাহাজানি। কিন্তু হেরেমবাসীরা থাকতো নিরাপদে। অন্যান্য অঞ্চলের লোক তাদেরকে দেখতো সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে! বলতো, কতোইনা সৌভাগ্যবান এরা। বসবাস করে হেরেমের অভ্যন্তরে। এরা যে আল্লাহ্‌র ঘরের প্রতিবেশী। লুণ্ঠনকারীরাও একারণেই সমীহ করতো তাদেরকে। ফলে কুরায়েশরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছিলো বহির্বিশ্বের সঙ্গে। ইয়েমেনের দিকে শীতের প্রকোপ ছিলো কম। তাই তারা শীতকালে বাণিজ্য করতে যেতো ইয়েমেনে। আর গ্রীষ্মের প্রখরতা কম ছিলো সিরিয়ার দিকে। তাই তারা গ্রীষ্মকালে বাণিজ্য করতে যেতো সেদিকেই। এভাবে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় মওসুমে তাদের বেসাতি হতো প্রচুর।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আতা বর্ণনা করেছেন, প্রথমদিকে কুরায়েশরা ছিলো দুর্দশাগ্রস্ত ও অনাহারক্লিষ্ট। সর্বপ্রথম হাশেমই তাদেরকে শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতে বহির্দেশে বাণিজ্যে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন। এভাবে বাণিজ্য করে তারা উপার্জন করতে থাকে প্রচুর পরিমাণে। দরিদ্র-ধনী সবার মধ্যে মুনাফার মাল বণ্টন করে দেওয়া ছিলো তাদের রীতি। ফলে দরিদ্র-ধনী সকলেই সেখানে জীবন যাপন করতো সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে। কালাবী বলেছেন, সর্বপ্রথম হাশেম ইবনে আবদে মানাফই উট বোঝাই করে সিরিয়া থেকে আমদানী করেন গম। বাগবী লিখেছেন, কুরায়েশদের জন্য ইয়েমেন ও সিরিয়ার পথে বাণিজ্যযাত্রা ছিলো খুবই কষ্টকর। পথ ছিলো বন্ধুর, অসমতল। তবে বাণিজ্যসম্ভারে ভরপুর ছিলো ইয়েমেন। সেখানে সুলভে পাওয়া যেতো কৃষিজাত পণ্য। দু'টি বাণিজ্যকেন্দ্র ছিলো সেখানে। বিভিন্ন দেশের বণিকেরা বাণিজ্যকেন্দ্র দু'টিতে উপস্থিত হতো স্থলপথে উষ্ট্রারোহী হয়ে, অথবা জাহাজযোগে সমুদ্র পথে। পণ্য আমদানী করতো মাহসাব ও জেদ্দা সমুদ্র বন্দরে। সেখান থেকে পণ্য সংগ্রহ করে আনতো কুরায়েশরা। ওদিকে সিরিয়াবাসীরা তাদের পণ্য বাজারজাত করতো আবতারা নামক বাণিজ্যকেন্দ্রে। কুরায়েশরা সেখান থেকে পণ্য কিনে আনতো মক্কায়। এভাবে তারা শীত ও গ্রীষ্মকালে চালাতো তাদের বাণিজ্যিক তৎপরতা। একারণেই আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছেন ইবাদতের নির্দেশ। বলছেন 'অতএব তারা ইবাদত করুক এই গৃহের মালিকের' (আয়াত ৩)। যদি এখানকার প্রথম বাক্যটি আগের সুরার শেষ বাক্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, অথবা এখানকার 'লাম' কে বলা হয় বিস্ময়সূচক, তাহলে এখানকার 'ফা' অব্যয়টি হবে যোজক অথবা নৈমিত্তিক। আর যদি 'লাম' সংযুক্ত করা হয় 'ইবাদত করুক' কথাটির সাথে, তাহলে বলতে হয়, 'ফা' অব্যয়টি এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত, অথবা একটি অনুক্ত শর্তের ফলাফল।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন'। অর্থাৎ তিনিই তো

www.eelm.weebly.com

তাদেরকে করেছেন হেরেমের অধিবাসী। নিরাপদ করে দিয়েছেন লুণ্ঠনকারীদের অপপরিকল্পনা থেকে, এমনকি দুধর্ষ আবরাহা বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েও তিনি নিশ্চিত করেছেন তাদের চিরনিরাপত্তা।

জুহাক, রবী ও সুফিয়ান সওরী বলেছেন, আল্লাহ্পাক তাদেরকে তাঁর রোষতপ্ত ধ্বংসলীলা থেকে নিরাপদ রেখেছেন। নবী ইব্রাহিম দোয়া করেছিলেন 'হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তা! তুমি এ স্থানকে করে দাও চিরশান্তির আলয়। আর এর অধিবাসীদেরকে জীবনোপকরণ দান কোরো ফল দ্বারা'। তাঁর এমতো প্রার্থনার মহিমায় কুরায়েশদের বসবাস স্থল মক্কা নগরীতে কখনো সংঘটিত হয়নি ব্যাপক ধ্বংসলীলা।

আল্লামা জাওজী তাঁর 'হিসনে হাসিন' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবুল হাসান কাযভীনী থেকে পরিণত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, দস্যু-তস্করের আক্রমণাশংকাকালে লি ঈলাফি কুরাইশিন' পাঠ করলে বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

আমি বলি, আমার পীর-মোর্শেদ আমাকে বলেছেন, সুরা কুরাইশ যে কোনো বিপদ থেকে পরিত্রাণের রক্ষাকবচ। সুতরাং তুমি ভীতিপ্রদ পরিবেশে এই সুরাটি পাঠ কোরো। আমি এই আমলের উপরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি।

সূরা মাঊ'ন

৭ আয়াতবিশিষ্ট এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাশান্তির আলয় পুণ্যভূমি মক্কায়।

সূরা মাঊ'ন ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

اَرَءَيۡتَ الَّذِىۡ يُكَذِّبُ بِالدِّيۡنِ ؕ﴿۱﴾ فَذٰلِكَ الَّذِىۡ يَدُعُّ الۡيَتِيۡمَ ۙ﴿۲﴾ وَلَا
يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الۡمِسۡكِيۡنِ ؕ﴿۳﴾ فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّيۡنَ ۙ﴿۴﴾ الَّذِيۡنَ هُمۡ عَنۡ
صَلَاتِهِمۡ سَاهُوۡنَ ۙ﴿۵﴾ الَّذِيۡنَ هُمۡ يُرَآءُوۡنَ ۙ﴿۶﴾ وَيَمۡنَعُوۡنَ الۡمَاعُوۡنَ ﴿۷﴾ ع

r তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে দীনকে অস্বীকার করে?
r সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয়
r এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।
r সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের,
r যাহারা তাহাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন,
r যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে,
r এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্যদানে বিরত থাকে।

---

www.eelm.weebly.com

প্রথমে বলা হয়েছে 'আরাআইতাল্ লাজী ইউ কাজ্জিবু বিদ্দীন' (তুমি কি দেখেছো তাকে, যে দ্বীনকে অস্বীকার করে)। 'বাহরে মাওয়াজ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রশ্নটি স্বীকৃতিমূলক। 'রুয়ত' অর্থ ' দেখা' হলেও এখানে এর অর্থ জানা, অথবা চেনা আর 'দ্বীন' অর্থ এখানে ধর্ম, অথবা প্রতিফল দিবস। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি ওই ব্যক্তিকে তো চিনেনেই, যে প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করে।

আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে আস ইবনে ওয়ায়েল সাহামীকে লক্ষ্য করে। এক বর্ণনায় এসেছে, মুকাতিল বলেছেন, আয়াতখানির লক্ষ্যস্থল ওলীদ ইবনে মুগীরা। সুদ্দী, ইবনে কীসান এবং অপর বর্ণনানুসারে মুকাতিলের মন্তব্যও এরকম। জুহাক বলেছেন, আমর ইবনে আমের মাখজুমীর কথা। এ সকল বিবরণের প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছিলো দু'বার— প্রথম দিকে মক্কায় এবং শেষদিকে মদীনায়। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সুরা 'আরাআইতাল্ লাজী' অবতীর্ণ হয়েছে এক মুনাফিক ব্যক্তি সম্পর্কে। আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গি এ কথাই প্রমাণ করে যে, এখানকার ইঙ্গিতসূচক পদ 'আল্ লাজী' (যে, যে ব্যক্তি) সীমিতার্থক। আবার কেউ কেউ বলেছেন, জাতিবাচক।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'সে তো সে-ই, যে এতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়'। একথার অর্থ— ওই ব্যক্তিটি প্রতিফল দিবসকে তো অস্বীকার করেই, অধিকন্তু রূঢ় আচরণ করে পিতৃহীনের প্রতি। আর তাকে তাড়িয়েও দেয়। এখানকার 'ফাজালিকা' বাক্যের 'ফা' অব্যয়টি নৈমিত্তিক। আর এর পরের 'ফা' (আয়াত ৪) প্রথমোক্তটির নিমিত্ত। এখানে ইয়াদুউ' অর্থ সজোরে ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দেওয়া।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না'। একথার অর্থ— প্রতিফল দিবসের প্রতি বিশ্বাস নেই বলে সে আরো একটি অপকর্ম করে, নিরন্নকে অন্নদান করে না। এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে না অন্যদেরকেও।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের (৪) যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন' (৫)। এখানকার 'ফা' অব্যয়টি পরিণতিসূচক। এভাবে ব্যক্তব্যটি দাঁড়ায়— এতিমের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার এবং অন্নহীনকে অন্নদান না করা যদি হয় ধর্মপরায়ণতার দুর্বলতার প্রতীক এবং তিরস্কার শাসনের উপলক্ষ হয়, তবে নামাজের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন, অথবা লোক দেখানো নামাজ তো হবে সত্যপ্রত্যাখানেরই একটি শাখা এবং তা হবে শাস্তিরও উপযোগী। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই 'ফা' অব্যয়ের পরেই উল্লেখ করা হয়েছে 'ওয়াইল' (দুর্ভোগ)। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— এ সকল অসৎ আচরণের পরিণতি হচ্ছে মর্মন্তুদ শাস্তি। অথবা বলা যেতে পারে 'ফা' অব্যয়টি এখানে নৈমিত্তিক। অর্থাৎ আগের (আয়াত ২)'ফা' পরের 'ফা' এর নিমিত্ত। তাই এখানে

www.eelm.weebly.com

‘তাদের জন্য’ (লাহুম) না বলে বলা হয়েছে ‘সালাত আদায়কারীদের’ (লিল মুসল্লীন) একারণে যে, প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে সৃষ্টির সঙ্গে আচরণ প্রসঙ্গে এবং পরে আল্লাহপাকের সঙ্গে আচরণ প্রসঙ্গে।

‘সাহূন’ অর্থ উদাসীন, বেপরোয়া। মাসআদ ইবনে সা’দ সূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, হজরত সা’দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, একবার রসুল স. এর কাছে ‘যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন’ আয়াতের মর্মার্থ জানতে চাওয়া হলো। তিনি স. বললেন, এর অর্থ— যারা নামাজের সময় বিনষ্ট করে দেয়। ইবনে জারীর ও আবু ইয়ালার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ওই সকল লোক ‘সাহূন’ (উদাসীন) যারা নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করে না। আবুল আলিয়া এর অর্থ করেছেন, যারা সময় মতো নামাজ পাঠ করে না এবং নামাজের মধ্যে রুকু-সেজদা পুরোপুরি আদায় করে না। কাতাদা বলেছেন ‘সাহূন’ অর্থ নির্ভিক, বেপরওয়া। কেউ কেউ অর্থ করেছেন যারা নামাজ পড়ে ঠিকই, কিন্তু এর জন্য পুণ্যের আশা করে না, আবার না পড়লে শাস্তিরও ভয় করে না, তারাই ‘সাহূন’। মুজাহিদ বলেছেন এর অর্থ যারা নামাজ পড়তে গড়িমসি করে এবং প্রদর্শন করে আলস্য। মুজাহিদ বলেছেন, ‘সাহূন’ তারাই, যারা নামাজ পাঠ করে লোক দেখানোর জন্য এবং নামাজ বাদ পড়ে গেলে তারা এর জন্য করে না আক্ষেপ।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— ‘যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে’। এখানকার ‘ইউরাউন’ শব্দটি সাধিত হয়েছে ‘রুয়ত’ (প্রদর্শন) থেকে। অর্থাৎ যারা নামাজ পাঠ করে জনগণের প্রশংসা অর্জনের জন্য। রসুল স. বলেছেন, যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ পাঠ করে ও রোজা রাখে এবং দান খয়রাত করে, তারা শিরিক করে।

শেষোক্ত আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— ‘ওয়া ইয়াম্‌নাউ’নাল মাউ’ন’ (এবং গৃহস্থালীর ছোট খাট সাহায্যদানে বিরত থাকে)। কুতরব বলেছেন ‘মাউ’ন’ বলে অতি তুচ্ছ বস্তুকে। আর এখানে ‘মাউ’ন’ অর্থ জাকাত। হজরত আলী, হজরত ইবনে ওমর, হাসান বসরী, কাতাদা এবং জুহাকও এরকম বলেছেন। পুঞ্জীভূত সম্পদের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশকে জাকাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয় বলেই এখানে জাকাতকে বলা হয়েছে ‘মাউ’ন’।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, মাউন বলে দা-কুড়াল, বালতি, হাঁড়ি, পাতিল ইত্যাদি সাংসারিক নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুকে। মুজাহিদ বলেছেন,‘মাউ’ন’ হচ্ছে ধার-কর্জ। ইকরামা বলেছেন, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল বস্তু। ক্ষুদ্র হচ্ছে সাংসারিক বস্তু এবং বৃহৎ হচ্ছে জাকাত। মোহাম্মদ ইবনে কা’ব ও কালাবী বলেছেন, অতিপরিচিত সামগ্রী পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করাকে বলে ‘মাউ’ন’। এ সকল সামগ্রী কেউ চাইলে না দেওয়া ঠিক নয়। যেমন আগুন, পানি, লবণ ইত্যাদি।

www.eelm.weebly.com

জননী আয়েশা বলেছেন, আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কেউ চাইলে পানি না হয় দেওয়া গেলো। কিন্তু আগুন, লবণও কি দিতে হবে? তিনি স. বললেন, হুমায়রা! শোন, কেউ যদি কাউকে একটু আগুন দেয়, তবে সে যেনো তাকে দিলো আগুনে রান্না করা খাদ্য। আর যে লবণ দিলো, সে যেনো দিলো লবণ দিয়ে রান্না করা ব্যঞ্জন। পানি যেখানে সুলভ, সেখানে পানি যে দিলো, সে যেনো মুক্ত করে দিলো একজন ক্রীতদাসকে। আর পানি যেখানে দুর্লভ সেখানে যে পানি দান করলো, সে যেনো বাঁচালো একজনের জীবন। ইবনে মাজা।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন 'যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন' আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করে। তারা মুসলমানদেরকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়তো। তাঁদের অনুপস্থিতিতে নামাজ পাঠ করতো না। তাদের সাথে সাংসারিক লেনদেনও করতো না।

হজরত আনাস ও হাসান বসরী বলেছেন, আল্লাহ্পাকের প্রতি জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা; তিনি বলেছেন 'আ'ন সলাতিহিম সাহূন' 'ফী সালাতিম সাহূন' বলেননি। 'আ'ন সলাতিহিম সাহূন' অর্থ যারা নামাজ পরিত্যাগ করে, নামাজের পরোয়াই করে না। এরকম স্বভাব মুনাফিকদের। আর 'ফী সলাতিম সাহূন' অর্থ যাদের নামাজের মধ্যে এলোমেলো ধারণার আগমন ঘটে। নিঃসন্দেহে এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা। এ ধরনের ধারণা অপসারণের চেষ্টা করতে হবে এবং এর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে আল্লাহ্র। আল্লাহপাক ইচ্ছা করলে এমতো অমনোযোগিতার পাপ মার্জনাও করতে পারেন। মাদারেক।

হজরত ওসমান ইবনে আবুল আস বলেছেন, একবার আমি রসুল স. সকাশে নিবেদন জানালাম, হে মহাবিচার দিবসের কাণ্ডারী! আমিতো কখনো কখনো নামাজ এবং ক্বেরাতের মধ্যে শয়তান কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত অন্তরায় অনুভব করি। দ্বিধান্বিত হই। তিনি স. বললেন, ওই শয়তানটির নাম খিনযাফ। তুমি তার প্রভাব অনুভব করলে আল্লাহ্ সমীপে আশ্রয় কামনা কোরো। বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ কোরো তিনবার। হজরত ওসমান বললেন, আমি এরকম করেছিলাম। আল্লাহ্ তার প্রভাব থেকে আমাকে মুক্তও করেছিলেন। মুসলিম।

একলোক একবার ইমাম কাসেম ইবনে মোহাম্মদের নিকট জিজ্ঞেস করলো, আমার তো নামাজের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কী করবো? তিনি জবাব দিলেন, নামাজ পড়তে থাকো। নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হবে না। মনে মনে ভেবো, আমার নামাজ তো এখনো শেষ হয়নি। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

www.eelm.weebly.com

সূরা কাওছার

৩ আয়াতবিশিষ্ট এই সূরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাতীর্থ মক্কায়।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, একবার আমরা রসুল স.এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলাম। দেখলাম তিনি বসে আছেন উদাসভাবে। কিছুক্ষণ পর তিনি মৃদু হাসলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে দয়াল নবী! আপনার মৃদু হাসির অর্থ কী, তা কি আমরা জানতে পারি? তিনি স. বললেন, এক্ষুণি আমার উপরে অবতীর্ণ হলো সুরা কাওছার। এরপর তিনি স. সদ্য অবতীর্ণ সুরাখানি পাঠ করে শোনালেন। তারপর বললেন, তোমরা কি জানো, কাওছার কী? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয়তম নবীই এ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তিনি স. বললেন, কাওছার একটি প্রস্রবণ। আল্লাহ্ ওই প্রস্রবণ আমাকে দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহাবিচারের দিবসে ওই মহাকল্যাণময় কাওছারের পাশে সমবেত হবে আমার উম্মত। আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের মতো অগণন পানপাত্র বিদ্যমান থাকবে কাওছারের পাড়ে। উপস্থিত জনতার মধ্যে একজনকে টেনে বের করে দেওয়া হবে। আমি নিবেদন করবো, হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালয়িতা! লোকটি তো আমার উম্মত। বলা হবে, না, আপনি জানেন না। আপনার তিরোধানের পর এই লোকটি ধর্মীয় বিষয়ে প্রচলন ঘটিয়েছিলো অপপ্রথার (বেদাতের)। মুসলিম।

শিথিল সূত্রসহযোগে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু আইয়ুব বলেছেন, যখন রসুল স. এর শিশুপুত্র হজরত ইব্রাহিম ইন্তেকাল করলেন, তখন অংশীবাদীরা বলাবলি করতে লাগলো, মোহাম্মদ আঁটকুড়ে, নির্বংশ। তখন আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করলেন 'ইন্না আ'ত্বইনাকাল্ কাওছার'। ইবনে জুরাইজ সূত্রে ইবনে মুনজিরও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত শাম্মার ইবনে আতীয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, উকবা ইবনে মুয়ীত বলতো, মোহাম্মদের সন্তান-সন্ততি বেঁচে থাকবে না। সে তো নির্বংশ। তখন আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করলেন 'তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই তো নির্বংশ'।

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনানুসারে ইবনে জারীর বলেছেন 'সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো এবং কোরবানী করো' আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছিলো হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন। তখন হজরত জিবরাইল এসে বলেছিলেন, আপনি এখানেই কোরবানী করুন এবং ফিরে যান। একথা শুনে রসুল স. উঠে ভাষণ দিলেন। তাঁর ওই ভাষণের মধ্যে নির্দেশ ছিলো কোরবানী করার এবং কেশ কর্তন করার। এর পর তিনি আদায় করলেন দুই রাকাত নামাজ। স্বহস্তে কোরবানী করলেন তাঁর কোরবানীর পশু। বর্ণনাটি অতীব বিরল শ্রেণীর। বায্যার প্রমুখ হাদিসবেত্তাগণ বিশুদ্ধ সূত্রসহযোগে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, কা'ব ইবনে আশরাফ ইহুদী একবার মদীনা থেকে মক্কায়

www.eelm.weebly.com

এলো। অংশীবাদী কুরায়েশরা তার সঙ্গে দেখা করে বললো, এই লোকটি (রসুল স.) আমাদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। সে বলে, আমরা নাকি পাপী। আমরা হজযাত্রীদের সেবাযত্ন করি। তাদেরকে পানি পান করাই। আমরাই কাবাগৃহের রক্ষক। অথচ সে আমাদেরকে গোনাহগার বলে। কা'ব বললো, তোমরাই উত্তম। তখন অবতীর্ণ হলো 'নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষপোষণকারীরাই নির্বংশ'।

ইকরামার বর্ণনাসূত্রে ইবনে আবী শায়বা তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে এবং ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর উপরে যখন ওহী আসতে শুরু করলো, তখন অংশীবাদীরা বলতে শুরু করলো, সে আমাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। সে লেজকাটা। তখন অবতীর্ণ হয় 'তোমার প্রতি বিদ্বেষপোষণকারীরাই তো নির্বংশ (লেজকাটা)। সুদ্দী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, কারো পুত্রসন্তান মারা গেলে যদি তার আর কোনো সন্তান না থাকতো, তবে কুরায়েশরা তাকে বলতো, লোকটির বংশ কেটে গেছে। রসুল স. এর যখন পুত্রবিয়োগ ঘটলো, তখন আস ইবনে ওয়াইল বললো, মোহাম্মদের বংশ নিপাত গেলো। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

ইমাম মোহাম্মদ ইবনে আলী জয়নুল আবেদীন ইবনে ইমাম হোসাইন থেকে বায়হাকী তাঁর 'দালায়েলুন নবুয়ত' গ্রন্থেও উল্লেখিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর রসুল স. এর ওই মহাসৌভাগ্যশালী সন্তানের নাম ছিলো হজরত কাসেম। মুজাহিদ সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছিলো আস ইবনে ওয়াইলকে উদ্দেশ্য করে। সে বলেছিলো, আমি মোহাম্মদের শত্রু। বাগবী লিখেছেন, একবার রসুল স. কাবাপ্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। তখন সেখানে প্রবেশ করছিলো আস ইবনে ওয়াইল। বনী সাহাম তোরণে দু'জনের দেখা হলো। উভয়ের মধ্যে কিছু বাক্যবিনিময় হলো। তখন কুরায়েশদের হোমরা চোমরারা বসেছিলো কাবাপ্রাঙ্গণে। আস সেখানে পৌঁছলে তাদের একজন বললো, কী নিয়ে আলাপ করছো তোমরা? আস বললো, আলাপ আর কী হবে। সে তো আবতার (লেজকাটা)। তখন জননী খাদিজার সন্তান সদ্য বিগত হয়েছেন।

ইয়াজিদ ইবনে নোমান সূত্রে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, রসুল স. এর প্রসঙ্গ উঠলেই আস ইবনে ওয়াইল বলতো, আরে বাদ দাও ওর কথা। ওতো আঁটকুড়ে। তার তো বংশধরই নেই। সে দুনিয়া থেকে চলে গেলে তার কথা আর কেউ মনেও করবে না। তখনই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

আমার মতে বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, রসুল স. এর কোনো সন্তানের পরলোকগমনের পর এই সুরাখানি অবতীর্ণ হয়নি। কেননা, হজরত কাসেমের ইন্তেকাল হয়েছিলো হিজরতের অথবা তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে মক্কায়। আর মোহাম্মদ ইবনে আলীর সূত্রভূত জাবের জুফী ছিলো একজন প্রতারক। ওয়াকেদীর সুদূর ধারণা এই যে, রসুলতনয় হজরত ইব্রাহিমের পরলোকগমন ঘটেছিলো দশম নববী সনে ১০ ই রবিউল আউয়াল মঙ্গলবারে। 'সাবিলুল রাশাদ' পুস্তকে

www.eelm.weebly.com

এরকমই বলা হয়েছে। তবে আয়াতখানি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত সম্পর্কে দু'টি বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায়। তার একটি বর্ণনা হজরত আনাসের, যা উপস্থাপন করেছেন মুসলিম। আর অন্যটি বর্ণনা করেছেন বাযযার, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। বর্ণনাটিতে ছিলো কা'ব ইবনে আশরাফের মক্কায় আগমনের কথা।

সূরা কাওছার ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ۞ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۞

r আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করিয়াছি।

r সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।

r নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।

প্রথমে বলা হয়েছে—'ইন্না আ'ত্বইনাকাল্ কাওছার' (আমি অবশ্যই আপনাকে কাওছার দান করেছি)। ভাষাবিদগণ বলেন, 'কাওছার' শব্দটি সাধিত হয়েছে 'কাছরত' থেকে, যেমন 'নাওফাল' থেকে নফল। যে বিষয়টি সংখ্যায় অধিক, গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার, আরববাসীরা তাকেই বলে কাওছার। একথার সমর্থন রয়েছে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিতে। তিনি বলেছেন, কাওছার হচ্ছে ওই মহামূল্যবান পুরস্কার, যা আল্লাহ্ কেবল দান করেছেন তাঁর প্রিয়তম রসুলকে। সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবুল বাশার ও আতা ইবনে সাইব। আবুল বাশার বলেছেন, আমি একবার সাঈদ ইবনে যোবায়েরকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকে যে বলে কাওছার জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম? তিনি বললেন, ওই প্রস্রবণও 'কাওছার' নামক মহামূল্যবান পুরস্কারের অন্তর্ভূত। এই বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত হয়, এখানকার 'আল কাওছার' এর 'আলিফ লাম' জাতিবাচক। হজরত ইবনে আব্বাস কথিত 'মহামূল্যবান পুরস্কারে'র অন্তর্ভুক্ত। এভাবে যারা কোরআন মজীদ এবং নবুয়তকে কাওছার বলেন, তার নিকটও এখানকার 'আলিফ লাম' জাতিবাচক। তবে উত্তম এই যে, এখানকার 'লাম' টিকে সীমিতার্থক ধরে নিয়ে ওই ব্যাখ্যাটিই উপস্থাপন করা সমীচীন, যা বর্ণিত হয়ে এসেছে রসুল স. থেকে, যা বর্ণিত হয়েছে হজরত আনাস থেকে ইমাম মুসলিম কর্তৃক।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি বেহেশতে গিয়ে দেখলাম বিশাল একটি হ্রদ। তার চতুষ্পার্শ্বে রয়েছে মুক্তাসদৃশ অসংখ্য তাঁবু। আমি হ্রদের পানিতে হাত দিলাম। দেখলাম, সে পানি

www.eelm.weebly.com

স্বচ্ছ, সুপেয় ও মেশকের মতো সুরভিময়। জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী? তিনি বললেন, এটাই সেই মহাকল্যাণময় কাওছার, যা আল্লাহ্ আপনাকে দান করেছেন। সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে আহমদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. বললেন, কাওছারের পানি হবে দুগ্ধশুভ্র, মধু অপেক্ষা অধিক সুমিষ্ট। তাতে ভেসে বেড়াবে সন্তরণপ্রবণ পক্ষীকুল। তাদের গ্রীবাদেশ হবে উটের মতো অংস-পুটবিশিষ্ট। মান্যবর ওমর জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তমজন! তাহলে তো বিষয়টি হবে খুবই কল্যাণপ্রদ। তিনি স. জবাব দিলেন, তার চেয়ে অধিক কল্যাণপ্রদ হবে ওই পানি পান করা।

হজরত উসামা ইবনে জায়েদ থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, একবার শহীদশ্রেষ্ঠ হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পত্নী রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র হাবীব! আপনাকে কি জান্নাতে কাওছার নামের কোনো প্রস্রবণ দেওয়া হয়েছে? তিনি স. জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তার তটদেশ হবে মহামূল্যবান মুক্তা, জবরজদ ও ইয়াকুতের। আর তা প্রশস্ত হবে আইলা থেকে সানআ পর্যন্ত দূরত্বের সমান। আর সেখানকার পানপাত্রগুলো হবে তারকারাজি সদৃশ অগণন। তিবরানীর দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে 'ইন্না আ'ত্বইনাকাল্ কাওছার' আয়াতখানির ব্যাখ্যাব্যপদেশে হজরত হুজায়ফা বলেছেন, জান্নাতে রয়েছে বিশাল পরিধিবিশিষ্ট একটি হ্রদ। তার তটভূমিতে রক্ষিত স্বর্ণ-রৌপ্যের পানপাত্রগুলি হবে অসংখ্য। সেগুলোর সংখ্যা কতো তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জানা নেই। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতাভ্যন্তরের একটি প্রস্রবণের নাম কাওছার, যার দুই তীর স্বর্ণের। মুক্তাবিছানো জমিনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে তার পানি। ইবনে মাজা, আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি হাদিসটির প্রত্যয়ন করেছেন।

বোখারী বর্ণনা করেছেন, একবার জননী আয়েশার নিকটে 'ইন্না আ'ত্বইনা কাল্ কাওছার' আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হলো। তিনি বললেন, কাওছার একটি পবিত্র প্রস্রবণ, যা আল্লাহ্ উপহার দিয়েছেন তাঁর প্রিয়তম রসুলকে।

অন্ততপক্ষে পঞ্চাশজন সাহাবী থেকে হাউজে কাওছার সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সর্বহজরত খলিফা চতুষ্টয়, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, ইমাম হাসান, হামযা, আয়েশা সিদ্দিকা, উম্মে সালমা, আবু হোরায়রা, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, জাবের এবং আরো অনেকে রেদ্বওয়ানুল্লহি তায়ালা আ'লাইহিম আজ্মাঈন। সুয়ূ্যতী তাঁর 'বুদুরে সফিরা' গ্রন্থে মান্যবর সাহাবীগণ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন প্রায় সত্তরটি।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে 'ফাসল্লি লিরব্বিকা ওয়ানহার' (সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো এবং কোরবানী করো)। এখানকার 'ফাসল্লি' (সালাত আদায় করো)। কথাটির 'ফা' অব্যয়টি নিমিত্তপ্রকাশক। অর্থাৎ যেহেতু আপনার প্রভুপালক আপনাকে হাউজে কাওছার দান করে ধন্য করেছেন, সেহেতু আপনি কেবল তাঁর উদ্দেশ্যে নামাজ পাঠ করুন।

www.eelm.weebly.com

এতে করে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যাবতীয় উপায় নিহিত রয়েছে নামাজের মধ্যে— বচনগত, আচরণগত ও অন্তর্গত। মানুষের ভিতর-বাহির উভয়ই সম্মিলিতভাবে হয় যথাকৃতজ্ঞতার প্রতিভূ। কেউ কেউ উপদেশ দিয়েছেন, অতএব নামাজ পাঠ করা উচিত কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে, অন্যের উদ্দেশ্যে (খেয়ালে) নয়।

'ওয়ান্হার' অর্থ কোরবানী করো। অর্থাৎ কোরবানী করুন উট (কেননা আরব দেশে উটই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সম্পদ বলে বিবেচিত) এবং উটের গোশত বিলিয়ে দিন পিতৃহীন ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে। যারা এতিমদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করে এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করে না, তাদের মতো করবেন না। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এই আয়াতখানির বক্তব্যগত যোগাযোগ ঘটবে আগের সুরার ২ ও ৩ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে, যেখানে বলা হয়েছে 'সে তো সে-ই, যে এতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না'। অর্থাৎ এখানে দেওয়া হয়েছে ওই আয়াত দু'টির বিপরীতার্থক নির্দেশ।

ইকরামা, আতা ও কাতাদা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— ঈদের দিন নামাজ পাঠ করো এবং স্বীয় কোরবানীর পশু জবাই করো। এমতো ব্যাখ্যার পটভূমিকায় ঈদুল আজহার নামাজ ও কোরবানী হয়ে পড়ে ওয়াজিব। সাঈদ ইবনে যোবায়ের কথাটির অর্থ করেছেন— মুজদালিফায় ফরজ নামাজ আদায় করো এবং কোরবানী করো মিনায় গিয়ে। জনৈক বর্ণনাকারীর উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে জাওজী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন— নামাজ পাঠ করো এবং বক্ষদেশে বাম হাতের উপরে বাঁধো ডান হাত। অর্থাৎ নামাজ পড়ো তাহরীমা বেঁধে। এমতাবস্থায় 'আনহার' শব্দটির অর্থ হবে বুকের উপরে হাত বাঁধা। অবশ্য বর্ণনাটি নিতান্তই দুর্বল। তাই তাফসীরকারগণ বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি।

শেষোক্ত আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই তো নির্বংশ'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! নির্বংশ বলে আপনাকে যারা খোঁটা দেয়, তারাই সুনাম-সুকীর্তির দিক দিয়ে নির্বংশ। যুগ যুগ ধরে তাদের উপরে বর্ষিত হতে থাকবে মনুষ্যজাতি ও ফেরেশতাকুলের অভিসম্পাত।

আস ইবনে ওয়াইলের পঞ্চত্বপ্রাপ্তির পর তার দুই পুত্র হজরত আমর ও হজরত হিশাম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আস তো নির্বংশ বা লেজকাটা নয়। এমতো প্রশ্নের জবাব রয়েছে উদ্ধৃত ব্যাখ্যাটির মধ্যেই। ইসলাম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো তার কুফরীর বংশপ্রবাহ। তাঁর মুসলমান সন্তানদ্বয় তাই বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন কাফের পিতার উত্তরাধিকারজাত সম্পদ থেকে। কেননা মুসলমান কখনো কাফেরের ওয়ারিশ হয় না। এটাই ইসলামের বিধান। বরং বলা যেতে পারে, ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দু'জন হয়ে গিয়েছিলেন রসুল স. এর রূহানী সন্তান এবং তাঁর জান্নাতবাসিনী পত্নীগণ হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের রূহানী জননী।

www.eelm.weebly.com

এখানকার ‘হুয়া’ (তারা) সর্বনামটি সীমিতার্থক। অর্থাৎ আপনার প্রতি যারা বিদ্বেষ পোষণ করে, তারাই নির্বংশ, আপনি নন। কিয়ামত পর্যন্ত কলেমা, আজান, ইকামত ও বহুবিধ বিষয়ে আপনার নামোচ্চারণ হতে থাকবে আল্লাহ্র নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে। পরকালেও বিঘোষিত হতে থাকবে আপনার নামের মহিমা। বিশ্বাসী-পুরুষ-নারী এবং ফেরেশতাদের মুখেও আলোচিত হতে থাকবে আপনার প্রসঙ্গ। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালয়িতা! শেষ রসুল মোহাম্মদের বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী উম্মতকে তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

সূরা কাফিরূন

৬ আয়াতবিশিষ্ট এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যধাম মক্কায়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার কুরায়েশেরা রসুল স.কে আহ্বান জানালো এবং বললো, মোহাম্মদ! শোনো, আমরা তোমাকে এতো ধন-সম্পদ দিবো, যাতে করে তুমি হয়ে যেতে পারো মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদপতি। আর যে রমণীকে তুমি বিয়ে করতে চাও, তার সঙ্গেই আমরা তোমাকে দিবো পরিণয়বদ্ধ করে। বিনিময়ে আমরা শুধু চাই, তুমি আমাদের দেব-দেবীদের দুর্নাম করবে না। অথবা— এক বৎসর তুমি আমাদের দেব-দেবীদের উপাসনা যদি করো, তবে পরের বছর আমরা উপাসনা করবো তোমার আল্লাহ্র। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের মধ্যে আর কোনো দ্বন্দ্ব ফ্যাসাদ থাকবে না। রসুল স. বললেন, দেখি! আমার পরম প্রভুপালয়িতা এ সম্পর্কে কী নির্দেশ দান করেন। ওয়াহাবের বক্তব্যানুসরণে আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, কুরায়েশরা বলেছিলো, তোমার ও আমাদের মধ্যে মীমাংসা হোক এভাবে— এক বছর তুমি আমাদের মাবুদ গুলোর ইবাদত করো, আর এক বছর তোমার আল্লাহ্র ইবাদত করবো আমরা। এভাবেই বছরের পর বছর বেঁচে থাকতে পারে আমাদের উভয়ের ধর্মমত।

সাঈদের বর্ণনা থেকে ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, একবার ওলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়াইল, আসওয়াদ ইবনে আবুল মুত্তালিব এবং উমাইয়া ইবনে খালফ রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে প্রস্তাব রাখলো, মোহাম্মদ! এসো আমরা এক সঙ্গেই সব করি। পূজা করি আমাদের দেব-দেবীদের এবং তোমার আল্লাহ্র। তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়—

সূরা কাফিরূন ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ وَلَاۤ اَنْتُمْ

www.eelm.weebly.com

عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَآ اَنْتُمْ
عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

r বল, 'হে কাফিররা!

r 'আমি তাহার 'ইবাদত করি না যাহার ইবাদত তোমরা কর

r এবং তোমরাও তাঁহার ইবাদতকারী নহ যাঁহার ইবাদত আমি করি,

r 'এবং আমি ইবাদতকারী নহি তাহার, যাহার ইবাদত তোমরা করিয়া আসিতেছ।

r 'এবং তোমরাও তাঁহার ইবাদতকারী নহ, যাঁহার ইবাদত আমি করি।

r 'তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূণ'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলুন, হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! এভাবে এখানে সম্বোধন করতে বলা হয়েছে তাদেরকে, যারা রসুল স. এর কাছে উত্থাপন করেছিলো সত্য-মিথ্যার মিশ্রণের প্রস্তাব। আল্লাহ্পাক জানতেন, তারা চিরসত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাই তিনি রসুল স. কে এখানে সম্বোধন করতে বলেছেন এভাবে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'আমি তার ইবাদত করি না, যার ইবাদত তোমরা করো'(২)। একথার অর্থ— তোমরা ইবাদত করো অলীক দেব-দেবীদের। ওরকম অযথার্থ ইবাদত তো আমি করি না। করবোও না কোনো কালে। এখানে বক্তব্যটির শুরুতে ব্যবহার করা হয়েছে নেতিবাচক 'লা'। এভাবে এখানে একথাটিই বুঝানো হয়েছে যে, অংশীবাদিতা ও বিশ্বাসের মিশ্রণ চিরনিষিদ্ধ। বায়যাবী লিখেছেন, শুধু 'লা' (না) ভবিষ্যতকালার্থক। অর্থাৎ এখন যা হচ্ছে না, তা ভবিষ্যতেও হবে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা তার ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি (৩) এবং আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছো' (৪)। এই বক্তব্যটিও ভবিষ্যতকালজ্ঞাপক। অর্থাৎ আমি যে এক-এককক-অবিভাজ্য সত্তার ইবাদত করি, তাঁর ইবাদত তোমরা যেমন এখন করো না, তেমনি করবে না ভবিষ্যতেও।

'মান' শব্দটি ব্যবহৃত হয় বিবেকসম্পন্নদের ক্ষেত্রে এবং বিবেকহীনদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় 'মা'। কিন্তু এখানে বিবেকবানদের ক্ষেত্রে 'মা' ব্যবহৃত হয়েছে কেবল শাব্দিক সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে। অর্থাৎ এখানে 'মা' আনা হয়েছে আগের আয়াতের 'মা' এর সঙ্গে সমতা রক্ষার্থে। এভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে কেবল পারস্পরিক উপাস্যের গুণাগুণের প্রতি। বিবেকবান-বিবেকহীনের প্রসঙ্গটিকে সামনে আনা

www.eelm.weebly.com

হয়নি। 'মা' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ধাত্যর্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি যেমন কোনোদিন তোমাদের কাল্পনিক দেব-দেবীদের পূজা করবো না, তেমনি তোমরাও কোনোদিন আরাধনা করবে না মহাসৃষ্টির মহাপ্রভুপালয়িতার।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি'। বাক্যটি আগের বাক্যেরই পুনরাবৃত্তি। অধিকাংশ ভাষাবিদ বলেন, কোরআন যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, সেহেতু এর প্রকাশভঙ্গি হবে আরবী ভাষার রীতি অনুসারেই। সম্বোধনরীতিও হবে তেমনই। আর আরবীতে বার বার একই কথা বলা হয় বক্তব্যের গুরুত্ব প্রকাশার্থে। যেমন বাক্যসংকোচনের উদ্দেশ্য থাকে বক্তব্যসংক্ষেপণ। এখানেও সেরকমই করা হয়েছে। কুরতুবী বলেছেন, এখানে একত্ববাদ ও বহুত্ববাদের বক্তব্যগত সম্মিলন ঘটার ফলে বাক্যগুলিও হয়ে পড়েছে পুনরাবৃত্তিমূলক। কেননা বক্তব্যটি এসেছে কাফের কুরায়েশদের একটি নির্দিষ্ট অপপ্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে। তারা বলেছিলো, একবছর আমরা হবো বহুত্ববাদী, আর এক বছর একত্ববাদী। কিন্তু এরকম হওয়া যে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, সে কথাটিও এখানে বার বার উচ্চারণ করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরকমও বলা হয়েছে যে, প্রতিটি বাক্যের প্রথম 'মা' যোজক এবং পরের 'মা' ধাতুমূলক। অর্থাৎ উপাস্যের একিভূতী এবং ইবাদতের একিভূতীর অবাস্তবতা বুঝানোই এখানে উদ্দেশ্য।

শেষোক্ত আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার'। এই আয়াতের দু'টি বাক্যই বিজ্ঞপ্তিমূলক। কিন্তু এমতো ভাবনার কোনো অবকাশ নেই যে, বক্তব্যটির (তোমাদের দ্বীন তোমাদের) দ্বারা এখানে কাফেরদের কুফরীর ব্যাপারে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, অথবা মুসলমানদেরকে জেহাদ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বরং বলা যেতে পারে, এই আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে পূর্ববর্তী বক্তব্যের গুরুত্ব ও পরিণতিকে। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা জেহাদের আয়াতকে রহিত করা হয়েছে, এরকম ভাবা যেতেই পারে না। কুফরী যেহেতু কল্যাণকর নয়, সেহেতু এরকম চিন্তাও অসমীচীন যে, সমঝোতার মাধ্যমে এখানে ইমানদার ও কাফেরদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে স্ব স্ব অবস্থানে থাকতে। তাই তো আমরা দেখতে পাই, এর পরেও রসুল স. বার বার কাফের কুরায়েশদেরকে ইমান ও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তারা তাঁকে এবং তাঁর প্রিয় সহচরবর্গকে দিয়েছে নানা প্রকারের যাতনা। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরকম হওয়াই সমীচীন যে— তোমরা প্রতিফল লাভ করবে তোমাদের কৃতকর্মের এবং আমি লাভ করবো আমার কৃতকর্মের প্রতিফল।

ইতোপূর্বে সুরা যিলযালের তাফসীরের একস্থানে হজরত আনাস ও হজরত ইবনে আব্বাসের এক হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পুণ্যের দিক দিয়ে সুরা কাফিরূন সমগ্র কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। জননী আয়েশা বর্ণনা

www.eelm.weebly.com

করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কতোই না উত্তম হতো, যদি ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজে পাঠ করা হতো সুরা কাফিরূন এবং সুরা ইখলাস। ইবনে হিশাম। ওরওয়া ইবনে নওফেল ইবনে হজরত মুয়াবিয়া বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! আমাকে এমন একটি সুরা শিক্ষা দিন, যা আমি পাঠ করতে পারি রাতে শয্যাগ্রহণকালে। তিনি স. বলেছিলেন, সুরা কাফিরূন পাঠ করো। কেননা এতে রয়েছে অংশীবাদিতার প্রতি তীব্র অনীহা।

হজরত যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আমাকে বললেন, তুমি কি চাও, প্রবাসকালে তোমার বাসস্থান হোক সর্বোন্নত এবং পাথেয় হোক সর্বাধিক? আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি স. বললেন, সর্বদা পাঠ কোরো সুরা কাফিরূন, ইখলাস, নাসর, ফালাক্ব ও নাস— এই পাঁচটি সুরা। আর প্রতিটি সুরা আবৃত্তির শুরু থেকে শেষে পাঠ কোরো বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। হজরত যোবায়ের বলেছেন, আমি ছিলাম বিত্তশালী। কিন্তু প্রবাসে আমি হয়ে যেতাম দুর্দশাকবলিত। পাথেয় হয়ে যেতো নিঃশেষ। কিন্তু যখন থেকে প্রবাসকালে আমি এই পাঁচটি সুরা পাঠ করতে শুরু করলাম, তখন থেকে দুর্দশা আমার নাগাল পেতো না। পাথেয় থাকতো প্রচুর। গৃহে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আমি প্রাচুর্যের মধ্যেই থাকতাম।

হজরত আলী বলেছেন, একবার রসুল স.কে দংশন করলো একটি বৃশ্চিক। তিনি স. সঙ্গে সঙ্গে লবণ ও পানি আনতে বললেন। আর ক্ষতস্থানে লবণ পানি প্রবাহিত করে দিতে দিতে দম করতে লাগলেন সুরা কাফিরূন, সুরা ফালাক, সুরা নাস পড়ে পড়ে। আল্লাহই সমধিক অবগত।

সূরা নাসর

এই সুরাখানিতে রয়েছে মাত্র ৩টি আয়াত। এর অবতরণ স্থল মহাপুণ্যনিকেতন মক্কা নগরী।

আবদুর রাজ্জাক তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে লিখেছেন, মুয়াম্মার সূত্রে জুহুরী বর্ণনা করেছেন, মক্কাবিজয়ের বছর শহরের নিকটে উপস্থিত হয়ে রসুল স. হজরত খালেদের নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক সৈন্যকে পাঠালেন মক্কার ভাটি এলাকায়। সেখানে হজরত খালেদের বাহিনীর সঙ্গে কুরায়েশদের একটি দলের সংঘর্ষ উপস্থিত হলো। বিজয়ী হলেন হজরত খালেদ। এরপর রসুল স. এক ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিপক্ষীয়দেরকে অস্ত্রসমর্পণের আদেশ দিলেন। সকলেই দলে দলে অস্ত্র সমর্পণ করতে লাগলো এবং গ্রহণ করতে লাগলো ইসলাম। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো এই সুরাখানি।

www.eelm.weebly.com

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○
اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَ الۡفَتۡحُ ۙ﴿۱﴾ وَ رَاَیۡتَ النَّاسَ یَدۡخُلُوۡنَ فِیۡ دِیۡنِ
اللّٰهِ اَفۡوَاجًا ۙ﴿۲﴾ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَ اسۡتَغۡفِرۡهُ ؕؔ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿۳﴾

r যখন আসিবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়

r এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে

r তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিও এবং তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিও, তিনি তো তওবা কবুলকারী।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ইজা জ্বাআ নাসরুল্লহি ওয়াল্‌ফাতহ্'। মক্কাবিজয়ের সময় এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছিলো বলেই এখানকার 'ইজা' (যদি) শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'ইজ'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়। অন্যান্য আয়াতেও 'ইজা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে 'ইজ' অর্থে। যেমন 'ইজা জ্বাআ আম্‌রুনা ওয়া ফারাত তানূর' (অবশেষে যখন এসে গেলো আমার আদেশ এবং উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো ভূপৃষ্ঠ), 'হাত্‌তা ইজা বালিগা' (যখন সে পৌঁছলো)।

'ওয়াল ফাতহ্' অর্থ বিজয়। অর্থাৎ মক্কাবিজয়। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, মক্কাবিজয়ের দিন রসুল স. বলেছিলেন, এটা সেই দিন, আল্লাহ্ যে দিনের প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন ' ইজা জ্বাআ নাসরুল্লহি ওয়াল ফাতহ্'।

ঐতিহাসিকেরা ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— হুদায়বিয়া নামক স্থানে রসুল স. কুরায়েশদের সঙ্গে দশ বছরের জন্য একটি অনাক্রমণ চুক্তি করলেন, যার শর্তগুলোর মধ্যে ছিলো— এই দশ বৎসর জনগণকে দেওয়া হবে পূর্ণনিরাপত্তা। তারা অবাধে চলাচল করতে পারবে। অন্যান্য গোত্র তাদের ইচ্ছামতো যে কোনো দলে যোগদান করতে পারবে। এই শর্তটির কারণে আরবের বিভিন্ন গোত্র তাদের ইচ্ছামতো যোগ দিতে লাগলো মুসলমান অথবা কাফের কুরায়েশদের সঙ্গে। মুসলিম দলে যোগ দিলো খাজাআ গোত্র এবং বনী বকর যোগ দিলো কুরায়েশদের সঙ্গে। গোত্রদুটির মধ্যে ছিলো দীর্ঘদিনের প্রলম্বিত বিদ্বেষ। কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর বনী বকর চড়াও হলো বনী খাজাআদের উপর। কুরায়েশদের মধ্য থেকে তাদের সাহায্যে এগিয়ে গেলো সাফোয়ান ইবনে উমাইয়া, ইকরামা ইবনে আবু জেহেল, সুহাইল ইবনে আমর। শায়বা ইবনে ওসমান, হুয়াইতাব ইবনে আবদুল উজ্জা এবং তাদের সঙ্গী সাথীরা। প্রচণ্ড লড়াই হলো। দু'পক্ষেই হতাহত হলো অনেক লোক। যুদ্ধশেষে কুরায়েশেরা বুঝতে পারলো, রসুল স.

www.eelm.weebly.com

এর সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করা হয়েছে। এর জন্য তারা পরস্পরকে দোষারোপ করতে শুরু করলো। আমর ইবনে সালেম খাজায়ী তার গোত্রের চল্লিশ জনকে সঙ্গে নিয়ে সংবাদ জানানোর অভিপ্রায়ে যাত্রা করলো মদীনা অভিমুখে। কিন্তু তারা মদীনায় উপস্থিত হওয়ার আগেই রসুল স. ঘটনাটি জেনে ফেললেন। সাহাবীগণকে বললেন, কুরায়েশরা চুক্তিভঙ্গ করেছে। অবশ্য এটাই ছিলো আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়। জননী আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন, নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো কল্যাণ রয়েছে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। জননী আয়েশা থেকে মোহাম্মদ ইবনে আমর এবং জননী উম্মে সালমা থেকে তিবরানীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

আমর ইবনে সালেম খাজায়ী তার লোকজনকে নিয়ে মদীনায় পৌঁছলো। রসুল স.কে খুলে বললো সকল বৃত্তান্ত। রসুল স. বললেন, এখন তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা আমার কর্তব্য। নতুবা আমরাও তো তোমাদের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে পারবো না। ঘটনাটি ঘটেছিলো হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির বাইশ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর শাবান মাসে। রসুল স. তিনটি শর্ত জানিয়ে তাঁর প্রতিনিধিরূপে মক্কায় পাঠালেন হজরত হামযাকে। শর্ত তিনটি ছিলো— ১. বনী খাজাআর নিহত ১৩ জনের জন্য রক্তপণ দিতে হবে ২. অন্যথায় বনী খাজআকে আক্রমণকারী বনী বকরের মিত্রশক্তি বনী নাফাছাকে করে দিতে হবে চুক্তিবহির্ভূত, যেনো মুসলমানগণ তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারে ৩. অথবা রহিত করে দিতে হবে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি। শর্ত তিনটির কথা জেনে কুরায়েশরা মহা বিপদে পড়লো। নিজেদের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্কের পর একমত হলো যে, সন্ধিচুক্তি রহিত করে দেওয়াই উত্তম। হজরত হামযা সন্ধিচুক্তি বাতিলের সংবাদ নিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

রসুল স. পরামর্শ সভায় বসলেন। হজরত আবু বকর পরামর্শ দিলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল! তাদের প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শন করাই উত্তম। সন্ধিচুক্তিটি পুনর্বহাল করলেই মনে হয় ভালো হয়। কেননা তারা তো আপনারই স্বজাতি। অচিরেই হয়তোবা তারা আপনার অনুগামীও হয়ে যেতে পারে। হজরত ওমর বললেন, যুদ্ধ, কেবল যুদ্ধই হচ্ছে এর একমাত্র সমাধান। হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম বাণীবাহক! আপনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুন। তারা তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যেও নিকৃষ্ট সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তারা আপনাকে ‘পাগল’ ‘যাদুকর’ কতো কিছু বলে অপবাদ দেয়। সুতরাং যুদ্ধের মাধ্যমেই তাদেরকে শায়েস্তা করতে হবে। তাদেরকে পরাভূত করতে পারলে সমগ্র আরব আপনার করতলগত হবে। আর অনুগামী যদি হয়, তবে সমগ্র আরব হবে আপনার অনুগত।

রসুল স. হজরত ওমরের অভিমতকেই গ্রহণ করলেন। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন নীরবে। আরবের বিভিন্ন গোত্র-শাখাগোত্রকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন কুরায়েশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে। ফলে আসলাম, গিফার, মুজাইনা, হরফিয়া, আশজা ও সুলাইম গোত্রের লোকেরা যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে

www.eelm.weebly.com

সমবেত হলো মদীনায়। অন্যান্য গোত্রগুলো সংবাদ পাঠালো, তারা পথে তাদের লোকজন নিয়ে মিলিত হবে। এভাবে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ালো দশ হাজার, মতান্তরে বারো হাজারে। সম্ভবত মদীনা থেকে যাত্রার প্রাক্কালে সৈন্যসংখ্যা ছিলো দশ হাজার। পথে অন্যান্যরা যোগ দিলে সে সংখ্যা হয়ে যায় বারো হাজার।

ওদিকে কুরায়েশরা চিন্তিত হয়ে পড়লো। মদীনায় পাঠালো তাদের প্রিয় নেতা আবু সুফিয়ানকে। তিনি মদীনায় এসে সোজাসুজি উপস্থিত হলেন তাঁর কন্যা উম্মতজননী উম্মে হাবীবার গৃহে। রসুল স. এর শয্যায় উপবেশনের উদ্যোগ করতেই জননী উম্মে হাবীবা বিছানা গুটিয়ে নিলেন। বললেন, এটা রসুলুল্লাহ্ স. এর বিছানা। এর উপরে কোনো মুশরিক উপবেশন করতে পারে না। আবু সুফিয়ান বললেন, তুমি আমার কন্যা হয়ে আমার সঙ্গে এরকম আচরণ করতে পারলে? জননী উম্মে হাবীবা বললেন, হ্যাঁ, আমি আপনার কন্যা, কিন্তু আল্লাহ্ তো দয়া করে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন পবিত্র ইসলামের ছায়ায়। অথচ আপনি একজন গোত্রপতি হলেও এখনো অংশীবাদী। আপনার তো উচিত এই মুহূর্তে মহাসত্য ইসলামকে গ্রহণ করা।

আবু সুফিয়ান সেখানে আর দাঁড়ালেন না। বাইরে এসে সাক্ষাত করলেন রসুল স. এর সঙ্গে। তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন অনেক কথা। রসুল স. তার একটিরও জবাব দিলেন না। তিনি তখন সুপারিশকারী হিসেবে নিযুক্ত করলেন হজরত আবু বকরকে। তিনি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। সরাসরি বলে দিলেন, আপনার জন্য আমি কোনো সুপারিশ করতে পারি না। হজরত ওমর রাগান্বিত হলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, যুদ্ধই সকল সমস্যার সমাধান। আমার কাছে যদি মাত্র একটি ছড়িও থাকে, তবুও তো আমি তাই নিয়ে যুদ্ধ করবো আপনাদের বিরুদ্ধে। আবু সুফিয়ান এবার দেখা করলেন হজরত আলী ও হজরত ফাতেমার সঙ্গে। তাঁরাও তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। শেষে বিফল মনোরথ হয়ে তিনি ফিরে গেলেন মক্কায়। কিছুকাল পরে হজরত ইবনে উম্মে মকতুম, অথবা হজরত আবু জর গিফারীকে মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করে রসুল স. ৮ম হিজরী সনের ১০ই রমজানে সদলবলে যাত্রা করলেন মক্কা অভিমুখে। দোয়া করলেন, হে আমাদের প্রভুপালক! গুপ্তচরের অপপ্রভাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কোরো।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, রসুল স. যোবায়ের, মেকদাদ ও আমাকে আদেশ করলেন, এক্ষুণি মক্কার দিকে যাত্রা করো। বুস্তানখাখে পৌঁছে এক উষ্ট্রারোহিনীর সাক্ষাত পাবে। তার কাছে একটি পত্র আছে, পত্রটি ছিনিয়ে নিয়ে এসো। আমরা যাত্রা করলাম। বুস্তানখাখে পৌঁছে দেখা পেলাম কথিত উষ্ট্রারোহিনীর। তার গতিরোধ করে বললাম, চিঠিটা দাও। সে বললো, আমার কাছে কোনো চিঠি নেই। আমি বললাম, ভালোয় ভালোয় বের করে দাও। নয়তো তোমাকে বিবস্ত্র করে তল্লাশী করা হবে। সে এবার বিনা বাক্যে বের করে দিলো চিঠিটি। আমরা চিঠি নিয়ে ফিরে এলাম মদীনায়। চিঠিটি লিখেছিলেন হাতেব ইবনে আবী বালতা। ওই চিঠির মাধ্যমে তিনি মক্কায় অবস্থানরত

www.eelm.weebly.com

তাঁর আত্মীয়স্বজনদেরকে রসুল স. এর মক্কা অভিযানের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন। রসুল স. তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, হাতেব! কী ব্যাপার? হাতেব বললেন, আমি মার্জনাপ্রার্থী। তবে হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! এর মধ্যে আমার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিলো না। আমার পরিবার-পরিজন রয়েছে মক্কায়। আমার কিছুসংখ্যক মুহাজির ভাইদের স্বজন-পরিজনও রয়েছে সেখানে। চিঠির মাধ্যমে আমি কেবল তাদের নিরাপত্তা কামনা করেছিলাম। ভেবেছিলাম, এই সংবাদ পাওয়ার কারণে তারা হয়তো কুরায়েশদের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। বিজয় তো হবে আপনারই। রসুল স. বললেন, হাতেব সত্য কথাই বলেছে। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তার আচরণ তো মুনাফিকদের মতো। অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রসুল স. বললেন, রসনা সংযত করো। তুমি কি জানো না হাতেব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন গাজী। ওই যুদ্ধবিজয়ীদের সম্পর্কে কি আল্লাহ্ এই বলে শুভসমাচার দান করেননি যে 'তোমাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে। এখন তোমরা যা খুশী তাই করতে পারো'। হজরত ওমর অনুতপ্ত হলেন। প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো। 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে বরণ কোরো না'।

রসুল স. রোজাদার ছিলেন। রোজা রেখেছিলেন সাহাবীগণও। সকলে ইফতার করলেন কাদীর নামক স্থানে পৌঁছে।

রসুল স.এর প্রিয় পিতৃব্য হজরত আব্বাস ছিলেন হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্বে। তিনি ওই সময় বেরিয়ে পড়েছিলেন মক্কা থেকে। উদ্দেশ্য ছিলো হিজরত। সৌভাগ্যবশত তিনি রসুল স. এর সাক্ষাত পেলেন জুহফা নামক স্থানে। তাঁর চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারেছ এবং তাঁর পুত্র জাফর ইবনে আবু সুফিয়ান রসুল স. এর সঙ্গে মিলিত হলেন আবওয়ায়। তাঁরাও ইসলাম গ্রহণ করলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আবু সুফিয়ান এবং আতেকার পুত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়া আবওয়া নামক স্থানে রসুল স. এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তিনি স. তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, ওদের কোনো প্রয়োজন আমার নেই। ওরা আমার সম্পর্কে অনেক অবান্তর কথা বলেছে। আমার মর্যাদাহানি করেছে। তাঁরা শরণ গ্রহণ করলেন উম্মতজননী উম্মে সালমার। জননী তাঁদের পক্ষে সুপারিশ করলেন। রসুল স. আর তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করলেন না।

কাদীরে পৌঁছেই যুদ্ধের পতাকা উড্ডীন করবার আদেশ দিলেন রসুল স.। পতাকা ভাগ করে দিলেন বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে। তাঁর ব্যক্তিগত দলের পতাকাবাহী হলেন হজরত যোবায়ের। এরপর যাত্রা শুরু করলেন। ইশার নামাজের সময় পৌঁছে গেলেন মাররুজ জাহরান নামক স্থানে। তখন পর্যন্ত কুরায়েশরা রসুল স. এর অভিযান সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। ওই রাতেই আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, হাকীম ইবনে হাযাম এবং বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা গোপনে সংবাদ সংগ্রহের জন্য মক্কা থেকে বের হলো। রসুল স. তাঁর সেনাবাহিনীকে

www.eelm.weebly.com

বিভিন্ন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করার আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হলো। এক সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠলো প্রায় দশ হাজার স্থানে। হজরত আব্বাস আপন মনে বলে উঠলেন, এই রাত্রিশেষের ভোর হবে কুরায়েশদের জন্য অত্যন্ত অশুভ। আল্লাহ্র শপথ! আজ যদি মোহাম্মদ মহাপ্রতাপের সঙ্গে মক্কায় প্রবেশ করে, তবে কুরায়েশদের দাপট নিভে যাবে চিরতরে। এরপর তিনি একটি খচ্চরের পিঠে চড়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন এই উদ্দেশ্যে যে, যদি মক্কার দিকে গমনকারী কোনো জ্বালানী সংগ্রহকারী, দুগ্ধ বিতরণকারী, অথবা অন্য কোনো পথিকের মাধ্যমে কুরায়েশদেরকে এই সংবাদটি পৌঁছে দেওয়া যায় যে, বাঁচতে যদি চাও, তবে আল্লাহ্র রসুলের নিকট উপস্থিত হয়ে নিরাপত্তাপ্রার্থী হও। কিছুদূর অগ্রসর হতেই তিনি আবু সুফিয়ানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। তিনি বলছিলেন, আল্লাহ্র শপথ! আজ রাতের মতো আলোর মেলা আমি জীবনে দেখিনি। হজরত আব্বাস তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, শোনো আবু সুফিয়ান! মোহাম্মদ তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে এসেছেন। তাঁকে প্রতিহত করা অসম্ভব। আবু সুফিয়ান বললেন, তাহলে উপায়? হজরত আব্বাস বললেন, তুমি যদি ধরা পড়ো, তবে নিশ্চয় তোমার মস্তক ছেদন করা হবে। তার চেয়ে আমার বাহনে উঠে পড়ো। আমি তোমাকে তাঁর কাছে পৌঁছে দেই। তুমি তাঁর কাছে নিরাপত্তা ভিক্ষা করো। আবু সুফিয়ান তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলেন। রসুল স. এর কাছে পৌঁছার আগেই তাঁরা ধরে পড়ে গেলেন হজরত ওমরের চোখে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আরে, আরে, এতো দেখছি আল্লাহ্র দুশমন। বিনা চেষ্টায় এসে গ্যাছে আমাদের দখলে। একথা বলেই তিনি আবু সুফিয়ানকে আঘাত করার জন্য ছুটে এলেন। তার আগেই হজরত আব্বাস তাঁকে নিয়ে দ্রুত উপস্থিত হলেন রসুল স. সকাশে। রসুল স. তাঁর কথা শুনে বললেন, আজ রাতের জন্য আপনি তাঁকে আপনার সঙ্গেই রাখুন।

সকাল হলো। হজরত আব্বাস আবু সুফিয়ানকে নিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। রসুল স. বললেন, হে কুরায়েশ গোত্রপতি! এখনো কি লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ মোহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্ কলেমায় বিশ্বাসী হবার সময় আসেনি? আবু সুফিয়ান বললেন, আমার পিতামাতা আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হোক। আপনি সহিষ্ণু, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। আল্লাহ্র শপথ! আমার ধারণা, দ্বিতীয় কোনো আল্লাহ্র অস্তিত্ব যদি থাকতো, তবে তুমিই হতে সেই আল্লাহ্। রসুল স. বললেন, আমি যে আল্লাহ্র রসুল, এ বিষয়ে তোমার হৃদয়ে এখনো কি প্রতীতি জন্মেনি? আবু সুফিয়ান বললো, না। এখনো আমার মনে রয়ে গেছে কিছুটা খটকা। হজরত আব্বাস বললেন, আরে অবুঝ! ইসলাম গ্রহণ করো। মস্তক ছেদিত হওয়ার আগেই বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্। আবু সুফিয়ান আর কথা বাড়ালেন না। পবিত্র কলেমা উচ্চারণ করলেন উদাত্ত কণ্ঠে। হজরত বুদাইল ও হাকীম তো ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এর আগেই।

www.eelm.weebly.com

তিবরানী লিখেছেন, রসুল স. তখন বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আবু সুফিয়ান ওই পিলু গাছের আড়ালেই আছে। তাকে বন্দী করে আনো। ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদেরকে বন্দী করেছিলেন রসুল স. এর দেহরক্ষীগণ। আর সেদিন তাঁর দেহরক্ষীগণের প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন হজরত ওমর। তাঁর বর্ণনায় আরো এসেছে, আবু সুফিয়ান তখন বলেছিলেন, আব্বাস কোথায়? আর এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, আবু সুফিয়ানকে যখন রসুল স. এর কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, তখন তাঁর সাথে হজরত আব্বাসও ছিলেন। রসুল স. তখন ঘোষণা দিয়েছিলেন, ওই ব্যক্তিদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হলো, যারা আশ্রয় গ্রহণ করবে কাবাপ্রাঙ্গণে, আবু সুফিয়ানের গৃহে, অথবা নিজ নিজ বাড়িতে। আবু সুফিয়ান মক্কায় পৌঁছে ঘোষণা করেছিলেন, হে কুরায়েশ জনতা! আজ মোহাম্মদ এমন একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে আগমন করেছেন, যার অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার সাধ্য তোমাদের নেই। সুতরাং তোমরা তাঁর ঘোষিত নিরাপত্তা গ্রহণ করো। আশ্রয় নাও কাবাপ্রাঙ্গণে, আমার বাড়িতে, অথবা নিজ নিজ ঘরে। লোকজন সেরকমই করলো।

হাকীম ইবনে হাযাম এবং বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা রসুল স. এর পবিত্র হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করলেন। রসুল স. তাঁদেরকে আহবায়করূপে প্রেরণ করলেন কুরায়েশদের কাছে। তাঁরা মক্কায় উপনীত হলেন। এরপর তিনি স. মুহাজির ও আনসার বাহিনীর সৈনাপত্যের দায়িত্ব দিলেন হজরত যোবায়েরকে। নির্দেশ দিলেন, মক্কার উজানে হাজ্জন নামক স্থানে পৌঁছে পতাকা উত্তোলন কোরো। পুনরাদেশপ্রাপ্তির পূর্বে স্থানত্যাগ কোরো না। তিনি পতাকা হাতে অগ্রসর হলেন। ওই হাজ্জন এলাকা দিয়েই রসুল স. মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। সেখানে তাঁর জন্য নির্মাণ করা হয়েছিলো তাঁবু। তিনি স. তখন হজরত খালেদ ইবনে ওলীদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তুমি বনী খাজাআ ও বনী সুলাইমকে নিয়ে প্রবেশ কোরো মক্কার ভাটি এলাকা দিয়ে। কুরায়েশ এবং আবদে মানাফের বংশদ্ভূতরা ইতোপূর্বে বনী বকরকে ভাটি অঞ্চলের দিকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। সেজন্যই রসুল স. হজরত খালেদকে ভাটির দিক থেকে অগ্রাভিযান শুরু করতে বলেছিলেন। আরো বলেছিলেন, যদি তোমাদের বিরুদ্ধে কেউ লড়তে না আসে, তবে তোমরাও লড়াই কোরো না।

রসুল স. তখন হজরত সা'দ ইবনে উবাদার হাতেও নিশান তুলে দিয়েছিলেন। তিনি স. কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন কাদার পথ দিয়ে। প্রবেশ কালে জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আজ লড়াইয়ের দিন। আজ নিষিদ্ধতা বৈধ (আজ রক্তপাতের নিষিদ্ধতা স্থগিত)। জনৈক মুহাজির একথা শুনে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! শুনুন, সা'দ কী বলছে? সে তো কুরায়েশদের উদ্দেশ্যে এরকম বলতে পারে না। রসুল স. তখন হজরত আলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ঠিক আছে। পতাকা উত্তোলন করো তুমি। অগ্রসর হও কাদার পথ দিয়ে। হজরত আলী তাই করলেন। তারপর তাঁর পতাকা উড্ডীন করলেন কাবাপ্রাঙ্গণের রুকনে ইয়েমেনে।

www.eelm.weebly.com

আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, হজরত যোবায়ের বর্ণনা করেন, রসুল স. তখন ঝাণ্ডা তুলে দিয়েছিলেন আমার হাতে। আর তিনি স. মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন দু'টি ঝাণ্ডা নিয়ে। আলী আমার আগে মক্কার চড়াই অঞ্চলে পৌঁছুতে পারেননি। আর নিম্নাঞ্চল দিয়ে প্রবেশকালে খালেদ সম্মুখীন হয়েছিলেন প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতার। কুরায়েশ ও অন্যান্য অংশীবাদী গোত্রের লোকেরা তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তিনিও তাদের উপরে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন বীর বিক্রমে। ওই সংঘর্ষে নিহত হয় কুরায়েশদের চব্বিশ জন এবং হুজাইল গোত্রের চার জন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, ওই সংঘর্ষে নিহত হয়েছিলো বারো অথবা তেরো জন। এর পরেই অংশীবাদীরা পরাভব স্বীকার করে। কেউ কেউ পালিয়ে যায়। তখন মুসলমানদের মধ্যে শহীদ হয়েছিলেন জুহাইনা গোত্রের হজরত সালমা ইবনে খাইলা, হজরত ইবনে জাবের ফেহরী এবং হজরত হারীশ ইবনে খালেদ। অবশ্য রসুল স. তাঁর সকল সেনানায়ককে নির্দেশ দিয়েছিলেন, মক্কায় প্রবেশকালে কাউকে হত্যা করা যাবে না। তবে কেউ আক্রমণ করলে কেবল তাকে হত্যা করা যাবে। আবার তিনি স. নির্দিষ্ট করে কয়েকজনের নাম উচ্চারণ করে বলেছিলেন, ওদেরকে কোনোক্রমে রেহাই দেওয়া যাবে না, তারা যদি কাবাগৃহের গেলাফের নিচেও আশ্রয় নেয়, তবুও। তাদের নাম— ১. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী সাররাহ্। সে মুসলমান হওয়ার পরে ধর্মত্যাগ করেছিলো। মক্কাবিজয়ের দিবসে হজরত ওসমানের সুপারিশে তাকে রেহাই দেওয়া হয়। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ২. ইকরামা ইবনে আবু জেহেল। মক্কাবিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ৩. হুয়াইরিছ ইবনে নকীদ। হিজরতের পূর্বে সে মুসলমানদেরকে খুবই কষ্ট দিয়েছিলো। তাকে হত্যা করেছিলেন হজরত আলী। ৪. হাকীম ইবনে সাবাবা। সে মুসলমানও হয়েছিলো। জি-কারার যুদ্ধে জনৈক আনসারী ভুলক্রমে শত্রুসেনা মনে করে হত্যা করেছিলেন তার ভাইকে। ওই মান্যবর আনসারী থেকে সে রক্তপণ আদায় করেছিলো। তারপর সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে তাঁকেই আবার হত্যা করে সে ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। তাকে হত্যা করে তার নিজের সম্প্রদায়ের গাইলা ইবনে আবদুল্লাহ্। ৫. হুব্বার ইবনে আসওয়াদ, খুবই নিষ্ঠুর চরিত্রের লোক ছিলো সে। মুসলমানদেরকে সে অত্যাচারে অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে তুলতো। রসুল স. এর প্রিয় পুত্রী হজরত জয়নাবকে সে এমন আঘাত করেছিলো যে, এতে তাঁর গর্ভপাত ঘটে। ওই আঘাতজনিত রোগেই তিনি পরলোকগমন করেন। মক্কারবিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রসুল স. তাঁকে মার্জনা করেন। ৬. হারেছ ইবনে তিল্লাল খাজায়ী। তাকে হত্যা করেছিলেন হজরত আলী। ৭. কবি কা'ব ইবনে জুহাইর। সে রসুল স.কে অপবাদ দিয়ে কবিতা রচনা করতো। মক্কাবিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রসুল স. এর প্রশংসায় রচনা করেন অনবদ্য কবিতা। ৮. ওয়াহশী ইবনে হারব। তিনি ছিলেন রসুল স. এর প্রিয় খুল্লতাত শহীদশ্রেষ্ঠ হজরত হামযার হত্যাকারী। মক্কাবিজয়ের দিন তিনি তায়েফে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরে তায়েফ থেকে ফিরে

www.eelm.weebly.com

আসেন এবং আশ্রয় গ্রহণ করেন ইসলামের চিরনিরাপত্তা ও শান্তির ছায়ায়। ৯. আবদুল্লাহ্ ইবনে হানযাল। প্রথমে তার নাম ছিলো আবদুল উজ্জা। ইসলাম গ্রহণের পর রসুল স. তাঁর নাম রাখেন আবদুল্লাহ্। একবার রসুল স. তাকে জাকাত সংগ্রাহকরূপে এক স্থানে পাঠালেন। সহযোগীরূপে সঙ্গে দিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ খাজায়ীকে। তিনি ছিলেন পাচক। পথিমধ্যে উভয়ে এক সরাইখানায় যাত্রাবিরতি করলেন। একদিন দুপুর বেলা জাকাতসংগ্রাহক আবদুল্লাহ্ পাচক হজরত আবদুল্লাহ্কে বললো একটা কিছু জবাই করে তার গোশত রান্না করো। কিন্তু পাচক হজরত আবদুল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ পালনে আলস্য করলেন। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে সে তাঁকে হত্যা করলো। আর পালিয়ে গেলো ধর্মত্যাগী হয়ে। তার সঙ্গে থাকতো দু'জন নৃত্যগীতপটিয়সী ক্রীতদাসী। তারা তাদের গানের মাধ্যমে রসুল স. এর কুৎসা রটনা করতো। মক্কাবিজয়ের দিবসে রসুল স. মুরতাদ আবদুল্লাহ্ এবং ওই ক্রীতদাসীদ্বয়কে হত্যার নির্দেশ দেন। হজরত সাঈদ ইবনে হারেছ মাখজুমী ও হজরত আবু বারযাহ্ আসলামী ওই মুরতাদ ও তার একজন ক্রীতদাসীকে হত্যা করতে সমর্থ হন। অপর ক্রীতদাসী যায় পালিয়ে। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে। ১০. আমর ইবনে হাশেমের মুক্তকৃতা ক্রীতদাসী সারা। সে ছিলো মক্কার প্রসিদ্ধ গায়িকা। তার কাছ থেকেই উদ্ধার করা হয়েছিলো হজরত হাতেব ইবনে আবী বালতার চিঠি। মক্কাবিজয়ের পর সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। ১১. হজরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা। সে উহুদ যুদ্ধে চর্বণ করেছিলো রসুল স. এর প্রিয় পিতৃব্য শহীদশ্রেষ্ঠ হজরত হামযার কলিজা। রসুল স. তাঁকে মার্জনা করেছিলেন। ১২. সাফওয়ান ইবনে উমায়ইয়া। মক্কাবিজয়ের দিন সে জেদ্দায় পালিয়ে গিয়েছিলো। ভেবেছিলো, সে হয়তো সেখান থেকে কোনো জাহাজযোগে ইয়েমেনের দিকে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করতে সক্ষম হবে। রসুল স. তাকে নিরাপত্তা দেন হজরত উমাইর ইবনে ওয়াহাবের সুপারিশে। তাই সে জেদ্দা থেকে ফিরে আসে এবং ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে চিন্তাভাবনার জন্য অবকাশ প্রার্থনা করে দুই মাসের। রসুল স. তাকে চার মাসের অবকাশ দেন। পরে তিনি মুসলমান হয়ে যান।

ইমাম আহমদ ও তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. মক্কায় প্রবেশ করেন পাগড়ীপরিহিত অবস্থায়। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, তখন তাঁর পবিত্র মস্তকে শোভা পাচ্ছিলো শিরোস্ত্রাণ। পরে পাগড়ী। প্রবেশকালে তিনি স. বার বার আবৃত্তি করেন সুরা নাসর।

পরিশেষে রসুল স. হাজ্জন নামক স্থানে তাঁর জন্য নির্মিত তাঁবুতে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুই মহাপুণ্যবতী সহধর্মিণী— হজরত উম্মে সালমা ও হজরত মায়মুনা। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে মহাবিজয়ী! আপনি কি আপনার পৈত্রিক নিবাসে উঠবেন না? তিনি স. বললেন, আকীল কি সে সুযোগ রেখেছে? কোথায় গিয়ে উঠবো? উল্লেখ্য, আকীল রসুল স. এর পিতৃপুরুষদের বাড়িঘর বিক্রি করে দিয়েছিলো। জনৈক সাহাবী বললেন, হে মহাবাণীবাহক! সেখানে

www.eelm.weebly.com

তো অনেকেরই বাড়িঘর রয়েছে। আপনি তো যে কোনো বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারেন। তিনি স. বললেন, না। আমি কারো বাড়িতেই উঠবো না। তাই হলো। রসুল স. তাঁর তাঁবুতেই অবস্থান করতে লাগলেন। নামাজের সময় সেখান থেকেই তিনি স. উপস্থিত হতেন কাবা গৃহে। প্রথম দিন তিনি স. তাঁর তাঁবুতে কিছুক্ষণ বিশ্রামগ্রহণের পর স্নান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পানি সংগ্রহ করা হলো। তাঁর প্রিয় পুত্রী হজরত ফাতেমা পর্দার ব্যবস্থা করলেন। স্নান সমাপনের পর তিনি স. পাঠ করলেন আট রাকাত চাশতের নামাজ। মুসলিম।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, তাঁর চাচাতো বোন হজরত উম্মে হানী বলেছেন, তিনি স. সেদিন স্নান করেছিলেন আমার গৃহে এসে। এরপর নামাজ পাঠ করে তিনি স. উটের পিঠে চড়ে গমন করেন কাবাপ্রাঙ্গণে এবং উষ্ট্রারোহী অবস্থাতেই যষ্টি দ্বারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে তাতে চুম্বন দান করেন। উচ্চারণ করেন তকবীরধ্বনি। সাথে সাথে তার প্রতিধ্বনি ওঠে তাঁর সহচরবর্গের কণ্ঠে। তিনি স. সাতবার কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করেন। প্রদক্ষিণ করেন তাঁর সহচরবৃন্দও। প্রতিবারেই তিনি স. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন তাঁর যষ্টি দ্বারা। কাবাপ্রাঙ্গণে তখন প্রতিষ্ঠিত ছিলো ক্ষুদ্র-বৃহৎ তিন শত ষাটটি প্রতিমা। তিনি সেগুলোকে আঘাত করেন যষ্টি দ্বারা। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমাগুলো হয়ে পড়ে ছিন্ন-ভিন্ন এবং ভূতলশায়ী। তাঁর পবিত্র কণ্ঠে তখন বার বার উচ্চারিত হতে থাকে 'জ্বাআল হাক্বকু ওয়া যাহাক্বাল বাতিল' (সত্য সমাগত, মিথ্যা তিরোহিত)। রসুল স. এর যষ্টির আঘাত ছাড়াই তখন অনেক প্রতিমা ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। ফুজালা ইবনে ওমর লাইছি মনে মনে ইচ্ছা করে, তাওয়াফরত অবস্থাতেই সে রসুল স.কে হত্যা করবে। ধীরে ধীরে ভিড় ঠেলে পৌঁছে গেলো তাঁর কাছে। তিনি স. ডাকলেন, ফুজালা! সে জবাব দিলো, এই যে আমি। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মন কী বলছে? সে বললো, তেমন কিছু না। আমি তো আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করছি। তার কথায় রসুল স. মৃদু হাসলেন। বললেন, লজ্জিত হও। আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। তিনি স. ফুজালাকে আরো কাছে ডেকে এনে তাঁর পবিত্র হস্ত স্থাপন করলেন তাঁর বক্ষদেশে। পরে হজরত ফুজালা নিজেই বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর পবিত্র হস্ত আমার উপর থেকে উঠিয়ে নেওয়ার আগেই আমি গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে অনুভব করলাম, এখন তিনি স.ই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম জন। অংশীবাদীরা পর্বত শিখর থেকে এসবকিছুই চাক্ষুষ করেছিলো।

তাওয়াফ পর্ব সমাপ্ত হলো। চতুষ্পার্শ্বে তখনও প্রচণ্ড ভীড়। রসুল স. তাঁর উট থেকে অবতরণ করলেন। উটটিকে কোথাও বসানোর স্থান পাওয়া গেলো না। তাই সেটিকে রেখে আসা হলো কাবা চত্বরের সীমানার বাইরে। রসুল স. মাকামে ইব্রাহিমে উপস্থিত হলেন। তখন তার মাথায় ছিলো উষ্ণীষ। তিনি স. সেখানে দুই রাকাত নামাজ পাঠ করলেন। গেলেন জমজম কূপের পাশে। কূপের ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখে বললেন, যদি আবদুল মুত্তালিবের গোষ্ঠীর জন্য এটা গর্বের বিষয় না হতো, তবে আমি আজ নিজ হাতে এক ডোল পানি উত্তোলন করতাম। এক ডোল

www.eelm.weebly.com

পানি উত্তোলন করলেন হজরত আব্বাস, অথবা হারেছ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। রসুল স. পান করলেন পবিত্র জমজমের জল। বাদবাকীটুকু দিয়ে সামাধা করলেন ওজু। ওজুর ব্যবহৃত জলাহরণের জন্য সাহাবীগণের মধ্যে লেগে গেলো ঠেলাঠেলি, প্রতিযোগিতা। যারা সে জলের অংশ পেলেন, তারা তা সঙ্গে সঙ্গে মেখে নিলেন নিজেদের মাথায়, চোখে-মুখে-শরীরে। কুরায়েশেরা এমতো অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলো। বলতে লাগলো, আমরা কোনো রাজাকেও এরকম সম্মান পেতে দেখিনি। শুনিওনি। হোবল ছিলো পৌত্তলিকদের সর্ববৃহৎ প্রতিমা। প্রতিমাটি ছিলো কাবাগৃহের সামনের দিকে প্রধান ফটকের কাছে। রসুল স. এর নির্দেশে সেটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হলো।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কাবাগৃহের ছাদে উঠলেন। আমাকেও বললেন, ওঠো। উঠলাম। ছাদের উপরে ছিলো আর একটি বড় প্রতিমা। আমি সেটিকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিচে ফেলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো প্রতিমাটি। রসুল স. উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলন 'সত্য সমাগত, অসত্য তিরোহিত। অসত্যের তিরোহিতি তো অবধারিত'।

এরপর রসুল স. কাবাগৃহের চাবি সংগ্রহের জন্য হজরত বেলালকে পাঠিয়ে দিলেন চাবিরক্ষক ওসমানের কাছে। ওসমান বললো, চাবি তো আমার মায়ের কাছে। একথা বলেই সে তার মায়ের কাছে চাবি চাইলো। তার মা বললো, লাত ও উজ্জার শপথ! আমি কাবার চাবি তোমার হাতে কখনোই দিবো না। সে বললো, মা! চাবিটা দিয়ে দাও। আজ লাত উজ্জা কেউ নেই। চাবি না দিলে আমার গর্দান তো যাবেই, আমার এই ভাইয়ের গর্দানও আস্ত থাকবে না। ওদিকে তাঁদের ফিরে আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে রসুল স. সেখানে পাঠিয়ে দিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হজরত ওমর ফারুককে। তাঁরা ওসমানের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকলেন। তাঁদের কণ্ঠস্বর শুনে তার মা বললো, ওসমান! এই নাও চাবি। ওদের হাতে চাবি দেওয়ার চেয়ে তোমার হাতে দেওয়াই ভালো। এভাবে চাবি উদ্ধার হলো এবং তা যথাসময়ে হস্তগত হলো রসুল স. এর। তিনি স. ওই চাবি দিয়ে কাবাগৃহের বন্ধ তালা খুললেন। ওসমান ও তালহা বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এ অধিকার তো ছিলো আমাদেরই। তিনি স. তাদের কথায় ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

এরপর রসুল স. হজরত ওমরকে আদেশ করলেন, কাবাগৃহের ভিতর থেকে সমস্ত বিগ্রহ ও চিত্র অপসারিত করো। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। শুরু হলো ধোয়া-মোছার কাজ। এভাবে একসময় আল্লাহ্‌র ঘর ও তৎসন্নিহিত প্রাঙ্গণ থেকে চিরতরে অপসারিত হলো বিগ্রহ-ধর্ম-সংস্কৃতির অপবিত্র চিহ্নাবলী। রসুল স. হজরত জায়েদ এবং হজরত তালহাকে নিয়ে কাবাগৃহের ভিতরে প্রবেশ করলেন। মধ্যখানে দাঁড়িয়ে পাঠ করলেন দুই রাকাত নামাজ। বললেন, এটাই কেবলা। তারপর দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। বললেন, আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে সত্যে

www.eelm.weebly.com

পরিণত করেছেন। তাঁর বান্দাকে বিজয়ী করেছেন তাঁর প্রতিপক্ষীয়দের উপর। শোনো হে জনতা! আজ থেকে মূর্খতার যুগের সকল অপপ্রথা অবলোপিত হলো। পরিত্যক্ত হলো প্রতিশোধমূলক রক্তের অধিকার। আর সুদ ইত্যাদি পাওনা-দেনাকেও আজ আমি পদদলিত করলাম। সর্বপ্রথম আমি নিজে রবীয়া ইবনে হারেছের রক্তের দাবি প্রত্যাহার করে নিলাম। তবে কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণ ও হজযাত্রীদের পানি সরবরাহের দায়িত্বের কোনো পরিবর্তন হবে না। যারা এতোদিন ধরে এ দায়িত্ব পালন করতো, তারাই থাকবে তাদের স্ব স্ব দায়িত্বে।

আরো শোনো, লাঠি-সোটার আঘাতে নিহত, অথবা ভুলক্রমে, কিংবা ইচ্ছাকৃত হত্যাসদৃশ হত্যার রক্তপণ একশত উট। তার মধ্যে চল্লিশটিকে হতে হবে গর্ভবর্তী। অংশীদারকে লক্ষ্য করে ওছিয়ত করা যাবে না। নবজাতক হবে তার, যার শয্যায় সে জন্মগ্রহণ করেছে। ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যু পর্যন্ত প্রস্তরাঘাত। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী তার সম্পদ অন্যকে দিতে পারবে না। অমুসলিমদের বিপক্ষে সকল মুসলমান একটি বাহুর মতো। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিপক্ষে কোনো বিশ্বাসী অথবা আশ্রিত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে (জিম্মিকে) হত্যা করা যাবে না। বিপরীত ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অংশীদারিত্ব অচল। জাকাত-সংগ্রাহকরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে জাকাত সংগ্রহ করবে। জাকাতদাতাদেরকে জাকাত-দপ্তরে ডেকে আনা যাবে না। তারাও জাকাত-সংগ্রাহকদেরকে উত্যক্ত করতে পারবে না। কোনো রমণীর মা বা খালাকে বিবাহ করার পর আর তাকে বিবাহ করা যাবে না।

সাক্ষী উপস্থিত করা দাবিদারদের দায়িত্ব। সাক্ষী উপস্থিত না করতে পারলে শপথ করতে হবে। শপথ কার্যকর করা হবে দাবি অস্বীকারকারীর উপর। বিবাহ সিদ্ধ— এমন কোনো পুরুষের সঙ্গে রমণীরা ভ্রমণে বের হতে পারবে না। ফজর ও আসরের নামাজ সমাপন করার পর আর কোনো নফল নামাজ আদায় করা যাবে না। দু'দিন রোজা রাখা নিষেধ— ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন। নিষেধ মাত্র একটি লুঙ্গি, অথবা মাত্র একটি জামা পরিধানের। কেননা এতে করে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হওয়ার রয়েছে সমূহ সম্ভাবনা। তেমনি নিষেধ একটি চাদর অথবা একটি কম্বল এমনভাবে পরিধান করাতে, যাতে দুই বাহু হয়ে যায় আবদ্ধ, যাতে প্রয়োজনের সময়েও হাত বের করা যায় না।

হে কুরায়েশ জনগোষ্ঠী! আল্লাহ্ দয়া করে মূর্খতার যুগের অহমিকা ও জাত্যাভিমান থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করেছেন। মনে রেখো, তোমরা সকলে এক আদমের সন্তান। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। সুতরাং তোমাদের গর্ব করার কিছু নেই। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন 'হে মানবজাতি! আমি তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে.....' শেষ পর্যন্ত।

এবার বলো, হে মক্কাবাসী! তোমরা আমার কাছ থেকে কীরূপ আচরণ আশা করো? জনতা জবাব দিলো, আপনি সজ্জন, সাধু, আপনার পিতা-পিতামহও ছিলেন এরকমই। সুতরাং আপনার কাছ থেকে আমরা সেরকমই শিষ্টাচার আশা

www.eelm.weebly.com

করি। তিনি স. বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি তো দয়ার পারাবার। যাও, তোমরা সকলেই মুক্ত। সভা শেষ হলো। জনতা গাত্রোত্থান করলো। তাদেরকে দেখে মনে হলো, যেনো তারা এই মাত্র উঠে এসেছে কবর থেকে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, অজ্ঞতার যুগে বনী লাইছের জনৈক ব্যক্তি হত্যা করেছিলো বনী খাজাআর জনৈক ব্যক্তিকে। মক্কা বিজয়ের দিবসে সুযোগ পেয়ে বনী খাজাআ তাদের অপ-প্রতিশোধ চরিতার্থ করলো। তারা হত্যা করলো বনী লাইছের এক লোককে। রসুল স. একথা জানতে পেরে তাঁর ভাষণে বললেন, হে জনতা! দ্যাখো, আবরাহাবাহিনীকে আল্লাহ্ এ শহরে প্রবেশই করতে দেননি। অথচ তিনি তাঁর রসুল ও তাঁর অনুগামীগণকে মক্কাবাসীদের উপরে বিজয়ী করেছেন। ভালো করে শুনে রাখো, আমার পূর্বে জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অধিকার কাউকে দেওয়া হয়নি। এরকম অধিকার আমার পরেও কেউ পাবে না। আমার পূর্বে এখানে রক্তপাত ঘটানো কারো জন্য বৈধ ছিলো না। এরপরেও বৈধ হবে না কারো জন্য। আর আমার জন্যও এ কাজ বৈধ ছিলো কেবল আজকের দিনের কিয়দংশের জন্য। এরপর থেকে চিরদিনের মতো এখানে রক্তপাত হারাম। এখানকার বৃক্ষ, লতা-গুল্ম কিছুই কর্তন করা যাবে না। কারো পরিত্যক্ত সম্পদ জোরপূর্বক অধিকার করলেও নয়। আরো শোনো, নরহত্যার বিনিময় রক্তপণ, অথবা হত্যা। আবু শাহ নামক জনৈক ইয়েমেনী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল। একথাটা আমাকে লিখে দিন। রসুল স. জনৈক সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন বিধানটি লিখে দিতে। একজন কুরায়েশী দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাহক! বৃক্ষ-লতা-গুল্ম কর্তনের বিধান থেকে ইজখের ঘাসকে বাদ দিলে ভালো হয়। এটা আমাদের সাংসারিক প্রাত্যহিক কর্ম সমাধার জন্য অত্যাবশ্যক। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে, ইজখের ঘাস থেকে কর্তনের নিষিদ্ধতা উঠিয়ে নেওয়া হলো।

এক বর্ণনায় এসেছে, এক লোক তখন দাঁড়িয়ে বললো, হে মহানবী! আমি এক রমণীকে রক্ষিতা হিসেবে রেখেছিলাম। তার কয়েকটি সন্তানও আছে। এখন তার প্রতি আমার কর্তব্য কী? তিনি স. বললেন, বিবাহ ব্যতিরেকে কোনো রমণীকে রক্ষিতা রাখা যাবে না। এরকম রমণীর সন্তান-সন্ততি হবে অবৈধ। বংশপরিচয় ও উত্তরাধিকারিত্ব থেকে তারা হবে বঞ্চিত। আমার ধারণা, তোমরা আমার কথা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। আমি আল্লাহ্ সকাশে আমার ও তোমাদের জন্য মার্জনা যাচনা করি। রসুল স. ক্ষান্ত হলেন। এরপর তাঁর নির্দেশে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করলেন, কোনো মুসলমানের গৃহে প্রতিমা থাকতে পারবে না। যদি থাকে তবে সেগুলোকে ভেঙেচুরে নিক্ষেপ করতে হবে দূরে।

জোহরের নামাজের সময় হলো। হজরত বেলাল নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে কাবাগৃহের ছাদে উঠে আজান দিলেন। কাবাপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট আবু সুফিয়ান, খালেদ ইবনে উসাইয়েদ ও হারেছ ইবনে হিশামের জাত্যাভিমান বিপর্যস্ত হলো। তাদের মনে

www.eelm.weebly.com

হলো, কালো মানুষের কাবাগৃহের ছাদে ওঠার অধিকার থাকবে কেনো? খালেদ ইবনে উসাইয়েদ বলেই ফেললো, আল্লাহ্ আমার পিতার সম্মান রক্ষা করেছেন। এরকম অসহনীয় দৃশ্য দর্শনের পূর্বে তাঁকে তুলে নিয়েছেন পৃথিবী থেকে। কেউ কেউ বললো, এখন বেঁচে থাকার আর কোনো অর্থ নেই। হজরত আবু সুফিয়ান বললেন, আমি কোনো মন্তব্যই করবো না। বললেন এখানকার পাথরগুলোই একথা রাষ্ট্র করে দিবে। হজরত জিবরাইল তাদের এমতো কথোপকথনের সংবাদ ঠিকই জানিয়ে দিলেন রসুল স.কে। রসুল স. তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, তোমরা যা কিছু বললে, তা আমাকে জানানো হয়েছে। তোমরা তো বললে এই কথাগুলো। ঠিক বলিনি? আবু সুফিয়ান তার সাথীদেরকে বললেন, কী, আমি কি বলিনি, এখানকার পাথরগুলোও আমাদের কথা প্রচার করে দিবে? খালেদ ও হারেছ বললো, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি সত্যি সত্যিই আল্লাহ্র রসুল।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁর দৃষ্টিহীন পিতাকে হাত ধরে রসুল স. এর কাছে হাজির করলেন। রসুল স. বললেন, আবু বকর। তিনি তো বয়োবৃদ্ধ। তাঁকে এভাবে কষ্ট দিলে কেনো? আমি তো নিজেই তাঁর কাছে যেতে পারতাম। রসুল স. সস্নেহে তাঁর বুকে পিঠে হাত বুলালেন। তিনিও অনায়াসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর মস্তক ও শ্মশ্রুর কেশরাজি হয়ে গিয়েছিলো ছাগামফূলের মতো শাদা। রসুল স. সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, কালো রঙ ছাড়া অন্য যে কোনো রঙ দ্বারা রঙ পরিবর্তন করে দিয়ো।

রসুল স. উপবেশন করলেন একটি উঁচু স্থানে। অপেক্ষাকৃত নিচু স্থানে বসলেন হজরত ওমর। দলে দলে লোক এসে রসুল স. এবং হজরত ওমরের হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। পুরুষদের পালা শেষ হলো। এগিয়ে এলো মেয়েরা। তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হলো তাদের হস্তস্পর্শ না করেই, কেবল মুখে মুখে। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. সাফা পর্বতে আরোহণ করলেন। কাবাগৃহের দিকে চেয়ে ভাবের আবেগে আপ্লুত হলেন। হাত তুলে শুরু করলেন অন্তরঙ্গ প্রার্থনা। পর্বতের সানুদেশে দণ্ডায়মান আনসার সাহাবীগণ সেই অপূর্ব মায়াভরা দৃশ্য দেখে এই ভেবে শংকিত হলেন যে, রসুল স. এর জন্মভূমির আকর্ষণ উত্তাল হয়ে উঠেছে। এটাই তো স্বাভাবিক। তিনি মনে হয় আমাদের সঙ্গে আর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করবেন না। প্রার্থনা শেষ হলো। রসুল স. নিচে নেমে এসে মিলিত হলেন আনসারগণের সঙ্গে। সম্বোধন করলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তাঁরা উচ্চকণ্ঠে জবাব দিলেন, হে মহানবী! এই যে আমরা। তিনি স. বললেন, তোমরা তো এসকল কথা ভেবে শংকিত হয়েছিলে, না? তাঁরা স্বীকার করলেন, হে মহান রসুল! আপনি ঠিকই বলেছেন। তিনি স. বললেন, নিশ্চয় তোমাদের আশংকা ভিত্তিহীন। আমি তো আল্লাহ্র সন্তোষ কামনায় তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তোমাদের ও আমার জীবন মরণ সব একাকার। আনসারগণ কেঁদে ফেললেন।

www.eelm.weebly.com

বললেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম জন! আপনার প্রতি আমাদের উদগ্র ভালোবাসাই আমাদেরকে শংকাগ্রস্ত ও বিমর্ষ করে তুলেছিলো। আমরা আমাদের অপভাবনার জন্য মার্জনাপ্রার্থী। তিনি স. তাঁদের অজুহাত গ্রহণ করলেন।

মক্কাবিজয়ের দিবসে রসুল স. তিন ব্যক্তির নিকট থেকে আর্থিক ঋণ গ্রহণ করে তা বণ্টন করে দিয়েছিলেন অস্বচ্ছল সাহাবীগণের মধ্যে। সাফওয়ান ইবনে উয়াইনার নিকট থেকে নিয়েছিলেন পঞ্চাশ হাজার, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে রবীয়ার নিকট থেকে চল্লিশ হাজার এবং হুয়াইতাব ইবনে আবদুল উজ্‌জার নিকট থেকে চল্লিশ হাজার। এ সকল ঋণ তিনি পরিশোধ করেছিলেন হুনায়েন যুদ্ধের পর। রসুল স. সেদিন বলেছিলেন, আজকের দিনের পর মক্কার উপরে আর কোনো অভিযান পরিচালিত হবে না। হিজরতের প্রয়োজনও আজ থেকে শেষ হয়ে গেলো।

আবু ইয়ালা ও আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কাবিজয়ের পর শয়তান উচ্চস্বরে চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। তার সাঙ্গপাঙ্গরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে জবাবে বলে, আর কখনো আশা কোরো না যে, উম্মতে মোহাম্মদী শিরিকের দিকে ফিরে আসবে। মাকহুল সূত্রে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন ইবলিস তাঁর দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলো বিরাট বিরাট অগ্নিকুণ্ড। হজরত জিবরাইল তৎক্ষণাৎ রসুল স.কে একটি দোয়া শিখিয়ে দিলেন। দোয়াটি এরকম 'আউ'জু বিকালিমাতিললাহিত্‌ তামমাতিল লাতী লা ইউজ্বাউইবু হুন্‌না বাররুউঁ ওয়ালা ফাজ্বির মিন শররি মা নাযালা মিনাস সাজা ওয়ামা ইয়া'রুজু ফীহা ওয়ামিন শাররি মা বাছ্‌ছা ফীল আরদ্ব ওয়ামা ইয়াখরুজু মিনহা ওয়া মিন শাররিল লাইলি ওয়ান নাহার ওয়া মিন শাররি কুললি ত্বরিক ইয়াত্বরুকু বি খইর ইয়া রহমান'। ইবনে আবী বাযযার সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, মক্কাবিজয়ের দিন দেখা গেলো, বিদখুটে কদাকার এক হাবশী বৃদ্ধা তার নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে এবং চীৎকার করে কাঁদছে। রসুল স.কে যখন তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো তখন তিনি স. বললেন, সে ছিলো পৌত্তলিক কুরায়েশদের আরাধ্য দেবী। সে বলছে, তোমাদের শহরে আজ থেকে আমার উপাসনা হয়ে গেলো চিররুদ্ধ।

সেদিন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো 'আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে আদেশ করছেন, তোমাদের নিকটে রক্ষিত গচ্ছিত সম্পদ তার প্রাপককে ফিরিয়ে দাও'। রসুল স. তখন ওসমান ইবনে আবী তালহাকে ডেকে এনে তার হাতেই পুনঃ অর্পণ করলেন কাবা গৃহের চাবি। বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত এ চাবি রক্ষিত হতে থাকবে তোমার বংশধরের মধ্যেই। জালেম ব্যতীত অন্য কেউ তোমাদের কাছ থেকে এ চাবি ছিনিয়ে নিতে পারবে না। চাবিবহনের এ মহান দায়িত্বের জন্য আল্লাহ্‌ তোমাদেরকেই মনোনীত করেছেন। এই উপলক্ষে যা কিছু তোমাদের হস্তগত হবে, তা তোমাদের জন্য বৈধ। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত জিবরাইল তখন বলেছিলেন, যতোদিন পর্যন্ত এ গৃহ স্থায়ী থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত এ গৃহের

www.eelm.weebly.com

তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব পালন করবে ওসমান ও তাঁর বংশধরেরা। উল্লেখ্য, হজরত ওসমান পরলোক গমনের প্রাক্কালে কাবাগৃহের চাবি হস্তান্তর করেন তাঁর ভাই হজরত শায়বার হাতে। তাঁর বংশধরেরাই এ পর্যন্ত চাবি বহন করে আসছেন। বহন করবেন মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. মক্কায় অবস্থান করেছিলেন উনিশ দিন। ওই সময় তিনি নামাজ আদায় করতেন কসর হিসেবে। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. তখন মক্কায় অবস্থান করেছিলেন সতেরো রাত এবং বোখারীর অপর বর্ণনায় এবং তিরমিজির বিবরণে বলা হয়েছে, তিনি স. তখন মক্কায় যাপন করেছিলেন আঠারো রাত। এমতো বর্ণনাবৈষম্য নিরসনার্থে বলা যায়, আগমন ও প্রস্থানের দিন বিয়োগ করলে সতেরো রাতই হয়, আর যোগ করলে হয় উনিশ দিন। আর প্রহর হিসেবে গণনা করলে হয় আঠারো।

মক্কাবিজয়ের পর সমগ্র আরব স্তম্ভিত হয়ে গেলো। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, যে আল্লাহ্ আবরাহার হস্তিযুথকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, সেই আল্লাহ্ই মোহাম্মদকে দান করলেন মহাবিজয়। এখন তোমরাই বলো, তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর আছে কি? সত্যি সত্যিই তিনি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত রসুল। এরকম কথাবার্তা ও সিদ্ধান্ত চলতে লাগলো বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্রগুলোর মধ্যে। শেষে সকলে একে একে দ্বিধাহীন চিত্তে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগলো ইসলামের চির-সুশীতল ছায়ায়। এই সুরার দ্বিতীয় আয়াতে সে কথাটিই বলে দেওয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে 'এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে'। ইকরামা ও মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'মানুষ' অর্থ ইয়েমেনবাসী। রসুল স. একবার বলেছিলেন, ইয়েমেনবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। এরা অতীব বিনম্র এবং ইমান গ্রহণের ক্ষেত্রে কোমল হৃদয়বিশিষ্ট। জ্ঞানের উৎপত্তি ইয়েমেন দেশে। শোনো, উটের মালিকের কাছ থেকে প্রকাশ পায় উন্নাসিকতা ও আত্মম্ভরিতা এবং ছাগলের মালিকের নিকট থেকে প্রকাশ পায় সহিষ্ণুতা ও শিষ্টাচার।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে— 'তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কোরো এবং তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কোরো, তিনি তো তওবা কবুলকারী'।

এখানে 'ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিক' অর্থ তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কোরো। কথাটি প্রথম আয়াতের 'যখন' (ইজা) শর্তের পরিণতি। আর এখানকার 'বিহামদি' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি তখন পাঠ করুন 'সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী'। অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনাকে যে অচিন্তনীয় মহাবিজয় দান করে আপনাকে অনুগৃহীত করলেন, তার জন্য আপনি বর্ণনা করুন তাঁর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা।

www.eelm.weebly.com

হজরত আনাস বলেছেন, মহানবী স. যখন মহাবিজয়ীর বেশে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন, তখন জনতা তাঁর অতুলনীয় মর্যাদা ও সম্ভ্রম দর্শন করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলো। আর তিনি স. এ দৃশ্য দেখে মনে মনে আল্লাহ্‌কে জানাচ্ছিলেন অসংখ্য কৃতজ্ঞতা, যা প্রকাশ পাচ্ছিলো তাঁর বাহ্যিক অবয়বেও। তিনি স. তাঁর মস্তক মোবারক করে রেখেছিলেন নিম্নমুখী। মনে হচ্ছিলো তা বুঝি স্পর্শ করে আছে উটের গদি। অত্যুত্তম সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাকেম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর সবিনয় অবনমিত মস্তক তখন স্পর্শ করেছিলো তাঁর উটের আসনের মধ্যবর্তী স্থান। আর যখন লোকেরা দলে দলে এসে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করলো, তখন তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, হে আমার পরমতম আরাধ্য! পারলৌকিক জীবনই হচ্ছে প্রকৃত জীবন।

'ওয়াস্‌তাগফিরহু' অর্থ এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কোরো। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি আপনার উম্মতের প্রতি অতিমমতাময়তার কারণে কখনো কখনো অত্যুৎকৃষ্ট আমল ছেড়ে গ্রহণ করেছিলেন কেবল উৎকৃষ্ট আমলকে, আপনার অতুলনীয় মর্যাদার পক্ষে যা ছিলো কিঞ্চিত অনুত্তম। সে কারণে আপনি আজ আমা সকাশে মার্জনাপ্রার্থনা করুন। অথবা— আপনি ক্ষমাপ্রার্থনা করুন আপনার উম্মতের জন্য। কেননা তাদের মধ্যে অনেকেই তো হবে গোনাহ্‌গার। উল্লেখ্য, এমতো নির্দেশনার কারণেই রসুল স. প্রতিদিন সত্তরবার ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে একশতবার ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা। এরূপ হাদিস হজরত আবু হোরায়রা, হজরত আনাস এবং হজরত শাদ্দাদ ইবনে আউস থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিবরানী ও আবু ইয়ালা।

লক্ষণীয়, এখানে ক্ষমাপ্রার্থনা করার আগে উল্লেখ করা হয়েছে প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার কথা। বিষয়টি বিসদৃশ মোটেও নয়। কেননা এটাই হচ্ছে অবরোহণের (নুজুলের) প্রকৃত পদ্ধতি। আর এমতো পদ্ধতি কার্যকর করতে গেলে কিছু না কিছু ভুল হতেই পারে। তাই সব শেষে বলা হয়েছে ক্ষমা প্রার্থনার কথা। উল্লেখ্য, এভাবে এখানে রসুল স.কে লক্ষ্য করে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে মূলত তাঁর উম্মতকেই। তবে উম্মতের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে, প্রার্থনার পূর্বে পাঠ করে নিতে হবে দরূদ শরীফ।

'ইন্‌নাহু কানা তাও্ওয়াবা' অর্থ তিনি তো তওবা কবুলকারী। অর্থাৎ আল্লাহ্ ক্ষমাপ্রার্থীদের প্রার্থনা গ্রহণকারী তখন থেকে, যখন থেকে তিনি তাদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন আমানত বহনের ভার। ছায়লাবী লিখেছেন, রসুল স. এর কণ্ঠে একবার এই আয়াতের পাঠ শুনে হজরত ইবনে আব্বাস কেঁদে ফেললেন। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদলে কেনো? তিনি জবাব দিলেন, এই সুরায় তো রয়েছে আপনার মহাতিরোধানের সংবাদ। তিনি স. বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো।

www.eelm.weebly.com

বায়যাবী লিখেছেন, এই সুরায় বলা হয়েছে ইসলামের আহ্বানের পরিপূর্ণতার কথা। সে কারণেই বলা হয়, এখানে রয়েছে রসুল স. এর অন্তিমযাত্রার সংবাদ। অন্য এক আয়াতে বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে 'আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম....'। আর এখানকার 'ক্ষমাপ্রার্থনা করো' কথাটির মধ্যে সুস্পষ্টরূপে একথাটি ফুটে উঠেছে যে, তাঁর মহা অভিযাত্রা সন্নিকটবর্তী।

বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মান্যবর ওমর আমাকে মহান বদরযোদ্ধাগণের অন্তর্ভূত বলে মনে করতেন। একবার এক সাধু পুরুষ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি একে বদর যোদ্ধাগণের মধ্যে গণনা করেন কেনো? এতো আমাদের সন্তানদের বয়সী। ওমর জবাব দিলেন, আপনারা যাদেরকে ভালো বলে জানেন, এতো তাদেরই দলের। তিনি আরো বলেছেন, একবার খলিফা ওমর বদর যোদ্ধাদেরকে নিমন্ত্রণ দিলেন। তার সঙ্গে নিমন্ত্রণ জানালেন আমাকেও। সর্বসমক্ষে আমার পরিচয় তুলে ধরাই ছিলো তাঁর এমতো নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য। পানাহারপর্ব শেষে তিনি নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বলুন তো দেখি, সুরা নাসর সম্পর্কে আপনারা কে কী জানেন? একজন বললেন, যেহেতু আল্লাহ্ আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং বিজয় দান করেছেন, সেহেতু আমাদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনার। আর একজন বললেন, আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না। অন্যেরা রইলেন নীরব। শেষে মান্যবর খলিফা আমাকে বললেন, এবার তুমি কী জানো, বলো। আমি বললাম, সুরাখানি রসুল স. এর মহাতিরোভাবের ইঙ্গিতবাহী, আল্লাহ্ এখানে তাঁর রসুলকে জানাচ্ছেন— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আমার সাহায্য সমাগত। মক্কাবিজয়ও সুসম্পন্ন। সুতরাং আপনি আল্লাহ্র সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন, তাঁর সকাশে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন আপনার প্রিয় উম্মতের জন্য, যিনি পরম ক্ষমাপরবশ ও ক্ষমাপ্রার্থীদের প্রার্থনা গ্রহণকারী। আর আপনি প্রস্তুতি গ্রহণ করুন পরকালযাত্রার। সে পরমলগ্ন যে অত্যাসন্ন। খলিফা মহোদয় আমার কথা শুনে বললেন, বৎস! তুমি যা জানো, আমিও তা-ই জানি।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন সুরা 'ইজা জ্বাআ' অবতীর্ণ হলা, তখন রসুল স. আমাকে একান্তে ডেকে বললেন, আমাকে এবার অন্তিমযাত্রার সংবাদ দেওয়া হলো।

হজরত আনাস থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, সুরা 'ইজা জ্বাআ নাসরুল্লহ্' সমগ্র কোরআনের এক চতুর্থাংশ। জননী আয়েশা থেকে বোখারী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. তাঁর রুকু ও সেজদায় পাঠ করতেন 'সুবহানাকা আল্লহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আল্লহুম্মাগ্‌ফির'। তাঁর নিকট থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. অত্যধিক পরিমাণে পাঠ করতেন 'সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী আস্‌তাগফিরুল্লহা ওয়া আতূবু ইলাইহি'। রসুল স. বলেছেন, আমার পরম প্রভুপালয়িতা আমাকে বললেন, অচিরেই আপনি আপনার উম্মতের মধ্যে দেখতে পাবেন একটি নিদর্শন। তখন পাঠ করবেন 'সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী আস্‌তাগফিরুল্লহা ওয়া আতূবু

www.eelm.weebly.com

ইলাইহি’। আমি সে নিদর্শন প্রদর্শন করেছি। আর তা হচ্ছে ‘ইজা জ্বাআ নাসরুল্লহি...... ইন্নাহু কানা তাওওয়াবা’। হাসান বসরী বলেছেন, যখন রসুল স. এর অন্তিমযাত্রার সময় হলো, তখন আল্লাহ্পাক তাঁকে জানালেন, আপনার শেষ বিদায়ের সময় অতীব সন্নিকটবর্তী। সুতরাং আপনি অধিক হারে বর্ণনা করতে থাকুন আমার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা। অভিমুখী হন কেবল আমার, যেনো আপনার পৃথিবীর জীবনের সমাপ্তি ঘটে অত্যুত্তম পুণ্যসম্ভার সহযোগে। নিশ্চয় আমি আমার প্রতি অভিমুখীদেরকে গ্রহণ করি পরম সমাদরে। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. পৃথিবীর আলো-ছায়ায় বাস করেছিলেন আর মাত্র দুইটি বছর।

সূরা লাহাব

এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহাপুণ্যের আলয় মক্কায়। এতে আয়াত রয়েছে ৫টি।

বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর উপরে যখন অবতীর্ণ হলো ‘আর আপনি আপনার নিকটজনদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন’ তখন তিনি স. তাঁর আত্মীয় স্বজনদেরকে সমবেত করলেন। যথারীতি তাঁদেরকে ভয় প্রদর্শন করলেন আল্লাহ্র। বোখারী প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, তখন রসুল স. একদিন আরোহণ করলেন সাফা পর্বতের চূড়ায়। শংকাজড়িত কণ্ঠে উচ্চস্বরে তাঁর আত্মীয় স্বজনদের নাম ধরে ডাকলেন। কুরায়েশ জনতা জড়ো হলো পর্বতের সানুদেশে। তিনি স. উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, হে জনতা! এখন আমি যদি বলি, পর্বতের অপর প্রান্তে একদল শত্রু সেনা লুকিয়ে আছে। তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করবে সন্ধ্যায়, অথবা সকালে, তাহলে তোমরা কি আমার একথা বিশ্বাস করবে? জনতা সমস্বরে জবাব দিলো, নিশ্চয়। তুমি যে আল আমীন (সত্যবাদী)। তিনি স. বললেন, তাহলে শোনো, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তোমরা সাবধান হও। আবু লাহাব বললো, তুমি ধ্বংস হও। এ জন্যই কি তুমি আমাদেরকে এখানে ডেকেছো? একথা বলেই সে একটি প্রস্তরখণ্ড হাতে তুলে নিয়ে রসুল স. এর প্রতি নিক্ষেপোদ্যত হলো। তখনই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য সুরার প্রথম তিনটি আয়াত।

সূরা লাহাব ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

تَبَّتۡ يَدَاۤ اَبِىۡ لَهَبٍ وَّتَبَّؕ ﴿۱﴾ مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَؕ ﴿۲﴾
سَيَصۡلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍۚ ﴿۳﴾ وَّامۡرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِۚ ﴿۴﴾ فِىۡ
جِيۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ ﴿۵﴾

www.eelm.weebly.com

r ধ্বংস হউক আবু লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হউক সে নিজেও।
r উহার ধন-সম্পদ ও উহার উপার্জন উহার কোন কাজে আসে নাই।
r অচিরে সে প্রবেশ করিবে লেলিহান অগ্নিতে
r এবং তাহার স্ত্রীও— যে ইন্ধন বহন করে,
r তাহার গলদেশে পাকান রজ্জু।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— চিরহতভাগ্য আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক। ধ্বংস নেমে আসুক তার নিজের উপরেও। তার অর্থবিত্ত ও উপার্জন তার কোনো উপকারে আসেনি। আসবেও না। দোজখের লেলিহান অগ্নিকুণ্ডে তার প্রবেশের ক্ষণ অত্যাসন্ন।

এখানে 'তাব্বাত' অর্থ ধ্বংস হোক। এর ধাতুমূল 'তাবাব' যার অর্থ, এমনই এক গহবর, যা সমূহ বিপদ ডেকে আনে। 'ইয়াদা আবী লাহাব' অর্থ আবু লাহাবের দুই হস্ত। অর্থাৎ আবু লাহাব স্বয়ং। যেমন বলা হয় 'ওয়ালা তুলক্বু বিআইদী কুম ইলাত তাহলুকাহ্, (তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ কোরো না)। এখানেও 'আইদী' অর্থ নিজেকে, নিজেদেরকে। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, আবু লাহাব রসুল স.কে আঘাত করার জন্য হাতে পাথর তুলে নিয়েছিলো। তাই এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে তার হস্তদ্বয়ের কথা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে হস্তদ্বয় অর্থ ইহজগত ও পরজগত। অর্থাৎ তার ইহকাল-পরকাল— দুই কালই ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত। অথবা এখানে 'হস্তদ্বয়' কথাটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে তার বিত্ত ও প্রভুত্বকে।

আবু লাহাবের আসল নাম ছিলো আবদুল উজ্জা (উজ্জা দেবীর দাস) মুকাতিল বলেছেন, সে সুদর্শন চেহারার লোক ছিলো বলেই তাকে বলা হতো আবদুল উজ্জা। পরে তার উপনাম হয় আবু লাহাব। আবদুল উজজা নামটা অতি জঘন্য। তাই এখানে তাকে বলা হয়েছে আবু লাহাব, যার অর্থ ধ্বংসের পিতা, চরম ধ্বংসাত্মক। 'ওয়া তাববা' অর্থ ধ্বংস হোক সে নিজেও। অর্থাৎ সে তো ধ্বংসই হয়ে গিয়েছে। অথবা বলা যেতে পারে, 'তাববাত' শব্দটির মাধ্যমে এখানে তার ধ্বংস কামনা করা হয়েছে এবং 'তাব্বা' এখানে এসেছে তার ধ্বংসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের লক্ষ্যে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আবু লাহাব বিনাশপ্রাপ্ত হোক, বরং সে তো বিনাশ হয়েই গিয়েছে। অর্থাৎ তার বিনাশপ্রাপ্তির বিষয়টি সুনিশ্চিত। একারণেই এখানে ভবিষ্যতকালজ্ঞাপক ক্রিয়া ব্যবহার না করে ব্যবহার করা হয়েছে অতীতকালবোধক ক্রিয়া।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. যখন তাঁর স্বজনদেরকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন, তখন আবু লাহাব বললো, ভাতিজা! তুমি আমাকে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছো। কিন্তু আমি তো শাস্তির পরোয়াই করি না। প্রয়োজন হলে আমি আমার সন্তান-সন্ততি-ধন-সম্পদ সবকিছুর বিনিময়ে তোমার কথিত শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করবো। তখন অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

www.eelm.weebly.com

‘মা আগনা আ’নহু মালুহূ ওয়ামা কাসাব’ অর্থ তার ধন সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোনো কাজে আসেনি। অর্থাৎ তার সঞ্চিত বিপুল বিত্ত-বৈভব ও উপার্জিত সম্পদ তাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অথবা তার পুঞ্জীভূত ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন কি তাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে? পারবে না। ‘ওয়ামা কাসাব’ অর্থ তার উপার্জন। অথবা— তার সন্তান-সন্ততি। মাতা মহোদয়া আয়েশা সিদ্দীকা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নিজস্ব উপার্জনজাত আহার্য সর্বোত্তম ও পবিত্রতম। তোমাদের সন্তান-সন্ততিও তোমাদের উপার্জন। বোখারী, তিরমিজি।

উল্লেখ্য, আবু লাহাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র উতবা যখন বাণিজ্যব্যপদেশে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেছিলো, তখন তাকে পথিমধ্যে ভক্ষণ করেছিলো একটি নেকড়ে। আর আবু লাহাব মারা গিয়েছিলো বসন্ত রোগে, বদর যুদ্ধের কয়েকদিন পর। কয়েকজন হাবশী ক্রীতদাসের সহায়তায় তাকে বালিচাপা দেওয়া হয়।

‘সা ইয়াস্‌লা নারান জাতা লাহাব’ অর্থ অচিরে সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে। ‘জাতা লাহাব’ অর্থ লেলিহান অগ্নি। অর্থাৎ সেদিন আর বেশী দূরে নয়, যখন আবু লাহাব দগ্ধীভূত হতে থাকবে দোজখের লেলিহান আগুনে।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহন করে (৪) তার গলদেশে পাকানো রজ্জু’ (৫)। এখানে ‘ওয়াম্‌রাআতুহু’ অর্থ তার স্ত্রীও। অর্থাৎ আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলকেও ভোগ করতে হবে একই পরিণতি। উল্লেখ্য, সে ছিলো হরব ইবনে উমাইয়ার কন্যা এবং হজরত আবু সুফিয়ানের ভগ্নি।

‘হাম্‌মালাতাল হাত্বব’ অর্থ যে ইন্ধন বহন করে। আরবী ভাষায় পরনিন্দুককে বলা হয় কাষ্ঠ, বা ইন্ধন বহনকারিণী। অর্থাৎ পর নিন্দাকারিণী। ইবনে ইসহাক হামাদান খান্দানের জনৈক ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, রসুল স. এর গমনাগমনের পথে আবু লাহাবের স্ত্রী কাঁটা পুঁতে রাখতো। সেদিকে ইঙ্গিত করেই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। জুহাক ও ইকরামা সূত্রে ইবনে মুনজিরও এরকম বর্ণনা করেছেন। আতিয়াও এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে। কিন্তু কাতাদা, মুজাহিদ এবং সুদ্দী বলেছেন, ‘হাম্‌মালাতাল হাত্বব’ অর্থ পর নিন্দুক। উম্মে জামিলের স্বভাবই ছিলো পরনিন্দা করে বেড়ানো, একের বিরুদ্ধে অপরের কথা লাগিয়ে ওই দু’জনের মধ্যে শত্রুতার আগুন জ্বালানো, যেমন কাষ্ঠ খণ্ডের ঘর্ষণে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় আগুন। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে ‘হাম্‌মালাতাল হাত্বব’ অর্থ পাপের গুরুভার বহনকারিণী। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘তারা তাদের পিঠে বহন করে পাপের বোঝা’।

‘ফী জ্বীদিহা হাবলুম্‌ মিম্‌ মাসাদ্‌’ অর্থ তার গলদেশে পাকানো রজ্জু। ‘জ্বীদ’ অর্থ গলদেশ, গলা। আর ‘মাসাদ’ অর্থ লৌহশৃঙ্খল, যার দৈর্ঘ্য সত্তর হাত। ওই লৌহশৃঙ্খল তার গলায় আটকিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে তার পিঠের উপর দিয়ে

www.eelm.weebly.com

কটিদেশ পর্যন্ত। আবার শব্দটির অর্থ পাকানো মজবুত রজ্জুও হয়, খেজুর গাছের ছালের হোক, অথবা পাট জাতীয় অন্য কোনো তন্তুর। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস এবং ওরওয়া ইবনে যোবায়ের। মুজাহিদ সূত্রে আখফাশ বলেছেন, লোহার শিকলকেই 'মাসাদ' বলে। শা'বী এবং মুকাতিল বলেছেন, উম্মে জামিল শক্ত রশি দিয়ে তার লাকড়ির বোঝা বাঁধতো। একদিন সে এভাবে বাঁধা একটি লাকড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে একটি পাথরের উপরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। এমন সময় একজন ফেরেশতা সেখানে উপস্থিত হয়ে তার লাকড়ির বোঝাটি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। ফলে তার গলায় ফাঁস লেগে যায় এবং ওই অবস্থাতেই অক্কা পায় সে। ইবনে জায়েদ বলেছেন, ইয়েমেন অঞ্চলে এক প্রকার গাছ জন্মে, তার নাম 'মাসাদ'। আর তার আঁশ দ্বারা তৈরী রশিকেও বলে 'মাসাদ'। কাতাদা বলেছেন, 'মাসাদ' অর্থ গলার হার। হাসান বসরী বলেছেন, উম্মে জামিলের গলার মোতির মালাকে এখানে বলা হয়েছে 'মাসাদ'। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, রমণীটি সুন্দর একটি কণ্ঠহার ব্যবহার করতো। সেই কণ্ঠহারটিকেই এখানে বলা হয়েছে 'মাসাদ'। সে বলতো, মোহাম্মদের সাথে শত্রুতার পাথেয় হবে আমার এই গলার হার।

'মাসাদ' অর্থ যদি এখানে লোহার শিকল হয়, তবে বুঝতে হবে, এখানে বলা হয়েছে তার পরকালের অশুভ পরিণতির কথা। আর এর অর্থ যদি হয় সাধারণ রশি, তবে বুঝতে হবে, প্রসঙ্গটি ইহজগতের। লক্ষণীয়, ঘটনাটি এখানে বর্ণিত হয়েছে রূপকভাবে। উম্মে জামিলকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করাই এখানে উদ্দেশ্য। তবে এখানে শা'বী যে বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন, তার অর্থ বোধগম্য নয়। কেননা আবু লাহাব ও তার স্ত্রী তখনকার সমাজে পরিচিত ছিলো কুলীন ও রক্ষণশীল রূপে। সুতরাং উম্মে জামিল যে লাকড়ির বোঝা বহন করতো, এরকম কথা কষ্টকল্পনা বৈ কি।

সূরা ইখলাস

৪ আয়াতবিশিষ্ট এই সুরাখানিও অবতীর্ণ হয়েছে মহিমময় পুণ্যতীর্থ 'মক্কায়'।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে আবুল আলিয়া বর্ণনা করেছেন, পৌত্তলিকেরা একবার রসুল স. এর কাছে আল্লাহ্‌র বংশপরিচয় জানতে চায়। তখন অবতীর্ণ হয় এই সুরা। তিরমিজি, হাকেম, ইবনে মাজা। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে তিবরানী এবং ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার কা'ব ইবনে আশরাফ, হুয়াই ইবনে আখতাব এবং আরো কয়েকজন ইহুদী রসুল স. এর মহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললো, যে আল্লাহ্ আপনাকে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কিছু গুণ বর্ণনা করুন। তখন অবতীর্ণ হয় এই সুরা। সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বরাত দিয়ে ইবনে জারীর, কাতাদা এবং ইবনে মুনজিরও

www.eelm.weebly.com

এরকম বলেছেন। জুহাক, কাতাদা ও মুকাতিল সূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, একবার কিছুসংখ্যক ইহুদী পণ্ডিত রসুল স. এর সুমহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললো, 'আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে কিছু বলুন। হতে পারে, আমরা ইমান গ্রহণ করবো। তওরাত কিতাবে তো আল্লাহ্‌ তাঁর অনেক গুণের উল্লেখ করেছেন। বলুন, তিনি কিসের তৈরী? তিনি কী আহার করেন, না করেন না? কেউ তার অংশীদার কিনা। যদি থাকে, তবে সে কে? তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় সুরা ইখলাস।

আবান সূত্রে আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, খায়বরের কতিপয় ইহুদী একবার রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, আবুল কাসেম! আল্লাহ্‌পাক তাঁর অন্তরালবর্তী জ্যোতি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন ফেরেশতামণ্ডলীকে, আসমানকে সৃষ্টি করেছেন গলিত কর্দম দ্বারা, আগুনের স্ফুলিঙ্গ দ্বারা ইবলিসকে। তেমনি ধোঁয়া থেকে আকাশ এবং পানির বুদ্বুদ থেকে পৃথিবীকে। এখন বলুন, আপনার পালনকর্তা কিসের তৈরী? রসুল স. নীরব হয়ে রইলেন। তখন সুরা ইখলাস নিয়ে আবির্ভূত হলেন হজরত জিবরাইল। এ সকল বর্ণনা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সুরা ইখলাস অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, আবুল আলিয়া বলেছেন, বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপ্রধানেরা একবার রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললো, আপনি আমাদের কাছে আপনার প্রভুপালকের বংশপরিচয় প্রকাশ করুন। তাদের এরকম অপবিত্র উক্তির প্রেক্ষিতে হজরত জিবরাইল আনেন এই সুরাখানি। এই বর্ণনাটিও একথা প্রমাণ করে যে, সুরাখানির অবতরণস্থল মদীনা। ইতোপূর্বে হজরত উবাই ইবনে কা'ব কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে যে অংশীবাদীদের কথা বলা হয়েছে, সম্ভবত তারাই বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপ্রধান। আর এরকমও হতে পারে যে, অংশীবাদী ও ইহুদী উভয় গোত্রের গোত্রপ্রধানেরা তখন একসঙ্গে উপস্থিত হয়ে রসুল স.কে এরকম অপপ্রশ্ন করেছিলো।

আবু জুবিয়ান ও আবু সালেহ সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার আমের ইবনে তোফায়েল ও আব্বাদ ইবনে রবীয়া রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলো। আমের বললো, মোহাম্মদ! তুমি আমাদেরকে কার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছো? তিনি স. জবাব দিলেন, মহান আল্লাহ্‌র প্রতি। আমের পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহ্‌ কীভাবে সৃষ্ট হলেন, সে সম্পর্কে কিছু বলো। তিনি সোনার, না রূপার? না কাষ্ঠনির্মিত? তাদের এরকম মন্দ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় সুরা ইখলাস। আব্বাদ ভস্মীভূত হয়েছিলো বজ্রাঘাতে এবং আমের ধ্বংস হয়েছিলো মহামারীতে।

সূরা ইখলাস ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

www.eelm.weebly.com

r বল, 'তিনিই আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়,
r 'আল্লাহ্ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী;
r 'তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই,
r 'এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।'

প্রথমে বলা হয়েছে 'কুল হুয়াল্লহু আহাদ' (বলো, তিনিই আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়)। এখানকার 'হুয়া' (তিনি) সর্বনামটি অভিজাত শ্রেণীর। এখানে 'তিনি' উদ্দেশ্য এবং বিধেয় এর পরের বাক্যটি। অথবা এখানকার 'হুয়া' একটি সাধারণ সর্বনাম; যা সম্পর্কযুক্ত হবে সেই প্রভুপালনকর্তার সঙ্গে, যার সম্পর্কে করা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! আপনি তাদেরকে বলুন, হে অংশীবাদীর দল! তোমরা আমার নিকট যাঁর পরিচয় জানতে চেয়েছো, জেনে রাখো তিনি এক-একক-অদ্বিতীয়'। এখানকার 'আহাদুন' 'আল্লাহ্র' অনুবর্তী। অথবা বলা যায়, 'আহাদুন' এখানে বিধেয় হয়েছে 'হুয়া' সর্বনাম থেকে। আর এখানকার 'আহাদুন'এর মূলরূপ ছিলো 'ওয়াহাদা'। 'ওয়াহাদা' এবং 'ওয়াহিদ' সমার্থক। হজরত ইবনে মাসউদের ক্বেরাতে 'হুয়াল্লহু আহাদ' স্থলে রয়েছে 'লাওয়াহিদ'। হজরত ওমরের ক্বেরাতেও তা-ই।

যদি 'হুয়া' সর্বনামকে অভিজাত সর্বনাম ধরে নেওয়া হয়, 'আল্লাহ্'কে ধরে নেওয়া হয় উদ্দেশ্য এবং 'আহাদ'কে বিধেয়, তাহলে বাক্যের বিশুদ্ধ মর্মার্থ প্রকাশ্য অর্থে হবে না। কারণ একটি অবিভাজ্য প্রকৃত সত্তার নাম আল্লাহ্। আর যা অবিভাজ্য, তাতে একাধিকতা অসম্ভব। যেমন জায়েদ একজনের নাম, যা একজনকেই বুঝায় এবং নাকচ করে দেয় একাধিকতাকে। আর তা কোনোকিছুর সমষ্টিও নয়। কেননা এখানে বিদ্যমান সামষ্টিকতার একক। এরপর পুনরায় তাকে এক বলা সঙ্গত নয়। তাই 'আল্লাহ্' পদটির দ্বারা এমন এক সাধারণ সত্তাকে মেনে নিতে হয়, যিনি একক উপাস্য হওয়ার প্রকৃত যোগ্য। কারো উপাস্য হওয়ার যোগ্য হতে পারেন কেবল তিনিই, যিনি তাকে অনস্তিত্ব থেকে আনেন অস্তিত্বে এবং সেই সঙ্গে পূর্ণ করে দেন তার স্থিতিলাভের প্রয়োজনসমূহকে। আর যিনি স্বয়ম্ভু, তিনিই অপরকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম। সেই অবিভাজ্য সত্তার গুণাবলীও পূর্ণ ও পরিণত, নশ্বরতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে চিরপবিত্র। সৃষ্টি তাঁর সত্তা ও গুণবত্তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনিও সৃষ্টির সত্তা ও গুণবত্তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সৃষ্টির সত্তা ও গুণবত্তার সঙ্গে তাঁর সত্তা ও গুণবত্তার কোনো সংযোগই নেই। যা স্বয়ম্ভু ও স্বাধিষ্ঠ নয়, তা অপরকে অধিষ্ঠিত করতে পারবে কীভাবে? বরং তার নিজের বিদ্যমানতাই তো সেই স্বয়ম্ভু সত্তা ও গুণবত্তার প্রতিবিম্ব, শাখা-প্রশাখা কদাচ নয়। কেননা শাখা-প্রশাখার সংযোগ থাকে মূলের সঙ্গে। কিন্তু সৃষ্টির সঙ্গে সত্তার এমতো সম্পর্ক কল্পনা করা যায় না। সুতরাং সৃষ্টি কেবলই প্রতিবিম্ব, যে প্রতিবিম্বে আল্লাহ্ই দয়া করে দান করেছেন অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব। সুতরাং আল্লাহ্ই কেবল আনুরূপ্যবিহীন, এক-একক-অবিভাজ্য-অসমকক্ষ ও অংশীবিহীন— এরকম ব্যাখ্যাই

www.eelm.weebly.com

অধিক ফলপ্রসূ সঙ্গতিপূর্ণ ও সমীচীন। কিন্তু এরকম ব্যাখ্যা আবার অংশীবাদী ও ইহুদীদের প্রশ্নের যথাযথ জবাবও নয়। কেননা তারা প্রশ্ন করেছিলো ভিন্নভাবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র এককত্বের স্বরূপ জানতে চেয়ে তারা কিছু বলেনি। কারণ রসুল স. তাদেরকে প্রথম থেকেই একটি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কলেমার প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন। সে কলেমা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ' (আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্যই নেই)। তাদের প্রশ্ন ছিলো অত্যন্ত অযথার্থ ও স্থূল। তারা বলেছিলো, যিনি তোমাকে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপাদানগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। বলো তিনি কিসের তৈরী— সোনা, রূপা, লোহার, না কাঠের।

যদি এখানকার 'হুয়া' (তিনি) সর্বনামকে ওই অবিভাজ্য সত্তার স্থলাভিষিক্তও ধরা হয়, যেরূপ উল্লেখ করা হয়েছিলো প্রশ্নকারীদের প্রশ্নে, তবুও এ বাক্যটি তাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে না। অর্থাৎ কথাটি তাদের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর নয়। আল্লাহ্‌র এককত্ব সম্পর্কে তারা তো প্রশ্নই করেনি। বরং নবী প্রেরণকারী ওই সত্তার যৌগিক তত্ত্ব সম্পর্কে তারা প্রশ্ন তুলেছিলো। একারণেই উভয় অবস্থায় আল্লাহ্ হবেন যাবতীয় সংযোজন, বিয়োজন, পরিযোজন, পরিবর্ধন, এক কথায় সকল যৌগিকত্বের যাবতীয় অনিবার্যতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, পবিত্র। অর্থাৎ তিনি চির অমুখাপেক্ষী আকার-নিরাকার, প্রকার-প্রকৃতি থেকে। তাঁর সাত্তিক তত্ত্ব চির অসমকক্ষ। গুণবত্তার ক্ষেত্রেও কেউ অথবা কোনোকিছু তাঁর তুল্য নয়। অংশীদার তো নয়ই। সুতরাং কেউ অথবা কোনোকিছুই তাঁর মতো নয়। তিনি যে অনুরূপ্যবিহীন। একারণেই আল্লাহ্‌র পরিচয় ধন্য সুফী-আউলিয়াগণ বলেন, আল্লাহ্‌র সত্তা-গুণবত্তা ও কার্যকলাপে কারো অথবা কোনোকিছুর কোনোই অংশ নেই। তাঁর অবোধ্য সত্তা তাঁরই গুণবত্তার সমাহার, কিন্তু তাঁর ভিত্তি নয়। বরং তিনি তাঁর গুণরাজিরও ভিত্তি। আর তাঁর গুণরাজির মূল হচ্ছে তাঁরই চিরজীবিতা (হায়াত) গুণ (সিফাত)। ওই হায়াত সিফাতের ভিত্তিতেই দাঁড়িয়ে আছে তাঁর অন্যান্য গুণ— জ্ঞান (এলেম) শক্তিমত্তা (কুদরত) অভিপ্রায় (এরাদা) বাণী (কালাম) দর্শন (বাসার) শ্রবণ (সামা) ইত্যাদি। আর হায়াত হচ্ছে তাঁরই সত্তার শাখা বা ভিত্তি। অর্থাৎ তাঁর সত্তা (জাত) যেনো মৌলিক অসমাধ্য একটি বিষয়, যার উৎস হচ্ছে তাঁরই অস্তিত্ব। সেকারণেই সুফি-সাধকগণ বলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ অর্থ লা মাওজুদা ইল্লাল্লহ্ (তাঁর বিদ্যমানতা ছাড়া আর কারো বিদ্যমানতাই নেই)। কেননা প্রকৃত বিদ্যমানতা রয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র। সমগ্র বিশ্বজগত যেনো ওই বিদ্যমানতারই ছায়া-প্রচ্ছায়া। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ই চিরস্থায়ী, মৌলিক মহাসত্য। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে ডাকে তারা মিথ্যা'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তিনি ব্যতীত অন্য সকল কিছুই ধ্বংসশীল'। অর্থাৎ সকলকিছুই নশ্বর, অনশ্বর কেবল আল্লাহ্। সুতরাং প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণবত্তার সঙ্গে সৃষ্টির অস্তিত্ব ও গুণবত্তার সাদৃশ্য রয়েছে কেবল নামত। প্রকৃতপ্রস্তাবে স্রষ্টা ও সৃষ্টি মিলিত বা পরস্পর সম্পৃক্ত নয়। যারা এমতো ব্যাখ্যা বুঝতে অক্ষম, তাদের উচিত, তারা যেনো

www.eelm.weebly.com

সুফি-আউলিয়াগণের সাহচর্য-সম্পৃক্ত হয়। তাহলে হয়তো তাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হতে পারে তত্ত্বজ্ঞানের দুয়ার। আল্লাহ্তায়ালার আনুরূপ্যহীন এককত্বই কি তাঁর চিরবিদ্যমানতা ও তাঁর প্রতিপালনযোগ্যতার জন্য যথেষ্ট নয়? সকল কিছুই যে তাঁর জ্ঞানগোচর। অথচ অজ্ঞ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে না যে, তাঁর আনুরূপ্যহীন জ্ঞান ও ক্ষমতা সকল কিছুকেই আনুরূপ্যবিহীন ভাবে সতত পরিবেষ্টন করে রয়েছে। আর এই আয়াতটি তাঁর পরিপূর্ণ সত্তা ও গুণবত্তার প্রতি ইঙ্গিতবহ।

'কুল' অর্থ বলো। অর্থাৎ হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন। 'কুল হুয়াল্লহু আহাদ' অর্থ তিনিই আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়। এই বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে নবী-রসুলগণ কর্তৃক প্রচারিত বাণীর সারমর্ম। আর এই বাণীটি এমন এক জ্ঞানগর্ভ ও মহান বাণী যে, বিশাল বিশাল গ্রন্থের বক্তব্যাবলী যেনো এর কাছে কিছুই নয়। আর এই মহান বাণীর জটিল জটিলতর ব্যাখ্যার আবশ্যকও কিন্তু নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র অবোধ্য সত্তা ও গুণবত্তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা অবশেষে অন্তর্ভূত হয় যুক্তিবিদ্যাতেই। যারা প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত, তাদের কাছে বরং এরকম জটিল আলোচনা ধ্বংসাত্মক। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আপনাকে তারা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি তাদেরকে বলুন, রূহ হচ্ছে আমার প্রভুপালকের পক্ষে থেকে একটি আদেশ'। রূহও আল্লাহ্র সৃষ্টি। সেই রূহের রহস্যোদ্ধারই যখন নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, তখন রূহের স্রষ্টার সত্তাগুণবত্তার রহস্যোদ্ধারকর্মও নিশ্চয় সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। বরং বুঝতে হবে, এ প্রসঙ্গে যে ব্যক্তি তার অক্ষমতার পরিচয় পায়, সে-ই আসলে জ্ঞানী। আর এ জ্ঞান লাভ হতে পারে কেবল তাদের, যারা পায় তাঁর ব্যবধানরহিত আনুরূপ্যহীন সামীপ্য ও সান্নিধ্য। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একবার আমরা নিয়তি সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রসুল স. সেখানে উপস্থিত হয়ে আমাদের কথা শুনলেন। দেখলাম, তিনি রোষতপ্ত। মুখমণ্ডল রক্তিমাভ। মনে হচ্ছিলো, তাঁর পবিত্র মুখাবয়বে ঘষে দেওয়া হয়েছে আনারের লাল দানা। বললেন, এ প্রসঙ্গে আলোচনা করার জন্য কি তোমরা আদেশপ্রাপ্ত? এজন্যই কি তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে আমাকে? এ সম্পর্কে তর্কাতর্কি করতে গিয়েই তো তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সাবধান! এ প্রসঙ্গে আর আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ো না। তিরমিজি, ইবনে মাজা, শোয়ায়েব থেকে আমর ইবনে শোয়ায়েব।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আল্লহুস্ সমাদ' (আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)। হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী এবং সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'সমাদ' অর্থ নির্ভীক, বেপরোয়া। হজরত বুরাইদা এবং ইবনে জারীরও এরকম বলেছেন। আমার ধারণা, সম্ভবত বর্ণনাটি সুপরিণত সূত্রজাত। আর কথাটি রূপকার্থক। কেননা তিনি জ্ঞানাতীত, বোধ্য গুণাতীত, ধারণা-কল্পনার অতীত।

www.eelm.weebly.com

শা'বী বলেছেন, তিনিই 'সমাদ' যিনি পানাহারের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে পরবর্তী বাক্যে। এরকম বলেছেন হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে আবুল আলিয়া। আবু ওয়াইল শাকিক ইবনে সালমা বলেছেন 'সমাদ' অর্থ সর্বদিক দিয়ে যার কর্তৃত্ব শিখরস্পর্শী। আবু তালহা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস শব্দটির এরূপই মর্মার্থ করেছেন। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, যিনি যাবতীয় গুণে ও কর্মে পরিপূর্ণ, তিনিই 'সমাদ'। কেউ কেউ বলেছেন, প্রতিটি কর্মের যিনি মূল উদ্দেশ্য, প্রতিটি প্রয়োজন যার উপরে নির্ভরশীল, তিনিই 'সমাদ'। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'সমাদ' ওই অধিপতি, যাঁর কাছে রয়েছে সকলের চাওয়া ও পাওয়া। তাই মানুষ প্রয়োজনে তাঁর কাছেই হাত পাতে এবং সাহায্য চায়। সুতরাং তিনিই সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য। যেমন আরবী প্রবাদে বলা হয় 'সমাদতুহু' (আমি তাকেই উদ্দেশ্য করেছি)।

কাতাদা বলেছেন, সৃষ্টি লয় হওয়ার পর যিনি অবশিষ্ট থাকবেন, তিনিই সমাদ। হজরত আলী বলেছেন, তিনিই সমাদ, যার উপরে আর কেউ নেই। এরকম বর্ণনা করেছেন ইকরামা। রবী ইবনে আনাস বলেছেন, তিনিই সমাদ, বিপদ যাকে স্পর্শ করতে পারে না। মুকাতিল বলেছেন, সমাদ অর্থ নির্দোষ।

আমার মতে সমাদ এর প্রকৃত অর্থ লক্ষ্যস্থল। 'কামুস' অভিধানে লেখা রয়েছে, সমাদ অর্থ ইচ্ছাময়। যবরযুক্ত 'মীম' দ্বারা গঠিত 'সমাদ' অর্থ অধিপতি। কেননা তাঁর দাসগণের প্রতিটি কর্মের লক্ষ্যস্থল তিনিই। আর এখানকার 'আস্‌সমাদ' পদের 'আলিফ লাম' তাই প্রমাণ করে যে, তিনি অমুখাপেক্ষিতার চরম শিখরে আরূঢ়। সাধারণ মানুষের বুদ্ধি-বিবেক দুর্দশায়িত। প্রকৃত বিশ্বাস থেকে তাদের অবস্থান অনেক দূরে। পার্থিবতাকেই তারা বানিয়ে নিয়েছে তাদের লক্ষ্যস্থল। কিন্তু সৃষ্ট কোনোকিছু লক্ষ্যস্থল হওয়ার অযোগ্য। লক্ষ্যযোগ্য কেবল তিনিই।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যাসমূহের কোনোটাই শব্দটির প্রকৃত অর্থ নয়। বরং ওগুলো আনুসাঙ্গিক। কেননা সামগ্রিকরূপে লক্ষ্যস্থল কেবল তিনিই, যিনি কারোই মুখাপেক্ষী নন, অথচ সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। সন্দেহাতীতরূপে সকল উৎকর্ষ ও পূর্ণত্ব কেবল তাঁর মধ্যেই বর্তমান। সর্বপ্রকার আধিপত্য তাঁরই কর্তৃত্বাগত। আর তিনি চিরমুক্ত ও চিরপবিত্র সকল ধরনের দোষত্রুটি, ক্ষতি-বিনষ্টি ও পানাহার থেকে। তিনি অনাদি। তাঁর স্বামী-ভার্যা-পিতা-সন্তান-বংশধর হওয়া অচিন্তনীয়। কেউই তাঁর সমান্তরাল, সমকক্ষ বা অংশীদার নয়। তিনি আনুরূপ্যবিহীন এক একক-আবিভাজ্য এমন এক সত্তা, যা জ্ঞান-ধারণা-কল্পনার অতীত।

উল্লেখ্য, 'আল্লহু আহাদ' বলার পর 'আল্লহুস্ সমাদ' বলার প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু তবু এরকম বলা হয়েছে একারণে যে, তাঁর সম্পর্কে তথাকথিত বিভিন্ন মতের লোক বিভিন্ন কথা বলে, যার কোনোটাই তাঁর আনুরূপ্যবিহীন একক সত্তার উপযুক্ত নয়। যেমন কেউ বলে, তিনি এক নন। কেউ বলে, তিনি কারো জনক,

www.eelm.weebly.com

অথবা জাত, অথবা কারো বংশসম্ভূত। এ সকল অপউক্তির মূলোৎপাটনার্থেই প্রথমে বক্তব্যটি প্রকাশ করা হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে। পরে করা হয়েছে সে সংক্ষিপ্তির বিস্তারণ। আর সে কারণেই 'আল্লহুস্ সমাদ' এর পরের বাক্যগুলো উপস্থাপনা করা হয়েছে যোজক অব্যয় ব্যতিরেকেই। 'আল্লহু আহাদ' বলার পর 'আল্লহুস্ সমাদ' বলার আর একটি উদ্দেশ্য একথা জানিয়ে দেওয়া যে, যে সত্তা সকলকিছু থেকে চিরঅমুখাপেক্ষী নন, তিনি ইবাদতেরও যোগ্য নন। আর যিনি অমুখাপেক্ষী, তিনিই মানুষের একমাত্র লক্ষ্যস্থল ও একমাত্র উপাস্য। তাঁর এমতো অমুখাপেক্ষিতা দর্শনেই তো মানুষকে বিনয়াবনতচিত্তে মেনে নিতে হয় তার একান্ত আনুগত্য। সুফী-সাধকগণ তাই লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ জিকির করার সময় বিলোপ করতে থাকেন তিনি ব্যতীত অন্য সকলকিছুকে। এটাই তাঁদের মূল সাধনা। বিষয়টি অতীব জটিল। এমতো জাটিল্যের অবসান ঘটাতে পারেন কেবল আল্লাহ্।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ' (তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি)।

মক্কার পৌত্তলিকেরা বলতো, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। ইহুদীরা বলতো, আল্লাহ্ নবী উযায়েরের জনক। আর খৃষ্টানেরা বলতো, আল্লাহ্ হচ্ছেন নবী ঈসার পিতা। এ সকল অপবিত্র উক্তির মূলোৎপাটনার্থেই এখানে বলা হয়েছে 'তিনি কাউকে জন্ম দেননি'। এমতো কর্ম তাঁর জন্য অসম্ভব। কেননা তিনি কারো সমগোত্রীয় নন, নন সমকক্ষ, সমজাতীয় বা সমান্তরাল। পিতা-পুত্র-স্বামী-ভার্যা-বংশধর তো হয় সমজাতীয়রা। আর তিনি কোনো বিষয়েই অপারগ নন যে, তাঁকে পুত্রের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। আর ক্ষয়-বিলয় হওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় যে, প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করতে হবে পুত্রকে।

'তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি' অর্থ তাঁর কোনো জনক হওয়াও অসম্ভব। কেননা এ ক্ষেত্রেও সমগোত্রীয়তা ও অমুখাপেক্ষিতা হচ্ছে অনপনেয় বাধা। তাছাড়া জাত সকল কিছুই নশ্বর। কিন্তু তিনি তো অনশ্বর। আর নশ্বরতা তো উপাস্য হওয়ারও অন্তরায়। এখন কথা হচ্ছে, এখানে অতীতকালবোধক ক্রিয়া ব্যবহার করা হলো কেনো? এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অপউক্তিগুলো ছিলো অতীতকালবোধক। তাই অতীতকালবোধক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে এখানে প্রশ্নোত্তরের সঙ্গতি রক্ষার্থে। অথবা বলা যায়, অতীতকালজ্ঞাপক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে পরের বাক্যে। তাই এভাবে এখানে রক্ষা করা হয়েছে ক্রিয়ার কালগত সাযুজ্য।

শেষোক্ত বাক্যে বলা হয়েছে—'ওয়া লাম ইয়াকুল্ লাহু কুফুওয়ান আহাদ' (এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই)। এখানে 'লাম ইয়াকুন' এর বিধেয় 'কুফুওয়ান'। এর উদ্দেশ্য 'আহাদুন'। আর 'লাহু' পদটি এখানে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে 'কুফুওয়ান' এর সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্পাকের পবিত্রতাও

www.eelm.weebly.com

অতুলনীয়, নিরূপম। একারণেই এখানে সম্পর্ককে উল্লেখ করা হয়েছে সম্পর্কযুক্ততার অগ্রে। শেষোক্ত তিনটি বাক্যই এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে যোজক অব্যয় সহকারে। এরকম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পৃথক পৃথক প্রত্যেক ধরনের অপমন্তব্যের মূলোৎপাটন করা।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি সুপরিণত সূত্রসম্ভূত হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ বলেন, আদমসন্তানেরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। অথচ এরকম করা তাদের জন্য বৈধ নয়। তারা আমাকে গালি দেয়। এটাও অবৈধ। তার মিথ্যারোপের নমুনা হচ্ছে, তারা বলে, আল্লাহ্ প্রথমবার যা সৃষ্টি করেছেন, পুনর্বার তা করতে সক্ষম হবেন না। অথচ দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা সহজতর। আর তাদের গালি হচ্ছে, তারা বলে, আল্লাহ্র সন্তান-সন্ততি আছে। অথচ আমি চির-অসমকক্ষ, এক-একক-অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী। আমি না জাতক, না জাত। আমি তো আনুরূপ্যবিহীন।

পরিচ্ছেদ ঃ হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমরা কি প্রতি রাতে এক তৃতীয়াংশ কোরআন পাঠ করতে পারো না? আমরা বললাম, তা কী করে সম্ভব? তিনি স. বললেন, সুরা ইখলাস পুণ্যের দিক দিয়ে এক তৃতীয়াংশ কোরআনের সমতুল। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন বোখারী। এরকম বর্ণনা এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আনাস থেকেও।

মাতা মহোদয়া আয়েশা বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এক লোককে কিছুসংখ্যক সৈন্যসহ এক অভিযানে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর সৈন্যদেরকে নিয়ে নামাজ পাঠকালে প্রায়শ সুরা ইখলাস তেলাওয়াত করতেন। দলটি ফিরে এলে রসুল স. সমীপে সৈন্যরা বললো, তিনি এভাবে নামাজ পড়ালেন কেনো? রসুল স. বললেন, তাকেই জিজ্ঞেস করে দ্যাখো না, সে কী বলে। সৈন্যরা তাদের দলপতিকে যখন একথা বললো, তখন দলপতি বললো, এতে রয়েছে আল্লাহ্র সত্তা ও গুণবত্তার অতুলনীয় বিবরণ। তাই আমি এ সুরাটিকে ভালোবাসি এবং অধিকাংশ সময় এই সুরা দিয়ে নামাজ পাঠ করি। রসুল স. এর কানে যখন তারা এ জবাব পৌঁছালো, তখন তিনি বললেন, তাকে বলে দিয়ো, আল্লাহ্ তাকে ভালোবাসেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. এর সুমহান সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে বললো, সুরাটি আমার খুব ভালো লাগে। তিনি স. বললেন, এই ভাল লাগাই তোমাকে নিয়ে যাবে জান্নাতে। তিরমিজি। বোখারীও এর সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার এক ব্যক্তিকে সুরা ইখলাস পাঠ করতে শুনে বললেন, অপরিহার্য হয়ে গেলো। আমরা সবিনয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কী অপরিহার্য হয়ে গেলো? তিনি স. বললেন, জান্নাত। মালেক, তিরমিজি, নাসাঈ। হজরত আনাস থেকে তিরমিজি কর্তৃক

www.eelm.weebly.com

বর্ণিত এবং উত্তম ও বিরল শ্রেণীর আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি শয়নকালে ডান কাতে শুয়ে একশত বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। তিরমিজি ও দারেমী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশতবার সুরা ইখলাস পাঠ করবে, আল্লাহ্পাক ক্ষমা করে দিবেন তার পঞ্চাশ বছরের পাপ। তবে তার ঋণের বোঝার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। অপর এক বর্ণনাতেও পঞ্চাশ বছরের পাপ মাফ করার কথা বলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে ঋণের উল্লেখ নেই। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে অপরিণত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার বললেন, যে ব্যক্তি এগারো বার 'কুল হুয়াল্লহু আহাদ' পাঠ করবে, তার জন্য বেহেশতে নির্মাণ করা হবে একটি গৃহ। আর কুড়িবার পাঠ করলে সেখানে নির্মিত হবে দু'টি প্রাসাদ। একথা শুনে হজরত ওমর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম প্রত্যাদেশবাহক! তা হলে তো আমাদের জন্য বেহেশতে প্রাসাদ নির্মিত হবে অনেক। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র দান এর চেয়েও অধিক সুপ্রশস্ত। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

সূরা ফালাক্ব

মহাপুণ্যতীর্থ মদীনাভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরাখানি। এর মধ্যে আয়াত রয়েছে ৫টি।

আবু সালেহ সূত্রে কালাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার রসুল স. কঠিন অসুখে পড়লেন। এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন, দু'জন ফেরেশতা এলো। একজন বসলো তাঁর শিয়রে, আর একজন পায়ের কাছে। দু'জনের মধ্যে কথোপকথন শুরু হলো এভাবে— এঁর কী হয়েছে? ইনি তো অসুস্থ। কী অসুখ? যাদুগ্রস্ততা। কে যাদু করেছে? ইহুদী লবীদ ইবনে আ'সাম। কীভাবে? চামড়ার ফিতায় যাদুমন্ত্র করে পাথর চাপা দিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে অমুক কূপের ভিতরে। যাও, সেটিকে বের করে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দাও। রসুল স. এর তন্দ্রা ভেঙে গেলো। ভোর হলো। রসুল স. হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে কথিত কূপে পাথরচাপা দিয়ে রাখা যাদুকৃত ফিতাটি উদ্ধার করে আনতে বললেন। তাঁরা অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্দেশ প্রতিপালন করলেন। যাদুর ফিতাটি এনে দেখা গেলো, তার মধ্যে পেঁচানো রয়েছে একটি সূতা। সূতাটিতে রয়েছে এগারোটি গিঁট। এই ঘটনাটির প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস। এই দুই সুরায় আয়াত রয়েছে মোট এগারোটি। তিনি স. একটি করে আয়াত পড়তে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে খুলে যেতে লাগলো একটি করে গিঁট। বায়হাকী তাঁর 'দালায়েলুন নবুওয়াত' গ্রন্থে এরকমই বিবরণ দিয়েছেন।

www.eelm.weebly.com

আবু নাঈম তাঁর 'দালায়েল' গ্রন্থে আবু জাফর রাজী সূত্রে লিখেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, একবার ইহুদীরা রসুল স. এর উপরে কিছু একটা করলো। তিনি স. পীড়িত হয়ে পড়লেন। শয্যাশায়ী রসুলের নিকটে অস্থির হয়ে যাতায়াত করতে লাগলেন সাহাবীগণ। এমন সময় একদিন হজরত জিবরাইল আর্বিভূত হলেন সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস নিয়ে। রসুল স. সুরা দুটি দিয়ে তাবীজ বানালেন। সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে গেলো তাঁর পীড়া।

বাগবী লিখেছেন, মাতা মহোদয়া আয়েশা এবং হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর ছিলো এক ইহুদী অনুচর। ইহুদীরা তাকে হাত করলো। তার মাধ্যমে তারা সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো রসুল স. এর মস্তকের কেশ এবং তাঁর চিরুনীর কয়েকটি দাঁত। ওগুলোর সাহায্যে তারা রসুল স. এর উপরে যাদু করে বসলো। এ অপকর্মের মূল হোতা ছিলো লবীদ ইবনে আ'সাম। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হয় সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, জননী আয়েশা সিদ্দিকা বলেছেন, রসুল স. একবার রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। রোগের প্রকোপে কখনো কখনো স্মৃতিভ্রমও ঘটতে লাগলো তাঁর। তাই কখনো কোনো কাজ না করেও তাঁর মনে হতো করেছেন। তিনি স. আল্লাহ্ সকাশে বিশেষভাবে দোয়া প্রার্থনা করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্র নিকট থেকে যা জানার দরকার ছিলো, তা আমি জেনে নিয়েছি। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! খুলে বলুন তো বিষয়টা কী? বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, দু'জন লোক এলো। একজন দাঁড়ালো আমার মাথার দিকে, আর একজন পায়ের দিকে। একজন বললো, ইনি কষ্ট পাচ্ছেন কেনো? অন্যজন বললো, ইনি যাদুগ্রস্ত। প্রথমজন বললো, কে যাদু করেছে? দ্বিতীয়জন বললো, ইহুদী লবীদ ইবনে আ'সাম। প্রথম জন— কিসের উপর। দ্বিতীয়জন— চিরুনী, চিরুনীতে লেগে থাকা চুল এবং পুরুষ খেজুর বৃক্ষের পুষ্পগুচ্ছের উপর। প্রথমজন— ওগুলো কোথায় রাখা হয়েছে? দ্বিতীয়জন— বনী যুরাইকের কূপ যরওয়ানের মধ্যে। জননী বললেন, স্বপ্ন দেখার পর রসুল স. ওই কূপের পাশে উপস্থিত হলেন। ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ্র শপথ! কূপটির পানি তো মেহেদীর মতো লাল। আর সেখানকার খেজুর গাছগুলো দেখতে ভূতের মতো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম জন! আপনি ওই লোকটিকে প্রকাশ্যে অপরাধী বলে চিহ্নিত করছেন না কেনো? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ তো আমাকে সুস্থ করে দিয়েছেন। তাছাড়া জনগণের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হোক, তা আমি চাই না। বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, যাদুর পুঁটলিটি ছিলো কূপের তলদেশে একটি পাথরের নিচে চাপা দেওয়া অবস্থায়। লোকেরা তা তুলে আনলো। দেখা গেলো ওটার মধ্যে রয়েছে রসুল স. এর মাথার চুল ও চিরুনীর দাঁত।

হজরত ইয়াজিদ ইবনে আরকাম থেকে স্বসূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, এক ইহুদী রসুল স.কে যাদু করেছিলো। ফলে তিনি স. খুব ক্লেশ ভোগ করছিলেন। এমতাবস্থায় হজরত জিবরাইল এসে তাঁকে জানালেন, এক ইহুদী আপনার উপর

www.eelm.weebly.com

যাদু করেছে। তিনি স. হজরত আলীকে পাঠিয়ে যাদুর সরঞ্জামগুলো উদ্ধার করে আনলেন। গ্রন্থিযুক্ত একটি সূতাতেই ছিলো যাদুর মূল মন্ত্র। একটা একটা করে গ্রন্থি খোলা হতে লাগলো। তিনিও একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। এভাবে সকল গ্রন্থি খোলা হলে তিনি লাভ করলেন পূর্ণ নিরাময়। মনে হলো তিনি যেনো বন্ধনমুক্ত হলেন। বিষয়টি তিনি স. ওই ইহুদীকে জানতেই দিলেন না।

জননী আয়েশা থেকে বায়হাকীর 'দালায়েল' গ্রন্থে এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, এক ইহুদী রসুল স. এর উপর যাদু করেছিলো। একটি তন্তুতে এগারোটি গিরা দিয়ে সে ওই তন্তুটিকে পাথরচাপা দিয়ে রেখেছিলো একটি কুয়ার তলায়। ফলে তিনি স. অপ্রকৃতিস্থিত হয়ে পড়লেন। কষ্ট পেতে লাগলেন খুব। এমন সময় নাজিল হলো সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস। হজরত জিবরাইল এসে যাদুর স্থানের সন্ধান দিলেন। রসুল স. হজরত আলীর দ্বারা তন্তুটি উদ্ধার করে আনলেন। সদ্য অবতীর্ণ সুরা দু'টির এগারোটি আয়াত পাঠ করে তিনি স. খুলতে সমর্থ হলেন তন্তুটির এগারোটি গিরা। অবশেষে লাভ করলেন পূর্ণ উপশম। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. যাদুরোগে কষ্ট পেয়েছিলেন দীর্ঘ ছয়টি মাস। তার মধ্যে তিন রাতের কষ্ট ছিলো অসহনীয়। ওই সময়েই অবতীর্ণ হয় ফালাক্ব ও নাস।

মুসলিম লিখেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, হজরত জিবরাইল তখন উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। হজরত জিবরাইল বললেন, পাঠ করুন বিসমিল্লাহি আরক্বীকা মিন কুললি শাই ইয়ুজীকা মিন শাররি কুললি নাফস্ আও আ'ইনিন হাসিদ আল্লাহু ইয়াশফীকা বিসমিল্লহি আরক্বীক।

সূরা ফালাক্ব ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

r বল, 'আমি শরণ লইতেছি ঊষার স্রষ্টার
r 'তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অনিষ্ট হইতে,
r 'অনিষ্ট হইতে রাত্রির অন্ধকারের, যখন উহা গভীর হয়
r 'এবং অনিষ্ট হইতে সমস্ত নারীদের, যাহারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়
r 'এবং অনিষ্ট হইতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।'

প্রথমে বলা হয়েছে 'ক্কুল আউ'জু বিরব্বিল ফালাক্ব' (বলো, আমি শরণ নিচ্ছি ঊষার স্রষ্টার)। এখানে 'আল ফালাক্ব' অর্থ অন্ধকার বিদীর্ণকারী ঊষালোক। জাবের

www.eelm.weebly.com

ইবনে হাসান, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, মুজাহিদ এবং কাতাদা এরকমই বলেছেন। 'ফালিক্বুল ইসবাহ্' আয়াতেও শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, 'ফালাক্ব' অর্থ বিদীর্ণ করা, ফেঁড়ে ফেলা। যেমন অর্থ গ্রহণ করা হয় 'ফালিক্বুল হাববি ওয়ান নাওয়া' আয়াত থেকে। যেমন সবজির বীজ ফেটে অংকুরোদ্‌গম ঘটে চারার। মেঘ ফেঁড়ে নামে বৃষ্টি। ভূমি বিদীর্ণ করে প্রবাহিত হয় স্রোতস্বিনী। গর্ভাশয় ফুঁড়ে বের হয় শিশু। জুহাক বলেছেন, এর মর্মার্থ— সমগ্র সৃষ্টি। ওয়ালেবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন 'ফালাক্ব' জাহান্নামের একটি বন্দীশালা। কালাবী বলেছেন, দোজখের একটি উপত্যকা। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নরকের একটি অন্ধ কূপের নাম 'ফালাক্ব'। ইবনে জারীর ও বায়হাকী লিখেছেন, আবদুল জব্বার খাওলাদী বর্ণনা করেছেন, একবার দামেশকে আমাদের কাছে আগমন করলেন রসুল স. এর একজন শ্রদ্ধেয় সাহাবী। তিনি রা. লোকদেরকে পার্থিব কাজকর্মে অতিরিক্ত মগ্ন হতে দেখে বললেন, এতে এদের কোনো মঙ্গল নেই। এদের সম্মুখে কি ফালাক্ব নেই? জিজ্ঞেস করা হলো, হে মাননীয় রসুল-সহচর! 'ফালাক্ব' কী ? বললেন, ফালাক্ব হচ্ছে নরকের একটি কুয়া। ওই কুয়ার মুখ উন্মুক্ত করা হলে তার ভিতর থেকে এমন উত্তপ্ত আগুন বের হবে যে, তার ভয়ে নরক নিজেই আর্তনাদ করে উঠবে।

ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেছেন, আল ফালাক্ব জাহান্নামের একটি গৃহ। ওই গৃহের দরজা যখন খোলা হবে, তখন তার ভয়াবহ উত্তাপ দেখে জাহান্নামবাসীরা ভয়ে চীৎকার করে উঠবে। জায়েদ ইবনে আলী তাঁর পিতৃস্থানীয় ইমাম হোসাইন ইবনে হজরত আলীর বরাত দিয়ে বলেছেন, আল ফালাক্ব হচ্ছে জাহান্নামের তলদেশের একটি কূপ।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 'রব্বিল ফালাক্ব' (ফালাক্বের প্রভুপালনকর্তা)। এরকম বলা হয়েছে একথাটি বুঝাতে যে, জাহান্নাম ও ফালাক্বের যিনি অধিপতি, তিনিই কেবল বাঁচাতে পারেন এদু'টোর ভয়ংকর অকল্যাণ থেকে। কাজেই এদু'টোর অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পেতে চাইলে শরণ গ্রহণ করতে হবে কেবল তাঁর।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'মিন শাররি মা খলাক্ব' (তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে)। এখানে 'মা খলাক্ব' অর্থ যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি যাবতীয় সৃষ্টির অমঙ্গল থেকে ফালাক্বের মালিকের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা চাই। উল্লেখ্য, কোনো সৃষ্টিই অনিষ্টতামুক্ত নয়। আদম অর্থাৎ অনস্তিত্বের কলংক রয়েছে প্রতিটি সৃষ্টির মূলে। তবে ওই কলংক থেকে সৃষ্টি মুক্তি নিতে পারে কেবল আল্লাহ্‌পাকের জ্যোতিসম্পাতের আলোকে আলোকিত হলে। তখন তার অপকর্ষতা রূপান্তরিত হয় উৎকর্ষতায়, যেমন আলোর উদ্ভাস ঘটলে অন্ধকারও হয়ে যায় আলো। যেমন

www.eelm.weebly.com

এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘আল্লাহ্ তখন তার পাপকে পুণ্যে পরিণত করে দেন’। রসুল স. বলেছেন, আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গিয়েছে। সে আমাকে ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্টের পরামর্শ দেয় না। আল্লামা বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহ্পাক এখানেও কেবল সৃষ্টিজগতের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় যাচনা করতে বলেছেন। আধ্যাত্মিক জগতের উল্লেখ করেননি। কেননা সেখানে কোনো অনিষ্টতাই নেই। সেখানে তো কেবল কল্যাণ আর কল্যাণ। সৃষ্টিজগতের অনিষ্টতা কখনো হয় ইচ্ছাকৃত, যেমন জুলুম, অথবা স্বভাবগত যেমন আগুনের দাহিকাশক্তি, বিষের সংহারক ক্ষমতা।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— ‘ওয়া মিন শাররি গসিক্বিন ইজা ওয়াক্বাব’ (অনিষ্ট হতে রাত্রির অন্ধকারের, যখন তা গভীর হয়)। ‘গসাক্ব’ এর আভিধানিক অর্থ পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া, ভরপুর হওয়া। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘ইলা গসাক্বিল লাইলি’ (রাত্রের আঁধার পরিপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত)। এভাবে ‘গসাক্বাল আ’ঈন’ অর্থ অশ্রুভরা আঁখি। ‘গসাক্বাল ক্বমার’ অর্থ পূর্ণ চন্দ্রালোক। কামুস অভিধানে লেখা রয়েছে ‘গসিক্ব’ অর্থ চাঁদ, এবং রাত; যখন অপসৃত হয় রক্তিম গোধূলি। ‘গাসাক্বন’ এবং ‘আগসাক্বন’ অর্থ অন্ধকার হয়ে যাওয়া।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন ‘গসাক্ব’ অর্থ প্রবাহিত হওয়া। এভাবে ‘গসাক্বাল লাইল’ অর্থ রাতের আঁধার ও কুয়াশায় ঘেরা। ‘গসাক্বাল আ’ঈন’ অর্থ অশ্রুপ্রবাহ। ‘গসাক্বাল ক্বমার’ অর্থ চাঁদের দ্রুত অস্তগমন। কেউ কেউ বলেছেন, ‘গসাক্ব’ অর্থ শীতলতা, যেমন শীতের রাত দিবস অপেক্ষা শীতল। চাঁদ সূর্য অপেক্ষা কোমল। রাত ও চাঁদকে ‘গসাক্ব’ বলা হয় এ জন্যই। এরই ভিত্তিতে চাঁদকে বলে ‘যামহারীর’— অত্যন্ত শীতল।

এখানে ‘গসাক্ব’ অর্থ হবে চাঁদ। কেননা মাতা মহোদয়া আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, এক রাতে রসুল স. আমার হাত ধরলেন এবং চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, আয়েশা! আল্লাহ্র নিকট ওই গসিক্বের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কোরো, যখন তা অস্তগামী হয়। স্বসূত্রে বাগবী।

‘ইজা ওয়াক্বাব’ অর্থ যখন তা গভীর হয়। অর্থাৎ যখন তা হতে থাকে দ্যুতিহীন, অদৃশ্য। বলা বাহুল্য, চাঁদ ক্ষয় হতে থাকে পূর্ণ কিরণময় হওয়ার পর থেকে, পূর্ণিমা রজনী থেকে।

হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী এবং মুজাহিদ বলেছেন ‘গাসাক্ব’ অর্থ রাত্রি। অর্থাৎ রাত্রির আগমনলগ্নে তার অন্ধকার আবৃত করে অপসৃয়মান আলোকে। ইবনে জায়েদ বলেছেন ‘গাসাক্ব’ অর্থ আকাশের নিচের দিকে অপসৃয়মান সপ্তর্ষিমণ্ডল, স্বল্প সময়ের মধ্যে যা চলে যায় অস্তাচলে। কারণ মানুষ বলে থাকে, সপ্তর্ষিমণ্ডলের অস্তগমনকালে প্রকোপ বাড়ে বিপদাপদের। আর সে বিপদ কেটে যায় তার উদয়কালে।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— ‘ওয়া মিন শাররিন্ নাফ্ফাছাতি ফীল উ’ক্বাদ’ (এবং অনিষ্ট হতে সমস্ত নারীর, যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়)। এখানকার

www.eelm.weebly.com

'নাফ্‌ফাছাতি' স্ত্রীলিঙ্গের বহুবচনীয় শব্দরূপ। শব্দটির বিশেষ্যপদ এখানে রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ যাদুকর নর-নারী, যারা মন্ত্রতন্ত্র পাঠ করে এবং রসুল স. এর উপরে যাদু করার সময় সুতায় ফুৎকার দেয়। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, লবীদের নির্দেশে তার কন্যারাই এরকম করেছিলো।

শেষ আয়াতে (৫) বলা হয়েছে 'ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইজা হাসাদ' (এবং অনিষ্ট থেকে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে)। এরকম করে বলা হয়েছে এখানে একথাটি বুঝাতে যে, মনের ভিতরের গোপন হিংসা দগ্ধ করে হিংসাকারীকে। কিন্তু অন্যের জন্য তা ক্ষতিকর হয় তখন, যখন সে হিংসা প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যখন সে অন্যের উপরে হিংসা চরিতার্থ করে।

উল্লেখ্য 'তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে' (আয়াত ২) কথাটির মধ্যে সব ধরনের অনিষ্টতার কথা বলা হয়েছে। তার পরেও বলা হয়েছে 'গসিক্ব' 'নাফ্‌ফাছাত' ও 'হাসিদ' এই তিনটি অনিষ্টতার কথা। এর কারণ হচ্ছে, রসুল স. এর উপরে যে যাদু করা হয়েছিলো তার মধ্যে ওই তিন ধরনের অনিষ্টতাই ছিলো। ছিলো যাদু, প্রতারণা ও হিংসা। আবার 'হাসিদিন' ও 'গাসিক্বিন' অনির্দিষ্টবাচক এবং 'আন নাফ্‌ফাছাতি' নির্দিষ্টবাচক। এভাবে এখানে তাদেরকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার কারণ হচ্ছে, লবীদের কন্যারা ছিলো নির্দিষ্ট ব্যক্তি। তাই তাদের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় যাচনা করা হয়েছে নির্দিষ্টবাচক শব্দরূপের মাধ্যমে। রসুল স. এর প্রতি হিংসাপোষণকারীরা অসংখ্য। আর তারা সুচিহ্নিতও নয়। তাই তাদের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করার প্রার্থনা উপস্থাপন করা হয়েছে অনির্দিষ্টবাচক শব্দরূপের মাধ্যমে।

হজরত উকবা ইবনে আমের বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল! আমি সুরা ইউসুফ ও সুরা হুদ পাঠ করে থাকি। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষাকারীরূপে সুরা ফালাক্বের মতো আর কিছু নেই। আহমদ, দারেমী, নাসাঈ। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

সূরা নাস

এই সুরার অবতরণস্থল ও মহাপুণ্যতীর্থ মদীনা। এর মধ্যে আয়াত রয়েছে ৬টি।

সূরা নাস ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ شَرِّ

الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۝٤ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥

مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ۝٦

www.eelm.weebly.com

r বল, 'আমি শরণ লইতেছি মানুষের প্রতিপালকের,
r 'মানুষের অধিপতির,
r 'মানুষের ইলাহের নিকট
r আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার 'অনিষ্ট হইতে,
r 'যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,
r 'জিন্নের মধ্য হইতে এবং মানুষের মধ্য হইতে।'

প্রথমে বলা হয়েছে 'কুল আঊ'জু বি রব্বিন্ নাস' (বলো আমি শরণ গ্রহণ করছি মানুষের প্রতিপালকের)। এখানে 'বলো' বলে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। আর এখানে 'রববিন্ নাস' অর্থ মানুষের প্রভুপালক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি আপনার প্রার্থনায় বলুন, মানুষের যিনি স্রষ্টা, পালয়িতা ও ব্যবস্থাপয়িতা, আমি সেই মহান প্রভুপালনকর্তারই শরণ যাচনা করি।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'মালিকিন নাস' (মানুষের অধিপতির)। অর্থাৎ সেই প্রভুপালয়িতার কাছেই আমি শরণ প্রার্থনা করি, যিনি মানুষের অস্তিত্বেরও অধিপতি।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'ইলাহিন্ নাস্' (মানুষের ইলাহের নিকট)। বাক্যটি আগের বাক্যদু'টোর বিস্তৃতি বা বিবৃতি। অর্থাৎ শরণ কামনা করি আমি সেই প্রভুপালক ও অধিকর্তার নিকট, যিনি একমাত্র উপাস্যও। কেননা পালয়িতা তো বলা হয় মাতা-পিতাকে, অথবা অন্যান্য অভিভাবককেও। আবার অধিপতি বলা হয় রাজা-বাদশাহকেও। কিন্তু উপাস্য তারা কদাচ নন। আল্লাহ্র প্রতিপালকত্ব ও অধিপতিত্ব যে অন্য কারো মতো নয়, সেকথা প্রমাণার্থেই তাই অবশেষে বলা হয়েছে 'মানুষের উপাস্যের নিকট'। অর্থাৎ তিনি পালনকর্তা ও অধিপতিই কেবল নন, তিনি উপাস্যও।

এখানকার 'আন্ নাস্' (মানুষ) পদটির নির্দিষ্টবাচক 'আলিফ লাম' সীমিতার্থক। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে সীমিত-সংখ্যকদেরকে। অর্থাৎ রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দকে। আল্লাহ্পাকের পালকত্ব, আধিপত্য ও উপাস্য হওয়ার বিষয়টি সার্বজনীন হওয়া সত্ত্বেও এখানে বিশেষভাবে তাঁদেরকে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য তাঁদের বিশেষ মর্যাদাকে প্রকাশ করতে। এর আরো একটি কারণ এ-ও হতে পারে যে, এই সুরা দুটো অবতীর্ণই করা হয়েছে রসুল স. এবং তাঁর সহচরবর্গের উপর থেকে যাদুর প্রভাবকে চিরতরে তিরোহিত করা। কেননা পাল্যজনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব বহন করতে হয় পালনকর্তাকেই। গউছুছ্ ছাকালাইন বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী তাই বলেছেন—

'যখন তুমিই আমার পৃষ্ঠদেশের আশ্রয়, তখন আমার কাছে কি লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আসতে পারে? পৌঁছতে কি পারে আমার কাছে কোনো জুলুম, যখন তুমিই আমার সাহায্যদাতা? চারণভূমির রক্ষাকর্তা যদি তা রক্ষা করতে সমর্থ হয়, আর এদিকে

www.eelm.weebly.com

হারিয়ে যায় উটের পা বাঁধার রশি, তবে কি তার জন্য এটা লজ্জার ব্যাপার নয়? অবিশ্বাসীরাও আল্লাহ্‌র প্রভুপালকত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের অধীন। তবুও আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের কোনো পরিচয়ই নেই। তাই তারা তাঁর হেফাজত থেকে বঞ্চিত। একারণেই আহযাব যুদ্ধের সময় রসুল স. তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আমাদের পালনকর্তা আছেন, তোমাদের কোনো পালনকর্তা নেই।

২ ও ৩ সংখ্যক আয়াতে পুনঃপুনঃ 'মানুষ' উল্লেখ না করে সর্বনাম ব্যবহার করলেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু তা করা হয়নি ব্যাখ্যাটিকে সুদূরপ্রসারী করণার্থে এবং রসুল স. ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামীগণের সূউচ্চ মাহাত্ম্য প্রকাশার্থে। উল্লেখ্য, সুরা ফালাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে দৈহিক দুর্বিপাক থেকে আশ্রয় গ্রহণের, যে দুর্বিপাকে পতিত হতে থাকে মানুষসহ অন্য সকল সৃষ্টি। তাই সেখানে বলা হয়েছে 'রব্‌বিল ফালাক্ব'। কিন্তু এখানে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে হৃদয়ঘটিত অনিষ্টতা থেকে, যা কেবল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেকারণেই এখানে 'রব' (প্রভুপালক)কে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে মানুষের সাথে। বলা হয়েছে 'রববিন্ নাস'। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— মানুষকে প্রবঞ্চনায় নিক্ষেপকারী প্রবৃত্তির প্ররোচনার অনিষ্টতা থেকে আমি শরণ গ্রহণ করছি কেবল আল্লাহ্‌র, যিনি মানুষের কার্যাবলীর অধিপতি এবং মানুষের একমাত্র উপাস্য।

উল্লেখ্য, এই সূরার ৬টি আয়াতের মধ্যে ৫টিতেই উল্লেখ করা হয়েছে 'আন্ নাস' (মানুষ)। সর্বনাম ব্যবহার করা হয়নি একটিতেও। এভাবে এখানে বক্তব্যকে করে তোলা হয়েছে অধিকতর উদ্দেশ্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ, সর্বনাম ব্যবহার করলে যা হতো না। তাছাড়া এখানে প্রতিটি আয়াতের উদ্দেশ্যও পৃথক পৃথক। সর্বনাম ব্যবহার করলে উদ্দেশ্যের এই পৃথকতাও প্রকাশ পেতো না। বক্তব্যটি হয়ে যেতো একমুখী। তাই কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন ১. প্রথমোক্ত 'আন্ নাস' অর্থ মানব শিশু, যারা লালন পালনের মুখাপেক্ষী। সেজন্যই বলা হয়েছে 'রব্‌বিন্ নাস' (মানুষের প্রতিপালকের) ২. দ্বিতীয় আয়াতের 'আন্ নাস' অর্থ যুবক, যারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে। রাষ্ট্ররক্ষায় তাদের প্রয়োজন অনিবার্য। তাই বলা হয়েছে 'মালিকিন্ নাস' (মানুষের অধিপতির) ৩. তৃতীয় আয়াতের 'আন্ নাস' অর্থ বয়োপ্রবীণ, যারা পার্থিব কর্মকাণ্ড থেকে অবকাশ পেয়ে নিমগ্ন হয় এক আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ ইবাদতে। তাই বলা হয়েছে 'ইলাহিন্ নাস' (মানুষের ইলাহের নিকট) ৪. পঞ্চম আয়াতের 'আন্ নাস' অর্থ পরিশুদ্ধ মানুষ, যারা শয়তানের শত্রু। তাই আশ্রয় কামনা করতে বলা হয়েছে এভাবে 'মিন শাররিল ওয়াস্‌ওয়াসিল্ খন্নাস' (যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে) ৫. ষষ্ঠ আয়াতের 'আন্ নাস' অর্থ শয়তান প্রভাবিত মানুষ। অর্থাৎ শয়তান যেমন মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, তেমনি কুমন্ত্রণা দেয় তার দলভূত মানুষেরাও। তাই তাদের অপপ্রভাব থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এখানে। রসুল স. বলেছেন, যদি অথর্ব বৃদ্ধ, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও চারণশীল চতুষ্পদ জন্তু না থাকতো, তাহলে তোমাদের উপরে নেমে আসতো শাস্তি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু

www.eelm.weebly.com

ইয়াসা, বাযযার ও বায়হাকী। এর সমর্থনে রয়েছে আরো একটি অপরিণত সূত্রবিশিষ্ট হাদিস, যা জুহুরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবু নাঈম। আবার এক আয়াতে বলা হয়েছে 'যদি বিশ্বাসী নর-নারী না থাকতো, যাদেরকে তোমরা জানতেনা ......' শেষ পর্যন্ত।

বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য সুরার বাক্যগুলোর গতিধারা থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্পাক পুনরুত্থান ঘটাতে সম্পূর্ণ সক্ষম। আর বাক্যগুলোর ধারাবাহিক বিন্যাস থেকে প্রতীয়মান হয়, মানুষের জন্য মর্যাদার স্তরও রয়েছে অনেক। তবে এমন স্তরের রহস্যভেদ করতে পারেন কেবল তাঁরা, যাঁরা আল্লাহ্র পরিচয়ধন্য। তাঁরা আল্লাহ্র বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অভিভূত হয়ে যান। হৃদয় ও মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝতে পারেন, অবশ্যই আল্লাহ্ একমাত্র প্রভুপালয়িতা, যিনি কারোরই মুখাপেক্ষী নন, অথচ সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। সৃষ্টির প্রতিটি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করেন সেই আনুরূপ্যবিহীন আল্লাহ্ই, অন্য কেউ নয়। তিনিই মালিক, মোখতার এবং সর্বাধিপতি। সুতরাং তিনিই সকলের একমাত্র উপাস্য।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'মিন শাররিল ওয়াস্ওয়াসিল খন্নাস' (আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে)। এখানকার 'আল ওয়াস্ওয়াসি' নামপদ, অর্থ কুমন্ত্রণা।হ্রস্ব থেকে অতিহ্রস্ব ধ্বনির নাম 'ওয়াস্ওয়াসা', যা কেবল হৃদয়ে অনুভব্য, শ্রুতির অতীত। এখানে 'ওয়াস্ওয়াসা' বলে বুঝানো হয়েছে শয়তানের সেরূপ সূক্ষ্ম কুমন্ত্রণাকে। অথবা বলা যায়, আধিক্য বুঝানোর জন্যই এখানে ধাতুমূলকে ব্যবহার করা হয়েছে কর্তৃবাচক শব্দরূপের স্থলে। কিংবা এখানে সম্বন্ধপদ রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ কুমন্ত্রণা প্রক্ষেপণকারী। এরকম বলেছেন জুজায।

এখানকার 'আল খন্নাস' (আত্মগোপনকারী) শব্দটি 'আল ওয়াস্ওয়াসা' (কুমন্ত্রণা) এর বিশেষণ। শব্দটির ধাতুমূল 'খনসুন' বা 'খুনসুন' অর্থ চুপিসারে পশ্চাদপসরণ করা। এটাই শয়তানের রীতি। যখন আল্লাহ্র জিকির করা হয়, তখন সে চুপিসারে পিছনে হটে যায়। এ জন্যই তাকে এখানে বলা হয়েছে 'আত্মগোপনকারী'। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শাকীক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষের হৃদয়ে আছে দুইটি কুঠরী— একটিতে থাকে ফেরেশতা, অপরটিতে শয়তান। মানুষ যখন আল্লাহ্র জিকিরে মগ্ন হয়, তখন শয়তান পিছনে সরে যায়। আর যখন মানুষ জিকির থেকে উদাসীন থাকে, তখন সে তার ঠোঁট দিয়ে হৃদয়ে ঠোকর মারতে থাকে। এভাবে হৃদয়ে প্রক্ষেপ করে প্ররোচনা। আবু ইয়ালা। তিনি এই হাদিসটি হজরত আনাস থেকেও বর্ণনা করেছেন।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'আল্ লাজী ইউওয়াস্উইসু ফী সুদূরিন্ নাস' (যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে)। একথার অর্থ— মানুষ যখন আল্লাহ্র স্মরণচ্যুত হয়, তখন শয়তান তার অন্তরে দেয় কুমন্ত্রণা। এভাবে এখানে বিবৃত হয়েছে 'ওয়াস্ওয়াসা' পদের দ্বিতীয় বিশেষণ। শব্দটিতে যের যুক্ত করা হয়েছে সে কারণেই।

www.eelm.weebly.com

শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে 'মিনাল জ্বিন্নাতি ওয়ান্ নাস' (জ্বিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে)। এই বাক্যটিও 'ওয়াস্ওয়াসা'র বিবরণ, অথবা বিবরণ 'আল্ লাজী'র। অর্থাৎ কুমন্ত্রণাদাতা জ্বিনের মধ্য থেকে যেমন হয়, তেমনি হয় মানুষের মধ্য থেকেও। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি মানুষ শয়তান ও জ্বিন শয়তানকে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু বানিয়ে দিয়েছি'। সারকথা হচ্ছে, আলোচ্য সুরার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুল এবং তাঁর অনুগামীগণকে জ্বিন ও মানুষের অনিষ্টতা থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে আল্লাহ্ সকাশে আশ্রয় যাচনা করার নির্দেশনা দিয়েছেন।

একটি সংশয় ঃ একজন মানুষ আর এক জন মানুষের হৃদয়ে তো প্রবেশ করতে পারে না। তাহলে মানুষ কুমন্ত্রণাদাতা, এরকম বলার অর্থ কী?

সংশয়ভঞ্জন ঃ মানুষও কুমন্ত্রণাদাতা। তবে তাদের কুমন্ত্রণা প্রভাব বিস্তার করে পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে। মানুষের কথা অন্য মানুষের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করেই। তখন হৃদয়ে কার্যকর হয় কুমন্ত্রণা। অথবা এখানকার 'মিনাল জ্বিন্নাতি ওয়ান নাস' কথাটি সম্পৃক্ত হবে আগের আয়াতের 'ওয়াস্ওয়াসা' পদের সাথে। অর্থাৎ মানুষের মনের ভিতর জ্বিন ও মানুষ বিভিন্ন কার্যোপলক্ষে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে। কালাবী বলেছেন, আগের আয়াতের 'কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে' কথাটিতে যে মানুষ উদ্দেশ্য 'জ্বিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে' বাক্যে দেওয়া হয়েছে তারই পরিচয়। যেনো মানুষ জ্বিন ও মানুষ উভয়ের কুমন্ত্রণার ধারক। 'নাস' অর্থ আবার জ্বিনও হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া আন্নাহু কানা রিজ্বালুম মিনাল ইনসি ওয়া ইয়াউজুনা বি রিজ্বালিম মিনাল জ্বিননি'। এই আয়াতে রিজ্বালুম মিনাল ইনসি' (অনেক লোক) বলে বুঝানো হয়েছে জ্বিনদেরকে)। বাগবী লিখেছেন, এক বেদুইন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, একদিন তার সামনে একদল জ্বিন উপস্থিত হলো। সে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কে? তারা বললো, আমরা জ্বিনদের লোক। ফাররার বক্তব্যও এরকম। আবার এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানকার বক্তব্যটি হবে— আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি জ্বিনজাতীয় শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে এবং মানুষের অনিষ্ট থেকে।

হজরত উকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমরা কি জানো, আজ রাতে এমন কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, যার মতো ইতোপূর্বে আর অবতীর্ণ হয়নি। শোনো, সদ্য অবতীর্ণ সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস। মুসলিম। আহমদের বর্ণনায় বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে, রসুল স. একবার বললেন, আমি কি তোমাদের এমন সুরা শিক্ষা দিবো না, যার অনুরূপ কোরআনে, যবুরে এবং ইঞ্জিলে নেই? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! অবশ্যই শিক্ষা দিন। তিনি তখন আবৃত্তি করলেন সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস।

www.eelm.weebly.com

উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. শয্যাগ্রহণের সময় সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস পাঠ করে দুই হাত একত্র করে তাতে ফুঁ দিতেন। তারপর দুই হাত দিয়ে মুছে ফেলতেন তাঁর পবিত্র শরীর। মুছতেন মস্তক, মুখমণ্ডল, দেহের উভয় পার্শ্ব, যতদূর হস্ত প্রসারিত করা যায়। এরূপ করতেন তিনি তিনবার। মুসলিম।

হজরত উকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেছেন, এক যাত্রায় আমি ছিলাম রসুল স. এর সহগামী। জুহফা এবং আবওয়ার মাঝখানে পথ চলার সময় হঠাৎ শুরু হলো ঝড়। অন্ধকার আমাদেরকে ঢেকে ফেললো। রসুল স. সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস পাঠ করে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করতে লাগলেন। আমাকে বললেন, উকবা! তুমিও এমন করো। আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। ওভাবে কেউ কখনো আল্লাহ্ সকাশে সাহায্যপ্রার্থী হয়নি। আবু দাউদ।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হাবীব বর্ণনা করেছেন, এক রাতে মুষল ধারায় বৃষ্টি শুরু হলো। চরাচর ঢেকে গেলো ঘোর অন্ধকারে। আমরা রসুল স. এর শরণাপন্ন হলাম। তিনি স. বললেন, বলো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কী বলবো? তিনি স. বললেন, সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস। এই তিনটি সুরা সকাল-সন্ধ্যায় তিন বার করে পাঠ করলে তোমরা রক্ষা পাবে যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে। তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ। জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস পাঠ করে তাঁর নিজের উপরে ফুঁক দিতে লাগলেন। যখন খুব বেশী দুর্বল হয়ে পড়লেন, তখন আমিই সুরা দু'টো পাঠ করে তাঁর উপর ফুঁক দিতে লাগলাম। কিন্তু ফুঁক দিতাম তাঁর হাতে, আর তাঁর হাতই বুলিয়ে দিতাম তাঁর পবিত্র শরীরে। বাগবী।

কোরআনের মাহাত্ম্য

হজরত ওসমান ইবনে আফফান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই, যে নিজে কোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়। বোখারী, মুসলিম। বায়হাকী তাঁর 'আল আসমা' গ্রন্থে অতিরিক্তরূপে সংযোজন করেছেন এই কথাটুকু— সকল গ্রন্থের উপরে কোরআনের মর্যাদা ওইরূপ, যে রূপ মর্যাদা স্রষ্টার, তার সৃষ্টির উপর।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দুই ধরনের লোকের প্রতি ঈর্ষা করা বৈধ। তার মধ্যে এক ধরনের লোক এরকম— আল্লাহ্ যাকে দান করেছেন কোরআন। আর সে দিবারাত্রি জড়িত থাকে কোরআনের সঙ্গে। অপর ব্যক্তি সে, যাকে আল্লাহ্ দান করেছেন অঢেল সম্পদ, আর সে তার সম্পদ অকাতরে ব্যয় করতে থাকে আল্লাহ্র পথে। বোখারী, মুসলিম।

www.eelm.weebly.com

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিফল দিবসে তিনটি বস্তু আরশের নিচে স্থান পাবে— ১. কোরআন, যার রয়েছে দু'টি দিক, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ২. আমানত ৩. স্বজনবন্ধন। স্বজনবন্ধন তখন চীৎকার করে বলতে থাকবে, শোনো, যে আমাকে জড়িয়ে রেখেছিলো, আজ আল্লাহ্ও তাকে তাঁর স্বজন বলে গণ্য করবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করেছিলো, আজ আল্লাহও তাঁর সামীপ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন তাকে।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে কোরআনের বাহককে বলা হবে, পাঠ করো এবং উন্নতমান হও। আবৃত্তি করো মধুর স্বরে, যেমন মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করতে পৃথিবীতে। সেখানে যেখানে শেষ করেছিলে, সে স্থানই তোমার মাকাম। আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. জ্বিন ও মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, যাকে তার কোরআন তেলাওয়াত আমার জিকির থেকে বিরত রাখে, তাকে আমি দান করব প্রার্থনাকারী অপেক্ষা অধিক। সকল বাণীর উপরে আল্লাহ্র বাণীর মর্যাদা ওই রূপ, যেরূপ মর্যাদা স্রষ্টার, তাঁর সৃষ্টির উপর।

হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআনের একটি অক্ষর পাঠ করে, সে লাভ করে দশটি পুণ্য। আর একটি পুণ্যকে করা হবে দশগুণ। আমি এরকম বলিনা যে, আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর। তেমনি পৃথক পৃথক অক্ষর লাম ও মীম। তিরমিজি, দারেমী। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম সূত্রপরম্পরাগত, বিশুদ্ধ ও বিরল শ্রেণীর। হারেছ ইবনে আওয়ার বর্ণনা করেছেন, আমি একবার এক মসজিদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম, মসজিদের ভিতরে কিছু লোক হাদিস সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করছে। আমি খলিফা হজরত আলীর নিকটে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি জানালাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি তারা এরকম করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, শোনো, রসুল স. একবার বললেন, সাবধান! অচিরেই ফেৎনার উদ্ভব ঘটবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! তাহলে আমাদের উপায় কী হবে? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র বাণী পাক কোরআন, যাতে রয়েছে অতীতের ইতিবৃত্ত, ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা। তোমাদের জীবনযাপনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে কোরআনে। এ নিয়ে কেউ যেনো কৌতুক না করে। কোনো অত্যাচারীর কারণে যদি কেউ একে পরিত্যাগ করে, তবে আল্লাহ্ ওই অত্যাচারীকে ধ্বংস করে দিবেন। কোরআনকে ছেড়ে কেউ যদি অন্য উপায়ে পথপ্রাপ্তির অভিলাষী হয়, তবে আল্লাহ্ তাকে বিভ্রান্ত করে দিবেন। এটাই আল্লাহ্পাকের সুদৃঢ় রজ্জু। এর মধ্যেই রয়েছে শুভউপদেশমূলক মহাজ্ঞান। এটা এমন মহান গ্রন্থ, যাকে মান্য করে চললে প্রবৃত্তি কখনো বক্র-পথাভিমুখী হবে না। বচনে থাকবে না কোনো দোদুল্যমানতা। জ্ঞানান্বেষীগণ এ গ্রন্থ বার বার পড়েও পরিতৃপ্ত হবে না। পুনঃ পুনঃ পাঠ করলেও

www.eelm.weebly.com

এর আবেদন কখনো ক্ষুণ্ন হবে না। এর বিস্ময় অনিঃশেষ। এটা ওই গ্রন্থ, যার সংস্পর্শে জ্বিন জাতির ঔদাসীন্য দূরীভূত হয়েছিলো। তারা বলেছিলো, আমরা এমন বিস্ময়কর বাণী শ্রবণ করেছি, যা প্রদর্শন করে সরল পথ। আমরা এর উপরে ইমান এনেছি। এই কোরআনের অনুসরণে যে কথা বলবে, সে সত্য বলবে। যে এর বিধানাবলীর উপরে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করবে, সে উত্তম বিনিময় লাভ করবে। যে এর আলোকে মীমাংসা করবে, সে সুবিচার করবে। এর প্রতি যে আমন্ত্রণ জানাবে, সে পেয়ে যাবে সরল পথ। তিরমিজি, দারেমী।

হজরত মুয়াজ জুহুনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে, কার্যকর করে কোরআনের নির্দেশাবলী, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ তার পিতামাতার মাথায় পরিয়ে দিবেন এমন মুকুট, যা হার মানাবে দিবাকরের প্রখরতাকেও, যে দিবাকরকে তোমরা প্রত্যক্ষ করো তোমাদের আপন আপন আবাস থেকে। এখন অনুমান করো ওই ব্যক্তিটির মর্যাদা হবে কী রকম? আহমদ, আবু দাউদ।

হজরত উকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, কোরআন পাক চামড়ার উপরে রেখে ওই চামড়া আগুনের উপরে রাখলে কোরআনপাক আগুনে পুড়বে না। দারেমী। হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন মজীদ পাঠ করে এবং একে বানিয়ে নেয় তার পশ্চাতের ঢাল, এতে বর্ণিত হালালকে মেনে নেয় হালাল হিসাবে এবং হারামকে মনে করে হারাম, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর তার পরিবারের এমন দশজনের জন্য তাকে শাফায়াত করবার অনুমতি দিবেন, যাদের জন্য অপরিহার্য হয়েছিলো জাহান্নাম। তিরমিজি, আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারেমী।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নামাজের বাইরে কোরআন তেলাওয়াত করা অপেক্ষা, নামাজের অভ্যন্তরে কোরআন তেলাওয়াত উত্তম। আবার নামাজের বাইরে তেলাওয়াত করা তসবীহ, তকবীর অপেক্ষা উত্তম। আর রোজা দোজখ থেকে রক্ষা পাওয়ার ঢাল। হজরত আউস সাকাফী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, না দেখে কোরআন পাঠ করার মর্যাদা এক হাজার। আর দেখে পাঠ করার মর্যাদা তার দ্বিগুণ। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, কোনো কোনো হৃদয়ে মরিচা পড়ে যায়, যেমন লোহাতে মরিচা পড়ে পানির পরশে। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! সে মরিচা পরিষ্কার করার উপায় কী? তিনি স. বললেন, মৃত্যুর স্মরণ এবং কোরআন পাঠ। উপরোল্লিখিত হাদিসত্রয় বায়হাকী সংকলন করেছেন তাঁর শো'বুল ইমানে। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ এতো অধিক একাগ্রতার সঙ্গে তাঁর নবীর কোরআন তেলাওয়াত শোনেন যে, সেরকম করে অন্য কিছুই শোনেন না। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রার অপর বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ উৎকর্ণ হয়ে কারো সুললিত স্বরের কোরআন তেলাওয়াত শোনেন না, যেমন উৎকর্ণ হয়ে শোনেন তাঁর নবীর সুললিত স্বরবিশিষ্ট সশব্দ তেলাওয়াত। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তি আমাদের দলভূত নয়, যে সুললিত কণ্ঠে কোরআন আবৃত্তি করে না।

www.eelm.weebly.com

হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, একবার আমরা কোরআন পাঠ করছিলাম। আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলো একজন অনারব গেঁয়ো লোক। এমন সময় রসুল স. সেখানে উপস্থিত হলেন। বললেন, পাঠ করো। তোমাদের প্রত্যেকের পাঠ উত্তম। অচিরেই এমন লোকের আগমন ঘটবে, যারা কোরআনের পাঠপদ্ধতি সোজা করে ফেলবে, যেমন সোজা করা হয় তীর। অর্থাৎ তারা পাঠ করবে অতিদ্রুত। আর এমতো পাঠের বিনিময় তারা এ জগতেই নিয়ে নিবে। পরজগতের পুণ্যলাভের আকাংখাও তাদের থাকবে না। আবু দাউদ, বায়হাকী।

হজরত হুজায়ফা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোরআন আবৃত্তি কোরো আরবী পাঠরীতি ও আরবী স্বরে। গায়কদের রাগ-রাগিনী এবং গ্রন্থধারীদের পাঠপদ্ধতি পরিহার কোরো। আগামীতে এমন কিছুসংখ্যক লোকের প্রাদুর্ভাব ঘটবে, যারা কোরআন আবৃত্তি করবে গায়কী ঢঙে, রাগ-রাগিনী সহযোগে। তাদের তেলাওয়াতের প্রভাব তাদের কণ্ঠনালীর নিচে পৌঁছবে না। তাদের হৃদয় হবে ফেৎনাভরা। তারাও ফেৎনায় পতিত হবে, যারা তাদেরকে ভালোবাসবে। বায়হাকী, ইবনে রযীন। হজরত উবায়দা মুলাইকি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওহে কোরআনের অধিকারী! কোরআন মজীদকে উপাধান বানিয়ো না। দিনে রাতে তেলাওয়াত কোরো। তেলাওয়াতের হক আদায় কোরো। পাঠ কোরো সুললিত কণ্ঠে, বিশুদ্ধ উচ্চারণে। এর প্রচার-প্রসারে সচেষ্ট হয়ো এবং এর বিষয়ে গবেষণাও কোরো, যেনো অর্জন করতে পারো সফলতা। পার্থিব বিনিময়প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাড়াহুড়া করে পাঠ কোরো না। এর প্রকৃত বিনিময় তো লাভ হবে পরকালে। বায়হাকী হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোরআন পাক হচ্ছে উত্তম প্রতিষেধক। ইবনে মাজা। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করছেন, রসুল স. বলেছেন, মধু ও কোরআন সকল ব্যাধির উপশমক। ওয়াইলা ইবনে আসকা বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল স. এর সুমহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে তার কণ্ঠনালীর ব্যথার কথা জানালো। তিনি স. বললেন, কোরআন পাঠ করতে থাকো। বায়হাকী। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল স. এর সুমহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, আমার বুকে খুব ব্যাথা। তিনি স. বললেন, কোরআন পাঠ করতে থাকো। আল্লাহ্ তো স্বয়ং বলেছেন 'শিফাউল লিমা ফীস্ সুদুর' (বক্ষে যা আছে তার নিরাময়ক)।

হজরত তালহা ইবনে মাতরাফের বর্ণনায় এসেছে, যখন কোনো রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পাশে বসে কোরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন দেখা যায় তার রোগের প্রকোপ কমে আসছে। রসুল স. এর যুগেও এরকম বলা হতো। আবু উবায়দা। আল্লাহ্ই প্রকৃত পরিজ্ঞাতা।

আলহামদু লিল্লাহি রববিল আ'লামীন ওয়া সল্লাল্লহু তায়ালা আ'লা খইরি খলক্বিহী মুহাম্মাদ ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজ্মাঈন। আমিন।

সমাপ্ত

www.eelm.weebly.com

ISBN 984-70240-0012-6

www.eelm.weebly.com